প্রবাসী—বৈশাখ ১৩৭৭

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৭৭

সূচীপত্র

প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩৭৭

সূচীপত্র

প্রবাসী—আশ্বিন ১৩৭৭

সূচীপত্র

প্রবাসী

ষষ্টিবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ

১৩৬৭ সাল প্রবাসী-প্রকাশনার ষষ্টিতম বর্ষ। এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটি রচনা-সম্পদে সমৃদ্ধ এবং বহুচিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত।

এতে আছে :

বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা অন্ততঃ চব্বিশটি তিন-রঙা ছবি।

অন্ততঃ কুড়িটি এক-রঙা ছবি :

এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট গল্প, উপন্যাস এবং নাটকের অলঙ্করণের জন্য অঙ্কিত ছবি :

এ ছাড়া অন্যান্য নানা বহুসংখ্যক ছবি :

প্রবাসীর আকারের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা সম্বলিত এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম :

প্রবাসী-প্রসঙ্গ শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী শান্তা দেবী, শ্রীহরিহর শেঠ, যামিনীকান্ত সোম, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়, শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সীতা দেবী, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, শ্রী[illegible]মোহন সেন।

স্মৃতিকথা (বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সম্পর্কে)—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীমতী লীলা মজুমদার, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীকান্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীমতী মনীষা রায়।

ষাট বৎসরের বাংলা সাহিত্য—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে বাংলার ষাট বৎসর—শ্রীসুধীর খাস্তগীর, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীকানাই সামন্ত।

শিক্ষায় বাংলার ষাট বৎসর—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীভূপতিমোহন সেন, শ্রীত্রিগুণাচরণ সেন, শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী।

মূল্য : ১২·৫০ টাকা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত -
প্রবাসী

প্রবাসী—কার্ত্তিক ১৩৭৭

সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
প্রবাসী

সূচীপত্র

প্রবাসী—পৌষ, ১৩৭৭

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
প্রবাসী

প্রবাসী—মাঘ ১৩৭৭

সূচীপত্র

ফাল্গুন—১৩৭৭

প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩৭৭

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
প্রবাসী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭০তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৭৭

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

লেনিন

পৃথিবীতে যে সকল যুগপরিবর্তক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও যাঁহারা আদর্শে, কর্মে ও পথ প্রদর্শনে মানবজাতিকে অগ্রগমনে বিশেষ করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন তাঁহাদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই বিপ্লববাদে বিশ্বাসী ছিলেন, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সাধারণ মানুষ নিজের পূর্ণ উন্নতি সাধন করিতে হইলে বিপ্লব ব্যতীত অন্য পথে সে কার্য্যে সফলতা অর্জন করিতে পারে না। সাধারণ মানুষের সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সাম্য, স্বাধীনতা ও মানবতার অধিকার লাভ করিবার উপকরণ ও উপায়ের একান্ত অভাব দেখা যায়। অর্থ, অস্ত্র, সংহত লোকবল কিম্বা সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত শক্তি করায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা—কোন কিছুই দরিদ্র উৎপীড়িত সাধারণ মানুষের—পক্ষে আহরণ করা সম্ভব হয় না। যাহার কিছু নাই তাহার পক্ষে জীবনের সকল আগ্রহ আকাঙ্খা হয় ভুলিয়া থাকিতে হয়, নয়ত শূন্য হাতে অধিকার আহরণ ও প্রাপ্তির সংগ্রামে অবতরণ করিতে হয়। এই যে সর্বহারাদের সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ইহারই নাম হইল বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লব মানে উৎকট উদ্দেশ্যহীনতার আস্ফালন বা অভিব্যক্তি নহে। বিপ্লবীর কোন মালমশলার আয়োজন ও ব্যবস্থা না থাকিলেও আদর্শ ও উদ্দেশ্য অতি প্রকৃষ্ট সরল ও সহজভাবেই হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। লেনিনের জীবনকাহিনীর মধ্যে এই কথার সত্যতা বিশেষ করিয়া প্রমাণ হইয়াছে। তিনি আজীবন বিপ্লবের পথেই চলিয়াছিলেন। দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ অতি দরিদ্র জনগণের সাহায্যেই তিনি রুশিয়ার মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের উচ্ছেদসাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহার মূলে ছিল তাঁহার ও তাঁহার দলের লোকেদের

সংযম এবং সুশৃঙ্খলভাবে ও স্থির নিশ্চয়তার সহিত নিজেদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিবার সংকল্প ও সাধনা। লেনিনই প্রথম বলিয়াছিলেন যে বিপ্লবকে তেমন করিয়াই শিক্ষা ও অবলম্বন করিতে হইবে যেমন করিয়া যে কোন পেশার কর্মীগণ কর্মকৌশল আয়ত্ত করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ সুকৌশল ও সাধনা সকলকার্য্যে যেরূপ প্রয়োজন হয় বিপ্লব করিতে হইলেও সেইরূপই তাহার প্রয়োজন হয়। পেশাদার বিপ্লবীগণ সেইভাবেই নিজেদের কর্ম শিক্ষা করেন যেমন করিয়া যন্ত্রবিদ যন্ত্রকৌশল অথবা চিকিৎসক চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করেন। বিপ্লবীগণের নিজেদের সীমাবদ্ধ শক্তি সামর্থ্য এবং অস্ত্রশস্ত্র পূর্ণরূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতে জ্ঞান, কৌশল ও সকলদিক বাঁচাইয়া চলার ক্ষমতা তেমনিভাবেই আহরণ ও গঠন করিয়া লইতে হয়, যেমন করিয়া বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বিশেষ জ্ঞান ও কর্মকৌশল আহরণ করিয়া থাকেন। লেনিনের পূর্ব্বে বিপ্লবীদিগের চালচলন ঢিলাঢালা ছিল এবং সেইজন্য তাঁহারা পেশাদার সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধে প্রায়ই পরাজিত হইয়া যাইতেন। কিন্তু পরে পেশাদার বিপ্লবীদল গঠন করা আরম্ভ হইলে বহুদেশেই রাজশক্তিকে পরাভূত করিয়া জনসাধারণ নিজেদের প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হ'ন।

লেনিনের নির্দ্দেশ মানিয়া চলা সহজ ছিল না। তিনি কোন মতবাদের অভ্রান্ততাতে বিশ্বাস করিতেন না। এমন কি মার্কসবাদের অর্থও ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন প্রকারের হইতে পারে; যেমন ইংলণ্ডে যে অর্থ হইবে ফ্রান্সে তাহা না হইতে পারে; এইরূপ কথাও তিনি বলিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তিনি সকল বিপ্লবীকে কথা কম বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মিথ্যাকথা বলা, প্রবঞ্চনা করা, চুরী করা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সকলকে বিশেষভাবে সতর্ক হইতে বলেন। কারণ চোর, মিথ্যা-বাদী ও প্রবঞ্চক কখনও উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না, এবং তাহার চরিত্রের গতি স্বভাবতই অন্যায় ও অবনতির দিকেই যাইতে চায়। বিপ্লববাদীর ও একান্ত অবলম্বন হইল তাহার স্বার্থপরতাব নীতিবোধ। যাহারা প্রবৃত্তির দাস তাহারা ক বিপ্লবে সফলতা অর্জ্জন করিতে পারে না।

লেনিনের ন্যায়বোধ অসাধারণ ছিল। তিনি নবগঠিত রাষ্ট্রের শক্তিশালী কর্ণধার তখন কেহ কাহারাও তাঁহার বেতন বাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা কে তিনি ইহার বিরুদ্ধে একটা তীব্র সমালোচনা ক আপত্তি জ্ঞাপন করেন। আমি এত কিছু পরি করি না যার জন্য আমার বেতন বৃদ্ধির কোন ক থাকিতে পারে। ইহা অবিলম্বে রদ করা হউ ইত্যাদি ইত্যাদি। ন্যায়বান, সংযমী, মহা পরিশ্র জ্ঞানী এই কর্মবীর রুশিয়ার জনসাধারণকে পৃথি জাতিসভার একটা অতি উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত কর দিয়া গিয়াছেন। অন্যায়, অবিচার, সুযোগ সুবি দাতে অসাম্য, উৎপীড়ন, শোষণ প্রভৃতি নাশ করিব জন্য মানবজগতে যে চিরন্তন সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে সেই মহাযুদ্ধের এক প্রধান সেনাপতি ছিলেন লেনি ভারতবাসীদিগের সহিত তাঁহার কোন সাক্ষাৎ স গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হয় নাই। ভারতবাসী তাঁহাকে এবং তিনি ভারতীয়দিগকে কখন নিকটতা দেখিতে বা চিনিতে সক্ষম হ'ন নাই; কিন্তু তা হইলেও লেনিনের আদর্শ ভারতের মানুষ শ্রদ্ধাপ অন্তরেই সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয় বিপ্লবীদিগে কর্মক্ষেত্রে যে দায়ীত্ব ইহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহ রক্ষা করিয়া চলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করা কঠিন কি অসম্ভব নহে। ভারতীয় বিপ্লববাদীদিগের মধ্যে নান স্তরের ও চরিত্রের মানুষ আছেন। ইহার কার ভারতীয় বিপ্লববাদ বহুরূপী। তাহার নেতৃত্ব, আদর্শ উদ্দেশ্য, উপায় প্রভৃতি এক প্রকার নহে। কোন দল চলেন এক পথে এবং অন্য দল সে পথ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতেই সকলকে বলিয়া থাকেন। ভারতীয় বিপ্লববাদে অভিনব, উন্নত ও প্রগতিশীল মতবাদ যেমন আছে, প্রগতিশীলতাও তেমনি প্রবলভাবেই কোন কোন দলেত

মতবাদের মূলে থাকিতে দেখা যায়। লেনিনের বিপ্লবীরা ছিল সমগ্র জাতির মতদ্বৈধবিহীন এক মন-প্রাণের পরিচায়ক দল। আমাদের দেশে দলাদলির অন্ত নাই। শাসকগোষ্ঠীর প্রভুত্ববর্জিত পূর্ণ স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়ায় বিচরণক্ষম ব্যক্তিত্ব কোথাও আত্মপ্রকাশে মত্ত; কোথাও বা কোন ধর্মসম্প্রদায় নিজের প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য দল গঠন করিয়াছে এবং অন্য কোথাও কোন অতীতের নেতৃত্ব নবকলেবর ধারণ করিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা ব্যতীত বড় বড় দল ভাঙিয়া ছোট ছোট কক্ষিদলের সংখ্যা হইয়াছে অসংখ্য; এমন কি কমুনিষ্ট দলও কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়া পারস্পরিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং ভারতের গঠনশীল রাষ্ট্রীয়দল কিম্বা বিপ্লবীগণ; কেহই জাতীয়ভাবে বৃদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছে না। এবং লেনিনের নাম জপ করিয়া নূতন মন্ত্রে দীক্ষা লইলেও ভারতের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যত যেপথে চলিতেছে তাহার গতি পরিবর্তন সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। সেই কারণেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নাম কাটিয়া সেইখানে লেনিন লিখিলেও ফলে আমরা এক জাতি এক মন প্রাণ হইয়া উঠিব বলিয়া সন্দেহ হয়। সমগ্র জাতি এক মত হইলে যে ঐক্য জন্মলাভ করে ও তাহার উপরে যে শাসনক্ষেত্রের একাধিপত্য গঠিত হইয়া উঠিতে পারে তাহার প্রভাবে ব্যক্তিত্বের অধিকার খর্ব্ব হইলেও জাতীয়তা খর্ব্ব হয় না। আমরা যেপথে চলিয়াছি সেই দিকে ক্রমশঃ ব্যক্তিত্বও হৃতশক্তি হইয়া বিলুপ্ত হইবে এবং জাতীয়তাও গড়িয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয় না।

বিক্ষোভ ও বিপ্লব

আমরা দেশবাসীরা ও আমাদিগের শাসকগোষ্ঠীর শাসনদণ্ডধারী মহারথীগণ বর্ত্তমানের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে ও বাস্তবক্ষেত্রের রাজ্যশাসন কার্য্যে নিজেদের একান্ত অসহায় ও বিপর্য্যস্ত বলে করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কারণ যে সকল রীতি, নীতি, নিয়ম ও শৃঙ্খলার বন্ধনে আমরা ভারতীয় জন-সমাজকে আবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত থাকিতে চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছি, বর্ত্তমানে সেই সকল অভেদ্য ও অলঙ্ঘনীয় পদ্ধতির প্রাচীর আর পূর্ব্বের ন্যায় মানবসমাজকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে অথবা নির্দ্দিষ্টভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য করিতে পারিতেছে না। মানুষ নানা কারণে রীতি, নীতি ও নিয়ম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে ও সেই সকলের সমাজমঙ্গল সৃজনশক্তির যাথার্থ্য লইয়া প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রীতি-নীতি কে সৃষ্টি করিয়াছে, সেগুলির সত্য উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে কিনা বা কেমন করিয়া হইতে পারে প্রভৃতি বহু কথাই আজকাল সকলে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছে। পিতা, মাতা, পতি, শিক্ষক, রাজ-কর্মচারী, পুরোহিত, বেতনদাতা, উপরওয়ালা, রাষ্ট্রীয়-দলের নেতা, গ্রামের মোড়ল, মহাজন, জোতদার, আড়তদার অথবা অন্য যে কেহ আদেশ ও নির্দ্দেশদাতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন; আজ সকলেরই আসন টলায়মান। কাহারও প্রভুত্ব, গুরুগিরি, অভ্রান্ত জ্ঞান-বুদ্ধি অথবা অপর কোনপ্রকার শ্রেষ্ঠতা আজকালকার সমাজের মানুষ আর মুখবন্ধ করিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। মানুষ সকলের অধিকার লইয়াই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে। সকলেই কোন পূর্ব্বপ্রচলিত অন্যায়ের পথে চলিয়া আসিতেছে; সকলেরই কোন অন্যায় মতলব আছে এবং সামাজিক রীতিনীতির মূল উদ্দেশ্য যাহা তাহা অবিচার, উৎপীড়ন ও শোষণ চেষ্টা উদ্ভূত; সামাজিক উন্নতি ও জনমঙ্গল তাহার গোড়ার কথা নহে। কাহারও আছে কাহারও নাই, এই অবস্থায় যাহার নাই তাহার মনে জাগ্রত হয় বিক্ষোভ ও সেই অন্যায় ও অবিচারবোধের মূল কথা হইল যাহার আছে তাহার থাকাটা অন্যায় সামাজিক রীতিজাত শোষণ ও পক্ষপাতিত্বের ফল। সুতরাং সকলের তুলনায় অল্প-সংখ্যক লোকের কিছু অধিক আমদানী থাকিবে ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা মানিতে প্রস্তুত নহেন। সকলের পাওনা সমান হইবে, একথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে চাহেন না; কারণ সকলের বিদ্যাবুদ্ধি, কর্ম্মক্ষমতা,

কার্যকৌশল, উৎপাদনশক্তি ও দক্ষতা সমান নহে। অল্প কিছু লোকের সকল দিক দিয়া কর্মক্ষমতার মূল্য অনেক অধিক। সেইজন্য সাধারণভাবে অর্থনৈতিক সাম্যবাদ প্রচারিত হইলেও কেহ তাহার প্রতিষ্ঠা চেষ্টা করিতে বিশেষ জোর লাগাইতেছেন না। বেশী পাওয়া যথাসম্ভব কমাইয়া দাও ও অল্প পাওয়াও যথাসাধ্য শোধন করিবার চেষ্টা কর। এই নীতি অনুসরণে চলিতে থাক ও দেখ কোথায় কতটা সংস্কার হইতে পারে।

বিক্ষুব্ধ যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কিছুই পা'ন না। কারণ তাঁহারা একেবারেই বেকার। সামাজিক অর্থনীতিতে যেন তাঁহাদের কোন স্থানই নাই। সমষ্টিগত সকল কাজ কারবারে তাঁহাদিগের অংশ কোথাও দেখা যায় না। এই অবস্থায় তাঁহারা বিক্ষুব্ধ হইতেই পারেন এবং বিপ্লব আনয়ন করিলেই মঙ্গল ইহাও ভাবিতে পারেন। কারণ সমষ্টিবাদের সমষ্টিতে যদি অনেকে বাদ পড়িয়া যায় তাহা হইলে সেই সমষ্টিবাদ বিকৃত আকার ধারণ করে ও তাহার সমর্থনে কাহারও বিশেষ কিছু বলিবার থাকে না। ধনতন্ত্র, শোষণপদ্ধতি, শ্রেণী-সংগ্রাম প্রভৃতি যে সকল বিষয় আমরা সমাজের উন্নতির সহায়ক বলিয়া মনে করি না সেই সকল কথাই প্রকট হইয়া উঠে যদি না বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। বেকার সমস্যাই বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণ। বিপ্লব যাহারা চায় তাহারাও প্রধানত বেকার।

চারিদিকে এখন বিক্ষোভ ব্যক্ত হইতেছে হিংস্র আক্রমণের সাহায্যে। গান্ধী, নেহেরু ও অন্যান্য দেশ নেতাদিগের চিত্রেতে অগ্নিসংযোগ করা হইতেছে। পাঠাগারের পুস্তক, স্কুল কলেজের আসবাব প্রভৃতিও ভাঙিয়া পুড়ান হইতেছে। কখন কখন ট্রাম ও বাসে আগুন লাগান হইতেছে, ট্রেন চালান বন্ধ করা হইতেছে, হরতাল ঘোষণা, কাজকর্ম বন্ধ ইত্যাদিও করা হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই অবস্থায় কি কর্তব্য তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তবে শুনা যাইতেছে যে তাঁহারা কড়া নিয়ম প্রণয়ন করিয়া সহস্র সহস্র বিক্ষুব্ধ-ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিবেন বলিয়া আলোচনা চালাইতেছেন। স্বাধীনতা নিঃশেষ করিয়া যদি এইভাবে সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সমাজে শান্তি স্থাপন করিতে হয় তাহা হলে সেই শান্তি (রাষ্ট্রীয়) মৃত্যুর শান্তির সহিত তুলনীয়। হিটলারের কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্প যেমন শান্তি আনিয়াছিল ইহাও সেইরূপে ভারতের উৎপীড়িত শোষিত অবিচার আক্রান্ত জনতাকে আরও নিদারুণ অন্যায়ের চাপে চলৎশক্তিহীন করিয়া অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিবে। উহার নাম কি শান্তি? এই অন্যায় ভারতবাসীর কখনও সহ্য করা উচিত হইবে না। কমপক্ষে এক লক্ষ ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিলে তবে হয়ত বিক্ষুব্ধ জনতা কতকটা নির্বাক নিশ্চল অবস্থায় দমন-নীতি সহ্য করিয়া জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু তাহা কখনও অধিককাল স্থায়ী থাকিবে না। বিক্ষোভ শীঘ্রই দশগুণ বৃদ্ধিলাভ করিয়া প্রবলতর আকারে দেখা দিবে। সুতরাং পি, ডি, আইন করিয়া সুবিধা হইবে না। আগুনের হল্কা দেখা না যাইলেই আগুন নাই প্রমাণ হয় না। তুষানল জ্বলন্ত থাকিলেও প্রায় অদৃশ্য থাকে। তাহা হইতে আগুন জ্বলিয়া উঠিতে সময় লাগে না। এক লক্ষ লোকের কারাবাস ব্যবস্থা করিতে মাসিক অন্ততঃ পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই টাকা যদি যথাযথভাবে ব্যয় করা যায় তাহা হইলে পাঁচ লক্ষ লোকের কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যায়। সুতরাং সামাজিক অর্থ ব্যয় করিয়া সমাজের বহু লোককে কারাবদ্ধ না করিয়া সেই অর্থে অথবা আরও অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান চেষ্টা করাই অর্থনৈতিকভাবে বুদ্ধির কথা বলা চলে।

একবার বেকার অবস্থা হ্রাসের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলে অর্থনৈতিক ধারা অন্য দিকে গতিমান হইবে। বলা যাইতে পারে এত লোক কি কাজ করিবে যাহার মূল্য সমাজ কোন ক্ষতি স্বীকার না করিয়া দিতে পারিবে। ধরা যাউক রাস্তা নির্মাণ করার ব্যবস্থা। রাস্তা

নির্মাণ করিয়া দেশের সকল গ্রাম হইতে সকল গ্রামে যাইবার ব্যবস্থা উন্নততর হইলে তাহাতে অর্থনীতির জোর বাড়িয়া চলে। রাস্তা নির্মাণ করার খরচ উঠাইতে হইলে সকলপ্রকার যানবাহনের উপর কর ধার্য্য করিয়া তাহা উঠান যায়। বাস, লরি, মোটর-গাড়ী, গরু ঘোড়া টানা গাড়ী, রিক্সা, ঠেলা এমন কি সাইকেলও কর দিতে পারে। যেসকল কর এখন আছে তাহা শতকরা দশ টাকা হারে বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। গ্রামবাসীদিগের উপর জমির খাজনা বৃদ্ধি করিয়াও সরকারী আয় বাড়ান চলিতে পারে। সর্ব্বত্র রাস্তাঘাট নির্ম্মিত হইয়া যাইলে গ্রামবাসীদের আর্থিক উন্নতি হইবে এবং তাহার ফলে সর্ব্বপ্রকার ক্রয়-বিক্রয় বৃদ্ধি হইবে।

দ্বিতীয় কথা হইল জলাশয় সংস্কার করিয়া মৎস্যের চাষ ও সেচন ব্যবস্থা করা। এই কার্য্যে যাহা ব্যয় হইবে তাহা জলাশয়ের মালিকদিগকে দিতে হইবে। মৎস্যের চাষ, হাঁস মুরগী পালন প্রভৃতি যাহারা করিবে তাহারা জলাশয় ব্যবহারের জন্য যাহা দিবে তাহার অংশ সরকারী কর হিসাবে লওয়া হইবে। এই সকল প্রতিষ্ঠান ফলের গাছ লাগাইবার ব্যবস্থাও করিতে পারে। অর্থনীতির দিক দিয়া পাকা ব্যবস্থা কি হইবে তাহা অবস্থা অনুসারে নির্দ্ধারিত হইবে; কিন্তু প্রথমে যাহা ব্যয় হইবে তাহা দিবেন রাজসরকার। কারণ তাঁহারা যদি মানুষকে কারাবদ্ধ করিতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসনের জন্য অন্ততঃ ততটা টাকা কেন দিতে পারিবেন না?

অর্থাৎ মূল সমস্যার সমাধান চেষ্টা না করিয়া যদি গায়ের জোরে সমাজসংস্কার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে সেই চেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে আমরা প্রথম হইতেই গভীর সন্দেহ প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। যদি কেহ সত্য সত্যই পাকিস্থান অথবা চীনের গুপ্তচরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাকে বা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ, এমন কি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেও আমরা আপত্তি করিব না। কিন্তু বিক্ষুব্ধ ছাত্রগণ সকলে বিদেশীর গুপ্তচর এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি না। হয়ত বিদেশীরা তাহাদের বিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে অরাজকতায় যোগদান করিতে উস্কাইতেছে; কিন্তু তাহা হইলে সেই বিদেশীদিগের অর্থপুষ্ট গুপ্তচরদিগকেই ধরপাকড় করা হউক। ছেলে-মেয়েদের উপর কোন উৎপীড়নের ব্যবস্থা করা কখনও উচিত হইবে না। অর্থনৈতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে তাহাদিগের রোগ প্রশমিত হইয়া যাইবে।

ফরাক্কা

কলিকাতা বন্দরে যথেষ্ট জল না থাকাতে বিগত আট-দশ বৎসরকাল সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। বর্ষার পূর্ব্বে যখন গ্রীষ্মকালে জল বিশেষ করিয়া শুকাইয়া আসে তখন কলিকাতার ভাগীরথীর জল শুধু কমিয়া যায় তাহা নহে তাহা লবণাক্ত হইয়া পানের ও কারখানায় ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বযুগে যখন গঙ্গায় পলি পড়া ততটা অধিক হয় নাই ও জলস্রোত গভীর ও জোরাল ছিল তখন বৎসরে ১ কোটি টনের অধিক মোটভারের জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আসিত। বিগত কয়েক বৎসরে সেই মোটভারের পরিমাণ হ্রাস হইয়া প্রায় অর্দ্ধেকে নামিয়াছিল এবং এইরূপ হইতে থাকিলে নানাভাবে কলিকাতা বন্দর ক্রমশঃ জাহাজী কারবারের পক্ষে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর বন্দরে পরিণত হইবে বলিয়া সকলে আশঙ্কা করিতে আরম্ভ করেন। ফরাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা করা হয় কলিকাতার বন্দরের জলের গভীরতা বৃদ্ধি ব্যবস্থা করিবার জন্য। এই কার্য্য করা হইবে স্থির করা হয় গঙ্গা হইতে বাঁধে জমান জল জঙ্গীপুরের খালে ছাড়িয়া ও সেই জল ক্রমে ভাগীরথীতে আনিয়া ফেলিয়া জলস্রোত ও তাহার গভীরতা বাড়াইবার আয়োজন করিয়া। ভাগীরথীর গ্রীষ্মকালে জলের অভাব ঘটে প্রায় সেকেণ্ডে ত্রিশ হাজার কিউবিক ফুটের। কিউসেক কথাটির অর্থ হইল এক সেকেণ্ডে এক কিউবিক ফুট জল বহিয়া যাওয়া। ত্রিশ

হাজার কিউসেক অর্থে বুঝিতে হইবে সেকেণ্ডে ত্রিশ হাজার কিউবিক ফুট জল বহিয়া যাইতেছে। এই পরিমাণ অতিরিক্ত জল ফরাক্কা বাঁধ হইতে ভাগীরথীতে আনিলে কলিকাতা বন্দর রক্ষা পাইবে এবং কলিকাতায় আবার পূর্ব্বের ন্যায় জাহাজ চলাচল হইতে পারিবে। কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতার অবস্থা বুঝিয়া ও ঐ বন্দরের ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিচার করিয়া ফরাক্কা পরিকল্পনা গ্রাহ্য করিয়া কার্য্যারম্ভ করান। এই বাঁধের জন্ত ১৫৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে এবং ইহার জন্ত পাকিস্থানের সহিত বহু কথা কাটাকাটি হইয়াও ইহার আবশ্যকতা নিশ্চয়ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ফরাক্কা বাঁধের সহিত ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা সরকারী বেসরকারী উভয়ভাবেই সর্বজনস্বীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

ফরাক্কা পরিকল্পনার গঠনকার্য্য যথেষ্ট দ্রুতভাবে অগ্রসর না হওয়াতে বহুবার বহু সমালোচনা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগতই সেই সমালোচনার উত্তরে সাফাই গাহিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহাদের এই কার্য্যে কোন অলসতা অথবা ইহার শীঘ্র সমাপ্তি সাধন চেষ্টায় কোন ত্রুটি কখনও দেখা যায় নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় যে ফরাক্কা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা লইয়া উপর তলায় কোন মতদ্বৈধ নাই এবং কেন্দ্রীয় সরকার ইহাকে পূর্ণভাবে সমর্থিত জাতীয় অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা বলিয়া স্বীকার করেন। সুতরাং যদি দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকার এমন কোন কার্য্য করিতেছেন যাহাতে এই পরিকল্পনার সাফল্যে বাধা পড়ে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতি স্থির নাই। নিজেদের গড়া জিনিস যদি কাহারাও নিজেরাই নষ্ট করে তাহা হইলে সেই-সকল কর্মীদের কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সন্দেহ স্বভাবতই জাগ্রত হইতে পারে। শুনা যাইতেছে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুকাল হইতে উত্তর প্রদেশে দুইটি নদ র জল বাঁধ বাঁধিয়া আটকাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন যে নদীগুলি গঙ্গার জলস্রোতবৃদ্ধির বিশেষ অঙ্গ। এই দুইটি হইল যোগরা ও সার্দা নদী। ইহারা গঙ্গার উপনদী ও ইহাদের জল যদি বাঁধিয়া অন্ত ক্ষেত্রে সেচনকার্য্যে লাগান হয় তাহা হইলে গঙ্গার জলস্রোত অনেকাংশে হ্রাস হইয়া যাইবে। যে ত্রিশ হাজার কিউসেক জলের অভাবে কলিকাতা বন্দর নষ্ট হইতে বসিয়াছে সেই ত্রিশ হাজার কিউসেক জলই উত্তর প্রদেশে দুইটি বাঁধ বাঁধিয়া গঙ্গা-বক্ষ হইতে সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই কার্য্য করা হইতেছে উত্তর প্রদেশের কোন কোন লোকসভার সভ্যদিগকে খুশী করিবার জন্ত এবং কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কথাটা কিন্তু চাপিয়া রাখিয়া কাজ করা আরম্ভ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র কমিশনকে না জানাইয়াই এই কার্য্যে মত দিয়া কার্য্যারম্ভ করাইয়াছেন; অর্থাৎ এই কাজটা যে ভাল কাজ হইতেছে না তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের অজানা ছিল না।

সেচনকার্য্য নানাভাবে করা সম্ভব হয়। উত্তরপ্রদেশে নলকূপ ও ইন্দারা বসাইয়া ব্যাপকভাবে সেচনকার্য্য সাধিত হয়। এই ক্ষেত্রে বাঁধ বাঁধিতে ও খাল কাটিতে যে অর্থ ব্যয় হইবে সেই টাকায় হয়ত আরো অধিক জল নলকূপ ও ইন্দারা বসাইলে পাওয়া যাইত। কিন্তু অর্থনীতি যখন রাষ্ট্রনীতির খেলায় চালের অঙ্গ হইয়া নিয়ন্ত্রিত হয় তখন মানুষের শুভবুদ্ধি কূটবুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। উত্তরপ্রদেশের রাষ্ট্রনেতাগণ যদি কলিকাতা বন্দরের উপর এই অন্যায় আক্রমণ করিতে কোনও লজ্জা বোধ না করেন, তাহা হইলে কলিকাতার জনসাধারণের উচিত হইবে উত্তরপ্রদেশের লোকদের যাহাতে কলিকাতায় বাস করিয়া অর্থোপার্জন করিতে অসুবিধা হয় তাহার ব্যবস্থা করা। উত্তরপ্রদেশের কয়েক লক্ষ লোক কলিকাতায় নানা কার্য্যে উপার্জন করিয়া সেই অর্থ নিজ দেশে প্রেরণ করিয়া থাকেন। কলিকাতার অবস্থা সম্বন্ধে উত্তরপ্রদেশের লোকেদের কোনও সহানুভূতি না থাকে তাহা হইলে ঐ প্রদেশবাসীদিগের উচিত হইবে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া উত্তরপ্রদেশে ফিরিয়া যাওয়া। কেন্দ্রীয় সরকারও যে কার্য্যক্ষেত্রে কোন নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিয়া

চলেন তাহাও আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। তাঁহাদিগের কোনও নীতি বা আদর্শ আছে কি?

আনবিক অস্ত্র

চীন দেশের কম্যুনিষ্ট নেতাগণ আনবিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বহুকাল হইতেই আনবিক অস্ত্র তৈয়ার করিয়া অস্ত্রাগারে জমা রাখিতেছেন; প্রয়োজন হইলে যাহাতে চীন যে কোন সামরিক-শক্তিকে ঐ অস্ত্র ব্যবহার করিয়া বিধ্বস্ত করিতে পারে। চীন এই বৎসর আনবিক বোমা যন্ত্রতন্ত্র নিক্ষেপ করিবার ব্যবহারও চূড়ান্ত করিয়াছে। চীনের নিজস্ব একটা কৃত্রিম উপগ্রহ এখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই প্রকার উপগ্রহ অনন্ত আকাশে উড়াইতে যে পারে তাহার পক্ষে একই উপায় অবলম্বন করিয়া আনবিক বোমা দূরদূরান্তরে নিক্ষেপ করা সহজ কথা। অর্থাৎ চীন এখন এক মহাদেশ হইতে আর এক মহাদেশে বোমা ফেলিতে অনায়াসেই সক্ষম হইবে। প্রধানত এই প্রয়োজন আত্মরক্ষার জন্যই চীনের প্রয়োজন হইবে কারণ, রুশিয়া ও আমেরিকা উভয় মহাশক্তিই চীনের প্রতি বর্ত্তমানে শত্রুভাব পোষণ করেন। কিন্তু চীনের যে শুধু আত্মরক্ষারই প্রয়োজন আছে এবং অপরকে আক্রমণ করিবার আগ্রহ নাই এমন কথা কে বলিতে পারে? আমরা দেখিয়াছি যে, চীনের কম্যুনিজম প্রভুত্ব স্থাপন আগ্রহ খুবই প্রবল এবং চীন অনেক দেশই ঐ মতলবে আক্রমণ ও দখল করিয়াছে যেসকল দেশের সহিত চীনের কোনও শত্রুতা নাই। এশিয়াতে কম্যুনিষ্টশক্তি প্রবলতর করিয়া তুলিবার জন্য চীন এশিয়ার যে কোনও দেশ আক্রমণ করিতে পারে এবং ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি দেশ আক্রমণ করিয়াছেও। ভারতবর্ষও এই জাতীয় চৈনিক অনুপ্রবেশ হইতে রক্ষা পায় নাই। ভবিষ্যতে যে চীন ভারত আক্রমণ করিবে না এমন প্রতিশ্রুতিও কেহ দিতে পারে না। কারণ চীনের সহিত পাকিস্থানের বিশেষ সামরিক ঘনিষ্ঠতা আছে এবং চীন পাকিস্থানের সাহায্যে ভারতের বহু জমি দখল করিয়া বসিয়া গিয়াছে। সুতরাং চীন যদি দেখে যে ভারত অসহায়, অস্ত্রবলে চীনের সহিত যুদ্ধে অক্ষম এবং অস্ত্রবলবৃদ্ধি সম্বন্ধেও অপারগ, তাহা হইলে চীন এবং পাকিস্থান ভারতের যে কোন অংশ নিজেদের ইচ্ছামত দখল করিয়া লইতে পারে এবং ভারত সেই লুণ্ঠনের কোন প্রতিবিধান করিতে না পারিলে তাহা সহ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইবে। এরূপ অবস্থায় ভারতের চির অনুসৃত পন্থা ধরিয়া চলা আর সম্ভব হইবে না। ভারতকে নিজের অস্ত্রবল বাড়াইতেই হইবে; অর্থাৎ আমরা আনবিক অস্ত্র ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞারক্ষা সম্ভব হইবে না। আনবিক অস্ত্র ভারত তৈয়ার করিতে পারে এবং করা আবশ্যক। একথা প্রবাসীতে আমরা বহুবার বলিয়াছি। শান্তির আদর্শ রক্ষা করা মহাধর্ম্ম কিন্তু যুদ্ধে অক্ষমতা ধর্ম্ম নহে, তাহা মহা পাপ। কারণ যে যুদ্ধ করিতে পারে অথচ যুদ্ধ করে না সেই ধার্ম্মিক। যে যুদ্ধ করিতে পারে না বলিয়া শান্তি রক্ষা করিয়া চলে তাহার শান্তি রক্ষা বাধ্যতামূলক তাহা কোন সুনীতি অনুসরণের ফল নহে। সুতরাং তাহা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। ভারতের এখন আনবিক অস্ত্র গঠন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ ভারত যদি নিজের শক্তিতে নিজের রাজ্য রক্ষা না করিতে পারে তাহা হইলে ভারতকে আমেরিকা অথবা রুশিয়া আনবিক ছাতা খুলিয়া বোমা-বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবে এ আশা করা বাতুলতা। কারণ ঐ দুই দেশের কোনটিই ভারতের পরম বন্ধু নহে। শুধু সুসময়ের সখা।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি সভার অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন ও আজ হইতে বহুশত বৎসর পরেও থাকিবেন। ইহার কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভার অঙ্গে অঙ্গে বিকশিত আলোকিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিতে হইলে কোন চেষ্টা করিতে হয় না। কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্প রচনা-কৌশলে অদ্বিতীয়, সঙ্গীত-রচনা ও সুরসংযোগে অতুলনীয়, সঙ্গীতনাট্য নৃত্যনাট্য প্রভৃতির অপরূপ উদ্ভাবক, চিন্তাশীল, দার্শনিক, রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতিবিদ, ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক; সকল

ভাণ্ডারের শিল্পব্যাপী, চিত্রকর, সৌন্দর্যবোধ ও রস-অনুভূতির পরম জাতা ও প্রকাশক, বহুকলাবিদ এই মহা-পুরুষের গুণাবলীর সম্পূর্ণ বর্ণনা অল্পে সম্ভব হয় না। রবীন্দ্র-প্রতিভা বহুমুখী ও তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইতে হইলে মানুষের নিজের জানভাণ্ডার পূর্ণ হইতে এমন করিয়া সাজাইয়া লইতে হয় যাহাতে মানুষের শিক্ষা নানাদিকে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যেসকল মানুষ জীবনের স্রোতে ভাসিয়া চলেন, দুই চারিটি মাত্র পরিচিতির সুযোগ যাঁহারা গ্রহণ করিতে সক্ষম এবং অন্তর্দৃষ্টি ও সুদূরের আকর্ষণবোধ যাঁহাদের ভিতর জাগ্রত হয় নাই, তাঁহাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে বা চিনিতে পারা সহজ নহে। বহু গুণাকর যিনি তাঁহার পরিচয় পাওয়াও বিচিত্র উপলব্ধির সমাবেশের ফল। জীবনস্রোতে ভাসমান অবস্থায় সে গভীর উপলব্ধি, সে বিচিত্র রস আহরণ কেমন করিয়া হইতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি ছিলেন কিন্তু তিনি আরও ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন বাংলা মায়ের সন্তান—

মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঢঙ ঢঙ।
ও পারেতে বিষ্টি এল, ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশ মাণিক জ্বালা।

অথবা

কলসী লয়ে কাঁখে, পথ সে বাঁকা—
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধু ধু
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দুধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।

এই সব বর্ণনা গভীর ভালবাসার সম্বন্ধ না থাকিলে সম্ভব হয় না। কবি বাংলার কথা বলিতে যে আনন্দ পাইতেন ও তাহা শব্দবিন্যাসে ছন্দের খেলায় যেভাবে ব্যক্ত করিতেন তাহাতেই দেখা যাইত যে তাঁহার প্রাণের টান কোন দিকে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় কবি যেসকল দেশপ্রেম-জ্ঞাপক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বাংলাদেশের প্রতি ভালবাসা আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সকল সৃষ্টি বাংলাদেশের কৃষ্টি ও আদর্শবাদকে অমরত্ব দান করিয়াছে। কোন এক ব্যক্তির প্রতি যদি কোন দেশের মানুষের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইবার কারণ কখন প্রকৃষ্টরূপে দেখা দিয়া থাকে; বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি বাঙালীর প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার প্রকাশ তাহা হইলে যতই প্রগাঢ় ও বিস্তৃতরূপ ধারণ করুক না কেন, সে অভিব্যক্তি কখনও সম্পূর্ণ হইবে না। তিনি আমাদের যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা যেরূপ সীমাহীন আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনও তেমনি কখনও শেষ হইবে না। বৎসরে, বৎসরে যুগে, যুগে, বাঙালী মহাকবির স্মৃতি পূজা করিতে থাকিবে; তাহার কোন সমাপ্তি কখনও হইবে না।

নকশাল

কোন জমির মূল্য যদি পাঁচশত টাকা হয় এবং ঐ জমি হইতে যদি বার্ষিক দুইশত টাকা মূল্যের ফসল হয় তাহা হইলে জমি হইতে খরচ-খরচা বাদ না দিয়া মূলধনের শতকরা চল্লিশ টাকা আয় হইতেছে বলা যাইতে পারে। চাষের খরচ যদি পঞ্চাশ টাকা ধরা হয় তাহা হইলে ঐ আয় খরচবাদ দিয়া দাঁড়ায় বৎসরে দেড়শত টাকা। যে চাষের ভার গ্রহণ করে তাহাকে যদি ভাগে অর্দ্ধেক দেওয়া হয় তাহা হইলে সে পরিশ্রম করিয়া ও অপরাপর ঝুঁকি বহন করিয়া পায় বৎসরে পঁচাত্তর টাকা। জমির মালিক কিছু না করিয়া শুধু মূলধনের লাভ হিসাবে পায় পঁচাত্তর টাকা—অর্থাৎ মূলধনের উপর শতকরা পনের টাকা। নকশালপন্থীদিগের মতে যে পরিশ্রম করে সেই জমির পুরা ফসল পাইবার অধিকারী। মালিক চোর এবং তাহার কিছু পাওয়া উচিত নহে। ন্যায়তঃ বলা যাইতে পারে শতকরা পনের টাকা আয় কিছু অধিক; সুতরাং উহা কমাইয়া শতকরা দশ কিম্বা ছয় করিলে যে পরিশ্রম করিয়া মূল্য সৃষ্টি করিতেছে তাহাকে অর্থ নৈতিকভাবে শোষণ করার কথা উঠে না। জমির মালিক কেহ না কেহ হইবেই। যদি ব্যক্তিগত মালিকা

(এরপর ৮৩ পাতায়)

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

রাজা পূজা পান স্বদেশে। বিদ্বান পূজা পান দেশে দেশে। সমুদ্রের এপারে ওপারে সর্বত্র রাসেলের অনুরাগী পাঠকেরা এবং অনুরাগিনী পাঠিকারা ছড়িয়ে আছেন। বিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতে রাসেলের মতো সর্বতোমুখী প্রতিভা বুঝি দ্বিতীয় নেই।

মানবসংস্কৃতির ভাণ্ডারে গ্রীকসভ্যতার পরম অবদান, বোধ করি, চিন্তার বলিষ্ঠ স্বাধীনতা। চিন্তার এই বলিষ্ঠ স্বাধীনতার ছাপ রাসেলের লেখার সর্বত্র জল্ জল্ করছে। সক্রেটিসের সগোত্র বার্ট্রাণ্ড রাসেল সত্যের দিকে মনকে চিরদিন মুক্ত রেখেছিলেন। বিচারের মুক্তধারাকে কখনও কুসংস্কারের শৈবালদলের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হ'তে দেন নি। যা যুক্তির যোপে টেঁকেনা, যার ভিত্তি শুধু ঐতিহ্য অথবা ভাবপ্রবণতা তাকে রাসেল ক্ষমা করেননি কখনও। ইবসেন যেমন সত্যের মুখোস-পরা সর্বপ্রকারের মিথ্যাকে এবং কপটতাকে এ যুগে নিদারুণ আঘাত হেনেছেন তাঁর যুগান্তকারী-নাটকগুলিকে হাতিয়ার ক'রে ঠিক তেমনি ক'রেই বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথির ভূমিকা নিয়ে অন্ধকারের শক্তিপুঞ্জের উপরে অমোঘযুক্তির শরবর্ষণ ক'রে গেছেন। প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, নর-দেবতার অপমান এবং মানুষের বিধিদত্ত অধিকারে পদক্ষেপ—এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাসেল মুহূর্তের জন্য শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেননি কখনো।

হাঁ, চিন্তার বলিষ্ঠ স্বাধীনতার দিক থেকে সক্রেটিস, হুইটম্যান, ইবসেন, রাসেল—এঁরা সমগোত্রের। রাসেলের ভাবের রাজ্যে পর্য্যটন করতে হ'লে বাপ-ঠাকুর্দার কাছ থেকে শৈশবে পাওয়া ধারণাগুলিকে ছাড়বার মতো দুঃসাহসী হওয়া দরকার। ভাবপ্রবণতার দ্বারা চিত্তকে আবিষ্ট হ'তে দিলে রাসেলের সাথের সাথী হওয়া চলবেনা। সমস্ত গোঁড়ামিকে, অন্ধ সংস্কারকে, সমস্ত dogma কে দূরে রেখে বিচারের হাত ধরে, বিজ্ঞানকে জীবনতরীর হালে বসিয়ে সত্যকে জানবার জন্য কূলহীন সাগরবক্ষে যারা ভেসে যেতে পারে, যারা সত্যকে জেনে স্বর্গসুখ ছাড়তে প্রস্তুত, নরকের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তৈরী,—সেই সংস্কারমুক্ত সত্যান্বেষী চিন্তাবীরদের পুরোভাগে রাসেলকে আমরা নিশ্চয়ই স্থান দিতে পারি।

যথার্থ সংস্কৃতির মধ্যে চিত্তের সংকীর্ণতার কোন স্থান নেই। সংস্কৃতির মধ্যে খাদ নেই যেখানে মানুষ সেখানে সমগ্র বিশ্বের নাগরিক; প্রকৃত সংস্কৃতি মানুষকে সাহায্য করে মানবসমাজকে সমগ্রভাবে বুঝতে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীগুলি কোন্ কোন্ আদর্শকে অনুসরণ করলে সুখী হবে, তারও একটা ধারণা জন্মে দেওয়াও কি প্রকৃত সংস্কৃতির কাজ নয়? খাঁটি সংস্কৃতির সম্পদে যে মানুষ ধনী সে কি বর্তমানকে দেখতে পারে অতীত এবং ভবিষ্যত থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে? বার্ট্রাণ্ড রাসেলের পাণ্ডিত্যের মধ্যে একদেশদর্শিতার কোন বালাই ছিলনা। অথবা এই কথা বলাই বোধ হয় ঠিক যে মনকে সর্বপ্রকারের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত রাখবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন তিনি। তাঁর চেতনায় ছিলো সমগ্র মানবপরিবারের শুভকামনা। গণিতের দুরূহসমস্যাগুলির সমাধানের ব্যাপারে জ্ঞানপিপাসু চিত্তের যেমন অসীম উৎসাহ ছিলো আফ্রিকার অরণ্যের গহনে পলায়মান শোষিত নির্য্যাতিত নিগ্রোদের জীবনকাহিনী জানবার কৌতূহলও তাঁর মনে ছিলো সমভাবেই জাগ্রত। জানার এই কৌতূহল না থাকলে সাম্রাজ্যবাদের এবং পুঁজিবাদের উপরে এমন প্রচণ্ড আঘাত রাসেল কখনও হানতে পারতেন না।

রাজনীতি অর্থনীতি, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, গণিত, ইতিহাস —জ্ঞানের কোন্ ক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধিৎসুর অনলস উদ্ভত জাগ্রত মন নিয়ে তিনি দিক থেকে দিগন্তরে পর্যটন করেন নি? জ্ঞানরাজ্যের এই বে-পরোয়া মাঙ্গো পার্ক অথবা লিভিংস্টোন্ তাঁর মানসপরিক্রমার পরিচয় রেখে গেছেন গ্রন্থের পর গ্রন্থে। আর এই সব গ্রন্থ পাঠ করে যে কথাটি অভ্যাস হ'য়ে আমাদের মনে জাগে তা হচ্ছে রাসেলের নিজের ভাষাতেই: "an essential part of wisdom is a comprehensive mind" রাসেল ছিলেন জ্ঞানী এবং জ্ঞানী ছিলেন ব'লেই তাঁর গণ্ডী-ভাঙা মন খণ্ডকালের মধ্যে সীমিত থাকতে পারেনি, নিজেকে কোন একটা বিশেষ দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেও আবদ্ধ রাখতে পারেনি। যেমন নিজের দেশের ইতিহাসকে দেখেছেন তেমনি দেশদেশান্তরের পতন-অভ্যুদয়ের কাহিনীকে জানতে চেষ্টা করেছেন. তাদের গভীরতম আশা আকাঙ্খাকে জানবার সাধনায় ব্রতী থেকেছেন, তাদের অধিবাসীদের মধ্যে নিজের চেতনাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছেন, যেখানে তাদের গৌরব প্রাপ্য সেখানে গৌরব দান ক'রতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। এতো বড়ো একটা সংবেদনশীল, প্রজ্ঞায় প্রোজ্জ্বল, উদার comprehensive mind তাই পাশ্চাত্যাভিমানের ক্ষুদ্রতাকে কখনও বরদাস্ত করতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে ইটন, হ্যারো, রাগবির পাবলিক স্কুলগুলির শিক্ষাদানসম্পর্কে তিনি যে-মন্তব্য করেছেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য। বলেছেন: As an engine of imperialism, the public schools have failed. সাম্রাজ্যবাদের বাহন-হিসাবে পাবলিক স্কুলগুলি ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে কারণ এই স্কুলগুলি ছেলেদের মনকে প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল করবার তত চেষ্টা করেনি যতখানি তারা চেষ্টা করেছে ছাত্রদের মনে ক্ষমতার এবং কীর্তির আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। এইসব অভিজাতঘরের ছেলেরা ভালো খেলোয়াড় তৈরী হয়েছে, অন্যদের উপরে প্রভুত্ব করতে শিখেছে, সাম্রাজ্যবাদের ঝাণ্ডা বহন করে উপনিবেশগুলিতে শাসকের ভূমিকা নিয়েছে। মনের মধ্যে তাদের দুর্বিনীত অহংকার—পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকচ্ছটায় তারা প্রাচ্যের অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত ক'রে দেবে। প্রাচ্যের বিদ্বজ্জনেরা যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অকুণ্ঠ অর্ঘ্য দিতে অস্বীকার করেছে সেখানে হ্যারো-ইটনের স্কুলেপড়া শ্বেতাঙ্গপ্রভুদের আরক্ত চোখেমুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। প্রাচ্য সংস্কৃতি ব'লে যে একটা সংস্কৃতি থাকতে পারে—সে সম্পর্কে তারা তো একেবারেই অজ্ঞ। মানুষের অধিকার যত সঙ্কীর্ণ তাদের ঔদ্ধত্য ততই প্রবল। যুদ্ধজাহাজের কামানগুলির দ্বারা তার প্রতিপন্ন করবেই, যে-হেতু তারা বিজেতার ভূমিকায় সেই হেতু সংস্কৃতির দিক থেকেও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সকল তর্ক-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। পাশ্চাত্যের হস্তীমূর্খ শাসকদের সঙ্গে প্রাচ্যের মহামনা পণ্ডিতদের কথোপকথন শুনে রাসেলের মনে কি ধারণা হয়েছে তা অকপটে তিনি প্রকাশ করেছেন। রাসেল তাঁর Education and the social order গ্রন্থে লিখেছেন:

বিলাতের পাবলিক স্কুলের পণ্ডিতম্মন্য সেরা সেরা লোকদের আমি দেখেছি প্রাচ্যের বিদ্বজ্জনদের প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হতে এবং নিজেকে একজন ইংরেজ ভাবতে লজ্জায় আমার কর্ণমূল রাঙা হ'য়ে উঠেছে।"

সমগ্রবিশ্বের মধ্যে চেতনার আনন্দময় সম্প্রসারণ যদি নির্ভেজাল কালচারের লক্ষণ হয় তবে বার্ট্রাণ্ড রাসেল যে রোমাঁ রলাঁর মতোই সংস্কৃতির মূর্তবিগ্রহ ছিলেন, এতে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? জ্ঞানের যে গভীরতা ও প্রসারতা থাকলে সমগ্র মানবসমাজকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা যায় প্রজ্ঞার সেই গভীরতা এবং প্রসারতা এ যুগে রাসেলের মধ্যে আমরা যতটা দেখেছি ততটা খুবই অল্প লোকের মধ্যে দেখা গেছে। শুধু এই যুগে কেন, অতীতের বেশ কয়েকটা শতাব্দীর মধ্যে রাসেলের মতো এমন বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে কয়জন এসেছেন? অগাধ পাণ্ডিত্যের নমুনা ইতিহাস ঘাঁটলে দুর্লভ হবে না। কিন্তু যাকে বলে comprehensive mind, যে-মন দেশ-কালের সীমা-

রেখা লঙ্ঘন ক'রে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠির বিচিত্র সাংস্কৃতিক জীবনের মর্মকোষে প্রবেশ করতে পারে সেই উদার, বলিষ্ঠ, প্রবলগতি-বেগসম্পন্ন চিত্তের বিশালতার অধিকারী ছিলেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল।

এমন অতুলনীয় মানসিক সম্পদে ধনী ছিলেন বলেই রাসেলকে আমরা কোন বিশেষ দেশের, বিশেষ কালের, বিশেষ ধর্মের অথবা বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ ব'লে চিহ্নিত করতে পারিনে। একটা বাঁধা-ধরা থিয়োরির বা মতবাদের সুস্পষ্ট চিহ্নে তাঁর জীবনদর্শনকে চিহ্নিত করা যায় না। তিনি ছিলেন সত্যের। তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য চিন্তার বলিষ্ঠ স্বাধীনতায়। J. B Bury তাঁর গ্রীসের ইতিহাস যেখানে সমাপ্ত করেছেন সেখানে আছে: "গ্রীসের রিপাব্লিকগুলি একটা কাজ করেছে যে-কাজকে কালজয়ী বলা যেতে পারে। মানবজাতিকে তারা বিচিত্র সম্পদের সন্ধান দিয়েছে, সর্বোপরি তারা দিয়েছে, পৃথিবীতে যার মূল্যকে পরম মূল্য বলা যায় সেই চিন্তার নিঃশঙ্ক স্বাধীনতার সম্পদ।" রাসেলের কাছ থেকেও এসেছে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে অনেক বহুমূল্য সম্পদ। কিন্তু এই সম্পদরাশির মধ্যে যার মূল্য আর সবদের [illegible]লোকে ছাড়িয়ে আছে তা হচ্ছে গ্রীক সাধারণতন্ত্র-[illegible]গুলির যৌবনে আমরা যা পেয়েছি অর্থাৎ Fearless [fr]eedom of thought.

Sir Percy Nunn তাঁর Education : Its [D]ata And First Principles-এর মধ্যে লিখেছেন: "এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে মানুষের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত তার জীবনের ছোটবড়ো সব ঘটনাকে নিরাসক্ত যুক্তির বা বিচারের স্বচ্ছ আলোয় রঞ্জিত করা।" রাসেল এবং নান্ উভয়েই যুক্তির [ক্ষ]মতাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। আর এই স্বীকৃতি যারা দিয়েছেন তাঁদের অপরাজেয় বাণীর মাধ্যমে যা আমাদিগকে পৌঁছে দেয়না কোনো আপ্তবাক্যের [illegible] শিক্ষতার মধ্যে। তাঁরা আমাদিগকে যে-[illegible] ফুরিয়ে যায় না কোনো গির্জার, মন্দিরের বা মসজিদের চতুঃসীমানার মধ্যে এসে। হৃদয়হীন কোনো পণ্ডিতদের পুঁথি ঘেরা নীরক্ত জগতের সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও কি সেই রাস্তা আমাদিগকে পৌঁছে দেয়? মার্কিন কবি হুইটম্যান তাঁর বন্ধুদের কানে আরামের কোন আশ্বাসবাণী শোনান নি। তিনি বলেছেন, "No friend of mine takes his ease in my chair". "আমার কেদারায় বসে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে, এমন বন্ধু আমার একটিও নেই।" বার্ট্রাণ্ড রাসেলও তাঁর কোনো বন্ধুর জন্য কার্পেট-মোড়া ঘরে আরামকেদারার ব্যবস্থা করে রাখেন নি। সত্যের চরণমূলে জীবনকে নিবেদন করে দিয়েছেন যাঁরা বিধাতা তাঁদের ভাগ্যে তো আরাম লেখেন নি। ভগবান প্রত্যেক মানুষের মনের সামনে দুটো বস্তু রেখেছেন। এই দুয়ের একটাকেই শুধু আমরা বেছে নিতে পারি—। যিনি সত্যকে বেছে নেবেন তাঁর ভাগ্যে আরাম নেই। যিনি আরামকে বেছে নেবেন তাঁরও কি সাধ্য আছে সত্যের পথে অবিচলিত থাকবার? পিতা-পিতামহেরা অভ্রান্ত ব'লে মনে করতেন যে-ধারণাগুলিকে,—তাদের সত্যে সন্দেহ পোষণ করা মানে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নেওয়া। পুঁথিতে যা লেখা আছে তার উল্টো কথা বলতে গেলে পাদ্রীরা যাবে চটে, সমাজের প্রবীণ-পাকারা আসবে তেড়ে, পুরুতপাণ্ডারা উঠবে তেলে-বেগুনে জ্বলে। কি দরকার সত্যের অন্বেষণে অতীতের শান্তিময় নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয় বর্জন ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার? তাই সত্যের দিকে যাদের মুখ নেই, যারা মুখ ফিরিয়ে আছে আরামের দিকে 'ফাল্গুনী' নাট্যকাব্যে তাদের মুখ দিয়ে কবি বলিয়েছেন: "পিছনের কোনো বালাই নেই রে, যত মুস্কিল এই সামনেটাকে নিয়ে।"

জড়তার বিন্দুবিসর্গ ছিলোনা রাসেলের মনের জীবনে। মনের গঠনের দিক থেকে নচিকেতার সঙ্গে ছিলো তাঁর অদ্ভুত সাদৃশ্য। নচিকেতার সত্য জানার সেই পবিত্র পরম তৃষা! কেউ বলে মৃত্যুর পরে মানুষ থাকে, কেউ বলে থাকে না। শোনা কথায়, জনশ্রুতিতে বিশ্বাস ক'রে ঠাণ্ডা হ'য়ে বসে থাকবার ছেলে নচিকেতা

মন। যম নচিকেতার সামনে রেখেছিলেন আমাদের প্রলোভন। বলেছিলেন, "বিত্ত নিয়ে তৃপ্ত থাকো নচিকেতা, মৃত্যুর কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।" নচিকেতা রাজসিংহাসনের দিকে ফিরেও তাকান নি। নারীমায়ায় মুগ্ধ হ'লেন না। দীর্ঘজীবনও কামনা করলেন না। তাঁর আত্মার সত্যকে জানার ব্যাকুলতা। অজানাকে জানবার জন্য তিনি মরিয়া। আর কিছুতেই তাঁর প্রয়োজন নেই। নচিকেতার মর্মস্পর্শী উপাখ্যানটির মধ্যে প্রাচীন ভারতের জ্ঞানের তৃষার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে।

রাসেলের মধ্যেও নচিকেতার এই জ্ঞানতৃষ্ণা। শাণিত বিচার-বুদ্ধির হাতে হাত রেখে একটা নিঃশব্দ খোলা মনের বিপুল অনুসন্ধিৎসায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে রাসেল চলেছেন তাঁর মানস-পরিক্রমায় সত্যকে জানতে। অজানার যে আকর্ষণ মেরুযাত্রীকে নিয়ে যায় শ্বেত ভল্লুকের আর পেঙ্গুইনের দেশে অজানা থেকে অজানায় সেই একই আকর্ষণে রাসেল চলেছেন অজানার গর্ভ থেকে জ্ঞানের দিব্যসম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ-যাত্রায়।

"মানুষ সত্যকে যত ভয় করে এমন ভয় বুঝি আর কিছুকেই সে করেনা পৃথিবীতে। সর্বনাশকে, এমন কি মৃত্যুকেও বুঝি সে এত ভয় করে না। সত্য বিপর্য্যয় ঘটানোর শক্তি রাখে, সত্য প্রলয়ঙ্কর, সত্য ভীষণ। সত্য একচেটিয়া অধিকারের প্রতি নিষ্করুণ, আমাদের অভ্যাসগুলি যত আরামেরই হোক না সত্যের কাছে তাদের মার্জ্জনা নেই। সত্য কোনো বিধি-নিষেধের ধার ধারে না, কোনো কর্তৃত্বের কাছে মাথা নোয়ায় না, যুগ-যুগান্তের পরীক্ষিত জ্ঞানকে উপেক্ষা করতে সঙ্কুচিত হয় না। সত্য নরকের অতলস্পর্শী গহ্বরের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে এবং একটুও ভয় পায় না। সত্য মহান, সত্য জগতের জ্যোতি, সত্য মানবের প্রধান গৌরব।"

ভাষা রাসেলের ভাষা। কী রাজনীতির ক্ষেত্রে, কী শিক্ষার ক্ষেত্রে, কী ধর্মের ক্ষেত্রে রাসেল রেখে গেছেন স্বাধীন মনের বলিষ্ঠ চিন্তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। একটা বলিষ্ঠমনের সমস্ত শক্তি দিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারতেন ব'লেই যুদ্ধের বর্বরতাকে তিনি কোনো মতেই সমর্থন করতে পারেন নি। রাজনীতিতে মোটেই কোনো আগ্রহ নেই, ছবি আঁকার দিকে মনের ঝোঁক আর ঝোঁক—এমন একজন ফরাসী শিল্পীর হঠাৎ ডাক পড়লো সমরক্ষেত্রে জার্মানদের গুলি ক'রে মারবার জন্য। তার বন্ধুরা তাকে বলছে, জার্মানরা নাকি মানবসমাজের কলঙ্ক। একজন জার্মান সুরশিল্পীকেও ডাকা হোলো যুদ্ধক্ষেত্রে দুই ফরাসীকে গুলি করবার জন্য। সুরশিল্পীও রাজনীতির প্রতি সমভাবে উদাসীন। কেন দুইজনে ঘোষণা করতে পারবেনা, পরস্পরকে হত্যার ব্যাপারে তারা কোনো অংশ নেবেনা? যুদ্ধ যারা ভালোবাসে তারা লড়াই নিয়ে মত্ত থাক। বেচারা চিত্রকর আর সুরশিল্পীকে ওর মধ্যে জড়ানো কেন? কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা এমনই প্রবল যে নিজের দেশের লোককে হত্যা করলে রাষ্ট্র হত্যাকারীকে ফাঁসিতে লটকাবে এবং বিদেশীদের হত্যা করতে অস্বীকার করলে তাকেও ফাঁসিতে ঝোলাবে। রাষ্ট্রের এই বর্বরতা রাসেলের অগ্নিগর্ভ লেখাথেকে আঘাতের পর প্রচণ্ড আঘাত।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধনের উপাসনাকে তিনি সুনজরে দেখতে পারেন নি। তিনি কি পূজার মধ্যে দেখেছিলেন ভিতরের মানুষটার পরাজয়। ভিতর থেকে প্রাণ শুকিয়ে যায়, পৌরুষকে আশ্রয় ক'রে বিচিত্র কর্মধারার মধ্যে মানুষ যখন আত্মপ্রকাশ করতে পারে না তখন জীবনধর্মে বঞ্চিত মানুষ Religion of material goods'কে অবলম্বন করে। অন্তর থেকে আনন্দ আহরণের উৎসগুলি যখন শুকিয়ে গেলো তখন সিগার, শ্যাম্পেন আর মোটরকারকে সে আশ্রয় করলো অন্তরের বিপুল দৈন্যকে বাহিরের উপকরণরাশি দিয়ে ভরিয়ে তুলবার দুরাশায়। পুঁজি-বাদের (capitalists) মধ্যে রাসেল দেখেছিলেন মানবজীবনের প্রতি একটা নিদারুণ অবজ্ঞার প্রকাশ। It is reverence towards others that is lacking in capitalism রবীন্দ্র-নাথের 'রক্তকরবী'তে যক্ষপুরীর বিশু ক্ষুব্ধ ক'রে বলছে কাড়ুলালকে, 'ওদের কাছে আমি মানুষ নই, কেবল সংখ্যা।" দেশীর ভাগ মানুষে

মধ্যেই একটা সহজপ্রবণতা আছে কিছু তৈরী করবার। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে, মজুরির জন্য শ্রমের মধ্যে কিছু তৈরী করবার প্রবণতা চরিতার্থতা-লাভের সুযোগ পায় খুবই অল্প। ধনতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্বকে নিষ্পেষিত ক'রে দেয়।

পৃথিবীতে দারিদ্র্যের দুঃখ ভোগ করলে সেই দুঃখভোগের পুরস্কার মিলবে মৃত্যুর পর স্বর্গসুখের মধ্যে—খ্রীষ্টানধর্মের এই মতবাদকে রাসেল সমর্থন করেন নি। পাপীরা কৃতকর্মের জন্য নরকে পুড়ছে—ধর্ম যাজকদের নরকের এই ধারণার মধ্যে রাসেল দেখেছেন শাস্তিদাতা ভগবানের নিষ্ঠুরতার প্রকাশ। পাদ্রীসাহেবরা শান্তির সময়ে অহিংসার যতই জয়গান করুন রণদামামা বেজে উঠলেই তাঁরা যুদ্ধের সমর্থক হ'য়ে দাঁড়ান এবং জোরের সঙ্গে বলতে থাকেন ঈশ্বর আছেন তাঁদেরই পক্ষে। অর্থাৎ যাঁরা মনে করেন, যুদ্ধে পাইকারিভাবে 'নরহত্যা মূঢ়তার পরিচায়ক তাঁদের নির্যাতনে ধর্ম-যাজকদের সায় দিতে কোথাও বাধেনা।

রাষ্ট্রের আকাশস্পর্শী স্পর্ধা, রাষ্ট্রনেতাদের ক্ষমতার দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য, আত্মকেন্দ্রিক মুনাফাখোর পুঁজিবাদীদের মানবজীবনের প্রতি অমার্জনীয় অশ্রদ্ধা, শিক্ষার নামে ছাত্রদের সর্বোদ্ধত কূপমণ্ডূক বানাবার অপচেষ্টা, অহিংসার মুখোসপরা খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের জিঘাংসা—রাসেল গাণ্ডীবধারী অর্জুনের মতোই জীবনের প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রে অন্যায়ের, অবিচারের এবং মিথ্যার ও কপটতার বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। এইযে 'military attitude of the soul, আত্মার এই যে ক্ষাত্রভাব, একেই এমার্সন বলেছেন শৌর্য বা Heroism. রাসেলের ব্যক্তিত্বে এই শৌর্য্যের পরিমাণময় প্রকাশ দেখেছি আমরা। ইবসেনের লেখায় মুকুরে যেটি প্রতিফলিত দেখেছি রাসেলের লেখাতেও তাই-The same curt and awful contempt for lies and for shams, the same vision of a Heaven beyond"

বলা বাহুল্য, সর্বপ্রকারের মিথ্যার, মূঢ়তার এবং কপটতার বিরুদ্ধে যিনি ক্ষাত্রভাবে উদ্দীপ্ত হ'য়ে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছিলেন তাঁকে বিস্তর দুঃখ, বিস্তর নির্যাতন সইতে হবে, এটাই ছিলো স্বাভাবিক। ইবসেনের An Enemy of the People নাটকের নায়ক পৌরপতিদের মিথ্যার মুখোস খুলে সত্যকে ফাঁস ক'রে দিয়েছেন। ক্রুদ্ধ জনতা এই অপরাধে স্বার্থান্বেষী নেতাদের প্ররোচনায় তাঁর নতুন ট্রাউজার ছিঁড়ে দিয়েছে। ডাক্তারের ঐ একটাই নতুন ট্রাউজার। স্ত্রী ক্যাথারিনের খেদোক্তি শুনে নায়ক ডাঃ স্টক্‌ম্যান বলেছেন: You should never wear your best trousers when you go out to fight for freedom and truth" স্বাধীনতার এবং সত্যের জন্য যখন লড়াই করতে যেকবে কখনো ভালো কাপড় পরে বেরিও না।" রাসেলকে অন্যেরা কতখানি বুঝেছিলো জানিনে। কিন্তু যারা পুঁজিপতি, প্রচুর সম্পত্তির মালিক তারা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলো, জীবনের আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রে যে নবধর্মে তারা দীক্ষা নিয়েছে সেই" religion of material goods" একটা অত্যন্ত ঠুনকো জিনিষ। বিংশশতাব্দীর ধন-পূজা রাসেলের কাছথেকে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। সর্বোদ্ধত যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রনেতাদের প্রভুত্বের মূলে তীক্ষ্ণ-সমালোচনার কুঠারাঘাত করতেও পশ্চাত পদ হন নি তিনি। তারাই বা তাঁর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাইবে কেন? যুদ্ধ-বিগ্রহ, দিগ্বিজয়, ধন-বৈভব ক্ষমতার মোহ, পার্থিব কীর্ত্তি—এই নিয়ে যাদের জগৎ তারা যুদ্ধের বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদের শত্রু, কাঞ্চন-পূজার নির্মম সমালোচক রাসেলের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারাকে এবং কর্মধারাকে রীতিমতো ভয় করতেন এবং এইটাই স্বাভাবিক। পাণ্ডা-পুরুত-পাদ্রীরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলো, এই মানুষটার এবং তাদের মধ্যে মিলনের কোনো সম্ভবনাই নেই। হয় তাঁরা থাকবেন, নয় রাসেল থাকবেন। আপোষ মীমাংসা অসম্ভব।

হাঁ, একজন বীর বটে—যেন সপ্তরথীপরিবৃত মুমূর্ষু অভিমন্যু সত্যের জন্য, মানবের স্বাধীনতার জন্য পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, রাষ্ট্রশক্তি, পৌরোহিত্য, আভিজাত্যের দুর্জয় অহংকার অহংকারের সমস্ত শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। সর্বপ্রকারের অন্ধশক্তির

ত রাসেলের মনোভাব কজিয়েছে, a warlike
itude. রাষ্ট্রকে "the most serious menace
liberty" বলতে তাঁর লেখনীতে একটুও বাধলোনা!
military attitude of the soul ই তো Heroism.

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর কুৎসিৎ চেহারা তিনি
লো করেই দেখেছিলেন, উৎকট জেদবুদ্ধির দ্বারা
ত আমাদের এই জগত অধঃপতনের পথে নামতে
মতে কোথায় এসে পৌঁছেছে তার পরিচয় ভালো
রেই তিনি পেয়েছিলেন, মানুষের স্বভাবের মধ্যে
প্ত দানবটাকে চিনতে তাঁর একটুও ভুল হয় নি।
নি জানতেন এমন একটা পৃথিবীর পাগলাগারদে
ই বাস করছেন যেখানে আজ যীশু খ্রীষ্ট লণ্ডনে
ব্যের নিয়ে উপস্থিত হলে Scotland Yard এর
দৃষ্টি আর সি, আই ডি, তাঁকে সন্দেহের চোখে
তো আর আমেরিকা তাঁকে নাগরিকের অধিকারে
ত করতো যেহেতু অস্ত্রধারণে তিনি রাজী হতেন
। রাসেল তাঁর Education and the Social
der গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই ব্যঙ্গোক্তি করে লিখেছেন:
l the Western nations admire Christ
o would certainly be suspect to Scotland
ard if He lived now, and would be refused
nerican citizenship on account of His
willingness to bear arms.

কিন্তু আগেই বলেছি রাসেলের মন ছিল Compre-
nsive mind. মানুষের স্বভাবের গভীরে আছে
ত্বের তৃষ্ণা। বিত্তে তার আত্মা তৃপ্ত হবার নয়।
বনকে চুটিয়ে ভোগ করে যাবো, এ জীবন জন্তুর
বন, মানুষের নয়। আর আত্মকেন্দ্রিক ভোগসর্বস্ব
ভব জীবনের মধ্যে দিনযাপন কখনও মানুষকে
পর্যাপ্ত দুঃসহ ক্লান্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারে?
বলে মানুষ নৈতিক অধঃপতনের চরমে পৌঁছে গেলেও
নিশ্চয় করে জানে, কোন্ জিনিষ সুন্দর এবং কোন্
জিনিস অসুন্দর, কোন্ আদর্শ বর্জনীয় এবং কোন্ আদর্শই
বরণীয়। এবং সে আরও জানে, ভালো হয়েই আসে,
যা মহৎ এবং সুন্দর তাই করা তার পক্ষে উচিত।
প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কখনো না কখনো আসে মহৎ
কিছু করবার প্রেরণা। হৃদয়-আকাশের উপর দিয়ে
সেই শুভ চিন্তাগুলি চলে যায় বড়ো বড়ো শ্বেতপক্ষ
বিহঙ্গমের মতো। মানুষের স্বভাব সম্পর্কে রাসেল
অনুপম ভাষায় বলেছেন, Man is a child of earth
and of the starry heavens মানুষ নক্ষত্রখচিত আকাশ
আর মাটির পৃথিবী—এ দুইয়ের মিশ্রণে তৈরী। তার
মনটা আলো-ঝলমল স্বর্গ আর নরকের আঁধার গুহা—
এ দুয়ের মাঝামাঝি ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থান করছে।

রাসেল বিশ্বাস করতেন, বিবেকানন্দের এবং
মেটার্লিঙ্কের মতোই বিশ্বাস করতেন চালচলোয়ালে
সজ্জিত, বর্মপরা মানুষগুলি বাইরে থেকে যতই মূর্খ
ব'লে প্রতীয়মান হোক, বর্মের তলায় লুকানো রয়েছে
আঁখির জল, শিশুর হাসি মানুষের ক্ষুধিত আত্মা মানুষের
দ্বারে দ্বারে করাঘাত ক'রে বেড়াচ্ছে একটু ভালোবাসার
অমৃতের জন্য। মানুষকে ভালোবাসা যায়, মানুষের
উপরে বিশ্বাস রাখার মধ্যে মূঢ়তার বিন্দুবিসর্গও নেই।
তাই দিকে দিকে যখন নিষ্ঠুরতার, হানাহানির এবং
ঘৃণার প্রাদুর্ভাব তখনও রাসেল ছিলেন অপরাজেয়
আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন পরস্পরকে ঘৃণা ক'রে
কোথাও আমরা পৌঁছাতে পারবো না তিনি লিখেছেন
"আমি জানি না কাউকে ঘৃণা করা যায় কি না। কিন্তু
নিশ্চয় আমি জানি, যাদের দুষ্ট লোক বলে আমি মনে
করি তাদের প্রতি ঘৃণা মানবজাতির উদ্ধারের পথ নয়।"
রাসেল দেখতে চেয়েছিলেন একটা নূতনতর জগতের
জন্ম। এই নূতন জগতে থাকবেনা দারিদ্র্য, থাকবেনা
মানুষের দিগন্তপ্রসারী দুর্গতি, থাকবেনা পুঁজিবাদের
নিষ্ঠুরতা, পৌরোহিত্যের প্রভুত্ব রাষ্ট্রশক্তির নিষ্করুণ চাপে
মানুষের স্বাধীনতার সলিল সমাধি। এই নূতন জগতে
মানুষ দেবে মানুষকে অকুণ্ঠ সম্মান। রাসেল বিশ্বাস
করতেন, জগৎ-জোড়া দুর্গতির কারণ বহির্জগতে
কোথাও নেই, আমাদের জানার পরিধির সঙ্কীর্ণতাও নয়।
আমরা পূর্বপুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী জানি।

হাদের দুঃখকে বিজ্ঞানের কৌশলে আমরা প্রায় অবলুপ্ত করে দিয়েছি। তবুও আজ আমরা কত অসহায়বোধ করছি।

রাসেল বলেছেন পৃথিবীর এত দুঃখের কারণ রয়েছে আমাদের ভিতরের প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে. আমাদের জন্মাগত কতকগুলি ভাবের আবেগ, যৌবনে মর্মের গভীরে সঞ্চারিত কতকগুলি হৃদয়বৃত্তির উচ্চাকাঙ্ক্ষায়। আমাদের শৈশবে, যৌবনে ধ্বংসাত্মক মূঢ় প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষাদীক্ষার দোষে আমাদের অবচেতনায় বাসা বাঁধে এবং অবচেতন মনের সেই উন্মত্ত হৃদয়বৃত্তিগুলির সর্বনেশে খেলাই আজকের পৃথিবীটাকে একটা পাগলাগারদে পরিণত করেছে।

রাসেল বলছেন: আমাদের সমস্যার প্রতিকার হচ্ছে মানুষগুলিকে আবার সুস্থ স্বাভাবিক ক'রে তোলা, তাদের মন থেকে হিংসার বিষাক্ত বীজাণু অপসারিত করা। কী ক'রে আমরা মানুষগুলিকে মূঢ়তা থেকে, মুক্ত করতে পারি? রাসেল জবাব দিয়েছেন, and to make men sane they must be educated sanely. মানুষগুলিকে আমরা যদি ঠিকমত শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারি, আমাদের শিক্ষায় যদি আদর্শগত কোন গলদ না থাকে, মানুষ মানুষের জীবনকে শ্রদ্ধা করতে শিখবে, যুবকদের সব চেয়ে গুরুতর ধর্ম যুদ্ধে নরহত্যা করা—এই মূঢ় ধারণা থেকে তাদের মন মুক্তি পাবে।

যারা পৃথিবীর এইরূপান্তর ঘটানোর কাজে পথিকৃৎ-এর ভূমিকা নেবে - রাসেল বলছেন, নিঃসঙ্গতার বাধার, দারিদ্র্যের এবং নিন্দার সম্মুখীন তাদের হতেই হবে। রাসেল বলছেন, They must be able to live by truth and love. সত্য আর প্রেম, এই হবে তাদের জীবন-পথের পাথেয়।

রাসেল ছিলেন সত্যাশ্রয়ী এবং উদারচেতা মানব-প্রেমিক। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের পেয়ালা দুঃখে ছিলো ভরা। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের সুখে বঞ্চিত হোলেও রাসেলের মনে একটা গভীর সান্ত্বনা ছিলো যাকে তিনি দৈবসুখের চেয়ে অনেক মূল্য দিতেন। রাসেল লিখে গেছেন, আমার ছেলেমেয়েদের ভাগ্যে সুখের ঘাটতি হোলেও একটা বোধ তাদের মনে জাগরূক থাকবে: তারা তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছে জগতের দুঃখের অংশ কমানোর জন্ত।"

বুদ্ধের করুণকোমল হৃদয় নিয়ে রাসেল এসেছিলেন পৃথিবীতে। তাঁর জীবন-তরণীর হালে ছিল প্রজ্ঞা। সেই জীবন অনুপ্রাণিত ছিলো মৈত্রী এবং করুণায়। সীজারের আর নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁর কোন সহানুভূতি ছিলনা। তিনি ছিলেন লিঙ্কন আর বুদ্ধের সগোত্র।
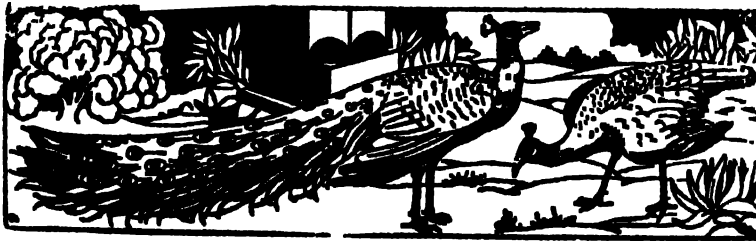
নেড়া

(গল্প)

সুবোধ বসু

এই জিনিষটা নেড়ার মধ্যে আগে থেকেই ছিল। এখন বিকশিত হয়েছে মাত্র।

ছেঁড়া তালি-দেওয়া ময়লার পলেস্তারা পড়া হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া গেঞ্জি বা আদুড় গা এই সাজে তাকে বহু বছর দেখেছি। হয় গুলতি ছুঁড়ে চড়ুই পাখির গায়ে বা বাড়ির আলসে বা ঘুলঘুলিতে তাগ করছে, নয়তো রাস্তার কুকুরগুলিকে ঢিল মেরে পাড়া মাথায় তুলছে বা কর্পোরেশনের রাস্তার আলোর বাল্ব চুরমার করতে পেরে খুশিতে হি হি করে হাসছে। পাচীল টপকে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে ফুল বা পুরোগাছ চুরি এতো কিছুই নয়। আর কিছু যদি করার না থাকে, তবে হয়তো প্রতিবেশীদের দরজায় খড়িমাটি দিয়ে ছবি এঁকে দেবে বা দেওয়ালে পেরেক ঠুকে একটা গর্ত বানাবার চেষ্টা করছে।

এসব বজ্জাতি সত্বেও মানুষটা কিন্তু সে কম আকর্ষণীয় ছিল না।

'কয়েকটা পয়সা দিন না, সমরদা। অফিস থেকে তো আসছেন, অনেক পয়সা আছে পকেটে।'

'অফিস থেকে রোজ পয়সা পাওয়া যায় না কিরে? কি করবি পয়সা দিয়ে? বিড়ি খাবি?'

'ধোৎ।' লজ্জায় সংকুচিত হয়ে নেড়া জবাব দিয়েছে। 'বিড়ি খাই নাকি? একটা ঘুড়ি কিনব। সারা দুপুর সুতো মাঞ্জা দিয়েছি। অথচ ঘুড়ি কেনবারই সুযোগ নেই।

এরকম অনেকবারই আদায় করেছে আর প্রায় কোনও সময়ই যে অছিলাতে চাওয়া সেই কাজে ব্যয় করেনি। কিন্তু ওর হাসিতে বা চটপটে কথাবার্তা বা সবিনয় ব্যবহারের মধ্যে কোথায়ও একটা আকর্ষণ আছে যার জন্ত ওর কোনও ব্যবহারই অমার্জনীয় মনে হয় নি।

আমাদেরই রাস্তায় আমাদের বাড়ি থেকে অল্প দূরে নিজস্ব একটা ছোট খোলার ঘরে নেড়ার বাবা নলিনের ঝালাইয়ের দোকান ছিল। যেখানে সারাক্ষণ নলিন হাঁপর চালাত আর দুনিয়ার যাবতীয় ভাঙা জিনিষ মেরামত করত ঝালা দিয়ে। নেড়াকে শাসন করবার তার সময় বা ক্ষমতা কোনওটাই ছিল না। অনেক চেষ্টা করেছে সে ছেলেকে নিজের ব্যবসা শেখাতে। চেপে ধরলে না করতে পারে না নেড়া। দু একদিন গিয়ে বসেছে। তারপর সরে পড়েছে।

কাসতে কাসতে একদিন যখন নেড়ার বাবা মারা গেল, নেড়া তখন চৌদ্দ বা পনেরো। বাড়িতে মা আছে, কিন্তু খাওয়া নেই। নেড়ার খুব এসে যায় না তাতে। এখান থেকে ওখান থেকে সে খাওয়া জুটিয়ে নিতে পারে। কিন্তু মা কেঁদে কেটে জোর জার করে তাকে দু'রাস্তা দূরে সাহাবাবুদের মোটর-গ্যারাজে ঢুকিয়ে দিলে সাহাগিন্নীদের ধরে। সেখান থেকে একাধিকবার পালিয়ে এসেছে নেড়া। কিন্তু তার মা ও নাছোড়বান্দা। বাবুদের হাতে পায়ে ধরে আবার কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসেছে। বাপের কাছ থেকে নেড়া ঝালাবিদ্যাটা শিখেছিল। বার বার পালানো সত্বেও বাবুরা যে আবার তাকে চাকরিতে নিতেন, হয়তো তার প্রধান কারণ এইটাই।

এসব তো পুরাণো ইতিহাস। ইতিমধ্যে নেড়ার মা মারা গেছে। নেড়া হাফপ্যান্ট ছেড়ে ড্রেন পাইপ আর টি-শার্ট ধরেছে। পৈতৃকবাড়ি বেচে দিয়ে গ্যারাজেই বাস করা শুরু করেছে। কিন্তু পুরাণো পাড়ার মায়া সম্পূর্ণ কাটাতে পারেনি। ভাঙা জীপ বা ঝরঝরে মোটরগাড়ি স্বয়ং চালিয়ে নিতান্ত বেপরোয়া গতিতে এ রাস্তা দিয়ে হামেশাই সে যাতায়াত করে। সঙ্গে বন্ধুবান্ধব—চেহারা দেখে মনে হয় গ্যারাজেরই।

মুখে জলন্ত সিগ্রেট। হাওয়ার দৌরাত্ম্য এড়াবার জন্য মাথায় রঙিন সিল্কের রুমাল বাঁধা। উদ্দেশ্যটা পুরোনো প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বাহবা আদায় করা, এতে সন্দেহ থাকার উপায় নেই।

কিন্তু তার এই উন্নতির মধ্যেও যখনই দেখা হয়েছে, 'সময় দা' বলে বিনীত আত্মীয়তা প্রকাশ করেছে এবং আকর্ষণীয় হাসিটিও বাদ দেয়নি। তবে কচিৎ দেখা হয়েছে। দু'চার সেকেণ্ডের মামুলি সম্ভাষণের পর যে যার পথে চলে গিয়েছি। নেড়ার হালের খবর প্রায় কিছুই জানিনে।

এই খবর দিলে তার ছেলেবেলার বন্ধু ভাস্কর। একই পাড়ায় থাকত, একই ইস্কুলে পড়ত দু'জনে। নেড়া সিক্সথ্ ক্লাসে দু'বার আটকে যাবার পর পড়া ছেড়ে দিলে। ভাস্কর স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে' জুনিয়ার ক্লার্কের কাজ পেয়েছে বাবার সাবেক অফিসে। রুটিনে-বাঁধা জীবনে নেড়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা শিথিল হয়ে উঠেছে। তবু পুরোণো বন্ধুর খবরাখবর রাখে।

'শুনেছেন তো। আজ দুপুরে নাকি পুলিশ এসেছিল আমাদের রাস্তায়। নেড়ার খোঁজে।' একদিন রাস্তায় দেখা হলে ভাস্কর বললে।

'তাই নাকি? কেন?' প্রশ্ন করলাম।

'কলেজস্ট্রীটের মোড়ে পরশু যে ট্রাম পোড়ান হয়েছে, সেই সম্পর্কে।'

'সে কিরে?' আমি অবাক হয়ে বললাম। 'সেখানে ছিল নাকি নেড়া সেদিন। গ্যারেজে দুপুরে কাজ থাকে না?'

'কলেজস্ট্রীটের মোড় তো এক ঢিলের রাস্তাও নয়।' নেড়ার বন্ধু জবাব দিলে। 'শহরের যেখানেই ট্রাম বা বাস পুড়ুক, নেড়া ভেল্কীবাজীর মতো সেখানেই হাজির!...'

'বটে! কোনও পার্টি, মানে পোলিটিক্যাল পার্টির লোক নাকি?' প্রশ্ন করলাম।

'যারাই পোড়াতে চায়, ও তাদেরই লোক!' ভাস্কর মুখ টিপে হাসল। 'একদিন জেলে যাবে নির্ঘাৎ। ক'দিন আর নবরত্ন গা-ঢাকা দিতে পারবে!...'

ভবানীপুর গিয়েছিলাম অফিসের কাজে বেলা আড়াইটে আন্দাজ। এক ঘণ্টার মধ্যে যা করবার সমাধা হলো। হাজরার মোড় থেকে যখন দোতলা-বাস চাপলাম তখন পৌনে চারটেও নয়। পার্কে প্রকাণ্ড ছাত্র সভা দেখে গিয়েছিলাম। এখন দেখি জায়গাটা প্রায় খালি।

কিন্তু শহরের আবহাওয়ায় কখন কি পরিবর্তন হবে, কিছুই ঠিক নেই। রাস্তা ফাঁকা ছিল। বাস চলে এসেছে প্রায় বিনা বাধায়। ডালহৌসী স্কোয়ার বড় জোর কুড়ি মিনিটের পথ। এমন সময় সহসা দাঁড়িয়ে পড়লেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তখন নজরে পড়ল আমাদের সামনে আরও বাস, ট্রাম, মোটরগাড়ি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পার্কের সভা মিছিল হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ায়ই নাকি এই কাণ্ড।

এখন যাবার তাড়া যতই জরুরী হোক, ধৈর্য্য ধরে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তাতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু আবহাওয়া ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। কাঁদুনে বোমার আওয়াজ এসেছে। জগুবাজারের মোড়ের দিক থেকে ছুটে পালিয়ে আসছে জনতা। সংঘর্ষের নানা ভয়াবহ বিবরণ সভয়ে প্রচার করতে করতে যাচ্ছে। মনে হলো যেন কটা ফায়ারিং এর শব্দ। একদল বিক্ষোভকারী দৌড়ে আসছে এদিকে। ফুটপাথের জনতা শঙ্কিত হয়ে পথ করে দিচ্ছে। স্লোগানের সঙ্গে 'মার' 'মার' শব্দ উঠেছে চারদিকে।

আমাদের বাসটা ছিল সকলের পেছনে। ছুটন্ত জনতার মধ্য থেকে সাত আট জন উনিশ কুড়ি বছরের ছেলে মারমুখী ভঙ্গিতে আমাদের বাস এর পা-দানির দিকে ছুটে এলো।

দোতালায় বসেছিলাম। একতলা থেকে শিশু স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলিত আতঙ্ক কোলাহল শুনতে পেলাম। 'নেমে যান' 'নেমে পড়ুন' 'ওরে বাবারে, একি বিপদ রে'! সীট কাড়। ঢাল পেট্রোল!' অদ্ভুত ঐক্যতান!

উপরতলার যাত্রীদেরও না নেমে উপায় নেই। ভালো ছেলের মত সুড় সুড় করে সবাই নেমে পড়ছে

বাস ছেড়ে। মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করে আমিও সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। পেছনে যাত্রী আর কেউ ছিল না, তাই না দৌড়লেও চলে। অসীম কৌতূহল মনে। কাগজে বহুবার পড়েছি এই ঘটনার বিবরণ। কিন্তু নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য ক'জনের হয়।

পেন্‌-নাইফ্‌ দিয়ে একটা ছেলে পুরু গদির মধ্যে প্রাণপণ খোঁচা মেরে চলেছে। তার সঙ্গী ঢালছে পেট্রোল একটা সোডার বোতল থেকে। তৃতীয় ফস্‌ ফস্‌ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালছে আর গদির ক্ষতস্থানে বুলোচ্ছে সেগুলি। কিন্তু ধুৎ করতে পারছে না। 'আরে শীগগির কর, নইলে শালারা এসে পড়বে যে।' চতুর্থ তাড়া দিয়ে বললে।

'সরে যাও, সরে যাও'। বলে চিৎকার করতে করতে জ্বলন্ত মশাল হাতে কালো রুমালে মাথা ও কপাল ঢাকা একটা নতুন ছোকরা প্রায় ঝড়ের মত একটা ঝাপটা মেরে বাসে লাফিয়ে উঠল রাস্তা থেকে। ভাগ্যিস তিন সিঁড়ি উপরে দাঁড়িয়েছিলাম, নইলে এই নররূপী সাইক্লোনের ধাক্কা খেয়ে থুবড়ে পড়তে হ'তো।

'সরে যান দাদারা। একি ক্লাশে বসে কলমের খোঁচা মারছেন। সরে যান।'

পলকে কোমরবন্ধ থেকে ধারালো বাটালের মতো লোহার ফলা বের করে ফেললে আগন্তুক। একটানে চড় চড় করে ফেঁড়ে ফেললে পুরো একটা বেঞ্চের গদি। পাশের ছেলেটার কাছ থেকে একটানে কেড়ে নিলে পেট্রোলের বোতল। এর পর মশাল দিয়ে অগ্নিসংযোগ করতে তিন সেকেণ্ডও নয়।

হি হি করে খুশির অট্টহাসি হেসে অন্যদের আগেই জ্বলন্ত বাস থেকে নেমে পড়ল ছোকরা।

এই হাসিই তাকে চিনিয়ে দিলে। ভিড়ের মধ্যে মিশে পড়বার আগেই ভালো করে দেখে নিয়েছি মুখটা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, মেছোবাজার থেকে ঠিক সময়মত এখানে হাজির হলো কি করে নেড়া? ভোজবাজীই বটে।

অফিসে ফিরতে দেরী হলো। তারপর জরুরী রিপোর্ট তৈরী করতে সন্ধ্যা। বাড়ি রওনা হতে পৌনে আটটা বেজে গেল। দেরির জন্য ভাগ্যকে অভিসম্পাত করেছিলাম। মেছুয়াবাজারের মোড়ে বাস থেকে নামবার সময় দারুণ একটা সুযোগ মিলে গেল। দেখলাম, নেড়া পেছনে পেছনে নামছে।

'অফিস থেকে ফিরতে এত দেরি?' নেড়া সবিনয়ে বললে।

বলতে যাচ্ছিলাম, এই দেরী তোমাদেরই কৃপায়। কিন্তু প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে বললাম, 'কোন দিকে যাচ্ছিস?'

'গ্যারাজে ফিরছি। কেমন আছেন সমরদা? অনেকদিন দেখা হয়না।' বলে সে সঙ্গে চলতে লাগল। কিছুটা দূর পর্য্যন্ত দুজনের একই পথ।

'এসব করে কি লাভ পাস?'

'কি সব?' নেড়া সবিস্ময়ে তাকাল।

'মানে বাস পোড়ানোর কথা বলছি।'

'কোথায় ছিলেন আপনি?' বেশ ঘাবড়ানো গলার আওয়াজ।

'সেই বাসেই ছিলাম। কোন পার্টির তুই?'

'পার্টি! না কোনই পার্টিতে নেই।' নেড়া বেশ একটু শঙ্কিত হয়েই বললে। 'সব পার্টিই সমান হারামজাদা। কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজি...

'তবে এসব করিস কেন?'

'করি কেন। আমি জানি সমরদা আপনাকে বললে ভয় নেই। আপনি পুলিশে গিয়ে লাগাবেন না, নেড়া গলা খুব নিচেতে নামিয়ে বললে কি, জানেন, এ না করে পারিনে। আগুন লাগানো, বোমা ফাটানো, সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি এসব দেখলেই চট করে কেমন জানি মাথায় যা খুন চেপে যায়। আর নিজেকে চাপতে পারি নে। লাফিয়ে পড়ি। ইচ্ছে করে সব পুড়িয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিই......একটা হিংস্র দৃষ্টি পলকে কোথা থেকে ছুটে এলো নেড়ার দুই চোখে।

'কিন্তু কাজটা কি ভালো?' আমি উপদেশ হিসাবে

বললাম। 'এই ধর বাস্-এরই কথা। তুই আমি সবাই এতে যাতায়াত করি। সাময়িক উত্তেজনায় বশে একটা পুড়িয়ে দেওয়া মানে আমাদেরই যাতায়াতের কষ্ট বাড়া, কেননা রাস্তায় আরেকটা কম বাস চলবে। আর এই যে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার বা আরও বেশি টাকা ক্ষতি হলো, আমাদেরই ট্যাক্স বাড়িয়ে তা আদায় হবে।... এসব আর করিস নে। কারু কথায়ই নয়।'

'ভাবি তো করব না। কিন্তু পারি না যে!' নেড়া প্রায় অনুতপ্ত কণ্ঠেই বললে।

এর পর মাস ছয় বাদে নেড়াকে আরেকবার দেখেছিলাম। কিন্তু অন্য ভূমিকায়।

রাত সাড়ে আটটা বা কিছু বেশি হবে। বেড়িয়ে ফিরছি। আমাদের রাস্তায় মোড়ের কাছাকাছি, কিন্তু মোড় থেকে একটু দূরে অপেক্ষাকৃত অন্ধকারের মধ্যে ট্যাক্সি এসে থামল। দু তিন সেকেণ্ড পরে গাড়ির দরজা খুলে এক তরুণী মেয়ে নেমে এলো ফুটপাথে। তারপর কোনও দিকে না চেয়ে মোড়ের দিকে বেশ একটু দ্রুত হেঁটে চলল। অপর দিকের দরজা খুলে বের হয়ে এল ড্রেনপাইপ পরা রেশমী টি-শার্ট গায়ে এক ছোক্রা, রাস্তা পার হয়ে অপর ফুটপাথে উঠে সিধা উল্টো দিকে চলা শুরু করল, এদিকে আর তাকিয়েও দেখলে না। কেমন একটা চোর-চোর ভাব।

যেসব প্রেমিক প্রেমিকা শহরের ভিড়ের মধ্যে মেশবার মত নিরালা জায়গা পায় না, বা অন্যদের দৃষ্টি থেকে বাঁচতে চায়, এটা তাদের পক্ষে খুব সুবিধাজনক উপায় এটা জানা ছিল কিন্তু জানা ছিল না, আমাদের নেড়া আগুন লাগানো ছেড়ে প্রেম করছে। ভিড়ের মধ্যে মেশবার আগেই তাকে সনাক্ত করতে পেরেছিলাম।

আরও ক'মাস পরে রাস্তায়ই নেড়ার বন্ধু ভাস্করের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভাবলাম প্রকারান্তরে নেড়ার রোমান্স কোনও পরিণতিতে পৌঁচেছে কিনা জেনে নিই।

'নেড়ার খবর শুনেছেন?' ভাস্কর নিজে থেকেই আমার জিজ্ঞাসের জবাব হাজির করলে। 'ষ্টাবড্। এক হপ্তা ধরে হাসপাতালে! কোনও রকমে বোধহয় এ যাত্রা বেঁচে যাবে...

কেন, কি হলো? সত্যই চমকে উঠলাম। নিশ্চয়ই দলাদলি। কাদের সঙ্গে?...'

'নেড়া প্রেম করছিল। ভাস্কর গম্ভীর হয়ে বললে। 'আর করছিল ওরই এক বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে। ওর সব কিছুই অস্বাভাবিক তো! ভাল কাজ শিখেছে। ভালো মাইনে পাচ্ছে এখন। প্রাইভেট কিছু কিছু কাজও করে। আয় যথেষ্ট। এখন বিয়ে থা করে। পৈতৃক-বাড়ি বেচে দিয়েছিস কুছপরোয়া নেই। বাড়ি ভাড়া কর। কিন্তু ওর সব বাউণ্ডুলে। আরেক জনের বিয়ে-করা স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম শুরু করলি! আর সে মেয়েটাও এমন, নিজের স্বামীকে ছেড়ে নেড়াকে বিয়ে করতে রাজি! নিরুপায় হয়ে বন্ধু—মরিয়া হয়ে বলতে পারেন।

'এ রকম হলে তো ছুরি খাবেই।' আমি বললাম।

'না। এখনও নয়।' ভাস্কর বলতে লাগল। বন্ধুও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গিয়েছিল। বলেছে, আমার ঘর তো খতম হয়েই গেছে। ওরা যদি সুখী হ'তে পারে হোক। করুক বিয়ে

'তবে আবার কি হলো?'

'ও বাঁদরের কি কিছু ঠিক আছে। ক'দিন পরে হঠাৎ বললে, না বিয়ে করব না। মেয়েটা কেঁদেকেটে মাথা কুটে বিলাপ করে পাগলের মতো হয়ে উঠল। কিন্তু নেড়ার এক কথা। না, বিয়ে করব না। ভেবে দেখুন. কি পাজি! তখন ওরা দল ক'রলে। তাকে তাকে ছিল। সুযোগ বুঝে ছোরা চালিয়ে দিয়েছে। দেড় ইঞ্চিরও বেশি!...'

আশৈশব এ জিনিষটা দেখেছি নেড়ার মধ্যে। নষ্ট করবে। হাতের কাছে যা-ই পাবে, নষ্ট করবে। রাস্তার আলোর বাল্ব আর জলের কলের ট্যাপ,

দেওয়ালের আস্তর, পাখি ফুল থেকে ধাপে ধাপে অংলস্পৃহা বেড়ে চলেছে। বাস পোড়াতে বচক্ষে দেখেছি। এইবার বন্ধুর সংসার আর বন্ধুপত্নীর জীবন দুই জ্বালিয়ে দিলে! ওকি ক্রিমিন্যাল না রুগী?

'যতই বাঁদর হোক, ভাবছি একবার হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসব।' উপসংহারে ডাক্তার বললে।

হাঁ, যাস্।'

চলতে চলতে নেড়ার হাসিটা মনে পড়ে গেল। আশ্চর্য্য আকর্ষণীয় হাসি। যে এমন হাসতে পারে, সে এমন নৃশংসতা করে কি করে? নেড়া পাগল নয় তো?

রাষ্ট্রবাদের পরিণাম

সমর বসু

(শ্রীঅরবিন্দের "The Ideal of Human Unity" গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় অবলম্বনে)

[The call of the state to the individual to immolate himself on its altar and to give up his free activities into an organised collective activity is therefore something quite different from the demand of our highest ideals—Sri Aurobindo]

নবজাগরণ, শিল্পবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব ইত্যাদি কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা শুধু ইউরোপীয় জীবনকেই প্রভাবিত করেনি, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সমগ্র মানব-জাতিকেই নূতন একটি প্রেরণায় উদ্বোধিত করেছে। নূতনতর সমাজভাবনায় ভাবিত হয়ে উন্নততর সভ্যতার দিকে এগিয়ে গিয়েছে মানুষ একটু যেন অধিকতর দ্রুতগতিতে। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সমষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে' প্রভূত ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্র গঠনের যে প্রয়োজন এ কথা মানুষ যখ[ন] বুঝতে পারল, তখন তার চিন্তা চেতনায়, ধ্যানধারণা[য়] রাষ্ট্রবাদের (State Idea) তত্ত্বটি একটু একটু ক'[রে] রূপ ও আকার পেতে লাগল। মানুষ বুঝতে পারল,— The hope of the good and progress o[f] humanity lies in the efficiency and organi[-]sation of the state. শুধু তাই নয়, সমষ্টি তথ[া] ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা বিদ্যাবত্তা সামর্থ্য (শারীরিক এব[ং] আর্থিক) তার চিন্তাশীলতা তার আবেগ-প্রব[ণতা] সবকিছুই সে যদি রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করে, তবে[ই] রাষ্ট্রের পক্ষে সমগ্রের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। রাষ্ট্র[-]বাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে মানুষের এই নিশ্চয়তা সমাজজীবনে[র] রাষ্ট্রবাদের ভিতকেই শুধু দৃঢ়তর করেনি—The state

idea is rushing towards possession with a great motor force and is prepared to crush under its wheels everything that conflicts with its force or asserts the right of the human tendencies.

কিন্তু 'রাষ্ট্রবাদ' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য কি? রাষ্ট্রবাদকে কি যূপকাষ্ঠের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যেখানে ব্যক্তিকে বলি দেওয়া হয়? অবশ্য তত্ত্বের দিক থেকে রাষ্ট্রবাদের বিরুদ্ধে এতখানি অপবাদ দেওয়া যুক্তিসংগত নয়; কেননা রাষ্ট্রবাদের তত্ত্বে ব্যক্তির আত্মোৎসর্গকে বিশেষভাবে মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সমগ্রের কল্যাণার্থে ব্যক্তির কাছে রাষ্ট্রের দাবী হল সে যেন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। সুতরাং ব্যক্তির এই নিঃসর্ত আনুগত্য স্বীকৃতিকে কখনই 'বলির' সঙ্গে তুলনা করা যায় না। বরং বলা যেতে পারে এ হল ব্যক্তির মনুষ্যত্ব তথা মহানুভবতা প্রকাশের পরম সুযোগ।

তত্ত্ব এইভাবে ব্যক্তিকে যতই মহান করে তুলুক না কেন; ব্যবহারিক জীবনে আমরা যা দেখি তা কিন্তু একটু ভিন্ন রকমের। আমরা দেখি, ব্যক্তি আনুগত্য স্বীকার করছে একদল মানুষের কাছে যাদের অন্যনাম শাসক সম্প্রদায়, সমগ্রের প্রতিভূ বলে যাদের মেনে নেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি আনুগত্য স্বীকার করে—(অর্থাৎ করতে বাধ্য হয়,) সমষ্টিগত এই অহমিকার কাছে যার সঙ্গে সমষ্টির অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ব্যবস্থা একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট। কতকগুলি লক্ষ্য এবং উচ্চাশা এই শাসকগোষ্ঠী পূর্বাহ্নে স্থির করে নেয়, তারপর তাকে সার্থক করে তোলবার জন্যে ব্যক্তির উপর চাপ দেয়। কেননা ব্যক্তি আগেই তার আনুগত্য স্বীকার করেছে।

রাষ্ট্রের এই শাসকগোষ্ঠী জনগণের মধ্য থেকে গড়ে উঠতে পারে, অথবা শাসকশ্রেণীর (Ruling class) বংশ থেকেও উদ্ভূত হতে পারে। চরিত্রগত কিছু বৈশিষ্ট হয়ত তাঁদের থাকতে পারে যার জন্যে অতি সহজেই তাঁরা জনগণের প্রতিভূ হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। অনেক সময় চারিত্রিক বৈশিষ্ট না থাকলেও পরিস্থিতি চাপে, বাক-চাতুর্যের সাহায্যে জনগণকে সম্মোহিত ক[রে] তাদের উপর প্রভুত্ব করার শক্তি তাঁরা অর্জন করেন। যে-কোনও উপায়েই তাঁরা জন-প্রতিনিধিত্ব অর্জ[ন] করুক না কেন, ফলের দিক থেকে তাতে কোনও ইতর বিশেষ হয় না। কেননা জনগণের প্রতিভূ নিজেদে[র] যাঁরা প্রচার করেন, তাঁদের যতই চারিত্রিক বৈশি[ষ্ট] থাকুক না কেন, কিংবা বাক-চাতুর্য বা সম্মোহনবিদ্যা যতই তাঁদের করায়ত্ত হোক না কেন, তাঁরা অর্থাৎ শাসক শ্রেণী যে জাতির শ্রেষ্ঠতম মনীষার অধিকারী ব[া] মহত্তম আদর্শের ধারক অথবা উচ্চতম প্রবেগে[র] প্রতিনিধি এমন কথা দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যাবেনা।

যে-কোনও একটি দেশ বলে নয়, পৃথিবীর স[ব] দেশেরই রাজনীতিবিদ যাঁরা তাঁদের সম্বন্ধে ঐ একই মন্তব্য উচ্চারণ করা যায়। অর্থাৎ সুনিশ্চিতভাবে এ-কথা বলা যায় না যে তাঁরাই হলেন জনগণের অন্তঃপুরুষের বা অন্তরাত্মার যথার্থ প্রতিনিধি। তিনি যে পরিবেশে মানুষ, সেই পরিবেশকে ঘিরে যত রকমে[র] হীনতা, স্বার্থপরতা, অহমিকা ও আত্মপ্রবঞ্চনা সমাজ জীবনের মধ্যে নিয়ত ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতা হলে[ন] সেই পরিবেশের উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি। এ ছাড়া আছে তাঁর নিজস্ব মানসিক অযোগ্যতা, চিরাচরিত নীতি অনুসরণের প্রতি দুর্বল আগ্রহ, ভীরুতা এবং মিথ্যার ছলনা। দুরূহ সমস্যা যখন সমাধানের উদ্দেশ্যে তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়, তখন দেখা যায় যে, সেই সমস্যা সমাধানের জন্য যে-কঠিন প্রয়াসের প্রয়োজন তাঁর মধ্যে তার কত অভাব। অথচ বড় বড় বুলি সর্বসময়েই তাঁর জিহ্বাগ্রে, মহান আদর্শের কথায় সবসময়েই তিনি পঞ্চমুখ। যদিও অবিলম্বে সেইসব 'বুলি' দলীয় শূন্য চীৎকারে পর্যবসিত হয়।

আধুনিক রাজনৈতিক জীবনের এই ব্যাধি ও মিথ্যাচার সর্বদেশেই সমানভাবে প্রকট, অথচ সাধারণ মানুষ তা সহজে উপলব্ধি করতে পারে না, নির্বিবাদে তাঁদেরকে নেতা বলেই মেনে নেন।

কিন্তু কেন? আধুনিক রাজনৈতিক জীবনের এই উৎকট ব্যাধি ও ব্যাপক মিথ্যাচার সম্বন্ধে জনগণ অবহিত হতে পারেন না কেন? কেনই বা এর কোনও প্রতিকার হয়না? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে জাগতে পারে। সুতরাং কারণটি অনুসন্ধান করার প্রয়োজন।

আমরা জানি জন গণ-মন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর দ্বারা। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যাঁরা রাষ্ট্র গড়ে তোলেন তাঁদের তাই প্রথম লক্ষ্য হল, বুদ্ধিজীবি যাঁরা তাঁদেরকে খুসী করে, সম্মোহিত করে তাঁদের কাছ থেকে স্বীকৃতি (মৌন অথবা উচ্চারিত) আদায় করা। এই বুদ্ধিজীবি-শ্রেণীর সুগঠিত কাপট্যের আবরণে ঢাকা থাকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমস্ত দুঃস্থতা ও উৎকট ব্যাধিসব। সাধারণ মানুষ তাই কিছু জানতে পারে না।

মানুষ অভ্যাসের দাস। কিছুকালের মধ্যেই রাষ্ট্র-কর্তৃক প্রবর্তিত রী'তনী'তি অনুসরণে যখন সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন আর তার কোনও অভিযোগ থাকে না। পরিবর্তিত পরিবেশকে সে স্বীকার করে নেয়। তখন প্রতিকারের কথা তার মনেই জাগেনা। রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা তাই অনায়াসেই সাধারণ মানুষের কাছে বিনাবাধায় রাষ্ট্রের দাবী পেশ করতে সক্ষম হন।

সাধারণ মানুষের ভালমন্দ, সুখ দুঃখের সমস্ত ভার রাষ্ট্র তথা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হাতেই ন্যস্ত। বাস্তবিকপক্ষে এই পদ্ধতিতে সার্বিক কল্যাণসাধন সম্ভব নয়। এর সাহায্যে সুসংগঠিত উপায়ে এমন সব অন্ন ঘটতে পারে যার ফলে সাধারণের অকল্যাণ হওয়াই সম্ভব। সামান্য কিছু উপকার, সামান্য কিছু মঙ্গললাভ অবশ্য হয়, তা না হলে অগ্রগতি সম্ভব হতনা। প্রকৃত এইভাবেই বিপদের ভিতর দিয়ে, ঝঞ্ঝাবাত্যার ভিতর দিয়ে পথ করে করে এগিয়ে চলে আপন লক্ষ্যের দিকে। মানুষের এই অপূর্ব মানসিকতা বা অদম্য মনঃশক্তি যতই বাধা সৃষ্টি করুকনা কেন প্রকৃতির গতিকে সে রুদ্ধ করে দিতে পারে না। তার সহায়তা ব্যতিরেকেই প্রকৃতি এগিয়ে চলে।

আজকের দিনে রাষ্ট্রবাদ যাদের দ্বারা অনুসৃত তাদের চেয়েও উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন কিংবা মহত্তর মানুষ যদি রাষ্ট্র-যন্ত্র' পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করে, প্রাচীন সভ্যতার আদর্শে বা সুনীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা য'দি রাষ্ট্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তা হলেও ফলের দিক থেকে বিশেষ কিছু হেরফের হবেনা। কেন না, রাষ্ট্রবাদ বড় গলায় নিজের যে-পরিচয় দেয় তা হবার সামর্থ তার নেই। তার প্রচারের সবটুকুই ভান।

তত্ত্বের দিক থেকে বলা হয়—রাষ্ট্র হল এমন একটা কিছু যার মধ্যে গভীরভাবে সংহত হয়ে আছে সমষ্টিগত মানুষের প্রজ্ঞা, মণীষা ও শক্তি যা সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে নিয়োজিত। কিন্তু বাস্তবে যন্ত্রটিকে পরিচালনা করেন যাঁরা, তাঁরা হলেন সমষ্টিগত সাধারণ মানুষের একটি ভগ্নাংশ মাত্র। এবং সেই সামান্য অংশটুকুরও সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক শক্তিও পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত হতে পারেনা; যতটুকু প্রকাশ করতে এবং প্রয়োগ করতে রাষ্ট্র সুযোগ দেয়, ততটুকুই তাঁরা প্রকাশ করেন এবং ততটুকুই তাঁরা নিয়োগ করেন। এইভাবে যে রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে উঠেছে তার দ্বারা যতটুকু ভাল হবার তাই হয়েছে। এর চেয়ে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারত যদি রাষ্ট্র ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে ফেলত। ব্যক্তির কর্মক্ষমতা, আদর্শপরায়ণতা এবং আন্তরিকতাই হল সমষ্টির অগ্রগতির পক্ষে একান্ত সহায়ক। রাষ্ট্রের কাজ হবে সময় সময় এগিয়ে এসে ব্যক্তির ঐ আন্তরিক প্রয়াসকে আরও সুষ্ঠুভাবে সফল ও সার্থক করে তোলা। কিন্তু তা না করে রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির ওই কর্মক্ষমতাকে গ্রাস করতে চেষ্টা করে তাহলে অগ্রগতির পথ অবশ্যই রুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন অনিবার্য্যভাবে দেখা দেবে সংঘর্ষ বা প্রতিরোধ। আজ আমরা যে ধরনের সুসংগঠিত সার্বিক রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত উদ্যোগী হয়েছি, যে বিশাল এবং প্রভূতশক্তিসম্পন্ন জটিল রাষ্ট্রীয় সক্রিয়তাকে

বরণ করে নেবার জন্ত আগ্রহী হয়েছি, সেই ধরনের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা যদি সম্ভব হয় তাহ'লে তা' ব্যক্তির স্বাধীন ও আন্তরিক সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে হরণ করে নেবে, নয়তো তাকে দমিত করে আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োগ করবে। তখন রাষ্ট্রযন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দোষ-ত্রুটি সংকীর্ণতা ও অক্ষমতা অপসারিত করবার অথবা তাকে সংশোধন করবার কোনও উপায় আর থাকবেনা।

আপাতঃবিচারে মনে হয় রাষ্ট্র বুঝি সমষ্টিগত মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা, জ্ঞান ও বুদ্ধির আধার; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র তা নয়। কেননা রাষ্ট্র তার কর্মপ্রবর্তনায় অনেক সময় এমন সব মানুষকে উপেক্ষা বা অবহেলা করে বাস্তবিক পক্ষে যাঁরা প্রকৃত চিন্তাশীল এবং গভীর মনীষার অধিকারী। সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য হতে পারেন, কিন্তু গুণের দিক থেকে তাঁরা কখনই উপেক্ষণীয় নন। বর্তমানের প্রয়োজনে শুধু নয়, ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্মেও তাঁদের মনীষায় যে প্রয়োজন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, তবুও রাষ্ট্র হয় তাঁদের দমন করে, নয়তো অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখে। এই জন্মেই রাষ্ট্রযন্ত্র:কে বলা হয় নিকৃষ্টতম গোষ্ঠি-অহমিকা। রাষ্ট্রবাদের এই অহমিকার একটা শক্তি আছে। কিন্তু সে শক্তি,—সাধারণভাবে সমষ্টিগত মানুষের কল্যাণকর শক্তি অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টতর। সাম্প্রতিককালে,—রাষ্ট্রবাদের এই অহংকার যে কত কদর্যময় তা মানবজাতির দৃষ্টিতে এবং চেতনাতেও ধরা পড়েছে।

ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের যদি তুলনা করা যায়, তাহলে অনায়াসেই আমরা বুঝতে পারবো জীবনচর্যার দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এবং কি তার স্বরূপ।

ব্যক্তির মধ্যে নিগূঢ় আছে অন্ততঃ এমন একটা শক্তি যার নাম হল আত্মা (soul)। যদি তাকে অস্বীকারও করা যায়, তাহলে তার অভাবপূরণের জন্ত ব্যক্তি, বিবেক অথবা নীতিবোধের দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করে। বিবেক অথবা নীতিবোধকেও যদি গ্রাহ্ন না করা হয়, তথাপি ব্যক্তি সমাজের শাসনকে উপেক্ষা করে চলতে সাহস পায়না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি পরিচালিত হয়—আত্মিক প্রেরণায় কিংবা বিবেক নীতিবোধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে অথবা সমাজের অনুশাসনে ধারা মেনে। কিন্তু অপর দিকে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। সবের বালাই নেই। তার না আছে আত্মা না আছে বিবেক কিংবা নীতিবোধের প্রতি কোনও নিষ্ঠা সমাজকে সে ভয়ও করেনা, গ্রাহ্নও করেনা। কেননা সে নিজেকেই তো সমাজের গোষ্ঠীগত শক্তি বলে মনে করে। রাষ্ট্র হল, সমষ্টিগত মানুষের সামরিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক শক্তির সমাহার। তার মনোময় শক্তি যদি আদৌ কিছু থেকে থাকে তাহলে তা অতি সাধারণ এবং নিতান্ত অপরিণত। দুঃখের কথা এই যে, রাষ্ট্র তার এই অপরিণত বুদ্ধি-শক্তি প্রয়োগ করছে কতকগুলি মিথ্যা ধারণা ও চলতি বুলির উপর নির্ভর করে। আধুনিককালে তার এই অপরিণত নীতিবোধকে ঢেকে রাখবার জন্ত রাষ্ট্রীয় দর্শনতত্ত্বের আবরণীকেও সে কাজে লাগাচ্ছে।

গোষ্ঠীগত জীবনে মানুষ বর্তমানে যদিও বা অন্ততঃ অর্ধসভ্য জীব হয়ে উঠতে পেরেছে, আন্তর্জাতিক জীবনে সে কিন্তু এখনও আদিমস্তরেই প'ড়ে রয়েছে। এই সেদিন পর্যন্ত একটি সুসংগঠিত জাতির সঙ্গে অপর জাতির সম্পর্ক ছিল নিতান্তই জান্তবিক। তীব্র ক্ষুধা নিয়ে একটি অতিকায় জন্তু যেমন অপর জন্তকে আক্রমণ করে ঠিক তেমনি একটি জাতি নিজের ক্ষুধা মিটাবার জন্মে অপর জাতিকে গ্রাস করত। ক্ষুধা মিটে গেলে কিংবা শিকারকে পর্য্যুদস্ত না করতে পারলে জন্তরা যেমন ক্লান্ত হয়ে ঘুমোয়, ঠিক তেমনি সময় সময় ঐসব অতিকায় জাতিকেও আমরা সুপ্ত অবস্থায় থাকতে দেখেছি। পরে ক্ষুধা জাগ্রত হলে কিংবা শিকারকে আক্রমণ করার মত শক্তি সংগৃহীত হলে পুনরায় তাকে দেখেছি প্রবল হহংকারে জেগে উঠতে। সুতরাং আন্তর্জাতিক জীবনে মানুষ যে জন্তুর স্তর থেকে উঠতে পারেনি এ মন্তব্য বোধকরি অসমীচীন নয়।

বর্তমানেও এ অবস্থায় মৌলপরিবর্তন কিছু হয়নি।

সহজে আক্রান্ত হতে পারে এমন জাতির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কিছু করা হয়েছে।

একটা জাতিগত তীব্র অহংবোধ হল সমস্ত দেশেরই আদর্শ। এই আদর্শ অনুসরণে প্রতিটি দেশ এমনই গভীরভাবে আচ্ছন্ন যে, তার মধ্যে সত্যিকারের দীপ্যমান চেতনার জাগরণ সম্ভব হচ্ছেনা। তাই সত্যাসত্য বিচার করার শক্তি তাদের নেই। তারা বুঝতেই পারছেনা কেমন করে লুণ্ঠনকারী জাতিকে সংযত করা যায়। আন্তর্জাতিক আইনবিধি যা তারা প্রণয়ন করেছে, কার্যক্ষেত্রে তা যে কত দুর্ব্বল অভিজ্ঞতায় তা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। তবুও অন্যদের কোনও ব্যবস্থাগ্রহণ কোনও জাতির পক্ষেই সম্ভব হচ্ছেনা এই কারণে যে, প্রত্যেক জাতিরই একটা ভয় আছে.—ভয়—পরাজয়ের, ভয়—অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের।

অতি প্রাচীনকালের রাষ্ট্রগুলি আদর্শবাদী ও সমাজ-সচেতন ছিল। কিন্তু তারা ভিন্ন দেশের সঙ্গে আদান-প্রদানের ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিল না। প্রাচীন ও আধুনিক কালের অন্তবর্তীযুগে, রাষ্ট্র ছিল নিষ্ঠুর লোলুপ এবং চতুর অত্যাচারী। কাজে কর্মে, কথার-বার্তায় (অর্থাৎ মতবাদে) এমনকি ধর্মবোধের ক্ষেত্রেও সেসব রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করত না। এই সব স্বাধীনচেতা ব্যক্তি এবং পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিরাই ছিল তাদের আহার্য, তাদের শিকার। কিন্তু যে-জনসমষ্টির উপর নির্ভর ক'রে ঐসব রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তাকে শক্তিমান ও অর্থবান করে রাখবার প্রয়োজনের বশে ঐ সব রাষ্ট্রগুলিকে সময় সময় এমনসব বিধি-ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হত যা ছিল সমগ্রজাতির পক্ষে অন্ততঃ কিছুটা শুভপ্রদ।

বর্তমানে রাষ্ট্রের কার্যকলাপের কোনও কোনও দিকে অবশ্য কিছুটা উন্নতি হয়েছে—অন্য সব দিকে যথেষ্ট অবনতি হওয়া সত্বেও। রাষ্ট্রগুলি এখন বুঝতে শিখেছে যে, তার অস্তিত্বকে বজায় রাখতে হলে সমষ্টির এমন কি প্রতিটি ব্যক্তির আর্থিক এবং দৈহিক বৃত্তির জন্যে সুব্যবস্থা করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্র বুঝতে পেরেছে যে, বিদ্যা বুদ্ধি ও সুনীতির দিক থেকে সামগ্রিক ভাবে রাষ্ট্রকে উন্নত হতে হলে ব্যক্তিকে উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই যুক্তির উপর নির্ভর করে রাষ্ট্র যথার্থ প্রয়োজন বিধি-বিধান অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছে। একটা নৈতিক-শক্তি ও বিচারশক্তিসম্পন্ন উচ্চতর সত্তায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে রাষ্ট্রশক্তির এই প্রয়াস আধুনিক সভ্যতার একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা। শুধু অন্তর্জীবনে নয়, বহিঃজগতের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠাতেও বুদ্ধিনিষ্ঠ ও নীতিনিষ্ঠ :হয়ে ওঠার যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এবোধও মানবজাতির চেতনায় জাগ্রত হয়েছে, অবশ্য ইউরোপীয় রাজনৈতিক জীবনের বিরাট বিপর্যয়ের ফলে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয় :—রাষ্ট্র যতই নূতন আদর্শ ও সম্ভাবনা নিয়ে সচেতন হয়ে উঠছে, ব্যক্তির স্বাধীন কার্যধারাকে আত্মসাৎ করার জন্য তার দাবীকে সে ততই প্রবল করে তুলছে। এ-সম্বন্ধে যদি সামান্য কিছু মন্তব্য করা যায় তাহলে অবশ্যই বলতে হয় যে, রাষ্ট্রের এই দাবী পেশ করার সময় এখনও আসেনি। রাষ্ট্র যদি অকালেই তার দাবী পূরণের জন্যে সচেষ্ট হয়ে ওঠে তাহলে মানবজাতির অগ্রগতি অবশ্যই রুদ্ধ হবে। শুধু তাই নয়, মানবজাতির ভাগ্যে অনিবার্য্যভাবে নেমে আসবে সেই ঐতিহাসিক দুরবস্থার অভিশাপ যা রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবার পর গ্রীসীয়-রোম্যান-জীবনকে একদিন দুঃসহ করে তুলেছিল।

তর্পণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নীলকণ্ঠ

স্নেহাস্পদেষু

তোমার চিঠি পেয়ে মনে হ'ল শ্রীকুমার বাবুর সম্বন্ধে কিছু লিখি স্মৃতিচারণী ঢঙে, কেন না এ-ঢঙ তুমি ভালোবাসো। তা ছাড়া স্মৃতিচারণী লিপিকায় ব্যক্তিগত অনেক কিছু লেখা যায় যা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধে লেখা সম্ভব নয়। তাই অবহিত হও।

তুমি লিখেছ—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দেহপ্রয়াণের খবরে আমি মনে নিশ্চয়ই দুঃখ পেয়েছি। ভুল লেখো নি, কারণ তিনি ছিলেন একাধারে আমার শিক্ষক, উপদেষ্টা, বন্ধু ও দরদী গুণগ্রাহী। আমার নানামুখী বৃত্তির গুণমূল্য দিতে তিনি এত আনন্দ পেতেন যে, আমাকে সময়ে সময়ে সত্যিই কুণ্ঠিত হতে হত।

আজ কিছু লিখব তাঁর পুণ্য স্মৃতিতর্পণে,—তাঁর কাছ থেকে আমি কী পেয়েছি, কী শিখেছি।

তিনি আমাদের ছেড়ে গেছেন এতে আমি দুঃখ পেয়েছি বৈকি—বিশেষ এই জন্যে যে, অতঃপর, আর তাঁর স্মিত আশীর্বাদ আবির্ভাব হবে না আমার নানা গানের আসরে, দেখব না আর আমার ভজন শুনে তাঁর চোখে প্রেমাশ্রুর স্নিগ্ধ দীপ্তি। তিনি তো শুধু প্রবুদ্ধ সমঝদার ছিলেন না, ছিলেন ভক্ত। তাই আমি ব্যথিত হয়েছি একথা কবুল করতে একটুও কুণ্ঠিত নই গীতার ধমক মেনে নেওয়া সত্ত্বেও যে গতাসু বা জীবিত কারুর জন্যেই তত্ত্বদর্শীরা শোক করেন না যেহেতু দেহ নশ্বর হলেও আত্মা অমর।

এ-জগতে আমরা বাস করি নানা স্নেহসঙ্গে আনন্দ পেতে ও স্নেহাস্পদ ও শ্রদ্ধাভাজনদের মাধ্যমও আনন্দ দিতে। শ্রীকুমার বাবু ১৯১৩ থেকে আজ পর্যন্ত—প্রায় ষাট বৎসর—আমাকে বহু আনন্দ দিয়েছেন, আমিও তাঁকে আমার গান লেখা ও ভক্তিশ্রদ্ধার মাধ্যমে কিছুটা আনন্দ দিয়েছি—যে কথা তিনি তাঁর ভাবগম্ভীর স্নেহমধুর ভাষায় বারবারই স্বীকার করেছেন।

আমাদের তিনি ছিলেন প্রিয় শিক্ষক—প্রেসিডেন্সি কলেজে। তাঁর ছোঁয়াচে আমার মনে যেন আরো বেশি করে জেগে উঠেছিল বহুপাঠী হবার উচ্চাশা। সমসেট মম বলেছেন—এ দুঃখময় জগতে একটি অফুরন্ত অপ্রতিবাত সুখের আকর আছে যা অক্ষুণ্ণ—তার নাম পাঠানুরাগ (love of books)। শ্রীকুমার বাবু ছিলেন বহুপাঠী (এটি মহাভারতের বিশেষণ, কেমন সুন্দর বলো তো ?) বই পড়তে তাঁর স্ফূর্তি নেশা তার ছিল—রাশি রাশি বই পড়তেন তিনি কী যে আনন্দে! বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন—স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। আমরা প্রায়ই সসম্ভ্রমে তথা সহর্ষে বলতাম : "Gold medalist রে! সাবধান!"

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা বরেণ্য ছাত্র বলে নাম পান উত্তরজীবনে তাঁরা প্রায়ই নগণ্য হয়ে দাঁড়ান দেখা যায়। এর একটা কারণ—তাঁরা জীবনে ছোটখাট সুখ বিলাস ধন যশের কাঙাল হয়ে বহুপাঠী হবার সাধনাকে পাশ কাটিয়ে সস্তায় নাম কিনতে চান বা বাহ্য ভোগকেই মহনীয় সাহিত্যশিল্পদর্শনচর্চার চেয়ে বেশি বরণীয় মনে করে থাকেন।

শ্রীকুমার বাবু এদের দলে ছিলেন না কোনদিনই। ছাত্রাবস্থায়ও যেমন বহুপাঠী ছিলেন বৃদ্ধ বয়সেও ঠিক তেমনিই গ্রন্থানুরাগী ছিলেন—যাকে সাহেবি ভাষায় বলে bibliophil।

আমাদের দেশে গুণানুরাগীর আদর চিরদিনই ছিল এবং (আশা করি) এখনও লুপ্ত হয় নি। শ্রীকুমার বাবু তাই তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাবেন মনে হয় তাঁর বহুশাস্ত্র সাধনার জন্যে।

ছাত্রদের সঙ্গে তিনি আদানপ্রদান করতেন শুধু স্নিগ্ধ সৌজন্যের আলোয় নয়, সহজ স্নেহের হেমপ্রভায়। তাঁর কাছে যখনই গিয়েছি তিনি স্বাগত সম্ভাষণ করেছেন সস্নেহে। এ কম কথা নয়—ছাত্রদের ভালোবাসতে পারা। এ যে পারে সে আপনি পারে—যার হৃদয়ে স্নেহের ধারা উপর থেকে নামে নি সে নীচেকেও তার সুধাধারে উর্বর করতে পারে না। কবি নিশিকান্তের একটি সুন্দর গানে আছে:

কেমন ক'রে বলব তোমায় কেন বাজাই অনুরাগের
বীণা?
জানি শুধুই ভালোবাসি, কেন বাসি—জানি না
জানি না।

বস্তুতঃ সব প্রতিভা তথা প্রেরণার সম্বন্ধেই একথা খাটে। যার প্রতিভা আছে সে সৃষ্টি করে কেন করে জানে না কোনোদিনই—করার তাগিদেই করে, প্রেরণা পেলে প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারে না ব'লে। আকাশের বৃষ্টিধারার মতনই নেমে আসে স্নেহের অমৃত-ধারা—তাই কথায় বলে—স্নেহ নিম্নগামী। শ্রীকুমার বাবুর কাছে গেলে এই কথাই মনে হ'ত, শুধু আমার নয়—সকলেরই। তিনি শিক্ষক একথা ভুলে যেতাম তাঁর বন্ধুরূপের কমনীয়তায়।

আর শুধু ছাত্রদের প্রতিই নয়—সকলের প্রতিই তিনি সমান প্রীতিমান্ ছিলেন সহজিয়া ঢঙে। সদাপ্রসন্ন ছিলেন তিনি স্বভাবে। তাই কতশত সভাসমিতিতে যে তিনি যেতেন বলবামাত্রই—কত কনফারেন্সের সভাপতি হ'তেন—(শুধু বাংলাদেশে নয়—বাংলার বাইরেও)—তার অবধি নেই বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। "না" বলতে তিনি পারতেন না—শুধু ছাত্রদের নয়—কাউকেই না। কয়েকবৎসর আগে দক্ষিণে কোথায় এইভাবে সভাপতি হ'তে গিয়েছিলেন। ফিরতি পথে ক্লান্তদেহে এসেছিলেন আমাদের মন্দিরে—"হরিকৃষ্ণ মন্দিরে"। তাঁকে অতিথি পেয়ে আমাদের সে কী আনন্দ! তাঁরও সে কী আনন্দ মন্দিরে আমার ভজন কীর্তন ভাষণ শুনে!

আমার গানের এমন অকৃত্রিম অনুরাগী বাংলাদেশে হয়ত আরো আছে, কিন্তু প্রবুদ্ধভাবে আমার সুরকৃতির বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন করবার ক্ষমতায় তিনি ছিলেন উচ্চাধিকারী। বোধহয় একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মোহিতলালের পরে এমন গভীরদর্শী ও আত্ম-প্রত্যয়ী সমালোচক বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। তাই তিনি তাঁর স্বভাবের তাগিদেই আমার নানা বৃত্তিকে মান দিতেন তাঁর নিশ্চিতবোধের সহজ উচ্ছ্বাসে। কোনো দিনই ভুলতে পারি না সংস্কৃত কলেজে একদা আমার গান ও ভাষণের পরে তাঁর আমাকে অভিনন্দিত করা "সর্বতোমুখী প্রতিভা" বলে।

তিনি আমার শুধু গানেরই নয়, সাহিত্যেরও অনুরাগী ছিলেন প্রথম থেকেই। তাঁর প্রখ্যাত বিপুলকায় "বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থে তিনি আমার প্রকৃযোগপর্বের লেখা উপন্যাসগুলির মূল্যায়ন করেছিলেন সাত পৃষ্ঠা ধ'রে! আমার নানা ত্রুটিও দেখিয়েছিলেন অবশ্য, কিন্তু মূলতঃ তিনি ছিলেন গুণদর্শী সমালোচক, ব্রণান্বেষী ক্রিটিক নয়। তবু আজও ভাবতে আমার আশ্চর্য লাগে যে, তিনি সে যুগেও আমার গুণবিচারে এমন সোচ্চার হতে পেরেছিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া ঢঙে। তাই তো তিনি আর সব ক্রিটিকেরা কী বলবে, সায় দেবে কি না দেবে, এ দুর্ভাবনা রেখে অকুতোভয়েই লিখতে পেরেছিলেন ১৩৫৪ সালে [৩৭৬ পৃষ্ঠা]:

"দিলীপকুমারের মন একদিকে যেমন সমাজ ও ধর্মসমস্যার আলোচনায়, যুক্তিতর্কে তীক্ষ্ণ নিপুণতা ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছে, অন্য দিকে তেমনি কাব্য ও ললিতকলার রসোপলব্ধির দিক দিয়াও নিজেকে সূক্ষ্ম ও অনুভূতিশীল বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। এই চিন্তাশীলতা ও নিবিড় রসোপলব্ধির যুগল মিলন

তাঁহার রচনাকে আকর্ষণীয় করিয়াছে। নিছক কালচারের দিক দিয়া উপন্যাস সাহিত্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ আছেন কিনা সন্দেহ এবং এই কালচার তাঁহার উপন্যাসের কেবল বহিরাবরণ বা বাহ্যসৌষ্ঠব নয়—কেন্দ্রীভূত সারাংশ, আবেদনের মূল সুর।"

বলা বাহুল্য, তাঁর প্রবুদ্ধ সমালোচনায়, আমি উল্লসিত হয়েছিলাম। তাঁকে লিখে জানিয়েছিলাম যে, আমি অর্জুনের মতোই "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ।" আজ আমার উপন্যাসের চাহিদা প্রবর্ধমান, কিন্তু সে-যুগে আমাকে বরণ করতেন একটি বিশিষ্ট সীমিত পাঠকগোষ্ঠী যাঁরা উপন্যাসে শুধু হাস্যরস পেয়েই তৃপ্ত হতেন না—কথাসাহিত্যে শুধু গল্প ছাড়া অন্য কোন গভীর রসকে বর্জনীয় মনে করতেন না।

তাঁর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণী ভঙ্গীতে আরো অনেক কিছু লিখতে পারি। কিন্তু উপস্থিত হাতে আরো অনেক কাজ পড়ে গেছে। তাই আর দু-একটি কথা বলেই আমার এ তর্পণের সমাপ্তি টানব।

জীবনে আমরা চলি প্রায়ই দিনগতপাপক্ষয় করে। অর্থাৎ চলি চলতে হয় বলেই। বৈদেশিক বুদ্ধিবাদীরা আরো সদম্ভে বলেন: এ-জীবনটাকে যতটা পারো ভোগ করে চলো—এর পরে কী আছে সে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে। ইন্দ্রিয় ও মনোজগতের বাইরে যা আছে সবই ঝাপসা। যে-বেসাতিতে নগদ বিদায় মেলে তারি ভজনা করে চলো। এক কথায় ঐহিকতাকেই মনে প্রাণে বরণ করো বাস্তব বলে, বাকি সব অবাস্তব, কবিকল্পনা, ভাববিলাস, আকাশকুসুম।"

শ্রীকুমার বাবু এ-শ্রেণীর স্থূল বস্তুবাদী বা ভোগবাদী ছিলেন না কোনদিনই। স্বভাবে তিনি ছিলেন অন্তর্মুখী ধার্মিক, তাই দৃশ্য জগৎকেই শেষ সত্য ব'লে আঁকড়ে থাকতে পারেননি—এ-জীবনের অন্তিম লক্ষ্য কী, কোন্ পথে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোয় পৌঁছতে পারে, কোন্ মন্ত্রে নৈষ্কর্ম্যের প্রসাদ পেয়ে অভী হ'তে পারে, কোন্ দীক্ষায় অপরাবিদ্যার বহির্বাটীকে পাশ কাটিয়ে পরা প্রজ্ঞার অন্দরমহলের ছাড়পত্র পেতে পারে—এ সবই জানতে চাইতেন। এককথায়, তিনি ছিলেন স্বভাবে আর্ত কিন্তু অর্থার্থী নয়, ছিলেন জিজ্ঞাসু, ধর্মার্থী। তাই তিনি গুরুবাদকে অকুণ্ঠে অঙ্গীকার করতে পেরেছিলেন নিজেকে পরম ভাগবত সীতারাম ওঙ্কারনাথের শিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে।

এ কৃতিত্ব তথা সৎসাহস এ-যুগে সহজসাধ্য নয়—বিশেষ করে বিদ্বৎসমাজে—বুদ্ধিপ্রবণ ভাবুকের পক্ষে। কারণ এ-যুগে বিজ্ঞানের জয়জয়কার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে (বিশেষ করে) বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে নাস্তিক্য বা অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এ-স্রোতের পালটা স্রোত আসবেই আসবে—কারণ মানুষ ইহলোকসর্বস্ব হয়ে কখনই তৃপ্ত হ'তে পারে না—নান্যে সুখমস্তি—অসীম অশেষের সঙ্গে রাখীবন্ধন না হলে তার নিস্তার নেই, এই-ই হল সত্যের সত্য। ধন-জন-যশ-মান গৃহসুখ দেহবিলাস—এসবে মানবাত্মার মুক্তি নেই, নেই নেই। মুক্তি মিলতে পারে কেবল অধ্যাত্ম জ্ঞানে ওরফে পরম ভক্তিতে। শ্রীকুমার বাবু ভারতের এ-শাশ্বতবাণীকে বিশ্বাস করতেন, তাই মানতেন উপনিষদের মহাবাক্য: "প্রজ্ঞা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ"—শুধু ভগবৎ-মিলনেই মানুষ জীবন্মুক্তের পদবী লাভ করতে পারে লক্ষ মোহবন্ধনের মায়া কাটিয়ে।

এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আরো মঞ্জুল গভীর ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তিনি আমার শুধু বুদ্ধিবাদী গবেষণাকে নয়—অধ্যাত্ম সাধনাকেও সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করেছিলেন, হয়েছিলেন আমার ভক্তিসঙ্গীতের অনুরাগী, ধর্মীয় কাব্য কথিকার গুণগ্রাহী। তাই আমার মধুমুরলীতে আমার ধর্মীয় কবিতার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে তাঁর বাধেনি, আমার অঘটনী গল্পমালা রসভাসের গভীর দর্শনে সায় দিয়ে আমাকে তিনি বার বারই আশীর্বাদ করেছেন। এ-কথার উল্লেখ করলাম আত্মগুণগান করতে নয় বিশ্বাস কোরো। উল্লেখ করলাম, সত্যিই অধ্যাত্মলোকে তাঁর সহজ প্রবেশ ছিল এই কথাটি ঘোষণা করতে—সেইসঙ্গে যদি বলি তাঁর সঙ্গে এখানে আমার আত্মার যোগের জন্যে আমি

উল্লসিত হয়েছিলাম তাহলে সেটা সুশোভনই হবে, যেহেতু এ-সূত্রে আমি তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতাই জ্ঞাপন করতে চাইছি—আরও এই জন্যে যে, আমার অধিকাংশ প্রাকযৌগিক বন্ধুর সঙ্গে একেত্রে আমার আজ কোন গভীর আত্মিক মিলই নেই। শ্রীকুমার বাবুর সঙ্গে ছিল এ-অঙ্গীকারে তাইতো আমার আনন্দ আরও গভীর হয়ে উঠেছিল। এ-হেন পরম শুভানুধ্যায়ী আমার আত্মীয়ের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ থেকে আজ আমি বঞ্চিত হয়েছি ভাবতে ব্যথা বাজে, যদিও সে ব্যথার উলটোপিঠে এই সান্ত্বনা আছে যে, তাঁর আশীর্বাদ আমার তীর্থযাত্রার পথে আমাকে যে-বল দিয়েছিল সে-পাথেয় অফুরান।

এ-আশীর্বাদের মূল্য আমার কাছে আরও বেশি হয়ে উঠেছে আজ বিশেষ করে এইজন্যে যে, যেখানেই আমার সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয়েছে সেখানেই তিনি আমার যুক্তিখণ্ডন করতে কুণ্ঠিত হননি। সত্যের ভিৎ—এই আমাদের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ আসীন ছিল, তাই সে-সম্বন্ধে মতভেদের কাটল হুদাসীন আনন্দ-সম্বন্ধের কোন হানি করতে পারেনি। এই মতভেদের একটি মাত্র উদাহরণ দিয়েই আমার এ দীর্ঘপত্রের সমাপ্তি টানব।

আমার সুভাষ-তর্পণ (Netaji, the Man) বইটি পড়ে তিনি একটি পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও লিখেছিলেন যে, সুভাষ যে-পথে গিয়েছিল সে পথের পথিক হওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। আমি আমার তর্পণে লিখেছিলাম—সুভাষ রাজনীতির বিপথে পা না দিলে আজ সে আমাদের মধ্যে জাতীয় জীবনে এক ভাবের পথিকৃৎ হয়ে আমাদের দিব্য প্রেরণা দিত—যেহেতু সে স্বভাবে ছিল ভাবুক তথা যোগী, রাজনৈতিক নয়। শ্রীকুমার বাবু আমার এ উক্তি প্রতিবাদ করায় আমি তাঁকে লিখেছিলাম :

"আজ দেশের কী দুরবস্থা বলুন তো? পিতৃদেব মেবারপতনে গেয়েছিলেন : 'আবার তোরা মানুষ হ.' সুভাষ ছিল মানুষের মত মানুষ—স্বভাবে নেতা। তাই আমি এখনো অনুতপ্ত, বলবই বলব যে সুভাষ যদি ধর্মের জগতে থাকত তাহলে আজ সে আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় বিবেকানন্দ হয়ে এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ 'নেশন-বিলডার' রূপে আমাদের আশ্বস্ত করতে পারত তার আত্মিক জ্যোতির অভীমন্ত্রে।" (আমি শুধু আমার পত্রের চুম্বকটি দিলাম এখানে)

উত্তরে শ্রীকুমার বাবু আমাকে লিখেছিলেন :

শ্রীশ্রীদুর্গা। ৩১, সাদার্ণ এভিনিউ
১৪।৫।৬৩ কলিকাতা-২৯

স্নেহাস্পদেষু
প্রিয় দিলীপ
তোমার পত্র পেলাম।......

আমার লেখাটা তোমার ভালো লেগেছে জেনে সুখী হলাম। তোমার অনুতাপ জন্মানো তো দূরের কথা, তোমার মত পরিবর্তনেরও দুরাশা প্রবন্ধটি লিখবার সময় আমার মনে স্থান পায় নি। তবে বিষয়টাকে যে আর একদিক থেকেও দেখা যায় এই কথাটাই তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম। পাপীকে পরিবর্তন করা যায়, ধার্মিককে কে কবে পরিবর্তন করতে পেরেছে? জগাই মাধাইকে সংশোধন করা যেতে পারে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য সংশোধনাতীত।

তবে আমার মনে হয় তোমরা অধ্যাত্ম সাধনায় জীবনকে নিয়োগ করার ফলে প্রাকৃত মানুষের প্রয়োজনটা সব সময়ে উপলব্ধি করো না। শ্রীঅরবিন্দ যদি বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞানরাজ্যের অধীশ্বর না হতেন তাহলেও হয়ত তিনি নিজে পরমহংসশ্রেণী যোগেশ্বর হতে পারতেন, কিন্তু সাধনতত্ত্ব কি এমন চমৎকার করে বোঝাতে পারতেন? তোমার নিজের কথাটাই ভেবে দেখ না কেন। তোমার যদি সুকুমার শিল্পসাহিত্যে অসাধারণ অধিকার না থাকত তবে "অঘটন" হয়ত ঘটতই, কিন্তু সেই অঘটনের কাহিনী কি এমন চিত্তাকর্ষক ঢঙে এমন মনস্তত্ত্বসম্মত উপায়ে বিবৃত করতে পারতে? বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন, কিন্তু যে-বেচারী শেষ নাগ তার অযুতফণায় বিশ্বের ভারসাম্য রক্ষা করছে, অধ্যাত্মসাধনা ব্যাপারে তার কি কোনো সহযোগিতা

নেই? পুরাণে পাই—মুনিঋষিরা তাঁদের তপস্যাকে নানা দানবিক অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্যে রাজশক্তির আনুকূল্য চাইতেন। তাঁরা তাঁদের অধ্যাত্মসাধনলব্ধ ব্রহ্মতেজে যজ্ঞবিঘ্নকারী দৈত্যদানাদের সহজেই ভস্মীভূত করতে পারতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু করেন নি কেন? শুধু এই জন্যেই নয় কি যে, তাঁদের যোগশক্তির এরূপ অপচয় তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্যের অনুকূল মনে করেন নি? সুভাষ ধর্মপথে গেলে দ্বিতীয় বিবেকানন্দ হতে পারত এটা ঠিক; কিন্তু যে-শ্রীঅরবিন্দ বা বিবেকানন্দ একক মাহাত্ম্যে আমাদের মধ্যে জন্মেছেন, আমরা কি তাঁদেরই সাধনা আত্মসাৎ করতে পেরেছি? ঐশীশক্তিসম্পন্ন লোক যত কম জন্মায় ততই ভালো; কেন না পূর্বঋষিদের সাধনা আয়ত্ত করায় আমরা তত বেশি সুযোগ পাব। কে জানে, সুভাষ সিদ্ধিলাভ করলে কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের সংঘাতের মত আবার নূতন একটা মতবাদ গজিয়ে উঠে আমাদের বিভ্রান্ত করত কি না? এই জন্যেই আমি লিখেছিলাম তোমার Netaji, the Man বইটিতে তোমার মতের প্রতিবাদে যে, "গ্রন্থকার তদানীন্তন অতলস্পর্শী বিফলতার কথা হয়ত সম্যক্ ভেবে দেখেন নি যার ফলে আমরা পড়ে গিয়েছিলাম নৈরাশ্যের পাতালে। তাই সুভাষের আই-এন-এ সৈন্যব্যূহ গড়ে তোলাকে বলা চলে সময়োপযোগী—যার প্রসাদে আমরা হতাশা কাটিয়ে দুরাশার দীপ্ত আলোকলোকে জেগে উঠেছিলাম।" তাই তোমার বইটির ভূয়সী প্রশংসা করা সত্ত্বেও আমি বলতে চাই যে, সুভাষ তার বিধি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেছে। সে যে দ্বিতীয় বিবেকানন্দ হয় নি তা হয়ত ভগবৎ-ইচ্ছারই নিগূঢ় অনুবর্তন।

যাক্, এবার পত্র শেষ করি। আমি একরকম আছি ও আমার দ্বারা ভগবান যে কাজ সম্পন্ন করাতে চান তা যথাশক্তি নিষ্পন্ন করার চেষ্টা করছি।

তুমি ও ইন্দিরা আমার আশীর্বাদ জানবে।

ইতি।

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ চিঠিটি আস্ত উদ্ধৃত করলাম আরো তাঁর স্বাধীন চিন্তার তেজস্বিতা তথা দৃষ্টিভঙ্গির বলিষ্ঠ স্বকীয়তাকে ফুটিয়ে তুলতে।

গত কয়েক বৎসর ধ'রে তাঁকে দেহদুঃখ সইতে হয়েছিল অনেক। কিন্তু মন তাঁর তেমনি তাজা ছিল। কলকাতায় শেষবার যখন তিনি আমার গানের আসরে আসেন তখন ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও আমার ভজন শুনে সমানে অশ্রুপাত করেছিলেন আগের মতই। শুধু তাই নয়, দেহের দৌর্বল্য সত্ত্বেও আমার 'মধুমুরলী' কাব্যগ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। তাতে আমার কবিতার দুএকটি ত্রুটির কথা লেখার পরে উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছিলেন। লিখেছিলেন:

"দিলীপকুমারের কবিপ্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ হয়েছে তাঁর দার্শনিক কবিতাবলীর মধ্যে। এখানে তাঁর বুদ্ধি-সমীক্ষা ও কাব্যানুসন্ধার অপূর্ব সমন্বয় আশ্চর্যভাবে উদাহৃত। মননশৃঙ্খলার দৃঢ় কাণ্ড অবলম্বন ক'রে সুকুমার লতিকার ম'ত কবির সৃষ্টি ভাবের ও শিল্পলাবণ্যের ঊর্ধ্বজগতে অনায়াসে বিহার করেছে।"

ভক্তিসঙ্গীত ও ভক্তিকাব্য তাঁর মনকে কী গভীরভাবে নাড়া দিত ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। তবে এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব—দেহের বার্ধক্য সত্ত্বেও এই অনুভবের তারুণ্য অক্ষুণ্ণ রাখায় সহজ পটুতা। তাই তো বৃদ্ধবয়সেও বহু কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন শেষ পর্যন্ত অথচ সাধারণ ঐহিক মানুষ যেভাবে কর্মভোগে জড়িয়ে পড়ে সেভাবে নয়—তাঁর পত্রের শেষে যে ছত্রটি লিখেছিলেন আমাকে স্মরণীয়: "আমাকে দিয়ে ভগবান্ যে-কাজ সম্পন্ন করাতে চান তা যথাশক্তি নিষ্পন্ন করার চেষ্টা করছি।"

এই ই হ'ল কর্মযোগের কথা: কর্ম যখন ভগবানের চরণে সমর্পিত হয় তখনই কেবল সে যোগের কোঠায় উত্তীর্ণ হয়, নৈলে সে-কর্ম থাকে ঐহিক কর্ম মাত্র—যার ফলাফল ঐহিক পাপপুণ্যের সঙ্গেই অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা। শ্রীকুমার বাবুর কর্ম ছিল ভগবৎ-মুখী, যার অন্ত্য লক্ষ্য—নিষ্কাম কর্মী হ'তে পারা। এ-আদর্শে পৌঁছতে পারা

চাট্টিখানি কথা নয়। অবশ্য প্রতি কর্মীই জীবনে তাঁর মনের প্রাণের ভগবৎমুখী স্বরূপে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ-উদ্বুদ্ধ হয়ে চলতে চান। কিন্তু চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান থাকবেই। তাই আমি বলছি না যে, শ্রীকুমার বাবু তাঁর আদর্শকে প্রতিবাদে পূর্ণপদে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, প্রতি কর্মের চেষ্টাকে ভাগবত সিদ্ধমুখী ক'রে অনায়াসে কৃতকৃত্য হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের সঙ্গে আমি নানাসূত্রে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার ফলে একটা জিনিষ আমার চোখে পড়ত বারবারই: যে, তাঁর মধ্যে একটি নিস্পৃহ উদাসী ধার্মিক ছিল যার প্রার্থনা নিরন্তরই ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠত উপনিষদের প্রার্থনার সুরে: "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—ঠাকুর আমাদের বুদ্ধিকে পরম মঙ্গলের সঙ্গে সংযুক্ত করুন।" বিশেষ ক'রে বহুপাঠী বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় সবজান্তা মোড়লের ভাব। এ-ভাবের লেশও কোনোদিন শ্রীকুমার বাবুর অশ্রান্ত কর্মসাধনাকে ম্লান করে নি।

তিনি আমাদের সমাজকে দিয়ে গেছেন অনেক কিছু—তাঁর চারিত্রবলে, ভাবুকতায়—সর্বোপরি আত্মিক শক্তিতে শ্রদ্ধা ও অধ্যাত্মসাধনে নিষ্ঠার ফলে গড়ে ওঠা সুসমঞ্জস আনন্দদানের সহজ প্রতিভায়। তাঁর ভগবৎ-কৃপাধন্য জীবনের যে-সুন্দর নিটোল পরিণতি তাঁর জীবনদর্শনের ও কর্মাঞ্জলির মধ্যে দিয়ে উত্তরোত্তর ফুটে উঠত। তাঁর উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞ প্রণাম জানাই তাঁর স্নেহধন্য অতৃপ্ত অনুরাগীর মুখপাত্র-রূপে।

ইতি—

২৫শে ফাল্গুন
১৩৭৬।

তোমার নিত্য শুভার্থী
শ্রীদিলীপকুমার রায়

যত আঁধার তত আলো

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৩

ব্রজ সিনহার ঘর দু'খানিও খালি হ'য়ে গেল। শনিবারের সন্ধ্যাটা আর নৃত্যগীতে মুখর হ'য়ে ওঠেনা।

ব্রজ সিনহা এবং বাসার সকল দায়িত্ব সারওয়াগীই নিয়েছে। যদিও তারা আলাদা বাড়ীতেই থাকবে। সারওয়াগীর শ্বশুর হিসাবে এই বাজারবাড়ীতে থাকাটা তার পছন্দ নয়, শোভনও নয়। কথাটা সারওয়াগীর।

সারওয়াগী দিলদরিয়া লোক, বিয়ে উপলক্ষ্যে এই বাজারবাড়ীর প্রত্যেকটি লোককেই প্রচুর খাইয়েছেন। যারা বিয়ের আগে বিস্তর চেঁচিয়েছে বিয়ের সময় তারা আর নতুন করে গোল বাধায়নি।

জগন্নাথ চৌধুরী ঘুরে ঘুরে খানিক তদারক করে একসময় সকলের অলক্ষ্যে ঘরে চলে গেলেন। মনের কোথায় যেন একটা খোঁচা লেগে রক্ত ঝরতে সুরু করেছে।

আর একটি মেয়েও একদিন নিরুপায় হ'য়ে ছগনকে বিয়ে ক'রেছিল। ছগন আর সারওয়াগী। দুজনে কত প্রভেদ।

ছগনের বৌ আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্য আত্মবলি দিয়েছে—জীবন দিয়ে জীবনের মূল্য পরিশোধ ক'রে গিয়েছে। আর সারওয়াগী কুলসম্মান ফিরিয়ে দেবার জন্যই কবিতাকে স্ত্রীর সম্মান দিয়ে গ্রহণ করেছে। প্রভেদ আছে বৈকি বা থাকবেও চিরদিন।

জগন্নাথ বহুদিন পরে আবার ছগনের বৌ-র খাতা-খানি নিয়ে বসলেন।

দিনলিপির একাদশ পৃষ্ঠা

সুকুমার পাকা অভিনেতা। আমি অন্ধ আর মূর্খ দর্শক। অভিনয়কে সত্য ভেবে শূন্যে সৌধ রচনা করেছি। যথাসময় সে সৌধ আমার মাথায়ই ভেঙে পড়লো। জানিনা আরও কত দুর্ভাগিনীর জীবন্ত কবরের উপর সুকুমার-ছগন কোম্পানীর অর্থের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলতে লাগল। সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল আমার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় জীবন। আমি ছগনের লোহার খাঁচায় বন্দিনী। ওরা পোষ মানিয়ে হাত বদল করবে বহু সহস্র টাকার বিনিময়ে। খবরটা সংগ্রহ ক'রতে খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি।

যে দেহটাকে নিয়ে এতো জঞ্জাল জড়ো হ'য়েছে সেই দেহের বিনিময়ে যদি আমাকে তা সাফ ক'রতে হয় তবুও আমি পিছু হ'টবো না। আমি ছগনকে রক্ত-চক্ষু দেখালেও তার একান্ত সচিবকে কাছে টেনে নিলাম। ওকে আমার চাই। ওরই সাহায্যে একবার যদি এই খাঁচার বাইরে যেতে পারি তারপর চূর্ণ ক'রবো ছগনকে—চূর্ণ ক'রবো সুকুমারকে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগা যে আমার গোপন সংকল্প প্রকাশ হ'য়ে পড়লো তার অহেতুক ব্যস্ততায়। ছগনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না—দেখা গেল তার একান্ত সচিবের মধ্যে। সে পালাল। কিন্তু পরে জেনেছি যে এদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসভঙ্গ ক'রে পালাতে গেলে তাকে চিরদিনের জন্যই চলে যেতে হয়। বেচারা—আমাকে

নিয়ে সংসার ক'রবার প্রলোভনে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণটা দিতে হ'লো। বড় দমে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মন আমাকে আশার বাণী শোনাল।......

দ্বাদশ পৃষ্ঠা :

সত্যইতো আমার আবার পিছন ফিরে তাকাবার দরকার কি। অতীত আমার জন্য কোনদিন আর ফিরে আসবে না। নিজেকে নতুনভাবে প্রস্তুত ক'রে নিলাম। আমি জানি এর পরে আমাকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ছগনলালের। হ'লোও তাই।

কিন্তু তুরুপের টেক্কাটি তখন আমার হাতে। ওর একান্তসচিবের সহায়তায় ওদের বহু গোপন দলিল আমি হাত করেছি, একথা ওরা জানে। ছগনের শত অত্যাচারেও তা আর ফিরে পাবেনা একথাও সাহসের সঙ্গে জানালাম। আরও বললাম একজন একান্ত-সচিবকে সরিয়ে যদি ভেবে থাক পথ পরিষ্কার হয়েছে তা'হলে ভুল ক'রেছো। ছগন বলল, সাবাস! সে আমার সঙ্গে একটা রফা ক'রতে আগ্রহ প্রকাশ ক'রল, ওর আগ্রহ আমাকে ভাবিয়ে তুলল। আমি দ্বিধায় পড়লাম। নতুন কোন মতলব হাসিল ক'রবার জন্যই তার এ আগ্রহ কিনা তা তখন না বুঝলেও পরে জানতে পারলাম। ছগন আমাকেও তাদের একজন অংশীদার ক'রে নিতে সাগ্রহে এগিয়ে এল। আমি এ সুযোগ গ্রহণ করলাম। আমার নিজের জন্য নয়। আমার পক্ষে সর্বত্রই সমান। আমার জীবনের আর কতটুকু মূল্য। কিন্তু কাছে কাছে থেকে যদি আর দশটা অসহায় জীবনকে এদের লোলুপ হৃদয়হীন আবেষ্টন থেকে মুক্ত ক'রে দেবার সুযোগ ক'রতে পারি তা'হলে নিজের অতৃপ্ত আত্মার কাছে অন্ততঃ একটা কৈফিয়ৎ দিতে পারব। আজ এই মুহূর্তে এই পন্থাই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হ'লো। ছগনের মুঠোর মধ্যে গিয়ে ওকে মুঠোয় পুরবো এইটেই ছিল আমার সংকল্প। তাই আইনসম্মতভাবে ওকে বিয়ে ক'রলাম।......

ত্রয়োদশ পৃষ্ঠা :

কিন্তু সংকল্প করা এক আর তার বাস্তব রূপ দেওয়া আলাদা কথাটা অল্পদিনের ব্যবধানেই বুঝতে পারলাম। মন আমার রুখে দাঁড়াল। আর দেহটা একটা অস্বস্তিকর আতঙ্কে সর্বদা সজাগ দৃষ্টিতে ছগনকে পাহারা দিতে লাগল। কিন্তু এমনি এক পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ বাঁচতে পারে না। ছগন তার স্বামীত্বের অধিকার নিয়ে বেশী এগিয়ে এলেই তাকে ছড়ি হাতে মানুষ হবার শিক্ষা দেবার চেষ্টা করি, ওকে বুঝিয়ে বলি যে, পয়সাকে অত ভাল না বেসে, মানুষকে ভালবাসতে শেখ তুমি সব পাবে। মানুষ বিক্রির পাপ-ব্যবসা তোমাকে গোটাতেই হবে। ছগন উপেক্ষার হাসি হাসে। সে হাসি আমার সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমি বলি, তোমার কারবারের গোপন দলিল আজও আমার লোকের কাছেই আছে। আমি স্পষ্ট দেখলাম তার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। হাত দুখানা মুষ্টিবদ্ধ হ'ল।

মনে মনে আমি ভয় পেলেও প্রকাশ্যে দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, তোমার দলে ভাঙন ধরেছে। তাদের অনেকে আজ আমার হাতের মুঠোয়। তোমার একান্তসচিবকে তত খুন করে রেহাই পেলেও আমার গায়ে হাত দিয়ে সুবিধে হবে না। তোমার লোকই তোমাকে টুঁটি টিপে মারবে। চাইকি একবার তোমার কুমারবাবুর সঙ্গেও পরামর্শ করে দেখতে পার।

ছগনের চোখদুটো ধীরে ধীরে ছোট হ'য়ে গেল। সম্ভবতঃ ভয় পেয়েছে...আমি পুনরায় বললাম, তোমার কুমারবাবুর একলার কতখানি বুদ্ধি, আর কতখানি শক্তি। আমার কথা শোন। তোমার অনেক টাকা—আজীবন তুমি সুখে থাকতে পারবে—আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো......

ছগন একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল, চুপ রহ......

চতুর্দশ পৃষ্ঠা :

আমি চুপ করেই গেলাম। ছগন কিন্তু চুপ ক'রে

থাকতে পারল না। ও হয়তো ভেবেছিল যে চীৎকারের জবাব আমি চীৎকার করেই দেবো। তাহ'লে একটা সহজ পথ আবিষ্কার করা তার পক্ষে সহজ হ'তো। আমার নীরবতা সম্ভবতঃ ছগনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সবসময় আমাকে পাহারা দিতে লাগল। যে সন্দেহের বিষ আমি ছড়িয়েছি ওর রক্তের মধ্যে তার ক্রিয়া সুরু হয়েছে। ছগনের ছটফটানি দেখে কথাটা আমার মনে হ'য়েছে। মনে মনে একটা হিংস্র আনন্দ অনুভব করলাম। ছগন নম্র হ'লো। কারবার গুটিয়ে নেবার প্রতিশ্রুতি দিল। আশ্চর্য্য হ'লাম। এই নীতি স্বীকার কি নিছক ভয় পেয়ে না আমার দেহটার প্রতি ওর আসক্তির জন্য তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। ছগনের দৃষ্টিতে কেমন একটা ভাবাবেগ···একটা কুটিলতা প্রকাশ পেল। এ দৃষ্টি আমার পরিচিত। সুকুমারের দৃষ্টির মধ্যেও পরস্পরবিরোধী দুটি ভাবের খেলা আমি লক্ষ্য করেছি। তখন না বুঝলেও আজ আর বুঝতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু ছগনকে আর বেশী করে ঘাঁটাতে ভরসা পেলাম না। ওর মনে নতুন কোন সন্দেহের বিষ প্রবেশ করাতে আমি চাইনা, বরং বিশ্বাস করে ওর মনে বিশ্বাসের প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে আমি বদ্ধপরিকর হ'লাম। এক চমৎকার খেলায় আমি মেতে উঠলাম।

পঞ্চদশ পৃষ্ঠা :

আমার পোড়া অদৃষ্ট। আমি আছি খেলায় মেতে আর শয়তানটা তার পোষা বিড়ালকে আমার অলক্ষ্যে দিয়েছে ছেড়ে। আমার একাগ্রতার সুযোগ নিয়ে কখন যে ঘুঁটিগুলো ওলোটপালট ক'রে দিয়ে যায় আমি তা জানতে পারি না। ছগনের ব্যবসা আমার অলক্ষ্যেই চলেছে এবং ভালভাবেই চলছে। শুধু পূর্ব্বের ধারাটি পালটে নিয়েছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি আর সামান্য শক্তি নিয়ে মিথ্যাই বছরের পর বছর তাল ঠুকেছি। কাজ কিছুই এগোয়নি। আমাকে স্ত্রীরূপে পাশে পেয়ে ছগনের কাজে বরং সুবিধেই হয়েছে। একটা ভদ্র পোষাকের আড়ালে নিজের কদর্য্য চেহারাটাকে ঢেকে রেখে পরম নিশ্চিন্তে সে কাজ ক'রে গেছে। তবে এক স্থানে বেশী দিন থাকবার সাহস তার হয়নি। শেষ পর্যন্ত এই বাজারবাড়ীর দুখানি ঘর সে দখল ক'রে বসলো।

এখানে নানা জাতির নানা পরিবারের সঙ্গে একটা সহজ সম্বন্ধ গড়ে তুলে নিজেকে অনায়াসে তাদের একজন ব'লে চালিয়ে দিল। তাদের সুখে দুঃখে এগিয়ে যায়—নানাভাবে সাহায্য করে। ভাবলাম মন্দ কি—যা খুইয়েছি তা নিয়ে আর ক্ষোভ ক'রবো না। যা পেলাম তার মূল্যই বা এমন কম কি।

ষোড়শ পৃষ্ঠা :

কিন্তু আমার এই আত্মতুষ্টি আমার কল্পনায় গড়া। আমার দৃষ্টি শুধু একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সে দৃষ্টি নিজের মনগড়া দৃষ্টি দিয়েই সব দেখেছে। তার বাইরের কোন কিছু চোখে পড়েনি। আমার দুটি মাত্র চোখে কতখানি আর দেখেছি, একটি মাত্র মাথায় কতখানি চিন্তা ক'রতে পেরেছি।

আমি হেরে গেছি। আমার একার শক্তি এতবড় সঙ্ঘবদ্ধ পাশব-শক্তিকে রোধ ক'রতে সক্ষম হলো না। ঘৃণা ধরে গেছে আমার বর্ত্তমান জীবনের উপর। আমার বেঁচে থাকা সবদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় দুঃখ এই হীন ব্যবসার সঙ্গে বহু ভদ্রবেশী ধনী আর মানী ব্যক্তিরা জড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের বুদ্ধি, অর্থ আর শক্তি এদের নিঃশব্দে, রক্ষা ক'রে চলেছে। নিজের রক্ত মাংসের দেহটার প্রতি আবার নতুন দৃষ্টিতে তাকালাম। কি ছিল কি হ'য়েছে। অথচ এই দেহটাকে নিয়েই কত কাণ্ড ঘটলো। কিন্তু আমি আর পারছিনা। একটা মৃত দেহকে স্পিরিটে ভিজিয়ে আর কতদিন তাকে ধরে রাখব। তার চেয়ে যে গেছে সে একেবারেই যাক।

এই প্রকাণ্ড দলটির বহু সংবাদ এবং দলিলপত্র আমি সংগ্রহ করেছি। যথাস্থানে তা পাঠিয়েও দিয়েছি। ছগন হয়ত সন্দেহ করেছে। আমার গলাটিপে মেরে ফেলতে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত নিজে পালিয়েছে। আমার

প্রেরিত দলিলপত্র যখন যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছুবে তখন আমি আর থাকব না ভবিষ্যৎ ওদের ভাগ্যে কি লিখিবে তা আমি জানি না। কিন্তু যাবার আগে আমি এই বিশ্বাস নিয়েই যাচ্ছি যে পৃথিবীর বুক থেকে আজও সত্য একেবারে মুছে যায়নি—যেতে পারে না……

জগন্নাথ সহসা হা হা করে' হেসে উঠলেন। তার আর সত্য…সব চেয়ে বড় মিথ্যা……

পাশের ঘর থেকে মনোরমা দ্রুতপদে এ ঘরে ছুটে এল। তার চোখেমুখে বিস্ময়। কি মিথ্যা দাদু? তুমি কিসের কথা বলছো?

কোন একটা অপরাধ করে ধরা পড়ে যাওয়ার মত মুখের অবস্থা হ'ল জগন্নাথের। তিনি বললেন, ও কিছু নয় মনোদিদি।

মনোরমা ভ্রু কুঁচকে বলল, কিন্তু হাতের খাতাখানা কিছু নয় বলে নিশ্চয় উড়িয়ে দিতে পারি না দাদু।

একটু থেমে সে পুনরায় বলল, এতদিন আমার সত্যিই মনে হ'চ্ছে কৌতূহলের বশে খাতাখানা রেখে আমি ভাল কাজ করিনি। নিজেও দুঃখ পেয়েছি তোমাকেও দুঃখ দিয়েছি।

জগন্নাথ এতক্ষণে সামলে নিয়েছেন। তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, ও সব নাটুকে দুঃখ আমার নেই। তাছাড়া ছগনের বৌ আমার কে যে দুঃখ পাব? মিথ্যে… মানে অকারণে দুঃখ পাওয়াটাই মিথ্যে তাই নিজেকে নিজে বলেছিলাম।

মনোরমা হেসে উঠে বলল, হঠাৎ নিজেকে এ কথা শোনাবার দরকার হ'লো কেন দাদু? কৈফিয়ৎ দেবার জন্য বুঝি?

বলে সে চলে যেতে উদ্যত হতেই জগন্নাথ তাকে পেছনে ডাকলেন, শুনে যা দিদি-

মনোরমা চলে যেতে যেতে ব'লল, সময় নেই দাদু।

জগন্নাথ আর দ্বিতীয়বার ডাকলেন না। নিজের মধ্যে আবার ডুবে গেলেন। চতুর্দিকের হাওয়া-বাতাস যেন একেবারে থেমে গেছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে জগন্নাথের। আজকের এই শ্বাসরোধকারী চিন্তাটা মনোরমাকে নিয়ে। ওর চতুর্দিকের আলো বাতাসকে তিনি সাদা পাথরের দেয়াল তুলে আবদ্ধ করে রেখেছেন। মনোরমার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা সেই সাদা দেয়ালের গায় মাথা ঠুকে ঠুকে আজ হয়তো শ্রান্ত-ক্লান্ত। স্পন্দন আছে—উদ্দীপনা নেই। ঠিক ঠিক যেমনটি জগন্নাথ একদিন ভেবে রেখেছিলেন হুবহু তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। অথচ নিজের কাজের এমন সুষ্ঠু পরিণতি দেখেও আজ তিনি বেদনাবোধ ক'রছেন। যদিও এই পথে চলা ছাড়া আর অন্য কোন সমাধানজনক দিক তার চোখে পড়েনি। আজ কিন্তু জগন্নাথ ভিন্ন ধারার চিন্তা ক'রতে বসেছেন—দৃষ্টি আজ নতুন কিছু খুঁজে ফিরছে। কিন্তু চতুর্দিকে তাঁর রাশি রাশি কাল অন্ধকার। আলো জ্বালবার প্রধান বস্তুটি তিনি হারিয়ে বসে আছেন।…তাই শুধু হতাশা আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস তার বুকের মধ্যে তোলপাড় ক'রছে।

মনোরমা পুনরায় ফিরে এসে অভিমান ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, তোমার আজ কি হয়েছে? আজ যে বড় আর ডাকলে না দাদু। তামুক খেতেও ভুলে গেলে?

জগন্নাথের তন্ময়তা কেটে গেল। সঙ্গোপনে একটি নিঃশ্বাস চেপে গিয়ে একটু হেসে বললেন, ভুলবো কেন মনোদিদি? তবে তামুকের আগে একবাটি চা পেলে আরও ভাল হয় ভাই।

মনোরমা পুনরায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তার চলার পথের পানে খানিক চেয়ে থেকে পুনরায় তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। নিজের বিরুদ্ধেই আজ তিনি ক্ষেপে গেছেন। মনোরমার অপরিণত অনুভূতির বিকাশের পথগুলিকে কেন তিনি বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন আজ তারই কৈফিয়ৎ চাইছেন নিজের কাছে। আজ যদি মানুষ তার মত এবং পথকে বদলে ফেলতে পারে মনোরমা কি পারবে একটি সবুজ তাজা মন নিয়ে এগিয়ে যেতে! একটু একটু করে সযত্নে ওর চিন্তাকে, যুক্তিকে অনুভূতিকে তিনি নিজের মতানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে হয়তো……

জগন্নাথ চমকে উঠলেন। এসব তিনি কি ভাবছেন! মনোরমার পক্ষে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে আসাটাই ত'

বড় কথা নয়। ওর চলার পথের সীমাকে তিনি আর কতটুকু সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। ওর সৃষ্টিকর্তাই জীবনের সূচনায় এক নিষ্ঠুর পরিহাস ক'রে বসেছেন। তারই জের টানতে হচ্ছে জগন্নাথকে।

বোবা সৃষ্টিকর্তাকে দোষারোপ ক'রেও তিনি আপন মনে মাথা নাড়তে থাকেন। সকলপ্রকার যুক্তি আজ তাঁর কাছে কেমন অর্থহীন মনে হচ্ছে—বড় কঠিন আর কঠোর এই যুক্তিগুলি। অথচ এই যুক্তিকেই একদিন তিনি কন্যার প্রতি অপরিসীম স্নেহে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হননি কিন্তু সেই কন্যারই গর্ভজাত সন্তানের প্রশ্ন যখন দেখা দিল তখন এই যুক্তিগুলিই অমোঘ সত্য হ'য়ে উঠল জগন্নাথের কাছে। দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি এগিয়ে গেলেন। কোন প্রকার দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলেন না। আজ জীবনের সায়াহ্নে উপস্থিত হ'য়ে অতীতের ফেলে-আসা দিনগুলিই আবার নতুন সমস্যার রূপ নিয়ে তাকে বিচলিত ক'রে তুলেছে। তাঁর অবর্তমানে এই নিরপরাধী মেয়েটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। ভবিষ্যত ওকে কোন পথে টেনে নিয়ে যাবে। জগন্নাথ চোখে অন্ধকার দেখছেন। তাঁর শ্বাসরোধ হয়ে আসছে।

মনোরমার আহ্বানে পুনরায় তিনি চিন্তার জগত থেকে মাটির জগতে ফিরে এলেন।

মনোরমা বলছিল, চা নাও দাদু। ভাবুক একটু পরেই দিচ্ছি।

জগন্নাথ নিঃশব্দে পিয়ালাটি তার হাতে থেকে তুলে নিতেই মনোরমা চলে গেল।

জগন্নাথ চায়ের পেয়ালাটি পাশের টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে পুনরায় চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন।……দুহাত ভরে শুধু নিচ্ছেন কিন্তু দিতে পেরেছেন কতটুকু। খানিকটা স্নেহ আর খানিক ভালবাসা। এই স্নেহ আর ভালবাসাকে পাথেয় ক'রে কতদিন মনোরমা এই মানুষের পৃথিবীতে সহজভাবে পথ চলতে সক্ষম হবে। নিজে তিনি জীবনপথের শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন আর মনোরমা সবে সুরুতে পা দিয়েছে। দীর্ঘ বিপদসঙ্কুল পথ অথচ পাশে এসে কেউ হাত ধরে দাঁড়াবার নেই। কারণে অকারণে ইদানিং এই একটা চিন্তাই জগন্নাথকে পাগল ক'রে তুলেছে। অন্ধের মত শুধু পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন কিন্তু কোথায় পথ……

মনোরমার পুনরাবির্ভাবে জগন্নাথ চমকে উঠে দ্রুত চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে তাতে চুমুক দিলেন।

তাঁর রকম দেখে মনোরমা হেসে ফেলে বলল, আমি না এলে বোধ হয় চায়ের কথা তোমার মনেই হ'তো না দাদু।

জগন্নাথ মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, পড়তো বৈকি দিদি। না পড়ে কি উপায় আছে। আমার একটা ভয়-ডর নেই?

মনোরমা গম্ভীর হ'য়ে উঠল। বলল, কদিন ধরেই তুমি বড্ড অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছো। আমার মোটেই ভাল লাগছে না। তুমি তো এমন কোন দিন ছিলে না দাদু। দাবা খেলা বন্ধ ক'রেছো। টহল দেওয়াও প্রায় ছেড়ে দিয়েছো। এমন ক'রলে বাঁচবে কতদিন?

জগন্নাথ খানিক স্থিরদৃষ্টিতে মনোরমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখেমুখে একটা চাপা উদ্বেগের ভাব দেখা দিল। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হঠাৎ এ কথা ব'লছো কেন দিদি?

মনোরমা খানিক কি ভেবে শান্তকণ্ঠে বলল, কোন দিন কিছু বলি না ব'লেই কি তুমি কিছু করো আমি নিজের সম্বন্ধে কোন কথা ভাবি না? তর্কের খাতিরে যত কথাই বলি না কেন আসলটা সত্যিইতো তোমার থেকে নেই।

জগন্নাথ সোজা হয়ে বসলেন। মাথাটা একবার ডাইনে থেকে বাঁয়ে হেলিয়ে বললেন, এ কথ'তো আমার কথা ভাই। তুমিই বরং সবসময় আমাকে থামিয়ে দাও দিদি?

ভাবতে ভয় পাই ব'লে। মনোরমা ক্লান্ত হেসে জবাব দিল, ভাবতে ভাল লাগে না তাই থামিয়ে দিই। নইলে এই চিন্তাই আমার সবার বড় চিন্তা হওয়া উচিত তা বুঝি কিন্তু পাছে তুমি দুঃখ পাও, আমার ভবিষ্যত

নিয়ে বিব্রত বোধ করো তাই তোমাকে থামিয়ে দিই নইলে যা সত্য তাকে অস্বীকার করলেই মিথ্যে হ'য়ে যেতে পারে না দাদু।

জগন্নাথ মনোরমাকে মেনে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, কিন্তু তুই কিছু বলিস না বলেই কি আমি ভাবনামুক্ত মনোদিদি? যতদিন বয়েসের জোর ছিল, গায়ের জোরে সব উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রেছি। নিজের সুবিধেমত "যুক্তিকে" মনে ক'রেছি দুর্বলতা—দুর্বলতার আখ্যা দিয়েছি যুক্তি। আজ কিন্তু দুর্বলতাই সবার বড় হয়ে উঠেছে। মন বলছে মানুষের বুকে এই দুর্বলতা ছিল বলেই তাকে দিয়ে অনেক মহৎকাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। নইলে দুনিয়াটা নিতান্তই একটা লড়াইখানা হ'য়ে পড়তো।

মনোরমা মৃদু কণ্ঠে বলল, বুঝলাম না দাদু।

জগন্নাথ একটু দম নিয়ে পুনরায় ব'লতে লাগলেন, তোর দাদুর জীবনে একসময় একটা মস্তবড় দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। যুক্তি আর স্নেহের সঙ্গে বাধল সংঘর্ষ। স্নেহ পেল মাত্রাধিক মূল্য। তাকেই একমাত্র সত্য ব'লে মেনে নিতে গিয়ে সমাজ সংসার, আত্মীয় পরিজন সব ছাড়লাম। সর্বশক্তি দিয়ে আমার পরম স্নেহের পাত্রীকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রলাম কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লো না। কেমন ক'রে হবে তাই আমি যে নিজেই মস্তবড় অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ালাম। বুদ্ধি আমাকে বিপরীত কথা শোনাল যুক্তি বুকের সত্যকে গ্রাস ক'রে ফেলল। আমি না পারলাম এগিয়ে যেতে না পারলাম পিছিয়ে পড়তে। তাই মাঝ পথে দাঁড়িয়ে একবার সামনে তাকাই আবার পিছনে দৃষ্টি ফেরাই কিন্তু শেষের সন্ধান আজও পেলাম না। না এদিকের, না ওদিকের।

মনোরমা ডাকল, দাদু—

জগন্নাথ সাড়া দিলেন, কি ভাই।

মনোরমা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল, কোনদিন কোন কারণেই কি তোমার দুঃখের বোঝা আর কাউকে বইতে দেবে না।

জগন্নাথ অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, বড় ভারী আমার দুঃখের বোঝা সইতে পারবি না মনোদিদি—

জগন্নাথ নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠলেন। এ আজ কি তিনি বকতে সুরু ক'রেছেন। ঝোঁকের বশে তিনি অনেকখানি এগিয়ে গেছেন কিন্তু আর নয়।

মনোরমা বলল, বোঝা বইতে না দিয়েও কেমন করে আমার শক্তির পরিচয় পেলে দাদু?

জগন্নাথ কেমন একপ্রকার হেসে উঠলেন, তোর দাদুর ঐটেই সব চেয়ে বড় দোষ ভাই কিছু না বুঝেও বোঝার ভান করে।

মনোরমা আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা আবশ্যকবোধ ক'রল না। এর পরে জগন্নাথ যে মুখ খুলবেন না তা সে জানে।

১৪

ব্রজ সিনহার ঘর দুখানিও খালি হয়ে গেছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে নতুন ভাড়াটে এসেছে। হগনের ঘরদুটো আজও খালিই পড়ে আছে।

ব্রজ সিনহার ঘরদুটি দখল ক'রেছে দুটি যুবক। একটি কোন এক সওদাগরী অফিসে চাকরী করে। অপরটি কলেজের ছাত্র। স্বপাকে খায়, মহানন্দে বাসন মাজে মসলা পেষে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ ডাকলে এগিয়ে যায়। না ডাকলে কৌতূহল প্রকাশ করে না। মুখে সবসময় ওদের অম্লান হাসি।

বাল্যে ওরা মা বাপ হারিয়েছে। মামার কাছ থেকে যৎসামান্য আর্থিক সাহায্য পেয়ে বড়টি একটা পাশ ক'রতেই তিনি হাত গোটালেন। তারও সংসার আছে। এবং তা দিন দিন বৃদ্ধির পথেই চলেছে। মামীর আক্রোশকে ধিক্কার দিয়ে মামা তাঁর অক্ষমতার কথা ভাগনেকে জানিয়েছেন।

প্রত্যক্ষ সত্য চোখের সম্মুখে। ব'লবার কি থাকতে পারে। দেশের যা কিছু জমি-জমা ছিল বিক্রি করে ছোটর হাত ধরে বড় ভেসে পড়ল। কিন্তু বেশীদিন ওদের ভাবতে হয়নি। দুঃখকষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়

থাকায় যে কোন কাজকেই ওরা কাজ বলে ভাবতে শিখেছিল। শ্রেণী বিভাগ করে কাজের জাতি-বিচার ক'রতে শেখেনি। কাজ জুটল সামান্য কাজ। তাকেই অসামান্য মর্য্যাদা দিল। এই মর্য্যাদাবোধ তাকে ধাপে ধাপে উপরের দিকে ঠেলে দিতে লাগল। কাজই কাজের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যায়। উৎসাহ যোগায়। কাজের মধ্যে মহানন্দের স্বাদ পেয়েছে বড়।

বড় আর ছোট। রঞ্জন আর অঞ্জন।

অঞ্জন বলে, একটা লোক রেখে দিলে হয় না দাদা? সারা দিন পরিশ্রম করে এসে আবার রান্না করা অথচ আমার ওপর কিছু ক'রবার হুকুম নেই।

রঞ্জন হাসি মুখে বলে, সারাদিন কলেজ ক'রে এসে অঞ্জনবাবু যদি রান্না ক'রতে পারেন তাহ'লে রঞ্জনবাবু পারবেন না কেন। তাছাড়া—একটু থেমে রঞ্জন পুনরায় বলল, তোমার হ'লো একটা সাধনার সময়। এ সময়ের মূল্য অত্যন্ত বেশী। একে আমি অকারণে নষ্ট হ'তে দিতে পারি না অঞ্জন।

অঞ্জন বলল, সেই জন্যইতো লোক রাখার কথা ব'লছিলাম দাদা।

রঞ্জন জবাব দিল, তার মানে এখন থেকেই তুমি পরিশ্রমকে ভয়ের চোখে দেখতে সুরু ক'রেছো। এটা ভাল কথা নয়। ভয়ের কথা—দুঃখের কথা অঞ্জন। তাছাড়া টাকা আসবে কোথা থেকে ভাই।

অঞ্জন হাসি মুখে জবাব দিল, যা আসছে তাতেই হ'য়ে যেতে পারে দাদা।

রঞ্জন শান্তকণ্ঠে বলল, এটাও ভাল কথা নয় অঞ্জনবাবু। সাধনা আর টাকার হিসেব একসঙ্গে ক'রতে ব'সো না। যখন ও দায়িত্ব আমিই নিয়েছি আমাকেই ভাবতে দাও। মনে রেখো তুমি সফল হলেই আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পাব। তাছাড়া সবদিকেই আমার দৃষ্টি আছে সেতো দেখতেই পাচ্ছ। রাস্তা থেকে বস্তি, সেখান থেকে এই কোঠাবাড়ীতে এসেছো। অবস্থার সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রেখে চলবার চেষ্টাই আমি সবসময় করি। আর এতে আমি আনন্দ পাই অঞ্জন।

অঞ্জন লজ্জিত হয়। রঞ্জন মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

অঞ্জন কুণ্ঠিত হেসে বলে, কথাটা আমি ঠিক ও ভাবে বলিনি দাদা। এখানে এসে তোমার ঐ রাস্তার কথা ভাবতে বড় ভয় হয়।

রঞ্জন বলল, হঠাৎ রাস্তার কথাটা ভাবতে বসলে কেন অঞ্জন বাবু? তোমার এই ভয়টা কিন্তু পরাজিতের মনোভাব। একে সবসময় ত্যাগ করা উচিত। তাছাড়া ঘরের মানুষই একসময় রাস্তায় নেমে দাঁড়ায়, আবার রাস্তার মানুষই ঘরে উঠে আসে। অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলাটা সবচেয়ে বড় কথা। আমাদের নিজেদের দিকে তাকালেই সবসময় কথাটা আমি অনুভব করি। ভাল থাকতে আর ভাল পরতে সকলেই চায় কিন্তু পারে না। তাই বলে কি হতাশ হতে হবে অঞ্জন!

অঞ্জন নিরুত্তর।

রঞ্জন বলে, কি ভাবছো অঞ্জন? দাদা তোমায় দিব্যি গড় গড় করে "হিতোপদেশের" বাছাইকরা কথাগুলি আউড়ে যাচ্ছে—তাই না? আমি কিন্তু ধার করা কথা বলিনি। তোমার দাদার নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা এগুলো। আমারও সাধ ছিল—স্বপ্ন ছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক তা সফল হ'তে দিল না। আমার স্বপ্নের সফল রূপ তোমার মধ্যে দেখতে চাই অঞ্জন। আমার সামনে যে বাধা ছিল অঞ্জনের সামনে তা নেই। আমার একথা সবসময় মনে রেখো।

অঞ্জনের মুখে মিষ্টি হাসি।

রঞ্জন আর কথা না বাড়িয়ে বাজারের থলেটি হাতে তুলে নিল। অঞ্জন বলে, এই মাত্র তুমি আপিস থেকে এসেছো। হয় একটু বিশ্রাম করে তারপরে যাও নইলে আমাকে দাও দাদা আমিই বরং—

রঞ্জন ধমক দিল, তারপর বাজারের তামাম জঞ্জাল এনে হাজির করবে। তার চেয়ে যা ক'রছিলে তাই করো।

বলে চক্ষের পলকে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সকাল বেলা সেদ্ধ ভাত খানিকটা মাখন সহযোগে খেয়ে নিয়ে দু-ভাই বার হ'য়ে যায়। বিকাল বেলা একটু মাছ ওদের রোজকার বরাদ্দ। রঞ্জন সর্ব্বপ্রথমে মাছের দোকানে

যায়। সামান্ত ক'দিন পূর্ব্বে বাজারবাড়ীর খাতায় ওরা নাম লেখালেও মাছ তরকারী বিক্রেতাদের কাছে রঞ্জন বিশেষভাবে পরিচিত হ'য়ে গেছে। সকলেই এই মিষ্টভাষী যুবকটিকে খাতির করে। এর পিছনে সামান্ত একটু ইতিহাস আছে॥ আধপোয়া মাছের খদ্দের রঞ্জন সসঙ্কোচে একপাশে দাঁড়িয়ে প্রথম দিন বলেছিল, আপনারা অন্ত খদ্দের বিদায় ক'রে আমাকে তাই –

এরপরে রঞ্জনকে গিয়ে শুধু দাঁড়াতে হয়। চাইবারও প্রয়োজন হয় না কিন্তু রঞ্জন অনেক সময় লজ্জা পায়। এতো সেদিন সে যোগেন আচার্য্যকে ব'লছিল, দেখুন দেখি আপনারা সব দাঁড়িয়ে আছেন আর –

তাকে থামিয়ে দিয়ে আচার্য্য বলেছিলেন, তাতে আর হ'য়েছে কি : তারপরে গলাটা একটু খাট ক'রে পুনরায় বলেন, বাকীর খদ্দের যে। ধারেও খাব আবার আগেও নেব এটা আশা করা অন্যায়।

রঞ্জন কেমন হতবুদ্ধির মত চেয়ে থাকে। যোগেন আচার্য্য ব'লতে থাকেন, তার উপর তুমি আবার আর একটি কাণ্ড ক'রে রেখেছো। আরে না না কিছু অন্যায় করোনি। বয়েসকে তার প্রাপ্য সম্মান দিয়েছো…যে বস্তুটি সকলে দিতে চায় না। খুব ভাল – সত্যিই ভাল। তুমি দিতে জানলে পাবার জন্ত কখনই হাত পাততে হবে না। তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন।

রঞ্জন শেষপর্য্যন্ত পালিয়ে আচার্য্যি মশাইর হাত থেকে রক্ষা পেল। কিন্তু লোকটিকে তার বড় ভাল লাগল। এবং সেই থেকেই সময় এবং সুযোগ পেলেই সে তার ঘরের আশেপাশে উঁকি মারতে সুরু ক'রলো।

রোজকার মত আজও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না। অনতিবিলম্বে মাছ তরকারী নিয়ে ফিরে এল রঞ্জন। অঞ্জন ততক্ষণে বই খাতা নিয়ে বসেছে। দাদার গুরুগম্ভীর উপদেশগুলিকে সে রীতিমত ভয় করে। যদিও মাঝে মাঝে একটু বেশী বলে মনে হয়। তবে দাদার সদিচ্ছা সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। রঞ্জন যা কিছু করে যা কিছু বলে তার মধ্যে সবসময় এমন একটা আন্তরিক স্নেহের স্পর্শ থাকে যে দাদাকে সাহায্য করবার জন্ত তার বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভবপর হ'য়ে উঠে না। পাছে অজান্তসারে আঘাত করে বসে এই ভয়ে।

ঘরে প্রবেশ ক'রে খানিক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকেও অঞ্জনের তরফ থেকে কোন প্রকার সাড়া না পেয়ে রঞ্জন হাসি মুখে বলল, হ্যাঁরে অমন চুপ ক'রে আছিস কেন অঞ্জন। কি মাছ নিয়ে এলাম তাও একবার জিজ্ঞেস করলি না।…

অঞ্জন গম্ভীরভাবে উত্তর ক'রল, বিরক্ত ক'রো না। কোন কারণেই আমার সময় নষ্ট করবার হুকুম নেই।

রঞ্জন স্মিত হেসে বলল, হুকুম যখন তখন তা মানতেই হবে অঞ্জন নইলে ডিসিপ্লিন থাকে না। কিন্তু আজ মহাশোল মাছ এনেছি এ কথাটাও তোকে ব'লবো না?

অঞ্জন সোজা হ'য়ে বসে শান্তকণ্ঠে বলল, প্রলোভন দেখিয়ে কর্ত্তব্যচ্যুত করানটা অন্যায়। তাই বলে মহাশোলের পেটির অংশটা আনতে ভুল করোনিতো?

দাদা ভাই একসঙ্গে হাসতে থাকে।

১৫

চতুর্দ্দিকে ছেঁড়া কাগজ। মাঝখানে বসে আছে মলয়। একটার পর একটা চারমিনার পুড়িয়ে চলেছে সে। মনে হয় খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। তবে এ উত্তেজনার মধ্যে আনন্দই বেশী প্রকাশ পাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে গুণ গুণ ক'রে গান গাইছে। কখনও উঠে পায়চারি করে। কখনও জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়।

মলয় তার উপন্যাসের হারান অংশ খুঁজে পেয়েছে কিন্তু জোড়া দিতে গিয়ে তাকে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। একের দেহে অপরের মাথা জুড়ে দিতে ব'সেছিল মলয়। সুতরাং…

সুতরাং তাকে থামতে হ'য়েছে। থামতে হ'য়েছে আবার নতুন করে আরম্ভ ক'রবার জন্ত। তাই ওর আশে পাশে অত ছেঁড়া কাগজ। মলয়ের লেখা উপন্যাসের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। নতুন করে ঢেলে সাজতে হবে তার উপন্যাস। তার নায়িকার অকাল বৈধব্য হ'তে পারে না। সে বেঁচে থাকবে পূর্ণতর জীবনে পৌঁছবার জন্ত। নইলে মলয়ের গল্প বাঁচবে না;

সে নিজেও বাঁচবে না। প্রায় দীর্ঘ দুটি যুগের এই বিরামহীন আর ক্লান্তিহীন ঘোরা ফেরা একেবারেই মিথ্যে হ'য়ে যাবে।

মলয় নতুন করে আবার খাতা কলম নিয়ে বসেছে। তার কলমের মুখে আজ বান ডেকেছে। পাতার পর পাতা ভরে উঠছে একটা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। মলয় লিখছিল। আত্মনিমগ্ন হ'য়ে লিখছিল। আর তার বর্ণিত চরিত্রগুলি জীবন্ত হ'য়ে চলা-ফেরা সুরু করে দিল। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর পূর্ব্বের বহু ঘটনা পাশাপাশি সারিবদ্ধ হ'য়ে তার চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিল।………মলয় লিখল—

……রায়েদের ছোট ছেলে ওদের বংশের ব্যতিক্রম। এ বছর সে এম, এ পাশ ক'রেছে। রায়-বংশে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। তেজারতি কারবার ক'রে এদের অর্থসাচ্ছল্য। এ বংশের ছেলেরা লেখা-পড়ার চেয়ে অর্থ উপার্জ্জনের কথাটাই ভাল বোঝে। কি ভাবে টাকা লেন দেন করতে হয়, কোন পদ্ধতিতে টাকা খাটালে আসলের চেয়ে সুদের অঙ্কটা বেশী হতে পারে এই বিষয় জ্ঞানলাভ করাটাই প্রকৃত শিক্ষা ব'লে জেনে এসেছে। এনিয়ে কোনদিন কোন প্রকার আপত্তি শোনা যায়নি। ব্যতিক্রম দেখা গেল মৃগাঙ্কর সময় থেকে। প্রথম আপত্তি উঠল মৃগাঙ্কর তরফ থেকে। লেখাপড়া আগে তারপরে অন্ত চিন্তা।

বাপ বললেন, উত্তম প্রস্তাব কিন্তু একবার এগুলে আর পিছিয়ে আসতে পারবে না। শেষপর্য্যন্ত যেতে হবে। এ মনের জোর যদি থাকে তাহলে আমি খুশী হ'য়ে তোমাকে অনুমতি দেব।

মৃগাঙ্ক জবাব দিল, আপনার আশীর্ব্বাদ পেলে আমি কৃতকার্য্য হ'তে পারব বাবা।

বাপ ব'ললেন, আমার অনুমতি পাওয়া মানেই আশীর্ব্বাদ পাওয়া মৃগু। তুমি সফল হও একান্তভাবে আমি এই কামনা করি।

মৃগাঙ্ক পিতার পদস্পর্শ ক'রল।

পিতার আশীর্ব্বাদের জোরেই হোক কিংবা মৃগাঙ্কর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়ই হোক পাঠ্যাবস্থায় তাকে কোনদিন পিছু হঠতে হয়নি। সম্মানের সঙ্গে প্রত্যেকটি ধাপ একের পর এক ডিঙিয়ে গিয়ে এম এ পর্যন্ত পাশ ক'রেছে।

এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র ক'রেই রায় বাড়ীতে একটা উৎসবের আয়োজন চলেছে। মৃগাঙ্ক তার বাবার কাণ্ডকারখানা দেখে লজ্জা পেলেও মনে মনে তৃপ্ত হয়েছে, এ কথা বলা বাহুল্য। তথাপি সে বাপের কাজে মৃদু বাধা দিয়ে বলল, আপনার ছেলের মত চারটে পাশ করা ছেলে আজকাল ঘাটে পথে ঘুরে বেড়ায়, এ নিয়ে এত হৈচৈ করবার কোন মানে হয়না।

বাপ ধমক দেন। তোমার কাজ তুমি করেছো মৃগাঙ্ক আমি কোনদিন বাধা দিইনি। আমার কাজেও কেউ বাধা দেয় এ আমি পছন্দ করিনা।

আশে পাশে আরও বহুর মধ্যেই এই একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। শশাঙ্ক বাবু যথার্থই বলেছেন বাবাজি। তুমি তোমার কাজ করেছো তিনি তাঁর ক'রছেন আমরা ইতরজন সে আনন্দের ভাগ নিতে এসেছি।

মৃগাঙ্ক হাসি মুখে বলে, আমি আমার দিকটা ভেবেছি।

তুমি থামো মৃগাঙ্ক—শশাঙ্কমোহন ছোট রকমের একটি হুঙ্কার দিয়ে বললেন, আর আমিও আমার দিকটা ভেবেই কাজ করছি।

এই পর্য্যন্ত বলে উপস্থিত সকলের পানে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জানালেন, ভাববেন না—আপনাদের কোন ইচ্ছেই অপূর্ণ থাকবে না। খাওয়াদাওয়া বাজনা গান…

মৃগাঙ্ক এরপরে আর দাঁড়িয়ে না থেকে নিঃশব্দে সরে পড়ল। যাবার পথে একটা চাপা হাসির শব্দে তাকে থামতে হ'ল।

যতসব কাণ্ড! ছেলে আর বাঁচিনে। আদিখ্যেতা। তবে হ্যাঁ তোর মৃগুদা কিন্তু সত্যিই দত্যিকুলের প্রহ্লাদ।

কথা বলছিল চৌধুরীদের মৃদুলা। মেয়েটি সহরে মামার বাড়ী থেকে কলেজে পড়ে। তৃতীয় বার্ষিক

শ্রেণীর ছাত্রী। চৌধুরীরাও ধনী কিন্তু লেখাপড়ার রেওয়াজ ওদের বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। মৃদুলার বাবা জগন্ময় চৌধুরী শোনা যায় দিনে রাতে না হোক আট ঘণ্টা বই নিয়ে থাকেন। ভদ্রলোক বিপত্নীক। মৃদুলার দশবছর বয়সের সময় তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে।

এ পারে রায়েদের বাড়ী ওপারে চৌধুরীদের। দু-বাড়ীকে আলাদা করে রেখেছে এক বিরাট দীঘি। দু-বাড়ীর ভৌগোলিক সীমানা। এ ছাড়াও আছে, তা হ'লো মত এবং পথের নিশানা। ওটা প্রায় দুস্তর। তাই চৌধুরীদের মৃদুলাকে রায়েদের বাড়ীর সম্মুখে দেখে সে একটু আশ্চর্য্য হ'ল। কিন্তু নিজের উপস্থিতির কথা জানতে না দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মৃদুলার কথার একটা জবাব শোনা গেল, তা বাপু এতে হাসির কি আছে?

নেই! পুনরায় মৃদুলা হেসে উঠল। শব্দটা অত্যন্ত বেসুরো লাগল মৃগাঙ্কর কানে। খানিকটা অবজ্ঞার রেশ মেশান রয়েছে এই শব্দ ঝঙ্কারের মধ্যে।

মৃদুলা বলছিল, শশাঙ্ক বাবু হয়তো উপযুক্ত কাজই করেছেন কিন্তু তাঁর সুযোগ্য ছেলেকে দেখেও যে কোন তফাৎ খুঁজে পেলাম না তাই।

মৃদুলার এই ধরণের কথাবার্ত্তা মৃগাঙ্কর মোটেই ভাল লাগল না। চৌধুরীদের সঙ্গে রায়েদের বিবাদ বহুদিনের। কি কারণে এবং কেমন ক'রে এর সূত্রপাত হয়েছিল তার খোঁজ ওরা কেউ রাখে না। বিবাদ ছিল এই পর্য্যন্ত, কিন্তু তা নিয়ে প্রকাশ্যে কোন গোলযোগ হ'তে মৃগাঙ্ক দেখেনি সেইজন্যেই মৃদুলার এই গায় পড়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কোনমতে কারণ সে খুঁজে পেল না। তবে চুপ করে চলে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হ'লো না। এগিয়ে এসে সোজা সে প্রশ্ন করে বসল, আমায় মাপ করবেন, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই আপনাদের কথাগুলো আমি শুনে ফেলেছি, তাই দুটো কথা না বলে চলে যাওয়া হ'ল না।

একটু থেমে পুনরায় সে বলল, আমি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ হলেও আমার বাবার কিন্তু দৈত্যরাজের মত শক্তিও নেই, সামর্থ্যও নেই নইলে তাঁরই রাজত্বে বসে তাঁরই প্রকাশ্য নিন্দা করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব হ'তো না।

মৃদুলা লজ্জা পেল।

মৃগাঙ্ক অবস্থাটা উপলব্ধি করেও থামতে পারল না। বলে চলল, একটা অনুরোধ একজন অল্পশিক্ষিত লোকের কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁকে আর যা ভাবুন আমার বলবার কিছু নেই কিন্তু তাঁর শিক্ষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাকে কটাক্ষ ক'রতে গিয়ে নিজেকে ছোট করবেন না। বাবার বাড়াবাড়িটাও কিন্তু আন্তরিক----

এই পর্য্যন্ত বলেই মৃগাঙ্ক চলে যেতে উদ্যত হল। মৃদুলা তাকে বাধা দিয়ে ব'লল, কোন ব্যক্তি বিশেষকে কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কটাক্ষ করিওনি। ওঁর মাত্রাধিক বাড়াবাড়ি নিয়েই অবশ্য আলোচনা ক'রেছি। আন্তরিকতার দিকটা আমার জানার কথা নয়।

মৃগাঙ্ক বলল, আপনার যুক্তি আর সমালোচনা কোনটাকেই প্রশংসা করা গেল না।

মৃদুলা বলল, নিন্দা অথবা প্রশংসা পাবার জন্য কোন কথা বলিনি আমি।

মৃগাঙ্ক গম্ভীর হ'য়ে উঠল, বলল, আপনার এই ধরনের সমালোচনা অপরকে দুঃখ দিতে পারে এ কথাটা অন্ততঃ আপনার বোঝা উচিত।

মৃদুলা মৃদুকণ্ঠে বলল' দেখুন আপনি মিথ্যে রাগ ক'রেছেন। কথাকটি হঠাৎ শুনে ফেলেছেন তাই নইলে এর চেয়ে কত অনুচিত কথা মানুষ মানুষের সম্বন্ধে ব'লে থাকে। আমিও না হয় অসাবধানে একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি।

মৃদুলার এই অনুতপ্ত ভাবটির অন্য অর্থ ক'রল মৃগাঙ্ক। সে ব'লল, তা আমি জানি। রায়বাড়ীর সম্বন্ধে চৌধুরীবাড়ীর যে কি ধারণা তাও আমার অজ্ঞাত নয়। আপনি তারই কিছুটা নমুনা দেখালেন।

মৃদুলার চোখ দুটি হঠাৎ জলে উঠলো। সে অপেক্ষাকৃত কঠিন কণ্ঠে ব'লল, দোষ ক'রে তা স্বীকার

ক'রে দুঃখ প্রকাশ করার পরেও তার জের থেকে যায় একথা আমার জানা ছিল না। আমরা কিন্তু এই শিক্ষাই আমাদের মা বাপের কাছে পেয়েছি।

মৃগাঙ্ক বক্রোক্তি ক'রল, খুব যে শিক্ষার অহংকার আপনার ?

মৃদুলাও জ্বলে উঠল। মান কাল ভুলে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল, তা আর থাকবে না কেন। কতবড় শিক্ষিত বংশের মেয়ে আমি—কোন্ রক্তের ধারা আমার দেহে বইছে।

হঠাৎ মৃদুলা থামল। পাশের মেয়েটির হাত ধরে টান দিয়ে বলল, চল্ কেতকী। এখানে আর এক মিনিট নয়। ভেবেছিলাম অন্যায় করেছি এখন মনে হচ্ছে কম ক'রে বলেছি।

মৃগাঙ্কর চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠল। কিন্তু তাকে কোন কথা ব'লবার অবকাশ না দিয়ে কেতকীর হাত ধরে মৃদুলা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মৃদুলার সঙ্গে মৃগাঙ্কের প্রথম সাক্ষাৎ এমনি একটি আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমেই হল।

মৃদুলা চলে যাবার পরও একইভাবে বহুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। অপমানের জ্বালায় তার সর্বাঙ্গ জ্বলছে। তার মনের একটা দিক ব'লছে সে চুপ ক'রে থাকলেই বুদ্ধিমানের কাজ ক'রত, অপর দিক এ যুক্তিকে মেনে নিল না বরং চুলচেরা হিসেব ক'রতে বসল যে, কতটুকুর পরিবর্তে কতখানি সে পেল। কতখানি ওজন করে ফেরৎ দিতে পারলে সুদসমেত আদায় হ'তে পারে।

আর মৃদুলা উত্তেজিতভাবে চলে গেলেও বাড়ীর কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল।

কেতকী বলল, থামলে যে, আবার কি হ'লো।

মৃদুলা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিল, ভাবছিলাম আজ কার মুখ দেখে আমার ঘুম ভেঙেছিল। ভোর কোথায় নেচে উঠে আমার রায়েদের ওখানে না যাওয়াই উচিত ছিল। অকারণে নাহোক কতগুলি বাজে কথা বলে এলাম

সান্ত্বনার ছলে কেতকী ব'লল, নিছক অকারণে হবে কেন ভাই। মৃগাঙ্কও তো চুপ করে ছিলেন না।

মৃদুলা মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু বিচার ক'রে দেখলে দোষটা আমারই। গায়েপড়ে কথার সৃষ্টি আমিই করেছি তোমার মৃগাঙ্ক নয়।

কেতকী জবাব দিল, তুমিতো নিজের অন্যায় মেনে নিয়েছিলে ভাই।

মৃদুলা বলল, মেনে নেওয়ার মধ্যে গলদ ছিল কেতকী।

কেতকী নীরব।

মৃদুলা পুনরায় ব'লল, চল আবার ফিরে যাই।

কেতকীর কণ্ঠে বিস্ময়। জিজ্ঞেস ক'রল, কোথায় ?

মৃদুলা শান্ত হেসে বলল, মৃগাঙ্ক বাবুর কাছে। জানিস ভাই, আমার বাবা বলেন যে শিক্ষার মধ্যে সংযম নেই তাকে শিক্ষাই বলেনা। আমি হাত জোড় ক'রে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে আসবো।

কেতকী বলল, কার কাছে ? মৃগাঙ্ক বাবুর ? কিন্তু অন্যায় যদি কিছু ক'রে থাক তা ওঁর বাবার কাছে। মৃগাঙ্ক বাবুকে তুমি তাঁর কথার জবাব দিয়েছ শুধু।

মৃদুলা খানিক চুপ করে থেকে পুনরায় বলল, আমার কথাগুলি মৃগাঙ্ক বাবুর বাবাকে উদ্দেশ ক'রে বলা হ'লেও তিনি তা শোনেন নি—শুনেছেন মৃগাঙ্কবাবু। সেই জন্যই—

কেতকী আপত্তি জানিয়ে বলল, প্রকারান্তরে তুমি কিন্তু ক্ষমা চেয়ে নিয়েছো ভাই।

মৃদুলা মৃদু হেসে জবাব দিল, আমি ত' প্রকারান্তরে কোন কথা বলিনি কেতকী।

সোজাসুজি ত বলনি। কেতকী রাগ করে ব'লল, তোমাদের বাপু আমি মোটেই বুঝতে পারি না।

শেষ পর্য্যন্ত মৃদুলা অবশ্য আর যায় নি কিন্তু কেতকী গিয়েছিল এবং একান্তে সাক্ষাৎ ক'রেছিল। তাদের মধ্যের প্রত্যেকটি কথা প্রয়োজনমত একটু বাড়িয়ে আর কমিয়ে সে মৃগাঙ্ককে জানাল, কিছু বুঝলেন মৃগাঙ্ক ?

কেতকীর কথাগুলি বেশ মন দিয়ে শুনে তার পর জবাব দিল, এক বিন্দু না।

কেতকী একটুখানি হেসে পুনরায় বলল, গরু মেরে জুতো দান। আমাদের মত লেখাপড়া না জানা মেয়ে তো আর বৃহুলা নয় - ওদের ধরনই আলাদা।

কেতকীর উদ্দেশ্যটা না, বুঝেই মৃগাঙ্ক জবাব দিল, ঠিক কথা। কিন্তু আমার এসব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ব্যথা ক'রবার কোন প্রয়োজন নেই।

কেতকী যেন রীতিমত বিস্মিত হ'য়েছে এমনি মুখভাব করে বলল, অবাক কাণ্ড, তাই বলে অকারণে এতবড় অপমানটা হজম ক'রতে হবে! চৌধুরীবাড়ীর বৃহুলার চেয়ে রায়বাড়ীর মৃগাঙ্ক রায় কম কিসে।

মৃগাঙ্ক বিরক্ত হলো। কিন্তু মুখে সে তার প্রকাশ পেল না। একটু হেসে জবাব দিল, তুমি দেখছি পুরোনো ঝগড়ায় ফিরে আসতে চাইছো কেতকী। আমি কিন্তু ছোট বড়র হিসেব ক'রে দেখিনি। ওতে সময়ের দরকার হবে।

মৃগাঙ্ক এড়িয়ে যেতে চায় কথাটা বুঝেও কেতকী থামতে পারে না। বলে, দুই আর দুই এ যে চার হয় এও কি আপনাকে হিসেব ক'রে দেখতে হয় মৃগুদা?

মৃগাঙ্ক বিরক্ত হ'য়ে বলল, যারা সবে সুরু ক'রছে তাদের মিলিয়ে দেখতে হয় নইলে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত আলোচনাকে জোর করে বন্ধ ক'রে দেবার জন্যই মৃগাঙ্ক দ্রুত কেতকীর দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। ওকে আর কোনপ্রকার কথা বলার সুযোগ পর্য্যন্ত দিল না।

কেতকীর এই পারপড়া ভালমানুষীকে মৃগাঙ্ক ভাল চোখে দেখতে পারেনি, তাই বলে বৃহুলার স্পষ্ট উপেক্ষাকে সে ভুলতে পারেনি। ওর এই অহংকার সে চূর্ণ করবে মৃগাঙ্ক মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল। আর এই প্রতীজ্ঞাকে পূর্ন ক'রতে গিয়ে যে ঝড় উঠল তার পরবর্ত্তি জীবনে তারই উন্মত্ত তাণ্ডবে ভেঙেছে প্রচুর উড়িয়ে নিয়ে গেছে অনেক - মৃগাঙ্কর নাগালের, বাইরে। সহস্র চেষ্টারও আর তা ফিরে আসবেনা, তাইত আজ জীবনের এই দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে এসেও পিছন পথে দৃষ্টি ফেরালেই বুকের মধ্যে তার হাহাকার ক'রে ওঠে—চিৎকার ক'রে বলতে ইচ্ছে হয় — বৃহুলা ভালই যদি বেসেছিলে তাহলে আর একটু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে কেন দেখলে না ভুল মৃগাঙ্ক সত্যই করেছিল। সুদের হিসেব ক'রতে বসে তাই আসল খুইয়ে বসল—

দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। মলয় লেখা বন্ধ করে গিয়ে ভিতরে উঠে এসে দরজায় না খুলেই সাড়া দিল, কে? কি চাই?

বাইরে থেকে মনোরমার গলার শব্দ পাওয়া গেল।

মলয় দরজা খুলে দিতেই সে ঘরে প্রবেশ ক'রে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, আমাকে মাপ ক'রবেন। আমি জানতাম না আপনি এখন লিখছিলেন।

মলয় একটু হেসে বলল, যখন এসেই পড়েছো তখন বসো। তোমার জন্য একটা ভাল খবর আছে।

মনোরমা জবাব দিল, বসছি কিন্তু ঘরটার আপনি কি ছিরি ক'রেছেন। পোড়া বিড়ি সিগারেটের টুকরো আর ছেঁড়া কাগজ ছড়িয়ে একেবারে নরক বানিয়ে রেখেছেন যে। এর মধ্যে থাকেন কি ক'রে?

মলয় হা হা ক'রে হেসে উঠল। একবার তার কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিয়ে স্নিগ্ধ হেসে বলল, অভ্যেস হ'য়ে গেছে।

মনোরমা সহসা ঝুঁকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রল, এতো কাগজ এলো কোত্থেকে?

মলয় শান্তকণ্ঠে বলল, আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি?

মনোরমা চমকে উঠে বলল, তার মানে আপনি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রেছেন?

মলয় মাথা নেড়ে জবাব দিল, ক'রলাম। কারণ আগাগোড়াই আমি ভুল লিখেছিলাম। এতোদিনে সত্যের সন্ধান পেয়েছি।

মনোরমা রুদ্ধকণ্ঠে বলল, এই ভাল খবরটাই কি আপনি আমাকে দিতে চেয়েছিলেন?

মলয় প্রফুল্ল কণ্ঠে বলল, ঠিক তাই মনোরমা। তুমি

দেখে নিও এবারে কত চট্‌ পট্‌ আমার লেখা এগিয়ে যাবে।

দুঃখিতভাবে মনোরমা ব'লল, আগে কিন্তু চলেনি—

মলয় বলল, তার কারণ ছিল মনোরমা। আমি লিখতে বসে কোন একটি বিশেষ চরিত্রের উপর পক্ষপাতিত্ব ক'রেছিলাম। আমার এই দুর্বলতাই এগোতে বাধা দিয়েছে। সত্যের সঙ্গে আর কল্পনার সঙ্গে বারে বারেই ঠোকাঠুকি হ'য়েছে।

একটু থেমে সে পুনরায় ব'লতে লাগল, মিথ্যাকে সত্য ব'লে চালাতে গিয়ে অত্যন্ত সাবধান হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এতেই বুঝি মিথ্যাটাকে সত্য ব'লে চালিয়ে দিতে পারবো কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সত্য মিথ্যা কোনটাই প্রতিষ্ঠিত হলো না। মাঝে থেকে পরিশ্রমই সার হ'লো।

মনোরমা বলল, আপনি কি বলতে চাইছেন বুঝলাম না। সত্যমিথ্যার এত বড় ব্যাখ্যার কি দরকার তাও জানি না।

মলয় বলল, বড্ড জড়িয়ে ফেলেছি ব'লেই হয়তো বুঝতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। আসলে আমার সঙ্কল্পটা ছিল লেখার গতি দিয়ে। যে চরিত্রটি আমার জানা, আমার লেখা সেটি সহজেই আমার চোখের সামনে ধরা দেবে, ঘোরা ফেরা ক'রবে। আমার হাঁটবে উঠবে বসবে হাসবে খেলবে। আমার চোখের সঙ্গে, মনের সঙ্গে আর কলমের সঙ্গে সে তালে তালে দ্রুত এগিয়ে চলবে। কিন্তু শুধু চিন্তা দিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করলে সহজ এবং স্বাভাবিক চরিত্র আঁকা শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ।

মনোরমা মাথা নেড়ে বলল, আপনি এখনও আমাকে বোঝাতে পারেননি। শুধু সত্য দিয়েই কি সাহিত্য। কল্পনাকে পোষাক প'রে একটা মানুষ আঁকা কি অসম্ভব? না কেউ আঁকে না?

মলয় বলল, অপরের কথা আমি জানি না মনোরমা। আমি শুধু নিজের কথা তোমাকে বলেছি। আমি জীবনে একখানা বই লিখবার চেষ্টা ক'রে আসছি আজ বহু বছর ধ'রে কিন্তু আজও তা শেষ ক'রতে পারিনি। এবারে বোধ হয় পারবো। এই একখানিতেই আমার সুরু ও শেষ হবে। এর বেশী আর কোন কথা আজ বলতে চাই না।

মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করতে গিয়েও অপ্রসঙ্গে এল, আপনার ঘরের এই জঞ্জালগুলো আমি সাফ ক'রে দেবো?

মলয় হাত তুলে নিষেধ ক'রল, ওগুলো থাক। ঐ জঞ্জালগুলো আজ আমাকে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

মনোরমা একবার মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল। মলয় বাধা দিল না। ক্রমশঃ

মনের গহনে

বিভা সরকার

ফাল্গুন তখনো নেয়নি বিদায়—বসন্তের মন মাতানো হাওয়া বইছে, গাছের পাতারা নব পত্রপল্লবে সেজে মর্মরিত হিল্লোলিত হচ্ছে সে বাতাসে। গাছে গাছে ফুল ফোটানোর মাতন জেগেছে। আমের বোলের গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠেছে দক্ষিণে বাতাস। এ বাতাসে কেমন যেন মন-আনচান করা—মন কেমন-কেমন করায় যাচ্ছ। অকারণেই মানুষ খুঁজে মরে মনের মানুষটিকে। ইংরেজ কবিরা কি একেই বলেছেন Amorous wind? বিশ্বের বিরহী কি জেগে উঠেছেন?

বাড়ীর সামনে দিয়ে নেবু বাগানের গা বেয়ে চলে গেছে একটি পায়ে চলা সুন্দর প্রশস্ত পথ। দুই ধারে তার আমলকির সারি। মৃদু বাতাসে ঝিরঝির করছে নতুন কচি পাতারা। অন্যমনা হয়ে পড়েছিলেন বুঝি বা শ্রীমতী ক্ষণকালের জন্য। হঠাৎ কন্যার উচ্ছ্বসিত চিৎকারে সম্বিত ফিরে দেখতে পেলেন—আদরিণী নন্দিনী আসছে ছুটে তাঁরই কাছে। মা! মা! মাগো! আর এদের পাতা খসানোর দুঃখে বুক দুরু দুরু করছে না—না মা? সেই যে।

আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরু দুরু।
পেয়েছে খবর পাতা খসানোর সময় হয়েছে সুরু!
সে দিন তো শেষ হয়ে গেছে না মা? এখন তো শুধু নতুন পাতায় সাজবার আনন্দ।

চঞ্চলা মেয়ে হঠাৎ 'ওটা কি মা?' বলে ছুটলো একটা ভাঙা অব্যবহৃতপুরানা হ্যাণ্ড পাম্পের দিকে।

'ওরে থাম থাম করে চিৎকার—পেছনে ছুটলেন শ্রীমতী, কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না, যা ভয় পেয়েছিলেন তাই ঘটে গেল নিমেষে। পাম্প নাড়তেই ভেতরে বোলতার চাকে যেন ঢিল পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তারা বেরিয়ে এল পালে পালে। মেয়েকে টেনে আনতে আনতেও দিল কয়েকটা হুল ফুটিয়ে মুখে চোখে হাতে পায়ে। শ্রীমতীও বাদ গেলন না কামড়ের হাত থেকে। তাঁদের চিৎকারে চাকররা ছুটে এসে নিয়ে গেলে নন্দিনীকে বাংলোয়। সোর পড়ল—মিট্টিকা তেল! মিট্টিকা তেল! অর্থাৎ কেরসিন তেলের। বোলতার কামড়ের বিষে মহৌষধ এ কেরসিন—কে জানে; তারপর তারা কামড়ের জায়গাগুলি চাবির মাথায় ফুটোয় চেপে চেপে সরু ছুঁচ দিয়ে হুলগুলো বের করে দিতে লাগলো। তাতেও কিন্তু রেহাই মিলল না—মেয়েটার তো দারুণ জ্বর এসে গেল। পরের দিন মুখ ফুলে এমন চেহারা হল। চেনা দায়। তারপর আরম্ভ হল চুলকানো। চূন জলের সেঁকে যেন স্বর্গ সুখ হতে লাগলো। তিনটি দিন জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে মিটলো সে বোলতার কামড়ের জের।

* * *

চৌধুরী এবার একাই টুরে গেছেন। বিকেল থেকে তাই বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় শ্রীমতীর। পায় পায় এগিয়ে যান সব্জিবাগের দিকে। বাগানটি বড় সুন্দর করে সাজানো। কে জানিনা কবে ইউকেলিপটস আর ঝাউ এর সারি দিয়ে সাজিয়ে ছিলো প্রধান রাস্তাটি। পড়ন্ত রৌদ্রের অস্তরাগে রাঙা হয়ে উঠেছে আকাশ। পৃথিবীতেও নেমেছে তার ছায়া। কে এক বিশ্ববৈরাগী মুঠো মুঠো বৈরাগ্য বিশ্বের বুকে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে।

অন্যমনা শ্রীমতী প্রধান রাস্তাটি ছেড়ে বাঁ ধারে ছোট পথটি ধরে মালির ঘরের দিকে চললেন মালিনীর সন্ধানে। তাঁকে বিস্মিত করে একটি কচি ম্লানমুখ

মাটির নীচু ঘরের ছোট জানালাটি দিয়ে তাঁরই দিকে যেন অবাক চোখে চেয়ে আছে। তিনি হেসে কথা বলতে যেতেই তাঁকে বিভ্রান্ত করে সে মুখ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সরে গেল। অবাক হয়ে শ্রীমতী সন্ধানী দৃষ্টিমেলে দেখলেন বাইরে থেকে শেকল তোলা আর শুধু তাইই নয় তালা লাগানো।

শ্রীমতীর সমস্ত সত্তা যেন থমকে দাঁড়ালো। তৎক্ষণে ঘোষিত হয়ে গেছে তাঁর উপস্থিতি। কলমুখরিত কণ্ঠে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এসেছে মালিনী। এতই ব্যাথিত হয়েছিলেন শ্রীমতী যে প্রত্যভিবাদনও জানাতে ভুললেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ও ঘরে কে থাকে?

শ্রীমতীর অবস্থা বুঝে নিয়েছে মালিনী।

সে শুধু জানালে মা জী, ও বেলদারের ঘর। বাগানের কিছু কাজেও গেছে বা অন্য কোনও নিজের প্রয়োজনে। ঘরণী তার নাবালিকা তাই সাহস করেনি ঘর খোলা রেখে যেতে। সবিস্ময়ে শ্রীমতী বললেন "সে কিরে? তাই বলে জীবন্ত মানুষকে এমন তালা দিয়ে যাবে?" কণ্ঠে তাঁর বেদনা আর উদ্বেগ ঝরে পড়ে। সত্যই বিচলিত হয়েছেন তিনি। লজ্জিত মালিনী মুখ নামায়। আবার বলেন শ্রীমতী, "তোরা তো আছিস। আর ভয়টাই বা কিসের দিন দুপুরে? সকলেই আছে। এ হাতা এমন কিছু চোর ডাকাত ভরা অজগর বিজবন তো নয় রে। চলতে চলতে মালিনী জবাব দেয় মা জী! সে অনেক কথা। আমরাও কত বোঝাই বারণ করি, কি যে হয়েছে ওর মনে ওই জানে। কিছুতেই ওকে পারে না, সদাই ওর ভয় পাছে এ মহামূল্য মণি খোয়া যায়। প্রৌঢ়স্য তরুণী ভার্যা হলে এ রকমই হয় বোধহয়।

মালির সঙ্গে কত বচসায় ঝগড়া হয়ে গেছে—ফল হয়েছে উল্টো। মনে মনে ও বোধহয় মালিকেও সন্দেহ করে। লোকটা বড় অভাগা মা জী। ওর সঙ্গে আমাদের পরিচয় কি আজ—সেবার সেই প্লেগে ওর সর্বনাশ হয়ে গেল। দুই ছেলে রেখে ঘরণী গৃহিণী বৌটা মরে গেল। কিছু দিন পাগলের মত হতে বসেছিল তারপর আমরা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তিন মাসের ছুটিতে ওকে দেশে পাঠিয়ে দিলুম। তিনমাস পরে ফিরে এল এই কচি বৌটাকে নিয়ে। আমার মনে বড় ধাক্কা লেগেছিলো—পুরুষজাতটাই বুঝিবা এমনি ধারা। ভুলতে দুদিনের বেশী লাগেনা। মন আমার বিষিয়ে উঠেছিলো মা জী! মালির প্রতিও; কিন্তু আসলে যে তা নয় সে কথা পরে বুঝতে পারি। দনমনিয়াকেও সত্যিই ভালবাসত। মনে হয় এমেয়েটাকে সুখী করতে পারছে না মনে করে মনে মনে ও ছোট হয়ে গেছে, নিজের কাছে। নিজের অপরাধবোধ আজ সর্বক্ষণ ওকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে তাই না ও এমন হয়েছে। নিজেরই ছেলেটাকে ও ভাল চোখে দেখলো না মেয়েটার সমবয়সী ছিল বলে। পাঠিয়ে দিলো তাদের দেশে মামার বাড়িতে। সেও পালিয়ে বাঁচল—মেয়েটাও হাঁফ ছাড়লো অহরহ নির্যাতনের হাত থেকে।

অনেক কষ্ট করেছে মা জী, ওদের দেশে অনেক টাকা লাগে ছেলের বিয়েতে তার ওপর ওতো আবার দ্বিতীয় পক্ষ। লোকটা যেন কেমন বদমেজাজী পাগলাটে হয়ে গেছে। নিজেও কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটাকে নির্যাতন করছে। এক একবার মনে হয় ওকে এখান থেকে বদলি করিয়ে দিলে হয়ত কিছু সুফল হবে কিন্তু তাও আমরা পারি না। মেয়েটা কেঁদে বলে তা হলে আমি আর বাঁচব না বহিন, ও আমায় মেরে ফেলবে! যাই করুণ তোমরা তো আমার আছ।

আর সত্যই তাই—ওকে আমি লুকিয়ে খেতেদি, খবর দারী করি। একটা সুরাহা—আজকাল যেন একটু নরম হয়ে আসছে, মালি বলে ও একটা সাময়িক পাগলামি, কেউ গ্রাহ্য না করলে আপনি ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েটার কপালে আছে কয়দিনের দুঃখ, উপায় কি। তা ছাড়া মা জী, ঐ যে মনুভাই তার চাপরাশি, ওর এক আত্মীয় এসেছিলো ওর কাছে। চাকরির ভরসা দিয়ে আনিয়েছিলো ও তাকে, কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই করতে পারে নি। লোকটাও ছিলো

একেবারেই অপদার্থ নয়ত নিজের ধর্মপত্নীকে কি কেউ বেচে দেয়। তিনশোটাকায় একদিন ঐ মন্নরামই কোথায় নিয়ে গিয়ে বেচে দিয়ে এলো মেয়েটাকে— আদায় করে নিলে প্রায় পুরো টাকাটাই তাদের দুজনায় খাওয়া খরচ বলে। মাত্র গাড়ীভাড়াটুকু দিয়েছিলো। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে এসব চলে মাজী। স্তম্ভিত শ্রীমতী প্রশ্ন করেছিলেন 'দেশে গিয়ে ও আপন আত্মপরিজনের কাছে কি জবাব দেবে?

কি করে মুখ দেখাবে?

উত্তর দিয়েছিলো মালিনী—'বলবে মরে গেছে কলেরায়, বা সাপে কেটে।

বিচলিত শ্রীমতী বলেন 'মেয়েটাই বা মেনে নিল কেন?

মালিনী জবাব দেয়—'সেইটাই তো অবাক লাগে। বেচারা একটু বোকা মতন ছিল আর আমরা তো পড়া-লিখা জানিনা, দেশঘরের ঠিকানাভি ভাল করে বলতে পারিনা। বেচারা অনপড় ছিল। ঐ যে আমাদের ডাক্তারসাহেব হরনাম সিংজী—জান মা জী! অনপড় বলে প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করে আবার পড়িলিখি মেয়ে সাদি করে এনেছে। বড় ভালছিলেন আগের স্ত্রী প্রীতমকর। আমাদের কত ভালবাসতেন, বাড়ী গেলে ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করতেন সুখ দুঃখের খবর নিতেন, এটা ওটা খাবার জিনিষ তুলে দিতেন বাচ্চাদের হাতে আর কত খুবসুরৎ ছিলেন। এ ডাক্তারনী তো লাগেই মা তাঁর কাছে কিন্তু ঐ অনপড় বলে নসিব টুটল, ডাক্তারসাহাব ছোড়দিয়ে আবার নতুন পড়িলিখি মেয়ে সাদি করলেন। বড় দেমাক মা জী এই নতুন ডাক্তারনীর। মুলতানের কোন স্কুলের বুঝি মাষ্টারনি ছিলেন। আমরা আর কেউ ওদিকে সহজে যাই না মা জী।

যত শুনছেন ততই স্তম্ভিত হচ্ছেন শ্রীমতী। যা চকচকায় সবই যে সোনা নয় মনে মনে বুঝছেন সে কথা। যে রূপ দেখিয়েছে তাঁকে রাবি নদীর ধারের রায়চৌতরার পরিবেশ প্রথম দৃষ্টিতে সেইটেই যদি তিনি তাঁর মনে চিরন্তন করে রাখতে পারতেন। কিন্তু তা তো হয় না।

প্রশ্ন করেন আবার শ্রীমতী—যখন বেচল মেয়েটাকে তোরা জানতে পারিসনি? এ যে বে-আইনী। ও বেটাকে জেলে দেওয়া যেত।

হাসলো মালিনী বুঝিবা তার বিজ্ঞ মা জীর এমন অবিজ্ঞজনের মত কথায়। আইন করে যদি অন্যায় বন্ধ করা যেত, দেশে তো তাহলে অন্যায়ই থাকতো না, এ দুনিয়া স্বর্গরাজ্য হয়ে যেত।

মেয়েটা বাধা দেয়নি? আবার শুধান শ্রীমতী।

জবাবে মালিনী বলে, সে বোধহয় জানতো না মা জী আগে পর্য্যন্ত। তাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বা এই রকম আর কিছু বলে থাকবে। তার স্বামীটাও তখন কাছে ছিল না। তাকে মন্নরাম শহরে পাঠিয়েছিলো কি যেন সওদা করার অছিলায়। হয়ত স্বামীর কিছু হয়েছে এই ভয় দেখিয়েই নিয়ে গিয়েছিলো। আমরা জানতে পারি লোকটা ফিরে এসে স্ত্রীকে না দেখে যখন কাঁদাকাটা আরম্ভ করে। রাতারাতি তাকে ও বিদায় করে দেয় এখান থেকে পাছে সাহেব জানতে পেরে কিছু করেন। সেই থেকে কেবলসিং বেলদারের আরও ভয় পাছে তার স্ত্রীকে তার অবর্তমানে কেউ নিয়ে চলে যায়।

মা জী! দুনিয়া বড় খারাপ জায়গা। চান্দনী আর কতটুকু বেশীর ভাগই আঁধেরা।

নির্বাক পাথর হয়ে গেছেন ততক্ষণে শ্রীমতী, মালিনীর কোনও মন্তব্যই তাঁর কানে যেন পৌঁছাচ্ছিলনা, পায়ে পায়ে এসে পড়েছিলেন নদীর ধারের বড় রাস্তায়। হঠাৎ সাঁপ সাঁপ চিৎকারে সম্বিত ফিরে সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্যে স্থাণু হয়ে থেমে গেলেন। প্রথমে ভাল বুঝতে পারেননি, তারপর দেখলেন বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছে একটা রেখা আর তার পশ্চাতে এক নবাগত সাঁপ সাঁপ চিৎকারে ছুটে এসে নিমেষের মধ্যে ল্যাজ টেনে ধরল এক কালনাগিনীর। জোয়ান মস্ত পুরুষটা, সাপটাও তেমনি দুর্দান্ত। একটা ইঁদুরের গর্ত্তে সে তার মাথাশুদ্ধ কিছুটা দেহ ঢুকিয়ে ফেলেছিলো,

কিছুতেই তা থেকে বের করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিল সে। এ নাগ মানুষের যুদ্ধের টানাটানিতে জয়ী হল নাগিনী, কিন্তু মানুষ যে বুদ্ধিমান শেষ পর্যন্ত যে তাকে জিততেই হবে। এই লোকচলাচলের পথে ক্রুদ্ধা আহতা নাগিনীকে যদি তারা ছেড়ে দেয় কত পথিকের সে যে সর্ব্বনাশ করবে। লোকজন জমা হল, কোদালি সাবল এল, আরম্ভ হল মাটী খোঁড়া ইঁদুরের গর্ত্ত ঘিরে। দিনান্তের সেই পড়ন্ত সূর্যের আলোয়। জয়ী হল মানুষ, টেনে বার করল গর্ত্ত খুঁড়ে সেই আধমরা জীবটাকে। কিন্তু কি আশ্চর্য! প্রকৃতির সহজাত প্রেরণায় আপন অঙ্গকে ঘুরিয়ে তার আহত স্থানটিকে কেমন আবৃত করে ফেলেছে ইতিমধ্যে সেই সাপিনী মনে হচ্ছে যেন ফাঁস দেওয়া একখণ্ড কাল সিল্কের দড়ি। এদের হাতে নিস্তার সে পেল না। পিটিয়ে ঠেঙিয়ে তাকে মেরে ফেলেও এদের শান্তি হল না। কাঠকুটো জড়ো করে তাকে জ্বালিয়ে দিলে। নদীর ওপারে দিনের চিতা তখন জ্বলে উঠেছে। নদীর জলে যেন আগুন লেগেছে বলে মনে হল শ্রীমতীর। দিনেশ্বর যেন মানুষের এ অকারণ নির্ম্মমতায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে সব ভস্ম করে দিতে চাইছেন। শ্রীমতীর বড় মন খারাপ হয়ে গেল। বেদনাতুর মন নিয়ে তিনি ঘরে ফিরে এলেন। কি কুক্ষণেই না আজ বেড়াতে বেরিয়েছিলেন।

* * * *

আকাশের পানপাত্রে
চল চল প্রভাত মদিরা!

দেখ! দেখ শ্রীমতী চেয়ে দেখ। কি অপূর্ব প্রকাশ আজ প্রভাতের। দিনটা আজ কি সুন্দর! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন চৌধুরী! ভোরবেলায় সেই কোন প্রদোষে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া আজ চৌধুরীদম্পতী বেড়াতে বেরিয়েছিলেন লছমন চৌতরার দিকে। যেতে যেতে শুনেছিলেন মঙ্গল-আরতির শঙ্খধ্বনি, ফেরার পথে নদীর ওপারে দেখলেন এ অপূর্ব্ব সূর্যোদয়, ব্রীজের বক্ষের কয়েকটি পিন্ খুলে দিয়েছে। একটু জল বেড়েছে যেন নদীর ক্ষীণ স্রোতধারায়। এখানে ওখানে মানুষের চলাফেরা আরম্ভ হয়ে গেছে। গাঁয়ের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে বিশ্বকর্মার ঘড়র ঘড়র রব শোনা যাচ্ছে। ঘরে ঘরে ধোঁয়া উঠছে গৃহস্থের উনানে আগুন পড়েছে। সবে মুখর হয়ে উঠছে শিশুকণ্ঠের কলরব।

বাংলোয় এসে দেখেন তার চাপরাশি দাঁড়িয়ে আছে জরুরি তারবার্ত্তা নিয়ে। কপালে মস্ত তিলকমাটির ফোঁটা, মোটা শিখা ঝুলছে যেন ধর্মের জয়ধ্বজা উড়িয়ে। বেটা বেড়াল তপস্বী। মৃদুকণ্ঠে সকৌতুকে বললেন চৌধুরী।

হাড় শয়তান, বিটলে ভণ্ড কোথাকার। শ্রীমতীর পানে অবাক হয়ে তাকালেন চৌধুরী তাঁর এ অকারণ উষ্মায়। জোড়করে আনম্র নমস্কার জানিয়ে পালিয়েছে ততক্ষণে সে।

ঘরের পানে যেতে যেতে শুনলেন চৌধুরী ওর ইতিবৃত্ত শ্রীমতীর কাছে। তিনিও একটু অবাক হলেন বৈ কি। বাইরে বেটা ভারী ভক্তি দেখায়। কতদিন ভোরবেলায় পদচারণা করতে করতে দূর থেকে দেখেছেন তিনি সন্ন্যাত মানুষটা কুয়াতলার বট গাছ প্রদক্ষিণ করে মন্ত্রোচ্চারণ করছে আর হাতের ঘটি থেকে জল ঢালছে। জোড় করে সূর্যপ্রণাম করছে। এমনি করেই কি সে তার বিবেকের গ্লানি ধুয়ে ফেলছে সবার অলক্ষ্যে? কে জানে! ভাবেন মনে মনে চৌধুরী ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষটার অন্তরেও এমন কুটিল সরীসৃপ বাস করছে এ কে জানে। গহন অরণ্যও এর কাছে হার মানে। সংসার বড় বিচিত্র আর বিচিত্রতর হল মানুষ। তাকে বোঝা ভার! বুঝিবা একটু অন্যমনা হয়ে পড়েছিলেন—হঠাৎ শ্রীমতীর তীব্র কণ্ঠে চমকে উঠ-ছিলেন ওটাকে জেলে দাও! শাস্তি দাও তুমি, নয়ত তোমারও অধর্ম হবে! অবাক চৌধুরী বলেন, আমি আবার কি করলুম? লাভের অংশে ভাগ বসালুম মনে করছ নাকি?

ঠাট্টা রাখ। জবাব দেন শ্রীমতী উষ্মার সঙ্গে। কাজটা কি তুমি অন্যায় মনে করছ না? •মানুষকে

পশুর মত কেনা-বেচা চলে এই বিংশ শতাব্দীতে?—কখনই নয়। এবং কোন শতাব্দীতেই নয়। এ অত্যন্ত অন্যায়। চরম অপরাধ মানি কিন্তু আমি কি করব? কে কবে কি করেছে না করেছে তার জবাব দিহি আমি নিতে পারি না—জবাব দেন বিব্রত চৌধুরী! আর এ অন্যায় যে সে করেছে তার প্রমাণই বা কি? আবার বলেন চৌধুরী।

কেন—সবাই সাক্ষী দেবে জবাব দেন শ্রীমতী!

কেউ সাক্ষী দেবে না আর আমার অধীনে থাকার সময় যদি বা হত তাও বা কথা ছিলো। তোমার ইচ্ছায় কি হাওয়ার পেছনে ছুটব? আমার উপস্থিতিতে যদি কেউ কোনও বেয়াদবি করে তখন কি তাকে ছেড়ে কথা বলব মনে কর। বলতে বলতে স্নানের ঘরের দিকে ছুটলেন চৌধুরী সাহেব। অপ্রসন্ন খিরক্ত মন নিয়ে আপন ঘরে ঢুকলেন শ্রীমতী। সকাল থেকেই লোক-জনের মুখে কেমন এক চাপা চঞ্চলতা লক্ষ্য করেছেন শ্রীমতী। ব্যাপার কি? সকৌতুকে শুধালেন তিনি চৌকিদারকে।

"মালে গাঁও মে মজ্জার মার হোয়েগি আজ—বাঁই মানে কে লিয়ে সব মস্ত হো রহে হৈঁ অর্থাৎ মালে গ্রামে কুমীর মারা হবে আজ আর সেইখানে যাবার জন্যই সব পাগল হয়ে রয়েছে জবাব দেয় চৌকিদার সসম্ভ্রমে। সে আবার কি? কোনও উৎসব নাকি এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের? প্রশ্ন করেন শ্রীমতী।

"নহি নহি রাণী সাহেবা ঐসা কুছ নহি, লেকিন হরসাল ইসি ভরহ ইসি বখৎপর বহাঁকে চমার লোকা মজ্জার মচ্ছি ওঁ কো ঘেরামেঁ চাল কর মারা করতে হৈঁ। য়হী হৈ উনকি রোজগারী সারি সাল ভরকে লিয়ে। বহ লোগ ইনকা কচ্চা চমড়া বেচতে হৈঁ। চর্ব্বি বনাতে হৈঁ ওর ইনকা অণ্ডা গোস্ত বহ লোগ খাতে ভি হেঁ। বহ লোগা বড়ে ছোটে জাতকে হৈঁ য়হহি হৈ ইনকা কারবার।' অর্থাৎ "না না রাণী সাহেবা, অমন কিছুই নয়, তবে প্রতিবছর এমনই করে এমনই সময়ে ওখানের চামারগুলো কুমীরগুলোকে ঘেরায় আটকে মারে। এইটেই তো সারা বছরের একমাত্র জীবিকা। ওরা এদের কাঁচা মাংস চামড়া বিক্রী করে, চর্ব্বি তৈরী করে, তা ছাড়া ওরা এদের ডিম মাংস আহারও করে। এক একটা কুমীরের পেটে দেড়শো থেকে দুশো পর্যন্ত ডিম থাকে। ওরা বড় নীচ জাত মাগো, এই ওদের জাত-ব্যবসা, আপনমনেই বলে চলে চৌকিদার, কণ্ঠে জেগে ওঠে তার ঘৃণা। নির্বাকবিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে শুনে যান শ্রীমতী। তারপর সবিস্ময়ে শুধান কোথায় এমন আজব ঘটনা ঘটে? আর কেমন করেই বা এরা একসঙ্গে এত কুমীর ধরতে পারে, বুঝতে পারলুম না। তুমি একটু ভাল করে বুঝিয়ে বল চৌকিদার।

ইতিমধ্যে চৌধুরী এসে পড়েছেন সেখানে। তিনিও শুনেছেন এ কাহিনী কিছুক্ষণ আগে ডিসচার্জ ওভার-সিয়ার রামসিংজীর কাছে। তিনি একবার দেখতেও গিয়েছিলেন কৌতূহলি হয়ে। সে এক বীভৎস ব্যাপার। আঁসটে গন্ধে আর পৈশাচিক লীলায় স্তম্ভিত হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন তিনি। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের অসহায়তাই আমরা দেখতে অভ্যস্ত কিন্তু বিরাট বিরাট কুমীরগুলোকে মাছের মত হত্যা আমাদের ধারণার বাইরে। এই যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এর জন্ত প্রস্তুতি চলে বহুদিন ধরেই। এই সাধনাই এর বীজ থেকে প্রায় মাইল চার নীচে নদী যেখানে প্রস্থে বেশ সংকীর্ণ এমনই একটি স্থান এরা বেছে নিয়েছে কুমীর-গুলোকে জালে ফেলার উপযুক্ত হিসাবে। জল যখন কম থাকে তখনই তারা নদীটিকে কাঠের গুঁড়ি পুঁতে পুঁতে উটের লোমের তৈরী একরকম মোটা জালে ঘিরে ফেলে। কুমীরগুলো ঠিক ধরতে পারে না এ ফাঁদ কিন্তু জল যখন বেশ কমে যায় তখন নিরুপায় হয়ে দেখে তারা বন্দী। না পারে এগোতে না পারে পেছতে। কিছু উজানে জল একেবারে কমে গিয়ে চড়া পড়ে যায়। এমনি বন্দীদশায় বেশ কিছু দিন তারা পড়ে থাকে জলে এরপর সড়কি বল্লম বিঁধে বিঁধে তাদের হত্যা করা হয়। ওরা জানে এদের শরীরের দুর্ব্বলতম স্থানগুলি যেখানে সহজেই অস্ত্রের আঘাত করা যায়।

কানের পাশে সড়কি চালিয়ে কখনও কখনও বা বড় বড় ভাণ্ডার করে একেবারে মুখের মধ্যেও তীক্ষ্ন অস্ত্র ওরা চালিয়ে দেয়। এক বীভৎস পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠে তারা একটার পর একটা একটা জীব হত্যাই করে যায়। ব্যবসাদাররাও এসে জোটে নগদ কাঁচা পয়সা নিয়ে কুমীরের চামড়ার লোভে। কাঁচা ট্যান করা চামড়া ওরা অতিস্বল্পমূল্যে ধনবান ব্যাপারিদের বেচে দেয়। ব্যাপারিরা আবার সেই সব চামড়া ট্যানারিতে উচ্চমূল্যেই বিক্রয় করে তা ছাড়া এরা চর্বিও বিক্রিকরে। হিংস্রতায় বীভৎসতায় মত্তমাংসের যথেচ্ছ ব্যবহারে সে এক জীবন্ত নরক সৃষ্টি হয় কয়টাদিন এই নদীর বুকে। তার পরেই নদীতে ঢল নামে উত্তাল তরঙ্গমালায় যেন ধুয়ে মুছে শুভশুচি করে যায় নদীর সব গ্লানি সব আবিলতা অপবিত্রতা।

শুনতে শুনতে শিউরে উঠেন শ্রীমতী। মানুষই কি বিধাতার হিংস্রতম সৃষ্টি। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ভাবেন তিনি মনে মনে।

বড় ছেলে আর মেয়ে গিয়েছিলো তাঁদের কাছে গ্রীষ্মের ছুটির অবকাশে। বহু কষ্টে তাদের এ দৃশ্য দেখার কৌতূহল থেকে নিবৃত্ত করেন চৌধুরীদম্পতী।

চৌধুরী বলেন এ যদি শিকার হত আমি নিজে তোদের নিয়ে যেতুম সঙ্গে করে তাই বলে এই নারকীয় লীলা দেখাতে নিয়েও যেতে পারব না আর যেতেও দেব না।

ছেলেমেয়ের অনমনীয় ইচ্ছের কাছে একদিন রাবি নদীর বুকে কুমীর-শিকারের প্রতিশ্রুতি তাঁকে দিতেই হল।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপন আপন কাজে তারা চলে গেলেন।

সেক্সপীয়ারের নায়িকা : কর্ডেলিয়া

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

রাজা লীয়রের কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডেলিয়া। তাঁর হৃদয়ের আনন্দ। ফ্রান্সের রাজকুমার ও বার্গেণ্ডীর অধিপতি তার প্রণয়াসক্ত। শাশ্বতী নারী কর্ডেলিয়া বাচালিকা নয়। উচ্ছ্বাসবর্জিতা কর্ডেলিয়ার সংযম অপরিসীম। তার দুঃখ, তার হৃদয়ের প্রত্যন্তে যে গুমরে মরে ভাষা সে তাকে মুখের ভাষায় এনে অভিব্যক্ত করতে পারে না। যখন তার প্রিয় পিতা তাকে প্রশ্ন করেন কর্ডেলিয়া তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর পিতাকে) কতটা ভালবাসেন, কর্ডেলিয়া উত্তর দেয় :—

I love your majesty
According to my Dond ; no mereless
(Act I Sc I)

কর্ডেলিয়ার এই বাহুল্যবর্জিত, পরিমিত উত্তর রাজা লীয়রকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করে না। বরং তার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে তিনি বড়ই বিস্মিত হন এবং কর্ডেলিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন :—

How, how Cordelia ! Mend your
Speech a little
Lest your may mar you fortune (Act I. Sc I)

কিন্তু স্বার্থশূন্যা কর্ডেলিয়া তৎসত্ত্বেও অবিচলিতা থেকে বলে :—

Good my Lord
You have begot me, bred me, lov'd me ;
I return these duties back as right fit
Obey you, love you, and most honour
you (Act I. Sc I)

কর্ডেলিয়া যখন তাঁর বাবার মুখের উপরে সাফ সাফ জবাব দেয় তখনও তাঁর কথার মধ্যে যুক্তি ও বিবেচনার অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায় :—

Why have my sisters husbands if they say
They love you all ? Haply when I shal
wed
That lord whose hand shall take my
plight shall carry
Half my love with him, half my care and
duty
Sure I shall never marry like my sisters
To love my father all (Act I Sc I)

কর্ডেলিয়ার এই সংলাপ থেকেই বোঝা সম্ভব যে সে কত স্পষ্টভাষিণী, তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী গণেরিল ও রীগানের মতন তাঁর মধ্যে কোন ছল চাতুরী নেই নেই কোন হীন কপটতা। তাঁর ভবিষ্যৎ স্বামী সম্পর্কে সে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছে, তা' অবশ্য আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

বৃদ্ধ লীয়ারের কার্যকলাপ শুরু হবার পর থেকে কুসুমিতা কর্ডেলিয়া অসুখী। কেননা তার হৃদয়ের সুকুমারবৃত্তিগুলিকে সে কখনোই সাম্রাজ্যের হীন লোলুপতার কাছে জলাঞ্জলি দিতে পারে না। তার চেতনা চাটুকারিতার পায়ের তলায় পড়ে গড়াগড়ি খেতে পারে না। সবরকম হীনতাকে, কপটতাকে এবং জাগতিক চাহিদাকে উপেক্ষা করে কর্ডেলিয়া যে মুক্ত হতে চায় এক মেঘমুক্ত উজ্জ্বল সূর্যালোকিত নীলাম্বরে। অথবা শান্ত চন্দ্রিমার মতন কর্ডেলিয়া যে তার আলোর স্বর্ণাধারা অবারিত করতে চায় একা নিভৃতে।

তার সংক্ষিপ্ত এবং পরিমিত সংলাপ—তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীদের উচ্ছ্বাসময় সংলাপ থেকে স্বতন্ত্র নিশ্চিত অবশ্যই তার বৃদ্ধপিতা লীয়ারকে আনন্দিত করে না। তিনি তাকে ভুল বোঝেন এবং তাঁর ক্রোধের অত্যু

কারণে পরিণত করেন তাকে। তার উপর থেকে অতঃপর লীয়ার সকল স্নেহ ভালোবাসা, উপহার ইত্যাদি প্রত্যাহার করে নেন। শুধু কি তাই? তাকে অকারণে দর্পিতা বলেও মনে করা হয়। স্বয়ং লীয়ারই বলেন :—

'let pride, which she call plainness, marry her (Act I, Sc I)

কর্ডেলিয়ার প্রতি এই অবিচারের প্রতিবাদ একমাত্র কেন্টের আর্ল ছাড়া আর কেউই করেন না। মোহগ্রস্ত তিমির দৃষ্টিসম্পন্ন রাজা লীয়ারের কানে কানে তিনিই উচ্চারণ করেন :—

Thy youngest daughter does not love thee least ;

কিন্তু লীয়ার কর্ডেলিয়ার নামটি পর্যন্ত আর যেন শুনতে চান না। তিনি তাই কর্ডেলিয়ার একমাত্র সমর্থক, অনুরাগী এই লোকটিকে দেন নির্বাসন দণ্ড। অতঃপর কর্ডেলিয়া তাঁর বৃদ্ধপিতা লীয়ারের ক্রোধ ও ঘৃণার দৃষ্টিতলেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই লাঞ্ছিতা হন। বার্গেণ্ডীর অধিপতি সম্পদহীনা পিতৃস্নেহে বঞ্চিতা কর্ডেলিয়ার প্রেমে ক্ষান্তি মেনে বিদায় হন। ফ্রান্সের রাজকুমারকেও কর্ডেলিয়ার মতন যুবতীর প্রেম পরিত্যাগ করতে প্ররোচনা দেওয়া হয়। কিন্তু ফ্রান্সের রাজকুমার কর্ডেলিয়ার প্রকৃত মূল্য বোঝেন। তিনি বোঝেন যে কর্ডেলিয়ার মূল্য প্রশ্নাতীত তিনি বোঝেন—'She is herself a dowry' (Act. I Sc I)কর্ডেলিয়া হলো—fairest Cordelia, that are most rich, being poor (Act I Sc I) এহেন কর্ডেলিয়াও তার পিতৃস্নেহে বঞ্চিতা। তার পিতা তার প্রতি যে কঠোরতা দেখিয়েছেন, তার প্রতিদানে সেও হয়তো তা দেখাতে পারতো, কিন্তু সে তা দেখায়নি। বরং রাজঅন্তঃপুর ছেড়ে যাবার সময় তার পিতার প্রতি অপরিসীম অনুরাগে তার ভগিনীদের উদ্দেশ্যে করে সে বলেছে :—"Love well our father. your professed bosoms I commit him,"

কর্ডেলিয়ার এই সংলাপ তার ভগিনীদ্বয়ের অপরিসীম ক্রোধের কারণ হয়। কিন্তু কর্ডেলিয়া বলে :—

Time shall unfold what plighted cunning hides,
Who covers faults, at last with shame derides.....................(Act 1 Sc, I)

অতঃপর কর্ডেলিয়া তার স্বামীর সঙ্গে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে চলে যায়।

কর্ডেলিয়ার ভগিনীদের প্রতি বক্তব্য ক্রমশ সত্য বলে প্রমাণিত হয়। তার ভগিনীরা তাঁদের বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে ক্রমশ অতি রূঢ় ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁর ফলে তাঁদের পিতা লীয়ারের প্রথমে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। তারপরে তিনি শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। লীয়ার তাদের চরম অবহেলার পাত্র হয়ে উঠেন এবং তারপর কেন্টের তত্ত্বাবধানে ডোভারে প্রেরিত হন। এখানে এক ফরাসী শিবিরে আবার কর্ডেলিয়ার সঙ্গে তাঁর পিতা লীয়ারের দেখা হয়।

কর্ডেলিয়াকে আমরা এ সময় তার বৃদ্ধ পিতার জন্য উদ্বিগ্ন হতে দেখি। সে অনুসন্ধান করে :— How does the king ? (Act I Sc 7) তারপর যখন নিদ্রিত লীয়ারকে সে দেখে, তখন সে উচ্চারণ করে : —

O my dear father ! Restoration hang
Thy medicine on my lips, and let this kiss
Repair those violent harms that my two sisters
Have in thy reverence made. (Act 4 S 7)

শেষ পর্যন্তও তার অপরাধী পিতার প্রতি কর্ডেলিয়া অনুরক্তা। সে এত মমতাময়ী এবং শ্রদ্ধাশীলা? কিন্তু দুঃখের বিষয় লীয়ার তাকে চিনতে পারেন না। তা সত্ত্বেও কর্ডেলিয়ার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনা। সে লীয়ারের জন্য তথাপি সহানুভূতিশীলা। যখন তাই লীয়ার বলেন :—

If you have poison for me I will drink it.

I know you do not love me ; for your sisters
Have, as I do remember, done me wrong :
You have some cause, they have not.
(Act 4, Sc 7)

কিন্তু কর্ডেলিয়া উত্তর দেয় :—No cause, No cause

লীয়ার শুধান :—Am I in France ?
কর্ডেলিয়া উত্তর দেয় :—In your own Kingdom Sir.

পীড়িত পিতাকে শান্তি দেবার জন্য সর্বদাই কর্ডেলিয়ার চেষ্টা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ভগিণীদের যৌথ ষড়যন্ত্রের কাছে তাকেও পরাজিত হতে হয়। কর্ডেলিয়া এবং লীয়ার দুজনেই কারাগারে বন্দী হয়। এইখানে লীয়ার কর্ডেলিয়াকে চিনতে পারেন এবং তার কাছে প্রস্তাব করেন :—

Come let away
to prison
We two alone will sing birds i'the cage
(Act 5. Sc 3)

কর্ডেলিয়া গান গাহিবার অবকাশ পায় না। তার আগেই তাকে হত্যা করা হয়। তার মৃতদেহকে কোলের উপর নিয়ে লীয়ার বিলাপ করতে থাকেন :—

She's dead as earth...... ......
(Act 5, Sc 3)

ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধেই মৃত্যুবরণ করতে হলো কর্ডেলিয়াকে। তার সারাটি জীবনকালে তার প্রিয় পিতা তাকে ভুল বুঝেছেন। কারণ সে প্রতারণা বলে কিছু জানতো না কোনদিন। যদিও তার জীবন ন্যায় এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই উৎসর্গিত তথাপি কোন জাগতিক উপহার মেলেনি তার শেষ পর্যন্ত। শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই নারী তার নির্মৈতার হাতে দণ্ডপাণিই লাভ করলো কেবল। স্বতাবতই তাই প্রশ্ন জাগে, যে সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য লড়ে তাকেই কি হতে হয় ক্রুশেভার? পীড়নই কি সততা ও বিশ্বস্ততার পুরস্কার? হয়তো, হয়তো বা তাই। তাই সব চেয়ে বড় সত্য।

কর্ডেলিয়া সর্বযুগের সর্বদেশের তিমিরদৃষ্টিসম্পন্ন মানবকুলকে ডেকে যেন এই সত্য ও ন্যায়ধর্মের যূপকাষ্ঠেই প্রাণ বলি দিতে বলেছে।

সেক্সপীয়ার রচিত নায়িকাদের আসরে কর্ডেলিয়ার স্থান অনেক উচুঁতে। হয়তো সবচেয়েই উঁচুতে। বাহিরের দেশকাল, দিন যাপন ও প্রাণধারণের গ্লানি, পাওয়া না পাওয়ার চুলচেরা হিসাব ইত্যাদি সব পরিচিত বিষয়ের দ্বারা কর্ডেলিয়ার বিচার চলে না।

যেদিন মানুষের মন ক্ষুদ্র লাভালাভের সংকীর্ণ গণ্ডিমুক্ত হবে, বৈষয়িক অন্ধকারের আবর্ত পার হয়ে আলোর দিকে উৎসাহি যাত্রা শুরু করবে সেইদিন, কেবল মাত্র সেইদিনই কর্ডেলিয়ার মতন নারীসত্তার উজ্জীবন হবে। তার পূর্ব পর্যন্ত তার মরণ ঘুম কেউ ভাঙতে পারবে না।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

• হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আশার ক্ষীণ আলো—

পশ্চিম বঙ্গে সর্ব্বত্র নানা অনাচার, প্রশাসনিক ব্যভিচার, সি পি এম-এর নির্লজ্জ 'ডিমক্র্যাসীর' তাণ্ডব, ফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে দল এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ক্ষমতার নিত্য নৈমিত্তিক অসভ্য বর্ব্বরোচিত (মাপ করিবেন—অসভ্য এবং বর্ব্বরদের মধ্যেও যে প্রকার সহজ অনাড়ম্বর সভ্যতা এবং সহজ সরল মানবিক আচার ব্যবহার দেখা যায়, আমাদের বর্তমান ফ্রন্ট সরকারদের অতি সভ্য শরিকদের মধ্যে সেই মানবীয় কোন কিছুই দেখা যায় না !) ভূতের নৃত্যের মধ্যে-যখন মনে হইতেছিল, এ-পোড়া ভাগ্যহত 'রাজ্যে 'মানুষ' বলিতে আর কেহ বোধহয় অবশিষ্ট নাই, ঠিক সেই সময় সংবাদপত্রে দেখা গেল—

"পথের সেই রোগী আশ্রয় পাইলেন—

সংবাদে প্রকাশ—জলবসন্ত রোগাক্রান্ত এক ব্যক্তি কলিকাতার কোন হাসপাতালে স্থান এবং আশ্রয় না পাইয়া, অবশেষে অ্যামবুলেন্স কর্তৃক রাসবিহারী অ্যাভেনিউ এ মহানির্ব্বাণ মঠের সামনে ফুট-পাথে পরিত্যাক্ত হয়েন। অ্যামবুলেন্স এই নিরাশ্রয় রোগীক লইয়া কলিকাতার ছোট বড় প্রায় সব কয়টি হাসপাতালেই ভর্তি করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু জলবসন্তের কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং নির্দ্দিষ্ট বেড না থাকাতে—অবশেষে রোগীকে যে স্থান হইতে গাড়ীতে তোলা হয়—সেই অগতির গতি নিরাশ্রয়ের শেষ আশ্রয় ফুটপাথেই ফেলিয়া দিতে বাধ্য হয়।

বেশ কয়েকদিন ফুটপাথেই এই ৬৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে পড়িয়া থাকিতে হয়। তাহার পর শ্রীপরেশ নাথ মণ্ডল নামক এক ভদ্রলোক রোগীকে পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বহু কষ্টে তাঁহাকে টালিগঞ্জে নিজের বাড়িতে লইয়া যান এবং নিজের গৃহেই তাঁহার সাধ্যমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এখন পরেশবাবুর চিন্তা রোগমুক্ত হইবার পর ভদ্রলোকের কি উপায় হইবে—কি ভাবে তাঁহার দিন চলিবে।

এই প্রসঙ্গে কিছু ন্যায্য মন্তব্য করা হয়ত অবান্তর হইবেনা। রাসবিহারী অ্যাভেনিউ দিয়া হাজার হাজার (লক্ষ লক্ষও হইতে পারে) লোক সর্ব্বক্ষণ যাওয়া-আসা করিতেছে, কিন্তু এই জনস্রোতের মধ্যে কি একজনও মানুষ ছিল না? আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম-কীর্তন করি, ঘটা করিয়া তাঁহার পুণ্য জন্মতিথি পালন করি, কিন্তু পুণ্যস্মৃতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ের অপার করুনা এবং মানবপ্রেমের কথা স্মরণ করিয়া, একজনও কি তাহা সামান্যভাবেও অনুকরণ করিবার চেষ্টা করি?

তারপর, মহানির্ব্বাণ মঠের কথা। মঠটি নাকি একটি পবিত্র স্থান এবং এখানে মানুষের আত্মার বিবিধ-প্রকার কল্যাণের চেষ্টা করা হয়, নিয়মিত, ধ্যান, কীর্ত্তন এবং পূজাপার্ব্বণ ও পালন করা হয়। মঠের সর্ব্বত্যাগী সাধকদের দৃষ্টি বোধহয় সদা সর্ব্বদা উর্দ্ধে স্বর্গলোকের

প্রতি নিবদ্ধ থাকে, এবং সেই কারণেই হয়ত মঠের সামনে ফুটপাথে মরণাপন্ন রোগাক্রান্ত নিরাশ্রয় অসহায় মানুষ রোগীর প্রতি দৃষ্টি দিবার তাহাদের অবকাশ হয় নাই। মঠবাসী এবং মঠ-ভক্তদের অধিকতর আত্মিক এবং আর্থিক কল্যাণ হউক।

রাজ্যের হাজারো প্রকার নিরাশার মধ্যেও আজ একটি মাত্র মানুষের দেখা পাইলাম, যিনি এখনো অন্তর দিয়া পরের দুঃখ অনুভব করিতে পারেন এবং দুর্গতের ত্রাণের জন্য সাধ্যমত সব কিছু করিতে পারেন। এই প্রকার দু-চারটি মানুষও যদি পশ্চিম বঙ্গে এখনো থাকে, তাহা হইলে আমরা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু আশা করিতে পারি। এই প্রকার দু-চারটি মানুষ যাহা করিতে পারে এবং পারিবে, আমাদের ৩২×২০০০ দফা কার্য্যসূচী-ওয়ালা বুকফাটা মেকি দেশভক্ত এবং দেশ সেবকেরা তাহা হাজার বছরেও পারিবে না।

আমাদের একটা আশঙ্কা হইতেছে কলিকাতা কর্পোরেশন এবং উক্ত সরকার অনধিকার চর্চ্চার অপরাধে টালিগঞ্জের শ্রীপরেশনাথ মণ্ডলের নামে মামলা না দায়ের করেন! চিকিৎসাব্যাপার সরকারের হাতে এবং ফুটপাথ হইতে কিছু সরানোর দায় কলিকাতা পৌরসভার।

দিব্যদৃষ্টি চৌহান—

মহারাষ্ট্র বীর চৌহান, আমাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বহু পরিশ্রম এবং বিনিদ্র রজনীযাপন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে পশ্চিম বঙ্গে 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার' (আইন শৃঙ্খলা) ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই—অর্থাৎ সবই 'স্বাভাবিক' আছে। এই বিষয়ে বর্গীবীর চৌহানেরও মার্কসীয় মহাপীর শ্রীজ্যোতি বসুর [আমাদের রাজ্যের গত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী] দেখা যাইতেছে একেবারে একমত—হরিহর আত্মাও বলা যাইতে পারে। শ্রী চৌহানের কথা যদি 'সত্যই-সত্য' হয়, তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা অন্যান্য প্রায় সকল মন্ত্রী [লাল-মন্ত্রীদের ছাড়া] এ-রাজ্যের 'ল-অ্যাণ্ড অর্ডার' সম্পর্কে যাহা বহু দিন ধরিয়া বলিয় আসিতেছেন সবই মিথ্যা এবং অপপ্রচার ছাড়া আ কিছুই নহে! সোজা কথায় পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীদের মধ্যে শ্রীজ্যোতি বসু, 'রামবল' গোঁসাই এবং অন্য দু-তিন জ ব্যতিরেকে, আর সকল মন্ত্রী মিথ্যাবাদী।

চোখকান-ওয়ালা সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রে যখন একবাক্যে বলিতেছেন যে পশ্চিম বঙ্গে সাধার জীবন বিপর্যস্ত, দেশের সর্ব্বত্র বর্ত্তমানে যাহা চলিতেছে তাহাকে অজয়বাবুর ভাষায়, বর্ব্বর এবং অসভ্য ছাড় আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু চৌহা সাহেব তাঁহার 'বর্গীয়' দৃষ্টিতে সবই 'স্বাভাবিক' দেখিতেছেন এ-রাজ্যে! অথবা মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে এই বর্গীবীর প্রকাশ্যে বলেন যে—কেন্দ্র সরকার পশ্চি বঙ্গের অবস্থার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন, যথাসময় এ রাজ্যের সম্পর্কে [কেন্দ্র সরকার] যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যই করিবেন। কিন্তু কেন্দ্রের অর্থাৎ কেন্দ্র সরকারের আভ্যন্তরিক টলমল অবস্থায় ভীত হইয়া কেন্দ্রীয় কর্ত্রী এবং কর্তারা বিপদে পড়িয়া এখন সর্ব্ব 'মিত্র'—সন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বহুনিন্দিত দেশদ্রোহী রাজনৈতিক দলগুলিও আজ কেন্দ্রের বন্ধু বিপদের সহায়।

ইতিপূর্ব্বে দেশমাতা ইন্দিরা বহুস্থানে বহুবা ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্র সরকার কখনও কো অবস্থাতেই কমিউনিষ্ট পার্টির সহিত কোন আঁতা স্থাপন করিবেন না। আজ কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ইন্দিরাজীর মত এবং পথ দুইই বদলাইয়াছে, এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহাশয়গণও দেশমাতা নির্দেশিত পথে, এবং মতে চলিতে এবং তাঁহার সুরে সুর মিলাইতে বাধ্য হইয়াছেন।

চৌহান সাহেব বোধহয় তাঁহার 'বর্গীয় মাপকাঠিতে এ-রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার বিচার করিতেছেন অর্থা বর্গীরা যখন বাংলাদেশে বিবিধপ্রকার নারকীয় অত্যাচা অনাচার, লুটপাট চালাইয়া দেশে অরাজকতা কায়ে করিয়াছিল, বর্ত্তমান বাংলার অবস্থা এখন সে পর্যায়

পৌঁছায় নাই, কাজেই তাঁহার মতে পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা আজ অতি উত্তম এবং অতি স্বাভাবিকই আছে।

বর্গীবীর চৌহান মহারাজ আর একটি চমৎকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বলেন রাজ্যের শান্তি এবং শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব রাজ্যসরকারের, অতএব এ বিষয়ে কেন্দ্র কিছুই করিতে পারিবেন না। কিন্তু মাত্র দুই বৎসর পূর্বে রাজ্যের অবস্থার যখন এত অবনতি ঘটে নাই, সেইসময় তৎকালীন রাজ্যপালকে দিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পতন ঘটাইতে চৌহান মহারাজ কোন প্রকার সঙ্কোচবোধ করেন নাই।

কেন্দ্র সরকারের কর্তব্য যদি কেবলমাত্র রাজ্যগুলি হইতে ট্যাক্স আদায় করিয়া কেন্দ্রের বিলাসবহুল অথবা অপচয়ই হয়, তাহা হইলে এ-কেন্দ্র এই সরকার যত শীঘ্র পরিবর্তন যায় আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার প্রয়াসে শ্রীমতি ইন্দিরা আজ দেশের সর্বত্র এক মহা ভাঙনের প্লাবন আনিয়াছেন। এই সামান্যবুদ্ধি মহিলার কথাবার্তায় মনে হইতেছে, দেশের সকলপ্রকার ভাল-মন্দের নায়িকা তিনি। ভাল কতটা হইতেছে এখনও বলা যায় না, তবে দেশের এবং জাতির পক্ষে অমঙ্গল এবং ক্ষতিকর অনেক কিছুই তিনি করিতেছেন। সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি করিয়াছেন দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সততা এবং ন্যায়নিষ্ঠাকে বলি দিয়া। যে দেশের প্রধান মন্ত্রী অঙ্গরাজ্য সরকারের পতন ঘটাইতে নানা অন্যায় পন্থা গ্রহণেও দ্বিধা করেন না, সে প্রধান মন্ত্রীর দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসকের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার কোন অধিকার নাই।

রামমোহন ধন্য হইলেন।

কিছুকাল পূর্বে দেশমাতা, জবহরলাল কন্যা শ্রীমতি ইন্দিরা বহু পরিশ্রম এবং পরম কষ্ট স্বীকার করিয়া দিল্লী হইতে রাধানগরে রামমোহনের আদিবাস দর্শন করিতে যান। ভারতপথিক রামমোহনের গ্রামে তিনি ভাষণপ্রসঙ্গে বলেন যে—

ভারতের নবযুগের স্রষ্টা এবং পথপ্রদর্শক: রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ এবং জবাহরলাল নেহেরু (!)! রামমোহন এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপত্তি করিবার কিছু নাই, কিন্তু এই দুইজন বিশ্ববন্দিত মহামানবের সহিত জবাহরলালের নাম এক পর্যায়ে বসাইবার অপচেষ্টা কেন? পিতৃভক্তি ভাল এবং সন্তানের তাহা থাকা উচিত, কিন্তু ভাল-মান-জ্ঞান হারাইয়া মহান মহীরুহের সহিত ভ্যারেণ্ডা গাছকে সমগোত্রীয় করার চেষ্টা কেবল হাস্যকর নহে, অতি লজ্জার কথাও। তবে সকল ব্যক্তির এই শেষোক্ত সদ্গুণটি সকল সময় দেখা যায় না।

ভারতের অন্যান্য মহাজনদের নাম, এমন কি মহাত্মা গান্ধীকেও বাতিল করিয়া, ছাঁটিয়া দিয়া, নিজের পিতাকে, আমাদের মতে তুলনায় অযোগ্য পিতাকে, জোর করিয়া অযথা সম্মান দিবার চেষ্টার অর্থ হইবে তাঁহাকে অপমান করা। জবাহরলাল হয়ত অনেক বিদ্যা, অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন কিন্তু এ কথা আজ কে অস্বীকার করিতে পারে যে এই জবাহরলালই ভারতের বর্তমান বহু দুরবস্থা এবং সমস্যার স্রষ্টা? এ-বিষয় অধিক বলার প্রয়োজন নাই। [জবাহরলালের বহু সাধের পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানগুলি (রাশিয়ার অনুকরণে) আজ দেশকে পঞ্চত্বপ্রাপ্তির দিকে লইয়া যাইতেছে। দোষ হয়ত প্ল্যানের নহে, দোষ অযোগ্যদের হাতে কর্মভার অর্পণ করা এবং এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অদ্ভুত একটা যোগ্যতা এবং দক্ষতা আছে। **Round screw square hole**-এ বসাইতে এখন আর কেহ কোথায় পারে নাই, পারে না, পারিবে না।]

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ আইন বাতিল।

সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক ১৪টি ব্যাঙ্ক সরকারী আওতায় যে বিশেষ আইন বলে করা হয়, সুপ্রীমকোর্টের রায়ে তাহা অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

এই বিচারফল বাহির হইবার পর সরকারী মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়া

স্বয়ং মত প্রকাশ করিয়াছেন যে—দেশের সর্বস্তরে সকল মানুষের মনে এখনও প্রকৃত সমাজবোধ জাগ্রত হয় নাই। সোজা কথায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের সমালোচনা না করিয়া, নাক ঘুরাইয়া কাজ করা হইল। এমন কি প্রয়োজনমত সংবিধান সংশোধন কিংবা অদল বদল করার ইঙ্গিত, প্রধান প্রশাসিকা দিতে ভুলেন নাই এবং এ-বিষয়ে তিনি, বিশেষ করিয়া দুইটি কমিউনিষ্ট পার্টি এবং অন্যান্য কয়েকটি উগ্র রাজনৈতিক দলের সহিত সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে প্রায় একমত।

চারিদিক হইতে যেভাবে সংবিধান সংশোধন, এমন কি পুরাণ সংবিধান বাতিল করিয়া রাজনৈতিক দলগুলির (বিভিন্ন দলের দাবী এ-বিষয় আলাদা) ইচ্ছা এবং দাবীজাত নূতন সংবিধান রচনার কথা উঠিতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে সমগ্র ভারতের জন্য একটি মাত্র সংবিধান আর চলিবে না। এক একটি রাজনৈতিক দলের পাণ্ডাদের মত লইয়া ভারতে অন্তত ১৮টি সংবিধান চালু করিতে হইবে। দলীয় নেতারা কথা বলিতেছেন জনসাধারণের মুখপত্র হিসাবে এবং তাঁহারা যাহা করিতেছেন এবং যে দাবী পেশ করিতেছেন, তাহা জনগণ তথা দেশের জনসাধারণের কঠোর নির্দেশ-মতই। জনগণ নেতাদের দাবি এবং তাহা পূরণের আন্দোলন প্রভৃতির বিষয় একেবারে অজ্ঞ থাকিলেও তাহা জনগণের নামে প্রচার করায় দোষ কি? কারণ শেষ পর্যন্ত ভালমন্দের সকল চোট এবং ক্ষয়ক্ষতি দেশের নির্বাক জনগণকেই সহ্য এবং বহন করিতে হইবে। সরকারী রোষের তাপ নেতাদের ভাগে যাহা পড়ে তাহা প্রায় রাজকীয়, কিন্তু জনগণকে যাহা ভোগ করিতে হয়, তাহা নারকীয় বলিলে অন্যায় হয় না। সোসালিষ্ট সমাজে ইহাই বিধি। কারণ আপনি আমি আয়কর সময়মত না দিতে পারিলে তাহার জন্য দণ্ডভোগ করিতে হইবে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বিশিষ্ট ব্যক্তি (বর্তমান একই মস্তকে যাহার দুইটি মুকুট শোভা পাইতেছে) যদি পরপর দশ বছর আয়কর না দেন, তাহা হইলে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না, কাজের বিষম চাপে তাহা সামান্য ভুল মাত্র। এবং স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী তাঁহার পক্ষে সাফাই গাহিতে লজ্জাবোধ করিবেন না।

জনগণ প্রস্তুত হউন এবার ইন্দিরা মার্কা সোস্যালিজম ব্যাঙ্কগুলির পোদ্দারি গ্রহণ করিয়া দেশের বড় বড় সংবাদপত্রগুলির উপর শকুনির দৃষ্টি দিতেছে। যেমন মনে হইতেছে-ভারতে যে হইবে ইন্দিরা-বিরোধী সেইই হইবে, ভারত ও তথা জাতীয়তা বিরোধী!

শ্রীনন্দকে অভিনন্দন—

কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ রেলমন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পরেই তিনি আই এন টি ইউ সি'র সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা যথাযথ হইয়াছে স্বীকার করিব এবং এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের দুই তিনজন রাজ্যমন্ত্রী তাঁহাদের নিজ নিজ ট্রেড ইউনিয়ানের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করার কোন কারণ খুঁজিয়া না পাওয়াতে একই সঙ্গে মন্ত্রিত্ব এবং বিশেষ বিশেষ ট্রেড ইউনিয়ানের নেতৃত্বপদেও নিজেদের বহাল রাখিয়াছিলেন! মনে থাকিবে এ রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মহাশয় স্বয়ং বোধহয় ৫।৬ ইউনিয়নের সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন! পৃথিবীর কোন সভ্য রাষ্ট্রে এমন ব্যাপার বিরল, নাই বলিলেও চলে। মন্ত্রীর নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সকল প্রজাই সমান এবং অপক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার আশা করে। যে ব্যক্তি একদিকে মন্ত্রী এবং অন্যদিকে শ্রমিক-নেতা সেই ব্যক্তির পক্ষে. সকল ব্যাপারে, বিশেষ করিয়া শ্রমিক-মালিক বিরোধে, নিরপেক্ষ থাকা একপ্রকার অসম্ভব। কারণ মন্ত্রী মহাশয়গণ বিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান, তাঁহারা জানেন মন্ত্রীত্ব অতি অস্থির বিষয়, আজ আছে, কাল নাই। শ্রমিক-নেতৃত্ব তাঁহাদের কাছে পাকা বস্তু কাজেই অনিত্যের জন্য নিত্যকে তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন কেন?

এ-বিষয় আমাদের পরিষদ বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তীর মত কি?

পশ্চিম বঙ্গের অকাল ?

১৩৭৬ সাল পশ্চিম বঙ্গের তথা সমস্ত বাঙালী জাতির পক্ষে একটি অতি ভয়াবহ দুর্বৎসর বলা অনুচিত হইবেনা। বিগত দুইশত বৎসরে এই হতভাগ্য দেশ এবং ভাগ্যহত জাতির বুকের উপর দিয়া এমন সর্ব বিষয়ে অকল্যাণকর এবং অনাচার অত্যাচারের স্রোত বহিয়া যাইতে পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। আমরা পূর্ব্বকালে এমন দেউলিয়া প্রশাসন ব্যবস্থাও আর কখনও দেখি নাই, শুনি নাই। তথাকথিত গণতন্ত্রের দৌলতে এমন অপদার্থ, স্বার্থসর্বস্ব এবং আদর্শনীতিহীন প্রশাসকের দলও কখনও দেশ এবং জাতির ভাগ্য লইয়া এমন বিচিত্র খেলা খেলিবার অবকাশ আর কোনদিন পায় নাই! ভবিষ্যতে আবার কখনও পাইবে কিনা জাতির ভাগ্যবিধাতাই বলিতে পারিবেন। সি পি এমের অত্যাচার, অনাচার এবং জনগণের উপর অকথ্য নির্য্যাতনের পালা রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তনের ফলে আপাতত হয়ত কিছুকালের জন্য বন্ধ হইল, কিন্তু ইহা কতদিনের জন্য তাহা বলা শক্ত! বাঙলা কংগ্রেসের সভাপতি এবং পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগের ফলেই বর্ত্তমান রাজ্যমন্ত্রীসভার পতন ঘটিল, যদিও তথাকথিত যুক্তফ্রন্টের শরিক-দলগুলি ঠাঁই বজায় রাখিয়া দলপতিদের মন্ত্রিত্ব তথা ক্ষমতার আসন অধিকার করিয়া থাকিবার জন্য কোন প্রচেষ্টা বা অপচেষ্টাই বাকি রাখেন নাই। কিন্তু অজয়বাবুকে ধন্যবাদ (সেই সঙ্গে শ্রীসুশীল ধাড়াকেও) তিনি বিভিন্ন দলের বিভিন্ন নেতাদের স্তোকবাক্যে আত্মবিস্মৃত না হইয়া নিজের কথার খেলাপ করিলেন না এবং এই খেলাপ না করায় ফলেই আজ পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ জন কিছুকালের জন্য অন্তত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইল।

একথা পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে যে, রাজ্যের পুলিশ-দপ্তরকে সি পি এম নেতা তথা রাজ্যের 'উপ'-মুখ্যমন্ত্রীর কবলমুক্ত করিতে পারিলেই রাজ্যপুলিশ তাহাদের কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতে সক্ষম হইবে। আজ কার্য্যতঃ তাহাই দেখা যাইতেছে। রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রাজ্যের শান্তি এবং শৃঙ্খলা বহু পরিমাণে ফিরিয়া আসিতে দেখা গেল। পুলিস হঠাৎ তৎপর হইয়া কয়েক হাজার তাজা বোমা, বোমা তৈয়ারীর বেশ কয়েকমণ মাল মসলা এবং শত শত মারাত্মক অস্ত্রাদি, তথাকথিত জন-যোদ্ধাদের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়াছে। সবই পুলিশের জানা ছিল, কিন্তু 'গণপতি' উপমুখ্যমন্ত্রীর নির্দ্দেশের কারণেই পুলিসকে বেকার হইয়া নীরব-দর্শকের ভূমিকা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। পুলিসের হঠাৎ তৎপরতা সি পি এম ব্যাপারীদের কিঞ্চিত ভাবিত করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই এই সকল জনমায়ী ব্যাপারীরা ক্রন্দন করিতে সুরু করিয়াছে এই বলিয়া যে—এ-রাজ্যে এখন ব্যাপকভাবে সি পি এম সমর্থক চ্যাঙড়া বাহিনীর উপর নাকি অকথ্য অত্যাচার চালানো হইতেছে এবং নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাইতেছে জ্যোতিহীন রাজ্যপুলিশ এবং অ-সি পি এম জন-সাধারণ! মাক্সীয় দিব্য জ্যোতি-বিভাসিত শ্রীজ্যোতি বসু এবং তাঁহার দলীয় নেতারাও আজ এই ক্রন্দন-আসরে যোগদান করিয়াছেন! হায়! ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। যে-ব্যক্তি কথায় কথায় ছোট বড় সকলকে চোখ রাঙাইয়া শাসন করিতে কোন লজ্জা বোধ করিত না। আজ সেই পরম প্রতাপশালী 'গণরাজের' শ্রীমুখ হইতে অন্য সুর বাহির হইতেছে! কেন? যে-ব্যক্তি সকলকেই, বিশেষ করিয়া বিরুদ্ধবাদীদের সময়ে-অসময়ে একেবারে 'ঠাণ্ডা' করিয়া দিবার হুমকী দিত, আজ সেই ব্যক্তি হঠাৎ এমন সহজ সরল বিনয়ভূষণ বশংবদ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হইল কোন যাদুমন্ত্র বলে?

শ্রীজ্যোতি মহাশয়কে (এবং সি পি এম ব্রেণমেণ্ড প্রমোদবাবুকেও) একটা কথা জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। কথাটা আর কিছুই নহে, মাত্র কিছু-কাল পূর্ব্বেই যুক্তফ্রন্টের (অ) রাজত্বকালে নিরীহ জনগণ যখন সি পি এম এবং সহকর্মী অন্য দু-একটি দলের হিংস্র দলীয় 'সেনাদের' হাতে ক্রমাগত বিবিধ

প্রকারে নিপীড়িত এবং নিগৃহীত হইতেছিল সেই সময় জ্যোতি বসু মহাশয় পুলিশকে কেন বেকার করিয়া রাখেন এবং সাধারণের শত কাতর আবেদন-নিবেদনেও পুলিশকে নিগৃহীত জনগণের উদ্ধারে যাইতে দেন নাই? পশ্চিম বঙ্গের এই সি পি এম কলঙ্কিত অধ্যায়ে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে জ্যোতিবাবু কর্ণপাত করার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নাই কেন? পুলিশকে তিনি সাধারণের কাজে সেবা লাগাইতে দেন নাই? অথচ নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে তিনি কোন লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। পুলিশকে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। রাজ্যপুলিস জ্যোতিবাবুর আমলে প্রায় তাঁহার জমিদারীর বরকন্দাজবাহিনীতে পরিণত হয়। ইহার জন্য কেহ বা কাহারা দায়ী?

পুলিশ আজ রাহুমুক্ত হইয়া তাহাদের স্বাভাবিক কর্তব্য পালন করিতেছে কিংবা করিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া জ্যোতিবাবু এবং তাঁহার দলের ছোট বড় প্রায় সকল নেতা উপনেতার মন একান্ত চঞ্চল এবং ভীতি-গ্রস্তও হইয়াছে। এই বিজাতীয় আদর্শে উদ্বোধিত দেশের এবং মানুষের এই শত্রুদলের ভয় হইয়াছে এই ভাবিয়া যে পুলিশ যদি তৎপরতার সহিত নিখুঁতভাবে তাহাদের 'মার্চ' এবং বিগত দশ এগারো মাসের ব্যাপক নরহত্যা, ডাকাতি, ছিনতাই এবং অন্যান্য শত শত প্রকার সমাজবিরোধী ক্রিয়াকর্মের, অনুসন্ধান চালায়, হয়ত দেখা যাইবে শতকরা ৯৫টি অপরাধজনক ক্রিয়া-কর্মের জন্য সাক্ষাৎ কিংবা পরোক্ষভাবে দায়ী জ্যোতিবাবুদের সি পি এম দলের চাইচামুণ্ডারা কিংবা সমর্থকেরা! অনুসন্ধানের ফলে এমন বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে যাহার ফলে রাজ্যের বহু সি পি এম নেতার বিরুদ্ধেও ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাইতে পারে এবং বিচারকের রায়ে হয়ত বহু নেতাকে শ্রীঘরে কিছুদিন বিশ্রাম (বাধ্যতামূলক) লাভের অবকাশ দেওয়া হইতে পারে। ইহাতে অবশ্য জ্যোতিবাবুর মত এবং সমগোত্রীয় নেতাদের ভয় পাইবার কিছু নাই, কারণ তাঁহাদের মত ব্যক্তিদের পক্ষে শ্রীঘর এবং মাতুলালয়ের মধ্যে বিশেষ কোন তফাত নাই। একদিক দিয়া শ্রীঘরই হয়ত ভাল, ইহাতে খাতিরও যেমন বাড়ে, মাতুল মহাশয়ের পয়সাও তেমন বাঁচে!

রাজ্যপুলিশ ফ্রন্ট রাজত্বে (প্রকৃতপক্ষে অ-রাজত্বে!) কি কাজে বা অ-কাজে ব্যস্ত ছিল?

আমাদের প্রাজ্ঞ রাজ্যপালকে সবিনয় নিবেদন জানাইব, তিনি যেন তাঁহার রাজ্যের পুলিশ-দপ্তরের, বিশেষ করিয়া বড় বড় নামকরা অফিসারদের বিগত বারো মাসের ক্রিয়াকর্মের বিষয় একটু খোঁজখবর লয়েন এবং এই সকল উচ্চ বেতনভোগী পদস্থ পুলিস-কর্তারা তাঁহাদের নির্দ্ধারিত কর্তব্য যথাযথ পালন করেন কি না, সে বিষয়ে একটা তদন্তের ব্যবস্থা করেন অবিলম্বে।

আজ এ-কথা সকলেই জানেন যে, ফ্রন্টিয় মন্ত্রীগণ প্রায় সকলেই রাজ্যের প্রশাসন-যন্ত্রকে দলীয় স্বার্থে, কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থেও ব্যবহার করিতে কোন-প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, শেষ পর্য্যন্ত প্রশাসনের হাল এমনই হয় যে ফ্রন্টেরই বহু শরিকদল (আর এস পি, এস এস পি, বাঙ্গলা কংগ্রেস প্রভৃতি) খোলাখুলি বলিতে বাধ্য হয়েও যে রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রীদের দফ্‌তর এক একজন মন্ত্রীর এবং তাঁহার দলের খাস তালুক বা জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে। এ অভিযোগ প্রকট-ভাবে প্রযোজ্য উপমুখ্য মন্ত্রী জ্যোতি বসু সম্পর্কে। এই দিব্য জ্যোতি তথা দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিটি সমগ্র রাজ্য সরকার এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকেই তাঁহার নিজস্ব জমিদারী বলিয়া জ্ঞান করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার অধীন রাজ্য পুলিশকে তাঁহার নিজের জমিদারীর বরকন্দাজবাহিনীতে পরিণত করেন! সে যাহাই হউক এখন রাজ্যপাল মহাশয় দয়া করিয়া রাজ্য-পুলিশ সম্পর্কে তদন্তের কি ব্যবস্থা করিবেন তাহা জানিবার জন্য আমরা তথা হতভাগ্য রাজ্যবাসী মাত্রেই উৎসুক রহিলাম।

তদন্তের ফলে যদি দেখা যায় যে, প্রাক্তন উপমুখ্য মন্ত্রী পুলিশকে তাঁহার দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থেও ব্যবহার করিয়া থাকেন বেআইনী ভাবে, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে আইন-অনুমোদিত ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হইবে না। তাহা জানিবার অধিকার এ-রাজ্যের গরীব করদাতাদের আছে।

'যদির' কথা বলিতেছি।

শ্রীজ্যোতি বসু যে সত্যই 'প্রশাসনিক' অপরাধে অপরাধী এমন কথা বলিব না, বলাও ঠিক নহে। কিন্তু গোপন বা প্রকাশ্য তদন্তের ফলে যদি দেখা যায়, শ্রীবসু মহাশয় উপমুখ্য এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকা কালে তাঁহার পদাধিকার বলে ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন, দলীয় স্বার্থ সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার এবং অপক্ষপাতিত্বের পরিচয় দেন নাই, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে তাঁহার বিচার কে করিবে এবং কোন্ বিশেষ আদালতে? আমাদের রাজ্যপালের ভাষণে এবং আচরণে যতটুকু দেখা যাইতেছে, তাহাতে সাধারণে ধরিয়া লইয়াছে শ্রীধাবন জ্যোতিবাবুর গুণমুগ্ধ। এতই গুণমুগ্ধ যে—রাষ্ট্রপতির শাসন কলিকাতা রেডিও হইতে ঘোষণার কালে তিনি জ্যোতি বাবুকে পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের, যে কোন সরকারের পক্ষে একজন যোগ্যতম প্রশাসক বলিতে দ্বিধা করেন নাই! যে ব্যক্তি এবং যাঁহার দল পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে আজ অভিশাপস্বরূপ প্রমাণিত হইয়াছে তাঁহাদের জনমারী সংগ্রামী হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য, সেই দলের বিশিষ্টতম নেতাই আজ আমাদের রাজ্যপালের নিকট হইতে যে অভিনন্দন পাইলেন তাহা সত্যই অভিনব। রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করিবার সময় জ্যোতি বাবুকে এমন "আপ্"করিবার পক্ষে রাজ্যপালের যুক্তি কি? পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পদার্পণ করিয়াই শ্রীধাবন মার্শ্বীয় বীর জ্যোতিবসুর গুণকীর্তন করেন, আবার জ্যোতি বসু তথা ফ্রন্টমন্ত্রিবর্গকে বিদায়দানের সময়ও তিনি জ্যোতি-কীর্তন করিতে ভুলিলেন না।

এখন বক্তব্য এই যে—প্রয়োজন হইলে শ্রীধাবন কি জ্যোতি বসুর বিচারের নির্দেশ দিতে পারিবেন? আমাদের মনে হয় এমন পাপ-কর্ম তিনি কিছুতেই করিতে পারিবেন না, তাহার পূর্বে তিনি নিশ্চয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের (তাঁহার মতে state of slaves!) রাজ্যপালপদ ত্যাগ করিতেও দ্বিধা করিবেন না।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে আর একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। রাজ্য পুলিস যে-সময় কিছু তৎপরতার সহিত যুক্তফ্রন্ট আমলে অনুষ্ঠিত খুন জখম ডাকাতি এবং অন্যান্য সমাজ-বিরোধী কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের ধরপাকড় করিতে আরম্ভ করিল ঠিক সেই সময় রাজ্যপাল পুলিসকে সংযত হইতে এবং অনাবশ্যক বল প্রয়োগ বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক থাকিতে সদুপদেশ দান করিলেন কেন? যতদূর জানি, পুলিস এ-পর্যন্ত অযথা বলপ্রয়োগ কিংবা অন্যায় প্রতিহিংসা লইবার মানসে বিশেষ কোন কিছুই করে নাই—পুলিসের নব অভিযানে একমাত্র সি পি এম এবং সমধর্মী দু-একটি রাজনৈতিকদল ছাড়া আর কোন দলই কোন অভিযোগ করে নাই। পুলিসি তৎপরতা দেখিয়া সি পি এম তারস্বরে কাতরাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই রক্তরাঙা দলটির এখন সর্বাপেক্ষা বড় ভয় এই যে—ফ্রন্টের আমলে যেসকল খুন জখম, ডাকাতি লুঠতরাজ প্রভৃতি গণআন্দোলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার শতকরা ৯৯ টি ঘটনার জন্যই দায়ী সি পি এম এবং এই দলের তিনজন বিশেষ উচ্চপদস্থ নেতা। এই নেতারাই সি পি এম-বাহিনী এবং সমর্থকদের প্ররোচক এবং মন্ত্রদাতা। ইহাদের সমাজবিরোধী 'উস্কানদার' বলিতে কোন বাধা নাই।

আজ যখন পশ্চিম বঙ্গে কিছু পরিমাণে আইন ও শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পুলিস এবং অন্যান্য সরকারী বিভাগ করিতেছে, ঠিক সেই শুভ মুহূর্তেই সি পি এম—সকল প্রয়াস প্রচেষ্টাকে বানচাল করিতে উদ্যত হইয়াছে। রাজ্যপালও কি সি.পি এমের হুমকী-মিশ্রিত কাতর আবেদন-নিবেদনে গলিয়া গেলেন? কিন্তু জনগণের শত আবেদন এবং কাতর ক্রন্দনেও পুলিস যখন জনসাধারণের ত্রাণে কনিষ্ঠ অঙ্গুলীও চালনা করিতে

পারে নাই বা করে নাই, দেশের এবং দেশের সাধারণ জনের সেই পরম বিপদ তথা দুঃখের দিনে, রাজ্যপাল কি রাজ্যের প্রধান প্রশাসকের কর্ত্তব্য পালন করিতেন ? রাজ্যপাল হিসাবে তিনি অবশ্যই রাজ্যমন্ত্রীদের মানুষের নিরাপত্তা বিধানের নির্দ্দেশ দিতে পারিতেন ! কেন তিনি তাঁহার এই সমান্য কর্ত্তব্য পালন করেন নাই ? শ্রীজ্যোতি বসুর পুলিস-দপ্তরের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা কি রাজ্যপালের সাহসে কুলায় নাই ?

আজ দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিবে হইবে যে রাজ্যপাল হিসাবে শ্রীধরমবীরের বিদ্যা এবং প্রশাসনিক বিচার বুদ্ধি তথা নিরপেক্ষতা ঢের বেশী ছিল। তিনি আর যাহাই করুন বিতাড়িত গদিচ্যুত মন্ত্রীদের কিংবা মন্ত্রীবিশেষের পশ্চাৎধাবন করিয়া তাঁহার মন যোগাইবার চেষ্টা কখনই করিতেন না। প্রাক্তন 'বিচারপতি' হয়ত চুলচেরা বিচার করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিচারকের পদক্ষেপ সহজ হয় না, আইনের কাঁটাতার প্রতিপদে তাঁহার সহজ চলাকে ব্যাহত করে।

মিনি ফ্রন্ট ?—

তথাকথিত যুক্ত ফ্রন্ট বিযুক্ত ফ্রন্টে পরিণত হইবার পর এবং সি পি এম কর্ত্তার হস্ত হইতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কর্ত্তৃত্ব লুপ্ত হইবামাত্র এই রাজনৈতিক দলটি, বিশেষ করিয়া দলের কর্ত্তারা যে-ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এবং সি পি এম দলের বহির্ভূত সকলকেই এমন বিষম হুমকী দিতেছেন যাহাতে লোকের মনে এই ধারণাই হইবে যে চীনা চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ্গ যেন পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম নেতাত্রয়ের (বসু-দাসগুপ্ত-কুঁয়ার) হস্তেই রাজ্যের সর্ব্ব ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন সেই সঙ্গে রাজ্যবাসীদের ভবিষ্যত ভাগ্যও!

গত কিছুকাল হইতে সি পি এম কর্ত্তারা হুমকী দিতেছেন যে এ-রাজ্যে কোন মিনি ফ্রন্ট গঠন করিয়া নূতন মন্ত্রীসভা করিতে তাঁহারা দিবেন না। এ-কার্য্য নাকি পশ্চিম বঙ্গবাসীদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। সোজা কথায় বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমকে বাদ দিয়া কোন কিছু করা যাইবে না এবং ফ্রন্ট-শরিকদের অন্য দলগুলি মিনি ফ্রন্ট গঠন প্রয়াস চালাইলে তাহা হইবে বিশ্বাস-'ঘাতকতা'। অন্যদিকে কিন্তু সি পি এম যদি মিনি ফ্রন্ট গঠন করিতে প্রয়াস পায় তাহা হইবে রাজ্যের জনগণের প্রতি মহান কর্ত্তব্য পালন এবং বিশ্বাস রক্ষা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে প্রায় ছয় সাত মাস পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলা কংগ্রেস এবং সি পি আইকে ছাঁটিয়া দিয়া এ-রাজ্যে মিনি ফ্রন্ট গঠনের গোপন প্রয়াস-প্রচেষ্টা সি পি এম চালাইতেছিল। কিন্তু অতীব দুঃখের কথা যে নেকড়ের আশ্রয়ে মেষ শাবকের দল আসিতে রাজী হয় নাই। কারণ তাহারা জানিত যে নেকড়ে এক এক করিয়া সকল মেষ-শাবকেই সাবাড় করিবে।

নিজেদের মিনি-ফ্রন্ট গঠন প্রয়াস ব্যর্থ হইবার পর সি পি এমের নিকট একদা মিষ্ট মিনি-ফ্রন্ট নামক আঙ্গুর ফলটি হঠাৎ তিক্ত হইয়া উঠিল! ভাগ্যবিপর্য্যয় মানুষকে কি প্রকার নীতিহীন এবং সুযোগ সন্ধানী করে বাঙ্গলার সি পি এম এর (দু) নীতি ধারক এবং চীনের তল্পিবাহক দলটি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত! ক্ষমতাচ্যুত মানুষ কি প্রকার ভালমান জ্ঞানহীন হইতে পারে তাহাও আজ পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলকে (কেরল রাজ্যেও ইহাদেরই মাসতুতো ভাই পার্টি সম অবস্থায়!) দেখিলেই ভাল করিয়া বুঝা যাইবে!

বোলচাল দেখিয়া মনে হইবে দেশের একটি মাত্র রাজনৈতিক দলই মানুষের মঙ্গল কামনা করে, এবং এক মাত্র এই বিশেষ দলটি জনগণের পক্ষে কথা বলিতে এবং দাবিদাওয়া পেশ করিতে পারে, অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলগুলি "প্রতিক্রিয়াশীল," এবং ইহারা বণিকগোষ্ঠী, জোতদার, এবং অন্যান্য "ভেস্টেড্ ইণ্টারেষ্টের" দালাল মাত্র। দেশের জনগণের পক্ষ লইয়া কোন কথা বলিবার অধিকার এই সকল "প্রতিক্রিয়াশীল"দের কখনও থাকিতে পারে না এবং মাও-সে-তুঙ্গের দালালের দল তাহা কখনও ঘটিতে দিতে পারে না!

পশ্চিমবঙ্গের স্ব-নির্বাচিত এবং স্বঘোষিত ভাগ্যবিধাতা সি পি এম প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়াছে যে

এরাজ্যে তাহাদের বাদ দিয়া কোন মিনি কিংবা মেজর ফ্রন্ট গঠিত হইতে পারে না! এঘোষণার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ সি পি এম দলের তিন প্রধান যে বিধান দিবেন কিংবা ব্যবস্থা করিবেন, বাঙ্গালার জনসাধারণকে তাহাই বিনা প্রতিবাদে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই নাকি সি পি এম মার্কা গণতন্ত্র। আমাদের জানিতে ইচ্ছা হইতেছে রাজ্যের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সি পি এমের ঘোষণা এবং দাবী সম্পর্কে কি মত পোষণ করেন এবং সি পি এম-কেই তাহাদের গৃহ'কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে কি না, যদি করে, মামলা খারিজ হইল। কিন্তু যদি না করে, তবে অন্য দলগুলি তাহাদের স্বাতন্ত্র এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে?

আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী-কিন্তু—

কোন একটি রাজনৈতিক দলের মারমুখী হুমকী এবং গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের নিকট নতিস্বীকার করিতে রাজী নই। গত কিছুকাল হইতে এ-রাজ্যের বিশেষ একটি শক্তিশালী (কিন্তু সর্ব্বশক্তিধর নহে) দল নিজেদের ছাড়া অন্য সকল দলকেই প্রতিক্রিয়াশীল এবং পুঁজিপতিদের দালাল বলিয়া যত্রতত্র দলীয় মিটিং ডাকিয়া বিশুদ্ধ নিন্দাবাদ তথা কাঁচা গালাগালি করিতে লজ্জাবোধ করিতেছে না। ভাব দেখিয়া মনে হইবে যেন বাঙ্গলা দেশে রাজনৈতিক পার্টি বলিতে মাত্র একটিই এবং অন্য পার্টিগুলি মেকি এবং স্বার্থান্বেষী দেশদ্রোহীদের দল ছাড়া আর কিছুই নহে। এই 'একটি' দলের কার্য্যকলাপ মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। অবস্থা এমনই হইয়াছে যে, এই বিশেষ মার্ক্সীয় দলটির বিরুদ্ধে সংবাদপত্রেও কোন প্রকার বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করা চলিবে না, বা চলিতে দেওয়া হইবে না!

এবার মনে হইতেছে, বিশেষ কয়েকটি পত্র পত্রিকার বিরুদ্ধে দলীয় বাহিনী লেলাইয়া দেওয়া হইতে পারে এবং যাহার ফলে দেশব্যাপী, বিশেষ করিয়া কলিকাতায় একটা ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হইতে পারে। সি পি এম নেতারা এই হুমকী বারবার দিতেছেন এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে। সি পি এম নেতারা জানেন তাঁহাদের উস্কানী দিবার টেক্‌নিক্ অসাধারণ—কিন্তু নীতিবিবর্জ্জিত দলীয় বাহিনীকে সংযত করিবার কোন শক্তি তাঁহারা রাখেন না। হাঙ্গামার ফলে যেসকল অসামাজিক কাণ্ডকারখানা ঘটিবে নেতারা তাহার জন্য যথাবিহিত দায়ী করিবেন প্রতিক্রিয়াশীল দালাল এবং চরদের, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমানের নিবীর্য্য কংগ্রেসের দুইটি টুঁটো জগন্নাথ দলকে। সুযোগ বুঝিয়া এই প্রতিক্রিয়া শীল" দলের বেতনভুক দালালরাই নাকি সি পি এম দলে ঢুকিয়া পড়ে এবং নানাপ্রকার অসামাজিক কার্য করিয়া তুলসীপাতার মত পবিত্র সি পি এম দলকে অযথা নিমিত্তের ভাগী করে।

এ-রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিকে এবং ধনী-সম্প্রদায়ের দালালদের সি পি এমের বিরুদ্ধে এই প্রকার ষড়যন্ত্রের আমরা তীব্র নিন্দা করি এবং আশা করি, 'অপর'পক্ষ হিংসার আশ্রয় লইয়া পরম শান্তিবাদী এবং চরম অহিংস নীতি-বিশ্বাসী সি পি এম কে হিংসার আশ্রয় লইতে যেন বাধ্য না করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকাগুলিও যেন সাবধান থাকেন।

শ্রী জ্যোতিবসুর প্রার্থনা—

(৩-৪-৭০)

বিগত ২রা এপ্রিল শহীদমিনার ময়দানের সি পি এম জনসভায় জ্যোতিবাবু বলেন—

"আমরা কমিউনিষ্টরা বাঁচিতে চাই। কেননা আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে'চাই। (আমরা) মানুষের মুক্তির সংগ্রামে নিয়োজিত আছি। যতদিন সেইকাজ শেষ না হচ্ছে ততদিন বাঁচতে ইচ্ছে করে"।—

জ্যোতিবাবুর ইচ্ছা ভগবান অবশ্যই পূর্ণ করিবেন এবং আমরাও প্রার্থনা করি জ্যোতিবাবু যেন তাঁহার দেশের এবং মানুষের প্রতি মহান কর্ত্তব্যপালন করিবার দীর্ঘ অবকাশ এবং দীর্ঘতর জীবন লাভ করেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গবাসী অধম অ-রাজনৈতিক জনগণ জ্যোতিবাবুকে আবেদন জানাইব তিনি যেন আমাদেরও জীবনের সামান্য কর্তব্য পালন করিয়া আমাদের সীমিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার অবকাশ দান করেন। জ্যোতিবাবুর, তথা সি পি এমের চরম লক্ষ্য কি তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই, লক্ষ্যটা লিপিবদ্ধ হইয়া যদি সাধারণে প্রচারিত হয় তাহা হইলে হয়ত অ-সি পি এম জনগণও তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিবার একটা দুর্লভ চান্স পাইতে পারে।

বাঁচিতে সবাই চায়, আমরাও চাই। কিন্তু আমাদের বাঁচিবার প্রয়াসে অন্যকে 'মুক্তি' দিবার কোন বাসনা কাহারো নাই। গত কিছুকাল যাবত যাহা দেখা গিয়াছে, তাহাতে জ্যোতিবাবুর দল এবং দলীয়-বাহিনী অন্য অ-দলীয় ব্যক্তিদের বিলোপসাধন করিয়া নিজেদেরই কেবলমাত্র অমৃতের অধিকারী করিতে সর্বভাবে প্রয়াসী হইয়াছেন। আশা করি সি পি এম কর্তারা অযথা হিংসার বাণী প্রচার করিয়া, অন্যদেরও হিংস্র করিবেন না।

পশ্চিম বঙ্গের ব্রেজনেভ বলিয়াছেন— (৫-৪-৭০)

পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়ায় শুধু জোতদার, এবং প্রতিক্রিয়াশীলরাই খুশি হইয়াছেন। সাধারণ মানুষ ইহার বিরুদ্ধে। যুক্ত ফ্রন্টের আমলে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া যে প্রচার চলিয়াছে তাহা মিথ্যা। ব্রেজনেভ প্রমোদ দাশগুপ্ত বোধহয় হঠাৎ পিকিং হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া রাজ্যের সবই অতি স্বাভাবিক অবস্থায়, 'নর্ম্যাল' দেখিতে পাইতেছেন। প্রমোদবাবুর কথা সত্যি বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, এ রাজ্যের শতকরা ৯৯ জন লোককেই মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘোষণা করিতে হয়। দৃষ্টিভঙ্গির কতখানি বিকৃতি ঘটিলে মানুষ এমন নির্জ্জলা অসত্য ভাষণ করিতে পারে, এমন উন্মাদের মত উক্তি করিতে পারে, ব্রেজনেভের উক্তি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রমোদবাবু গোঁসা করিবেন না, রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হওয়াতে বাঙ্গলার শতকরা ৯৯.৯ জন মানুষই খুশী। এবং এই শাসন ১৯৭২ পর্য্যন্ত চলিলে আমরা আরও খুশী, আরও নিশ্চিন্ত হইব। পশ্চিম বঙ্গে এখন সর্বাপেক্ষা অসুখী সি পি এম এবং ইহাদের ল্যাজবোট অন্য ২।১ টি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী দল। মন্ত্রিত্বের কঠিন মায়া ত্যাগ করা শক্ত। যদি পুনরুদ্ধার করার জন্য ইহারা গদা ধরিতেও রাজী।

অচিরে আবার যদি সি পি এম নায়কের পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত "যুক্তফ্রন্ট" সরকার গদীয়ান হয়, তাহা জ্যোতিবাবুর ইপ্সিত "মানুষের মুক্তি সংগ্রামে" তিনি এবং তাঁহার দল অতি তীব্রভাবে যুক্ত হইবে, এবং বহু বহু অধম অপ্রগামী বঙ্গবাসী রাজ্যের নরকযন্ত্রণা হইতে ইচ্ছা না থাকিলেও চটপট অবশ্যই "মুক্তিলাভ" করিবে। জ্যোতিবাবুর দীর্ঘজীবন দাবী করি। যাহাতে তিনি দেশকে অমরজ্যোতি বিভাসিত করিয়া, অন্ধকারের মানুষকে স্বর্গীয় মার্ক্সালোকের অমৃত-স্বাদ দান করিতে সক্ষম হইতে পারেন॥

রবীন্দ্রনাথকে যেমন দেখেছি

গৌতম সেন

রবীন্দ্রনাথকে যখন প্রথম দেখি তখন আমার বয়স পঁচিশ। সে এক স্মরণীয় দিন। ঘটনাটাও ঘটেছিল নাটকীয়ভাবে। একটু খুলে বলি।

আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদে। ছোটবেলা থেকেই লেখার বাতিক ছিল। দেশ থেকে একটা কাগজ বের-করবার খেয়াল হলো। আমার বন্ধু দেবেন্দ্রনারায়ণ বাগের প্রেস ছিল। তার উদ্যোগ আর উৎসাহই ছিল সব চাইতে বেশি। সে নিজে সাহিত্যিক না হ'লেও, সাহিত্যানুরাগী ছিল।

স্থির হলো, প্রথম সংখ্যাটি গুণীজনের লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করা হবে। একটা লিষ্টও তৈরি করা হ'লো। যেমন: রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুরূপা দেবী, বিভূতি ভট্ট, জলধর সেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নিরুপমা দেবী।

দুইবন্ধু মিলে আমরা কলকাতায় এলাম। রবীন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। বয়সে নিতান্তই ছেলেমানুষ আমরা—কবির সঙ্গে দেখা করা কি তখন সহজ কথা? ভারতবর্ষের সম্পাদক তখন জলধর সেন। আমরা যুক্তি করে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। জানালাম আমাদের মনের কথা। তিনি সহজপথ বলে দিলেন। বললেন, মন্টুকে (দিলীপকুমার-রায়) গিয়ে ধরো। সে তোমাদের সঙ্গে করে কবির কাছে নিয়ে যাবে। মন্টুর ঠিকানাও দিলেন। শরৎবাবুর কথা বলায়, সে-পথেরও তিনি নির্দেশ দিলেন। শরৎচন্দ্র তখন থাকেন দেউলটিয়ার বাড়িতে। পানিত্রাস ষ্টেশনে নেমে যেতে হয়। কলকাতার বাড়ি তখনো হয়নি।

তখন জ্যৈষ্ঠের প্রখর রোদ। বিকেলের দিকে দিলীপ রায়ের বাড়ি গেলাম। তখন তাঁর কতই বা বয়স। আমার চাইতে বছর চারেকের হয়ত বড়। চমৎকার ফর্সা রং। গলায় একটা সরু চেন চিক চিক করছে। বড় ভাল লাগলো তাঁর কথাবার্তা। যাই হোক, বিকালের দিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এসে পৌঁছুলাম।

এ সেই ঠাকুরবাড়ি। তখন কিই বা বুঝি। শুধু জানি, রবীন্দ্রনাথ এখানে থাকেন। হায় রে অবোধ বালক!

সদর দরজা পার হয়ে প্রশস্ত অঙ্গনে এসে পড়লাম। পূর্ব দিকের দোতলা থেকে একটি মধুর কণ্ঠ ভেসে এলো: এসো এসো, মন্টু, এসো—অনেকদিন তোমার গান শুনিনি।

চেয়ে দেখি, দোতলার বারান্দায় কবি দাঁড়িয়ে আছেন। কি চওড়া বুক, হাতের মাংস-পেশী তেমনি নিটোল, গালদুটিতে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। তেমনি ধবধবে শাদা চুল আর দাড়ি। অপূর্ব এ-দৃশ্য—জীবনে ভুলবো না। কবিকে এমন ভাবে দেখবার সৌভাগ্য জানি না আর কারো হয়েছে কি না।

কবি-বর্ণনায় পরশুরাম লালিমা (পুং) এঁকেছিলেন—সেই ছবিই চোখে ছিল, কিন্তু কবিকে দেখে মনে হলো এ যেন তার প্রতিবাদ। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম।

ওপরে উঠে এলাম। কবি তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের একটি কোণে টেবিল-অর্গান। বললেন, আগে গান শোনাও, পরে কথা। পর পর চার-পাঁচখানা গান হ'লো।

কবি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর যেন চমক ভেঙে বললেন, বলো, তোমার খবর। এরা কারা?

দিলীপ রায় আমাদের পরিচয় দিলেন। বললেন, এরা মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছে। লেখার বাতিক আছে, একখানা কাগজ বের করছেন। আপনার লেখা চায়।

তিনি হেসে বললেন, আমাদের লেখা আবার কেন? আমরা তো অনেক লিখলাম। এখন তোমরা লেখো। ইত্যাদি অনেক কথা, অনেক উপদেশ। অবশেষে অমিয় বলে ডাকলেন। অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন তখন কবির প্রাইভেট সেক্রেটারি। তিনি এসে আমাদের নাম ঠিকানা লিখে নিলেন। আশ্চর্য সময়ানুবর্তিতা। ঠিক সাতদিন পরে কবির লেখা এসে পৌঁছেছিলো।

কবিকে প্রণাম করে বিদায় নিলাম। দিলীপ রায় অবশ্য তখন এলেন না। পাশেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি। সাহস করে দোতালায় উঠে গেলাম। আগাগোড়া মোগল আমলের আসবাবে ঘর সাজানো। ওপরে প্রশস্ত বারান্দায় গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, দেখলাম, অতবড় লম্বা-চওড়া বারান্দায় জনপ্রাণী নেই—এমন কেউ নেই যে জিজ্ঞাসা করি। হঠাৎ নজর পড়লো বারান্দার একটি কোনে চেয়ারে হেলান দিয়ে কে-যেন বসে আছেন। অনেকক্ষণ পরে টেবিলে-রাখা রং তুলি দিয়ে কাগজে আঁচড় দিলেন। বুঝলাম, ইনিই অবনীন্দ্রনাথ। বসে বসে আঁচড় দিচ্ছেন আবার চুপ করে চেয়ে রয়েছেন সামনের বাগানের দিকে। এ ধ্যান, সাধ্য কি এগিয়ে যাই।

দূরে—তাঁর কাছ থেকে অনেকখানি দূরে, আর একজন ব'সে আছেন আকাশের দিকে চেয়ে। দুজনেই ব'সে আছেন যেন এ-জগতের কেউ নন। বুঝলাম ইনিই গগনেন্দ্রনাথ। এই দক্ষিণের বারান্দার সামনে ছিল বাগান। বাগানের সীমানায় একসারি নারকেল গাছ। শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেদিন কত কথাই না মনে হয়েছিল।

আমরা গিয়েছিলাম অবনীন্দ্রনাথের কাছে। একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়িয়েও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলাম না। অনেকক্ষণ পরে আমাদের দেখে তিনি চমকে উঠলেন। কিন্তু চমকেই উঠলেন, কিছু বললেন না। আমরাই কথা পাড়লাম। লেখার কথা শুনে বললেন, সাতদিন পরে এসো। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো, এই যে আমাদের আসা এবং যাওয়া, এর মধ্যে ঘরের আর একটি কোনের মানুষের কোন লক্ষ্যের মধ্যেই এলো না! তিনি সামনের বাগানের দিকে ঠিক তেমনিভাবে চেয়ে আছেন! অপূর্ব এই দুই ধ্যানী শিল্পীকে দেখে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলাম।

সাতদিন পরে আবার গেলাম। বললাম, আমাদের কথা দিয়েছিলেন তাই এসেছি। শুনে 'হা হা হা হা হা' করে এমন জোরে হেসে উঠলেন যে আমরা চমকে উঠলাম। বললেন, সম্পাদকের কাছে আবার প্রতিশ্রুতি! ওতে পাপ নেই।

পরে লেখা অবশ্য আদায় করেছিলাম। লেখাটি বড় ভাল হয়েছিল। তিনি যা লিখেছিলেন তার মর্মকথা এই—আমরা লিখি কাগজের উপর কালি দিয়ে। সে লেখা একদিন মুছে যায়, কিন্তু বিধাতাপুরুষ যা লেখেন আমাদের কপালে তা কোনদিন মোছে না।

কাগজ বেরুলে তাঁর হাতে দিতে গেলাম। এ-লেখার কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। বললেন, আমি লিখেছি? দেখি. দেখি। প'ড়ে আনন্দে যেন নেচে উঠলেন, বললেন, বাঃ চমৎকার হয়েছে—যাই রবিকাকাকে দেখিয়ে আসি। বলেই ছুটলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। আমরা হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম! জীবনে অনেক মানুষ দেখেছি, কিন্তু এমন আত্মভোলা লোক আর দেখিনি।

যন্ত্রণা

(গল্প)

শ্যামসুন্দর দাশ

কবিরাজ বিজয়কৃষ্ণ শাস্ত্রী মশায় তখন গীতার একাদশ অধ্যায়ে মনোনিবেশ করেছেন। রেড়ীর তেলের প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো আর ধূপের গন্ধে প্রতি সন্ধ্যার মত আজও বিজয় আয়ুর্বেদভবন মন্দিরের পবিত্র শুচিতায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। প্রতি সন্ধ্যার মত সেদিনও শাস্ত্রী মশায় গীতার রস আস্বাদনে তন্ময়।

এমনি সময় একটি যুবক এসে একটা চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে বললে…"নমস্কার কবরেজ মশায়, একটু বসছি ;…অসুবিধা করলাম নাতো…"

বাই ফোকাল কাচের উপরের টুকরো দিয়ে শাস্ত্রী-মশায় চেয়ে দেখলেন যুবককে :…

বললেন—"না না অসুবিধা কি ; রোগীর সেবার জন্যেই তো বসে আছি, বসুন।

একটু মনোযোগ দিয়ে যুবকটিকে দেখলেন শাস্ত্রীমশায়, কেমন যেন ক্লিষ্ট, উদ্‌ভ্রান্ত, সবে কৈশোর উত্তীর্ণ, আপনি বলতে বাধছে, তাই আবার বললেন—"তা বাবা, তোমার চেহারা এমন শুকনো কেন? তোমাকে তুমি বললাম কিছু মনে করলে নাতো?

শাস্ত্রীমশায়ের তুমি বলাতে একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে যুবক বললে, বলেই যখন ফেলেছেন, তখন চালিয়ে যান স্যার, কি আর করা যাবে, বলছিলেন শুকনো চেহারা কেন—জীবনটাই তো রসহীন, ছিবড়ে হয়ে গেছে স্যার।

শাস্ত্রীমশায় বললেন, না, না রসহীন হয়ে যাবে কেন, অবশ্য শাস্ত্রে বলেছে দেহ অধিক রসাশ্রিত না হওয়াই ভাল।

শাস্ত্রে যাই বলুক ওসব এখন তুলি রাখুন স্যার।

তুলি রাখবো, শাস্ত্রীমশায় সচকিত হয়ে ওঠেন, বলেন—কি বললে বাবা ঠিক বুঝতে পারলামনা তো।

ওসব বুঝবেন না স্যার, যুবকের সপ্রতিভ উত্তর।

শাস্ত্রীমশায় কিছুক্ষণ চিন্তিত হয়ে যুবকটির দিকে চেয়ে তার মস্তিষ্ক কুপিত বায়ুপ্রভাবে কতটা বিকৃত তাই ভাবতে চেষ্টা করেন। এবং যুবকের কি কষ্ট জানতে চান।

যুবক বলে—হাসালেন স্যার, কষ্টের কি আর শেষ আছে, এত কষ্ট পেয়েছি যে কষ্টতে আর কষ্ট হয়না স্যার, অভ্যাস হয়ে গেছে, নকল বেবী ফুড দিয়ে জীবন সুরু করে, এখন পর্যন্ত কাঁকর বেছে খেয়ে দিব্যি বেঁচে আছি, নকল জিনিষ, বিষাক্ত হাওয়া, বিষ খাওয়া ওসব বডিতে ইমিউন হয়ে গেছে স্যার, কিছু ক্ষতি করেনা, বুঝলেন স্যার বেঁচে তবু আছি, বেঁচে থাকবও। ওসব কষ্টো-ফষ্টো স্যার আমাদের আসে না।…তবে কি জানেন স্যার, একটা জ্বালায় সর্বদা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি,—ঐ জ্বালা হতে মুক্তির কি কোন উপায় আছে স্যার?

শাস্ত্রীমশায় প্রশ্ন করেন কি বললে জ্বালা অর্থাৎ প্রদাহ, তা এটা দেহের কোথায় অনুভব কর বলতে পারো?

বলছি স্যার, এই একটা মাত্র জায়গা এই বুকের ভেতরটা কেমন যেন স্যার সারাক্ষণ হু-হু করে জ্বলে যাচ্ছে। যুবক ব্যাকুল হয়ে বুকে হাত দিয়ে দেখায়।

বুক অর্থাৎ হৃদয়? কবিরাজ মশায় এই অদ্ভুত রোগীর দিকে মনযোগ দেন, প্রশ্ন করেন 'আচ্ছা জ্বালার কারণটা কি তোমার মনে হয়, বলতে পারো কি?

তা স্যার পারি—যুবকটি যন্ত্রণামলিন হতাশ স্বরে বলে—কি জানেন স্যার, এ জ্বালা আমার একার নয়, জগৎ জুড়ে সবারই বুকে এ জ্বালা সুরু হয়ে গেছে,

এ জ্বালায় আমি জলছি, আমার বাপ, মা, ভাই বোন, রাম, শ্যাম সবাই জলছ। এ-জ্বালার আধুনিক নাম, যুগ-যন্ত্রণা বুঝলেন স্যার, দেখছেন না সারা দুনিয়ার আবহাওয়া, রেডিও এ্যাকটিভিটিতে বিষিয়ে গেছে, আমার মনে হয়, ঐ সর্বনাশা বিষে মানুষের মনে আজ এই জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।

বিশ্লেষণ বড়ই দুরূহ মনে হলো শাস্ত্রী মশায়ের কাছে। তাই প্রশ্ন করলেন, কি বললে বুঝলাম নাতো?

বুঝলেন না,—শাস্ত্রী মশায়ের অজ্ঞতায় যুবকের মনে করুণা জাগে। বলে—'রেডিও এ্যাকটিভিটি অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় বাতাসে জগৎ ছেয়ে যাচ্ছে, তারই তেজে আমাদের অনুভব, প্রবৃত্তি, দেহের গঠন, মায়া ভালবাসা সব পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। অচেনা ভয়াল জন্তুর এক নতুন অজানা হিংস্র ভয়ঙ্কর চেতনা নিয়ে আমরা জেগে উঠছি, ঐ বিষ আমাদের কোষে কোষে তরল সীসা ঢেলে দিচ্ছে যেন। তার উপর আছে জন্তুর মত ছুটো পেটে খাওয়ার জন্যে বিরামহীন যুদ্ধের ক্লান্তি আর গ্লানি।

কিন্তু স্যার, আমি বিস্মিত হচ্ছি; এই ভেবে যে যখন সারা পৃথিবী এই জ্বালায় জলছে তখন আপনি ঐ রেড়ীর তেলের স্নিগ্ধ আলোয় নিরুদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন কোন্ যাদুমন্ত্রে। আপনার এই জীবন কেন এত নিরুদ্বেগ, সৌম্য রূপ এত প্রশান্ত জানতে ইচ্ছে করে কি সেই বস্তু দিয়ে আপনার ঘরটিকে ঘিরে রেখেছেন, যার জন্যে এই ঘরের ধুপের গন্ধেভরা বাতাস এখনও তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠেনি?

শাস্ত্রীমশায় উত্তেজিত যুবকের কথায় কোন বাধা না দিয়ে চুপ করে শুনে যাচ্ছেন;

স্যার, এই যন্ত্রণার মূল কোথায় তা আমি যেমন ভেবেছি তেমনি আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি—আমাকে দিয়েই শুরু করছি, বি, এ টা পাশ করতে গিয়ে স্যার অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে—চেয়ার টেবিল ভেঙে তছনছ করে তবেই পাশ করেছি।

শাস্ত্রীমশায় অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন—চেয়ার টেবিল তাঙার প্রয়োজন কেন হয়েছিল?

সেও স্যার ঐ যন্ত্রণারই বহিঃপ্রকাশ. তা পরে বুঝবেন, এখন শুনুন। তারপর চার বছর ধরে বহু সরকারী বেসরকারী বড় বড় দালান ফেরৎ হয়ে সর্দিতে ভুগেছি। সর্দি, অর্থাৎ শ্লেষ্মায়, কেন?—বড় বড় দালান ফেরৎ জনিত শ্লেষ্মার কোনও শাস্ত্রীয় সম্বন্ধ ভেবে না পেয়ে কবিরাজমশায় প্রশ্ন করে বসেন।

সর্দি হবে না. বলেন কি স্যার। বাস করি বাইশের ছুই কেনারাম পালিত লেনের জানালাহীন গুদোমে, একত্রিশ টাকার ভাড়াটে হয়ে, ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে অন্তত মাসে দুবার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে ফিরি—সর্দির আর দোষ কি বলুন?

শ্লেষ্মার এমন চমকপ্রদ কারণ যা কোনও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নি, তা যুবকের কাছে জানতে পেরে শাস্ত্রী ম'শায় পুলকিত হয়ে ওঠেন। বলেন, তারপর?

তারপর স্যার, যথারীতি চারবছর ধরে পালিশ করে করে সিমেন্ট ক্ষয় করে ফেললাম, এখন পুরো মস্তান বনে গেছি।

মস্তান, এই ম্লেচ্ছ অসংস্কৃত শব্দটী শাস্ত্রীমশায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত মনে হলো না এবং অর্থ কিছু বুঝতে না পেরে বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন 'শব্দটীর অর্থটা ঠিক বুঝলাম নাতো?'

"বুঝলেন না স্যার! এই শব্দটীর অর্থ, একটী যন্ত্রণা অর্থাৎ একটী মস্তান সমান একটী যন্ত্রণার প্রতীক, একটী অভিশাপ, একটি সমস্যা। এবার বুঝলেন?

কৈ নাতো।

শাস্ত্রী মশায়ের অজ্ঞতায় বড়ই অবাক হয়ে যুবক বলে—"আচ্ছা আরও একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি—ধরুন, সকালে উঠে দেখলেন সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত, তখন আপনার করার মত কোনও কাজ নেই তাই তুলে আপনার বরাদ্দ দুটো শুকনো রুটি, পাতলা খয়েরী ইনফিউশান ভিজিয়ে চিবোতে চিবোতে দেখলেন আপনার বাবার ক্ষয়ে যাওয়া শরীরটা, ভাগোর বোনটার দেহ ছেঁড়া-শাড়ীতে ঢাকছে না, মার শিরা বের হওয়া হাত দুটীর হলুদমাখা নোখগুলি ক্ষেটে

কেটে গেছে, শীর্ণ গাল ফুলিয়ে ভিজে ঘুঁটেতে ফুঁ দিয়ে অফিসের ভাত রান্নার উনুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্যাকাসে সাদা চোখের জল ঝরানো সব দেখলেন, মন আপনার খিঁচড়ে গেল। উদয়াস্ত খেটে খেটে আপনার বাবার তখনো হাড় কখানা কঙ্কাল হয়ে যেতে বসেছে—অথচ আপনি বি এ পাশ করা শক্ত সমর্থ যুবক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই দুঃখজর্জর পরিবারের এত কষ্টের এতটুকু লাঘব করার কোন পথ না পেয়ে নিরুপায় হয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন কাজ না থাকার যন্ত্রণা হতে মুক্তির আশায়। একটা যাহোক কিছু করে বিধিয়ে যাওয়া মনটাকে মাতাল করার নেশায়। বাবার ক্ষয়ে যাওয়া শরীরটা আরও ক্ষয়িয়ে দিয়ে সংগ্রহ করা ডাল-ভাত দুটো খাওয়ার জন্যে চোরের মত নিঃশব্দে বাড়ি এসে আবার যখন চোরের মত বেরিয়ে যান, তখন এই বুকটার জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাওয়া একটা জ্বালা সুরু হয়ে যায় নাকি? এই যন্ত্রণার যুগে যারা জন্মেছে, এই যন্ত্রণা বুকে নিয়ে যাদের দিন কাটছে, তারা কেমন করে শান্ত, সৌম্য, আদর্শবান হয়ে উঠবে বলতে পারেন স্যার? এই যন্ত্রণার ফসল আমরা, ছন্নছাড়ার দল আমাদেরই সবাই মস্তান বলে।

শাস্ত্রী মশায়…এই করুণ বর্ণনায় একটু বিচলিত হয়ে বললেন—আয়ুর্বেদে এই যন্ত্রণা উপশমের কোন ভেষজ আছে বলে আমার মনে হয় না তবে ঈশ্বরের কাছে তোমাদের শান্তির জন্যে প্রার্থনা করবো।

কি বললেন স্যার, ঈশ্বর? ওসব তো নস্যি হয়ে যেতে বসেছে. ডারউইনের থিওরির পর মানুষকে ঈশ্বরের সন্তান আদম ইভের বংশধর বলে মানতে কি আর ইচ্ছা হয়?

যুবকের কথায় শাস্ত্রীমশায়ের আজন্ম বিশ্বাসে বড় আঘাত লাগল—একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন —ওসব আলোচনা থাক বাবা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বাদ সম্বন্ধে আলোচনার অধিকার তোমার আরও পরে আসবে তুমি এখনও শিশু। যাই হোক তুমি তোমার সেই প্রবাহের কথা বলছিলে তাই বল।

তা বলছি স্যার, মনে হচ্ছে আমার কথাটা আপনি ঠিক মানতে পারলেন না. এক'দিন নিশ্চয়ই মেনে নেবেন। হ্যাঁ যা বলছিলাম। আচ্ছা বলার আগে একটা কথা বলছি স্যার. মনে কিছু করবেন না, ঠিক বলুন তো স্যার, মনে মনে আপনি ভাবছেন কি না যে আমি খুব লেকচার দিচ্ছি?

না না তা ভাববো কেন, বলে যাও শুনছি।

হ্যাঁ ভাববেন না স্যার যে জ্ঞান দিচ্ছি। ঠিক ঠিক যার জন্যে মস্তান হয়েছি আমরা, তাই কেবল বলছি, আপনি যদি বক্তৃতা ভাবেন তবে আমি নিরুপায়।

আমাদের নিয়ে নাকি সমাজ বড়ই সমস্যায় পড়েছে। আচ্ছা স্যার, সমস্যা যখন তখন সমাধানও নিশ্চয়ই আছে আর সমাধান খুঁজতে হলে সমস্যা কোথায় তাও বের করতে হবে। আমাদের নিয়ে যে একটা মূল সমস্যা তার সম্বন্ধে আমি যা ভেবেছি—তাই বলছি। দেখবেন স্যার,আমার নির্লজ্জ ভাববেন না। আমি স্রেফ নিজেকে ডিসেকশান করে তুলে ধরছি—আপনার সামনে। আর ডিসেকশান যখন তখন রক্তের বীভৎসতার ভয় আর নগ্নতার লজ্জা পেলে তো চলবে না …বা জতে পাড়াতে পথে সকলের বিরক্তির কারণ হয়ে বুকভরা জ্বালা নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও শান্তি পাচ্ছি না, কিছুতে আনন্দ পাচ্ছি না, মুখে যখন শিস দিচ্ছি, মনে তখন বোনটার ছেঁড়া-কাপড়ের কথা, বাবার দুমড়ানো দেহটার কথা! একখানা থান ইট যখন ঝাড়ছি একটা প্রাইভেট কারের বাম্পার টিপ করে, আর সবাই দাঁত বের করে হাসছে, আমার তখন মনে পড়ছে আমার মার শুকনো গাল ফুলিয়ে উনুনে ফুঁ দেওয়ার কথা।

কি করি বলুনতো স্যার, তার উপর এত যন্ত্রণাতেও দেহটার মধ্যে হরমোনগুলো ঠিক ঠিক কাজ চালিয়ে গিয়ে আমাদের যৌবনে নিয়ে হাজির করেছে, এ আবার আর এক জ্বালা। প্রাকৃতিক কারণেই ঐ মেয়েদের উপর কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব না করে পারিনা। বেটা সবাই স্যার বড়ই নিন্দার ব্যাপার বলে।…অথচ

কত চিন্তাবিদ, দার্শনিক ব্যক্তিরা সাধুভাষার নামাবলি চাপিয়ে, ঠিক আমাদের মনের কথাটাই বলেছেন, কেমন করে শুনবেন? বলেছেন—"নারী শুধু গৃহমধ্যে অংশত নিষ্ক্রিয় জায়া ও জননীরূপেই বিরাজ করেনা, গৃহের বাহিরে পুরুষকে মহত্তর সৃষ্টির উন্মাদনায় মাতাইয়া তুলিতে হ্লাদিনী শক্তির আধারাভূতা হইয়া দেখা দেয়। নারীর এই দুইরূপকে সেক্সপীয়ার, গোপেন হাউয়ের রুশচুকো হইতে রবীন্দ্রনাথ অবধি বরেণ্য মনীষীবৃন্দ স্বীকার করেছেন, ...

শাস্ত্রীমশায় তখন বললেন – তা করুন, তবু তোমার বুকভরা যুগ-যন্ত্রণা নিয়ে নারীর প্রতি এই আকর্ষণটা কি উচিত হচ্ছে বাবা, বিশেষ করে বাবার ক্ষয়ে যাওয়া দেহ, আর তোমার পরিবারের যে করুণ বর্ণনা তুমি করলে, এর পরেও তোমার মনে আকর্ষণ জাগে? এখন সব কিছু ছেড়ে তোমার চরিত্র গঠন করা উচিত, সব ভুলে এমন আদর্শ গ্রহণ করা উচিত, যা তোমার আত্মবিকাশের পথে সাহায্য করবে।"...শাস্ত্রীমশায় যুবকটির অস্থির মনের গতিপথ ভিন্নমুখী করার চেষ্টায় কিছু উপদেশ দিলেন।

যুবক বললে, শুনুন স্যার, জ্ঞান পরে দেবেন। ঐ আত্মবিকাশ সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন সে কথাও মনীষীরা বলেছেন "আত্মস্থিতি ও আত্মবিকাশের পথে নর ও নারী পরস্পরের সহায়ক, ধর্ম, কর্ম ও জ্ঞানসাধনায় যে রূপেই হোক একের প্রয়োজন অপরকে, সেইজন্তেই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও পরস্পরের মিলনের উন্মাদনা জড় জগতের মহাকর্ষ নীতির মতোই স্বাভাবিক ও সহজ। এই উন্মাদনার নামই প্রেম। এখন বুঝলেন তো স্যার, এই আকর্ষণের শিকার আমাদের হতেই হয়েছে এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মেই এবং এই আকর্ষণ যখন মাধ্যাকর্ষণের মতোই অমোঘ তখন সেতো বিচার করে দেখে না যে আমার বাবার দেওয়া দুখানা রুটি ছাড়া আর একজনের জন্তে আর দুখানার বন্দোবস্ত করার সাধ্য আমার নেই। এবং যেহেতু দেশটা আদিম গুহার মত নয় সভ্য ঝকমকে, সেই হেতু আকর্ষণ যতই তীব্র হোকনা অস্বাভাবিক বিরুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আপাতত আকর্ষণটাকে বিকর্ষণে রূপান্তরিত করতে বাধ্য হচ্ছি এবং তারই ফলস্বরূপ বুকে দাউ দাউ করা জ্বালার সঙ্গে এক অসহনীয় যন্ত্রণা জন্ম নিচ্ছে। তাই বলছিলাম স্যার, আমরা জ্বলছি শুধুই জ্বলছি।

যুবকের অদ্ভুত বিশ্লেষণের সবটাই তখন অর্থহীন মনে হচ্ছিলনা শাস্ত্রীমহাশয়ের। তাইতো এ যুগে যন্ত্রণার সংজ্ঞাতো সম্পূর্ণ আলাদা। আয়ুর্বেদ প্রণেতা ঋষিদের যুগে এ জ্বালা ছিল না তাই শাস্ত্রে এ প্রদাহের উপশম বর্ণিত হয়নি। মনে এক অস্বস্তিকর বেদনা ও অদম্য কৌতূহল নিয়ে যুবককে একটা প্রশ্ন করেন শাস্ত্রীমশায়। তোমার দুর্বল দেহ, প্রায় অনাহারে ক্ষীণ, অশান্তি ক্ষোভ হতাশায় যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, তবু আশ্চর্য্য হচ্ছি, তুমি দেহধারণের জন্তে আহারের স্থূল চিন্তা না করে সূক্ষ্মভাবে সমাজের একটা বিরাট সমস্যার কথা চিন্তা করার শক্তিটুকু এখনও বাঁচিয়ে রেখেছো মনে। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, তোমরা সমাজের চোখে ঘৃণ্য হয়েও অভিমানভরে সমাজকে ত্যাগ না করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সমস্যার মূল অন্বেষণ করে চলেছো, তোমাদের ভাবনা আমাদের যুগ হতে অনেক উন্নত বলেই মনে হচ্ছে।

যুবক এতক্ষণে একটু সহজ হবার চেষ্টা করে বলে, স্যার এ-যুগটা এমনি অস্থির চঞ্চল যে আজকের ভাবনা চিন্তা কাব্য সাহিত্য সবকিছুর মধ্যেই এই চঞ্চলতার আভাস পাবেন। আজকের চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, চিত্রকর সকলেরই প্রকাশভঙ্গি একই সুরে গুমরে উঠছে তাদের ভাষার রেখার ঐ যন্ত্রণার প্রকাশ। মনোরম কিছু রচনার চেয়ে তাদের তুলি কলম এক অব্যক্ত যন্ত্রণার সৃষ্টিতেই তন্ময়। যুবক কথা শেষ করে কিছু চিন্তা করলে, তারপর বললে, স্যার আমার কয়েকজন যন্ত্রণাকাতর শিল্পী-বন্ধু এখন ছবি এঁকে চলেছে। সেসব ছবি যদি একবার দেখতেন, বুঝতেন কি টেরিফিক্ যন্ত্রণার প্রকাশ হয়েছে সেসব ছবিতে। শাস্ত্রীমশায় বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করেন, ছবিতে যন্ত্রণার প্রকাশ সে আবার কি?

—বলেন কি স্যার, মডার্ণ আর্ট কি জানেন না? আমি

ঠিক এ ব্যাপারটা আপনাকে বুঝাতে পারবোনা। কারণ ছবিতে যন্ত্রণার প্রকাশ আমি করিনা, আমি মাঝে মাঝে কবিতায় এ জ্বালা ব্যক্ত করার চেষ্টা করি। যাইহোক আধুনিক আর্টের যন্ত্রণার কিছু আপনাকে বুঝাতে পারি কিনা চেষ্টা করছি……

যুবক আবেগবিহ্বল হয়ে শাস্ত্রী মশায়কে বুঝাবার চেষ্টা করে বললে,—

কল্পনা করুন স্যার, একটি ধু ধু মাঠ, শুকনো একটা বাবলা গাছের একটি মাত্র ডালে একটিও পাতা নাই, ফুল নেই আছে শুধু ধূসর রংএর কয়েকটি তীক্ষ্ণ কাঁটা। একটা রোগা শকুন পালকহীন গলা নিচু করে কি যেন দেখছে, দূরে কালি মাখা ভাঙা একটা হাঁড়ি - কেমন বুঝলেন স্যার, বলুন তো?

অসহায় শাস্ত্রীমশায় এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, কিছু বুঝলাম নাতো?

বুঝলেন না, এত যন্ত্রণার এতটুকুও বুঝতে পারলেন না…হোপলেস। যুবক হতাশ হয়ে বলে…আচ্ছা থাক ছবির ব্যাপার বুঝান একটু শক্ত কারণ জিনিষটা আমিও ঠিক বুঝিনা।…আচ্ছা আমার রচনা একটা শুনুন এবার, এতে আমাদের জীবন যন্ত্রণার কিছু আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন।…

"পথে যেতে যেতে খেজুর গাছটায় আমি
খোঁচা মেরে দেখেছি, রস ঝরেনি
ঝরেছে রক্ত।
বুঝেছি চলার পথ অমসৃণ কণ্টক
কবিতা যেন খাপছাড়া অসমাপ্ত॥"

বুঝলেন স্যার, কি বোঝেন কি তো? আমিও বুঝিনি, কিন্তু এটা বুঝেছি যে এই ছন্দহীন, খ্যাপা উদ্গীরণ আমারই বুক হতে হয়েছে, আমার বুক সর্ব্বদা যখন জ্বলছে পুড়ছে তখন এ কবিতা তো স্নিগ্ধ প্রস্রবণ হবে না, এ ফুটন্ত লাভা! এটা বুঝেছি শিশুর জন্ম হয় মায়ের অসহ্য প্রসব যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে। কারণ মা একটি জীবন সৃষ্টি করেন। আমাদের বিশ্বাস আমরাও একটা কিছু নতুন সৃষ্টি করতে চলেছি, তাই আমাদেরও এত যন্ত্রণা বা উল্টো করে বলতে পারেন, এত যন্ত্রণা তাই কিছু নতুন সৃষ্টি করছি আমরা। শাস্ত্রী-মশায় যুবকের দিকে চেয়ে এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন, বললেন—কথাটা বেশ বলেছো বাবা, কিন্তু ঐ কি যে সৃষ্টি করতে চলেছো সেটাই ঠিক বুঝতে পারলাম না, যুবক অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলো ‥

"আজ্ঞে, সেটা ঠিক আপনাকে বুঝতে পারবোনা কারণ এ জীবনটাকে আমরাও ঠিক বুঝতে পারি না। তবে গতানুগতিক যতকিছু নিয়ম, সে নিয়মের ক্লান্তি আর গ্লানিতে আমরা জর্জ্জর; ঐসব পুরনো অচলায়তনকে আমরা ভেঙে চুরমার করে দিতে চাই—কবিতায় আমরা ছন্দ রাখবো না, গল্পে আমরা অর্থ রাখবোনা। চিরদিনের ছক বাঁধা জীবন আমরা মানবোনা.…উদ্ভ্রান্ত যুবক ছুটে বেরিয়ে গেল।

শাস্ত্রী মশায়ের মনে হলো, এতদিনের শান্ত স্নিগ্ধ নিজন আয়ুর্ব্বেদ ভবনের বাতাস তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠেছে, চির শান্ত বুকের ভেতরটায় কেমন যেন একটা অশান্ত যন্ত্রণা।

দমকা বাতাসে উড়ে উড়ে গীতার পাতা এলোমেলো হয়ে গেছে, একাদশ অধ্যায়টা আর খুঁজে পেলেন না।

পারাপার

(গল্প)

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খালেদ মিঞা ছইয়ের নীচে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসে হুঁকো টানছিলো, রাত তখন মাত্র প্রহর হবে, কৃষ্ণপক্ষের রাত। ইছামতীর পাড়ে নৌকোটা মৃদু মৃদু দুলছিলো, পাশেই হানিফশেখের নৌকোখানা বাঁধা, আশেপাশে আরও নৌকো বাঁধা রয়েছে, হানিফের নৌকোর ছইয়ের ভেতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছিল। আজকের মত এখানেই রাতটা কাটাবে ওরা তারপর কাল আবার অন্য কোনখানে যাবে। খালেদ মিঞা হুঁকোর কলকেটা মুখের কাছে এনে দেখল কালো টিকেগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। মিঞা মনে মনে বলল, "এ হালার টিকেগুলোও যেন কেমনতরো। একটু হাসি সময়ের মধ্যেই পুইড়্যা ছাই হইয়া যায়। হুঁকোটা একপাশে হেলান দিয়ে রেখে মিঞা বলে উঠল, "হানিফশেখ ঘুমাইছ নাকি? ছিদলগঞ্জ কবে যাইবা, যাইবার কালে আমারে অবশ্যই কইও কিন্তু। আমিও যামু" হানিফশেখ শুয়েছিল বা পাশে ফিরতে ফিরতে বলে উঠল "আমার মনে আছে মিঞা', তুমি যে এখনও শোও নাই, জাইগ্যা জাইগ্যা স্বপ্ন দেখবা নাকি, মিঞা একটু চেঁচিয়ে বলে উঠল "এহনই ক্যান হইছড্যা আমি দিনরাইত হবসময়ই দেখি......পুরা কথা শেষ হলনা মিঞার। কোন মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেলো যেন মিঞা, তাই ছইয়ের ভেতর থেকে পাড়ের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল মিঞা। আবার মিঞা শুনতে পেল সেই ডাক। কোন মেয়েমানুষ যেন ডাকছে, "মাঝি' 'মাঝি," ছইয়ের এককোণে রাখা নিবু-নিবু হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দিল মিঞা' তারপর হ্যারিকেন নিয়ে ছইয়ের বাইরে এসে পাটাতনের উপর দাঁড়াল।

বোধহয় মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ হানিফশেখও শুনতে পেয়েছিলো, সেজন্য সেও একটা লুঙ্গি হা[...] পাটাতনের উপর এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আবার মে[...] মানুষটি যেন ডাক দিলো 'মাঝি--ই' মিঞা মনে ম[...] বলল, গলার আওয়াজটা চেনা চেনা মনে হয়। তার[...] মিঞা হ্যারিকেন নিয়ে ডাঙায় নামল। হ্যারিকে[...] আলোয় যেটুকু দেখা গেল তাতে মিঞার মনে হ[...] যে সে মেয়ে মানুষটিকে বোধহয় চেনে। হানিফশে[...] আস্তে আস্তে নৌকো থেকে নেমে খালেদ মিঞার পা[...] এসে দাঁড়াল। এবার মেয়েমানুষটিকে চিনল মিঞা[...] মেয়েমানুষটি আর কেউ নয় অচিন্ত'র চৌধুরী বাড়[...] ছোটবউ সোনামতি। মিঞার তাকে না চিনবার ক[...] নয়, তবুও যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে[...] মিঞা', তাই সন্দেহনিরসনের জন্য হাতের হ্যারিকে[...] বুক সমান উঁচুতে তুলে ধরে, আবার ভাল করে মে[...] মানুষটির আপাদমস্তক দেখে। নাঃ আর কোন স[...] নেই যে উনিই সোনামতি। অবাক হয়ে মিঞা ব[...] উঠল 'মা ঠাকেন আপনে,'।

সোনামতি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল একটা ব্যথা তার সারা মুখ দিয়ে প্রকাশ হ[...] চাইছে, সোনামতি বলল—"হ্যাঁ, আমাকে পার কে[...] দিতে হবে মিঞা"। মিঞা তার কথা শুনে [...] বোবা হয়ে গেল, তারপর পাশেই দাঁড়ান হানি[...] দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, হানিফের চোখদুটো, সাম[...] দাঁড়ান মেয়েমানুষটির উপর নিবদ্ধ ছিল। হানিফ[...] অবাক হয়ে দেখছিলো, কোঁকড়ানো কালো চু[...] গোছা এতই কালো যেন অন্ধকারের সাথে মিশে যে[...] চায়। হরিণের চোখের মত একজোড়া টানা ট[...] চোখ, কিন্তু সে চোখে ঝিলিক নেই, আছে বেদ[...]

আতাপ। সিঁথির সিঁদুরের দাগটাকে যেন মুছে ফেলা হয়েছে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটাও নেই।

খালেদ মিঞা একবার সোনামতি একবার হানিফের দিকে দেখছিলো, সোনামতি আবার বললে "কি মিঞা এত কি ভাবছ" মিঞার চোখের পাতা পড়ছিলো না, শুধু চোখের মণিটা চারদিক ঘুরছিলো। হঠাৎ মিঞার কথা ফুটল—বলল এত রাহিতে হঠাৎ আপনে একা একা পাড়ে আইলেন। আবার আইসা কইথাছেন আমারে ঐ পারে নিয়া চল। আমার মাথায় যে কিছুই ঢোকতাছে না মাঠাইরেন। আর পারে আমি আপনেরে নিয়া গেলে আবার কি হইব কে জানে। ঐ পারে গিয়া কোথায় যাইবেন? ঐ পাড়ে তো আরও জঙ্গল। সাপে কোপে ভরা। এই ঘুটঘুইটা অন্ধকারের মইধ্যে আমি আপনেরে ঐ পাড়ে একলা ছাড়তে পারবনা মা ঠাইরেন। শত হইলেও আমরা আপনাদের প্রজার মতন। নুন যখন খাইছি, তখন বেইমানি কইরলে আল্লায় ছাইড়বোনা। আপনেরে বরং.........সোনামতি কথা কেড়ে নিয়ে বলল আমাকে বরং ফিরিয়ে দিয়াসবে তাইনা "আমি আজ ওপারে যাবই" আমার আর দেরি করা চলবে না। ঠিক আছে দেখি অন্য কোন মাঝি রাজী হয় কিনা। এই অবস্থায় মিঞা নিতান্তই অসহায় বোধ করতে লাগল। সে তার কর্তব্য খুঁজে পেল না। সোনামতি ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় মিঞা একটু জোরেই বলল "আমি না হয় আপনেরে সাথে কইরা বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়াসি......। খালেদ মিঞার কথা শেষ হলনা, সোনামতি নদীর পাড় দিয়ে দ্রুতপায়ে দক্ষিণমুখী চলল, আর একবারও পিছন ফিরে দেখলোনা। হানিফ শেখ একটু এগিয়ে এসে বলল "কাজটা বড় ভাল হইল না মিঞা, চল আমরা না হয় পিছুপিছন যাই। এই এত রাইতে এতহানি অন্ধকারে কিছু হইলে তখন আমাদের কেমন লাইগব, তাছাড়া কর্তা যদি জাইনতে পারে যে আমাদের সামনেই কিছু হইছে তাইলে আবার কি হয় কে জানে! খালেদ মিঞা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক সেসময় হঠাৎ একঝলক আলো এসে ওদের মুখে পড়ল। দুজনেই সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দশবারজন লোক এসে ঘাটে উপস্থিত হল। সামনের জনকে ভদ্রলোক বলেই মনে হল। হাতে একটা বিরাট টর্চলাইট। লোকগুলোর মধ্য থেকে ভদ্র বেশী লোকটিই এগিয়ে এল, বলল "মাঝি" আরে খালেদ মিঞা না, খালিদ মিয়া উত্তর দিল "আইজ্ঞে হ্যা"। খালিদ মিঞা এতক্ষণে ভদ্রবেশী লোকটিকে চিনল। যে মেয়েমানুষটি এই কিছুক্ষণ আগে এইস্থান ত্যাগ করেছে উনি তারই বড় ভাসুর, তার নাম সতীশচন্দ্র বড় ভালমানুষ উনি। আশে-পাশের দশ-বিশটা গ্রামের সকলেই একডাকে চেনে ওনাকে। এগিয়ে এসে সতীশচন্দ্র জিজ্ঞেস করল, এখান দিয়ে কি তোমরা কোন মেয়েমানুষকে যেতে দেখেছো? খালিদ মিঞা অত্যন্ত উদাস এবং ব্যথিত স্বরে বলল, তা আর কন ক্যান কর্তা, এইতো ছোট মাঠাইন এই হানে আইয়া আবার দক্ষিণ দিকে চইলা গেলেন। এত রাইতে তারে ঐ পাড়ে নিয়া যাইতে কইলেন আমার কর্তা সাহস হইল না। তাছাড়া একটা কিছু কারণই হব হঠাৎ আইসা কইলেই তো আমি আর তেনারে ওই পাড়ে লইতে পারি না। সকল সময় আপনারাই তো আগে থিকা কইয়াছেন তারপর আমরা কোথাও লইয়া যাই। মাথা নেড়ে হানিফশেখও এই যুক্তির সমর্থন করল। সতীশচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে বলল শিগগির চলতো, এই দিকেই তো যেতে দেখেছো তোমরা। খালেদ মিঞা তাড়াতাড়ি লুঙ্গিটা ভাল করে কোমরে বেঁধে নিল তারপর হারিকেন নিয়ে দ্রুত পায়ে নদীর পাড় দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলল। সাথে সাথে আরসব মানুষও চলল। যাবার সময় মিঞা হাঁক দিয়ে বলল শেখ, তুমি মনসুররে ডাইকা লইয়া আইসো ও তারে হাঁতার জানে তাড়াতাড়ি আইস কিন্তু; আর হ্যাঁ, সঙ্গে একটা দড়ি অবশ্য লইয়া আইস মনে কইরো। খালেদ মিঞা সহ সকলে নদীর পাড় দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলল। সতীশচন্দ্র শক্তিশালী টর্চের আলোয় নদীর মধ্যটাও বার বার দেখতে লাগল। মিঞা দেখল আরও চার পাঁচটা টর্চ লাইট রয়েছে ওদের সঙ্গে। মিঞা সতীশচন্দ্রের পিছন পিছন চলছিল। অন্য কোনদিকে দৃষ্টি ছিল না সতীশচন্দ্রের। তার মুখ দেখে কিছু জিজ্ঞেস

করবারও সাহস হচ্ছিল না মিঞার। তবে মনে মনে ধারণা করে নিচ্ছিল নিশ্চয়ই আবার একটা ঝগড়াঝাটি হয়েছে। খালেদ জানে ছোটকর্তা ভয়ানক রাগী মানুষ, রেগে গেলে তার আর জ্ঞান থাকে না। কখনও কখনও মার ধোরও শুরু করেন। তিনি খালেদ মিঞার হঠাৎ মনে পড়ল একবার একটা চোরকে এমন চড় মেরেছিল ছোট কর্তা, যে, ব্যাটা সাতপাক ঘুরে ছিটকে পড়েছিল। পাঁচ-ছ হাত যাওয়ার পরেই একসঙ্গে টর্চের আলো গিয়ে পড়ছে নদীর জলে। চারিদিকে আলোকিত করে তুলছে টর্চের আলো। কোনখানে জলে একটু বুদ্‌ বুদ্‌ দেখলেই সতীশচন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়ছে, বলছে দেখতো মিঞা, সন্দেহ হয় নাকি। মিঞা যখন বলছে, না তখন আবার সকলে এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নদীর পাড়ে অথবা আশে-পাশেও টর্চের আলো ফেলা হচ্ছিলো!

ইতিমধ্যে মনসুরকে সঙ্গে নিয়ে শেখও এসে দলের সঙ্গে যোগ দিল। নদীতে কাটাতে কাটাতে খালেদ বুড়ো হয়ে গেল সেকারণেই অন্ধকারেও তার চোখ নদীর জলের উপর একটা ঢেউকে লক্ষ্য করে চলল। হঠাৎ মিঞা বলে উঠল, "কর্তা ঐ খানটার জলটা যেন কেমন কেমন মনে হইতেছে, আলোটা একবার ফেলেন দেখি, খানটা পাড় হতে পনের-কুড়ি হাত দূরে। নদীর মধ্যে ঐ জায়গাটাতে একটু বুদ্‌ বুদ্‌ করে উঠছিলো। কতকগুলি বৃত্তাকার ঢেউ বড় হতে হতে ক্রমাগত পাড়ের দিকে এগিয়ে আসছিলো, খালেদ মিঞা চিৎকার করে বলে উঠল, মনসুর ঝাঁপাইয়া পড় দড়িটাও কোমরে বাইন্ধা লাও, বলে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর জলে, আরও অনেক লোকই ঝাঁপিয়ে পড়ল। উল্টো দিক হতে একটা নৌকো আসে ছিলো ঐ নৌকোটার একটা মাঝি জিজ্ঞেস করল "কি হইছে" আইচ্ছা তাই কন আমিও যেন একটা মানুষরে ঐ পাড়ে দেখছি বইলা মনে হয়। সকলে মিলে খুঁজতে লাগল। পাঁচটা বড় টর্চের জোরালো আলোয় সব অন্ধকার ঘুচে গিয়েছিল। মনসুর পাকা সাঁতারু আবার ডুবুরিও বটে। অনেক কষ্টে টেনে তুলল সোনামতির ফুলে-ওঠা দেহটা। চোখ দুটোয় ভরা রয়েছে বেদনা আর দুঃখ। চুলগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, গায়ের কাপড় খুব একটা আলগা হয়ে পড়েনি, কোমড়ে আঁচলটা জড়ানো। হারিকেনের মৃদু আলোয় মনে হচ্ছিল যেন সোনামতির মুখে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সাদা মুখটা একটু একটু চক চক করছিলো। সকলে মিলে দেহটা পাড়ে নিয়ে না তুলে যে নৌকাটা যাচ্ছিলো তার পাটাতনের উপর তুলল। সতীশচন্দ্রও সাঁতরিয়ে নৌকায় গিয়ে উঠল। খালেদ মিঞা নানা প্রকার চেষ্টা করতে লাগল, পেটের জল বার করল, শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল কিন্তু সব কিছুই বৃথা, নাকে হাত দিয়ে দেখল প্রশ্বাস পড়ছেনা। হাতের নাড়ীও তার চলা বন্ধ করেছে। সমগ্র শরীরে মৃতের চিহ্নই যেন ধীরে ধীরে দেখা যেতে লাগল। সকলেই লক্ষ্য করল খালেদ মিঞার মুখটা যেন কেমন হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি উদাস, বোধহয় কিছু ভাবছিলো মিঞা। এই ঘটনার জন্ত যেন নিজেকেই দোষী মনে করছিলো মিঞা। তার মনে বার বার যেন এই প্রশ্ন আসছিল, তার জন্যই কি এই মৃত্যু? আবার মন যুক্তি দিচ্ছিলো, না না তা হবে কেন, সে তো তাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। সে যদি ওকে পার করে দিত তাহলে কর্তাদেরকেও কৈফিয়ত দিতে হত। তাছাড়া ওত রাতে একটা মেয়েমানুষকে ঐখানে ঝোপে ভরা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া কখনই উচিত হতনা। মিঞার কোন দোষ নেই, সে নির্দোষ। এবার মিঞা আবার সোনামতির মুখের দিকে চাইলো, তারপর আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। জীবনের কদিনই বা পার হয়েছে। এর মধ্যেই সোনামতি সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে চলে গেল পরপারে। সতীশচন্দ্র ঝুঁকে পড়ে একবার সোনামতির মুখের দিকে দখলো তারপর খালিদ মিঞার দিকে চাইলো। খালিদ মিঞার ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছিলো, চোখের কোনায় চিক চিক করছিলো দুফোঁটা জল, দুহাতে মুখ ঢেকে অনেক কষ্টে বলে উঠলো "কর্তা, মাঠারেন চিরকালের লইগাই ওই পাড়ে চইলা গেলেন। আর কোনদিনই ফিরিয়া আইবেন না" চারিদিকে বিরাজ করছিল এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আর অন্ধকার।

উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের একটি বিস্মৃত অধ্যায়

কানাই চট্টোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের যুগ। এই যুগে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিয়াছিল। এই বিপ্লবের পশ্চাতে রহিয়াছে একটি বিশিষ্ট পটভূমিকা—সেই পটভূমিকা হইল তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ইউরোপীয় বণিকগণের উপনিবেশ স্থাপনের লক্ষ্য স্থল ছিল। ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বে ইংরেজগণেরই জয় ঘোষিত হইল। ধীরে ধীরে বণিকের মানদণ্ড পোহাইলে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল। কলিকাতা তাহার জাবদ অঙ্কন সরাইয়া আপন কোলের উপর আধুনিক কালের আসন পাতিয়া দিল। বাণিজ্য ও শাসনের পথ বাহিয়া শহর কলিকাতার পত্তন হইল। এই শহর কলিকাতা হইল অর্থকামী ধনবানদের পীঠস্থান। ইহারই বিবর্তনে মধ্যবিত্তসমাজের সূত্রপাত।১

বাংলার নবজাগরণের বিশিষ্ট পটভূমিরূপে সেই যুগের সমাজের পরিচয় লওয়া আবশ্যক। সমাজ তখন অজ্ঞানতায় অরাজকতায় ও কলুষতায় আচ্ছন্ন। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী, উৎকোচ দ্বারা ধনবান হওয়া নিন্দনীয় ছিল না। অর্থের প্রাচুর্য্যই ছিল সেই যুগের মানদণ্ড। তাই ধনী-সম্প্রদায় পিতামাতার শ্রাদ্ধে পুত্র-কন্যার বিবাহে, পূজাপার্বণে প্রভূত ধনব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। শিমুলিয়া পটীর মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন। যে ধনী পূজোৎসবে প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণ ইংরেজদের খানাপিনা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। নিজ ভবনে বাইজী-দিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল।২

সেই সময় অবস্থাপন্ন গৃহস্থ যাহারা 'বাবু' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের অবসর বিনোদন করিতেন মদ্যপান করিয়া, বনে ঘুরিয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি হাফ-আখড়াই প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদের আসরে আমোদ করিয়া কাল কাটাইয়া।

একদিকে এইরূপ অন্যদিকে সমাজে অজ্ঞানতা, ধর্মের গোঁড়ামি, পৌত্তলিকতা, সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রভৃতি তীব্রগতিতে প্রবাহিত। অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় সমাজ পরিপূর্ণ। সমাজের এই বন্ধ্যাত্ব ঘুচাইতে হইলে প্রয়োজন জোয়ারের, প্রয়োজন মুক্তধারার, যে মুক্তধারার বাঁধভাঙা প্রবল প্রবাহ ভাসাইয়া লইয়া যাইবে যাহা কিছু মলিন পঙ্কিল, যাহা কিছু কলুষ ও আবিল।

শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের যখন এই দুরবস্থা, তখন নানা-কারণের সমাবেশ হইল। দেশের লোকের দৃষ্টি শিক্ষার প্রতি বিশেষতঃ ইংরেজিয়ানার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ যতই ইংরাজের ব্যবসা বিস্তৃত হইতে সুরু করিল ততই প্রয়োজন হইতে লাগিল অল্প শিক্ষায় শিক্ষিত করনিকের, যাহারা অল্প বেতনে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে সাহায্য করিবে। সুতরাং কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা নিজেদের পুত্রদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে

বেশী উৎসাহিত হইলেন। ঠিক এই সময়েই ভবিষ্যত বাংলার সমস্ত সম্ভাবনাকে আশ্রয় করিয়া মেঘাচ্ছন্ন বাংলার আকাশে নবযুগের নবারুণ রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হইল।[৩]

১৮.৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করিয়া ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে "আত্মীয় সভা' স্থাপন ও বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সমাজে আলোড়ন তুলিয়াছিলেন। রামমোহন ধর্মসংস্কারের সহিত সমাজসংস্কারও সুরু করিয়াছিলেন। 'আত্মীয় সভায়' ধর্মালোচনার সহিত সামাজিক কলুষতা দূর করিবার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টাও করা হইত।

"হিন্দুকলেজ" স্থাপনের সহিতই এদেশে পশ্চিমী-শিক্ষার জোয়ার আসিল। নব্যশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানেরা সহর কলিকাতায় আসিয়া 'হিন্দুস্কুলে' ভিড় জমাইতে সুরু করিল। দুই এক দশকের মধ্যে 'হিন্দু কলেজ' বাংলাদেশের পীঠস্থানে পর্যবসিত হইল। 'হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কারমুক্ত মন লইয়া বাংলার যুবকসম্প্রদায় আন্দোলন সুরু করিলেন। ইহারা সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য এবং কেবলমাত্র বাংলা দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশ তবুও এই radical'দের আন্দোলনে সমগ্র বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। এই প্রসংগে তৎকালীন কলিকাতার বর্ণনা রেভারেণ্ড লংসাহেবের লেখা হইতে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না:

"Calcutta as regards education, in some respects resembles Cambridge or Oxford. Thousands of youths come and lodge in Calcutta for the purpose of attending school–their parents live perhaps fifty or a hundred miles in the country. Among educated youngmen a great sphere of usefulness is opened. There is greater activity of mind among natives in Calcutta than in the country".[৪]

এই সমস্ত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরা, দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করিতেন। তাঁহারা পশ্চিমী-শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, শিল্পবিপ্লব, ফরাসীবিপ্লব, ও আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রভৃতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নব্যবাংলার যুবকদিগের গুরু ছিলেন 'ডিরোজিও'। তাঁহার সংস্রবে আসিয়া 'হিন্দু কলেজের' ছাত্রগণের মনে মহাবিপ্লব ঘটিতে লাগিল। তিনি এই সমস্ত ছাত্রদিগকে লইয়া Academic Association নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। সমস্ত নৈতিক ও সামাজিক বিষয় অসংকোচে ও স্বাধীনভাবে এই সভার অধিবেশনে বিচার করা হইত।

তারচরণ চক্রবর্তীর 'ডিরোজিও' নিজেই যে কেবল সুর বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাই নহে। তাঁদের তরুণ ছাত্রদের মনের আত্মবাণীতেও সেই সুরের ঝংকার তুলিয়াছেন।[৫]

'পার্থিনন' নামে সভার এক মুখপত্রও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রিত হইলেও প্রচার করা সম্ভব হয় নাই।

এইরূপে 'হিন্দুকলেজ' ও 'ডিরোজিও'র মাধ্যমে কলিকাতায় যে 'ইয়ংবেঙ্গল' সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল তাহারা সমাজের যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্রতর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহাদের এই বিদ্রোহে ইংরাজগণ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদের এই বিপ্লবকে দমন করিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু তবুও এই বিপ্লব দমন করা সম্ভব হইল না। 'ডিরোজিও' এবং তাঁহার ছাত্ররা Academic Association এ নিয়মিত সভা করিয়া বহু বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। ১৮৩০ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সমস্ত বক্তৃতা হইয়াছিল তাহাতে তাঁহাদের দাবী ছিল জুরীর মাধ্যমে বিচার, চাকুরীর ভারতীয়করণ, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, ১৮৩৩ চার্টার এ্যাক্ট এর সংশোধন ও সর্বোপরি কুলি চালানের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

১৮৩৩ সালে কিছু 'radical' যুবক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য একটি সভার সৃষ্টি করেন; ইহাই 'সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা' নামে পরিচিত। এই বয়সেই 'young Bengal' দল বিজ্ঞানচর্চার জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার নাম 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ'।

কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলনে অবসাদ আসে। এখন হইতে তাঁহারা কেবলমাত্র সভাসমিতি, আলোচনা ও পত্রিকা প্রকাশেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইল স্থায়ী কোন সংগঠন সৃষ্টি করা যাহার মাধ্যমে তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত করিতে পারেন। তাঁহারা এই মর্মে শত শত শিক্ষিত নাগরিকদের নিকট আবেদন করিলেন।

তাঁহাদের আবেদনে প্রায় তিনশত নাগরিক ১২ই মার্চ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজহলে উপস্থিত হইয়া একটি সংগঠন স্থাপন করেন যাহা 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা' বা Society for the Acquisition of General Knowledge.' নামে সাধারণ্যে পরিচিত। নিয়ম হিসাবে সমিতি প্রথমেই লিপিবদ্ধ করেন:

"That it is highly desirable that a society be established among young natives with object of promoting mutual improvement and this society be named the society for the Acquisition of general knowledge; that for this purpose monthly meetings be held, at which written or verbal discourses be delivered on subjects previously chosen by the deliverers excluding religious discussions of all kinds".৬

প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ (১৮৩৮-১৮৪৩) দেড়-শতাধিক সভ্য সহ 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা' নিয়মিত আলোচনার জন্য বসিত। এই সংগঠন তিনটি পুস্তিকা যথাক্রমে ১৮৪০, ১৮৪১ ও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত করেন। ইহার সহিত অপরাপর নিয়মাবলী ও সভ্যদের সম্পূর্ণ তালিকাও মুদ্রিত হইয়াছিল। আমরা এই পুস্তিকাগুলির লেখা যদি আলোচনা করি তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে তাঁহারা কত বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করিতেন। প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Importance of the study of History.' পরবর্তী অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল 'শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হইবে কিনা?' ইহা ছাড়া হিন্দু-মহিলাদের অবস্থা এবং বৈষয়িক সংস্কারের বিষয়ও আলোচিত হইত। প্যারীচাঁদ মিত্র অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার জন্য। এই সভাতে বৈজ্ঞানিক সাংস্কৃতিক আলোচনা ইত্যাদিও হইত।

ইহাদের আলোচনার আরও বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

1. A short topographyeal account of Chhota Nagpur—Tarak Nath Sen.
2. On matter—Gauendro Mohan Tagore.
3. On the cultivation of states of Chittagong —Kshetra Mohun Mukerjee.
4. On the anatomy of the Ear— Prosunna Kumar Mittra.
5. On truth—Kishory Chaund Mittra.
6. On the Anatomy of Eye —Saut Cowrie Dutta.
7. Account of Singhblum Tarak Nauth Sen.
8. On the present condition and future prospect of Educated Natives. —Kishory Chaund Mittra.

'জ্ঞানোপার্জিক সভার' সভ্যরা কেবলমাত্র আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না তাঁহারা দেশে বিভিন্ন সংস্কারের জন্য চেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহাদের চিন্তার প্রকাশ দেখাযেতে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের 'বৈ-সামরিক সংস্কার' নামক প্রবন্ধ হইতে প্রতীয়মান হয়। তিনি লিখিয়াছেন:

I will not dwell any more upon particular examples of the evils by which we are surrounded. Our minds are full of their practical effects and our daily observations

and experience are sufficient to bring them constantly to our recollection ...... Are the ignorant, the illiberal, the unenlightened, the uninstructed and the illiterate to lead the great work of reformation? Can the blind lead the blind? No! Gentlemen, that shall not, that can not be. To you it is that the country looks up with eagerness—and from you it is that she expects her release from one of the most galling yokes—even that of superstition, ignorance and evil customs. The work of domestic and moral reforms must begin with and be conducted by the inhabitants of the soil. Foreigners may at best aid and encourage you—but you must personally bear the heat and brunt of the battle ...... You must yourselves exert your energies if you wish to better days in your country.

"আরো একটু বিস্তারিতভাবে এই সংগঠনের দিকে দৃষ্টি দিলে হিন্দু কলেজের অবদান কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। মোট প্রায় ১০০ জন সভ্যের মধ্যে অর্ধেকের বেশী সদস্যই ছিলেন হিন্দু কলেজের। সদস্যদের নামের তালিকা [illegible] সভায় বিভিন্ন বর্ণের [illegible] সদস্য সংখ্যা ছিলেন। এই সদস্য কেবলমাত্র কলিকাতার অধিবাসী ছিলেন না। এমনকি সুদূর গ্রামেও ইহার শাখা ছিল, যেমন ঢাকার হিন্দু [illegible] নাশিনী সভা। সুতরাং সভ্যদের তালিকা দেখিয়া বুঝা যায় যে জ্ঞানোপার্জিকা সভা বা [illegible] ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দিনে দিনে এই সভার আলোচনা রাজনৈতিক আলোচনায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে এই অসহিষ্ণু যুবকেরা পাশ্চাত্য উদারচেতা কয়েকজন ব্যক্তিদের সহিত একত্রিত হইয়া বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার জন্য একটি সংগঠন সৃষ্টি করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের mechanical institution স্থাপিত হয়। এই ধরনের সংগঠন ভারতে এই প্রথম। ইহার উদ্যোক্তাদের নাম দেখিলে [illegible] হইতে হয় যে তৎকালীন যুগের সেরা কৃত-বিদ্যগণই ইহার সদস্য ছিলেন, যেমন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে উত্তর কলিকাতার প্রায় ২০০ শত উৎসাহী যুবক একত্রিত হইয়া সমাজের উন্নতির জন্য "দেশ হিতৈষিণী সভার" সৃষ্টি করেন। উদ্বোধন বক্তৃতায় সারদাপ্রসাদ ঘোষ বলেন

Ever since the commencement of the British supremacy in this country, the policy of our present rulers has been to deprive us of the enjoyment of political liberty which is the cause of our misery and degradation. The losses of happiness follows the losses of civil liberty as shadow does substance. Our present rulers pay a superstitious adoration to mammon and scruple not to adopt any means by which they can enrich themselves and reduce us to squalid poverty. Need I undertake the painful task of harrowing up your tender feelings by an enumeration of all the instances of grinding oppression exercised over us? No because they are too numerous to be detailed before you and too glaring to escape your observation. ...... Such being the nature of the constitution of this country are we not prompted by all that is dear to man to adopt measures calculated to improve our condition.[7]

এই সমিতির নিয়মাবলী দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই সভার অন্যতম কাজ ছিল ইংলণ্ডের "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি"র [illegible] যোগাযোগ রাখা। ইহা ছাড়া ইহাদের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ লইয়াই এই সভার সদস্য নির্বাচন করা।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই "young Bengal সম্প্রদায় তাহাদের মুখপাত্র হিসাবে দ্বিভাষিক পত্রিকা "Bengal

Spectator প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল প্রধান্য জনসাধারণের মধ্যেও এই রাজনৈতিক চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানো। ইতিমধ্যেই young Bengal'দের আবার আচরণে পরিবর্তন আসিয়াছিল, যাহাদের উদ্দেশ্য হইল ইংরাজের কুশাসনের সমালোচনা করা। ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৩ এর জ্ঞানোপার্জিকা সভায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় East India company's criminal Judicature এবং পুলিশের বর্তমান অবস্থার উপর বক্তৃতা করেন। কিন্তু বক্তৃতা অর্দ্ধপথেই বাধাপ্রাপ্ত হয় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন রিচার্ডসনের দ্বারা। তিনি ইহাকে রাজদ্রোহিতারূপে ব্যাখ্যা করেন। জ্ঞানোপার্জিকা সভার সেক্রেটারী রিচার্ডসনকে ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে বলেন। শেষ পর্যন্ত এই সভা একটি আলোচনার মধ্যে শেষ হয়।

এই বৈঠক জ্ঞানোপার্জিকা সভার ইতিহাসেই নব বাঙ্গলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। এই আলোচনার পর জ্ঞানোপার্জিকা সভা স্থানান্তরিত হয়। এখানেই জর্জ টমসন সাহেব সদস্যদের সহিত মিলিত হইয়া Bengal British India Society ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করেন। ইহাই সর্বপ্রথম সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

৮

সুতরাং বাংলার নবজাগরণের যুগে জ্ঞানোপার্জিকা সভার একটি বিশেষ মূল্য ছিল। ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। সমাজের কলুষতা ও অশিক্ষার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সমস্ত young Bengal এর ধারকরা সংস্কারমুক্ত হইয়া যে আন্দোলন তাঁহাদের শিক্ষকের সহিত যুক্ত করিয়া ছিলেন তাহার পরিসমাপ্তি হইল Bengal British India Society তে। ইহা হইতেই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যাহারা ২০০ বৎসরের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল হইতে দেশ-মাতৃকাকে মুক্ত করিয়াছিল। এই young Bengal এর সভ্যরা, বন্ধু শিক্ষক। পরিশেষে জ্ঞানোপার্জিকা সভার অন্যতম সদস্য কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখা উদ্ধৃত করিয়া আমি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।[৯]

"The youthful band of reformers who had been educated at the Hirdoo College, like the tops of the Kanchangunga, were the first to catch and reflect the dawn - when has an opposition to popular prejudices, been dissociated with difficulty and trouble···To excommunication and its concomitant evils, our friends were subjected···conformity to the idolatrous practices and customs evince a weak desertion of privilege. Non-conformity to them on the otherhand is a moral obligation which we owe to our conscience.

পাদটীকা:—

1. Awakening in Bengal—Goutam Chattopadhya. Page-1
(২) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী পৃ ৫৫
বিদ্রোহী ডিরোজিও—বিনয় ঘোষ পৃ-৩১
4. British Friend of India Magazine (London) vol III May, 1843 Page-327.
(৫) বিদ্রোহী ডিরোজিও—বিনয় ঘোষ পৃ-৫৫
6. Awakeing in Bengal —Goutam Chattopadhya p-27.
7. Bengal Hurkuru, Oct 6, 1841.
8. Bengal Hurkuru, Oct 6, 1841.
9. Studies in the Bengal Renaissance Sushobhan Chandra Sirkar p-31

জন্ম-জন্মান্তর

(উপন্যাস)

রামপদ মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে সময়ে আধুনিক মহা-কর্মের মোহমুক্তি ঘটিয়ে গ্রহান্তর যাত্রায় প্রায় সফলকাম, তখন এমন একখানি পত্র নিয়ে মন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সরু সুতোয় দোলা খেতে থাকবে এ ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি? বিজ্ঞান-বার্ত্তা এখন যে তোড়ের খেলা সুরু করেছে— তার কাছে জন্মান্তরবাদের রহস্যও ফিকে হয়ে আসছে, আমাদের পুরাতন মনে শিকড় নামিয়ে আছে পুরাতন দিনের কিছু সংস্কার তারই জলবায়ুতে জমিটা বেশ স্যাঁতসেঁতে এটি স্বীকার ক'র—, কিন্তু তাই বলে দৈবী মহিমাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারি তেমন বিশ্বাসের শক্তিই বা কই, কলিযুগে শুনেছি দেবতারা নিদ্রিত, উত্তর বা দক্ষিণমার্গের কল্পনা নয়, বিজ্ঞানের প্রখর আলোর ছায়া ছায়া কল্পলোক একেবারে নিশ্চিহ্ন। এখন পৃথিবীর কিম্বা আমাদের দুর্দশা বাড়লে আমরা বলি না, এ আমাদেরই কৃতকর্মের ফল—দেবতার কোপ; আমরা তার জন্য দায়ী করি মানুষকেই এবং স্বহস্তে সেই তার নামাবার জন্য কর্মযজ্ঞের হবিস্তে আহুতি প্রদান করি, সেই কর্মের সমস্ত দায়িত্ব তুলে নিই আপনার মাথায় এবং অকৃতকার্য হলেও দৈবের উপর দোষারোপ করি না, অথচ আশ্চর্য এমনি যোগাযোগ ঘটেছিল আলোচ্য কাহিনীতে যা নাকি দৈব ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। হ্যাঁ, ওটা অবিশ্বাস্য পর্য্যায়ের গল্পই, অঘটনের ঘটা। তবু গল্প বলার আগে চিঠিখানা আর একবার পড়ে দেওয়া ভাল। এ চিঠির মর্ম আমি যেটুকু উদ্ধার করেছি, আমার পাঠকরাও যে ততটুকু জানতে পারবেন সে আশা রাখি না। তার মানে এই নয়, যে পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তির উপর কটাক্ষপাত করছি। তার মানে, এই সুযোগে গল্প বলার লোভটুকু সম্বরণ করতে পারছি না। গল্পটা আমার কাছে চিরকালের বিস্ময়। বিস্ময় আছে বলেই কৌতূহল,-এবং তার সঙ্গে আনন্দ—আনন্দের সেই তোড়টুকুই ভাগভাগে করে নিতে চাই। শুনুন সেই আশ্চর্য্য গল্প।

ভাল কথা, চিঠি পড়বার আগে আর একটি সর্ত। এটা গল্পের মত শোনালেও-আসলে সত্য ঘটনা। খানিকটা বিস্বাদ, কিছুটা তিক্ত স্বাদও হয়তো বা-এবং বৈচিত্র্যহীনও কোন কোন বর্ণনা প্রসঙ্গে। বাস্তব কাহিনীর রং রস অথবা রোমান্সের মাত্রা সীমিত। সেই কারণে স্থান কাল এবং চরিত্রের যাথাযথ পরিচয় এতে দেওয়া যাবে না। সত্যের মধ্যে ভেজাল একটু থাকবেই অর্থাৎ স্থান এবং পাত্র-পাত্রীর নামগুলি। জীবিত চরিত্রদের সম্মান-রক্ষার্থে সুভদ্র এই নিয়মটুকু মানতেই হবে। তা হোক, গল্পের কৌতূহল এতে কম হবে না। এইবার অবহিত হোন।

উত্তর প্রদেশের রাজধানী থেকে লিখছেন আত্মীয়

আপনাকে আজ একটা আশ্চর্য্য ঘটনা জানাই। আপনি মহেশ্বর ওরফে মহেশকে জানেন তো? সাক্ষাত-পরিচয় নাই থাক, ইতিপূর্বে কয়েকটি পত্রে ওর জীবনের কিছু কিছু অংশ আপনাকে জানিয়েছি। আমার সহকর্মী বলে ওর জীবন-গতি সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বরাবরই সজাগ। আর একথা তো আপনি জানেনই-মহেশ একটু ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। সচরাচর যেসব

মানুষের সঙ্গে আমাদের সামাজিক সম্বন্ধ বা কর্মক্ষেত্রের যোগাযোগ তারা প্রায় সকলেই ছকে-বাঁধা পথ-চলা পথিক। তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে আমাদের মোটামুটি পরিচয় আছে কেননা আমাদের মনের আয়নায় তারা অতিশয় স্পষ্ট। মহেশের দুঃখের বা দুর্ভাগ্যের কি বলব, যাই বলি—সে বিবরণ আপনাকে কিছু জানিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য্য দুর্ভাগ্যের ওই চেহারাটা তার মনকে খুব বেশি নাড়া দিতে পারেনি—ও প্রায়ই বলে, বেশ আছি। সংসারের বাহিরের যে-রূপ-যেটা নকল সোনার মত ঝক ঝক করছে তার জন্ত আমি লালায়িত নই। ভাবতে পার দুটি তিনেক বাচ্ছা হওয়ার পরও আসক্তির আনন্দ আমাকে পাগল করতে পারল না কেন? আমি দীর্ঘ চারটি বছর সেই বন্ধনের বাহিরে কাটিয়েছিলাম অনায়াসে। আমাদের গল্পের চখাচখির সংসার ওপারে-এপারে দুই শরীর, মাঝখানে বিচ্ছেদের নদী নিদারুণ। এ আমার দুঃখ বিলাস নয়—দুঃখের দূরচক্রবাল সেই চিরকালের সূর্য্যোদয়ের রঙ; জীবনকে যা বিস্তীর্ণ করে, অথবা জীবনের মহিমা উপলব্ধি করায়। জীবনের কি মহিমা সে কথা তো অনেকবার বলেছি। সত্যি বলছি, আপনাকে সেই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কথা, যেটা প্রত্যয়ের চেয়ে অনুভূতিতে বেশি প্রত্যক্ষ। অনেকবার শুনেছি, ধারণা করতে পারিনি অথচ কিছু না বলে উপেক্ষা করাও কঠিন মনে হয়েছে। চার বছর স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েও—ও একবারের জন্যও বলেনি, এ জীবন অর্থহীন। বরং জানিয়েছে, জীবনের আরও একটা উদ্দেশ্য আছে: আপনাকে ভোগ করার চেয়ে আরও এক সুখের ক্ষেত্র ও অধিকার করেছে, আপনাকে জানার চেষ্টা। এটাই নাকি ভারতীয় সাধনার মূল উৎস। হবেও বা! যাক, তারপরে দৈববশে স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের বিবরণটুকু আপনি আমার মুখে শুনেছেন। তারপরে আরও বিপর্য্যয় কাহিনী। সেইসব ঘটনা যখন ওর সংসারের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল এবং ওর মনকে ক্ষত-বিক্ষত করছিল তখন আমরা এই মাসখানেক আগের কথা—স্থির করলাম, কোন তীর্থধামে গিয়ে দিনকতক কাটিয়ে মনের হৃতস্বাস্থ্য উদ্ধার করবার চেষ্টা করব। ভারটা ছিল ওর, কৌতূহলটা আমাদের। কিন্তু সে কি সত্যই দায়? যাই বলি না কেন, আমরা এবার বেছে নিলাম এমন একটা স্থান, বহু প্রাচীন কাল থেকে তন্ত্রপীঠ বলে যার খ্যাতি আছে। বেছে নিলাম এমন একটি সময়, তখন নাকি ওই পীঠস্থানের মহিমাকে বহুগুণে উজ্জ্বল করে। হাজার হাজার যাত্রী আসে তা প্রত্যক্ষ করতে, উপলব্ধি করতে।

অম্বুবাচীর সময়ে আমরা তন্ত্রপীঠ কামাখ্যাধামে এসেছিলাম।

ঐ দেবীর ক্ষেত্রের বর্ণনা দেবনা, আপনি বহুবার ওখানে গেছেন। এবং হয়তো বা অনুভবও করেছেন, অলৌকিক বহু ঘটনার উৎপত্তি-কেন্দ্র বলে। স্থানটি অন্যান্য তীর্থভূমির চেয়ে কিছু স্বতন্ত্র। এখানে এলে সেই মুখে-মুখে শোনা কাহিনীগুলি কেমন যেন মনের উপর ছায়া ফেলে। সেইসব অঘটন যদিও আজকাল ঘটে না-ঘটবে এমন বিশ্বাস অতি ভক্তিমান যাত্রীরাও মনে মনে পোষণ করেন না; তবু কি জানি কেন, প্রত্যাশার ছায়ায়-ছায়ায় অশরীরী অবাস্তব ঘটনাগুলি কানাকানি করে। বলতে বাধা নাই, এখানে এসে পর্য্যন্ত আমরাও তেমনি একটি প্রত্যাশায় লুব্ধ হয়ে চলাফেরা করছিলাম। তিনদিন মন্দির-দুয়ার বন্ধ ছিল। নবচক্ষুর অন্তরালে মন্দিরের গর্ভগৃহে কি সব রহস্য যেন ঘনিয়ে উঠছিল, মন্দির-দুয়ার খুললে আমরাও তার শরিক হব এমনি একটা প্রত্যাশা। প্রতিদিন মন্দিরপরিক্রমা করে ভুবনেশ্বরী শিখরে এসে বসি। আপনি তো জানেনই কামাখ্যা-পর্বতের এটি সর্বোচ্চ শিখর। দিগ্‌বসনা প্রকৃতির মধ্যে দেবীর ধ্যানমূর্তিকে অনুভব করার এমন সুযোগ আর কোথায়ই বা আছে। ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পিছনে সব চেয়ে চওড়া যে দুখানা পাথর আছে, তার একটিতে বসে আমরা ব্রহ্মপুত্রের ওপারে অখণ্ডাকার ধু ধু বিস্তৃত মাঠের পানে চেয়ে থাকি। বিরাট সীমাহীন বস্তুর মহিমাকে উপলব্ধি করিনা হয়তো—কেননা দলবেঁধে গল্প করতে করতে তা সম্ভব নয়, অনেক যাত্রীর কোলাহল কলরবও তার

অনুকূল নয়, তবু দূর দিগন্তের ধোঁয়া ধোঁয়া খাসিয়া জয়ন্তীয় পাহাড়গুলির বেড়ার এপারে যে অফুরন্ত ভূমি-প্রকৃতি তার পানে চেয়ে বিশ্ব দেহের বিশালত্বকে কল্পনা করে নিজেকে মনে হয় কত তুচ্ছ। ওইখানে বসে একদিন আলোচনা হয়েছিল তন্ত্র সম্বন্ধে। কেউ কেউ বলেছিলেন, সারা ভারতবর্ষে যে কটি পীঠস্থান আছে তন্ত্রসাধনার সব চেয়ে অনুকূল ক্ষেত্র হল এই নীলপর্বত কামাখ্যাধাম। এখানে যোনিপীঠে দেবীর অধিষ্ঠান। বীরাচারী সাধকের পক্ষে এই মূর্তিকল্পনাই শ্রেষ্ঠতর কল্পনা। সে যাক, মহেশের কথা বলি। মহেশ এই তর্ক-তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছিল এবং পরম বিশ্বস্তভাবে কল্পনা করেছিল এ হল পরীক্ষিত সত্য। এই দেবীপীঠে ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করলে মনোবাসনা অপূর্ণ থাকে না। হঠাৎ আমার কি খেয়াল হল, বললাম, দেখ তো, অম্বুবাচীর তিনদিন শেষ হবে, কাল মন্দির দুয়ার খুলবে। দেবীর কাছে কিছু প্রার্থনা কর না কেন?

কি জিনিস চাইব? উপেক্ষার হাসি হেসে বলেছিল মহেশ।

আমার মাথায় রোখ চেপে গেল পরীক্ষা নেবার, বেগের সঙ্গে বললাম, তুমি তো সংসার বিবাগী নও, আজকাল স্ত্রী নিয়ে সংসারও করছ। এই সংসার যাতে ভালভাবে চলে এমন কিছু বস্তু চাইবার কি নেই?

আছে হয়তো, কিন্তু সে চাওয়ায় শান্তি কি!

কেন এখন অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে যে অশান্তি ভোগ করছ অন্তত তা থেকে তো মুক্তি পেতে পার।

কর্মফল কি প্রার্থনার দ্বারা কাটানো সম্ভব! তাছাড়া আমি রামকৃষ্ণদেব নই, সে বকলমা দেবার শক্তি কই!

তা হোক চাও কিছু। প্রার্থনা কর। আমরা জোর দিয়ে বললাম। এতদূর ছুটে এলাম, একটা কিছু প্রমাণ না নিয়ে ফিরে যেতে মন খুঁতখুঁত করছে।

মহেশ উত্তর না দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের দিকে চেয়ে রইল।

আপনি তো জানেনই মহেশ আমাদের সহকর্মী হলেও সহধর্মী নয়। অর্থাৎ আমাদের মত সাধারণ ছেলে নয়। ওর জন্মকাল থেকে পাওয়া বিশেষ একটি শক্তি ওর স্বভাবে মিশে আছে। শাস্ত্রপাঠ, সদাচার পূজা অর্চনা এই সবে ওর অনুরাগ বরাবর লক্ষ্য করেছি। সংসারে সমস্ত কাজে জড়িয়ে থেকেও লাভ-ক্ষতি সুখ-দুঃখে উদাসীন। কখনো কখনো রাতভোর ধ্যানজপে তন্ময় হবার শক্তিও ওর আছে। কেমন করে তা সম্ভব বুঝি না, কিন্তু ওর ক্ষীণ দেহের মধ্যে শক্তির উত্তাপটুকু এর এক সময়ে আমরা লক্ষ্য করে চমৎকৃত হয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, সাধনার অলক্ষ্য ক্ষেত্রটিতে একদিন না একদিন ও পৌঁছবেই। কেন আমাদের এই ধারণা জানতে চান যদি, এবার যখন আসবেন এখানে ওর যোগাযোগের ইতিহাস শোনাবো, বুঝতে পারবেন। অতি সাধারণ আমাদের মধ্যে ও যে বিশিষ্ট, এই পাকা ধারণার বশেই আমরা ওকে অনুরোধ করলাম—দেবীপীঠে এমন কিছু চেয়ে নাও যাতে তোমার সংসারে শান্তি আসে।

আপনাকে বলেছি কি মাত্র কয়েক বছর হল ওর স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পালা শেষ হয়েছে। এখন আরও কয়েকটি সন্তান এসেছে ওদের সংসারে। পাকা-পাকিভাবে গৃহরচনার উদ্যোগ-আয়োজন চলছে, জমি কেনার কাজটাও অনেকখানি এগিয়েছে। তবু ওর বিশ্বাস ভাগ্য এখনও প্রতিকূল। এই সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন নাকি ক্ষণভঙ্গুর,—প্রতিদানে বাড়ায় মাত্র ধাঁধার-পাঁককে বাঁধছে। আমরা দৈবকৃপাপ্রার্থী কাপুরুষ বলে ওকে কর্ম বলে বিশ্বাসী হতে উত্তেজিত করেছি। এই দণ্ড নিছক অনুরোধ নয়—বক্রোক্তি দিয়ে ওর জাড্যতার দৃঢ় করার চেষ্টা করলাম।

মহেশ অবশেষে বলল, চেষ্টা করব। সংসারে শান্তি কে না চায়। আমিও চাই। নিশ্চয় চাইব।

পরের দিন গর্ভমন্দিরে বসে কি প্রার্থনা করেছিল জানি না, তবে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার পর ওকে প্রফুল্ল মনে হল। আমরা কিছু বললাম না বুঝলাম ফল হয়েছে। ফুল নেওয়ার সময় পাণ্ডা আমাদের আশীর্বাদ করলেন। মায়ের প্রসাদী একটুকরো বস্ত্র

দিয়ে বললেন, মাদুলিতে ভরে বস্ত্রখণ্ড ধারণ করলে দেবী তোমাদের সর্ব আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। বিশ্বাস রাখতে হবে দেবীর উপরে।

আমরা এক এক খণ্ড প্রসাদী বস্ত্র নিয়ে খুশী মনে পাহাড় থেকে নেমে এলাম।

পৌঁছলাম আমাদের কর্মস্থলে—আমাদের বাসায় বা বাড়ীতে। কিন্তু আমাদের বাসায় ইতিমধ্যে এত বেশী দেবদেবীর পট প্রসাদ নির্মাল্য ভস্ম সিঁদুর সজিল এয়োতির চিহ্ন জড়ো হয়েছে—যা না কি সারা ভারতবর্ষে তীর্থপরিক্রমার ফলশ্রুতি। শুধু একটি হিন্দু সংসারেই এই সব মাঙ্গল্য আশীর্বাদী বস্তু জমা হয় না, ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি সংসারের এইগুলি অপরিহার্য সম্পদ। তবু আশ্চর্য, অধিকাংশ সংসার দুঃখ দৈন্য অভাব অনটনের কশাঘাতে নিত্য জর্জরিত, নিত্য ক্লিষ্ট। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের যেমন নিত্য নূতন খেলনার আসক্তি, আমাদের বয়স্ক মনেতেও তেমনি জোরালো ওই স্বভাবের অনুবৃত্তি। অনেক দেবদেবীর অনেক মূর্তি ও মহিমা আমাদের আবেগকে উদ্দীপ্ত করে, নূতনের নেশায় আপ্লুত হই একদণ্ডে, সবচেয়ে নূতন এসে পুরাতনকে—অতি নূতনকে স্থানচ্যুত করে তেমনি অনায়াসে। বিশ্বাসের শক্ত পাত্রে ভাবের ফুলগুলিকে গুছিয়ে রাখার স্বভাব আমাদের নাই। ভাবালুতাকে ভাব বলে ভুল করি আর সেই কারণে ভাব আমাদের স্থিতি না দিয়ে স্রোতের মুখে ঠেলে দেয়। বাড়ীতে এসে আমরা যথারীতি প্রসাদী বস্ত্রখণ্ড মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রেখে দিলাম সেই জায়গাটিতে যেখানে প্রায় শতসংখ্যক দেবতার আশীর্বাদ ধুলোর আস্তরণে একই বর্ণ ধারণ করেছে। স্থির করলাম, মাদুলি এনে ওই বস্ত্রখণ্ড ধারণ করব, কিন্তু সে যেন দরিদ্রাণাং মনোরথ, সত্যই স্বভাবে আমরা কম দরিদ্র নয়।

মহেশ কিন্তু তা করল না—তিন দিনের মধ্যে সেই বস্ত্রখণ্ড মাদুলিতে ভরে ওর স্ত্রীকে ধারণ করিয়ে দিল। কিন্তু ফল ফললো বিপরীত। কেন, সেইটিই তো এই পত্রের কথা। আপনি যখন আসবেন এখানে কিংবা আমি ওখানে যাব সাক্ষাতে সব জানাব। এমন ঐকান্তিক বিশ্বাসের এমন সর্বনাশা ফল আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি অথচ তাই ঘটলো!

এখন আমরা ভারাক্রান্ত চিত্তে একটি অশুভ অলক্ষ্য ভাবি পরিণতির পানে চেয়ে আছি। কবে আসবে সে দিন জানিনা, তবে সেদিন আসবেই। মহেশের সংসারের প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনাই অমঙ্গল-চিহ্নে ফুটে উঠছে। মহেশ ম্লান হেসে প্রায়ই বলে, ঘনায়ে আসিছে মৃত্যু লগন মিলন-লগ্ন করে?

চিঠিখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। আশ্চর্য, যে ঘর একদিন বিচ্ছেদের অন্ধকারে প্রায় মুছে যেতে বসেছিল সেখানে অকস্মাৎ কেনই বা আলো জ্বলে উঠলো? আর জ্বললই যদি, আলো কেন, সলিতার অকুলান হলো কেন মাঝপথে? এ যদি তাঁর লীলাই হয়—তাহলে অকুণ্ঠিত গলায় বলব তিনি নিষ্ঠুর।

ভাঙা গড়া খেলা নিয়ে তাঁর এ কেমন আনন্দ, এক খুশীর রঙে মন রাঙিয়ে সৃষ্টিলীলার সাধ জাগল যার সেই রংটা এত কাঁচা করে তৈরী করলেন কেন! চোখের জলে যদি ফিকে হয় রঙ তো তার বড়াই মিছে। মহেশ তাঁর লীলার মহিমা নানাভাবে প্রচার করে আনন্দ পায় অথচ মহেশকেই কঠিন পরীক্ষা দেবার জন্ম ডাক দিচ্ছেন তিনি। মহেশ নাকি তাই বলে, এ তো দুঃখ দেওয়ার নিষ্ঠুর আনন্দ নয়, এ হল দুঃসাগর উত্তীর্ণ করিয়ে দেবার আয়োজন। এতেই নাকি ওর উল্লাস। জানিনা সব খেলাই সোনাপ ফলে ফোটে কিনা।

এবার বেশ খানিকটা পিছিয়ে এসে আরম্ভ কথা কওয়া প্রয়োজন। না হলে একটি অকরুণ মৃত্যু ঘটিয়ে কাহিনীকে বিয়োগান্ত করার সার্থকতা কি? বিয়োগ অত্যন্ত কাঁচা রঙ, তাতে তুলি ডুবিয়ে যত করুণ করেই আঁকা হোক না ছবি—ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাস ছাড়া সে ছবির মূল্য কি! মহেশের জীবনটা সস্তা খেলো নয় বলেই আমার বিশ্বাস। ওর বাপ মা আত্মীয় স্বজন—সকলের কাছেই চোখে ও রহস্যময় জিনিস। অনেক কানাঘুষার বস্তু।

রমেশের দিদিমার একমাত্র মেয়ে সুরমা; অনেক খুঁজে পেতে ঠাকুরদেবতার মানত করে পাত্রস্থ করেছিলেন। পাত্রের নাম মহেন্দ্র। সেকালের মান অনুযায়ী সৎ পাত্রই। পবিত্র শিবস্থানে বাস, নিত্য গঙ্গা-স্নান, শিবশক্তির অর্চনা ও পূজা পাঠ করা ছেলে। চাকরি করে না—নাই করুক, খাওয়া-পরার সচ্ছলতায় সংসার স্বচ্ছলগতি। নামকরা পণ্ডিতবংশের ছেলে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে যাজনকার্য্য করে, বাঁধা আয় আছে, এখানে ওখানে ভগবৎ কথার আসরে বসলে উপরি-পাওনাও নিন্দার নয়। দক্ষিণা সামান্য হলেও ভোজ্য-উপকরণে নিত্য দিনের অভাব মোচনের আশ্বাস আছে। ভাত কাপড়ের ভাবনা নাই, মাঝে মাঝে দুধ ঘি সন্দেশ মেঠাইটাও অলভ্য নয়' অভাব শুধু একটি বস্তুর—বংশধরের। যথাসময়ে সন্তান লাভ হল; কিন্তু বাঁচল না।

প্রথম সন্তানটি নষ্ট হওয়ায় মনোকষ্টে আছেন মহেন্দ্র। কিন্তু তার চেয়ে বেশি মনোকষ্ট বুড়ি দিদিমার। ঠাকুর-দেবতার পায়ে মাথা কোটার কামাই তো নেই, সেই সঙ্গে ভাল যোগী সন্ন্যাসীর তল্লাস করেও ফিরছেন। একটি মাত্র মেয়ে—তার ছেলেমেয়েদের নিয়েই বুড়ো বয়সের সাধ-আহ্লাদ সার্থক হবে। কিন্তু কেমন বিধাতার কোপ প্রথম সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয়ে পৃথিবীর আলো দেখল না। মৃতবৎসা নয় মেয়ে—আধঘণ্টাটাক বেঁচে ছিল সন্তান-তারপর কেমন যেন নীল হয়ে নেতিয়ে পড়ল। বাপ-মায়ের যত না বাজলো, বুড়ী বুক চাপড়ে মাথার চুল ছিঁড়ে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। একদিন গঙ্গায় স্নান সেরে এক সাধু উপরের চাতালে পা দিয়েছেন, বুড়ী আছাড় খেয়ে পড়লো তাঁর পায়ে।

সাধু শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন—করকি করকি মা।

বুড়ী নিজের দুঃখের কথা সবিস্তারে বলে গেল। সমস্ত শুনে সাধু কয়েক মুহূর্ত তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে রইলেন। পরে ধীরে ধীরে বললেন, দেখ মা, এসবই জন্মান্তরের ফল। তোমার মেয়ের সন্তানভাগ্য ভাল নয়—দুর্গতি আছে।

কোন উপায় নেই বাবা? আকুল কণ্ঠে শুধোলে বুড়ি।

উপায় আছে বইকি—শাস্ত্রাচার মেনে চলতে হবে হোম পূজা জপ ধ্যান এসব নিয়মিত করতে হবে জামাইকে বলবে সে ঠিকমত এসব যেন করে, আমি মন্ত্র বলে দেব। তারপর মেয়ে সন্তানসম্ভবা হলে আমায় খবর দেবে।

আপনাকে কোথায় পাব বাবা?

গঙ্গার উত্তর ধারে এক পোয়া রাস্তা গেলে আমার আশ্রম পাবে ডান হাতে, শঙ্কর আশ্রম। সন্তান প্রসব হলে আমায় খবর দেবে, ও ছেলে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র প্রাণ-হীন হবে। সে দেখে ঘাবড়ে যেও না। এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে জানাবে, তারপর যা করবার আমি করব। হাঁ যতক্ষণ আমি না পৌঁছব জামাই যেন ইষ্টমন্ত্র জপ করে যায়—বিপদে অস্থির না হয়ে ইষ্টকে স্মরণ করে।

বুড়ী প্রণাম করে বলল, আপনিই আমাদের ভগবান বাবা।

সাধু ঈষৎ হেসে বললেন, ভগবান সর্বত্র আছেন আমার দেহে তোমার দেহে প্রতিটি জীবজন্তুর দেহে। কিন্তু আত্মজ্ঞান না জন্মালে তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমরা মুখ্যু মেয়েমানুষ অত শাস্তরটাস্তর জানিনে বাবা—আপনারাই আমাদের জ্যান্ত ভগবান। সাধু হাসলেন, ভারি মিষ্টি সে হাসি, বললেন, এবার চলি মা।

বুড়ী বলল, কাল আপনার আশ্রমে যাব বাবা?

বেশ তো যাবে।

বুড়ীর আসল উদ্দেশ্য আগেভাগে আশ্রমটা দেখে রাখা—প্রয়োজনের সময়ে যাতে পৌঁছতে দেরি না হয়।

মহেন্দ্রকে সঙ্গে করে বুড়ি একদিন আশ্রম চিনে এলো। তারপর মহেন্দ্রও বারকয়েক যাতায়াত করল। সেই আশ্রমে বসেই মহেন্দ্রকে মন্ত্র দিলেন সাধু। বললেন; সকাল সন্ধ্যায় যখন সুবিধা হবে জপ করবে। এ

ছাড়া সাধ্যমত পূজা পাঠের সময় বাড়িয়ে নিত, যোগ কাজে সুযোগ ঘটলে। কলিতে বঞ্জকল যোগের দ্বারাই অর্জন করা যায়।

শিবমন্ত্রে দীক্ষালাভ করল মহেন্দ্র।

যথাসময়ে সন্তান প্রসব করল সুরমা। ফুটফুটে ছেলে। যেন কোমল একদলা মাখন। কিন্তু মাখনের মতই কোমল থলথলে দেহ, হাত পা নাড়ল না চোখ খুলনা—অন্ধকার মাতৃজঠর থেকে আলোর জগতে এসে টুঁ শব্দটি করল না। যেন অচেতন পদার্থ। দাই তাড়াতাড়ি ছেলেকে তুলে নিয়ে হাতের দোলায় সচেতন করতে চাইল - ছেলে কাঁদুক—জীবনী লক্ষণ প্রকাশ পাক।

বুড়ী দিদিমা শাঁখ হাতে ঘরের বেশ খানিকটা দূরে দুশ্চিন্তা নিয়ে শুভ সংবাদের প্রতীক্ষা করছিল। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছিল কি গো দাই, দিদি পোয়াতির কি খবর?

মহেন্দ্র খোলা বারান্দার একধারে বসে ইষ্টমন্ত্র জপ করছিল। জপে তন্ময়তার চেয়ে উৎকণ্ঠাই প্রবল। একাগ্রতার চেয়ে অস্থিরতাই বাড়ছিল প্রতি মুহূর্তে।

ওই অতখানি দূরত্বে থেকেও আঁতুড়ঘরের জিনিস-পত্র নাড়াচাড়ার ও ফিসফাস আলাপের শব্দ ও সংকেত ধরবার চেষ্টা করছিল।

দাই নবজাতককে হাতের চেটোয় নিয়ে দোলা দিতে দিতে চাপা গলায় বলল, খোকা হয়েছে দিদিমা।'

বুড়ি অর্ন্তচবোধ ভুলে চাপা আনন্দে উৎলে উঠল, খোকা! বলে শাঁখটা মুখের কাছে তুলল।

দাই বলল, দাঁড়াও গো - ছেলে কাঁদুক আগে, যা ন্যাতাক্যাতা মেরে রয়েছে—

বুড়ি অস্থিরকণ্ঠে বলল, ওকে ভাল করে নাড়া দে কাঁদো কাঁদো।

না দিদিমা, ছেলে কাঁদছে না—কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে।

বুড়ি আর শুনল না, সাধুর সতর্কবাণী মনে পড়ল।

শাঁকটা মেঝের উপর ঠকাস করে নামিয়ে রেখে মহেন্দ্রকে উদ্দেশ করে বলল, তুমি বাবা ইষ্টমন্ত্র জপ কর—বাবাকে ডাক আমি আসছি।

বুড়ী আর দাঁড়াল না ছুটতে ছুটতে বার হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

(৮এর পাতার পর)

উঠাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে চাষী জমির মালিক হইতে পারিবেনা—মালিক হইবে দেশের জনসাধারণ অর্থাৎ দেশশাসকগোষ্ঠী। তাহা হইলে চাষীকে খাজনা দিয়া জমি ভোগ করিতে হইবে এবং সেই খাজনা ঐ উপরের হিসাবে ধরা জমির মূল্যের শতকরা ছয় টাকা প্রমাণ হইবে; অধিকও হইতে পারে। চীনদেশে শুনা যায়, যেসকল ব্যক্তির কাজ-কারবার ছিল তাহাদিগকে কাজ-কারবারের মোট মূল্যের শতকরা ছয় টাকা তাহাদিগের প্রাপ্য বলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে যে জাতীয় করিয়া লইবার জন্য ক্ষতিপূরণ করিয়া সম্পত্তি গ্রহণ করা হয়, তাহাতেও সম্পত্তির অধিকারীর যাহাই হউক একটা আয় হয়। নকসাল-রীতি তাহা হইলে দুই কারণে অর্থনীতিবর্জ্জিত হিসাবের উপর গঠিত। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি কোনপ্রকারের মূলধন ব্যবহার করিয়া ঐশ্বর্য্য উৎপাদন করে সেই ব্যক্তিই ঐ উৎপাদিত ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ অধিকারী, এই কথাটি ন্যায়সঙ্গত নহে। মূলধন, তাহা জমিই হউক অথবা যন্ত্রই হউক, সর্ব্বদাই কাহারও পরিশ্রমপ্রসূত বস্তু। সেই পরিশ্রম যে করিয়াছিল তাহার অধিকার নিশ্চিন্তভাবে নাকচ করিয়া দিয়া ঐ মূলধন পরে যে ব্যবহার করিবে তাহাকে উহার সত্তাধিকারী করিয়া দেওয়া কোনও সুনীতি বা ন্যায়ের কথা নহে। যদি সকল মূলধন সমাজের হয় তাহা হইলেও যে পরিশ্রম করিবে তাহাকে সমাজের নিকট হইতে মূলধন কোনও অর্থনৈতিক সর্ত্তে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ মূলধন ব্যবহার করিবার সুবিধার জন্য খাজনাও দিতে হইতে পারে এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা রক্ষা ও চালনার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্যও রাজকর দিবার আবশ্যকতা থাকিবে। নকসাল-পন্থা তাহা হইলে সুনিশ্চিত নহে। উহার মধ্যে যে সকল সামাজিক রীতি অন্যায় তাহার সংস্কার চেষ্টা যেটুকু আছে তাহার মূল্য নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু গায়ের জোরে নীতি বা রীতি প্রবর্ত্তনের সমর্থন করা যায় না। বর্ত্তমান সামাজিক রীতি নীতির বহু দোষ আছে। কিন্তু তাহার সংস্কার শুধু গায়ের জোর দেখাইয়াই হইতে পারে না। তাহার জন্য চাই সুচিন্তিত ও উত্তমরূপে পরিকল্পিত আদর্শবাদ। সেই আদর্শকে রূপায়িত করিতে হইলে চাই কর্ম্মশক্তি, একনিষ্ঠতা, ন্যায়-বোধ ও ত্যাগ। নিজেদের লাভ হইবে অথবা নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহা ভাবিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সেইরূপ প্রচেষ্টার ফল কখনও শুভ হয় না। কি দিতে হইবে তাহা অগ্রে ভাবিতে হইবে। প্রাপ্যের কথা পরে।
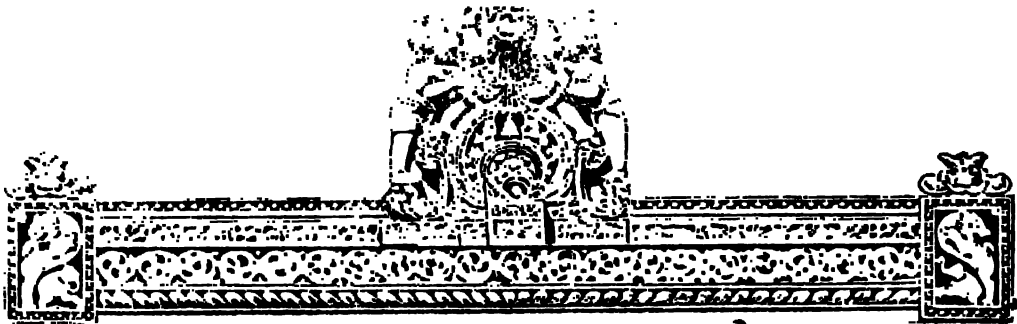
বিত্তহারা রিক্তাসনে

দিলীপ দাশগুপ্ত

লোকারণ্যে মিশে গেছি এই পৃথিবীতে।
সুউচ্চ প্রাসাদলোভীদল কিছু দিতে—
অথবা কৃপণ হোলো : আলোজলা কোনো গৃহাঙ্গন
আশ্রয়বিমুখী, তাই পথ আর পথিক সম্বল।
সিংহাসন থেকে নেমে ধূলিপথে নিঃশেষ সজ্জায়
আভিজাত্যগর্বী মুখ ঢাকি নিতো পরম লজ্জায়।
এতদিন ছিলো চাঁদ মানসীর চোখে আর মুখে,
পাতালের পানে ধেয়ে মাতালের অভিশপ্ত সুখে
অকারণে চলে চলে ক্ষয় করে শান্তির পাহাড়—
নিজ হাতে বন্ধ করে দিয়েছে সে বসন্তের দ্বার।
আজ সেই পথ বয়ে মুক্ত বায়ু—মুক্ত আলো আসে
তাকিয়ে সূর্যের দিকে শতচাঁদ দেখি এ আকাশে।
বিত্তহারা রিক্ত আমি বিপ্লবী-মধুর পৃথিবীকে—
নিজেই এনেছি ডেকে আপনার দিকে।
অপূর্ব্ব-অদ্ভুত আমি। আমি আজ বিপ্লবের নেতা।
নতুন স্বর্গের ধ্যানে আজ আমি সেই দৃঢ়চেতা
যে পারে রক্তের স্রোতে জন্ম দিতে নতুন প্রাসাদ,
আর মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা ঢেলে দিতে, যার ভিন্ন স্বাদ।
দুর্যোগ-দুর্দিন-দীর্ণ আজ মনে তাই মনে হয়,
অসত্যের শ্মশানেই জন্ম নেয় নব কিশলয়।

সন্ধানী

(The Hunter : W. J.)

অধ্যাপক—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নীল-বেণী সাগর পারে
দূর দিগন্ত রেখার ধারে
অ্যান্টিলা ও হেব্রাইডিস
অ্যাজেকা ও ক্যারিব্‌বিস
দেশের পরে দেশ পেরিয়ে
কোথায় আছে ইউকাতান্‌।
ইউকাতান্‌! ইউকাতান্‌!
মনের মাঝে শুনছি গান।

ধূসর গিরি শিখর সারি
আশে পাশে দেখব তারি
শিশুকালের হারানো ধন,
ইউকাতান! হায় স্বপন!

অনেক আগে পুঁথির পাতে
প্রথম দেখা তোমার সাথে।
অজানা কোন্‌ কল্পলোকে
রইনু চেয়ে নিষ্পলকে।
রক্তে আসে আগুন-বান
নামের জাদু 'ইউকাতান'।

তখন মলয়-স্নিগ্ধ দিবা,
প্রাণে সেদিন দিব্যবিভা।
স্বর্ণশিখা রক্তে জ্বলে,
আকুল তৃষা পলে পলে।
সেদিন পেলে 'ইউকাতান',
মর্মে তোমার পেতাম স্থান।

সে দেখা আজ ভুলে গেছি,
নেইকো মনে কি জেনেছি।
মায়াময়, ঐ দেশের তরে
গিয়েছি দেশ দেশান্তরে,
মিলল না আর সে সন্ধান,
স্বপ্নপুরী 'ইউকাতান'।

হয়তো কভু জাহাজ থেকে
রেলিঙে হাত দুটি রেখে
দেখেছি দূরে ধূসর পাহাড়।
অমনি যেন নীল কুয়াশায়
মন্ত্রমায়ায় মুগ্ধ প্রাণ
উঠল বলে 'ইউকাতান'!

ইউকাতান! ইউকাতান!
দূর সুদূর! ঢেউয়ের গান।
কূলের সীমা মিলায়ে যায়
শৈলচূড়া কোথা হারায়।
বুদ্‌বুদের পথরেখা
রইল সাগরজলে লেখা
—ঝাপসা হ'ল দুই নয়ান।
স্বপ্ন হয়েই রইলে তুমি—
ইউকাতান! ইউকাতান।

—:—

প্রকৃতির পরিশোধ

জগদানন্দ বাজপেয়ী

নাতি দূর অতীতের কোন এক
অশুভ প্রভাতে
কংগ্রেসের করধৃত অকরুণ
সে খড়্গ আঘাতে,
দ্বিখণ্ডিত ভারতের রাষ্ট্রদেহ
লুটিল ধুলায়
আজি তাহা হায়
নিয়তির নির্দেশ অনুগামী
আসিয়াছে নামি
কংগ্রেসের দেহ লক্ষ্য করি।
কৃপাণকর্তিত দেহ ভূমিতলে
যায় গড়াগড়ি।
প্রতি আবর্তিত সেই শোণিতাক্ত
তিক্ত ইতিহাস
প্রকৃতির প্রতিশোধ, নিয়তির
রূঢ় পরিহাস।
কোন ক্রুদ্ধ দেবতার ক্ষমাহীন
রুদ্র অভিশাপ
সদ্য ছেদনের ব্যথা রক্তস্রাবী
ক্ষতের সন্তাপ
মরণ বরণ করি জুড়াবার
সুযোগ না দিয়া
মৃতকল্প খণ্ড দেহে প্রাণশক্তি
দিল সঞ্চারিয়া।
মহারোষে উঠিয়া হুঙ্কারি
একে অপরের প্রতি দ্বন্দ্বযুদ্ধে
জানায় আহ্বান

উত্তরাধিকার সূত্রে লভিয়াছে
তারা যে সম্মান
কুৎসা আর কলঙ্কের
আদিম লেপনে
বিলুপ্ত করিতে তাহা প্রয়াসী
তাহারা প্রাণপণে
একে বলে সেইপূর্ণ, অন্যে বলে
পরিপূর্ণ সেই
হাস্যকর এ লীলার ইতিহাসে
তুলনা তো নেই।
ধিক্ অহমিকা
অংশ করিবারে চায় অভিনয়
পূর্ণের ভূমিকা।
খণ্ডের এই কিন্তু শেষ কথা নয়
অংশ ক্রমে ভগ্নাংশতে পরিণত
হইবে নিশ্চয়।
তারপর দ্বিখণ্ডিত কংগ্রেসের
চূর্ণ রেণুগুলি
জাতীয় সুসংহতির শ্মশানের ধূলি
মাঝে হইবে বিলীন
বহুদূরবর্তী নহে অশুভ সে
অবাঞ্ছিত দিন।
আজিও জানে না
সেই ধ্বংসস্তূপ হতে কোনদিন
সমুত্থিবে কিনা
লইয়া নূতনশক্তি সংহত নবতম
অপূর্ব মহানব্রত সাধন লক্ষ্য।

শাঁঝের ডাক

আশুতোষ সান্যাল

মৌন সন্ধ্যা নেমে আসে ঐ যৌবন-বন-ছায়রে,
কে যেন কহিছে কানে কানে ডেকে "আয়রে আয়রে
আয়রে"!

অস্ত-অচল-শয়ান সূর্য,
তবু তীব্র আলোক-তূর্য ;
কোন্ সে করাল কুহুনিশীথিনী বিভীষিকা হানি'
যায়রে, হায়রে!
বেহাগের সুরে বাঁশি তোর সুরে—আর কি ভৈরোঁ
বাজবে!
ললিতকুঞ্জ কুসুমপুঞ্জে আর কিরে মন, সাজবে!
ভেঙে যদি যাবে তোর ভরা হাট,
বৃথা কেন মায়া!—গুটিয়ে নে পাট—
শোন্ পেতে কান কার আহ্বান ধ্বনিত সান্ধ্য বায়রে,—
হায়রে!

এই সন্ধ্যার কূলে ব'সে যতো জীবনের পানে চাইরে
স্ফুটপুষ্পের সুবাসের মতো স্মৃতির সুরভি পাইরে।
কতো সুলোচনা মদবিহ্বলা
রজনী আমার করেছে উতলা,
কতো কোকিলের 'কুহু' জেগেছিল বন-বন-বীথিকায়
হায়রে!
মধুর অলস স্মৃতির বিলাস! এখনি আঁধার আ
অকূল প্লাবনে কোথা যাবো ভেসে কে কাহারে
রাখবে।
যৌবন যাক্—কোনো ক্ষতি নাই,
শেষ আভাটুকু আমি শুধু চাই ;
জীর্ণ জরার ঘৃণ্য পরশ—চাইবে কে বলো তা'য়রে,
হায়রে!
জানি, তবু নাহি নিস্তার কভু ইহসংসারে ভাইরে,
মনে যেন কোন্ তামসী ঘনায়, যেমন ঘনায় বাইরে
দেহ-মনে যেন লেগেছে ভীষণ
যৌবন-জরা-দ্বৈরথ রণ ;
এ কূল ও কূল দুকূলে তাকাই নিষ্ফল নিরুপায়রে!
হায়রে!

জনমত

অশোক চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমান জগতে যত প্রকার রাষ্ট্র গঠিত ও চালিত দেখা যায় সকল রাষ্ট্রেরই ,উচ্চতম আদর্শের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রে হয়ত রাজারানীর উপস্থিতি এখনও আছে। কিন্তু সেই সকল রাষ্ট্রেও জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণই শাসন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া সাধারণের ইচ্ছানুরূপভাবেই দেশ শাসন করিয়া থাকেন। অনেক দেশে রাজারাণী নাই, নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রের উচ্চতম নায়ক ও আদেশ নির্দ্দেশ দিবার কর্ত্তা। কিন্তু সেই সকল দেশেও রাষ্ট্রপতি কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া যথেচ্ছা শাসন চালাইতে পারেন না। তাঁহার যেসকল পরামর্শদাতা থাকেন, তাঁহারা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি, এবং সেই দিক দিয়া দেখিলে রাষ্ট্রপতি দেশবাসীর কথাতেই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। অন্য আর এক প্রকারের রাষ্ট্রও বর্ত্তমানে বহু দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। সেই সকল রাষ্ট্র হইল সমষ্টিবাদী কম্যুনিষ্ট। সমষ্টিবাদের প্রধান কথা রাষ্ট্র শাসন সংক্রান্ত নহে; তাহা হইল অর্থনীতির কথা। কম্যুনিষ্ট বা সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রে শাসনকার্য্য নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের মত লইয়াই চালিত হয় বলিয়াই নিয়ম। কিন্তু মূল কথা হইল জাতীয় ঐশ্বর্য্য ও তাহার উৎপাদন ব্যবস্থা লইয়া। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে সকল মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, চাষের জমি, বৃক্ষ, জলাশয়, ভাড়াটিয়া গাড়ী, বাড়ী ইত্যাদি সকল উৎপাদন সাহায্যকর বস্তুই কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তি সংঘের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। মানুষ মানুষকে বেতন অথবা লভ্যাংশ দিয়া হুকুমের চাকুরীতে নিয়োগ করিয়া কোনভাবে পরের শ্রমে নিজের উপার্জ্জনের সুবিধা করিতে পারিবে না, ইহাই হইল কম্যুনিজমের মূলমন্ত্র। এই নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণের অধিকার যেমন থাকিতে পারে না, অথবা বিশেষ করিয়া নিয়ন্ত্রিত ও খর্ব্বাকারে থাকিতে পারে মাত্র, তেমনি ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিবার অথবা সেই অনুসারে আজ একপ্রকার ও কাল অন্য প্রকার রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থা করিবার অধিকারও কঠোর নিয়ন্ত্রণের চাপে চিরস্থির ও অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় রূপায়িত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাহাতে কেহ না বদলাইতে পারে সেইজন্য রাষ্ট্রীয়, কৃষ্টি সংক্রান্ত, দার্শনিক, সামাজিক, সকল বিষয়েই রকমারি আলোচনা এবং নূতন নূতন মত ও পথের অনুসন্ধান কম্যুনিষ্ট নেতাগণ সুনজরে দেখেন না। কম্যুনিষ্টের রাষ্ট্র ও অর্থনীতির আদর্শ ও বিশ্বাস অভ্রান্ত এবং তাহার পরিবর্ত্তন বা সংস্কৃতি হইবে না ইহাই স্থির হইয়া আছে। এই কারণে জনমত অনুসারে আইনত সকল কার্য্য করা হইলেও সেই জনমত পুঁথিগত হইয়া গিয়াছে ও তাহার কোন পরিবর্ত্তন কেহ চাহিতে পারে না। চাহিলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধতার মতই মহা পাপ বলিয়া ধার্য্য হইবে। এরূপ অবস্থায় জনমতের কোন বৈচিত্র থাকিতে পারে না ও ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয়দলও থাকিতে পারে না। কম্যুনিষ্টদল রাষ্ট্রক্ষেত্রে একমাত্র দল। কম্যুনিজম ব্যতীত অন্য রাষ্ট্রমত থাকিতে পারে না বলিয়া ঐ সকল রাষ্ট্রে সেইজন্য রাষ্ট্রীয়দল বলিতে শুধু থাকে একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিষ্টদল। বিবাদ বিসম্বাদ যাহা হয় তাহা ব্যক্তিগত নেতৃত্ব লইয়া। কেহ আসে, কেহ যায় কিন্তু মতের আভ্যন্তরের কথা কেহ বলে না। মত সকলেরই এক, শুধু কার্য্যে কেহ ভাল কেহ মন্দ। ব্যক্তির স্বাধীনতা বিশেষ না থাকিলেও কূটতর্ক করিয়া প্রমাণ করা যায় যে সমষ্টিগতভাবে স্বাধীনতা বৃহত্তরভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। সে যাহাই হউক, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে সকল মানব এক মতে ও আদর্শে অন্তরঙ্গভাবে নিবিষ্ট আছে বলিয়া জনমত অথবা স্বাধীনতা নাই তাহা প্রমাণ হয় না। স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার জন্য জনমতের পার্থক্য থাকিতেই হইবে এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

এখন দেখিতে হইবে যেখানে জনমত বিশেষভাবে সক্রিয় ও যেখানে ততটা প্রবলভাবে কার্য্যক্ষেত্রে ব্যক্ত নহে, উভয়ক্ষেত্রেই জনমত আছে কিনা। সকল ব্যক্তি ধর্ম লইয়া তর্ক বিতর্কে নিযুক্ত হইলে কিম্বা সকলেই মত মস্তকে ধর্ম্মের কথা মানিয়া চলিলে ধর্মবিশ্বাস থাকা না থাকার প্রশ্নের একই উত্তর হয়। উত্তর এই যে ধর্মবিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহন করিলে অথবা না করিলে তাহা ধর্ম্মবিশ্বাসই থাকিয়া যায়। জনমতও তেমন কোথাও কোথাও নানা রূপ ধারণ করে এবং কোথাও কোথাও তাহা বিভেদবর্জ্জিতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

জনমত কিভাবে ব্যক্ত হয়? বর্ত্তমান জগতে ব্যাপক প্রচারের শক্তি সর্ব্বজনস্বীকৃত। অর্থাৎ যে কথা বড় গলায় বলা হয়; বেতারে প্রচারিত হয়; সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়; ক্লাবে, বার লাইব্রেরীতে, স্কুলে, কলেজে, ইউনিয়ন আফিসে ও মিটিংএ উচ্চারিত হয়; সেইসকল কথাই মূল্যবান। তাহাই জনমত এবং সকলকে তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে এইসকল প্রচার বহুক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয়-দলের নেতাদিগের নির্দ্দেশে করা হইয়া থাকে; এবং জনমত সকল সময়ে ঐ সকল নেতাদিগের স্বপক্ষে থাকে না। অতি সম্প্রতিই দেখা গিয়াছে যে বহুদল মিলিয়া নানাপ্রকার অপপ্রচার করিয়া পৃথিবীকে দেখাইয়াছিল যে বাংলার রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে তাহাদের স্থান কত উচ্চে ও তাহারা দেশবাসীর কত প্রিয়জন। কিন্তু শীঘ্রই দেখা যাইল যে দেশবাসী তাহাদিগকে ততটা প্রিয়জন বলিয়া মনে করে না। কারণ তাহারা জনমত বলিয়া যাহা সকলকে শুনাইতে লাগিল, লিখিতভাবে প্রচার করিল ও নিজেদের পারস্পরিক আলোচনাতে বিচার করিতে লাগিল, সেই সকল মতামতের সহিত জনসাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন নিকট সম্বন্ধ রহিল না। কারণ জনসাধারণ সচরাচর নিজেদের জীবনযাত্রার সুবিধাও অসুবিধা লইয়াই মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন: দার্শনিক আলোচনা অথবা উচ্চাঙ্গের রাষ্ট্র কিংবা অর্থ-নীতি লইয়া তাঁহারা কদাপি বহুসংখ্যকভাবে তর্ক-বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েন না। রাষ্ট্রীয় দলগঠন যাঁহারা করেন কূটতর্ক তাঁহাদিগেরই বিশেষত্ব; কারণ বাস্তব-ক্ষেত্রের কোন স্থির নিশ্চয়ভাবে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের রাজনীতি, সমাজ-নীতি বা অর্থনীতির কচকচির আড়ালে গা ঢাকা দিয়া কোন কাজ না করিয়া অলস ও অকর্ম্মণ্যভাবে নেতৃত্ব উপভোগ করাই রাষ্ট্রনেতাদিগের অভ্যাস এবং কর্ম্মপদ্ধতির আদর্শ বলিয়া মনে হয়। কারণ তাহা না হইলে শুধু কথার স্রোতই বহিয়া চলিতে থাকে, খাজনা মাশুল আদায় প্রবলভাবে চলিতে থাকে কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য ও বিলিব্যবস্থা কিছুই হয় না কেন? যথা দেখা যায় যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভারতের জনসাধারণের কোন সাক্ষাৎ ব্যক্তিগতও নির্দ্দিষ্ট পরিচয় আইনতঃ গ্রাহ্যভাবে কেহ প্রাপ্ত হইতে পারেন বা দিতেও পারে না। অন্য সকল সভ্য দেশে কোন মানুষ যে কে তাহা নিঃসন্দেহে জ্ঞাত হইবার একটা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহৃত নিয়ম থাকে। পরিচিতি পত্রে (card of identity) প্রত্যেক মানুষের নাম, পিতার নাম (স্বামীর নাম), বয়স, ঠিকানা, শরীরের আকার ইত্যাদির ও চেহারার বর্ণনা এবং চিত্র অবশ্যই থাকে। ভারতবর্ষে নির্ব্বাচনের সময় লক্ষ লক্ষ ভোট যেমন তেমন করিয়া প্রদত্ত হয় এবং পরিচিতি পত্র অথবা পরিচয় গ্রহণের কোন ব্যবস্থা কেহ করে না। কারণ মিথ্যা ভোট না হইলে নেতাদিগের বিশেষ অসুবিধা হয়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে আরও অনেক সহজসাধ্য ব্যবস্থা না করিয়া অন্যায়ের নানা পথ উন্মুক্ত রাখা হয়। কোন রাষ্ট্রীয়দলই সেই সকল পথ রুদ্ধ করিবার কোন চেষ্টা অদ্যাবধি করিবার চেষ্টাও করেন নাই। সামাজিক রীতির ক্ষেত্রে প্রায় সকল দুর্নীতি, কুসংস্কার, অন্যায়, অবিচার প্রবল-ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ লইয়া মানুষকে পুড়াইয়া মারাও চলিতেছে; কন্যার বিবাহ দিতে পিতাকে ভিখারীর অবস্থায় পড়িতে হইতেছে; দুধে জল ও ভেজাল খাদ্যের জন্য বহু শিশুর প্রাণ যাইতেছে; চুরী, ঘুষ, তার কাটা, ওয়াগন ভাঙ্গা, খুনখারাপি সর্ব্ববিস্তৃতভাবে চলিতেছে। অপরাধ-প্রবণতায় মগ্ন হইয়া থাকিয়া ও দেশবাসীর উপর জোর-

জুলুম করিয়া যাঁহারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন তাঁহারাই আবার নীতিসংক্রান্ত বক্তৃতা দিয়া সকল ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাওয়ার কথাটাই উচ্চকণ্ঠে বলা হইতেছে। কর্তব্যকর্ম করিবার কথা চাপা থাকিতেছে কারণ অন্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে একজনের কাজ করিতে দুই, তিন অথবা চার ব্যক্তিও নিযুক্ত হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের যে দুইটি প্রধান কারণ তাহার মধ্যে একটি হইল ব্যক্তিগত উৎপাদনশক্তি পূর্ণরূপে ব্যবহৃত না হওয়া এবং অন্যটি হইল বেকার অবস্থা। রাষ্ট্রনেতাগণ কথাটি জানেন না এমন নহে; কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতিসাধন চেষ্টা করিতে তাঁহাদিগের কোন উৎসাহ আমরা দেখিতে পাই না। রাষ্ট্রনেতাগণ নিজেরাও যে নিজেদের উৎপাদনশক্তি কোনরূপে ব্যবহার করেন তাহা আমরা জানিনা; তাঁহাদিগের অনুচরগণও একই পথের পথিক। সুতরাং ভারতের মানুষ উৎপাদনকার্যে হয় নিযুক্ত হইবার সুযোগ পায় না, নতুবা নিযুক্ত হইলে যথেষ্ট কাজ করেনা। দারিদ্র্যের কারণ প্রকট ও প্রবল কিন্তু তাহার প্রতিকার করিতে যেসকল রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহা হইবার উপায় নাই। কারণ অল্পসংখ্যক নেতৃত্বভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাস্তব উদ্দেশ্য বর্জিত গুরুগিরির ধাক্কায় জনমত অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। রাষ্ট্রমতের উদ্দেশ্যহীন বুকনির কোনও চাপ জীবনযাত্রা নির্বাহ পদ্ধতির উপর পড়েনা বলিলেই চলে।

সুতরাং জনমত ব্যক্ত হইবার যে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক আবশ্যকতা থাকে; জনমতের পরিবর্তে কয়েকজন তথাকথিত নেতৃত্বাধিকারী ব্যক্তির কষ্টকল্পিত ও উদ্ভট প্রেরণালব্ধ নূতন জগত গঠন পরিকল্পনার চোঁয়াটে, আবছা ও অনিশ্চিত বর্ণনা হইতে সে প্রয়োজন-সিদ্ধি সম্ভব হয় না। তাঁহাদের কথাগুলির অর্থ থাকিলেও কথাগুলি নিরর্থক আবেগে উচ্চারিত। কারণ অর্থ থাকার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় কোন পরিকল্পনার জনমঙ্গল সৃজন ক্ষমতা হইতে। মঙ্গল উদ্ভব ক্ষমতা না থাকিলে অর্থও থাকে না। দার্শনিক, আধ্যাত্মিক বা নৈয়ায়িক বিশ্লেষণে কোন গূঢ় অর্থ প্রকাশ পাইলেও তাহাদ্বারা মানবজীবন যদি সুগম, উন্নত, অধিক উপভোগ্য ও প্রাণবান হইয়া না উঠে তাহা হইলে সে অর্থ থাকা না থাকা সমান। গূঢ় অর্থ নির্দ্ধারণ বুদ্ধি ব্যবহারে এমন হইতে পারে যে তাহাতে বিষয়টা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়ায়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের হিং টিং ছট কবিতাতে তিনি ১২৯৯ বঙ্গাব্দে হবুচন্দ্র রাজার স্বপ্নের অর্থ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"হবুচন্দ্র রাজের আজ দিন ছয়সাত
চোখে কারো নিদ্রা নাই পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়া নত করি শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।

রাজা হবুচন্দ্র পৃথিবীর সকল দেশের পণ্ডিত ডাকাইয়া আনাইয়াও স্বপ্নে শ্রুত হিং টিং ছট কথার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলেন না।

"কোনখানে নাহি পায় অর্থ কোনরূপ
বেড়ে ওঠে অনুস্বর বিসর্গের স্তূপ—।"

ইহার পর ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতি যাহারা আসিল তাহারাও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারিল না। শেষ অবধি আসিল এক বাঙ্গালী

"যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।

* * *

স্বপ্ন কথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া।
'নিতান্ত সরল অর্থ অতি পরিষ্কার।
বহুপুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সংবর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।

এভাবে গূঢ় অর্থ নির্ণয় চলিতে থাকিল ও শেষ অবধি

"ত্রয়ীশক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট
সংক্ষেপে বলিতে গেলে 'হিং টিং ছট্'"

বলিয়া বাঙ্গালী পণ্ডিত সমস্যার সমাধান করিলেন। সকলে কথাটার অর্থ বুঝিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

কবিতাটির উদ্দেশ্য অর্থহীনতার অর্থহীন ব্যাখ্যা করিয়া অর্থ উদ্ধার করার হাস্যকর অভ্যাস আমাদিগের মনে কিভাবে জাগ্রত থাকে তাহা দেখান। হবুচন্দ্ররাজা রাষ্ট্রের প্রতীক ও তাঁহার স্বপ্নের সহিত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। মহাকবি প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে এখনকার মানসিক প্রগতির কথা অনুমান করিয়া কবিতাটি লেখেন নাই; কিন্তু তথা-কথিত উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারার দুর্বোধ্য অসারতাই হাস্যরসে ব্যক্ত করিয়াছেন।

যে জনমত পরিষ্কারভাবে উদ্দেশ্যসিদ্ধির আগ্রহে ব্যক্ত হইলে রাষ্ট্রনায়ক ও আমলাদিগকে কিছু কিছু কাজ করিতে হয়, সে জনমত ব্যক্ত না হইলেই জননেতা-দিগের সুবিধা হয়। গূঢ় অর্থবহুল মতবাদ প্রচার এই কারণে জননেতাগণ বিশেষভাবে পছন্দ করেন। কারণ তাহাতে জনসাধারণ বলিতে পারে না "সর্ব্ব সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা কর, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া বন্ধ কর, চিকিৎসার ও ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা আরও উত্তম করিতে হইবে, চালের দাম হ্রাস করিতে হইবে, অল্প ভাড়ায় উৎকৃষ্ট বাসস্থান নির্ম্মাণ কর ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাব্যতীত ট্যাক্স, মাশুল, রেলভাড়া, প্রভৃতি কম করিবার কথাও কেহ বলিতে পারিবে না। সকলে মিলিয়া শুধু অর্থনৈতিক মতবাদের মূল কথার অতি গূঢ় অর্থ লইয়া জনসাধারণকে মন্ত্র পড়াইয়া নব নব রাষ্ট্রমন্ত্রে দীক্ষা দিবার চেষ্টা করিতে গভীরভাবে নিবিষ্ট থাকিবেন। ফলে জাতির উন্নতির কথা কোনক্ষেত্রেই বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং নেতৃত্বের কোন সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য কখনও বাস্তবরূপ ধারণ করিবে না।

ভারতীয়দিগের তুলনায় যেসকল দেশ রাষ্ট্রক্ষেত্রে বহু উন্নত সেইসকল দেশের মানুষ যখন নিজেদের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগকে শাসনভার দান করে তখন তাহারা ঐসকল ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে আয়কর পাউণ্ডে বা ডলারে কত শিলিং বা সেণ্ট হইলে তাঁহারা কার্য্যে বহাল থাকিতে পারিবেন। সিগারেট অথবা বিয়ারের মূল্যও অনেক সময় নির্ব্বাচনের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বেকারসমস্যা ও বেকার ভাতার পরিমাণ কখন কখন উচ্চারিত হয়। দার্শনিক তত্ত্বকথা লইয়া কদাপি আলোচনা হয় না। রাষ্ট্রীয় দলগুলিও জীবনযাত্রার সহজ সরল কথা লইয়াই ভোটদাতাকে নিজেদের সপক্ষে আনিবার চেষ্টা করে। গভীর ও গূঢ় অর্থ বিশ্লেষণে তাহারা যায় না। ইহার কারণ রাষ্ট্রকর্ম্মের ক্ষেত্র প্রগতিশীল জাতিদের জনমত অনুসারে জীবনের সহজ সরল দিন কাটাইবার ক্ষেত্র মাত্র। সেখানে জটিল মতবাদের কোন স্থান নাই। যদি কেহ দুর্বোধ্য কথার অবতারণা করে তাহা হইলে তাহাকে জনসাধারণ সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। কারণ কোন দলকে সমর্থন করা হইবে কিনা তাহা নির্ভর করিবে সেই দলের জনসেবার ক্ষমতা ও প্রতিশ্রুতির উপর। সোজা কথায়, শাসনভার দেওয়া না দেওয়া একটা লেনদেনের কথা। যেভাবে দেশ শাসন করা হইলে জনগণের তুষ্টি হইবে তাহা বুঝিয়া বলিতে হইবে দেশবাসী কি দিবে এবং কি পাইবে। ব্যাঙ্ক বা বীমা প্রতিষ্ঠান জাতীয় সম্পত্তি হইলে কাহার কি লাভ হইবে তাহা বলা যায় না। ক্ষতিও হইতে পারে অনেকের। দেশের হাজার করা একজন মানুষ উচ্চ খাজনায় চাষের জমি পাইলে যে ৯৯৯ জন বাকি থাকিয়া যাইবে তাহারা কিজন্য কোন দলের প্রার্থীকে ভোট দিবে? বাস্তব লাভ লোকসানের কথা যাহারা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারে ও বুঝিতে চায় সেইসকল জাতির লোকেরা জনমত বাস্তবের ভাষায় কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া ব্যক্ত করিতেও জানে এবং দলপতিদিগের নিকট সেইসকল কথার সোজা উত্তর শুনিতেও চায়। ভারতের মানুষ সহজ সরল ভাষায় নিজেদের আকাঙ্খা ব্যক্ত করিতেও পারেনা এবং তাহাদের জন-নেতাগণও কোন কথার সোজা উত্তর দিতে জানেনও না, দিতে চাহেনও না। নেতা ও সাধারণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা কতটা পরস্পরের উপর পূর্ণ বিশ্বাসের ও কতটা প্রতারণার তাহা বলা সহজ নহে। জনসাধারণের নেতাদিগের উপর বিশ্বাস আছে কিছু কিছু। নেতারাও যে জনসাধারণের হিতাকাঙ্খী একেবারেই নহেন তাহাও

সত্য নহে। কিন্তু এই পারস্পরিক সম্বন্ধ সহজ সরল বোঝাপড়ার আলোকে উদ্ভাসিত নহে। দুর্বোধ্য জটিল মতবাদের কুয়াশাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে কোন প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিরই পরিষ্কার কোন অর্থ বা মূল্য থাকে না। গণতান্ত্রিক আদর্শ উপলব্ধি যদি শতকরা একশত হয় তাহা হইলে আটঘন্টা পরিশ্রম করিলে যে মজুরী পাওয়া যাইবে তাহাতে বাসগৃহের ভাড়ার, খাওয়াপরার খরচের, লেখাপড়ার, চিকিৎসার, সামাজিক প্রয়োজনের ও বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন কিছু সঞ্চয়ের ব্যবস্থা হইবে কি? চাকুরী না থাকিলে বেকার ভাতা কতটা হইবে? চাকুরী শতকরা ১০০ শত উমেদারের জুটিবে কি না। গণতান্ত্রিক প্রাপ্যের ইস্তাহারের কোন কোন বস্তু বা ব্যবস্থা কাহার কতটা জুটিবে ও কি উপায়ে জুটিবে তাহা কে কাহাকে বলিয়াছে? শোষণহীন সমাজগঠিত হইলে কেহ অপরের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে পারিবে না। কিন্তু সকলের পরিশ্রম করিয়া নিজ নিজ ভরণপোষণ করিবার আয়োজন কতটা ও কিভাবে হইবে? কম্যুনিজমের পুরাতন কথা ছিল সকল মানুষ নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে পরিশ্রম ও উৎপাদন করিবে এবং সকলেই সমাজের নিকট হইতে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে ভোগের মাল মশলা পাইতে পারিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তখন দেখা গিয়াছিল যে মানুষের উৎপাদন সসীম এবং ভোগের প্রয়োজন উৎপাদনের তুলনায় অসীম। সেই জন্য ষ্টালিন নিয়ম করিয়া দিলেন যে সকল মানুষ যেরূপ ক্ষমতা অনুসারে উৎপাদনকার্য্য করিবে তাহারা ভোগের সময় সেইরূপ উৎপাদন অনুসারে ভোগ্য ক্রয়ক্ষমতা অর্জন করিবে। অর্থাৎ একপ্রকার ফুরণের হিসাবে সকলের উপার্জ্জন-ব্যবস্থা করা হইবে। সেই ফুরণের ব্যবস্থা করিবার সময় সামাজিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য উৎপাদনের অনেকাংশ ফল উৎপাদক ব্যক্তিগণ পাইবে না। সেই অংশটিকে রাজকর বা যাহাই বলা হউক তাহা ব্যক্তির পরিশ্রমেরই ফল। অর্থাৎ ব্যক্তি ব্যক্তিকে শোষণ না করিলেও ব্যক্তিসংঘ বা সমাজ ব্যক্তির পরিশ্রমের ফল ব্যক্তিকে পূর্ণ উপভোগ করিতে দিবেন না। ইহা একপ্রকারের শোষণ কি না তাহার বিচার তাত্ত্বিকের ক্ষেত্রে চলিয়া যায়। সে যাহাই হউক ব্যক্তি পরিশ্রম করিবার সুযোগ কতটা পাইবে ও তাহা হইতে কাহার কি পাওনার ব্যবস্থা হইবে তাহা দ্ব্যর্থবর্জ্জিতভাবে বলা হইতেছে না কেন? কংগ্রেসী আমলে স্বাধীনতার কথা শুনিয়া শুনিয়া ভারতের মানুষ শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের নিকট কি পাইয়াছিল? এখন কম্যুনিষ্টদিগের গণতান্ত্রিক স্বর্গ ও শোষণবর্জ্জিত 'ইউটোপিয়া'র প্রকৃত দেনা-পাওনার দিকটা না জানিয়া, না বুঝিয়া, শুধু বুকনির উপর নির্ভর করা কতটা বুদ্ধির কার্য্য হইবে তাহা বিচার করা আবশ্যক। বিশেষ করিয়া কম্যুনিজম চরম একাধিপত্যের কারবার। রাজশক্তি পার্টির হাতে একবার তুলিয়া দিলে আর তাহা ফিরাইয়া লওয়া যাইবে যাইবে না। সময় থাকিতে সকল কথার পূর্ণ অর্থ বুঝিয়া ও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে রাষ্ট্রীয়-দলগুলিকে ও তাহার নেতাদিগকে কতটা যথেচ্ছা করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। আমরা যাহা বুঝি তাহাতে মনে হয় কোন দল বা কোন নেতা-গোষ্ঠীই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। সুতরাং কাহাকেও সর্ব্বশক্তিমান হইতে দেওয়া আমাদিগের পক্ষে নিরাপদ নহে। কম্যুনিজম একমাত্র রাষ্ট্রদলের রাজত্ব স্থাপন করে। সুতরাং কম্যুনিজম একটি দলকে সর্ব্বশক্তিমান করে। সেই হিসাবে কম্যুনিজম জাতির ও ব্যক্তির অধিকার রক্ষার দিক হইতে নিরাপদ নহে। যেদেশে কোন দল বা ব্যক্তিই পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে সে-দেশে একাধিক রাষ্ট্রীয় দল থাকাই বাঞ্ছনীয়।

দীনবন্ধু সি, এফ, এণ্ডরুজ

চিন্ময়ী বসু

ভারত-পথিক

সি, এফ, এণ্ডরুজ। চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ। আমাদের কাছে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ নামেই বেশী পরিচিত তিনি। এণ্ডরুজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের নিউ কাসল্ শহরে। তাঁর পিতার নাম ছিল জন এড্‌উইন্ এণ্ডরুজ এবং মাতার নাম ছিল শার্লট এণ্ডরুজ। চৌদ্দজন ভাইবোনের মধ্যে চার্লস বা চার্লি ছিলেন চতুর্থ। তাঁর পিতা ও পিতামহ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ। তাঁদের বাড়ীতে ছিল একটি সুন্দর পবিত্র পরিবেশ। এই ধার্মিক পরিবেশেই এণ্ডরুজ বড় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর স্বভাব ও ব্যবহারে ছেলেবেলা থেকেই কতগুলি বিশেষ গুণ দেখা গিয়েছিল। ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। মাকে তিনি খুব ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। রোজ সন্ধ্যায় তিনি ও অন্যান্য ভাইবোনগণ মিলে মায়ের সঙ্গে উপাসনা করতেন। উপাসনারত মায়ের সেই মধুর ও স্বর্গীয় রূপ দেখে এণ্ডরুজ মুগ্ধ হয়ে যেতেন। বড় হয়েও তিনি অনেক সময়েই বলতেন, "আমার মায়ের মমতাময়ী ও স্নেহশীল মুখ মনে রেখেই আমিও সকলের প্রতি স্নেহশীল হওয়ার চেষ্টা করি।"

বাল্যকাল থেকেই এণ্ডরুজ অত্যন্ত সৌন্দর্যপ্রিয় ছিলেন। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মনোরম তাতাই তাঁর মনকে জয় করে নিত। বাবা, মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে চার্চে যেতেন তিনি উপাসনা করতে। চার্চের সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন। সেখানকার সব কিছুই তাঁর খুব ভাল লাগত। অবাক বিস্ময়ে তিনি সব কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন।

খুব ছোট বয়সেই এণ্ডরুজ তাঁর অন্যান্য ভাইবোনদের সঙ্গে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিলেন। লেখাপড়াতে ছিল তাঁর খুব আগ্রহ। বাড়ীতে তাঁর বাবা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার যত্ন নিতেন ও দেখাশোনা করতেন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যও যাতে সুগঠিত হয় সেজন্য তিনি তাদের নানারূপ খেলাধুলায়ও সর্বদা উৎসাহ দিতেন। ছোটবেলা থেকেই এণ্ডরুজ সাঁতার, ক্রিকেট খেলা ইত্যাদিতে অত্যন্ত পটু হয়ে উঠেছিলেন। স্কুলে এই সব খেলাধুলায় তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভাল কবিতাও লিখতে পারতেন তিনি। স্কুল-জীবনেই তাঁর কিছু কিছু কবিতা ছাপা হয়েছিল। একটু বড় হয়ে এণ্ডরুজ তাঁর বাবার কাছে শুনেছিলেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষ নামে একটি সুন্দর দেশ আছে। অনেক কৌতূহল নিয়ে তিনি বাবার কাছ থেকে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের কথা, তাদের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার এবং অন্যান্য বিষয়ে বহু চমকপ্রদ গল্প শুনতেন। এইসব কাহিনী শুনে শুনে ছেলেবেলা থেকেই এণ্ডরুজের ভারতবর্ষ দেখার খুব ইচ্ছা হল। একদিন তিনি তাঁর মাকে এসে বললেন, "মা এখন থেকে রোজ তুমি আমাকে কিছু কিছু ভাত খেতে দেবে। বাবা বলেছেন যে ভারতবর্ষে সকলে ভাত খায়। বড় হয়ে আমিও সেখানে যাব তো। তাই আমাকে ভাত খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে"। মা তো ছোট এণ্ডরুজের এই কথা শুনে হেসেই অস্থির।

এণ্ডরুজ-পরিবারের আর্থিক অবস্থা প্রথমে ভালই ছিল। কিন্তু পরে তাঁদের অত্যন্ত আর্থিক কষ্টে পড়তে হয়েছিল। অর্থাভাবে এণ্ডরুজের বড় ভাই স্কুল ছেড়ে দিয়ে কাজে লেগেছিলেন কিছু অর্থ উপায়ের জন্য। অল্পদিনের টাকায় এণ্ডরুজের স্কুলে পড়ার খরচ কোনও রকমে চলতে লাগল। তাঁর মা কঠোর পরিশ্রম শুরু করলেন সংসারের জন্য। খুব মিতব্যয়িতার সঙ্গে তিনি চলতেন যাতে সংসারে কোনও অভাব দেখা না দেয়।

মায়ের কাছ থেকেই এণ্ডরুজ মিতব্যয়িতা শিখেছিলেন। সব কিছুর সদ্ব্যবহারের দিকে ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি।

ছেলেবেলা থেকেই এণ্ডরুজ মেধাবী ছিলেন। ক্লাসের সব পরীক্ষার ফলই ভাল করতেন তিনি। সব সময়ে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। স্বভাবে ছিলেন তিনি অত্যন্ত লাজুক, চুপচাপ ও গম্ভীর প্রকৃতির—কিন্তু বিতর্কে ছিলেন সুদক্ষ। স্কুলে রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি যে কোনও বিষয়ের বিতর্কেই এণ্ডরুজ অংশগ্রহণ করতেন তাতেই যথেষ্ট সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করতেন। ছবি আঁকতেও পারতেন ভাল। তাঁর আঁকা অনেক ছবি এখনও সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। নানারকমের ভাষাও শিখেছিলেন এণ্ডরুজ।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় এণ্ডরুজ কৃতিত্বের সঙ্গে জলপানি পেয়ে পাশ করেছিলেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি কলেজ জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর বাবা ও মায়ের ইচ্ছা ছিল এণ্ডরুজ বড় হয়ে বাবার মত ধর্ম-যাজক হন। তাঁদের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে এণ্ডরুজ যারপর নেই আনন্দিত হয়েছিলেন। কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানারূপ জনসেবার কাজ করতেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল সহরের আশপাশের বস্তিগুলিতে—যেখানে দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, অশিক্ষিত লোকেরা সব বাস করত। এণ্ডরুজ তাদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য নানা রকমের চেষ্টা করতেন। ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে তিনি বস্তীবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার খবর নিতেন। তাদের অভাবগ্রস্ত শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত দুঃখবোধ করতেন। তিনি মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন বস্তীবাসীদের দুঃখ দূর করার। বস্তীতে সেবার কাজ করতে গিয়ে এণ্ডরুজকে অনেক সময়ে বিপদে পড়তে হয়েছিল। বস্তীর অসাধু, দুষ্ট লোকেরা তাঁর এইসব কাজ পছন্দ করত না অনেক সময়ে। তাঁর উপর বিরক্ত হত এবং তাঁর কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করত। অনেক লোকই তাঁর সৎ উদ্দেশ্য না বুঝে তাঁকে গালাগাল করত। কিন্তু যিশু-ভক্ত দয়ালু হৃদয় এণ্ডরুজ এইসব ব্যবহারে কিছু মনে করতেন না। হাসিমুখে তিনি তাদের ক্ষমা করতেন এবং তাদের সাহায্যের জন্য আবার এগিয়ে যেতেন। তিনি মনে করতেন, দুঃখীজনের সেবা করাই হল ভগবান যিশুকে সেবা করার শ্রেষ্ঠ পন্থা।

এণ্ডরুজের স্বভাবে দয়ার সীমা ছিল না। অন্যের প্রয়োজনকে তিনি সর্বদা নিজের প্রয়োজন থেকে বেশী বলে মনে করতেন। একবার এণ্ডরুজ কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, পথে একটি লোক তাঁর কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চাইল। এণ্ডরুজ তাঁর পকেটের সব পয়সা লোকটিকে দিয়ে দিলেন। এমনকি গাড়ী ভাড়ার পয়সা পর্যন্ত রাখেন নি। তারপর অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে তিনি বাড়ী ফিরেছিলেন। এরকম ঘটনা তাঁর জীবনে অনেকবারেই ঘটেছিল।

সব কাজেই ছিল এণ্ডরুজের দৃঢ় সংকল্প। যে কাজেই তিনি হাত দিতেন, তা যত কঠিনই হক না কেন, তিনি শেষ না করে ছাড়তেন না তাকে। শত অসুবিধার মধ্যে পড়লেও তিনি পিছু হটতেন না কখনও। এই দৃঢ় মনোভাবের জন্যই তিনি জীবনে সব কাজে সফলতা লাভ করতে পেরেছিলেন। এণ্ডরুজ সারাদিনই পরিশ্রম করতে পারতেন। তাঁর সহৃদয় ব্যবহারের জন্য বন্ধু জুটেছিল অনেক। তাঁর সহচর্যে বন্ধুরা খুব আনন্দবোধ করতেন। অনেক সময় এমন হত যে গভীর রাত পর্যন্ত বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে যেতেন। তারপর মাত্র কুড়ি মিনিট সময় ঘুমিয়ে উঠে এণ্ডরুজ তাঁর লেখাপড়ার কাজ শুরু করতেন। ঐ কুড়ি মিনিটই হত তাঁর সারাদিনের বিশ্রাম।

এণ্ডরুজ মনে করতেন প্রেম হল ভগবানের প্রতীক। প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে মানুষের সেবা করাকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে গ্রহণ করেছিলেন। ইংলণ্ডের ডক ও জাহাজ কর্মীদের দুরবস্থা দেখে তিনি খুব দুঃখবোধ করতেন। তিনি দেখেছিলেন নামমাত্র পয়সার জন্য শ্রমিকরা কী অস্বাভাবিক পরিশ্রম করতে বাধ্য হত। কোন কোন শ্রমিক কঠোর পরিশ্রম করেও সপ্তাহে মাত্র আঠার শিলিং পেত। সেই সামান্য অর্থেই অতি কষ্টে তারা সংসার চালাত, পাঁচ ছয় জন লোককে খাওয়াতে হত। ওই সব শ্রমিকদের আর্থিক কষ্ট নিজে যাচাই

করে দেখার জন্য এণ্ডরুজ একবার ঠিক করলেন যে সপ্তাহে দশ শিলিং এর বেশী তিনি নিজের জন্য ব্যয় করবেন না। এই পরীক্ষায় তিনি দেখেছিলেন যে খুব হিসাব করে চললেও এই পয়সায় দিনের খরচ চালাতে গিয়ে তাঁকে প্রায়দিনই রাত্রের খাওয়া বাদ দিতে হত—কোনও পুষ্টিকর খাদ্য তো জুটতই না। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করে গেছেন।

কলেজে পড়া শেষ করে এণ্ডরুজ লণ্ডন পেম্ব্রোক কলেজ মিশনে যোগদান করেন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে। সেখানেও তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে আরম্ভ করেছিলেন। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পেম্ব্রোক কলেজ মিশনের কাজ ছেড়ে দিয়ে ক্লার্জি ট্রেনিং স্কুলের উপাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। এই সময় এণ্ডরুজ শিক্ষাদান এবং নিজের লেখাপড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কিছুদিন পরেই তাঁর স্বপ্নের দেশ ভারতবর্ষে যাবার জন্য তাঁর ডাক পড়ল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডন ছেড়ে এণ্ডরুজ ভারত অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ এণ্ডরুজ বোম্বাইতে এসে পৌঁছেছিলেন। এই দিনটিকে তিনি তাঁর "ভারতীয় জন্মদিন" বলতেন। বোম্বাই থেকে তিনি চলে যান দিল্লীতে। সেখানেই সেণ্ট ষ্টীফেন্স্ কলেজে তিনি কাজে যোগ দিয়েছিলেন। দিল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং অন্যান্য সব কিছুই এণ্ডরুজকে মুগ্ধ করেছিল। প্রথম দর্শনেই তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষকে তিনি অতি আপনার বলে গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লীর সেণ্ট ষ্টীফেন্স কলেজে তখন উপাধ্যক্ষরূপে কাজ করছিলেন একজন ভারতীয় খ্রীষ্টান। তাঁর নাম ছিল সুশীলকুমার রুদ্র। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে এণ্ডরুজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। রুদ্র মহাশয়ের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। তিনি বলতেন, "সুশীল রুদ্রের কাছে যা আমি পেয়েছি পৃথিবীতে আর কারও কাছে তা পাইনি আমি"। রুদ্র মহাশয়ের কাছ থেকেই এণ্ডরুজ ক্রমে পরাধীন ভারতবর্ষের নানা দুঃখ-দুর্দশার কথা জানতে পেরেছিলেন। এইসব কাহিনী শুনে তিনি বড়ই দুঃখবোধ করতেন। তাঁর স্বদেশীয় ইংরেজরাই ভারতবাসীদের উপর অন্যায়-অবিচার করত—এই কথা ভেবে তিনি অত্যন্ত লজ্জাবোধ করতেন। তিনি মনে করতেন, নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতায় সকল দেশেরই সমান অধিকার। কোনও দেশের স্বাধীনতা হরণ করে নেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। পরাধীন ভারতবর্ষ যাতে তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা লাভ করতে পারে সেইজন্য এণ্ডরুজ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ভারতীয়দের মধ্যে জাতিভেদপ্রথা দেখে এণ্ডরুজ অত্যন্ত দুঃখবোধ করতেন। তিনি মনে করতেন যে যে এই জাতিভেদ-নীতিই হয়তো ভারতের স্বাধীনতা লাভে একদিন বাধার সৃষ্টি করবে। তিনি সেণ্ট ষ্টীফেন্স কলেজের ছাত্রদের জাতিভেদপ্রথা দূর করার জন্য উপদেশ দিতেন। জাতি, বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে সকলের সেবা করার জন্য তিনি কলেজের ছাত্রদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে এণ্ডরুজ নিজেই অস্পৃশ্যদের সেবা এবং ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের উদ্ধারের কাজে এগিয়ে যেতেন। দেশের উন্নতি করতে হলে জাতীয় ঐক্য প্রথমেই দরকার—একথা তিনি সর্বদা ছাত্রদের মনে করিয়ে দিতেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপারে ছাত্ররা যাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এণ্ডরুজ সেইরূপ চেষ্টা সব সময় করতেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়ে তিনি নিজেও অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এই আগ্রহের বশেই তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতার অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। সেখানেই তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি দাদাভাই নওরোজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ক্রমে গোপালকৃষ্ণ গোখলে, লাজপৎ রায়, তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রভৃতি ভারতীয় জাতীয় নেতাদের সঙ্গে এণ্ডরুজের পরিচয় হয়েছিল।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট ষ্টীফেন্স কলেজের অধ্যক্ষের পদ খালি হয়েছিল। তখন কেম্ব্রিজ কলেজ মিশন এণ্ডরুজকে

ওই অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করা ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এণ্ড্রুজ এ প্রস্তাবকে অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করেছিলেন। তাঁর বয়ঃজ্যেষ্ঠ সুশীল রুদ্র মহাশয় বহুদিন থেকেই উপাধ্যক্ষরূপে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করছিলেন। রুদ্র মহাশয়কে বাদ দিয়ে তাঁকে অধ্যক্ষ করা! এণ্ড্রুজ এ অন্যায় কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর দৃঢ় মনোভাবের জন্যই মিশন কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত সুশীল রুদ্রকে অধ্যক্ষপদ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়ের ইংরেজ শাসনে একজন ভারতীয় 'নেটিভের' অধীনে কোনও ইংরেজ কাজ করবে—এ-কথা কেহ কল্পনায়ও আনতে পারত না। কিন্তু এণ্ড্রুজের উদারতা ও দৃঢ়তার জন্য তাও সম্ভব হয়েছিল। এণ্ড্রুজ রুদ্র মহাশয়ের অধীনে থেকেই আনন্দের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এই ব্যাপারে ইংরেজরা এণ্ড্রুজের উপর খুব চটে গিয়েছিল। এই বছরেই বাংলা দেশকে ভাগ করার প্রস্তাব আনা হয়েছিল। ইতিপূর্বে বর্তমানের আসাম, বিহার, উড়িষ্যা—এই তিনটি প্রদেশই বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে বাংলার জনগণের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল এবং ইহার বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ছাত্রদের মধ্যেও এই আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌঁছেছিল। ক্লাসে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এণ্ড্রুজ ভারতীয় ছাত্রদের জাতীয় আন্দোলনকে উৎসাহ দিতেন। ফলে ইংরেজ সরকার এণ্ড্রুজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচর লাগিয়েছিলেন তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। কলেজের ছাত্রদের উপরও কড়া নজর রাখা হত।

কলেজের ছাত্রদের এণ্ড্রুজ খেলাধুলায়ও খুব উৎসাহ দিতেন। বিশেষ করে ক্রিকেট-খেলায় ছিল তাঁর বেশী আগ্রহ। খেলার মাঠে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুর মত এক হয়ে মিশে যেতেন। সারাদিনই তিনি পরিশ্রম করতেন। ভারতের সঙ্গে পরিচয় বাড়াবার জন্য এণ্ড্রুজ ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন। যেখানেই যেতেন সেখানেই তিনি ইংরেজ মিশনারীদের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় করিয়ে দিতেন এবং ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের খবর তাঁদের জানাতেন। তিনি সকলের কাছেই বলতেন যে, পুরো স্বাধীনতা ব্যতীত ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি ভারতবাসীদের ধর্মের গোঁড়ামি ত্যাগ করার কথা বলতেন। তাঁর কাছে সব ধর্মই সমান ছিল। ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার জন্য এণ্ড্রুজ হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ পাঠ করেছিলেন। একদিকে যেমন হিন্দু সাধু স্বামী রামতীর্থ তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলেন, অপরদিকে মুসলমান-সাধক মৌলভী জাকাউল্লাকে তিনি একান্ত বলে মনে করতেন।

বিশেষ কাজের ডাকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ড্রুজ আবার লণ্ডনে গিয়েছিলেন। সেই বছরই লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। ইতিপূর্বে দুজনই পরস্পরের নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সাক্ষাৎপরিচয় ছিল না তাঁদের। প্রথম দর্শনেই তাঁরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনই এণ্ড্রুজ ইংরেজ কবি ইয়েট্‌সের মুখে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদের আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই এণ্ড্রুজের মনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে অপার ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা দেখা দিয়েছিল তা পরবর্তী সময়ে ক্রমে আরও বেড়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই তিনি বাংলা ভাষা শেখার সংকল্প করেছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র এবং সাধনাস্থান শান্তিনিকেতনে প্রথম এসেছিলেন। সেখানকার ছাত্রগণ তাঁদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বন্ধু হিসাবে এণ্ড্রুজকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ এবং সহজ সরল জীবনযাত্রা এণ্ড্রুজকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। তাঁর খুবই ইচ্ছা হয়েছিল সেখানে থেকে তিনি সেখানকার কর্মীদের কাজে সাহায্য করেন। কিন্তু দিল্লীর কলেজের কাজ তখন তাঁর পক্ষে ছাড়া সম্ভব ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে কলেজের গ্রীষ্মের ছুটিতে আবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এবং সেখানে

সাহায্যের কাজে লেগেছিলেন। ক্রমে ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। এই পরিচয়ের মধ্য দিয়ে এণ্ডরুজ কলকাতার ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন।

ভারতের বাইরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে বসবাসকারী ভারতীয়দের সম্বন্ধেও এণ্ডরুজ খোঁজখবর করতেন। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য তিনি খুবই চিন্তা করতেন। সেখানে ও অন্যান্য উপনিবেশে 'চুক্তিবদ্ধ' শ্রমিকদের উপর বৃটিশ শাসনকর্তা নানারূপ অন্যায় ও অবিচার করত যার ফলে ভারতীয়দের সেখানে খুব দুঃখ-কষ্টে দিন কাটাতে হত। তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য কিছুদিন ধরে গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাত্মা গান্ধী, প্রভৃতি ভারতীয় জাতীয় নেতাদের নেতৃত্বে আন্দোলন চলছিল। এই উদ্দেশ্যে ইংরেজ-শাসকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য গোখলে ও গান্ধীজি আফ্রিকাতে গিয়েছিলেন। গান্ধীজী দীর্ঘদিন দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে নাটাল, ডারবান প্রভৃতি স্থানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে। ভারতীয় শ্রমিক এবং আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদের উপর বৃটিশরা অন্যায় অত্যাচার করে তাদের নানাভাবে বঞ্চিত করে রাখত। গান্ধীজী সব সময়েই এই সব অন্যায় ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করতেন। ভারতীয় শ্রমিকরা দক্ষিণ আফ্রিকাতে ও অন্যান্য উপনিবেশে সাধারণতঃ চুক্তিবদ্ধ হয়ে কয়লা খনি, চা-কল, চিনি-কল, সুতা-কল প্রভৃতি স্থানে কাজ করত।

এণ্ডরুজের মনে কিছুদিন ধরেই একটা চিন্তা জেগেছিল। তিনি অনেক সময়েই ভাবতেন "আমি কেন চলে যাই না দক্ষিণ আফ্রিকাতে গান্ধীজীর এই কঠিন সংগ্রামে স্বেচ্ছাসেবীরূপে সাহায্য করার জন্য?" তিনি এই কথা যখন চিন্তা করছিলেন সেইসময় দিল্লীতে খবর এল যে নাটালে পুলিশ নিরস্ত্র ভারতীয় সত্যাগ্রহী-দের উপর গুলি বর্ষণ করেছে। গুলিচালনার খবরে এণ্ডরুজ লজ্জায় ও রাগে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তখনই তিনি ঠিক করলেন তাঁকে এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতেই হবে। তিনি গোখলের সঙ্গে আলোচনা করে আফ্রিকাতে যাবার ইচ্ছা তাঁকে জানালেন। শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। সেটা ছিল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল পুরস্কার' পাওয়ার খবর এসেছে ভারতবর্ষে; রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিন পূর্বেই বিদেশভ্রমণ শেষ করে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন। এণ্ডরুজকে দেখেই তিনি সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এণ্ডরুজ নতজানু হয়ে কবির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন এবং তাঁর পদধূলি নিজ মাথায় গ্রহণ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন থেকে দিল্লীতে ফিরে এসে গোখলের সঙ্গে দেখা করে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার দিন স্থির করে ফেললেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী উইলিয়ম উইন্‌ষ্টেনলি পিয়ার্সনকে সঙ্গে নিয়ে এণ্ডরুজ দক্ষিণ-আফ্রিকার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ডারবানে এণ্ডরুজকে অভ্যর্থনা জানাতে হেনরি পোলকের সঙ্গে আরও কয়েক ব্যক্তি জাহাজ-ঘাটে এসেছিলেন। হেন্‌রি পোলক পূর্বে একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন যখন তাঁর সঙ্গে এণ্ডরুজের পরিচয় হয়েছিল। জাহাজ থেকে নেমেই এণ্ডরুজ পোলককে জিজ্ঞাসা করলেন, "গান্ধীজী কোথায়?" পোলক তখন কুলিদের মত মোটা সাদা ধুতি ও কুর্তা পরিহিত যোগীর মত এক ক্ষীণকায় ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি ফিরালেন। এণ্ডরুজ তাড়াতাড়ি নতজানু হয়ে গান্ধীজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। গান্ধীজী তার কয়েকদিন পূর্বেই জেলের বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই গান্ধীজী ও এণ্ডরুজের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্বের সূচনা হয়েছিল। তাই, দুই তিন দিনের মধ্যেই গান্ধীজী হলেন এণ্ডরুজের প্রিয় "মোহন", আর এণ্ডরুজ হলেন গান্ধীজীর প্রাণের "চার্লি"।

প্রতিধ্বনি

শ্রীশান্তা দেবী

অনেক সময় মনে হয় আমি যখন ছোট-শিশু মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খাই, তারপর একটু একটু করে বড় হয়ে আর পাঁচটা মানুষের মত হতে থাকি, তখন আমি কি ভাবতাম, কি করতাম, এগুলো সব কেন আমার মনে পড়ে না ? এটা একটা বড় দুঃখ ! "শিশু আমিটা কি রকম ছিলাম" জানতে অনেকেরই ইচ্ছা হয়।

মনে যখন নেই তখন পরের মুখে শোনা কথা জেনেই খুশী থাকা ভাল। শুনেছি আমি ছোট্টবেলায় খুব মোটা-সোটা ছিলাম, দৌড়তে পারতাম না। তাই আমার ...র ছোট্ট দাদাটি যখন দৌড়ে বেড়াতেন, তখন আমি ...ক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে নেড়ে বলতাম, "দোলা দুলি, দোলা দুলি।"

দাদা আমার চেয়ে দেড় বছরের বড়। মস্ত দাদা ...র ছোট বোনটিকে বলতেন, "ভাইটি।" যদি কেউ ...াসা করত, তোমার ভাইটি কত বড় ?" দাদা ...তেন, আকাশ পলযত।"

আমার দাদা দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। তাঁর ... কালে প্যারিসে একটা শিশু-প্রদর্শনী হচ্ছিল। ...র লোকেরা বাবাকে বলতেন আপনার খোকাকে ... exhibition এ পাঠিয়ে দিন !"

...ঠিয়ে দেওয়া হয়নি অবশ্য। এমন কি ছয় সাত বৎসর ...ের আগের দাদার কোন ছবিও দেখিনি।

আমি কিন্তু মোটেই দাদার মত দেখতে হইনি। ... নিখুঁত মুখ নাক চোখ কোনটাই আমি পাইনি। ...বলতেন, "ছোট্ট, বয়সে পোড়া নারাঙ্গা হয়ে তোমার ...া ময়লা হয়ে গেল।' যাক গে, তাতে কিছু এসে যায় ...। ছোট বয়সে ওসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। ...র ছোট বোন সীতা আমার চেয়ে প্রায় দুবছরের ...ট। তিনটি শিশু নিয়ে আমার একুশ বছরের ছোট মা বড় বিব্রত থাকতেন। তাই আমার এক মাসিমা আমাকে পালন করবার ভার নিলেন, মাসিমা আমাকে অদ্ভুত ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর ভালবাসা প্রকাশের ধরনটা বিচিত্র ছিল। তিনি আমায় কোলে নিয়ে আদর করে করে বলতেন চিপ-কপালী, থ্যাবড়া নাকী। আমার দুটো গালের গালের চাপে নাক বেচারা তার উচ্চতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিল। মাসিমার ছোট ছেলের নাম জীবন। সে তার মাকে ভারি ভালবাসত। মাতৃস্নেহের একজন ভাগীদার জোটাতে তার মনে বড়ই আঘাত লেগেছিল। সে বলত "কোথেকে একটা চেপসি মেয়ে এসে আমার মাটাকে কেড়ে নিল।" রাগ করে জীবন দাদা একদিন আমার নাক টিপে ধরেছিল। কারুর চোখে না পড়লে সেইদিনই হয়ত আমার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত। কিন্তু ওর হিংসাটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। পরে সে আমাকে খুবই ভালবাসত।

আমার ছোট বোনটির জন্মসংবাদ পেয়ে আমার মেজ জ্যাঠা মহাশয় বাবাকে লিখলেন, "তোমার আর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করাতে বড় দুঃখিত হইলাম।"

বাবা ভীষণ চটে গেলেন, বল্লেন, "মেজদাদাকে কি আমার মেয়েকে খাওয়াতে হবে যে তিনি দুঃখিত হতে গেলেন ?"

সীতাও দেখতে সুন্দর হয়েছিল। তাকে লোকে "হাঁসের ডিমের মত সাদা বললে সীতা বলত "হাঁভান দিম।" বাবা বলতেন, সীতা আমার মায়ের মত দেখতে হবে।" হয়ত সে ঠাকুরমার মত দেখতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর মত নিরীহ ভাল মানুষ হয়নি। সুন্দর দেখে তাকে পাড়ার মেমসাহেবরা আদর করে কাছে ডাকলে সে অর্দ্ধেক বাংলা ও অর্দ্ধেক হিন্দী মিশিয়ে বলত, "যাবনা রে লক্ষীছাড়ী পক্ষীছাড়ী। সাহেবলোগ কৌয়া খাতা হ্যায়, ওলোগ পেত্নী হ্যায়।"

প্রথম স্মৃতির কথা লিখব মনে করে নিজের স্মৃতিতে যেসব কথা ধরে রাখতে পারিনি তাই আগে লিখে বস্‌লাম।

যতদূর মনে পড়ে আমার প্রথম স্মৃতি অতি সাধারণ একটা জিনিস। এলাহাবাদে বোধহয় আমি আড়াই কি দুই বৎসর বয়সে মা বাবার সঙ্গে যাই, সেখানে যে-বাড়ীতে প্রথম ছিলাম হয়ত তারি একটুকরা স্মৃতি আমার প্রথম স্মৃতি। বাড়ীতে একটা বারান্দা ছিল এবং একটা অত্যন্ত উঁচু চটের পরদা গলির মুখের আবরু রক্ষা করত। হয় আমি বাহিরের জগৎটা দেখতে উৎসুক ছিলাম, অথবা কুৎসিত পরদাটা আমার চক্ষুশূল ছিল। তাই সেই স্মৃতিটাই আমার মনে আজও জেগে আছে, সেই সময়ের এলাহাবাদের চেহারাটা কিছু মনে নেই। বোধহয় বিশেষ বেরোতে পেতাম না। মা শিশুদল নিয়ে বিব্রত থাকতেন। ছোটবেলা মায়ের আদর পেয়েছিলাম, কিন্তু সীতার আগমনের পর মা তাকে নিয়েই এত ব্যস্ত থাকতেন যে মায়ের আদর কাকে বলে তা আমার মনে পড়ে না। সীতার হজম ভাল হতনা বলে সে নাকি সারারাত কাঁদত এবং সকালে উঠে চাকরের মেয়ের নামে দোষটা দিয়ে বলত "খিসিয়া কাঁদে—ওমা, হ্যাঁ।" যদিও মাসিমা কিছুদিন পর্য্যন্ত আমায় পালন করেছিলেন, তবু মোটা-মুটি আমি ছিলাম স্বাধীন জেনানা। আমাকে কেউ খাইয়ে দিচ্ছে কি স্নান করাচ্ছে এসব মনেই নেই। নিজেই নিজের সব করতাম এবং বোধহয় এই জন্যেই আমি কারুর সঙ্গে শুতে ভাল বাসতাম না। শীতের রাতে ঘুম পেলে জুতো, মোজা, ফ্রক, ওভারকোট সব পরে শুয়ে পড়তাম। কেউ বারণ করলেও শুনতাম না। তাছাড়া আমি ছিলাম ভীষণ শীতকাতুরে। অনেক রাতে মা আমার বুটজোড়া ও ওভারকোটটা খুলে নিতেন। তখন আমি ঘুমে অচৈতন্য। এলাহাবাদে কন্‌কনে শীত পড়ত। সাহেববাড়ীতে চিমনি থাকত আগুন পোয়াবার জন্য। আমাদের ছিল না। আমি নিতান্ত স্থানাভাব না হলে একলাই শুতাম। কাজেই জুতো মোজা পরে শুয়ে পড়লে কারুর অসুবিধা হতনা। সকালে যখন আমার বিছানা তোলা হত তখন দেখা যেত পাথর বাটি ভাঙা অনেকগুলো টুকরো বালিশের তলায় সুরক্ষিত রয়েছে। পাথরবাটির টুকরো দিয়ে মেঝে বা স্লেটের উপর বেশ লেখা যেত। আমরা ভাই-বোনেরা সেগুলি ভাগ করে নিজের নিজের অংশ নিজের কাছে রাখতাম। আমি বোধহয় বেশী সাবধান ছিলাম তাই বালিশের তলায় নিজের ধন-দৌলত রাখতাম। এলাহাবাদে খুব পাথর বাটি বিক্রী হত। এসব কথা কিছু পরের। এর আগে যে কথাটি আমার সব চেয়ে পরিষ্কার মনে আছে সেটি আমার সাড়ে তিন বৎসরের একটি বেদনাময় স্মৃতি। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে আমাদের শোবার ঘরের মেঝেতে আমার সুন্দরী তরুণী হাস্যমুখী মা তাঁর রাশীকৃত চুল ধূলায় লুটিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে নিঃশব্দে কাঁদছেন। পাশের শুভ্র বেশধারী এক সুদর্শন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ও একটি বয়স্কা বিধবা বাঙালী মহিলা কি সব নাড়াচাড়া করছেন। তাঁরা একটি ছোট খাটের দুধারে দুজন। সেই খাটে একটি ফুলের মত শিশু চোখ বুজে শুয়ে আছে। পরে জেনেছিলাম সে আমাদের ভাই দেবব্রত। এক মাস বয়সেই ইরিসিপেলাস রোগে তার মৃত্যু হয়। পাঞ্জাবী ব্রাহ্ম সুন্দরসিংজী ও শ্রীযুক্তা চঞ্চলা ঘোষ তার সেবা করতে এসেছিলেন।

এই বাড়ীটা ছিল এলাহাবাদের সাউথ রোডে। বাড়ীর মালিক ছিলেন ব্যারিষ্টার রৌশনলাল। এখান থেকে বাবার কলেজ কায়স্থ পাঠশালা খুব কাছে ছিল। সেকালে ব্রাহ্মসমাজে একের দুঃখে বিপদে অপরে আত্মীয়ের মত সাহায্য করতেন। তাই বাবার এই বিপদের সময় বন্ধুরা সাহায্য করতে দূর থেকে এসেছিলেন। তখনকার দিনে মানুষের বাড়ীতে স্থানাভাব নামক কথাটার চলন হয়নি। অল্প তাড়াতেই অনাবশ্যকরকম বেশী স্থান পাওয়া যেত। আত্মীয় বন্ধুর জন্য বাড়ীর দুয়ার থাকত অবারিত।

মনে পড়ে তারপর বহুদিন দুপুরবেলা যখন বাবা কলেজে থাকতেন তখন মা বাক্স থেকে একটি ছোট

পুঁটুলি বার করে চেয়ে চেয়ে দেখতেন। তাতে ছিল গুটি-কয়েক রঙিন ডোরা-কাটা জামা, প্রায় পুতুলের গায়ের মাপের মত। খানিক পরে মা আবার সেগুলি গুছিয়ে তুলে রাখতেন।

এরপর এল একটি আনন্দের দিন। মাঘী পূর্ণিমার রাত্রি আকাশভরা জ্যোৎস্নার মধ্যে বাড়ীতে একটা ব্যস্ততা দেখা দিল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা, ভোরবেলায় জেগে উঠে শুনলাম আমাদের একটি নূতন ভাই এসেছে। ছুটে গেলাম তার ঘরে। দেখি সুন্দরী মায়ের বিছানা আলো করে মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত সুন্দর একটি শিশু শুয়ে আছে। সকলের মুখে হাসি আর ধরে না। বাবা বলেন আমরা নাকি দুই বোনে দুটো ইঁট হাতে করে শিশুর দরজার দু-পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। কার কাছে শুনেছিলাম গত বছর কে যেন আমাদের ভাইকে নিয়ে চলে গিয়েছিল, সে আর আসেনি। এবার তাই ঠিক করলাম যে আসবে তাকে আমরা দুই বোনে ইঁট মেরে সায়েস্তা করে দেব। তখন আমার বয়স সাড়ে চার, আর সীতার বয়স আড়াই পার হয়ে গেছে। আমার ঠাকুরমা নূতন শিশুটিকে এক মুঠো খুদের বদলে বেচে দিলেন। তা'হলে আর শিশুর উপর কোন অমঙ্গলের দৃষ্টি পড়বে না। শিশুটির ডাক নাম হ'ল কুদু। বাবা তাঁর শোকে সান্ত্বনারূপে ওর নাম রাখলেন 'অশোক'। বেশ কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আমরা ছিলাম এই চার ভাই বোন।

এই বাড়ীতে মাকে দেখতে আসতেন ফুলমণি নামে এক খ্রীষ্টান ধাত্রী। তিনি বাঙ্গালী এবং বেশ ভাল বাংলা বলতেন। কিন্তু তাঁর পোশাক ছিল মেমসাহেবের মত। গোড়ালী পর্য্যন্ত লম্বা স্কার্ট ও ব্লাউজ। মাথায় একটা ক্যাশানেবল টুপিও ছিল। ফুলমণির স্বামী ছিলেন কুচকুচে কালো। কিন্তু নিজেকে তিনি সাহেব মনে করতেন। মায়ের একজন কালো নার্সও ছিলেন, সেও মেমসাহেবের মত ফ্রক পরত। সাউথ রোডের বাড়ীটায় আমরা বছর পাঁচেক ছিলাম। এলাহাবাদ যদিও সমতল জায়গা, তবু এই বাড়ীটার রাস্তাটা বড় রাস্তা থেকে ঢালু হয়ে নেমেছিল যেন পাহাড়ের গা। একদিকে মেহেদির বেড়। একটা বড় ঘাসের লন, তার পাশে খোদ রৌসনলাল সাহেবের বাড়ী এবং পিছন দিকে আরও দুটি ছোট ছোট বাড়ী। সবচেয়ে শেষে মস্ত একটা পেয়ারা বাগান। ফলের সময় পাকা পেয়ারার মিষ্ট গন্ধে বাগান ভরে থাকত। পেয়ারা-বাগানের পাশে বা পিছনে ষ্টেশন রোড বলে একটা রাস্তা ছিল। আমি সে রাস্তাটা বেশ বড় হবার আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু প্রত্যহ দেখতাম সন্ধ্যার আগে সারা আকাশ লাল করে সূর্যদেব ষ্টেশন রোডের পিছনে কোথায় যেন টুপ করে ডুবে যান। আমি ছোটবেলায় ভাবতাম ওখানে নিশ্চয় একটা অতল গহ্বর আছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখবার সাহস হ'ত না।

এলাহাবাদের অনেক বাড়ীর বারান্দা ও কার্নিশ পাথরের হ'ত। আমাদের পাশে একটা উঁচু জমিতে অনেকগুলো দু'হাত আড়াই হাত পাথর পড়ে থাকত। লোকে বলত "ওটা ঠিকাদারের জায়গা"। ঠিকাদার কাকে বলে তখন জানতাম না, ভাবতাম না জানি কি একটা তাজ্জব মানুষ সে। এত পাথর দিয়ে সে কি করে, কল্পনাই করতে পারতাম না।

কুদুর যখন মাস চারেক বয়স তার একটু আগেই আমার পাঁচ বৎসর পুরে গেছে। আমি শোবার ঘরের মেঝেতে কোল পেতে বসে কুদুকে কোলে নিয়ে খেলা করতাম। ওকে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে পারতাম না। কুদুর একটা ঝি ছিল তার নাম সুমারিয়া। এককানে মস্ত একটা রূপার ফুল বড় একটা সিলভার মেডেলের সমান। তবে তার মাঝখানটা উঁচু আর তার থেকে রূপার ঝিঁজির ঝুলত। অন্য কানে ফুল ছিল না। তাই সে দুঃখ করে বলত, "কা করি—হামার দুইঠো ভড়কী নহি হ্যায়"। বেচারী একটাতেই সন্তুষ্ট ছিল। সুমারিয়া সুবিধে পেলেই কুদুকে আমার কোলে দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিত। কুদু বেশ ফর্সা গাঁট্টাগোঁট্টা দেখতে

হয়েছিল। চাঁদের মত গোল মুখ, পাতলা পাতলা লাল ঠোঁট আর নরম কিন্তু সোজা সোজা একমাথা চুল। নরম, নরম সুডৌল হাত পা, কিন্তু কথাগুলো একেবারেই নরম ছিল না। সে খুব ছোট বয়সেই কথা বলতে শিখেছিল। তার বেশীর ভাগই হিন্দি। কিন্তু কথাগুলো উচ্চারণ করত শক্ত শক্ত করে। কর্ণেলগঞ্জকে সে বলত 'কণ্ডেলগঞ্জ' 'দরওজা বন্ধ কর' বলতে বলত 'দরওয়াজা পণ্ড্রো কর'। নিজের বুদ্ধির ওপর তার তখনই অসীম শ্রদ্ধা। যখন বছর দুই কি আড়াই বয়স তখন একদিন এক মেছুনী মাছ বিক্রী করতে এসেছিল। তার মাছগুলো ছোট ছোট চুণো মাছ। কুহু ছুটে এসে বলল, "আরে এ মছলি কৌন পেঁড়মে ফরতা হ্যায়"। মেছুনী হেসে বলল "ক্যা' বাবু, মছলী পেঁড়মে ফরতা হ্যায় কি পানিমে"? কুহু কিছুমাত্র না দমে বলল, "আরে পানিই মছলিকা পেঁড় হ্যায়"। আর একদিন মায়ের একটা মালিশের শিশি মা একটা উঁচু তাকে তুলে রাখছিলেন, আমাদের বললেন "ওটা যেন ছুঁয়োনা, ও বিষ, খেলে মানুষ মরে যায়"। ঘণ্টা দুয়েক পরে কুহু এসে মায়ের কাছে সদর্পে বলতে লাগল, "আমি কিছুতেই মরিনা বিষ খেলেও মরিনা।" মা ভয়ে ছুটে এসে দেখেন, তাকের উপর মালিশের শিশিটা যথাস্থানেই রয়েছে এবং কুহুর গায়ে ভুর ভুর করছে গোলাপ জলের গন্ধ। মালিশের শিশির পাশেই ছিল একটা গোলাপ জলের শিশি, সেটা খালি পড়ে আছে।

মায়ের দুই জন মেমসাহেব শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। একজন মিশনারী মেম, তিনি ইংরেজী পড়াতেন. অন্যজন মিস্‌ ল্যাংলী বলে এক ফিরিঙ্গি মহিলা। মিস্‌ ল্যাংলীরা ষোলটি ভাই বোন, আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকতেন। মিস্‌ ল্যাংলী বোধহয় মা-কে ডাকতেন বৌ বলে। তাঁর চুল কম ছিল এবং আমার মায়ের চুল ছিল হাঁটু পর্য্যন্ত, ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তল। মিস্‌ ল্যাংলী বলতেন, "বউ তোমার এত চুল কি করে হোল? তুমি কি তেল মাখ"? মা বলতেন, "আমি নারকেল তেল মাখি"। মেমসাহেব কয়েকদিন পরে এসে বললেন, "বউ আমি ত' রাত্রে শোবার সময় নারকেল তেল মেখেছি, কিন্তু আমার চুল একটুও বড় হ'ল না। তার উপর আবার মাথায় পিঁপড়ে ধরে যায়।" মেমসাহেব বোধহয় মাথায় এক শিশি পুরো তেল ঢেলেই শুতেন। রাত্রে বোধকরি ঘুমও হয়নি। ইনি মা'কে হার্মোনিয়ম বাজাতে শেখাতেন। মা অতি দ্রুত সব শিখে নিতেন।

মায়ের কথা বলতে হলে কত কথাই মনে হয়। তিনি অতি সাদাসিধা পোশাক পরতেন কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও মিষ্ট হাসিই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ ভূষণ। মাকে আমি কখনও বিনুনি করে কাঁটা দিয়ে খোঁপা বাঁধতে দেখিনি। তিনি তাঁর রাশিকৃত চুল টান করে বেঁধে হাতে পাঁচ দিয়ে একটি খোঁপা করে রাখতেন। অনেক ফিতের গুছি কাঁটা দিয়েও লোকে অত বড় খোঁপা সহজে বাঁধতে পারত না। বাবা চিরকালই স্বদেশী শিল্পের উপর নির্ভর করতে ভালবাসতেন বলে মা সর্ব্বদা দেশী মিলের কাপড় পরতেন। ধোপার বাড়ী দিলেই তার পাড়ের রং চারধারে ছড়িয়ে পড়িত। ছেলেবেলার স্মৃতিতে মায়ের পোশাকি-শাড়ী বলতে দু'খানা কাপড় কেবল মনে পড়ে—একটা আসমানি রংয়ের পার্শী শাড়ী আর একটা বেগুনী রংয়ের মেরিনো (গরম) শাড়ী। আমার দাদামশায় মাকে একবার একটা চন্দ্রকোণার চৌধুরী শাড়ী দিয়েছিলেন। সেই শাড়ীটা পরিয়ে মায়ের একটা ফোটোগ্রাফ বাবা তুলেছিলেন। বাবা খুব ভাল ছবি তুলতেন! মায়ের ভাল ছবি বলতে ঐ ছবিটিই আমাদের সম্বল। তখন অনেক তাঁতের শাড়ীর তিনটে পাড় থাকত নামটা পাছাপাড়। মার শাড়ীটায়ও তিনটা পাড় ছিল।

যদিও অল্প বয়সেই মাকে পুত্রশোক পেতে হয়েছিল তবু পারিবারিক জীবনে মা ছিলেন সুখী ও তৃপ্ত। আজকাল মেয়েদের এরকম তৃপ্ত দেখা যায় কম। নিজের মনে গান করায় ছিল তার আনন্দ। মার গানের গলা ছিল অপূর্ব্ব। একলা গেয়েই একটা হল ভরিয়ে দিতে

পারতেন। আমরা বাংলার বাহিরে মানুষ হয়েছিলাম। কিন্তু মায়ের দৌলতে আমরা শিশুকাল থেকেই অনেক বাংলাগান শিখেছিলাম। শুধু যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত তা' নয়। যাত্রার গান, ভাদু পুজার গান আগমনীগান সবই মা গাইতেন। মনে পড়ে মায়ের মধুর গলায় সাঁওতালী গান—"বাবুদের কলা বাগানে

ওলো, আমার গোলাপকাঁটা

ফুটেছিল চরণে।"

নয়ত ভাদুর গান "কাশীপুরের রাজার মেয়ে

ছিলে তুমি নন্দিনী

জয় ভাদুমনি।"

যাত্রার গানে ভীষ্মের শরশয্যার গান ছিল মার প্রিয়!

"মরিরে বাপ কুমার আমার।

এদশা তোর কে করিল?

জানিরে তোর ইচ্ছামরণ

শরশয্যা কিসের কারণ

বিশ্বমাঝে কোন পাষণ্ড

ভীষ্মজননী নাম ঘুচাল?"

আজ কালকার দিনে গল্প বলা আর শোনার রেওয়াজ উঠেই গিয়েছে। মা গল্প বলতেন আর্টিষ্টের মত। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। আমার সবচেয়ে ছোট ভাই মুলু প্রতিরাত্রে ঘুমোবার সময় গল্প শুনতে চাইত। তার কয়েকটা ফেভারিট গল্প ছিল। তার মধ্যে একটা হ'ল খুখুচুখুর গল্প। মা যদি গল্প বলতে বলতে কোনও যায়গাটা একটু বদলে ফেলতেন মুলু তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দিত। আমার পছন্দ ছিল অমূল্যরতন শাড়ী আর সাত বৌয়ের গল্প

শাশুড়ী সাত বৌকে খেতে দিচ্ছেন আর বলছেন

'সাত বোয়ের সাত আসকে খড়কের আগায় ঘি

খুঁৎ খুঁৎ খুঁৎ করছ কেন খেতে নারছ কি?

দাও দাও ঢেকে রেখে দি'

বর্ষায় যখন কাল মেঘে আকাশ ঢেকে আসত, বৃষ্টি যেন নামে নামে তখন পাড়ায় পাড়ায় বড় বড় নিম গাছের ডালে প্রকাণ্ড তক্তা দড়িতে ঝুলিয়ে দোলনা টাঙানো হত। হিন্দুস্থানী মেয়েরা সারি সারি দোলনায় ঘোমটা-শুদ্ধ বসতো আর ছেলেরা দোলনার উপরেই দু'পাশে দাঁড়িয়ে দোল দিত। ঝরঝর বারিধারার মধ্যেও মেয়েদের মিলিত কণ্ঠের গান শোনা যেত,

"আরে রামা, সাঁঝ ভেল

ঘরে নাহি আইসে কানাহিয়া

হে হরি……—…"

আমরা বৃষ্টিতে দোল খেতাম না বটে তবে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব ঝুলনের গানগুলি গাইতাম। রবীন্দ্রনাথের কাল মৃগয়ার গান মা আমাদের শেখাতেন "ও ভাই দেখে যা কত ফুল ফুটেছে।"

মা বেশ ভাল হিন্দি বলতেন—গাঁইয়া হিন্দি বা দেহাতী বুলি নয়—চোস্ত হিন্দি। পড়তেও শিখেছিলেন এলাহাবাদে। সরস্বতী বলে একটা হিন্দিমাসিকপত্র ছিল, মা সেটা নিয়মিতই পড়তেন। এই সময়ে মাসীমার বড় ছেলে প্রতিভারঞ্জন একজন মৌলবীর কাছে উর্দু পড়তেন তার দেখা দেখি মাও উর্দু পড়তে শেখেন। অক্ষরগুলো আমরা চিনতাম না কিন্তু আলিফ বে পে তে বলে যেতাম গড় গড় করে। মৌলবী সাহেব একটু পড়িয়েই ঢুলতে থাকতেন, তারপর জেগে উঠে বলতেন "বহুৎ পড় দিয়া বাচ্ছা।"

আমি নিজের সাজ পোষাক স্নানাদি যেমন নিজেই করতাম বিদ্যা অর্জনও তেমনি নিজেই সুরু করি।

মা বলতেন "একদিন দেখলাম শান্তা সঞ্জীবনী পড়ছে। অবাক হয়ে বললাম তুই পড়তে শিখলি কি করে? শান্তা বললে "কেন তুমি যে দাদাকে পড়াও।"

মা দাদাকে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পড়াতেন, আমি টেবিলের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকতাম।—কেউ অত লক্ষ্য করতো না। —কিন্তু আমি ওইরকম করেই বাংলা পড়তে শিখে নিয়েছিলাম। কিন্তু একটা মজা ছিল তারমধ্যে। আমি বই ধরতাম উল্টা করে। জীবন দাদা ও মসীমা অনেক চেষ্ট করেও আমাকে সোজা দিকে বই ধরাতে পারতেন না। কিছুকাল পরে আমাদের জন্য এক বৃদ্ধ বাঙালী মাষ্টারমশায়কে রাখা

হয়েছিল। তিনি যে আমাদের কি পড়িয়েছিলেন অনেক চেষ্টা করেও মনে আনতে পারি না। কিন্তু মনে আছে; আরো কিছু কাল পরে এক বাঙালী যুবক আমাদের পড়াতে এলেন। তিনি অঙ্ক কষতে খুব ভাল বাসতেন, আমিও অঙ্ক ভালবাসতাম। মাষ্টারমশায় আমাকে আট বৎসর মাত্র বয়সে সারা পাটিগণিতটাই প্রায় শেষ করিয়ে দিলেন। বড় বড় square rootএর অঙ্ক কষতাম মনে আছে। কি কারণে জানি না তিনি বদলী হয়ে গেলেন।

এবং ঠিক তার পরেই আমার দাদা, সীতা আর ক্ষুদু তিনজনে টাইফয়েড বাধিয়ে বসলেন। আমার ত পড়াশুনা মাথায় উঠে গেল।—আমি ছেলেবেলায় খুব সুস্থ ছিলাম আমার কখনই জ্বর জাড়ি হত না। কিছু-দিন পরে মায়ের আবার চোখ উঠল এবং আমাদের পাচক মহারাজ (ওদেশে রাঁধুনী ব্রাহ্মণকে মহারাজ বলে) কেভিবারি —' করতে দেশে চলে গেলেন। বাবা পড়লেন মহামুস্কিলে। কলেজ আছে প্রবাসী কাগজ আছে তার উপর বাড়ীর এই অবস্থা। অগত্যা আমাকেই আট বৎসর বয়সে রন্ধনের ভার নিতে হল। আমি হাঁড়ি নামাতে পারতাম না। ভাত ফুটে উঠলেই বাবার বসবার ঘরে দৌড়ে গিয়ে বলতাম "ও বাবা মাড় গলিয়ে দাও" (অর্থাৎ ফেন গেলে দাও") বাবা ফেন গেলে দিয়ে যেতেন। রুটির তাওয়া নামাতে পারতাম না বলে রুটিগুলো যতক্ষন না ফুলে ঢোল হত ততক্ষণ তাওয়াতেই উলোট পালোট করতাম। এদিকে আমার সদ্য রোগ মুক্ত তিন ভাইবোন হাঁটতে ভুলে গিয়েছিলেন। খাবার সময় তাঁদের আমি বিছানা থেকে কোলে করে তুলে আনতাম, দাদাও বাদ যেতেন না। ক্ষুদুর বয়স সকলের কম কিন্তু সে সবার আগে হাঁটতে শিখল ক্রমে ক্রমে।

যাই হোক, দু'দিন বাদেই আবার পড়াশোনা সুরু হোল। দেখা গেল আমি যেমন দ্রুত সমস্ত পাটিগণিত শিখে ফেলেছিলাম, তেমনি দ্রুত ভাবেই সব ভুলে গিয়েছি।—যাক আবার শিখে নিতে খুব দেরী হ'লনা।—

শিশুকাল থেকে সাউথ রোডের বাড়ীটাকেই নিজেদের বাড়ী বলে জানতাম। কিন্তু ডাক্তাররা বললেন "এবাড়ীতে আর থাকা চলবেনা। অন্য ভাল বাড়ীতে বাচ্চাদের সরাতে হবে"। খোঁজ খোঁজ করে বিরাট এলফ্রেড পার্কের পাশে খাস সাহেব পাড়ায় একটা বাড়ী নেওয়া হলো। তার লাল দেওয়াল ঘেরা প্রকাণ্ড বড়ো আম বাগান। একেবারে বড় রাস্তার উপরে পার্কের উল্টো দিকেই গেট। সকালে বিকেলে সেখান দিয়ে শ্বেতাঙ্গ শিশুরা আয়াদের সঙ্গে বাগানে বেড়াতে যেত।—সীতা মুগ্ধ হয়ে তাদের দেখতে দেখতে খেতেই ভুলে যেত। মা বলতেন "কি করছিলি এতক্ষণ?" সীতা বলত মেমের মেয়ে দেখছিলাম। পার্কে একটা band stand ছিল। সেখানে band শুনতে আমরা প্রায় যেতাম। তার পর পার্কের বড় বড় লাল ফুলের গাছগুলি এখনো মনে পড়ে।—আমার ভাই বোনদের পাল্কিতে শুইয়ে নুতন বাড়ীতে আনা হয়েছিল। এবাড়ীতে এসে তারা চট্ পট্ খাড়া হয়ে উঠল। দাদাত আম গাছের মাথায় চড়ে বসে থাকতেন, আমরা নীচে হুটোপাটি করতাম। একদিন এক ভদ্রলোক বাবার সন্ধানে এসে বাবাকে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "বাড়ীতে আর কে আছে? আমি বললাম দাদা আছে।" ভদ্রলোক বললেন দাদাকে ডাক। তিনি ভেবে ছিলেন দাদা মাতব্বর মানুষ। দাদা যে আমার চেয়ে দেড় বৎসরের বড় এবং তখন আম গাছের উপর চড়ে আকাশ কুসুম দেখছেন তা'ত তিনি জানতেন না। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম "দাদা ত গাছে চড়ে বসে আছে।" ভদ্রলোক হতাশ হয়ে চলে গেলেন।

রৌশনলালের যে বাংলো আমরা ছেড়ে এলাম তার কাছেই বড় একটা বাড়ীতে তিনি থাকতেন আগেই বলেছি। এঁর স্ত্রী লাহোরের ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা। এঁর শ্যালকের জামাতা হন সচ্চিদানন্দ সিংহ (হিন্দুস্থান রিভিয়ুর সম্পাদক) রৌশনলালের একটি পালিত পুত্র ছিল। কিছু দিন পরে তিনি বাড়ীটা তেজবাহাদুর সাপ্রুকে ভাড়া দিয়ে দেন তখনও আমরা ওখানেই থাকতাম।।তেজ বাহাদুরের বিরাট পরিবার। তাঁর মা,

বাবা, ঠাকুর দাদা স্ত্রী কন্যা সবাই ওখানে থাকতেন। সত্যি কিনা জানিনা, শুনতাম ওঁর স্ত্রীর নাম তেজরানী ও কন্যার নাম তেজদুলারী ছিল। ওইটা বোধ হয় পারিবারিক প্রথা। তেজবাহাদুরের ঠাকুরদাদাকে আমার এখনোও মনে পড়ে! সুবেশ ছোট্ট খাট ফর্সা শান্ত মানুষটি, সকালে বিকালে ফুল বাগানে পায়চারি করতেন। কিন্তু তেজবাহাদুরের বাবা ছিলেন মস্ত মোটা সারাদিনই চেয়ারে বসে থাকতেন আর কথায় কথায় সজোরে চীৎকার করতেন। তাঁর প্রাত্যাহিক একটা কাজছিল চাকরকে সকালে বাজার করতে দেওয়া। তিনি উচ্চৈস্বরে চেঁচিয়ে বলতেন "এক সের গাজর, আধ সের করেলা, দুই আনাকো পান ইত্যাদি।" কুহু তার নকল করে বলত একসের গোজর…গোজর মানে বিছে।

ভদ্রলোকের একটা আদরের সুন্দর গরু ছিল বিরাট সাদা ধপ ধপে। সে ওঁর হাতে খেতে পেত। তাই বোধহয় খাবার লোভে মাঝে মঝে আমাদের ঘরেও এসে ঢুকতো। একেবারে ভিতরে।

একদিন হঠাৎ শোনা গেল তেজবাহাদুরের বাড়ী চোর এসেছিল, তাকে ধরা হয়েছে। আমরা সবাই চোর দেখতে ছুটলাম। দেখলাম একটা রোগামত লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এসেছে। সীতা বলল "চোর কই? ও ত মানুষ।" তখন থেকে আমাদের দুই বোনের একটা খেলা হয়েছিল 'লক্ষি চোর আর দুষ্ট চোরের।' কোন চোরের কি কর্তব্য তা আজ আর ঠিক মনে পড়ছে না। লক্ষি চোরেরা নিশ্চয়ই চুরি করতনা।

বাবার এক বন্ধু আমাদের বাড়ীতে এসে আমরা কে কি পড়ি জিজ্ঞাসা করছিলেন। আমি বললাম "আমি চারুপাঠ পড়ি" ভদ্রলোক বললেন "তা'হলে তোমার নাম চারুশীলা।" কুহুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে বলল "আমার নাম দ্বিতীয়শীলা।" সে তখন বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ পড়ত। আমিই তাকে প্রথমভাগ পড়তে শিখিয়েছিলাম। তখনকার দিনে আজকালকার মত কিশলয় কিম্বা 'সহজ পাঠ' ছিল না। আমরা দুই ভাগ বর্ণ পরিচয় পড়বার পর কথামালা, বোধোদয় 'আখ্যান মঞ্জরী চারুপাঠ ৩ ভাগ পড়তাম। এগুলি শেষ করবার পর আমি অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' পড়তাম। ইংরেজীতে তখন Royal Readers পড়া নিয়ম ছিল। তারপর Scot এর Ivanhoe Talisman প্রভৃতি নভেল। দাদা খুব ছোট বয়েস থেকেই Encyclopedia থেকে সুরুকরে যে কোন ইংরেজী বই সামনে পেতেন পড়ে যেতেন। ভাষা শেখবার ক্ষমতা তাঁর খুব ছিল। একবার এক সাহেব বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসে বাবাকে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন. তাঁর কি হয়েছে? দাদাকে তখনোও বিশেষ ইংরেজী শেখানো হয়নি' কিন্তু দাদা বললেন "He has caught cold" ইংরেজী না শিখেই ইংরেজী বলছে। মা শুনে দারুণ মুগ্ধ। বাঙ্গালী আর এক ভদ্রলোক বাবার সন্ধান করাতে দাদা বললেন, 'তিনি অন্যত্র গিয়েছেন।" ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন "কুত্র?" তাতেও দাদার অটল গাম্ভীর্য্য নষ্ট হল না। তিনি স্থানটির নাম করলেন। আমাদে বাড়ীতে বইয়ের অভাব ছিল না। Encyclopedia ও ছিলই তার উপর আমাদের জন্য সচিত্র Royal Natural History চার পাঁচ খণ্ড কিনে দেওয়া হয়েছিল। তাতে অসংখ্য বাঘ সিংহ হরিণ প্রভৃতির ছবি।

বাবার কলেজের কল্যাণে শেক্সপীয়রের সব বই আলাদা আলাদা খণ্ড ম্যাকমিলান থেকে বাবা পেতেন। লাল লাল মলাটের সেই বইগুলিও দাদাকে নাড়াচাড়া করতে দেখতাম। দাদাকে অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবার কিছুদিন পরে দাদার জন্য সংস্কৃত পণ্ডিতও একজন রাখা হয়েছিল। তখন দাদা আর একটু বড়। যখন তখনই তিনি বারান্দায় পায়চারি করতে করতে আওড়াতেন। "কশ্চিৎকান্তা বিরহগুরুণা" অথবা "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানু…" শুনে শুনে আমাদেরও মুখস্থ হয়ে যেত। এমন কি পাণিনির 'ঙ ণ ম ঙ ণ স, 'যগপটদস' ইত্যাদি সূত্র এখনও মনে পড়ে। দাদা হিন্দীও খুব ভাল বলতে পারতেন।

বাবা নিজের দেশ বাঁকুড়াকে খুব ভালবাসতেন। তাই প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা বাঁকুড়া আসতাম। সেখানে পাঠকপাড়ায় বড় পুকুরের কাছে আমাদের পৈতৃক বাড়ী আর লালবাজারে ওয়েসলিয়ন মিশনের গির্জ্জার পাশে আমাদের মামার বাড়ী ছিল।

আমার দাদামশায় ছিলেন কিন্তু দিদিমা তখন জীবিত ছিলেন না। দিদিমার মা তখনও বেঁচে। তাঁকে আমি নব্বই বছর বয়সের দেখি। তিনি তখন আমার দাদাকে কোলে নেবার জন্য মহা উৎসুক। আট নয় বছরের ছেলেকে কোলে নেওয়া নব্বই বছরেইও তাঁর মত বীরাঙ্গনার পক্ষে সহজই ছিল। অল্প বয়সে তিনি বাঘ ভল্লুককেও ভয় পেতেন না। একবার তাঁর গোয়ালঘরে বাঘ ঢুকেছিল। ভদ্রমহিলা উনান থেকে একটা জলন্ত কাঠ নিয়ে তেড়ে গোয়ালঘরে গিয়ে হাজির। বাঘের মুখের মধ্যে জলন্ত কাঠ ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা দেখে বাঘ বেচারী অপ্রস্তুত হয়ে পালিয়ে গেল। তাঁর ছেলেরা ঘন বনের ভিতর দিয়ে বোনের বাড়ী যাওয়া আসা করতেন। একবার তাঁর বড় ছেলে পথে দুটো ভালুক-ছানা দেখে কুড়িয়ে এনেছিলেন। পরে সারারাত মা ভালুকটা দরজার কাছে বসে কাঁদতে সুরু করল। মায়ের মামা তখন বাচ্ছা দুটোকে বাইরে বার করে দিলেন। দাদামশায়ের ওঁদা গ্রামে পাকা বাড়ী ছিল, কিন্তু বাঁকুড়া সহরে মাটির বাড়ী করেছিলেন। দাদামশায় ঘটাপটা খুব ভালবাসতেন। তাই বাড়ীতে তাঁর একটা রাজছত্র আর একটা গাদা বন্দুক ছিল। রাজা অবশ্য তিনি ছিলেন না। জমিজমা অনেক ছিল। তার উপর ঘাটশিলার রাজার তাঁর মোক্তারনামা ছিল। বাঁকুড়া থেকে ঘাটশিলায় ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে হাতীর পিঠে চড়ে যেতেন পথে বন্য ভাল্লুক ও বন্য হাতীর দলের সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যেত। তাঁর কাছে টানা লাড়ু কিম্বা বিউলির ডাল খেতে চাইলে চটে যেতেন, বলতেন রসগোল্লা আর বুটের (ছোলা) ডাল খাবে।

আমার ঠাকুমা দেবদ্বিজে ভক্তিমতী সাদাসিধা ও সত্য-নিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তালাচাবি বন্ধ করতেও পারতেন না তাই টাকা পয়সা হাঁড়ির মধ্যে রেখে দিতেন। ছোটখাট সওদা করতেন চাল কি ধান দিয়ে—গুনতেও হোত না, পোয়া মেপে ঢেলে দিলেই হোত। ঠাকুরমার গোয়ালে অনেক গরু আর প্রকাণ্ড সিন্দুকে অনেক মাপের বাটি ছিল। যখন গরুর দুধ বেশী হোত তখন ঠাকুরমা, বড় বড় বাটি বার করতেন আর যেই দুধ কমে যেতো অমনি বড় বাটিগুলি সিন্দুকে তুলে ছোট ছোট এক প্রস্থ বার করতেন। ঠাকুরমার কাপড় কাচা বাতিক ছিল শকড়ি বিচারের জন্য। একবার একটা মস্ত বড় কার্পেটে কিছু শকড়ির সংস্পর্শদোষ হয়েছিল—ঠাকুরমা কার্পেটটাকে নিয়ে গিয়ে ফেললেন বড় পুকুরের জলে। জলে ভিজে কার্পেটের ওজন এমন বেড়ে গেল যে ঠাকুরমা তাকে আর টেনে তুলতে পারলেন না। কার্পেটের সলিল সমাধি হয়ে গেল।

ক্রমশঃ

শিক্ষক থেকে লোকশিক্ষক

যদুপতি ঘোষ

সংক্ষিপ্ত—মূল রামায়ণে আছে-দেবর্ষি নারদ এসে মহর্ষি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করলেন,-কো ন্বাস্মিন সাম্প্রতং লোকে গুণবান কশ্চ বীর্য্যবান·· বলে কয়েকটি দুর্লভ গুণের উল্লেখ করলেন। মহর্ষি উত্তরে বল্লেন—বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্ত্তিতা গুণাঃ—এবং এই সমস্ত মহৎগুণের আধারস্বরূপ রাম চরিত্রের বর্ণনা করলেন। যদি দেবর্ষি কখনও ছদ্মবেশে এসে আমাদের সমসাময়িক কোন মানভূমবাসী যে-কোন ব্যক্তিকে তার জানাশোনা কোন মহৎ ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে কোন চিন্তা না করেই—সে প্রথমে ঋষিকল্প নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্তের নাম করবে। লোকে তাঁকে ঋষি নিবারণচন্দ্র বলে। এই ঋষি উপাধি কে তাঁকে দিয়েছিল তা জানি না তবে কোনদিন কাকেও এর বিরুদ্ধে একটী কথাও উচ্চারণ করতে শুনিনি।

৮৭৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার গাওপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম। স্বগ্রামে বাল্য-শিক্ষা শেষ-করে—তিনি বরিশালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। ১৮৯০ খ্রীঃ প্রবেশিকা এবং ১৮৯২খ্রীঃ এফ এ পাস করেন। এই সময়টি তাঁর জীবনের একটি মহা সন্ধিক্ষণ, কারণ এই সময়ে তিনি মহাপ্রাণ অশ্বিনীকুমার দত্তের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন, যার ফলে তাঁর চরিত্রে মহৎ গুণাবলীর বীজগুলি অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এফ এ পরীক্ষা পাস করার পর তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু পরে আবার তাঁকে অনেক ফিরে—সংসারী করা হয়। বিএ পাশ করার পর তিনি শিক্ষা-বিভাগে চাকরী নেন।

আমরা তাঁর প্রথম পরিচয় পাই পুরুলিয়া জেলা স্কুলের—প্রধান শিক্ষকরূপে। তিনি আসবার পর যেন এই স্কুলে স্বর্ণযুগ এসে গেল। ভাল ছেলেরা প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিগুলি বার বার নিতে লাগল, পাশের সংখ্যা খুব বেড়ে গেল। এমন কি স্কুলের ফুটবল টিমটাও দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠল। প্রত্যেক অভিভাবকই চাইতে লাগলেন যে তাঁর ছেলে জেলা-স্কুলে ভর্ত্তি হোক আর ছেলেরাও জেলা-স্কুলে পড়তে পেলে আনন্দ এবং গৌরব অনুভব করত। কোনদিন তিনি কোনও ছাত্রকে কড়া শাসন করেছেন, অথবা অধীনস্থ-ব্যক্তিদের শক্ত কথা বলেছেন, এমন কথা কখনও শুনিনি। এমন ছিল তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা আর সকলের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা যে তাঁর ছাত্রদের মনে শৃঙ্খলহীনতার-কথা স্থানই পেতনা, অথবা তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের মনে কর্ত্তব্য বিচ্যুতির কথাও উদয় হোত না। সদা হাস্যমুখ, মিষ্টভাষী এই মহৎ ব্যক্তিটির চোখের দৃষ্টিই ছিল যেন আশীর্বাদে ভরা। তাঁর চেহারার বর্ণনায় এ কথা বলতে পারা যায় যে যদি কোন মধ্যযুগের ইউরোপীয় শিল্পী তাঁকে দেখতেন তাহলে কোনও-সেণ্টের মূর্ত্তি আঁকবার জন্য অবিলম্বে স্কেচ করে নিতেন।

ছাত্রদের উপর তাঁর কি-অসাধারণ প্রভাব ছিল সে-বিষয়ে একটি ঘটনার কথা বলি। দেশ তখন অসহযোগ আন্দোলনের বন্যায় ডুবে গেছে, মানভূমও বাদ যায় নি। একবার পুরুলিয়ায় কয়েকজন কংগ্রেসনেতা জেলা-স্কুলে পিকেটিং করছেন, ছেলেরাও ঠিক করেছে স্কুলে ঢুকবে না। কিন্তু যেই নিবারণবাবু বেরিয়ে এসে ছেলেদের ডাকলেন, অমি তারা সুড় সুড় করে স্কুলে ঢুকে পড়ল। তারপর তিনি তাদের বল্লেন যে, দেশের কাজে যোগ দেবার জন্য তিনিই তাঁদের ডাক দেবেন। তিনি তাঁদের শিক্ষক, সুতরাং দেশের কাজে যোগদান করায়-তিনি হবেন তাদের অগ্রণী। ঘটনাক্রমে বিহারের

তদানীন্তন ডিরেক্টর-ককান সাহেব তখন পুরুলিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। ব্যাপার শুনে তিনি খুব খুসি হয়ে নিবারণবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু নিবারণবাবু তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, ছেলেদের দেশের ডাকে সাড়া দেওয়ায় তিনি বাধা দেন নি তবে তিনি তাঁদের শিক্ষক, সুতরাং একাজে তিনিই হবেন তাদের অগ্রগামী। এর কিছুদিন পরেই তিনি কাজে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু ককান সাহেব তাঁকে কিছুতেই চাকরী ছাড়তে দেবেন না। তাঁর কর্মদক্ষতায় ও চরিত্রগুণে ককান সাহেব তাঁকে যেমন ভালবাসতেন তেমনি শ্রদ্ধাও করতেন। তিনি নিবারণ বাবুকে লম্বা ছুটি নিয়ে মনস্থির করতে উপদেশ দিলেন, এবং এও বললেন যে শেষ পর্য্যন্ত যদি তিনি চাকরী করতে নাই চান তাহলে পেনসনের ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু এই বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি পুরুষ তাঁর সঙ্কল্প থেকে টললেন না। অবসরপ্রাপ্ত জীবনের নিশ্চিন্ত আরাম তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারল না। তাঁর পরিবার ছিল খুব ছোট। তাঁর সহধর্ম্মিণী-বহপূর্ব্বেই একটি পুত্র আর একটি কন্যা রেখে পরলোক গমন করেছিলেন। এই ক্ষুদ্র পরিবারটি নিয়ে পেনসনের টাকায় সে সময়ে তিনি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন। ককান সাহেবকে একটি পত্র দিয়ে তাঁর দেশসেবার অটুট সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে দিলেন। শোনা যায় তাঁর এই পত্রটির সাহিত্যিক মূল্যও ছিল নাকি অসাধারণ। অবশ্য তিনি সুসাহিত্যিকও ছিলেন। প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত।

চাকরী ছেড়ে দিয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার ফলে মানভূমে এই আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠল। তিনি সভা-সমিতি করে বক্তৃতা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। নেহাৎ প্রয়োজন বোধ না করলে বক্তৃতা দিতেন না। কিন্তু যখন বলতেন তখন তা যেমন হোত হৃদয়গ্রাহী, তেমনি বিজ্ঞাবত্তায় আর যুক্তিতর্কে সমৃদ্ধ। তিনি ছিলেন কর্মযোগী। বহুকষ্ট সহ্য করে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে সত্য এবং অহিংসার বাণী প্রচার করতে লাগলেন। মানভূমের খেড়িয়া, সবর প্রভৃতি আদিবাসীরা যেমন দুর্দান্ত তেমনি দুর্দ্ধর্ষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তারা অশনিতন্দ্রা বিদ্যুৎ। কারও শাসন তারা মানত না। তীর ধনুক ছিল তাদের সকল সময়ের সাথী। ব্রিটিশরাজ্যের প্রবল প্রতাপান্বিত পুলিশ পর্য্যন্ত তাদের ভয় করত। কিন্তু নিবারণবাবু এহেন দুর্দান্ত জাতিদের পর্য্যন্ত বশীভূত করতে পেরেছিলেন। হাড়ি ডোম প্রভৃতি হরিজনদের উন্নতি-কল্পে তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছিলেন। পুরুলিয়ার উপকণ্ঠে একটি আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। তার নাম ছিল কর্মমন্দির। সেখানে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সৈনিক তৈরী করতেন। আশ্রমবাসীদের তথা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই আশ্রমটি ছিল পুলিশের চক্ষুশূল। বহু উৎপীড়ন অত্যাচার করা সত্ত্বেও তারা কিন্তু এটি ভাঙতে পারেনি। এমনি ছিল তাঁর চরিত্রমাধুর্য্য আর জ্ঞানদানের পদ্ধতি যে যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসত, তারা কিছুতেই যেন তাঁকে ছেড়ে যেতে পারত না। এই সম্পর্কে তাঁর সার্থক লোক-শিক্ষার একটি দৃষ্টান্তের কথা বলি।—তখন বিপ্লা আর দিগম্বা ডাকাতের নামে, মানভূম, বাঁকুড়া এবং বর্দ্ধমান বেশ কিছুটা অংশ থরহরিকম্পমান হোত। রণ-পা নামক, লম্বা লম্বা দু'টো বাঁশকে বাহন করে তারা ঘোড়ার চেয়েও বেশী তাড়াতাড়ি ছুটতে পারত। একই রাত্রে অবিশ্বাস্য রকম দূর দূরান্তে গিয়ে ডাকাতি করে আসত। শোনা যায়, তারা পাঁঠা কেটে তার কাঁচা রক্ত খেত আর হরিণের মত বেগে মাইলকয়েক দৌড়ে তা হজম করত। পুলিশ বহু কৌশল-জাল বিস্তার করে তাদের অসতর্ক অবস্থায় ধরেছিল। একবার হাজারিবাগ জেলে দিগম্বা নিবারণ-বাবুর সংস্পর্শে আসে। তাঁর আদর্শে এবং শিক্ষায় দিগম্বার চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে শান্তভাবে সজ্জনের মত সে জীবনযাপন করত। বাকী

জীবনে সে নিবারণবাবুকে দেবতার মত ভক্তি করত। জেলেই হোক আর বাইরেই হোক মহান লোকশিক্ষক নিবারণচন্দ্র তাঁর কাজ করতে বিরত হননি, অথবা ব্রিটিশ রাজশক্তিও তাঁকে নিষ্ক্রিয় করতে পারেনি।

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার পর, তিনি তিনবার কারাবরণ করেছিলেন, ১৯২৯ এ একবৎসর, ১৯৩০ এ ছ মাস এবং ১৯৩২ এ আঠারো মাস। তাঁর সাধারণ স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপই ছিল। তৃতীয়বার কারাবাসের কষ্ট তাঁর পক্ষে জীবনহানিকর হয়ে উঠল। ১৯৩৪ এর ১৭জুলাই এই প্রচার বিমুখ চিরকালের দেশভক্তির আদর্শ, আদর্শনিষ্ঠ ঋষি নিবারণচন্দ্র মহাপ্রয়াণ করেন।

তিনি বলতেন—ভারত বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্র, শান্তিমন্ত্রের জন্মভূমি। জ্ঞানে ও কর্মে এই মন্ত্রের উপলব্ধিই ছিল তাঁর চির জীবনের সাধনা।

স্বনাম ধন্য লোকসেবক নেতা শ্রীবিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর একমাত্র পুত্র। আদর্শ পিতার আদর্শ পুত্র, স্বমহিমায় উজ্জল। আবাল্য দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। আমাদের যৌবনকালের তিনি সর্বজনপ্রিয়—সার্বজনীন, বিভূতি দা। গতবারে যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এবারেও হয়েছিলেন।

রামায়ণের কথা দিয়ে আরম্ভ করেছি, ঋষিচরিত্রের ফলশ্রুতির কথাটাও রামায়ণের ফলশ্রুতি থেকে উদ্ধৃত করি—শৃণ্ব মহত্বমীয়াৎ। আমরা অর্থাৎ যাঁরা তাঁকে দেখবার সৌভাগ্যলাভ করেছি, মনে করি যে, আমাদের মত স্বার্থসর্বস্ব, আত্মসুখাম্বেষী ব্যক্তিদের মনও এই মহৎ চরিত্রের শ্রবণ মননে, ক্ষণকালের জন্যও আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

নবযুগ স্রষ্টা ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীযোগানন্দ দাস তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় তাঁহার বালেশ্বর নববিধান ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিকী উৎসবে প্রদত্ত ভাষণ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত তথা জগতের ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মূল্য ও অর্থ কি তাহা এই ভাষণে সরল ও সহজভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা এই স্থলে ঐ ভাষণ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মহাত্মা রামমোহন রায় আধুনিক ভারতের জন্মদাতা রূপে পরিচিত। তিনি শুধু মূল মন্ত্রটি ধরিয়ে দিয়ে গেলেন, আর রেখে গেলেন তাঁর সন্তানকে, তাঁর উত্তরাধিকারীকে সেই মন্ত্রসাধনার জন্য এবং সেই মন্ত্রে নিখিল ভারতকে ও জগদ্বাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। সেই সন্তানের, সেই উত্তরাধিকারীর নাম ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজের জনক বলেই রামমোহন আধুনিক ভারতের জনক।

রামমোহনের পরে বাংলাদেশের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি রাজনারায়ণ বসু, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মিলনের ঋষি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মৌলবী গিরিশচন্দ্র সেন, ব্রহ্মগীতোপনিষদের উদ্‌গাতা গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, আশ্চর্য মানুষ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দেশপ্রেমিক মহাজাতিমিলনের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আনন্দমোহন বসু, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ব্রহ্মযোগী সিদ্ধপুরুষ কুমিল্লার আনন্দস্বামী, ওড়িশার মহাত্মা কালিন্দী কবিলা ও বিশ্বনাথ কর, ঋষি পদ্মলোচন দাস, বরদাকান্ত বর্ধন ও গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা, নবরূপে ওড়িয়া সাহিত্যের জন্মদাতা ফকিরমোহন সেনাপতি ও মধুসূদন রাও; মহারাষ্ট্রের মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, নারায়ণ গণেশ চন্দাবরকর ও বিঠলরাম শিন্ডে; দাক্ষিণাত্যের রামমোহন রায় রূপে পরিচিত রাজগোপাল চার্লু সুব্বারয়ণ চেট্টি; অন্ধ্রদেশের বীরেশলিঙ্গম পান্টুলু ও কুড়ুমল রঙ্গরাও, পাঞ্জাবের দয়াল সিং মাজাটিয়া, পণ্ডিত দিগম্বরলাল পাণ্ড্য, পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী; গুজরাটের ভোলানাথ সারাভাই, গোপাল দেশমুখ ও বাল্হোজলাল ছোটেলাল; যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যানাথ; সিন্ধুদেশের সাধু হীরানন্দ; আসামের পণ্ডিত পদ্মহাস গোস্বামী, সারা ভারতের বহুতর ব্রাহ্ম সাধকের চিন্তাধারা ধর্ম ও কর্ম সাধনা, লোকসেবা, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষানীতি, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ত্যাগ ও নৈতিক জীবন ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনকে নব নব প্রেরণা দিয়েছে এবং তার ঢেউ গিয়ে লেগেছে নিখিল ভারতের জাতীয় জীবনে।

শ্রীঅরবিন্দের পিতা ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসুর জামাতা ও ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী কেশবচন্দ্র পরমহংসদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন কি পরমহংসদেব কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেন সেই সত্য আজ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার দরকার। তুলনামূলক ধর্ম ও সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র পৃথিবীতে প্রথম ঘোষণা করেন রামমোহন রায়, পরমহংসদেবের বহু পূর্বে। এই বাণী, সকল ধর্মের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা, ব্রাহ্মসমাজের 'ট্রাষ্টডীড' থেকে শুরু করে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে, ব্রাহ্মমন্দিরের উপাসনায় ও উপদেশে ধারাবাহিক ভাবে চ'লে এসেছে। এবং পরমহংসদেবের যে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল, বিশেষত মল্লিকবাড়ীর

ব্রাহ্মসমাজে যে মহোৎসবের উপাসনাতে প্রীতিভোজে বসে তিনি সকলের সঙ্গে আহার করতেন, তার প্রমাণ আছে।

ইতিহাস-বিখ্যাত কেনরি লুই ভিভিয়ান্ ডিরোজিওর জীবনীলেখক টমাস এডওয়ার্ডস ১৮৮৪ সালে ক্রীশ্চান্ পাদ্রীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে লিখছেন :

'The power of Brahmoism as a factor in the religious life of Bengal is not to be despised, and its hold on the aspirations of young Bengal and we may say of India, is of a kind that Christian workers in India would do well not to undervalue or underrate"

বাংলা দেশের ধর্মীয় জীবনে ব্রাহ্মধর্মের শক্তি তুচ্ছ করবার নয়। যুব-বাংলার এমন কি যুব-ভারতের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব এমন একটা জিনিস, ক্রিশ্চান কর্মীরা (অর্থাৎ পাদ্রীরা) যাকে ছোট করে না দেখলেই ভাল করবেন।

রামমোহন রায়ের জীবনচরিত রচয়িত্রী কুমারী কলেট বলেছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম শুধু ভারতের জন্য নয়, ইউরোপের জন্যও প্রয়োজন।

আমেরিকা থেকে ব্রাহ্মসমাজের আন্তর্জাতিক মূল্য বিষয়ে ডাঃ এক্ সি সাদার্থ বলেন :

'If I were to suggest a single word to describe the service the Brahmo Samaj has rendered during the nineteenth century to India and the world, that would be Emancipation.

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য যা করেছে, একটি মাত্র শব্দ দিয়ে যদি তা প্রকাশ করতে হয়, তবে সে শব্দটি হ'ল মুক্তি।

কিন্তু শুধু মিশনারীর কথা নয়।

ডাঃ অ্যানী বেসান্ট্, একজন ইংরেজ মহিলা, যিনি ভারতকেই তাঁর নিজের দেশ করেছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। সেই তেজস্বিনী স্বাধীনচেতা অ্যানী বেসান্ট্ ভারতের জাতীয় ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলছেন :

"The Brahmo Samaj marked the awakening of the Indian Nation from the coma produced by the East India Company."

ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ও শোষণের ফলে এদেশের মৃত্যুমুখী মানুষদের যে সংজ্ঞাহীন মূর্ছা ঘটেছিল, তা থেকে ভারতীয় জাতিকে প্রথম বাঁচিয়ে তুলেছে ব্রাহ্মসমাজ।

পাদ্রীও নন, জাতীয় নেতাও নন, একজন সাধারণ ইংরেজ সম্ভবত কোনও কফি বাগিচার মালিক রবার্ট কইট ১৮৭২ সালে বিলেত থেকে প্রকাশিত তাঁর Concerning John's Indian Affairs নামক গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজকে একটা volcano বা আগ্নেয়গিরি আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ দেশে দু'টো আগ্নেয়গিরি দেখা দিয়েছে, একটা হল সিপাহী-বিদ্রোহ, তার আগুন নিভে গিয়েছে। দ্বিতীয় আগ্নেয়গিরি হ'ল ব্রাহ্মসমাজ, তার আগুন এখনো নেভেনি, ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মনে রাখতে হবে এ বই ছাপা হয়েছে বিলেতে ১৮৭২ সালে। অর্থাৎ যখন মহাবিপ্লবী কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড জয় করে এসে সমাদিনের স্বর্গের মত গৌরবের শিখরদেশ থেকে সারা ভারতে আগুন ছড়াচ্ছেন এবং ভারতের দিকে দিকে তাঁর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত শিষ্যেরা সে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছেন। যে প্রচণ্ড ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে ভারতের ইংরেজ বড়লাটকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল, যে-আন্দোলনের অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করতে ইংরেজ সরকারকে এক সময়ে বহু প্রয়াস পেতে হয়েছে, রবার্ট কইট ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তার তুলনা করে বলছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের তুলনায় ওয়াহাবী আন্দোলন তুচ্ছ তুষ মাত্র, mere chaff, যা হাওয়ায় উড়ে যায়। এই কথা ব'লে তিনি ইংরেজ সরকারকে ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে বলছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের ভাবধারা সারা ভারতে যে-রকম দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে, এইভাবে বাড়তে থাকলে এদেশে আমাদের

অর্থাৎ ইংরেজশাসনপদ্ধতির পক্ষে সে-টা নির্ঘাত মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে—"spreading at such a rate as must inevitably prove speedily fatal to our present system of Indian administration." ১৮৭২ সালে, ইলিয়টের ঐ গ্রন্থ প্রকাশের সময়ে সারা ভারতে ৯টির জায়গায় ৬৪টি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছে, ১৮৮৩ সালের মধ্যে অর্থাৎ কংগ্রেস জন্মের দু'বছর আগে, এই ৬৪টি দাঁড়িয়েছিল ১৪১টিতে, এবং শতাব্দীর শেষে প্রায় দুইশত। সুতরাং ইলিয়ট্ যে 'দ্রুতগতির' কথা বলেছিলেন, সেটা খুব ভুল বলেন নি।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন কাউকেই আমরা অস্বীকার করি না। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাধারাই এদেশকে বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ করেছে। "সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্" ছিল ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের মৌলিক বাণী,—মন্দির নয়, মসজিদ নয়, গির্জা নয়। গত শতাব্দীতে জাতীয়তা-বোধ প্রভৃতি বাইরের জগতের যা-কিছু প্রগতিশীল তা'কে স্বীকার করতে গ্রহণ করতে আমরা দ্বিধা করিনি। আজকের দিনেও বিশ্বের যা কিছু প্রগতিশীল তাকে স্বীকার করতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু বিশ্বকে স্বীকার করার আগে নিজের দেশকে চেনা দরকার নিজের দেশের প্রগতিশীল চিন্তা ও কর্মধারার ইতিহাসকে জানা দরকার, স্বীকার করা দরকার।

রামমোহন রায় একাধারে ধর্মপ্রবর্তক ও জমিদার, ব্যাংকার, আইনের পুস্তক ও সতীদাহের বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রচারের সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় উপনিষৎ অনুবাদ ও বেদান্ত প্রচার করছেন, ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছেন, ভূগোল রচনা করেছেন, রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে আন্দোলন করছেন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পত্তন করছেন, ইংরেজী বাংলা হিন্দী ফার্সীতে সংবাদপত্র বা করছেন; আরবী ভাষায় কোরানও পড়ছেন প্লাটো আরিস্টটল পড়ছেন আবার ইউক্লিডও পড়ছেন; লাতিন ভাষায় নিউটনের 'লা প্রিন্সিপিয়া'ও আয়ত্ত করছেন, বেন্থাম বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন আবার ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে পুস্তিকা রচনা করছেন, কবিতায় গীতার অনুবাদ করছেন বিলেত গিয়ে সেখানকার রিফর্ম-বিল আন্দোলনে মনপ্রাণ দিয়ে যোগ দিচ্ছেন, দিল্লীর বাদশার দৌত্য করছেন, পার্লামেন্টের কাছে এ দেশের কৃষকদের বিষয়ে তথ্য পেশ করছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে উপনিষদের অনুবাদ বিলি করছেন ও নিজের Universal Religion বা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্ম নেতাদের চারিত্রে ও ধর্মবোধে এই সর্বাঙ্গীনতা পরিস্ফুট। আনন্দমোহন একাধারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি। সেইজন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাংলা মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেই বলেছিল: "সমাজ ও মনুষ্য জাতিকে বিস্মৃত হইয়া কেবল ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকাকেই ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম বলিয়া মনে করেন না।' ১৮৭৮ সালে ঐ সমাজের ইংরেজী মুখপত্র Brahmo Public Opinon আরো স্পষ্ট করে লিখেছে যে 'ব্রাহ্মধর্মে শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতিই হয় না। ব্রাহ্মধর্ম প্রমাণ করবে যে এর দ্বারা আমাদের মানসিক উন্নত এমনকি রাজনৈতিক ও দৈহিক political and physical উন্নতিও হবে ব্রাহ্মসমাজ নির্ভয়ে এই সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।' এখানেই রামমোহন রায় থেকে শুরু করে সমস্ত ব্রাহ্মনেতাদের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ধর্মগুরুদের মৌলিক চারিত্রগত প্রভেদ।

চীনের সাহায্য লইতে হইবে কেন?

দেশের যাহা কিছু অভাব অভিযোগ তাহা দূর করিবার জন্য কেন বিপ্লব হওয়া আবশ্যক; কেন আদর্শবাদী কর্মী ও দেশ নেতারা গঠনশীল প্রচেষ্টার দ্বারা সে সকল অভাব দূর করিতে পারেন না, প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর বিপ্লবপন্থীরা দিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা বিপ্লবকেই আদর্শ বলিয়া খাড়া করিয়াছেন; অভাব অভিযোগ দূর করাকে নহে। জনসাধারণ অভাব অভিযোগ দূর করাটাই প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন।

বিপ্লব হইলে অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে নিঃসন্দেহ—লাভ কিছু হইবে কিনা বলিতে পারে না। সে যাহাই হউক, বিপ্লব হইলেইবা তাহা আমরা নিজেদের শক্তিতে কেন সক্ষমভাবে করিতে পারিব না? চীনের সাহায্য কেন লইতে হইবে? এবং চীনের সাহায্য লওয়ার অর্থ কি চীনের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া নয়? এ বিষয়ে "যুগবাণী" বলিতেছেন ;

"চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান"—দেয়ালে দেয়ালে এই বার্তা এতদিন ঘোষিত হইতেছিল, গত ২২শে এপ্রিল কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী লেনিনবাদী)-এর উদ্যোগে প্রায় পনেরো হাজার যুবকের যে মিছিল কলিকাতার পথ পরিক্রমা করিয়াছিল তাহাতে স্লোগান দেওয়া হইয়াছে: "চীনের ফৌজ আমাদের ফৌজ।" আমাদের কার্যালয়ের সম্মুখ দিয়া মিছিলটি যখন যাইতেছিল আমরা তখন উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। মাও সে তুঙের বড় ছবি লইয়া লাল বই হাতে নাড়িতে নাড়িতে কমিউনিষ্ট যুবকরা আরও যেসব স্লোগান দিয়া মহানগরীর রাজপথ মুখরিত করিয়াছে তাহার মধ্যে একটি ছিল এই: "মুক্তি ফৌজ আসছে—আসবে।" আমরা যাহা বুঝিলাম তাহা সোজা কথায় এই যে, চীনের সামরিক বাহিনী ভারতের অভ্যন্তরে অদূর ভবিষ্যতে প্রবেশ করিবে এবং উহাকে মুক্তি ফৌজ রূপে আমাদের স্বাগত জানাইতে হইবে। আজ পর্যন্ত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (ডাঙ্গেপন্থী), মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি (প্রমোদপন্থী), কিংবা অন্য কোন মার্ক্সবাদী পার্টি নক্সালপন্থীদের উপরোক্ত মত ও পথের নিন্দা করেন নাই। বরং বিশেষত জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাসগুপ্ত ও হরেকৃষ্ণ কোঙার যেরকম চড়া গলায় ইদানীং কথা বলিতেছেন তাহাতে নক্সালপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের সুরের মিলটাই লক্ষ্য করিতেছি। জ্যোতি বসু নাকি এমন অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছেন যে এদেশে আর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার আশা নাই, কারণ শীঘ্রই এদেশে বিপ্লব ঘটিয়া যাইবে। কোন পথ দিয়া বিপ্লব আসিবে আমরা জানি না। সুন্দরবন অঞ্চলের পথ দিয়া বিপ্লবের একটা ঝটকা আসিতে পারে, তবে ঐ বিপ্লবের পতাকা অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত সবুজ পতাকা হইবে বলিয়াই মনে হয়। নেফা ও উত্তরবঙ্গের দিক হইতে যদি কাস্তে হাতুড়ি মার্কা বিপ্লব একই সঙ্গে প্রবেশ করে তবে কেহ বিস্মিত হইবে না। কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তানভুক্ত চীন সেখানে একটি প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করিতেছে—উহার সাহায্যে তিব্বত হইতে সামরিকবাহিনী ও রসদ সহজে পৌঁছাইতে পারিবে। সড়ক নির্মাণ শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৯৭১ সালে, চীন এখন তড়িঘড়ি কাজ সারিয়া এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সড়কটি খুলিয়া দিতে চায়। মুক্তি ফৌজের আগমন ত্বরান্বিত হইবার ইহা কি ইঙ্গিত।

গত ২৪শে এপ্রিল ময়দানে এস ইউ সির জনসভায় নক্সালপন্থীদের কিছু সমালোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু চীনা ফৌজকে মুক্ত ফৌজ রূপে আহ্বান করিয়া আমার কর্মপন্থা সম্পর্কে কোন মন্তব্যই ঐ সভায় শুনি নাই। এই নীরবতার অর্থ আমরা বুঝিতেছি না। নক্সালপন্থীদের একথাও বুঝিতে আমরা অক্ষম যে দেশে সশস্ত্র বিপ্লব করিতে হইলে দেশবাসীর দ্বারাই সেটা সম্ভব নয় কেন? একথা সত্য যে দেশের শাসকশ্রেণী দেশগঠনে, জাতিগঠনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে; জনসাধারণের দুর্দশারও সীমা নাই। তাদের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে, শাসন ক্ষমতা হইতে তাদের উচ্ছেদ করিতে হইবে, বিপ্লবী শক্তিগুলির ক্ষমতা দখল করিতে হইবে,—এসব কথাই আমরা বুঝিতে পারি। দেশ যদি সেইজন্য প্রস্তুত থাকে, বিপ্লবের মহেন্দ্রক্ষণ যদি আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে ক্ষমতা দখলের সেই চূড়ান্ত লড়াই শুরু হোক। সে লড়াই রক্তাক্ত হইবে, সশস্ত্র হইবে, হিংসাত্মক হইবে—বিপ্লব তাহা ছাড়া সফল হয় না। বিপ্লবের সেই চেহারাটা গৃহযুদ্ধের রূপ লইবে এই পর্যন্ত বুঝি; চারু মজুমদার, কানু সান্যাল গৃহযুদ্ধে বিপ্লবীপক্ষের সেনাপত্য করিবেন তাহাও বুঝি। কিন্তু চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির সেজন্য কেন আসা দরকার মার্ক্সবাদী নেতারা সেকথা খোলাখুলি বুঝাইয়া দিলে দেশবাসী কৃতজ্ঞ থাকিবে।

সাময়িকী

"মেঘালয়"

প্রদেশের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে স্বাধীনতা ততই প্রবল ও পরিণত হইয়া উঠিবে, এইরূপ ধারণা অনেকে পোষণ করেন। ইহার মধ্যে কোন যুক্তি বা সুবিচারের কথা নাই। আমরা মনে করি প্রদেশ গঠন শুধু দেশ শাসনের সুবিধার কথা বলিয়াই বিচার্য্য। ভারতবর্ষে যে বহু নূতন নূতন প্রদেশ গঠন করা হইতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে বৃহত্তর আকারের প্রদেশের নেতাদিগের স্বজাতি ও স্বদলপ্রীতি। সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যদি সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের উপর সুবিচার না করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের প্রদেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলিয়া নিজেদের নিচে দাবাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে প্রদেশগুলি ক্রমে ক্রমে আরও ভাগ হইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে। এই জাতীয় আশঙ্কা আছে বহু প্রদেশে। ইহার মধ্যে বিহার একটি প্রকট উদাহরণ। "মেঘালয়" প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় কে কি বলিয়াছেন তাহা করিমগঞ্জের 'যুগশক্তি' পত্রিকায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

গতকল্য ২রা এপ্রিল শিলং-এ আসামের অভ্যন্তরে স্বশাসিত পার্বত্য রাজ্য মেঘালয়-এর জন্ম হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে এই নূতন রাজ্যের উদ্বোধন করেন।

শিলং প্যারিসন গ্রাউণ্ডে প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাবেশে এই রাজ্যের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

প্রধানমন্ত্রী মেঘালয় সরকার ও জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি এই আশ্বাস দেন যে, ভারতের এই সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভবপর সকল প্রকার সাহায্য দিবেন। প্রধানমন্ত্রীর ইংরাজি ভাষণ লোকসভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীজি, জি সোয়েল স্থানীয় খাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া শোনান।

মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন সাংমা মন হইতে ভয় ঘৃণা পরিহার করার জন্য এবং দেশের উন্নয়নে সবকিছু নিয়োজিত করিতে পার্ব্বত্য জনগণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

মেঘালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আকাশবাণীর গৌহাটি কেন্দ্র হইতে ঐদিন রাত্রে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে ক্যাপ্টেন সাংমা আরোও বলেন যে, মেঘালয় ও উহার জনগণের পক্ষে এই দিনটির এক বিরাট তাৎপর্য রহিয়াছে।

তিনি বলেন, ১৬ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা পূরণ করার জন্য আমাদের উচ্চমানের চরিত্র, চিন্তা ও মনের সততা, এক লক্ষ্য, সহিষ্ণুতাবোধ, কঠিন কাজ করার ক্ষমতা এবং উচ্চ আদর্শ থাকা দরকার।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আসামের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্র মোহন চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার প্রতিনিধিত্ব করেন। শ্রী চৌধুরী বলেন যে, মেঘালয় রাজ্য এবং সেখানকার জনগণের সুখ সমৃদ্ধি সম্প্রসারণ ও সুনিশ্চিত করার জন্য আসাম সরকার চেষ্টার কোন ত্রুটি করিবেন না।

নতুন রাজ্য মেঘালয়ের জন্ম উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল শ্রী বি, কে নেহরু এক বাণীতে বলিয়াছেন যে সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তিয়া এবং গারো পার্ব্বত্য জেলা লইয়া আসামের মধ্যেই নূতন স্বশাসিত মেঘালয় রাজ্যের জন্ম পার্ব্বত্য অঞ্চল ও সমতল অঞ্চলের জনগণের গভীর বন্ধনের মাধ্যমে প্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন যুগের সূচনা করিয়াছে।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা নতুন মেঘালয় রাজ্যের জন্ম উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া

বলেন যে, আসামের ভিতরেই সংযুক্ত খাসি ও জয়ন্তিয়া এবং গারো পাহাড় জেলাকে লইয়া একটি স্বয়ংশাসিত রাজ্য মেঘালয়ের জন্ম আমাদের গণতন্ত্রের সংবিধানের ইতিহাসে একটি অভূতপুর্ব ঘটনা। যে শান্তিপুর্ণ ও আপোষমূলকভাবে এই নতুন রাজ্য গঠিত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে ইহা ভালভাবে প্রমাণিত হইবে যে আমাদের দেশে গণতন্ত্রের শিকড় কত গভীরে চলিয়া গিয়াছে।

বেকার সমস্যা

শ্রী শিশির কান্তি রায় 'যুগবাণীতে' লিখিয়াছেন :

স্বাধীনতা লাভের পর বাইশ বছর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে অথচ আজ পর্যন্ত বেকার সমস্যার বিন্দুমাত্র সমাধান হওয়া দুরে থাকুক - উহা উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়া এমন এক ভয়াবহ স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছে যাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা সুদুরপরাহত মনে হয়। সেদিন কাগজে দেখিলাম ভারতবর্ষে সর্বমোট বেকারের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি। এই সাংঘাতিক সংবাদে যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তিই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন। অথচ সাড়ে তিন কোটি লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা হইলে এতে লাভবান হইবেন এদের উপর নির্ভরশীল এই দেশের অন্তত পনেরো কোটি লোক।

মাত্র বছর কয়েক আগে ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু কেরানীদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে অফিসে বসিয়া বাবু সাজিয়া কেরানীর কাজ করিবে তেমন লোকের প্রয়োজন তাঁহার নাই। তিনি চান ইঞ্জিনীয়ার ও ওভারসীয়ারের দল। ফলে রাজ্যে রাজ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও পলিটেক্‌নিক ইনিষ্টিটিউট প্রয়োজনাতিরিক্ত খোলা হইল। কয়েক লক্ষ ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার পাশ করিয়া বাহির হইল। আজ ইহাদের দুরবস্থার কথা জানেনা এমন ব্যক্তি ভূ-ভারতে নাই। ইঞ্জিনীয়ার যুবকরা এখন পাঠশালার শিক্ষক হওয়ার জন্য দরখাস্ত দেয়, পুজার মণ্ডপে চায়ের দোকান খুলিয়া চা বিক্রী করে। কেরানীর চাকুরী পর্যন্ত ইহাদের ভাগ্যে জোটে না এখন। দুই দুইটা যুদ্ধের ঠ্যালা সামলাইতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। কোথায় গেল পাঁচসালা পরিকল্পনা আর কোথায় গেল কি। আজ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলিতে ছাত্রাভাব দেখা দিয়াছে।

একথা ঠিক যে বেকার সমস্যার কোন ব্যাপক প্রতিকার চেষ্টা এখন অবধি কেন্দ্রীয় শাসকদিগের তরফ হইতে করা হয় নাই। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির জন্য বেকার সমস্যা কতটা দায়ি তাহা রাষ্ট্রনেতারা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই।

কলিকাতার দুধের কথা

কলিকাতার নাগরিকগণ একপ্রকার জলমিশ্রিত দুগ্ধ ও চালানী গুঁড়া দুধগোলা জল খাইয়া থাকেন। এই ভাবে কৃত্রিম দুগ্ধপানের নজির মহাভারতেও পাওয়া যায়; সুতরাং বিষয়টার একটা মহান ঐতিহ্যও রহিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে আমাদিগকে বাংলা সরকার যে সস্তার দুধ সরবরাহ করিতেছেন তাহা সাক্ষাৎভাবে সস্তা হইলেও তাহার একটা লোকসানের দিক আছে যাহার ধাক্কা আমরা ট্যাক্সবৃদ্ধির মাধ্যমে খাইয়া থাকি। হরিণঘাটার দুগ্ধের কারবার কেমন করিয়া চলে তাহার একটা বর্ণনা 'যুগজ্যোতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে ঐ সস্তার দুগ্ধ জাতীয় হিসাবে কতটা সস্তা। দুধের গুণাগুণ বিচার করিলে লোকসানের দিকটা আরো প্রকট হইয়া দেখা যায়। আমরা বর্ণনাটির অধিকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

সরকারী দুগ্ধ প্রকল্পের একশ্রেণীর কর্মী গত ২০শে এপ্রিল হইতে "নিয়ম মাফিক" কাজ সুরু করায় কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ডেয়ারি ডেভেলাপমেন্ট এণ্ড অ্যানিম্যাল হাসবেনড্রি ওয়ার্কারস ইউনিয়নের সম্পাদক অরুণ বসু এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে মিল্ক কমিশনারের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ওখানকার কর্মীদের ৮ ঘণ্টার জায়গায় দৈনিক ১২ হইতে

১৬ ঘণ্টা কাজ করিতে বাধ্য করা হয় এবং এইজন্য তাঁহারা কোন ওভারটাইম পান না। কর্তৃপক্ষ ওভারটাইমের বদলে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের স্পেশাল পে দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। ফলে কয়েকদিন যাবতই দুধ সরবরাহ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে এবং কে কবে দুধ পাইবেন তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

হরিণঘাটার ব্যাপার কি তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সরকার এ পর্য্যন্ত এখানে ৮ কোটির মত টাকা লগ্নী করিয়াছেন এবং ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটেও আরও ২২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এই খাতে বরাদ্দ করিয়াছে। ৭৮ কোটি টাকা মূল্যের দুধ প্রতিবছর এখান হইতে সরবরাহ করা হইতেছে অথচ প্রতি বছরই এখানে প্রচুর পরিমাণে লোকসান হইতেছে। লোকসানের পরিমাণ নিম্নরূপ—

	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০	১৯৭০-৭১ (আনুমানিক)
পরিচালনার হিসাবে—	২০,৩৫,০০০	২৫,৬২,০০০	৩২,৮৩,০০০
সুদী টাকার সুদ—	৪০,৬৪,০০০	৪২,৫৪,৭০০	৪৪,১৯,০০০
ডিপ্রিসিয়েসন—	৩৬,৮১,০০০	৪০,৮৫,০০০	৪৩,২০,০০০
মোট—	৯৭,৮০,০০০	১,০৯,০১,০০০	১,২০,২২,০০০

সরকার ইহাকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া জাহির করিলেও যে প্রতিষ্ঠানকে বছরের উপর বছর এইভাবে লোকসান দেওয়া সত্ত্বেও টিকাইয়া রাখা হইয়াছে তাহাকে দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা জনহিতকর পরিকল্পনা বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। সে ক্ষেত্রে যদি জনগণের হিতই সাধন করা না হইল তাহা হইলে ইহার অস্তিত্বের কোনই অর্থ থাকে না।

দেশ বিদেশের কথা

কম্বোডিয়ার যুদ্ধ

কাম্বোডিয়ার রাজার রাষ্ট্রীয় মতামত কি ছিল তাহা বিচার করা কঠিন। কেননা তিনি প্রথমে আমেরিকার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াই চলিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত আমেরিকা অথবা চীনের রাষ্ট্রনৈতিক কোন মতদ্বৈধ প্রবল আকারে দেখা দেয় নাই। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে কাম্বোডিয়ার রাজপ্রাসাদে একটা ছোট বিপ্লব হইল ও তাহার ফলে রাজা (প্রিন্স) শিহানুক হঠাৎ নির্ব্বাসনে চলিয়া গেলেন। এই বিপ্লব না কি দক্ষিণপন্থীরা ঘটাইয়াছিল ও অনেকের মতে তাহাতে আমেরিকার হাত ছিল। শিহানুক নির্ব্বাসনে যাইলেন পিকিংএ। অর্থাৎ তাহার কম্যুনিষ্ট দলের সহিত সংযোগ ছিল। তাহা হইলে তিনি যে পূর্ব্বে আমেরিকানদিগের সহিত সখ্য স্থাপন চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা ছিল অভিনয় মাত্র। বাস্তব মতবাদ তাঁহার উল্টা রকমেরই ছিল। সে যাহাই হউক, কাম্বোডিয়ার প্রাসাদের অন্দরমহলে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতে আমেরিকান প্রভাব থাকিলেও সৈন্যদল ছিল না। ভিয়েৎকং ও ছিল না। কম্বোডিয়ার মানুষই বিভিন্ন দলভুক্ত হইয়া আপোষে লড়াই করিয়া শিহানুককে বিতাড়িত করিয়া অপর প্রকার রাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

অতঃপর দেখিতে হইবে যে কাম্বোডিয়ায় ভিয়েৎকং আগে ঢুকিল কিম্বা আমেরিকান অথবা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সৈন্যগণ আগে গিয়াছিল। এই বিষয়ে মতানৈক্য হইবে। আমেরিকানগণ বলিবে যে ভিয়েৎকং আগে আসিল বলিয়াই তাহারা নিমন্ত্রিত হইয়া কাম্বোডিয়াতে গিয়াছিল, রক্ষক হিসাবে। ভিয়েৎকং বলিবে আমেরিকান যদি কাম্বোডিয়ায় গিয়া স্থানীয় লোকেদের উপর হুকুম চালাইতে আরম্ভ করে তাহা হইলে তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হয়। এবং যে হেতু রাজা শিহানুক কম্যুনিষ্ট সমর্থক সুতরাং ভিয়েৎকং সৈন্য দিয়া তাহার অনুচরদিগকে রক্ষা করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

আসল কথা পারে পড়িয়া গায়ের জোরে পরহিত করা রাষ্ট্রধর্ম্ম বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। সে কার্য্য যেই করুক না কেন। আমেরিকান করিলে তাহা সাম্রাজ্যবাদ এবং কম্যুনিষ্ট করিলে তাহা জনমুক্তির মহান চেষ্টা, এই জাতীয় কুটতর্কেও আমরা বিশ্বাসী নহি। যাহাদের দেশ তাহারাই স্থির করিবে কিরূপ রাষ্ট্র কোন দেশে গঠিত হইবে। চীন তিব্বতে গিয়া "মুক্তি সংগ্রাম" করিয়া সমগ্র তিব্বতটাকে চীনের দাস করিয়া লইল এবং সেই অন্যায় বিশ্বের সকলে (পণ্ডিত নেহেরুও বাদ পড়েন নাই) হজম করিয়া লইল। ইহা হইল বর্ত্তমান যুগের অতি প্রকট একটা রাষ্ট্রীয় অধর্ম্ম ও অন্যায়ের কথা। পাকিস্তান দুইবার গায়ের জোরে কাশ্মীর ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে ঐ একই ধরণের অন্যায় আবেগে। পাকিস্থানের অন্যায় রুশিয়া, আমেরিকা চীন প্রভৃতি সকল দেশ মানিয়া লইয়া পাকিস্থানকে তৃতীয়বার ভারতের অনুপ্রবেশ করিবার ব্যবস্থা এখনও করিয়া দিতেছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক অধর্ম্ম আর অধর্ম্ম থাকিতেছে না। ইংরেজী কথায় বলে মাইট ইজ রাইট অর্থাৎ শক্তি ও সত্য কিম্বা গায়ের জোরে দখল ও আইনের অধিকার একই কথা। বস্তুত ঐ জাতীয় মিথ্যাকে আমরা সত্য বলিতে পারি না। আর একটা কথা, অন্যায় যে যেখানেই করুক তাহা কখনও ন্যায় হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। দল বুঝিয়া ন্যায়

অন্যায় ধর্ম অধর্ম ও ন্যায় অন্যায় স্থির করা যাইতে পারে না। কাম্বোডিয়াতে যাহা ঘটিতেছে তাহা আপাত-দৃষ্টিতে বিশেষভাবে অন্যায়। আমেরিকার যদি যুদ্ধ করিয়া উত্তর ভিয়েৎনামের লোকেদের দমন করিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে সে চেষ্টা কাম্বোডিয়ায় করিবার কোন ন্যায়সংক্রান্ত কারণ নাই। যে যাহার যুদ্ধ নিজ নিজ দেশে চালাইলেই ভাল হয়। যদিও তাহাতেও বহু নির্দোষ লোকের প্রাণ যায় ও বহু ক্ষতি হয় সাধারণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র, কোন প্রকারের রাষ্ট্র গঠিত হইলেই মানব-সমাজ দোষমুক্ত এবং সকল মানুষের সকল কষ্ট শেষ হইয়া যায় না। ন্যায় সুবিচার ও ধর্ম রাষ্ট্রীয় মতবাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সুনীতি ও ধর্মের প্রেরণা ও আগ্রহ মানুষের প্রাণে তখনই জাগ্রত হয় যখন সে ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার সময় নিজের ও নিজদলের সুবিধার কথা ভুলিয়া শুধু সত্য কি তাহারই উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে পারে।

রাষ্ট্রপতির শাসন

পশ্চিম বাংলায় যে ১৪ দলের সমবেত শক্তিতে গঠিত মন্ত্রীসভা শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিল সে মন্ত্রীসভা রাষ্ট্রীয় দলগুলির পারস্পরিক কলহ বিবাদের এবং কম্যুনিষ্ট মার্কসিষ্ট দলের সকলের উপর একাধিপত্য স্থাপন চেষ্টার ফলে ভাঙ্গিয়া যায়। মুখ্য মন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় অনেক দিন হইতেই বলিতেছিলেন যে কম্যুনিষ্ট মার্কসিষ্ট-দল পুলিশ নিজেদের হাতে লইয়া দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করিতেছেন এবং এই অপরাধের বন্যা দেশকে ক্রমে ক্রমে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। অজয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় কম্যুনিষ্ট মার্কসিষ্টদলের নেতা ও বাংলার উপমুখ্য মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর বিপ্লবের মাধ্যমে কম্যুনিষ্ট রাজত্ব স্থাপন চেষ্টা দমন করিবার জন্য অনাহারে সত্যাগ্রহ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। তখন কোনও দিক দিয়া দেশের শৃঙ্খল অগ্রগমন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া এবং সম্মুখে রাজকতার ভয়াবহরূপ ক্রমশঃ বিকটতর হইয়া উঠিতে দেখিয়া অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া সমবেত মন্ত্রী-সভা ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার ফলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তিত হইল এবং পশ্চিম বাংলার আইন প্রণয়ন সভাও নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তনের ফলে দেশের অবস্থা যে খুব উন্নতির দিকে গিয়াছে তাহা বলা চলে না। স্কুলে, কলেজে ও অন্যান্য স্থলে মারপিট, বোমা নিক্ষেপ, আসবাব ভাঙ্গা, মূল্যবান চিত্র পুস্তক বাস ট্রাম জ্বালাইয়া দেওয়া প্রভৃতি এখনও চলিতেছে। মানুষের ভদ্রতা হ্রাস হইয়া ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি হইতেছে এবং সকলের ব্যবহারে মনে হইতেছে যে কেহ কাহাকেও বা কোনকিছু না মানিয়া চলিলেই দেশের উন্নতি অসম্ভব দ্রুতগতিতে তাহার ঊর্দ্ধতম সীমা অতিক্রম করিয়া চরমে পৌঁছাইয়া যাইবে। ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচার চলিতেছে যে পাঠের ব্যবস্থার কোন নূতন রকমের সংস্কৃতি হইলেই সকলের রোজগারের পথ খুলিয়া যাইবে। সুতরাং যে ক্ষেত্রে উপার্জ্জন করিতে না পারাই, দেশের সকল অভাব অভিযোগের মূলে রহিয়াছে সেখানে বিদ্যালয়গুলিকে ধ্বংশ করিতে পারিলেই দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছ্যের উন্নতির সহিত লেখা-পড়ার ব্যবস্থার সম্বন্ধ গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে থাকিলেও; লেখাপড়ার ভিতর দিয়া সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। জাতীয় ঐশ্বর্য্য উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ব্যবস্থায় অসংখ্য শাখা প্রশাখা আছে এবং তাহার অনেকগুলির সহিতই শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ কোন সংযোগ নাই। যেসকল অসামঞ্জস্য ঘটিলে বস্তু উৎপাদনে, তাহার ক্রয় বিক্রয়ে ও ব্যবহারে লেনদেনের মিল ও ভারসাম্য রক্ষা হয় না, তাহার অধিকাংশের সহিতই পাঠ্যপুস্তকের কোনও পরিচয় কখনও হয় না। বরঞ্চ বলা যাইতে পারে যে বিদ্যালয়ে যাহা শিখান হয় তাহা দ্বারা উৎপাদন কার্য্যে সাহায্য হইলেও অল্পই হয়। সুতরাং বিদ্যা অর্জ্জনের যে কৃষ্টিগত মানবীয় উন্নতির দিক আছে তাহা অতি আবশ্যক হইলেও; ভোগাবস্তু উৎপাদনকার্য্যে বহুস্থলেই সেই বিদ্যা ফলপ্রদ ও কার্য্যকর হয় না একথা মনে

রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে তেমনি করিয়াই চলিতে ফিরিতে হয়, যাহাতে মস্তকের বিদ্যা যেন হস্তের কর্ম-কৌশলকে অসাড় করিয়া না দেয়। লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরী করিব ইহাই সকল ছাত্রছাত্রীদিগের মনোবাঞ্ছা কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া হাঁস মুরগীর চাষ, দুধের কারবার, ফলের গাছ লাগান কিম্বা যে কোন অন্য পরিশ্রমের কাজ করা চলিবে না ইহাই বা কে স্থির করিয়া দিয়াছে? ছাত্রছাত্রীদিগের মধ্যে বাস্তবক্ষেত্রের অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করিয়া চলিবার আগ্রহ বিশেষ লক্ষিত হয় না। ইহার জন্য বয়স্করাও বহুল অংশে দায়ী। কারণ চাকুরীই করিতে হইবে এই মনোভাব তাঁহারাই সৃষ্টি করিয়াছেন।

পশ্চিম বাংলায় চাকুরীর বাজার ক্রমশঃ আরোও মন্দা হইতেছে। অনেক কারখানা, অফিস, দফতর বন্ধ হইয়া সহস্র সহস্র লোকের চাকুরী থাকিতেছে না। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় অবাঙ্গালীর সংখ্যা পূর্বের ন্যায়ই অত্যধিক থাকিতেছে। এই সকল অবাঙ্গালী নানাভাবে বেশ কিছু রোজগার করিয়া সেই অর্থ নিজ দেশে মণিঅর্ডার যোগে নিয়মিত পাঠাইয়া থাকে। ইহারা যেসকল কার্য্য করে তাহার অনেক কাজ বাঙ্গালীরা করিতে প্রস্তুত থাকে না। যথা মোট বহিবার কাজ, দারোয়ানের কাজ ইত্যাদি। কিন্তু মোটরগাড়ি-চালকের কাজ, ধোপার কাজ, নাপিতের, পানওয়ালার, গোয়ালার, দরজির, রাজমিস্ত্রির, ফেরিওয়ালার, মজুরীর কাজ ইত্যাদি বহু কাজই বাঙ্গালীরা করিতে পারে এবং তাহাদের করা প্রয়োজন। এই সকল কাজে সহস্র সহস্র অবাঙ্গালী পশ্চিম বাংলায় নিযুক্ত আছেন। রন্ধন পরিবেশন প্রভৃতিও বাঙ্গালীকে করিতে দেখা যায় না। কিন্তু করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতির শাসনকালে যদি পশ্চিম বাংলার বেকার সমস্যা কিছুটা নরম হইয়া আসে তাহা হইলে তাহার ফল ভালই হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সে চেষ্টা কি কেহ করিতেছে?

বিদ্যাসাগর : ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, প্রকাশক জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১৩। পৃষ্ঠা-১৪৪।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ১৯৬৮ সনের বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালার পাঁচটি বক্তৃতা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। বক্তৃতার বিষয়গুলি যথাক্রমে—বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব, ঋগ্বেদের যুগে ভারতীয় নারী, স্মৃতি-শাস্ত্রের যুগে ভারতীয় নারী, মধ্যযুগে বঙ্গনারী এবং উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গনারী। বক্তৃতাগুলি ২৯ শে জুলাই ১৯৬৭ এবং ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

ডাঃ মজুমদারের মতে রাজা রামমোহন রায় বাংলা গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টা নহেন কারণ বাংলার গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণের দান অপরিসীম এবং তাঁহারা সকলেই রামমোহনের পূর্ব্বগামী। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতিসাধনে রামমোহনের দানের তুলনা হয় না। বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ডাঃ মজুমদার বলেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৫৭), কথামালা ও চরিতাবলী (১৮৫৬) এবং সীতার বনবাস (১৮৬০) এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল।"

ঋগ্বেদের যুগে সাধারণতঃ ১৬।১৭ বয়সের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ হইত না এবং গৃহকর্ম্মের সঙ্গে শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। সমসাময়িক ইতিহাসে, অন্যান্য প্রাচীন সভ্য-জাতির স্ত্রীলোকের অবস্থা হইতে ভারতীয় নারীর মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বেশী ছিল, ইহাই প্রমাণ করে।

ঋগ্বেদের যুগ শেষ হইবার পর ২০০০ বা ততোধিক বৎসরব্যাপি সময়কে হিন্দুযুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে খৃষ্টজন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে ও উহার পরে নারীজাতির প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদার ক্রমশঃ অবনতি হয়। ইহাও এই দীর্ঘসময়ের ধর্মগ্রন্থ, কাব্য, নাটক প্রভৃতি হইতে লক্ষ্য করা যায়। পুত্রকে আদর এবং কন্যাকে অনাদর বাড়িয়া চলিয়াছিল। নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল। মধ্যযুগে অর্থাৎ মোটামুটি ১২০০ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্ত্রীলোকের অবস্থা অবনতির চরমে পৌঁছিয়াছিল।

ডাঃ মজুমদার বাল্য-বিবাহ, সামাজিক কুসংস্কার, কঠোর সামাজিকবিধি ও নারীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে নারীজাতি বন্ধনমুক্ত হয়। এই সম্পর্কে বিশেষতঃ সতীদাহ নিবারণে রামমোহন রায়ের দান অতুলনীয়। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে খৃষ্টান মিশনারীগণের দানও স্বীকার্য্য। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলে বিধবাবিবাহ আইন পাশ সম্ভব হইয়াছিল এবং তিনি ইহার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া নিজেকে নিঃস্ব করিয়াছিলেন।

ডাঃ মজুমদারের বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালার বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী-প্রগতির বহুল প্রচার কামনা করি।

অনাথবন্ধু দত্ত

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ
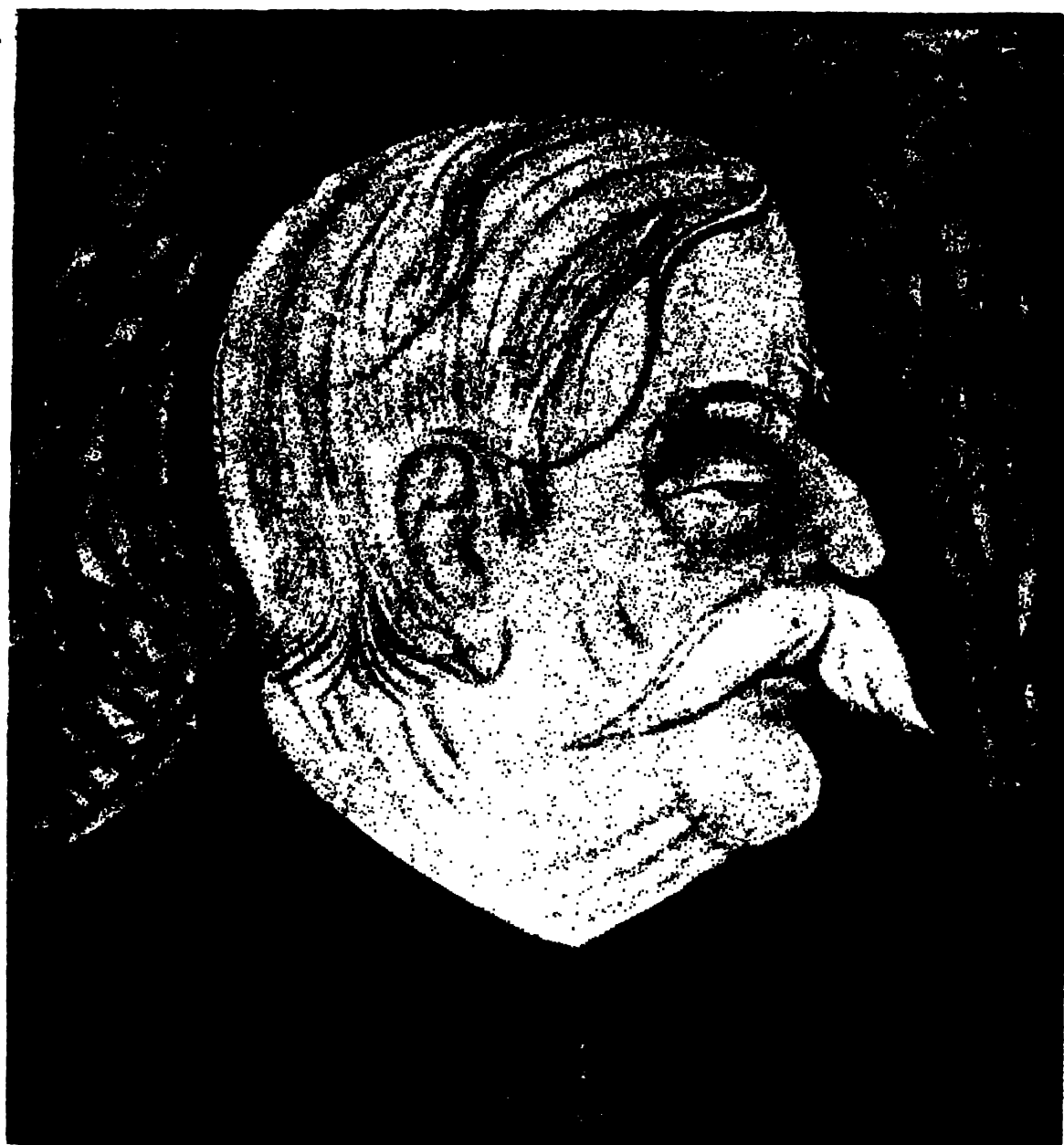
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭০তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রথমতঃ আরম্ভ হয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগের প্ররোচনায় ও ব্যবস্থায়। Divide et impera অর্থাৎ অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়া সকলের উপর প্রভুত্ব কর, এই নীতি অনুসারে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক কলহবিবাদের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাধা দিবার ব্যবস্থা করিত। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা এই উদ্দেশ্যে বহু স্থলে বৃটিশের মাহিনা করা গুণ্ডাদিগের দ্বারা আরম্ভ করান হইত ও পরে তাহা দাঙ্গার রীতি অনুসারে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া যাইত। তার পর নানান স্বাভাবিকবিভাগগুলিকে মতলব অনুসারে পরিবর্ত্তন করিয়া সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর মধ্যে কলহ সৃষ্টি বৃটিশের আর একটা অনৈক্যসৃষ্টির পন্থা ছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ বিভাগ ইহার একটি উদাহরণ। ঐ বিভাগের ফলে স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হয় ও পরে বৃটিশ প্রভুদিগকে ঐ আদেশ প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা করিবার সময় বৃটিশ শাসকগণ বাংলার কয়েকটি জেলাকে বিহারের সহিত জুড়িয়া দেয় যাহার ফলে মানভূম, সিংভূম সাঁওতাল পরগণা ও কিষণগঞ্জ অঞ্চল এখনও বিহারে যুক্ত আছে ও তত্রস্থ বাঙ্গালী সাধারণ নিজেদের বিহার প্রবাসী বাঙ্গালী বলিয়া আইনতঃ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার ফলে বাঙ্গালীরা ঐ সকল জেলায় "নিজবাসভূমে পরবাসী" হইয়া সংখ্যা লঘুত্বের চাপে বহু অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগ করিতে পূর্ণরূপে সক্ষম হইতেছেন না।

বৃটিশ শাসনের চূড়ান্ত হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য সৃষ্টির উদাহরণ হইল মহম্মদ আলি জিন্নার ভারতের দুই জাতির অস্তিত্বের কাল্পনিক বর্ণনাবিন্যাসে। মহম্মদ আলি জিন্নার পাকিস্তান গঠনের দাবির ফিরিস্তি লণ্ডন হইতে একজন উর্দ্দু ভাষার বিশেষজ্ঞ ইংরেজ সংবাদপত্রের লেখকের সাহায্যে রচিত হয়। ঐ সময় বলা হয় যে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান নামক দুই জাতির বাস। মুসলমান জাতির ভাষা উর্দ্দু, শাস্ত্র, পরিধেয় বস্ত্র, রীতি নীতি সামাজিক আচার ব্যবহার এক প্রকারের ও হিন্দুদিগের সহিত সাদৃশ্য বর্জ্জিত। যদিও ভারতের মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনেরই ভাষা উর্দ্দু ছিলনা। অধিকাংশ মুসলমানই বাংলা পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পুস্তু, বালুচি প্রভৃতি ভাষা বলিতেন এবং হিন্দুরাও ঐ একই ভাষাভাষী ছিলেন। কিন্তু বৃটিশ-শাসকগণ "বুঝবই

না ত বুঝাবে কি করে" পন্থা অনুসরণ করিয়া জগতে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিতে থাকিলেন যে ভারতের মুসলমান একটা ভিন্ন জাতির লোক ও তাহাদিগের ভিন্ন দেশ দাবি করিবার যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে। বস্তুত: ভারতের মুসলমানগণ ঠিক হিন্দুদিগের মতই প্রদেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিতেন ও তাঁহাদের খাদ্য, পোষাক, রীতি, নীতি, আচার ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ছল ও এখনও আছে। বাঙ্গালী মুসলমান মৎস খাইয়া থাকেন ও ভাতই তাঁহার প্রধান খাদ্য। পাঞ্জাবী মুসলমান রুটি ও মাংস খাইতে অভ্যস্ত। পাঞ্জাবী মুসলমান পায়জামা ও পাগড়ী পরিধান করেন; বাঙ্গালী মুসলমান পরেন ধুতি ও খালি মাথায় থাকেন। গান বাজনা প্রভৃতি এই সকল বিভিন্ন জাতির মুসলমানদিগের ভিন্ন ভিন্ন ঢংএর। পাঞ্জাবী মুসলমানের কাওয়ালি ও বাঙ্গালী মুসলমানের ভাটিয়ালি এক জাতীয় সঙ্গীতই নহে।

যাহাই হউক বৃটিশ প্ররোচনায় ভারত বিভাগ হইয়াছে ও পাকিস্থানও একটা ভিন্ন রাষ্ট্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাকিস্থান হইবার পরে সেইখানকার লোকেরা ক্রমাগতই ভারত অক্রামণ করিয়া ভারতের জমি দখল করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকে। দুইবার তাহারা সসৈন্যে ভারত আক্রমণও করিয়াছে এবং ভারতের নিকট পরাস্ত হইয়া বৃটিশ, আমেরিকা রুশিয়ার সাহায্যে নিজেদের চোরাই জমি রাখিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতে এখনও যে কয়েক কোটি মুসলমান আছে তাহাদের মধ্যে পাকিস্থান ক্রমাগতই বিক্ষোভ প্রচার চালাইয়া থাকে এবং তাহারা যাহাতে আর একটি ক্ষুদ্রতর পাকিস্থান গঠিত করিয়া পৃথকভাবে ভারত ছাড়িয়া পাকিস্থানে যুক্ত হয় সেই চেষ্টা পাকিস্থানের দ্বারা সদা সর্ব্বদা চালিত আছে। পূর্ব্ব পাকিস্থানে এক কোটির অধিক হিন্দুর বাস। তাহারা কিন্তু পৃথকভাবে কোন হিন্দু এলাকা সৃষ্টি করিয়া ভারতের সহিত যুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে পারিতেছেনা। ইহার কারণ যে ভারত সরকার পাকিস্থানের সকল ভারত-বিরোধের কার্য্য হজম করিয়া যান এবং প্রত্যাক্রমণের কোনও চেষ্টা করেন না। শুধু হিন্দু মুসলমান সম্পর্কিত ব্যাপারে নহে, পাকিস্থান যখন বিদ্রোহী পার্ব্বত্য জাতির লোকেদের অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করিয়া যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত করে, ভারত সরকার তখনও তাহার কোন সাক্ষাৎ ও সক্রিয় প্রতিবাদ করেন না। পাকিস্থানী রাজনীতি পাশ্চাত্য দেশগুলির ও চীনের প্ররোচনায় চালিত। এই সকল দেশের ভিতরে ভিতর কি মতলব ও পারস্পরিক সম্বন্ধ কি তাহা কেহ বলিতে পারে না। কারণ চীন, রুশিয়া ও আমেরিকার পরস্পরের সহিত শত্রুতা থাকিলেও ঐ তিনটি দেশই পাকিস্থানের সহিত গভীর সখ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। ভারতও আমেরিকা ও ও রুশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াই চলে, যদিও ঐ দুই দেশই পাকিস্থানের সহিত ভারতের সম্বন্ধের কথা উঠিলেই পাকিস্থানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে। বৃটিশ সর্ব্বক্ষেত্রেই আমেরিকার তাঁবেদার বহু বিষয়ে আমেরিকাকে রাজনৈতিক কুচক্র করিতে শিক্ষাদান করে। ভারতের যেসকল পার্ব্বত্য জাতির লোক ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া থাকে তাহাদের সহিত অনেক স্থলেই বৃটিশ জাতির লোকেদের সংযোগ দেখা গিয়াছে। পাকিস্থানও তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছেন বলিয়া দেখা গিয়াছে। সুতরাং ভারতবিরুদ্ধ ষড়যন্ত্রে বৃটিশ ও পাকিস্থানের পারস্পরিক সংযোগ প্রমাণ করা খুবই সহজ।

ভারতে বর্ত্তমানে যেসকল সাম্প্রদায়িক কলহ কখনও কখনও হইতে দেখা যায়, তাহা লইয়া নানাপ্রকার মতামত প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কেহ দেখেন হিন্দুদের সংখ্যালঘুদের নির্য্যাতন চেষ্টা; কেহ দেখেন পাকিস্থানের হিন্দু নির্য্যাতনের প্রতিক্রিয়া; কেহবা দেখেন মুসলমান-দিগের পরম দুর্দ্দশাগ্রস্থ অবস্থায় লড়িয়া মরিবার আবেগ। আসলে যাহা দেখা যায় তাহার মূলে থাকে নানা প্রকারের ঘটনার ঘটন। পরে যখন কলহটা বিস্তৃত আকার গ্রহণ করে তখন তাহা নিছক সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে। কোন কোন সময়ে দেখা যায় অল্পকয়েকজন

মুসলমান কোন হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত মিছিল বা পূজার স্থানের উপর আক্রমণ করাতে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। চাইবাসা ও তৎপূর্ব্বে আহমেদাবাদ ও ভিওয়ানডিতে ঐরূপ হইয়াছিল। এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমানগণ্ডি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদিগের উপর আক্রমণ করে; ইহাতে মনে হয় যে ঐরূপ আক্রমণ আরম্ভ করার সহিত বৃটিশ আমলের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদিয়া দাঙ্গা বাধাইবার ব্যবস্থার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। যাহারা ঐভাবে দাঙ্গা লাগায় তাহারা প্রায় কোন সময়ই আহত বা নিহত হয় না। দাঙ্গা বাধাইয়া তাহারা কলহ ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়ে। কে মরিল কে বাঁচিল তাহা দেখিবার জন্য ঐ ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদিগের কোন উৎসাহ থাকে না। কথা হইল, এই সকল সাম্প্রদায়িক কলহসৃজক গুণ্ডাগুলিকে কে নিযুক্ত করে? পূর্ব্বকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ করিত, এখন সন্দেহ যে পাকিস্থানী গুপ্তচরগণ টাকা দিয়া এই সকল কার্য্য করায়। কারণ পাকিস্থান ব্যতীত আর কাহারও দাঙ্গা লাগাইয়া কোন মতলব হাসিল হয় না। লাভ যাহার হয়, অপরাধ সেই করে বা করায় এই সন্দেহের সত্যতাই বহুক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়। সুতরাং সাম্প্রদায়িক কলহবিবাদ বাধাইবার মূলে পাকিস্থানী ষড়যন্ত্র আছে ইহা বহু লোকেই মনে করেন। যদি কোথাও দেখা যায় যে দাঙ্গা বাধাইবার গোড়াপত্তন হিন্দুরাই করিয়াছে, তাহাতেও মনে হইবে না যে পাকিস্থানী অর্থ হিন্দু গুণ্ডাদিগের হস্তে পড়িতে পারে না। হিন্দুগুণ্ডাদিগের দ্বারা মুসলমানদিগের উপর আক্রমণ করাইতে পাকিস্থান পারে না এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। এই জাতীয় বিশ্বাস আরও এই কারণে হয় যে ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র সহর রহিয়াছে যেখানে হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে বাস করে ও কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রবলভাবে বর্ত্তমান থাকিত তাহা হইলে শুধু কখন কখন এক দুইটি স্থানে দাঙ্গা বাধিত না; প্রায়ই দাঙ্গা লাগিয়া থাকিত ও বহুলোক হতাহত হইত। তাহা যে হয় না ইহাদ্বারা প্রমাণ হয় যে দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ নাই। কখন কখন ঝগড়া লাগান হয় ও যাহারা লাগায় তাহারা অনেকক্ষেত্রেই পাকিস্থানী গুপ্তচর। সুতরাং বিষয়টার কোন সহজ মীমাংসা হইতে পারে না। দুই সম্প্রদায় ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র শান্তিতে বসবাস করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব নাই। সাম্প্রদায়িক কলহ লাগান হয় ও পাকিস্থানী কিম্বা অপর কোন গুপ্তচরেরা লাগায়। এই গুপ্তচর কাহারা তাহা বাহির করিতে হইবে। সন্দেহ নানান শক্তির উপর পড়ে। পাকিস্থানের বন্ধু চীন। চীনের গুপ্তচর ভারতে অনেক আছে। পাকিস্থানের বন্ধু আমেরিকা, রুশিয়া ও বৃটেন। এই সকল জাতির বহুলোক ভারতে বাস করে ও লোকের সহিত মেলামেশা করে। তাহারা ভারত-বিরুদ্ধ অপপ্রচারও করিয়া থাকে। সাম্প্রদায়িক কলহবিবাদ বিষয়ে যে তাহারা নিস্পৃহ— তাহা কে বলিতে পারে?

ভারত সরকার মধ্যে মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ বন্ধুত্বপ্রবণ করার জন্য উপদেশমূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন তাহাতে জনসাধারণ বিষয়টা ভুল বুঝিয়া থাকেন। বন্ধুত্বের কোন অভাব নাই। কলহ-বিবাদ কোন তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় হইয়া থাকে। এই তৃতীয় পক্ষকে দমন করা আবশ্যক। তাহা করিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়ের এক জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। স্বদেশী বিদেশী যে যেখানে যে-ভাবেই ভারত বিরুদ্ধতা করে; সকল ভারত শত্রুকে পূর্ণরূপে দমন করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ইহা কে করিতেছে কি ভাবে করিতেছে ও কেন পূর্ণরূপে সক্ষম হইতেছে না, এই সকল প্রশ্নের উত্তর ভারতবাসী জনসাধারণ যথাযথভাবে শুনিতে চাহেন।

ভূসম্পদ ও ঘরবাড়ীর স্বামিত্বের সীমা

ভারতের "সোসিয়ালিষ্ট প্যাটার্ণ" এর অর্থনীতির কখন কি অর্থ হয় তাহা পরিষ্কার বুঝিতে হইলে একটা বিশেষ "প্যাটার্ণ" এর কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়; যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সাহায্যে আহরণ করা যায় না। "সোসিয়ালিষ্ট প্যাটার্ণ" অর্থে বুঝিতে

হইবে সর্ব্বপ্রথমে বাজারে ও গলিগলিতে প্রচারের কথা। যেরূপ কিছু বলিলে অথবা করিলে বাজারের ও তৎসংশ্লিষ্ট অলিগলির বাসিন্দাগণ মনে করিবেন যে ভারতে সমাজতন্ত্র, সমষ্টিবাদ, সাম্য, মৈত্রী ও সকলপ্রকার মানবীয় অধিকার দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া চরম সাফল্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছে সেইরূপ রাষ্ট্রীয় ভঙ্গিমা অবলম্বন করিয়া চলাকেই সোসিয়ালিষ্ট প্যাটার্ণের রাষ্ট্রকর্ম্মপদ্ধতি বলা হয়। এই কর্ম্মপদ্ধতির কোন মূল-নীতি নাই। যাহা করিলে লোকে বলিবে সোসিয়ালিজম জিন্দাবাদ ও ভোট-দিবার সময় দলবিশেষের প্রার্থী-দিগের নির্ব্বাচন করিবে তাহাই করিতে হইবে। প্যাটার্ণ-রক্ষার চেষ্টার অভিব্যক্তি নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যক্ত হইয়া থাকে। তাহার ফলে ভারতের সমাজবাদ ও মানবীয় অধিকার কতটা অগ্রগমনে সক্ষম হইয়াছে তাহা বলা খুবই সহজ। ভারতের মানুষ মধ্যযুগে যত প্রকার অন্যায়, অবিচার, উৎপীড়ন ও শোষণের আক্রমণে নিপীড়িত ছিল, আজও দুইশত বৎসরের বৃটিশ সভ্যতা ও ২২ বৎসরের সোসিয়ালিষ্ট প্যাটার্ণের স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া তাহারা প্রায় একই অবস্থায় পড়িয়া আছে। জমিদারী উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাষ্ট্র জমিদারের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া একইভাবে বা আরও অন্যায়ভাবে চাষীর উপর শোষণ রীতি প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছে। জীবনবীমা রাষ্ট্র করায়ত্ত হইয়াছে কিন্তু ফলে জীবনবীমা দফতরগুলির কর্ম্মাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা বীমাপত্র ক্রয় করেন তাঁহাদেরও লাভ অপেক্ষা লোকসানই অধিক হইয়াছে। কিছু কিছু কারবার কারখানা রাষ্ট্র হস্তগতভাবে চালিত হইতেছে, কিন্তু তাহার ফলে কাহারও কোন বিশেষ লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহারা ঐ সকল ব্যবসা বাণিজ্য কারবার প্রভৃতির মালিক, অর্থাৎ ভারতীয় জনসাধারণ, তাহারা কয়েক সহস্র কোটি মুদ্রার ঋণভার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া মাত্র কয়েক শত কোটি মূল্যের বাস্তব ঐশ্বর্য্য চোখে দেখিতে পাইয়া থাকেন ও সেই ঐশ্বর্য্য ব্যবহার করিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রকে উচ্চস্তরের ব্যবসাদার প্রমাণ করিবার জন্য বৎসরে বহুকোটি টাকা লোকসান দিয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। যাহারা ঐ সকল রাষ্ট্রীয় কারবারের কর্ম্মী তাহারা সকলেই গভীর অসন্তোষের আকর ও অধিকাংশ সময়েই মন্থরগতিতে কাজ চালাইয়া বা হরতাল করিয়া সময় অতিবাহন করিয়া থাকে। যাঁহারা উৎপাদিত বস্তুর ক্রেতা, তাঁহারাও টাকা দিয়া মাল পাইতেছেন না বলিয়া অভিযোগ করিতে চিরঅভ্যস্ত ও ব্যস্ত। সুতরাং সোসিয়ালিষ্ট প্যাটার্ণের যাহারা ভার বহন করে তাহা-দিগকে কোনভাবেই উক্ত প্যাটার্ণ মুগ্ধ করিতে পারে নাই। জনসাধারণ শুধু ভয়ে ভয়ে দিন কাটান যে ঐ প্যাটার্ণ আবার কোন রূপ ধারণ করিয়া কি ভাবে অধিকতর ওজনে সকলের জীবন দুর্ব্বিসহ করিতে আরম্ভ করিবে।

কিছু দিন হইল শুনা যাইতেছে যে ভারতের কোন নাগরিকই ব্যক্তিগত ও পরিবারগতভাবে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমানের অধিক ভূসম্পত্তির বা সহরের গৃহ-সম্পদের মালিক হইতে পারিবে না। যে দেশে সুদ খোর মহাজনগণ শতকরা মাসিক একটাকা বা দুই টাকা সুদে টাকা ধার দিয়া লাঠির সাহায্যে ঋণের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে; যেদেশে পাঁচশত টাকা ব্যয়ে নির্মিত "ঝোপড়ির" মাসিক ভাড়া দশ, পনের বা কুড়ি টাকা হয়, যে দেশের দোকানদারগণ ধারে চাল, ডাল বিক্রয় করিয়া প্রথমতঃ ওজনে ও দরে ঠকায় ও পরে বাকি টাকার উপর উচ্চহারে সুদও জোড়ে; যে দেশে ঘুষ না দিলে বিল আদায়, চাকুরী বা কোনপ্রকার পারমিট বা লাইসেন্স পাওয়া অসম্ভব হয়; এবং যে দেশে গণ্ডমূর্খগণ রাজনীতির দোহাই দিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজেদের "কালো" সম্পদের পরিমাণ অবাধে বাড়াইয়া চলে সেই দেশে প্রকাশ্যভাবে কে কি প্রকার সম্পত্তির অধিকারী হয় তাহা লইয়া আইন গঠন করা অতিশয় হাস্যকর ও সত্যকার সমাজবাদের আদর্শের সহিত ঘনিষ্ঠসম্পর্কবর্জ্জিত অভিনয় মাত্র। "কালো" টাকা

এদেশের একটি মহা সমাজবিরুদ্ধ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠান বলা হইতেছে কারণ "কালো" টাকা ও "কালো" বাজার ভারতব্যাপীরূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার চেষ্টা হয় না ; কারণ লোকে বলে রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের মহারথীগণের মধ্যে বহুব্যক্তিই কালো বাজার ও কালো টাকার সহিত অন্তরঙ্গভাবে জড়িত আছেন। এই সকল অন্যায়ের সমর্থনকারী ও অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে না কি অনেক মন্ত্রী, লোকসভার বিধানসভার বা অপরাপর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য আছেন। সেই কারণে যেসকল নিয়ম আইন ও ব্যবস্থা করিলে ভারতবাসী জন-সাধারণের আর্থিক উন্নতি ও সুরাহা হয় সেই সকল কার্য্য কদাপি করা হয় না। তৎপরিবর্ত্তে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ হয়, যাহার ফলে হয়ত কোন কোন রাষ্ট্রীয়দলের লোকেরা কিছু কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়া ও তাহা শোধ না করিয়া লাভবান হইতে সক্ষম হইতে পারে। এখন যে ভূসম্পত্তি ও সহরের গৃহ-সম্পদের সীমা নির্দ্ধারণ করা হইতেছে, তাহার ফলেও সমাজের কোন লোকের কোন-লাভ হইবে না। জমি বেনামী করা ভারতবর্ষের একটা বহুপুরাতন ও প্রচলিত পন্থা এবং সেই কারণে কোন প্রকার সীমা নির্দ্ধারণ করিলে শুধু দুই একজন ভদ্রলোকের তাহাতে কিছু কিছু জমি মারা যাইবে এবং বাকি সমস্ত অধিক জমির মালিকগণ বেকসুর যেমন ছিলেন তেমনই থাকিয়া যাইবেন।

গৃহ সম্পদ কোন পরিবার কত রাখিবে তাহার সীমা বাঁধা হইতেছে। পরিবার কাহাকে বলে? কোন ব্যক্তির পরিবারে কেহ নাই অপর কাহারও পাঁচটি পুত্র ও দুইটি অবিবাহিতা কন্যা আছে এবং সকলের মিলিত পুত্র-কলত্রাদি গণতি করিলে সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশের কোঠায়। সুতরাং বড় পরিবারের গৃহসম্পদ কলিকাতা, দিল্লী বা বোম্বাই এশুধু বাস করিতেই হইয়া দাঁড়ায় দশলক্ষ টাকা প্রমাণ। কোন কোন ব্যক্তির পরিবারে তিন জন ডাক্তার, তিন জন আইনজীবি, দুইজন ব্যবসায়ী ও দুইজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী থাকেন। তাঁহার পরিবারের গৃহসম্পদ স্বভাবতই পাঁচলক্ষ টাকার অধিক হইবে। যাঁহার কোন সন্তানাদি নাই তাঁহার কথা পৃথক।

অপর কথা হইল যে, বাঙ্গালী ভদ্রলোকেদের সম্পত্তি পরিবারগতভাবে থাকে। অপর জাতীয় ব্যক্তিগণের বহু গৃহ থাকিলে সেগুলিকে কোম্পানিগত করা হয়। কোম্পানির পরিবার কে, কতজন এবং কোথায় থাকে? সুতরাং পরিবারের হিসাব করিয়া গৃহসম্পদ সীমাবদ্ধ করিলে তাহার ধাক্কা লাগিবে ভদ্রলোকেদের পৃষ্ঠে—কোম্পানির পিছনে যাহারা গা ঢাকা দিয়া গৃহ সম্পদ রাখিবে তাহারা প্রায়ই এক পরিবারের লোক হইবে না এবং পরমানন্দে গৃহের ভাড়া হইতে ভোগের কার্য্য চালাইতে থাকিবে। বেনামীতে গৃহসম্পদ রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে অপর কোন প্রকারের সম্পদ বন্ধক রাখিয়া নিজেদের সম্পদের অধিকার সংরক্ষিত রাখা অতি সহজ কার্য্য হইবে। এবং অনেকেই সেই উপায়ে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে সম্পত্তি বাড়াইয়া চলিবে। মার খাইবে ভদ্রলোকে, যাহারা ঐ সকল অর্থনৈতিক কারসাজি জানে না বা জানিলেও কার্য্যক্ষেত্রে লাগাইতে ইচ্ছুক হয় না।

আসল কথাটা হইল যে গৃহসম্পদ সীমাবদ্ধ করিলে তাহাতে কিভাবে সমষ্টিবাদের সাহায্য হয়? যাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ভাড়া দেয় তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ না করাইলে, গৃহের অভাব এখনকার তুলনায় আরোও প্রকট হইয়া উঠিবে। গৃহের অভাব এখন যাহা আছে তাহাই বেশ খারাপ বলা যায়। নূতন গৃহ না নির্ম্মাণ করা হইলে ভাড়া আরও বাড়িবে এবং তাহাতে গরীব লোকের কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। ইহাতে সোসিয়ালিস্ট প্যাটার্ন বা নকল সমষ্টিবাদ আরও অধিক জনসাধারণের অহিতের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে।

যদি কোন কারণে গৃহ সম্পদ ক্রয় করা সীমাবদ্ধ করিতে হয় তাহা হইলে সেই সীমা নির্দ্ধারণের সময় অনেক বিষয় দেখিয়া নিয়ম প্রণয়ন করা আবশ্যক। প্রথম কথা স্থান অনুসারে সীমা কমবেশী

করা আবশ্যক। বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, বর্দ্ধমান, মির্জ্জাপুর বা কোন ২০০০০ বাসিন্দার বৃহৎ গ্রাম; সর্ব্বত্রই এক সীমা নির্দ্ধারণ বেগার ঠেলা কাজ বলিয়া মনে হয়। বোম্বাই, কলিকাতা বা দিল্লীতে পাঁচলক্ষ টাকার গৃহসম্পদ বিশেষ কিছু নহে। আসানসোলে পাঁচ লক্ষ টাকায় তিন চার খানা বড় বড় গৃহ নির্ম্মাণ সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং বোম্বাই দিল্লী বা কলিকাতায় যদি সীমা দশলক্ষ টাকা করা হয় তাহা হইলে অন্য সহরে ৭॥০ লক্ষ, ৫ লক্ষ বা ২॥০ লক্ষ হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। প্রথমতঃ গৃহসম্পদের সীমা বাঁধা না হইলেই উত্তম। গৃহের অভাব এত অধিক এবং গৃহ হইতে আয় হয় এত কম যে ঐরূপ সম্পত্তি সৃষ্টি হইলে সামাজিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। চাষের জমির পরিমাণ ও আধুনিক চাষের প্রণালী দেখিলে মনে হয় যে ৭৫ বিঘা বড়ই কম। আধুনিক প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা হইলে ঐটুকু জমি চাষই হইবে না। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত চাষ বর্ত্তমান জগতে আর চলিবে না। আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেই কথা মনে রাখিয়া করা আবশ্যক।

উদ্বাস্তু

কলিকাতার পথে-ঘাটে আবার উদ্বাস্তু নরনারী শিশু প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার কারণ একটি মাত্রই হইতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে সেই কারণেই যে ঐ সকল লোকেরা পূর্ব্ব পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ কেহই করিবে না। কারণটি বরাবরই পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুসলমান-দিগের হস্তে হিন্দুদিগের লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন। এই অত্যাচার ও অন্যায় নিষ্পেষণ অনেক সময়ই পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুসলমানগণ শুধু অকারণ পুলকে করিয়া থাকেন। কখন কখন ভারতবর্ষে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় তাহার ফলে পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুনিগ্রহ আরম্ভ হয়। তবে পাকিস্তানের স্থির অনুসৃত রীতি হইতেছে মধ্যে মধ্যে হিন্দুবিতাড়ন প্রবলভাবে আরম্ভ করা। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে ও বিহারে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক কলহ হইয়াছে। ইহার ফলে পাকিস্তানে হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইবে ইহা এক-প্রকার স্বয়ংসিদ্ধ সত্য। কলিকাতার রাজপথে যাহারা পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহারা সংখ্যায় অধিক নহে; এবং আমরা আশা করি ভারত সরকার শীঘ্রই তাহাদের একটা উপার্জ্জনের ও বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কিন্তু এইরূপ যে মধ্যে মধ্যে হয় ইহার একটা পাকাপাকি প্রতিবিধান করা আবশ্যক। একটা উপায় হইল; পাকিস্তানের দুই চারিটি জেলা ভারতে সংযুক্ত করিয়া লইয়া সকল হিন্দুকে পাকিস্তান হইতে ভারতে লইয়া আসা। ভারতের মুসলমানগণও প্রয়োজন বোধ করিলে ভারত ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা কেহ করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। অপর ব্যবস্থা হইল পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের নিজেদের মধ্যে এমন একটা ব্যবস্থা করা যাহাতে পাকিস্তান ভবিষ্যতে ভারতের কোন স্থান দখল চেষ্টা না করে এবং ভারতও বিশ্বজাতি সংঘের নিকট বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া লইয়া নিজ অধিকার পূর্ণরূপে বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করে। বিশ্বজাতি সংঘ আর একটি ব্যবস্থাও করিতে পারেন তাহা হইল পাকিস্তান হইতে কোন হিন্দু অথবা ভারত হইতে কোন মুসলমান নিজ নিবাসস্থল পরিবর্ত্তন করিয়া যদি এদেশ হইতে ঐদেশে অথবা ঐদেশ হইতে এই দেশে আসিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহার একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম প্রবর্ত্তন করা। যিনি চলিয়া যাইবেন তাঁহার বিষয় সম্পদ সম্পর্কিত ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা ও পলাতকের মত গোপনে অন্য দেশে প্রবেশ না করিয়া কোন সুনিয়ন্ত্রিত রীতি অনুসরণ করিয়া দেশ পরিবর্ত্তন করিবার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। এখন যাহা হইতেছে তাহা অত্যন্ত অশোভন ও মানুষের মানবীয় অধিকারনাশক। সুতরাং যদি উভয় দেশ মিলিতভাবে এইরূপ করে যাহাতে মনে হয় যে দেশগুলি সম্পূর্ণরূপে মানবসভ্যতার রীতি নীতি বর্জ্জন করিয়া চলে না ও চরম বর্ব্বরতার কেন্দ্র নহে তাহা হইলে জগতে দুইটি দেশেরই সম্মানবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের নিপীড়

পাকিস্তানেই অধিক হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস সুতরাং এই সকল বন্দোবস্ত হইলে পাকিস্তানের লাভ অধিক হইবে। পাকিস্তানের এই কারণে উপরোক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইলে তাহাতে মত দেওয়াই উচিত। কিন্তু একথাও সকলে জানেন যে পাকিস্তান ন্যায় অন্যায় ও সুযোগ সুবিধা বিচার করিয়া চলে না। তাহারা গায়ের জোর ব্যবহারে অধিক বিশ্বাসী। সুতরাং পাকিস্তানের শুভবুদ্ধির উদয় না হইলে কোন ব্যবস্থাই হইবে বলিয়া মনে হয় না।

দলবদ্ধ হইলে লাভ হয়

বহুলোক দলবদ্ধ হইলে অনেক কাজ করিতে পারে যাহা অল্পসংখ্যক লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই কারণেই মানুষ দল বাঁধে ও দলের জনবল বাড়াইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে দল বাঁধিয়া মানুষ যাহা করে বা করিবার চেষ্টা করে তাহা গঠনমূলক বা সকলের পক্ষে লাভজনক কার্য্য নহে সংহত ও সংযতভাবে যদি বহুলোক কোন কিছু করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সে চেষ্টা প্রায়ই সফল হয়; একথা জানা সত্ত্বেও মানুষ অধিকাংশ সময়ে দল বাঁধিয়া শুধু অপকর্ম্মই করিবার চেষ্টাতে নিযুক্ত হয়, সর্ব্বমানবের লাভ বা উন্নতির চেষ্টা অল্প সময়েই করে। আমাদের দেশে দল বাঁধার খুবই প্রচলন হইয়াছে। পূর্ব্বে ছিল পূজার আয়োজন, কিম্বা হাট বাজার বসান ও মেলার ব্যবস্থা। এখন তাহার সঙ্গে হয় শ্রমিকদের ইউনিয়ন, ছাত্র সংঘ, রাষ্ট্রীয় দল; আরও কত কিছু। পথে ঘাটে দেখা যায় শত শত (অনেক সময় হাজার হাজার) মানুষ পতাকা হস্তে দল বাঁধিয়া চলিতেছে ও সমস্বরে "স্লোগান" নিনাদে আকাশ ফাটাইতেছে। কিন্তু যদি বলা হয় যে সকলে দল বাঁধিয়া কচুরিপানা পরিষ্কার করিয়া দেশের জলাশয়গুলিকে ব্যবহারে লাগাইবার ব্যবস্থা করো তাহা হইলে সেই সকল জনহিতকর কার্য্যে বহু লোক হাত লাগাইতে নাও অগ্রসর হইতে পারে। যদি বলা হয় সমবায় সংঘ গঠন করিয়া সকলে একত্র ক্রয়-বিক্রয় ও দ্রব্য উৎপাদন কার্য্যের ব্যবস্থা করো; তাহা হইলেও দেখা যাইবে লোক তত আসিতেছে না। অর্থাৎ হাল্লাহুজুগ করিতে যত লোক আহ্বান হয়, কোন লাভজনক কার্য্যে (যাহা করিতে পরিশ্রম বা অর্থ লাগে) তত সহজে লোক পাওয়া যায় না।

এমন কথা বলা যায় না যে ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংঘ বা রাষ্ট্রীয় দলের উদ্যোক্তাগণ সমবেতভাবে সকলের পক্ষে লাভজনক কার্য্য করা যায় সেকথা জানেন না। জানেন কিন্তু করেন না বলিলেই ঠিক কথা বলা হয়। কারখানা ও দফতরের কর্ম্মীগণ সমবেত-ভাবে চেষ্টা করিলে চায়ের দোকান, মুদীখানা প্রভৃতি খুলিয়া ব্যবসায়ীদের দ্বারা শোষিত হওয়া নিবারণ করিতে পারেন; কিন্তু করেন না। ছাত্র পরিষদগুলি একক হইয়া নানা কার্য্য করিতে পারেন যথা পুস্তকের দোকান, ধোবার দোকান, চায়ের দোকান ইত্যাদি, কিন্তু তাহারা কোন কার্য্যের ভিতর যাইতে সহজে চায় না বিদেশে (আমেরিকা ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে) দেখা যায় ছাত্রগণ নানা কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে কিন্তু আমাদের দেশে শুধু টিউশন বা ছেলে পড়ানই কেহ কেহ করে। হোটেলের বাসন ধোয়া প্রভৃতি কেহ করে না। কারণ এ দেশে শ্রমের আভিজাত্য, ডিগনিটি অফ লেবর, বলিয়া কোন দৃষ্টিভঙ্গী নাই। যাহারা চাকুরী, চাকুরী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, তাহারাও কোন উৎপাদনীয় কার্য্যে সহজে আত্মনিয়োগ করিতে চাহেন না। প্রয়োজন দলবদ্ধভাবে কাজ করিতে শেখার। কারণ যদি সকল মানুষকে কর্ম্মে নিযুক্ত করার কোন আয়োজন ভারত সরকার করিতে চাহেন, তাহা হইলে সেই নিয়োগ ব্যবস্থায় পরিশ্রমের কথাই উঠিবে। চেয়ারে বসিয়া লক্ষ লক্ষ লোক কোন দেশেই উপার্জ্জন করিতে পারে না। এদেশেও তাহা সম্ভব হইবে না। সুতরাং দেশের লোককে দলবদ্ধভাবে পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে শিখিতে হইবে। এই দেশের দারিদ্র্য ও অসংখ্য লোকের বেকারভাব পরিশ্রম বিমুখতা হইতেই প্রধানতঃ জন্মলাভ করিয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সকলের কাজ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী বদলান প্রয়োজন। ইহা করিতে হইলে মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

নূতন ভারত

অনেক সময় শুনা যায় যে কেহ বা কাহারা একটা নূতন ভারত গড়িয়া তুলিবেন, যে ভারতে কোনও অভাব অভিযোগ থাকিবে না। নূতন ভারত গঠন করিবার প্রথম কার্য্য হইল পুরাতন ভারতের বহু প্রতিষ্ঠানকে ভাঙিয়া চুরিয়া জায়গা পরিষ্কার করিয়া লওয়া, যাহাতে গঠনের কার্য্যে কোন বাধা না পড়ে। যেসকল প্রতিষ্ঠান ভাঙা হইবে সেইগুলির দোষ হইতেছে দুই প্রকারের। প্রথমতঃ অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাহা অন্যায়, অবিচার, উৎপীড়ন ও শোষণের, উপর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেইগুলি সে ভাঙিয়া না দিলে সেই নৈতিক আবহাওয়ার সৃজন সম্ভব হইবে না যাহাতে সুস্থ সবল নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন সহজ হইবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও দুষ্টরক্ত-বহুল প্রতিষ্ঠান হইল শাসন প্রতিষ্ঠান অথবা রাষ্ট্র। ইংরেজীতে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের নাম হইল "গভর্ণমেন্ট"। নূতন ভারত গঠন করিতে হইলে বিপ্লবী ও বিক্ষুব্ধ জনগণ প্রথমে চাহেন "গভর্ণমেন্ট" বা রাষ্ট্রকে ভাঙিয়া দিতে। ইহার অর্থ হইল সকল দফতর, আদালত, খাজনা মাশুল রাজকর আদায় শিক্ষা ও চিকিৎসা কেন্দ্র, সেচন. রাজপথ. রেলরাস্তা, জাহাজ, বিমান, সেনাদল প্রভৃতি উৎখাত করিয়া আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্য্য ব্যবস্থার আরম্ভে ফিরিয়া যাইতে হইবে ও তৎপরে যাঁহারা নূতন ভারত গঠন করিবেন তাঁহাদের প্রেরণা ও কর্ম্মকৌশলের উপর নির্ভর করিয়া নূতনের গঠনের অপেক্ষা করিতে থাকা হইবে। রাষ্ট্র উৎখাত বা উৎপাটন করা হইলে সর্ব্বত্র অরাজকতা বিরাজ করিবে ও পরে তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে নূতন রীতি-নীতি পদ্ধতি জন্মলাভ করিবে। মধ্যপথে যেখানে কোন নিয়ম কানুন 'বলিব্যবস্থা থাকিবেনা সেইখানে ভারতীয় মানুষকে রক্ষা করিবে কে এবং লুঠপাট চুরি ডাকাতি হইতেই বা মানুষ না বাঁচিলে তাহার অবস্থা ঠিক কি হইবে সে কথা কেহ চিন্তা করিতেছেন না। পুরাতনকে সমূলে উৎপাটন করিয়া নূতনকে গড়িয়া তোলা শুনিতে ভাল লাগিলেও কার্য্যত ফলপ্রসূ হয় না। তাহার পরে দেখিতে হইবে নূতনের গঠনের জন্য যে প্রেরণা, প্রতিভা, শিক্ষা, দক্ষতা ইত্যাদির আবশ্যক তাহা 'স্লোগান" উচ্চারক বিক্ষুব্ধ বিপ্লবীদিগের মধ্যে আছে কি না। যদি না থাকে তাহা হইলে আনাড়ীর হাতের রান্না ভারতের মহাজাতির হজম হইবে কি না তা বিচার করা প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছি যে ভারতে ও অপরাপর দেশের মহাজ্ঞানী, প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ বিশেষ ব্যক্তিগণ বহু সময়েই কোন কিছু করিতে যাইলে তা যথাযথভাবে করিতে সক্ষম হন না। বড় বড় কথা আড়ালে গোঁজামিল দিয়া কোনও রকমে বেগারঠেলা কাজ করিয়া নাম কিনিবার চেষ্টা করাই এই সব লোকেদের অভ্যাস। এই অবস্থায় যাঁহারা উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া নূতন ভারত গঠনে অবতীর্ণ হইবেন তাঁহাদের নিকট আমরা কি আশা করিতে পারি যতটা বুঝিতে পারা যায় এইসকল ব্যক্তির চারদিক দেখিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কারণ ফিরিয়া আসিবার পথ ত ইঁহারা রাখিতেছেন না। পিছনে যাহা কিছু সকলই ভাঙিয়া দিয়া আগে চলা হইতেছে একপ্রকারের যুদ্ধ-রীতি আছে যাহাতে ফিরিয়া যাইবার পথ না রাখিয়া আগে চলা হয়। ফিরিয়া যাইবার পথ না থাকিলে মানুষ প্রাণপাত করিয়া লড়াই করে। আমাদের বিপ্লবীদিগেরও অগ্রগমন রীতি ঐ প্রকার হইবে পুরাতন পথ ও প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙিয়া দিয়া তাহার ফিরিয়া যাইবার সম্ভাবনাই রাখিবে না। সেই কারণে সাফল্য যদি প্রাপ্তি না হয় তাহা হইলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া "স্টেটাস ক্যো"তে ফিরিয়া যাওয়ার কথা উঠিবে না। বিজয় না হইলে শুধু একটি পথই থাকিবে তাহা হইল মৃত্যুর পথ। কিন্তু, কোন ব্যক্তি বা সৈন্যদল যে প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিতে পারে কোন বিরাট জাতি তাহা করিতে পারে না। জাতি মৃত্যু পণ করিতে পারে না; কারণ জাতির পরিস্থিতি দীর্ঘকাল গভীর দুঃখ ও অপমান সহিয়াও ভবিষ্যতের আশায় উদ্দীপিত থাকিতে পারে। ভারত বহুশত বৎসর পরদাসত্বে নিমজ্জিত থাকিয়া আবার নূতনের পথের পথিক হইয়াছে। এই অবস্থায় ভারত যথেষ্ট নূতনত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়া অনেক ভারতবাসী বিক্ষুব্ধ হইয়া বিপ্লব প্রভৃতির জন্য আন্দোলন আলোড়ন করিতেছেন। কিন্তু যাহা ধীরে ধীরে ব্যতীত হয় না তাহার জন্য সহনশীলতার আবশ্যক। পর্ব্বত হইতে আরোহণ ও অবরোহণ উভয় কার্য্যই ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে করিতে হয়। লাফ দিয়া পাহাড়ে উঠাও যায় না বা পাহাড় হইতে নামাও যায় না। এই কারণে অধিকাংশ ভারতবাসীই ধীরভাবেই অগ্রসর হইতে চাহেন। যাঁহারা চাহেন না এবং মনে করেন উল্লম্ফনই আরোহণের শ্রেষ্ঠতর পন্থা তাঁহারা কার্য্যতঃ সক্ষম হইবেন না।

রাষ্ট্রবাদের তত্ত্বে ব্যক্তির স্থান

সমর বসু

[শ্রীঅরবিন্দের 'The Ideal of Human Unity' অবলম্বনে]

[Whatever the perfection of the organised state suppression or oppression of individual freedom by the will of the majority or of a minority would still be there as a cardinal defect vitiating its very principle. And there would be something infinitely worse. For a thoroughgoing scientific regulation of life can only be brought about by a thoroughgoing mechanisation of life. This tendency to mechanisation is the inherent defect of the state-idea and its practice. —Human Cycle—chap-XX- Sri Aurobindo.]

রাষ্ট্রবাদের তত্ত্ব আজকের দিনে বিশ্বের চিন্তাশীল মানুষদের যে বিশেষভাবে ভাবিত করে তুলেছে তার অন্যতম কারণ হ'ল—রাষ্ট্রবাদের তত্ত্বে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে, যার ফলে রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তিকে আত্মোৎসর্গ করতে বাধ্য করা হয়। আমরা জানি ব্যক্তির স্বাধীন কর্মধারার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহকে ব্যাহত ক'রে রাষ্ট্র যদি বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে ব্যক্তির সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়োগ করার নির্দেশ দেয় তা হ'লে সাধারণভাবে মানবজাতির সার্বিক প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাষ্ট্র চায় ব্যক্তি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করুক, তার স্বাধীন কর্মপ্রচেষ্টাকে সে নিয়োগ করুক গোষ্ঠীর সুনিয়ন্ত্রিত কর্মোদ্যমকে সফল করার উদ্দেশ্যে। রাষ্ট্রের বেদীতে ব্যক্তির এই আত্ম-বলির অন্য অর্থ হল—বৃহত্তর অহমিকার কাছে (অর্থাৎ গোষ্ঠী অহমিকার কাছে) ব্যক্তি-অহমিকার আত্মসমর্পণ। এই বৃহত্তর অহমিকা কিন্তু ব্যক্তি-অহমিকা অপেক্ষা গুণের দিক থেকে এমন কিছু শ্রেষ্ঠতর নয়। বরং এ-কথা বলা যেতে পারে যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির যে-অহমিকা তার তুলনায় সাধারণভাবে রাষ্ট্রের অহমিকা বহুলাংশে নিকৃষ্টতর। অথচ রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তিকে আত্মদান করতে হবে; এবং এইখানেই আমাদের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের সঙ্গে রাষ্ট্রবাদ তত্ত্বের মৌল-বিরোধ।

কিন্তু কাকে বলব—আমাদের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ! তাঁর "Ideals and Progress" গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর কথায়—

"The salvation of the human race lies in a more sane and integral development of the possibilities of mankind in the individual and in the community -(page 45) .....what then shall be our ideal? Unity for the human race by an inner oneness and not only by an external association of interests (page. 50)

রাষ্ট্রের অহমিকার কাছে, ব্যক্তির অহমিকার বিলোপসাধনের মধ্যে সমগ্র মানবজাতির ঐক্য সূচিত হয়না! বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের পরিপূরণের উদ্দেশ্যে বাইরের জীবনে আমরা যেসব সংঘ বা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলি তার সাহায্যে আমাদের অন্তর্জীবনের ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্রবাদ বলে থাকে যে, বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই যে পরার্থপরতার আদর্শ, আত্ম-ত্যাগের সাধনা সকল মানুষের সঙ্গে ঐকসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস এবং সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান গোষ্ঠীআত্মার বিকাশ-সাধন - এর বিরুদ্ধে আমাদের বলার

কিছু নেই। কিন্তু মানবসমাজে এই সব মহান আদর্শের সার্থক রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তির বিলুপ্তি-সাধনের কোনও প্রয়োজন নেই; এবং ঐ বিলুপ্তি-সাধনের দ্বারা পূর্ণতা অর্জনও সম্ভব নয়। কেননা—'Man must learn not to suppress and mutilate, but to fulfil himself in the fulfilment of mankind: শুধু তাই নয়, মানুষকে আরও শিখতে হবে যে 'অহং'কে খর্ব না ক'রে, নষ্ট না করে তাকে কি ক'রে আরও প্রসারিত করা যায় যাতে সে আপন সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর কোনও কিছুর মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পারে। বৃহত্তর সেই 'কোনও কিছুকেই' তো ব্যক্তি-অহং নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করতে চায়। কিন্তু বৃহৎ কোনও রাষ্ট্রযন্ত্র যদি ব্যক্তির স্বাধীনসত্তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করে তা'হলে তার ফল হয় পুরোপুরি ভিন্নধরণের। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষের সামগ্রিক উন্নতিসাধনের উপায় হিসাবে রাষ্ট্রের কার্যক্ষমতা বিশেষ ফলপ্রসূ, যদিও রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে নানাধরনের অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু তাই বলে আমাদের চরম সিদ্ধির শেষ উপায় হিসাবে রাষ্ট্রবাদকে গ্রহণ করা কখনই সমীচীন হতে পারে না।

রাষ্ট্রবাদ আরও ব'লে থাকে যে, সুগঠিত রাষ্ট্রযন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং বিশ্বব্যাপী তার কর্মবৃত্তির প্রসারের মাধ্যমেই সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতি সম্ভব। রাষ্ট্রবাদের এই কাল্পনিক দাবীকে বলা যেতে পারে অত্যুক্তি। নিজের এবং সমষ্টির প্রয়োজনে মানুষ সমাজে বাস করে এ কথা সত্য। কিন্তু এ কথা কি সত্য যে রাষ্ট্র পরিচালিত কর্মপদ্ধতির সাহায্যেই ব্যক্তির পূর্ণ উৎকর্ষ এবং সমাজের সর্বস্তরের সার্বিক কল্যাণ-সাধন সম্ভব? এ কথা কখনই সত্য হ'তে পারেনা। যা সত্য তা'হল এই যে,—রাষ্ট্র সমাজের সকল ব্যক্তির সমবেত প্রচেষ্টাকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাধা-বিপত্তি অপসারিত ক'রে কিছু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারে। এবং এইটুকুর জন্যেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা। এর অতিরিক্ত কিছু কর্মক্ষ রাষ্ট্রের থাকলেও ব্যক্তি কিংবা সমাজের বিকাশ অ অগ্রগতির জন্য তার কোনও প্রয়োজন নেই। কে মানুষের পারস্পরিক সাহচর্য ও সহযোগিতার মে নূতন নূতন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের সেখানে ক কিছুই নেই।

ইংরাজ জাতি রাষ্ট্রবাদের তত্ত্বে আস্থাশীল ন ব্যক্তির বিকাশ সাধনই তার কাম্য। কিন্তু তার ব্যক্তিবাদের (স্বাতন্ত্র্যবাদের) তত্ত্বে মানুষের পারস্পা সাহচর্যের শক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এবং এ খানেই নিহিত ঐ তত্ত্বের যা কিছু ত্রুটি এবং দুর্বলত আবার সমাজ-মানুষের সমবায়ে যে সুফল ফলে ও নজির দেখিয়ে 'টিউটনিক' জাতি চাইল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে আরও কঠোর ক'রে তুলতে; কেননা সমা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বিশেষ কাজে নিয়ে করা রাষ্ট্রিয়শক্তির দ্বারাই সম্ভব। 'টিউটনিক' জাতি এই যৌথবাদ তত্ত্বের যা কিছু দুর্বলতা তাও এইখানে নিহিত। রাষ্ট্র যখন সমাজ-মানুষের যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগী হয় তখনই সে একটা বির যন্ত্রদানবে পরিণত হয়, যার দাপটে মানুষের যাবতী স্বাধীনতা, উদ্যম এবং ক্রমোন্নতি নিদারুণভাবে নিষ্পেষিত হয়।

রাষ্ট্র যেহেতু মানুষের গোষ্ঠীগত রূপ, সেইহে রাষ্ট্রের কাজ বিশেষ কোনও ব্যক্তির জন্য নয়, সাধারণ ভাবে সকলকার জন্য। কিন্তু জীবনযন্ত্রের ক্রমবৃদ্ধি জন্য যে স্বাধীন, সুসম এবং বুদ্ধিপ্রভাবিত অথবা সহজাত প্রবৃত্তি পরিচালিত বিচিত্র কর্মপদ্ধতির প্রয়োজন রাষ্ট্রে ধারা সে কর্মধারা অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কেননা রাষ্ট্র আর যাই হোক জীবন্ত প্রাণীদেহ নয়। রাষ্ট্র একটি যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রের মতই সে কাজ করে। তার নিজস্ব কোনও কৌশল নেই। কোনও রুচিবোধ নেই, নেই কোনও সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তি অথবা গভীর সম্বোধি।

রাষ্ট্র চায় যন্ত্রের মত কিছু একটা উৎপাদন করতে। কিন্তু মানুষ চায় নিজের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়ে নিজেকে

প্রকাশ করতে। চায় নূতন কোনও সৃষ্টির উপকূলে নিজেকে আবিষ্কার করতে।

রাষ্টনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রবাদের এই ত্রুটি বিশেষভাবে প্রকট। একথা অবশ্যই মানতে হবে যে, সর্বসাধারণের জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রই এব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র যখন শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তখনই যত গোল বাধে। শিক্ষা তখন হয়ে পড়ে বাঁধা রুটিন গত একটি নিত্যকর্মপদ্ধতি। সেখানে ব্যক্তির স্বতোৎসারিত কোনও প্রেরণা এতটুকু উৎসাহ পায়না। অথচ ব্যক্তির ক্রমবৃদ্ধির এবং সত্যিকারের আত্মবিকাশের জন্য এই স্বতোৎসারিত প্রেরণারই প্রায়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মানুশীলনের মাধ্যমে সে প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। যন্ত্র যেমন একই ফর্মায় ফেলে একেই ধাঁচের জিনিস সব উৎপাদন করে, রাষ্ট্র যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে ঠিক সেইরকম ফল ফলে। অর্থাৎ কারখানায় উৎপাদিত পণ্যবিশেষ যেমন আকারে-প্রকারে একটির থেকে যে কোনও অপরটি পৃথক হতে পারেনা, ঠিক সেই রকম রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায়তনরূপী কারখানায় উৎপাদিত ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষাগত এমন কোনও বৈশিষ্ট চোখে পড়েনা যা একের থেকে অপরকে পৃথক করে চিহ্নিত করতে পারে। সর্বসাধারণকে নিয়েই যেহেতু রাষ্ট্রের কারবার সেইহেতু uniformity' রক্ষা করাকেই সে বিধেয় বলে মনে করে। এবং একাজটাও তার পক্ষে অনেক সহজ। ব্যক্তিগত স্বাভাবিক বৈচিত্রকে পালন করা তার যান্ত্রিকবৃত্তির পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একথা তো মানতেই হবে-যে, ' **Uniformity is death, not life.**

একদিকে মানবজাতির ক্রমবিকশিত সংস্কৃতিবোধ এবং অপরদিকে ব্যষ্টিগত মানুষের চিন্তাচেতনার উৎকর্ষ সাধনের স্বাধীনতা যদি ক্ষুণ্ণ না হয় তাহলে জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় সাধনা, এবং জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন আজও অনস্বীকার্য; কেননা এর দ্বারাই সমষ্টিগত অন্তরাত্মা **(communal soul)** একটু একটু করে বিকশিত হয়ে ওঠে। মানবজাতির সামগ্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই সমষ্টিগত অন্তরাত্মারও বিশেষ অবদান আছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি শুধু মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক অপ্রয়োজনীয় নয়,—সত্য কথা বলতে কি,—এ-গুলি অত্যাচার, উৎপীড়ন।

আমাদের সমষ্টিগত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম প্রযোজ্য,—অর্থাৎ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কুফল সম্বন্ধে উপরে যা মন্তব্য করা হল তার থেকে কিন্তু এ-ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত বা সমীচীন হবেনা যে, মনুষ্য জীবনের উৎকর্ষসাধনে রাষ্ট্রের কিছু করার নেই। একটা সীমাবদ্ধ ভূমিকা তার অবশ্যই আছে: এবং মানবজাতির শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে সেই টুকুই প্রয়োজনীয়।

সমষ্টিগত মানুষ তাদের সামর্থের সমবায়ে সার্বিক উৎকর্ষের প্রয়াসে যেসব কর্মে রত হয়, সেইসব সমবায়-মূলক কার্যাবলী যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারে তার জন্য রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে, সুযোগ সুবিধা দান করতে হবে; ক্ষতিকারক অপচয় নিবারণ করে সর্বপ্রকারের বাধাবিঘ্ন ও সংকট অপসারিত করতে হবে। (অবশ্য সকল প্রাকৃতিক কার্যাবলীতে কিছু পরিমাণ অপচয় ও সংঘর্ষ থাকবেই, থাকা প্রয়োজনও)। এছাড়া রাষ্ট্রকে দেখতে হবে যে, প্রতিটি ব্যক্তি তার স্বভাব ও সামর্থ অনুযায়ী আত্মোন্নতির ও আত্মসার্থকতার সমান সুযোগ যেন পায়। পরিকার্য কোনও অবিচার যেন ব্যক্তির এই আত্মবিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি না করে।

রাষ্ট্রশক্তির যে-বিরাট সামর্থের কথা আধুনিক সমাজ-বাদের তরফে ঘোষণা করা হয় সেই বিরাটশক্তি শুধু উপরোক্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে আমাদের বলার কিছু নেই। কেননা সেটা প্রয়োজন এবং ন্যায়সংগত। কিন্তু রাষ্ট্র যদি মানুষের স্বাধীন আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে অহেতুক তার রূঢ় হস্ত প্রসারিত করে তাহলে সেটা সামগ্রিকভাবে মানবজাতির পক্ষে ক্ষতিকর হবে অথবা

হতে পারে। এমনকি সমষ্টিগত মানুষের সমবায়ে পরিচালিত কার্যাবলীও অনেক সময় অহিতকর হয়ে উঠতে পারে যদি না সে-প্রচেষ্টা ব্যক্তির প্রয়োজন অনুসারে তার আত্মবিকাশের আনুকূল্য করে। সমবায়-প্রচেষ্টাকে প্রকৃত অর্থে কল্যাণকর করে তুলতে হলে তার কর্মপদ্ধতিতে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যার সাহায্যে ব্যক্তির পক্ষে আত্মবিকাশের সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগই মেলে। কেননা ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি রোধ করে সমষ্টির মঙ্গলসাধন সম্ভব নয়। সুতরাং সমবায়-প্রচেষ্টা যদি ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত না করে তাকে সম্প্রদায়গত অহমিকার বেদীতে বলি দেয় তাহলে সে-প্রচেষ্টা মানুষের পক্ষে কখনই কল্যাণকর হতে পারে না। কেননা মানবজাতির পূর্ণ বিকাশের জন্য যে-স্বাধীন-সুযোগ ও প্রেরণার প্রয়োজন ঐ ধরনের সমবায় প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা লাভ করার কোনও অবকাশ নেই। এবং আমরা জানি—

'So long as humanity is not full-grown, so long as it needs to go and is capable of a greater perfectibility, there can be no static good of all, independent of the growth of the individuals comprising the all.'

ক্রমবিকাশের পথে মানুষ এগিয়ে চলেছে। 'চরৈবেতি' তার চলার মন্ত্র! পরিপূর্ণভাবে বিকশিত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত মানুষের এই এগিয়ে চলা থামবে না। ব্যষ্টিকে নিয়েই সমষ্টি। সুতরাং ব্যষ্টির উন্নতি ব্যতিরেকে সমগ্রের পরিপূর্ণবিকাশ সম্ভব নয়। যে-শ্রীবৃদ্ধি মানুষের প্রয়োজন এবং যা অর্জন করবার সামর্থ তার আছে সেই শ্রীবৃদ্ধিলাভ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে রাখলে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে তা অকল্যাণকরই হ'য়ে উঠবে।

যে সব যৌথবাদী আদর্শ (**collectivist ideals**) অন্যায়ভাবে ব্যক্তিকে দাবিয়ে রাখতে চায় অচিরেই তারা দেখতে পায় যে তাদের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে একটি অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এবং যখন তারা, (বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে, অথবা ভবিষ্যতে যে ব্যবস্থা স্থাপন করার তারা আশা রাখে তার মধ্যে) এই অচলাব সম্মুখীন হয়, তখন তৎপরবর্তী যে কোনও প্রয়োজ পরিবর্তনের প্রয়াসকে তারা সহজ মনে গ্রহণ করতে না। কেননা সুস্থিত সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে-শ শৃঙ্খলা বিরাজ করে তার মধ্যেই তারা পরিতৃপ্ত থা চায়। এবং সেই জন্যে পরবর্তী সক্রিয় পরিবর্তনকে স্বীকার করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় তারা বলে, "পরিবর্তন তারাই চায় যারা নিরা বিরোধী, ব্যক্তি বাদীতার দোষে দুষ্ট এবং অসহিষ্ণু।"

ব্যক্তিই সর্বদা এগিয়ে চলে, এবং বাকী আর সক এগিয়ে চলতে বাধ্য করে; অন্যদিকে সুস্থিত সম ব্যবস্থায় নিশ্চল হয়ে থাকাই হল সমষ্টির সহ প্রবৃত্তি। প্রগতি, আত্মোন্নতি এবং আপনার বৃহত্তর সত্তার উপলব্ধি ব্যক্তির চেতনায় এনে গভীরতর সুখের মধুর আস্বাদন। ব্যক্তির জীবনে ন সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্। স্থিতি, নিরাপত্তা ও স্ব মধ্যে সুখের সন্ধান পায় সমষ্টি। যতদিন এই কেবলমাত্র অর্থনীতিগত স্থূল আধার হিসাবেই ক্রিয় থাকবে, যতদিন না তারমধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান গোষ্ঠী অ সচেতন হ'য়ে উঠবে, ততদিন এই মানসিকতা ঘুচবেনা। সীমাবদ্ধ সুখ ও সুস্থিত অবস্থার মধ্যে পরিতৃপ্ত থাকবে। বৃহত্তের দিকে যে অগ্রগতি ত স্বীকার করার মত মানসিক প্রসারতাকে সে আ করতে পারবে না।

ব্যক্তিজীবনের গতিপ্রকৃতি ও সমষ্টি জীব কার্য্যধারা, যা এখানে বিশ্লেষণ করা হল, পরিপ্রেক্ষিতে বোধকরি এ-মন্তব্য অগ্রাহ্য হবে না মানবজাতির বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহা একটা সুস্থ ও স্থায়ী ঐক্য গ'ড়ে তোলা সম্ভব ন পারস্পরিক নিবিড় সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ কতকগুলি সুগ শক্তিশালী রাষ্ট্রসমষ্টির সমবায়েও সে-ঐক্য প্রতি আশা সুদূরপরাহত। এমনকি বর্তমানের যেসব বিশৃঙ্খল ও অর্দ্ধ-সুশৃঙ্খল জাতিসমূহের মধ্যে এব পারস্পরিক সৌহার্দ ও সমঝোতা গড়ে উঠেছে (con

of nation) তাদের সকলকে নিয়ে যদি একটা বিশ্বরাষ্ট্র গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় তাও সফল হবেনা। সে বিশ্বরাষ্ট্র যদি অতীতের একচ্ছত্র রোমান সাম্রাজ্যের অনুকৃতি হয় কিংবা সাম্প্রতিককালে যে Federal State গ'ড়ে তোলা হচ্ছে, সেইভাবে সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা'হলেও ফল এক হবেই—অর্থাৎ মানবজাতির সুস্থ ঐক্য গ'ড়ে তোলা সম্ভব হবেনা। তবে বাইরের দিক থেকে প্রশাসনিক যন্ত্রের সাহায্যে মানবজাতিকে যে সংহত করবার চেষ্টা হচ্ছে তার কি কোনও প্রয়োজন নেই? আছে। অদূর ভবিষ্যতে এইভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে মানুষ অন্ততঃ সমষ্টিজীবনের স্বরূপ কি তার একটা আভাস পাবে এবং সেই জীবনযাপন করায় কিছুটা অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে। এর চেয়ে অধিক কিছু লাভ হওয়ার আশা নেই। কেননা বাইরের শাসনে মানবজাতিকে চিরকালের জন্য ঐক্যবদ্ধ ক'রে রাখা যাবেনা। এবং ঐ ব্যবস্থা মানবজাতির পক্ষে কখনই শুভপ্রদ হ'য়ে উঠবেনা। সুতরাং তা স্থায়ী হবেনা, যদি না ঐ ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের গভীরতর, অন্তরতর কোনও কিছুর উদ্ভাবন সম্ভব হয়। অন্যথায় বিরাটতর আকারে এবং ভিন্নতর পরিবেশে সেই পুরাণো পৃথিবীর অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

প্রশাসনের সাহায্যে মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তা একদিন সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়বে এবং তার জায়গায় বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্যের উপর ভিত্তি করে গ'ড়ে উঠবে একটা নূতন 'পুনর্গঠনের' যুগ। মানবজাতির এ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনেরও বোধকরি প্রয়োজন আছে। তবুও এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা লাভ না করেও আমাদের অগ্রগতি সম্ভব যদি আমরা রাষ্ট্রযন্ত্রকে আমাদের প্রকৃত আত্মিক উন্নতির উপায়ে পরিণত করতে পারি। এবং তা করতে পারলে সেই যন্ত্রের সাহায্যে নীতিবোধ ও অধ্যাত্মবোধসম্পন্ন মানবজাতিকে অন্তর্গূঢ় আত্মিক ঐক্যে (বাহ্যিক: দেহগত অথবা প্রাণগত ঐক্যে নয়) প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না।

ব্যর্থ হয়নি

(গল্প)

শ্যামসুন্দর দাশ

খুব সকালে স্নান করে পুজো সেরে অন্নপূর্ণা লক্ষ্মীর ঝাঁপি থেকে তার অনেকদিনের সঞ্চয় করা সতেরোটি টাকা আঁচলে বেঁধে আর একবার প্রণাম করলে ; মনে মনে প্রার্থনা করলে, স্বামীর মঙ্গলের জন্য।······

তারপর চা জলখাবার নিয়ে প্রায়-অন্ধ স্বামীর কাছে এসে বললে,···"ওগো এত কি ভাবছো, নাও চা খেয়ে নাও তো। ললিতমোহন ভা ছিল,···দৃষ্টিশক্তি আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে···অনেকদিন আগের দেখা কত তুচ্ছ সব জিনিষ আজ অস্পষ্ট ছবির মত মনের চোখে ভীড় করে আবছা ছায়ার মত, পরিচিত শব্দে তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারে ললিতমোহন। আজ ওরা সবই স্মৃতি ; পুরণো ছবির মত মনের অতলে মলিন হয়ে গেছে। ভাবছিল ভয়াবহ ভবিষ্যতের কথা, সঞ্চিত যা কিছু ছিল তিন বছরে সবই প্রায় শেষ হয়ে গেল। সামনে পড়ে রইল জীবনের পথ—সম্বলহীন অন্ধকার। তবু এই পথেই চলতে হবে, এই পঙ্গু অসহায় জীবনটাকে তবু বাঁচিয়ে রাখতে হবে কেন? ললিত-মোহনের দৃষ্টিহারা চোখদুটিতে শুধু এই প্রশ্ন।

চিকিৎসক বলেছেন একটা চশমা নিলে নাকি দৃষ্টি ফিরেও পেতে পারে। ললিতমোহনের বিশ্বাস হয়নি। মাত্র দুটি লেন্সের কি এত শক্তি যা এই ঘোলাটে চোখে আবার ঝকঝকে আলো জেলে দেবে

সহরের পরিচিত কোলাহল, অবিশ্রান্ত চঞ্চল প্রাণের কর্ম্মমুখর স্পন্দন সহ্য হয়নি ললিতমোহনের। চলে গিয়েছিল এই সহর হতে অনেক দূরের এক গ্রামে-যেখানে পৌঁছতনা বলিষ্ঠ সুস্থ জীবনপ্রবাহের ঢেউ, আর আধুনিক বিলাসব্যসনের কণামাত্র চিহ্ন।

অভিমান আর যন্ত্রণায় ললিতমোহন নিজেকে নিঃশব্দে বিলুপ্তির পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু অন্নপূর্ণা? যার মনে ছিল অনেক সাধ আশা—সে ভুলতে পারেনি ডাক্তারবাবুর ঐ কথাটুকু, ভাবতে পারেনি মিথ্যা সান্ত্বনা বলে, মনের গোপন কোণে সযত্নে তুলে রেখেছিল কথাটি·····একটা চশমা নিলে হয়তো আবার সেরে উঠতে পারেন···

মনে প্রাণে নিঃস্ব রিক্ত ললিতমোহনকে তাই জোর করেই আবার সহরে নিয়ে এসেছে অন্নপূর্ণা।···

···অন্নপূর্ণার প্রশ্নে মলিনমুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে ললিতমোহন···বলে··"না কিছু ভাবিনি তো, কিন্তু, এমন করে বেঁচে থেকে লাভ কি বলতে পারো অন্নপূর্ণা?"···

লে কসা নেই বা কি। জগৎ জুড়ে এত সুন্দরের আয়োজন, উপভোগ্য কত কি না আছে এই পৃথিবীতে··· এসব দেখে শুনে কি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায় না?···

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় অন্নপূর্ণা···স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে অজান্তে বড় আঘাত দিয়ে ফেলেছে সে, যত কিছু সুন্দর মনোরম প্রায় অন্ধ স্বামীর কাছে আজ সেসব একেবারেই মূল্যহীন। নিঃস্ব দরিদ্রের সৌন্দর্য্য উপভোগ যে হাস্যকর একটা কল্পনা ঠুনকো এ সান্ত্বনা অন্নপূর্ণার নিজের কাছেও সম্পূর্ণ অর্থহীন মনে হয়···জলভরা চোখ দুটি উদাস হয়ে যেন দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে, মনের বিবরে কি খুঁজে ফেরে যেন। মাত্র চার বছরের বিবাহিত জীবনে সব কিছু এমন মূল্যহীন হয়ে যাবে, একটু চপলতা, একটু হাসি আনন্দের জগৎ হতে এমনভাবে দূরে চলে যাবে তাকি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল অন্নপূর্ণা। নিজের চোখের পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে জগতের সব কিছু সে দেখছে. শুধু আলো, আর আলো, নিজের চোখের এত আলো নিয়ে সে কি করবে ; অন্ধকারে ঢেকে যাওয়া স্বামীর চোখদুটিতে নিজের চোখের এব

আলোর কিছু কি ভাগ দেওয়া যায় না...দুচোখের দৃষ্টি টলটলে জলে ঝাপসা হয়ে যায়।

অন্নপূর্ণার হাতে চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। নিঃশব্দে দুজনে চোখের জল ঝরাতে লাগলো যেমন করে এই তিন বছরে অজস্র ঝরিয়েছে। ললিতমোহন অনুভবে বুঝতে পারে কেন অন্নপূর্ণা স্তব্ধ হয়ে গেল, আস্তে আস্তে কাছে এসে বলে "অন্নপূর্ণা কাঁদছো?"...একটা নিস্তব্ধ অসহায় প্রাণের অবাক্ত ব্যথা ঐ একটা কথায় যেন শত সান্ত্বনা হয়ে অন্নপূর্ণাকে আরও কাঁদিয়ে দেয়।

বলে "ওগো তুমি আমার একটি কথা রাখো ঐ ডাক্তারবাবুর কাছে একটিবার চল, আশা তুমি এমন করে ছেড়ে দিলে আমি কোন্ আশায় বাঁচবো বলতো?" ললিতমোহন ম্লান হেসে বলে..."তুমি পাগল হয়েছো অন্নপূর্ণা, শুধুমাত্র একটা চশমাতেই আমি আগের মত দেখতে পাবো এ বিশ্বাস যে আমার আর নেই। তাছাড়া আমি তো বুঝতে পারি কেমন করে আমাদের দিন কাটছে, এক সঙ্গে এতগুলো টাকা তো আমার কাছে নেই অন্নপূর্ণা।"...

অন্নপূর্ণা বলে..."তোমাকে তা ভাবতে হবে না, আমি জেনে এসেছি তোমার চশমার দাম মাত্র সতের টাকা, এই দেখ, আমার লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ছিল আমি নিয়ে এসেছি, তোমাকে আজই আমি নিয়ে যাবো।" অন্নপূর্ণা স্বামীর হাত ধরে অনুরোধ করে। অন্নপূর্ণার দুটী হাত হাতের মধ্যে নিয়ে ললিতমোহন চুপ করে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে বলে...চল অন্নপূর্ণা, তোমার জীবনের সম্বল শেষ আশাটুকু যা ছিল তাও হারিয়ে আসবে চল। 'অমন করে বলতে নেই...তুমি চলতো এখন। অন্নপূর্ণা স্বামীকে অনুরোধ করে।

বিশাল সহরের উত্তাল শব্দের বুক চিরে একসময় দুজনে ডাক্তারের নিঃশব্দ স্নিগ্ধ ডার্করুমে এসে বসলো—

অন্নপূর্ণার বুক আশায় আশঙ্কায় কাঁপতে লাগলো, অন্ধ ললিতমোহন নির্ব্বিকার। অভ্যস্ত পুরু দুটি কাঁচের লেন্স নিয়ে ডাক্তারবাবু ললিতমোহনের চোখে পরিয়ে দিলেন। ললিতমোহনের নির্ব্বিকার রেখাহীন মুখে অবিশ্বাস্য পুলকের বন্যা বয়ে গেল যেন। চার বছর ঐ মুখে হাসি দেখেনি অন্নপূর্ণা। ললিতমোহন হাসছে, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখচোখ, চিৎকার করে বলে উঠেছে ডাক্তারবাবু অন্নপূর্ণা, আমি দেখতে পাচ্ছি ক, খ, গ, এ. বি, সি, সব সবকিছু আমি দেখতে পাচ্ছি। অন্নপূর্ণা। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে উত্তেজিত ললিতমোহন। চার বছর আগের দেখা টিপ দেওয়া মুখটা এতদিন অস্পষ্ট হয়ে গেছিল। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দুই হাতের মধ্যে সেই মুখটা ধরে আবেগে কম্পিত গলায় বলেছে ললিতমোহন..."অন্নপূর্ণা, কাঁদছো? সেকি! এই দেখ আমি সব দেখতে পাচ্ছি। বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস যেন কিছুতেই সংযত করতে পারে না ললিতমোহন। অবিশ্বাস্য এই ঘটনা তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে ঝড় তুলেছে যেন। ডাক্তারবাবুর সামনে তার মনের এই প্রচণ্ড বিপ্লব বহুকষ্টে শান্ত করবার চেষ্টা করতে করতে ঘেমে নেয়ে উঠলো ললিতমোহন।

আঁচল খুঁটে সিঁদুরের ছিটেফোঁটা-মাখা সতেরটি টাকা ডাক্তারবাবুর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলো অন্নপূর্ণা। ঈশ্বরের প্রতিভূ দেবদূতের মত ডাক্তারবাবুর পাদু'টি কৃতজ্ঞতায় চোখের জলে ভাসিয়ে দিল; তারপর কম্পিত হাতে ললিতমোহনের হাত ধরে বেরিয়ে এল অনেক আনন্দ আর আলোয়-ভরা পথে। অশান্ত আনন্দের বন্যায় ভেসে যেতে লাগলো দুটি হৃদয়।

কতদিন পর এই কোলাহল-মুখর আধুনিক জগৎটাকে দেখলে ললিতমোহন; অন্ধকারের জগতে ডুবে থেকে এতদিনে এই প্রাণবন্ত সমাজটাকে চিনতে যেন কষ্ট হচ্ছে ললিতমোহনের! এর মধ্যে কত পরিবর্ত্তনই না হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ যোগাযোগহীন দূর প্রবাসে থেকে এতদিন কতকিছুরই খবর ওর অজানা থেকে গেছে। তাই সব আগে একজন হকারের কাছ থেকে সেদিনের একটা সংবাদপত্র কিনে ফেলল ললিতমোহন।

দু'চোখে বুভুক্ষা নিয়ে, তাই পড়তে লাগলো ললিতমোহন। এ তো পড়া নয় অবর্ণনীয় এক

অনুভূতি অপটিক নার্ভ বেয়ে স্নায়ুতে, শিরায় রোমাঞ্চময় পুলকের হিল্লোল বইয়ে দিচ্ছে, কিছুতেই বিশ্বাস হয়না, আবার সেই ছোট ছোট কালো অক্ষরগুলো দেখতে পাচ্ছে, ললিতমোহন উন্মাদ হয়ে গেছে যেন।

অন্নপূর্ণা হু'চোখ ভরে স্বামীর এই উচ্ছল চপলতা উপভোগ করলো, তারপর বললো,…'যাই এবার চা নিয়ে আসি, তখন চা জুড়িয়ে গিয়েছিল, তুমি বেশ জোরে কাগজ পড় আমি শুনবো।'…চিৎকার করে ললিতমোহন কাগজ পড়ছিল পাশের ঘরে অন্নপূর্ণা শুনছিল আর হাসছিল।

…শোন অন্নপূর্ণা, কি আশ্চর্য্য সব ঘটনা ঘটে গেছে এই চার বছরে। চাঁদের আকাশেও মানুষ হানা দিয়েছে। অবাক বিস্ময়ে ললিতমোহন বিহ্বল। সংবাদের অংশ বিশেষ যেখানে নভোচারীদের টেলিভিসনের ভাষ্য হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে সেই সংবাদটাই পড়ছিল ললিতমোহন।

…'এখনও তাঁরা প্রদক্ষিণ করে চলেছেন। তিন নভোচারী তাঁদের কেবিনে এখন ভাসছেন…চাঁদের আকাশ হতে পৃথিবীকে একটা বলের মত দেখাচ্ছে, চাঁদের দেহে অজস্র ক্ষত চিহ্ন—মনে হচ্ছে,সেখানে ভীষণ ধুলো, গলিত লাভার স্রোত জমাট বেঁধে পাথর হয়ে হয়ে গেছে যেন…মানুষ বাস করা সেখানে একেবারেই অসম্ভব, জীবনের অস্তিত্ব কি প্রাণের স্পন্দন সেখানে কিছুই নেই মনে হচ্ছে। অক্সিজেন তো মোটেই নেই, রুক্ষ পাথরের চাঁই; এখানে ওখানে, শুধু গহ্বর আর শীতল মৃত্যুর স্তব্ধতা।

…'দেখেছো অন্নপূর্ণা, দেখেছো, এত খরচ করে ওরা ওখানে কি দেখতে গিয়েছিল!'…অন্নপূর্ণাকে শুনিয়ে আবার পড়তে শুরু করলো ললিতমোহন।

…'এবার আমরা আমাদের কেবিনের অবস্থা বলছি।…আমরা ভাসছি, দেহ সম্পূর্ণ ভারহীন, বমি ভাব হচ্ছে,…যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আমাদের চা গরম রাখার ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই চা খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আমরা চা খেতে পেলাম না।…এবার আমরা চাঁদের ওপাশে যাচ্ছি. যোগাযোগ কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ থাকিবে। ..আবার পরে আপনাদের শোনাবো।'

…'শুনছো অন্নপূর্ণা, কি কাণ্ড শুনছো', চঞ্চল শিশুর মত ললিতমোহন উচ্ছল হয়ে ওঠে।'

…হ্যাঁ শুনছি, 'উত্তপ্ত চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে অন্নপূর্ণা পাশে এসে বসলো। বললে 'নাও চা খেয়ে নাও, এ-চা কিন্তু খুব গরম; যান্ত্রিক গোলযোগে ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। ..'

হু'জনে হেসে উঠলো।

চা খেতে খেতে ললিতমোহন পড়ছিল—তারপর আমরা চাঁদের এপাশে এলাম, এবার শুরু হবে আমাদের আসল কাজ, অর্থাৎ চাঁদে নামার জায়গাটা সন্ধান করা। ..শুনুন, দূর থেকে আপনারা চাঁদকে যত সুন্দরই দেখুন না, আমাদের কিন্তু ভারী বিশ্রী দেখাচ্ছে, নিরস চাঁদটা। কিন্তু একি! টেলিভিসান্ ক্যামেরার লেন্স হু'টো কেমন ঘোলাটে হয়ে আসছে যেন, আমরা চাঁদের দেহ তেমন আর দেখতে পাচ্ছিনা, সব ধোঁয়াটে আবছা অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভীষণ আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠে ললিতমোহন। বলে,—'না না অন্নপূর্ণা আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি।

বিহ্বল, বিভ্রান্ত ললিতমোহনের কম্পিত শরীর জড়িয়ে ধরে অন্নপূর্ণা বলে,—'হ্যাঁ, ওগো, এইতো তুমি দেখতে পাচ্ছো'।

ভয়ে ভয়ে চোখ খোলে ললিতমোহন, মুখ আবার হাসিতে ভরে ওঠে, বিবর্ণ, নীল হয়ে যাওয়া মুখ আবার স্বাভাবিক হয়। আস্তে বলে,—'তাইতো, সত্যিই আমি দেখতে পাচ্ছি। চারবছর পর আবার আমি দেখতে পাচ্ছি, চোখজোড়া সত্যিই খারাপ হয়ে যায়নিতো।'

অন্নপূর্ণার হু'চোখ ছাপিয়ে জল এসে পড়েছিল: ভাবছিল. লক্ষীর ঝাঁপিতে অতি কষ্টে সঞ্চয় করা মাত্র কয়েকটি টাকায় এমন অসম্ভব সম্ভব হলো কি করে করুণাময় ঈশ্বরের চরণে আবার শতশত প্রণাম জানাল।

খাটের একপাশে কাগজটা পড়েছিল, কয়টি লাইন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছিল ললিতমোহন, মনে মনে পড়লো, '. টেলিভিসান্ ক্যামেরার হু'টি লেন্স সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ অতি তুচ্ছ যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সতের'শ কোটি টাকা ব্যয়ের এই অভিযান ব্যর্থ হ'লো।

জন্ম-জন্মান্তর

(উপন্যাস)

রামপদ মুখোপাধ্যায়

সাধুর কৃপায় বংশ রক্ষা হল। সাধুর উপদেশেই ছেলের নামকরণ হল মহেশ। একটা মন্ত্রপূতঃ কবচও দিলেন উনি। বললেন: এই কবচ ছেলেকে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করবে। আট বছর পর্যন্ত কবচটা হাতে থাকবে, তারপর আপনিই ওর দায়িত্ব শেষ হবে। আট বছরের পর একদিন এই কবচটা হারিয়ে যাবে। খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন নাই। এই পৃথিবীতে সব বস্তুই নির্দিষ্ট একটা স্থিতিকালের সঙ্গে জড়িত—কার্যকারণসূত্রে বাঁধা। তারপর তা মূল্যহীন। কবচ হারিয়ে গেলেও ছেলের জীবনে কোন ক্ষতি হবে না।

সাধুর ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে মিলে গিয়েছিল কিন্তু তার আগে বাল্যজীবনের প্রসঙ্গ কিছু আছে।

দেবতার আরাধনা, মন্ত্র জপ ও যজ্ঞের ফলে যার উৎপত্তি, স্বভাবতঃই তার সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা জন্মায়। সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হলে সদ্ভাবে ভাবিত জীবনের কল্পনা স্বাভাবিক। তার সম্বন্ধে বাবা মায়ের ও আত্মীয়জনের অনেক প্রত্যাশা। ছেলে বাল্যকাল থেকে শান্তশিষ্ট হবে, দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাবান হবে—অন্ততঃ মিথ্যাচারপরায়ণ হবে না এবং দুর্নীতির ছায়ায় পা ফেলবে না। কথায় আছে যেমন জমি তেমনি গাছ। মহেশ কিন্তু পুরাতন প্রবচনকে নস্যাৎ করে দিয়ে দুর্দান্ত হয়ে উঠল। তবে এর মূলে কিছু কারণও ছিল বই কি। মরাহাজা ছেলেদের বেলায় যা ঘটে—অতিরিক্ত আদর, তা ওর ভাগ্যেও ঘটেছিল। চাইতে না-চাইতে জিনিষ পেয়ে পেয়ে ওর আবদারের সীমাও বেড়ে গিয়েছিল এবং ছেলেবেলা থেকেই এই বোধ জন্মেছিল—ওর সুখ বা তৃপ্তির জন্যই সংসার। ওর কথা শোনবার জন্য সবাই কান পেতে আছে, ওর মুখে হাসি দেখলে কৃতার্থবোধ করে। অন্যের কথা শোনার দায় ওর নাই—অন্যকে উপদেশ দেবার সুযোগটাও কেন দেবে?

কাজেই বাবা যখন বলেন, খোকা নমো করতো শিব-ঠাকুরকে

ও ঘাড় শক্ত করে মাথা নাড়ে না।

কর নমো লক্ষ্মীছেলে।

উত্তরে ঘাড় আরও শক্ত হয়—স্বর আরও কর্কশ হয়। না না।

কোন কোন দিন দেবপূজার উপাচারগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওর আনন্দ। ফুলগুলি দুহাতের আঙুল দিয়ে কুচি কুচি করে হাতের তালুতে রেখে চটকায় এবং নিজের মাথায় ফুল চাপিয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে—নমো নমো।

ভোগের জন্য মিষ্টি আনতে দিলে সেই মিষ্টির অর্ধেকও বাড়ীতে পৌঁছয় না। ফুল বিল্বপত্র হাতে দিলে মাথায় ঠেকায় না—মাথা ত নোয়াবেই না। স্নানের ঘাটে জল ছিটিয়ে সাঁতার কেটে মানুষের জপপূজায় ব্যাঘাত করে হেঁটেহেঁটে বসে মাংস পেঁয়াজ খায়। এমনি আরও অনেক অনাচার। এ সমস্ত বালকের খেয়াল, কিন্তু স্বভাব তৈরী হয় এমনি করে।

ওর নাস্তিকতা বুঝতে বাবা মা বেদনা বোধ করেন কিন্তু অধিকাংশ উপার্জনশীল ছেলে যেমন প্রশ্রয় পেয়ে থাকে—তেমনি সস্নেহ প্রশ্রয়ও ও পায়। কথা না বুঝলেও ছোট ছেলেদের অনুভূতি প্রখর। চোখের চাউনি, মুখের ফাঁকা ধমক—প্রহারের গভীরতা অবোধ শিশুর কাছে অবোধ্য নয়।

মহেশের ভাষায়…আমিও সেটা বিলক্ষণ বুঝতে পারতাম। কেমন করে বুঝতাম ব্যাখ্যা করতে পারব না। কিন্তু ওঁরা যে আমাকে শাসন করছেন না, শাসনের

তর্জনে স্নেহের মশলা মিশিয়ে রেখেছেন এ বোধ দিব্য টনটনে ছিল। সামান্য ভ্রূকুটিতে যেমন ককিয়ে উঠতাম। ওঁরা বুকে চেপে চুমু খেয়ে পিঠ চাপড়ে কত সোহাগই না জানাতেন। যেন আমার কান্নায় পৃথিবীতে মহা-অনর্থ পাত হয়ে যাবে। অথচ একটু লক্ষ্য করলে অনায়াসে ধরতে পারতেন কান্নার সুরটি কৃত্রিম। কণ্ঠে প্রচুর শব্দ আছে, চোখে একফোঁটা জল নেই। ওঁদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার দৌরাত্ম্য নিত্যি নতুন নতুন রূপে প্রকাশ পেত। ভাবতাম এ আমার অধিকার ন্যায্য পাওনা। ক্রমে এই স্বভাবটাই পাকা হয়ে গেল। এতে আনন্দলাভ করতাম, খেলার আনন্দ।

বাবা কখনও কখনও রাগ করে বলতেন, কাঁদুক, ছেলে কাঁদলে সংসার রসাতলে যাবে না, ছেলের মঙ্গল হবে।

মা বলতেন, আহা কি কথার শ্রী! কাঁদলে ছেলের ভাল হবে!

হবে। কথায় জোর দিয়ে হাসতেন বাবা। ছেলে-বেলায় পড়েছিলাম, বালানাং রোদনং বল। কান্নাতেই ছেলেদের স্বাস্থ্য তৈরী হয়।

রাখ তোমার শাস্তরের কথা। কথায় কথায় শাস্তর মেনে চললে আর সংসার করা যায় না।

তখন নেহাৎ কচি ছেলেটি নই, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভাব হয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা এবং মন দুইই বিনিময় হচ্ছে। অন্য বাড়ীর আচার ব্যবহার সমাজের রীতি-প্রকৃতির আঁচও কিছু কিছু পাচ্ছি। বুঝতে পারি উপরের মহল আমাদের শাসন করে সুখ পান। যেমন আদর করে পান। আদর বা শাসন যাই হোক মোটের উপর সুখটা হল কর্তৃত্বের। এখন বুঝি ওটা ইগো অহং। জীব-প্রকৃতির আদিম বৃত্তি। ওঁদের নিষেধবাক্য অবহেলা করে আমিও সেই সুখানুভূতি লাভ করতাম। ওঁরা ঠাকুর দেবতা দেখলে মাথা নোয়াতেন আমি মাথা না নুইয়ে আনন্দ পেতাম। ওঁরা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে বলতেন, অমনোযোগী হয়ে আমি সুখ পেতাম। আমার অহং বিপরীত পথে চলেই তৃপ্ত হতো। এমনি করে লেখাপড়াতেও মন বসলো না।

এইবার সত্যিই শঙ্কিত হয়ে উঠলো মহেন্দ্র। ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, লেখাপড়া না শিখলে গতি কি হবে। শাস্ত্রজ্ঞ নাই হোক—মন্ত্রতন্ত্রে কিছু হাল-হদিস রাখাও তো প্রয়োজন। সেদিকে রুচি না থাকলে রুজি-রোজগারের চেষ্টাও চাই-আর তার জন্য ইস্কুলের একটা ছাপ অন্তত লাগাতে হবে নামের পিছনে। কিন্তু এছেলে পুরুষপনায় সবকিছুই অস্বীকার করতে চাইছে। না দেবস্থানে, না বিদ্যাস্থানে-শ্রদ্ধার অঞ্জলি কোথাও ভরতে চাইছে না। আদর সোহাগ লালনের কাল বহুদিন শেষ হয়েছে, তাড়নার কালও বেশিদিন থাকবে না, এরপর সারা জীবন ধরে জ্বলতে হবে তাঁকে।

হাঁ, এখনই অভাবের তাপটুকু লাগছে সংসারে। তাঁর একার উপার্জন; সংসারে পোষ্যসংখ্যা বাড়ছে। মহেশের পরও এসেছে দু'টি। পুত্র সন্তান। আরও আসবার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে একটু একটু করে বাড়ছে নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের দর। য়ুরোপে একটা দারুণ যুদ্ধ হয়ে সব কেমন উলট-পালট হয়ে গেল। দুধ, ঘি, চাল, ডাল, মায় পরনের কাপড় জামা পর্য্যন্ত। এখন একটা চাকরি না হলে, আয় না বাড়লে সংসার চালানো কঠিন। ছেলেদের ভবিষ্যৎ তো বটেই পিতাদের বর্তমানও অন্ধকার।

একদিন স্বামী স্ত্রীতে খুব কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। খবরদার বলছি ওকে আদর দেবে না।

আদর আমি একাই দিই?

কে প্রথম দোষী বা বেশী দোষী এইনিয়ে তর্ক, তার থেকে কলহ। সেদিন মহেন্দ্র রাগ করে কিছু খেলে না।

রাগ করে কদিন উপবাস করতে পারে মানুষ। ভবিষ্যতের উপবাস ঠেকাবার জন্যই তো শাসন, সুতরাং শাসনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল মহেন্দ্র। আর তার ফলে… মহেশের ভাষাতেই জিদ দিয়ে জিদ ভাঙা যায় না এই সহজ কথাটা অধিকাংশ অভিভাবকই বোঝেন না। তাঁরা বোঝেন না, শিশু হলেও সে মানব-শিশু; মানবিক বৃত্তি তার স্বভাবধর্ম, বল প্রয়োগে তার একগুঁয়েমি ভাবটাই বাড়ে। আমারও মনে হতে লাগল, ওঁরা অন্যায় করছেন বিনাদোষে তাড়না করছেন, লাঞ্ছনা করছেন। বাবাকে

দেখলে ভয় পেতাম খুবই, তার চেয়েও ভীষণ কথা ওকে না দেখতে পেলে খুসী হতাম। অর্থাৎ সূক্ষ্ম আকারে এটা বিতৃষ্ণাই। ওঁর কোন কথা যত ভালই হোক, সদুপদেশ নীতি নিয়মনিষ্ঠা যা কিছু উনি শিক্ষা দিতে চাইতেন, মনে মনে বলতাম, না না-না। তোমার কাছ থেকে কিছুই নেব না, তোমাকে আমি পছন্দ করি না। তাছাড়া একটি বৃত্তি মনের মাঝখানে মাথা তুলছিল ওঁকে বিপাকে ফেলে আনন্দলাভ। এটা সূক্ষ্মভাবে প্রতিশোধস্পৃহা কিনা মনোবিৎরা বিশ্লেষণ করবেন আমি কিন্তু ভালমন্দ নির্বিচারে ওঁর উপদেশ অমান্য করে চলে আনন্দ পেতাম। ঠাকুরের পূজোর জন্য ফুল আনতে দিলে সে ফুল উচ্ছিষ্ট হাত না ধুয়েই আনতাম, মিষ্টদ্রব্য আনতে দিলে নির্দ্বিধায় তা উচ্ছিষ্ট করতাম। ঠাকুরের ভোগের আগে নিজের ভোগে লাগাতাম অসঙ্কোচে।

সন্দেহ হলে বাবা শুধোতেন—পাঁচ-পয়সার চিনি-সন্দেশ এত কম কেন?. বলতাম দোকানী এইটুকুই ত' দিলে।

কোন দোকান থেকে কিনেছিস?

পাছে ধরা পড়ি—দূরের একটা অজানা দোকানের নাম করতাম।

কিন্তু বিশ্বাস কর—মিথ্যাচার আমার স্বভাববিরুদ্ধ। বাবাকে রুষ্ট করার জন্য এমন করতাম। অথচ আমি দেবতাকে কোনদিনই অবহেলা করতাম না। গঙ্গায় ডুব দিয়ে মনে হত দেহটা হাল্কা হয়ে গেল। গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করতে করতে কখনোই ভাবতাম না—থাক, আর নয়। বরং একশোবার জপকে হাজার বারে তুলতে কতখানি সময় যায় সেই কৌতুহলেই বার বার ঘড়ি দেখতাম। জপে হয়তো মন বসতো না,—সময় মাপায় নিষ্ঠা তাই বলে কি তরল ছিল? না। এক একদিন অদ্ভুত একটা ভাব এসে যেত। তোমার কি মনে আছে—ঘাটের উপর স্নান সেরে উঠে ডানদিকে যে মন্দিরটি পড়ে—সেটিতে লোকসমাগম খুবই কম হতো। কারণ ঘাটের ওপিঠ ঘুরে মন্দিরের দুয়োর থাকায়, কেউই ঘুরে শিবের মাথায় জল ঢালতে যেতনা, তার চেয়ে পইঠার ধারে শিবেরা অনায়াসলভ্য। চলতি পথে তাঁদের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে যাত্রীরা আসল শিবকে দর্শন করতে যায়। আমি কিন্তু একটু ঘুরে ঐ অনাদরবঞ্চিত শিবঠাকুরের সামনে এসে বসতাম। তাঁর মাথায় চাপানো বেলপাতা তুলে দিয়ে মন্ত্র আউড়ে আবার তাঁর মাথাতেই চাপাতাম। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা আর কি! সে পূজা নয়, খেলা। তা হোক, সেই পুজো পুজো খেলাতেই এক একদিন চমৎকার মন বসে যেত। কেমন করে যেন হারিয়ে যেত সময়। দক্ষিণ ঘুরে রোদ এসে পড়তো মন্দিরের দোর গোড়াটিতে আলোর ইশারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠতেই তন্ময়তা ভাঙতো। তখন কিন্তু বেলার হিসাব করে চমকে উঠতাম না, প্রসন্ন পরিতৃপ্ত মনে কোন হিসাবই পীড়া জন্মাত না।

এরপর মহেশের জীবনের গতি ফিরেছিল অন্য খাতে। তার আগে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ইদানীং প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওদের সংসারের গতিটা শ্লথ হয়ে এসেছিল। শুধু যাজনিক বৃত্তিতে পাঁচ-ছটি প্রাণীর সংসারকে ঠেলে চালানো যায়না, আরও টুকিটাকি কি সব যেন করত মহেন্দ্র। শিবস্থানে নিত্য পুণ্যকর্মের তালিকা, নিত্য নূতন পুণ্যার্থীসমাগম, গঙ্গার ঘাটে একটু চেষ্টা চরিত্র করলে আয় বাড়ানো যায়, কিন্তু তেমন রুচি ছিলনা মহেন্দ্রের। আরও একটু উন্নতভাবে কোন ঠাকুরবাড়ীতে ভাগবত-পাঠের আসরে বসতে আপত্তি করত না মহেন্দ্র। কিম্বা ওই ধরণের সম্মানজনক কোন বৃত্তি, ছোট ছোট ছেলেদের বিদ্যাদান, বা কোন অতিথি-সেবাশ্রমে হিসাব নিকাশ রাখা। এ-সব ছাড়াও ছোট বাড়ীর খানিকটা নীচের দু-খানা ঘর-ভাড়া দিয়ে কিছু আয় বাড়িয়ে নিয়েছিল।

এই তীর্থক্ষেত্রে স্থায়ী ভাড়াটে বড় একটা মেলেনা। মিললেও তেমন ভাড়াটে রেখে বাড়ীটাকে আবদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলনা মহেন্দ্র। তার অনেক ঝক্কি ঝামেলা। নিত্য নূতন বায়না। তার চেয়ে যারা হাওয়া বদলাতে আসে দু চার মাসের জন্য কিংবা দশ পনের দিনের অস্থায়ী কোন পুণ্যার্থী, এদেরই বেছে বেছে বাড়ীতে

এনে তুলতো মহেন্দ্র। এতে প্রাপ্যটা বাড়তো, ঝামেলা পোহাতে হত কম। শুধু শীতকালটা কোনমতে কাটিয়ে দেওয়া।

সেবার এক ভাড়াটে এলো হাওয়া বদলাতে। এলো শীতকালটা থাকবে বলে, চার মাসের কড়ারে। কিন্তু আলাপ পরিচয়ে ওদের সঙ্গে খুব দূর সম্পর্কের সুতোর খেইটা একদিন ধরা পড়ল। সম্পর্কে মহেন্দ্র নাকি মেয়েটার ভাই হয়। সামনেই ছিল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ঘটা করে কপালে ফোঁটা দিয়ে সম্পর্কটি পাকা করে নিল মেয়েটি—তারপর।……

তারপরের গল্পটা ওদের নিয়ে নয়, ওদের থেকে একধাপ নেমে সুরু হয়েছিল। সে গল্পও তেমন জমেনি, তবু বীজ বোনা হয়ে গেল—তার অঙ্কুরোদ্গম হতে না হতে—

সেই মেয়েটার নাম মুরলা। একদিন মুরলা বলল, বৌদি, আমার ইচ্ছে কাশীতেই থেকে যাও।

সুরমা হেসে বলল, বেশ তো থেকে যাও।

মুরলা বলল, অসুবিধার মধ্যে উনি চাকরি করছেন দিল্লীতে—অনেকখানি দূর।

সুরমা ঠাট্টা করে বলল, তা ঠাকুরজামাই বদলী হয়ে আসুননা এখানে।

মুরলার চোকদুটি চক্ চক্ করে উঠলো। বলল, তা হলেত ভালই হয়। বেঁচে যাই। এখানে কেমন গঙ্গা কত—ঠাকুর দেবতা—নিত্যি কথকতা পালপার্বণ, আর তোমরা ত আপনার লোক রয়েইছো, বেশ হবে।

হালকাভাবে উঠেছিল কথাটা—শীতের মধ্যেই স্থায়ীভাবে শিকড় নামালো, ভদ্রলোক দিল্লী থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এলেন এবং চেষ্টা করতে লাগলেন কাছাকাছি ভাল একটা বাসার। পছন্দমত ভালবাড়ী মেলানো কঠিন—তা যতদিন না হয় এই বাড়ীটাই মন্দ কি? ভিড় তো এ বাড়ীতে বেশী নয়। মহেন্দ্ররা কুচো তিনটিকে নিয়ে পাঁচ—এদের আরও কম। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে দুই আর কর্তা গিন্নী। মেয়েটাই বড়—বয়স বছর আট, নাম ভগবতী। ভারি শান্ত সুশ্রী মেয়ে। কাজেরও বটে ওই বয়সেই কল থেকে জল ভরে আনে, কুটনো কোটা, রুটি বেলা, পান সাজা…টুকিটাকি হাত সুড়সুড় কাজের মেয়ে।

মুরলা যেমন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে সম্বন্ধটা পাকা করে নিলে, ভগবতীও মহেশের কপালে ফোঁটা দিতে, বসে ছড়াটা তিনবার আওড়ালে।

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়ুক কাঁটা।

যমের দুয়ারে কি পরিমাণ কাঁটা জমলো, সে যম-মহারাজই জানেন—মেয়েটার পাকা পাকা কথায় সুরমা তো হেসেই খুন।

ঠাকুরঝি! ভগী তোমার পাকা গিন্নী। বলে শাকের সঙ্গে প্রথম পাতে একটু ঘি দিতে হয় বেটাছেলেকে, তাতে নাকি আয়ু বাড়ে।

মুরলা বললে, তা কথা ওর খুব। একবার যা শুনল আর ভুলবেনা, কার পাতে ঘি দিতে ভুল হল বৌদি?

সুরমা বলল, মহেশ আর ও একসঙ্গে খেতে বসেছিল কিনা—মেয়ে লক্ষ্য করে খামাকে জ্ঞান দিলে। আবার বলে ও কি রুটী সেঁকছ মাসীমা, একটুও ফুলছেনা। রুটীতে ফোস্কা না উঠলে নাকি খেলে অম্বল হয়।

মুরলা বলল, এ তোমার ঠাকুরজামাই এর ভাণ্ডারী। আমাকে কি রুটী বেলতে দেয়—বলে, বেলবার দোষে রুটীতে ফোস্কা পড়েনা।

বল কি! বিস্ময়ে চোক কপালে তুলে সুরমা বলে, এইটুকু মেয়ে রুটী বেলে, চাকি বেলুন সামলায় কেমন করে!

তা পারে। কাজের গোছ ওর খুব। দেখ না একদিন কেমন পরিপাটি করে গুছিয়ে-গাছিয়ে তোমার কাজ করে দেবে।

সেইদিনই, বলবার আগেই দোতলায় উঠে এসে ভগবতী বলল, মাসীমা, আজ আমি রুটী বেলব।

পারবি তুই?

ওমা মেয়েমানুষের কাজ মেয়েমানুষে পারবেনা।

সুরমা ত হেসেই অস্থির। গলা উঠিয়ে বলল, ঠাকুরঝি শোন, তোমার মেয়ের কথা—ও নাকি মেয়েমানুষ।

ভগবতী বলল, মেয়েমানুষ নয় তো কি। আমি কি কাছা দিয়ে কাপড় পরি, না কোট গায়ে দিয়ে আপিস যাই।

তা বটে। এই এত্তোখানি ঘোমটা টেনে হেঁসেল সামলাব, এই নে চাকি বেলুন—দাঁড়া। আটাটা ঠেসে দিই—

তা দাও, আমার হাতে যদি'র বল থাকলে তোমাকে সাধতাম কিনা!

সুরমা হাসতে হাসতে বলল, তা ঠাকুরকে বলনা—ঠাকুর, আমায় তাড়াতাড়ি বড় করে দাও।

আহা তাই যেন হয়। সংবের মা—কিলিয়ে বুঝি কাঁঠাল পাকানো যায়! সে কাঁঠাল খেতে ভাল লাগে!

মহেশের সঙ্গেও এমনি করে ভাব জমাল। ইতিমধ্যে কয়েকটি খেলুড় জুটিয়ে ছাদে পেতেছে খেলাঘর। এক-কোণে ইট সাজিয়ে আলাদা আলাদা ঘর তৈরী হয়েছে। রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, শোবার-ঘর, জল-ঘর। খুঁটি মুটি টিনের কৌটা এনে জড়ো করেছে, দোকান থেকে কিনে এনেছে ছোট লোহার উনুন, খুন্তি, কড়াই, হাতাবেড়ি আর হাঁড়িকুড়ি। তরিতরকারির খোসাগুলো এনে ছোট লোহার বঁটিতে কুচি কুচি করে রান্নার আয়োজন করে। এই খেলার শুধু রান্না খাওয়ার কাজেই হাত মকসো নয়। ঘর গৃহস্থালীর অনেক খুঁটিনাটি ঘটনারই মহড়া চলে। তার মধ্যে প্রধান হল বিয়ে-বিয়ে খেলা। প্রথমটা জোড়া মিলিয়ে বর বউ ঠিক করে নেওয়া—তারপর যে যার সংসার গুছিয়ে রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা। এইসব ব্যবস্থায় ভগবতীরই নির্দেশ মেনে চলে সবাই। বিয়ে থেকে রান্না সবই ত্রুটিহীনভাবে তারই পরিচালনায় সুসম্পন্ন হয়। সেই ছাদের আসরে টেনে আনে মহেশকে বলে, চুপ করে বস। যা বলি শোন।

মহেশ কখনো হাসে, কখনো বিরক্ত হয়। বিশেষ করে যখন জোড় মিলিয়ে বরকনের সংসার পাতায় ভগবতী। খেলুড়েদের জোড় মিলিয়ে দিয়ে মহেশকে বলে, এইবার বাকি রইলাম তুমি আর আমি।

মহেশ বলে ধ্যাৎ।

ঠোঁট উলটে হাসে ভগবতী, আহা, কি ভয়োর ছেলের। কবে পছন্দ হয় নি বুঝি?

মহেশ এই কথায় রেগে যায়—পায়ের ঠেলায় সাজানো ঘর সংসার উল্টে দিয়ে দুম দুম করে নেমে যায়। ছাদের ক্ষুদে দলটি তো থ। ভগবতী কাঁদো কাঁদো। বলে, দেখলে দেখলে - পুরুষমানুষের রাগ দেখলে। আমি কি এমন দোষ-ঘাট করলাম।

কিন্তু সব সময়ে রাগই করে না মহেশ, অনুরাগের সুরে কখনো কখনো বলে, এই গিন্নির কি দিদি দে। ভারি খিদে পেয়েছে কিন্তু।

ভগবতী বলে, হলো দু'দণ্ড স্থির হও। আগে তেল মাখ চান কর, তৈরি কাট—আমি তাড়াতাড়ি ভাত নামিয়ে মাছের ঝোলটা চাপিয়ে দিই। খেতেই ঝোল নেমে যাবে।

কে জানে এর সবটাই খেলা কিনা। মেয়েরা কচিবেলা থেকে সংসারের হাল চাল, সংসারের পাঠ রপ্ত করে নেয় তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি এবং নিভুর্ল নকল! সুখ দুঃখের আকার ইঙ্গিতটুকু কৌতুক-রহস্যের ছলেই ধরতে চায় ওরা। একদা সংসার রঙ্গমঞ্চে যে-অভিনয় জমবে, এ হয়তো তারই প্রস্তুতি। তবু খেলাও কখনো কখনো সত্য হয়ে ওঠে। খেলা তখন বয়সের সীমা ছাড়িয়ে জীবন-পরিধি স্পর্শ করে: অভাবিত অনেক দুঃখ তখন বেদনার কাঁটা হয়ে কল্পনার রঙীন ফানুস ফুটো করে দেয়।

ভগবতী যখন সুরমার পাশটিতে বসে রান্নার এটা-ওটা এগিয়ে দেয়, রুটি বেলে, পেঁয়াজ কুচোয়, মশলা বাটে তখন প্রতিবেশীরা থাকলে মন্তব্য করে—আহা বেশ কাজের মেয়েটি। তোমার এমনি একটি বউ হলে দিব্যি হয়।

সুরমা বলে, হাঁ রাম না জন্মাতে রামায়ণ।

কেন ছেলে যখন বড় হবে লেখাপড়া শিখে চাকরি করবে তখন এমনি একটি হাত দুরস্ত কাজের মেয়ে পেলে—

সুরমা বাধা দিয়ে বলে, দেখছই তো দিদি, লেখাপড়ায় ছেলের মনই নেই। ও আবার মানুষ হবে, ওর আবার বিয়ে দিয়ে বউ আনব।

কেন এই মেয়েটিকেই নাও না। জানাশোনা ঘর। না হয় সকাল-সকালই বিয়ে দিয়ে দিলে। সেকালে এর চেয়েও কম বয়সে বিয়ে হতো।

কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে দেয় সুরমা, হাঁ তাই ভাল। আমি তেজে হাতে দড়ি পড়ুক আর কি! কিরে ভগী, হাঁ করে যে গিলছিস গল্প? যা বিছানাটা একটু ঝেড়েঝুড়ে রাখগে তো।

ভগবতী চলে গেলে গলা নামিয়ে বলে, ওসব কথা ওর সামনে তুলো না দিদি, বড্ড পাকা মেয়ে। তাছাড়া সম্বন্ধ একটা রয়েছে। যা হবে না তা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা ভাল নয়।

মেয়ের মনে কিন্তু রঙ ধরতে সুরু করল। ওই অতটুকু বয়সে যুবতী মনের বাসনা কোথা থেকে কেমন করে ফুল ফোটায় কেউ বলতে পারে না কিন্তু মেয়েদের মন স্বপ্নের জগৎ গড়ে নেয় বড় তাড়াতাড়ি।

ভগবতী একদিন মহেশকে বলল, চোপর দিন উড়ে উড়ে বেড়াও কেন লেখাপড়ায় মন বসাও।

মহেশ রেগে গেল। আমি লেখাপড়া করি না-করি তোর কি।

বাঃ রে—আমার কি! বলি তখন তো ভুগতে হবে আমাকেই। পাকা গিন্নির মত মুখ ভার করে জবাব দিল ভগবতী।

এই পাকামিতে হাসি আসা উচিত মহেশ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। ইস ভুগতে হবে! তুই আমার কে রে—

ছি ছি ওকথা বলো না। বলতে নেই। লজ্জায় জিভ কেটে মাথা নামাল ভগবতী।

মহেশ ওর চুলের ঝুঁটি ধরে সবেগে নাড়া দিয়ে বলল, কেনরে, বলব না কেন? তুই আমার কে?

ভগবতী বলল, আঃ ছাড়, ছাড়, লোকে দেখলে নিন্দে করবে। বলবে পুরুষের মত হম্বিতম্বি করে। কথায় আছে বাইরে না মুখ পায় ঘরে এসে বউ ঠ্যাঙায়।

কেরে! ঠাঁই করে একটা চড় কষিয়ে দিল মহেশ।

ও মাগো—ডাকাত ছেলে মেরে ফেললে গো। চীৎকার করে উঠলো ভগবতী।

অপ্রতিভ মহেশ তাড়াতাড়ি নেমে গেল ছাদ থেকে।

মহেশ বলেছিল। বড্ডই বাড়িয়েছিল মেয়েটা। মার খেয়েও চেতনা হয়নি। যখন তখনই অমনি করে ডাকত আমায়। একদিন কষে ধমক দিয়ে বললাম, কেন অসভ্যপনা করেছ কি হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করব। আমাকে দাদা বলে ডাকবি।

বয়ে গেছে। সম্বন্ধ রাখবে না? পাপ হবে না?

সত্যি বলতে কি ভাই, ওর এই ধৃষ্টতায় যা রাগ হতো। কিন্তু মারধর করলে ওরও জিদ বেড়ে যায় বলে অনুনয় করতাম। না রে, আমার তো একটাও বোন নেই, তুই আমার বোন হলে কেমন ভাল হয়।

বয়ে গেছে তোমার বোন হতে। ঠোঁট উল্টে জবাব দিত।

তাহলে ভাইফোঁটা দিলি কেন? আর দিবিনে?

না আর কখনও দেব না। ঘাড় ঘুরিয়ে চলে যেত।

হাসতাম। উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতাম। আর সত্যি বলতে কি, ওর সঙ্গে স্নেহের সম্পর্কটাই ভাল লাগতো। বারো-তেরো বছরের ছেলের মনেতে অন্য চিন্তা যে ছায়া ফেলে না তা নয়।

কিন্তু সে চিন্তা পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট নয়। নরনারী সম্পর্কিত নিবিড় মধুর একটু সুখ প্রত্যাশা হয়তো গল্পের রাজপুত্রের মত কুচবরণ কন্যালাভের লোভ হয়তো বা।

স্নেহ ক্ষুধার দাবি সে চিন্তার ছায়া ফেলে না—' সেটাকে সঙ্গলাভের কৌতূহল বলা যায়। মোট কথা বোনের উপর স্নেহ দিয়ে আমি তৃপ্ত ছিলাম ওকেও পরিতৃপ্ত করতে চাইতাম। একটি বছর ভগবতী আমাদের বাড়ীতে ছিল একটি বছরে একটি দিনও ওকে অন্যচক্ষে দেখতে পারিনি।

একটি বছর পরে জ্বরে পড়ল ভগবতী। চিকিৎসা করেও যখন রোগের উপশম হল না তখন একদিন সুরমাকে বলল, মাসীমা ওকে একবার ডাক না।

কাকে ডাকব?

মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, ছিঃ নাম ধরতে নেই। তোমার বড় ছেলেকে। দেখতে ইচ্ছে করছে।

মহেশ ইস্কুলে গেছে।

ইস্কুলের ছুটি না আজ? আজ তো রামনবমী।

তা বটে। তা ওকে দেখে কি হবে।

দেখব। আরতো এ-জন্মে দেখতে পাব না।

ওকি কথা! বাট্ বাট্; সুরমা শিউরে উঠল।

সত্যি বলছি আমি বাঁচব না। একটু থেমে বলল, এ-জন্মে তো ওর সঙ্গে বিয়ে হল না।

ছিঃ মা! ও কথা বলিসনে। ভগবান তোকে ভাল করে দেবেন। ভাল ঘরে তোর বিয়ে হবে।

ভাল ঘরে গেলে তো। এই বরই আমার ভাল ওইতো আমার বর। ও হেসে চোখ বুজলো।

বারণ করলে শোনে না। কি আর বলবে সুরমা। চোখের জল মুছে মনে মনে বলে — ভগবান, ওর সুমতি দাও। ওকে ভাল করে দাও।

ভগবতী ওর চোখের জল দেখতে পেল। বলল, কাঁদছ কেন, আমি তো আবার আসব তোমাদের কাছে। এ-জন্মে হলোনা, পরের জন্মে হবে। দেখো ঠিক আমি আসবই এখানে — ওই আমার বর। ওই বরই আমার বর।

কেঁপে উঠল সুরমা। এমন প্রত্যয়-নিষ্ঠাপূর্ণ দৃঢ় কণ্ঠস্বর ও জীবনে শোনেনি। মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেল!

ছেলেকে বলল, একবার ওর কাছে গিয়ে বস মহেশ।

মহেশ মাথা নেড়ে বলল, মাথা খারাপ। গেলেই ছাইভস্ম যা তা বকবে।

তা বকুক — একটু যদি শান্তি পায়।

এখন আমার কাজ আছে - রুগীর ঘরে বসে ঘ্যানর ঘ্যানর শুনতে পারব না।

মহেশ যে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় না তা নয়। যার যখন ঘরে আর কেউ থাকে, যখন নিভৃত আলাপের সুযোগ নিয়ে সম্বন্ধবিরুদ্ধ আলোচনা করতে পারে না ভগবতী। মেয়েটার জন্য মমতা হয় ওর কাঙালপনাকে অপ্রীতির চক্ষে দেখে না, কিন্তু পাকা পাকা কথাগুলো কিছুতেই সহ্য করতে পারে না মহেশ।

ছাদের খেলাঘর ভেঙে গেছে এখন নীচের সংসার থেকেও বুঝি চলে যাবার জন্য পা বাড়াল ভগবতী। দুঃখিত হল মহেশ কিন্তু সে কিইবা করতে পারে।

এমনি করে এক অপূর্ণ কামনা বুকে নিয়ে একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের মত একদিন ভগবতী চলে গেল ওদের বাড়ী থেকে। সেই নিদারুণ দিনটি গভীর ক্ষতের মত মনে গেঁথে রইল কিছুকাল তারপর সে ক্ষতও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। শুধু একটা পরিবর্তন দেখা গেল মহেশের লেখাপড়ায় আদৌ তার মনোযোগ রইল না। কেবল রাস্তায় রাস্তায় টো টো করে টহল দিয়ে ঘুরতে লাগল। কখন বাড়ী আসে, কখন খাওয়া দাওয়া করে বার হয়ে যায় কেউ জানে না। কোন কোন দিন দুপুরে সে বাড়ীতেই আসে না।

এ বৃত্তান্ত মহেন্দ্র জানতো না। সুরমা বলে নি। কি জানি, যা রাগী মানুষ শুনলে হয়তো খুনখারাপির মত ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাবে। কিন্তু একদিন রাত্রিতেও বাড়ী এলো না মহেশ, অনেক রাত পর্যন্ত ওর জন্য খাবার আগলে বসে ঘুমে ঢুলতে লাগল সুরমা। সেদিন মহেন্দ্রও বাড়ী ছিল না। নিমন্ত্রণ ছিল কোথায়। নিমন্ত্রণবাড়ী থেকে গভীর রাত্রিতে বাড়ী ফিরে সদর দরজা ঠেলতেই খুলে গেল এবং রান্নাঘরের সামনের দাওয়ায় স্তিমিত হ্যারিকেনের আলোয় স্ত্রীকে ঢুলতে দেখে বিস্মিত হল মহেন্দ্র। বলল, এত রাত্রি পর্যন্ত সদর দরজা খোলা কেন তুমিই বা রান্নাঘরের দাওয়ায় ঢুলছ কেন? সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা দেওয়া খাবারের পানে নজর পড়তেই মহেন্দ্র আর একটি প্রশ্ন করলো, বড়বাবু বুঝি এখনও বেড়িয়ে ফেরেন নি?

অস্বীকার করা গেল না।

মহেন্দ্র গম্ভীর গলায় বলল, আজই প্রথম, না হর-রোজই এমন চলছে?

সুরমা তাড়াতাড়ি বলল, না-না আজই দেখছি আসেনি —

কিন্তু দিনের বেলায়ও ওনি অনিয়ম হচ্ছে।

সুরমা বুঝতে পারল স্বামীর কানে বার্ত্তা পৌঁছে গেছে, এখন অস্বীকার করলে অপরাধের গুরুত্বই বাড়বে।

কোন কথা না বলে, ভাতের থালাটা তুলে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলো!

মহেন্দ্র বলল, ভাতে জল দিয়ে শুয়ে পড়গে আমি নীচেয় রইলাম।

সে কি! খাবেনা?

না গুরুভোজন হয়েছে মনে করছি খানিকটা পাঠ করব।

পূজোর সময় একজায়গায় তন্ত্র ধারকের কাজ করতে হবে। পুঁথিগুলোতে একটু চোখ বুলিয়ে নেব।

স্ত্রীর শুকনো মুখের পানে চেয়ে বলল, ভয় নেই, রাজহপুরে গোলমাল হবেনা নিশ্চিন্তে ঘুমোওগে।

রাজহপুরে সত্যিই কোন গোলমাল হয়নি—সেই রাত্রিতে বাড়ীতেই ফেরেনি মহেশ। পরের দিন সকালেও মহেশের দেখা নাই। এদিকে মহেন্দ্রও আহারাদির পর যথারীতি বাবার আড্ডায় গেলনা—বাইরের ঘরে বসে মন্ত্র-তন্ত্রের পুঁথিপত্র নিয়ে পড়াশুনা করতে লাগল। সুরমা ত ভয়ে কাঠ। মহেন্দ্র বিশেষ কোন কথা বলছেনা। নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের উদ্দেশে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা তর্জন-গর্জন শোনা যাচ্ছেনা বা কোন দুশ্চিন্তাজনক মন্তব্য-উদ্বেগ কৌতুহল, কিছু না। এযেন নিত্যদিনের ঘটনা। বজ্রগর্ভ মেঘের মত মহেন্দ্র চুপচাপ।

মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল সুরমা। অবশেষে ব্যাকুলকণ্ঠে বলল, দুপুর উতরে গেল আজও তো ফিরল না মহেশ। কোথায় গেল, কি হল একটা খোঁজ কর।

গম্ভীরস্বরে মহেন্দ্র বলল, নিয়েছি। ভালই আছে।

ভাল আছে? কোথায়?

জাননা কোথায়? আউবসরনীতে অষ্টম প্রহর সুরু হয়েছে। নাম-কীর্ত্তনে মেতেছেন মহাপ্রভু। ভয় নেই, অকৃতি অধম পাপী তাপী কেউ আর কণা লাভে বঞ্চিত থাকবে না।

কিন্তু কাল থেকে যে কিছুই খায়নি।

হা হা করে হেসে উঠল মহেন্দ্র; নামযজ্ঞ-ভূমিতে অন্নের অভাব নাকি? নামের সঙ্গে অন্নও বিলুচ্ছেন কর্মকর্তারা। তোমার সন্তানটিও উপবাসে নেই।

তা যাওনা একবার—খোঁজ খবর নিয়ে এস।

সেহাতই হিরণ্যকশিপুর ভূমিকাটা দেখাবে। কিন্তু প্রহ্লাদের তাতে অসুবিধা ঘটতে পারে। দেখ আমিও মানুষ, আমার ধৈর্য্য সাধারণ মানুষের মতই; আর আমার সন্তানস্নেহও সমুদ্র নয়, গঙ্গাও নয়—সেহাতই একটা ডোবা।

স্বামীর মনের উত্তাপ বাড়ছে বুঝতে পেরে সুরমা আর কিছু বলল না। মনে মনে স্থির করল, সন্ধ্যাবেলায় আরতি দেখতে যাবার ছল করে অষ্টমপ্রহরের জায়গায়টা ঘুরে আসবে।

ঘটনার গতি তার আগেই অন্য পথে ঘুরে গেল। আধঘণ্টা বাদেই বাড়ীতে ফিরল মহেশ, সদর দরজা ঠেলতেই সামনে মূর্তিমান কালের মত দাঁড়িয়ে মহেন্দ্র।

পা থেকে খড়ম খুলে নিয়ে মহেন্দ্র গর্জন করে উঠল, আভি নিকালো, নিকালো।

সুরমা পড়ি তো মরি করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে না আসতেই ঘটনাটা ঘটে গেল। 'প্রচণ্ড' শব্দ করে সদর দরজাটা তৎক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সুরমা, ওগো, কি করলে, ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিলে?

দিলাম। বলে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে গেল মহেন্দ্র।

সুরমা আর কালবিলম্ব করল না—ছুটে গিয়ে খিল খুলে চেঁচিয়ে উঠল, মহেশ মহেশ!

কিন্তু কোথায় মহেশ! বাঁকা গলিটায় তখন সান্ধ্য-ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘন হয়ে উঠছে—তিন চার হাত দূরের—মানুষকে চেনা যায় না, তারই মধ্যে মহেশ হারিয়ে গেল।

ক্রমশঃ

বিদেশী পর্য্যটকদের দৃষ্টিতে সতীদাহ প্রথা

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

সতীদাহ প্রথা ভারতের একটি অতি প্রাচীন ধর্ম্মীয় সংস্কার। 'সতী' প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক স্মিথ বলেছেন, **Satee Probably was a sythian rite introduced from central Asia** (১) স্বামীর মৃত্যু হলে হিন্দু বিধবাগণ মৃত স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতেন। স্বামীর সহমৃতা হয়ে তাঁরা 'সতী' নামে আখ্যায়িত হতেন। কেবল হিন্দুসমাজেই সতীদাহ-প্রথাটি সীমায়িত ছিল না। মুসলমান সমাজেও এর অল্পবিস্তর প্রচলন ছিল। অনেক মুসলমানরমণীও সে-যুগে স্বেচ্ছায় স্বামীর সহমৃতা হয়ে 'সতী' হয়েছেন। যা'হোক, ধর্ম্মার্থে আলোচ্য প্রথাটির জন্ম হ'লেও, কালক্রমে তা একদিন ধর্ম্মান্ধতায় পর্যবসিত হয়। অনেক সময় মৃত ব্যক্তির বিধবাপত্নী সহমরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও তাঁকে বলপূর্ব্বক জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করা হইত। এ ব্যাপারে হতভাগ্য রমণী শত অনুনয় করেও সহমরণ হতে নিষ্কৃতি পেতেন না। জীবনরক্ষাকল্পে তাঁর আক্ষেপ-পীড়িত কাতরোক্তি ধর্ম্মান্ধদের মনে এতটুকু করুণার উদ্রেক করত না। অসহায়-ভাগ্য নিপীড়িতা রমণী নিতান্ত অসহায়ের মত সহমরণের নিদারুণ বিধানকে শিরোধার্য্য করে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হতেন।

রক্ষণশীল সমাজে তখন পুরুষদের একচ্ছত্র আধিপত্য। ধর্ম্মীয় সংস্কারের নানা বিধি-নিষেধের মধ্যে রক্ষণশীল সমাজ তখন উদ্ধত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে ছিল। একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি, অমানুষিক পীড়ন এবং ধর্ম্মাচারণে ভেদবুদ্ধি, অন্যদিকে নিদারুণ অবহেলা, ঘৃণা, যন্ত্রণা ও মৃত্যু। জীবনের সমস্ত দিকেই কদর্য্যতার সমাবেশ। এমন একটি কদর্য্য সমাজ-পরিবেশে নারীর কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজে অন্তঃপুরের নারী তখন যন্ত্রমাত্রে রূপান্তরিত। তাঁদের হৃদয়ে তখনও প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে ওঠেনি। অতএব নারীহৃদয় যেখানে বিদ্রোহ-মৌন নিঃশব্দ ও নিষ্ক্রিয়, তাঁর ব্যক্তিজীবনও সেখানে সংশায়িত। তৎকালীন সমাজে-পুরুষ ব্যক্তিত্বের কাছে নারী ছিল হীনমন্যতা-বোধে বিচলিত। ব্যক্তিত্বের অন্তরালে আত্মগোপন করে এই দিনের পর দিন তাঁরা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করতেন। এইভাবে ক্রমশঃ তাঁরা জীবন রক্ষার মৌল অধিকারটুকু হারাতে বসেছিলেন। নারীজীবনে এমন একটি মর্ম্মান্তিক অধ্যায় পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসে বোধহয় আর কখনও রচিত হয়নি।

ধর্ম্মান্ধেরা সতীদাহপ্রথাটিকে ধর্ম্মসঙ্গত আচরণ বলে প্রচার করতেন; আর এই প্রচারের ফলে বাংলা তথা ভারতের সর্ব্বত্র সতীদাহের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল। ফলে বহু রমণী ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীর সহমৃতা হতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সতীদাহ প্রথাটিকে ধর্ম্মীয় আকারে রূপ দিয়ে তদানীন্তন সমাজের কয়েকজন মুষ্টিমেয় সমাজ-প্রধান তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির নানা পথ আবিষ্কার করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করত বিধবা রমণীর আত্মীয়েরা। সহমরণে বাধ্য করে তারা বিধবারমণীর যাবতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি অতি সহজে আত্মসাৎ করত। এইভাবে ধর্ম্মীয় প্রথাটি ক্রমে মানুষের নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থসিদ্ধির একটি অন্যতম সহায়করূপে পরিগণিত হয়েছিল।

যাইহোক, ইতিহাসে ধর্ম্মের নামে গোঁড়ামি, নিষ্ঠুরতা এবং স্বার্থসিদ্ধি আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। সতীদাহপ্রথা এমনি একটি নিষ্ঠুর ধর্ম্মান্ধতা। বলা বাহুল্য, ধর্ম্ম হচ্ছে নৈতিক বিশ্বাসের বিষয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাসবোধ নিহিত রয়েছে। জ্ঞানের বিকাশের সংগে সংগে মানুষের বিশ্বাস ক্রমশঃ বিশুদ্ধতর হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বিশ্বাস যখন গোঁড়ামি এবং অন্ধ কুসংস্কারে পর্য্যবসিত হয়, তখন ধর্ম্ম আর তার কল্যাণময় রূপটি ধরে রাখতে পারে না। ধর্ম্ম হয়ে ওঠে তখন শুভবোধহীন অবিবেকী। স্বার্থপর মানুষ যুগে যুগে ধর্ম্মকে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়েছে। ধর্ম্মানুভূতিকে কলুষক্লিন্ন লালসায় পর্য্যবসিত করেছে। ফলে, সমাজে দেখা দিয়েছে চরম বিনষ্টি: পরিণাম হয়েছে,— নিস্ফল।

সম্রাট ঔরঙ্গজীবের আমল হতেই ভারতীয় সমাজজীবনের সকলক্ষেত্রে ভাঙ্গন দেখা দিতে শুরু করে। তারপর অষ্টাদশ শতকে বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের একটানা অভিযান যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যায় অত্যাচারে সমাজের সংযম ও সুনীতির বন্ধন দ্রুত শিথিল হয়ে পড়ে। কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অকাল বৈধব্য, সতীদাহ ইত্যাদি এমন অনেক অধঃপতনের উপসর্গ সমাজজীবনকে অসাড় ও ভারগ্রস্ত করে তোলে। এই সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারের বেড়াজালে সমকালীন বাংলাদেশ দুর্ব্বল আত্মশক্তি ও দুরপনেয় চারিত্রিক কলঙ্কের অভিশাপে ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছিল।

সতীদাহ প্রথার উৎসমূলে কৌলীন্যপ্রথার প্রভাব সুস্পষ্ট। তদানীন্তন কুটিল ব্রাহ্মণেরা বহু বিবাহ করিতেন। তাঁদের মৃত্যু হলে স্ত্রীরা নিজেদের অত্যন্ত অসহায় বলে মনে করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর নিদারুণ দুঃখ কষ্টে এবং আত্মীয়বর্গের গলগ্রহ হয়ে তাঁদের জীবন নির্বাহ করতে হত। সমাজে তাঁরা ছিলেন অপাঙ্‌ক্তেয়— সকল প্রকার সামাজিক অধিকার ও মানবিক মর্য্যাদা থেকে বঞ্চিত। ধর্ম্মে, কর্ম্মে আচারে বিচারে সামাজিক বিধি-নিষেধ তাঁদের জীবনকে আরও সকরুণ করে তুলত। আচারবদ্ধ সমাজপতিদের নিদারুণ বিধান এবং অনুশাসন সমূহকে শিরোধার্য করে তাঁর এক ধূমকলঙ্ক পরিবেশে জীবন নির্ব্বাহ করতেন। প্রতিবেশী ও আত্মীয়বর্গদের একটানা অবহেলা আর অমানুষিক পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা সমাজজীবন হতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন। একদিকে তাঁদের জীবনে নিত্য নতুন অভাব, নিদারুণ দারিদ্র্য ও সুকঠোর পেষন; অন্যদিকে উচ্চতর ব্রাহ্মণ্যসমাজের উদ্ধত ভ্রুকুটি, ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত বিরোধ এবং বিচিত্র ধরণের বর্ণগত বিধি-নিষেধ। জীবনের বাস্তব করুণ চিত্রের নিদর্শন হিসেবে এগুলিই যথেষ্ট। এই মসীকৃষ্ণ পরিবেশে আত্মীয়-বান্ধবদের প্রীতিবর্জ্জিত, অসহায়, উপায়হীনা রমণীদের জীবনে কোথাও এতটুকু আশার আলো ছিলনা: নিপীড়িত যন্ত্রণা প্রকাশের ভাষাও ছিলনা— ছিলনা মানবধর্ম্মে ক্ষীণতম বিশ্বাস। বিদগ্ধ সমালোচক William Graham Sumner তৎকালীন হিন্দুসমাজের একটি করুণ দুঃস্থতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে মন্তব্য করেছেন—A man who knows India well says that it was no kindness to widows to put a stop to Sutee because, if they live on, their existence is so wretched that death would be better"(২) ঐতিহাসিক সমালোচক W.J.Wilkins ও তাঁর একটি গ্রন্থে হিন্দুবিধবা রমণীদের আক্ষেপপীড়িত জীবনের অনুরূপ কয়েকটি বলিষ্ঠ চিত্র বিধৃত করেছেন। সহায়সম্বলহীন হিন্দু বিধবাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

"She was addressed as if she was to blame for the death of her husband. The head of a widow was shaved, although Hindoo women cared very much for their hair. She was allowed but one meal a day and must fast frequently. She was shunned as a creature of ill Women.(৩)

অধিকাংশ রমণী নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা

করে মৃত্যুকামনা করতেন। আবার অনেকে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বিড়ম্বিত ভাগ্যের কথা চিন্তা করে স্বেচ্ছায় সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। ক্রমে এরূপ আচরণ একটি প্রথায় রূপান্তরিত হয়। ধর্মান্ধেরা এই বিশেষ আচরণটির সঙ্গে সতীত্বের ধারণাটি যুক্ত করে একটি ধর্মসম্মত প্রথায় রূপদান করে। (৪) আর এই ধর্মসম্মত আচরণটিই 'সতীদাহ' প্রথা নামে প্রচলিত। এ ছাড়া ইতিহাসে সহমরণের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মুসলমান-আমলে বহু রাজপুতরমণী তাঁদের সতীত্বরক্ষার উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের এরূপ আচরণের পশ্চাতে একটি নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষার্থেই তাঁরা আত্মাহুতি দিতেন; কোনরূপ বেদোক্ত ধর্মাদর্শ রক্ষার জন্য নয়।

আদিম আর্য-সমাজে বিধবারমণীদের অগ্নিকুণ্ডে দাহ করার প্রচলন ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোনরূপ বলপ্রয়োগের ভূমিকা ছিলনা। কোন রমণী সহমরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে, তাঁর সেই অনিচ্ছায় কোন প্রকার বাধা দেওয়া হতনা। এককথায়, উক্ত প্রথামূলে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছিলনা। অবশেষে বৈদিক যুগে প্রচলনটির বিলুপ্তি ঘটে। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে 'মনু-সংহিতায়' নারীর ক্ষেত্রে সহমরণের কোন নির্দেশ নেই। উক্তগ্রন্থে সংহতিকার মনু বিধবারমণীদের জীবন-যাত্রা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। এ থেকে সহজে অনুমিত হয়, সে যুগে সহমরণের কোন প্রচলন ছিলনা। মনুর সমকালীন যুগে স্ত্রীলোকদের বৈধব্যজীবন নানা আচার-বিচারে বিধিবদ্ধ ছিল। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে তাঁদের জীবনযাপন করতে হত। কোন রমণীর চারিত্রিক অবনতি ঘটলে সামাজিক বিধান অনুযায়ী তিনি দণ্ডনীয় হতেন। অপরাধ প্রমাণিত হলে তাঁকে কঠোর শাস্তি গ্রহণ করতে হত। বলাবাহুল্য, নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সকল প্রকার নৈতিক ও চারিত্রিক ব্যভিচার তৎকালীন সমাজে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত।

সতীদাহ প্রথা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারলাভ করে। ইতিপূর্বে প্রথাটি শুধু নিম্নতম স্তরের লোকসমাজে সীমাবদ্ধ ছিল। কয়েকজন বিদেশী পর্যটকদের রোজনামচায় সতীদাহপ্রথার কয়েকটি বীভৎস অনুষ্ঠানের ঘটনাচিত্র পাওয়া যায়। ঘটনা এবং তথ্যগুলি নানা ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ। ঐ সকল পর্যটকদের মধ্যে নিকোলো-ডি কন্টির (Nicolo De Conti) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভিনিসবাসী কন্টি ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতপরিভ্রমণে এসেছিলেন। ভারত ও পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন দেশে তিনি ৩০ বৎসর কাল [১৪১৯-১৪৪৯] অতিবাহিত করেন। কন্টি যে-সময় ভারতপরিভ্রমণে এসেছিলেন, সতীদাহপ্রথা তখনও পুরোপুরিভাবে বিধিবদ্ধ হয়নি। তবু তাঁর রোজনামচায় সতীদাহের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বিবরণ পাওয়া যায়। বিজয়নগর পরিভ্রমণ-কালে সেখানকার একটি সতীদাহের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, 'মধ্যভারতে কোন মৃত ব্যক্তিকে দাহ করার সময় সেই ব্যক্তির স্ত্রীগণকেও তার সঙ্গে দাহ করা হত প্রথম স্ত্রী আইন অনুসারে সহমৃতা হতে বাধ্য হতেন, একমাত্র স্ত্রী হলেও সহমরণ হতে তাঁর নিষ্কৃতি ছিলনা। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য স্ত্রীগণকে এরূপ সর্তে বিবাহ করা হত যে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শোভা বৃদ্ধির জন্য সহমৃতা হবেন। কন্টির এই বিবরণলিপি হতে জানা যায়, তখনও ভারতে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল এবং বিবাহকালীন সর্তানুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ মৃত স্বামীর পত্নীগণকে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিতে হত। সতীদাহের কয়েকটি বীভৎস অনুষ্ঠান কন্টি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এমন আর একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন "মৃত স্বামীকে দাহ করার পূর্বে তাঁর পত্নীকে উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত করা হত। তারপর সুগন্ধী কাষ্ঠ সজ্জিত চিতায় অগ্নিসংযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে বিধবা পত্নী কয়েকবার চিতা প্রদক্ষিণ করতেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত অন্যান্য স্ত্রী-পুরুষেরাও পুণ্যার্থে সতীর সঙ্গে এই কাজে অংশ গ্রহণ

করতেন। সে সময় বাদ্যধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠত। এর ফাঁকে একজন পুরোহিত উর্দ্ধাসনে বসে সতীকে অনিত্য জীবন সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেন। তারপর সতী মৃত স্বামীর চতুর্দ্দিকে আর একবার প্রদক্ষিণ করে অবগাহনান্তর চিতায় ঝাঁপ দিতেন। কোন সতী সহসা মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পড়লে, তাঁকে বলপূর্বক চিতায় নিক্ষেপ করা হত।"

সিবাস্টিয়ান-মানরিক এক বিদেশী-ধর্মযাজক। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারার্থে তিনি-১৬১২খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। মানরিক প্রায় ১৩-বৎসর-কাল ভারতের নানা স্থানে অবস্থান করেন। মানরিকের বারানসী-ভ্রমণ লিপিতে উত্তর ভারতের সতীদাহপ্রথা সম্বন্ধে কতকগুলি বিবরণ পাওয়া যায়। তখন উত্তরপ্রদেশেও সতীদাহ-প্রথা অক্ষুণ্ণছিল। তবে সেখানকার প্রথামূলে কোনরূপ বীভৎস অনুষ্ঠানের-পরিচয় পাওয়া যায় না। সেদেশে স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীগণ অধিকাংশক্ষেত্রেই সহমরণে অভিগমন করতেন। কিন্তু সহমরণপ্রথায় কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছিলনা। যদি কোন স্ত্রীলোক সহমরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন, তখন তাঁর মস্তক মুণ্ডন করে তৎক্ষণাৎ পরিবার হতে বহিষ্কার করা হত। পরে তাঁর কোন সংবাদ রাখা হতনা।

বিদেশী পর্যাটক হিউয়েন-ভন-লিনস্টোনের তথ্য-সম্বলিত ভ্রমণবিবরণী ভারত সমাজ ইতিহাসের একটি অতি মূল্যবান দলীল। যাজক লিনস্টান ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতপরিভ্রমণে আসেন। ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যেই তিনি ভারত এবং পর্তুগীজ উপনিবেশে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। এই বিদেশী পর্যাটকের রোজনামচায় সতীদাহের কয়েকটি মর্ম্মান্তিক ঘটনাচিত্র স্থান পেয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর বিবরণে লিখেছেন,-"কোন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হলে তাঁকে মহা সমারোহে দাহ করা হত। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির-বিধবাপত্নী স্বজন-পরিবেষ্টিতা হয়ে উপস্থিত থাকতেন। নানা বাদ্যধ্বনিতে শ্মশানভূমি-মুখরিত হয়ে উঠত। সমবেত আত্মীয়-স্বজনেরা তখন মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে নানা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে বিধবাপত্নীকে স্বামীর সহমৃতা হবার জ উৎসাহিত করতেন। স্ত্রীলোকটি পরে নিজদেহ হ অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করে সেগুলি তাঁর বান্ধবী এ আত্মীয়দের মধ্যে বিতরণ করে অত্যন্ত প্রফুল্লচি অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিতেন। এইভাবে মৃত স্বামীর স তাঁকেও ভস্মীভূত করা হত। ক্ষেত্রবিশেষে কোন কে স্ত্রীলোক সহমরণে অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন। এক্ষ ক্ষেত্রে তাঁদের মস্তক মুণ্ডন করে পরিবার হতে বহিষ্ক করা হত। তৎকালীন সমাজ-নীতি অনুসারে ঐ রমণ তাঁর বৈধব্য জীবনে আর কোন দিন মূল্যবান বেশভূ এবং অলঙ্কারে নিজ দেহ সজ্জিত করতে পারতেন ন সমাজের চোখে তিনি তখন নিন্দনীয়া—লোক সমা অসতী-জ্ঞানে পরিত্যক্তা।"

মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারে ক্যাথলিক ধ যাজকেরা (জিসুইট) একসময় যথেষ্ট প্রতিপত্তি লা করেছিলেন। মনসিরাট এমনি একজন ক্যাথলিক ধ যাজক। মনসিরাটের লিখিত বিবরণী হতেও সতীদা কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ পাওয়া যায়। তদানীন্তন কা সমাজব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে মনসিরাট লিখেছে "ব্রাহ্মণেরা তখন সমাজের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলে ব্রাহ্মণ্যধর্মে একটি সংস্কার ছিল,-ধর্মার্থে মৃত স্বামীর স প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তার পত্নীকেও জীবিত অবস্থায় দ করা। ধর্মে এরূপ বীভৎস অনুষ্ঠান কতদূর মানব বিরোধী, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।" যাই হে ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকেরা প্রথমে হিন্দুধর্ম্মের এই অমানু প্রথাটি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না। এক প্রতিবেশী রা রাজা সতীদাহের একটি অনুষ্ঠানে তাঁদের নিম জানিয়েছিলেন। ঘটনাস্থলে যখন তাঁরা উপস্থিত হ বিষয়টি উপলব্ধি করলেন তখন তাঁদের বিষণ্ণ-হৃদয় উ পাপানুষ্ঠানের প্রতি বিদ্রোহ করে উঠেছিল। অ এমনি আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজা স্বয়ং ঐ আসুরি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সকলের প্রতি আনুকূল্য প্রদ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেন নি। রাজার এ কদর্য্য মনোভাব দেখে, রডেল ফো নামে এক

যথারীতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সতীদাহ প্রথার বিলোপসাধনের জন্যও তাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারকে সাহায্য করেছিলেন। গতানুগতিক চিন্তাধারা থেকে জাতিকে মুক্তকরার উদ্দেশ্যে অনেক বিদেশী সমাজসংস্কার সেদিন সমাজ সংস্কার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সংস্কার সাধনের কাজে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন না থাকিলে সেদিনের সেই সমাজ-বিপ্লব কি পরিণতি লাভ করত, বলা যায় না। জাতির জীবনে ধর্ম্ম ও সংস্কার-চেতনার যে শুভ উদ্যম সেদিন পরিলক্ষিত হয়েছিল, তার মূলে রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্ম সমাজের অবদান যেমন অনস্বীকার্য্য, তেমনি বিদেশী ধর্মযাজক ও পর্যটকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতাও অপরিসীম। নবজাগরণের ইতিহাসে দু'য়ের যুগ্ম অবদান চিরস্মরণীয়।

---

(1) Oxford History of India : By Smith.

(2) Folk ways : By William Graham Sumner.

(3) Modern Hinduism : By W.J. Wilkins.

(4) ভারতবর্ষের ইতিহাস : বিনয় ঘোষ।

(5) "Akbar, the Mogul emperer, forbade suttee about 1600. He acted from the Mohammedan stand point. His ordinance had no effect on the usage ....."

By William Graham Sumner.

অমৃতের আবির্ভাব

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

"তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন।
শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক।"

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ কঠোপনিষদ্, ১.২।২৩

"শাস্ত্রজ্ঞান পায় না তাঁহারে
যেথা বিদ্যা মানে সেথা হার।
তিনি যারে করেন বরণ
তারি কাছে প্রকাশ তাঁহার।"

"বেলা যে গেল"—সাধারণ একটি কথা। প্রতিদিন প্রত্যেকে শুনাছি, এই সাধারণ কথাটিই ভোগসুখলালিত রাজপুত্র লালাবাবুর অন্তরে আলোড়ন তুললো। তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন। বৃন্দাবনের পথের ভিক্ষুক হলেন মুর্শিদাবাদের এক রাজপুত্র।

দেশে বহু পণ্ডিত বহু শাস্ত্রী, বহু দিগ্বিজয়ী প্রতিভাকে ছেড়ে ঐ লালাবাবুকেই তিনি বরণ করলেন। লালাবাবুর কাছেই অমৃতের আবির্ভাব হলো! তখন সংসারের নাগপাশে আবদ্ধ লালাবাবুর—

"ছিন্ন হলো হৃদয়বন্ধন
ছিন্ন হলো সকল সংশয়,
মুক্তি দিল সকলকলুষ
মিলে গেল পরম আশ্রয়।"

(২)

এগারো বারো বছরের এক গ্রাম্য বালিকা। খায় একটু বেশী। ছেলে হ'লে সেটা দোষের হতো না। কিন্তু এ যে মেয়ে! মা'র বড় চিন্তা—শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মেয়ে কী করবে? এ যে বড়ই বদনামের ভাগী হবে! হলোও তাই শ্বশুরবাড়ী গিয়ে খাওয়ার খোঁটা শুনতে শুনতে মেয়েটি অস্থির হয়ে উঠলো! শাশুড়ীর বিদ্রুপবাণে মর্মে বিদ্ধ হতে হতে একদিন সে বলে ফেললো—

"এবার না খেয়েই থাকবো।"

শাশুড়ী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—"আকণ্ঠ না গিলে যে থাকতে পারে না, সে থাকবে না খেয়ে।"

বালিকা মনের খেদে বেরিয়ে পড়লো—গঙ্গার দিকে! বারো বছরের বালিকা পুরাণের বালক ধ্রুবের মত একমনে হরিকে ডাকতে লাগলো। মা গঙ্গার কোলে বসে বিপদতারণের শরণ নিলো। তার একমাত্র প্রার্থনা:

"দয়াময়! আমার ক্ষিদেতেষ্টা দূর করো।"

দয়াময়ের দয়া হলো!

অর্ধশতাব্দীর উপর অনাহারে আছেন এক নারী—এই আশ্চর্য সংবাদ দেশে বিদেশে প্রচারিত হলো। তীর্থস্থানের মত, সেই নারীর পদপ্রান্তে বহু বহুশ্রুত পণ্ডিত এবং যোগী, তপস্বীর আগমন হতে লাগলো। ১

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ-"

"তিনি যারে করেন বরণ-
তারি কাছে তাঁর আবির্ভাব।"

এই শাস্ত্র বাক্য সার্থক হলো।

(৩)

"জানি না কেমনে, কোনখানে
অমৃতের হয় আবির্ভাব।"

মেদিনীপুর জেলায় দর্শন সম্মেলনের সভাপতি হয়ে গেছেন আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী। সেখানে শুনলেন কোনো এক বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। সহৃদয় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁকে দেখতে গেলেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের মুখেই শুনেছি :

"বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আমি স্তম্ভিত হলাম। আমার শাস্ত্রজ্ঞানের গর্ব চূর্ণ হলো। আমার সান্ত্বনা-বাক্য শেষ হবার আগেই বৃদ্ধা বলে উঠলেন ;

"তুমি কী বলছ বাবা। আনন্দময়ীর রাজ্যে মৃত্যু কোথায় ?"

অপূর্ব আলোকে মুখ তাঁর উদ্ভাসিত। কাকে সান্ত্বনা দেবার এ ঔদ্ধত্য। এই নিরক্ষরা নারী যা পেয়েছেন, আমার সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান আমাকে কোনদিন তা দেবে কি ?"

শাস্ত্রজ্ঞান পায়না তাঁহারে
মেধা বিদ্যা যাবে সেথা হার।
তিনি যারে করেন বরণ
তারি কাছে প্রকাশ তাঁহার।

বেদজ্ঞানবিবর্জিতা এই নারীর নিকট এই বেদবাণী সার্থক হয়েছে ;

"আনন্দ হইতে জন্ম লভে প্রাণিগণ
আনন্দেই করে তারা জীবন ধারণ,
আনন্দে প্রবেশ করে, ছাড়ে যবে দেহ।
আনন্দেই আসা যাওয়া নাহিক সন্দেহ।"
"আনন্দময়ীর রাজ্যে মৃত্যু কোথায় ?"
"আকাশ ভরিয়া আছে আনন্দ নির্ঝর
সে আনন্দে অভিষিক্ত নিত্য চরাচর।
সে আনন্দ না থাকিলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
রুদ্ধ হোত' রুদ্ধ হোত প্রাণের প্রকাশ।"

সন্তানের শ্রাদ্ধবাসরে উচ্চারিত বেদমন্ত্র এই নারীর জীবনে সার্থক হয়েছে,

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ –
"আকাশ ভরিয়া মধু বাতাস বহিছে মধু
স্রোতস্বিনী বহে মধুধারা –
দিবস মাধুর্যে ভরা রজনী মধুক্ষরা
মধুময় চন্দ্র সূর্য তারা
মধুময় বনস্পতি ওষধি মধুর অতি
মধুময় এ বিশ্বনিচয়,
মধু অন্ন, মধু নীর, মধুর গাভীর ক্ষীর,
ধূলিকণা তাও মধুময়।"

---

১ মহীয়সী সাধিকা গিরিবালার জন্ম (১৮৬৭ ৬৮ সালে) বাঁকুড়া জেলার বিউর গ্রামে। নয় বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। শ্বশুরবাড়ী থাকাকালীন বারো বৎসর বয়সে তাঁর ঐ অলৌকিক শক্তিলাভ হয়। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে নিঃসন্তানা গিরিবালা তাঁর গ্রামেই ফিরে আসেন। শ্বশুরবাড়ী ছিল তাঁর উত্তরবঙ্গের (ইছাপুরের নিকট) নবাবগঞ্জে। সেখানে তিনি অল্পদিনই বাস করেছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর নিজ গ্রামেই বাস করেন। স্বামী যোগানন্দ তাঁর Auto biography of a yogi" গ্রন্থে (পৃ ২৯৯, ও পৃ৪৬০--৭১) গিরিবালার পবিত্র জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধিকার বয়স যখন ৬৮, তখন (১৯৩৬) স্বামী যোগানন্দ এক মার্কিন শিষ্যসহ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তখন পর্যন্ত, অর্থাৎ দীর্ঘ ৫৬ বৎসর গিরিবালা অন্নজল গ্রহণ করেন নি।

প্রতিধ্বনি

শ্রীশান্তা দেবী

আজকালকার মেয়েরা সই পাতানো কাকে বলে অনেকেই জানেন না। সই মানে সখী। সেকালে প্রায় সব মেয়েরই সই থাকত। 'সই' ছাড়া অন্যান্য নাম পাতানোরও চলন ছিল। ঠাকুরমা বোধ হয় সাগরসঙ্গম দেখতে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর একজন সখী ছিলেন "সাগরজল।" পরস্পরকে ওঁরা সাগর জল বলে ডাকতেন। ঠাকুরমার ছেলে মেয়েরা এঁকে 'সাগরজল মা' বলে ডাকতেন। সখীদের মধ্যে 'দেখন হাসি' 'ফুল' আবীর কত কি পাতানোর ঘটা ছিল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ভগিনী চারুশীলা ও তাঁর বৌদি পরস্পরকে 'আবীর' বলতেন।

আমরা যখন শিশু তখন ঠাকুরমা প্রয়াগে (এলাহাবাদে] 'কল্প বাস' করতে গিয়েছিলেন। মাঘের কনকনে শীতে গঙ্গাগর্ভে বালুর চরে অড়হর গাছের বেড়ার ঘরে পুণ্য প্রার্থিনীরা একমাস কল্পবাস করতেন। ঠাকুরমার মত আরও অনেক বর্ষিয়সী মহিলা সেখানে ছিলেন। এবং গঙ্গাগর্ভে বসেও সাংসারিক মান মর্য্যাদার বিচার করতেন। তাঁদের কার নাতনীর কটা নাম, কার বৌমা ইংরেজী ফার্ষ্ট বুক পড়ে ফেলেছেন সবই ঠাকুরমাকে শুনতে হত। আমার স্বল্পভাষিণী পিতামহী শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে বলতেন, আমার সোনার চাঁদ নাতি-নাতনীদের একটা করেই নাম আর আমার বৌমা বাংলা ইংরেজী, ফারসী সব পড়তে পারেন।" ঠাকুরমা নাতি-নাতনীদের কাশীশ্বরী, বিশেশ্বরী কেদারনাথ, এই সব নাম রেখেছিলেন; বিভাবতী, শোভাবতী ওসব তাঁর মাথায় আসত না। ঠাকুরমার রূপগুণ সবই গর্ব করবার মত ছিল, কৃতী পুত্রের মাতাও তিনি ছিলেন; কিন্তু তাঁর ব্যবহারে কোন জাঁক ছিল না।

পাঠকপাড়ার বাড়ীর থেকে লালবাজারে দাদা-মশায়ের বাড়ীতে আমরা গরুরগাড়ী চড়ে যেতাম। গাড়ীতে খড় ও সতরঞ্চি পেতে বসবার জায়গা করা থাকত; ওঠবার সময় গরু দুটোকে খুলে নিয়ে গাড়ীটাকে চাপু করে রাখত, আমরা আঁকড়ে পাঁকড়ে উঠে পড়বার পর গাড়ী আবার খাড়া হত। দাদামশায়ের বাড়ীতে দুটো উঠোন ছিল একটা ভিতর বাড়ীর আর একটা বাহির বাড়ীর। বাহির বাড়ীতে মস্ত বৈঠকখানা ঘর ছাড়া ঢেঁকিশাল ও গোয়াল ঘর। ভিতর বাড়ীতে একটা ভিত উঁচু বারান্দার কোলে দুটি শোবার ঘর অন্য ভিতে রান্নাঘর। দ্বিতীয় উঠোনের পর একটা দরজা দিয়ে খিড়কির পুকুরে যেতে হত, তাকে বলত গোড়ে। এইখানে বাসন মাজা হত।

দাদামশায়ের বাড়ীর গৃহিণী ছিলেন আমার বড় মাসীমা তিনি অল্প বয়সেই চারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধবা হন। তার উপর তাঁর কুলীনের বাড়ী বিবাহ হওয়ার জন্য দুটি সতীনও ছিলেন। মাসিমার কন্যারও সতীনের উপর বিবাহ হয়। কারণ তাঁরাও কুল মেনে চলতেন।

পাঠকপাড়ার বাড়ীটা ছিল পাকাবাড়ী। তখন তার দুতলায় একখান মাত্র ঘর। বাকি ঘর সব নীচে একতলায়। বাবার পৈতৃকবাড়ী জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে ঠাকুরমা বর্ষাকালে বড় কষ্ট পেতেন। তাই বাবা

সে বাড়ীটা ভেঙে সমস্ত একতলা নূতন করে করেছিলেন তাঁর নিজের উপার্জিত টাকা দিয়ে। আমরা বাবার তৈরী বাড়ীটাই দেখেছি। নীচের যে ঘরে ঠাকুরমা শুতেন সে ঘরে তাঁর মাথার কাছের জানালায় বোধ হয় শিক দেওয়া থাকত না, কারণ ঠাকুরমা খোলা আকাশের নীচে মাথা দিয়ে শুতে ভালবাসতেন, তাই তাঁর বিছানার মাথার দিকটা জানালা দিয়ে বার করা থাকত বোধ হয়। ঠাকুরমার ছেলেদের নাম ছিল রামশঙ্কর, রামেশ্বর, রামানন্দ আর বারাণসী। ঠাকুরমা ঠাকুর-দেবতার নাম অনুসারে নাতি নাতনীদের নাম রাখতেন, বোধ হয় নানা তীর্থ করেছিলেন। বড় ছেলের মেয়ে কাশীশ্বরী, মেজ ছেলের ছেলে বিশ্বেশ্বর আর সেজ ছেলের ছেলে আমার দাদা কেদারনাথ। দাদার রাগ হলে আমাকে বলতেন, "আমি যদি আগে না জন্মাতাম, তাহলে তোর নাম হত কেদারেশ্বরী।"

পটকপাড়ায় আমরা সকালে উঠে সর্ষের তেল মাখানো মুড়ি খেতাম ছোট্ট ছোট্ট পেঁয়াজের সঙ্গে। কখন কখন জলখাবারের সঙ্গে ফুলুরিও খেতে পেতাম। বাড়ীর কাছে বড় পুকুরের ধারে গোপালের বেড় বলে একটি মন্দির ও বাইরের দিকে একটা মস্ত অশ্বত্থ গাছ ছিল। তাতে কয়েকটা হনুমান বসে থাকত। আমি ফুলুরির বাটিটা নিয়ে হনুমান দেখবার জন্যে ছাদে চলে যেতাম। একটা হনুমান টের পেয়ে ছাদে এসে হাজির। আমার ফুলুরি খাওয়া যা হত তা আর বলে কাজ নেই। আমি একটা ফুলুরি মুখে দিতে না দিতেই হনুমানটা হাত পাতত। আমি ভাল মানুষের মত তাকে ফুলুরি তুলে দিতাম। সে আমার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়িই খেত। সুতরাং বাটিটা যখন শেষ হত তখন দেখা যেত আমার পেটে যে ক'টা গিয়েছে তার তিনগুণ খেয়েছে হনুমানটা।

আমার বড় জ্যাঠামশায়ের পুত্রবধূ কুহুকে স্নানের সময় তেল মাখিয়ে দেবার জন্য ডাকতেন। কুহু রেগে একদিন মাকে বলল, "মা, আমি কিন্তু বউদিকে মারব, ও আমার কি একটা 'বিচ্ছি'রি নাম বের করেছে।" মা বল'লেন, "কি নাম?" বউদি বললেন, "ঠাকুরণ বলে ডেকেছিলাম।" ঠাকুরমার উঠোনে বাগ্দী ঝিয়ে রাশীকৃত কাঁসার বাসন ঝক্‌ঝকে করে মেজে উপুড় ক রেখে দিয়ে যেত। পিসিমা আর জ্যাঠাইমা বাস গুলির উপর আবার একবার জল ঢেলে ধুয়ে সেগু রান্নাঘরে তুলতেন। কারণ ঐ ঝিদের জল আচর নয়। ঢেঁকিশালে একটা ঢেঁকি ছিল, তাতে ধ ভাটা হত। একজন মেয়ে ঢেঁকিতে পাড় দিত, অ অন্য এক জন গর্ত্তে হাত দিয়ে ধানগুলো নেড়ে দিত তাদের কখনও তালে ভুল হত না। যদি গর্ত্তে হ থাকতেই ঢেঁকি তার উপরে পড়ে তাহলে যে হাত তার হাতটা যায় ছেঁচে। ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া সি—স খেলার মত, একবার উঁচু একবার নীচু হ মনে হয় মেয়েটি একটানা লাফিয়ে চলেছে।

আমাদের যে বৌদির কথা একটু আগে বলল ছেলেবেলায় তাঁর আচরণ আমার কাছে অদ্ভুত লাগ দিনের বেলা তাঁর স্বামী যদি তাঁর সামনে দি হাঁটতেন, তাহলেই বউদি একগলা ঘোমটা টানতে কিন্তু রাত্রে তাঁদের ঘরে গিয়ে দেখতাম বউদি স্বা সঙ্গে দিব্যি মাথা খুলে গল্প করছেন। আমি অ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। সামাজিক নিয়ম ক বুঝতে পারতাম না।

শৈশবে যখন এলাহাবাদ থেকে বাঁকুড়া যা আসা করতাম, তখন বাঁকুড়া পর্যন্ত রেললাইন না। আমরা এলাহাবাদ থেকে ট্রেনে চড়ে রাণী এসে নামতাম। সেখানে যাত্রীদের অপেক্ষা কর একটা বিচ্ছিরি আস্তানা ছিল। যেমন ময়লা তে ধুলো। তারপর বাঁকুড়া পর্যন্ত যাবার দুটি উ মনে পড়ে। এক হল সারারাত ধরে উটের চড়ে, আর এক হল শ্যা কোম্পানীর ঘোড়ার চড়ে। এই পথটা যে কি সুন্দর ছিল, তা এ মনে আছে। দুধারে শালবন, মাঝখান দিয়ে কাঁকুরে রাস্তা। লম্বা ঋজু শালগাছগুলি ডাল

বেশী ছড়ায় না। আম, কাঁঠাল, জাম গাছের মত তারা মোটা ভারিক্কী দেখতে নয়; সাঁওতাল মেয়ের মতই যেন আঁট করে কাপড় পরে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে গাছের তলায় ধুলা জঞ্জাল নেই, কে যেন ঝাঁট দিয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে পলাশ গাছ, ফুলের সময় লালে লাল হয়ে থাকত, যেন বনে আগুন লেগেছে। খানিকটা করে শালবন যেতে না যেতেই মাঝে মাঝে বিরাট দৈত্যের মত কালো কালো পাথর অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে; কখনও বা একটা জগদ্দল পাথর যেন একটা মাত্র বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; তার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে না। এইসব পথের কিছু কিছু দূরে নদী বয়ে যায়। কোনো নদী শুধুই বালি, দেখে মনে হয় অন্তঃসলিলা, কোনোটাতে বা একটু ঝির ঝির করে জল চলেছে। উটের গাড়ী দোতলা এবং মস্ত ভারী। একপাল যাত্রী নিয়ে ঐ নদীতে নেমে পড়া গাড়ীর পক্ষে খুব নিরাপদ নয়। গভীর রাত্রে, মনে আছে, একবার গাড়ী দাঁড় করিয়ে বয়স্ক যাত্রীদের সব নামিয়ে দেওয়া হল। অশোক বলতেন যে উট-গাড়ীর সামনে একজন ঘোড়সওয়ার বিউগল বাজাতে বাজাতে যেত, বোধহয় বাঘ তাড়াবার জন্য। আমার ভাল মনে পড়ে না। যাই হোক, বয়স্ক যাত্রীরা নেমে পড়বার পর আমরা কুচোকাচারা গাড়ীতেই রইলাম। গাড়ী হুড়াম করে নদীগর্ভে নেমে পড়ল। যাত্রীদের হাঁড়ি-কুড়ি বালতি উলটে পালটে একাকার হয়ে গেল। যখন তারা আবার গাড়ীতে উঠল, তখন দুপক্ষে খুব বকাবকি শুরু হয়ে গেল।

'শা কোম্পানী'র গাড়ী কিছুদূর অন্তর ঘোড়া বদল করত; গাড়ী ছোট বলে বেশী যাত্রীও নিত না। আমরা ভাই-বোন ও মা বাবা ছাড়া আর কেউ গাড়ীতে থাকত মনে পড়ছে না। এই কোম্পানীর ঘোড়াগুলো ছিল ভারী জেদী। যখন নড়বে না ত হাজার পিটলেও নড়বে না। বাঁকুড়ার লোকে তাই জেদী লোককে বলত, 'শা কোম্পানীর ঘোড়া।' ভোরবেলা সূর্য ওঠবার সময় স্কুল গাড়ীর ভিতর বালতিতে দাঁড়িয়েই নৃত্য শুরু করে দিতেন। আমরা বাঁকুড়া থেকে এই সব গাড়ীতে ফেরবার সময় মস্ত একটা হাঁড়ি ভর্তি করে জিলিপি নিয়ে ফিরতাম, তাকে বলে 'ঝিলপি।' খেতে অমৃতের চেয়ে সুস্বাদু, রসে টুপটুপে।

এলাহাবাদ ষ্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়ী করে বাসার দিকে যেই যাত্রা শুরু করতাম, অমনি একটা জায়গায় একদল লোক 'চুঙ্গি' মাশুল নেবার জন্য মহা কলরব সুরু করত। এটা ছিল একটা মস্ত উৎপাত।

বাঁকুড়ায় যখন রেল লাইন হল তখন বাঁকুড়া ষ্টেশনে নেমেই দূরে আমাদের মামাবাড়ী দেখতে পেতাম, অনেক বড় বড় মাঠের ওপারে। আজকাল আর সে সব মাঠ নেই, বাড়ীতে বাড়ীতে শহর হয়ে গিয়েছে। খড়পাতা গোরুর গাড়ীর বদলে লোকে এখন সাইকল রিকশ চড়ে। একটা জিনিষ দেখে ভারী অবাক লাগত তখন। ষ্টেশনে যারা গাড়ী থেকে মাল নামাত, তারা এলাহাবাদের মত পুরুষ মানুষ নয়; খাটো লাল পাড় শাড়ী আঁট করে পরা সাঁওতাল মেয়ে। তাদের বলত কামিন। আমরা অবাক হয়ে দেখতাম। কলকাতাতেও ষ্টেশনে পুরুষমানুষ কুলি। তখন পর্যন্ত দার্জিলিঙের মহিলা কুলিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়নি। পরে তাদের মাথায় ফিতে দিয়ে পাঁচমনী মাল পিঠে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে দেখে সত্যিই হাঁ করেছিলাম।

আমার ঠাকুরমা মারা যাবার পর ছুটিতে আর আমরা পাঠকপাড়ায় গিয়ে বাস করিনি। বাবা ইস্কুল-ডাঙ্গায় বড়ী ভাড়া করতেন, আমরা সেই ভাড়া বাড়ীতে উঠতাম। ইস্কুল-ডাঙ্গা পাঠক পাড়ার চেয়ে অনেক খোলামেলা। এলাহাবাদ থেকে আমাদের ঝি রাঁধুনীরা সঙ্গে আসত। রাঁধুনী মহারাজের এক-জোড়া ভাল জুতা ছিল। সারাদিন রান্নাঘরের পবিত্রতা রক্ষা করতে গিয়ে তার জুতা পরা হত না। তাই রাত্রে কাজকর্ম সেরে সে জুতাজোড়া পরে বেড়াত।

ঝিটি ছিল আমার মত। আমার ছোটো ভাইকে অর্থাৎ মুলুকে কোলে করে রাখত আর অবসর সময়ে আমাকে এঁচোড়ে পাকাবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হয়ে নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলত। সে রকম গল্প আমি এত বয়সেও আর কখনও শুনিনি। তার নাম ছিল বুধিয়া। তাই শুনে আমার সেজ মাসিমা তাঁর এক মেয়ের নাম রাখেন বুধিয়া। ইন্দুল-ডাঙ্গারই একটা বাড়ীতে মুলু জল খেতে গিয়ে কাঁসার গেলাস শুদ্ধ পড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে দু টুকরো করে ফেলেছিল। বোধহয় ঠোঁট সেলাই করবার জন্য সিভিল সার্জেনকে ডেকে আনতে হল।

বাঁকুড়ায় আমার মাসতুতো আর জাড়তুতো বোনেদের কাছে সেকালের মেয়েদের ব্রত করা দেখতাম। তারা উঠোনের মেঝেতে ছোট্ট পুকুর কেটে পুণ্যি পুকুরের ব্রত করত—

"পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে গো দুপুরবেলা।"

ইত্যাদি বলে। কেউ বা 'হরির চরণে'র ব্রত করে ছড়া কাটত—

হরির চরণ হরির পা,
হরি বলেন ওগো মা,
আজ কেন আমার ঠাণ্ডা পা
কোন্ সতী পূজেছে পা?
সে সতী পুণ্যবতী
সাত ভায়ের বোন সাবিত্রী সতী…

কিন্তু এইসব বোনেদের সঙ্গে আমরা ঠিক মন খুলে মিশতে পারতাম না। কোথায় যেন একটা বাধা লাগত। হয়ত আমরা বিদেশ থেকে খোট্টা হয়ে গিয়েছিলাম। প্রাচীনপন্থী বাঙালী মেয়েরা আমাদের নিজের করে নিতে পারত না। আমাদের বন্ধু ছিলেন আমাদের ছোট মাসি। ছোট মাসি বয়সে আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়, কিন্তু চৌদ্দ বছরেও তাঁর বিয়ে হয়ে যায়নি বলে বেশ ছেলেমানুষ ছিলেন। বিয়ের পরেও ইন্দুলডাঙ্গায় আমাদের বাড়ীতে আসতেন। দেখতে ছিলেন অবিকল আমার মায়ের ছবির মত; লোকে দুই বোনকে ভুল করত। ছোট মাসির ধরণ ধারণ ছিল খুব সহজ ও সরল। মেছুনীরা ছোট মাসিকে মা মনে করে মাছের দাম চাইত, আর ছোট মাসি হেসে লুটোপুটি খেয়ে যেতেন।

সেকালে ব্রাহ্মণের মেয়েদের অনেকেরই সতীন থাকতেন। আমার দুই পিসিমারই সতীন ছিলেন। বড় পিসিমা ছিলেন নিঃসন্তান; তাই তিনি প্রায় বাপের বাড়ীতেই থাকতেন। ছোট পিসিমাও অধিকাংশ সময় বাপের বাড়ীতেই কাটাতেন। তাঁর দুই ছেলেই বোধহয় তাঁদের মামার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করেছিলেন। সন্তানহীনা বড় পিসিমা আমার বাবার পৈতার সময় বাবাকে ভিক্ষা দিয়ে তাঁর ভিক্ষা-মা হয়েছিলেন। তাঁর মাতৃ-হৃদয় সন্তানের জন্য ক্ষুধিত ছিল। তাঁর অন্য দুই ভাইয়ের মাতৃহীন শিশুদের তিনিই মায়ের আদর দিয়ে পালন করেছিলেন। পিসিমার নিঃসন্তান জীবনের বেদনা আমার বাবা বুঝতেন। যখন পিসিমার মৃত্যু হয়, তখন আমার বাবা পুত্রের মত চুল দাড়ি কামিয়ে তাঁর শ্রাদ্ধ করেছিলেন।

ইন্দুলডাঙ্গাতেই পরে আমাদের একটা নিজস্ব বাড়ী কেনা হয়। বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের পাশে এই বাড়ীটি কেদারনাথ কুলভি ও হেমাঙ্গিনী কুলভির করা। মা-বাবা তাঁদের কাছ থেকেই বাড়ীটি কিনেছিলেন। নিজস্ব বাড়ীটায় আমরা বেশীদিন থাকিনি। বাবা কলকাতায় বরাবরের জন্য চলে আসার পরে বাঁকুড়া যাওয়া কমে গিয়েছিল। তবু যতদিন গিয়েছি বেশীরভাগ প্রতিবেশী ছিলেন মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও তাঁর দিদি। মহেশবাবুর ভাগিনেয় নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, অমলকুমার সিদ্ধান্ত আর বিমলকুমার সিদ্ধান্তও তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। মহেশবাবুর লাইব্রেরী ছিল মস্ত। ছুটির সময় গেলে সীতার কাজ ছিল সেই লাইব্রেরী ঘেঁটে-ঘেঁটে ইংরেজী নভেল বার করা। সীতার গল্প পড়ার বাতিক ছিল

খুব ছোট বয়স থেকেই। কুচুর পরে আমাদের আর একটি ছোট ভাই হয়, সে বছর দুই আড়াই মাত্র বেঁচেছিল। তাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত, "সীতু কি করছে?" সে বলত, "ছিপ্‌পু দপ্‌প দিলছে।" তখন সীতার বয়স মাত্র সাত। মহেশবাবুর লাইব্রেরী আক্রমণ করার সময় সীতার বছর এগার বয়স।

বাঁকুড়াতে সেকালে কলের জল ছিল না। লোকে পুকুরের কেহ বা কুয়ার জলেই সাধারণ কাজ করত। কিন্তু খাবার জল আনত গন্ধেশ্বরী (গোঁদাই) নদী থেকে। গন্ধেশ্বরী নদীতে জল দেখা যেত না, শুধুই বালি। লোকে বালিতে গর্ত খুঁড়ে খানিকটা জল ফেলে দিয়ে পরে পিতলের ঘড়ার মুখে কাপড় দিয়ে ছেঁকে সেই জল বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খেত। জল আনার কাজ ছিল মেয়েদেরই। বিকেল বেলা মেয়েরা সব দল করে 'জলকে যাবি চল" বলে বেরোত। আমাদের ইস্কুল ডাঙ্গার বাড়ীতে ভাল কুয়া ছিল, তবুও আমরা গন্ধেশ্বরী থেকেই জল আনাতাম। আমাদের একজন আত্মীয়া জল এনে দিতেন। ওখানে অত পর্দা ছিল না। আমাদের কুয়াতে কপি কল ছিল। তাই দিয়ে জল তুলে বাবা আর আমাদের জাড়তুতো ভাই বিশন-দাদা কুয়াতলাতেই স্নান করতেন। বালতিশুদ্ধ জল বাবা অনায়াসে মাথায় ঢেলে দিতেন। এই বাড়ীটায় আমরা স্বদেশীর সময় কিছুদিন ছিলাম। তখন বিশন-দাদারা স্বদেশী কাপড় ঘাড়ে করে কলকাতার ছেলেদের মত ফিরি করতেন।

বাঁকুড়ায় দেখতাম ছোট মেয়েরা চুলের গুছি চুল দিয়ে বোনা দড়ি, ফিতে কাঁটা ফুল নিয়ে একবাড়ী থেকে আর এক বাড়ীতে চুল বাঁধাতে যেত। ছোট ছোট মেয়েদের মাথায় মস্ত মস্ত খোঁপা। রিবন বাঁধার ফ্যাশন তখনও ওখানে ঢোকেনি। খোট্টা দেশে থাকার দরুণ ও ফ্যাশানটা আমাদেরও শেখা হয়নি। আমার দশ-এগার বছর বয়সে কলকাতা থেকে মায়ের এক ব্রাহ্ম বন্ধু আমাকে হলদে সিল্কের রিবন এনে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল মিস্ দেব। তারপর আর রিবন কিনে ছিলাম কিনা সন্দেহ। কারণ বাবা ছিলেন স্বদেশী' ও-সব বিলাতী জিনিষ স্পর্শ করতে আমরা বিশেষ সুযোগ পেতাম না।

বাঁকুড়ায় আমাদের বড় মাসিমাও আমাদের সঙ্গে বেশ গল্প করতেন, যদিও তিনি ছিলেন মার দিদি। তাঁর কাছে শুনেছিলাম আমাদের দিদিমাও ছিলেন বীরাঙ্গনা। একবার রাত্রে দাদামশায় বাড়ী ছিলেন না। লাল-বাজারের বাড়ী মাটির। চোরেরা সিঁদ কেটে ঘরে ঢোকবার চেষ্টায় ছিল। দিদিমা একটা দা হাতে সিঁদের কাছে বসে সজোরে বলতে লাগলেন, । "এই দা নিয়ে বসলাম, যে মাথাগলাবে তার মাথাটা এক কোপে কেটে ফেলব।" মাথা হারাবার ভয়ে চোরেরা আর মাথা গলাল না। আমরা মামার বাড়ী গেলে মাসিমার কাছে ছাতু (mushroom) আর গুগলির তরকারি খেতে চাইতাম। দাদা মশায় শুনলে চটে যেতেন। কিন্তু মাসিমা লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের জন্য করে দিতেন। অন্যান্য আত্মীয়দের কাছে আমরা উপহার বিশেষ পেতাম না, কিন্তু মাসিমা আমাদের পুরী থেকে কেন্দুরে বাটি এনে দিয়েছিলেন দুই বোনকেই। দাদামশায় অবশ্য মাঝে মাঝে শাড়ী দিতেন। আমরা রঙীন শাড়ী পেলে কুচু মহা কান্না জুড়ে দিত। সে সাদা ধুতি কিছুতেই নেবে না। তার জন্য নীলাম্বরী শাড়ী কিনে আনা হত। দাদামশায় বলতেন "বলরাম"।"

বড় মাসিমার শ্বশুরবাড়ী ছিল আমরাল বলে একটা গ্রামে। সেখানের অনেক বিখ্যাত রসুইয়ে বামুন কলকাতায় কাজ করতে আসত। তারা দেশে গিয়ে কলকাতার মেয়েরা কি রকম "ঘাংরার উপর শাড়ী বেজিয়ে পরে" ইত্যাদি নানা গল্প করত। মাসিমার কাছে আমরা সেসব শুনতাম।

গরমে বাঁকুড়ায় দুইতিন মাস কাটিয়ে প্রতিবছরই আমাদের এলাহাবাদে ফিরতে হত। আমাদের ইস্কুল ডাঙার বাড়ী থেকে শুশুনিয়ার পাহাড় দেখা যেত, যেন

একটি বিরাট হাতী হাঁটু গেড়ে বসে আছে স্থির হয়ে। অনেক দিন পর্য্যন্ত তার কথা মনে পড়ত। স্নান করতে গিয়ে মনে আসত বাঁকুড়ায় বড় পুকুরের ঘাটে মেয়েরা কেমন তেল হলুদের বাটি নিয়ে স্নান করতে যেত, তাদের সাবান মাখার বালাই ছিল না। পুকুরে কাপড় কাচতে গিয়ে শাড়ীগুলো বেলুনের মত ফুলে ফুলে উঠত। ছোট মেয়েরা শাড়ী পড়ত না, ফ্রকেরও চলন ছিল না। তারা ছোট ছোট গামছার মত কাপড় কোমরে জড়িয়ে বেড়াত; তাকে বলত ট্যানা। একে লুঙ্গি বললেও চলে।

বাবা এলাহাবাদে যাবার অনেক আগে থেকেই ওখানে ব্রাহ্মসমাজ ছিল। বাবা গিয়ে সেটিকে আবার নুতন করে জাগিয়ে তোলেন। এই জন্যই ইন্দুভূষণ রায়কে বাঁকিপুর থেকে এলাহাবাদ আনা হয়েছিল। রবিবারে উপাসনা তিনিই বেশীরভাগ করতেন। নগেন্দ্রনাথ সোম বলে একজন ভদ্রলোককেও উপাসনা করতে দেখেছি মনে হচ্ছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের কাজেই আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। আমরা প্রতি রবিবারে ঘোড়ার গাড়ী চড়ে ব্রহ্মমন্দিরে যেতাম। মা প্রায়ই গানের ভার নিতেন। সমাজে "তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি," এবং "বল দাও, মোরে বল দাও" প্রভৃতি তাঁর প্রিয় গান ছিল। ইন্দুভূষণ অন্যগান ছাড়া স্বরচিত "ভিখারি ডাকে দ্বারে হে তুন দয়ার ঠাকুর" ইত্যাদি গেয়ে মানুষের মন ভিজিয়ে দিতেন। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনকে গানের সঙ্গে সঙ্গে দুলতে দেখতাম।

এলাহাবাদে আমাদের বাড়ীতে বাবা পারিবারিক উপাসনা করতেন। মা গান করতেন, কখন কখন বাবাও তাঁর সঙ্গে গান করতেন। বাবা যে গান করতে পারতেন পরে তা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। বাবার একটা প্রিয় গান ছিল:—

"আমায় অনেক দিয়েছ নাথ,
আমার বাসনা তবু পুরিল না
দীনদশা ঘুচিল না
অশ্রুবারি মুছিল না···"

উপাসনার পর যখন আমরা বারান্দায় পিঁড়ি পেতে, দুধ দিয়ে তৈরী সুজির হালুয়া খেতে বসতাম তখন আমাদের মহারাজের ছোট্ট মেয়ে রজওয়ান্তিয়াও একটি বাটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে বসে যেত। তখন ওখানে গরুর দুধ টাকায় ষোল সের করে! নির্বিচারে খরচ করতে কোনো বাধা ছিল না। কড়ায় করে এক কড়া দুধ জ্বাল দেবার পর ক্ষুদ্র কড়াটা চেপে ধরত, "আমি সব দুধটা খাব।" তারপর তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পরিবেশনের ভার দেওয়া হোত। সে হাতায় করে প্রত্যেককে দুধ তুলে তুলে দিয়ে বাকিটা নিজের জন্য রাখত। তার অন্নপ্রাশনের সময় সে একবাটি পায়েসের সমস্তটা খেয়ে নিয়েছিল। বাবা আমাদের ছেলেবেলার এইসব অনেক গল্প বারবার বলতেন। তাঁর মনটা অত্যন্ত স্নেহকোমল ছিল যদিও ছেলেমেয়েদের আদর করা তাঁর আসত না। তিনি মিষ্টি করে ডেকে বা আমাদের বাল্যকালের গল্প বলে তাঁর স্নেহটা অন্যভাবে বুঝিয়ে দিতেন। আমাদের সঙ্গে বাবার খেলাকরা কখনও মনে পড়ে না। তবে আমরা মাঝে মাঝে বাবাকে দিয়ে মেঝেতে ময়না পাখি আঁকিয়ে নিতাম মনে আছে। তাছাড়া সীতা, বাবা কলেজ যাবার আগে খেতে বসলে, তাঁর গলা জড়িয়ে পিঠে ঝুলে থাকত। বাবা তাকে 'ছোটু" বলতেন। খাওয়া হয়ে গেলে মাকে বলতেন, "ছোটুকে নামিয়ে নাও।" সীতা বাবার টুপিটা পরে বলত, "আমি প্রিন্সিপাল সাহেব হয়েছি।

এলাহাবাদে সন্দেশ রসগোল্লার বালাই ছিল না; কিন্তু বড় বড় পেয়ারা আর বড় বড় আম খেয়ে শেষ করা যেত না; আর ছিল হালুয়া দিয়ে থালাভরা লুচি। পেয়ারার হয় জলের দর, নয়ত বিনা পয়সাতেই জুটে যেত যদি বাড়ীতে বাগান থাকত। পাকা আমের সময় ঘন দুধে আমের রস দিয়ে তাতে হাত রুটি ছিঁড়ে মেখে খেতে

ছিল ভারী মজা। আর সৌখীন ছেলেভুলোনো খাবার লজেন্স ছিল না, ছিল গোলাপী রেউড়ি। বাংলাদেশের তিলকুটের মত। ছ'সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত আমি চকোলেট কখনও খাইনি। একবার এক সাহেবের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম বাবা মার সঙ্গে। মেম-সাহেব আদর করে চকোলেট খেতে দিলেন। এমন তেতো লাগল যে গলা দিয়ে গলেই না। অথচ ভদ্রতা জ্ঞানও ছিল তাঁদের সামনে ফেলে দিতে প রলাম না।

রাত্রে রান্নাঘরের সামনে কি ভিতরে—যে বাড়ীতে যেমন খাবার জায়গা—আমরা সারি দিয়ে বেতাম। সব চেয়ে বড় পিঁড়িটার নাম ছিল "আরামী"। যে সেটা সবার আগে দখল করতে পারত সে বলত "আরামী দখল!" গরম গরম রুটি সেঁকা হলে পাতে পড়ত সঙ্গে সঙ্গে, লুচি হলেও তাই। সব তৈরী করে এনে বেড়ে দেবার নিয়ম ছিল না। অনেক সময় বাড়ীতে অন্য অনেকেও থাকতেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গে খেতেন। যখন নেপালবাবু, গিরীশবাবুরা ছিলেন তখন তাঁরা পাল্লা দিয়ে রুটি খেতেন, কেউ আঠারোটা কেউ কুড়িটা। দুই একজন বালকও চেষ্টা করত তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। এই রুটি বাজারে কেনা আটার নয়। বাড়ীতে যাঁতা বসানো থাকত। গম-পিসুনী মেয়ে "পিসনেহর" এসে যাঁতার দুই দিকে পা ছড়িয়ে বসে আটা ভেঙে দিয়ে যেত। তারা অনেক সময় ছোট যাঁতায় করে আস্ত ডাল ভেঙে দিয়ে যেত। সরষের তেলও ছিল খুব সস্তা। বেরি বেরি নামক বিভীষিকার নাম তখন কেউ জানত না। মা একটা বড় মাটির হাঁড়িতে এক হাঁড়ি তেল নিয়ে তার মধ্যে আস্তে আস্তে কাঁচা আমের কসি বের করে নিয়ে, আমের ভিতরে মশলা পুরে আমগুলিকে তেলে ডুবিয়ে রাখতেন আচার করবার জন্য। বড় বড় আস্ত করলাও ভিতরে মশলা ভরে আস্তই ভাজা হত, তার নাম কঁলৌঞ্জী। আমি ভোজনে দড় মোটেই ছিলাম না, এমনকি অনেক সময় খেতেই ভুলে যেতাম। তবু এ খাবারগুলি মনে আছে। বাড়ীতে বোধহয় শিশুদের শীতকালে তেল মাখানো হোত। একদিন এইরকম কোনো কারণে একটা বাটি করে মা তেল রেখেছিলেন। খানিক পরে দেখেন কুহু আসছেন, তাঁর মাথার থেকে পা পর্যন্ত তেল চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। মা বললেন, "একি রে?" কুহু বললে, "ওনি সে তেল লাগায় দিয়া রে!" বাটিটা সে মাথায় উপুড় করে ঢেলে দিয়েছিল।

সাউথ রোডের বাড়ীতে রৌসনলালদের একজন দরোয়ান ছিল, সে খুব তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ত গানের মত সুর করে—

"রামচন্দ্র কৃপাল ভগবন্ত সুন্দরম্
ইতিবশেষ তুলসীদাস মুনি মনোরঞ্জনম্।"

এই শ্লোকটি আমরাও আওড়াতাম, হয়ত কিছু ভুল শিখেছি, ঠিক বলতে পারি না।

তাছাড়া মাথায় ছোট পাগড়ী বেঁধে সারেঙ্গী বাজিয়ে গান করতে আসত কোন কোন ভিক্ষাজীবি। তাদের গানের একটু টুকরো এখনও মনে পড়ে। আমরাও গাইতাম—

"কব্ তু ছোড়া গোকুল নগরী
কব তু ছোড়া কাশী—
ঝাড়খণ্ডমে অঃ বিরাজে।
বৃন্দাবনকে বাসী
ঠাকুর ভলা বিরাজো হো।"

আমাদের পাশের বাড়ীতে বাগানে তেজবাহাদুরদের বেগুন ক্ষেত ছিল। কুহু একদিন সেখান থেকে গোটা দুই বেগুন তুলে এনেছিল। মা বললেন, "ছিঃ পরের বেগুন তুলে আনে না ভালো লোক।" "তুলে আনলে কি হয়?" কুহু জিজ্ঞাসা করল। মা বললেন, "তুলে আনলে চুরি করা হয়।"

দিন কয়েক পরে বাবার এক বন্ধু বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কুহু বললে "বাবা নেই।" ভদ্রলোক যখন চলে যাচ্ছেন তখন কুহু মহা উৎসাহে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "আরে ভাগায় দিয়া রে, ভাগায় দিয়া।" মা বললেন, "ও রকম কেন বলছ? উনি ভালো লোক।" কুহু বলল 'উনি বেগুন চুরি করেন না?"

এলাহাবাদে থাকতে মায়ের দৌলতে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে আমাদের খুব পরিচয় ছিল, কারণ মা মধুর কণ্ঠে "কালমৃগয়ার" গান ও ব্রহ্মসঙ্গীত প্রায়ই গাইতেন। আমরাও তাই একটু একটু গাইতে শিখেছিলাম কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ওখানে একদিন মাত্র দেখেছিলাম—আমাদের সাউথ রোডের বাড়ীতে। তিনি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, আর আমাদের পাচক মহারাজ তাঁদের নিজের খাটিয়া পেতে বসতে দিয়েছিল। তার পর বাবাকে সে এসে খবর দিল, দুজন আমীর আদমী এসেছেন। তাঁর কতকটা পাশা পোষাকে এসেছিলেন, ভয় ছিল বাবা হয়ত চিনতে পারবেন না। তাই বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "চিনতে পারছেন ত এই পোষাকে?" তখন আমার বয়স খুব কম, ছয় সম্ভবত হবে। —"আমীর আদমী"দের দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।—

ছেলে বেলায় শিলাবৃষ্টির সময় ছোটাছুটি করে শিল কুড়োতে সব শিশুরাই ভালবাসে, আমরাও ভালবাসতাম। আমরা যখন সাউথ রোডে খুব ছোট ছোট তখন একদিন, ১৯০০সালে ভীষণ শিলাবৃষ্টি হোল। আমাদের বাড়ীর ব'রান্দা ছিল উঠান থেকে হাত দুই উঁচুতে। দেখতে দেখতে শিলা জমেজমে উঠানটা বারান্দার সমান উঁচু হয়ে গেল, যেন কেউ শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছে। খোলার চাল অসংখ্য ফাটল, গরু বাছুরও মরল ঢের। কিন্তু আমরা সেসব বোঝবার মত বড় ছিলাম না। শিলায় বাঁধানো উঠান দেখে আমাদের মহা আনন্দ। জীবনে অমন শিলাবৃষ্টি আর কখন দেখিনি।

সেকালে এলাহাবাদে মোটরকার ছিলনা। কাজেই ট্যাক্সি যে ছিল না তা বলাই বাহুল্য। লোকে ঘোড়ার গাড়ী এবং এক্কা গাড়ী ব্যবহার করত। আমরা প্রথম বোধ হয় যোগীন চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শরৎ চৌধুরীর মোটরগাড়ী দেখেছিলাম। স্কুলের মেয়েদের একরকম 'বয়েল গাড়ী" (গোরুর গাড়ী) চড়ে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখতাম। বেশীর ভাগ লোক এক্কাই ব্যবহার করত। মেয়েরা এক্কায় ঘেরাটোপের মধ্যে বসত, পুরুষরা খোলা এক্কায় পা ঝুলিয়ে বসত। বাবা এক্কা চড়েন এটা তাঁর কলেজের ছেলেরা পছন্দ করত না, কিন্তু বাবা মাঝে মাঝে এক্কাতেও চড়তেন। তাতে অন্য কলেজের ছেলেরা কায়স্থ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সর্ব্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠতাকে ছোট করবার জন্য বলত, "তোদের প্রিন্সিপ্যাল এক্কা চড়েন।" বাবা কলেজে ঘোড়ায়-টানা পাল্কী গাড়ীতে যেতেন, হেঁটেও মাঝে মাঝে যেতেন সাউথ রোডের বাড়ী থেকে। অন্যান্য কলেজের প্রিন্সি-প্যালরা ছিলেন ইংরেজ, কাজেই তাঁদের কায়দা-কানুন আলাদা ছিল। বাবাই প্রথম স্বদেশী প্রিন্সিপ্যাল।

আমাদের শৈশবের অনেক কথা বাবার জীবনীতে লিখেছি। এখানে তার কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি হয়ে গেছে।

দাদাকে অ্যাংলোবেঙ্গলী স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হলেও আমাদের তিনজনকে স্কুলে দেওয়া হয়নি। একবার কথা হয়েছিল কনভেণ্টে আমাদের দুইবোনকে দেওয়া হবে। কিন্তু সেকালে কনভেণ্টে ভর্ত্তি হলে একটা ইংরেজী নাম রাখতে হত এবং অন্যান্য আরও কিছু কিছু নিয়ম ছিল যা বাবার মেনে নিতে সম্মানে বাধত। অগত্যা আমরা বাড়ীতেই শেষ পর্য্যন্ত পড়াশুনা চালিয়ে-ছিলাম এলাহাবাদ-বাসের ঐ কয়টা বৎসর। সুকবি ও সুগায়ক ইন্দুভূষণ রায় হলেন আমাদের মাষ্টার। তাঁকে আমরা মেসোমশায় বলতাম। মেসোমশায়কে কোনো কথার মানে জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলতেন, "ডিক্স্-নারী দেখ।" অঙ্কেও ফাঁকি দেবার জো ছিল না। এই কারণে সীতা ও স্কুচুর খুব রাগ ছিল। তারা বলত, "আপনি যখন থাকবেন না, তখন আপনার সমাধির উপর লিখে রাখব—অঙ্ক কস আর ডিকস্‌নারী দেখ!" ইংরেজী কবিতা পড়িয়ে তিনি সেই মাঝে মাঝে বাংলা কবিতা অনুবাদ করতে বলতেন। মিসেস্ হিমান্সের একটি কবিতা আমি অনুবাদ করেও ছিলাম মনে আছে। পুরাতন পাঠ বারেবারে জিজ্ঞাসা করার অভ্যাস তাঁর ছিল। সীতার তা পছন্দ হোত না। তাই মুক্তি পাবার

সে একটা উপায় ঠিক করেছিল। একটা পাতা পড়া শেষ হয়ে গেলেই সেই পাতাটা সে ছিঁড়ে ফেলে দিত।

স্কুলের মত করে ত পড়া হত না, কাজেই ইতিহাস, ভূগোল কিছুই শিখিনি, অঙ্কেও Algebra, Geometry জানতাম না। সংস্কৃতটা শিখতে হবে এই ভেবে উপক্রমণিকাটা মুখস্থ করানো হয়েছিল পুরাকালে সংস্কৃত-শিক্ষার্থীদের জন্য "ঋজুপাঠ" বলে একটা বই ছিল। উপক্রমণিকা মুখস্থ করার পর তার প্রথমভাগটা বোধহয় কিছুদূর পড়েছিলাম।

সাহিত্যের দিকেই আমাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছিল যেন। মেসোমশায় পড়ানোর সময় ছাড়া অন্য সময়েও আমাদের নিয়ে কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাসের মহাভারত ও রামায়ণ সুর করে করে পড়ে শোনাতেন। বারবার শুনে অনেক জায়গা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এখনও তাঁর পড়া অনেক লাইন মনে পড়ে :—

"রে রে বক নিশাচর আয়রে সত্বর
এত বলি ডাকে ভীম বীর বৃকোদর।"

অথবা

"দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসার
কি সানন্দ গতি মদমত্ত করিবর
ভুজযুগে নিন্দে নাগ আজানুলম্বিত
করিকর যুগবর বাহু সুললিত।"

কিম্বা

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজাতি
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী।"

শিশুমনে বকরাক্ষসের গল্প আর অর্জুনের লক্ষ্যভেদের গল্প ছবির মত ফুটে উঠত। বাংলা শব্দ শিক্ষাও এতে সহজ হয়ে গিয়েছিল। কেন জানিনা বকরূপী ধর্ম্মরাজের—

"অপ্রবাসে অঋণে যাহার দিন যায়
যদ্যপি সে অপরাহ্নে শাকান্ন খায়
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর
বারি চর, শুন চারি প্রশ্নের উত্তর।"

কবিতাটি আজও মনে আছে। এতে শিশুর চিত্তহরণের উপযুক্ত কোনো কথাই নেই।

ক্রমশঃ

সাতটি প্রশ্ন ঃ নেতাজী ও স্বামীজি

অমিতাভ

নেতাজীর জন্ম ১৮৯৭ সনের ২৩ শে জানুয়ারী। এর ঠিক তিন দিন বাদে ২৬ শে জানুয়ারীতে বিশ্ববিজয় করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন স্বামীজী। আর এর তিপ্পান্ন বছর বাদে এই ২৬ শে জানুয়ারী তারিখেই ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান। এ যোগাযোগ কি আকস্মিক, অথবা বিধাতানির্দিষ্ট? হয়তো ভারতের প্রাণপুরুষের শাশ্বত আত্মা এইভাবেই এক দীপ থেকে জ্বালিয়ে নিলেন আরেক দীপ। "আজ স্বামীজি থাকলে—একদিন বলেছিলেন নেতাজী—"তাঁকেই আমার দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করতাম"। নিজ জীবনের উৎকর্ষ সম্বন্ধে বলেছিলেন তিনি—"আমাকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিলো স্বামী বিবেকানন্দের চিঠিপত্র ও বক্তৃতা"।

১৯৩৪ সন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম তখন প্রায় তুঙ্গীপর্বে। কংগ্রেসের নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যেও শেষ বোঝাপড়ায় শুরু। নেতাজীর দৃঢ়বিশ্বাস অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ভারত স্বাধীন হবে। স্বাধীন ভারতের নবরূপ কোন্ কাঠামোয় রচিত হবে তারই ছক আঁকছেন কাগজে কলমে। ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা ও শিল্পোন্নয়ন সম্বন্ধে নেতাজী তখন এক বিতর্কমূলক ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন। চরকা ও ছোটশিল্পের সম্বন্ধে জাতীয় কংগ্রেসকে তিনি সরাসরি বলে দিলেন যে, ভারী শিল্প ছাড়া দেশ দাঁড়াতে পারেনা, ছোট শিল্পও নয়।

আর্থিক পরিকল্পনা ছাড়াও আরেক দিগন্তের রূপ দিতে প্রয়াসী হলেন নেতাজী। ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন বৈজ্ঞানিকদের কাছে। কার্লসবাড থেকে সাতটি প্রশ্ন রেখেছিলেন তিনি ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে। এগুলির উত্তর নিয়েও তিনি বহুবার আলোচনা করেছেন বিভিন্ন বক্তৃতায় ও প্রবন্ধ রচনায় দীর্ঘ দশবছরের উপর এসব প্রশ্ন নিয়ে এক নব দিগন্তে দ্বার খোলার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। প্রশ্নগুলি সাজিয়ে বৈজ্ঞানিকদের কাছে পেশ করা সত্ত্বেও ঠিক তখনি এ কোন উত্তর তিনি পাননি। আংশিকভাবে পেয়েছিলে তিন বছর বাদে ১৯৩৮ সনের ২১ শে আগস্টে সাই নিউজ. এ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় বার্ষিক সভায় মেঘনাদ সাহার কাছে।

নেতাজীর প্রশ্নগুলি দেশ ও জাতির পক্ষে এ উল্লেখযোগ্য ছিলো যে সমভাবেই এসব প্রশ্ন স্বামীজী মনেও উঠেছিলো; বিভিন্ন বক্তৃতায় ও রচনায় এ নি আলোচনাও যথেষ্ট করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, নেতা ও স্বামীজী উভয়েই প্রশ্নগুলির উত্তরে প্রায় একই সিদ্ধা পৌঁছেছিলেন।

"প্রথম প্রশ্ন"

নেতাজীর প্রথম প্রশ্নটি হলো—'ভারতীয় সভ্য কি তার জীবন-সন্ধ্যায় উপনীত কিংবা নবযুগের প্রত্যু লোক? যে জাগরণ দেখা যাচ্ছে তা কি সত্যিই সর্বা উদ্বোধন, যার মধ্যে নবসৃষ্টির তাগিদ রয়েছে, না কি পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্কের প্রতিক্রিয়ামাত্র—উত্তে কোন কিছু গ্রহণ করলে মাংসপেশীতে যেমন চাঞ্চ শিহরণ ঘটে তেমনি কিছু?

প্রশ্নটির দু'টি দিকই স্বামীজি তুলেছিলেন। তাঁ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ভারতের জাগরণ তাঁর চো পড়েছিলো। কিন্তু নিজেই আবার সাবধান ক দিয়েছিলেন—বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল,

ক্ষণস্থায়ী; সাবধান, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান।… হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ এমনি প্রবল হইতেছে যে, ভাল-মন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি বিচারশাস্ত্র [বা] বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না '(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬খণ্ড ২৪৭পৃঃ)।"…ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢংয়ের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হইয়া যাই" (ঐ পৃঃ ৩৪)। আজ বিংশ শতাব্দীর এই দশকে আমরা ইউরোপীয় বা আমেরিকার কোন দেশের অনুকরণ করি না বটে, কিন্তু বিদেশীদের মোহ তো ছাড়তে পারিনি। আজো পরদেশকেই নিজেদের আদর্শ বলে মনে করি। এর মূলে রয়েছে দাসসুলভ মনোভাব।

ভারতের জাগরণের এই দিকটি ধরিয়ে দিয়েও তিনি লক্ষ্য করেছেন, সমাজে আরো কতকগুলি লক্ষণের উদয় হচ্ছে যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। শিক্ষার প্রসার, বিভিন্ন লোকেদের মধ্যে ভোগাধিকার তারতম্যের উচ্ছেদ, সাধারণ জনগণের আত্মসচেতনতা, নারীজাতির উত্থান প্রভৃতি ভারতীয় নবযুগের সূচনা করছে। তাই স্বামীজী বলছেন যে, প্রাথমিক উত্তেজনা কাটিয়ে ভারত উন্নতির পথে এগুবে।

ভারতের অধঃপতনের মূল দু'টি কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন – প্রথমটি, শিক্ষার অপ্রসার ও দ্বিতীয়টি বিদেশী জাতিগুলির সঙ্গে ভারতের আদান-প্রদানের অভাব। আর এর সমাধানে বলছেন স্বামীজী –" আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম; আর ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর তাহা ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে অপরেরা যাহা কিছু দেয় তাহারই গ্রহণে প্রস্তুত হইতে হইবে" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, ২৮৪ পৃঃ)।

তাই নেতাজীর মতো স্বামীজীরও চোখে পড়েছিল যে ইউরোপীয় সভ্যতার চাকচিক্য (glamour) ভারতীয়দের একাংশকে অন্ধভাবে আকর্ষণ করছে। তবুও দূরদৃষ্টির সাহায্যে এও বুঝেছিলেন যে, শিক্ষার প্রসারতায় এর প্রভাব কাটিয়ে উঠে ভারতীয়েরা জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হবে এবং ভারতীয় সভ্যতা নবীন বেশে শীঘ্রই আবির্ভূত হবে।

॥ দ্বিতীয় প্রশ্ন ॥

নেতাজীর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিলো—"আমাদের সভ্যতার মত যেসব সভ্যতার মধ্যে জড়ত্ব এসে গেছে, সেখানে নবপ্রাণসঞ্চারের উপায় কি? সভ্যতার উত্থান-পতন সম্বন্ধে কি কোন নিয়ম আছে যা বলে দিতে পারবে কিভাবে আমাদের সভ্যতার মধ্যে আমরা নতুন জীবনী শক্তি এনে দিতে পারবো?"

১৯২৮ সনে মহারাষ্ট্রে এক ভাষণে নেতাজী নিজেই এর উত্তর দিয়েছিলেন—"স্যার ফ্লিনডার্স পেত্রীর সঙ্গে আমিও একমত যে, ব্যক্তির মত সভ্যতা চক্রাকারে গড়ে ওঠে ও ধ্বংস হয়; প্রত্যেকটি সভ্যতারই একটি জীবন-দর্শন রয়েছে এবং আমি মনে করি অনুকূল অবস্থা হলে মৃত সভ্যতারও পুনরুজ্জীবন হওয়া সম্ভব। যখন এই পুনরুজ্জীবনের সময় আসে তখন বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকেই জাতির প্রাণশক্তি বেরিয়ে আসে।" কিভাবে এই সভ্যতার পুনর্জাগরণ সম্ভব? ১৯২৯ সনে তিনি পাবনা যুব সম্মেলনীতে এক ভাষণে পথনির্দেশ করেছিলেন—"কিরূপ অবস্থায় জাতির পুনর্জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাও কোন কোন ঐতিহাসিক নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এবং বিভিন্ন শিক্ষার (culture) সংস্পর্শের ফলে জাতির এবং জাতীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম হইতে পারে।"

পাবনা ভাষণের মূল বক্তব্যে নেতাজী স্বামীজীকেই অনুসরণ করেছেন এবিষয়ে স্বামীজির বক্তব্য আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই পেয়েছি। মহারাষ্ট্র-ভাষণে নেতাজী-মতও অনেকটা স্বামীজির মতোই, যদিও স্বামীজি আরো গভীরে ঢুকে এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন স্বামীজি সমাজের গভীরে চারটি মূল শক্তিকে দেখ:

পেয়েছিলেন—(১) জ্ঞান বা বিদ্যা, (২) শৌর্য, (৩) অর্থ ও (৪) কায়িক শ্রম। তাঁর মতে, পৃথিবীতে এই চারটি ক্রমান্বয়ে আধিপত্য বজায় রেখে চলে যায়। এ নিয়ে আমরা সবিস্তারে অন্যত্র আলোচনা করেছি বলে এখানে আর তার পুনরুল্লেখ করলাম না। স্বামীজি বলেছেন, এই চারটি শক্তিরই সামঞ্জস্য করে আমাদের সমাজে এক নব জীবনশক্তি এনে দিতে হবে। ব্রাহ্মণ্যযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয় যুগের সংস্কৃতি বৈশ্যযুগের শ্রীময়ী সম্পদ ও শূদ্রযুগের সাম্যভাব—এই চারটি নিয়ে নতুনভাবে সমাজকে গড়তে চেয়েছেন তিনি। এ নিয়ে আমরা অন্যত্র ২ আলোচনা করায় এখানে পরবর্তী প্রসঙ্গে আসছি।

॥ তৃতীয় প্রশ্ন ॥

পাবনায় যুব-সম্মেলনী ভাষণ প্রসঙ্গের জের টেনে তৃতীয় প্রশ্নে নেতাজী বলেছিলেন "আমাদের জাতির প্রাণশক্তি বৃদ্ধির জন্য স্বজাতিতে বিবাহ বা ভিন্ন জাতিতে বিবাহ কোনটি বাঞ্ছনীয়? স্বগোষ্ঠীতে বিবাহ না ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিবাহ কোনটি লোককল্যাণের অধিক উপযোগী?"

নেতাজী ও স্বামীজি উভয়েই মানবিক দিক দিয়ে সন্ন্যাসী, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দেশের চিন্তা তাঁদের এ-ব্যাপারে উদাসীন রাখতে পারেনি। এ বিষয়ে স্বামীজি একবার বলেছিলেন "দেখিতে পাইতেছনা আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশত বৎসর ধরিয়া বিবাহ হইয়া এখন ধরিতে গেলে সকল ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতেই শরীর দুর্বল হইয়া যাইতেছে,...অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভিতরই রক্তটা চলাফেরা করিয়া দূষিত হইয়া পড়িয়াছে।.. শরীরের মধ্যে একবার নূতন অন্যরকম রক্ত বিবাহের দ্বারা আসিয়া পড়িলে এখানকার রোগাদির হাত হইতে ছেলেগুলি পরিত্রাণ পাইবে ও এখনকার চেয়ে ঢের কর্মঠ হইবে।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ২৩৭ পৃঃ)

১৯২৯ সনে হুগলী জেলা ছাত্রসম্মেলনে একই কথা বললেন নেতাজী "জাতির রক্তস্রোত যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে—এখন চাই নতুন রক্ত"। পাবনা ভাষণে তিনি বলেছিলেন "ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্তসংমিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির আগমনে ফলে এই ভারতভূমি বিভিন্ন শিক্ষাধারার সঙ্গমস্থলে পরিণত হইয়াছে"। রক্ত-সংমিশ্রণের সমর্থনে একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে 'তরুণের স্বপ্ন' বইটিতে তাঁর লেখা পাই "আর্য দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিনটি জাতির রক্ত সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙালী জাতির উৎপত্তি প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতকগুলি গুণ বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। সুতরাং রক্তের সংমিশ্রণ হইলেই গুণের সংমিশ্রণও হইয়া থাকে। রক্তের সংমিশ্রণের ফলেই বাঙালীর জীবন এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ। আর্যের ধর্মপ্রবণতা ও আদর্শবাদ, দ্রাবিড়ের কলাবিদ্যা ও ভক্তিপ্রবণতা এবং মঙ্গোলের বুদ্ধিকৌশল, অনুচিকীর্ষা ও বাস্তববাদ বাংলার সাগরসঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে।"

বিভিন্ন দেশের মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বামিজি স্বীকার করেছেন—"ভারতবর্ষে অন্তর্জাতিক বিবাহটা হওয়া দরকার, তাহা না হওয়ায় জাতির শারীরিক দুর্বলতা আসিয়াছে" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, পৃঃ ২৩৬)। কিন্তু ঠিক তখনই এর প্রচলন সমর্থন করেননি কারণ "আপাততঃ উহা সমাজ-বন্ধনকে শিথিল করিয়া নানা উপদ্রবের কারণ হইবে, একথা নিশ্চিত" (ঐ, পৃঃ ২৩৭)। ষাটবছর বাদে নেতাজীও বিদেশী জাতির সঙ্গে রক্ত-মিশ্রণের খারাপ দিকটা সচেতন করে দিয়েছিলেন কারণ ব্রহ্মদেশে এর ফল ভাল হয়নি।

॥ চতুর্থ প্রশ্ন ॥

নেতাজীর চতুর্থ প্রশ্নটি ছিলো ভারতের জনসংখ্যা বিষয়ে। এ দেশের জনসংখ্যা এত দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে যে এর ফলে ভবিষ্যতে দারিদ্র্য নিবারণের ক্ষমতা ভারতের হয়তো থাকবেনা। তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি এদেশে চালু করা সম্ভব কি না।

১৯৩৮ সনের হরিপুরা ভাষণে তিনি পরোক্ষভাবে এ প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের কাছে সরাসরি এ প্রশ্ন রাখলেন—"কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কি অবলম্বনীয় নয়?"

জনসংখ্যা স্ফীতির ফলে দারিদ্র্য যে এদেশে অবধারিত একথা স্বামীজি বহু আগেই উল্লেখ করেছেন। এর প্রতিকারার্থে অবশ্য তিনি কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণের সাহায্য নেবার উপায় কোথাও বলেছিলেন কিনা জানা যায় না। জনসংখ্যাবৃদ্ধির গুরুতম প্রধান কারণ হিসাবে তিনি দু'টি দিকের কথা বলেছেন—প্রথমটি বাল্যবিবাহ ও দ্বিতীয়টি মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার অপ্রসার। 'বাল্যবিবাহের উপর আমার অত্যন্ত ঘৃণা।...ঐরূপ পৈশাচিক প্রথাকে স্বতঃ বা পরতঃ সাহায্য করা অতি ঘৃণ্য বিবেচনা করি।...মেয়েদের আরো বড় করিয়া বিবাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তাহা না হইলে অনাচার ব্যভিচার আরম্ভ হইবে। তবে যে রকম শিক্ষা চলিতেছে সেই রকম নহে, Positive কিছু শিক্ষা চাই—খালি বইপড়া শিক্ষা হইলে হইবে না। যাহাতে Character formed হয়, মনের শক্তি বাড়ে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ২৩৪-৫ পৃঃ)

ছাত্রজীবনে ছেলে-মেয়ে সকলকেই ব্রহ্মচর্যকে আদর্শ হিসাবে গণ্য করতে দেখালে ছাত্রাবস্থায় শরীর মন আরও পুষ্ট ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই স্বামীজি ছাত্রজীবনকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ভবিষ্যৎ জীবনে কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণের চেয়ে বাল্যকাল থেকেই ছাত্রদের মানসিক কাঠামো যুক্তি ও সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত করলে স্থায়ী কল্যাণের সম্ভাবনা, নতুবা সাংসারিক জীবনে এ কৃত্রিম পদ্ধতি বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। আর এ সমস্যার সমাধান স্বামীজি করতে চেয়েছেন একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা।

।। পঞ্চম প্রশ্ন ।।

নেতাজীর পঞ্চম প্রশ্নটি ছিলো সাধারণ লিপি নিয়ে। তিনি বলেছেন যে, প্রথমে দেবনাগরী লিপির সমর্থক থাকলেও ১৯৩৪ সনে তুরস্ক ভ্রমণের পর রোমান-লিপিকেই তিনি আদর্শ লিপি বলে মনে করেন।

ভারতীয় জাতির ঐক্যবিধানের জন্য দেবনাগরী লিপির সংস্কার করে মহাত্মা গান্ধী সর্বজনগ্রাহ্য একটি লিপি করতে চেয়েছিলেন। ডঃ মেঘনাদ সাহা অবশ্য নেতাজী-মতের অনুসরণে গান্ধীজির মত নিরাশ করে রোমানলিপির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'Science and Culture' পত্রিকার আগষ্ট (১৯৩৫) সংখ্যায় 'A common script for I n d i a' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ছয় বছর পরে ১৯৪১ সনের অক্টোবর সংখ্যাতেও 'A common language for India' প্রবন্ধে তিনি পণ্ডিত নেহেরুর মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। নেহেরুর মত ছিলো, দ্রুত কাজের পক্ষে রোমান লিপির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদী হলেও প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রাখার জন্য দেবনাগরী লিপির দরকার। ডঃ সাহা এর উত্তরে বলেছিলেন যে বাংলা দেশে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলা লিপিতেই লেখা হচ্ছে এবং ভারতের বিভিন্ন ভাষার লিপিতেও গীতা রয়েছে বলে নেহেরুর ধারণা অমূলক।

স্বামীজির মত ছিলো, শিক্ষা সবসময়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে দিতে হবে; কিন্তু জগতের সঙ্গে যোগ রাখার জন্য ইংরেজি শেখাও আবশ্যিক হওয়া দরকার। রাষ্ট্রভাষার বিতর্কমূলক আলোচনায় তিনি সংস্কৃতকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। কারণ হিসাবে বলেছিলেন, সংস্কৃতভাষা সকল প্রাদেশিক ভাষারই জন্মদাত্রী বলে সকলেই এ-ভাষাকে সহজে গ্রহণ করবে এবং এর ফলে ভারতের মধ্যে ভারতীয় জাতি গড়ে ওঠার একটি অবলম্বন খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা মনে রেখেও সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা উচিত বলে তিনি মনে করেছিলেন।

।। ষষ্ঠ প্রশ্ন ।।

এরপরে নেতাজী প্রশ্ন করেছিলেন—"সারা ভারতের জন্য একই জাতীয় উন্নত খাদ্যনীতির প্রবর্তন সম্ভব

কিনা," কারণ ভারতের বহু জায়গার খাদ্যরীতিই অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাস্থ্যকর যার জন্য শারীরিক সামর্থ্যের হানি ঘটছে।

নেতাজীর মতো স্বামীজিরও মনে এই সমস্যা উঠেছিলো। সমগ্র ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করায় বিভিন্ন স্থানের খাদ্যরীতির সঙ্গে তাঁর ছিলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। স্বাস্থ্য ও মস্তিষ্ক দুয়েরই পুষ্টির জন্য উন্নত খাদ্যরীতির প্রচলনে তাঁর চেষ্টা দেখা যায়। যদিও বিভিন্ন প্রদেশে খাদ্যরীতি বিভিন্ন, তবুও ডাক্তারী মতে বিচার করে প্রতিটি খাদ্যরীতিকেই সুষম পর্যায়ে তোলা উচিত। জনৈক বঙ্গবাসীকে তিনি বলেছিলেন—"মেলাই তেল-চর্বি-খাওয়া ভালো নয়। লুচি হতে রুটি ভাল।...মাছ মাংস, Fresh vegetable খাবি, মিষ্টি কম" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯খণ্ড, ২৮ পৃঃ)। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে খাদ্য সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতাবলী আলোচনা করে স্বামিজী আদর্শ আহারের ইঙ্গিত দিয়েছেন (ঐ, ৬ খণ্ড ১৭—১৮৫ পৃঃ)।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে স্বামিজী এ সবের মাঝেই ভালো অনেককিছু পেয়েছেন। যে যেরকম খাদ্যে ছোটবেলা থেকেই অভ্যস্ত, তাতেই তার ভাল হয়—সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার তো বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে...ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্ম কর্ম ভেদে আহারাদি সমস্তই পৃথক, এইটিই সিদ্ধান্ত" (ঐ, ৬ খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ)। আবার বিভিন্ন প্রাদেশিক আহারসমূহ থেকে মোটামুটিভাবে একটি সুষম খাদ্য সম্বন্ধে বলেছেন—"খিদে পেলে কচুরি জিলিপি খানায় ফেলে দিয়ে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়াও হবে। ভাত, ডাল, আটা রুটি, মাছ, শাক, দুধ যথেষ্ট খাদ্য। তবে ডাল দক্ষিণীদের মতো খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোলশান্ন, বাকিটা গরুকে দিও। মাংস খাবার পয়সা থাকে, খাও; তবে ও পশ্চিমী নানাপ্রকার গরম মশলাগুলো বাদ দিয়ে। পেটে পুরলেই কি খাওয়া হলো? যেটুকু হজম হবে, সেইটুকুই খাওয়া" (ঐ, ৬ খণ্ড, ১৭৬—পৃঃ)।..."যার দু'পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুরি মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে! ভাত রুটি খাওয়া অপমান। এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেট-মোটা আসল জানোয়ার হবে না তো কি?...সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিতো, দু'কুড়ি কইমাছ কাঁটাসুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, একশ' বছর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি-কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ীচড়ে আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে; কলকেত্তাই হওয়ার এই ফল! আর সর্বনাশ করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার-বদ্যিগুলো। এরা সবজান্তা, ওষুধের জোরে ওরা সব করতে পারে। একটু পেট-গরম হয়েছে তো অমনি একটু ওষুধ দাও; পোড়া বদ্যি বলে না যে, দূর কর ওষুধ যা দু' ক্রোশ হেঁটে আয়। নানান দেশ দেখেছি, নানা রকমের খাওয়াও দেখেছি। তবে আমাদের ভাত ডাল ঝোল চচ্চড়ি শুক্তো মোচার ঘণ্টর জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয়না ...খাবার নকল কি ইংরেজ করতে হবে—সে টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশে উপযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর, সস্তা খাওয়া পূর্ব বাঙলায়, ওদের নকল করো য পারো।"..."দুধ যেমন শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে তেমনি ঢোক ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নচে অনেক দেরী লাগে। ...মূর্খ মাতা কচি ছেলেকে জো করে ঢক ঢক করে দুধ খাওয়ায়, আর দু' ছ'মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে।" (ঐ, ৬ খণ্ড১৮৪ পৃঃ)

খাদ্য সম্বন্ধে নেতাজী প্রশ্ন রেখেছিলেন ডাক্তারদে কাছে। স্বামীজির মনেও এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয়তা জেগেছিলো। তাই বিভিন্ন খা আলোচনা করে নিজ অভিজ্ঞতায় তিনি এক সমাধা আনতে চেয়েছিলেন।

"সপ্তম প্রশ্ন"

নেতাজীর প্রশ্ন ছিলো জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে স্বামীজি পোষাকের সৌন্দর্য অস্বীকার করেননি, কি

বহির্ভারতে প্রতিনিধিমূলক কোন পোষাক ভারতীয়দের থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেছিলেন।

পোষাক সম্বন্ধে স্বামীজির সুন্দর আলোচনা আছে "স্বামী শিষ্য সংবাদ" বইটিতে (ঐ, ৯ খণ্ড. ২৫৫ পৃঃ)—

"স্বামীজি তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: আহার, পোষাক ও জাতীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করলে ক্রমে জাতীয়ত্ব লোপ হয়ে যায়। বিদ্যা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়। কিন্তু যে বিদ্যালাভে জাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয়না—অধঃপাতের সূচনাই হয়। শিষ্য। মহাশয়, অফিস-অঞ্চলে এখন সাহেবদের অনুমোদিত পোষাকাদি না পরিলে চলেনা।

স্বামীজি, তা কে বারণ করছে? অফিস-অঞ্চলে কার্য্যানুরোধে ঐরূপ পোষাক পরবি বই কি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙালী বাবু হবি। সেই কোঁচা-ঝুলানো, কামিজ গায়, চাদর কাঁধে। বুঝলি?

জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে নিজের মতামত দিয়ে আরেক জায়গায় স্বামীজি বলেছেন—"ধুতি-চাদর আর্য্যদের চিরন্তন পোষাক। এইজন্যই ক্রিয়াকর্মের বেলায় ধুতি চাদর পরতেই হয়" (ঐ ৬ খণ্ড ২৮৩ পৃঃ),

নেতাজী ও স্বামীজি তৎ তৎকালীন সময়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছিলেন এই সাতটি প্রশ্ন নিয়ে। আজ এত বছর বাদেও এ প্রশ্নসমূহের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়। প্রশ্ন ছিলো। উপযুক্ত মনীষার দ্বারা তার উত্তরও পাওয়া গেছে। এবারে তা কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগের পালা। আইন-প্রণয়নের উপর ভরসা করে নয়, জনসাধারণকে সচেতন করে তুলে ঘরে ঘরে স্বেচ্ছায় এই উত্তরের বাস্তব প্রয়োগই অধিকতর কাম্য, কারণ তা হবে চিরস্থায়ী।

১। শারদীয়া দৈনিক বসুমতী ১৩৭৬ (মার্কসীয় ইতিহাস-তত্ত্বের সীমা—অমিতাভ)

২। মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৬৬ এবং বৈশাখ ১৩৭৭ (বিবেকানন্দ-দৃষ্টিতে রাষ্ট্রনীতি-অমিতাভ)

ডেল কার্নেগি ও ভারতীয় দৃষ্টি

ভাস্বর ভট্টাচার্য্য

[অপরের সামান্যতম উন্নতি কিংবা সাফল্যে আন্তরিক প্রশংসা করুন]

ক্ষুধা ও ক্ষুধাবৃত্তি যেমন মানুষের একটা জৈবিক নিয়ম, অপরের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন-লাভের ইচ্ছাও—মানুষের এক সহজাতবৃত্তি। এই আর্তি (craving) মানুষের মনোজগতের এক বলিষ্ঠতম এষণা অথবা তাগিদ। প্রফেসর উইলিয়াম জেমস্-এর উক্তিটিও এবিষয় প্রণিধেয়: 'The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated.' মানব-মন এমনতর উপাদানেই গঠিত যে যতক্ষণ না সে তার মনের কোন সাড়া, প্রতিধ্বনি, স্বীকৃতি কিংবা অনুমোদন (recognition) 'কিছু হ'তে' বা 'কারো হ'তে' লাভ না করে—ততক্ষণ সে এক বিষম অনিশ্চিতি ও অতৃপ্তির মধ্যে দোল খায়। কিংবা মনেরই কোন মানসিক রোগ হয় তখন। নয়তো বা মনটা নিজে নিজেই যায় মচকে। তেমনতর অনালোকিত মন নিয়ে কিছু করতে -তখন মনের নিজের মানহানি ঘটে। সে মনে তখন না থাকে স্ফূর্তির আবেগ (Impetus) কিংবা আবেগের উষ্ণতা (animation)। এমনতর অবস্থা মন কি বুঝতে পারলেও মনের মালিকটি কিন্তু বুঝতে পারে না যে সে কখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মারা গেছে! সুতরাং তেমন বিবর্ণ, বিষণ্ণ, স্পন্দহীন জগত থেকে (Azoic state) তাকে ফিরিয়ে জিজীবিষা ও প্রাণবত্তার অবগ্রতায় উদ্দীপিত করাই কি মানবিক ধর্ম নয়? এইটুকুর অভাবে যে-মানুষ নিষ্কর ক'রে বিপথগামী হ'তো, যে মন মানুষ থেকে চিরদিনের জন্তে 'মন ঘুরিয়ে বা মুখ ঘুরিয়ে' থাকতো, সে মানুষকে চিরদিনের জন্তে অকৃতজ্ঞ ও নির্মম আখ্যা দিত কিংবা উপর্যুপরি আঘাতে হয়তো cynic হয়ে উঠতো - তেমন একজনকে যদি একটুকু দরদ বা একটুকু উৎসাহ দেওয়া যায়, তাতে এমনই বা ক্ষতি কি? আমরা শারীরিক পঙ্গু ও অপটুদের দয়া, দাক্ষিণ্য কিংবা সহানুভূতি দেখিয়ে চলি। কিন্তু মানসিক অব্যবস্থিত বা অপটুদের প্রতি আমাদের কোন দয়া, ভালবাসা অথবা সহমর্মিতা নেই। এটা আমাদের বিচারের এক এক-তরফা দৃষ্টি বা একদেশদর্শিতা।

অধ্যাপক উইলিয়াম লায়ন বলেছেন—'আমি দেখেছি লোকেদের সম্পর্কে আগ্রহ দেখালে তারা খুশীতে উপচে ওঠে'। আপনিই ভাবুন না কেন, কৈশোর কিংবা যৌবনের সেই সবুজ দিনগুলোর যখন আপনার অনেক-কিছুই ছিল অপটু, অপুষ্ট, এলোমেলো। এখনকার চেয়ে শত শতগুণ ভুলভ্রান্তি ঘটতো যখন পদে পদে, নির্দিষ্ট পথ ও পদ্ধতির মধ্যে চলা যখন আপনার অভ্যাস হয়নি, প্রাজ্ঞতার কারুকার্যখচিত সাদা শালটি যখন আপনার গা'য় জড়ানো ছিল না—তখন কি আপনি জীবন চলার পথে টাল খেয়ে হাঁটতেন না, দিগ্‌ভ্রান্ত হতেন না? একটুকু দরদ, সামান্যতম সহানুভূতি, কখনো সহমর্মিতা দিলে যখন দেখা যায় একজনের চোখের তারায় আশার আলো দেখা দিয়েছে, রক্তে জেগেছে তার উৎসাহের উদ্দামতা—তবে তা থেকে আমরা নিজেদের বিমুখ করে রাখি কেন? মনোবিজ্ঞান ও ব্যবহারবিজ্ঞানের কথা বাদ দিলেও, মানুষ হিসাবে মানবিকতা বা humanitarian sense দেখাবার এই তো চরম ক্ষণ—পরম লগ্ন!

কিছুদিন আগে এমন কি শিশুদের সামান্যতম উন্নতি কিংবা সাফল্যে আন্তরিক প্রশংসা করার জন্

...র শিশুবিজ্ঞানী অধ্যাপক এ, জে, নিকিন "শিশুদের
...নৈতিক উত্তেজনা" নামক প্রবন্ধে বলেছেন :

..."তার (শিশুর) সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী
...গুলি তাকে করতে দিন এবং সে করছে কিনা
...খুন। ভালো করে করতে পারলে তার প্রশংসা
...রুন"।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রশংসার এক সার্বজনীন
...বেদন আছে। এর থেকে শিশু, কিশোর, প্রৌঢ়,
... কেউই বাদ পড়েন না বা বাদ যান না। সেই
...শোরের প্রারম্ভকার প্রদোষে যখন আপনার কাছে
...নেক কিছুই অন্ধকারের মতো ছিল, যখন আপনার
...জেকে নিজে যানাও সম্পূর্ণতর হয়ে ওঠেনি, তখন
... আপনি চাইতেন না একজন বয়স্কলোকের চোখের
...লোতে নিজেকে জেনে নিতে—নিজেকে আবিষ্কার
...রে নিতে। কিংবা যে গুণগুলি আপনার সম্ভাবনার
...ঙ্গিত বহন করতো কিন্তু যেগুলির জন্য আপনার
...বচেয়ে অবহেলা, অনাদর ও দুঃখ পেতে হয়েছিল,
...বে দেখুন, সেইগুলি সে আজ পল্লবিত ও বিকশিত
...'য়ে এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে—তাও কিন্তু এক
...রদীজনের জন্যেই ঘটেছে, এক সহানুভূতিশীল হৃদয়ের
...ৎসাহবাক্যই এনে দিয়েছে। অতএব শৈশবে যৌবনে
...এবং জীবনের অপরাহ্নবেলায়ও ওই একই নিয়ম, ওই
...একই আকুতি।

ব্যবহারবিজ্ঞানের দৃষ্টি ছাড়াও সাধারণভাবেই আমরা দেখেছি, একজন সম্পাদকের সামান্যতম স্বীকৃতি-দানের জন্যই চার্লস ডিকেনস্-এর জীবনে কিরূপ আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এইটুকু অনুমোদন ও উৎসাহ না পেলে ডিকেনসের জীবন হয়তো বোতলের গায়ে লেবেল লাগিয়েই কাটতো। আর আমরাও হয়তো ডিকেনসের অমর রচনাবলীর রসাস্বাদনে বঞ্চিত হতাম। H. G. Wells এর ঘটনাটিও ঠিক এমনতর। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যখন ওয়েলস কোন দিশা পাচ্ছিলেন না, জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা ও হতাশায় যখন ভেঙে পড়েছিল তাঁর মন, তখন এক সুন্দর শিক্ষকের অনুপ্রেরণাময় চিঠিই তাঁকে দিয়েছিল আশার আলো-বাঁচার ইংগিত। আর এই উৎসাহ ও উদ্দীপনাবাক্যই তাঁকে দিয়েছিল ৭৭টি গ্রন্থ রচনার অনুপ্রেরণা এবং যা থেকে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হ'য়ে আছেন। Caruso এর জীবনেও ঠিক অনুরূপ ঘটনাই আমরা দেখতে পাই। দেখতে পাই Lawrence Tibbett-এর দুর্ভাগ্যময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল কি ক'রে Rupert Hughes এর উৎসাহ বাক্যে। সুতরাং মানুষকে, উদ্দীপিত ও উৎসাহিত ক'রে তার ভিতরের অনুদ্ঘাটিত গুণরাশিকে (Latent possibilities) সর্বসমক্ষে আনতে গেলে তাকে উৎসাহ, অনুমোদন ও স্বীকৃতিদান ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ভূমিকা গ্রহণে আপনার সার্থকতা কি? সার্থকতা হ'ল ১) আপনি এক বঞ্চিত ও অবধারিত প্রতিভাকে উদ্বোধিত করার কাজে প্রয়াসী হয়েছেন। ২) আপনি এক বিভ্রান্ত ও বিপথগামীকে দিশা দিচ্ছেন। ৩) আপনার অপরের গুণাবিষ্কারের ক্ষমতা বাড়ছে এবং সেটি আরো বহুতরগুণে সংবেদী (sensitive) ও কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠছে। ৪) আপনি পূর্বাপেক্ষা উপচিকীর্ষু ও মানবিক [Humanitarian] উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে উঠছেন।

যেহেতু আপনি কেবল আত্মাদরশীল নন কিংবা কেবল নিজেরটুকুই সাড়ে ষোল আনা বোঝেন না—একমাত্র সেইজন্যই সমাজে আপনার স্থান থাকবে অনেক উচ্চে এবং আপনার ওই অমায়িক [unsophisticated] সহৃদয়তার জন্য লোকে আপনার উষ্ণ সান্নিধ্য চাইবে মনেপ্রাণে। আসুন আমরাও কার্নেগির সংগে সুর মিলিয়ে Be hearty in your approbation and lavish in your traite. অতএব এর মূল বিবক্ষা ও লক্ষ্যটুকু যে ভারতীয় আদর্শপুষ্ট তা প্রাচীন ঋষিদের উক্তি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে :

...অনসূয়া চ দয়া ভূতেষু অপৈশুনম্।

অর্থাৎ অনসূয়া (পরগুণে দোষারোপ না করা), প্রাণীতে দয়া, সর্বজীবের প্রতি অপিশুনতা [অক্রূরতা বা

নির্দয় ব্যবহার না করা] ইত্যাদি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ভারতীয়দৃষ্টির আলোকে যদি এই নীতিগুলির যৌন বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, তবে তা ভারতীয় আদর্শেরই পরিপোষক বলে ধরে নেওয়া চলে। যদিও ভারতীয় উচ্চ আধ্যাত্মিকতাও মূল দর্শনের সংগে তার অনেক প্রভেদ।

ইতিহাস এবং ব্যবহারবিজ্ঞান সাক্ষ্য দেয় যে, সামান্যতম সহানুভূতি এবং উৎসাহবাক্যের দ্বারা যখন মানুষের এত উদ্দীপনা ও কর্মোৎসাহ জেগে ওঠে তখন সেটুকু করতে আমরা কুণ্ঠা বা অনীহা প্রকাশ করি কেন? পূর্বে বলা হয়েছে তার কারণ দম্ভ [পূর্বপ্রকাশিত অংশ দ্রষ্টব্য]। কিন্তু আরেকটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এক্ষেত্রে যে বিশেষ মানসিক বৃত্তিগুলি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখে তার দৃষ্টিকে আবিল ও অমানবিক করে তোলে তা হ'ল: স্বার্থ, অসূয়া ও মাৎসর্য। স্বার্থ-এটি একটি আত্মশ্লাঘাপ্রসূত হিংসাত্মক বৃত্তি। যে বিষবাষ্পের আচ্ছন্নতায় সে নিজের ব্যতিরিক্ত জগতের আর কারো কিছুই দেখতে পায় না। তার সবকিছু ও সমগ্র চিন্তা এবং ভাবধারা তার নিজেকে ঘিরেই আবর্তিত। কেবল নিজেকে এবং নিজজনদের নিয়েই তার জীবনায়ন। এই হিংসাত্মক বৃত্তির দাসত্বে মানুষ কখনো কখনো এই উপচিকীর্ষা থেকে বিরত হয়।

অসূয়া পর গুণে দোষাচ্ছাদনের চেষ্টা। এই বৃত্তি প্রায়শঃ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। সভ্যংমন্য মানুষের নিজেকে অপরের থেকে বিশিষ্টভাবে তুলে ধরার এক বিকৃত অপচেষ্টার থেকে এর জন্ম। শিল্পী, সাহিত্যিক এমন কি অনেক যশস্বী লোকের আচরণেও এই মারাত্মক ব্যাধি পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে লক্ষিত হয়েছে।

মাৎসর্য—পরশ্রীকাতরতা। অপরের শ্রীবৃদ্ধিতে নিজেকে দুঃখী মনে করা। এটি একটি প্রচ্ছন্ন হিংসার অপ্রকট অভিব্যক্তি। এই দূষিত মনোভাব থেকে ক্রমশঃ জন্ম নেয় এক চাপা ক্ষোভ বা ঈর্ষা। যা অল্পক্ষণের মধ্যেই বিদ্বেষে পরিণত হয়। আর সেটি ধীরে ধীরে যে রূপ নেয় তা হ'ল: ক্রোধ ও দ্বেষ। পরিশেষে সেটি প্রতিশোধ কিংবা জিঘাংসায় রূপান্তরিত হওয়াও বিচিত্র নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই মাৎসর্যেরও একটি কল্যাণকর দিক আছে। অপরের শ্রীবৃদ্ধিতে 'কাতরতা' প্রকাশ না ক'রে কীভাবে ওইরূপ শ্রী-র অধিকারী আমিও হতে পারি তদ্বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব পোষণ করাই প্রকৃত জীবনযোদ্ধার (sportive) লক্ষণ। আর এই প্রতিযোগিতায় মনোবৃত্তিতে যদি না মানুষ নিজেকে পরিবর্তিত ক'রে তুলতো তবে আজ এমন সভ্যতার অগ্রগতিও সম্ভব হ'ত না। অপরের বা অপর দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে নিজে বা নিজেদের কাতর হয়েই ঘরে বসে থাকতে হ'ত।

এখন দেখা যাক, এইসব দূষিত মনোভাব পোষণ ক'রে রাখলে কী হয়? James Allen তাঁর সুন্দর ছোট্ট বইটিতে বলেছেন: Men imagine that thought can be kept secret, but it cannot; it rapidly crystallises into habit, and habit solidifies into circumstance. অর্থাৎ মানুষ ভাবে বুঝি চিন্তাকে (দূষিত) গোপন রাখা চলে কিন্তু তা কখনই নয়; এটা খুব সত্বরই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দূষিত চিন্তার পরিণতি কী ভয়াবহ ও সংক্রামক। আমরা যদি কোনরূপ খারাপ বা অসুস্থ চিন্তার মনে ঠাঁই দেই—দেখবো আমাদের মুখাবয়ব ও অংগ-প্রত্যংগের মধ্যে পড়বে তার কালো ছায়া এবং আচরণ ও ব্যবহারের মধ্যে দেখা দেবে তার পৈশাচিক দৌরাত্ম্য। আর সেইজন্যে Goethe বলেছেন: Behaviour is a mirror in which every one shows his image. সুতরাং আমরা যদি আমাদের স্বকীয় image-কে ভদ্রভাবে জীবন চলার পথে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হই তবে—এইসব দূষিত চিন্তাজাল থেকে আমাদের নিষ্কৃতি পেতেই হবে। ভারতীয় আদর্শ আরো উচ্চে, আরো গভীর ও দুরবগাহী। তাঁরা বলেন:

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহ সন্ধৌ
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং···ইত্যাদি।

অর্থাৎ শত্রু এবং মিত্র, পুত্র অথবা বন্ধুলোক, ইহাদিগের প্রতি সমান যত্ন করিবে, কাহারও প্রতি ন্যূনাতিরেক বোধ করিবে না; বিগ্রহ কিংবা সন্ধি উভয়েই সমান যত্ন করিবে ইত্যাদি। উপদেশ চিরদিনই চরমকে লক্ষ্য করেই দেওয়া হয়। তা যে যার সামর্থ্যানুযায়ী আচরণে পর্যবসিত করেন। অত গভীর ও উদার উপদেশ যদি আমরা সর্বাংগীনভাবে পালন নাও করতে পারি, যদি তার সামান্যতমও নিজের আচরণ ও ব্যবহারের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পারি—তবে না জানি নিজেদের কতই না মঙ্গল হবে। ভগবান তথাগতের উপদেশও এবিষয়ে স্মর্তব্য :

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কদাচনং।
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥

অর্থাৎ বৈরের দ্বারা কখনো বৈর শান্ত হয় না, অবৈর ভাবের দ্বারাই বৈর শমিত হয়, ইহা সনাতন ধর্ম। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, মাৎসর্যাদি পিশুনভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা যদি আমাদের মানবিক স্বাভাবিক ধর্মগুলি হারিয়ে বসি, তারচেয়ে অমানুষোচিত কাজ আর কী হতে পারে? যে দেশের মানুষরা অপরের উপকারার্থে হাসতে হাসতে নিজের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তর জীবনটিকেও বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না—সেখানে আমরা সামান্য একটু উৎসাহ বাক্য কিংবা একটু সহানুভূতি দেখাতে এত অনীহা প্রকাশ করি কেন?

আজকের এই স্বার্থ-জর্জর দৈনন্দিনতার যুগে আমরা যেন কেমন ভোঁতা বা জাড্যের রূপ পরিগ্রহ করেছি। সামান্য স্বীকৃতি বা অনুমোদনেও (appreciation) যেন আমাদের দারুণ অনিচ্ছা। এমন কি সামান্যতম সৌজন্য দেখাতেও যেন কুণ্ঠা আমাদের। আর, কোন কিছুর জন্যে ধন্যবাদ দেওয়াটাকেও যেন আমরা প্রয়োজনীয় বলে বোধ করিনে। অথচ আজকের সহস্র সহস্র সমাবেশে (meeting) শত শত বক্তাকে বক্তৃতা দিতে দেখা গেলেও, খুব কমই তাঁদের কপালে সামান্য সৌজন্যমূলক ধন্যবাদটুকু মেলে। তাই বিদেশীদের চোখে এটি কেমন যেন এক বিসদৃশ ও অদ্ভুত অভব্যতা বলে মনে হয়। অথচ Prochonow-এর effective public speaking-এ তিনি হুঁশিয়ারী করে দিয়ে বলেছেন: 'Express real appreciation to the speaker who has made a conscientious effort to do a good job'.

যাই হোক, উপর্যুক্ত বিষয়গুলি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে, যদি সত্যিকারের কাউকে সুন্দর করার অভিলাষ কিংবা অভিপ্রায় আমরা হৃদয়ে বহন করি তবে তার প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের দ্বারাই তা সম্ভব। কার্নেগি নির্দেশিত এই নীতিটি যে কি গভীরতাব্যঞ্জক এবং সেটি যে আধ্যাত্মিক, ব্যবহারিক ও পারিবারিক জীবনের কত গভীরে অনুপ্রবিষ্ট—তা একটু সূক্ষ্ম দিকে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। এই একটি মাত্র নীতির অনুপস্থিতিতে এবং সম্যগভাবে এই বিষয়টি অনুধাবন করতে না পারার জন্যে যে কত মধুর দাম্পত্যজীবন নষ্ট হয়েছে তার সপ্রমাণ তথ্য-পঞ্জী আমাদের কাছে ভুরি ভুরি আছে। সুতরাং যদি নিজের শান্তি ও অপরের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, তবে ভালবাসার সুরেই বলুন :

সুহৃৎ বদতি মিত্রানি বিবর্দ্ধন্তু সুখপ্রদঃ।

(ক্রমশঃ)

দীনবন্ধু সি, এফ, এণ্ডরুজ

চিন্ময়ী বসু

দীনবন্ধু

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান থেকে ষোল মাইল দূরে ছিল ফিনিক্স্ আশ্রম। সেখানেই থাকতেন গান্ধীজী। দুঃখীজনের সেবা করেই তাঁর দিন কাটত সেখানে। এণ্ডরুজ গান্ধীজীর সঙ্গে সেই ফিনিক্স্ আশ্রমে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন গান্ধীজী কীরূপ প্রাণ ঢেলে দিয়ে সারাদিন দুর্গতদের সেবা করতেন। সেসব কাজে না ছিল তাঁর কোনও আলস্যের স্থান, না ছিল কোনও দ্বিধা বা সংকোচ। ফিনিক্স্ আশ্রমে গিয়েই এণ্ডরুজ প্রথম আফ্রিকার 'চুক্তিবদ্ধ' শ্রমিকদের সঙ্গে পরিচিত হন।

গান্ধীজীর সঙ্গে এণ্ডরুজ আবার যখন ডারবানে ফিরে এসেছিলেন তখন সেখানকার ভারতীয়গণ এক সভার আয়োজন করে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। তাদের অভ্যর্থনার উত্তরে এণ্ডরুজ তাদের বলেছিলেন, "সুদূর আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের জন্য আমি তাদের মাতৃভূমির ভালবাসা বয়ে এনেছি"। আফ্রিকায় কিছুদিন থাকার পর এণ্ডরুজ লক্ষ্য করেছিলেন সেখানকার ভারতীয়দের মধ্যেও বর্ণ-বিদ্বেষ বর্তমান। ইংরেজরা যেমন আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের হীন চোখে দেখত, ভারতীয়গণ ততোধিক অবজ্ঞা করত কাফ্রি, জুলু প্রভৃতি স্থানীয় কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীদের। ভারতীয়দের এই অন্যায় আচরণে তিনি অত্যন্ত দুঃখবোধ করলেন। তিনি এই ভেবে চিন্তিত হয়েছিলেন যে, ওই দুই জাতিকে এক করতে না পারলে তো ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা খুবই কষ্টকর। তিনি আরও ভাবলেন যে আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি ভারতীয়দের অবজ্ঞার ভাব গান্ধীজী ও তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টি করবে। এই সময় একদিন এণ্ডরুজ একটি সভায় ভারতীয়দের মুক্তি-সংগ্রাম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। একদল জুলু তাকে অনেকটা পথ অনুসরণ করে এগিয়ে এল। তাঁর সামনে এসে তারা জিজ্ঞাসা করল, "আমরা জানি আপনি ভারতীয়দের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু আপনি কি আমাদের জন্যও প্রাণ দিতে পারেন?" এই ঘটনার পর এণ্ডরুজ বর্ণ-বিদ্বেষ দূর করার জন্য আরও কঠোর সংকল্প করলেন।

এণ্ডরুজের মনে ধারণা হয়েছিল যে ধর্মভাব জাগিয়ে তুলতে পারলে মানুষের মন থেকে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব দূর করা সম্ভব হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে চার্চে গিয়ে গিয়ে তিনি এই বিষয়ে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। একদিন এণ্ডরুজের বক্তৃতা শোনার জন্য গান্ধীজী পিয়ারসনকে সঙ্গে নিয়ে ডারবানের একটি চার্চে গিয়েছিলেন। কিন্তু চার্চের বাইরে থেকেই বিমুখ হয়ে গান্ধীজীকে ফিরে আসতে হয়েছিল। তাঁর এণ্ডরুজের বক্তৃতা আর শোনা হল না। তিনি যে কৃষ্ণকায় এশিয়াবাসী। তাঁকে তো চার্চের মধ্যে ঢুকতে দিতে পারেন না চার্চের কর্তৃপক্ষ। গান্ধীজীর প্রতি এইরূপ অন্যায় ব্যবহারে এণ্ডরুজ যারপর নাই বিচলিত হয়েছিলেন। এই সময় এণ্ডরুজকে কিছুদিনের জন্য আবার লণ্ডন ফিরে যেতে হয়েছিল. এবারে লণ্ডনে গিয়ে আবার তিনি গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি নেতাদের সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন। লণ্ডন থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আবার ভারতবর্ষে ফিরে এলেন তিনি।

এণ্ডরুজ ভারতবর্ষে এসে দেখলেন যে এখানে বর্ণভেদ প্রথা আরও প্রকট। মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়

ব্যবহার তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। এই কু-প্রথা দূর করবার জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ভারতবাসীদের প্রতি ইংরেজদের হীন আচরণের নানারূপ কঠোর সমালোচনা শুরু করলেন। ফলে শাসক ইংরেজরা এণ্ডরুজকে আরো সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। অপরপক্ষে ভারতবাসীরাও সকলে এণ্ডরুজকে বড় একটা সুনজরে দেখত না। তাঁকে তারা ইংরেজ শাসকদের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করত।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন্স্ কলেজের কাজ ছেড়ে দিয়ে এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনে গিয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিলেন। শান্তিনিকেতনে আসার কিছুদিন পরেই তিনি ভয়ংকর এশিয়াটিক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই মারাত্মক রোগের ভয়ানক আক্রমণে তিনি প্রায় মরণের মুখোমুখি হয়েছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের অন্যান্য সহকর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্নে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। স্বাস্থ্য ভাল করার জন্য তারপর তাঁকে হাওয়া পরিবর্তন করতে সিমলায় পাঠান হয়েছিল। সিমলায় অবসর যাপনের সময়ে এণ্ডরুজের মন সর্বদাই আফ্রিকার দুর্গত ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশার চিন্তায় ভরে থাকত। এই সময়েই তাঁর হাতে একখানি বই এল। বইখানির নাম ছিল, ফিজি অব টু-ডে, অর্থাৎ 'আজকের ফিজি'। ফিজি হল প্রশান্ত মহাসাগরের একটি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ। সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলো অষ্ট্রেলিয়ানরা। বহু ভারতীয় তখন এই দ্বীপে পাকাপাকিভাবে বাস করছিল। এই সব ভারতীয়রা প্রধানতঃ 'চুক্তিবদ্ধ' শ্রমিকরূপে বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের জীবন ছিল অনেক দুঃখ ও অত্যাচারে জর্জরিত। অনেক সময় এমনও হত যে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনেক শ্রমিক আত্মহত্যাও করত। এণ্ডরুজ ফিজি সম্বন্ধে আরও অনেক বই ও লেখা সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন। ফিজির এই সকল নিপীড়িত ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য অনেক দিন থেকেই ভারতবর্ষে আন্দোলন চলছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করতেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হল। গোখলের মৃত্যুর পর তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার এণ্ডরুজ নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি এই কাজের দায়িত্বকে ভগবান যীশুর আশীর্বাদের দান বলে গ্রহণ করেছিলেন।

এণ্ডরুজের মনে হয়েছিল ভারতবর্ষে থেকে সুদূর ফিজির নিপীড়িত অধিবাসীদের দুর্দশা মোচন করা সম্পূর্ণ সম্ভব নয়, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা দরকার। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আসল অবস্থা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই সব কারণে তিনি স্বয়ং ফিজিতে যাবার সংকল্প করলেন। সেখানে যাবার আগে তিনি ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শ্রমিক সংগ্রহ কেন্দ্রগুলি থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ফলে তিনি জানলেন যে শ্রমিক সংগ্রহ করার দালালেরা অনেকক্ষেত্রেই নানারূপ প্রলোভন দেখিয়ে এবং অনেক মিথ্যা ছল করে অনিচ্ছুক ভারতীয় শ্রমিকদের কৌশলে 'চুক্তিবদ্ধ' করে বিদেশে চালান দিত। এইরূপে তিনি দেখেছিলেন যে শতকরা আশীজন শ্রমিককেই এইভাবে সংগ্রহ করা হত। এইসব তথ্য সংগ্রহ করে অবশেষে তিনি ফিজিতে গেলেন। সেখানে তিনি প্রথমেই সেখানকার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সঙ্গে এই বিষয়ে নানারূপ আলাপ-আলোচনা করলেন এবং দাবি জানালেন যে সব আগে 'চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক' নিয়োগ প্রথা বন্ধ করতে হবে। ফিজিতে বসবাসকারী ভারতীয়দের যথোপযুক্ত সম্মান দিতে হবে। শ্রমিকদের আর্থিক উন্নতি ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন একথাও এণ্ডরুজ তাদের জানিয়ে দিলেন। শ্রমিকদের রুগ্ন, জীর্ণ, ক্ষীণকায় শিশুদের দুরবস্থা দেখে এণ্ডরুজ বিচলিত হয়েছিলেন আরও বেশী। এইসব শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতি করা যায় কীরূপে এই চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা এবং শিক্ষাদানের সুবন্দোবস্ত যাতে করা যায়

তার জন্য তিনি ব্যাকুলভাবে চেষ্টা শুরু করলেন। এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেই এণ্ডরুজকে একবার ভারতবর্ষে ফিরে আসতে হয়েছিল।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে এণ্ডরুজ আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে শ্রমিকরা আর চুক্তিবদ্ধ হয়ে ফিজিতে না যেতে পারে। এমন কি যে জাহাজে করে কুলিদের ভারতবর্ষ থেকে ফিজিতে পাঠান হত সেইসব জাহাজ-ঘাটে গিয়ে তিনি পিকেটিং করারও সংকল্প করেছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও ক্রমশ তীব্র হল। এই সব নানা কারণে সাময়িকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে শ্রমিকদের আর চুক্তিবদ্ধ করে কাজে পাঠানো হবে না। কিন্তু এই কুপ্রথা আবার যে-কোনও সময়ে চালু হতে পারে এই আশংকায় এণ্ডরুজ আবার ফিজিতে চলে গেলেন, সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে যুদ্ধের জন্য জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বেড়ে যাওয়াতে শ্রমিকদের দুর্গতি ও অভাব আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। খাদ্যাভাবে দিনের পর দিন তারা উপবাসে কাটাচ্ছিল। নিজের সন্তানকে খেতে দিতে না পেরে একজন শ্রমিক আত্মহত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল এবং দণ্ডলাভ করেছিল। শ্রমিকদের এই অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট দেখে এণ্ডরুজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। অসহনীয় এই দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য অনেক শ্রমিক ভারতবর্ষে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নানা অজুহাতে তাদের আসতে দেওয়া হচ্ছিলনা। এণ্ডরুজ বুঝেছিলেন যে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করতে না পারলে কোন আন্দোলনই সফল হওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি ভারতীয় শ্রমিকদের বাসস্থান সমূহে ঘুরে ঘুরে তাদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। নিজেদের সম্বন্ধে শ্রমিকরা যাতে সচেতন হয়ে উঠে তার জন্য তিনি সব রকম চেষ্টা করতে লাগলেন। এণ্ডরুজের এই সকল কাজের জন্য ফিজির শাসকগোষ্ঠী এণ্ডরুজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে ভারতীয় বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কিন্তু দীন-দরিদ্রের সহায় দৃঢ়চেতা এণ্ডরুজ কিছুতেই তাঁর আদর্শকর্ম থেকে সরে আসেন নি। দীনের সেবায় এণ্ডরুজের অক্লান্ত আত্ম-নিয়োগে ফিজির ভারতীয়গণ অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিল এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁকে "দীনবন্ধু" আখ্যা দিয়েছিল। ফিজিবাসী ভারতীয়দের দুঃখ দূর করার জন্য এণ্ডরুজ অষ্ট্রেলিয়াতেও গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এই ব্যাপারে জনমত সংগঠন করেছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার মহিলা সমিতি এ বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

ভারতবর্ষের বাইরে বা ভিতরে যেখানেই তিনি দুর্গতদের দুর্গতির কাহিনী শুনতে পেতেন সেখানেই গিয়ে হাজির হতেন তাদের সাহায্যের জন্য। ভারতবর্ষে শ্রমিকদের অবস্থাও সুখকর ছিল না মোটেই। তার উপর যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে দ্রব্যমূল্য মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল। ফলে সাধারণ ভারতীয়দের, বিশেষতঃ শ্রমিকদের, দুরবস্থার আর সীমা ছিল না। শ্রমিকরা দিন-মজুরী বাড়াবার জন্য বোম্বাই, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন কল-কারখানায় আন্দোলন শুরু করেছিল। ফলে কিছু কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে এবং এণ্ডরুজের মধ্যস্থতায় এই সকল অচল অবস্থা দূর হয়েছিল। এই সময়েই এণ্ডরুজ কারখানা-মালিকদের বাধ্য করেছিলেন শ্রমিক-সংঘের স্বীকৃতিদানে। এণ্ডরুজই সর্ব প্রথম ভারতবর্ষে শ্রমিকসংঘ গড়ার সূচনা করেছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে হাওড়া, লিলুয়া, কাঁচড়াপাড়া, উত্তর প্রদেশের লখ্‌নউ প্রভৃতি স্থানে রেলওয়ে-কারখানা সমূহে যে শ্রমিক-ধর্মঘট হয়েছিল তা তাঁরই মধ্যস্থতায় সন্তোষ-জনকভাবে মিটমাট হয়েছিল। আসামের চা-বাগান থেকে কর্মচ্যুত হয়ে শ্রমিকরা যখন পূর্ববঙ্গের চাঁদপুরে গিয়ে দলে দলে হাজির হয়েছিল তখন সেখানে তাদের বাসস্থানের কোন সুব্যবস্থাই করা হয়নি। তারা পথে-ঘাটে, ষ্টেশনে সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিন কাটাচ্ছিল। ফলে সেখানে কলেরা রোগ দেখা দিয়েছিল

ভয়াবহরূপে। কলেরা মহামারীর খবর পেয়ে এণ্ডরুজ গিয়ে চাঁদপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবা করার জন্য। অবিশ্রাম পরিশ্রম করে তিনি তাঁদের সেবা করেছিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দেই খুলনা জিলাতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সেখানেও ঠিক গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন দীনের বন্ধু, দুর্গতদের সহায় এণ্ডরুজ, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ত্রাণকার্যে সহায়তা করার জন্য। দক্ষিণ ভারতে মালাবার, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে অস্পৃশ্যতা বর্তমান ছিল অত্যন্ত ভয়ংকররূপে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আবার হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য। সেই সকল স্থানেও এণ্ডরুজ গিয়েছিলেন অস্পৃশ্যতা দূর করতে এবং মৈত্রীস্থাপনে সাহায্য করতে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা দূর করার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের তথাকথিত অস্পৃশ্যদের কাছে গান্ধীজী ছিলেন দেবতাস্বরূপ। এণ্ডরুজ যখন দক্ষিণ ভারতে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন "গান্ধীর ভাই' এসেছে" এই সংবাদ প্রচার লাভ করেছিল। মানুষের হাতে মানুষেরই অবমাননা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি লিখেছিলেন, "দরিদ্রের উপর নির্যাতনই হল ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় সমস্যা"।

বিদেশ-প্রত্যাগত আশ্রয়হীন শ্রমিকদের সমস্যাও কম ছিল না। তাদের না ছিল কোন আশ্রয়স্থল, না হয়েছিল কোন কর্মের সংস্থান। ফিজি, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যেসব শ্রমিক ভারতবর্ষে ফিরে এসেছিল তারা কলকাতার কাছে মেটিয়াবুরুজে অতি শোচনীয় অবস্থায়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বস্তীতে এসে উঠেছিল। সেখানে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ছিল খুব বেশী। ভারতবর্ষ ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। একমাত্র পরিচিত বন্ধু ছিল তাদের এণ্ডরুজ। ভারতবর্ষে এসে কোনরূপ জীবিকার ব্যবস্থা করতে না পেরে তারা আবার তাদের পূর্ব কর্মস্থানে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এই কাজে সাহায্যের জন্য তারা এণ্ডরুজের শরণাপন্ন হয়েছিল। এণ্ডরুজ যারপর নাই চেষ্টা করেছিলেন এই সব বিপন্ন লোকদের জন্য যাতে একটা সুব্যবস্থা করা যায়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এণ্ডরুজ আবার আফ্রিকায় গিয়েছিলেন কেনিয়াতে বসবাসকারী ভারতীয়দের নানা সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে। আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সাহায্য করতে গিয়ে সেখানকার শ্বেতাঙ্গদের হাতে এণ্ডরুজকে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। তারা এণ্ডরুজকে দৈহিক নির্যাতন করতেও দ্বিধাবোধ করত না। তাঁর সম্বন্ধে কটূক্তির তো আর শেষই ছিল না। একবার তিনি নাইরোবি থেকে উগাণ্ডা যাচ্ছিলেন। ট্রেনের কামরায় তাঁর সহযাত্রী ছিলেন কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ। তারা এণ্ডরুজের দাড়ি ধরে টেনেছিল এবং তাঁর প্রতি নানা কটূক্তি করেছিল। তাঁকে ট্রেন থেকে টেনে বাইরে বের করে দেবার পর্যন্ত চেষ্টা করেছিল। আর একবার এণ্ডরুজ যখন উগাণ্ডা থেকে ফিরছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে স্টীমারে এক শিখ-পরিবারের আলাপ হয়। তাঁদের সঙ্গে একটি শিশুসন্তান ছিল। এণ্ডরুজ শিখদম্পতির সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন আর শিশুটিকে সস্নেহে আদর করছিলেন। শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরা বহুক্ষণ ধরেই এণ্ডরুজের এই 'বিসদৃশ' আচরণ লক্ষ্য করছিল। তাদের মধ্যে একজন আর ধৈর্য রাখতে না পেরে ছুটে এল এবং অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে এণ্ডরুজকে বলেছিল, "জান, তোমার কোলে ওই কালো বাচ্চাটিকে দেখে তোমাকে খুন করার কথা আমার মনে হয়েছিল। আমার ইচ্ছা হয়েছিল তোমার গলার চাদর ধরে টেনে তোমাকে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিই"। কিন্তু এত অপমান সত্ত্বেও এণ্ডরুজ বিন্দুমাত্র বিচলিত বা বিরক্ত হন নি কখনও। সেবার কাজে যখন ব্যস্ত থাকতেন তখন তিনি নিজের সুখ-সুবিধার কথা কোনও সময়েই মনে আনতেন না। আফ্রিকাতে অনেক সময় এমনও হয়েছিল যে তাকে দশ-বার দিন একটানা শুধু ট্রেনেই ভ্রমণ করতে হত। খাবার হয়ত কিছুই জুটতনা তাঁর ভাগ্যে। কেবল সরবৎ বা চা খেয়েই কাটিয়ে দিতেন কোন দিন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে এণ্ডরুজের স্বাস্থ্য অবনতির

দিকে যাচ্ছিল। তিনি বার বার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আবার ইংলণ্ডে চলে যেতে হয়েছিল। সেখানে থেকে কিছুদিন চিকিৎসা করবার পর তিনি আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তখন ভারতবর্ষে আসবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ভারতের দুঃখী নিপীড়িতজনেরা যে তাঁর মুখ চেয়ে বসে আছে। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—কবির এই উক্তিতে এণ্ডরুজের ছিল অকুণ্ঠ বিশ্বাস। এই মানুষের সেবার ডাকে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে এলেন অল্পদিনের মধ্যেই। আসামে তখন আফিমের চোরাই-কারবার নিয়ে খুব একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতের আফিমের ব্যবসা ছিল সম্পূর্ণরূপে সরকারের হাতে। চীনদেশেই আফিমের চালান যেত সবচেয়ে বেশী। কিন্তু চীনের চাহিদার তুলনায় তা ছিল অতি সামান্য। ফলে আসামের চোরাপথে আফিমের গোপন-ব্যবসা চলত বেশ ব্যাপকভাবে। এই গুপ্ত অসাধু কাজে বেশ কিছু অসৎ ও লোভী ভারতীয় ব্যাপৃত ছিল। বহু সাধারণলোকও আফিম খাওয়ার নিয়মিত অভ্যাস করেছিল। আফিম-সেবন এবং ইহার চোরা-কারবারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এণ্ডরুজ ভারতবর্ষে এসে এই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। ভারতবর্ষের বড় বড় নেতাদের সহি সংগ্রহ করে এণ্ডরুজ সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন যেন কেবলমাত্র ঔষধ বা বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ছাড়া সরকার আফিম-চাষের অনুমতি না দেন। এই-রূপে ভারতবর্ষে বা বাইরে যখনই যেখানে কোনও সমস্যা উপস্থিত হত এণ্ডরুজও সেখানে ঠিক গিয়ে দেখা দিতেন তাঁর উদার হৃদয় প্রসারিত করে। উড়িষ্যায় একবার প্রবল বন্যার আবির্ভাবে সেখানকার লোকের আর দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিলনা। খবর পেয়ে এণ্ডরুজ সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন দুর্গতদের ত্রাণকার্যে সহায়তা করতে। আসাম-রেলের শ্রমিকরা একবার তাদের দাবি-দাওয়ার সমর্থনে অনির্দিষ্টকাল হরতাল করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু উপস্থিত অবস্থায় হরতাল তেমন ফলপ্রসূ হবেনা দেখে এণ্ডরুজ তাদের হরতাল করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু রেলের কর্মচারীরা তাঁর কথায় কান না দিয়ে হরতাল শুরু করেছিল। দুএক দিন যেতে না যেতেই ওই সব কর্মচারীদের এক শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হল। তখন তাদের উদ্ধারের জন্য সেই এণ্ডরুজই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন ত্রাণকর্তারূপে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এণ্ডরুজ আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন। সেখানে তখন ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এমন এক আইন চালু করতে চেষ্টা করছিলেন যাতে নাটাল, ট্রান্সভাল, জোহেনসবার্গ, প্রিটোরিয়া এবং অন্যান্য অনেক স্থান থেকে ভারতীয়রা বিতাড়িত হয়ে যেত। এণ্ডরুজ দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়ে স্থানীয় সরকারের সঙ্গে চিঠি-পত্র দিয়ে এবং বড় বড় কর্তাব্যক্তির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে ভারতীয়দের পক্ষ অবলম্বন করে লড়াই শুরু করেছিলেন ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করে তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতে লাগলেন। ওই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করার জন্য তিনি সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছিলেন। এই সময়েই দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান সহরে ভারতীয়দের মধ্যে বসন্তরোগ মহামারিরূপে দেখা দিয়েছিল। বস্তীবাসী ভারতীয়রা এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এণ্ডরুজ নিজে গিয়ে সেখানে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, পরিচর্যা ইত্যাদি করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি নিজ হাতেই রোগীদের পরিচর্যা করেছিলেন।

এণ্ডরুজের এই নিঃস্বার্থ সেবা এবং অবিরাম আবেদন-নিবেদনের ফলে আফ্রিকার ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর মনো-ভাব অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল। ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার ও তাদের সুখ-সুবিধার কথা তারা কিছু কিছু ভাবতে শুরু করেছিল। ইহার পরেই বৈষম্যমূলক আইন বাতিল করে দেওয়া হল। নাগরিক এবং সামাজিক-জীবনে ভারতীয়দের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হল। এইসব অধিকার থেকে ভারতীয়রা ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। আফ্রিকাবাসী ভারতীয় শ্রমিকরা সাধারণত তাদের পুত্র-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেখানে বাস করত। স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা দেশেই থাকত। তাদের আফ্রিকাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হত না। এণ্ডরুজ বহু চেষ্টা করে এই রীতিও দূর করেছিলেন। এই ব্যবস্থার অবসান হওয়াতে আফ্রিকাবাসী ভারতীয়রা যারপর নাই সুখী হয়েছিল। তাদের মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটেছিল নিজ নিজ পুত্র-পরিবারকে কাছে পেয়ে। এটাই ছিল এণ্ডরুজের অক্লান্ত পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এণ্ডরুজ আবার ভারতবর্ষে ফিরে এসেছিলেন। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, "চার্লি, তুমি পরমাশ্চর্য, তুমি মহান!"

কাশ্মীরের পথে

পুষ্প দেবী

ইচ্ছে ছিল মহারাজ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের সঙ্গে অমরনাথ যাবো সব ঠিক ঠাক। এমন সময় শুভার্থী গৃহচিকিৎসক আপত্তি করলেন। বল্লেন, এই শরীরে অত দূরের দেশ যাবেন না—শেষে একটা বিভ্রাট বাধাবেন? মহারাজের সঙ্গে গেলে যে বিভ্রাট হয় না, এ সহজ কথাটা তাঁকে শোনাবে কে? বিশেষ করে আবার স্বামী অধ্যাপক মশাই সত্যিসত্যিই অসুস্থ। তার ওপর যাও বা কি ছিল সন্তানশোকের বজ্রাঘাতে তাও গেছে। মনোভঙ্গের দুঃখে যখন হতাশ হয়ে বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ ডাঃ উষা রায়ের আবির্ভাব। বললো, "চলুন চলুন আমরা কাশ্মীর যাচ্ছি, লিটারারী কনফারেন্সে আপনিও চলুন। যারা একখানা দুখানা বই লিখেছে তারা সাহিত্যিক হয়ে যাচ্ছে। আর আপনি এগারোখানা উপনিষদ কাব্যানুবাদ করে গাঢাকা দিয়ে বসে থাকবেন? শুনে উৎসাহভরে উঠে বসলুম। এবার গৃহ-চিকিৎসক সানন্দে অনুমতি দিলেন। কিন্তু মূলে ভুল হল। একটু দেরী করার ফলে উষাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হলুম। সহযাত্রিণী হলেন নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনীর কাব্যশাখার সভানেত্রী ডাঃ বাণী রায়। হাওড়া থেকে পাঠানকোট কম রাস্তা নয়। চলেছি ত চলেইছি। পথে গোমো ষ্টেশনের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পরেশনাথ পাহাড়েরই বা কি কম বাহার। দুটি চোখ পরম প্রশান্তিতে মেলে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি। এর আগে অবধি দৃশ্যপট সাঁওতাল পরগণার মত ছিল। এবার পট বদলালো। নানা পরিবেশ। সুন্দর সুন্দর দেশগুলি পেরিয়ে পৌঁছুলুম পাঠানকোটে। আশ্চর্য্য, কোন ব্যবস্থা নেই সমিতি থেকে। আমাদের জন্য না হোক অন্ততঃ বাণীর জন্য ওদের কোন ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কাব্যশাখার সভানেত্রী যে। তাছাড়া আমরা দুজনে আছি। বাণী সম্পূর্ণ একা। নিদারুণ গরম। এধারে কনফারেন্সের উদ্যোক্তারা বলে দিয়েছেন "কলকাতার ডিসেম্বর ওখানে শীতবস্ত্র বেশী করে নেবেন।" ট্রাঙ্ক-ঠাসা শাল ওভার-কোটের কথা এখন ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে। তার ওপর গায়ের লেপ? সেকী কম বোঝা? দুখানা রাগ নিয়ে ছিলুম। কিন্তু সহযাত্রীদের সহানুভূতির চোটে শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক মশায়ের জন্য একখানা লেপ না নিয়ে পারিনি। বিপরীত পক্ষও যে ছিলেন না তা নয়। তাঁরা বলেছিলেন "এটা কাশ্মীর যাবার সময় নয়। এপ্রিলের ফুল কোটাও দেখবেন না, অক্টোবরের ফলও পাবেন না—মাঝ থেকে শ্রীনগরের গরমে প্রাণটা যাবে"। একবার মনটা দোলায়মান হয়েছিল। আবার ভাবলুম কাশ্মীর নিয়ে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যা গোলযোগ চলছে, তাতে হয়ত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের কাশ্মীর ছেড়ে দিতে হবে। কাশ্মীরের ভৌগোলিক পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অল্পদিনের মধ্যেই হয়ত আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে—কে জানে? হয়ত কাশ্মীর উত্তরের নামকরা দেশগুলির সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ হবে বাণিজ্যের জন্য। উত্তর ও দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সেতুস্বরূপ হওয়া কাশ্মীরের পক্ষে খুবই সম্ভবপর। কাজেই কাশ্মীর যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না। এর ওপর এতগুলি সাহিত্যিকের সঙ্গ সেও কম লোভনীয় নয়।

নিদারুণ গরম। ঐ কড়া রোদ্দুরে মালপত্র নিয়ে কুলির দয়ায় বাসে মাল তুলে সুস্থির হয়ে বসা গেল। বাস রওনা হল কাশ্মীর অভিমুখে। পাহাড়ের গা বেয়ে পাকানো-পাকানো রাস্তা। ছুরির ফলার মত বাঁক। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের হাতে ষ্টীয়ারিং সত্যিই প্রশংসা পাবার মত খেলা দেখালো। তবু পথভ্রান্ত হল ড্রাইভার। ঠিক

এর আগেই আমার ছোট মেয়ে তপতী কাশ্মীর ঘুরে এসেছে। সে আমার বাটোটের যে ছবি এঁকে দিয়েছিল। তা আমরা পেরিয়ে গেলুম। আশ্চর্য্য ভূস্বর্গ কাশ্মীর! রাত আটটা অবধি পরিষ্কার দিনের আলো। কত যে ঝরণা! কত যে আশ্চর্য্য পাহাড় পেরিয়ে এলুম! সে বলে বোঝান যাবে না। যাইহোক ঘুরে-ফিরে আমরা আবার বাটোটে এলুম। এবং বাণীরায়ের অদ্ভুত অধ্যবসায়ে একটি সুন্দর ঘরও রাত্রিবাসের জন্য পেলুম। পরদিন সকালে আবার রওনা হলুম। তখন ঝির-ঝির করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। পথ অনেকটা দার্জ্জিলিং-এর মত। জহর ট্যানেল বেয়ে গাড়ী চললো। লালনীল আলোয় সাজান উজ্জলতা আর শ্যাওলা বর্ণ-সৌন্দর্য্যে মনকে মোহিত করে; এবার জম্মু পার করে শ্রীনগর—পাথরে লেখা "সুখী উপত্যকায় স্বাগত"। পথে আমরা ভেরি নাগ দেখলুম। সে যে কী অপূর্ব্ব বাগান, ঝরণা আর হ্রদ—কালির আখরে তা ফুটিয়ে তোলা শক্ত। বাগানের মধ্যে বৃত্তাকার একটি প্রাচীরঘেরা জায়গা। তাতে শিবলিঙ্গ আছেন। মধ্যে একটি হ্রদের মত গোলাকার ঝরণা প্রবলবেগে বয়ে বাইরের বাগানের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে। নীলরং এর জলের সে কী অপূর্ব্ব খেলা! তার ওপর দিয়ে জায়গায়-জায়গায় সেতু বেঁধেছে। আর দুধারে যেন রং বেরং এর ফুলের ওড়না প্রজাপতির মত রং এর বাহার ছড়িয়ে দুটি চোখ জুড়িয়ে দেয়। এখানে ভূস্বর্গ কাশ্মীর নামে আমার লেখা একটি কবিতা দিলুম—দেখেছি দুচোখ ভরে।

শ্যামল বানানী পর্ব্বত শ্রেণী অপরূপ রূপ ধরে।
শিলার ভিতর হতে ঝর ঝর ঝরণা বহিয়া যায়,
চরণেতে তার উপলের বাধা তবুও বাধা না পায়!
বহি গিরি দরী বন পর্ব্বত সে যেন পাহাড়ী মেয়ে,
চলিয়াছে ছুটি পর্ব্বত পানে পদে পদে বাধা পেয়ে।
বন্ধন তার মুক্তি যে তার চরণে নূপুর সম,
হল জটাভার কুন্তল তার ভঙ্গি সে মনোরম।
কোথা পিঙ্গল কোথাও বা লাল কোথা নীলরং তার,
পাথরের মাঝে রং এর কী খেলা কিবা চমৎকার।
শিলা গুহা কত কত প্রান্তর কতনা বনানী ভরা,
এই কাশ্মীর ভূতলে স্বর্গ কত জন মনহরা।
আমিও দেখেছি দুই চোখ ভরে চোখ সে ফিরান দায়
অপরূপ রূপ রূপশিল্পীর রূপ মনে পড়ে যায়।
মোহন বাঁশরী কেলি ক্ষণতরে মোহন তুলিকা ধরে।
আঁকিল যে ছবি অতুলন যাহা সবায় মোহিত করে।
ধেয়ান মগন শঙ্কর সম বিরাট বিশাল তাহা,
বর্ণিতে তাহা ভাষা মানে হার স্থির অবিকল যাহা।
ক্ষণে ক্ষণে তার মূর্ত্তি আবার অমূর্ত্ত রূপ ধরে,
নয়নের দিঠি কূল নাহি পায় শুধু বিস্ময়ে ভরে।
দুটি চোখে আঁকি স্বরগ সুষমা হৃদিপটে আঁকি নিই
বলিবার ভাষা মানিলেও হার আমি তারে ভুলি নাই

কীনারবাগের হাউস-বোটগুলি অপূর্ব্ব। কিন্তু অধ্যাপক মশাই ঐ কাদার মধ্যে কাঠের পাটাতন বসিয়ে যে নামা-ওঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা দেখে বললেন কাজ নেই চলো, আমরা কোন হোটেলে যাই। সেখানে থাকার ফলে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে আমি ধন্য হয়েছিলুম। তাঁরা দুজনেও আমাদেরই মত সদ্য সন্তানশোকে অভিভূত।

আলাপ হয়েছিল অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি ও তাঁর সহধর্মিনী তাঁদের অমায়িক ব্যবহারে আমায় মুগ্ধ করেছিলেন। কিন্তু এঁরা আসার আগে একদিন সেই হোটেলে আমাদের একা থাকতে হয়েছিল। অধ্যাপক মশাই সুস্থ নন। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা তাই শঙ্কিত হয়েছিলুম। এতদিন সঙ্গে ডাঃ বাণী রায় ছিল তাই নিঃসঙ্গ বোধ হয়নি। রাত্রে ওঁকে বল্লুম কাজ নেই সাহিত্য-অধিবেশনে যোগ দিয়ে। তার চেয়ে চলো ফিরে যাই। অটল পণ! সত্যি রাতবিরেতে অসুখ বিসুখ হলে দেখবে কে? সকাল হতেই বল্লুম, চলো কাছাকাছি কোন দোকানপসার থাকলে দুচারটে এখানকার জিনিষ কিনে নিই কিছু স্মরণ চিহ্ন। পথে-বেরুতেই বাস-ট্যাণ্ডে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা। সদ্যস্নাতা গরদবাসপরিহিতা পূজারিণী মূর্ত্তি। আমি ত এই বিদেশে ঐ বাঙালী মেয়েকে পেয়ে হাতে চাঁদ

পেলুম। ইনি হলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী। তাঁরা যাচ্ছেন ক্ষীর ভবানী দেখতে। রইল আমার বাজার করা। এ সুবর্ণসুযোগ আমরা ছাড়লুম না। হলুম যা ক্ষীর ভবানী দেখতে। পথে যেতে যেতেই আমাদের কলকাতা ফিরে যাবার সংকল্প বদলে গেল। কারণ যখন শুনলুম এ মা দুজনেই আমাদের হোটেলেই আছেন। বাসে করে ক্ষীর ভবানী রওনা হলুম। এখানে শঙ্কর ও ভবানীর যুগলমূর্ত্তি। এত সুন্দর পরিবেশ। ঠিক যেন সেকালের তপোবন। শোনা যায় বিবেকানন্দ এখানে এসে সাতদিন ধ্যানস্থ ছিলেন। এখানে পূজার উপচারও অপূর্ব্ব! বড় বড় তুলসী পাতা আর আমাদের দেশে রথের সময় যেমন চিনির মঠ পাওয়া যায়, তেমনি ক্ষীরের মঠ। আর ঘীয়ের প্রদীপ। মার্ব্বেল-পাথরে বাঁধানো একটি সরোবরের মধ্যে শঙ্কর ভবানীর মন্দির। জানিনা কিভাবে পুরোহিত গিয়ে মন্দিরে পূজো করেন—হয়ত নৌকায়।

আমরা কিন্তু সেই সরোবরের পাশে মার্ব্বেল বাঁধানো চত্বরে প্রদীপের মালা জ্বালিয়ে আর ক্ষীরের মঠ জলে ভাসিয়ে পূজো করলুম। জায়গায় জায়গায় সুললিত স্বরে বেদমন্ত্র পাঠ হচ্ছে। কোথাও চণ্ডীপাঠ হচ্ছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ। বোঝার কোন অসুবিধা নেই। একজন কিশোর-সাধু দুটি হাত জোড় করে আদ্যোত্তর অপরাজিতা-স্তব পাঠ করতে করতে বারে বারে মন্দির প্রদক্ষিণ কচ্ছিলেন। আমি কিছু মুদ্রা তাঁকে দিয়ে প্রণাম করায় তিনি হাত নেড়ে আমায় বল্লেন "ওতে আমার কি হবে?" কি ভাষায় বলেছিলেন তা আজ আমি বলতে পারব না। কিন্তু অর্থ তিনি স্পর্শ করেননি। এটা মনে আছে অদূরে গাছতলায় একটি পরিবার রান্না চড়িয়েছেন। শুনলুম মানতশোধ করতে এসেছেন। তিনি কিন্তু প্রসাদ ঐ সাধুকে দিলেন। হালুয়া-গোছের কিছু। সাধু গ্রহণ করলেন। আমার মনে বারে বারে বুদ্ধ সুজাতার উপাখ্যান মনে পড়ছিল। এর পর আমরা ওখানের একটি দোকানে কাশ্মীরের অপূর্ব্ব চা খেলুম। মাটির গেলাসের উপর কাঁসার কারুকার্যময় বাটিতে গরমমশলা সহযোগে দুগ্ধবিহীন সেই চা—। এর পর আমরা বাসে করে ফিরলুম।

ফিরিবার পথে দেখি কতমেয়ে অপরূপ রূপভার,
সবাকার মাঝে হেরি শৈলজা করি যে নমস্কার।
গিরিজা তাঁহার সেই রূপকণা দিয়াছেন জনেজনে
সবাকার মাঝে যার রূপ রাজে বিচারিয়া দেখি মনে।
কাশ্মীর শুনি ভূস্বর্গ সেই স্বরগে ভূতল আসে,
শুনি বিস্ময় আমি শুধু দেখি ক্ষীর ভবানী যে হাসে!
পর্ব্বত হেরি মনে পড়ে যায় তপস্যারতা উমা,
অপরূপ রূপ দেখিয়া দেখি যে জননী সে হরহমা!
সেই রূপে তোর এই আঁখি মোর আর কিছু দেখি
নাই,
তাঁহার সেরূপ দেখিবার তরে লক্ষ নয়ন চাই।

হোটেলে ফিরে দেখি ডাঃ বাণী রায় এসে চিঠি রেখে গেছে। চিঠির প্রতিটি অক্ষরে অভিমান ভরা। আমার যে এখানে এসে আছি অথচ তাকে জানাইনি এই হচ্ছে অনুযোগ। সত্যি সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। সে বেচারা কত ঘুরে ঘুরে আমাদের সন্ধান পেয়েছে। আমরা দুজনেই অসুস্থ শোকাতুরা। এ কারণে সে ঠিক নিজের মেয়ের মত আমাদের আগলে রেখেছিল। ঐ বিদেশে তার ঐ স্নেহ-ভরা হৃদয়ের পরিচয় বারে বারেই পেয়েছি। তাকে ত চিঠি লিখে মান ভাঙালুম। পরদিন সকাল থেকে হৈ-হৈ। টেগোর-হলে অল ইণ্ডিয়া লিটারারী কনফারেন্সের বিরাট আয়োজন। সারা শ্রীনগর জুড়ে হৈ হৈ রব। ফলে দোকানে দোকানে প্রতিযোগিতা। এই মওকায় পচিশ টাকার শাল একশো পঁচিশে বিক্রী হল। প্রথমদিন ৬ই জুলাই রবিবার (১৯৬৯) এই অধিবেশন সুরু হল বেলা দশটায়। প্রথমে কাশ্মীরের চীফমিনিষ্টার সাদিক ভাষণ দিলেন। তার পরে কাশ্মীর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞান স্বাগত জানালেন। এরপর জম্মু ও কাশ্মীরের গভর্নার শ্রীভগবান সহায় বক্তৃতা দিলেন। এরপর সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট শ্রীমান দেবেশ দাস আই সি এস তাঁর সুন্দর

ভাবগর্ভ ভাষণে সকলকে তৃপ্ত করেন। এরপর অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকা ওখানকার কবিদের পুরস্কার দেন। এর পর রাতে সুন্দর একটি লোক-নৃত্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাহিত্যিকদের আনন্দিত করা হয়। সাতই জুলাইও আবার টেগোর-হলে অনুষ্ঠান। ঐ দিন ফাইন আর্টস সম্বন্ধে শ্রীরাসবিহারী সরকার একটি সারগর্ভ ভাষণ দেন। তার পর কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী জে, এম, সাদেক তাঁর বাগানবাড়ীতে আমাদের অর্থাৎ সমস্ত ডেলিগেটদের পার্টি দেন। সে এক বিরাট ব্যাপার। মনোরম উদ্যানে উৎসবের আয়োজন। একধারে ব্যাণ্ড বাজছে "জনগন মন "অধিনায়ক" খানিক দূরে দূরে একটি করে টেবিলে চারজন করে আমন্ত্রিত বসেছেন। একটি টেবিলে ডাঃ উমা রায় ও ডি পি আই এর স্ত্রী মায়া সেনগুপ্তকে দেখে সহর্ষে এগিয়ে গিয়ে আমরা দুজনে আসন গ্রহণ করলুম। কিন্তু কাশ্মীরেও উপনিষদের মহিমা প্রমাণ হল। মিসেস কমলা দাশ সভাপতি দেবেশ দাশের পত্নী এসে আমায় গভর্ণারের টেবিলে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে কাশ্মিরী পণ্ডিত-মণ্ডলী আমি এগারখানি উপনিষদের কাব্যানুবাদ করেছি শুনে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। ঐদিন রাত্রে টেগোর-হলে অদ্ভুত নটরাজ-নৃত্য আমাদের মুগ্ধ করেছিল। শুনলুম ওখানকার আর্ট ডায়রেকটার (বাঙ্গালী) যিনি তিনিই নটরাজ সেজেছিলেন।

এই কাশ্মীর-অধিবেশনে একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল। দুটি বাঙ্গালী ছেলে পদব্রজে এই কাশ্মীরের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের এই কঠিন অধ্যবসায়ে মুগ্ধ হয়ে মিঃ সাদেক তাদের দুটি কাশ্মিরী শাল উপহার দেন। এর পর আরো দুদিন ধরে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়েছিল। লীলা বিদ্যান্ত তাঁর ছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নটনীড় অভিনয় করেন। এটিও আমার ভালো লেগেছিল। এবার ফেরার পালা। এর প আমরা পাঠানকোট থেকে মোটরে অমৃতসর যাই সেখানে জালিয়ানওয়ালাবাগ ও স্বর্ণমন্দির দেখার পা গুরুদাসপুর গড় পথ অতিক্রম করে গেলুম। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের অমর গাথা বন্দী বীর —

"গুরু দাস পুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল তুরাণী সেনার করে—"

এখানকার পথ অতি সুন্দর—। দুপাশে আম গাছ কচি কচি আম। ডালগুলি আমের ভারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। কিন্তু চুরি করার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাশ থেকে প্রহরী বেরিয়ে এসে দাম চাইবে সব গাছ জমা দেওয়া। কিন্তু মূল্য নামে মাত্র চার আনা কিলো। সেখান থেকে আমরা জালিয়ানওয়ালাবাগে গেলুম অতীতের বেদনাদায়ক স্মৃতিতে মন মথিত। যেখানে বন্দুকের গুলির বিন্দুগুলি আজো সেই নৃশংস হত্যা কাণ্ডের সাক্ষী হয়ে বিরাজিত। এর পর গেলুম বিখ্যাত গোল্ডেন টেম্পল—দেখতে। সত্যিই দেখার মত জিনিস। এখানের নিয়ম মাথায় আবরণ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। আমাদের পক্ষে অবগুণ্ঠনের আশ্রয় সহজ। কিন্তু পুরুষরা মাথায় রুমাল বেঁধে নিরস্ত্রক্ষা করছেন। কি অপূর্ব্ব কাজ? সোনার যোড়া মীনার কারুকার্য্য চোখ যেন ধাঁধিয়ে দেয়। দোতলাতেও ঠিক অনুরূপ চিত্র। নিচে তারের যন্ত্র সংযোগে দেবতার স্তব পাঠ হচ্ছে—। চারিধারে বাঁধের নির্ম্মল জলধারা তার পাশে পাশে মর্ম্মরমণ্ডিত পথটি ঠিক ছবির মত দেখায়। মনের পটে ছবিটুকু এঁকে নিয়ে আবার পাঠানকোটে ফিরলুম। তীর্থে গেলে যেমন দেবদর্শন ছাড়াও শত ভক্তের দর্শন মেলে। এই সাহিত্যতীর্থেও আমার সেই শত শত বাণীতীর্থের সহযাত্রীদের স্মৃতিটুকুও আমার জীবনে পরম সম্পদ হয়ে রইল।

মালবৈদ্য ও সর্প-ঐতিহ্য

অবনীভূষণ ঘোষ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী সম্ভূত মালজাতি বাংলার—বিশেষ করে বাংলার পশ্চিম সীমানার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। তাদেরই একটি দলের বংশপরম্পরাগত পেশা হল সাপ ধরা, সাপের খেলা দেখান, সাপ ও সাপের বিষ বিক্রি করা এবং সর্বোপরি সর্পাঘাতের চিকিৎসা করা। এই চিকিৎসা কাজের জন্যে এরা সাধারণ্যে মালবৈদ্য নামে পরিচিত। পুরুষানুক্রমে সাপের সংস্পর্শে আসায় স্বভাবতই সাপের ধরন-ধারণের একটা ঐতিহ্য মালবৈদ্যদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। তা নিয়ে সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করব।

মালবৈদ্যরা সমস্ত সাপকে তিনটি প্রধান দলে ভাগ করেছে—চৌসাপা, বীজকড়ী ও বিষহীন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিরক্ষর মালবৈদ্যদের কাছ থেকে আশা করার প্রশ্নই ওঠে না। কোন সাপের দংশনে মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনার তারতম্যানুসারেই তাদের কাছে ঐ সাপের পরিচয়। কোন সাপের দংশনে মানুষের মরণের সম্ভাবনা বেশী, কোন সাপের দংশনে মানুষের মরণের সম্ভাবনা কম আর কোন সাপের দংশনে মানুষের মরণ হয় না, তদনুযায়ীই সে সাপ মালবৈদের কাছ থেকে গুরুত্বের দাবি করে। এ দৃষ্টি নিছক বাস্তবতাপ্রসূত, সাপ সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টির সঙ্গে অভিন্ন। চৌসাপা মারাত্মক বিষধর সাপ, বীজকড়ী অল্পবিষ সাপ আর বিষহীন নির্বিষ সাপ।

চৌসাপা বলতে মালবৈদ্য বোঝে গোখরো জাতি, কেউটে জাতি, শঙ্খচূড় জাতি ও বোড়া জাতি। গোখরো জাতি অর্থাৎ বিচিত্র বর্ণের গোখরো; কেউটে জাতি অর্থাৎ বিচিত্র বর্ণের শঙ্খচূড়; কেউটে, শঙ্খচূড় জাতি অর্থাৎ বিচিত্রবর্ণের শঙ্খচূড়কে তারা শঙ্খফণীও বলে; বোড়া জাতি অর্থাৎ চন্দ্রবোড়া—আদি সাপ। এখানে উল্লেখ্য, বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে গোখরো ও কেউটে একই প্রজাতিভুক্ত—দুই জাতের সাপ নয়। আর একটি কথা। গোখরো বিচিত্র বর্ণের হয়ে থাকে, কেউটেও বিচিত্র বর্ণের হয়ে থাকে, কিন্তু শঙ্খচূড়ের গায়ে রঙের বৈচিত্র্য খুবই কম। বস্তুতঃ বৃহদাকার গোখরো-কেউটে সাপকেও শঙ্খচূড় মনে করাতে মালবৈদ্যদের এই বিভ্রান্তি ঘটেছে।

কালচ (common krait) নামে একটি মারাত্মক বিষধর সাপ আছে। এ সাপকে কোথাও বলে কালাচ, কোথাও বলে ডোমনাচিতি, কোথাও বা বলে বিষাক্ত চিতা। মালবৈদ্যরা বলে, এ সাপের উপদ্রব বাংলাদেশে ছিল না। কোন অতীতে বন্যার জলে ভেসে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে—এখন বাংলারই একটি সাপ হয়ে গেছে। আজকালকার মালবৈদ্যরা এই কালচ জাতিকে চৌসাপার ভিতর ফেলে, বোড়া জাতিকে চৌসাপার বাইরের একটি জাতি বলে গণ্য করে। তা হলে বর্তমানে মালবৈদ্যের মতে সর্পজাতির প্রধান বিভাগ হল: (ক) চৌসাপা যার মধ্যে রয়েছে গোখরো জাতি, কেউটে জাতি, শঙ্খচূড় জাতি ও কালচ জাতি (খ) বোড়া (গ) বীজকড়ী ও (ঘ) বিষহীন।

আয়ুর্বেদকার সর্পজাতির পাঁচটি প্রধান বিভাগ করেছেন: দর্বীকর, মণ্ডলী, রাজিমৎ, বৈকরঞ্জ ও বিষহীন। আয়ুর্বেদকারের এই বিভাগের সঙ্গে মালবৈদ্য-কৃত সর্পজাতির বিভাগের আমরা তুলনা করতে পারি।

আয়ুর্বেদকার যাকে বলেছেন দর্বীকর, মালবৈদ্য মতে তা হল কলন্ড-ভিন্ন চৌদাপা; আয়ুর্বেদকারের মণ্ডলী হল মালবৈদ্যের বোড়া; আয়ুর্বেদকারের রাজিবৎ মালবৈদ্যের কালচ; আয়ুর্বেদকারের বৈকরঞ্জ মালবৈদ্যের শীষণ্ডী; আর বিষহীন তো দুজনেরই সমার্থক।

তখনকার প্রচলিত বর্ণাশ্রম অনুসারে আয়ুর্বেদকার সাপকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভাগ করেছেন। মালবৈদ্যকেও সাপের অনুরূপ কাল্পনিক ভাগ করতে দেখা যায়। তারা চারটি ভাগের নাম দিয়েছে: বামনা, হাড়িয়া, বইরা ও চাঁড়ালিয়া।

সাপের দাঁত ভেঙে গেলে সেখানে নূতন দাঁত বের হয় না। মাটির মধ্যে লুকায়িত বা অংশত উদ্‌গত দাঁতের অঙ্কুর বড় হয়ে ভাঙা দাঁতের স্থলাভিষিক্ত হয়। সাধারণ নিরেট দাঁতের মত বিষদাঁত সম্পর্কেও একথা খাটে। মালবৈদ্যরাও এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। তারা সাপের তিন ধরনের দাঁতের কথা বলেছে কামড়া দাঁত, বিষদাঁত ও কুড় দাঁত। কামড়া দাঁত সাধারণ নিরেট দাঁত, বিষদাঁত আমরা বুঝি, কুড় দাঁত মাড়ির মধ্যে লুকায়িত বা অংশতঃ উদ্‌গত অঙ্কুর দাঁত।

বিশেষ করে সর্পাঘাতের চিকিৎসারক্ষেত্রেই মাল বৈদ্যরা জনসাধারণের সমীহ আদায় করে থাকে। আমাদের দেশে ওঝারাও সর্পদংশনের চিকিৎসা করে। কিন্তু তাদের চিকিৎসাবিধি আর মালবৈদ্যদের চিকিৎসাবিধির মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। সচরাচর যারা ওঝাগিরি করে, তাদের জীবনে সাপের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। সেজন্যে সর্পাঘাতের চিকিৎসায় তাদের প্রধান সম্বল তন্ত্রমন্ত্র—নিছক বুজরুকি বলতে পারি। সাপ মালবৈদ্যদের নিত্যসঙ্গী। সাপে এদের দংশন করে—এবং সে দংশনের চিকিৎসাও তাদের করতে হয়। এ চিকিৎসাবিধি সম্পূর্ণ কার্যকর হতে না পারে। কিন্তু সাধারণ ওঝার সর্পদংশনের চিকিৎসার মত তাতে বুজরুকির স্থান থাকতে পারে না। মালবৈদ্যদের চিকিৎসাবিধির সঙ্গে তাদের নিজেদেরই যে জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত থাকে। আজকাল কোন কোন মালবৈদ্য দু পয়সা বেশী রোজগারের লোভে তন্ত্রমন্ত্রের আশ্রয় নেয় বটে, কিন্তু সেটা সাধারণ রীতি নয়। মালবৈদ্যরা অহংকারের সঙ্গে বলে, তারা তন্ত্রমন্ত্রের ধার ধারে না। এমন কি জড়িবুটিতেও তারা বিশ্বাস করে না। বিষ নষ্ট করার ব্যাপারে নয়, বিষ-চিকিৎসায় সহায়ক হিসাবে দু-একটি গাছের আশ্রয় নেয়।

অতীতে তাগা-বাঁধা ও রক্তমোক্ষণ ছিল সর্পাঘাতের চিকিৎসায় প্রধান কার্যকর উপায়। অতীতে বলি কেন, যেখানে রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত বিষ-নিরোধক ওষুধ সরাসরি রক্তে ইনজেকশন করে দেওয়ার ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে না, আজও সেখানে তাগা-বাঁধা ও রক্তমোক্ষণই প্রধান কাযকর উপায়। অতীতে ও আজও মালবৈদ্যরা সর্পাঘাতের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা বা তার কিছুটা রকমফের অবলম্বন করে থাকে। বিষধর সাপ ধরতে যাওয়ার সময় তারা সঙ্গে শণের বা পাটের পাকান লম্বা দড়ি রাখে, একটা ছুরিও রাখে। ঘটনাক্রমে বিষধর সাপে দংশন করলে দষ্টস্থানের উপরে—চার আঙুল উপরে পরপর তারা ঐ দড়ি দিয়ে দুটি বা তার বেশী বাঁধন দেয়। একে ডোর বা তাগা-বাঁধা বলে। তার পর ছুরি দিয়ে দষ্টস্থান কেটে রক্ত বের করে দেয়।

মালবৈদ্যরা সর্পাঘাতের চার রকম চিকিৎসা করে: ধুবি, সাঁতি, শিং, ও বেড়ি।

ধুবি চিকিৎসায় দষ্টস্থানে একটুকরো জলন্ত কাঠ বা কয়লা চেপে ধরা হয়। এতে বিষ নষ্ট হয়ে যাবে, মালবৈদ্যরা বলে বিষ "সাহাধ্য" হয়ে যাবে। দষ্টস্থানে তপ্ত লোহাও ধরা হয়। দেশলাইয়ের কাঠি জেলেও ক্ষতস্থান পুড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। ধুবি চিকিৎসা সর্পাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে করা দরকার, বিষ যখন ক্ষতস্থানের মুখে রয়েছে তখনই করা প্রয়োজন। ধুবি চিকিৎসায় বালির পুঁটলি—মালবৈদ্যরা বলে বালির "টোপলা"—আগুনে বেশ গরম করে ক্ষতস্থানে ও তার চারপাশে সেক দেওয়ারও রীতি আছে।

ক্ষতস্থান এবং ক্ষতস্থান থেকে ডোর পর্যন্ত স্থানে স্থানে মালবৈদ্যরা কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে চিরে দেয় যাতে

রক্ত বের হয়ে যায়। রক্তের সঙ্গে বিষও বেরিয়ে যাবে। এ হল সাত্তি চিকিৎসা।

চেরা ক্ষতস্থানে মালবৈদ্যরা নুন দেয়—নুন-মেশান গরম জল দেয়। এটা লক্ষণীয় ব্যাপার। নুন দেওয়াতে রক্ত বের হওয়ায় সাহায্য করে। এ হল পিং চিকিৎসা। সাপের বিষ রক্তের সঙ্গে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। কোন সে অতীতে মালবৈদ্য নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বুদ্ধি দিয়ে সেকথা বুঝেছিল তাই সে ডোরের ব্যবস্থা করেছিল। আর একটি সত্য সে জেনেছিল—সাপের বিষ মানুষের রক্তের সঙ্গে না মিশলে বিশেষ ক্ষতিকর হয় না। সে জন্যে সে দষ্টস্থানে মুখ লাগিয়ে চুষেও রক্ত বের করে।

বেড়ি চিকিৎসার আশ্রয় মালবৈদ্যরা সাধারণতঃ গ্রহণ করে না। তবে ডোরের উপর বিষ ওঠার সম্ভাবনা দেখলে তারা এ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কাস্তে, দা, ছুরি বা অনুরূপ কোন অস্ত্র আগুনে লাল টকটকে করে ডোরের উপর গোল করে পুড়িয়ে দাগ দেওয়াকে বলে বেড়ি চিকিৎসা। প্রয়োজন বোধ হলে অন্যান্য ডোরের উপরও বেড়ি দিতে হবে। মালবৈদ্যরা অনেক সময় লোহা বা তামার বেড়ি পুড়িয়ে দষ্টস্থানের উপর আট করে দেয়।

খুবি, সাত্তি, পিং ও বেড়ি—অবস্থা বুঝে মালবৈদ্যরা এই চারটি চিকিৎসার সাহায্য নেয়। কখনও বা একটির বেশী সাহায্য নিতে হয়।

বিষধর সাপ—এমন কি মারাত্মক বিষধর সাপ দংশন করলেই মানুষ মরতে বাধ্য নয়। মারাত্মক বিষধর সাপে দংশন করেছে, কিন্তু ঠিকমত দংশন করতে পারে নি। ঠিকমত দংশন করতে না পারায় ঠিকমত বিষ—মৃত্যুকর মাত্রায় বিষ ঢালতেও পারে নি। সুতরাং দষ্টব্যক্তির বেঁচে ওঠা স্বাভাবিক। আজও অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি একথাটা বোঝেন না। কিন্তু নিরক্ষর মালবৈদ্য বোঝে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বোঝে। বিষধর সাপের সব দংশনই তারা একইভাবে দেখে না। তাদের মতে বিষধর সাপের দংশন তিন ধরনের হয়ে থাকে: ছোলা, টানা ও টিপা।

বিষধর সাপে ছোবল মেরেছে—মালবৈদ্যরা বলে "ছোঁ" দিয়েছে—কিন্তু ঠিকভাবে না লাগায় সামান্য একটু ছাল উঠে গেছে। এ হল ছোলা কামড়। ছোলা কামড়ে দেহে বিষ ঢোকার সম্ভাবনা ওঠে না। বিষধর সাপে ছোবল মেরেছে। কিন্তু মানুষটি দেহ টেনে নেওয়ায় অথবা অবস্থাবিশেষে ছোবল ঠিকমত না পড়ায় মাত্র আঁচড়ের দাগ পড়েছে···ফোঁটা রক্তও বের হয়েছে। একে বলে টানা বা আঁচড়া কামড়। এ দংশনেও দেহে বিষ ঢোকে না—ঢুকলেও মৃত্যুকর মাত্রায় বিষ ঢুকতে পারে না। এ দষ্টব্যক্তি আপনা থেকে অথবা সামান্য শুশ্রূষায় বেঁচে ওঠে। বিষধর সাপে ছোবল দিয়েছে, ঠিকমতই দংশন করেছে। গভীর ক্ষত দেখা যাচ্ছে। এ টিপা কামড়। এ দংশনে মৃত্যুকর পরিমাণ বিষ আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করতে পারে। সুতরাং চিকিৎসার দরকার। মালবৈদ্যরা বলে, ছোলা ও টানা কামড়ে চিকিৎসার দরকার হয় না। তারা আরও বলে, তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে যেসব সর্পদষ্ট ব্যক্তি বেঁচে যায় বলে দাবি করা হয়, তাদের দংশন ছোলা বা টানা। কোন কোন মালবৈদ্য ছোলা, টানা ও টিপার পরিবর্তে যথাক্রমে উবো, কালি ও সাট শব্দ ব্যবহার করে। মালবৈদ্যের ছোলা, টানা ও টিপা কামড়ের সঙ্গে আয়ুর্বেদকারের অবিষ, রদিত ও সর্পিত দংশন তুলনীয়।

মালবৈদ্যরা আর একটি খুব বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলে। রোগীকে আদৌ সাপে দংশন করে নি কিন্তু সে ভেবেছে সাপে তাকে দংশন করেছে অথবা তাকে বিষহীন সাপে দংশন করেছে অথবা তাকে বিষধর সাপে দংশন করলেও দেহে বিষ ঢোকে নি। নিছক ভয়ে এসব ক্ষেত্রেও রোগীর দেহে নানা ক্ষতিকারক লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। এ অবস্থাকে মালবৈদ্যরা বলে বিষ পরপাট। আয়ুর্বেদকার এ অবস্থাকে বলেছেন সর্পাঙ্গাভিহত।

মালবৈদ্যরা বলে, বিষ "তাওয়ায়" পড়ে গেলে রোগীর দেহে জীবনের কোন বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না; তবে "মহাপ্রাণী" সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহ অনেকক্ষণ ত্যাগ করে না। সেজন্যে এসব রোগীকেও তারা দাহ

করতে বা গোর দিতে বারণ করে। মৃত বলে পরিগণিত এসব রোগীর জন্তে তারা জলসার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এ চিকিৎসার রোগীর মাথার বা সর্বাঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একনাগাড় জলের আসরে অর্থাৎ ধারানি দেওয়া হয়ে থাকে। জলসার অন্তিম চিকিৎসা।

জলসার আবার দু রকম—শীতলবিধি আর উষ্ণবিধি। শীতলবিধিতে রোগীর দেহে ঠাণ্ডা জলের ধারানি দেওয়া হয় আর উষ্ণবিধিতে দেওয়া হয় গরম জলের ধারানি। সামান্ত চেতনা থাকলে অথবা দেহে তাপ থাকলে বোধহয় শীতল জলসারের বিধি, নতুবা বোধহয় উষ্ণ জলসারের বিধি।

কৌতূহল জাগতে পারে, এই জলসার চিকিৎসার কোন কার্যকরতা আছে কিনা? আজকের দিনে জলসার চিকিৎসা অবান্তর, অবাঞ্ছনীয়ও বটে। তবে অতীতে জলসার চিকিৎসার একটা ভাল দিক ছিল। জলসার প্রকৃতপক্ষে সর্পবিষের চিকিৎসা নয়, বিষ পরগাই অবস্থার চিকিৎসা। যেসব মানুষ ভয়ে অচেতন হয়ে পড়ত, নিরপর অজ্ঞলোক যাদের মৃত বলে জ্ঞান করত, তাদের চৈতন্ত ফিরিয়ে আনার অতি স্থূল উপায়—অসাড় দেহে সাড় জাগানর অতি স্থূল প্রয়াসমাত্র। সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে দাহ না করে অথবা কবর না দিয়ে তাকে কলাগাছের ভেলায় অথবা অন্ত কোনভাবে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার রীতি আমাদের দেশে আছে। অতীতে এই রীতি সর্পাঘাতে মৃত বলে গণ্য বহু ব্যক্তির প্রাণ বাঁচিয়েছে—আজও কোন কোন ক্ষেত্রে তা করে থাকে।

দেশাত্মবোধ

অশোক চট্টোপাধ্যায়

বর্তমানকালে যাঁহারা প্রৌঢ় ও বয়স্ক ভারতবাসী তাঁহাদিগের জন্মের পূর্ব্বে ভারতের সর্বত্রই ইংলণ্ডেশ্বরীকে সম্রাট বলিয়া খুশীমনে স্বীকার করা হইত। রাজভক্তি তখন বড় চাকুরে খয়েরখাঁদিগের প্রাণে প্রবলভাবে জাগ্রত ছিল ও তাহাদিগের সম্বন্ধেই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গান বাঁধিয়াছিলেন

আমরা সব রাজভক্ত, রাজভক্ত
বলে চেঁচাই উচ্চ রবে.
নইলে যে চাকরী যাবে,
নইলে যে চাকুরী যাবে।

যাঁহারা চাকরী করিতেন না অথচ ইংরেজকে ভারতের অধীশ্বর বলিয়া ভক্তিভয়মিশ্রিত আবেগে উচ্চাসনে বসাইয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন; তাঁহাদের হইয়া কবি গাহিয়াছিলেন

সাধে কি বাবা বলি
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়

সুতরাং ভারতের অনেক মানুষ লোভ ও ভয় এই দুই কারণে ইংলণ্ডকে রাজনৈতিক মহাতীর্থক্ষেত্র বলিয়া মনে করিত এবং যে সকল ভারতবাসী ঐ মনোভাবকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাঁহারা সকল ভারতীয়কে নিজ দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে বলিতেন। বিদেশীর দাসত্ব করা ও বিদেশীকে নিজ দেশবাসী অপেক্ষা উচ্চস্তরের মানুষ বলিয়া চিন্তা করা যে কতটা আত্মসম্মান-হীনতার পরিচায়ক তাহা অনেক বিখ্যাত ভারতসেবক-গণ সেই সময়ে বলিয়া বলিয়া দেশবাসীকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। ফল কখন কখন ভাল হইত; আবার অনেক সময় শুধু অরণ্যে রোদনই হইয়া শেষ হইত।

বাজরে শিঙা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
চীন ব্রহ্মদেশ ক্ষুদ্র সে জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

ঐ কবিতা লেখার পরে চীন ও জাপান মহাশক্তিশালী জাতি হইয়া উঠিয়াছে, এবং ভারত আরও বহুকাল দাসত্বশৃঙ্খল কণ্ঠহার করিয়া পরিয়া থাকিয়া কোনমতে একটা খণ্ডিত দেশ নিজ শাসনে লইয়া আসিবার অধিকার অর্জন করিয়াছে। কিন্তু দাসমনোভাব অনেকটা থাকিয়া গিয়াছে; অন্তত: দরবারে, দপ্তরে, আদালতে ও রাষ্ট্রীয় সভাসমিতিতেও কোথাও কোথাও। এটা মনের গতির দোষ। আত্মসম্মানবোধ একবার নষ্ট হইয়া যাইলে তাহার পুনরুদ্ধার সহজ হয় না। বিদেশীর হুকুম মানিয়া চলার ও বিদেশীর ধমকী হজম করিয়া আনন্দে বিচরণ করিবার অভ্যাস একবার মানুষের চরিত্রে যদি শিকড় গজাইয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হয় তাহা হইলে চরিত্রের শুদ্ধি অত্যন্তই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বিদেশীভক্ত মানুষের অন্তরে যথার্থ স্বাধীনতার আকাঙ্খা অথবা আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা আর কিছুতেই প্রাণবান হইতে চাহে না। সেই অবস্থায় ইংলণ্ডের পূজা সম্ভব না হইলে আমেরিকা, রাশিয়া অথবা চীন তাহার স্থান অধিকার করে। ইংলণ্ডের সৈন্যবাহিনীকে যেমন পূর্ব্বে মনে হইত আমাদের নিজস্ব বাদশাহী পল্টন; এখন অপর কোন বিদেশী সেনাদলকে রক্ষক অথবা ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইংলণ্ডেশ্বর তখন যেমন প্রভু ছিলেন

এখন প্রভু হইবেন অপর কোন দেশের কোন রাষ্ট্রপতি অথবা জননেতা। দাসমনোভাবের প্রধান লক্ষণ হইল পরপদলেহন আগ্রহ। ইহার কোন চিকিৎসা আছে কিনা আমরা জানিনা, তবে মনে হয় অপর সকলপ্রকার মনের শিক্ষা-দীক্ষার মতই স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান-বোধও চেষ্টা করিলে আয়ত্ত করা যাইতে পারে। শুধু দাসমনোভাব যত অধিক গভীরভাবে কোন মানুষের হৃদয়ে নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধনা করিয়া অপসারণ করিতেও তত অধিক সময় লাগিতে পারে। যে কথা শুধু ভাবিলেই শুদ্ধ চরিত্র স্বদেশভক্ত মানুষের মনে প্রবল ঘৃণার উদ্রেক হয়; দাসমনোভাবাক্রান্ত ব্যক্তি তদ্গতচিত্তে সেই কথাই রসাইয়া রসাইয়া উপভোগ করিতে সক্ষম হয়। তাহার অন্তরে নিজেকে অপর দেশের লোকের গোলাম মনে করিতে কোন ঘৃণা বা অপমান অনুভূত হয় না। "ইংলণ্ডের রাজা আমাদের রাজা" বলিতে লজ্জা ত হয়ই না বরঞ্চ অধিক করিয়া গৌরব-বোধই হয়। "ইংলণ্ডের সৈন্যদল আসিলে আমরা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব"; একথাও ভাবিতে যাহারা মনে মনে বিদেশীর গোলাম তাহাদের কোন আত্মমর্য্যাদার হানি বোধ হয় না। মনের অবস্থা কিরূপ হইলে মানুষ অপরের পদতলে থাকিলে আনন্দ অনুভব করে তাহা যাহাদের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ও উন্নত তাহাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নহে। ইংলণ্ড আমাদের উপর প্রায় দুইশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে সুতরাং ইংলণ্ডের প্রভুত্ব আমাদের দেশের গ্রাম্যলোকেরা এক-প্রকার মানিয়াই লইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত শহুরে লোক রুশিয়া, আমেরিকা বা চীনের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া ঐ সকল দেশের লোকেদের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ সকল দেশের লোকেদের সহিত মিলিত হইয়া নানান প্রকার দেশদ্রোহীতামূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেছেন। ইহা দেখিয়া মনে হয় বিদেশীর প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধার কথাটাই আসল কথা নহে; আসল আকর্ষণ হইল নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি চেষ্টা। যে উপায়েই হউক স্বদেশবাসীদিগের উপর নিজে প্রভুত্ব স্থাপন করিতেই হইবে; স্বদেশ শাসনক নিজেদের করায়ত্ত করিতেই হইবে। তাহার জন্য য বিদেশের কোন নেতাকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া মানি লইতে হয়, অথবা বিদেশী সৈন্যবাহিনী এদে আনিবার ব্যবস্থা করিতে হয় ত তাহাও করা হইবে ছলে বলে কৌশলে, আত্মসম্মান বিসর্জ্জন অথবা আ বিক্রয় করিয়া—যেমন করিয়াই হউক আত্মপ্রতি করিতেই হইবে। আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ হইল নিজে সম্মান ও মর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিয়া চলা। কি অনেক মানুষ আছে যাহারা গ্রামে মোড়ল হইলে জেলার সদর আদালতের পেয়াদাদিগের চাটুকারিত করিয়া দিন গুজরাণ করিতে কোন লজ্জা বোধ কর না। অর্থাৎ নিজ দেশে প্রতিষ্ঠাসৃষ্টিই অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। তজ্জন্য অন্য দেশের গোলামী করিতে হইলেও তাহাতে আফসোসের কিছু থাকিবে না। এই-রূপ আগ্রহের মূলে যে নীচতা থাকে তাহা হীনচরিত্রের পরিচায়ক। এবং এই জাতীয় মানুষ কখন পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

এখন দেখিতে হইবে ভারতে কত লোকের প্রাণে ঐ-পরদাসত্বরস পিপাসা জাগ্রতভাবে বর্ত্তমান আছে। যদি ভারতের জন সংখ্যার অধিকাংশের মনেই পরপদ-লেহন স্পৃহা প্রবল আকারে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠ স্বদেশভক্ত ও আত্মসম্মানজ্ঞানবান ব্যক্তি-দিগের পক্ষে ভারতে বাস করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাহাদিগকে তখন সেইভাবেই আর একটা স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে যেরূপ পূর্ব্বকালে বৃটিশের বিরুদ্ধে হইয়াছিল। তবে আমাদের মনে হয় না যে ভারতের অধিকাংশ বাসিন্দাই পরদাসত্ব-অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে। ষাট বৎসরের স্বাধীনতার প্রয়াস কখনও নিষ্ফল হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না। ইহা ব্যতীত মানুষের অন্তরের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণা তাহাও মানুষকে স্বাধীনতার পূর্ণতম উপলব্ধির দিকেই লইয়া যায়। অপরের কথায় ওঠা-বসা কোন ব্যক্তিরই প্রাণের আকাঙ্খা হইতে পারে না। সেই

জন্যই এখন প্রয়োজন হইয়াছে যাচাই করিয়া দেখা যে কে বা কাহারা বিদেশের গুপ্তচরদিগের প্ররোচনায় বিদেশীর অভিপ্রায় ও অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে আত্মনিয়োগ করিতেছে। এবং তাহা পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হইলে ঐ অসুস্থ মনোভাবের চিকিৎসার ব্যবস্থা কি হইতে পারে তাহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য হইবে।

যাহারা মনে করেন হিংস্র আক্রমণ করিয়া অপরকে নিজ মতে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেওয়াই রাষ্ট্রক্ষেত্রের মতবাদ প্রচারের শ্রেষ্ঠ পন্থা, আমরা তাঁহাদিগের সহিত এক মত নহি। আক্রমণ করিলে শত্রুতা জাগ্রত হয় এবং আক্রমণের ভয়ে মানুষ প্রতিবাদ না করিতে পারে সাময়িক ভাবে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে আক্রান্ত মানুষ সর্ব্বদাই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধবাদীই থাকিয়া যায়। মতের আনুকূল্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উপায় বুঝাইয়া বুঝাইয়া মানুষকে মত পরিবর্ত্তন করিতে শিখান। যে সকল ব্যক্তি গায়ের জোরে মতবাদ প্রচার করিতেছেন তাঁহাদের ছুরি ছোরা বন্দুক বোমাই তাঁহাদের প্রবলতম সমালোচনা ও বিরুদ্ধবাদ সৃষ্টির অস্ত্র। এই কারণে জাতীয়তাবাদী দেশভক্ত ব্যক্তিগণ যদি কোন প্রকার জোর জুলুম না করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে দেশপ্রেম প্রচার করেন তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে দেখা যাইবে বহুলোক তাঁহাদিগের সহিত একমতাবলম্বি হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আক্রমণের উত্তরে প্রত্যাক্রমণ করাই স্বাভাবিক এবং মানুষ কোন চিন্তা না করিয়াই প্রত্যাক্রমণে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই আগ্রহ দমন করা আবশ্যক। যেখানে অপরিণত বয়স্কদিগকে ভয় দেখাইয়া ও ভুল বুঝাইয়া নূতন মতবাদের দিকে লইয়া যাওয়া হইতেছে, সেখানে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা ও সমাজ-বিজ্ঞান ব্যবহারে আমাদের সকল দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিয়া প্রচারকার্য্য সাধন করিতে হইবে। আমরা সহজেই দেখাইতে পারি যে ভারতের ঐতিহ্যই তাহার অন্তরের আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সত্যকার মানবীয় আভিজাত্য মনের সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য। তাহার সহিত আর্থিক আধিক্যের কোন সম্বন্ধ নাই। বরঞ্চ বলা যাইতে পারে যে আর্থিক পুঁজিপাটার সহিত আভিজাত্যের প্রতিকূলতাই প্রধানতঃ লক্ষণীয়। বড়বাজারের, ডালহৌসি স্কোয়ারের অথবা দালাল ষ্ট্রীটের আবহাওয়া ঠিক আভিজাত্যের পরিচায়ক বলিয়া কেহ মনে করিতে পারে না। সারনাথ, নালন্দা, অজন্তা অথবা মহাকবি কালিদাসের কাব্য; কোন কিছুই ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যবাহুল্য হইতে গঠিত বা রচিত হয় নাই। ভারতীয় মানুষের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও প্রেরণা হইতে যাহা জন্মিয়াছে তাহার ধারা যুগযুগান্তর ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে এবং তাহার সহিত তুলনায় আর্থিক বা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার মূল্য অল্প বলিয়াই বিচার করা হইবে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় উপায় হিসাবে ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব করিয়া মানুষের সৃজনী-শক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া দিবার যে চেষ্টা তাহা হইতে ভারতীয় মানবের কোন লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। অল্প সময়ের জন্য কোন কোন ক্ষুদ্র গণ্ডির মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হইলেও সে লাভ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না।

ইংরেজীতে বলে **selling one's soul for a mess of pottage** অর্থাৎ আত্মবলিদান করিয়া এক বাটি ছাতু আহরণ। বৃহত্তর স্বার্থ ভুলিয়া যদি কেহ ক্ষুদ্রতর প্রাপ্তির দিকে হস্তপ্রসার করে তাহা হইলে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা কেহ করিতে পারে না। আমরা যে শুধু বর্ত্তমান কালেই এইরূপ নির্বুদ্ধিতা করিয়াছি তাহা নহে। অতীতেও আমরা বহুক্ষেত্রে উচ্চস্তরের মঙ্গলের কথা অবহেলা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে ছুটিয়া গিয়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক অকল্যাণকে ডাকিয়া আনিয়াছি। ভারতের যে জীবনের ধারা ও অগ্রগমনের পথ তাহা আধ্যাত্মিক আগ্রহের ও কৃষ্টির বৈচিত্রের পথপ্রদর্শক ও নির্দ্দেশক। তাঞ্জোর, শ্রীরঙ্গমের মন্দির, মহাবল্লিপুরমের অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য ইলোরা ও অজন্তা; কিম্বা বিষ্ণুপুরের চিত্রময় ইষ্টক ও টালি, ইতমতদ্দৌলার পাথর বসান অপরূপ কারুকার্য্য, বেনারসের রেশম কিংখাব ও কাশ্মীরের শাল গালিচা ভারতীয় শিল্পীর যে রসঅনুভূতি বাস্তবে ব্যক্ত করে, তাহার সহিত অর্থলোলুপতা কিম্বা মানুষ মানুষকে খাটাইয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে প্রভৃতি অতি সাধারণ আর্থিক প্রচেষ্টার কোন অন্তরের

ঘনিষ্ঠতা নাই। ঘরে বসিয়া ছেঁড়া কাপড়ের সুতা দিয়া কাঁথা সেলাই করা, আলপনা দেওয়া মাটির বা কাঠের অতি অল্প মূল্যের খেলনা তৈয়ার করা প্রভৃতি বহুকথা কৃষ্টির আলোচনায় উত্থিত হয় যাহার সহিত সাম্রাজ্য বিস্তার অথবা আর্থিক শোষণরীতির কোন সম্বন্ধ নাই। প্রাচীন গ্রীসে অথবা চীন ও পারস্যে যেমন মানুষ নিজের নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যকলাপের মধ্য দিয়া নিজেদের সৌন্দর্য্যবোধ, কর্ম্মকৌশল ও শিল্পকলার প্রতিভা ও প্রেরণা ব্যক্ত করিত, ভারতেও তেমনই চলিয়া আসিয়াছে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া। শ্রমিক ধনিকের অথবা রাজা প্রজার প্রতিষ্ঠা বাজারে ও দরবারে থাকিলেও উপমার ভাষায় বলা যাইতে পারে যে ভারতের জীবনের ধারা তাহাদিগের নেওয়া দেওয়া আদেশ নির্দ্দেশ কোথাও কোথাও কালস্রোতে প্রোথিত কাষ্ঠ-স্তম্ভের মতই রাখিয়া দিয়া নিজের মনের আবেগে নিজেই বহিয়া চলিয়াছে। সে গতিকে রুদ্ধ বা তাহার পথ পরিবর্ত্তন করাইবার ক্ষমতা পাড়-ঘেঁষা কাঠের খোঁটার মধ্যে কোনওদিনই দেখা যায় নাই।

ব্যাকরণ, কাব্য সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, অথবা রন্ধন, সূচিশিল্প, সাজপোষাক, অলঙ্কাভরণের কলা-কল্পনা ও রচনাকৌশল কোনও দিন কে কত অর্থ অর্জ্জন করিল কিম্বা করিল না, তাহার উপর নির্ভর করে নাই। অতি গরীব যে সেও অনেক সময় পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাজে পূজার অর্ঘ্য পাইয়াছে এবং সভ্যতা ও কৃষ্টির অপরাপর ক্ষেত্রেও মানুষের উপার্জ্জন দিয়া তাহার বিদ্যা বা প্রতিভা কদাপি সীমাবদ্ধ হয় নাই। যদিও একথা সত্য যে পুরাকালে রাজা মহারাজারা পণ্ডিত ও গুণী-লোকেদের সমাদর বিশেষভাবেই করিতেন, তাহা হইলেও সে সমাদর পণ্ডিত ও গুণীলোকেরা পাণ্ডিত্য বা অপরক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিবার পরেই পাইতেন। কৃষ্টির বিভিন্ন আদর্শের অনুসরণ গুণীলোকেরা নিজ চেষ্টাতেই করিতেন; ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদের সাহায্যে ও সহায়তায় নহে। যে মানুষের ভিতরে নিজস্ব আগ্রহ, আকাঙ্খা, আবেগ বা প্রেরণা থাকিত না তাহাকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দিলেও তাহার দ্বারা কোন কিছুই সাধিত হইত না। বলা যাইতে পারে যে ভোগের আকর্ষণ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির উপর অধিক করিয়া পড়ে বলিয়াই তাহার পক্ষে ব্যাকরণ দর্শন কাব্য অথবা চৌষট্টি কলার চর্চ্চা ও আশ্রয়গ্রহণ ততটা সহজ হয় না। মন তাহার ভোগের দিকেই সতত আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র গৌতম অসীম ঐশ্বর্য্য ও ভোগের সমারোহ অগ্রাহ্য করিয়া দিব্যজ্ঞানের সন্ধানে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিকতার প্রেরণাজাত আবেগে শত সহস্র বিত্তবান ব্যক্তি যুগে যুগে মন্দির, মঠ, ধর্ম্মশালা, জলাশয়, অন্নচ্ছত্র, অনাথআশ্রম প্রভৃতি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীতে সম্ভবত যেসময় বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিদ্যাকেন্দ্র কোথাও ছিল না; ভারতে সেই সুদূর অতীতে তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে সহস্র সহস্র ছাত্র-শত শত মহাপণ্ডিত অধ্যাপকদিগের নিকট বিদ্যা-অর্জ্জনে নিযুক্ত থাকিত। ধনৈশ্বর্য্যের এইরূপ শিক্ষা-প্রসারার্থে ব্যবহার সমাজসেবার উন্নততম নিদর্শন। বৌদ্ধযুগের মানব ব্যক্তির অধিকার ও ভোগস্পৃহা পরিহার করিয়া যে সংঘের শরণে বা আশ্রয়ে গমন করিতেন তাহার মূলে কোন অর্থনৈতিক সাম্যের আকাঙ্খা ছিল না। আর্থিক সাম্যকে কোন উচ্চস্থান না দিয়া সংঘের প্রগতির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এক ভারতবর্ষকেই ২৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে জীবন পথে চলিতে দেখা গিয়াছিল। বর্ত্তমানকালে যাঁহারা সাম্যের আদর্শকে পূর্ণরূপে একটা আর্থিক ব্যবস্থায় পরিণত করিতে চান তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে আর্থিক সাম্য অথবা জীবনযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব অঙ্গের সমান সুবিধায় সাম্য আরব্ধ হইলেও সকল ব্যক্তি দেহে মনে প্রাণে সমান অধিকার প্রাপ্ত হ'ন না। ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র গণ্ডিগত প্রভুত্ব ঐ জাতীয় অর্থনৈতিক সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকিতে পারে। সমাজের অধিকাংশ মানুষই এই অবস্থায় পরের হুকুমে চলিতে বাধ্য হইতে পারে এবং হুকুম না মানিলে শিরশ্ছেদ ও নির্ব্বাসন দণ্ড রাষ্ট্রীয় শাসন কার্য্যের প্রাত্যহিক অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। সম্রাট অশোক

যখন ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শে রাজ্যশাসন অথবা সাম্রাজ্য-প্রসার করিতেছিলেন তখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি গোষ্ঠী বৌদ্ধধর্ম্ম বা বৌদ্ধ সামাজিকপ্রথা ও পন্থার বিরুদ্ধতা করিলে দণ্ডনীয় হইত বলিয়া ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরঞ্চ ইহাই মনে হয় যে পিয়দাস দেবনমপিয় সম্রাট অশোক ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজ-মতবাদ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করিতেন না। সুতরাং যাঁহারা মতবাদপ্রচার গায়ের জোরে করিতে চাহেন তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতির সহিত ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিদের "তলোয়ার ও পুস্তক" পন্থার সাদৃশ্য থাকিলেও ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্য ও আদর্শ তাঁহাদের কার্য্যকলাপের সমর্থন করে না। মতবাদ সর্ব্বদাই অন্তরের কথা। অন্তরের পথ তলোয়ার বন্দুক দিয়া উন্মুক্ত করা যায় না। গায়ের জোর শুধু শরীরের উপরই প্রযুক্ত হইতে পারে। হিংসা কখন সফল হইয়া আক্রান্তজনের হৃদয়ে প্রেমের ঘনিষ্ঠতারূপে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না। হিংস্র উপায় অবলম্বন পরাজয় স্বীকার করার প্রমাণ। কারণ যাহার মতবাদ স্বতঃসিদ্ধ তাহাকে গায়ের জোরে মতবাদ প্রচার করিতে বা চালাইতে হয় না। উৎকৃষ্ট ও কল্যাণময় মতবাদ নিজগুণে সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইয়া থাকে। তলোয়ার ও বিস্ফোরক ব্যবহার তখনই আবশ্যক হয় যখন মতবাদের গুণ সম্বন্ধে মানবমনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জাগ্রত হয়।

স্বদেশী-আন্দোলনের সময় কাহারও মস্তকে লাঠি মারিয়া বুঝাইতে হয় নাই যে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে" নিতে হয়। যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বৃটিশকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিয়া-ছিলেন তাঁহারাও চাহিয়াছিলেন "বেঁচে থেকে ভাই সুখ কি আছে লাগুক জীবন দেশের কাজে; জীবন দিলে জীবন পাবে, হোক জনম সফল।" বৃটিশের অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া তরুণ ছেলেমেয়েরা গাহিত "আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবে আমি কি মা'র সেই ছেলে; দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি, কে পালাবে, মা ফেলে।...যখন মুদে নয়ন করব শয়ন শমনের সেই শেষ কোলে, তখন সবই আমার হবে আঁধার স্থান দিও মা ঐ কোলে।" মাতৃভূমির গৌরব উপলব্ধি করিয়া কবি গাহিয়াছিলেন "জানিনে তোর ধন রতন, আছে কিনা রাণীর মতন; শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে; সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।" মাতৃভক্তি, দেশভক্তি কাহাকেও দীর্ঘ ন্যায়বিচার কিম্বা দার্শনিক বিতর্ক করিয়া শিখাইতে হয় না। শুধু মানব-প্রাণে তাহা নিজ হইতেই জাগিয়া উঠে। অপর দেশকে নিজ দেশ অপেক্ষা অধিক আদরের লক্ষ্যস্থল বোধ করিলে অথবা নিজ মাতাকে অবহেলা করিয়া অপর কোন স্ত্রীলোককে মা বলিয়া ডাকিলে তাহা মানসিক অসুস্থতা অথবা হীন মতলব হাসিল চেষ্টার পরিচায়ক বলিয়া বুঝিতে হইবে। "আমার মাকে মা না বলে আমি রামের মাকে মা বলিব।" অথবা "আমার দেশের যা হয় হোক কিছু আসে যায় না; কিন্তু ল্যাপ-ল্যাণ্ডের জয় হোক!" এই জাতীয় কথা কোন লাভের আশায় কেহ বলিতে পারে, অথবা বলে উন্মাদ হইলে।

অতিক্ষুদ্র, শক্তিহীন, গরীবদেশের মানুষও নিজের মাতৃভূমির জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকে। ভারত বিরাট দেশ। তাহার ঐতিহ্য বহু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া প্রসারিত রহিয়াছে। এই যুগেও ভারতের মানুষ সভ্যতায়, শিল্পকলায়, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, নৃত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, আত্মত্যাগে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া একের পর এক করিয়া কত মহামানব এই দেশে জন্মিয়াছেন তাহা ভাবিলেও ভারত-মাহাত্ম্য আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। অতীতের ঋষি ও গুণীজনের জ্ঞান, বিদ্যা ও সৃজনশক্তির কথা না তুলিয়াই বলা যায় যে এই দেশে রামমোহনের পরে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণপরমহংস, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহামতি গোখলে, বালগঙ্গাধর তিলক, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রামন, রামানুজন, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের আবি-র্ভাবে ইহাই প্রমাণ হয় যে ভারতের প্রেরণা ও প্রতিভা চিরজাগ্রত। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে, স্বাধীনতা লাভ

প্রচেষ্টায় শত সহস্র ব্যক্তি আত্মত্যাগের মহানআদর্শ অনুসরণে ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র আমাদের দেশের ইতিহাস আলোকিত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। অর্থ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, ভোগের অধিকার প্রভৃতি বাস্তব স্বার্থের কথা পূর্ব্বকালে কেহই মুখ্য বলিয়া বিচার করিতেন না। নিজেদের স্বাধীনতা, জাতীয় প্রতিষ্ঠা, জগতে দেশবাসীর সম্মানিত স্থান গ্রহণ প্রভৃতিই বড় কথা ছিল। সম্মানিতভাবে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার, উপযুক্ত উপার্জ্জন, ব্যবসা, কারবার ও আর্থিক ক্ষেত্রে ন্যায় অন্যায়ের কথা বৃহত্তর অধিকার বিচারসূত্রেই উত্থিত হইয়াছিল। পরদাসত্ব হইতেই শোষিত হইবার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। অপরের প্রভাব নিজেদের জীবনে প্রবল হইয়া উঠিতে দিলে কোন না কোন সময়ে তাহার ফলে মানুষকে অন্যায়ভাবে আর্থিক-শোষণের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইতেই হয়। এই কারণেই পরমুখাপেক্ষী হওয়া কদাপি বাঞ্ছনীয় হয় না।" রোমের সম্রাট আমাদের সম্রাট। রোমের সেনাদল আমাদের সেনাদল" ভাবিতে আরম্ভ করিলেই অতি শীঘ্র "রোমের থলিতে আমাদের অর্থ" রাখা আরম্ভ হইবে ও তাহাতে আপত্তি করিলে "রোমের চাবুকে আমাদের পৃষ্ঠদেশ ক্ষত বিক্ষত হইবে।" পরপদলেহন মানসিকভাবে আরম্ভ হয় কিন্তু তাহা হইতে বাস্তবক্ষেত্রে দাসত্বের সম্বন্ধ গঠিত হইয়া উঠিতে অধিক সময় লাগে না। দেশভক্তি ও দেশাত্মবোধের পথই উন্নত পথ। নিজের দেশকে "সকল দেশের সেরা" মনে করা মানব-প্রগতির দিক দিয়া সম্যক পন্থা। যেখানে নিজের দেশ বিচিত্র রসে, বর্ণে, আকারে ও ঐতিহ্যে "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী" এবং "স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" সেখানে সহজেই অনুভব করা যায় যে "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি; সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।" কিন্তু যদি বহু যুগ ধরিয়া দেশভক্তির মন্ত্র জপ করিয়াও দেখা যায় যে দেশদ্রোহিতা প্রবল হইয়া উঠিতেছে ও দেশের অনেক মানুষের অন্তর হইতে আত্মসম্মানবোধ বিদেশীর প্ররোচণায় অপসৃত হইয়া যাইতেছে তাহা হইলে কি করা যাইবে?

মানুষ যখন অন্যায় করে তখন সে মনে মনে স্বীকার করিতে চায় না যে সে দোষী। নিজের দোষ ও অপরাধকে আত্মপ্রবঞ্চনার দ্বারা কর্ত্তব্যকার্য্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া লইবার চেষ্টা মনোবিজ্ঞানের অতি সাধারণ ও সদাসর্ব্বদা প্রচলিত মিথ্যার অনুসরণের উদাহরণ। স্বদেশ-বিরুদ্ধতাকে বিশ্বপ্রেম অথবা বিশ্ববাসীর কোন দার্শনিক কারণজাত অধিকারের দোহাই দিয়া শুদ্ধ করিয়া লওয়া আজকালকার দেশদ্রোহীদিগের রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার মিথ্যাভাব প্রকাশের কোনও মূল্য সত্যানুসন্ধানীর নিকট থাকে না। মিথ্যাকে বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকিলে হিটলারের মতে তাহা সত্য হইয়া দাঁড়ায়। এই বিশ্বাসে বহু মিথ্যাবাদী নিজেদের মিথ্যা ক্রমাগত বলিতে থাকে। মিথ্যা অবশ্য কখনই সত্য হইতে পারে না। এবং হয়ত না। কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠাও চেষ্টা না করিলে সাধিত হইতে পারে না। সত্যও ক্রমাগত প্রচার না করিলে তাহার প্রতিষ্ঠার জোর কমিয়া যায়। দেশভক্তি স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাবোধের প্রচার এই জন্য অবিশ্রান্ত ভাবে চালাইয়া চলিতে হয়। বর্ত্তমানে জাতীয়তার সংকটকালে ইহার আবশ্যকতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরের দেশের উপর অধিকার বিস্তারের চেষ্টা সর্ব্বক্ষেত্রেই নিজেদের লাভের জন্যই করা হয়। কিন্তু যাহাতে অধিকৃত দেশের লোকেরা পরের প্রভুত্ব স্থাপন সহজে মানিয়ালয় সেইজন্য তাহাদিগকে বুঝান হয় যে তাহাদের মঙ্গলের জন্যই ঐ ভাবে তাহাদের দেশের উপর বিদেশীর প্রভুত্ব স্থাপন করা হইতেছে। **Pax Romana** অর্থাৎ রোম কর্ত্তৃক স্থাপিত শান্তি অথবা **Pax Britannica** অর্থাৎ বৃটেন কর্ত্তৃক স্থাপিত শান্তি সাম্রাজ্যবাদের পরোপকারের বিজ্ঞপ্তির নাম। রোম ও বৃটেন সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেন সাম্রাজ্য অন্তর্গত দেশগুলিতে শান্তি স্থাপন উদ্দেশ্যে। শান্তি স্থাপন ব্যতীত সভ্যতা বিস্তার, সামাজিক দুর্নীতি নিবারণ, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ইত্যাদি আরও বহু উপকার

অধিকৃত দেশগুলি প্রাপ্ত হইত। আমাদিগের বাল্যকালে **England's Work in India** নামক একটা পুস্তক স্কুলে পাঠ্য করা হইয়াছিল। তাহা পড়িলে দেখা যাইত যে ইংলণ্ড নিছক ভারত উদ্ধারের জন্যই ভারত দখল করিয়াছিল। কালো জাতিগুলির বহু দোষ। সে সকল দোষের বোঝা বহন করিত বেচারা শ্বেতকায় পরদেশ দখলকারীরা। ইহাই ছিল তথাকথিত **Whiteman's Burden**। বোঝার ভিতরে যে লুঠের টাকা থাকিত তাহার কথা ভুলিয়াই চলা হইত। আজকাল যে কারণ দেখাইয়া অপরের দেশ দখল করা হয় তাহাকে বলা হয় **liberate** বা "মুক্তি" দান করা। এইভাবে রুশিয়া আর্মেনিয়া আজেরবাইজান প্রভৃতি নানা দেশকে মুক্তিদান করিয়াছে। চীন তিব্বতকে মুক্তি দিয়াছে। চেকোশ্লোভেকিয়া "মুক্তি" বরদাস্ত করিতে না পারিয়া ভাঙ্গা শৃঙ্খল আবার পরিবার চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু রুশিয়া প্রভৃতি দেশ প্রবল পরাক্রমে চেকোশ্লোভেকিয়ার ঐ অসৎ অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া দেয়। চীনের খুবই ইচ্ছা সারা এশিয়াকে মুক্তিদান করিয়া তাহার বুকের উপর মুক্তির প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু এশিয়াবাসী চীনের এই শুভ অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে বাধা দিতেছে।

অনেক সময় সাম্রাজ্যবিস্তারের মানবতা বিরুদ্ধ অভিপ্রায়কে আভিজাত্যমণ্ডিত করিবার জন্য পাশবিক শক্তিতে বলীয়ান জাতি সকল নিজ নিজ দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকার চিত্রকর প্রভৃতির নাম করিয়া দেখাইতে চাহেন যে তাঁহাদের দেশ ও সভ্যতা উন্নততর। সুতরাং তাঁহাদের পরের উপর প্রভুত্বের অধিকার আছে। কিন্তু কোন সময় কোন মহামানব কোন দেশে জন্মাইলে তাহাতে সেই দেশের অধর্ম্ম বা অন্যায়ের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় না। অত্যাচার, উৎপীড়ন, লুণ্ঠন ও অপরের স্বাধীনতা নাশ করা যে মহাপাপ সেই মহাপাপই থাকিয়া যায়। **Epictatus, Seneca, Virgil** ও **Dante** এর নাম করিয়া রোমের পাপক্ষালন হইতে পারে নাই। **Shakespeare** ও **Newton** দেখাইয়া ইংলণ্ড অপরের দেশে অনুপ্রবেশ করিলে তাহা অন্যায়ই থাকিয়া যায়। **Mencius, Confucius,** কিম্বা **Lao'tse** চীনকে কোন রাষ্ট্রক্ষেত্রের প্রভুত্ব দান করে না। আমরাও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য্য বা অপর ঋষিদের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তাহার আড়ালে কোন মহা অন্যায় করিয়া পার পাইয়া যাইতে পারি না। এক কথায় কোন ব্যক্তি বা জাতির সভ্যতা বা কৃষ্টিজাত বৈশিষ্ট তাহাকে বা তাহাদের অপরের উপর রাষ্ট্রীয় বা আর্থিক প্রভুত্ব করিবার অধিকার দিতে পারে না।

বর্ষামঙ্গল

নিহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

[রবীন্দ্রনাথ ঋতু পূজারী।···

বিশেষতঃ বর্ষা ঋতুর।

বহুদিন বহুকবিতা, গান আর নাটকের মাধ্যমে বর্ষার মেঘকজ্জল সজল-শ্যামল সুস্নিগ্ধ রূপটি আমাদের মানস-লোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এ'প্রচেষ্টা সর্বক্ষেত্রেই সাফল্যলাভ করেছে, কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত ও বিশ্ববন্দিত! এখানে তাঁরই রচিত কতকগুলি বর্ষাঋতু সংগীত দিয়ে বর্ষা-প্রশস্তি করার চেষ্টা করা হ'য়েছে।]

ধরণী চিরদিনের তৃষাকাতরা।···

ক'বে কোন্' বিস্মরণী যুগে তমসাপূর্ণ অন্ধকার-গর্ভে জেগেছিল অনির্বাণ পিপাসা। বার-বার সে তৃষা জাগে পরিক্রমাবর্তের কোন এক মুহূর্তে ;—যখন স্নিগ্ধ-শ্যামল ধরণীর বক্ষ মার্তণ্ডদেবের খরতাপে শুষ্ক, বিবর্ণ, আর নিরস হ'য়ে যায়। বিশীর্ণা প্রকৃতি হ'য়ে পড়ে মুমূর্ষু: ধূ ধূ উষরপ্রান্তর পথে ভেসে চলে তপ্তক্লান্ত উদাসী বাতাসের হু-হু দীর্ঘশ্বাস !···

বিশুষ্ক ঝরা বালুকাপথে বিসর্পিত স্রোতস্বিনীর অবরুদ্ধ ক্রন্দন।

নির্মেঘ নির্মল রৌদ্রক্লিষ্ট আকাশে পিপাসার্ত চাতকের সে কী মর্মন্তুদ করুণ বিলাপ !···

'দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তৃষায় হানে।···

জানি ঝঞ্ঝার বেশে
দিবে দেখা তুমি এসে,
একদা তাপিত প্রাণ।' (গীতবিতান)

চরাচরের ভৈরব ও রুদ্রমূর্তি লক্ষ্য করে ভীত-সন্ত্রস্ত দিগ্বধূরা আকুল নিবেদন জানালো বরুণের দরবারে :

এসো, এসো হে তৃষ্ণার জল
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল
কল কল ছল ছল।···
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা,
এসো বন্ধহীন ধাঁরা
এসো হে প্রবল
কল কল ছল ছল। (গীতবিতান)

দিগ্বধূদের আকুলনিবেদন বরুণদেবের হৃদয়কে হয়তো স্পর্শ করলো।

মার্তণ্ডদেবের অপ্রতিহত তাপ থেকে দগ্ধীভূত প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্যে তিনি বিরাট আয়োজন করলেন গোপনে।

কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ মহাকাল রুদ্রকে প্রসন্ন না করলে এমনি আয়োজন পণ্ডশ্রম হবে। কারণ তার 'নৃত্যের তালেই ঝঙ্কার অংকুর। 'নৃত্যের তালে তালে নটরাজ

ঘুচাও সকল বন্ধ হে,
সুপ্তি ভাঙাও চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।···(গীতবিতান)

মুক্ত-সুরের ছন্দবেগে জেগে উঠ্‌বে যে বিক্ষুব্ধ-আত্মা', তাইত তাপিত প্রাণে আনবে শ্যামলের স্পর্শ !

তপের তাপের বাঁধন কেটে তবেই সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌বে সবুজের নবীন প্রাণ।···

তপের তাপের বাঁধন কাটুক
রসের বর্ষণে ;
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর
করুণ স্পর্শনে।···
পরাণ ভরাণো ঘনছায়া জাল
বাহির আকাশ করুক আড়াল,

নয়ন ভুলুক, বিজলি ঝলুক
পরম দর্শনে। (গীতবিতান)

পরম দর্শনের আকাঙ্খায় উষর প্রকৃতির তৃষিত-আত্মায় জাগ্‌লো বিক্ষুব্ধ আলোড়ন। নদ-নদী, মরু-কান্তার, প্রান্তরপথের একটানা দীর্ঘ হা-হুতাশভরা তাপিত বক্ষ অকরুণ বারিধারায় 'সিক্ত হ'য়ে শান্ত সুশীতল হবার দুর্নিবার বাসনা নিয়ে ব্যাকুলিত হ'য়ে উঠলো দিকে দিকে।... ... ... দুরন্ত পিপাসা, ঊর্দ্ধমুখ তৃষ্ণাকাতর চাতকপাখীদের মত আকুল হ'য়ে বেড়াতে লাগ্‌লো শ্যামছায়া ঘনদিনের নিরুদ্দিষ্ট আশায় :

এসো শ্যামছায়া ঘন দিন এসো এসো।...(বর্ষামঙ্গল)

এদিকে বরুণরাজের আহ্বানে প্রসন্ন হ'য়েছেন নটরাজ রুদ্রদেব।

তিনি তাঁর প্রলম্বিত রুক্ষ-ধূসর জটাজুট নেড়ে দিয়ে বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝার আলোড়ন জাগিয়ে দিলেন অনন্ত মহাশূন্যে।...

তারই প্রয়োজনে বরুণদেবের আয়োজন।

ধরিত্রীমাতা আজ পিপাসার্ত্তা।

জলদান করে তাঁর তাপিত আত্মাকে শান্তি দিতে হবে।

তৃষ্ণাতুরকে জলদান সজ্জনের কর্তব্য।...

বরুণরাজ আহ্বান জানালেন তাঁরই মানসী নন্দন-বাসিনী জলদানীকন্যাদের। মেঘনীলাম্বরীতে বিদ্যুৎবর্ণা তনুতটকে আবরিত করে শতসহস্র অভিষেককুম্ভ হাতে তারা প্রস্তুত হ'য়ে রইলো মানসসরোবরের উপত্যকায়।

সেখান থেকে তাদের যাত্রা হবে সুরু। শুধু আয়োজনের অপেক্ষা মাত্র।...

সহসা সাতসমুদ্র-পারের ধ্যানমগ্ন প্রভঞ্জনের যোগনিদ্রা কার শান্তশীতল স্পর্শে ভেঙ্গে গেল।

অসময়ে নিদ্রাভঙ্গহেতু পবনদেবের কঠোর মুখ ক্রোধরক্তিম হ'য়ে দাঁড়াল। ঊনপঞ্চাশী বায়ু-অশ্ব-চালিত শকটে আরোহণ করে তিনি এসে দাঁড়ালেন হিমালয়ের পাদদেশে।

বরুণদেব যখন দেখলেন, তাঁর কৌশল জয়যুক্ত, তখন তিনি যাত্রারম্ভের ইংগিত করলেন অনন্ত অম্বরের শূণ্য গর্ভলীন রুদ্রঝঞ্ঝাকে :

আহ্বান আসিল মহোৎসবে
অম্বরে গম্ভীর ভেরীরবে।... ...
শ্রাবণের প্রবীণাপাণি
মিলাল বর্ষণবাণী
কদম্বের পল্লবে পল্লবে।' (গীতবিতান)

এবং তারপরেই :

খরবায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।......
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল,
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল
হ'য়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল
জয়, জয় জয় গান, গাইয়ো। (গীতবিতান)

সুতরাং হে কর্ণধার, যে-প্রলয়ংকর বৈশাখী ঝড় মত্ত-মাতঙ্গের মত দিগ্বধূদের চমকিত করে ছুটে আসছে, তার আগমনে ভয় ভীত বা সন্ত্রস্ত না হ'য়ে বরঞ্চ তালে তাল রেখে অভিনন্দন কর, কারণ সে আসে তোমার কল্যাণে, বিশ্বজনগণের হিতার্থে।...

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে...
ঘন গৌরবে নব যৌবন বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।...(গীতবিতান)

ঊনপঞ্চাশী বায়ু-অশ্বের হ্রেষা-ধ্বনিতে দিগাঙ্গন, জলস্থল, অরণ্যপ্রান্তর প্রকম্পিত করে দুর্বাশার ক্রোধাগ্নির মত অগ্রবর্তী প্রভঞ্জনের অভিযান আরম্ভ হোলো। অভিযান আরম্ভ হোলো সুদূর ঈশাণকোণের নিরবলম্ব বিস্তৃত পটভূমিকায়।...মনে হোলো যেন অযুত মত্ত-মাতঙ্গ তাদের আকাশচুম্বী আক্রোশ নিয়ে সৃষ্টি-ধ্বংস কার্যে অপেক্ষা করছে।

পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদের মত গুরু-গুরুধ্বনি সচকিত করে তুললো সমস্ত চরাচরকে। মৃদু শব্দতরংগের মত বাতাসের বেগ দোলা দিল স্থির নদীর কালোজলে, রক্ত-শিমুলের ডালে-ডালে, রক্তপলাশের পাতায় পাতায়।

প্রথমে মৃদু, তারপরে প্রবল।

উজ্জ্বল ও স্থির প্রকৃতি মুহূর্তে মলিন ও ধূলিধূসরতায় বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো। ধূমল জলদচিরেখা প্রকৃতির বুকে ছায়া বিস্তার করলো শ্যেনপক্ষীর কালো ডানার মত। কি সুন্দর কিন্তু কি ভয়ঙ্কর!…

বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা,
তোমার শ্যামল শোভার বুক
বিদ্যুতেরি আলা।……
বায়ে রাখে ভয়ংকরী
ঝঞ্ঝা মরণ ঢালা। [গীতবিতান]

কৃষ্ণসর্পের মত ক্ষ্যাপা হাওয়ায় নাচন লাগলো ঘনবেণুকুঞ্জে।

সে নাচন ছড়িয়ে পড়লো বৃক্ষের শাখা থেকে শাখান্তরে—অরণ্যে, অরণ্যে।

আষাঢ় কোথা হ'তে আজি পেলি ছাড়া
মাঠের শেষে শ্যামল বেশে ক্ষণেক দাঁড়া।…
আকাশ হ'তে আকাশ করে ছুটোছুটি
বনে বনে মেঘের ছায়ায় ল্যুটোপুটি
ভরা নদীর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কে দেয় নাড়া।'
[গীতবিতান]

নৃত্যলীলায় নেপথ্যে অকস্মাৎ কার যেন নূপুরের শিঞ্জনধ্বনি বেজে ওঠে। সে ধ্বনি যেন বহু-দূরাগত, কান পেতে শোনো।

রিম্ ঝিম্, ঝম্ ঝম্।…

হাওয়ার নাচনের তালে-তালে সে নূপুরের ধ্বনি ক্রমে মিলিয়ে যেতে লাগলো। ঐ যে তেপান্তরের মাঠের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে সে। নৃত্যরতা কন্যারূপে, তাকে কিছু চেনা যায়, কিছু অচেনা।

মেঘবরণী তার রূপ, মেঘবরণী শাড়ী তার পরণে, মেঘবরণী চুলে তার নীল অপরাজিতা, হাতে নবনীপের মালা।

বিজয়িনী অভিসারিকার মত সে এগিয়ে আসছে,… ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

অবশেষে কদম্ব ঘেরি তার মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এলো:

'কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া খেলে,
পিয়ালগুলি নাচের ঠাটে হাওয়ায় হেলে।……
ঝিল্লিমুখর বাদল সাঁঝে,
কে দেখা দেয় হৃদয় মাঝে,
স্বপনরূপে চুপে-চুপে ব্যথায় আমার চরণ ফেলে।'
(গীতবিতান)

চুপে চুপে চরণ ফেলে সে এ'সে দাঁড়াল আমার কুঞ্জকুটির দ্বারে।

সাড়া পেয়ে দোর খুলে দিলাম।

ক্ষ্যাপা হাওয়ার ঝাপসা আলোয় তার কালো ছায়ার কিছুই নজরে এলো না যে। শুধু একঝলক হিমেল জল ঝরে পড়লো আমার চোখে মুখে, যেন কোন অন্তরাল-বর্তিনীর গুমরানো কান্নার একপশলা জল।

এই কান্নার শব্দ আর জলের ধারা ছড়িয়ে পড়লো সর্বদিকে, সমস্ত অরণ্য প্রান্তরে।

ক্রমেই এ' কান্না আর জলের ঝর্ণাধারা বিরামবিহীন হ'য়ে উঠলো:

'নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর
হে গম্ভীর,
বনলক্ষ্মীর কম্পিতকায় চঞ্চল অন্তর
ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর,
হে গম্ভীর।……
ছিন্ন হ'য়েছে বন্ধন বন্দীর, হে গম্ভীর।' (গীতবিতান)

ক্রমশঃ নিভে এলো দিবসের আলোর জ্যোতির্লেখা।

অসময়ে ঘিরে নামলো মলিন সন্ধ্যার সুদূরপ্রসারী যবনিকা।

জাগতিক সমস্ত কোলাহলকে উপেক্ষা করে একটানা শ্রাবণধারার অবিশ্রান্ত বর্ষণ। মাঝে মাঝে মঞ্জুরিত তমাল শালপিয়ালের পাতার ফাঁকে ফাঁকে নাচছে বিজলি-মেয়ের চঞ্চল-নৃত্যলহর।

বাদল-মেঘের মাদল বাজিয়ে এ' নৃত্যলহরির সঙ্গত চলছে গুরু-গুরু মন্দ্রে।

মুখর ঝিল্লি-নিনাদ যেন ক্ষ্যাপা বাউল-বাতাসের একতারা।

আর দর্দুরের আনন্দ-কলোচ্ছাস যেন কীর্তনীয়ার করতাল।

'বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা,
সারা বেলা ধরে ঝর-ঝর ঝর ধারা।......
ঘর ছাড়ানো আকুল সুরে
উদাস হ'য়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে হাওয়া গৃহহারা। (গীতবিতান)

গৃহহারা উদাসী হাওয়ার মত মনও হ'য়ে ওঠে গৃহছাড়া উদাসী। নবীন মেঘের সুর লেগে যায়:

'আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে,
আমার ভাবনা যত উতল হোলো
অকারণে।... ... ...
যে-পথ গিয়েছে নিরুদ্দেশে,
মানসলোকে গানের শেষে
চিরদিনের বিরহিনীর কুঞ্জবনে।' (গীতবিতান)

মন চলে যায় সেই নিরুদ্দেশের পথে, যেখানে চিরদিনের বিরহিনী গানের শেষে বাস করছে কুঞ্জবনে।

সেই বিরহিনীর চিন্তা হঠাৎ যেন মনকে মোহাবিষ্ট করে তোলে।

সমগ্র চেতনায় স্পন্দিত হ'য়ে উঠলো এক প্রচ্ছন্ন রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

একটা বেদনা-বিজড়িত বিধুরতা সমস্ত চেতনাসত্বাকে ছাড়িয়ে বাইরের বর্ষণমুখর নিবিড় রাত্রির দামিনীচমকিত আঁধার আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়লো:

'সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণধারা।...'
(বর্ষামঙ্গল)

'ঈ-ভরা ভাদর, মাহ বাদর, শূন্য মন্দির মোর',... কেন এই অভাব, কেন এই শূন্যতা? বাইরে ঝিল্লিমুখরিত ঘোর ঘনঘটাপূর্ণ শাঙনশর্বরীর উদ্দাম উল্লাস আর ভেতরে কেন রিক্ততার মৌনবেদন?

এই বেদনার যেন শেষ নেই।

কখন যে এই অপরিসীম ব্যথা-নির্যাস দেহ-শোণিত নিঙড়ানো আঁখিনীরে পরিণত হয়ে কোঁটায় কোঁটায় ঝরে পড়তে লাগলো, বুঝতে পারিনি।

মনে হলো এই পুঞ্জিভূত ব্যথাই যেন বাইরের ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ শাঙন মেঘের রূপে তমসাচ্ছন্ন সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির বুকে কান্নার ভারে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

বাইরের বর্ষণমুখর প্রকৃতি আর চিরদিনের বিরহীর মনের তন্ত্রী যেন একই সুরে বাঁধা।

'শ্রাবণ বরিষণ পার হ'য়ে
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে।... ...
বিজন বিরহীর কানে কানে
সজল মল্লার গানে গানে
কাহার নামখানি কয়ে কয়ে
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে।'
(গীতবিতান)

যার 'নামখানি কয়ে কয়ে' আসে, কী তার পরিচয়? কোন্ সে দেশের অপরিচিতা বিরহিনী,—কী তার সংজ্ঞা? কী তার রূপ?

তারই চিন্তায় কেন্দ্রীভূত মন ভারাক্রান্ত।

বাইরের বাদলের ঘুমপাড়ানীয়া গান দু'চোখের পল্লবে নিয়ে এলো তন্দ্রাচ্ছন্নতা। হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে গেল কার মৃদুপায়ের মঞ্জু-ধ্বনিতে।

মনে হোলো, সে যেন এসেছিল।

আমার অজানার নেপথ্যে লঘুপায়ে সে যেন এসেছিল আমারি খোলা দ্বার-পথে,—যার কণ্ঠভরা ছিল বাদল-দিনের গান, পরণে ছিল মেঘ-ডম্বরু শাড়ী, হাতে ছিল নবনীপের মালা, খোঁপায় ছিল শালের মঞ্জুরী আর ভেজা আরক্তিম পায়ে ছিল আশার ভরসা।

এ' সেই বিরহিনী,—যে এসেছিল বহুদূরের চেনা-অচেনার সাগর পার থেকে,—চির পুরাতনের মাঝে চির নূতনের বেশে, অভিসারিকারূপে।...

বন্ধু, যদি এলে, তবে কেন এ' বিরহ-তাপিত হৃদয়কে অভিসিক্ত করে দিয়ে গেলে না?...

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ' সঘন শ্রাবণ প্রাতে।

ছিলে কি মোর স্বপনে—

সাথীহারা রাতে।... ... (গীতবিতান)

বন্ধু ফিরে তাকাল না,—চলে গেল যে-পথে এসেছিল।

অশান্ত দয়িত মনজুড়ে গুমরে বেড়াতে লাগলো নিরাশার বাণী।

সেই নিরাশার বাণীর সঙ্গে সহসা আশার আভাস ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো।

কে যেন মধুর কণ্ঠে বললো :

হে অতৃপ্ত বিরহি, আমি আবার আসবো।

কালচক্রে আমার এমনি আসা আর যাওয়া।

চিরদিনের এমনি আসা-যাওয়ার লীলাখেলায় অনাগত বর্ষের ঋতুচক্র ভরে উঠে নতুন নতুন প্রাণের সম্পদে, প্রকৃতির গহন শ্যামলিমায়, পুষ্পে, ফলে, ফসলে।

আমি চিরপুরাতন তবু চিরদিনের নূতন।

একই বেশে বারে বারে আমাকে ফিরে আসতেই হয়, নইলে তৃষা মিটেনা পিপাসার্তা ধরিত্রীর,—বিরহ-জ্বালার নিবৃত্তি হয়না চিরযুগের দয়িত-দয়িতার।

কিন্তু আমি নিজেই চিরদিনের অতৃপ্ত,—এ হেতু চিরদিনের তৃপ্তি দিতে পারিনা কাউকে।

এবং এ জন্যেই আমার বার বার ফিরে আসা, আর ফিরে আসি।...'

সুতরাং,...

আবার সে আসবে।

এই আশার সান্ত্বনা বাণী নিয়ে আগামীবর্ষের দিকে চেয়ে বসে থাকতে হবে।

আবার হবে শাওনজলদধারায় নববর্ষের মঙ্গল-অভিষেক : আবার হবে তৃষা-অতৃপ্ত ধরণীর শ্যামলের মধুর পরশ।...

আবার ঘটবে চিরবিরহী-বিরহিনীর প্রাণে অমৃতের ক্ষণিক আস্বাদন।...

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকরাজ ?

পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত-ফ্রন্ট সরকার, বিশেষ করিয়া সি পি এম এবং সি পি আই শরিকদ্বয় মাত্র এক বছরেই 'শ্রমিকরাজ' কায়েম করিয়া গিয়াছে, এ-কথা কে অস্বীকার করিতে পারে ? এ রাজ্যের সর্ব্বস্তরের শ্রমিক-মহলে আজ এ-ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে একজোট হইয়া শ্রমিক সঙ্ঘ, ইউনিয়ন নেতাদের পরামর্শমত, ন্যায় বা অন্যায় যাহাই দাবী করিবে, হতভাগ্য শিল্প-সংস্থার মালিকদের তাহা অবশ্যই স্বীকার করিয়া শ্রমিকদের পর্ব্বতপ্রমাণ দাবীও মিটাইতে হইবে। বলা বাহুল্য শ্রমিকদের দাবী মিটাইবার পারগতা বিষয়ে কোন প্রশ্নই থাকিতে পারে না, এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই দাবী-দাওয়া একতরফাই হইবে। শ্রমিকদের ক্রমবর্দ্ধমান দাবী এবং মালিক-পীড়ন আজ এমন এক স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছে—যেখানে শিল্প সংস্থার মালিকদের পক্ষে এ-রাজ্যে আর বসবাস করা, এবং শিল্প-প্রসার দূরে থাকুক, যাহা আছে তাহাও রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছে—! ফলে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের কেবলমাত্র দাবী-আদায়ে প্ররোচনা না দিয়া, যদি লেবার ইউনিয়ন-রাজচক্রবর্ত্তী এবং রায় বাহাদুরগণ শ্রমিকদের তাহাদের ন্যূনতম কর্ত্তব্যপালনে উৎসাহিত করিতেন, তাহা হইলেও বুঝিতাম যে যাঁহারা শ্রমিক ভাঙাইয়া নিজেদের আখের গুছাইতে ব্যস্ত, তাঁহাদের কিঞ্চিত শুভবুদ্ধি এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও সামান্য কিছু জ্ঞানও আছে। শ্রমিক এবং কর্ম্মীদের লাগাতার সংগ্রামে নিয়োজিত রাখিয়া শ্রমিকনেতারা হয়ত আপাত কিছু বেশী মুনাফা লুটিতেছেন—কিন্তু ইহা কতদিনের জন্য ? ভবিষ্যত কি ? শ্রমিক এবং কর্ম্মীদের মনে আজ ইহাই প্রকট 'করা' হইয়াছে, "আমার কাজ বা কর্ত্তব্য করি কি না করি তাহা তোমাদের (শিল্প মালিকদের) দেখিবার প্রয়োজন নাই, তোমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য—যাহা চাহিব তাহা দাও, দিতে হইবেই। টাকা কোথা হইতে আসিবে, সে-মাথা ব্যথা তোমাদের!" কারখানার উৎপাদন যদি শতকরা ১০ ভাগও কমিয়া যায়, তাহা হইলেও শিল্প-মালিকদের নিস্তার নাই। ধর্ম্মঘট, ঘেরাও ত আছেই, তাহার উপর বিবিধ প্রকার মালিক-পীড়ন আজ কারখানা-এলাকা ছাড়িয়া শিল্পপতিদের আবাসেও প্রসারিত করা হইতেছে। মালিকদের পরিবারবর্গেরও নিস্তার নাই। এ-যেন কথামালার--"তুই না করিয়া থাকিস্ তোর বাপ করিয়াছে" নীতির বাস্তব প্রয়োগ !

সাধারণ শ্রমিকদের উপর সাধারণ লোকের একটা মায়া আছে, আমাদেরও আছে, কিন্তু ইউনিয়ন-নেতাদের হঠকারিতা এবং নীতিহীন কার্য্যকলাপের ফলে বাঙলার শ্রমিক (শতকরা ৭৫ ভাগই বহিরাগত) ক্রমে সাধারণের মায়া, মমতা এবং সমবেদনা হারাইতে বসিয়াছে। শ্রমিক-নেতারা এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে মনে হইবে, বাঙলাদেশে বিশ-পঁচিশ লক্ষ শ্রমিক ছাড়া দ্বিতীয় কোন শ্রেণীর মানুষ এখন নাই ! একমাত্র শ্রমিকদের দাবী মিটিলে, শ্রমিক পরিশ্রম না করিয়াও পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে এবং তাহাদের অন্যান্য অভাব-অভিযোগ দূর হইলেই বাঙলা 'কল্যাণ রাষ্ট্রে' পরিণত হইবে। বাঙালী জাতিও বাঁচিবে !

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি প্রায়ই শ্রমিকদের প্রতি মালিকপক্ষ এবং বিত্তবানদের নারকীয় অত্যাচারের কথা, বঞ্চিত শ্রমিকদের সামান্য যাহা আছে, তাহা হইতেও তাহাদের বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্রের কথা বলিয়া চিৎকার করিতেছে—রাষ্ট্রপতির শাসনে কেন্দ্রীয় কর্তারা তথা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারও নাকি এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। এই ষড়যন্ত্রব্যর্থ করিতে বর্তমানে হৃতশক্তি এবং নষ্টগৌরব রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষ করিয়া দুইটি কম্যুপার্টি এবং ফরোয়ার্ড ব্লক অবিলম্বে শ্রমিকস্বার্থ রক্ষা করিতে এবং ফ্রন্ট সরকারের আমলে শ্রমিক যে সকল অধিকার এবং আর্থিক সুযোগ সুবিধা 'সংগ্রাম' করিয়া 'রক্তের' বিনিময়ে অর্জন করিয়াছে, সেই সব যাহাতে হাতছাড়া না হয়, তাহার জন্য রাজ্যব্যাপী আন্দোলন, বিক্ষোভ এবং প্রয়োজন-বোধে সংগ্রাম সুরু করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন! কোন্ গোপন সূত্রে সি পি এম, সি পি আই প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলি (বাস্তবপক্ষে যাহাদের রাজ্যও নাই এবং নীতিরও কোন বালাই নাই এবং নীতির নামে যাহাদের 'জীবিকা' একমাত্র দুষ্ট নীতি এবং সকলের ক্ষতিকর অযথা আন্দোলন) আজ আবার 'রণক্ষেত্রে' প্রবেশ করিয়া রাজ্যের মৃতপ্রায় প্রায় বিলুপ্ত শিল্প-ব্যবসায়কে এবং শিক্ষাকে একেবারে রাজ্যছাড়া করিবার পাকা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন! রাষ্ট্রপতির শাসনে যে সামান্য শান্তি এ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে তাহা হৃদপিণ্ডদাহনের কারণ বলিয়া মনে হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম ১৩ মাসের ফ্রন্ট-সরকারের আমলে রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তানাশ, নর-হত্যা, চুরি ডাকাতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস, এবং সরকারী পুলিসকে বেকার করিয়া দল এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করিতে, সর্ব্বপ্রয়াস চালাইয়া পরম সার্থকতা অর্জন করা—ইহা সর্ব্ববিদিত সত্য!

বহু কীর্ত্তির অধিকারী এবং জাতি ও দেশকে প্রায় অন্তিম দশায় ঠেলিয়া দিবার সফলপ্রয়াসী সি পি এম শাসিত ইউ এফ সরকারকে আবার নবজীবন দান করিবার প্রচেষ্টা ইউ-এফ.-এর বিশেষ আটটি দল মর্গে রক্ষিত ইউ এফ সরকারকে পুনঃজীবিত করিয়া আবার চলমান করিতে বিশেষ প্রয়াস-প্রচেষ্টা সুরু করিয়াছে সি পি আই-এর নেতৃত্বে। দলের সকল শরিকের (বাঙ্গলা কংগ্রেস ছাড়া) বাসনা এই যে সি পি এমও পুনঃগঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারে থাকিবে। ফ্রন্টের দলগুলির ধারণা হইয়াছে এই যে রাষ্ট্রপতির শাসনে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালী বড়ই মনমরা হইয়া পড়িয়াছে এমন কি শতকরা ৯০ জন সাধারণ বাঙ্গালী আহার নিদ্রার কথাও প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে এই চিন্তা করিয়া যে—যুক্তফ্রন্ট সরকার অবিলম্বে রাজ্যের শাসন ভার হাতে না লইলে (বা পাইলে) এ-রাজ্যে চিরতরে সুখ সূর্য্য অস্তমিত হইবে এবং রাজ্যবাসীরা ভুলিয়া যাইবে স্বাধীনতা, সুখ সম্পদ নিরাপত্তা কাহাকে বলে!

'হইলেও-হইতে-পারে' যুক্তফ্রন্ট সরকার-এ সি পি এম কোন্ সর্তে থাকিবে?

বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আট শরিক নব-উদ্যমে নূতন করিয়া আবার যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনে চেষ্টিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে এক সংবাদে প্রকাশ যে, নব-গঠিত অর্থাৎ পরিকল্পিত যুক্তফ্রন্ট সরকারে সি পি এম অবশ্যই থাকিবে তবে তাহা সর্তসাপেক্ষ যে সি পি এম অর্থাৎ বর্তমানে কিঞ্চিত স্তিমিত-জ্যোতি শ্রীল শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসুকে—বাঙ্গালার স্বরাষ্ট্র বিভাগ, বিশেষ করিয়া পুলিস দপ্তর তাহাদের ছাড়িয়া দিতে হইবে! আর একটি সর্ত এই যে শ্রী অজয় মুখার্জিকে আগামী যুক্তফ্রন্ট সরকারের নেতা অর্থাৎ মুখ্য মন্ত্রী বলিয়া স্বীকৃতি দিতে হইবে।

ব্যাপারটা খানিকটা গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল গোছের হইল না কি? আমরা বুঝিতে পারিলাম না—স্বরাষ্ট্র দপ্তর (পুলিস) ছাড়িয়া দেওয়া না দেওয়া প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মার্কসিষ্ট জ্যোতি বসুর মর্জির উপর কেন নির্ভর করিবে; পুলিস দপ্তরের ভার বা অধিকার কি জ্যোতি বাবুর নিজের কিংবা পারিবারিক জমিদারীর অন্তর্গত? পরলোকগত বিখ্যাত চিকিৎসক কি কোন গোপন দলীলে প্রিয় পুত্রকে এই বিশেষ অধিকার

দান করিয়া গিয়াছেন? পরলোকগত খ্যাতনামা এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসককে ব্যক্তিগতভাবে চিনিতাম। তিনি সজ্জন, সদালাপী এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। সেইকালে শ্রীমান জ্যোতিকেও বহুবার দেখিবার অবকাশ হয়—শান্তশিষ্ট সুদর্শন একটি বালকের কথা মনে পড়ে। সেই বালকের মধ্যে যে এতখানি তেজ, তাপ এবং অগ্নি লুকাইয়া আছে কেহ ভাবিতেও পারে নাই--(বিধাতার লীলাখেলা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা অসম্ভব!) সেই কোমলদর্শন, শান্তস্বভাব জ্যোতি বসু আজ এই রাজ্যের অগ্নিগর্ভ এক বিষম রাজনৈতিক নেতা, যে-নেতা পথে ঘাটে ময়দানে সি পি এম বিরোধী সকল দল এবং ব্যক্তিকে প্রায় চোখ রাঙাইয়া কথা বলিতেছেন, কারণে অকারণে সকলকেই 'ঠাণ্ডা' করিয়া দিবার ধমকও দিতে কসুর করিতেছেন না! উপমুখ্য-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত না থাকিয়াও জ্যোতি বসু যে-প্রকার বোলচাল দিতেছেন, তাহাতে বাহিরের লোক মনে করিবে—এই জ্যোতিবাবুই বাঙলার মুকুটবিহীন রাজা এবং প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ও বাঙালীর ভাগ্যবিধাতা! (হায় বাঙলা! হায় হায় বাঙালী!) কিন্তু জ্যোতি বাবু তথা সি পি এম এবার একটু বিপদে পড়িয়াছেন। কথায় কথায় সি পি এম নেতারা যে জনসাধারণের সমর্থনের দোহাই দিতেন এবং এখনও (একটু কম করিয়া) দিতেছেন, সেই বাঙালী জনগণের একটা অতি বৃহৎ অংশ আজ সি পি এমের বিরুদ্ধে গিয়াছে এবং সি পি এম নেতারা, বিশেষ করিয়া জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং রামবল্ল গোঁয়ার যেখানেই জনসমাবেশের আয়োজন করিতেছেন সেই স্থানেই গ্রামে বা শহরে, প্রায় সর্বত্র সি পি এম-বিরোধী পূর্ণ হরতাল হইতেছে! বহুস্থানে সি পি এম সমর্থক এবং নেতারা দৈহিক বিক্ষোভের সম্মুখীন হইতেছেন! যে দল মনে করিয়াছিল, যে তাহারা ক্ষমতাচ্যুত হইলে, সারা রাজ্যে রক্তস্রোত বহিবে এবং দেশে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলিত হইবে, সেই পরম 'বিক্রমশালী' এবং ক্ষমতার মোহে বুদ্ধিভ্রষ্ট দুর্নীতি-পরায়ণ সি পি এমই আজ প্রাণভয়ে ভীত এবং সত্যন্তর না দেখিয়া রাজ্যপালের নিকট দলের নেতা এবং উগ্র সমর্থকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য কাতর আবেদন করিতেছে বার বার!

ইহাকেই কি বলে উলট-পুরাণ? পুলিশকে বেকার রাখিয়া, পার্টি-সমর্থকদের দ্বারা বিরোধী পক্ষ এবং সাধারণ জনকে পিটাইতে বড় আনন্দ, বড় মজা। জ্যোতি বসু প্রমুখ কম্যু-এম নেতারা এতদিন এই আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু আজ যখন পাল্টা প্রহার সুরু হইল, তখন বীরদের মুখে কাতর কাতরানি এবং ব্যাকুল ক্রন্দন, বিরোধী পক্ষ উপভোগ করিবে, ইহাতে অবাক হইবার কিছুই নাই! যাক আমাদের...

মূল বক্তব্য হইল এই যে, নূতন ফ্রন্ট সরকার যদি বাঙলার ভাগ্যদোষে আবার গঠিত হয়, সেই সময় কে কোন্ দপ্তরের ভার পাইবেন তাহা নির্ভর করা উচিত একমাত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিচারবুদ্ধির উপর। পার্টির দলগত সংখ্যার উপর মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়া অনুচিত এবং এইরূপ হইলে শিক্ষা-দপ্তরের ভার পড়িবে নেহাত অযোগ্য এক তথাকথিত শিক্ষকের উপর যাঁহার প্রকৃত পেশা পার্টির দালালী করা ছাড়া আর কিছুই নহে। ভূমি রাজস্ব, সংস্কার এবং ভূমিহীন কৃষকদের জমি বণ্টন করা প্রভৃতির ভার পাইবেন আবার সেই রকম এক ব্যক্তি, যাঁহার নীতি "জোর যার মুলুক তার" প্রয়োগে পার্টির সমর্থক তথা ভক্তদের পরের জমি দখল করিয়া (আইন বে-আইনের কোন প্রশ্নই এখানে নাই) বিতরণ করা। পার্টির লোক কৃষক না হইলেও তাহাকে কৃষি জমি দান করা হইবে এবং যে জমি এই ব্যক্তি যথাসময়ে অন্যকে বিক্রয় করিতে দ্বিধা করিবে না! এই ভাবে অন্যকার বিশেষ ঘৃণিত জোতদারদের হাতেই আবার কৃষি জমি ফিরিয়া যাইবে! সে যাহাই হউক, যতই আকাশকুসুম রচিত হউক, ১৪ দলের যুক্তফ্রন্ট পশ্চিম বঙ্গে আর হইবে না, কারণ বাঙলা কংগ্রেস সোজাসুজি বলিয়া দিয়াছে যে তাহারা সি পি এম-এর সহিত এক পংক্তিতে আর বসিবে না। বাঙলা কংগ্রেস সম্পর্কে সি পি এম-এর মনোভাব ঠিক একই প্রকার।

যদি মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচন এ-রাজ্যে আবার হয়,

তাহা হইলে আমরা আশা করিব, বাঙ্গলার সর্বশ্রেণীর সকল ভোটদাতা সি পি এমের কীর্তিকাহিনী ভুলিয়া যাইবে না এবং সি পি এমের মধুবাক্যে আবার বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া আবার পশ্চিম বঙ্গকে নারকীয় জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে নিমজ্জিত করিবে না, সি পি এম প্রার্থীদের ক্ষমতার আসনে বসিবার জন্য ভোটদান করিয়া! একবার কপালগুণে আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি—কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সে আশা করিব না। আর একবার সি পি এম অর্থাৎ জ্যোতি-প্রমোদ-কোঁয়ারের দল প্রশাসনিক ক্ষমতায় বসিলে এ-রাজ্যের ভাল যতটুকু এখনও কোনক্রমে টিকিয়া আছে, মানুষের যে-সামান্য স্বাধীনতা এখনো রহিয়াছে, রাজ্যের শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যে যে অতি সামান্য পুনর্জীবনের স্পন্দন পরিলক্ষিত হইতেছে, সব কিছুই অতি অল্পকাল মধ্যে আবার লোপ পাইবে এবং বাঙ্গলা দেশ ভদ্রমানুষ নামে অভিহিত হইতে পারে এমন কোন লোকের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশনের দক্ষ শাসন গুণে আজ কলিকাতার যে অবস্থা হইয়াছে, সি পি এম গদিতে বসিলে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ কলিকাতা নামক নারকীয় নগরের বৃহত্তর সংস্করণ হইতে কালবিলম্ব ঘটিবে না।

ধ্বংস করাই যাহাদের জীবনব্রত, দেশের যাহা কিছু ভাল এবং জনকল্যাণকর সেইসবকে চিরতরে নির্বাসিত করিয়া বিদেশী, বিজাতীয় আমাদের পক্ষে অকল্যাণকর কু-আদর্শকে মানুষের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া, [বলা বাহুল্য জোর করিয়া] দেশকে কম্যু-রাজ্যে অর্থাৎ মহা শ্মশানে পরিণত করিতে যাহারা ব্যাকুল এবং অতি তৎপর, সেই কম্যুর দল এবং তাহাদের সম ও সহকর্মী অন্যান্য দলগুলিকে দেশ হইতে আগাছার মত বাছিয়া পুড়াইয়া দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই!

কৃষকবন্ধু রামবল পোঁয়ারের একটি 'করুণা'র নিদর্শন

দৈনিকপত্রে প্রকাশিত নিম্ন উদ্ধৃত পত্রটিতে যে-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে মন্তব্য করিবার অবকাশ বিশেষ নাই। গরীব বিধবার কাতর নিবেদন দেখুন:

"আমি একজন দরিদ্র বিধবা। আমার সহায় সম্বল কিছু নাই। ১৯৫৬ সালে কোন প্রকারে দুইশত পঞ্চাশ টাকা যোগাড় করে জমিদার নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হতে ২৪পরগণা জেলার জগদ্দল থানার অধীন গুড়দহ মৌজার ৩৫০ খতিয়ানে ২৪২ দাগ নম্বরে ৪৮ শতক জমির মধ্যে ২৯ শতক জমি আমি ক্রয় করেছিলাম। তদবধি উক্ত জমি আমি ভোগদখল করছি এবং উক্ত জমিতে আমার তৈয়ারী বাঁশ, তাল, কলাগাছ, আউশ ধান ও একটি টালির ঘর ছিল এবং ২০ বছর ঐ জমির জন্য পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দিচ্ছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যুক্ত ফ্রন্ট সরকার হওয়ার পর গত নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যাঁরা নিজেদের গরিব ও ভূমিহীনদের প্রতিনিধি বলে দাবি করেন, তাঁদের অনুচরেরা আমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমার জমির বেড়া কেটে গাছপালা, শস্যাদি নষ্ট করে ঘরদোর ভেঙে টেকসমাকো কারখানার কতিপয় কর্মচারীকে নিয়ে এনে বসিয়েছে। জগদ্দল থানায় এবং সরকারের উচ্চ মহলে জানিয়েও কোন প্রতিকার পাইনি।

আমি সহায় সম্বলহীন বিধবা। ঐ জমিটুকুই আমার ভরসা। আশা করি আপনার বহুলপ্রচারিত পত্রিকায় আমার এই করুণ কাহিনী প্রচার করে সরকার, সমস্ত রাজনৈতিক নেতা ও দেশের জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন পৌঁছে দেবেন। প্রতিকারের আশায় রইলাম। —ভাগ্যহীনা বিধবা, দুর্গারাণী মুখার্জি, গুড়দহ (কান্তিচন্দ্র মুখার্জির বাড়ি), পোঃ শ্যামনগর, ২৪ পরগণা।"

সি পি এম পার্টির লোকেদের দ্বারা এইভাবে গরীবদের সামান্য জমিও যে কত লুট হইয়াছে, তাহার পূর্ণ হিসাব দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। প্রকৃত এবং ন্যায্য অধিকারীকে বঞ্চিত করিয়া হাজার হাজার একর জমি পার্টিসমর্থকদের মধ্যে দান খয়রাতী করা হয়, দেশের সাধারণ আইনে যাহা কখনও গ্রাহ্য হইতে

পারে না। কিন্তু "রাজা যদি চুরি করে, কে তাহার করিবে বিচার।" সি পি এম নেতাদের বিচারে আইন-আদালতের কোন মূল্য নাই, দেশের আইন কানুনও তাঁহাদের বিচারে মূল্যহীন কারণ এযাবৎ আইন কানুন যাহা কিছু রচিত হইয়াছে—তাহা সবই বিত্তবান, শিল্পপতি, সমাজের উপরতলাবাসী এবং জোতদারদের স্বার্থরক্ষার কারণেই! অতএব কট্টর কম্যু-নেতাদের বিচারে আইনসঙ্গতভাবে অধিকৃত জমি হইতে গরীব কৃষককে বেদখল করা এবং সেই জমি পার্টির লোকেদের বিনামূল্যে দান করাতে দোষাবহ কিছুই থাকিতে পারে না। কৃষকের জমি অ-কৃষককে দেওয়াতেও কিছুই অন্যায় থাকিতে পারে না।

কেবল জমি নহে। ক্ষেতের পাকা ফসল জোর করিয়া কাটিয়া লওয়ার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গরীব চাষী তাহার গায়ের রক্ত জল করা পরিশ্রমের ফসল তাহার চোখের সামনে মার্কসিস্ট-গুণ্ডার দল কাটিয়া লইতেছে, চাষী হতাশ দৃষ্টিতে সেই দৃশ্য দেখিতেছে। পুলিশ হস্তক্ষেপ করিবে না। কারণ পুলিশ-মন্ত্রীর পাকা হুকুম ছাড়া পুলিশ জন-সাধারণের 'গণতান্ত্রিক অধিকারে' এবং 'মুভমেন্টে' হস্তক্ষেপ করিবে না! পুলিশমন্ত্রীর এই নির্দেশ !!

রাষ্ট্রপতির শাসনকালে এইসব অন্যায়ের অবিচারের এবং লুটের কোন প্রতিকার যে হইবে, সে আশাও এখন আর করিতে পারিতেছি না।

"দিব কিঞ্চিত না করি বঞ্চিত"—কেন্দ্রীয় করুণার দয়ার দান—

বিগত ২৪ এ বৈশাখের আনন্দবাজারে প্রকাশিত নিম্নপ্রদত্ত মন্তব্যটি আশা করি বাঙ্গলী পাঠকের তথা সাধারণ বাঙ্গালীর চিত্ত কেন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা বিগলিত করিবে।

দিল্লীশ্বরদের সমদর্শিতার দৃষ্টান্ত অনেক। সম্প্রতি আর একটি মিলিয়াছে। দেশের প্রধান ভাষাগুলির পুষ্টি এবং বলবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নাকি অতিশয় মনোযোগী। এইজন্য প্রতিবছর জলের মত টাকা খরচ করা হইতেছে। গত বৎসরও দানসাগরে ঘাটতি পড়ে নাই। কিন্তু সে অর্থ কি সকলেই পাইতেছে? সরকার বলিবেন, আলবৎ—চৌদ্দটি প্রধান ভারতীয় ভাষার কোনটিই বাদ পড়ে নাই, দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ সকলেই ভাগ পাইয়াছে। কথাটা এক দিক হইতে হয়তো ঠিক, কিন্তু অন্য দিক হইতে সম্পূর্ণ ফাঁকি। কেননা হিসাবের খাতা বলিতেছে দাবির ব্যাপারে সকলে সমান হকদার হইলেও প্রাপ্তির ব্যাপারে সকলের ভাগ্য সমান ছিল না। হিন্দীর শ্রীবৃদ্ধিকারীরা পাইয়াছেন যেখানে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা, আর তেরোটি ভাষা সেখানে মিলিত ভাবে পাইয়াছে ৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। দানের অনুপাতটা নাকি এইরকম হিন্দী যদি পায় ২৭ টাকা, তবে অন্য তেরোটি ভাষা পাইবে ১ টাকা, অর্থাৎ ভাষা-পিছু মাত্র কয়েক পয়সা। সুতরাং বলা নিষ্প্রয়োজন, আমাদের এই রাজার রাজত্বে আমরা সবাই রাজা এটা গুজব মাত্র, আসল রাজা ওই হিন্দীওয়ালারা। হিন্দী যে "মোর ইকোয়াল" তাহার অন্য নমুনাও আছে। গত বৎসর সরকার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন নাকি একুনে ৬১টি। তাহার মধ্যে ২৫ খানা কিতাব হিন্দী, বাকী সব আংরেজি; বাংলা, মারাঠি কিংবা তামিল তেলগু—সব অপাংক্তেয়। ইংরাজীর এই সমাদর হইতেই বোঝা যায় হিন্দীর সাধ্য এখনও খুবই সীমাবদ্ধ, হিম্মত থাকিলে "আংরেজী হঠানেওয়ালারা" নিশ্চয়ই হিন্দী ছাড়িয়া ইংরাজীতে এতগুলি বই ছাপিতেন না। তবু এই নাবালকের পাতেই পড়িতেছে সিংহ-ভাগ। তাছাড়া মনে রাখিতে হইবে একা কেন্দ্রীয় সরকারই হিন্দীর পৃষ্ঠপোষক নহেন, কয়েকটি রাজ্য সরকারেরও ধ্যানজ্ঞান হিন্দী, ওই খাতে তাহারাও অকাতরে টাকা ঢালিয়া চলিয়াছেন। তদুপরি এই কেন্দ্রীয় বদান্যতা! ইহার পরও কি বলা চলে কেন্দ্র—রাজ্য সম্পর্কের অবনতি, আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি সবই অন্যদের কীর্তি? বিষবৃক্ষের কিছু কিছু চারা যে দিল্লির নব্য মুঘল-

উদ্যানের নার্সারি হইতেও সংগ্রহ করা সম্ভব, তাহার প্রমাণ এই দান-পত্রব।

কেন্দ্রের এই ব্যবহারে আমাদের রাগ করিবার কি অধিকার আছে বুঝিতে পারিলাম না! আমরা ডি-এম-কে দল ভুক্ত হইলে কথা ছিল। বিশেষ একটি স্মারক ডাকটিকেটে তামিল অক্ষরে নামোল্লেখ না থাকায় তামিল-নাড়ু তাহা প্রত্যাখান করিবামাত্র ভারত সরকার সেই বিশেষ ডাক টিকেট বাতিল করিয়া নূতন ডাক টিকেট (তামিল অক্ষর সহ) প্রকাশ করেন অতি সত্বরগতিতে। কিন্তু বাঙ্গলার প্রখ্যাত এবং দেশবরেণ্য মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য যে সকল স্মারক ডাক-টিকেট কেন্দ্রীয় ডাক তার বিভাগ প্রকাশ করেন একান্ত দয়া করিয়া, সেইসব টিকিটে বাঙ্গলা হরপের কোন প্রকার চিহ্নও থাকে না। মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণে যে ডাক টিকেট প্রকাশিত হয়, তাহাতে ইংরেজি এবং হিন্দীতেই দেব নাগরী হরফে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ছাপা হয়। পশ্চিমবঙ্গের কেহ এমন কি বাঙ্গালী সংসদ সদস্যগণও ঐ-বিষয় কিছু বলার কোন প্রয়োজন মনে করেন নাই। এমন কি যে কম্যুসদস্য সরকারের এবং কংগ্রেসের দোষত্রুটি দেখাইতে সদা তৎপর সেই সি পি আই সদস্য শ্রীভুপেশ গুপ্তও বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর হইয়া এ বিষয়ে কোন কথা বলার কোন প্রয়োজনবোধ করেন নাই! অথচ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি কটাক্ষ করিয়া সংসদে বা অন্যত্র কোন মন্তব্য কেহ করিলে, এই কম্যু সংসদ সদস্যগণ তাহার মুণ্ডপাত করিতে কাল-বিলম্ব করেন নাই!

কেবল ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, পঞ্চ বার্ষিক যোজনায় রাজ্যভিত্তিক অর্থ অনুমোদনের বেলাতে কেন্দ্রের হিন্দী ভাষী রাজ্যগুলির প্রতি অতি কারুণ্য প্রকাশ পায়। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তামিলনাড়ু তাহা অনুমোদন করে নাই, সোজা কথায় তামিলনাড়ু এ পরিকল্পনা তাহার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে; কারণ তামিলনাড়ুর অর্থ মন্ত্রীর মতে: "অর্থ কমিশন উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং অন্যান্য "হিন্দীভাষী" রাজ্যের জন্য বেশ ভালরকম অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। মহীশূর, কেরল এবং অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিন্তু তামিলনাড়ুর চারপার্টির অধিবাসীর দাবি অগ্রাহ্যকরা হইয়াছে" এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নামটা যোগ করা যাইতে পারে, বিশেষ করিয়া কলিকাতাকে বাঁচাইবার সমস্যা। বছরের পর বছর কেন্দ্রীয় সরকার এবং তাহাদের নিয়োজিত পরিকল্পনা কমিশন (এবং অর্থ কমিশনও) পশ্চিমবঙ্গ এবং কলিকাতা সম্পর্কে পরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন যোজনার প্রারম্ভকাল হইতেই, অর্থাৎ শ্রীনন্দমহারাজের আমল হইতেই। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রের দৃষ্টিতে 'ব্লাইণ্ড্ স্পট'। পশ্চিম-বঙ্গের এই সঙ্কটের কারণ কি?

আসল কথা আমাদের বিবিধ রাজনৈতিক দলগুলি অতি ব্যস্ত তাহাদের দলগত স্বার্থ এবং দলীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্যই তাহাদের সর্ব্ব শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। মাঝে মাঝে অবশ্য তাহাদের দরিদ্র, নিপীড়িত এবং সদা সর্ব্ব-অভাবগ্রস্ত বাঙ্গলার মানুষদের জন্য চোখের জল ফেলিতে দেখা যায়, কিন্তু এই চোখের জল মেকি 'গ্লিসারিণ-টিয়ার' মাত্র। বিশেষ করিয়া নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আমাদের জনকল্যাণব্রতী পলিটিক্যাল পার্টিগুলি আদাজল খাইয়া সাধারণ মানুষের কল্যাণ কিসে হইবে, কোন পথে, তাহার নীরব চিন্তা এবং সরব শ্লোগান্ চিৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে। প্রত্যেকটি পার্টি একথা বারবার ঘোষণা করিতে ভুলে না যে একমাত্র তাহারাই দেশকে, জাতিকে সর্ব্ব দুর্দ্দশা মুক্ত করিয়া নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গরাজ্যে ঠেলিয়া দিতে পারিবে! নিরীহ, নিরক্ষর এবং অর্দ্ধ ও অশিক্ষিত ভোটদাতারা সকল সময় ধাপ্পা এবং স্তোকবাক্যে ভুলিবার জন্যও প্রস্তুত হইয়া থাকে। সরল মনে তাহারা পলিটিক্যাল্ পার্টি নেতাদের পরম মিথ্যা আশ্বাস এবং বিরাট ধাপ্পাবাজীকেও চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করে! কিন্তু চিরকাল ইহা চলিবে কি? জনগণের মোহ-ভঙ্গ হইতে কিছু সময় লাগিতে পারে, কিন্তু একবার মোহ-ভঙ্গ হইলে জাগ্রত জনগণ যে

শেষ সংগ্রাম আরম্ভ করিতে, সেই মহাধ্বংসী সংগ্রামে কোন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করিয়া কপট, মিথ্যাচারী, স্বার্থপর নেতারা হইবে প্রথম "শহীদ"। একথা বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য সি পি এম, সি পি আই,এস ইউ সি এবং নেতাজী অপমানকারী ফরোয়ার্ডব্লক সম্পর্কে।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির প্রবল স্রোত—

পশ্চিমবঙ্গের তদারকী কমিশন তাহার চতুর্থ প্রতিবেদনে এই রাজ্যের প্রশাসন ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রবেশ এবং প্রাবল্য সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করিয়াছে। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী কিছুদিন পূর্বে রাজ্য সরকারের নিকট ৩৮ পৃষ্ঠার রিপোর্টে রাজ্যে কি প্রবলভাবে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া বলেন গত বৎসর (১৯৬৯-৭০) কমিশন ২৪৪৭টি অভিযোগ পাইয়াছেন। ইহার পূর্বে তিন বৎসরে এই প্রকার দুর্নীতির অভিযোগ ছিল এগারো শত হইতে দু'হাজারের মধ্যে। রিপোর্টের অংশবিশেষ আমরা নিয়ে দিলাম :

বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত দুর্নীতি ও অসাধুতা দেখা যাচ্ছে তার মূল কারণ, আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত অপব্যবস্থা।

তিনি বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, বিভাগীয় প্রধান প্রধান অফিসর খাতাপত্র সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। তাঁরা যদি সতর্ক না হন, তবে দুর্নীতির যে জোয়ার এসেছে, তা রোধ করতে সমগ্র প্রশাসনিক কাঠামোরই পরিবর্তন দরকার হবে।

কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ওই সময় ৩১ জন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারকে সাজা দেওয়া হয়েছে। সাতজন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারকে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে।

এছাড়া গত বছর অফিসারদের সঙ্গে যোগসাজসে রাজ্য সরকারকে নানা কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করার অভিযোগে ১৭টি ফার্মকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ৭টি প্রতিষ্ঠানের খাতাপত্র স্পেশাল অডিট করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ওই তালিকার মধ্যে কলকাতায় ৩৩০ এবং মফস্বলের ৩০০ জন গেজেটেড অফিসার এবং কলকাতায় ৪৫২ জন নন-গেজেটেড ও মফস্বলে ১১৬১ জন নন গেজেটেড অফিসার আছেন। এর মধ্যে একজন আই পি, ২ জন আই এস। এস, ১ জন আই এ এস অফিসারও আছেন। এছাড়া আছেন দুজন একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার, একজন সুপারিনটেনডেন্টিং অফিসার এবং একজন চীফ ইনজিনিয়ার। ওই আই পি অফিসার এবং দুজন আই এ এস অফিসারের মধ্যে একজনের মামলা ১৯৬১ সাল থেকে চলছে।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ওই সময়ে ২৩ জন গেজেটেড অফিসারকে তাদের অপরাধমূলক কাজের জন্য হয় সতর্ক অথবা বদলি করা হয়েছে।)

এছাড়া ১৯ জনকে কঠোর এবং ১২ জনকে অল্প সাজা দেওয়া হয়েছে। এবং ১৭ জনকে অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।)

কমিশন তাদের ওই প্রতিবেদনে রাজ্য সরকারের ২২টি বিভাগের সম্পর্কে আলাদাভাবে মন্তব্য করেন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "স্বরাষ্ট্র পুলিশ অসামরিক প্রতিরক্ষা, কৃষি স্বাস্থ্য, খাদ্য, ত্রাণ, উদ্বাস্তুপুনর্বাসন সেচ পশুপালন শিল্প বাণিজ্য, আবগারি, শিক্ষা, পূর্ত ও গৃহনির্মাণ বিভাগ।

প্রতিবেদনে বলা হয় : একজন আই পি অফিসার বড় একটি বাড়ি করে একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের অনুমতি নেওয়া হয় নি।

কমিশন মনে করেন, সারা রাজ্যে গ্রামীণ "স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে তদন্ত করে রক্তস্তম্ভনক তথ্য পাওয়া যায়।" তাতে দেখা যায় ওইসব প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের খাতাপত্রে অপারেশনের সংখ্যা তথ্য

ভুয়া করে বাড়িয়ে রেকরড করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই সব ভুয়া নির্বীর্যকরণের টাকা আত্মসাৎ করা।

অত্যাবশ্যক পণ্য আইন অনুসারে যে সব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি আগে দণ্ডিত হয়েছে তাদের নামেও আবার চিনি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদির লাইসেনস পারমিট ইস্যু করা হয়েছে।

কমিশনের পুর্ণ রিপোর্ট আমারা পাই নাই, এবং তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব কারণ স্থানাভাব। কিন্তু তদন্ত কমিশনের যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনের অবস্থা কি শোচনীয় হইয়াছে, তাহা ভালরকমেই বুঝা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কংগ্রেসী আমলে ও প্রশাসনে এ-রাজ্যে বহু দুর্নীতি ছিল, কিন্তু সেই আমলে মানুষের চক্ষুলজ্জা বলিয়া কিছু ছিল এবং প্রশাসনে দুর্নীতি এমন 'সগৌরবে' মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই! আর একটা জিনিষ ছিল—সরকারী কর্ম্মচারী এবং সাধারণ মানুষের একটু ভদ্রতাবোধ, আন্তরিক না হইলেও, লোকদেখানো ভদ্রতা ছিল কিন্তু কংগ্রেসী প্রশাসনে যাহা বিশ বছরে ঘটে নাই বা ঘটিতে পারে নাই, ১৪ ইয়ারীর যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলে, প্রশাসনের যে অসামান্য কিছু বজায় ছিলো তাহা কয়েকমাসের রাজত্বকালে একবারে লুপ্ত হইল। মন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া সামান্য সরকারী কর্মচারী পর্য্যন্ত ফ্রন্ট আমলে হঠাৎ যে স্বাধীনতার আস্বাদ পাইল, তাহারই প্রয়োগ—অপ্রয়োগের বিষম খেলায় সকলেই মত্ত হইল।

এক একজন ফ্রন্টীয় মন্ত্রী নিজ নিজ দপ্তর সম্পর্কে এমনভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন সকলেই এক-একটা রাজ্যের স্বাধীন নৃপতি! নিয়োগ, প্রমোশন প্রভৃতি বিষয়ে চিরাচরিত আইন কানুন সবই বিসর্জ্জন দেওয়া হইল। মন্ত্রীর দলীয় ভক্ত-সমর্থকদের 'সরকারী কর্ম্মে নিয়োগ করায় বাধা দিবার কেহ রহিল না! সকল মন্ত্রী নিজের নিজের দলীয় শক্তি এবং স্বার্থ রক্ষায় সর্ব্বসময় ব্যয় করিতে ব্যস্ত রহিলেন—অন্যদিকে সরকারী একান্ত জরুরী কাজও মন্ত্রীমহাশয়ের সময়ের অভাবের জন্য জমা হইতে থাকিল, মন্ত্রীদের দপ্তরগুলিতে ফাইলের পর ফাইল জমিয়া পাহাড়প্রমাণ হইল। মন্ত্রীমহাশয়গণ সরকারী কাজের অজুহাতে রাজ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে কখনও সময়ের অভাববোধ করেন নাই। "সরকারী কাজে টুর"—অতএব টি-এ এবং অন্যান্য খরচা (গাড়ী পেট্রল প্রভৃতি) করদাতাদের অর্থে বিনা বাধায় পকেটস্থ হইতেও কোন বাধা রহিল না! চক্ষুলজ্জা এবং আত্মসম্মান বোধের বালাই না থাকিলে, মানুষের কোন কিছু করিতে, তাহা যতই হীন, নীতিহীন হউক না কেন, আটকায় না। তবে যাহা কিছু করা হইতেছে, তাহা নিপীড়িত জনগণের স্বার্থেই—ঢাক পিটাইয়া একথাটা সব সময় প্রচার করিতে হইবে, এমন কি কোন মন্ত্রী বা নেতা যদি চুপ করিয়া বসিয়াও থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে তিনি জনকল্যাণের জন্য নূতন কোন পথ বা সুত্র সন্ধান করিতেছেন! কাজেই এই সময় তাঁহাকে বিরক্ত করা হইবে মহাপাপ!

ইউ এফ চোদ্দ ইয়ারীর দল মাত্র ন'মাসে প্রশাসনকে ধাপার মাঠে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে বলিলে অন্যায় বা বেশী কিছু বলা হয় না এবং এ-বিষয়ে সি পি এম নেতাদ্বয় শ্রীমান জ্যোতি এবং রামবল্লভ গোঁয়ার সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জল দৃষ্টান্ত। অচিরে হয়ত দেখিতে পাইব শ্রীধাবন জ্যোতি বাবুকে ভারতরত্ন এবং শ্রীগোঁয়ারকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি ভূষিত করিবার জন্য কেন্দ্রের কাছে নিবেদন জানাইবেন! নিজেদের কীর্ত্তিকলাপ বিষয়ে যদি ফ্রন্টীয় ভাগ্যবিধাতার স্বাভাবিক অবস্থায় এবং 'সুস্থ'-চোখে দেখিবার অবসর পাইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা আন্দামানে গিয়া তথাকার বনে জঙ্গলে লজ্জায় আত্মগোপন করিতেন! একান্ত বেহায়া, নির্লজ্জ এবং দুই কর্ণবিহীন বলিয়া আবার তাঁহারা লোকসমক্ষে নিজেদের এবং দলীয় গুণ প্রচার করিতে সাহস পাইয়াছেন—!

হাসপাতালও শ্রমিক-পীড়নের আওতার বাহিরে নয়

কিছুদিন পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়:

অভিযোগ, দাবি, বিক্ষোভ-প্রদর্শন সঙ্গত কি অসঙ্গত, দোষ কাহার, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। কিন্তু তিন-তিনটি হাসপাতাল বন্ধ হইয়া যাওয়া এবং আরও একটি হাসপাতাল বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়া যে খুবই দুঃখজনক ও অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার তাহা নির্দ্বিধাতেই বলিব। কারণ রোগীর তুলনায় কলিকাতায় হাসপাতালের সংখ্যা নিতান্তই কম। তদুপরি হাসপাতালগুলি যদি এইভাবে ক্রমে ক্রমে দরজা বন্ধ করে তাহা হইলে রোগীদের এবং তাঁহাদিগকে লইয়া তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের যে কী দুঃসহ অবস্থায় পড়িতে হয়, তাহা কাহারও পক্ষেই অনুমান করা কঠিন হওয়ার কথা নয়। কাজেই হাসপাতাল বন্ধ হইলে কর্তৃপক্ষ বা কর্ম্মচারী কাহার কী লাভ বা লোকসান হয় জানি না, কিন্তু ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, জনসাধারণ তাহাতে নিতান্তই বিপন্ন হইয়া পড়ে। মানবিকতার দিক দিয়া বিচার করিলেও ইহা নির্ম্মম আচরণ বলিয়া গণ্য হইবে। কাজেই অভাব-অভিযোগ যাহাই থাকুক কোন অবস্থাতেই কোন পক্ষ হইতেই এমন পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় যাহাতে একটি হাসপাতাল বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিবার, দাবি দাওয়া আদায় করিবার বা বিরোধ মিটাইবার কোন শান্ত সুষ্ঠু পথ নহে তাহা যদি স্বীকার করিতে হয় তা হইলে বলিতেই হইবে, মনুষ্যত্ব বা সভ্যতার পথে মানুষ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নাই। হাসপাতালে বিরোধের সূচনাতেই সরকার যদি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে তাহা মিটাইবার জন্য তৎপর হন তাহা হইলে হাসপাতাল বন্ধ করার প্রয়োজন নাও হইতে পারে এবং বন্ধ হাসপাতালগুলিও আবার হয়তো খোলা সম্ভব হইতে পারে। বস্তুত সরকারী প্রচেষ্টাই হউক কিংবা বিরোধী পক্ষদের সৎ ও শুভ প্রয়াসের ফলেই হউক, হাসপাতাল বন্ধ হওয়ার মত জনস্বার্থ-বিরোধী ব্যাপারের অচিরে অবসান হওয়া আবশ্যক।

ব্যক্তিগতভাবে তিরিশ বৎসরেরও বেশী কলিকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গের দুইটি বৃহত্তম হাসপাতালের সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিলাম, এবং এই কারণে হাসপাতালের ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মীদের হাল ১৯৬০ সাল হইতে কিংক্রতভাবে নিম্নগামী হইতে থাকে তাহা ভাল করিয়াই জানি। হাসপাতাল কর্ম্মীদের সকল দাবী-দাওয়া অন্যায় বা অযৌক্তিক এমন কথা কখনই বলিব না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা প্রয়োজন সাধারণ শিল্পসংস্থার মত হাসপাতাল বিশেষ করিয়া বেসরকারী হাসপাতাল সর্ব্বক্ষেত্রে শ্রমিকদের সকল প্রকার আর্থিক দাবী, ইচ্ছা থাকিলেও মিটাইতে পারে না। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছি, এমন অনেক দাবী হাসপাতাল শ্রমিক এবং কর্ম্মীরা করেন, যাহা বহুক্ষেত্রে শ্রমিক ইউনিয়নের অ-শ্রমিক নেতাদের উদ্ভাবিত! উদ্ভট দাবি তুলিয়া নেতারা শ্রমিকদের তাক্ লাগাইয়া দেন এবং বুঝাইয়া দেন, শ্রমিকদের জন্য ইউনিয়ন নেতারা কি ভীষণ সংগ্রাম করিতেছেন। বলা বাহুল্য এইসব শ্রমিক নেতারা বহু ক্ষেত্রে বাহ্যত অবৈতনিক হইলেও, আসলে এবং কার্যত উত্তমরূপেই 'বৈতনিক' অথবা 'পেড্'।

শ্রমিকমহলের ন্যায্য দাবি বিষয়ে কিছু বলিবার বা আপত্তি করিবার নাই, কিন্তু দাবি যতই জোরদার হউক না কেন, তাহা আদায়ের জন্য হাজার হাজার নিরীহ রোগী এবং সাধারণ মানুষকে নির্যাতীত করিবার কোন অধিকার শ্রমিকদের থাকিতে পারে না। (কিছুদিন পূর্ব্বে সামান্য সংখ্যক শ্রমিক অবলীলাক্রমে কলিকাতা এবং বৃহত্তর কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থা কেমন করিয়া অচল করিয়া দেয় তাহা আমরা ভুলি নাই!)

একথা অস্বীকার করা যায় না যে বর্তমান সময়ে—সমাজের সাধারণ মানুষকে পীড়ন করিতে বাঙলার শ্রমিকমহল—তথা ইউনিয়ন-নেতারা, আদাজল খাইয়া

লাগিয়াছেন। এ-অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে, সাধারণ মানুষের কর্তব্য ও করণীয় কি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলার দরকার নাই। বাঙ্গলার জনসাধারণ আর একটা কথা মনে রাখিবে, এ-রাজ্যের শ্রমিকদের শতকরা ৭০।৭৫ ভাগ অবাঙ্গালী। তাহারা বাঙ্গলারই খাইতেছে এবং ইচ্ছামত কিংবা নেতাদের হুকুমমত বাঙ্গালী ঠেঙ্গাইতেছে!

কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্র-গ্রাহ্য! কিন্তু—টাকার কি ব্যবস্থা হইবে?

কিছুদিন পূর্বে দিল্লী হইতে আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা জানান:

নয়াদিল্লী, ২৩ মে—বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের অফিসাররা আজ এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বৈঠক করার পর ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না, পৌর কাজকর্মের উন্নতির জন্য চতুর্থ যোজনার আমলে যে ১৪০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে স্থির হয়েছে, তা কোথা থেকে আসবে? রাজ্যের চতুর্থ যোজনায় ওই খাতে ইতিমধ্যেই ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে চুঙ্গি কর থেকে পাওয়া যাবে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বিলে চুঙ্গি করকে 'প্রবেশ কর' বলে বর্ণনা করা হবে।

আরও ৩০ কোটি টাকা বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ হিসাবে তোলা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সব আশা যদি ফলবতীও হয় তা হলেও ১১০ কোটি টাকার বেশী পাওয়া যাচ্ছে না। তখনও ঘাটতি থাকছে ৩০ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের অফিসাররা এবার পি এল-৪৮০ টাকার তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য বলেননি। তাঁদের বক্তব্য ছিল অতীতে তহবিল থেকে এতবার অর্থ বরাদ্দ করার জন্য বলা হয়েছে—বিশেষ করে ১৯৬৭ সালের প্রথমবার রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলেও ওই মর্মে প্রার্থনা জানানো হয়েছিল—কিন্তু কোনবারই কেন্দ্রের মনে ছাপ ফেলা যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকার একবারও বলেননি ওই তহবিল থেকে টাকা পাওয়া যেতে পারে। বস্তুত, ওই তহবিলের সমগ্র টাকাই কেন্দ্রীয় বাজেটে ঋণ হিসাবে নেওয়া হয়েছে। যদি কিছু অর্থ ওই তহবিল থেকে নিয়ে কলকাতার জন্য বিনিয়োগ করা হয়, তা হলে সেই পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় বাজেটে টান পড়বে।

সেই ঘাটতি অতিরিক্ত কর বসিয়ে কিংবা মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। এরকম কোন পন্থাই কেন্দ্রের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি।

ফোর্ড ফাউনডেশন ওই ঘাটতি পূরণ করতে পারবেন কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কেননা, তাঁরা সাধারণত সমীক্ষার জন্য টাকা দেন—প্রকৃত উন্নয়ন কাজে নয়। কেন্দ্রের মুখপাত্র রাজ্যের অফিসারদের এমন কোন আভাসও দেননি যে, সাহায্যের জন্য কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে বলা হবে।

যোজনায় ইতিমধ্যে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে এখন পর্যন্ত কলকাতার জন্য নিজের পকেট থেকে কেন্দ্রের কিছু দেবার অভিপ্রায় দেখা যাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় সব টাকাই পশ্চিমবঙ্গকে যোগাড় করতে হবে।

'প্রবেশ করের' খুঁটিনাটি ঠিক করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন এ সম্পর্কে একটি বিল তৈরি করবেন। খসড়া বিল পরীক্ষা করে দেখার জন্য দরকার হলে কেন্দ্র থেকে একজন আইনজ্ঞ কলকাতায় আসবেন।

সংসদের পরামর্শ-কমিটির ১০ জুনের বৈঠকে ওই বিল পেশ করা হবে। আশা করা যায়, অধিকাংশ সদস্যের অনুমোদন মিলবে। অধিকাংশ সদস্য যদি অনুমোদন নাও করেন, তাঁদের সিদ্ধান্ত কেন্দ্র মানতে বাধ্য থাকবেন না। রাষ্ট্রপতি তখন এই সব ব্যবস্থা কার্যকর করতে পারবেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ ও রাজ্য সরকারের অফিসাররা যোজনা-কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ ডি আর গ্যাডগিল ও অন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

প্রকাশ, ১৯৬৬ সালে সি এম পি ও যে পথে কলকাতার

মৌল উন্নয়নের পথনির্দেশ দিয়েছিলেন, সে পথ ধরেই কাজ হওয়া উচিত বলে যোজনা কমিশন একমত হন। জোর দেওয়া হবে জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী নিকাশী কাজ, বস্তি উন্নয়ন ও সড়ক উন্নয়ন ও পরিবহণের উপর।

এ সব দীর্ঘমেয়াদী। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসন ১৯৭২ পর্যন্তই। সুতরাং ওই সব কাজের জন্য কম সময় হাতে আছে। সরকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবং সেইমত বেছেনিয়ে এমনভাবে এগিয়ে যেতে হবে যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারেন রাষ্ট্রপতির শাসনের অর্থ কাজ এবং এই শাসনে তাঁদের পৌর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি হবে।

কলকাতার ট্রামের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। একথা সবাই স্বীকার করেন ১৯৬৭ সালে রাজ্য সরকার ট্রামের ভার নিজের হাতে নেওয়ার পর বিরাট অঙ্কের টাকা আগাম দেওয়া সত্বেও ট্রাম পরিবহণ ব্যবস্থার অবনতিই ঘটেছে।

গত বছর সরকার ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেন। কোনক্রমে ট্রাম চলাচল বহাল রাখার জন্যই সেই টাকা ব্যয় হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য একরকম কিছু করা হয়নি।

কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ করপোরেশনের অবস্থাও খুব কাহিল। সরকার বছরে ট্রাম ও বাসকে মোটে ৪ কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছেন। এই বোঝা অনির্দিষ্ট কাল বহন করা যায় না।

প্রতিবিধানের রাস্তা হল ট্রাম ও বাসের যথোপযুক্ত ভাড়া বৃদ্ধি। গত তিন বছর এজন্য অনেকবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তা করা যায়নি।

কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি বিধান সম্পর্কে-কি করা উচিত, কি করা হইবে, না হইবে প্রভৃতি স্থির করিতে করিতেই হয়ত ১৯৭২ সাল আসিয়া যাইবে এবং সেই সময় নূতন নির্বাচনের ফলে যদি আপাত-মৃত যুক্ত ফ্রন্ট আবার ক্ষমতা লাভ করে, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের কপালে কি আছে—তাহা বলিতে পারেন একমাত্র মানবভাগ্যবিধাতা! তবে যুক্ত ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসিলে আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইব! এইবার যে অন্ধকার রাজ্যের উপর নামিয়া আসিবে তাহা হয়ত চিরস্থায়ী হইবে। আমাদের এ ভয় মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আমার সুখী হইব!

কংগ্রেসের উপর আর কোন আশা করিনা। ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসকে দুই ভাগ করিয়া একদা মহান কংগ্রেসকে খতম করিয়া পরম সার্থকতা অর্জন করিয়াছেন!
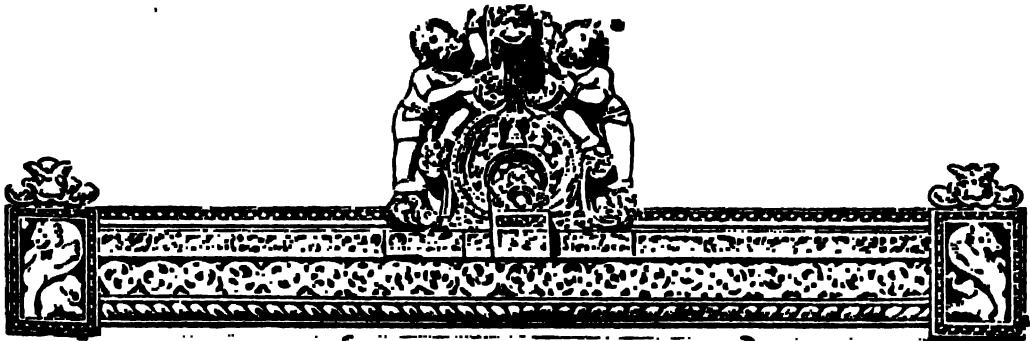
যত আঁধার তত আলো

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৬

মনোরমা ঘর থেকে চলে যেতেই দরজাটা পুনরায় বন্ধ করে দিয়ে মলয় স্থির হ'য়ে বসল। একটি চারমিনারে অগ্নিসংযোগ করে ঘন ঘন গোটাকয়েক টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল। ঘরের চতুর্দ্দিকে ইতঃস্তত ছড়ান কাগজগুলির পানে একবার করুণ দৃষ্টিতে দেখে ক্ষণপূর্ব্বে লিখিত খানকয়েক কাগজের প্রতি দৃষ্টি ফেরালো। মৃগাঙ্ক চরিত্রের উপর অনাবশ্যক এবং অসঙ্গত মমতা দেখাতে গিয়ে মলয় যে ভুল ক'রেছিল তারই প্রায়শ্চিত্ত করেছে আজ।

মলয় পুনরায় লিখতে সুরু করল :—

মৃগাঙ্ক শিক্ষিত। শিক্ষার গর্ব্ব তার মধ্যে ছিল। কিন্তু তার শিক্ষা তাকে সহনশীলতা শেখায় নি—প্রতিশোধ নেবার যোরাল বুদ্ধি যুগিয়েছে—বর্ব্বর ক'রে তুলেছে। নইলে কেন সে গা ঢাকা দিয়েছিল? সত্যকে স্বীকার ক'রে নিতে কেন মৃগাঙ্ক দ্বিধা ক'রেছিল? এই একটি প্রশ্ন? তাকে চতুর্দ্দিক থেকে ঘিরে আছে।

মৃদুলা মৃত্যুকে বরণ ক'রে বাঁচার গ্লানি থেকে আত্মরক্ষা করেছে। বাঁচার গ্লানি··· বাঁচার গ্লানি··· কথাকটি মৃগাঙ্ক আপন মনে বার বার উচ্চারণ ক'রতে থাকে। বাঁচার জন্ত সর্ব্বত্র এত আয়োজন অথচ মৃদুলা বাঁচতে চায়নি। বাঁচতে সে তাকে দেয়নি। চাতুর্য্য-পূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে একটি উদার সরল সুন্দর মেয়েকে মৃগাঙ্ক—

মলয়ের কলম থেমে গেছে। ভিতরে বাইরে সে রীতিমত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে—উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। পুনরায় চারমিনারে ঘন ঘন টান দিতে থাকে মলয়। দৃষ্টি তারা সহসা খোলা জানালাপথে বাইরের উন্মুক্ত উদার আকাশের পানে স্থির নিবদ্ধ হ'ল। আকাশে অসংখ্য তারা ফুটে উঠেছে। তারাগুলি ঝিকিমিকি হাসছে। হয়ত এমনি ঝিকিমিকি হাসি দেখবার জন্যই মৃদুলা ক্ষণ-কালের জন্ত আত্মবিস্মৃত হয়েছিল নইলে ··

মলয় পুনরায় তার গল্পে ফিরে এল।

মৃগাঙ্কর মত একটি যুবক কেমন ক'রে এ কাজ ক'রতে পারল। একদিন একটি অসতর্ক মুহূর্ত্তে যে কথাকটি সে বলেছিল সেইটাই কি মৃগাঙ্কর কাছে এত বড় হ'য়ে উঠেছিল যার কাছে পরবর্ত্তিকালে সেই মৃদুলার প্রেম প্রীতি, ভালবাসা, পরিপূর্ণ সমর্পণ সব কিছু ম্লান হ'য়ে গেল! এই প্রশ্নটি আজ দীর্ঘদিন ধরে তার চোখের সম্মুখে ঝুলে রয়েছে। সময় থাকতে সে ভাবেনি। সময় উৎরে যাবার পর ভাবতে সুরু ক'রছে। নিজের কাজকে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিচার ক'রতে ব'সেছে।

মলয়কে পুনরায় থামতে হ'ল। গল্প তার এক পাগলা ঝড়ের মুখে পড়েছে। উড়ে আসছে এলোমেলোভাবে। শেষের অংশ আগে, আগের অংশ শেষে। মলয় নিজের উপর বিরক্ত হ'য়ে উঠল। কলম রেখে দুহাতে নিজের চুলগুলি টানতে লাগল। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারী ক'রতে লাগল। মলয় নিজেও যেন ঝড়ের মুখে পড়েছে। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে। কুঁজো থেকে একগ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে একনিঃশ্বাসে তা পান করে। খানিকটা জল মাথায় ঢালে।

আকাশে তারাগুলি তেমনি হাসছে। মৃদুলাও হাসিমুখে এসে মৃগাঙ্কর পাশে দাঁড়িয়েছে। মলয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার গল্পের নায়িকার একজোড়া গভীর কাল চোখ। সে চেয়ে আছে পলকহীন চোখে মৃগাঙ্কর মুখের পানে। মৃগাঙ্ক পাশ কাটিয়ে চলে যেতে উদ্যত

হ'তেই মৃদুলার অস্পষ্ট কণ্ঠ শোনা গেল...মলয় চমকে উঠল সে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে মৃদুলার কণ্ঠস্বর...

মলয়ের কলম পুনরায় তার হাতে উঠে এসেছে। চিন্তা শব্দের গ্রন্থিতে বাধা পড়তে সুরু ক'রেছে।

মলয় লিখতে লাগল :—

মৃদুলা বলছিল, আপনার রাগ ত' কম নয় মৃগাঙ্ক বাবু। একটা কুশল প্রশ্ন অথবা পাল্টা অপমান করতেও তো পারতেন।

কোন জবাব না দিয়ে মৃগাঙ্ক পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গিয়ে বাধা পেল। পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে মৃদুলা বলল, আমার কথার জবাব না দিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রলে আমি চিৎকার করবো।

মৃগাঙ্কর দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠল।

মৃদুলা তা লক্ষ্য ক'রেই বলল, বাড়ী বয়ে সেদিন যখন অপমান ক'রে এলাম তখন তো' এতটা অবাক হন নি।

মৃগাঙ্ক নিরুত্তর।

মৃদুলা একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, আপনি কথা কইবেন না ঠিক ক'রেছেন না কি?

মৃগাঙ্ক এতক্ষণে মুখ খুলল, না ব'লতে হ'লেই খুশী হতাম। কিন্তু স'ত্য ক'রে বলুন তো আমি আপনার কি ক'রেছি? এভাবে পিছু নিয়েছেন কেন?

মৃদুলা সহসা অত্যধিক গম্ভীর হ'য়ে উঠল। বলল, ইচ্ছে হ'লে অনায়াসে আপনি শোধ নিতে পারেন মৃগাঙ্ক বাবু। আমি দুঃখ পাবো না। প্রাপ্য বলেই মাথা পেতে নেব। আপনার পিছু নিয়েছি এই কথা জানাবার জন্যই। বিশ্বাস করুন আপনাকে যতটুকু দুঃখ দিয়েছি তার চেয়ে এই কদিনে আমি ঢের বেশী দুঃখ পেয়েছি।

মৃগাঙ্ক জবাব দিল, আমি বিশ্বাস করেছি- এবারে দয়া করে পথ ছাড়ুন।

মৃদুলা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, এ আপনার রাগের কথা।

মৃগাঙ্কর মুখে হাসি দেখা দিল। বলল, তাহ'লে আপনিই বলে দিন কিভাবে জবাব দিলে রাগের কথা না।

খানিক চুপ ক'রে থেকে মৃদুলা সখেদে প্রত্যুত্তর দিল জবাব দেবার আর দরকার নেই। আপনি যা মৃগাঙ্কবাবু।

একটু থেমে সে পুনরায় বলল, তবে যাবার আগে শুনে যান যে আমার অসাবধান উক্তির জন্য আমি লজ্জিত আর দুঃখিত। পারেন তো ভুলে যাবেন।

কিন্তু যাকে যেতে বলা হ'ল সে যাবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে মৃদু হেসে বলল,

একটু আগে আপনি রাগের কথা ব'লছিলেন না?

মৃদুলা জবাব দিল, এত কথার পরেও মানুষের রাগ হবে না?

মৃগাঙ্ক শান্ত কণ্ঠে বলল, ওটা আমারও প্রশ্ন। এবং আমি যদি রাগটা কোন ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। কিন্তু থাক ওসব কথা।

থাকবে কেন—আপনার যা ব'লবার বলুন মৃগাঙ্ক বাবু। মৃদুলা বলল যোগ যখন যাবার করেছি তখন তা কতদূর পৌঁছেচে সেটা জেনে নিই।

মৃগাঙ্ক একটু হেসে বলল, আপনি খুব দুঃখিত হ'য়েছেন আমি জেনে নিয়েছি। কিন্তু আপনার বান্ধবী কি বলে জানেন?

মৃদুলার মুখে চোখে বিস্ময়ের ভাব স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। সে শান্ত কণ্ঠে বলল, কেমন ক'রে জানবো বলুন—

মৃগাঙ্ক হাল্কা হেসে বলল গরু মেরে জুতো দান করা...

মৃদুলার দুচোখ জলে উঠল সে অনেক আত্মসম্বরণ করে জবাব দিল, কেতকী তার উপযুক্ত কথাই হয়তো বলেছে কিন্তু আপনিও কি একই পথে চলা করেন মৃগাঙ্ক বাবু?

মৃগাঙ্ক অল্প হেসে জবাব দিল, যদি করেও থাকি তাতে আপনার তো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই মৃদুলা দেবী।

আছে। মৃদুলার কণ্ঠস্বর তক্ত মলিন হ'য়ে উঠল সে জবাব দিল, আছে এই জন্য যে আমি যে এত করে দুঃখ প্রকাশ ক'রলাম আপনার কাছে তার আপনি অনুপযুক্ত।

মৃগাঙ্ক শব্দ ক'রে হেসে উঠল।

মৃদুলা নীরব।

মৃগাঙ্ক পুনরায় বলল, রাগের কথা থাক। আমার একটা সহজ প্রশ্নের সোজা উত্তর দেবেন।

মৃদুলা জবাব দিল, চেষ্টা ক'রবো।

মৃগাঙ্ক বলল, সত্যি ক'রে বলুনতো একটা অন্যায় করে তা স্বীকার ক'রলেই কি সব চুকে যায় মৃদুলা দেবী? আঘাতের বেদনা ভোলা কি এতই সহজ? আপনার সঙ্গে আজ দেখা হওয়ার পর থেকেই এই একটা কথাই আমি বারে বারে ভাবছি।

মৃদুলা খানিক মাথা নীচু করে কি ভাবল তার পরে মুখ তুলে স্থির কণ্ঠে বলল, আপনার প্রশ্নের জবাব আমার না দেওয়াই উচিত। আমার জবাব আপনার মনের মত হবে না। অকারণে আরও দুঃখ পাবেন।

মৃগাঙ্ক হেসে বলল, আমি প্রস্তুত আছি।

মৃদুলা একটু ইতঃস্তত করে বলল, আমার মনে হয়… না থাক মৃগাঙ্ক বাবু।

মৃগাঙ্ক বলল, আপনি কি ভয় পাচ্ছেন মৃদুলা দেবী?

মৃদুলা কথাটা স্বীকার ক'রে নিয়ে বলল, তা একটু পাচ্ছি।

মৃগাঙ্ক বলল, আমাদের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক নেই যার জন্তে আপনি ভয় পেতে পারেন।

মৃদুলা এক মুহূর্তে অনেক কথা ভেবে নিয়ে জবাব দিল, তা বটে, তাহলে শুনুন, আমার মনে হয় 'ইউ আর সাফারিং ক্রম ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।' আপনার পারিবারিক জীবনের অতীতের ধারাবাহিক ইতিহাস আপনার মনকে সংস্কারাচ্ছন্ন করে রেখেছে—

মৃগাঙ্কর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। সে আর দ্বিতীয় কথা না বলে চোখের পলকে সেখান থেকে চলে গেল।

মৃদুলা কেমন যেন হতভম্বের মত তার চলার পথের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তার মুখে আর একটা কথাও যোগাল না।

১৭

আত্মরক্ষার জন্ত তখনকার মত মৃগাঙ্ক চলে গেলেও গুলিবিদ্ধ বাঘের মত সে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াল। তবে মানুষ আর জন্তর মধ্যে প্রভেদ থাকার জন্তই হয়তো আঘাতকারীর উপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে সে কূট বুদ্ধির আশ্রয় নিল। যুদ্ধের খেলায় সে মৃদুলাকে এমন শিক্ষা দেবে যে ইহজীবনে সে তা ভুলতে না পারে। তাই চলে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল মৃগাঙ্ক। একবারও ভেবে দেখল না কেন সে এমনি এক উন্মাদ খেলায় মেতে উঠতে উদ্যত হয়েছে। কতখানি অপরাধ মৃদুলা করেছে। মৃদুলার চিন্তায় যে কথাকটি ধরা দিয়েছে তাকেই অকপটে প্রকাশ করে কতখানি অন্যায় সে করেছে? যে কথা মনে উদয় হয়েছে তা প্রকাশ করা যদি অপরাধ হয় তাহলে মনের ইচ্ছাকে গোপন রেখে মৃগাঙ্ক যে ধরনের চিন্তাকে সংগোপনে প্রশ্রয় দিচ্ছে তা আরও বড় অপরাধ। কিন্তু এর বিচার করবে কে…সে নিজেই যখন বিচারকের আসনে বসেছে।

মলয়ের লেখার গতি রুদ্ধ হল। এক ঝলক দমকা হাওয়ায় খোলা জানালাটা প্রচণ্ড শব্দ করে বন্ধ হয়ে যেতে সে চমকে উঠেছে। তার একাগ্র চিন্তায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে। ছেঁড়া কাগজের টুকরাগুলি চতুর্দিকে উড়ে গিয়ে আরও খানিকটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। মলয় উঠে গিয়ে পুনরায় জানালাটা খুলে দিল। তারাগুলি মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ, পূর্ব্বেও যে তারাগুলি ঝিঁকিমিকি হাসছিল তার চিহ্নমাত্রও আর নেই। আশ্চর্য্য যোগাযোগ। মলয়ের চিন্তাধারার সঙ্গে তারাগুলির অন্তর্ধান আর মেঘের আবির্ভাবের কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে।

এই যোগসূত্রের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মলয় স্পষ্ট অনুভব করছে তার গল্পের নায়ক মৃগাঙ্কর মৃদুলার জীবন পথে আবির্ভাবকে। যে আবির্ভাব একটি মেয়ের জীবন থেকে কেড়ে নিল বিমল আনন্দকে—গ্রাস করে ফেলল সমস্ত শুভ সম্ভাবনাকে। কিন্তু মৃগাঙ্ক নিজে কতখানি পেল। তাইত আজ এমন নিবিষ্ট চিত্তে সে দেনা-পাওনার হিসেব করতে বসেছে।

মলয় পুনরায় কলম তুলে নিল।

…বিচারক রায় দিল। অল্পবয়স্কা বলেও এতটুকু করুণা পেল না। দণ্ডদানের দায়িত্বটাও মৃগাঙ্ক নিজের

হাতে নিল। চরম দণ্ডবিধানই সে করেছিল। কিন্তু তারপর…এই তারপরের মীমাংসা করতে গিয়ে আবার নতুন করে মৃগাঙ্ককে বিচারকের আসনে বসতে হল। এবারে সে নিজের বিচার করতে বসেছে।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে তার নিজের কাজ আর তার পরিণতির কথা সমালোচনা ক'রতে ব'সে আবার তাকে তার অতীতজীবনের কতকগুলির ঘটনার মধ্যে ফিরে যেতে হ'ল। সর্ব্ব প্রথম তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল গোলার দীঘির কানায় কানায় ভরা টলটলে জল আর দক্ষিণ পারের কোল ঘেঁসে অবস্থিত এক প্রাচীন বট গাছ।…

…মৃগাঙ্ক জলের ধারে বটগাছের নীচে চুপ ক'রে বসে আছে। দিনকয়েক ধরে রোজই এই বিশেষ স্থানটিতে এসে মৃগাঙ্ক চুপ বসে থাকে। রোদ পড়তে এবং সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে আবার চলে যায়। সেদিনেও মৃগাঙ্ক যথাসময় এসেছিল কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্য বহু পূর্ব্বেই তাকে উঠতে হ'ল। আকাশক ঝড় জলে চতুর্দ্দিকে একটা উন্মাদ মাতামাতি চলেছে। দশহাত দূরের মানুষকেও চেনা যাচ্ছিল না। মৃগাঙ্ক দ্রুত বাড়ীর পথে এগিয়ে চলেছে। পথের মাঝে মৃদুলার সঙ্গে দেখা। বিপরীত দিক থেকে সে দ্রুত এগিয়ে আসছিল। হুচোট খেয়ে পড়ে না গেলে হয়ত কেউ কাউকে দেখতেই পেত না। একটা অস্ফুট আর্তনাদে মৃগাঙ্ক থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস ক'রল, কে?

মৃদুলা সাড়া দিল।

মৃগাঙ্ক এগিয়ে এসে প্রশ্ন ক'রল, খুব লাগেনি তো?

মৃদুলা জবাব দিল, খুব লেগেছে।

মৃগাঙ্ক বলল, আমি কোন সাহায্য ক'রতে পারি কি?

ধন্যবাদ আমি একলাই যেতে পারবো।

বলেই উঠতে গিয়ে পুনরায় কাতরোক্তি করে বসে পড়ল।

মৃগাঙ্ক ওর পাশে বসে পড়ে বলল, দেখি তো কোন পায় লেগেছে?

মৃগাঙ্ক মুখে একপ্রকার শব্দ করে বলল, ইস আঙুলটা যে একেবারে থেঁতলে গেছে। এ অবস্থায় যাবেন কি ক'রে? আমার কাঁধে ভর দিয়ে যেতে পারবেন কি? অবশ্য কোন আপত্তি না থাকলে।

মৃদুলার চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। সে ক্লিষ্টকণ্ঠে বলল, যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি। আমার অত ভাববার সময় নেই।

মৃগাঙ্ক ওকে হাত ধরে দাঁড় করাল। যন্ত্রণায় মৃদুলার মুখ কাল হয়ে গিয়েছিল। কয়েক পা অগ্রসর হ'য়ে গিয়ে মৃগাঙ্ক পুনরায় ব'লল, আপনার অসুবিধে হলে ব'লবেন, আমি না হয় আপনার বাবাকে ডেকে নিয়ে আসব।

মৃদুলার পায়ের গতি রুদ্ধ হ'ল সে মৃদু কণ্ঠে বলল, আপনার অসুবিধে হ'লে বাবাকে ডেকে আনতে পারেন।

মৃগাঙ্ক একটু যেন লজ্জা পেয়েছে এমনিভাবে ব'লল, প্রশ্নটা আমাকে নিয়ে না?

মৃদুলা ক্ষুব্ধকণ্ঠে জবাব দিল, তাহলে কাউকে নিয়েই নয়। আমি, তো আপনাকে ভর করেই চলেছি।

মৃগাঙ্ক অন্য কথায় এল, এই ঝড় জল মাথায় ক'রে কোথায় গিয়েছিলেন?

মৃদুলা আস্তে আস্তে জবাব দিল, কেতকীকে তাদের বাড়ী পৌঁছে দিতে।

মৃগাঙ্ক খানিক বিস্ময় প্রকাশ ক'রে ব'লল, আমি হ'লে যেতাম না।

মৃদুলা একটু ইতঃস্তত করে বলল, সব মানুষ তো একরকম হয় না মৃগাঙ্কবাবু।

মৃগাঙ্ক একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, তা ঠিক— কিন্তু এই যে আপনাদের বাড়ী এসে গেছি। আমি যাই, বলেই নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হ'য়ে গেল। মৃগাঙ্ক আর পিছন ফিরে না তাকালেও সে অনুভব ক'রছিল যে একজোড়া বিস্মিত চোখ বড় অদ্ভুত-ভাবে তার পানে চেয়ে আছে।

এমনি করেই তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটল এবং এই দিনটিকে কেন্দ্র করেই মৃগাঙ্ক আবার নতুন পথে চলতে

মৃদুলার পায়ের আঘাতটা সামান্য নয়। ভোগালও বেশ কিছু দিন। মৃগাঙ্ক অপরের মারফত খবর পেলেও নিজে থেকে তাদের বাড়ীতে যায়নি। ইচ্ছে করেই সে যায় নি। এই না যাওয়াটাও তার পরিকল্পনার একটি অঙ্গ। মৃগাঙ্ক ওজন ক'রে আর হিসেব ক'রে এগোতে চায়। এবং হিসেব মতই সে আবার নিয়মিত জলের কিনারে এসে ব'সতে লাগল আর বেহিসেবির মত একদিন মৃদুলা এসে তার পাশে দাঁড়াল।

হেসে বলল, দীঘির মাছ গুণছিলেন নাকি মৃগাঙ্ক বাবু?

মৃগাঙ্ক মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই হঠাৎ মৃদুলা গম্ভীর হ'য়ে উঠল। বলল, আপনি কেমন লোক মৃগাঙ্কবাবু?

অত্যন্ত মন্দ লোক, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণচেতা···মৃগাঙ্ক জবাব দেয়, অপরাধ দোষ স্বীকার ক'রে দুঃখ জানালেও ভুলতে পারে না···ভদ্র আর শিক্ষিত সমাজে চলবার একেবারে অনুপযুক্ত···মৃগাঙ্ক হাসতে থাকে।

মৃদুলা যেন খুব অবাক হ'য়েছে এমনি মুখের ভাব করে বলল, ওমা···আপনি তাহলে হাসতেও জানেন! তা বলে হাসি দিয়ে কখনও সত্য গোপন করা যায় না। লোক সত্যি সত্যিই আপনি ভাল নন্। নইলে একটা অসহায় মেয়েকে ওভাবে তাদের দোর গোড়ায় ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে পারতেন না। আর ভদ্র যে আপনি নন তার প্রমাণও আপনি দিয়েছেন।

যথা— মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করে হাসিমুখে।

মৃগাঙ্কর হাসি মুখের জবাবে মৃদুলা অস্বস্তি বোধ করে।

মৃগাঙ্ক পুনরায় সহাস্যে বলে, থামলেন কেন—শুনতে আমার ভালই লাগছে। মৃদুলা তথাপি নিরুত্তর।

মৃগাঙ্ক কিন্তু চুপ করে থাকে না, সে পুনরায় তরল কণ্ঠে বলে, আপনি যখন মুখ খুলবেন না তখন আমিই বলছি আপনি শুনুন।

মৃদুলা মুখ তুলে তাকাল।

মৃগাঙ্ক বলতে লাগল, মৃগাঙ্ক রায় অভদ্র কারণ মেয়েটিকে ওভাবে পৌঁছে দিয়েও একদিনের জন্য তার খোঁজ করেনি, ঠিক কিনা?

মৃদুলা হেসে বলল, আপনি জ্ঞানপাপী। আপন আমার বলবার কিছু নেই।

মৃগাঙ্ক হাসতে থাকে।

মৃদুলা বলে, শুধু জ্ঞানপাপীই নয় আপনি (পরিমাণে নির্লজ্জ।

মৃদুলার কথার ধরণে মৃগাঙ্কর হাসি আরও বৃদ্ধি পা সে বলে, এটা আপনি নির্জলা সত্য ব'লেছেন। নির্লজ্জ আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।

মৃদুলা সহসা হোঁচট খেল, কোন জবাব দিল না।

মৃগাঙ্ক থামতে পারে না। বলতে থাকে, এরই মধ্যে থেমে গেলেন? আমি কিন্তু আপনাকে মিথ্যে বলিনি জানেন তো মৃদুলা দেবী আমাদের আর্থিক সচ্ছলতা গোড়ার কথা হ'ল মানুষের অভাবের সুযোগ নিয়ে দোহ করা। নির্লজ্জতা হ'লো আমাদের ব্যবসার মূলধন লজ্জাকে ত্যাগ ক'রতে না পারলে আমাদের অর্থে বনিয়াদ ধ্বসে পড়বে যে।

মৃদুলা করুণ হেসে বলল, আমাকে আর কত লজ্জা দেবেন মৃগাঙ্ক বাবু! হাজারবার বলছি আমার ঘাট হয়েছে দোষ করেছি। আর কি ভাবে বললে হবে সেই কথাটা না হয় বলে দিন। পায় ধরে ক্ষমা চাইতে হবে?

বলতে বলতেই মৃদুলা সহসা মৃগাঙ্কর পাশে ব' পড়ল। মৃগাঙ্ক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জিতকণ্ঠে বলল, আপনার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে মৃদুলা দেবী?

মৃদুলা গম্ভীরভাবে বলল, এখনও হয়নি কিন্তু যেভাবে আপনি পেছনে লেগেছেন তাতে মাথা খারাপ হ'তে খুব দেরী লাগবে না।

মৃগাঙ্ক সহসা গম্ভীর হ'য়ে উঠল। বলল, বেশ তো! আর কোনদিন যাতে আপনার সামনাসামনি পড়তে না হয় সেইভাবে চ'লবো।

মৃদুলা অন্য প্রসঙ্গ তুলল, আপনি গ্রহ নক্ষত্র মানেন মৃগাঙ্কবাবু?

মৃগাঙ্ক বিস্মিতকণ্ঠে বলল, কি সর্বনাশ কোথা থেকে আপনি কোন রাজ্যে চ'লে গেছেন। একেবারে মাটি ছেড়ে গ্রহ নক্ষত্রে। কিন্তু আসল কথাটি কি বলুন দেখি?

বলছিলাম এইজন্তে—মৃদুলা জানাল, আমাদের প্রথম সাক্ষাতের রাতটির কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

মৃগাঙ্ক মৃদু হেসে বলল, কথাকটি বুঝি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না আপনি? কিন্তু কেন জানেন কি? ওখানেও আপনার চিন্তাধারার অলক্ষ্যে থেকে কাজ করে যাচ্ছে আপনার "কমপ্লেক্স" তবে সেটা "সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স"।

মৃদুলা ম্লানকণ্ঠে জবাব দিল, আপনি খুব হিসেব করে আঘাত করতে পারেন মৃগাঙ্ক বাবু, কিন্তু আমাকে আর রাগাতে পারবেন না। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।

চিন্তার কথা—মৃগাঙ্ক বলল, আমাকে তাহলে আবার আর একটা পথের সন্ধান করতে হবে দেখছি।

মৃদুলা সংযতকণ্ঠে জবাব দিল, একটা কেন আপনি দশটা পথের সন্ধান পাবেন। আমি আর ভুলেও সে পথে পা দিচ্ছি না। কিন্তু আপনি সেই থেকেই দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না।

মৃগাঙ্ক একটা সম্মানজনক ব্যবধানে বসে পড়ল। জিজ্ঞেস করল, কোথাও চলে যাচ্ছেন বুঝি?

মৃদুলা বলল, বাবার ইচ্ছে পড়াশুনোটা চালিয়ে যাই। সুতরাং চলে যেতে হবেই। দেশ গাঁয় তো থাকি না, এবারে দিনকয়েক থাকতে হবে এই সর্তে বাবার সঙ্গে এসেছি। ছেলেবেলা থেকে বাইরে বাইরে থেকে আমার গ্রামের বাড়ীর উপর কেমন একটা কৌতুহল ছিল। সেইজন্তেই—

মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করে, সেইজন্ত কি?

মৃদুলা বলল, ওসব কথা আর তুলবো না—থাক্।

মৃগাঙ্ক বলে, সেই ভাল। আচ্ছা আপনি ত' শুনেছি গত বছরেই পাশ করেছেন—একটা বছর নষ্ট করলেন কেন?

মৃদুলা দুঃখ করে বলল, অসুস্থ ছিলাম। বাবা বললেন,

মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করে, মামার বাড়ীতে থেকেই বুঝি প[াশ] শুনা করেন?

মৃদুলার একটি নিঃশ্বাস পড়ল। বলল, কি আর ক[রি] বলুন। ছেলেবেলায় মা মারা গেলেন। বাবাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। মামা মামী খুবই যত্ন করেন ওঁদের আবার কোন মেয়ে নেই।

মৃগাঙ্ক হেসে বলে, তাহলে তো বেশ ভালই আছেন

মৃদুলা জবাব দিল, বলতে পারেন। আমিও তা[ই] ভাবতুম কিন্তু কিছুদিন ধরে মন বলছে এতটা ভাল ন[া] থাকাই ভাল। হঠাৎ নিজের চেহারাটা নজরে পড়ে[ই] আমি ভয় পেয়ে গেছি।

মৃগাঙ্ক খানিক একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে একটু হেসে বলল, শুধু চেহারা দেখে, না অন্ত কোন কারণে?

একটু চুপ করে থেকে মৃদু হেসে মৃদুলা জবাব দিল, আপনার সাহস তো কম নয় মৃগাঙ্কবাবু—

মৃগাঙ্ক নিরীহকণ্ঠে জবাব দিল, সাহস নয় কৌতুহল। কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে জবাব নাও দিতে পারেন।

খানিক চুপ করে থেকে মৃদুলা শান্তকণ্ঠে বলল, ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা ছেড়ে দিন। কারণ ছাড়া কোন কাজ হয় না নইলে হঠাৎ নিজের মনের চেহারা দেখে ভয় পাব কেন? আর তা এমন ঘটা করে বলতে বসবোই বা কেন? বিশেষ করে আপনার কাছে। কিন্তু আজ আর নয়। অন্ধকার হয়ে গেছে।

দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

মৃগাঙ্ক বলল, সময়টা আজ বেশ কাটল।

মৃদুলা সায় দিয়ে বলল, বাকী কটা দিন এমনি ভাল কাটলেই খুশী হবো। এ কথাটা দয়া করে মনে রাখবেন মৃগাঙ্ক বাবু—

রাখব—জবাব দেয় মৃগাঙ্ক

আচ্ছা নমস্কার—মৃদুলা বলে।

দাঁড়ান—পালাচ্ছেন কেন। আপনাকে এগিয়ে দিতে হবে না। মৃগাঙ্ক বলল। মৃদুলা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। দূর থেকে জবাব দিল, ধন্যবাদ।

মনের খাবল। কলম বেইমানি করেছে। এক

১৮

রঞ্জন মহাশোল মাছের কালিয়া রান্নায় ব্যস্ত। অঞ্জন তক্তপোষের উপর বসে অধ্যয়নরত। একসময় পড়া বন্ধ করে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

পাশের ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে খণ্ড প্রলয় সুরু হয়েছে।

স্ত্রী বলছে, খেতে পরতে দেবার মুরোদ নেই বিয়ে করেছিলে কেন?

আর্তনাদ করে উঠল স্বামী, সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে আমি ঘরে ফিরেছি কথাটা তোমার মনে রাখা উচিত।

স্ত্রী আর এক গ্রাম উচ্চে কণ্ঠস্বর তুলে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আর আমি বুঝি দিনরাত শুয়ে বসে কাটাই? বলতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। ঘর...বাজার-বাড়ীর এক গোয়ালঘরে এনে পুরে রেখেছো। একে ঘর বলতে তোমার বাধে না!

স্বামী বাধা দিয়ে বলে, এর জন্ত দায়ি কে? আমি তোমায় হাজারবার বলেছি তুমি শুনলে না। গ্রামের বাড়ীতে তোমার মন উঠলো না। সহরে স্বামীর সঙ্গে থাকবার জন্তে পাগল হয়ে উঠলে। এখন আমাকে শোনালে কি হবে।

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর আর এক পরদা উপরে উঠতে স্বামী সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

অঞ্জন ডাকল, দাদা।

রঞ্জন সাড়া দিল, কেন রে?

অঞ্জন বলল, শুনেছো?

রঞ্জন জবাব দিল, শুনেছি।

অঞ্জন বলল, এখানে আর কতদিন থাকতে পারবো তাই ভাবছিলাম।

রঞ্জন জবাব দিল, পালিয়ে কোথায় যাবি বলতে পারিস? মধ্যবিত্ত যে আজ এখানে এসেই দাঁড়িয়েছে তাই। নিজেদের দিকেই একবার খোলা চোখে চেয়ে দেখলে আর বুঝতে কষ্ট হবে না। কিন্তু এতে ভয় পাবার কি আছে। এই বিপর্য্যস্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকেই আমাদের আবার নতুন পথের সন্ধান করে নিতে হবে। ভেঙে পড়লে নিজেরাই দুর্ব্বল হয়ে পড়বো যে—

খোলা দরজা দিয়ে মন্থরপদে জগন্নাথ চৌধুরী এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। রঞ্জনের শেষ কথাটার সূত্র ধরে বললেন, খাসা বলেছো—ভায়া। আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছো না তোমরা। আর চিনবে কি করে এইতো সবে এসেছো। আমার নাম হলো জগন্নাথ চৌধুরী—

অঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে একমুখ হেসে বলল, কি যে বলেন...আপনাকে চিনবো না? গোটা বাড়ীর আপনি হলেন সরকারী দাদু—

রঞ্জন গম্ভীরকণ্ঠে ডাকল, অঞ্জন—

জগন্নাথ হেসে বললেন, ওকে মিথ্যে ধমকাচ্ছো ভায়া। কথাটা অঞ্জন ঠিকই বলেছে। কিন্তু রঞ্জন ভায়া, কি পাকাচ্ছ বলো দেখি বাজারবাড়ীকে যে একেবারে আমোদিত করে তুলেছো।

রঞ্জন হাসিমুখে বলল, আজ্ঞে মাছের কালিয়া। অঞ্জন বাবুর দৌলতে রান্নাটা একরকম রপ্ত করে নিয়েছি... কি অঞ্জন, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো কি ওঁকে বসতে দাও।

জগন্নাথ বার বার মাথা নাড়তে থাকেন। বলেন, হু বড্ড বেমানান হচ্ছে। অঞ্জন বাবু দেখছি ঠিকই বলেছেন। এই বাজারবাড়ী তোমাদের উপযুক্ত নয়। কতদিন থাকতে পারবে ঠিক বুঝতে পারছি না।

রঞ্জন বলল, আপনি তো শুনেছি দেড় যুগ কাটিয়ে দিয়েছেন। তবু আমাদের সম্বন্ধে এ অহেতুক সন্দেহ কেন দাদু?

জগন্নাথ হাসি মুখে বলেন, তোমাদের গা থেকে নরম মাটির গন্ধ পাচ্ছি। তোমরা ঘরে এলে বসতে বলো। না বললে ক্রটি ধরো।

অঞ্জন বলে, আপনার ঘরে গেলে বুঝি বসতে বলেন না?

জগন্নাথ বলেন, এ বাড়ীতে কেউ কারুর ঘরে ঢোকে না অঞ্জন বাবু। শুধু উঁকি মেরে সরে পড়ে। না দেখতে চায় নিজের ঘরের চেহারা, না দেখতে চায় অপরের।

অঞ্জন জবাব দেয়, এ আর এমন মন্দ কি।

জগন্নাথ বলেন, তোমার কথাটা তেমন পরিষ্কার হলো না। আর একটু খোলাখুলি বলো ভাই।

অঞ্জন বলে, পরের ঘরে মাথা গলিয়ে গোলযোগের সৃষ্টি না করে চুপ করে থাকা ঢের ভাল।

জগন্নাথ হেসে বলেন, ভাল-মন্দর কথা বলছিনে অঞ্জন ভায়া। এ বাড়ীর নিয়মের কথা বলতে চেয়েছি।

রঞ্জন এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবারে সে মুখ খুলল, আপনি কিন্তু এই নিয়মের জীবন্ত ব্যতিক্রম।

জগন্নাথ বলেন, আমাকে আবার এর মধ্যে টেনে আনছো কেন?

রঞ্জন বলল, আপনি আমাদের ঘরের মধ্যে উপস্থিত আছেন বলে।

জগন্নাথ জবাব দিলেন, তোমাদের কোথাও কোন আড়াল নেই যে। একটা ভারী পর্দাও ঝুলছে না দোর-গোড়ায়। খোলা পেয়ে তাই ঢুকে পড়েছি।

অঞ্জন বলল, কিন্তু আপনার কাছে তো সব ঘরের দরজাই খোলা শুনতে পাই।

জগন্নাথ হাসিমুখে জবাব দেন, ওটা শোনা কথা। খানিক সত্য খানিক মিথ্যা। তবে সেকেলে লোক বলে বেহাৎ অভ্যাস ছাড়তে পারিনে। কারণে অকারণে জোর করে ঢুকে পড়ি। প্রবেশ অধিকার না পেলে কান পেতে শুনি আর ভাবি আজকের দিনের সামাজিক-জীবনের হৃৎপিণ্ডগুলো কোন ধাতুতে গড়া। বিবাদ-বিসম্বাদ অভাব-অনটন সর্বকালেই ছিল ভাই। কথায় কথায় লাঠি হাতে বাবা এগিয়ে যেতো প্রয়োজনে বুক পেতে তারাই দাঁড়াতো। বর্তমানকালে সে লাঠিকেও খুঁজে পাই না সে বুকের সন্ধানও মেলে না। আমরা বুড়োর দল খাপ খাওয়াতে না পেরে শুধু দোরে দোরে মাথা ঠুকে বেড়াচ্ছি।

রঞ্জন বলল, কেমন করে খুঁজে পাবেন দাদু। সে লাঠিতেও ঘুন ধরেছে আর সে বুকগুলোও সব শুকিয়ে গেছে। নয়তো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

অঞ্জন বলল, তুমি ওর কথা শুনো না দাদা। উনি ও সেই সাবেকদিনের মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সে দিন যে আর নেই সেকথা উনি ভুলে যান।

রঞ্জন ডাকে, অঞ্জন—

জগন্নাথ বলেন, বাধা দিও না ভাই, ওকে বলতে দাও।

অঞ্জন ব'লে, অ্যাটম আর হাইড্রোজেন যুগে কখনও লাঠি বাঁচতে পারে দাদু। লাঠির যুগের মানুষ ছুঁচফোটা রক্ত দেখলেই থেমে যেতো। তারা কখনও দেশকে দেশ একটি আঘাতে নিশ্চিহ্ন করার কথা ভাবতেও পারতো না। এই যে এতবড় পরিবর্তন একে আপনি কি বলবেন? ভিতরের কোমল প্রবৃত্তিগুলি ইস্পাত হয়ে না গেলে ধ্বংসের এত বড় চিন্তা তাদের মাথায় আসবে কেন দাদু—

রঞ্জন বলল, তুমি মুষ্টিমেয়র কথা বলছো অঞ্জন।

অঞ্জন বলল, কিন্তু এই মুষ্টিমেয়র হাতেই সমষ্টিকে চালানর ভার তাদের শুভাশুভর দায়িত্ব।

রঞ্জন বলল, সমষ্টিকে অসন্তুষ্ট রেখে মুষ্টিমেয় বেশীদিন বাঁচতে পারে না রঞ্জন। আর তা পারে না বলেই চতুর্দ্দিকে এতো তাল-ঠোকাঠোকী চলেছে। কিন্তু এসব আলোচনা এখন থাক। তার চেয়ে বরং আপনার জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

রঞ্জন চায়ের জল চাপিয়ে ফিরে আসতেই অঞ্জন পুনরায় জগন্নাথকে উদ্দেশ করে বলল, আচ্ছা দাদু, বর্ত্তমান যুগের মানুষগুলোর হৃদপিণ্ডগুলো কোন ধাতুতে গড়া এ যখন জানেন না তখন না জেনে সেখানে ছুরি চালিয়ে লাভ কি? কি দরকার আপনার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার?

জগন্নাথ একটি হাই তুলে বারকয়েক তুড়ি দিয়ে হাসি মুখে বললেন, বনের মোষই আমাকে দিনরাত তাড়া করে বেড়ায় ভাই—তাই প্রাণ বাঁচাতে ছুটোছুটি করতে হয়।

রঞ্জন হাসতে থাকে।

অঞ্জন সে হাসিতে যোগ দেয় না। বলে, সেই জন্যেই বুঝি বগল নিয়ে বুনো মোষের আস্তানায় আস্তানায় ঘুরে বেড়ান? যদি ছুটোছুটি করতে গিয়ে কোথাও হুড়ে গিয়ে থাকে?

জগন্নাথ রঞ্জনের পানে চোখ ফিরিয়ে বলেন, ছোঁড়াটা কি আবোল-তাবোল বকছে ভাই?

অরুন বলে, আবোল-তাবোল বৈকি—আসলে আপনার মনে যত অভিযোগ তত ভালবাসা। তাই কথা আর কাজ আপনার বিপরীত পথে চলে।

রঞ্জন ধমক দেয়, খুব কাজিল হয়েছো অরুন!

জগন্নাথ ভিতরে ভিতরে একটু চাঞ্চল্যবোধ করলেও প্রকাশ্যে হাসি মুখে বললেন, তোমার কথাগুলো বেশ। ওকে বলতে দাও রঞ্জন ভায়া। বেশ গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে কিন্ত। বলি সাহিত্যিক হবার চেষ্টা চলেছে নাকি?

অরুন একটু লজ্জা পেয়ে বলে, কথাগুলো কিন্ত আমার নয় দাদু। মনোদিদির কথা।

জগন্নাথ বিস্মিত কণ্ঠে বলেন, বটে··বটে···মনোদিদি আজকাল এইসব কথা বলে বেড়ান বুঝি? ঘরের মধ্যেই শত্রু পুষে রেখেছি তাহলে! সাবধান হতে হচ্ছে—

সকলে মিলে হাসতে থাকে।

জগন্নাথ হাসি থামিয়ে বলেন, এবারে তাহলে উঠি—

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলে, কিন্ত আপনার চা—

জগন্নাথ হেসে বললেন, বিলক্ষণ চা না খেয়ে উঠবো ভেবেছো। তোমাকেই করতে হবেতো?

রঞ্জন অসংকোচে জবাব দিল, বেশ বলেছেন—আমি ছাড়া আবার কে করবে। বলেই রঞ্জন চলে গেল। এবং অনতিকালমধ্যে ফিরে এসে পুনরায় বসে পড়ে বলল, চা ভিজিয়ে এলাম। কিন্ত যতক্ষণ চা না পাচ্ছেন আপনার ঐ হৃৎপিণ্ড আর লাঠির কথা বলুন।

জগন্নাথ হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, সে কি আছে রঞ্জন বাবু! তোমাদের ঐ অ্যাটম আর হাইড্রোজেনের ভয় পৃথিবী ছেড়ে পালিয়েছে।

রঞ্জন বলল, আপনি পাশ কাটিয়ে যাবেন না দাদু। আজকাল সর্বত্রই এই একটা কথা শোনা যাচ্ছে। অতীতে এটা ছিল ওটা ছিল এখন তার কিছু নেই, কিন্ত কিছু ছিল না এখন হয়েছে এ কথাটাও সেই সঙ্গে বলবেন তো?

জগন্নাথ হাসিমুখে বললেন, ওটা আমার কথা না ভাই। আমি ধর্মও বুঝিনে, সমাজও মানি না, আমি শুধু হৃদয়ের কথা বলতে চাই, মানুষের নৈতিক চরিত্রের কথা ভাবতে বলি।

রঞ্জন বলল, আপনার এ কথায় কোন যুক্তি নেই। মনে হয় কোন একটা বিশেষ কারণে আপনি কিছুই পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছেন না। ছেলেবেলার কিছু কিছু স্মৃতি আজও আমার মনে পড়ে। বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম কিংবা অতিথি এলে কত খুশী হয়ে উঠেছি। বাড়ীতে উৎসব লেগে যেতো। মানুষের বুকের সে পরম বৃত্তিগুলি সত্যি সত্যিই লোপ পেয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। বদলেছে দিন। চতুর্দিকের অসংখ্য অভাব-অনটনের তাড়নায় সবকিছু আড়ালে পড়ে গেছে।

জগন্নাথ বাধা দিয়ে বলেন, তবুও—

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রঞ্জন পুনরায় বলে, বেশী দূরে যেতে হবে না দাদু। আমি মামার কাছে মানুষ। তিনি তাঁর সাধ্যাতীত যতদিন সম্ভব হয়েছে করেছেন, কিন্ত তাঁর নিজের সন্তানদের একান্ত প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত করে আমাকে সাহায্য করতে না পারার জন্য তাকে যদি আপনি হৃদয়হীন. বলেন তবে আমি আপত্তি করবো। নিজের আত্মজদের সম্বন্ধে প্রত্যেক মানুষের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। আর এই দায়িত্ব পালন করতে পারা যে কতখানি শক্ত হয়ে পড়েছে আজকাল সেকথা আপনার আমার চেয়ে ঢের বেশী জানা আছে। কিন্ত···ঐ দেখুন চায়ের কথা ভুলেই বসে আছি। রঞ্জন উঠে দাঁড়াল।

রঞ্জন ফিরে এসে চায়ের পিয়ালা জগন্নাথের দিকে এগিয়ে দিতে একটু হেসে তিনি বললেন বসো, বাবাজি। আমি হয়তো ঠিক হিসেব করে সব কথা বলতে পারিনি তাইতেই তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছো। কথাটা আমি ঠিক ওভাবে বলিনি। ভাল মন্দ সব নিয়েই সংসার আর সমাজ কিন্ত বর্তমানকালে এই ভালর খুব বেশী অভাব। অন্ততঃ আমার চোখে যাদের দেখেছি তাদের সম্বন্ধে একথা আমি বলতে পারি। ভাল আর মন্দ দাঁড়িপাল্লায় ফেলে ওজন করলেই আমার ভয় হয়। ভয় পাই তোমাদের জন্য। পাছে মন্দর চাপে দুনিয়া থেকে ভাল একেবারে না লোপ পেয়ে যায়।

অঞ্জন প্রশ্ন করল, এই ভয় পাওয়ায় লাভ কি?

লাভ-লোকসানের কথা তেমনি করে ভেবে দেখিনি, জগন্নাথ জবাব দিলেন, যা চোখে পড়তে দুঃখ পেয়েছি সেই কথাই বলছি। অভাব-অনটন আগেও ছিল এখনও আছে ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে কিন্তু লোভ মানুষকে এ ভাবে উন্মাদ আর উচ্ছৃঙ্খল করে তুলতে পারে এ এখনও কল্পনা করতেও পারতাম না ভাই।

রঞ্জন বলল, একে সত্য বলে ভাবতে মন চায় না।

জগন্নাথ বলেন, চাওয়া উচিতও নয় তাই যেটা চোখের সামনে দিন রাত দেখছি চোখ বুজে তাকে মিথ্যা বলে ভাবা যায় না। মোদ্দা মন্দ ভালর উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে যে ভালকেও আজ আর চিনতে পারা যায় না। নিজেদের আত্মসম্মান বাঁচাতে গিয়ে যা চাইনা তাকেও নির্বিবাদে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি আমরা। এই সর্বনাশের পথ বন্ধ না হলে কারুর মঙ্গল হবে না। আমাদের কথা ছেড়ে দাও রঞ্জন ভাই। আজ আছি কাল নেই কিন্তু তার পর? এই তারপরের চিন্তাটাই মাঝে মাঝে আমাদের মত বুড়োদের চিন্তিত করে তোলে। আমরা মানবীয় ধর্ম ভুলেছি, কর্তব্য ভুলেছি, নিজেদেরও ভুলে যাচ্ছি।

অঞ্জন বলল, আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—

জগন্নাথ পিয়ালাটি তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে নামিয়ে রাখলেন, তারপরে বললেন, তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসে হয়তো বিরক্ত করে গেলাম।

রঞ্জন বলল, আপনি ত খারাপ কথা বলেননি তবে প্রতিকারের কোন পথ চোখে পড়ে না বলে শুধু দুঃখই পাই।

জগন্নাথ বললেন, তবু খুঁজে দেখতে হবে তোমাদের। হেরে গেলে চলবে না। এর সঙ্গে আজ তোমাদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। একে বারে মুছে যাবে যে।

অঞ্জন হাল্কা সুরে বলল, মুছে যাবার আগে চেঁচিয়ে গলা কাটাব—

জগন্নাথ বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, চেঁচিয়ে গলা কাটাবে?

অঞ্জন বলল, চেঁচিয়ে বলব, আমাদের বাঙলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয়, নেতাজীর মত লোক জন্মেছিলেন—আমরা কারুর চেয়ে ছোট না—

রঞ্জন তাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিল।

জগন্নাথ বললেন, অঞ্জন ঠিক কথাই বলেছে। ওকে ওর বক্তব্যটা শেষ করতে দিলে না যে রঞ্জন। আমার আসল কথাটাও তাই।—ওঁদের দিক থেকে তোমাদের দৃষ্টি আজ নিজেদের পানে ফিরিয়ে আন। নিজেদের চেহারাগুলো একবার ভাল করে দেখো। কিন্তু আজ আর নয় ভাই। আর একদিন বরং ধীরে সুস্থে বসে গল্প করা যাবে।

জগন্নাথ মন্থরপদে প্রস্থান করলেন।

ক্রমশঃ

'রাজা'

(রামমোহন রায় ১৭৭২-১৮৩৩)

জ্যোতির্ময়ী দেবী

চন্দনকাঠের চিতা। পাশে কলস কলস ঘৃত।
গঙ্গোদক কোশাকুশী সর্বমাঙ্গলিক
পুষ্পপাত্র মালা শঙ্খ রক্তাম্বর অলক্তসিন্দুর
সব নিয়ে সমবেত ব্রাহ্মণ স্বজন বন্ধু গুরু পুরোহিত।
বহু মূল্য শয্যা পরে মরণ শয়নে শায়িত দয়িত।
শোকার্ত অলকমণি পাশে।
সম্মুখে অনন্ত পথ তার আর এক চিরকাল বিচ্ছেদ বিধুর।
সহসা ডাকিল কারা, "ওঠো ওঠো বধূ।
এসো নারী। এসো এসো সতী
মিটিয়ে বিচ্ছেদ দাহ। কর স্নান। লও করে ফুলমালা।
পর অলক সিঁদুর।
সাজো সাজো ভর্তৃ চিরবিবাহের রক্ত পট্টাম্বরে।
ওরে পুরনারী চন্দন আঁকোরে ভালে, হাতে বেঁধে
কাজল-লতাটি।
শোক আর মরণের সপ্তসিন্ধু বাহি এবারের সপ্তপদী
মাড়াইয়া আকাশের মহাশূন্য মাটি।
এযাত্রা হবে না শেষ ফুরাবেনা পথ সপ্তপদী সতী জনে
জনে!

মিশিবে বিচ্ছেদ দাহ চিতাশয্যার আগুনে।"

শুকালো চোখের জল।

মিলালো বিচ্ছেদ দুঃখ। নারী আতঙ্কে বিহ্বল।

চন্দনকাজল মালা অলক্ত সিন্দুরে সাজাইয়া দিল সবে দেহখানি তার।

চাহিল বিমূঢ় সতী।

পাশে প্রাণহীন পতি।

কোন্ মহা সপ্তপদী-পথে কি করিয়া যাবে ধরি তার হাত।

* * *

দূর হতে আসে দুঃসংবাদ।

ছ'নেছে শোকের অশ্রু। আর এক কোন্ ভয়ে শাক্ত অন্তর।

আসেন পুরুষসিংহ শ্রীরামমোহন নিজ গৃহপর।

চারিদিকে নতশির ভীত মুখ স্তব্ধ পরিজন।

জিজ্ঞাসেন, কোথা মাতা। কোথা মোর ভ্রাতৃবধূগণ।

অঙ্গুলী সংকেতে তারা দেখাইল বধূদের গৃহ।

সভয়ে পরিজন। নাহিক অলকমণি শুধু। শূন্য তার ঘর।

কোথা বধূ শুধান দেবর।

মিলেনা উত্তর।

নয়নে ফুটিল নীর।

সে অশ্রুতে ছায়া জাগে ক্রীড়াসাথী ক্ষুদ্র বধূ অলকমণির।

এসেছিল নববধূ ললাটে চন্দন আঁকা কাজললতাটি হাতে,

পরিধানে রাঙা চেলী, চরণে নূপুর।

গেছে সহমৃতা হতে মৃত্যু বিবাহের পথে,—

সহ-মৃত্যু অভিযাত্রী বধূ গেছে বহু দূর।

সে অশ্রুর অস্পষ্ট আভাসে

কাদের অসংখ্য মূক ত্রস্ত মূঢ়-মুখ

ভবিষ্যৎ বর্তমান অতীতের পথে জাগে ভাসে।

ক্ষোভ রোষ করুণায় চোখে ভরে জল।

সে জল নিবায়ে দিল শত যুগ যুগান্তের

অনির্বাণ নারী চিতানল!

সে ক্রোধবহ্নির আলোক,

দেখাইল প্রাণে সত্য, প্রেমে সত্য, জীবনের নিত্য সতীলোক।

তোমাকে বলেছে লোকে রাজকার্যে রাজোপাধি তব।

কে জানে সে কথা।

আমি জানি নারী জানে সত্য তাহা নয়।

ধরণীতে রাজ-অধিরাজ সেই অসহায় মানুষেরে যে দেয় অভয়।

---

* (অলকমণি দেবী রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের পত্নী। সহমৃতা ১৮১১। রাগ দুঃখ ক্ষুব্ধ রাজা ঐ প্রথার উচ্ছেদের আন্দোলন করেন দীর্ঘ ১১ ২০ বছর। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রথা উঠে যায়।)

সাম্য

(গল্প)

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

ওদের আমি চিনি। ওরাও চেনে আমাকে। চলতি পথের চেনা আমাদের। শান্তিপুর-লোকালের রোজযাত্রী ওরা। আমিও। ওদের দলে ছ'জন। কেউ আসে শান্তিপুর থেকে, কেউ রাণাঘাট থেকে। কাঁচরাপাড়া নৈহাটি আর ব্যারাকপুরের তিনজন। শেষজন ওঠে খড়দহ থেকে। গাড়িতে অবশ্য বোঝবার উপায় নেই ওরা ছ'জন। ওদের সংগে গলা মেলায় তাল দেয় আরও অনেকে। বলতে গেলে কামরার মধ্যেকার রোজযাত্রীদের এক বড় অংশ।

কামরার নিশানা ওদের জানা নিখুঁতভাবে। কারও ভুল হয়না কোনদিন। ওদের একজন কেরাণী। নাম ভবেশ দত্ত। বয়স চল্লিশের কোঠা পেরিয়েছে সবে। দেখে মনে হয় অনেক বেশী। কেননা মাথার চুল প্রায় সবই সাদা। খোঁচা দাড়ি গালে। কেরাণীর স্বাভাবিক পোশাক ধুতি আর পাঞ্জাবী। পানে মুখ প্রায় সব সময়ই লাল। দাঁতগুলো কালো। মুখে হাসি সব সময়। তবে হাসির মধ্যেও বিপর্যস্ত কেরাণী-জীবনের ছাপ। করতাল বাজান ভবেশ দত্ত। করতালজোড়া পকেটেই থাকে।

একদিন আমি বলেছিলাম, 'আপনার চুলগুলো কিন্তু আপনার বয়সকে ডিঙিয়ে গেছে!

পান-খাওয়া কালো দাঁত বের করে হাসলেন ভবেশ দত্ত।

বললেন, 'প্রতি মাসেই ঘাটতি বাজেটের ধাক্কা সামলাতে হয় কিনা। ট্যাক্স্ তো কমাতে পারিনা। ঘাটতি মেটাতে হয় অতিরিক্ত প্রোভাবুশান্ দিয়ে। তাই চুলের আর দোষ কি?

ভবেশ দত্ত আসেন শান্তিপুর থেকে।

রাণাঘাট থেকে আসেন অধ্যাপক সুকুমার চৌধু[illegible] রসায়নশাস্ত্রের ডাকসাইটে অধ্যাপক কলকাতার এক কলেজের। ডিগ্রীও অনেকগুলো। রসায়নের ব[illegible] লিখেছেন গোটাকয়েক। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে[illegible] দু'কানের ওপর আর কপালের মাঝামাঝি কয়েক গো[illegible] চুলে পাক ধরেছে। চুল আঁচড়ানো পরিপাটি ক[illegible] সিগারেট খান মাঝে মাঝে। অধ্যাপকসুলভ গাম্ভ[illegible] মুখে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। হাসির প্রলেপ [illegible] গাম্ভীর্য ঢাকবার প্রয়াস। গানের সংগে তাল রা[illegible] হাত দিয়ে। প্রাণখুলে গলা দেন নিজেও।

নকুল হাজরা বেঙ্গল পটারির শ্রমিক। ব[illegible] পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। আসেন কাঁচরাপাড়া থেকে। কালো ছিপছিপে চেহারা। চুলগুলোও কালো কুচ[illegible] খুব ছোট করে ছাঁটা। খাকি ফুলপ্যান্ট আর [illegible] জামা পরনে। সংগে থাকে টিফিন-ক্যারিয়ার। [illegible] বাজান নকুল হাজরা।

নৈহাটি থেকে আসেন সোমেশ আচার্য। অর্থনী[illegible] শিক্ষক মধ্য কলকাতার কোন এক স্কুলের। বয়স [illegible] কাছাকাছি। লম্বা স্বাস্থ্যবান। শ্যামবর্ণ। চেহা[illegible] যৌবনোচিত চাকচিক্য। দামী সার্ট-প্যান্ট। [illegible] টাক পড়ে এসেছে মাথায়। অবশিষ্ট চুল দিয়ে [illegible] ঢাকার প্রয়াস। হয়তো অবিবাহিত বলে। মাঝে মা[illegible] সিগারেট খান। সময়ে বিড়িও।

জিজ্ঞেস করলে বলেন, 'বিড়িই আমাদের খা[illegible] প্রতীক। তবে মাঝে মাঝে অভিজাত হবার সাধ [illegible] না হয়?

ব্যারাকপুর থেকে আসেন অজিত বসু। বি পি

পিয়ন। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। কাঁচাপাকা চুল। কোঁকড়ানো। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি। কপালে ভাঁজ পড়ে কথা বলার সময়। পান খান প্রচুর। গোটাকয়েক দাঁত পড়ে গেছে এর মধ্যেই। কাপড়ের ঝুলন্ত ব্যাগ কাঁধে। ভেতরে টিফিন-বাক্স।

খোল বাজান অজিতবাবু। গলা তোলেন চোখ বুজে।

কমলাকান্ত রায় বিদেশী ফার্মের ম্যানেজার। ওঠেন খড়দহ থেকে। ম্যানেজারসুলভ ভারিক্কি চেহারা। চকচকে প্রশস্ত টাক মাথায়। চারপাশে সামান্য চুল বৃত্তাকারে। যেন সূর্যের চারদিকে রাহুর পরিবেষ্টনী। দাড়ি-গোঁফ নেই মুখে। মনে হয় রোজ কামান। পাইপ টানেন মাঝে মাঝে। চোখের দৃষ্টি গভীর। একটা অনুসন্ধিৎসার ভাব সব সময়। দামী চামড়ার ফোলিও-ব্যাগ সঙ্গে। ভেতরে কাগজপত্রের সঙ্গে থাকে একজোড়া খঞ্জনী। গানের সঙ্গে খঞ্জনী বাজান কমলাকান্তবাবু।

একেকটি গানের মূল গাইয়ে একেকজন। ধুয়া ধরেন আর সবাই। শুধু ওরাই নয়। কামরার আরও অনেকে। শেয়ালদা পৌঁছে সকালের যাত্রা শেষ হয় নাম সংকীর্তন গেয়ে। বিকেলে ফেরতা পথেও একই ব্যাপার। গান চলাকালীন কামরার এই অংশটায় তৈরী হয় আলাদা এক পরিবেশ। শহরতলীর লোকাল ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের ক্ষণিক সহাবস্থান। পেশাগত পরিচয় পড়ে থাকে দূরে। তৈরী হয় আলাদা এক সমাজ। গাড়ীর চলার শব্দ। সঙ্গে খোল-করতাল-খঞ্জনীর বাজনা। গানের সুর কখনো উচ্চগ্রামে কখনো ধীর লয়ে। রাজনীতি খেলাধুলা ধর্মঘট বেকার সমস্যা প্রাদেশিকতা ছাত্রবিশৃঙ্খলা নিয়ে গরম আলোচনা নেই এখানে। কামরার যাত্রীরা যেন সাময়িকভাবে ভুলে যায় সবরকম বৈষম্য। ভুলে যায় কোত্থেকে তাদের আসা, কোথায় তাদের যাওয়া। এ যেন সাংগীতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে মুক্তির উদ্দেশে যাত্রা।

ভবেশ দত্তকে বলেছিলাম একদিন, 'আপনাদের একটা ব্যাপার আমায় খুব আশ্চর্য করেছে। বৃত্তি আপনাদের আলাদা। থাকেনও এক জায়গায় ন আপনারা একসাথে মিললেন কি করে?'

একটু হাসলেন ভবেশবাবু।

উলটে আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার মনে হয় বৃত্তিই মানুষের আসল পরিচয়?'

একটু বিব্রত বোধ করি ভবেশবাবুর প্রশ্নে।

বললাম, 'না ঠিক তা নয়। তবে বর্তমান সমাজে ওটাই কি প্রাধান্য পায়নি?'

কি যেন ভাবলেন ভবেশবাবু। বললেন, 'হয়তো প্রাধান্য পেয়ে থাকবে। আর এটা তো খুবই স্বাভাবিক. সমাজ তো আর চিরদিন একরকম থাকে না। তবে এ বোধ হয় আপনি অস্বীকার করবেন না যে বৃত্তিই মানুষ-বিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয়।'

একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে।

তারপর আবার বললেন, 'কথায় বলে বিশ্বাসে মেলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। এখানেও অনেকটা সেই ব্যাপার আর কি। মনের খোরাক একবারে পেলে বৃত্তি দূরে সব তুচ্ছ হয়ে যায়।'

পিয়ন অজিত বসু তখন গান ধরেছেন।—

ডুব দে মন কালী বলে,
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে।—

ধুয়া ধরেছেন অনেকে। গান চলতে থাকে।

ভবেশবাবুকেই জিজ্ঞেস করি আবার। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর গান করবার মতন মনের জোর আপনারা পান কোত্থেকে?

খানিকক্ষণ কি ভাবলেন ভবেশবাবু।

তারপর বললেন, 'মনের জোরটুকু আছে বলেই তো নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে আছি। সরকারী কেরানী আমরা। জীবনে আমাদের বৈচিত্র্যের নামগন্ধও নেই। অভাব-অনটন আমাদের টেনে নিয়ে যায় ধিকিয়ে চলা গরুর গাড়ির মতো। আনন্দটুকু নেয় শুষে। কেরানীজীবনের ঘেরাটোপের মধ্যে বাস করে সংসারটাকে একটা গরম কড়াই বলে মনে হয়। সংসারের আরেকটা দিকও যে

আছে তা যেতে হয় ভুলে। ঘেরাটোপের বাইরে এসে একটু নিশ্বাস ফেলার ইচ্ছে করে না হয় বলুন?'

হাসলেন ভবেশবাবু। বাইরে তাকালেন জানলা দিয়ে।

আমি বললাম, 'আপনাদের এই মনের জোরটুকুকে শ্রদ্ধা না করে পারছিনা।'

এবারে একটু হাসলেন ভবেশবাবু। নিঃশব্দ হাসি।

বললেন, 'আসল ব্যাপার কি জানেন, আর্থিক বৈষম্যটা আমাদের সমাজে জগদ্দল পাথরের মতন চেপে বসেছে। আমরা যে মানুষ একথা প্রায় ভুলতে বসেছি। পরিচয় আমাদের মাস-মাইনে দিয়ে। ওই ছাপ পীঠে নিয়ে আমরা যে যার জগৎকে করে নিয়েছি আলাদা। সে প্রাচীর ডিঙিয়ে একপাশের জল আরেকপাশে ফেলবার সুযোগ খুব কম। ট্রেনের কামরা কিন্তু খানিকটা সে সুযোগ করে দিয়েছে। এখানে আমাদের একসমাজ। আমরা রোজ-যাত্রী। চলতি পথের সুখদুঃখকে আমরা নিই সমানভাবে ভাগ করে।'

অনেকগুলো কথা বলে একটু যেন লজ্জিত হলেন ভবেশবাবু। আমি চুপ করে থাকি।

ভবেশবাবুই বললেন আবার, 'দূরে থাকার অনেক সুবিধে। অন্ততঃ আমাদের মতন কেরাণীর পক্ষে। দিনের বেশির ভাগ সময়েই কাটে পথে আর অফিসে। এইই যেন আমাদের সত্যিকারের জীবন। রাতের আশ্রয়টুকু শুধু বাড়িতে। মাস গেলে গিন্নির হাতে মাইনেটা ফেলে দিয়েই খালাস'।

আবার থামলেন ভবেশবাবু।

একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললেন, 'আমার গিন্নি কিন্তু মোটামুটি চালিয়ে নেয়। জানেন......আমার গিন্নি ঠিক আজকালকার মতন নয়। তাই ওকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধাই করি।'

নিজের গিন্নির প্রশংসা করতে গিয়ে খানিকটা যেন কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লেন ভবেশবাবু। বাইরে তাকান আবার। মনে হলো কি এক গভীর চিন্তায় ডুব দিলেন। হয়তো বা নিজের গিন্নির কথাই আবার ভাবতে থাকেন। আমার কল্পনার পটেও সহনশীলা বাংগালীবধূর এক ঐতিহ্যময়ী ছবি আঁকা হয়ে যায়। ঐতিহ্যময়ী সেই কল্যাণীমূর্তিরাই হাজার অশান্তির মাঝে শান্তির রেখা টেনে রেখেছে হাসিমুখে।

রামপ্রসাদী গান শেষ হ'য়েছে। যাত্রীরা সবাই নীরব। শুধু একটানা গাড়ির শব্দ। অন্যদিন একঘেয়ে বিরক্তিকর মনে হয়। আজ মনে হয়না।

নীরবতা ভাঙেন সোমেশবাবু।

সুকুমারবাবুকে বললেন, 'আপনার সেই প্রিয় কীর্তনটা হ'য়ে যাক সুকুমারদা।' সমর্থন করলেন পিয়ন অজিত বসু।

বললেন, 'হ্যাঁ দাদা' বংশীবদনের রাই জাগে গানটা একবার শোনাও তো। তোমার গলায় গানটা বড় ভালো লাগে।'

একটু আশ্চর্য হই বৈ কি। রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকের মুখে বৈষ্ণবকীর্তন! আমি যেন মানুষের মনের একটা নতুন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। দরজা খোলার প্রতীক্ষায়। আরেকটা ব্যাপার চমৎকৃত করে আমায়। ডাকসাইটে পণ্ডিত অধ্যাপকের সংগে সাধারণ পিয়নের ঘনিষ্ঠতা। ভবেশ দত্তের প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে যাই হাতেনাতে।

আমি বললাম, 'বংশীবদনের ওই পদটা তো ভোরবেলায় গাইতে হয়।'

উত্তর দিলেন অধ্যাপক নিজেই, 'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমাদের ভোরবেলা হয় ট্রেনের কামরায়।' মনের কোন্ গভীরতা থেকে অধ্যাপকের কথাগুলো বেরিয়ে এলো। তবু আমাকে ভাবিয়ে তোলে অধ্যাপকের শেষ কথাটা। সারাদিনে অঢেল সময় অধ্যাপকদের হাতে। সুকুমারবাবুর কথাটা সেখানে এক চরম ব্যতিক্রম।

গান ধরলেন সুকুমারবাবু।—

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।

কত নিদ্রা যাও কালামানিকের কোলে॥......

সুকুমারবাবুর গলায় পদাবলীর সুরলয় নিখুঁত। অদ্ভুত ভাবগম্ভীর মুখ অধ্যাপকের। মাথা নাড়ছেন মাঝে

মাঝে। এ যেন আরেক মানুষ। আমি নিজেই খানিকটা অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ি। অধ্যাপকের মিষ্টিগলা কানের কাছে তরঙ্গ তোলে—" রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে.........। জানিনা এই গানের মধ্যে অধ্যাপক নিজের জীবনের কোন বিশিষ্ট অর্থ খুঁজে পেয়েছে কিনা। গানের মধ্যে যেন অধ্যাপক নিজের সত্তাকে বিলীন ক'রতে চাইছেন।

সোমেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করি আমি, 'অর্থনীতির শিক্ষক আপনি। এখানে মিললেন কি করে ?। সোমেশ-বাবু বললেন, 'আমি মিলিনি। আমাকে মিলিয়েছে।' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকি সোমেশবাবুর দিকে।

সোমেশবাবুই বললেন আবার, ছাত্রদের 'অর্থনীতির থিওরি পড়িয়ে পড়িয়ে সব কিছুই অর্থনীতির মাপকাঠিতে বিচার করা শুরু করেছিলাম। সে অর্থনীতি কেমন জানেন ? বাস্তবের সংগে তার মিল খুবই কম। হাঁপিয়ে উঠেছিলাম তত্ত্বের বেড়াজালে। একেক সময় তলিয়ে দিতে ইচ্ছে হতো অন্ধলোকে। হয়তো তাত্ত্বিক বলেই ছাত্ররাও আমাকে এড়িয়ে চলতো। এমনি সময় খুঁজে পেলাম এদের। মিলিয়ে দিলেন এরাই।'

আমি বললাম, 'আপনার বয়সে পদকীর্তনের দিকে বড় একটা ঝোঁক থাকেনা। অন্ততঃ আজকালের ছেলেদের।

একটু হাসলেন সোমেশবাবু।

বললেন, 'গানের রস বুঝতে বয়েসটা কোন বাধাই নয়। আসল ব্যাপার হ'লো মন। মনের প্রবৃত্তিকে তো জোর করে চেপে রাখা যায়না।'

আমি বললাম, 'বিয়ে করেছেন ?'

'কেন বলুনতো ?'

'না, মানে বিয়ের পর পিছির পাল্লায় পড়ে অনেকেই ধর্মের দিকে ঝোঁক পড়ে কিনা।'

একটু জোরেই হাসলেন সোমেশবাবু।

বললেন, 'ক্লাস নেলে যা পাই নিজের খরচ তাতে কোনরকমে চলে যায়। পরের একটা মেয়েকে ঠিক মানুষের মতো প্রতিপালনের সংগতি সেখানে নেই। আরেকটা ব্যাপার কি জানেন ? আমাদের দেশের মেয়ের বাপ বিয়ের পাত্রের যে প্যানেল তৈরী করেন তার শেষে নামটি স্কুলশিক্ষক।'

থামলেন সোমেশবাবু। মুখের ভাবটা বদলালো ওঁর গভীর চিন্তায় ডুব দিলেন। জ্রদুটো কুঁচকে আসে। যেন হাতড়িয়ে বেড়ান মনের মধ্যে।

আবার বললেন, 'শিক্ষকতার একটা আদর্শ গড়ে নিয়ে এপথে এসেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে এসে দেখলাম সে আদর্শ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাস্তবের আঘাতে ভেঙে খানখান হ'য়ে গেলো। বোধহয় আজও বিশ্বে একমাত্র দেশ ভারতবর্ষ যেখানে শিক্ষকরা সব দিক দিয়েই অবহেলিত। কোন আর্থিক আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা নেই তাদের। স্বার্থত্যাগ ক'রেও যেন তারা অপরাধী। আমি জানিনা কোনদিন শিক্ষকরা আমাদের দেশে তাদের প্রাপ্যসম্মান পেয়েছে কিনা। কে জানে ভবিষ্যতে কোনদিন পাবে কিনা। তবে......যে ঘেরাটোপে বাঁধা পড়েছি সেখান থেকে মুক্তির কোন সম্ভাবনাই তো আর নেই তাই ঘানিও টানতে হবে, তেলও বানাতে হবে। ঘেরাটোপের বাইরে আমরা সবাই যে মানুষ এদের মধ্যেই তা আমি দেখতে পেয়েছি।'

অধ্যাপকের গান থামলো। আবার ক্ষণিক নীরবতা। চলন্ত গাড়ির শব্দ। দুপাশে শহরতলীর বাড়িঘর জন-জীবনের চলন্ত মিছিল। চার দিকেই যেন মিছিল আর মিছিল। আমরা রোজযাত্রীরাও যেন মিছিল করে চলেছি গাড়িতে।

এবার গান ধরলেন নকুল হাজরা। অনুরোধ করতে হলোনা ওঁকে।

বৃন্দাবন ছাড়ি, কৃষ্ণ মথুরাতে গেল।......

কৃষ্ণের বিরহে বিরহিনী রাধিকার আর্তি আর হৃদয়-ব্যাকুলতা নিপুণভাবে ফোটাতে লাগলেন নকুল হাজরা।

এবার জিজ্ঞেস করলাম প্রবীন অজিত বসুকে। কদ্দিন আছেন এদলে ?

'তা বলতে পারেন একেবারে গোড়া থেকেই আছি।'

'আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন।

'আমার সম্পর্কে...!'

পানখাওয়া দাঁত বের করে হাসলেন অজিত বাবু।

বললেন, 'আমাদের মতন পিয়নের জীবনে কি-ই বা থাকতে পারে। লক্ষ লক্ষ চিঠি বিলি করি বাড়িতে বাড়িতে আপিসে আদালতে। প্রায় মেশিনের মতনই কর্তব্য করতে হয়। তবে মানুষের সাহচর্য বড় একটা পাইনা। যাদের কাছে চিঠি বিলোই চিঠিই তাদের সব। পিয়ন নয়। আরও আশ্চর্য কি জানেন? চিঠি ডেলিভারিতে কারও দেরী সয়না। তাই অনেক সময়ই অনেকের অধৈর্যের কারণ হতে হয়। তার ওপর সাহেবের মেজাজ তো আছেই।'

একটু হাসলেন অজিতবাবু।

আবার বললেন, 'বাড়িতে বড় অশান্তি। ছেলেমেয়েগুলো মানুষ হ'লোনা। আমার কষ্টের রোজগার পয়সা উড়িয়ে বেশ ফুর্তিতে ওরা দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। বুঝবে একদিন যেদিন রোজগার করতে নামবে নিজে হাতে। আসল, ব্যাপার কি জানেন? পরিবার যদি ভালো হয় তবে সব কিছুই ঠিক থাকে।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন অজিতবাবু। ঝুলন্ত থলে থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বের করলেন। একটা পানের খিলি মুখে পুরলেন।

তারপর নিজেই আবার বললেন, ভালবেসে বিয়ে করার এই বড় জ্বালা। যা করবে মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হ'বে। আমি যেন একটা অপরাধী।'

বাইরে তাকালেন অজিত বাবু। কি এক গভীর চিন্তা ওকে গ্রাস করলো। হয়তো বা ও'র যৌবনের সেই রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী ওঁকে নিয়ে চলেছে বহু বছর আগের যৌবনের মধ্যগগনে। সেদিন আর আজকের মধ্যে একটা আনুপাতিক হিসেব কষছে। ওঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাইনা।

নকুল হাজরার গান এখনো চলেছে।

এবার জিজ্ঞেস করি কমলাকান্ত রায়কে, আপন মতন একজন লোককে এই দলে দেখে কিছু আশ্চর্য হচ্ছি বৈ কি!'

ঝকঝকে দুপাটি দাঁত বের করে হাসলেন কমলাকান্ত বাবু।

বললেন, 'নিশ্চয়ই বকধার্মিক বলে মনে হচ্ছে শ্রমিক-শোষণের দোষটা হরিনাম দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছি।'

আমি যে ব্যঙ্গ করিনি সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কমলাকান্তবাবুই বললেন তার আগে।

বললেন, 'ম্যানেজার-ছাপ একবার যে পীঠে নিয়েছে, বর্তমান সমাজের চোখে সে একটা বিরাট অপরাধী। ম্যানেজার শব্দটার অর্থই দাঁড়িয়েছে শ্রমিক নিষ্পেষণের যন্ত্র। ম্যানেজাররাও যে মানুষ এটা যেন সবাই ভুলে গেছে। ম্যানেজারকেও চাকরি করতে হয়, পেট চালাতে হয়। শ্রমিকদের ওপর মালিকের আদেশ-নির্দেশ ম্যানেজারকেই পালন করতে হয় কি না। তাই শ্রমিক-অসন্তোষের বেশীর ভাগই বহন করতে হয় ম্যানেজারকে। কিন্তু ম্যানেজারও যে শ্রমিকের ভালো চাইতে পারে একথা বোধহয় কেউই বিশ্বাস করতে চায় না।'

হাসলেন কমলাকান্তবাবু। মুখটা একটু গম্ভীর হলো।

আবার বললেন, 'সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ তো নিঃসঙ্গ-জীবন কাটাতে পারে না। তবু জীবনের বহু বছর নিঃসঙ্গ কাটিয়েছি। শ্রমিকদের সংগে মিশতে গিয়েছি। মালিক করেছে ব্যঙ্গ: শ্রমিকরাও তাদের শত্রু ভেবে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সত্য বলতে কি, আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এইরকম একটা পরিবেশের খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল আমার পক্ষে।'

থামলেন কমলাকান্তবাবু। আমি নীরবে তাকিয়ে থাকি কমলাকান্তবাবুরই দিকে। ম্যানেজার-কাঠামোর ভেতরে যে মানবিক অভিযোগ ধূমায়িত হয়ে ছিল পথ খোলা পেয়ে এবার তা বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কমলাকান্তবাবুই আবার বললেন, 'আমিও ছিলা

খুব গরীব ঘরের ছেলে। আমিও ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছি পরের দয়ায়। তাই গরীবের যে কি জ্বালা তা একেবারে অজানা নয় আমার কাছে।

ম্লান একটু হাসি কমলাকান্তবাবুর মুখে।

নকুল হাজরার গান থেমেছে।

এবার গান ধরলেন কমলাকান্তবাবু নিজেই। খঞ্জনী বাজিয়ে। বলরামদাসের একখানি পূর্বরাগের পদ ধরলেন উনি।

কিবা সে মোহন বেশ ভুলাইল সব দেশ
না রহে সতীর সতীপনা।......

আবার স্তম্ভিত হই আমি। তাকিয়ে থাকি ম্যানেজারের ভেতরকার মানুষটার দিকে। বুঝতে চেষ্টা করি সেই আদিকাল থেকে বয়ে আসা অপরিবর্তিত মনুষ্যসত্তাকে।

নকুল হাজরাকেও প্রায় একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।

নকুল হাজরা বললেন, 'বুঝতেই পারছেন কলকারখানার শ্রমিক আমরা। মেসিনের সংগে আমাদের কোন তফাৎ নেই। কারখানায় তো আবার পাল্লা দিতে হয়। কে কাকে টেক্কা দিয়ে ওপরে উঠবে। যন্ত্রের কাছে হাত-পা বাঁধা আমাদের। জীবনের সবরকম শখ বিকিয়ে দিতে হয় হাড়ভাঙা খাটুনির কাছে। সন্ধ্যের পর বাড়িতে ফিরি। শরীর থাকে ক্লান্ত। নিজের বৌকেও তখন শত্রু মনে হয়। অনেককে দেখেছি নেশার ঘোরে বৌকে ধরে মারতে। ওরা মানুষ নয়। আমারও যে দু'একদিন মেজাজ চড়া না হয়েছে এমন নয়। কিন্তু বৌর মুখখানা দেখলে সব ক্লান্তি ভুলে যেতাম। তবে আসা-যাওয়ার পথে গান গাওয়ার দরুণ কোন রকম ক্লান্তিই আর থাকে না।

থামলেন নকুল হাজরা। কি যেন চিন্তা করলেন।

তারপর বললেন, 'লেখাপড়া শিখতে পারিনি। তাই ভালো চাকরি জুটবে কোথেকে '

আমি বললাম, 'লেখাপড়া শিখেই বা আজকাল কি হচ্ছে বলুন? কটা লোক চাকরি পাচ্ছে?'

তা যা বলেছেন। সত্যি একেক সময় ভাবি দেশটার হলো কি? ছেলেরা কি এম-এ বি-এ পাস করবে প পথে ঘুরে বেড়াবার জন্যে?'

আমি বললাম, 'কথাটা খুবই সত্য। তবে দুঃখ বিষয় উত্তর দেওয়ার কেউ নেই।'

নকুল হাজরা আবার নিজের কথায় ফিরে এলেন।

বললেন, ছেলেবেলায় গান শেখার ভীষণ ঝোঁক ছিল। শিখেও ছিলাম কিছুদিন। কিন্তু আজ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হয়।'

দাঁতের ফাঁকে একটু ফ্যাকাশে হাসি নকুল হাজরার মুখে।

কমলাকান্তবাবুর গান থামলো।

দমদম পেরিয়ে গেলো। শেয়ালদা পৌছতে আর বেশী দেরী নেই।

এবার আমি অধ্যাপক চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করি। রসায়নশাস্ত্রে আর পদাবলী কীর্তনকে আপনি যেভাবে মিলিয়েছেন তাতে আশ্চর্য না হয়ে পারছিনা।

প্রাণখোলা হাসি হাসলেন অধ্যাপক চৌধুরী। তারপরেই যেই হারালেন গভীর চিন্তায়। হয়তো কিছু বলবেন বলেই।

ওদিকে তখন দল নামকীর্তন ধরেছেন।—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" সুর ধরেছেন যাত্রীদেরও অনেকে। অনেকে হাতে তাল রাখছেন। এই মুহূর্তে ট্রেনের কামরা কীর্তনের আসর হয়ে উঠেছে। হরিনাম পুরণো হয় না। বাংগালীর রক্তে মজ্জায় মিশে আছে এই হরিনাম। অবতার শ্রীচৈতন্য সেই কোন্ যুগে এ নাম চালু করে গেছেন, আজও তা অপরিবর্তিত। এর কাছে নেই কোন স্থান-কাল-পাত্র-ভেদ। সব কিছু ভুলে নিজের অজান্তেই বাংগালী নিজেকে মিলিয়ে দেয় এই নামের মধ্যে। অধ্যাপক চৌধুরী বললেন,' সফরের ঝুলিতে ডিগ্রী পুরেছি অনেকগুলো। পড়াশুনা আর ছাত্রপড়ানো ছিল জীবনের ব্রত। কিন্তু সেটাই আমার জীবনের হ'লো একটা বিরাট অভিশাপ।'

এরা সবাই যেন একই পথের পথিক। হয়তো বা আমরাও। জীবনে আমাদের একই শূন্যতা। তাই যাত্রা আমাদের একই মুক্তির সন্ধানে। পথটাই শুধু আলাদা।

আমি বললাম, 'বিজ্ঞান তো ঈশ্বরের আস্তিত্ববাদে বিশ্বাস করে না। তাই অস্তিবাদী বৈষ্ণবদর্শনের সংগে তাকে মেলানো কি সম্ভব?

অধ্যাপক বললেন, 'কেন সম্ভব নয় বলুন? বিজ্ঞানও কি আস্তিক্যবাদী নয়? বিজ্ঞান যে মহাশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তার সংগে বৈষ্ণবের ভগবৎসত্তার কোন মিল নেই কি? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কি বলছেন একবার ভেবে দেখুন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥

বিজ্ঞান জড়ের সাধনা করছে ঠিকই। কিন্তু সে জড়ের মধ্যেও কি একই চৈতন্যশক্তির প্রকাশ হয়নি?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন অধ্যাপক চৌধুরী।

তারপর বললেন, 'বলছিলাম ডিগ্রীগুলো আমার জীবনের অভিশাপ। বিশ্বাস করুন ঠিক তাই-ই। ওই ডিগ্রীগুলোর জন্যেই কলেজের ছাত্রমহল থেকে আমি বহুদূরে। পাণ্ডিত্য কেন মানুষে মানুষে মেশবার পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় আজ পর্যন্তও বুঝে উঠতে পারলাম না। কলেজে আমার পরিচয় হ'লো ডাকসাইটে প্রফেসর। শুধু কি কলেজেই……?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন অধ্যাপক চৌধুরী।

বললেন, বাড়িতেও আমার একই অবস্থা। কাছের হ'য়েও স্ত্রী ছেলেমেয়েদের কাছে আমি অনেক দূরের। ওরা আমাকে ভয়ে শ্রদ্ধা আর সম্মান করে। কিন্তু ভালোবাসা ওদের কাছ থেকে পাই না। সেখানেও ডিগ্রীগুলোই প্রতিবন্ধক। অনেক সময় ইচ্ছে হয় পুড়িয়ে ফেলি ওগুলোকে। জীবনের নিঃসঙ্গতাকে ভে চুরমার করে দিই। ওদের কাছে যেয়ে বলি। তা আমিও তোমাদের মত রক্ত-মাংসের মানুষ। থামলেন অধ্যাপক চৌধুরী।

তারপর বললেন, নিঃসঙ্গতার একঘেয়েমী মানুষকে পাগল করে তোলে। হয়তো আমিও তাই হতাম ঠিক এমনি সময় পেয়ে গেলাম সত্যিকারের বাঁচা পরিবেশ।

কীর্তনের দলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন অধ্যাপক চৌধুরী।

আবার বললেন, 'মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান পাওনা স্ত্রীর সাহচর্য থেকে আমি বঞ্চিত। আমার স্ত্রী নিরক্ষর। তাই হয়তো আমার থেকে বহু দূরের। বাড়িতে লোকজন অনেক। তবুও বাড়িটাকে কেমন শূন্য মনে হয়। সেই শূন্যতার গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি। এদের সংগ আমার জীবনের এক বিরাট পাওনা। এদের মধ্যেই আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি।

গাড়ি শেয়ালদায়ে ঢুকল। কীর্তনও শেষ হ'য়েছে। কর্মক্লেত্রের তাগিদ মানুষগুলোর মনে আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই গাড়ি থেকে নামার ব্যস্ততা সবার মধ্যে।

ভিড় ঠেলে নেমে আসি আমিও। সামনের দিকে চলমান যাত্রী-মিছিলকে যাই ভুলে। আমার চোখের সামনে ভাসতে থাকে একই তারে বাঁধা দু'টি জীবন। মহাকাশের গভীর শূন্যতায় ভাসমান দুটি উপগ্রহের মতো। চরিত্রে তারা ভিন্ন এক। পথিক তারা একই পথের।

কাজী আবদুল ওদুদসাহেব

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

আমরা সেকালের আবহাওয়ায় থাকা মেয়েরা লেখক-মানুষদের প্রায় চিনিই না, শুধু তাঁদের লেখাটাই চিনি। তাতে আবার সে-লেখক মুসলমান। ওঁদের সমাজের মেয়েদেরই আমরা চিনি না বলাই সত্য, পুরুষ তো দূরের কথা। মুসলিম মেয়েদের দু'একজনের সঙ্গে বা (মুখ-চেনা বলাই ঠিক) চেনা হয়েছে, তা রেলপথে হয়েছে বেশী। তাঁদের বাড়ীতেও নয়, আমাদের বাড়ীতেও নয় সে পরিচয় চেনা।

এমন অবস্থায় কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হওয়ারও কথাই নয়। কিন্তু হঠাৎ "বিশ্বভারতী" পত্রিকায় শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের তাঁর "শাশ্বতবঙ্গ" নামের বইখানির সমালোচনা পড়ে ভারি আগ্রহ ও কৌতূহল হয়েছিল তাঁকে দেখার পরিচয় পাবার। তা একে অন্তঃপুরের গণ্ডিবাসিনী মেয়ে আমি, আর তিনি মুসলমান, সে চেনা আর বহুদিন হয়নি। তবে তাঁর লেখা রবীন্দ্রকাব্য (বর্ষার কবি?) আলোচনা "বিচিত্রায়" তার আগে পড়া ছিল।

যাই হোক, কবে কেমন করে [১৯৫৫।৫৬] বারাসতের "ব্রজরেণু" ভবনে পি ই এনের একটা বার্ষিক সম্মেলনে দেখাটা হ'ল। যেচেই তাঁর লেখার অনুরাগী-পাঠিকা বলে পরিচয় দিলাম। বোধ হয় তিনিই একমাত্র মুসলিম সভ্য সেদিন সেখানে ছিলেন। আর বিশেষ কারুকে আমার চেনা ছিল না।

একটু সামান্য কথাবার্তা শুনলাম। তার মাঝে কি সূত্রে একটা আশ্চর্য্য উক্তি তাঁর মুখ থেকে শুনেছিলাম দেশ বিভাগের প্রসঙ্গে:—দু সম্প্রদায়ের কার মনে কোনখানে কোন কষ্ট আমাদের বা তাঁদের অর্থাৎ দুসম্প্রদায়ের দেশঘর ভিটেমাটি চিরকালের মত যাদের এখানে এমন অবস্থাও অনেকেরই হয়েছে। মানুষ যে দিশাহারা হতবুদ্ধির মত কি গেল আর কি রইল ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। তখনো সেই সময়ের কথা মাত্র ৪।৫ বছর দেশ বিভাগের পরের কথা।

বললেন "...ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায়নি" আমরা শ্রোতা-শ্রোত্রীরা আরো কিছু শোনার আশায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কিন্তু সেই স্বজনবিচ্ছিন্ন ভিটামাটি ছাড়া হতভাগ্য দুদেশবাসীর মনের মর্ম্মান্তিক অবস্থার কথা কে বলতে পারবে ভাষায়।

ঐটুকুই বলেই কাজী সাহেব নীরবেই রইলেন। তাঁর মনে শাশ্বত বঙ্গ শাশ্বত মূর্ত্তিমতী হয়ে বসেছিলেন। এর অনেক আগে শ্রীযুক্ত রেজাউল করিম সাহেবের "বঙ্কিমচন্দ্র" বইখানিতে কাজী সাহেবের লেখা ও দুটি প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট হয়েছিল। নিরপেক্ষ যুক্তিময় দৃঢ় মন্তব্য ও অভিমতে সে রচনা দুটি সমৃদ্ধ। তখন 'আনন্দমঠ' পোড়ানো 'রাজ সিংহ' বর্জ্জনের ইচ্ছা কিছু লোকের মনে উদ্‌ভ্রান্ত মনোভাব এনেছে। এবং তার কিছুকাল পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের "শ্রী ও পদ্ম" প্রতীক নিয়েও বিরুদ্ধতা দেখা দিয়েছে। সে সময়েও ঐ কয়েকজন খাঁটি মুসলমান দৃঢ়ভাবে ঐ আন্দোলনের প্রতিবাদ করেন। "সাহিত্যের চরিত্রের কথা সাহিত্যিকের নিজের কথা বলে মেনে নেওয়া চলে না" এই বলে।

এরপরেও কয়েকবার পি ই এনের সাধারণ সভায় ও বার্ষিক সভায় এবং অন্যত্রও দেখা হয়। আমি তাঁর লেখার একজন বিশেষ পাঠিকা তখন তিনি জেনেছেন। দিলেন ও বললেন পড়তে তাঁর "বাংলার নবজাগরণ" এবং বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্র বক্তৃতা মালার পাণ্ডুলিপি।

শেষ করতে পারব কিনা ভাবছি। একটি হজরতের জীবন কথা, আর অন্যটা কোরাণ শরীফ। বাংলায় কোরাণ শরীফের অভাব। বাঙালী পাঠকের জন্য আবার দেখা হল একবার একটা রাশিয়ান লেখকদের মিলনসভায়। তখনো সুস্থ সবল মানুষ। প্রায় ১০।১২ বছর আগে। তারপর তিনি কবে অসুস্থ হয়েছেন জানি না ঠিক।

কিন্তু শেষ তাঁকে দেখি তাঁর বাড়ীতে ৮বি তারক দত্ত রোডে ১৯৬৮তে আমার একটা বইতে তাঁর "ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায়নি'।' অমর উক্তিটা ঋণ নিয়েছিলাম (ইতিহাসে স্ত্রীপর্ব প্রবাসী) পরে বইটার নাম হয় "এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা।" সেই ঋণ স্বীকার করতে যাই। আমি তাঁর চেয়ে সম্ভবতঃ বয়সে বড়। গিয়েছিলাম শ্রীশৈবাল গুপ্ত ও শ্রীমতী অশোকা গুপ্তদের সঙ্গে। তিনি তখন একটু সুস্থ আছেন। তাঁরাও কাজীসাহেবের পূর্ব পরিচিত।

দেখলাম তাঁর কোরাণ শরীফ শেষ করেছেন কয়েক বছর আগে। এবং হজরতের জীবন কথাও সমাপ্ত করেছেন। চমৎকার ভূমিকাছটা। মুখবন্ধে বড় বড় করে লেখা দাগ দিয়ে "ধর্মে বলপ্রয়োগ নাই" হজরতের মহান উক্তি। ভিন্ন ভাষার কোরাণ শরীফকে আশ্চর্য্য সরল করে দিয়েছিলেন।

কর্ম সমাপ্তির সার্থকতার আনন্দ শরীরের অসুস্থতাকে অতিক্রম করে গেছে। সেই কর্মসমাপ্তির প্রসন্ন আনন্দে পরিপূর্ণ মনে পূর্বপরিচিত শৈবাল গুপ্তদের সঙ্গে গল্প করলেন। অসুস্থতাটা যেন দেহখানি ছুঁয়ে আছে মাত্র। স্রষ্টার শিল্পীমনকে কাবু করতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করলাম "হজরৎ জীবনী শেষ করতে পেরেছেন?" ভারি আনন্দের কথা। আমাকে হজরতের জীবন কথা ও কোরাণ শরীফ দুখানি সহাস্যে সই করে দিলেন।

মনে হল "দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে
ভেবে রাখি মনে মনে
কর্ম অন্তে সন্ধ্যাবেলায়
বসিব তোমারি সনে"

আকার রূপময় এক মূর্তি তার চোখের সামনে দেখতে পেলাম।

সাময়িকী

রামমোহন দ্বিশতবার্ষিকী

রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকল দিক দিয়াই খুব সক্ষম ও কর্ম্মী ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানের গভীরতা, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, দার্শনিক বিশ্লেষণ শক্তি, বহুভাষা শিক্ষা করিয়া প্রকৃষ্ট অনুশীলন প্রতিভার প্রকাশ, সকল দিক দিয়াই রামমোহন পৃথিবীর মহামানবদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইয়োরোপের কোন মহাজ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, তিনি যদি ইয়োরোপে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তিনি ইরাসমাসের সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। রামমোহন রায়ের মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি প্রগাঢ়তার সহিত কর্ম্মশক্তির প্রকাশ এমনভাবে সমন্বিত দেখা যায় যাহা একান্ত অসাধারণ। আগামী ১৯৭২ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্মদিনের দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বর্ত্তমান যুগের জাতীয় জাগরণের মূল প্রেরণা যাঁহার চিন্তা ও কর্ম্মের ভিতরেই বিশেষ করিয়া সক্রিয় ছিল সেই মহাপুরুষের দ্বিশতবার্ষিকী জন্মোৎসব তেমনিই সমারোহের সহিত হওয়া উচিত যাহাতে বিশ্ববাসী বুঝিতে পারেন যে ভারতের মানব

নিজের ঐতিহ্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে অপারগ নহেন।

রাজা রামমোহন রায় যে যুগে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে যুগে ভারতে বিজ্ঞান, যন্ত্রকৌশল, সমাজ-সংস্কার, জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি আধুনিকতার নিদর্শন তখনও ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয় নাই। কুসংস্কারের অন্ধকার তখনও ভারতের মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বাল্যবিবাহ, সহমরণ প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা বিরুদ্ধতা, (স্ত্রী) শিশুহত্যা প্রভৃতি তখন অতি প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল। রাজা রামমোহন রায় আরও দেখিয়াছিলেন যে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ কিভাবে হিন্দুদিগের সভ্যতার নিন্দা করিয়া ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মাহাত্ম্য বর্ণনা ও প্রচার করিয়া ভারতীয়দিগকে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া ঈশ্বরের দরবারে নিজেদের আশ্রয় স্থির করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে শিক্ষা দিতে থাকিতেন। তিনি প্রথমতঃ সকল ধর্ম পুস্তক পাঠ করিবার জন্য হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, আরবি, ফারসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিলেন। সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, উর্দু, বাংলা ইত্যাদি ভারতীয় ভাষার জ্ঞানও তিনি প্রগাঢ়রূপে অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শুনা যায় তিনি চতুর্দ্দশটি ভাষা লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারিতেন। তিনি অতি অল্প বয়সে তিব্বত গমন করেন, বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে পূর্ণতর জ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছায়। তিব্বতী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তদ্দেশে তাঁহার জীবন বিপন্ন হয় ও কয়েকজন তিব্বতী মহিলা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। এই কারণেই তিনি আজন্ম বিশেষ ভাবে স্ত্রীজাতির উন্নতি ও রক্ষার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় বিদেশী খৃষ্টীয় সমালোচকদের সহিত তর্কে তাঁহাদিগকে অনায়াসেই পরাস্ত করিতেন এবং দেখাইতেন যে কুসংস্কার ও লোকাচার সকল দেশেই সকল ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে থাকে ও তাহার সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও কোন জাতির দার্শনিক মতবাদের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে না। হিন্দুদিগের দর্শন শাস্ত্রাদি অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে হিন্দুজাতি চিন্তার ক্ষেত্রে জীবন অতিবাহন রীতির বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় নিজেদের বৈশিষ্ট ও জ্ঞান উত্তমরূপেই প্রমাণ করিয়াছে। কর্ম্ম কৌশলে ও জীবন নির্ব্বাহের নানান অঙ্গে হিন্দুদিগের প্রতিভা যুগে যুগে যেভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তাহাদিগের সম্বন্ধে নিন্দাবাচক সমালোচনা বিদেশীরা শুধু স্বার্থসিদ্ধি ও নিজেদের অন্যায় শোষণ ও লুণ্ঠনের সাফাই হিসাবেই করিয়া চলিয়াছেন। যে কুসংস্কার ও দুর্নীতি ভারতীয় সমাজের উন্নতির পথে বিঘ্নরূপে বর্ত্তমান আছে তাহা শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তারের দ্বারা অনায়াসে অপসৃত হইতে পারে। রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী যুগে ক্রমে ঐ সকল কুসংস্কার ও দুর্নীতি দূর হইয়া ভারতীয় সমাজ আজ পৃথিবীর অপর দেশের তুলনায় মানসিক গঠনের দিক দিয়া বহু উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই উন্নতির জন্য প্রধানতঃ রাজা রামমোহন রায়কেই ভারতবাসীদিগের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।

ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টাতেই বিশেষভাবে শক্তিলাভ করিয়াছিল। এই শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করাতে পুরাতন পন্থা ছাড়িয়া শিক্ষা নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করে। ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অধিকারে থাকিলেই আধুনিক যুগের শিক্ষার আদর্শ পূর্ণ সংরক্ষিত হয় না। বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখা ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ অর্থনীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ই প্রাচীনপন্থী শিক্ষার অন্তর্গত ছিলনা। সেই কারণে সংস্কৃত, ল্যাটিন কিম্বা আরবি, পাঠ করিলেও জীবনের বহু বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেই মানুষ অজ্ঞ থাকিয়া যাইত। ইংরেজী শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন ও ইংরেজী শিক্ষার ধারা অনুসরণে ভারতীয় কথিতভাষা সমূহও নিজ নিজ শিক্ষাপদ্ধতি বহু শাখাপ্রশাখা সংযুক্ত আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির আদর্শে গঠন করিয়া লইয়াছে। এই কার্য্য

কখনও সম্ভব হইত না, যদি না ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইত। এই উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন ও তাহার ফলে অপরাপর গঠন কার্য্য রাজা রামমোহন রায়ের ভবিষ্যত দৃষ্টিজাত।

উনবিংশ শতাব্দীর যে নানা পথে অগ্রগমনের চেষ্টা তাহার মূলে রহিয়াছে আধুনিকতার আকর্ষণ, আবেগ ও অনুভূতি। এই শতাব্দীতে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও ভারতকে তাঁহারা নানাভাবে নূতন নূতন উপলব্ধির ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। দেখা যাইবে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাবের সহিত এই সকল পথ প্রদর্শকদিগের আগমন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত আছে। অর্থাৎ বর্তমান ভারতের যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজন্ম লাভ হইয়াছে ও এখন যে অতীতের সৃষ্টি ও সভ্যতার সহিত আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তার একটা সমন্বয় স্থাপিতহইয়াছে তাহা রামমোহন রায়ের জন্যই শীঘ্র হওয়া সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার উপস্থিতি না থাকিলে ভারত আরও বহুকাল সনাতন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকিত এবং নূতন ঊষার সূর্য্যালোকে তাহার মানসচক্ষু উন্মিলিত হইতে আরও দীর্ঘকাল বিলম্ব হইতে পারিত। তিনি ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে ক্লেদমুক্ত করিয়া নূতন পবিত্রতায় প্রাণবান করিয়া জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সিদ্ধ করিতে হইলে যে জাগ্রত দৃষ্টি থাকা আবশ্যক হয় রাজা রামমোহন রায়ের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল। তিনি ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যেমন চাহেন নাই যে ভারতীয়েরা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করেন, তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও চাহেন নাই যে আমরা অল্প অল্প ইংরেজী রপ্ত করিয়া ইংরেজের অনুগত ভৃত্যের কর্য্যে নিযুক্ত থাকি। তিনি বলিষ্ঠ জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন ও কোন বিষয়েই দুর্ব্বলতা সহ্য করিতে চাহিতেন না। তৎকালীন পরিস্থিতিতে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের আগ্রহ জাগ্রত হয় নাই; ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তার পন্থাও সেইরূপ প্রকট ও প্রবল আকারে ব্যক্ত হয় নাই। ইহা পরে হয়ও ফলে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পরে ঘোর বিক্ষোভজাত বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়।

রাজ রামমোহন রায় একদিকে যেমন ধর্ম্মকে আচার, অনুষ্ঠান রীতি পদ্ধতিগত কুসংস্কার মুক্ত করিয়া তাহাকে তাহার প্রাচীন শাস্ত্র ও দর্শন অনুগামী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; যাহার ফলে হিন্দুধর্ম্মের নূতন নূতন শাখা গঠিত হয় ও সনাতন ধর্ম্মাচারও নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করে; অপরদিকে তিনি সামাজিক রীতি-নীতি চালচলনকেও শুদ্ধ ও নির্দ্দোষ করিবার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেন। ভারত হইতে যে শিশুহত্যা, নারীজাতির অপমান, উৎপীড়ন ও ব্যাপক অজ্ঞতার অন্ধকার আজ দূর হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে ঐ মাহাপুরুষের চেষ্টা। সহমরণ প্রথা তুলিয়া দেওয়া তাঁহার একটী মহান ও চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাওয়া, বিধবা বিবাহের প্রচলন, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি মানবতা-বিরুদ্ধ প্রথার উচ্ছেদ ও অপর সকল সংস্কার কার্য্যই তিনি প্রথমে সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা আরম্ভ না করিলে কখনও সম্ভব হইত না। তাঁহার চেষ্টায় প্রবল রক্ষণশীল ব্যক্তিসংঘের আপত্তি সত্বেও যখন ১৮২৯ খৃঃ অব্দে সতীদাহ প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল তখন সমাজ সংস্কারকগণ মনে ভাবিলেন যে সামাজিক কুসংস্কারের "বাস্টিল" এতদিনে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর জাতির উন্নতি ও প্রগতি স্বাধীন চিন্তার উপরে নির্ভর করিতে আরম্ভ করিল। শৃঙ্খলের একটী কড়া ভাঙ্গিয়া দিলেই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়। রাজা রামমোহন রায় শৃঙ্খল ভাঙ্গা আরম্ভ করিয়া ভারত-ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মের দ্বিশত বার্ষিকী তাই আজ ভারতের মানুষ মহা সমারোহে অনুষ্ঠান করিবে আশা করা যায়। জাতীয় উন্নতির ও অগ্রগমনের মহামন্ত্রের তিনি বর্ত্তমান যুগের প্রথম উদ্গাতা। তাঁহার স্মৃতির সম্মানরক্ষা সকল ভারতীয়ের একটি অতিবড় কর্তব্য।

রাশিয়া ও মিশর

আমেরিকা সাধারণ তন্ত্রকে বাঁচাইবার জন্য ভিয়েৎ-নামে মহাযুদ্ধ চালাইয়া চলিয়াছে ও ফলে সহস্র সহস্র মানুষের প্রাণ গিয়াছে ও যাইতেছে। এইরূপ যুদ্ধ

হইতেছে কেন বিচার করিলে দেখা যায় যে কম্যুনিষ্ট-নীতিতে পরদেশকে "মুক্তিদান" করার যে রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সত্যকার অর্থ হইল পরদেশকে জোর করিয়া কম্যুনিজম মানিয়া লইতে বাধ্য করা। উত্তর ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে বলপূর্ব্বক রাষ্ট্রমত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করাতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আমেরিকা অবশ্য কম্যুনিজমের প্রসার নিবারণ করিতে চায় ও সেই জন্যই ভিয়েৎনামের পরিস্থিতি দেখিয়া পূর্ণশক্তিতে ঐ দেশের কম্যুনিষ্টবিরোধী দলের নেতাদিগকে সামরিক সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিল। আমেরিকায় যুদ্ধ সাহায্য কার্য্য এতই ব্যাপক হইয়াছে যে মনে হয় যে আমেরিকাই যুদ্ধ চালাইতেছে, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আমেরিকার সহায়ক মাত্র। বহির্জগতে মানুষ ঠিক পরিষ্কার বুঝিতে পারে না যে ভিয়েৎনামের সকল মানুষই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রমত পোষণ করে কি না। যদি সকলেই কম্যুনিজম চাহিত এবং শুধু আমেরিকাই বাহির হইতে আসিয়া তাহাদের কোনো কোনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর লোকেদের কম্যুনিষ্ট বিরুদ্ধতা করিতে শিখাইতেছে; তাহা হইলে আমেরিকার কার্য্য জগতে শান্তি ও স্বাধীনতা স্থাপনের দিক হইতে ন্যায়কার্য্য হইতেছে না। কিন্তু যদি ভিয়েৎনামে সত্য সত্যই অনেক কম্যুনিষ্ট বিরোধী মানুষ থাকে এবং ভিয়েৎকংই গায়ের জোরে সে দেশে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে; তাহা হইলে বিষয়টা অন্যরূপ ধারণ করে।

আমরা যদি ভিয়েৎনাম ছাড়িয়া মিশর ও ইসরায়েলের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে সেখানে আমেরিকা ইসরায়েলকে সামরিক মাল-মশলা দিয়া সাহায্য করিতেছে; যেমন ভিয়েৎনামে চীন ও রাশিয়া করিয়া থাকে; এবং রুশিয়া মিশরকে প্রথমে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিয়া পরে সৈন্য পাঠাইয়া সাহায্য করিতেও আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে মিশরে ১৫০০০ রুশিয়ান আকাশ ও জল সৈন্য রহিয়াছে। এবং তাহারা বহু ক্ষেত্রে ইসরায়েলের রাষ্ট্রসীমার বাহিরে ইসরায়েলের উপরে আক্রমণও চালাইতেছে। ঠিক যেরূপ যুদ্ধ আমেরিকা ভিয়েৎনামে চালাইতেছে সেইরূপ ব্যাপক যুদ্ধে রুশিয়া এখনও মিশরে লিপ্ত হইয়া যায় নাই; কিন্তু তাহা হইতে অনেক সময় লাগিবে না। আমেরিকা এখন যে ভাবে যুদ্ধবিমান সরবরাহ করিয়া ইসরায়েলকে যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তার করিতে সাহায্য করিতেছে; তাহাতে যে কোন মুহূর্ত্তে রুশিয়া ও আমেরিকা একটা তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে পারে। বিশ্ব মহাযুদ্ধ না হউক ঐ দুইটি মহাশক্তিশালী জাতি ক্রমে ক্রমে যে আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ-সূত্রে পরস্পরের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া বসিতে পারে সেই সম্ভাবনা এখন বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা যে কি ভাবে কখন ঘটিয়া যাইতে পারে তাহা কেহ বলিতে পারেন না; কিন্তু সম্ভাবনা ক্রমে ক্রমে প্রকৃষ্টরূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা ঘটিলে বিশ্বমানবের মহা অকল্যাণের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে সন্দেহ নাই।

পঞ্চশস্য

স্বামী বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ

সনাতন হিন্দুধর্ম হইতে ব্রাহ্ম সমাজের মতবাদ অনেকাংশে বাছবিচার করিয়া গঠিত। অর্থাৎ সনাতন হিন্দুসমাজের আচারপদ্ধতির অনেক কিছু ব্রাহ্মসমাজে চলে না। মূলতঃ ব্রহ্মধর্ম্ম হিন্দুশাস্ত্র অনুমোদিত ও দার্শনিক তথা বিচারেও দুই মতের ভিতরে কোন ভিত্তিগত পার্থক্য নাই। স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাদিতে যোগদান করিতেন। পরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যুক্ত থাকেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও মতবাদের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও ব্রাহ্ম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা একপ্রকার ছিল। সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে একটি পুরাতন প্রবন্ধ পুনঃমুদ্রিত করা হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে এই বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। আমরা উহা আংশিকভাবে উদ্ধৃত করিতেছি।

খ্যাতনামা ধর্ম-প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ সাহস সহকারে পৃথিবীর অপর প্রান্তস্থিত আমেরিকাভূমে গমন পূর্বক, হিন্দুধর্মের নবীন ব্যাখ্যা দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়া এবং সেই সঙ্গে নিজেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া, সম্প্রতি দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এই সময়ে দেশীয় ভ্রাতৃগণ তাঁহার কৃতকার্যতার জন্য তাঁহাকে যে বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, দেশীয় লোকের এই আচরণকে সময়ের একটী শুভ চিহ্ন বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কারণ হিন্দুধর্মের প্রচারক হইয়া বিদেশে গমন পূর্বক অন্য জাতীয় লোকের মধ্যে বাস করা এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিবার রীতি এদেশের পক্ষে অভিনব, এবং এদেশের ধর্মশাস্ত্রেরও অভিপ্রায়ানুরূপ নহে। এরূপ অবস্থাতেও যে স্বামী বিবেকানন্দ দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেষ সমাদর পাইয়াছেন তাহা বর্তমান সময়ের উদার শিক্ষারই ফল বিশেষ। কিন্তু বিবেকানন্দ বেদান্ত সম্বন্ধে ষ্টার থিয়েটারে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া এদেশবাসী হিন্দুগণ তাঁহাকে আর পূর্ববৎ ভক্তি ও সমাদর করিবেন কিনা সন্দেহ। কারণ স্বামী বিবেকানন্দ প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্র—পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া, একমাত্র বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদকেই হিন্দুর অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি এবং পুরাণের যে সকল অংশ বেদের সহিত ঐক্য হয়, তাহাই একমাত্র গ্রাহ্য, অন্যান্য অংশ পরিত্যাজ্য। এমন কি গৃহ্যসূত্রসমূহকেও অগ্রাহ্য করিয়া—বেদেরই অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এদেশবাসীদিগকে এই ভাবের কথাই বলিয়াছিলেন। উপনিষদ প্রতিপাদ্য একমাত্র চিন্ময় অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে মানবের উপাস্য, এবং সেই বেদান্তশাস্ত্রই সকলের অবলম্বনীয় রাজা তাহাই ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের লোকে সে সময়ে তাঁহাকে সম্মান করা দূরে থাকুক, যথাশক্তি তাঁহার প্রতিকূলতাই করিয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে উপনিষদ হইতে ব্রহ্মবাদ-সমর্থক উক্তিসকল সংগ্রহ করিয়া যে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন, তাহাও দেশীয় জনগণের তেমন আদরের বস্তু হয় নাই। তিনিও সাধারণ লোকের তেমন সহানুভূতি পান নাই। এখন যদি স্বামী বিবেকানন্দ রাজা ও মহর্ষির পথ অনুসরণ করিয়া দেশীয় জনগণের সমাদর ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হন তাহা হইলে ইহাকে একটি বিশেষ শুভচিহ্নই বলিতে হইবে এবং রাজা ও মহর্ষির শুভচেষ্টা এতদিনে কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হইতেছে, স্বামী বিবেকানন্দের বর্তমান মত অবগত হইয়া দেশীয় জনগণ আর তাঁহাকে পূর্বের

তার সমাদর করিবে কি না। যদি স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসম্বন্ধীয় এই মত পূর্ব্বে প্রচারিত হইত, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে এত আগ্রহ ও সসম্মানে গ্রহণ করিত কি না তাহাও সন্দেহের বিষয়।

বিপ্লব ও গণতন্ত্র

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট লীগ প্রকাশিত বুলেটিন হইতে আমরা পশ্চিমবাংলার বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের পর জমি, ভেড়ি প্রভৃতি জবর দখলে ভাটা পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু অবস্থার বাস্তব উন্নতি কতখানি হইয়াছে বলা মুসকিল। পার্টিগুলির হানাহানি ও খুনখারাবির সংবাদ এখনও বন্ধ হয় নাই, ইহার উপর নক্‌শালের উপদ্রবে সবাই বেশ একটু ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক জটিলতার ইহা আর একটি নূতন লক্ষণ। আর একটি ঘটনাও নূতন ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছে। যুক্তফ্রণ্ট বিযুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া যাহাকে মনে হইয়াছিল সেই মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আজ কোণঠাসা অবস্থায় দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। নেতারা অনুগামীদের মনোবল ফিরাইয়া আনিবার মানসে দিকে দিকে সফরে বাহির হইয়াছেন।

কিন্তু হরতালের একচেটিয়া অধিকার লইয়া যাঁহারা এতদিন বসিয়াছিলেন তাহারা নিজেরাই হরতালের মধ্যে পড়িয়া কিঞ্চিৎ বিব্রতবোধ করিতেছেন।

মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে মানুষের বক্তব্য প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করিবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত বলিয়া তাঁহারা চীৎকার শুরু করিয়াছেন। মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য রক্তাক্ত বিপ্লবের হুমকিও ছাড়িয়াছেন। তিনি স্থির মস্তিষ্কে বিচার করিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন যে তাঁর পরিকল্পিত রক্তাক্ত বিপ্লবও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের একটি পথ মাত্র।

যে রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা যুক্তফ্রণ্ট শাসনে সব কয়টি শরীক নিজ নিজ পথে লক্ষ লক্ষ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করিয়া ঘটাইতে চাহিয়াছেন; তাহা একমাত্র স্বৈরতন্ত্রেই সম্ভব। স্বৈরতন্ত্রে যে গণতন্ত্রের কথা বলা হয় তাহা পার্টির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং যে অধিকার তাঁহারা অপরকে দিতে চাহেন না তাহা পাইবার জন্য বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে বৈ কি! ক্ষমতার লড়াই-এ সকল পার্টি যেখানে সমান দাবিদার সেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করিবেন একথা ভাবিবার কোন কারণ ঘটিয়াছে কি?

মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আজ বেকায়দায় পড়িয়া গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি করিতেছেন, কিন্তু একথা তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে মার্ক্সবাদী তূণ হইতে গালি গালাজের যে তীর তাঁহারা নিক্ষেপ করিতেছেন তাহা রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত হইবার পথে প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারে, কিন্তু জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবেনা—ইহা জনসাধারণ-কে নূতন দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইতে সাহায্য করিবে মাত্র।

বর্তমানে সংগ্রামের কথা না বলিলে বামপন্থী বলিয়া নিজের পরিচয় দেওয়া চলে না, তাই দলগুলির মধ্যে সংগ্রামের প্রতিযোগিতা পড়িয়া গিয়াছে। দিকে দিকে 'লাল সেলাম' ও 'জিন্দাবাদ' এর ভারে জনসাধারণ বিভ্রান্ত। সংগ্রামের শেষ কোথায় তাহা জনসাধারণকে কেহ ভাবায় নাই—প্রয়োজনও বোধ করে নাই। নেতারা আহ্বান জানাইবেন—আর জনসাধারণ তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলিবে। ইহাই রাজনৈতিক দলগুলির মনোভাব। সংগ্রামের লক্ষ্য যদি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়—তাহা হইলে মানুষের সামনে তেমনি একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া ধরিতে হইবে—মানুষ তাহার ভুল ত্রুটি বিচার করিয়া যাহাতে আগাইয়া আসিতে পারে তাহার জন্য ব্যাপক আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ এক বিকল্প রাজনীতি তুলিয়া ধরিবার মত মানুষ সম্ভবতঃ কোন রাজনৈতিক

দলেই নাই, সেই জন্ম পরস্পরকে গালিগালাজে তাঁহারা আসর মাৎ করিতে চাহিতেছেন। দুর্বল একজোটে সকলকে কোন ঠাসা করিতে চাহিতেছে। ক্ষমতা দখলের রাজনীতির ইহাই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।

রুশিয়া ও পাকিস্থান

'যুগজ্যোতি' সাপ্তাহিকে শ্রীঅধীররঞ্জন দে লিখিয়াছেন :

আজ ধর্ম্মে অবিশ্বাসী তথাকথিত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়া ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতকে পথে বসাইয়া মোল্লাতন্ত্রের দেশ পাকিস্থানকে বেরাদারণ করিয়াছে—রণসম্ভার দিয়া পাকীস্থানকে ভরিয়া দিতেছে। রাশিয়া বেশ ভালভাবেই জানে মোল্লাতন্ত্রের দেশ পাক দস্যুরা এই রণসম্ভার একমাত্র ভারতের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করিতে পারে। মধ্য প্রাচ্যে এই কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ধর্ম্মান্ধ রক্তলোলুপ মুস্‌লিম রাষ্ট্রগুলিকে বিপুল অস্ত্র-সম্ভার শুধু খয়রাতিই করিতেছে না গোপনে নিজের রণ-বিশেষজ্ঞের দল পাঠাইয়া এই বাক্‌সর্ব্বস্ব মুসলিম দেশের "বীর" সৈনিক বাহিনীকে যুদ্ধকৌশলে তালিম দিতেছে। উদ্দেশ্য একটি সদ্যজাত শিশু-রাষ্ট্র ইজরাইলকে পিষিয়া মারা। রাশিয়ান রণ-সম্ভারে এবং বিশেষজ্ঞদলের দ্বারা বলীয়ান হইয়া মধ্যপ্রাচ্যের এই মোল্লাতন্ত্রের দেশগুলি জেহাদ ঘোষণা করিয়া ইজরাইলকে খতম করিবার জন্য মরিয়া হইয়া চারিধার হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। আমেরিকান দস্যুদের হাত হইতে আত্মরক্ষার লড়াইর জন্য যদি কোরিয়া, ভিয়েৎনাম ইতিহাসে অমর হইয়া থাকে তবে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার প্রত্যক্ষ মদতে বলীয়ান ধর্ম্মান্ধ দস্যু মুস্‌লিম রাষ্ট্রগুলির বর্ব্বর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার লড়াইতে যে অপূর্ব্ব বীরত্ব ইজরাইল দেখাইতেছে তাহার জন্য যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সে ইতিহাসের পাতায় অমর হইয়া থাকিবে।

ক্রুশ্চেভের পতনের পর সোভিয়েট রাশিয়া ভারতের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান রুশ নেতৃবৃন্দ পাক্ দস্যুদের হাত দিয়া ভারতের বুকে তীক্ষধার খড়্গ তুলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। বিশ্ব-রাজনীতিতে এবং পররাষ্ট্র নীতিতে ক্ষুদ্র মোল্লা রা[ষ্ট্র] পাকীস্থান "ইণ্টারন্যাশনাল ক্যাসানেবেল চ্যাটা বক্‌স." (স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসু প্রদত্ত ডিগ্রী) দুর্দ্ধ[র্ষ] জওহরলাল নেহরুর কর্ণমর্দ্দন করিয়া দিয়াছিল এব[ং] বর্ত্তমানে তাহার পরম সোস্যালিষ্ট মাইনোরিটি সরকা[র] পরিচালিকা প্রিয়দর্শিনী কন্যার দুই কর্ণ এবং নাসিকামর্দ্দ[ন] করিয়া চলিয়াছে। নেহরু এবং ইন্দিরার দাম্ভিকতা এবং ধোকাবাজির ফলে সমগ্র বিশ্বে ভারত আ[জ] নিঃসন্দেহে বান্ধবহীন। আর তাহার চোখের উপর[ে] ক্ষুদ্র মোল্লা রাষ্ট্র পাকিস্থানের চরণতলে চীনের দস্যুর সোভিয়েট রাশিয়া এবং রক্তপিপাসু আমেরিক[া]। ফ্যাসিষ্টরা অগণিত রণসম্ভার লইয়া গড়াগড়ি যাইতেছে আমেরিকা—রাশিয়া—লাল চীন কেহই কাহারও বন্ধু রাষ্ট্র নহে—শত্রু রাষ্ট্র বলা যায়। আর তিন শত্রুর মহা উদ্দেশ্য এক—পাক দস্যুদের হাতে বিপুল রণ-সম্ভা[র] তুলিয়া দেওয়া এবং সকলেই জানেন এই মোল্লা রা[ষ্ট্র] একটি মাত্র জায়গাতেই এই বিপুল অস্ত্রসম্ভার প্রয়ো[গ] করিতে পারে—আল্লা আল্লা বলিয়া ভারতের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়া।

পাকিস্থান হইতে হিন্দু বিতাড়ন

কিছুদিন হইতে বহু হিন্দু নরনারী পূর্ব্ব-পাকিস্থা[ন] হইতে পশ্চিমবঙ্গে পালাইয়া আসিতেছেন। ম[নে] হইতেছে এইরূপ পলায়নের মূলে আছে উৎপীড়ন লুণ্ঠন ও অত্যাচার। শুধু শুধু ২৩ বৎসর মুসলমা[নের] ধর্ম্মরাজ্যে বাস করিবার পরে কেহ পালাইতে পারে না ইতিপূর্ব্বেও বহুবার হিন্দু-বিতাড়নের ফলে পূর্ব্ব-পাকিস্থা[ন] হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু, পলাইয়া ভারতবর্ষে প্রবে[শ] করিয়াছে; সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ঐ পলাইয়া আসা[র] মূলে নিশ্চয়ই একই ধরণের কারণ আছে বলিয়া ম[নে] হয়। সাপ্তাহিক "যুগবাণী" পত্রিকা এই সম্বন্ধে যাহ[া] বলিয়াছেন তাহা এই বিষয়ের বিষদ ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রতিদিন গড়ে দুই হাজার উদ্বাস্তু ভারতে আসিতেছে। এ পর্যন্ত আশি হাজারেরও বেশী নতুন লোক আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র ত্রিশ হাজারের স্থান মানা ক্যাম্প প্রভৃতি অঞ্চলে হইয়াছে। এই প্রচণ্ড গরমে পূর্ববঙ্গের লোকগুলিকে মানা ক্যাম্পে লইয়া গেলে তাদের অর্ধেক মারা পড়িবে। সরকারের উচিত আসাম হইতে সুরু করিয়া পাক-ভারত সীমান্ত বরাবর এদের পুনর্বাসন দেওয়া। জল বায়ুর দিক হইতে এই অঞ্চল এদের বাসের পক্ষে অনুকূল হইবে, তাছাড়া পাক-সীমান্ত হইতে আক্রমণ ঘটিলে এরাই হইবে প্রথম বাধা। সরকার চান বা না চান বাস্তবে উদ্বাস্তুরা এইভাবেই পুনর্বাসন করিয়া লইবে। সেজন্য মুসলমানের গৃহ ও সম্পত্তি দখলের অভিযান চলতে পারে। পূর্ব পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু চলিয়া আসিলে ভারত সরকার তাহাদের পুনর্ব্বাসন দিবেনা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও সে সাধ্য নাই। যারা প্রাণের দায়ে ঘর বাড়ী ছাড়িয়া ভারতে আসিতেছে, তারা গাছতলায় পড়িয়া মৃত্যুবরণ করিবে এ আশাও সরকার যেন না পোষণ করে। বাস্তবে যা ঘটিবে তা অনুমান করা শক্ত নয়। উদ্বাস্তুরা মুসলমানদের ঘর বাড়ি দখল করিতে সুরু করিবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধা খুবই স্বাভাবিক। তাহার প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানেও হইবে— হাজার হাজার হিন্দু সেখানে নিহত ও আহত হইবে। তার প্রতিক্রিয়ারূপে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাবানল জ্বলিবে। সরকার পুলিশ ও মিলিটারী দিয়া উহা দমন করিতে পারিবেনা। মুসলমানের ভোটের আশায় এখনও যারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর ধামা চাপা দিতে চাহিতেছে ৭২ সাল নাগাদ তারা আর মুসলমানের ভোট পাইবে কিনা সন্দেহ। কেননা পাকিস্তান যদি হিন্দুশূন্য হয় তবে ভারতও মুসলমান শূন্য হইবে। ইহা প্রকৃতির বিধান—কোন বক্তৃতায়ই এ ধারা রোধ করা যাইবে না। ভারত সরকারের তাই উচিত সময় থাকিতে সমস্যার মূল উৎপাটিত করা ও পাকিস্তান সরকারকে এ ব্যাপারে সকল চুক্তি মানিয়া চলিতে বাধ্য করা। রাষ্ট্রসঙ্ঘেও পাকিস্তানের হিন্দুদের সমস্যাটি তোলা উচিত।

দেশ-বিদেশের কথা

কাম্বোডিয়ার বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

কাম্বোডিয়ার যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে তাহা যে ক্রমে ক্রমে বিশ্বমহাযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে এই কথা বহু লোকে মনে করিতেছেন। "যুগান্তর" সাপ্তাহিকে বলা হইয়াছে:

কাম্বোডিয়ার যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। মাও সেতুঙ বলিয়াছেন যে বিশ্বযুদ্ধ হয়তো শীঘ্রই বাধিবে। তাঁর কথা লঘুভাবে নিবার কোন কারণ নাই। কাম্বোডিয়ার যুদ্ধে উত্তর ভিয়েৎনাম ও ভিয়েৎনাম বাহিনী পরাস্ত হইয়াছে। সিহানুক ভিলে ও হো চি মিন ট্রেইল এই দুটি পথে তার উত্তর হইতে দক্ষিণে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পাঠাইত। এই দুটি পথ তাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। এখন উত্তর হইতে দক্ষিণে সরবরাহ পাঠাইবার পথ তাদের নাই। ফলে ভিয়েৎনাম যুদ্ধেও এবার তাদের হারের পালা সুরু হইতে বাধ্য। চীন এখন হাজার হাজার সৈন্য ইন্দোচীনে পাঠাইতে সুরু করিয়াছে। রাশিয়া প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়াছিল, তার একটা বড় অংশ মার্কিনী ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্যদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। রাশিয়া ইন্দোচীনের যুদ্ধে আর বেশী জড়াইতে চায় না। রাশিয়া যখন চেকো স্লোভাকিয়ায় লালফৌজ পাঠাইয়া গত বছর ঐ দেশটি দখল করে তখন যুক্তরাষ্ট্র চুপচাপ ছিল। এখন ইন্দোচীনের যুদ্ধে রাশিয়ার চুপচাপ থাকার পালা আসিয়াছে। এমন কি বিদেশে সিহানুক যে কাম্বোডির সরকার গঠন করিয়াছেন রাশিয়া উহাকেও স্বীকৃতি দেয় নাই। রুমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়া স্বীকৃতি দিয়াছে, কিন্তু রুশপন্থী কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রই স্বীকৃতি দেয় নাই। ইহাতে প্রিন্স সিহানুক রাগিয়া রাশিয়ার মনোভাব সম্পর্কে প্রকাশ্যে নিন্দা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মাও সেতুঙ প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়াইয়া সিহানুককে সর্বতোভাবে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

চীন ইচ্ছা করিলেই ইন্দোচীনে কয়েকলক্ষ সৈন্য পাঠাইতে পারিবে। সেখানে এখন মার্কিন সৈন্য আছে চার লক্ষের বেশি। কোরিয়ায় যাহা ঘটিয়াছে ইন্দোচীনে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের লড়াইয়ের মাধ্যমে তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে। তবে এবার পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। জাকার্তায় যে এগারোটি এশীয় দেশের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়াছিলেন তাহাতে বোঝা গিয়াছে যে এই এগারোটি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে থাকিবে। সে কারণেই এবারের যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইবার সম্ভাবনা বেশি।

সংখ্যালঘুদের অভিযোগ

সংখ্যালঘু মুসলমান নাগরিকগণ তাহাদের উপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ হইতেছে বলিয়া জাতিসংঘের নিকট নিজেদের অভিযোগ পেশ করিবেন না কেন? এই সম্বন্ধে "জমায়েত-ই ইসলামি" পরিচালিত "রেডিয়েন্সের" উক্তি সাপ্তাহিক "যুগজ্যোতি"তে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে বলা হইয়াছে:

(১) আইন ও শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে সকল নাগরিকই বাধ্য না কি এ ব্যবস্থা শুধু সংখ্যালঘুদের জন্যই?

(২) ভারতীয় জনসংখ্যার দশ শতাংশ মুসলমান তাই সংস্কৃতির ভিত্তিতে চার পাঁচটি রাজ্য পৃথক করিয়া যাহাতে সেখানে শুধু মুসলমানরাই সাম্প্রদায়িক নিগ্রহের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া শান্তিতে বাস করিতে পারে, সে চেষ্টা করা হইতেছে না কেন?

(৩) যেখানে সরকার মুসলমানদের নিকট হইতে সকলপ্রকার কর লওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রত্যাভূতি দিতে পারিতেছে

না। সেখানে মুসলমানরা কর দেওয়া বন্ধ করিবে না কেন ?

(৪) হরিজনরা যাহারা তুলনামূলক ভাবে অধিমাত্রায় নিগৃহীত হইতেছে, তাহারা যদি জাতিসংঘের দ্বারস্থ হইতে পারে, তাহা হইলে মুসলমানরা তাহাদের শান্তিতে বাস করিবার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের দ্বারস্থ হইবে না কেন ?

"যুগজ্যোতির" ঐ সম্বন্ধে মন্তব্য হইল :

"কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী যাহারা ২৩টির মধ্যে ২১টি সংঘর্ষ ঘটাইবার জন্য দায়ী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের আইন শৃঙ্খলা মানিয়া চলা কাহার কর্তব্য এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা কত দূর শোভন সে প্রশ্ন আমরা তুলিব না। মুসলমানদের নিরাপদে (?) বাস করিবার জন্যই তো পাকিস্তান সৃষ্টি করার দাবী উঠিয়াছিল; কিন্তু ভারত বিভাগের পর দলে দলে হিন্দু পাকিস্তান পরিত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আসিলেও মুসলমানরা কেন ভারতভূমি ত্যাগ করে নাই অথবা তাহাদের পুনরায় ভারতের মধ্যে নূতন পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাব সঙ্গত কিনা, সে আলোচনা করিয়াও লাভ নাই। কারণ আমাদের বর্তমান সরকার নিজেই আমাদের মুখে কালিমা লেপন করিতেছে এবং মুসলমানদেরই এই সকল অসঙ্গত দাবী তুলিতে উৎসাহিত করিতেছে। প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দাঙ্গাবিধ্বস্ত মহারাষ্ট্র সম্পর্কে দুইটি মন্তব্য তাঁহার অনুগামী প্রগতিশীল (?) সংবাদপত্রে ফলাও করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। শিবসেনার জনৈক প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি নাকি বলিয়াছেন—"আমরা সহরে বাস করিতেছি, জঙ্গলে নয়। সুতরাং তাহার উপযুক্ত আচরণ করিতে হইবে।" আবার জনৈকা মুসলমান মহিলা তাঁহার স্বামীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আসিলে তিনি নাকি মন্তব্য করিয়াছেন—"কারাগারে থাকায় তোমার স্বামী বাঁচিয়া আছে ও নিরাপদে আছে। বাহিরে থাকিলে সে হয়তো নিহত হইত।"

ইহার পর যদি মুসলমানরা জাতিসংঘে যাইতে চায় তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের কি বলিবার থাকিতে পারে ?"

কোন সংখ্যালঘু ব্যক্তিদেরই সাধারণ আইন সংক্রান্ত অভিযোগ জাতিসংঘের নিকট লইয়া যাইবার অধিকার নাই। তাহা থাকিলে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রীয় দলও তাহাদের উপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইতেছে বলিয়া জাতিসংঘের নিকট চলিয়া যাইতে পারিত। দেখিতে হইবে ঐ অত্যাচার ও উৎপীড়ন কে করিতেছে। মুসলমানদিগের উপরে সমগ্র হিন্দুজাতি মিলিতভাবে কোন আক্রমণ করিতেছে না। সকল মুসলমানও ভারতবর্ষে উৎপীড়িত হইতেছে না। সাম্প্রদায়িক মারামারি যাহারা করে তাহারা অল্পসংখ্যক লোক ও আইনতঃ দণ্ডনীয়। অনেকে শাস্তি পাইয়াও থাকে। কোন সংখ্যা লঘু গোষ্ঠী থাকিলেই তাহাদের জন্য একটা করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে পৃথিবীতে বহু লক্ষ রাষ্ট্র গঠিত হইয়া যাইবে।

লটারীর মোহ

পূর্বকালে ভারতবর্ষে ও আরও অনেক দেশে লটারী খেলা আইন বিরুদ্ধ ছিল। যদি কখনও কোথাও লটারী করিতে দেওয়া হইত তাহা হইলে কোন বিশেষ অভাব দূর করাই তাহার উদ্দেশ্য হইত। যথা দুর্ভিক্ষ বা বন্যা-আক্রান্ত লোকেদের সাহায্য প্রভৃতি। ফ্রান্সে "প্রিমিয়াম বণ্ড" নামের ঋণ পত্র বিক্রয় বহু পুরাতন প্রতিষ্ঠান। আয়রল্যাণ্ডের "হসপিটাল সুইপষ্টেক"ও পুরাতনকাল হইতে চলিতেছে। আমাদের দেশে ডার্বির ঘোড়দৌড় লইয়াও কোথাও কোথাও লটারী খেলা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে যেভাবে সর্বত্র লটারীর ব্যবস্থা হইতেছে, পূর্বে সেরূপ ব্যাপকভাবে জুয়াখেলার আয়োজন কখন কেহ করে নাই বা করিতে দেয় নাই। ইহার কারণ এই যে জুয়া খেলিয়া অর্থ লাভ কোন উচ্চাকাঙ্খার কথা নহে। যাহারা এই অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে তাহাদের জীবন সুখময় হয় না। কারণ সহস্র সহস্র ব্যক্তির টাকাই পাইয়া দুই একজন মানুষ লাভবান হয়। একজনের মুখে লাভের আনন্দালোক প্রতিফলিত করিতে লক্ষ লোকের

[ে] অদরকার হইয়া যায়। এই ব্যবস্থা কখনও জাতীয় [স]াম্যবাদের উপলব্ধির সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইতে [প]ারে না।

শুনা যাইতেছে যে বহুস্থলেই বহু গরীব পরিবারের [ল]োকেরা লটারীর টিকেট ক্রয় করিবার জন্য মাসিক, [স]াপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকাদি ক্রয় বন্ধ করিতেছেন। [অ]নেকে সিনেমা দেখা অথবা জলযোগ করা ছাড়িয়া [ল]টারীর টিকেট ক্রয় করিতেছেন। কেহ কেহ স্কুলের [ফ]িজের টাকা দিয়া লটারীর টিকেট ক্রয় করিতেছেন। [জ]ুয়ার নেশা দেশকে পাইয়া বসিয়াছে। এবং ইহার মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত লটারী বা জুয়া খেলার ব্যবস্থা। ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

খাদ্যের উৎপাদন ও আমদানি

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর দফতর হইতে প্রকাশিত ১৯৬৯-৭০ সালের বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় যে ১৯৬৯তে খাদ্য পরিস্থিতি ভালই চলিয়াছে। কারণ ১৯৬৮-৬৯ এ খাদ্য উৎপাদন উত্তমই হইয়াছিল। এই বৎসর তাহার পূর্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় সমান সমান উৎপাদনই দেখা গিয়াছে। আগের বৎসর ৯৫-১ মিলিয়ন টন খাদ্য-বস্তু (দানা) উৎপাদিত হইয়াছিল এবং এই বৎসর হইয়াছিল ৯৩ মিঃ টন। দেশে ভিতর হইতে যে খাদ্য মন্ত্রীগারা খাদ্য সংগ্রহ কার্য্য করা হয় এই বৎসরে তাহার পরিমাণ হইয়াছিল ৬০ লক্ষ টন। আমদানি ঐ কারণে ৫৭ লক্ষ টন হইতে হ্রাস হইয়া ৩৯ লক্ষ টনে নামিয়া আসে ইহাতে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় তুলনামূলকভাবে অল্পই করিতে হয়।

১৯৬৯-৭০ সালে খাদ্য বস্তু উৎপাদন উত্তমই হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। যদিও কোথাও কোথাও বৃষ্টিপাত ভাল করিয়া হয় নাই তবুও উন্নততর বীজ সার ও চাষের নূতন ব্যবস্থার ফলে ফসল অধিকই হইবে বলিয়া মনে হয়। চাষের জমির পরিমাণও বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৯৬৪-৬৫ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ বৎসরের খাদ্য (চাল, গম ও অপরাপর শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য বস্তু) উৎপাদন সম্বন্ধীয় তথ্য নীচের সংখ্যা তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

মিলিয়ন টন

বৎসর	চাউল	গম	অপরদানা	মোটপরিমাণ	ডাল	মোট খাদ্যবস্তু
১৯৬৪-৬৫	৩৯.৩	১২.৩	২৫.৪	৭৭.০	১২.৪	৮৯.৪
১৯৬৫-৬৬	৩০.৭	১০.৪	২১.১	৬২.২	৯.৮	৭২.০
১৯৬৬-৬৭	৩০.৪	১১.৪	২৪.১	৬৫.৯	৮.৩	৭৪.২
১৯৬৭-৬৮	৩৭.৬	১৬.৫	২৮.৯	৮৩.০	১২.১	৯৫.১
১৯৬৮-৬৯	৩৯.৮	১৮.৭	২৫.১	৮৩.৬	১০.৪	৯৪.০

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে মানুষের কর্ম প্রচেষ্টা ও কৌশল। বিজ্ঞান ক্রমে অধিক করিয়া মানুষের সাহায্যে ব্যবহৃত হইতেছে। আরও উন্নতি হইবে আশা করা যায়।

"শিবাজী"

প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি হইতে।

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭০তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৭৭

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বৃটেনের নির্ব্বাচনে রক্ষণশীলদের জয়

বৃটেনে সম্প্রতি যে নির্ব্বাচন হইয়াছে তাহাতে শ্রমিকদলকে পরাজিত করিয়া রক্ষণশীলগণ জয়লাভ করিয়াছেন। ফলে বৃটেনের শ্রমিক দলনেতা হ্যারল্ড-উইলসন ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের প্রধান মন্ত্রীর গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছেন ও ঐ ঐতিহাসিক প্রাসাদ ভবনে রক্ষণশীল নেতা এডওয়ার্ড হীথ বৃটেনের নূতন প্রধান মন্ত্রীরূপে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রমিকদলের পরাজয় বৃটেনের নির্ব্বাচন বিশেষজ্ঞদিগকে একান্ত ভাবে বিস্মিত করিয়াছে। নির্ব্বাচনের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই সকল ভবিষ্যত বক্তাগণ নির্ব্বাচনে যে শ্রমিকদলের বিজয় স্থির নিশ্চয় একথা বারে বারে বলিয়াছেন। অন্ততঃ শতকরা বারজনের অধিক হিসাবে শ্রমিকদলের প্রার্থীগণ জয়লাভ করিবেন একথাও অনেকে বলিয়াছিলেন। যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংখ্যাধিক্যে শ্রমিকদলের প্রার্থীদিগের বিজয় হইবে মনে করিয়াছিলেন তাঁহাদের মত অনুসারে শতকরা অন্ততঃ দুইজন অধিক হারে শ্রমিকদলের প্রতিনিধি জয়লাভ করিবেন বলিয়া ভবিষ্যত বাণী করা হইয়াছিল। রক্ষণশীলদলের জয় হইতে পারে এমন কথা কেহই বলেন নাই। এই কারণে যখন রক্ষণশীলদিগের বিজয়ীর সংখ্যা অধিক হইয়াছে দেখা যাইল তখন সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন যে রাজনীতির ক্ষেত্রে সকল অসম্ভব ঘটনাই ঘটিতে পারে।

এডওয়ার্ড হীথ কিন্তু নির্ব্বাচন হইবে স্থির হইবার পর হইতেই পূর্ণ উদ্যমে নিজের প্রচার কার্য্য চালাইয়া চলিতে থাকেন। তিনি শ্রমিকদলের রাজ্যশাসন পন্থার মূল রীতি নীতি অনুসরণের ফলে ভবিষ্যতে বৃটেনের মহা ক্ষতি হইবে এই কথাই ক্রমাগত প্রচার করিতে থাকেন। এই ধরনের শাসন পন্থা অনুসরণ করিলে যে অদূর ভবিষ্যতে বৃটেনে একখানা রুটির মূল্য হইবে প্রায় তিন টাকা, একটা টেলিফোন করিতে লাগিবে এক টাকা ও সব খরচই ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া পাউণ্ডের ক্রয় ক্ষমতা নামিয়া ১০ শিলিং হইয়া দাঁড়াইবে এই কথাই এডওয়ার্ড হীথের প্রচারের মূলমন্ত্র ছিল। শ্রমিকদলের রাজ্য শাসন কার্য্য বেশ উত্তমরূপেই চলিতেছিল। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য, বেকার সংখ্যা হ্রাস বা অন্য যে কোন দিক দিয়াই বিচার করা সম্ভব তাহাতেই বৃটেনের অবস্থা ভালই ছিল দেখা যাইতেছিল। কিন্তু হীথের অপপ্রচার সকলের মনে দেশের ভবিষ্যত

অবস্থা সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছিল। জাতির বর্তমান পরিস্থিতি যেমনই হউক না কেন, শ্রমিকদলের শাসন নীতির ফল অদূর ভবিষ্যতে বিষময় হইবে এই বিশ্বাস লোক মনে প্রবল করিয়া তুলিয়া শ্রমিকদলের পরাজয় সাধিত করা হইল।

এখন শ্রমিকদলের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিগণ হইবেন সরকারের বিরুদ্ধ পক্ষ। অর্থাৎ নূতন রক্ষণশীল সরকার যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, শ্রমিকদলের নেতাগণ তাহার সমালোচনা করিবেন। সমালোচনার কার্য্যে এই দল চিরকালই বিশেষ পারদর্শী এবং এখন রক্ষণশীল দল- আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে, অর্থনীতিতে কিম্বা প্রগতি বিরুদ্ধতাতে যাহাই করিতে যাইবেন তাহারই প্রবল সমালোচনা হইবে। প্রথমতঃ আধুনিক যুগে রক্ষণশীলতা বিশেষ চলিতে পারে না। সমাজবাদ সমষ্টিবাদ ও তথাকথিত বামপন্থা প্রভৃতিই হইল আজ-কালকার উন্নতিশীল রাষ্ট্রনীতি। সকল দেশেই এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই রাষ্ট্রনীতিবিদরা চলিয়া থাকেন। সুতরাং রক্ষণশীলতার পুরাতন অর্থ আর নাই। এখন রক্ষণশীলরাই নূতন পথের পথিক। পূর্ব্বকালের মতন নীতিগত পার্থক্যের আজকাল রাষ্ট্রক্ষেত্রে আর স্থান নাই। সুতরাং এখনকার শ্রমিকদলের বাম পন্থা এবং রক্ষণশীলদিগের দক্ষিণ পন্থা প্রায় একই পন্থা। এই হিসাবে পার্থক্য আর নাই, আছে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এডওয়ার্ড হীথ কোন অভিজাত বংশের সন্তান নহেন। তাঁহার পিতা উচ্চস্তরের কারিগর শ্রেণীর লোক। তিনি অবশ্য শিক্ষায় ও চাল চলনে উচ্চশ্রেণীর লোক। তাহা যাহাই হউক হীথ বৃটেনে অভিজাত বংশীয়দিগের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিবার যে কোন চেষ্টাই করিবেন না, একথা সকলেই জানেন। তিনি পাউণ্ডের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াইতে পারিবেন কিনা অথবা রাজস্ব খাজনা মাশুল প্রভৃতির হার কমাইয়া সাধারণ মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থায় সক্ষম হইবেন কিনা এ সকল কথার উত্তর কার্য্যক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে পাওয়া যাইবে। বৃটেনের আমেরিকা প্রীতি, নাগরিকের অধিকার দান সম্বন্ধে বর্ণবিদ্বেষ, দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডিশিয়া প্রভৃতি শ্বেতকায় প্রভুত্ববাদী দেশগুলির সহিত সখ্যের সম্বন্ধ স্থাপন ইত্যাদি বহু প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়ে ও কর্ম্মে শ্রমিক দলের মন্ত্রীত্ব থাকিবার সময় হইতেই বৃটেনের রাষ্ট্রনীতি বামপন্থা অনুসরণে চালিত না। বর্ত্তমানে যাহা হইবে তাহাতে নূতন করিয়া কোন রক্ষণশীলতা অথবা কোন শ্রেণী বিশেষের সহায়তা সাধন চেষ্টা আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এখন অবধি যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে রাজস্ব আদায় পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতে থাকিবে। কোথাও কোন রাজকর আদায় কম করা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে কোন সাধারণভাবে বেতন বৃদ্ধির চেষ্টাও হইবে না বলিয়াই মনে হয়; কারণ তাহা হইলে মুদ্রার পরিমাণ স্ফীত হইবে এবং ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিবারণ সম্ভব হইবেনা। রুটির মূল্য হয়ত তিন টাকার অধিকই হইয়া দাঁড়াইবে এবং পাউণ্ডের ক্রয়শক্তি ১০ শিলিং-এরও নীচে নামিয়া যাইবে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি না ঘটিয়া যাইবে না এবং তাহার ফলে এক হইতে অপর গোষ্ঠীতে বেতন বাড়াইবার চেষ্টা সংক্রামক ব্যাধির মতই ছড়াইয়া পড়িবে।

আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ রক্ষা ও গঠন ক্ষেত্রে কোনও মহা পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়াও মনে হয় না। শ্রমিক নেতাগণ যেভাবে বুর্জ্জোয়া এবং সমাজবাদী জাতি উভয় দলের সহিতই বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন; রক্ষণশীল নেতাগণও তাহাই করিতে থাকিবেন বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ এই যে আমেরিকাও বর্ত্তমানে কোনও শত্রুতা বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছেন না। রুশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশও শান্তি রক্ষা করিয়াই চলিতে চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য মিশর-ইসরায়েল এবং কাম্বোডিয়া বিপদজনক সম্ভাবনা উর্ব্বর ক্ষেত্র হিসাবে উপস্থিত রহিয়াছে।

সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন ও আয়োজন

ইংরেজ শাসনের অবসান হইবার পর যখন কংগ্রেসী রাজত্ব আরম্ভ হইল তখন সকলে ভাবিয়াছিলেন অতঃপর নানাদিকে নূতন ব্যবস্থা দেখা যাইবে ও মানুষ পূর্বের তুলনায় অধিক সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইতে সক্ষম হইবে। কিন্তু দেখা যাইল যে সে আশা ফলবতী হইল না। মানুষের অভাব বাড়িয়াই চলিল; মূল্যবৃদ্ধি এমন প্রবল হইল যে পূর্বের তুলনায় জীবন যাত্রার ব্যয় বহুগুণ বাড়িয়া গেল, কালোবাজার প্রকটভাবে খোলা বাজারকে দ্রব্য সরবরাহহীন করিয়া তুলিল এবং ভেজাল ও পচা মাল ব্যতীত সরেস মাল বাজার হইতে অদৃশ্য হইল। সকল কার্যে বিলম্ব, সুপারিশ ব্যতীত কোন কিছুই না পাওয়া, আইন ও নিয়ম বিরুদ্ধতার বিস্তার, উৎকোচ দেওয়া নেওয়ার প্রাদুর্ভাব; শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অন্যায় দুর্নীতি ও অবনতির সহায়ক কার্য পদ্ধতি পরিচালনা প্রভৃতি সমাজ-বিরুদ্ধতার প্রসার ক্রমাগত বাড়িয়া চলাই সর্বত্র দেখা যাইতে লাগিল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাহারা বৃটেনের সহিত দ্বন্দ্বের সময় ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের চূড়ান্ত করিয়াছিলেন তাঁহারাই ব্যক্তিগত ও দলগত সুবিধা ও লাভের জন্য সমাজের মঙ্গল ও উন্নতির কথা অবহেলা করিয়া স্বার্থপরতার শেষ সীমা অতিক্রম করিয়া সকল পাপ কার্যকেই নিজেদের রাষ্ট্রাধিকারের অঙ্গ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। নির্লজ্জতা, প্রবঞ্চনা, নিজেদের লোক ঢুকাইয়া নানাক্ষেত্রে নানা-ভাবে লাভ করা এবং যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা না দিয়া অপরকে পাওয়াইয়া দেওয়া ইত্যাদিই সকল স্থলে রীতি হইয়া দাঁড়াইল। ফলে দেশের মানুষের জীবন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির দ্বারা উন্নত ও সুখের না হইয়া ক্রমে ক্রমে মহা কষ্টের, অপমানের ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। কংগ্রেসী শাসকদিগের শুধু স্বার্থপরতা দোষই যে ছিল তাহা নহে, তাহারা নিজ প্রদেশের লোকেদের সুবিধা ও ন্যায্য পাওনা অন্য প্রদেশের শোষকদিগের হস্তে তুলিয়া দিয়া অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেসী নেতাদিগকে তুষ্ট করিয়া নিজেদের নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা জোরাল করিবার ব্যবস্থা করিতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই সকল কারণে নানান প্রদেশে কংগ্রেস বিরুদ্ধতা ক্রমশঃ বাড়িতে আরম্ভ করিল। বাংলা দেশে এই বিরুদ্ধতা আরও প্রবল ভাবে দেখা দিল এই কারণে যে বাংলার অর্থনৈতিক সুখ সুবিধা স্বদেশী আন্দোলন ও পরে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে বৃটিশ শাসকদিগের দ্বারা নানাভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কংগ্রেস যখন ভারত বিভাগ মানিয়া লইয়া বৃটিশের নিকট হইতে খণ্ডিত ভারতের শাসনভার লইয়া শাসন কার্যে নিযুক্ত হইল তখন বাংলার প্রতি যে সকল অন্যায় করা হইয়াছিল সেই সকল অন্যায়ের কোনও প্রতিবিধান কংগ্রেস করিল না। এবং বাংলার কংগ্রেসী নেতাগণ সেই সকল অন্যায় চিরস্থায়ী হইতেছে দেখিয়াও মুখ বুজিয়া অবাঙ্গালী কংগ্রেসী নেতাদিগের অন্যায়ের সমর্থন করিয়া চলিতে থাকিলেন। বাংলা দেশে বহু রাষ্ট্রীয় দল গঠিত হওয়াতে বাঙ্গালীর একতাতে ঘা লাগিয়াছিল ও বাঙ্গালী মিলিত ভাবে কোন একটা স্থির নিশ্চিত পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে নাই; এখনও পারিতেছে না। ১৯৬৭ খ্রীঃ অব্দের নির্বাচনের পরে কংগ্রেসের একাধিপত্যের অবসান ঘটিল। কিন্তু অন্য কোন রাষ্ট্রীয় দলের একক বা মিলিত শক্তি এমন ভাবে গড়িয়া উঠিল না যাহাতে স্থায়ীভাবে কংগ্রেস বিরোধী কোন মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করা সম্ভব হইতে পারে। নানা দলে বিভক্ত, অনভিজ্ঞ, চিন্তাক্ষেত্রে অভিনব কল্পনা বিলাসি, বিদেশীর ষড়যন্ত্র সমর্থক, নানা গোষ্ঠীর সাহায্য পুষ্ট বিভিন্ন প্ররোচকদিগের মতলববাজী মুগ্ধ অপরিণত বুদ্ধি রাষ্ট্রকর্মোন্মাদনা আক্রান্ত উৎসাহিত ব্যক্তি সংঘ অথবা সম্প্রদায়-শ্রেণী-পেশা বা অপর বৈশিষ্ট্যগত স্বভাব হেতু বিভক্ত ব্যক্তি সকল রাষ্ট্রীয় দলের উপর দল গঠন করিয়া দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। পরে এই সকল দল মিলিত হইয়া ও শাসনভার করায়ত্ত

মন্ত্রীত্ব গঠন করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা আরম্ভ করিলে অতি শীঘ্রই তাহাদিগের ভিতর পারস্পরিক কলহ বিবাদ শুরু হইল। মতদ্বৈধ, আদর্শভেদ, স্বদেশ ও বিদেশের প্ররোচকদিগের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি নানা কারণে মন্ত্রীমণ্ডলীর মিলিত ভাবে শাসন পরিচালনা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এবং শীঘ্র শীঘ্রই ঐ বহু দলগত শাসন পদ্ধতি অচল প্রমাণ হইল।

দেশবাসী, বিশেষ করিয়া যাহারা অল্পবয়স্ক ও নিজেদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে নৈরাশ্যাক্রান্ত, এই অবস্থায় ভাবিতে আরম্ভ করিলেন, কোন পথে চলিলে এই বিপন্ন অবস্থা হইতে বাহির হওয়া সম্ভব হইবে। কেহ কেহ এই অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বহুদূরে গিয়া পড়িলেন। সমাজ গঠনের প্রারম্ভকাল হইতে সামাজিক রীতি নীতির ব্যাধি ও দোষ, ঐতিহাসিক অবস্থা বিচার করিয়া কি ভাবে কি হইল স্থির করা, আধুনিক কালের নেতৃত্বের, শিক্ষা পদ্ধতির, ধর্মের, দর্শনের আচারবিচারের বিশ্লেষণ করিয়া দেশের লোকের রাষ্ট্রীয় আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা কি ভাবে কতদূর ক্ষতিগ্রস্থ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা ইত্যাদি বহু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করিয়া নূতন সমাজ কি করিয়া গড়িয়া তোলা যায় ও ভবিষ্যতে অন্যায় অবিচার অপসৃত করিয়া স্থায়ীভাবে ন্যায় ও সুনীতির প্রতিষ্ঠা কি করিয়া হইতে পারে তাহা স্থির করার জন্য অনেকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কেহ কেহ অনতিবিলম্বে নূতন সমাজ গড়িয়া ফেলিবার আগ্রহে পুরাতন যাহা ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভাঙ্গার তালিকার মধ্যে পড়িল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষ্টি ও শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি এবং অনেক সংস্কার প্রার্থী দল বাঁধিয়া বিস্ফোরক ব্যবহারে পুরাতনকে নির্ম্মূল করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে আগুয়ান হইলেন। বিষয়টা জটিল ও বিপদজনক সম্ভাবনার আকর হইলেও মানিতে হইবে যে পুরাতন সমাজের বহুদোষ আছে ও তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। বিস্ফোরক ও অগ্নি ব্যবহার করিয়া সে পরিবর্ত্তন আনয়ন সহজ হইবে কি না তাহা চিন্তা করিবার কথা। তবে আরও শান্তিপূর্ণভাবে সমাজ সংস্কার গঠন বা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, ইহাও মানিতে হইবে। সুতরাং উদ্দেশ্য শুভ ও আবশ্যকীয় হইলেও পন্থা বিপদজনক ও ক্ষতিকর হইতেছে বলিয়া অপর পন্থা অবলম্বন করিবার কথা চিন্তা করা আবশ্যক। বিস্ফোরক, অগ্নি, প্রভৃতি ব্যবহার সম্বন্ধে আপত্তি আছে বলিয়া সংস্কার, গঠন ও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই বলা যাইতে পারে না। এই দেশের মানুষ যদি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে না পারে; যদি তাহাদিগের উপার্জ্জন ও কর্ম্ম শক্তির পূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তন করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। সুতরাং বিষয়টা সম্যকরূপে বুঝিয়া সকল অন্যায়ের প্রতিকার ও অভাব দূরীকরণ ব্যবস্থা করা আবশ্যক—এবং শীঘ্রই আবশ্যক।

ছয়পার্টির আটপার্টির দাঙ্গাহাঙ্গামা

বাংলা দেশের জনসাধারণ রাষ্ট্রক্ষেত্রে কি চায়? সাধারণ মানুষ চায় শান্তিপূর্ণভাবে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে। অর্থাৎ উপযুক্ত উপার্জ্জনের ব্যবস্থা, যথেষ্ট খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান ঔষধ চিকিৎসার আয়োজন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক, আমোদ আহ্লাদের সুযোগ এবং সামাজিক ভাবে ভারতে ও জগতে একটি সম্মানের আসন এবং উচ্চস্তরে ঘোরাফেরার অধিকার। সাধারণ মানুষ ১৮৪৮খ্রীঅব্দের কোন মহাপুরুষের কোন উক্তির কি অর্থ অথবা এখনকার মহাপুরুষদিগের বাক্য বাণী অথবা ব্যবহারের বিশ্লেষণ লইয়া মস্তক ঘর্মাক্ত করেনা। ন্যায়ের কচকচি কিম্বা অন্যায়ের সাফাই লইয়াও তাহারা ব্যস্ত নহে। যাহারা দার্শনিক তত্ত্ব ও উচ্চাঙ্গের তথ্য বিচারে আনন্দ পায় তাহারা মিছিল বাহির করিয়া কিংবা বিরাট জনতা জড় করিয়া সেইরূপ মানসিক কসরত করিতে চাহে না। বিচার বিশ্লেষণ আলোচনা প্রভৃতি হাতে গোনা অল্প সংখ্যক

লোকেই করিতে পারে এবং তাহা লইয়া ব্যাপক প্রচার ও প্রবল আন্দোলন করা যায় না। কিন্তু বাংলা দেশে দেখা যাইতেছে যে সকল অসম্ভবই সম্ভব হইতেছে এবং দলবদ্ধ জনতা "তৈলাধার পাত্র" না "পাত্রাধার তৈল" বলিয়া চিৎকার করিয়া সভাস্থল মুখর করিয়া তুলিতেছে। যাহারা বলে তৈলাধার পাত্র তাহারা সংখ্যায় অধিক না যাহারা পাত্রাধার তৈল বলে তাহারাই দলে ভারি? এই কথার উত্তর সদা পরিবর্ত্তনশীল। কেননা দল বদলান একটি রোজকার অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন কারণ না থাকিলেও শুধু অকারণ পুলকে মুখ বদলাইবার জন্যই কাল যাহা অস্বীকার করা হইয়াছে আজ তাহাই উচ্চরবে উচ্চারণ করিয়া চিত্তশুদ্ধি করা আবশ্যক হইতেছে। যাহারা নৈয়ায়িক তাহারা বাজারে গিয়া সর্ব্বসাধারণের সমর্থন সন্ধানে ইতঃস্তত ভ্রাম্যমান হয় না; কিন্তু বর্ত্তমানকালে দেখা যাইতেছে যে সংখ্যা গুরুত্বের মূল্য দিয়াই সকল মূল্য বিচার করা হইতেছে। সুতরাং সকল কথাই শেষ পর্য্যন্ত কত লোক কি বলিতেছে সেই অনুসারে বিচার করা হইতেছে এবং পণ্ডিতজন ব্যাখ্যেয়তার অনুসরণ না করিয়া লোকবল দৃষ্টি করিয়া নিজমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতেই তৎপরতা দেখাইতেছেন। ফলে হইয়াছে যতমত তত দল এবং প্রত্যেক দলের মত নিজ নিজ গৎ বা "স্লোগান" সুরে বেসুরে গাহিয়া মিছিলে ও সভাস্থলে প্রচার করা হয়। সুতরাং কোন মতেরই প্রকাশ ও প্রচার নিনাদ ও গর্জ্জন বর্জ্জন করিয়া নিস্তব্ধ নীরবভাবে হইতে পারেনা। আন্দোলন ও আলোড়ন কখনও নির্দলীয় আভিজাত্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারেনা। দল গঠন ও শত শত কণ্ঠজাত নির্ঘোষ এখনকার মতবাদের শ্রেষ্ট পরিচয়। ভাড়া করিয়া হউক অথবা লোভ দেখাইয়াই হউক বহু লোক একত্র না করিলে রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিচরণ সম্ভব হয় না এই কারণে বাংলা দেশে আজ অনেক দল গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের যে ঠিক কি বলিবার আছে তাহা সকলের পক্ষে বুঝিতে পারা সম্ভব নহে। কিন্তু পৃথক পৃথক দল যখন আছে তখন মতের অনৈক্যও আছে ধরিয়া লওয়া যায়। অনৈক্য অতি প্রবল হইলেও অনেক সময় দেখা যাইতেছে যে বহু দল মিলিত হইয়া এক একটি মহাদলের সৃষ্টি হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ দলের মিলনের ফলে এক মহাদল গঠিত হইয়া বাংলার শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু অধিকার অনধিকার ও শাসন কার্য্যের ভাগবাট লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয় ও মহাদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তাহার পরে এখন ক্ষুদ্রতর মহাদল গঠন চেষ্টা চলিয়াছে এবং সেই সকল নব গঠিত দলগোষ্ঠী বাংলার শাসন ভার পাইতে পারে কি না তাহা বিচার করা হইতেছে। এই সকল চেষ্টার ফলে দুইটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। একটি ছয়দলের ও অপরটি আট দলের। বিধান সভায় কোন গোষ্ঠীর কয়জন সমর্থক আছে তাহা এখনও পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে পূর্ব্বে যে প্রতিনিধি যে দলের সমর্থক ছিলেন বর্ত্তমানে তিনি সেই দলে আর না থাকিতে পারেন। দল বদলান পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে ও থাকিবে। ইহা ব্যতীত কোন প্রকার রাজ্যভার প্রাপ্তির সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে দরাদরি ক্রয় বিক্রয় প্রলোভনের জাল ফেলা আরম্ভ হইয়া যায়। তাহার ফলে দল বদল কিছু কিছু হইবেই এবং প্রথমত হিসাবে যাহা দাঁড়াইতে পরে সে অবস্থা আর না থাকাই সম্ভব। এই কারণে ছয়দল আট দল যে সংখ্যাগুরুত্ব দাবি করিবে সে দাবি পরে প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভব না হইতেও পারে। এই অবস্থায় বিষয়টি হাল্কাভাবে দেখিয়া নূতন দলগোষ্ঠীর হস্তে রাজ্যভার দেওয়া সেই ব্যবস্থার স্থায়িত্বের দিক দিয়া সুবিচারের কথা নাও হইতে পারে। ১৯৭২ খ্রীঃ অব্দের নির্ব্বাচন হইলে পর অবস্থা কি দাঁড়াইবে কেহ তাহা এখন বলিতে পারে না। একটি নূতন নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করিলে যদি দলগুলির সমর্থক সংখ্যা বিধান সভায় প্রায় একই থাকিয়া যায় তাহা হইলে নূতন নির্ব্বাচন করিয়া কোন লাভ হইবে না। এ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা এখনকার মত অপরিবর্ত্তিত রাখাই সুবিবেচনার কথা।

বাংলার রাজ্যপালের কথা

বাংলার রাজ্যপাল শ্রী ধাওয়ানকে লইয়া নানা প্রকার সমালোচনা চলিতেছে। তিনি নাকি নিরপেক্ষ নহেন। কম্যুনিষ্টদিগের প্রতি নাকি তাঁহার সহানুভূতি বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান আছে এবং সেই কম্যুনিষ্টগণ নাকি শ্রী জ্যোতিবসুর অনুসরণকারী বাম পন্থী (মাওবাদী ?) মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট। অবশ্য কম্যুনিষ্টদিগের মধ্যে কে কোন মতবাদী তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। পূর্ব্বে জ্যোতিবসু মহাশয় চীনের সহিত গভীর সখ্যতার বন্ধনে বাঁধা ছিলেন। পরে চীন ভারত আক্রমণ করিলে পরে তিনি অন্তত কথায় চীনের অনুশাসন মানিয়া চলা ত্যাগ করিয়া মার্কসবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রী ধাওয়ান বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি যদি কম্যুনিষ্ট মত সমর্থন করেন তাহা হইলে তিনি সকল কথা বিচার করিয়াই তাহা করিবেন। অবশ্য দিল্লীর নির্দ্দেশেও ঐ সমর্থন ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকিতে পারে। শ্রী ধাওয়ান সম্বন্ধে আরও অভিযোগ শুনা গিয়াছে। তিনি কলিকাতার আইনজীবিদিগের সম্বন্ধে নাকি অশ্রদ্ধাজ্ঞাপক কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। ডাক্তারগণ যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান, তিনি নাকি তাঁহাদের সহিত দেখাও করেন নাই ও তাঁহাদিগকে সারা রাত্রি রাস্তায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়াও সে সম্বন্ধে কোন কিছুই করেন নাই। সাধারণ ভাবে সকলেই বলেন যে শ্রী ধাওয়ান রাষ্ট্রপতির শাসন কার্য্য জোরাল ভাবে করিতেছেন না। বাংলার যে অরাজক অবস্থা তাহা শ্রী ধাওয়ানের অবহেলার ফলে যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া গিয়াছে। উপরন্তু তথাকথিত নকশালবাদী-দিগের প্রবল সমাজ বিরুদ্ধতা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার একটা কারণ যে শ্রী ধাওয়ান নাকি বামপন্থী রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে কার্য্য ক্ষেত্রে বহু সংখ্যায় মোতায়েন রাখিয়াছেনও আরও উচ্চ উচ্চ পদে কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী-দিগের নিযুক্ত করিতেছেন। এই সকল অভিযোগের সত্যতা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন হইতেছে না, এই কারণে যে শ্রী ধাওয়ান শাসন কার্য্যে বিশেষ সক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই এবং সেই জন্যই তাঁহাকে দিল্লীতে ফেরত পাঠানো কোন অন্যায় করা হইবে না। অবশ্য শ্রীমতী ইন্দিরার যদি কোন বিশেষ মতলবে শ্রী ধাওয়ান বাংলায় প্রেরিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে সেই মতলব হাসিল না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি বাংলায় থাকিবেন বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ বলেন যে শ্রীমতী ইন্দিরা শ্রী জ্যোতি বসুর অনুরোধে শ্রীধাওয়ানকে বাংলা দেশে পাঠাইয়াছিলেন। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বর্ত্তমানে শ্রী জ্যোতি বসুকে খুসী করিবার প্রয়োজন আর পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যকরী ভাবে উপস্থিত নাই। যদি আবার নির্ব্বাচন হয় ও শ্রী জ্যোতি বসুর সমর্থকগণ আরও অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হ'ন তাহা হইলে শ্রীমতী ইন্দিরার শ্রী বসুর সাহায্য আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু সেই রূপ ঘটিলে শুধু শ্রীধাওয়ানকে বাংলা দেশে পাঠাইলেই শ্রীজ্যোতি বসু শ্রীমতী ইন্দিরাকে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিবেন না। আরও অনেক কিছু নেওয়া-দেওয়ার কথা উঠিবে এবং সকল বিষয় উভয় পক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী হইলে তবেই সেই জাতীয় গুপ্ত বা প্রকাশ্য চুক্তি সক্রিয় ভাবে প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং শ্রীধাওয়ানকে বাংলা দেশে রাখিয়া অরাজকতার পরমায়ু বৃদ্ধি করিবার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। এবং তাঁহাকে এদেশ হইতে অন্যত্র পাঠাইলে সকলের মঙ্গল হইতে পারে। এমন কাহাকেও এদেশে আনা উচিত যিনি সকলের বিভিন্ন অভিযোগ পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া লইয়া শীঘ্র শীঘ্র বিচার ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং একবার নীতি অনুযায়ী ভাবে সুবিচার সম্পন্ন হইয়া যাইলে পরে কাহাকেও আর হাল্লা হাঙ্গামা করিয়া নিজেদের ও অপরের সময় নষ্ট করিতে দেওয়া হইবে না; ইহাই শাসন কার্য্যের মূল মন্ত্র ও অবশ্য পালনীয় রীতি ও পদ্ধতি বলিয়া ধার্য্য করা হইবে। শাসন কার্য্যের সফলতা রীতি নীতির বাধ্যতামূলক প্রতি পালনের উপর নির্ভর করে। শাসক রীতিনীতি পদ্ধতি মানিয়া চলিবেন ও সকলকে মানিয়া চলিতে বাধ্য করিবেন।

পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ

রুশিয়া, আমেরিকা, চীন ও অপর কোন কোন জাতি পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ করিতেছে; যদিও চীন ব্যতিত অপর জাতিগুলি বিশ্বশান্তির পৌরহিত্য কার্য্যে সদা অগ্রগামী। অবশ্য রুশিয়া ও আমেরিকা প্রয়োজন বোধ করিলেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বিলম্ব করে না। এবং প্রায়ই তাহারা যুদ্ধে লিপ্ত থাকে দেখা যায়। পাকিস্থান বিশ্বরাষ্ট্র জগতে ভাড়ার গাড়ীর মতই চলে। যে যখন ভাড়া দিয়া পাকিস্থানকে নিজ মতলবের জন্য নিযুক্ত করিতে চাহে, পাকিস্থান সাময়িক-ভাবে তাহারই ভৃত্য সাজিয়া এখান ওখানে তাহার কার্য্যভার বহন করিয়া ঘোরাফেরা করে, এবং পরক্ষণেই পুনরায় বিরুদ্ধ পক্ষের ভাড়াতে উল্টোপথে চলিতে আরম্ভ করে। এই ভাবে চীন, রুশিয়া ও আমেরিকা পরস্পর বিরোধী হইলেও কাহারও পক্ষে পাকিস্থানকে ভাড়ায় নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে কোন অসুবিধা হয় না। চীন পাকিস্থানকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আকসাই চীনের ও অন্যান্য পথঘাট ও ঘাঁটি নির্ম্মাণের জমি আদায় করিয়া লইয়াছে। জমিগুলি অবশ্য ভারতের নিকট হইতে লুঠ করা জমি। কিন্তু পাকিস্থান বা চীনের তাহাতে কোন অসুবিধা হয় নাই কারণ পরদ্রব্য নিজের মনে করা ঐ দুই দেশেরই চিরকালের অভ্যাস। চীনের তিব্বত দখল বা পাকিস্থানের ভারতের কোন প্রদেশের এলাকায় অনুপ্রবেশ প্রায় একজাতীয় অপকর্ম্ম। আমেরিকা পাকিস্থানের কোথায় কোথায় ঘাঁটি বাঁধিয়াছে তাহার পূর্ণ হিসাব বাহিরের লোকে জানে না। তবে যদি কখনও আমেরিকার সহিত রুশিয়ার সংঘাত লাগে তাহা হইলে তখন দেখা যাইবে পাকিস্থানের নানান কেন্দ্র হইতে আমেরিকার বিমান ও রকেট রুশিয়ার দিকে ধাবমান হইতেছে। রুশিয়ার সহিত যদি চীনের সংঘর্ষণ হয় তাহা হইলে পাকিস্থান হয়ত কোন অজুহাতে চীনের সৈন্য চলাচলে বাধা দিয়া রুশিয়াকে সাহায্য দান করিবে। আরব সাগরে রুশিয়া ও আমেরিকা যুদ্ধ জাহাজ (ডুবুরী ও ভাসমান) চালাইলে তাহার আশ্রয়ের জন্য পাকিস্থানের বন্দরগুলি যদি খোলা থাকে তাহারও একটা মূল্য আছে। এই সকল কারণে আমেরিকা ও রুশিয়া যে পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য দান করিতে অগ্রসর হইবে তাহাতে কাহারও আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকে না। ইংলণ্ড ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইতালি প্রভৃতি দেশ শুধু ব্যবসা দেখিয়াই চলে। এই সকল দেশ যে পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ করিবে তাহার উদ্দেশ্য ব্যবসাদারী। ইংলণ্ডের কিছু পুরাতন কূটনৈতিক মতলববাজীও আছে। তাহার উদ্দেশ্য হইল নানান দরবারে ঢুকিয়া সুবিধার অন্বেষণ। কোথায় কবে কি সুবিধা আসিবে তাহা পূর্ব্ব হইতে কেহ বলিতে পারে না।

অস্ত্র সরবরাহ কেন করা হয় তাহা বুঝিলেও তাহার ফল কি হইতে পারে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায় না। পাকিস্থান ইতিপূর্ব্বে সতের আঠার বৎসরের মধ্যে দুইবার কাশ্মীর ও একবার কচ্ছ দেশ আক্রমণ করিয়াছে। এই সকল যুদ্ধে পাকিস্থান জয়লাভ করিতে পারে নাই। ভারত সম্মিলিত জাতিসংঘের কথায় পাকিস্থানকে যথাযথ শিক্ষা ও শাস্তি না দিয়াই বাঁচিয়া যাইতে দেয়। ইহাও জাতি সংঘের পক্ষপাত দোষের প্রমাণ। পাকিস্থান যদি আরও কয়েকবার ভারত আক্রমণ করে তাহা হইলেও পাকিস্থানকে যথাস্থানে পাঠান ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হইবে না। কারণ ঐ কৃত্রিম উপায়ে গঠিত রাষ্ট্রটি জাতি সংঘের কৃপায় যত দোষই করুক নাকেন যেন-তেন প্রকারে বিনা শাস্তিতে পার পাইয়া যাইবে। ভারত অকারণে খণ্ডবিখণ্ড হইয়াছিল বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার অপরাধে। এখন ভারত আন্তর্জ্জাতিক কূটনীতির লক্ষ্য-ভেদের নিশানা এবং বিনা আপত্তিতে সেই স্থলে থাকিতে প্রস্তুত হইলে রুশিয়া ও আমেরিকার বদান্যতার ছিটেফোটা ভারতের কপালে জুটিয়া যাইতেও পারে। অবশ্য এ সকল ভিতরের গোপন কথা প্রকাশ্য আলোচনার বিষয় নহে।

ঐতিহ্যের গৌরব ও মহিমা নিশ্চিহ্নকরণ

প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টি জগতকে যাহা দিয়াছে তাহা আদরের সহিত রক্ষা করিলে একথা প্রমাণ হয় না যে পুরাকালের মহারথীদিগের সকল কার্য্য মতামত ও মতলবের আমরা সমর্থন করিতেছি। যে ঘটনা অথবা মানুষ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ আকর্ষণ নাই তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট পুস্তক চিত্র, স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, সুর, সঙ্গীত প্রভৃতি আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিব এমন কোন আদর্শ রীতি প্রবর্ত্তন করিবার কথা কেহ বলিবে না; কারণ, এমন কি দোষাবহ বিষয় বস্তু ও

আচরণের প্রতীক যাহা তাহাও অনেক স্থলেই কৃষ্টি ও শিল্পের নিদর্শন হিসাবে বহু মূল্যবান হইতে পারে ও সেইজন্য ঐ সকল বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ সকল জাতির অতি আধুনিক মহাপ্রগতিশীল ব্যক্তিদেরও করা কর্তব্য। অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহানুভূতি নাই এবং মোগল আভিজাত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা আছে বলিয়া তাজমহলটিকে বোমা দিয়া উড়াইয়া দিবার কথা যদি কেহ ভাবে তাহা হইলে তাহাকে উম্মাদ সাব্যস্ত করিতে হইবে। পরস্ত্রী অপহরণ অথবা পরদেশ লুন্ঠন আক্রমণ অন্যায় বলিয়া হোমারের মহাকাব্য ইলিয়ড ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে এমন কথা কে বলিবে? বহু চিত্র ও মূর্ত্তি আছে যাহাতে সাম্রাজ্যবাদী, সুদখোর, হত্যাকারী ও অপরাপর নীচ ও হীণচরিত্র ব্যক্তিদিগকে দেখা যায়। অনেক দেবদেবীর চিত্র ও মূর্ত্তি আছে যাহা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসকদিগের নিকটে পূজনীয় নহে। কিন্তু তাই বলিয়া শত শত অতি উৎকৃষ্ট চিত্র ও মূর্ত্তি কি কেহ নষ্ট করিয়া ফেলিবে? পুরাতন শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত। বিজ্ঞান তখনও গড়িয়া উঠে নাই। অনেক কিছুই তখন সত্য বলিয়া চিন্তিত হইত যাহা পরে অসত্য প্রমান হইয়াছে। কিন্তু সত্যের অনুসন্ধিৎসার অভিব্যক্তি কখনও প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতীকগুলি ধ্বংস করিয়া সাধিত হইতে পারে না। পুরাতনকে পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া তাহার উপরেই নূতনকে গড়িয়া তুলিতে হয়। পুরাতনকে উচ্ছেদ করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইলে নূতনের অবস্থা হয় ভিত্তিহীন ও টলমলে। ল্যাটিন ও সংস্কৃত না থাকিলে আধুনিক বহু ভাষারই শিকড় কাটিয়া যাইত। রাগ রাগিনীর রূপ-ধ্যান সর্ব্বদাই অলীক বলা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষনে মানব মনের সকল আবেগই ভ্রান্ত ও বর্জ্জনীয় অনুভূতিতে সন্নিবিষ্ট বলিয়া প্রমান করা যাইতে পারে। এই ভাবে দেখিলে আধুনিকতার আবেগ ও আগ্রহও কোন চরিত্রহীনতা লব্ধ দুষ্ট রস অনুভূতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে দেখান যাইতে পারে। পুরাতনের গৌরব ও মাহাত্ম্য শুধু নিজ বিশ্বাসের মাপকাঠি দিয়া মাপিয়া বিচার করিলে অনেক সময়ই সেই মহান ঐতিহ্য ম্লান ও জ্যোতিহীন প্রতীয়মান হয়। মুসলমান ধর্ম্ম যখন প্রচারিত হয় ও যখন নূতন ধর্ম্মের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ জনগণ দিকে দিকে সেই নূতন বার্ত্তা বহন করিয়া ধাবমান হইল তখন তাহারা নূতনের প্রতিষ্ঠার জন্য পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছিল। তাহাদের সেই ভ্রান্ত আগ্রহের তাড়নায় আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। ভারতের বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দাও ধ্বংসিত হয়। সেই সময়ে সহস্র সহস্র মন্দির মূর্ত্তি ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যের নিদর্শন চিরতরে বিলুপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ সন্তান কালাপাহাড়ের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের ফলে তিনি যে ভাবে পুরাতনের বিনাশ সাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন তাহাও এই ব্যাধিগ্রস্থ মনোভাবের একটা চূড়ান্ত উদাহরণ। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে এই শিক্ষাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আহরণ করেন যে সকল ভুল ভ্রান্তির ভিতরে মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মের উৎস স্ফুরিত হয় বলিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হয় না। বীজের মধ্যে বৃক্ষের আকৃতির প্রকাশ হয় নাই বলিয়া তাহার ভিতরে বৃক্ষের উদ্ভব সম্ভাবনা নাই কে বলিবে? সত্য শিব ও সুন্দর তেমনি বহু সময়ে অর্দ্ধস্ফুট ও অব্যক্তভাবে উপস্থিত থাকিতে পারে। যাহা বোধগম্য নহে তাহা নাই কে বলিবে? সুতরাং ইহা নাই, উহা ভুল তাহা অর্থহীন বলিয়া চিৎকার করার কোন মূল্য নাই।

পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতির যাহারা পূর্ব্বযুগের সেবক তাঁহাদের বিশ্বাস এখন হয়ত ভুল প্রমান হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিক হইতে ঐ সকল ভুল বিশ্বাস মহা মূল্যবান ও তাহার চর্চ্চা করা অনাবশ্যক নহে। মানব সভ্যতা জ্ঞান ও প্রগতির শেষকথা এখনও উচ্চারিত হয় নাই। আজ যাহা সত্য মনে হইতেছে কাল তাহা নূতন আবিষ্কারের ফলে মূল্যহীন হইয়া দেখা দিবে। বর্ত্তমানের মানব ধর্ম্ম সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ রূপ ধারণ করিবে। কিন্তু যুগে যুগে সেই ধর্ম্মই আদৃত হইবে বলিয়া তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করা চলিতে পারে না। এ কথা ঠিক যে অতীতকে অবলম্বন করিয়া চলিলে জীবন যাত্রার পূর্ণ খোরাক তাহা হইতে আহরণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু একথাও স্থির নিশ্চয় সত্য যে অতীতকে উড়াইয়া দিয়া শুধু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত ধরিয়া চলা যায় না। কারণ বর্ত্তমান ক্রমাগতই অতীতে বিলীন হইয়া যায় ও ভবিষ্যত উপলব্ধির বাহিরে থাকে। অতীতই সভ্যতার একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় অবলম্বন যাহার সহিত যোগ সূত্রের বন্ধন অটুট রাখিয়া বর্ত্তমানের মানুষ ভবিষ্যতের অজানার দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

নেশন ও সাম্রাজ্যঃ প্রকৃত ও রাজনৈতিক ঐক্য

সমর বসু

[শ্রীঅরবিন্দের The Ideal of Human Unity অবলম্বনে]

[So long as the humanity is not full grown, so long as it needs to grow and is capable of a greater perfectibility, there can be no static good of all independent of the growth of the individuals comprising the all. Sri Aurobindo]

কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকেই শুরু হয়েছে মানুষের গোষ্ঠীজীবন। ক্রমবিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে হতে গোষ্ঠীজীবনও ক্রমশঃ প্রসারিত হয়েছে। মানুষ আর এখন তার ছোট্ট পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ নেই। কুল, বংশও উপজাতির বেড়া ভেঙে ফেলে সে গড়ে তুলেছে 'Nation', এই 'নেশন্'ই এখন তার গোষ্ঠীগত পরিচয়। কিন্তু এই 'নেশন' এর সীমার মধ্যেও সে আবদ্ধ থাকতে চায়না, সে চায় এমন একটি স্বর্গরাজ্য যেখানে বিশ্বজনীন্ মানুষ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। টুক্‌রো টুক্‌রো 'নেশনের' সীমায় আবদ্ধ মানুষের তাই প্রার্থনা :

"Where the mind is without fear
and the head is held high,
Where knowledge is free ;............
Where the world has not been broken up
Into fragments by narrow domestic walls,
Into that haven of freedom my father :
Let my country awake."—Rabindranath.

কিন্তু কেমন করে বিশ্বমানব-ঐক্যের এই বিরাট আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়? কেমন করে সমগ্র মানুষকে উদ্বোধিত করা যায় বিশ্ববোধের পরম মন্ত্রে।

এইটাই হল সমস্যা, যা নিয়ে চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই ভাবিত। এই সমস্যাটি দুরূহ হয়ে পড়েছে দুইটি স্বতন্ত্র কারণে। আমরা আগেই বলেছি,—আদিম যুগথেকেই মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শুরু করেছে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীজীবনের সীমাও ক্রমশঃ প্রসারিত হয়েছে,—কিন্তু তা একটি গোষ্ঠীতে পরিণত না হয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে—ফলে এই পৃথিবী broken up fragments' এর সমষ্টি হিসাবেই থেকে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে একটি করে গোষ্ঠীগত অহমিকাও গড়ে উঠেছে। এখন সমস্যা হল—এই গোষ্ঠীগত অহংকে—পরিশোধিত করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাকে প্রসারিত করা কিংবা তার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন সম্ভব কিনা? কেননা বিশ্বজনীন মানব ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী অহমিকাকে অবশ্যই প্রসারিত অথবা বিলোপ করতেই হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল,—বহির্জীবনের বিধি-বিধানের সাহায্যে কার্যকর কোনও দৃঢ় বিশ্বজনীন ঐক্য-প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব কিনা? এই প্রশ্নের সঙ্গে আরও একটি সন্দেহ থেকে যায়—সে এমন ঐক্যের প্রতিষ্ঠা যদিও বা সম্ভব হয়, তাহলে মানুষের মধ্যে এতদিন ধরে একটু একটু করে যে স্বাতন্ত্র্যবোধ গড়ে উঠেছে, এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী অহমিকার প্রভাবে মানুষের যে-যৌথজীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবে কিনা, অর্থাৎ বিশ্বজনীন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে নেশন্‌গত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে কিনা।

এ-ছাড়া তৃতীয় সংশয় হল,—কেবলমাত্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্য নয়,—পরন্তু সমগ্র মানবজাতির মধ্যে এক শক্তিশালী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্য গড়ে তোলা আদৌ সম্ভব কি নয়?

বর্তমানে মানুষের গোষ্ঠীগত পরিচয় হল, 'নেশন্'। কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্র সাম্রাজ্য বিস্তারের সাহায্যে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নেশন্‌কে পরাভূত করে আপন সাম্রাজ্য-ভুক্ত করে নিতে পারে। কিন্তু তার সাহায্যে পরাভূত নেশন্‌দের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য যেমন গড়ে উঠেনা তেমনি বিজয়ী রাষ্ট্রের সঙ্গে তারা মিলে মিশে যেতে পারেনা। পরাভূত হলেও মানুষের গোষ্ঠীগত রূপ কিন্তু পরিবর্তিত হয়না।

ইংরাজ আমাদের দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল সত্যি, কিন্তু সেই কারণে আমরা কেউ জাতি হিসাবে ইংলিশ হয়ে যাইনি। রাজনৈতিক শাসনের দিক থেকে যদিও আমরা ছিলাম ইংলণ্ডবাসীদের মত একই সম্রাটের প্রজা সেটা ছিল বাইরের ব্যাপার, ভিতরের কিছু নয়। তাই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের কোনও স্বাভাবিক ঐক্য গড়ে ওঠেনি। ইতিহাস থেকে এই ধরনের অনেক নজিরই তুলে ধরা যেতে পারে-যেমন অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যবিস্তারের ইতিহাস। এর থেকে এই কথাই ধরে নিতে পারা যায় যে, বাহ্যিক শক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্যগত ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সকল সম্রাজ্যের ঐ একই দশা হয়, যদি না সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে একটি জাতিগত সত্তা গড়ে ওঠে।

ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন উপনিবেশগুলির মধ্যেও ঐক্য গড়ে তোলা সহজ নয়। ভাষার দিক থেকে, এবং কুল ও বংশের দিক থেকে যদিও শাসকগোষ্ঠির সঙ্গে তারা একটি দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ তবুও ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা এই মত পোষণ করতেন – যে, উপনিবেশগুলি মূল রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ব্রিটিশসাম্রাজ্যবাদের প্রাসাদ ভেঙে পড়বে। বাস্তবিক পক্ষে ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীরা একসময় ব্রিটিশ জাতীয়তার প্রসারিত প্রত্যঙ্গ হিসাবে থাকতে রাজী ছিল না। বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি জাতি-সত্তা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য তাদের সে-প্রয়াসকে উন্নততর কোনও বিধানের সাহায্যে চাপা দেওয়া হয়েছিল।

একই নেশনের অন্তর্ভুক্ত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যে স্বাভাবিক ঐক্য গড়ে ওঠে তা স্বতঃস্ফূর্ত বলেই তাকে বলা যেতে পারে—সত্যপ্রতিষ্ঠ ঐক্য অথবা প্রকৃত ঐক্য। এ-ছাড়া মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আর একধরনের ঐক্যকে গড়ে তোলা যায় রাজনৈতিক শক্তির সাহায্যে; একে বলা যেতে পারে রাজনৈতিক ঐক্য।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, নাম প্রকৃতি, ও আকৃতি যখন অভিন্ন তখন রাজনৈতিক ঐক্যের থেকে সত্যপ্রতিষ্ঠ যথার্থ ঐক্যকে পৃথক করা হয় কেন?

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে এই পৃথকীকরণের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, এবং গুরুতর পরিণামও এর সঙ্গে জড়িত।

জাতীয় ঐক্য বর্জিত একটি সাম্রাজ্য (যেমন অস্ট্রিয়া) যখন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে তখন তার অস্তিত্ব চিরকালের জন্য লোপ পায়; বাহ্যিক ঐক্যকে পুনরায় গড়ে তোলার স্বতঃস্ফূর্ত কোনও আগ্রহ সেখানে আর থাকে না। কেননা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে কোনও আন্তরঐক্য প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

অপরপক্ষে কোনও রাষ্ট্র, যার মধ্যে প্রকৃত জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ছিল তা' যদি অবস্থার বিপাকে ভেঙে পড়ে তবুও তার একত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। কেননা, বাইরের ভাঙন তার আন্তর ঐক্যকে পর্যুদস্ত করতে পারে না। ঐতিহাসিক নজির হিসাবে এই প্রসঙ্গে গ্রীসের ইতিহাস উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যান্য অনেক সাম্রাজ্যের মত গ্রীক সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছে। বহু শতাব্দী ধরে কোনও রাজনৈতিক সত্তাও তার বর্তমান ছিল না। কিন্তু তবুও তারপক্ষে আপন স্বতন্ত্র সহ ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কেননা, সে সর্বদা তার স্বাতন্ত্র্যকে, তার অন্তর্গূঢ় 'অহং' কে রক্ষা করে এসেছে এবং সেই কারণেই তার অস্তিত্ব সে বজায় রাখতে পেরেছিল তুর্কীর শাসনকাল পর্যন্ত। তুর্কীর শাসনাধীন অন্যান্য রাজ্যগুলির পক্ষেও এইভাবে পুনর্জীবনলাভ সম্ভব হয়েছিল, কেননা তুর্কীর শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট হল এই যে, শাসিত রাজ্যগুলির আন্তরিক বৈশিষ্টকে সে ধ্বংস করেনি, মুছে দেয়নি, এবং তার পরিবর্তে তুর্কীজাতীয়তাকে (Ottoman

Nationality) তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতেও প্রয়াসী হয়নি। এইসব শাসিত জাতি যে-পরিমাণে তাদের প্রকৃত জাতীয়-চেতনা সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল ঠিক সেই পরিমাণেই তারা জাতীয়-জীবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে অথবা তার পুনর্গঠনের প্রয়াসে যত্নশীল হয়েছে।

প্রকৃতঐক্যের মধ্যে নিগূঢ় যে-সত্য, তার শক্তি এতই প্রবল যে, যে-সব জাতি অতীতে কোনওরূপ বাহ্যিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি, যাদের নিয়তি এবং পরিবেশ, এমন কি যারা নিজেরাই ছিল নিজেদের প্রতিকূল, যারা বিকেন্দ্রিক (centrifugal শক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল এবং যারা হয়ে পড়েছিল বৈদেশিক আক্রমণের সহজ শিকার, তারাও তাদের শক্তিরাজিকে কেন্দ্রমুখী (centripetal) করতে এবং নিজেদের মধ্যে একটি সংবদ্ধ একতাকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ইতিহাস সেই কথাই বলে।

ঐতিহাসিক নজির হিসাবে ভারতবর্ষের ক্রমবিকাশের ইতিহাস হল সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ঘটনা। অন্য কোথাও বিকেন্দ্রিক বা কেন্দ্র-বিমুখী শক্তি এত প্রবল এবং এত জটিল হয়ে ওঠেনি। বিবর্তনের গতি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এত বেশী সময় নিয়েছে যে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়; 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা' যা অবলম্বন করে তাকে এগিয়ে যেতে হয়েছে তাও অতি বিস্ময়কর এবং ভয়াবহ। তবুও এই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সে এগিয়ে চলেছে।

ভারতবর্ষের মহাজীবনকে অবলম্বন করে যে-দুটি মহাকাব্য রচিত হয়েছে তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, সুদূর অতীতকাল থেকেই ভারতবর্ষে একটা কেন্দ্রমুখী প্রবেগের বিকাশ ঘটেছে। সম্রাট বা রাজ-চক্রবর্তীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত রাজসূয় অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞের মাধ্যমে সেই প্রবেগ একটি বিশেষ রূপ পেয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস, যা মূলতঃ বৈদেশিক শাসনের ইতিবৃত্ত, তারমধ্যে দেখা যায় এক বিচিত্র ঘটনার অপূর্ব সংঘটন। বৈদেশিক শক্তি যখন কেন্দ্রাভি-মুখী প্রবেগকে প্রকট করতে প্রয়াসী তখন কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির দ্বারাই বৈদেশিক শাসনের ঘটছে অবসান। এর থেকে যে-ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, তা হল এই যে,...the more foreign the rule, the greater has been its force for the unification of the subject people. "এর থেকে সুনিশ্চিত ভাবে এই ধারণা করা যায় যে জাতীয়-সত্তা আগের থেকেই সেখানে গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয় there is an indissoluble national vitality necessitating the inevitable emergence of the organised nation." তাই প্রবলতম বাধা-বিপত্তির আঘাতেও অবচেতন প্রয়োজন বিনষ্ট হয়নি।

বৈদেশিক শাসনের প্রভাবে জাতি কিভাবে গড়ে ওঠে ইতিহাস থেকে তার নজির প্রভূতপরিমাণে উদ্ধার করা যায়। ইউরোপের আধুনিক দেশগুলির মধ্যে সকলকেই একদিন বৈদেশিক আধিপত্যকে স্বীকার করতে হয়েছিল এবং তার জাতীয়তাবোধ সংসাধিত হয়েছিল ন্যূনাধিক দীর্ঘকাল বিদেশীর শাসনাধীন থেকে। রাশিয়ার যেমন, ইংল্যাণ্ডেও ঠিক তেমনি,—যে বৈদেশিক জাতির আধিপত্য ছিল,—অনতিকালের মধ্যেই সে-জাতি শাসক-গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং পরিশেষে দেশের সঙ্গে অঙ্গীভূত ও একীভূত হয়ে যায়। ইতালীতে অস্ট্রিয়ার একাধিপত্য, বল্‌কানে তুর্কীর সার্বভৌমত্ব; এবং নেপোলিয়নের স্বল্পকালের প্রভুত্ব জার্মানীতে। আসল কথা হল বাইরের থেকে একটি চাপ বা পেষণ অভ্যন্তরের অসংবদ্ধ জীবনে একটু একটু করে জাগিয়ে তোলে সংহতি, জাগিয়ে তোলে ঐক্যবোধ।

এইভাবেই বর্তমানে একমাত্র জীবন্ত ঐক্যবদ্ধ সত্তা হিসাবে 'নেশন'ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবচেতনায়। এই নেশনকে বাহুবলে বা অন্য কোনও কৌশলে ধ্বংস-করার বা বিচ্ছিন্ন করার সর্বরকমের প্রয়াসকেই বলা যেতে পারে মূঢ়তা এবং অর্থহীন। কারণ এই নেশনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের বিধান। রাজনৈতিক ঐক্য কিন্তু নেশনগঠনের মৌলউপাদান নয়।

কেননা সে ঐক্য ব্যতিরেকেও নেশন গড়ে উঠতে পারে। সাম্রাজ্যগত ঐক্য ক্ষয়িষ্ণু এবং মরণশীল কিন্তু নেশন অমর। The Nation in modern times is practically indestructible, unless it dies from within. অর্থাৎ যতদিন না অন্যকোনও বৃহত্তর জীবন্ত সত্তা প্রকট হয়ে উঠছে,—ততদিন এই Nation idea বেঁচে থাকবে, এবং যখন সেই বৃহত্তর সত্তার উদ্ভব সম্ভব হবে তখন উচ্চতর আকর্ষণের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশের তার উদ্দেশে মধ্যেই সে নিজেকে বিলিয়ে মিশিয়ে দেবে।

এখন প্রশ্ন হল প্রকৃতি পরিমাণবাদের গতিপথে সাম্রাজ্য তা' হলে নিয়তি-নির্দিষ্ট কোনও স্তর বা সত্তা কিনা? বর্তমানে যদিও 'নেশন'ই হল প্রাণবন্ত ঐক্যের আদর্শ, তথাপি ভবিষ্যতে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের রীতি-নীতির কোনও অদলবদল যদি ঘটে, এবং তা ঘটার সম্ভাবনাও রয়েছে যথেষ্ট; তখন কিন্তু সাম্রাজ্য শুধু রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে গ্রাহ্য হবেনা, তার মধ্যে জেগে উঠবে একটা মানসিক সত্তা এবং তার ফলে জাতিতে জাতিতে একটা মানসিক ঐক্য গড়ে ওঠাও সম্ভব। যেমন স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস ও ইংল্যাণ্ড মিলে ব্রিটিশ নেশনের সংহতি সৃষ্টি করেছে। সুতরাং নেশনগত ঐক্যের বদলে সাম্রাজ্যগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—এ কথা জোর করে বলা যায়না। প্রকৃতির গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, প্রকৃতি বহুকাল ধরে সাম্রাজ্যগত সংঘবদ্ধতাকে পরিপুষ্ট করার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট। এবং এ বিষয়ে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। যার ফলে এই সাম্রাজ্যগত ঐক্যের আদর্শের রূপ ও রেখা বিশ্বমানুষের চেতনায় একটু একটু করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জাতীয়তাবাদের (Nationalism) বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রকৃতির এই প্রয়াস যদিও বর্তমানে স্থূল ও হিংসার পথকে আশ্রয় করেছে তবুও একথা বলা অযৌক্তিক হবেনা যে, প্রকৃতির এই ক্ষিপ্র পদক্ষেপ অন্য এক অবস্থা সৃষ্টির পূর্বাভাস। সুতরাং ভবিষ্যতে মানব-ঐক্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় জাতীয়তাবাদ (Nation hood) যে ভূমিকা গ্রহণ করবে সে-সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করার পূর্বে আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, সাম্রাজ্যগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠায় প্রকৃতি বহুকাল ধরে ধীরেসুস্থে যে-প্রয়াস চালিয়ে আসছে তার থেকে যে সম্ভাবনা আজ দেখা দিয়েছে তার কার্য্যকারিতা কত সুদূরপ্রসারী কিংবা তার কার্য্যকরী কোনও ক্ষমতা আদৌ আছে কিনা!

আমাদের আরও বিবেচনা করে দেখতে হবে যে ঐ দুটি স্বতন্ত্র আদর্শের মধ্যে একটি (নেশন) যখন জীবন্ত সত্তা রূপে বর্তমান তখন অপরটিকে (সাম্রাজ্যগত ঐক্য) বিশেষ পরিবেশের মধ্যে এনে রূপান্তরিত করা যায় কি না। ইউরোপীয় জীবনে যে সংঘর্ষ ঘটেছিল তারই ফলে ঐ দুটি স্বতন্ত্র সম্ভাবনার জন্ম। একটি হল—সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীন নেশনদের নিয়ে জাতিপুঞ্জের মৈত্রীসংঘ—(a federation of free nations) গড়ে তোলা, অপরটি হল কয়েকটি বৃহত্তর সাম্রাজ্যর আধিপত্যে গোটা পৃথিবীটাকে বণ্টন করা। এই দুটি আদর্শের এক আশ্চর্য সম্মিলন অদূর ভবিষ্যতে যে সংঘটিত হতে পারে এমন সম্ভাবনার আভাসও দেখা দিয়েছিল। সুতরাং বিষয়টি আগাগোড়া বিবেচনা করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যদি এই সম্মিলন বাস্তবিকপক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে ভেবে দেখতে হবে,—এই সম্মিলনকেই নূতন স্থায়ী অবস্থার মৌলভিত্তিরূপে গড়ে তোলা যায় কিনা!—তা যদি না যায়, তবে বুঝতে হবে,—এ হল প্রকৃতির ক্ষণিক কৌশল, এর দ্বারা স্থায়ী কোনও অবস্থান্তর ঘটবেনা। সে যাই হোক, সমস্ত বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা না করে কোনও মন্তব্য করা সমীচীন হবেনা।

বত্রিশপুত্তলিকা ও রাজাভোজ

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

উজ্জয়িনীর মাঠ। রাখাল ছেলেরা খেলা করছিল।

হঠাৎ একটা ঢিবির উপর উঠে বসে একটা ছেলে।

আর বললে, আমি তোদের রাজা।

আশ্চর্য্য। সবাই তাকে রাজা বলে জয় দিল। সেলাম করল।

ছেলেটা নাকি ভারি অদ্ভুত বিচার করে খেলার ঝগড়ায়।

রাজার কানে যায়। তখন ভোজরাজা সে দেশে রাজা।

রাজার হুকুমে ঢিবি খোঁড়া হল।

*　　*　　*

ধুলো মাটীর নিচে থেকে মাটীতে কাদাতে মাখামাখি দেখলেন সোনা-রূপার একটা আশ্চর্য্য সিংহাসন।

রূপোর তৈরী বত্রিশটা সিঁড়ি। সেই বত্রিশটা সিঁড়ি মাথায় করে ধরে আছে সোনার তৈরী হীরে মণির সাজ পরা বত্রিশটি পুত্তলিকা।

রাজা মন্ত্রী অমাত্যদল মুগ্ধ। সিংহাসন ধুয়ে মুছে রাজপুরীতে নেবার আয়োজন হল।

ভোজরাজা চমৎকৃত হয়ে সেখানেই তার সিঁড়িতে পা রাখলেন। আর অমনি সেই সিঁড়ির নিচের পুতুলটি কথা কয়ে উঠল জ্যান্ত হয়ে।

বললে, তুমি কে? এ সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের। তাঁর মত যে রাজা তারই এতে ওঠার অধিকার আছে।

ভোজ রাজা। আমি রাজা ভোজ এখন এখানকার রাজা। এই রাজ্য-সম্পত্তি-দেশ সব আমার এখন।

১ম পুতুল। তোমার মন্ত্রীসভায় নবরত্ন আছেন? কবি কালিদাসের মত?

রাজা। (স্তব্ধ, পরে) না।

পুতুল ফিক করে হেসে আকাশে উড়ে গেল। সিঁড়ি খসে গেল।

রাজা দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা তোলেন।

২য় পুতুলও নড়ে উঠে কথা কইল। এ সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের। তাঁর মত কেউ ছাড়া বসবার অধিকার নেই। তোমার সভায় কি পণ্ডিত বররুচি আছেন?

রাজা। (নীরব) না। এ পুতুলও ঈষৎ হেসে উড়ে গেল। সিঁড়ি খসে গেল।

রাজা তৃতীয় সিঁড়িতে পা দেন।

৩য় পুতুলও হাসল। বললে, তোমার সভায় আছেন জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের মত পণ্ডিত? আর উড়ে যায়।

রাজাও পা রাখেন চতুর্থ পঞ্চম থেকে একত্রিশ অবধি। সব পুতুলই ঈষৎ হাসে আর বলে রাজ্যভরা জ্ঞানীদের কথা। নবরত্ন? নবরত্নের মহামাত্য অমর সিং? ধন্বন্তরী বৈদ্যরাজ? ক্ষপণক (বৌদ্ধজ্ঞানী)? আর মহা পূর্ত্তশাস্ত্রজ্ঞ শঙ্কু? আর বেতালভট্ট, ঘটকর্পর অলৌকিক কর্ম্মা?

একে একে সবাই মৃদু হাসে আর বলে—জ্ঞানী? গুণী? তত্ত্বজ্ঞ? পণ্ডিত? তুমি কি তেমনি গুণজ্ঞ গুণগ্রাহী দয়ালু অক্রোধী প্রজাপালক? তুমি কি কাব্য-কলা রসিক? শাস্ত্রজ্ঞ? বিবেকবান? শ্রদ্ধাবান? দাতা?

তারা ফিক ফিক করে হাসে আর উড়ে যায়।

আর সিঁড়ি মিলিয়ে যেতে থাকে।

রাজা এবারে শেষ সংখ্যা বত্রিশের সিঁড়িতে পা রাখেন।

বত্রিশ সংখ্যা পুতুলও মৃদু হাসল। বলে, রাজা চরণ নামিয়ে নিন। নীচে মৃত্যুগহ্বর দেখা যাচ্ছে। এ সিংহাসন আপনার জন্য নয়।

ভোজ দেখলেন পায়ের তলায় শেষ সিঁড়ি থর থর করে কাঁপছে। আর হীরামাণিকখচিত সোনা-রূপা গঠিত বত্রিশ পুতুলের মাথায় ধরা অপূর্ব সিংহাসনখানি নিঃশব্দে চোরাবালির মাঝে অতলে নেমে যাচ্ছে। আগেই পুতুল সব উড়ে গেছে। সিংহাসনও শেষ পুত্তলিকার মাথা সহ অদৃশ্য হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

এখন রাজার পায়ের নীচে চোরাবালির কাঁকরের স্তূপ শুধু। পাহাড়প্রমাণ সেই ঢিবির আকারে।

রাজা লজ্জিত। অপ্রতিভ। ক্ষুব্ধ। রুষ্ট। হত-বুদ্ধি। শুধু জানেন না এ লজ্জা কিসের। কার ওপরে রাগ বা ক্ষোভ করবেন।

তাঁরও চারদিকেও বত্রিশজনের অনেক গুণ বেশী কর্তব্য অপালক, লুব্ধ উৎকোচগ্রাহী অমাত্য মন্ত্রীদল, অসাধু, চাটুকার নাগরিক, প্রজা, মূঢ় দীনদরিদ্র গ্রামবাসী, সেই সরল রাখালবালকদল—তারাও তাঁর লজ্জায় লজ্জিত হয়ে মুখ নামিয়ে রইল।

সবাই মনে ভাবে, তাহলে ভোজরাজা অত বড় রাজা নয়? বিক্রমাদিত্যের মত নয়? সে বিক্রমাদিত্য কেমন ছিল?

অদৃশ্য বিক্রমাদিত্যের কীর্তির কাছে অদৃশ্য বিচার-শীলা পুতুলের ধিক্কারের কাছে বহু বহু গুণ সংখ্যা বত্রিশ সদস্য মন্ত্রী নিয়ে পরাজিত ভোজ নিজের রাজসভায় ফিরে গেলেন।

চোখের সামনে ভেসে আসে বত্রিশ সিংহাসনের রূপ। সে সিংহাসন তিনি কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি।

আর কানে ভেসে আসে পুতুলদের ঈষৎ ব্যঙ্গ কৌতুক হাসিভরা কথা। প্রশ্ন—

'তোমার সভায় কালিদাস বররুচি বরাহমিহির প্রমুখ নবরত্ন আছেন? জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞ গুণবান আছেন? তুমি ধার্মিক? তুমি প্রজাপালক?'

এ পরাজয় কার কাছে? নিজের কাছেই, না সেই কীর্তিজীবিত মৃত রাজা বিক্রমাদিত্যের কাছে? ভোজ রাজা ভাবেন।

ভীমরতির উৎস সন্ধানে

শ্যামসুন্দর দাশ

জন পাঁচ ছয় অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদের ছোট্ট সভাটি সন্ধ্যার আগেই ভেঙে গেল। সন্ধ্যা হয় হয় সকলেই ভীমরতি নামক ভীষণ অসুখটার চিন্তায় ভারাক্রান্ত মনে আপন আপন বাড়ির পানে পা বাড়ালেন। কারণ অসুখটা বহুপুরাতন ও দুরূহ সিম্‌টম্‌সে এতই জটিল যে এ হতে মুক্তির কোনও পথ আজকের সভায় আবিষ্কৃত হলো না। এই সভায় আলোচনার জন্য কোনও গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়বস্তুর প্রয়োজন কোনওদিন হয়নি। ঝিমিয়ে-যাওয়া জীবনকয়টি সাময়িক উত্তেজনার জন্যে একটুখানি আফিম খুঁজতেন; অন্তত ঐ আলোচনার নেশায় ওঁরা আফিমের আমেজ অনুভব করতেন। তাই প্রতিদিন একই জায়গায় মিলিত হয়ে কিছু আলোচনা, কিছু অভিমত ব্যক্ত করে কত যেন চিন্তিত এমনিভাবে সকলেই বিদায় নিতেন কিন্তু আজকের সমস্যা ওঁদের সকলেরই, তাই সকলেই মনে প্রাণে অনুভব করেছেন ব্যাপারটা।

বৃদ্ধকয়জন শঙ্কিত মনে আজ অনুভব করেছেন শৈশবের হারিয়ে-যাওয়া অবুঝ জেদি একটা ইচ্ছা মনের চাপা-পড়া কোন হতে যেন উঁকি মারছে। তাই বাড়িতে ছেলে, বৌ, গিন্নী সকলের কাছেই একটু বিশেষ কিছু পাওয়ার দাবী তাঁরা করতে সুরু করেছেন আজকাল। যা না পেলেও চলে যেতো, যা যা পাবার কথা একবারও ভাবতেন না এতদিন। সংঘাত ঐখানেই। নতুন করে যারা জীবন শুরু করেছে, পরিবারের যুবক ছেলে, আধুনিকা বধূ, তাঁরা মরচে-পড়া ঝড়ঝড়ে গাড়ীটা যে বাতিল করবে এবং আক্ষরিক অর্থেই তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

কিন্তু তা বললে তো চলে না; ঐ সংসার ঐ পরিবার এর সবকিছুই যে ঐ বৃদ্ধেরই সৃষ্টি। ঐ অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণের অগণিত অভিজ্ঞতার জমিতে অজস্র স্বেদ-বিন্দুর সেচ দিয়ে উৎপন্ন সোনার ফসল কীটের অত্যাচারে ধ্বংস হতে দিতে পারেন কি তিনি? ভোর পাঁচটায় প্রাতঃভ্রমণ সেরে এসে রোদ হয়ে যাওয়া বেলা পর্যান্ত যদি বাড়ির সব তরুণ প্রাণচঞ্চলদের বালিস জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে এই কুঅভ্যাসের বিষময় ফলের কথা চিৎকার করে শুনিয়ে দেন এবং তাদের ঘুম না-ভাঙ্গা পর্যান্ত উপদেশবর্ষণ করতেই থাকেন তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায়না; কারণ তাঁর অভিজ্ঞতার অভিধানে বেলায় ঘুমিয়ে ওঠার একমাত্র অর্থই আছে তা বিশেষ ক্ষতিকর। কিন্তু ফল কি হয়। আলুথালু চুলে ব্যাজার-মুখে বৌমা তোয়ালে নিয়ে বাথরুম দখল করেন এক ঘণ্টার জন্যে, আর ফুলো-ফুলো চোখে গম্ভীর হয়ে সেভ করতে বসেন এম, এ, পাশ করা অফিসার-পুত্র। কারও মুখে প্রসন্নতার দেখা মেলেনা। উপদেষ্টা অপ্রস্তুত হয়ে ভাবতে থাকেন কোথায় যেন ভুল করে ফেলেছেন।

অবসর-নেওয়া বৃদ্ধের স্ত্রী প্রাকৃতিক অ:মাঘ নিয়মে স্থূলাঙ্গী হবেনই এবং তরুণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটা নিঃশব্দ আঁতাত বা বোঝাপড়া করে নিয়ে এ্যাডমিনিস-ট্রেসনের ভারটা ষোল আনা নিজের হতে তুলে নেবেন এই জাগতিক নিয়ম। কারণ তিনি বেশ ভালভাবেই জানেন যে প্রশাসন চালাতে হলে পেছনে যুবশক্তির বিশেষ প্রয়োজন এবং কোনও পোর্টফোলিয়হীন বৃদ্ধ নেতার সহায়তা নেওয়া মস্তবড় হঠকারিতা; উপরন্তু বৃদ্ধাটীর অবসর নেওয়ার পর হাজারগণ্ডা বায়নাক্কা হয়েছে; ; এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক, তার উপর আছে ভীমরতিরূপ ভীষণ রোগের প্রকোপ, যার ফলে বাড়ির আর সব শান্তিপ্রিয় সদস্যের শান্তি বিঘ্নিত

পনা চিট করবার একচ্ছত্র অধিকার তাঁরই। অতএব ঠাকুরঘরের বরাদ্দ সময় সঙ্কুচিত করে বেশ ধীর-গম্ভীর-ভাবে বেরিয়ে এসে, একা অপরাধির মত বসে থাকা অবসরপ্রাপ্ত স্বামীটিকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করেন অর্থাৎ সমস্তদিন তাঁকে কন্ট্রোল করার মত প্রচুর উইল-ফোর্স প্রয়োগ করে নেন, তারপর বলেন...বলি তোমার হয়েছে কি বলতো, ছেলে বৌমা কতক্ষণ শুয়ে থাকে সেদিকেও তোমার নজর; তোমার কি ভীমরতি হয়েছে?

ভীমরতি, শব্দটির সুরুতে এক প্রবল পরাক্রমশালী বীরের নাম থাকা সত্ত্বেও, বাড়ির অবসরপ্রাপ্ত অসহায় সর্বময় কর্তাটি কিন্তু বীরবিক্রমে পালটা-প্রতিবাদে নিজের যুক্তি দাঁড় করাবার কোনও শক্তিই পাবেন না। বরং মনে মনে ভাববেন তবে কি সত্যিই ভীমরতির আক্রমণ শুরু হয়ে গেল, সাতসকালে অন্তত একবার তা বেশ প্রমাণিত হয়ে গেল।

সেই কলেজ জীবন হতে প্রবল প্রতাপে অফিয়তি করার শেষদিনটি পর্যান্ত ঘড়ি ধরে পেয়ে এসেছেন খয়েরী রঙের পানিয়ের পেয়ালাটি যার খাদ্যমূল্য থাকুক আর নাই থাকুক তার উষ্ণতার সঙ্গে ঠোঁট, মুখগহ্বর, গলা আর পেটের কিছুদূর পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক শতাব্দী ধরে পরিচিত, মুখে ঐ গরম সেঁকটি নেওয়ার অভ্যাস আপনার বহুদিনের যেটা ঠিক ঠিক সময়ে হাতের কাছে পেয়ে এসেছেন চিরদিনই, কিন্তু অবসর গ্রহণের পর হতে বস্তুটি ঠিক সময়ে পাওয়ার পথে কিছু বাধা এসে পড়েছে আজকাল; যেমন পুজো না সারা হলে গিন্নী ভাঁড়ারে যান কি করে; আর ভাঁড়ারে না গেলে সব সরঞ্জাম রান্নাঘরে পেঁছিয় কি করে। ছোট্ট নাতনীটির ফুড তৈরী না হলে হিটারটা পাওয়া যায় কি করে, শীতকাল হলে সকালে ঘুম থেকে উঠে বড় ছেলের শেভ হবার জল গরম হতে কিছু সময় যাবে বৈকি;—অকাট্য যুক্তি সবই, তার উপর আছে উপদেশ বর্ষণ,...এতকাল যা চলেছে তা চলেছে, তিনকাল গিয়ে এখনও জ্ঞান হলো না; আহ্নিক নেই, পুজো নেই, বাসি কাপড় ছাড়া নেই—ভীমরতি আর কাকে বলে;—দ্বিতীয়বার আপনি অনুভব করলেন যে সত্যিই আপনি ভীষণভাবে ভীমরতিতে আক্রান্ত।

অবসরপ্রাপ্ত জজসাহেব আপনি, যুক্তিগুলির একটিও অর্থহীন ভাবতে পারেন না, বরং গভীরভাবে চিন্তা করার জন্যে নিজেকে একটু একা করতে চান—একেই কি তবে ভীমরতি বলে; ছি, ছি, ছোট্ট নাতনিটার বেবীফুড তৈরী হওয়ার আগেই বুড়ো মানুষ এক পেয়ালা চায়ের জন্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন, কি লজ্জা। ..

গুটিগুটি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন একটু একা হওয়ার জন্যে। হয়তো বা অপ্রস্তুত লজ্জাজড়ান মুখটা লুকোবার জন্যেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, হুঙ্কার শুনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো...

...বলি সূর্য্যি তো মাথার উপর উঠেছে, এখন ঐ বাসিমুখে যাওয়া হচ্ছে কোথায় শুনি।

তাইতো যাওয়া হচ্ছে কোথায়, এ কৈফিয়ৎ গিন্নীর পক্ষ থেকে অবশ্যই চাওয়া যেতে পারে, এবং চাইলে জবাবদিহিও একটা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে। জীবনে একদিনও কি এমন কৈফিয়ৎ-দাবী আসেনি—এসেছে, কিন্তু এভাবে নয়, বেশ মধুরভাবে, ঠোঁট ফুলিয়ে কপট অভিমান ফুটিয়ে চোখে দুষ্টুমী মাখিয়ে দাবী এসেছে, ওগো কোথায় চললে—বলই না, বাবা। বলবে না তো, বেশ আর কক্ষনও জিজ্ঞেস করবো না। এতখানি রিণরিণে ব্যঞ্জনাময় হয়ে কৈফিয়ৎ এসেছে, উত্তর দিতেও ভাবতে হয়নি, বেশ হাসিমুখেই আবদারটুকু উপভোগ করে বলেছেন—কেন বলতো, কোথায় আর যাই, এই একটু ক্লাব হতে ঘুরে আসি সারাদিন কোর্টকাচারী করে বড় ক্লান্ত লাগে, তাই একটু ফ্রেস হয়ে আসা আর কি। এপিটাইট একদম নেই।.. অপর দিকে কপট ক্রোধ এতক্ষণে ভেসে গেছে, বিস্মিত আকুল অনুযোগ ...ওমা, কোথায় যাবো, তাইতো বলি কোর্টে যাবার সময় তুমি কিছু খাওনা, সব ফেলে রেখে যাও, ভাবি হয়তো তাড়াতাড়ি খাওয়া হয়না, কিন্তু রাত্রেও খিদে নেই সেকি! ডাক্তার দেখাবে না কিছু না, তুমি কি বলতো?

ওসব ঠিক হয়ে যাবে বলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেছেন।

কিন্তু এখন কৈফিয়ৎ কি দেবেন, কোনটা বিশ্বাসযোগ্য হবে ভাবতে বেশ সময় লাগে, এবং ভাবতে ভাবতেই আবার আক্রমণ এসে পড়ে……"বলি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে, না চানটান করবে, তোমার না হয় বসে শুয়ে সময় কাটে না, না খেলেও চলে কিন্তু আমাদের নাওয়া-খাওয়া আছে, না তোমার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে সংসার চলবে।

চিরদিনই আপনার মুখের গঠন আয়নায় দেখে আসছেন, হাঁ তো নয়ই বরং যাকে বলে দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ, দাঁত কিছু পড়ে যাওয়ায় তা বরং আরও দৃঢ় যাচ্টাবদ্ধ। তবু গিন্নী অক্লেশে ঐ মুখে হাঁ দেখলেন, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় হয়তো বা মুখটা হাঁ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে ভেবে বন্ধ মুখটা আরও জোরে বন্ধ করে বাড়ির দিকেই ফিরলেন এবং পরবর্তী নোটিশমত স্নান করার জন্যে বাথরুমের দরজায় গিয়ে লাইন দিলেন, ভিতরে তখন বড় ছেলে। তার অফিস যাওয়ার প্রস্তুতির প্রাথমিক কর্ম্ম সম্পাদনে ব্যস্ত।……শেষে চান্স হয়তো মিললো, ছেলে স্নান সেরে বেরিয়ে গেলেন, পরিষ্কার শেভ-করা মুখ সদ্য স্নান করা তাজা দেহ-লাবণ্যের দিকে চাইলেন একটু, নিজের চেয়ে দীর্ঘ বলিষ্ঠ যুবকসন্তানের গুরুগম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে আপনার প্রায় হারিয়ে-যাওয়া ব্যক্তিত্বকে মনে মনে খুঁজে ধরে আনবার চেষ্টা করলেন কি জানি কেন সেটা একবার যাচাই করার ইচ্ছাও হলো গম্ভীরভাবে বললেন,…তোমরা স্নানে এত সময় নাও কেন। অবশ্য বলে ফেলেই আপনি বুঝতে পারলেন, কথাটা তেমন লাগসই হয়নি যাতে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। বরং কেমন যেন হালকা ছেলেমানুষিই হয়ে গেল; ছেলেরও বুঝতে কষ্ট হয়নি, তাই মৃদু হেসে আপনার অভিযোগ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মাকে বলেছে, কৈ মা খেতে দাও। মা ও ছেলের মধ্যে বেশ একটা চতুর হাসি বিনিময় হয় তা আপনার চোখ এড়ায়না।

বাথরুমের বন্ধ ঘরে সম্পূর্ণ একা হয়ে যে-কথাটা আপনাকে ভাবিয়ে তুললে তা হচ্ছে; মা ও ছেলের মধ্যে কেমন সুন্দর একটা সমঝোতা গড়ে উঠেছে, আর আপনি আস্তে আস্তে দূরে সরে গিয়ে শুধুমাত্র হাত পা-দেহ-উদরসর্ব্বস্ব মূল্যহীন অস্তিত্ব হয়ে গেছেন একটা। তাই আপনার মূল্যবান উপদেশও মা, ছেলের মুখে উপেক্ষার হাসি না হোক, একটা শিশুর কথা শুনে উপভোগের হালকা হাসি ফুটিয়ে তোলে।

বাথরুমের আয়নায় তেলমাখা গামছাপরা নিজের প্রতিকৃতিটার গায়ে কল্পনায় গাউন পরিয়ে টাই এঁটেও আর আগের সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ জজ সাহেবটিকে খুঁজে পাচ্ছেন না। দেখতে পাচ্ছেন মুখের ব্যক্তিত্বব্যাঞ্জক রেখাগুলি নিঃশেষে মিলিয়ে গিয়ে অবোধ শিশুর সরল মুখ জেগে আছে একখানা। যে সময় একটু চা পেলে খুসিতে ডগমগ হয়ে ওঠে, ঠিক দশটার আগের মত ছুটো খেতে চায়, ছুটো উপদেশ দিয়ে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করা দুঃখ যন্ত্রণা হতে আর সবাইকে সাবধান করতে চায়; এতদিনের ঝড়-ঝাপটায় বিপর্যস্ত শ্রান্ত দেহটা নিয়ে সময়ে শিশুর মত একটু ঘুমিয়ে পড়তে চায়।

কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে এইটুকু চাওয়া অনেক চাওয়া বলে মনে হয় আজকাল।

হয়তো কোনও ছুটির দিন বিকেলে বাড়ির সবাই বাড়ির সামনের পড়ে-থাকা বাড়তি জমিটুকুর সদ্ব্যবহারের পরামর্শ করেন। বড় ছেলের মতে ওটা একটা সুন্দর টেনিসলন হতে পারে, বৌমারও তাই মত। ভিন্নমত হতেই পারে না, কারণ ছেলে এখন যুবক ও মস্তবড় অফিসার।

মেয়ের মত সুন্দর সাজান বাগান হোক একটা। কারণ জাপানী প্রথায় ফুল সাজান অর্থাৎ ইকেবানায় সে হাত-পাকাতে চায়। যার প্রদর্শনীতে একটা স্থান রাখতে পারলে বিনা খরচে কাশ্মীর উড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। গিন্নী সবাইকেই হাসিমুখে সমর্থন জানান; পানের-রসে রঞ্জিত মুখে হাসি [illegible]

মিলিয়ে গেল তখনই যখন রিটায়ার্ড জজসাহেব আপনি ঐ-বাড়ি বাগানের সৃষ্টি কর্তা এই ব্যাপারে আপনার কিছু মতামত জানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

সান্ত্বনা দেওয়ার মত হাসি হাসি মুখে বড়ছেলে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা তোমরা সব চুপ কর, বাবার মতটা কি শোনাই যাকনা।

গিন্নী বললেন ওর আবার কি মত; হয়তো বলবেন, ঝিঙে, চিচিঙের বাগান করা যাক·········সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

আপনি আর কিছু বলবেন না, যদিও আপনার মনে সত্যিই তেমন একটা ইচ্ছা জেগেছিল টম্যাটো, বেগুন, কলা, শশা, পেপে, তাজা, শিশির ভেজা-ঝকঝকে সবুজ আনাজ ঝুড়ি ভর্ত্তি করে তুলছেন বেকার বসে থাকা মালীটার মাস মাইনেটা অন্তত ওসুল হচ্ছে আর বিরাট একটা লাভ হচ্ছে আপনার; অলস ঝিমিয়ে-পড়া সকাল দুপুর বিকেলগুলি আপনার দিব্যি কেটে যাচ্ছে ঐ বাগানের পরিচর্য্যায়। মনে হচ্ছেনা আপনি হাত পা সর্ব্বস্ব মূল্যহীন অস্তিত্ব মাত্র—নিজেকে মনে হচ্ছে না বাতিল, স্থবির। টসটসে পাকা পেপেটা পেড়ে নিয়ে আপনি যখন হাসিমুখে বাড়ীতে ঢুকছেন গিন্নী আগের মত ঝল-মলে হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলছেন, বাঃ বাঃ কতবড়, কিসুন্দর চমৎকার। যেমন প্রশংসামুখর ভাষায় আপ্যায়িত হতেন গাড়িভর্ত্তি সাড়ী টয়লেট নিয়ে ফিরে এলে, সেই অনেকদিন আগে। কিন্তু না, আপনার সেই সাধটুকু এক ঝলক কোরাস হাসির হলকায় পালাবার পথ পেলনা। গিন্নী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ভীমরতি আর কি!

আপনি শত চেষ্টাতেও ওদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিতে পারলেন না, ইচ্ছা হলেও ওদের সঙ্গে মিশে যেতে পারলেন না—ম্লান মুখে আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন আপনার অজস্র অভিজ্ঞতার ভারে নুয়ে-পড়া মাথাটা আরও নিচু করে।

পথ, আপনার বহুদিনের চেনা-পথ ধরে চলতে শুরু করলেন; ভাসা-ভাসা অর্থহীন চিন্তা-ভাবনার জটিল জটপূর্ণ মস্তিকে পাক দিয়ে দিয়ে আপনাকে অন্যমনস্ক করে তুলল, গাউন পরে গাড়ীতে করে এই পথ দিয়ে কতদিন গিয়েছেন, এই পথের ছোটখাটো কতকিছুর সঙ্গে আপনার মনের গোপন আত্মীয়তা। ছোট্ট একটা গাছ নিঃশব্দে বিশাল হয়ে উঠেছে; ছোট্ট উলঙ্গ শিশুরা যারা আপনাকে দেখতো অবাকবিস্ময়ে, বড় বড় চোখে রাজ্যের ভয় আর সম্ভ্রম মাখিয়ে—তারা আজ পূর্ণ ব্যক্তিত্বে ভরপুর গম্ভীর। ওরা আপনার পাশ দিয়ে হেঁটে যায় সদর্পে। ওদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আপনাকে সন্ত্রস্ত করে তোলে, পথ ছেড়ে দাঁড়ান আপনি। হঠাৎ-দেখা হঠাৎ-মিলিয়ে যাওয়া গম্ভীর মুখটায় আপনি সেই উলঙ্গ শিশুটির মুখের আদল দেখতে পান।

সুদূর মধুর অতীতের—কতস্মৃতির রোমন্থন চলে ঐ পথটুকু চলার সময়, স্মৃতির অতলে ডুবে গিয়ে কখন আপনার বাহ্যিক দৃষ্টি দৃষ্টিহারা হয়ে যায় পথিকের সঙ্গে হঠাৎ সংঘর্ষে। চমকে উঠে ভয়ে ভয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন রূঢ় কর্কশ কণ্ঠে পথিক অমার্জ্জিত সম্বোধন করে বলে, কি দাদা, বাইফোকাল নাকি! অপ্রস্তুত হয়ে চশমাটা বের করে চোখে পরেন; সত্যিই সেটা বাইফোকাল। না পরলে দূরের বা কাছের জিনিষ ঠাহর হয় না।

পথিকের প্রচ্ছন্ন উপহাসের অর্থ বুঝতে পারেন। কিন্তু বুঝতে পারেন না ওর ঐ দাদা সম্বোধন! আপনি পথিকের দাদা হলেন কোন্ সূত্রে। ইয়োর অনার নয়, হুজুর নয়, সাদামাটা স্যারও নয়। দাদা, বড় লঘু সস্তা সম্বোধনহাটে-বাজারে বাসে-রিক্সায় এমন কি বার বছরের কিশোরের মুখেও আজকাল শুনতে পাওয়া যায়। তবু ভাল, ওরা দাদা বলে, ভীমরতি হয়েছে বলে না।

শিথিল দেহটা টেনে টেনে শেষে এসে পৌঁছন সেই পার্কটার কাছে। দূর হতে দেখেন সাদা চুলে ভরা পাঁচ-ছয়টি মাথা। ঘনিষ্ঠ হয়ে আলোচনায় তন্ময়। দেখেন সংখ্যায় তাঁরা ঠিক আছেন, না একটি দুটি কমে গেছেন। ওরা আপনার বড় আপনজন ওঁরা উদগ্র দুশ্চিন্তা নিয়ে আপনারই পথ চেয়ে ছিলেন এতক্ষণ। কারণ এই সভায়

সদস্যদের কেউ কেউ হঠাৎ বিনা নোটিশে অনুপস্থিত হয়ে যান, সে খবর এই সভায় কেউ কোনোদিন পৌঁছে দেয়না ; সদস্যেরা ধরে নেন অনুপস্থিত সভ্য আর কোনোদিন উপস্থিত হবেন না।...তবু যথানিয়মে ফিস-ফিস করে ওঁদের আলোচনা চলে। আলোচনাটা ঐ একই বিষয় নিয়ে ঘুরপাক খায়। সকলেই অনুভব করেন তাঁরা একই রোগে আক্রান্ত। সকলেই গিন্নীর ডাইগনোসিস্ অনুযায়ী ভীমরতি নামক অসুখে ভুগছেন। এবং এই ইটিওলজিহীন ভীষণ রোগের কারণ অনুসন্ধানে অসহায় উদ্বেগে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্যে প্রতীক্ষা করছেন।

আজও এর সমাধান হয়নি, কারণ ঐ শাস্ত্রবহির্ভূত রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে করতেই সদস্য সংখ্যা কমতে সুরু করেছে ; সভাশেষে বাড়ি গিয়ে আর ফিরে আসেননি। এক ঘণ্টার এই সভায় কোনও উন্মাদনা নেই, নেই কোনও পরিকল্পনা বা আশার ছকবাঁধা প্রোগ্রাম। সন্ধ্যার আগেই সভা ভেঙে যায়, সভা ভাঙবার আগে শেষবারের মত সকলেই ফিস্ ফিস্ করে সেদিনের নিজ নিজ বাড়ির অভিজ্ঞতার কথা দ্রুত বলে নেন।

বাড়িতে কতবার ঐ অসুখের কথা আজ শুনেছেন তাঁরা।

শুনতে শুনতে কেমন যেন বিশ্বাস এসে গেছে [আজ-কাল, সত্যিই তাঁরা ভুগছেন।

রোগের উপসর্গগুলো মনে মনে মিলিয়ে নেন সকলে —যেমন ঐ অসুখ হলে বারে বারে ক্ষিধে পায় ; ভোর না হতেই চায়ের তেষ্টা পায়, কেমন সব ছেলেমানুষি আবদারে আর চিন্তায় সারাক্ষণ মন ভরে থাকে। সকলেই দৃঢ়তার সঙ্গে ঐ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করবার শক্তি সঞ্চয় করে নেন। এই অসুখ হতে মুক্ত হতে হলে— ক্ষিধে পেলে চাইতে নেই, ঘুম পেলে ঢুলতে নেই, ঘুম না পেলে জেগে বসে থেকে অপরের বিরক্তি ঘটাতে নেই। বাড়ির সবাই ভুল করলেও উপদেশ দিতে নেই, বাড়িতে যা হয় হোক দেখতে নেই, যা ঘটে ঘটুক শুনতে নেই।

ব্যস, এবার বাড়ি ফেরা যেতে পারে। তবু মন অশান্ত—অস্থির বড় কঠিন অসুখে ভুগছেন সবাই, এর সঠিক কারণ অনুসন্ধানের সঙ্কল্প নিয়ে প্রতিদিনের মত আজও বৃদ্ধ ছয়জন তাদের পক্ষাঘাতে থর থর করে কাঁপা মাথা কাঁপিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় নেন।

সেই পথে ফিরে যেতে যেতে ভয় কণ্টকিত মৃত্যুহীন বিভীষিকাময় এক অনুভূতি দিয়ে আপনি বুঝতে পারেন যে সত্যি ভীমরতিতে আপনিও আক্রান্ত। না হলে কেন বারে বারে ক্ষিধে পায় আপনার, কেন এত উপদেশ দিতে ইচ্ছা করে, কেন এখনও সাধ জাগে সেই আগের মত ঠিক সকাল ছটায় চা খেতে, সাধ জাগে সব্জির বাগান করবার !

ডেল কার্ণেগি ও ভারতীয় দৃষ্টি

ভাস্কর ভট্টাচার্য্য

'পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রেখে, একে অপরের প্রয়োজন, প্রণোদন (propensity) ও স্বার্থের দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে কি করে একটি পরিচ্ছন্ন ও প্রাণবন্ত জীবন-যাপন করা সম্ভব'—তদ্বিষয়ে পূর্বে কার্নেগির ব্যবস্থিত নীতিগুলির ব্যবহারিক' পর্যায় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নীতিনিচয় প্রধানতঃ মানসিক (ধর্মের প্রাকৃপ্রস্তুত) ব্যবহারিক, পারিবারিক ও দুশ্চিন্তানিরসন সম্পর্কীয় হলেও ঐ নীতিগুলির কিছু অবান্তর ভেদ আছে। সেগুলি একটির সংগে অপরটি সংশ্লিষ্ট কিংবা সম্পৃক্ত (co-related)। ফলে এত অল্প পরিবারের মধ্যে অমন গভীর ও তলস্পর্শী নিয়মগুলির ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। সেজন্যে আমরা কোন স্পষ্টরেখ (sharp out line) পর্যালোচনা না করে ভারতীয় দৃষ্টির আলোকে কার্নেগির ব্যবস্থিত নীতিবিষয়ের মোটামুটি ব্যবহারিক রূপারোপ ও তজ্জাতীয় অবান্তর ভেদগুলি নিয়েই আলোচনা করব।

পূর্বে আমরা জেনেছি, এই ঘাতপ্রতিঘাতের দৈনন্দিন জীবনে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা বজায় রাখতে গেলে আমাদের কিছু নিয়ম ও নীতি মেনে চলতেই হয়। মোটামোটিভাবে কার্নেগির নির্দেশিত যে সাতটি নিয়ম আমরা আলোচনা করেছি তা হ'ল :

১] অপরের প্রয়োজন এবং তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিকোণের দিকে নজর রাখুন।

২] অপরকে [নিজের চেয়ে] বেশি কথা বলতে দিন এবং সেটি আন্তরিকতার সংগে শুনুন।

৩] মুখের হাসি [সৌমনস্য] বজায় রাখুন।

৪] অপরকে মর্যাদা এবং গুরুত্ব দিন।

৫] তর্ক এড়িয়ে চলুন।

৬] মানুষের ত্রুটি পরোক্ষভাবে দেখান [যদি একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে]

৭] অপরের সামান্যতম উন্নতি কিংবা সাফল্যে আন্তরিক প্রশংসা করুন।

উপর্যুক্ত কার্নেগির ব্যবস্থিত নীতিগুলি ছাড়াও এর কিছু কিছু এমন কতকগুলি শাখা-প্রশাখা কিংবা অবান্তর ভেদ আছে সেগুলির উল্লেখ না করলে তা অসমাপ্ত থাকবে। প্রাসঙ্গিকভেবেই, যেগুলি এই নীতিনিচয়কে পুষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে তা নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি।

আমরা দেখেছি, ঋষি কিংবা মনীষীরা অতি অল্প কথার মধ্যে অনেক কিছু কথা বলে যান। ফলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের তদ্বিষয়ক তাৎপর্যবোধ করতে কিছু বেগ পেতে হয়। আমাদের বোধগম্যতার চৌহদ্দির মধ্যে সেগুলির অর্থাবগতি ঘটলে কিঞ্চিৎ আশ্বস্তবোধ করি, অন্যথায় 'দুর্বোধ্য' কিংবা 'অবোধ্য' বিশেষণে বিশেষিত করি। ভাষ্যকার, টীকাকার, বর্তিককার এবং ব্যাখ্যাকারের দায়িত্ব হ'ল এইসব দুর্বোধ্যতার সংগে বোধগম্যতার এক সুগম্য সেতু রচনা করা। আমাদের তেমন কোন গুরুদায়িত্ব নেই, আমরা শুধু এইগুলির ব্যবহারিক সার্থক্য সম্পর্কেই কিছু বলব। এবং অন্যান্য যে সিদ্ধান্তগুলি এটিকে পরিপুষ্ট ও পরিপূরিত করে তদ্বিষয়ে পাঠককে অবহিত করবো মাত্র।

ব্যবহারবিজ্ঞানীরা গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখেছেন, মানবিক সৌস্থিত্য (self possession) ব্যতিরেকে কাউকেই সদাচরণ করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখতে গেলে যে উপচিকীর্ষাবৃত্তির অনাবিলতা প্রয়োজন সেটুকু আমরা স্বীয় ভাবাবেগ,

প্রয়োজন ও স্বার্থের দ্বারা মলিন করে তুলি। ফলে অসূয়া, পৈশুন্য, পরুষতা প্রভৃতি নীচ বৃত্তিগুলি আমাদের মানবিকতা প্রকাশে প্রধান এবং প্রথমতম অন্তরায় হিসাবে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন ধরা যাক্, কার্নেগি বললেন: 'অপরের সামান্যতম উন্নতি কিংবা সাফল্যে আন্তরিক প্রশংসা করুন। জিনিষটা খুবই শক্ত। কতখানি মানসিক উদারতা, দাক্ষিণ্য এবং সৌজন্যবোধ থাকলে মানুষ অপরের উন্নতি কিংবা শ্রীবৃদ্ধিতে নিজেকে খুশি বা পুলকিত বোধ করবেন। কতখানি ধীরতা ও সৌসাম্য তাঁর চরিত্রে থাকলে সেই সুধী অপরের 'মৈত্রীভাবনা' করতে পারেন। আজকাল মৈত্রী শব্দটির বহুল প্রচার হলেও শব্দটির তাৎপর্য সম্পর্কে অনেকেই অনবহিত। শব্দটি দার্শনিক। মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে এর বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। চিত্তের সম্প্রসাদ লাভের জন্য যোগীরা এই পরম রমণীয় ও উপাদেয় বৃত্তিগুলির চর্চা, ধ্যান ও ধারণাদি করে থাকেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগদর্শনের সমাধিপাদে বললেন: মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ পুণ্যা পুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্। ব্যাসদেব তাঁর যোগভাষ্যে বললেন: তত্র সর্ব্বপ্রাণিষু সুখসম্ভোগাপন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ ......। আচার্যবর্য হরিহরানন্দ তাঁর ভাস্বতীটীকায় এটিকে আরো বিস্তৃত ও মনোরমভাবে উল্লেখ করে বললেন: 'সুখসম্পন্নেষু সর্বপ্রাণিষু অপকারিষ্বপি মৈত্রীং ভাবয়েৎ—স্বমিত্রস্য সুখে জাতে যথা সুখী ভবেত্তথা ভাবয়েঃ মাৎসর্য্যের্ষাদীনি চেদুপতিষ্ঠেরন্ মৈত্রীভাবনয়া তদুৎপাটয়েৎ।...অস্য যোগিন এবং ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্মঃ অবিমিশ্রং পুণ্যং জায়তে বাহ্যোপকরণসাধ্যেন ধর্মেণ ভূতোপঘাতাদিদোষাঃ সম্ভাব্যন্তে মৈত্র্যাদিনা চ অবদাতং পুণ্যমেব। অর্থাৎ সুখসম্পন্ন সর্বপ্রাণীর প্রতি, এমন কি তাহারা অপকারী হইলেও, মৈত্রীভাবনা করিবে অর্থাৎ নিজ মিত্রের সুখ হইলে যেরূপ সুখী হও তদ্রূপ ভাবনা করিবে। মাৎসর্য বা পরশ্রীকাতরতা এবং ঈর্ষাদি যদি উপস্থিত হয় তবে তাহা মৈত্রীভাবনার দ্বারা উৎপাটিত করিবে।...এরূপ ভাবনার ফলে যোগীর শুক্ল ধর্ম অর্থাৎ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ পুণ্য সঞ্জাত হয়। বাহ্য উপকরণের দ্বারা নিষ্পাদনীয় ধর্মাচরণের ফলে প্রাণিপীড়নাদি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু মৈত্র্যাদির দ্বারা অবদাত বা নির্মল পুণ্য হয় অর্থাৎ বাহ্য-সাধননিরপেক্ষ বলিয়া তদ্দ্বারা কেবল বিশুদ্ধ পুণ্যই আচরিত হয়।

এ ছাড়াও সুপ্রাচীন 'পঞ্চশিখাদীনাং সাংখ্যসূত্রম্' এ দেখা যায়: 'যে চৈতে মৈত্র্যাদয়ো ধ্যায়িনাং বিহারাস্তে বাহ্যসাধননিরনুগ্রহাত্মানঃ প্রকৃষ্টং ধর্মমভিনির্বর্তয়ন্তি।' মহাভারতের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি: 'আক্রুষ্ট স্তাড়িতশ্চৈব মৈত্রেণ ধ্যাতিরাত্তমম্' ইত্যাদি মৈত্রীরই গুণগানে পঞ্চমুখ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মৈত্র্যাদি ভাবনার সংগে গুণগ্রাহিতা, অনসূয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণের যে অবিনাভাবী সম্পর্ক আছে তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। মানুষের গুণাবিষ্কারের চেষ্টায় নিরত শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির আশা করি তদ্বিষয়ে অপ্রতুলতাও ঘটে না। আর শ্রদ্ধা এমন একটি কল্যাণকর বৃত্তি যেটি শ্রদ্ধেয় বিষয়ের ক্রমশঃ গুণাবিষ্কারেই তৎপর থাকে। প্রাচীন ঋষিরা এইজন্যেই শ্রদ্ধাবানতা সম্পর্কে উদাত্তস্বরে উপনিষদ্, যোগসূত্র, সংহিতা, যাস্ক-নিরুক্ত, মহাভারত, গীতা এমনকি পুরাণাদির মধ্যেও বারবার এই কথাই বলে গেছেন। আন্তরিকভাবে মানুষের গুণাবিষ্কারের চেষ্টা, তার উন্নতিতে প্রশংসা বা উদ্বোধিত করার যে কল্যাণকর প্রয়াস—সেটি ভারতীয় দৃষ্টিতে এক ধর্মীয় প্রচেষ্টা বলেই অভিহিত করতে হবে। ভারতীয় দৃষ্টির তাৎপর্যাবগতির জন্যে আমাদের এই কথাটি মনে রাখতে হবে, কোন ধর্মীয় প্রয়াস বা প্রচেষ্টার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বিবক্ষিত বিষয়টি অপ্রকট অথবা উহ্য থাকে—সেইটিই কিন্তু মূল। বাইরের আচারাদি Ritual হল উপলক্ষ্য—লক্ষ্য হল তদীয় শুভকর্ম। মৈত্র্যাদি ভাবনাপ্রসূত এরূপ গুণ-গ্রাহিতা শক্তি যে তাকে সার্বিক কল্যাণ ও শান্তির পথে নিয়ে যাবে এটি প্রমাণিত সত্য। আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি এই সদাচরণের দ্বারা সে চিত্তের সম্প্রসাদ

পাবেন—তা বস্তসাপেক্ষ ইহজগতে দুর্লভ। মানুষকে উৎসাহিত, উদ্দীপিত ও বলশালী করতে কত না বলকারী সামগ্রীই আমরা তাকে খাওয়াই—কিন্তু একবারও তার মনের খোরাকের দিকে বিন্দুমাত্র অবহিত হইনা কিংবা ভুলেও তদ্বিষয়ে দৃকপাত করিনা। এজন্য সখেদে কার্নেগি বললেন :

We nourish the bodies of our children and friends and employees ; but how seldom do we nourish their self-esteem. We provide them with roast beef and potatoes to build energy ; but we neglect to give them kind words of appreciation that would sing in their memories for years like the music of the morning stars.

এই kind words of appreciation দেওয়াটাই হল আমাদের মূল লক্ষ্য—চরম ও পরমতম সাধনা। সেটি কোনো sophisticated বা artificial উদ্গীরণ নয়। সেটি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে স্বতোৎসারিত এক সাবলীল অভিব্যক্তি—যেটি সত্যই Comes from within...!

মানুষকে প্রাণ খুলে প্রশংসা করার মধ্যে অনেকে চাটু-কারিতা বা তোষামোদের গন্ধ দেখতে পান বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তলিয়ে বুঝলে দেখা যাবে সংকাটি অমূলক। এই বিষয়ে কার্নেগির যে কিছু মনে হয়নি এমন নয়। তিনি বলেছেন :

The difference between appreciation and flattery ? That is simple. One is sincere and the other insincere. One comes from the heart out ; the other from the teeth out. One is unselfish ; the other selfish. One is universally admired ; the other is universally condemned.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মৌখিক চাটুকারিতা ও তোষামোদ থেকে যথার্থ গুণগ্রাহিতা যে ভিন্ন এবং বাক্-সর্বস্ব স্তোকবাক্য থেকে প্রকৃত মানুষকে উদ্বোধিত করার জন্য যে কল্যাণকর প্রশংসা পৃথক—তা আশা করি সকলেই অবহিত আছেন। অতএব এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, কার্নেগির অপরের সামান্যতম উন্নতি কিংবা সাফল্যে আন্তরিক প্রশংসা করুন' নীতিটিকে পুরোপুরি মেনে চলতে গেলে আমাদের অনেকগুলি সহকারী অনুসঙ্গ অথবা সহভাবী কিছু কিছু অনুসিদ্ধান্ত মেনে চলতে হয়। যেমন মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবনতাবোধ গুণগ্রাহিতা শক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং Let us try to figure out the other man's good points' জাতীয় কিছু কিছু প্রবচন আর এইগুলিই হ'ল ওইরূপ নীতির অবান্তর ভেদ।

মানুষকে কর্মোৎসাহে উদ্বোধিত করে তার ক্ষয়প্রাপ্ত অনীহান্বিত ধমনীতে যে জিজীবিষা ও প্রাণবন্তুতার জোয়ার নিয়ে আসা—তা আশাকরি এই ব্যবহারবিজ্ঞানী পূর্বে মনস্তত্ত্বে নির্দিষ্টতার মধ্যে দেখাতে কেউ অগ্রণী হন নি। কর্মৈষণা বা কর্মোদ্যম (enthusiasm) যেটি জীবের প্রাণবন্ততার চিহ্ন, তদ্বিষয়ে এই ব্যবহারবিজ্ঞানীর স্পষ্টরেখ পথ ও পদ্ধতির নির্দেশ—মানুষের ব্যবহারিক জীবনে এক আশীর্বাদরূপেই পরিগণিত হয়েছে। এখন দেখা যাক, সামান্যতম অনুমোদন বা স্বীকৃতিদানের দ্বারা (appreciation মানুষের জীবন যে কীভাবে পরিবর্তিত ও উন্নত হতে পারে এবং ব্যবহারিক জগতের কৃতবিদ্য-পুরুষরা এতদ্বিষয়ে কতটাই বা গুরুত্ব দেন, সেটুকু Charles Schwab এর কথা থেকেই প্রমাণিত হবে। (এই ভদ্রলোক যিনি বছরে এক মিলিয়ন ডলার মাইনে পেতেন অর্থাৎ দৈনিক পেতেন তিন হাজার ডলার)। অত বৃহত্তম কারখানা পরিচালনার ব্যাপারে তিনি যে অমর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন—তা যে এই ব্যবহারবিজ্ঞানীর নীতিনিচয়েরই অনুসৃতি, সেটুকু এই কৃতবিদ্য মানুষটির উক্তিতেই সপ্রমাণ হবে।

"I consider my ability to arouse enthusiasm among the men," said Schwab, "the greatest asset I possess, and the way to develop the best that is in a man is by appreciation and encouragement. ......,There is nothing else that so kills the ambitions of a man as criticisms from his superiors. I

never criticize anyone. I believe in giving a man incentive to work. So I am anxious to praise but loath to find fault. If I, like anything, I am hearty in my approbation and lavish in my praise.

এতদ্বিষয়ে Ovid এর একটি কথা খুবই সুন্দর এবং প্রণিধেয়: **It is a kingly action, believe me, to help the fallen.** এই **kingly action**-ই হ'ল যথার্থ অপরকে উৎসাহিত ও উদ্বোধিত করার মূলমন্ত্র। আর দেখা যাবে, এইরূপ সদিচ্ছাপোষণ থেকে এক পরহিতকর কল্যাণকামী কর্মসম্পাদনের অভ্যাসে **(Habits)** অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবেন। যেটি তাঁর অজ্ঞাতসারেই এক সুন্দরতর রূপ নেবে এবং তাঁর চারিত্রিক অভিব্যক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হবে। যেজন্য Ovid আরো নিশ্চয় ক'রে বললেন: **Habits change into character.** সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের কোন ইচ্ছা (তা খারাপ এবং ভালো উভয়বিধই হতে পারে) খুব শীগ্‌গিরই অভ্যাসের রূপ নেয় এবং সেই অভ্যাস অনতিবিলম্বেই পর্যবসিত হয় চরিত্রে। মানুষ মনে করে, সে তার ইচ্ছাকে গোপন রাখবে কিন্তু সদাচরণ কিংবা দুরভিসন্ধি যাই হোক না কেন—সেটি তার চর্চা, চর্যা, ইংগিত, ব্যবহার, আচরণ ও অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে অংশত কিংবা সামগ্রিকভাবে প্রকাশ পাবেই। যেজন্যে **James Allen** এর কথাটি আরেকবার না বলে পারছি না:

Men imagine that thought can be kept secret, but it cannot; it rapidly crystallises into habit, and habit solidifies into circumstance...

এতক্ষণ আমরা কর্মৈষণা বা উৎসাহ **(enthusiasm)**-এর এক কল্যাণকারী মানবিক উচ্চাদর্শের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। উপস্থিত এই অমূল্য সদ্‌গুণটির ব্যবহারিক জগতের প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। **James Allen** তাঁর ক্ষুদ্র বইটির মধ্যে এক বৃহৎ চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে বলেছেন: **A man is literally what he thinks, his character being the complete sum of all his thoughts.** দেখা যায়, আমরা যদি সৎ চিন্তা করি তাহলে আমাদের অবয়ব ও অভিব্যক্তির মধ্যে এক শান্তি ও সুষমা ফুটে ওঠে। আমরা যদি কোন নীচ, অপরাধপ্রবণ কিংবা পর্যুষিত চিন্তায়-ব্যাপৃত থাকি, দেখা যাবে তজ্জাতীয় অভিব্যক্তিও আমাদের মনোজগতে ও বহিরাচরণে উঁকি মারছে। আমরা যদি কারণে কি অকারণে দুঃখিত কিংবা ব্যথিতবোধ করি—আমাদের অভিব্যক্তিও তদ্রূপ রূপরেখা নেবে। আর আমরা যদি কর্মে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও বীর্য্য প্রকাশ করি, দেখা যাবে আমাদের মনে এমন কি সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে এক অমোঘ দুর্বার প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। আর শুধু তাই নয়, সেটি সংক্রামিত ও হয়েছে অনেকের মধ্যে। মানুষকে কর্মোৎসাহিত করলে দেখা যায়, সে নিজেও কত প্রাণময় ও উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে। একটি চীনা প্রবাদ আছে: যে-হাত গোলাপ দান করে, সে-হাতে গোলাপের গন্ধও অনেকক্ষণ লেগে থাকে। তাই মানুষকে উৎসাহিত ও উন্নীত করার জন্যে যে কল্যাণকর প্রয়াস—তার দ্বারা পরোক্ষভাবে তিনি নিজেরই এবং পরিপার্শ্বের অশেষ কল্যাণসাধন করছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দেবতার লীলাভূমি ভারতের প্রাণের প্রতিভূ ; হে চির দীপ্ত !
দ্যুলোকলোকের অশোক দুলাল, পুণ্য-শুভ্র ধর্মনিত্য !
দলি' বিলাসের মায়াবিনী কায়া ওগো নিষ্কাম অমল কান্তি !
কত দিশাহারা জনে দিলে দিশা, ভীরু অশান্তে ভরসা শান্তি।
তামসিকতার ক্লিন্ন নিগড়ে শৃঙ্খলিতের দুঃখ দৈন্য —
ঘুচাতে হে দেবসেনানী, তোমার তুলিলে গড়ি' বেদান্তী সৈন্য !
হীন লোকাচারে মিথ্যা বিহারে ছিল যারা চির-পথভ্রান্ত !
তোমার অভ্যুদয়ে হ'ল নব অরুণোজ্জ্বল পথের পান্থ।
হে মহানুভব ! বরি' দেবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস,
জানিলে তাঁহার বরে — তুমি চির-জীবন্মুক্ত শিবের অংশ।
পরশে তোমার তাই তো ঘটিল অঘটন : যারা ছিল নগণ্য —
তোমার বীর্য-পরশমণির ছোঁওয়ার পলকে হ'ল হিরণ্য।
প্রাচী প্রতীচির মাঝে সেতু বাঁধি' সিন্ধুর বাধা করিলে লুপ্ত,
ঐন্দ্রজালিক ! জাগালে — যাহারা পরাধীনতায় ছিল নিষুপ্ত।
গীতা ও পুরাণ ন্যায় বিজ্ঞান দর্শন উপনিষদ, তন্ত্র,
কণ্ঠে তোমার ঝঙ্কৃত হ'য়ে জগন্মাতার অভয় মন্ত্র।
একাধারে ধ্যানী মনীষী, জাতির স্রষ্টা — দিল যে ধ্যানের দীক্ষা,
করিত কত না সংশয়ী মন প্রাণ নিরাশায় যার প্রতীক্ষা,
মানুষ দেবের করুণা-পরশে দিব্য-জীবনে বিকাশ মর্ত্যে —
তোমার মহান্ জীবন বিকাশে জানিল তারা এ-স্বর্গ সত্যে।
ব্রহ্মচারী যে স্বাধিকারে তার, শুধু অমৃতেরি জপিল তৃষ্ণা,
প্রেমের মুকুট দেখি শিরে যার লাজে মুখ ঝাঁপে লালসা কৃষ্ণা,
যে তুমি বিলালে দুহাতে তোমার সাধনালব্ধ মণিকারত্ন
স্বার্থ ভুলিয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবায় রহিয়া মগ্ন !
সপ্ত ঋষির দেদীপ্যমান লোক হ'তে নেমে তব বরেণ্য —
জীবন আহুতি দিয়ে প্রেমানলে করেছিলে ধূলি ধরণী ধন্য।
এসো ফিরে আজ হে দেবদিশারি, বিলাতে মুগ্ধে মুক্তি শান্তি,
দিব্য তেজের ওঙ্কারে তব বিনাশি' বেসুরা বাসনা ভ্রান্তি।
জয়ের পথ বিদারে বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ বিবেকানন্দ —
দিলে তাহাদের তৃতীয় নয়ন — ছিল যারা মোহবাসনা অন্ধ।

সমালোচক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তি

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লোকান্তর গমণের পর প্রায় চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। বর্তমানকালের বাংলা-সাহিত্যের পাঠকগণের নিকট তাঁহার স্মৃতি কতখানি উজ্জ্বল আছে তাহার হিসাব করিলে দেখা যায় যে অল্পসংখ্যক গবেষক ও সাহিত্যানুরাগী ছাত্র ও পণ্ডিত-সমাজ ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষিতমহলে তাঁহার পরিচয় আজ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উনবিংশ শতাব্দীতে যেসকল মনীষী বাংলা-সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—তাঁহাদের সঙ্গে একাসনে বসিবার যোগ্যতা যদি কাহারো থাকে তবে নিঃসন্দেহে তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কলেজের ছাত্রজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্যের সাধনায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। বস্তুত বাংলা-সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে তাঁহার অবদান কতখানি তাহা আজ ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে অক্লান্ত অধ্যবসায়, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও আত্যন্তিক নিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হইয়া হরপ্রসাদ সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন তাহা সম্যকভাবে না বুঝিলে তাঁহার কৃতি ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হইবে না। তাঁহার বহুমুখী কর্মধারা কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অথবা হিন্দুধর্মশাস্ত্র ও দর্শন অনুশীলনের মধ্যে আবদ্ধ ছিলনা। বৌদ্ধসাহিত্য, বৈদিকসাহিত্য, স্মৃতি, ইতিবৃত্ত, ভূগোল, পুরাণ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ইত্যাদি ব্যতীত স্বদেশ, সমাজ ও মাতৃভাষার উৎকর্ষসাধনে তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন সমগ্র বাঙালী জাতি সেজন্য তাঁহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের অনুরাগী পাঠক তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। তাঁহার আবিষ্কৃত কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য পুঁথি যাহা তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ কতদূর উন্মুক্ত করিয়াছে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইবেনা। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাচ্যবিদ্যার আধুনিক গবেষণার মূলপত্তন যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিমভারতে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এবং পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কেবল মাত্র এই দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্বন্ধে ম াহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা সত্যই বলিয়াছেন: He of all people has been the real father of oriental research in north India"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত দুর্লভ পুঁথিগুলির মধ্যে বৃহৎধর্ম্মপুরাণ, বৃহৎস্বয়ম্ভুপুরাণ, চিত্তবিশুদ্ধি প্রকরণ, আনন্দ ভট্টকৃত 'বল্লাল চরিত,' সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রাম-চরিত' পণ্ডিত অশোক ও রত্নাকর শান্তি রচিত ছয়খানি বৌদ্ধ ন্যায়ের পুঁথি, অশ্বঘোষ কৃত 'সৌন্দরনন্দকাব্য,' কুমায়ুনরাজ রুদ্রদেব কৃত বাজপক্ষী-শিকার সম্বন্ধীয় 'শ্যৈনিক শাস্ত্র' (ইংরাজী অনুবাদ সহ) বিশেষ পরিচিত। এইগুলি ব্যতীত আর্য্যদেব কৃত 'চতুঃশতিকা' এবং 'অদ্বয় বজ্র সংগ্রহ' সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পুঁথি হিসাবে স্বীকৃত।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা অধিক নয়। ঐগুলির নাম যথাক্রমে "ভারত মহিলা" "বাল্মীকির জয়", 'সচিত্র রামায়ণ", "মেঘদূতব্যাখ্যা", "কাঞ্চন-মালা", "বেনের মেয়ে", "প্রাচীন বাংলার গৌরব", "বৌদ্ধ ধর্ম" ইত্যাদি।

আজিকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট এই গ্রন্থগুলির আবেদন হ্রাস হইলেও তাঁহার জীবদ্দশায় এইগুলি যে রসিকজন কর্তৃক সমাদৃত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ না করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমগ্র কীর্তির পরিচয় না দিয়া তাঁহার কৃতির একটি বিশেষদিকের সহিত পরিচয় করিব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে ডঃ সুশীল কুমার দে বলিয়াছেন, "প্রাচীন ভা'তের সাহিত্য, ধর্ম, ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতির কোনও দিকই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই; কিন্তু তাঁহার প্রধান আসক্তি ছিল দুইটি বিষয়—মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনা এবং নানাদিক দিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলীর গুণগ্রাহীতা" আমরা তাঁহার উপরোক্ত প্রধান দুইটি আসক্তির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম বিষয়টি বাদ দিয়া বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বাংলা সাহিত্যের সকল বিভাগই আজ সুসমৃদ্ধ। এমনকি সমালোচনা বিভাগ যাহা কিছুদিন পূর্বেও যথেষ্ট দৈন্যদশায় অবজ্ঞাত ছিল বর্তমানে তাহাও আশাতীত ঐশ্বর্য্যে ভূষিত হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীগণ বাংলাসাহিত্যের সমালোচনার প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে স্মরণীয় হইলেও বিজ্ঞানসম্মত বিচার-বুদ্ধি, অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী, সংস্কারমুক্ত মনন ও রীতি-সম্মত বাক্য ও যুক্তির প্রয়োগে সাহিত্যবিচারের পদ্ধতি বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, মোহিতলাল, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির দানে সাহিত্য-সমালোচনা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়। বলাবাহুল্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন বঙ্কিম প্রবর্তিত সমালোচনা-পদ্ধতির একান্ত অনুগামী এবং রাজেন্দ্রলালের ধারার অন্যতম উত্তরসাধক। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত যেসকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি একপ্রকার অনাদরের মনোভাব পোষণ করিতেন। ফলে ঐ সকল সংস্কৃতপন্থী উন্নাসিক-গণ বাংলাভাষায় যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন তাহাতেই সংস্কৃতবহুল শব্দ (তৎসম বা তদ্ভব) প্রয়োগ করিয়া নিজেদের অন্তরিতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু হর-প্রসাদ শাস্ত্রীর মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। তিনি আজীবনকাল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে পঠদশায় তথাকার খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী'র প্রেরণায় ও পরবর্তী যুগে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শ লাভ করিয়া তিনি সংস্কৃতবিরল খাঁটি বাংলা রচনার অভ্যাস করেন। উত্তরকালে তাঁহার বাংলার রচনারীতি বঙ্কিমচন্দ্রকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিল যে তিনি সপ্রশংসচিত্তে হরপ্রসাদকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"তুমি এমন বাংলা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া?" হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরিচিতি প্রদ'নকালে রবীন্দ্রনাথ যা•া বলিয়াছিলেন তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্র-নাথের মতে" হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন করে নিতে শিখেছিলেন।...বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই কিন্তু হরপ্রসাদ শ স্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে এবং তাঁর ছিল দর্শন-শক্তি।...তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না।"

একই সঙ্গে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ যাঁহার বাংলারচনার তারিফ করিয়াছেন তিনি যে বাংলাভাষাকে সত্য সত্যই শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন তাহা পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের প্রতি হরপ্রসাদ এত অনুরাগী ছিলেন যে যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতেই তিনি একাগ্রচিত্তে ইহার সর্বাঙ্গীন সম্প্রসারণে আত্ম-

নিয়োগ করেন। তাঁহার প্রথম রচিত বাংলাপ্রবন্ধ 'ভারত মহিলা' হোলকারের নিকট পুরস্কৃত হইলে তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতি দ্বিগুণিত হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক ব নানীত হইয়া ঐ রচনাটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৮২ মাঘ চৈত্র) হইলে পর তিনি অতিশয় উৎসাহিত বোধ করেন। বঙ্কিমসম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকাটি মাত্র চার বছর প্রকাশিত হইয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর একবছর অন্তে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় উহা পুনঃপ্রকাশিত হয়। সেই সময় হইতেই হরপ্রসাদ নিয়মিত বঙ্গদর্শনে নাম উল্লেখ না করিয়া বহুরচনা প্রকাশ করেন। এই সময় সাহিত্যের বিভিন্ন দিকব্যতীত স্বদেশ ও মাতৃভাষাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম জীবনের সাহিত্যবিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে 'বাংলাসাহিত্য বর্তমান শতাব্দীর' (ফাল্গুন ১২৮৭) এবং বাঙ্গালা ভাষা (শ্রাবণ ১২৮৮) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা তিনিই সর্বাগ্রে উল্লেখ করেন তাঁহার 'কলেজী শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে (ভাদ্র ১২৮৭)। অতঃপর আমরা হরপ্রসাদের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে মনোনিবেশ করিব এবং উহা হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধার করিয়া তাঁহার সাহিত্যে সমালোচনার বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করিব।

"বাঙ্গালাসাহিত্য-বর্তমান শতাব্দীর" প্রবন্ধে হরপ্রসাদ তদানীন্তন সাহিত্যের দুইজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ মধুসূদন ও বঙ্কিম চন্দ্রের রচনা আলোচনা করিয়াছেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনাকাব্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন: "কবি আমাদিগকে তাঁহার প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে স্বর্গনরক, ভূলোক, ভুবলোক স্বলোক সব দেখাইয়াছেন; উন্মত্ত কল্পনা উদ্দামভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইনি সকল ভাষায় ব্যুৎপন্নকেশরী ছিলেন, ইঁহার মনোমধ্যে নানাজাতীয় ভাবরাশি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইনি তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ধরিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী অত্যুৎকৃষ্ট নাটক। তাঁহার ব্রজাঙ্গনা গীতিকাব্য জয়দেবের সমস্থানীয়; তাঁহার বীরাঙ্গনা বীরাঙ্গনাগণের যোগ্যপাত্র।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসকে আলোচনাসূত্রে গ্রথিত করিয়া অতিশয় সংক্ষেপে তিনি যাহা মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সত্যই রসগ্রাহীচিত্তের পরিচায়ক।—" ইঁহার দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল ও কমলাকান্তের দপ্তর এক-একখানি এক-এক অদ্ভুত পদার্থ। ইঁহার গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য যে বঙ্গীয় পাঠকদিগের সম্মুখে এক একটি উৎকৃষ্ট পুরুষ ও উৎকৃষ্ট-নারীচরিত্র দেখান এবং আরও সৎপথভ্রষ্ট হইলে তাহার যে অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত তাহারও চিত্র দেখান। তাঁহার প্রতাপ পুরুষশিরোমণি, যেমন বুদ্ধি, যেমন বিজ্ঞতা যেমন কর্মক্ষমতা তেমনি উচ্চতর প্রেমাকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ আবার তেমনি ধর্মপথে মতিমান।... তাঁহার সূর্য্যমুখী, আয়েষা, ভ্রমর, ললিতলবঙ্গলতা এমন কি তাঁহার রূপসী-হীরা রোহিণী হইতেও আমরা উৎকৃষ্ট নীতিশিক্ষা পাইয়া থাকি।"

বঙ্কিমমণ্ডলের লেখকগণের মধ্যে চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। তিনি বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্ব্বে অভিজ্ঞান শকুন্তলের একটি উৎকৃষ্ট সমলোচনা লিখিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রবন্ধে সেই সমলোচনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন:" চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ-দর্শনে অভিজ্ঞান শকুন্তলের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা ইউরোপীয় সমালোচনা হইতে কোন অংশেই ম্লান নহে।"

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হরপ্রসাদের খ্যাতি প্রসারিত হয় এবং বিভিন্ন পত্রিকা হইতে তাঁহার রচনার জন্য আমন্ত্রণ আসিতে থাকে। ক্রমে তিনি সেকালের সকল সু-প্রচারিত পত্রিকা—যেমন সাহিত্য, আর্য্যদর্শন নারায়ণ, নব্যভারত, বিভা, কল্পনা ইত্যাদির লেখকগোষ্ঠীভুক্ত হইয়া নিয়মিত রচনা প্রদান করেন। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকাও তাঁহার রচনা প্রকাশ করিয়া নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। উপরোক্ত পত্রিকা ব্যতীত তিনি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, মানসীও

মর্মবাণী, উদ্বোধন, প্রাচী, প্রবর্তক ইত্যাদি বহু পত্রিকায় প্রায়শ রচনা প্রেরণ করেন। এই সকল পত্রিকা ভিন্ন আরও অনেক অল্পখ্যাত পত্রিকায় তাঁহার মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রকাশিত রচনার অধিকাংশই অদ্যাবধি কেবলমাত্র মাসিকপত্রিকা বা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ রহিয়াছে, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সুযোগলাভ করে নাই। তাঁহার যে গ্রন্থাবলীটি প্রচারিত আছে তাহাও বহুলাংশে অসম্পূর্ণ। শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের দেশে ইদানীং অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের পূর্ণাঙ্গ রচনাবলী বা তাহার সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের পর সুদীর্ঘ ষোল বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে তথাপি তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। কোনও সুবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে অগ্রণী হইলে হরপ্রসাদের প্রতি জাতীয় ঋণের কিছুটা মুক্তির পথ প্রস্তুত করিয়া দেশবাসীর নিকট কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে কালিদাসের রচনাবলীর রসবিচার সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। তিনি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তখনই সমগ্র রঘুবংশ তাঁহার মুখস্থ হইয়া যায়। রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট তিনি রঘুবংশের পাঠ গ্রহণ করেন। উত্তরকালে তিনি যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন সেইসময় কালিদাসের এই মহাকাব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ সকল প্রবন্ধগুলি হইতে কালিদাসের কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার বিচারভঙ্গী বিশ্লেষণী দৃষ্টি এবং অভিনব মূল্যায়নের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রঘুবংশ শীর্ষক প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৯০ সনের কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে তিনি 'রঘুবংশ' সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের মনে যে বহুকালাগত বিরূপ ধারণা ছিল তাহা অপনোদিত করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যরসপিপাসু কোন কোন ব্যক্তির মতে রঘুবংশ কালিদাসের কাব্যসমূহের মধ্যে অপকৃষ্ট ও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কাব্যের সমষ্টি। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'রঘুবংশ একখানি উৎকৃষ্টকাব্য ইহা কাব্যসংগ্রহ নহে একখানি কাব্য। অন্যান্য কাব্যের ন্যায় ইহার উদ্দেশ্য আছে, একতা আছে, উপদেশ আছে এবং গভীর অর্থ আছে। রঘুবংশের দৈর্ঘ্যই উহার নিন্দারকারণ।"

'রঘুবংশে'র মূলবৈশিষ্ট্য কি তাহা বুঝাইতে হরপ্রসাদ বলিয়াছেন "রঘুতে অলৌকিকের বাড়াবাড়ি নাই। লোকে যাহা দেখে, লোকে যাহা শুনে, লোকে যাহা শিখে তাহার উৎকৃষ্ট বস্তু লইয়াই রঘুবংশ।··· ব্রহ্মবল, ক্ষাত্রবল ও দৈববল এই মিলে রঘুবংশের উৎপত্তি।···রঘুবংশের রামচন্দ্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। বাল্মীকির রাম (Ideal) মনুষ্য, সদ্‌গুণীর মনুষ্যের চরম উৎকর্ষ। কালিদাস বাল্মীকির রামটি চুরি করিয়া লইলেন, অর্থাৎ দেখাইলেন যে রঘু, অজ ও দশরথ-বংশে যে রাজা হইবেন তিনি আদর্শ মনুষ্য হইবেন। রামায়ণের রাম একখানি ছবিতে একটি প্রতিকৃতি আর রঘুর রাম একখানি আলেখ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতির মধ্যে সকলের চেয়ে ভালটা। সামাজিক-দিগকে অবজ্ঞা করিয়া বিয়োগান্ত নাটক লেখা সুবিধা নয়। তাহাই (কালিদাস) একটি বংশের অদৃষ্ট সম্যকরূপে বর্ণনা করিয়া মনুষ্য অদৃষ্টের যথার্থ চিত্র দেখাইলেন।"

রঘুবংশের অপর বৈশিষ্ট্য আদর্শ বংশ বর্ণনা। হরপ্রসাদের ভাষায় "রঘুরাজা দিগ্বিজয়ীর আদর্শ, অজরাজা সহৃদয়তার আদর্শ, রাজাদশরথ বাসনাশক্তির আদর্শ, কুশরাজা রুচিমত্তার আদর্শ, অতিথিনীতিপরায়ণতার আদর্শ, সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য যে অগ্নিবর্ণ সেও বিলাসিতার আদর্শ। কালিদাস এই আদর্শসমূহের ঠিক মধ্যস্থলে বাল্মীকির সেই আদর্শ মনুষ্যকে বসাইয়াছেন।"

কালিদাসের অপরকাব্য কুমারসম্ভবের সহিত রঘুবংশের তুলনা করিয়া হরপ্রসাদ বলিয়াছেন: "আমাদের বিশ্বাস রঘুবংশই কালিদাসের শেষ লেখা। প্রথমতঃ রঘুবংশের রচনায় গাম্ভীর্য্য ও বৃদ্ধজনোচিত অহংকাররাহিত্য দৃষ্টিগোচর হয়। কুমারসম্ভবে

অলংকার ও ভাব (sentiment) রাশি রাশি পরিলক্ষিত হয়। রঘুবংশের সর্ব্বত্র কবিকল্পনার বীরত্ব ও কুমারে প্রাধর্য্য দেখা যায়। রঘুবংশ ও কুমারে অনেকগুলি শ্লোকই এক কিন্তু কুমারের বিবাহ বর্ণনা অনেক অধিক। কুমারের ভাষাও নানাস্থানে নানারূপ। কিন্তু রঘুতে সেরূপ নহে। তাষা প্রায়ই সর্ব্বত্র সমান সরল।

রঘুবংশের গাঁথুনি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কালিদাসের কাব্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় আলোচনা। বাল্মীকির রামায়ণ এবং কালিদাসের রঘুবংশ এই দুইটি মহাকাব্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং একই প্রেরণার অভিব্যক্তি। তবে রঘুবংশের সামান্ত এই প্রভেদ যে ইহাতে কালিদাস সূর্য্যবংশের সকল রাজার গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের সকলের উপর শ্রীরামচন্দ্রকে স্থাপিত করিয়াছেন। হরপ্রসাদের ভাষায় "এক এক রাজার এক এক গুণের চরম, আর রামচন্দ্রে সকল গুণের চরম। এই রঘুবংশের সূত্র। এই রঘুবংশের unity of action, এই রঘুবংশের মূল কথা, এই রঘুবংশের বীজ। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাণ।"

কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কালিদাস সম্বন্ধীয় একটি সুচিন্তিত আলোচনা। সকলদেশের সকল যুগের কবিগণের নিকট বসন্ত ঋতুর একটি 'বিশেষ আবেদন ও আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সংস্কৃত-সাহিত্যের সকল কবি তাঁহাদের কাব্যে এবং নাটকে বসন্তের সার্থক রূপবর্ণনায় অনেক শ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেকেই এই বিষয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তথাপি কালিদাসের বসন্ত বর্ণনার সহিত তুলনায় এইগুলি ম্লান হইয়া যায়। কালিদাস তাঁহার প্রত্যেকটি কাব্য বা নাটকে বসন্ত ঋতুর নিখুঁত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। ঋতুসংহারের ষষ্ঠ সর্গ, মালবিকাগ্নিমিত্রের তৃতীয় অঙ্ক, কুমার-সম্ভবের তৃতীয় সর্গ এবং রঘুবংশের নবম সর্গ কালিদাসের বসন্ত বর্ণনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথায় বলা যায় "কালিদাস কত যত্ন করিয়া, কত নিপুণ হইয়া প্রকৃতির কার্য্যকলাপ দেখিতেন, কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছোট বড় সবপ্রকারের সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেন এবং তাহাতে মাতোয়ারা হইয়া যাইতেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।" 'মেঘদূত' কালিদাসের অমর সৃষ্টি। কবির কল্পনা এই কাব্যে এমন এক উচ্চ শিখরে উন্নীত হইয়াছে যাহা যুগ যুগ ধরিয়া রসিকের বা প্রেমিকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। মাত্র একশত পনরটি শ্লোকে রচিত এই কাব্য অমরার অপূর্ব সৌন্দর্য্য মর্ত্ত্য মানুষের নিকট উপস্থাপনা করিয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'কবির কল্পনায় সমাজের, মনুষ্যের, সমাজ নিয়মের, মনুষ্যের সুখের যতদূর উৎকর্ষ কল্পনা করা যাইতে পারে এই জগৎ সেই উৎকর্ষ-সমূহের সমষ্টিমাত্র। পাঠক দেখিবেন হিমালয়ের ওদিকে তুষারধবল কৈলাসের উপরে ভারতভূমি হইতে দুর্ভেদ্য প্রাচীরমালার দ্বারা পৃথক কৃত করিয়া মহাকবি একটি মহানগরী সৃষ্টি করিয়াছেন। জলভরা মেঘে অনবরত গর্জ্জন ও বিদ্যুৎবিলসন হইলে উহার যেরূপ শোভা পায় সে নগরের শোভাও সেইরূপ। উহার বরাঙ্গনাগণ বিদ্যুৎবরণী স্থির সৌদামিনীতুল্য. উহার আলেখ্যসমূহ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিবিধ বর্ণে শোভিত, উহার মৃদঙ্গার ধ্বনি মেঘধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, উহার মণিময় তলদেশ বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল ও চাকচিক্য-ময়,; ছয়ঋতুরই ফলফুল উহার বায়ুকে নিত্য আমোদিত করিতেছে উহার পাদপসমূহ সকল সময়েই পুষ্পাভরণে ভূষিত থাকে, সকল সময়ে পদ্মপ্রস্ফুটিত থাকে আর তাহার পার্শ্বে হংসসমূহ সকল-কালে মেখলাকারে বিচরণ করে, সকল সময়ে ময়ূর সমূহ বিচিত্র পুচ্ছ বিস্তার করত জনগণের আনন্দসমূহ উৎপাদন করে। সর্ব্বরাত্রেই সুধাংশুদেব স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল কিরণমালা বিস্তার করিয়া উহার সুধাধবলিত হর্ম্ম্য-শ্রেণীকে শোভিত করেন।" কালিদাসের কল্পনায় যক্ষপুরী কেমন বস্তুরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা বুঝাইতে হরপ্রসাদ উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। ইহাতে কবিদৃষ্টির সহিত সমালোচকের রসজ্ঞতায় যে অপূর্ব্ব

বিলন হইয়াছে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কালিদাসের কবী-প্রতিভার সহিত বিধাতার সৃজনীশক্তির তুলনা করিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই মন্তব্য করিয়াছেন। "মানব চরিত্রের গূঢ়তত্ত্ব তাঁহার কিছুমাত্র অবিদিত নাই। তিনি দেখিয়াছেন যে এই সুখের সংসারে স্ত্রী পুরুষ যুবক-যুবতী কেহই বসিয়া থাকে না। সকলেই এই সুখাস্বাদে নিরন্তর ব্যাপৃত।"

সংস্কৃত কাব্যের বা নাটকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে উহার প্রেমিকগণ বিরহ বা বিচ্ছেদের কল্পনায় সিদ্ধহস্ত হইয়াও কখনও বিয়োগের শরণ লন নাই। ইহার ফলে সংস্কৃতে কোন কাব্য বা নাটকই বিয়োগান্ত হয় নাই। এই কারণটি সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতে হরপ্রসাদ বলিয়াছেন: "হিন্দুগণ স্বভাবকে জীবের অপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক ও উচ্চতর। জড়জগৎ প্রাণী-জগতের তুলনায় অতি তুচ্ছ পদার্থ। তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল বলিয়াই সংস্কৃতে বিয়োগান্ত কাব্য জন্মে নাই।"

কালিদাসের মেঘদূতকে গীতিকাব্যে অভিহিত করা যায় কিনা এই বিষয়ে পণ্ডিত ও আলঙ্কারিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা গিয়াছে। যে অর্থে জয়দেবের 'গীত গোবিন্দ'কে গীতিকাব্য বলা হয় কালিদাসের মেঘদূতকে সেই অর্থে গীতিকাব্য নিশ্চয়ই বলা যাইবে না। তথাপি ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্তমান যাহার জন্য ইহাকে গীতিকাব্য আখ্যা দিলে ভুল হইবে না। দৃঢ়তার সহিত তাহা সপ্রমাণ করিতে হরপ্রসাদ বলিয়াছেন: 'গীতগোবিন্দ গানময়, মেঘদূত ছন্দোময়। যে ছন্দে মেঘদূত লিখিত হইয়াছে তাহা গীত হইতে পারে সত্য এবং মন্দাক্রান্তা ছন্দঃ গীত হইলে সহৃদয়গণের হৃদয় উন্মত্ত করিতে পারে তাহাও সত্য। কিন্তু তথাপি ইহাকে গান নাই বলিয়া কেহ কেহ ইহাতে গীতিকাব্য বলিবেন না। না বলুন, আমরা ইহাকেই গীতিকাব্য বলি। বললে কোনও একটি ভাব হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া হৃদয়কে অধিকার করিয়া, পরিপূর্ণ করিয়া আপ্লুত করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া অথবা উচ্ছলিত করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, সেই ভাবপ্রকাশক কাব্যের নাম গীতিকাব্য। সমস্ত মেঘদূতে বরাবর প্রিয়ার জন্য সকাতরতা পরিদৃষ্ট হয়। সেইসঙ্গে স্বভাবের, মনুষ্যের এবং মনুষ্যহৃদয়ের সৌন্দর্য্য তাহার প্রগাঢ় সহানুভূতি মিশ্রিত হইয়া কাব্যকে জগতে অতুল করিয়া তুলিয়াছে।...(কবি) জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া রমণী সৌন্দর্য্য দ্বারা তাহার উপসংহার করিলেন। দেখাইলেন রমণী-সৌন্দর্য্য স্বভাব সৌন্দর্য্য হইতে উচ্চতর। উহাই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা। মেঘদূত গীতে রচিত না হইলেও ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গীতিকাব্য ভুবনে অতুল।"

প্রাচীন বাংলাকাব্য বলিতে আমরা যেসকল বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তাদের রচনা বুঝি তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। চণ্ডীদাসের কাব্য তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বাঙালী জাতির পুরুষ পরম্পরাগত বস্তুরূপে সমাদৃত এবং তাহার ঐতিহ্য সংস্কারের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়াছে। বাঙালীর শিরাধমনীতে যে গীতিকাব্যের প্রতি স্বভাবগত অনুরাগ বর্তমান তাহারও মূলে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গীতিঝঙ্কার অনুরণিত।

বাঙালীর জীবন সাধনায় যে আরাধ্যদেবতার অধিষ্ঠান তাহার সহিত এই দুই কবির কাব্য-কল্পনাও অনেকখানি আসন জুড়িয়া বসিয়াছে। যুগেযুগে জ্ঞানী মনীষী ও রসজ্ঞগণ এই দুই কবির কাব্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া এবং ইহার অন্তর্নিহিত রস-কল্পনার নিঃস্রবণকে উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বর্তমান আলোচনার স্বল্পপরিসরে সেই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ সম্ভব না হওয়ায় কেবলমাত্র সংক্ষেপে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইতেছে।

প্রাচীন বাংলাকাব্যের গবেষকগণ দেখাইয়াছেন যে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্যই বাংলাসাহিত্যের মূল-পুঁথি যাহাকে অবলম্বন করিয়া জয়দেব তাঁহার গীত-গোবিন্দ রচনা করিয়াছেন। এই চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাস নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের

সমসাময়িক কবি এবং ইঁহার পুঁথির হস্তাক্ষর পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে এই কাব্য ইংরাজী ১৩০০ হইতে ১৪০০ সনের মধ্যে রচিত হয়। অপর যিনি চণ্ডীদাস দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে খ্যাত তিনি ১৪।১৫ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চারণকবি ছিলেন। খেয়ালমত গান বাঁধিতেন কিন্তু কোন বই লিখিয়া যান নাই।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথি সম্বন্ধে হরপ্রসাদ বলিয়াছেন: "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিখানি মোটামুটি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। ইহারও পালাগুলির নাম খণ্ড। বড়ু চণ্ডীদাসের বইখানি কৃষ্ণের ইতিহাস। তাঁহার জন্ম হইতে রাধিকার বিরহ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে; বাকী কতদূর ছিল জানিনা।

জয়দেব ও চণ্ডীদাস উভয় কবির কাব্যই বসন্ত-বর্ণনা দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে এবং উভয়ের মানভঞ্জন অধ্যায়টি বিশ্লেষণ করিলে অনুমান করা যায় যে জয়দেব চণ্ডীদাসের কাব্য হইতে মানভঞ্জন পর্ব্বটি কল্পনা করিয়াছেন। তবে জয়দেবের পাণ্ডিত্য ও কবিকল্পনার প্রাখর্য্য থাকায় তিনি অলঙ্কারের প্রয়োগে উহাকে চণ্ডীদাস অপেক্ষা সুন্দরতর করিয়াছেন।

হরপ্রসাদের মতে "তিনি (জয়দেব) উচ্চজনের কবি, সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; বড়ু একজন ভাষাকবি, বলিতে গেলে একরকম মেঠোকবি। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্নের একরত্ন। তিনি রাজকবি। বড়ু চণ্ডীদাস সাধারণ লোকের জন্য পাঁচালী ও গীত লিখিয়াছেন। জয়দেব চণ্ডীদাসের গোয়াল-গোয়ালিনীদের যে সমস্ত ব্যাপার আছে সব নিঃশব্দে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি একজন বড় কবি, পরের জিনিষ ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া অলঙ্কার-শাস্ত্রের সামঞ্জস্য রাখিয়া কেমন করিয়া কাব্য লিখিতে হয় ঠিক জানেন।......জয়দেবের বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী' এই গানটির বৃন্দাবন খণ্ডের সহিত 'যদি কছু বোল বোলসি তবেঁ দশনরুচি তোহ্মারে' এই গানটি মন দিয়া তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, চণ্ডী-দাসের গানটি জয়দেব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কেননা জয়দেবের অমন অলোকসামান্য গানের পর চণ্ডীদাস ওরূপ গান লিখিতে কখনই সাহস করিবেননা। জয়দেব আরও অনেক জায়গায় চণ্ডীদাসের গানের পাপড়ীগুলি লইয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।"

কাব্যরসিক বাঙালী-জাতির হৃদয়ে বিদ্যাপতির আসনও অনেক উঁচে। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হইলেও তাঁহার গানের প্রতি বাঙালীর সহজাত অনুরাগ রহিয়া গিয়াছে। কথিত আছে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতির গানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষার অনুসরণে যে ব্রজবুলির উদ্ভব হয় তাহা হইতেই গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও রায়শেখর প্রভৃতি পদকর্ত্তাদের কাব্য জন্মলাভ করিয়াছে। বহু গবেষণার ফলে হর-প্রসাদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন—"বিদ্যাপতি কিন্তু সহজিয়াও ছিলেননা, বৈষ্ণবও ছিলেন না। তিনি মিথিলা বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন। অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ, সূর্য্য, শিব, বিষ্ণু, ও দুর্গা এই পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতেন।...স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল ইহা ব্যতীত তিনি 'ভূপরিক্রমা' (এখনকার গেজেটিয়ারের মত) পুরুষ পরীক্ষা গয়ত্তত্ত্ব লিখনাবলী (পত্রলিখিবার ধারা) দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী (দুর্গাপূজাবিধি) প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যেমন কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের পদ লিখিয়াছেন, তেমনি শিব ও গঙ্গার বিষয়ে অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন।"

বিদ্যাপতির কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ বলিয়াছেন: "বিদ্যাপতি যে সকল পদ লিখিয়াছেন তাহার অনেকই মাত্র আদিরসের, রাধাকৃষ্ণ বা বৈষ্ণবের পদ নয়। বিদ্যাপতি অনেক জায়গায় ঋতুবর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা অতি মিষ্ট সুরঅতি মিষ্ট, সংস্কৃত ঋতুবর্ণনায় যা কিছু মিষ্ট আছে সব আনিয়া এক করা হইয়াছে। গানগুলি কিন্তু ছোট। বিদ্যাপতি কীর্ত্তনের গান লিখেন নাই। তাঁহার দুদশটি গান লইয়া কীর্ত্তনীয়ারা তাহাদের কীর্ত্তনে যোগ করিয়াছে মাত্র।"

বিদ্যাপতির কবিমানস বা কাব্যপ্রেরণার মূল কি তাহা বুঝাইতে হরপ্রসাদ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, "তিনি সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আদিরস সৌন্দর্য্যের খনি। তিনি বহু-সংখ্যক আদিরসের গান লিখিয়া গিয়াছেন। অনেক সময় কৃষ্ণরাধা উপলক্ষ্য মাত্র, আদিরসই প্রধান লক্ষ্য। মিথিলার রাজসভায় ব্রাহ্মণরাজার সভাষদগণের মধ্যে বাহিরে একটি পবিত্র ভাব দেখান খুব দরকার ছিল। বিদ্যাপতি তাহা বেশ দেখাইয়াছেন।"

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে 'ধর্ম্মমঙ্গল' সুপরিচিত। প্রাচীন পুঁথি ও পুরাকীর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচকদের মতে স্কন্দ পুরাণ হইতে ধর্ম্মায়ণের আদি কাব্য রচনা করেন কবি ময়ূরভট্ট। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া খেলারাম, রূপরাম, ঘনরাম প্রমুখ কবিগণ এইজাতীয় কাব্যরচনায় ব্রতীহন। অতঃপর রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মমঙ্গল গীত রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রমাই পণ্ডিতের "ধর্ম্মমঙ্গল" পুঁথিটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমকালীন আবিষ্কৃত পুঁথির অন্যতম। পুঁথির আলোচনা প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ ধর্ম্মঠাকুরের পরিচয় প্রদান করিতে বলিয়াছেন: ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের উপর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মস্বরূপ। ধর্ম্মঠাকুরের পুঁথি পড়িতে গেলেই একজন লোকের নাম সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহার নাম রমাই পণ্ডিত। ঘনরামের মতে ইনি জাতিতে বাইতি, ময়নাগড়ের কিছু দূরে ইনি ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিতেন। ইনি ধর্ম্ম-পূজার আদি গুরু। রমাই পণ্ডিতের পুঁথিতে শ্রীনিরঞ্জন উষ্মা নামে একটি অধ্যায় আছে, সেটি ছোট সকল স্থলে অর্থবোধ হয় না কিন্তু যাহা হয় তাহাতেই ভক্তগণের হিন্দুদ্বেষ ও যবন মৈত্রী প্রকাশ পায়।

ধর্ম্মঠাকুর বঙ্গদেশের এক মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি যেখানে বর্ত্তমান, সেইখানেই অনাচরণীয় জাতির সংখ্যা অধিক এবং মঙ্গল কম। রাঢ়ে এইভাব, দক্ষিণেও এইভাব; কিন্তু পূর্ব ও মধ্য বাঙ্গলার ভাব স্বতন্ত্র, সেখানে মুসলমান অধিক, অনাচরণীয় জাতিকম।"

পরিশেষে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাহা বলিয়াছেন সব ধর্ম্ম মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য: "যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হইল যে ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ। বৌদ্ধরা তো আপনাদিগকে কখনও বৌদ্ধ বলিতনা, তাহারা আপন ধর্ম্মকে সদ্ধর্ম বা ধর্ম বলিত। সেই ধর্ম্মনামটাই বজায় রহিয়াছে।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কেবল সংস্কৃত সাহিত্য এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলনেও তিনি যথেষ্ট প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' নামক প্রবন্ধটি এই উক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই রচনাটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (বৈশাখ ১২৮৫) প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য এই জাতীয় তুলনা মূলক আলোচনা সেযুগে খুবই বিরল ছিল। হরপ্রসাদ বহু তথ্যসম্ভারে এই চিন্তাপূর্ণ আলোচনাটি রচনা করিয়া বিদগ্ধসমাজে পরিবেশন করেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির খ্যাতি যিনি অর্জন করিয়াছেন সেই সেক্সপিয়রের অমর রচনাবলীর রস বিচার করিয়া হরপ্রসাদ তাহার সহিত ভারতের কবিকুলচূড়ামণী কালিদাসের কবিকর্ম্মের রসবিশ্লেষণ করিয়া যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার মনোজ্ঞতা কেবলমাত্র রসিক পাঠকেরই সমাদরের বস্তু। এমন সুসংহত ও সারগর্ভ আলোচনা বাংলা সাহিত্যের মূল্য-বান সামগ্রী। ইঁহার ভাষা যেমন সুনিপুণ, আলোচ্য বস্তু তেমনি ভাবগম্ভীর। হরপ্রসাদ প্রথমেই দুই কবির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যটি ইঙ্গিত করিতে বলিয়াছেন:

"কালিদাস একজন সুনিপুণ চিত্রকর। রঙ ফলাইতে অদ্বিতীয়। সেড দিবার ক্ষমতাও খুব আছে। সকলের অপেক্ষা তাঁহার বাহাদুরী সাজানোতে আর বাছিয়া লওয়াতে। তিনি চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন ও কবির কলমে লিখিতেন। প্রকৃতিতে যা কিছু আছে সবই সুন্দর, অথবা লিপিচাতুর্যে সবই সুন্দর করিয়া তুলিব এভাব তাঁহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। তিনি স্বভাব-শোভা কাহাকে বলে জানিতেন, চিনিতেন এবং সেগুলি বাছিয়া লইতে ও সাজাইতে খুব মজবুত ছিলেন। সেক্স-

পীয়রের পক্ষে বাছিয়া লইবার কিছু দরকার ছিলনা। তাঁহারা চুইচক্ষে যাহাই পড়িত, তাহাই লইতেন, কিন্তু কাজের সময় সেগুলিকে ছাঁটিয়া পরিষ্কার করিয়া নিজ ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতেন। সৌন্দর্য্য বাছিয়া লইবার তাঁহার দরকার ছিলনা, যে হেতু অসুন্দরকে সুন্দর করিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। অসুন্দর বস্তুর উপর কালিদাসের এমনি বিতৃষ্ণা যে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থমধ্যে কোথাও পাপের বর্ণনা বা কোন বীভৎস রসের বর্ণনা নাই। কিন্তু সেক্সপীয়রের পাপের ছবিই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত। আমরা কালিদাসে শ্মশান বর্ণনা পাইনা, নরক বর্ণনা পাইনা, ম্যাকবেথ পাইনা, ইয়াগোও পাইনা। কিন্তু সেক্সপীয়রের অদ্ভুত পাপ সৃষ্টি ব্যালিবান্‌কে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিনা।"

সাধারণতঃ প্রতিভাবান কবিগণ কাব্যরচনায় যে দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি করেন তাহার মধ্যে আন্তর্জ্জগৎ বা মানুষের মন অথবা বাহ্যজগৎ বা প্রকৃতিরাজ্য প্রাধান্যলাভ করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে কালিদাস এই উভয় বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার কাব্যপ্রণয়নে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কালিদাসের দৃষ্টিতে রমণীগণ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য রূপে প্রতিভাত হইয়াছে এবং রমণীহৃদয়ের পবিত্র প্রণয় সুন্দরতর রূপে তিনি লেখনিচিত্রণে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে রমণীহৃদয়ের প্রণয় তাহার তির্য্যকরূপ লইয়া প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার গতি যেখানে ঋজুতাকে পরিহার করিবা সরলতা কোমলতাকে পরিত্যাগ করিয়া বক্রকুটিল পন্থায় ছুটিয়া গিয়াছে সেই হৃদয়বৃত্তির চুর্বার ও চুর্দ্দমনীয় অবস্থাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে যিনি সার্থকভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি শিল্পীশ্রেষ্ঠ সেক্সপীয়র। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথায় বলা চলে "কিন্তু যেখানে দশপনরটি পরস্পরবিরোধীভাব যুগপৎ উদয় হইয়া অন্তরাকাশকে অন্ধকার করে, যেখানে হৃদয়ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত, যেখানে ভাবসন্ধি ভাবসবল হইবার কথা সেখানে কালিদাস আসিবেন না, সেখানে সেক্সপীয়র ভিন্ন গতি নাই।"

অতঃপর সেক্সপীয়রের সাহিত্যের মূলগত তথ্যটি উদ্ঘাটন করিতে হরপ্রসাদ যা বলিয়াছেন তা প্রণিধানযোগ্য : "সেক্সপীয়র মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন। তুমি যেমন চাও সেক্সপীয়র তেমনি মানুষ তোমায় দিবেন। তুমি শকুন্তলার মত সরলা মুগ্ধহৃদয়া সামাজিক কুটিলতা-অনভিজ্ঞা বালিকা চাও মিরান্দা দেশদিমোনা লও। পাকা গিন্নী ঘরকন্নায় মজবুত, ভাজে না, মোচকায় না এমন মেয়ে চাও তোমার জন্য ডেমকুইলী আছে। পতিপরায়ণা পতিব্রতা যুবতী চাও পোর্শিয়া আছে। জগৎমোহিত করিবার জন্য মায়াজাল ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। যে জালে পা দিতেছে তাহারই সর্ব্বনাশ করিতেছেন। এমন চুর্বুদ্ধিশালিনী ভুবনমোহিনী চাও ক্লিওপেট্রা আছে। চুরাকাঙ্খায় জর্জ্জরিতহৃদয়া লোকের উপর অধিপত্য করিবার ইচ্ছায় পাষাণবৎ দৃঢ়সংকল্প পুরুষকে পাপে প্রেরণ করিবার জন্য শয়তানরূপিণী পাপিষ্ঠা দেখিতে চাও লেডি ম্যাকবেথ আছে।"

আসলে কালিদাসের ধ্যেয় বস্তু কি তাহার দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিতে হরপ্রসাদ বলিয়াছেন : "কালিদাস মনুষ্যহৃদয়ের সুন্দর অংশ দেখাইতে পারেন। উদাহরণ, তিনি কণ্বমুনিকে শকুন্তলার ঠিক যাত্রার সময় বাহির করিলেন। যেহেতু কন্যা প্রেরণের সময় পিতার কান্না বড়ই সুন্দর। সেটি দেখান হইল অমনি কণ্বমুনি ডিসমিস। কালিদাস তাঁহাকে একেবারে লুকাইয়া ফেলিলেন আর বাহির করিলেন না।"

আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠকালে ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণ হয়তো মনে করিবেন যে হরপ্রসাদ স্বয়ং সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত থাকার দরুন এবং কালিদাসের কাব্যের প্রতি তাঁহার স্বভাবগত অনুরাগের ফলে তিনি সেক্সপীয়রের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছেন। অর্থাৎ সেক্সপীয়রকে কেবলমাত্র অসুন্দর বস্তুর নির্মাতারূপেই তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। সেক্সপীয়রের সিদ্ধপ্রতিভা যে অসুন্দর সৃষ্টিতে যেমন সিদ্ধহস্ত তেমনি সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনেও

পশ্চাৎপদ হন নাই তাহা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন: কালিদাস গ্রথিত সৌন্দর্য সেক্সপীয়রেরও আছে। কালিদাসের পুরূরবা, কালিদাসের শকুন্তলা অন্যত্র মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু সেক্সপীয়রের প্রসপেরো আর কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রসপেরোর স্বভাব মনুষ্যহৃদয়গত সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা।...তবে সেক্সপীয়রের স্পিরিট বা পরিস্থান সেটি যেমন নূতন তেমনি সুন্দর, সবই মনুষ্যের মত কিন্তু কেমন পবিত্র আনন্দময় কোনরূপ শোক দুঃখ নাই। শোক দুঃখ যে বৃত্তিদ্বারা অনুভব হয় সে বৃত্তিও তাহাদের নাই। অথচ মানুষের কষ্ট দেখিলে মনটা কেমন হয়।"

সেক্সপীয়রের অপর বৈশিষ্ট কি যাহা কালিদাসে অবর্তমান তাহার সম্বন্ধে হরপ্রসাদ এই উক্তি করিয়াছেন: "কালিদাস এক পার্ব্বতীর তপস্যা ভিন্ন আর কোথাও বিস্ময়উদয়করণে সমর্থ হন নাই। সেক্সপীয়রের এরূপ বিস্ময়উৎপাদক মনুষ্যহৃদয়ের চিত্র অসংখ্য। সর্ব্বপ্রধান লেডী ম্যাকবেথ, একবার অনুতাপ নাই বরং প্রতিজ্ঞা একবার যখন নামিয়াছি দেখাযাক পাতাল কতদূর। একবারও হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রকাশ নাই। কেমন প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব!......সেক্সপীয়রের হাস্যরসকর চরিত্র বর্ণনা এক আশ্চর্য জিনিষ। প্যারোলস ফলস্টাফের সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাসের বিদূষকগুলি কোন কর্ম্মেরই নহে। জীবনমূল্য প্রভাশূন্য খোসামুদে বামন মাত্র।"

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রোজন। বস্তুত: কালিদাস সম্বন্ধে হরপ্রসাদের শেষ কথা "বাহ্যজগৎ বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয় সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নাই সত্য তবে উপসংহারে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন অর্থাৎ সেক্সপীয়র মহাকাব্য লিখিতে গিয়া যেরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন কালিদাসকে সেরূপ হইতে হয় নাই। সেক্সপীয়রের শ্রব্যকাব্য প্রায় লোকে পড়ে না। কালিদাসের শ্রব্যকাব্যগুলি—রঘু, কুমার, ঋতুসংহার সকলই পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদরের বস্তু—এই বিষয়ে সমালোচকগণ নিশ্চয়ই একমত হইতে পরিবেন না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ যাহা গ্রন্থাকারে অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই এবং মাসিকপত্রিকার পৃষ্ঠায় আবদ্ধ রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। বর্ত্তমান আলোচনার পরিধিতে সেইগুলির প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা বা পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নয়। সেই কারণে কয়েকটি বাছিয়া লইয়া এই প্রবন্ধের অঙ্গীভূত করা হইতেছে। বলাবাহুল্য ঐগুলি হরপ্রসাদের সমালোচনাকীর্ত্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

বাংলাসাহিত্যের গবেষকগণ সম্প্রতি বহু অনুসন্ধানের পর ফুলমনি ও করুণা নামে বাংলা উপন্যাসের প্রথম নিদর্শনটি আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও বাংলাসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলিলে প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালকে বুঝাইত। প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ ঠাকুরের ছদ্মনামে স্বসম্পাদিত মাসিক পত্রিকায় আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত করেন। বাংলাসাহিত্যে কথ্যভাষার প্রথম পরীক্ষা এই গ্রন্থ হইতেই সুরু হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র নামক প্রবন্ধে হরপ্রসাদ লিখিয়াছেন: "তিনি বুঝিয়াছিলেন সাধুভাষা লোকে পড়িতে পারেন না, বুঝিতে পারেন না, সুতরাং সেভাষায় লেখা আর না লেখা দুই সমান। তাই তিনি চলিত বাংলা ধরেন। আগে বাংলা গদ্যে বই লেখা হইত—তার বিষয় হয় সংস্কৃত হইতে নেওয়া, নয় বিচার, না হয় নাটক ও নভেল—রুচি এমন কদাকার যে স্ত্রীলোকের হাতে কোনমতেই দেওয়া যায়না।...... বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথমে দেখাইয়াছেন যে বাংলাদেশেও ঘরের কথা লইয়া বই লেখা যায়, আর সে বই পড়িবার মতনও হয়।

অলঙ্কারে যাহাকে দোষ বলে, পদাংশদোষ, পদদোষ, শব্দদোষ, অর্থদোষ, বাক্যদোষ প্যারীচাঁদ বাবুর বইয়ে সবই আছে। কিন্তু তাঁহার বর্ণনার শক্তি অদ্ভুত পড়িবার সময় মনে হয়, জিনিসটা চোখে দেখিতেছি। বইগুলি এক একখানি এলবাম-তাতে কত কত পুরান ছবি রহিয়াছে। আলালের ঘরের দুলালে ব্লাকিয়ার সাহেবের চেহারা, ব্লাকিয়ার সাহেবের আদালত, সুপ্রীমকোর্টের গ্র্যাণ্ডজুরী,

পেটাভুরী প্রভৃতির ছবিগুলি যেন পরস্পর সাজান আছে। রচনা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। প্যারীবাবুর রচনার একটি বিশেষ গুণ এইযে ইংরাজীতে যাহাকে Humour বলে তাহাতে উহা পরিপূর্ণ। তিনি যেসকল মনুষ্যের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলিবেশ টিকল হইয়াছে।......তাঁহার বইগুলি বাংলায় লেখা হইলেও তিনি ইংরাজীতেই প্রায় ভূমিকা লিখিতেন। এইসব হইলেও তিনি কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাংলার জন্ত তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। বাংলার মেয়ে ও পুরুষ যাতে ভাল হয়, তিনি তাঁহার চেষ্টা করিতেন।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পূর্ব্ববর্ণিত বিভিন্ন সমালোচনা প্রবন্ধ হইতে যে বিষয়টি সহজেই অনুমান করা যায় তাহা এইযে তিনি বঙ্কিমপ্রবর্ত্তিত সমালোচনানীতির সমর্থক ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অনেকখানি ছিল। বঙ্গদর্শন পত্রিকা হইতেই তাঁহার সাহিত্যজীবনের সূচনা হওয়ার ফলে বঙ্কিম-মণ্ডলের বিভিন্ন লেখকগণের ন্যায় মতাদর্শ, ভাষাবৈচিত্র এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হরপ্রসাদকে বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত অনুগামী হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে বঙ্কিমপূর্ব যুগে সংস্কৃত পণ্ডিত ও আলঙ্কারিকদের নির্দ্দিষ্ট পন্থার অক্ষম অনুসরণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ভবভূতির উত্তরধারে কাব্য সমালোচনায় দেখাইয়া দেন যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের রীতি অনুযায়ী কাব্যের সমালোচনায় তাহার রসমাধুর্য্য বা মর্ম্মার্থ যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এই প্রবন্ধে তিনি ইংরাজ কবিসমালোচক ম্যাথুআর্ণল্ডএর এবং ইংরাজী সাহিত্যের অন্যান্য বিখ্যাত আলোচকগণের বিচারপদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে বাংলাসাহিত্য বিশ্লেষণের নব্য ধারার প্রবর্ত্তন করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও তাঁহার 'বঙ্কিমবাবু' ও উত্তর চরিত প্রবন্ধে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন। আমাদের দেশের সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে ভবভূতি-মাঘ, ভারবি এবং শ্রীহর্ষ অপেক্ষা অল্প কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ভবভূতির উত্তরচরিত বঙ্কিমের কি পরিমাণ প্রিয়বস্তু ছিল তাহার বর্ণনা প্রদান করিতে হরপ্রসাদ বলিয়াছেন; "বঙ্কিমবাবুর হৃদয় ছিল, তিনি এ নাটকখানির মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন, তাই তাহা স্বদেশবাসীগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সাহসও প্রকাশ পাইয়াছে, কারণ তখন ইউরোপীয় ধরনে কাব্যপরীক্ষা এদেশে আরম্ভ হয় নাই। এদেশের পণ্ডিতেরা 'সাহিত্য দর্পণ' কাব্য প্রকাশ প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থের মত অনুসারে কাব্য পরীক্ষা করিতেন। বঙ্কিমবাবু একেবারে সে মত ত্যাগ করিয়া নূতন ইউরোপের নূতন ধরণের উত্তর চরিত সমালোচনা করিতে বসিলেন।......উত্তর চরিত্র পরীক্ষা করিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু আলঙ্কারিকগণকে অত্যন্ত ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তিনি লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে উঁহারা যেভাবে কাব্য বা নাটক বুঝাইতে চান সেভাবে কাব্যনাটকের ভিতরে প্রবেশ করা যায়না।"

"ভবভূতি সম্বন্ধে হরপ্রসাদ যে উক্তিটি করিয়াছেন তাহা সকল রসিক ব্যক্তির বিশেষভাবে স্মরণীয় "ভবভূতি সংস্কৃতের শেষ কবি, ভাবের শেষ কবি, প্রতিভার শেষ কবি।"

বঙ্কিমশিষ্য হরপ্রসাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রচনায় স্বীয় গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করিয়াছেন। ঐ সকল প্রবন্ধগুলি একত্রিত করিয়া একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলে বঙ্কিমসাহিত্য সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্য এযুগের পাঠকের নিকট উপলব্ধি হইতে পারিবে। আমরা বর্ত্তমান আলোচনায় তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ বিষয়ীভূত করিতেছি। দুইটি প্রবন্ধই 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামে যথাক্রমে 'নারায়ণ' (আষাঢ় ১৩২৫) ও 'বসুমতী, (শ্রাবণ ১৩১১) পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। এই দুই প্রবন্ধেই হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্যসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল অনুপ্রেরণা ছিল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। এই কারণে তিনি অসুন্দরকে আদৌ প্রশ্রয় দিতে চান নাই। সমাজের মধ্যেও যেমন ব্যক্তিজীবনেও তেমনি নীতিনিষ্ঠ আদর্শের প্রচারক

ছিলেন। সর্বোপরি তাঁহার অকৃত্রিম দেশপ্রেম জন্মভূমির প্রতি অভিন্ন অনুরাগে আবদ্ধ রাখিয়া ছিল। হরপ্রসাদের কথায় বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি হইতে আমরা এখানকার কার সমাজে কোথায় কি জিনিষ সুন্দর আছে তাহা দেখিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছি। হীরার ঘরের আলোচনানাটি হইতে আরম্ভ করিয়া নগেন্দ্রনাথের বৈঠকখানার পেন্টিং পর্যন্ত সব জায়গায়ই তাঁহার চক্ষু গিয়াছিল এবং আমাদেরও চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু আমাদের দেশের সৌন্দর্য্য সব ফুটাইয়া দিয়া আমাদিগকে দেশ ভালবাসিতে শিখাইয়াছেন।"

বঙ্কিমসম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা সেযুগের শিক্ষিত-সমাজে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে সম্যক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবকে বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি কবি কালিদাসের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন 'সমাগত রাজবৎ উন্নতধ্বনি'। বঙ্গদর্শন সম্পাদনায় বঙ্কিমের কৃতিত্ব কি তাহা বুঝাইতে হরপ্রসাদ বলিয়াছেন, "সরল ভাষায় সরলরীতিতেই দর্শন বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বসকল সাধারণের সম্মুখে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম ধরিয়াছিলেন।"

অতঃপর হরপ্রসাদ যাহা বলিয়াছেন তাহা বর্তমান কালের পাঠকগণের নিকট অতিশয়োক্তি বিবেচিত হইলেও প্রণিধানযোগ্য "বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু করিয়াছেন ইচ্ছায় করুন বা অনিচ্ছায় করুন, জানিয়া করুন বা না জানিয়া করুন—সব গিয়া এক পথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা—জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তিকরা। তিনি এই যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে হরপ্রসাদের অপর প্রবন্ধটি নানা কারণে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার সাহিত্যের আধুনিক পাঠক বা সমালোচকগণ যে বঙ্কিমসাহিত্য সম্পর্কে সমান অনুরাগী নন তাহা বলার অপেক্ষা রাখেনা। বিশেষতঃ যাঁহারা উগ্রমতাবলম্বী তাঁহারা যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যথেষ্ট বিরূপ ধারণা পোষণ করেন তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ যাঁহাদের বিচারবুদ্ধি কিছুটা রাজনৈতিক মতবাদের তাড়নায় পরিচালিত তাঁহাদের দৃষ্টিতে বঙ্কিম সাহিত্য গণ-সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত নয় এবং বুর্জোয়া সাহিত্যের নামান্তর। এইসকল উৎকট আদর্শবাদী এবং সাহিত্য-বেরসিকদের কথা চিন্তা করিয়াই যেন হরপ্রসাদ লিখিয়াছিলেন :"বঙ্কিমবাবু খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন না। তিনি বড় বড় জিনিষগুলিকেই দেখিতেন, তাই তাঁহার বইয়ে দুঃখী গরীবের স্থান নাই; যাহারা খেটে খায় তাহাদের স্থান নাই। তাঁহার সকল নায়কনায়িকাই বড় মানুষ। অভাবের তাড়নায় তাহারা ক্লেশ পায় না। তাহাদের যাহা ক্লেশ আছে তাহা কেবল প্রেমের তাড়না। দুই পুরুষ এক মেয়েকে ভালোবাসে বা এক পুরুষকে দুই মেয়ে ভালোবাসে, এই তাঁর গল্পের মূলমন্ত্র। কিন্তু ইহারই মধ্যে তিনি এত বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন যে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কখনও একঘেয়ে হয় নাই, দুইটি গল্পও কোনমতেই এক নহে। একখানা বইয়ে দুইটি গল্প মিলাইবার চেষ্টা তিনি মাত্র দুইবার করিয়াছেন। এক বিষবৃক্ষে আর একবার চন্দ্র-শেখরে। বিষবৃক্ষে তিনি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রশেখরে বঙ্কিমবাবুর কল্পনার দৌড় সকলের চেয়ে বেশী। শৈবলিনীর স্বপ্নের মত প্রকাণ্ড জিনিষ বাঙ্গালায় আর নাই।"

বঙ্কিমবাবু অত্যন্ত স্বনিষ্ঠ লেখক ছিলেন। তাঁহার দূরদর্শিতা এত গভীর ছিল যে বাহিরের সকলপ্রকার বাধাকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়া অপ্রতিহত গতিতে স্বীয় বিচারবুদ্ধির প্রেরণায় তিনি অগ্রসর হইতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের এই বিশালতাই তাঁহাকে সর্ব্বকার্য্যে বিজয়ীর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বঙ্কিমচরিত্রের এই দিকটি ফুটাইয়া তুলিতে হরপ্রসাদ এমন একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন যাহা ঐতিহাসিক তথ্যহিসাবে অতিশয় মূল্যবান : "বঙ্কিমবাবুর এমন একটা কিছু ছিল যাহাতে তিনি অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন এবং যাহা তাঁহার চেলাদের ছিল না। এইটেই তাঁহার বিশেষত্ব এইটেই তাঁহার প্রতিভা। তিনি বন্দেমাতর

গান লিখিয়া বেহিম সকলকে শুনাইলেন সকলেই আপত্তি করিল, কেহ ভাবের আপত্তি করিল, কেহ বলিল কটমট হইয়াছে, কেহ বলিল বাঙ্গালায় সংস্কৃত মিশিয়া একটা অদ্ভুত জিনিষ হইয়াছে, কেহ বলিল বিটকেল হইয়াছে, কেহ বলিল মলয়জ শীতলাং শীএর ঈকারের জন্য শ্রুতিকটু হইয়াছে, কিন্তু বঙ্কিমবাবু কাহারও কথা শুনিলেন না, আপনার গোঁএ উহা ছাপাইয়া দিলেন।"

বঙ্কিমমণ্ডলের বিভিন্ন লেখকগণের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার অধিকতর শক্তিশালী লেখক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত 'নবজীবন' ও 'সাধারণী' পত্রিকায় বাংলা সাহিত্যের সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিকই রচনা প্রদান করিয়া গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 'নবজীবন' ও 'সাধারণীর' সমালোচনা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই দুই পত্রিকায় 'শুধুই রহস্য' 'নূতন মতে নূতন পঞ্জিকা', 'চনকচূর্ণ বা চানাচুর' 'শুকশারী সংবাদ', 'নব বোধোদয়', 'নবজীবনের আট কৌড়ে' 'ভাই হাতভালি' ইত্যাদি রসরচনা বা ব্যঙ্গরচনা ব্যতীত অনেক গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে সুচিন্তিত সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন।

'বঙ্গদর্শনগোষ্ঠী'র লেখকগণের মধ্যে অক্ষয় সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক মধুর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল। 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার' (ভারতী ভাদ্র ১৩২৯) নামক প্রবন্ধে হরপ্রসাদ যে পরিচিতি প্রদান করিয়াছেন তাহা ইতিপূর্বে খুবকম সমালোচকই করিয়াছেন। হরপ্রসাদের মতে 'অক্ষয় চন্দ্র সরকার বাংলা সাহিত্যে একজন মহারথী' ছিলেন। অন্যান্য লেখকদের মত তিনি অনেক রকমের, অনেক রং এর, অনেক ঢংএর অনেকগুলি বই লিখিয়া যান নাই সত্য কিন্তু তিনি বাংলা সাহিত্যের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কেহ বড় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার দীর্ঘজীবনটাকে তিনি একখানা বাংলা বিশ্বকোষ করিয়া বাঙালীদের দিয়া গিয়াছেন।"

রামেন্দ্রসুন্দর বাংলাসাহিত্যের একজন প্রতিভাধর পুরুষ। তাঁহার পাণ্ডিত্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, ধর্মনিষ্ঠা, স্বদেশভক্তি বাঙালীর ইতিহাসে একটি মূল্যবান পর্ব রচনা করিয়াছে। 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা মানব চিত্তায় এই ত্রিধারা রামেন্দ্র সঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল। 'নানান দেশে নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশাই তাঁহার সাহিত্যজীবনের মূলমন্ত্র ছিল।"

হরপ্রসাদশাস্ত্রী তাঁহার 'রামেন্দ্রবাবু' (সাহিত্য ভাদ্র ১৩২৬) নামক প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই : "অনেকেই বলেন—কথাটাও সত্য যে দর্শনই হউক, বা বিজ্ঞানই হউক' ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিয়াছেন তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাঁহার মধুরতায় প্রাণকে জয় করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিত।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রাজনৈতিক নেতা ও দেশসেবক হিসাবে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও মূলত একজন ধর্মপ্রাণ ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় হরপ্রসাদ অনেক প্রবন্ধ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা' (ফাল্গুন ১৩২২) বঙ্কিমবাবু ও উত্তর চরিত' (১৩২২) 'রঘুবংশের গাঁথুনি' 'বঙ্কিমচন্দ্র (আষাঢ় ১৩২৫) এই আলোচনায় অন্তর্ভূত হইয়াছে। চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যানুরাগ—কাব্যও আলোচনায় স্ফূর্তিলাভ করিয়া বাঙালী রসিকচিত্তকে আনন্দিত করিয়াছে। হরপ্রসাদও চিত্তরঞ্জনের রচনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের কাব্যকর্ম তাঁহাকে কি পরিমাণ মোহিত করিয়াছিল তাহার প্রমাণ খুঁজিতে হইলে 'বাংলাসাহিত্যে চিত্তরঞ্জন' (বসুমতী শ্রাবণ ১৩৩২) শীর্ষক প্রবন্ধটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে হইবে। ঐ প্রবন্ধে হরপ্রসাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন :

এ জগতে কেন জন মিলে উঠা ভার
মন মুখ কাষ সব একরূপ যার"

চিত্তরঞ্জন এইরূপ লোক ছিলেন।

অতঃপর হরপ্রসাদ ইহাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন: "চিত্তরঞ্জন একজন খুব ভক্তলোক ছিলেন। তাঁহার কবিতা পুস্তকগুলিতে ভক্তির যে একটা আকুলতা দেখা যায় সেটা প্রাচীন বৈষ্ণবপদাবলী ভিন্ন আর কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ। দাস মহাশয়ের নিজের পদ্যগুলি বেশ মিষ্ট লাগিত। তিনি যেন কি একটা প্রেমভক্তি ভালবাসার জিনিষ খুঁজিতেছেন, পাইতেছেন না, পাইবার জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছেন, উধাও হইয়া বেড়াইতেছেন।"

কান্তকবি রজনীকান্ত বাংলা সাহিত্যের একজন স্বরণী কবি ও গীতিকার। ধূপের ন্যায় দগ্ধ হইয়া তিনি নিজের জীবনকে দেশবাসীর জন্য এবং সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্য আত্মদান করিয়া গিয়াছেন। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 'কান্তকবি রজনীকান্ত' নামে যে প্রামাণিক জীবনী রচনা করিয়াছেন বাংলাসাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই কবির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর এক আলোচনায় নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।প্রবাসী ভাদ্র ১৩২১' হরপ্রসাদ এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলিয়াছেন: বসওয়েল না থাকিলে জনসনের নাম এত দিনে সকলেই ভুলিয়া যাইত। মল্লিনাথ না হইলেও কালিদাসের কবিতা দুর্ব্যাখ্যা বিষমূর্চ্ছিতা হইয়া এতদিনে কোথায় তলাইয়া যাইত খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। নলিনী বাবু তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া রজনীকান্তের জীবনের সকল ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাহির করিয়াছেন এবং তাঁহার ছোট-ছোট পদ্যগুলিও কোথায় কিভাবে লেখা হইয়াছিল তাঁহার পুরা ইতিহাস দিয়াছেন।',

অতঃপর রজনীকান্ত ও তাঁহার কাজ সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন: শুনিয়াছি তুলসীদাস বিউবনিক প্লেগে পীড়িত হইয়া অসীম যন্ত্রণার মধ্যে হনুমান বাহক নামক একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া ইষ্টদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ়ভক্তি দেখাইয়াছিলেন আর সমস্ত হিন্দুস্থানকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুলসীদাসের সে যন্ত্রণা চারিদিন মাত্র ছিল। পাঁচদিনের দিন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। রজনীবাবুর ভীষণ যন্ত্রণা আটমাস। এরূপে যন্ত্রনায় লোক অধীর হয় আর রজনী বাবু তাহাতেই আমাদের—অনেক অমৃত দিয়া গিয়াছেন এবং বঙ্গজননীকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতা এই সময়েই অধিক জমিয়াছে। অল্প কথায় প্রগাঢ়ভাব এই সময়েই তিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।"

হর প্রসাদ শাস্ত্রীর বিভিন্ন সময় রচিত ষোলটির অধিক প্রবন্ধ হইতে উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধার করিয়া তাঁহার সমালোচনা শক্তির পরিচয় দেওয়া হইল। বর্ত্তমান যুগে যখন বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা-বিভাগ পূর্বাপেক্ষা বহুলাংশে পরিপুষ্ট হইয়াছে সেইসময় হর প্রসাদের রচনাগুলি আধুনিক বিচারণার মানদণ্ডে সর্ব্বতোভাবে সার্থক বলিয়া মনে হইতে না পারিলেও একথা বিস্মৃত হইলে চলিবেনা যে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত ধারাকে অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদের সমালোচনা নৈপুণ্যের উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহার জ্ঞানের ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা ভাষার শ্রী যেন তাঁহার হস্তে সমৃদ্ধতর হইয়াছে তেমনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের রূপ তাঁহার দানে— তাঁহার সহজ সরল ও সুন্দর ভাষারীতি, ভাবুকতাবিহীন অভিপ্রায় সংযত রচনার গুণে বাংলা সাহিত্যের বৈভবকে বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে বাংলার সমালোচনাসাহিত্যকে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হওয়ার পদক্ষেপকে ত্বরান্বিত করিয়াছে।

দেশবন্ধু স্মরণে

চিত্তরঞ্জন দাস

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন তারিখটির কথা আজ মনে পড়ে। ঐ দিন বাংলা তথা ভারতের মহান জননেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস দার্জিলিংএ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে স্বরাজ্য সপ্তাহ উপলক্ষে কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে সাতদিন ব্যাপী সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেবার ফলে, শরীর খুবই খারাপ হ'য়ে পড়েছিল এবং প্রধানত স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যই তখন তিনি দার্জিলিংএ যান। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তাই যখন তিনি ১৮ই জুন সকাল ৮ টায় স্পেশাল ট্রেনে এসে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছুলেন, তখন আমরা আর আমাদের প্রিয়নেতা দেশবন্ধুকে পেলাম না, পেলাম তাঁর শবদেহ।

উল্লখিত স্বরাজ্য সপ্তাহের শেষদিন বিভিন্ন সভায় ভাষণদানের পর তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন রাত ১০॥ টায় দর্জিপাড়া ব্লাকওয়ার স্কোয়ারে। তাঁর শেষ বক্তৃতার মর্ম্ম ছিল নিম্নরূপ ',আপনারা সমগ্র দেশবাসী আমাকে সহায্য করুন। হয় অর্থ দিন, আমি একা কাজ করি, নয় সকলে কাজ করুন, আমি একা অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করি। সব কাজ আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বৃটিশ সরকারকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করি। আপনাদের সক্রিয় সাহায্য পেলে ভারতের বুক থেকে ওদের নাম মুছে ফেলব। সে শক্তি আমার যথেষ্ঠ আছে। তবে শরীরের যা অবস্থা তাতে আর বেশী দিন বাঁচব বলে মনে হয় না। কিন্তু যে কয়দিন বাঁচি একবার চেষ্টা করে দেখব ওদের ভারত ছাড়া করতে পারি কিনা" ইত্যাদী।

১৬ই জুন'৭০ সন্ধ্যায় হ্যারিসন (বর্ত্তমান মহাত্মা গান্ধী) রোডে অবস্থিত এ্যালফ্রেড (বর্ত্তমান গ্রেস সিনেমা) থিয়েটারে একটি সম্মিলিত নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ যথা—দানীবাবু, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি সকলেই—যোগদান করেছিলেন। আমরা সেখানে দর্শক। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। ২।৩টা দৃশ্য শেষ হবার পরেই রসরাজ অমৃতলাল বিষণ্ণবদনে দর্শক সমক্ষে ঘোষণা করলেন: "এইমাত্র আমরা দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পেলাম। এর পরে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করবার ইচ্ছা বা মনোবল আমাদের নেই। সুতরাং আজকের অনুষ্ঠান আমরা বন্ধ করছি আশাকরি দর্শকবৃন্দ আমাদের ক্ষমা করবেন।" নির্ব্বাক, নিস্পন্দ দর্শকমণ্ডলী তখন নিঃশব্দে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করলেন।

সারারাত সর্ব্বত্র শুধু একই কথা—'দেশবন্ধু আর ইহজগতে নেই।' পরদিন প্রাতে সংবাদপত্রে শুধু দেশবন্ধু আর দেশবন্ধু। মহাত্মা গান্ধী সেদিন ছিলেন খুলনায়। সংবাদ পেয়ে সেখান থেকে তিনি কলকাতায় তারবার্ত্তা পাঠালেন :—' **Unthinkable, but God is great. Arrange Funeral procession. Postponed East Bengal tour. Proceeding calcutta next mail"--Gandhi."**

সে দিনটিও কেটে গেল। সর্ব্বত্র বিষাদের ছায়া। পরদিন অর্থাৎ ১৮ই জুন ভোর ৫টায় আমরা যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী ছিলাম, শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়ে সমবেত হই। দার্জিলিং থেকে স্পেশাল ট্রেন দেশবন্ধুর পবিত্র শবদেহ বহন করে কলকাতায় আসছে। তারই প্রতীক্ষায়। সকাল ৮টায় ট্রেনটি এসে প্লাটফরমে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ভীড়। পুষ্পস্তবকে আবৃত খাটের উপর শায়িত দেশবন্ধুর শবদেহ। ট্রেন থেকে যথাসময়ে নামান হ'ল। শবযাত্রায় প্রথমেই কাঁধ দিলেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু জনতার প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে শবদেহ বহন করে অগ্রসর হওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল। অনেকের

অনুরোধে তখন মহাত্মাজী শবদেহ ছেড়ে দিয়ে করজোড়ে জনগণের নিকট আবেদন জানালেন পথ পরিষ্কারের জন্ত যাতে শবদেহ নিয়ে অনায়াসে অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু তখন প্রচণ্ড ভীড় ও দারুণ কোলাহল। কে কার কথা শোনে? মহাত্মাজীর আবেদন আর কারো কর্ণে পৌঁছুল না। আমরা বহুপূর্ব্ব থেকেই জনতানিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত। হঠাৎ শুনতে পেলাম—"গান্ধী মারা গেল, গান্ধী মারা গেল।" পেছনে তাকিয়ে দেখি গান্ধী। চোখের চশমা ও পায়ের স্যাণ্ডেল নেই। ভীড়ের মধ্যে কোথায় পড়ে গেছে। মহাত্মাজীর তখন অসহনীয় অবস্থা। অতি কষ্টে আমরা তখন একটা সার্কেল ক'রে ভীড়ের মধ্য থেকে মহাত্মাজীকে নিয়ে এলাম সারকুলার রোডে। সম্মুখে একখানা চলন্ত মটরগাড়ী দেখে, গাড়ীখানাকে থামালাম। আরোহী এবং চালক ছিলেন একজন শ্বেতাঙ্গ। আমাদের অনুরোধে তিনি দুজন স্বেচ্ছাসেবক-সহ ক্লান্ত মহাত্মাজীকে সানন্দে তাঁর গাড়ীতে তুলে নিলেন এবং ভবানীপুরে দেশবন্ধুর বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিলেন।

শিয়ালদহ ষ্টেশন, সারকুলার রোড ও হ্যারিসন রোডে তখন উদ্বেলিত জনসমুদ্র। কোনও গৃহ কিম্বা স্থান বিন্দুমাত্র ফাঁকা ছিল না। তৎপূর্ব্বে কলকাতার জনতার এরূপ প্রচণ্ডভীড় কেউ কখনও দেখেনি কিম্বা শোনেওনি। ষ্টেশন ছেড়ে সারকুলার রোড অতিক্রম করে আমরা তখন শবদেহ নিয়ে হ্যারিসন রোডে ঢুকেছি। উত্তর পার্শ্বের কোলাহলপূর্ণ গৃহগুলির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম ক্রন্দনরত সহস্র সহস্র নরনারী। তখন মনে হল আমাদের সকলেরই যেন পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। জ্যৈষ্ঠ মাস, রোদের প্রখর তাপ, আমাদের সব নগ্নপদ। অধিকাংশ বাড়ীর ওপর থেকে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য হাতপাখা আমরা পেলাম। কলকাতা করপোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য পূর্ব্বহ্নেই প্রচুর পরিমাণ পানীয় ও রাস্তায় দরবরাহের জল এবং অন্যান্ত বিষয়ের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করেছিলেন। হ্যারিসন রোড দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে লক্ষ লক্ষ লোকের মৌন মিছিলটি বড়বাজারে মদনমোহন বর্মণের বাড়ীর সম্মুখে থেমে যায়। সেখান থেকে মেছোবাজার ষ্ট্রীটের মাধ্যমে আমরা কলেজ ষ্ট্রীটে আসি। কলেজ ষ্ট্রীট থেকে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ও ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট হ'য়ে করপোরেশন ষ্ট্রীট দিয়ে করপোরেশনে যাই। সেখান থেকে চৌরঙ্গী রোড ধরে ভবানীপুর অভিমুখে অগ্রসর হই। বলা বাহুল্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে অপেক্ষমান লক্ষ লক্ষ জনতা কর্ত্তৃক নানাভাবে মহান নেতার প্রতি জাতির শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন লক্ষ্য করলাম। বৈদেশিক সাহেবগণ মাথার টুপি খুলে নতমস্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। ভবানীপুর আশুতোষ মুখার্জী রোডে একজন অশিতীপর বৃদ্ধ অকস্মাৎ উদাত্তকণ্ঠে গাইলেন:
"তোমরা দেখ আসি নগরবাসী সোনার মানুষ যায় চ'লে,
ঐ যে সোনার মানুষ যায় চ'লে।"

বেলা প্রায় ৩টায় আমরা শবদেহ নিয়ে কেওড়াতলা শ্মশানে প্রবেশ করি। প্রবেশদ্বারে মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্ব-থেকেই জনগণের নিকট আবেদন জানাচ্ছিলেন শ্মশানের সংকীর্ণ স্থানে সকলকে প্রবেশ না করবার জন্ম। আমরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম এবং আমাদেরই চোখের সম্মুখে দেশবন্ধুর পবিত্র শবদেহ কেবলমাত্র বিশুদ্ধঘৃত ও চন্দনকাষ্ঠের দ্বারা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। রাত ৯টার পর চিতাভস্ম নিয়ে সর্ব্বহারার মত বাড়ী ফিরলাম। আজও ভুলতে পারিনি।

প্রতিধ্বনি

শ্রীশান্তা দেবী

ইংরেজী সাহিত্যের দিকেও আমাদের মনকে একজন টেনে নিয়ে যেতেন। তিনি নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়। সীতাকে তিনি একটা Little Arthur's History of England এনে দিয়েছিলেন। সীতা সেটা পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছিল। রাজবংশাবলী আগাগোড়া বলে যাওয়া তার ছিল একটা খেলা। নেপালবাবুই উস্কে দিতেন। এছাড়া, তিনি রোজ খোলা আকাশের তলায় বাঁধানো চাতালে সন্ধ্যায় সভা করে জিন ভাল জিন, মন্টিক্রস্টো, থ্রি মস্কেটিয়ার্স, কোরাল আইল্যাণ্ড কত গল্পই আমাদের বলতেন। নানা রকম গল্প শুনে শুনে ছেলেবেলা থেকেই গল্প বলার একটা ইচ্ছা আমাদের দুই বোনের মনে জেগেছিল। মনে মনে নানা গল্প রচনা করে আমরা দুজনে পরস্পরকে বলতাম। রূপে গুণে, ঐশ্বর্যে আমাদের গল্পের নায়ক নায়িকাদের যতদূর উঁচুতে আমরা তুলতাম তার চেয়ে উঁচুতে তোলা সম্ভব ছিল না। কারুর এক একটা গল্প খুব দীর্ঘ হয়ে গেলে তাকে সেইখানে খতম করে দেওয়া হত। এই খেলার নাম ছিল "গপ্প ওড়ান্"।

আমরা দুবোন মিলে আমাদের গল্প উপভোগ করতাম, দাদার ছিল তার চেয়েও গোপন একলার গল্প। দাদার একটা খাতা ছিল, তার উপর লেখা থাকত "ইহা কেহ খুলিবে না ও পড়িবেনা"। ঠিক ভাষাটা মনে পড়ছে না, কিন্তু বক্তব্যটা ঐ রকম। দাদা নিজের মনেই লিখতেন এবং পড়তেন এবং নিজের মনেই মুখ টিপে টিপে হাসতেন। হাসির কারণটা বুঝতে পারতামনা।

আমরা প্রয়াগবাসী হলেও বাংলা আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলাম্ বাবার জন্য। শৈশব থেকেই দেখতাম বাবার বাংলা কাগজ বার করা—হয় "প্রদীপ" নয় "প্রবাসী।" ইংরেজী কাগজ বাবার কাছে প্রচুর এলেও আমরা বিশেষ পড়তাম না। দেখতাম বাংলা সাপ্তাহিক "হিতবাদী" "বঙ্গবাসী" "সঞ্জীবনী" কলকাতা থেকে আসত বিছানার চাদরের মত বড় বড়। তাতেই একটু-আধটু আমরা চোখ বুলোতাম। ভাল করে পড়া সুরু হল বঙ্গভঙ্গের পর। খুন, বোমা, জেল, ফাঁসি যতসব রোমহর্ষকব্যাপার। এখন অবশ্য এসব ভাতজলের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও একটা জিনিষ এই রকমই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, যা আজকাল হলে কেউ ফিরেও তাকাত না। সেটা হল আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মশায়ের কন্যার বিধবা বিবাহ। ইংরেজি ভাষায় যত রকমের হরফের নাম আছে তার সব পরে পরে সাজিয়ে দিয়ে একটা কাগজে ছাপা হয়েছিল: স্মল পাইকায়—'ছঃ বর্জাইসে—ছিঃ ইত্যাদি ইত্যাদি। আশুতোষ যখন সরস্বতী পদবী পান তখন তাঁর একটা দেবী সরস্বতীরূপী ছবি গোঁফসমেত কাগজে ছাপা হইয়াছিল। সাউথরোডের বাড়ীতেই ১৩০৮ সালে "প্রবাসী" প্রথম বাহির হয়। বাড়ীর সব চেয়ে যে ঘরটা নীচু এবং লম্বা সেই ঘরে প্রবাসীর কাজ হত। কাজ করবার লোক বিশেষ কেউ

ছিল না। বাবা এবং মা প াক কদ্রা ঠিকানা লেখা সব করতেন। আমরা টিকিট লাগাবার জন্য দৌড়ে দৌড়ে বাটি করে জল আনতাম আর টিকিট লাগাতাম। খুব শীঘ্রই বোধ হয় আশুবাবু বলে একজন ভদ্রলোক ম্যানেজারের কাজে ভর্তি হন। তবে মা ছিলেন ম্যানেজারের উপরে ম্যানেজার। এরপরে অনাথবাবু বলে আর একজন ম্যানেজার হন। অনাথবাবুকে আমরা 'খুবু' বলতাম। তাঁর অকস্মাৎ আসল বসন্ত হল। ইন্দুভূষণবাবু ও তাঁর পত্নী রোগীর সেবা হাতে করে করলেন, কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না। আমি যখন শৈশবে ভাত রাঁধতাম মনে পড়ছে, তখন "খুবু"ও মাঝে মাঝে "মাড় গলিয়ে" দিতেন। প্রবাসীর কথা লিখতে গিয়ে মনে হয় 'দাসী'র কথা। কিন্তু "দাসার যুগ আমার জন্মের সুতরাং স্মৃতিরও বাইরে।

ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব এলাহাবাদে দুবার হত—একবার অগ্রহায়ণে আর একবার মাঘে। প্রথমটাতে আমরা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকতাম এবং কবিতা গল্প গান ইত্যাদি দিয়ে বালকবালিকা সম্মিলন মাতিয়ে রাখতাম। সে সবই ছিল বাংলা। তাছাড়া ওখানে একটা বাঙালী সম্মেলন হত প্রতি বছরে। সেখানে বাংলা কবিতা আবৃত্তি করবার জন্য অনেক ছেলেমেয়েরা জুটত। সেই আমরা প্রথম—

"পঞ্চ নদীরতীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিল শিখ"

আবৃত্তি শুনলাম। শ্রীশবাবুর কন্যা সুজাতা, দুর্গাচরণবাবুর কন্যা প্রতিভা এবং আমার ভগ্নী সীতাও বাঙালী সম্মেলনে আবৃত্তি করতেন। আমি বঞ্চিত হতাম, কারণ আমি বারো বছরেই পর্দানশীন ছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের 'নদী' কবিতা আমরা ভাইবোনেরা বাড়ীতে সমস্বরে আবৃত্তি করতাম।

"ওরে, তোরা কি জানিস কেউ
জলে উঠে কেন এত ঢেউ?"

ছেলেবেলা "মুকুল" আমাদের খুব প্রিয় কাগজ ছিল। তার অন্যান্য লেখকদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও ছিলেন। তাঁর "সে পয়সাদ" কিম্বা "হবু গবুঅশ্বচুটি" কবিতা আমরা গড় গড় করে মুখস্থ বলতাম। এরসঙ্গে তাল রেখে ভাইরা একজন নাচতেন। এখনও একটু একটু মনে পড়ে।

"হবুগবু অশ্বচুটি করতে ছিলেন জলপান,
হেনকালে এলেন তথায় বন্ধু একজন লম্বাকান।
বন্ধু বলেন, হবুগবু এযে দেখি বিষম দায়
একই বংশে জন্ম মোদের জাতি সম্পর্কে মোরা ভাই।
কালের দোষে বদল হয়ে, হয়ে গেছে লম্বা কান
খর্ব্বাকৃতি হলাম আমি মোটা লেজটি অন্তর্ধান।"

আর একটি বই ছিল সুকবি কমিনী রায়ের "গুঞ্জন।" আমরা সেটা সমস্বরে এত সজোরে পড়তাম যে বাবা বলতেন "হুঙ্কার"। মনে আছে :—

আর রোদ কোথাও নাই, চল বাগানেতে যাই
এই আমার কলসী তোমার খুপী কোথায় ভাই।

আমাদের বাড়ীতে অতিথি সমাগম নিত্য লেগে থাকত। তার মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী। দেশের আত্মীয় স্বজন বন্ধু ছাড়া প্রবাসী ব্রাহ্ম বা প্রবাসী সাহিত্যিকরা প্রয়োজন হলেই আমাদের বাড়ী এসে উঠতেন। যাঁরা কলকাতা থেকে এলাহাবাদে কোন চাকরী নিয়ে যেতেন, তাঁরাও প্রথমে আমাদের বাড়ীতেই উঠতেন। এলাহাবাদে ক্রস থোয়েট গার্লস স্কুল বলে একটা স্কুল ছিল। সেখানে কাজ নিয়ে কবি কামিনী রায়ের ভগ্নী প্রেমকুসুম সেন, রামতনু লাহিড়ীর বংশের শান্তা সরকার ও প্রমদা দেব তিনজন পরে পরে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। এঁদের আত্মীয় নিশীথচন্দ্র সেন ও মিস রাধারাণী লাহিড়ীও এঁদের সঙ্গে এসেছিলেন।

জীবনটা তখন ঘটনাবহুল ছিল না। কিন্তু নানারকম মানুষকে সহজভাবে নেবার অভ্যাস আমাদের হয়ে গিয়েছিল। কেউ পুণ্যকামী তীর্থযাত্রী, কেউ বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ভবঘুরে ছেলে, কেউ চোস্ত সাহেবী পোষাকপরা অধ্যাপক, কেউ গিলে-

করা পাঞ্জাবীপরা জমীদার পুত্র, কেউ বা গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী সকলেই আমাদের বাড়ীতে সাদরে একই ভাবে অভ্যর্থিত হতেন। সেই পিঁড়ি পেতে খাওয়া, দড়ি-বোনা বড় বড় চারপাইয়াতে শোওয়া এবং স্বচ্ছন্দমনে যার যত দিন প্রয়োজন থেকে যাওয়া। গৃহী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ গল্প বলে আমাদের মনোহরণ করতেন। ভবঘুরে কেউ বা অকস্মাৎ কাউকে না বলে স্নানের ঘর থেকে বাবার ধুতি পরে অন্তর্হিত হতেন। কোনো মারাঠি মহিলা আঠারো হাত শাড়ী একবার কেচে শুকিয়ে এলেই তাতে আবার জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতেন নিজের দেশের প্রথামত। কোনো সিন্ধী "বৈগন" খেতে দিলে তিড় বিড় করে উঠতেন।

অতিথিরূপে বাইরের অনেক লোককেই দেখা অভ্যাস ছিল। তাছাড়া খুব ছোট বয়সেই দুই একটা বড় জিনিষও দেখবার সৌভাগ্য হয়। ১৯০৫এর কাশী কংগ্রেসে যখন গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রেসিডেন্ট হন, তখন বাবা এলাহাবাদ থেকে ডেলিগেট হয়েছিলেন। তিনি আমদের সবাইকেই কাশী নিয়ে যান। সেখানে একেশ্বরবাদীদেরও সম্মেলন হচ্ছিল। সেটা ছিল বেনারস ক্যান্টনমেন্টে। হয় স্পেশাল ট্রেনে নয় ঘোড়ার গাড়ীতে আদত কাশী যেতে হত আমাদের। প্রায় প্রত্যহই যেতাম আমরা। সেই প্রথম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,রমেশ দত্ত, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতিকে দেখি। গোখলের গোলাপ ফুলের মত রং আর লাল জরিদার পাগড়ী কি চমৎকার লেগেছিল। "ভারতীর" সম্পাদিকা বিখ্যাত সরলা দেবী তখন নব-বিবাহিতা হয়ে স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন। সোশ্যাল কনফারেন্সে মহিলাদের মধ্যে বক্তা ছিলেন হেমন্তকুমারী চৌধুরী ও লেডী বিদ্যা রমন ভাই (গগনবিহারী মেহটার শাশুড়ী)। হেমন্তকুমারীর কোলে ছেলে ছিল। মনে হচ্ছে যেন অন্য জনেরও ছিল। গগনবিহারীর সুন্দরী শ্যালিকারা তখন ছোট ছোট মেয়ে। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী সুন্দরী সুদক্ষিণা দেবীও একজন বক্তা ছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শুনে একজন মন্তব্য করলেন' উদকোত খপসুরৎ দেখকে চকেল দিয়া।"

কংগ্রেসে যাবার সময় আমি আমার মায়ের একটা ভাল শাড়ী ধার করে একজন ব্রাহ্ম মহিলার কাছে যাই আমাকে পরিয়ে দেবার জন্য। আমার শাড়ী পেয়ে আনন্দ দেখে তাঁর এক বন্ধু বললেন, "দেখেছ, মার একটা শাড়ী পেয়েই কত খুসী! আমাদের এত থেকেও আমরা খুসী হই না।" কথাটা আমার মনে এমন ঘা দিয়েছিল যে আজও ভুলিনি।

নেপালবাবু, চারুবাবু প্রভৃতি যাঁরা আমাদের বাড়ীর দীর্ঘকালের বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই সীতার সঙ্গে মা পাতিয়েছিলেন, কাজেই আমি হতাম তাঁদের মাসিমা। এঁরা আজীবন এই সম্পর্ক রেখেছিলেন। বাবার অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, মেজর বামনদাস বসু প্রভৃতি। মার সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতেও আমরা যেতাম। তাঁরা এলাহাবাদেরই স্থায়ী এবং পুরাতন বাসিন্দা। অনেকেরই বাড়ীতে জনসংখ্যা কম ছিল। কিন্তু শ্রীশবাবু ও বামনদাস বাবুদের পরিবার ছিল বিরাট। তাঁদের মা মাসির থেকে সুরু করে দুইভাই, বৌদি, দুইভায়ের ৬।৭ টি ছেলে মেয়ে, ভাগ্নে ভাগ্নী, শালী, বোন ভগ্নীপতি সকন্যা বিধবা আত্মীয়া সবাই প্রায় একত্রে থাকতেন; বাড়ীর লোকই উনিশ কুড়িজন সর্ব্বদা। তারউপর অতিথি অভ্যাগতের ত স্রোত বয়ে যেত। কখন কখন বিশেষ কোন উপলক্ষ্য থাকলে একশতজনও ঐ বাড়ীর ভিতর ঢুকে বসতেন। বাড়ীটাও ছিল তেমনি, নানাদিকে ঘর যেন গাছের ডালের মত ক্রমেই বেড়ে চলত। এ বাড়ীতে মিস্ত্রী লেগে নেই, এবং কোনো দিকে নূতন কিছু হচ্ছেনা, এরকম কোনো দিন দেখেছি মনেই হয় না। বাড়ীর উঠানে বামনদাস বাবুর সংগৃহীত পাথরের প্রাচীন মূর্ত্তি অনেকগুলি গড়াগড়ি যেত, যা যে কোন মিউজিয়মে রত্নের মত রাখার যোগ্য। উপরের ঘরে সারি সারি টেবিল ও তাকের উপর অসংখ্য বই। তার উপর এলাহাবাদের ধূলা ঘন হয়ে পড়ত। অতবড় বাড়ীর অতরকম হাঙ্গামা মিটিয়ে চাকরবাকরদের বই ঝাড়বার সময়ই হত না।

আমাদেরই মত এবাড়ীর মেয়েরা ও ইন্দুভূষণ-রায় মহাশয়ের কাছে পড়ত। কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক অল্প বয়সে তাদের বিবাহ হয়ে যায়। তখনকার দিনে চোদ্দ বছরের মেয়ে অরক্ষণীয়া ছিল। মেয়েরা খুব গোঁড়া হিন্দু মতে মানুষ হয় নি, বাবা কাকা উদার ছিলেন বলে। তাই তাঁরা স্বামীর এঁটো থালায় খাওয়া প্রভৃতি প্রাচীন নিয়মে একটু বিব্রত হতেন। কিন্তু মা মাসির অনুরোধে সবই করতে হত। বাড়ীতে যদিও ঘরের অভাব ছিল না, তবু বামনদাস বাবু শীত গ্রীষ্ম সব সময় খোলা আকাশের তলায় শুতে ভালবাসতেন। তাঁর স্ত্রী জীবিত ছিলেন না, সন্তান ছিল একটি মাত্র পুত্র। হিন্দু সমাজে কন্যার বিবাহে কন্যার পিতামাতাকে যে পরিমাণ মাথা হেঁট করতে হয়, তাতে শ্রীশবাবুর সম্মান অত্যন্ত আহত হত। দুই কন্যার বিবাহের পর শুনেছি তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তৃতীয়া কন্যার বিবাহ যদি আপনা হতে না হয় ত তিনি তার বিবাহই দিবেন না।

ধর্ম সম্বন্ধে এঁদের বাড়ীতে খুব উদারতা ছিল। ওঁদের এক ভগ্নী ছিলেন ব্রাহ্ম, বামনদাসবাবু স্বয়ং খানিকটা শিখধর্মের অনুরাগী ছিলেন, শ্রীশবাবু ছিলেন থিয়সফিস্ট এবং কায়স্থদের উপবীতের অধিকারী মনে করতেন। ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে এঁদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা সর্ব্বদা আসত। বোধহয় একসময় শ্রীশবাবু ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। বামনদাস বাবু খুব ভাল চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু তাঁর মা বলতেন, "বামনদাসের শুধু দুটো ওষুধ আছে।"

আমরা ছোটবেলা মাঘোৎসবের সময় অনেক সময় কলকাতায় চলে আসতাম। কখনও মফঃস্বলের ব্রাহ্মদের জন্য ভাড়া করা বাড়ীতে থাকতাম, কখনও অন্য কোথাও। একবার ছিলাম ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে। তাঁর তখন একটিমাত্র কন্যা। মাঘোৎসবে বালক-বালিকা সম্মেলনেই ছিল সব চেয়ে ঘটা। ফুলের মালা, গোলাপের তোড়া ত ছিলই, তার উপরে পাত পেড়ে বিকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত একে একে লোক খাওয়ানো। প্রথম দ্বিতীয় দল বালক-বালিকা, ক্রমে মফঃস্বলের ব্রাহ্ম নাম করে আশে পাশে যে যেখানে থাকত প্রায় সবাই সারি বেঁধে খেতে বসে যেত। বালক বালিকার দৌলতে বোধহয় তিনপুরুষ পর্য্যন্ত খাওয়া চলত। সেদিন নিমন্ত্রণকর্ত্তা থাকতেন ডাঃ নীলরতন সরকার। তাঁরা ভাই ভগ্নী মিলে কি পরিমাণ পরিশ্রম যে করতেন এখনও মনে পড়ে। মন্দিরের ভিতরে বালকবালিকাদের গল্প বলতে আসতেন অন্যদের সঙ্গে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি খাঁটি সাহেবী পোষাকে আসতেন, এবং গল্পের শেষে বোধহয় অনাথ আশ্রমের জন্য ছেলেমেয়েদের সামনে হ্যাট পেতে ভিক্ষা নিতেন। অনেক ছোট ছেলে বলত, "ঐ যে গরীব সাহেব, যাঁর কিছু নেই তাঁকে আমরা পয়সা দিই।" পয়সা দেবার জন্য ছেলেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত।

উৎসবের পর আবার প্রয়াগে প্রস্থান। প্রয়াগ বহুকালের তীর্থস্থান। কথায় বলে "প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, মরগে পাপী যথা তথা।" সেই প্রয়াগ তীর্থে ত্রিবেণীর তীরে নিত্যই স্নানযাত্রীর ভীড় লেগে থাকত। কিন্তু প্রচণ্ড ভীড় হত মাঘ মেলার সময়। একমাস ধরে মাঘ মাসে সারা ভারতবর্ষের পুণ্যকামীরা এখানে আসতেন। তখন কুম্ভমেলা হত বারো বৎসর অন্তর। সে এক অতুলনীয় বিরাট জনতা। স্পেশ্যাল ট্রেন, মালগাড়ী সবই তীর্থ যাত্রীতে বোঝাই। হিমাচল থেকে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত যাত্রীরা স্নানের জন্য এলাহাবাদে ছুটতেন। আমরা বাংলা ১৩১২ সালে কুম্ভ মেলা দেখি। কত লক্ষ লোক যে জমা হয়েছিল জানি না। ধর্ম্মশালা, হোটেল, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী, গাছতলা সর্ব্বত্রই যাত্রীর আস্তানা। আমাদের বাড়ীতেও বহু যাত্রী এসেছিলেন। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে হিন্দুস্থানী মণিঅর্ডারওয়ালার বেয়ান থেকে বাঙালী খ্যাতনামা উকিল-পরিবার পর্য্যন্ত অনেকেই এলেন। এমন কি সন্ন্যাসিনীও একজন এসে হাজির।

কুম্ভমেলায় রোজ মিছিল বেরোত; আমরা প্রায় সারাদিনই পথের ধারের জানালার কাছে হাজিরা দিতাম, পাছে কোনো দ্রষ্টব্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। জরিজড়োয়া পরা মোহান্তদের হাতীর মিছিল, উদ্‌গ্রীব নাগা সন্ন্যাসীদের "ভাণ্ডারা" (ভোজ) খাওয়ার মিছিল, আলুলায়িতকুন্তলা ত্রিশূলধারিণী ভৈরবীদের মিছিল কোনোটারই অভাব ছিল না। বড় বড় সন্ন্যাসীদের তাঁবুতে তাঁবুতে আখড়া ছিল। সেখানে চাঁদোয়ার তলায় সভা ও বক্তৃতা হত। আমরা ছোটবড় অনেকে মিলে দল করে এইসব আখড়া দেখতে যেতাম। সঙ্গে বাবার ছাত্র নিরালম্বস্বামী থাকাতে খুব সুবিধা হত। ইনি পূর্ব্বে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন। অরবিন্দ বারীন্দ্রদের সহকর্ম্মী ছিলেন এককালে। এসময় আমাদের বাড়ীতেই অতিথিরূপে এসেছিলেন, আমার মাকে 'মা' বলতেন এবং আমাদের হিমালয়ের দুর্গম পথে ভ্রমণের গল্প বলতেন। সন্ন্যাসীরা কতরকম প্রায়শ্চিত্ত করতেন তার ঠিক নেই। কেউ "খড়ে রহা বাবা" রূপে সাত বছর দাঁড়িয়ে, কেউ বা পেরেকের বিছানায় শুয়ে কাটাতেন। আমরা প্রয়াগের অক্ষয়বট, নদীর পারের ঝুঁসি, আবার খস্রুবাগ ইত্যাদিও দেখে বেড়াতাম।

এলফ্রেড পার্কের কাছের বাড়ীতে আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ভাইরা। তাঁদের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হত। আমাদের বাড়ীতে মাকে আমরা আগমনীর গান গাইতে অনেক সময় শুনতাম—

গিরিরাজ আমার গৌরী এসেছিল—
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য হরিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাইল?

কন্যারূপিণী দুর্গার একটা ছবি মনে ফুটে উঠত। কিন্তু বাস্তব দুর্গোৎসব আমরা ভয়ে প্রায় দেখতেই যেতাম না। "মাগো করুণাময়ী" বলে যখন একটা কসাই হাতে বলির খাঁড়াটা দেয়ালের ওপার থেকে দেখা যেত তখন আমরা কানে আঙুল দিয়ে দৌড় দিতাম। অন্য সময়ে ও বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আমাদের খুব ভাবছিল। বাড়ীতে নবজাত শিশুর জন্যে আট-কৌড়ে হলে আমাদের ডাক পড়ত। আমরা ভাজা-ভুজির সঙ্গে একটা করে চকচকে দুয়ানি দক্ষিণা নিয়ে চলে আসতাম।

এর পর সাহেব পাড়ার আরও কয়েকটা বাড়ীতে আমরা পর পর ছিলাম। কোনোটাকে বলতাম সিমিয়নের বাংলো কোনোটা ছিল হ্যামিল্টনের বাংলো। এই পাড়াতে দাদাদের একটা ফুটবল টিম ছিল। তার সভ্য ছিলেন সমরগুপ্ত (পরে আর্টিষ্টরূপে বিখ্যাত) জীবনময় রায়, সুশীল চৌধুরী (পরে বার-এট ল), ইন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালী ছেলেরা। দাদাই বোধহয় সবচেয়ে ছোট ছিলেন। সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর মেয়েদের ডাকনাম ছিল মটুক, বুড়ুণ, অস্তি। পাঁচিলের দুপাশে দুদল দাঁড়িয়ে আমরা গল্প করতাম।

এই বাড়ীতে আমাদের খেলার সাথী ছিল টোবি নামে একটি সাদা টেরিয়ার কুকুর। তাকে নিয়ে আমরা ছুটোছুটি করতাম। কিন্তু বেচারী কারুর নির্ব্বুদ্ধিতায় অথবা দুর্বুদ্ধিতে অসময়ে মারা গেল। আমরা ভাই-বোনেরা শোকার্ত্তভাবে তার গোর দিয়েছিলাম।

এসব জায়গায় বাঙালী অভিজাত প্রতিবেশীই থাকতেন, আদত হিন্দুস্থানী জীবন বেশী দেখা যেত না। ঝি, চাকর রাঁধুনী ছিল হিন্দুস্থানী, অন্য পাড়াপড়শী বা বন্ধু কেউ হিন্দুস্থানী ছিল না। বাড়ীর যে জমাদার সে সাহেববাড়ীর জমাদার বলে সাজ পোষাক কায়দা কানুন খুব দুরস্ত ছিল। তাদের জাত লালবেগী, বাড়ীর মেয়েরা রীতিমত সুন্দরী ও সুসজ্জিতা। ঝাঁটা হাতে আসত বটে, কিন্তু রাজকন্যা সাজালেও অনায়াসে মানিয়ে যেত। সাহেববাড়ীতে তারা রান্নাঘরেও কাজ করত।

অশোকের পর অনিল, সিভিল লাইনসেরই একটি বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করে। বোধহয় আড়াই বৎসর বয়সে দুরন্ত ডিপথিরিয়া রোগে তার মৃত্যু হয়। ভারি মিষ্টি কথা বলত সে। মুন্নু কোন্ বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেছিল ভাল

মনে পড়ে না। সিভিল লাইনসেরই কোনো একটি বাড়ীতে। বোধহয় সেই বাড়ীতে আমাদের একটা প্রিয় কুকুর ছিল যার পাঁচটা বাচ্চা হয়েছিল। স্নুহু তাদের নামকরণ করেছিল। দুটো ছিল সুন্দর বাচ্চা, তাদের নাম বুল্লা আর খুল্লা এবং তিনটে ছিল বিচ্ছিরি রোগা বাচ্চা, তাদের নাম নেংটি, পেংটি – আর সুঁটকি। মাটা কিন্তু বেশ মোটা আর সুন্দর দেখতে, খানিকটা স্প্যানিয়ালের মত।

এর পর আমরা সিভিললাইনস ছেড়ে মেঘরাজ নামক এক হিন্দুস্থানীর কীটগঞ্জের বাড়ীতে চলে যাই। এই মেঘরাজ বর্মায় রেল লাইনে কাজ করতে করতে এক ঘড়া মোহর পেয়ে যায়। ফলে তার আর কাজ করতে হয় নি আজীবন। সে এক বেগম সাহেবার ৩০।৪০ বিঘার সম্পত্তি কিনে বসে। সেখানে বাড়ীই ছিল তিনটি তার উপর ফুল বাগান, ধান ক্ষেত গম ক্ষেত, অজস্র ফলের বাগান সবই ছিল। আমরা এখানে অনেকে মিলে ভীড় করে থাকতাম, বড় নির্জনজায়গা! ইন্দুভূষণবাবু সপরিবারে এবং নেপাল বাবু ও গিরীশ বাবু সবাই আমরা ছিলাম এক পরিবারভুক্ত। রান্না খাওয়া সব একত্রে। কলের জল ছাড়া বাড়ীতে একটা মস্ত ইঁদারা ছিল, বোধহয় ক্ষেতে জল দেবার জন্য। বিরাট একটা ডোল কিম্বা মশক দড়িতে ঝোলান থাকত, আর এক জোড়া বলদ তাতে করে জল তুলত। ইঁদারাটা ছিল খুব উঁচুতে, সেখান থেকে লম্বা একটা ঢালু পথ অনেক দূর নেমে গিয়েছিল। বলদ জোড়া যখন ঢালু পথদিয়ে গড় গড় করে নেমে যেত, তখন জল ভর্ত্তি মশকটা কুয়াথেকে উঠে পড়ত। আবার যেই তারা উপর দিকে উঠে আসত তখন শূন্য মশকটাকে ছেড়ে দিলেই সেটা জলের মধ্যে গিয়ে পড়ত। মানুষের কোনো পরিশ্রম ছিল না।

এলাকাটা এতই বড় যে সেখান থেকে চারদিকে অনায়াসে যাওয়া যেত না। কেবল একদিকের একটা গেট একটা বড় রাস্তার ধারে মোটামুটি লোকালয়ের সঙ্গে যোগ রাখত। এইজন্য এখানে চোর ডাকাতের উপদ্রবও বেশ ছিল। সারারাত চৌকিদার ও চৌকিদারনীন পাহারা দিত। চৌকিদারনী স্ত্রীলোক হলেও মস্ত বীরাঙ্গনা। একলা লণ্ঠন নিয়ে নিশুতি রাতে বেশ ঘুরে বেড়াত। কিছুদিন পরে এরা স্বামী-স্ত্রী পায়ে হেঁটে প্রয়াগ থেকে শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে গিয়েছিল। স্বামী বোধহয় জীবিত ফিরে আসেনি, চৌকিদারনী এসেছিল। যাই হোক এখানে শুধু যে চোর ডাকাত ছিল তাই নয়, বেগম সাহেবার কবরের কাছে বিরাট একটা অজগরের বাস ছিল। কোন কোন দিন রাত্রে চৌকিদার চীৎকার করে বলত, "বাবু অজগর!"। আমি ছেলেবেলা নির্ভীক ছিলাম। ঐ সমাধির কাছে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি মস্ত মোটা আর লম্বা অজগর ধীরমন্থর গতিতে ঘাসের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের দিকে ফিরেও তাকাত না। বাড়ীতেও মাঝে মাঝে সাপ বেরোত।

এইখানে একরাত্রে একটা ভীষণ কাণ্ড হল। সে বাড়ীর ঘরগুলো মস্ত মস্ত, এক একটা ঘরেই এক এক পরিবারের সকলের স্থান হয়ে যেত। রাত্রে যে যার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়েছি। অনেকক্ষণ পরে দরজায় খট খট করে আওয়াজ হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আর সাড়া পাওয়া যায় না। মেসোমশায়ের বড় ছেলে প্রতিভারঞ্জন হঠাৎ এই সময়ে বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছেন। দেখেন ইঁদারার উঁচু পাড়ের উপর একদল লোক দাঁড়িয়ে। "কোন হায় রে" বলতেই উত্তর হল "মেহমান" (অতিথি)। চোরেরা নিজেদের 'মেহমান' বলত। প্রতিভারঞ্জন "দাঁড়াও আলো এনে দেখি" বলে চট্ করে একটা ডুমওয়ালা ল্যাম্প নিয়ে বেরিয়ে এলেন। অমনি বর্শার ফলকের মত তীক্ষ্ণ দীর্ঘ একটা লাঠি সজোরে এসে তাঁর কপালে লাগল। কপাল ফেটে দুই ফাঁক। সাদা ডুমওয়ালা ল্যাম্প রক্তে লালে লাল হয়ে গেল। বাড়ীশুদ্ধ কাহারও যেন ভয় ডর ছিল না, শিশু বৃদ্ধ যুবা সবাই খোলা আকাশের তলায় তখনই বার হয়ে পড়লেন। বড়রা চীৎকার করে পুলিশ

ডাকাডাকি করলেন। ইন্দুভূষণ ও আমার বাবা ২।৩টো খাট টপকে অন্ধকারে লাঠি হাতে বিদ্যুৎ বেগে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কি অদ্ভুত সাহস! যাই হোক চোরদের চিহ্ন দেখা গেল না। পুলিশ দারোগা সবই একে একে দেখা দিল। মাস দুই ফাটা মাথা নিয়ে প্রতিভারঞ্জন পড়ে রইলেন, রোজ ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে যেত।

তাঁর শরীর দুর্ব্বল দেখে মাসিমা তাঁকে প্রত্যহ এক তাল মাখন আর মিছিরি খাওয়াতেন। এতে জীবনদাদার মনে বড়ই দুঃখ হত, তিনি প্রাণপনে নিজের শারীরিক দুর্ব্বলতা মাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন, যাতে তাঁর ভাগ্যেও একটু মাখন মিছিরি জোটে। ভাল হয়ে ওঠার পর দুই ভাইয়ে মাঝে মাঝে ঝুটোপুটি লেগে যেত নানাকারণে। একবার ঝগড়ার পর জীবন মস্ত এক কবিতা লিখে বসলেন, তার আরম্ভ প্রাচীন ষ্টাইলে

"একি হল আজ, একি হল আজ
দাদা যে আমারে মারিল বৃথা।
তাড়াতাড়ি আমি বলিয়া দিলাম
আসিলেন তারে বকিতে মাতা"

আমাদের ছেলেবেলায় মাকে "বামা 'বোধিনী' পত্রিকা নিতে দেখতাম। তাতে "একি হল আজ, একি হল আজ" বলে শুরু করা অনেক কবিতা থাকত। মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনীরা লিখতেন। "বামা বোধিনী" ছাড়া ছোট মাপের 'ভারতীও' আসত, আর আসত 'বান্ধব' বলে একটি পত্রিকা। কিছু বড় হলে পড়ে দেখেছি, 'বান্ধবে' প্রেততত্ত্ব বিষয়ে অনেক সত্য ঘটনা বার হত।

এই বাড়ীতে মুলুকে ছোট্ট আনা হয়েছিল। তাকে আমরা তখন মুকু কিম্বা মুকুতা বলে ডাকতাম। জীবনদা তাকে একটা কার্ড লিখে দিয়েছিল—

"মুকুতার হাতে আমি মুকুতা তোমারে
দিলাম একার্ডখানি অতীব সাদরে।"

জীবনদা মানুষটা চিরকালই স্নেহশীল, ৪।৫বৎসর বয়সে আমার যে নাকটিপে ধরেছিলেন, সেটা তাঁর একটা খেলা মনে হয়েছিল। ওর ফল যে মারাত্মক সে জ্ঞান তার ছিল না। অত ছোট ছেলের ও জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়।

মেঘরাজের তিনটা বাড়ীর মধ্যে যেটা সব চেয়ে বড়, সেটার একেবারে বাদশাহী পরিধি। আমরা প্রথম কয়েক মাস সে বাড়ীতেও ছিলাম। তার একটা বারান্দা এত বড় ছিল যে আমরা বড় ছোট মিলে আট নয় জন তাতে রীতিমত ফুটবল খেলতাম। নেপাল বাবুও আমাদের ভাই বোনদের সঙ্গে একজন খেলোয়াড় ছিলেন। ছোটদের সঙ্গে খেলতে তাঁর খুব ভাল লাগত।

যখন আমরা সাউথ রোডে ছিলাম তখন নেপালবাবু ও গিরীশবাবু কিছুদিন পরে ঐখানেই একটা ছোট বাড়ীতে উঠে যান। বিজয়কৃষ্ণ বসু বলে আর একজন মাষ্টারও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। এলাহাবাদে নেপালবাবু অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে এসেছিলেন। দাদা ও জীবন দাদা ছিলেন সেই স্কুলের ছাত্র। নেপালবাবু খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারতেন না। এটা কোথায়, সেটা কোথায় করতে করতে তাঁর দেরী হয়ে যেত। তবু তিনি এই দুই ছাত্রকে বলতেন. "তোমরা যদি আমার পরে স্কুলে পৌঁছাও ত তে মাদের late লিখে দেব।" ছাত্ররা বলত, যদি আপনি দেরীতে পৌঁছান ত আপনাকে late লিখিয়ে দেব। ভাত খাবার পরে তিনজনেই রেস দিয়ে স্কুলের দিকে দৌড়তেন। স্কুলটা বেশী দূরে ছিল না। অধিকাংশ সময়ে নেপালবাবুরই দেরী হত। কলকাতায় 'ল' পরীক্ষা দেবার জন্য যখন মাঝে মাঝে যেতেন তখনও দেরী করে ফেলার জন্য মাঝে মাঝে তাঁর ট্রেন ফেল হত। নেপালবাবু সকলের সঙ্গেই খুব গল্প করতেন, ছোট বড় বিচার ছিল না। কিন্তু সেকালের ব্রাহ্মদের মত সংযম শিক্ষার উপরেও তাঁর ঝোঁক ছিল। ছেলেবেলায় দেখেছি সপ্তাহে একদিন তিনি মৌনব্রত পালন করতেন। সেদিন তিনি কারও সঙ্গে কথা না বলে ইসারায় সব কথা বুঝিয়ে দিতেন।

মেঘরাজের বাংলোতে নেপালবাবু রোজ প্রাতর্ভ্রমণে বেরোতেন। সঙ্গী থাকতাম আমি আর মোহিনীদিদি

(ইন্দুবাবুরকন্যা)। ভোর বেলা উঠে নেপালবাবু "আমার মুজো কোথায়, জুতো কোথায়" বলে হাঁক'হাকি করতেন। শেষে সোহিনীদিদি ঠিক করলেন আগের রাত্রে তিনি সব গুছিয়ে রেখে দেবেন। আমার তখন ৯।১০ বৎসর বয়স, আমি কিন্তু ওদের সঙ্গে ধুলোভরা পথে নিমগাছ আর শিশুগাছের তলায় তলায় বেশ মাইল তিনেক রোজ ঘুরে আসতাম। আগে নেপালবাবু কখন কখনও দুপায়ে দুরকম মোজা পরেই বেরিয়ে পড়তেন।

মেঘরাজের বাংলোয় আমের সময় নেপালবাবুর আর একটা কাজ ছিল আম কেনা। সকাল বেলা বড় বড় ঝুড়িমাথায় আমওয়ালারা ক্রমাগত ফিরি করতে বেরোত। নেপালবাবু আমাদের দুই একজনকে সঙ্গে নিয়ে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেন। আম সস্তাই ছিল, তাই আমওয়ালারা একটা করে আম চাখতে দিত। ৮।১০ জনের আম চেখে আমাদের প্রচুর আম খাওয়া হয়ে যেত। তারপর হত একজনের কাছে শ' হিসাবে আম কেনা। একশ' আমের দাম খুব একটা বেশী ছিল না। রাতের আহারের সময় ক্ষীর আর রুটির সঙ্গে আমমেখে খাওয়ায় খুব আনন্দ ছিল।

মেঘরাজের বাংলোয় থাকতে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে" নৌকাডুবি ও "চোখের বালি" বেরিয়েছিল মনে হচ্ছে। বাড়ীতে কাগজ এলেই কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। মা. সোহিনীদিদি ও নেপালবাবু তিনজন ছিলেন প্রধান পড়ুয়া। আমরা তখনও ছেলেমানুষ। তবে 'হিতবাদী' প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী পড়তাম।

কিছু দিন নেপালবাবু তাঁর স্ত্রীপুত্রকেও এনেছিলেন। তখন তাঁরা বোধহয় আলাদা বাড়ীতে ছিলেন। নেপালবাবুর একজন সুন্দরী বালবিধবা দিদি ছিলেন। খুব হাসি হাসি মুখ। নেপালবাবুর ছেলে কালীপদ ভারি মজার মজার কথা বলত। আমার ছোট ভাই মুলুর হজম ভাল হত না বলে খুঁটের আগে তাঁর জন্য পোরের ভাত হত মাটির হাঁড়িতে। কালীপদ বিস্মিত হয়ে বলত, "মুলু কি বেম্ন হইছে?" মেসোমশায় একাদশীতে উপবাস করতেন ও থান ধুতি পরতেন বলে কালীপদ মেসোমশাই এর বৈধব্য ঘটেছে কিনা প্রশ্ন করত। নেপালবাবুর একজন ভাগিনেয় ছিল, সে আমার বাবাকে বুড়াবাবু বলত, কারণ অল্প বয়সেই বাবার সবচুল পেকে যায়। মাসিমা একদিন তাকে বললেন, "বুড়াবাবু বুড়াবাবু বলো না। জান, উনি এম্ এ পাশ?" ছেলেটি বললে, এম এ পাশ? আমি মনে করলাম ইনটিন্সে পাশ। কই, এট্টাও ত ইংরেজি কথা কইতে শুনি না।" বাবার বাংলার সঙ্গে ইংরেজী মিশিয়ে না বলায় এবং লেখার সময় বড় বড় পাণ্ডিত্যপুর্ণ কথা ও অলঙ্কার ব্যবহার না করায় একজন সাহিত্যিকও একবার বিস্ময়প্রকাশ করেছিলেন।

হিন্দুস্থানী জীবনের কয়েকটা জিনিষ আমরা একটু দূরে থাকলেও দেখতে পেতাম। সেটা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ছিল কিনা জানিনা। অনেক সময় রাস্তা দিয়ে একদল মেয়ে নাচতে নাচতে যেত বিশেষ একটি মেয়েকে ঘিরে। নাচের কারণ, ঐ বিশেষ মেয়েটির ভাইপোর জন্মগ্রহণ। তাই পিসিকে নাচ'ত হবে। যখন কোনোদূর জায়গা থেকে একজন আত্মীয়া আর একজন আত্মীয়ার বাড়ী আসত তখন প্রথমেই তারা পরস্পরের গলা জড়িয়ে বেশ খানিকটা কেঁদে নিত। একে বলে "ভেট" করা। কান্না শেষ হয়ে গেলেই দুজনে নানা হাসি গল্প সুরু করে দিত। ভদ্রমহলে এইরূপ ভেট করা প্রায় .যথতাম মেয়েদের মধ্যে।

ওদেশে বর বড় কি কনে বড় নিয়ে সবাই মাথা ঘামাত না। আমাদের এক ব্রাহ্মণ মহারাজ ছিল, তার বউ বলত, "হম সব জোয়ান থী, তব ত ও বাচ্চা থা।" আবার উল্টো দিকে অনেক জাতের ছেলেদের কনের পণ জোগাড় করতে করতে বয়স অর্দ্ধেক কেটে যেত। তার পর অনেক টাকা দিয়ে ছোট্ট একটি বউ আসত। ওদেশে কোনো কোনো জাতে মেয়ে বড় কম ছিল। অনেক মানুষ বউ জোটাবার মত টাকা সারা জীবনেও

সংগ্রহ করে উঠতে পারত না। নীচু জাতের মধ্যে পঞ্চায়েতের সাহায্যে divorceও হতে দেখেছি। শুধু পুরুষরাই করত না, মেয়েরাও করত। মুসলমানদের নিকার বিয়ের মত এদের নিম্নশ্রেণীতে একরকম বিবাহ ছিল, তাকে বলে "বৈঠায় লিয়া।" বিধবা কিম্বা স্বামী পরিত্যক্তাদের মধ্যেই বোধহয় এটা হত। পরে পঞ্চায়েৎকে ডেকে খাইয়ে সে বিবাহটা শুদ্ধ করে নেওয়া হত।

এলাহাবাদের প্রধান উৎসব ছিল পূজার সময় রামলীলা। ছোট ছোট ছেলেদের রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান ইত্যাদি সাজানো হত। তারপর বড় বড় চৌকিতে ট্যাবলোর মত করে তাদের দাঁড় করিয়ে উপরে চাঁদোয়া দিয়ে রাস্তায় মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হত। উঃ সে কি ভীড়। রাস্তার দুইধারে পথে এবং সব বাড়ীর ছাদে বারাণ্ডায় লোকে লোকারণ্য। কোনো কোনো রামলক্ষ্মণ হাতী চ'ড়েও আসতেন। দুধারে ভীড়ের লোকেরা জয়ধ্বনি করত আর অনবরত ফুলের তোড়া ছুঁড়ত। রামলক্ষ্মণের পিছনে উপবিষ্ট চেলারা ছড়ি দিয়ে দিয়ে ফুলগুলো ফেলে দিত যাতে দেবতাদের গায়ে না লাগে। মিছিলের শেষ হত যে মাঠে সেখানে রামরাবণের যুদ্ধ হবে একদিন রাবণকে দগ্ধ করে রামলীলা শেষ হত। দর্শকরা "রাওনওয়া মর গিয়া" বলে উত্তেজিত হয়ে চেঁচাত। রাবণ ছিল বিরাট কাঠ-খড় ও কাগজের মূর্তি। আমরা অন্য বহু দর্শকদের সঙ্গে বামনদাস বসুদের বাড়ীতে বসে মিছিল দেখতাম, আর জিলিপি খেতাম। ওদের বাড়ীর মেয়েদের এত লোকের সেবা করতে হয়রান হতে হত।

কালীপুজোর সময় বড়লোকদের বাড়ীর দেওয়ালির আলো দেখতে লোকে ভীড় করে যেত, আমরাও গিয়েছি। হোলির উৎসবটা ছিল অভদ্র। গালাগালি অসভ্যতা অনেককিছু ছিল তার সঙ্গে জড়িত। "পবিত্র হোলি"র চলন করবার জন্য একদল সংস্কারক খুব চেষ্টা করতেন। মালবীয়জি তারমধ্যে একজন।

এলাহাবাদে বাঙালী সম্মিলনীর প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাবা। সেখানে বক্তৃতা, গান, আবৃত্তি ত হতই, তার উপর লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা, tent pegging, হাইজম্প, লং জম্প, কত কি খেলা হত। বড় বড় গোঁফ কামানো ছেলেরা under sixteen লিখিয়ে এইসব খেলায় ঢুকে পড়ত। গান শোনাবার জন্য বাবা কলকাতার কুন্তলীন প্রেসের এইচ, বসুর কাছ থেকে ফনোগ্রাফ আনিয়েছিলেন। বাজাবার জন্য একজন লোকও সঙ্গে ছিলেন। তখনকার রেকর্ড ছিল গেলাসের মত দেখতে, থালার মত নয়। এই প্রথম কলের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান শুনলাম। "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী" "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি"।' এসব গান তার আগে এলাহাবাদে কেউ শোনেনি। কোনো কোনো রেকর্ড ছিল সুবিখ্যাত গায়িকা অমলা দাশের। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "পারত জন্মো না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলায়," ও "বুড়োবুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত, বুড়ো ছিলো পরম বৈষ্ণব বুড়ী ছিল ভারি শাক্ত," এইসব হাসির গান আমরা দুদিনেই শিখে নিলাম। কি মজা লাগত সেইসব গান গাইতে! বাজিয়ে ভদ্রলোক আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন, যখন তখন নানা রেকর্ড বাজিয়ে আমাদের খুশী করতেন।

তার পর এল বঙ্গভঙ্গ। বাংলাদেশে তখন সভা-সমিতি, পুলিশের গুঁতো, ধরপাকড়, বিলিতি কাপড় পোড়ান, স্বদেশী কাপড় ফিরি করা, কতরকম উত্তেজনা। আমরা বাইরে থাকলেও একেবারে নীরব ছিলাম না। এলাহাবাদেও সভা,মিছিল, রাখীবন্ধন সব হত। আমি তখন শাড়ী পরেছি ছোট হলেও, কাজেই আমাকে পর্দানশীন করা হয়েছিল। মা বলতেন, "ও দেখতে বড় হয়ে গিয়েছে।" সীতা পায়জামা আর পাঞ্জাবী পরে মিছিলের সঙ্গে বেরিয়ে যেত। সভাতে আমরা সবাই চিকের আড়ালে বসতাম। একটা সভায় সুলেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি অনেকে বক্তৃতা করেছিলেন। নগেন্দ্রবাবু বোধহয় মহিলাদের শ্রুতিসুখকর হবে মনে

করে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন মেয়েলি ভাষায়—"যখন কোন ভাগ্যবতী বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে তোলেন ......" ইত্যাদি বলে। চিকের আড়াল থেকে একজন মহিলা মন্তব্য করলেন, "আমর মিন্‌সে"; এদিকে একটা ছোট মেয়ে আমার পাশে বসে ক্রমাগত আমার চুল ধরে টান দিচ্ছিল। আমি যতই সরে বসি, সে ততই এগিয়ে আসে। সীতা ছিল আমার রক্ষয়িত্রী, সে দিল মেয়েটাকে ঠাস্‌ করে একটা চড়। মেয়েটা একদম চুপ। কাজেই সভাতে স্বদেশী বক্তৃতার উপর আরও অনেক কিছু হত।

রাখীবন্ধনের দিন আমরা অরন্ধন করলাম। বাবা কোথা থেকে লাল রেশমের সুতো আর হলদে চরকার সুতো নিয়ে এলেন। লাল থোপা দিয়ে দিয়ে আমরা হলদে সুতোর রাখী তৈরী করলাম। কত লোককেই যে বাবা তাকে রাখী পাঠালেন তার ঠিক নেই। কলকাতায় এসেও এই নিয়মটা আমরা কিছু দিন পালন করেছিলাম।

কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতে না মেলাতে বাবা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সিপ্যালের কাজ ছেড়ে দিলেন। তখন বাংলা প্রবাসী এবং ১৯০৭এ নব প্রকাশিত ইংরেজী 'মর্ডান রিভিয়ু' নিয়েই বাবা কাজে লাগলেন। তাঁর সহায় হলেন ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়। এসব কথা বাবার জীবনীতে আমি আগেই লিখেছি।

আমাদের বড় মামার বাঁকুড়াতে পড়াশোনা ভাল হ'চ্ছিল না। তাই মা তাঁকে এলাহাবাদে আমাদের সঙ্গে নিয়ে এলেন। বাড়ীতে আর একজন মানুষ বাড়ল। বড় মামা পরে প্রবাসীর কাজে লেগে গেলেন। পাড়ার ছেলেরা তাঁকে মাতুল ব'লে ডাকত। খোট্টা দেশের ছেলেরা মাতুল কথার অর্থ সবাই জানত না; অনেকে তাই বলত মাতুলবাবু'।

এলাহাবাদে আমাদের বিশনদাদাও কিছুদিন ছিলেন। একবার মাসিমা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন "হ্যাঁরে, সিপাহী বিদ্রোহ কোন বছর হয়?" তাই শুনে আমাদের ঝিয়ের বুড়া মা বললে, "উ তো বাচ্চা হ্যয়! ক্যা জান্‌তা? হম্‌সে পুঁছো।" সে মিউটিনি দেখেছিল।

সাহেবপাড়ার বাড়ীগুলোর পরে এবং মেথরাজের বাড়ীর পর আমরা এলাম দেশী পাড়ায়, তার নাম কোঠা পার্চ্চা। বাড়ীর মালিক ফুলমণি ধাত্রী। অনেক-গুলোঘর, ছুটো উঠোন, চাকরদের জন্য আলাদা একটা কাঁচা ইটের মহল, কিন্তু সাহেব পাড়ার বাড়ীর মত মস্ত বড় বা ছোট্ট কম্পাউণ্ডও নেই। এখানে সারা-ক্ষনই বাড়ীর মধ্যে থাকতে হয়। আমাদের অনভ্যস্ত মন ছট্‌ফট করত। পিছনের প্রতিবেশীরা একেবারে বস্তিবাসী আর সামনে রাস্তার ওপারে পাণ্ডাদের আড্ডা। তারা যাত্রী দেখলেই সদলে সরবে চীৎকার করে, "গঙ্গা বিষ্ণু ছোটেলাল গয়াজীকা পাণ্ডা।" রাত্রে শীত গ্রীষ্ম সব সময়ে তারা খোলা বারান্দায় শুয়ে ঘুমোয়, শীতের সময় নাক মুখ চোখও লেপে মুড়ি দিয়ে থাকে। ভালো ভালো লক্ষ্ণৌ ছিটের লেপ।

এখানে বাড়ী বাড়ী বোধহয় কল ছিল না; তাই গরীব বাসিন্দারা আমাদের বাড়ীর সামনে রাস্তার কলে সারাদিন জল ভরত আর বাসন ধুত, যেমন আমাদের কলকাতাতেও ধোয়। গল্পগাছা ঝগড়া সবই সঙ্গে সঙ্গে চলত। একজন শুচিবায়ুগ্রস্তা মেয়ে ছিল, সে প্রত্যহ তার ঘড়াটা বার কুড়ি পঁচিশ ধুয়েও তৃপ্ত হত না। আর সকলের মুখগুলো এখন ভুলে গেছি, কিন্তু তাকে আজও মনে আছে।

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম হাওয়া বইত দুপুর বেলা, ঠিক যেন আগুনের হলকা, তাকে বলত 'লু'। বাড়ীর সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে মা একটু ঘুমোতেন, আমরা বড় আর একটা ঘরে বন্ধ থাকতাম, সে ঘরটা রাস্তার ধারে। মা শুতে যাবার পরই একটা লেমোনেড-ওয়ালা রাস্তার ধারে এসে ক্রমাগত তার গাড়ী ঘড় ঘড় করত। আমার ভ্রাতারা রাস্তার দিকের দরজাটা খুলে তার কাছ থেকে সবাই লেমনেড নিয়ে খেত। তার পর

বিকেল বেলা সে এসে মায়ের কাছে পয়সা চাইত। বকুনি খেলে হয়ত দু' চার দিন লেমনেড খাওয়া বন্ধ থাকত, কিন্তু তার পর আবার যে কে সেই!

গরমের সময় রাত্রে আমরা বাইরে শুতাম, অর্থাৎ উঠোনে। হঠাৎ বৃষ্টি এলে পড়িকি মরি করে খাট-বিছানা তুলে ঘরে ঢুকতে হত। আমার কিন্তু গায়ে বৃষ্টি পড়লেও ঘুম ভাঙত না, বাবা আমাকে ঘুমন্ত কোলে তুলে ঘরে শুইয়ে দিতেন। আমার তখন ব'ছর বারো বয়স। আরো ছোটবেলা আরোই ঘুমোতাম। যখন সিভিললাইনসে ছিলাম তখন ত বাড়ীর উঠোন ছিল না, খোলা কম্পাউণ্ডেই বাইরে শুতে হত। এতে অনেকের অনেক রকম বিপদও হত। এক বাড়ীর মেয়েদের চোরে নাক কান ছিঁড়ে গহনা নিয়ে পালিয়ে ছিল।

এলাহাবাদে পুরাকালে খুব প্লেগ হত। অনেকে শহর ছেড়ে পালাত। বাবা কখনই বোধ হয় পালাননি। দুই একবার আমাদের দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মেসোমশায় ত প্লেগরোগীর সেবাও করতেন। আমরা প্রায় সব বছরই ওখানেই থাকতাম। কিন্তু একবার আমাদের বাড়ীতেই ইঁদুর মরতে সুরু করল দেখে বাবা তৎক্ষণাৎ ঠিক করলেন এখানে ছেলে-মেয়েদের আর রাখা চলবে না। সে বাতিয়া বাগ নামক একটা জায়গায় হেল্‌থ ক্যাম্প হয়েছিল। আমরা সেখানে চলে গেলাম। সেখানের কুঁড়ে ঘরগুলি অড়র গাছের বেড়ার, চাল খড়ের। ঝড়ে আগুনে বা গরু ও মানুষের অত্যাচারে যেকোনো মুহূর্তেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এইরকম আকস্মিক দুর্ঘটনা হতও। আমরা কিন্তু আনন্দেই ছিলাম। অন্য একটা এই রকম কুঁড়ে ঘরে নেপালবাবুরা সপরিবারে ছিলেন। সেখানে তাঁর শাশুড়ী সারাদিন ধরে নানারকম রান্না করতেন এবং তানুভুন নামে একটি ভাইপো মাঝে মাঝে খেলাচ্ছলে মাছ ধরে এনে আমাদের রান্নাঘরে দিয়ে যেত। নেপালবাবুর ভাগ্নে ও ভাইপো দুজন ছিল, নামটা ভুল করলাম কিনা জানি না। ছেলেটি নিজেদের বাড়ীতে অর্থাৎ কুটিরে মাছ নিয়ে গেলে বোধ হয় বকুনির ভয় ছিল। নেপালবাবু ছোট ছেলেদের ঐ জাতীয় খেলা পছন্দ করতেন না। সোবাতিয়া বাগে বড় বড় চুরির খবরও প্রায়ই পাওয়া যেত। তাই বড় ছেলেরা রাত্রে পাহারা দেবার পালা করেছিল।

বাবাকে ইংরেজ সরকার মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। মডার্ণ রিভিয়ু প্রকাশিত হবার পর থেকে তাঁদের রাগ আরও বেড়ে গেল। কোনো প্রকারে তাঁকে এলাহাবাদ থেকে তাড়াতে পারলে তারা বাঁচে। স্বদেশীর সময় নেপালবাবুর চাকরী গেল, স্বদেশী সভায় যোগ দেওয়ার জন্য। হিউয়েট সাহেব কয়েকজন বাঙালীকে দণ্ড দিয়ে বাঙালী সমাজে ভীতি উৎপাদন করার চেষ্টা করেন। নেপালবাবু লিখেছিলেন "বলা বাহল্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ই ছিলেন হিউয়েট দণ্ডনীতির প্রধান লক্ষ্য।"

১৯০৮ এ বাবার লেখায় কি একটা ছিদ্র পেয়ে সরকার পক্ষ হুকুম করলেন, হয় মডার্ণ রিভিয়ু বন্ধ করতে হবে, নয় সম্পাদককে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এলাহাবাদ ছেড়ে যেতে হবে।"

বাবা তাঁর বহু সুখদুঃখের স্মৃতিজড়িত এত দিনের প্রিয় কর্মভূমিকে ছেড়ে সপরিবারে কলকাতায় ফিরে এলেন। আগে এলেন বাবা, আমরা সবাই দাদার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর ফিরলাম। সম্ভবত দাদা সকলের পরে এলেন।

আমরা এলাহাবাদ ছেড়ে আসাতে ভৃত্যমহলে মহা দুঃখ দেখা দিল। গোয়ালিনী বললে, "মাজি, যদি নৈনী (এলাহাবাদের পরের ষ্টেশন) তক যেতেন তাহলেও আমি দুধ দিয়ে আসতাম। কিন্তু কলকত্তা ত যেতে পারব না।" আমাদেরও দুঃখের সীমা ছিল না। এর চোদ্দ পনের বৎসর পরে আমাদের পুরাতন পাচক গণেশ মহারাজ "খোঁখীরাণী"কে অর্থাৎ আমাকে দেখতে কলকাতায় একবার আমাদের বাড়ী এসেছিল।

মাতাভিখ্ বলে বাবার এক ভৃত্য ছিল। সে যদি বেঁচে থাকত, হয়ত সেও আসত। সে বাবাকে খুব ভক্তি

করত। বাবা যদি চটি পায়ে কখন পথে বেরোতেন, অমনি সে জুতোজোড়া নিয়ে বাবার পিছন পিছন দৌড়ত। সে আবার ইংরেজীও বলত, কারণ সে ট্রিনিডাডে গিয়েছিল। সময় জানতে হলেই বলত, "হোয়াটো কি লাক?"

বাবা কায়স্থ কলেজ ছেড়ে দেওয়াতে অধ্যাপক ও ছাত্ররা সকলেই গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন। বাবা ইংরেজী কাগজ চালাবেন শুনে পণ্ডিত বালকৃষ্ণ চটেই আগুন; বললেন, "রামানন্দ ত বৌরা (পাগল) হো গয়া।" কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল হিন্দুস্থানী। তবু তারা এই স্বল্পভাষী বাঙালী অধ্যাপককে বিদায় দিতে হবে জেনে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল। বিদায় দিনের অপরাহ্নে কলেজে বিদায়-উৎসব হয়। তারপর নূতন ও পুরাতন সমস্ত ছাত্ররা সভাভেঙে অধ্যাপককে গাড়ীতে বসিয়ে সেই গাড়ী নিজেরা টানতে টানতে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এল। বাড়ীর সামনের রাস্তা, পথের ধারের বারান্দা সব ছাত্রের ভীড়ে ঠাসাঠাসি। শেষ প্রণাম জানাতে এক এক জন করে ছাত্র তাঁর পায়ে মাথা পে[illegible] দুহাতে হাঁটু জড়িয়ে আর উঠতেই চায় না। সে দৃশ্য যা[illegible] দেখেছে, তারা চোখের জল সামলাতে পারেনি। এম[illegible] করে কত রাত হয়ে গেল, কিন্তু বিদায়পর্ব্ব যেন শে[illegible] হতে চায় না।

আমরা আমাদের আসবাব সবই বোধহ[illegible] বামনদাসবাবুদের বাড়ীতে রেখে বাক্স প্যাঁটরা এবং ব[illegible] এর বোঝা নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম।

এলাহাবাদে যাঁদের সঙ্গে এতকাল এক পরিবারে[illegible] মত কাটিয়েছিলাম, তাঁদের সকলকেই ছেড়ে চ[illegible] আসতে হল। মনে হল নির্ব্বাসনে যাচ্ছি।

মুলু তার "ডাকালবাবু" বামনদাসবাবুকে ছাড়[illegible] কোনো ডাক্তারকে পছন্দ করত না। তিনি ও[illegible] "মুলুবাবু, আপনি" বলে কথা বলতেন। সেটিই ছি[illegible] তাঁর রীতি। কাউকেই "তুমি" বলতেন না। কলকাতার রীতি সব আলাদা দেখে বেচারী মর্ম্মাহ[illegible] হল।

অরাজকতার উৎস সন্ধানে

অশোক চট্টোপাধ্যায়

আজকাল বাংলা দেশের কিছু লোক ডাকাইতি লুঠ অপরের জমি দখল ও পরস্পরের উপর বোমা বর্ষন ও অস্ত্র চালনা করিয়া মানবতার দায়িত্ব পালন ও অবসর অতিবাহন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে পাঠ করা যায় যে ছোরাছুরি বিস্ফোরক সজ্জিত যোদ্ধাগণ কোন স্কুল বা কলেজ সদলবলে প্রবেশ করিয়া পুস্তকাগার ধ্বংস, বিজ্ঞানাগারে অগ্নি সংযোগ, স্বনামধন্য ব্যক্তিদিগের চিত্রাদি থাকিলে সেগুলি নষ্ট করা ও আসবাব প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের প্রতি তাহাদের বিরুদ্ধতা গভীর আবেগের সহিতই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। স্কুল কলেজ ব্যতীত অপরাপর কোন কোন প্রতিষ্ঠানের উপরও কখন কখন আক্রমন করা হইয়া থাকে এবং পথে ঘাটে পারস্পরিক সংঘাতও কোথায় কোথাও প্রবল শক্তিতে চালিত হইতে দেখা যায়। হাসপাতাল, কৃষ্টি ও ধর্ম-কেন্দ্র, প্রকাশ্য জনসভা, চলচ্চিত্রাগার, সাধারণের ব্যবহারের যানবাহন, দোকান, ব্যাঙ্ক ডাকঘর—যে কোন স্থানেই এই সকল স্বয়ংসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া সমাজ বিরুদ্ধতর করিয়া নিজেদের আদর্শবাদ সার্থক করিবার চেষ্টা করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। এই সকল অতীত উচ্ছেদকারী, ঐতিহ্য ধ্বংসক, জাতীয়তা বিনাশক নূতন মানব সভ্যতা গঠন প্রয়াসী, সর্ব্ববিষয়ে অবিশ্বাসী, বিকৃতমতবাদপুষ্ট অপ্রাপ্ত বয়স্ক সর্ব্বজ্ঞদিগের কার্য্যকলাপ দেখিলে বুঝা যায় যে তাঁহারা সকলে এক মানসিক সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। সুতরাং পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিবার সময় মনে রাখা আবশ্যক হয় যে এই দেশের সকল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মী একগোষ্ঠীর অন্তর্গত নহেন। ডাকাইতি লুট যাঁহারা করেন, অথবা যাঁহারা অপরের ভূসম্পত্তি গ্রাস করিতে তৎপর তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খা প্রণোদিত। না। কারণ ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অপরের সম্পদ লুণ্ঠন ও অপহরণে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা কোন উচ্চস্তরের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া সমাজ সংস্কার কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তাঁহারা মহা অভাবের তাড়নায় অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রযান ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া, গুপ্তচরের সাহায্যে কোথায় কোন সময় ধন সম্পত্তি পাওয়া যাইতে পারে তাহার খবর রাখিয়া লুটপাটের আয়োজন করেন, ইহাই বা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়? দূর দূরান্তরে তাঁহাদের আস্তানা থাকে, বোম্বাই পাঞ্জাবের সহকর্ম্মীদিগের সাহায্যে ডাকাইতি লব্ধ অর্থ ক্রমে ক্রমে ভোগে লাগাইবার ব্যবস্থাও থাকে; এমত অবস্থায় মনে হয় যে ডাকাইতির ব্যবস্থা চালাইবার মূলধন সংগ্রহেও তাঁহাদের কোনও অসুবিধা হয় না। সেই জন্য অভাবের অবতারনা করিয়া তাঁহাদিগের অসৎ প্রচেষ্টার সাফাই গাহিবার কোন প্রয়োজন আমরা অনুভব করিনা। যে সকল ব্যক্তি বিদেশের লোকের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া ভারতে বিদেশীয় মতলব হাসিল করিতে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহাদেরও বিশেষ অর্থাভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ বিদেশীয়রা ভারতের সাধারণতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া তৎস্থলে অপর রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতে অপারগ নহেন। আমাদিগের দেশের তথাকথিত বিপ্লববাদীরা যে ভাবে সদলবলে অপর দেশে ভ্রমণে যাইয়া থাকেন ও সেই সকল দেশের সাহায্যে ভারতে বিপ্লব আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে মনে হয় ঐ সকল দলের নেতা ও তাঁহাদের অনুচরদিগের অর্থাভাব কখনও হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই দেশে বিদেশীয় অর্থপুষ্ট অবস্থায় বিপ্লব প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, এবং বিপ্লব প্রচারের অঙ্গ হিসাবেই তাঁহারা অরাজকতার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়া

অপরের ক্ষেত্রের ধান কাটিয়া লওয়া ইত্যাদি কার্যের মূলে রহিয়াছে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় ফন্দিবাজী। কূটনীতি বিশারদ চক্রান্তকারী ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র করিতে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা তাঁহারা বিদেশীর নিকট পাইয়া থাকেন ও সেই অর্থে চেলাচামুণ্ডা সংগ্রহ করিয়া দলভারি করিয়া লইয়া তাঁহারা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন। অস্ত্রশস্ত্রও বিদেশ হইতে গোপনে প্রচুর পরিমাণে আসিয়া যায়; অথবা বিদেশীর অর্থে এইদেশে ক্রয় করাও অনায়াসে হইয়া থাকে। ব্যাপকভাবে অপপ্রচার করিয়া এবং রাজশক্তি করায়ত্ত করিবার লোভ দেখাইয়া বিক্ষোভ সৃষ্টি করা হয়। অভাব, শিক্ষার অব্যবস্থা, চাকুরী না পাওয়া প্রভৃতি সামাজিক পরিস্থিতি প্রকটভাবে বিদ্যমান থাকাতে ষড়যন্ত্রকারীদের দুষ্কর্মের সুবিধা ও সাহায্য হয়; কিন্তু বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলার ব্যবস্থা হয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া। সেই অর্থ যদি সদ্ব্যয় করা হইত তাহা হইলে তাহা দ্বারা মানুষের মনে বিপ্লবের আগ্রহ না জাগাইয়া সমাজ গঠন কার্য্য করিবার ইচ্ছাও জাগান যাইতে পারিত, ও ফলে দেশের উন্নতি সহজ ও সরল পথে চলিয়াই সম্পন্ন হইতে পারিত।

চাকুরী নাই চাকুরী নাই বলিয়া যে রব ওঠান হয় তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কাজ কারবারে অশান্তি ও শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলেই আজকাল বহু কারখানা, দফতর ইত্যাদি বন্ধ হইয়া যাইতেছে। বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির একটা কারণ এই কারবার পরিচালনায় মুশকিল ও আর্থিক বিঘ্ন বিপত্তি। এই গোলযোগের মূলে রহিয়াছে বিদেশীর ষড়যন্ত্রজাত বিক্ষোভ প্রচার ব্যবস্থা ও বিপ্লব আনয়ন চেষ্টা। অর্থাৎ বেকারদিগের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ঐ একই মূল কারণ, হইতে বিক্ষোভ ঘনায়মান হইতেছে ও বিপ্লবের আয়োজন বিস্তৃতি আহরণ করিতেছে। কাজকারবার সহজ ও লাভজনক ভাবে না চলিলে যে তাহার ফলে বেকার চাকুরের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবেই, ইহা কাহাকেও দীর্ঘ আলোচনা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন না হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু আমরা সহজ কথা সহজভাবে বুঝিতে চাহিনা বলিয়াই বাংলায় বেকার সমস্যার কারণ বুঝিতে আমরা ঘোরাল পথে চলিতে থাকি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সহিত তুলনায় বাংলা দেশের কর্মীদিগের উপার্জন খুব অল্প নহে। কিন্তু উপার্জন ভারতের সর্ব্বত্রই জীবন নির্ব্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নহে; কিন্তু অপরের চাকুরী যাঁহারা করেন না ও নিজ উৎপাদনের ফল যাঁহারা পূর্ণরূপে নিজেরাই ভোগ করেন, ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের উপার্জনও যথেষ্ট নহে। অল্প উৎপাদন ও অল্প উপার্জন ভারতের একটা সর্ব্বত্র প্রচলিত চিরস্থায়ী অর্থনৈতিক ব্যাধি। সুতরাং কেহ কাহাকেও বেতন দিয়া কর্মে নিযুক্ত করিলেই যদি তাহাকে উৎপাদনের পরিমাণ বিচার না করিয়া শুধুমাত্র জীবন নির্ব্বাহের ব্যয় বিচার করিয়া উপযুক্ত বেতন দিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে ভারতের সর্ব্বত্রই বেতন ভোগীদের কাজ পাওয়া কঠিন হইবে। গ্রামের চাষীরা, শহরের গো যান বা একা চালক অথবা স্বাধীন কামার, কুমার, জোলা বা জেলের তুলনায় কারখানার শ্রমিকদিগের উপার্জন কম বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিতে বিপ্লববাদী শ্রমিক নেতাগণ সকল কারখানা ও আফিস দফতরেই জোরাল গলায় শোষনের অভিযোগ করিয়া সকল শ্রমিককে উত্তেজিত করিতে সদা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন দেখা যায়। এই সকল নেতাগণ যদি রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রকারীদিগের সহিত জড়িত না থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মানবতাবাদকে শ্রদ্ধার সহিতই গ্রহণ করিতাম; কিন্তু যেখানে সেই মানবতার আদর্শ ভারতীয় রাষ্ট্রকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে, সে ক্ষেত্রে ঐ আদর্শের সম্ভ্রম নষ্ট করিতেছেন আদর্শ প্রচারকেরা নিজেরাই। একথাও ভাবিয়া দেখিতে হয় যে যাঁহারা চাকুরী পাইতেছেন না বা পাইয়া হারাইতেছেন; তাহারাই লুটপাট ডাকাইতি দাঙ্গা ও খুন খারাবি করিয়া

বেড়াইতেছেন কি না, উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বেকারদিগের ঐ সকল কার্য্যে যোগদান করিতে বিশেষ দেখা যায় না। সুতরাং চাকুরী নাই কিম্বা অর্থাভাব আছে বলিয়া বিক্ষুব্ধ জনগণ অরাজকতার সৃষ্টি করিতেছে, এই অনুমান কখনও কোথাও সত্য বলিয়া প্রমাণ হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা ভ্রান্ত বিশ্বাসজাত আন্দাজের কথা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন বৃটিশের সৃষ্টিকরা দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলা দেশে পনের লক্ষ মানুষ অনাহারে প্রাণ হারায় ও যখন এই দেশের বিশ্বমানবতার আদর্শ-বাদী কম্যুনিষ্ট প্রচারকগণ সকল মানুষকে ফ্যাশিষ্ট দমনের সহায়তা করিয়া, বিক্ষোভ বিপ্লব ভুলিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলিয়া শান্তভাবে অনাহারে মরিতে শিখাইতে ছিলেন; তখনও এই দেশে কোথাও লুঠপাট হয় নাই। অভাব, অনাহার এমনকি প্রাণ যাইলেও সভ্য জগতের মানুষ নিজের সভ্যতা ভোলে না। বাংলার মানুষ সুসভ্য একথা সকলেই জানেন। সেই মানুষ যদি ছুরি ছোরা বোমা লইয়া ধাবমান হয়, দল-বদ্ধভাবে পরদ্রব্য অপহরণ করে, জাতির সম্মানিত মহামানবদিগকে অপমাণ করিতে অগ্রসর হয়, বিজাতীয় সমাজনেতাদিগের পূজায় নামিয়া নিজদেশের ঐতিহ্য ভুলিয়া নিজ জাতির জ্ঞান ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য অবহেলায় ভস্মস্তূপের আবর্জ্জনার মধ্যে নিক্ষেপ করে; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহা কোন অভাবের তাড়নায় অথবা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আক্রোশ বশতঃ হইতেছে না। ইংরেজী ভাষায় একটা কথা আজকাল, সকলেই, ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা হইল ফ্রাষ্টেশণ বা ব্যর্থতাবোধজাত নৈরাশ্য। ঐ নৈরাশ্য না কি মানুষকে না করাইতে পারে এমন কাজ নাই। আমাদের দেশের অপরিণত বয়স্কমানুষ-দিগের মনে ঐ ফ্রাষ্টেষণ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার ফলে তাহারা সকল অন্যায় কার্য্য করিতেই এখন প্রস্তুত হইয়া থাকে। এবং তাহারা যথেচ্ছাচারের চুড়ান্ত করিয়া নিজেদের মানসিক শান্তি ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টাই করিয়া থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। কষ্টকল্পিত মনোবিজ্ঞান আওড়াইবার ইহা অপেক্ষা অধিক অসংগত দৃষ্টান্ত বড় একটা পাওয়া যায় না। পাঠ্য পুস্তকগুলি পছন্দসই হয় নাই বলিয়া মহাত্মা গান্ধীর চিত্র কাটিয়া তিন টুকরা করা হইল-ব্যর্থতা বোধের আবেগ-শুনিলেই বুঝা যায় যে ব্যর্থতা বোধটা ফরমাশ দিয়া তৈয়ার করান, স্বাভাবিক নহে। এবং বায়নার টাকাটা মহাত্মার শত্রু পক্ষের তহবিল হইতেই দেওয়া হইয়াছিল। যতটা জানা যায় যাঁহারা এই সকল কার্য্য করেন তাঁহাদিগের সহিত পাঠ্য পুস্তকের সম্বন্ধ কিছুমাত্র ঘনিষ্ঠ নহে। বাংলা দেশে যাহা ঘটিতেছে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে বহু দূরের নানা কেন্দ্র হইতে। স্থির নির্দিষ্টভাবে কোন কথা বলিতে আমরা পারি না। কিন্তু খরচের টাকা আসে ওয়াশিংটন, লণ্ডন, মস্কো, পিকিং ইসলামাবাদ ও নূতন দিল্লী হইতে বলিয়া জনরব। ফ্রাষ্টেশণ উত্তম ও উত্তেজক মনোভাব কিন্তু উহা দ্বারা বিল শোধ করা যায় না। খাওয়া থাকা জামা কাপড় যাতায়াত করিতে বিভিন্ন দলের দশ বিশ হাজার ব্যক্তির বাৎসরিক মাথা পিছু নিদেন পক্ষে ৩০০০ টাকা করিয়া লাগে, অর্থাৎ সকলের ব্যয় একত্র করিলে বছরে তিন হইতে ছয় কোটি টাকা অবধি খরচ হইতে পারে। ইহার উপরে আছে অস্ত্র শস্ত্র বোমা বারুদের খরচ। এত টাকা শুধু ফ্রাষ্টেশণ হইতে যদি পাওয়া যাইত তাহা হইল উক্ত ব্যর্থতাবোধের মত অর্থকরী মনোভাব জগতে আর অন্য কোথাও পাওয়া যাইত না।

অরাজকতা তাহা হইলে কোন স্বাভাবিক অবস্থার ফলে নিজ হইতে জাগিয়া উঠিতেছে না। হইতে পারে কোথাও কোথাও কোন কোন ব্যক্তি নিজ হইতেই প্রতিষ্ঠিত শাসকদিগের অপসারণ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। কিন্তু অধিক লোকের মনে ঐ ভাব নিজ হইতে জাগিয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয় না। যেখানে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বহু সহস্র ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে অরাজকতা সৃজনে আত্মনিয়োগ করিয়া চলিয়াছেন, সেখানে মনে করা স্বাভাবিক যে বিষয়টা অত সহজ ও সরল নহে। ইহা ব্যতীত বহু প্রমাণও আছে যে ভারতের সাধারণ-

তন্ত্রের অবসান প্রার্থী বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচরগণ ভারতে অর্থব্যয় করিয়া রাষ্ট্র বিরুদ্ধতা প্রচার করিয়া থাকেন। ভারতের বিরুদ্ধে যাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া খোলাখুলি লড়াই করে সেই সকল পার্ব্বত্য জাতিগুলির যুদ্ধ শিক্ষাদান ও অস্ত্র সরবরাহ ব্যবস্থাও বিদেশীরা করিয়া থাকে। এই সকল কারণে বিদেশী ভারত শত্রুদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ও তাহাদের প্রতি সন্দেহ হওয়াও স্বাভাবিক। দেখা যায় যেখানেই অরাজকতা সেখানেই রাষ্ট্রীয়দলের লোক ঘোরাফেরা করে। যেখানেই রাষ্ট্রীয়দল সেখানেই বিদেশী অর্থ, বিদেশী মতবাদ, বিদেশীদিগের পরামর্শে বিদেশী ঢং এর কার্য্য কলাপ ও যুদ্ধনিনাদ। সুতরাং বিদেশীদিগের উপর সন্দেহ হইবে না কেন? বিশেষ করিয়া যখন জানা গিয়াছে যে বহু বিদেশী গুপ্তচর এদেশে আছে ও এই দেশের রাষ্ট্রশত্রুগণ তাহাদিগের সহিত মিলিতভাবে কাজ করে। এই সকল রাষ্ট্রশত্রুগণ বহু অর্থ ব্যয় করে। সে অর্থ আসে কোথা হইতে তাহাও জানা আবশ্যক।

ভারতের রাষ্ট্রশত্রু যে সকলেই বিদেশী তাহা হইতে পারে না। যাহারা বিদেশীর নিকট অর্থ গ্রহণ করিয়া নিজদেশের রাষ্ট্র ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে তাহাদিগের সহিত এমন লোকও থাকিতে পারে যাহারা স্বদেশে সংগৃহিত অর্থে সামাজিক বিপ্লব ব্যবস্থার আয়োজন করিয়া চলিতেছে। কিন্তু এইরূপ লোকের সংখ্যা অল্পই হইবে। কিছু লোক যে আছে তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন। ইঁহারা প্রয়োজন হইলে বিদেশীর নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতে অপারগ নহেন। কিন্তু সকলেই বিদেশীর সাহায্য গ্রহণে প্রস্তুত নহেন। কেহ কেহ আছেন যাঁহারা বিদেশী দেশশত্রুদিগকে কোন অবস্থাতেই বন্ধু বলিয়া মানিতে চাহেন না। নিজ দেশে নিজ দেশবাসী রাষ্ট্রবিপ্লব করিলে তাহা রাষ্ট্রীয় অধিকার বহির্ভূত নহে; কিন্তু বিদেশী যদি আমাদের দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইবার জন্য ষড়যন্ত্র ও অর্থব্যয় করে তাহা হইলে সেই কার্য্য বিদেশীর পক্ষে অনধিকার দোষদুষ্ট আন্তর্জাতিক অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইবে; এবং স্বদেশের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষী লোকেরাও ঐ সব বিদেশীদিগকে শত্রু বলিয়াই বিচার করিবেন। এইরূপ চিন্তা এই জন্যই করা হয় যে আমাদের দেশে আমরা যদি বিপ্লব চাহি তাহা হইলে সেই আকাঙ্ক্ষা আমাদের নিজ অধিকার অন্তর্গত জাতীয় স্বার্থের কথা। কিন্তু বিদেশী যদি সেই বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করে তাহা হইলে আমরা বলিব বিদেশী কোন অধিকারে তাহা করিতেছে? তাহার ইহাতে কি স্বার্থ থাকিতে পারে? সে নিশ্চয় কোন গুপ্ত অভিপ্রায় সিদ্ধি করিবার জন্যই তাহা করিতেছে এবং সে অভিপ্রায় তাহার নিজের সুবিধা অনুগামীই হইবে; আমাদের দেশের কোন লাভ তাহা হইতে হইবে না।

বর্ত্তমানের অরাজকতা তাহা হইলে এক কারণে, এক উদ্দেশ্যে, একদলভুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট ও অনুষ্ঠিত হইতেছে না। উপযুক্ত শিক্ষা, উপার্জ্জনের সুযোগ সুবিধা না থাকায় কিছু লোক মানসিক অস্থিরতা প্রযুক্ত অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগের সংখ্যা অল্প ও সমাজ বিরুদ্ধতাও ততটা প্রবল নহে। কিছুলোক অপরাধ প্রবণতা হেতু ডাকাইতি লুঠ খুনখারপি ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে ও এই সকল লোক রাষ্ট্রীয় দলের লোকেদের সহিত কোথাও কোথাও জড়িত থাকায় পুলিশ ইহাদের ধরপাকড় শাস্তি সম্বন্ধে উদাসীন ও সেই জন্য ইহাদিগের অপরাধ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিগণ সংখ্যায় অত্যল্প নহে। অরাজকতা ক্ষেত্রে প্রবলতম গোষ্ঠী হইল রাষ্ট্রীয় দলের পেশাদার হাঙ্গামা, দাঙ্গা করাইবার লোকের। খুন জখম অগ্নি সংযোগ ভূমি দখল ফসল লুঠ ইত্যাদি বহু দুষ্কর্ম্মই ইহারা করিয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তির নেতা ও নিয়োগকর্ত্তাগণ কিছুটা স্বদেশী ও কিছুটা বিদেশী অর্থে নিজেদের অরাজকতা বন্যার কার্য্য চালাইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বিদেশী ভারত শত্রুদিগের ষড়যন্ত্রের অংশীদার এবং তাহাদের অর্থে বিপ্লববাদ

(এরপর ৩২২ পাতায়)

যত আঁধার তত আলো

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

১৯

মনোরমা হেসে বলল, তারপর ?

অঞ্জন বলল, দাদার সব ভাল কিন্তু অকারণে সময় নষ্ট হতে দেখলেই ক্ষেপে যান ! আর তেমনি হয়েছেন আপনার দাদুটি। যদি একবার সুরু করলেন তাহলে আর থামতেই চান না। আমি বসে বসে খুব মজা দেখছিলাম মনোদি—

বিস্মিতকণ্ঠে মনোরমা বলে, মজা !

অঞ্জন বলে, সত্যিই মজা—দাদু এমন সব কথা বলেন। গত দিনের সবই নাকি ভাল আর বর্তমান কালেই সবকিছুই খারাপ।

মনোরমা বলে, দাদু নিজে কিন্তু এসব কথা বিশ্বাস করেন না।

করেন কিনা… মনোরমার কথার পিঠে অনেকখানি জোর দিয়ে অঞ্জন বলল, শুধু বিশ্বাসই করেন না, নিজের বিশ্বাসকে জোর করে অপরকেও বিশ্বাস করাতে চান।

মনোরমা হেসে বলল, তাই নাকি ? তারপর ?

অঞ্জন দুষ্কৃতিচালে বলল, তাঁর বিশ্বাসের বোঝা আমাদের দুর্বল ঘাড়ের উপর চাপাতে চাইলেন।

কিন্তু পারলেন না কি বলো অঞ্জন ? মনোরমা তরলকণ্ঠে জবাব দিল।

অঞ্জন বলল, আমরা ঘাড় পেতে নিলে তো।

মনোরমা হেসে বলল, তোমাদের হলো অবিশ্বাসী মন—

অঞ্জন বলল, সেইজন্যেই কোমর বেঁধে লড়াই সুরু করে দিলাম।

মনোরমা খোঁচা দিয়ে বলল, সেকি তোমাদের দুর্বল ঘাড় বলে না, অবিশ্বাসী মনের জন্য ? কিন্তু লড়াইটা শেষ পর্যন্ত জমেছিল তো অঞ্জন ?

অঞ্জন বলল, শেষ পর্যন্ত লড়াই করাই সার হলো—

মনোরমা বলল, কোন পক্ষই বুঝি ধুলোয় গড়াগড়ি দিলে না ? একটু থেমে সে পুনরায় পরিহাসের ভঙ্গীতে বলল, এটা কিন্তু ভালই হয়েছে যে পক্ষই হেরে যাক তাতে দুঃখ থাকতো।

অঞ্জন বলল, আপনি অত খোঁচা দিয়ে কথা বলছেন কেন ?

মনোরমা হাসিমুখে জবাব দিল, মেয়েমানুষ যে—

অঞ্জন কিছু না ভেবেই বলে বলল, কে বলে আপনি মেয়েমানুষ …

মনোরমা খিল খিল করে হেসে উঠল, এটাও কি প্রমাণসাপেক্ষ অঞ্জন ভাই ? রেগে গেলেই বুঝি কাণ্ডজ্ঞান হারাতে হয়।

অঞ্জন নিজের কথায় লজ্জা পেলেও পিছু হটল না। বলল, কথাটা ঠিক তা নয় মনোদি। দাদা বলেন, মেয়েদের মেয়েমানুষ বললে অসম্মান করা হয়।

মনোরমার মুখে ভারী মিষ্টি একটুখানি হাসি ফুটে উঠল। সে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল : আশ্বস্ত হলাম ভাই। তোমার কথা আমার মনে থাকবে অঞ্জন কিন্তু সব কথার মধ্যে দাদাকে টেনে আন কেন ? তোমার নিজের কোন মতামত নেই ?

অঞ্জনের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আমার কোন আলাদা মতামত নেই—দাদার মতামত দিয়েই আমার সবকিছু গড়ে তুলেছি মনোদি।

মনোরমা হেসে বলল, লক্ষ্মণ ভাই আজকের দিনে দুর্লভ।

অঞ্জন শান্তকণ্ঠে জবাব দিল, লক্ষ্মণ ভাই পেতে হলে রামের মত দাদা হওয়া চাই। আমার দাদাও তেমনি দাদা।

মনোরমা বলল তোমার দাদার ভাগ্য ভাল।

অঞ্জন আপত্তি জানাল। বলল, দাদার নয় আমার মনোদিদি। আমার জন্য দাদার ত্যাগ অপরিসীম।

মনোরমা বলল, খুব ভাল কথা—কিন্তু এখন যা বললে তা চিরদিন মনে থাকবে তো ?

ব্যথিত কণ্ঠে অঞ্জন বলে, হঠাৎ এ প্রশ্নের [illegible]

মনোরমা বলল, সকলের মনে থাকে না বলেই বললাম অঞ্জন। আমাদের দেশের দাদাদের বাপের দায়িত্ব আর কর্ত্তব্য পালন করতে হয় কিন্তু অধিকার থাকে না। দাদা হয়ে জন্মান বর্ত্তমানকালে একটা পাপ।

অঞ্জন বলে, তুমি বড় হেঁয়ালি করে কথা বলো মনোদিদি। আমি সব সময় তোমার কথা বুঝি না।

মনোরমা স্নিগ্ধ হেসে বলল, না বোঝার মত করে কোন কথা তো আমি বলি না ভাই। সংসারে বাপের যেমন তাঁর ছেলের উপর দায়িত্ব রয়েছে তেমনি ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবার অধিকারও রয়েছে। তিনি প্রয়োজনবোধে আদর করবেন, দরকার হলে শাসন করবেন—তাতে বলবার কিছু নেই।

কিন্তু দুর্ভাগা দাদাদের শুধু দায়িত্ব পালন ক'রবার দায় আছে অন্যায় ক'রলে তার প্রতিকার ক'রবার উপায় নেই।

অঞ্জন বাধা দিয়ে বলল, তোমার কথা আমি স্বীকার করি না। প্রতিকার করতে জানলেই পথ পাওয়া যায়।

মনোরমা একটু হেসে বলল, সে পথে অনেক বিপদ। চতুর্দ্দিকের হিতৈষীর দল সমালোচনার ঝড় তুলবেন। শেষ পর্য্যন্ত মান বাঁচাতে আর প্রাণ বাঁচাতে—

অঞ্জন পুনরায় বাধা দিয়ে বলে, তোমার কথা ভাবতেও আমার ভয় হয় মনোদি। তাছাড়া অকারণে ঝড় উঠবে কেন?

মনোরমা বলে, ঝড় যখন দেখা দেয় তখন অকারণটাই একটা মস্ত বড় কারণ হয়ে ওঠে। এ আমার শুধু মুখের কথা নয় ভাই, নিজের চোখে দেখা। আমাদের আচার্য্যি কাকাকে নিশ্চয় তুমি জান। এমন আপন ভোলা সাদা-সিধে লোক বড় একটা চোখে পড়ে না কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ জন্মেছেন দাদা হয়ে। মা বাবা যেতে সংসারের জোয়াল ওঁকেই বইবার জন্য এগিয়ে যেতে হলো।

অঞ্জন জিজ্ঞেস করে, কেন তাঁর বাবা?

মনোরমা বলল, তিনি বিদেশে একটি ছোট কোম্পানীর পরিচালক। স্ত্রী-বিয়োগের পর কাজ নিয়ে আরও বেশী করে মেতে উঠলেন। আর আচার্য্যি কাকা তাঁর ছোট ছোট ভাই বোনদের নিয়ে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। সাঁতরে অবশ্য তিনি উঠেছিলেন কিন্তু কূলে উঠে তাঁর ভাইয়েরা সব হিসেব করতে বসে গেল। শুধু টাকা আনা পাইয়ের হিসেব নয় ভাই—দাদার কথা বলার হিসাব, চলা ফেরার হিসাব, তার বিয়ে করার হিসাব, সেই বৌয়ের করণীয় কর্ত্তব্যের হিসাব, উচিত-অনুচিতের চুলচেরা হিসাব অথচ নিজেদের কাজের হিসাবটাই তারা একবার খতিয়ে দেখল না। তাদের প্রচুর দাবি কিন্তু পেতে হলে যে কিছু দিতে হয় এই কথাটা তাদের হিসেবের খাতায় স্থান পেল না।

অঞ্জন ব্যাকুলভাবে বাধা দিয়ে বলল, তোমার ঐ হিসেবের খাতা বন্ধ করো মনোদি। ও আমার শুনতে ভাল লাগে না।

মনোরমা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে, প্রার্থনা করি এই হিসেবের খাতার গোলকধাঁধায় তোমাকে যেন কোন দিন না পড়তে হয়। আচার্য্যি কাকা বলেন, যে যত হিসেব করে তার তত অশান্তি বাড়ে। ও হিসেব সহজে মেলে না। যখন মেলে তখন আর অতীতের লোকসানকে পুষিয়ে নেবার সময় থাকে না।

কিন্তু মনোদি—অঞ্জন একটু ইতঃস্তত করে বলল, তোমার আচার্য্যি কাকা হিসেব না করেও কি দুঃখ পাবার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন?

মনোরমা বলে, নিশ্চয় পাননি কিন্তু তা তোমার ঐ হিসেব না করার জন্য নয়। মিথ্যা হিসাবের এই আর কদর্য্য চেহারা দেখে। আচার্য্য কাকা বলেন, কূলে যখন উঠেছে আর চলে যাওয়াটাও যখন স্থির করেছে তখন হিসেব করবার ছলনা না করে খোলা মন নিয়ে সহজভাবে চলে গেলে কি আমি বাধা দিতাম, না ওদের কোন লোকসান হতো? সংসারের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে আবার রাজনীতির খেলা দেখাবার কি প্রয়োজন ছিল।

মনোরমা একটু থেমে পুনরায় বলতে থাকে, এই প্রয়োজন যে নিজেদের অন্যায়কে আড়াল করবার জন্য একথাটাও আচার্য্যি কাকা মানতে চান না। তিনি

বলেন, একে যদি অন্যায় বলেই ওরা বুঝবে তাহলে কখনই এমন কাজ করতে পারতো না।

অঞ্জন বলল আচার্য্যি কাকা একসঙ্গে দুরকমের কথা বলেন কেন?

মনোরমা শান্ত হেসে বলে, ও কিছু নয় অঞ্জন নিজের দুঃখটাকে একটু হাল্কা করে নেবার মিথ্যা চেষ্টা। এমনি একটা দুর্ঘটনার মধ্যে খানিক আনন্দের স্বাদ তিনি পান। আমার দাদু সেদিনে রাগ করে বলেছিলেন, ওদের অকারণ প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে আপনিই বাড়িয়ে তুলেছিলেন। সময় থাকতে শাসন করা উচিত ছিল।

আচার্য্যি কাকা সক্ষেদে বলেছিলেন, ও পথে অনেক বাধা ছিল। আপনি তা বুঝবেন না তাছাড়া ওদের একলা দোষ দিলে কি হবে। সবই আমার অদৃষ্টের দোষ নইলে যার জন্যে যতকিছু আজ পর্যন্ত করছি তা সবই আমার বিরুদ্ধে যায় কেন? আমার সব তাদেরই এমন করে মন্দ হয়ে যাবে কেন?

অঞ্জন বলল, উনি বোধ হয় সুখশান্তিপ্রিয় আর নির্বিরোধী লোক?

মনোরমা বলে, ঠিক তাই। অকারণে চীৎকার করে কেউ যদি মিথ্যাকেও সত্য বলে প্রচার করতে থাকে, আচার্য্য কাকা সেখান থেকে নিঃশব্দে সরে গিয়ে তাঁর ভাগ্যের উপর অভিমান করে বসে থাকেন তবুও পাল্টা চীৎকার করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চান না।

অঞ্জন বলে, আপনার আচার্য্যি কাকাকে প্রশংসা করতে পারি না।

মনোরমা বলে, কেউ করে না। কিন্তু আচার্য্য কাকা অন্য কথা বলেন। চীৎকার করে প্রতিবাদ করলে নাকি মিথ্যাকে বেশী মূল্য দিয়ে তাকে আরও দীর্ঘায়ু করে তোলা হবে।

অঞ্জন খানিক যেন অবজ্ঞা হাসি হেসে বলল, এই ধরণের জীবন-দর্শন মোটেই স্বাভাবিক নয়, সুস্থও নয়।

মনোরমা হেসে বলে, সুস্থ কিনা জানি না অঞ্জন কিন্তু স্বাভাবিক যে নয় একথা ঠিক। দাদু বলেন, সত্যের মধ্যে আছে সূর্য্যের আলো—মিথ্যার কাল মেঘ তাকে বেশীদিন ঢেকে রাখতে পারে না। এক সময় তা প্রকাশ হতে বাধ্য।

অঞ্জন বলে, কিন্তু মেঘকে সরিয়ে দেয় হাওয়া। মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না হলে সে তো কায়েম হয়ে বসবে মনোদি।

মনোরমা স্নিগ্ধ হেসে বলে, ঠিক তোমার মত আমিও দাদুকে যুক্তি দেখিয়েছিলাম, তিনি বলেন, মিথ্যার পরম শত্রু নাকি সে নিজেই। মিথ্যাই মিথ্যাকে প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু আজ আর নয় অঞ্জন। পরচর্চা খুব লোভনীয় হলেও এখন থামতে হচ্ছে। তোমার দাদার আপিস থেকে ফিরে আসবার সময় হয়ে গেছে।

অঞ্জন চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, আপনি খুব মনে করিয়ে দিয়েছেন মনোদি।

অঞ্জন দ্রুত প্রস্থান করল।

॥ ২০ ॥

মলয় পুনরায় তার কলম তুলে নিল। মৃদুলার শেষ কথার সূত্র ধরে লিখতে সুরু করল :—

হঠাৎ মৃদুলা তার মনের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল কেন এই কথাটিই ঘুরে ফিরে মৃগাঙ্কর মনে আনাগোনা করতে লাগল। অস্পষ্টতার পোষাক পরিয়ে মৃদুলা যে কথাটা একাধিকবার ব্যক্ত করেছে তার একটা সহজ অর্থ খুঁজে বার করতে মৃগাঙ্ক তৎপর হয়ে উঠল। কোন্ বিষের ধাক্ক মৃদুলা তাকে এমন কাবু করেছিল সেই বিষই কি অমৃত হয়ে তাকে অমরত্ব দান করতে উদ্যত হয়েছে? প্রথম পরিচয়ের ক্ষণটির কথা মনে জেগে উঠতে তার অন্তরের পাগলা গাড় মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। তাই মন চঞ্চল হয়ে উঠলেও তাবা তার বুকের মধ্যে স্থির হয়ে থাকে।

পড়ন্ত রোদের ম্লান আলো দীঘির জলে ঝলমল করছে—কাঁপছে। এই সময়টিতেই মৃদুলা। রোজ এসে এখানে উপস্থিত হয়। আজ কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও তার দেখা পাওয়া গেল না। মৃগাঙ্ক বহুক্ষণ অপেক্ষা করে এক সময় চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পা বাড়াতেই কেতকীর সঙ্গে মুখোমুখী দেখা হয়ে গেল।

কেতকীর হঠাৎ এই তুমি সম্বোধন মৃগাঙ্ককে রীতিমত বিস্মিত করে তুললেও সে সহজকণ্ঠেই জবাব দিল, এইখানেই এসেছিলাম।

কেতকী বলল, ও; দীঘির পাড়ের হাওয়াটা খুব স্বাস্থ্যকর।

মৃগাঙ্ক একটু হেসে বলল, সেইজন্যেই রোজ একবার করে এখানে আসি। জায়গাটি সত্যিই ভাল। তার উপর তোমার বান্ধবী মৃদুলাও রোজই আসেন। সময়টা ভালই কাটে।

কেতকী ভ্রূ কুঁচকে জবাব দিল, কথায় তোমারও বেশ ধার আছে দেখছি। এমন তো আগে ছিলে না তুমি। পাঠ নিচ্ছ বুঝি?

মৃগাঙ্ক বলল, সুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ হবে না বোধ হয়। তিনি তো শুনছি কয়েকদিনের মধ্যেই সহরে চলে যাচ্ছেন।

কেতকী বলল, তুমি না হয় আর কদিন পরে যাবে।

মৃগাঙ্ক বলল, তোমার একথার মানে?

কেতকী বলল, জলের মত সোজা। আইন পড়বে না?

এর সঙ্গে আগে পরের কি সম্বন্ধ? মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করে।

কেতকী বলে, একটু বেশী মেতে উঠেছো বলেই কথাটা বললাম।

মৃগাঙ্ক কঠিনকণ্ঠে জবাব দিল, ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আর তোমাকেও আমার অভিভাবক নিয়োগ করা হয়নি।

কেতকী লাল হয়ে উঠল। কিন্তু অল্পেই সামলে নিয়ে বলল, আমার না হয় অন্যায় হয়েছে কিন্তু যে মেয়ে তোমাকে অমন বিশ্রীভাবে অপমান করতে পেরেছিল তাকে এতটা প্রশ্রয় দিচ্ছ কেমন করে।

দিচ্ছি বুঝি—মৃগাঙ্ক প্রশ্নের ভঙ্গীতে জবাব দিল।

তাইতো দশজনে বলে। কেতকী জবাবে বলল।

মৃগাঙ্ক গম্ভীরভাবে বলল, ভারী আশ্চর্য্য কথা তাঁরা বলেন দেখছি।

কেতকী বলে, বলবার সুযোগ তুমি নিজেই দিয়েছো মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক শান্ত হেসে বলল, এটা বেশ বলেছো—আমিই সুযোগ করে দিয়েছি আর আমিই কিছু জানি না।

কেতকী বাঁকা হেসে বলল, একথা আর কাউকে বলো বিশ্বাস করবে কিন্তু আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করো না। আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি।

উষ্ণকণ্ঠে মৃগাঙ্ক জবাব দিল, অভিযোগটা তাহলে দশজনার নয় তোমার। কিন্তু জিজ্ঞেস ক'র হঠাৎ আমার উপর তোমার এত দয়া কেন?

কেতকী বেদনার্ত্ত কণ্ঠে ডাকে, মৃগাঙ্ক—

মৃগাঙ্ক থামতে পারে না, জ্বালাভরা কণ্ঠে বলতে থাকে কারণে অকারণে তুমি অনেক কথা আমাকে শুনিয়ে থাক। কেন যে শোনাও তা আমি জানি। তুমি হয়তো দুঃখ পাবে তাই মুখ বন্ধ করে ছিলাম কিন্তু এখন দেখছি আমি ভুল করেছি। অন্ততঃ তোমার মিথ্যা আশা ভেঙে দেবার জন্যও আমার কিছু বলা উচিত ছিল। একটা কথা আজ শুনে যাও। তোমার সঙ্গে মৃদুলার কোন তুলনা হয়না কেতকী—

আহতকণ্ঠে কেতকী আর্ত্তনাদ করে উঠল।

মৃগাঙ্ক তথাপি থামতে পারল না। তার ধৈর্য্য আজ শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। সে বলে চলল, মৃদুলা দুর্মুখ কিন্তু তার মধ্যে শিক্ষার দীপ্তি আছে। অন্যায় করে তা সংশোধন করবার সৎসাহস আছে। মৃদুলা উগ্র কিন্তু ইতর নয়। তুমি কেতকী তার বন্ধু বলে পরিচয় দাও অথচ এই বন্ধুত্বের এতটুকু মর্য্যাদা আজ পর্য্যন্ত দিয়েছো কি?

কেতকীর দুচোখ সহসা জ্বলে উঠল। আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই আক্রমণ করল, মৃদুলা দেখছি সেদিন মিথ্যে বলেনি। শিক্ষার পেছনে বংশগত কৃষ্টি থাকলে একটি মেয়েকে এভাবে অভদ্র আক্রমণ করতে পারতে না তুমি।

কেতকী সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মৃগাঙ্ক এমনি এক পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে অপ্রস্তুত হ'য়ে লজ্জিত কণ্ঠে বলল, আমার এতটা রূঢ় হওয়া উচিত হয়নি। তুমিও আজ অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে আছ। এবারে বাড়ী যাও।

কেতকী নীরব।

মৃগাঙ্ক বলল, মৃদুলাকে নিয়ে তুমি একটু বেশী এগিয়ে গিয়ে চিন্তা ক'রতে সুরু ক'রেছো। এত অল্পে এত বেশী চিন্তা না ক'রলেই ভাল হবে। তোমার পক্ষে ও আমার পক্ষেও।

কেতকী মৃদু কণ্ঠে ডাকল, মৃগু —

মৃগাঙ্ক সাড়া দিল, বলো—

কেতকী বল্ল, তোমাকে আমি ছেলেবেলা থেকেই জানি।

মৃগাঙ্ক জবাব দেয়, আমিও তোমাকে কিছুটা জানি ব'লে এতদিন বিশ্বাস ক'রতাম।

কেতকী একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, মৃদুলার তুমি কতটুকু জান?

মৃগাঙ্ক বলল, ধরে নিতে পার কিছুই জানি না। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?

কেতকী ভেঙে পড়ল, তুমি কি কিছুই বোঝ না।

মৃগাঙ্ক শান্তকণ্ঠে বলল, কোনদিন চেষ্টা করে দেখিনি ব'লেই হয়তো আজ এত দুঃখ পাচ্ছি, উত্তেজিত হ'য়ে উঠছি। কিন্তু নিজেকে আর কত ছোট ক'রবে কেতকী? অনেক রাত হ'য়েছে এবারে বাড়ী যাও।

যাচ্ছি—বলে দুপা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় দাঁড়িয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আজ যত অপমান তুমি আমায় করলে তারজন্য একদিন তুমি আপশোষ ক'রবে মৃগু।...

মলয় চমকে উঠল। জানালার ছিটকিনিটা বহুদিন থেকেই নেই। কবে খসে গিয়েছে তার ঠিক নেই। দমকা হাওয়া বইলেই সশব্দে বন্ধ হ'য়ে যায় পাল্লা দুটো। এইমাত্র হাওয়ার আঘাতে শব্দ ক'রে বন্ধ হয়ে গেছে জানালাটা। হাওয়া প্রবেশের ঐ একটি মাত্র পথ। দম আটকে আসছে মলয়ের।

বৈশাখ যায় যায়। আজও এক ফোঁটা বৃষ্টি হয়নি। হবার আশাও কম। যদিও খবরের কাগজে রোজই সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতি রোজই মানুষের হিসেবকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। ঘরে ঘরে রোগ দেখা দিয়েছে।

মলয় উঠে গিয়ে পুনরায় জানালাটা খুলে দিয়ে এল। মাথার মধ্যে তখনও কেতকীর শেষ কথাটা দোলা খাচ্ছে। এই শেষ কথার সূত্র ধরেই আবার তাকে এগুতে হবে।

মলয় পুনরায় স্থির হয়ে বসল। সাদা কাগজের উপর অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

...মৃগাঙ্কর পরবর্তী জীবনে আফশোষ করতে হয়েছিল ঠিক কিন্তু তা কেতকীকে দুঃখ দেবার জন্য নয়। নিজের দ্বিধাগ্রস্ত মনই তার জন্য দায়ী! নইলে সে আজ এখানে কেন? কেনই বা বঞ্চিত জীবনের দুর্বিষহ বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে বছরের পর বছর। কিন্তু থাক সেসব কথা।

মৃগাঙ্ক কেতকীর শেষ কথায় পুনশ্চ উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং অল্পেই নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বলল, তোমার কথায় সায় দিতে পারিনি বলেই একথা বলছো কেতকী? দুঃখ যদি সত্যিই আমার জন্য তোলা থাকে তার জন্য আগে থেকেই আতঙ্কিত হয়ে পিছিয়ে পড়তে আমি পারবো না। বর্তমানের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেতকী সহসা যেন আগাগোড়া পালটে গেছে এমনি শান্ত সংযত কণ্ঠে বলল, তোমার আনন্দের রসদ যোগাতে মৃদুলা যদি কোনদিন তোমার কাছে না আসে মৃগু?

মৃগাঙ্কর মুখভাব কঠিন হয়ে উঠল। সে গম্ভীরভাবে বলল, তাহলে বুঝবো তোমার অশোভন খেলা আরও অনেকদূর এগিয়ে গেছে। তোমার এ পথ জয় করবার পথ নয় কেতকী। ঘৃণাই কিনে পাবে।

কেতকী বাঁকা সুরে জবাব দিল, তোমার অহঙ্কার দেখছি আকাশ ছুঁয়েছে।

কেতকীর কথায় জ্বালা ধরে পড়ল। তুমি কি মনে করো কেতকী, শুধু তার নিজের স্বার্থের জন্যই তোমাকে—

তাকে বাধা দিয়ে মৃগাঙ্ক বলে, সেটা আমার চেয়ে তুমিই বেশী জান কেতকী। মৃদুলার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিনটি থেকে তোমার ব্যবহার, তোমার আচার-আচরণের কথা ভেবে দেখলেই তোমার প্রশ্নের জবাব পাবে। মৃদুলার অশোভন ব্যবহার নিয়ে তুমি যত অশোভন আলোচনা করছো আমার কাছে তা আরও বেশী বেদনাদায়ক। অথচ মৃদুলা তোমাকে নিয়ে আজ

পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি। তুমি নিজের আসল পরিচয় দিয়েই দিয়েছো কেতকী।

কেতকী জ্বলে উঠল, সমালোচনার কাজ করলে সমালোচনা সহ্য করতে হয়।

মৃগাঙ্ক বলল, না করেও অনেক সময় সহ্য করতে হয় কেতকী। বিনা কারণে অনেক জল ঘোলা হয়েছে, এবারে তুমি যাও। এই অন্ধকারে এমনি জনবিরল স্থানে তোমাকে আমার কাছে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে হয়তো তোমাকেও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। চলো খানিক এগিয়ে দিয়ে আসি।

কেতকী এক পা নড়ল না। অন্ধকারে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

মৃগাঙ্ক নীরস কণ্ঠে বলল, আমার একটা কথা সব সময় মনে রেখো কেতকী, ভিক্ষার মুষ্ঠো চালে কিংবা দুটো পয়সায় পেট ভরলেও মন ভরে না। দেহের চেয়ে অনেক বড় মন। সেখানের প্রবেশপথটা বড় বিচিত্র।

কেতকী নীরব। এতবড় আঘাতটাকেও সে নিঃশব্দে হজম করল।

কোন প্রকার বাধা না পেয়ে মৃগাঙ্ক আর বেশীদূর অগ্রসর হ'ল না। সংযতকণ্ঠে শুধু জিজ্ঞেস ক'রল, তুমি কি যাবে?

কেতকী মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, যাব, কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না। কেতকী কয়েক পা অগ্রসর হ'য়ে যেতেই মৃগাঙ্ক কোমল কণ্ঠে ডাকল, শোন কেতকী।

কেতকী ফিরে দাঁড়াল। মৃগাঙ্কর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন তার কানে ধরা পড়েছে। সে আস্তে আস্তে বলল, কিছু ব'লবে?

মৃগাঙ্ক তার আজকের রূঢ় ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রতে গিয়েও পারল না, শুধু বলল, না কিছু না। তুমি যেতে পার।

কেতকী চলে গেলেও মৃগাঙ্ক তখনই চলে যেতে পারেনি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। হঠাৎ কেতকী কেন যে এভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এ কথাটা তার কাছে আর অস্পষ্ট নয়। কিন্তু তাই বলে মৃদুলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবার কোন সঙ্গত কারণ সে খুঁজে পেল না। ইদানিং কেতকীকে মৃগাঙ্ক এড়িয়ে চলতে চাইলেও মৃদুলাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেনি একদিনের জন্যও। বাড়াবাড়ি যা কিছু ক'রছে তা কেতকী।

মৃদুলা একটি অসতর্ক মুহূর্তে যে উক্তি করেছিল তারই লজ্জা ঢাকতে সে নানাভাবে নিজেকে ব্যস্ত করেছে। তার কথায় এবং ব্যবহারে এমন কোন প্রগলভতা প্রকাশ পায় নি যা অপরের চোখে বিসদৃশ লাগতে পারে। অথচ কেতকী সেই থেকেই সজাগ প্রহরা দিয়ে চলছে। কিন্তু কেন?

মৃগাঙ্ক কখন যে অন্যমনস্কভাবে চলতে সুরু করেছে তা সে নিজেও জানে না। তার চিন্তার অনেকখানি জুড়ে তখন কেতকী বিরাজ ক'রছে। কবে হাসি-ঠাট্টার ছলে দু বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল তাকে মনে মনে লালন করে আজ কোথায় এনে কেতকী তাকে দাঁড় করিয়েছে। ও যেন হাসতে ভুলে গেছে—

শোন...

মৃগাঙ্ক চমকে উঠল, কে?

আমি মৃণুদা—কেতকী ফিস ফিস করে বলে।

তুমি এখনও যাও নি? মৃগাঙ্কর কণ্ঠে একরাশ বিস্ময়।

নিবিড় কণ্ঠে কেতকী বলে, একলা যেতে বড় ভয় ক'রল। তাছাড়া তোমার সঙ্গে আমার আরও একটু দরকার আছে।

মৃগাঙ্ক একবার জিব দিয়ে নিজের ঠোঁট দুখানা চেটে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, বলতে পার—

কেতকী চলতে চলতে বলল, আমার অসংযত ব্যবহারের জন্য তুমি আমায় ক্ষমা করো। তুমি ঠিকই বলেছ আমার আজকের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হওয়াই উচিত।

মৃগাঙ্ক একটুখানি হাসল। জবাব দিল না কিন্তু পায়ের গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়ে উঠল।

একটু আস্তে চলো মৃণুদা। কেতকী বলল, নইলে তোমার সঙ্গে পারবো কেন—

মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে মৃগাঙ্ক পুনরায় চলতে সুরু করল।

কেতকী বলল, তোমার মুখে মৃদুলার প্রশংসা শুনলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। ওর সেদিনের ব্যবহারটাই নতুন করে মনে পড়ে। ওকি মৃণাল তুমি যে আবার দাঁড়াতে সুরু করলে।

মৃগাঙ্ক দাঁড়াল, বলল, অভ্যাসের দোষ মনে থাকে না।

তাই হবে—কেতকী ফিস ফিস করে বলে, তুমি সহরে যাবে কবে? শুনলাম আইন পড়বে।

মৃগাঙ্ক জবাব দেয়, সেই রকমই ইচ্ছে আছে।

কেতকী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, কবে যাবে কথা তো বললে না?

মৃগাঙ্ক বলে, আমি নিজেই তা জানি না তবে মৃদুলা কবে যাবে তা তোমাকে বলতে পারি।

কেতকী বিষণ্নকণ্ঠে বলে, তুমি এখনও রাগ করে আছো। আমি মৃদুলার কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি, তোমার কথা জানতে চেয়েছি।

মৃগাঙ্ক বলে, তার জবাব তো তোমাকে আগেই দিয়েছি কেতকী।

কেতকী ক্ষীণকণ্ঠে বলল, জবাব দাওনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছো, কিন্তু তুমি যখন পছন্দ করছো না তখন থাক ওসব কথা, তার চেয়ে তোমার ইচ্ছেমত গল্প করো।

মৃগাঙ্ক বলল, তোমার সঙ্গে কি গল্প আর করবো। আমার কাব্য করবার অভ্যাস নেই।

কেতকী অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো। বলল অন্ধকার কেটে গিয়ে কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখেছো। চারিদিকে এতো চমৎকার মিঠে আলো—আর আমি তোমার পাশে পাশে চলেছি মৃণাল, তুমি কি পুরুষমানুষ নও!

মৃগাঙ্ক নীরব। আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় সে পড়েছে।

জান মৃণাল—কেতকীর কণ্ঠস্বর যেন ঘন কুয়াশার আড়াল ভেদ করে বার হয়ে আসছে। ও বলছিল, যাকে বলে আমি সুন্দরী। নিজের এই দেহটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি, স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছি… নৈবেদ্য সাজিয়ে কেমন করে নিজেকে নিবেদন করে সার্থক হয়ে উঠবো তা নিয়ে কতো কল্পনা করেছি।

মৃগাঙ্ক তথাপি নিরুত্তর।

কেতকী থামতে পারে না বলতে থাকে, নৈবেদ্য সাজালাম, পূজা করলাম, অর্ঘ্য দিলাম, কিন্তু দেবতা নিলেন না…ওর কণ্ঠস্বর ভিজে উঠল।

মৃগাঙ্ক এতক্ষণে মুখ খুলল, তুমি বৈষ্ণব-দেবতাকে রক্ত দিয়ে পূজো করতে গিয়েছিলে হয়তো সেইজন্যেই দেবতা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

কেতকী যেন বহু দূর থেকে কথা ব'লছে এমনিভাবে বলতে লাগল, কিন্তু সে রক্ত যে প্রেমের প্রতীক এ-কথাটাতো মিথ্যে নয়। বৈষ্ণব-দেবতা যে প্রেমের অবতার মৃণাল।

মৃগাঙ্ক ধীরে ধীরে ব'লতে থাকে, যে প্রেমে হিংসার গন্ধ আছে সে প্রেম প্রেম নয়। অন্ততঃ বৈষ্ণবের কাছে নয়।

কেতকী নীরবে পথ চলতে থাকে। ওর কথা পথ হারিয়েছে, চিন্তা গভীরতায় পৌঁছুবার চেষ্টা ক'রছে।

মৃগাঙ্ক ডাকল, কেতকী—

কেতকী সাড়া দিল।

মৃগাঙ্ক বলল, একেবারে থেমে গেলে কেন?

ভাবছিলাম মৃণাল, কেতকী ভিজে কণ্ঠে জবাব দিল, বোকার মত এ আমি কি ক'রলাম। নিজের ওজন বুঝে চলতে না শেখার গ্লানি আমাকে হয়তো আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে, কিন্তু তার জন্য যত দুঃখই আমি পাই না কেন, কোন দিন আর অভিযোগ আনব না। আমার এ কথাটা অন্ততঃ তুমি বিশ্বাস করো মৃণাল।

কেতকীর এ আর এক রূপ—যার সঙ্গে মৃগাঙ্কর ইতিপূর্বে কোনদিন সাক্ষাৎ ঘটে নি। সে বিস্মিত হ'ল। ব্যথিত হল। আপন অজ্ঞাতে কণ্ঠস্বরে খানিক আন্তরিকতা প্রকাশ পেল, বলল, এসব কথা থাক কেতকী।

কেতকী বলল, তাই ভালো মৃণাল। কিন্তু আর কতদূর আমার সঙ্গে তুমি যাবে।

মৃগাঙ্ক জবাব দিল, ইচ্ছে করোতো তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে পারি।

কেতকী বলল, আমার একলা চলাফেরা করার অভ্যেস আছে।

একটু হেসে মৃগাঙ্ক বলল, একটু আগে কিন্তু অন্য কথা বলেছিলে।

কথাটা মেনে নিয়ে কেতকী জবাব দিল, মিথ্যে বলেছিলাম। পথের মাঝে তোমার জন্ত দাঁড়িয়ে থাকার ওটা একটা মিথ্যে কৈফিয়ৎ। বলে সম্মুখের পথে পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়াল। বলল, মৃদুলা তার বাবার সঙ্গে আসছে।

কেতকীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকাতেই অদূরে পিতা এবং কন্তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। ওরা কাছে আসতে মৃদুলাই প্রথমে কথা বলল, এঁর কথাই তোমায় বলে'ছলাম বাবা। ইনিই মৃগাঙ্কবাবু।

জগন্ময় সহাস্তে বললেন, তোমাকে আর আপনি ব'লবো না মৃগাঙ্ক। তোমার সব কথা আমি শুনে'ছি। বড় আনন্দ হ'য়েছে—বংশের চিরাচরিত একটা ধারাকে তুমি বদলে দিয়েছো। ব্যবসার সঙ্গে শিক্ষার বিরোধ থাকবে কেন। বরং দুইয়ের মিলন ঘটলে একে অপরকে সবসময় সাহায্যই করে থাকে।

একটু থেমে তিনি পুনরায় বলেন, আমার পাগল মেয়ে নাকি সেদিনে কি সব কাণ্ড ক'রে এসেছে। শুনে অবধি...

তাঁকে বাধা দিয়ে মৃগাঙ্ক বলল, সে একটা ছেলে-মানুষী ব্যাপার। আমরা মিটমাট ক'রে নিয়েছি। কিন্তু এসব খবর আপনাকে দিল কে?

জগন্ময় হেসে উঠলেন, অপরাধী স্বয়ং। তারপরে অবশ্য কেতকীর কাছ থেকেও শুনেছি। খুবই অন্যায় করেছিল মৃদুলা। অকারণে যে মানুষকে ছোট করে সে নিজেই যে কত ছোট হয়ে যায় এই কথাটাই ওকে আমি বার বার করে বুঝিয়েছি।

কেতকী মৃদু কণ্ঠে বলল, মৃদুলা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার দোষ স্বীকার করে এসেছে।

জগন্ময় শান্তভাবে বললেন, ন্যায়সঙ্গত কাজই করেছিল নইলে মৃদুলার হয়ে আমাকেই মৃগাঙ্কর কাছে ছুটে যেতে হতো। অপরাধ করে তা স্বীকার করলেই সব শেষ হয়ে যায় না, অন্যায় প্রবৃত্তিকে শাসন করাও প্রয়োজন।

মৃদুলা ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, তুমি কিন্তু আমাকে আবার নতুন করে দুঃখ দিচ্ছ বাবা।

জগন্ময় গভীরকণ্ঠে বললেন, নতুন করে হলেও এর প্রয়োজন আছে মৃদুলা। মৃগাঙ্ক অবশ্য মুখে স্বীকার করেছে যে তোমাদের মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে গেছে কিন্তু কার্য্যত তা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

সকলে এক সঙ্গে জগন্ময়ের পানে তাকাল।

মৃগাঙ্ক বলল, আপনার এ অনুযোগ কার বিরুদ্ধে ঠিক বোঝা গেল না।

মৃদুলা ও কেতকী নীরব।

জগন্ময় বললেন, মৃগাঙ্ক একদিনের জন্তও কি তোমাদের বাড়ী গিয়েছে মৃদুলা?

মৃগাঙ্ক অপ্রস্তুত হল। মৃদুলা আর কেতকী এক সঙ্গে হেসে উঠল। জগন্ময়ও সে হাসিতে যোগ দিলেন।

মৃগাঙ্ক সামলে নিয়ে বলল, খুবই অন্যায় হয়ে গেছে, কিন্তু কি জানেন আমি বরাবরই একটু অসামাজিক কোথাও বড় একটা যাই না তার উপর আপনারা আবার এখানে থাকেনই না।

আরে বাপু সেই জন্তই তো এতো অভিযোগ জানাচ্ছি জগন্ময় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বললেন, গ্রামে থাকিনে বলেইতো এতো আগ্রহ নইলে হয়তো মুখ দেখা দেখি বন্ধ থাকতো।

পুনরায় সকলে এক সঙ্গে হেসে উঠল।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে জগন্ময় বলে উঠলেন, কথাটি কিছু মিথ্যে বলেছি কি যে সকলে মিলে এমন ক হাসছো?

তুমিও কিন্তু আমাদের সঙ্গে হেসেছো বাবা। মৃদু-বলল।

এইখানেই মলয়কে থামতে হল। সেট বিক্রী করেছে। কলম রেখে রান্নায় মনোনিবেশ করতে হ তাকে।

তৃষিতা সরণি

যোগেশচন্দ্র মজুমদার

স্থপতি-শিল্পী বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথের সাড়া বহুদিন পরে পাওয়া গেল। কাল প্রাতে তাঁহার একখানি চিঠি হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং কিঞ্চিৎ ভাবিত করিয়াও তুলিয়াছে।

বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে সতীর্থরূপে একত্রে বহুদিন একই স্কুলে ও কলেজে কাটিয়াছে। আমাদের অন্তরঙ্গতা লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য সহপাঠীরা আমাদের অভিন্ন-হৃদয় বলিয়া উল্লেখ করিত। কেহ কেহ পার্থ ও পার্থসারথি বলিয়া, সম্বোধন করিয়া পরিহাস করিতে ছাড়িত না। কলেজের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর দুইজনের জীবনের গতি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। আমি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া সুদূর হিমালয় প্রদেশে শিমলায় কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে যোগদান করি। সে সময় শুনিয়াছিলাম যে বন্ধুবর সমুদ্রে পাড়ি দিবার চেষ্টায় আছেন। বিদেশ হইতে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়া বিশেষজ্ঞরূপে দেশে প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা। তাহার পর তাঁহার আর কোনও সংবাদ পাই নাই। সে আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা।

শিমলায় যদিও কর্মে যোগদান করিয়াছিলাম, সারা বৎসর আমাকে শিমলায় কাটাইতে হইত না। গ্রীষ্মের সাত মাস থাকিতে হইত এবং শীতের সূচনায় পূর্ব্বে কলিকাতায় নামিয়া যাইতে হইত। রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা স্থায়ী ছিল। বৎসরে দুইবার স্থান পরিবর্তন বেশ ভালই লাগিত। কিন্তু ১৯১২ সালে রাজধানী পরিবর্তনে এই ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল। কর্তৃপক্ষেরা স্থির করিলেন যে যতদিন না নূতন রাজধানী গড়িয়া উঠে অফিসগুলিকে শিমলায় থাকিতে হইবে। তুষারপাত পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, এবার তাহা দেখিবার সুযোগ ঘটিল। পার্ব্বত্য পরিবেশ সমতল ভূমি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিদেশী ফুল, ফল, বৃক্ষ প্রভৃতির পরিচয় যাহা বিদ্যালয়ে ইংরাজি পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে লাভ করিয়াছিলাম এখানে তাহার প্রাচুর্য্য দেখিয়া মনে অপূর্ব্ব বিস্ময় জাগিয়া উঠিল। তুষারপাতের সময় মনে হইত না যে ভারতবর্ষে আছি।

ইহার ঠিক দুই বৎসর পরে য়ুরোপে হঠাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া উঠে ও তাহার তরঙ্গ ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছে। যেদিন প্রথম শিমলায় যুদ্ধ ঘোষণার-সংবাদ আসিয়া পৌঁছে, সেদিনের কথা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। উচ্চ-পদস্থ ইংরাজ-সৈনিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের দেখিলেই বুঝা কঠিন হইত না যে ব্যাপার কিরূপ গুরুতর হইয়া দেখা দিয়াছে। Army Headquarters যে কয়টি সুবৃহৎ ভবন ছিল সবগুলি তাহা অবিলম্বে কাঁটা তার দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইল এবং প্রত্যেক প্রবেশ দ্বারে সঙ্গীনধারী ইংরাজ সৈনিক পাহারা দিবার ব্যবস্থা হইল। পাশ না দেখাইলে ভিতরে বাহিরে যাতায়াতের উপায় ছিল না। ইংরাজ মহলে আমোদ-আহ্লাদের অনুষ্ঠান সব রহিত হইয়া গেল. শিমলা বিধবার বেশ ধারণ করিল।

যুদ্ধোপলক্ষ্যে ভারতবর্ষ হইতে সৈনিক ও যুদ্ধের নানা দ্রব্যসম্ভার নানাক্ষেত্রে পাঠাইবার জন্য একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠে। তাহার নাম দেওয়া হইল। Munitions Board. ইংলণ্ড হইতে বিশেষজ্ঞ ও বিচক্ষণ কয়েকজন কর্মচারী উচ্চ-বেতনে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান ছিলেন, Sir Thomas Holland. তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য তাঁহার প্রভূত প্রসিদ্ধি ছিল। ইনি পূর্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করিতেন ও উত্তরকালে Director. Geological Survey of India পদ অলঙ্কৃত করেন। প্রায় চারিশত কর্মচারী লইয়া এই বোর্ড গঠিত হয়। Sir Thomas Holland ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিংয়ের সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের যে-কোনও প্রদেশে যে-সব কর্মচারীরা তাঁহাদের কর্ম-দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের নিজের ইচ্ছামত নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবেন। সেই সূত্রে আমাকে এই অফিসে যোগদান করিতে হয়।

এক বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। যুদ্ধের পরিণতি যে কি আকার ধারণ করিবে কেহই বলিতে পারিল না। কর্তৃপক্ষেরা অতঃপর স্থির করিলেন যে যুদ্ধের অপিসগুলি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। রাজধানী পরিবর্তনের পর দিল্লীর উপকণ্ঠে টিমারপুর পল্লীতে একটি অস্থায়ী রাজধানী গড়িয়া উঠে। রাজপ্রতিনিধি ভবন, সেক্রেটেরিয়েট ভবন, যুদ্ধের দপ্তর এবং কর্মচারীদের বাসভবনের জন্য অনতিদূরেই একটি কলোনি গড়িয়া উঠে। ব্যবস্থা হইল যে বোর্ডের কর্মচারীদের এই সব বাসভবনগুলিতে থাকিতে হইবে। কিন্তু সকলের স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে অবশিষ্ট কর্মচারীদের দিল্লীর প্রায় চারি মাইল দক্ষিণে, বন জঙ্গল কাটিয়া তাহারই এক অংশে, হনুমানজী মন্দিরের নিকট যে কয়েকটি বাসভবন নির্মিত হইয়াছিল তথায় বাস করিতে হইবে। অদৃষ্টক্রমে আমাকেও এই স্থানে আসিয়া উঠিতে হয়। যদিও নূতন রাজধানীর প্রথম অধিবাসী হইবার গৌরব অর্জন করি তবুও ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একটু চিন্তিত হইয়া পড়ি।

রামায়ণ ও মহাভারতে বনবাসের কথা বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম ও উহা বিশেষ রমণীয় বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু উত্তরকালে ইহা যে নিজ অদৃষ্টেই ঘটিবে তাহা কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। পুরাকালে মুনি, ঋষিরা বন মধ্যে কুটীর নির্মাণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বনজাত ফলমূলাদিতে ক্ষুধাবৃত্ত করিতেন। নদীর জল তাঁহাদের তৃষ্ণা দূর করিত। কোনও কষ্টবোধ করিতেন না। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে কুটীরের পরিবর্তে ইষ্টকনির্মিত বাসভবনে বাস করিবার সুযোগ ঘটিলেও সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবার যাহা প্রয়োজন, যথা ঘৃত লবণ তৈল তণ্ডুল বস্ত্র ইন্ধন ইত্যাদি সুদূর চারি মাইল দূরবর্তী পুরাতন নগরী হইতে আহরণ করিয়া আনিতে হইত। সহরে যাইবার একটি মাত্র ধূলিধূসরিত পথ ছিল। সকলে উহাকে কুকুরের রাস্তা বলিত। আজমীরী দরওয়াজা হইতে বাহির হইয়া, হনুমানজীর মন্দিরের পাশ দিয়া কুতব মিনার হইয়া আজমীরে গিয়া পৌঁছিয়াছে। হনুমানজীর মন্দিরের অনতিদূরেই কুতব রোড হইতে পুরাতন ছাউনির দিকে একটি পুরাতন জীর্ণ রাস্তা বাহির হইয়াছে ও তথায় গিয়া মিলিয়াছে। নাম ছিল Old Cantonment Road. এই রাস্তাটির দুই পার্শ্বে নূতন বাস ভবন গুলি অবস্থিত ছিল। এই পথটিতে ও ভবন গুলিতে আলোর কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। কলে জল সামান্যক্ষণের জন্য পাওয়া যাইত। অনেক সময় এমন হইত যে চারি পাঁচ দিন জল পাওয়া যাইত না। বাধ্য হইয়া অপরিষ্কৃত কূপের জল ব্যবহার করিতে হইত। মুনি-ঋষিরা যে আমাদের অপেক্ষা ভাগ্যবান ছিলেন তাহা মনে ঈর্ষা জাগাইয়া তুলিত।

সহরে যাইবার জন্য যান-বাহনের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। একা, টাঙাওয়ালারা এ অঞ্চলে সহজে আসিতে চাহিত না, বিশেষ রাত্রিকালে—রাহাজানির ভয়ে। দ্বিগুণ বা ততোধিক ভাড়ায় রাজি করাইতে পারা যাইত না। পাচক, ভৃত্য দুই এক দিন কাজ করিয়া গা ঢাকা দিত। অনেক সময়ে স্বপাক রন্ধনে বা অনাহারে অফিস করিতে হইত। কার্য্যালয় ছিল ৮ মাইল দূরে। কর্তৃপক্ষেরা কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য কয়েকখানি Bus এর ব্যবস্থা করিয়া দেন। ভাড়া দিতে হইত না।

সৌভাগ্যক্রমে আমি একটি পুরাতন চাকর সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম। সংসার-তরণীর সেই ছিল কর্ণধার। যখন এই পরিবেশে দিন যাপন করিতেছি সেইসময়ে বন্ধুবরের চিঠিখানি হাতে আসিয়া পঁহুছিলো। জানাইয়াছেন যে কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বিদেশ হইতে ফিরিয়াছেন এবং কলিকাতায় একটি বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারিং কার্যে বিশেষজ্ঞরূপে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। কার্যের কর্তৃপক্ষেরা সম্প্রতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে যে নূতন রাজধানী গড়িয়া উঠিতেছে সে সম্বন্ধে নানা তথ্য করিবার জন্য তাঁহাকে দিল্লী পাঠাইতে চাহেন। বন্ধু ভারতবর্ষে থাকিতে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া অন্য কোনও প্রদেশে কখনও যান নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই হয়। বিলাতী হোটেলে তিনি থাকিতে অনিচ্ছুক। ভারতবর্ষীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের কয়েকটি ঘটনা তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া, শিমলায় তাঁহার একটি আত্মীয়ের নিকট সংবাদ লইয়া আমাকে চিঠি লিখিতেছেন। যদি আমার কোন অসুবিধা না হয় ত দুই চারি দিনের জন্য আমার কাছে আসিতে চাহেন।

অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বন্ধুকে আসিতে লিখিয়া দিলাম। অসুবিধার কথায় একটু ইঙ্গিত করিয়া ছিলাম।

যেদিন সন্ধ্যা রাত্রে বন্ধুর দিল্লী পৌঁছিবার কথা সেদিন ভাবিয়াছিলাম আফিস হইতে ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাটি ফিরিব কিন্তু এমনই দুরদৃষ্ট যে চেয়ার ছাড়িয়া যখন উঠিতে যাইব, হঠাৎ সিমলার war office হইতে একটি টেলিগ্রাফ আসিয়া পৌঁছিল। তাহার ব্যবস্থা করিতে বেশ রাত্রি হইয়া গেল। বন্ধুর কথা ভাবিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। যাহা হউক, রাত্রি দশটার পর বাড়ী ফিরিয়া দেখি বন্ধুবর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বহু দিন পরে উভয় উভয়কে দেখিয়া আনন্দের সীমা রহিল না। নূতন স্থানে বাড়ি চিনিতে কোনও কষ্ট হইয়াছিল কি না তাহা জিজ্ঞাসা করি। এ সম্বন্ধে তিনি নিজের কঠিন ও তিক্ত অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিলেন তাহার উল্লেখ না করাই সমীচীন মনে করি। আমি যে পরিবেশে দিন যাপন করিতেছি সে জন্য যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

রাত্রে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয্যাশায়ী হইলাম। ভোরে উঠিয়া বন্ধুবরকে লইয়া গাড়ীর বাহির হইলাম। নূতন সুবৃহৎ কারখানাটি যে স্থাপিত হইয়াছে; যাহাকে আধুনিক যন্ত্রদানবের বিশাল কর্মক্ষেত্র বলা যাইতে পারে সেখানে প্রথমে গেলাম। কারখানা হইতে তীব্র-বজ্রব উঠিয়া চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছিল তাহাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কথায় কথায় উল্লেখ করিলাম যে এই কারখানাটি (stoneyeard) পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে-মনে হয় ভূমিকম্প হইতেছে। নবীন রাজধানীকে Garden City অভিহিত করিয়া ভবিষ্যতে ইহা কিরূপ আকারে প্রতিভাত হইবে তাহার Model একটি ভবনে রক্ষিত হইয়াছে তাহাও দেখাইয়া আনিলাম। অজ্ঞাত তথ্য যাহা জানা ছিল তাঁহার গোচরে আনিলাম। দুই চারি দিনের মধ্যে তিনি Lutyens, Baker প্রভৃতি নগর নির্মাতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ও নিজে সমগ্র স্থানটি পরিদর্শন করিয়া নানা আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করিলেন।

তাঁহার দিল্লী পরিত্যাগ করিবার আগে একদিন নূতন রাজধানী সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। বুঝিলাম তিনি নূতন নগরীর পরিকল্পনা ও গঠন সম্বন্ধে আদৌ প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। সুবিস্তীর্ণ সমাধি ক্ষেত্রের উপর নূতন রাজধানী নির্মাণের পরামর্শ যাহারা দিয়াছিলেন তাঁহাদের সুবুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন! মৃতের সমাধির প্রতি সাধারণের যে একটি শ্রদ্ধার ভাব স্বভাবতই বিরাজ করে তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া হৃদয়হীনতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতে তিনি যে দুঃখ অনুভব করিয়াছেন তাহার সীমা নাই। তিনি ইহাকে City of milion graves বলিতে চাহেন! Garden Cityত নহেই। দিল্লীর আরও কিছু দক্ষিণে সমাধিহীন অকর্ষিত নূতন ভূমিতে নূতন রাজধানী নির্মাণের পক্ষে যে কী অলঙ্ঘনীয় বাধা ছিল তাহা তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে অক্ষম। আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, সাজাহান যদি আজ বর্ত্তমান থাকিতেন ও তাঁহাকে যদি নূতন নগরী নির্মাণের ভার দেওয়া যাইত তিনি পৃথিবীতে আরও একটি বিস্ময়সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারিতেন।

বন্ধুবরের গৃহে ফিরিবার দিন প্রত্যাসন্ন হইয়া আসিল। যেদিন কলিকাতা যাত্রা করিবেন, সেই দিন ভোরে উঠিয়া জানাইলেন যে রাত্রি সাড়ে দশটার এক্সপ্রেস-ট্রেনে দিল্লী পরিত্যাগ করিবেন। নূতন চাউনি হতে কোনও যানবাহন পাওয়া যায় না, সুতরাং সেদিন অফিস হইতে নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু পূর্ব্বে উঠিয়া পুরাতন দিল্লীতে পৌঁছিলাম। সামান্য কিছু দ্রব্যাদি কিনিয়া একটি টাঙ্গা করিয়া নূতন চাউনিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। টাঙ্গাওয়ালাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে তাহার টাঙ্গার

স্টেশনে যাইব ও তথা হইতে রাত্রে নঈ হাউসিতে ফিরিব। এ জন্য সে অগ্রিম ভাড়া পাওয়ায় তাহা তাহাকে দিই। বন্ধুকে লইয়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। টাঙ্গা-ওয়ালাকে বলিলাম সে যেন আমার জন্য প্রতীক্ষা করে। বন্ধুবরকে ট্রেনে উঠাইয়া দিবার পর স্টেশনের বাহিরে যেখানে টাঙ্গাওয়ালাকে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম সেখানে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। টাঙ্গাওয়ালা অগ্রিম ভাড়া যে কেন চাহিয়া লইয়াছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। দিল্লীতে এইভাবে যে প্রথম প্রতারিত হইলাম তাহা নহে; স্টেশনের সীমানার মধ্যে আর কোনও যানবাহন চোখে পড়িল না। অনন্যোপায় হইয়া কুইন্স গার্ডেনের ভিতর দিয়া চাঁদনী চকের ঘণ্টাঘরের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। এ স্থানে একটি Tonga-stand ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোন যানই চক্ষে পড়িল না। বাড়ী যে কি করিয়া ফিরিব সে সম্বন্ধে দুর্ভাবনা জাগিয়া উঠিল। সমস্ত চাঁদনীচক, নঈ সড়ক প্রভৃতি ঘুরিলাম কিন্তু অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবার কোন লক্ষণ দেখা দিল না। দোকানপাট সব বন্ধ হইয়াছে সহর বেশ নির্জন হইয়া আসিতেছে। শেষে এক অবাঙ্গালীর পল্লীতে উপস্থিত হইয়া ভাবিলাম যদি যানের যোগাড় হয় কিন্তু নিরাশ হইতে হইল। আজমীরী দরওয়াজার নিকট ক্রমশ আগাইয়া গেলাম শেষ অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে।

দেখিলাম অদৃষ্ট অবশেষে সুপ্রসন্ন হইয়াছে। আজমীরী দরওয়াজার একটি একা দাঁড়াইয়া আছে। কাছে গিয়া দেখিলাম ইহা একাই বটে তবে ইহা হস্তিনা-পুরের রথের বংশাবতংশ বলিয়া বোধগম্য হইল। শ্রীহীন, গুটিকয়েক কাঠখণ্ড জোড়াতাড়া দিয়া একার আকৃতি দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যাহাহউক এ সম্বন্ধে অত বিচার করিতে মন চাহিল না। বাড়ী পৌঁছান লইয়া কথা। একাওয়ালা দেখিলাম একটি বৃদ্ধ মুসলমান, সারা অঙ্গ একটি কালো কম্বলে আবৃত করিয়া বসিয়া আছে। হাতে তাহার একটি ক্ষুদ্র যষ্টি। তাহার মুখ দেখা যাইতেছে না। তাহার সঙ্গে যখন একা ভাড়ার কথা পাড়িতে যাইব সেইসময়ে হঠাৎ পৃষ্ঠে একটি প্রবল মুষ্ট্যাঘাত অনুভব করিলাম। চমকাইয়া উঠিতে হইল। স্থান, কাল ভাল নহে, সবকিছু ঘটিয়া উঠাও অসম্ভব নহে। পিছন ফিরিয়া দেখি যে পশ্চাতেই প্রতিবেশী মহাদেব ভাদুড়ী মশাই! আমাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন ইহাকেই বলে সৌভাগ্য! ধুতি কিনিবার জন্য সহরে আসিয়াছিলেন, পছন্দমত পাড়ের ধুতি কিনিতে তা এত রাত্রি হইয়া যাইবে ভাবিতে পারেন নাই গত দুইঘণ্টা গাড়ীর চেষ্টায় ফিরিয়াছেন। শেষে হতাশ হইয়া এদিকে আসিয়াছেন।

একাওয়ালাকে আমাদের গন্তব্যের স্থান উল্লেখ করিলাম ও ভাড়ার কথা জানিতে চাহিলাম। উত্তরে সে কিছু না বলিয়া হাতের যষ্টিটি আকাশের দিকে সোজা করিয়া দেখাইল। বুঝিলাম এক টাকার কমে সে যাইবে না। একার পক্ষে ইহা অত্যধিক বোধ হইল কিন্তু ইংরাজী প্রবাদ বাক্যটি স্মরণ করিয়া উহাতেই রাজি হইতে বলি।

প্রতিবেশী ভাদুড়ী মহাশয় বয়সে আমার অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের বড় সেজন্য তাঁহাকে একটু সমীহ করিয়া চলিতাম, তিনিও আমাকে ছোট ভায়ের মত স্নেহ করিতেন। গৌরবর্ণ ও স্থুল বপু তাঁহাকে সার্থকনামা করিয়াছিল। বহু কষ্ট করিয়া তিনি একায় উঠিয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একাটি যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল। আরও একটি ঘটনা ঘটিল। একার নীচে হইতে একটি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের মার্জার শিশু লম্ফ দিয়া রাস্তা পার হইয়া অপর পারে ফুটপাতে গিয়া বসিল। যাত্রারম্ভে ইহা দেখিয়া ভাদুড়ী মহাশয় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। কোনওক্রমে আমি ভাদুড়ী মহাশয়ের পার্শ্বে স্থান করিয়া লইলাম এবং একাওয়ালাকে যাত্রা করিবার কথা বলিলাম। কিন্তু যে ঘোড়াটি একায় সংযুক্ত ছিল তাহার তখন নট্‌ নড়ন চড়ন' অবস্থা। অবশেষে তাহার মালিক অনেক তোয়াজ করিয়া তাহাকে সচল করিয়া তুলিল। সামান্য মাত্র অগ্রসর হইয়াছি এমন সময়ে পাশে যে একটি দোকান ছিল সেখান হইতে লম্বা আলখাল্লা-পরা

ফকীরের মত একটী লোক উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, রহিম শেখ, বাবুদের লইয়া এই গভীর রাত্রে যাইতেছ, 'খতরে যে মত্ ডাল্না' নিরাপদে পৌঁছিয়া দিও। খুদা হাফিজ!" রহিম শেখ তাহার যষ্টিটি আকাশের দিকে উঁচু করিয়া দেখাইল। কি বুঝাইল সেই জানে।

আজমীরী দরওয়াজায় আসিয়া পৌঁছিলাম। এ-স্থানটি অসমতল। বৃহৎ উপলখণ্ড দিয়া বাঁধান। গাড়ী চলাচলের অসুবিধা হইত। বাদশাহদের আমলে বৃহৎ লৌহকীলকযুক্ত দৃঢ় কপাট ইহার দুই দিকে বিরাজ করিত। নির্দ্ধারিত সময়ে ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। এখন সেসব আর কিছুই নাই। উন্মুক্ত সু-উচ্চ প্রবেশদ্বার শুধু বর্ত্তমান।

বহু কষ্টে অশ্বপ্রবর এই স্থানটি অতিক্রম করিল। যেখানে আসিয়া পৌঁছলাম উহা একটি সুবৃহৎ কাঠের গোলা। যে সময়ের কথা লিখিতেছি সে সময়ে দিল্লীতে পাথুরে কয়লার প্রচলন ছিল না। সকলেই কাঠ ব্যবহার করিত। এই গোলাটি দেখিবার মত ছিল। সমতল পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। সমান আকারের কাঠের গুঁড়িগুলি সাজাইয়া প্রায় তিন চারি তলা সমান উচ্চ করা হইয়াছে। এইরূপ স্তূপ অনেকগুলি ছিল। ইহারই মধ্য দিয়া পথটি চলিয়া গিয়াছে।

সম্মুখেই একটি বিশাল প্রান্তর। সেই স্থানে পৌঁছিলাম। এই প্রান্তর অতিক্রম করিলেই রাস্তাটি কুতব রাস্তায় পাহাড় গঞ্জের পুলিসের থানার নিকট গিয়া মিলিয়াছে। বৃক্ষলতাহীন এই প্রান্তরটি ছিল একান্ত নির্জ্জন। প্রান্তর অতিক্রম করিতেছি, দূর হইতে বৃক্ষের কোটরে পেচকের কলহ-ধ্বনি জাগিয়া উঠিল এবং ভাদুড়ী মহাশয়কে কিঞ্চিৎ ভাবিত করিয়া তুলিল। প্রান্তরের মধ্যস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি মনে হইল যেন মরুভূমির মধ্য দিয়া যাইতেছি। প্রতি মুহূর্ত্তে একটা অজানা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে দেখি আকাশে মেঘ আসিয়া জুটিয়াছে ও তাহার মধ্য দিয়া ম্লান চন্দ্রকিরণ দৃশ্যটিকে যেন আরও গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। উভয়ের মধ্যে কথোপকথন প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে। কি করিয়া যে গন্তব্য স্থলে গিয়া পৌঁছিব তাহা কেবলই মনে উঠিতেছে। একাওয়ালা বোধ করি আমাদের মনের ভাব বুঝিয়াছিল, তাহার যষ্টি ঘুরাইয়া বুঝাইতে চাহিল যে ভয় পাইবার কিছু নাই। অবশেষে প্রান্তরের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিলাম. অদূরেই একটি রেলওয়ে ওভারব্রিজ। অধুনা পাহাড়গঞ্জ নিউ দিল্লীর ষ্টেশনের নিকট যে সুবৃহৎ over bridge বর্ত্তমান, সেইরূপ ইহা মনে করিলে ভুল করা হইবে। সামান্য তিন চারিটি খিলানের উপর এই পুলটি-যান বাহনের যাতায়াতের জন্য। নীচে রেলওয়ে লাইন বোম্বাইয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ এঞ্জিনের তীব্র বংশীধ্বনি বাজিয়া উঠিল এবং কিছু পরেই এঞ্জিনের শীর্ষে স্থিত সন্ধানী আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ট্রেনটি নিকটে আসিয়া পড়িল। বহুক্ষণ নির্জ্জনতায় কাটিয়াছিল, হঠাৎ ট্রেনের মধ্য প্রাণ চাঞ্চল্য দেখিয়া মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সামান্য ক্ষণের জন্য। দেখিতে দেখিতে ট্রেন দিগন্তে মিলাইয়া গেল। পূর্ব্বের নির্জ্জনতা যেন ফিরিয়া আসিল।

অদূরেই রাস্তাটি পাহাড়গঞ্জ থানার নিকট কুতব রাস্তার সহিত মিলিয়াছে ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। থানার নিকট যখন পঁহুছিলাম—চারিদিক দেখি জন-শূন্য। সুষুপ্তা নগরীর এই দৃশ্যটি মনে গভীর রেখাপাত করিল।

পাহাড়গঞ্জ পুলিস থানাটি অধুনা 'লেডি হার্ডিং সরাই নামে পরিচিত। ইহার পাশ দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি, প্রহরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ভাদুড়ী মহাশয় এক, দুই করিয়া গণিতে আরম্ভ করিলেন। গোণা শেষ হইলে বুঝিতে পারিলেন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল, কখন যে বাড়ী পৌঁছিতে পারিবেন সে জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। কিছুদূরে রাস্তার বাম দিকে কয়েকটি ভাস্করের দোকান। ইহারা পাথর কাটিয়া নানা প্রকারের আকৃতি দিয়া থাকে, বিত্তবান ব্যক্তিদিগের গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজন হয়। দোকানগুলি সব এখন বন্ধ। দোকানগুলি অতিক্রম করিলে একটি বৃহৎ জলাশয়

দেখা গেল। স্থানীয় লোকে ইহাকে 'সাহি তালাও' বলিয়া অভিহিত করে। কোন্ বাদশাহ যে এই পুষ্করিণীটি নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারি নাই পুকুরের অনতিদূরেই একটি সমাধিক্ষেত্র চোখে পড়িল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি বাম দিকের ঝোপে শব্দ হইয়া উঠিল। রাস্তার অপর পার্শ্ব হইতে তাহাদের আত্মীয়-বর্গেরা প্রহর ঘোষণায় যোগ দিল। যে অবাঞ্ছনীয় পরিবেশটি সৃষ্ট হইল তাহাতে মন বিরূপ হইয়া উঠিল! যাহাহউক, কিছু পরে বনভূমি পুনরায় শান্তভাব ধারণ করিল। আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম কিন্তু সে কয়েকক্ষণের জন্য। হঠাৎ রাস্তার দক্ষিণ দিক হইতে কয়েকটি শৃগাল দৌড়িয়া রাস্তা পার হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কয়েকটি সারমেয় তাহাদের পিছু ধাওয়া করিয়াছে। শৃগাল ও সারমেয়ের এই কীর্তি দেখিয়া একার ঘোড়াটি আর অগ্রসর হইতে চাহিল না, দাঁড়াইয়া পড়িল। কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে চাহে না। রহিম সেখ ব্যস্ত হইয়া পড়িল ও পরে অনেক কৌশল প্রয়োগ করিয়া তাহাকে সচল করিয়া তুলিল। মন্থর গতিতে আমরা অগ্রসর হইতেছি এমন সময় হঠাৎ একটা তীব্র উৎকট গন্ধ নাকে আসিয়া ঢুকিল। ভাদুড়ী মহাশয় সজাগ হইয়া উঠিয়া বলিলেন ও রহিম শেখ যে আমাদের শ্মশান ভূমিতে লইয়া আসিয়াছে সে উষ্মাভরে ব্যক্ত করিলেন। রহিম উত্তরে কিছুই বলিল না। নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ব্যাপার কি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে অফিসের সহকর্মী স্থায়ী বাসিন্দা বাবু বিহারী লাল কথায় কোথায় একদিন ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে ঠিকাদারেরা এই রাস্তার দুইপার্শ্বে গভীর রাত্রে পাথর পুড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করে। সমস্ত রাস্তাটি তখন ধূম ও উৎকট দুর্গন্ধে ভরিয়া উঠে। রাস্তার দুই দিক ভাল করিয়া দেখিলাম, তাহাই বটে। রাস্তার দুই পার্শ্বে বোধ কার ২৫-৩০টি ভাঁটি হইতে ধূম অবিরল বহির্গত হইতেছে। রহিম সেখকে শীঘ্র এ স্থল ত্যাগ করিবার জন্য বলিলাম।

অশ্বের গতি এখন বেশ দ্রুততর হইয়াছে বুঝাগেল এবং আমাদের অস্থি পাঁজরের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি, চারি দিকে গভীর অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দূরে সম্মুখ রাস্তায় একটি আলোকবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। ক্রমশ ঐ আলোকবিন্দুটি আকৃতিতে বড় হইয়া উঠিল। নিকটে আসিলে দেখিলাম আলখাল্লায় আবৃত একটি দীর্ঘাকার ব্যক্তি। কপালে ত্রিপুণ্ড্র, দক্ষিণ হস্তে একটি ত্রিশূল ও বামহস্তে একটি লণ্ঠন লইয়া আমাদিগের প্রতি অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তাহার পশ্চাতে চারিজন বলবান ব্যক্তি একটি শব বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে। আমাদের বাম পার্শ্বে রাখিয়া তাহারা অগ্রসর হইয়া গেল। 'রাম নামই যে একমাত্র সত্য' এবং সকলের গতি ধ্বনি এই ঘোষণা অনেকক্ষণ কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। তাহারা সহরে নিগমবোধ ঘাটের দিকে চলিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম। চারিদিক পুনরায় নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। অশ্বপ্রবরটি এখন নিজ মনে ধীর মন্থর গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে, আমরা চোখ বুজিয়া আছি, হঠাৎ যেন মনে হইল রহিম শেখ তাহার স্থানটিতে বসিয়া নাই। চালকবিহীন একায় যে নানা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা সে কথা মনে পড়িতেই Kipling-এর phantom rickshaw র ঘটনাটি মনে পড়িয়া গেল ও চিত্ত আতুর হইয়া উঠিল। ভাবিলাম শেখ সাহেব হয়ত প্রকৃতির দাবী মিটাইতে গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে। তাহার প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল শেষে চোখে অস্পষ্ট-ভাবে পড়িল যে অনতিদূরের একটি বট গাছের তলা হইতে একটি বালতি ও এক হাতে দড়ি লইয়া ফিরিতেছে। বুঝিলাম অশ্বপ্রবরের জন্য, পুরাকালে বাদশাহেরা যে পথের ধারে পথিকদের জন্য কূপের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেইরূপ একটি কূপ হইতে জল লইয়া আসিতেছে। তীব্র শীতের রাতে তুষার শীতলজল অশ্বটিকে পান করাইলে তাহার যে অচিরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা সে কথা ভাদুড়ী মহাশয় বলিলেন। তিনি জানিতেন না যে কূপের জল রাত্রে কবোষ্ণ থাকে। যাহাহোক অশ্বটি জল পান করিয়া বোধ করি কিছু সুস্থ বোধ করিল।

তাহার জল পান শেষ হইলে রহিম শেখ একার নীচে রক্ষিত যে একটি থলি ছিল তাহা তাহার সম্মুখে রাখিল। অশ্বটি নিজ আহার্য্যে মন দিল। রহিম শেখ অবশেষে একার নিজ স্থানটিতে আসিয়া বসিল। অশ্বের গতি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর হইল, আশা হইল শীঘ্রই গন্তব্য স্থলে গিয়া পৌঁছিব।

হঠাৎ আকাশের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, দেখিলাম যে উহা কাল মেঘে ছাইয়া গিয়াছে। দেখিতে দেখিতে একটা দমকা বাতাস জাগিয়া উঠিল ও পথের বাম পার্শ্বে যে একটি বৃহৎ বাঁশ গাছের ঝাড় ছিল তাহার মধ্যে দাপাদাপি শুরু করিয়া দিল। মনে হইল শত শত দানব তাহাদের উগ্র খেলায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের এই মত্তলীলা ও অট্টহাস্য আমাদের প্রাণে আতঙ্ক জাগাইয়া তুলিল। চারিদিক ধূলি-বালিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যৌবনে কলেজে কালিদাসের কাব্যে পড়িয়াছিলাম যে হিমালয়ে বংশকুঞ্জ মৃদু সমীরণে অপূর্ব মধুর বংশীধ্বনি জাগিয়া উঠে কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাহার বিপরীত ঘটিল। যাহাহউক, দমকা বাতাসের যেমন হঠাৎ আবির্ভাব হইয়াছিল তেমনই তাহার তিরোভাব ঘটিল। দীর্ঘ বাঁশগুলির শীর্ষদেশ তখনও আকাশে উঠা নামা করিতেছে মনে হইল তাহারা যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে।

প্রচণ্ড বাতাসের জন্য অশ্বপ্রবর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রকৃতি কিছু শান্ত হইলে সে পুনরায় সচল হইয়া উঠিল। রাস্তার দুই ধারের বন জঙ্গল এখন অনেকটা পাতলা হইয়া আসিয়াছে দেখিলাম, মাঝে মাঝে ঝোপ জঙ্গল দেখা যাইতেছে। এমনই একটা ঝোপের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখি যে ঝাঁকড়া মাথা কয়েকটি আদিবাসী বুনো লোক পরস্পরের মধ্যে যেন কি পরামর্শ করিতেছে ও মাঝে মাঝে দূরে কাহাকে ইশারা করিতেছে ভাদুড়ী মহাশয়ের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিলাম। তিনি একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন হয়ত ভাবিয়া থাকিবেন যে সময় উপস্থিত হইয়াছে। কোনও বাক্য স্ফুরণ হইল না। আফিসের বিহারী-লাল বাবুর কথা মনে পড়িল। তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে এই সব ব্যক্তিরাই রাত্রে নির্জ্জনে পথিকদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের ভাগ্যে কিছুই ঘটিল না। একাটি নিকটবর্ত্তী হইলে দেখি যে যাহাদের বুনো লোক বলিয়া দেখিয়াছিলাম, প্রকৃত তাহারা তিন চারিটি খর্ব্বকায় খেজুর গাছ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহাদের মাথার উপরে শকুন জাতীয় কয়েকটি পাখী পাখা বিস্তার করিয়া উঠা বসা করিতেছিল—আমাদের নিকট তাহাই ইসারা করিয়া হাত নাড়া বোধ হইয়াছিল। প্রকৃত ব্যাপার জানিয়া নিঃশঙ্ক হইলাম।

এবারে বন জঙ্গল শেষ হইয়া গেল এবং বিশাল এক প্রান্তর দেখা গেল। তাহারই শেষ সীমায় দিকচক্রবাল আড়াল করিয়া একটি বিশাল প্রাচীন দুর্গ বর্ত্তমান। ইহার প্রাকার, কয়েকটি চূড়া ও তিনটি সু-উচ্চ প্রবেশ-দ্বার অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। অবাক হইয়া দেখিতেছি এমন সময় ভাদুড়ী মহাশয় জানাইলেন যে রহিম শেখ তাহার স্থান ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একাটি অচল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে।

ভাদুড়ী মহাশয় যে কি বলিলেন তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হইল না, আমার মন ঐ বিশাল প্রান্তরে তখন আবদ্ধ। বোধ হইল, ঐ প্রান্তরটি অশ্বখুরধ্বনিতে হঠাৎ মুখর হইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে দেখিতে উহা বহু অশ্বারোহী সৈনিকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বহু সশস্ত্র পদাতিকও দ্রুত ধাবন করিয়া আসিলো। মশালোকে তাহাদের ছায়ার মত দেখাইতেছে। হাতে তাহাদের তীক্ষধার ও শাণিত অস্ত্র স্কন্ধে ধনু ও পৃষ্ঠে তূণ। মাঝে মাঝে তূর্য্যধ্বনি ও দামামার গভীর ধ্বনি চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে। বুঝিলাম দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য সকলেই সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় প্রান্তরের অপর পার্শ্বে দুর্গ আক্রমণকারীদের আবির্ভাব ঘটিল। অদ্ভুত বেশধারী এই বৈদেশিক সৈনিক সমাবেশ দেখিয়া মন উদগ্র হইয়া উঠিল। অচিরেই রণ-সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল। অস্ত্রের তীব্র ঝনৎকার ধনুকের টঙ্কার ধ্বনিতে চারিদিকের আকাশ বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল। এমন সময় দেখা গেল দুর্গের একটি প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল ও জলস্রোতের মত অগণ্য সৈনিক

প্রান্তর পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ইহাদের পশ্চাতেই একজন অশ্বারোহীকে দেখা গেল। অন্য একজন অশ্বারোহী ইহার মস্তকের উপরছত্র ধরিয়া। তাঁহাকে দেখিবামাত্র যুদ্ধোন্মত্ত সৈনিকেরা জয়োল্লাস করিয়া উঠিল। যুদ্ধের সংঘর্ষ চরমে গিয়া ঠেকিল। পরিণাম যে কী হইবে তাহা বুঝা কঠিন হইয়া উঠিল। এমন সময়ে শতাধিক হস্তীর সমবেত বৃংহণ ধ্বনিতে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল—হস্তীযূথ তীব্র গতিতে বিপক্ষদের মধ্যে গিয়া পড়িল। বিপক্ষ দল যখন বিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে তখন গগন প্রাঙ্গণের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত তড়িতের সুতীব্র নীল শিখা বহিয়া গেল ও অচিরেই বজ্রধ্বনিতে সমগ্র ধরিত্রী কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল প্রান্তরের মধ্যেই বজ্রপাত হইয়া থাকিবে। যুদ্ধের কি পরিণাম হয় দেখিবার জন্য মন ব্যস্ত হইয়াছিল প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি পাত হওয়াতে উহা জনশূন্য বোধ হইল। কেবল দেখিলাম যে কয়েক সহস্র বৎসরের প্রাচীন দুর্গটি শুধু একাকী মহাকালের সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এতক্ষণ যে দৃশ্যে মন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা ভোজবাজির মতই বোধ হইল। দুর্গটির প্রতি আর এক বার চাহিয়া দেখিলাম। মনে পড়িল আচ্ছা, ইহাই ত সেই পুরানো কিল্লা—স্থানীয় লোকেরা যাহাকে ইন্দ্রপৎ বলিয়া উল্লেখ করে। ইহাকে যে এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই তাহা খুবই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইল। প্রত্যেক দিনই ত অফিস যাইবার মুখে উহা চোখে পড়ে।

ইতিমধ্যে রহিম শেখ কখন যে ফিরিয়া আসিয়া নিজ স্থানটি অধিকার করিয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই। এক্কা সচল হইয়া উঠিল ও কিছুক্ষণ পরে কুতবের রাস্তা হইতে যে রাস্তাটি পুরান ছাউনির দিকে চলিয়া গিয়াছে সেই সংযোগস্থলে আসিয়া পৌঁছিল। অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে এই স্থান হইতে হনুমানজীর মন্দির ছায়ালোকের ন্যায় বোধ হইল। পক্ষীমাতা যেমন নিজ-পক্ষের দ্বারা শাবকগুলিকে বিপদ হইতে রক্ষা করে, মন্দিরপ্রাঙ্গণ একটি সুবৃহৎ বনস্পতি তাহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া যেন মন্দিরটিকে রক্ষা করিতেছে। অচিরেই গন্তব্যস্থলে আসিয়া এক্কা দাঁড়াইয়া পড়িল। বাজারের পূর্বে রহিম শেখকে এই স্থানটির কথাই উল্লেখ করিয়াছিলাম। এমন সময়ে একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটিল। রহিম শেখ এক্কা হইতে লাফ দিয়া রাস্তায় পড়িল এবং দৌড়াইয়া রাস্তার অপর পার্শ্বে যে একটি বহু পুরাতন জীর্ণ মসজিদ ছিল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা দুই জনও এক্কা হইতে নামিয়া পড়িলাম ও রাস্তার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিমের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। যখন প্রায় ধৈর্য্যের সীমা হারাইয়াছি, সেই সময় মসজিদের ভিতর হইতে 'আল্ হম্-দুলিল্লা' ধ্বনি উচ্চৈঃস্বরে জাগিয়া উঠিল। চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখি এক্কা ও অশ্বটিও সেই মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়াছে! সমস্ত ব্যাপারটি যেন স্বপ্নের মত বোধ হইল।

ইতিমধ্যে দেখি যে আকাশের পূর্বদিক অল্প পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে এবং সম্মুখবর্তী মন্দিরের একটি দ্বার যেন অর্ধ উন্মুক্ত হইয়াছে। ভিতর হইতে প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি-রেখা বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে ও ঘণ্টার মৃদু-মধুর ধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে। মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করিয়া বাড়ী ফিরিবার কথা ভাদুড়ী মহাশয়কে জানাইলাম। তিনি সহজেই সম্মত হইলেন।

মন্দিরাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে একটি চাতাল চোখে পড়িল। উভয়ে সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম। বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। স্থির ও নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি; কয়েক মুহূর্ত পরে মন্দিরাভ্যন্তর হইতে প্রভাত-বন্দনা গানে আসিয়া পৌঁছিল। বৈরাগিকেরা গান ধরিয়াছে:—

> "উঠো, জাগো মুসাফির ভোর ভঁয়ো।
> অব রৈন কাঁহা যো সোয়ত হ্যায়॥
> যো সোয়ত হ্যায় সো খোয়ত হ্যায়।
> যো জাগত হ্যায় সো পাবত হ্যায়॥"

কতক্ষণ যে বসিয়াছিলাম তাহা মনে নাই। যখন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল বোধ হয় যে মন্দিরপ্রাঙ্গনস্থিত বৃক্ষগুলি পাখীদের কাকলিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। আলোকের রশ্মি দ্বারা পৃথিবী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বাড়ীর দিকে ধীরে ধীরে পা বাড়াইলাম।

যাত্রা শেষ হইয়াছে। নবীন রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

গুরু-শিষ্য সংবাদ

সন্তোষকুমার ঘোষ

নৈমিষারণ্যের ব্যাপার। পুরাণ-বক্তা সৌতির মুখ থেকে শোনা। সুতরাং যা বলছি তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়।—

ঝুরি নামা বুড়ো বটগাছের তলার বেদীর উপর বসে বৃদ্ধ বিপ্রর্ষি ঘন ঘন হাই তুলছেন আর মাঝে মাঝে মাছি তাড়াচ্ছেন। তখন ব্রহ্মবিদ্যার ক্লাশ। বিদ্যার্থীরা কিন্তু বিলকুল অনুপস্থিত। ঝাড়া একপ্রহর অপেক্ষা করার পর গুরু বেদী ছেড়ে উঠে পড়বার উপক্রম করছিলেন। হঠাৎ দূর থেকে শিষ্যমণ্ডলীর সমবেত কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল।—

চলবে না—চলবে না।

গুরুদের জুলুম—চলবে না।

গুরুর-উৎপাড়ন—চলবে না।

আমাদের অভিযোগ—শুনতে হবে।

আমাদের দাবি—মানতে হবে।

অন্য এক আশ্রমের আর এক বিপ্রর্ষি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। দেহ সম্পূর্ণ নগ্ন। বাকল-কপনিরও বালাই নেই। হাঁপাতে হাঁপাতে কোনরকমে বললেন—এ কি! এখনো উপবিষ্ট রয়েছেন কোন্ ভরসায়! অবিলম্বে আশ্রমভূমি ত্যাগ করুন। না হ'লে—এখনি ঘেরাও হতে হবে আপনাকে।

বৃদ্ধ বিপ্রর্ষি চমকে উঠলেন। বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে শুধু বললেন—ঘেরাও!—সে আবার কি!

শব্দটা—দেশজ না প্রাকৃত? শব্দটার অর্থই বা কি?—সম্ভবত এ ধরনের কোন চিন্তাই তাঁর মগজের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। নবাগত কিন্তু ভুক্তভোগী। হাড়ে হাড়ে অর্থ বুঝেছেন তিনি। তাড়াতাড়ি বললেন—কুলপতিদের তাঁবে যেখানে যত পড়ুয়া আছে—সবাই এখন একজোট হয়েছে। আশ্রমে আশ্রমে দল পাকিয়েছে। শিষ্য সংসদ গড়ে উঠছে। শোনেন নি আপনি?

বৃদ্ধ বিপ্রর্ষি হাঁ-না কোন রকম উত্তর দিলেন না। আশ্রমাভিমুখী শব্দতরঙ্গ ক্রমশঃ নিকটতর হচ্ছে। তাঁর দৃষ্টি তখন ঊর্ধ্বমুখী - শ্রুতি উৎকর্ণ—মন উৎকণ্ঠাক্লিষ্ট। নবাগত বললেন—ওই শুনুন, গগণভেদী প্রচণ্ড আরাব। বাঁধা বুলির রব তুলতে তুলতে শিষ্যামিছিল এগিয়ে আসছে। আপনার উপর চড়াও হবে ওরা। ওদের অভিযোগ না শুনলে—ওদের দাবি না মানলে—ঘেরাও করে রাখবে আপনাকে। আশ্রম তছনছ করে ছেড়ে দেবে।

বৃদ্ধ বিপ্রর্ষি উৎকণ্ঠামিশ্রিত স্বরে বললেন—বলেন কি! তা বৎসদের অভিযোগ কী? কী দাবি ওদের?

নবাগত বললেন—অভিযোগ একটা নয়।—অগণ্য অনন্ত। দাবির পরিমাণও ঝুড়ি-ঝোড়া দিয়ে মেপে শেষ করা যায় না।

বৃদ্ধ বিপ্রর্ষি এবার নবাগতের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। নগ্ন দেহ দেখে চমকে উঠলেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—এ কি! আপনার বাকল-বসন ইত্যাদি কোথায় গেল! এমন নিরাবরণ অবস্থায় ছুটে এসেছেন—ব্যাপার কি!

নবাগত বললেন—ব্যাপার শুনলে ভিমি যাবেন আপনি। আমার আশ্রমে সেদিন বেদের কর্মকাণ্ডের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। যা প্রশ্ন করি—পরীক্ষার্থীদের মতে সবই কঠিন—সবই দুর্বোধ্য। বৎসদের দুর্বিনীত মেজাজ আর উৎকট আচরণ দেখে আমি সামান্য একটু উষ্মা প্রকাশ করেছিলাম মাত্র। ওরা শুধু সমস্বরে প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হয় নি।—আশ্রমের বেদী ভেঙেছে—আটচালা উপড়েছে—পুঁথিপত্রও সব পুড়িয়ে ফেলেছে।

বৃদ্ধ বিপ্রর্ষি মহাউৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে বললেন—বিদ্যার্থী হয়ে ওরা এভাবে বিদ্যাদানের অবমাননা করেছে! বলেন কি! এযে নিতান্ত অভাবনীয় ব্যাপার!

নবাগত বললেন—এখন আর কিছুই অভাবনীয় নয়। সবই সম্ভব। আমি বেঁকে দাঁড়িয়েছিলাম বলে অষ্টাহ কাল ধরে আমাকে ঘেরাও করে রেখে আমার হাজার হাল করে ছেড়েছে ওরা। শেষে নাকে কানে খৎ দিয়ে কুলপতির পেশায় ইস্তাফা দিতে হয়েছে। তবে রেহাই পেয়েছি। পানীয়পাত্র, অরণী মন্থ, ব্রহ্মদণ্ড মায় পরনের বাকলটি পর্যন্ত ফেলে আশ্রম ত্যাগ করতে হয়েছে আমাকে। এজন্মে আর আশ্রমমুখো হচ্ছি না। এখন সোজা মানস-তীর্থে চলেছি সেখানেই দেহ রাখবো ঠিক করেছি।

সম্মিলিত কণ্ঠস্বর নিকটতর এবং প্রচণ্ডতর হতে লাগল। আর বিলম্ব না করে তিনি সরে পড়লেন।

স্থবির দেহ নিয়ে বৃদ্ধ বিপ্রর্ষির পক্ষে তক্ষুণি আশ্রমভূমি ত্যাগ করা আদৌ সম্ভব নয়। অগত্যা বসে বসে প্রমাদ গণতে লাগলেন তিনি।—কতযুগ ধরে কত হাজার হাজার শিষ্য স্নাতক হয়ে বেরিয়ে গেছে তাঁর আশ্রম থেকে। কিন্তু এমন অলুক্ষণে আরাব—এমন সর্বনেশে বায়না নৈমিষারণ্যে কস্মিনকালেও শোনা যায় নি। এ আবার কি।

দেখতে দেখতে শিষ্যমিছিল এসে বটগাছসমেত গুরুবৃদ্ধকে নেকড়ের পালের মত ছেঁকে ধরল। ছিড়েখুঁড়ে গুরুকে এমনই উদরসাৎ করবে এমনি ধরনের একটা উদগ্রভাব সকলেরই মুখেচোখে। তিনজন মহাশিষ্য মুখপাত্র হিসাবে বুক ফুলিয়ে বেদীর সামনে এগিয়ে এলেন। কোনরকম ভূমিকার আশ্রয় না নিয়েই প্রথম মুখপাত্রটি বৃদ্ধগুরুকে সোজাসুজি বললেন—আচার্যদেব, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে হাজার রকমের হয়রানির ব্যবস্থা। ঝুড়ি ঝুড়ি নিয়ম-কানুন। কাঁড়ি কাঁড়ি নিষেধ-নীতি। ওসব আর মানবো না আমরা।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে ধ্বনি উঠল—মানবো না, মানবো।

বৃদ্ধগুরু মহাবিস্ময়ে শুধু যুগলনয়ন বিস্ফারিত করলেন। মুখ দিয়ে কোনরকম বাক্যস্ফুরণ হল না।

প্রথম মুখপাত্রটি উদ্দাম আবেগে বলে চলেছেন—আশ্রমের সবকাজই অবশ্যকরণীয়। কোনরকম নড়চড় হবার যো নেই। গোয়ালের ভার নাও—গোধন চরাও—সমিধ যোগাড় কর—ক্ষেত-খামার সামলাও—ইঙ্গুদী ফল পেষো—গোধূম ভাজো—পুরোডাশ বানাও—বেদী গড়ো—উঠান নিকোও।—এসব রীতিমত পরিচারক-পরিচারিকা আর পাচক-পাচিকাদের কাজ। এ ধরনের উঞ্ছকাজ আর আমাদের দিয়ে করান চলবে না।

সমস্বরে ধ্বনি উঠল সঙ্গে সঙ্গে—চলবে না, চলবে না।

বৃদ্ধবিপ্রর্ষি বিস্মিতকণ্ঠে কোন রকমে বললেন—বলো কি হে বৎস! ব্রহ্মচর্যাশ্রম বলে কথা! সবকিছুরই নিক্কানবিশী করা দরকার এ সময়টায়। না হ'লে, এরপর সুখে-স্বচ্ছন্দে গার্হস্থ্যাশ্রম পালন করবে কী করে?

দ্বিতীয় মুখপাত্রটি উদ্দণ্ডগোছ হয়ে উঠে বললেন—সে ভাবনা আপনার নয়। আমরা গার্হস্থ্যাশ্রমের খোল-কাঠামো ইত্যাদি বিলকুল পাল্টে দেবো। সেকেলে চতুরাশ্রমও আর মানবো না।

সঙ্গে সঙ্গে গগণভেদী রব উঠল—মানবো না, মানবো না।

বৃদ্ধবিপ্রর্ষি শিষ্যমণ্ডলীর মনোভাব দেখে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন—অর্বাচীনের দল হয় রীতিমত উদ্‌ভ্রান্ত—না হয়ে উৎকট কোন রোগগ্রস্ত। না হলে এমন সব উদ্ভট ধরনের চিন্তা মগজের মধ্যে মাথা চাড়া দেবে কেন!

তৃতীয় মুখপাত্রটি হঠাৎ তূর্যনিনাদে চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন—পরীক্ষা না দিয়েই আমরা স্নাতক হতে চাই আমাদের আর আশ্রমের চিরাচরিত প্রথামত পরীক্ষা করা চলবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে রব উঠল—চলবে না, চলবে না।

প্রথম মুখপাত্রটি এবার রীতিমত নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন—আচার্যদেব, পাঠক্রমও আমরা নিজেরাই বাছবো, নিজেরাই ঠিক করবো। এ সব ব্যাপারে আপনার আর নাক গলানো চলবে না।

প্রচণ্ড শব্দ উঠল আবার।—চলবে না, চলবে না।

এরপর তিন মুখপাত্র হঠাৎ একজোটে চেঁচিয়ে উঠলেন। উদ্ধতকণ্ঠে বললেন—ব্রহ্মবিদ্যারও পাঠ নেবো না আমরা। ব্রহ্ম ভুয়ো—ব্রহ্ম ভাঁওতা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ধ্বনি উঠল—ব্রহ্ম ভুয়ো—ব্রহ্ম ভাঁওতা।

মুখপাত্ররা আবার চীৎকার করে উঠলেন—'আত্মানং বিদ্ধি'—'ওঁ তৎ সৎ'—'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং'—এসব বুলিও ভাওতাসর্বস্ব। এসবও আর মানবো না আমরা।

প্রচণ্ড ধ্বনি উঠল সঙ্গে সঙ্গে।—মানবো না, মানবো না

ধ্বনির ধাক্কায় বৃদ্ধগুরুর কানের পর্দা ফেটে চৌচির হবার উপক্রম হল। শুধু অভাবনীয় নয়—নিতান্ত অসহনীয় সব বাক্য। গুরু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। প্রায় মরীয়া হয়ে বললেন—ঋষি মহর্ষিদের বংশাবতংস না তোমরা। তোমাদের রক্তধারার সঙ্গে হাজার হাজার বছরের আর্য ঐতিহ্যধারা মিশে আছে। আজ হঠাৎ 'মানবো না' ব'লে উদ্ভট বায়না ধরেছ, উৎকট রব তুলছো। এতে তোমাদের পূর্বপুরুষদেরই অপমান করা হবে—পূর্বসূরীদেরই অগ্রাহ্য করা হবে। সেই সঙ্গে নিজেদেরই মাথা হেঁট হবে—সে খেয়াল রাখো?

মুখপাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত দুর্বিনীতভাবে বললেন—পূর্বপুরুষ মানি না আমরা। পূর্বসূরীদেরও মানি না।

বিস্মিত কণ্ঠে গুরু বললেন—অবাক করলে বৎসগণ! পূর্বপুরুষদের মানো না! পূর্বসূরীদেরও নস্যাৎ করে দিতে চাও! তবে কি স্বয়ম্ভু তোমরা?

মুখপাত্ররা একজোটে বললেন—আমরা স্বয়ম্ভু। আমরা অতীত মানি না, ভবিষ্যৎ ভাবি না। শুধু বর্তমান নিয়েই আমাদের কারবার।

বলে কি অর্বাচীনের দল! বিস্ময়ে গুরু হতবাক হয়ে গেলেন। তবু আশা ছাড়লেন না তিনি। গলদঘর্ম হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। অর্বাচীনদের সম্বিৎ ফেরাবার উপায় কি! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন একটা উপায় হাতড়ে পেলেন। উদাত্ত মধুর কণ্ঠে বলে উঠলেন—দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ বৎসগণ, তোমরা মোহগ্রস্ত। দিব্যদৃষ্টি পেলে তোমরা নিজের নিজের স্বরূপ দেখতে পাবে। স্বরূপ দেখলেই মোহাচ্ছন্নতা কাটলেই আবার সম্বিৎ ফিরে পাবে।

চকিতের মধ্যে গুরু ব্রহ্মবলে মুখপাত্র তিনটিকে দিব্যদৃষ্টি দান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—অমৃতস্য পুত্রগণ, নিজের নিজের স্বরূপ দর্শন করো।

দিব্যদৃষ্টি পাওয়ামাত্রই মুখপাত্রদের চোখের সামনে নিজের নিজের স্বরূপ ফুটে উঠল। পরস্পরের দিকে চেয়ে পরম বিস্মিত হলেন ওঁরা। অপরিচিত কাদের মূর্তি এ!

হঠাৎ বিস্মৃতপ্রায় অতীতের কোল থেকে অন্য এক গুরুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—আরুণি!—আরুণি! তুমি কোথায় বৎস?

গুরুর আহ্বানে প্রথম মূর্তি বিনীতকণ্ঠে সাড়া দিলেন। বললেন—ভগবন্, আমি এখানে। খেতের আলের মধ্যে শুয়ে দেহ দিয়ে জলস্রোত রোধ করছি।

আবার গুরুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—উপমন্যু! উপমন্যু! —বৎস, কোথায় তুমি?

দ্বিতীয় মূর্তির বিনীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—ভগবন্, আমি এখানে অন্ধ অবস্থায় কূপের মধ্যে পড়ে রয়েছি।

আবার আর এক গুরুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—যদি তুমি আমার শিষ্য হও, তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।

প্রফুল্লমুখে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করে তৃতীয়

ৃর্তি বললেন—আচার্যদেব, এইদিন আপনার গুরু-দক্ষিণা।

মুখ্যপাত্ররা সম্মোহিতের মত গুরু-শিষ্যের কণ্ঠস্বর শুনছিলেন। শিষ্যদের কণ্ঠে যেন নিজেদেরই পূর্বজন্মের পরিচিত কণ্ঠস্বর।

বৃদ্ধ বিপ্রর্ষি উদাত্তকণ্ঠে বললেন—তোমরা যা ছিলে।

চকিতের মধ্যে রূপান্তর ঘটল আবার ওঁদের দেহের। পরস্পরের দিকে চেয়ে তিনমুখপাত্রই সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন। তিনজনেরই খাঁটি চতুষ্পদের আকার। হাতে পায়ে আঙুলের বদলে চেরা চেরা খুর। লম্বাটে মুখ, লম্বাটে কান। দুজনের মাথায় দুটি করে শিং। একজন শুধু শৃঙ্গ সম্পদহীন। তাছাড়া, প্রত্যেকেই লাঙ্গুল গৌরবে গৌরবান্বিত।

গুরু জলদগম্ভীরকণ্ঠে বললেন—তোমরা যা হইয়াছ। মুখপাত্ররা নিজেদের শরীরের বিবর্তিত দশা দেখে রীতিমত উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। ক্ষেপে সেই অবস্থাতেই সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে স্লোগান দিতে শুরু করলেন। কিন্তু হায়! চি হিঁ হি হি, হাম্বা হাম্বা, আর ব্যা-ব্যা ছাড়া আর কোন অন্য বুলি শ্রীমুখ দিয়ে নিঃসৃত হল না।

চকিতের মধ্যে আবার রূপান্তর হল মুখপাত্রদের। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাল গোল পাকিয়ে গিয়ে কিম্ভূতকিমাকারগোছের তিনটি মূর্তি ফুটে উঠল। না মানুষ, না জানোয়ার, না পতঙ্গ, না বিহঙ্গ। কিম্ভূতকিমাকার জীব তিনটি ক্রমশঃ নিরাকার হ'তে হ'তে—শেষটায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

গুরু সঙ্গে সঙ্গে জলদগম্ভীরকণ্ঠে বললেন—তোমরা যা হইবে। নিরাকার অবস্থাতেই তিন মুখপাত্র মরীয়া হয়ে আবার স্লোগান দিতে শুরু করলেন। বীতশ্রদ্ধ গুরু সঙ্গে সঙ্গে ওদের দিব্যদৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। মুখপাত্রদের বুলির অনুকরণের। সমবেত শিষ্যমণ্ডলী তখন আকাশ বাতাস ফাটিয়ে চীৎকার করছে।

চলবে না—চলবে না।
গুরুদের জুলুম—চলবে না।
গুরুর উৎপীড়ন—চলবে না।
আমাদের অভিযোগ—শুনতে হবে।
আমাদের দাবী—মানতে হবে।

এই স্বরূপদর্শন করানোর জন্যে গুরুবৃদ্ধকে কিন্তু গুরুতর এবং গুরুতম আক্কেল সেলামি দিতে হয়েছিল। বৃদ্ধগুরু এরপর একটানা আটায় দিন ধরে ঘেরাও হয়ে ছিলেন। শিষ্য মহাশিষ্যের দল তাঁকে ঠায় বসিয়ে রেখে রেখে তাঁর আজন্মসঞ্চিত সব ব্রহ্মতেজ নিঙড়ে বার করে নিয়ে ছিলেন। শুকিয়ে শুকিয়ে দড়ি হয়ে গিয়ে শেষটায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় গুরু কোন রকমে দেহত্যাগ করে তবে রেহাই পান।

প্রত্যাদেশ

(গল্প)

বিমলজ্যোতি দাস

কিসের যেন মেলা বসেছে। তার মধ্যে বিরাট প্রদর্শনী, অসংখ্য দোকান পসার, প্রচুর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। অগণিত লোকের ভিড় জমেছে। সোমনাথ তাদের মধ্যে অন্যতম। তার মনে হচ্ছে এ সমস্তর পিছনে যেন একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কি সে উদ্দেশ্য ?

সোমনাথ চলেছে ত চলেইছে—কতক্ষণ তা বলতে পারে না। নিজের চিন্তায় কতকটা তন্ময় হয়ে চলতে চলতে হঠাৎ সুমিষ্ট কণ্ঠের ডাক শুনে চমকে উঠল—এই যে, সোমনাথ বাবু!

মুখ তুলে চেয়ে সোমনাথ বিস্মিত হল। পরিচ্ছন্ন মূল্যবান সজ্জায় সজ্জিত একটি সুন্দরী তরুণী সামনে দাঁড়িয়ে। তার কালো আয়ত চক্ষে ভুবনবিজয়ী দৃষ্টি। সোমনাথের বিস্ময় লক্ষ্য করে সে বলল—আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না সোমনাথ বাবু? আমি লীলা, আপনার "নন্দিতা" উপন্যাসের নায়িকা। সমালোচকদের মতে আপনার সার্থকতম সৃষ্টি। কিন্তু আপনার বর্ণনামত আমি আজও অনূঢ়া। অবশ্য এর একটা কারণও আছে।—তরুণীর চক্ষে কটাক্ষ এবং মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল।

সোমনাথ নির্বাক। তার উপন্যাসের নায়িকা লীলা এত সুন্দর! এ যেন জ্যোৎস্নায় গড়া অপ্সরার মূর্তি। সোমনাথকে নিরুত্তর দেখে মেয়েটি বলল—বুঝতে পারলেন না। আমি—আমি আপনাকে ভালবাসি। বলুন, কবে আমি আপনাকে পাব ?

সোমনাথ বিস্মিত, নির্বাক। রমণীর প্রবালরক্ত ওষ্ঠাধর থেকে নদীর কলধ্বনির মত সুমিষ্ট হাসি ভেসে এল। সে বলল—কৈ, বলতে পারলেন না ত ? থাক, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। এখন তবে আসি সোমনাথ বাবু!—বলে এক ঝলক দক্ষিণা বাতাসের মত মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটু দাঁড়িয়ে সোমনাথ আবার চলতে আরম্ভ করল। আগের থেকে আরও চিন্তান্বিত। কিছু দূর যেতেই "অনাথাশ্রম" নাম লেখা একটা মস্ত বাড়ীর ভিতর থেকে পাংশুবর্ণ একটি যুবতী বেরিয়ে এল—কোলে সদ্যপ্রসূত শিশু। সোমনাথকে দেখেই মেয়েটি তীব্র স্বরে চীৎকার করে উঠল—এই যে সোমনাথ বাবু! অনেক খোঁজাখুঁজির পর আজ আপনার দেখা পেয়েছি! আপনার কাছে আমার একটা কৈফিয়ৎ চাইবার আছে! আমি আপনার কি করেছিলাম যে আপনি আমাকে জলে ডুবিয়ে আত্মহত্যা করালেন, এবং আমার ছেলেকে অনাথ আশ্রমে রাখিয়ে দিলেন? এক নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পাঠকদের কাছে বাহবা নিতে চেয়েছিলেন, না? কিন্তু আমার দুর্দশার কথা একবার ভেবে দেখে-ছিলেন কি? অবশ্য বিয়ের পূর্বেই একজনের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে আমি ভুল করেছিলাম সত্য, কিন্তু পারতেন না কি আপনি সেই প্রণয়ীর সঙ্গে আমার বিবাহ ঘটিয়ে দিয়ে আমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে? তাহলে ত আর অবৈধ সন্তান ধারণের গ্লানিতে আমাকে আত্মহত্যা করতে হত না। বলুন, চুপ করে আছেন কেন? জবাব দিন!—যুবতীর অশ্রুলাঞ্ছিত ডাগর চোখ দুটি থেকে যেন আগুন বেরিয়ে এল।

বিস্ময়-বিমূঢ় সোমনাথ কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল এমন সময়ে কোলের ছেলেটি কেঁদে ওঠাতে রমণী সচকিত হয়ে উঠল এবং উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুতপদে একদিকে চলে গেল।

মেয়েটিকে সোমনাথ চিনেছে। এই তাহলে তার জনপ্রিয় উপন্যাস "পরিত্যক্তার" নায়িকা নির্মলা। উপন্যাসখানাকে বিয়োগান্ত করার মূলে মেয়েটি যা বলল সেইরকম উদ্দেশ্যই সোমনাথের ছিল। কিন্তু আশ্চর্য! ও তা জানল কি করে? সোমনাথ ত এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলে নি। কোন অজ্ঞাত উপায়ে নির্মলা তার গোপন মনোভাব জানতে পেরেছে সেই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে সোমনাথ আবার তার মন্থর উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ সুরু করল। একটু দূরে যেতেই দেখে, একখানি পর্ণকুটিরের ভিতর থেকে গেরুয়া আলখাল্লা-পরা সৌম্য-মূর্তি এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। আবক্ষলম্বিত শাদা দাড়ি। হাতে জপের মালা। দৃষ্টি যেন বহু, বহুদূরে প্রসারিত। সোমনাথকে দেখে বৃদ্ধের শান্ত নেত্রদুটি ঈষৎ বিস্ফারিত হল। গম্ভীরস্বরে বললেন—কে, সোমনাথ না?

সশ্রদ্ধকণ্ঠে সোমনাথ উত্তর দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, তুমিই ত "জ্যোতিষীর সাধনা" উপন্যাসের লেখক, না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ বললেন, বেশ। আমাকে বোধ হয় তুমি চিনতে পেরেছ? আমি তোমারই বর্ণিত জ্যোতিষী প্রতাপ। গ্রন্থে তুমি আমার মনোভাবের যে সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছ, তা সত্যই অপূর্ব। তোমারই নির্দেশে আমি জ্যোতিষের চেয়েও উচ্চতর সাধনায় বহির্গত হয়েছিলাম। জগদীশ্বরের কৃপায় তাতে আমি সিদ্ধিলাভও করেছি। জ্যোতিষের সাহায্যে মানুষ শুধু নিয়তির লিখন পাঠ করতে পারে, নিয়তিকে আয়ত্ত করতে পারে না। কিন্তু এ বিদ্যার সাহায্যে কর্মফলকে আয়ত্ত করা যায়।

সে বিদ্যাটি কি? সোমনাথ জিজ্ঞাসা করল।

তা আমি তোমাকে বলব না বৎস! তুমিও আমারই মত অনুসন্ধান করে জানো। এই অনুসন্ধানে আছে বিপুল আনন্দ ও গৌরব। এই বলে আশীর্বাদ করে মালা জপতে জপতে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

সোমনাথ আবার অগ্রসর হল। জ্যোতিষীর এই আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সে খুসি হল, যদিও এটা সে তার উপন্যাসে দেখায়নি। তারপর চলতে চলতে সে একটা প্রেক্ষাগৃহের সামনে এসে দাঁড়াল। সেখানে বহু লোক জড় হয়েছে থিয়েটার দেখতে। সোমনাথকে দাঁড়াতে দেখে একজন এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করল—আসুন সোমনাথবাবু! আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

তারসঙ্গে সোমনাথ ভিতরে এসে বসল। অল্পক্ষণ পরেই প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভল এবং ষ্টেজের আলো জ্বলল। যবনিকা ওঠার পর একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি এসে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন: সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ! আজ আমরা আপনাদের এমন অভিনয় দেখাব যা আপনারা কখনও দেখেননি। কেননা, যে-নাটক আমরা অভিনয় করব তার মঞ্চ হল ভবিষ্যৎ জগৎ, এবং পাত্র-পাত্রীরা ভাবীকালের নরনারী। আপনাদের মধ্যে যাঁরা এই নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে পারবেন তাঁরা ভাগ্যবান। এই বলে বক্তা নেপথ্যে সরে গেলেন। তারপর থিয়েটার আরম্ভ হল। এ কি অদ্ভুত অভিনয়! নট-নটী সকলেরই মুখের কিছু অংশ কালো মুখোশে ঢাকা। যে নাটক অভিনীত হল তার ঘটনাপরম্পরা অপ্রত্যাশিত এবং অদ্ভুত। অভিনয়ের শেষে সেই লোকটি আবার ষ্টেজের উপর এসে বললেন: সোমনাথবাবু, অভিনয় কেমন লাগল? আপনি বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, আপনার উপন্যাস "ভাবীকালের কথার" এটা নাট্যরূপ? অবশ্য ভবিষ্যতের যে-ছবি আপনি এঁকেছেন, নাটকে তার অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। আশা করি এতে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না। কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে কিছু পার্থক্য ত থাকবেই। তবুও ভবিষ্যতের চিত্র-অঙ্কনে আপনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য! আচ্ছা, নমস্কার! বক্তা পর্দার অন্তরালে অদৃশ্য হলেন।

দর্শকবৃন্দের প্রচণ্ড হাততালি শেষ হলে প্রেক্ষাগৃহের আলোগুলো আবার জ্বলে উঠল। সেগুলো এত উজ্জ্বল যে সোমনাথ চক্ষু মুদ্রিত করে হাত ঢাকা দিল। একটু পরে আবার যখন সে চোখ খুলল তখন দেখল, জানলা দিয়ে প্রভাতের রৌদ্র এসে তার মুখের উপর পড়েছে।

বিস্মিতভাবে চারিদিকে চেয়ে সোমনাথ চক্ষু রগড়াতে লাগল। একি, সেত তার শয্যায় শুয়ে রয়েছে। তবে এতক্ষণ সে কি-যেন সব দেখছিল? স্বপ্ন? হাঁ, নিশ্চয় তাই। কিন্তু কি আশ্চর্য স্বপ্ন! হুবহু ঠিক সত্য ঘটনার মত। তারই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে গেল। শুধু দেখা নয়। কিছু প্রেম, কিছু তিরস্কার, কিঞ্চিৎ উপদেশও সে লাভ করেছে। তার মনে হল, স্বপ্নে সে যেমন যেমন দেখেছে, উপন্যাসগুলির ঘটনাবিন্যাস সেইরকম হলেই যেন ভাল হত। কিন্তু কি করা যায়? এখন আর উপায় নেই।

সত্যই কি কোন উপায় নেই? ভাবতে ভাবতে সোমনাথের মনে হল একটা উপায় করা যেতে পারে। উপন্যাসগুলো আগামী সংস্করণে পরিবর্তন করে দেবে। লীলাকে ভাল জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেবে, নির্মলার কাপুরুষ প্রণয়ীকে বাধ্য করাবে নির্মলাকে বিবাহ করে তার সন্তানকে স্বীকার করতে, প্রতাপ যে সত্যের সাধনায় কৃতকার্য হয়েছে তা দেখাবে, এবং "ভাবী কালের কথা" পরিবর্তন করে স্বপ্নে-দেখা নাটকের মত করে লিখবে।

এই স্থির করে সোমনাথ যেই বিছানা ছেড়ে উঠেছে, অমনি চা ও খাবার নিয়ে স্ত্রী উর্মিলা প্রবেশ করল। খাদ্যদ্রব্য টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, বাবাঃ! আজ যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দিচ্ছিলে! অন্যদিন কত সকালে ওঠো, আর আজ—

বাধা দিয়ে সোমনাথ বলল—শোনো উর্মি, আজ আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। বলে স্বপ্নবৃত্তান্ত আগাগোড়া বর্ণনা করল এবং উপন্যাসগুলিকে পরিবর্তন করবার সঙ্কল্পও ব্যক্ত করল।

শুনে উর্মিলা বলল—তা কি করে হবে? উপন্যাসগুলো কতদিন আগে লেখা হয়েছে, হাজার হাজার কপি জনসাধারণের কাছে রয়ে গেছে। ওরকম করা ঠিক হবে না।

সোমনাথ—তবে কি হবে? এমন স্বপ্নটা মাঠে মারা যাবে? আমার ত মনে হয় স্বপ্নের ভিতর দিয়ে আমি একটা প্রত্যাদেশ পেয়েছি।

উর্ম্মিলা—তুমি বরঞ্চ এক কাজ কর। মূল উপন্যাসগুলো পরিবর্তন না করে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করে একখানা নূতন উপন্যাস লেখ। নাম দাও "প্রত্যাদেশ।" সে একটা নূতন জিনিষ হবে। আমার মনে হয় অন্য কোনও ঔপন্যাসিক আজ পর্যন্ত এ রকম করেননি।

সোমনাথের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল সত্যি উর্মি, তুমি চমৎকার প্রস্তাব করেছ। এই না হলে আর সাহিত্যিকের স্ত্রী!

সকটাক্ষে উর্মিলা বলল—আচ্ছা, হয়েছে। এখন হাত মুখ ধুয়ে খেতে বস দেখি।

হাঁ, এই যে। বলে সোমনাথ উঠে পড়ল।

গ্রাম বাংলার পাঁচালী

মৃণালকান্তি দত্ত

বাংলাদেশের যে দিকটা পাথুরে লালমাটির গড়া সেই দিকের একটা আধা গ্রাম আধা শহরে ইস্কুলে পড়তাম আর হোস্টেলে থাকতাম। ইস্কুলের পাশ দিয়ে ছোট পাহাড়টার দিকে একফালি রাস্তা চলে গেছে। ও পাশে কয়েকটি বাড়ী। একটি বাড়ীতে সার্কেল অফিসার থাকতেন। মাসুদ সাহেব খুব রাশভারি লোক। তার পুত্র আমিনুল আমার বন্ধু আর কন্যা আনোয়ারা তদ্‌ভ্রাতা আমিনুল এবং আমার গুণ মুগ্ধা কারণ আমিনুল টেবিল পিটিয়ে তবলা বাজাত আর আমি খালি গলায় তা মন্দ গাইতাম না। আনোয়ারা গান খুব ভালবাসত কিন্তু কি জানি কেন মাসুদ সাহেব কন্যার সঙ্গীত প্রীতি বেশী বাড়তে দেন নি। একটা ভাল মাস্টার রাখলে আনু ভাল গায়িকা হয়ে উঠত। মিডল ইংলিশ ইস্কুলের শেষ পরীক্ষার পর আনোয়ারা আর স্কুলে যেত না; আমাদের স্কুলের রসিদ-স্যার বাড়ীতে ইংরেজী আর উর্দু পড়াতেন।

আমিনুলের বাড়ী আমি প্রায়ই যেতাম। গানের ঝোঁকেই যেতাম। ওদের রেকর্ডের স্টক প্রায় অফুরন্ত ছিল। আরো একটা মজা ছিল আমিনুলের মা বেশ ভাল ইংরেজী বলতেন। আমি ৪১।৪২ সালের কথা বলছি, স্থান একটি উন্নত পল্লীগ্রাম তখনও পাহাড় ভেদে টাউন-শিপ গড়ে ওঠেনি ওখানে, বিজলী বাতি, বায়োস্কোপ ইত্যাদি হয় নি। মাসীমাকে আমরা ইংরেজীতে কথা বলতে বলতাম আমাদের সঙ্গে এবং তিনি কথা রাখতেন। বাইরে বেরুলে তিনি পর্দায় চলতেন এমন কি দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার বস্ত্র ভদ্র বিচারণ বদ্ধ ছিল। তবু আমি কি ভাবে যেন অন্দরে জায়গা করে নিয়েছিলাম। সেই-ক্যাসিংটা আমার প্রথম থেকেই রপ্ত।

যারা আজকে চল্লিশ কিংবা উত্তর-চল্লিশ তাদের মনে থাকবে সে সময়ে বাংলা কাব্য সঙ্গীত জগতে কি ভীষণ ঢেউ। অজয় গঙ্গা থেকে কর্ণফুলী পর্যন্ত সে যেন এক প্লাবন সুরের আর গীতি রচনার যাদুকরদের। এ কথা আমি রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বলছি।

মাসুদ সাহেব ট্র্যান্সফার হয়ে গেলেন। তখন আমরা ইস্কুলের উঁচু ক্লাশে। তার বাসা রয়ে গেল; ঠিক হল আমিনুলের পরীক্ষা হয়ে গেলে তার পর তারা মাসুদ-সাহেবের কর্মস্থলে যাবে। আমি প্রায় রোজই ওখানে যাই। দুজনে পড়ি গান শুনি, আনুর সঙ্গে খুনসুটি হয়। এখন মনে হয় আনুর টানেই বোধ হয় যেতাম। রেকর্ডে বাজে—"যদি দখিণা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে।" মাসীমা নূতন এনেছেন রেকর্ডটা। বড় ভাল ছিল সময়টা। মাসীমা ভাল, গান ভাল, আমিনুল ভাল, আধ ফোটা ফুলের মত—আনু আরো ভাল।

সেদিন সুরটা মোটামুটি তুলে নিলাম গলায়। যদি দখিণা পবন, আসিয়া ফিরে গো দ্বারে। আমিনুল টেবিল বাজিয়ে সঙ্গত করছে। আসবার সময় চটি জোড়া পাই না। আনু বলল গানটা আরো একবার নকল করলে দেখা যাবে চটিজোড়া খুঁজে পাওয়া যায় কি না।

আনু আমায় অনেক কষ্ট দিয়েছে। খাবার খেয়ে জল পাইনি, কথা দিতে হয়েছে জল খেয়েই পাহাড়ে বেড়াতে কিম্বা খেলার মাঠে চম্পট না দিই। আমার জামা নোংরা থাকলে আমাকে নোংরা বলেছে। সংস্কৃতে আমার ভীষণ ভয়, আর পরীক্ষার ঘরটা পড়েছিল ঠিক ওদের বাড়ীর মুখোমুখি। চোখে চোখ পড়তেই গ্রামোফোনে ঐ ডিস্কটা তুলে দিল "যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে।" এক জোছনা রাত্রে

আমরা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। মাসীমা একটা বিরাট পাথরের উপর বসে পড়লেন। আমিনুল মায়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। ওপাশে আমি আর আনু বসেছিলাম। দূরে পাথর ভাঙা কলের ট্রলি লাইন চলে গেছে পশ্চিমে বড় বড় পাহাড় গুলোর দিকে।

আমি বলছিলাম একবার ঐ দূরের পাহাড় পর্যন্ত মাসীমাদের নিয়ে গেলে কেমন হয়। মাসীমা আমাদের উল্টা দিকে মুখ করে বসে হুঁ হুঁ করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ফেউ ডাকল। আনোয়ারা ভয় পেয়ে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল। সেদিন আমি স্পর্শের জগতের খোঁজ পাই। আনু জানে না একটা নূতন দুনিয়ার দোর সে খুলে দিয়েছিল। মায়ের কোলে মুখ রেখে আমিনুল বলেছিল। "ঐ 'দখিণা পবনটা'—ধর দেখি।" সেদিন আমরা সবাই গান গেয়েছিলাম। এমন কি মাসীমাও গেয়েছিলেন "কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী।" সেই প্রথম মাসীমার গান শুনি। মাসীমার গলার সুর ছিল আর কেমন ব্যথা, কিসের কেমন করে জানব।

পরীক্ষা শেষে খুলনা চলে গেল। আমি হোস্টেল ছেড়ে চলে এলাম। খুলনা থেকে ঢাকা। পত্র বিনিময়ের ত্রুটি হল না। আনোয়ারার বিয়ের খবর পেয়েছিলাম। যেতে পারিনি এমন কি ছোটখাট কিছু উপহারও পাঠাতে পারিনি। আমার জীবন তখন অনেক জটিলতায় ভরা। তারপর দেশ ভাগ, আমার অনেক বন্ধুর মত আমিনুলও হারিয়ে গেল।

বহু বছর কেটে গেল। দখিনা পবন নিয়ে মাথা ঘামাই না। উত্তর ভারতের দু-সেবন করি, অর্থান্বেষণে ঘুরে বেড়াই। শীত শেষের এক মাঝরাতে উত্তর প্রদেশের এক শহর থেকে লক্ষ্ণৌ দিল্লী এক্সপ্রেস ধরেছি, গন্তব্যস্থল দেহলি উঁচু ক্লাশের টিকিট কিন্তু কোন ফার্স্টক্লাশ কামরাই খুলবে না। কণ্ডাকটারের শরণাপন্ন হলাম কিছু হল না। করিডরে দাঁড়িয়ে আছি। একটা কামরা থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, বাথরুমে গেলেন ফিরলেন। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কৃপাপরবশ বললেন যে যদিও তার রিজার্ভেশন আছে, তবুও তিনি বসবার একটু জায়গা করে দিতে পারেন। তার ঢাউস একটা ট্রাঙ্কের উপর বসলাম। ধন্যবাদ দিলাম। বেডল্যাম্পের নীলাভ আলোয় দেখলাম দুদিকের বাঙ্কে এবং বেঞ্চে অনেকে নিদ্রিত। সৌজন্য-বোধে ভদ্রলোককে সিগ্রেট দিলাম, নিলেন। শিষ্টতা রাখবার মত কিছু কথোপকথন চলল। ক্রমে প্রকাশ পেল ভদ্রলোক কোন এক বিখ্যাত মুস্লিম বিদ্যায়তনের অধ্যাপক।

ভোর হল, আলো ফুটল। অধ্যাপকের পুত্র, কন্যারা জাগল। স্ত্রী পর্দানশীন, তবুও ভদ্রলোক আমাকে তার কুপেতে জায়গা দিয়েছিলেন। কন্যাটির দিকে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারি না। আমাদের সেই আনোয়ারা যেন অনেকগুলো বছর পিছিয়ে—তেমনি করে ফিরে এসেছে। আমার কেমন জানি শচীন বর্মনের গাওয়া সেই গান খানি মনে হল 'যদি দখিণা পবন" কখন জানি না গুণ গুণ করে গাইছি। ভদ্রলোক এবার পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি তাহলে বাঙালী।" মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলাম। তার পিছনে একটি নারী তার স্ত্রী, দামী বোরখায় সর্বাঙ্গ আবৃত শুধু মুখের সামনের পর্দাটা উঠে গেছে; আর অবাক বিস্ময়ে দুটি চোখ আমার দিকে তাকিয়ে—আছে। সে চোখ চিনতে ভুল হয় নি। সে মুখ চিনতে ভুল হয় নি। ওদের ষ্টেশনে আসতে ওরা সবাই নেমে গেল। অধ্যাপক আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। পেছনের অবগুণ্ঠনবতীরও আমন্ত্রণ পেলাম। আমার ট্রেন ছাড়ল। আনোয়ারা তখন মুখের উপরের পর্দাটুকু তুলে আমার দিকে চেয়ে ছিল। দিল্লী ষ্টেশনে ট্রেন ঢুকবার আগেই লাল কেল্লা চোখে পড়ল। ঠিক ঐ রংএর মাটির দেশে আনোয়ারার সঙ্গে আমার পরিচয়। ঐ লাল ধুলোর রং দেহ থেকে মুছলেও মন থেকে যায় নি, যাবে না।

(২৯৩ পাতার পর)

প্রচারের কর্ম্মে নিযুক্ত। কোন কোন নেতা বিদেশীদিগের সহিত সংযোগে কাজ করিতে চাহেন না। তাঁহারা স্বাধীন ও স্বদেশভক্ত বিপ্লববাদী। বিপ্লবাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদিগের পারস্পরিক কলহজাত অরাজকতাও বর্ত্তমানে ব্যাপক ভাবে ঘটিয়া থাকে।

অরাজকতা নিবারণের উপায় কি? বিভিন্ন কারণ-জাত সমাজ বিরুদ্ধতা নিবারণের উপায়ও স্বাভাবতই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে অথবা পরীক্ষা কেন্দ্রে যে ব্যবস্থা চলিবে, ডাকঘর বা ব্যাঙ্ক লুঠ বন্ধ করিতে ঠিক সেই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে না। বিদেশীয় গুপ্তচর ও জাতীয়তায় বিশ্বাসী বিপ্লববাদী একভাবে ও এক উপায়ে নিজেদের অন্যায় আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া ন্যায়ের পথে চলিতে প্রস্তুত হইবেন না। রাষ্ট্রীয় দলের নেতাদিগের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদিগকে দমন করিতে হইলে যে উপায়ে কাজ হইবে, আমেরিকা চীন বা রুশিয়ার অর্থপুষ্ট দুস্কর্ম্মের দালালদিগকে ঠিক সেই উপায়ে দমন করা সম্ভব হইবে না। অরাজকতার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা ভিন্ন ভিন্ন মূল হইতে উদ্ভূত। তাহার প্রতিষেধকও সেই জন্য নানা প্রকারের হইবে। অতি সহজে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা এই সমস্যার স্বরূপ বোধে সক্ষম হন নাই। জটিল ব্যাধির চিকিৎসা কখনও সরল সুনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে পারে না। চিকিৎসার বহুমুখীরূপ সর্ব্বদাই ব্যাধির বৈচিত্র অনুসরণে গড়িয়া উঠে।

দেহকে নিরাময় করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম, প্রধান ও অবশ্য অনুসরনীয় পন্থা হইল স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন। শরীরের স্বাস্থ্য যথাযথ ভাবে পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে ব্যাধি আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইল অল্প বয়স হইতেই যাহাতে দেশবাসীগণ উপযুক্ত শিক্ষা, জীবনাদর্শ বোধ, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ ও কর্ম্মের আগ্রহ জাগ্রত জীবন্ত ভাবে নিজের করিয়া লইতে সক্ষম হন, সেইরূপ ব্যবস্থা করা। জাতির মানসিক অবস্থা যে ক্ষেত্রে বহু দিক হইতে আক্রান্ত সে ক্ষেত্রে আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা পূর্ণ ও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা মূলতঃ দুর্ব্বলতা নিবারণ করিয়া শক্তি বৃদ্ধির আয়োজন করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। অল্প বয়স হইতেই বালক বালিকাদিগের শারিরীক শক্তি ও স্বাস্থ্য গঠন শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদিগের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, বস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের গৌরব' ভারত সভ্যতার মাহাত্ম্য, ভারতীয় মহামানব দিগের কীর্ত্তি বুঝিতে ও তাহার সহিত অন্তরের পরিচয় সাধন করিতে হইলে সকল বালক বালিকার ভারত ভ্রমণের প্রয়োজন হয়। বাংলা দেশের অধিকাংশ বালক বালিকাই ভারতের সহিত পরিচিত নহে। বিশেষ রেলগাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া বহু সংখ্যক লোককে ভারত দেখাইয়া আনিতে ব্যয় অধিক হয় না। সুবিধা মত ব্যবস্থা করিলে সকল ব্যক্তিকেই অল্পব্যয়ে দেশ দর্শন করাইয়া আনা যায় ও সঙ্গে উপযুক্ত লোক থাকিলে সেই ভ্রমণের ভিতর দিয়াই দেশের ঐতিহ্য, মাহাত্ম্য ও গৌরব শিক্ষা দেওয়া যাইতে পরে। বাৎসরিক এক কোটি টাকা ব্যয় করিলে প্রায় একলক্ষ বালক বালিকাকে দেশ ভ্রমণ করান যায়। কিছু কিছু অর্থ তাহাদিগের অভিভাবকগণও দিতে পারিবেন। শিক্ষার ভিতর দিয়া স্বদেশভক্তি জাগাইয়া তোলা প্রয়োজন ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবদিগের জীবনচরিত, ভারত সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ প্রতীক বাণী —এই সকল বিষয় শিক্ষার ভিতরে গুরুত্বপূর্ণভাবে স্থান রাখা প্রয়োজন।

বিদেশী সভ্যতার ভিতরে যাহা ঘনিষ্ঠভাবে জানিলে মানুষের অতীত সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগ্রত হয় ও সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়া সেই স্থলে তথাকথিত আধুনিকতাকে বসাইবার আগ্রহ অতিরিক্ত ভাবে জাগ্রত না হয়, সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা অধিক করিয়া করা প্রয়োজন। ভাব উপলব্ধির দিক দিয়া প্রাচীন সভ্যতার সহিত আধুনিকতা তুলনীয় নহে।

বিজ্ঞান ও যন্ত্রের অভিনবত্ব বাদ দিলে এবং চিন্তা বা মতবাদের মাহাত্ম্য দিয়া আধুনিক সভ্যতার মূল্য বিচার করিলে, মানব প্রগতি কোন পথে চলিয়া এতদূর আসিয়াছে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। এবং দেখা যাইবে যে আধুনিক চিন্তার ধারাও বহুলাংশে প্রাচীন উৎস হইতেই প্রবাহিত। যাহা উৎকৃষ্ট ও মানব প্রাণের সহিত নিকটভাবে জড়িত তাহার আরম্ভ প্রায় সর্ব্বদাই পুরাতনের ভিতর পাওয়া যায়। পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় জগৎ ও সভ্যতার ভিতরেই অতীতকে গভীর ও প্রবলভাবে উপলব্ধি করা যায়; এবং আধুনিকতার দাবি অনেক বিষয়েই কাল্পনিক ও গায়ের জোরে মিথ্যাকে অপপ্রচার চালাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা মাত্র। সুতরাং নূতনত্বের ও আধুনিকতার দাবি বহুস্থলেই সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। সামাজিক বিধিব্যবস্থার সকল কথাই বিচার সাপেক্ষ এবং মানুষ মাত্রেরই নূতনভাবে সমাজ পরিচালনার চেষ্টা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু সেই অধিকার মানুষকে অপরের মস্তকে লগুড় চালাইয়া নিজমতের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে দিতে পারেনা। ঐরূপ চেষ্টা কখনও কাহারও সহ্য করা উচিত নহে।

বিপ্লবের পরে কি ?

স্বাতী চক্রবর্ত্তী

অন্দরে বাইরে সর্ব্বত্রই এখন খালি বিপ্লবের আলোচনা। ছোট বড় সবাই এখন বিপ্লববিশেষজ্ঞ হয়ে উঠছেন। কেউ চাইছেন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, কেউ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, কেউ বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব আবার কেউ কেউ কি বিপ্লব চাইছেন তাই জানেন না। আমার কথা হল—যে বিপ্লবই আমরা চাই না কেন এবং সে বিপ্লব সম্বন্ধে যত অজ্ঞতাই আমাদের থাকুক না কেন, একটা পরিবর্ত্তনের যে দরকার তা অনস্বীকার্য কিন্তু পরিবর্ত্তনটা কোন পথে আসবে এবং তাতে আমাদের কতটা দেওয়ার থাকবে সেটাই কথা।

নকশালপন্থীরা বলছেন, তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লব চান এবং এই বিপ্লবে সক্রিয় অংশ নেবে ছাত্র এবং কৃষকশ্রেণী। তাঁদের মতে তাই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার কাজে শতকরা ৮০ জন কৃষক অংশ নিচ্ছে। এই বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক, যদিও এটা কারোরই অজানা নয় যে শহরে—বিশেষ করে গ্রামে নকশালপন্থীদের সংগঠনের কাজ কত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নকশালপন্থীরাই একমাত্র জোর গলায় বলছেন যে বিপ্লব তাঁরা চান এবং এই বিপ্লবের কাজে তাঁদের পথে যে বাধা আসবে তাকেই তাঁরা নির্ম্মম হাতে হটিয়ে দেবেন। এর বিরুদ্ধে আমাদের বলার কিছুই নেই কারণ এটা বোধ করি বিপ্লবেরই ধর্ম, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত বিপ্লব হয়েছে তা রাজনৈতিক হোক, বা ধর্ম্মীয়, সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন; রক্তপাত একেবারে হয়নি এটা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিপ্লবের যজ্ঞে কম বেশী তাজা রক্তের আহুতি দিতেই হয়। কিন্তু আসল মুশকিল হল, যে সশস্ত্র প্রচেষ্টা চলেছে তাকে ঠিক বিপ্লব আখ্যা দিতে পারা যাচ্ছেনা, গুরুত্ব হারিয়ে সবটাই

একটা অসন্তোষের প্রকাশমাত্র হয়ে যাচ্ছে যাকে, সহিংস বিক্ষোভ বলা যেতে পারে। সমস্ত অবস্থাটা আরো বেশী অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ প্রথমত বিপ্লবের বা বিক্ষোভের মূল আদর্শটা আমাদের চীনের কাছ থেকে ধার করা এবং দ্বিতীয়তঃ লড়াইটা আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, এই প্রবাদ বাক্যের তেমন ভাল উদাহরণ যতদিন স্কুলে বাক্যরচনা করেছি তখন মাথায় আসেনি, এতদিনে এল নকশালপন্থীদের মূল কেটে জলসেচন দেখে। চীনের আদর্শ চীনেই চলবে, নিজেদের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে চীনের আদর্শ ভারতের মাটিতে চলাতে চাইলে তা মহীরুহ হবে না, অঙ্কুরেই তার বিনাশ ঘটবে। কিন্তু এখন যে প্রচেষ্টা চলেছে তা তো এই পথেই, এতে করে আমরা এগিয়ে না গিয়ে আরো পিছনে হটে আসছি। বিপ্লব মানুষকে পেছনে নিয়ে যায় না, তার একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে যা তাকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায় কিন্তু প্রচেষ্টাটা যখন বিকৃত একটা বিক্ষোভ হয়ে দাঁড়ায় তখন সামনে এগোবার শক্তিটাও তার লুপ্ত হয়ে যায়। বিপ্লব নিছক একটা ওলোট-পালোট নয়, বিপ্লব একটা চলমান শক্তি যার উদ্দেশ্য প্রগতি। বিপ্লব কখোন চিরস্থায়ী নয়, তার গতির তরঙ্গে তরঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে একটা প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদিত হয় যার উৎপত্তি হল সংঘর্ষ থেকে। বিপ্লবের প্রস্তুতি সময়সাপেক্ষ কিন্তু চরম বৈপ্লবিক উপলব্ধি এক মুহূর্তের। অট্টালিকা ভাঙতে হলে এক ঘায়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়। একটি একটি ইঁট পড়েই তা সম্ভব হয়, শেষ ইঁটটি যখন পড়ে তখনই চরম বিপ্লব সাধিত হয় এবং এই পড়াটুকু একমুহূর্তের মাত্র।

আমরা যা করছি এখন তা হল বাড়ীর দেয়ালে দেয়ালে জোর ঘা মেরে তাকে চুরমার করার চেষ্টা। আমরা ভুলে যাচ্ছি যে আমরা যে বাড়ীতে বাস করছি সেই বাড়ীই ভাঙতে চেষ্টা করছি। একেই নড়বড়ে ভিত, আরো নড়িয়ে দিলে যে পুরো বাড়ীর কাঠামোটাই আমাদের মাথায় পড়বে তা ভাবছিনা। পরিবর্তন আমরা চাই কিন্তু তাই বলে ধ্বংসকে আবাহন জানাতে পারবো না। অথচ এখন যে পথে চলেছি তাতে ধ্বংস অনিবার্য। দেশের অভ্যন্তরে জোর একটা প্রকাণ্ড ভাঙাচোরা আরম্ভ হলে আমাদের তথাকথিত 'মিত্র শক্তি' যারা (অহিংস ভারতের সবাই মিত্র—শত্রুও) তারা আমাদের তেইশ বছরের বদ্ধমূল ধারণার সম্মান রেখে আমাদের আক্রমণ করতে দ্বিধা করবে না। এবং সেই উঁচানো সঙীনের বিরুদ্ধে কিভাবে তখন আমরা দেশ এবং আত্মরক্ষার পথ খুঁজে বার করব? একথা সত্যি যে গণশক্তির কাছে মুষ্টিমেয়র শক্তি সাগরে বিন্দুবৎ মাত্র কিন্তু প্রতিকূলে শক্তি যেখানে সশস্ত্র এবং অধিক শক্তিশালী সেখানে জনমত দলনে অসুবিধা হবার কথা নয়। আমাদের প্রতিবেশী বা দূরের শক্তি—যেই হোক না কেন, যেমনই দেখবে এদেশে আভ্যন্তরীণ ভাঙাচোরা চলছে অমনি সে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে তেড়ে আসবে। আজকের তথাকথিত বিপ্লবীরা তখন দেশকে রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা করবেন কি উপায়ে তা জানতে ইচ্ছা করে। আজ যা হয়েছে কাম্বোডিয়ায়, কাল যা হয়েছিল চেকোস্লোভাকিয়ায়, তারই পুনরাবৃত্তি যে আগামীকাল ভারতে ঘটবেনা সে প্রতিশ্রুতি কে দিতে পারে?

যে পরিবর্তনের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি সেটা হল অহেতুক ধ্বংসের পথ। এই পথে কখনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান যায় না। আমাদের মূল লক্ষ্য হল দেশে একটা সুস্থ শাসন এবং সমাজব্যবস্থা আনা, সেটা যে তন্ত্রবাদেরই স্থাপনা কামনা করুক না কেন। কিন্তু mass fury একবার জেগে উঠলে আবার ধ্বংসকে রুখবে কি ভাবে? আমাদের মূলেই যে distortion বা বিকৃতি রয়ে গেছে। এই distorted forceটাই তখন বেশী জোরালো হয়ে ওঠে এবং তখন সেই বিপ্লব অথবা out-burst এ controlling force টা বলবৎ করা যায় না। বিপ্লবের অনিবার্য ধ্বংসকে স্বীকার করে নিয়ে অহেতুক ধ্বংসকে রোধ করতে একমাত্র পারে নিয়ন্ত্রিকরণ শক্তি এবং এই শক্তি হল মানুষেরই চেতনাবোধের একটি অংশ। সুতরাং যতদিন না মানুষ তৈরী হচ্ছে ততদিন

বিপ্লবের বিকৃতরূপকে বিপ্লব নামে নিয়ে এলে তা হবে নিজেদেরই প্রবঞ্চনা করা।

যে অহেতুক ধ্বংসের পথ অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে চলেছি সেই পথ বর্জন না করলে আমরা ক্রমশই সর্বনাশের মুখে এগোব। প্রতিকূল শক্তির চরিত্রে পরিবর্তন এনে আমরা যদি তাকে নিজ দলভুক্ত করতে পারি তাহলেই প্রকৃত বিপ্লব সাধন হবে নতুবা বিরুদ্ধ-শক্তিকে একমাত্র বিনাশ করাই যদি আমাদের মূল লক্ষ্য থাকে তাহলে এই বিনাশকারী তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে আমরা একদিন নিজেদেরই বিনাশ করে ফেলব। সেটা হবে যুদ্ধে আমাদের পরাজয়, কারণ মূল লক্ষ্য তখন আমাদের মৃত আত্মার থেকে লক্ষযোজন দূরে থাকবে।

আজ আমরা রাইফেল নিয়ে দেশের অন্দরমহলের সব ঘরগুলো ভাঙতে চলেছি। কিন্তু এমন দিন আসবে যেদিন আমাদেরই রাইফেল কেড়ে আমাদের মেরে দেশকে দখল করবে বিদেশী শক্তি। ধ্বংসের মদমত্ততায় আমাদের একত্ববোধ স্তিমিত হতে বাধ্য। তখন আমরা বিদেশী-শক্তির অনুপ্রবেশ রুখব কি ভাবে ?

যে পরিবর্তন আজ আমরা সবাই চাইছি সে পরিবর্তনকে যেন মাত্র একটা বিক্ষোভের রূপ না দিই, তাতে বিশৃঙ্খলাই শুধু আসবে। আমরা চাই পরিবর্তন এবং তা বিপ্লবিক দর্শন অনুযায়ী। যে ভাঙাগড়া আসছে তাকে আমরা রোধ করতে পারিনা—চাইও না। কিন্তু তাকে একটা ভিন্ন character দিতে পারি। এ চেষ্টার সঙ্গে দেশ-প্রেমের সমন্বয় ঘটলেই আদর্শ বিপ্লব সাধিত হবে। নতুবা শুধুমাত্র ভাবাবেগ এবং আদর্শের distorted version এর মিলনে কখনো একটা আন্দোলন সফল হয় না।

সুতরাং যে বিক্ষোভের পথ ধরে আমরা wholesale ধ্বংসের পথে চলেছি তার পর কি ? আরও একবার পরাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ ? এখনকার তথাকথিত বিপ্লবীরা বোধকরি এটাকেও ব্যাখ্যা করবেন History repeats itself বলে।

দীনবন্ধু সি, এফ, এণ্ডরুজ

চিন্ময়ী বসু

রবীন্দ্রনাথের শিষ্য ও গান্ধীজীর ভাই

এণ্ডরুজ বলতেন, "ভারতবর্ষে এসে আমি দ্বিতীয় জন্মলাভ করেছি"। বাস্তবিকই তিনি ভারতবর্ষকে তাঁর মাতৃভূমি বলেই গ্রহণ করেছিলেন। এদেশে তাঁকে পাঠান হয়েছিল খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ও ধর্ম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে। সেই দায়িত্ব নিয়ে ভারতবর্ষে এণ্ডরুজ শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেছিলেন। ক্রমে তিনি এদেশের বহু নেতা ও বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। ভারতীয়দের সেবায় আত্মনিয়োগ করে তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁক বহু দিন কাজ করতে হয়েছিল। সকলেই তাঁর প্রিয় বন্ধু ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তিনি যতটা ঘনিষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে কাজ করে যে দীর্ঘ দিন কাটাবার সুযোগ পেয়েছিলেন তেমনটি আর কারও সঙ্গে হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এণ্ডরুজের "গুরুদেব"। এণ্ডরুজ ছিলেন গুরুদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং শিষ্য। প্রথম দর্শনেই গুরুদেবের প্রতি তাঁর যে অকৃত্রিম ও গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জেগেছিল তা ক্রমে বেড়েই গিয়েছিল। গীতাঞ্জলির কবিতার ইংরাজী অনুবাদের আবৃত্তি শুনে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে এণ্ডরুজ বলেছিলেন, 'সেই সন্ধ্যা আমার জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে দিয়েছিল'। রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালবাসার টানেই তিনি শান্তিনিকেতনে এসে কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনকে বানিয়েছিলেন তাঁর "আবাস"। রবীন্দ্রনাথও নিজে বলতেন যে এণ্ডরুজের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মার সম্পর্ক। সেখানে ছিল না কোনও স্বার্থের যোগ, ছিল না কিছুমাত্র কৃত্রিমতা। রবীন্দ্রনাথকে এণ্ডরুজ পরম গুরু রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে এণ্ডরুজ লিখেছিলেন, "আমার সারা জীবনে আমি আর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করি নি যিনি রবীন্দ্রনাথের মত বন্ধুত্বের বন্ধনে, জ্ঞানের আলোকে এবং আন্তরিক স্নেহ-প্রীতিতে মানুষের জীবনে এমন পূর্ণতা দান করতে পারেন। তাঁর উপস্থিতিই মানুষকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করত"।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গলাভের অনুপ্রেরণাতেই এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকরূপে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তখন শান্তিনিকেতনের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও আর্থিক সংকটের কথা চিন্তা করে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। এরূপ সংকটজনক অবস্থায় নিজের লাভালাভের কথা না ভেবে এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে এসে মনে প্রাণে তিনি গুরুদেবের প্রকৃত শিষ্য হওয়ার চেষ্টা করলেন। সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় রীতিনীতি অনুসরণ করতে লাগলেন। তিনি ধুতি চাদর পরতেন। অধিকাংশ সময় খালি পায়ে থাকতেন। মাঝে মাঝে চটি পায়ে দিতেন। গুরুজনদের শ্রদ্ধাসহকারে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের তিনি আপন সন্তানের মত ভালবাসতেন ও স্নেহ করতেন। তাঁর মন সব সময়েই তাদের মঙ্গল চিন্তায় ভরে থাকত। তিনি একাধারে ছাত্রদের শিক্ষক ও বন্ধু ছিলেন। তাদের লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্বতো ছিলই—তাছাড়া তাদের খাওয়া দাওয়া, উৎসব-আনন্দ, খেলাধুলা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। ছাত্রদের নিয়ে যখন খেলার মাঠে নামতেন তখন তিনি তাদের একজনই হয়ে যেতেন—আবার যে কোনও উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি তাদের মতই চঞ্চল ও মুখর হয়ে উঠতেন। ছাত্ররাও এণ্ডরুজকে রবীন্দ্রনাথের পরম সুহৃদ ও আত্মীয় বলে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছিল। তারা তাঁকে তাদের শিক্ষাগুরু এবং পরিচালকরূপে গ্রহণ করেছিল, এণ্ডরুজ সর্বদা ছাত্রদের বলিষ্ঠ মনোভাব

গড়তে এবং ন্যায় ও স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে প্রেরণা দিতেন। তাদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ জাগাবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে প্রাদেশিকতা বোধ বা জাতিভেদ নীতির প্রকাশ দেখা যেত। এণ্ডরুজ ছাত্রদের এরূপ ভেদবুদ্ধিতে অত্যন্ত মর্মাহত হতেন। রবীন্দ্রনাথের নিকটও তিনি এই বিষয় নিয়ে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। ক্রমে এণ্ডরুজের সস্নেহ চেষ্টায় এবং উদার ব্যবহারে ছাত্রদের মন থেকে এই সব ভেদনীতি দূর হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এণ্ডরুজের শ্রদ্ধা ও প্রীতি এতই সুগভীর ছিল যে গুরুদেবের প্রাণের প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনের কোনও রূপ অভাব অভিযোগ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সংকট দূর করার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে বেড়াতেন। প্রয়োজনের সময় তিনি যে কোথা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আনতেন তা রবীন্দ্রনাথও স্বয়ং জানতে পারতেন না। শান্তিনিকেতনের উন্নতির জন্য এণ্ডরুজ দিনে দশ বার ঘণ্টা অক্লান্তভাবে কাজ করে যেতেন। এই কঠোর পরিশ্রমে মাঝে মাঝে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ মাত্র ছিল না। গুরুদেবের জন্য তিনি সব কষ্ট অম্লান বদনে মেনে নিতেন। গুরুদেবের সস্নেহ আশীর্বাদ বলেই সব কিছুকে গ্রহণ করতেন। রবীন্দ্রনাথই ছিলেন এণ্ডরুজের সর্ব কর্মের প্রেরণা। শান্তিনিকেতনে আসার কিছু দিন পর এণ্ডরুজ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন না। অন্যান্য সকলে তাঁর প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছিল। এণ্ডরুজও আর বাঁচার আশা ত্যাগ করেছিলেন। এণ্ডরুজের এরূপ সংকটজনক অসুস্থতার খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। গুরুদেবকে দেখেই এণ্ডরুজের বাঁচার আশা প্রবল হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের আপ্রাণ চেষ্টায় ও সেবায় এণ্ডরুজের প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল সেবার।

এণ্ডরুজের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার উপর রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল অত্যধিক। বহু কাজের দায়িত্বভারই তিনি তার উপর ন্যস্ত করতেন। শান্তিনিকেতনকে গড়ে তোলার কাজে যে সব মনীষী অবদান রেখে গেছেন এণ্ডরুজ তাঁদের অন্যতম ছিলেন। আর একজন বিদেশীয় মনীষী ছিলেন তাঁর সহযোগী। তিনি হলেন উইলিয়াম পিয়ার্সন। পিয়ার্সনও শান্তিনিকেতনের উন্নতির জন্য অকুণ্ঠ পরিশ্রম করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করেই ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গেও এণ্ডরুজের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল সুগভীর। এণ্ডরুজ তাঁকে বড় ভায়ের মতই শ্রদ্ধাভক্তি করতেন এবং রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে তাঁকে 'বড়দাদা' বলেই সম্বোধন করতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথও এণ্ডরুজকে ছোট ভাই রূপে স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন।

এণ্ডরুজের নিঃস্বার্থ আচরণ রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। তাঁর আপনভোলা স্বভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় কৌতুকও করতেন খুব। এণ্ডরুজের নিজের জিনিস পত্র সম্বন্ধে কোন হিসাব বা সাবধানতা ছিল না। পরের জিনিসের ব্যাপারেও তাঁর ঐ একই মনোভাব ছিল। ফলে অনেক সময়েই তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র খুঁজে পাওয়া যেত না। রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে সকলকে বলতেন, "কেউ যদি কোন জিনিস হারাতে চাও তবে সেটি এণ্ডরুজকে দাও"। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এণ্ডরুজের তত্ত্ব আলোচনাও চলত অহরহ। অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা হিন্দু শাস্ত্র—বেদ, উপনিষদ, ভগবৎ গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ নিয়ে গভীর আলোচনা করতেন। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথও এণ্ডরুজকে শাস্ত্র আলোচনায় প্রেরণা জোগাতেন। ক্রমে এণ্ডরুজ হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থসমূহের একজন অনুরাগী পাঠক হয়ে উঠেছিলেন এবং শাস্ত্রবিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের কাজে আত্মোৎসর্গ করার সুযোগ পাওয়াতে এণ্ড্রুজ নিজেকে ধন্য মনে করতেন। শান্তিনিকেতনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন বলেই অকাতরে তার সেবা করে গেছেন দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর। শান্তিনিকেতনে কাজ করতে করতেই তিনি ভয়ানকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অসুস্থতার ফলেই ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল এণ্ড্রুজের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যারপরনাই শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রতি এণ্ড্রুজের অকৃত্রিম ও অপর্যাপ্ত ভালবাসাকে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। এণ্ড্রুজের আত্মোৎসর্গের আদর্শ এবং তাঁর নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব শান্তিনিকেতনের অন্যান্য কর্মীদেরও কাজে প্রেরণা জোগাত। তাই তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "কেবলমাত্র তার (এণ্ড্রুজের) জীবনের যা শ্রেষ্ঠ দান তাই তিনি আমাদের জন্য এবং সকল মানবের জন্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে রেখে গেলেন,—নশ্বদেহ ধূলিসাৎ হবার মুহূর্তে এই কথাটি আমি আশ্রমবাসীদের কাছে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জানিয়ে গেলাম"।

এণ্ড্রুজের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে নানা কল-কারখানায় বহু ভারতীয় শ্রমিক চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করত। সেইসব কল কারখানার শ্বেতাঙ্গ মালিকরা এই সব ভারতীয়দের প্রতি নানারূপ অন্যায় অবিচার করত যার ফলে তাদের অত্যন্ত দুঃখ কষ্টে দিন কাটাতে হত। তাদের প্রতি অন্যায় অবিচার দূর করার ব্যবস্থা করতে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন এবং আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। গান্ধীজীর এই কাজে ভারতবর্ষ থেকে সাহায্য করেছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থান ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করতেন গান্ধীজীর আন্দোলনের অর্থের প্রয়োজন মিটাবার জন্য। ওই আন্দোলন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের জনসাধারণকে সজাগ করার চেষ্টাও তিনি করতেন। গোখলের এই কাজে এণ্ড্রুজও কিছু কিছু সাহায্য করতেন। অবশেষে গোখলের কাছে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গোখলে এণ্ড্রুজের দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। এণ্ড্রুজ উইলিয়াম পিয়ারসনকে সঙ্গে নিয়ে ডারবান অভিমুখে রওয়ানা হলেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে।

ডারবানে এণ্ড্রুজকে অভ্যর্থনা জানাতে বহুলোকই জাহাজ ঘাটে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে গান্ধীজীও ছিলেন। এণ্ড্রুজ জাহাজ থেকে নেমেই জিজ্ঞাসা করলেন, "গান্ধীজী কোথায়?" তখন মিঃ পোলক নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক অতি সাধারণ বেশ পরিহিত সন্ন্যাসীতুল্য ক্ষীণকায় এক ব্যক্তির প্রতি নির্দেশ করে বললেন, "ইনিই গান্ধীজী"। এণ্ড্রুজ সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে গান্ধীজীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দুদিন দিন যেতে না যেতেই গান্ধীজী ও এণ্ড্রুজের মধ্যে গভীর প্রীতি ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। গান্ধীজী হলেন এণ্ড্রুজের প্রিয় "মোহন"—আর এণ্ড্রুজ হলেন গান্ধীজীর আদরের "চার্লি"। গান্ধীজীর একনিষ্ঠ অনুগামী হয়ে এণ্ড্রুজ কাজ শুরু করলেন। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় আচারণের অবসানের জন্য তিনি শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে নানারূপ আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নানাস্থানে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেন এবং বর্ণ বিদ্বেষ যাতে দূর করা যায় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। ভারতীয় শ্রমিকদের বস্তীতে বস্তীতে ঘুরে গান্ধীজী দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয়দের নানাভাবে সাহায্য করতেন। গান্ধীজীর এইসব কাজে এণ্ড্রুজ একজন বড় সহায় হয়ে ছিলেন। এণ্ড্রুজ এইসব কাজ করতেন গান্ধীজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন বলে তাকে আফ্রিকা-বাসী শ্বেতাঙ্গদের কাছে নানারূপ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। তারা এজন্য এণ্ড্রুজকে সর্বদাই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করত। কিন্তু গান্ধীজীর প্রতি তিনি তাদের এই আচরণে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না। গান্ধীজী ও

এণ্ডরুজের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং আপ্রাণ চেষ্টায় দক্ষিণ আফ্রিকার কলকারখানাতে চুক্তিবদ্ধ করে ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগ প্রথা বন্ধ হয়েছিল। আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ভারতবর্ষে ফিরে এসেও এণ্ডরুজ গান্ধীজীর দেশ-সেবার কাজে সহায়তা করার জন্য সর্বদা ব্যগ্র থাকতেন। স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা ছাড়া গান্ধীজীর আর একটি প্রধান কাজ ছিল দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করা এবং হরিজনদের সেবা করা। এণ্ডরুজ গান্ধীজীর এই কাজে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। বলতে গেলে এণ্ডরুজের চেষ্টাতেই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কার্যসূচী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। সবরমতীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং আর কার্য পরিচালনার ব্যাপারে এণ্ডরুজ ছিলেন গান্ধীজীর অন্যতম সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর পরিচয়ও করিয়ে দিয়ে ছিলেন এণ্ডরুজই। এণ্ডরুজ ছিলেন যেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এবং গান্ধীজীর সেবাগ্রামের মধ্যেকার যোগসূত্র। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের কার্যসূচী বা অন্য কোনও কোনও নীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে কোনও মতবিরোধ উপস্থিত হলেও এণ্ডরুজই মধ্যস্থতা করে তাঁদের আবার একমতে নিয়ে আসতেন। দুজনার উপরেই ছিল এণ্ডরুজের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী দুজনেই তাঁকে যারপরনাই স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন।

গান্ধীজীর স্ত্রী কস্তুরবাই গান্ধীর প্রতিও এণ্ডরুজের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। এণ্ডরুজ তাঁকে মায়ের মত ভক্তি করতেন। এণ্ডরুজ যেবার প্রথম ভারতে যান সেইবারই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছিল ইংলণ্ডে। এই মর্মান্তিক শোক সংবাদ পেয়েছিলেন ভারতে উপস্থিত হবার কিছুদিন পরেই। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত মনকষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি তখন শারীরিক দিকেও অসুস্থ ছিলেন। এণ্ডরুজের এই গভীর শোকের সময়ে কস্তুরবাই এসে তাঁকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে-ছিলেন। অন্যান্য ভারতীয় কয়েক জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে এসে তিনি এণ্ডরুজকে বলেছিলেন। "এখন থেকে আমরাই তোমার মা হব।" এই কথায় এণ্ডরুজ খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন মায়ের মৃত্যুর পর তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "আমার মায়ের প্রভাবেই আমি ভারতবর্ষকে এতটা ভালবাসতে পেরেছি এবং ভারতবর্ষকে আমার স্বদেশ বানিয়েছি। মায়ের মৃত্যুর পর এখন আমি ভারতের ঘরে ঘরে আমার মাকে খুঁজে পাব।"

গান্ধীজীর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কোন কোন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে এণ্ডরুজের মতের অমিল না হত যে তা নয়। কিন্তু এণ্ডরুজ সে মতবিরোধকে আপোষে পরিণত করে নিতেন। তিনি বলতেন, "গান্ধীজীর সঙ্গে মত-বিরোধে আমি কিছু মনে করি না। বরঞ্চ এতে আমাদের বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়।" এণ্ডরুজ মনপ্রাণ দিয়ে ভারতীয়দের ভালবেসেছিলেন এবং তাদের উন্নতি-সাধন এবং স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু অনেক ভারতবাসী তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাঁরা এণ্ডরুজকে শাসক ইংরেজদের অনুচর মনে করতেন। শান্তিনিকেতনে এসেও প্রথম দিকে এণ্ডরুজ তাঁর প্রতি এই বিরোধী মনোভাবের কিছু পরিচয় পেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী এণ্ডরুজকে ঠিক চিনে নিয়েছিলেন। এণ্ডরুজের আন্তরিকতা এবং ভারতপ্রীতিতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী যখন শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তখন এণ্ডরুজের প্রতি শান্তিনিকেতনবাসীদের কারও কারও মধ্যে বিরূপ মনোভাব দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় তাদের বিরোধী মনোভাব দূর হয়েছিল এবং তাঁরা এণ্ডরুজকে অকৃত্রিম বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলেন।

গান্ধীজীর প্রতি এণ্ডরুজের শ্রদ্ধা এতই সুগভীর ছিল যে তিনি গান্ধীজীকে যিশুর প্রতিভূ বলে মনে করতেন। গান্ধীজীর গভীর এবং অকৃত্রিম ভগবদ-ভক্তি দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। গান্ধীজী এণ্ডরুজকে বলতেন, "ভগবানে বিশ্বাস রাখ। তিনি হলেন সর্বব্যাধির চিকিৎসক।" ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এণ্ডরুজ অসুস্থ হয়ে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। গান্ধীজী কলকাতায় এলেন হাসপাতালে এণ্ডরুজকে দেখতে। তাঁকে দেখে এণ্ডরুজ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং বললেন, "আর আমার কোনও চিন্তা নেই।" মৃত্যুশয্যাতেও তিনি গান্ধীজীর নির্দেশ অনুসরণ করে বলতেন, "আমি ভয় করি না। ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে।"

কংগ্রেস স্মৃতি

(প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ)

চতুস্ত্রিংশ অধিবেশন—অমৃতসর—১৯১৯

শ্রীগিরিজামোহন সান্ন্যাল

(১)

গত বৎসর দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের পর থেকেই দেশের সর্বত্র অসন্তোষ প্রকাশ পেল। রৌলট কমিটীর সুপারিশ অনুসারে যে দুটি বিল গভর্ণমেন্ট প্রণয়ন করেছিল তার বিরুদ্ধে ভারতের জনমত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং দেশের সকল প্রান্তে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকল। এই প্রতিবাদে মডারেট নেতাগণ যোগ দেন নি। বোম্বাই শহরে আহূত নরমপন্থীদের এক সভায় খপর্দে মশায় আরও তদন্ত না করে প্রস্তাবিত বিল ইম্পিরিয়াল কাউনসিলে পেশ না করার জন্ত এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর বিরোধিতায় ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

রৌলট কমিটীর সুপারিশ অনুসারে দুটি বিল ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে পেশ করা হল। প্রথমটিতে ভারত দণ্ডবিধি আইন এমনভাবে স্থায়ী পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা হল যাতে কর্তৃপক্ষের মতে কোন কাজ বিপজ্জনক মনে হলেই তা কঠোর হস্তে দমন করার ক্ষমতা সরকারের উপর অর্পিত হল। দ্বিতীয়টিতে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধারণ ফৌজদারি আইনের পরিবর্ত্তে সরকারকে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হল। রৌলট বিল নামে পরিচিত বিল দুটি বিবেচনার জন্ত যে সিলেক্ট কমিটীতে পাঠান হল তাতে ভারতীয় সদস্ত ছিলেন পাঞ্জাবের আইনজীবি সৈয়দ মহম্মদ সফী, ডঃ তেজবাহাদুর শাপ্রু, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ময়মনসিংহের জমিদার সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী, বিদর্ভের নেতা খপর্দে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিঠলভাই ঝাবর ভাই প্যাটেল।

১৯১৯ সাল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। যেমন একদিকে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের স্বায়ত্বশাসন সংস্কারের প্রস্তাব সম্বন্ধে সমস্ত দেশে আলোচনা চলছিল অপর দিকে রৌলট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবলভাবে চলতে লাগল।

বারবার দেখা গিয়েছে যে যখনই গভর্ণমেন্ট কোন শাসন সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডনীতিও অবলম্বন করেছে, বিক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে স্যর এস পি সিংহকে (সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ) ১৯১৯ সালের প্রারম্ভেই ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতীয় বিভাগের সহকারী সচিব (আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া) নিযুক্ত করে। এই প্রথম একজন ভারতীয়কে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হল। তখনকার দিনে ভারতবাসীর পক্ষে এ বড় কম সম্মানের পদ ছিল না, কিন্তু এতে দেশের লোক ভুলল না।

মধ্যপ্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ১৯ শে জানুয়ারী দিল্লী কংগ্রেসে গৃহীত আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যকরী করার জন্ত এবং লোকমান্ত তিলক-মহাত্মা গান্ধী ও হাসান ইমামকে ভারতের প্রতিনিধি-স্বরূপ প্যারিসে শান্তি সম্মিলনে যোগদানের ব্যবস্থা করার জন্ত গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করে এক প্রস্তাব পাশ করে। কিন্তু ভারতের জনমতকে অগ্রাহ্য করে

শান্তি সম্মিলনে ভারতের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয় বিকানীরের মহারাজা এবং স্যর এস পি সিংহকে।

রৌলট বিলের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ-সভা হতে লাগল। ৩০ শে জানুয়ারী তারিখে বিডন স্কোয়ারে (বর্তমানে রবীন্দ্র কানন) মতিলাল ঘোষের সভাপতিত্বে এক মহতী সভায় বিল দুটিকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হল। এই সভায় আবুল কাসেম, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, পীযূষকান্তি ঘোষ প্রভৃতি নেতাগণ তীব্র ভাষায় বিল দুটির নিন্দা করেন।

১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে কলেজ স্কোয়ারে একটি বৃহৎ সভায় বিল দুটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়।

৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে একটি বিরাট সভার আয়োজন হয়। সভাগৃহে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় সভা রাস্তা পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

৩১ শে জানুয়ারী তারিখে মাদ্রাজে প্রতিবাদ সভার সভাপতিত্ব করেন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার।

মনোহর লালের সভাপতিত্বে লাহোরে প্রকাণ্ড প্রতিবাদ সভা হয়।

২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে এলাহাবাদের প্রতিবাদ সভার নেতৃত্ব করেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু।

মডারেট নেতারাও—যথা স্যর দীনশা ওয়াচা, স্যর নারায়ণ চন্দ্রভারকর, কলকাতায় ভারতসভার সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন তীব্র ভাষায় প্রস্তাবিত বিল দুটির নিন্দা করে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এমন কি গভর্ণমেন্টের ঘরের খাঁ বলে পরিচিত নবাব নবাব আলী চৌধুরী; মিঞা মহম্মদ সফী, খাঁন জুলফিকার আলী খাঁ পর্যন্ত গভর্ণমেন্টের পক্ষ ত্যাগ করে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউনসিলে বিরোধী পক্ষে যোগদান করেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন মতাবলম্বী দল সমূহের সম্মিলিত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে রৌলট বিল গৃহীত হওয়ায় শান্তি সম্মিলনে (প্রথম বিশ্ব যুদ্ধান্তে পিস কনফারেন্স) একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হল। প্রেসিডেন্ট উইলসন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করলেন—

"আমরা কোন জাতির প্রভু নই। আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এই ব্যবস্থা করতে যাতে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি তাদের নিজেদের প্রভু মনোনীত করতে এবং তাদের নিজ অভিপ্রায় অনুসারে নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (১)

যাই হউক রৌলট বিলের সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হলে দেখা গেল যে, মজরিটি রিপোর্টে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, খপর্দে ও প্যাটেল স্বাক্ষর দেন নি কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাতে স্বাক্ষর দিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী এই সময় অসুস্থ ছিলেন। বোম্বাই সহরে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছিল। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তিনি ১০ ই ফেব্রুয়ারী আমেদাবাদে যান।

আমেদাবাদে কিছুদিন বিশ্রাম করে ১০ই মার্চ তারিখে তিনি বোম্বাই ফিরে আসেন এবং অনতিবিলম্বে রৌলট বিল বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ এই আন্দোলন থেকেই তিনি সর্বভারতীয় অবিসম্বাদিত নেতারূপে গণ্য হলেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিল দুটির প্রতিরোধকল্পে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিকল্পনা করতে কৃতসংকল্প হয়ে বোম্বাই থেকে সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে একটি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রচার করলেন। এই প্রচারপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, বিঠলভাই প্যাটেল প্রভৃতি নেতাগণ।

প্রতিজ্ঞাপত্রটি নিম্নলিখিত মত ছিল :—

---

(1) "We are masters of no people but we are here to see that every people in this world shall choose its own masters and govern its destinies, not as are we wish, but as it desires,

"আমরা আমাদের বিবেকানুসারে মনে করি যে ১৯১৯ সালের ১ নং বিল (ক্রিমিন্যাল আমেণ্ডমেন্ট বিল) এবং ২ নং বিল (ক্রিমিন্যাল ল-বিল—এমারজেন্সি পাওয়ার্স) দ্বারা ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকার—যার উপর সমগ্র জাতির নিরাপত্তা নির্ভর করছে এবং এমন কি যার উপর রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তা বিপন্ন হবে অতএব আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে এই বিল দুটি আইনে পরিণত হলে সেগুলি প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনগুলি এবং অন্যান্য যে সকল আইন এই বিলের বিধানানুসারে প্রণীত হবে—সেগুলি আমরা ভদ্রভাবে অমান্য করব এবং আমরা আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে এই সংগ্রামে আমরা সত্যকে অনুসরণ করব এবং কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তি সম্বন্ধে হিংসাত্মক কার্য্য থেকে বিরত থাকব।"

প্রতিজ্ঞাপত্র প্রচারের পর মহাত্মা গান্ধী—বিল দুটির অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করে একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করলেন এবং গভর্ণমেন্টের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন।

ঐ দিনই বোম্বাই শহরে একটি বৃহৎ সভায় মহাত্মার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন (Passive resistance movement] সমর্থিত হয়।

এর পর মহাত্মা গান্ধী ৭ই মার্চ তারিখে দিল্লীতে এবং ৩ই মার্চ তারিখে এলাহাবাদে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি দেখে মডারেট নেতাগণ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনশা ওয়াচা ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী একটি ইস্তাহার প্রচার করে বললেন যে এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই।

১৩ই মার্চ তারিখে কলকাতায় টাউন হলে এক জনসভায় গান্ধজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন সমর্থিত হয় এবং তা কার্য্যকরী করার জন্য ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে, নিয়ে একটি কমিটী গঠিত হয়।

দেশব্যাপী আন্দোলন অগ্রাহ্য করে ১৮ই মার্চ তারিখে বিল দুটি দিল্লীর বিধান সভায় (ইম্পিরিয়াল লেজিস-লেটিভ কাউনসিল) পাশ হল। প্রতিবাদস্বরূপ বি. এন শর্মা ও মহম্মদ আলী জিন্না কাউনসিলের সদস্যপদে ইস্তাফা দিলেন।

অমৃতসরে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত আন্দোলনের সমর্থন জন্য এক বিপুল সভা আহূত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ব্যারিষ্টার বদর ইসলাম। সভায় ভাষণ দেন ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ সইফুদ্দিন কি লু, পণ্ডিত দীননাথ প্রভৃতি।

বিল দুটি পাশের জন্য মহাত্মা গান্ধী ৬ই এপ্রিল শোক-দিবস ঘোষণা করলেন এবং দেশবাসীকে ঐ দিন উপবাস ও প্রার্থনা করার জন্য আহ্বান জানালেন।

গভর্ণমেন্ট বিচলিত হয়ে উঠল এবং নিষ্ক্রিয় থাকতে পারল না। যে কোন প্রকারে এই আন্দোলন বন্ধ করার চণ্ডনীতি শুরু হল।

৬ই এপ্রিল শোকদিবস পালন সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ৩০শে মার্চ দিল্লীতে এক জনসভা হয়। ঐ সভায় উপস্থিত নিরস্ত্র জনতার উপর সৈন্যবাহিনী মেসিন-গান থেকে গুলি পর্যন্ত বর্ষণ করল। অনেক হতাহত হল।

এই ঘটনায় সর্বত্যাগী শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পর্য্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। এর ফলে তিনি শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। তিনি একটি বিবৃতি দ্বারা দেশবাসীকে ৬ই এপ্রিল শোকদিবসরূপে পালন করতে আহ্বান করলেন।

৬ই এপ্রিল দেশের সর্বত্র শোকদিবস পালিত হল।

কলকাতায় ঐ তারিখে মনুমেন্টের নীচে ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বিরাট সভা হয়। গোলদীঘি ও বিডন স্কোয়ার হয়ে দুটি সঙ্কীর্তনের দল শোভাযাত্রা করে সভাস্থলে উপস্থিত হয়। সভাক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য হয়েছিল।

ভারতের সর্বত্র প্রতি সহরে এবং প্রধান প্রধান স্থানে শোকদিবস পালিত হয়। জনগণের উপর মহাত্মা

গান্ধীর যে অত্যাশ্চর্য প্রভাব তা এতে প্রমাণিত হল। এই আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে বিশেষ কিছুই করতে হয়নি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর আহ্বানেই সর্বত্র অভিনব সাড়া পড়েছিল।

সত্যাগ্রহ কমিটি প্রথমত নিষিদ্ধ পুস্তক এবং সংবাদপত্র রেজেষ্টারি বিষয়ক আইন ভঙ্গ করা সাব্যস্ত করল। তদনুসারে গান্ধীজির হিন্দ স্বরাজ্য, সর্বোদয় এবং সত্যাগ্রহের কাহিনী এবং মুস্তাফা কামালপাশার জীবনী ও বক্তৃতাবলী ৭ই এপ্রিল বোম্বাই সহরে ফেরি করে বিক্রয় করা হল। হকারদের মধ্যে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং, সরোজিনী নাইডু, ওমর শোভানী প্রভৃতি।

গভর্ণমেন্ট নিশ্চেষ্ট থাকবে না এবং অনতিবিলম্বে ধড়পাকড় সুরু হবে বুঝতে পেরে মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীর প্রতি তাঁর নির্দেশ সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশ করলেন। নির্দেশটি নিয়ে দেওয়া হল :—

"আমরা যে কোন মুহূর্তে বন্দী হতে পারি। সে কারণ এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে যদি কেউ গ্রেপ্তার হয় বা আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন পায় তা হলে সেটা তাকে মানতে হবে। আত্মপক্ষ সমর্থন করা চলবে না বা কোন উকিল নিযুক্ত করা হবে না। যদি জরিমানার আদেশ হয় তাহলে জরিমানার টাকা দেওয়া চলবে না। ঐ টাকা অনাদায়ের জন্য যদি তার কোন সম্পত্তি গভর্ণমেন্ট ক্রোক করে বিক্রয় করে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করে—তা হলে সে কাজে বাধা দেওয়া চলবে না। টাকা আদায়ের জন্য যদি কারাবাসের হুকুম হয় তা হলে কারাবরণ করতে হবে। সহকর্মীর গ্রেপ্তারে বা কারাগারে প্রেরণে অন্যান্য সত্যাগ্রহীর কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ করা চলবে না। এ কথা মনে রাখতে হবে যখন আমরা স্বেচ্ছায় কারাবরণ ডেকে এনেছি তখন প্রকৃতপক্ষে কারারুদ্ধ হলে তার বিরুদ্ধে কারুর কিছু বলা চলবে না। আমরা যখন কারারুদ্ধ হব তখন কারাগারে আইন মেনে চলা আমাদের কর্তব্য হবে কারণ বর্তমানে কারাসংস্কার আমাদের আন্দোলনের অন্তীভূত নয়। সাধারণ কয়েদীর মত সত্যাগ্রহী কোন প্রকার গোপন আচরণ করবে না। সত্যাগ্রহী যা করবে তা প্রকাশ্যভাবেই করবে।

এই নির্দেশ প্রচারের পর গান্ধীজি ট্রেন-যোগে ১০ই এপ্রিল তারিখে দিল্লী রওনা হলেন। পথিমধ্যে একটি ষ্টেশনে তাঁর উপর একটি নিষেধাজ্ঞা জারি হল। ঐ নিষেধাজ্ঞায় তাঁর পাঞ্জাব প্রবেশ বন্ধ করে তাঁর গতিবিধি বোম্বাই শহরে সীমাবদ্ধ করা হল। মহাত্মা গান্ধী সহাস্যে পুলিশ-অফিসারকে বললেন যে তাঁর কর্তব্যানুসারে তিনি এই হুকুম অমান্য করবেন এবং পুলিশ অফিসারেরও উচিত হবে তাঁর কর্তব্য পালন করা। এর পর তিনি তাঁর একান্ত সচিব মহাদেও দেশাইকে একটি বাণী লিখতে বললেন। সেই বাণীটি হচ্ছে—"আমি আশা করি, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, ক্রিশ্চান, ইহুদি এবং অন্যান্য সকলে যাঁরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যাঁরা তাকে নিজের দেশ বলে মনে নিয়েছেন তাঁরা সকলেই এই জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবেন এবং আমি আশাকরি যে মহিলারাও পুরুষদের মত তাতে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করবেন"।

পাটনার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মজহর-উল-হক্ গান্ধীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদস্বরূপ ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদে ইস্তফা দেন।

এদিকে দিল্লী ষ্টেশনে মহাত্মাকে অভ্যর্থনা করার জন্য বিশাল জনতা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। ষ্টেশনে যখন ট্রেণ পৌঁছুল তখন সেই ট্রেণে মহাত্মাকে না দেখে জনতা হতাশ হয়ে পড়ল। মহাদেও দেশাই ট্রেণের কামরা থেকে নেমে সমবেত জনতার নিকট মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ জানালেন। সকলে এই সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল এবং জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। অবিলম্বে ষ্টেশনের নিকট একটি সভা আহ্বান করে দেশাই মশায় মহাত্মার বাণী পাঠ করে শোনালেন। তার পর সকলে মিলে উপাসনা করলেন।

মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

ভারতবর্ষের দিকে দিকে প্রতিবাদসভা আহ্বান

করে দেশের নেতাগণ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন, দেশব্যাপী অসন্তোষ দেখা দিল।

এই সময় পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার মাইকেল ওডোয়ার চরম হঠকারিতার পরিচয় দিলেন। তাঁর গভর্ণমেণ্ট অমৃতসরের জনপ্রিয় প্রসিদ্ধ নেতৃদ্বয় ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সইফুদ্দিন কিচলুকে গ্রেপ্তার করে অনির্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তথাকার নাগরিকগণ। আন্দোলন আর শান্তিপূর্ণ পথে চালান সম্ভব হল না। উন্মত্ত জনতা সকল শৃঙ্খলা ছিন্ন করে সিভিল ষ্টেশনের দিকে ধাবিত হল। জনতার এক অংশ অমৃতসর রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে ইউরোপীয় রেলের গার্ড রবিনসনকে আক্রমণ করে নৃশংসভাবে লাঠির আঘাতে হত্যা করল। তা দেখে রেলের অন্যান্য কর্মচারীরা প্রাণভয়ে পলায়ন করল। এমন সময় একদল গুর্খাসৈন্যের আবির্ভাবে রেল ষ্টেশন রক্ষা পেল বটে কিন্তু উন্মত্ত জনতা টেলিগ্রাফের তার কেটে পাঠানকোট জলন্ধর রেললাইন উপড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করল। ধ্বংস হল টেলিগ্রাফ অফিস ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ভবন। মৃত্যুকে বরণ করল ব্যাঙ্কের দুজন ইউরোপীয় কর্মচারী এজেণ্ট মিঃ ষ্টুয়ার্ট এবং একাউনটেণ্ট মিঃ স্কট উন্মত্ত জনতার হাতে। চার্টার্ড এবং এলায়েন্স ব্যাঙ্কের অফিসও ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পেল না এবং তার এজেণ্ট মিঃ টমসনকেও মৃত্যুবরণ করতে হল। সৈন্যবাহিনীর ওকুস্থলে আবির্ভাবে ভিন্ন ভিন্ন জনতা নগরের দিকে বিতাড়িত হল। কিছু সময়ের জন্য লাহোর ও অমৃতসরের পুলিশের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হল।

এর স্ফুলিঙ্গ আমদাবাদেও পৌঁছে গেল। সেখানে কয়েকজন ইউরোপীয় ও মিলের কর্মচারীদের উপর অত্যাচার হল এবং টেলিগ্রাম অফিস অগ্নিসংযোগে ধ্বংস হল। এই উপলক্ষে আমেদাবাদের শ্রমিক-নেত্রী শ্রীমতী অনুসূয়া সারাভাইকে (প্রসিদ্ধ শিল্পপতি আম্বালাল সারাভাইয়ের ভগ্নী) গ্রেপ্তার করা হয়।

গভর্ণমেণ্টের প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই দেখা গেল। ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের নিকটবর্তী জালিয়ান-ওয়ালাবাগ নামক স্থানে বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে বৃহৎ জনসমাগম হয়েছিল। সভায় বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক শিশু সন্তান সহ উপস্থিত ছিল, বাগের তিনি দিক বাড়ী ঘর ও প্রাচীর দ্বারা আবৃত। ঐ বাগে প্রবেশের একটি মাত্র পথ ছিল তাও সঙ্কীর্ণ। বাগের পূর্বাংশে একটি বড় ইঁদারা ছিল। শিশু বৃদ্ধ বালক বালিকা সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কয়েক সহস্র নরনারী ওখানে জমায়েত হওয়ার পর হঠাৎ জেনারেল ডায়ার সৈন্যসহ ঐ প্রবেশ-পথে উপস্থিত হয়ে নিরস্ত্র জনগণের উপর নৃশংসভাবে মেশিনগান থেকে গুলি বর্ষণ করতে লাগল, তিন দিক আবদ্ধ পলায়নের পথ নেই ভীত ত্রস্ত জনতার অনেকেই গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করল এবং কেউ কেউ প্রাণভয়ে দৌড়াতে গিয়ে ইঁদারার মধ্যে জীবন্ত সলিল-সমাধিলাভ করল। গুলি না ফুরাণ পর্য্যন্ত এই হত্যা-কাণ্ড অনুষ্ঠিত হল। নির্মমতায় ও নিষ্ঠুরতায় এর তুলনা নেই। এই জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ফল হল এর সুদূর প্রসারী।

এই পরিস্থিতিতে সভাপতি গান্ধীজী এবং সহকারী সভাপতি হর্নিম্যানের পরামর্শানুসারে সত্যাগ্রহকমিটী আইনঅমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা সাব্যস্ত করল এবং সকল সত্যাগ্রহীকে সেইমত উপদেশ দেওয়া হল।

এই প্রসঙ্গে মহাত্মাগান্ধী সত্যাগ্রহ কমিটীসমূহের সম্পাদকদের নিকট পত্র দ্বারা জানালেন যে তিনি সাময়িকভাবে আইনঅমান্য বন্ধ রাখার উপদেশ দিতে বাধ্য হলেন। তিনি জানালেন যে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত যে যখন তিনি এই গণ আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন তিনি দুষ্ট প্রভাবকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন। তিনি বিশেষ বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে জনতার হিংসাত্মক কাজের সঙ্গে সত্যাগ্রহীদের কোন যোগ নেই বরং সত্যাগ্রহীদের উপস্থিতিই তাদের দুষ্ক্রিয়ার প্রতিরোধ করেছে। তিনি সত্যাগ্রহীদের উপদেশ দিলেন যেন তারা আইনঅমান্য বন্ধ রেখে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্ণমেণ্টকে সক্রিয় সহায়তা করে।

শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত আইনঅমান্য আন্দোলনের জন্য গান্ধীজিকে তীব্রভাবে নিন্দা করেন।

ডঃ তেজবাহাদুর শাপ্রু পাঞ্জাবের অধিবাসীদের মনে আশ্বাস ফিরিয়ে আনতে দমননীতির কঠোরতা যথাসম্ভব কমানোর অনুরোধ করে কর্তৃপক্ষের নিকট টেলিগ্রাম করলেন। কিন্তু পাঞ্জাবের দমননীতির কঠোরতা তাতে কিছুমাত্র কমল না।

১৪ই এপ্রিল তারিখে লাহোরের এক সভা ত্যাগের হুকুম অমান্য করায় ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। ২১শে এপ্রিল লাহোরের ২০ জন প্রধান প্রধান নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ তারিখেই অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ গভর্ণমেন্টের নিকট জমা দেওয়ার হুকুম জারি করা হয়।

২৩শে এপ্রিল তারিখে লাহোর ও অমৃতসর জেলায় জঙ্গী আইন (মার্শাল ল) এবং আমেদাবাদ ও করাচীতে ভারত প্রতিরক্ষা আইন জারি করা হয়।

এর অব্যবহিত পরেই নির্ভীক ভারতহিতৈষী বোম্বে ক্রণিকালের ইংরাজ সম্পাদক মিঃ বি, জি, হর্নিম্যানের উপর ভারতত্যাগের আদেশ জারি করা হল।

গান্ধীজি এক প্রস্থ পুস্তিকা প্রকাশ করে হিংসাত্মক কার্য্যের নিন্দা করলেন।

পাঞ্জাবে মার্শাল ল' জারি হওয়ার পর যে রকম নির্মম অত্যাচার আরম্ভ হল তার কোন তুলনা নেই। প্রকাশ্যভাবে লোকজনের উপর বেত্রাঘাত হতে লাগল। এমন কি রাস্তায় চলার সময় নাগরিকদের সরীসৃপের ন্যায় বুকে হেঁটে রাস্তা চলতে বাধ্য করান হল।

মার্শাল আইনানুসারে বিচার পরিণত হল প্রহসনে। সি, আই, ডি, পুলিশের পাগড়ী পোড়ানোর মত সামান্য অপরাধেও একজনকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল।

অমৃতসরে শিখদের নিকট থেকে কৃপাণ কেড়ে নেওয়া হল এবং অমৃতসর রেল ষ্টেশনে স্ত্রীলোকদেরও অপমানজনভাবে খানাতল্লাসী চলতে লাগল।

ইংরাজ সম্পাদিত পত্রিকাগুলি দমননীতির বিরুদ্ধে বলা দূরের কথা, তারা আরও ইন্ধন যোগাতে লাগল। "ইংলিশম্যান" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখল—"এটা এখন জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন হয়েছে যে ভারতবর্ষের কর্তা কে? গান্ধী না ভাইসরয়?"

ইংরাজের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল। মাদ্রাজের বিশপ গান্ধীর কার্য্যের প্রশংসা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ধর-পাকড় চলতেই লাগল। ঐ যে লাহোরের ব্যারিষ্টার ডঃ গোকুলচাঁদ নারাং এম্, এ, পি, এচ, ডি, সরদার হবিবুল্লা খাঁন এবং খাজা ফিরোজউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পেশোয়ারের আফগান পোষ্টমাষ্টারের সহিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগে জনপ্রিয় নেতা ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ গ্রেপ্তার হন।

পাঞ্জাবের অর্থনৈতিক জগতে যাদুকর [উইজার্ড অব ফাইন্যান্স) নামে খ্যাত সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ নেতা লালা হরকিষণ লালও গ্রেপ্তার হন। মার্শাল ল অনুসারে বিচারের সময় তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে অনুমতি দেওয়া হল না।

ইতিপূর্বে লালা মনোহরলালকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইনি ব্যারিষ্টার এবং প্রথিতযশা অর্থনীতিজ্ঞ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রথম মিন্টো প্রফেসরের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন অধ্যাপক মনোহরলাল। পরবর্তীকালে তিনি পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী হন।

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্যর শঙ্করণনায়ার মার্শাল আইনানুসারে শাসনের প্রতিবাদস্বরূপ বড় লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

এই মাসেই কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যা ও পাঞ্জাবের দমননীতির প্রতিবাদস্বরূপ বড়লাটের নিকট একটি তীব্র ভাষায় পত্র লিখে স্যর উপাধি পরিত্যাগ করেন।

২৭শে জুন কলকাতায় টাউন হলে ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে পাঞ্জাবের ঘটনাবলী ও শাসনসংস্কার সম্বন্ধে একটি সভা হয়। সভায় এত লোক হয়েছিল যে তিল ধারণের স্থান ছিল না।

৬ই জুলাই তারিখে মিঃ জাস্টিস্ লেসলি জোনসের সভাপতিত্বে মার্শাল ল কমিশন একটি রায়ের দ্বারা লালা হরকিষাণ লাল, পণ্ডিত রামভুজ দত্তচৌধুরী, মৌলানা আতাউদ্দিন ও যোতা সিংকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ও তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুকুম দেন। ঐ রায়েই ডঃ গোকুলচাঁদ নারাং, সৈয়দ মহম্মীন শাহ, ডঃ নওলচাঁদ হিতৈষী ও মথুরাপ্রসাদকে মুক্তি দেওয়া হয়।

অমৃতসর ষড়যন্ত্র মামলায় আর একটি রায় দ্বারা মিঃ জাস্টিস ব্রডওয়ের নেতৃত্বে মার্শাল ল কমিশান ডঃ মহম্মদ বক্সীর উপর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া এবং তাঁর সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। ডাক্তার সত্যপাল, ডক্টর সইফুদ্দিন কিচলু, স্বামী অনুভবানন্দ, লালা দীননাথ, গুরুবক্স রায়, গোলাম মহম্মদ এবং আবদুল আজিজের উপর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হল। কয়েকজন লঘুদণ্ডে রেহাই পেল এবং সৌভাগ্যবান কয়েকজনকে ছেড়েও দেওয়া হল:

"লাহোর ট্রিবিউনের" প্রসিদ্ধ সম্পাদক কালীনাথ রায়ের উপর কঠোর দণ্ড প্রয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে তাঁর কারাবাসের মেয়াদ দুই বৎসর থেকে কমিয়ে তিন মাস করার নির্দেশ দিলেন বড়লাট বাহাদুর।

আন্দোলনের ফলে ভারত সচিব পাঞ্জাবের ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত কমিশনের আবশ্যকতা স্বীকার করলেন।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের ছোটলাট হাকিম মহম্মদ বক্সীর মৃত্যুদণ্ড রহিত করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিলেন এবং অন্যান্য অনেক শাস্তি মুকুব করলেন।

পাঞ্জাবের ঘটনার জন্য ভারত শাসন সংস্কারের প্রস্তাব সম্বন্ধে নেতাগণ কিন্তু উদাসীন হন নি। এ সম্বন্ধে পার্লামেন্টারি কমিটির সম্মুখে কংগ্রেসের দাবি উপস্থিত করার জন্য প্রতিনিধিস্বরূপ মাননীয় বিঠলভাই প্যাটেল, দেওয়ান বাহাদুর ভি. পি. মাধব রাও, ও এন্. সি. কেলকার ২৮ শে এপ্রিল লণ্ডনে রওনা হন, তাঁদের বিদায় সভায় নেতৃত্ব পদ অলঙ্কৃত করেন কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। জুলাই মাসে বিপিনচন্দ্র পালও ঐ প্রতিনিধিদলে যোগ দেন।

ভারতের সকল দলের প্রতিনিধিই উক্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত ছিলেন। পার্লামেন্ট কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোভাব ছিল সহযোগিতার কিন্তু প্যাটেল ও মাধব রাওয়ের মনোভাব ছিল বিরোধিতার।

৩০শে আগস্ট তারিখে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে বোম্বাই শহরে একটি জনগণের অধিবেশন হয়। ঐ সভাতে রৌলট আইন চালু রাখার এবং মার্শাল ল' কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা হয় এবং পাঞ্জাবের ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট দাবি করা হয়। ক্রমশঃ

অন্যদিন

সন্তোষকুমার অধিকারী

অন্য কথা বলো—
অন্য এক পৃথিবীর, কিম্বা অন্য সময়ের কথা।
একটি বছর ধরে' বর্ণাঢ্য ব্যাঞ্জনা দিয়ে গান
গেয়েছো অনেক ;
শুনেছি দীপকরাগ, তারপর আঘাতে নীলিম
ব্যর্থতার মুহুমীত,
নিরাশার অশ্রুধারা বুকছিঁড়ে ঝরেছে মল্লারে।
অনুভব-গাঢ় এই অনন্ত জীবনে
ভালবাসা, ত্যাগ, স্মৃতি, তৃপ্তি থেকে অতৃপ্তির পথে
পুনরাবর্তন শুধু জেনেছে হৃদয়।

যতদূর যাই,
সেই এক, সেই এক……বারবার সেই একই কথা।
সেই রাজপথ, বন, আলোছায়া ভরা হৃদয়ের
ক্লান্তির বেদনা ;
সারাদিন রাজনীতি, সারাদিন নীতিধর্ম লোক্তার যোগানে।
পার্কে মানবতা, নীল মিছিলে রক্তের মুখ,
শহর কোঁকায়, ভীত রুদ্ধশ্বাস কাঁপে।

তাই বলি, অন্য কথা বলো—
মানুষের অগণিত রূপকথা আছে,
সময়ের আরও দীর্ঘ ইতিহাস আছে,
অন্য এক মানে আছে বাঁচার। জানোনা,
পিছে-পড়ে' থাকেনা কিছুই ?

বস্তু থেকে অন্য বস্তু, এক দেহ থেকে অন্যদেহে
প্রাণ থেকে প্রাণান্তরে তার
অবারিত সঞ্চরণ ?
অতীত অতীতমাত্র
পরিত্যক্ত পত্রগুচ্ছ চৈত্রশেষ আবর্জনা শুধু।

একটি কবিতা তবে লেখো।
বড় বিধি মনন যন্ত্রণা
বন্ধুরা বিক্রীত হয়ে সারি সারি 'হেঁটে চলে গেল।
সকল প্রত্যয় ছিঁড়ে ভীরুতার অন্ধকারে মজ্জমান মগ্ন শিবির।
স্নায়ুগুচ্ছ ছিঁড়ে যায় উত্তাপে ; এখন
কোন কথা নেই কোনখানে।

ঘোলাটে বিশীর্ণ চোখে কে যেন এখনও চেয়ে আছে :
আমি ওকে বলে যাই,
স্মৃতিকে বিশ্বাস আমি করি না কখনও।
দীপ জ্বলে' যায় তার শিখায় শিখায়—
নদী হাঁটে ঢেউ থেকে ঢেউয়ে ;
ভূমির বালির চড়া থেকে—
বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত ধরে আমিও অনন্ত এক জীবনের পথে যেতে চাই।

ভ্রান্ত পথিক

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

শ্রান্ত পথিক তোরা কোথাকার পান্থ গো
চঞ্চল চলো দিনরাত্রি,
কোথা নেই কোন্ দেশ পেলি তার বার্তা কি?
যে অজানা তীর্থের যাত্রী।
জন্মের পরে থেকে কর্মের বোঝা বয়ে
ঘুমিয়া মরিলি ওরে পান্থ,

শ্রান্তির ভারে হায় যেমন কেঁদে ওঠে
আজো তবু চলিবারে ক্লান্ত।
ঊষা আসে উঠেরোদ তাতে করে পথ
দাউ দাউ জলে মধ্যাহ্ন,
যাত্রার পথে তোর বেলা ঐ নেমে আসে
লাল হয়ে এল অপরাহ্ন।
"বেলা যায় বেলা যায়"-কেহ ঐ ডাক্ ছাড়ে
কেহ কয়—"ঐ যায় কাল গো,"
তারি সাথে মিশে তোর বন্ধুগো হল ভুল
হারাইলি জীবনের তাল গো।
সবীর সাথে তুই মিলাইয়া কণ্ঠ গো।
হারাইলি আপনার ছন্দ।
"কাল যায়"—বলি সবে' করি তুই সাবধান
নিজে হায় হয়ে র'লি অন্ধ।

বন্ধুগো তোরি পথে যায় জীবনের বেলা
ওঠে তাল পড়ে তার সোমগো,
তুই শুধু চলেছিস চলেনারে মহাকাল
সীমাহীন সে যে মহাব্যোমগো।

অনন্ত মহাকাল নাই তার আদি শেষ
অসীম সে কি করে' সে চলবে?
বন্ধু গো, আঁখি খোল তোরি যাত্রার বাহু
ভুল করে তোরি পথ চলবে।

ওই দেখ কালাকাশ বক্ষেতে তারি তোর
যাত্রার রচা মহাপথটি,
চলেনারে মহাকাল পাছ গো তোরি ঐ
জীবনের চলে শুধু রথটি।

তোরি ঐ বেলা যায় এল সাঁঝ সাথী নাই
সংসার বসে যায় দূরে,
চলেনারে মহাকাল তোরি ঐ জীবনের
বেলা হায় ডুবে যায় দিবে।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের লোকসভা, রাজ্য-বিধান সভা প্রভৃতির 'গণ-বিকাশ'

গত কিছুকাল হইতে আমাদের রাজ্য বিধান সভা, বিশেষ করিয়া লোকসভাতে মাননীয় সদস্যদের পাণ্ডিত্য দেশপ্রেম, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতির গুণের প্রবল বন্যা দেখা যাইতেছে। দেশের সর্ব্বোচ্চ আইন সভা, অর্থাৎ দিল্লী নামক ঐতিহাসিক নগরে অবস্থিত ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের কার্যকলাপে এবং দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করিবার বিষম প্রয়াসে আমরা মুগ্ধ, হতবাক হইয়াছি। আমাদের অদ্যকার পার্লামেন্টের সদস্যদের ব্যবহার এবং "আত্ম-উন্নতির প্রয়াস প্রচেষ্টা অবলোকন করিয়া, ১৭ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিখ্যাত অলিভার ক্রমওয়েলের 'লং' পার্লামেন্টে প্রদত্ত একটি ভাষণের কথা মনে পড়িতেছে। গ্রেট ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ক্রমওয়েল পার্লামেন্টের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন: (১৭ শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশ দশকে)

"You have sat too long here for any good you been doing. Depart, I say and let us have done with you. In the name of God-go !"

বলা বাহুল্য-পার্লামেন্টের তৎকালীন সদস্যবৃন্দ স্বেচ্ছায় পার্লামেন্ট গৃহ ত্যাগ করেন নাই, ক্রমওয়েল তাহাদের ঘাড় ধরিয়া পার্লামেন্ট হইতে খেদাইয়া বিতাড়িত করেন এবং পার্লামেন্ট ভবনের সদর দরজায় তালা লাগাইয়া চলিয়া যান!

আমাদের প্রধান মন্ত্রী আছেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হইতেছে পলিটিক্যালী তিনি ক্রমশ "আন্ওয়েল্" হইতেছেন: বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী পার্লামেন্টে নিজের আসন বজায় রাখিতেই সদা প্রাণান্ত —নীতিহীন সদস্য কিংবা সদস্যদের বিতাড়িত করিবার চিন্তার সাহস তাহার নাই, হইবেও না কোনদিন!

আমাদের অদ্যকার সংসদ সদস্যগণ সংবিধানে প্রদত্ত বিশেষ শ্রেণীর লোকেদের বিশেষ কতকগুলি অধিকার বিলুপ্ত করিতে একদিকে যেমন বিষম উৎসাহী, অন্যদিকে তেমনি নিজেদের জন্য বিশেষ কতকগুলি সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণে ততোধিক উৎসাহী। সদস্যবৃন্দ নিজেদের বেতন এবং ভাতাবৃদ্ধি করিয়া লইলেন, দিল্লী শহরে বসত (কিংবা ভাড়া দিবার জন্য) বাড়ী নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রাধিকারও আদায় করিয়া লইয়াছেন, কোন প্রকার দ্বিধা লজ্জা বোধ না করিয়া। নিজেদের জন্য সুবিধা আদায়ে (যেমন ফ্রি টেলিফোন, রেল ও বিমান ভ্রমণ, বিনা ভাড়ায় বসতবাটি—কেবল নিজে ভোগ করাই নহে অনেকে এই বাড়ী বা ফ্ল্যাট ভাড়া খাটাইয়া থাকেন এবং অন্যদিকে অন্যদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার বিলোপে ইঁহারা কথায় কথায় তথা অভিহিত পবিত্র সংবিধান ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করেন না। এই মহাশয় সংসদ-সদস্যগণ কথায় কথায় দেশের গরীব দুঃখী এবং সদা অভাব জর্জ্জরিত জনগণের জন্য মায়া কান্নার মাত্রায় ধূলাবালী কর্দমাক্ত করিয়া তুলেন। কিন্তু দরিদ্রজনের প্রকৃত মঙ্গল সাধনে আমাদের ভাগ্য বিধাতারা—পার্লামেন্ট হাউসের অভ্যন্তরেই তাঁহাদের সমস্ত প্রয়াস প্রচেষ্টা প্রধানত বক্তৃতার মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন। কথা সর্ব্বস্ব অতি পণ্ডিত সদস্যবৃন্দ আজ পর্য্যন্ত প্রকৃত কাজের কাজ কি করিয়াছেন, নিজেরাই

একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন, সেই সঙ্গে ইহাও ভাবিয়া দেখিতে পারেন পার্লামেন্টে তাঁহাদের প্রচণ্ড ভাষণগুলিতে কতটুকু সার বস্তু থাকে! এবং এই সকল ভাষণ পাঠ করিয়া কিঞ্চিত লেখাপড়া জানা সামান্য বুদ্ধিমান সাধারণ মানুষ কি মনোহর মন্তব্য করিয়া থাকে তাহাতে দৃষ্টি দিবার কিংবা কর্ণপাত করার অবসর আমাদের সংসদ এবং রাজ্য সভার মাননীয় সদস্যদের নাই—তাঁহারা নিজেদের সুখ সুবিধা এবং স্বার্থসিদ্ধির কারণে সর্বদা এতই নিবিষ্টমনা এবং সদা ব্যস্ত! এই প্রসঙ্গে একজন বিখ্যাত লেখক এবং প্রকৃত মানব হিতৈষীর লেখা হইতে সামান্য উদ্ধৃত করা যথোচিত হইবে বলিয়া মনে করি। টমাস পেন বলেন:

'It is inhuman to talk of a million sterling (ভারতীয় মুদ্রায় কোটি কোটি টাকা) a year, paid out of the public taxes of any country' for the support of an individual (ভারতের সংসদ এবং বিধানসভার সদস্য' রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণ্ডলী, ইত্যাদি ইত্যাদি) whilst thousands who are forced to contribute thereto are pining with want and struggling with misery. Government does not consist in a contrast ,between prisons and labour, between poverty and pomp; it is not instituted to rob the needy of his mite and increase the wretchedness of the wretched...."

উপরের উক্ত প্রায় সব কয়টি অনাচার আজ আমাদের বহু ঘোষিত এবং স্ব-প্রশংসিত তথাকথিত কল্যাণ রাষ্ট্রে প্রকট হইয়াছে। একদিকে দেখিতেছি সরকার অনুগৃহীত ক্ষুদ্র এক শ্রেণীর লোক আরাম বিলাসে দিন যাপন করিতেছে, তা অন্যদিকে ভারতের শতকরা প্রায় ৮০।৮৫ জন মানুষ দিনান্তে এক পেটা আহারের জন্য ভিক্ষুকের মত হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। একদিকে কোন পরিশ্রম না করিয়াই অনুগৃহীতদের সুখের জীবন আর অন্যদিকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়াও দেশের জনতার বৃহত্তম অংশ প্রানান্তকর দারিদ্র্য এবং জীবন-যন্ত্রণা হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

আমাদের প্রধান মন্ত্রী ধনীর দুলালী কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার বিচিত্র "সমাজবাদ" ঘোষণা করিয়া ১৪টি বেসরকারী ব্যাঙ্ক সরকারী আওতায় আনিয়াই তাঁহার new socialism এর বহু ঘোষিত ক্রিয়া কর্ম্ম শেষ করিলেন। বর্তমানে তিনি এবং তাঁহার নূতন কংগ্রেসের চ্যালাচামুণ্ডার দল আবার কাহার কোন বেসরকারী সফল শিল্প সংস্থার সর্ব্বনাশ করিবেন, সরকারী আওতায় আনিয়া, দেশের পক্ষে সর্ব্বনাশকর এবং ব্যবসা বাণিজ্যের বিষম ক্ষতিকর বিবিধ পরিকল্পনার উদ্ভাবনে অতি-ব্যস্ত। প্রধান মন্ত্রীর সকল কর্ম্মে তাঁহার প্রধান সহায়—এ-যুগের ভোলানাথ নব কংগ্রেস সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী! (ইহার পূর্ব্বে কোন কংগ্রেস সভাপতি একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদে নিজেকে বহাল রাখেন নাই—কিন্তু ইন্দিরাজীর দয়াতে সবই সম্ভব হইতেছে)। এই ভাবে আর কতদিন চলিবে জানি না। তবে জনচিত্তে বিক্ষোভের কালমেঘ দেখা যাইতেছে—হঠাৎ কখন রাজনৈতিক ভূমিকম্পে দিল্লীর মসনদ ধ্বংস হইবে কেহ বলিতে পারে না।

"আজ বাঙলা যাহা ভাবে
কাল সারা ভারত তাহাই ভাবে—"

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহামতি গোখলে এই বাক্য উচ্চারণ করেন। কিন্তু গত কিছুকাল হইতে এ-বিষয় বাঙলা এবং বাঙালী একটু ঝিমাইয়া পড়ে—গত বৎসর হইতে হঠাৎ দেখা গেল বাঙলার সাময়িক নিদ্রা ভাঙিয়াছে এবং বাঙালী ও বাঙলার 'চিন্তা' সারা ভারতকে আবার সচকিত, চিন্তান্বিত করিয়াছে। দৃষ্টান্ত: নকশাল বাড়ী এবং নকশালপন্থীর দল যাহারা নিজেদের সি পি আই (এম এল) বলিয়া অভিহিত করিতেছে।

বাঙলার নকশাল পন্থীদের মতবাদ ঠিক কি তাহা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট নহে, কিন্তু এই নূতন 'রাজনৈতিক' দলটির ক্রিয়াকর্ম্মের সহিত আজ দেশবাসী

হাতে হাতে পরিচিত হইয়াছে এবং ইহাদের ভাবধারা এবং ক্রিয়া কর্ম্ম কেবল ভারতবর্ষেই নহে, সুদূর ফরাসী দেশেও কিছুসংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা অনুসৃত হইতেছে এমন সংবাদও পাওয়া গিয়াছে এবং ইহা দেখিয়া মনে করা যাইতে পারে যে নকশাল মতবাদে এমন কিছু বস্তু আছে যাহা এক শ্রেণীর যুব (এবং যুবতী) চিত্তকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিতেছে। এখানে ভালমন্দের কোন প্রশ্ন তুলিতেছি না, একমাত্র প্রশ্ন হইতেছে—নকশাল পন্থীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কেন এত প্রসার লাভ করিতেছে—। এ—প্রশ্নের জবাব কেহ দিবেন বা দিতে পারিবেন কিনা বলিতে পারি না।

নকশালীদের বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগ এই যে—ইহারা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং নেতাদের ছবি (এবং মূর্তিতে) আলকাতরা লেপন করিয়া নষ্ট করিতেছে, বহু স্থানের গ্রন্থাগার পুড়াইয়া দিতেছে—এবং এই প্রকার আরো বহু ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া কর্ম্ম নিযুক্ত আছে। কিন্তু আজ নকশালীরা কি নূতন কিছু অন্যায় (!) বা কালিলেপন কাজ করিতেছে?

দেশের লোক, বিশেষ করিয়া "গান্ধীজিবী" কংগ্রেসীরা গত ২২।২৩ বৎসর ধরিয়া গান্ধীর নামে যে কালিলেপন করিয়াছে, নকশালীরা তাহার হাজার অংশের এক অংশও করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। মুখে অহরহ গান্ধী নাম লইয়া কংগ্রেসীরা নেহরু আমল হইতেই গান্ধী নামকে জনচিত্তে ঘৃণ্য করিয়া তুলিতে দ্বিধা করে নাই। গান্ধীর আদর্শকে সবদিক হইতে খর্ব্ব করিয়া ভক্তের দল নিজেদের কোথায় নামাইয়াছেন, (এবং সেই সঙ্গে মহাত্মাকেও) তাহা আমরা তথা দেশের সাধারণ মানুষ আজ ভাল করিয়া জানি।

আর সুভাষচন্দ্রের কথা? যে বিশেষ রাজনৈতিক দলের একমাত্র উপজিবীকা সুভাসের নাম, সেই দলই আজ কেমন করিয়া নেতাজীর কুৎসাকারী, নেতাজীর অপমানকারী কমিউনিষ্ট পার্টি দুটির সহিত, রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে, সাধনে এবং নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে, কোন্ মুখে সহাবস্থান প্রয়াস করিতে পারে, তাহা আমার বুঝিতে পারি না!

সুভাষচন্দ্রকে যাহারা বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী পোষা কুকুর, "কুইস্‌লিং," দেশদ্রোহী এবং ক্ষমতা লোভী স্বার্থপর নেতা বলিয়া অভিহিত করে, নেতাজীকে ধরিতে পারিলে যাহারা জীবন্ত কবরদিবার হুমকীও দেয়, সেই সি পি আই (তৎকালীন এই পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হয় নাই) দলের সহিত নেতাজী প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লক কেমন করিয়া আজ নিজেদের আদর্শ বিসর্জন দিয়াই নেতাজীকে বিদ্যাধরীর পলি জলে ভাসাইয়া দিয়া অবলীলাক্রমে একই সঙ্গে, একই মঞ্চে আরোহণ করিয়াপরমানন্দে রাজনৈতিক খেমটা নৃত্যে মশগুল হইতে পারে—তাহা অতি কমবুদ্ধি সাধারণ লোকের পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব। আজ বলিবে ইচ্ছা করে—

রাজনীতির বিচিত্র কাণ্ড
গোড়া নাই আগা—
সুবিধামত অচেতন, সুবিধায় জাগা।

তথাকথিত ভদ্র এবং আইন মান্যকারী রাজনৈতিক দলগুলি যে মহৎ কর্ম্ম—অর্থাৎ গান্ধী, সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য বরেণ্য নেতাদের শ্রাদ্ধক্রিয়া বহুদিন ধরিয়া অবিরল করিয়া আসিতেছে আজ নকশালীরা সেই মহত পুণ্য কর্ম্মে যোগদান করিয়াছে বলিয়া এত হৈ চৈ করিবার কারণ খুঁজিয়া পাই না! একদিক হইতে, একটা বিশেষ দৃষ্টি কোন্ হইতে বিচার করিলে নকশালীদের কিছু প্রশংসাও অবশ্যই করা যায়! নকশালীরা আর যাহাই হউক, তাহারা কোন প্রকার রাজনৈতিক ন্যাকামোর ধার ধারে না। ইহাদের মতবাদ এবং কর্ম্ম পদ্ধতিকে সোজা কথায় বলা যায়—"ধর! মার"! প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা প্রয়োজন, একটি বিশেষ উগ্রপন্থী তীব্র লাল রাজনৈতিক দল, গোপনে নকশালীদের সর্ব্ব প্রকার উৎসাহ দিতেছে, আবার প্রকাশ্যে বলিতেছে তাহারা নকশালীদের কাজ কর্ম্ম এবং মতবাদের সমর্থক নহে! এই বিশেষ দলটি পরের হাতে তামাক খাইতে

অতি অত্যন্ত। এই বিশেষ মার্কস্-ভক্ত পার্টি পশ্চিমবঙ্গে গত দুই বৎসর ধরিয়া নকশালীদের অপেক্ষা কোন অংশে কম উপদ্রব এবং নরহত্যা সহ শান্তি এবং জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করিতেছে না, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই পার্টি, পার্টি নেতা এবং সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ এমন কি নিন্দা সূচক কোন বাক্যও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কর্তা করিতে ভরসা পাইতেছেন না। আমাদের রাজ্যপাল ত পরম উৎসাহ উচ্ছ্বাসে এ-রাজ্যের তথা সর্ব্ব ভারতীয় সি পি এম নেতা এবং প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে দেশের গৌরব এবং প্রশাসনিক মহাবীর বলিয়া ঘোষণা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই! স্বীকার করিতে হইবে পরম পণ্ডিত এবং অতি মাননীয় শ্রীযুক্ত ধাবনের অনুধাবন শক্তি অতি তীক্ষ্ণ এবং সুদূর প্রসারী!

পুলিসের কর্ত্তব্য কি ?

পশ্চিমবঙ্গে যখন চীনা চেয়ারম্যান মাও সে তুঙের মতবাদ গ্রহণ করিয়া এক দল সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী পরম ধীরস্থসহ এবং বেপরোয়া ভাবে দিনের পর দিন যথা ইচ্ছা ধ্বংসাত্মক কার্য চালাইয়া যাইতেছে, স্কুল কলেজ, সিনেমা তছনছ করিতেছে, ট্রাম 'বাস পুড়াইতেছে, পিস্তল, বন্দুক, বোমা প্রভৃতির ব্যাপক ব্যবহারে শত শত নিরীহ ব্যক্তিকে খুন জখম করিতেছে এবং বিদ্রোহের হুমকীর সঙ্গে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ড্রেস রিহার্স্যাল দিতেও কসুর করিতেছে না, সেই সময় পুলিসের কর্ত্তব্য, জন স্বার্থের খাতিরেই কঠোরতম হস্তে এই সব অনাচার দমন করা এবং এই দমন কাজে পুলিশের উচিত 'সুট্ টু-কিল'—পদ্ধতি গ্রহণ করা। বামপন্থী কয়েকটি দল পুলিসকে এই ক্ষমতা দিতে রাজী হওয়া-না-হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না, কারণ বিশেষ যখন দু-চারিটি বাম পন্থী রাজনৈতিক দল, দেশের শান্তি চায় না'ও তাহাদের প্রধান কাজই হইল "ঘোলাজলে মাছ ধরা"!—

কিন্তু কেন্দ্রসরকার নকশালীদের নিষিদ্ধ দলব লিয়া কেন ঘোষণা করিতেছেন না? পি ডি অ্যাক্টজারীর দাবি বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার করিয়াছেন কিন্তু প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ার এ-সব বিষয়, সামান্ত বিষয়, চিন্তা করিবার সময় কম, বিদেশে ভারতের মহিমা প্রচার এবং সেই সঙ্গে নিজের গদি সংরক্ষণ প্রভৃতি অতিগুরুতর রাজ-কার্য্য লইয়া তিনি নিজেকে অতি কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিতরাখিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, পি ডি অ্যাক্টজারি করা হইলে তাঁহার পরম সমর্থক গণপন্থী দলগুলি, বিশেষ করিয়া সি পি আই এবং সি পি এম, মনে ব্যথা পাইবে কিনা তাহাও মাতাজী ইন্দিরাকে অবশ্যই চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে বৈকি। প্রধান মন্ত্রীরকাজ এবং দায়িত্ব আমরা যত সহজ এবং সরল মনে করি প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে 'যার ব্যথা সেই জানে' কি জানে পরে? সে সে যাহাই হউক—আসল কথা—

সি পি এম তাহাদের এক বছরের (অ)রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গের পুলিসকে কেবল বেকার নহে, অথর্ব্ব করিয়া গিয়াছে। পুলিশ মহলের সর্ব্বস্তরের সকলের মনে এই ধারণাই সৃষ্টি করা হয় যে সি পি এমের সামান্ত একজন পদাতিকের হুকুমও পুলিসের বড় কর্তাদেরও অবশ্যই নতশিরে পালন করিতে হইবে এবং তাহা না করিলে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে—অপদস্থ অপমানিত হইতে হইবে। বহুক্ষেত্রে ইহা বাস্তবেও হইয়াছে। কর্ত্তব্যরত পুলিশ কনেষ্টবলদের খাটিয়াতে শয়নাবস্থায় সি পি এম কর্ম্মীকে দীর্ঘ ৬।৭ মাইল পথ বহন করিয়া যাইবার দৃষ্টান্ত আছে! একদা পরম প্রতাপশালী পুলিশ কনষ্টেবলকে সি পি এমের পালকী বেহারাতেও রূপান্তরীত হইতে হইল! রাষ্ট্রপতির শাসনে আসিয়াও রাজ্যপুলিস এখনও সহজ নির্ভয়চিত্ত হইয়া তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিতেছে না। পুলিসের মনে এই আতঙ্ক রহিয়াছে যে আবার হঠাৎ যদি সি পি এম নেতা নূতন নির্ব্বাচনের জোরতে গদি দখল করিয়া পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হইয়া পুলিস দপ্তরের ভার লইতে পারেন, তাহা হইলে আজ যেসব পুলিশ (ছোট বড় সবাই) তাহাদের নির্ব্বাচিত কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, তাহাদের সায়েস্তা করিতে কোন দ্বিধা, লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিবেন না! পুলিসকে সি পি এম তথা জ্যোতি-জয়

মুক্ত না করা পর্যন্ত রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা এবং জন নিরাপত্তার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া মনে করি।

সি পি এম নেতা এই নির্দেশও তাঁহার দলীয় পদাতিক এবং সমর্থকদের জারি করিয়াছেন যে—রাষ্ট্রপতির শাসনকালে আজ যে সকল পুলিস (সর্বস্তরের) সি পি এমের দলভুক্ত জনসেবক এবং গণভৃত্য এবং অন্যান্য কর্মীদের "নির্য্যাতীত" অর্থাৎ বেআইনী ক্রিয়াকলাপের জন্য ধরপাকড় করিতেছে, তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিতে, সম্ভব হইলে সি পি এম কর্তাদের দপ্তর নথিভুক্ত করিতে। যথা সময়ে এই সকল বেয়াড়া কিন্তু কর্তব্য-পরায়ণ পুলিসের বিরুদ্ধে দলপতি গণরাজ মহাশয় তাহাদের সম্পর্কে যথোপযুক্ত সি পি এম নির্দ্ধারিত আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। অতএব পুলিস সাবধান! হঠাৎ মোহগ্রস্ত হইয়া ভবিষ্যত ভুলিয়া কেবল বর্তমানকে লইয়াই মত্ত হইও না!"

পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের যে রকম অবস্থা, মনে যে প্রকার অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্ক দেখা যাইতেছে তাহার একমাত্র প্রতিকার হইবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিসকে (সাময়িক ভাবে) তামিল নাড়ু, অন্ধ্র কিংবা গুজরাট রাজ্যে বদলী করিয়া সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পুলিস বাহিনীকে পশ্চিমবঙ্গে আনয়ণ করা অবিলম্বে। আর তাহা সম্ভব না হইলে (হইবে না জানি) এ-রাজ্যে অন্তত পাঁচ বছরের জন্য সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত করা। আমাদের বিজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ রাষ্ট্রপতি এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীরও সর্বাধিনায়ক, কাজেই তাঁহার পক্ষে এ রাজ্যে সাময়িক-ভাবে সংবিধান শিকায় তুলিয়া রাখিয়া তিনি সামরিক শাসন অবশ্যই কায়েম করিতে পারেন। তাঁহার পরম স্নেহের আদরিণী প্রধানমন্ত্রী ভারতমাতা ইন্দিরা রাষ্ট্রপতির নব ব্যবস্থা গ্রহণে অবশ্যই বাধা দিবেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, একটা রাজ্যের কল্যাণ সাধন রাষ্ট্রপতির কাছে ইন্দিরা-কল্যাণ কামনা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান এবং শ্রেয়তর বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা বাজে চিন্তা করিতেছি—বর্তমান ভারতে উচিত হইয়াছে অনুচিত, শাদা হইয়াছে কালো!

জন্ম-জন্মান্তর

(উপন্যাস)

রামপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই ঘন ধোঁয়ার রাশি অপসারিত হল—আটশো মাইল দূরের একটা খানদানী শহর লাহোরে। দেখা গেল পরিষ্কার দিনের আলোয় রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছে কিশোর মহেশ। দীর্ঘদিন ধরে হেঁটে চলেছে—ক্রমশঃ উত্তরমুখে। কত তীর্থভূমি গ্রাম জনপদ পার হয়ে এসেছে—কত নদী প্রান্তর অরণ্য পর্ব্বত তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে—মহেশ থামে নি, একমনে চলেছে সামনে। কোন্ পথ, কি লক্ষ্য, কি বা উদ্দেশ্য স্পষ্ট নয়—চলেছে তো চলেইছে। সে বুঝি ভারতবর্ষে আর থাকবে না। হিন্দুকুশ পার হয়ে আর কোন রাজ্যে চলে যাবে। গান্ধারে, কাবুলে—বাগদাদে কিংবা এশিয়া ছাড়িয়ে অন্য মহাদেশে? অকুতোভয় কিশোর চলেছে তো চলেইছে। পথের মাঝে সরাই আছে—ধর্মশালা আছে—দয়ালু আশ্রয় ও অন্নদাতা আছে। পথ কোন ধর্মের চিহ্নে চিহ্নিত নয়—মন্দির মসজিদ বা গীর্জ্জার সম্পত্তি নয়, ধনিকের খাসতালুকের গর্ভে ওঠেনি। নামটা রাজপথ হলেও রাজ-এক্তিয়ারে পড়ে না, জনতারই সম্পদ। কিশোর ছেলে—অজানা মুলুক—ভাষা ও মানুষজন সম্পূর্ণ অপরিচিত, তবু আশ্চর্য্য কার উপরে ঠাঁই নিয়েছে হৃদয়। মানুষের হৃদয়ের প্রকাশ মুখের আয়নায়। ক্লেশ, ক্ষুধা, বাৎসল্য, প্রীতি, তৃষ্ণা, বিতৃষ্ণা যাবতীয় মনোবৃত্তির ছায়া ভাসে ওই আয়নাতে। উজ্জ্বল আয়নায় ছায়া ফেলে, ছায়া চিনে সহায় নিঃসম্বল কিশোর এক দেশ পার হয়ে অন্য দেশের পথ ধরে অনায়াসে। এমনি করে এই যাত্রার শেষ কোথায় হল—স্মৃতির অধ্যায়ে তা লেখা রইল না। ইতিহাস-জ্ঞান ছিল না কিশোরের—স্থানের নাম বা ব্যক্তির পরিচয় চঞ্চল মনে কাঁচা কালির দাগ। পথ চলতে চলতেই মিলিয়ে যায়। হাঁ—তবে মনে আছে এক সময়ে ভারতবর্ষের সীমা ফুরিয়ে গিয়েছিল। রেল-লাইন শেষ হয়েছিল। অনুর্ব্বর রুক্ষ পাহাড়ের উদ্ধত ভঙ্গী অতিশয় অকরুণ বোধ হয়েছিল—ক্রমশঃই যেন বিপদসঙ্কেত ঘনীভূত হচ্ছিল। ঝোল্লা-ঝাব্বি পরা লম্বা দাড়িওয়ালা বন্দুক কাঁধে এক দীর্ঘকায় পাঠান সর্দার ফিরে যাবার কথাই বলেছিল। ও শোনেনি। অগত্যা একখানা চিরকুট লিখে ওর হাতে দিয়ে বলেছিল—কেউ বন্দুক হাতে তেড়ে এলে তার হাতে যেন এখানা দেয়। তাই করেছিল কিশোর। পরে জেনেছে—সেটা আফ্রিদি মুলুক। ব্রিটিশ প্রভুদের সঙ্গে পাঠানদের সম্বন্ধ সাপে-নেউলের মত। জঙ্গী মানুষরা ওপারে পৌঁছতে পারে না—বন্দুকের নিশানা ওদের অব্যর্থ। ওই মুলুকে রাশি রাশি বোমা ফেলেও ওদের জব্দ করতে পারেনি ইংরেজ। কিশোর কিন্তু ওই মুলুকে গিয়েছিল—। সেই চিরকুটের লেখাটাই ছিল রক্ষাকবচ। ওপারের সর্দার ওকে জানিয়েছিল—আর এগিয়ো না—মারা যাবে। শুধু শত্রু মারার আনন্দ নয়—মানুষ তা সে যে বয়সেরই হোক না কেন—ছেলে বুড়ো জোয়ান—যে অবস্থারই হোক তাকে মারার আনন্দও কোন কোন

মানুষের নেশা। চোখের সামনে দুই একটা ঘটনা দেখলও। নিঃসহায় করুণ মৃত্যু দেখে নির্বিকার ভাবটা কেটে গেল। সেই সদাশয়ের কাছ থেকে আর একখানা চিরকুট যোগাড় করে ফিরে এলো কিশোর। তারপর আবার লাহোর-অমৃতসর-জলন্ধর-শাহারাণপুর—আরও অনেক নামকরা জনপদ পার হয়ে পৌঁছলো বৃন্দাবন-ধামে।

এইখানে যে ঘটনাটি ঘটলো আজও তা স্মৃতির পাতায় অতিশয় উজ্জ্বল। দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণে—আহার নিদ্রা বিশ্রামের বিপর্যয়ে শরীর-যন্ত্র ক্রমশঃই বিকল হয়ে আসছিল। শুধু অদম্য মনোবলে আহার নিদ্রার অনিয়মকে গ্রাহ্য করে নি মহেশ। যে প্রবল শক্তি তাকে ঘর থেকে টেনে পথে নামিয়ে লক্ষ্যহীন পদচারণায় বেগ সঞ্চার করেছিল—শুভাশুভ বোধ এবং সুখ-দুঃখের হিসাব-নিকাশ ভুলিয়ে দিয়েছিল—সেই প্রবল গতিবেগই এখন যুক্ত হল গৃহমুখী পথাতিবাহনে। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম নীতি স্বভাবতঃই শিথিল হল। শুধু শিথিলই নয়—শরীর সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উদ্বেগও রইল না। ফলে সঞ্চিত অনিয়মের ধাক্কাটা এসে পড়ল বৃন্দাবনধামে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই। তার দুদিন আগে থেকেই চলছিল নামমাত্র আহার—। শুধু চানা আর জল। দু'খানা শুকনো বাসি রুটিও যেন এক সময় উদরস্থ হয়েছিল। বৃন্দাবনে কোন আশ্রয়ে পৌঁছবার আগেই—বিজন একটি মাঠের মাঝখানে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হল পেটে। মনে হল পেটের নাড়ীগুলো বাত্রিশ বাঁধন ছিঁড়ে মুচড়ে দুমড়ে বার হয়ে আসতে চাইছে। তার টানে সারা শরীর দু'ভাঁজে কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে—। অসহ্য যন্ত্রণা! অবসন্ন দেহে মাঠের ধুলার উপরে বসে পড়ল মহেশ। বসেও শান্তি নাই লুটিয়ে পড়ল ধুলায়। হায় ভগবান! সুদীর্ঘ পথযাত্রার এই কি শেষ পর্ব!

তখন গোধূলিবেলার আবছা অন্ধকার নেমেছে চারদিকে। সত্যিই সেটা গোধূলির ছায়া, না অবসন্ন দেহে চৈতন্যের বিদায়সঙ্কেত। ক্রমশঃ বেদনাবোধের উগ্রতায় অনুভূতি মূর্চ্ছাতুর। মহেশ বেশ বুঝতে পারছে আর সামান্যক্ষণই পৃথিবীর স্পর্শ তার চৈতন্যকে জাগিয়ে রাখবে—; পৃথিবীর রূপ ক্রমশঃ মুছে যাচ্ছে, আলো নাই, গন্ধ নাই, শব্দ ব্যঞ্জনাহীন, শুধু একটানা সাঁ সাঁ ধ্বনি-তরঙ্গ মূর্চ্ছার আবেশে দেহযন্ত্রকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। এ এক অসহ্য মুহূর্ত! দীপশিখা নিভে যাবার আগে যেমন কেঁপে কেঁপে ওঠে—যেন ছায়ার গ্রাসে পড়ে আলোর অন্তিম অসহায় আকুলিবিকুলি।

আলো নিভে যাবার আগে মনে হল কে যেন পাশে এসে দাঁড়াল। সে যেন হাঁটু গেড়ে বসল—আস্তে আস্তে মাথাটি তুলে নিলে তার কোলে। মাথার উপরে একখানি হাত রেখে শুধোলো, কি হয়েছে তোমার? খুব কষ্ট হচ্ছে কি?

চোখ দিয়ে তখন দরদর ধারে জল পড়ছিল—কথা বলার শক্তি ছিল না—অসহায়ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে জানাল মহেশ—বড় যন্ত্রণা।

ভয় কি—এই জলটুকু খেয়ে ফেল তো। হাঁ কর। বাস—ঠিক হয়েছে।

জল, না ওষুধ দিলেন ধন্বন্তরী স্বয়ং, মন্ত্র পড়ে কে যেন অসহ্য ব্যথাকে জল করে দিলে। নিভতে নিভতে শিখাটি আবার প্রদীপের মুখে স্থির হল। মহেশ পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন বলতে গেল—মূর্তি কথা কইতে নিষেধ করে বললেন, কিছু খাবে?

প্রশ্ন করে উত্তরের অপেক্ষায় রইলেন না—নিজের উত্তরীয়ের ভাঁজ খুলে একখানা মোটা রুটি বা'র করে—আধখানা ছিঁড়ে নিলেন। তারপর সেই টুকরোটা ওর মুখের সামনে ধরে বললেন, খাও।

মহেশের এখন পূর্ণজ্ঞান। সে স্পষ্ট দেখতে পেলে রুটির চেহারা। আধপোড়া, মোটা, শক্ত। নিশ্চয় তিন চার দিনের বাসি। পেটের এই অসহ্য যন্ত্রণার হেতু দিন দুই আগে খাওয়া সেই রুটিদুখানার চেহারা

স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভীত মহেশ আর্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আধখানা রুটির পানে।

মূর্তির পানেও চাইল পরক্ষণে।

পরনে গৈরিক বসন নাই ; আধময়লা খাটো ধুতি, কাঁধে ফেলা তেমনি আধময়লা উড়ানি—গায়ের রঙ সে-ও তেমনি উজ্জ্বল নয়—আধময়লাই যেন! কিন্তু কি আশ্চর্য দুটি চোখ—! তারই শোভায় কিশোরের মেদুর-লাবণ্য মুখমণ্ডলে! শুদ্ধ-পবিত্র শান্ত, পরম নির্ভরযোগ্য একটি আশ্রয়। সন্ন্যাসী নয়—অথচ গৃহাশ্রমেও ওঁকে কল্পনা করা যায় না। চমৎকার মধুরস্বরে উনি বললেন, ভয় কি, খেয়ে নাও। তুমি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছ, খেলে বল পাবে।

হাত বাড়িয়ে রুটি নিলে মহেশ। বিনা দ্বিধায় সবটা খেয়ে ফেললে—।

মূর্তি বললেন, এখন নিশ্চয় উঠতে পারবে। আমার সঙ্গে এসো।

এখন একটু আগেকার অসহ্য যন্ত্রণার কথা ভুলে গেছে মহেশ—সহজ মানুষের মত উঠে দাঁড়িয়েছে এবং পুরোবর্তী মহাত্মাকে (এই দণ্ডে—এই বিশেষণটি যথাযথ মনে হল)' অনুসরণ করে পথ চলছে।

এখন অন্ধকার বেশ ঘন হয়েছে—দিগন্তব্যাপী মাঠ কূলকিনারাহীন সমুদ্রের মত লাগছে। এই তমিস্রা দরিয়ায় কোথায় আশ্রয়—কোন পথে চলেছে—ইনিই বা কে—এইসব প্রশ্ন মনকে আকুল করছে না।

ওঁকে অনুসরণ করে একটি কুটিরের দুয়ারে এসে পৌঁছল মহেশ।

কুটিরে আসবাবপত্র নাই বললেই চলে। শুধু মেঝেয় একখান কম্বল বিছানো ; চাদর উপাধান কিংবা শয্যার আর কোন সাজ-সরঞ্জাম নাই। ঘরের দেয়াল মাটির—প্রসাধনহীন শরীরের মত খাঁ খাঁ করছে। তাক নাই, শিকা নাই, খাটিয়াও নয়—ঘরের মেঝেতেও উল্লেখযোগ্য তৈজসপত্র ছড়ানো শুধু এক কোনে একটা মাটির কলসীতে জলভরা, একটা মাটির ভাঁড়—জল পানের জন্য। একটি কাঠের তেড়াকায় মাটির প্রদীপ জলছে। শিখাটি অনুজ্জ্বল, কিন্তু অকম্পিত। তারই ছায়া-ছায়া আলোয়—অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

আপনি কে? অনেকক্ষণ অভিভূতের মত চেয়ে থেকে প্রশ্ন করল মহেশ।

মূর্তির মুখে হাসি ফুটল, কোন উত্তর এলো না। সেই মুহূর্তে মহেশের মনে হ'ল—প্রশ্নটা কি দুষ্ট হল? স্থান কালের উপযোগী নয়? আমি কে—এই প্রশ্ন তো অনাদি কালের। প্রথম মানুষ এই নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিল। এই প্রশ্নের ধারাপথ বেয়ে আরও বহুতর প্রশ্ন ভিড় জমিয়েছে মানুষের মনে। তারই উত্তর খুঁজতে গিয়ে সভ্যতা আজ তুঙ্গস্থানে। জীবন-জিজ্ঞাসায় এই স্রোত ধারায় অবগাহন করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে মানুষ, আবার ঈশ্বরকে নস্যাৎ করেও দিয়েছে। এমন অনেক কথা বাবার মুখে বহুবার শুনেছে, ভাগবত আসরেও শুনেছে। কিশোর-মনে কল্পনায় অনেক রঙ ধরেছে। স্বতোৎসারিত এই জিজ্ঞাসা নিশ্চয় অবান্তর নয়। কিন্তু উনি অমন করে হাসলেন কেন? আর একটি প্রশ্ন করতে গিয়ে আশ্চর্য হল মহেশ, ঘরে কেউ নেই—সে একাই শূন্য দেয়ালের পানে চেয়ে বসে আছে।

আকাশ পাতাল ভাবনা করতে করতে খুবই অস্থির হয়ে উঠল। অবশেষে সে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

এমনি করে সপ্তাহখানিক কাটল। মহাত্মা কখন আসেন—কখন চলে যান বুঝতে পারে না মহেশ। কেই বা রান্না করে—কোথা থেকে রুটি কালুয়া তরকারি আনে—কলসীতে কখন জল ভরা হয়—শৌচকর্মের জলই বা কে যোগায়, কিছুই বুঝতে পারে না মহেশ। অথচ দৈনন্দিন কাজগুলি যথানিয়মে সুসম্পন্ন হয়।

কুঁড়ের বাইরে এসে দেখে—অসীম বিস্তার ধূ ধূ মাঠ-আকাশ অবারিত দিকসীমাকে আলিঙ্গন করেছে—এই মাঠে বনঝোপ কম—, বালুময় ভূমিতে যে কণ্টক-

ন্ম জন্মায় তাও নাই। ব্রজমণ্ডলের সীমানার ধ্যেই আছে তো, না অন্য কোথায়?

একদিন সন্ধ্যাবেলায় মহাত্মার জিজ্ঞাসা করল, এ জায়গার নাম কি?

ব্রজমণ্ডল। উত্তর দিলেন মহাত্মা।

ব্রজমণ্ডল যদি গোবিন্দজীর মন্দির কই!

মন্দির দেখতে চাও?

'দেখাবেন?' 'বেশ আমার সঙ্গে এস।'

এখন যে অন্ধকার হয়ে গেছে।

'হোক না আমার সঙ্গে এস।'

দশ হাত দূরে মহাত্মা চলেছেন—পিছনে মহেশ। মাঠ আর শেষ হতে চায় না। কিন্তু অন্ধকারে মাঠ বন পথ ঘাট সবই তো লেপে পুঁছে একাকার। তবু চলেছে মহেশ—সামনে ওঁকে লক্ষ্যে রেখে। কিন্তু সব সময় সেই লক্ষ্যই কি দৃষ্টিপথলব্ধ হচ্ছে! এক একসময়ে উনি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন—অমনি পথ হারানোর ব্যাকুলতায় মহেশ শিউরে উঠছে। এই করাল অন্ধকার একবার যদি গ্রাস করে—কখনই কি পৌছতে পারবে আলোর রাজ্যে?

অমনি ব্যাকুলকণ্ঠে শুধোচ্ছে মহেশ, আপনি কোথায় —আমি যে পথ দেখতে পাচ্ছি না।

এই তো আমি। আবছা অন্ধকারে মূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পথ হারাবে কেন—সামনে—শুধু সামনে চল। বাঁয়ে হেলবে না, দক্ষিণেও নয়, শুধু সামনে। সমর্পিত চিত্ত, এক মন, এক চিন্তা—পথ হারাবে না।

এমনি করেই গোবিন্দজীর মন্দিরে এসেছিল মহেশ —আবার মন্দির থেকে কুটিরে পৌঁছেছিল ওইভাবে। পথ হারানোর ভয় আর পথ নির্দেশের আশ্বাস দুইয়ের মাঝে দোলা খেতে খেতে অনেকবার দেবদর্শন হল।

একদিন বাঁকে লালের মন্দিরে আরতি দেখতে দেখতে কেমন ক্ষুধাবোধ হল। ভাবল—আহা, আজ যদি ঠাকুরের প্রসাদ পেতাম—গরম পুরী আর হালুয়া। কত অকিঞ্চন মানুষকে কে প্রসাদ দেবে। ভোগের জন্য অর্থদান তার সাধ্যাতীত, সুতরাং এই সাধও তার পুরবে না। ভাবতে ভাবতে মন্দিরের বাইরে এসেছে—অমনি কোথা থেকে মহাত্মা এসে দাঁড়ালেন সামনে। হাতে ওঁর শালপাতার ঠোঙা।

সেদিকে চাইতেই বললেন, ধর। বাঁকে বিহারীর প্রসাদ।

প্রসাদ! আপনি কোথায় পেলেন?

হাসলেন মহাত্মা। সেই রহস্যময় মধুর হাসি। যেন বললেন, তোমার ইচ্ছার রূপটি আমার অগোচর নাই, আমি সব জানি। নাও—ধর।

হাত বাড়িয়ে প্রসাদ নিলে মহেশ—উনি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। প্রসাদ খাওয়া শেষ হল তো ঠিকানায় পৌঁছানোর সমস্যা। রাত অন্ধকার, পথ নিশানাহীন। আকুল হয়ে উঠতেই সামনে দেখে মহাত্মা মৃদু মৃদু হাসছেন। ইশারায় জানালেন সামনে অগ্রসর। আমার সঙ্গে এসো।

মহেশের মনে একটি ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ়মূল হল। এর সবটাই অপ্রাকৃত—অলৌকিক ব্যাপার। এ কি সেই কাহিনী যা ছেলেবেলায়—ভাগবতের আসরে কয়েক-বারই শুনেছে।

অদ্যাপিও সেই লীলা করে কৃষ্ণ রায়।
কোন কোন ভাগ্যবন্ত দেখিবারে পায়॥

কৃষ্ণলীলা কোন কাহিনী নয়, কবির কল্পনা নয়, কোন যুগের ইতিহাসও নয়। এই লীলা নিত্য কালের—ভাগ্যবন্ত মানুষের কাছে অতিশয় বাস্তব। সেই ভাগ্য তার কি হয়েছে? না হলে ওই মহাত্মার আশ্রয় লাভ করবে কেন!

জীবনসংশয় পীড়া থেকে ত্রাণ করে ইনি আশ্রয় দিয়েছেন, সেইটিই তো অহেতুকী করুণা। এই করুণা ধারায় স্নান করে ধন্য হয়েছে মহেশ। এখন চোখ খুলে মন খুলে এই করুণার স্বরূপটি বুঝতে হবে। এ সুযোগ বার বার আসবে না একবার ভুল করলে জীবনভোর অনুতাপে জ্বলতে হবে। না—ভুল করবে না

মহেশ। বৃথা এত পরিশ্রম, ক্লেশকর পর্যটন, দূরের নেশায় ঘর ছাড়ার সংকল্প যদি লক্ষ্যেই না পৌঁছতে পারা গেল এই সঙ্গ—সাধুসঙ্গ কোন মতেই ছাড়বে না মহেশ। প্রাণ গেলেও—না।

এই রকম চিন্তায় মন যখন উতল পাথাল সেই সময় মহাত্মা একদিন বললেন, মহেশ, তোমার ঘরে ফিরবার সময় হ'ল—এবার ফিরতে হবে।

মহেশ অত্যন্ত বিষম আঘাত খেয়ে চমকে উঠল, ঘর! মাথা নেড়ে জানাল ঘরে আর ফিরবেনা সে। হেসে বললেন মহাত্মা, ঘরে ফিরবে না থাকবে কোথায়?

অল্প অল্প মাথা দুলিয়ে হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, বাবা। এত অল্প বয়সে এ পথে কেন? ফিরে যাও ঘরে।

মহেশ কাঁদতে কাঁদতে বলল, না আপনার এখানে থাকব। আমায় দীক্ষা দিন।

হাসলেন মহাত্মা, দীক্ষা!

কেন অল্প বয়সে কেউ কি দীক্ষা পায় না?

উনি বললেন, দীক্ষার তো বয়স নাই ধ্রুব পাঁচ বছর বয়সে হরিকে লাভ করার জন্য ঘর ছেড়েছিল। প্রহ্লাদও ছেলেবেলায় সংসারবিরাগী হয়েছিল।

তবে? অধিকতর আগ্রহে প্রশ্ন করল কিশোর।

উনি ঈষৎ হেসে বললেন, কিন্তু ধ্রুব হয়েছিলেন, ধ্রুবলোকের রাজা,—প্রহ্লাদ তাঁর পিতৃরাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রাক্তন কর্ম তাঁদের ভোগভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

কিশোর মাথা নাড়ল, আমি সংসারে থাকতে চাই না।

চাও না - কেন না সংসার তোমাকে আঘাত দিয়েছে আঘাত পেয়ে যে ত্যাগ বাসনা তার আয়ু তেমন দীর্ঘ নয়। তোমার সর্বাঙ্গে এখনও ভোগের ছাপ—সংসারের পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে তোমাকে।

কিন্তু সংসার আমার ভাল লাগে না।

সাধু হাসলেন, কেন? সংসারই তো সাধনার ক্ষেত্র। সে ক্ষেত্র অতিক্রম করার শক্তি তোমাকে অর্জন করতে হবে, পারবে তুমি। তবে এখন নয়। এখনও অনেক ভোগ তোমার সামনে—ফিরে যাও।

একটুখানি চিন্তা করে কিশোর বলল, ফিরে যাব, তার আগে দীক্ষা দিন।

দীক্ষার সময় এখনও আসেনি, তা ছাড়া আমি তোমার গুরু নই। নির্দিষ্ট সময়ে তোমার গুরুলাভ হবে—তুমি শক্তি অর্জন করবে। তার আগে অনেকখানি দীর্ঘ পথ তোমায় পাড়ি দিতে হবে। যাও বাবা ফিরে যাও। চল, আজই তোমাকে টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।

ফিরে আসার আগে সাধু বললেন, মন দিয়ে লেখাপড়া করবে—জেনো বিদ্যার্জনও ধর্ম। সংসারে অর্থকরী বিদ্যারও প্রয়োজন আছে। অর্থ শুধু অনর্থেরই হেতু নয়, ধর্ম অর্জনেরও সহায়ক। চতুর্বর্গের একটি হল অর্থ। ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

বৃন্দাবন থেকে আরও দুই একটি তীর্থ সেরে নিজের দেশে ফিরে এল মহেশ।

এখন সংসারের অন্য মূর্তি। মহেন্দ্রকে মনে হল স্নেহশীল—। দীর্ঘ অদর্শনের পর ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন না, কঠোর তিরস্কার করলেন না, কোন প্রশ্ন নয়। প্রতিদিন যেমন সহজভাবে কথাবার্তা হয় তেমনি ভাবেই বললেন। মনে করছি একজন মাষ্টার রাখব তোর জন্যে। উঁচু ক্লাসের পড়া একলা একলা অসুবিধা হবে।

মহেশ উৎফুল্ল হয়ে মাথা নাড়ল।

*

যোগাযোগ ঘটলো আশ্চর্যভাবে। মাষ্টারের নাম নিরঞ্জন গোঁসাই। সংক্ষেপে গোঁসাই। গোঁসাই-এর সংসার বলতে ছাত্রের দল। বাপ মা আত্মীয়স্বজন —কেউ নাই। বাড়ীঘর নাই। কবে শহরে এসে বাঙালী টোলার এই একতলা ঘরখানিতে প্রাইভেট টিউশনের আখড়া খুলেছে—সে হিসাব কারও কাছে

মিলবে না। তবে শহর ছাড়িয়ে বহু দূরে একটা নির্জন পড়ো বাগিচায় এক মহাত্মা থাকতেন সে সংবাদ অনেকেরই জানা। তিনি শিষ্য সেবক নিয়ে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে ধর্ম-প্রচার করতেন না—ওষুধ বিষুদ জাঁরবুটি দিয়ে রোগনিরাময়ের খ্যাতিও তাঁর ছিল না, কিংবা করকোষ্ঠী দেখে ভবিষ্যদ্বাণীও করতেন না। তবু তাঁর আশ্রমে কিছু লোকের যাতায়াত ছিল। ইহলৌকিক কিংবা পারত্রিক মুক্তি লাভের দুরাশা তাদের হয়তো ছিল না, এমনি কৌতূহল,—কোলাহল থেকে কিছুক্ষণের জন্য নির্জনতালাভের আস্বাদ অথবা জীবনধর্ম অনুসারে কিছু বৈচিত্র সন্ধানে এরা আসতেন। তারই মধ্যে ছিলেন গোঁসাই। তখন তরুন যুবক—গেরুয়া পরণে—কণ্ঠে আর হাতেও রুদ্রাক্ষবীজ—আর কোন ভড়ং ছিল না—। গোঁসাই আশ্রমেই থাকতেন—গুরুসেবা করতেন। শহর থেকে আটা ফলমূলাদি কিনে আনতেন, ধুনি জ্বালার আয়োজন করতেন। মৌনী সাধু, কথা বলতেন না,—কখনও মাথা নাড়তেন, অল্প অল্প হাসতেন, পূজা নিয়ম-পদ্ধতি বুঝিয়ে দিতেন ইসারায়। গোঁসাই ছিলেন দু-পক্ষের বাণী বিনিময়ের মাধ্যম। শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের যে আসর বসত অপরাহ্ণে —তার প্রধান পাঠক গোঁসাই—ব্যাখ্যাকর্তাও গোঁসাই। পাঠের যথার্থ ব্যাখ্যা হলে আনন্দে ঘন ঘন মাথা দোলাতেন সাধু। যার অর্থ—ঠিক—ঠিক। ব্যাখ্যার ত্রুটি ঘটলে নঙর্থক ঘাড় নাড়তেন—, কাগজের একটা টুকরোয় পেনসিল দিয়ে শ্লোক লিখে গোঁসাই এর হাতে দিতেন—গোঁসাই ঠিক সূত্রটি ধরে ঠিক পথে ব্যাখ্যা করলে ঘনঘন মাথা নেড়ে সানন্দ সমর্থন জানাতেন মৌনী বাবা। এমনি করে বেশ কিছু লোকের সঙ্গে গোঁসাই এর পরিচয়। সাধু দেহরক্ষা করলে—সেই জনবিরল স্থানে গোঁসাই থাকতে পারলেন না। কিংবা গোঁসাই এর অনুগামীরা তাঁকে টেনে নিয়ে এলেন শহরে—নিজেদের সীমানায়। তাঁরাই প্রস্তাব করলেন—এমন একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খোলার। গোঁসাই যদিও বিদ্যার পরিচয় কোনদিন দেন নি, তবু তাঁর গুণের সৌরভ শাস্ত্রব্যাখ্যার ফলে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাঝে মাঝে কলেজের ছাত্ররা আসত দল বেঁধে—এবং তাদের পাঠ্যতালিকা থেকে দুরূহ দুরূহ প্রশ্ন করত। দর্শন এবং বিজ্ঞানের প্রশ্ন। সাহিত্যের প্রশ্নও থাকত। গোঁসাই অনায়াসে উত্তর দিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে বলতেন—বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার বা তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু শুধোলে নির্ঘাৎ ফেল করবো—; আশা করি আমায় অপদস্থ করবে না তোমরা।

সে প্রশ্ন বড় একটা কেউ করত না, প্রসঙ্গত কিছু আলোচনা হত। দর্শন এবং ধর্মশাস্ত্র—জীবনবোধ এই নিয়েই চলত আলোচনা। এই ক্ষেত্রে গোঁসাই অপরাজিত। কিন্তু শহরে নিজ শিক্ষালয়ে দেখা গেল শিক্ষাদানেও ওঁর কৃতিত্ব কম নয়। ঘন্টা হিসাব করে পড়ান মাষ্টারের চেয়ে সমস্ত দায়িত্ববোধে অধিকতর সচেতন উনি। ওঁর হাতে ছাত্র দিয়ে অভিভাবকরা নিশ্চিন্ত। মহেন্দ্রও একদিন মহেশকে নিয়ে এই শিক্ষালয়ে এলেন। বললেন, ভারি অমনোযোগী ছেলে,—আপনাকে চেষ্টা করে তরিয়ে দিতে হবে।

গোঁসাই হেসে উঠলেন, আমি বুঝি কাণ্ডারী! বলেছেন ভাল—। ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা খাচ্ছি এখন হাবুডুবু।

মহেন্দ্র কি বলতে চাইলেন—হাত উঠিয়ে গোঁসাই বললেন, দেখছেন না—এই অর্ণবে কত ঢেউ—কত শব্দ। বলে ঘরভর্তি ছাত্রদের দিকে আঙুল ইসারা করলেন।

মহেন্দ্র ঘরের'পানে চেয়ে প্রমাদ গনলেন—তিল ধারণের ঠাঁই নাই।

গোঁসাই তাঁর হতাশা লক্ষ্য করে মহেশকে ডাকলেন নিকটে, এসো তো ভাই—এদিকে এসো একবার। কাছ থেকে দেখি একবার।

মহেশ কাছে এলে ওর মুখের উপরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মাথা নাড়লেন। বললেন, দেখি তোমার হাত। ডান হাত।

নিজের বাঁ হাতের তেলোয় মহেশের ডান হাতখানি চেপে ধরে একদৃষ্টে করেরেখা নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

তারপর মহেন্দ্রের পানে চেয়ে বললেন; কথায় আছে সুজন হলে তেঁতুল পাতাতেও স্থানাভাব হয় না। এর ভার আমি নিলাম।

মহেন্দ্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মহেশও। প্রথম দর্শনে ভারি ভাল লাগল গোঁসাইকে। যেন কত কালের চেনা মানুষ। কত আপন জন। এই জগতে মাঝে মাঝে এমনি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। এক একজন মানুষকে প্রথম দেখেই হঠাৎ ভাল লেগে যায়, মনে হয় ও যেন অনেক কালের চেনা, কত আপন জন। আবার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কোন কোন জনকে খুব কাছে পেয়েও মনের বিরূপতা ঘোচে না। দৃষ্টির আলোর প্রীতি অথবা অপ্রেম যেমন করে এক লহমায় স্বচ্ছ হয়ে ওঠে সে রহস্য কে ভেদ করবে। এযে জন্ম জন্মান্তর রহস্য। মহেশ ভাবল, হবেও বা। ইনি আমার আত্মীয়।

গোঁসাই বললেন, তুমি কি শুধু বিদ্যা অর্জনই করতে এসেছ—যাতে সংসারের উন্নতি হয়?

উদ্দেশ্য যেখানে স্পষ্ট—সেই ক্ষেত্রে এমন অনাবশ্যক অদ্ভুত প্রশ্ন কেন? কিশোর বালকের কাছে এই প্রশ্নের রহস্যও স্পষ্ট নয়। মহেশ অবাক চোখে গোঁসাইএর পানে চেয়ে রইল।

গোঁসাই বললেন, জীবনের উদ্দেশ্য যদিও একটা—একটা সোজা পথই সামনে, যা ধরে লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় মানুষ। কিন্তু সোজা পথের গা থেকে পথের অনেক ডালপালা বার হয়—এটা বোধ করি দেখেছ। বলি ঘোরাঘুরিও তো বেশ খানিকটা হয়েছে।

মহেশ বলল, আমাকে এমন পথ দেখিয়ে দিন যাতে উন্নতি করতে পারি।

হো হো করে হেসে উঠলেন গোঁসাই। পথ কি আমিই চিনতে পেরেছি—চেনার চেষ্টা করছি শুধু। যেমন অন্ধ দেখায় অন্ধকে পথ, তেমনি আর কি। তা হোক—চেষ্টা যদি না সিধ্যাতে—কারই বা দোষ। তুমি পথ চিনতে পারবে বলেই ভার নিলাম। পরিশ্রম করে যাও—উত্তরে যাবে।

গোঁসাইএর ক্লাসে শুধু ইস্কুলের পড়া নয়—অধ্যাত্ম মার্গের ইঙ্গিতও অনেকখানি থাকে। পরা-অপরা দুই বিদ্যাদানেই তাঁর সমান উৎসাহ। জীবন প্রসারিত হোক:

অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ লোকে প্রতিষ্ঠিত হোক মন্ত্রজীবন। এইটিই চান গোঁসাই। অধ্যাত্ম ধারণার অনুকূল নয় যে মন, সেখানে পাঠ দেন না গোঁসাই। বলেন, মরুভূমিতে বীজবুনে কি লাভ! ওরা অন্যত্র চেষ্টা করুক।

যদি কেউ প্রশ্ন করে—সৎজীবনলাভের চেষ্টা করলেই তো জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়—

গোঁসাই বলেন, পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হলে শুধু কি দুঃখ—? উত্তর দেওয়ার চেষ্টা থাকবে না—আনন্দ থাকবে না? কঠিনের মধ্য দিয়ে আসে বলেই তো উত্তরে পুরোপুরি আনন্দ। পরিশ্রম অধ্যবসায় নিষ্ঠা এইসব মূল্য দিয়ে জীবনকে লাভ করতে হয়—না হলে জীবনের স্বাদ কি।

মহেশ লেখাপড়ায় মনোযোগ দিল। এবং আশ্চর্যের কথা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল ভালভাবে। তারপর আরও পড়বার প্রশ্ন রইল না,—চাকরি না নিলে সংসার অচল হয়ে পড়বে—এই সত্য নিত্যদিনের সংসারযাত্রার রীতি থেকে বুঝতে পারছিল মহেশ। তবু ওর ইচ্ছা ছিল আরও কিছুকাল শিক্ষকের সান্নিধ্যে কাটায়। অর্থকরী শিক্ষার পিছনে প্রচ্ছন্ন ছিল পিপাসা—জীবন-অন্বেষণ ইচ্ছা। সদ্ভাবে সাধুভাবে সুস্থ জীবন-যাপনের ইচ্ছা। সে ইচ্ছা পূরণের সর্তগুলি মাষ্টারমশায় ছাড়া কার কাছ থেকেই বা জেনে নিতে পারবে!

কিন্তু ইচ্ছা তার পূরণ হল না। একদিন সকালে এসে দেখে—মাষ্টারমশাই দুয়োরে তালা ঝুলিয়ে কোথায় চলে গেছেন। চাবিটা অবশ্য পানের দোকানী তেওয়ারির কাছেই রেখেছেন। তেওয়ারিই জানালে—বদরী বিশালায় পাড়ি দিয়েছেন গোঁসাই—। ওখান থেকে যাবেন গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী; আরও দূরে যাবেন হিমালয় পার হয়ে মানস সরোবরে। তারপরে আর

কোথায় কোথায় যাবেন তেওয়ারি জানে না। হয় তো যা ভারততীর্থ পরিক্রমা করবেন। এক সাল দো সাল —লোকন মালুম নহী হায় কব লৌটেঙ্গে মাষ্টার সা'ব।

এই জগৎটাই কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল মহেশের কাছে। ফাঁক ভরাবার জন্য কাজ চাই। সংসারে শান্তি আনার জন্যও চাই টাকা। চাকরির চেষ্টায় সুরু হল হাঁটাহাঁটি। এ আপিস সে আপিস কলকারখানা অনেক ঘুরলে মহেশ। অবশেষে চাকরি পেয়ে গেল রেল-আপিসে। অস্থায়ী চাকরি। তা হোক—ক্রমে এই কাজই পাকা হবে। সংসারে শান্তি আসবে।

সংসারের চিন্তা কি আদৌ পীড়ন করছিল মহেশকে? বাপ মায়ের দুঃখ দূর করার ইচ্ছা অথবা কর্তব্যবোধ প্রবল হয়েছিল? কিংবা যৌবনকালের কামনা—ভোগ-ভূমির উত্তাপ সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হচ্ছিল অন্তরে। মহেশ মানুষ;—মানুষের যাবতীয় বৃত্তির বেগ বহন করতে সে বাধ্য। দেহধর্মকে অতিক্রম করার চেষ্টা সে করেনি, সে সাধ্যও ছিল না। মন ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠছিল।

এই সময়ে মহেশের মা একটি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ছেলে উপযুক্ত ও উপার্জনক্ষম হলে প্রতিটি মায়ের মনে একই বাসনা জাগে। ওঁরা দীপ থেকে দীপ জ্বালিয়ে রাখার কথা ভাবেন। ওঁরা বংশধারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আকুল হন। মরজগতে অমর হবার কামনা—। মহেন্দ্রের কাছে সেই ইচ্ছাটি ব্যক্ত করলেন।

মহেন্দ্র বললেন, চাকরি পাকা হোক আগে।

সুরমা বলল, আমার বুঝি বয়স বাড়ছে না। কতকাল ঠেলব সংসার।

ইতিমধ্যে সংসারের আয়তন কিছু বেড়েছে। মহেশের পরের দুটি ভাই বড় হয়েছে—তাদের ইস্কুলের সময় বাঁধা, ভাত দেওয়া ও জলখাবার তৈরীর ভার চেপেছে কাঁধে। একা হাতে সব কাজই করতে হচ্ছে—। এমন একটু ফুরসুৎ মেলে না, দশ মিনিটের পথ গঙ্গায় গিয়ে একটা ডুব দিয়ে আসে, কিম্বা ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সময় খানিকটা কাটায়। পাড়াপড়শীর কাছে স্নান ও দেবদর্শন মাহাত্ম্য শুনে শুনে এখন নিজেকে ভাগ্যহীনা বলে আক্ষেপ সুরু করে সুরমা। প্রায়ই অনুযোগ তোলে—আমি আর পারছি না—পারছি না।

সুতরাং মহেন্দ্র তৎপর হলেন। খুঁজে পেতে একটা সম্বন্ধও স্থির করলেন। দু'পক্ষের দেখাশোনা দেনা-পাওনায় মিলল। বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল।

ক্রমশঃ

চীনের সহিত মিতালি

বীরভূম হইতে প্রকাশিত ময়ূরাক্ষী সাপ্তাহিকে বলা হইয়াছে :

বাম কম্যুনিষ্ট পার্টির তিন নেতা হঠাৎ চীন প্রভাবিত কোরিয়ায় যাচ্ছেন। অগ্নিদগ্ধী কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত তাদের একজন।

চীনা সরকার দুবেলা গাল দিচ্ছে ওদের বিপ্লবের শত্রু মার্কসবাদের অপভ্রংশ বলে। বলছে, এরা দেশী পুঁজিপতিদের রক্ষাকবচ। অথচ এঁরা যাচ্ছেন তাদেরই এলেকায়!

কোরিয়াকে মধ্যস্থ করে মাও-এর ভজনাদ্বারা আনুকূল্য লাভের জন্য?

গরজটা বাম কম্যুনিষ্টদেরই। তাঁরা এখন রাজনীতি ত্রিশঙ্কুর দশায় ঝুলছেন।

ইতিপূর্বে এদেরই এক প্রধান রুশ কবলিত এলেকায় চিকিৎসার অজুহাতে গিয়েছিলেন। ওখানে ভরসা পেলেও ভারতের ডানদের সঙ্গে বনিবনাও হওয়া দুষ্কর। এদিকে আবার নক্সালীরা বিপ্লবের দুষমনদের আগেই খতম করতে চায়—চাইবেই! এভাবে তো বেশী দিন চলে না।

চীনের আনুকূল্য পাবার জন্যই কি তবে এ-আই-টি-ইউ-সি, এ বি টি এ ও অন্যান্য সকল গণ সংগঠনে ইচ্ছা করেই ভাগ ধরালেন?

আসলে বাম কম্যুনিষ্ট পার্টিতে এক বিরাট পরিবর্তন আসন্ন।

কেন! ভোটে কি আর আশা নেই?

সমাজতন্ত্র কোন পথে

শ্রীগৌরপদ মজুমদার লিখিত একটি পুস্তিকা আমরা পাইয়াছি। ইহাতে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেখানো হইয়াছে যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র ও সমষ্টিবাদ ঠিক রুশিয়া ও চীনের পথে চলিবে এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আমরা ঐ পুস্তিকার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

ভারতবর্ষের মেহনতী জনতার মুক্তি অর্থাৎ উন্নয়ন কোন পথে এবং সমাজতান্ত্রিক পথে উত্তরণের পথ কি এ বিষয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশেষ অভিজ্ঞ বলে যারা মনে করতেন দেখা যাচ্ছে মার্কসবাদের বাস্তব প্রয়োগ করতে গিয়ে তাঁরা বরাবরই বিভ্রান্তির পথে পা দিয়েছেন। ফলে সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন আজ পর্যন্ত স্বপ্নই থেকে গেছে। ইতিমধ্যে বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনেও বিরাট ফাটল দেখা দিয়েছে। সারা দুনিয়ার চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হওয়ায় সোভিয়েট দেশের সঙ্গে বিরোধ ক্রমে তীব্র হয়ে পরস্পরকে শত্রু মনে করতে শুরু করেছে। ফলে বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলো দুই শিবিরে ভাগ হয়ে একদল চীনের অনুরাগী, অপর দল সোভিয়েটের সমর্থক হতে বাধ্য হয়েছে। ভারতবর্ষেও তার ধাক্কা এসে লাগে চীন-ভারত যুদ্ধের সময়। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি দুই ভাগ হয়ে যায়।

১৯৬৪ সালে চীনের প্রতি অনুরক্ত একদল কমিউনিষ্ট বন্ধু মূল কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে পুরানো দলকে শোধনবাদী আখ্যায় ভূষিত করে এক নূতন পার্টি

সংগঠন করেন এবং নিজেদের সাচ্চা মার্কসবাদী বলে পরিচয় দেন। এই নূতন মার্কসবাদী পার্টি বললেন, "বর্তমান ভারত সরকার বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া জমিদার সরকার এবং বর্তমান বিপ্লবের প্রকৃতি হবে সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী।" মূল শ্লোগান—জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে।

পুরনো কমিউনিষ্ট পার্টির এখনকার শ্লোগান হল, "জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব" সম্পন্ন করার। এই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও মাঝারী বুর্জোয়ারা যুক্তভাবে।

সি পি এম-এর "জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের" নেতৃত্ব দেবে শ্রমিক শ্রেণী আর কৃষক মধ্যবিত্ত ও মাঝারী বুর্জোয়ারা মিত্র হিসেবে এই বিপ্লবে সহযোগিতা করবে। অর্থাৎ বিপ্লবে সহযোগিতা সম্বন্ধে কোন বিরোধ নেই। শুধু একদল মনে করেন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এই বিপ্লব সম্পন্ন করা চাই, আর এক দল যৌথ নেতৃত্বের তত্ত্বে আস্থা রাখেন। অর্থাৎ দুই দল মিশ্র শ্রেণীর নেতৃত্বেই এই বিপ্লব সম্পন্ন হবে মনে করেন। মার্কস ও লেনিন এরূপ কোন কৌশলের কথা কোথাও ব্যক্ত করেছেন বলে জানা নেই। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরস্পর বিরোধী শ্রেণী স্বার্থের লোকের কোন শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করবেন এবং কি করেই বা রাষ্ট্রক্ষমতায় বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থের নেতৃবৃন্দ অবস্থান করবেন তা বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসাধ্য। প্রকৃতপক্ষে এই সরকারকেও কি কংগ্রেসের মত মিশ্র অর্থনীতিই চালু রাখতে হবে না?

দুই কমিউনিষ্ট পার্টির শ্লোগান ভিন্ন ভিন্ন হলেও মূল বক্তব্য হচ্ছে "সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী।" দুই কমিউনিষ্ট পার্টিই মনে করেন, সামন্তবাদের উচ্ছেদ না হলে ধনিকতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হতে পারছে না এবং ধনতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা না হলে পরবর্তী ধাপ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কথাই ওঠে না। ফলে ভারতবর্ষে বর্তমান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কোন সম্ভাবনা নেই বলেই তাঁদের বিশ্বাস। পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য মাঝারী ও বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে একই সরকারে অবস্থান করতে মার্কসবাদী বন্ধুরা রাজী।

বিষয়টি কিছু জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখক অতঃপর বলিতেছেন :

পূর্বের আলোচনায় একথা পরিস্ফুট হয়েছে যে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশেষজ্ঞ বলে দাবী করেন তাঁরা ভারতের মেহনতী জনতার মুক্তির পথ নির্দেশে বার বার মার্কসবাদের রাজপথ ছেড়ে চোরা গলিতেই ঘুরে বেড়িয়েছেন—সঠিক পথের সন্ধান করে উঠতে পারেন নি।

তাই যেমন অতীতে তেমনি বর্তমানেও কমিউনিষ্ট বন্ধুরা ভারতের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে কষ্ট কল্পিত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে চলেছেন; বাস্তবে তার কোন ভিত্তি নেই। ভারত সরকার সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারও নয় বা সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধিও নয়। সামন্তবাদের যৎ সামান্য অবশেষ অবশ্য এখনও কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে। তার সম্পূর্ণ বিলোপ অতি দ্রুত গতিতেই সম্পন্ন হতে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে "জাতীয় গণতন্ত্র" ও "জনগণতন্ত্রে"র মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। দুই বিপ্লবেরই উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং পুঁজির বিরোধী সংগ্রামে কৃষক, শ্রমিক ও মাঝারি পুঁজির মালিকদের একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে উচ্ছেদ করা। তফাৎ শুধু জাতীয় গণতন্ত্রী কমিউনিষ্টরা মনে করেন ভোটের মাধ্যমেই এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব—আর জনগণতন্ত্রে আস্থাবান কমিউনিষ্টরা মনে করেন বিপ্লবের শ্লোগান দিয়ে আর বাস্তবে তীর ধনুক বল্লমের মহড়া দেখিয়ে একাজ সম্পন্ন করতে। তীর ধনুক দিয়ে যে রাষ্ট্রের পুলিশ-বাহিনী বা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে ক্ষমতা

দখল করা যায় না এটা নেতারা জানেন। প্রকৃত পক্ষে লড়াইটা রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে নয়, লড়াইটা হচ্ছে আগামী ভোট যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো যাতে ভয়ে ত্রাসে ভোটের ময়দান থেকে সরে পড়ে সেইজন্য সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করা।

কারণ জনগণতন্ত্রের বিপ্লবী বন্ধুরা গত ৫।১২।৬৮ সালে বর্ধমান কেন্দ্রীয় প্লেনামে গৃহীত আদর্শগত প্রস্তাবে স্বীকার করেছেন। "এটা সত্য যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শের সংগে হিংসা বেমানান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পুরোধা চিন্তানায়কেরা, প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতৃবৃন্দ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এই বুর্জোয়া হিংসাকে সংযত, সীমিত এবং সম্ভব হলে এড়ানোর উপায় বের করার জন্য সর্বদা আগ্রহী ছিলেন। কারণ শান্তিপূর্ণ পথে উত্তরণই সর্বহারা শ্রেণীর সুবিধা জনক।" "ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মাঃ) শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ও সমাজতন্ত্রে রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা করে। একটী শক্তিশালী বিপ্লবী গণ-আন্দোলন বিকশিত করে, সংসদীয় এবং সংসদ বহির্ভূত উভয় পথেরই সংগ্রাম সমন্বিত করে শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রগণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রতিরোধ অতিক্রম করতে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই রূপান্তর ঘটাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।"

বি, এম, বিড়লার বক্তৃতা

যুগবাণী পত্রিকায় বি, এম, বিড়লার দিল্লী প্রেস ক্লাবে কথিত উক্তি সংক্ষেপে মুদ্রিত করা হইয়াছে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বি, এম, বিড়লা দিল্লীর প্রেস ক্লাবে বলিয়াছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার বহু বছর যাবত বাংলাকে বঞ্চিত করিয়াছেন. শিল্পের লাইসেন্স ও কাঁচামাল দুই-ই পশ্চিমবঙ্গকে দেন নাই ও কলিকাতা শহর ও বন্দর ধ্বংস করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সম্প্রতি ভারত সরকারকে একথা উচ্চ পর্যায়ে জানাইয়াছেন। যেমন বিলেট, স্লাট, স্কেল টাইপের ইস্পাত ও কোমকাল না দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের বহু কারখানা অলস হইয়া বসিয়া আছে। সোডা অ্যাশের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের কাঁচ-শিল্প ডুবিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে দেশের শতকরা ৪০ ভাগ কাঁচ শিল্প অবস্থিত, অথচ সোডা অ্যাশ শতকরা ৮০ ভাগ উৎপন্ন হয় ভারতের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে। উহার সরবরাহ এখানে পর্যাপ্ত ও নিয়মিত নয়। হলদিয়ার কাছে সোডা অ্যাশ কারখানা প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স চাহিয়াও পাওয়া যায় নাই। পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্র কারখানাগুলি তুলার অভাবে সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। তুলা পশ্চিমবঙ্গে জন্মে না। ভারত সরকার ইস্পাত ও কয়লার দাম ভারতের সর্বত্র সমান বাঁধিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তুলার দাম পশ্চিমবঙ্গে বেশি পড়ে। পশ্চিমবঙ্গকে গুজরাট বা মহারাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম তুলা দেওয়া হয়—চাহিদা সত্ত্বেও। পশ্চিমবঙ্গ ফাইনান্সিয়াল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী কে, এন, মুখার্জি বলিয়াছেন যে তাঁরা টাকা দিবার আগ্রহ লইয়া বসিয়া আছেন কিন্তু শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে তাঁদের কাছে অর্থ লইতে যায় না। ২৬টি খনের দরখাস্ত তাঁরা মঞ্জুর করার পর দরখাস্তগুলি প্রত্যাহৃত হইয়াছে। গত বছর দরখাস্ত জমা পড়িয়াছিল মাত্র ৪৪টি, তার মধ্যে ২৬টি প্রত্যাহৃত হইল। এ রাজ্যে শ্রম অসন্তোষ যে রূপ লইয়াছে তাহাতে ছোট, মাঝারি, বড় কোন শিল্পপতিই আর অর্থ বিনিয়োগ করিতে ভরসা পায় না।

সাময়িকী

অনিলবরণ রায় ও অখণ্ড ভারত

শ্রীঅনিলবরণ রায় স্বনামধন্য চিন্তাশীল ও কর্ম্মী। তিনি পূর্ব্বে শ্রীঅরবিন্দের সহিত নানা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স হইয়াছে আশি বৎসরের অধিক; কিন্তু তিনি এখনও নিজের আদর্শ অনুসরণ করিয়া পূর্ণরূপে রাষ্ট্রসেবাতে আত্মনিয়োগ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমানের কার্য্য হইল ভারত ও পাকিস্থানকে আবার মিলিতভাবে এক দেশে পরিণত করা। তিনি বলেন দেশ যদি এক হয় তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন শাসন ব্যবস্থা করিলেই দুই দেশ হইয়া যায় না। ভারত ও পাকিস্থান এক দেশ। সুতরাং দুইটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সংবিধানের আইন কানুন রচনা করিয়া দিলেই দুই দেশ হইয়া যায় না। অতএব এই দুই রাষ্ট্রকে একত্র করিয়া এক রাষ্ট্র পুনর্গঠন করা একান্ত আবশ্যক। শ্রীঅনিলবরণ সম্প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্থানে সদলবলে প্রবেশ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। পাকিস্থান সরকার অবশ্য তাঁহার এই আগ্রহ সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল নহেন; কেননা দুইরাষ্ট্র থাকিলে বহু রাষ্ট্র নেতার দিন গুজরান হইবার সুবিধা হয়; মিলিত হইলে নেতৃত্ব ক্ষেত্রে বেকার সমস্যার উদ্ভব হইবে। ভারতেও বহু প্রদেশ সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্রনেতাদিগের খোরপোষ ও পুষ্যিপালনের সুবিধা করা হইয়াছে। এত প্রদেশেরও ভারতবর্ষে প্রয়োজন নাই। এবং ইহার ফলে জাতির একতা নষ্ট হইয়া ভাষা ও অপরাপর ক্ষুদ্র স্বার্থ ঘটিত কলহের সূচনা হইতেছে। শ্রীঅনিলবরণ রায়ের উচিত হইবে প্রথমে ভারতের আভ্যন্তরিণ বিভাগগুলি খারিজ করিয়া এক ভারত গঠন চেষ্টা করা ও পরে ভারত পাকিস্থান মিলন সাধন করা। কারণ তিনি পাকিস্থানে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে পাক সরকার কারারুদ্ধ করিয়া নিগ্রহ ব্যবস্থা করিবে এবং ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অমিল আরও প্রবল হইয়া উঠিবে।

হাওয়া জল মাটির শুদ্ধি সাধন

আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিকেরা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন যে মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান অভ্যাস দোষ বশতঃ জগতের জলহাওয়া মাটি ধীরে ধীরে অধিকভাবে বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা না করিলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া দাঁড়াইবে। এই কারণে সভ্যজগতে বহুদেশে এরূপ নিয়ম কানুন প্রবর্ত্তন করা হইতেছে যাহাতে পারিপার্শ্বিকের শুদ্ধতা রক্ষা করা হয়। অর্থাৎ অকারণে অধিক ধোঁয়া বা বিষাক্ত বাষ্প আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া, বাসস্থান কারখানা প্রভৃতির ময়লা জল ও আবর্জ্জনা নদী কিম্বা সমুদ্রে ত্যাগ করিয়া এবং বিষাক্ত পদার্থ মাটিতে যাহাতে না প্রবেশ করে তাহার ব্যবস্থা না করিয়া বিষ গাছপাতা শাকসব্জিতে সংক্রামিত হইতে দেওয়া প্রভৃতি ক্ষতিকর অভ্যাস দমন ব্যবস্থা এখন একটা অতিপ্রয়োজনীয় কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পেট্রোল, ডিজেল ও জল বাষ্প চালিত যান যাহাতে অতঃপর বৈদ্যুতিক শক্তিতে কোন প্রকার ধোঁয়া বা বাষ্পের সৃষ্টি না করিয়া যাতায়াতের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে ও আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ চালিত যানই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিবে। এই বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনও যথা সম্ভব কোন অগ্নি বা বিস্ফোরক ব্যবহার না করিয়া যাহাতে হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে। জল, বায়ু সমুদ্রের জোয়ার ভাটা সূর্য্যালোক ইত্যাদির ব্যবহার যথাযথ ভাবে করিলে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিদ্যুৎ উৎপাদনকার্য্য বিনা অগ্নি ও বিস্ফোরকে সম্ভব হইবে। মানুষের গৃহে রন্ধন ও শীত নিবারন এবং কারখানার যন্ত্রাদি চালানাও বিদ্যুৎ ব্যবহারেই করা হইবে। ইহা হইল হাওয়া শুদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থার কথা। জলে কোনও প্রকার অশুদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সেই সকল বস্তু শুদ্ধ করিয়া লইবার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র করা হইতেছে।

কলিকাতার গঙ্গায় যেরূপ যথা ইচ্ছা ময়লা ও বিষাক্ত জিনিস ছাড়া হয়; পৃথিবীর কোন সভ্যদেশে সেরূপ করিতে দেওয়া হয় না। খোঁজ করিলে হয়ত দেখা যাইবে যে কলিকাতাতে আইন কানুন আছে কিন্তু কেহ মানেনা। নিজেদের দুই পয়সার সুবিধার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বিপন্ন করা ভারতবর্ষের রীতি। এবং সরকারী জনহিত সংরক্ষকগণও এ দেশে দুই পয়সা ঘুষ লইয়া বহুলক্ষ লোকের সর্বনাশের কারণ হইতে কোন লজ্জাবোধ করেন না। দেশবাসীও দলাদলি ও অযোগ্যকে যোগ্য প্রমান করিবার আগ্রহে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া জনশত্রুদিগের সমর্থন করিয়া চলিতে থাকেন। এই অবস্থায় পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার রাখা কঠিন কার্য্য। মাটিতে যে ময়লা ও বিষাক্ত বস্তু জমা হইয়া থাকে তাহারও কোন প্রতিকার এদেশে এখনও সম্ভব হইবে না। তবে এই সকল বিষয়েরই আলোচনা এখন হইতে আরম্ভ করা প্রয়োজন। ধূম্র নিবারণ ব্যবস্থা আইনতঃ একটা আছে বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু কেহ তাহা মানিয়া চলে না। কলিকাতার রাষ্ট্রীয়ভাবে চালিত বাসগাড়ীগুলি অযথা এত অধিক ধোঁয়া ছাড়ে যে তাহার কোন তুলনা অপর দেশে পাওয়া যায় না। গাড়ীগুলি ঠিক ভাবে মেরামত করিয়া রাখা হয় না বলিয়াই ইহা হইতে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থা কেহ করে না। কারণ, সম্ভবত, মেরামতের টাকা চুরি ইত্যাদি। এই সকল চোর, ঘুষখোর প্রভৃতি যে সকল লোক তাহাদের মধ্যে বহু বক্তৃতাবাজ আছে যাহাদের কথা শুনিলে মনে হয় যে তাহারা জনহিতকেই জীবনের মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল দুর্নীতিপরায়ন মিথ্যা অভিনয়ের পাণ্ডাদিগের শাস্তির ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক মনে হয়।

কাম্বোডিয়ার যুদ্ধ

রাষ্ট্রপতি নিক্সন বলিয়াছেন আমেরিকার কাম্বোডিয়াতে যে সকল সৈন্য ছিল তাহারা নিজ কার্য্য পূর্ণ সক্ষমতার সহিত সম্পন্ন করিয়া কাম্বোডিয়া হইতে চলিয়া গিয়াছে। কাম্বোডিয়াতে আমেরিকান সৈন্যগণ কোন কার্য্যের জন্য গিয়াছিল তাহা আমরা পরিষ্কার ভাবে জানি না। তাহারা কাম্বোডিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা ঠিক। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে ঐ দেশের এখনও অনেকাংশ ভিয়েৎকংএর হস্তে রহিয়াছে। বহু স্থানে উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্যগণ চড়াও হইয়া রহিয়াছে। অনেক যাতায়াতের পথ ভিয়েৎকংএর হস্তে রহিয়াছে। অথচ নিক্সন বলিতেছেন তাঁহার সৈন্যগণ সক্ষমতার সহিত কার্য্য শেষ করিয়া কাম্বোডিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাম্বোডিয়ার কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধের কথা ব্যাপক ভাবে চিন্তা করা যায় তাহা হইলেও, দেখা যাইবে আমেরিকান দিগের বিবেচনা হীনতার দীর্ঘ ইতিবৃত্ত। কম্যুনিষ্ট দমন কার্যে কোন সফলতাত হয়ই নাই; শুধু অসংখ্য লোকের জীবন নষ্ট ও বিপন্ন হইয়াছে। মহাকষ্টভোগ করিয়াছে লক্ষ লক্ষ নর-নারী বালক-বালিকা ও শিশু। ধ্বংস হইয়া উড়িয়া গিয়াছে সকলের শেষ সম্বল পর্য্যন্ত। কম্যুনিষ্ট দিগেরও এই যুদ্ধে কোন মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বহু লক্ষ লোক আগুনে পুড়িয়াছে, সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে মহা কষ্টের মধ্যে নির্মাজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু কেন? কমিউনিষ্টরাষ্ট্রের প্রজা হওয়া এত বড় কথা নহে যে তাহার জন্য শত শত শিশু পুড়িয়া, জলে ডুবিয়া, না খাইয়া প্রাণ হারাইবে। কম্যুনিষ্ট হওয়ার মানবীয় গৌরব এত মহান নহে যে তাহার জন্য শত শত লোকের হত্যার পাতক বহন করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে। কাম্বোডিয়া ও ভিয়েৎনামের যুদ্ধ কাহিনী মানুষের ইতিহাসে কোন স্বর্ণাক্ষরে লিখিবার উপযুক্ত কাহিনী নহে। মানব ইতিহাসের উহা একটা অতি-বড় নির্বুদ্ধিতা ও কলঙ্কের কথা। রাশিয়ার জারদিগের রাজত্ব ভাঙ্গিয়া মানব স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহার সহিত ভিয়েৎনামের "কে বড়" তাহা স্থির করিবার যুদ্ধ তুলনীয় নহে। ফরাসী বিপ্লবের বাস্তিল ভাঙ্গার কিম্বা আমেরিকান সিভিল ওয়ারের দাসত্ব উচ্ছেদের কথাও এখানে ছিল না। তবে লড়াই করিয়া সহস্র সহস্র শিশুও নারী হত্যা করা হইল কেন?

দেশ-বিদেশের কথা

সমবায়ব্যাঙ্ক, রিসার্ভ ব্যাঙ্ক ও জনমঙ্গল

সরকারী সকল ব্যবস্থায়ই "চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে" রীতি অনুসরণে করা হইয়া থাকে। প্রথম সকল কার্য্য গা ঢিলা দিয়া আরম্ভ করিয়া ও মধ্যপথে কার্য্যের গলদ আবিষ্কার করিয়া সকল কিছু বন্ধ করিয়া নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া থাকাই হইল সরকারী কার্য্য পদ্ধতির স্বভাব ও স্বরূপ। ফলে জনসাধারণের কোনও সাহায্য বা উন্নতি সরকারের ব্যাবস্থায় হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া থাকে। সাপ্তাহিক বারাসত বার্তা পত্রিকায় উত্তর চব্বিশ পরগণায় কৃষক দিগের আর্থিক অভাব ও তাহা নিবারণের যে ব্যাবস্থা সমবায় ব্যাঙ্ক করিয়া থাকেন তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাধাদিবার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আমাদের প্রতিনিধি উত্তর ২৪পরগণার প্রধান কৃষি অঞ্চলে ঘুরে এসে জানাচ্ছেন এবারের চাষ আবাদে সর্ব্বনাশ ঘটে উঠেছে। চাষবাসের কাজ যখন পুরামাত্রায় চলার কথা ছোট চাষীদের কাজ চালাতে এক বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে। গত দুই বছর কৃষকেরা উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য এবং লাভজনক দাম পায়নি, তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে একবেলা উপোস করে রয়েছে। চাষের কাজ জলদি সমাধা করতে নগদ টাকার আবশ্যক। পাটের চারা ক্ষেতে নিড়ান দিতে এবং ধানের রোয়া বসাতে জনমজুরের নগদ দাম দিতে হয় অথচ এদের হাতে টাকা নেই। এরপর আসছে সার ও কীটনাশক ওষুধের খরচ। গোলাপোতা থেকে সামান্য কিছু দূরে এক ছোট চাষী নগদ টাকা কোনমতে সংগ্রহ করতে না পেরে গত বছর পুষ্করিণীতে ছাড়া পোনা মাত্র ৫।৬ গ্রামের রুই কাতলার বাচ্চা বেচে দিয়েছেন। বাদুড়িয়ার ৪।৫ বিঘা জমির মালিক যতীন আর কোন উপায় না দেখে পরিবারের ২০।২৫ টাকার শাড়ী মাত্র ৭ টাকায় বেচে দিয়েছে। কৃষক মহলে নিদারুণ নগদ টাকার হাহাকার চলেছে। বসিরহাটের এম, এল, এ অধ্যক্ষ শ্রী অমিয় বানার্জির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে জানান যে এখন কৃষকদের টাকার দরকার এবং সত্বর কৃষকদের টাকা দিতে না পারলে চাষের ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। গাইঘাটার এম, এল, এ শ্রী অপূর্ব্বলাল মজুমদারের প্রকাশিত বিবৃতিতে দেখা গেছে উত্তর ২৪ পরগণা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যম এখন পর্য্যন্ত কৃষকদের কর্জ্জ দিতে না পারায় গোটা উত্তর ২৪ পরগণার কৃষক সমাজ তীব্র সঙ্কটের মধ্যে পড়েছেন।

উত্তর ২৪ পরগণা সমবায় ব্যাঙ্ক সংগঠিত হবার পর উত্তর ২৪ পরগণার চাষীদের স্বল্পমেয়াদী কর্জ্জে চাষের উপযুক্ত পরিমাণ টাকা বন্টন করা হত। লক্ষীর পরিমাণ কোটি টাকার বেশী এবং এছাড়া সরকারের ব্লক অফিস-গুলি থেকেও কৃষকদের সাহায্য দেওয়া হ'ত। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এখনপর্য্যন্ত কর্জ্জ বন্টনের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। গত এক বছরের বেশী সময় ধরে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরোধ চলেছে। ব্যাঙ্ক পরিচালকমণ্ডলীর প্রতি রাজ্য সরকারের অসন্তোষ সংক্রান্ত অর্ডারের বিরুদ্ধে ম্যানেজিং কমিটি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। এই বিরোধের ফলে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উত্তর ২৪ পরগণার লক্ষাধিক কৃষক পরিবার। রাজ্য সরকারের সমবায় বিভাগ এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে উত্তর ২৪ পরগণার কৃষিঋণ বন্টন করবেন কি করবেন না এখন পর্য্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। সমবায় বিভাগের কোন কোন মহল থেকে শোনা যাচ্ছে রাজ্য সরকারের সমবায় বিভাগের ব্লক অফিসের কো-অপঃ ইন্সপেক্টরের মারফৎ সোজাসুজি কৃষকদের কৃষিঋণ বন্টনের চিন্তা করছেন।

অপর মহল থেকে শোনা যাচ্ছে স্টেট ব্যাংকের মাধ্যম এ ছুটোর কোনটি সরকারের সমর্থিত সংবাদ নয়। বারাসাত বার্তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালনাতে সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি এবং বহু ক্রটি বিচ্যুতি উল্লেখ করে রিপোর্ট তৈরী করেছেন। এই রিপোর্টের একটি বিশেষ গুরুতর বিষয় হ'চ্ছে ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী একজন ভাইস চেয়ারম্যান ও একজন সদস্যের ব্যক্তিগত আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ ব্যাঙ্কের এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট বিভাগ রাজ্য সমবায় বিভাগের মারফৎ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে অর্থ সরবরাহ করেন এবং সরবরাহের মূল তত্ত্বাবধানে থাকেন রাজ্য সরকারের সমবায় বিভাগ। যদি উত্তর ২৪ পরগণা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যম কৃষিঋণ বন্টন করা না হয় তবে এর প্রত্যক্ষ ফল দাঁড়াবে ব্যাঙ্কের দরজায় তালাচাবি পড়া। কৃষিঋণ বন্টনের অর্জিত সুদের উপরেই এই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এইরূপ অবস্থা ঘটে উঠলে ব্যাঙ্কের দেড়শতের বেশী কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবে যাবে এবং দেড়শতের বেশী পরিবার অভাবে ক্ষুধার মধ্যে পতিত হবেন। ১৯৬৮-৬৯ হিসাবে দেখা গেছে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের বেতনসহ ভ্রমণভাতা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদিতে ৫ লক্ষ ৭৯-হাজারের বেশী টাকা খরচ হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের দেড়শতের বেশী মধ্যবিত্ত পরিবারের কাজ রোজগার বন্ধ হয়ে যাবার অর্থ হচ্ছে ক্ষুধা ও মৃত্যু। ব্যাঙ্ক কর্মচারী-দের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার ভাব গড়ে উঠেছে। এই ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের এক মহল মুদ্রিত হস্তাক্ষরে কর্মচারীদের ১৫০টি পরিবারের বাঁচার স্বার্থে বর্তমান পরিচালকমণ্ডলীর পরিবর্তে সমবায় বিভাগের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগের দাবী করছেন যাতে এই ব্যাঙ্কের মারফৎ সরকারের ঋণদানের কাজ অব্যাহত থাকে। কর্মচারীদের অপর মহল ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক কৃষকদের কলকাতায় নিয়ে ঋণের দাবীতে এবং একজন সমবায় অফিসারের বদলীর দাবী করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ যেমন অনিশ্চিত কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তেমনি অনিশ্চিত। বসিরহাট ব্রাঞ্চের কাউণ্টারে একজন কর্মচারী আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন—এমন দিনে এখানে কৃষি সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে চাঁদ বসে যেত এখন খাঁ খাঁ করছে।

জীবন নির্ব্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি

আজকাল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সকল বেতনভোগী লোকেদের মধ্যে অভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে ও সেই জন্য সর্বত্র বিক্ষোভ ও অতিরিক্ত ভাতার দাবি আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের ধারণা ছিল শহরেই অধিক দেখা যাইতেছে। কিন্তু করিমগঞ্জ (আসাম) হইতে প্রকাশিত যুগশক্তি সাপ্তাহিকের নিম্নে উদ্ধৃত সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে মনে হয় যে জীবন যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি দেশব্যাপী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সারাটা দেশ জুড়িয়া সর্বপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য এত ব্যাপক ভাবে বাড়িতেছে যে উহার ফলে মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

চাকুরিজীবী সীমিত আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণকল্পে বর্দ্ধিত মহার্ঘ ভাতার জন্য বারংবারিক আন্দোলনে নামিতে বাধ্য হইতেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক দাবী আদায়ে সফলকামও হইতেছেন। কিন্তু অপর্যাপ্ত এই ভাতা বৃদ্ধি প্রকৃত সমস্যা সমাধানে কোন কাজেই আসিতেছে না। বাজারে টাকার প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে আরেক দফা মুদ্রাস্ফীতি হইতেছে মাত্র। ক্রয়ক্ষমতা যথাপূর্বং থাকিয়া যাইতেছে। আর চাকুরিজীবী শ্রেণীর বাহিরে মুষ্টিমেয় ধনীলোকের ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি শতকরা পঁচাশি জন লোক প্রাণে বাঁচিতে প্রাণান্ত হইতেছেন। জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসা সঙ্কুচিত হইয়াছে আর কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা এবং মূল্য-বৃদ্ধি সত্ত্বেও

কৃষিজীবী মানুষ তাহার কোন সুযোগ নিতে পারিতেছে না, ঋণ ও দাদনদাতা মহাজনই লাভের কড়ির ষোলআনা পকেটস্থ করিতেছে। গোটা দেশের অর্থনীতিই আজ এক অস্বাভাবিক ঘূর্ণিপাকে খাবি খাইতেছে, উত্তরণের কোন আশাই দেখা যাইতেছে না।

যে কোন কল্যাণ রাষ্ট্রই দেশের মানুষকে অন্ততঃ মোটা ভাত মোটা কাপড় যোগান দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমাজতন্ত্রের আশ্বাসদানকারী আমাদের সরকার দেশবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের কথাও সর্বদা বলিয়া থাকেন। কিন্তু জনসাধারণের খাওয়া পরার মৌল সমস্যার সমাধানেই সরকার অণুমাত্র সাফল্য দেখাইতে পারেন নাই। বরঞ্চ সরকারী করনীতি এবং সরবরাহ নীতি কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমস্যাকে জটিলতর করিতেছে। ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির প্রতিকারে সরকারকে সম্পূর্ণ নিরুপায় বলিয়া মনে হয় এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের মুনাফার ক্ষুধা নিবারণে সরকারী যন্ত্রের ব্যর্থতা লজ্জাকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশের বিভিন্ন অংশে আজ জাতীয়তাবিরোধী এবং চরমপন্থী যে সমস্ত বিধ্বংসী শক্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে, তাহারা এই পরিস্থিতি হইতেই শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধাররা দেশব্যাপী যে সমস্ত অবাঞ্ছিত প্রবণতা দেখিয়া শঙ্কিত হইতেছেন, তাহার প্রতিকারের পন্থা নিরূপণের সময়ে শুধুমাত্র দমন নীতির উপর নির্ভর না করিয়া এই মৌল সমস্যার দিকে দৃকপাত করিলে তবেই ব্যাধির শিকড়ে পৌঁছাইতে পারিবেন।

দুই বোন

শিল্পী—সুরেন্দ্রনাথ কর

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭০তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৭৭

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীমতী আশাদেবী আর্য্যনায়কম

অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমতী আশাদেবী আর্য্যনায়কম ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন অসাধারণ গুণবতী পরহিতকারিণী ধর্ম্মপ্রাণা উচ্চশিক্ষিতা মহিলা কর্ম্মীকে হারাইল ও সেই ক্ষতি সহজে পূর্ণ করা সম্ভব হইবে না। ১৯৩৬ সালে শ্রীমতী আশাদেবী ও তাঁহার স্বামীকে মহাত্মা গান্ধী সেবাগ্রামে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান ও তাঁহাদিগের হস্তে তাঁহার পরিকল্পিত নূতন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তনভার অর্পন করেন। ঐ শিক্ষার আদর্শ সুগঠিত করিয়া তাহার প্রচলন কার্য্যে যে সাফল্য লক্ষ্য করা গিয়াছিল তাহার মূলে ছিল আর্য্যনায়কম দম্পতির আপ্রাণ পরিশ্রম ও চেষ্টা। আশাদেবী পরলোকগত অধ্যাপক ফনীভূষণ অধিকারীর কন্যা। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃতে এম এ পরিক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ও তৎপরে বিশ্বভারতীতে উচ্চতর শিক্ষা লাভেচ্ছায় গমন করেন। এই শিক্ষাকেন্দ্রে তিনি নিজে পাঠ ও অনুসন্ধান বিশ্লেষণ মূলক কার্য্য করিতেনএবং শিক্ষকের কার্য্যভারও কিছু কিছু গ্রহণ করিতেন। শ্রীযুক্ত আর্য্যনায়কমের সহিত তাঁহার বিশ্বভারতীতেই পরিচয় হয় ও পরে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন। শ্রীযুক্ত আর্য্যনায়কম সিংহল দেশের মানুষ ছিলেন ও ধর্ম্মবিশ্বাসে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম মানিয়া চলিতেন। স্বামী স্ত্রীর জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম বিভিন্ন হইলেও আদর্শক্ষেত্রের একতা এতই প্রবল ছিল যে তাঁহারা আজীবন এক প্রাণ হইয়া সকল কার্য্যে পরস্পরের সহায়তা করিয়া পূর্ণ সক্ষমতা আহরণ করিতে পারিয়াছিলেন।

আশাদেবী পৃথিবীর নানা দেশে গমন করিয়া বিভিন্ন সমাজসেবা কার্য্যের সহিত যোগ স্থাপন করিয়া নিজ আদর্শের পূর্ণতর উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সভ্য ছিলেন তাঁহার মতামতের এই সকল কার্য্য ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মূল্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার নিকটে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীঅশোক অধিকারী ও দুই ভগিনী লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ভক্তিদেবী উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন

শ্রীমতী আশাদেবী আর্য্যনায়কম

করা হয় সেবাগ্রামে। তাঁহার মৃতদেহ যখন সেবাগ্রামে লইয়া যাওয়া হয় তখন শ্রী ভিনোবা ভাবে সেই খানে গিয়া ক্রিয়াকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। পরে চিতাভস্ম রাজঘাটে ও কাশীধামে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে এখন অতি অল্প সংখ্যক লোকই আছেন, যাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করেন। শ্রীমতী আশাদেবী আর্য্যনায়কম এই সকল আদর্শবাদীদিগের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে গান্ধীবাদের প্রচারে যে বাধা পড়িবে তাহার অপসারণ সহজ হইবে না। কারণ উচ্চশিক্ষা, সুরুচি, সুনীতি অনুসরণ ও বিশ্বের বহুগুণীজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য আশাদেবীর যে বিশেষত্ব ছিল তাহা অন্য কাহারও মধ্যে আমরা দেখিতে পাই না।

রাজা মহারাজাদিগের পাওনা

ভারতবর্ষ যখন ইংরেজের প্রভুত্ব মুক্ত হইয়া নিজ-রাজত্ব স্থাপন করিল, তখন যে সকল বিলিব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটা ছিল ভারতের ভিন্ন ভিন্ন রাজা মহারাজাদিগের "জমিদারী"গুলি ভারতের অন্তর্গত করিয়া লওয়া ও রাজাদিগকে খাজনা ও রাজস্ব আদায় করিতে না দিয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে বাৎসরিক একটা টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থা করিবার কারণ এই ছিল যে রাজা মহারাজাদিগের ইংরেজের সহিতও এমনই সম্বন্ধ ছিল যাহাতে তাহারা রাজস্ব আদায় করিয়া, শাসন কার্য্যের বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াও বিশেষ লাভবান হইতেন। কোন কোন রাজা মহারাজার খরচের তুলনায় এত অধিক রাজস্ব আমদানি ছিল যে তাহারা পৃথিবীর মহা ধনবানদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতেন। ইংরেজ ভারতকে যখন স্বাধীনতা দিল তখন প্রথমতঃ ভারতের একটা বৃহৎ অংশ কাটিয়া লইয়া পাকিস্তান গঠন করাইল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এশিয়াতে অ্যাংলো-আমেরিকার রাষ্ট্রীয় ও সামরিক প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। ভারতবর্ষ যখন এই ব্যবস্থা মানিয়া লইল তখন সর্ব্ব কালের জন্য নিজ স্বাধীনতার অধিকারের একটা অংশ ইংরেজের আদেশে ত্যাগ করিয়া সে অধিকার খর্ব্ব করণে নিজ স্বীকৃতি চিরস্থায়ী করিল। এখন যে ভারতবাসীরা নিজেদের স্বাধীন মতামত জাহির করিয়া কখন এটা কখন সেটা ইহার উহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে ও কাড়িয়া লয় তখন তাহারা ভুলিয়া যায় যে বৃহত্তম অধিকার যাহা তাহারা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে সে অধিকার ফিরাইয়া লইবার ক্ষমতা

তাহাদের নাই। পাকিস্তান যতদিন আছে ততদিন স্বাধীনতার জাতীয়তার মানবীয় দাবি বা অধিকারের কথা জোরগলায় বলিলে ভারতের ঐ সকল লোকেরা শুধু নিজেদের হাস্যাস্পদ করে মাত্র। কারণ যাহাদিগের মাতৃভূমির একটা বিরাট অংশ বিদেশী প্রভুদের আদেশে ভিন্ন দেশ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেইরূপ মহা অন্যায় যাহারা সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে তাহারা যখন নানা প্রকার অধিকারের দোহাই দিয়া ইকার টাকা উদ্ধার জমি ও অপর কাহারও ব্যবসা বা সম্পত্তি লইয়া টানাটানি আরম্ভ করে, তখন পরিষ্কার বুঝা যায় শক্তের ভক্ত, নরমের যম কথাটার প্রকৃত অর্থ কি। যে সকল লোক অমুক বাদ তমুকবাদ আওড়াইয়া পর অর্থ লোলুপতার তাড়নায় যাহারা বাধা দিতে পারে না তাহাদের সম্পত্তি গ্রাস করিবার চেষ্টাতে আত্মনিয়োগ করে তাহাদের মধ্যে অনেকেই উদ্বাস্তু শ্রেণীর লোক, অর্থাৎ তাহাদিগকে পাকিস্তান সরকার দেশ ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য করিয়াছে। ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য ঐ সকল লোকের যদি সত্য সত্যই প্রাণপণ করিয়া সংগ্রাম করিবার আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা সর্বাগ্রে পাকিস্তান আক্রমণ করিয়া নিজেদের পৈতৃক বাসস্থান গুলি পুনঃ অধিকার করিয়া লইত। তাহা না করিয়া নানান অবস্থার সাধারণ লোকের জমি দখল বা সম্পত্তি গ্রাস করিবার চেষ্টা করিলে মনে হয় ঐ সকল লোকের নীতিবোধ খুব প্রবল নহে। ভারত সরকারেরও নীতিবোধ কতটা জোরাল তাহারও আলোচনা করিলে দেখা যাইবে সর্বক্ষেত্রে তাহা এক প্রকার নহে। পাকিস্তান গঠনের যে অন্যায় তাহাত ভারত সরকার বরদাস্ত করিয়া বসিয়াই আছেন, এমন কি স্বাধীনতা আহরণের পরেও পাকিস্তান যে কাশ্মীরের অনেকাংশ দখল করিয়া লইল তাহাও ত ভারত সরকার ফিরাইয়া পাইবার কোন চেষ্টা করিতে অপারগ বলিয়া মনে হইতেছে। কিছু কিছু কাশ্মীরের জমি পাকিস্তান চীনকে দান করিয়াছে, সে কথা লইয়াও ত কোন উচ্চ-বাচ্য হইতেছেনা। চীন যে ভারতের পূর্বসীমান্তে বহু জায়গা বেদখল করিয়াছে তাহার আলোচনাই বা কে করিবে এবং কবে করিবে? শুধু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ অথবা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদের সম্পদ কাড়িয়া লইলেই ন্যায় ও সামাজিক সুনীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় না। অন্যায় ভাবে বা সমাজ বিরুদ্ধ ভাবে ধন সম্পদ আহরণ করা যে আদর্শ অনুসারে অনুচিত বিবেচিত হয়; সেই আদর্শ অনুসরণেই বুঝিতে পারা যায় যে পরের দেশ দখল করিলে তাহাও দোষাবহ কার্য্য এবং সেইরূপ কার্য্যের বিরুদ্ধে ন্যায়বান সমাজতন্ত্রবাদীদিগকে সংগ্রাম করিতে হয়। শক্তিশালীর নিকট আধ-আধ কথা বলিবে এবং দুর্বলের উপর হুঙ্কার ও গর্জন ছাড়া হইবে এইরূপ রীতির কোনও মর্য্যাদা থাকিতে পারে না। শক্তিমানের পদলেহন ও দুর্বলের অর্থ লুণ্ঠন কোন অবস্থাতেই যথার্থ আদর্শবাদী ব্যক্তিগণ করিতে পারে না।

রাজা মহারাজাদিগকে রাজ অধিকার ত্যাগ করিতে হইবে অতি অবশ্য কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সকল প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রেণী ও জাতির অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। একথা ভুলিলে কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তি সমষ্টির আত্মসম্মান রক্ষা কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। ন্যায্য অধিকার বিচার ইচ্ছামত করা না করা ও নীতিবাদের ক্ষেত্রে সহজ সুবিধা অনুসরণ রীতি কোন জাতিকে কখন জগতের রাষ্ট্র সমাজে উচ্চ স্থান গ্রহণ করিতে সক্ষম করে না।

তথাকথিত নকশাল

আজকাল বহু স্থলেই লুঠপাট করিতে গিয়া লুণ্ঠনকারীগণ সশব্দে মাও সে তুং-এর বাণী উচ্চারণ করিয়া নিজেদের নকশাল পন্থী বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে। এই চেষ্টার উদ্দেশ্য কখনও নিজেদের সত্য পরিচয় দেওয়া হইতে পারে না; কারণ যাহারা রাষ্ট্র বা সমাজ নীতি লইয়া কর্মক্ষেত্রে নূতন পথে চলে, তাহারা শুধু লুঠপাট করিয়া ও কিছু বাক্য আওড়াইয়াই কার্য্য শেষ করিতে পারে না। যেখানে লুঠপাটের

পরস্ব অপহরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় না সেখানে আরোই সন্দেহ বৃদ্ধি হয় যে লুণ্ঠনকারীগণ বস্তুত শুধু ডাকাইত এবং তাহাদিগের অন্যান্য আচরণ অভিনয় মাত্র। ইহা ব্যতীত কখন কখন দেখা যাইতেছে যে তথাকথিত নকশালদিগের কোন রাষ্ট্র-কর্মক্ষেত্রের কার্যাকলাপের জন্য পূর্ব্বকার খ্যাতি কিছু নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাহারা অজানা—অপরাধ প্রবণতার ক্ষেত্রে সুপরিচিত। অর্থাৎ পুলিশের খাতায় নাম আছে ওয়াগণ ভাঙ্গার জন্য অথবা অপর কোন চুরি ডাকাইতির অপরাধের জন্য। কোথাও কোথাও দেখা গিয়াছে যে নকশাল সাজিয়া যাহারা লুঠপাটে লাগিয়াছে তাহাদিগের ওয়াগন ভাঙ্গিয়া মাল চুরি করার জন্যই পুলিশের খাতায় নাম উঠিয়াছে। এই অবস্থায় মানুষ স্বভাবতই নকশাল পন্থীদিগকে ভুল বুঝিতে পারে; কিন্তু ইহার কোন প্রতিকার একমাত্র নকশাল পন্থীগণই করিতে পারে। তাহারাই জানেন যে কে তাহাদের দলের লোক এবং কে নহে। তাহারা অনায়াসেই নকশাল 'অভিনেত্'দিগকে সায়েস্তা করিতে পারে। কিন্তু করে না কেন?

পূর্ব্বকালে কখন কখন দেখা যাইত, অপরাধ প্রবণ ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদিগের সহিত একত্র বাস করিতেছে ও তাহাদিগকে অর্থ সাহায্যও করিতেছে। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীগণও অপরাধ প্রবণ ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করিত। বর্ত্তমানে এই সংযোগ নব-জন্ম লাভ করিয়া আবার জোরাল হইয়া উঠিয়াছে। পরে কি হইবে তাহা কেহ যথাযথ ভাবে বলিতে পারে না।

যাদবপুরে সি, আর, পি,র হাঙ্গামা

কিছুকাল পূর্ব্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনে ও প্রাঙ্গণে একটা বিরাট হাঙ্গামার সূচনা হয়। ইহার এক তরফে ছিল পুলিশ বিরোধী ছাত্র, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মী ও জন-সাধারণ, ও অপর দিকে ছিল সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী। ঐ পুলিশ বাহিনী যাদবপুরে শান্তি রক্ষার জন্য মোতায়েন ছিল, ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে। বাংলা দেশে আজ-কাল বহু লোক আছেন যাঁহারা রাষ্ট্র ক্ষেত্রের বাস্তব অবস্থা বিচার করিয়া চলেন না। যাদবপুরে সি, আর, পি, কেন ছিল, এ কথার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ঐ স্থলে এত অধিক বে-আইনী কার্য্যকলাপ চলিতেছিল, যে বাংলা দেশের পুলিশ শান্তি রক্ষা করিয়া উঠিতে সক্ষম হইতে ছিল না। সেই জন্য ঐ কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী এ দেশে প্রেরিত হয়। আর একটা কারণ বাংলা দেশে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্ত্তন। বাংলা দেশে জন-সাধারণ মিলিয়া মিশিয়া নিজেদের শাসন পদ্ধতি চালিত রাখিতে অক্ষম হওয়াতে রাষ্ট্রপতির শাসন এই প্রদেশে আরম্ভ হয়। ইহার জন্য রাষ্ট্রপতির দোষ দেওয়া যায় না; দোষ বাংলা দেশের জন-সাধারণের, অর্থাৎ জন-সাধারণের নির্ব্বাচিত রাষ্ট্র কর্ম্মীদিগের। সুতরাং যদি কেন্দ্রীয় শাসকগণ কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী বাংলা দেশে পাঠাইয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই আইন সঙ্গত এবং কোন কোন মানুষের তাহা পছন্দ না হইলেও তাহাতে বাধা দিবার অধিকার আইনত বাংলা দেশের লোকের নাই। রাষ্ট্রপতির শাসন না থাকিলে এবং নিজেদের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেই ভাল; কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হইতেছে ততক্ষণ ছাত্র শিক্ষক অথবা জনতার হুকুমে দেশ শাসিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা সংবিধান সম্মত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং যাদবপুরে যদি কেন্দ্রীয় অতিরিক্ত শান্তি রক্ষক বাহিনী রাখা হইয়াছিল তাহার জন্য সেই বাহিনীর লোকেরা দায়ী নহে। এবং যদি বাংলা দেশের অধি-বাসী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকেরা ঐ বাহিনীর লোকেদের গালিগালাজ করিয়া থাকেন বা তাহাদিগের উপর ধূলা-বালি ও বোমা বর্ষণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই ব্যবহারের সমর্থন করা যায় না। শুনা যায় যে ঐরূপ ব্যবহার নাকি জন-সাধারণ সি, আর, পির, প্রতি করিয়াছিলেন।

অপর দিকে সি, আর, পি, গভর্ণমেন্টের বেতন-

ভোগী পুলিশ। কোনও ক্ষেত্রে যদি জনতা উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ব্যবহার করে, তাহা হইলেও কোন পুলিশ বাহিনী নিজেদের কর্তব্য ভুলিয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতে পারে না। পুলিশকে গুলি চালাইতে বলিলে তাহারা নির্দেশ অনুযায়ী ভাবে এক বা দশটা গুলি চালাইবে। লাঠি চালাইতে বলিলে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিদিগের উপর লাঠি চালাইবে; কিন্তু কোন অবস্থাতেই পুলিশের প্রহরী হাকিষ্টিক অথবা বন্দুকের কুঁদা ব্যবহারে যত্র-তত্র জন-সাধারণের মাথা ফাটাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া গুণ্ডাবাজী করিতে পারে না। জনতার যদি কোন সংযম ও শৃঙ্খলা বোধ না থাকে তাহার জন্য জনতা শাস্তি পাইতে পারে। জনতা চাকুরে নহে, সুতরাং তাহাদের চাকুরী যাইবার কোন কথা উঠে না। পুলিশ কিন্তু সংযম ও শৃঙ্খলা অনুযায়ী ভাবে ব্যবহার করিতে বাধ্য। না করিলে পুলিশের শাস্তিও হইতে পারে, তদুপরি চাকুরীও যাইতে পারে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সি, আর, পি'র ব্যবহার জনতার ব্যবহার হইতে উন্নত ধরণের হয় নাই। উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিযোগিতায় কে হারে কে জেতে বলা কঠিন। আমরা যতটা জানি, দাঙ্গাকারী সি, আর, পি, বাহিনীকে যাদবপুর হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাদিগের দুর্দান্ত ব্যবহারের জন্য কোন শাস্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

জমি দখল

যাহাদিগের চাষের জমি নাই তাহারা বলপূর্ব্বক যাহাদিগের কিছু অধিক জমি আছে তাহাদিগের জমি দখল করিয়া লইতে পারে, এই নীতি বর্ত্তমান বাঙ্গলায় প্রচলন চেষ্টা হইতেছে। এই নীতির সপক্ষে বলা যায় যে যদি কাহারও অনাবশ্যক ভাবে অত্যধিক চাষের জমি থাকে তাহা হইলে সেই জমি তাহার নিকট হইতে লইবার ব্যবস্থা সমাজের ও সাধারণের মঙ্গলকর বিবেচনা করা যাইতে পারে। জমি কতটার অধিক হইলে অনাবশ্যক বিবেচিত হইবে? কোন প্রদেশে বলা হয় ১০ বিঘার অধিক হইলে তাহা অতিরিক্ত বলা হইবে; কোথাও বলা হয় ঐ সীমা ১৫ বিঘাতে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। সীমা যাহাই হউক, ধরা যাইতে পারে যে তাহার অধিক যে জমি থাকিবে তাহা অপর চাষীদিগকে দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উপরোক্ত জমি দখল নীতির বিরুদ্ধে বলা যায় যে জমি প্রথমতঃ ছাড়িয়া দিলে তাহা সরকারী খাস বলিয়া ফিরাইয়া লওয়া হইবে ও তৎপরে তাহা অপর চাষীকে সরকারী ব্যবস্থা অনুসারে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। চাষীরা সাক্ষাৎ ভাবে জমি দখল করিয়া লইবে এইরূপ ব্যবস্থা কদাপি সঙ্গত রীতি বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া যদি কোন রাষ্ট্রীয় দলবিশেষ ঐ জমি দখল কার্য্যে দলের অনুগত চাষীদিগকে সাহায্য করিয়া জমিতে বসাইয়া দেয় তাহা হইলে বিষয়টা আরোই বেআইনী হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং কত জমি কাহার থাকিতে পারে তাহা আইনতঃ স্থির করা হইলে পরে যাহাদিগের অতিরিক্ত জমি আছে দেখা যাইবে তাহাদের জমি প্রথমতঃ খাস করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তৎপরে সেই খাস জমি কাহাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিবার সময় দেখিতে হইবে কাহার দাবী অধিক জোরাল। দাবী বিচারে স্থানীয় লোকদের অধিকার সর্ব্বাধিক বিবেচিত হইবে ও পরে দেখিতে হইবে যাহারা জমি লইবে তাহারা প্রকৃত চাষী কি না। কারণ আজ যে চাষী, কাল সে চাষী না থাকিতে পারে; অপরকে জমি ভাড়া দিয়া দিতে পারে, মজুর দিয়া চাষ করাইতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং সকল দিক দেখিয়া মানবীয় অধিকার ও প্রয়োজন বিচার করিয়া জমি বন্দোবস্ত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত; শুধু রাষ্ট্রীয় দলের সুবিধা ও দলবৃদ্ধির কথা দেখিলেই চলিবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাই হইতেছে মনে হয়।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের লোকেরা খুব ভারতীয় বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যখন উত্তর ভিয়েৎনামের

কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেন্ট সেই দেশের সকল ভারতীয়দিগের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করে, তখন সেই সকল ভারতবাসীদিগকে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম আশ্রয় দান করে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রায় ৮০০০ ভারতবাসী আছে ও তাহাদিগের ব্যবসা ও সম্পত্তির মূল্য শত শত কোটি টাকা হইবে। বর্ত্তমানে যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভারত-বিরুদ্ধতা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে অনেক-গুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ দক্ষিণ ও উত্তর উভয় ভিয়েৎনামেই ভারতের কনসুল প্রেরিত হইয়াছে ও ঐ দুই দেশেরও কনসুলদ্বয় ভারতে আছে। কিছু কাল পূর্ব্বে উত্তর ভিয়েৎনামের ভারত বিরুদ্ধতা প্রবল ভাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার ঐ দেশে কনসুল স্থলে রাজদূত বা অ্যামবাসাডার নিয়োগ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার ক্ষুব্ধ চিত্তে ভারত সরকারকে জানান যে উত্তর ভিয়েৎনামে যাহা হইবে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামেও তাহা করা উচিত হইবে। নতুবা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পক্ষে ভারতের সহিত সৌহার্দ্য রক্ষা করিয়া চলা কঠিন হইবে। ইহাতে ভারত সরকার কোন যথাযথ উত্তর দিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের মনোরথ পূর্ণ করিবেন এরূপ আশার সঞ্চার করেন নাই।

এইরূপ পরিস্থিতিতে ভারত সরকার হঠাৎ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের এক তথাকথিত বিপ্লবী গভর্ণমেন্টের ক সম্বন্ধ রক্ষা মন্ত্রী মাদাম বিনহকে আমন্ত্রণ ারতে আনিয়া সম্বর্দ্ধনাদি করিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ভারত বিদ্বেষ আরও প্রবল করিয়া তুলি-লেন। যে ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আইনতঃ নিযুক্ত গভর্ণমেন্টের কনসুল প্রভৃতি দিল্লীতে আছে ও ভারতের কনসুল সাইগনে রহিয়াছে, সে ক্ষেত্রে কোন স্বয়ং-নিযুক্ত বিপ্লবী গভর্ণমেন্টকে কোনও ভাবে আমল দেওয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনাম বৈরাচরণ বলিয়া বোধ করিতেই পারে। তাহার জন্য ভারতকে তীব্র সমালোচনাও করিলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে দোষ দেওয়া যায় না। ভারতের যে মনে মনে পৃথিবীর যেখানে যে বিপ্লব হইতেছে তাহার সম্বন্ধে ভালবাসা আছে ও ভারত যে মনে করে সকল বিপ্লবের দায়ীত্ব ভার তাহারই উপরে অন্ততঃ কিছুটা ন্যস্ত রহিয়াছে; এই মনোভাব আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ রক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক নহে। ভারতের মনে রাখা উচিত যে তাহার উপর সকল বিপ্লবের অভিভাবকত্বের ভার কোন ভাবেই কেহ দেয় নাই।

একথাও মনে রাখা উচিত যে উত্তর ভিয়েৎনাম ভারতের ব্যবসায়ীদিগের বহু শত কোটি টাকা বিনা কারণে বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহাদিগকে ঐদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং ঐ দেশের রাষ্ট্রনেতাগন চীন যখন ভারত আক্রমণ করে তখন চীনের অন্যায়ের সমর্থন করিয়াছিল। পণ্ডিত নেহেরু উহা লইয়া পত্রযুদ্ধও কিছুটা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার ফলে উত্তর ভিয়েৎনাম মত বা দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায় নাই। সকল দিকদিয়া বিচার করিলে বুঝা যায় যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামই এখন পর্য্যন্ত ভারতের সম্বন্ধে সখ্যভাব পোষন করিয়াছে। উত্তর ভিয়েৎনাম তাহা করে নাই। কিন্তু ভারত গায়ে পড়িয়া উত্তর ভিয়েৎনামকেই তৈল মর্দ্দন চেষ্টা করিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে ভারত বিরুদ্ধতায় অগ্রসর হইতে বাধ্য করিয়াছে। কূটরাজনীতি ক্ষেত্রে ইহা একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। অর্থনৈতিক বা আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ গঠন ও রক্ষা বিষয়েও এইরূপ ব্যবহার অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক।

পাকিস্থানের হিন্দু বিতাড়ন চেষ্টা

পাকিস্থান হইতে আবার হিন্দু জনসাধারণ ভিটামাটি ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহার কারণ নূতন কিছু নহে, চিরপুরাতন লুণ্ঠন, নারীনির্য্যাতন, খুন খারাবি প্রভৃতি যে সকল অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে পূর্ব্বে বহু লক্ষ হিন্দু পলায়ন করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল; এখনও ঠিক সেই জাতীয় নিগ্রহের জন্যই হিন্দুরা পাকিস্থান হইতে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে। ১৯৬৫ খৃঃ অব্দে ভারত আক্রমণ করিয়া পাকিস্থান যে

শিক্ষালাভ করিয়াছিল প্রায় পাঁচ বৎসর কাল তাহার ফলে পাকিস্থান শান্তিরক্ষা করিয়া চলিয়াছে। এখন আবার রুশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও চীনের নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পাকিস্থানের মনোভাব ভারত আক্রমণের দিকে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইতিপূর্বেও ভারত বিরুদ্ধতার প্রথম লক্ষণ দেখা যাইত হিন্দু বিতাড়নের ভিতরে। কিছু কাল হিন্দু বিতাড়ন করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করিয়া তৎপরে ভারত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করা হয়। ইহাই পাকিস্থানের অভ্যাস। সেই কারণে মনে হয় যে এখন হিন্দুদিগকে যে তাড়ান আরম্ভ হইয়াছে তাহা ক্রমে ক্রমে ভারতের সহিত সামরিক সংঘর্ষে গিয়া দাঁড়াইবে। অস্ত্র সংগ্রহ দিয়া ঐ কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এখন আবহাওয়া সৃষ্টি করা হইতেছে যাহাতে সকল পাকিস্থানী প্রাণ দিয়া ভারতের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত হয়। তৎপরে আসিবে স্থান ও কাল নির্ণয় করা ও যুদ্ধ। আমাদের কর্ত্তব্য হইবে প্রস্তুত হওয়া সেই অদূর ভবিষ্যতের যুদ্ধের জন্য। আরও প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন চেষ্টা করিয়া যাহাতে এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ হয় পাকিস্থানের সহিত। যাহাতে যুদ্ধ শেষের সহিত পাকিস্থানও ভিন্ন রাষ্ট্র হিসাবে আর না থাকে।

বাঙ্গলার বিধান সভার অবসান

১৪ পার্টির রাজত্ব ভাঙ্গিয়া যাইবার পর রাষ্ট্রপতির রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বিধান সভার অধিবেশন না হইলেও সভার অস্তিত্ব লোপ এতকাল হয় নাই। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও অপরাপর রাষ্ট্রনেতাগণ মধ্যে মধ্যে কয়েক দল একত্র হইয়া রাজ্যশাসনভার গ্রহণের পরিকল্পনায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। কিন্তু কোন প্রকার মিল না থাকায় সেই প্রকারের কোন নূতন ব্যবস্থা হয় নাই। এখন বিধান সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং ইহার ফলে নূতন নির্ব্বাচন না করিয়া কোন ভাবে মন্ত্রীদের হস্তে শাসন ভার গ্রহণের আর সম্ভাবনা হইবে, তীব্র ভাষায় ভারত সরকারের নিন্দাবাদ হইবে। কিন্তু মনে, হয় না যে অতিশীঘ্র কোন নির্ব্বাচন ব্যবস্থা কেহ করিবে। নির্ব্বাচন হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশের সকল জ্ঞানবান ব্যক্তির চিন্তা করা আবশ্যক কি করিয়া নির্ব্বাচনে মিথ্যা ভোট, কেনা ভোট, মদ্যপান করাইয়া ভোট গ্রহণ প্রভৃতি নিবারণ করা সম্ভব হয়। ভোট যাহার তাহার ভোট দিতে আসিবার পূর্ব্বেই অন্য লোক আসিয়া সেই ভোট দিয়া দেওয়া, মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তির ভোট দিয়া দেওয়া এবং পয়সা দিয়া, ভয় বা লোভ দেখাইয়া ভোট দেওয়া একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হয় শতকরা ১৫ হইতে ৩০টি ভোটই মিথ্যা। এই সকল কারণে দেশের যাহারা বিদ্যা বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি ও নীতিবোধে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহারা প্রায় কখনই নির্ব্বাচিত হইতে পারে না। অর্থাৎ নির্ব্বাচনের যাহা উদ্দেশ্য, যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদিগকে শাসন কার্য্যে লইয়া আসা সে উদ্দেশ্য ঐ পূর্ব্ববর্ণিত অসৎ ও অন্যায় ভোট দান রীতির ফলে কোন ভাবেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত আছে রাষ্ট্রীয় দলগুলি। এই সকল দলের কোনটিরই উদ্দেশ্য জনকল্যান সাধন নহে। দলপাকাইয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধিই মূল উদ্দেশ্য। এই স্বার্থ আবার বহু ক্ষেত্রে জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গল বিরুদ্ধ। কোন দল চাহে ভারতকে বিদেশীর অধীনে লইয়া বসাইতে: আর কোন দল চাহে এমন কিছু যাহাতে অধিকাংশ ভারতবাসীই একটা নূতন দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মহা অভাবের চাপে জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হইবে। আর [illegible] কোন দল আছে যাহারা বিদেশীর নিকট অর্থ [illegible] দলের শক্তি বৃদ্ধি করে। এই দলগুলির অভিপ্রায় বিদেশীর নির্দ্দেশে ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা করা। সে অভিপ্রায় কখনই ভারতের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। সুতরাং নির্ব্বাচন শীঘ্র হইলেই যে দেশবাসীর লাভ হইবে তাহা কে বলিবে?

মাসতুতো ভাই

রুশিয়া ও চীন [illegible] কাহারও মতে বাহিরে

শত্রুতার অভিনয় করিলেও ভিতরে ভিতরে গভীর ও গুপ্ত মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ রুশিয়া ও চীন উভয় দেশই কম্যুনিষ্ট সুতরাং ঐ দুই দেশের রাষ্ট্রীয় মূলমন্ত্র একই। কিন্তু চীন বলে রুশিয়া কম্যুনিষ্ট আদর্শ পূর্ণাঙ্গ রাখে নাই এবং রুশিয়া বলে চীনের নানা প্রকার বাড়াবাড়ি করিয়া মাও রাজ্যের স্বৈরাচারের সুবিধাবৃদ্ধি করাকে কম্যুনিজমের পবিত্রতা রক্ষা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইহা ব্যতীত কিছু ঝগড়া হইতেছে রাজত্বের সীমানা নির্দ্দেশের সম্বন্ধে মত দ্বৈধজাত। সত্যকার মনোমালিন্য তাহা হইলে থাকিতে পারে শুধু রাজত্বের সীমানা লইয়াই। মার্কস, লেনিন, স্টালিন, মাও প্রভৃতি কম্যুনিজমের মহাগুরুদিগের মতবাদের গুঢ় অর্থ লইয়া যে সাজান তর্ক বিতর্ক তাহার জন্য রুশিয়া ও চীন লড়াই করিবে ভাবিবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। সীমানা লইয়া ঝগড়া হইলেও তাহা মিটমাট হইয়া যায়। পুরাতন যে পারস্পরিক সমালোচনা হইয়াছিল রুশিয়া চীনকে বাড়তি পড়তি অস্ত্রশস্ত্র ও কারখানার যন্ত্রপাতি দান করার ফলে তাহা এখন আর চলে না; কারণ চীন ও ঐ একই পন্থা অনুসরণ করিয়া "রিজেক্ট" মাল পাঠাইয়া পাকিস্থান ও অন্যান্য ভক্ত মুল্লুকের অস্ত্রশস্ত্রাগার ভর্ত্তি করিয়া দিতেছে। ইহা একটা পুরাতন আন্তর্জাতিক সামরিক সাহায্য দানের চিরপ্রচলিত রীতি। বহুকাল পূর্ব্বে ইংলণ্ড মিশরকে অনেকগুলি যুদ্ধবিমান দান করিয়াছিল। সেগুলি একদিন প্রাতে যুদ্ধ করিতে গিয়া তোপ ছুঁড়িতে না পারার ফলে একাধারে মার খাইয়া বিনষ্ট হয়। আমেরিকা ঐ একই রীতি অনুসরণ করিয়া নানান দেশকে পুরাতন বস্তাপচা মাল সরবরাহ করিয়াছে ও করিতেছে। রুশিয়া এখন মিশরকে ঐ রূপ অস্ত্র জোগাইতেছে। সুতরাং ঐ বিষয়টি এখন কোন কলহের জাগ্রত কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

এই অবস্থায় রুশিয়ার সহিত চীনের কলহ লইয়া যে আলোচনা হইয়া থাকে তাহা যে সকল কারণ আছে ধরিয়া লইয়া করা হয় সে সকল কারণের অস্তিত্ব কতটা কাল্পনিক ও কতটা বাস্তব তাহা বিবেচনার বিষয়। চীন ও রুশের যে মতের মিল আছে নানা বিষয়ে তাহার একটা প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। চীন ভারতের যে সকল অংশ দখল করিয়াছে অথবা দাবী করিয়া থাকে, রুশিয়া হইতে প্রকাশিত মানচিত্রে সেই সকল ভূখণ্ডকে চীনের অন্তর্গত বলিয়া দেখান হইয়া থাকে। ভারত সরকার ইহাতে আপত্তি জানাইলে রুশিয়া বলে মানচিত্রগুলি সরকারীভাবে ছাপা হয় নাই। রুশিয়ায় সকল কিছুই সরকারী; শুধু ঐ মানচিত্রগুলিই বেসরকারী।

রুশিয়ার নিজ দোষ অস্বীকার করাটা সন্দেহজনক। যে দেশে কোন লোক কবিতা বা উপন্যাস লিখিলেও তাহা রুশ সরকার অনুমোদিত না হইলে লেখককে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে যাইতে হয়, সেই দেশে কোন মিত্র-জাতির রাজত্বের সীমানা লইয়া যে কেহ বে-সরকারী ভাবে ছিনিমিনি খেলিতে পারে, একথা কখনও বিশ্বাস করা যায় না। এই মানচিত্র প্রকাশে রুশ সরকারের হাত আছে, বলা বাহুল্য। চীনের সহিত রুশের কলহ কতটা অভিনয় ও কতটা বাস্তব তাহা উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বোধ ক্ষেত্রে আকাশ কুসুম দর্শন জাতীয় নিরাপত্তার দিক হইতে চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করে। তাসখন্দে রুশিয়া যেরূপ ভারতকে ডুবাইয়া পাকিস্থানের সুবিধা অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল; ভবিষ্যতে চীনের সহিত ভারতের কোন সীমান্ত নির্দ্ধারণ বৈঠক বসিলে বড়দাদা রুশিয়া আর একটি বৃহত্তর তাসখন্দ সৃষ্টি করিবে কি না তৎ সম্বন্ধে ভারতকে সজাগ থাকিতে হইবে।

মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

সুবিমল সিংহ

আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আসিতেছে। অচিরেই স্নাতকোত্তর পর্যায় অবধি সমস্ত বিষয় আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই শিক্ষাই মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়া হয়। তবে আমাদের দেশে এযাবৎ উচ্চশিক্ষা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হইতেছে। এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সমুদয় প্রামাণিক গ্রন্থই বিদেশী ভাষায় রচিত। ফলে হঠাৎ ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষায় উচ্চশিক্ষাদানের ব্যবস্থা একটু জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হইল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত স্তরের অসংখ্য গ্রন্থের দেশীয় ভাষায় রূপান্তরের সমস্যা। সরকার এই কাজে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিবেন সত্য, তবে কাজটা একটা বড় সেতু অথবা বাঁধ নির্ম্মাণ কিম্বা একটা পরিকল্পিত শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার মত নহে যে শুধু অর্থব্যয় করিলেই সম্পন্ন করা যায়। কারণ বিদেশী ভাষায় রচিত উচ্চস্তরের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির দেশীয় ভাষায় তর্জমা করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রয়োজন সেই সব গ্রন্থের সম্যক অনুধাবন এবং তারপর দেশীয় ভাষায় ঐ গ্রন্থসমূহের তত্ত্বগুলির যথার্থ পরিবেষণ। ইহা নিছক কতকগুলি পরিভাষা সঙ্কলনের প্রশ্ন নহে। আধুনিক অর্থশাস্ত্রের অতিশয় প্রাথমিক পর্য্যায়ের একটা অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হইবে।

ইংরাজীতে "ইলেষ্টিক" (elastic) বলিয়া যে শব্দ আছে তাহা আমরা প্রায়ই বাংলায়ও ব্যবহার করিয়া থাকি। সকলেই জানেন রবার অথবা তজ্জাতীয় যেসব বস্তু টানিলেই লম্বা হয় আবার ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে তাহাকেই "ইলেষ্টিক" আখ্যা দেওয়া হয়। ইহাকে বাংলায় তর্জমা করা যায় "সঙ্কোচ-প্রসারশীল"। ইংরাজীতেও শব্দটা এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে শব্দটির সহিত দুইটা ধারণা জড়িত আছে। একটা হইল টানিলে প্রসারিত হওয়া আর অপরটা হইল প্রসারিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসা। অতএব ইংরাজী অভিধানে শব্দটার একটা অর্থ দেওয়া আছে 'সঙ্কুচিত অথবা প্রসারিত করিলে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে প্রবণ" ("tending after contraction, expansion etc to resume normal bulk or shape"। আবার আরেকটা অর্থও দেওয়া আছে "অনমনীয় অথবা অপরিবর্ত্তনীয় নহে "not inflexible or unalterable" এর প্রথমোক্ত অর্থটার ভিত্তিতে অর্থাৎ সংকুচিত অথবা প্রসারিত করিলে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে প্রবণ" এই অর্থে শব্দটার বাংলা পরিভাষা করা হইয়াছে "স্থিতিস্থাপক"। এখন অর্থশাস্ত্রে "চাহিদার" সহিত elasticity অথবা সঙ্কোচ-প্রসার শীলতার একটা ধারণা জড়িত আছে। চাহিদার নিয়ম এই যে কোন দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া দিলে চাহিদা বাড়ে অর্থাৎ

ক্রেতারা ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে ক্রয় করেন এবং মূল্য বাড়াইয়া দিলে চাহিদা কমে অর্থাৎ ক্রেতারা ক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেন। এই নিয়মটী সাধারণভাবে প্রায় সব দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইলেও কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে মূল্য একটু কমাইয়া দিলেই চাহিদা হয়ত খুব বেশী বাড়িয়া যায় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মূল্য যথেষ্ট কমিলেও চাহিদা বিশেষ বাড়ে না। প্রথমোক্ত দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে বলা হয় চাহিদা 'elastic" এবং শেষোক্তগুলির ক্ষেত্রে বলা হয় চাহিদা inelastic'। স্পষ্টই বুঝা যায় যে এখানে চাহিদার elasticity বলিতে 'সংকোচ-প্রসারশীলতা" বুঝাইতেছে; "স্থিতিস্থাপকতা নহে। অথচ স্কুল-কলেজের অনেক পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায় পূর্ব্বোক্ত পরিভাষা অনুসারে 'elasticity of demand" এর তর্জ্জমা করা হইয়াছে "চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা"। এক্ষেত্রে তর্জ্জমাটি প্রায় বিপরিতার্থক। এরূপ অবস্থায় শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা অসম্ভব। অথচ অর্থশাস্ত্রে এই ধারণাটি এত প্রাথমিক অথবা মৌলিক যে ইহা না বুঝিলে অর্থশাস্ত্র পড়াই কোন অর্থ হয় না। একটু আলোচনা করিলেই এই কথার তাৎপর্য বুঝা যাইবে।

অর্থশাস্ত্রে চাহিদার মূল্যানুগ সংকোচ-প্রসারশীলতাকে (Price-elasticity of demand) পাঁচটি বিভিন্ন মানে ভাগ করা হয়, যথা ১) Neither elastic nor inelastic demand ২) Elastic demand ৩) Inelastic demand ৪) Absolutely inelastic demand ৫) Infinitely elastic demand।

কোন দ্রব্যের মূল্য যে অনুপাতে কমিল (অথবা বাড়িল) চাহিদা যদি ঠিক সেই অনুপাতে বাড়ে (অথবা কমে) তবে বলা হয় চাহিদা Elastic ও নহে Inelastic ও নহে। ইহাকে বাংলায় "সম-সম্প্রসারণশীল" অথবা "সম সংকোচপ্রসারশীল" চাহিদা বলা যায়। এক্ষেত্রে পূর্ব্বের উচ্চতর (অথবা নিম্নতর) মূল্যে ক্রেতারা দ্রব্যটির জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেন বর্ত্তমানের নিম্নতর (অথবা উচ্চতর) মূল্যেও ঠিক সেই পরিমাণ অর্থই ব্যয় করিবেন। যেমন ধরা যাক, কলিকাতার বাজারে কাটা পোনামাছের দর আট টাকা কিলো হইলে ক্রেতারা দৈনিক সাত হাজার কিলো ক্রয় করেন এবং সাত টাকা কিলো হইলে আট হাজার কিলো ক্রয় করেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই ক্রেতাদের মোট ব্যয় হইবে ৫৬০০০ টাকা। অর্থশাস্ত্রে এরূপক্ষেত্রে বলা হয় চাহিদার সংকোচপ্রসারশীলতার মান "এক" (Elasticity=1, অথবা E=1)। এক্ষেত্রে বিক্রেতারা যদি নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা না করিয়া একজোট হন তাহা হইলে মূল্য আট টাকা হইতে কমাইবেন না। কারণ আট টাকা মূল্যে সাত হাজার কিলো বিক্রী করিয়া যে টাকা পাইবেন, ৭ টাকা মূল্যে তদপেক্ষা ১ হাজার কিলো বেশী বিক্রয় করিয়াও সেই টাকাই পাইবেন। তার চেয়ে বাজার খারাপ না করিয়া এক হাজার কিলো মাছ পুনরায় জলে ছাড়িয়া দেওয়াও ভাল।

আবার কোন দ্রব্যের মূল্য যে অনুপাতে কমিল (অথবা বাড়িল) চাহিদা যদি তদপেক্ষা অনুপাতে বেশী বাড়ে (অথবা কমে) তাহা হইলে বলা হয় দ্রব্যটির চাহিদা Elastic। এক্ষেত্রে বলা হয় চাহিদার সংকোচ-প্রসারশীলতার মান 'এক" এর অধিক (Elasticity is greater than unity, অথবা E>1)। বাংলায় এক্ষেত্রে চাহিদাকে "স্থিতিস্থাপক" বলিলে অনেকটা বিপরীত ধারণাই হইতে পারে। এবং শুধু "সংকোচ-প্রসারশীল" বলিলেও ঠিক হইবে না। তবে "অতি-সম্প্রসারণশীল" বলিলে অথবা অতিসংকোচ প্রসারশীল হয়ত অর্থটা স্পষ্ট হইতে পারে। যাহাই হোক, এক্ষেত্রে মূল্য কমাইয়া দিলে ক্রেতাদের চাহিদা এত বাড়িয়া যাইবে যে তাঁহারা দ্রব্যটির জন্য পূর্ব্বে যত টাকা ব্যয় করিতেন এখন তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করিবেন। অপরপক্ষে মূল্য বাড়াইয়া দিলে তাঁহাদের ক্রয়ের পরিমাণ এত কমিয়া যাইবে যে

তাঁহাদের ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে। অর্থাৎ মাছের দর আট টাকা কিলো হইলে যদি তাঁহারা সাত হাজার কিলো ক্রয় করেন তবে সেই দর সাত টাকায় নামিলে তাঁহারা আট হাজার কিলোর বেশী ক্রয় করিবেন। মনে করা যাক, তাঁহারা নয় হাজার কিলো কিনিবেন। এক্ষেত্রে আট টাকা দরে সাত হাজার কিলোর বিক্রয়লব্ধ অর্থ (৫৬০০০ টাকা) এবং সাত টাকা দরে নয় হাজার কিলোর বিক্রয়লব্ধ অর্থের (৬৩০০০) তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে সাত টাকা দরে দুই হাজার কিলো বেশী বিক্রয় করিয়া বিক্রেতারা সাত হাজার টাকা বেশী পাইবেন। এক্ষেত্রে বিক্রেতারা যদি একজোট হন অথবা মাছের যোগান যদি কোন একচেটিয়া ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর হাতে থাকে এবং তাঁহাদের হাতে নয় হাজার কিলো মজুত থাকে [illegible] দুই হাজার কিলো মজুত করিয়া রাখিলে অথবা অন্যত্র চালান দিলে তাহা হইতে সাত হাজার টাকার বেশীই আসিবে তবে দর আট টাকায় বাঁধিয়া সাত হাজার কিলো মাত্র বিক্রয় করিবেন। আর যদি দেখেন যে দুই হাজার কিলো মাত্র মজুত করিয়া রাখিয়া অথবা অন্যত্র চালান দিয়া তাহা হইতে সাত হাজার টাকাও আসিবে না তবে দর সাত টাকায় নামাইয়া নয় হাজার কিলোই বিক্রী করিয়া দিবেন।

অপরপক্ষে কোন দ্রব্যের মূল্য যে-অনুপাতে কমিলে (অথবা বাড়িলে) ক্রেতাদের চাহিদা যদি তদপেক্ষা অল্পাতে কম বাড়ে (অথবা কমে) তাহা হইলে বলা হয় যে দ্রব্যটির চাহিদা inelastic। এক্ষেত্রে বলা হয় চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসারশীলতা "এক"-এর কম (elasticity is less than, অথবা E 1)। বাংলায় যদি elastic শব্দটির তর্জমা স্থিতিস্থাপক করি তাহা হইলে inelastic কথাটিকে "অস্থিতিস্থাপক" বলিতে হইবে। এবং স্কুল কলেজের কোন কোন পাঠ্যপুস্তকে তাহাই আছে। আবার যেসব পুস্তকে elastic demand কে "অতি সঙ্কোচপ্রসারশীল চাহিদা" না বলিয়া শুধুমাত্র "সঙ্কোচ-প্রসারশীল চাহিদা" বলা হইয়াছে সেখানে inelastic চাহিদাকে স্বভাবতঃই "সঙ্কোচপ্রসারবিহীন" চাহিদা বলা হইয়াছে। কিন্তু inelastic চাহিদাও সঙ্কোচপ্রসারবিহীন নহে কারণ এক্ষেত্রেও মূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার পরিবর্তন হয়। তবে মূল্যের পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত কম। অতএব এক্ষেত্রে চাহিদাকে শুধুমাত্র "সঙ্কোচ-প্রসারবিহীন" না বলিয়া "স্বল্প সঙ্কোচ-প্রসারশীল অথবা "নাতি সঙ্কোচপ্রসারশীল" চাহিদা বলিতে পারি। এই inelastic চাহিদার বিশেষত্ব এই যে এক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের মূল্য কমিলে ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে বটে তবে খুব কম বাড়িবে। ফলে ক্রেতারা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রব্যটির জন্য [illegible] এখন [illegible] হইবে। অপরপক্ষে কোন দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণও কমিবে বটে, তবে সামান্যমাত্র কমিবে। ফলে ক্রেতাদের ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবে। অর্থাৎ মূল্য কমিলে ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ কমিবে এবং মূল্য বাড়িলে তাঁহাদের ক্রয়ের পরিমাণ কমিবে কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িবে। মোটকথা "মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে" চাহিদার এই নিয়মটি elastic এবং inelastic চাহিদা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই দুই শ্রেণীর চাহিদার মধ্যে গুণগত (qualitative) কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্যটা পরিমাণগত (quantitative)। যাহাই হোক, চাহিদা inelastic হইলে বিক্রেতারা দর চড়াইয়া দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কম মাল বিক্রী করিয়াও বেশী টাকা পাইবেন। অপরপক্ষে দর কমাইয়া দিলে পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমাণে বেশী বিক্রি করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু মোট টাকা আসিবে কম। আমাদের পূর্ব্বের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেই বুঝা যাইবে যে পোনা মাছের চাহিদা যদি inelastic হয় আর মূল্য ৮ টাকা কিলো হইলে

ক্রেতারা ৭ হাজার কিলো ক্রয় করেন তবে মূল্য ৭ টাকায় নামিলে তাঁহারা ৭ হাজার কিলোর বেশীই কিনিবেন বটে, তবে ৮ হাজার কিলো অপেক্ষা কম কিনিবেন মনে করা যাক, তাঁহারা ৭৫০০ কিলো কিনিবেন। এক্ষেত্রে ৮ টাকা দরে ৭ হাজার কিলোর জন্য তাঁহারা ব্যয় করিতেন ৫৬০০০ টাকা (৮×৭০০০ = ৫৬০০০) এবং ৭ টাকা দরে ৭৫০০ কিলোর জন্য ব্যয় করিবেন ৫২৫০০ টাকা (৭×৭৫০০=৫২৫০০ অর্থাৎ দর ৮ টাকা হইতে ৭ টাকায় নামিলে ক্রেতারা ৫০০ কিলো মাছ বেশী কিনিয়াও খরচ করিবেন ৩৫০০ টাকা (৫৬০০০—৫২৫০০=৩৫০০) কম। কিন্তু বিক্রেতারা যদি একজোট হন অথবা মৎস্যব্যবসায় যদি একচেটিয়া কারবারীর হাতে থাকে তবে ক্রেতাদের সে-গুড়ে বালি প'ড়বে অর্থাৎ মাছও বেশী খাইবেন আবার টাকাও কম খরচ করিবেন তাহা হইবে না। কারণ বিক্রেতারা দেখিবেন যে ৭ টাকা দরে ৭৫০০ কিলো মাছ বিক্রি করিয়া যে টাকা পাইবেন ৮ টাকা দরে তাহাপেক্ষা ৫০০ কিলো মাছ কম বিক্রি করিয়াও ৩৫০০ টাকা বেশী পাইবেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের হাতে যদি ৭৫০০ কিলো মাছ থাকেও এবং ৫০০ কিলো মাছ মজুত করিয়া রাখিবার কিম্বা অন্যত্র চালান দিবার কোন সুবিধা না থাকে তবুও মূল্য ৮ টাকায়ই রাখিয়া ৭০০০ কিলো বিক্রি করিয়া বাকী ৫০০ কিলো মাছ নষ্ট করিয়া ফেলাও তাঁহাদের পক্ষে লাভজনক। এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায় কোন কোন ধনতান্ত্রিক দেশে অনেক সময় কেন পণ্যদ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। আমেরিকায় কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বেশী হইলে যদি দেখা যায় যে, সমুদয় পণ্য বাজারে ছাড়িলে মূল্য এত নামিয়া যাইবে যে উৎপাদকেরা মোট যত টাকা পাইবেন তাহার চেয়ে মূল্য চড়া রাখিয়া কিয়দংশ বিক্রয় করিলেই অনেক বেশী পাইবেন, তাহা হইলে মূল্য চড়া রাখিয়া অবিক্রীত অংশ নষ্ট করিয়া ফেলাও তাঁহাদের পক্ষে লাভজনক। এ অবস্থায় সরকার উৎপাদকদের চড়া মূল্যের সুযোগ দিয়া উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যাদি কিনিয়া লন। সময় সময় তাহা নষ্টও করিতে হয়। আবার তাহার মত দেশকে তাহা ঋণস্বরূপে দিয়া বাধিতও রাখা যায়।

চাহিদার যে তিনটি বিভিন্ন মানের সঙ্কোচ-প্রসারশীলতার কথা বলা হইল তন্মধ্যে সম-সঙ্কোচ-প্রসারশীল চাহিদা (E=1) অপর দুইটির অর্থাৎ অতি-প্রসারশীল চাহিদা (E>1) এবং স্বল্প প্রসারশীল চাহিদা (E71) এই দুইটির মধ্যবর্তী অবস্থামাত্র। এই তিনটি ছাড়াও আরও দু'টি চরম মানের elasticityর কল্পনা করা হয়। তাহাদের একটি হইল absolutely inelastic demand অথবা সম্পূর্ণরূপে সঙ্কোচপ্রসারবিহীন চাহিদা এবং অপরটি হইল infinitely elastic demand অথবা অসীম সংকোচপ্রসারশীল চাহিদা। Absolutely inelastic demand অথবা সম্পূর্ণ সঙ্কোচপ্রসারবিহীন চাহিদার ক্ষেত্রে মূল্য বাড়ুক বা কমুক চাহিদা অর্থাৎ ক্রেতাদের ক্রয়ের পরিমাণ একই থাকে। একমাত্র এই ক্ষেত্রেই আমরা 'সঙ্কোচ-প্রসারবিহীন" শব্দটি ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু কোন কোন পাঠ্যপুস্তকে inelastic চাহিদাকে যেমন "অস্থিতিস্থাপক" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তেমনই সম্ভবতঃ absolutely inelastic চাহিদাকে "সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বরং বিপরীত ধারণারই সৃষ্টি হইতে পারে। যে চাহিদার পরিবর্তন হয় না তাহাকে "স্থিতিশীল" চাহিদা বলা যায়, "অস্থিতিস্থাপক" বলা অসঙ্গত। যাহাই হোক, অর্থশাস্ত্রে absolutely inelastic চাহিদার মান ধরা হয় 'শূন্য' (E=O)। আর ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থা হইল infinitely elastic demand অথবা অসীম সঙ্কোচপ্রসারশীল চাহিদা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মূল্য নামমাত্র কমিলেই (অথবা বাড়িলেই) চাহিদা অপরিসীমভাবে বাড়িয়া (অথবা কমিয়া) যায়। এক্ষেত্রে বলা হয় সঙ্কোচ-প্রসারশীলতার মান "অসীম" অথবা infinity (E=∞)। অর্থশাস্ত্রে এই শেষোক্ত শ্রেণীর চাহিদাটির অর্থাৎ অসীম-সঙ্কোচপ্রসারশীল (E=∞) চাহিদাটির ধারণার প্রয়োগ হয় "পূর্ণ প্রতিযোগিতার"

ক্ষেত্রে যখানে অসংখ্য প্রতিযোগী বিক্রেতা একই দ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন এবং যে কোন একজন বিশেষ বিক্রেতা বাজারের মোট যোগানের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র যোগান দিতে পারেন। এরূপক্ষেত্রে বাজারের সামগ্রিক চাহিদা স্বল্প অথবা অতি-সঙ্কোচপ্রসারশীল যাহাই হউক না কেন কোন একজন বিশেষ বিক্রেতার দৃষ্টিতে তাঁহার নিজের পণ্যের চাহিদা অসীমভাবে সঙ্কোচ-প্রসারশীল। কারণ তিনি যদি তাঁহার পার্শ্ববর্তী বিক্রেতা অপেক্ষা এক পয়সাও দাম বেশী চাহেন তবে তাহার পণ্যের কণামাত্রও বিক্রয় হইবে না। অপরপক্ষে তিনি যদি অন্যান্য বিক্রেতারা যে-দরে বিক্রয় করিতেছেন তাহাপেক্ষা এক পয়সা দাম কমাইয়া দেন তা'হইলে তাঁহার সমস্ত পণ্য মুহূর্তে বিক্রয় হইয়া যাইবে। কারণ তাঁহার পণ্যের পরিমাণ বাজারের মোট যোগানের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। এককথায় বলা যায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে কোন বিক্রেতা চলতি বাজারদরে যত খুশী বিক্রয় করিতে পারেন। মূল্য বাড়াইবার শক্তি তাহার নাই, কমাইবার শক্তিও নাই; কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চলতি বাজারদর এমন পর্যায়ে নামিয়া আসে যে তাহাপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করিতে গেলে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলেও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ইহার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

আশা করি উপরের আলোচনা হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে অর্থশাস্ত্রে চাহিদার elsticity অথবা সঙ্কোচপ্রসার শীলতার ধারণা অতিশয় প্রয়োজনীয়। এবং বিভিন্ন মানের elasticity সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে অর্থনীতির প্রাথমিক জ্ঞানও সম্ভব নয়। কিন্তু যথার্থ পরিভাষা অথবা অনুবাদের অভাবে বিষয়টি শিক্ষার্থীর নিকট অস্পষ্ট থাকিতে বাধ্য। আবার সহজবোধ্য অনুবাদের সাহায্যে সাধারণ লোকের পক্ষেও অর্থ নীতির অনেক দুরূহ তত্ত্বের জ্ঞান লাভ সম্ভব। আমাদের আলোচিত চাহিদার elasticity অথবা সঙ্কোচপ্রসার শীলতার ধারণা থাকিলে পণ্যদ্রব্য, পরিবহন, ডাকটিকিট ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণ, মুদ্রার বৈদেশীক বিনিময় হার, ব্যাঙ্কের সুদের হার ইত্যাদির পরিবর্তন সংক্রান্ত সরকারী অথবা বেসরকারী নীতির সম্ভাব্য ফলাফল অথবা যৌক্তিকতা সম্পর্কে জনসাধারণের পক্ষে বিচার করা সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ট্রাম, বাস, রেলগাড়ি ইত্যাদির ভাড়া বাড়াইলেই যে পরিবহনসংস্থার আয় বাড়িবে এমন মনে করিবার কারণ নাই। পরিবহনের চাহিদা যদি অতিসঙ্কোচপ্রসারশীল (elastic) হয় তবে ভাড়া বাড়াইলে যাত্রীর সংখ্যা এত কমিয়া যাইবে যে মোট আয় কমিয়া যাইবে এবং ভাড়া কমাইলে যাত্রীর সংখ্যা এত বাড়িবে যে মোট আয় বাড়িবে। আবার এমনও হইতে পারে যে ভাড়া সামান্য বাড়াইলে আয় বাড়িবে, অধিক বাড়াইলে আয় কমিবে। অথবা উভয়ক্ষেত্রেই আয় বাড়িবে তবে সামান্য বাড়াইলে যত বাড়িবে বেশী বাড়াইলে তত বাড়িবে না। আবার এমন অদ্ভুত ব্যাপারও হইতে পারে যে ভাড়া কমাইলেও আয় বাড়িবে ভাড়া বাড়াইলেও আয় বাড়িবে। যেমন ধরা যাক, বর্তমানে ট্রামের ভাড়া ১০ পয়সা এবং তাহাতে দৈনিক ৮ লক্ষ যাত্রী হয়। ফলে ট্রাম কোম্পানীর দৈনিক আয় হয় ৮০ লক্ষ পয়সা অর্থাৎ ৮০ হাজার টাকা। এখন মনে করা যাক যদি, ভাড়া ১০ পয়সা হইতে কমাইয়া ৮ পয়সা করা হয় তবে যাত্রীসংখ্যা বাড়িয়া হয় ১১ লক্ষ। ফলে কোম্পানীর দৈনিক আয় ৮০ লক্ষ পয়সা অথবা ৮০ হাজার টাকা হইতে বাড়িয়া দাঁড়ায় ৮৮ লক্ষ পয়সা অর্থাৎ ৮৮ হাজার টাকায়। আবার যদি ভাড়া ১০ পয়সা হইতে বাড়াইয়া ১২ পয়সা করা হয় তবে ধরা যাক, যাত্রীসংখ্যা ৮ লক্ষ হইতে কমিয়া হয় ৭ লক্ষ। ফলে কোম্পানীর মোট দৈনিক আয় ৮০ লক্ষ পয়সা অথবা ৮০ হাজার টাকা হইতে বাড়িয়া দাঁড়ায় ৮৪ লক্ষ পয়সা অর্থাৎ ৮৪ হাজার টাকায়। ভাড়া দুই পয়সা কমাইলেও আয় বাড়ে, দুই পয়সা বাড়াইলেও আয় বাড়ে। দুই পয়সা কমাইলে তিন লক্ষ যাত্রী অধিক বহন করিয়া আয় বাড়ে ৮ হাজার টাকা এবং দুই পয়সা বাড়াইলে একলক্ষ যাত্রী

কম বহন করিয়া আয় বাড়ে ৪ হাজার টাকা। ইহার কারণ এই যে ভাড়া যখন ৮ পয়সা এবং ১০ পয়সার মধ্যে উঠানামা করে তখন চাহিদা ।অতিসংকোচপ্রসারণীল (elastic) কিন্তু ভাড়া যখন ১০ পয়সা এবং ১২ পয়সার মধ্যে উঠানামা করে তখন চাহিদা স্বল্প সংকোচপ্রসারণীল (inelastic)। এখন যদি দেখা যায় যে তিন লক্ষ যাত্রী অধিক বহন করিতে কোম্পানীর অতিরিক্ত ব্যয় হয় তিন হাজার টাকা তাহা হইলে ভাড়া কমাইয়া কোম্পানীর নীট আয় বাড়ে পাঁচ হাজার টাকা (অতিরিক্ত আয় ৮০০০ টাকা হইতে অতিরিক্ত ব্যয় ৩০০০ টাকা বাদ দিয়া)। অপর পক্ষে যদি দেখা যায় যে একলক্ষ যাত্রী কম বহন করিবার দরুণ সংস্থার ব্যয় বাঁচে একহাজার টাকা, তাহা হইলে ভাড়া বাড়াইয়াও নীট আয় বাড়ে পাঁচ হাজার টাকা (অতিরিক্ত আয় ৪০০০ টাকার সহিত ব্যয়সংকোচ ১০০০ টাকা যোগ করিয়া)। উভয় ক্ষেত্রেই সমান কথা। কিন্তু ভাড়া কমাইলে শুধু যে জনসাধারণ উপকৃত হইবে তাহাই নয়, দৈনিক তিন হাজার টাকার ব্যয়বৃদ্ধির অর্থ হইল পরিবহন সংস্থায় অতিরিক্ত কর্মসংস্থান এবং কর্মিদের আয় বৃদ্ধি। অপরপক্ষে ভাড়া বাড়াইলে যে একলক্ষ যাত্রী কমিবে এবং ফলে এক হাজার টাকার ব্যয় সংকোচ হইবে তাহার অর্থ হইল কর্মসংকোচ অথবা ছাটাই।

এই আলোচনার পর এই মন্তব্য বাহুল্য যে বিদেশী ভাষায় রচিত তত্ত্বসমূহের দেশীয় ভাষায় সম্যক পরিবেষনের অভাবে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের প্রতি প্রাথমিক সূত্রগুলিও শিক্ষার্থীদের অনধিগম্য থাকিতে বাধ্য। এক্ষেত্রে যদিও বিষয়টি মোটেই দুরূহ নয়, তর্জমার বিপর্যয়ে ইহাকে দুরূহ করা হইয়াছে। আর এই বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ, শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থের সহিত বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা না করিয়া অন্ধের মত কতকগুলি কৃত্রিম পরিভাষার অনুসৃতি। কোন শাস্ত্রের বিশেষতঃ অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদির মত সর্বজনীন শাস্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়েই যদি এরূপ বিপর্যয় ঘটে তবে ঐসব শাস্ত্রের উন্নত পর্যায়ে যেখানে তত্ত্বগুলি বাস্তবিকই দুরূহ সেখানে কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আগুন

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা ছিন্নমূল। মনে পড়ে, প্রায় পনের বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে এসে উঠেছিলাম এই ভারতে। তখন ছোট ছিলাম। সীমান্তের একটা রেল-ষ্টেশনের পাড়ে তাঁবুর মধ্যে আমরা এসে উঠলাম। তারপর গেলাম মহারাষ্ট্রে। ওখানে বাবা কোনরকম সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। আবার ফিরে এলাম হাওড়া ষ্টেশন। আবার আমাদের পাঠানো হোল মধ্যপ্রদেশে। এমনি করতে করতে চার বছর কেটে গেল।

কোনখানেই স্থির হয়ে বসতে পেলামনা আমরা। আমরা পেলামনা স্নেহ, পেলামনা মানুষের মর্যাদা। আজও মনে পড়ে, আমাদের যখন একজায়গা থেকে আর এক যায়গায় নিয়ে যাওয়া হত, তখন হুড়মুড় করে আমাদের ঠেলে উঠোনো হোত, লরীতে, নয়ত ট্রেনে। তখন মনে হত, আমরা যেন কতগুলো গরু মোষ ছাগল ভেড়া। খাদ্য, বস্ত্র, সুখ, শান্তি কোনকিছুই আমরা উপযুক্তভাবে ভালভাবে পাইনি। শেষকালে এই কলকাতায়, পরে ক্যানিং-এ। আমাদের প্রাণে সব সময় জ্বলে অভাব, দুঃখ আর না পাওয়া অধিকারের যন্ত্রণা।

ইতিমধ্যে দু-দুটো ভাই-বোন মারা গেছে। বাবাও মারা গেলেন এই সেদিন। কখনও মাছের জাল বুনি, অন্যের মাঠে কাজ করি ও কখনও বিড়ি বাঁধি। শেষ কালে পার্টিতে যোগ দিলাম। আমার এসব ভাল লাগত না। ওরা শেখাত—ও বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল, ও পুঁজিবাজী ইত্যাদি, কিছুই বুঝিনি কি এসবের অর্থ, তবে কাজ করতে বললে পারি। আগেই বলেছি, আমাদের ভেতর সবসময় আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে অন্যায়, অধর্ম, শয়তানী, সব কিছু পোড়ান যায়, দূর করা যায়। কিন্তু একদিন আমাদের অন্য কিছু পোড়াবার আদেশ এল। প্রথমটা যখন শুনলাম তখন ভাবলাম, এইমুহূর্তে পার্টি ছেড়েদি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, খাব কি? আর যাবই বা কোথায়! সমস্ত দেশজুড়ে চলছে জঘন্য পার্টীবাজী, এর থেকে নিস্তার পাওয়া কি এত সোজা! ওরা বলল কতগুলো কৃষকের বাড়ী পোড়াতে হবে। তখন রাত অনেক। আকাশে অসংখ্য তারা। চাঁদটা পরিস্কার আকাশে একটা ঝকঝকে রুপোর থালার মত শোভা পাচ্ছে। বাঁশঝাড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য জোনাকি। ধান ক্ষেত, ডোবা নালা পেরিয়ে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম কতগুলো চালাঘরের কাছে,—সবাই ফিসফিসিয়ে কথা বলছে দেখলাম। কতগুলো লোকের হাতে রয়েছে বড় বড় টিন, কারুর হাতে খড়, কাপড়, আরও কত কি! আমি চিরকালই নিরীহ কিন্তু ওরা আমার অন্তরের আগুনকে হাওয়া দিয়ে আরও তেজী করে তুলেছে। এতদিন কয়টি শুধুমাত্র আলো নিয়ে জ্বলছিল, আজ সেই মনের আগুন ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে, ভীষণ উত্তাপ বেরোচ্ছে, নিজেই বুঝতে পাচ্ছি ও আগুন হয়ত সব ধ্বংস করে দেবে; ধ্বংস করে দেবে মানুষের অনাবিল শান্তির নীড়, কান্না হাসি দিয়ে গড়া খেলাঘর।

আমি হাত গুটিয়ে বসেছিলাম। পেছন থেকে কে যেন ধাক্কা দিল, বলল—"এই ওঠ এবার, শ্লোগান দিতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গেই আগুন লাগান হবে ঘর-গুলোতে।"

আমি বললাম,—"হ্যাঁ। তা আমাকে কি করতে হবে?"

তোমাকে বল্লম হাতে দাঁড়াতে হবে, যেই বুর্জোয়ার বেরিয়ে পালাতে যাবে, ওমনি তুমি বল্লম চার্জ করবে।" বলেই, আমার হাতে একটা বল্লম দিল লোকটা। উঃ কি তীক্ষ্ণ ধার! কি ভয়ানক লক লক করছে বল্লমের মুখটা। আমার হাত কাঁপতে লাগল। ভাবলাম—মনুষের বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে নেবার কি অধিকার আছে আমার। আমি ভাবছিলাম, বুর্জোয়া, প্রতি-ক্রিয়াশীল, এসবের মানে কি। কি হবে ওদের হত্যা করে। হত্যা আর হিংসা কি নতুন জীবন গঠনে সহায়ক? নতুন সমাজগঠনে সহায়ক?

হঠাৎ কেঁপে উঠলাম শ্লোগানের ঠেলায়। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, বাড়ীগুলিতে আগুন লাগান হল। চালা-

ঘরগুলোতে হয়ত ঘুমোচ্ছে মানুষেরা। হয়ত মায়ের কোলে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে সন্তান, আমি যেমন ছোট বেলায় মায়ের বুকে লেপটে থাকতাম। হয়ত ওদের মনে রয়েছে কত স্বপ্ন। হয়ত ওরা একদিন জীবন-সংগ্রামে সফল হত। হয়ত ওরা—

আর ভাবতে পারলাম না, বিকট বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে গেল। বুঝলাম, বোমা ফাটাল। তাকিয়ে দেখি লকলক করে জ্বলে উঠছে ঘরগুলো। ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে আর্ত্ত চীৎকার। নারী পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ—মৃত্যুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে করুন আবেদন—বাঁচাও, বাঁচাও—কে আছো বাঁচাও। চারদিক লালে লাল। বাইরে অবিরত স্লোগান দিয়ে চলেছে আমার সাথীরা। আমি ওদের মুখের দিকে চেয়ে দুপা পিছিয়ে গেলাম। ওদের মুখে যে পশুর হিংস্রতা। সেই আগুন, সেই অভাবের আগুন আজ ঘর জ্বালাল। মনুষ্যত্বকে করল শব।

আমার সঙ্গের লোকগুলো কান ফাটা চীৎকার করে। সেই ভয়ার্ত কণ্ঠগুলোর আওয়াজ, আবেদনকে দাবিয়ে দিতে লাগল। হঠাৎ সামনের বাড়ীটার জানালা দিয়ে লাফিয়ে বেরুল একটা পুরুষমানুষ। মুহূর্তে ওর বুকে একটা বল্লম গিয়ে বিঁধল, ধপকরে পড়ে গেল লোকটা বলে উঠল, "কামিনী পালিয়ে-যা—পালিয়ে যা—তারপর সবচুপ।

চারদিক বাড়ীর আগুনের আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে। কুণ্ডলি পাকাতে পাকাতে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে। লক লক করে আগুনের শিখা উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ শুনলাম, একটা নারীকণ্ঠের আর্ত্ত চীৎকার, "কে আছো বাঁচাও!" সেই চীৎকার যেন মনে হোল মায়ের চীৎকার।

করুন সেই চীৎকার শুনে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। বল্লম ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, সামনের জলন্ত বাড়ীটায়। লাথি দিয়ে ভেঙে ফেললাম আধপোড়া দরজাটা, জলন্ত বাঁশ কাঠ সব পড়ছে ওপর থেকে। চারদিকে আগুন আর আগুন, ধোঁয়া আর ধোঁয়া, কোথাও কোন প্রাণী দেখতে পেলাম না আমি। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছিল, আগুনের তাপে কুকড়ে কুকড়ে যাচ্ছিলো মাথার চুলগুলো, হঠাৎ দেখলাম, একটা মোটা জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়ির নীচে একটা জ্বলন্ত খাট আর তার তলা থেকে দেখা যাচ্ছে একটা শিশুর হাত। মুহূর্ত্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে উপড়ে ফেললাম আধ-পোড়া খাটটা। কিন্তু হায়! স—অ—ব শেষ।

মায়ের কোলে লেপটে আছে শিশুটা। দুজনেরই চুলগুলো পুড়ে গেছে। ঝলসে গেছে চোখগুলো। শিশুটা দুটো হাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে মায়ের গলা। আমার মধ্যের মানুষটা হঠাৎ বিদ্রোহ করে উঠল। এই জঘণ্য নৃশংসতায় আমি ভাগ নিয়েছি, এই ভেবে আমার ভীষণ দুঃখ হতে লাগল, নিজের ওপর ঘৃণা হতে লাগল। কিন্তু চোখ দিয়ে জল বেরোল না, বেরোতে লাগল আগুন। তখনও বাইরে কোলাহল শোনা যাচ্ছিল। দেখলাম একটা বল্লম পড়ে আছে। বল্লমটা তুলে নিয়ে ছুড়ে মারলাম বাইরে, হঠাৎ—আঃ আঃ করে একটা আওয়াজ হোল, বুঝলাম একটা পশুকে ঘায়েল করেছি আমি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, ভগবান! লাখ লাখ বল্লম দাও, শেষ করে দেই ওদের। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, না—না, ওরা তো পশু নয় ওরাও মানুষ ওদের পশু করা হয়েছে। ওদের মনের ভেতর যে আগুন জ্বলছে, সেই আগুনে লোভরূপ ঘৃত দেওয়া হয়েছে, ওদের মনের আগুন লকলক করে জ্বলে উঠেছে, ওরা হয়েছে পশু। হঠাৎ একটা মোটা কাঠের গুঁড়ি ভেঙে এসে পড়ল আমার মাথায়, আমি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। যখন আমার চেতনা হোল তখন ভোর হয়ে এসেছে। আমার ওপর পড়া গুঁড়িটা নিভে গেছে। ওটাকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এখনও কাঠগুলো নেভেনি। কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে কোন কোন জায়গা থেকে। দূরে কোথাও একটা মোরগ ডেকে উঠলো!

আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কারা যেন বলছে,—"আমাদের মারলে কেন? আমরা তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি। আমরা মানুষ, কেন তোমরা আমাদের সুখের সংসার চিরকালের জন্য আগুন দিয়ে ছাই করে দিলে—কেন?—কেন?—কেন?

আমি কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না। আমার মনটা কেঁদে উঠল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি ভাবতে লাগলাম, আগুন দিয়ে আমরা নির্ভয়ে দিলাম কতগুলো নিরীহ, সরল মানুষের জীবন। চিরকালের জন্য ছাই করে দিলাম সুখ আর দুঃখের আবরণে-গড়াখেলাঘর। কিন্তু আগুন তো বাঁচাতে পারে। আগুন তো, পচা, গলা, নোংরা, ময়লা আবর্জনা, সব পুড়িয়ে ধ্বংস করে, তৈরী করতে পারে, পবিত্র, নির্মল, পরিচ্ছন্ন, একটা আবহাওয়া, একটা স্থান, একটা জীবন, একটা সংসার, একটা দেশ, একটা পৃথিবী।

একটি পত্র

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ওঁ
৩১ বৈশাখ
১৩৭২

হরিকৃষ্ণ মন্দির
ইন্দিরা-নিলয়
পুণা-৬

শ্রীমৎ অনির্বাণ

শ্রীচরণেষু,

আপনার দ্বিতীয় পত্রটি পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। আমার মনে হয়—গীতা নানা অধিকারীর জন্যে নানা ব্যবস্থা দিতে বাধ্য হয়েছেন—তাই শুধু জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-সমন্বয়ই নয়— যাঁরা রাজযোগ ক'রে "নাসিকাগ্রমবলোকয়ন্" শুচৌ স্থানে বসে বুঁদ হয়ে থাকতে চান তাঁদেরও বলেছেন, চাও তো এও করতে পারো। এ পথেও তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু সব শেষে কি ফিরে আসতে হয় না পৃথিবীর কর্মাঙ্গনে? তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন:

> The earth is the heroic spirits battlefield
> The earth is the chosen place of the
> mightiest souls
> The forge where the Archmason shapes His
> works.

আমি তাঁকে যতদূর বুঝেছি তাতে মনে হয় তিনি বলতে চেয়েছিলেন স্থূলতম অনধিকারী মাটিতেও ব্রহ্মকমল ফুটিয়ে মাটিকে স্বর্গ করতে হবে—এরই নাম মর্ত্যলীলা বা নরলীলা—যাই নাম দিন। আপনার এ বিষয়ে কি মনে হয় জানালে আশ্বস্ত হব যে আমি ভুল বুঝে গোল ক'রে ফেলিনি। আপনার ভরসা চাই এই জন্যে যে আপনার বুদ্ধিও উজ্জ্বল। শুধু অধ্যাত্ম-অনুভূতির পরেও মানুষ যে কত ভুল করে নানা সাধকের গোলমেলে কথা থেকে বহুবারই টের পেয়েছি। যা দেখি, পাই, জানি—তাকে দেখাতে, পাওয়াতে, জানাতে গেলেই বাধে গোল—প্রেরণা সত্য হয়েও ব্যাখ্যা দ'রে মজায়। সম্প্রতি একটি পরম খৃস্টান সাধুর লেখা পড়তে পড়তে এই কথাই মনে হচ্ছিল। তাঁর আশ্চর্য আশ্চর্য অনুভূতি হত—অখণ্ড শান্তি, অসহ পুলক, চরিত্রের পবিত্রতা—সবই মুগ্ধকর কিন্তু যখন তিনি মর্ত্যজীবনের পাঠ দেন এ-সব উপলব্ধির ভাষ্য করতে গিয়ে তখন বলতেই হয়: "হা হতোঽস্মি।" যেমন ধরুন, জগতের নানা দুরন্ত দুঃখযন্ত্রণাকেও তিনি বলতে চেয়েছেন ভগবানের loving slap: এক নার্স সদ্যোজাত শিশুকে চড় মেরেছিল যাতে সে কেঁদে উঠে নিঃশ্বাস ফেলে। চড় মেরেছিল বলেই শিশু কাঁদল, তাই না বেঁচে গেল। উপমাটি শুনে থ হয়ে যেতে হয়। হিটলারের সৈন্য পোল সৈনিকদের অণ্ডকোষে পচা অন্ন গুঁজে দিতে পেছপাও হয়নি। গেবেলস ও হিমলার লক্ষ লক্ষ লোককে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে রেখে পশুর অধিক খাটাতেন,—শিশুরা বাপ-মার বিরুদ্ধে গুপ্তচর হত, পা উপরে মাথা নিচু করে বিজাতীয় চ'কে ঝুলিয়ে রাখা হত শাস্তি দিতে (exemplary punishment)। এ সবকে Loving slap এর সঙ্গে তুলনা করে অশিবকে নাকচ করার দর্শনকে দর্শন বলতে হলে বলতেই হয়—বোকা বনা ছাড়া ধার্মিক হওয়ার পথ নেই। আপনি মনীষী, শুধু আধ্যাত্মিক মহাসাধক নন তাই আপনার শরণাপন্ন। ইতি

স্নেহাশীর্বাদার্থী
দিলীপ

পুনঃ সাধু ওঙ্কারনাথ "অঘটনের ঘটা" পড়ে লিখেছেন —"রোমাঞ্চ হল" ইত্যাদি।

জন্ম-জন্মান্তর

(উপন্যাস)

রামপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মহেশ কোন আপত্তি করল না। চাকরি পাকা নয়, তবু নদীর চরে বাসা বাঁধার মত 'অনিশ্চয়তার চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করল না। একালের ছেলে হয়েও —মহেশ অন্য কালের ধাতুতে গড়'। তার উপর যৌবনে কালের কল্পনা আদি বাসনার রং। মহেশ সহজেই আত্মসমর্পণ করল।

মহেশের ভাষায় :—

প্রথম যৌবনে পৃথিবী অপরূপ। তখন সামনে পিছনে পাশের দৃশ্য ও মানুষ পটভূমি হয়ে ওঠে—আমিটা তারই আশ্রয়ে সর্বগ্রাসী সত্তার মত অতিশয় প্রবল। একটি সংসারের মধ্যে আমি দ্বিতীয় একটি সংসার তৈরী করতে লাগল।

আমার কর্মক্ষেত্র আমাদের এই শহরেই। বিয়ের পর রমা আমাদের সংসারে রয়ে গেল। তাই নিয়ম। মায়ের মনোবাসনা পূর্ণ করে সংসারে এটা-ওটা কাজের ভার নিতে লাগল—অথচ কি আশ্চর্য, মায়ের মুখে হাসি ফুটলো না। একটি একটি করে কাজের ভার তুলে নিচ্ছে রমা—আর মা ভাবছেন তাঁকে অধিকারচ্যুত করা হচ্ছে। মার মুখের ভাব সব সময়েই কঠিন। অথচ বাহ্যিক প্রকাশে কোন বৈলক্ষণ্য নাই।

রমা মাঝে মাঝে বলে, দেখ আমার ভাগ্যের দোষ, না হলে কাউকে খুশী করতে পারি না কেন?

'মাইনে পেয়ে টাকাটা যদি রমার হাতে দিতে যাই, ও হাত গুটিয়ে নেয় সত্রাসে। বলে, মার হাতে দাও।

কোন ভাল জিনিস দিতে গেলেও—ওই কথা। সংসারকে লুকিয়ে আমায় কিছু দিতে চেয়ো না—ভাল দেখাবে না।

কিন্তু আমার মন সব সময়েই চায় ওকে একান্ত আপন করে কিছু দিতে। আমার ভালবাসার প্রকাশ থাকবে যে জিনিসের মধ্যে—সেটা লাভ করে খুসীতে ভরে উঠবে ও—ওর মুখের হাসিতে সেই ভালবাসা ফিরে পাব। দেওয়া-নেওয়া এই আনন্দের কি তুলনা আছে। রমা এ জিনিস চায় না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় ভালবাসার মর্মই ও বোঝে কি? সংসারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ঠাটটি বজায় থাকলেই ও খুসী, ও যত্নেই তুষ্ট।

একদিন ওকে কাঁদতে দেখলাম। দেখে আশ্চর্য হলাম, ব্যথিত হলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করতে বলল, আমায় কিছু শুধিয়ো না—আমার ভাগ্য।

তখনই প্রথম মনে হল, বৃহৎ একটি বেদনা ও বহন করে চলেছে নীরবে। এই সংসারে আসার দিন-কয়েক পর থেকেই লক্ষ্য করছি—ভাবান্তর। কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় না। জবাব না পেয়ে রাগ হয়—আবার এ-ও বুঝি ওর বেদনার কারণ জেনে পাছে

আমি বেদনা পাই, সেইজন্যই ও কিছু ভাবতে চায় না। যেমন এই কথাটি মনে হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-চমকের মত স্মৃতির গভীরে আলোড়ন উঠল। একটি হিসাব পরীক্ষা করতে বসলাম।

ঠিক—ঠিক। সে কতদিনের ঘটনা? বড় জোর দশ-বারো বছর হ'ল। রমার বয়স হিসাব করলে গরমিল ধরা পড়বে। ভগবতী কি রমা হয়ে ফিরে এসেছে আমার কাছে? তার অন্তিমবাসনা কি রূপ-গ্রহণ করেছে? অসম্ভব। জন্মান্তরবাদ যদিই বিশ্বাস করি—(যুক্তি দিয়ে গ্রহণীয় না হলেও সংস্কারবশত অস্বীকার করা যায় না) তাহলেও হিন্দুমতে এই হিসাবের গরমিলটা সহজ বুদ্ধিতে ধরা পড়বে। হিন্দুমতে বলে—মৃত্যুর এক বছর কাল আত্মা প্রেত লোকে বাস করে সেই ভোগকাল সব শ্রেণীর আত্মারই ভাগ্যলিপি। তারপর বাৎসরিক শ্রাদ্ধের অন্তে—অর্থাৎ সপিণ্ডকরণ শেষ হলে আত্মা মুক্ত হয়ে আরও উর্দ্ধলোকে গতিলাভ করে। তখন তার ইচ্ছামত বাসনার বেগ বাড়লে নরলোকে পুনরায় জন্ম নিতে অথবা আরও উর্দ্ধে চলে যায়। সেইকাল থেকে পুনর্জন্মের বয়স হিসাব করাই নিয়ম। ভগবতীর মৃত্যু হয়েছে বড় জোর বারো বছর, সপ্তদশী রমা হয়ে কেমন করে ফিরে আসবে। অথচ আমার প্রতি রমার আকর্ষণ অনুভব করতে পারি। বাহ্যিক প্রকাশে ভালবাসা সরব না হয়েও—অন্তর্মুখী টানটা অনুভব করি। অথচ অনুভব করেও সেই ভালবাসাকে আস্বাদ না করতে পেরে স্থির হতে পারছি না।

আবার এক এক সময়ে ভাবি—এই তুচ্ছ সাংসারিক প্রাপ্তির জন্য এত কাঙালপণা কেন, মোহবন্ধন ছাড়া কিছু নয়। মাষ্টারমশায়কে সামনে দেখি। বৃন্দাবনের সাধুর কথাও কানে বাজে: তোর ভোগের এখন অনেক বাকি, এরই মধ্যে সংসার ছাড়বি কিরে? এখন দেহ-দীপের শিখায় ভোগের আরতি করে মন অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়ে সারারাত্রি সম্ভোগ-সুখের প্রমত্ততায় কাটে, —সকালে শ্রান্তদেহ অসুস্থ মন ছি ছি ধিক্কার দেয়। প্রতিদিনের প্রতি রাতের একই কর্ম, একই রীতি। ভুজঙ্গ জড়ত্বের নাগপাশে একী দুঃসহ বন্ধন। গঙ্গার জলে বহুক্ষণ দেহ মার্জনা করে দীর্ঘক্ষণ স্তবপূজায় মন্ত্রপাঠ করে—, শিবের ললাটনেত্রে কলুষ আবর্জনা ভস্মীভূত হবার কল্পনা করে—সান্ত্বনা পাই। হায় সে কতটুকু সময়ের সান্ত্বনা! সন্ধ্যার ছায়া নামতে না নামতে পৃথিবী আবার আকর্ষণ করে স্থূল আনন্দের নেশায়। অবাধ্য অবোধ মন দেহের পথ ধরেই ফিরে আসে ভোগের ভোজনাগারে। আমি ডুবে যাই অন্ধকারে।

'মহেশের মনে দ্বৈতসত্তার এই দ্বন্দ্ব ক্রমশই প্রবল হতে থাকে। সংসারে সুখের উপকরণ হাতের কাছে পেয়েও সুখী হতে পারে না মহেশ। মহেশ ছটফট করে। বেশী সময় লাগে জপ পূজায়—আত্মানুসন্ধানে কিন্তু, আত্মানু-সন্ধান কি ততটাই সহজ?

এই সময়ে আর একটি প্রচণ্ড ধাক্কা এসে লাগল। রমা যখন সন্তানসম্ভবা—ধাক্কাটা এলো সেই সময়ে। এক বছর কাজ করার পর অস্থায়ী চাকরিটি চলে গেল—মহেশ আবার বেকার।

বেকার শব্দটা মধ্যবিত্ত সংসারে কি ভয়াবহ জিনিস, সে ভুক্তভোগী মধ্যবিত্ত ছাড়া কেউ বুঝবে না। এই একটি জিনিস রঞ্জনরশ্মির মতই সংসার-ত্বক ভেদ করে অন্তর্লোককে প্রত্যক্ষ করায়। যাবতীয় বস্তুর রূপলাবণ্য থেকে মোহের কান্তিটুকুকে সরিয়ে নেয়। এমনকি স্নেহ প্রেম সখ্যতার ক্ষেত্রেও তার উলঙ্গ প্রকাশ—রূঢ় বাস্তবতারই নামান্তর।

চাকরি নেই শুনে বাবা গম্ভীর হলেন, মা মুখ বাঁকালেন ভায়েরা কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে রইল· রমা শুধু আঘাতের বেদনায় মুহ্যমানা।

বাবা উপদেশ দিলেন, চাকরির চেষ্টা কর, না হলে আমার সাধ্য নয় এ সংসার চালানো।

মা বললেন, সংসার তো বেড়েই চলেছে—কি করে কি হবে।

দু'ভাই অভিযোগ তুলল, তাবলে আমরা ইস্কুল ছাড়ব না বলে দিচ্ছি।

মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তোমাদের জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবার খরচ কে যোগাবে শুনি!

তাই বলে আমাদের কেরিয়ার নষ্ট হবে। না, কখনোই না। ওরা সজোরে প্রতিবাদ করল।

বাবা বললেন মাকে, তা হয় না—ওরা পড়বে। টেনেটুনে সংসার চালাবার চেষ্টা কর।

এই সময়ে মহেশের একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। অনেক দুঃখ জানিয়ে লিখেছিল, ভাই, একটা কাজের সন্ধান দাও। আমি তো চেষ্টা করছিই—তুমিও চেষ্টা কর। তুমি ভাবতেও পারবে না কি ভাবে দিন কাটছে। রমাকে বলেছিলাম বাপের বাড়ী যেতে, ও গেল না। বলল, বাবা বেঁচে নেই, ভায়েদের সংসার। বিধবা মা একা কি করেন। তিনিই তো ভায়েদের মুখ চেয়ে আছেন। আর ভায়েরাও পাকা চাকরি করে না। কি করে? জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিল, জানি না কি করে। শুনি উপার্জন করে, নাহলে সংসার চলছে কিসে। কিন্তু সেটা বাঁধা-ধরা চাকরি নয়। কিন্তু ভাই, এ সংসারে থাকলে ও বাঁচবে না। ওর সঙ্গে আর একটি ছোট প্রাণীও মরবে। তাকে নিয়ে আমাদের কত আশা, কত স্বপ্ন। শুনবে? লজ্জার কথা—তবু তোমাকে জানাচ্ছি এই আশায়, হয়তো আমাদের বাঁচাবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা তোমার প্রবল হবে। কথায় আছে বাপ-মায়ের স্নেহ—বিশেষ করে মায়ের, তার তুলনা নাকি নেই। হায়—অভাগার ভাগ্যে সবই কি বিপরীত! সংসারের খরচ কমাতে বলেছেন বাবা, মা প্রাণপণে সেই চেষ্টা করছেন। আমাদের দু'জনকে নিয়ে উনি একটা ইউনিট করেছেন। অর্থাৎ খাত্তরেশন আমরা একজন। ক্ষুধার কাছে প্রেমও মূল্যহীন, রমা আমার কাছে মূল্যহীন নয়। ও অর্দ্ধেক দিন অসুস্থতার ভান করে নিজের ভাগটা আমার জন্য রেখে দেয়। আমি তর্ক করি কিন্তু জিততে পারি না। দু'টি জোরালো হাতিয়ার আমার বিপক্ষে। এক ক্ষুধা দুই হয় সম্মান। আমি নাকি ওর পূজনীয় দেবতা, সুতরাং যজ্ঞভাগে আমারই প্রাপ্য সিংহভাগ। এক একদিন বিদ্রোহ করি, নাহলে ওকে বাঁচাবার পথ খুঁজে পাই না। বুঝি ও ভাজা-মনে সেই অন্ন গ্রহণ করে, মুখে ওর ক্লেশের ছায়া। এই পরিবেশে সুস্থ প্রসন্নচিত্ত বংশধর প্রত্যাশা করা কি বাতুলতা নয়। মনে করছি উঞ্ছবৃত্তি ধরব। গঙ্গার ঘাটে অথবা মন্দিরের দুয়ারে হাত পেতে দাঁড়াব। যা হবার হোক, সম্মানের মূল্যে জীবন নষ্ট করতে পারব না।

আমি জানি শেষপর্য্যন্ত কোনটাই ও করতে পারেনি, মরীয়া হয়ে রমাকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে লিখল, 'এও সম্মানহানি, দু দুটি জীবনহানির চেয়ে কাম্য বলে এই পথ নিলাম। আমার শ্যালকরা কি কাজ করেন জানতে পারলাম আভাসে ইঙ্গিতে। সেটাও আমাদের সমাজে সম্মান-জনক নয়। কিন্তু আধুনিক যুগে নতুন করে যে মান নির্ণীত হচ্ছে সমাজের এটা হয়তো তারই ফলশ্রুতি। এখন যাদেরই দেখছ বাড়ী গাড়ী সম্মান প্রতিপত্তি তাদের প্রায় সকলকার পিছনের দিকে চাইতে মানা। চিরকালের প্রবচন, অন্ধকারের পটভূমিকায় আলোর বাহার বেশি খোলে, যেমন নিকষ কালো মেঘে বিদ্যুৎ চমকায়। একালে ওটা প্রবচন নয়, দৃষ্টান্ত। ও নিয়ে মাথা ঘামাবো না। এখন দুর্গা বলে নৌকা ভাসিয়ে দেব দরিয়ায়। ভাসব অকূলে। যদি ইতি-মধ্যে চাকরির সন্ধান পাও—আমার অস্থায়ী ঠিকানায় (সেটা মাঝে মাঝে জানাবো) একটা খবর দিও। চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব বন্ধু।'

পশ্চিম ছেড়ে পুবে যাত্রা করল মহেশ। শোনা ছিল কলকাতায় কাজের অভাব নাই। যে যেমন মানুষ, যেমন যোগ্যতা তার তেমনি কাজ জোটে। একেবারে গীতার শ্লোক, যাথার্থে গুণ কর্মবিভাজন। গুণ অনুসারে কাজের বিভাগটা চোখে পড়ল। রেল-

স্টেশনে ট্রেনকামরায় পথে সর্বত্র এই বিভাগ। মহেশের কল্পনায় অনেক জীবিকার রঙ ধরলো। এই যে হাজার হাজার লোক চোখের সামনে চলাফেরা করছে, এরা কেউ তো কর্মহীন নয়। প্ল্যাটফরমে এত ভেণ্ডার, চায়ের স্টল, খাবারের স্টল, খবরের কাগজ আর রঙীন বই নিয়ে এত হকার এবং মজুরের দল, জীবিকার অর্জনে এরা সবাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। বাস আর ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে - রিকশা আর ঠেলা গাড়ির সারিতে শ্রম বিক্রয়ের বিচিত্র দৃষ্টান্ত। তারপর হাওড়া পুলের নীচেয় পণ্যবাহী নৌকার সারি, ওদিকে স্টীমার অফিসেও কর্মব্যস্ত মানুষ। পথের দুধারে অসংখ্য দোকান। জীবন ও জীবিকার ভারে কলকাতা সর্বক্ষণই কোলাহলমুখর। এই বিরাট কর্মযজ্ঞশালার এক প্রান্তে তার কি একটু ঠাঁই হবে না! হতেই হবে, ঠাঁই - হওয়া চাই।

কলকাতায় ইতিপূর্বে আসেনি। এমন দূর সম্পর্কের আত্মীয় পরিচিত কারও নাম মনে পড়ল না। পড়লেও পরাশ্রয়ে উঠবার চিন্তা সে করেনি। সোজা-সুজি উঠলো ধর্মশালায়। আর সেইদিন বিকেলেই কাজের চেষ্টায় বার হল। দৈবের যোগাযোগ কিছু ছিল নইকি। একটা বড় মত আড়তের সামনে এসে সমান্যক্ষণ ইতস্ততঃ করে ভিতরে ঢুকে গেল। একজন কর্মচারী ওকে জিজ্ঞাসা করল, কাকে চাই?

মহেশ একটুও ইতস্ততঃ করল না, বলল, কর্তাকে চাই।

ওই যে উনি!

কর্মচারীর নির্দেশমত উঁচু তক্তপোশের সামনে এসে দাঁড়াল মহেশ।

বুকসমান উঁচু, জোড়া তক্তপোশে চালা ফরাস পাতা, গোটা দুই-তিন তাকিয়া এধার ওধার ছড়ানো। ফরাসের মাঝখানে সামনে একটি কাঠের ডেস্ক ও ক্যাশ বাক্স কোলের কাছে নিয়ে বসে আছেন, এই গদির মালিক ভবতারণ বসু। এক হাতে গড়গড়ার নল, অন্য হাতে কলম। ডেস্কের উপরে খোলা খাতা খানায় চোখ বুলিয়ে বোধ করি হিসাব দেখছেন আর সঙ্গে সঙ্গে গড়গড়ার নলে টান দিচ্ছেন; ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ উঠছে। তাঁর দু'পাশেই কয়েকজন লোক, এই হিসাব নিয়েই আলোচনা চালাচ্ছে।

মহেশকে দেখে তাদেরই একজন বলল, কি চাই আপনার?

মহেশ কর্তার দিকে চেয়ে বলল, কর্তা মুখ তুলে বললেন, আপনি ওই চেয়ারটায় বসুন, ওঁর কাছে একটু দরকার—হিসেবটা চুকিয়ে পাঁচ মিনিট মাত্র, আপনার অসুবিধা হবে না তো?

না—না, আমি বসছি। মহেশ তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। ওর মনে আশা জাগল, হয়তো কিছু কাজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কর্তার মুখে সহৃদয় প্রসন্নতা কণ্ঠস্বরে ভদ্রতার আশ্বাস। এক একজনের মুখে-চোখে এমনি আশ্বাসের কথা লেখা থাকে, গলার স্বর সান্ত্বনার মত বোধ হয়।

পাঁচ মিনিটেই অবশ্য কাজ শেষ হল না, আরও কিছুক্ষণ গেল। তা হোক একটুও অস্বস্তিবোধ করল না মহেশ। মহেশ চোখ ফিরিয়ে ঘরের আসবাব-পত্র দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে সময়ের হিসাব হারিয়ে গেল।

তারপর কখন এক সময়ে কর্তার ডাকে সম্বিত ফিরে দেখে, কর্তা ছাড়া আর একজন মাত্র লোক বসে আছেন গদিতে। তিনিও হিসাবপত্রের খাতা খুলে তারই মধ্যে ডুবে গেছেন।

কর্তা বললেন, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি কিছু মনে করো না বাবা।

না—না, অপ্রতিভকণ্ঠে কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না মহেশ।

কর্তা বললেন, তোমাকে আপনি বলতে পারলাম না। হিসাব করলে তুমি আমার নাতির বয়সী হবে। রাগ করো না যেন। বলতো এবার কি বলবে?

আমি—আমি, সঙ্কোচে লজ্জায় কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেল মহেশের। কেমন করে চাকরির কথাটা পাড়বে ঠিক করতে পারল না।

কর্তা লোক চরিত্রে অভিজ্ঞ। ওর আরক্ত বিব্রত মুখের পানে চেয়ে একটু হাসলেন। বললেন, তুমি কি এই শহরে নতুন আসছ?

আজ্ঞে!

কোথা থেকে আসছ?

পশ্চিমের একটা শহর থেকে।

কোথায় উঠেছ?

আজ্ঞে—ধর্মশালায়।

আহারাদি কি করেছ? বল, সঙ্কোচ করো না।

আজ্ঞে দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে—

বুঝেছি। তোমার জাতি জিজ্ঞাসা করলে আশা করি রাগ করবে না? কর্তা হাসতে হাসতে বললেন।

ওঁর জিজ্ঞাসাবাদের সুরে আত্মীয়জনোচিত স্নেহের আভাসটুকু পেয়েছে মহেশ। এতক্ষণে ওর সঙ্কোচ চলে গেছে। ওঁর কথাবার্তার সহজ সুরে আকৃষ্ট হয়ে ভাবছে আসল কথাটা পাড়তে আর বাধ বাধ ঠেকবে না।

মহেশ বলল, আমরা ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ, প্রণাম। দুহাত কপালে ঠেকিয়ে কর্তা হাসলেন আবার। জাতসাপের লক্ষণ দেখেই চেনা যায়—,আমিও আঁচ করেছিলাম সেটা, তা কি প্রয়োজনে দেশ ছেড়ে বিদেশে এসেছ বাবা?

আজ্ঞে চাকরির সন্ধানে।

চাকরি। বলে শব্দ করে হেসে উঠলেন। আগে স্নান আহার হোক—বিশ্রাম হোক, তারপর চাকরির কথা।

মহেশ এবার মরিয়া হয়ে বলল, আজ্ঞে চাকরি না পেলে এখানে থাকব কি করে?

কর্তা হাসিমুখেই বললেন, ব্রাহ্মণ সন্তান পুজো আচ্ছা শাস্ত্রটাস্ত্র একটু আধটু নিশ্চয় জানা আছে। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি একথাটা কখনও কি শোননি? না বিশ্বাস কর না? বলে হা-হা করে হেসে উঠলেন।

মহেশ অপ্রতিভ হল না। বলল' যাই বলুন-একটা ব্যবস্থা আমায় করে দিন।

হবে হবে, ব্যস্ত কেন? ব্রাহ্মণ সন্তান—পুজোটুজো নিশ্চয় কিছু জানা আছে, কেমন ঠিক তো? তা আমার বাড়ীতেই না হয় দিনকয়েক বেগার খাটলে। গৃহে শালগ্রাম শিলা আছেন—তাঁর নিত্য পূজা আছে, দুটো দিন চালিয়ে দিতে পারবে না?

মহেশ বলল যতদিন বলেন চালিয়ে দিতে পারব। ওতে আমি আনন্দ পাই।

ব্যস ব্যস, আর কি কথা। এস আমার সঙ্গে—তোমার থাকবার জায়গাটা পছন্দ করে নাও।

মহেশ মনে মনে হাসল। আমার পছন্দ। ভিক্ষার চাল আবার কাঁড়া কি আকাঁড়া তাই নিয়ে বিচার! উনি যে আশ্রয় দিচ্ছেন—এই যথেষ্ট। এ তাঁরই করুণা।

আশ্রয় বলে আশ্রয়, একেবারে অতিথি নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা। দিনে পঞ্চ ব্যঞ্জন ভাত—রাত্রিতে লুচি। স্বপাকেই ব্যবস্থা করে নিতে বলেছিলেন ভবতারণবাবু। কিন্তু ওঁর বাড়ীতে ব্রাহ্মণেই রান্না করে—সেই অন্ন গ্রহণে আপত্তি ছিল না মহেশের। বিনিময়ে গৃহ-নারায়ণের সেবা। কিন্তু সেইটুকু শ্রমের মূল্যে নিত্য বরাদ্দ ছিল আরও একটি কারণে। একার দুঃখ মোচনের ইচ্ছা নিয়ে সে তো দেশত্যাগ করেনি,—একটি মুখে রাজভোগ তোলবার সময় অস্বস্তিও তাই বেড়ে যায়। খাওয়ার সময় বড় বেশী করে মনে পড়ে অভাবগ্রস্ত সংসারকে। একজনের অন্ন দুজনে ভাগ করে খাওয়ার ব্যবস্থা। পিত্রালয়ে বউ এর দিন কিভাবে কাটছে সেটা অনায়াসে অনুমান করে নেওয়া যায়। নিজের বাড়ীতে স্বার্থের নগ্নরূপ দেখে মন বিষিয়ে উঠেছে—উপার্জনহীন পুরুষের অসম্মানের জালা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। শ্বশুরালয়ের

ছবিটি তো সেই একই আয়নার ছায়া, হাই উঠলে সব দর্পণই মলিন।

বসে বসে কতদিন আর পরের অন্ন মুখে তুলবে। অস্থির হয়ে উঠলো মহেশ।

ভবতারনবাবুকে বলল, কতদিন এভাবে বসে থাকব —আপনার কারখানাতেই যা হয় একটি কাজ দিন।

ভবতারণবাবু কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ নারায়ণ—তাঁর সেবা নিতে পারি, পাপ হবে না?

মহেশ মরিয়া হয়ে বলল, নারায়ণের পরিবার অভুক্ত থাকলে পাপ হবে না? আমার একার জন্য হলে আপনাকে কিছুই বলতাম না কিন্তু।

ভবতারণবাবু ওর মুখের পানে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, বুঝেছি ঠাকুর—চাকরি না হলে শান্তি পাচ্ছ না। সংসারের চিন্তায় তোমার মন পুড়ছে।

মহেশ মুখ নামিয়ে নিল। ওর চোখে জল আসছিল —নিজেকে কোনমতেই সম্বরণ করতে পারছিল না।

ফোনটা তুলে নিলেন ভবতারণবাবু। ডাকলেন, হ্যালো—মহিম আছো? একবার আমার গদিতে আসতে পারবে? হাঁ ছুটির পরই আসবে—খুব জরুরি একটা পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে। কেমন আসছ তো? ছটা থেকে সাতটার মধ্যে? আচ্ছা আচ্ছা, আমি অপেক্ষা করব।

ফোন নামিয়ে মহেশের পানে চেয়ে বললেন, আজই একটা যা-হোক কিছু হয়ে যাবে। মহিম আসছেন সন্ধ্যে-বেলায়, রেল আফিসের একজন বড়দরের কর্তা উনি— যাকে তোমরা বল এ্যাডমিনিস্‌ট্রেটিভ-অফিসার। আশা করছি ওঁর দ্বারা সুরাহা হবে। তবে আমার আশাটা তুমি ভেঙে দিচ্ছ বাবা—ভেবেছিলাম তোমারই হাতে নারায়ণের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব।

মহেশের মুখখানা শুকিয়ে গেল ওঁর কথায়। ভাবল আমি কি সত্যই ওঁকে আঘাত দিচ্ছি? নিজের সুখ-সুবিধার জন্য—

ভবতারণবাবু ওঁর পাংশু মুখের পানে চেয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন, আরে ডরো মৎ ঘাবড়াও মৎ। আমি ঠাট্টা করছিলাম।

মহেশ কাতরকণ্ঠে বলল, কিন্তু সত্যই তো আপনার অসুবিধা হবে। নারায়ণের সেবা পূজা—

ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ তাই তোমরা ঠাকুরদাদার কথা ভেবে আকুল হচ্ছ? উনি কি আজকের দেবতা, কোন্ আদ্যিকালের ঠাকুর—কিসে কি হয় সে জানেন ভালভাবেই। এখানেও তোমার চাকরিটা পাকা ছিল না বাবা—পুরোহিত দেশে থেকে এলেই সবার কাজটি তোমার খসে যেত, আবার যে বেকার সেই বেকার হতে। এ বরং ভালই হচ্ছে, একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা। আর এ কি আমার দ্বারা হচ্ছে ভাবছ? মোটেই না। যে দুদিন ঠাকুরের সেবা করেছ —প্রার্থনা করেছ তারই ফললাভ করছ—বুঝলে? যাও আজ ভালকরে ওঁর ভোগ চড়াও—মানত কর যাতে মহিমের মুখ দিয়ে ভাল খবরটা শুনতে পাই।

† † †

চাকরি রেল আফিসে।

মহিমবাবু বললেন, হেডঅফিসে খালি নেই— ডিভিসনে যেতে হবে। আসানসোল। অসুবিধা হয় যদি আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

মহেশ বলল, অসুবিধা হবে না। আমি তো কলকাতাতে থাকি না—পশ্চিমে থাকি।

ভাল—খানিকটা এগিয়েই থাকবে তাহলে। যদি ইচ্ছা কর আরও খানিকটা এগিয়ে দিতে পারি।

কোথায়?

দানাপুরে কিংবা এলাহাবাদে।

মহেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল তাহলে তো আরও ভাল হয়। এলাহাবাদে আমার পরিবার থাকেন।

মহিম বাবু বললেন, কিন্তু প্রথমেই অতটা এগিয়ে দিতে পারব না—ফার্স্ট এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

আসানসোলে। পরে ওদিকে পাঠাতে অসুবিধা হবে না।

তাই দেবেন।

সত্যিই মনটা আজ খুশীতে ভরপুর। এ যে কল্পনারও অতীত ঘটনা। এমনি একটা আশা বেশ কিছুদিন ধরে মনে ছায়া ফেলেছিল বটে, সেটা দুর শা:বলে এক ধারে ঠেলে রেখেছিল। রমা পরপর করে ক'খানা চিঠি লিখেছে। লিখেছে—তুমি সত্যিই কি আসবে না এখানে? আমি কি ক:র দিন কাটাই বলতো? ভাবছ এখানকার অন্ন আমার সুখের অন্ন? ছিল বটে একদিন। এখন তোমার উপর দায়িত্ব দিয়ে এঁরা দায়ঝক্কি এড়িয়েছেন। এখন এ সংসারে আমি পর—বোঝামাত্র। তোমার বোঝা তুমি না নিলে কে নেবে? কোন পত্রে আছে কি নিষ্ঠুর তুমি। উপার্জন নাই কর, একবারও কি আমাদেরও দেখতে ইচ্ছে করে না? ক্রমে হয়তো ভুলেই যাবে আমাদের কথা—তার আগে ভগ:ান করুন আমার মৃত্যু হোক।

শেষ পত্রে লিখেছে, যে নতুন এসেছে তার কথাটাও বুঝি শুনতে চাও না? না ই হোক পুত্রসন্তান—সন্তান তো। কন্যাসন্তান কি বাপ-মায়ের কম স্নেহ দাবি করে? মেয়ে বলে কি ওর দাবি নেই?

মনটা আনচান করে বই কি এমনি ধারা পত্র পেলো, উপার্জনহীনের মনকে কঠিন শাসন করা প্রয়োজন। অর্থ না থাকলে স্নেহ প্রকাশের মর্য্যাদা কে দেবে। অন্তরকে বাইরে মেলে ধরবার একটিই মাধ্যম আছে, উপহারের মাধ্যম। একটা কিছু দিয়ে আশীর্বাদ না করলে মন ভরবে না—সমাজেও স্নেহকে স্বীকার করবে না। সমাজ-স্বীকৃতি না মিললে সংসারে নানান অশান্তি। অতএব চাকরি না পাওয়া পর্য্যন্ত সে যে স্নেহহীন নির্ম্মম এইটিই জানবে সবাই। তা জানুক। সে যে নিরুপায়।

এখন চাকরির সুসমাচারে মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। লিখল:—আর কিছুদিন অপেক্ষা কর—আমাদের আশা নিশ্চয় পূর্ণ হবে।

আশা পূর্ণ হল। ছমাসের মধ্যে আসানসোল থেকে বদলি হয়ে এল এলাহাবাদে। সুখ এখন ষোলকলায় পূর্ণ-পূর্ণিমার চাঁদ। তবু চাঁদেও কলঙ্ক আছে—যত উজ্জ্বলই হোক তার কিরণ—কলঙ্ককে গোপন করতে পারে না। এলাহাবাদে কোয়ার্টার পেল, সেই বাসায় রমাকে নিয়ে এলো। সামান্য [দিনের] জন্য সুখনীড়ের সন্ধান পেল মহেশ তারপর·……

হাঁ—তারপরই ভাগ্যের খেলা :শুরু হল। ওর দুই শ্যালক একদিন পুলিসের দৃষ্টিতে পড়ল। ওদের উপার্জনের সূত্রটা নিয়েই গোলমাল বেধেছিল। একটি বড় চোরাকারবারীদের সঙ্গে ওরা সংযুক্ত ছিল—চোরা-চালানীর সময় ধরা পড়ল হাতেনাতে। এবং তারপর……..

সে ওদের ভাগ্যে যা হবার হবে—কিন্তু সমস্ত ঝক্কি এসে পড়লো পরিবা·টির উপরে। বাড়ীওয়ালা নোটিশ জারি করল-আমার বাড়ী ছেড়ে দাও। চোর-গুণ্ডাদের জন্য আমি বাড়ী তৈরী করিনি।

শাশুড়ী প্রমাদ গুণলেন, কি হবে বাবা। তুমি থাকতে পথে দাঁড়াব!

মহেশ বলল, কিন্তু আমি কি করতে পারি।

যতদিন ওরা হাজত থেকে :ফিরে না আসে তোমার কোয়ার্টারে একটু জায়গা দাও।

রমা আড়ালে এসে মাথা নেড়ে বলল, না—না, এমন কাজও করো না। ওদের নিয়ে জড়িয়ে পড়লে আমরাও ডুববো।

মহেশ বলল, বিধবা মানুষ—আরও দুটি নাবালক সন্তান নিয়ে কোথায় দাঁড়াবেন।

রমা বলল, তাই বলে আমার সংসার নষ্ট হবে। না —না, এ কাজ করবে না, বলো—ছোট কোয়ার্টারে জায়গা নেই।

মহেশ বলল, ছি রমা—কোয়ার্টার ছোট বলে আমাদের মনকে ছোট করব?

রমা লজ্জায় মাথা নামালে—প্রতিবাদ করার শক্তি

তার রইল না। তবু অনেকক্ষণ বাদে ক্ষীণ আপত্তি তুলল, তোমার সরকারী চাকরী—ওদের সুনাম নেই, ক্ষতি হবে না?

ওরা তো এই কোয়ার্টারে থাকবে না,—ওরা নিজেদের ব্যবস্থা করে নেবে।

নিলেই ভাল। নিস্পৃহভাবে জবাব দিল রমা। কিন্তু ব্যাপারটা ঘটলো অন্যরকম। পুলিশ প্রমাণ করতে পারল না ওদের দোষ। প্রমাণাভাবে কয়েকদিন হাজত বাসের পর ওরা ফিরে এলো। ফিরে এসে মহেশের কোয়ার্টারেই উঠল।

মহেশ প্রমাদ গুণলো।

কথায় বলে স্বভাব যায় মলে—ইল্লত যায় না ধুলে। ওদের ও সেই গোত্র, দুই ভাই বাড়ীতে কখন আসে—কখন চলে যায় কেউ জানে না। নিয়মিত সময়ে আহারও করে না। কখনো সারাটা দিন চুলের টিকি দেখা যায় না—কখনো বা সারারাত উধাও।

মহেশ বলল রমাকে, গতিক ভাল ঠেকছে না—আবার কি ওরা দলে মিশছে!

রমা বলল, জানি না। গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে। তখন পই পই করে বারণ করেছিলাম, শুনলে?

মহেশ বলল, ভেবেছিলাম ওদের আক্কেল হবে। তা যখন হল না—এবার অপ্রিয় সত্য কথাটা শানাতে হবে।

পারবে? কুটুম বলে বাধবে না? নিজেকে খাটো ভাবতে লজ্জা করবে না?

মহেশ বলল, পারতেই হবে। তা তুমি তোমার মনকে ...

আমি পারব না। আমার মাকে আমি জানি। ...লে রমা আর সেখানে দাঁড়াল না।

অগত্যা মহেশই শাশুড়ীর কাছে কথাটা পাড়ল। ...ই সঙ্কোচের সঙ্গে তুলল কথাটা—মা, এইবার ...পনারা বাসার চেষ্টা করুন না হলে খুবই কষ্ট হচ্ছে ...পনাদের।

শাশুড়ী বললেন, কষ্ট হলেই বা উপায় কি! কপালে যদি লেখা থাকে কষ্ট কে খণ্ডাবে বল। চেষ্টা তো ওরা করছেই—না পেলে কি করবে!

মহেশ বলল, বলেন তো আমিও চেষ্টা করি।

শাশুড়ী বললেন, তা কর না চেষ্টা—আমরা কি বারণ করেছি? মাথা থেকে আপদ বালাই নামাতে কে না চায়—বিশেষ করে কুটুমের বালাই।

তারপর আত্মগতভাবে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, কথাতেই আছে যম জামাই ভাগনা—তিন নয় আপনা। এবে হতেই হবে।

আপনি মিথ্যে রাগ করবেন না মা—

রাগই করি আর দুঃখই পাই কথাটা তো মিথ্যে নয়। তা বলবো ওদের—তোরা বাপু অন্যত্র ঘর দোরের চেষ্টা কর—কতদিন আর কুটুমের বাড়ীর অন্ন ধ্বংস করবি? তা বাবা বলেছিলামও ওদের—নিত্যি দিন বলছিও। বলে - কি দিনকাল পড়েছে—দুমুঠো ভাত যদি দেওরা যায় এক ছটাক জমি কোথাও মেলাতে পারবে না। পাকিস্থান থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ চলে এসেছে এদেশে—আমাদের জায়গায় অভাব—অন্নেও টান ধরেছে। উঃ—ভগবান আর কতকাল বাঁচিয়ে রাখবেন। চোখে আঁচল চেপে উনি দৃশ্যটাকে খুবই করুণ করে তুললেন।

বিরক্ত হল মহেশ। মহেশের মনে পড়লো ছেলেবেলাকার একটা গল্প—গোঁসাই বলেছিলেন—সৎ-অসৎবৃত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে। বলেছিলেন, খবরদার অসৎ বৃত্তিকে কখনো প্রশ্রয় দিয়ো না। লোভকে, হিংসাকে, ক্রোধকে কিছুতেই বাড়তে দিয়ো না। ওরা হলো বুড়ো শয়তান—যে সিন্দবাদ নাবিকের কাঁধে চেপে কিছুতেই নামতে চায় নি। সত্যি—গল্পগুলো বানানো হলেও কখনো কখনো সত্যের এত কাছাকাছি চলে আসে—সত্যি মিথ্যার প্রভেদ ঘুচে যায়। কিন্তু গল্পের সবটা কল্পনাই বা হবে কেন? জীবনের সত্য থেকেই তো ওদের ছেঁকে তুলে নিই আমরা। তুলে নিয়ে কিছু রঙ মেশাই—কিছু খাদ মেশাই—মন-

রোচক করার মশলা মিশিয়ে রহস্ত রস কৌতুহল জমাই। কিন্তু সে গল্প শুনতে ভাল লাগে,—নিজের সংসারে যদি সজীব হল—তাহলেই প্রাণান্তকর ব্যাপার।

এদিকে একটি ছুটি দিন করে প্রায় একটি বছর পুরে এলো—আত্মীয়রা স্থানান্তরিত হবার লক্ষণ প্রকাশ করলেন না। সংসারে আরও একটি কন্যাসন্তান এসেছে। শশুরবাড়ীর ভারটা—সম্পূর্ণ না হোক—বইতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে কিছু টাকা ওরা দেয় বটে—সে টাকা নিতে ভয় করে। কি জানি কোন্ উপায়ে কোথা থেকে আনছে টাকা। সরকারী চাকরি, কোন্ একটা সূত্র ধরে সন্দেহ ঘনালে চাকরির নিরাপত্তা থাকবে না। ইদানীং চোরা-কারবারীদের ধরবার জন্ত সরকার খুব সজাগ হয়ে উঠেছেন। আপিসেও কালো বাজারের ছিদ্র দেখা দেয় মাঝে মাঝে। কেউ সাস্পেণ্ড হয়—কেউ চাকরি খোয়ায়। এইসব সমাজ-বিরোধী কাজকর্ম নিয়ে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে মহেশ, অথচ ক্ষোভের বিষয়—তারই অন্তঃপুরে এদের ছায়া দিনে দিনে ঘন হচ্ছে।

একদিন সহকর্মী রমেনকে বলল, ভাই—কি যে করি বুঝতে পারছি নে। পরিবার নিয়ে শেষকালে কি পথে বসতে হবে!

রমেন বলল, তোমার শ্যালক ছুটি কি খুব দুর্দান্ত?

দুর্দান্ত! গায়ে তাদের খুব বল নেই বটে, মাথায় অনেক ফন্দী-ফিকির ঠাসা।

রমেন বলল, তাহলে একদিন ফাইট দেয়া যাক—অবশ্য তুমি যদি রাজী হও। জানি না তোমার সেন্টিমেন্টে বাধবে কিনা।

না বাধবে না। আমার নিজের জন্য যত না হোক আমার স্ত্রী-কন্তার মুখ চেয়ে ওদের শাসন করতেই হবে। তবে একা আমার সাধ্য নয়।

এই কথা! রমেন হা হা করে হেসে উঠলো। একা কেন, আমরা তোমার মন্ত্রী শাস্ত্রীর দল রয়েছি না? স্রেফ হুকুম কর, এ্যাইসা ম্যাজিক দেখিয়ে দেব, তারিফ করবে—সাবাস হ্যাডিনি দি গ্রেট

ক্রমশঃ

ওজন

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

এইবার একটা চাকরী কিংবা প্রফেসারী আর তারপর মনোরমা—।

আঃ, ভাবতে কি ভালোই লাগছে অসীমের। কিছু কিনবে নাকি মনোরমার জন্যে? না, কিছু কেনা চলবে না এখন, টাকাই বা পাবে কোথায়? কিন্তু এতবড় আনন্দের দিনে কিছু দেবে না মনোরমাকে? নিশ্চয় দেবে—এমন কিছু দেবে যাতে পয়সা খরচ নেই অথচ তৃপ্তি পাবে মনোরমা, অসীমও তৃপ্ত হবে। কিন্তু অসীম যে মিলিটারিতে যোগ দিতে চায় সে-কথা জানান চলবে না মনোরমাকে, আর ওজনের কথাটাও তাই সম্পূর্ণ চেপে যেতে হবে।

পুঁটিরামের দোকানের বড় ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল অসীমের। চারটে বেজে পাঁচ। ইস্ বাড়ি পৌঁছতেই সাড়ে চারটে, তারপর মনোরমার বাড়ি। সার্টিফিকেটখানা তাকে না দেখালে যেন তৃপ্তি নেই। তার আগে আবার ওজন করতে হবে নিজেকে। দরখাস্তখানা কালই ছাড়তে হবে, না হলে ডিউ ডেটের আগে পৌঁছবে না জায়গায়।

কিন্তু মনোরমা যখন জানতে পারবে তার মিলিটারীতে যোগ দেওয়ার খবর, তখন? তখন কি করবে মনোরমা, কি-ই বা করবে অসীম? মনোরমা কি তাকে যেতে দিতে চাইবে! মায়ের মত করিয়েছে অনেক কেঁদেকেটে, কাটিয়েছে অনেক ছুটকো ছাটকো বাধা, কিন্তু প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হবে মনোরমার কাছে। সে নিশ্চয় ছাড়তে চাইবে না তাকে। আরে দুর! দরখাস্ত করলেই কি চাকরী হয়, হোক না তা মিলিটারির চাকরী? হাজারে হাজারে বি, এ, এম, এ,-রা ছুটছে আজকাল এই রিস্কি চাকরীর পেছনেই। চাকরীর বাজারে যে কোন একটা অবলম্বন পেলেই বেঁচে যাবে সে। সেদিক দিয়ে মিলিটারির চাকরী তো রাজকীয় ব্যাপার। সুতরাং কোন বাধাই মানবে না অসীম।

—।

অথচ অসীমের জীবন আজ ভিন্নমুখী হতে পারত। এই বি. এ, এম. এ, পাশ করার কোন প্রয়োজনই আর থাকত না তার, যদি আরও পাঁচ বছর আগে সেই চাকরীটা পেয়ে যেত সে।

হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্যে ও ব্যস্ত তখন, বাবার এক বন্ধু নিয়ে এসেছিলেন চাকরীর খবরটা। দরখাস্ত করেছিল, ইন্টারভিউ দিয়েছিল—মেডিকেল পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিল। সমস্ত বাধা উৎরিয়ে আটকাল শেষে ওজনে। ওদের হিসেবমত তিন কিলো কম। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ও বেরিয়ে এসেছিল অফিসটার বাইরে। পকেটে গিজগিজ করছিল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটগুলো আর হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার মার্কশীটখানা (সার্টিফিকেট তখনও পাওয়া যায়নি)। কেন যেন ওর মনে হয়েছিল অফিসের ওজন-যন্ত্রটা বাজে—ঠিক ওজন পাওয়া তাতে সম্ভব নয়। কিন্তু কেমন করে স্থির নিশ্চয় হবে ও, কেমন করে ও বুঝবে যে সত্যিই ঐ যন্ত্রটা—তখনই চোখে পড়ে গিয়েছিল, প্যারাডাইসের ওজন-যন্ত্রটার দিকে।

দশটা পয়সা ফেলে নিজেকে ওজন করছিল অসীম। যদিও অফিসের ওজনের সঙ্গে মেলেনি তবুও নির্ধারিত মান থেকে বেশ কমই হয়েছিল তার দেহের ভার। সুচিত্রা সেনকে পেয়েছিল ওজন-টিকিটের উল্টো পিঠে। সেটা তাই যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছিল ও। আজ পাঁচ বছর পরে হয় তো পুরনো জিনিষের বাক্সটায় সে টিকিটটার দেখা মিললেও মিলতে পারে।

"ইনক্লাব জিন্দাবাদ, শিক্ষাক্ষেত্রে পুলিশী জুলুম চলবে না চলবে না, আমাদের দাবী—"

বিরাট একটা মিছিল চলে গেল আমহার্স্ট স্ট্রীটের ওপর দিয়ে। বাস্তবে ফিরে এল অসীম। পকেটে হাত দিল ও। খসখস করে উঠল এম. এ, পাশের

সার্টিফিকেটখানা। একটু আগেও এটা ছিল না ওর কাছে। এখন আছে। ও এখন এম. এ। আঃ কি খুশীই না লাগছে এখন। বাড়ির সুনাম, বাড়ির গর্ব। পাড়ায় বলা যাবে বুক ফুলিয়ে, আত্মীয়রা হিংসে করবে। বন্ধুমহলে একটা স্পেশাল সম্মান। এম. এ পাশ করা, কলকাতা ইউনিভার্সিটির শেষ ধাপটি পেরিয়ে যাওয়া—কি আনন্দ! এতটা আনন্দ কি কখনও পেয়েছে অসীম? মনে পড়ে না তার। কই বি. এ. পাশ করার পর অভিজ্ঞান পত্রখানা যেদিন পেয়েছিল সেদিনও তো এতটা আনন্দ জাগেনি, শিহরণ লাগেনি দেহে মনে। আস্তে আস্তে রোল করা কাগজটা বার করল পকেট থেকে। নতুন কাগজের মৃদু গন্ধে ভরপুর হলো মনটা।

অনেক শিক্ষা পেয়েছে অসীম। মস্ত বড় বিদ্বান ও আজ। ভাবতে ভাল লাগল: আমি এম. এ। আমি মস্ত শিক্ষিত। মিলিটারির চাকরীটা না পেলেও আমি প্রফেসারি করব, ছেলে পড়াব, আমি আমার শিক্ষা বিলিয়ে দেব তরুণদের মধ্যে। আমি এম. এ. কলকাতা ইউনিভার্সিটির শেষ ধাপ অবলীলাক্রমে আমি পেরিয়ে এসেছি। আমি গণ্য, আমি মান্য—আমি এক-জন-হুঁ—সকলে আমাকে সম্মান দেবে, কেউ হয় তো হিংসা করবে আমাকে—আমার শিক্ষাকে। দূর হতে ভেসে এল মিছিলের কণ্ঠস্বর: আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা—মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ।

পুরীর সিঁড়িতে পা দিল অসীম। ওজন-যন্ত্রের পাদানিতে দাঁড়াল। কাঁচের ভেতর লাল চক্রটা একটু ঘুরে থেমে গেল। মেসিনের ভেতর একটা দশ পয়সা ঢুকিয়ে দিল ও। প্যান্টের পকেটে খসখস করে উঠল সার্টিফিকেটখানা। ওজনের-টিকিটটা বেরিয়ে এল।

ওজন দেখে আশ্চর্য হলো অসীম। পাঁচ বছর আগেকার ওজনের কথা মনে পড়ল, একই ওজন মনে হচ্ছে। তবে কি পাঁচ বছরে ওজন বাড়েনি তার! সেদিনও প্যান্ট সার্ট পরা ছিল, পায়ে সু। আজও তাই। তখন হাতে ধরা খামের মধ্যে ছিল হায়ার সেকাণ্ডারীর মার্কশীট, আজ পকেটে আছে এম. এ.-র সার্টিফিকেট। আজ আর সেদিনের ব্যবধান পাঁচ বছরের। এই পাঁচ বছরে আরও শিক্ষা পেয়েছে অসীম, বড় হয়েছে। তবে?

হয় তো বা ভুল হচ্ছে অসীমের। সেদিন ওজন আরও কম ছিল—বাড়ী গিয়ে মিলোলেই ধরা পড়ে যাবে ভুলটা। হাঁ, তাই হবে বোধ হয়।

বাড়ী এল। খুঁজে বার করলো আগেকার সেই ওজন-টিকিটটাকে।

অবিকল এক।

হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করার সময় যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল আজ এম. এ. পাশ করার পর সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে অসীম।

ওজন বাড়েনি তার।

সাংস্কৃতিক সংযোগ না কূটনৈতিক তৎপরতা ?

সন্তোষকুমার দে

বহু অজানারে জানার জন্তে, দূরকে নিকট বন্ধু ও পরকে ভাই করার উদ্দেশ্যে যদি সাংস্কৃতিক বিনিময় দেশে দেশে চালু হয়, তাহলে তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে? কিন্তু এই আপাততঃ মহৎ উদ্দেশ্যটির মধ্যে থাকে যদি কোন গূঢ় অভিসন্ধি, গোপন উদ্দেশ্য তাহলে এই মহৎ প্রচেষ্টা হয়ে যায়, অনেকাংশে বিফল। আর জনমানসে দেখা দেয় এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে, বিশেষ করে ভারতবর্ষ পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার পর হতে সারা-বিশ্বে সাংস্কৃতিক সংযোগ ও ছাত্র-বিনিময় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। প্রাচীন যুগেও গ্রীস, রোম, মিশর, চীনেও এই রকম সাংস্কৃতিক-বিনিময় প্রচলিত ছিল।

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। অতি প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় পণ্ডিত ও প্রচারকেরা তিব্বত, চীন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, সুমাত্রা, বালী, যবদ্বীপ, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি দূর ও নিকট প্রাচ্যের দেশগুলিতে ভারতের অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রীর বাণী পৌঁছে দিতেন।

সর্বপ্রথম ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য কাশ্যপ-মাতঙ্গ বন্ধু ধর্মরত্নের সঙ্গে মীং সম্রাটের আমন্ত্রণে চীনের পূর্ব-হান প্রদেশে বুদ্ধের বাণী প্রচারে গিয়েছিলেন। তিনি ৪২টি অধ্যায়ে সূত্রগ্রন্থ সংকলন করে পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখান। তারপর গিয়েছিলেন কুমারজীব সম্রাট সীনের আমন্ত্রনে। এর পর গেলেন ধর্মক্ষেম। তিনি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত্র মহাসন্নিপাত, মহাপরিনির্বাণসূত্র প্রভৃতি ২০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ভাষায় ভাষান্তরিত করে ভারতীয় সংস্কৃতির বনিয়াদ দৃঢ় করে তোলেন। তারপর আচার্য পরমার্থের নাম করা যেতে পারে। ইনি চীন সম্রাট য়ু-তির আমন্ত্রণে ৫৪৬ খৃষ্টাব্দে চীনে উপনীত হন। সেখানে তিনি কপিলের সাংখ্যকারিকা প্রভৃতি ৭০ খানি সংস্কৃত পুস্তক চীনা ভাষায় অনুবাদ করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বুদ্ধের বাণী প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। তারপর দেখি আচার্য বোধীধর্ম চীনে গিয়ে "চাং" নামে এক বিশেষ ধরনের ধ্যানের প্রবর্তন করেন। বোধীধর্মের পর গিয়েছিলেন বজ্রবোধী ও অমোঘবজ্র। বজ্রবোধীর মৃত্যুর পর অমোঘবজ্র ৭৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করে বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিস্থাপন করেন। এর পরও ছোট বড় অনেক ভারতীয় প্রচারক চীনে যান। এই মিত্রতার যাত্রা এক তরফা ছিল না। যেমন এ-দেশ থেকে বৌদ্ধাচার্যেরা চীন ও তিব্বতে গিয়েছিলেন, তেমনি ও-দেশ থেকেও প্রথম শতাব্দী থেকেই অসংখ্য চীনাছাত্র ও অধ্যাপক এ-দেশে আসেন বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্যে।

যেমন আমাদের দেশে, তেমনি দেখি ইউরোপেও জ্ঞানান্বেষণে ছাত্রেরা প্রাচীন রোমান যুগেও রোম থেকে গ্রীসে ও মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে যেত। রোম-সাম্রাজ্যের পতনের পরও এই মিত্রতার যাত্রা, তথা বিদ্যার্থীদের নব নব জ্ঞানের প্রতি আকুল আকূতি স্তব্ধ হয়ে যায়নি। তাই দেখা যায়, শার্লিম্যানের যুগে এই সংস্কৃতিক সংযোগ আবার নতুন করে আরম্ভ হয়। অশোক যেমন সারা এশিয়ায় বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য দিকে দিকে পাঠিয়েছিলেন প্রচারক, শার্লিম্যানও সেইরকম খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্তে দলে দলে সারা ইউরোপে পাঠাতে লাগলেন প্রচারক। রেণাসাঁস অর্থাৎ নব-জাগরণের যুগে ফ্লোরেন্স কেমব্রিজ ও বেসিল

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রদের ভীড় দেখা গিয়েছিল। মধ্য যুগেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। তখনও ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকার (ট্রিমবকটুতে) ছাত্র বিনিময় বেশ চালু ছিল।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিক সংযোগ, ছাত্র-বিনিময় প্রভৃতি পৃথিবীতে নতুন জিনিস নয়, এটি বুঝাবার জন্যে। এগুলি আবহমান কাল থেকে প্রচলিত ছিল। তবে তফাৎ এই যে, তখন এই সাংস্কৃতিক সংযোগের সঙ্গে রাজনীতির কোন সংস্রব ছিল না। সেটা ছিল নিছক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিষয়। বর্তমানে সাংস্কৃতিক সংযোগের নামে যা চলছে, তাতে জনসাধারণের মনে বেশ একটু সন্দেহের ছায়াপাত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এশিয়া ও আফ্রিকার ছাত্র-ছাত্রীদের ইউরোপ বা আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করা অসাধ্য না হলেও বেশ দুরূহ ব্যাপার ছিল। তারা কোন আর্থিক সাহায্য তো পেতই না, বরং পেত বিদ্রূপ, বিরূপতা ও অবহেলা। ইংলণ্ডে ১৮৯৯ সালে রোড্স্ ফাউনডেশন স্থাপিত হয়; কিন্তু সেটি এশিয়া বা আফ্রিকার ছাত্রদের জন্যে নয়। আশ্চর্যের বিষয়, যেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হল এবং তার অব্যবহিত পরেই এশিয়া আফ্রিকার ছোট-বড় অনেকগুলি রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করল, অমনি এইসব দেশের কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রদের শিক্ষাপ্রাপ্তির কোন অসুবিধা তো রইলই না বরং তাদের সাহায্যের জন্যে অসংখ্য ফাউনডেশন, স্কলারসিপ প্রভৃতি স্থাপিত হল। এ বিষয়ে সব চেয়ে বেশী অগ্রণী হল আমেরিকা। সেখানে স্থাপিত হল (১) ফুলব্রাইট স্কলারসিপ, (২) ফোর্ড ফাউনডেসন ফেলোসিপ, (৩) কার্নেগী এনডাউমেন্ট, (৪) আফ্রিকান একসচেঞ্জ প্রভৃতি। ফলে ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইন্দোনেসিয়া, মালয়, সিঙ্গাপুর ও আফ্রিকার বহু দেশ থেকে হাজারে হাজারে ছাত্র-ছাত্রী আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চশিক্ষা, বিশেষ করে কৃষি, বিজ্ঞান, ইনজিনিয়ারিং ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অধ্যয়নের জন্য ভীড় জমাতে আরম্ভ করল।

আমেরিকার বিদেশী ও কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রদের জন্যে (যদিও আমেরিকার নিগ্রোরা উচ্চ শিক্ষায় বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা পায় না) এই ঢালাও ব্যবস্থা দেখে সোভিয়েত রাশিয়াও আর স্থির থাকতে পারল না। অনুন্নত দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য তারও প্রাণ কেঁদে উঠল। তাই দেখা যায়, ষ্টালিন-যুগের যে রাশিয়া সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করছিল, সেই রাশিয়ায় ষ্টালিনোত্তর যুগে দেখা গেল এর অদ্ভুত পরিবর্তন। ভারত সমেত সমস্ত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্যে সোভিয়েত রাশিয়া, পোলাও, রুমানিয়া ও চেকোশ্লোভিয়ার সঙ্গে একযোগে অসংখ্য ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা বললেন, পরস্পরকে জানার জন্যে, পৃথিবীতে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য, নতুন চিন্তা সংস্কৃতি ও ভাবধারার বিনিময়ের জন্যে এই সাংস্কৃতিক সংযোগ একান্ত আবশ্যক এবং আমরাও একথা বিশ্বাস করলাম।

কয়েক বৎসরের মধ্যে সোভিয়েত পরিকল্পিত বৈদেশিক ছাত্রবৃত্তি ও ছাত্রবিনিময় প্রচেষ্টা এমন বৈশিষ্ট্য অর্জন করল যে, আমেরিকাকে বাধ্য হয়ে পারস্পরিক মত-বিনিময়ের জন্যে মস্কোতে ব্যুরো অব ইনটার ন্যাশনাল রিলেসনস এবং কাউনসেলের ফর কালচারাল এফেয়ার্স স্থাপন করতে হল।

যাই হোক এই সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হওয়ায়, ১৯৫৪ সালে ১৪ জন ভারতীয় ছাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্যে মস্কো প্রেরিত হয় এবং ঐ বছরই মিশর থেকে প্রেরিত হয় ৪০ জন ছাত্র। ১৯৫৭ সালে সাত জন ভারতীয়, ৩ জন ইন্দোনেসীয়, ৩ জন সিংহলী, ২১ জন মিশরী ও ৪০ জন আরবী ভাষাভাষী ছাত্র মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করে। ১৯৫৮ সালে ১৬০ জন সাইবেরিয়ান, ৩৩৫ জন মিশরী এবং ১৭ জন ভারতীয় ছাত্র প্রেরিত হয়। ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় ছাত্রসংখ্যা কম হওয়ায় অনেকে একটু আশ্চর্য

হতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা হল ১৯৫৬ সালের রাশিয়া ভারতীয় ছাত্রদের ধাতু ও খনিজবিদ্যা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্যে এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কথা ছিল ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় ছাত্রদের একটি নাতিবৃহৎ দল ও দেশে শিক্ষা শেষ করে ভিলায়ে সোভিয়েত উদ্যোগে যে ইস্পাত কারখানাটি প্রস্তুত হবে সেখানে তারা কার্যভার গ্রহণ করবে। কিন্তু গোড়া থেকেই ভারত-সরকার দলে দলে ভারতীয় ছাত্রদের সাম্যবাদী দেশে পাঠাতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। ঠিক এমনি সময় আমেরিকা এর আভাস পেয়ে হঠাৎ অত্যন্ত উদার হয়ে পড়ল এবং ঘোষণা করল, ১৯৫৭ সাল থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে ৯০০ থেকে ১,০০০ ভারতীয় ছাত্রকে ইনজিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যায় পারদর্শী করার জন্যে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। খবর পেয়ে ভারত-সরকার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। রাশিয়ার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। ফলে ১৯৫৭—৫৮ সালে মাত্র ১৫ জন নেপালী এবং ১০ জন ইন্দোনেশীয় ছাত্র সোভিয়েত হায়ার ইন্স্টিটিউশনে ভর্তি হল। আমেরিকা বুক ফুলিয়ে বলতে পারল, একশ কোটি অধিবাসীর দেশে চীন-সোভিয়েত ব্লক আমেরিকার তুলনায় অর্দ্ধেকের চেয়ে কম বিদেশী ছাত্রদের জন্যে উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরেছে; আর আমেরিকা মুক্ত দুনিয়ার জন্যে করেছে দরাজ শিক্ষা ব্যবস্থা।

বাস্তবিক রাশিয়ার পক্ষে কুবেরের দেশ আমেরিকার সঙ্গে এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়। তবু রাশিয়া হাল ছাড়ল না। এদিক দিয়ে সুবিধা করতে না পেরে, এশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে অন্য একটি পথ বেছে নিল। সে **mezhkniga** অর্থাৎ ইনটার ন্যাশনাল বুক কোং প্রতিষ্ঠা করল। আর সেই সংস্থাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল ইউনিয়ন অব্ সোভিয়েত কমপোজারস, ইউনিয়ন অব্ সোভিয়েত জার্ণালিষ্টস, মস্কোর বিজ্ঞান পরিষদ, লেনিন লাইব্রেরী প্রভৃতি। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হল অতি প্রয়োজনীয় রুশভাষায় লিখিত পুস্তকগুলির এশিয়া ও আফ্রিকার ছাত্রদের জন্যে ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা। কাজ বেশ ভালভাবেই চলতে লাগল। ১৯৫৭ সালে এই সংস্থা এই রকম তিন কোটি পুস্তক নামমাত্র মূল্যে বা বিনা মূল্যে অ-কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে বিক্রী করল। ১৯৫৮ সালে রুশ-ভারত প্রযুক্তিবিদ্যাসহায়ক সর্তানুসারে ভারতেই এই সব পুস্তক ইংরেজীতে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা হল। এই বছরই নিকট প্রাচ্যের যাবতীয় ভাষায় প্রযুক্তি-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকগুলির অনুবাদ করে ৪১৩, ৬০০ খণ্ড ঐ সব দেশে বিলি করা হল। রাশিয়ার প্রভাব এইসব দেশে বেড়ে চলেছে দেখে আমেরিকা প্রমাদ গুণল। কাজেই এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করবার জন্যে আমেরিকাকে আবার একটি পালটা প্রতিষ্ঠান খাড়া করতে হল। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হল I. M. G. ইনফরমেশন মিডিয়া গ্যারান্টি প্রোগ্রাম। এরাও সস্তায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক পুস্তকগুলি প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করল; কিন্তু এই প্রকাশনি-প্রতিযোগিতায় আমেরিকা জিততে পারল না; কারণ ১৯৫৮—৫৯ সালে আমেরিকান ডলারের টান পড়ায়, সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত সাহায্য করতে পারলেন না। বর্তমানে আমেরিকার ঐ সঙ্কট কেটে যাওয়ায় আবার পুরাদমে কাজ আরম্ভ হয়েছে। ফলে অনুন্নত দেশগুলি দুই তরফ থেকেই স্বল্প মূল্যে প্রয়োজনীয় পুস্তকের সাহায্য পাচ্ছে।

বৈদেশিক সাহায্য, ছাত্রশিক্ষা ব্যবস্থা, পুস্তক প্রকাশন প্রভৃতি সকল বিষয়ে রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অর্থাভাবে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে; তাই রাশিয়া এক নতুন দিগন্ত খুলবার জন্যে ধরল এক অভিনব পন্থা। আরম্ভ করল সাংস্কৃতিক-বিনিময়, বললে দূর ও নিকট-প্রাচ্যের দেশসমূহে, বিশেষকরে ভারতবর্ষেও আছে অনেক জিনিস জানবার, শিখবার ও বুঝবার। তাদের জীবনদর্শন, তাদের সাহিত্য, ইতিহাস, দার্শনিক চিন্তা, স্থাপত্য, ললিতকলা,

তাই এদের হৃদয়হরণ করবার জন্য আরম্ভ করল বেদ বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত থেকে আরম্ভ করে ভারতের প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির রুশভাষায় অনুবাদের এক ব্যাপক পরিকল্পনা। ভারতের জাতীয় কবি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের সম্মানের জন্যে কালিদাস ও রবীন্দ্র-সপ্তাহ পালন করল। ভারতীয় ছায়াচিত্র প্রদর্শন, ভারতীয় নৃত্যগীত প্রভৃতির অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। শ্রেষ্ঠ সোভিয়েট নৃত্যশিল্পীদের শান্তিনিকেতনে আধুনিক ও মণিপুরী নৃত্য এবং মাদ্রাজে কথাকলি ও ভারতনাট্যম নৃত্য শিক্ষার জন্য পাঠান হল। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী মারা প্লিসেটস্কয়া সমেত বলসয় থিয়েটার তাদের অনবদ্য শিল্প প্রদর্শনীর জন্যে এল ভারতবর্ষে। তাঁরা দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরে নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন এবং টিকিট বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করলেন। প্রসিদ্ধ আজারবৈজান গায়ক বীবুটভ্ ইকবালের কয়েকটি উর্দু সংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের চমৎকৃত করলেন।

অনুরূপভাবে মিশর, সিরিয়া, লেবানন ও আরব রাষ্ট্রগুলিতেও সোভিয়েট রাশিয়া সোৎসাহে সাংস্কৃতিক-অভিযান আরম্ভ করে দিলেন। সোভিয়েট সায়েন্স একাডেমি এইসব দেশের প্রত্নতত্ব, নৃতত্ব, জাতিতত্ব, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি গবেষণা আরম্ভ করলেন। এইসব দেশের শিল্পীরাও রাশিয়ায় তাদের নৃত্যগীতাদি পরিবেশন করতে লাগলেন।

দূর ও মধ্য প্রাচ্যে রাশিয়ার এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হল। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণের উষ্ণ স্পর্শ বুদ্ধিজীবীদের হৃদয়কে ভাতিয়ে ও মাতিয়ে তুলল। আমেরিকাও এই দেশে পিছিয়ে রইল না। তাঁরাও আরম্ভ করলেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু তাঁরা এসেছিলেন শুধু দিতে, নিতে নয়। তাঁরা চেয়েছিলেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে, অনুকম্পা দেখাতে, প্রসন্ন দৃষ্টিতে প্রসাদ বিতরণ করতে। এদেশের কৃষ্টি, জ্ঞান। সব বিষয়ে তাঁদের ছিল এক ঔদাসিকভাব। এদেশের ললিতকলা, নৃত্যগীত, লোকসাহিত্যের যে এক মহৎ আবেদন আছে, তা তাঁরা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করতেন; তাই এ দেশের লোক তাঁদের সাংস্কৃতিক সংযোগকে দূর থেকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, কিন্তু প্রাণের স্পর্শে নিতে পারেন নি। রাশিয়া এসেছিল দিতে আর নিতে, মিলিতে মেলাতে। পার্থক্য এইখানে।

সোভিয়েট রাশিয়ার এই-অসামান্য সাফল্য দেখে আমেরিকা নিজের ভুল বুঝতে পারল, নীতির পরিবর্তন করল। অভিভাবকের ভাব, বড়-দাদাগিরি ভুলে এবার ভাই ভাই হতে চেষ্টা করলে। আমাদের নৃত্যগীত, শিল্প, কৃষ্টির নবমূল্যায়ন আরম্ভ করল। উস্তাদ আলি আকবর খান, বেলায়েৎ খাঁ, রবিশঙ্কর, শুভলক্ষ্মী সেদেশে আমন্ত্রিত হলেন। কেউ সেখানে সরোদ, কেউ সেতার বাজিয়ে, কেও বা সংগীত পরিবেশনে প্রশংসা অর্জন করলেন; কেও বা সেখানে সংগীতকলানিকেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সেতার, সরোদ ও মার্গসংগীত সেখানে স্বীকৃতিলাভ করল।

সারা দুনিয়ার উপর প্রভুত্বকামী দুটী পরাক্রান্ত দেশ আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকা নিয়ে চলেছে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এরা কি আফ্রো-এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির সত্যকারের মঙ্গলাকাঙ্খী? যদি তা সত্য হয়, তাহলে তারা মিলে-মিশে অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নে আগিয়ে আসে না কেন? এই কেন-র সঠিক উত্তর না পেয়ে এশিয়াবাসী হয়ে উঠেছে সন্দিগ্ধ। তারা সন্দেহ করছে এ সাহায্য নিষ্কাম নয়, এর পিছনে রয়েছে এক গূঢ় উদ্দেশ্য। এইসমস্ত দেশ, যারা এতদিন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসন ও শোষণে ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, যারা ছিল লাঞ্ছিত, ভাগ্যহত, শত অত্যাচারে জর্জরিত তাদের কাছে এই দুই শক্তিশালী দেশ দরদী বন্ধু সেজে এসেছেন ভালবাসা ও ভক্তি লাভ করতে, এদের উপর গণতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী দেশগুলির প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিহত করতে এবং নিজ নিজ সমাজ ও রাষ্ট্রের এক স্বপ্নমাখা, সুষমামণ্ডিত

অন্ততপক্ষে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত করা যায় বা আমেরিকার অমিত শক্তির কাছে নতজানু করানো সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে। এই-রকম মন্তব্য যদি কেউ করেন, তাহলে তাকে নিছক অকৃতজ্ঞতা বা কাণ্ডজ্ঞানহীনতা বলা যাবে না। কারণ দেখা যায়, সাম্যবাদী গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে ভারত সিংহল, ব্রহ্ম ও আফ্রিকা প্রভৃতি রাষ্ট্র হতে যেসমস্ত ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্যে পাঠান হয়েছিল, তাদের মধ্যে এমন ছাত্র অনেক ছিল, যাদের বিদ্যার দৌড় হল মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার মান। এইসব ছাত্রদের মধ্যে একবার একদল বুদ্ধিমান আফ্রিকান ছাত্র অভিযোগ করে যে, ধনতান্ত্রিক দেশের এক মিথ্যা চিত্র তাদের সম্মুখে ধরা হয়েছিল, মার্কস লেনিনতত্ত্ব তাদের বাধ্যতামূলক ভাবে অধ্যায়ন করতে হত, রাজনৈতিক কর্মসূচি ও প্রচারকার্যে যোগদান করতে হত এবং কিছুদিন পরে ব্যাপারটা এত ঘোরাল হয়ে উঠে যে, প্রায় ২০০ আফ্রিকান ছাত্র হয় ঐসব দেশ ছেড়ে চলে আসে, নয়ত ছেড়ে আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এইসব স্বাধীনচেতা ছাত্রদের মধ্যে ৪০ জন গিয়েছিল রাশিয়ায় ৪০, জন পূর্ব জার্মানীতে এবং ৫০ জন চীনদেশে। এই প্রসঙ্গে দিল্লী পলিটেকনিক স্কুলের শ্রী বিজয় বাত্র যিনি ছাত্রবৃত্তি নিয়ে ড্রেসডেন শহরে গিয়ে চার বছর পড়াশুনা করে মোহমুক্ত হয়ে ফিরে এসে জার্মান উইকলিতে ৩০-৬-৬২ ও ৭-৭-৬০ তারিখে যে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, তা স্মরণ করা যেতে পারে।

অভিযোগ শুধু রাশিয়ার বিরুদ্ধেই করলে চলবে না। আমেরিকাও এবিষয়ে ভোরের ফোটা ফুলটির মত একেবারে নিষ্কলুষ নয়। তারও উদ্দেশ্য হল, এইসব অনগ্রসর দেশগুলিকে সাম্যবাদীর শিবির থেকে সরিয়ে এনে নিজেদের শিবিরভুক্ত করা; অর্থনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে তাদের ওপর প্রভুত্ব করা এবং একটা নয়া উপনিবেশ সৃষ্টি করে তাদের কাঁধে বন্দুক রেখে, (বর্তমানে যেমন ভিয়েতনামে হচ্ছে) দরকার হলে ভবিষ্যতে যাতে কমিউনিজমের মোকাবিলা করা যায় তার ব্যবস্থা করা।

এ ধারণা যদি সত্য না হয়, তাহলে কেন বিভিন্ন ছাত্র যুবসংস্থা এবং ছাত্রবিনিময় প্রকল্পের মাধ্যমে কৌশলে আমেরিকার "সিয়া" (সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি) অনুপ্রবেশ করছে? শুনা যায়, কলকাতা ও কাঠমুণ্ডের পূর্বাঞ্চলে সিয়ার প্রধান ঘাঁটি। এদেশের ছাত্রসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে কৌশলে তাদের কাছ থেকে জনসাধারণের তথা ছাত্রসম্প্রদায়ের মতিগতি কোন্ দিকে, তারা কোন্ শিবিরভুক্ত ইত্যাদি জানবার জন্যে আমেরিকান ছাত্রদের প্রচুর টাকা দেওয়া হচ্ছে। ওয়াশিংটন পোষ্টের খবর :—কবি নাট্যকার, সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিকদের আন্তর্জাতিক সংস্থা PEN সিয়ার কাছ থেকে অর্থসাহায্য পেয়ে থাকে। ১৯৬৮ সালে ঐ সংস্থার বাজেটের অর্ধেক অর্থ যুগিয়েছে Radio Free Europe। রেডিও ফ্রি ইউরোপ প্রধানতঃ সিয়ার অর্থে পরিচালিত। কথাটা হয়ত একেবারে মিথ্যা নয়। মিথ্যা না হবার কারণ হল, এইসব সাংস্কৃতিক সংযোগের ফল কিরকম হল; অর্থাৎ এতে তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হল কিনা, বা হলেও কতটুকু হল তার মূল্যায়নের জন্যে রীতিমত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইরকম দু-একটি সমীক্ষার ফল এখানে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

যেসব জার্মান ছাত্র আমেরিকায় গিয়েছিল তাদের সম্বন্ধে সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, এইসব ছাত্র আমেরিকার শিক্ষার ফলে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ বিসর্জন দেয়নি এবং আমেরিকার অপরিমেয় শক্তি ও অতুল ঐশ্বর্য দেখেও তারা এতটুকু প্রভাবান্বিত হয় নি। জাপানী ছাত্রদের বিষয় সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা আমেরিকার রাজনৈতিক প্রচারের দিকে দৃষ্টিপাত না করে, নিজ নিজ পাঠ্যবিষয় নিয়ে মশগুল থাকত। এশিয়া ও আফ্রিকার ছাত্রদের বিষয় সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, আমেরিকান ছাত্রদের সঙ্গে ২।৩ বৎসর অধ্যয়ন ও বসবাসের ফলে, বিশেষ করে বয়স্ক পরিণত বুদ্ধি ছাত্রছাত্রীরা আপনাপন রাজনৈতিক মতবাদে জলাঞ্জলি দিয়ে নূতন মতে দীক্ষিত হয়নি। অনুরূপ সমীক্ষণ হয়ত রাশিয়াতেও করা হয়েছিল।

আমাদের মনে হয়, সমীক্ষার এই মন্তব্য সমষ্টিগতভাবে সত্য হলেও, ব্যক্তিগতভাবে নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমরা লক্ষ্য করেছি. যেসমস্ত ভারতীয় ছাত্র এইসব দেশ থেকে শিক্ষা শেষ করে ফিরে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের মতামত, চালচলন এইসব দেশের মতই হয়েছে বলে মনে হয়। যাই হোক, এই সাংস্কৃতিক সংযোগ রজকিনী প্রেমের মত নিকষিত হেম নয়, এতে কামগন্ধ কিছু আছে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। যাঁরা ছাত্রবিনিময়ের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন, তাঁরা সেটা যে নিঃস্বার্থভাবে করবেন, অতিবড় আশাবাদীরও সেরকম আশা করা উচিত নয়।

এখন করণীয় কি? সাংস্কৃতিক সংযোগের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতার খাদমেশান থাকলেও ভারতীয় ছাত্রদের রাশিয়া বা আমেরিকায় উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ লওয়া উচিত কিনা? আমাদের মনে হয়, সুযোগ সর্বোতভাবে লওয়া উচিত—বিশেষ করে ক[illegible] বিজ্ঞান, ইনজিনিয়ারিং, চিকিৎসা ও প্রযুক্তি বিদ[illegible] বিষয়ে।

১৯৬০ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, একম[illegible] আমেরিকাতেই ১০০ টি এফ্রো-এশিয়া দেশের ৬০,০[illegible] ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। প্রায় ৪০০০ ভারতীয় ছা[illegible] আমেরিকায় শিক্ষা ও গবেষণায় রত আছে; অনুরূ[illegible] ভাবে প্রায় ১৪,০০০ আমেরিকান ছাত্র-ছাত্রী এফ্রো[illegible] এশিয়ায় শিক্ষার্থী হিসাবে ছড়িয়ে আছে। এই আদা[illegible] প্রদান কিছুতেই সর্বোতভাবে অমঙ্গলজনক হতে পারে ন[illegible] ফলে হয়ত ভুল বুঝা-বুঝির অবসান হবে, শান্তি ও[illegible] সৌহার্দ্য স্থাপিত হবে। অনগ্রসর দেশগুলি উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়ে "নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা, নিত্যনূতন কর্মনিষ্ঠা, জীবনগ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা উলটাতে" সক্ষম হবে।

প্রতিধ্বনি

শ্রীশান্তা দেবী

দাদা আমি ও সীতা কলকাতাতেই জন্মেছিলাম। তারপর শিশুকালেই কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদে চলে যাই। আবার ১১।১২ বৎসর পরে সেই কলকাতাতেই ফিরে এলাম, তবে অন্য পাড়ায়। দেখলাম বাবা মা এপাড়াতেও অনেককেই চেনেন, আমরা প্রায় কাউকেই চিনি না। এলাহাবাদের গেট দেওয়া লন সমেত বড় বড় একতলা বাংলো বাড়ীর পর এখানের ছোট্ট তিনতলা বাড়ী কেমন যেন খেলা ঘরের মত লাগল। একটা বাড়ীর সঙ্গে আর একটা বাড়ীর যেন গলাগলি ভাব, মাঝখানে এক তিলও ফাঁক নেই। দেখি আমাদের তিনতলা বাড়ীর পাশেই সেবাব্রত শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের চারতলা বাড়ী, বারন্দার রেলিং ছাড়া দুটো বাড়ীর মধ্যে আর কিছু আড়াল নেই; অন্য আর এক দিকেও রেলিং এর পরেই আর একটা ভাড়া বাড়ী। কেবল দুটো দিক একটু ফাঁকা—দক্ষিণদিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণ, যাকে আমরা মাঠ বলতাম। আর একদিকে আড়াই হাত চওড়া একটা গলি, পিছনের বাড়ীগুলিতে যাবার জন্যে। কোনো বাড়ীতেই ২।১ হাতের বেশী উঠোন নেই, কিছু নেই, গাছপালার ত চিহ্নই নেই, কেবল কোনো রকমে দিন ও রাত্রি যাপনের ব্যবস্থাগুলি ঠাসাঠাসি করে সাজানো। এরকম বাড়ীতে আমরা কখনও থাকিনি। আমাদের বাড়ী ছিল সব মাঠ বাগান ক্ষেতের মধ্যে এক একটা বড় বড় আস্তানা। আম, পেয়ারা, সজনে কত রকম গাছ। এখানে সমাজ পাড়ার প্রাঙ্গণে দুটি সুপারি গাছ ও একটি কদম গাছ। বোধ হয় একটি বেল গাছও ছিল। অতি শৈশবে শুনেছি হেরম্ববাবুর কাছের কোনো বাড়ীতে থাকত। মা সে সব কিছু মনে নেই।

এখানে চাকর বাকর সব অন্য রকম. বাড়ীতে প্রায় কেউ থাকে না, অধিকাংশই ঠিকে ঝি। তারা শরৎচন্দ্রের ভাষায় "combined hand' রান্নাও করে, সংসারের অন্য কাজও করে এবং থেকে থেকে কামাই করে। তাদের পরনে মাত্র এক ফের কাপড়, গায়ে জামা নেই। এলাহাবাদের দরিদ্রতম ঝিও দুপাট করে বারো হাত শাড়ী পরত এবং গায়ে সর্ব্বদা তাদের জামা আঁটিয়া থাকত। ছোট কাপড় পরার চেয়ে তালি বা জোড়া কাপড় পরতেও তাদের কোন আপত্তি ছিল না।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী ও মর্ডান রিভিউ এর আপিস এসেছিল, কাজেই আমাদের ঝি-এর উপর একটা দরোয়ান আর একটা চাকর রাখতে হল। ঠিকে বামুন ঠাকরুণ রান্নার ভার নিল, এলাহাবাদের মত আর মহারাজ নয়। এই বামুন ঠাকরুণের নাম সদী বামনী। সে আমাদের শৈশবেও মার কাজ করেছিল। তখন মায়ের একটি শিশুকে সে ডাকত "রূপ সুন্দর" বলে।

ভোর না হতেই প্রত্যেক বাড়ীর প্রত্যেক তলায় অথবা প্রত্যেক ঘরের আলাদা আলাদা গৃহস্থের আলাদা আলাদা উনুনে ঘুঁটে ও কয়লার ধোঁয়া চোখগুলো প্রায় অন্ধ করে দিত। এলাহাবাদে আমাদের রান্না হত কাঠের জ্বালে। কাঠ ধরানো অনেক সহজ ছিল, এত ধোঁওয়াও হত না। ভাল করে কাঠ সাজাতে পারলে আর ফুঁ দেবার একটা লম্বা চোঙা থাকলে বেশী গোলমালে পড়বার ভয় ছিল না।

যাইহোক এখানের কয়লার উনানেও আমরা এলাহাবাদের মত সকালে গরম গরম লুচি খেতাম, চা পাউরুটি নয়। আটামাখা ও লুচি বেলা ছিল আমার কাজ। উনান ধরানোর পর দুধ নেওয়ার পালা। দুধ এখানে আনত শিবপুর ডেয়ারীর গোয়ালা; তারা মস্ত বড় গরু দরজায় দাঁড় করিয়ে দুধ দোয়াত না, টিনে ভর্ত্তি দুধ বাড়ীতে বাড়ীতে মেপে দিয়ে যেত। আমাদের বাড়ীটা সবটাই আমাদের ছিল, অন্য অধিকাংশ বাড়ীতে একখানা বা দুখানা ঘর নিয়ে আলাদা আলাদা ভাড়াটের বাসা। এই সব বাড়ীতে প্রত্যেকের একটা খোপের মত রান্নার জায়গা থাকত বটে; কিন্তু স্নান করবার ঘর প্রতি পরিবারের আলাদা ছিল না। এই জন্য ঝগড়া ঝাটিও বাঁধত কারুর কারুর মধ্যে।

সমাজ পাড়ায় ছিল অনেকগুলি মেয়ে, এত কাছাকাছি বাস এবং সন্ধ্যায় সবাই প্রাঙ্গণে বেড়ায়, কাজেই শীঘ্র তাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। তাদের একদল পড়ে বেথুনে আর একদল ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে। এর মধ্যে ২।৪ টি ছোট মেয়ে পাড়ার কাছেই চার আনার ইস্কুলে ঝিদের সঙ্গে হেঁটে যেত। যারা ২ টাকার ইস্কুলে পড়ত তারা স্বভাবতই, চার আনার ইস্কুলকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে মনে করত না। সে সব খুবই ছোট স্কুল। বেথুন কলেজের জোড়া ঘোড়ায় টানা মস্ত বড় বস্ আসত পাদানে উর্দ্দিপরা সহিস দাঁড়িয়ে। তারা গাড়ী দাঁড়াতেই সদর্পে নেমে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ছেড়ে দৌড়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ত, দরজায় দরজায় "গাড়ী আয়া বাবা" বলে হাঁক দিতে দিতে। ছোট মেজ বড় নানা মাপেরফ্রকপরা শাড়ী পরা মেয়েরা দুই হাতে বুকের উপর এক পাঁজা বই খাতা চেপে বেরিয়ে পড়ত, কারুর ব্যাগ ছিল না তখন। সবাই পায়ে জুতোও দিত না। স্নানের পর লম্বা চুল ঝুলিয়েই বড় মেয়েরাও কলেজ যেত, খোঁপা বা বিনুনি না করলে বকুনি খেতে হত না। ২।১ জন মাথার উপর একটা কালো ফিতে বাঁধত।

এই বেথুন কলেজের স্কুলেই গরমের ছুটির পর, হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার সময় বোধ হয়, বাবা আমাদের দুই বোনকে একদিন ভর্ত্তি করে দিলেন। হেড মাষ্টার শ্যামাচরণ গুপ্ত মহাশয় বাবার পরিচিত ছিলেন। এলাহাবাদে আমাদের বাড়ীতে একবার অতিথিও হয়েছিলেন। পরীক্ষা কিছু করলেন না, কেবল কি কি বই পড়েছি জিজ্ঞাসা করলেন। বিশেষ কিছু ইতস্ততঃ না করে আমাকে প্রি-ম্যাট্রিক ও সীতাকে আর দুই ক্লাশ নীচে ভর্ত্তি করে নিলেন। আমাদের রেখে দিয়ে বাবা ম্লান মুখে বাড়ী ফিরে গেলেন, আমরাও কাতর মুখে ক্লাশে গিয়ে বসলাম, অচেনা মেয়েদের মধ্যে। ইতিপূর্ব্বে স্কুলে ত কখন যাইনি, কাজেই বাবারও মন খারাপ আমাদেরও মন খারাপ। মস্ত বড় হল ঘর, মাঝখানে বেথুন সাহেবের ছোট একটি আবক্ষ মূর্ত্তি; ঘর বড় বটে কিন্তু একটা ঘরেই ছয়টা ক্লাশ। সে কালের দিন ত, কাজেই ক্লাশও খুব বড় বড় নয়, আমাদের ক্লাশে মাত্র গুটি আষ্টেক মেয়ে; আজ তারা সবাই বেঁচে নেই, অর্দ্ধেক ওপারে চলে গিয়েছেন।

আমি তখন ইতিহাস, ভূগোল, বীজগণিত, জ্যামিতি এ সব কিছুই জানি না মাষ্টার মশায়রাও কিছুই বলে দেন না। তাঁরা ক্লাশে যতটা পড়া হয়ে গিয়েছে, নিয়মমত তার পর থেকেই পড়ান। হেড মাষ্টার মশাই অঙ্ক কসাতেন, আমি একজন অর্ব্বাচীন বসে আছি জেনেও, বোর্ডে বীজ গণিতের বড় বড় অঙ্ক খস খস করে কসে যেতেন; তাঁর দ্রুত কসার ধরনটা খুব **admire** করতাম, কিন্তু এক বর্ণও বুঝতে পারতাম না। দেড় বৎসর পরে ম্যাট্রিক দিতে হবে, আজকালকার দিন হলে চারটে টিউটর রাখা হত। কিন্তু বাবা সে সব কিছুই করলেন না। অগত্যা নিজেই হাবুডুবু খেতে খেতে বই থেকে পাঠোদ্ধার করতে লাগলাম এবং সীতার অঙ্কের মাষ্টারীও করতে হল। ছয় মাস পরে বাৎসরিক পরীক্ষা দিলাম, যা জানা হয়ে ওঠেনি, তা বাদই দিলাম। তবু ভালই পাশ করে গেলাম।

সুহৃ ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে ভর্ত্তি হলেন, মুলুকে বোধহয়

স্কুলে দিয়ে আবার ছাড়িয়ে নেওয়া হল। তার বয়স তখন মাত্র পাঁচ এবং শরীর অত্যন্ত খারাপ। সে সারাদিন গান গেয়ে, ভাঙা ঘড়ির স্প্রিং দিয়ে সাবমেরিন বানিয়ে অবসর কাল নূতন বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে বা ক্ষুদুর সঙ্গে ভাব ও ঝগড়া করে দিন কাটাতে লাগল। পড়াশুনাও অল্প চলত। পাশ করে আসার জন্যে দাদা কলেজে ভর্তি হলেন। এলাহাবাদ থেকে একটা সোনার মেডেলও পেলেন।

ক্ষুদু ও মুলুর অনেক স্বরচিত হাস্যকর গান ছিল, তারা দুজন সেগুলো গাইত; একটা ছিল "ক্ষুদু মুলু কানমলা খায়", আর একটা ছিল কে কে বিড়ি খায় (অর্থাৎ সিগারেট খায়) ও তাদের নামের তালিকা। কানমলা অবশ্য ক্ষুদুরা কোনদিন খেত না, কারণ বাবা মা ছেলেমেয়েদের কখনও মারতেন না। মা যদি ক্ষুদুকে বলতেন, "তোমার মা হব না" তাহলেই ক্ষুদুর সব দুষ্টুমি থেমে যেত। "অমুক বাবু বিড়ি খান—আমি বিড়ি খাইনা। অমুক বাবু বিড়ি খান—আমি বিড়ি খাইনা। অমুক বাবুর মেয়েগুলি সব্বাই বিড়ি খায় —আমি বিড়ি খাই না"—এই ছিল ওদের দ্বিতীয় গান। বিড়ি খাওয়া ফর্দে যাদের নাম ছিল, তাঁদের নাম করলে বিপদ।

আমাদের সময় আমাদের ক্লাশে অন্তত সবাই প্রায় পুরুষ শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা কেউ চোগা চাপকান পরতেন, কেউ ধুতি চাদর, কেউ বা বিলাতি সুট। প্রধানত নীচের ক্লাশের জন্য কয়েকজন মহিলা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন; এঁরা প্রায় সকলেই পুরা লম্বা হাতের সাদা জামা আর সাদা শাড়ী পরতেন। ওঁর মধ্যে সেলাই এর শিক্ষয়িত্রী নগেন দিদি লেস দেওয়া ছোট হাত পরে সুসজ্জিতা ফিটফাট হয়ে আসতেন। পোষাকে প্রথম নিয়ম ভঙ্গ করলেন জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। তিনি ডুরে চোখুপী রঙ্গীন নানারকম শাড়ী পরেই আসতেন; অবশ্য তাঁর বয়সও খুব কম ছিল। বড় বড় গলার জামা পরতেন, কিন্তু নিজের মায়ের কাছে বকুনি খতেন সে জন্য। জ্যোতির্ময়ীকে আমরা চামীদি' বলতাম। তাঁর মা ছিলেন ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, চন্দ্রমুখীর মত এদেশের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। চামীদি আমাদের ম্যাট্রিক ক্লাশে ইংরাজী পড়াতেন। আমাদের এক মাষ্টারমশায় **Englands Work in India** পড়াতেন; তিনি বই খুলে কেবলি **underline** করতে বলতেন; **and, but thus, so,** ইত্যাদি কয়েকটা কথা ছাড়া সবই প্রায় **underline** করতে হত। ক্লাশের বাইরে আমরা যদি অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতাম, মাষ্টার মশায় তিতি বিরক্ত হয়ে উঠতেন, বলতেন, 'সখিত্ব করা হচ্ছে, জিহ্বা লক লক করছে!' ক্লাশের ভিতর **underline** করা ছাড়া আর একটা কথা তিনি বার বার বলতেন, কিছু বুঝিয়ে দেবার পর, **"do 'stand** মা **do 'stand ?"**

দ্বারিকবাবু বলে একজন মাষ্টার ছিলেন। সাদা চোগা চাপকান পরা, বেশ হাসিখুসী; তিনি বলতেন, "ইংরিজী যদি শিখতে চাও তো খবরের কাগজ পড়।" দুপুরে ঢং ঢং করে টিফিনের ঘন্টা পড়লেই বোর্ডিং-এর মেয়েরা মহোৎসাহে খেতে চলে যেত, আমরা শুকনো মুখে চাতালে ঘুরে বেড়াতাম। নীচের ক্লাশের অনেক মেয়েদের ঝি-চাকরেরা লুচি, তরকারি, দুধ নিয়ে আসত, মেয়েরা চাতালে উবু হয়ে বসে খেয়ে নিত। আমরা ঐ ভাবে খেতে লজ্জা পেতাম বলে কিছু খাওয়াই হত না। মাটির একটা বিরাট জালায় খাবার জল থাকত, যার দরকার সে ঝিয়ের কাছে জল চেয়ে নিত। একটা বাক্সওয়ালা আসত, চকলেট লজেন্স ইত্যাদি নিয়ে; কেউ কেউ তার কাছে ঐ সব কিনত। আমার মোটেই ভাল লাগত না। তারপর একদল মেয়ে ঝাঁক বেঁধে **skip** করতে শুরু করত, চুল দুলিয়ে দুলিয়ে; যে যত রকম কেরামতী জানে দেখাত। আমি ও বিদ্যাটা অর্জ্জন করিনি, তাছাড়া ঐ দলের চেয়ে আমরা ছিলাম একটু বড়।

আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন এক বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায়, ধপধপে সাদা ধুতি চাদর, পাঞ্জাবীও সেই রকম, ধপধপে সাদা জুতো পরতেন। তিনি কম কথাই বলতেন।

।কত্ত কর্ত্তব্য পালন করা যে প্রত্যেকের উচিত একথা প্রায়ই সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। তাঁর কাছে হিতোপদেশের 'মিত্রলাভ' 'সুহৃদভেদ' ইত্যাদি পড়তে বেশ ভাল লাগত। বাংলা প্রচুর পড়েছিলাম বলে সংস্কৃত গল্প বুঝতে কিছুই কষ্ট হত না। তাঁকে প্রণাম করলে পণ্ডিতমশায় বলতেন, "পুরুষদের পায়ে হাত দিয়ে মেয়েরা প্রণাম করে না।" পদ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের অল্প অল্প পড়তে হত। "তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়" পড়ে পড়ে হয়রাণ হবার জোগাড়। রামায়ণের একটা লাইন মাঝে মাঝে এখনও মনে পড়ে, "জ্যোৎস্না তুষার মলিনা সীতেব চাতপ-শ্যামা।" আমাদের বৃদ্ধ পণ্ডিতমশায় পেনসান নিয়ে চলে যাবার পর এক নূতন পণ্ডিতমশায় এলেন, সাধারণ বাঙালীদের মতই আধ ময়লা কাপড়-চোপড় পরে।

সীতা ইংরেজী বেশ ভাল লিখত, কারণ ছোট্ট বয়স থেকে সে অনেক ইংরেজী বই ও ম্যাগাজিনে ডুবে থাকত। স্কুলে একদিন নূতন পণ্ডিতমশায় তাকে একটা সংস্কৃত গল্প ইংরেজীতে অনুবাদ করতে দিলেন। খাতাটা লেখা হলে দেখে বললেন, "তুমি বই থেকে কপি করেছ।" সীতা তো রেগে আগুন, গিয়ে হেড মাষ্টারমশায়কে বলে দিল। তিনি বললেন, "নিজে লিখতে পারে না তাই ওরকম বলে। আমি তাকে বলব।"

আমাদের ড্রইংও শিখতে হত। এক মাষ্টারমশায় ছিলেন, তিনি প্রত্যহ এসেই আমাদের **straight line** টানতে বলতেন। মাঝে মাঝে "মডেল ড্রইং কর," বলে বড় বড় কাঠের **cube** ইত্যাদি এনে টুলের ওপর রাখতেন। আর পেনসিলটা কি করে চোখের সামনে লম্বা করে ধরে মাপ ও **angle** বুঝতে হয় শেখাতেন। তাঁর কাছে আঁকতে কিছু শিখিনি। এর পর এক সুট পরা ফিটফাট ড্রইং মাষ্টার এলেন। তিনি বেশ ভাল আঁকতে পারতেন। রঙীন ছবি আঁকতে দিয়ে নিজেই সযত্নে সবটা এঁকে দিতেন। তারপর আমাকে দিয়ে কালি-কলমে ছুটো বেড়াল আর হাতীর ছবি আঁকালেন। আমি ছবি আঁকতে পারছি দেখে মহা খুসী হ গেলাম। এর দশ বৎসর পরে নন্দলালবাবুর কা: সত্যি আঁকা শিখি।

স্কুল ছুটির ঘন্টা পড়লে যারা ফার্স্ট বাসে যা(তারা হুড়মুড় করে কলরব করতে করতে সৈদ্ আ রহিমের গাড়ীতে উঠে পড়ত। বাবা বলতেন "মানু গাড়ী চড়ে যায়, কিন্তু কোচম্যানকে কখনও দেখে না।" কথাটা সাধারণ ভাবে সত্য হলেও আমা' আজ পর্য্যন্ত সৈয়দ আর রহিমকে মনে আছে, রোগ' ফর্সা সৈদ্ আর মোটা কালো পান খাওয়া রহিম। আমরা প্রায়ই দ্বিতীয় দফায় যেতাম, সুতরাং নির্জন স্কুলের বারান্দায় পাইচারি করা ছাড়া কাজ থাকত না। বাড়ীর জন্য আর খাবার জন্য মনটা ব্যস্ত হত। তবু বেথুন কলেজটা ভারি ভালো লাগত। সমাজ পাড়ার মত গলির ভিতর গলি নয়। কেমন চওড়া রাস্তা বড় বড় খেলার মাঠ, দূরে হেদো পুকুর, আর সব চেয়ে সুন্দর চমৎকার লম্বা লম্বা সারি সারি দেবদারু গাছ—সবুজ পাতায় ঝলমল করত।

বেথুন কলেজে বছরে একবার করে পুরাতন ছাত্রীদের সমাগম হত। তখন অনেক নামকরা বিদুষী মহিলার দর্শন লাভ করেছি। চন্দ্রমুখী বসু ছিলেন প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট, তাঁকে একবারই মাত্র দেখেছি। পরে ইনি মোমগাই নামক একজন ভদ্রলোককে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর কন্যা বাসন্তী মোমগাই বেথুনে পড়তেন আমাদের চেয়ে উপরে। ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলীও প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। এঁদের কথাই কবি হেমচন্দ্র লিখেছিলেন—

"হরিণনয়না ওগো কাদম্বিনী বালা,
শুন চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা।"

কাদম্বিনী ব্রাহ্ম সমাজের কন্যা ও বধূ বলে তাঁকে আমরা অনেক বারই দেখেছি। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবাদিতে ও আমাদের বাড়ীতে আসতেন। সমাজ পাড়ার যে বাড়ীতে আমরা ছিলাম, সে বাড়ীতে

কাদম্বিনী বহু পূর্বে ছিলেন শুনেছি। কাদম্বিনী ভাল ডাক্তার ছিলেন এবং খুব কড়া কড়া কথা বলতেন, অপ্রিয় সত্য বলতে ভয় পেতেন না। নিজের ছেলে-মেয়েদেরও বাদ দিতেন না। কবি প্রিয়ম্বদা দেবীকেও বেথুন সম্মিলনীতে দেখেছি। শুভ্রবেশা সুন্দরী, কিন্তু তারই মধ্যে সুন্দর করে সাজতেন আর মিষ্টি মিষ্টি করে হেসে কথা বলতেন। তাঁর একমাত্র সন্তান তারাকুমার অকালে মা ও দিদিমাকে রেখে চলে গিয়েছিল। তারই নামে বোধ হয় ওর বাড়ীর নাম হয় "তারাবাস।" প্রিয়ম্বদা সহজেই মানুষের মন হরণ করতে পারতেন। তিনি সার্থক 'প্রিয়ম্বদা' ও মেয়েদের 'প্রিয়দি' ছিলেন। তাঁরা মা ও মেয়ে প্রসন্নময়ী ও প্রিয়ম্বদা অনেক সময়েই একসঙ্গে বেড়াতেন। দুজনেই শুভ্রবেশা ও সুন্দরী, বয়সে বোধ হয় বেশী তফাৎ ছিল না। স্যার রাজেন্দ্রের কন্যারাও বছরে একবার বেথুনে আসতেন। তাঁরা শাড়ী পরতেন, কিন্তু প্রসাধন খুব বিলিতী ভাবের। লেডি অবলা বসুও ছিলেন বেথুনের ছাত্রী। মনে হচ্ছে, তিনিও মাঝে মাঝে দেখা দিতেন ওখানে।

স্কুল থেকে আমরা যখন বাড়ী ফিরতাম প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যেত। এসে এক ভাঁড় চিনিপাতা দই খেতাম, তার নাম ছিল প্রাণকৃষ্ণবাবুর দই, কারণ ডাঃ প্রাণকৃষ্ণবাবুর একতলাতে দই-এর দোকানটা ছিল। দোকানের কেনা ঢাকাই পরোটা ছিল আমাদের একটা প্রিয় জলখাবার। তখন infectionকে ভয় পেতাম না। বাবা রাত জেগে পড়া পছন্দ করতেন না; কাজেই খাওয়া-দাওয়া পড়া-শুনা সেরে ন'টার মধ্যেই শোওয়া ছিল নিয়ম। শুয়ে শুয়ে দুই বোনের গল্পটা খুব জমত। কিন্তু বাবা আমাদের কণ্ঠস্বর বেশীক্ষণ শুনলেই বলতেন, "মাতারি রাত হয়েছে, ঘুমোও।" লণ্ঠনের আলোতে অল্প রাতকেই বেশী রাত মনে হত। অন্ধকার থাকত। আমরা গ্রীষ্মকালে অনেক সময় বারান্দায় মাদুর পেতে ঘুমোতাম। কারণ পাড়ার চারপাশে মহলানবিশ মশায় ছাড়া কারুর বাড়ীতে বিজলী বাতি ছিল না; দূরে ডাঃ নৃপেন্দ্র লাল মিত্রের বাড়ীতেও বিজলী বাতি জ্বলত, বাড়ীর মেয়েদের ঘোরাফেরা দূর থেকেই দেখা যেত। তারা আমাদের চেয়ে বেশী রাত জাগত।

বেথুন স্কুলের মাইনে ছিল দু টাকা মাত্র; বাস ভাড়া লাগত না। তবে নানা গলি ঘুরে ঘুরে মেয়ে তুলতে তুলতে ঘোড়াটানা বস্ যেত, কাজেই অনেকটা সময় অকারণেই গাড়ীতে কাটত। বাবা-মা'র ব্যবসায় ভাল করে না জেনে বেথুনে মেয়ে নেওয়া নিয়ম ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে ২।১টা ফাঁকি ধরা পড়ত না। আমাদের গাড়ীতে একটি সুসজ্জিতা মেয়ে আসত। সে একবার বলেছিল, "আমার মা কাল মুজরো করতে গিয়েছিল।" অনেক দিনের কথা ভাল মনে নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে মেয়েটিকে নিয়ে গোলমাল হয়েছিল।

কলকাতার অনেক গলি আমাদের চেনা হয়ে গিয়েছিল। শিবনারায়ণ দাসের লেন ছিল ভীষণ নোংরা, এখানে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন, তাঁর কন্যারা মাধবিকা ও সুলতিকা ছিলেন বেথুনের ছাত্রী। মুক্তারামবাবু স্ট্রীট ছিল একটা গোলকধাঁধা, কত বাঁক ঘুরে যে গাড়ী যেত তার ঠিক নেই।

সেকালে স্কুলের মেয়েদের কোনো ইউনিফরম ছিল না। আমরা প্রায়ই মিলের শাড়ী পরে স্কুলে যেতাম। অনেকে সব সময়ই তাঁতের শাড়ী পরে আসত, কিন্তু বেশীর ভাগ সাদা। সেকালে দুজন ব্রাহ্মমহিলা ছিলেন, তাঁরা পুঁটলি নিয়ে বাড়ী বাড়ী তাঁতের শাড়ী বিক্রী করতে যেতেন। আমরা কিনতাম কিছু কিছু। তাঁর ফরাসডাঙ্গার শাড়ী যাঁরা পরতেন তাঁরা তাঁদের আভিজাত্য সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন ছিলেন। একজন মহিলাকে আমরা বামাদিদি বলতাম। তিনি শেষ সময়ে বেশ কিছু টাকা বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজে দান করে গিয়েছিলেন। এদের শাড়ীগুলি তাঁতের কিন্তু নানা রকমারি ছিল না। স্কুলে মেয়েরা নানা রকম পোষাকেই আসত। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের বাড়ীর দুটি ছোট ছোট মেয়ে আসত,

ভারি সুন্দর দেখতে তারা। কিন্তু দুজনের সাজসজ্জা দু রকম। একটি মেয়ে মেমসাহেবের মত চুল কাটা, ফ্রক পরা, অন্যটির মাথায় খোঁপা, পায়ে মল, পরনে শাড়ী, দুজনের বয়সই ৭।৮ হবে। আর একজন দেশ বিখ্যাত ভদ্রলোকের বাড়ীর দুটি ছোট মেয়ে যেদিন প্রথম ভর্তি হল, সেদিন সুন্দর করে বড় খোঁপা বেঁধে ব্লাউজের উপর শুধু একখানা শাড়ী পরেই চলে এল। পরে মহিলা শিক্ষয়িত্রীরা বলে দিলেন শাড়ীর সঙ্গে পেটিকোট পরতে হবে। একজন ক্রীশ্চান শিক্ষয়িত্রী স্কার্ট ও ব্লাউজের উপর একটা আলাদা আঁচল কাঁধে ব্রাচ দিয়ে আটকে পরতেন। এইরকম পোষাক ব্রাহ্মসমাজের একজন মহিলাও বিলাতে পড়তেন, ছবিতে দেখেছি। আমরা যখন ম্যাট্রিকুলেশন দিই, তখন একটি সুবিখ্যাত বাঙালী বাড়ীর মেয়েও এই রকম স্কার্ট ব্লাউজ ও আঁচল পরে পরীক্ষা দিতে আসতেন।

আমাদের যুগে নাম করা ছাত্রী ছিলেন তটিনী গুপ্ত। ইনি হেডমাষ্টার শ্যামাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা। শুনতাম তটিনী পরীক্ষার সময় দিনে ১৮ ঘণ্টা পড়তেন। খাওয়া শোওয়া ইত্যাদির জন্য মাত্র ছয় ঘণ্টা হাতে থাকত। তটিনী ছাত্রী অবস্থায় অনেক সময়ই তাঁর মেসোমশায় ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে থাকতেন। স্কুলে তিনি বোধহয় ইংরেজী ছাড়া আর সব বিষয়েই প্রথম হতেন, সীতা হতেন ইংরেজীতে প্রথম ঐ ক্লাশে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তটিনী ছেলেমেয়ে সকলের মধ্যে প্রথম হন। I. A. ,B. A., M. A, তেও বোধহয় তাই। তাঁর কাছাকাছি হতেন সরোজকুমার দাস। সরোজকুমার দাসের সঙ্গে পরে তটিনীর বিবাহ হয়। তটিনী ছেলে বেলায় দুই একটা মজার পাগলামী ও করতেন। একবার মেয়েদের সঙ্গে বাজী রেখে এক শিশি কালী খেয়ে ফেলেছিলেন। আমাকে তিনি বরাবর ভালবাসতেন। শেষ সময়েও দেখা করতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তখন সবে বিদেশ থেকে কলকাতায় ফিরেছি, তটিনীর অসুখের কথা ভাল জানতাম না।

আমাদের স্কুলের মেয়েরা শাস্তিও পেত নানারকম সেকালে বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ানো ছিল একরকম শাস্তি। অপরাধ যদি গুরুতর হত, তাহলে হলের মাঝখানে একটা টুল এনে সারাদিন সেই মেয়েটিকে পর পর ওই টুলে দাঁড়াতে হত। এইভাবে দাঁড় করানো একবারই মাত্র দেখেছি। একবার একটি ম্যাট্রিক ক্লাশের মেয়েকে এক মাষ্টার বেঞ্চের উপর দাঁড়াতে বলছিলেন তাতে সে অপমানিত হয়ে এমন ঝগড়া করেছিল যে মাষ্টারই চুপ হয়ে গেলেন। ছোট মেয়েদের ভাগে মাঝে মাঝে কানমলাও জুটত। একজন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন ভারি রাগী—কিন্তু পিটপিটে। তিনি মেয়েদের কান মলবার সময় বোর্ডমোছা ঝাড়ন দিয়ে তাদের কান ধরতেন, পাছে তাঁর হাতে মেয়েদের কানের ময়লা লেগে যায়। ছোট মেয়েদের পড়া বলাবার সময় মাষ্টাররা এক একজনের দিকে পেনসিল দেখিয়ে "You" "You" বলতেন আর তারা পড়া বলত। একদিন একটি মেয়ে একটু অন্যমনস্ক ছিল, "you" বলা মাত্র পড়া বলে নি। তার পাশের মেয়েটি সজোরে চেঁচিয়ে বললে, "এই you, পড়া বল।" মাষ্টার মশায় চটে বেচারা পরোপকারী মেয়েটিকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলেন; কিন্তু সেকালের ছাত্রীরা এই সব শাস্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শেখেনি।

কোনো কোনো ছোট মেয়ে ছিল কোন কোন বড় মেয়ের উপাসিকা। তারা ফুল, চকোলেট ইত্যাদি পূজার অর্ঘ্য নিয়ে আসত, উপাসিতা যদি হাসি মুখে গ্রহণ করতেন তাহলে উপাসিকার আ-কর্ণ লাল হয়ে উঠত আনন্দে ও লজ্জায়।

তখন বৈদ্যুতিক যুগ ছিল না বললেই চলে। স্কুল ও কলেজের ঘরে বড় বড় টানা পাখা টাঙানো থাকত। পাখা কুলিরা সারা দুপুর পাখা টানত। বেচারীদের মাঝে মাঝে ঘুম পেত, তারা দড়ি ধরেই ঘুমিয়ে পড়ত। গরম লাগলে মাষ্টার মশায়রা হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে পড়ে পাখাটায় সজোরে একটা টান দিতেন। তার

ধাক্কায় কুলি বেচারী হুমড়ি খেয়ে আবার উঠে পড়ে পাখাটানা শুরু করত।

প্রথম যে বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা হয় সেই বৎসরই আমি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তার আগের বছর হয়েছিল এন্ট্রান্স পরীক্ষা। বেথুনে সব পরীক্ষারই সেন্টার ছিল। বাঙালী মেয়ে মেমসাহেব সবাই ওখানেই পরীক্ষা দিত। একবার লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্নসিংহের কন্যা রমলা বা কমলা পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছিলেন লোরেটো থেকে ডাঃ সরকার মহাশয়ের কন্যা নলিনী ও ভাগিনেয়ী সুরীতি। পরীক্ষা দিতে যাবার দিন বাবা আমাকে একটা নূতন জরি-পেড়ে শাড়ী কিনে দিলেন। পরীক্ষা দিতে খুব ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে একটা স্কলারশিপও পেলাম। যদি আগে থেকে সব বিষয় পড়া অভ্যাস থাকত, হয়ত আর একটু উপরে স্থান পেতাম।

সে বৎসর আমাদের ইংরেজীর প্রধান পরীক্ষক ছিলেন ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি পরে গবর্ণর হন। একদিন ডাঃ সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি বললেন, "মন্দ লেখনি। তবে অত লম্বা Essay যদি না লিখতে তাহলে ভুল কম হত।" আমার মনে পড়ল স্কুলে প্রথম ভর্ত্তি হওয়ার সময়ের কথা। গোড়ার দিকেই একদিন মাষ্টার মশায় একটা বিষয় নির্ব্বাচন করে বলেছিলেন, "এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লেখ।" আমি ভেবেই পেলাম না প্রবন্ধ আবার কি করে লিখতে হয়। অনেক ভেবে একপাতা লিখে নিয়ে গিয়ে দেখালাম। মাষ্টারমশায় খাতাটা হাতে করেই বললেন, "এত ছোট"। ঠিক করলাম যা থাকে কপালে, এর পর বড় বড় প্রবন্ধ লিখব। কিন্তু ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের কথায় মনে হল বড় লিখলেই সব হয় না। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

পরীক্ষার পর লম্বা ছুটি। ছুটিতে একটা নূতন আনন্দলাভ হল দার্জ্জিলিং ভ্রমণে। পাহাড়ে কখনও আগে যাইনি। প্রথম দেখার রোমাঞ্চ আজও মনে আছে। পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্র পরে আরও অনেক দেখেছি, পুলকিতও হয়েছি, কিন্তু নবীন চোখে প্রথম দেখা জিনিসটাই আলাদা। ট্রেন থেকে নেমে এক জায়গায় বাক্স এবং কুলির ধাক্কা খেতে খেতে জাহাজে চড়া, তার পর আবার সারা পার হলে, সিলিগুড়িতে খেলা ঘরের ট্রেনে চড়া। কি সে ট্রেনের গতি! মনে হত হেঁটেও তো আমি ওর চেয়ে জোরে যেতে পারি। তাও কি ছাই, একটানা চলে? কতবার যে থামে, কেন যে থামে বোঝাই যায় না। একটা পাহাড় পাক দিয়ে যদি ওঠে, আর একটা পাক দিয়ে খানিকটা নেমে আসে। পায়ের কাছে বিশাল বিশাল মহীরুহের জঙ্গল দেখবার মত, মোটা মোটা লম্বা লম্বা গাছে ঠাসা। তার ভিতর দিয়েই কোথা থেকে মেয়েরা পিঠে ঝুড়ি ঝুলিয়ে হাসি হাসি মুখে ফুল ফল মালা কত কি বিক্রি করতে আসছে। এ বন বাংলা দেশের শালবনের মত ছবি ছবি মাজাঘসা দেখতে নয়, ভয়াবহ গম্ভীর দেখতে। মেয়েগুলি কিন্তু সুন্দর, কোমরে একটা শাড়ী, বুকের জামার উপর আর একটা চাদর বাঁধা, মাথায় তৃতীয় শাল কি চাদর, গলায় শিকি আধুলির মালা। একদল আবার সতরঞ্চি পরে মুখে খয়েরের ঘন প্রলেপ দিয়ে বেড়ায়; দুটো আলাদা জাত বেশ বোঝা যায়।

একটু উঁচুতে উঠতেই ঘোর গ্রীষ্মের দিনেও শীতের কাঁপুনি, থেকে থেকে ট্রেনের মধ্যে মেঘ ভেসে ঢুকে আসছে, আবার চলে যাচ্ছে। পথে বিপথে ফার্ণ কত রকমের, ইচ্ছে করছে সব তুলে নি। শিশুকালে আমার বড় জ্যাঠামহাশয়ের কাছে এই রকম সব ফার্ণের পাতা বই এর ভিতর প্রতি পৃষ্ঠায় সাজানো পেয়েছিলাম।

এমনি করেই দার্জ্জিলিং পৌঁছালাম। সব আজ মনে নেই। মনে থাকলেও সব লিখতে গেলে দার্জ্জিলিংএর কথাতেই খাতা ভরে যাবে। তবে পাহাড়ের মাথা কেটে যেখান থেকে পাগলা ঝোরা নানা দিক দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে নেচে অসংখ্য জলধারায় ছুটে আসছে তাকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। পাহাড়ে ঝরণার সফেন নৃত্য এই আমাদের প্রথম দেখা।

আমাদের জন্য লাসা ভিলার একটি ছোট কুটির বা অংশ (ডেজি ব্যাঙ্ক) ভাড়া নেওয়া ছিল; কিন্তু আমরা প্রথম গিয়ে উঠলাম হেমমাসিমার (হেমলতা সরকার) বাড়ীতে। তখনকার দিনে আমাদের এদিকে অনেকেই তাই উঠত। হেমমাসিমার ছোট মেয়ে দুটি আমাদের পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেল। কি আদর, কি যত্ন! আমরা যখন ডেজি ব্যাঙ্কে চলে গেলাম তখন হেমমাসিমার ছোট মেয়ে দুটি রোজ সকাল বিকালে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। আমরা কাছাকাছি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি দেখলেই তারা দৌড়ে এসে বাবার দুই হাত ধরে হিড় হিড় করে বাড়ীর মধ্যে টেনে নিয়ে যেত। কিছুতেই আর কোথাও যেতে দেবে না। আমাদের আগেই বাবা কিছুদিন ওদের বাড়ীতে এসে ছিলেন কিনা।

হেমমাসিমা দার্জ্জিলিঙের অনেক রকম গল্প করতেন। ওদেশে তখন নাকি জিনিস বাইরে ফেলে রাখলেও কেউ চুরি করত না। পাহাড়ীরা চুরি করাকে ভয় করত। তাই আমাদের জিনিস পত্রের জন্য ভয় করতে বারণ করলেন। ওদেশের জাতিভেদের গল্পও করতেন। ওখানে ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করত বটে, কিন্তু সেই মেয়ের ছেলে বড় হলে আর নিজের মায়ের হাতে খেত না। এই রকম ব্রাহ্মণ পাচক একজন বোধ হয় আমাদের জন্য ঠিক করা হয়েছিল। মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে তাঁর ভুটিয়া মন্দির কিম্বা ক্যালকাটা রোডে বেড়াতে যেতেন। ক্যালকাটা রোডের পাশে বোধ হয় একটা বড় পাহাড় ধসে পড়েছিল একবার। তখন কি করে "নীল ক্যামেল" বাড়ীশুদ্ধ সবাই মারা যান তার গল্প ওঁর কাছে শুনি। তাদেরই নামে কলকাতায় "নীল মেমোরিয়াল" পরে হয়েছিল।

দার্জ্জিলিঙ ব্রাহ্ম সমাজ আগে বাজারের এত কাছে ছিল না বলতেন। ক্রমে বাজার এগিয়ে আসে। প্রতি রবিবার হেমমাসিমাই বেশীর ভাগ উপাসনা করতেন। খাতায় লিখে আনতেন তাঁর উপদেশ। গান করতেন অনেক সময় স্বর্গীয় পি, এন, বসুর কন্যারা। ব্রাহ্ম নন এমন অনেক লোকই সমাজে আসতেন। হেমমাসিমা মহারাণী স্কুল নামে ওখানে বাঙালী মেয়েদের একটা স্কুল করেছিলেন।

তখন স্বদেশী সিল্কের নানারকম কাপড় বিশেষ পাওয়া যেত না। আমরা ছোট মেয়ে হলেও বাবা আমাদের পরবার জন্য তসর ও গরদের শাড়ী কিনে দিয়েছিলেন। যদি কখনও সুতার শাড়ী পরে বেরোতাম, হেমমাসিমা ভীষণ বকতেন, বলতেন, "লোকে তোমাদের আয়া মনে করবে।" তিনি নিজে সর্ব্বদাই গরদের শাড়ী পরতেন বাইরে বেরোবার সময়।

ওখানে আমরা খুব বেড়াতাম বলে ভীষণ ক্ষিদে পেত। মা বাজার থেকে আসবার পরই আমরা ক্রীত খাদ্যের মধ্যে যতটা তৎক্ষণাৎ খাওয়া যায় তা খেয়ে নিতাম। ভাত খাবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতাম না।

আমাদের বাড়ী থেকে উপরে অনেক উঁচুতে জলা পাহাড়ে গোরাদের ক্যান্টনমেন্ট দেখা যেত, বাজনাও শোনা যেত। গোরারা অনেক সময় কার্টরোড পর্য্যন্ত নেমে আসত। তার চেয়ে নীচে বোধ হয় তাদের যাওয়া বারণ ছিল। মেয়েদের বিরক্ত করা গোরাদের অভ্যাস ছিল। অনেকেই তাদের খুব ভয় করত। কার্ট রোড দিয়ে যেতে যেতে উপরের রাস্তা দিয়ে গোরা নামতে দেখলে আমরা নীচের রাস্তায় তাড়াতাড়ি চলে যেতাম; যতক্ষণ না গোরারা অদৃশ্য হত ততক্ষণ নীচে দাঁড়িয়ে থাকতাম। একবার ওরা জনতিনেক দূর থেকে আমাদের রাস্তা আগলে ছিল, আমরা বুঝতে পেরে নীচের রাস্তায় একটা ভুটিয়ার ঘরের দরজায় গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।

কোন্ বছর মনে নেই, একবার হেমমাসিমার বাড়ীতে তাঁর বাবা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এসেছিলেন। আমরা তখন ওখানে। শাস্ত্রী মহাশয় মেসমেরাইজ করতে পারতেন। একবার করে দেখালেন। সব কথা মনে নেই, শুধু মনে আছে আমার চোখ বেঁধে দেওয়া

হয়েছিল। খানিক পরে শুনলাম সবাই হাততালি দিচ্ছে। আমার চোখ খুলে দেওয়া হল। আমি তখন পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসে আছি। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে দিয়ে তাই করিয়েছিলেন।

ম্যালে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে থাকা অথবা পার্শ্বোপবিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে গল্প করা চেষ্টারদের নিয়ম ছিল। আমরা কিন্তু বসে না থেকে খুব বেড়াতাম। বার্চ্চ হিল, ঘুম নানা দিকে চলে যেতাম। দাদা ত হেঁটে কার্সিয়াংও যখন তখন চলে যেতেন। নীলরতনবাবুর সঙ্গে কোনো একবছর আমরাও হেঁটে কার্সিয়াং গিয়েছিলাম। আমাদের মেজ জ্যাঠামশায় দার্জ্জিলিঙে জেলার ছিলেন। তাঁর বাড়ী অনেক নীচে, সেখানেও মাঝে মাঝে যেতাম। দেখতাম কয়েদীরা জেলের পোষাক পরে ও লোহার বালা পরে বাড়ীর মধ্যে কাজ করে বেড়াচ্ছে। ছোট শিশুদের কোলে নিয়েও বেড়াচ্ছে, কেউ তাদের ভয় করছে না।

দার্জ্জিলিঙে কোনো একবছর সীতার বেশ কিছুদিন ধরে জ্বর হত। ডাঃ বিপিন বিহারী সরকার মহাশয় দেখতেন। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করতেন "কি খেতে ইচ্ছা করে?" সীতা বলত, "রসগোল্লা, আমের অম্বল ইত্যাদি। ডাক্তার বলতেন "সে ত হতে পারে না।" আবার সেই পুরাতন শাগু বার্লি সীতা চটে যেত। ডাঃ নীলরতন সরকার মশায় তখন তাঁর Glen Eden এর বাড়ীতে ছিলেন। একদিন তাঁর বৌদি বেড়াতে এসে সীতাকে বললেন, "তুই একবার আমাদের ডাক্তারকে দেখা দেখি।" নীলরতনবাবুর ডাক পড়ল। সীতা আগের মতই আমের অম্বল খেতে চাইল। নীলরতনবাবু "আচ্ছা" বলে বাড়ী চলে গেলেন। খানিক পরে তাঁর বাড়ী থেকে একটা পাকা ল্যাংড়া আম এল। ডাক্তার বলে পাঠালেন, "এইটা দিয়ে অম্বল রেঁধে দেবেন।" সীতা ত মহা খুসী!" নীলরতনবাবুর ছেলেরও সে সময় জ্বর হয়েছিল। তাকে আমের অম্বল না দেওয়াতে সে বাবার উপর চটে গেল।

দার্জ্জিলিং বেড়িয়ে কলকাতায় ফিরে এসে কলেজে ভর্ত্তি হলাম। এবার আর দুইটাকা মাইনে নয়, তিন টাকা মাইনে। ঘরও আলাদা, মেয়ের সংখ্যাও বেশী। পূর্ব্ববঙ্গের একদল মেয়ে ও অন্যান্য স্কুলের মেয়ে নিয়ে প্রায় জন পনের কুড়ি মেয়ে হবে বোধ হয়। বেশীর ভাগ মেয়েই বোর্ডিংএ থাকত। আমরা কয়েকজন বাড়ী থেকে আসতাম। সত্যজিৎ রায়ের মা ঢাকা থেকে পাশ করে এখানে তাঁর মাসীর বাড়ী থেকে পড়তেন। তাঁর ডাক নাম ছিল টুলু। ভাল গান করতেন, তাঁর ছোট বোন কনক ত বিখ্যাত গায়িকা। এঁদের মাতুল কুলের অনেকেই গায়ক গায়িকা।

আমাদের কলেজে খুব ঘটা করে প্রাইজ হত, লাটসাহেব আসতেন, তাই লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। অবশ্য কার্ড না পেলে ঢোকা বারণ ছিল। বেথুনের কমিটিতে ঠাকুরবংশীয় একজন ছিলেন। তিনি প্রাইজের গানে সুন্দরী মেয়েদেরই শুধু নিতে চাইতেন। অথচ গায়িকা হলেই মানুষ সুন্দরী হয় না, কাজেই মহা-মুশকিল বেধে যেত। বেথুন স্কুল থেকে প্রথম হয়ে পাশ করে অনেক প্রাইজ পাওয়া যেত। তাই আমার ত প্রাইজে প্রাইজে টেবিল বোঝাই হয়ে গেল। লর্ড কার মাইকেলের হাতে প্রাইজ ও অভিনন্দন পেলাম। অবশ্য এটা গর্ব্বের বিষয় কিছুই নয়। লাটসাহেব হ্যাণ্ড সেক করলেন, সে কি মোটা হাত! ধরা যায় না, মনে হচ্ছিল বাঘের থাবা। টুলুর সঙ্গে লাটসাহেবের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। তিনি বললেন, "তোমরা একসঙ্গে পড়? একজন ছোট্ট আর একজন মস্ত বড় কেন?" টুলু দেখতে বেশ লম্বা চওড়া ছিলেন।

আমাদের বাল্যকালে ঝি রাঁধুনী ছাড়া অন্য মেয়েদের রাস্তায় হাঁটতে দেখতাম না, ট্রামেও প্রায় কোন মেয়ে চড়ত না। মেয়েরা স্কুলে যে বন্ধ বাসে যেত তার একটা মাত্র জানালা খোলা। কোনো কারণে গাড়ী অল্পক্ষণ পথে আটকে গেলে সেখানে পাড়ার ছেলেরা কৌতূহলে উন্মুখ হয়ে ভীড় করে দাঁড়াত। আমাদের সমাজ পাড়া থেকে বেথুন কলেজ বেশী দূরে নয় অথচ ছুটির পর গাড়ী পাবার জন্য ঘন্টা দুই স্কুলে বন্দী থাকতে হত। আমাদের পাড়ার অনেকগুলি মেয়ে

বেথুনে পড়ত। আমরা একদিন ঠিক করলাম সবাই মিলে হেঁটে বাড়ী ফিরব। আমাদের মধ্যে শান্তিময়ী দত্ত বোধহয় প্রধান ছিলেন। যাই হোক কলেজ স্কুল থেকে হেঁটে বাড়ী ফেরার বিষয়ে আমরা পথ প্রদর্শক বলে দাবী করতে পারি। সবাই মিলে বই খাতা নিয়ে রওনা হলাম। পথে বিস্মিত দর্শকেরা দাঁড়িয়ে গেল। কেউ কেউ আমাদের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কি করে যে নাম জানল জানি না। কেউ বা "একটা প্রার্থনা আছে" বলে কাছে এগিয়ে এল। এই সব উৎপাতের জন্ম আমরা হেঁটে ফেরার মতলবটা বেশীদিন রক্ষা করতে পারি নি।

আমাদের ছেলেবেলায় থিয়েটায় দেখা ব্রাহ্ম সমাজে মহাপাপ বলে গণিত হত। তাই আমরা কখনও **public theatre** এ অভিনয় দেখতে যাইনি। কিন্তু সমাজ পাড়ায় আমাদের বাড়ীর প্রায় গায়ে ছিল "সঙ্গীত সমাজ।" সেখানে অনেক অভিনয় হত। ছেলেরাই মেয়েদের ভূমিকায় নামতেন। পাড়ার বিপিন বিহারী রায় মহাশয়ের ছাদ থেকে ওদের ষ্টেজটা স্পষ্ট দেখা যেত। আমরা পাড়ার অনেক মেয়েরা মিলে সেখানে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনী" এবং বোধহয় দ্বিজেন্দ্রলালের "সাজাহান" অভিনয় দেখতাম রাত জেগে জেগে। দেখতে ভালই লাগত। তবে প্রেমাভিনয় হাস্যকর মনে হত। "দিগ্বিজয়"ও গিরিজায়া একটু অতিরিক্ত ঝগড়া করত।

পুরাকালে "স্বদেশী" মেলা বলে একটা মেলা পান্তির মাঠে মাঝে মাঝে হত। একবার স্বদেশী মেলায় গিয়ে শুনি সেখানে গহরজান নাম্নী বাঈজি এসেছেন। কৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয় ছিলেন দারুণ কড়া ব্রাহ্ম। তাঁর মেয়েরা খবরটা শুনেই পড়ি কি মরি করে মেলা ছেড়ে পালালেন। অগত্যা আমরাও দৌড় দিলাম, কি জানি গহরজানের দৃষ্টি লেগে যদি কোন পাপ হয়ে যায়।

এলাহাবাদেও কিন্তু আমরা মাসিমাদের বাড়ীর পাশের একটা বাঈনাচ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলাম সিঁড়ি থেকে উঁকি মেরে। সেখানে **Audience** সব পুরুষ মানুষ নর্তকী একলা স্ত্রীলোক।

আমরা যখন সমাজ পাড়ায় আসি তখন সেখানে গুরুচরণ মহলানবিশ, বিপিন বিহারী রায়, দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ এঁরা ছিলেন প্রাচীন বাসীন্দা। শাস্ত্রীমহাশয় ও থাকতেন, তাঁকে আলাদা ধরছি। প্রথম চারজনের ছিল নিজেদের বাড়ী। সাধনাশ্রমে নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কালীচন্দ্র ঘোষাল, বৃন্দপাণ্ডত মশায় এবং কিছুদিন পরে গুরুদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিও ছিলেন। এঁরা ব্রাহ্ম প্রচারক, তাই সাধন আশ্রমের বাড়ীতে থাকতেন। সাধন আশ্রমের একটা কাঠের দোতলা বাড়ীও ছিল। তাতে মহিলারা কেউ থাকতেন না। একলা পুরুষ মানুষই একজন থাকতেন। পাড়ার অন্য সব বাড়ীতেই একাধিক পরিবার ভাড়া নিয়ে থাকতেন। মহলানবিশ ও দেবীবাবুরা বসতবাড়ী ভাড়া দিতেন না। পাড়ার ছেলেরাও বাইরের কিছু কিছু ছেলে মন্দিরের প্রাঙ্গণে খেলা করত মহাকোলাহল করে। এখানেই সন্ধ্যার কাছাকাছি মেয়েরা গল্প করতে করতে বেড়াত। তখন সমাজ পাড়ায় ছেলের চেয়ে মেয়েই বেশী ছিল। সীতানাথবাবুর ছয় মেয়ে, ভবসিন্ধুবাবুরও পাঁচ ছয় মেয়ে, প্রবোধবাবুর ও চার মেয়ে। কাজেই ছেলেদের বল খেলা অনেকেই পছন্দ করতেন না; বল গিয়ে যখন কারুর ঘরে পড়ত কি জানালার কাঁচ ভেঙে দিত তখন একটা প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হত। দুচার দিন হয়ত ছেলেরা একটু থামত, কিন্তু দুদিন বাদেই আবার যে কে সেই। বাবার ঘরে প্রায়ই ফুটবল এসে পড়ত, কিন্তু বাবা কখনও ছেলেদের তাতে কিছু বলতেন না। বাইরের যে সব ছেলেরা খেলতে আসত তার মধ্যে একজন ছিল ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের পুত্র **Harry** কেশব ঘোষ।

দেবীপ্রসন্নবাবুর নিজের ছেলে-মেয়ে ছিল মাত্র দু'জন; কিন্তু তাঁর বাড়ীতে অনেক আশ্রিত ও পালিত ছেলে-মেয়ের বাসস্থান ছিল। তারা অনেকেই পড়া-

শুনা করত, কোনো কোনো মেয়ের ওখান থেকেই বিয়ে হয়ে যেত। এর উপর ঐ বাড়ীতেই ছিল তাঁর "নব্যভারত" কাগজের প্রেস ও অফিস। অবশ্য আমার বাবারও দু'টো কাগজ ছিল, তখন কিন্তু তাঁর নিজের প্রেস হয়নি। দেবীপ্রসন্নবাবুর বাড়ীতে মাঘ মাসে নিজেদের একটা বিশেষ উৎসব হত। লোকডাকা, খাওয়ানো, ঘর সাজানো সবই হত বেশ ভাল করে। অনেক রকম কাজ তিনি স্বহস্তেই করতেন। তবে আমার যতটা মনে পড়ে ভদ্রলোক মিশুক ছিলেন না বিশেষ, অনেকের কড়া কড়া সমালোচনা করতেন।

বাবা যখন অল্প বয়সে কলকাতায় ছিলেন, তখন **Indian Messenger**, তত্ত্বকৌমুদী, বিশেষত "দাসাশ্রম" ও "দাসীর" সঙ্গে খুব জড়িত ছিলেন। "দাসাশ্রমের" তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট এবং "দাসী" পত্রিকার সম্পাদক। অনেক সময় "দাসীর" সব লেখাই বাবাকে লিখতে হত, "দাসাশ্রমে"র সাহায্যের জন্যও তাঁর পক্ষে মোটা টাকাই দিতে হত। ইন্দুভূষণ রায় ছিলেন একজন "দাস"। কিন্তু সে সব যুগ আমার স্মৃতির বাইরে।

এলাহাবাদে দেখেছি বাবা "প্রদীপ" এবং "প্রবাসী" নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, কলেজের কাজের উপর। "প্রদীপ' সম্বন্ধে বেশী কথা মনে নেই, "প্রবাসী"ই ভাল মনে পড়ে। কলেজের চাকরী ছেড়ে দেবার পর "প্রবাসীর" সঙ্গে "মডার্ণ রিভিউ" যুক্ত হল।

আবার যখন কলকাতায় এলেন তখন এই দুইটি কাগজই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। তার সঙ্গে ভাল ভাল বই পাবলিশ করাও চলতে লাগল এবং তা ছাড়া ছিল ব্রাহ্মসমাজের কাজ। তার তিনি প্রেসিডেন্ট পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রেসটা বাবাই ভাল করে গড়ে তোলেন। নিজের কাগজে কড়া কথা লিখতেন বলে কলকাতা আসবার পরও তাঁর পিছনে পুলিশ সারাক্ষণ লেগে থাকত। এলাহাবাদের চেয়ে এইখানেই বেশী সজাগ ছিল তারা। চিঠি খোলা, গোয়েন্দা লাগানো নানা রকম জ্বালাতন চলত।

সাধারণ সমাজের মন্দিরে উপাসনার জন্য আগে বাঁধানো বেদী ছিল। তারপর ঠিক হয় ঐ বেদীটা ভেঙে ফেলে কাঠের বেদী তৈরী করা হবে, যা নাড়া-চাড়া এবং খোলা যায়। কিন্তু তাতার কথায় নবীন পন্থী ও প্রাচীন পন্থীদের মধ্যে প্রায় কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। ঐ বেদীতে কত কত সাধক বসেছেন; সেটা ভেঙে ফেলায় মত মহাপাপ প্রাচীন পন্থীরা ভাবতেই পারতেন না। খুব সম্ভব মহর্ষিও ঐ বেদীতে বসে ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে প্রাচীনদের মধ্যে দেবী-প্রসন্নবাবু, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন বেদী ভাঙা হল তখন তাঁরা মন্দিরের ভিতরে দাঁড়িয়ে ভীষণ তর্জন গর্জন করছিলেন। কিন্তু বাধা দিতে পারলেন না।

ব্রাহ্মসমাজের বেদী ভাঙা, রবীন্দ্রনাথকে অনারারী সভ্য করা এবং ব্রাহ্মগণ হিন্দু কিনা এই সব নিয়ে সমাজে প্রায়ই তর্কবিতর্ক ও রীতিমত ঝগড়াঝাটি লেগে যেত। অধিকাংশ স্থলেই বাবা ছিলেন যুবকদের পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ "ঘরে বাইরে" লিখেছিলেন, এটা ছিল তাঁর একটা অপরাধ বা অযোগ্যতা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যুবকদের এবং বাবার চেষ্টায় তাঁকে অনারারী মেম্বার করা হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রীর মত বাবাও নিজেকে "হিন্দুব্রাহ্ম" মনে করতেন এবং সেই কারণেই আমার বিবাহের সময় আমি যখন "আমি হিন্দু নই" বলে রেজিস্ট্রী করতে চাইনি, বাবা তখন আমাকে সমর্থন করে ছিলেন।

ক্রমশঃ

সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যনারায়ণ

গোপাল চাউলে

সুপ্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে নানাভাবে সূর্যদেবের পূজা প্রচলিত। বৈদিকযুগে সূর্যকে পূষণ, ভাগ, মিত্র আর্যামান এক বিষ্ণুরূপে কল্পনা করা হয়েছিল। পরবর্তী বৈদিকযুগেও সূর্য প্রধান আত্মা ও জগৎস্রষ্টারূপে পরিচিত। খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই উত্তর ভারতে সূর্যপূজার প্রচলন বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রানুশাসন এবং মুদ্রা থেকেও আমরা জানতে পারি যে প্রাচীন কালে বহু রাজা এবং রাজবংশই সূর্যদেবের উপাসক ছিলেন। এই পর্যায়ে বল্লভীরাজ ধারাপাট এবং পুষ্যভূতিরাজ রাজ্যবর্দ্ধনের নাম উল্লেখ করতে পারি। এই সকল রাজাদের মধ্য অনেকেই পরম আদিত্যভক্ত উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়াও নানান প্রতীক চিহ্নের দ্বারাও সূর্যপূজা ও সূর্যদেবকে কল্পনা করা হয়েছিল, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গেছে বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন ভারতীয় পাঞ্চমার্ক মুদ্রা থেকে। উত্তর ভারতের পাঞ্চাল দেশের মিত্ররাজাদের নাম এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উত্তর ভারতে সূর্য্যমূর্ত্তির ভাবধারা এসেছিল পূর্ব্ব ইরান থেকে, তাই পূর্ব্ব ইরানের সূর্য্যদেবতার অনুকরণে উত্তর ভারতের সূর্য্যদেবকেও বুটজুতা পরিহিত দেখা যায়। বর্ত্তমান মুলতানের চন্দ্রভাগা নদীতীরে একদা এক সুবৃহৎ সূর্যমন্দির ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এবং আরবদেশীয় ভৌগোলিক অলইকারিশ ও আবুইষাকের বিবরণে ইহার উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে নির্ম্মিত একাধিক সূর্য্যমন্দিরের অস্তিত্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে আজও বিদ্যমান, এইগুলি হল যথাক্রমে কোনারকে, আজমীরে, গুজরাটের মোঢেরায় এবং দক্ষিণভারতে।

দক্ষিণ ভারতেও মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে সূর্যপূজার প্রচলন হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্নস্থানে প্রাপ্ত সূর্যমূর্ত্তি থেকে। দক্ষিণ ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সূর্য্যমূর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে গুডিমল্লমে পরশুরামেশ্বর মন্দিরে। এই মন্দিরটি আনুমানিক খ্রীষ্টিয় ৭ম শতাব্দীর। দক্ষিণ ভারতের সূর্যমূর্ত্তিগুলি উত্তর ভারতের তুলনায় কিছুটা স্বাতন্ত্রপূর্ণ। প্রধা[ন] এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ হল সূর্যমূর্ত্তিগুলিতে কোনরকম পাদুকা না থাকা।

সাধারণত সূর্য্যমূর্ত্তিতে দেখা যায় সূর্য্যের দুই হাতে প্রস্ফুটিত পদ্মফুল, সমপদস্থানক মুদ্রায় রথের উপর দণ্ডায়মান, পদতলে অর্দ্ধমারব অরুণরথের সারথি এবং তাহার ঠিক নিচেই তিনটি অথবা সাত অশ্ব। সূর্য্যের উভয় পার্শ্বে উষা ও প্রত্যুষা নামে দুই শরনিক্ষেপরতা নারীমূর্ত্তি, শরনিক্ষেপ করে অন্ধকাররূপ দানবকে বিতাড়িত করার কাজে নিযুক্ত। দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা উত্তর ভারতের সূর্য্যমূর্ত্তিতে একাধিক পার্শ্বদেবতাকেও দেখা যায়, এরা হল যথাক্রমে দণ্ডি কুণ্ডি (পিঙ্গল), সূর্যের চারিপুত্র, দুই স্ত্রী, য[ম] রেবন্ত মনু ইত্যাদি উদাহরণস্বরূপ কিচিং এর সু[র্য]মূর্ত্তিটি উল্লেখযোগ্য। ইহাছাড়াও কলিকা[তা] বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষি[ত] পালযুগের একাধিক সূর্যমূর্ত্তিতেও ঐ সমস্ত পা[র্শ্ব]দেবতাকে দেখা যায়।

শুধু হিন্দুধর্ম্মীয় দেবদেবী কেন, অহিন্দু দেবদেবী সঙ্গেও সূর্যকে দেখা গেছে বৌদ্ধ গয়ার প্রাচীন শি[লা] প্রাকারে এক পশ্চিম ভারতের ভাজার বৌদ্ধগুহা[য়]। খৃষ্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকের সূর্য্যমূর্ত্তিতে যে বৈদেশি[ক] প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল তার প্রম[াণ] পাওয়া যায় মথুরা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত কুষাণযুগে[র] একটি সূর্যমূর্ত্তি থেকে। বুটজুতো পরিহিত, হা[তে] উন্মুক্ত কৃপাণ পরনে কুষান লম্বা কোট ও পায়জাম[া]

গুপ্তযুগ থেকেই সাধারণত সূর্য্যমূর্ত্তি থেকেবৈদেশিক প্রভাব ক্রমশ ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে।

ভারতীয় ধর্ম্ম তথা সংস্কৃতিতে একাধিক দেবতাকে একই সঙ্গে কল্পনা ও পূজা করার রীতিটিও বহুকাল যাবৎ প্রচলিত। এই প্রসঙ্গে আমরা পঞ্চায়তন পূজার কথা স্মরণ করতে পারি। এই পূজায় একইসঙ্গে পাঁচটি প্রধান প্রধান দেবদেবীর পূজা করা হত। তবে এক দেবতাকে আর এক দেবতা অপেক্ষা পৃথক করে চেনার জন্য বিভিন্নরকম পাথর ব্যবহার করা হত। যেমন লাল পাথর গণেশ, সাদা পাথর শিব, কাল বিষ্ণু, একটুকরা ধাতু দ্বারা পার্ব্বতী এবং একটুকরা স্ফটিক দ্বারা সূর্য্যকে বোঝান হত। এছাড়া হিন্দুধর্ম্মের উপর বৈদেশিক প্রভাব, শাক্ত, বৈষ্ণব তথা শৈব প্রমুখ উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ প্রভৃতিই একদা একের মধ্যে একাধিক দেবতার মূর্ত্তিনির্ম্মাণে ভারতীয়দের অনুপ্রাণিত করেছিল। যেমন অর্দ্ধ-নারীশ্বর, শিবলোকেশ্বর, হরিহর ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে দক্ষিণভারতে, বিশেষ করে মহীশুর রাজ্যে মধ্যযুগে হোয়সাল রাজাদের দ্বারা নির্ম্মিত প্রায় অধিকাংশ মন্দিরেই একাধিক সূর্য্যমূর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, মুখ্যদেবতা শিব, বিষ্ণুর সঙ্গে একই মন্দিরের বিভিন্ন গর্ভগৃহে সূর্য্যকেও পূজা করা হত। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বর্ত্তমান হালেবিডের ৩ মাইল পূর্ব্বে চ্যাট চ্যাট হাল্লি নামক গ্রামের চেটেশ্বর মন্দিরটিতে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে নির্ম্মিত, এই ত্রিকূটাচল মন্দিরটির ৩টি গর্ভগৃহে যথাক্রমে শিব, সূর্য্য ও বিষ্ণু মূর্ত্তি আজও শোভা পাচ্ছে।

এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল সূর্য্যনারায়ণের মূর্ত্তি। হোয়সাল ভাস্কর্য্যে সূর্য্যের স্বাতন্ত্র্য মূর্ত্তি ছাড়াও ঠিক হরি-হর মূর্ত্তির অনুকরণে সূর্য্য ও নারায়ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যনারায়ণের মূর্ত্তিটিও সার্থক সৃষ্টি। একই মূর্ত্তির মধ্যে সূর্য্য ও নারায়ণের এই অদ্ভুত সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে বেলুড়ের চেন্নাকেশবমন্দিরের সূর্য্যনারায়ণ, হালেবিডের হোয়-সালেশ্বর মন্দিরের সূর্য্যনারায়ণ এবং নুগেহালির আদিত্য মূর্ত্তির সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। এই মূর্ত্তিগুলি আকারে অন্যমূর্ত্তিগুলি অপেক্ষা বেশ ছোট এবং মন্দিরের গাত্রে এমন স্থানে অবস্থিত যাহা সচরাচর দর্শকের দৃষ্টি-গোচর হয় না। বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে তবেই এইগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

বেলুড়ের সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তিটি চেন্নাকেশব মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে অবস্থিত। মূর্ত্তিটি দুই হস্তবিশিষ্ট এক সপ্তাশ্ববাহিত রথের উপর দণ্ডায়মান, পদতলে অরুণদেব রথের সারথি। নুগেহালির আদিত্য মূর্ত্তিটি চতুর্হস্তবিশিষ্ট। সম্মুখের দক্ষিণ ও বামহস্তে পদ্ম এবং পশ্চাতের দক্ষিণ ও বামহস্তে যথাক্রমে চক্র ও শঙ্খ এবং পদতলে অরুণ ও সপ্তাশ্ব।

হালবিডের হোয়সালেশ্বর মন্দিরের উত্তর দিকে রথাকৃতি যে দ্বিতল মন্দিরটি মূল মন্দিরের গর্ভগৃহের সহিত সংযুক্ত, উহার পূর্ব্বদিকের দেওয়ালগাত্রে এই সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তিটি অবস্থিত। মূর্ত্তিগাত্রের (iconography) দিক থেকে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূর্ত্তিটি উচ্চতায় মাত্র আড়াই থেকে তিনফুট, চতুর্হস্তবিশিষ্ট সম্মুখের দুইহস্তে দুইটি পদ্ম, পশ্চাতের দুইহস্তে চক্র ও শঙ্খ। সূর্য্যদেব রথের উপর দণ্ডায়মান। পদতলে সারথি অরুণ এবং তাহার নীচেই সাতটি বলিষ্ঠ অশ্ব মূর্ত্তিটির দুই পার্শ্বে শ্রীদেবী ও ভূদেবী এবং উহাদের দুই পার্শ্বে যথাক্রমে ঊষা ও প্রত্যূষা। হোয়সাল-ভাস্কর্য্যে প্রচলিত সমস্তরকম অলঙ্কার দ্বারা মূর্ত্তিটি সুসজ্জিত এমন সুন্দর সূর্য্যনারায়ণ মূর্ত্তি সত্যই বিরল। আশাকরি এই প্রবন্ধটি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি ছাত্রছাত্রী তথা বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর বিশেষ উপকারে আসবে।

গ্রাম বাংলার পাঁচালী

মৃণালকান্তি দত্ত

১০ নং ফর্মের কথা শুনেছেন? আপনি যদি এমন কোন পরিবারে জন্মে থাকেন যাদের Landed gentry বলে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে বর্তমানে আপনিও একটি চিহ্নিত ব্যক্তি। ভূমিসংস্কার আইন অনুযায়ী ১০নং ফর্মে বিশেষ তারিখের মধ্যে বিবরণী পেশ করতে হবে। এর আগে গেল জমিদারী উচ্ছেদ, এবার বুঝি সংস্কারমুক্ত পুরুষ হয়ে মুক্তকচ্ছ অবস্থায় আপনি ইতি-উতি সঞ্চারমান হবেন। তা হোক, অনেক তো ভোগ (কিংবা দুর্ভোগ) করেছেন আর কেন? হয়তো ভাবছেন এই ১০-নং ফর্ম আবার কত কি ঢেকে দেবে, চিরদিনের জন্য কত কি ভুলিয়ে যাবে।

মিশর দেশে কোথায় কি এক বিরাট জলাধার তৈরী হল, ইজিপ্টোলজিস্টরা সারা দুনিয়া জুড়ে কতো কাঁদলেন। হায়, হায় কতো পুরাতত্ত্ব, ইতিবৃত্ত জলের তলায় চলে গেল! তা যাক, তবু ঐ জল দিয়ে মরুভূমিতে ফসল ফলবে, তুলোর গাছ বড় হবে, তাই বেচে বারুদ কিনবে, জঙ্গী উড়োজাহাজ কিনবে, ঐ ডাটি-জুওলোকে সায়েস্তা করবে। আমাদের নাগার্জুনসাগরের কথা ভাবুন যা ঢেকে দিয়ে গেল কত পুণ্যতনীকে। আপনার বুকটা যদি টনটন করে তাহলে বলব "হে তৃতীয় পাণ্ডব, এই হৃদয়দৌর্বল্য পরিহার কর। ঐ ড্যামের জল দিয়ে এ্যারসা ধান গম ইত্যাদি জন্মাবে যে তখন চতুর্থ সন্তানকে আর অবাঞ্ছিত মনে হবে না। জমিদারী উচ্ছেদ তেমনি অনেক কিছু ঢেকে দিয়ে গেছে; ১০ নং ফর্ম বুঝি আরো কিছু, অন্য কিছু ঢেকে দিয়ে যাবে। আমি অন্ততঃ জানি ফটিকের মেজো কাকার দল ঢেকে গেছে, ওরা আর উঠবে না।

ফটিকের মেজ কাকাকে আমি প্রথম দেখি ১৯৪৩-সালে। দুপুর বেলা ফটিকের কাকীমা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে নিজের হাতে পোস্ত বাটছিলেন। রাঢ়দেশের মেয়ে ছিলেন তিনি, পোস্ত তাঁর চাই-ই। ঐ ভর্তি দুপুরে মেজকাকা ফিরলেন, সঙ্গে তার ছায়ার মত ভ্রাতুষ্পুত্র ফটিক—হিরো এবং হিরো ওয়ারসিপার। ডি,বি,বি এল খানা কাঁধে নিয়ে কয়েকটা রক্তাক্ত মরাল পাখী হাতে ঝুলিয়ে ফটিকের মেজকাকা এবং ফটিক মহারাজ বাড়ীতে ঢুকলেন। মেজকাকীর বাটনাবাঁটা শেষ হয়নি। মাথার কাপড় সরে গেছে! ফটিককে বললেন "মাথার কাপড়টা চড়িয়ে দেতো আমার দুহাত জোড়া! ফটিক তাই করে দিলো; তারপর কি মনে করে মেজকাকী ঐ পোস্তমাখা হাত দিয়েই ফটিককে কাছে টেনে গালে একটা চুমু খেলেন। ফটিকের আদুল গায়ে পোস্ত বাঁটা লেগে গেল। তা যাক।

এবার দেখা যাক এই Idle rich মেজকাকা কি করছেন। কোথাকার কি রাস্তা মেরামতির জন্য ডিস্ট্রিক-বোর্ডে জরুরি একটা চিঠি পাঠাতে হবে। মিলিটারী লরি চাপা পড়ে কে মারা গেছে। তার বিধবার আবেদনটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আছে। ঠাকুরদার প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুলের তিনিই প্রানপুরুষ। তিনজন শিক্ষক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। সেখানে একবার যেতেই হবে।

লুঙ্গিপরা একমুখ দাড়ি একটি মুসলমান যুবক বগলে পুঁটুলি নিয়ে বাহির বাড়ীর দোরে উঠলেন। ভদ্রলোক মুসলমান নন, ঐ বেশে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছেন ৪২ সালের আগষ্টের পর থেকে। নাম চিন্ময় মৈত্র। চিন্ময়বাবুর সঙ্গে স্নানাহার করে মেজকাকা রামলাল বিদ্যামন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন। যাবার পথে খোঁজ নিয়ে অনাদির বড় ছেলেটার টাইফয়েড কি অবস্থায় আছে।

পথে দেখা দ'রোগা প্রিয় সান্যালের সঙ্গে। দারোগা বাবুর সাইকেল থেকে নেমে নমস্কার টমস্কার করলেন। "হেঁ, হেঁ, হেঁ. বুঝলেন তো স্যার। ভাবতেছি কাল সকালে একবার আপনার বাড়ী যাব। উপরওয়ালা খবর দিচ্ছে—চিন্ময়বাবু নাকি; বুঝছেনই তো স্যার, আমাগো তো চাকরী। চলি স্যার, কাল নটায় যাব। দারোগাবাবু গেলেন। মেজকাকা ভাবলেন চিন্ময়কে কাল কোথাও পাঠাতে হবে। দারোগা লোকটি ভাল।

রামলাল বিদ্যামন্দিরের সেক্রেটারী মেজকাকা ঠিক করলেন, দশমশ্রেণীর ছেলেদের ইংরাজীর বড় ক্ষতি হচ্ছে। ইংরাজীর দুজন মাষ্টারমশাই ম্যালেরিয়ার কবলে। অতঃপর মেজকাকাকে দশমশ্রেণীর ইংরাজী ক্লাশে দেখা গেল। মেজকাকা কবিতা পড়াচ্ছেন Poplars are felled, Farewell :to the cool colonnade পপলার গুলির পাতন ঘটল, সুস্নিগ্ধ ছায়াঘন বীথিকাকে বিদায় জানাই। মেজকাকা কবিতা পড়াচ্ছেন পঁয়তাল্লিশটা কিশোর মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে। প্রাণচঞ্চল ৪৫টা ছেলে ফুটবল ভুলে গেছে, ঝগড়া ভুলে গেছে, সব ভুলে গেছে—যেন সাপুড়ের বাঁশী শুনে স্তব্ধ।

আজ ভাবছি পপলারগুলো কেটে সেখানে কি করা হয়েছিল? vine-yard দ্রাক্ষাকুঞ্জ, ক্রিকেট মাঠ কিংবা শুঁড়িখানা। যা কেটে ফেলা, ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে ভবিষ্যতে সেখানে কি গড়বে? এই বাংলা দেশেই দেখেছি আম্রকুঞ্জ উৎপাটিত করে সেখানে তাঁবু ফেলে বায়োস্কোপ চলছে। হিন্দি ছবি চলছিল নাম "মুঝে জিনে দো"। সহযাত্রী বলেছিলেন অনুবাদ করলে ওটার মানে দাঁড়ায়—আমাকেও বাঁচতে দাও।

ভাগীরথীর বন্যায় এক ঘূর্ণি থেকে একজনকে উদ্ধার করতে গিয়ে ঐ দীর্ঘদেহী সুপুরুষ মেজবাবু প্রাণ হারান।

ফটিকের সঙ্গে যখন আমার শেষবার দেখা হয় তখন সে চিরিমিরির কাছে এক কোলিয়ারীতে কয়লার টাবের হিসাব রাখার কাজ করছিল। মেজকাকীর খবর নিতে ভয় হয়েছিল, তাই জিজ্ঞাসা করিনি তিনি কেমন আছেন, কোথায় আছেন, আছেন কি না।

বরণীয় মানুষ ও স্মরণীয় মুহূর্ত

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

জে. সি ওয়েন্স জগতের এক অমর নাম। আমাদের নিপীড়িত নিগ্রো সমাজের এক অতি দরিদ্র পরিবারের ছেলে এই জে. সি ওয়েন্স।

১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে এই নিগ্রোবীর চারটি স্বর্ণ পদক জয়লাভ করে নিজেকে বিশ্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি প্রতিযোগিতা করেছিলেন ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড় রিলে রেস (৪ × ১০০ মিটার) এবং লং জাম্প। প্রতিটি বিষয়ে তিনি রেকর্ড করে বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ লাভ করেন। তার লং জাম্পের বিশ্বরেকর্ড দীর্ঘ তিন দশক পর্য্যন্ত অম্লান ছিল।

ওয়েন্স একই দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পরপর তিনটি স্বর্ণ-পদক লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। কিন্তু কোন পদকটির জন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হয়েছিলেন সেটি বোধ হয় অনেকেই জানেন না।

ওয়েন্সের নিজস্ব বিভাগ ছিল স্বল্পপাল্লার দৌড়। ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে সমগ্র বিশ্বই তখন তাকে সাম্ভাব্য বিজয়ীর তালিকায় স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু ১০০ মিটার দৌড়ে তাকে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রতিযোগিতায় ওয়েন্সকে এমন এক প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় যিনি প্রায় তার তুল্যই দৌড়বীর ছিলেন। ইনি ছিলেন জার্ম্মানীর প্রখ্যাত নামা দৌড়বীর R, H, Metcalf (আর, এইচ, মেটকাফ) ইতিপূর্ব্বে তিনি যতবার ওয়েন্সকে হারিয়েছেন ঠিক ততবারই ওয়েন্স মেটকাফকে হারিয়েছেন। সুতরাং এ দিনটি ছিল একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিন। তাই এই বিভাগে জয়লাভ করে ওয়েন্স সত্যসত্যই খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। এরপর ২০০ মিটার ও রিলে রেসে জয়লাভ করে মাত্রাতিরিং আনন্দে উত্তেজিত হলেও কিন্তু ওয়েন্সের সর্ব্বাপেং আনন্দের কারণ ছিল লং জাম্পে বিজয়ীর সম্মান লাভ

অলিম্পিকে যোগদানের মাত্র কিছুকাল আগে স্বদে ইন্টার স্কুল প্রতিযোগিতায় লং জাম্পে জয় লাভ ক তিনি এবিষয়ে উৎসাহী হন। সুতরাং এ বিষয়ে তঁ অভিজ্ঞতা ছিল অল্প। আর স্বল্প অভিজ্ঞতা সত্বেও ত অলিম্পিকের বিশ্বরেকর্ড দীর্ঘ তিন দশক পর্য্যন্ত অম্লা ছিল। কিন্তু ঐখানেই তার সব নয়। তার সীমাহী আনন্দের কারণ এই যে তিনি তার অবহেলিত জাতে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখে এসেছিলেন এমন একটি স্থানে এমন একটি প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে যেখানে দর্শকদে মিলিত বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং দাম্ভিকতা তাকে এ প্রতিযোগিতার পূর্ব্বে অসম্ভব বিচলিত করে তুলেছিল

বার্লিন অলিম্পিকের এই প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণ ওয়েন্সকে অসম্ভব ব্যাঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্যে তার সাফলে সোপান তৈরী করতে হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের এ অবহেলা নিগ্রো ওয়েন্সের প্রাণে খুবই বেজেছিল।

এই রকম পরিস্থিতিতে একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে যাঁর দেশ ও সমাজের সম্মানে দর্শা ওয়েন্স সত্যসত্যই আনন্দে দিশেহারা হন। অ খেলোয়াড়ী মনোভাবের আদান প্রদানে পরাজি প্রতিদ্বন্দ্বী ও দর্শকদের নিকট বন্ধুত্বসুলভ মনোভাবে উন্মেষ দেখে সে-দিন তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে যান

লং জাম্পের এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেদি প্রতিযোগিতা করছিলেন দুইজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। আ নিরাশার মধ্যে দুই প্রতিযোগীর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী চলেছে তখন। লক্ষলোক সমাগত—ষ্টেডিয়াম তখন স্থির করতে পারছেনা না কে হবে জয়ী—যুক্তরাষ্ট্রে ওয়েন্স অথবা জার্ম্মান প্রতিনিধি লং?

অনিশ্চয়তার মধ্যে এবং দ্বিধাশঙ্কিত চিত্তে দুই প্রতিযোগির মধ্যে চলেছে তখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতা। হঠাৎ একি! জার্মানীর লং লাফের পর মাটিতে শুয়ে ছটফট করছেন কেন? জানা গেলে অতিরিক্ত পরিশ্রমে পায়ের পেশী সংকোচনের ফলে তার এই অবস্থা।

এই দৃশ্যদেখে সমস্ত ষ্টেডিয়াম তখন দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে উঠেছে। সকলেই তখন চিন্তা করছেন "যাঃ এই যুবকই তবে বিশ্বজয়ী কৃষ্ণাঙ্গ হতে চলেছে আজ।"

সহসা দেখা যায় তাদেরই বিদ্রুপবান জর্জ্জরিত সেই নিগ্রো যুবক ওয়েন্সই তার ব্যাগ নিয়ে ছুটে আসছেন লং এর দিকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতন তারা দেখতে থাকে— হাঁটুগেড়ে বসে ওয়েন্স লং এর পরিচর্য্যায় মন দিয়েছেন। নিকটবর্ত্তী সকলকে সরিয়ে দিয়ে তিনি লং এর পায়ের পেশীর নমনীয়তা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তার অঙ্গ সংবাহনে রত হলেন। এই রকম চলল কিছুক্ষণ। অতঃপর দেখা গেল লং উঠে দাঁড়িয়েছেন। সমস্ত ষ্টেডিয়ামে তখন ওয়েন্সের নামে গগণভেদী জয়ধ্বনি উঠেছে। ক্ষণিকের জন্য বোধ হয় তখন ষ্টেডিয়ামের সকলেই লং এর নামও স্মরণ করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

লং সুস্থ হওয়ার আধঘণ্টা পর আবার প্রতিযোগিতা শুরু হল। অতঃপর সকলকে পরাজিত করে লং এবং ওয়েন্স অবশিষ্ট রইলেন শেষ পর্য্যায়ের দীর্ঘ লম্ফের জন্য।

এইবারই স্থির হতে চলেছে—কে হবে বিশ্বজয়ী— ওয়েন্স না লং।

প্রস্তুত হলেন লং। দূর থেকে ছুটে এসে নির্দ্দিষ্ট সীমানা থেকে তাকে তীব্র বেগে লাফ দিতে দেখা গেল। মনে হল তিনি যেন উড়ে গিয়ে নির্দ্দিষ্ট সীমানা থেকে আশাতিরিক্ত দূরত্বের ব্যবধানে মাটিতে গিয়ে পড়লেন। মুখরিত হয়ে উঠল ষ্টেডিয়াম দর্শকদের আনন্দ ধ্বনিতে দূরত্ব মাপা হল—25 ফি 9½ ইঞ্চি।

ওয়েন্স চোখ তুলে দেখে নিলেন একবার লাফের বহরখানা।

এবার ওয়েন্সের পালা। দৌড়ের সময় দেখা গেল সুঠাম দীর্ঘ দেহী কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের মুখখানি দৃঢ় সঙ্কল্পে কঠিন হয়ে উঠেছে। ঝড়ের গতিতে লাফ দিলেন তিনি। এক অবিশ্বাস্য দূরত্বের ব্যবধানে লাফিয়ে গিয়ে তিনি মাটি স্পর্শ করলেন। দূরত্ব দেখা হল 26 ফিঃ 5¼ ইং একটি বিশ্বরেকর্ড।

ওয়েন্সের নামে সমস্ত ষ্টেডিয়াম তখন ফেটে পড়েছে।

সেই কোলাহলের মধ্যে দেখা গেল পরাজিত লংই সর্ব্বপ্রথম ছুটে এসে কৃষ্ণাঙ্গ ওয়েন্সকে জড়িয়ে ধরে জানাচ্ছেন তার আন্তরিক অভিনন্দন। সাদায় কালোয় একাকার হয়ে গেছে যেন সব। কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেছে জাতি, বর্ণ এবং ধর্ম্মের তুচ্ছ অহমিকা।

বার্লিন অলিম্পিকের এই মিলনাত্মক দৃশ্য এবং বিশ্ব সমাগত দর্শকদের অকুণ্ঠ মিলিত আনন্দোচ্ছাস হয়ত সে দিন জানিয়েছিল—মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে যাওয়া যায়। একদিন হয়ত বা সম্ভব হলেও হতে পারে বিশ্ব কবির সেই অমৃতময় বাণী—

"তপস্যা বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া"

এই অলিম্পিকের পর ওয়েন্স বলেছিলেন "মুক্ত মানুষের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা ঘৃণা বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে এনে দেয় পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সখ্যতা এবং নিরপেক্ষ প্রতিযোগীতার মাধ্যমেই নিজের এবং দেশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য মানুষের যথাসাধ্য নিয়োগের আকুল প্রয়াস।"

হিন্দুবিবাহ ও পণপ্রথা

সুকুমার দাস

বিবাহ ব্যাপারটাই বেশ রহস্যঘন ও আনন্দময়। এক নবীন যুবকের সঙ্গে অপর এক নবীনার মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠার প্রথম পরিবেশ রচিত হয় বিবাহ অনুষ্ঠানে। এই বিশেষ লগ্নে অন্তরের ফল্গুধারা অপরের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করার মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব সুর তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। আবার অন্যদিকে ভবিষ্যৎ কর্মময় সংকট পরিপূর্ণ জীবনের স্রোতে এগিয়ে চলার নতুন দায়িত্ব এসে পড়ে। একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে ভয়, একপ্রান্তে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় মুহূর্ত, অন্যপ্রান্তে কর্তব্যের নতুন আহ্বান।

হিন্দু বিবাহের বিচিত্র কল্পনা, বিচিত্র অনুষ্ঠান, বৈচিত্রময় প্রথা ও আচার ও আচরণ। কিছুদিন পূর্বেও আমাদের দেশে নাবালিকা কন্যার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ছিল। ৭ বছর থেকে ১২ বছরের মধ্যেই অধিকাংশ মেয়েকে পাত্রস্থ করার বিধি ছিল। এখন কন্যা সাবালিকা না হলে বিবাহের ব্যবস্থা করা সরকারের অনুমোদন লাভ করে না। তবুও মেয়েদের কৈশোর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কন্যার পিতামাতা কন্যাদায়ের হাত থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করেন। বিবাহের পূর্ব অনুষ্ঠান হচ্ছে নবসম্বন্ধ স্থাপন অর্থাৎ কন্যাপক্ষ পাত্র দেখতে যান এবং পাত্র পক্ষও কন্যাকে যাচাই করেন। কন্যা যাচাই বা ইনটারভিউ এর দিনে কন্যা থেকে আরম্ভ করে তার পিতামাতা সকলেই ভয়ে ভয়ে কাটান। পাত্রপক্ষ কন্যার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বয়স, পরীক্ষা করেন খুব ভাল করে। যখন বিভিন্ন প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করা হয় সেই নবীনার প্রতি তখন তার মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে। তার সেলাই-বোনা, গানবাজনা, চলাফেরা থেকে আরম্ভ করে তার কেশবতী কন্যার মত দীর্ঘ কেশ আছে কি না তা বিচার হয়। কন্যার পক্ষে পরীক্ষা সাগর পার হওয়া যায়, তবুও পাত্রপক্ষ ইচ্ছামত ৫।১০ হাজার কিংবা ৫০ হাজার টাকার দাবী দিয়ে বিদায় নেবেন। কন্যাপক্ষ সেই অর্থ যথারীতি দিতে প্রস্তুত থাকলে বিবাহের দিন পাকা হয়। শুধু টাকা নয়, সেই সঙ্গে পাত্রকে খাট, আলমারী, রেডিও, সাইকেল, রিষ্টওয়াচ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে দিতে হয় কন্যাকর্তাকে। তার পর পাঁজি দেখে শুভদিন স্থির করা হয়। দিন স্থির হওয়ার পরেও কন্যাকে বলির পাঁঠার মত ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে হয়, যদি কোন প্রকারে পাত্রপক্ষের অমত হয় তাহলেই মুস্কিল।

বিয়ের পূর্ব দিনে পাত্র পাত্রীর গায়ে হলুদ দেওয়া হয়ে থাকে। বিয়ের দিনে একদল বরযাত্রী সঙ্গে নিয়ে পাত্র বিয়ে করতে যান। বরযাত্রী ২০ জন হতে পারে, আবার ২০০ জনও হতে পারে। এই দুর্মূল্যের বাজারে তাদের ঠিকমত আদর যত্ন করাও সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া বরযাত্রীরা অনেক সময় 'বদ' যাত্রী হয়ে বসেন অর্থাৎ তাঁরা কন্যাপক্ষের বাড়ীতে গিয়ে নিজেদের রাজকুমার মনে করেন—যদি খাওয়া কিংবা অন্য কোন বিষয়ে কোন সম্মানহানি ঘটে তাহলে বাবুদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় এবং বিবাহ আসর ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়।

বিবাহ-বাসরে পুরোহিত ও নরসুন্দরের মাঝখানে পাত্র ও কন্যাকে বিভিন্ন আচার-আচরণ শেষ করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করে কন্যার দায়িত্ব ভার নিতে হয় পাত্রকে। তাদের মুখে উচ্চারিত হয়—"যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব

যদস্তু হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।"

এইভাবে উভয়ের মধ্যে সমপ্রাণ বা একটা নিবিড় সখ্যভাব গড়ে উঠে। কন্যার পিতা নিজকন্যাকে সম্প্রদান করে ভারমুক্ত হন।

কখন কখন বরযাত্রীদের উপর চাউল ইঁট প্রভৃতি ছুড়ে রসিকতা করা হয়। তার পর সিন্দুর দান, মালা-বদল হোম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হয়। সেই রাত্রেই আবার বাসরশয্যা রচিত হয়—ইহাই নারী ও নরের প্রথম শুভ রজনী।

পরের দিন নববধুকে সঙ্গে করে পাত্র নিজ বাটীতে হাজির হন এবং বৌভাতের ব্যবস্থা করেন। বিরাট ভোজনপর্ব শুরু হয় এবং নববধূকে সুসজ্জিত করে বসিয়ে রাখা হয় পুতুলের মত। নিমন্ত্রিতরা এসে কন্যার মুখদর্শন করেন এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেকে সাধ্যাতীত উপহারদানে নিজেকে ধন্য মনে করতে চান। তারপর ফুলশয্যার রাত। ইহা বিবাহের অন্যতম অঙ্গ ও অংশ—এই রাত্রির জন্য দীর্ঘদিন ধরে পাত্র ও পাত্রীকে অপেক্ষা করতে হয়। ইহা জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর রাত্রি বলে হিন্দুসমাজে পরিচিত।

সুতরাং অতি প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুবিবাহে ২টি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি হচ্ছে বৈদিক আচার, অপরটি হচ্ছে লৌকিক আচার। বৈদিক যুগ থেকে হিন্দু-বিবাহব্যবস্থায় কতকগুলো আচার-আচরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়েছে, যেমন কুশণ্ডিকা, প্রায়শ্চিত্ত হোম, শিলা আরোহণ ইত্যাদি। বৈদিক আচারের পাশাপাশি লোকাচারগুলি আমাদের বিবাহব্যবস্থাকে আরও চিত্তাকর্ষক ও প্রাণময় করে তুলেছে। অনেক সময় এই লোকাচারগুলিকে নিছক অর্থহীন বলে মনে হলেও এর মধ্যে একটা নিগূঢ় অর্থ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুবিবাহের অপর নাম পাণিগ্রহণ। এর অর্থ বর কর্তৃক বধূর পাণি বা হস্ত গ্রহণ করা। যে সমাজে পুরুষের স্থান স্ত্রীর উচ্চে সেখানে এই ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে পুরুষ গ্রাহক এবং স্ত্রী গ্রহীতা।

আমাদের সমাজ পূর্বকালে মাতৃতান্ত্রিক ছিল এবং এর ফলস্বরূপ বিবাহ অনুষ্ঠানে অধিকাংশ বিষয় স্ত্রীলোকেরাই সুসম্পন্ন করে থাকেন। গায়ে হলুদ, ধানভানা, সুতার সাত পাক ছাড়ান, উলুধ্বনি, বিবাহ বাসরে উপদ্রব, নৃত্যগীত প্রভৃতির মধ্যে মহিলাদের প্রাধান্য বিদ্যমান।

আমাদের দেশে যে এককালে মাতৃতান্ত্রিক ছিল তার আর একটা প্রমাণ পাই স্বয়ংবরসভার মধ্যে। পূর্বে নারীরা তাদের পছন্দমত পুরুষের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে সভামধ্যে নিজের বিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন। রূপ ও গুণের প্রতিযোগিতায় যে-পুরুষ জয়লাভ করতেন, তিনি কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পেতেন। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষকে বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষায় সম্মুখীন হতে হ'ত। পুরাকালে রামচন্দ্রকে হরধনু ভঙ্গ করে এবং অর্জুনকে মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করে নারীরত্ন লাভ করতে হয়েছিল। এমনকি দ্বাদশ শতাব্দীতে কনৌজ অধিপতি পৃথ্বীরাজ কর্তৃক সংযুক্তা হরণের কাহিনী ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে অজানা নয়।

কিন্তু বর্তমান হিন্দুসমাজে নারীরা আপাঙক্তেয়, তাদের মান মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত। কন্যার পিতাকে দিনের পর দিন মর্মান্তিক মনোকষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়। এর প্রধান কারণ অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন না থাকা। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতী, সদগোপ ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের মানুষ এই সমাজে বাস করে, অথচ তাদের মধ্যে বিবাহের বন্ধনের সম্ভাবনা খুব কম। বিশেষ করে কৌলিন্য প্রথার ফলে এই সমস্যা আরও অনেকগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। একশত বছর আগেও কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যার জন্য উপযুক্ত কুলীন পাত্র না পাওয়ায় ফলে ষাট বছরের বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ ষোড়শী কন্যার পানিগ্রহণ করতে আপত্তি করতেন না, আর তার জন্যে সেই বৃদ্ধকে ২০।২৫ টি বিবাহ করতেও বিশেষ অসুবিধেয় পড়তে হ'ত না। বর্তমানে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে এবং অসবর্ণ বিবাহ সমাজে শুরু হয়েছে—এমনকি যুবক যুবতীরা পিতামাতার মতামত অগ্রাহ্য করে জাতির ভেদাভেদ লক্ষ্য না করে রেজেস্ট্রি বিবাহ সুসম্পন্ন করছেন।

কন্যার বিবাহের দ্বিতীয় ও সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, প্রয়োজনমত অর্থের অভাব অর্থাৎ পণপ্রথা। আজ বিংশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজ নিজেকে অনেক উন্নত ও

শিক্ষিত বলে মনে করছে, সেখানে পণপ্রথা অক্টোপাশের মত আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে এবং দিনের পর দিন এটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে—একথা ভাবতে কেমন লাগে। যে পিতার ৪৫ টি বিবাহ-যোগ্যা কন্যা থাকে তাকে বিবাহের পণের অর্থ যোগাড় করতেই জীবনের সর্বস্ব নষ্ট করতে হয়। তাঁর জীবনে আর্থিক ও মানসিক অবস্থা মোটেই সুখপ্রদ নয়। আমাদের জাতীয় সরকার এই পণপ্রথাকে উচ্ছেদ করবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ করতে কুণ্ঠিত হয় নি, কিন্তু তাকে কার্যকরী করবার কোন চেষ্টা সরকার তথা জনসাধারণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না এটাই অতীব আশ্চর্যের কথা। আজ আমাদের দেশে নারী প্রগতির কথা বলা হয়। মেয়েরা স্কুল কলেজে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করছে, তারা পিতার সম্পত্তির অংশীদার পর্য্যন্ত হয়েছে, কিন্তু তারা আজও পুরুষের পণ্যদ্রব্য হয়ে রইলো।

আমাদের দেশে সমাজসংস্কার, ভূমিসংস্কার প্রভৃতির জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তার জন্য বহু জননেতা সারা জীবন সংগ্রাম করে চলেছেন। কিন্তু যেখানে হাজার হাজার হিন্দুমেয়ের চোখে অশ্রু ঝরছে ও তাদের পিতাদের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন এখনও শোনা যাচ্ছে, সেখানে কোন সমাজসংস্কারক এ বিষয়ে অগ্রণী হন নি এটাই অদ্ভুত।

এককালে হিন্দুসমাজের সতীদাহ-প্রথা নিবারণ করবার জন্য রামমোহন রায়ের মত মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল এই দেশেরই মাটিতে। আজ তেমনি কোন মহাপুরুষের জন্য অপেক্ষা করছে সমগ্র হিন্দুসমাজ—যাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে শত শত বছরের অভিশপ্ত এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে দারুণ কুঠারাঘাত হবে এবং এই দেশের বুক থেকে পণপ্রথা সমূলে উৎপাটিত হবে।

আমাদের দেশের মেয়েরাও তো আর পিছিয়ে নাই——তাঁরা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলছেন। তাঁরাও একদিন দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

বর্তমানে বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে তাঁরা যুক্ত আছেন। তাঁদের নিজেদেরই আজ পণপ্রথা বিষয়ে বেশী চিন্তা করার প্রয়োজন হয়েছে। তাঁরা এখনও কেন চোখ বুজে ঘুমিয়ে আছেন? কোন সময়ে কোন্ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন কিংবা উদারচেতা পুরুষেরা স্বেচ্ছায় কন্যার পিতার নিকট পণ গ্রহণ করবেন না, এই আশায় বসে থাকলে অযথা অনেক বিলম্ব ঘটবে। তার চেয়ে বরং নারীজাতি নিজেরাই যদি রণহুঙ্কার দিয়ে নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দেন, যদি একযোগে তাঁরা একথা ঘোষণা করেন যে—টাকার বিনিময়ে তাঁরা বিবাহবাসরে যাবেন না এবং এর জন্য যদি সারাজীবন কুমারীব্রত গ্রহণ করতে হয় তবুও তাঁরা পিছিয়ে রইবেন না তবেই তাঁদের সুদিন আসবে।

যেদিন সমগ্র নারী-সমাজের মধ্যে এই শুভচেতনা জাগ্রত হবে, যেদিন তাঁরা স্বাবলম্বী হয়ে তাঁদের নিজেদের আদর্শকে সামনে রেখে পণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, জোর আন্দোলন করবেন, সেদিন তাঁদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং হিন্দু সমাজ ও একটা অভিশপ্ত প্রথার লোহপাশ থেকে মুক্ত হবে।

বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

বিজ্ঞাপন কি এবং কেন?

কোন ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষকে জনগণ তথা জগতের পাদপ্রদীপের সাম্‌নে উপস্থাপিত করার প্রক্রিয়ার অপর নামকে বিজ্ঞাপন বলা যেতে পারে।

বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক যুগের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন এমন একটি শক্তিশালী কার্যকরন, যার ভূমিকা অমোঘ ও সুদূর প্রসারিত।

যদিচ বিজ্ঞাপনের সাধারণ 'মিডিয়া' বা বাহক কাগজ মাত্র,...কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে নানা পর্যায়ের মিডিয়াও প্রচলিত হ'য়ে চলেছে। যেমন, রেডিয়ো, টিভি, ছায়াচিত্র, ডাক তারবিভাগ, প্রাচীর, বেলুনঘুড়ি, বিভিন্নযান ও জানোয়ার।...

একদা যখন হস্ত বা মেসিন প্রস্তুত কাগজ বর্তমান সভ্যতার অন্যতম মুখপাত্র হ'য়ে দাঁড়ায়নি, তখন ব্যক্তি ও বস্তুবিশেষকে পরিচিত হবার প্রাধান্য এনে দিয়েছে সাধারণ গ্রাম্য জয়ঢাক।

কিন্তু জয়ঢাকের ঢক্কানিনাদ একটা সীমিত পরিধির মধ্যে প্রচারিত করার সুযোগ দিয়েছে মাত্র; অবশিষ্টাংশ হ'য়েছে জনে-জনে মুখে-মুখে। অবশ্য মুখান্তর প্রচার অতিরঞ্জনের অবকাশ দিয়েছে প্রচুর।

দূরান্তরের তথ্য-সংবাদ প্রচারের পক্ষে ঘোড়া, উটের ভূমিকা অসামান্য। কিন্তু যারা সংবাদবাহী হ'য়ে যেত এদের পৃষ্ঠশাহী হয়ে, তারা সামান্য সওয়ার মাত্র। কাজেই তখনো প্রচারের সীমার গণ্ডী খুব বেশী ব্যাপকতর হবার সুযোগ পেত না। বাকীটা ঘট্‌তো মুখান্তরে।

ভিন্‌দেশী বণিকদের বাণিজ্যিক লেনদেনের কালে স্থানীয় ব্যক্তি ও বস্তুবিশেষের সুযোগ যথেষ্ট ঘটেছে সংবাদ প্রচারের।

এঁরা স্বদেশীয় সংবাদ যেমন ব্যাপক প্রচার করে গেছেন, সঙ্গে দেশীয় তথ্যও নিয়ে গিয়েছেন তল্পীতল্পাতে বয়ে।

কিন্তু এমনি প্রচার ছিল প্রায়শঃ মৌখিক। কোন কোন ক্ষেত্রে মৌখিক সংবাদ এমন আশ্চর্যভাবে বিজ্ঞাপিত হ'য়েছে যে, যার ফলে বাণিজ্যিক লেনদেন ক্ষেত্রে ভিন্‌দেশী বণিকদের আনাগোনা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়ে গেছে।

এ'সমস্ত অবশ্য দু'এক শতাব্দীর আগেকার কথা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দেশে যখন কাগজের বহুল প্রচলন শুরু হোলো তখন প্রচার বা বিজ্ঞাপনের গতিমুখও বদ্‌লাতে লাগ্‌লো।

শিক্ষার প্রগতির পথে ভাষা যখন আক্ষরিক ছন্দ পেয়ে মুক্তি পেল, তখন কাগজের 'মিডিয়াতে এই আক্ষরিক ভাষাই হোলো বিজ্ঞপ্তির বাহন।

ভাষার সঙ্গে সংযোগ ঘট্‌লো চিত্রের, যা বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞাকে করলো জোরালো এবং গভীর।

প্রথমদিকে চিত্রের ব্লক-নির্মাণ যখন গবেষণার বিষয় বস্তু, তখন হাতে কাঠ-খোদাই করা ব্লকে প্রকাশিত শাদা-কালো চিত্রই বিজ্ঞাপন-প্রচার কাজে সহায়তা করে এসেছে।

বস্তুটি ছিল বিশেষ সময় সাপেক্ষ। কারণ এক একটি ব্লক-নির্মাণে বিশেষ কয়েকটি দিনের প্রয়োজন ঘটতো,—যাতে খরচের মাত্রাধিক্য হ'য়ে যেত। ফলতঃ সে সময় চিত্র বাদ দিয়েই যতটা সম্ভব আক্ষরিক ছন্দ ব্যবহার বিজ্ঞপিত করার রেওয়াজ হ'য়েছিল।

কিন্তু যখন দেশে 'লাইন' ও হাফটোনের ব্লক

নির্মাণের প্রচলন আবিষ্কৃত হোলো, তখন যুগান্তর ঘটলো বিজ্ঞাপন প্রচার জগতে।

এই সময় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা এগিয়ে এলেন স্ব ব্যবসা প্রচারের খাতিরে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ স্থাপনা করলেন বিজ্ঞাপন কেন্দ্র; অথবা সুযোগ সুবিধামত কোন বিত্তবান বিশেষ চিত্রশিল্পীদের সহায়তায় তৈরী করলেন বিজ্ঞাপন প্রচারবিভাগ বা এড্‌ভারটাইজিঙ এজেন্সি,—যাদের একমাত্র ক্রীয়াকার্য হোলো, অর্থবিনিময়ে যাবতীয় বস্তুর প্রচার।

এবার কাগজের মিডিয়াতেই সগৌরবে বিজ্ঞাপন প্রচার চললো বিজ্ঞাপন কেন্দ্র বা এডভারটাইজিঙ এজেন্সি মারফত। ফল অবশ্য ভালই ফলতে লাগলো। বিশেষ বস্তুটি যখন কাগজীয় বিজ্ঞাপনের ঘাড়ে চড়ে সিন্ধাবাদের মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো; তখন ব্যবসায়ের সুড়ঙ্গপথে প্রচুর অর্থাগমের সুযোগ এনে দিলে। তথাকথিত বিজ্ঞাপিত বস্তুটির প্রোডাকশান ভ্যালু বেড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যিক বস্তুটির এস্টাব্লিশমেন্ট খরচাও বৃদ্ধির পথে। সমস্ত বাদ দিয়ে লাভের খাতিয়ান শিল্পপতির পুঁজিতে কত জমলো, তা অবশ্য বিবেচ্য বিষয়।

বস্তুতঃ মোটামুটি দাঁড়ায় এই, যে আবশ্যকীয় দ্রব্যটি একদিন কোন ফ্যাক্টরীর গর্ভগৃহে প্রস্তুত হ'য়ে একরূপ হেয় বা অজ্ঞানিত অবস্থায় পড়ে থাকে, একদিন সেই বস্তুটি কাগজীয় বিজ্ঞাপনের ঘোড়সওয়ার হ'য়ে দেশ বিদেশের ঘরে ঘরে স্বনামধন্য হ'য়ে পড়ে রাতারাতি স্বনাম প্রচারের দ্বারা। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে ফ্যাকটরী মালিকের সুনাম ও সিন্দুককেও রাশভারী করে তোলে এক যোগে।

বিংশশতাব্দির প্রথম দিকে বিজ্ঞাপন প্রচার একমাত্র কাগজীয় বিভাগেই সীমিত ছিল বলা যায়।

প্রতিবৎসর মনুষ্যজন্ম বৃদ্ধি হ'য়ে চলেছে। এমনি বৃদ্ধির পথে নানা সমস্যা জড়ীভূত। এর মধ্যে বাঁচার সমস্যাই হয় তো কঠিন। রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তান্বিত। চাই উপযুক্ত খাদ্য, চাই লজ্জানিবারণের বস্ত্র। তারপর অন্যান্য সমস্যার সমাধান।

যুদ্ধ বা মারামারি করে এ'কঠিন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। নানা দল পাকিয়ে, বিভিন্ন মতবাদ ছড়িয়ে, আর অজস্র ইজমের কচকাচ করেও জুৎসই কিছুই হচ্ছে না। বর্তমানে জন্মসংখ্যা হ্রাস করার নীতিও চতুর্দিকে বলবৎ।

কিন্তু ইতিমধ্যে যেরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে তার সমাধান বা পরিপূরক হিসাবে শিল্পপতিদের ব্যবসার চৌহদ্দি বাড়াতে হয়েছে। নগরে বা সহরে বসাতে হয়েছে নানা জাতির ছোটবড় শিল্প প্রতিষ্ঠান। তা বাদে বেড়েছে সরকারী নানা শিল্প ইমারত ও কারখানা। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হ'য়ে চলেছে এই সব প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়ে চলেছে, তার প্রচার চাই। এবং দ্রুতগতি প্রচার। শুধু কাগজের ঘাড়ে চাপিয়ে ধীরে সুস্থে প্রচার নয় এবার। আরো ব্যাপকতর। মাত্র একদিনের মধ্যে ঘরে ঘরে বাণিজ্যিক বস্তুটির নাম-ধাম-গোত্র, ক্রিয়া—প্রচারিত হ'য়ে যাওয়া চাই।

এমনি প্রচারের কাজে এলো রেডিয়ো, টেলিভিশান। বস্তুবিশেষের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষ ও তাড়িৎ-তরঙ্গে বিশ্বের ঘরে ঘরে বিজ্ঞাপিত হ'য়ে স্থায়ী আসর লাভ করলো।

প্রচারকে আরো ব্যাপকতর করার কাজে এলো ছায়াচিত্র আর প্রাচীর পত্র। সহরের গলিপথ, এবং গ্রামের ছায়াপরিবেশে—যেখানে রেডিও বা ছায়াচিত্রের তেমন ছায়া পড়েনি, সেখানে—মাইকে, জানোয়ারের পিঠে, বেলুন ঘুড়ির বুকে, জনপথে বিজ্ঞাপনের নানা চড়া বস্তু ও ব্যক্তিবিশেষের মাহাত্ম্যকে জোরালো করে তুলতে থাকে।

ক্ষেত্র বিশেষে শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীরা বুঝে নিলেন, বিজ্ঞাপন যত জোরালো, প্রোডাকশান তত বৃদ্ধি, তত অর্থলাভ। হয়তো এ কারণেই লাভ্যাংশের একচতুর্থভাগ অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ব্যয়ে

রেখে দিয়ে থাকেন মালিকেরা। হয়তো এই চতুর্থভাগই একদিন ষোলআনা লাভ নিয়ে আসবে বিজ্ঞাপনের দৌলতে।

বিজ্ঞাপনের অ্যাকশান্ রি অ্যাকশান্

যে-কোন মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন যখন প্রচারিত হ'তে থাকে, তখন জনসাধারণের মধ্যে তার কি কার্যকরণ ঘটে, জানা প্রয়োজন।

নিস্তরঙ্গ জলের বুকে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ফলে আন্দোলন জাগবেই।

কোন একটি বস্তুর বিজ্ঞাপন যখন কোন মিডিয়া মারফৎ জনারণ্যে নিক্ষিপ্ত করা হয়, তখন বিজ্ঞাপনদাতা বুঝে নেন্, বস্তুটি সম্বন্ধে যে কোন একটি আন্দোলন না ঘটেই পারে না।

কারণ, বস্তু-বিষয়ক বিজ্ঞাপনটি হয়ে থাকে গভীর মনস্তত্ত্বমূলক ভাষায় লিপিবদ্ধ। এবং এটিকে কোন ব্যক্তিবিশেষের মনের উপর ছাপ ফেল্‌তে গেলে শুধু একদিনের প্রচারেই সেটি সম্ভব নয়, সেটি প্রতিদিন বা বা প্রতি মাসে বিভিন্ন মিডিয়া অর্থাৎ কাগজ, ছায়াচিত্র রেডিয়ো অথবা প্রাচীরপত্র মারফৎ বিজ্ঞাপন করে যাওয়া চাই।

চক্ষু ও কর্ণের মাঝখানে যে বস্তু অর্থাৎ অদৃশ্য বিবেকসত্তা কাজ করে চলেছে, তার উপর বিজ্ঞাপনের প্রতিফলন বা ছায়া না পড়লে চলবে না। যখনই সে ছায়া পড়লো, তখনই বিজ্ঞাপনের সফলতা।

এই গেল একদিকের কথা, অপর দিক হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞাপিত বস্তুটির মানসিক প্রক্রিয়া কখন কেমন করে ঘটে?

প্রথমত দেখা গেছে, কোন দেশের জনসাধারণই বিজ্ঞাপন ব্যাপারটাকে খুববেশী আনন্দের চোখে দেখে না।

কেন দেখে না, তার হেতু হয় তো, বস্তুটির একতরফা আত্মপ্রচার।

এমনি আত্মপ্রচারের নেপথ্যে বিজ্ঞাপনদাতাদের যে স্বার্থ বা আত্ম অহংকার বিদ্যমান থাকে, কম বেশী সকলের মনে স্বতঃস্ফূর্ত ধারণা জন্মে যায় যেন। দৈনিক বা মাসিকের পাতায় যে সুন্দরী মেয়েটি মেঘের মত চুল এলিয়ে কোন একটা হেয়ার টনিকের সচিত্র বিজ্ঞাপন হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে মনপ্রাণ খুলে দেখবার আগেই যে ধারণা হয়, তা হ'চ্ছে, সুন্দরী মেয়েটির আড়ালে হেয়ার টনিকের বোতল নিয়ে স্বার্থ বা লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে একটি ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে যেন নিঃশব্দে।

তারপর ধারণা হবে, যে টনিকের গুণে মেয়েটির মেঘের মত এমন চুল, হাজার টাকা খরচ করে তাকে এমন বিজ্ঞাপিত করার কি প্রয়োজন?

তার পরের মনস্তত্ত্ব হবে, ভেজাল তেলটিকে 'সাচ্চা' বলে প্রচার করার এ একপ্রকারের অপকৌশল নয়তো?

ফলতঃ, প্রথমেই বিজ্ঞাপিত তেল সম্বন্ধে যে-ভীরু সংশয় মনে জাগে, তাকে সহসা ঠেলে ফেলে দেবার উপায় নেই।

কিন্তু আশ্চর্য এই, এমনি সংশয় কিছুদিনের মধ্যেই কেটে যায়, যখন সেই একই তেলের বিজ্ঞাপন, পরিচিত লোকমুখে, প্রাচীর-দেয়ালে, আকাশ বাণীতে, প্রেক্ষা-গৃহের পর্দায় ঘন-ঘন অবচেতন মনের দেয়ালে আঘাত হানতে থাকে। একদিন হয়তো দেখা যায়, যে তেল ভেজাল বলে সংশয়াচ্ছন্ন ছিল, তারই একবোতল বাড়ীর মেয়েদের চুল গ্রন্থির কাজে ঘরে এসে গেছে কখন। এইখানেই বিজ্ঞাপনের সার্থকতা এবং অবিসংবাদিত জয়-গৌরব।

বিজ্ঞাপনের ভালমন্দ :

বর্তমানকালের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা জীবজগতের কল্যাণে যেমন 'ভাল'র আমদানী করেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে খাপছাড়াভাবে দুষ্ট শনিগ্রহের মত 'মন্দ'কেও কখন সমাজ জীবনের অন্ধ্রে-রন্ধ্রে গ্রহণ করে নিয়েছে, বোঝার অবকাশ রাখেনি।

বিজ্ঞাপন যদি মানুষের সমাজ-শিল্পব্যবস্থার প্রভূত অগ্রগতি ও উন্নতি ঘটাবার পক্ষে বন্ধুর মত সহায়ক হ'য়ে থাকে, তবে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, সেই বিজ্ঞাপনকেই মানুষ বর্তমানে এমনভাবে Exploit করছে এবং করেছে, যা মানবসমাজ কল্যাণ বিগর্হিত।

বিজ্ঞাপন যে নিঃস্বার্থভাবে জনকল্যাণের পক্ষে কাজ করে চলেছে, এমনি 'বোধ' নিয়ে একদল সমাজবিরোধী ব্যক্তি নিজের স্বার্থ সিদ্ধি ও পুষ্টি করার চক্রান্তে একদিন মেতে উঠলো এবং অচিরাৎ এরা জনস্বার্থ ও জনকল্যাণ বিরোধ বস্তু নিয়ে এমন বিজ্ঞাপন পত্র প্রচার ও প্রকাশ করতে লাগলো যে, সরল ও নিরক্ষর ব্যক্তিরা এমনি প্রচার পত্রের ফাঁদে পড়ে অর্থদণ্ড দিতে শুরু করে দিলে।

যেমন ধরুন, যে-ওষুধটি বিজ্ঞাপনের প্রচারে ভালজেনে আপনি কিনে ঘরে নিয়ে এলেন, ব্যবহারের পর দেখা গেল, সমস্ত ওষুধটি নিষ্ক্রিয়, ভেজাল; কিন্তু যখন উক্ত ওষুধটির নিষ্ক্রিয়তা ধরা পড়লো, তখন দেখা গেল, বিজ্ঞাপন খরচ নিয়ে ওষুধের মালিক বেশ কয়েক-হাজার টাকা মুনাফা লুটে নিয়েছেন ইতিমধ্যে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষের এমন কয়েকটি স্থান আছে, যেখানে নানা ঝুটা কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের জাল ফেলে সমাজবিরোধী কাজ করে চলেছে একপ্রকার দুষ্টবুদ্ধি লোক। ভারতীয় বর্তমান জনসংখ্যার এক পার্সেন্টের কাছে যদি এমনি সমাজবিরোধী বিজ্ঞাপনের আবেদন পৌঁছে এবং কাজ হয়, তবে একবছরের মধ্যে ঝুটা কোম্পানী যা মুনাফা লুটে নেবে, তা' হবে কল্পনাতীত।

বস্তু নেই, অথচ প্রচুর উপায় হ'ল, শুধু একমাত্র বিজ্ঞাপনের কারসাজীতে।

বিকৃত বিজ্ঞাপন :

যে উপায়ে বিজ্ঞাপনকে সমাজ বিরোধীরা দুরভি-সন্ধিমূলকভাবে বা দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হ'য়ে মন্দ পথে নিয়ে চলেছে, প্রায় ঠিক সেভাবেই আরেকদল ব্যবসায়ী অত্যন্ত স্থূলভাবে বিজ্ঞাপনকে Exploit করার চেষ্টা করে চলেছে।

পয়সা উপায়ের লোভে এরা সামান্য চক্ষুলজ্জা পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা, লোকাচার সংস্কৃতি এবং ট্রাডিসান,—কোনদিকেই দৃষ্টি নেই উপরোক্ত লোভী ব্যবসায়ীদের।

প্রগতির নামে পাশ্চাত্যসভ্যতার বিকৃত রূপকে এরা ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বাহবা কুড়োবার চেষ্টা করছেন।

মেয়েদের যাবতীয় কস্‌মেটিক' বা প্রসাধন দ্রব্য এবং অন্তর্বাসের পটভূমিকায় এরা এখন লোভনীয় তথা যৌন আবেদন সুলভ নারীদেহ (কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নগ্ন) আমদানী করছেন যে, অনেক সময় সন্দেহ জাগে যে আমরা সত্যই ইউরোপের কোন দেশে বাস করছি, না ভারতবর্ষে।

ঐ ক্ষেত্রে যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন, তাদের মনোভাব বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যারা বিজ্ঞাপনটি লে-আউট; করে কোন কাগজে বা প্রেসে পাঠিয়ে দেন, তাদেরও কি বিজ্ঞাপন দাতাদের মত সগোত্র ভাবতে হবে?

এডভারটাইজিং এজেন্সির ডিরেক্টর হয়তো বলবেন, উপরোক্ত বিজ্ঞাপন দাতাদের মতামতের কাছে আমরা বাঁধা, কারণ তাদের পয়সাতেই সব কিছু, সুতরাং আমরা কি করতে পারি?

ঠিক কথা, আমাদের কিছুই করবার নেই।'

কিন্তু সত্যই কি কিছুই নেই করবার?

স্বার্থ এবং পয়সার লোভে একজাতীয় লোক যদি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রসাতলে ডুবিয়ে দিতে চায়, সেই সঙ্গে এডভারটাইজিং এজেন্সির ডিরেক্টরকেও কি তাদেরই সমগোত্র হতে হবে?

সুস্থ বিজ্ঞাপন সুস্থ সংস্কৃতির স্বাক্ষর।

সমাজসেবী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতির্ময়ী দেবী

এই ক'বছরে সারি সারি কত বিরাট মহামানবের মানুষের শতবার্ষিকী স্মারকবর্ষ উদ্‌যাপিত হ'ল; শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হ'ল—বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ কয়েক বছর আগে পরে করে আবির্ভূত কত মহামানবকে। যাঁরা কেউ মহাকবি, কেউ ধর্মপ্রবক্তা, কেউ বা বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, কেউ বা দর্শনাচার্য্য —আরো কতজন, তাঁদের সমসাময়িককেও লোকে স্মরণ করলেন শ্রদ্ধাভরে।

এবারে যাঁর স্মারকবর্ষ এসেছে তিনি ধর্মপ্রবক্তা বা ধর্মগুরু নন, কবি কিম্বা বৈজ্ঞানিকও তাঁকে বলা চলবে না, খুব ধনী প্রতিষ্ঠাবান তিনি ছিলেন না, বক্তাও ছিলেন না এবং সাহিত্যিক বা লেখক যাকে বলা যায় তাও তিনি ছিলেন না। কখনো কোনো বিষয়ে আত্মপ্রচারও করেননি তিনি;—এবং অন্য কেউই তাঁকে তাঁর জীবনকালে বা লোকান্তরের পরও প্রচার করেননি।

অথচ তিনি কেমন করে সমস্ত ভারতবর্ষের—বাংলা-দেশ ছাড়াও—শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষ অশিক্ষিত নরনারী জনসাধারণ সকলের মনে একটী গভীর ও নিবিড় মুগ্ধ—আশ্চর্য্য শ্রদ্ধাময় আসন পেয়েছিলেন—এটী যেমন আশ্চর্য্য তেমনি আশারও কথা মানুষের মনে বহন করে আনে।

লোকে ভাবেন, জনসাধারণ মানে 'স্ত্রী-পুত্র'—অশিক্ষিত সাধারণ যাঁরা—তাঁরা বুঝি কিছু বোঝেন না। মানুষ চেনেন না। গুণগ্রাহিতার শক্তি নেই। বুঝিয়ে দিলে তবে বোঝেন। কিন্তু বারে বারেই দেখা যায় সেটা তাঁদের ভুল ধারণা।

তারাও শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করতে জানে, তারা কৃতজ্ঞ, তারা গুণীর গুণ, ত্যাগীর ত্যাগ, মহতের মহত্ত্ব সবই দেখতে পায়,—শুধু পারে না মঞ্চে উঠে বক্তৃতা করে সেকথা বলতে। তাই সব শতবার্ষিক স্মারকদিনে দেখা যায় সেই জনসমুদ্রের মধ্যেও তাঁদের ভক্ত গুণমুগ্ধ কম নেই। রামানন্দবাবুকেও তারা দেখতে পেয়েছে, দেখেছে তিনিও একজন দৃঢ় ও মহৎ চরিত্র-শক্তিসম্পন্ন বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন। যেমনধরণের মানুষ ১৮ শতক ও ১৯ শতকের শেষ অবধি দেশের আশ্চর্য্য ভাগ্যক্রমে বাংলায় ও ভারতবর্ষে দিকে দিকে অনেকজনই দেখা দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশে যাঁদের সকলেরই রাজা রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র অবধি—আশা ও আদর্শের ক্ষেত্র ও লক্ষ্য ছিল,—ধন নয়, ঐশ্বর্য্য নয়, বিলাস-বৈভবময় 'জীবনযাত্রার মান' বাড়ানো নয়,—('ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং' নয়) লক্ষ্য ছিল মানুষের ধর্ম চরিত্র কর্ম নানা গুণ ও জ্ঞানময় একটা মানবসমাজ গড়ে তোলা।

সেই স্বপ্নের অনেক 'সাধক'ই বাংলা দেশে তখন জন্মগ্রহণ ও কর্মসাধনা করেছিলেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তার একজন অন্যতম অনন্যসাধারণ যুগ-কর্ম-সাধক মানুষ।

অনেক দূর থেকে দেখে মনে, হয় সেই যুগটা আঠারো ও উনিশ শতকের অনেকটাই ছিল যেন ব্রাহ্মণ-ধর্মের ও ক্ষাত্রয়ধর্মের যুগ। চিন্তা কখনো শিক্ষা জ্ঞানময় আদর্শের—তেজের দীপ্তির অনায়াস ত্যাগের সেবাধর্মের এক প্রদীপ্ত উজ্জ্বল যুগ। যেখানে ব্রাহ্মণ্যতার স্বপ্নধারা, ত্যাগময় ধারা আর ক্ষাত্রবলিষ্ঠ উদার নির্ভীক ধারা পাশাপাশি চলেছিল।

যাদের আদর্শ ছিল, লক্ষ্য ছিল, মানুষের মানস-ঐশ্বর্য্য লাভ, মনের মুক্তিদান। সেবা করে শিক্ষা দিয়ে আনন্দ দিয়ে জাতিকে জাগিয়ে তোলা, জড়ত্ব মোচন, এবং এসেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র। জেগে উঠেছিল নব শিল্প লোকে অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখে। জেগে উঠেছিল মূঢ় মূক নারীসমাজ। বেঁচে ওঠার অধিকার পেয়েছিল সতীদাহের চিতা থেকে। জেগে উঠেছিল ক্ষুদ্র সমাজ শিক্ষায় ও জ্ঞানার্জনের সমান অধিকারে। বহু দোষগুণে সমাবেশিত ব্রিটিশ শাসন, খৃষ্টান সমাজের মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজের নব অভ্যুদয় সব নিয়ে সব থেকে যেন এক নূতন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যুগজাগরণ। যেখানে ব্রাহ্মণ্য ত্যাগের, জ্ঞানের চিন্তার কল্পনার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ক্ষাত্রয়-ধর্মের তেজস্বিতা ঔদার্য্য নির্ভীক অন্তরের এক আশ্চর্য্য যুক্তবেণী সঙ্গম হয়েছিল।

সে সময়ের প্রায় ঐ সব ক'জন মহামানবেই ঐ দুই ভাবের চিন্তাধারা কমবেশী পরিমাণে মিলেমিশে ছিল দেখা যায়। যে চিন্তা ও কল্পনায় স্বাধীনতালাভের একটা প্রবল আকাঙ্খাই যেন বিশেষভাবে ফুটে ছিল। এই স্বাধীনতার জন্য মানসিক আকাঙ্খা বা কিছু বিদ্রোহ মোগলসাম্রাজ্য যুগেও দেখা গেছে দু'চার জায়গায় কিন্তু সে বিক্ষিপ্তভাবে। রাজস্থানে উদয়পুর চিতোরে—প্রতাপ সিংহ থেকে রাজসিংহ অবধি—মহারাজা শিবাজীর মারাঠা অভ্যুদয়ে, শিখ অভ্যুদয়ে, আর বাংলার ছোটখাটো বারো ভূঁইয়া (বারো ভূস্বামী) রাজা প্রতাপাদিত্য, মহারাজা সীতারামের অভ্যুত্থানে। মুসলমান ঈশা খাঁও ছিলেন এঁদের মাঝে।

কিন্তু এই নব ব্রাহ্মণ্য যুগের নূতন চিন্তাতে রাজা মহারাজা জমীদাররা কেউ ছিলেন না; যাঁদের নিজ রাজ্য রক্ষা বা দিগ্বিজয় করা অথবা শুধু নিজেদের সম্পত্তি—রাজ্য-গ্রাম-দেশ নগরের ভাব নাই, ছিল মূলকথা, তাঁদের মত এঁদের চিন্তার ধরণ ছিল না।

সাধারণ নিঃস্ব মানুষ, এঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই অসাধারণ হয়ে দেখা দিয়েছিলেন, শুধু দেশের স্বাধীনতাকে ভালবেসে। যাঁদের তুলনা সব দেশেই কম। আমাদের দেশেতো আরোই কম। আগের আগের যুগে যাঁরা ধর্মসংস্কার নিয়ে দেখা দিয়েছেন। কখনো কখনো তাতে স্বাধীনতার বিদ্রোহও মিশেছে যেমন শিখ অভ্যুত্থানে গুরুগোবিন্দ সিংহের।

একালেও প্রথমে তা এসেছিল রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কারের বার্ত্তা নিয়ে। তার পরেই কিন্তু তা আর শুধু ধর্মের গণ্ডীতেই আটক রইল না। তাঁর চিন্তা দেশের কল্যাণ সমাজের—সংস্কারের পথে—শিক্ষার জ্ঞানের ধারায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

আঠারো-উনিশ শতকের মিলোনো ইতিহাস সেই সব মানুষের—সাধারণের মাঝে জন্মানো অসাধারণ মানুষের ইতিহাস। এ যুগের নতুন ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় তাঁরা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁদেরই অন্যতম একজন।

অথচ ঐ দু'শতাব্দীর কবি সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী সমাজসংস্কারকদের বিশেষ সংজ্ঞা ও কর্মজগতের কথায় একটী কোনো নামে তাঁর কোনো পরিচয় দেওয়া যাবে না। এটা যেমন বিচিত্র ও আশ্চর্য্য মনে হয় তেমনি এইটাই হল তাঁর বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট পরিচয়।

এই শ্রদ্ধেয় আশ্চর্য্য নীরব মানুষটী অর্দ্ধশতাব্দী ধরে যে কর্মধারা আদর্শধারা চিন্তাধারা প্রবাহিত করে

গেছেন আত্মপ্রচার না করে শুধু কয়েকখানি পত্রিকা বিশেষভাবে দু'খানি পত্রিকা সম্পাদন করে, যার তুলনা শুধু তিনি নিজেই ; তাঁর সঙ্গে অন্য কারুর তুলনা করা যাবে না। তাঁর প্রথম সম্পাদিত পত্রিকা ছিল 'দাসী'। কলিকাতা দাসাশ্রম থেকে প্রকাশিত হত। সে পত্রিকা আমরা দেখতে পাই নি। নামে ও আদর্শে তার ভাব ছিল 'সেবিকা'র 'সেবার'। তাই নামও দেন 'দাসী'। তারপরে সম্পাদনা করেন 'প্রদীপ' নামে একখানি মাসিক পত্রের। সেখানি আমরা দেখেছিলাম সুদূর রাজস্থানের প্রবাসের বাড়ীতে। তাতেই বোঝা যাবে তাঁর 'প্রদীপে'র প্রচার ও সমাদরও কত দূরে ছিল। প্রবাসীর মত এ পত্রিকাও সচিত্র ও সুদৃশ্য ছিল।

১৩০৮ সালে বাড়ীতে দেখি 'প্রবাসী'। এই 'প্রবাসী' যেমন তাঁর গৌরবের নিশান ছিল, তিনিও তেমনি 'প্রবাসী'র গৌরবান্বিত সম্পাদক ছিলেন।

এরপর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হল 'মডার্ণ রিভিউ', যেন সব্যসাচীরূপে সম্পাদক মহাশয় ইংরাজী ও বাংলায় সমানভাবে তাঁর আদর্শ সত্য, ধর্ম, দেশ, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প সব এক করে দেশবাসীর সামনে মাসের পর মাস আশ্চর্য্য সমাবেশে সমারোহে এনে দিতে লাগলেন। তখন ১৩১৪।১৫ বাংলা সাল অর্দ্ধশতাব্দীরও আগের যুগ। সেকালের পাঠকসমাজে সে যে কি পরমপ্রাপ্তি কি দুর্লভ আনন্দ পরিবেশণ তা যাঁরা সেই সেকালের স্বল্পসমৃদ্ধ স্বল্পসংখ্যক বাংলা সাহিত্যের পাঠক ছিলেন তাঁরা জানেন।

মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গদর্শন' প্রশস্তি 'রাজবৎ সমারোহময় প্রবেশ' বলেছিলেন 'বঙ্গদর্শনের' প্রকাশের কথায়। ("আধুনিক সাহিত্য" বঙ্কিমচন্দ্র) মহাত্মা গান্ধীর একটী উক্তি শোনা যায়—তাঁকে কে জিজ্ঞাসা করেন, 'তাঁর বাণী কি' তাতে তিনি নাকি বলেন, "আমার জীবনই আমার বাণী"।

রামানন্দবাবুকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি কি বলতেন জানিনা। তখন এত বাণী নেবার হুজুগও ছিল না, এবং সম্ভবতঃ তিনি 'বাণী' দিতে অভ্যস্ত ছিলেন না।

কিন্তু আমরা আজ বলতে পারি তাঁর জীবন ও জীবনের সাধনার 'মর্মবাণী' বহন করে এনেছে তাঁর "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ"। তিনি ওই দু'খানি পত্রিকার সম্পাদনেই বেঁচে আছেন চিরকালের আদর্শ সাহিত্যপত্রে, সাহিত্য-জীবনে, সমাজ-জীবনে, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, মানুষ, শিল্প, সব নিয়ে এক করে। তা থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না। 'প্রবাসী' বা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাই এক দেহে 'হরিহর'। পৌত্তলিক উপমায়।

আমরা তাঁর পত্রিকা দুটী থেকেই তাঁর পরিচয় এবং তাঁর উদ্দেশ্য তাঁর আদর্শ ও আশার লক্ষ্য দেখতে পাই। তাঁর উক্তি তাঁর আলোচনা "বিবিধ প্রসঙ্গ"ই তাঁর জীবন চরিত। আমরা সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা যারা কখনো তাঁকে চিনতামনা, দেখিনি, জীবনকথাও জানা ছিল না, তারা তো ঐ 'প্রদীপ' 'প্রবাসী' আর 'মডার্ণ রিভিউ'তে তাঁর একটী মনোময় জ্ঞানময় সত্যময় পরিচয় ও তার পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি দেখেছি। ব্যক্তি মানুষটাকে দেখবার বহু অনেক আগেই সে দেখা।

"প্রবাসীর সূচনা। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা প্রবাসী প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম। বঙ্গদেশ হইতে দূরে থাকায় কি লেখা কি ছবি কি ছাপা সকল বিষয়েই আমাদের অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় যদি লেখক এবং পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই তবে আমাদের চেষ্টা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে।

"প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্য্যের বিচার হওয়া ভালো। এইজন্য আমরা আপাততঃ

আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।” প্রবাসী বৈশাখ ১৩০৮। প্রথম ভাগ। প্রথম সংখ্যা।

এই হল প্রবাসীর সূচনার আশা ও উদ্দেশ্য। তাঁর এই আশা যে তখনি সার্থক হয় তা দেখা গেল প্রথম প্রকাশের পরই। প্রবাসী এত সমাদৃত হল যে তার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হল। (শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে ১৩৭২)

কিন্তু “প্রবাসী” সম্পাদক মহাশয় ১৩০৮ সাল থেকে যখন এই তাঁর অপরিমেয় সাহস ধৈর্য্য আগ্রহ নিয়ে ‘সত্য শিব সুন্দরের’ পথে যাত্রা করেছিলেন, তখন তাঁর লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণভাবে পান নি। সবাই জানেন রবীন্দ্রনাথ তখন ‘সাধনা’ ও ‘বঙ্গদর্শন’ সম্পাদনা করছেন। ‘ভারতী’তেও আছেন। কবিতা প্রবন্ধ ‘চোখের বালি’, ‘নৌকাডুবি’ উপন্যাস গল্প নানা লেখা প্রায় সবই ওই তিন পত্রিকাতেই বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে দু একটী কবিতা (সব ঠাঁই মোর ঘর আছে) প্রবাসীতে দেখা গেছে।

‘প্রবাসী’ সম্পাদক মহাশয় তখন পরিচিত হয়েছেন কবির সঙ্গে এলাহাবাদেই। এদিকে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ সুরু হয়ে গেছে—বাংলা ১৩১০।১১ থেকে। প্রবাসীতে ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ নানা মন্তব্য তো ছিলই, তা ছাড়া যোগেশচন্দ্র রায়, রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ গভীর দেশপ্রেমিক মনীষী মনস্বী চিন্তাশীল লেখকদের রচনা তিনি পেয়েছিলেন। কবি দেবেন্দ্রনাথকে ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিদেরও পেয়েছিলেন তাঁর প্রবাসীর পাতায়,—তাঁর সাহিত্যসেবার সমাজসেবার শিক্ষালোকের পাশে। এরপর ১৩১৪ সালেই রবীন্দ্রনাথের বড় গল্প ‘মাষ্টার মশাই’ প্রকাশিত হল প্রবাসীতে (বৈশাখের)। তারপর ঐ বছরের ভাদ্র থেকে ‘গোরা’ প্রকাশিত হতে থাকে ১৩১৬ সাল অবধি। এই সময়ের প্রবাসীতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কয়েকটী মধুর স্বদেশী গল্প ও সরস অন্য গল্পও বেরিয়েছে। তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা গান প্রবন্ধও তখন ‘প্রবাসী’তে প্রায় নিয়মিত বেরিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ‘প্রবাসী’র পাতায় এসে দাঁড়াবার আগেই ‘প্রবাসী’ সম্পাদক মহাশয় ‘প্রবাসী’কে স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমায় বিস্তৃত সাহিত্য লোকে শিল্প জগতেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তখনি ‘প্রবাসী’ প্রবাসে উত্তর ভারতে দিল্লী রাজস্থানে পাঞ্জাবের বাঙালীর ঘরে পরম সমাদৃত স্থান পেয়েছে জানি, কি পুরুষ কি নারীসমাজে।

সেই সময়ের স্বদেশীযুগের বঙ্গবিভাগের আন্দোলনের দিনেও তাঁর যেসব সুচিন্তিত মন্তব্য ও বিবিধ প্রসঙ্গ চোখে পড়ে, তাতেও বোঝা যায় সম্পাদক মহাশয় একলাই চলেছেন; যেমন তাঁর সম্পাদকীয় রচনাতে, তেমনি অনন্যভাবে তাঁর সম্পাদকীয় বৃহৎ কাজ—প্রকাশের বিষয়বস্তু নির্বাচনেও—সাহিত্য, কলা, রাজনীতি নিয়ে।

স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁর সেই সময়ের উক্তি চোখে পড়ে। সেই উন্নত আদর্শ এখনো তেমনি দরকার আছে।

বলেছেন “দেশে যে স্বদেশভক্তির হাওয়া বহিতেছে সন্দেহ নাই...। স্বদেশ কথাটী দুটী শব্দের সংযোগে গঠিত হইয়াছে মনে হয়। ‘স্ব’ এবং ‘দেশ’ যাঁরা ‘স্ব’ এর উন্নতি করিতে পারেন না তাঁরা দেশের উন্নতি কেমন করিয়া করিবেন?” নিজে ভাল না হইলে যেমন দেশের কাজ করা যায় না, তেমনি প্রাণের সহিত দেশের কাজ করিতে গিয়াও মানুষ বদলাইয়া যায়, মানুষের ‘স্ব’ বদলাইয়া যায়। ..সকলে মনে রাখিবেন আমাদের প্রধান কাজ দেশের বর্ত্তমান অবস্থার—প্রতিজ্ঞা রক্ষা। ইহার জন্য চরিত্রের সামাজিক রীতি নীতির প্রথার যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা অবিলম্বে করিতে হইবে।

(‘প্রবাসী’ মাঘ ১৩১২)

বলা যায় এই আদর্শরক্ষার কাজ আরো বেশী দরকার হয়ে পড়েছে। অন্ততঃ প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় থাকলে তাই বলতেন।

১২৯৯ সালে 'দাসী' পত্রিকার প্রস্তাবনাতে যা দখেন তাতে ও তাঁর সমাজের কল্যাণ ও সেবার ভাবই ব স্পষ্ট। বলেন, 'বঙ্গসাহিত্য সংসারে মাসিক ত্রিকার অভাব নাই তবু আমরা কেন আর একখানি দ্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছি এই প্রশ্ন সকলেই জ্ঞাসা করিতে পারেন। রাজনীতি সাহিত্য ইতিহাস স্নতত্ত্ব বা বিজ্ঞানের অনুশীলন আমাদের উদ্দেশ্য হে। বঙ্গীয় পুরুষ ও রমণীগণের মধ্যে সেবার ভাব াগাইয়া দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।...উচ্চাভিলাষ । যশোলিপ্সায় আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। দাসী নিজ শক্তি অনুসারে মানবসেবায় নিযুক্ত াকিবে।. বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে স্বার্থপর রিয়া ফেলে। বিলাসীরা প্রতিবেশীর আর্ত্তনাদ নিতে পায় না।...

'দাসী' যেন এই মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে।

('দাসী' আষাঢ় ১২৯৯)

ঐ সময়েই মনে হয় তিনি দেখেছিলেন সেবার ব জাগাতে গেলেও শিক্ষা ও নানারকম ভাবের ানের প্রেরণা আদর্শও দরকার,—মানুষকে উদ্বুদ্ধ ার জন্য।

তারপরই 'প্রবাসী'র আবির্ভাব। আর সেই প্রথম খ্যার আয়োজনেই তাকে একটী আদর্শ পত্রিকায় া দিয়ে তিনি দেশবাসীর সামনে এনেছিলেন।

প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ, কবি দেবেন্দ্রনাথ নের কবিতা, আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ, নেন্দ্রমোহন দাসের রচনা বিবিধ প্রসঙ্গ আর অজন্তা াবলী, (যা তখন সাধারণ মানুষের প্রায় অজানা ত্রকলা) প্রবাসী বাঙালীর কথা কান্তিচন্দ্র খাপাধ্যায়ের (জয়পুর প্রধান মন্ত্রী) তাঁর ও জয়পুর াজার ছবি নিয়ে 'প্রবাসী'র আবির্ভাব হল।

প্রচ্ছদের ছবিটাতেও নতুনত্ব ছিল। মঠ মন্দির ত্য বিহার তাজমহল শিখ ধর্মমন্দির প্যাগোডা দ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের স্থাপত্য নিদর্শন নিয়ে পরিষ্কার কাগজ ও ছাপা। আর বার্ষিক দক্ষিণা ২·৫০ পঃ (আড়াই টাকা মাত্র)।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "প্রথম যখন রামানন্দবাবু 'প্রদীপ' পরে 'প্রবাসী' বের করেন মনে বিস্ময় লাগল আকারে বড় ছবিতে অলঙ্কৃত, রচনায়। বিচিত্র, এমন দামী জিনিষ যে বাংলাদেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয় নি"।

অবনীন্দ্রনাথও তার কত কাল পরে বলেন, "সচিত্র মাসিকপত্র বার করার কথা এসেছিল আমাদের অনেকের মনে, কিন্তু সে পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ার সন্দেহ নিয়েই আসত সে ভাবনা; তাই যখন রামানন্দবাবু ছবি ছাপানোর কথাটা আমার কাছে পাড়লেন, তখন তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েতে পরিপূর্ণ সংসারটীর দিকে চেয়ে আমি বলেছিলাম, "কাগজটী চালাতে গিয়ে বিপদে না পড়েন শেষে।"

"..................আমরা আর্টিষ্টরা বিনা পয়সায় তাঁর দৌলতে দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি শুধু তা নয়, দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনো। তখন কোথায় ছিল নব যুগ, কোথায় 'বঙ্গবাণী', ভারতবর্ষ, কোথায় বসুমতীর পুরস্কার ....।"

(প্রবাসী ১৩৩৩ বৈশাখ)

এককথায় রামানন্দবাবু যেন লোকগুরু, লোক-শিক্ষক। তাঁর চোখের আড়াল দিয়ে সমাজের অভাব ত্রুটী কোন কিছু এড়িয়ে যাবার যো ছিল না। 'শিক্ষার উদ্দেশ্য' বলে যে বিবিধ প্রসঙ্গে বলেন, তাতেই তাঁর চিত্তের কল্পনার ও দৃষ্টির বহুমুখীতা দেখা যাবে।

তাঁর নানা বিষয়ের আলোচনার সেই উক্তিগুলি থেকেই মানবসেবী, সাহিত্যসেবী, সমাজসেবী রামানন্দ বাবুর একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু সবটা নয় তবু।

নিবেদিতার উক্তি। ভগিনী নিবেদিতা বাংলা জানতেন না। কিন্তু প্রবাসীর সব খোঁজই তিনি

রাখতেন। মডার্ণ রিভিউতে চিত্র পরিচয় ও নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

এক সময়ে ক্ষিতিমোহন সেনকে তিনি বলেছিলেন, "গৃহলক্ষ্মী যখন ঘরের কোণে প্রদীপটি জ্বালেন তাতে ঘরের কাজের মতই আলোর মতই আলোর ব্যবস্থাও করেন। ...কিন্তু এই যে প্রদীপটি জ্বলিয়াছে, দেখিলাম তাহার অপরিসীম শক্তি। ...ঐ ব্যক্তিটী এখন শুধু বাংলার সুখ-দুখ নিয়ে ব্যস্ত আছেন; এমন একদিন আসবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনা প্রকাশের ভার লইবেন। বিধাতা তাঁহাকে সেই যোগ্যতা দিয়াছেন। ..এই প্রদীপখানি একদিন ঘরের বাহিরে আকাশ প্রদীপ হইবে। আলোক স্তম্ভের মহাদীপের মত তার শক্তি ।"

(পৌষ। প্রবাসী ১৩৫০ পৃঃ ২৬৮)

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'প্রবাসী' সম্পাদক যা বলেন তাও এখানে তিনি তাঁর শিক্ষা বলতে কি বোঝায় তাঁর অভিমত ও গভীর এবং বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য,—লেখাপড়া শিল্প বার্ত্তা কলা ইত্যাদির যতকিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে তাহার প্রত্যেকেরই একটা ধারা আছে, যাহা পুরাতনকে আশ্রয় করিয়া নূতন পথে প্রবাহিত হইয়া চলে । সুতরাং শিক্ষা ব্যাপারটা শুধু কেবল নিস্ক্রিয়ভাবে পুরাতনকে গ্রহণ নয়,...যাহা সুন্দর, যাহা মহৎ তার চর্চা ও সমালোচনায় মানবচিত্ত ও নরচরিত্র সুন্দর ও মহৎ হইবার অবকাশ পায়। সুন্দর ও মহৎ (বিষয়) সৃষ্টি করিতে পারে বা উপলব্ধি করিতে পারে ...।

"শিক্ষায় চিন্তাশক্তি জন্মে ... অতীত ও বর্ত্তমানকে আত্মপ্রত্যয় যাচাই করিয়া চলিতে চলিতে ভবিষ্যতের রাজপথ প্রস্তুত হয়—প্রতিষ্ঠায় দর্পরথও অবাধে চলিবার উপায় হয়।"

বলেন, "গত আগষ্ট মাসের শেষে কেম্ব্রিজ সহরে যে 'শিক্ষায় নব আদর্শ সমিতি'র (দি সোসাইটী ফর নিউ আইডিয়াল ইন এড্‌ুকেশন) অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে আলোচনার বিষয় ছিল, সৃজনী-শক্তি ও শিক্ষায় তাহার স্থান—

মন ও শরীরের উপর হাতের কাজের প্রভাব; অঙ্কনশিক্ষার কাল্পনিক দিক; সঙ্গীতে জাতীয়তা; শিল্প ও কারিগরী-বৃত্তির শিক্ষাসম্বন্ধীয় মূল্য; অভিনয়-বৃত্তির অনুশীলন; এইসব বিষয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে মণীষী বলিয়া সুপরিচিত লর্ড লিটন্, লর্ড হ্যালডেন, স্যার স্যাডলার, শিল্পী গোটেন ষ্টাইন প্রভৃতি আলোচনা করেন।

ইউরোপে ছাত্রছাত্রীদের অভিনয় করানো শিক্ষার একটা অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। অভিনয়ে উচ্চারণ স্পষ্ট হয়, বাক্যের জড়তা দূর হয়, সঙ্গীত অভ্যাস হয়, মুখস্থ করার শক্তি বাড়ে, শিল্প ও সাহিত্যের উপর অনুরাগ ও রসবোধ জন্মে।

আমাদের দেশের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পদ্ধতিতে ছাত্রদের শিক্ষাকে আনন্দ ও উৎসাহে পরিণত করিয়াছেন।"

(প্রবাসী ১৩২৬ কার্ত্তিক)

রামানন্দবাবু দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে শিক্ষিত দেখতে চেয়েছিলেন। আমাদের নিজেদের মনে আছে, তখন প্রবাসে বসে 'প্রবাসী' পড়ি। 'প্রবাসী'তে একবার বেরেছে গরমের ছুটীতে ছেলেদের গ্রামে গিয়ে অন্ততঃ একটি দুটি নিরক্ষরকেও অক্ষরপরিচয় করানোর কথা, পাঁচ-দশজন ছেলেমেয়ে যদি একটি করেও মানুষকে শুধু বর্ণ পরিচয় করিয়ে দেন, তাহলে দেশের নিরক্ষরতা দূর করার একটা উপায় হয় ...।"

এই অভিনব অভিযানের ইঙ্গিত 'প্রবাসীর' পাতায় পূর্ব্বেও দেখেছি। 'প্রবাসীর' বিবিধ প্রসঙ্গের ওপর আমাদের অসীম শ্রদ্ধা। তারপর একটি ক্ষুদ্র ঘটনা। ১৩২৬ সালে জয়পুরে আছি। বাড়ীতে একটা উৎসব উপলক্ষে দু'চারজন খুড়িমা পিসিমা জড় হয়েছেন।

তাঁদের সঙ্গে দুটী বাঙালী আর উড়িয়া ভৃত্য এসেছে তাঁদের ছেলেমেয়েদের কাজের জন্য।

সারাদিন তারা নানাকাজে ব্যস্ত থাকে। গরমের দিন। ছাদে শোওয়া উত্তর পশ্চিমের গরমে। সারি সারি 'নেওয়ার' আর দড়ির খাটিয়ায় বিছানা পড়েছে। বিদ্যুৎ তখনো সেদেশে নেই। হেরিকেনের যুগ।

'প্রবাসী' এসেছে বৈশাখ মাসের। হেরিকেন আলো নিয়ে নিজের পড়াশোনা গল্প সেলাই হচ্ছে। কি মনে হয়ে অকস্মাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। কিশোর বাঙালী ভৃত্যটিকে ডাকলাম। একখানি বর্ণ পরিচয় প্রথমভাগ নিয়ে। খোকা তো তার মার কাছে ঘুমোচ্ছে। আয় তোকে 'অ আ' শেখাই। সে খুব খুশী এবং লজ্জিতও। বুঝি ভাবছে বড় হয়ে গেছে। তারপর পড়া শুরু। আজ শেখাই 'অ আ ই ঈ' কাল ভুলে যায়।

অবশেষে বেশ কয়েকদিন পরে 'অজ-আম-কর-খল-অচল-আসন' ইত্যাদিতে পৌছলাম তাকে নিয়ে। কিন্তু সেকি কৌতুকময় পড়া ও বয়স্ক পড়ানোর অভিজ্ঞতা।

জিজ্ঞাসা করি বইয়ে আঙুল দিয়ে 'হরি বল্ এটা কি?'

সেও অপ্রস্তুত মুখে বলে 'হরি বল্ এটা কি?'

একছাদ মেয়েরা হেসে ফেলে। আবার বলি, 'এই অক্ষর এই কথাটা কি বল্? অজ বল্। অ আর বর্গীয় 'জ'।' সে আবার ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকায়। বুঝতে পারে না। শুধু 'অজ' বলবে, না সবশুদ্ধ বলবে 'হরি এটা অজ। 'অ' আর 'জ'।

যাই হোক মাসতিনেকে তার প্রথম ভাগ পরিচয় হয়েছিল। দ্বিতীয় ভাগ শুরু হল। কিন্তু অভ্যাগতরা ফিরে গেলেন।

বছর দুই পরে কলকাতার বাড়ীতে এসে দেখি সে দ্বিতীয় ভাগ পড়তে শিখেছে। তারপর আরো বছর কতক পরে দেশ থেকে ফিরে এলো বিয়ে করে। চিঠি আসে হরির। এবং চমৎকৃত হয়ে দেখি হরির বৌকে চিঠি লেখে।

আনন্দিত আশ্চর্য্যে বললাম 'পড়তে পারিস? বুঝতে পারিস চিঠির অক্ষর?'

সে সলজ্জে হেসে ঘাড় নাড়লে।

এখন মনে হচ্ছে, প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের উপদেশ শোনা ও কাজে লাগানোর কাজ প্রথম উৎসাহিনী অনুসারিণী মেয়ে আমিই হয়ত—মেয়েদের মধ্যে। কিন্তু নিজে থেকে তো ওটা আমার মনে জাগেনি, 'প্রবাসী' থেকেই ওই ইচ্ছাটি পাওয়া।

আর এখন ভাবি প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় বেঁচে থাকতে যদি এই ক্ষুদ্র একটি নিরক্ষরকে সাক্ষর করার অভিযান-কাহিনীটা তাঁকে শোনাতে পারতাম, না জানি হয়ত একটা সার্থক আনন্দিত কৌতুকে তিনিও এই অন্তঃপুরবাসিনী তাঁর প্রবাসীর ভক্ত-অনুরাগী পাঠিকা একজন মেয়ের কথা শুনতেন। কিন্তু আসলে আমার এটা নিজের কথা বলা নয়, এটা হল আমাদের সেকালের অন্তঃপুরেও প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও আলোচনাগুলি কত গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, প্রেরণা জাগাতে তারই একটা নিদর্শন।

তাঁর যুক্তিময় দেশ ও দেশবাসীর জন্য গভীর ভালবাসা ও চিন্তাময় ইঙ্গিতগুলি অন্তঃপুরেও সেকালের ধরণে সামান্য লেখাপড়া জানা গল্পপড়া মেয়েদেরও দেশের কথা ভাবতে শেখাত। যে অস্পষ্ট অজানা ভালবাসা প্রথম ছোটবেলায় জেগেছিল 'আনন্দমঠ' পড়ে —সন্তানদের কথা পড়ে দেশের জন্য। সেসময় দেশ কাকে বলে তার ইতিহাস ভূগোল মানুষ কি তাই জানি না।

ভাষা নিয়ে, দেশপ্রেম নিয়ে, নারী শিক্ষা ও নারী রক্ষা সম্পর্কে ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক বিষয় ও প্রতিভা নিয়ে সাহিত্য, শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল, রাজনীতি সমাজনীতি-কোনটা নয়, সব বিষয় নিয়েই তাঁর আলোচনাতে 'প্রবাসী'র পাতা ভরা। 'প্রবাসী' যে

সমৃদ্ধ ও আদর্শ পত্রিকার স্থান অধিকার করেছিল, তার পিছনে একটীমাত্র মানুষের সত্যনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম, সমাজসেবার বিস্তৃত ও গভীর আদর্শ ছিল। যিনি একটা প্রতিষ্ঠান বিশেষ। এখনো পুরোনো প্রবাসীর পাতায় পাতায় ঐ মহৎ আদর্শের গভীর দৃষ্টির ইতিহাস ছড়ানো আছে। মহামানবদের বিশেষ মানুষদের উপর শ্রদ্ধা ছড়ানো আছে।

রামমোহন রায় সম্বন্ধে তাঁর মৃত্যু শতবার্ষিকী স্মরণের দিনে বলেছেন, "আজ থেকে একশ একষট্টি বছর পূর্বে বাংলাদেশে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙালীর ভারতীয়দের সকল মানবজাতির যে সর্বাঙ্গীন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহা বাস্তবে পরিণত করিবার জন্ম চিন্তা অর্থব্যয় এবং স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং উৎপীড়ন ও লোকনিন্দা সহ্য করিয়াছিলেন তাহা তাঁর নিজের প্রতিভা ও চিন্তাপ্রসূত। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন সে যুগে সেই আদর্শ সেই সময়ের পক্ষে অনন্যসাধারণ ও বিস্ময়কর। কল্যাণের আদর্শ সাধনায় কোনো কোনো অংশে তাঁর অপেক্ষা শক্তিমান ও কৃতী অবশ্য তাঁহার পূর্বে ও পরে জন্মগ্রহণ করেছেন।...

"কল্যাণের আদর্শ অখণ্ড। দেশের মঙ্গল জাতির মঙ্গল কোনো একদিকে করিতে হইলে অন্য সকল দিকেও করা আবশ্যক। ধর্মে সামাজিক প্রথায় শিক্ষায় জ্ঞানে আচার ব্যবহারে সাহিত্যে ললিতকলায় পণ্য শিল্পে আর্থিক রাজনীতিক কৃষি-বাণিজ্য সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের উন্নতি আবশ্যক...। তাঁর সকল চেষ্টার মূলে এই বিশ্বাস ছিল, যে, মানবে প্রীতি ও মানবের মঙ্গল সাধনের চেষ্টাই ভগবৎ ভক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন ও তাঁর সেবার শ্রেষ্ঠ উপায়...।

"সহমরণ বিষয়ে তাঁর একটা পুস্তিকায় তিনি নারীদের উচ্চতম জ্ঞানলাভের অধিকার সাহস ধৈর্য্য সংযম চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রমাণ করিয়াছেন।

"মানুষের হৃদয় মনের ঐশ্বর্য্য—ভাব ও চিন্তা তাহার সম্পদ...। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবী নাম জড়-পিণ্ডের অংশ ছিল বটে, কিন্তু জাগতিক মানব ঐশ্বর্য্যে ভারতীয়দের অধিকার ছিলনা লইতে পারিত না...। রামমোহন রায় নিজেই ইংরেজীর সাহায্যে শুধু ব্রিটিশের নহে অন্য পাশ্চাত্যের ভাবে ও চিন্তায় অংশী হইতে পারিয়াছিলেন।

...রামমোহনকে আধুনিক ভারতের জনক বলা হয় তাহার এক কারণ তিনি ভারতবর্ষকে আধুনিক হইবার পথে আনেন।...

অন্য কারণ, তিনি যুগপ্রবর্ত্তক। তিনি আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ধার্মিক অর্থনৈতিক শিক্ষাবিষয়ক বহু প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক।

জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কে লেখেন, "কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন এ বৎসর আমাদের দেশে সর্বপ্রধান স্বদেশী ঘটনা কি ঘটিয়াছে তাহা হইলে আমরা কি উত্তর দিব? বিলাতী চুড়ী ভাঙ্গা নয়, বিলাতী কাপড় পোড়ানো নয়, পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের পরাজয়ও নয় এমন কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনও নয়,—সর্ব প্রধান স্বদেশী ঘটনা বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ-চন্দ্র বসুর "উদ্ভিদের সাড়া" (Plant Response) নামের গ্রন্থ প্রকাশ।

আমাদের মানসিক পরাধীনতাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয় যাহা আমাদের কোনও স্বদেশবাসীর মানসিক শক্তির অসাধারণতা প্রমাণ করে, তাহাই হইল গুরুতম স্বদেশী ঘটনা।" (১৩১৩ ভাদ্র প্রবাসী)

ভারতের প্রাচীন গৌরবের কেহ অমর্য্যাদা করিলে তিনি ভারতহিতৈষীদের মুখেও তাহা সহ্য করিতেন না। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, কোনো সাংবাদিক মিসেস বেসান্টের জবানীতে মাদ্রাজ মেল পত্রিকায় ভারতে ব্রিটিশ গণতন্ত্রবাদের যুক্তিযুক্ততা নিয়ে কিছু বলেন, রামানন্দবাবু সেই প্রসঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে সুরু করে নানা যুক্তি দেখিয়ে এই উক্তির বিরুদ্ধে লিখলেন; তখন ভারতীয় সাংবাদিকমহলে সাড়া পড়ে গেল।

ভাষার সম্পর্কেও সেই সেকালেও 'প্রবাসী' সম্পাদকের বক্তব্য যেমন স্পষ্ট ও সত্য তেমনি জাতীয়তাবাদী। তিনি বলেছিলেন "কোনো একটী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সংকল্প করিলে তাহা যত বৃহৎ আয়তনের দেশ জুড়িয়া প্রচলিত হয় ততই তাহার উন্নতির পথ মুক্ত হয়। সংস্কৃতভাষা এইরূপ শ্রীশালিনী হইল কেন? তাহার কারণ ভারত বর্ষের সকল প্রদেশের মনীষীগণ এই ভাষার উপকরণ জোগাইয়াছেন। ইংরাজ প্রভাবে বাংলাসাহিত্যে অসামান্য পুষ্টি হইয়াছে। আশা করা যায় গবর্মেণ্ট স্বচেষ্টায় এই গতিমুখ ফিরাইয়া ইহার বহু আশাময় উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবেন না"।

(প্রবাসী ১৩১২ বৈশাখ)

(এই কথা মনে হয় এখনকার গবর্মেণ্টকেও বলা যাবে।)

অন্যত্র বলেছেন, "সাহিত্যে যেমন জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব পড়ে তেমনি জাতীয় প্রকৃতিও প্রতিফলিত হয়...। সাহিত্যকে রূপ দিতে হইলে তাহাতে সকল শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জীবনের ছবি থাকা চাই।

ভাষা ও দেশ সম্বন্ধে আরেক জায়গায় বলেছেন, একটা জার্মান লেখকের উক্তি আছে "আমাদের জার্মানদের দেশ কোথায় সে কি শুধু গ্রাম বা স্বদেশে? না, যেখানে যেখানে জার্মান ভাষায় কথা বলা হয় সেই সব জায়গাই আমাদের দেশ"।

সাময়িকপত্রের সাহিত্যের কথাতে বলেন (১) সম্পাদনা ও পরিচালনা (২) আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা বলে আরো বলেন "বিভিন্ন বিষয়ে লেখার জন্য একটী লেখকগোষ্ঠী তৈরী করা ও তাঁদের পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন...। কিন্তু সে সময়ে তিনি 'প্রদীপে'র সম্পাদক। নিজের পত্রিকায় তিনটী বিষয়ই পরে তাঁর হাতে সার্থকতা পেয়েছিল দেখা যাবে। 'প্রদীপ' তাঁর নিজের কাগজ ছিল না।

দেশপ্রেমের কথায় বলেন, "দেশ কি সকলের উপরে?.. স্বদেশ স্বজাতি অপেক্ষা ও জগৎ ও মানবজাতি বড় এবং ভগবান ও ধর্ম সকলের উপরে একথাও ভুলিলে চলিবে না। স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে ধর্মের কোনো বিরোধ নাই।...সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যাহা ধর্মসঙ্গত নহে তাহা দ্বারা কল্যাণ হইতে পারে না। যাহাতে অপরের অনিষ্ট ও অকল্যাণ হয় তাহাতে আমাদের কল্যাণ হইতে পারে না"।

(জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫)

মানুষ হওয়া। "আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা না জন্মিলে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। অথচ সকল শ্রেণীর লোকের সচেষ্ট না হইবার কারণ অনেক রহিয়াছে। ভারতবাসীর মধ্যে ধর্মোপদেষ্টা কবি বৈজ্ঞানিক শিল্পী ঐতিহাসিক যোদ্ধা বলিয়া দেশেবিদেশে যাঁরা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কাজগুলি তাঁহাদেরই করিতে হইয়াছে।—নিজের শক্তি প্রতিভা চেষ্টা চিন্তা অধ্যবসায় নিজের সাহস তপস্যায় তাঁহারা কৃতী ও কীর্তিমান হইয়াছেন।

একজন মানুষের মানুষ হইবার যে পথ এক একটা জাতিরও মানুষ হইবার সেই পথ। মানুষ নিজেই নিজের প্রদীপ, অবলম্বন যষ্টি অপরের অনুগ্রহ কামনা মনুষ্যত্বলাভের প্রধান অন্তরায়। আমাদেরও মানুষ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা।"

(প্রবাসী ১৩২১ ফাল্গুন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন। "প্রবাস" শব্দটী প্রাচীন। 'প্রবাসী' শব্দটীও পুরাতন। সুতরাং এই মাসিকপত্রটীর নাম দিবার পূর্বে এই নামটী রচনা করিতে হয় নাই। অন্য নামের বিষয়ও চিন্তা করিয়া ছিলাম। শেষে এই নামই রাখা স্থির করিলাম। পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই লোকমুখে ছাপার অক্ষরে এই নামটীর যত ব্যবহার হইয়াছে আগে ততবার ৩৫ বছরে কখনো হয় নাই। অতএব প্রবাসী প্রবাসীবাঙালী প্রভৃতি কথার প্রচলনের দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিতে পারি না। ইহার উপর আর একটী তর্ক আছে, ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, তার যেখানেই

থাকি তাহা প্রবাস নহে। একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও কথা হয় তিনিও 'প্রবাস' নামের পক্ষপাতী নন। "প্রবাসী' নামে যতই আপত্তি উত্থাপন করি না কেন স্বীকার করতে হবে বাংলাদেশ আমাদের আপন দেশ, মাতৃভূমি, বাংলাভাষা আমাদের মাতৃভাষা। প্রতি বৎসর এই সম্মেলন আমাদের এই কথাটা নতুন করে যেন মনে করিয়ে দেয়। এ দেশকে আপন মনে করব আমরা, কিন্তু জন্মভূমি যে সকল দেশের চেয়ে বড় তা ভুললে চলবে কেন।

আমরা অনেক স্ত্রীলোককে 'মা' বলে সম্বোধন করি। তাদে মাতৃত্বের গৌরব বৃদ্ধি পায়; কিন্তু যে মা পেটে ধরেছেন সে মা কিন্তু অন্য মা'দের চেয়ে একটু পৃথক, সে জননী, শুধু মা নয়। বাঙলা জননী একথাটা মনে রাখা বড় দরকার।...

দূরদেশে থাকলে কি হবে মার টান বড় টান।

তাই বলছি আজ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন বাঙালীর অন্তরতম ঐক্য যে আছে সপ্রমাণ করবে।

সাহিত্যে বাঙালী আপনাকে প্রকাশ করেছে বলেই সে আপনার কাছে আর আপনি অগোচর নেই। যেখানে যাক্ এই আত্মানুভূতিতে তার গভীর আনন্দ বৎসরে বৎসরে নানা সম্মেলনীতে বারবার উচ্ছ্বসিত হচ্ছে।"

(প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৪২)

নির্ভীক দেশপ্রেমিক রামানন্দ। ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ। তিনি জে টি স্যাণ্ডারল্যাণ্ড রচিত ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ বইখানির ১৯২৮, ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

কিন্তু সরকার তার প্রচার বন্ধ করে দিলেন। গোয়েন্দা পুলিশ অকস্মাৎ ২৪ মে ১৯২৯ তারিখে প্রবাসী অফিস এবং সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ী খানা-তল্লাসী করে যতগুলি ঐ বই পেল সবই নিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসীর ও ঐ বইয়ের প্রকাশক এবং মুদ্রাকর সজনীকান্ত দাসকেও গ্রেপ্তার করল। পরবর্তী ৬ই জুন তারিখে রামানন্দবাবু নিজেও ঐ প্রকাশকের জন্য রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হলেন। গান্ধীজী তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' এ বিষয়ে মন্তব্য করেন, "কোনো ভারতীয় যত বড়ই হোক না কেন তাহার মাথাও মাঝে মাঝে নত করে দিতে হবে। পাছে সে নিজের অবস্থার কথা ভুলে যায়।"

যথাসময়ে বিচার হ'ল। 'প্রবাসী'র সত্ত্বাধিকারী রামানন্দবাবুর এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশকরূপে সজনীবাবুর দুইহাজার টাকা জরিমানা হ'ল। সজনীবাবু বলেন, এই সময়ে রামানন্দবাবুর যে চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখেছেন তাহার তুলনা নাই।

হিন্দু মহাসভার ব্রাহ্ম-হিন্দু-ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ রামানন্দ। ১৯২৯ সালে ২রা এপ্রিল তিনি সুরাট অধিবেশনে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হ'ন।

তাতে বলেন, "হিন্দু মহাসভা হিন্দুর যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তা হয়ত ইতিপূর্বে স্পষ্ট করে কেহ বলেন নি, কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটি বিদ্যমান ছিল। মহাসভা বলেন, যে কেহ ভারতবর্ষে উদ্ভূত কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন তিনিই আপনাকে হিন্দু বলিবার অধিকারী। হিন্দু বা সনাতন ধর্ম, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য্য সমাজের ধর্ম এগুলি ভারতে উদ্ভূত প্রধান ধর্ম। এইসব ধর্মসম্প্রদায়ের কিছু লোক নিজেদের হিন্দু মনে করে থাকেন।

সম্প্রতি কাশীতে হিন্দু মহাসভার যে অধিবেশন হইয়া গেল তাহাতে জি, কে, নারিম্যান নামক একজন বিদ্বান পার্শী উপস্থিত ছিলেন তিনি বলেন, পার্শীদের ধর্ম বা জরথুস্ত্র ধর্ম ভারতে উদ্ভূত না হইলেও তাহা ভারতেই প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান আছে। তাঁহার মতে ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম এবং ইরাণী সভ্যতা ও ধর্ম একই আর্য্য সভ্যতার বিভিন্ন শাখা। সেইজন্য তাঁহাদের পার্শীদেরও হিন্দু মহাসভায় যোগ দেওয়া উচিত। হিন্দু মহাসভা এই সর্বভারতীয় অসাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমিককে পাশে পেয়ে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। রামানন্দ বলেন, ইহা সত্য কথা জাতিবর্ণ নির্বিশেষে

সমস্ত ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বার্থ এক । কিন্তু সকল সম্প্রদায় ইহা বুঝেন নাই।"

('প্রবাসী' ষষ্ঠিবার্ষিকী সংখ্যা থেকে ১৩৭২)

রামানন্দ—সুভাষচন্দ্র। "সুভাষচন্দ্র তখন ভিয়েনাতে। মাঝে মাঝে 'মডার্ণ রিভিউ'তে লেখেন। রামানন্দবাবু তাঁহাকে পাঠাবার জন্য বেশী টাকার একটি চেক আমাদের সামনে খামে ভরলেন। তাঁহাকে বলি, আপনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সুভাষবাবুকে বেশী টাকা দিতেছেন।" তিনি বলেন, "সুভাষবাবু বিদেশে। অনেক খরচ। আরও বেশী দেওয়া উচিত। পারি না।"

(প্রবাসী ষষ্ঠিবার্ষিকী সংখ্যা যতীন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের লেখা থেকে)

ভাষা সম্পর্কেও তাঁর সুচিন্তিত উক্তি পুরানো প্রবাসীর পাতায় ছড়ানো আছে। "হিন্দী' 'হিন্দী" বলে সভায় গোলোযোগ। পণ্ডিতজীর ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মৌলিকতা ও সৃজনীপ্রতিভা হিন্দী হইতে বেশী। ইহাতে আমার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল। আমি দেখিলাম হিন্দী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের অসহিষ্ণুতা এত বেশী যে তাঁদের কোনো হিতাকাঙ্খীর কাছেও কিছু শোনবার ধৈর্য্য নেই । ইহার ভিতরে হীনমন্যতা আছে"। রামানন্দবাবু বলেন 'ইহা বাঙালী বলিলে রক্ষা আছে কি!' গান্ধীজীর মন্তব্যও রয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গ তো এখনো বহমান। অতএব এ বিষয়ে আর উদ্ধৃতি থাক।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর একটি কথাতেই ঐ বিচ্ছেদের গভীরতা আর ব্যাকুলতা যে বৃদ্ধ সম্পাদকের কত তা বোঝা যাবে। বলেন, "ভেবেছিলাম কবির আগেই আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্রবিহীন জগত দেখিতে হইবে তা ভাবি নাই।"

('প্রবাসী' ভাদ্র ১৩৪৮)

গান্ধীজী প্রসঙ্গ ও মহৎ প্রকৃতির লক্ষণ সম্পর্কে বলেন "মহৎ প্রকৃতির লক্ষণ এই যে, মহৎ মানুষ নিজের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ ও মহৎ আছে তা স্থায়ী ও চিরন্তন এবং অন্য মানুষের মধ্যেও তাহা আছে বিশ্বাস করেন । গান্ধীজীকে অনেকেই মহৎ লোক বলিতেছেন। ভাবিয়া দেখিলে তাহার কারণ বোঝা যায় তিনি জগতের অন্য সাধুদের মত আপনাকে মানবপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠ প্রেরণার বশবর্ত্তী করিয়াছেন । কিন্তু ইহা বলিলেই তাঁহার মানবপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণার ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি শুধু নিজের জাতিকেই মহৎ মনে করিতেছেন না। তিনি বিশ্বাস করেন ইংরেজজাতির মধ্যেও এই মহত্ত্ব সুপ্ত আছে। এবং আমাদের সাত্ত্বিক বীরত্ব ও সহিষ্ণুতার দ্বারা তাহাদের ন্যায়নিষ্ঠা ও সাত্ত্বিকতা জাগাইতে পারিব। কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন 'তিনি ঈশ্বরদূত নন কোনো প্রত্যাদেশও পাননি।"

(প্রবাসী আষাঢ়, ১৩২৮)

রামানন্দবাবুর নানা বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা গভীর সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শবাদকে এই ক'খানি কাগজের পাতায় এঁকে দেওয়া বা বলা কোনো একজনের সম্ভব ও সাধ্য নয়।

দাসী, প্রদীপ, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'ই তাঁর "জীবন চরিত" লিখে রেখেছে তাঁরই হাতের অক্ষরে মুখের ও মনের ভাষায়। এবং সাধারণ 'বহু মনে' সেই 'জীবন চরিত' একটি আশ্চর্য্য যুগের ছাপ এঁকে গেছে তাঁর সম্পাদকীয় সাধনার পঞ্চাশ বছর কালের।

এখন শুধু কয়েক লাইন তাঁর নারী প্রসঙ্গের উক্তি দিয়ে 'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয়কে নারীজাতির শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তাঁর মত করে মেয়েদের দুঃখ লাঞ্ছনার অবমাননা

কথা আগে মাত্র দুজন বিশেষভাবে ভেবেছিলেন— রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়।

তিনি বলেছেন "সমাজসংস্কার ছাড়া নারীজাতির উন্নতি ও জাতির উন্নতির আশা নাই। স্বাবলম্বন নারীদের পক্ষেও মঙ্গলজনক।

বলেন, "জগতের সভ্যতম দেশও অনেক বিষয়ে বর্ব্বরতা অতিক্রম করিতে পারে নাই। একটি বিষয় এই যে যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের সৈন্যই বিপক্ষের স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করে।

যুদ্ধের সময়েই হোক অথবা শান্তির সময়েই হোক যেদিন মেয়েদের ওপর এইরূপ ব্যবহার আর হইবে না সেদিন বুঝা যাবে মানুষ পশুত্বের অবস্থা অতিক্রম করে মানবত্ব লাভ করেছে।

"ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল" জন্মগ্রহণ করলে বলেন, (১) "এই মহামণ্ডলের উদ্দেশ্য ভারতের সকল ধর্ম সকল বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মেয়েদের একত্র করে নৈতিক ও অবস্থাগত স্থায়ী উন্নতি সাধন।

.........(৫) মহামণ্ডল অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজন করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

নারী-সাহিত্যিক সম্বন্ধেও তাঁর উক্তি এবং বিশ্লেষণ যেমন চমৎকার তেমনি স্পষ্ট ও নূতনতর। বলেছেন, "কেবল পুরুষরা লিখিলে যাহা হইত নারী লেখনী ধারণ করার পর স্বতন্ত্র কিছু পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস বাড়িতে থাকিলে স্বাধীনভাবে লিখিতে পারিবেন। তাহা হইলে সাহিত্যে নূতন শক্তি ও সম্পদ সঞ্চিত হইবে।

আর একটা মহাসত্য বলেন, "নারীর নিজের কথা সাহিত্যে খুব কমই ব্যক্ত হইয়াছে।" যে আগে কেউ বলেননি।

রামানন্দবাবুর ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব, সম্পাদকীয় আদর্শ, সত্য-শিব-সুন্দরের মহৎ ভাব অনুসরণ, প্রচার-হীন প্রচ্ছন্ন নীতিবোধ আর পরিচ্ছন্ন নির্মল রুচিবোধ পঞ্চাশ বছরের সাধনায় বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিককে একটি শাশ্বত পথনির্দেশ করেছে। তাঁকে অবিস্মরণীয় শ্রদ্ধাভরে প্রণতি জানিয়ে আমার কথা শেষ করি।

(রামানন্দ জন্ম শতবার্ষিকী বৎসরে লিখিত)

কংগ্রেস স্মৃতি

(প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ)

চতুস্ত্রিংশ অধিবেশন—অমৃতসর—১৯১৯

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(২)

এই সকল ব্যাপার যখন ঘটছিল তখন কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন সম্বন্ধে তোড়জোড় আরম্ভ হল। গত বৎসরের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবার অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হবার কথা কিন্তু পাঞ্জাবের পরিস্থিতির জন্য সেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া সম্ভব কিনা এ সম্বন্ধে অনেকেরই মনে সন্দেহ জেগেছিল। সে সন্দেহ নিরাকরণ করে শ্রীবালকৃষ্ণ ১লা সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানালেন ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ কিচলুর গ্রেপ্তার ও শাস্তির জন্য যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিবর্ত্তন হয়েছে। অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য হাজার হাজার অমৃতসরবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদনপত্র অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে এবং এই আবেদনে কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য ডি, পি, মাধব রাও যিনি কংগ্রেসের পক্ষে জয়েন্ট কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিতে লণ্ডন গিয়েছেন তাঁর নামের সুপারিশ আছে।

পাঞ্জাবের অধিবাসীরা অমৃতসর কংগ্রেসের জন্য অভ্যর্থনা গঠন করে তার সভাপতির পদে বরণ করল স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে।

এই সময় জনমতের চাপে গভর্ণমেন্ট—পাঞ্জাব তদন্ত কমিটী নিযুক্ত করল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইনডেমনিটী বিলও পাশ করা সাব্যস্ত করল।

তদন্ত কমিটীর প্রস্তাবিত সদস্যদের বিরুদ্ধে এবং রৌলট আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের জন্য একটি জনসভা কলকাতার টাউন হলে আহুত হয়। তার সভাপতিত্ব করেন মতিলাল ঘোষ। টাউন হলে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় জনতার এক বিপুল অংশ টাউন-হলের বাইরে সমবেত হয়েছিল, সেখানে বক্তৃতা দেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাতে ইনডেমনিটীবিলের নিন্দা করা হয়।

অমৃতসরে যখন কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তুতি চলছিল তখন অমৃতসরের ডেপুটী কমিশনার ৪ঠা অক্টোবর অভ্যর্থনা সমিতিকে পত্র লিখে জানালেন যে তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট এবং মার্শাল ল কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউনসিলের আপীলের রায় বের হওয়ার পর ডিসেম্বর মাসে অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন করা সমীচীন হবে না কারণ তখন জন-সাধারণের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা।

তাহলে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করা কঠিন হবে এবং এমনকি পুনরায় গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় তিনি অভ্যর্থনা সমিতিকে পরামর্শ দেন যেন তারা কেন্দ্রীয় এলাকা—যথা অমৃতসর, লাহোর, গুজরাণওয়ালা, লায়ালপুর ও জলন্ধর বাদ দিয়ে অন্য কোথাও কংগ্রেসের অধিবেশন করে।

১৫ই অক্টোবর পুনরায় ডেপুটী কমিশনার মিঃ এফ এইচ, বার্টন অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক লালা গিরিধারীলালকে পত্রদ্বারা গত এপ্রিল মাসের দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা তার কারণ ও ফল সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করার সর্ত্তে কংগ্রেসের অধিবেশনের যৌক্তিকতা বিবেচনা করতে বললেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল না।

১৫ই অক্টোবর গভর্ণমেন্ট তদন্ত কমিটী নিযুক্ত করে তার সদস্য মনোনীত করলেন—(১) মাননীয় বিচার-পতি র‍্যাঙ্কিন (২) মাননীয় মিঃ রাইস (৩) মেজর জেনারেল জর্জ বারো (৪) স্যর চিমনলাল শিতলবাদ (বোম্বে হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবি) (৫) সরদার সাহেবজাদা সুলতান আমেদ খাঁন (৬) কানপুরের মিঃ টমাস স্মীথ এবং লক্ষ্ণৌর মাননীয় পণ্ডিত জগৎ নারায়ণ (প্রসিদ্ধ আইনজীবি এবং ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। এই কমিটীর চেয়ারম্যান হলেন এবং নিযুক্ত লর্ড হান্টার কমিটী হান্টার কমিটী নামে পরিচিত হল।)

কংগ্রেসও একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটী করে তার সদস্য নির্ব্বাচন করল (১) মহাত্মা গান্ধী (২) পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু (৩) শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ (৪) শ্রীআব্বাস তায়েবজী এবং (৫) শ্রীফজলুল হক। ঐ কমিটীর সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীসন্তানম্ বার-অ্যাট-ল।

বেসরকারী কমিটী কাজ সুরু করে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। এই কাজে অসামান্য কার্য কুশলতার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

হান্টার কমিটীও সাক্ষ্য গ্রহণ করতে আরম্ভ করল। ২১শে অক্টোবর এনড্রুস সাহেব এসোসিয়েটেড প্রেস মারফৎ টেলিগ্রাম দ্বারা জানালেন যে হান্টার কমিটীর নিকট উপস্থিত সাক্ষীদিগকে ভয়প্রদর্শন করতে তিনি নিজে দেখেছেন। তিনি উপদেশ দিলেন যে যদি প্রকাশ্যে এই প্রকার ভয়প্রদর্শন চলতে থাকে তা হলে কমিটীর সম্মুখে কেউ যেন সাক্ষ্য প্রদান না করে।

এই সময় খিলাফৎ আন্দোলনও প্রবলভাবে আরম্ভ হল। লক্ষ্ণৌতে খিলাফৎ কনফারেন্সে ১৭ই অক্টোবর খিলাফৎদিবস রূপে পালন করা সাব্যস্ত হল। ঐ তারিখে সকলকে উপবাস করতে এবং খিলাফৎ ও তুর্কী সাম্রাজ্যের একতা রক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেওয়া হল। মহাত্মা গান্ধী হিন্দু ভারতের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিলেন।

১২ই নভেম্বর লাহোরের এক সভায় মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত নেহেরু, মিঃ এনড্রুস এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ সিদ্ধান্ত করলেন যে নেতাগণকে মুক্তি না দিলে হান্টার কমিশন বয়কট করা হবে।

ইতিমধ্যে অমৃতসর মিউনিসিপাল কাউন্সিল এচিসন পার্কে কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য অভ্যর্থনা সমিতিকে অনুমতি দিল। প্রধান খালসা দেওয়ান প্রকাণ্ড "শিখ প্যাণ্ডেল" যাতে ১৫০০০ হাজার লোকের স্থান হয় এবং ৬০০০ চেয়ার কংগ্রেসের ব্যবহারের জন্য প্রদান করল।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি থেকে সভাপতি পদের নামের সুপারিস পাওয়া গেল। দেখা গেল যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ১২ ভোট, স্যার শঙ্কর নায়ার ১০ ভোট, বাল গঙ্গাধর তিলক ৭ ভোট, মহাত্মা গান্ধী ৭ ভোট, হর্নিম্যান, মতিলাল ঘোষ, বিজয় রাঘবাচারিয়া, জোসেফ ব্যাপ্টিষ্টা, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য প্রত্যেকে ২ ভোট, মাধব রাও, সুব্রা

রাও, ডঃ এস সুব্রাহ্মানিয়াম, ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মামুদাবাদের রাজা প্রত্যেকে ১ ভোট পেয়েছেন। চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য অভ্যর্থনা সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হল।

১৯শে নভেম্বর স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে অভ্যর্থনা সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন করেন। ঐ সভায় বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের উপর পাঞ্জাব প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয় এবং গভর্ণমেন্টকে ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বলা হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনের তারিখ নির্ধারিত হল ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

অন্যান্য বারের ন্যায় অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের অধিবেশনও একই সঙ্গে একই স্থানে করা ঠিক হল।

এই পটভূমিকায় অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

(৩)

কংগ্রেসে যোগদান করার জন্য বাংলা দেশের প্রতিনিধিগণ ২৩শে ডিসেম্বর পাঞ্জাব মেলে অমৃতসর রওনা হন। ঐ ট্রেনে যাঁরা গেলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাননীয় কামিনীকুমার দত্ত (শিলচর), মাননীয় অখিলচন্দ্র দত্ত (কুমিল্লা), মনমোহন নিয়োগী (ময়মনসিংহ), সূর্য্যকুমার সোম (ময়মনসিংহ), বীরেন্দ্রলাল শাসমল, বিপিনচন্দ্র পাল, মুজিবর রহমন, মোহম্মদ মুনিরুজ্জামান, মৌলভী আক্রাম খাঁ (পরবর্তী কালে মৌলানা, "আজাদের' সম্পাদক) প্রভৃতি। রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে বাংলার প্রতিনিধিস্বরূপ আমিও ঐ ট্রেনে রওনা হলাম।

সেইদিনই পার্শেল এক্সপ্রেসে বাংলা দেশের আরও ১০।১৫ জন প্রতিনিধি রওনা হন। এবার বাংলা দেশ থেকে নির্বাচিত বহু কলকাতা প্রবাসী পাঞ্জাবী কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন।

আমি ও আরও ২।৩ জন যাত্রী পাঞ্জাব মেলের শেষের দিকে একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠেছিলাম। তখনকার দিনে আজকের মত ট্রেনে ওত ভীড় হত না। বেশ খেলা-মেলায় শুয়ে-বসে যেতে পেরেছিলাম। পরদিন ট্রেনে এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌছলে নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সদলবলে সেই ট্রেনে উঠে তাঁদের জন্য রক্ষিত প্রথম শ্রেণীতে আসন গ্রহণ করলেন। আমাদের কামরায় দুজন আর্দালী কয়েকটি বড় কাঠের বাক্স নিয়ে উঠল। অনুসন্ধানে জানলাম যে তাঁরা পণ্ডিতজীর ভৃত্য। কাঠের বাক্সের একটিতে পণ্ডিতজী ও তাঁর সহযাত্রী বন্ধু এলাহাবাদ হাইকোর্টের এডভোকেট প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য খাদ্য পানীয় রক্ষিত ছিল। অন্য একটি কাঠের বাক্সে ছিল পণ্ডিতজীর কয়েক জোড়া জুতো।

পণ্ডিত মতিলাল অত্যন্ত বিলাসী বলে খ্যাত ছিলেন। এলাহাবাদ থেকে দিল্লীর পথে কয়েকটি ষ্টেশনে পণ্ডিতজীকে প্ল্যাটফরমে পায়চারি করতে দেখা গেল। কোন সময়েই তাঁকে এক পোষাকে দেখা গেল না। প্রত্যেক বারই পোষাকের পরিবর্তন লক্ষ্য হল এবং তা মাথার হ্যাট থেকে পায়ের জুতো পর্য্যন্ত।

দিল্লী ষ্টেশন থেকে পণ্ডিতজীকে অমৃতসর নিয়ে যাওয়ার জন্য স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঐ ট্রেনে মুসলিম লীগের নির্বাচিত সভাপতি প্রসিদ্ধ হাকিম আজমল খাঁকেও নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। স্পেশাল ট্রেন অমৃতসর ষ্টেশনে পৌছুলে সভাপতিদ্বয়কে সমবেত জনতা বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রাসহ তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আবাসস্থানে নিয়ে যায়। আমাদের ভাগ্যে ঐ শোভাযাত্রা দর্শন হয় নি।

আমাদের ট্রেন অমৃতসর পৌঁছানোর পর ষ্টেশনে উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবকগণ বাংলার প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট বৈজনাথ হাইস্কুলে আমাদের নিয়ে গেলেন।

বাংলার বাহিরে খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধার জন্য এবার আমাদের তরফ থেকে সুদর্শন যুবক সুরেশকুমার মুখোপাধ্যায় আহারের ব্যবস্থার ভার নিয়েছিলেন। সুরেন ছিল বিপ্লববাদী এবং এজন্য তাকে নির্যাতনও যথেষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এ রকম অক্লান্তকর্মী ও মিষ্টস্বভাব ব্যক্তি খুব কমই নজরে পড়ে। তার ব্যবস্থায় আহারাদির আয়োজন খুব সুন্দর হয়েছিল। পরবর্তীকালে সুরেশ একটি ছোটখাটো চামড়ার কারখানা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বর্তমান বিধান সরণি স্থাপন করে শান্তিনিকেতন প্যাটার্নের মানিব্যাগ এবং অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় লিপ্ত হয়। অকালে এই প্রাণোচ্ছল যুবকের মৃত্যুতে দেশের ক্ষতি হয়েছে।

আমরা শেষে ডিসেম্বর অমৃতসর পৌঁছাই। অমৃতসরে পৌঁছানের পর আমাদের প্রধান কর্তব্য হল শহীদের রক্তধারা পরিশুদ্ধ জালিয়ানওয়ালা বাগের পুণ্যভূমি দর্শন। আমরা কয়েকজন জালিয়ানওয়ালা বাগ দেখতে গেলাম। দেখলাম বাগের তিন পার্শ্বের দেওয়ালে এবং অট্টালিকার পশ্চাদ্ভাগে গুলি বর্ষণের দাগ রয়েছে। বাগের মাটী শহীদের অজস্র রক্তধারায় রঞ্জিত হয়েছিল। সেই রক্ত রঞ্জিত মৃত্তিকার কিয়দংশ সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে এসেছিলাম। বাগের যে ইঁদারায় ভিতরে ভীতসন্ত্রস্ত জনতার অনেকে পালাতে গিয়ে পড়ে জীবন্ত সলিলসমাধিলাভ করেছিল তার উপর পরে স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।

অমৃতসরে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনের তারিখ একদিন পিছিয়ে গেল।

একদিন হাতে পাওয়ায় হাওড়ার উকিল জ্যোতিষ চন্দ্র হালদার লাহোর বেড়িয়ে আসার প্রস্তাব করলেন। বললেন যে লাহোরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ী আছে সুতরাং সেখানে থাকার কোন অসুবিধা হবে না। আমিও আরও দুজন প্রতিনিধি এ সুযোগ ত্যাগ করলাম না। আমরা লাহোরভ্রমণে হালদার মশায়ের সহযাত্রী হলাম। ২৫শে তারিখেই আমরা অপরাহ্ণে ট্রেনে রওনা হয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে লাহোরে পৌঁছলাম। সেবার পাঞ্জাবে প্রচণ্ড শীত। জ্যোতিষবাবুর কথায় আমরা কোন বিছানাপত্র সঙ্গে নিই নি। জ্যোতিষবাবুর আত্মীয়স্থানীয় জমিদার মিত্র মহাশয়ের বাড়ী খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা হল না। দেখলাম যে মিত্র মহাশয়ের বাড়ীটি বেশ বড়। গৃহকর্তা পরম সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। সেখানে যেমন আদর-অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম তা ভোলবার নয়। আহারের এলাহী বন্দোবস্ত হয়েছিল। রাত্রে মিত্রভবনের এক বৃহৎ কক্ষে আমাদের শোবার ব্যবস্থা হল। দেখলাম যে শীতের সময়ে আরামের বন্দোবস্তও খুব পরিপাটি। সমস্ত কক্ষ জুড়ে পুরু গদির উপর ফরাস পাতা। আমাদের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেকের নিকট বেশ পুরু ও নরম ৩।৪ খানি করে রাগ রাখা হয়েছিল, গৃহস্বামীর ব্যবহার অতি অমায়িক। দুঃখের বিষয় তাঁর নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বললেন যে তাঁর বাগানে বহু যত্নে পাঞ্জাবের মত জায়গায় কাঁঠাল গাছ রোপণ করে তার ফল ভোগে সমর্থ হয়েছেন।

পরদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের অমৃতসরে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন সুতরাং সময় অতি কম, এর মধ্যেই লাহোরের মোটামুটি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে হবে। গৃহকর্তা আশ্বাস দিয়ে বললেন যে তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন।

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা সহর থেকে বের হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। প্রাতরাশের বিরাট আয়োজনের জন্য আমাদের বেরুতে অনেকটা বেলা হয়ে গেল। মিত্রমশাই গলাবন্ধ কোট, প্যাণ্ট এবং গোল টুপি পরে তাঁর নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ীতে আমাদের প্রথমে রাবী নদীর পরপারে অবস্থিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সাদাসিদে কবর ও সম্রাট

জাহাঙ্গীরের কারুকার্য্যখচিত অতি মনোরম সমাধি ভবন দেখতে নিয়ে গেলেন। নূরজাহানের সমাধির উপর নির্ম্মিত ভবনে কোন কারুকার্য্য নেই। জাহাঙ্গীরের সুদৃশ্য এবং কারুকার্য্যে মণ্ডিত। ভবনের ছাদের উপর দিয়ে গাইড আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যা দেখালেন তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হলাম। ছাদের গঠন-কৌশল এমন অপূর্ব যে তার উপর থেকে নদীর পরপারস্থ লাহোরের প্রসিদ্ধ জুম্মা মসজিদের ৪টি গম্বুজের মধ্যে ৩টির বেশী দেখা যায় না। ছাদের যে কোন স্থানে, যান না কেন এক সঙ্গে ৪টি গম্বুজ চোখে পড়বে না—চতুর্থটি আড়ালে পড়ে যায়। স্থপতিশিল্পের এই বৈশিষ্ট দেখে বিস্মিত হলাম।

সমাধি দুটি দেখার পর মিত্রমশায় বেলাবাড়ার অজুহাতে প্রাতঃকালে আর কোথাও নিয়ে গেলেন না সোজা বাড়ী ফিরলেন। তারপর মাধ্যাহ্নিক ভোজন ও বিশ্রামের পর চা-পর্ব শেষ হতে বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে জুম্মা মসজিদ, কেল্লা, মহারাজা রণজিৎ সিংহের সমাধি প্রভৃতি ২।৩টি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইমারত দেখার সুযোগ পাওয়া গেল মাত্র। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমরা অমৃতসরে ফিরলাম।

৪

২৭শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল বেলা ১ টায়। নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই সমস্ত প্যাণ্ডেল প্রতিনিধি ও দর্শক দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে কোন কংগ্রেসে এত লোকসমাগম হয়নি, তা ছাড়া এবার বহু কৃষাণ প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিল।

প্রাতঃকাল থেকেই দলে দলে লোক প্যাণ্ডেলের বাইরে জমা হচ্ছিল। বেলা ১০ টার সময় প্যাণ্ডেলের গেট খোলা হয়। তখন স্বেচ্ছাসেবকগণের সকল চেষ্টা পর্য্য করে এবং সমস্ত শৃঙ্খলা চূর্ণ করে প্যাণ্ডেলের অভ্যন্তরে জনস্রোত জলস্রোতের বেগে প্রবেশ করল। স্বেচ্ছাসেবকগণ অতিকষ্টে তাদের গতি নিয়ন্ত্রিত করে প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান খালি রাখল। প্যাণ্ডেলে ১২ হাজার লোকের বসবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু অন্ততঃ ১৬ হাজার লোক ঠেলাঠেলি করে প্যাণ্ডেলের ভিতরে প্রবেশ করে। তা ছাড়া ভিতরে প্রবেশ করতে না পেরে বহু সহস্র লোক বাইরে ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, সুতরাং তাদের জন্য বক্তৃতা দেবার অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আমারও নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে স্বেচ্ছা-সেবকদের সাহায্যে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে বাংলা প্রদেশের জন্য নির্দিষ্ট ব্লকে রক্ষিত চেয়ারে আসন গ্রহণ করলাম।

কলকাতা বা বোম্বাইয়ের মত এখানকার স্বেচ্ছা সেবকগণের ব্যবহার নম্র দেখা গেল না। তাদের রুক্ষ মেজাজের জন্য অনেক অনর্থের সৃষ্টি হয়েছিল।

নেতাদের জন্য নির্দিষ্ট মঞ্চের (ডায়াস) দুপাশে ভারত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর তৈলচিত্র টাঙ্গানো ছিল। বক্তৃতামঞ্চের সম্মুখে জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদ দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক একটি সুন্দর বালকের আলেখ্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

ক্রমে ক্রমে একে একে দুইয়ে দুইয়ে নেতাগণ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করতে লাগলেন। লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধী, বিপিনচন্দ্র পাল ও হাকিম আজমল খাঁ যখন প্রবেশ করলেন তাঁরা বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হলেন।

এর পর যখন সদ্য কারামুক্ত লালা হরকিষণলাল, ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ কিচলু ও অন্যান্য নেতাগণ প্রবেশ করলেন তখন তাঁদের দেখে সমবেত জনমণ্ডলী আনন্দে যেন উন্মত্ত হয়ে পড়ল। ঘন ঘন করতালি ও তুমুল হর্ষধ্বনিতে সভামণ্ডপ মুখরিত হতে থাকল। মহাত্মা গান্ধী ডঃ কিচলু ও অন্যান্য নেতৃবর্গকে আলিঙ্গন করলেন।

বেলা ২-১০ মিনিটের সময় নির্বাচিত সভাপতি মহাশয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত, মামুদাবাদের রাজাবাহাদুর এবং হাকিম আজমল খাঁকে পুরোভাগে এবং শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, চিত্তরঞ্জন দাশ ও সি, পি, রামস্বামী আয়ারকে পশ্চাতে রেখে শোভাযাত্রা করে সভাগৃহে উপস্থিত হয়ে মঞ্চোপরি উপবেশন করলেন।

মঞ্চোপরি যারা বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধী, এম্, এ. জিন্না, শ্রী ও শ্রীমতী হাসান ইমাম, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, স্যার দীনশা পেটিট, এস্ আর বোমানজী, এস্ বি বোমানজী, জি,কে, দেওধর, কস্তুরি রঙ্গ আয়েঙ্গার, বিজয়রাঘবাচারিয়া, ভি, পি মাধব রাও, কে ভি রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, আব্বাস তায়েবজী, সচ্চিদানন্দ সিংহ, এস সত্যমূর্তি, দেওয়ান মাধব রাও, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং সদ্য কারামুক্ত পাঞ্জাবের নেতৃবর্গ।

প্যাণ্ডেলের ভিতরে. ভীড়ের চাপে লোকের দাঁড়াবার স্থান পর্য্যন্ত ছিল না। চাপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই বিপুল জনতাকে শান্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষ প্যাণ্ডেলের বাইরে মহাত্মা গান্ধী এবং আরও কয়েকজন নেতার বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। অমৃতসরের পণ্ডিত জগন্নাথ এবং বিপিনচন্দ্র পাল যথাক্রমে উর্দু এবং ইংরাজিতে ঘোষণা করে জানালেন যে প্যাণ্ডেলের বাইরে মহাত্মা গান্ধী, ডঃ কিচলু এবং পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী অভিভাষণ দেবেন সুতরাং যাঁরা স্থানাভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা যেন বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত সভার বক্তৃতা শোনেন। এতে ভিতরে চাপ কতকটা কমল।

শ্রীমতী সরলা দেবীর পরিচালনায় মহিলাগণ স্বাগত সঙ্গীত গান করলেন। তার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিন্দীতে তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনার পর সমবেত জনতাকে কন্যা ও পুত্র সম্বোধন করে অভ্যর্থনা কমিটীর পক্ষ থেকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

তাঁর নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে তিনি বললেন যে, যে-সকল নেতৃবৃন্দ দিল্লী কংগ্রেস থেকে ফিরে এসেই অমৃতসরে কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন এবং যাঁরা হিন্দুমুসলমানের ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন গত ১০ই এপ্রিল শুভ রামনবমীর দিনে ভীতিগ্রস্ত গভর্ণমেন্ট তাঁদের প্রতি নির্বাসন দণ্ড দেওয়ায় শিখ গুরু দ্বারা পবিত্রীকৃত পুণ্যভূমি অমৃতসর আরও পবিত্র হয়েছে। একদিকে তাদের প্রিয় নেতাদের থেকে বিচ্ছেদ এবং অন্যদিকে যাকে তারা দেবতাজ্ঞানে সম্মান ও পূজা করত তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদে অমৃতসরের জনগণ বিমূঢ় হয়ে পড়ল। এর প্রতিকারের মানসে দল বেঁধে তারা ডেপুটিকমিসনারের নিকট আবেদন জানানোর জন্য তাঁর বাংলোর দিকে অগ্রসর হল। তখন সেই নিরস্ত্র ও শোকগ্রস্ত জনতার উপর সেনা-বাহিনী গুলি বর্ষণ করল। হতাহত আত্মীয় স্বজনের দর্শনে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং তাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। তার পর তাদের দ্বারা যে পৈশাচিক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় তা ভারতবর্ষের পক্ষে কলঙ্কজনক। এর ফল হল পাঞ্জাবে মার্শাল ল জারি এবং গভর্ণমেন্টের দমননীতি অবলম্বন, তার পর বৈশাখী সংক্রান্তির পবিত্র দিনে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সংবাদে সকলে বজ্রাহত হয়ে পড়ল। মার্শাল আইন প্রয়োগের ফলে পাঞ্জাবের সর্বত্র কবরস্থান ও শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করল।

এই নিস্তব্ধতা প্রথম ভঙ্গ হল তখন, যখন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে তিনি অমৃতসরে প্রবেশ করলেন। তাঁদের প্রবেশের ফলে অমৃতসরবাসীর মৃতদেহে যেন জীবনসঞ্চার হল।

তিনি তারপর বললেন যে কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম একজন সন্ন্যাসী কংগ্রেসের মঞ্চোপরি

দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসী হয়েও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাঁকে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য নয় তদপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্যে তিনি এখানে হাজির হয়েছেন।

স্বামীজী জানালেন যে লালা হরকিষণ লাল, লালা দুনীচাঁদ, রামভূজ দত্ত চৌধুরী, ডঃ কিচলু ও ডঃ সত্য পালের সমবেত নির্দেশে এবং কর্তব্যের প্রেরণায় তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করেছেন।

পাঞ্জাবের নবজাগরণের জন্য তিনি মার্শাল আইন প্রয়োগকর্তা স্যর মাইকেল ওডেয়ার ও তাঁর সহকারী জেনারেল ডায়ার ও কর্নেল ফ্রাঙ্ক জনসনকে ধন্যবাদ দিলেন। রাজনৈতিক চেতনা এতদিন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত পাঞ্জাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, মার্শাল ল প্রয়োগের ফলে পাঞ্জাবের সর্বত্র এমন কি সুদূর পল্লীতে অশান্ত গ্রামবাসীদের মধ্যেও এই জাতীয় সমিতির উদ্দেশ্য বিস্তার লাভ করেছে। মহিলাগণও জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়েছেন।

তারপর তিনি মন্টেগুর শাসনসংস্কার আইন সম্বন্ধে নরম দল, গরম দল, মহারাষ্ট্রের হোমরুল দল (তিলকের হোমরুল পার্টি) ও আডায়েরের হোমরুল দল (অ্যানি বেশান্তের হোমরুল পার্টি) প্রভৃতি বিভিন্ন দলের মধ্যে যে বিরোধ বিসম্বাদ দেখা দিয়েছে, তা দূরীভূত করে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে আহ্বান করলেন। তিনি বললেন যে মডারেট ও একট্রিমিষ্ট উভয় দলই শাসনসংস্কার আইন মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন কেবল সামান্য কয়েকটা বিষয়ে মতভেদ আছে, তা মিটিয়ে ফেলা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে যে, মডারেটগণও ভারত মাতার সন্তান। তিনি বললেন যে, দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ গোখলে, রাজনৈতিক সন্ন্যাসী শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কিম্বা সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক যোদ্ধা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশের জন্য অবদান অস্বীকার করা যায় না। সন্ন্যাসীর উপদেশ মানলে মুহূর্তে এই মতদ্বৈধ মেটান যায়। তিনি সকলকে কিছু নত হতে এবং যা পাওয়া গিয়েছে তা কাজে লাগাতে উপদেশ দিলেন।

শাসনসংস্কারের জন্য তিনি মন্টেগু সাহেবকে ধন্যবাদ দেওয়ার পক্ষপাতী। ধন্যবাদ দেওয়া মানে এ নয় যে আরও ক্ষমতা লাভের জন্য আমরা আন্দোলন থেকে বিরত থাকব।

তিনি জানালেন যে তিনি রাজনৈতিক নন। স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে আরও কি কি অবলম্বন করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে বিচার করার ভার রাজনৈতিকদের উপর দিয়ে তিনি কতকগুলি কাজের আভাস দিলেন। তাঁর মতে এ পর্যান্ত এই জাতীয় সভায় যা কাজ হয়েছে তা হল আমাদের অভাব-অভিযোগ উপস্থিত করে তার প্রতিকারের জন্য প্রস্তাব পাশ করা। প্রাপ্ত অধিকারগুলি কার্য্যে পরিণত করার জন্য লোকগঠনের চেষ্টা এ পর্যান্ত হয় নি। এখন এই কাজে আমাদের মন দিতে হবে। এর একমাত্র পন্থা হচ্ছে—প্রত্যেক পিতা ও মাতা তাদের জীবন ও চরিত্র এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে যাতে তাদের সন্তানদের সম্মুখে একটি সুষ্ঠু আদর্শ রাখা যায়। তিনি জানালেন যে তাঁর ২৬ বৎসরের জনহিতকর কার্য্যের অভিজ্ঞতায় তিনি খুব কম শিক্ষিত লোকের সান্নিধ্যে এসেছেন যারা সঙ্কটের সময় তাঁদের চরিত্র ঠিক রাখতে পেরেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, ডঃ সুব্রহ্মনিয়ার ন্যায় কয়জন ব্রাহ্মণ আছেন যাঁরা বড় লাটের অন্যায় ভীতি-প্রদর্শনের জন্য স্যর উপাধি ত্যাগ করেছেন? ভারতের কয়জন খাঁটি সন্তান আছেন যাঁরা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত যে গভর্ণমেন্ট পাঞ্জাবের সন্ত্রাসপূর্ণ রাজ্য শাসনের সঙ্গে জড়িত সেই গভর্ণমেন্ট-প্রদত্ত স্যার উপাধি একদিনের জন্য রাখাও পাপ মনে করে প্রতিবাদস্বরূপ ত্যাগ করতে পারেন? অথবা স্যার শঙ্কর নায়ারের মত কয়জন সাহসী পুরুষ আছেন যাঁরা যে-গভর্ণমেন্ট গুরুতর অবিচারের জন্য অপরাধী সেই গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সংশ্রব রাখতে অস্বীকার করে বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউনশিলের সদস্য পদ ত্যাগ করতে পারেন?

তিনি আরও বললেন যে যতদিন দেশে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন না হয় এবং ছাত্রগণ প্রাচীন কালের ব্রহ্মচারীদের মত জীবন নিয়ন্ত্রণ না করে ততদিন আমাদের সন্তানগণ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভাবধারায় ক্রীতদাস হয়ে থাকবে।

তারপর তিনি ভারতবর্ষের ৬।। কোটি অস্পৃশ্যদের কথা বললেন। যাতে তাদের নিজ সন্তানগণ অস্পৃশ্য ছাত্রদের সঙ্গে একই শিক্ষালয়ে বিদ্যালাভ করতে সকলের গৃহে নিজ আত্মীয়ের মত মিশতে এবং সকলের কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে দেশের কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি সকলকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন।

তিনি জানালেন যে, যে-স্বপ্ন তিনি গত ২৬ বৎসর ধরে মানসচক্ষে দেখছিলেন সেই স্বপ্ন দিল্লীর জুম্মা মসজিদে সফল হয়েছে এবং তিনি বিস্মিত হবেন না যদি তাঁর এই স্বপ্নও (অস্পৃশ্য জাতি সম্বন্ধে) তাঁর জীবদ্দশায় সফল হয়। সেই সুদিন আনতে হলে সকলকে পাশ্চাত্য মতে ভোজন পান ও পোষাক ত্যাগ করতে হবে। এর ফলে জাতির বিভিন্ন অংশ একীভূত হবে।

সংশেষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে তাঁর অভিভাষণ শেষ করলেন।

ক্রমশঃ

রাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙ্গালী

অশোক চট্টোপাধ্যায়

"বাঙ্গালী অদ্য যাহা চিন্তা করিতেছে, কল্য সমগ্র ভারত সেই চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে।" এই উক্তি বহুকালাবধি সত্য ছিল, এবং বাঙ্গালী চিন্তার ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট, বৈচিত্র ও প্রতিভা দেখাইয়াছে, তাহা শুধু ভারতকে নহে, অপরাপর দেশেরও বহু চিন্তাশীল মানুষকে মুগ্ধ ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সাহায্য করিয়াছে। বাঙ্গলার বর্ত্তমান যুগের চিন্তাধারার বহু দিক আছে। সেই চিন্তা জাতীয়তা বোধ, স্বাধীনতা অর্জ্জন আগ্রহ, আর্থিক উন্নতির চেষ্টা, শিক্ষার প্রসার সাধন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি বৈজ্ঞানিক ভাবে উদ্দেশ্য বিচার করিয়া গড়িয়া তোলা, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের রূপ ধারণ করিয়া গঠিত ও ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ সকল পথে যে বাঙ্গালীর মন চালিত হইয়াছিল তাহার একটা কারণ ইয়োরোপের সহিত সংঘাত ও সাহচর্য্য। পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজ যখন আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া অর্ণবপোত আশ্রয়ে ভারতের উপকূলে অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল, তখন স্বভাবতই ভারতবাসীদিগের মনের ক্ষেত্রে একটা প্রবল আলোড়নের সূত্রপাত হইল। যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে, অথবা দিল্লীশ্বর জগদীশ্বর ইত্যাদি বাক্যজালে জড়াইয়া পড়িয়া গতিহীন শক্তিহীনতাকে উচ্চ আদর্শের সিংহাসনে বসাইয়া নিশ্চেষ্ট প্রশান্ত মনোভাবের অবিচলিত অবস্থা চিরস্থায়ী করা আর সম্ভব রহিল না। সামরিকক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, কূটনৈতিক

বাস্তব পরিস্থিতি বিচারে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ও বিশ্লেষণে ইয়োরোপীয়দিগের মনের সুদূর প্রসার ও তীক্ষ্ণধার বিচক্ষণতা চতুর্বেদ পাঠক পণ্ডিত ও কোরান কণ্ঠস্থকারক হাফিজদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দর্শনের যে সকল অঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের শ্রেষ্ঠতা নিবিষ্ট ছিল সেসকল কথায় সক্ষম আলোচনা করিতে পারে এমন কোন পণ্ডিত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিলেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতা বাহ্যিক গতিবেগে সকল কিছু ভাসাইয়া দিয়া নিজ প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিয়া লইয়াছিল। মনের গভীরে যাহা ছিল তাহা স্পর্শিত হইল না। প্রায় শতবর্ষকাল সে ঐশ্বর্য্য গুপ্তধনের মতই অজানা ও অব্যবহৃত রহিয়া গেল।

বাঙলাদেশে রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথমে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় সভ্যতার তুলনামূলক বিচার আরম্ভ করিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ও দার্শনিক উভয় দিকেই নিজের অসামান্য প্রতিভার আলোকে কত অজানাকে জানাইতে আরম্ভ করিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করা অল্পে সম্ভব হয় না। ভারতীয়দিগের রাষ্ট্রীয় অধিকার তখন রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্থিতি ও প্রতিপত্তি দিয়া বিচার করা হইত না। কারণ সে যুগে পৃথিবীর কোন দেশেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব প্রতিষ্ঠা ছিল না। সম্রাট বা রাজা কোন কোন শ্রেণীর মানুষকে রাষ্ট্রীয় শক্তির কিছু কিছু আংশিক অধিকার দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া সকল শক্তিই রাজশক্তির সহিত জড়িত ছিল। রাজার শক্তি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই ধরা যাইত যে রাষ্ট্র স্বাধীন ও নিজ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। রাজা রামমোহন রায় ভারতীয় বাদসাহী ও রাজস্ব অধিকার লইয়া ইংরেজের সহিত তর্কবিতর্কে প্রখর বুদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ইয়োরোপের মানুষের রাষ্ট্রাধিকার বিচারেও তিনি কখন কখন মত প্রকাশ করিতেন ও ইয়োরোপীয়গণ তাঁহার এই ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভা স্বীকার করিতে দ্বিধা করিতেন না। তাঁহার জ্ঞান ও মনীষার কথা উল্লেখ করিয়া প্রসিদ্ধ প্রগতিশীল সমাজবাদী রবার্টওয়েন নিজ স্মৃতিকথায় লিখিয়াছিলেন যে রাজা রামমোহন যদি ইয়োরোপে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ইরাসমাসের সমতুল্য হইত।

বাস্তব অধিকার অথবা রাষ্ট্রমতের ক্ষেত্রে তিনি যে অগাধ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম ও দর্শনের আলোচনায় তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জ্ঞান ও বিদ্যা দেখাইয়াছিলেন। তিনিই প্রথম খৃষ্টান পাদ্রীদিগের সহিত তর্কে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে দার্শনিক বিচার ও বিশ্লেষণে ভারতীয় ঋষিগণ যে অপরূপ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহার কোন তুলনা অপর কোন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা বা দার্শনিক আলোচনায় কোথাও পাওয়া যায় না। তিনিই প্রথম চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতীয়দিগের অকল্পনীয় প্রতিভার কথা জগৎসভায় ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দু শাস্ত্রকারদিগকে অমরত্বে অধিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বের কথা এবং এই মহামানবের চিন্তা ও কর্ম্মের ভিতর দিয়াই বাঙলাদেশে সেই প্রেরণা প্রবলভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে যাহার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু বাঙালী চিন্তার ও কর্ম্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যশ আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইসকল অসাধারণ মানবদিগের মধ্যে ধর্ম্মের ও দর্শনের জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ। সাহিত্য আসরে খ্যাতি অর্জ্জন করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও বহু লেখক ও কবি। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ। শিক্ষার ও জ্ঞানের জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার মৈত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ মণীষীগণ এবং আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রাজকার্য্য

ইত্যাদিতে স্বনামধন্য হইয়াছিলেন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত, নীলরতন সরকার, সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, মহেন্দ্রলাল সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আরও বহু গুণীজন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অবসানে ও বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে অসংখ্য সাহিত্যিক, নাট্যকার, জ্ঞানীগুণী, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর, রাষ্ট্রনেতা, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য কর্ম্মবীরগণ বাঙলার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, রাধিকা গোস্বামী, যদু ভট্ট, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, সরোজিনী নাইডু (চট্টোপাধ্যায়), অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি সেই যুগে বাঙলাকে গৌরবালোক উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই মানসিক বিকাশের আশ্রয়েই বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভকালে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, বাঙলা বিভাগ লইয়া। লর্ড কার্জন বাঙলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুইটি পৃথক প্রদেশ সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা করায় এই আন্দোলন আরম্ভ হয় ও তাহার নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন বহু উচ্চশিক্ষিত কর্ম্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। স্বদেশী আন্দোলন নামটি দেওয়া হয় বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার বর্জন পরিকল্পনা হইতে। বাঙালীরা সুচিন্তিতভাবে ইহাই স্থির করেন যে ইংরেজকে বাণিজ্যক্ষেত্রে আঘাত করিতে পারিলেই ইংরেজকে দমন করা সম্ভব হইবে; কারণ ইংরেজ ছিল নেপোলিয়নের ভাষায় "দোকানদার' জাতি। তাহার মাল বিক্রয় না হইলেই তাহার পরাজয় ঘটিবে ও সে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে। ইংরেজ তখন দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া ভারতের বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বনাশ সম্পন্ন করিয়া নিজেদের মানচেষ্টার্জ্জিত বস্ত্রব্যবসায় প্রবলভাবে ভারতের উপর বিস্তার করিয়া প্রায় সকল ভারতীয়কেই বিদেশী বস্ত্র ব্যবহারে বাধ্য করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের মূলমন্ত্র সেইজন্য বাঙালী আন্দোলনকারীগণ করিলেন বিদেশী বর্জন। বয়কট কথাটি ঐ সময় বাঙলা ভাষায় সর্ব্বজনবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।" "বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত" প্রভৃতি কথা বাক্যে, সঙ্গীতে গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইতে লাগিল। ইংরেজ বাঙালীকে দমন করিতে নানা অস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। ধর-পাকড় বেত্রাঘাতের উত্তরে বাঙালী সকল ভেদ-বিবাদ ভুলিয়া এক মনপ্রাণ হইয়া ইংরেজবিরুদ্ধতায় আত্মনিয়োগ করিল। কোথাও কোথাও ইংরেজ ও ইংরেজসমর্থকদিগের উপর গুলি ও বোমা বর্ষিত হইল। সেই আক্রমণে অনেকে প্রাণ হারাইল এবং ভজন্য বহু বাঙালী যুবক ফাঁসির মঞ্চে জীবন দান করিল এবং আরও অনেকে দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসনে প্রেরিত হইল। কিন্তু ইহার ফলে যে নবজাগরণ ভারতে প্রাণবান হইয়া উঠিল তাহাতে সত্য সত্যই ইংরেজের দোকানদারী আহত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘা খাইল কাপড়ের ব্যবসায়। ভারতের বস্ত্রবয়নশিল্প অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিশ্ববিখ্যাত ছিল। ইংরেজের অত্যাচারে ও আক্রমণে ঐ শিল্প মহা দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিলে ভারতের বস্ত্রবয়ন কার্য্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইল। বহু নূতন নূতন কাপড়ের "মিল" গঠিত হইল এবং স্বদেশে উৎপাদিত মিলের কাপড় দেশের লোক সাদরে ক্রয় করিতে লাগিল। কুটির-শিল্পও জোরাল হইয়া উঠিল এবং বিভিন্ন প্রকার তাঁতের কাপড়ের বিক্রয় বিশেষভাবে বৃদ্ধিলাভ করিল। বস্ত্র-শিল্প ব্যতীত অপরাপর শিল্পসংস্থাপনও বহু লোকে আরম্ভ করিয়া দিলেন। যাহাতে দেশের কারখানাজাত দ্রব্য উৎপাদন বাড়াইয়া বিদেশী দ্রব্য আমদানি কমাইয়া দেওয়া যায় সেসময়ে সেই চেষ্টাই অনেকে করিতেছিলেন। বাঙ্গলাদেশের বহু বিদ্বান ও স্বনামধন্য ব্যক্তি এই নূতন নূতন কারখানাস্থাপন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইঁহাদিগের

মধ্যে সাবানের ও চামড়ার কারখানা স্থাপন করিলেন ডাঃ নীলরতন সরকার; রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা করিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বস্ত্রবয়ন কারখানার সহিত সংযুক্ত হইলেন আইনজীবি ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী। ছুরি, কাঁচি, বোতাম, তালা, স্টীল ট্রাঙ্ক, লোহার সিন্দুক, গেঞ্জি মোজা, ফুটবল ক্রিকেট হকি ব্যাডমিন্টন খেলার সরঞ্জাম, কাচের শিশি বোতল, গেলাস, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি বহু দ্রব্য তৈয়ার আরম্ভ হইল। হেমেন্দ্র বসু গ্রামোফোনের (ফোনো-গ্রাফ) রেকর্ড প্রস্তুত করিলেন। তিনি অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি বিদেশী ঢং এর "সেন্ট" প্রভৃতিও প্রস্তুত করিতেন।

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা হয় জমিদারীর আয়ের উপর নির্ভর করিতেন; নয়ত তাঁহারা চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। আর ছিলেন কিছু লোক যাঁহারা চাকুরী না করিয়া ডাক্তারী, ওকালতি, ব্যারিষ্টারি ইত্যাদিতে প্রচুর রোজগার করিতেন। কোন কোন বাঙ্গালী দোকান, আড়ত প্রভৃতি চালাইতেন। কিন্তু তাঁহারা ইংরেজের আমদানি মাল লইয়াই কেনাবেচা করিতেন। কারখানায় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করার ভিতরে বাঙ্গালীদিগকে কোথাও প্রায় দেখা যাইত না। স্বদেশী আন্দোলনের পরে বাঙ্গালী এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করিয়া প্রাণ দিয়া কারখানা খাড়া করিতে লাগিয়া গেলেন। নানাপ্রকার দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বহু বিদ্বান, উচ্চবংশীয় ব্যক্তিগণ কারখানা স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে কাগজ কলম পেনসিল কালি, তালা, সিন্দুক, পেরেক, কব্জা, স্ক্রু, তার, বিস্কুট, চিনি জ্যাম, জেলি, বার্লি, এরোরুট ইত্যাদি অসংখ্য বস্তু বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া সারা ভারতে বিক্রয় হইত। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে পরে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল বস্তুই দেশের কারখানায় উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং বহু বাঙ্গালী এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

রাষ্ট্রীয় কার্য্য ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সহিত কারখানা স্থাপন করা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া গেল; কারণ বিদেশী বাণিজ্য নষ্ট করিয়া দিতে না পারিলে ইংরেজ তাহার শোষণরীতি ত্যাগ করিতে এবং রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব বর্জ্জন করিতে কদাপি বাধ্য হইবে না, একথা বাংলার সকল শিক্ষিত লোকই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা সেইজন্যই স্বদেশীকে এমন অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশী মালমশলা উৎপাদনের জন্য এমন আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিয়া পড়িলেন।

ইংরেজ নানাভাবেই স্বদেশী-প্রচারে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাঙালী দোকানদারদিগকে আর বিশ্বাস করিতে না পারিয়া অপর জাতির দোকানদারদিগের সাহায্যে বিলাতি মাল বিক্রয় চেষ্টা হইতে লাগিল। অনেক বাঙালী বহু অর্থ বিসর্জ্জন করিয়া স্বদেশী মন্ত্র প্রচারিত রাখিতে সচেষ্ট হইলেন। বৃহৎ বৃহৎ এজেন্সি বাঙালীর হস্তচ্যুত হইয়া অপর জাতির ব্যবসাদারদিগের নিকট চলিয়া গেল। বাঙালী কিন্তু তাহাতে টলিল না। বাংলা দেশের সর্ব্বত্র "বন্দে মাতরম" ধ্বনির সহিত একতার ও আত্মবিসর্জ্জনের সঙ্গীত শোনা যাইতে লাগিল। ইংরেজ বাঙালীর এই রাজ-অভক্তির অভিব্যক্তি দেখিয়া স্থির করিল এই দুঃসাহসী জাতির লোকগুলোকে এমনই করিয়া দমন করিবে যে তাহারা চিরকালের মত ইংরেজ-বিরুদ্ধতা কত বড় অপরাধ তাহা বুঝিয়া লইবে। "বন্দেমাতরম্" বলা, গীতা পাঠ করা, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া প্রভৃতি অনেককিছুই "সিডিশন" অথবা রাজাকে অমান্য করা বলিয়া ধার্য্য হইল। ইংরেজপ্রভুদিগের গুনাইয়া "বন্দেমাতরম্" বলার জন্য ছেলেদের বেত মারিবার আদেশ দেওয়া হইতে লাগিল এবং গীতা অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" কাহারও নিকটে থাকিলে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইতে লাগিল।

এরূপ অবস্থায় অহিংসভাব রক্ষা করা সহজ হয় না এবং শীঘ্রই গুলি ও বোমার আওয়াজ জাতীয় সঙ্গীতের

সহিত শোনা যাইতে লাগিল। এই অস্ত্র ব্যবহারে স্বাধীনতা পাওয়ার চেষ্টা ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সহস্র সহস্র বাঙালী যুবক গুলি চালাইতে শিখিল এবং ইংরেজকে অস্ত্রাঘাতে বিধ্বস্ত করিয়া তাড়ান হইবে ইহাই রাষ্ট্রনীতি বলিয়া অনেকে মানিয়া লইল। বহু মহা চিন্তাশীল ব্যক্তি এই মতের সমর্থন করিতেন। শ্রীঅরবিন্দের নাম এই সূত্রে করা যাইতে পারে। তিনি ইংরেজ-বিতাড়ন বিষয়ে এই মত অবলম্বন করিয়াই চলিতেন এবং অপরকে শিক্ষা দিতেন। বাংলাদেশে এই মতই প্রবলভাবে চালিত হইয়াছিল এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-নীতি প্রচার হইবার পরেও বাঙালী এই পথের পথিকই রহিয়া গিয়াছিল। মহাত্মার নীতি রাষ্ট্রক্ষেত্রে মানিয়া লইলেও অন্তরে অন্তরে বাঙালী সেই নীতির মাহাত্ম্য কখনও স্বীকার করিয়া লয় নাই। চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতাগণ সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা সর্ব্বদাই একটা বিশেষ সম্ভাব্য রাষ্ট্রীয় নিষ্পত্তি বলিয়া বিচার করিতে দ্বিধা করিতেন না।

অহিংস-নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বাঙলার রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের প্রেরণা এরূপ একটা নিস্তেজভাব প্রাপ্ত হইল যাহাতে বাঙালীর বহুদিনের সুগঠিত আগ্রহের তাহার ভিতরে প্রাণবান হইয়া উঠিবার আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না। বাঙালী জাতির প্রতিভা যুগাধিককাল একভাবে উন্মেষিত হইয়া, হঠাৎ আর উল্টা পথে গতিশীল হইয়া উঠিতে সক্ষম হইল না। অহিংস, অসহযোগ আন্দোলনে তাই বাঙালী পূর্ণ আবেগে যোগদান করিতে সক্ষম হইল না।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষের দিকে, যখন সেই যুদ্ধ চেষ্টা দরকষাকষিতে পর্য্যবসিত হইল, বাঙ্গালী তখন ঐ কার্য্যে কোন উৎসাহ অনুভব করিতে পারিল না। সমস্ত সংগ্রামের পরিকল্পনাটাই একটা অবাস্তবতার ভিতরে পড়িয়া মায়া-মরীচিকার আকারে দেখা যাইতে লাগিল। ইহার পরে রাষ্ট্রীয় কার্য্যকলাপ শুধু রীতি-নীতি পদ্ধতির খেলা হইয়া দাঁড়াইল। দল বাঁধিয়া, দল ভাঙ্গিয়া নানা পথে নানা মতে চলাফেরা বাঙ্গলার রাষ্ট্রকর্ম্মীদিগকে রাষ্ট্রক্ষেত্রের খেলোয়াড় করিয়া তুলিল। আদর্শে বিশ্বাস, কর্ত্তব্যে নিবিষ্টপ্রাণ সত্যানুসন্ধান ব্যাকুল জনগণকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতি তাহাও সাক্ষাৎভাবে "বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর বুকে যত ভালবাসা" তাহার সহিত জড়িত নহে। বাঙ্গালী "এক হউক" এ চিন্তারও স্থান কোথাও নাই। খণ্ড-বিখণ্ড গৌরব অর্থহীন আকর্ষণ বিমুগ্ধ মোহাবিষ্ট বঙ্গ-সন্তান আজ সদা রাষ্ট্রচিন্তা ভারাক্রান্ত কিন্তু সে চিন্তার মূলে কোন স্থির অচঞ্চল নিশ্চয় মনোবিম্ব নাই। পরি-বর্ত্তনশীল চিত্তবৃত্তি সুস্থ মানসিক অবস্থার পরিচায়ক নহে। কিন্তু সেই মানসিক অবস্থা কি কারণে জন্মলাভ করিল তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে উহা বহু সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের ফল। রাষ্ট্র-নেতাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রের বৃহৎ বৃহৎ ভুল ও ইচ্ছাকৃত অন্যায় কার্য্যের ফলেও ঐ সকল সামাজিক অন্যায় বহু স্থলে হইয়াছে। সুতরাং বিষয়টাকে কোন উপযুক্ত প্রতিবিধান ব্যবস্থা না করিয়া শুধু উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সেই ব্যবস্থা কি তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু সেই আলোচনা করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

যত আঁধার তত আলো

(উপন্যাস)

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২১

শুনেছিস মনোদিদি? টহল দিয়ে ফিরে এসে জগন্নাথ মনোরমাকে ডেকে বললেন।

মনোরমা একখানি রুমালে ফুল তুলছিল। মুখ তুলে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাতে জগন্নাথ পুনশ্চ বললেন, আমাদের আচার্য্যি মশাইও বোধ হয় এ বাড়ীর মায়া কাটিয়ে চললেন।

মনোরমা বলে, একটু খুলে বলো দাদু ঠিক বুঝতে পারছি না।

একে একে নিভিছে দেউটি, জগন্নাথ হতাশকণ্ঠে বললেন, আচার্য্যি গিন্নি কিছুতেই বাগ মানছেন না। বাজারবাড়ীতে তিনি আর থাকতে রাজী নন!

মনোরমা একটু হেসে বলল, খুব দুঃখের কথা কিন্তু আচার্য্যি কাকীর হঠাৎ এ মতিভ্রম হলো কেন দাদু? নিশ্চয়ই তার কারণটাও তুমি জেনে এসেছো?

জগন্নাথ মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, বংশধরদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা চিন্তা করে আগে থেকেই তিনি সাবধান হয়েছেন।

মনোরমা পুনরায় রুমালে ফুল তোলায় মনোনিবেশ করতেই জগন্নাথ পুনরায় কথা কয়ে উঠলেন, ভাবছি এর পরে কার পালা আসবে। জানিস, দিদি আচার্য্যি মশাই এর মধ্যে জমিও কিনে ফেলেছেন। বলছিলেন আপনিও চলে আসুন। বাজারবাড়ীর আর সে দিন নেই। চরিত্র হারিয়েছে, তা ছাড়া যাঁকে নিয়ে সংসার তিনিই যখন নোটিশ দিলেন তখন আর চুপ করে থাকি কি করে।

মনোরমা নীরবে হাতের কাজ করে চলেছে। কোন জবাব দিল না।

জগন্নাথ বলতে থাকেন, আচার্য্যি গৃহিণীর যুক্তিকে সরাসরি অগ্রাহ্য করাও চলে না।

মনোরমা হাত থামিয়ে বলে, সুতরাং তাঁর না গিয়ে উপায় নেই, কিন্তু তোমাকে তো আর কেউ যুক্তি-পরামর্শ দিতে আসছে না, যে তোমাকে আচার্য্যি কাকার পিছু পিছু যেতে হবে।

মনোরমার কথায় কান না দিয়ে জগন্নাথ বলেন, আচার্য্যি মশাইয়ের অনুরোধ আমি কিন্তু এক কথায় নাকচ করে দিতে পারিনি। ভেবে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি।

হাতের রুমালটা কোলের উপর রেখে মনোরমা বলল, তোমার কিন্তু নাকচ করে দেওয়াই উচিত ছিল।

জগন্নাথ বলেন, এ কথা কেন মনোদিদি?

মনোরমা সহজ ভাবেই বলল, তোমার এত দীর্ঘ-

দিনের ভালবাসা—এত সহজে একে ত্যাগ করা কি সহজ হবে ?

জগন্নাথ হেসে জবাব দিলেন, বৃদ্ধ বয়েসে স্ত্রী-বিয়োগও মানুষ সহ্য করে। মেনেও নেয় দিদি।

মনোরমা বলল, উপায় নেই বলেই মেনে নেয়, কিন্তু বাড়ী বদল তোমার নিজের হাতের মধ্যে।

জগন্নাথ সহসা গম্ভীর হয়ে বলেন, যতদিন বয়েসের জোর ছিল মনের বলও ছিল, কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অল্পেই বড় ভয় পাই।

মনোরমা বলে, তোমার এ ভয় কার জন্যে দাদু ? তা ছাড়া কাকে তুমি ভয় পাচ্ছ ?

জগন্নাথ চুপ করে থাকেন।

মনোরমা পুনরায় বলে, পালিয়ে গেলেই কি তোমার ভয় ঘুচবে দাদু।

জগন্নাথ বলেন, ঠিক জানি না দিদি তবু যতটুকু সাধ্যাতীত নয় সেইটুকুই করতে চাইছি।

মনোরমা হেসে বলল, তুমি একচোখো হরিণের মত ভাবতে শুরু করেছো। এখান থেকে পালিয়ে যেখানে যাবে সেখান থেকে যদি আরও বড় আঘাত আসে তাহ'লে কি করবে ? আবার অন্য কোথাও পালাবে তো ? তোমার আজ কাল কি হয়েছে বলো তো দাদুভাই ? আমাকে নিয়ে খুবই কি বিব্রত হয়ে পড়েছো ?

জগন্নাথ বিস্মিত কণ্ঠে বলেন, এ কথা কেন দিদি।

মনোরমা বলল, কেন বলবো না দাদু। তুমি যদি আজ তোমার নিজের কথার মর্য্যাদা দিতে না চাও তাহলে আমি অন্তত চুপ থাকবো না। আমার যা কিছু শিক্ষা তা যে তোমার কাছে দাদুভাই।

জগন্নাথ বলেন, সে আত্মবিশ্বাস আমার টুটে গেছে ভাই। আমার সব চিন্তা আজ এক চিন্তার মধ্যে দিন-রাত পাক খাচ্ছে। তুই আমার সকল চিন্তার বড় চিন্তা হয়ে উঠেছিস দিদি। নইলে নিজের জন্য কোনদিন আমি ভাবিনি আজও ভাবছি না।

মনোরমা আরও খানিকটা সজাগ হয়ে উঠল, হঠাৎ আমার সম্বন্ধে এতটা সচেতন হয়ে উঠবার কোন কারণ ঘটেছে কি।

জগন্নাথ বললেন, হঠাৎ নয় মনোদিদি। হরেন মাষ্টার আমাকে এই পথে ভাবতে বাধ্য করেছে। এতোদিন আমার দৃষ্টি শুধু একদিকেই ছিল।

মনোরমা রাগ করে জবাব দিল, হরেন মাষ্টারের মত লোক আজই কি তুমি প্রথম দেখলে, না মনোরমার মত দুর্ভাগিনী ত এর আগে তোমার চোখে পড়েনি। আসলে তুমি অন্য কথা ভাবছো। সত্যকথাটা আমাকে বলতে চাও না।

জগন্নাথ শান্তভাবে বলেন, তুই রাগ করিস কেন দিদি। আমি তো রাগের কথা বলিনি। তবে সত্য মিথ্যার কথাটা যখন বললি তখন শুনে রাখ যদি কোন দিন কোন কারণে আমাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়ে থাকে সে তোরই মঙ্গলের জন্য, তোরই শান্তির জন্য।

একটু থেমে তিনি পুনরায় বলতে থাকেন, এই সত্য আর মিথ্যার হিসেব আমি অনেক দিন সুরু করেছি কিন্তু আজও শেষ করতে পারিনি। কিছুতেই অঙ্ক মিলছে না। আর আমার অশান্তি বেড়ে উঠছে।

মনোরমা বলে, তোমার অঙ্ক কোনদিন মিলবে না দাদু।

জগন্নাথ ভূত দেখার মত চমকে ওঠেন। বলেন, কেন কিসের জন্য মিলবে না শুনি ? মনোরমা বলে, মাঝ পথে ভয় পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারা যায় না—কিন্তু তোমার কি আজ তামুকের তেষ্টাও পায়নি ?

ও তাই বলো ভাই, জগন্নাথ বলেন, আর কি বেশ বলছিলে ঐ তামুকের কথা—আজ পর্য্যন্ত নিজে হাতে তো সেজে খেয়েছি বলে মনে পড়ে না মনোদিদি। দয়া করে হাতের কাছে এগিয়ে দিলে আমি কোনদিন না করেছি এ আমার পরম শত্রুরাও বলবে না।

মনোরমা বলে, তুমি আজ কাল বেশ খোঁচা দিয়ে কথা বলতে শিখেছো দাদু।

জগন্নাথ হাসতে থাকেন। আর মনোরমা রাগ করে উঠে গেল। তার কোলের উপর থেকে যে ফুল তোলা রুমালখানা মাটিতে পড়ে গেছে সেদিকে পর্য্যন্ত হুঁস নেই। জগন্নাথ রুমালখানা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

তামাক নিয়ে ফিরে এল মনোরমা। দাদুর হাতে রুমালখানা দেখে একমুখ হেসে জিজ্ঞেস করল, কেমন হয়েছে দাদু?

জগন্নাথ বললেন, হয়েছে ভালই কিন্তু কোন ভাগ্যবানের জন্য করা হলো দিদি? মনোরমা স্নিগ্ধ হেসে বলে, আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। তোমাদের ঐ অঞ্জন বাবুর জন্য। আমার মুণ্ডু ঘুরে যাচ্ছিল। বেছে বেছে চিনে নিয়েছ তো ঠিক!

জগন্নাথ বার কয়েক হুঁকায় টান দিয়ে হেসে বললেন, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। আমি মিথ্যা হিংসা করে কি করবো।

দাদু—

তবে হ্যা—জগন্নাথ বলেন, ছেলে দুটো ভাল। জাতের ছেলে। বেশী দিন এ বাড়ীতে টিঁকবে বলে মনে হয় না। ওদের ভবিষ্যৎ আছে। আর সে সম্বন্ধে ওরা একটু বেশী সচেতন।

মনোরমা নীরবে শুনছে। কোন জবাব দেয় না। জগন্নাথ হাঁ করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে পুনরায় বলতে থাকেন, আমার মত পৈতে পুড়িয়ে যারা বোষ্টম হয়নি তারা এখানে থাকবে কেন। আচার্য্যি মহাশয় তো পা বাড়িয়ে আছেন। পুরানোর মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত হয়তো আমাকেই এখানে পড়ে থাকতে হবে। আচ্ছা দিদি, তোর এখানে থাকতে আর ভাল লাগে?

মনোরমা হেসে বলে, এখন পর্যন্ত তো লাগছে, পরে কি হবে জানি না।

একটা স্পষ্ট উত্তর দে ভাই—জগন্নাথ বলেন।

মনোরমা বলে, তোমার ভাল লাগাই আমার লাগা দাদু। এর বেশী জানবার কিংবা ভাববার সুযোগ কোথায়।

জগন্নাথের দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে দেখাচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে তিনি চমকেও উঠলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে যথাসম্ভব স্বাভাবিককণ্ঠে বললেন, তোর এই ধরনের কথায় আমি কত ব্যথা পাই তা যদি জানতিস দিদি।

মনোরমা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে, না জানলেও কিছু কিছু অনুমান করতে পারি দাদু। সেইজন্যেই অত্যন্ত প্রয়োজনবোধ করলেও আমি নিজের সম্বন্ধে কোন কথা জানতে চাই না। ভয় পাই।

মনোরমা থামল।

জগন্নাথ নীরবে শুধু হুঁকো টেনে চলেছেন। চতুর্দ্দিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। জগন্নাথের সম্মুখের পথটাও ধোঁয়ায় ঢাকা। তিনি চোখ বুজে সেই ধোঁয়ার বেড়াজালকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে আলোয় আসবার জন্য আজ ব্যাকুল। কিন্তু তাঁর দুর্ব্বল দেহ অবসন্ন হয়ে পড়েছে—পা চলতে চায় না। মন বলে আর কতদূর—কোথায় সেই ঈপ্সিত পথ।

মনোরমা ডাকল দাদু—

সাড়া পাওয়া গেল, কি দিদি—

মনোরমা বলে আচার্য্যি কাকা তাহলে সত্যিই চলে যাবেন?

জবাব দিলেন জগন্নাথ, বড় জোর মাস দুই আর আছেন। আমি ফেরাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তার মাথায় আদর্শ গৃহস্থ হবার ভূত চেপেছে—কে ওখানে? সাড়া পাওয়া গেল, আমি রঞ্জন দাদু—

জগন্নাথ আহ্বান জানালেন, বাইরে কেন ভিতরে চলে এসো ভাই।

রঞ্জন ভিতরে প্রবেশ করে উদ্বিগ্নভাবে বলল বড্ড বিপদে পড়ে গেছি। আচার্য্য মশায়ের কাছে প্রথমে

গিয়েছিলাম বুদ্ধি নিতে, তিনি না থাকায় গেলাম হরেন বাবুর কাছে। তিনি ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলেন তাই শেষ পর্য্যন্ত আপনার কাছে ছুটে এলাম।

জগন্নাথ ধমকে উঠলেন, তাদের জন্য অপেক্ষা না করে আমার কাছে কেন—

মনোরমা জগন্নাথকে বাধা দিয়ে রঞ্জনকে উদ্দেশ্য করে বলল, তাঁদের কাছে কেন ছুটে গিয়েছিলেন—কি বিপদে পড়েছেন আপনারা সেকথা তো বললেন না।

রঞ্জন করুণ হেসে বলল, কারণটা হয় তো সামান্যই কিন্তু ভয় পেয়ে আমি বুদ্ধি হারিয়েছি। অঞ্জন হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অপিস থেকে ফিরে এসে দেখি জ্বরে বেহুঁস হয়ে আছে।

জগন্নাথের মুখের পানে চোখ তুলে একবার চেয়ে দেখে মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমিও যাবে নাকি দাদু? এই হতভাগা বাড়ীতে যতদিন আছি কি বলো দাদু চাকরীটা তাহলে নিয়েই ফেলি।

তারপর রঞ্জনকে বলে, আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন না যান। আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি।

রঞ্জন চলে যেতে জগন্নাথ মাথা নেড়ে বললেন, সময়টা বড় খারাপ ভাই। ছোঁড়াটা ভাবিয়ে তুললো দেখছি—যা বসন্ত হচ্ছে চতুর্দিকে...

মনোরমা আর্ত্তনাদ করে উঠল, দাদু—

তেমনি মাথা নাড়তে নাড়তেই তিনি বললেন, ছেলেটার উপর একটা মায়া পড়ে গেছে বলেই সবার আগে খারাপ চিন্তাটা মনে এসেছে মনোদিদি। কিন্তু আর দেরী নয় ভাই চলো।

২২

জগন্নাথের আশঙ্কা শেষ পর্য্যন্ত সত্য বলে প্রমাণিত হলেও রোগটা খুব সহজ বলে ডাক্তার রায় দিলেন না। সাত দিন পরে ডাক্তার টাইফয়েড বলে সিদ্ধান্ত করলেন। রঞ্জন ভয় পেয়ে মাঝে মাঝে এমন সব কাণ্ড করে বসছে যে মনোরমা আড়ালে মুখ টিপে হাসলেও জগন্নাথ রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠেছেন।

রঞ্জন দোষ স্বীকার করে নিয়ে বলে, আপনি রাগ করছেন কিন্তু এর আগে অনেক বিপদে পড়লেও অসুখ-বিসুখের সাক্ষাৎ ঘটেনি বলেই একটু ঘাবড়ে গেছি।

মনোরমা বলল, একে একটু বলে না রঞ্জনবাবু। এতো বেশী উতলা হলে আপনি নিজেই অঞ্জনের সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করবেন। তার চেয়ে আমি বলি কি আপনি যেমন নিয়মিত অপিস করেন তাই করুন। যদি দরকার হয় ফোন করে আপনাকে না হয় ডাকিয়ে নেবো।

জগন্নাথ মনোরমার কথায় সায় দিলেন।

রঞ্জন অসহায় ভাবে বলল, জানেন তো অঞ্জন ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর কেউ নেই।

মনোরমার চোখে মুখে পুনরায় খানিক চাপা হাসি দেখা দিল, আর জগন্নাথ মৃদুকণ্ঠে বললেন, যেমন আমার মনোরমা ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। কিন্তু তাতে হয়েছেটা কি। অসুখ মানুষেরই হয়—সে অসুখ ভালও হয়। তাছাড়া অঞ্জন তো ভালর মুখে রঞ্জনবাবু।

রঞ্জন চুপ করে থাকে।

জগন্নাথ আলোচনাটাকে অন্য পথে নিয়ে এলেন, আরে বাপু ভয় ভাবনা না আছে কার। তুমি ভাবছো ভাইয়ের অসুখের কথা, আমি ভাবছি আমার বৃদ্ধ বয়েসের কথা। এখুনি হয় তো মনোদিদি আবার রাগ করে বসবেন, তিনি আবার আমার বয়েসের হিসেব নিতে রাজী নন।

এতক্ষণের গুমোট আবহাওয়াটা একটু যেন কেটে গেছে মনে হল।

মনোরমা ধমক দিল, এটা রুগীর ঘর দাদু।

জগন্নাথ তথাপি থামতে পারেন না, অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে বলতে থাকেন, আমার জীবনে এখন ভাঁটার টান ধরেছে। ফিরে যাবার ডাক এসেছে। তোমাদের মত দু'কূল ভাসিয়ে চলবার কথা ভাববো কেমন করে ভাই।

মনোরমার চোখ-মুখের ভাব থমথমে হয়ে উঠল, এত অবান্তর বকতে পার তুমি দাদু। জানেন রঞ্জনবাবু, দাদু শুধু নিজের জীবনের জোয়ার ভাঁটার দিকটাই দেখতে পান, কিন্তু যে জীবনে জোয়ার কিংবা ভাঁটা কোনটাই নেই—আমি বদ্ধ জলাশয়ের কথা বলছি, তাদের সম্বন্ধে উনি কি বলেন একবার জিজ্ঞেস করবেন কি?

রঞ্জন কিছু না বুঝেই একটুখানি হাসল। বলল, খেরা কেটে তাকে জোয়ারের জলের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেই তো চুকে যায়।

মনোরমা অকারণেই একটু লাল হয়ে উঠল আর জগন্নাথ উঠলেন চমকে। মনোরমা উঠে গিয়ে অঞ্জনের জ্বরের চার্ট দেখতে লাগল। রঞ্জন কিছুই লক্ষ্য না করে পুনরায় বলতে থাকে, জলাশয়ে জলোচ্ছাস দেখতে হলে কিছু ত্যাগ আর কিছু পরিশ্রম করতে হয়। সংযোগের জন্য খাল কাটতে দরকার পরিশ্রমের আর খালকে সম্পূর্ণ করতে কিছু জমি ছেড়ে দিয়ে করতে হবে ত্যাগ স্বীকার। ব্যাস চুকে গেল সমস্যা।

জগন্নাথ বলেন, কিন্তু মানুষের সমাজে ঐ দুটো বস্তুরই একান্ত অভাব। তারা নিজেরাও মরে অপরকেও মারে, তবু অহংকার ছাড়ে না। কিন্তু আর নয় রঞ্জনবাবু। মনোদিদি ঠিকই বলেছেন এটা রুগীর ঘর, তার চেয়ে তুমি বরং অঞ্জনের ওষুধপত্রগুলি নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করো।

রঞ্জন অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘর ছেড়ে চলে গেল। জগন্নাথও একবার ভয়ে ভয়ে মনোরমার মুখের পানে চেয়ে দেখে নিঃশব্দে সরে পড়লেন।

মনোরমা দেখেও যেন দেখেনি এমনিভাবে বসে রইল। একবার সে অঞ্জনের কপালে হাত রেখে উত্তাপ পরীক্ষা করে মৃদুকণ্ঠে ডাকল, অঞ্জন ভাই—

অঞ্জন চোখ মেলে তাকাল। সাগ্রহে মনোরমার হাতখানি কপালের উপর চেপে ধরে মৃদুকণ্ঠে বলল, খুব ঠাণ্ডা।

মনোরমা সস্নেহে বলল, ভাল বোধ করছো অঞ্জন—

অঞ্জন একটু হাসল, কোন জবাব দিল না।

মনোরমা কোমল কণ্ঠে বলল, কথা বলতে ভাল লাগছে না বুঝি?

অঞ্জন সম্মতি জানাল।

মনোরমা বলল, চুপ করে থাক তাহলে। আমি তোমার পাশেই আছি।

মনোরমা একখানি বই নিয়ে পড়তে শুরু করল। কিন্তু পড়ায় মন বসলো না। ঘুরেফিরে রঞ্জনের কথাকটি তার মনের একটি সূক্ষ্ম তারে টোকা দিতে লাগল। জোয়ারের জলের ঢেউ এসে হৃদয়ের কূলে আছড়ে পড়ছে। ধীরে ধীরে ভাঙতে শুরু করেছে জমাট মাটির বাঁধন।

আর জগন্নাথ ওখান থেকে বার হয়ে এসে, সোজা উপস্থিত হলেন যোগেন আচার্য্যের ঘরে। সাদর আহ্বান জানালেন আচার্য্য মশাই, আসুন চৌধুরী মশাই।

জগন্নাথ নীরবে আসন গ্রহণ করলেন। মন তার ভাঁটার টানে সমুদ্রে এসে পড়েছে। চিন্তা তার হাবুডুবু খাচ্ছে।

যোগেন আচার্য্য বলেন, বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন যেন চৌধুরী মশাই।

জগন্নাথ জবাব দিলেন, তা একটু হয়েছি। বয়েসটাই ভাবিয়ে তুলেছে। পিছন পানে চোখ ফিরিয়ে তাই ভয় পেয়ে গেছি; মনোদিদিকে নিয়ে আমার ভাবনা আজ আর কূল পাচ্ছে না।

যোগেন আচার্য্য বলেন, যাঁর ভাবনা তিনিই ভাববেন। আমরা তো শুধু নিমিত্ত মাত্র।

জগন্নাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, কথাটা ভাল কিন্তু আমাদের মন যে বড় অবিশ্বাসী। যে কথা মুখে বলি তার উপর আন্তরিক আস্থা নেই। তাই এতো দুঃখ পাই। যতক্ষণ জেগে থাকি এ চিন্তার হাত থেকে নিস্তার নেই।

যোগেন আচার্য্য বলেন, এতো চঞ্চল হতে আপনাকে এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না তো।

জগন্নাথ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, চঞ্চল হবার কি সত্যই কোন কারণ ঘটেনি আচার্য্য মশাই ?

যোগেন আচার্য্য গম্ভীর হয়ে উঠলেন, কথা বললেন না।

জগন্নাথ বলেন, তুই ভদ্রলোকের ছেলে, এ কেমন তোর ব্যবহার—

যোগেন আচার্য্য বলেন, এদের মনোবৃত্তির কথা আর বলবেন না। তুই স্কুলমাষ্টার তোর হাতে কত অগণিত শিশুকে গড়ে তুলবার দায়িত্ব—দেশের ভবিষ্যৎ তোদের হাতে আর এই হলো তোর মনের পরিচয়। একটি অসুস্থ ছেলেকে সেবা করে সুস্থ করে তুলবার চেষ্টা হলো অপরাধ! আর এই মেয়েটিই দু'বেলা তোদের জন্য কি না করেছে। না না চৌধুরী মশাই, এই বাজারবাড়ীর হাওয়াটাই বিষাক্ত হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী সত্যিই কিছু অন্যায় কথা বলেন না।

জগন্নাথ দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, শেষ পর্য্যন্ত হয় তো আমাকেও এ বাড়ী ত্যাগ করতে হবে। মনোদিদি অবশ্য আপত্তি করেছে।

বিস্মিত কণ্ঠে যোগেন আচার্য্য বলেন, আপত্তি করেছে মনোরমা!

মনোরমার নিজের একটা যুক্তি আছে—জগন্নাথ ধীরে ধীরে বলেন।

যোগেন আচার্য্য প্রশ্ন করেন, কি বলে সে ?

জগন্নাথ বলেন, মনোদি বলে, পুকুরের সব জলটাই গেছে বিষাক্ত হয়ে, তুমি এপার থেকে জল না খেয়ে ওপারে গিয়ে খেলে কি বাঁচতে পারবে দাদু ?

ভাববার কথা চৌধুরী মশায়, বললেন যোগেন আচার্য্য। মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় এ আমরা কোথায় এসে উপস্থিত হয়েছি, পরিত্রাণের পথ কোথায়। এ পথ তো বাঁচবার পথ নয়।

হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন—এতক্ষণ কোন কথাই শোনেননি এমনি ভাবে জগন্নাথ জিজ্ঞেস করেন, কি বলছিলেন আপনি...

যোগেন আচার্য্য বলেন, বলছিলাম নিজেদের চারিত্রিক অবনতির কথা। আজ ছাত্রদের পুলিশ পাহারায় পরীক্ষা দিতে হয়, আইন করে ভদ্রতা শেখাতে হয়। সাধুতার পুরস্কার মেলে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াবার হুকুমনামা প্রাপ্তিতে। এর কোনটাকে স্বাভাবিক বলে আপনি ভাবতে পারেন।

জগন্নাথ মৃদুকণ্ঠে বললেন, আমিও সেদিকে ঠিক এই কথাটাই বলেছিলাম আচার্য্য মশাই। মনোরমা বলে, স্বাভাবিক শব্দটার চেহারা নাকি বর্ত্তমান যুগে পাল্টে গেছে। কথাটাই যা ঠিক আছে। আমি বললাম, তোর এ কথার মানে দিদি ? মেয়েটা অদ্ভুত এক যুক্তি দেখাল।

যোগেন আচার্য্য বলেন, আবার কি যুক্তি দেখালো ?

বলে—জগন্নাথ জবাব দেন, স্বাভাবিক শব্দটার সর্বাঙ্গে গুটি বার হয়ে তার রূপ পালটেছে তাই বলে বর্জন করাও সম্ভব নয়, ত্যাগ করাও উচিত নয় বরং যত্ন আর সেবা করে তাকে নিরাময় করে তোলার কথাই ভাবতে হয় দাদু।

যোগেন আচার্য্য বললেন, অর্থাৎ ঔষধের ব্যবস্থা করতে বলছে মনোরমা। কিন্তু কোথায় পাবেন সে ওষুধ, আর কে নেবে তার দায়িত্ব। সব কিছুই যে ভেজালে ভরা।

বলেছিলাম, জগন্নাথ জবাব দিলেন, তার উপরে মনোরমা বলে, তোমরা যাকে ভেজাল বলো, আজকের দিনে সেইটেই হ'লো আসল।... তোমরা যাকে আসল

বলো সে আজ ঐতিহাসিক সত্য বলে ধরে নিতে পারো। একদিন হয়তো ঐ শব্দটা নিয়ে গবেষণা ক'রবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নব্য মানুষরা।

বাইরে থেকে মৃদু আহ্বান শোনা গেল, দাদু—

জগন্নাথ সাড়া দিলেন, আয় ভাই, তোর কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল।

মনোরমা ঘরে প্রবেশ করে মৃদু হেসে বলল, তোমাদের হাতে বোধ হয় আলোচনা ক'রবার মত আর কিছু ছিল না দাদু, তাই হতভাগী মনোরমাকে নিয়ে পড়েছো। তাই না?

জগন্নাথ কোন কথা বলেন না। জবাব দিলেন যোগেন আচার্য্য, এ আবার কি ব'লছো মনোরমা?

মনোরমা বলল, কিছু মিথ্যে বলেছি কি কাকাবাবু? পৃথিবী আজ পাল্টে যাচ্ছে। পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়েই সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তন ঘটে একথা দাদুই আমাকে হাজারবার বলেছেন। আপনাদের আলোচনার কিছু কিছু আমার কানে গেছে বলেই বলছি। এই পরিবর্ত্তনকে অস্বীকার করলেই কি সবকিছু ঠেকিয়ে রাখা যাবে? আমি বলি তাকে এগিয়ে যেতে পথ ছেড়ে দিন। তাতে বরং ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব হ'তে পারে।

তাতে কি সর্ব্বনাশকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব মনোরমা? আচার্য্যিমশাই বলেন।

নয় কেন কাকাবাবু? মনোরমা জোর দিয়ে বলল, সময়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি। জোয়ারের যে জল সামনে চলে, ভাঁটার সময় সেই জলকেই পিছু হটতে হয়। বাধা দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি যাতে না করা হয় এই কথাটাই আমার বক্তব্য।

যোগেন কতকটা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, এসব কথা তুমি কাকে ব'লছো আর কেনইবা বলছো খুলে বলবে কি মনোরমা? যতদূর মনে হ'চ্ছে আমাদের আলোচনার একটা জবাব দেবার চেষ্টা করছো তুমি?

খানিক হাস্যোজ্জ্বল হাসি হেসে মনোরমা বলল, আপনার অনুমান মিথ্যে নয়। দাদুকে ডাকতে এসে একবার আমি ফিরে গিয়েছিলাম আপনারা তখন হরেনবাবুকে নিয়ে আলোচনা ক'রছিলেন। এখনও তারই জের চলছে মনে হ'লো। তাই বলছিলাম, হরেনবাবুকে তার মত করে চলতে দিন। বাধা দিয়ে তার নোংরামিকে শক্তি যোগাবেন না কাকাবাবু এই আমার অনুরোধ।

যোগেন আচার্য্য ক্ষেপে উঠলেন, এ তোমার কেমন কথা মনোরমা। এতবড় একটা অন্যায়কে চুপ ক'রে মেনে নেবো। প্রতিবাদ ক'রে তাকে বুঝিয়ে দেবো না!

বিচিত্রভাবে একটু হেসে মনোরমা পুনরায় বলল, কাকাবাবু বোঝাতে চাইছেন আপনি কাকে? হরেনবাবুকে তো? হায় ভগবান, এও আপনাকে বলে দিতে হবে যে আজ পর্য্যন্ত যত বদনাম তিনি দিয়েছেন তাকে সবচেয়ে বড় মিথ্যা বলে তিনি নিজেই জানেন? কি তাকে আপনি বোঝাবেন—তিনি তো ছেলেমানুষ নন। তারচেয়ে হরেনবাবু তাঁর পথে চলুন আমরা আমাদের রাস্তায় চলি। তাল ঠুকে লড়াই ক'রতে গিয়ে লোক জমা ক'রে কোন লাভ নেই।

সহসা মনোরমা তার দাদুর পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য কথায় এল, চলো দাদু, রঞ্জনবাবুকে তো জান ওঁর উপর ভরসা ক'রে অজনকে বেশীক্ষণ রাখা উচিত হবে না।

যোগেন আচার্য্য বললেন, তুমি মন্দ কথা বলোনি মনোরমা। ভেবে দেখার উপযুক্ত কথা।

জগন্নাথ এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, এবারে মুখ খুললেন। ঘাড় কাত ক'রে হেসে ব'ললেন ভাবতে হয় আপনি ভাবুন আচার্য্য মশাই। আমার মেনে না নিয়ে কোন উপায় নেই। মনোদিদির কাছে সবসময় হেরে গিয়েই আমার সেরা আনন্দ।

বটেইতো...মনোরমা হাসিমুখে বলল, আনন্দ না পেয়ে উপায় কি। মনোরমা অসহযোগ সুরু ক'রে

দিলে তামাক সেজে দেবে কে আর কাঁচ কলার ডালনা অমন কালিয়ার মত ক'রে বেঁধে খাওয়াবেই বা কে।
যোগেন আচার্য্য হেসে উঠলেন।

হাসবেন না আচার্য্যি মশাই—জগন্নাথ বলেন, মনোরমা ঠাট্টা করেনি। মেয়েটা রাঁধে ভাল। কিন্তু দোষের মধ্যে ঐ অহঙ্কার। না হয় শিখেছিস বাপু ভাল রাঁধতে তাই বলে নিজের ঢাক নিজেকে পিটতে হবে।

মাত্রাধিক গম্ভীর কণ্ঠে মনোরমা বলল, তবে যে তুমি সবসময় বলে বেড়াও যে, আজকের দিনে যেলোক নিজের ঢাক নিজে পিটতে পারে না সে ভদ্র আর শিক্ষিতসমাজে চলবার অনুপযুক্ত! কিন্তু আর একটি কথাও তোমাকে ব'লতে দেবো না। চলো।
মনোরমা উঠে দাঁড়াল।

২৩

কুকারের কাঠ কয়লা জ্বলে উঠেছে। সেই সঙ্গে খিদেয় জ্বলছে ওর পেট। মলয় অদূরে ব'সে সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। আজ প্রচুর লিখেছে। দেহে এবং মনে একরাশ ক্লান্তি নেমে এসেছে।

দিনকয়েক ধরে মনোরমা আর আসছে না। অঞ্জনকে নিয়ে ব্যস্ত আছে। অঞ্জনের অসুখটা বাঁকা পথ ছেড়ে যাবার সোজা রাস্তায় চলতে সুরু ক'রেছে। বাজারবাড়ীর অনেকের সোজা এবং বাঁকা দৃষ্ট ঐ একটি ঘরের উপর নিবদ্ধ। রুগীর চেয়ে শুশ্রূষাকারিণীকে নিয়েই আগ্রহটা বেশী! বিশেষ করে হরেন মাষ্টারের রাগটাই কিছু অধিক। কবিতা সারওয়াগীর বিয়ের পরে বাড়ীটা অনেকদিন ঝিমিয়ে ছিল। হঠাৎ নাড়া পেয়ে আবার জেগে উঠেছে। হরেন মাষ্টার দোরে দোরে কড়া নেড়ে জাগিয়েছে। আলোচনায় বিষ ঝরছে আগুন জ্বলছে। জল ঢালার লোকের ও সংখ্যা কম নয়ই। জ্বলে উঠেও তাই নিভে যাচ্ছে।

মনোরমার চালচলনে রীতিমত উদ্ধত অবহেলা প্রকাশ পাচ্ছে। বিশেষ ক'রে হরেন মাষ্টারকে দেখলেই সে ভাবটা আরও উগ্র হ'য়ে ওঠে। ইতিমধ্যে একদিন মাত্র তার সঙ্গে মলয়ের দেখা হ'য়েছিল। হেসে বলেছে, নতুন চাকরী জুটেছে—বড্ড দায়িত্ব। সময় করে আসতে পারছি না। লেখাটা শেষ হ'লে ব'লবেন কিন্তু। একসঙ্গে পড়বো। এক বেশী আর একটি কথাও মনোরমা ব'লতে চায়নি। হাতে তার অঞ্জনের পথ্যের বাটি।

মলয় তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে বলেছিল, চাকরির মেয়াদ আর কতদিন মনোরমা চলতে চলতেই জবাব দিয়েছিল, গ্রহণ করাটা আমার হাতে তারপর মালিকের ইচ্ছা। মলয় বলেছিল, সময় হলেই একবার এসো।

সময় পেলেই যাব। উত্তরে মনোরমা জানিয়েছিল।
আজও মনোরমা সময় করে উঠতে পারেনি। রোগের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে দিনের পর দিন। ক্লান্তি নেই অবসাদ নেই। একটা তীব্র বেদনায় মলয়ের মনটা ভারী হ'য়ে উঠে। জীবনের বিভিন্নধর্মী আশা-আকাঙ্ক্ষা এইভাবেই হয়তো ও মিটিয়ে নেয়। মুখ ফুটে কাউকে কিছু ব'লতেও পারে না, মুখ ফুটে কিছু চাইবারও নেই। মলয়ের সমস্ত সত্তা কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। নিতান্ত অকারণেই চোখ দুটো ঝাপসা হ'য়ে যায়। মনটা অতীতের কোন এক অতল সমুদ্রে ডুবে যায়। ক্ষণপূর্বের অসহ্য ক্ষুধা স্থানচ্যুত হ'য়ে তার বুকে আশ্রয় নিয়েছে। তোলপাড় সুরু হ'য়েছে তার চেতনার স্তরে স্তরে। মনোরমাকে নিয়েই আজকের এই চিন্তা।

অত্যন্ত অভাবিত ভাবেই দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ ক'রল মনোরমা। মলয় অবাক দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে দেখে বলল, আশ্চর্য্য যখন তোমার বিষয় মনে অসংখ্য প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ঠিক সেই সময়ই তোমার দেখা পাওয়া গেল।

মনোরমা মলয়কে ভুল বুঝল। কঠিনকণ্ঠে জবাব দিল, হঠাৎ বুঝি খুব মূল্যবান হ'য়েছি আপনাদের কাছে। কিন্তু আপনার ঘরের দরজা তো সবসময় বন্ধই থাকে মলয়বাবু।

মনোরমার এই অকারণ বিরক্তিতে মলয় রীতিমত বিস্ময়বোধ করলেও সহজকণ্ঠে জবাব দিল, সেই জন্যই কেউ দরজা ঠেলে আমার ঘরে এলে খুশী হই। কিন্তু তোমার আজ কি হ'য়েছে বল দেখি। এমন ক'রে রাগ ক'রলে কেন?

মনোরমা নিজের ভুল বুঝে লজ্জা পেল, বলল, না না রাগ ক'রবো কেন। অন্যমনস্ক ছিলাম ব'লেই— তাছাড়া মনটা ইদানিং বড় ছোঁয়াচে হ'য়ে পড়েছে।

মলয় স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, সকলেরই হয় মনোরমা। কিন্তু মনের জোর না থাকলে তো কেউ ভাল কাজ করতে পারে না। এমন কি উচিত কাজ ক'রতেও ভয়ে পিছিয়ে যায়। দরজা আমার প্রায় সব সময় বন্ধ থাকে এ কথা ঠিক। সে দরজা ঠেলে ভিতরে তুমি ছাড়া আর কেউ আসে না বটে কিন্তু বাতাস ঘরে ঢুকবার রাস্তাতো একটা আছে।

মলয় একটু থেমে পুনরায় বলল, ছোট বড় কথায় কান দেবার সত্যিই তোমার কোন দরকার নেই। মানুষের কটু-কথা কখনও মানুষকে ছোট ক'রতে পারে না যদি সে ছোট কাজ না করে।

মনোরমা খানিক চুপ ক'রে থেকে বলে, দাদুও ঠিক আপনার মত করে এই একই কথা রোজ একবার করে শোনান। কিন্তু আপনারা যতই ভাল ভাল কথা শোনান না কেন ঐ ছোঁয়াচে কথাগুলো কিন্তু অনেক সময় মনকে দুর্বল ক'রে দেয়। কখনও কখনও জখম ক'রেও বসেও।

মলয় শান্ত হেসে বলল, ওটা একটা সাময়িক অবসাদ অথবা চাঞ্চল্য। ওর জীবন ক্ষণস্থায়ী। যারা যত বেশী অন্যায় করে তারা তত বেশী চীৎকার করে। ওতে কিছু শান্তি ভঙ্গ হলেও তেমন ক্ষতি করতে পারে না বলেই আমি বিশ্বাস করি।

মনোরমা বলল, আমার মনটা নিছক স্টিলের তৈরী নয় মলয়বাবু, বারে বারেই আঘাতকে ফিরিয়ে দিতে পারবো। দাদু মনে হয় ইদানিং বুঝতে পেরেছেন তাই অন্য পথে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। শুনলে অবাক হবেন, দাদু এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন।

মলয়ের মুখে খানিক হাসি ফুটে উঠল।

মনোরমা বলল, হাসছেন কেন?

মলয় বলল, অনেক দুঃখেও হাসি পায়।

মনোরমা বলল, আপনার আবার দুঃখ কিসের।

মলয় স্মিতকণ্ঠে জবাব দিল, মানুষ হয়ে জন্মেছি আর দুঃখ থাকবে না? কিন্তু আমার কথা থাক। তোমার কথা বলো।

মনোরমা বলল, আমার নিজের সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। দাদু এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছেন তাই বললাম। আচার্য্যি কাকা অবশ্যই তাঁর নিজের বাড়ীতেই যাবেন।

মলয় পরিহাস করে বলল, তোমার দাদুকে ব'লে করে আমাকেও সঙ্গে নিও মনোরমা।

মনোরমা হেসে বলল, আপনাকে আবার সঙ্গে নিতে হবে কেন। হাত পা আছে গেলেই ফুরিয়ে যাবে। ইচ্ছে হলে যেতেও পারেন ইচ্ছে না হ'লে এখানেও আজীবন কাটাতে পারেন। বাধা দেবার কিংবা চিঠি দেবার তো কেউ নেই আপনার।

একটু থেমে একটু ভেবে সে বলল, আর বসবো না। এবারে যাই। কিন্তু আপনার বইটা শেষ হ'লে জানাবেন।

মলয় বলে, জানাবো।

মনোরমা ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে গেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিশ্রামের অবসরে মলয় একটি চারমিনার সিগারেট প্রায় শেষ ক'রে এনেছে।

এর পরে তাকে আবার খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে।

সিগারেটের শেষ গোটাকয়েক টান দিয়ে মলয় খাতাটা টেনে নিয়ে শেষের দিকের গোটাকয়েক লাইন পড়ে নিয়ে আবার সুরু করল :—

......মৃদুলা হাসছে কেতকীও হাসছে কিন্তু আমি মোটেই মিথ্যে কথা বলিনি মৃগাঙ্ক। জগন্ময় হাসিমুখে ব'লতে থাকেন, গ্রামের রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা। বাইরে থেকে হঠাৎ কিছুদিনের জন্ম এসে পড়লে খানিক অসুবিধের সৃষ্টি হয়। কোথাও ঠিক ঠিক ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হয়।

মৃগাঙ্ক বলল, রাজনীতি আপনি কাকে বলছেন?

জগন্ময় হেসে জবাব দেন, মতের আর পথের লড়াইয়ের কথা বলছি। তোমার দৃষ্টিকে একটু গুটিয়ে এনে আশে পাশে তাকাও দেখবে সংসারনীতি আর রাজনীতিতে কোন তফাৎ নেই। একমাত্র বাইরের পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়া।

মৃদুলা হেসে উঠল, বলল, আপনি বরং আমাদের সঙ্গে বাড়ী চলুন মৃগাঙ্কবাবু, নয়তো সময় থাকতে সরে পড়ুন তা না হ'লে রাজনীতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

তা পারে—জগন্ময় বললেন, বুঝলে মৃগাঙ্ক, কদিন ধরে প্রাণ খুলে কথা না বলতে পেয়ে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। মৃদুলার সঙ্গে কথা বলে তেমন সুবিধে হয় না।

মৃদুলা ডাকল, বাবা—

জগন্ময় বলেন, তুমি আমায় ধমকে থামিয়ে দিতে চাও নাকি? বুঝলে মৃগাঙ্ক আমি যদি বলি, গ্রামের মানুষগুলো খুব সহজ আর সরল। সঙ্গে সঙ্গেই মৃদুলা জবাব দেয়, সেইজন্মেই প্রায় আমার ভালো লাগে বাবা।

মৃগাঙ্ক বলে, এটা আর অন্যায় কথা কি?

বাধা দিয়ে জগন্ময় বলেন, দাঁড়াও দাঁড়াও আরও আছে। যদি বলি, কিন্তু একটা জিনিস আমার মোটেই ভালই লাগে না। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বড্ড বেশী জটলা করতে ভালবাসে ওরা। তিলকে তাল করে সাধারণ সমস্তাকে একটা বৃহৎ ব্যাপারে পরিণত করতে এদের জুড়ি নেই। মৃদুলা বলবে, তবু তুমি গ্রাম গ্রাম করে পাগল বাবা—আমি ভেবেও অবাক হ'য়ে যাই যে এই একটা মাস কেমন ক'রে কাটালাম। তবেই বোঝ মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক হাসতে থাকে। বলে, আপনাকে আবার সাবধান ক'রে দিচ্ছি। এখনও সময় আছে মৃগাঙ্কবাবু।

এতক্ষণে কেতকী কথা বলে, আপনি ওঁদের সঙ্গে যান মৃদুদা। এবারে আমি একাই যেতে পারবো।

জগন্ময় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, সেটা একটা কাজের কথা নয় কেতুমা, তাছাড়া মৃগাঙ্ককে এখন ধরে নিয়ে গিয়ে আমি নিজের লোকসান করতে রাজী নই। কতখানি সময় আর ওকে আটকে রাখতে পারবো। তার চেয়ে কাল একবার সময় করে এসো হে মৃগাঙ্ক। এখানের মেয়াদ আমাদের তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। চলো মৃদুলা।

মৃদুলা হেসে একবার মৃগাঙ্কর একবার কেতকীর প্রানে চেয়ে দেখে পিতাকে অনুসরণ করল।

মৃগাঙ্ক এবং কেতকীও অগ্রসর হল।

খানিক নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে মৃগাঙ্কই প্রথমে কথা বলল, কিছু বুঝলে কেতকী?

কেতকী লাজ্জিত হেসে জবাব দিল, বুঝেছি।

মৃগাঙ্ক বিস্মকণ্ঠে বলল, কি বুঝলে?

কেতকী বললে, অকারণে বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।

আরে না না, আমি সে কথা বলিনি, মৃগাঙ্ক বলে, তুমি দেখছি বড্ড অভিমানকাতর। আমি তোমার কথা বলছি না।

কেতকী বলল, না বললেও বলা উচিত ছিল। মৃদুলার সহজ সরল ব্যবহার দেখে আমার কিছু শিক্ষা হ'য়েছে। কাল একবার যাবো মৃদুলাদের বাড়ী।

মৃগাঙ্ক নিরিকণ্ঠে বলে, তুমি কি বলো।

কেতকী পরিহাসের ছলে বলে, আমি তো তোমার অভিভাবক নই মৃগুদা।

মৃগাঙ্ক জবাব দিল, মৃদুলা তোমারই বেশী পরিচিত, তাই জিজ্ঞেস করছি।

কেতকী একবার মুখ তুলে তাকাল কোন উত্তর করল না।

মৃগাঙ্ক বলে, চুপ করে রইলে যে?

কেতকী শান্তভাবে বলিল, আমার জবাব তোমার মনের মত না হতে পারে। প্রশ্নের জবাব তুমি নিজেই অনায়াসে পাবে।

মৃগাঙ্ক বলে, তবুও তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

কেতকীর দুচোখ সহসা সজল হয়ে উঠল। সে বারেক হেসে জবাব দিল, তুমি বিচার করে সুযোগ নেবার চেষ্টা করছো মৃগুদা।

মৃগাঙ্ক সহসা গম্ভীর হয়ে উঠল। বলিল, যখন তুমি বললে তখন থাক।

কেতকী চুপ করে থাকে।

মৃগাঙ্ক সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে, সাপ দেখেছো কেতকী [illegible]

কেতকী অন্যমনস্ক [illegible] সহসা চমকে উঠে দুপা পিছিয়ে গেল, সাপ [illegible] মৃগুদা?

মৃগাঙ্ক হেসে উঠল।

বাব্বা তাই বলো। এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কেতকী মৃগাঙ্কর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে হাসতে থাকে। তার পরে হাসি থামিয়ে বলে, হঠাৎ সাপের কথা [illegible] বললে কেন।

মৃগাঙ্ক বলে, তুমি [illegible] কিনা সেইটেই আমার প্রশ্ন।

কেতকী বলে, বেশ [illegible] অকস্মাৎ সেই মেয়েই রং পালটে যে আবার বিপরীত কেন। কিন্তু হঠাৎ মানুষকে বাদ দিয়ে সাপ কেন মৃগুদা?

মৃগাঙ্ক বলে; যার দাঁতে অত বিষ তার রূপের কিন্তু অবধি নেই। বিষের ভয় থাকলেও রূপের একটা আকর্ষণ আছে তাই না কেতকী। কিন্তু সাপুড়ে যে সাপকে নিয়ে খেলা করে তার দাঁত ভাঙা, খেলার আনন্দ থাকলেও প্রাণের ভয় নেই।

কেতকী গম্ভীরভাবে বলে, সাপ সব সময়ই সাপ মৃগুদা, তুমি একবার জড়িয়ে ধরতে পারে তাহলে সাপুড়েকে কাবু করা খুব শক্ত নয়।

মৃগাঙ্ক প্রশংসদৃষ্টিতে কেতকীর মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে বলে, সেই জন্যই কাছে এগোতে চেষ্টা করিনি। কিন্তু রূপের আকর্ষণের কথা অস্বীকার করা যায় না।

কেতকী ভ্রূকুঁচকে বলে, অত্যন্ত ভীরু আপনি।

মৃগাঙ্ক বলে, একথা বলছো কেন।

কেতকী জবাব দিল, কেলে সাপেরও রূপ আছে মৃগুদা কিন্তু সাপুড়ে খোঁজ করে কেউটে—যার বিষও আছে রূপও আছে। বাঁশীর সুরের সঙ্গে সঙ্গে ফণা তুলে দোলে, বেচাল দেখলে ছোবল মারে। কিন্তু বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছিল আমার। তোমাকে আমি যা ভেবেছিলাম তুমি তা নও।

কেতকী হেসে উঠেই মৃগাঙ্কর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, ঝোঁকের মাথায় কখন কি তোমাকে বলেছি তার জন্য দুঃখ জানিয়ে যাচ্ছি। বলেই আর উত্তরের অপেক্ষা না রেখে একরকম ছুটে সে চলে গেল।

মৃগাঙ্ক খানিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে থেকে একসময় বাড়ীর পথে পা বাড়াল। মনটা তার দোলা খেতে লাগল কেতকীর শেষের কথাকটিতে। ক্ষণপূর্বেও যে মেয়ে মৃদুলার সঙ্গে মেলামেশার জন্য ঈর্ষায় ফেটে পড়েছিল—অভিযোগ আর অনুযোগের অন্ত রাখেনি।

সুরে এ ভাবে কথা বলতে পারে নিজের কানে না শুনলে মৃগাঙ্ক বিশ্বাস করতেই পারত না। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের জট খুলতে বসে একটা বিশ্রী রকমের সন্দেহ তার মনে দেখা দিল। কেতকীর চলার গতি সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ নিয়েছে। কেতকী নিজেকে একটু বেশী পরিমাণে প্রকাশ করে ফেলেছে বলেই মৃগাঙ্ক এই পথে ভাবতে শুরু করেছে।

কেতকীর রাগ অভিমান; কিংবা ঈর্ষারও একটা সহজ অর্থ মৃগাঙ্ক অনুধাবন করতে পারে কিন্তু ক্ষণপূর্বের এই দুর্জ্ঞেয় ভালমানুষীকে সে স্বাভাবিক বলে ভাবতে পারছে না বলেই একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। বস্তুত মৃগাঙ্কর প্রতিটির পদক্ষেপ হিসাবের গণ্ডি পার হয়ে যেতে ভরসা পাচ্ছে না। কেতকী সজাগ দৃষ্টিতে তাকে প্রহরা দিয়ে চলেছে। মৃগাঙ্ক অন্যমনস্কভাবে পথ চলছিল। মৃদু আহ্বানে থমকে দাঁড়িয়ে সাড়া দিল, কে—

আমি সনাতন বাবু। জবাব পাওয়া গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সনাতন এসে মৃগাঙ্কর মুখোমুখী দাঁড়াল। এই লোকটিকেই আজ সকালে সে তার পিতার ঘর থেকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বার হয়ে আসতে দেখেছিল।

মৃগাঙ্ক ওর মুখের পানে ভাল করে তাকাতেই সনাতন হাত জোড় করে বলল, আপনি একবার বড়বাবুকে বলে না দিলে এ গরিব যে ছেলেপুলে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে ছোটবাবু।

মৃগাঙ্ক বিস্মিতকণ্ঠে বলল, তুমি কিসের কথা বলছো সনাতন?

সনাতন করুণকণ্ঠে আবেদন জানাল, গেল সনের দেনার টাকাটা কিছুতেই দিয়ে উঠতে পারিনি ছোটবাবু, তাই বড়বাবু নালিস করে ঘর বাড়ী নিলাম করে নেবেন বলেছেন।

মৃগাঙ্ক বলল, এ সব দেনা পাওনার ব্যাপার বড়বাবু কি শুনবেন আমার কথা?

সনাতন আগ্রহভরে বলল, শুনবেন শুনবেন—আপনার কথা শুনবেন না এ কখনও হতে পারে না। আপনি একটা কতবড় বিদ্বান লোক। সবাই বলে আপনার দয়ার শরীর।

মৃগাঙ্ক বলে, সবাই ভুল বলে সনাতন। তাছাড়া আমি কাজ-কারবার কোনদিন দেখি না। এর মধ্যে মাথা গলানও আমার উচিত হবে না। তুমি বরং অন্য কোথাও টাকার জোগাড় দেখ।

সনাতন একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে হতাশ কণ্ঠে বলল, অন্য উপায় হলো না বলেই আপনার কাছে এসেছি ছোটবাবু। চৌধুরীবাবুদের কাছে গেছিলাম। রায় কর্তার নাম শুনে পিছিয়ে গেলেন। সময় অসময় ওনাদেরও হাত পাততে হয় কিনা বড়বাবুর কাছে।

মৃগাঙ্ক বলে, ছোট তরফে গেলে না কেন—ওদের শুনেছি অনেক টাকা। খাবার লোকের মধ্যে একটিমাত্র মেয়ে।

সনাতন বলে, সেখানেও ত গেছিলাম ছোটবাবু। চৌধুরী কর্তার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। তাঁর মেয়েই আপনার কথা বললেন।

মৃগাঙ্ক উৎকর্ণ হয়ে উঠল, কি বলেন তিনি?

সনাতন বলে, বললেন আমরা তো গাঁয়ে থাকিনে সনাতন। দুদিন পরেই চলে যাচ্ছি। কবে আসব তারও কিছু ঠিক নেই। তুমি ছোটবাবুকে সব কথা খুলে বলো গিয়ে, তিনি নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করবেন। তার কথা তোমাদের রায়কর্তা কখনও ফেলতে পারবেন না।

মৃগাঙ্ক একটুখানি হাসল। বলল, তিনি সব কথা ভাল জানেন না বলেই আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি বলি তুমি আর একবার ছোট চৌধুরীমশায়ের কাছে যাও। ওখান থেকে টাকাটা পেলে তোমার অনেক সুবিধে হবে।

সনাতন তথাপি কিছু বলবার জন্য মুখ তুলতেই তাকে থামিয়ে দিয়ে মৃগাঙ্ক পুনরায় বলে, কাল সকালেই তুমি একবার যাও। উনি [illegible] কিছু করতে পারেন তাল

নইলে ইতিমধ্যে আমিও একবার ভেবে দেখি, বাবাকে কিছু বলা যায় কিনা।

সনাতন একটু ইতঃস্তত করে বলে, দিদিমনিও আপনার মতই কিসব বললেন।

মৃগাঙ্ক বলে, আবার কি বলেন তিনি?

সনাতন চুপ করে থাকে। জবাব দেয় না।

মৃগাঙ্ক পুনরায় জিজ্ঞেস করে, কি বলেন বললে না তো সনাতন।

নিষেধ করে দিয়েছেন ছোটবাবু—

মৃগাঙ্ক খানিক কি ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কত টাকার দেনা তোমার সনাতন।

সনাতন বলে, আজ্ঞে নিয়েছিলাম একশ এখন দুশ হয়েছে।

মৃগাঙ্ক একটু যেন চমকে উঠল। বলল, সব টাকাটাই কি তোমায় এখন দিতে হবে?

সনাতন বলল, আজ্ঞে সুদের টাকাটা পেলেই রায় কর্তা আর এক বছর সময় দেবেন বলেছেন।

মৃগাঙ্ক বলে, তার মানে সামনের বছরেও দেনা তোমার সেই দুশ-ই থেকে যাবে।

কপালে করাঘাত করে সনাতন বলে, ভাগ্য ছোটবাবু নইলে পর পর দু সন এমন অজন্মা হবে কেন। সাধ করে কি আর দেনা করি। এ সনের ধানটা উঠলেই সামলে উঠতে পারবো।

মৃগাঙ্ক নত মস্তকে কিছু চিন্তা করতে থাকে। মৃগাঙ্ক এক মস্ত পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছে। সে তার বাবাকে জানে। শুধু হাতে সনাতনকে তিনি কিছুতেই রেহাই দেবেন না একথা তার চেয়ে বেশী আর কে জানে—

সনাতন পুনরায় ডাকে ছোটবাবু—

সহসা মুখ তুলে অসহায়কণ্ঠে মৃগাঙ্ক বলে, তুমি ছোট তরফেই আর একবার যাও। দিদিমণি ইচ্ছে করলেই একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। একান্ত যদি কোন উপায় না হয় আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো। আজ তুমি যাও সনাতন।

বলেই আর উত্তরের অপেক্ষা না রেখে মৃগাঙ্ক দ্রুত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হয়ে গেল।

সনাতন অবাক হয়ে তার চলার পথের পানে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ক্রমশঃ

পথপ্রান্তে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

জীবনেশ্বর, আমাতে তোমার ছিল যে কাজ—
ফুরায়েছে যদি ছুটির বাঁশিতে দাও আওয়াজ।
জীবন-নাট্যে যে ভূমিকা দিয়ে পাঠালে মোরে—
অভিনয় তার শেষ হ'ল যদি রেখো না ধরে।
উলঙ্গ শিশু আসিনু একদা এ বসুধায়।
উলঙ্গ শিশু খেলা শেষ করে নেয় বিদায়।
জল-বুদ্বুদ জলেতে মিলাই। এই জীবন?
ইন্দ্র ধনুর বর্ণ গগনে কতক্ষণ?
কমলদলের জলকণা সদা পলায়মান।
ঘরে [illegible] দুলানো [illegible]শের ঐ-হাতে বিষাণ!

বিস্তর হোলো [illegible]-বিচ্যুতি, প্রমাদ
দীর্ঘবাসে, [illegible] তাদের দৈর
কুড়াই! তবু কি ছিল না তাদের সার্থকতা?
এত যে বেদনা, এত যে পাপের পঙ্কিলতা—
ব্যর্থ হোলো কি? না, গো না, -যা ছিল অনুর্ব্বর—
ভুলের তীক্ষ্ণ-হল-মুখে হোলো সে প্রান্তর
শতধা দীর্ণ! রক্তে রাঙা সে ভাঙা হৃদয়
অজস্র ফুলে হোলো পুষ্পিত সুষমাময়।

যুদ্ধ করেছি। সর্ব্ব অঙ্গে বিঁধেছে শর।
ধূলের মেঘেতে ঢেকে গেছে দিগ্ দগন্তর।
ভেঙে গেছে বাসা। [illegible]-ভাগ্য-তরী।
জীবন[illegible]পেয়ালা কানায় কানায় গিয়েছে ভরি
বেদনার বিষে। দুখ-নিশি আর কবে পোহাবে?
[illegible]

আজও সত্তর করেছি যখন অতিক্রম—
রক্তে আমার নেচে ওঠে রণ তুরঙ্গম
হেরি যবে ওরা গর্বোদ্ধত প্রবলতায়
নিঠুর জুতা নর-দেবতার হানে মাথায়!
সম্মানে তার করে পদাঘাত! কোথায় সেই
দূরে-ফেলে-আসা সাতাশ আমার? নেই, সে নেই
আর একবার মরা-গাঙে মোর সেই আগের
কল-কল্লোল যৌবন-জল-তরঙ্গের!

কে চায় মরিতে পালঙ্কে বুড়ো জরদ্গব ?
ভীষ্মের মতো শর-শয্যায় ঘুমায়ে রবো !
সারাটা জীবন যুদ্ধ করেছি ! যোদ্ধবেশে
সমর-ক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু মরিব হেসে !
জীবনের পথ আকীর্ণ করি শত বাধায়
বলেছে স্রষ্টা মানুষেরে, আমি এ বসুধায়
দুখের মুকুটে মুকুটিত তব করিনু শির !
লঙ্ঘিবে চূড়া তুষারমৌলি হিমাদ্রির !
স্বর্গেও তুমি শান্তি পাবে না ! বুকে তোমার
স্ফুলিঙ্গ দিনু অমরাবতীর হোম-শিখার !
অজানা অচেনা যেখানে নাইকো কোনো পাঁচিল,
সাগরের নীলে আকাশের নীলে যেখানে মিল—
নেই অকূলের বক্ষে তোমার বাহিবে নাও !
তুমি অসীমের;—ক্ষুদ্র হইতে বিরাটে যাও !
দুঃখ হইতে নব নব দুঃখ নিরন্তর
যাত্রা তোমার ! বাঁধিবে না তুমি কোথাও ঘর !
অল্পে তৃপ্তি পশু ও পাখীর ! তুমি মানব !
ভূমাতেই শুধু তোমার নিত্য মহোৎসব।

জরা-রাক্ষসী ধরেছে তোমারে ? কী কথা কও ?
জন্ম মৃত্যু বিহীন তুমি কি আত্মা নও ?
মাটির পিণ্ডে তুমি স্বর্গের অগ্নিশিখ !
তুমি হবে দাস ? পুতুল-নাচের পুত্তলিকা ?
পরের হুকুমে চলিবে তোমার জীবন তরী ?
পরের ইচ্ছা সঙ্কোচে শিরোধার্য্য করি,
বলের চরণ-প্রান্তে লুটাবে কিংশুক ?
বাজারে নাচিবে নাকে-দড়ি বাঁধা বুড়ো ভালুক ?
বন্য-কেশরী, তুমি নির্জ্জন গিরি গুহায় !
তোমারে নাচাবে হাটে হাটে— হেন সাধ্য কার ?
পুরুষ-সিংহ একবারই মরে, দু'বার নয় !

মাভৈঃ, মাভৈঃ বলো; অমৃতের আমি তনয় !
বলো, আরণ্য-কুঞ্জর আমি দুর্নিবার !
আমাকে বাঁধিবে দিগ্বিজয়ী সে কোন্ সীজার ?
কোন্ নেপোলিয়াঁ ? যে-আমি আত্মা অঙ্গহীন—
তাহারে মৃত্যু ভয় দেখায়, সে অর্ব্বাচীন !

প্রবলের পায়ে দণ্ড-জোড়া এই নতি-স্বীকার—
বর্ব্বরতার সম্মুখে এই নীরবতার
কোনো মানে হয় ? সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে
তামসিকতার একী লীলা-খেলা সর্ব্বনেশে !
ভীরুতা বেড়ায় বৈরাগ্যের মুখোস প'রে !
সিংহ-চর্ম্মে আবৃত গাধা চেঁচায় জোরে !
মহাবীর্য্যের বহ্নি জ্বলে না যার ভিতর—
সে তো নিষ্প্রাণ উদ্ভিদ—সে তো জড় পাথর
পাথরে মিথ্যা বলে কি ? তবু সে পাথরই রয় !
দস্যুর বাঁশ রচিত কবির বাঁশরী হয় !

অনেক কিছুই শেখালো পথের বিদ্যালয় !
রসনায় কোনো কঠিন বাক্য কখনো নয়।
ঘৃণা নয় কভু; কাহারেও নয় তিরস্কার !
মধুক্ষরণ প্রতিটি বাক্যে হোক্ তোমার !
কটূক্তি কেহ করিলে ক্ষুব্ধ হোয়োনা তায় !
নিন্দার শর ব্যর্থ করিও উপেক্ষায় !

তবু বাঁধ ধরা কোনো 'থিয়োরী'র নয় কোঠায় !
তোমার জন্য সত্যের ঐ নীলাম্বর ।
সংসার-পথে 'কমন্‌সেন্‌স্‌'-কে কোরো সহায় !
কোনোখানে গিয়ে সবারই মূল্য ফুরিয়ে যায় ।
বলো সীমাহীন প্রয়োজন আছে কোনো কিছুর ?
এত দরকারী কাঠ ! তাতে কি বানাই ক্ষুর ?
কোনো একদিকে ক্রমাগত চলা প্রগতি নয় !
আসল প্রগতি মানে কোন্‌খানে থামিতে হয় !
হিংসার পথ নিশ্চয়ই নয় ! তা বলে 'ক্রস'
একেবারে যদি ছাড়ো দুষ্টের হবে পাপোষ !
'যেখানে যেমন সেখানে তেমন'—এই তো ঠিক্‌ !
দৃষ্টিভঙ্গী সদা সর্বদা 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিক্‌ !'

কৃষ্ণবসনা অবগুণ্ঠিতা জননী মোর !
এসেছো শিয়রে ? মৃত্যুতে মাগো তোমারই ক্রোড় !
স্পর্শে তোমার জ্বালা-যন্ত্রণা নিমেষে দূর !
মৃত্যু, তোমার এ কী রূপ ! তুমি এত মধুর !
কে জানিত আগে মরণে এত যে মাধুরী মাখা !
কে জানিত আগে আঁধারে এত যে সুষমা ঢাকা !

মুক্তি এসেছে ! মুক্তি এসেছে ! কী উল্লাস !
এতদিন পরে কারাগার হতে আজ খালাস !
দেহ-রথখানা ঐ পড়ে আছে ভাঙা চাকায় !
আমি চলে যাই ছায়াপথে কোন্‌ নীহারিকায় !
কোন্‌ সে তারায় ! কোন্‌ সে অজানা সিন্ধুপারে ।
কোথায় সত্য সূর্য-রশ্মি অন্ধকারে ?
জীবনের আলো নিবায়ে যে গেল সহসা চলি —
যাবার বেলায় একটী কথাও গেল না বলি—
আর কি তাহারে দেখিব কোথাও ? কোনো তারায় ?

কোনো সমুদ্র সৈকতে ? কোনো গিরি-চূড়ায় ?
যে গর্ভধারিণী মহীয়সী নারী লোকান্তরে
নিঃসংশয়ে লক্ষ্মীমন্ত সাধুর ঘরে
জনম নিয়েছে ! হয়তো জন্ম হয়নি নিতে !
তৃষ্ণা-নদীর পারে আত্মার প্রশান্তিতে
এই জনমেই পৌঁছে গিয়েছে ! তা যেন হয় !
প্রথম আর্য্য সত্য - জীবন দুঃখময় !

না, গো না, মুক্তি চাবো না, হবো না স্বার্থপর !
জন্মান্তরে আসিবো হস্তে ধনু ও শর !
শুধু মুক্তির আনন্দ কি যে যাবার দিনে ?
মহাবেদনার বাজে না রাগিণী হৃদয় বীণে ?
একী নৈতিক, সাংস্কৃতিক বিপর্যয় !
একী বিভীষিকা ! হাটে মাঠে ঘাটে 'মামার জয়'
স্বাধীন মনের চিন্তার ঋজু বলিষ্ঠতা,—
সত্যাশ্রয়ী মানবাত্মার নির্ভীকতা—
কাল সমুদ্র গর্ভে লুপ্ত হোলো কি সব ?
আবার ঘৃণ্য পরানুকরণ দাস-সুলভ ?

স্মরণীয় হয়ে রবো সঙ্গীতে [illegible] !
তবু যদি কেহ দিয়ে থাকে মনে একটু বাসা—
স্মরণে রাখিও ক্ষুদ্রের শুধু এ পরিচয়--
যারা লাঞ্ছিত, যারা বঞ্চিত লয়ে অভয়
দাঁড়ায়েছি আসি তাহাদের পাশে ! এ দুনিয়ার
বক্ষে চাপিয়া আছে যে দুঃখ-পাষাণ-ভার—
কিছু তার আমি লাঘব করিতে সাধ্যমতো
যত্ন করেছি ! জানি ভুল-ত্রুটি হয়েছে কতো !
নিজগুণে সব ক্ষমা করে মোরে দাও বিদায় !
ঠাকুর ! আমারে ঠাঁই দাও দুটি কমল পায় !

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাটি সোনা—সোনা মাটি

আমাদের কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলির, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, একটি আশ্চর্য্য গুণ বা শক্তি আছে, যাহার ফলে ইহারা যাহা কিছু স্পর্শ করেন, তাহা সোনা হইলেও মৃত্তিকাতে পরিণত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন পাব্লিক্ সেক্টারের ইস্পাত এবং অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি সামান্য দৃষ্টিদান করিলেই ইহার প্রমাণ মিলিবে। সরকারী হিন্দুস্থান ষ্টিল্ লিমিটেডের অধীন চার-পাঁচটি ইস্পাত কারখানাতে বছরের পর বছর লোকসানের কারবার চলিতেছে কোটি কোটি টাকার! ইহাতে কর্ত্তাদের কোন চিন্তার কারণ নাই, কারণ কেন্দ্র সরকারের হাতে শ্রীমৎ স্বামী গৌরীসেনের অফুরন্ত অর্থ-ভাণ্ডার রহিয়াছে! সোজা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সরকার যে-কোন ব্যবসা কলকারখানাতে হাত দিয়াছেন বা দিতেছেন, এবং যে-সব কারবার কলকারখানায় সোনা ফলাইবার সর্ব্বপ্রকার অবকাশ ছিল, সেই সব কল-কারখানা আজ কেবলমাত্র অসার মাটিই প্রসব করিতেছে। নিজেদের ব্যর্থতার জন্য যদি বিন্দুমাত্র লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে কেন্দ্রসরকার তাঁহাদের অগ্রিগুরুমুখে এ কথা প্রচার করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না।

অমুক কারখানায় এবার লোকসান কম হইবে!

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত ব্যবসা চালানোর ব্যাপারে গুণের অবধি নাই। কলিকাতার ট্রাম, ষ্টেট বাস, দুধের কারবার—সব কিছুই লোকসানের কারবার এবং এই সকল কারবারে প্রতি বৎসর লোকসানের অঙ্ক বৃদ্ধিমুখেই চলিয়াছে। এখানে লাভ হইতেছে একমাত্র দেড়-দুহাজার বড় বড় অফিসারদের এবং এক শ্রেণীর শ্রমিক ও কর্ম্মীদের যাহারা কোন কাজ বা পরিশ্রম না করিয়াই মাসে মাসে ক্রম-বর্দ্ধমান বেতন ও ভাতা ভোগ করিতেছে। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে এবং ছোট বড় সকল কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ জানেন যে কাজের চাহিদা বিচার করিয়া সেইমত শ্রমিক ও কর্মীনিয়োগ না করিলে কারবার কখনও লাভের হইতে পারে না। হঠাৎ কাজের চাপ কিংবা মালের চাহিদা বৃদ্ধি হইলে, বেসরকারী কারবারী কল-কারখানার মালিক সাময়িক ভিত্তিতে অর্থাৎ ক্যাজুয়াল কর্ম্মী নিয়োগও করিয়া থাকেন। কিন্তু গৌরীসেন মহাশয়ের পয়সায় পরিচালিত কলকারখানা এবং অন্যবিধ কারবারে, প্রয়োজনবোধে নিযুক্ত সাময়িক শ্রমিক এবং কর্ম্মীও কারবারের ঘাড়ে পাকাপাকি একান্ত চাপিয়া থাকে। চুক্তিমত তাহাদের দিন, সপ্তাহ বা মাসান্তে বিদায় দেওয়া কোন কারখানা মালিকের পিতারও সাধ্যে কুলাইবে না। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হয়ত পাওনাগণ্ডা বুঝিয়া লইয়া চলিয়া যাইতে রাজী, কিন্তু ঠিক সেই সময় শ্রমিকদরদী এবং শ্রমিক স্কন্ধ নির্ভর ইউনিয়ন মহারাজদের আবির্ভাব ঘটবে। অসার অবাস্তব স্তোকবাক্য দ্বারা ইহারা নেহাত শান্ত শিষ্ট শ্রমিককেও মালিকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, খেপাইয়া মালিককে শায়েস্তা করিবার পথ দেখাইয়া দিবেন। ইউনিয়ন লিডাররা বুঝেন সব, মালিকদের ক্ষমতা অক্ষমতার বিষয় তাঁহারা অবহিতও আছেন,

কিন্তু শ্রমিক স্বার্থের অজুহাতে তাঁহারা নিজেদের স্বার্থের কথা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সেইমত কাজ করেন—ইহাতে যদি রাজ্যের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষয় প্রাপ্তিও ঘটে, তাহাতেও আপত্তি নাই! আজ বাস্তবেও পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিক সংস্থাগুলি শ্রমিক নেতাদের প্ররোচনাতে যে বিষম অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে এ-রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইতে আর বেশী সময় হয়ত লাগিবে না।

ভারতের অন্যরাজ্যগুলি যখন নিজ নিজ রাজ্যে শিল্প বিস্তারের ক্ষেত্র প্রসারিত করিতেছে, শিল্পপতিদের বিবিধ প্রকার সুযোগ সুবিধা দান করিয়া কলকারখানা খুলিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছে—ফললাভও করিতেছে যথেষ্ট, ঠিক সেই সময় আমাদের এই ভাগ্যহত রাজ্যের শ্রমিক ইউনিয়ন লিডারগণ, একটার পর একটা না একটা শ্রমিক বিক্ষোভ, ক্রমাগত দাবির ক্ষেত্র বৃদ্ধি করিয়া, একান্ত বাজে অজুহাতে কথায় কথায় ধর্ম্মঘট এবং কলকারখানার মালিকদের লক-আউট ঘোষণা করিতে বাধ্য করিতেছেন, চাওয়ামাত্র দাবি পুরণ না হইলে ঘেরাও এবং মালিকসহ মালিকপক্ষের লোকদের দৈহিক নির্য্যাতন, বহু ক্ষেত্রে কলকারখানার মালিককে এবং পদস্থ অফিসারদের হাড়গোড় চুর্ণ করিয়া দেওয়াও হইতেছে, এমন কি মালিকের বসতবাটীতেও শ্রমিকদের হৈ হল্লা এবং প্রচণ্ড বিক্ষোভ চালানো প্রায় প্রাত্যহিক কর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য আমাদের শ্রমিক রাজচক্রবর্ত্তীরা এই পুণ্যকর্ম্মে সর্ব্বপ্রকার উৎসাহ দিতেছেন। শ্রমিক নাচানো—ইহাদের মনোরঞ্জন করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, হাতিয়ারও বলা যাইতে পারে।

শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি সকলেই সমর্থন করে এবং সাধ্যমত এই দাবি পুরণ করা শিল্পপতিদের কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। শ্রমিকদের দাবি আদায় হউক, কিন্তু সেই সঙ্গে মালিকপক্ষও অবশ্যই কিছু দাবি করিতে পারেন শ্রমিকপক্ষের নিকট হইতে। এই দাবি আর কিছুই নহে, শ্রমিক তাহার নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া কলকারখানার উৎপাদন অব্যাহত রাখিবে, এবং এ-বিষয় শ্রমিকের কোন প্রকার গাফিলতি বা অবহেলা প্রমাণিত হইলে সে তাহার নির্দ্ধারিত প্রাপ্য পাইবে না, কিংবা কম পাইবে। সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনায় এই কথাই ন্যায্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে কি দেখিতেছি? মালিককে শ্রমিকের ন্যায্য অন্যায় সর্ব্বকার দাবি মানিয়া লইতে হইবে, কিন্তু কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে শ্রমিকের কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। শ্রমিক চলিবে তাহার ইচ্ছামত—এখানে তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা। গুরুতর অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হইলেও শ্রমিককে কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া চলিবে না। শ্রমিক অপরাধীকে ন্যায্য শাস্তি দেওয়া হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে—ধর্ম্মঘট, ঘেরাও এবং প্রয়োজন বোধে মালিক এবং মালিকের তরফের অফিসার এবং কর্ম্মীদের দৈহিক নির্যাতন! বলা বাহুল্য শ্রমিকদের এই সকল বেআইনী এবং জবরদস্তিমূলক ক্রিয়াকর্ম্ম ইউনিয়ন লিডারদের অনুমত্যানুসারে সংঘটিত হয়, যাঁহাদের মতে চালিত সবরকম শ্রম-আইনই হইল বে-আইন, তার শ্রমিকদের গায়ের জোরে যাহা কিছু করা হইবে, তাহাই হইবে সভ্যতার এবং প্রকৃত বাস্তব আইন। শ্রমিক-নেতারা সুষ্ঠভাবে বহুসময় শ্রমিকদের হাইকোর্টের হুকুম অমান্য করিতেও প্ররোচনা দান করেন—এই ক্ষেত্রে বর্ত্তমান রাজ্যসরকার এবং পুলিশও কর্ত্তব্যপালনে গড়িমসি করে। এই অবস্থায় Industrial Disputes Act বাতিল করিলে দোষ কি—বিশেষ কেতাবে লেখা আইন যদি বাস্তবে অপ্রযোজ্য হয়?

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য দ্রুত নির্ব্বাপণের পথে চলিয়াছে এবং আর অযথা কালক্ষেপ না করিয়া সমস্যার সমাধান না করিলে এ রাজ্যে কল-কারখানা এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। এ রাজ্য হইতে কল-কারখানা এবং শিল্প সংস্থাগুলি বিতাড়িত হইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিবে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী শ্রমিক। অবাঙ্গালী শ্রমিক অন্যত্র চলিয়া যাইবে এবং তাহাদের কর্ম্মসংস্থানে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি

হইবে না। মরিবে বাংলা, বাঙ্গালী শ্রমিক-কর্ম্মী এবং তাহার সহযাত্রী হইবে শ্রমিক এবং কর্ম্মীনির্ভর প্রায় ২ কোটি অসহায় বাঙ্গালী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। আমাদের পরম বিজ্ঞ এবং জনদরদী শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা এ বিষয়ে কিছু মাত্র চিন্তা করেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ এবং শক্তি বৃদ্ধি কিসে হয় এই লইয়া সদা ব্যস্ত চিন্তিত। দেশের, জাতির এবং শ্রমিক-কর্ম্মীদের প্রতি সামান্য দায়িত্ব এবং মমতা বোধ থাকিলে আমাদের শ্রমিক নেতারা আজ এমন করিয়া দেশ, জাতি এবং রাজ্যের কলকারখানা তথা শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস করিবার কাজে কখনই লিপ্ত থাকিতে পারিতেন না। যথোচিত বিদ্যা বুদ্ধি এবং সাধরণ জ্ঞান এবং দূরদৃষ্টি-শূন্য মানুষের নিকট হইতে কেহ কোন শুভকর, জাতি এবং দেশ কল্যাণকর কিছু আশা করিতে পারে না। আমাদের শ্রমিক নেতারা প্রায় সকলেই এই শ্রেণীর লোক, কাজেই ইহাদের নিকট হইতে অনিষ্ট ব্যতিরেকে কোন ইষ্টই আশা করা অনুচিত।

রাজ্যপালের প্রধান উপদেষ্টা ও শিল্পসঙ্কট

কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপালের প্রধান উপদেষ্টা মহাশয় বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স' তাঁহার জ্ঞান-গর্ভ ভাষণ প্রসঙ্গে অন্যান্য বহু বহু উত্তম উপদেশের সঙ্গে রাজ্যের শিল্পপতিদেরও বিনামূল্যে কিছু অযাচিত উপদেশামৃত বিতরণ করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা তিনি যে 'জাত'-উপদেষ্টা তাহাও প্রমান করিয়াছেন।

এই উপদেশামৃতে মোটামুটি বলা হইয়াছে:- শিল্পপতিদের—

১। রাজ্যবাসীদের উপর বিশ্বাস রাখিতে হইবে। এবং এই বিশ্বাস হইতেই শিল্পপতিরা 'ডিভিডেণ্ড' অর্জন করিবেন। ইহাতে অবশ্য একটু সময় লাগিবে। একথা শিল্পপতিরাও মনে রাখিবেন যে পশ্চিম বঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে আজ যে সঙ্কট দেখা যাইতেছে, তাহা একান্ত সাময়িক।

আশ্চর্য্যের কথা উপদেষ্টা মহাশয় সরকারের তরফ হইতে সঙ্কট মোচন কি করা হইবে বা হইতেছে সে বিষয়ে কোন কথা বলার কোন প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইহার কারণ এমনও হইতে পারে যে, এ বিষয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে ইন্দিরারাণীর কোন উপদেশ ধাবন মারফত এখানে আসে নাই।

২। উপদেশে শিল্পপতিদের এ রাজ্যে শিল্প সংস্থাগুলির প্রসারে আরও ঝুঁকি লইয়া, আরও টাকা অর্থাৎ মূলধন নিয়োগ করিয়া সাহস প্রদর্শন করিতে এবং ইহা করিতে পারিলে তাঁহারা অবশ্যই লাভবান হইবেন যেমন, তেমন রাজ্যের বেকারীও বহু পরিমাণে নিরশন হইবে। উপদেষ্টার পক্ষে উপদেশ দেওয়া বোধহয় কষ্টকর নহে। এবং পরকে গাঁটের পয়সা বহু কষ্টে অর্জিত অর্থ বিদ্যাধরীর নোংরা জলে নিক্ষেপ করিতে বলাও বোধ হয় অতি সহজ। এই উপদেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যদি শ্রমিকদের অযথা হামলা, বে-আইনী কার্য্যকলাপ, ঘেরাও, শ্রম আইনকে কদলী প্রদর্শণ এবং অন্যান্য বহুবিধ শ্রমিক অত্যাচার (মালিক ঠেঙ্গান প্রভৃতি) প্রতিরোধ করার বিষয় সামান্য কিছু উপদেশ দিতে পারতেন, তাহা শোভন সুন্দর এবং যুক্তিযুক্ত বলিয়া মানুষ গ্রহণ করিতে পারিত। এই প্রসঙ্গে পেশাদার শ্রমিক নেতাদের 'দমন' করা বিষয়ে আলোচনা করাও প্রধান উপদেষ্টা মহাশয়ের উচিত ছিল। সরকার নিজেদের প্রশাসনিক বিষয়ে অর্থাৎ রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, বে-আইনী বহুবিধ কার্য্যকলাপ বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। সোজা কথায় নিজেদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য পালনে চরম অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া শিল্পপতিদের বিনামূল্যে উপদেশ বিতরণ করিয়া তাহাদের বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিতে যে পরম তৎপরতা দেখাইতেছে, তাহা সত্যসত্যই অতি উপভোগ্য এক অপূর্ব্ব রসিকতা ছাড়া আর কি বলা যায়।

এ কথা আজ অতি নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য যে মাত্র তের মাসের যুক্তফ্রন্ট শাসনের ফলেই পশ্চিম বঙ্গে শিল্প মহলে আজ যে নৈরাশ্য উদ্ভব হইয়াছে ও সেই

সঙ্গে শিল্পপতিরাও যে বিষম অনিশ্চয়তা বোধ করিতেছেন, তাহার নিরশন যদি অবিলম্বে না হয়, তাহা হইলে রাজ্যপালের প্রধান উপদেষ্টা মহাশয়ের অতি মূল্যবান, কিন্তু অসার উপদেশেও কোন বাস্তব ফললাভ হইবে না। শিল্পপতিদের শ্রমিক দাবি মানিয়া লওয়ার অর্থ আজ হইবে লেবার-লিডারদের সকল প্রকার জুলুম এবং হুকুমের নিকট আত্মসমর্পণ করা। এ কথা কে না জানে যে, সাধারণ শ্রমিক তাহার শ্রমের মূল্য হিসাবে ন্যায্য পাওনা পাইলে সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু লেবার-লিডারদের পক্ষে এই 'শ্রম সন্তুষ্টি' অতি ক্ষতিকর, তাহাদের স্বার্থ ইহাতে সাধিত হয় না। শ্রমিক সন্তুষ্ট থাকিলে শ্রমিক নেতা মহাশয়গণ তাঁহাদের অসীম ক্ষমতা এবং শক্তি প্রদর্শন করা হইতে বঞ্চিত থাকেন। অতএব যেমন করিয়াই হউক, নেতারা শ্রমিকদের মনে একটা 'ক্রনিক' অসন্তোষ জিয়াইয়া রাখিতে সদা সচেষ্ট থাকিবেন এবং ইহাতে রাজ্যবাসী তথা রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে সর্বনাশ হইলেও লেবার-লিডারদের কিছু যায় আসে না। শ্রমিক নেতারা কথায় কথায় ধমকী দিবেন ও শ্রমিকদের বৃথা ও অযৌক্তিক স্তোকবাক্যে মালিকদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতে থাকিবেন। শিল্পপতিদের সর্বক্ষেত্রে লেবার-লিডারদের আজ্ঞাবহ থাকিতে হইবে। রাজ্যপালের প্রধান উপদেষ্টা মহাশয় নাসিকা বেষ্টন করিয়া শিল্প-মালিকদের এই উপদেশই দান করিয়াছেন, বহু রাত্রি জাগরণের বহু বহু চিন্তার ফলে।

যে সরকার রাজ্যের জনগণকে সাধারণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে অপারগ, যাহারা স্বীয় প্রশাসন নীতির ফলে রাজ্যের কোন প্রকার উন্নতি হওয়া দূরে থাক, অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইতে আরো খারাপের দিকেই যাইতেছে প্রতিদিন, সেই রাজ্যের রাজ্যপাল এবং তাঁহার উচ্চ বেতনভোগী উপদেষ্টাদের এখন একমাত্র কর্তব্য, পদত্যাগ করিয়া রাজ্যকে একান্ত ভাবে তাহার ভাগ্য ও জন-সাধারণের ভাগ্য পরস্পরের সহিত সদা-যুধ্যরত রাজনৈতিক দলগুলির হাতে ছাড়িয়া দেওয়া। আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রপতির শাসন এবং দলীয় শাসন আজ একই পর্য্যায়ে আসিয়াছে। প্রসঙ্গ-ক্রমে এ কথাও বলা যাইতে পারে, রাজ্যপাল যে ভাবে তাঁহার প্রশাসনিক কার্য্য চালাইতেছেন, যে ভাবে নানা প্রকার বোলচাল ছাড়িতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ একটি দুইটি রাজনৈতিক পার্টির মাসতুতো ভাই বলা অন্যায় হইবে না! ইহার বেশী বলা উচিত হইবে না, সমীচীনও নহে। কোন কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিবে বা করিতে সক্ষম, সে বিষয় রাজ্যপালের চিন্তার বিষয় হইতে পারে না। অথচ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল এই দিকেই যেন একটু বেশী ধাবিত হইতেছেন! পক্ষপাত দোষ-দুষ্ট রাজ্যপাল থাকা না থাকা আমাদের পক্ষে সমান ক্ষতিকর!

পাকিস্তানী অত্যাচার

স্বাধীনতা লাভের পর (অর্জন নহে) প্রথম দিন হইতেই পাক-সরকার এবং এক শ্রেণীর পাক-নাগরিক নিয়মিত ভাবে, কখনও বেশী কখনও কমসংখ্যায় পূর্ব্ব-বঙ্গ হইতে সংখ্যালঘু হিন্দু বিতাড়ন পর্বব্রত প্রতি-পালন করিতেছে। বিগত কয়েক মাসে প্রত্যহ শত শত হিন্দু পরিবার পূর্ব্ববঙ্গ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এপারে আসিতে বাধ্য হইতেছে! এবং এই ভাবে গত ছয়-সাত মাসে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে আসিয়াছে! যাহাদের মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া দিল্লীতে ভগবান কর্ত্তারা গদিতে আসীন হইলেন, দেশ বিভাগের সময় আমাদের কর্ত্তারা (সেই সময় জাতীয় কংগ্রেস ছিল দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা) প্রতিশ্রুতি দিলেন পূর্ব বঙ্গের হিন্দু সংখ্যা-লঘু যে সব পরিবার ভারতে আসিবে, তাহাদের সর্বপ্রকার দায়িত্ব এবং পুনর্বাসনের ভার কেন্দ্র সরকার লইবেন। এই সামান্য কর্ত্তব্য তাঁহারা সযত্নে সর্বভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। ইহার জন্য সর্ব্ব-প্রথম হইল নেহরু লিয়াকত চুক্তি, যে চুক্তি পাক-সরকার পরের দিনই ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ

করিল এবং ভারত সরকার ফাইলে গাঁথিয়া এক কোনে বিস্মৃত ফাইল স্তূপে রাখিয়া দিল।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘু বিতাড়নে বাধা দিবার আমাদের একমাত্র হাতিয়ার, "প্রতিবাদ আরো প্রতিবাদ সজোর প্রতিবাদ, তীব্র প্রতিবাদ এবং সর্বশেষে ভীষণ নীরব প্রতিবাদ।" বলা বাহুল্য, পাক সরকার এই সকল ভারতীয়দের দুর্বল প্রতিবাদের কোন মূল্যই দেয়নি! এমন কি তারা প্রতিবাদ পত্রের প্রাপ্তি স্বীকারও করেনি! এবারেও ঠিক ইহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে।

পাকিস্তানী পুলিশ, এপারে আসিয়া ভারতীয় রক্ষী বাহিনীর লোককে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। সুবিধা মত পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত এলাকার ক্ষেত হইতে ধান কাটিয়া লইয়া যাইতেছে। পাক গোরু-চোরের দল পশ্চিম বঙ্গ হইতে গোরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা প্রতিকার প্রত্যাশায় প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ করিয়া যাইতেছি। দিনের পর দিন ফল লাভের বিফল আশা লইয়া!

প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশে সংহতি শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টাও অবিরাম ভাবে চলিতেছে। এখন পাকিস্তানী নষ্টামীর বিষয় গবেষণার কোন অবকাশ নাই, কারণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম দিন হইতেই পাকিস্তানের প্রধান নীতি হইয়াছে "Hate India" এবং সেই সঙ্গে "Bite India as and when you can!"

পাকিস্তানী নষ্টামী চিরতরে বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় হইবে, পাকিস্তান যে সব নীতিহীন কার্য্যকলাপ চালাইতেছে, তাহার যথাযথ অনুকরণ করা। পাকিস্তান ভারতের সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতে ২০০ গোরু চুরি করিল। আমাদের রক্ষী-বাহিনীর কর্তব্য পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়া ৪০০ গোরু লইয়া আসা। পাকিস্তান পুলিশ যেখানে ২ জন ভারতীয়কে হত্যা করিল, ভারতীয় পুলিশ সেইখানে জবাব হিসাবে ১০ জন পাকিস্তানীকে হত্যা করিবে। পাক চোরের দল যেখানে ভারতের ধানক্ষেত হইতে ৫ বিঘা জমির ধান কাটিয়া লইয়া যায়, আমাদের তাহার জবাবে পাকিস্তানের ক্ষেত হইতে ২০ বিঘা জমির ধান কাটিয়া আনা উচিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পাকিস্তানী বদমাইসের দল ভারতে ঢুকিয়া, যে সকল চুরিচামারি খুন-জখম করিতেছে, আমাদেরও তাহার জবাবে এই সকল ক্রিয়া কলাপের দশগুণ বেশী করিতে হইবে। পাকিস্তান লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে যে ভাবে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতেছে, আমরাও এ দিক হইতে যদি ঠিক তাহাই করিতে পারি, দুর্দিনেই পাক সরকারের শয়তানী স্তব্ধ হইবে। ইহা করা যদি আমাদের অতি ভদ্র কেন্দ্র সরকারের রুচিতে বাধে, সেই ক্ষেত্রে জোর করিয়া যশোহর, খুলনা এবং পশ্চিম বঙ্গের লাগাও পাকিস্তানী অঞ্চলে হতভাগা বিতাড়িত হিন্দুদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে জমি জবর দখল করা আবশ্যক।

হাজার হাজার প্রতিবাদ পত্র বেকার! প্রতিবাদ প্রেরণ ব্যাপারটা একটা পরিহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিহাস অবিলম্বে বন্ধ করিয়া, বাস্তব প্রতিবাদ আজ একান্ত বিধেয়। ভীরু কাপুরুষের দ্বারা সমাজতন্ত্র socialistic pattern of society গঠন করার কথা বলা শোভা পায়, কিন্তু অধিকার রক্ষা চলিতে পারে না। আমাদের শাসকদিগের বড় বড় বোলচালে দেশের লোক, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গ আর কতদিন নিশ্চিন্ত থাকিবে জানি না।

চর্য্যাপদের কাব্যরূপ

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তি

'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়' বাংলা ভাষার একটি অতি সুপ্রাচীন নিদর্শন। সাধারণ ভাবে সংকলনটি 'চর্য্যাপদ' নামে পরিচিত। পদ অর্থে গীত বা কাব্য। গানের আকারে রচিত বলে চর্য্যাপদের অপর নাম চর্য্যাগীত। এই সুপ্রাচীন কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম গীতিকাব্য সংকলন।

২ গীতিমূলক হলেও 'চর্য্যাপদ' বিশুদ্ধ গীতি কবিতার পর্য্যায়ে পড়ে না। বিশুদ্ধ কাব্য সৃষ্টির প্রয়াস এখানে নিতান্ত গৌণ। গীতি রচনার মূলে রয়েছে চর্য্যাকারগণের আধ্যাত্ম সাধনার পরম ইঙ্গিত—ধর্ম্মীয় পরামুক্তির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। সিদ্ধাচার্য্য প্রদর্শিত সাধনার গোপন তত্ত্ব কতকগুলি বাহ্যিক প্রতীকের সাহায্যে বিবৃত। ফলে কাব্যের মূল বিষয় বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গূঢ় তত্ত্বদর্শনের আলোছায়ায় রহস্যাবৃত। এই রহস্যের তাৎপর্য্য কেবল মাত্র একটি বিশেষ রহস্যবাদী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের কাছেই অনুভূত। তত্ত্বভূয়িষ্ঠ এবং বুদ্ধি কেন্দ্রিক বলে চর্য্যাপদের বিষয় বস্তু সাধারণ পাঠকের কাছে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। সন্ধ্যা ভাষায় ব্যক্ত, প্রতীকের সাহায্যে বিধৃত এবং গুরুবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত চর্য্যাপদের কবিতাগুলি শুধু সিদ্ধাচার্য্যদের ব্যক্তিগত ধ্যান ধারণার স্বরূপ মাত্র। গীতিপদ সমূহে ব্যক্তিচিত্তের মুমুক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে, কবি মানসের আন্তর অনুভূতি গীতিকাব্যোচিত মহিমায় নিবেদিত হয়নি। চর্য্যাপদের বিষয়বস্তু ভাবাত্মক হলেও ভাবকল্পনা এখানে স্বতস্ফূর্ত গীতরসোচ্ছলে পরিবেশিত হয় নি। কবিতার বাণী বিন্যাসে গীতরূপ যতটুকু উৎসারিত, তা শুধু অধ্যাত্মচেতনার কৈবল্যতত্ত্বেই সীমায়িত। চর্য্যাকারগণ কাব্যবিচারে কবি-মানসের প্রাধান্য স্বীকার করেননি। তাঁদের কাব্যজিজ্ঞাসা জীবন চেতনার পরম বৈচিত্র্যকে অপ্রধান করে অধ্যাত্মবাদের নির্বিশেষ গৌরব লাভ করেছে। কিন্তু কাব্যবিচারে গীতিকবিতার বিষয়বস্তু মূলতঃ বৈচিত্র্যময় জীবনানুভূতি।(১) ব্যক্তিগত অনুভূত ভাবকল্পনার আশ্রয়ে গীতরূপ লাভ করে। বিষয়বস্তুর সঙ্গে কবির মানস-অনুভূতিটি যখন মধুর ছন্দে নিবেদিত হয়, তখনই তা গীতিকাব্যোচিত গরিমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। গীতি-কবিতায় বা গীতিমূলক কবিতায় কবির ব্যক্তি-অনুভূতি প্রত্যক্ষ, কিন্তু চর্য্যাকারগণের রচিত চর্য্যাগানে ব্যক্তি-অনুভূতি পরোক্ষ। চর্য্যাপদের সাধনতত্ত্ব শুধু অধ্যাত্ম-রসেই আভাষিত, বিশুদ্ধ জীবনরসে সঞ্জীবিত নয়। শূন্যবাদমূলক তত্ত্বব্যঞ্জনা চর্য্যাকারগণের উভয় কবি-মানসের ও জীবনদর্শনের সহায়ক। কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে তত্ত্বের হ্লাদৈকময়ী বাণী মূর্ত্তি অপরিস্ফুট থেকে যায়।(২)

চর্য্যার কাব্যতত্ত্ব কাব্যবিচারে কতদূর উপযোগিতা দাবী করতে পারে তা বিচার্য্য। গীতি কবিতার লক্ষণ বিযুক্ত চর্য্যাপদসমূহকে বিশুদ্ধ মননকাব্যরূপে আখ্যায়িত করা যায় না। যে কাব্য মূলতঃ তত্ত্বভূয়িষ্ঠ, তা কখনও বিশুদ্ধ কাব্যের আদর্শে বিচার্য্য নয়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধের আলোচনাটি প্রণিধান-যোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে।...কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। বিশুদ্ধ কাব্যের উদ্দেশ্য জগৎ ও জীবনের সকল রহস্যকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে কাব্যোক্তি মাধুর্য্যে উপস্থাপিত করা। Watts Dunton এর মতে, **Absolute poetry is the concrete and artistic expression of the human mind in emotional and rhythmic language.**

কবিমাত্রেই রূপদক্ষ জীবনশিল্পী। রূপসাধনাই কবি জীবনের পরম লক্ষ্য ; আবার রূপসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কাব্যের বিষয়বস্তু কাব্য সত্য ও কাব্য সৌন্দর্যে পরিমণ্ডিত হয়ে এমনভাবে পরিবেশিত হবে যেন পাঠক কবিমানসের সুগভীর আন্তরিকতা ও বিষয়তন্ময়তার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের নিবিড় যোগসূত্র নেই। কবিগণের জগত ও জীবনদর্শন এবং সৌন্দর্যচেতনা যেসকল রূপক প্রতীকের মধ্যে ধরা দিয়েছে, তার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের সবিশেষ পরিচয় নেই। তা ছাড়া চর্যাপদের ভাষা সকলের বোধগম্য নয়। বাংলা ভাষায় তখন উষালগ্ন। ভাষা অপভ্রংশের গর্ভ হতে সবেমাত্র আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে, শব্দগুলির সঙ্গে পাঠক নির্বিশেষে পরিচিত নয় ; আবার শব্দগুলি অপরিচিত বলে, ভাষার যথার্থ অনুধাবন পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই কাব্যরস আস্বাদন করতে গেলে পাঠককে সর্বপ্রথম চর্যাপদের শব্দার্থগুলিকে রপ্ত করতে হয়। কাব্যরসাস্বাদনের এই বিশেষ কৌশলটি নেহাৎই বুদ্ধিকেন্দ্রিক, এবং যা বুদ্ধিকেন্দ্রিক তা আদৌও কাব্যরূপ লাভ করতে পারে কিনা, প্রশ্ন থেকে যায়।(৩) যাই হোক, চর্যার কাব্যমূল্য যতটুকুই থাকুক, ভাষার অস্পষ্টতা যে কাব্যরসাস্বাদনের পক্ষে প্রধান অন্তরায়, একথা স্বীকার করা যায় না।

চর্যাপদের ভাষাকে আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সন্ধ্যাভাষা বলে আখ্যায়িত করেছেন। সন্ধ্যাভাষাটি যেমন আলো-আঁধারিতে রহস্যময়, তেমনি সেই দুর্বোধ্যতার আলো-অন্ধকারে চর্যাপদ অস্পষ্ট। অর্থবোধ ভাষার অস্পষ্টতাকে বশ করে এবং বুদ্ধিবলে উপমা প্রতীকের ব্যূহভেদ করে তবেই চর্যার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করা যায়। ঠিক এমনি এক পরিস্থিতির মধ্যে চর্যার সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ করতে হয়।

ভাষার রহস্য উদ্ভেদ করতে পারলে চর্যার কাব্যস্বরূপ উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না কাব্যবিচারে চর্যাপদের প্রকৃত স্বরূপ এবং ভাব ভাষা ছন্দ ও অলঙ্কারের মাপকাঠিতে ঐ পদের কাব্য গুণাগুণ কতটুকু স্বীকৃত, এবিষয়টি নিয়ে জ্ঞান-তপস্বীরা সবিশেষ আলোচনা করেন নি। তাঁদের আলোচনায় চর্যার ভাষা এবং অধ্যাত্মতত্ত্বের গুরুত্ব নিরূপিত হয়েছে সন্দেহ নেই ; কিন্তু কাব্যের যথাযথ গুণ নির্দেশিত হয়নি। একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতির ইঙ্গিত বহন করলেও চর্যা গৌণতঃ কবিতা। একথাটিকে সর্বপ্রথমে স্বীকার করে নিয়েই এর কাব্যগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করতে হয় ; কারণ কেবল তত্ত্বরূপে একে গ্রহণ করলে সাহিত্যবিচার অনেকাংশে নিষ্ফল হয়ে যায়।(৪) চর্যাপদের কাব্যবিচারে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র মজুমদার পাঠকের অনুভূতিটিকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, চর্যার ভাষা, ছন্দ এবং অলঙ্কার ত্রুটিমুক্ত না হলেও অনুভূতির মাপকাঠিতে এ এক সুন্দর কাব্য।(৫) তিনি আরও মন্তব্য করেছেন,—'ধর্মকে যখন আত্মোবোধের প্রয়োজনে নিয়োগ করা হয়, তখনই তা ভাবময়, রসময়, কাব্যময়রূপ গ্রহণ করে। মন্তব্যটি অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসুর একটি বিশেষ অভিমতের অনুসরণ মাত্র। চর্যাপদের কাব্যকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক বসু মন্তব্য করেছেন,—ধর্মানুভূতির সহিত কবিচিত্তের নিবিড় যোগ স্থাপিত হলে ধর্মতত্ত্ব ও কাব্যপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে ; (৬) অর্থাৎ তাঁর মতে সিদ্ধাচার্যদের ধর্মচেতনা তাঁদের ভাব মানসরসে সিক্তিত হয়ে কাব্যরূপ লাভ করেছে। শ্রদ্ধেয় বসুর অভিমতটি যুক্তিনিষ্ঠ হলেও দ্বিধান্বিত। তাঁর মন্তব্যে তিনি কোথাও স্পষ্টভাবে বলেননি যে ধর্মানুভূতির সঙ্গে কবিচিত্তের সংযোগ ঘটলে তত্ত্ব কাব্যপর্যায়ে উন্নীত হয়। হতে পারে আর 'হয়' এক বস্তু নয় বা এক অর্থবোধে ব্যবহৃত নয়। শ্রদ্ধেয় বসু সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চর্যার কাব্যরূপ বিচার বিশ্লেষণ করেছেন বলেই চর্যাকে তিনি প্রকৃত ভাবময় কাব্যরূপে আখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে চর্যাকারদের ধর্মানুভূতিতে কাব্যানুরক্তির সম্পর্ক নেই। তাঁদের কবিকল্পনা কেবল গূঢ় তত্ত্বের মধ্যে ধরা দিয়েছে বলে কাব্যকৃতি রূপময় হয়ে ওঠেনি। এবং সেই সঙ্গে বস্তুপুঞ্জরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে

ওঠেনি। কয়েকটি ক্ষেত্রে চর্য্যার অধ্যাত্ম সত্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত রূপে ব্যঞ্জিত হয়েছে; যেমন কাহ্নপাদ তাঁর একটি চর্য্যায় বলেছেন,—

মূঢ়া অচ্ছন্তে লো অ ন পেখই।
দুধ মাঝেঁ লড়হন্তে ন দেখই॥
ভব জাই ন আবই এথু কোই।
আইস ভাবে বিলসই কাহ্নিল জোই॥

তেমনি ভুসুকুপাদের একটি চর্য্যায় অধ্যাত্ম সত্য অনুরূপ ভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

জিম-জলে পাণি আ টলি আ ভেউন জাঅ।
জিম-মনর অনা-রে সমরসে গ-অন সমাঅ॥
জাসু নাহি অপ্পা-তাসু পরেলা কাহি।
আই অনু অনারে জাম মরণ ভব নাহি॥

কাব্যে ধর্মতত্ত্ব থাকতে পারে, কিন্তু কবির সেই তত্ত্বপ্রকাশ তখনই কাব্যাত্বের দাবী করতে পারে যখন কবি রূপাত্মক কল্পনার আশ্রয়ে তত্ত্বকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করেন এবং তাকে বাস্তবতার ঐশ্বর্য্যে মনোরম করে তোলেন। নিরাবয়ব আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তখনই কবির অনুভূতি স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে জনচিত্তকে আকৃষ্ট করে এবং রূপ ও রসে বিলসিত হয়ে পাঠকচিত্তে এক অপরূপ ভাবব্যঞ্জনার সঞ্চার করে। উপরন্তু সাহিত্য-দর্পণের ভাষায়, 'কাব্যসৃষ্টি হচ্ছে কোন ভাবের প্রত্যক্ষ প্রকাশ; কিন্তু সে ভাব কোন লৌকিক দেশ-কাল ব্যক্তির দ্বারা পরিচ্ছন্ন নয়। তা সাধরণীকৃত বা অসাধারণ এবং এই ভাবেই তার আস্বাদ। (৭) চর্য্যাকারগণের কবি কর্মে এই বৈশিষ্টটি বিশেষভাবে অনুপস্থিত। কবিতায় হৃদয়বৃত্তিকে যথাযোগ্য স্থান না দিয়ে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে অধিকতর মর্য্যাদা দিয়েছেন; ফলে চর্য্যাপদ কবি-মানস রসে সিঞ্চিত হয়ে প্রকৃত কাব্যরূপ লাভ করতে পারেনি। সিদ্ধাচার্য্যরা সম্ভবতঃ এই কারণেই সিদ্ধ কবি হিসেবে মর্য্যাদা পাননি।

চর্য্যা আকৃতিতে কাব্য হলেও প্রকৃতিতে নয়। কাব্য ধর্ম বহির্ভূত বিষয় কোন নীতিকাব্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কাব্য হিসেবে, তত্ত্ব হিসেবে নয়। কাব্যাদর্শ শুধু তত্ত্বের মধ্যে নিহিত নয়। তাই তত্ত্বের মাপকাঠি কাব্যবিচারে যথাসর্বস্ব নয়। কাব্যের উদ্দেশ্য কাব্য হিসেবে এর সার্থকতা। চর্য্যাকারগণ কবি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি বা সার্থক কাব্য রচনা প্রয়াসে তাঁরা কোন সময় উদ্বুদ্ধ হননি। কবিতার আকারে তাঁরা কেবল ধর্মাচরণের কতকগুলি ইঙ্গিত ব্যঞ্জিত করেছেন মাত্র। যে কোন বিষয়বস্তু কাব্যাকারে ব্যক্ত হলে যদি কবিতা হয়, তাহলে চর্য্যাপদকে কাব্যগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করতে বাধা নেই।

অনেকের মতে উপমা রূপকের মধ্যে চর্য্যার কাব্যমূল্য নিহিত। অভিমতটি অবশ্য সাধারণভাবে ঐকামত বহন করলেও একেবারে বিরোধশূন্য বলা যায় না। চর্য্যাপদের রূপক প্রতীকের অন্তরালে সহজিয় সাধক চর্য্যাকারগণের গোপন সাধনার ইতিবৃত্ত লুকানো রয়েছে। এগুলির তাৎপর্য্য অনেকের কাছে বোধগম্য নয়; কেবল গুরু পরম্পরায় সাধকেরা এগুলির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারতেন! পদগুচ্ছে সহজিয়াদের কেবল আচরণীয় সাধনপদ্ধতিই ব্যক্ত হয়নি, তান্ত্রিক কায়া-সাধনের অনেক অনাচরণীয় পদ্ধতিও গূঢ় শব্দ সংকেতের সাহায্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। ভাব প্রকাশার্থে যে সকল প্রতীক উপমার ব্যবহার আমরা দেখতে পাই, সেগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রয়োগসিদ্ধ হয়ে ওঠেনি। ফলে, ভাবের সঙ্গে প্রতীকের সংযোগ ব্যাহত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভাবের সঙ্গে প্রতীকের একটা সংযোগ আছে, কাব্যে সেগুলি প্রয়োগসিদ্ধ না হলে পাঠকের কাছে সে কাব্য দুর্বোধ্য হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। চর্য্যায় ব্যবহৃত উপমা প্রতীকগুলি অবশ্য সকলক্ষেত্রে পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়, কিন্তু কবির ভাব সত্তার সঙ্গে প্রতীক-উপমার সংযোগ প্রায়শঃক্ষেত্রে সার্থক হয়ে ওঠেনি। ভাবসত্তা যখন বস্তু থেকে পৃথক কোন প্রতীকের সাহায্যে অভিব্যক্ত হয়, তখন সাধারণ পাঠক তার মর্মোদ্ধার করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। চর্য্যাপদের উপমা-

প্রতীকগুলি উদ্দিষ্টার্থকে সহজ-বোধ্য না করে দুরূহ করে তুলেছে। উদ্দিষ্টার্থ শব্দ সংকেতে এমনভাবে বিবৃত যে তার উপলব্ধি সম্বন্ধে পাঠকের মনে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। উপরন্তু শব্দ-সংকেতগুলি পাঠকের কাছে কাব্যাকারে ফুটে ওঠে না বলে তাদের বুদ্ধির রাজ্যে এনে সচেতন চেষ্টার দ্বারা উপলব্ধি করতে হয়। চর্যাকারগণের ভাব-সত্তার প্রকাশই চর্যাপদের বৈশিষ্ট্য। কবির দৃষ্টিভঙ্গি যদি কবিরই বৈশিষ্ট্য হয় এবং তা যদি সাধারণের ধারণার একান্ত অনধিগম্য হয়, তাহলে সে কাব্য কখনো মনোময় কাব্যরূপে স্বীকৃত হতে পারে না। সিদ্ধাচার্যারা মর্মবোধের চেয়ে ধর্মবোধের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং আত্ম-বোধের জন্যই তাঁরা মর্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ফলে, পদনিচয়ে ধর্মবোধের প্রাধান্য অধিকমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে।

চর্যাপদগুলি সম্ভবত খ্রীঃ ১০ম ১২শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন এক সময়ের রচনা। বৌদ্ধধর্ম সে-সময় হিন্দুধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে ক্রমাগত বিরোধিতা করে অবশেষে রাজধর্মের মর্যাদা হারিয়েছে। হিন্দুধর্মের প্রাধান্যকে সেকালের সাধারণ মানুষ এবং সমাজ-পরিচালকের পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিল। কেবল এই নির্দিষ্ট কালটিতেই নয়, বৌদ্ধ আমলেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব কোন সময় বিঘ্নিত হতে দেখা যায়নি। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নৃপতিরাও সমাজ-শাসনে ব্রাহ্মণ্যআধিপত্যকে অবজ্ঞা করতে সাহস করেননি। চর্যাপদের সমকালীন ভারতে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ লোপ পেতে বসেছিল। বহু বৌদ্ধমঠ সংস্কার অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। জীর্ণ পরিত্যক্ত মঠগুলির ইঁট-কাঠ সংগ্রহ করে লোকেরা তখন নিজেদের বাসস্থানের কাজে ব্যবহার করত। "মঞ্জুশ্রী মূলকল্প" গ্রন্থে এবং হিউয়েন সাঙের কামরূপ বর্ণনায় বৌদ্ধধর্মের এই ক্ষীয়মান বিকৃত রূপ লক্ষ করা যায়। বুদ্ধ এবং মহাবীর ক্রমশঃ হিন্দুদেবতার রূপান্তরিত হয়েছিলেন। বিষ্ণু ও শৈব উপাসকেরা ধর্মজ্ঞানে বুদ্ধ ও মহাবীরকে বিষ্ণু ও শিবের অবতার মনে করে পূজা-অর্চনা করতেন। হিন্দুধর্মের উপাসনা-রীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে বুদ্ধের পূজা অনুষ্ঠিত হত। এইভাবে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে সুরু করে। কেবল মুষ্টিমেয় বৌদ্ধপ্রধানেরা গোপনে বৌদ্ধমতে ধর্মানুষ্ঠান করতেন।

বৌদ্ধধর্মের দুটি প্রচলিত মত, যথা—হীনযান এবং মহাযান। মহাযান মতে বোধিসত্ত্বা পূজা স্বীকৃতি পেয়েছে। উত্তরকালে নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে বোধিসত্ত্ব পূজা হিন্দু দেব-দেবীর পূজা অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। তাছাড়া বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার স্বরূপ লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, হিন্দুধর্মের অনেক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবেশ করেছিল। নেপাল, তিব্বত এবং বাংলা দেশে তান্ত্রিক মতের কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান ইত্যাদি বৌদ্ধমতগুলি গড়ে উঠেছিল। বাংলা ভাষার অতি সুপ্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদে বৌদ্ধমতের এই ক্ষয়িষ্ণু বিকারপ্রাপ্ত স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধধর্মে এই তান্ত্রিকতা ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হয়েছিল বলেই হিন্দুধর্মের পক্ষে সেদিন বৌদ্ধধর্মকে জন্মভূমি থেকে নির্বাসন করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি।

চর্যাপদে বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের সহজিয়াপন্থী-দের তান্ত্রিক যোগ সাধনার কথা বিবৃত হয়েছে। চর্যাকারগণ নিজেদের নামকরণও করেছেন তান্ত্রিক-মতে। প্রত্যেকেই তাঁদের সাধনার স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন গানের আকারে। যোগ-সাধনায় অচঞ্চল চিত্তের বিশেষত্ব সংকীর্তিত হয়েছে। চঞ্চলচিত্ত আসক্তিপরায়ণ আসক্তিক্লিষ্ট চিত্তে মহাসুখ বা মহানির্বাণ লাভ কল্পনা-তীত। অনিত্য সংসারে কামনা-বাসনার শেষ নেই। সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখৈশ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে মানুষ আত্ম-পরামুক্তির কথা বিস্মৃত হয়। ফলে বার বার তাকে সংসারে ফিরে এসে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। চিত্ত যখন অচিত্ততারূপে নিঃসীম শূন্যতায় লীন হয় তখনই তা মহাসুখ লাভে সমর্থ হয়। স্বাধিষ্ঠান শূন্যের

সংগে প্রভাস্বর শূন্যতার মিলন হলে চিত্তে বস্তুজগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান। আবার পরম জ্ঞানই সকল ধর্মের সার এবং আত্মপরামুক্তির বাহক। চর্য্যায় মহাসুখ সম্বন্ধে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে, যেমন—

খুনে খুন মিলি আ-জবেঁ।
সকল-ধাম উই আ তবেঁ ॥
আচ্ছহুঁ চউখন সংবোহী।
মাঝে নিরোহ অনুসর বোহী ॥

* * * *

তিনি ভুঅন-মই বাহিঅ হেলেঁ।
হাঁউ সুতেলি মহাসুখ-লীড়েঁ ॥
কইসনি হালো-ডোম্বী তোহারি ভাভরী-আলী।
অন্তে কুলিন জন মাঝেঁ কাবালী ॥

চিত্তের অচঞ্চলতা বা নিশ্চলতা সম্বন্ধে উপদেশ-প্রদান একমাত্র গুরুরই অধিকারভুক্ত। তাঁর উপদেশ ছাড়া চিত্তের নিশ্চলতা লাভ অসম্ভব। এমনি গুরুবাদী তত্ত্বসমূহ চর্য্যাপদের বিষয়ীভূত। চিত্তশুদ্ধিতেই তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ সম্ভব। এবং এর বলে মহানির্ব্বাণ লাভ সার্থক হয়! এই মূলমন্ত্র চর্য্যায় বার বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সহজিয়া কথাটি সহজাত অর্থে ব্যবহৃত। সহজ মতটি তান্ত্রিক মত। সিদ্ধাচার্য্যরা দেহের সহজাত বৃত্তির চরিতার্থকে ধর্ম সাধনার উপায় বলে মনে করতেন বলেই তাঁরা সহজিয়াপন্থী। অতি সংগোপনে তাঁরা দেহবৃত্তিক চর্য্যার অনুশীলন করতেন। চর্য্যাপদে তাই দেহতত্ত্ববাদের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। সহজিয়া তত্ত্বে যাগ-যজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদির কোন মূল্য নেই। মহা-সুখ বা মহানির্ব্বাণ কখনো যাগ-যজ্ঞ, কৃচ্ছ্রসাধন এবং মন্ত্রপাঠে লাভ করা যায় না। নিরাভরণ হলেই যদি মুক্তিলাভ হয়, তাহলে শিয়াল কুকুরেরাও নিঃসন্দেহে মুক্তি পাবে। দেহের লোম উৎপাটনেই যদি সিদ্ধিলাভ হয়, তাহলে যৌবনবতীদের নিতম্বেরও একদিন সিদ্ধিলাভ হবে। এমন মন্তব্য সহজিয়াপন্থী তিল্লিপাদ তাঁর চর্য্যায় উল্লেখ করেছেন,—

অই নগ্গারি অ হোই মুত্তি তা সুনহ সি-আলহ।
লোমু পাড়নেঁ অথি সিদ্ধি তা জুবই নি অম্বহ॥

কতকগুলি চর্য্যায় দৈহিক মিলন এবং দেহতত্ত্ববাদের কুণ্ঠাহীন প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করে অনেক সমালোচক সেগুলিকে আদিরসের সমপর্য্যায়ভুক্ত বলে ইঙ্গিত করেছেন। রসের স্বরূপ নিয়ে-সংস্কৃত সাহিত্যে বহু মতের সৃষ্টি হলেও রসের অনুভূতি প্রাহ্যত্ব কেউ অস্বীকার করেন নি। ভাবের আস্বাদিত অবস্থার নামই রস। অনাস্বাদিত ভাববস্তু রসের সংজ্ঞায় পড়ে না। ভাব আর রস এক বস্তু নয়। ভাব যখন সর্ব্বপ্রকার আস্বাদাত্মক রজস্তমোগুণের বিবিধ বাধা হতে মুক্ত হয়ে চিত্তে প্রকাশ পায়, তা হয় রস। (৮) চর্য্যার ভাবমূলে সংচিদানন্দের প্রকাশ নেই। তা ছাড়া কবিগণের প্রকাশভঙ্গিতে স্ফুটত্বের অভাব। অপ্রধানতা এবং উপলব্ধি বিষয়ে অযোগ্যতা ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত। ফলে, চর্য্যায় শব্দার্থজাত ভাববস্তু পাঠকচিত্তে রসের সঞ্চার করতে অসমর্থ। দেহমার্গীয় চর্য্যায় স্থায়ীভাবের প্রাধান্য। স্থায়ীভাব কখনো রসে পরিণত হয় না। এই বিশেষ স্থায়িত্বে রসের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হলেও স্থায়ীত্বের কিছু আস্বাদ থেকে যায়। স্থায়ীভাব সম্পন্ন হলে তবেই তা রসতা প্রাপ্ত হয়।

ভাবা অতিসম্পন্না প্রায়ন্তিরসতাম সমী
[বোপদেব কৃত মুক্তাফল, ১১।৯ টিকা]

তাছাড়া রস পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় অলঙ্কারের আশ্রয়ে। বিষম অলঙ্কারের তরঙ্গে ভাব রস প্রাপ্ত হয়। অলঙ্কারে সুশোভিতা কাব্য তখন এক পরম বৈচিত্র্যে রমণীয় হয়ে ওঠে। হৃদয়ে রসের সঞ্চার করতে তখনই তা সমর্থ হয়। অলঙ্কারের দিক হতে চর্য্যাপদ ত্রুটিমুক্ত নয়। অলঙ্কার প্রয়োজনের অসম্পূর্ণতাও এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এথেকে সহজেই অনুমেয় যে চর্য্যাকারগণ কাব্যরচনায় অলঙ্কার প্রয়োগের রীতি-নীতি সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন না, কিংবা সেই যুগে হয়ত বর্ত্তমানকালের মত কাব্যরচনার রীতিনীতি-সমূহ যথেষ্ট সুগঠিত ছিল না।

চর্য্যাপদে ভক্ত আছে কিন্তু ভগবান নেই। গুরুই যথাসর্ব্বস্ব। গদ্যাকারে সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্বগুলি লিখিত হলে চর্য্যাপদকে অনায়াসে একটি নীরস ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করা যেত। কিন্তু এই শুষ্ক তত্ত্বসত্তার তাল-মাত্রা সংযোগে গানের আকারে পরিবেশিত বলেই এর কাব্য যথার্থতা সম্বন্ধে নানা মতের সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রসঙ্গে মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য। তাঁর মতে, চর্য্যাগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের বাঙলা গান। গানগুলি কীর্ত্তনের মত, গানের নাম চর্য্যাপদ। চর্য্যার কাব্যমূল্য ও সিদ্ধাচার্য্যদের কবিকৃতি সম্বন্ধে তিনি আর কোন পৃথক মন্তব্য করেন নি। অতএব চর্য্যাপদের প্রধান আকর্ষণ ধর্মগ্রন্থ হিসাবে, কাব্যগ্রন্থ হিসাবে নয়।

আদিরসাত্মক কাব্য বলে চর্য্যাপদকে যাঁরা ইঙ্গিতায়িত করেছেন, তাঁরা কাব্যাশ্রিত রসের প্রকৃতি এবং রসোৎকর্ষতা সম্বন্ধে কোন বিশদ আলোচনা না করে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। আলঙ্কারিকেরা সমস্ত রসের আদিতে শৃঙ্গার রসকে স্থান দিয়েছেন। "শৃঙ্গ" শব্দের অর্থ পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনজনিত কামনার উদ্রেক। কামনাবির্ভাবের কারণস্বরূপ যে-রসটির প্রকৃতি অতিশয় উত্তম এবং সুরুচিপূর্ণ, তাকেই শৃঙ্গার রস বলা হয়। শৃঙ্গার রস মূলে পরস্ত্রী, অনুরাগিণী এবং বারবনিতার কোন স্থান নেই। শৃঙ্গার রস সামান্য নায়ক-নায়িকাকে অবলম্বন করে পুষ্ট। বিপ্রলম্ভ না থাকলে শৃঙ্গার রসের পুষ্টি হয় না। এতদ্ব্যতীত শৃঙ্গার রতি যৌনাশ্রিত হলেও তা সময়-বিশেষে যৌনভাবকে অতিক্রম করে বিশুদ্ধ প্রেমময় সত্তায় পরিণত হয়। চর্য্যাপদে আদিরসের ইঙ্গিত সুস্পষ্টীকৃত নয়। যে কয়টি পদ নিচয়ে আদিরসের প্রতীতি ইঙ্গিতায়িত হয়েছে, তা কোন বিশুদ্ধ রস নয়, রসাভাব মাত্র।

উদাহরণস্বরূপ যেমন একটি চর্য্যায়,—

> দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভা অ।
> রাতি ভইলে কামরু জা অ॥

একটি বধূর চিত্তে কবি আর্ত্তিপূর্ণ বিরহ লক্ষ্য করেছেন। দিবাকালে বধূটি কাকের ভয়ে জড়োসড়ো। দিবালোকেও তার হৃদয় ভীত সচকিত একাকীত্বের বেদনায় হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু রাত্রে সেই চিত্তে আর হাহাকার থাকে না। মিলনের তীব্রতায় সে তখন আবেশ-বিহ্বল কাম-রূপে পরিতৃপ্ত। এখানে বধূটির কোন পরিচয় নেই এবং তার প্রেমিকেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই কবিতায় রস আছে কিনা এবং সূর্য্যালোকে সজীবতা আছে কিনা, এই প্রশ্ন। পদটিতে অনুভাব নেই, সঞ্চারীভাবও তথৈবচ। অতএব পদনিচয়ে রসবত্তার পরিচয় কোথায়?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রস ও সৌন্দর্য্য উভয়ই রমণীয়। সৌন্দর্য্য সুখ্যাত ভাবাশ্রয়ে পরিপুষ্ট। অতএব তাকে রসবসে স্বীকার করে নিতে আপত্তি নেই। রসসৃষ্টিকল্পে চর্য্যাকারগণ বোধকরি রসবোধকে প্রাধান্য দেন নি। নতুবা তাঁদের রচনায় মানুষের সহজাত বৃত্তিগুলি স্থায়ীভাবের স্বরূপতায় এমন অশালীন-ভাবে প্রকাশ পেতনা; উদাহরণস্বরূপ যেমন কাহ্নপাদ তাঁর একটি চর্য্যায় কামচতুরা ডোম্বীর (ডোমনির) প্রশস্তি গেয়েছেন,—

> কেহো কেহো তোহারে বিরুআ বোলই।
> বিদুজন লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ॥
> কাহ্নে গাইউ কামচণ্ডালী।
> ডোম্বিত আগলি নাহি ছিনালী॥

অপর একটি চর্য্যায় কাহ্নপাদ ডোম্বীর সাথে সম্ভোগ-লীলায় মেতে উঠেছেন। ডোম্বীর প্রতি আসক্ত হয়ে পরম সুখে তাঁর দিন কাটে। কামজ প্রেমের আসক্তি তাঁকে উন্মত্ত করে তোলে। সহজে কেউ আসক্তি থেকে মুক্তি পায় না।

> অহনিসি সুর অ পসঙ্গে জা অ।
> জইনি জালের এনি পোহাস॥
> ডোম্ব এর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
> খনই ছাড়অ সহজ উম্মত্তো॥

কায়া সাধনার স্বরূপ উপরোক্ত চর্য্যাসমূহে কিঞ্চিৎ

প্রকীর্তিত। কায়া সাধনার একটি বিশেষ উপলব্ধি হল দেহবাদ। সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কায়াতত্ত্ব গোপনে অনুশীলিত হত। কায়াতত্ত্বের সবিশেষ ইতিবৃত্ত অশালীন স্থূল যৌনাচার ছাড়া কিছু নয়।

উপরন্তু পদগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আদিরস পূর্ণাঙ্গ আকারে উৎসারিত হয়নি। আদিরসে বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারীভাবের যে প্রাচুর্য্য থাকে এখানে তার বহুল অভাব পরিদৃষ্ট। অতএব চর্য্যাপদে প্রচুর রসভোগের উপকরণ থাকলেও অলঙ্কার উপমাদির বিচারে তা প্রকৃত রসাত্মক রচনা হয়ে ওঠেনি। রসের সঙ্গে অলঙ্কারের নিবিড় যোগ রয়েছে। রসাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার অলঙ্কারের প্রকাশ হতে থাকে এবং সেই অলঙ্কারাত্মক শব্দগুলির স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ তখনই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। চর্য্যাপদে এই লক্ষণটি অলক্ষিত।

চর্য্যার প্রধান বৈশিষ্ট বলতে দু'টি—চিত্র এবং তত্ত্ব। চিত্র বলতে তৎকালীন যুগের সামাজিক চিত্র এবং তত্ত্ব বলতে, সর্ব্বং অনিত্যম, সর্ব্বং অনাত্মম, নির্ব্বাণং শান্তম। এই হতেই সকল ভাব মোহের নিরসন এবং শূন্যবাদের উদ্ভব। পদনিচয়ে বিধৃত হয়েছে সাধারণ মানুষের সহজ সরল জীবনচিত্র, প্রাত্যহিক আচার-অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিবরণ এবং জীবনবোধের শিল্পসম্মত রুচিজ্ঞান। বর্ণনভঙ্গিমায় শিল্পরীতির কোন প্রবণতা নেই, নেই কোন দুঃসাধ্য প্রয়াস। সমাজ-জীবনের এমন সহজ সরল বর্ণনা অন্য কোন প্রামানিক গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। চিত্র-চিত্রণে চর্য্যাকারগণের কোনরকম অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায় না।

তাছাড়া উপাদান নির্ব্বাচনে সিদ্ধাচার্য্যগণ কোনরূপ অবাস্তবকে প্রশ্রয় দেন নি। অতি প্রত্যক্ষিত বস্তুসমূহ তাঁদের চর্য্যায় পরম সমাদরে স্থান পেয়েছে।

অধ্যাত্ম সাধনাই চর্য্যাকারগণের উদ্দেশ্য ছিল, কাব্যসাধনা নয়। আচরিত ধর্ম্মসাধনার প্রক্রিয়া-বর্ণনায় তাঁরা লৌকিক জগতের বিভিন্ন বস্তুকে ধর্ম্মীয় প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নৈরাত্ম প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে যে চিত্রময়তা তাঁদের ধর্ম্মীয় সংগীতে প্রকাশ পেয়েছে, তা নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক। একমাত্র এই বৈশিষ্টই চর্য্যাপদের পরম সম্পদ।

পদ-গীতি-নিচয়ে লৌকিক রূপজগতের বর্ণনা পাঠককে মুগ্ধ করে; বাস্তববোধের বিচিত্রতায় হৃদয়কে স্পর্শ করে। কেবল এই বৈশিষ্ট মাঝেই চর্য্যার গীতি-মূল্য নিহিত। চিত্রময়তার অংকনবন্ধে এর সাহিত্যমূল্য স্বীকৃত। বাংলা ভাষার উষালগ্নে ধর্ম্মীয় দোঁহায় ঐ পরম বৈশিষ্টটি এক প্রাচীন নিদর্শনস্বরূপ। তত্ত্বের সমন্বয়ে বাংলা কাব্যের আদি স্বরূপ উদ্ভাসিত। এই দিক থেকে বিচার করলে কাব্যাকারে লিখিত ধর্ম্মীয় দোঁহাগুলি যে সাহিত্যের অমূল্য সৃষ্টি, সন্দেহ নেই।

---

(১) 'সাহিত্যে সন্দর্শন': শ্রীশচন্দ্র দাস।

(২) 'বাংলা সাহিত্য': মণীন্দ্রমোহন বসু।

(৩) 'বাংলা সাহিত্যের' ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড)' অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৪) ঐ

(৫) চর্য্যাপদ: অতীন্দ্র মজুমদার।

(৬) বাংলা সাহিত্য': (প্রথম ভাগ) মণীন্দ্র মোহন বসু।

(৭) 'সাহিত্য দর্পণ: অনুবাদক—অবন্তীকুমার সান্যাল ও গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(৮) 'সাহিত্য সংগমে': অধ্যাপক বিনায়ক সান্যাল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

"যুগজ্যোতি" পত্রিকা বলিতেছেন—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় তিন মাস বন্ধ হইয়া আছে এবং বাৎসরিক পরীক্ষার অনুষ্ঠানও হয় নাই। একদিকে কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদসম্পন্ন ছাত্রদের মধ্যে অবিরত সংঘর্ষ ও অপর দিকে শিক্ষকদের পরীক্ষা বর্জ্জনের সিদ্ধান্তের ফলেই এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। বহু আলোচনা ও বিতর্কের পর শিক্ষকদের সহিত কর্তৃপক্ষের একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পাউণ্ডে শান্তিরক্ষা করিবার জন্য বহু কেন্দ্রীয় পুলিশ সেখানে আমদানী করা হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থার পর কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে ২৭শে জুলাই হইতে বাৎসরিক পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

এবার গোলযোগ বাধাইয়াছে ছাত্ররা। তাহাদের ইউনিয়নের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পাউণ্ড হইতে কেন্দ্রীয় পুলিশ সরাইয়া না লইলে তাহারা পরীক্ষা বর্জন করিবে। কিন্তু বিপদ হইয়াছে এই যে পুলিশ সরাইয়া লইলে সেখানে ছাত্রদের মধ্যে বিরাট সংঘর্ষ ঘটিবার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে। গত মে মাসের সংঘর্ষে দুইটি ছাত্র নিহত হইয়াছিল এবং দুইজনই নাকি নকসালপন্থী বলিয়া শোনা যাইতেছে। একথাও শোনা যাইতেছে যে নকসালপন্থীরা নাকি ঘোষণা করিয়াছে যে "দুইয়ের বদলে চার" অর্থাৎ দুইজন নিহত নকসালপন্থীর বিনিময়ে চারজন বিরোধী পক্ষের ছাত্রকে হত্যা করা হইবে। কাহাকে কাহাকে হত্যা করা হইবে, তাহাদের নামও নাকি ঘোষণা করা হইয়াছে। অপরদিকে নকসালপন্থীদের বিরোধীদল সি-পি-এমও নাকি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত রহিয়াছে। তাই পুলিশ সরাইয়া লইলে যে বিরাট হিংসাত্মক ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাধারণ ছাত্ররা উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে। পরীক্ষা দিতে তাহারা চায় কিন্তু ছাত্রনেতারা বিরোধীতা করিলে পরীক্ষা হলে পৌছান যে বিশেষ বিপজ্জনক ব্যাপার ইহাও তাহাদের অজানা নাই। আবার ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইয়া পুলিশ সরাইয়া লইলেও তাহাদের সমস্যার সমাধান হইবে না। কারণ উভয় দলের সংঘর্ষে যে বিস্ফোরণ ঘটিবে তাহা তাহাদের নিরাপত্তার পক্ষেও বিশেষ বিপজ্জনক।

এই সংকটের অবসান ঘটাইবার জন্য পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়াও সম্ভব নয়। কারণ এতগুলি ছাত্রর ভবিষ্যৎ তাহার ফলে অন্ধকার হইয়া যাইবে। পরীক্ষা না করিয়া উচ্চশ্রেণীতে উঠাইয়া দিয়াও লাভ নাই। কারণ কেন্দ্রীয় পুলিশ উঠাইয়া না লইলে ছাত্ররা হয়তো ক্লাসে যোগদান করিতে চাহিবে না এবং পুলিশ উঠাইয়া লইলেই সংঘর্ষ ঘটিবে। তাই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কর্ত্তৃপক্ষের তাঁহাদের কর্ম্মসূচিতে দৃঢ়ভাবে অবিচলিত থাকাই কর্ত্তব্য। বিস্ফোরণের আশঙ্কা অপেক্ষা বিস্ফোরণ ঘটিয়া যাওয়াই অনেক সময় ভাল। হয়তো তাহার পর মীমাংসার সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার অবস্থা

"যুগবাণী" সাপ্তাহিকে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আংশিকভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে:

ইন্দোচীনের যুদ্ধে বিশ্বের তিনটি বৃহৎ শক্তি মার খাইয়া ঐ অঞ্চল হইতে সরিয়া পড়িতেছে। ভিয়েৎনামে একদিকে আমেরিকা আর একদিকে রাশিয়া ও চীন যৌথভাবে রণ-সজ্জায় দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার ও ভিয়েৎনামের দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী জনগণ আমেরিকাকে হঠাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া ও চীন যাহাতে ঐ দেশে ঘাঁটি গাড়িতে না পারে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে। তারা রাশিয়া ও চীনের সাহায্য লইয়াছে কিন্তু তাদের মুরুব্বি সাজার সুযোগ দেয় নাই। উপরন্তু রাশিয়া ও চীনের মধ্যে শত্রুতা সুরু হওয়ায় এশিয়ার জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির মাথা তোলার পক্ষে একটা বড় সুযোগ আসিয়া গিয়াছে। আজ রাশিয়া, চীন ও আমেরিকা—পৃথিবীর এই তিন বৃহৎ শক্তি পরস্পরের ঘোর শত্রু;—এদের মধ্যে একমাত্র চীন এশিয়ার জাতীয়তাবাদকে কতকটা সমর্থন করে; অপর দুই পক্ষ সাম্রাজ্য বিস্তার ও শোষণ ছাড়া আর কোন লক্ষ্য লইয়া এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয় না। ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যাণ্ড লইয়া গঠিত গোটা ইন্দোচীন অঞ্চল আজ যুদ্ধের অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়া ক্রমেই ঐ তিন বৃহৎ শক্তির বাঁধন মুক্ত স্বাধীন এশিয় এলাকা রূপে গঠিত হইবার পথে চলিয়াছে। উহাকে মদত দিবে, সাহায্য করিবে জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি এশিয়ার অন্যান্য স্বাধীন জাতীয়তাবাদী দেশগুলি। ঐ অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের মধ্যখানে আছে ব্রহ্মদেশ; সকলেই জানে যে জেনারাল নে উইন পরিচালিত বার্মা রাশিয়া, চীন বা আমেরিকা কোনো পক্ষেই নাই, বরং নিঃশব্দে জাতীয়তাবাদের আদর্শকে উ 1 দৃঢ়ভিত্তিক করিতেছে।

জেনারেল নে উইন গত ৮ই জুলাই হঠাৎ দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে রুদ্ধ দ্বার কক্ষে পর পর তিন দিন ধরিয়া তিনি যেসব কথা আলোচনা করেন তার এক বর্ণও কোনো সংবাদপত্রে ঘুণাক্ষরে প্রকাশিত হয় নাই। নিঃশব্দে আসিয়া তিনি নিঃশব্দে চলিয়া যান - কোথাও কোনো বক্তৃতা করেন নাই, বিবৃতি দেন নাই, সাংবাদিকদের কাছে ঘেঁষিতেই দেন নাই। তাঁর দিল্লী আগমনের সংবাদ পাইয়া সন্ত্রস্তভাবে হানয় হইতে সোজা দিল্লী ছুটিয়া আসিলেন রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিরুবিন। তিনিও দফায় দফায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে নিভৃত বৈঠকে বসিলেন—কী আলোচনা হইল তাহাও প্রকাশিত হয় নাই। তবে দিল্লীর সংবাদপত্রগুলি এক বাক্যে বলিয়াছে যে নে উইন ও ফিরুবিন দুজনেই ইন্দোচীন যুদ্ধ ও এশিয়ার ভবিষ্যৎ লইয়া সম্ভবত আলোচনা করিয়াছেন।

আলোচনা যে পূর্ব্ব ভারতকে লইয়াই মুখ্যত হইয়াছে এই মর্মে একটা সংবাদ আমরা পাইয়াছি। পূর্ব্ব ভারতে ভিয়েৎনামের মতো ঘটনা ঘটিতে পারে, নে উইন যে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁর আগ্রহের অন্যতম কারণ বার্মা পূর্ব্ব ভারতের সংলগ্ন দেশ। পূর্ব্ব ভারতের প্রতি ইন্দোচীন খাওয়া তিনটি রাষ্ট্র—আমেরিকা, রাশিয়া ও চীন —লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। তারা জানে ইন্দোচীনে এশিয়ার বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী শক্তি যে বিজয় ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছে, বার্মা উহার সঙ্গে হাত মিলাইলে, ভারতের দিকে উহার আগমনে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। ভারত যদি আজ মাথা তোলে, আমেরিকা রাশিয়া ও চীনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এশিয়ার জাগ্রত, বিজয়ী জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্গে হাত মিলায়, তবে এই মুহূর্তে জাপান হইতে আফগানিস্তান পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড বিদেশী প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইবে, মহাশক্তির চাঞ্চল্যে দোলায়িত হইবে, এশিয়ার নব অভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ততর হইবে। পৃথিবীর কোন বৃহৎ রাষ্ট্রই তা চায় না। তাই আমেরিকা,

রাশিয়া ও চীন সকলেই উহাতে বাধা দিবে। তারা ইন্দোচীন হইতে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেও, পূর্ব্ব ভারতকে লুঠিয়া লইয়া এশিয়ার উত্থানোর সংগ্রামকে স্তব্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছে।

পাকিস্তান কি ভারত আক্রমণ করিবে ?

"সাপ্তাহিক বারাসত বার্তা" তে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে—

যখন পূর্ব্ব পাকিস্থানের সাতপুরুষের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে হাজার হাজার হিন্দু উত্তর চব্বিশ পরগণার সীমান্তে আশ্রয় নিচ্ছেন—পাকিস্থানের বেতার সপ্তম কণ্ঠে ভারতের বিরুদ্ধে অপ্রপচার চালিয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় নাকি দিনদুপুরে মহিলারা পথে বের হ'তে পারত না—বোমাধারী গুণ্ডারা ধরে নিয়ে যায়, পাক বেতারের ভাষ্যকারের উর্বর মস্তিষ্ক আরো আবিষ্কার করেছে চন্দ্রগুপ্তের আমলে মেগাস্থিনিসের ভারত ভ্রমণের ভিতর নাকি বর্ণহিন্দুদের দ্বারা অস্পৃশ্যদের যে ঘৃণার উল্লেখ ছিল সেটা এখনও বিদ্যমান এবং এমন কি দক্ষিণ ভারতের নাম্বুদ্রিপাদ ব্রাহ্মণ শ্রেণী এখনও অব্রাহ্মণদের ছায়া স্পর্শ করে না। কেবল সামাজিক দিক নয় অর্থনৈতিক দিক থেকে পাক বেতার যা বলছে তাতে হিসাব করলে দেখা যাবে দুর্ভিক্ষে ফি বছরে পশ্চিমবঙ্গে যত মানুষ মরে তাতে দশ বছরে এই রাজ্যে মানুষ বলতে আর কিছু থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে "নও দিল্লীর সরকার" নাকি খুশিতে চলে পড়েছে। পাক বেতারের এই হেন কুৎসা অপপ্রচার শাস্ত্রীজী—আয়ুব খাঁনের ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তির অঙ্গীকার কেবল লঙ্ঘন করছে না পদদলিত করছে। নিজের দেশ থেকে মাত্র কয়েক মাসে লক্ষাধিক নাগরিক ভারতে চলে গেল এই সত্য আড়াল করতেই যেন পাকিস্থান নতুন পর্য্যায়ে ভারত-বিরোধী অপপ্রচারে মেতে উঠেছে। একটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো পাকিস্থানের মজ্জাগত দোষ সেই দোষ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ভারতের গণতন্ত্র ভেঙ্গে পড়েছে—এতবড় মিথ্যা কথা বলে পাকিস্থান সরকার নিজেদের সুবিধা করার চেষ্টা করছেন যাদের রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই, নেই সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের ওপর পাকিস্থানের গায়ের ঝাল ঝাড়তে দিনের পর দিন তাহা মিথ্যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকলঙ্ক প্রচার করে চলেছে। পাকিস্থানের ভারত-বিদ্বেষী কুৎসা অপপ্রচার রুখতে ভারত সরকার এখন পর্য্যন্ত বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বন করেন নাই। তাসখন্দ চুক্তির মধ্যস্থতা করেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী—সোভিয়েত রাশিয়ার উচিত পাকিস্থানকে চুক্তির মর্য্যাদা রাখার জন্য বাধ্য করা। ভিতরে ভিতরে সোভিয়েত রাশিয়া পাকিস্থানকে তোয়াজ করে চলেছেন। এখানে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় পাকিস্থান যখন ভারত আক্রমণের মতলব আঁটে তার আগে ভারতের বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎসা প্রচার করতে থাকে। পাকিস্তানের নব পর্য্যায়ে রণসজ্জা পুনরায় পাকিস্থানকে গরম করে তুলছে—যে কোন একটা কাল্পনিক অজুহাতে ভারতের বুকে ফৌজ পাঠাতে পারে। প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কয়েক প্রকারের এই ধরণের ইঙ্গিত করেছেন—১৯৭০ সালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত আক্রমণ করতে পারে।

সাময়িকী

আণবিক অস্ত্রের পাহাড় বাড়িয়া চলিতেছে

আণবিক অস্ত্র এখন পৃথিবীর কয়েকটি দেশে তৈয়ার করিয়া আনবিক অস্ত্রশালায় জমা করা হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক আণবিক অস্ত্র আছে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে। সেখানে তিন হাজার বা ততোধিক মহাশক্তিশালী আনবিক বিস্ফোরক সংযুক্ত রকেট ও বোমা রক্ষিত আছে। রাশিয়ার আণবিক ভাণ্ডারে দুই হাজারের অধিক রকেট ও বোমা আছে। ইহার পরে যাহারা আণবিক অস্ত্র সম্ভার সংগ্রহ বা তৈয়ার করিয়াছে তাহারা হইল ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও চীন দেশ। এই সকল দেশের সমবেত অস্ত্র সংখ্যা এক হাজারের কম হইবে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীর ঐ পাঁচটি দেশই প্রায় ছয় হাজারের অধিক আণবিক অস্ত্র জমা রাখিয়াছে। এই সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হইলে তাহা হইতে যে তাপ ও বিষাক্ত-প্রভা নির্গত হইবে তাহাতে বহু কোটি লোক অচিরাৎ প্রাণ হারাইবে ও আরও অসংখ্য লোক রশ্মি বিচ্ছুরণ আক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে মারা যাইবে। প্রবল বিস্ফোরণ, লক্ষ লক্ষ ডিগ্রি মহাতাপ ও মারাত্মক আলোক রশ্মি বিকিরণ এই সকল কিছুই মানুষের বিনাশের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ কারণ। ছয় হাজার আণবিক বিস্ফোরণ প্রয়োজন হয় না; কয়েক শত বিস্ফোরণ ঘটিলেই মানব-জাতির ভবিষ্যৎ মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। উপরোক্ত পাঁচটি দেশ ব্যতীত বলা যায় কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া পশ্চিম জার্ম্মানী, জাপান, ভারতবর্ষ, ইসরায়েল ও আরও কোন কোন দেশ আণবিক অস্ত্র তৈয়ার করিতে পারে। হয়ত কিছু কিছু করিয়াছেও। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে আণবিক অস্ত্রের সংখ্যা দশ হাজারে পৌঁছাইবে ও ঐ সকল অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনাও ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিবে। এই ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া বৈজ্ঞানিক দিগের হৃদকম্প হইতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু ইহা কেমন করিয়া নিবারণ করা যায় কেহ জানে না।

আরব রাশিয়া ও ইসরায়েল

ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন করা হয় ইয়োরোপের ইহুদি দিগের জন্য একটা "মাতৃভূমি" সৃজন করার আবশ্যক হওয়ায়। আবশ্যক হইয়াছিল বৃটেনের আন্তর্জাতিক কূটনীতি অনুসরণের ফলে; প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে দেখা যাইল যে ইহুদি দিগের একটা রাষ্ট্র গঠন করিলে নানা দিক দিয়া এশিয়ায় ইয়োরোপের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা জোরাল হইবে। হিটলারের ইহুদি বিনাশ চেষ্টার ফলে বহু লক্ষ ইহুদি প্রাণ হারায় এবং বিশ্বের ইহুদিগণ পুনর্ব্বার যাহাতে ঐ জাতীয় নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মধ্যে না পড়ে সেই জন্য ইয়োরোপের সকল দেশের ইহুদিগণই ইসরায়েল গঠন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসে। এই কার্য্যে যে সকল শক্তি বিশেষ করিয়া চেষ্টাশীল হয় সেই সকল শক্তি কম্যুনিষ্ট বিরোধী হওয়ার ফলে রাশিয়া স্বভাবতই ইসরায়েলের বিপক্ষে যাইতে ইচ্ছুক হয়। মিলিত আরব রাষ্ট্র যখন ইসরায়েল ধ্বংস করিতে মনস্থ করে, রুশিয়া তখন আরব রাষ্ট্র গোষ্ঠীর নেতা মিশরকে সামরিক সাহায্য দান করিতে আগাইয়া আসে। রুশিয়া অবশ্য ভূমধ্যসাগরে নিজের একটা আস্তানা গড়িয়া তুলিতে চিরকালই ইচ্ছুক ছিল এবং এখন এই সুবিধায় ঐ কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা বিশেষ করিয়া আছে দেখিয়া শীঘ্র শীঘ্র মিশরে ডুবুরী জাহাজ, যুদ্ধ বিমান, রকেট প্রভৃতি নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র আনিয়া

শক্ত ঘাটি বাধিয়া বসিবার ব্যবস্থা করিল। বর্ত্তমানে মিশরে ১২০০০ সামরিক কার্যাদক্ষ রুশিয়ান কর্মচারী উপস্থিত আছে। ঐ সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে ও শীঘ্রই তাহা ২০০০০ হাজারে পৌছাইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞদিগের বিশ্বাস। এত অধিক সংখ্যায় রুশিয়ান সামরিক কর্মচারী দিগের আগমন হইয়াছে তাহার একটা কারণ যে আরব দিগকে অস্ত্রাদি সরবরাহ করিলে তাহারা তাহা ব্যবহার করিতে পারে না এবং ইসরায়েলের হস্তে সেইগুলি পড়িলে ইসরায়েল আমেরিকাকে সেই সকল অস্ত্র দিয়া রাশিয়ার সামরিক গোপন কথা ফাঁস করিয়া দেয়। ইহা বহুবার ঘটিবার পরে রুশিয়া অস্ত্র চালনার ভার আর আরব হস্তে দিতে চাহে না। কিন্তু অত অধিক রাশিয়ান মিশরে আসিলে রাশিয়ার সহিত আমেরিকার যুদ্ধ সম্ভাবনাও বাড়িয়া উঠে। রাশিয়ার সামরিক ব্যক্তিগণ অবশ্য ইসরায়েলের উপরে আক্রমণ চালাইতে কখন গমন করে না। ইসরায়েলের সৈন্য নিজদেশের বাহিরে আসিলে রুশিয়ানগণ তাহাদিগের উপর আক্রমণ চালায়। এই সকল ব্যবস্থা করিলেও ব্যাপারটা কিছু মাত্র সরল সহজ ভাবে নিরাপদ নহে। রাশিয়া যে কোন সময়ে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে এবং তাহা হইলে তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ সকলের উপর দ্রুতগতিশীল নৈসর্গিক ভীষণতার সহিতই আসিয়া পড়িবে।

রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি শ্রীধাওয়ান রাজ্যপাল

রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থায় ফলে আমাদের এই এই ভীষণ প্রোপ্রেসিভ রাজ্য পশ্চিম বঙ্গে গত কিছুকাল হইতে অশান্তি ক্রমশ বৃদ্ধির পথেই চলিয়াছে। আমরা সাধারণ মানুষ এই আশাই করিয়াছিলাম যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর, রাষ্ট্রপতির শাসনে রাজ্যের অবস্থার উন্নতি হইবে এবং ক্রমে ক্রমে পশ্চিমবঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক অনাচার, রাজ্যব্যাপী খুন জখম, লুটপাট, সি পি এম তথা নকশালীদের বেপরোয়া কার্য্যকলাপ বন্ধ হইবে—এককথায় মানুষের মনে নিরাপত্তার ভাব জাগরিত হইয়া শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য সবই সাধারণ গতিতে চলিতে আরম্ভ করিবে। আমাদের তথা বাঙ্গালী এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী অন্য সকলেই একটা শান্তি এবং নিরাপত্তার নিশ্বাস ফেলিবে—কিন্তু এ-আশায় ছাই পড়িয়াছে। রাজ্যপাল ধাওয়ান আমাদের সকল দিক হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

শ্রীধাওয়ান কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বলেন তিনি আইনজ্ঞ না হইলেও তাঁহাকে বিচারকের পদ দেওয়া হয়, প্রশাসনিক বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ নামক 'সমস্যা এবং সঙ্কটপূর্ণ রাজ্যের শাসনভার তাঁহারই উপর অর্পণ করা হইল। আমরা তখন মনে করিয়াছিলাম শ্রীধাওয়ান অতি বিনয়ী! পশ্চিমবঙ্গবাসীরা তাঁহাকে "বিনয়রত্ন" উপাধিতে ভূষিত করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসেই দেখা গেল শ্রীধাওয়ান আমাদের প্রতারিত করেন নাই। নিজের সম্পর্কে তিনি যাঁহা বলেন, তাহাতে কোন প্রকার অত্যুক্তি ত ছিল না, বরং তিনি নিজেকে পুরাপুরি উদ্‌ঘাটিত করেন নাই। তিনি যে মনে প্রাণে কম্যুনিজ্‌মে বিশ্বাসী সে বিষয়টা উহ্য রাখিয়াছিলেন। আজ পদে পদে তিনি কথায় এবং কাজে নিজেকে প্রায় সি পি এম দলভুক্ত বলিয়া জাহির করিতেছেন। সংবাদে ইহাও প্রকাশ যে বিশেষ একজন সি পি এম নেতার সহিত তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রায়ই পরামর্শ করিতেছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির নেতাদের রাজ্যপালের সহিত দেখা করিতে হইলে পূর্ব্বে দিনক্ষণ স্থির করিতে হয়, কিন্তু বিশেষ সি পি এম কম্যু নেতা যখন ইচ্ছা রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রাজ্যপালের সহিত দেখা করিতে পারেন। তাঁহাকে নানা উপদেশ দানেও কার্পণ্য করেন না।

রাজ্যপাল মহাশয় নিজেকে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য—নিরপেক্ষতা। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি যে ভাষণ দেন, তাহাতে বলেন যে তিনি বর্ত্তমানে বাতিল

যুক্তফ্রন্ট সরকারের 'কেয়ারটেকার' হিসাবেই কার্যভার লইলেন, যেখানে তাঁহার কর্তব্য ছিল যুক্তফ্রন্টের কয়েকটি শরিককে, বিশেষ করিয়া সি পি এম এবং তাহার নেতা পরম জ্যোতির্ময়কে 'টেক্‌কেয়ার' বলিয়া সাবধান করার। বর্তমান রাজ্যপালের শাসনের প্রথম দিক হইতেই দেখা যাইতেছে—তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টি'র দুইটি দলকেই একটু বেশী স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, বিশেষ করিয়া সি পি এমকে তিনি যেন একটা মাত্রাতিরিক্ত আদর দান করিয়া লালন করিতেছেন, স্নেহময় পিতা যেমন পালন করেন তাঁহার আদরের সন্তানকে!

আজ পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টি রাজনৈতিক দলই দাবি তুলিয়াছেন, ধাওয়ানকে এরাজ্য হইতে অপসারণ করিতে, কিন্তু দুটি কমিউনিষ্ট পার্টি এ বিষয় নীরব—যাহারা কর্তব্যনিষ্ঠ নির্ভীক প্রাক্তন রাজ্যপাল ধর্মবীরকে বাংলা হইতে খেদাইবার জন্য কোন প্রকার বিক্ষোভ এবং আন্দোলন এবং অসভ্যতা করিতে দ্বিধা করে নাই অথচ বেচারা ধরমবীর কেন্দ্রের নির্দেশমতই কাজ করিতেছিলেন। আজ ধাওয়ানও তাহাই করিতেছেন, বিশেষ করিয়া প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরার পরামর্শেই ধাওয়ান চলিতেছেন সর্ব্ব বিষয়ে।

প্রসঙ্গত একটা কথা জানা দরকার যে ধাওয়ান নেহরু পরিবারের স্নেহভাজন এবং নেহরুদের স্নেহের কারণেই, শতপ্রকার অযোগ্যতা, অজ্ঞতা এবং দেশে যোগ্যতর বহু ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও শ্রীধাওয়ান জজিয়তী, বিলাতে হাই কমিশনারী (অ্যামবেসেডর) প্রভৃতি প্রচুর বেতনযুক্ত সরকারী পদ লাভ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ডামাডোলের বাজারে কংগ্রেসের স্বার্থ এবং প্রাধান্য বজায় রাখিতেই ইন্দিরা ধাওয়ানকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত করেন। এ-নিয়োগে রাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কোন হাত নাই, বক্তব্য কিছু থাকিলে তাহা ইন্দিরার কর্ণে গোপনে বলিতে হইবে!! কিন্তু ইন্দিরার অরাজত্ব আর কতদিন চলিবে? প্রধান মন্ত্রীর শাসনগুণে আজ পশ্চিমবঙ্গ প্রায় মগ-রাজ্যে পরিণত হইয়াছে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হওয়ার পর—রাজ্যের শাসনভার পাইলেন রাজ্যপাল, কিন্তু একলা তাঁহার পক্ষে সব দিক সামলানো অসম্ভব বুঝিয়া তিনি পাঁচজন পরামর্শদাতা নিয়োগ করিলেন, তাহাতেও কুলাইল না, একজন রাজ্যপাল+৫ জন সলাকর—ইহার উপর তদারকা করিবার জন্য দশ বারো গণ্ডা সংসদ সদস্য দ্বারা গঠিত হইল একটি সুপার পরামর্শসভা এবং এই সভার মোড়লী করিতেছেন জনৈক সি, পি আই সংসদ সদস্য এবং ইঁহার মতামতই ইন্দিরা-গ্রাহ্য হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ লইয়া এ-প্রশাসনিক প্রহসন কেন? নামেই রাষ্ট্রপতির শাসন, বাস্তবে পশ্চিমবঙ্গ আজ ইন্দিরার রাজনৈতিক খেলার পুতুল মাত্র। বেচারা রাষ্ট্রপতিও আজ উহার অসহায় দর্শকমাত্র!

আমাদের রাজ্যপাল নির্ভীক এবং পরম সাহসী, ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আনন্দ বাজারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, কিছু দিন পূর্বে সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর শুনলাম রাইটার্স বিল্ডিংসে। বেশ কয়েকদিন পরে মহাকরণে গিয়েছি। কয়েকজন পরিচিত ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, মহামান্য রাজ্যপালের খবর কি? তার খবর শুনে তো আমি তাজ্জব—রাজ্যপাল আজ ভয়ে রাইটারস বিলডিংসে, আসেন নি রাজভবন থেকে সকালেই বার কয়েক ফোন এসেছিল রাইটারসে. সামনে বিক্ষোভকারীরা আছে কি? জবাব গেল হ্যাঁ আছে। রাজ্যপাল তারপরই সিদ্ধান্ত নেন, না, ওখানেগিয়ে কাজ নেই—আবার কি হাঙ্গামা হয়!

বিক্ষোভকারীদের ভয়ে রাজ্যপাল তাঁহার কর্তব্য পালনের জন্য শত কাজ থাকা সত্ত্বেও মহাকরণে আসিতে সাহস পাইলেন না। এমন কথা পৃথিবীর অন্য কোথায় কেহ শুনিয়াছেন কি? তা জানি না। না শুনিবারই কথা, কারণ একজন মহামান্য এবং সর্বশক্তিধর গভর্নর, কয়েকশত নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীর ভয়ে নিজেকে তাঁহার প্যালেসে 'অন্তরীণ' করিয়া রাখিবেন, এমন ঘটনা পৃথিবীতে অন্য সভ্যদেশে এখনো ঘটে নাই। এমন কি ভারতের অন্য কোন রাজ্যেও নয়।

তবে শ্রী ধাওয়ান একেবারে গুণহীন বর্ণহীন নহেন। তিনি ধাবন বিষয়ে অতি তৎপর, অগ্র বা পশ্চাৎ যখন যে দিকে প্রয়োজন এবং সুবিধা!

গভর্নর ইংরেজী শব্দটির একটি অর্থ হইতেছে, governor (1) Automatic regulator of supply of gas, steam, water etc to machine ensuring even motion (2) Kind of fishing fly

(Oxford Concise Dictionary 4th ed, p 522)

আমাদের গভর্নরের পক্ষে কোন্ অর্থ যথাযথ হইবে, তাহা জনগণ নিজেদের বিচারবুদ্ধিমত স্থির করিবেন।

সরকারী কর্ম্মচারীদের বদলী

বিশেষ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের এক জেলা হইতে অন্যত্র বদলী করা হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে মার্ক্সীয় বীর প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নির্দেশমতই কাজ করেন, তাঁহাদের অপরাধ কোথায়? ঠিক কথা, জ্যোতিবাবু এখনও বোধ হয় মনে করিতে পারিতেছেন না যে তিনি আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর গদীতে নাই, এবং বর্তমান সরকারের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রশাসনিক ব্যাপারে তাহার নাসিকা প্রবেশ করাইবার কোন অধিকারও নাই, করিলে তাহা কেবল অন্যায় নহে—বেয়াদবীও হইবে।

বলতে পারি না, শ্রী ধাওয়ান এবং তাঁহার 'পঞ্চ-শীল' পরামর্শ সমিতি এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা লইবেন। রাজ্যপালকে যতটা জানি, তাহাতে তিনি হয়ত জ্যোতি বসুর প্রতিবাদ হাসিমুখে "তথাস্তু" বলিবেন, এবং বদলীর আদেশও রদ করা হইবে, হয়ত ইতিমধ্যে হইয়া গিয়া থাকিবে। অনেক বিষয়েই শ্রী ধাওয়ান জ্যোতিবাবুর নির্দেশিত পথেই ধাবন করিতেছেন!

রাষ্ট্রপতির ওড়িষা সফর

আমাদের রাষ্ট্রপতি শ্রী গিরি মহাশয় কয়েকদিনের ওড়িষা সফরে গিয়াছিলেন কিছু দিন পূর্বে। বলা বাহুল্য তাঁহার সকল ভ্রমণ ব্যয় (দলবল সহ) আমাদেরই বহন করিতে হয় এবং ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক বিভাগের কিছু করিবার নাই। ইহা অতি উত্তম ব্যবস্থা বলিতে হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের অন্য একটি বক্তব্য আছে।

রাষ্ট্রপতি সমগ্র ভারতের এবং নিজেকে তিনি সকল রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রতিনিধি মনে করিবেন। কোন রাজ্যের কোন দাবী-দাওয়া সম্পর্কে নিজেকে কোন এক পক্ষের হইয়া কোন মতামত প্রকাশ এবং বিশেষ দাবী সম্পর্কে বিশেষ কোন রাজ্যের পক্ষে গদগদ হইয়া সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনগণের মনোরঞ্জনকারী কোন কথা বলিবেন না। সাধারণতঃ আমরা এই মত পোষণ করি। কিন্তু ওড়িষা সফরকালে রাষ্ট্রপতির ভাষণ যুক্তি-যুক্ত হয় নাই বলিয়া মনে করিয়াছেন। ওড়িষা একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের দাবী করিয়াছে এবং ঐ দাবী যে অতি উত্তম এবং কেন্দ্র সরকারের বিশেষ বিবেচনার অবকাশ রাখে' শ্রী গিরি তাঁহার মূল্যবান ভাষণে এমন কথাও বলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। রাষ্ট্রপতি এমন কথাও বলিয়াছেন, যেহেতু তিনি ঐ রাজ্যের ঐ দাবীর সম্পর্কে হস্তিনাপুরে গিয়া জোর তদবীরও চালাইবেন। কারণ তিনি ওড়িষার সর্বাঙ্গিক উন্নতি কিসে হয় তাহা দেখা তাঁহার বিশেষ কর্তব্য বলিয়া মনে করেন।

ওড়িষায় ইস্পাত কারখানা হইবে কি না তাহা একান্তভাবে নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধান মন্ত্রীর উপর এবং আমরা ইহাও জানি যে দাবী প্রবল হইলে এবং সেই সঙ্গে ওড়িষাবাসীরা রাজ্যব্যাপী গণবিক্ষোভের হুমকী দিলে পরম চাপনিষ্ঠ কেন্দ্র সরকার তাহা মানিয়া লইতে দ্বিধা করিবে না। ইহার প্রমাণ দক্ষিণ ভারতে তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কেন্দ্রীয় স্বীকৃতিতে মিলিবে। রাষ্ট্রপতি মহাশয় ওড়িষার দাবী সমর্থনের দ্বারা নিজেকে পক্ষপাতদুষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রপতির ওড়িষার দাবী সমর্থনে প্রধান মন্ত্রী এবং অন্য দু-একজন মন্ত্রীও রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার ভাষণের সত্যাসত্য বিষয়ে প্রশ্ন

করেন, সেই সময় শ্রী গিরি কিঞ্চিৎ আমতা আমতা করিয়া বলেন যে, তিনি সাধারণভাবে কথাটা বলেন এবং একটা সাধারণ কথার উপর এত গুরুত্ব দিবার এমন কি প্রয়োজন আছে ?

প্রসঙ্গক্রমে বিদেশ ভ্রমণান্তে রাষ্ট্রপতি যখন দিল্লীর বিমান বন্দরে অবতরণ করেন, সেই সময় তাঁহার বিমানে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বিনা বাধায় কাষ্টমস বেড়া পার হইয়া গেলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির দলের দ্বিতীয় বিমানের যাত্রীরা নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি আনার জন্য ধরা পড়িলেন। শত কাতর নিবেদনেও হৃদয়হীন কাষ্টমস কর্মচারীরা রাষ্ট্রপতির সহ-যাত্রীর দ্বিতীয় দলটিকে রেহাই দিলেন না! সংবাদ পাইয়া রাষ্ট্রপতি ব্যাপারটির পূর্ণ বিবরণ তলব করেন। কিন্তু তাহার পর কি ঘটিল, তাহা এখনো প্রকাশ পায় নাই। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত নেহেরুর আমলে অনুরূপ ব্যাপার ঘটে, কিন্তু হৃদয়বান নেহেরু আটক সঙ্গীদের সমস্ত মালপত্র নিজের বলিয়া ঘোষণা করিয়া এক কথাতেই কাষ্টমস কর্মচারীদের ঠাণ্ডা করিয়া দেন।

বিদেশ ভ্রমণে যাইবার সময় সঙ্গে এক রেজিমেন্ট সরকারী স্নেহভাজন কর্মচারী লইবার কি প্রয়োজন ছিল? তাহা আমাদের মত মূর্খের দল বুঝিবে না। এখানেও সেই গৌরী সেন মহাশয়ের ধনভাণ্ডার রাষ্ট্রপতির খেয়ালখুশীর খেসারত দিল!

প্রধান মন্ত্রীর লাটিন আমেরিকা পরিভ্রমণে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহাও গরীব দেশের নিরন্ন গরীব করদাতাদেরই দিতে হয়। অথচ এই প্রকার 'রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায়' ভ্রমণে হতভাগ্য ভারত রাষ্ট্রের কি মর্য্যাদা এবং ফললাভ হইল, তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিবে কি? সরকারী ভাবে হয়ত বলা হইবে যে, এখন মাত্র বীজ বপন করা হইল, যথা সময়ে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ গজাইবে এবং সেই বৃক্ষ আবার যথাকালে ফল প্রসব করিবে এবং আমরা কিংবা আমাদের উত্তরাধিকারী তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষ সেই অমৃত ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া মানবজীবন ধন্য করিবে। তবে এই সময় সব কিছুই একটা বৃহৎ "যদি" নির্ভর।

সাবধান

রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা এবং আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মান্যবর শ্রীজ্যোতি বসুর অনুমতি লইবেন। শ্রীঅজয় মুখার্জি রাজ্যপালের সহিত কিছুদিন পূর্ব্বে ঘন ঘন দেখা করেন। এই দেখাসাক্ষাৎ শ্রীজ্যোতির মতে অপরাধজনক এবং মাইনরিটি সরকার গঠনের অপচেষ্টা মাত্র। অবশ্য জ্যোতিবাবু এই প্রকার কিছু করিলে, তাহা অবশ্যই ন্যায়সংগত হইবে এবং বাঙ্গালার জনগণকে তাহাতে পূর্ণ সম্মতি দিতে হইবে। গণপতির পক্ষে সবই শোভা পায়।

কংগ্রেসের নীতি

একটি সংবাদে জানা গেল যে ভোলানাথ শ্রীজগজীবন মস্তকে দুইটি মুকুট পরিয়া থাকিলে, কাহারও পক্ষে প্রশ্ন করিবার কিছু থাকিতে পারে না। দ্বিমুকুটধারী একাধারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং কংগ্রেস (R) সভাপতি —কি মোহনদর্শন মূর্ত্তি! কিন্তু আরো আছে।

শ্রীভোলানাথ জগজীবন বলিয়াছেন, তাঁহার কংগ্রেস ত্যাগ করার কোন প্রশ্নই উঠে না—গত ৪০ বৎসর ধরিয়া তিনিই কংগ্রেসের নীতি নির্দ্ধারণ করিতেছেন। অর্থাৎ কংগ্রেসের জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ সবই করিতেছেন। নিঃসন্দেহে পাকা হাত। এ-তথ্যটা এতদিন কেহ জানিতে পারে নাই এবং ইহার কারণ ভোলানাথ এ-কথাটা এতদিন ভুলিয়া ছিলেন। এই মহাশয় ব্যক্তি বয়স এখন ৬৫, তাহা হইলে হিসাবে দাঁড়ায় যে তিনি তাঁহার ২৫ বৎসর বয়স হইতেই কংগ্রেসের নীতি-নির্দ্ধারক পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

আমরা আশাকরি প্রতিরক্ষা কাজে শ্রীজগজীবন হঠাৎ চীন, ইন্দোনেশিয়া বা জাপান আক্রমণ করিয়া ফেলিবেন না। ভোলামনে বহু কিছু করা সম্ভব।

দেশ-বিদেশের কথা

শুভ-সংবাদ

এলাহাবাদ হইতে আনন্দবাজারের নিজস্ব প্রতিনিধি লিখিতেছেন: বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যে-কতকগুলো ধর্মীয় প্রথা ও আচার আচরণ বহুদিন ধরে চলে আসছে, তার যুগোচিত সংস্কারের চেষ্টা বহুদিন হয়নি। একশো দেড়শো বছর আগে যে-সব সামাজিক অনুষ্ঠান অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত ছিল এখন পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় তা অনেক সময় বিড়ম্বনা বলে মনে হয়। বাংলাদেশে এখন নানা ডামাডোলের মধ্যে এ নিয়ে বিশেষ কারুর মাথা ঘামাবার সময় নেই, কিন্তু এলাহাবাদের প্রবাসী বাঙালী সমাজ সমবেত-ভাবে কয়েকটি সংস্কার প্রস্তাব নিয়েছেন। তাঁদের প্রস্তাবগুলি এই রকম:

বিয়ে, অন্নপ্রাশন, সাধ ভক্ষণ, উপনয়ন ও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কোনো রকম ভোজের ব্যবস্থা সমাজবিরুদ্ধ কাজ বলে গণ্য হবে। চা-কফি বা সরবৎ দিয়ে আপ্যায়ন করাই যথেষ্ট।

প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসাই এখনকার সামাজিক প্রথা। আজকাল এটা অনেক সময়ই খুব অসুবিধাজনক হয়। সেইজন্য এঁরা প্রস্তাব করেছেন, নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট।

এরা আরও প্রস্তাব নিয়েছেন যে এই সব সামাজিক উৎসবে উপহার দেওয়া বা নেওয়া অবাঞ্ছনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় উপহার দেবার বাধ্য-বাধকতার জন্য অনেক সময়ই অপ্রীতিকর অবস্থা হয় ভেতরে ভেতরে।

এলাহাবাদের কালী বাড়িতে অল্প খরচে বিয়ে অন্নপ্রাশন পৈতে ও শ্রাদ্ধের ব্যবস্থাও এঁরা করছেন।

এলাহাবাদে এবং অন্যান্য শহরে এই সংস্কার নির্দেশ প্রচার করার জন্য এঁরা একটি বাঙালী সমিতিও স্থাপন করছেন।

বাঙলার বাহিরে আছেন বলিয়াই হয়ত প্রবাসী বাঙালীদের সমাজসচেতনতা এবং সামাজিক কল্যাণ-বোধ এখনো লুপ্ত হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গে আমরা বাঙালীরা গণবিক্ষোভ, গণদাবি, 'গণতন্ত্র' রক্ষা এবং অন্যান্য বহু প্রকার 'গণভিত্তিক' আন্দোলন এবং সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং জন-নিরাপত্তা বিনষ্টকারী কার্যকলাপেই সদাসর্ব্বদা কালহরণ করিতেছি। আমরা সকলেই 'গণকে' লইয়া অতি ব্যস্ত এবং সেই কারণে যাহাদের লইয়া 'গণ' সেই 'জনের' (বা ব্যক্তির) প্রতি জনের তথা সমাজের কল্যাণ অকল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দিবার সময় কোথায়? জনকে বাদ দিয়া, জন-কল্যাণ অবহেলা করিয়া কখনও সুস্থ সবল সমাজ গঠিত হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় আমাদের তথাকথিত 'গণ'-পতিরা এককভাবে জনের প্রতি দৃষ্টি দিবার কোন প্রয়োজনবোধ করেন না। তাঁহাদের কারবার দল লইয়া এবং এই দলকে উত্তেজিত করিয়া, বৃথা অবাস্তব আশার মোহে প্রলুব্ধ এবং বিভ্রান্ত করিয়া নিজেদের এবং দলের স্বার্থসাধনে তৎপর, যে-জনদের লইয়া দল গঠিত সেই জন বা ব্যক্তির ভাল মন্দ, তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ কিসে এবং কোন পথে, তাহা গণপতিদের বিবেচনার বিষয় কখনও হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীসমাজ বিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে এখ ও হাজারো রকমের কুসংস্কার কু-সমাজপ্রথা এবং সামাজিক অত্যাচারে জর্জরিত, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন গণপতি মহারাজকে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সামান্য একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতেও শুনি নাই। গণপতিদের অনেকে এখনো পুত্রের বিবাহে নাক ঘুরাইয়া পণ গ্রহণ করেন, স্বার্থের খাতিরে সামাজিক কুসংস্কার বহুকিছু সমর্থন করেন, এবং ইহারাই "মালিকের" অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ভীম-গর্জ্জনে মেদিনী প্রকম্পিত করেন। অর্দ্ধ কিংবা অশিক্ষিত মানুষের কাছে ইহার বেশী আশা করা অন্যায়। যাক—

এলাহাবাদের প্রবাসী বাঙালীদের শুভ প্রচেষ্টার সামান্য অনুকরণ যদি আমরা করিতে পারি, রাজ্যের মঙ্গল হইবে। কিন্তু সময় হইবে কি?

রাষ্ট্রপতির একটি 'পরম' উপদেশ

আমাদের পরম বিজ্ঞ রাষ্ট্রপতি দেশের ডাক্তারদের উপদেশ দিয়াছেন Exploit the rich and help the poor ধনীদের নিকট হইতে যতপার কানমলিয়া আদায় কর এবং গরীবদের সাহায্য কর। রাষ্ট্রপতির হঠাৎ এ-উপদেশ দিবার এমনকি গুরুতর কারণ ঘটিল জানি না। কিন্তু একথা জানি যে চিকিৎসকেরা, বিশেষ করিয়া নামকরা চিকিৎসকেরা সকলেই, রোগীর নিকট হইতে একটা নির্দিষ্ট ফি বা দক্ষিণা গ্রহণ করেন, ফি-এর মাত্রা এইরকম হইয়া থাকে-১৩২, ৬৪, ৩২ ২৪, ১৬, ৮ এবং ৪ টাকা। প্রথম তিনটি অর্থাৎ ১৩২, ৬৪ এবং ৩২টাকা নামকরা অভিজ্ঞ ডাক্তারেরাই গ্রহণ করেন. পরের ফি গুলি অপেক্ষাকৃত কম খ্যাতিমান এবং নূতন ডাক্তারেরা দাবি করিয়া থাকেন। ডাক্তারকে কল্ দিবার সময় রোগীর বাড়ীর লোকেরা সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের ফি সম্পর্কে অবহিত থাকেন, কাজেই এখানে রোগীকে

exploit করার কোন প্রশ্ন থাকিতে পারে না। এমন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে ব্যক্তিগত ভাবে জানি, যাঁহারা বহু ক্ষেত্রে বিনা ফি অথবা কম ফি লইয়া রোগী দেখিয়া থাকেন।

'Exploit' কথাটা সর্ব্বক্ষেত্রে সমান অর্থে প্রয়োগ করা যায় না। শিল্প, বাণিজ্য, ক্রেতা-বিক্রেতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে Exploit কথাটা ভাল অর্থে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। তবে আমাদের দীনদরদী রাষ্ট্রপতি একজন পুরাতন এবং অভিজ্ঞ ট্রেড্ ইউনিয়ন লিডার ছিলেন কিছুদিন পূর্ব্বেও, কাজেই exploit কথাটাকে exploit করা তাঁহার পক্ষে হাড়মজ্জার সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। গরীবদের দয়া করিবার সময় হাসপাতালের ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মীদের নির্ম্মম 'exploitation' বন্ধ করিবার বিষয় কোন কথা বলার প্রয়োজনবোধ তিনি করিলেন না কেন? আজ পশ্চিমবঙ্গে সরকারী বেসরকারী প্রায় সকল হাসপাতালেই ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মীদের অত্যাচার অনাচারের ফলে বহু হাসপাতাল প্রায় বন্ধ হইবার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, রাষ্ট্রপতি একথা জানেন কি! জানিলেও ট্রেড্ ইউনিয়ন লিডারদের অভ্যাসমত, শত অপরাধ করিলেও কোনক্ষেত্রেই শ্রমিকদের তিনি কোন দোষ দেখেন না, দেখিলেও মুখ বন্ধ করিয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করিয়াছেন।

স্বপ্ন লোকের রাজকুমার : শ্রীভোলানাথ মিত্র, বর্ণালী, পি-১০ রিজেন্ট পার্ক কলিকাতা-৪০ মূল্য চার টাকা।

গ্রন্থকার এ বইখানি রূপকথাচ্ছলে বর্ত্তমান শোষণনীতি ও পেষণনীতির যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অভিনব। অবশ্য এই দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করিতে তাঁহাকে রূপকের আশ্রয়ও লইতে হইয়াছে।

গল্পের নায়ক আলোককুমার এই শোষণনীতির অর্গল ভাঙিবার জন্য জয়যাত্রায় বাহির হইল। এ সাধনা—যে-সাধনা মানুষকে যুগে যুগে শক্তি যোগাইয়াছে। এক মানুষ পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, আর এক মানুষ প্রাচুর্যের বিলাসে ডুবিয়া আছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, তাহারা দৈত্য। এই দৈত্যের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিতে আসিয়াছে আলোককুমার।

এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আলোককুমার দৈত্যের সেই শোষণযন্ত্র বিকল করিয়া দিল। কিন্তু কেবল যন্ত্র বিকল করিলেই তো হইল না, জগতে মানুষ কোথায়? যাহার একমাত্র ধর্ম মনুষ্যত্ব? এই মানুষের সন্ধানেই আলোককুমার বাহির হইল। সে বুঝিয়াছিল, 'শক্তি-খড়্গে দৈত্যের বিনাশ হয় না। শক্তি-খড়্গে দৈত্যের বাহুবল শুধু পরাস্ত হয়। মানুষের মধ্যে একমাত্র যদি মহামানবকে জাগ্রত করতে পার, তা হলেই দৈত্যের ছলনা পরাস্ত হবে।

সেই মহামানবকে জাগ্রত করিবার সাধনায় আলোককুমার নিজেকে নিয়োজিত করিল। এ সাধনা শুধু আলোককুমারের নয়—এই সাধনাই আজ প্রত্যেক মানুষের। যে অনাচার, যে অত্যাচার আজ পৃথিবী জুড়িয়া চলিয়াছে তাহার প্রতিরোধ করিতে এই মানুষই পারিবে। সে মানুষ আজ কতদূরে—কে জানে!

গ্রন্থকারের লেখনী সার্থক হইয়াছে। সকলেরই এ-বই ভাল লাগিবে বলিয়া বিশ্বাস রাখি।

গৌতম সেন

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭০তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৭৭

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আমাদের রাষ্ট্রীয় অবস্থা

আমরা বহুবার বলিয়াছি যে ভারত সরকার অথবা বিভিন্ন প্রদেশের শাসকদিগের জনসেবা কার্য্য বিশেষ কোন আদর্শের অনুসরণ করে না। যাহা না করিলে নয় সেইটুকুমাত্রই কোন প্রকারে বেগারঠেলা ভাবে করিবার চেষ্টা করিয়া অনেকগুলি প্রচারপত্র বা রিপোর্ট প্রকাশ করিয়া সরকারী কর্তব্য শেষ করাই হইল স্বাধীন ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনার নব্য রীতি। সরকারী সকল ব্যবস্থাই পুরাকালের সাম্রাজ্যবাদের কায়দা কানুন অবলম্বনে এখনও চলিতেছে এবং ইহার কারণ যাঁহারা দেশবাসীর নামে বৃটিশের নিকট হইতে শাসন ভার নিজেদের হস্তে লইয়াছিলেন তাঁহাদিগের কোন নূতন আদর্শে শাসন পরিচালনা ব্যবস্থা করিবার বুদ্ধি ও সামর্থ্যের অভাব। "ফাইল" ও "প্রোসিডিওর" বর্ণনার উপরে যেখানে বৃটিশ সিংহ ও শৃঙ্গধারী অশ্ব অঙ্কিত থাকিত, সেখানে এখন অশোকের ধর্ম্মচক্র অথবা অশোক স্তম্ভের শীর্ষাংশ আঁকা হইলেই কিছু নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় না। আই সি এস দিগের হুকুম একই রকমের রহিল শুধু কেহ তাঁহাদের আদেশ নির্দ্দেশ তেমন নিষ্ঠার সহিত শুনিল না—মানিল না; এই ঢিলা ও যথেচ্ছাচারী কর্ম্মপদ্ধতি কোন নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। আর নূতন শাসনের আবহাওয়াতে যদি সকল দেশবাসীর অভাব অভিযোগের নিবৃত্তি হইত তাহা হইলেও না হয় বুঝা যাইত যে স্বাধীনতা দাসত্ব অপেক্ষা অধিক উপভোগ্য ও আনন্দ বর্দ্ধন কারক। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে উপভোগের দ্রব্য সম্ভার কোন বিপুল বন্যায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে না, বরঞ্চ রাজস্ব ও মূল্য বৃদ্ধির চাপে পূর্ব্বে যে অবস্থায় মানুষ জীবনে যেটুকু সম্ভোগ-প্রাচুর্য্য আনয়ন করিতে সক্ষম হইত, এখন তাহারা শুধু একান্ত

আবশ্যক জীবন ধারণের মূল উপাদান ব্যতীত প্রায় আর কিছুই ক্রয় করিতে পারে না। পূর্ব্বে মানুষ ট্রাম-বাসে মোটামুটি গা ছেলাইয়া যাতায়াত করিতে পারিত; এখন সেইখানে তাহারা সহযাত্রীদিগের চাপে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পরিবাহিত হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশের মধ্যবিত্ত গৃহের মহিলাগণ যেরূপ তাঁতের বস্ত্র পরিতেন এখন তাঁহারা গজ হিসাবে ক্রয় করা কাটা কাপড় পরিতেছেন। আসল রেশম, গিণি সোনার গহণা, শেগুন কাষ্ঠের আসবাব প্রভৃতি প্রায় অদৃশ্য এবং তৎস্থলে কৃত্রিম রেশম, ৯ হইতে ১২ ক্যারেট সোনা ও মাল পাঠাইবার বাক্সের কাষ্ঠের চেয়ার টেবিলই সকলে পাইয়া থাকে। উপরন্তু বাড়ীর মেয়েরা আফিসে চাকুরী করিতে বাধ্য হইতেছেন; নয়ত পঞ্চাশ হইতে একশত টাকা মণের চাউল, ১২ টাকা কিলো মৎস্যের সূক্ষ্ম অংশ, ৬ টাকা সের দধি বা ১৬।১৭ টাকা সের সন্দেশ কেহ চোখে দেখিতেও পাইতে সক্ষম হয় না। পূর্ব্বে যেরূপ বেতন পাইয়া মানুষ যেভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিত এবং সামাজিক কারণে ব্যয় করিত কিম্বা সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইত এখন সেরূপ আয় হইলে প্রথমতঃ পূর্ব্বের তুলনায় দুই তিন গুণ টাকা আয়কর হিসাবে কাটিয়া লওয়া হয়। তৎপরে যাহা থাকে তাহার প্রত্যেকটি পয়সা দিয়া কোন কিছু ক্রয় করিতে হইলে বস্তুমূল্যের সহিত এই ট্যাক্স্ ঐ ট্যাক্স্ জুড়িয়া এক পয়সার জিনিস তিন পয়সায় ক্রয় করিতে হয়। আগের তুলনায় মূল্য বৃদ্ধি এই হিসাবের অন্তর্গত নহে। আগে যে চা ২॥৹ পাউণ্ড পাওয়া যাইত এখন তাহা ১২৲ কিম্বা ১৪৲ পাউণ্ড হইয়াছে। চার আনার সাবান হইয়াছে ১।৹, চার আনার চিনি হইয়াছে ২৲, দুই পয়সার পেন্সিল এখন বিক্রয় হয় আট আনায় ও চার পয়সার খাতার দাম হইয়াছে আট আনা। পূর্ব্বে একখানা ভাল উপন্যাস উত্তম কাগজে ছাপা ও সুদৃশ্যভাবে বাঁধান হইলে তাহার মূল্য যদি ২৲ টাকা হইত এখন হয় ১০॥৹। ৫৲ টাকার ঘড়ি হইয়াছে ৪৫৲; ৫৲ টাকার সার্ট হইয়াছে ২৭৲ টাকা, ৷৹ আনার গেঞ্জি হইয়াছে ৪৲ টাকা এবং ৮৲ টাকা জোড়া জুতা ক্রয় করিতে লাগে ৪০৲। যাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিবার মত রোজগার করে তাহাদিগের প্রতি তলার প্রতি বর্গফুট গৃহ নির্ম্মাণের খরচ দাঁড়াইয়াছে ৩০৲; পূর্ব্বে ছিল ৫৲। রেলভাড়া, বাড়ীভাড়া, ডাক মাশুল প্রভৃতির কথা না বলিলেই ভাল। সকল দিক দিয়াই রাজকর বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু রাজকার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহু অধিক অক্ষমতা দোষদুষ্ট হইয়াছে। মানুষের ব্যক্তিগত বা বৈষয়িক নিরাপত্তা খুবই হ্রাস হইয়াছে; আদালতে যাইলে কোন কিছুর বিচার হইতে এত সময় লাগে যে অভিযোগকারীর মাথার চুল পাকিয়া সাদা হইয়া যাইলেও প্রায় বাহির হয় না। যে সকল কাজ কারবার রাষ্ট্রীয় করা হইয়াছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইলে মানুষের জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠে।

মানুষের পক্ষে সরকারী বিধিব্যবস্থার আটঘাট বাঁচাইয়া কোন কার্য্য করাই মহা কঠিন হইয়াছে। যন্ত্র, উপকরণ প্রভৃতি যদি বিদেশের আমদানী বন্ধ হয় তাহা হইলে ঐরূপ কারবার চলিতে পারিবে না বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। স্বদেশে উৎপাদিত মাল মশলাই যে পাওয়া যাইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই। যাহাই পরিমাণে অল্প পাওয়া যায় তাহাই প্রথমে সরকারী চাহিদা পুরাইয়া তৎপরে জনসাধারণ পাইতে পারে। শুধু কারবারের কথা নহে, প্রাণ বাঁচাইবার ঔষধ হইলেও সরকারী কড়াকড়ির প্রাকার অতিক্রম করিয়া তাহা ভারতে প্রবেশ করিতে পারে না। শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন; সরকারের পছন্দমত বিষয় শিক্ষা যদি না হয় তাহা হইলে গমন অসম্ভব হইবে। অর্থাৎ ভারতবাসীগণ প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অর্থ হইয়াছে আমলাতন্ত্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ব্যতীত কোনওভাবে কাহারও সুখ সুবিধার কোন ব্যবস্থা হইবে না। আমলাগণ অবশ্য শক্তিমান রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে খুসী করিয়া চলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের নিজেদের লাভ ও সুবিধা বুঝিয়া চলার উপরে যদি অন্য কাহারও কোন

প্রয়োজন সিদ্ধি স্বাধীন ভারতে হইতে পারিয়াছে তাহা হইল রাষ্ট্রীয় দলগুলির নেতা ও তাহাদের প্রধান অনুচরদিগের। জনসাধারণ শুধু রাজস্ব মিটাইয়া এবং শাসকদিগের খামখেয়ালি রীতি পদ্ধতির ধাক্কা সামলাইয়া দিন কাটাইয়া থাকেন। যাহারা অতি গরীব ও নগণ্য তাহারা সকল দিক দিয়া এতই তুচ্ছ যে তাহাদিগের কথা আলোচনা না করাই বিধেয়। যে মানুষের আজকালকার দিনে বাৎসরিক আয় ১০০৲ শত টাকা সে যে কি খায় কি পরে বা কিভাবে থাকে সে কথা আমরাকল্পনাও করিতে পারি না। মাঝে মাঝে শুনি ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণ দারিদ্র্যের উপর যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন এবং এমন ব্যবস্থা করিবেন সংকল্প করিতেছেন যে মানুষে মানুষে আর্থিক আয়ের পার্থক্য বর্ত্তমানের মত অধিক যাহাতে আর না থাকে তাহাই করিয়া পূর্ণতর সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কিন্তু বাৎসরিক দশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার বা পাঁচ লক্ষ টাকা আয় হয়ত দুই লক্ষ লোকের আছে এবং দশ কোটি লোকের বাৎসরিক আয় ২০০৲ শত হইতে ৫০০৲ শতের মধ্যে এই দশ কোটি মানুষকে যদি অন্ততঃ বাৎসরিক ১০০০৲ হাজার টাকা পাওয়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হয় তাহা হইলে সেই আয়োজনের আর্থিক মূল্য দাঁড়াইবে ৬০০০।৭০০০ হাজার কোটি টাকায়। ঐশ্বর্য্যশালী দুই লক্ষ মানুষের যদি মাথাপিছু আয় বাৎসরিক ৩০,০০০৲ টাকা হয় তাহা হইলে তাহাদিগের সকলের মিলিত আয় হইবে ৩০০০০ × ২০০০০০ = ৬০০০০০০০০০ বা ছয় শত কোটি টাকা। ঐ সমস্ত টাকা কাড়িয়া লইয়া যদি দশ কোটি অতি গরীব ব্যক্তিদের ভিতরে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা মাথাপিছু পাইবে ৬০৲ ষাট টাকা করিয়া বৎসরে অর্থাৎ মাসিক ৫৲ টাকা। ইহা যদি করা যায় তাহা হইলে দারিদ্র্যের উপর যুদ্ধটা একটা প্রহসন মাত্র হইবে। তাহা হইলে সত্য সত্যই যদি দারিদ্র্যহীন ভারত গঠন করিতে হয় সে কার্য্যের জন্য প্রয়োজন হইবে নূতন ঐশ্বর্য্য উৎপাদন। যাহা আছে তাহার ভাগবাট অদল বদল করিয়া, কাহারও টাকা কাড়িয়া অপর কাহাকেও দিয়া ঐ তথাকথিত দারিদ্র্য ধ্বংসকারী মহাযুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব হইবে না।

ভারতবর্ষে শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকের অভাব নাই কিন্তু ভারতের সকল রাষ্ট্রনেতাই এত অধিক অবান্তর ও অর্বাচীন কথা বলিয়া সময় নষ্ট করেন যে তাঁহাদিগের দ্বারা কোনও গঠনমূলক কার্য্য আর হওয়া সম্ভব হয় না।

বিপ্লব, বিদ্রোহ না শুধু উপদ্রব ?

বাঙ্গলাদেশে একটা বিপ্লব চলিতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আবার অনেকে বলেন যে উদ্দেশ্যহীন মারপিঠ বোমা বর্ষণ পুস্তক আসবাব চিত্রাদি ধ্বংস করাকে বিপ্লব বলা উচিত নহে; উহা শুধু প্রবল অসন্তোষ প্রকাশের উদ্দাম প্রয়াস। প্রথমতঃ কোন ক্ষুদ্রদলের অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মতলব অথবা সত্য আবেগজাত কার্য্য কলাপকে বিপ্লব বলা যায় না। বাঙ্গলাদেশের চার কোটি মানুষের যদি শতকরা দশ জনও বর্ত্তমান গোলযোগে সংযুক্ত হইত তাহা হইলে চল্লিশ লক্ষ বিপ্লবী দেখা যাইত। কিন্তু যাহারা বোমা নিক্ষেপ করে, পরস্পরকে ছুরি ছোরা মারে বা অন্য প্রকার হাঙ্গামা করে তাহারা ঐ চার কোটির মধ্যে সংখ্যায় শতকরা একজনও নহে। কারণ তাহারা চার লক্ষ নহে সম্ভবতঃ এক লক্ষও নহে। সুতরাং এই পাইপ বন্দুক, বোমা, অ্যাসিডের বোতল অথবা ইট পাটকেল সোডার বোতল লইয়া যুদ্ধকে ঠিক বিপ্লব বলা চলে না। উহা কি তাহা হইলে ? বিদ্রোহ ? বিদ্রোহ হইলে ঐ সকল ব্যক্তিগণ জাতীয় নেতাদিগের চিত্র অথবা তাহাদের লিখিত পুস্তক নষ্ট করে কেন ? তাহা ব্যতীত বিদ্রোহটা যে স্কুল কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতির উপর করা হইতেছে তাহারই বা কারণ কি ? বিদ্রোহ সাধারণতঃ রাজশক্তির বিরুদ্ধেই হইয়া থাকে এবং বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদ ও রাজার সৈন্য সামন্তের উপরই আক্রমণ করে। জনসাধারণের উপর কোন

উৎপাত করে না। কারণ বিদ্রোহ সফল করিতে হইলে জনসাধারণের সহানুভূতি পাওয়া আবশ্যক হয়। পূর্ব্ব-কালের নেতাদিগের উপর ঘৃণা প্রকাশ করিলে সে সহানুভূতি পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। স্কুলের কলেজের পুস্তকাগার ধ্বংস করাও বিদ্রোহ অথবা বিপ্লবের লক্ষণ বলিয়া বিচার করা যাইতে পারে না।

যখন এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারীগণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন অনেক সময় তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করে। বহু খুন জখমের বর্ণনা হইতেও দেখা যায় যে তাহারা রাজশক্তির উপর বা সমাজের নেতাদিগের উপর কোন আক্রমণ না করিয়া নিজেদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী-দিগের উপর বোমাবর্ষণ করিতেছে। ইহাকে "গ্যাংওয়ার" অথবা নানা দলভুক্ত লোকের পারস্পারিক আক্রমণ বলা যায় কিম্বা ইহা মল্লবীরদের আখড়া আখড়ায় লড়াই-এর সহিত তুলনীয়। গ্যাং বা দল অথবা আখড়াগুলি কি ও তাহাদিগের বন্ধুত্ব নাই কেন এ প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি না।

কেহ কেহ বলেন এই সকল যোদ্ধাগণ চীনদেশের নেতা মাও সে তুঙ্গের ভক্ত ও ইহারা ঐ চীনদেশীয় নেতার নির্দ্দেশ মানিয়া চলে। কিন্তু চীনদেশীয় কোন মহাশক্তিশালী নেতা অযথা কিছু সংখ্যক ছাত্রদিগকে কেন পুস্তকের আলমারি ভাঙ্গিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ ছিঁড়িয়া ফেলিতে বলিবেন এ-কথা এতই অসম্ভব রকমে অযৌক্তিক যে উহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। হইতে পারে কোন কোন কলেজের ছাত্রগণ মাও সে তুঙ্গকে ভক্তি করে; কিন্তু সেই জন্য তাহারা বিবেকা-নন্দের মূর্ত্তির উপর আলকাতরা লাগাইবে কেন কেহ বলিতে পারে কি? মাও-ৎ-সে-তুঙ্গ কলেজের ছাত্র-দিগকে রসায়নাগার হইতে অ্যাসিড় অপহরণ করিতে বলিয়াছেন একথাও বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং যাহারা বোমা ছুঁড়িতেছে তাহারা চীনের পঞ্চম বাহিনীর লোক হইতে পারে না। বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ঠিক কোন চীন-ভারত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাভাষ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। বরঞ্চ রাজনৈতিক আবহাওয়া আগেকার তুলনায় এখন ভালই মনে হয়।

তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এখন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতেছে তাহা বিপ্লব বা বিদ্রোহ নহে, শুধু গ্যাংওয়ার ও তৎসঙ্গে জড়িত আইন সমাজ রীতি নীতি অমান্যকারী ব্যক্তিদিগের স্বতঃস্ফূর্ত্ত দুর্দ্দান্তভাবের ব্যাপক অভিব্যক্তি। গ্যাং বা দুর্দ্দমনীয় আখড়াগুলি প্রধানতঃ রাষ্ট্রনৈতিক দলের লোক দিয়াই গঠিত এবং বহু ক্ষেত্রেই ঐ সকল দলের নেতাদিগের নিজ নিজ দলের গুণ্ডা প্রকৃতির লোকদের উপর প্রভাব আছে এবং বহুস্থলে ঐ সকল দাঙ্গাকারীগণ নেতাদিগকে মানিয়া চলে না। তবে নেতাদিগের উপর যদি চাপ দেওয়া হয় তাহা হইলে কিছু কিছু আখড়ার সৈন্যগণ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিতে পারে। সকল রাষ্ট্রীয়দল-গুলিকে অবিলম্বে বলা উচিত যে তাহারা যেন কোন মিছিল বাহির করিতে, সভা করিতে, দল বাঁধিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে নিজ নিজ দলের লোকদিগকে না বলে। শুধু তাহাই নহে বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করিয়া ঐ জাতীয় কার্য্যকলাপ বন্ধ করা আবশ্যক। কারণ সাধারণ মানুষের বাঙ্গালাদেশে বাস করা ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, গরীব লোকের রোজগার বন্ধ হইতেছে, কাজ কারবার চালান কঠিন হইয়াছে এবং নিরাপত্তা নাই বলিলেই চলে। অথচ ইহা কোন ব্যাপক জন বিক্ষোভজাত বিপ্লব নহে। শুধু অল্পসংখ্যক সমাজ বিরুদ্ধতা প্রিয় লোকদের বেয়াইনী উশৃঙ্খলতা মাত্র।

এশিয়ায় বৃটেনের সামরিক দায়িত্ব সৃষ্টি

লর্ড ক্যারিংটন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যে সকল রাষ্ট্র বৃটিশ কমন্ওয়েল্থের অন্তর্গত সেই সকল রাষ্ট্রের সহিত একটা আত্মরক্ষা সংক্রান্ত পারস্পারিক চুক্তি ব্যবস্থা করিতেছেন। লর্ড ক্যারিংটন হইলেন বৃটেনের বর্ত্তমান রাজ সরকারের প্রতিরোধ সচিব অর্থাৎ ডিফেন্স্ সেক্রেটারি। নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া,

সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া নিজেদের রাষ্ট্ররক্ষা কার্য্যে বৃটেনের সহায়তা আকাঙ্খা করেন এবং বৃটেনও ঐ কার্য্য সিদ্ধির জন্য কিছু কিছু সৈন্য, নৌবহর ও সামরিক বিমান ঐ অঞ্চলে রাখিতে প্রস্তুত আছেন। এই সামরিক শক্তি যৎসামান্যই হইবে বলিয়া বৃটেন জগতবাসীকে জানাইতেছেন এবং একথাও বলিতেছেন যে পরে ঐ শক্তি আর ঐ স্থলে নিযুক্ত থাকিবার কোন প্রয়োজন রহিবে না। সে যাহাই হউক, বৃটেন যদি একজন সৈনিকও ঐ স্থলে রাখে তাহা হইলে সেই সৈন্যটিকে যদি কেহ আক্রমণ করে, সেই আক্রমণ তখন বৃটেনের উপর আক্রমণ বলিয়া ধার্য্য হইবে এবং সেই অবস্থায় বৃটেন তখন নিজের সমগ্র সমর আয়োজন ঐখানে লইয়া গিয়া তাহা শত্রু নিপাত কার্য্যে ব্যবহার করিবে। অর্থাৎ ইংরেজ যত অল্প সংখ্যক বিমান ও যুদ্ধজাহাজ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় রাখে না কেন উহা দ্বারা ইংরেজ একটা সামরিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে। দায়িত্ব সহজেই অধিকারের রূপ ধারণ করে এবং বৃটেনের অথবা কোন ইয়োরোপীয় জাতির দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ঐ প্রকার কোন অধিকার সৃজন এশিয়াবাসীর পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে।

সাধারণতন্ত্রের পরিণতি

সাধারণতন্ত্র বা ডিমক্রেসি অর্থে প্রাচীনকালে যাহা বুঝাইত তাহাতে মানুষ সাক্ষাৎভাবে নিজেই নিজেদের শাসন ব্যবস্থা করিত। মধ্যে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি এবং সেই প্রতিনিধি কে হইবে তাহা ঠিক করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় দলের সুপারিশ ও পরিশেষে সংবিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত আইন প্রণয়ক সভা প্রভৃতি আসিয়া পড়ায় সাধারণতন্ত্র যে অসাধারণত্ব আহরণ করিয়াছে তাহাতে মানুষ এখন আর বলিতে পারে না যে তাহার ইচ্ছামত শাসনকার্য্য চালিত হইতেছে। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচন হইয়া যাইবার পরে যে নির্ব্বাচনকারীদিগের ইচ্ছা অনুসারে প্রায় কোন কার্য্যই করেন না এ কথা সকলেই জানেন। তৎপরে ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রতিনিধি ভোটদাতাদিগের মতানুসারে চলিতে ইচ্ছুক থাকিলেও তিনি তাহা করিতে পারেন না; কারণ তাঁহাকে সুপারিশকারী রাষ্ট্রীয় দলের তাঁবেদারী করিয়া চলিতে হয়। রাষ্ট্রীয় দল যাহা বলে তাহা না মানিয়া ভোট-দাতাদিগের নিকট গমণ করিলে সেই প্রতিনিধির ভবিষ্যত অন্ধকার হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় দলের পরে আছে সংবিধানের নিয়ম কানুন ও রীতিনীতি পদ্ধতি। ভোটদাতার ইচ্ছার সহিত ঐ সকল বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ প্রথার বিশেষ সম্বন্ধ থাকা কদাপি সম্ভব হয় না। আইন প্রণয়ণ ও শাসনকার্য্য বাঁধাবাঁধির প্রাকারাবদ্ধ। তাহার মধ্যে কোন ভোটদাতা কি চাহেন, সেকথা ক্ষণিকের জন্যও স্থান পাইতে সক্ষম হয় না। ব্যক্তিগত ইচ্ছা, মতামত বা আগ্রহ, চরম শৃঙ্খলার আগার শাসন নিষ্ঠার অচলায়তনে কোনখানে প্রবেশাধিকার বা প্রশ্রয় পায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান প্রশাসন ব্যবস্থায় যেভাবে আইন প্রণয়ন করা হয় এবং তৎপরে যেভাবে সেইসকল আইন ও তৎসংক্রান্ত নিয়মকানুন প্রয়োগ করা হয় তাহার ভিতরে জনসাধারণের তথা-কথিত স্বায়ত্তশাসন আর স্বায়ত্তভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না।

সাধারণতন্ত্র তাহা হইলে ব্যক্তির নিজ ইচ্ছাকে শাসন কার্য্যে বিশেষ উচ্চস্থান দান করে না। ব্যক্তি নিজ অধিকার অপরের হস্তে যে তুলিয়া দেয় তাহাও একপ্রকার বাধ্যতা মূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্ব্বাচনের পরে যে জনসাধারণের সকল ইচ্ছা, মতামত, সুখ সুবিধা ইত্যাদি তাচ্ছিল্য করিয়া নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্রীয়দলের নেতাদিগের ইচ্ছায় ও ঐ সকল দলের লোকদের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিয়া থাকেন এ কথাও সর্ব্বজন বিদিত। জনসাধারণ এই রীতি ও পদ্ধতির সমর্থন করেন না; ইহাও সকলেই জানেন। তথাপি এই ফাঁকির স্বায়ত্তশাসন কি ভাবে মানব সাধারণের বুকের উপর জগদ্দল প্রস্তরের ন্যায় চাপিয়া

বসিয়া আছে তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। সাধারণতন্ত্রকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিলে জনসাধারণের ইচ্ছা ও মতামতের সম্মান রক্ষা হইতে পারে সে কথাও বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিবার কথা। এখন যে ভাবে সাধারণতন্ত্র সপ্তরথী ব্যাষ্টত হইয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া টিকিয়া আছে? সে অবস্থা অধিক দিন থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রীয়দলগুলিকে দমন করিয়া ও রীতি পদ্ধতির বাড়াবাড়ি সংযত করিয়া জনসাধারণকে স্বায়ত্তশাসন অধিকার যথাযথ ভাবে উপভোগ করিতে না দিলে সাধারণতন্ত্র শীঘ্রই ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইবে।

রাষ্ট্রকার্য্যের ধরণ ধারণ

অনেকে বলেন যে প্রতিবাদ করিবার লোক না থাকিলে সুচিন্তিত ভাবে রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা সম্ভব হয় না। এই জন্যই উপযুক্ত বিপক্ষ দল না থাকিলে কোন দেশের কোন মন্ত্রীমণ্ডলীই উপযুক্ত ভাবে রাজ্যশাসন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হ'ন না। বিপক্ষদলের লোকেরা যে কঠিন সমালোচনা করেন তাহাতে মন্ত্রী-মহোদয়গণকে সদা জাগ্রত ভাবে নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিতে শিখিতে হয়। গা ঢিলা দিয়া যথেচ্ছাচার করিলে গঠন মূলক কাজগুলিত হয়ই না এমন কি সুশাসন ব্যবস্থাও কেহ করিয়া উঠিতে পারে না।

অপর লোকেরা বলেন দল গঠন করিয়া রাষ্ট্রীয় কার্য্যশক্তির অপচয় করা হয়। রাষ্ট্রীয় দলের লোকেরা যদি জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতা যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় এবং সামাজিক প্রগতির পথ উপযুক্ত ভাবে চিনিয়া লইতে সক্ষম হয় তাহা হইলে তাহারা দলের আলোচনা সভাতেই সকল প্রশ্নের সত্য উত্তর সকল সমস্যার সমাধান এবং সকল জটিলতার মীমাংসা স্থির করিয়া লইয়া তবেই শাসন কার্য্যের মুক্ত আসরে অবতীর্ণ হ'ন। এই কারণে যেখানে একটি ব্যতীত অপর কোন রাষ্ট্রীয় দল নাই, সেখানে শাসন কার্য্য অতি উত্তমরূপেই চলিতে পারে ও চলে। বিরুদ্ধ সমালোচনার সেখানে কোন আবশ্যকই থাকে না যেহেতু রাষ্ট্রনীতি ঐ রূপ পরিস্থিতিতে স্বয়ংসিদ্ধরূপ ধারণ করে।

সম্রাট অশোক অধুনাতন অতি নিন্দিত একছত্র অধিপতি রূপে সাম্রাজ্য শাসন করিতেন কিন্তু তাঁহার শাসন পন্থা পৃথিবীতে একটা উচ্চতম রাষ্ট্রীয় আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে তিনি পরম ধর্মপ্রাণ কর্ত্তব্য নিষ্ঠ সুনীতি প্রবর্ত্তক ছিলেন ও তাঁহার স্পর্শে মানবতার সকল দোষ সূর্য্যালোকে কুয়াশার মতই মিলাইয়া যাইত। উদ্দেশ্য ও প্রবৃত্তি গহিত হইলে যেমন অতি সুচিন্তিত নীতি অনুগামী রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াও কোন সৎকার্য্য সাধিত হয় না; ধর্ম্ম ও পবিত্র আকাঙ্খা তেমনি সকল অন্যায় পন্থাকে ঘুরাইয়া চির সত্যের আশ্রয়ে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়।

মানুষ যদি সদন্তঃকরণে উন্নত আদর্শের অনুসরণ করে সে তাহা হইলে যে কোন পথ অবলম্বন করিয়াই চলুক না কেন শেষ অবধি তাহার লক্ষ্যস্থলে পৌছাইতে সক্ষম হয়। এই কারণে যে কোন সর্বজন স্বীকৃত অভ্রান্ত নিয়ম মানিয়া চলে না সেও অনেক সময় শুধু নিজগুণে সাফল্য লাভ করে। পরন্তু যে উচ্চতম রীতি পদ্ধতি ইত্যাদি প্রতি পদক্ষেপে আবৃত্তি করিয়া অগ্রসর হয়, সে অনেক সময় নিজ প্রবৃত্তির দোষে কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে না। কিউবার রাষ্ট্রপতি ফিদেল কাস্ত্রো রাষ্ট্রীয় সকল শক্তি ও তৎসঙ্গে সকল কার্য্যভার নিজ হস্তে লইয়াছেন। তিনি একাকি এত কার্য্য করেন যে তাহা না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। কিউবাতে নির্বাচন অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট সংবিধান অনুগত ভাবে কোন শাসকমণ্ডলী ইত্যাদি গঠন চেষ্টা করা হয় না। কোন সর্বশক্তিমান সোভিয়েৎ ও ঐ দেশে নাই। ফিদেল কাস্ত্রোর নির্দ্দেশেই সকল রাষ্ট্রকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং কেহ তাহার কোন সমালোচনা করে না। ইহার কারণ কাস্ত্রোকে কিউবাবাসী জনগণ দেবতার আসনে বসাইয়া রাখিয়াছে। সেই দৈব অধিকারেই কাস্ত্রোর একাধিপত্য সর্বজন সম্মানিত ও অপ্রতিহত গতিতে অগ্রগমনশীল। রাষ্ট্রীয় রীতি নীতি পদ্ধতি

প্রভৃতি দিয়া রাষ্ট্রকার্য্য সাধিত হয় না। কর্মীর চরিত্র আদর্শবোধ, জ্ঞান ও কার্য্য কৌশল দিয়াই সকল কিছু সফল হয়। অন্য কথা অবান্তর।

ফিদেল কাস্ত্রো ক্ষুদ্র দেশের অধিনায়ক হইলেও তাঁহার কর্মশক্তি, ব্যক্তিগত সত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহস বৃহৎ বৃহৎ দেশের নেতাদিগের অনুকরণ করিবার আদর্শ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। তিনি কিউবার বাক্যবীর নিষ্কর্মা বিপ্লব মঞ্চের অভিনেতাদিগকে কোন প্রকারেই সহজলভ্য নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেন না। "কাজ দেখাও, ত্যাগ দেখাও, কষ্ট সহ্য করিয়া দেশ সেবা কর। নয়ত রাস্তা খোলা ও অনন্ত বিস্তৃত—দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও।" এই জাতীয় বাক্য উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা ভারতের নেতাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। আমাদের বাল্যকালে কোন কোন বালক এক প্রকার "দেব-দেবনা ব্যাঙ্ক" খুলিয়া ফুটবল খেলা দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া লইত। এ-দেশের নেতাদিগের পক্ষে ঐ নামটি ভাল ভাবেই প্রয়োগ করা চলে। "নিতে চাই দিতে কিছু নাই" উত্তম স্লোগান। ফিদেল কাস্ত্রো এই বৎসরের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনে ঘাটি হওয়াতে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিবার পরে অন্য সহকারীদিগের কর্মক্ষেত্রের বিফলতার আলোচনা করিয়াছেন। চিনি এক কোটি টন উৎপাদিত না হইয়া মাত্র ৮৫ লক্ষ টন কেন হইতেছে? যদিও ইতিপূর্বে কিউবার ইতিহাসে কখন ৮৫ লক্ষ টন চিনি হয় নাই। হাভানার প্লাজা ডি লা রেভোলিউসিয়ন নামক চত্বরে এক বিরাট জনসভাতে কাস্ত্রো বলেন যে শুধু চিনি উৎপাদনে বিফলতা দেখা যায় নাই—মাংস, দুগ্ধ, সিমেন্ট, সার দাহ্য তৈলাদি বস্তু, গাড়ীর চাকার টায়ার, রাবার ও অপরাপর বস্তুও উপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় নাই। কাহার দোষে? কি করিলে এই অসাফল্যের পুনরাবৃত্তি আর না হইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে? ফিদেল কাস্ত্রোর রাষ্ট্রনীতি শুধু ফাঁকা আওয়াজ পূর্ণ নহে। কর্ম, উৎপাদন কার্য্যে সাফল্য, জীবন যাত্রা সহজ করা। মানুষের খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা—সকল কিছুই তাঁহাকে অষ্ট প্রহর অক্লান্ত পরিশ্রমে নিযুক্ত রাখে। রাজনীতি শুধু কথার ব্যবসায় নহে।

"বন্ধ" বন্ধ

নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ কথাটা বাংলা এবং বাঙালার অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। নাক কাটা যদি নাসিকাকে কোনওভাবে বিকৃত না করিত শুধু ছুরি লইয়া নাসিকাগ্রে সঞ্চালন মাত্র হইত তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইত না। কিন্তু ইহা আর অভিনয় থাকিতেছে না। নাকে একটা গভীর কাটার চিহ্ন ক্রমশঃ গভীরতর হইয়া দেখা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং শীঘ্রই যে নাসা আর অখণ্ড অবস্থায় থাকিবে না, তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। আর অন্যপক্ষের, যাহাদের যাত্রা ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা, তাহারাও পূর্ব্বেরই মত পেটে বালিশ বাঁধিয়া ভীম সাজিয়া অবিরাম সোলা ও কাগজের গদা ঘুরাইতেছে। ভয় পাইয়া অথবা সহানুভূতি পীড়িত হইয়া যে যাত্রাটা বন্ধ করিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং নাকের উপর অত্যাচার থামাইয়া যাত্রা উপভোগ করা অথবা অভিনয় স্থল ত্যাগ করিয়া অপর কার্য্যকরী ক্ষেত্রে গমণ করাও সম্ভব হইতে পারে।

প্রত্যহ দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া কেহ না কেহ প্রাণ হারাইতেছে এবং যে প্রাণ হারাইল তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া ট্রাম বাস জ্বালাইয়া আরও অপর কাহারও মৃত্যুর কারণ সৃজন হইতেছে; তদুপরি অসংখ্য মিছিল এবং হরতাল বা "বন্ধ"এর ধাক্কায় সকলের কাজকর্ম্ম "বন্ধ", গরীবের রোজগার "বন্ধ", বাজার "বন্ধ" হওয়ার ফলে রন্ধন ও ভোজন "বন্ধ"। নিজেদের নাক কাটা প্রায় সম্পূর্ণ এবং অপরের যাত্রা বন্ধ না হইয়া নিজেদেরই মহাযাত্রার পথ খুলিয়া যাইতেছে। এখন একমাত্র উপায় "বন্ধ" বন্ধ করা ও দেশবাসীকে রাষ্ট্রনৈতিক উৎপাত হইতে নিস্তার পাইতে দেওয়া। সকলেই অনেক পাইয়াছে; আর পাইতে চাহে না।

খাদ্য উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ উপায় চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি

ভারতবর্ষের মানুষের খাদ্য সংকট দূর করা একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, নূতন নূতন শস্যের আবিষ্কার, সার ব্যবহার, সেচন প্রভৃতি নানা ব্যবস্থা করিয়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা অবিরাম গতিতে চলিতেছে। "সবুজ বিপ্লব" এত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে বলিয়া প্রচার যে সকলে ভাবিতেছে খাদ্য বস্তুর অভাব আর থাকিবে না। কিন্তু সত্য সত্যই কি এইরূপ কোন অবস্থা হইয়াছে? একথা মানা যাইতে পারে যে চাল, গম প্রভৃতি শস্য দশ কোটি টন উৎপাদিত হইবে। পূর্ব্বে হইত কমবেশী ৮ কোটি টন। কিন্তু লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে দ্রুতগতিতে যাহার ফলে যেটুকু অতিরিক্ত খাদ্য উৎপন্ন হইতেছে তাহা অচিরাৎ খাওয়া হইয়া যাইতেছে। মনে হয় না যে মাথা পিছু বাৎসরিক মূল খাদ্যবস্তু চার মনের অধিক পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ এক মণে তিন মাস চালাইতে হইবে। দৈনিক আধ সেরেরও অল্প। ইহা লইয়া খুব উৎফুল্ল হইয়া পড়িবার কোন কারণ দেখা যায় না।

এদিকে সর্ব্বত্র প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে জমি ভাগ করিয়া বা দখল করিয়া লইয়া চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার। ক্ষেত যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইবে মোট খাদ্য উৎপাদন ততই কমিবার দিকে যাইবে। একথা কাহাকেও শিখাইবার প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বাধিক খাদ্য উৎপাদনের একটা প্রধান উপায় হইল বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্র-যন্ত্র সাহায্যে চাষ করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্র সেভাবে চাষও হয় না এবং তাহার পার্থক্য রক্ষাতে আল বাঁধিয়া বহু জমি নষ্ট করা হয়। জোর করিয়া জমি দখল করা যেখানে অধিক প্রচলিত হইবে সেখানে যাহারা জবর দখল করিয়াছে ও যাহারা পুরুষানুক্রমিক ওয়ারিস হিসাবে অথবা ক্রয় করিয়া জমির মালিক; এই দুই জাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সৌহার্দ্য থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং জমি টুকরা টুকরা হইলেও সমবায় বা অপর ব্যবস্থায় বৃহৎ ক্ষেত্র চাষের অর্থনৈতিক লাভ করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

দেশের দারিদ্র্য দূর করা ও সর্ব্বোচ্চ খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা করা এক সমস্যা নহে। দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে নানা প্রকার নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন হইবে। শুধু ছোট ছোট ক্ষেত দখল করিয়া কাহারও যথেষ্ট রোজগার হইবে না এবং সেই ব্যবস্থা যতই বিস্তৃত ভাবে করা হউক না কেন, অধিক মানুষের তাহাতে সারা বৎসরের কাজ জুটিবে না। ভারতের সকল চাষের জমি যদি সকল দেশবাসীর মধ্যে সমান ভাগ করিয়া দেওয়া হয় তাহাতে মাথাপিছু এক একর জমিও হইবে না। এইভাবে জমি ভাগ, খাদ্য উৎপাদনে একটা মহা বাধার সৃষ্টি করিবে।

মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ

সমর বসু

যথাসময়ে ক্লাশ শেষ হল। এবার প্রশ্নোত্তরের পালা। অধ্যাপক নীতিন সেন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে একবার প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তাকালেন। হঠাৎ একজন নবাগত শ্রোতার উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। তিনি গভীরভাবে তাঁকে নিরীক্ষণ করলেন।

চোখে চোখ পড়তেই নবাগত তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন,—আমি এতদিন জানতাম না যে প্রতি-মাসের প্রথম শনিবারে এখানে এই ধরনের একটা আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান হয়। গতকাল মাত্র সংবাদ পেয়েছি; তাই প্রথম সুযোগ অবহেলা না করে আজই ছুটে এসেছি।

স্থানীয় কলেজে আমি অধ্যাপনা করি। মাত্র মাস দুই হল এখানে এসেছি। তবে যে 'সাবজেক্ট' নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে, সে-সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। সেই জন্যে ঐ প্রসঙ্গে কোনও প্রশ্ন আমার নেই। তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে। যার জন্যে আমার এখানে আসা। কিন্তু এখনই সেটা এখানে উত্থাপন করা সমীচীন হবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না।

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী আগ্রহী দৃষ্টিতে নীতিনদার দিকে তাকাল। মৃদু হেসে নীতিনদা বললেন,—শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধীয় যদি কোনও প্রশ্ন হয়, তা'হলে নিশ্চয়ই এখানে আলোচনা হতে পারে। এই পাঠচক্রের পরিচালনায় গত পাচ বৎসর ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের আলোচনাচক্রের আয়োজন আমরা করেছি; সম্প্রতি বছর দুই হল সেসব আলোচনাচক্র ছাড়া শ্রীঅরবিন্দের The Ideal of Human Unity নামক গ্রন্থের থেকে প্রতিমাসে একদিন এই পাঠচক্র-ভবনে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই গ্রন্থটি শেষ হলে অন্য গ্রন্থ ধরা হবে। আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তরের জন্য কিছু সময় দেওয়া থাকে। সুতরাং সেই সময়টুকুর পর আপনার কথা আমরা শুনবো।

নীতিনদার বলা শেষ হতেই শৈলেনবাবু "State idea" সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করলেন। নীতিনদা তার যথাযথ উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—আর কারও কোনও প্রশ্ন আছে?

উপস্থিত সকলেই নীরব।

নীতিনদা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নবাগতকে উদ্দেশ করে বললেন, এবার আপনার প্রশ্ন আপনি করতে পারেন।

সকলেই বিশেষ আগ্রহ নিয়ে নবাগত অধ্যাপকের দিকে তাকালেন।

ঈষৎ লজ্জা প্রকাশ করে অধ্যাপক বললেন,—আমার নাম পীযুষ দাশগুপ্ত। আমি দর্শনের অধ্যাপক। মাস সাতেক আগে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আমি পণ্ডিচেরী গিয়েছিলাম।—মানে, প্রশ্নকরার আগে কিছু ভূমিকা করতে হচ্ছে, নইলে আমার অবস্থাটা আমি ঠিক আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারব না। যদি সময় না থাকে তো বলুন,—আমি না হয় অন্য একদিন আসব।

নীতিনবাবু এবং তাঁর সঙ্গে আরও অনেকে হাতঘড়ি দেখলেন। এবং প্রায় সমবেতকণ্ঠে সকলেই বললেন, —না, না, আজই আলোচনা হোক। নীতিনদা বললেন,—আপনার প্রশ্নটা তো আগে শোনা যাক।

আশ্বস্ত হয়ে পীযুষবাবু আবার শুরু করলেন;— পণ্ডিচেরী আশ্রমে যাবার অনেক আগে নীরেন,— মানে আমার বন্ধু,—আমাকে প্রায়ই বলত—শ্রীঅরবিন্দ

পড়তে। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, আমি তেমন আগ্রহবোধ করতাম না। একটা ব্যাপারে আমার খুব খট্‌কা লাগত,—শ্রীঅরবিন্দের The Life divine—আমাদের Universityতে মূল পাঠ্য হিসাবে কেন পড়ানো হয় না। এ-প্রশ্ন আমি অনেক senior professorদেরও করেছিলাম। এমন কি আমাদের মাষ্টারমশাইদেরও জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাঁরা বললেন,—এক সময় সে-চেষ্টা হয়েছিল। ডঃ সুরেন দাশগুপ্তর আমলে। কিন্তু অজ্ঞাতকারণে সেসব চাপা পড়ে গিয়েছে। শুনেছি আশ্রম থেকে কে একজন মিঃ পুরাণী অনেকদিন আগে এখানে এসেছিলেন,—শ্রীঅরবিন্দের উপর কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন Universityতে। তারপর এ বিষয়ে আর কোনও চেষ্টা হয়নি। Senior professorদের মধ্যে অনেকের অভিমত শ্রীঅরবিন্দ পড়াবার মত লোক নেই। জানিনা কথাটা কতখানি সত্যি। তবে পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে ফিরে এসে যখন আমি শ্রীঅরবিন্দের দু'একখানা বই যেমন,—Essays on the Gita, The Human Cycle এবং কিছু চিঠিপত্র পড়তে সুরু করলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে, শ্রীঅরবিন্দ শুধু দুরূহ নন, একটা বিশেষ ধরনের মানসিকতা গড়ে না তুলতে পারলে শ্রীঅরবিন্দকে বোঝা সম্ভব নয়। সে যাই হোক,—পণ্ডিচেরীতে ছিলাম প্রায় সাতদিন। 'দর্শনে'র পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রের ধারে বসে ছিলাম। নীরেন হঠাৎ আমায় জিজ্ঞেস করল,—এখন কেমন লাগছে?

আমি সহসা এর কোনও জবাব দিতে পারলাম না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম,—আশ্রম প্রতিষ্ঠানটির সবকিছুই বেশ well disciplined. পরক্ষণেই বুঝতে পেরেছিলাম উত্তরটি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। ছিল আমার মন গড়া। বন্ধুবর আশা করেছিল যে, আমি অভিভূতের মত আশ্রমকে ঘিরে যে-দিব্য পরিবেশ গড়ে উঠেছে সেই সম্বন্ধে আমার গভীর বিস্ময়ের কথা তাকে জানাবো। যদিও আমি, সত্য কথা বলতে কি,—বিস্ময়ে অভিভূতই হয়ে গিয়েছিলাম। তবুও বন্ধুকে নিরাশ করার উদ্দেশ্যেই তার প্রশ্নের জবাব ঐ ভা[illegible] দিয়েছিলাম। অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম,—[illegible] চেয়ে বেশী কিছু বলতে গেলে আরও সময় লাগ[illegible] আরও গভীরভাবে একে জানতে হবে।

এরপর নীরেন বলল,—শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈ[illegible] জীবনের সামান্য কিছু তথ্য জানো,—বাকী সবট[illegible] তোমাদের অজ্ঞাত। তাই তোমরা ঠিক সব বুঝ[illegible] পারনা। যখন পারবে তখনই শ্রীঅরবিন্দকে চেনা-জা[illegible] তোমাদের পক্ষে সহজ হবে। তার আগে নয়। এ[illegible] তখনই তোমরা বুঝতে পারবে—শুধু ১৯০৫-১০ সালে[illegible] জন্যে নয়, শ্রীঅরবিন্দ আগাগোড়া সারা জীবন বিপ্লবী। স্থূল দৈহিক জীবনের শেষেও তাঁর বৈপ্লবি[illegible] কর্মের অবসান ঘটেনি। তাই তাঁকে আমরা বা[illegible] মহাবিপ্লবী।

কথাগুলো শুনে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল,—অতিভক্তির উচ্ছ্বাস। পরক্ষণেই কিন্তু বুঝ[illegible] পেরেছিলাম কথাটার মধ্যে কোথাও যেন কোনও গভী[illegible] সত্য আছে। তাই সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম,—কী অর্থে তুমি তাঁকে আগাগোড়া বিপ্লবী বলছ?

নীরেন অশান্ত সমুদ্রের দিকে গভীর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে উদাসকণ্ঠে বলল,—সে কথা এখন বললেও তুমি বুঝতে পারবে না। সময় লাগবে। সেই মুহূর্তে নীরেনকে মনে হল যেন অনেক দূরের মানুষ।

এরপর আমি অনেক চেষ্টা করেছি,—কিন্তু বন্ধুবর আর মুখ খোলেনি।

পণ্ডিচেরী থেকে আমি একলাই ফিরে এলাম। নীরেন থেকে গেল। এখনও সে আশ্রমেই আছে। শুনছি, আর ফিরবেনা। চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত। ঐ প্রসঙ্গে এখনও সে আমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চায় না। সেই কারণেই আজ আমার এখানে আসা।

পীযূষবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে থামলেন।

মৃদুহেসে নীতিনদা বললেন,—তা হলে আপনার

মূল প্রশ্ন হল,—শ্রীঅরবিন্দকে মহাবিপ্লবী বলা যেতে পারে কিনা। অর্থাৎ কি কারণে তাঁকে তা বলা যেতে পারে? কিন্তু এ-বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করবার আগে আমাদের এই মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে মোটামুটি দু'একটি কথা বলা দরকার।

পীযুষবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন,—আমিও তাই চাই। বিষয়টির বিস্তৃত এবং বিশদ আলোচনা। আমার মনে হয় কেবল এই বিষয়টাই নিয়ে আলোচনার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করা হোক্। কেননা, আজ বোধহয় আপনাদের অসুবিধা হবে।

নীতিনদা বললেন,—তা করা যেতে পারে। এবং সেটাই বোধহয় ভাল হবে। কেননা, এ-আলোচনায় অনেক সময় নেবে। আপনার কবে সুবিধে হবে জানতে পারলে—

বাধা দিয়ে পীযুষবাবু বললেন,—আমার কোনও সুবিধা অসুবিধা নেই। আপনারা যেদিন আসতে বলবেন,—সেইদিনই আসবো। তবে সন্ধ্যের পর।

সুতরাং স্থির হল,—আগামী শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় পাঠচক্র ভবনে, শ্রীঅরবিন্দের মহাবিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হবে। আলোচনা করবেন,—অধ্যাপক নীতিন সেন।

দুই

নির্দিষ্ট দিনে যথা সময়েই আলোচনা সুরু হল। পীযুষবাবু যদিও মূল প্রশ্নকর্তা, তবুও আমাদের মত অনেকেরই এ-বিষয়ে আগ্রহ কম নয়। তাই দেখা গেল অন্যদিনের তুলনায় সেদিন লোকসমাগম একটু বেশীই হয়েছে।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে উদ্দেশ করে নীতিনদা বললেন,—আজকের আলোচ্য বিষয় হল, শ্রীঅরবিন্দকে মহাবিপ্লবী বলা যায় কি না? অর্থাৎ কি কি কারণে তাঁকে আমরা মহাবিপ্লবী বলব।

গতদিন আমি অধ্যাপক পীযুষ দাশগুপ্ত মহাশয়কে বলেছিলাম,—এই আলোচনা করার আগে আমাদের মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে দু-একটি কথা বলা দরকার। কেননা Revolution সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে Evolution অর্থাৎ বিবর্তনবাদের কথা আগে বলতে হয়। সুতরাং আমি সেইভাবেই সুরু করছি।

বিবর্তনধারার পর্যায়ক্রম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ Charles Darwin মানুষের আবির্ভাব পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছেন। মানুষের পর উন্নততর কোনও মানুষের অথবা অন্যকোনও জীবের আবির্ভাব সম্ভব কি না, এবং যদি সম্ভব হয়, তা হলে তা কি ধরণের হবে, সে সম্বন্ধে Darwin সাহেব নীরব। সেই সঙ্গে সাধারণভাবে প্রায় সমস্ত পাশ্চমী মানুষও। পাশ্চমী জড়বাদী দর্শন প্রভাবিত চিন্তা চেতনায় এ-দেশের বুদ্ধিজীবিরা যেহেতু বিশেষভাবে প্রভাবিত সেই হেতু এ-দেশেরও আধুনিক মানুষ Darwin এর তত্ত্বকেই স্বীকার করে নিয়েছে, যদিও সে তত্ত্ব এখনও প্রমাণিত হয়নি। তাই মানুষের পরে কি হবে সে-ব্যাপারে পাশ্চমী মানুষদের মত আমাদেরও কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু এ-দেশের ঋষিরা অন্য কথা বলেন। গভীর তপস্যার সাহায্যে যে-সত্য তাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাতে ধরা দিয়েছে—এক বিশাল অধ্যাত্মজীবন যেখানে মানুষকে উত্তীর্ণ হতে হবে। মানুষ mental being, কিন্তু মনোজীবনই বিবর্তনধারার শেষ লক্ষ্য নয়।

সমগ্র মানবজীবনকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। তার একটি ভাগে দেহ, প্রাণ ও মন—অন্যভাগে বিশাল অধ্যাত্মজীবন। এখন এই তত্ত্বটি—আগে আপনাকে স্বীকার করে নিতে হবে পীযুষবাবু, না হলে এর পরের আলোচনায় এগোন যাবে না। অবশ্য আলোচনা-প্রসঙ্গে যুক্তিতর্কের সাহায্যেই এ-তত্ত্বটিও প্রমাণিত হবে—।

পীযুষবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন,—অস্বীকারের কোনও প্রশ্নই এখানে উঠতে পারে না, তবে যদি কোনও বিষয়ে কোনও সন্দেহ জাগে বা বুঝতে অসুবিধে হয়, —তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে তা জানাবো।

আশ্বস্ত হয়ে নীতিনদা আবার বলতে সুরু করলেন,—অধ্যাত্মজীবনের কথা পরে বলব। এখন দেহ প্রাণ ও মন নিয়ে যা সমস্যা সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। বিবর্তনের গতিপথে জীবের আকৃতিগত যে-পরিবর্তন হয়েছে Darwin সাহেব তা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু অন্তর্জীবনে অর্থাৎ চেতনাগত যে-পরিবর্তনের ফলে মানুষ মনশ্চেতনার অধিকারী হয়েছে সে-সম্বন্ধে তাঁর কোনও মন্তব্য নেই। সুতরাং Darwin সাহেবের তত্ত্ব থেকে মানুষের আধখানা পরিচয়ই পাওয়া যায়। পুরো মানুষকে জানা যায় না। মানুষের যে-দিকটাকে বলা হয় Outer life অর্থাৎ বাহ্যজীবন, তাকে নিয়েই আমাদের যত ব্যস্ততা, এ-ছাড়া মানুষের যে Inner life অর্থাৎ অন্তর্জীবন আছে তার রহস্য সন্ধানে আমরা মোটেই উৎসুক নই। সেই জন্যই আমাদের জীবনকে ঘিরে যে-সব সমস্যা যুগে-যুগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার সমাধানের জন্য আমরা যেসব উপায় উদ্ভাবন করি, তা সাময়িকভাবে যতই সার্থক হোক না কেন, পরিণামে ব্যর্থ হয়। ব্যর্থ হয় এই কারণে যে, সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে আমরা মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে একেবারেই গণ্য করি না। মানুষের এই অন্তঃপ্রকৃতির রহস্যটিকে যুক্তি-বুদ্ধির সাহায্যে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

একটু থেমে পীযুষবাবুকে উদ্দেশ করে নীতিনদা বললেন,—আপনি সেদিন বলেছিলেন যে, 'Human Cycle' পড়েছেন। সুতরাং আমি আশা করতে পারি যে, মানুষের ক্রমবিকাশের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য আপনি অনুধাবন করতে পেরেছেন।

নীতিনদার কথায় একটু যেন বিব্রত বোধ করলেন পীযুষবাবু। বললেন,—একটু-আধটু পড়েছি বটে,—কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝতেই পারিনি। সুতরাং আপনি ধরে নিতে পারেন আমার কিছুই পড়া নেই। একজন সাধারণ মানুষকে যেভাবে বোঝান দরকার সেইভাবে যদি বোঝাতে পারেন তো খুব ভাল হয়।

ঈষৎ হেসে নীতিনদা বললেন,—আচ্ছা! সেই চেষ্টাই করব। তা হলে গোড়ার কথা একটু বলে নিই।

আমাদের উপনিষদে চেতনার তিনটি অবস্থার কথা বলা আছে—। সুপ্তাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং জাগ্রত অবস্থা। পৃথিবীতে সবকিছুই যখন জড়ময় ছিল—তখন জড়ের মধ্যে চেতনা ছিল নিদ্রিত। চেতনার তখন সুপ্ত অবস্থা। তারপর শৈবালজাতীয় উদ্ভিদের জন্ম হল। এই উদ্ভিদে এসে চেতনার ঘুম ভাঙল। তবে পুরোপুরি নয়। ঘোর কাটেনি; আচ্ছন্নভাব ঘোচেনি। স্থাবর উদ্ভিদে চেতনার তাই স্বপ্নাবস্থা। এর পর পৃথিবীতে জন্মাল প্রাণী। চেতনা জাগ্রত হল। কিন্তু সে-চেতনা রইল বহির্মুখী। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ। তাই প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ ঘটল না। মানুষে এসে সেই জাগ্রত চেতনা হল অন্তর্মুখী। মানুষ মনঃশক্তির অধিকারী হল।

Darwin এর তত্ত্বের উল্টোপিঠে চেতনার এই বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। Darwin তার সন্ধান পাননি, তাই সে-কথা কাউকে জানাতেও পারেননি। চেতনার এই ক্রমবিকাশের ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। মনশ্চেতনার চেয়েও উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন চেতনা এখনও রয়েছে অনভিব্যক্ত অর্থাৎ Unmanifested: চেতনার এই চতুর্থ অবস্থার নাম—তুরীয় অবস্থা।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা ছিল জড় তাই একদিন দেহ পেল। পেল প্রাণ। যা ছিল দেহময়, প্রাণময় তাই আবার একদিন মনোময় হয়ে উঠল। তাহলে আমরা অনায়াসেই বলতে পারি জড়ের মধ্যেই যেমন অবারিত ছিল দেহ-চেতনা, তেমনি দেহ-চেতনার মধ্যেই প্রাণ-চেতনা ছিল অবগুণ্ঠিত। এবং মনশ্চেতনা সেই প্রাণচেতনার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। আবরণ যেমন উন্মোচিত হয়েছে তেমনি ঘটেছে চেতনার

বিকাশ। বাইরের কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চেতনারও ঘটেছে এই ক্রমোন্নতি। সুতরাং এই দুইটি তত্ত্বকে একসঙ্গে বুঝলে তবেই বিবর্তনবাদের সম্যক পরিচয় লাভ সম্ভব।

এইখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—এই আবরণ উন্মোচনের ব্যাপারটা কেমন করে সম্ভব হল? এ প্রশ্নের জবাব আমি পরে দেবো।

জড়ের মধ্যে যেমন 'দেহ', দেহের মধ্যে যেমন 'প্রাণ' এবং প্রাণের মধ্যে যেমন মন আবরিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি মনের মধ্যে আবরিত হয়ে আছে অধ্যাত্মচেতনা। শ্রীঅরবিন্দ যার নাম দিয়েছেন অতিমানসচেতনা। সেই অধ্যাত্মচেতনাকে অভিব্যক্ত করাই হল মানুষের পরমতম অভীপ্সা।

মনশ্চেতনা উন্মীলিত হবার পর মনোময় মানুষ ক্রমবিকাশের এমন একটি স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে যেখান থেকে পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ হতে হলে মানুষকে সচেতনভাবে সক্রিয় হতে হবে। কেননা মানুষ আত্মসচেতন জীব। জড় থেকে উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষ পর্যন্ত ক্রমপরিণামবাদের গতি একান্তভাবে প্রকৃতির প্রভাবেই পরিচালিত হয়েছে। কেননা, সেখানে জড়, উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণীর সক্রিয়ভাবে কিছু করার শক্তি ছিল না। কিন্তু মানুষ সে-শক্তি অর্জন করায় মানুষকে সচেতনভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হবার জন্য। অবশ্য প্রকৃতি তাকে সাহায্য করবে। তমসার থেকে জ্যোতির্ময়ের দিকে চেতনার যে ক্রমগতি মানুষই হল সেই গতিপথে একটি উজ্জ্বলতম মাইল ষ্টোন্। কিন্তু শেষ লক্ষ্য নয়। শেষ লক্ষ্য অধ্যাত্মচেতনার উন্মীলন।

মনের ওপারে অর্থাৎ beyond mind—কোনও উচ্চতর চেতনা নেই এই বিশ্বাস আধুনিক মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়েছে এই কারণে যে, মানুষ বুদ্ধি দিয়ে তার নাগাল পায় না। বুদ্ধির অধিগম্য যা নয়, তাকে স্বীকার করে নিতে আধুনিক মানুষ রাজী নয়। মানুষ সবকিছু বুঝতে চায় যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে। আজকের এই যুগটাকে সেই কারণে বলা হয় যুক্তিবাদীর যুগ। অর্থাৎ Rational age-এ যুগের মানুষের বিশ্বাস—যুক্তি-বুদ্ধিই হল তার জীবনের নিয়ন্তা, তার পরিচালক। বুদ্ধির শক্তি তার মধ্যে কি করে বিকশিত হল সে-তত্ত্বটি কিন্তু গভীরভাবে কেউ অনুধাবন করতে চায় না। আমরা চিরকাল কি Rational ছিলাম। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, কিংবা ঐতিহাসিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন আমরা sub-human বা অবমানবস্তরে ছিলাম তখন কোন্ শক্তি আমাদের পরিচালিত করত! Intellect না Instinct? Reason না Impulse? পীযূষবাবু আপনি কি বলেন!

নীতিনদার এই আকস্মিক প্রশ্নে পীযূষবাবু কেমন যেন বিচলিত হয়ে পড়লেন। মুহূর্তে বিহ্বলভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বললেন, তখন তো আমাদের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ ঘটেনি—সুতরাং তখন আমরা সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রবেগের দ্বারাই পরিচালিত হতাম।

—ঠিক বলেছেন, তখন আমরা Rational হইনি। তখন আমরা যে স্তরে ছিলাম শ্রীঅরবিন্দ তার নাম দিয়েছেন Infra-rational stage. এর পর একটু একটু করে আমাদের মধ্যে বুদ্ধির উন্মেষ ঘটতে লাগল। আমরা Rational স্তরে উন্নীত হলাম। তখন প্রশ্ন হল আমরা চিরকালই কি Rational হয়েই থাকব! না বুদ্ধির চেয়ে উন্নততর কোনও শক্তির অধিকারী হবো!

কথাগুলো বলেই নীতিনদা থামলেন। সকলকার দিকে তাকালেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

পীযূষবাবু বললেন, আমার তো মনে হয়, বুদ্ধির শক্তিই তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হবে। আপনি যেটাকে উন্নততর শক্তি বলছেন—তাকেই বলা যেতে পারে তীক্ষ্ণতর অথবা তীক্ষ্ণতম বুদ্ধি। অর্থাৎ ভবিষ্যতের মানুষ তীক্ষ্ণতম বুদ্ধির অধিকারী হবে একথা বলা যেতে পারে।

—আপনার সঙ্গে এ-বিষয়ে আমি একমত। ঈষৎ হেসে নীতিনদা মন্তব্য করলেন। তারপর বললেন,—তীক্ষ্ণতম বুদ্ধির শক্তিরও সীমা আছে যার মধ্যে তার ক্রিয়াশীলতা। এবং তাকেই বলা যেতে পারে মানুষী-

সীমা অর্থাৎ human limitation. কিন্তু মানুষকে যে তার আপন সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে। কেননা বিধাতার তাই অভিপ্রায়।

একটু ইতস্ততঃ করে পীযূষবাবু জিজ্ঞেস করলেন,—একটা প্রশ্ন করব নীতিনদা?

নীতিনদা মাথা নেড়ে প্রশ্নটা শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

উৎসাহিত হয়ে পীযূষবাবু বললেন,—আপনি যে বললেন, বিধাতার তাই অভিপ্রায়, কিন্তু বিধাতার কি অভিপ্রায় তা আমরা জানবো কি করে? বুদ্ধি দিয়ে তো বিধাতাকে ধরাই যায় না। তাছাড়া বুদ্ধি তাকে স্বীকার করতেও চায় না।

—চাইবে কি করে, বুদ্ধির যে সে-শক্তি নেই। যাই হোক, বিধাতার অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করব, এখন Rational স্তরের উপরে ওঠা মানুষের পক্ষে সম্ভব কিনা সেই প্রসঙ্গটা শেষ করি।

আমি বলেছি, মানুষ আগে ছিল Infra-rational, সে সময় সে পরিচালিত হত Instinct এবং Impulse এর দ্বারা। পরে Rational স্তরে সে উন্নীত হল, বর্তমানে সে সেই স্তরেই রয়েছে। বর্তমানে সে তাই Intellect ও Reason এর দ্বারা পরিচালিত। ভবিষ্যতে মানুষ উন্নীত হবে Supra-rational স্তরে, তখন সে পরিচালিত হবে Intuition অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের দ্বারা। এখানে যে-তত্ত্বটি বিশেষভাবে স্মরণীয় তা হল এই যে, বুদ্ধি হল একটি অন্তর্বর্তী Intermediary স্তর। তার আগে Instinct পরে Intuition. এই Instinct এবং Intuition পরিচালনার ব্যাপারে কখনও ভুল করেনা। যত ভুল তা সবই ঘটে Intellect এর দ্বারা। তাই Intuitionকে বলা যেতে পারে Instinct এর ঠিক উল্টোপিঠ।

এই বোধির অর্থাৎ Intuition এর সাহায্যে মানুষ তার অন্তঃপুরুষের সন্ধান পাবে এবং তখনই সে জানতে পারবে আপনার স্বরূপকে, স্বভাবকে এবং স্ব-ধর্মকে। এই অন্তঃপুরুষেরই অন্য নাম চৈত্যপুরুষ। জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গে এই চৈত্যপুরুষকেই আমরা বলে থাকি জীবাত্মা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলেছেন 'পাকা আমি'। এই অন্তঃপুরুষকে না জানতে পারলে মানুষের পক্ষে তার ব্যক্তিজীবনের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব নয়।

নির্বাসন

(গল্প)
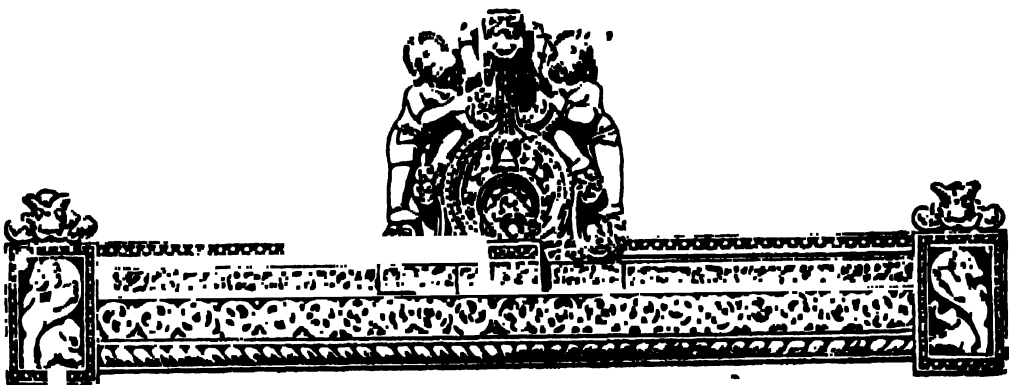
রথীন্দ্রনাথ ঘোষ

লাষ্ট শান্তিপুর লোকালটা তিন নম্বর প্লাটফর্মে এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে মুখার্জী, ভট্টাচার্য, দত্ত এবং ঘোষের মত দে'বাবুও তাঁর সাতাত্তর বৎসরের ভারী এবং জীর্ণ শরীরটাকে তুলে ছুঁড়ে দিলেন কম্পার্টমেন্টের মধ্যে।

দত্ত রেগে উঠলো.—"আপনার কি দরকার বলুন তো এভাবে লাফিয়ে ট্রেনে ওঠা, বুড়ো বয়সে হাত-পা ভাঙবেন নাকি ?

দে'বাবু অবশিষ্ট দাঁত দুটি বের করে হাসলেন।—তোরা দেখছি আমাকে জোর করে বুড়ো করিয়ে ছাড়বি। আরে বাবা' আমার গায়ে যা শক্তি আছে তাতে তোদের মতো দু-দুটো ছোকরাকে ছুঁড়ে দিতে পারি বুঝলি ?

ওরা সকলে হেসে ওঠে। ওরা জানে শঙ্করপ্রসাদ দে বার্দ্ধক্যের যন্ত্রণাকে দারুণ ভয় করেন। জীর্ণ-শার্ণ,বয়সের ভারে নুয়ে পড়া কোন মানুষকে দেখলেই তিনি অসহায় বোধ করেন। কোন কোন সময় ভয়ে আঁৎকে ওঠেন। নিজের শরীরটাকে টান টান করে সোজা করেন। মনে মনে বয়সটাকে জোর করে ভুলে যাবার চেষ্টা করেন। দত্ত যখন রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা খুড়ো, আপনি তো আমাদের বাবাদের সঙ্গে মিশতেন। এখন আমাদের দলে ভীড়লেন কেন ? দে'বাবু তখন সকলকে সচকিত করে হো-হো করে হেসে ওঠেন, বলেন—তোদের বাবাগুলো যে হঠাৎ মরে যেতে আরম্ভ করলো। তাই আমার পালা আসবার আগেই তোদের কাছে পালিয়ে এলাম। এখন তোদের মাঝখান থেকে কেড়ে নেবার সাধ্য যমের বাবারও নেই।

পাশাপাশি সবাই উচ্চ শব্দে হাসে। এরা এই সদা হাস্যময় বৃদ্ধকে ভালবাসে। দৈনিক অফিস যাওয়া-আসার পথে এরা পথের ক্লান্তিকে ভুলে থাকার জন্যই হৈ-হল্লোড় করে, শব্দ করে হাসে, তাস খেলে। আর দে'বাবু এই কয়েকজন তরুণের হৈ-হল্লোড়ের মধ্যেই নিজের অস্তিত্বকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করেন। মনের মধ্যে বয়সের ভয়াবহ চাপটা এদের মধ্যে এলেই যেন অনেকটা কমে যায়। অনেক দিনের হারিয়ে-যাওয়া তরুণ মনটা আজকে সাতাত্তর বৎসরের ক্ষত-বিক্ষত ধূসর মনের ওপর যেন একটা সবুজ ছায়া ফেলে। ব্যানার্জী এসে বললো.—"এই যে খুড়ো, একটু সরে বসতে হবে। তাসাপাটি বসাবো"।

দে'বাবু মিটমিট করে দত্তর দিকে তাকালেন—কই হে প্রেসিডেন্ট, তোমার রুলে কি বলে ? আমার কি সরে বসা উচিত ? দত্ত তাস সাজাতে সাজাতে উত্তর দিল—"প্রয়োজন হলে তাসখেলার জন্যে জায়গাটা ছেড়ে দিতেও হতে পারে।"

দে'বাবু হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন।—"তোমার নিয়ম বড় কড়া হে।"

দত্ত আড়চোখে তাকালো—"তবে আপনার জন্যে আমার রুলে একটু কনসিডারেশন আছে। কই, এদিকে আসুন।

সকলকে একটু ঠেলেঠুলে জানলার পাশে জায়গা করে দিল দত্ত। বললো,"—জানালার পাশে বসে হাওয়া খান।"

দে'বাবু বসতে বসতে ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করলেন—"থ্রী চীয়ার্স ফর প্রেসিডেন্ট—

মুখার্জী, ভট্টাচার্য, গাঙ্গুলী গলা মেলালো—হিপ্ হিপ্ হুররে।

এই রকমই এদের প্রতিদিনকার জীবন। সারাদিনের কাজ, জটিলতা, অভাব-অনটন সবকিছু এইখানে এদের

হৈ হল্লোড়ের তলায় চাপা পড়ে যায়। এই কয়েকটা ঘণ্টা এরা ভরা নদীর থৈ থৈ জলের মত আনন্দে ভরে থাকে দে'বাবুও এদের মধ্যে থেকে হৃদয়টাকে ভরিয়ে নেন। মনটাকে তাজা করে তোলেন। তাঁর মনে হয় তিনি বেঁচে আছেন এবং থাকবেন

ট্রেন চলতে আরম্ভ করে। দত্ত, মুখার্জী, গাঙ্গুলীরা তাস খেলতে থাকে! ওরা হার্টস, স্পেড ডায়মণ্ড নিয়ে মেতে ওঠে। দে'বাবু তাস খেলতে জানেন না। শিখতে কোনদিন চেষ্টাও করেন নি। কেন যেন তিনি মন থেকে সমর্থন পাননি। ওরা খেলায় মেতে ওঠে। দে'বাবু ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসেন, কথা বলেন আর মধ্যেমধ্যে অলস দৃষ্টিটাকে ছুঁড়ে দেন বাইরের অন্ধকারে ঘেরা পঁয়ত্রিশ বছরের পরিচিত লাইনের ধারের গাছ, বাড়ী এবং আকাশের দিকে।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই জীবন আরম্ভ হয়েছিল দে'বাবুর। বি, এ, পাশ করার পর এই চাকরীটা পেয়েছিলেন তিনি। সেদিনের তরুণ শঙ্কর প্রসাদ দে অনেক রঙিন আশার স্বপ্ন দেখেছিলেন। অনেক বড় হবার স্বপ্ন, সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার স্বপ্ন। কিন্তু সমস্ত আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

ছেলের বিয়ে দেবার জন্য যখন বাবা চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন তখন শঙ্কর মাকে অনেক বুঝিয়েছিল। অনেক অনুনয় বিনয় করেছিল। মায়ের হাত ধরে বলেছিল, মা, আমাকে আরও কিছুদিন সময় দাও। আমাকে প্রতিষ্ঠা পেতে দাও, আমাকে আরও বড় হতে দাও। সময় হলে দেখবে আমি আর আপত্তি করবো না। মা মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন,—"বিয়ে করলে কি কারও বড় হবার পথ বন্ধ হয়রে বোকা! মাথার ওপরে তো তোর বাবা রয়েছেন, তোর চিন্তা কিসের?

"না মা তুমি বাবাকে কিছুদিন সময় দিতে বলো।"

মা আপত্তি করেছিলেন।—"সে আমি তোর বাবাকে বলতে পারব না। তুই তোর বাবাকে চিনিস। যদি কিছু বলার থাকে, তুই নিজেই বলিস।

না। শঙ্কর বাবার সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারেনি। তা ছাড়া কোন ফলও হত না। বাবা সব কথা শুনে হয়তো গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে থাকতেন মুখের দিকে। তারপর গম্ভীর স্বরে বলতেন, "যাও নিজের কাজে মন দাও গে।"

সুধা এলো নববধূ হয়ে। কতই বা বয়েস তখন ওর, চৌদ্দ কিংবা পনেরো। খুব দুরন্ত ছিল ও। চলন্ত ট্রেনের মধ্যে থেকে যেমন বাইরের চলমান গাছ বাড়ী আর আকাশকে দুরন্ত মনে হয় ঠিক তেমনি ছিল সুধা। ছুটছে, কেবল ছুটছে, ওকে সহজে হাতের নাগালে পেতোনা শঙ্কর। শুধু সন্ধ্যেবেলায় সুধা নিজেই এসে ধরা দিত। যেন একটা দুরন্ত ফুটফুটে পাখি সারাদিন ছোটাছুটি করে সন্ধ্যেবেলায় একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে এসে লুটিয়ে পড়তো।

কিছুদিন শঙ্কর আনন্দে বিভোর ছিল। শুধু আনন্দ আর আনন্দ। কিন্তু হঠাৎ একদিন চমক ভাঙলো। গোটা সংসারটা যেন এক প্রবল ভূমিকম্পের ধাক্কায় বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বাবা মারা গেলেন। শঙ্কর সেদিন বুঝতে পারলো গোটা সংসারটা একটা ফাঁপা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। বংশগত আভিজাত্যকে বজায় রাখতে গিয়ে বাবু সব শেষ করে রেখে গেছেন। শুধু বাড়ীটা ছাড়া আর কিছুই নেই। তবুও শক্ত হাতে ভেঙে-পড়া সংসারটার হাল ধরলো। টাল সামলাতে না সামলাতে মা গেলেন। পর পর দুটি ধাক্কার চোটে শঙ্কর স্তব্ধ হয়ে গেল। আর সুধার কেমন হঠাৎ বয়েস বেড়ে গেল। মনে হল ও যেন একলাফে দশটা বছর এগিয়ে এসেছে।

ইতিমধ্যে অপর্ণা আর খোকা এলো। সুধা ওদের নিয়ে মেতে রইল। আর শঙ্কর শুধু বলদের মত প্রাণপণ শক্তিতে মাল বোঝাই গাড়ীটাকে টানতে টানতে, এগিয়ে চলতে চেষ্টা করছিল।

নৈহাটিতে গাড়ী থামলে গাঙ্গুলী, ঘোষ এবং ব্যানার্জী নেমে গেল। ওরা এখানেই থাকে। তাসের পাঠ চুকিয়ে মুখার্জী, ভট্টাচার্য দত্ত এবং দে'বাবু চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিলেন। দে'বাবুর এই নেশাটাও সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার। প্রথম সময়ে সিগারেটও খেতেন। কিন্তু পরে সংসারের এবং পকেটের বাজেটের জটিল অবস্থাটাকে একটু চাপা দেবার জন্যই সিগারেটটাকে বাতিল করে দিতে হয়েছে।

স্নানাঘাটে গাড়ী এলো প্রায় পৌনে দশটায়। মুখার্জী ও ভট্‌চায থাকে ষ্টেশনের ও পাশে। দে'বাবু সিদ্ধান্ত-পাড়ায় আর দত্ত চূর্ণার ধারে। দত্ত একটা রিক্সা নিল। দে'বাবু বললো—আসুন খুড়ো, আপনাকে বাড়ীর পাশে নামিয়ে দিয়ে যাই।

দে'বাবু ঘাড় নাড়লেন—নাহে না। তোদের ঘুণধরা শরীর বলেই নড়বার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার লোহার শরীর, না নড়ালেই মরচে ধরবে।

দত্ত ছাড়লোনা। জোর করে দে'বাবুকে রিক্সায় তুলে নিল। ষ্টেশনের এদিকে কোন কাজ না থাকলে দত্ত যেদিনই সোজা বাড়ী যায় সেদিনই দে'বাবুকে জোর করে রিক্সায় তুলে বাড়ীর পাশে নামিয়ে দিয়ে যায় ওরা সবাই এই সদা হাস্যময় বৃদ্ধকে ভালোবাসেন এবং শ্রদ্ধা করে।

বাড়ীতে পৌছে হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেলেন। এই চা নিয়ে সুধা আজকাল বকাবকি করে। "এত রাত্রে কেউ চা খায় নাকি? হাত মুখ ধুয়ে একেবারে ভাত খেয়ে নিলেই হয়। তা নয়, শুধু বিষ গেলা।"

সুধা আজকাল কেমন কর্কশ হয়ে গেছে। দে'বাবু চুপচাপ ইজিচেয়ারে শরীরটাকে মেলিয়ে দিয়ে বারান্দার ফাঁক দিয়ে আকাশটাকে দেখতে চেষ্টা করেন। বাড়ীতে এলেই কেমন যেন নিজেকে নিষ্প্রভ মনে হয় দেবাবুর। আকাশের দিকে ঘোলাটে দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিয়ে মনে মনে অনুভব করেন বয়েসটা সত্যই অনেক বেড়ে গেছে।

খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় চোখ বুজে শুয়েছিলেন তিনি। ঘুম আজকাল চট করে আসেনা। এলোমেলো চিন্তার একটা প্রচণ্ড স্রোত মস্তিষ্কের কোষে কোষে পাক খায়। হঠাৎ পায়ের শব্দে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন, সুধা আস্তে আস্তে এসে বিছানায় বসলো। দে বাবুর মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছো?"

"না ঘুমুইনি। এত তাড়াতাড়ি তো আজকাল ঘুমুতে পারি না।" মাথায় হাত বোলাতে বোলাতেই সুধা বললো,—"তোমার শরীরটা আজকাল খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই ঠিকমত টিফিন খাওনা।"

—"শরীরের আর দোষ কি বল। বয়স তো হচ্ছে। এবারে তোমাদের রেখে ভালোয় ভালোয় যেতে পারলেই হল।"—দে বাবু চাপা গলায় বলেন। সুধা একটু থেমে রইল। পরে শান্তস্বরে বললো,—"তুমি এত চিন্তা করছো কেন বলো তো? খোকা বড় হয়েছে। এবারে একটা চাকরী-বাকরী পেলে তোমার পাশে তো দাঁড়াতে পারবে।"

"না সুধা।"—দে বাবু অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। —"কারও কাছে আমার কোন দাবী নেই। নিজের জীবনটা তো আমি কোন রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে শেষ করে এনেছি। খোকা মানুষ হোক, বড় হোক তাহলেই আমি সুখী হব।"

—"কিন্তু লোকে তো ছেলে চায় শেষ বয়সে একটা অবলম্বনের জন্য।" দে বাবু এ পাশ ফিরে শুলেন।—"লোকে কি চায় আমি জানিনা কিন্তু আমি তা চাইনা। আমার অবলম্বন হিসেবে তো আমার পেনশন থাকবে। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকাটা লিখে দেব। খোকার জীবনটা ওর নিজের জন্যেই থাক। আমার মত ওকেও যেন সারা জীবন হোঁচট খেয়ে না চলতে হয়। খোকা সুখী হোক এই আমার একমাত্র কামনা। আমাদের বোঝা যেন ওকে না বইতে হয়।

সুধা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর থেমে থেমে বললো,—"খোকা আজ তপনের বাবার কাছে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন ব্যাঙ্ক থেকে ইণ্টারভিউ কয়েকদিনের মধ্যেই এসে যাবে —কিন্তু

সুধা একটু হোঁচট খেয়ে থেমে গেল। দে বাবু বুঝলেন সুধা কিছু বলবে। সংসারের দাবার ছকটাকে উনি এখন খুব ভাল করেই চিনে নিয়েছেন। সুধা, খোকা—এরা সচরাচর এই মানুষটির খুব কাছে আজকাল আসেনা। যখন প্রয়োজন পড়ে তখন কাছে আসে, একথা সে কথার পর আসল কথাটা বলে। দে'বাবু বুঝতে পারেন যতই তাঁর বয়স বাড়ছে ততই যেন তিনি দূরে সরে যাচ্ছেন। তাঁর দাম যেন ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নিজেকে খুব একলা মনে হয়। এদের

পাশাপাশি নিজেকে খুব অসহায় বোধ করেন। যখন এই অস্বস্তিকর একাকিত্বকে সহ্য করতে পারেন না তখন তিনি এদের সঙ্গে কথা বলতে চান, হাসতে চান। কিন্তু সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত এই ক্ষয়িষ্ণু বৃদ্ধকে সুধা কিংবা খোকা কেউ কাছে টেনে নিতে পারে না মাঝখানে একটা ব্যবধান যেন ক্রমশঃই বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অপর্ণা যেন একটু অন্যরকম. ও শ্বশুরবাড়ী থেকে এলে বাবার হাতের কাছে কাছেই থাকে। হরবর—হরবর করে অনেক কথা বলে। সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু খোকা. সুধা এরা যেন ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছে। একটা বিরাট প্রান্তরে দে বাবুকে একলা রেখে ওরা অনেক দূরে সরে যাচ্ছে, আর উনি একটা ভারি জোয়াল কাঁধে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে এগিয়ে যেতে চাইছেন।

"বলছিলাম যে"—সুধা আবার আরম্ভ করলো —"ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে পাঁচজন লোকের সামনে দাঁড়াবার মত খোকার তো কোন জামা কাপড় নেই। তাই ও বলছিল আজকাল কি সব টেরিলিন ফেরিজিন বেরিয়েছে, তার একটা জামা আর প্যাণ্ট করাবার কথা।

—"কিন্তু টেরিলিনের জামা আর প্যাণ্ট করাতে কত খরচ লাগে জানো?"

—"কত আর। খোকা বলছিল সওয়াশো টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে।"

"সুধা।"—দে বাবু চোখ মেলে তাকালেন।— 'সংসারের আসল অবস্থাটা তোমার তো অজানা নয়। এই দুর্দিনের বাজারে সংসার চালানোই কষ্টকর। তা ছাড়া আমার অবস্থাটাও তোমার জানা উচিত। মান্থলি টিকিট কাটাবার পর আমার হাতে মাত্র কুড়িটা টাকা অবশিষ্ট থাকে। কাজেই সওয়াশো টাকা তোমাদের কাছে কিছুই না হতে পারে কিন্তু আমার কাছে তার মূল্য অনেক। আমি যে একজন ছা-পোষা কেরানী এ কথা তোমরা ভুলে যাও কেন?"

সুধা এবারে অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলো।—তাহলে কেরানীর সংসার করার সখ হয়েছিল কেন? তোমার হাতে পড়ে আমার জীবনটাতো জলে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল? ছেলে মেয়েও কত পাপ করেছিল তাই এই পোড়া সংসারে জন্ম নিয়েছে।

দে বাবু কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর থমথমে গলায় বললেন—"দোহাই সুধা, আজ শেষ বয়সে এসব কথা শুনতে খুব কষ্ট হয়। আমার সঙ্গে তোমাদের জীবনগুলো যে ব্যর্থ হয়েছে এ তো আমি জানি। আমার বয়স হয়েছে। বছরখানেক পরে রিটায়ার করবো। তারপর আর কটাদিন বাঁচবো বল? একজন ছা-পোষা কেরানীর যে সংসার করা উচিত নয় একথা সেদিন মাকে বোঝাতে পারিনি বলেই তোমাদের আজ এই অবস্থা। কিন্তু তবুও আজও যখন তোমাদের কোনোরকমে বাঁচিয়ে রেখেছি তখন আমি যে কটা দিন বেঁচে আছি সে কটা দিন আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও সুধা।"

সুধা সোজা হয়ে দাঁড়াল। সারাজীবন তোমার তো অনেক কান্নাই শুনলাম। কিন্তু আজ কিছু শুনতে চাইনা। ছেলের জামা প্যাণ্ট ধার করেও করিয়ে দিতে হবে। সখ করে চেয়েছে, আমি তো না বলতে পারি না। দে বাবু দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরালেন। বুকের মধ্যে একটা চাপা ব্যথা অনুভব ক'রলেন। এরা কেন যে তাঁকে বুঝতে পারে না, তিনি ভেবে পাননা। যে লোকটা ভাল করে টিফিন খেতে পায় না, নিজের জামা কাপড় করাতে পারেনা, চিন্তায় চিন্তায় ঘুমাতে পারেনা—তার জন্য এদেরএতটুকু সমবেদনা নেই কেন? এই কি সংসারের নিয়ম? সময় বুঝে যে যার দলে ভীড়ে যায়। অথচ যে লোকটা গোটা জীবন ধরে সংসারের প্রত্যেকটি লোকের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে গেল তার কোন মূল্য নেই। এক কানাকড়িও না।

দে'বাবু বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে গিয়ে একবার দাঁড়ালেন, তারপর টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে একটু জল খেয়ে আবার তিনি বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে ঘুমাবার চেষ্টা করলেন। সময় তো থেমে নেই। যতক্ষণ সক্ষম আছেন ততক্ষণ সংসার নামের ঘানিটির চারপাশে নাকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় পাক খেতেই হবে। এর থেকে মুক্তি নেই। সুতরাং অফিস আছে, জীবন আছে। আর আছে দত্ত, মুখার্জী, ভট্টচায, ঘোষ, গাঙ্গুলী, এবং ব্যানার্জী, ওরা হার্টস্, স্পেড, ডায়মণ্ড নিয়ে মাতবে, চেঁচাবে, হাসবে, কথা বলবে, হৈ হল্লোড় করবে। আর দে'বাবু ঐ তরুণদের মাঝখানে বসে জীবন যন্ত্রণার চাপটাকে কমাতে চেষ্টা করবেন। সব কিছু ভুলে থাকার জন্য প্রাণখুলে হাসবেন, কথা বলবেন, আর মাঝেমাঝেই আজকের সাতান্ন বৎসরের ক্ষত-বিক্ষত ধূসর মনের গভীর থেকে অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া তরুণ এবং সবুজ মনটাকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে পেতে দেখতে চেষ্টা করবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কনফেশনস্ অব এ ইয়ং বেঙ্গল প্রসঙ্গে

কানাইলাল দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি রচনার সঙ্গে এ যুগের পাঠকের পরিচয় কম। অবশ্য বাঙলার তুলনায় তাঁর ইংরেজি লেখার পরিমাণও নগণ্য। একমাত্র রাজমোহনস্ ওয়াইফ (বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস) ছাড়া অন্যান্য সব ইংরেজি লেখাগুলি প্রয়োজনের তাগিদে সমকালীন সামাজিক ও মানবীয় ঘটনার উপর রচিত। এই রকম একটি রচনা হলো দি কনফেশন অব এ ইয়ং বেঙ্গল। প্রবন্ধটি বঙ্কিম-বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখার্জীর 'মুখার্জীস ম্যাগাজিনে' প্রথম প্রকাশিত হয় (১৮৭২)। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে প্রকাশিত এই লেখাটিতে যেসব সামাজিক সমস্যাদি আলোচিত হয়েছে আজকের সমাজেও সেগুলি কোন না কোন আকারে বর্তমান রয়েছে।

এই প্রবন্ধ রচনাকালের পূর্বের কয়েকটি দশকের কলকাতা বোধ করি আজকের চেয়ে বেশি অস্থির ছিল। সেদিনকার যুবসমাজ ইংরেজিয়ানার মোহে অনেক মন্দ কাজ করেছেন। বিদেশী সরকার যে শিক্ষা (ইংরেজি) ব্যবস্থা করেছিলেন তার দ্বারা ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার কথা নয়। পাদরিরা সরকারী কর্মচারিদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে ভারতীয় ধর্ম, শিক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে চিত্রিত করেন। বঙ্কিমের আবির্ভাবের অব্যবহিতপূর্বে এর প্রতিকারে একদল তরুণ ব্রতী হন। কিন্তু তাদের সে-প্রচেষ্টা তখনই বিশেষ ফলবতী হয়নি। অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষিত যুবক স্বধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিদেশীর চোখ দিয়ে দেখে হীনমন্যতায় ভুগতে থাকেন। কেউ কেউ বঙ্গ-জননীকে শাড়ি ছাড়িয়ে স্কার্ট পরিয়ে আধুনিক করবার চেষ্টা করেন। এরই মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দেশজননীকে তাঁর ভাল মন্দ সব কিছুকে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা ও ভক্তি দিয়ে স্বীকার করে প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে আবির্ভূত হলেন। বঙ্কিমের হৃদয়ে অজ্ঞ-দরিদ্র দেশবাসীর প্রতি যে স্বতোৎসারিত ভালবাসা ছিল তার মূল এইখানেই। দেশমাতাকে এই দৃষ্টি দিয়ে দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই তিনি দেশবাসীর হৃদয়ের মর্মস্থলে পৌঁছিতে পেরেছিলেন এবং যথার্থভাবে সত্যকার দেশকে জানতে পেরেছেন। তা যদি না হতো তা হলে কিছুতেই তিনি হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তের (বঙ্গদেশের কৃষক) জীবন কথা লিখতে পারতেন না।

শোভাবাজার (কলকাতা) রাজবাড়ির মহারাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের ঠাকুরমার শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে জেনারেল অ্যাসেম্বলিস্ ইনস্টিটিউশানের (বর্তমান স্কটীশ চার্চ কলেজ) অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেব কুযুক্তি ও কটূক্তিপূর্ণ কয়েকখানি দীর্ঘ চিঠি স্টেট্সম্যান কাগজে প্রকাশিত করেন। এই অন্যায় ও অসত্য অভিযোগের বঙ্কিমচন্দ্র যে উত্তর দিয়েছিলেন নানাকারণে তা বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে। ভারতবাসীর ভালমন্দ সবকিছু সম্পর্কে এমন প্রত্যয়শীল ও যুক্তিপূর্ণ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের মুখোমুখি ইংরেজরা এর আগে কোনদিন হয়নি। বঙ্কিম অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে বলিলেন ভালবাসা না থাকলে সত্য জানা যায় না। আরো বলেন যিনি ভালবাসতে জানেন এমন লোকের কাছেই শিক্ষা নিতে হবে। তাই তিনি অতিশয় দৃঢ়ভাবে লিখেছিলেন—ভারততত্ত্ব ও ধর্ম-শিক্ষাদান কোন বিদেশী শিক্ষকের নিকট সম্পূর্ণ হতে পারে না, এ ব্যাপারে ভারতীয় শিক্ষক চাই। ইংরেজরা ভারতীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করেন নি বলে ভারত সম্পর্কে তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ছিল।

ইংরেজরা হিন্দুধর্মাদি পড়িত এর দোষানুসন্ধানের

জন্যই। তারা যখন আমাদের ইংরেজি শেখাতেন তখন শিখার সঙ্গে শিরটি দেবার মতই হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও প্রাশ্চাত্য সভ্যতা এবং খ্রীষ্টানী ধর্ম মানবমুক্তির একমাত্র সত্য পথ বলে তুলে ধরতেন! নিত্য যা পড়াতেন, নিত্য তা শেখাতেন; কখনো সভা-সমিতি বিতর্ক বৈঠকে, কখন পারিবারিক ভোজসভায়। তাই অনেক বাঙালী তরুণ তাদের অসামান্য প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা সত্বেও একপ্রকার অপ্রতিরোধ্য হীনমণ্যতা ও তুচ্ছতাবোধ দ্বারা পীড়িত হতেন। এ থেকে মুক্তিলাভের জন্য তাঁরা ঘরে বাইরে উৎকট সাহেব হবার সাধনা করতেন। এর জন্য ইংরেজী বাৎচিৎ, বেশভূষা, খাদ্য পানীয়, আদব কায়দা এমনকি গাড়ি ঘোড়া আসবাবপত্রাদির ও আমরা নকল করে থাকি। অনুকরণ করলে চাটুকার হতে হয়। আর সে জন্যই বোধহয় আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার সময়ও "নাইন পার্ট ব্রোকেন ইংলিশ ওয়ান পার্ট পিওর বেঙ্গলি" ব্যবহার করেও লজ্জিত হই না।

সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের বহিরঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী দ্রুত ইংরেজভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে এই মন্তব্য দিয়ে বঙ্কিমের দি কনফেশনস্...প্রবন্ধটির সুরু হয়েছে। সাহেব বনিবার অত্যুগ্র প্রলোভনে সেদিনকার 'শিক্ষিত' যুবকরা—যারা ইয়ং বেঙ্গল নামে খ্যাত—যে আবর্ত সৃষ্টি করেছিলেন, স্বসমাজ ও স্বধর্মের বিরুদ্ধে যে সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন সে তুলনায় আজকের পরিবেশে বর্তমানকালের ছাত্র ও যুবসমাজের আন্দোলন তথা বিদ্রোহাত্মক আচরণ বোধ হয় অনেক বেশি সংযত ও সুভদ্র। ডাফ, ডিয়ালটি, ডিরোজিও, রিচার্ডসন, ওয়ার্ড, উইলসন প্রভৃতি সেদিনকার ঘটনার প্রকাশ্য নেপথ্য নায়কেরা তাদের অনেক হিতকর কাজ সত্বেও এই একটি মাত্র অপকর্মের জন্য নিন্দিত হয়ে আছেন। আজকের যুব-সমাজকে যারা ভ্রান্তপথে পরিচালিত করছেন অনেক সুকৃতি সত্বেও তাদের অদৃষ্টে একই রকম ধিক্কার উত্তর-সুরীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে।

ইংরেজ যখন এদেশে ব্যবসায়মাত্রে লিপ্ত ছিলেন। তখন বাঙালী কি ব্যবসায়-বুদ্ধিতে কি অন্যান্য ক্ষেত্রে কখনও পিছু হঠেন নি। পরন্তু সেই আদি যুগে বাঙালী প্রতিভাকে তারা বেশ শ্রদ্ধা ও সমীহ করেই চলতেন। কিন্তু ইংরেজ যখন ক্ষমতার আসনে জেঁকে বসলেন এবং বাঙালী যখন ইংরেজ হবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন তখন থেকেই অবস্থান্তরের সূত্রপাত হয়। বৈষয়িক ও সাময়িক লাভের লোভ যেমন, তেমনি নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের প্রত্যাশায়ও অবিলম্বে ইংরেজের অনেক চাটুকার জুটলো। ইংরেজের মত কর্মদক্ষ হবার আশায়ও বহু ইয়ং বেঙ্গল সাহেব হতে চেয়েছিলেন। কিছু কিছু বাড়াবাড়ি ঘটেছিল কোথাও কোথাও—মদ্যাদি পান, নিষিদ্ধ মাংসাদি ভোজন এমনকি পিতামাতা আত্মীয় বন্ধু জীবন ও জীবিকার আশ্রয়ও তারা সেজন্য ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হন নি। পূর্ণ বিশ্বাস ও অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা নিয়েই তাঁরা এসব করেছিলেন। সেই দুরন্ত আত্মপ্রত্যয় সাহস ও সত্যনিষ্ঠার তুলনা মেলা ভার! তাদের কৃতকর্মের মধ্যে যে অসম্মান ও অমর্যাদার কশাঘাৎ রয়েছে এ কথা শুনবার মত ভাষায় ও বুঝবার মত কথায় বঙ্কিমের পূর্বে আর কে বলেছেন?

বিরল বৈদগ্ধের সঙ্গে ঋষির ধ্যানদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। দেশমাতৃকাকে এক দৃষ্টিতে দেখলে কলম দিয়ে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত বের হয়,—তা আবার ইংরেজ রাজত্বের মহেন্দ্রক্ষণে—এ কথা ভাবলেই বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। ইংরেজিয়ানার যারা জাতীয় অমর্যাদা ও অসম্মানের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত না হলে বঙ্কিমের বন্দেমাতরম রচনা ব্যর্থই হতো। কোথায় রাজসাহীর কোন জমিদার ছোটলাটকে খুসি করার জন্য কুকুরের গাড়ি করেছে, কারা নেমন্তন্ন করলে আনন্দে আমরা ডগমগ হই, কে সেলাম দিলে আমাদের বুকটা উঁচু হয়,—ইত্যাদি সত্য ঘটনার বিদ্রূপাত্মক পরিবেশন যেন বাঙালীর পিঠে চাবুকের মত পড়েছে। হাজার চেষ্টা সত্বেও যে আমাদের ইংরেজি উচ্চারণের বাঙালটানটা যে থেকেই যায়, অথবা চেষ্টাসত্বেও পোষাকের ত্রুটি দূর হবার নয়,—এ সব চোখে আঙুল

দিয়ে দেখিয়ে দেবার পর লজ্জা পেয়ে প্রতিকারের পথ দেখতেই হয়। বঙ্কিম বলেছেন ইংরেজিয়ানা হিন্দুর তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ দেবদেবীকে উদ্বাস্তু করে সেই শূন্য স্থানে আরাম আর মান—কে বসিয়েছে। আমাদের যৌথ পরিবার যে ভেঙে গেল তার জন্য এই আরামের প্রলোভন কতটা দায়ী, কতটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ফল তা বিতর্কের বিষয়। সহযোগিতার প্রথম এবং প্রধান ক্ষেত্র যৌথ পরিবার ভেঙে দিয়ে আমরা যৌথ প্রচেষ্টা ও সমবেত সহযোগিতায় যারা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়তে প্রবৃত্ত হই। এ সব নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব সুন্দর আলোচনা করে দেখিয়েছেন কেমন করে আমরা আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হই।

আর মান? মানীকে? তারও একটি বিবরণ এই প্রবন্ধে আছে। যার গাড়ি আছে তার মান আছে। সেই প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বঙ্কিম আক্ষেপ করেছেন—বৈশ্য সভ্যতার প্রসারের ফলে পুরুষানুক্রমিক শিক্ষা সংস্কৃতির সাধনা মানুষকে আর মর্যাদার অধিকারী করে না, মর্যাদার চাবিকাঠি এখন ব্যাঙ্কের জমানো টাকার স্ফীতির উপর নির্ভর করে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার একবার এই মানের ঠেলায় দড়ি সমেত ঘটিটা কূয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। নিজে হাতে জল তোলা তখন ইজ্জতহানির ব্যাপার ছিল, বিশেষত অপরের চোখের সামনে।

পুরাতনকে সরে গিয়ে নতুনকে স্থান দিতেই হবে। এ নিয়ে যে বিরোধ তা স্বাভাবিক। ওটা সংস্কারের পথ। কিন্তু সংস্কারের পরিবর্তে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা ক্ষতিকর। হিন্দুধর্ম তথা ভারতধর্মকে সর্বপ্রযত্নে নিশ্চিহ্ন করার অন্তহীন উদ্যমের মধ্যে কোন কল্যাণ থাকতে পারে না। সংস্কারসাধনের কাজ সকলের দ্বারা হয় না। তার জন্য উপযুক্ত সময় ও লোকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। উনিশ শতকের সমাজজীবনে যে-আলোড়ন ছিল তা পরিমাণগতভাবে আজকের তুলনায় কিছু কম বেশী হতে পারে কিন্তু গুণগতভাবে একই ছিল, যদিও উপলক্ষ্য ভিন্ন এবং টেকনিক ও ট্যাকটিকসের কিছু অদলবদল ঘটেছে। সেই উনিশ শতককে আমরা আজ বাঙালির স্বর্ণযুগ ও ভারতবর্ষের নবজাগরণের শতাব্দী বলে বন্দিত করি। তেমনি বর্তমানের নানা ভয়ঙ্কর অবস্থা সত্ত্বেও আগামী দিনের মানুষ আজকের মানুষের শ্রমের ফসলে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ হবে। অতএব ঘটমান বর্তমানের দুর্যোগ দেখে শঙ্কিত হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র "হিন্দু' সম্পর্কে যা বলেছিলেন—সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে' সে কথা সত্য; ভারতবর্ষ ও হিন্দু অভিন্ন। হিন্দু কোন বিশেষ ধর্মমাত্র নয় এ একটা মানসিকতা।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করেছেন—হিন্দুত্বকে তো ছুয়ো দিচ্ছ কিন্তু তার সঙ্গে মুহূর্তের জন্য তুলনা করা যেতে পারে আমাদের মধ্যে এমন আত্মভোলা নির্মল চরিত্রের নির্বাক সাধক কৈ? কেবল তাই নয়—শ্রেয়বোধের প্রতি তার চিরজাগ্রত দৃষ্টি থাকা চাই, তাকে অধ্যয়ন লক্ষ্যধ্যানে অভিনিবিষ্ট হতে হবে। তিনি হবেন রাজনীতি বহির্ভূত দেশপ্রেমিক ও বিনয়ী।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই দুর্যোগের দিনে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন—প্রগতির নামে কি মর্যাদাহীনতা ও অসম্মানের ডালী আমরা মাথায় করে রাখি। প্রাথমিক মোহাচ্ছন্নতা কাটবার পর ইয়ংবেঙ্গল সৃষ্টিশীল গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানের শ্রদ্ধাহীনতা ও বিরোধ একদিন হ্রাস পাবে আর ইতিমধ্যে নতুন পথ নির্দেশক অর্থাৎ আর একজন বঙ্কিমচন্দ্র যতদিন না আসছেন আসুন, বঙ্কিম পড়ি—সেখানে পথের দিশা মিলতে পারে।

যত আঁধার তত আলো

(উপন্যাস)

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানাল মৃদুলা।

মৃগাঙ্ক ঘরে প্রবেশ করতেই মৃদুলা পুনরায় বলল, কেতকী বলছিল আপনি কিছুতেই আসবেন না। কিন্তু আমি জানি আপনি আসবেন।

মৃগাঙ্ক হেসে বলল, কেতকী এই কথা ব'লল বুঝি? কখন দেখা হলো আপনার সঙ্গে?

মৃদুলা বলল, আজ সকালে এসেছিল। কি জানি সব সাপের ভয় দেখিয়েছেন। মাগো মা আপনি এতোও পারেন।

মৃগাঙ্কর কান এবং দৃষ্টি সজাগ হ'য়ে উঠল, দাঁড়ান দাঁড়ান সাপের কথা কি সব ব'লছিলেন না আপনি।

মৃদুলা বলল, আমি কেন বলবো কেতকী বলছিল। কিন্তু মজা কি জানেন···ভয় দেখিয়েও আপনিই ভাল নাম কিনলেন।

মৃগাঙ্ক বলল, ভাল বুঝলাম না।

মৃদুলা বলল, আমিও ঠিক বুঝিনি। একবার বলে আপনি ভয় দেখিয়েছেন। আবার বলে মৃগুদার যা সাপের ভয় তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার তিনি তোমাদের বাড়ী আসবেন না। সত্যিই বুঝি আপনার খুব সাপের ভয়?

মৃগাঙ্ক হেসে বলে, আপনার সাপের ভয় নেই নাকি?

মৃদুলা খিল খিল করে হেসে উঠে বলে, সাপ কোথায় যে ভয় পাব! তাছাড়া ওরা আবার অকারণে কামড়ায় না।

মৃগাঙ্ক পরিহাসের ভঙ্গীতে বলে, একথা কেতকীকে বলবেন। সাপের ভয় তারই বেশী। আমি ভয় করি মানুষকে।

মৃদুলা হেসে বলে, মানুষের তো বিষ দাঁত নেই মৃগাঙ্কবাবু।

মৃগাঙ্ক বলল, আছে তবে চোখে দেখা যায় না। সেইজন্যেই ভয় বেশী। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাপের ভয় দেখাবেন না আপনার বাবার কাছে নিয়ে যাবেন।

মৃদুলা লজ্জা পেল। বলল, আমার খেয়াল ছিল যে, আপনি বাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্য এসেছেন। আসুন আমার সঙ্গে—বাবা পাশের ঘরেই আছেন।

মৃগাঙ্ক ধীরে ধীরে বলে, আপনি মানুষকে খুব লজ্জা দিতে পারেন।

মৃদুলা বলল, লজ্জা আপনি মোটেই পাননি। তাছাড়া আমি তো মিথ্যে বলিনি। বাবা না বলতে আপনি নিজের ইচ্ছায় একদিনও এসেছেন কি?

মৃগাঙ্ক বলল, না ডাকলে আসতে নেই মৃদুলা দেবী।

মৃদুলা বলল, কেতকীকে একদিনের জন্যও ডাকা হয় না কিন্তু সে আসে।

মৃগাঙ্ক বলে, সব কাজ সকলে পারে না।

মৃদুলার কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন দেখা গেল। বলল, ইচ্ছে থাকলেই পারে।

মৃগাঙ্ক হাসতে থাকে জবাব দেয় না।

মৃদুলা বলে, এটাও হাসির কথা হ'লো বুঝি।

মৃগাঙ্ক হাসি থামিয়ে বলে, ইচ্ছে থাকলেই আপনি একটা কেউটে সাপকে আদর করে কাছে টেনে নিতে পারেন? ভয় করবে না?

মৃদুলা সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল। কণ্ঠস্বরে পুরোমাত্রায় গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বলল, এতক্ষণে বুঝলাম কেতকী কি বলতে চেয়েছিল। আপনি লোক মোটেই সুবিধের নন। চলুন যাঁর কাছে এসেছেন তাঁর

চাছেই আপনাকে নিয়ে যাই। বলেই মৃগাঙ্ককে আর কোনপ্রকার কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পাশের ঘরে এসে উপস্থিত হয়ে জগন্ময়কে বলল, তোমার অতিথি এসেছেন বাবা।

জগন্ময় তন্ময় ভাবে একখানি বই পড়ছিলেন, কন্যার আহ্বানে মুখ তুলে মৃগাঙ্ককে দেখে সাদর আহ্বান জানালেন, আরে এসো মৃগাঙ্কবাবু এসো। মনে করে এসেছো তাহ'লে। খুব খুশী হয়েছি।

মৃদুলা হেসে বলল, মৃগাঙ্কবাবুকে তুমি কিন্তু কাল নিজেই নেমন্তন্ন করে এসেছিলে বাবা।

জগন্ময় খুব খানিক হেসে বললেন, খেয়াল ছিল না বুঝলে মৃগাঙ্ক, বড্ড মনোযোগ দিয়ে বইটা পড়ছিলাম কিনা—আরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন বসো। হ্যাঁ ঐ চেয়ারটা টেনে নিয়েই বসো।

মৃদুলা বলল, তোমরা ততক্ষণ গল্প করো বাবা আমি আমার নিজের কাজ সেরে নি সেই ফাঁকে।

জগন্ময় বাধা দিয়ে বললেন, দুজনে কখনও গল্প জমে মৃদুলা। ভুলচুক হলে মধ্যস্থ মানবো কাকে।

মৃদুলা হাসি মুখে জবাব দিল, তাই বলে যাঁকে নেমন্তন্ন করে ঘরে ডেকে নিয়ে এলে তাঁকে এক পেয়ালা চা দেবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে না?

জগন্ময় হেসে উঠে বললেন, আমি কি তাই বলেছি —কিন্তু শিবে হতভাগাটা করছে কি?

মৃদুলা মৃদু কণ্ঠে বলল, শিবনাথ না হয় এককাপ চা ক'রে দিতে পারবে কিন্তু শুধু এক পেয়ালা চা দিলেই কি তুমি খুশি হবে।

জগন্ময় মাথা নেড়ে জবাব দিলেন, ঠিক কথা। বুঝলে মৃগাঙ্ক এখনও সেই বই। মনের অনেকখানি জুড়ে বসে আছে। বলেই উঠে গিয়ে বইখানি তিনি চোখের আড়ালে রেখে এসে পুনরায় স্বস্থানে উপবেশন করলেন। বললেন, এবার এসো দুজনে আলাপ আলোচনা করি।

মৃদুলা পিতার অলক্ষ্যে একবার মৃগাঙ্কর মুখের চেহারাটা দেখে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

জগন্ময় বললেন, কতদিন পরে গ্রামে এসেছো মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক জবাব দেয়, তা প্রায় এক বছর।

জগন্ময় বললেন, আমি এলাম এক যুগ পরে পরিচিত অনেকেই ইতিমধ্যে সংসার থেকে ছুটি নিয়েছেন। যারা আছেন তাঁদেরও আর চিনবার উপায় নেই। ছেলে ছোকরাদের কথা না বলাই ভাল।

মৃগাঙ্ক বলে, এ কথা বলছেন কেন?

জগন্ময় দুঃখ করে বলেন, জীবনের বেশীর ভাগ সময়টা আমার বাইরে বাইরেই কেটেছে। ইচ্ছে ছিল পেনসনটা নিয়ে এখানেই শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেবো কিন্তু এখানকার বর্ত্তমান চেহারা আমাকে হতাশ করেছে। এর চেয়ে বাংলার বাইরে থাকাই বোধ হয় ভাল।

মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করে, কেন?

জগন্ময় বলেন, নিজেকে অন্ততঃ ফাঁকী দিতে পারব।

মৃগাঙ্ক বলল, আপনি বাইরের চেহারা দেখেই ভয় পেয়েছেন।

জগন্ময় বলেন, বাইরেটাই যে চোখে পড়ে মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক শান্ত হেসে বলে, সেইটুকুইতো সব নয়।

জগন্ময় সোজা হয়ে বসে বারকয়েক মাথা নেড়ে বললেন, তা ঠিক কিন্তু আমার বক্তব্য তা নয়। যাদের সম্বন্ধে তুমি আশার কথা শোনালে তাদের পথ দেখাবার লোকের একান্ত অভাব। সর্ব্বত্রই একটা অনিয়ম—সেই জন্যই হয়তো কখনও কখনও এখানে এসে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারি না। বাঙ্গালী বলে আমার এতদিনের গর্ব্বে আঘাত লাগে।

একটু থেমে তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, তোমরা লেখাপড়া শিখেছো গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগও আছে—আমাদের মত ভুল করবার অবকাশ তোমাদের অনেক কম। তোমরা যেন গ্রামকে ত্যাগ করো না। যে অন্যায় আমরা করছি তা যেন তোমরা করো না মৃগাঙ্ক। কিন্তু মৃদুলা এতক্ষণ বসে করছে কি। এতক্ষণেও আমাদের দু বাটি চা দিয়ে যেতে পারলো না।

মৃদুক.ঠ মৃগাঙ্ক বলল, চ থাক আপনি বলুন—

জগন্ময় পুনরায় বলেন, আজ মাসখানেক ধরে রোজই একবার করে ঘুরে ঘুরে দেখে আসছি কিন্তু যা দেখতে চাই তার দেখা মেলে না।

মৃগাঙ্ক একটু হেসে বলে, আমরা সবাই যদি শুধু দেখতেই চাই তাহলে যা চাই তা কোনদিন দেখার ভাগ্য আমাদের হবে না। সবাই আমরা ভয় পেয়ে হতাশায় পিছিয়ে গেলে পিছিয়ে পড়ার হাত থেকে কোন কিছুকেই ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

জগন্ময় মৃগাঙ্কের মুখের পানে চোখ তুলে বললেন, তোমার কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু এর কোন পথের সন্ধান দিতে পার কি মৃগাঙ্ক? ভেবে দেখেছো কিছু?

মৃগাঙ্ক বলে, আমার বুদ্ধি দিয়ে দেখেছি। পথ আছে কিন্তু সে পথে আমরা চলতে রাজী নই।

জ ান্ময় প্রশ্ন করেন, অর্থাৎ—

মৃগাঙ্ক বলে, আমি নিজেকে দিয়েই চিন্তা করে দেখেছি। আইন পড়বো ঠিক করেছি, কিন্তু আইন পাশ করে এখানে আমার করবার কিছু নেই। আমি জীবিকা নির্ব্বাহের কথা বলছি। সুতরাং আমাকে সহরের দিকে চেয়ে থাকতে হবে। গ্রামে থাকতে গেলে আমার ব্যক্তিগত উন্নতির আশা নেই। আপনার নিজের দিকেই দেখুন না, সেখানেও ঐ একই প্রশ্ন! অথচ এ যে কত বড় প্রশ্ন তা আমরা বুঝতে চাই না।

জগন্ময় বলেন, অর্থাৎ ব্যক্তি এখানে বড় হয়ে উঠেছে এই কথাই বলছো তুমি।

মৃগাঙ্ক জবাব দিল, হ্যাঁ।

জগন্ময় বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা যখন ভুল করেছিলেন, তখন দেশের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজকের মত সহস্র সমস্যায় জর্জ্জরিত ছিল না। তাদের পথ তোমরা অনুসরণ করো না মৃগাঙ্ক, তাহলে হয় তো একদিন তোমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।

মৃগাঙ্ক একটা জবাব দেবার জন্যই মুখ তুলেছিল মৃদুলার উপস্থিতিতে তাকে থামতে হল। মৃদুলা আগে আগে তার পিছনে শিবনাথ। ত র হাতে ট্রের উপর সাজান বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য।

মৃদুলা বলল, ট্রেটা টেবি.লর উপর রেখে তুমি চায়ের পট নিয়ে এসো শিবনাথ।

শিবনাথ চ.ল যেতেই জগন্ময় মুখে এক প্রকার প্রশংসাসূচক ধ্বনি করে বললেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে এত সব খাবার করলে কি করে মিছু?

মৃদুলা বলল, আগেই করে রেখেছিলাম বাবা। তোমার আর কি, নেমন্তন্ন করে এসে দিব্যি ভুলে বসে আছো। আর আমাকে সারা দুপুর এই সব করতে হয়েছে।

মৃগাঙ্ক লজ্জিত হয়ে বলল, আমাকে তো আপনার বাবা খাবার নেমন্তন্ন করে আসেননি। আপনি মিছি মিছি এত সব করতে গেলেন কেন!

মৃদুলা স্মিত হাস্তে বলল, উঁহু এখানে অনধিকার প্রবেশ করবেন না মৃগাঙ্কবাবু। এখানে আমার ইচ্ছা প্রধান। তাছাড়া—একটু থেমে মৃদুলা রহস্য তরলকণ্ঠে পুনরায় বলল. প্রথম সাক্ষাতে যতখানি বিষ উঠেছিল আজ তার ডবল করে অমৃত পরিবেশ করা হবে।

মৃদুলা উচ্ছ্বসিত ভাবে হেসে উঠল।

মৃগাঙ্ক কেমন অপ্রস্তুতের হাসি াসতে থাকে। জগন্ময়ের মুখের চেহারা দেখে মনে হয় তিনিও বেশ উপভোগ করছেন মৃদুলার কথাগুলি।

মৃগাঙ্ক অসহায় দৃষ্টিতে জগন্ময়ের মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে বলল, পুরনো কথা তুলে আমাকে এ ভাবে লজ্জা দেওয়া কিন্তু খুব অন্যায়।

জগন্ময় হেসে বলেন, তুমি কেন লজ্জা পাবে মৃগাঙ্ক? লজ্জা তো মৃদুলার পাওয়ার কথা।

মৃদুলা বলল, বাবা ঠিক কথাই বলেছেন। লজ্জার অজুহাতে যদি একটি খাবারও নষ্ট করেন, তাহলে দুঃখ রাখবার কিন্তু ঠাঁই থাকবে না মৃগাঙ্কবাবু। সামান্যই আমার ব্যবস্থা। সবগুলি খাবার দিদি মতে আমি নিজের হাতে করেছি।

মৃগাঙ্ক বলল, সন্দেশ আর লেডিকেনি পর্য্যন্ত নিজে করেছেন?

মৃদুলা বলল, তবে কি শিবনাথ করেছে নাকি? আপনাদের এখানকার বাজারে এসব মেলে? এর প্রত্যেকটি খাবার আমি মামীমার কাছে শিখেছি। বাবা খেতে আর খাওয়াতে খুব ভালবাসেন। বাবার মুখে শুনেছি আমার মা নাকি নানা দেশের নানা জাতীয় রান্না খুব ভাল করতে পারতেন।

জগন্ময় স'সা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন এবং বার বার মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে থাকেন, সে এক ইতিহাস মৃগাঙ্ক। খেতে আর খাওয়াতে আমি চিরদিন ভালবাসতাম। বাবা বিয়ে দিয়ে ঘরে আনলেন এক মস্ত বড়লোকের মেয়ে। মাকে বললাম, এটা কি করলে মা? এভাবে আমাকে জব্দ করবার মতলব তুমিই বুঝি বাবাকে দিয়েছো। মা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বললেন, একথা কেন রে জগু? মাকে বললাম তোমার ছেলের বাবুয়ানির কথা কি তোমার অজানা মা? মা খুব খানিক হেসে বলেছিলেন, মেয়েরা যে ঘর থেকেই আসুক তারা মেয়েই। আমার এ কথা তোকে একদিন স্বীকার করতেই হবে। স্বীকার একদিন সত্যিই আমাকে করতে হয়েছিল মৃগাঙ্ক। হঠাৎ একদিন বিনা নোটিসে বাবা চলে গেলেন। তার দশ দিন পার হ'তে না হ'তে মাও শক্কতা করলেন।

জগন্ময়ের একটি নিঃশ্বাস পড়ল।

মৃদুলা ডাকল, বাবা—

জগন্ময় সাড়া দিলেন, কি মা

মৃদুলা বলল, ওসব পুরনো কথা এখন থাক বাবা। তার চেয়ে এবারে তোমরা ওঠো। মুখ হাত ধুয়ে নাও। শিবনাথ জল নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

জগন্ময় বললেন, যাও হে মৃগাঙ্ক। হুকুম যখন হয়েছে তখন তা মানতেই হবে।

মৃগাঙ্ক উঠে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফিরে আসতেই জগন্ময় উঠে গেলেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মৃগাঙ্ক মৃদু কণ্ঠে বলল, আমাকে এভাবে জব্দ করবার কোন মানে হয় না মৃদুলা দেবী।

মৃদুলা ততোধিক আস্তে আস্তে বলল, সত্যি বলছি আপনাকে জব্দ করবার জন্য নয় আমি নিজেকে খুশী করবার জন্য এগুলো করেছি। বাবার সামনে হয়তো বলতে পারবো না তাই আগেই শুনিয়ে রাখছি যে, একটি জিনিসও যদি পড়ে থাকে তবে বুঝবো জেনে শুনে আমাকে শাস্তি দেবার জন্যই এ কাজ করেছেন।

আমি খেতে না পারলেও জোর করে খেতে হবে? মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে বলে এতো বড় মজার কথা বলছেন আপনি। তাছাড়া এতে আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন?

হবে-খুব হবে। এবারে আপনি থামুন তো নইলে বাবার সামনেই এমন কাণ্ড করবো তখন মজাটি বুঝবেন। মৃদুলা গভীর কণ্ঠে বলল।

মৃগাঙ্ক বোকার মত চেয়ে রইল। মৃদুলা উঠল হেসে।

জগন্ময় ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, এতো হাসি কিসের মৃদুলা?

হাসবো না বাবা। মৃদুলা তেমনি হাসি মুখেই বলতে থাকে মৃগাঙ্ক বাবুর কাণ্ড যদি তুমি দেখতে-তুমি চলে যেতেই উনি সুরু করলেন-এটা বেশী...ওটা বেশী... এতগুলো কি কোন ভদ্রলোক খেতে পারে।

সে কি হে মৃগাঙ্ক...জগন্ময় সহাস্যে বললেন, তুমি না গ্রামের ছেলে?

তাই, মৃদুলা বলল, ঐ নামেই। সহরের মেস হোটেলের খাওয়া পেটটিকেই একেবারে গিলে খেয়েছে। পেটই নেই তা খাবেন কি।

মৃগাঙ্ক সামলে নিয়ে, সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল, এতো কথার পরে ইচ্ছে থাকলেও হয়তো খেতে পারবো না।

বিলক্ষণ। জগন্ময় হেসে বললেন, মৃগাঙ্ক একথা বলতে পারে। আমি হলে আবার অন্য কথা ভাবতাম-তোমার আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় কম বলেই হাত চেপে ধরছো।

ছি ছি বাবা শেষ পর্যন্ত তুমিও মৃগাঙ্ক বাবুর সঙ্গে যোগ দিলে। মৃদুলা অল্প অল্প হাসতে থাকলেও তার চোখ মুখ অকারণেই লাল হয়ে উঠেছে।

জগন্ময় বলেন, যোগ না দিয়ে কি করি মা। মৃগাঙ্ক যদি শেষ পর্য্যন্ত সত্যিই হাত গুটিয়ে বসে তবে তোমার এই পেটুক চন্দ্র যে ফাঁকে পড়বে। তার হাত কি আর সহজ ভাবে চলতে পারবে? কিন্তু আর নয় এসো হে মৃগাঙ্ক দখি মৃদুলা আমাদের জন্য কি অমৃতের ব্যবস্থা করেছে।

সহসা হাত বাড়িয়ে একটি বাটি সম্মুখে টেনে নিয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন। খেতে কেমন মেয়ে বলতে না পারলেও চেহারাটি কিন্তু খাসা বানিয়েছো মিনু মা।

মৃদুলা হেসে জবাব দিল, মুখে দিয়ে সন্দেহটা ভঞ্জন করলেই পার বাবা। কিন্তু আপনি এখনও হাত গুটিয়ে আছেন কেন মৃগাঙ্ক বাবু?

জগন্ময় বললেন, ভাগ্যিস বলেছো মা নইলে আমি তো প্রায় শুরু করে দিয়েছিলাম। বলি মৃগাঙ্ক বাবু তুমি আরম্ভ করবে না আমাকেও তোমার জন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। আজকালকার ছেলেরা দেখছি একেবারে অপদার্থ। খেতে ভয়, শুতে ভয় চলতে ভয়। আরে বাপু এতোই যদি ভয় তবে জীবনটাকে ভোগ করবে কি করে।

মৃদুলা হেসে উঠল।

মৃগাঙ্ক আর দ্বিরুক্তি না করে মাংসের বাটী সম্মুখের পানে টেনে নিল।

জগন্ময় লুচি সহযোগে এক টুকরা মাংস মুখে দিয়ে মৃদুলার পানে প্রশংস দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে থেকে মৃগাঙ্ককে উদ্দেশ্য করে বললেন, মাংসটার তেমন স্বাদ হয়নি কি বলো মৃগাঙ্ক কিন্তু মেয়েটার এই রান্নারই কত অহংকার।

মৃগাঙ্ক কিছু না বুঝেই জবাব দিল, কেন মাংসটা চমৎকার হয়েছে।

মৃদুলা চোখ পা করে জগন্ময়কে বলল, এর পরে তোমার অদৃষ্টে হয় রাধুনি বামুন নয়তো শিবনাথ। তখন কান্নাকাটি করলেও শুনবো না বাবা।

জগন্ময় মৃদুলার কথার কোন জবাব না দিয় মৃগাঙ্ককে বলতে থাকেন খাও হে মৃগাঙ্ক এ তোমার মেস হোষ্টেলের রান্না নয়। দু'দিন পরে আবার তো ওদের হাতেই গিয়ে পড়তে হবে। ও কি তোমার যে হাতই পড়ছে না। নাও নাও হাত লাগাও। তোমার রকম দেখে আমিই লজ্জা পাচ্ছি যে মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিল, আমি একটু আস্তে আস্তেই খেয়ে থাকি, নইলে জিভের উপর অবিচার করা হবে।

জগন্ময় এক টুকরো মাংস মুখে দিয়েছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে বললেন, বুঝলাম না।

মৃগাঙ্ক হেসে বলল, আপনি বুঝতে চাইছেন না তাই। এতো সুন্দর রান্নার স্বাদ পুরোপুরি নিতে চাই আমি। আপনার ভাগ্যে প্রায়ই মেলে কিন্তু আমি আর পাচ্ছি কোথায়।

জগন্ময় হতাশ কণ্ঠে বললেন, সর্ব্বনাশ করলে তুমি। এ জানলে নেমতন্ন করে শত্রুর ঘরে ডেকে আনতাম না। একেই মেয়েটা রান্নার অহংকারে ফেটে পড়ে তার উপর, তুমি আবার সাপের পাঁচ পা দেখালে। কপালে আমার অনেক দুর্গতি আছে দেখতে পাচ্ছি।

মৃদুলার চোখে মুখে পরিতৃপ্তির উজ্জ্বল হাসি। সে বলল, তোমাকে আর একটু মাংস দেবো বাবা?

জগন্ময় পরম উদাসীন ভাবে বললেন, দিতে চাইছো দাও, কিন্তু তোমাদের জন্য শেষ পর্যন্ত থাকবে তো?

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে মৃদুলা হেসে গেল এবং অনতিবিলম্বে ফিরে এসে উভয়ের বাটিতে খানিকটা করে ঢেলে দিল।

মৃগাঙ্ক মুখ তুলে বলল, শুধু লুচি মাংস হলে কিছু বলবার ছিল না কিন্ত এর পরে ঐ মিষ্টিগুলোও খেতে হবে তো।

মৃদুলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল আস্তে আস্তে খান। ঠিক পারবেন।

জগন্ময় মৃদুলার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললেন আমি পারলে তুমিও পারবে মৃগাঙ্ক।

মৃদুলা পুনরায় বলল, তাছাড়া সত্যিই এমন কিছু বেশী করা হয়নি না হয় বাড়ী গিয়ে আর খাবেন না।

হাসি গল্পের ভিতর দিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ফিরে যাবার কথা পর্যন্ত মৃগাঙ্কের খেয়াল

নেই মৃগাঙ্ক বলছিল আপনি এত ভাল রান্না করতে জানেন তা আগে জানতে না পেরে ঠকে গেছি।

মৃগাঙ্কের কথায় সায় দিয়ে জগন্ময় বলেন, তা ঠকেছো। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মৃদুলা তার পেটুক বাপের খাওয়ার উপর সব সময়ই নজর রাখে, কিন্তু ঐ যা: তোমাকে পেয়ে যে আমি একটা কাজের কথাই ভুলে বসে আছি মৃগাঙ্ক।

মৃদুলা বলল, ছোট কাকার সেখানে যাবার কথা ছিল তোমার সেই কথা বলছো ?

জগন্ময় ব্যস্ত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মৃগাঙ্ক তোমার অসুবিধা না হলে অন্ততঃ ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করে যেও। কয়েকটা জরুরী বিলি ব্যবস্থা করেই আমি ফিরে আসব।

মৃগাঙ্ক বলল, অসুবিধে আর কি! কিন্তু—

তাকে থামিয়ে দিয়ে জগন্ময় বললেন তবে আর কিন্তু নয়। একটু বসেই যাও। বলে আরউত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি দ্রুত ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন।

জগন্ময় চলে যাবার পর বহুক্ষণ দুজনেই চুপ করে ছিল। দুজনেই হয়ত কিছু ভাবছিল। এক সময় মৃগাঙ্কই নীরবতা ভঙ্গ করল, আমরা কি ভাবছি বলুন তো।

অল্প হেসে মৃদুলা বলল আপনি কি ভাবছেন শুনলে আমার কথা বলবো।

মৃগাঙ্ক বলল, ভাবছিলাম, আমার অদৃষ্টে সবটুকু বিষই শেষ পর্যন্ত অমৃত হয়ে দেখা দিল।

মৃদুলা গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, সে কথা বুঝে থাকলে ও বিষ নিজের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া আমার সার্থক হয়েছে।

মৃদুলা দেবী—মৃগাঙ্কের কণ্ঠস্বরে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। মৃদুলার কানেও তা ধরা পড়ল। একটু নড়ে চড়ে সে জবাব দিল, বলুন—

মৃগাঙ্ক বলে, আর তিনটে দিন পরেই আপনারা চলে যাচ্ছেন তাহলে ?

মৃদুলা বলল, এখন পর্যন্ত তাই জানি।

মৃগাঙ্ক বলে, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন ?

মৃদুলা হেসে বলে, আপনি এখনও আমাকে তা বলেননি।

মৃগাঙ্কের কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল। বলল, আপনার সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই উচিত ছিল।

নরম গলায় মৃদুলা বলে, হঠাৎ এ সব কথা বলছেন কেন মৃগাঙ্কবাবু ?

মৃগাঙ্ক জবাব দেয়, মনে হলো তাই বললাম। কেন বলেছি জানি না।

মৃদুলা আস্তে আস্তে বলল, আমি জানি।

মৃগাঙ্ক একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। বলে, কি জানেন ?

মিষ্টি হেসে মৃদুলা বলে, আমি যা জানি আপনিও তা জানেন। আপনি হয় নিজেকে ঠকাতে চাইছেন অথবা না জানার ছল করে আমাকে লজ্জা দেবার চেষ্টা করছেন।

মৃগাঙ্ক ধীরে ধীরে বলে, শুধু রান্নার নয়, আপনার বুদ্ধিরও প্রশংসা করতে হয়।

মৃদুলা জবাব দেয়, রান্নার প্রশংসা করলে আমি খুসী হই, কিন্তু বুদ্ধির প্রশংসা করলে রীতিমত ভয় পাই। মনে হয় কোথাও হয় তো মস্ত ভুল করে বসেছি।

মৃগাঙ্ক বলে, ভারী অদ্ভুত আপনার যুক্তিগুলো। আর কেতকী বলে কি না—

মৃদুলা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, কেতকী থাক মৃগাঙ্কবাবু, আপনি আমাদের কথা বলুন। ভাল কথা সনাতনকে আমার কাছে ফেরত পাঠিয়ে আপনি ভালই করেছিলেন। ওকে দুশ টাকা আমি দিয়ে দিয়েছি। আমি কিছু না ভেবেই আপনার কথা বলেছিলাম। ভেবে দেখে আপনার অসুবিধার দিকটা বুঝতে পেরেছি।

মৃগাঙ্ক চুপ করে থাকে।

মৃদুলা বলে, রাগ করলেন নাকি !

মৃগাঙ্ক বলল, না-না রাগ করবো কেন, বরং আনন্দ পেয়েছি আপনি ভুল বোঝেননি বলে।

আমার ভাগ্য, মৃদুলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দুজনেই খানিক চুপ চাপ। খোলা জানালা পথে এক রাশ চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। দুজনের কেউই এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। এক ঝলক দমকা হাওয়া এসে ঘরে প্রবেশ করে মৃদুলার রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে গেল। আলগোছে মুখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে চাঁদের আলোর পানে মৃগাঙ্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মৃদুলা বলে, দেখেছেন ?

মৃগাঙ্ক অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিল, হুঁ—কিন্তু এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি।

মৃদুলার কণ্ঠস্বর কিসের ছোঁয়া লেগে ভিজে উঠেছে। সে বলল, আমিও না। খুব অভদ্র কিন্তু। সাড়া না দিয়ে এ ভাবে ঘরে ঢোকা খুব...

মলয়ের কলমের গতিবেগ সহসা রুদ্ধ হয়ে গেল। তার ঘরেও অপরিসর জানালা পথে জোৎস্না এসে ঘরময় এতক্ষণ ছড়িয়ে ছিল। সহসা কোথা থেকে কাল মেঘ ভেসে এসে তার শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে গেল। মলয়ের অজ্ঞাতসারে তার বুকের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি ক'ল। বুক ভেদ করে একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বার হয়ে এল।

২৫

মলয় গভীর আগ্রহ আর বেদনার্ত্ত দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে আছে। নিজেকে সে ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে। বর্ত্তমানের মলয় অতীতের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে—তলিয়ে যাচ্ছে নিজেকে সে আর মলয় বলে ভাবতে পাচ্ছে না। চোখে তার স্বপ্নের ঘোর। অন্যমনস্ক ভাবে পুনরায় সে তার কলম তুলে নিল। সাদা কাগজে চিন্তার প্রকাশ ঘটতে সুরু হল।

মৃদুলার অসমাপ্ত কথার সূত্র ধরে মৃগাঙ্ক পুনরায় বলতে লাগল, খুব অন্যায় তাই না ? কিন্তু আমরা ওকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের এই সুন্দর ক্ষনটিকে ও আরও কত সুন্দর করে তুলেছে। কেমন করে এলো, কোন পথ ধরে এলো তার হিসেব এখন নয় জীবনের মাঝে মাঝে একটু বেহিসেবী হলে কিন্তু মন্দ হয় না। আপনি কি বলেন মৃদুলা দেবী ?

মৃদুলা মিষ্টি হেসে বলে, আপনি বলে যান আমি আজ শুধু শুনবো।

মৃগাঙ্ক ডাকল, মৃদুলা—

বলুন—মৃদুলা জবাব দিল।

তুমি রাগ করলে না তো ? মৃগাঙ্কর গলা কাঁপছে।

মৃদুলা একটু হাসল। বলল, রাগ করবো কেন ?

নাম ধরে ডাকলাম যে—মৃগাঙ্ক কেমন অদ্ভুত ভাবে হেসে বলল।

মৃদুলা সহজ ভাবেই জবাব দিল, নাম ধরে ডাকবার জন্যইতো নাম রাখা হয়। মিছি মিছি আমি রাগ করতে যাব কেন !

মৃগাঙ্ক বলে, তোমাদের এখানে আসবার জন্য আমি ছটফট করেছি।

অথচ চলে যাবার দিন যখন ঘনিয়ে এলো তখন হলো আপনার আসবার সময়। আমি হলে কিন্তু রোজ আসতাম। মৃদুলার কণ্ঠস্বর বুজে এলো।

মৃগাঙ্ক বলে, আমার অবস্থায় পড়লে তুমিও পারতে না মৃদুলা।

মৃদুলা একটু যেন উত্তেজিত কণ্ঠেই জবাব দেয়। পারতাম মৃগাঙ্কবাবু পারতাম। আপনার কথাটাই আমাকে আর একবার বলতে হচ্ছে, মাঝে মাঝে একটু বেহিসাবী হয়ে অনেক সময় বহু দুর্লভ বস্তুও হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়।

মৃগাঙ্ক বলে, একথা আমার চেয়ে বেশী করে বোধহয় আর কেউ অনুভব করতে পারবে না।

মৃদুলা বলে, আবার যেন হিসেব করতে বসবেন না আবার যদি "দেবী" আপনি আজে সুরু করেন তাহলে আপনার দিব্যি করে বলছি...সহসা কথা থামিয়ে মৃদুলা উঠে দাঁড়াল এবং মৃগাঙ্কর বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হঠাৎ এভাবে না বলে কয়ে চলে যাওয়ার কোন অর্থ মৃগাঙ্ক খুঁজে পেল না। এলো মেলো চিন্তা একটার পর

একটা এসে তার মনের কোণে ভীড় জমাতে লাগল। এমনি অনেকক্ষণ কেটে গেল কিন্তু মৃদুলার দেখা নেই। মৃগাঙ্ক উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল। সেখান থেকে একসময় দরজার কাছে। তারপর বারান্দায়—

মৃদুলা চুপি চুপি ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলল, বারান্দার পরেই উঠোন তার পরে রাস্তা। আপনি কি পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন মৃগাঙ্কবাবু।

মৃগাঙ্ক ফিরে এসে পুনর্বার পূর্বের চেয়ারটি দখল করে বসল। বলল, যে ভাবে আপনি চলে গেলেন ভাবলাম হয়তো কোন অন্যায় করে বসেছি।

মৃদুলা সহাস্যে বলল, ভয় পেয়ে গেছিলেন, বলুন।

মৃগাঙ্ক খানিক চুপ করে থেকে ডাকল, মৃদুলা—

মৃদুলা চোখ তুলে তাকাল। জবাব দিল না।

মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করে সাড়া দিচ্ছ না কেন?

মৃদুলা শব্দ করে হেসেউঠল, বেশ যা হোক। আমি তো আপনার সামনেই বসে আছি।

মৃগাঙ্কর কণ্ঠস্বরে খানিক আবেগ প্রকাশ পেল। বলল, আমার মনে হচ্ছে তুমি অনেক দূরে রয়েছো মৃদুলা। অনেক অনেক দূরে।

মৃদুলা ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি আর চমক অনুভব করল। প্রকাশ্যে বলল, আকাশের চাঁদ ও অনেক দূরে রয়েছে। তারাগুলো আরও দূরে।

মৃগাঙ্ক আবেগ জড়ান কণ্ঠে বলে, তুমি চাঁদও না তারাও না। তুমি কল্পনা নও তোমার অস্তিত্ব আছে।

মৃদুলা হেসে বলে, তা আছে - কিন্তু শিবনাথ এতক্ষণ বসে করছে কি? সেই কখন হতভাগাকে দুকাপ চা আনতে বলে এলাম অথচ—মৃদুলা উঠে দাঁড়াল।

মৃগাঙ্ক সহসা ওর একখানা হাত ধরে ফেলে বাধা দিল। চা এখন থাক তুমি বসো মৃদুলা।

মৃদুলা বাধাও দিল না, হাতখানা টেনেও নিল না বরং দুষ্টামীর হাসি হেসে বলল, তবুও দেখুন লোকের কি স্বভাব আপনাকেও বলে ভীরু আর লাজুক আর অভাস্ত হিসাবি

মৃগাঙ্ক ওর হাতখানা ছেড়ে দিল। এমন আচমকা ছেড়ে দিল যে হাতখানা টেবিলের উপর ঠুকে গেল।

উঃ—মৃদুলা যন্ত্রনা সূচক শব্দ করল। মৃগাঙ্ক অপ্রস্তুতের মত হেসে হাতখানা পুনরায় নিজের হাতে তুলে নিল। লজ্জিত ভাবে বলল, খুব লাগেনি তো? আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। দেখি কোথায় লেগেছে?

মৃদুলা বলল, লাগেনি। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

মৃগাঙ্ক থামতে পারে না। বলো, ব্যস্ত হচ্ছি না। কিন্তু দেখি তোমার হাতখানা?

মৃদুল মুচকি হেসে বলল, দেখুন হাত। তারপরে বলুন কোথায় আমার লেগেছে আর কতখানি লেগেছে। আপনি বড় ছেলেমানুষ অথচ এই লোককে নিয়েই দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না।

বিস্মিত কণ্ঠে মগাঙ্ক বলে আমাকে নিয়ে তোমার দুর্ভাবনা!

হাঁ মশাই। মৃদুলা দুষ্টামীর হাসি হেসে বলল, শুধুই কি দুর্ভাবনা। দিনের পর দিন আপনাকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছি। সকাল নেই সন্ধ্যা নেই কেতকীদের বাড়ীকে কেন্দ্র করে আপনাদের বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছি।

কিন্তু পাওনি। মৃগাঙ্ক বলল, আমারও তখন প্রায় একই অবস্থা। যে মেয়ে আমারই বাড়ীর উপর দাঁড়িয়ে আমাকে অত কথা শুনিয়ে গেল সে যে কেমন মেয়ে এ আমাকে জানতেই হবে।

মৃদুলা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল, অর্থাৎ আমি যখন ওপাড়ায় আপনি তখন এপাড়ায়।

মৃগাঙ্ক মাথা নেড়ে স্বীকার করে।

মৃদুলা বলে ভারী মজা তো। কি ভাগ্যিস অসাবধানে একটা বেফাস কথা বলে ফেলেছিলাম।

দুজনেই একসঙ্গে হাসতে থাকে।

হাসি থামিয়ে একসময় মৃগাঙ্ক বলল, আজ আর আমার কোন ক্ষোভ নেই। বরং মনে হচ্ছে যে, এমনটি না ঘটলেই বুঝি অন্যায় হতো।

মৃদুলা প্রশ্ন করে, কেন?

মৃগাঙ্ককে কথায় পেয়েছে। সে বলতে থাকে, কেন আবার—যার বাড়ীর পাঁচিল ডিঙিয়ে মৃদুলা যেতে

পেয়েছিল বলেই না চৌধুরী বাড়ীর সিংহ দরজা মৃগাঙ্কর কাছে খুলে গেছে।

মৃদুলা একটুখানি হেসে বলল, চৌধুরী বাড়ীর দরজা খোলা না পেলেও রায় বাড়ীর ছোট কর্তার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না।

মৃগাঙ্ক গভীর কণ্ঠে বলল, কি ছিল আর কি ছিলনা সে কথা আজ আর ভাবতেও ভাল লাগেনা। আরম্ভের বেসুরো ধ্বনি আজ সুরে আর ছন্দে প্রাণ পেয়েছে।

মৃদুলা পুনরায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। হেসে বলল, বাবা, বাবা আপনি এমন ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে পারেন যে না হেসে আর বাঁচিনে।

মৃগাঙ্ক বলল, আমি তোমাকে একটিও বাজে কথা বলিনি মৃদুলা। আমার অন্তরের কথাই তোমাকে জানিয়েছি। তোমাকে আজ আমি নিজের অস্তিত্বের মধ্যে অনুভব করছি। মৃদুলা সহসা উঠে গিয়ে মৃগাঙ্কর চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ডাকল, মৃগাঙ্কবাবু—

মৃগাঙ্ক সাড়া দিল, বলো—

চাপা কণ্ঠে মৃদুলা বলতে থাকে, আপনি কি সুযোগ পেয়ে এইসব কথা আমাকে শোনাতে শুরু করেছেন? জানেন এতে আমি কতো লজ্জা পাই।

খানিক চুপ করে থেকে মৃগাঙ্ক কিছু চিন্তা করে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, মৃদুলা—

মৃদুলা সাড়া দিল, বলুন।

মৃগাঙ্ক বলল, আমার একটা প্রশ্নের সোজা উত্তর দেবে?

মৃদুলা জবাব দিল, আমি তো সোজাসুজিই সব কথার উত্তর দিচ্ছি মৃগাঙ্কবাবু।

মৃগাঙ্ক বলল, আমার আজকের ব্যবহারে তুমি শুধু লজ্জাই পেয়েছো না রাগও করেছো?

মৃদুলা বলল, কি হবে এসব কথা জেনে।

মৃগাঙ্ক বলল, নইলে সারা রাত হয়তো আমার ঘুমই হবে না।

মৃদুলা পুনরায় মৃগাঙ্কর সম্মুখের চেয়ারে এসে বসল। নির্লিপ্ত গলায় বলল, খুব ঘুম হবে। তারপরে খানিক ওর চোখে চোখ রেখে ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে আপনি কিন্তু মোটেই সোজা লোক নন মৃগাঙ্কবাবু।

মৃগাঙ্ক জবাব দিল, না হতেও পারি কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি সোজাপথেই চলেছি। মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে সহজ সম্বন্ধকে কখনও খারাপ করে তুলিনি। মনের কথাকেও জটিল করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করিনি। তাই হয়তো তোমার মনে এই ধরনের চিন্তা দেখা দিয়েছে।

মৃগাঙ্কর কথার ধরণে মৃদুলা অবাক হল। বলল, এসব কথা তো আপনাকে বলিনি আমি।

মৃগাঙ্ক গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে বলল, বলেছো স্মরণ নেই। আচ্ছা এবারে আমি উঠি। তোমার বাবা এলে বলো—

মৃদুলা সহসা উঠে পথ রোধ করে দাঁড়াল। দৃঢ় অথচ কোমল কণ্ঠে বলল, অন্যায় অভিযোগ করে এভাবে আপনি যেতে পারেন না। আমি আপনাকে যেতে দেবো না। আমার দোষটা কোথায় এবং কতখানি তা আপনাকে দেখিয়ে দিতেই হবে। তাছাড়া লক্ষ্মীটি পাগলামী করবেন না শিবনাথ চা নিয়ে এসে আপনাকে না দেখলে কি ভাববে বলুন দেখি। আর বাবাকেই বা আমি কি কৈফিয়ৎ দেবো।

মৃগাঙ্ক হেসে ফেলল।

আমার দুরবস্থা দেখেও আপনার মুখে হাসি এলো।

মৃদুলা আস্তে আস্তে বলল।

মৃগাঙ্ক মৃদুলার একখানি হাত নিজের সবল মুষ্টির মধ্যে চেপে ধরে হাসিমুখেই বলল, লজ্জা করবে কিসের জন্য বরং খুশী হয়েছি আমার প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল বলে। তোমাকে কেমন হারিয়ে দিলাম দেখলে।

মৃদুলা মধুর কণ্ঠে বলল—হার স্বীকার তো আমি অনেকদিনই করেছি মৃগাঙ্কবাবু কিন্তু হেরে গেলেও আমিই জিতেছি। আমার আনন্দ সেইখানে। মৃদুলা মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে।

মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে বলল, হেরে গিয়ে জেতা মানে?

মৃদুলার দৃষ্টিতে আর কণ্ঠস্বরে আবেগের ছোঁয়া

লেগেছে। রহস্যময় কণ্ঠে সে পুনরায় বলল, আমি হার স্বীকার করেছি বলেই তো আজ আপনি এখানে।

মৃগাঙ্ক মুঠি আরও শক্ত করে ওর হাতখানাকে চেপে ধরেছে। হাতের সঙ্গে সঙ্গে মৃদুলার দেহটাও কেঁপে কেঁপে উঠল।

মৃগাঙ্কর কণ্ঠে একটা পাগল আকুতি প্রকাশ পেল মৃদুলা—

মৃদুলা বলে, না—

মৃগাঙ্ক আবার ডাকে, মৃদুলা—

মৃদুলা আস্তে আস্তে জবাব দেয়, পাগল হলে নাকি মৃগাঙ্কবাবু—শিবনাথ চা নিয়ে আসছে যে ··

মৃগাঙ্ক সন্ত্রস্ত ভাবে হাত ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে গেল। মৃদুলা আরও একটু দূরে সরে গিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে।

মৃগাঙ্ক [illegible] বলে, তুমি আমায় ঠকালে।

মৃদুলা রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিল, আমি নিজেকেও নিজে ঠকিয়েছি ছোট রায়।

উভয় নীরব। একটা গভীর নিস্তব্ধতা ঘরের মধ্যে বিরাজ করছে। ক্ষণপূর্বেও যে এখানে একটা ঝড় বয়ে গেছে তা বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই। শুধু ঝড়ের কবলমুক্ত দুটি মানুষ শ্রান্তভাবে বসে আছে।

মৃগাঙ্ক মাথা নীচু করে বসে আছে। মৃদুলার দৃষ্টি খোলা জানালা পথে আকাশের পানে নিবদ্ধ। ভিতরে বাইরে সর্বত্রই আজ আলোর সমারোহ। গলে গলে পড়ছে চাঁদের রূপালি আলো।

মৃগাঙ্ক একসময় ধীরে ধীরে ডাকল, মৃদুলা—

মৃদুলা জবাব দেয়, কি বলছেন ছোট রায়।

মৃগাঙ্ক ব্যাকুল ভাবে বলল, তোমাকে আমি অপমান করে বসিনিতো ?

মৃদুলা হাসিমুখে জবাব দিল, অপমান করতে যাবেন কেন মৃগাঙ্কবাবু—

মৃগাঙ্ক কুণ্ঠিত ভাবে বলল, তাহলে আবার দূরে ঠেলে দিচ্ছ কেন।

মৃদুলা ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে এসে মৃগাঙ্কর কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে বলল, এইতো এসেছি ছোট রায়।

মৃগাঙ্ক ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, আমি কি তাই বলেছি মৃদুলা ?

তবে কি···বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে মৃগাঙ্কর মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে একসময় মুখ নীচু করে গভীর কণ্ঠে বলে, আর ভুল হবে না ছোট রায়।

ঘরের হ্যাজাক বাতিটা হাওয়ায় দুলছে। দুলছে ঘরের আলো। জানালা পথে আকাশের চাঁদকে দেখা যাচ্ছে। গলে গলে পড়ছে তার থেকে নরম আর সাদা আলো গাছের মাথায় মাথায় আর পাতায় পাতায়।

শিবনাথ দোরগোড়ায় এসে চা নিয়ে দাঁড়িয়েছে—দিদিমণি চা।

মৃদুলা ধমক দিলে, এতক্ষণে তোমার চায়ের কথা মনে হলো।

শিবনাথ বলে, আজ্ঞে দিদিমণি মনের ভুলে বাইরে গিয়ে নাম দেরী হয়ে গেল।

মৃগাঙ্কর চোখে চোখ পড়তেই একটু হেসে বলল, বাইরে বসে এতক্ষণ করছিলে কি !

শিবনাথ মুখ নীচু করে আস্তে আস্তে বলল, আজ্ঞে বাইরেটা বড় মনোরম লাগছিল দিদিমণি। চাঁদটি কেমন গোল হয়ে উঠেছেন আর কি সুন্দর বাতাস বইছেন। মনটা খুব প্রফুল্ল লাগছিলো।

মৃদুলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করল, তুমি বিয়ে করেছো শিবনাথ ?

শিবনাথ বিনয়ে একেবারে গলে গেল, আজ্ঞে কি যে আপনি বলেন বাপু। ও বোকার মত হাসতে থাকে।

মৃদুলা ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলে, বিয়ে করেছিস সে কথা বলতে দোষ কি !

শিবনাথ কেমন একপ্রকার হেসে বলে, সে তো ছ বছরের একটা মেয়েগো দিদিমণি।

মৃদুলা ধমক দিল, পালা এখান থেকে। ফাজিল কোথাকার।

শিবনাথ চা রেখে চলে গেল।

মৃগাঙ্ক বলল : আহা বেচারা। ওর বৌটা নেহাতই একটা বাচ্চা মেয়ে। দিদিমণির মত উঃ ছাড় ছাড় লাগে যে···চুল ছাড় মৃদুলা।

মৃদুলা চুল ছেড়ে সরে দাঁড়াল। চোখ পাকিয়ে বলল, চাকরবাকর নিয়ে এরকম অসভ্য ইয়ারকী আমি পছন্দ করি না।

মৃগাঙ্ক নিরিহ ভঙ্গীতে ওর মুখের উপর চোখ রেখে বলল, আমি তো ঠাট্টা করি নি মৃদুলা। যা সত্য তাই বলছি। শিবনাথ ছ বছরের খোকা নয় বলেই আকাশের চাঁদ আর মনোরম বাতাস ওকে চায়ের কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ঐ যে তোমার বাবাও এসে পড়েছেন।

অকারণে একটু নড়ে চড়ে বসে মৃদুলা অনুযোগ দিয়ে তার বাবাকে বলল, তোমার যদি একটুও সময়ের জ্ঞান থাকে বাবা। একজন ভদ্রলোককে যে বসিয়ে রেখে গেছো তা পর্য্যন্ত তোমার মনে নেই।

মনে থাকবে না কেন। জগন্ময় বললেন, মৃগাঙ্কর কথা আমার খুব মনে ছিল কিন্তু কাজে আটকে গেলাম। মৃগাঙ্ক কিছু মনে করেনি।

মৃদুলা বলল তোমাকেও চা দেবো তো বাবা?

জগন্ময় বললেন, এ আবার একটা কথা হ'লো। বকে বকে গলাটা কোথায় আমার শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে আছে।

মৃদুলা মৃগাঙ্ক এবং জগন্ময়কে চা পরিবেশন করে নিজেও এক পিয়ালা কাছে টেনে নিল।

জগন্ময় বার কয়েক চুমুক দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বলেন; সত্যিই কি আমার খুব দেরী হয়ে গেছে মা। বৈষয়িক ব্যাপার। কাজের চেয়ে কথাই বেশী হয়েছে। সেই আবার কাল যেতে হবে, অযথা তোমাকেও আটকে রেখে গেছি কাজও হ'লো না।

মৃগাঙ্ক বলল, না এমন আর কি অসুবিধে হয়েছে।

চা পান শেষ হ'তে জগন্ময় পুনরায় বললেন, যাবার আগে সম্ভব হ'লে আর একবার এসো মৃগাঙ্ক। কি জানি আর কোনদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা। হ্যাঁ ভাল কথা শিবনাথ একটা আলো নিয়ে মৃগাঙ্ককে যেন এগিয়ে দিয়ে আসে মৃদুলা।

মৃগাঙ্ক বলল, জ্যোৎস্না রাতে আলোর কি দরকার শিবনাথকেও যেতে হবে না। আমি একলাই যেতে পারব।

মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়াল। মৃদুলা আর একটি কথাও বলল না। শুধু নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে রইল।

একটা অপরিসীম ক্লান্তিতে মলয়ের চোখ বুজে আসছে। কলম আর চলতে চাইছে না। মলয় সেইখানে মেঝেতেই শুয়ে পড়ল।

ক্রমশঃ

রামানন্দ স্মরণে

যদুপতি ঘোষ

আমার পিতৃদেবের কর্মস্থান পুরুলিয়াতে থাকলেও, আদিবাস বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে। সুতরাং বাঁকুড়া জেলার একজন মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান হিসাবে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একটা বিশেষ শ্রদ্ধা-সম্মানের স্থান আমাদের বাড়ীতে ছিল। তাঁর দুই সুপ্রসিদ্ধা কন্যা সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর নাম আমরা সকলেই জানতাম। সে সময়ে অর্থাৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবিতকালে স্ত্রীশিক্ষায় অনগ্রসর—বাঁকুড়া জেলায় তাঁরা প্রথম উচ্চশিক্ষিতা মহিলা কিনা জানি না, তবে শিক্ষিতা মহিলা হিসাবে তাঁদের নামই আমরা প্রথম শুনেছিলাম। মনে আছে আমার এক কবি-আত্মীয় তাঁর কবিতার খাতাটির কলেবর গুরুতরভাবে বৃদ্ধি করলেও—তার একটাও কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করতে না পেরে বড়ই মনোদুঃখে ছিলেন। অবশেষে একবার শান্তা দেবীর বাঁকুড়ায় থাকাকালীন, তাঁকে ধরে এবং তাঁর আনুকূল্যে প্রবাসীতে একটা কবিতা ছাপিয়ে আশাতীত আনন্দলাভ করেছিলেন। কারণ তখন কোন রচনা প্রবাসীতে স্থান পাওয়া লেখকের পক্ষে বড়ই গৌরবের বিষয় ছিল।

সে সময়ে দেখেছি, আমার জানাশোনা যে সমস্ত বাড়ীতে পড়াশোনার চর্চা ছিল সেগুলিতে প্রধানতঃ প্রবাসী অথবা মডার্ণ রিভিউ পত্রিকা নেওয়া হ'ত। প্রবাসীর প্রথম পৃষ্ঠার উপরিভাগে একটা টবে রোপিত চারাগাছের এবং খাঁচায় বন্দী একটা মুক্তিপাগল পাখীর রেখাচিত্র থাকত। আর থাকত একটা উদ্ধৃতি নিজ-বাসভূমে পরবাসী হলে, পরদাস খতে নাম লিখাইলে। প্রথম রচনাটী প্রায়শঃই থাকত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের। তৎকালীন বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় লিখতেন। বুঝি আর না বুঝি প্রবাসী এলেই পড়তে আরম্ভ করে দিতাম। প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ সকলেই মনোযোগ সহকারে এবং রসগ্রহণ করে পড়তেন। মনে আছে একবার বিবিধ প্রসঙ্গে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তদানীন্তন ভারত সচিব এ্যামেরী সাহেবের কোনও মন্তব্যে বিরক্ত হয়ে বক্রোক্তি করেছিলেন—কেউ বলেন এ্যামেরী, কেউ বলেন আমেরী, আমি বলি আ মরি! আরেকবার বার্ণাড শ এর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উম্মার সহিত মন্তব্য করেছিলেন—"মাটিতে নামেন নাই, জাহাজে বসিয়াই রসিকতা করিয়া গিয়াছেন"। বার্ণাড শ, সেবারে অষ্ট্রেলিয়া থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে বোম্বে এসেছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষে নামেন নাই। শুনেছিলাম তখনকারদিনে যেসমস্ত ছাত্র উচ্চ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে বসতেন, তাঁরা প্রস্তুতির অত্যাবশ্যক অঙ্গ হিসাবে মডার্ণ রিভিউ বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন। একবার একজন আই সি এস পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন যে মডার্ণ রিভিউ পাঠে তাঁকে উক্ত পরীক্ষায় সফল হতে বিশেষ সাহায্য করেছে।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্র পিতৃবন্ধু জানকীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুরুলিয়া কোর্টে চাকরী করতেন। প্রসঙ্গতঃ একটা ঘটনার কথা বলি। পুরুলিয়ার মুন্সেফডাঙ্গায় জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের বিক্রয়ের জন্য একটা বাড়ী ছিল। কিন্তু অন্যান্য শরিকেরা অশান্তি করবে এই ভয়ে সেটা কেউ কিনতে

সাহস করেন নাই। কিন্তু জানকীবাবু সেটা নির্ভয়ে কিনে ফেল্লেন। সদর্পে বল্লেন—আমাদের বাপ-বেটার লাঠির সামনে কে আসছে আসুক। কেউ কোনরকম গোলমাল করতে সাহস করেনি। বলিষ্ঠতায় এবং তেজস্বিতায়, জানকীবাবু বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ার চাটুয্যেদের একজন সুযোগ্য বংশধর ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বিমলাপ্রসাদ আমাদের সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত দিকপাল ব্যক্তির সঙ্গে তার আত্মীয়তা থাকায় বন্ধুমহলে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। তার মুখে তাঁর বিষয়ে অনেক কথা আমরা সাগ্রহে শুনতাম। তার কাছে শুনেছিলাম যে তিনি সর্ব্বদা লেখাপড়ায় মগ্ন থাকতেন। একটা ঘরে তিনি একা বসতেন, সামনে থাকত একটা প্রকাণ্ড টেবিল, আর তার উপর রাশিকৃত দেশবিদেশের পত্র-পত্রিকা। তিনি নিবিষ্ট মনে পড়তেন আর প্রবাসী মডার্ণ রিভিউ এর জন্য টুকরো-টুকরো কাগজে রচনা লিখতেন।

তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম, তাঁর রচনাও বেশ কিছু পড়েছিলাম, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁকে চোখে দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। সেটা হয়েছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের (তৎকালীন নাম) অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে জামসেদপুর গিয়েছিলেন। সেখানে—তৎকালীন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী শিল্পপতি নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয়ের আহ্বানে অধিবেশন জামসেদপুরে হয় এবং তিনি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রণ করেন। রক্ষিত মহাশয় তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, এবং তিনি রক্ষিত মহাশয়ের বাড়ীতেই উঠেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, মূল সভাপতি হয়েছিলেন, দেবপ্রসাদ ঘোষ, সাহিত্যশাখার সভাপতি স্বনামধন্য গুরুসদয় দত্ত ইতিহাসশাখার সভাপতি প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ডঃ কালিদাস নাগ এবং বিজ্ঞানশাখার সভাপতি প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্ নলিনী সেনগুপ্ত মহাশয়। সভাক্ষেত্রে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রথম দর্শন করলাম। আকৃতিতেই তাঁর এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে কেউ চিনিয়ে না দিলেও চিনতে কিছুমাত্র কষ্ট হল না। বর্ণ কাঁচা সোনার মত, শুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত মুখমণ্ডলে অন্তর্মুখিতার প্রশান্ত গম্ভীরভাব। সৌম্যদর্শন ঋষিমূর্ত্তি। এ সম্বন্ধে রমাঁ রোলাঁর বর্ণনাটা উদ্ধৃত করা প্রসঙ্গোচিত বলে মনে করি—

How sympathetic he is by nature. The moment one see him one mus: love him. He radiates so much of affection and goodness and so simple and modest he is! ইত্যাদি।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে রক্ষিত মহাশয় জানালেন যে তাঁরা লোহার দেশের লোক, ভাব বিলাস ভাবালুতা, তাঁদের স্বভাবগত নয়। অক্লান্ত পরিশ্রম, অনিবার্য উদ্যম, অসফলতাকে অস্বীকার প্রভৃতি বিষয়ের উৎসাহ ব্যঞ্জক আলোচনাগুলিই তাঁদের দৃঢ় শক্ত মনে রেখাপাত করে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর অভিভাষণটা সাহিত্য সম্পর্কিত না করে মূলতঃ অর্থনীতিমূলক করে লোহার দেশের অধিবাসীদের শোনালেন। টাটার সঙ্গে তুলনা করে শ্রমশীলের অর্থলগ্নী না করার জন্য বাঙ্গালী ধনীদের উদ্যমহীনতা, ভীরুতা, বিলাস-পরায়ণতা প্রভৃতি দোষগুলির তীব্র সমালোচনা করলেন। সভায় সকলে তাঁর প্রাঞ্জল আন্তরিকতাপূর্ণ বহু অজ্ঞাত তথ্যসমন্বিত ভাষণটা বিমুগ্ধ চিত্তে শুনেছিল।

এ সম্পর্কে একটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং বিস্ময়কর দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসছে। ইতিহাসশাখার সভাপতি ডঃ নাগ অভিভাষণ দিতে উঠে সর্ব্বপ্রথমে তাঁর পূজনীয় শ্বশুরমহাশয়ের পায়ের ধুলো নিলেন। তাঁর এই আদর্শ নম্রতা এবং শ্রদ্ধাশীলতা সভায় সকলেরই হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। নাগ মহাশয় বঙ্গ মগধ ও কলিঙ্গের পুরাতন সংস্কৃতির ঐক্যের বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত দেশবরেণ্য ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার মত যোগ্যতা ছিল না। লোকমুখে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম এবং তাঁর

বিষয়ে রচনাদিও সাগ্রহে পড়তাম। ঐ যা একবার তাঁকে দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর মত বিরাট প্রতিভাবান এক কর্মীকে সেদিনও বুঝি নাই, আজও বুঝি না। তবে আমার সাধারণ বুদ্ধিতে তাঁর সম্বন্ধে এই ধারণা যে তাঁর জীবনসাধনার মূলে ছিল অকপট অনির্বাণ দেশভক্তি। যাতে তাঁর স্বদেশবাসীগণ মাতৃভূমিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে শিক্ষা করে, যাতে পরদাসখতে নাম লিখানোতে নিদারুণ অশান্তি এবং লজ্জাবোধ করে, সেজন্য তিনি অবিশ্রাম লেখনী চালনা করেছেন। তদানীন্তন ভারত সরকারের বিত্ত-বিভাগের উপদেষ্টা স্যার বি এন মিত্রের পরলোকগমনে এই নির্ভীক স্পষ্টবক্তা সংবাদপত্রসেবীর খেদোক্তি মনে পড়ে—"কি আর করিলেন, সারা জীবন কেবল চাকরী করিয়াই গিয়াছেন।" প্রতিভা এবং কর্মশক্তি যতই অসাধারণ হোক না কেন, যদি সেগুলি দেশহিতব্রতে নিয়োজিত না হত, তিনি তাদের সার্থকতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। দেশভক্তির ক্ষেত্রে চট্টোপাধ্যায় রামানন্দকে রায় রামানন্দের সঙ্গে তুলনা করলে কষ্টকল্পনার দোষে দোষী হব বলে মনে করি না। রায় রামানন্দ বাহ্যিক ব্যবহারিক-জীবনে অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হওয়ার জন্য ভোগ-বিলাসে আচ্ছন্ন থাকলেও আর্থিক-জীবনে তিনি ছিলেন সংত্যাগী, পরম ভগবদ্ভক্ত। তেমনি চট্টোপাধ্যায় রামানন্দ তাঁর ব্যবহারিক জীবনে সুলেখক সুবক্তা এবং সুবৃহৎ সংবাদ-সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা তথা সুদক্ষ পরিচালক হলেও অন্তর্জীবনে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ দেশভক্ত। তাঁর জীবনের সমস্ত চিন্তা এবং কর্মশক্তি তিনি দেশহিতব্রতেই উৎসর্গ করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যথার্থই বলেছেন—"ভারতের জাতি-গঠন কার্য্যে বহু জাতিগঠনকারী অপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

জীবনের ধারা

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

ঘরখানাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল রাজশেখর। একটা টেবিলে কিছু কাগজপত্র রয়েছে। সামনের ফুলদানিতে কিছু প্লাসটিকের ফুল। টেবিলের সামনে একখানা চেয়ার। আর একটা চেয়ার টেবিলের পাশেই ছিল। সেখানাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে রাজশেখরকে বসতে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ালের ধারে খাট। বিছানা বালিশ প্রভৃতি চাদর ঢাকা। এককোণে একটি তেপায়া টুলের উপরে বেশ বড় একটি রেডিও। ঘরের সঙ্গে লাগান ছোট একটু বারান্দা। বারান্দায় বেতের তৈরী দোলনা ঝুলছে। সবকিছু দেখতে রাজশেখরের মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত লাগল। দোলনা কার জন্য অলকাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। অলকার কোন সন্তান! প্রথম না দ্বিতীয় না তারও পরের কিছু!

অবশ্য কথা বলার সুযোগই বা হয়েছে কোথায়। প্রথম কড়া নাড়তেই একটি প্রশ্ন শোনা গেছে—কে? অলকা তারপরই ভীষণভাবে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে—কে! রাজশেখরদা!

'এস বোস' বলে ঘরের মধ্যে এনে চেয়ারখানা

এগিয়ে দিয়েছে অলকা। তার চোখে বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। অলকা প্রশ্ন করেছে "কানপুর থেকে ?" ন বছর বাদে ?"

রাজশেখর বলেছে 'না এখন কানপুর থেকে নয়— কোডারমা থেকে।'

কোডারমা কোথায় জানে না অলকা কিন্তু প্রশ্ন করেনি বলেছে 'বোস, শাশুড়ীকে ডেকে আনি।"

মিনিট দু'তিন পার হয়ে গেছে। রাজশেখর ঘরখানাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। দেওয়ালে কালীচরণ আর অলকার একসঙ্গে তোলা ছবি রয়েছে। খুব সম্ভবত বিয়ের কিছুদিন পরেই তোলা। অলকাকে ছবিতে আগের মতই সুন্দরী দেখাচ্ছে। মুখে খুব পরিচিত দুষ্টুমি মাখানো হাসি। ছবিটা দেখে পুরাণো কথা মনে পড়ল রাজশেখরের। ময়না পুকুরের পাড়ে বাঁকানো নারকেল গাছটার গর্ত থেকে শালিকের ছানা পাড়তে উঠেছিল অলকা। ছানাটাকে বার করে এনে সে ধীরেধীরে নেমে আসছিল। হঠাৎ মা শালিকটা কোথা থেকে এসে অলকার মাথায় ঠুকরে দিল। টাল সামলাতে না পেরে অলকা নীচের পুকুরে পড়ে গেল। সাঁতরে উঠে এল অলকা। তখনও সে ফ্রক পরে। জলে ভিজে ফ্রকটা তার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ভিজে জামায় যৌবনের প্রথম উন্মেষটুকু তার নজরে পড়ায় অলকা প্রথম লজ্জা পেল। রাজশেখর পুকুরের পাড়েই দাঁড়িয়েছিল। অলকা জিভ বার করে রাজশেখরকে ভেংচি কেটে একছুটে বাড়ী গিয়ে ঢুকল।

অলকা ঘরে এল, সঙ্গে শাশুড়ী। শাশুড়ী রাজশেখরকে চেনেন ছোটবেলা থেকে। একই পাড়ার ছেলে, বিশেষ করে কালীচরণ রাজশেখরের বন্ধু। এ-বাড়ীতে অনেক আগে থেকেই তার যাওয়া-আসা ছিল। তিনি রাজশেখরকে কুশল প্রশ্ন করলেন 'কেমন আছ, ভালত ?'

প্রথামত উত্তর দিল রাজশেখর - চলছে একরকম, আপনি ?'

'এই আর কি, কোথায় থাকো এখন ?'

'কোডারমার জঙ্গলে' বলল রাজশেখর।

'জঙ্গলে! কি কর সেখানে ?"

'অভ্রখনির হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার, প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করি, মাস গেলে চার পাঁচশ টাকার মত হয়।'

'ভাল, ভাল, আমরা ত ভেবেছিলুম তুমি বোধ হয় সন্ন্যাসী টন্যাসী হয়ে গেছ' বললেন অলকার শাশুড়ী।

"না আমি বরাবরই বাস্তববাদী। তা না হলে জীবনটা হয়ত অন্যখাতে বইত' বলল রাজশেখর।

অলকার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল, রাজশেখরদা কি বলতে কি বলবে কে জানে। অলকার সঙ্গে পরামর্শ করে ওর শাশুড়ী উঠে গেলেন, বোধ হয় জলখাবারের ব্যবস্থা করতে।

রাজশেখর অলকাকে ভাল করে দেখল। আগের চেয়ে একটু মোটা হয়েছে অলকা, মুখে কিশোরীসুলভ চপলতা কেটে গিয়ে গাম্ভীর্য্য এসেছে। রং ফরসা হয়েছে আর একটু। চুলগুলো আগের চেয়েও যেন বেশী কুঁচকে গেছে বলে মনে হল।

'কি দেখছ ?' প্রশ্ন করল অলকা।

'দেখছি! যদি বলি তোমাকেই' ?

'আমার মধ্যে দেখার কি আছে।'

'কি আছে তা কি কোনও দিন বোঝাতে পেরেছি ? বলল রাজশেখর।

'বাঃ বেশ মন ভোলান কথাবার্ত্তা বলতে শিখেছ দেখছি, অভ্যাসে সবই হয় তাই না ?

'অভ্যাস! তার মানে।

'মানে; আমাদের বৌদিটির মন ভোলাবার জন্যে মাঝে মাঝে তোমায় ওসব বলতে হয় নিশ্চয়, তাই বলছি।

রাজশেখর কয়েক মুহূর্ত্ত চুপকরে থেকে বললেন, না ঐ পাঠশালায় আর পড়া হয়নি। অলকার চোখে-মুখে বিস্ময়, মুখে অবিশ্বাসের ছায়া, বললে 'বিয়ে করনি তা হলে—কিন্তু কেন ?'

থাক না ওসব কথা, ও লাইন থেকে ত রিটায়ার করেছি।

অলকা তীক্ষ্ণ চোখে রাজশেখরকে দেখল। চোখের দৃষ্টিটাই কত রুক্ষ হয়ে গেছে রাজশেখরের। ও চোখে যেন কোন আলো নেই, কোন অনুভূতি নেই কিন্তু সত্যিই কি তাই!

- ও অনেক আগেই তোলা, বলল অলকা।

'এখন তুললে নিশ্চয় আরো ভাল হত, এতদিনে কালীচরণ আর একটু মোটাসোটা হয়েছে নিশ্চয়।'

'তা হয়েছে, মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের চেহারাটাও একটু বাড়ে।

অলকাকে গর্বিত মনে হচ্ছে। তার ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেছে, তার স্বামীর মাইনে বেড়েছে স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। অলকাদের বাড়ী সারানো হয়েছে, অলকার গায়ে নতুন নতুন গয়না হয়েছে, বাড়ীতে স্বচ্ছলতা এসেছে। তবে কেন অলকা গর্বিত হবে না। যা হওয়া স্বাভাবিক অলকা তার ব্যতিক্রম নয়।

অলকার উপরে রাগ হচ্ছিল রাজশেখরের। অলকা নিজের জগত গড়ে নিয়েছে, সে জগতের বাইরে কোনও সুর আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। অলকার বিয়ের কয়েকদিন আগেকার কথা মনে পড়ছিল রাজশেখরের। অলকা কেঁদে ভাসাচ্ছিল। দিন তিনেক মুখেও কিছু তোলেনি। রাজশেখর তাকে বুঝিয়েছিল যে কালীচরণকে বিয়ে করে সে সুখী হবে। রাজশেখর বুঝিয়েছিল কিন্তু যন্ত্রণায় তার বুকের মধ্যে কুঁকড়ে উঠছিল। অলকা বলেছিল কিন্তু রাজশেখর দা, আমি যে তোমাকে শুধু তোমাকে......। আর কিছু বলতে পারে নি অলকা। শুধু কান্না থাম বার জন্য মুখে আঁচল গুঁজে দিয়েছিল।

রাজশেখর উঠে চলে গিয়েছিল। তার যদি একটা চাকরী থাকত তাহলে সে অন্যরকম চিন্তা করতে পারত।

কালীচরণ ফিরবে কখন? এলোপাথাড়ি বল মারার মত হঠাৎ প্রশ্ন করল রাজশেখর।

'ও ত ফিরবে সেই রাত্রি আটটায়।

এখন দুপুর। কালীচরণ এখন ফিরবে না সে কথা রাজশেখর জানে, তবু ঐ রকম প্রশ্নটা সে করল। অলকাকে আবার ভালভাবে দেখতে লাগল রাজশেখর। কি সুন্দর—চোখ দুটো। ঐ চোখ দুটো দেখলে আবার আগের মতো কাছে সরে আসতে ইচ্ছে করে, আগের মত আলতো করে ঠোঁটের ছাপ এঁকে দিতে ইচ্ছে করে ঐ দুটোর উপরে। কিন্তু কি হবে ঐ চোখদুটোয় কালীচরণের মনের ছাপ আঁকা হয়ে গিয়েছে, রাজশেখরের ছাপ মুছে গেছে সেখান থেকে।

'চাটা হল কিনা দেখি, বলল অলকা।

না থাক তুমি বসো, চা খাবার জন্যে অতদূর থেকে আমি আসিনি। জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকাল অলকা। তার চোখে সন্দেহ ঘনীভূত হল, বলল 'খুব স্বাভাবিক। চা খেতে অতদূর থেকে কেউ আসতে যাবে কেন, তবু এসেছ যখন তখন শুধুমুখে ত ফিরে যেতে পারবে না।'

অলকা মোটা হয়েছে, ফর্সা হয়েছে, শান্ত হয়েছে কিন্তু কথা বলার ধরন কিছু পালটায় নি, মনে মনে ভাবল রাজশেখর। আজ কালীচরণের প্রতি হঠাৎ সে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। সে কালীচরণকে হিংসা করতে শুরু করেছে। কালীচরণ অলকাকে পেয়ে তৃপ্ত, সুখী অথচ অথচ...

বাইরে ইলেকট্রিকের তারে বসা কাকটা তেষ্টায় হাঁ করে রয়েছে। গরম হাওয়া ঘুরে গেল এক ঝলক। নিম গাছটার তলায় শুকনো পাতার খস খস শব্দ উঠল।

সেদিক থেকে চোখ ফেরাল রাজশেখর। অলকা ওরদিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তার চোখের তারায় অসীম গভীরতা।

অলকা হঠাৎ প্রশ্ন করল তবে কি শুধু আমায় দেখতেই এসেছ?

'জানিনা' বলল রাজশেখর। একটু থেমে বলল, ভালই আছ তাহলে!

ভাল না থাকলে তুমি আনন্দিত হতে?

রাজশেখর চমকে উঠল। না অলকা ভাল না থাকলে রাজশেখরের কষ্ট হত, অলকার দুঃখ সে সহ্য করতে পারত না, আর পারত না বলেই সেদিন একা চোরের মত পালিয়েছিল। অলকাকে সঙ্গে নিয়ে যায় নি। কিন্তু এখন অলকা সুখী অলকা তার নিজের জগতের সম্রাজ্ঞী, স্বামী পুত্র কন্যা স্বচ্ছলতার কেন্দ্রবিন্দুতে তাকে অধিষ্ঠিতা দেখে রাজশেখর কিছুতেই সুস্থির হতে পারছে না। কালীচরণের প্রতি কেমন যেন সে নির্মম হয়ে উঠছে। কালীচরণের চিন্তাটাই তাকে অসুখী করে তুলছে।

"তা কি সম্ভব, তোমার অকল্যাণ আমি কোনও দিন চাইনি" বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাজশেখর।

অলকার শাশুড়ী ঘরে এলেন। সিঙাড়া মিষ্টিটিষ্টি সব আনিয়েছেন তিনি। চা আর খাবারগুলো সামনে ধরে দিয়ে বললেন 'খাও বাবা, কিছুই ব্যবস্থা করা গেল না, কাল রাত্রে বরং তোমার নেমন্তন্ন রইল। এখানে খাবে।'

অলকার মেয়ে ওঘরে কাঁদল। অলকা উঠতে যাচ্ছিল। শাশুড়ী বললেন, আমি যাচ্ছি, তুমি বরং ঘটক ঠাকুরের সঙ্গে কথাটথা বল।'

'ঘটক ঠাকুর' বলে মনে মনে হাসল রাজশেখর। হ্যাঁ সেই ত সম্বন্ধটা এনেছিল। অলকার চোখদুটো হঠাৎ কেমন যেন ভারি হয়ে হয়ে এল, বললে, তুমি কেমন যেন রুক্ষ হয়ে গেছ, কঠিন হয়ে গেছ।

'পরিবেশ আর পরিস্থিতি মানুষকে বদলে দেয় অলকা, আমাকেও দিয়েছে, কিন্তু তুমি একই রকম আছ।'

'তাই কি আছি?' বলল অলকা। অলকার ভেতরে চিতাটা আজও নেভেনি রাজশেখর দা।'

হঠাৎ ওর চোখের কোল দুটো টল টল করে উঠল। সে চোখ মুছল।

অলকার শাশুড়ী নাতনীকে কোলে নিয়ে ফিরে এলেন। রাজশেখর সেদিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। ঠাণ্ডা চাটা এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়াল রাজশেখর। বললে, কাল রাত্রে আপনার নিমন্ত্রণ রাখতে পারলাম না, একটা জরুরি কাজ আছে কাল।

রাস্তায় এসে দাঁড়াল রাজশেখর। দরজার দিকে ফিরে তাকাল। না অলকা সামনে নেই। ইলেকট্রিক তারের দিকে চোখ পড়ল। কাকটা তখনও শুকনো গলায় হাঁ করে বসে আছে। কাকটার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল রাজশেখর।
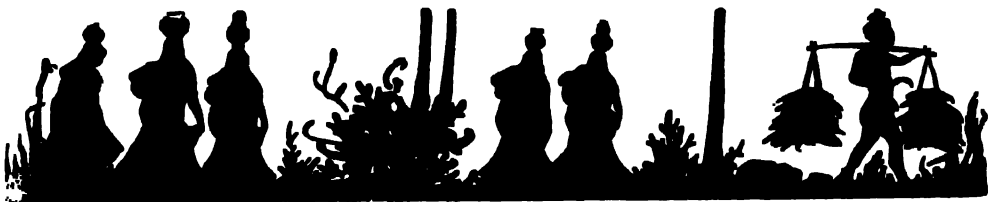
বর্দ্ধমান জেলায় খৃষ্টান মিশনারীদের অবদান

ললিত হাজরা

বর্ধমান জেলায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারে ও সমাজে অবহেলিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত নরনারীর সেবা-কার্যের অবদান অবিসংবাদিত। ধর্মপ্রচারের মানসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হইয়াছিল এ-কথা অনস্বীকার্য কিন্তু সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে থাকিয়া মিশনারীগণ মানবতার সেবা করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে আরম্ভ করিয়া এক শতাব্দীব্যাপি খ্রীষ্টান মিশনারীদের বর্ধমান জেলায় ক্রিয়াকলাপ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বর্ধমান জেলায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। সর্বাগ্রে চার্চ মিশনারী সোসাইটি (সি এম এস নামে খ্যাত) বর্ধমানে আসে। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সোসাইটির কর্তৃপক্ষ মিশনের কাজকর্ম চালাইবার জন্য বর্ধমান শহরে স্থায়ীভাবে থাকিবার আয়োজন করেন। রেভারেণ্ড্ জন্ জেমস্ উইট্‌ব্রেখ্‌ট্ (Rev John James Weibrecht) এই জেলায় মিশনারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন এবং তৎকালে মিশনারীদের প্রতিটি সেবামূলককার্যের সহিত তিনি যুক্ত থাকিতেন। স্মৃতিকথায় রেভাঃ উইটব্রেখ্‌ট্ চার্চ মিশনারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠার এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন: "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধর্ম-পরায়ণ ও বিশ্বস্ত কর্মচারী ক্যাপ্টেন ষ্টুঅার্ট (Captain Stewart) ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মিশনের কার্য আরম্ভ করেন এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুদিন পর্যন্ত মিশনের কার্য চালাইয়া যান। প্রথম বৎসরে বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং পরবর্তী দুই বৎসরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইল দশ ও মোট ছাত্র-সংখ্যা হইল এক হাজার। এই বাবদে মাসিক দুইশত চল্লিশ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। গোড়াতেই তাঁহাকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। ব্রাহ্মণগণ সাধারণের মধ্যে গুজব রটাইয়া বলিতে লাগিলেন যে শিক্ষা দিবার নাম করিয়া এই দেশীয় বালকদের ইংলণ্ডে পাচার করা হইল ষ্টুঅার্টের প্রকৃত মতলব। এমন ঘটনারও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে এক ব্যক্তি যখন জানিতে পারিল যে তাহার পুত্র ষ্টুঅার্টের বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইবার মতলব করিতেছে তখন সে এমনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল যে সন্ধ্যার সময়ে সেই পুত্রকে শৃগালের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিল। বিদ্যালয়ে মুদ্রিত পাঠ্য-পুস্তক প্রবর্তন করিবার ফলে বিপদাশঙ্কা দেখা দিল। ইতিপূর্বে পাণ্ডুলিপির সাহায্যে ছাত্রদিগকে বিদ্যার্জন করিতে হইত। যাহারা এই পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করিয়া জীবিকা অর্জন করিত তাহারা ভাবিতে লাগিল যে, তাহাদের বঞ্চিত করিবার জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে। গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগকে বলা হইতে লাগিল, ছাত্রদের হস্তে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক তুলিয়া দিলে ছাত্রদিগকে ভীষণ অসুবিধায় ফেলা হইবে। উহারা ঐগুলি পাঠ করিতে পারিবে না। যদিও বা কোন রকমে পাঠ করিতে পারে কিন্তু ঐগুলির অর্থ বিন্দু-বিসর্গ বুঝিতে পারিবে না। ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা ও ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত শিক্ষা ছাড়াও ক্যাপ্টেন ষ্টুঅার্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেগুলেশনের (Regulations) মুখবন্ধে হিন্দুদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত অংশটাও ছাত্রদের পড়াই-বার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বংশগত পদমর্যাদার বালাই ছিল না। কেবল-

মাত্র ছাত্রদের গুণগত মর্যাদা দেওয়া হইত। ব্রাহ্মণ বালকের সহিত নিম্নজাতীয় বালক একত্রে পাশাপাশি উপবেশন করিত।" যাহা হউক অচিরেই ক্যাপ্টেন ষ্টিউআর্ট পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির সুনাম কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই বিদ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্য ছিল অল্প সংখ্যক শিক্ষকের সাহায্যে বহু সংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষাদান এবং প্রাচীন প্রথায় শিক্ষাদানের খরচের তুলনায় অর্ধেক খরচে শিক্ষাদান। এই সংবাদ কলিকাতার শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। (এই সোসাইটির য়ুরোপীয় সম্পাদক ছিলেন মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার। সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষার উন্নতি সাধন।) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ মাসের জন্য স্কুল সোসাইটি তাহার সুপারিনটেনডেন্টকে বর্ধমানে প্রেরণ করিল। ষ্টিউআর্টের বিদ্যালয় পরিচালনা ও শিক্ষাপ্রণালী কি ধরণের ছিল সে সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জনই যে সোসাইটির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সরকার মিঃ উইলিয়াম্ আদমকে (Mr. William Adam) এই দেশের শিক্ষার অবস্থা তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। মিঃ আদম ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে তদন্তের জন্য আসিলেন। তিনি ৬২৯টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া এক রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে তিনি লিখিয়াছিলেন : শিক্ষার ব্যাপারে বর্ধমান হইল বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ জেলা।" বিদ্যালয়গুলিকে চালু করিবার পর বর্ধমানে চার্চ মিশনারী সোসাইটিকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ক্যাপ্টেন ষ্টিউআর্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই চিন্তার ফলস্বরূপ ক্যাপ্টেন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের উত্তর-পশ্চিমে দুই মাইল দূরে গ্রাণ্ড্ ট্রাংক রোডের পার্শ্বে চার্চ মিশনারী সোসাইটির পক্ষ হইতে একখণ্ড জমি ক্রয় করিলেন। এই ভূমিখণ্ডের উপরে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল চার্চমিশনারী সোসাইটির গীর্জা, বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম ও মিশনের কর্মীদের আবাসগৃহ। বর্ধমানে সোসাইটির প্রধানকেন্দ্র এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ষ্টিউআর্ট পরলোক গমন করেন। তৎপূর্বে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রেভাঃ জন জেমস উইটব্রেখট্ বর্ধমানের চার্চমিশনারী সোসাইটির পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রেভাঃ উইটব্রেখট্ ১৮৩০–১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধমানেই ছিলেন। তাঁহার পরিচালনায় সোসাইটির পরম উন্নতি হয়।

এই সোসাইটি কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্দ্ধমান শহরকে কেন্দ্রবিন্দু করিয়া তাহার চল্লিশ মাইল পরিধির মধ্যে চৌদ্দটি বিদ্যালয় এই সোসাইটি চালু করিয়াছিল। ইহার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি বালিকা বিদ্যালয় ও অন্যটি ছিল হিন্দু ছাত্রদের হোষ্টেলসহ বঙ্গদেশের অন্যতম সুপ্রাচীন হাইস্কুল। এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল "অ্যালবার্ট ভিক্টর হাই স্কুল"। (Burdwan Albert Victor High School)। বর্তমানে ইহার অস্তিত্ব নাই। এতদ্ব্যতীত একটি অনাথ আশ্রম ও কালনা শহরের সন্নিকটে একটি বিদ্যালয়ও এই সোসাইটির পরিচালনাধীনে ছিল। পরে "ফ্রী চার্চ্ অব্ স্কট্ল্যাণ্ড্" কালনার বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে। যাহা হউক চার্চ মিশনারী সোসাইটির শিক্ষা-বিস্তার কার্যাক্রম সুন্দররূপে চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু জোয়ারের মুখেই ভাটা আসিল। সমগ্র বর্দ্ধমান জেলায় বিপর্যায় নামিয়া আসিল। " বর্দ্ধমান দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির উপযোগী স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের সে-সৌভাগ্য অস্তমিত হইবার সূত্রপাত হইল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুর গ্রামে যে সংক্রামক জ্বরের সূচনা হয়, তাহা পরবর্ত্তী ৪৪ বৎসরকাল ধরিয়া নদীয়া, বারাসত, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার অসংখ্য গ্রামে ভীষণ কাণ্ড ঘটাইয়া বহুলোকের প্রাণসংহার করিয়া সহস্র সহস্র গৃহ অরণ্যে পরিণত করিয়া পরিশেষে ভাগীরথী পার হইয়া হুগলী ও বর্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হয়।"

(৺চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "বিদ্যাসাগর"—ষষ্ঠ সংস্করণ পৃঃ ৪১৫) উপরিবর্ণিত সংক্রামক জ্বর ভয়াবহ "বর্দ্ধমান জ্বর" (Burdwan Fever) নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বেশ কয়েকমাস ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কুখ্যাত "বর্দ্ধমান জ্বর" বর্দ্ধমান শহরে ও আশে পাশে নারকীয় কাণ্ড ঘটাইতে শুরু করিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান শহরে মোট জনসংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার কিন্তু পরবর্তী তিন বৎসরেই সংগ্রাসী "বর্দ্ধমান জ্বর" উল্লিখিত সংখ্যা ৩২ হাজার ৬৮৭ জনে অবনমিত করল। অর্থাৎ মাত্র তিন বৎসরেই বর্দ্ধমান শহরের ৩০ শতাংশ নরনারী-শিশুর প্রাণসংহার করিল। কুখ্যাত "বর্দ্ধমান জ্বর" চার্চ মিশনারী সোসাইটির উপরে চরম আঘাত হানিল। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীগণ বর্দ্ধমান শহর ও জেলা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন, অনাথ আশ্রমটিকে আগরপাড়ায় স্থানান্তরিত করা হইল, বিদ্যালয়গুলি ক্রমে ক্রমে ছাত্রাভাবে বন্ধ হইয়া গেল এবং মিশনের য়ুরোপীয় কর্মীর সংখ্যাও হ্রাস পাইল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিক হইতেই বর্দ্ধমান জ্বরের প্রকোপ হ্রাস পাইতে লাগিল। ইহার পর চার্চ মিশনারী সোসাইটির সর্ব্বাবলুপ্ত প্রভাবের পুনরুজ্জীবন ঘটিল না। বর্দ্ধমান জেলায় এই সোসাইটির ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া গেল। বর্দ্ধমান শহরের বাহিরে অন্য মিশনারী সোসাইটির লোকজন আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। কেবলমাত্র বর্দ্ধমান শহরেই সোসাইটি কোন রকমে টিকিয়া থাকিল। স্থানীয় য়ুরোপীয় বাসিন্দাদের অনারারী চ্যাপলেনের (Honorary Chaplain) কার্য করিবার নিমিত্ত একজন য়ুরোপীয় মিশনারী এখানে রহিয়া গেলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত কিছু কিছু ভ্রমনশীল যাজক শীতকালে বর্দ্ধমানের আশে-পাশের গ্রামগুলিতে আসিয়া খ্রীষ্টের জীবনী ও তৎপ্রচারিত ভগবদ্বাক্য প্রচারের দ্বারা এই সোসাইটির অস্তিত্বের কথা জানাইয়া দিতেন।

বর্দ্ধমানের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় কুড়িমাইল দূরে অবস্থিত মানকর গ্রামে একটি চার্চ মেডিক্যাল মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চার্চ অব ইংল্যাণ্ড জেনানা সোসাইটি (Church of England Zenana Society) ইহা পরিচালনা করিত। অর্থাভাবের দরুণ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইহার অবলুপ্তি ঘটে। এই মেডিকাল মিশন তিনজন য়ুরোপীয় মহিলা ও একদল এদেশীয় সুদক্ষ কর্মীর সাহায্যে একটি হাসপাতাল ও একটি ডিস্পেনসারী পরিচালনা করিতেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জে ওয়েসলীয়ান মেথডিস্ট মিশনের (Wesleyan Methdist Mission) আবির্ভাব হয়। এই মিশনের সহিত যুক্ত একজন য়ুরোপীয় সুপারিনটেন্ডেন্ট ও দুইজন এদেশীয় যাজক ব্যতীত কয়েকজন নারীকর্মী এবং খ্রীষ্টের জীবনী ও তৎপ্রচারিত ভগবদ্বাক্য প্রচারকও ছিলেন। নারীকর্মীগণ মহিলামহলে যাতায়াত করিতেন। সংশ্লিষ্ট গীর্জার প্রাপ্তবয়স্ক উপাসকসংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশত। য়ুরোপীয়দের জন্য একটি গীর্জা ও দেশীয় খ্রীষ্টানদের জন্য তিনটি ক্ষুদ্র ভজনালয় ইহার সহিত যুক্ত ছিল। মিশন শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার ক্লাশ সহ একটি অনাথ আশ্রম নিঃসঙ্গ ও আতুর নরনারীর জন্য একটি আবাস, বিদ্যালয় ও খ্রীষ্টীয় সাহিত্য বিক্রয়ের জন্য একটি দোকান পরিচালনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত মিশন টু লেপার্স ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড দি ইষ্ট (Mission to Lepers in India and the East) পরিচালিত রাণীগঞ্জের কুষ্ঠাশ্রমটিও এই মিশনের সুপারিনটেনডেণ্ট তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার মিশন টু লেপার্স বহন করিত। এই কুষ্ঠাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু উক্ত মিশন নয়। মিঃ স্মিথ (Mr. Smith) নামক জনৈক য়ুরোপীয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রাণীগঞ্জে এই কুষ্ঠাশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে এই কুষ্ঠাশ্রম একটি বৃহৎ ও সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত দেখা যায়। এই কুষ্ঠাশ্রমে দুইশত ছয়টি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রোগী ছিল এবং অনাথ আশ্রমে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মাতাপিতার উনিশটি রোগমুক্ত শিশু ছিল।

আসানসোল শহরে রোম্যান ক্যাথলিক মিশন কবে আসিয়াছিল তাহার সঠিক তারিখ জানিতে পারা যায় না কিন্তু জানিতে পারা গিয়াছে যে, ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মিশনের একটি গীর্জা আসানসোলে নির্মিত হয় এবং পর বৎসরেই সংসারত্যাগী ধর্মাচারীদের জন্য মঠ ও বিদ্যালয়ের জন্য অট্টালিকার নির্মাণকার্য্য সুরু হয়। পরলোকগত আর্চবিশপ গোয়েথেলস্ (Goethals) কর্তৃক প্রস্তাবিত সোসাইটি অব জিসাসের (Society of Jesus) ছাত্রদের জন্য ভবনটি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কার্শিয়াং শহরে ছাত্রদিগকে স্থানান্তরিত করিবার পর তদানীন্তন আর্চ বিশপ এই ভবনটি মিশনের হস্তে তুলিয়া দেন। এই ভবনটির পরিবর্ধন করিয়া সেন্ট প্যাট্রিক স্কুল চালু করা হয়। এই সময়ে আসানসোলে মেথডিস্ট এপিস্কোপাল চার্চের (MethodistEpiscopal Church) মিশন আসিল। ভ্রাম্যমান ধর্মপ্রচারকদিগের কার্য্যের মধ্যেই ইহার সূত্রপাত হয় এবং ইহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য বঙ্গীয় সরকার ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একখণ্ড ভূমি দান করেন। পর বৎসরেই সরকার প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে একটি গীর্জা নির্মিত হয়। তৎকালে এই মিশনের তত্ত্বাবধানে ৫০টি বালক লইয়া একটি মধ্য ইংরাজী আবাসিক বিদ্যালয় ও ৮৫টি বালিকা লইয়া একটি মধ্য ইংরাজী আবাসিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বালক-বালিকাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল অনাথ। এবং বাকী বালক-বালিকাগণ আটশত দরিদ্র পরিবার হইতে আসিত। এই মিশন আসানসোলেও কুষ্ঠাশ্রম তত্ত্বাবধান করিত।

কালনা শহরে ইউনাইটেড্ ফ্রী চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড মিশন (United Free Church of Scotland Medical Mission) একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কাটোয়া শহরেও এই মিশনের চিকিৎসক সপ্তাহে একদিন আসিতেন ও দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতেন।

কাটোয়ায় মিশনের কোন গীর্জা ছিল না। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ব্যাপটিস্ট মিশন পরিচালিত একটি বালিকা-বিদ্যালয় কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাত্মা উইলিয়াম কেরী এই বালিকাবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। কাটোয়ার সাহেব বাগানে মহাত্মা কেরীর জ্যেষ্ঠপুত্রের সমাধি রহিয়াছে।

উপন্যাস

জন্ম-জন্মান্তর

রামপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ম্যাজিকই বটে। একদিন অতর্কিতে ওরা এসে পড়ল। বড় শ্যালক রুটি তখন দাড়ি কামাচ্ছিল, ছোট ছুটকু নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। গতরাত্রি জাগরণে গেছে। নানা গুরুতর কঠিন কাজে ছুটোছুটি করতে হয়েছে রাত ভোর। উপার্জন হয়েছে মন্দ নয়—এখন এক মাস কোন দায়-দায়িত্ব না নিলেও চলবে।

রমেনের দল হুড়মুড় করে বাড়ী ঢুকলো। হ্যালো ব্রাদারস-ইন ল, হাউ ডু ইউ ডু? বলে পিঠে একটা সোহাগসূচক প্রবল থাপ্পড় কষিয়ে দিলে। সেই ধাক্কায় রুটির সর্ব্বদেহ কেঁপে উঠলো—মুখখানা হল নিকষ কালো। গম্ভীরমুখে খেঁকিয়ে উঠলো, আঃ, কি যে গাড়োয়ানি ইয়ার্কি করেন—ক্ষুরখানা যদি গলায় বসে যেত।

রমেন হেসে উঠলো, তাহলে ভালই হতো চিত্রগুপ্তের খতিয়ান কিছু সরল হতো—,

রুটি ধমক দিল, থামুন, থামুন—খুব রসিকতা হয়েছে।

রমেন হাসি থামিয়ে গম্ভীরগলায় বলল, রসিকতা আর কতটুকু দেখলেন ব্রাদার ইন ল—পুরো স্পুলটাই তো ক্যামেরার মধ্যে। ছাড়ব এক একখানা অ্যাটম বম্ব—

রুটি বলল, খুব হয়েছে বাড়ীতে গিয়ে যত খুসী ফটো তুলুন গে—অন্যের বাড়ীতে রঙ্গজানি মারতে আসবেন না।

বটে। গর্জ্জন করে উঠল রমেন। অন্যের বাড়ী? এটা বুঝি আমাদের মহেশের শ্বশুরালয়? একেবারে গিরিরাজ ভবন। অনাদি, হরেন, গুপী—উঠে আয় তো গুপরে—মাসীমার খেল দেখিয়ে দিই বাছাধনদের।

দুপ দুপ শব্দে উঠে এলো মহেশের সহকর্ম্মীরা। বাছা বাছা জওয়ানের দল—ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে এককালে ট্রেনিং নিয়েছে—পি,টি,প্যারেড করেছে নিয়মিতভাবে, ইয়া বুকের ছাতি—লোহার বলের মত হাতের পেশী—আঙুলগুলো সাঁড়াশীর মত সাড়া জাগানো। ওরা উঠে এসেই বলল, কাকে কাকে মামার বাড়ী দেখাতে হবে হুকুম কর রমেন দা?

আরসি ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো রুটি—ছুটকুও আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বেরিয়ে এলো, বলল, এরা কে দাদা?

গুণ্ডার দল। গুণ্ডা আনিয়েছে মহেশ—এ তারই কাজ। চীৎকার করে উঠলো রুটি।

রমেন এগিয়ে এসে রুটির ফতুয়াশুদ্ধ ঘাড়টা চেপে ধরল। তারপর ঝাঁকানি দিতে দিতে সিঁড়ির দিকে ঠেলতে ঠেলতে বলল, ওয়ান বাই রেডী—টু বাই স্টেডী, থ্রি বাই রান—বলে হুড়মুড় করে ওকে নীচের দিকে নামিয়ে নিয়ে গেল।

ছুটকুকে ধরতে হল না—ও নিজে থেকেই সিঁড়ির পথ ধরলো। নীচেয় পৌঁছে শাসানি দিলে, জামাইবাবু, এর ফল একদিন পাবে বলে দিলাম।

হা হা করে হেসে উঠলো রমেন—পাবেন বই কি —আগে ফুল ফুটুক—মুকুল ধরুক—তারপর ফল। ফল পাকতে পাকতে তোমরাও ফট।

শাশুড়ী অভিশাপ দিতে লাগলেন, আমি যদি সতীকন্যে হই—তাহলে হে ভগবান, তুমি এর প্রতিফল দিও—দিও—দিও।

ঘটনাটা শেষ পর্য্যন্ত বিয়োগান্তই হল। বন্ধুরা চলে যেতেই রমা কাপড় বদলে ছোট মেয়েটিকে বুকে চেপে বড় মেয়েটির হাত ধরে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বলল, চললাম।

মহেশ বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায়?

মা যেখানে গেছেন—ভাইয়েরা গেছে—

কিন্তু তুমি যাবে কেন? তোমার জন্যই তো—

রমা দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আমার জন্য হলে এমন বিশ্রী গুণ্ডামি করতে না। ছি ছি—একটা পথের কুকুরকেও এমন করে তাড়ায় না মানুষ।

মহেশ বলল, ওরা যেতে চাইছিল না বলে—

রমা বলল, আর কোন ভদ্র উপায় ছিল না বুঝি? তোমার জন্য আমার ইচ্ছে হচ্ছে আত্মহত্যে করি। ছি —ছি—ছি।

ধিক্কার দিতে দিতে বা'র হয়ে গেল রমা। মহেশের সামনে একরাশ অন্ধকার নামলো। সে কেমন করে জানবে বন্যার জল ঘরের শান্ত নিস্তরঙ্গ জলকে এমন আলোড়িত করতে পারে।

* * * *

এখন মহেশের মনে শান্তি নাই। আগেও সংসার যে খুব শান্তির ছিল তা নয়, তবু অভ্যাসের বশে তাতেই নিরাপত্তা বোধ করত। পরিবেশ সুস্থ না থাক, অস্বস্তিকর মনে হতো না। এখন মাথার উপরে নিরাবরণ আকাশ যে আকাশ ভাল লাগে কোন সময়ে? যখন মাথার উপরে থাকে আচ্ছাদন। ভাঙ্গা ঘরে শুয়ে আকাশ নিয়ে কাব্য করতে পারে। কোন সৌন্দর্য্যপ্রিয় কবি? জীবন-রঙ্গমঞ্চে পর্বে পর্বে ভাগ করা অনেকগুলি দৃশ্য—অভিনেতার চরিত্র বিকাশের সহায়ক সেইগুলি। কিন্তু খোলা-মেলা আসরে এক টানা যাত্রাগানের পালা দীর্ঘকাল ভাল লাগে—না। মহেশ এখন ক্লান্ত অবসন্ন।

ছিল আর একটি আশ্রয়। মন পেতে চাইত নির্জন নিরালা অবকাশ—যার মধ্যে বসে সামান্যক্ষণের জন্যেও নিজেকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ জাগে, খুব ছেলেবেলা থেকে সেই আনন্দের বীজকে যেন বুনে দিয়েছিল মনে, গোঁসাই অনুকূল জলসিঞ্চনে তাকে লালিত করেছিলেন। সংসারে জড়িয়ে পড়ার আগে এবং বন্ধন দশাতেও সেই চিন্তা প্রায়ই বিদ্যুৎ-রেখায় বিদীর্ণ করতো সুখের অন্ধকার। কথাটা ভগবৎ প্রসঙ্গে কে যেন একদিন উচ্চারণ করেছিলেন। সুখ মানে মোহ বন্ধন। যা জগতের ঐশ্বর্য্য শান্তির অন্তরাল থেকে তৃষ্ণা বাড়ায়, উদ্যম বাড়ায়—ক্ষণকালের জন্য তৃপ্তিও দেয়—। সীমার মধ্যে সুখসাধককে স্বচ্ছন্দ করা তার ধর্ম নয়। তাই তৃপ্তির পর আসে অবসাদ। মনোবৃত্তির পারে যাবার পথ আছে—, মানুষ কিন্তু স্বভাবের বশে বাঁধা। সেই পথ খুঁজে নিতে সাধনার প্রয়োজন। পূজায় বসে এক একদিন অভূতপূর্ব তন্ময়তা আসত—অনাবিল আনন্দস্রোত বইতো, চোখের কোল বেয়ে অশ্রুধারা নামতো। মনে হতো—এইতো খুঁজে পেয়েছি আনন্দসরণী—আনন্দ-ময়ের মন্দিরে পৌঁছবার সোজা উপায়। ছোট্ট ঠাকুর-ঘরটি ছিল মহেশের তেমনি আশ্রয়—শান্তিনিকেতন। আকস্মিক বিপর্যয়ে সে আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হল মহেশ।

এই জায়গাটাই জীবন থেকে সরে গেল। প্রবাস-ভূমিতে কতকাল বাস করবে পথিক। মহেশ উঠে পড়ে লাগল বদলির জন্য।

রমেন বলল, সেই ভাল—জায়গা বদল হলে মন ঠিক হয়ে যাবে। তুমি বদলির চেষ্টা কর।

ভূমি বদল হলেই মন শান্ত হবে, সুস্থির হবে।

হয়তো হবে, না হলেও এই স্মৃতিকণ্টক-ঘেরা জায়গায় সে এক দণ্ডও তিষ্ঠোতে পারছে না।

মাঝে মাঝে প্রয়াগসঙ্গমে চলে যায়। অপরাহ্ণে সঙ্গমের প্রশান্ত রূপ। ধূ-ধূ বালুর চড়ায় বৈরাগ্যের বসন বিছানো, তার উপরে বসলে প্রাচীন যুগের পরিবেশ ধীরে ধীরে মনকে টেনে নেয়। প্রাচীন পুঁথির পাতা থেকে কাহিনীরা করে আত্মপ্রকাশ। এমন বৈরাগ্যবাঞ্ছিত স্থান ভারতবর্ষে দুটি নাই। কখনো সকাম যজ্ঞধূমে আবৃত হতো এখানকার আকাশ, পরিপূরিত হতো নাদধ্বনিত মন্ত্রবীর্যে, আবার কখনও বা রাজচক্রবর্তী সর্বস্ব ত্যাগের দৃষ্টান্তে উজ্জীবিত করতেন ভূমি মহিমাকে। এখনও প্রভাতকালে আর অপরাহ্ণবেলায় দুই বিপরীত মানবিক বৃত্তির ধারা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের মাহাত্ম্যকে উদ্ঘাটন করে। সকালে স্নান পূজা ঐহিক কামনা। অপরাহ্ণে উদাস বালু-বেলায় বন্ধন-মুক্তির রূপাভাস। একই দেহে দ্বৈত জীবন-ভাবনা।

তবু কোনটাকেই ভাল করে ধরা গেল না। আসলে নষ্ট হয়েছে অভিনিবেশ, মনের প্রশান্তি। মন সুস্থির না হলে চঞ্চলবৃত্তিকে বশে আনা যাবে না।

মহেশ বদলির জন্য অফিসারের দ্বারস্থ হল।

অফিসারটি সহৃদয় ছিলেন। ওর শুকনো মুখের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, এখানকার জলবায়ু কি সহ্য হচ্ছে না?

মাথা নাড়ল মহেশ, তেমন অসুবিধে বোধ করছি না, কিন্তু থাকতে পারছি না, ভাল লাগছে না।

অফিসার বললেন, হেল্থটা চেক করিয়ে নিন। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে মন এমনি হয়। তবে যেখানে যেতে চাইছেন সেখানকার ক্লাইমেট আরও খারাপ।

তবু মনে হচ্ছে সেখানে ভাল থাকব।

যা ভাল বোঝেন। আমি রেকমেণ্ড করে দিচ্ছি, আপনিও চেষ্টা করুন। একবার চীফের সঙ্গে দেখা করুন।

খুব বেশি চেষ্টা করতে হল না, লক্ষ্ণৌতে বদলি হয়ে গেল মহেশ।

*　　*　　*

ছোট্ট একটি বাসায় এবার অখণ্ড অবসর। ঘরের দেয়ালে দেবদেবীর ছবি টাঙিয়ে জলচৌকির উপর আসন পেতে কয়েকটি মূর্তি ও পূজার সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখে তৃপ্তিবোধ করল মহেশ। বেদীর সামনে সকালে সন্ধ্যায় ধূপদীপ জ্বালিয়ে স্তোত্রপাঠ করে। উচ্চকণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করে, পাঠান্তে মনের ভার নেমে যায়। স্পষ্ট অনুভব করে মন হালকা হল, প্রসন্ন হল চলার পথটি, আরও ঋজু এবং প্রশস্ত হল। এক একদিন ফুল কিনে আনে, চন্দন ঘষে আর অনর্গল স্তবমন্ত্র পাঠ করে। আপিসের সময় বয়ে যায়, তবু তন্ময়তার ঘোর কাটে না। বন্ধন কেটে গেছে বলে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানায়। গুন গুন করে সুর ভাঁজে:

এই করেছ ভাল নিঠুর, এই করেছ ভাল।

কিংবা:—

আমার এ দেহখানি তুলে ধর
দেবালয়ের প্রদীপ কর।

কখনো:

তোমার নিবিড় কর মজ্জন করো মলিন মর্ম মুছায়ে।

এমনি করে লক্ষ্ণৌতে কাটলো ছ'টি মাস।

*　　*　　*

নদীর এক পাড় ভাঙে আর অন্য পাড় গড়ে এই প্রবাদ আবহমান কালের। মানুষের মন-নদীও এই স্বভাবের বশবর্তী। যতই পূজা অর্চনা দেবভাবনা নিয়ে সময় কাটুক, রাত্রি দিনে সে আর কতটুকু। আপিস ও ঘরের কাজ সেরে আরও অনেক সময় থাকে। কূল ভাঙা নদীর মত মন তখন ভাঙা-গড়ার খেলায় মত্ত হয়।

লক্ষ্ণৌ থাকবার কালে একদিন ইচ্ছা হল বাড়ি যায়। দু'শো মাইলের মত পথ, একটি রাত্রি

ব্যবধান। কেন বাড়ী যাবে জানে না, তবে বাড়ীর স্মৃতি ভোলেনি মহেশ। বিত্তহীন বেকার ছেলের অনাদর-তিক্ত অভিজ্ঞতা জমিয়ে রেখেছিল। তবু একেবারে সম্বন্ধ ছেদ হয়নি। মাঝে মাঝে চিঠিতে প্রণাম জানিয়েছে, কুশলবার্তা জানতে চেয়েছে, সেটা প্রাণহীন সৌজন্য ছাড়া কিছু নয়। প্রীতি শ্রদ্ধার বেগ ক্রমশই শিথিল হয়ে আসছিল। এখন মনের ফাঁক ভরাতে তাদের কথাই মনে পড়ল সর্বাগ্রে। সেইসব সহানুভূতিহীন স্বার্থ সঙ্কীর্ণ মনের কাছে সান্ত্বনা বা শান্তির আশা দুরাশা জেনেও মহেশ তারই পিছনে ছুটলো। এটাই বুঝি আত্মীয়তার বন্ধন, এক রক্তের টান।

বাবা গত হয়েছেন। মহেশ তখন আসানসোলে চাকরি নিয়েছে। তিন দিনের ছুটিতে বাড়ী এসেছিল, মুখাগ্নি করেছিল ছোট ভাই—সেই পিতৃকৃত্য করেছিল। সপিণ্ডকরণে মহেশের প্রয়োজনীয় ভূমিকা ছিল না। ইচ্ছা করেই নেয়নি, গঙ্গাতীরে আলাদা হয়ে কাজটা সেরেছিল সে, তারপর দুটি বছরের ছাড়াছাড়ি। মাঝে দু'বার বিজয়া দশমীর প্রণাম দিয়ে একখানা করে পোষ্টকার্ড ছেড়েছে, কোনটায় বাঁধাগতে আশীর্বাদ এসেছে, কোনটায় আসেনি। আন্তরিকতার অভাব এখন মনকে পীড়া দেয় না। মনের আসক্তি যেন এই প্রান্ত হতে ভাঁটার জলের মত সরে গিয়েছিল। তবু একেবারে যায়নি, স্টেশনে নেমে বুঝল। এক্কায় চড়ে চালককে নির্দেশ দিল জলদি যাবার জন্য। মনের এই বেগ আর কৌতূহল স্টেসনে পা দিতে না দিতে কেমন যেন প্রবল হয়ে উঠলো। তার ছোট দুটি ভাই, চুন-বালি-খসা ভাঙ্গা বাড়ী, সাদা থান পরা মা…

এক্কাচালক রুগ্ন ঘোড়ার পিঠে যত জোরে কশাঘাত করছে, ততই অস্থির হয়ে উঠছে মহেশ। চল—চল ভেইয়া জলদি চল।

আশ্চর্য্য দুনিয়া, আশ্চর্য্য মানুষের মন। গঙ্গার স্রোতের মত কোন কিছুই জমে না সেখানে। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রইল না, মা ভাইয়ের স্নেহ-যত্নে ভারি তৃপ্তি অনুভব করল মহেশ।

মা খেদ করে বললেন, তোরাই যদি বাড়ীতে না আসবি আমি কেন মিছে ভূতের বোঝা বয়ে মরছি। কে আছে আমার? এই দুটো অপোগণ্ড ছেলে কবে মানুষ হবে ভগবান জানেন! এই ভাঙ্গা বাড়ী—কোনদিন ছাদ ভেঙ্গে চাপা পড়ে অপঘাত মৃত্যু হবে, বিশ্বনাথ বলতে পারেন, আমার সুখ সাধ আশা ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছে। তবু তোদের মুখ চেয়ে—

মহেশ বলল, অল্প আয়—দুদিকে সামাল দিতে পারিনে, এবার ভাবছি ঘরদুটো মেরামত করিয়ে নেব, মাস দুই ছুটি নেব।

আর তপেন, সুরেন ওরা তো বলছিল ইস্কুল যাবে না। ছ' মাসের মাইনে বাকি, মাস্টাররা এমন কড়া তাগাদা দেন। মা দুঃখের পাঁচালী সুরু করল।

আমি কালই ওদের মাইনেপত্তর মিটিয়ে দিচ্ছি।

মা বললেন, আমার ইচ্ছে আর একবার ভাড়া বসাই, আয় বাড়ুক।

মহেশ বলল, একখানা ঘরে সবাইকে কুলোবে? তা ছাড়া আত্মীয়স্বজন কেউ এলে জায়গা দিতে পারবে না। এক ঘর ভাড়াটে রয়েছে, তাতেই কম অসুবিধে।

ভাইকে ডেকে বলল, হারে তপেন, মাস্টারমশাইর খবর রাখিস? তিনি কবে এসেছিলেন।

তিনি তো আসেন নি। কেউ কেউ বলে, সন্ন্যেসী হয়ে হিমালয়ে চলে গেছেন।

তাই সম্ভব। মহেশ ভাবল। উনি হিমালয়েই আছেন—তপস্যা করছেন। পুণ্যাত্মা সাধুদের মৃত্যু কল্পনা করা যায় না—কল্পনা করলে মন খারাপ হয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওঁদের তফাৎ ওখানেই। সাধারণ মানুষ সর্ব-ক্ষণই মৃত্যুভয়ে কাতর—ওঁরা হাসতে হাসতে দেহান্তর

গ্রহণ করেন। দেহান্তরগ্রহণ মৃত্যু নয়, জরা ব্যাধি-জাত জীর্ণ দেহ ত্যাগ নয়। অন্ত এক সুন্দর লোকে চিরবসন্তের দেশে প্রয়াণ। দু' বছরে অনেক ঢেউ বয়ে গেছে গঙ্গায়—অনেক পরিবর্তন হয়েছে সংসারের। সন্ধ্যাবেলায় বাঁধানো ঘাটের চত্বরে বসতেই হু হু করে উঠলো মন। কিছুই থাকছে না—কিছুই জমছে না, অথচ ধরে রাখার জন্ম কি প্রাণান্তকর পরিশ্রম।

* * *

বাড়ীটা মেরামত হল, বাপের কিছু ঋণ ছিল, শোধ হল, ভাইয়েরা ভালভাবে লেখাপড়া করতে লাগল। নিবু নিবু আশার বাতিগুলি তেল সলিতা পেয়ে আবার জ্বলে উঠতে লাগল। মাসকয়েকের জন্ম মনের অতৃপ্তি-বোধ ঘুচলো। তারপর আবার সেই একাকীত্ব বোধের পীড়ন। এ পীড়ন যে কত দুঃসহ—

এমনি সময়ে এলাহাবাদ থেকে রমার চিঠি এলো। অনেক দিন পরে চিঠি লিখেছে রমা। কোন অনুযোগ করেনি, অপ্রিয় ঘটনার উল্লেখ করে অতীতদিনের স্নেহ-ভালবাসাকে জাগিয়ে তুলতে চায়নি। শুধু লিখেছে: দুটি পোষ্য নিয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। আমাদের বাড়ীর কাছে একটি সরকারী সেবাভবন হয়েছে সম্প্রতি,—চেষ্টা করছি সেখানে যাতে কাজ পেয়ে যাই। তোমার কাছে একটা এনকোয়ারী যেতে পারে। আশা করি এমন কোন বিরূপ মন্তব্য করবে না যা কাজের প্রতিবন্ধক হবে।

কথাটা যত অনায়াসে লিখেছে, তত সহজেই কি মহেশের দিক থেকে গ্রহণ-যোগ্য? উপায়ক্ষম স্বামী, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উপার্জনের পথ বেছে নেওয়া স্বাধিকারপ্রমত্ততা ছাড়া কি বলা যায়। সে-ও না হয় হল, কিন্তু এত সহজে সম্বন্ধচ্ছেদ আইনে বাধবে না? আইন থাক, অগ্নি-ব্রাহ্মণ শালগ্রামশিলার সামনে শপথ নিয়ে গ্রহণ ধর্ম কি খেয়ালখুসির খেলা? না—এ হয় না। পশ্চিমের এই দু'টি শহরে যদিও ওরা বিখ্যাত নয়, তবু ছোট একটি বৃত্তে ওদেরও কিছু সামাজিক সম্মান আছে—বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন যত সঙ্কীর্ণ হোক পরিমণ্ডল, তারই মধ্যে ওদের সম্বন্ধবন্ধনের স্বীকৃতি আছে—সার্থকতা আছে। এইটুকুও যদি নষ্ট হয়ে গেল তবে কিসের চাকরি, কিসের মনুষ্যত্ব।

এলাহাবাদে ছুটলো মহেশ।

শাশুড়ী কঠিনমুখে বললেন, আবার কেন এসেছ বাবা? যা লোক শুড়ো দুটোকে নিয়ে দুঃখের অন্ন মুখে তুলছে—তাতে বাদ সাধতে এলে কি জন্যে?

ওদের নিয়ে যেতে এলাম।

শাশুড়ী গম্ভীরমুখে বললেন তবু ভাল। এতদিন উপোসে কাটালে তত্বতল্লাস নিলে না, এখন যেই না চাকরিতে ঢুকলো অমনি উথলে উঠলো সোহাগ।

পোড়া কপাল।

রমাকে একান্তে বলল, তোমারও কি ওই কথা। রমা বলল, দুঃসময়ে একটি খবর নাওনি—লজ্জা হওয়া উচিত।

মহেশ কুণ্ঠিতস্বরে বলল, তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে চাও না?

রমা একটু খোঁচা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারল না। বলল, আমার নূতন চাকরি। তবে এটা রাখা না রাখা তোমার হাত। ইচ্ছে করলে রিপোর্ট বদল করতে পার। বেদনা ভারাকণ্ঠে বলল মহেশ, রমা আমি কি এতটাই নীচ?

রমা মুখ ফিরিয়ে নিস্পৃহকণ্ঠে জবাব দিল, তুমি কি সে তুমিই জান ভাল করে। তবে সেইদিনকার ঘটনা আমি কখনোই ভুলতে পারব না।

আর কথা চলে না। কথা বলতে প্রবৃত্তিও হয় না। কঠিন সেই ঘটনার কথাটিই মনে গেঁথে রেখেছে রমা—তার তলায় অগুন্তি পরম মধুর মুহূর্তের স্মৃতি গেছে তলিয়ে। যাক তবে সব যাক। স্মৃতিতরঙ্গে পাক খেয়ে খেয়ে সেই বা কেন যন্ত্রণা ভোগ করবে।

চলে এলো মহেশ। স্মৃতির সুতোগুলো পাকে পাকে জড়িয়ে ছিল—ট্রেন-কামরায় একটি একটি করে পাক খুলতে লাগল।

রমা তো এমন ছিল না। বেকার জীবনে ওদের সংসারে যত অনাদর অবহেলায় দিন কেটেছে—তার সামান্য অংশও সে মহেশের সামনে তুলে ধরেনি। বলেনি তোমার মা এই কথা বললেন, কি এই কাজ করলেন। বরং সান্ত্বনা দিয়েছে—সময় মন্দ হলে এমনই হয়। না হলে তোমার চাকরি যাবে কেন।

দৈনিক আহার্য্যে একজনের চাল নিয়েছেন মা। ভাবটা বেকার ছেলেই এখন তার বোঝা, বোঝার উপর বোঝা তার বউ, তার দায় দায়িত্ব কেন বইবে সংসার। করনা উপার্জ্জন যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক টাকা আন রাজভোগ পাও—কেউ কিছু বলবে না।

বোঝার উপর আর দয়া করে আরো ভার চাপিও না, দোহাই। রমা অর্দ্ধেক দিন শরীর খারাপ বলে দিনের খাওয়া এড়িয়ে গেছে। বলেছে, দু'টি জিনিস যত বাড়াও—ততই বাড়ে। আহার আর নিদ্রা। কম খেয়ে অনেক লোক সুস্থ থাকে—দেখছি তো পথে-ঘাটে।

ওকথা বললে ব্যথা পাই—তুমি তো পথের লোকও নও। মহেশ প্রতিবাদ করছে মৃদুস্বরে।

রমা হেসে বলেছে, তা কেন, একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। এমনি করে দিন কেটেছে। অসীম সহিষ্ণু মেয়ে রমা। আবার ত্যাগেরও তুলনা নাই। সেবার অসুখে পড়লেন বাবা। প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কি সেবাই না করল রাত জেগে। দণ্ডে দণ্ডে ঔষধ পথ্য খাওয়ানো, মল-মূত্র সাফ। আর ভিতরে ভিতরে ঋণের দায় থেকে সংসারকে বাচানোর চেষ্টা, অনেকদিন পর্য্যন্ত ঘটনাটা জানতে পারেনি মহেশ। জানতে পারল কলকাতায় যাবার আগে, ওকে এলাহাবাদে পাঠাবার সময়ে। রমা যখন কাপড় পরে তৈরী হয়েছে—তখনই ধরা পড়ল ত্রুটি।

ওর অতি সাধারণ সজ্জার পানে চেয়ে বলল, ওকি —হারটা গলায় পরলে না? বাক্সর মধ্যে জিনিস রাখা ঠিক নয়—

রমা বলল, বাকসোর মধ্যে রাখিনি।

তবে? কোথায় রাখলে?

রমা মুখ নামিয়ে বলল, ওটা—বিক্রী করে দিয়েছি।

বিক্রী। আকাশ থেকে পড়ল মহেশ।

বাবার অসুখ, চারিদিকে যা আতান্তর—তোমার কাছে টাকা ছিল না—মায়ের কাছেও ছিল না—ভাবলাম—গহনা তো অসময়ের জন্যেই—

মহেশ খুসী হয়নি অখুসীও নয়—, সংবাদটা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। রমার ত্যাগকে বড় বড় বিশেষণ জুড়ে প্রশংসা করার কথা। তাও করেনি—, তার নিজের বেলায় যেটা ঘটতো—রমার ক্ষেত্রেও অবিকল সেটা ঘটলো। অঘোষিত ত্যাগের মহত্ব অন্তরই শুধু গ্রহণ করতে পারে। তেমনি নীরবে সেটা নিয়েছিল মহেশ।

সাময়িক হৃদয়বৃত্তির তাড়নায় অনেক বৃহৎ ত্যাগ ঘটে সংসারে; অভাবের দিনে সেই ত্যাগ উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হলে মহিমা হ্রাস স্বাভাবিক; রমা কিন্তু কোনদিন নিজের রিক্তভূষণ অঙ্গের পানে চেয়ে অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেনি। রমা তো ছোট নয়।

এই যে ঘটনাটা নিয়ে বিচ্ছেদের নদী দুস্তর হয়ে উঠলো, যাতে আদৌ এটি না ঘটে তার জন্য প্রথম সাবধানবাণী রমাই উচ্চারণ করেছিল। মহেশের কথা চিন্তা করেছিল রমা। কিন্তু সেই ঘটনার পরিণাম এমন বিয়োগান্ত হল কেন? রহস্যময়ী মেয়েদের মন কোন্ সূক্ষ্মতন্ত্রীতে আঘাত খেয়ে কিভাবে বিমুখ হয়—সে তত্ত্ব মহেশের অজানা। মহেশের দুর্ভাগ্য—রমাকে তেমন নিষ্ঠুর আঘাতই দিয়েছে। আঘাতের বেদনা একা রমাই বহন করছে না—হয়তো আজীবনকাল মহেশকেও বহন করতে হবে। মহেশ নিরুপায়। এই বুঝি তার ভাগ্যলিপি।

কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরে এলো মহেশ, পূজা পাঠ জপধ্যানে মনোনিবেশ করল। সংসার ছায়ামাত্র, এখন রইলো।

আপিস, স্বপাক এবং টুকিটাকি দু'একটি কাজ। এ ছাড়া—সবটুকু অবসর আত্মচিন্তায় উৎসর্গ করল। এখন অফিস বন্ধু এবং সামান্য কয়েকজন প্রতিবেশী লক্ষ্য করল নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার ও করকোষ্ঠী গণনায় মহেশ রীতিমত দক্ষ জ্যোতিষী।

ক্রমেই বাসায় লোকসমাগম বাড়ছে।

* * *

এমনি করে আরো চারটি বছর গেল। এর মধ্যে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে বাড়ী গেছে মহেশ—নিজের খরচটুকু ছাড়া সব টাকাই ঢেলেছে ওই সংসারে। দুটি ভাই এখন চাকরি করছে—একটির বিয়েও দিয়েছে। সংসারদায়মুক্ত মহেশ এখন ইচ্ছা করলে অন্যক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। ছেলেবেলা থেকে যে কামনা মনকে মাঝে মাঝে উদাস করত—এখন অনায়াসে তার কাছে আত্মসমর্পণ করা যায়। অথচ এই ছোট বাসাটিতে। ঠাকুর দেবতার আসন সাজিয়ে প্রতিষ্ঠা করে নতুন করে সংসারভোগের স্বাদ গ্রহণ করছে মহেশ। যে কারণে অর্থ উপার্জন—সেটা এখন বাহুল্যমাত্র। এখন অনন্য নিশ্চয়তা যাহ যে জন্য পর্যাপ্ত—এই বাণীকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করার শক্তি ওর বয়েছে, তবু সেই অটল বিশ্বাসে ও বলীয়ান হতে পারছে না—যা নাকি শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী—যোগক্ষেম বহনের প্রতিশ্রুতি দেয়। অন্তরের অন্তরে হয়তো কামনার বীজটুকু অনুকূল ক্ষেত্র লাভের জন্য উন্মুক্ত হয়ে আছে। নিঃসঙ্গতার মধ্যে সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ও আনন্দ তাই ওর ভাগ্যে ঘটছে না। দিন কাটছে গতানুগতিকভাবে।

গতানুগতিকভাবেই দিন কাটছিল—হঠাৎ একদিন ওর ছোট সম্বন্ধী ঠিকানা সংগ্রহ করে বাসায় উপস্থিত। এই ছেলেটি সম্বন্ধে কোন বিরূপ ধারণা ওর ছিল না। চার বছর আগে ও ছিল কিশোর ছেলে। মন্দস্বাস্থ্য, সেই কারণে দুর্বল প্রকৃতির। কথা বলতো কম—হাসত কম—। ওর আহার নিদ্রা লেখাপড়া নিয়ে কারও মাথাব্যথা ছিল না। সাধারণ ছেলেরা যেমন ছকে-বাঁধা জীবন তৈরীর জন্য পরিশ্রম করে—সেইটুকু পরিশ্রম কারও লক্ষ্যপথে পড়ে না—সেই ছেলের ভাল মন্দ নিয়ে কেউ আলোচনা করে না—। জগতে যে-নিয়মে সূর্য ওঠে অস্ত যায়, দিন রাত্রি ঋতুগুলি পালা বদল করে—আলো হাওয়া অন্ধকার জ্যোৎস্না যথা-নিয়মে ঘটে—এরাও সেই নিয়মে চাকরি পাওয়া গোছ সেরে অফিস করবে—সংসার করবে—চাল ডাল তেল নুনের হিসাব রাখবে, হয়তো কর্জ করবে, লটারির টিকিট কিনবে—ডাক্তারের কড়ি গুণবে এবং সমাজ-অঙ্গে সংলগ্ন হয়ে জাতিধর্মকে বজায় রাখবে। ছেলেটি দাদাদের মত গুণ্ডাপ্রকৃতি নিয়ে জন্মায়নি, ওর সম্বন্ধে কারও দুশ্চিন্তা ছিল না—, সাংসারিক ক্লেশ-মোচনে ওর ভবিষ্যৎ ভূমিকাকেও কেউ নির্ভরযোগ্য বলে কল্পনা করেনি। ছেলেটির নাম চরণ।

চার বছর বাদে এলো চরণ। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণ পার হয়ে গেলে পরিবর্তনটা বড় তাড়াতাড়ি আসে। এই সময়ে দেহ ও মনের সাজ-পোশাকগুলি বদলে যায়—অপরিচয়ের আলো-আঁধারীর জালে ঢাকা পড়ে মানুষটা। মহেশ অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে পরিচয়ের সূত্রটি ধরতে চাইল।

ওর সংশয় ভঞ্জন করে পায়ের কাছে হেঁট হতেই মহেশ বলে উঠল, চরণ।

চরণ লাজুক মুখে বলল, ভাল আছেন?

চার বছর বাদে এমন প্রশ্ন অসঙ্গত ও হাস্যকর এই বোধ হয়তো ওর ছিল না—কিংবা সেইটুকু বোধ থাকাতেই লজ্জা সঙ্কোচ মুখ নামিয়ে কোনমতে কথাটা উচ্চারণ করেছিল। না হলে দীর্ঘকালের ব্যবধানজনিত সঙ্কোচ লজ্জার ভার নামাবার আর কোন উপায়ই বা সামাজিক শিষ্টাচারে থাকতে পারে।

প্রশ্নটা সহজভাবেই গ্রহণ করল মহেশ। দীর্ঘ বিচ্ছেদের বাঁধ পার-হয়ে আসা এই আত্মীয়তার স্বাদ বুঝি সেতুবন্ধনের আশ্বাস নিয়েই এসেছে। আনন্দিত হল মহেশ, বলল, তোমরা ভাল আছ?

চরণ মাথা নেড়ে হাসল। পকেট থেকে একখানি

পত্র বা'র করে মহেশের হাতে দিয়ে বলল, দিদি দিয়েছে। পড়ে দেখুন।

চরণকে খাটিয়ার উপরে বসিয়ে চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়ল মহেশ। একবার নয়, বার দুই পড়ল। তারপর চরণের পানে চেয়ে ঈষৎ হেসে বলল, পড়লাম।

চরণ বলল, আপনি কি চিঠি দেবেন না—

মহেশ বলল,চিঠি দেওয়ার কথা নয়, তোমার মারফৎই সরাসরি জবাব চেয়েছেন তোমার দিদি। কিন্তু আমারও দু'একটি কথা জিজ্ঞাসা করার আছে—

বলুন, আমার জানা থাকলে বলতে পারি।

বলতে পারবে। তোমার দিদি এখানে আসতে চেয়েছেন, সেটা কেমন করে সম্ভব হবে? তিনি যে কাজটা নিয়েছেন—

এখন কোন কাজই করছেন না-, সেবা প্রতিষ্ঠান নিয়ে নিয়েছেন সরকার—যাদের সরকারী সার্টিফিকেট নেই তাদের কাজ ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

ও। একটু কাল চিন্তা করে মহেশ বলল, তোমার দাদারা এখন কি করছেন?

চরণের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল—অন্য-দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, বড়দা বাড়ী থেকে কোথায় চলে গেছেন—মেজদা হাজতে।

হাজতে! পরক্ষণেই ওদের প্রকৃতির কথাটা মনে পড়তেই মহেশ প্রশ্নের জের টানল না, শুধু বলল, তুমি কি এখন কোন কাজ করছ?

সে এমন কিছু নয়—মাস দুই হল অ্যাপ্রেন্টিস্গিরি করছি, একটা প্রাইভেট ফার্মে। সামান্য হাতখরচ পাই।

মহেশ বলল, তোমার দিদি এখানে এলে তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না?

অসুবিধে? কেন? দিদি তো আলাদা একখানা ঘর নিয়ে থাকেন—আলাদাভাবেই খরচপত্তর চালান।

মহেশ বলল, বুঝেছি।

চরণ বলল, আপনাকে সব খুলেই বলছি জামাইবাবু। দাদাদের তো জানেনই-, দিদির সঙ্গে ওদের বনতো না। দিদি এক সংসারে থাকতে পারেন নি ওদেরই জন্যে। চাকরি নিয়েছিল, নিজের খরচ নিজে চালাবে বলে।

একটু থেমে বলল, আপনি কবে যাচ্ছেন বলুন?

আমি! অন্যমনস্কের মত মহেশ বলল, আমার না গেলেই কি নয়?

সে আপনি জানেন। তবে আমার সঙ্গে যদি যেতে চান, খুব ভাল হবে। যদি ছুটি না পান, আমিও দিদিকে রেখে যেতে পারি।

মহেশ বলল, তুমি এখন বিশ্রাম কর, স্নান আহার কর, ওবেলা তোমার কথার জবাব দেব।

চরণ বলল, যাই জবাব দিন—দিদি এখানে আসবেই। এখানে ছাড়া কোথায়ই বা যাবে।

মহেশ সবিস্ময়ে চরণের পানে চেয়ে রইল। লাজুক বাকভীরু ছেলেটির কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরটি ওকে চমৎকৃত করল। সংসারঅনভিজ্ঞ তরুণও কখন কখন বা কিছু সংস্কারবোধে সচেতন হয়। হিন্দুধর্মে জন্মান্তর-বাদের ভিত্তিভূমি এবং স্বামীস্ত্রীর দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ধারণা পোষণ করে।

মহেশ বলল, বেশ কালই তোমার সঙ্গে যাব আমি।

শ্বশুরকুলে সম্রাজ্ঞী হও, এই মন্ত্রে যাকে আমন্ত্র[illegible] করেছিলাম একদিন, তার সেই গৌরব ধূলায় মিশিয়ে সে যদি ভিখারী হয়ে আমার ঘরে আসে, তাতে কার অগৌরব? ভাবল মহেশ। অগ্নি ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিলা ও স্বজনবৃন্দের সম্মুখে উচ্চারিত সেই পবিত্র প্রতিজ্ঞা রক্ষার দায় সম্পূর্ণভাবে যে আমারই।

পরে মহেশ বলেছিল: মনে মনে ছিল গর্ববো[illegible] নিজেকে মহত্বের শিখরে তুলে তৃপ্তি পেয়েছিলাম কিন্তু ভাই সত্যি বলতে কি, আমি চেয়েছিলা[illegible] ওকেই। চার বছর একাকী ধর্মচর্চায় মনোনিবে[illegible] করেও বিশেষ উন্নতি লাভ করতে পারিনি। [illegible] ক্রমশঃ শুকনো হয়ে উঠছিল। মুখে অপ্রাপ্তিজ[illegible] বৈরাগ্য, মনে স্ত্রী কন্যার সঙ্গলাভের কামনা যেমন হাওয়া অনুকূল হল, পা ভাসিয়ে দিলাম স্রোতে

বারো বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে সেই স্রোতে ভাসতে লাগলাম। জলচৌকির উপর ঠাকুরদেবতার পট-পূজার উপচার অর্ঘ্য সাজানো রইল, তার পাশে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে পাতলাম সংসার। বারো বছর ধরে স্রোত বইল একটানা এক মুখে। সংসার বাড়ল, ছেলে-মেয়ে এলো আরও কয়েকটি। বাঁধনটা ক্রমশই শক্ত হতে লাগল। এমনি করে কাটলো বারোটি বছর।

আবার কূলভাঙা নদীর উপমাটা মনে পড়লো। তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে হল। চাকরির এমন কিছু উঁচু পদের ছিল না, মাইনে ছিল ধরণ-বাঁধা। সংসার বাড়ছিল, দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী, ভাইদের সংসারে যে টাকাটা নিয়মিত পাঠিয়েছি, এখন এদিকের চাপে সেটা পাঠানো গেল না। ফলে মা কয়েকবার পুত্রের শারীরিক কুশল-জিজ্ঞাসার সঙ্গে নিয়মিত সাহায্যের কথাটাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। মহেশ তার বর্তমান অবস্থা জানিয়ে লিখল: এখন থেকে খুব বেশি পাঠাতে পারব বলে মনে হয় না। আপনার বড় বৌমা এসেছেন, দুটো বাচ্চাও রয়েছে। জিনিসপত্তর দিন দিন যেরকম মাগ্যি হয়ে উঠছে, বাঁধা আয়ে সংসার চালানো যে কি কষ্টকর ইত্যাদি—

উত্তরে মা লিখলেন; সেই জন্যই তোমার কাছে কিছু আশা করি। এখানেও সংসার ছোট নেই, ওরা দু'ভাই যা উপার্জন করছে, তাতে কোন রকমে পেটের ভাত পরনের কাপড় জোটে; সখ সাধ এসব তো বিসর্জন দিয়েছি, পূজাআচ্চা ধর্মকর্মও যায় যায়। যাই হোক তুমি একবার আসবে। বহুদিন তোমাকে দেখিনি, তোমার সঙ্গে কথা বলিনি, এ ছাড়া বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কিছু পরামর্শ আছে।

রমা চিঠি পড়ে বলল, চল আমিও যাই। অনেক দিন ওঁদের দেখিনি, বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করিনি।

এক সপ্তাহের ছুটি নিল মহেশ।

ক্রমশঃ

বিদ্যাসাগর

সীতা দেবী

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মনেই একটা গর্ববোধ আছে যে আমরা এমন এক দেশের মানুষ যেখানে অসংখ্য মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। কেউ বা এটা মুখ ফুটে বলি, কেউ বা বলি না। তাঁরা এ দেশের উন্নতির জন্য অনেক কিছু ত করে গেলেন, কিন্তু এখন দেশের যা দশা, তা দেখে এক এক সময় মনে হয় তাঁরা বুঝিবা ভস্মে ঘি ঢেলেই গিয়েছিলেন। দেশবাসী তাঁদের একটুও কি মনে রেখেছে? তাঁরা যে পথ দেখিয়েছিলেন, সে পথে চলার ইচ্ছা ক'জনের বা এখন আছে? যে সব কাজ তাঁরা আরম্ভ করেছিলেন, তা এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণাই বা ক'জনের মধ্যে?

তবু দেশ একেবারে সম্পূর্ণ করেই তাঁদের ভুলে যায় নি। তা না হলে তাঁদের জন্মদিনগুলি উৎসব করে পালন করবার কথা কারো মনেই আসত না। যদিও তাঁদের ভুলেই থাকি আমরা, তবু "ভুলে থাকা নয় সে ত ভোলা।" এই রকম একজন মহামানবের দেড়শ বছর আগে আমাদের দেশে শুভ আবির্ভাব ঘটেছিল, সেটা অনেকেই এখন স্মরণ করছেন। ইনিই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জন্মেছিলেন মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। জন্মস্থানের নামটি বড়ই মানিয়েছিল তাঁকে। সত্যই বীরসিংহই ছিলেন তিনি। কোনো অন্যায়, কোনো উৎপাতের কাছে তিনি কোনোদিন মাথা নত করেননি। তাঁর স্বভাবের এই গুণটি সবার আগে চোখে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এমন অমিত বীর্য্যবান্ পুরুষ এমন কোমল হৃদয় কি করে হলেন? দেশবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের জন্যে যেন জননীসুলভ স্নেহ নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এদের সকলের কল্যাণের জন্য তিনি না করতে পারতেন এমন কাজই ছিল না। এদের মঙ্গলের জন্য তিনি শেষ দিন অবধি সংগ্রাম করে গেছেন। আর সে ছিল সত্যকারের সংগ্রাম, শুধু সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা নয়।

আমি তাঁকে চোখে ত দেখিনি, জন্মেছি অনেক পরে। তবে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁদের অনেককে দেখেছি, তাঁদের কাছে গল্প শুনেছি। বাবা পড়াশুনো করবার জন্য এবং পড়াশুনোর শেষে চাকরি করবার জন্য কিশোর বয়স পার হয়েই কলকাতায় বাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চোখে দেখবার, তাঁর সঙ্গে কথা বলবার। মা-ও অল্প বয়সে বধূরূপে কলকাতায় বাস করতে এসেছিলেন। তখন মহিলা মহলে অনেকের কাছে অনেক গল্প শুনতেন। বাবার কাছে গল্প শুনতাম যে তিনি একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখতে গিয়েছিলেন নিজের এক সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে। সে ভদ্রলোক ঈশ্বরচন্দ্রকে আগের থেকেই চিনতেন। তাঁদের বাড়ী গিয়ে বাবা একটু বিস্মিতই হয়েছিলেন। এত বড় লোক, এত যাঁর নাম ডাক, তাঁর বেশভূষা, তাঁর গৃহসজ্জা এমন সাধারণ! কথাবার্ত্তাও বললেন যেন বহুদিন পরিচিত প্রৌঢ় আত্মীয়ের মত করে। খানিক কথা বলবার পরেই বাবার সঙ্গী-যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন "কিছু খাবি?"

অল্পবয়সে এমন উত্তম প্রস্তাবে কে না সম্মতি দেয়? যুবক রাজী হওয়া মাত্রই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তক্তা-পোষের তলা থেকে বিরাট রসগোল্লার হাঁড়ি বেরল। দুই অতিথিকে পীড়াপীড়ি করে ঈশ্বরচন্দ্র অনেকগুলি রসগোল্লা তাদের খাইয়ে দিলেন। নিজে ব্রাহ্মণের সন্তান, খুব ভক্ত ছিলেন মিষ্টি জিনিষের বোধ হয়।

নিজের চেয়ে ছোটদের আদর জানাবার এইটিই ছিল তাঁর সর্ব্বজন-পরিচিত উপায়। মা গল্প করতেন যে, তখনকার একমাত্র মহিলা কলেজ দেখতে গিয়ে নাকি তিনি লেডী প্রিন্সিপ্যাল ও তাঁর সহকর্মীর হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন "রসগোল্লা কিনে খাবি।" এঁদের অবশ্য তিনি ছোট বয়স থেকেই জানতেন। তাঁরা এ ব্যাপারে খানিকটা লজ্জিত হয়ে পড়ায় বিদ্যাসাগর মশায় একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন "বেটিরা সব বড় হয়ে গেছে, রসগোল্লা খাবে না।" দেশশুদ্ধ বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী সবাইকে যেন তিনি নিজের নাতি-নাতনীর পদে বসিয়ে নিয়েছিলেন। বিদ্যার সাগর ত তিনি ছিলেনই তার উপর দয়ার সাগরও তিনি ছিলেন। তাঁর কাছে আবেদন করে কেউ কি কোনোদিন হতাশ হয়েছিলেন? স্বভাবে, চরিত্রে, মনোভাবে তাঁর সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই এমন মানুষ- মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মত মানুষ মহাকষ্টে পড়ে এঁরই কাছে আবেদন করেছিলেন, এবং সে আবেদন সফলও হয়েছিল।

মহাপুরুষ ত অনেকরকম জন্মেছেন আমাদের দেশে। কেউ নবধর্মের প্রবর্ত্তক, কেউ সমাজ সংস্কারক, কেউ সাহিত্যিক, কেউ রাজনৈতিক নেতা, কেউ বা মুক্তি সংগ্রামের যোদ্ধা। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রকে শুধু একটা কোনও দলে ভিড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তিনি যেন সব দলেই ছিলেন, সবার দলেই ছিলেন। প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান নিয়ে সাড়ম্বরে কোনো কিছু করতেন না বলে তখনকার দিনে অনেকে তাঁকে নাস্তিক বলে অভিহিত করতেন। কিন্তু নাস্তিক বা কাকে বলে, আস্তিকই বা কাকে বলে? আমাদের দেশেই এই মহাবাণী শোনা গিয়েছিল—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

এঁর চেয়ে মানব দরদী ক'টা মানুষ কোথাও কবে জন্মগ্রহণ করেছেন? তিনি দরিদ্র অথচ মহৎ পিতা-মাতার ঘরের ছেলে, অত্যন্ত কষ্ট করে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল। বুদ্ধিমান পিতা অনেক অর্থব্যয় করতে পারেননি তাঁর শিক্ষার জন্য. কিন্তু ঠিক পথে তাঁকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, সময়োপযোগী শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন। যখন শিক্ষার শেষে কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি নামলেন, তখন অভূতপূর্ব্ব সাফল্য তাঁর জীবনে এল. তখন কিন্তু ভোগ-সুখের দিকে তাঁর মন গেল না। গরীবের দুঃখ তিনি বুঝতেন, নিকাসিতদের যন্ত্রণা তিনি বুঝতেন, এদের দুঃখ দূর করার দিকেই তাঁর মন গেল। তাঁর মা ভগবতী দেবী দীন-দরিদ্রের মাতৃ-স্বরূপিণী ছিলেন। মায়ের এই গুণ ছেলে ত পরিপূর্ণ-ভাবেই পেয়েছিলেন। বাল-বিধবার দুঃখ কত কাল ধরে আমাদের দেশের মানুষ দেখে আসছিল, তাঁর মনেই সেটা এমন বিপুল সাড়া জাগাল কি করে? ঘরে বাইরে এই নিয়ে কঠোর সংগ্রামে তিনি নামলেন। অর্থ নষ্ট, সামাজিক প্রতিপত্তি নষ্ট, বিদ্রুপ, বিরোধিতা, কি না জুটেছিল তাঁর ভাগ্যে? কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিজের বেছে নেওয়া পথে অবিচলিত-ভাবেই তিনি চলেছিলেন। নিজের পারিবারিক জীবনেও এইসব মতামত নিয়ে তাঁকে কম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু অন্যের জেদ বা অন্যের জোরের কাছে এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ কোনোদিনই মাথা নোয়াননি। এই ছিল তাঁর ধর্ম্ম, এঁকে যদি নাস্তিক বলা হয় ত আস্তিক যে কে তা ত জানিনা। মানুষের মধ্যেই তিনি তাঁর ভগবানকে পেয়েছিলেন, তাঁরই পূজা জীবনান্ত পর্য্যন্ত করে গেছেন।

পুরুষ বা নারী কারো কোনো দুঃখের দিকে তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকেননি, তবে মেয়েরাই বেশী দুর্ব্বল, অসহায় আর অনগ্রসর, তাদেরই সাহায্য করবার জন্য তাঁর সমস্ত প্রাণ আকুল হয়ে থাকত। মেয়েদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কিছুই ছিলনা। বিদ্যাসাগর আর তাঁরই মত কয়েকজন মানবদরদী মানুষ মিলে দেশে প্রথম মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেন। ছাত্রী জোটান, শিক্ষয়িত্রী জোটানও তখনকার দিনে সমস্যা

ছিল। বাড়ী বাড়ী ঘুরে একাজও ঈশ্বরচন্দ্রকে করতে হয়েছে। এই সূত্রেই স্কুল-কলেজের মেয়ে আর শিক্ষয়িত্রীদের তিনি চিনতেন বোধ হয়।

শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেই হয় না, আরো ঢের কাজ থাকে। মেয়েও না হয় জুটল, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীও জুটল, কিন্তু তারা পড়বে কি? বিদ্যাসাগর এবার নামলেন পাঠ্য পুস্তক রচনায়। আমরা ও সমসাময়িক ছেলে মেয়েরা তাঁর লেখা বই পড়েই ত বাংলা শিখেছি। এর আগে বাংলা ভাষায় ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ার বই বলতে কিছু ছিল কি? বাংলা সাহিত্যের জন্মদাতা যে ক'জন, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের নামও অতি উচ্চে। ভাষার চেহারা এখন অনেক বদলে গেছে, কিন্তু তিনি অমন শক্ত সুন্দর বনিয়াদ তৈরী না করলে, তার উপর এত বড় প্রাসাদ গড়া চলত কি? তাঁর মন যদি দরিদ্র দেশবাসীর অসংখ্য সমস্যা নিয়ে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত না থাকত, তাহলে সাহিত্যের সম্রাট তিনি অনায়াসেই হয়ে উঠতেন। কিন্তু এদিকটায় বেশী মন দেবার সময় তিনি কখন বা পেলেন? শুধু বাংলা ত নয়, সংস্কৃত শিক্ষারও কত রকম সংস্কার তিনি করেছিলেন। তাঁর লেখা উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী, ঋজুপাঠ এই সব বই-ই ত আমরা স্কুলে পড়েছি সংস্কৃত পড়ার প্রথম সোপান রূপে। প্রথম জীবনে তাঁরও ইচ্ছা ছিল তিনি পড়াশুনা শেষ করে গ্রামে চতুষ্পাঠী খুলবেন, তাঁর বাবারও সেই ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু বাঙালীর সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মত পরিবর্ত্তন হল। সংস্কৃত তিনি অতি উত্তমরূপেই শিখলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজিও শিখলেন। গ্রামের ছোট গণ্ডির মধ্যে তিনি আর আটকে রইলেন না, বাংলা দেশের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি সাধনেই পরিপূর্ণভাবে উদ্‌যোগী হলেন। কিন্তু একটা সমস্যা নিয়ে খাটবার অবস্থা ত তাঁর ছিল না? বাল-বিধবাদের আবার বিবাহ দেবার চেষ্টা তাঁর মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকত। নিজের পরিবারেও তিনি বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর বড় ছেলে নারায়ণচন্দ্র নিজে ইচ্ছা করে একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে ছিলেন। বিদ্যাসাগর এতে খুবই আনন্দিত হন। তাঁর ছোট ভাই এ ব্যাপারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন "আমি এতকাল বিধবা বিবাহের সপক্ষে প্রচার চালিয়েছি এখন যদি আমার নিজের ছেলে কুমারী কন্যা বিবাহ করত তাহলে কি আমি মুখ দেখাতে পারতাম? সে ত আমার ছেলের উপযুক্ত কাজই করেছে।" কত বিধবা বিবাহের আসরে যে তিনি স্বয়ং কন্যাকর্ত্তারূপে উপস্থিত হতেন তার ঠিক নেই। মধ্যে মধ্যে জাঁকজমকে মধ্যে মধ্যে এসব বিয়ে হত। অতিথি সমাগম কিছু মন্দ হত না, মতের অমিল যতই থাক। এই মেয়েগুলিকে তিনি একেবারে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসতেন, এবং সুখে দুঃখে আপদে বিপদে সর্ব্বদা এদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। এই রকম একজন মহিলার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল। তিনি তখন একজন অতি ধনবান ভদ্রলোকের গৃহিণী। প্রায় শিশুকালে ইনি বিধবা হন। এঁদের পরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ছিল। এই বালিকাটিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, সর্ব্বদা দেখতে যেতেন খেলনা মিষ্ট প্রভৃতি নিয়ে। নিজেই উদ্যোগী হয়ে তিনি এঁর বিয়ে দেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র এঁর সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন। দেখতে আসতেন অনেক উপহার নিয়ে। তাই যখন লেডী অবলা বসু তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিধবা আশ্রমের নাম রাখলেন "বিদ্যাসাগর বাণী ভবন", তখন মনে হয়েছিল এর চেয়ে উপযুক্ত নাম আর কিছু হতে পারে না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে কিছু লিখতে গেলে প্রথমেই একটু হতবুদ্ধি হয়ে যেতে হয়। তিনি ত শুধু বিদ্যাসাগরই ছিলেন না, দয়ার সাগর ছিলেন, গুণের সাগর ছিলেন তাঁর কোন দিকটা বাদ দিয়ে কোন দিকটা তুলে ধরব? মানুষের জীবনে কত দিকে কত অভাব, কত সংঘাত। কোনো কিছুই কি তাঁর দৃষ্টি এড়াত? আমাদের দেশের লোক বেশীর ভাগ ত

অত্যন্ত গরীব, অসুখ-বিসুখ করলে তাদের কোনোরকম চিকিৎসা হয় না। তাদের যন্ত্রণার অবসান করতে কোথাও কেউ নেই। এ ব্যাপার দয়ার সাগরের দৃষ্টি এড়ায়নি। নিজে তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন, দরিদ্র জনসাধারণের সেবা করবেন বলে। এ বিদ্যা তিনি ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। নিজের পরিবারের লোকদের চিকিৎসা তিনি অনেক সময় নিজেই করতেন। বেশীর ভাগ অবশ্য গরীব পাড়া-প্রতিবাসীর মধ্যেই তাঁর প্র্যাক্‌টিস্ ছিল। হোমিওপ্যাথিক ঔষধাবলির মধ্যে গোটা দুই ওষুধের সঙ্গে তাঁর নাম সংযুক্ত আছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে খরচ খুব কম, সুতরাং গরীবের চিকিৎসায় এটা খুব কাজে লাগবে এই ছিল তাঁর ধারণা। এতে ভাল না হোক মন্দ কিছু হবে না এও ছিল তাঁর ধারণা। আর এক মহাপ্রাণ মানবদরদীকে দেখেছিলাম এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে মানুষের ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করতে তিনি রবীন্দ্রনাথ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার বিহারের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যাসাগরের অতিথি হয়েছিলেন। এখানে ঈশ্বরচন্দ্রের একটি নিজের বাড়ী ছিল। এখানে তিনি একদিন দেখে অবাক হলেন যে পায়ে হেঁটে বহুদূর গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এক দরিদ্র মানুষের বাড়ীতে চিকিৎসা করছেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় বার্ধক্যে পদার্পণ করেছেন। এইখানের অধিবাসীরা বড় গরীব ছিল, অনেকে প্রায়ই অনাহারে থাকত। যারা একটু সম্পন্ন মানুষ তারা ভুট্টার চাষ করত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাদের সব ভুট্টা কিনে নিতেন যথাযোগ্য দামে এবং সেগুলি সন্ধ্যাবেলা ঐসব বুভুক্ষু মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন।

সবার উপর তাঁর বীর্য্য তাঁর সাহস মানুষের মনোহরণ করে। উপরওয়ালা হোক, ইংরাজ রাজপুরুষ হোক, ধনবান সমাজপতি হোক, কারো কাছে তিনি কখনও মাথা নীচু করেননি। অপমানকারীকে উচিত মূল্যে তার অপমানের প্রতিদান দিয়েছেন, তাতে সাংসারিক দিক দিয়ে নিজের লাভ-ক্ষতি কি ক্ষতি হবে তা কখনও বিবেচনা করেননি। ক্রমাগত প্রতারিত হয়েছেন, কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর আস্থা যায়নি। একজন মানুষ তাঁর খুব নিন্দা রটনা করে বেড়াচ্ছে শুনে নাকি তিনি হাসি-মুখে বলেছিলেন "ও বেটা আমার নিন্দে করে কেন? আমি ত কখনও ওর কোনো উপকার করিনি?"

মানুষের উপকারের জন্য এমন সর্বতোমুখী সংগ্রাম আর ক'জন আমাদের দেশে চালিয়েছেন? আজ কিভাবে আমরা তাঁকে স্মরণ করব? শুধু বক্তৃতা দিয়ে আর মূর্তিতে মালা দিয়ে? যে নর-নারায়ণের তিনি পূজারী ছিলেন, তাদের দুর্গতি মোচনের কোনো ব্যবস্থা হবে কি?

প্রতিধ্বনি

শ্রীশান্তা দেবী

মাঘোৎসবের সময় ১০ই মাঘ সন্ধ্যার অনেক আগে থেকেই মন্দির লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। একদল মন্দিরে নগর সংকীর্তন আসার জন্য অপেক্ষা করতেন, আর একদল সংকীর্তনকারীদের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে ঢুকতেন। কীর্তনে সে কি উন্মত্ত ব্যাপার। খোল করতাল নিয়ে ছেলেরা নেচে নেচে বেদী প্রদক্ষিণ করত, কারুর বা দশায় পেত। খোলের বোলে মাদকতা জাগিয়ে তুলতেন খুব নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

১০ই মাঘ উপাসনা শেষ হবার পর হত ১১ইএর জন্য মন্দির সাজানো। সেও একটা বিরাট ব্যাপার। সুকুমার রায়, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী বা মংলী ও তাঁদের চেয়ে অল্পবয়স্ক একদল ছেলে সারা রাত ধরে গাঁদা ফুলের মালা ও অন্যান্য ফুল পাতা দিয়ে ঘরটি সুন্দর করে সাজাতেন। প্রতি বৎসরই ১১ই ভোরে মনে হত সাজটা একটা নূতন রকম হয়েছে। ১১ই মাঘ কে কত ভোরে মন্দিরে স্থান পেতে পারেন এই চেষ্টায় অনেকেই ১০ই রাত্রে এসে সমাজপাড়ায় কারুর না কারুর বাড়ী শুতেন। আমাদের বাড়ীতেও কেউ কেউ এসে রাত কাটাতেন। সমাজপাড়ায় যাঁরা বারোমাস ঘরভাড়া করে থাকতেন তাঁদের ঘরে যথেষ্ট জায়গা না থাকলে মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণেও অনেকের বাড়ীর ছেলে মেয়েরা আমাদের বাড়ী শুতে আসত। পাড়ার লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে বেশ একটা আত্মীয়তার ভাব রেখে চলতেন। অবশ্য দুই একটা পরিবারে একটু ব্যতিক্রমও ছিল। ১১ই মাঘ আমরা খুব ভোরে গিয়ে মন্দিরে বসতাম। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এত লোক আসতে থাকত যে বয়স্কদের সম্মান দেখাবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত আমাদের আসন ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। খাবার সময় পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে আমরাও পরিবেশন করতাম। ফলে মাঝে মাঝে কয়েকটা বেগুনীভাজা মাত্র লাভ হত।

কিশোর বয়সে মানুষের মনে একটা রহস্যময় ধর্মভাব অনেক সময় জেগে ওঠে। ১১ই উপাসনার পূর্ব্বে সমবেতকণ্ঠে যখন "জাগো পুরবাসী, ভগবত প্রেম পিয়াসী" গানটি ধ্বনিত হয়ে উঠত তখন মনে হত যেন স্বর্গলোক হাতের কাছে এসে পড়েছে, কি যেন একটা অমৃত ফললাভ এখনি হবে। কৈশোরের সে মন পরে আর ফিরে পাওয়া যায় না। তাছাড়া এখন সাধারণ ছেলে মেয়েদের মন ধর্ম্মের দিকে বিশেষ যায় না। উৎসব মানে সবার আগে গিয়ে খেতে বসা এবং ভাল ভাল পোষাক পরা। শুনেছিলাম মহর্ষিদেব সাধারণ সমাজের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব না বলে 'ব্রহ্ম গোল' বলতেন। এখনকার উৎসব দেখলে তিনি কি বলতেন জানি না।

তখনকার দিনে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ছাড়া ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের উপাসনা লোকে খুব হৃদয়গ্রাহী মনে করত। গানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীমতী প্রতিভা দত্ত প্রভৃতি। গানের সঙ্গে বেহালা বাজাতেন চমৎকার দুজন। একজন মধ্যবয়স্ক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় আর একজন যুবক বোতাল (প্রফুল্ল) চট্টোপাধ্যায়। দুজনেই ছিলেন সুপুরুষ।

সমাজপাড়ায় এসে যাঁদের সব দেখতাম তাঁদের বিষয় ছোট খাট অনেক কথা বরাবর মনে পড়ে। কেশবকন্যা মণিকা মহলানবিশ ছিলেন ভারী শান্ত সুমার্জ্জিত মোলায়েম মানুষ, তাঁর চেহারাও ছিল সুন্দর। তিনি তাঁর বাড়ীতে নিয়ম করে তরুণ ছেলে মেয়েদের মাঝে

মাঝে পার্টি দিতেন। সেখানে গান গল্প খাওয়া হত। তাছাড়া সমাজপাড়ার গৃহিণীদের সঙ্গে নিয়ম করে মাঝে মাঝে দেখা করতেন। ভারী মিষ্টি করে গল্প করতেন। গিরিধি ব্রাহ্ম সমাজে তাঁকে উপাসনা করতেও দেখেছি। তাঁর ছেলেরা বড় কুনো ছিল বলে ক্ষুদুকে বলতেন, "ওদের তুমি একটু মানুষের সঙ্গে মিশতে শেখাও।"

ভবসিন্ধু দত্ত ছিলেন সুগায়ক; খুব দরাজ গলা ছিল তাঁর। সমাজের উপাসনায় গান করা ছাড়া বোধহয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের মেয়েদের গান শেখাতেন। কুমুদিনীদি ও বাসন্তীদি সমাজেও গান করতেন। ভবসিন্ধুবাবুর চেহারাও ভালো ছিল। তিনি বাবার ছাত্র ছিলেন। এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় সমাজপাড়ায় এসে কেবল মাত্র ভবসিন্ধুবাবুর স্ত্রী ও মেয়েদের পরিচিত দেখেছিলাম, কারণ আগ্রার ব্রাহ্ম নীলমণি ধর মশায় ছিলেন ভবসিন্ধু-বাবুর শ্বশুর। এঁরা আগ্রা যাওয়া আসার পথে এলাহাবাদে আমাদের বাড়ীতে ২।১ দিন থাকতেন। নীলমণিবাবুর ছেলে যামিনীকান্ত ধর আমাদের বাড়ী অনেকদিন ছিলেন, এলাহাবাদে কিছু একটা পরীক্ষা দিতে এসে।

সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তখন বোধহয় কেশব একাডেমির হেডমাষ্টারের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি মন্দিরে উপাসনা করা, সঙ্গত সভা করা ছাড়া পিঠাপুরমের রাজার সাহায্যে অনেকগুলি দার্শনিক বই লিখে প্রকাশ করেছিলেন। কিছুদিন মন্দিরে ছেলে মেয়েদের উপনিষদের ক্লাশও নিয়েছিলেন, আমরা যেতাম সেই ক্লাশে। সীতানাথবাবু প্রত্যহ গড়ের মাঠে বা আর কোথাও বেড়াতে যেতেন, মাঝে মাঝে ছোট মেয়েদের নিয়ে যেতেন। বেড়িয়ে এসেই জামা কাপড় রোদে দেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। খুব নিয়মিত চলতেন। তিনি দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন। সীতানাথবাবুর ছোট মেয়ে বকুল বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট; কিন্তু তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়েছিল। আমরা পাশাপাশি বারাণ্ডায় বসে রেলিংএর ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে কখনও কখনও পুতুল খেলতাম। পুতুলগুলি ছিল বকুলের।

সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। তিনি গেরুয়া কাপড় পরে নিজের ঘরে খাটের উপর বসে থাকতেন। তাঁর জীবিতকালেই তাঁর কন্যারা অনেকে মারা গিয়েছিলেন। এক কন্যা ঐ বাড়ীতেই—সপরিবারে বাস করতেন। বাড়ীর উপরতলার আর সব ঘরগুলি ভাড়া দেওয়া ছিল, এক তলাতে তিনি দেবালয় বলে একটি প্রতিষ্ঠান চালাতেন। সেখানে অনেক মানুষের বক্তৃতা কথকতা ইত্যাদি হত। সেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিপিন চন্দ্র পালের বক্তৃতা শুনেছি। সুন্দরীমোহন দাস মশায় কথকতা করতেন। তার একটা লাইন মনে পড়ে—

"করে এমনি ডাকাডাকি
পরমাত্মা নামে পাখী
জীবাত্মা পাখীর আঁখির পরে"।

দেবালয়ে একটা ছোট লাইব্রেরীও ছিল মনে হচ্ছে। সমাজপাড়ার একজন বৃদ্ধ বিকালে প্রাঙ্গণে বেড়াতে এসে কোনো ছেলেকে কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতেন তারা কি বলছে শুনবার জন্য। এই জন্য কোনো কোনো ছোট ছেলে তাঁকে নিয়ে খুব মজা করত। বৃদ্ধকে দেখলেই তারা কোনো একজন মেয়ের কানের কাছে একটু ফিস্‌ফিস্ করে চলে যেত। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে পড়বার আগেই—ছেলেটি দৌড় দিত। একটি ছেলে তার চেয়ে অনেক বড় একটি মেয়ের হাত ধরে কথা বলত। তাই দেখে বৃদ্ধ সেই ১১ বছরের ছেলেটির বাবাকে বললেন, "মেয়েটি বড় লজ্জাশীলা। আপনার ছেলেকে বলবেন যেন ওর হাত না ধরে, ও লজ্জা পায়।" ছেলেটির বাবা বললেন, "ওইটুকু ছেলেকে আমি ওসব বলতে পারব না"

সীতানাথ বাবুর দ্বিতীয়া পত্নী কাদম্বিনী দেবী সুগায়িকা ছিলেন। তিনি মন্দিরে গান করতেন বাইরেও তাঁর গানের ছাত্রী ছিল। তাঁর বৃদ্ধ পিতা কন্যার উপরই

বোধহয় নির্ভর করতেন। সীতানাথ বাবুর তৃতীয়া কন্যা শান্তিময়ীও সমাজে গান গাইতেন।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস মশায় ধর্মপ্রচারক, কিন্তু বেশ সুরসিক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সব বাড়ীতেই তাঁর যাওয়া আসা ছিল। তাঁর একটা কাজ ছিল বিবাহের সম্বন্ধ করা। কত ছেলে মেয়েরই যে তিনি বিবাহ দিয়েছিলেন। আমরা একটু বড় হবার পর প্রায়ই বলতেন,"হয় বিয়ে কর, নয় সমাজের কাজ কর।" সীতা বলত,"নিজে ত আপনি বিয়ে করেন নি তবে সবাইকে বিয়ে দিতে এত ব্যস্ত কেন?" নবদ্বীপবাবু হেসে বলতেন "আরে তখন কি তোদের মত এই রকম মেয়ে ছিল? হয় ধাত্রী নয় বিধবা বিয়ে করতে হত।" পুরাকালে ১০ই মাঘ সকালে তিনি উপাসনা করতেন মন্দিরে। খুব ভীড় হত তখন। এক সময় তাঁর চেহারা বেশ ভাল ছিল। পরে বহুমূত্র রোগে শীর্ণ হয়ে যান। উৎসবে আমরা বালক বালিকা সম্মেলনে বসতে না চাইলে তিনি বলতেন, "যত দিন বিয়ে না হবে, ততদিন এখানে বসতে হবে।" বলে নিজেও বসতেন।

সমাজপাড়ায় যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তাঁরা ছাড়া আর ২।১ জনের বাড়ীতেও আমাদের মাঝে মাঝে ডাক পড়ত। একটা ছিল নীলরতন বাবুর বাড়ী, আর একটা কৃষ্ণকুমার মিত্র মশায়ের বাড়ী। কৃষ্ণকুমার বাবুর স্ত্রী তাঁদের পারিবারিক উৎসবাদিতে আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করতেন। "সঞ্জীবনী" আপিসের দোতলায় তাঁরা থাকতেন। সেই বাড়ীর দুটি ঘর খুব পরিচ্ছন্ন সুন্দর ও রুচিসম্মতভাবে সাজানো দেখতাম। বসবার ঘর কি শোবার ঘর বোঝা যেত না। দুই মেয়ের ডিগ্রি হাতে দুটো খুব বড় বড় ছবি ঘরে টাঙানো থাকত। সুন্দর আলমারীতে ঝকঝকে বই। একটি ঘরে খাওয়া দাওয়া ভাঁড়ার সাদাসিধে ভাবে হত দেখলেই বোঝা যেত। তা ছাড়া অন্য ঘরও ছিল। একবার কৃষ্ণকুমার বাবুর এক শ্যালকের বিবাহ উপলক্ষে গিয়েছিলাম। ওঁর স্ত্রী বৌ-বরণের গল্প করছিলেন। তিনি সচরাচর সাদা শাড়ী পরতেন। বললেন, "বউ তুলতে হবে, এরকম হলে ত চলবে না।" তাই তাঁর মেয়েদের ভাল শাড়ী থেকে জমকালো দুখানা নিয়ে তিনি ও তাঁর ভগ্নী লজ্জাবতী বসু পরেছিলেন। নিজেদের বর্ণনা করলেন, "আমরা দুই বুড়ো পরী সেজেগুজে ফুলের মালা নিয়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম বউ আসবার সময়।" তিনি অনেক কথাই রসিয়ে রসিয়ে বলতেন। একজনরা প্রেমে পড়েছিলেন, কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতেন না। তাতে উনি বলতেন, "কেন? চোখে চোখে কি আর প্রেম হয় না?" এই বাড়ীতেই আমি অরবিন্দ ঘোষকে দেখেছিলাম। একবার মাত্র। সাদা টুইলের সার্ট গায়ে বসে ছিলেন। কাজী নজরুলকেও এই বাড়ীতে একবার দেখেছিলাম, মাথায় ঝাঁকড়াচুল, উঁচু কলারের রঙিন জামা গায়ে। গান শুনিয়েছিলেন।

সমাজপাড়ায় বাসের সময় জন্ম মৃত্যু বিবাহের সঙ্গে খুব ঘন ঘন সাক্ষাৎ হত। তার মধ্যে জন্মটা ছিলখুবই কম। সেকালে ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই থাকতেন উত্তর কলকাতায়। কাজেই কারুর মৃত্যু হলে আশে পাশের ছেলেদের ডাক পড়ত। তারা অনন্তের যাত্রীকে একবার সমাজের প্রাঙ্গণে ঘুরিয়ে নিয়ে যেত। কত মানুষকেই সেখানে শেষ দেখা দেখেছি। তার মধ্যে কুন্তলীন প্রেসের এইচ বসুর চেহারাটা এখনও মনে জল জল করে। তিনি সুপুরুষ ছিলেন। জীবিতকালে উৎসবের উদ্যান সম্মেলনের ব্যয়ভার বহন করতেন। ভারী ঘটা হত সেখানে। উপাসনা, বেড়ানো, খাওয়া দাওয়া, কনে দেখানো, রোমান্স অনেক কিছুই হতে দেখেছি।

বিবাহ ত সমাজপাড়ায় অনেকই দেখেছি। আমরা প্রথম যখন কলকাতায় এলাম তার পরই—উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হল। তাঁর চাইতে তাঁর ভাই সুকুমার রায় ও ভগিনী শান্তিলতা (?) র বিবাহই বেশী মনে আছে। সে দুটি হয়েছিল সমাজ-পাড়ার চেয়ে একটু দূরে ব্রাহ্মমন্দিরে। সমাজপাড়ার মধ্যে ঘটাপটার বিবাহও মাঝে মাঝে দেখতাম। আবার কোনো কোনো বিবাহে গোলমালও বাধত। একটি মেয়ের

বিবাহে কন্যাকে কালোপাড়ের শাড়ী পরানো হয়েছিল বলে বরপক্ষীয়া মহিলারা মহা কোলাহল করেছিলেন। আর একজনের বিবাহে বরের দাদা ঝগড়া করে সমস্ত বরযাত্রীদের অভুক্ত তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন র‍্যাশনের দিন ছিল না, সব বিবাহেই খাওয়া হত। কিন্তু একটি মেয়ের বিবাহে তার বাবার মত ছিল না বলে বাবা কোনো আয়োজন করলেন না। তখন কারুর একজনের চেষ্টায় সবাইকে এরারুট বিস্কুট আর চা দেওয়া হল।

ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ের একমাত্র কন্যার বিবাহেও খাওয়া দাওয়া বিশেষ হয়নি। প্রাণকৃষ্ণবাবু খাওয়ানোর টাকা দান করবেন বলে সামান্য লুচি তরকারী খাইয়েছিলেন। নীলরতনবাবু তাঁর খুব বন্ধু ছিলেন। তিনি কন্যাকর্তার ব্যবস্থার কথা শুনে নিজের বাড়ীতে মহা ঘটা করে কন্যাকে আয়বুড়ভাত খাওয়ালেন। এত রকমের রান্না তাঁর নিজের কন্যাদের বিবাহে হয়েছিল কিনা সন্দেহ। লোকও প্রচুর নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

মাঘোৎসবে প্রত্যহ খাওয়ানোর জন্য যে হোগলার ঘর বাঁধা হত, সেখানে বিবাহের খাওয়া দাওয়া করার বেশ সুবিধা ছিল। তাই উৎসবের পরেই অনেকগুলি বিবাহ হয়ে যেত। তার মধ্যে ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ খুব ঘটা করে হয়েছিল। আত্মীয় বন্ধু, সমাজের সভ্য ছাড়াও পাশের কাঁসারী পাড়ার বস্তির সকলকে তিনি নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন। তারা বোধ হয় বিরাট একটা মাছ উপহার দিয়েছিল। মাঝে মাঝে বাঙালী অবাঙালীর বিয়েও হত, তবে আজকালকার মত এত নয়। এইসব বিয়েতে কখনও হিন্দী কখনও বা ইংরেজীতে বিবাহ অনুষ্ঠান হত। ইংরেজী জানে না এমন বাঙালী মেয়ের সঙ্গেও অবাঙালীর বিবাহ দেখেছি।

একবার এক ভদ্রমহিলা মফঃস্বল থেকে কন্যা ও ভাবী জামাতাকে নিয়ে সাধনাশ্রমে এলেন ব্রাহ্মমতে তাদের বিবাহ দেবেন বলে। কন্যাটির মাথায় সিঁদুর। তার মা বললেন, "সিঁদুর নয়, কালীঘাটে ফাগ দিয়েছিল।" যাই হোক, 'দেবালয়ে'র ঘরে যথারীতি বিবাহ হল। বরকন্যা বিদায়ের পর জানা গেল, ভদ্রমহিলা একজন দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালিনী জমিদারণী। তিনি জামাতার উপর রাগ করে বিবাহিতা সধবা কন্যাকে এনে আবার অন্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত সে বিবাহের কি হ'ল এখন আর মনে পড়ে না।

একবার কি একটা কারণে ঝগড়া হওয়াতে ব্রাহ্ম যুবকেরা একটা আলাদা মাঘোৎসব করেছিলেন। সুকুমার রায় ছিলেন তাদের দলপতি। তিনিই উপাসনা করেন। অসময়ে যদি চলে না যেতেন সমাজের ছেলেদের তিনি গড়ে তুলতে পারতেন। আজকালকার লোকে সুকুমার রায় বলতে শুধু "আবোল তাবোল" প্রণেতাকে বোঝে। সেকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ছেলেদের "তাতাদা" ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন ব্রাহ্ম যুব আন্দোলনের নেতা। শুনেছি একবার একজন উপেন্দ্রবাবুকে বলেছিলেন "আপনার ছেলে আপনারই উপযুক্ত হয়েছেন।" তাতে উপেন্দ্রবাবু বলেন, "আমার চেয়ে আমার ছেলে অনেক ভাল হয়েছে।" উপেন্দ্রবাবু নিজে বেহালা বাজানো এবং গান শেখানো ছাড়া ছবি আঁকতেন এবং গল্প লিখতেন। তাঁর ব্যবসায় হাফটোন ব্লকের কথা অবশ্য আলাদা। তাঁর ছেলেমেয়েরা সুকুমার এবং সুখলতাও গল্প লিখতেন এবং ছবি আঁকতেন। সুকুমার বাবুর গল্প সবই 'হাসির গল্প।' ছেলেবেলা "মুকুল" কাগজে উপেন্দ্রবাবুর "ঘ্যাঁঘাসুরে"র গল্প আমরা খুব ভালবাসতাম। তাঁর "ছেলেদের রামায়ণ ও মহাভারত" ত অপূর্ব্ব। আরও অনেক গল্প তাঁর সুবিখ্যাত।

কলকাতায় এসে আর একটি প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎ পেলাম সেটি ছাত্রসমাজ। এই ছাত্রসমাজ পূর্ব্বে আমাদের পিতৃস্থানীয়দের অনেকের চরিত্র গঠনে সাহায্য করেছিল, পরে আমাদের সমসাময়িকদের চরিত্র গঠনেরও সহায় ছিল। তবে প্রথম যুগের মত শক্তিশালী আর

পরে ছিলনা। আমাদের সময়ে প্রতি সপ্তাহে শনিবার সমাজমন্দিরে ছাত্রসমাজের বক্তৃতা হত। সেখানে শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুহ প্রভৃতি অনেকের বক্তৃতা হত। কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় সে কি আশ্চর্য্য লোকসমাগম! মন্দিরের হলটিতে হয়ত হাজার অনেক লোক ধরে। বাইরে সমস্ত প্রাঙ্গণে, গলিতে, পাশের বাড়ীতে ছাদে ও বারন্দায় লোকে লোকারণ্য। তার উপর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের রাস্তা জুড়ে সুকিয়া ষ্ট্রীট থেকে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন পর্য্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে যেত। স্বয়ং বক্তাই সহজে ঢুকতে পথ পেতেন না। যুবকরা বডি গার্ড হয়ে অনেক কষ্টে তাঁকে হলে ঢোকাত। মহা হট্টগোলের যেই মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠত, অমনি সব গোলমাল চুপ। বক্তৃতা অন্তে ছিল জুতো হারানোর পালা। বেদীর কাছে মানুষ জুতো খুলে ঢোকে, ফিরে অনেকেই অপরের জুতো পরে চলে যেত। রবীন্দ্রনাথের জুতো প্রায়ই হারাত। লোকে হয়ত ইচ্ছা করেই নিয়ে পালাত। একবার ত তিনি নগ্ন পায়েই বাড়ী ফিরে গেলেন। তারপর থেকে যখন আসতেন, মন্দিরে ঢুকবার আগে প্রবাসী আপিসে জুতা রেখে যেতেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন আশ্চর্য্য মন-জাগানো বক্তা। তাঁর প্রত্যেকটি কথা প্রত্যক্ষ অনুভূতির থেকে বেরিয়ে মানুষের বুকে এসে ধাক্কা দিত। তখনকার দিনে তাঁর মত করে ঘরোয়া ভাষায় মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে বক্তৃতা দিতে কেউ পারতেন না। অন্যায় বা অনাচারের বিরুদ্ধে যখন তাঁর মন উত্তেজিত হয়ে উঠত তখন ভাষার শোভন অশোভন জ্ঞানও ভুলে যেতেন। কোন্ যুগে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি কিন্তু আজও এক একটা কথা মনে পড়ে যায়। বিদ্রোহী মনকে শাসন করে তিনি বলতেন, "মন, তুমি দুধকলা খাবে? তোমাকে চাবুক মারব।" মানুষ নানা কাজের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে প্রকৃত সাধনা ভুলে গেলে তিনি বলতেন, "ওরে বাঁশবনে ডোমকানা!" থিয়েটারে বাবুরা নটীদের সঙ্গে কি ভাবে নাচে বলতে গিয়ে একবার তিনি একটা গ্রাম্য কথা ব্যবহার করেছিলেন। বক্তৃতার শেষে হেম মাসিমা এসে নিজের বাবাকে তাই ভীষণ বকতে লাগলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় আমার বাবার কাছে প্রায়ই আসতেন। এই সমাজপাড়াতেই বাবা তাঁর "আত্মচরিত" "বিধবার ছেলে" "Men I have seen ও History of the Brahmo Samaj" প্রভৃতি বই প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। শেষোক্তটির জন্য বাবাকে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

ছাত্র সমাজের বক্তাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা দিতেন মেঘমন্দ্রস্বরে। ভাষাও যেমন বিশুদ্ধ, কণ্ঠও তেমনি গুরুগম্ভীর। বক্তৃতা দিতে একবার সরোজিনী নাইডুও এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স কম, ছোট্টখাট্ট দেখতে। ভারি সুন্দর সাজসজ্জা করতেন। সেকালে বাংলা দেশের মেয়েরা সাদা কাপড়ই পরতেন বেশী। কিন্তু সরোজিনী দাক্ষিণাত্য-বাসিনী হওয়ায় তাঁর পোষাকে সুন্দর সুন্দর রঙের চমক দেখা যেত। কাপড়ের প্রত্যেকটি ভাঁজ নিখুঁত ভাবে শরীর ঘিরে ঘিরে উঠত। মনে হত গায়ের উপর কেউ কাপড় পালিশ করে দিয়েছে। আজকাল বাঙালী মেয়েরা সাজপোষাক করবার সময় সবাই দাক্ষিণী ধরণে কাপড় পরেন। সেকালে কিন্তু তা ছিল না। সকলে হয় বাংলা ধরণে নয় জ্ঞানদানন্দিনী প্রবর্তিত ব্রাহ্মিকা ধরণে শাড়ী পরতেন। সরোজিনী তখন থেকেই দাক্ষিণী ধরণে কাপড় পরতেন। তাঁর মা বাঙালীর মেয়ে, বাঙালীর স্ত্রী, কিন্তু তিনিও দাক্ষিণী ধরণে কাপড় পরতেন, তবে মাথায় কাপড় দিতেন। বেশ মিষ্টি করে কথা বলতেন তিনি।

স্বদেশী আন্দোলনের পর গোয়েন্দা পুলিশের ভাবনা ছিল বাবার নিত্য সহচর। যখন তখন উপরওয়ালাদের কাছ থেকে কড়া হুকুম ও ধমক আসত।

তার ফলে শুধু যে দুশ্চিন্তা ছিল তা নয়, আর্থিক ক্ষতিও প্রচুর ছিল। কত সময় সমস্ত ছাপা ফর্মা পুড়িয়ে ফেলে আবার নূতন ফর্মা ছাপা হত।

বাড়ী সার্চের গোপন খবরও আসত। তখন যে সব কাগজ পত্র আপিসে রাখা নিরাপদ ছিল না, বাবা সেগুলি বেয়ারিং পোষ্টে এলাহাবাদের বামনদাসবাবুর নামে ডাকে দিয়ে দিতেন। বেয়ারিং পোষ্টের কাগজ হারাত না। আর এক নিত্য ব্যাপার ছিল censor এ চিঠি খুলে পড়া এবং পরে সেটি জুড়ে পাঠানো। কোনো কোনো চিঠি পাওয়াই যেত না একেবারে। এই-রকম একটা চিঠি মোতিলাল নেহরুর বিচারের সময় আদালতে তাঁর দস্তখত প্রমাণ করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই চিঠি মোতিলাল বাবাকে লিখেছিলেন কিন্তু বাবার হাতে পৌছায় নি। মোতিলাল আদালতে সেটি দেখে মুচকি হাসি হেসেছিলেন।

সমাজপাড়ায় বাল্যসমাজ, শিশু সমিতি, মহিলা সমিতি প্রভৃতি অনেক ছোটখাট সমিতি ছিল। বাল্যসমাজ দেবালয়ের ঘরে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় উপাসনার সময় বসত। যে সব ছোট ছেলেরা মন্দিরে বসত না তারাই ছিল এর সভ্য। এখানে গান গল্প বলা ইত্যাদি হত। প্রাইজও হত বছরে একবার খুব ঘটা করে। একবার প্রাইজে বেশ মজার একটি অভিনয় হয়েছিল। ছেলেমেয়েরা কেউ "বাঃ" কেউ "কিন্তু" কেউ "যদি" কেউ বা "বটে" সেজেছিল।" "বাঃ" ষ্টেজে ঢুকেই—বলল,—

> "আমার নাম বাঃ,
> বসে থাকি তোফা তুলে পায়ের উপর পা।"

"যদি" ঢুকেই বলল,

> "আমার নাম যদি,
> আশায় আশায় বসে থাকি হেলান দিয়ে গদি।"

"বটে" ঢুকেই বলল,

> আমার নাম বটে,
> কটমটিয়ে তাকাই যখন সবাই পালায় ছুটে।

প্রত্যেকের গানের প্রথম লাইনটাই মনে আছে, বাকি ভুলে গিয়েছি। শেষের দিকে একটা গানে ছিল

> "নিকম্মারা গেল কোথা
> পালাল কোন দেশে?"

এই গান গুলি উপেন্দ্র কিশোর বাবুর লেখা কি সুকুমার রায়ের লেখা এতদিন পরে মনে পড়ছে না। বাল্য সমাজে গল্প বলার ভার মেয়েরা নিতেন। সীতা এত ভাল গল্প বলত যে তার দিনে ছেলে মেয়েতে ঘর ভরে যেত। আমি একবার বাল্য সমাজের সম্পাদিকা হয়েছিলাম, তখন প্রাইজের দিন স্যর নারায়ণচন্দ্র-ভ'রকারকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। তিনি ধন্যবাদ দেবার সময় আমার চেয়ে আমার বাবাকেই বেশী ধন্যবাদ দিলেন। সভাতে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাপতির ত্রুটিটুকু সেরে নিলেন।

আমরা কিছুদিন সাধনাশ্রমের বারান্দায় একটা নাইটস্কুল করেছিলাম। পাড়ার ঝিদের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসত। তাতে একবার একটি মেয়েকে শাস্তি দিয়ে বলা হয়েছিল, "তোমাকে ক্লাশে নামিয়ে দেব"। সে বলল, "আমার নীচে কেলাসই নেই ত কোথায় নামাবে?" নাইট-স্কুলটা খুব বেশী দিন চলেনি।

নাইট-স্কুল এবং বাল্যসমাজ করার চেয়ে অনেক ভারিকি একটা কাজের সম্ভাবনা একবার হয়েছিল। তাতে আমরা খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। একবার বিশ্ব বিদ্যালয়ে একজন বিদেশী অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। সেখানে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। সভাভঙ্গের পর কেউ-একজন তাঁর কাছে আমাদের দুই বোনের পরিচয় দিলেন। আশুবাবু বললেন, "তোমরা আমার Universityতে বাংলা পড়াবার ভার নেবে?" হুবহু কথাটা আজ মনে নেই, কিন্তু তাৎপর্য্যটা এই রকম। আমরা বি,এ পাশ মাত্র। এম্, এ পাশ করিনি, তাঁর প্রস্তাবে অবাক হয়ে গেলাম। পরে আমাদের এক অধ্যাপককে গল্পটা বলে বললাম, "উনি বোধহয় ঠাট্টা করেছিলেন।" অধ্যাপক বললেন,

"আশুবাবু কখন ঠাট্টা করে বলেন না। কাজ নেওয়া উচিত ছিল।"

আমাদের কিশোর বয়সে সমাজপাড়ায় অনেক ছেলেও ছিল। কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতাম না। সেইটাই ছিল নিয়ম। কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে কথা বলতে নেই। প্রত্যহই তাদের দেখতাম, তাদের বিষয় অনেক গল্পও শুনতাম। কিন্তু এমনভাবে চলতাম যেন ওদের কখনও দেখিইনি। একবার একটা মেলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম; সেখানে একটি ছেলে আমাদের সবাইকে একটা করে ফুলের মালা কিনে দিয়েছিল। আমরা ত মহা বিপদে পড়লাম। না নিলে অসভ্যতা হবে, নিলে উচিত কাজ হবে না। অগত্যা হাতে করে নিয়ে অন্তরালে একসময় ফেলে দিলাম।

অবশ্য সব মেয়েই যে আমাদের মত এই নিয়ম পালন করত তা নয়। অনেকের ছেলেদের সঙ্গে বেশ ভাব ছিল, বেশ অল্প বয়সে রীতিমত রোমান্সও কিছু কিছু চলত। অনেক বাড়ীতে উপযুক্ত ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হত। আমাদের বাড়ীতে ওসব বালাই ছিল না। কুতুর বন্ধুরা জনকয়েক আসত, তাদের সঙ্গে অবশ্য গল্প করতাম। আর কখন-সখন অন্য বাড়ীতে কারুর কারুর সঙ্গে আলাপ হত।

কলকাতায় এসে বালিকাবন্ধুদের মধ্যে সমাজ-পাড়ার ও কলেজের বন্ধুদের ছাড়া আমার আর একটি বন্ধুলাভ হয়েছিল। সে ডাঃ সরকারের কন্যা নলিনী। ছেলেবেলার সে বন্ধুত্ব ভারি আনন্দময় ছিল। জীবনের নানা ঘূর্ণিতে এবং নিজের শারীরিক অক্ষমতায় সে বন্ধুত্ব ক্রমে চাপা পড়ে যায়; কিন্তু তার স্মৃতিটা এখনও সুখকর। মনে আছে নীলরতন বাবু একবার আমাকে ও নলিনীকে ভোর পাঁচটার সময় শিবপুরের বাগানে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও তাঁর মেয়েদের সঙ্গে দার্জ্জিলিঙেও নানা জায়গায় বেড়িয়েছি। অত কাজের মধ্যেও মেয়েদের দিকে তাঁর খুব দৃষ্টি ছিল।

আমরা যখন বেথুন কলেজে পড়তাম তখন উদ্ভিদ-বিদ্যা ছাড়া সেখানে কোনো বিজ্ঞান পড়ানো হত না। বিজ্ঞান পড়াবার জন্য নলিনী ও সুরীতি ছেলেদের সঙ্গে সিটিকলেজে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। তখন মেয়েরা ছেলেদের কলেজে বিশেষ পড়ত না। বহুপূর্ব্বে শুনেছি ডাঃ পি, কে রায়ের কন্যারা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছিলেন। ছেলেরা তাঁদের নানারকমে বিরক্তও করত শুনেছি। বেথুনে এমন কি অঙ্কশাস্ত্রও ম্যাট্রিকের পর কেউ পড়তে পেত না। আমার এবং আমার বন্ধু মোহিতকুমারীর অঙ্ক নেবার সখ ছিল। আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টার মশায় বলেছিলেন কলেজের course আমাদের প্রাইভেট পড়িয়ে দেবেন। সেই ভরসায় আমরা অঙ্ক নিয়েছিলাম I.A, তে। কখনও বেথুন স্কুলে কখনও মোহিতের বাড়ীতে আমাদের ক্লাশ হত। আমরা পড়তে বসবার আগে মোহিতের বউ দিদি আমাদের দোবারা চিনি দিয়ে এক প্লেট ঘন দুধের সরপোষ দিতেন। মোহিত ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা। মোহিতের সেজ দিদি স্নেহলতা মৈত্র অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। আমাদের অঙ্কশাস্ত্র চর্চ্চা এভাবে কিন্তু বেশী দিন চলল না। শেষে পরীক্ষার মাস দুই আগে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রাইভেট টিউটার রেখে আমি কোনোরকমে Statics and Dynamics পড়লাম। বলতে গেলে তার জোরেই পাশ করলাম, কারণ অন্যান্য অঙ্ক খুবই সামান্য শেখা হয়েছিল। যাই হোক অঙ্কে বেশী নম্বর না পেলেও এবারেও একটা স্কলারশিপ পেলাম। বেথুনে সর্ব্বদাই অনেক প্রাইজ থাকত, তাই কপালে এবারেও একটা সোনার মেডাল জুটে গেল। যতদিন কলেজে পড়েছি, প্রতিবৎসর ইন্‌স্পেক্টার এসে জিজ্ঞাসা করতেন, "তোমরা কে কে অঙ্ক চাও বল।" আমরা কয়েকজন প্রতি বারই হাত তুলতাম। কিন্তু চার বৎসরের মধ্যে হাত তোলানো ছাড়া অঙ্ক শেখানো বিষয়ে আর কোনো চেষ্টা কেউ করলেন না।

সতীশবাবু আমাদের বাড়ীতেই দাদাকে আ

প্রশান্তকে বি, এস সি'র অঙ্ক কসাতেন। একই সঙ্গে আমার আই এর অঙ্কও আমাকে করাতেন। তিনি খুব মিশুক ছিলেন। অঙ্ক কষাতে এসে আমাদের সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে রবিবারে আমাদের কুকারে খিচুড়ি রান্না শিখিয়ে আমাদের সঙ্গেই খেতেন। তাঁর বাড়ীতে আমরা দুই একবার নিমন্ত্রণে গিয়েছি।

সে যুগে বেথুনে যারা পড়তেন তাঁরা প্রায় সকলেই পরস্পরের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতেন। আমাদের চেয়ে চার ক্লাস উপরে মারি খোনাজি ও মোজেল নামে দুটি মেয়ে পড়তেন, তাঁরা বাংলা জানতেন না বোধ হয়, সর্বদাই ইংরেজীতে কথা বলতেন। যদিও একজন বাঙালী, কিন্তু দুই জনই মেমসাহেবের মত পোষাক পরতেন। তখন আমরা স্কুলে। কলেজে ওঁদের পর অর্থাৎ অল্প পরেই আমদের ক্লাশে একটি শাড়ী পরা খাঁটি বাঙালী মেয়ে ভর্ত্তি হয়। সে ভীষণ মেমসাহেবী করত। তাই ক্লাশের আর একটি মেয়ে তার নামে একটা কবিতা বানিয়েছিল।

"পুরাকালে ছিলেন—মস্ত একজন মেম।
Black sea তে পড়ে গিয়ে তাঁর হল deepest shame"

আমাদের সময় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন মিসেস কুমুদিনী দাস। তিনি খুব সামান্যই পড়াতেন; বি,এ ক্লাশে মাঝে মাঝে Cowpers Letters হাতে করে আসতেন। খুব মিষ্টি গলায় খানিকটা পড়ে চলে যেতেন। অন্য দুজন ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন পরেশনাথ সেন ও বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়। পরেশবাবু যা পড়াতেন ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু নোটস বিশেষ দিতেন না। বিজয়বাবু মিলটন সেকস্‌পিয়র সবের নোটস্ দিতেন এবং বইএর পাশে লিখে নিতে বলতেন। বিজয়বাবুর ইচ্ছা ছিল যে আমি Eng. Hons. নি; কিন্তু কলেজে পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না। তবু তাঁর কথামত কয়েকটা মোটা মোটা বই কিনেছিলাম; কিন্তু নিজে নিজে পড়ে শেষ করতে পারলাম না বলে Hons আর দেওয়া হল না। আমার বইগুলি পরে সীতার কাজে লাগল।

আমাদের সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন দেবেন বাবু। তাঁর পুরা নামটা ভুলে গিয়েছি। খুব ছোটখাট কৃশসামত মানুষ। চোগা চাপকান পরে আসতেন। তখনকার দিনের ছাত্রছাত্রীরা আদিরসাত্মক জিনিষ বা অশ্লীল জিনিষ গুরুজনের সামনে পড়তে লজ্জা পেত। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ঐ জিনিসগুলির প্রাচুর্য্য আছে। আমি তাই সেরকম কিছু পাঠ্য থাকলে একটা ছুতানাতা করে ক্লাশ থেকে পালাতাম। ক্লাশের মেয়েরা আমাকে তার জন্য পরে খুব বকুনি দিত।

কলেজে সুরবালা ঘোষ ও সুরবালা সিংহ নামে দুজন মহিলা অধ্যাপিকা ছিলেন। মিস ঘোষ কুমুদিনী দাসের পর কিছুদিন বোধ হয় প্রিন্সিপ্যালের কাজ করেন। তাঁরও পরে আসেন রাজকুমারী দাস। এ সময় আমরা কলেজে ছিলাম না।

আমরা কলেজে উঠবার আগেই ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাবী পত্নী বঙ্গবালা আমাদের কলেজের অধ্যাপকদের কাছে আসতেন বোধ হয় প্রাইভেট এম্‌, এ পড়বার জন্য। তাঁকে এবং আর একটি মহিলাকে প্রায়ই দেখতাম বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে বসে কথা বলতে। মেয়েরা তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্‌এ পড়তে যেত না বলে আমার ধারণা। আর দুই-চার বছর পরেই তা সুরু হয়। তাঁদের মধ্যে শকুন্তলা রাও, কমলকুমারী মৈত্র, মণীষা রায় এবং রোঞ্জনা গুহ-এর এক কনিষ্ঠা ভগিনীকে মনে পড়ে।

আমাদের অধ্যাপক পরেশবাবুর মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মার্জ্জিতরুচি ফিটফাট অধ্যাপক কমই দেখেছি। কলেজের দরজায় ধুলা পড়ে থাকত বলে তিনি দরজা খোলা বা বন্ধ করার সময় নখের ডগা দিয়ে দরজা ধরতেন। ছাত্রীরা কেউ কোনো তথ্য ভুল বললে তিনি বলতেন, "you can't create history"। তবে একটু আধটু অজ্ঞতাকে তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করতেন না; বলতেন, "Prime Ministerএর নাম না জানলেই কিছু

সর্ব্বনাশ হয়না।" তখন অবশ্য স্বদেশী Prime Minister এর যুগ নয়। ইনি ক্লাসে কখনো হাসতেন না, বা বাংলায় কথা বলতেন না।

লজিক ও ফিলসফি পড়াতেন হেমচন্দ্র দে। তিনি ভীষণ সাহেব ছিলেন, কখনও ইংরেজী ছাড়া কথা বলতেন না। কথার সুরটাও সাহেবদের মত করতেন।

উদ্ভিদবিদ্যা পড়াতেন হেমপ্রভা বসু; তিনি ছিলেন স্যর জগদীশের কনিষ্ঠা ভগিনী। ইনি স্কুলেও কিছু পড়াতেন। একটু খামখেয়ালী ছিলেন। স্কুলের মেয়ে হলেও সীতা তাঁর খুব প্রিয় ছিল।

ইকনমিকস পড়াতেন অক্ষয়কুমার সরকার। এঁর কাছে আমি বি এ ক্লাসে ওঠবার পর পড়েছি। প্রায়ই বলতেন, "তুমি এম্ এ তে ইকনমিক্‌স্ নিও।" অবশ্য আমার ভাগ্যে তা হয়নি। বি, এ তে ইংরেজী অনার্স নিয়ে ছেড়ে দিলাম বলে ইংরেজীর অধ্যাপকরা বলতেন "এম্, এ তে ইংরেজী নিও।" আমার এম্ এ পড়াটা হাস্যকর রকম হয়েছিল। বি, এ পাশ করবার দুই তিন বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েছিলাম। কিন্তু শুধু টাকা নষ্ট করাই সার হল। একদিন ক্লাস করেই পালিয়ে এলাম। পরে আর যাইনি। দুজন প্রফেসারের কাছে পড়েছিলাম—একজন প্রফুল্ল ঘোষ আর একজন অপূর্ব্বকুমার চন্দ। পরে প্রায়ই অপূর্ব্ববাবু ঠাট্টা করে বলতেন, "আমি এমনই পড়ালাম যে আপনি একদিনেই ভয় পেয়ে পালিয়ে এলেন।" অপূর্ব্ববাবু তাঁর স্মৃতিকথায় ছাত্রী হিসাবে আমার নাম লিখেছিলেন দেখেছিলাম।

আমাদের কলেজের জীবন কিছু ঘটনাবহুল ছিল না। সারা বছরে প্রাইজ, ছাত্রী সম্মেলন এইরকম দুই একটা নূতনত্ব ঘটত। কখনো কখনো সিনেমা দেখানোও হত। তবে প্রেমের ছবি থাকলে তার উপর একটা বিরাট হাতের ছায়া পড়ে ঢাকা দিত। এইরকম বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ছিল। যাই হোক, ছেলে মানুষে খোড় বড়ি খাড়ার মত এক ঘেঁয়ে জীবনেও গল্প করবার বিষয়ের অভাব বোধ করে না। কাজেই আমাদেরও গল্পের বিষয়ের অভাব হত না। কোনো কোনো অধ্যাপকের ইংরেজী উচ্চারণ খারাপ ছিল বলে অনেক মেয়ে তাঁদের নিয়ে প্রায়ই রসিকতা করত। মনে হত যে তাঁদের সহকর্মীরাও একটু আধটু করতেন। ইংরেজী বক্তৃতার সময় অনেকে মিলে তাঁকে ঠেলে পাঠাতেন।

এই রকম সাদামাটা কলেজে একবার জলন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয় থেকে বোধ হয় লজ্জাবতী নাম্নী এক অধ্যাপিকা কলেজ দেখতে এলেন। তিনি আমাদের ক্লাশে এসে একটাও ইংরেজী বা হিন্দী বললেন না। বেশ স্পষ্ট করে আস্তে আস্তে সংস্কৃতে কথা বলতে লাগলেন। মেয়েরা ত অপ্রস্তুত। অগত্যা আমি আমার স্বল্পবিদ্যায় যেটুকু কুলোল তাই দিয়েই সংস্কৃতে তাঁর কথার উত্তর দিতে বাধ্য হলাম।

বি, এ পড়বার সময় আমাদের ক্লাশে আর দুই একটি নূতন মেয়ে এলেন। তার মধ্যে একজন রাণী চ্যাটার্জ্জি। রাণী পরে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পুত্রবধূ হন। রাণীর কথা বলার ধরণ খুব মজার ছিল। তার পূর্ব্বতন কলেজের অধ্যাপিকাদের বাংলা বলা সে অনুকরণ করে দেখাত। কলেজটি খৃষ্টীয় প্রাচীন-পন্থী কলেজ, কাজেই বাংলার প্রতি খুব অনুরাগ তাদের ছিল না। সেই ধরণের কথা অভিনয় সহকারে না দেখালে তার রসটা ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। রাণী বোর্ডিঙে থাকতেন, আগের বোর্ডিঙের খাওয়া নিয়েও তার অনেক হাসির গল্প ছিল।

বোর্ডিঙে কয়েকজন কাপড়ওয়ালা আসত। তার মধ্যে একজনের নাম ছিল নাদির শা। সে দেখতে খুব ভাল ছিল এবং মেয়েদের সঙ্গে খুব রসিকতা করত। ভাল ভাল কাপড় ফরসা মেয়েদের গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে সে বলত, "আপনাকে কি সুন্দর যে দেখাবে তা আর কি বলব।" তারপর অবশ্য আকাশস্পর্শী দাম হাঁকত। কোন কোন মেয়ে বোকার মত যত খুশী কাপড় কিনত, তারপরই বাড়ী থেকে বকুনি আসত ডাকে। এমন কি উপরওয়ালাদের কাছে নালিশও আসত।

ঋণাঞ্জলি

চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ

(যে সকল ইয়োরোপীয় ভারতবন্ধু বলিয়া পরিচিত ও যাঁহাদের নিকট ভারতীয় মানব বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ, চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। ভারতবর্ষে দীর্ঘ ৩৬ বৎসর কাল বাস করিয়া তিনি এই দেশকেই নিজের দেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দীন দরিদ্রজনের সেবাতে জীবন কাটাইয়া নিজের দীনবন্ধু নাম সার্থক করিয়াছিলেন। স্বার্থবোধহীন সর্বত্যাগী দীনবন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ খৃষ্টভক্ত ও খৃষ্টধর্মের উচ্চতম আদর্শে নিজের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত "What I Owe to Christ" পুস্তকের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে "ঋণাঞ্জলি"। ঐ গ্রন্থের যে অংশে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজের দাক্ষিণ আফ্রিকা গমণ ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার কথা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন এইখানে সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।)

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবাসীদের অন্যতম পরম আস্থাভাজন নেতা ছিলেন গোখলে। ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর কাছ থেকে তারযোগে আমি এক জরুরী নির্দেশ পেলাম। দাক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা চুক্তিবদ্ধ শ্রমদাসত্ব প্রথার কবলে অসহনীয় অত্যাচারে নিপীড়িত হচ্ছে। এই প্রবাসী ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন মহাত্মা গান্ধী।—এদের সাহায্য করবার জন্যে আমাকে অবিলম্বে দাক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করতে হবে,—এই হোলো গোখলের নির্দেশ।

নাটালের বিভিন্ন বাগিচায় কাজ করবার জন্যে ১৮৬১ সাল থেকে ভারতীয় শ্রমিক চালান করা হোত চুক্তিপ্রথার মাধ্যমে। দিনে দিনে এই প্রথা অতি বীভৎস রূপ ধারণ করেছিল—ক্রমে উঠেছিল নানা অন্যায়ের দুরপনেয় কলঙ্ক। ভারতীয় শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্যে পেশাদার আড়কাটি নিযুক্ত করা হোত—এরা মালিকদের কাছ থেকে শ্রমিক মাথা পিছু দাম পেত। পুরুষের চাইতে স্ত্রীলোকের চালানের পারিশ্রমিক ছিল বেশী। আড়কাটিরা নির্বিচারে ছলবলের আশ্রয় নিত। হাজার হাজার ভারতীয় শ্রমিককে তারা চুক্তিপ্রথায় সংগ্রহ করে নাটালে চালান দিয়েছিল। ফলে নাটালে ইউরোপীয়ের চেয়ে ভারতীয়ের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

ভারত গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যে প্রাথমিক চুক্তি হয়েছিল তাতে সর্ত ছিল এই যে, ভারতীয় শ্রমিকরা নাটালে পাঁচ বছরের জন্য কাজ করবে। পাঁচ বছরের শ্রমের মেয়াদ সম্পূর্ণ হবার পর ভারতীয় শ্রমিক স্বাধীনভাবে নাটালে বসবাস করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু এই চুক্তিকে বানচাল করবার উপায় উদ্ভাবনে দেরি হয়নি। নাটাল গভর্ণমেন্ট আইন করলো যে পাঁচ বছরের শ্রমের মেয়াদ শেষ হবার পর প্রত্যেক ভারতীয় শ্রমিককে হয় তিন পাউণ্ড কর দিতে হবে না হয় আবার আর এক পাঁচ বছরের জন্যে শ্রমচুক্তি করতে হবে। যে করও দেবে না, বা নূতন করে শ্রমদাসত্ব মেনেও নেবে না তাকে নাটাল থেকে বিতাড়িত করা হবে।

নাটাল সরকারের উদ্দেশ্য ছিল অতি সরল। ভারতীয়েরা হয় চিরকাল বাগিচায় শ্রমদাস হয়ে থাকবে না হয় তাদের রাজ্য থেকে দূর করে দেওয়া হবে। মাথাপিছু মুক্তিকর স্ত্রী-পুরুষ ও এমন কি পনেরো বছরের উপরের বালক বালিকাকেও দিতে হবে। এমনি মহার্ঘ মাশুল দিয়ে স্বাধীনতা ক্রয় করতে ভারতীয় দরিদ্র শ্রমিকের ক'জনই বা পারবে?

এই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক-প্রথা দাসত্ব-প্রথার নামান্তর। বিখ্যাত ঐতিহাসিক সার ডবলু ডবলু হাণ্টার বলেছেন

যে এই প্রথা ও দাসত্ব-প্রথার মধ্যে সীমারেখা টানা দুষ্কর। বাস্তবিক অবস্থা তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করার পর আমিও দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছিলাম যে হাণ্টারের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ। ভারতীয় শ্রমিকরা নিজের পছন্দমত মালিক নির্বাচন করতে তো পারতই না—যদি বা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বাগিচা ত্যাগ করতে চেষ্টা করতো, তা'হলে ফৌজদারী অপরাধে শাস্তি পেত।

সরকারি পর্য্যবেক্ষণের একটা তথাকথিত ব্যবস্থা যে ছিল না তা অবশ্য নয়। কিন্তু তাতে মালিকের নিষ্ঠুরতা বিন্দুমাত্রও লাঘব হোত না। প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস দাসের মনে মোটেও ছিল না। এই প্রথার সব চাইতে বীভৎস রূপ ছিল এই যে, প্রতি একশো জন পুরুষ শ্রমিকের অনুপাতে চাল্লিশ জন করে নারী শ্রমিক সংগ্রহ করা হোত। বিবাহিত দম্পতি অতি অল্পই ভারতবর্ষ থেকে আসত। অতএব পুরুষ ও নারী শ্রমিকের সংখ্যার এই বিপজ্জনক তারতম্যের ফলে নাটালের ভারতীয় সম্প্রদায় দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছিল।

১৮৩৪ সালে দাসত্বপ্রথা রদ হয়। দাসত্বপ্রথার পরিবর্তে চুক্তি বদ্ধ শ্রমপ্রথার উদ্ভব হয় এবং এই প্রথা অনুসারে মরিশাস, ট্রিনিডাড, জামাইকা, গ্রেনাডা, বৃটিশ গায়েনা প্রভৃতি উপনিবেশের ইক্ষুবাগিচায় দলে দলে ভারতীয় শ্রমিক আমদানি করা হয়। প্রাক্তন দাসত্ব প্রথার অধিকাংশ অনাচার এই নূতন প্রথাতেও ফুটে উঠতে থাকে—কোনো কোনো ক্ষেত্রে নূতন প্রথার কলংক পূর্বতন প্রথার কলংককে ছাড়িয়ে যায়। মালিক যেখানে ভাল হোত, সেখানে ভারতীয় শ্রমিকরাও ভাল ব্যবহার পেত। কিন্তু মালিক যেখানে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী সেখানে শ্রমিকদের অবস্থা লাগামে বাঁধা জন্তুর মত। এমনি অত্যাচার ও নিপীড়নের ফলে কত হতভাগ্য শ্রমিক যে আত্মহত্যা করে মুক্তিলাভ করতো তার ইয়ত্তা নেই। বাগিচা জীবনের দুর্নীতি দুর্ভাগ্যকে আরও গভীরতর করে তুলতো—কখনও বা পৌঁছিতো নারীহত্যা ও পুরুষের আত্মহত্যার ভয়ঙ্কর পরিণতিতে। এই সমস্ত হত্যালীলায় আখ-কাটা ধারালো ছুরি সাধারণত ব্যবহৃত হোত। সরকারি তথ্য থেকেই জানা যায় যে বিভিন্ন বৃটিশ উপনিবেশে চুক্তিবদ্ধ শ্রমপ্রথার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা ও আত্মহত্যার সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় শ্রমিককে বাগিচার দাসত্বে শৃংখলিত রাখার জন্যে নাটাল সরকার যে তিন পাউণ্ড মুক্তিকর প্রবর্তন করেছিল তাই কত অন্যায় ও মানবতাবিরোধিতা বলে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এই করের প্রধান সমর্থক ছিল ইউরোপীয়ানরা।—ক্ষমতায় আসীন থাকা সত্ত্বেও জেনারেল বোথা বা স্মাট্‌স্ উভয়ের কেউই ইউরোপীয়ানদের চটিয়ে এই কর রদ করাবার নির্দেশ দিতে পারেন নি। মনে মনে তাঁদের হয়ত সদিচ্ছা ছিল গোখলে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় যান তখন তাঁরা গোখলেকে মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন—কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি তাঁরা রাখতে পারেন নি।—

এই অন্যায় করকে রদ করবার জন্যে সমস্ত প্রকার আবেদন নিবেদন যখন ব্যর্থ হোল তখন মহাত্মা গান্ধী ও তার সঙ্গীরা অহিংস অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। উত্তর নাটালের কয়লা খনি অঞ্চল থেকে একদল চুক্তি-বদ্ধ শ্রমিককে সংঘবদ্ধ করে গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহের বাহিনী গঠন করলেন। ভারতীয়দের দুঃখ দুর্দশার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই বাহিনী নিয়ে তিনি ট্রান্সভাল যাত্রা করলেন। দু-হাজারের অধিক ভারতীয় পুরুষ নারী ও শিশু গান্ধীজীর নেতৃত্ব বরণ করে নিল, তাঁর পিছু পিছু ড্রাকেনস্‌বার্গ পর্বতমালা পার হয়ে ট্রান্সভাল অভিমুখে যাত্রা করল। আরও হাজার হাজার ভারতীয় পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল কয়লাখনি পরিত্যাগ করা এবং ট্রান্সভালে প্রবেশ করা। দুই কাজই বে-আইনি উভয় কারণেই সশ্রম কারাদণ্ডের কঠোর শাস্তি। প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ও তাদের আত্মীয় বন্ধুগণ এই শাস্তির কথা জানত—তবু তারা ভয় পেলনা। দুর্গম পথযাত্রায়

কষ্টের সীমা নেই, কিন্তু গান্ধীজীর অনুবর্তীগণের একজনও পিছন ফিরলো না।

শেষপর্য্যন্ত অধিকাংশ সঙ্গীসহ মহাত্মাগান্ধী কারাবরণ করলেন। আন্দোলনের প্রতিটি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কেউ বা জেলে কেউ বা হাজতে আবদ্ধ হলেন। নাটাল থেকে আরও ভারতীয় শ্রমিক বাগিচা ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিতে অগ্রসর হলে তাদের ওপর শারীরিক অত্যাচার শুরু হোল—গুলী চলল নিরস্ত্র অভিযাত্রীদের উপর। ভারতবর্ষে যখন এই সব সংবাদ পৌঁছলো তখন উত্তেজনা চরমে উঠল। প্রবাসী ভারতীয়দের দাবী সমর্থন করে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ বিখ্যাত বক্তৃতা দিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন এই সংকটজনক পরিস্থিতি গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা যখন প্রত্যেকে কারারুদ্ধ তখন গোখলে আমাকে তারযোগে অনুরোধ করলেন অবিলম্বে সে দেশে যাবার জন্যে। স্বদেশে আমার মা তখন অন্তিম রোগশয্যায় আমি ইতিমধ্যে তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছি যে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দেশে রওনা হচ্ছি। আমার মার জীবনে স্বার্থপরতার লেশ ছিল না। এবার তিনি তাঁর শেষ স্বার্থত্যাগের নিদর্শন দিলেন। আমাকে লিখলেন--তাঁর কাছে না গিয়ে নাটালেই যেন আমি যাই, সেখানে তাঁর ভাগ্যহত ভারতীয় ভগিনীদের পরম প্রয়োজনে তাদের যেন আমি সেবা করি। মার সঙ্গে আর আমার দেখা হোল না। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছবার কিছুদিন পরেই তিনি চিরশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় নিলেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক ডক্টর সামুয়েল পিয়ারসনের পুত্র উইলি পিয়ারসন নাটাল যাত্রায় আমার সাথী হোলো। উইলির মা কোয়েকার ছিলেন। দিল্লীতে উইলি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার আশ্চর্য্য ব্যবহারে সে আমাকে একেবারে চমৎকৃত করে দিল। তাড়াহুড়ো করে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি কেন না দেরী করবার সময় নেই, সেদিন মধ্যরাত্রেই দিল্লী থেকে যাত্রা করতে হবে নইলে জাহাজ পাবো না। উইলি আমার কাছে এসে বললে তোমার যাওয়ার আগে একটি উপহার তোমাকে দিতে চাই। আমি প্রশ্ন করলাম উপহার? বেশ তো কি উপহার?

উইলি বললে—এই যে উপহার তোমার সামনেই উপস্থিত আমি।

তার পর তার সে কী উল্লাসভরা হাসি।

তার এই কৌতুকভরা আত্ম উপহার তার উজ্জ্বল চরিত্র মাধুর্য্যের প্রতীক। তার মত অকপট বন্ধু ও বিশ্বস্ত অনুচর আমি ইতিপূর্বে পাইনি। নাটালে পৌঁছানো মাত্র সে মুহূর্তে সেখানকার ভারতীয়দের অন্তর জয় করে নিয়েছিল। তাদের আশ্রয় পরিত্যাগ করে নানা সমুদ্র যাত্রা আমার আরম্ভ হোল—এই সব যাত্রায় উইলি ছিল আমার প্রধান সহায়। আমার জীবনের গভীরতা আঘাত আমি পাই যখন ১৯২৩ সালে ইটালিতে এক চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে উইলি মারা যায়। তার এই আকস্মিক অপমৃত্যুর জন্যই এই শোক অসহনীয় হয়েছিল।

কলম্বো থেকে ডারবান যাত্রার পথে অধিকাংশ দিন আমাদের জাহাজ প্রবল ঝটিকার পিছনে পিছনে চলল। ফলে ডারবান পৌঁছতে আমাদের পাঁচ দিন দেরী হয়ে গেল। তীরে পৌঁছতে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, জাহাজঘাটে মহাত্মাগান্ধী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

জেনারেল স্মাটস মীমাংসা চান, তাই তিনি বিনা সর্ত্তে গান্ধীজীকে মুক্তি দিয়েছেন। বুঝলাম অসমর্থনীয় গোলা টাক্সের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর আপত্তিকে উপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নিগ্রহের মূল রহস্য কি তা বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র দেরী হোলনা। মূল কারণ জাতিভেদ আর বর্ণ বিদ্বেষ। ভারতীয়রা কৃষ্ণকায় জাতি; একমাত্র বাগিচার মালিকরা ছাড়া দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্য সমস্ত ইউরোপিয়ানরা চাইত ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দূর করে দিতে। ভারতীয় শ্রমিকদের কেন যে আমদানী করা হয়েছিল

এই ছিল তাদের মহাদুঃখ। আফ্রিকার অন্যান্য কৃষ্ণকায় জাতিদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক হীনতার মধ্যে জীবন কাটাতে হতো—ইউরোপীয়ানদের উদ্দেশ্য হোলো ভারতীয়েরা ও যতদিন দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকবে ততদিন তাদেরও বর্ণমালিন্যের হীনতা মেনে নিয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকতে হবে।

দিল্লীতে অথবা স্টোক্সের সঙ্গে শিমলা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম তখনই খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাত্যাভিমান ও বর্ণবিদ্বেষের প্রশ্রয় আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলেছিল। জাতির বাধা আর বর্ণের বাধা মানুষ আর মানুষের মধ্যে প্রাচীর তুলবে—আমি ভাবতাম প্রকৃত খৃষ্টান হয়ে এই বাধাকে আমি মেনে নেব কেমন করে? এই বাধার ফলে পৃথিবীতে এমন এক জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়েছে যা আমার প্রভু যীশুখৃষ্ট চাননি। তিনি বলেছিলেন—মানুষে মানুষে ভাই ভাই আর সমস্ত মানবের পরম পিতা ঈশ্বর। এই জাতিভেদের ফলে খৃষ্টীয় সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে—ধর্মের ঐক্যকে খান খান করে দেবে জাত্যাভিমানের অস্ত্র। সমস্ত মানবের প্রাথমিক মৌলিক দাবীর জন্য খৃষ্ট আত্ম-বিসর্জন করেছিলেন। কিন্তু খৃষ্টান হয়েও দুই জাতি পাশাপাশি বসে উপাসনা করতে পারে না। আমি ভাবতাম একটা অত্যন্ত কলুষিত, কোন সর্বনাশা পথে আমরা চলেছি? খৃষ্টান হয়ে খৃষ্টের মুখে কলঙ্ক লেপন করে কি আমরা তাঁকে অপমান করবো?

ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলাম যে ইহুদিদের জাতীয় কূপমণ্ডূকতা যখন প্রাথমিক খৃষ্টীয় সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করতে উদ্যত হয়েছিল তখন এই বিপদকে প্রতিহত করবার জন্যে খৃষ্ট শিষ্য পল এমন কি সাধু পিটারেরও মুখোমুখি দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী পলের পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে লিখিত আছে।

নিউ টেস্টামেন্টের অন্যতম প্রধান ও প্রত্যক্ষ শিক্ষা জাতিভেদকে পরিহার করার শিক্ষা। জাতিমিলনের বাণী খৃষ্টের দ্ব্যর্থবিহীন সুস্পষ্ট বাণী। সাধু পল লিখেছেন—"যীশুর দৃষ্টিতে ইহুদিও নেই, গ্রীকও নেই আর্য্য নেই, অনার্য্য নেই। প্রভু নেই—দাস নেই—খৃষ্টই সর্বস্ব এবং সকলের মধ্যেই তিনি বর্তমান"।

কিন্তু যখন নাটালে পৌঁছলাম তখন দেখলাম মানুষে মানুষে যে বৈষম্যকে প্রতিহত করতে সাধু পল আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, ঠিক সেই বৈষম্য নাটালের খৃষ্টীয় সমাজকে কলঙ্কিত করে রেখেছে।

জাতিভেদ যে কেবল মাত্র সরকারি কাজে কর্মে প্রশ্রয় পাচ্ছে তাই নয়। এই অন্যায়কে আইনের সাহায্যে খৃষ্টীয় সমাজের মধ্যেও পরিপুষ্ট করা হচ্ছে। জাতি বৈষম্যের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক গির্জা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

জাতিতে জাতিতে সামাজিক গণ্ডিবদ্ধতা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। জনমতও এই ভেদবুদ্ধির ভিত্তিতে গঠিত হচ্ছে।

এই ভেদবুদ্ধির বীজ উপ্ত হয়েছিল অতীতে। যখন বুয়র শাসনের যুগে আইনে ছিল যে রাষ্ট্রে বা ধর্মে শ্বেতকায় কৃষ্ণকায়দের মধ্য পার্থক্য থাকবেই—উভয়কে কিছুতেই সমদৃষ্টিতে দেখা হবে না। সেই অতীত কলঙ্কের দায়ভাগ গ্রহণ করে সেই একই নীতিহীন পন্থা নাটালের বৃটিশ অধিবাসীরাও বহন করছে এবং একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। প্রথম যেদিন আমরা ডারবানে পৌঁছলাম সেই দিনই এই জাতিভেদের কুসংস্কার আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ল। তারপর অবিলম্বে দিনে দিনে এই সংস্কারের নানা কুৎসিত অভিব্যক্তির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হতে লাগল। এই পাপ বিষাক্ত সংক্রমণের মতো সুস্থ সমাজ দেহের অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সংক্রমণ দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক দিন থেকে সুরু হয়েছিল এবং এই ব্যাধিকে রোধ করবার চেষ্টাও বলতে গেলে কিছুই হয়নি। খৃষ্টান সমাজের বিভিন্ন শাখায় গভীরে ক্রমে এই বিষ বাসা বেঁধেছে।

এ ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের নির্দেশ অতি স্পষ্ট—ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে জাতিভেদের স্থান নাই। আমাদের পক্ষে অতি লজ্জার কথা যে খৃষ্টীয় ধর্মসমাজ এ পর্যন্ত এই জাতিভেদের বিরুদ্ধে নিতান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে

প্রতিবাদ জানিয়েছে। মৌলিক ধর্মকথার সঙ্গে ব্যবহারিক আচরণের কোনও সম্বন্ধ না থাকার জন্যে এই দুর্বল আত্ম-অবিশ্বাসী প্রতিবাদ কার্যকরী হয়নি।—

এক খৃষ্টান গির্জায় যাজনা করার নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছিলাম। মহাত্মা গান্ধী আমার যাজনা শুনতে চেয়েছিলেন বলে উইলি পিয়ার্সন তাঁকে গির্জায় নিয়ে এসেছিল। পরে আমি জানলাম যে গান্ধিজি কৃষ্ণকায় এশিয়াবাসী বলে তাঁকে গির্জার মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনায় আমার লজ্জার পরিসীমা ছিলনা। আমার মনে হয়েছিল স্বয়ং যীশুখৃষ্টকে যেন তাঁর আপন মন্দির দ্বার থেকে ওরা দূর করে দিয়েছে। কিন্তু এমনি ব্যবহারই দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় খৃষ্টানদের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক।

কিছুদিন পরের আর একটি ঘটনার কথা বলি। তখন আমি কেপটাউনে গিয়েছি। শুনেছিলাম নাটাল অপেক্ষা কেপটাউনে বর্ণ বিদ্বেষের উষ্মা অনেক কম। আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমাকে দেখাশুনা করবার জন্যে গান্ধিজী তাঁর পুত্র মনিলালকে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন। মণিলাল যে কী ভাবে আমার সেবা যত্ন করেছিল তা বলবার নয়। আমিও তাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতাম। একদিন মণিলাল অতি উদগ্রীব ভাবে আমাকে জানাল—কোনো গির্জায় বসে আমার উপদেশ সে একবার শুনবে এই তার বড় সাধ। সহরের উপকণ্ঠে একটি গির্জা ছিল—সেখানকার ধর্মযাজক ছিলেন ভারতীয়দের সুহৃদ। সেই গির্জায় আমি মণিলালকে নিয়ে গেলাম।

এই গির্জার যাজক আমাদের সাগ্রহে আমন্ত্রণ করলেন। প্রার্থনাসভা আরম্ভ হবার আগে তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমাকে ও মণিলালকে চা খাওয়ালেন। এ পর্য্যন্ত ভালয় ভালয় কাটল দেখে আমি প্রস্তাব করলাম প্রার্থনা সভায় মণিলালকে নিয়ে যাবো। ধর্ম্ম যাজকের মুখ ভার হোল এ কথা শুনে। তাঁর কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু নিশ্চয়ই আপত্তি করবে উপাসক-মণ্ডলী। গির্জার মধ্যে শ্বেতকায় উপাসকদের পাশাপাশি বসে কোনও ভারতীয় বালক যীশুর বাণী শ্রবণ করবে অসম্ভব এ প্রস্তাব। কিন্তু বেচারী মণিলালের আকাঙ্খা আমি মিটাই কি করে? শেষ পর্য্যন্ত একটা আপোষ মীমাংসা হোল। মণিলাল গির্জায় ঢুকবেনা—গির্জার দোরগোড়ায় বসে কান পেতে ধর্মোপদেশ শুনবে।

একের পর এক এমনিধারা নানা ঘটনায় অভিজ্ঞতা আমি পেতে লাগলাম। একটি ঘটনার কথা বলব—কারণ ঘটনাটি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

কেপটাউনের সেন্ট জন গির্জায় কোনও বর্ণ বিভেদ ছিল না। এক রবিবার প্রত্যূষে আমি সেই গির্জায় হোলি কমিউনিয়নে যোগ দিলাম। খৃষ্টের পূতাবশেষ সমস্ত উপাসক গ্রহণ করেছেন,এবার আমার ধর্মোপদেশ দানের পালা। হঠাৎ চোখে পড়লো এক বিশীর্ণা বৃদ্ধা নিগ্রো মহিলা। প্রার্থনা সভার শেষ প্রান্ত থেকে শ্লথ চরণে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। সমস্ত ইউরোপীয়ান উপাসকরা যতক্ষণ না নিজের নিজের আসনে গিয়ে বসেন ততক্ষণ ঐ কৃষ্ণকায়া বৃদ্ধা সকলের পিছনে অপেক্ষা করছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি পূতাবশেষ নিয়ে তাঁর সামনে এগিয়ে গেলাম। গভীরতম ভক্তিতে মাথা নিচু করে তিনি হাঁটু গেড়ে আমার সামনে বসলেন। সহসা আমার মনে হল—এই নতজানু নিগ্রো বৃদ্ধার মূর্ত্তি যেন সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশের আত্মার প্রতীক—যে আত্মা ইউরোপের অগণিত অন্যায়ের বেদনায় মুহ্যমান নতশির। বিনম্র সহিষ্ণুতার অনন্ত শক্তি দিয়ে শ্বেত জাতির এই অশেষ অন্যায়কে আফ্রিকা আপন শিরে গ্রহণ করেছে। এই নির্ব্বাক নিরুদ্ধ শক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে আফ্রিকার আসন্ন মুক্তির শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার।

এই গির্জায় ধর্মোপদেশ দানের জন্যে এখানকার ডীন আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। চারিদিকে দিনে দিনে যে সমস্ত নিষ্ঠুর দৃশ্য আমি দেখেছি তাতে আমার সমস্ত অন্তর তখন জ্বলছে। আমি বললাম এই আফ্রিকা পরম-পিতা একেশ্বরকে ভুলেছে তার বদলে এখানে দুই দেবতার পূজা। এক দেবতার নাম

বর্ণতৃষ্ণা আর এক দেবতার নাম বর্ণবিদ্বেষ। বর্ণবিদ্বেষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই উপাসনা সভায় আমার মনের সমস্ত পুঞ্জিভূত অনুভূতি সেদিন আমি প্রকাশ করে ফেললাম।

পরে আমার সমস্ত মন এক গভীর হতাশায় ভরে গেল। মনে হোল এই উপাসনা সভা এ যেন এক শ্বেতপাথরের কঠিন দেয়াল—এই দেওয়ালে একটি মাত্র রেখাপাতও আমি করতে পারিনি। তবে একটি লাভ হোলো আমার। বিধান-সভার সদ্য-অবসরপ্রাপ্ত সদস্য জে এম মোরম্যান আমাকে একটি সহৃদয় পত্র লিখে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি লিখলেন—আপনি জেনে রাখুন যে এই আফ্রিকাতে এখনো দু-একজন আছেন যাঁরা ঈশ্বরের নামে শয়তানের কাছে মাথা পাতেননি। এই মুষ্টিমেয়দের মধ্যে একজন সাধু আছেন, যাঁর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হলে আমি খুশী হব। তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ আপনাকে পাঠালাম।

এই কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা মালোনাল্যাণ্ডের আর্থার শার্লি ক্রিপস্। অক্সফোর্ডে তাঁর শিক্ষা। তরুণ বয়স, অপূর্ব কাব্য-প্রতিভার অধিকারী। আফ্রিকার আদিবাসীদের মধ্যে সরল অনাড়ম্বর খৃষ্টীয় জীবন তিনি যাপন করেন। এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ও ক্রমে এই পরিচয় নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

আফ্রিকার বান্টু অধিবাসীদের আমি এই সময় সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে শিখি। তাদের শীর্ণ-শ্রান্ত মুখে তাদের শতাব্দী পারের বেদনার রহস্য আমি অনুভব করি।

আফ্রিকার মর্মরহস্যের প্রথম পরিচয় আমি লাভ করি অলিভ শ্রাইনারের কাছ থেকে। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকার আর এক মহিলার কাছে আমার এই শিক্ষা পূর্ণতর হয়। এই মহিলা মিস মল্টেনো। অলিভ শ্রাইনারের মত এই মহিলাও শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি কোনোদিন। দুর্গত ও উৎপীড়িতের হয়ে সারাজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন। এই সংগ্রামের চিহ্ন তাঁর শ্বেত-শুভ্র চুলে, তাঁর মুখের অসংখ্য বলিরেখায়। ভারতীয়দের এক সভায় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি—দক্ষিণ আফ্রিকায় তোমরা থাকতে চাও আমি জানি। কিন্তু এ জন্যে যদি নির্যাতন বরণে প্রস্তুত না হও তাহলে জননী আফ্রিকার উপযুক্ত সন্তান বলে দাবী করতে তোমরা পারবে না। নির্যাতন বরণ আমাদের ঈশ্বরদত্ত অধিকার সহিষ্ণুতার পথই ঈশ্বর নির্দিষ্ট প্রেমের পথ। আফ্রিকাতে যদি থাকতে চাও, তাহলে এই আফ্রিকাকে মাতৃভূমি বলে মানতে হবে। নির্যাতিতা জননীর সমস্ত বেদনাকে বহন করতে হবে।

ভারতীয়দের কাছে মিস মল্টেনো তাঁর জীবনের কাহিনী বলতে লাগলেন। বুয়র মেয়ে তিনি, বাস করতেন এক নির্জন গোলাবাড়ীতে। নিস্তব্ধ পর্বতমালা, মাঝে মাঝে বেগবতী ঝরণা, রাত্রীর নিঃসীম অন্ধকারে আকাশভরা অসংখ্য নক্ষত্রের আলোকইঙ্গিত। মুষ্টিমেয় প্রাতিবেশীদের মধ্যে ছিল তাঁর যাওয়া-আসা। সেই বৈচিত্র্যহীন পরিবেশের মধ্যে জীবন কাটাতে এই ছায়াভূমি আফ্রিকার আত্মশক্তির ত্রিধারাকে তিনি উপলব্ধি করলেন।

একটি শান্তধারা সঙ্গীত। মেদুর আকাশ ও শান্ত পর্বত সানু লালিত মহাদেশে বৃটিশ ও ওলন্দাজের কর্কশ কণ্ঠও কোমল হয়ে যায়। মানুষের কণ্ঠ-নিঃসৃত প্রেম সঙ্গীত যেমন ভাবে আফ্রিকার মানবাত্মাকে নাড়া দিতে পারে, এমন আর কিছুই পারে না। অন্তরের সমস্ত তিক্ততাকে সঙ্গীতের প্লাবন হরণ করতে পারে।

দ্বিতীয় শক্তি বেদনাধারা। আফ্রিকা যতো নির্যাতন সহ্য করেছে পৃথিবীর কোনও দেশ কোনো মহাদেশ তা করেনি। কিন্তু এতো নির্যাতনেও আফ্রিকার হৃদয় কঠিন হয়নি, কোমলই হয়েছে। বহুযুগের সহিষ্ণুতা নিষিক্ত তাদের বেদনা করুণ ভাষা একদিন বিশ্বমানবের মর্মে গিয়ে পৌঁছবেই।

তৃতীয় শক্তি আফ্রিকার নারীজাতির নৈতিক শক্তি। অদূর ভবিষ্যতে এই শক্তিরও পূর্ণ প্রকাশ হবে। সারা

পৃথিবীতে সর্বত্র নারীজাতিই সৃষ্টির বোঝা বহন করে। আফ্রিকার নারীর মত এত গুরুভার বোঝাও কোন নারী বহন করেনি। দুর্বহ ভার ও দুর্বিসহ বেদনার অগ্নিপরীক্ষায় আফ্রিকার নারী-চরিত্র নিকষিত স্বর্ণের পবিত্রতা লাভ করেছে।

মিস মণ্টেনো যখন এইসব কথা বলছিলেন তখন তাঁর বেদনা বিধুর মুখের দিকে একদৃষ্টে আমি তাকিয়ে ছিলাম। আফ্রিকার তৃণতলে বসে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আবার নতুন করে উপলব্ধি করেছিলাম যে কষ্টের বাণী সকলের প্রবাহিত। কষ্টের আনন্দ সমজাতির অধিকার। আরো উপলব্ধি করেছিলাম যে প্রেমই সমাধান—সমুদ্র বিক্ষোভের মাঝে এই কাজই করতে হবে। এই প্রেমের পথেই আফ্রিকার মুক্তি ও কল্যাণ সম্ভব।

মিস মণ্টেনো বলেছিলেন—আফ্রিকাবাসীদের নির্যাতন বন্ধ ঈশ্বরের অধিকার। কয়েকদিন পরে নাটালে একটি অন্তঃস্পর্শী ঘটনায় মিস মণ্টেনোর এই কথার তাৎপর্য আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

ডারবানের ভারতীয় সমাজ আমার জন্যে একটি বিদায় সভার আয়োজন করেছিলেন। লক্ষ্য করলাম এই সভায় কয়েকজন জুলু উপস্থিত। এর পরেও অন্যান্য সভায় কিছু কিছু জুলু আমি দেখেছি। আমি যখন বক্তৃতা দিতাম তখন তারা স্তব্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাদের আচরণে গম্ভীর মর্যাদার প্রকাশ ও মুখমণ্ডলে গভীর বেদনার ছায়া আমাকে আকৃষ্ট করত।

এই বিদায়-সভায় অবসানে আমি মিঞা খান নামক এক বৃদ্ধ মুসলমানের দোকানে ফিরে গেলাম। এইখানেই আমি থাকতাম। মিঞাখানের সঙ্গে চা পান করতে বসেছি, এমন সময় দুজন জুলু নেতা সেখানে এসে উপস্থিত হোল। আমরা তাদের আমাদের সঙ্গে চা পান করতে নিমন্ত্রণ করলাম। তখন একজন জুলু আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মিঞাখানকে স্থানীয় ভাষায় বললে—আমরা এঁকে একটা প্রশ্ন করতে পারি ?

মিঞাখান আমাকে বুঝিয়ে বলতে আমি বললাম, নিশ্চয়ই! আপনি অকপটে বলুন কি আপনার প্রশ্ন ? আমার চোখে চোখ রেখে সেই জুলু নেতা তখন বললে, ভারতীয়দের সঙ্গে আপনি যখন কথা বলেন তখন আপনার চোখের দিকে তাকিয়েই আমরা বুঝতে পারি যে তাদের জন্যে প্রাণ দিতে আপনি প্রস্তুত। আমাদের জন্যেও প্রাণ দিতে কি আপনি পারেন ?

আশ্চর্য এই প্রশ্ন! এই প্রশ্ন এত বেদনা-উদ্গার যে সোজা বুকের মধ্যে গিয়ে বিঁধে। এই প্রশ্ন এত সহজ যে সহজ উত্তর ছাড়া এর কোনও উত্তর নেই। হৃদয়ের সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর কেমন ভাবে দেবো তাই ভাবতে আমার এক মুহূর্ত দেরী হোলো। তারপর দ্বিরুক্তি না করে সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর দিলাম। বললাম—হাঁ পারি। যদি কোনদিন আসবে সেদিন আপনাদের জন্যেও প্রাণ দেবো, সে জন্যে আমি প্রস্তুত।

উত্তর দিতে মুহূর্ত মাত্র দেরী হয়েছিল আমার। সেই মুহূর্তে চকিত বিদ্যুৎ-বিকাশের মত এই সত্য আবার আমার অন্তরে উদ্ঘাটিত হোল খ্রীস্টের সেবায় জাতিভেদের স্থান নেই। তাঁর দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান। তাঁর অনন্ত প্রেম-সমুদ্রে সবজাতির সবধারা এসে মিশেছে।

আর একজন মহাপ্রাণবতী মহিলার সহিত আমার এখানে পরিচয় হয়েছিল। তিনি ডবলু, ই, গ্ল্যাড-ষ্টোনের কন্যা মিসেস ড্রু। তাঁর ভ্রাতা লর্ড গ্ল্যাডষ্টোন ছিলেন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল। ভারতীয় সমাজের এই সংগ্রামে তাঁর আন্তরিক সমর্থন ছিল। দুর্গত মানবাত্মার গভীর বঞ্চনাকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন, তাঁর পবিত্র দৃষ্টিতে করুণধারা ঝরে পড়ত। মহাত্মা গান্ধী ও গান্ধী পত্নীর প্রতি তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ কথাবার্তায় আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করতাম।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় এই দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেই প্রথম দর্শনেই আমাদের

উভয়ের হৃদয় এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে যায়, সে বন্ধন এ জীবনে কখনও শিথিল হবে না। আমাদের দুজনের হৃদয়ের মাঝখানে যে প্রেম-মন্দাকিনী প্রবাহিত, সে স্রোতে কোনও ভাঁটা নেই।

মহাত্মা গান্ধীর বেদনাক্লিষ্ট কঠোর জীবনের মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, নির্যাতন-সহিষ্ণুতার সর্বজয়ী পরম শক্তি। গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে আমি ভয়কে জয় করতে শিখেছি। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শে প্রদীপ যেমন জ্বলে, আমার চরিত্রের যা কিছু নিদ্রিত শুভবোধ তাঁর চরিত্রস্পর্শে তেমনি জাগ্রত হয়েছে, উদ্ভাবিত হয়েছে আমার প্রেরণা। সামান্যতম প্রাণ যেখানে নির্যাতিত, সেখানেই তাঁর অনন্ত মমত্ব ভরা প্রাণ ছুটে গেছে। এমনি ভাবে অবিশ্রাম ছুটে ছুটে তাঁর দুঃখ সন্ধানী আত্মা বিরামহীন আবেগে সেই আনন্দ-চন্দ্রিমার সন্ধান করেছে, যার নাম সত্য—যার অপর নাম ঈশ্বর।

একটি উষ্ণ দিনের কথা মনে পড়ে। ট্রান্সভালে প্রিটোরিয়া শহরের কাছে এক নদীতীরে মহাত্মার সঙ্গে আমি বসে আছি। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করছিলাম এই বলে—সৃষ্টির উন্নততর প্রাণী নিম্নতর প্রাণীকে ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে, এটা প্রকৃতির নিয়ম, অতএব মানুষ যে পশুপক্ষী খায় সেটা নীতিবিরুদ্ধ নয়।

গান্ধীজী আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন, কিন্তু খৃষ্টান হয়ে তুমি এই যুক্তি কি করে দাও? তুমি তো বিশ্বাস করো যে পরম প্রভু মানবজন্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন জীবনকে রক্ষা করবার জন্যে, ধ্বংস করবার জন্য নয়। তোমাকে আমাকে সকলকে রক্ষা করবার জন্যেই যীশুখৃষ্ট আত্ম-বলিদানকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তবে? জীবন নেওয়া নয়, জীবন দেওয়া। এই কি জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য নয়? তাঁর এই কয়েকটি কথার মধ্যেই গান্ধীজীর জীবনসত্যকে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। গান্ধীজীর জীবনের ব্রত শুধু দেওয়া—কিছু নেওয়া নয়, চরম আত্মদানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম, অবিশ্রাম শুধু দেওয়া, এই দেওয়ার মধ্যেই অনির্বাণ আনন্দ।

প্রথম থেকেই অন্তরের সহানুভূতি দিয়ে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে গান্ধীজী একজন অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ধর্মনেতা তো নিশ্চয়ই যার আহ্বানে অসংখ্য নর-নারী বিগলিত চিত্তে অসহনীয় দুঃখ বিপদকে বরণ করে নেয়, কিন্তু এইটুকুই গান্ধীজীর পরিচয় নয়। ঐ আকাশের তারকাকুল যেমন সত্য, ঐ নিত্যস্থায়ী পর্বতমালা যেমন সত্য, তেমনি অবিনশ্বর চিরন্তন চিরনূতন চিরসত্যের মূর্ত প্রকাশ মহাত্মা গান্ধী। সমস্ত বাধা বেদনাকে অতিক্রম করে কে? অন্যায়কে হরণ করে কে? সমস্ত শক্তির অধিরাজ পরম শক্তি কি? অনন্ত সহিষ্ণু প্রেম। গান্ধীজীর এই একমাত্র বাণী। এই বাণী পরম সত্যের বাঙ্ময়রূপ। মিস মন্টেসোরিও গভীর হৃদয়াবেগের সঙ্গে এই একই সত্যের প্রতিধ্বনি করতেন। যখন তিনি বলতেন—সহিষ্ণুতার পথই ঈশ্বরনির্দিষ্ট প্রেমের পথ।

এই সত্যের ব্যবহারিক পরীক্ষা আমি দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামের মধ্যে নিত্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সেখানকার নিত্য নির্যাতিত ক্ষুদ্রকায় ভারতীয় সমাজের অবস্থা দেখে প্রথম শতাব্দীর খৃষ্টভক্ত সম্প্রদায়ের কথা আমার মনে পড়ত। সহজ সরল অন্তর মাধুর্যভরা সামান্য একটি গোষ্ঠী তাদের ঘিরে বিদ্বেষ ও ভেদাভেদের বিক্ষুব্ধ হলাহল বন্যা।

মহাত্মা গান্ধীর ফিনিক্স আশ্রমে গিয়ে প্রথম দিনই এই চিত্র স্পষ্ট প্রতিভাত হোল। গান্ধী ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুবর্তীরা এই আশ্রমে তাঁদের ধর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন। শিশুদের মহাত্মা বড়ো স্নেহ করতেন। শ্রীযুক্তা গান্ধী ও তাঁর পুত্ররা তখনো কারারুদ্ধ। আমি গিয়ে দেখলাম এই নিরাত্মীয় মানুষটাকে প্রিয় শিশুর দল ঘিরে রয়েছে। ভারতীয় অচ্ছুতসমাজের একটি শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে তিনি বসে আছেন; আর একটি পঙ্গু মুসলমান রুগ্ন বালক তাঁর কোলের একটি কোন দখল করবার চেষ্টা করছে। আমাদের সঙ্গে

আহার করবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে একটি জুলু খৃষ্টান রমণী।

সেদিন সন্ধ্যায় অনেক আলোচনা হোল। বৃটিশ ও বুয়রদের সম্বন্ধেও অনেক কথা হোল কিন্তু কোনো কথায় হিংসা নেই। ঈর্ষা নেই। জ্বালা নেই। দিনান্তের সেই অবসন্ন অন্ধকারে ধর্মগ্রন্থের কয়েকটি কথা কেবলই আমার মনে পড়তে লাগল।—

"যারা বিশ্বাস করে তাদের এক প্রাণ এক আত্মা; তারা একসঙ্গে আহার করে;—প্রভুর নামে দুঃখ বরণের জন্যে নির্বাচিত হয়েছে—সেই একই আনন্দে তারা বিভোর।"

সরকারি পর্য্যবেক্ষণ সত্ত্বেও চুক্তিদাসপ্রথার বীভৎস রূপের সঙ্গে পরদিন সকালেই আমার পরিচয় হোল। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমি বেড়াতে বার হয়েছিলাম। হঠাৎ একটা ইক্ষু বাগিচার ধারে একটি মূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়লো। পথের পাশে গুঁড়ি মেরে রয়েছে একটি কৃষ্ণকায় লোক। মহাত্মা গান্ধীর কাছে এসে সে তাঁর পদধূলি নিল ও নিজের নগ্ন পিঠটা খুলে তাঁকে দেখালে। চাবুকের আঘাতে আঘাতে সমস্ত পিঠটা ওর ক্ষতবিক্ষত। বুঝলাম অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে লোকটা বাগিচা থেকে পালিয়ে এসেছে ও গান্ধীজির আশ্রয় চাইছে। আমি কিছুটা পিছনে ছিলাম—এখন লোকটির পিঠের ক্ষতগুলি পরীক্ষা করবার জন্যে সামনে এগিয়ে এলাম। লোকটি যখনই দেখল আমি ইউরোপীয়ান, তখনই সে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল এই বুঝি আবার তাকে আমি মারব। আমি শ্বেতকায় হলেও শত্রু নই—বন্ধু, একথা তাকে বুঝিয়ে বলা সহজ হোল না। আমি যখন প্রথম তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই তখন তার চোখের সেই ভয়ার্ত্ত বিহ্বল দৃষ্টি বহুদিন আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি।

চারিদিকের এই সব ঘটনা ও দৃশ্যের মাঝখানে দেশ থেকে সেই তারবার্তাটি এসে পৌঁছলো। যেটি আসবে বলে আমি ভয় করছিলাম। আমার মা আর ইহজগতে নেই। নিরাত্মীয় বিদেশে বসে এই সংবাদ আমি পেলাম। তখন শ্রীযুক্তা গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয়া জননী আমাকে মাতৃবিয়োগ শোকে সান্ত্বনা দিতে এলেন। ভারতীয় জননীবৃন্দ প্রেমময়ী সান্ত্বনাদাত্রী তোমরা—বিদেশী সন্তানকে কী পবিত্র স্নেহসুধাদানে তোমরা তৃপ্ত করেছ। শোকের মর্মান্তিক আঘাতে যে করুণ সান্ত্বনাস্পর্শে যে অকপট ভালবাসায় তোমরা আমাকে অভিষিক্ত করেছ; সে অপরিশোধ্য ঋণ সারাজীবনে ভুলব না।

(চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজের সহিত ভারতের তিনজন অসামান্য মহাপুরুষের বন্ধুত্ব তাঁহার জীবনকাহিনীকে এক অপরূপ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া জগতবাসীকে বিস্ময়াপ্লুত করিয়া রাখিয়াছিল। একজন ইংরেজ ধর্মযাজক ধর্মের ক্ষেত্র হইতে কেমন করিয়া নিজেকে সরাইয়া আনিয়া রাষ্ট্রীয় ও মানবীয় অধিকারের সংগ্রাম ক্ষেত্রে মহা যোদ্ধারূপে বিশ্ববিখ্যাত হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন ও ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনের ফলে তাঁহাকে একান্ত নিজের বলিয়া যাঁহারা কাছে টানিয়া লইলেন তাঁহারা হইলেন অক্লান্তকর্মী সমাজ সেবক মহামতি গোখলে, ঋষিকল্প রাষ্ট্রনেতা মহাত্মা গান্ধী এবং কবি শ্রেষ্ঠ যুগগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; এই বৃত্তান্ত যেরূপ আশ্চর্য্য তেমনি ইহা এক অপরূপ বিশ্বমানবীয় আদর্শ পরিচায়ক।)

কংগ্রেস স্মৃতি

(প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ)

চতুস্ত্রিংশ অধিবেশন—অমৃতসর—১৯১৯

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(৩)

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ আসন গ্রহণ করার পর সভাপতির নাম প্রস্তাব করার জন্য মঞ্চোপরি দাঁড়ালেন কংগ্রেসের অন্যতম ভূতপূর্ব সভাপতি হাসান ইমাম।

পুনঃপুনঃ উর্দ্দুতে বলার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি প্রথমত উর্দ্দুতে পরে ইংরাজিতে বললেন।

ইমাম সাহেব বললেন যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাম পূর্বে এত প্রসিদ্ধ ছিল না কিন্তু গত কয়মাসে পাঞ্জাবের জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং দেশের সেবায় তিনি যে সময় ব্যয় করেছেন তাতে পণ্ডিতজীই হলেন এই কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র।

মাদ্রাজের হিন্দু পত্রিকার প্রসিদ্ধ সম্পাদক—কস্তুরি রঙ্গ আয়াঙ্গার ও লোকমান্য তিলক এই প্রস্তাব সমর্থন করার পর ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য দাঁড়ালে দর্শকদের মধ্য থেকে "হিন্দী", "হিন্দী" রব উঠতে লাগল। চক্রবর্তী মশায় বললেন যে হিন্দীতে বললেও সকলকে সন্তুষ্ট করা যাবে না কারণ যাঁরা হিন্দী জানেন না তাঁরা অসন্তুষ্ট হবেন—যেমন তাঁর বন্ধু মিঃ শর্মা। এক্ষেত্রে তাঁকে একটি ভাষা বেছে নিতে হবে। সুতরাং যেটা তাঁর পক্ষে সহজ অর্থাৎ ইংরেজী তাই তিনি বেছে নিলেন। তিনি জানালেন যে মিঃ হাসান একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি তিনি একদিকে ঘুরে হিন্দী বলতে পারেন এবং অন্য দিকে ঘুরে ইংরাজি বলতে পারেন, তাঁর (চক্রবর্তী মশায়ের) মাত্র একটি মুখ। সুতরাং সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি ইংরাজিতে বললেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর গুণাবলি উল্লেখ করে তিনি বললেন যে চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে (চক্রবর্তী মশায়কে) পরিচ্ছদ-বিলাসী বলেন। অবশ্য তিনি তা নন এবং এই উক্তি সম্পূর্ণ মানহানিকর কিন্তু খুব সম্ভব পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁর সম্বন্ধে এই উক্তিতে কোন আপত্তি করবেন না যদি বলা হয় পণ্ডিতজি তাঁর (চক্রবর্তী মশায়ের) অপেক্ষাও বেশী পরিচ্ছদ-বিলাসী।

এই প্রস্তাব আরও সমর্থন করলেন মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ইংরাজিতে, এবং হাকিম আজমল খাঁ ও জলন্ধরের রায় বাহাদুর রায়জাদা ভগতরাম উর্দ্দুতে।

প্রস্তাব যথারীতি গৃহীত হল।

অতঃপর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কে অভ্যর্থনা করে সভাপতির আসনে বসালেন।

সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু অপরাহ্ণ ৪।।টার সময় তাঁর অতি দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করতে মঞ্চোপরি দাঁড়ালেন। তুমুল হর্ষধ্বনি দ্বারা সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করল।

তিনি তাঁর অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করতেই চার দিক থেকে 'উর্দু, উর্দু' রব উঠতে লাগল। পণ্ডিতজি তা অগ্রাহ্য করে ইংরাজীতেই বলতে লাগলেন। তিনি

জানালেন কংগ্রেসের অধিবেশন একদিন স্থগিত থাকার ফলে তাঁর অভিভাষণ সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে সুতরাং এখন সম্পূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি বেশীক্ষণ শ্রোতৃবর্গকে আটকে রাখবেন না। এই বলে তাঁর লিখিত অভিভাষণ পড়তে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় উর্দু' উর্দু' ধ্বনি দ্বারা তাঁর পাঠের ব্যাঘাত হতে লাগল। এতে তিনি জানালেন যে যাঁরা তাঁর উর্দু অভিভাষণ শুনতে চান তাদের জন্য প্যাণ্ডেলের বাইরে অভিভাষণের উর্দু তরজমা পাঠ করার ব্যবস্থা হয়েছে। যাঁরা তা শুনতে চান তাঁরা স্বচ্ছন্দে প্যাণ্ডেল ত্যাগ করে বাইরে যেতে পারেন।

তিনি তাঁর সুদীর্ঘ অভিভাষণে তাঁকে সভাপতির গৌরবময় পদে বরণ করার জন্য যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন যে তাঁর নির্বাচন প্রধানতঃ পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর গত বৎসর দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় শান্তির ফলস্বরূপ পৃথিবীর সমস্ত জাতি মুক্তির আশায় উদগ্রীব হয়েছিল। শান্তি অবশ্য স্থাপিত হয়েছে কিন্তু ভারতে তার প্রথম ফল হল রৌলট আইন ও জঙ্গী আইন (মার্শাল ল)। এর জন্য যুদ্ধ করা হয়নি এবং এর জন্য সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করে নি। এ শান্তি আমাদের মনে কোন উদ্দীপনা জাগায়নি এবং শান্তির জন্য আয়োজিত উৎসবে অধিকাংশ লোক যোগ না দেওয়ায় আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

বর্তমান কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে ভারতসম্রাট রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়েছেন। ভারতবর্ষের সমুদয় নাগরিকের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিস্বরূপ যাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন তাঁদের কর্তব্য এই মহানুভাবতার জন্য ভারতসম্রাটকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। এই রাজানুগ্রহের জন্য আজ পাঞ্জাবের মহান নেতাগণ যাঁরা গতকাল পর্য্যন্ত কারাগারের অন্তরালে ছিলেন এই সভায় তাঁদের উপস্থিতি সম্ভব হয়েছে। তিনি এই সকল নেতৃবর্গকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন যে আগামী শীতকালে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারত-ভ্রমনে আসবেন। তাঁকে যেন যথোচিত অভ্যর্থনা করা হয়।

এরপর তিনি কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি মাদ্রাজের নবাব সৈয়দ মহম্মদের (১৯১৩ সালের করাচী কংগ্রেসের সভাপতি) মৃত্যুতে শোক প্রকাশ এবং অমৃতসর এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানে যে সকল বীর নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করলেন।

তারপর তিনি পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও বিভীষিকাময় জঙ্গী আইন প্রয়োগের আলোচনা করে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট পাঞ্জাবকে কি ভাবে দাবিয়ে রেখে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের স্রোতধারা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শোনালেন। পাঞ্জাবে কি ভাবে ১৯১৫ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত ভারত প্রতিরক্ষা আইনের বলে স্পেশাল ট্রাইবুনেল গঠন করে ষড়যন্ত্র মামলাগুলির বিচার হয়েছিল, কি ভাবে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল এবং শত শত লোককে অন্তরীন রাখা হয়েছিল তার বর্ণনা দিলেন। এই সময় লোকমান্য তিলক ও শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের উপর পাঞ্জাব প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। সম্প্রতি সেই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে তাঁরা এই সভায় উপস্থিত হতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

তারপর তিনি যুদ্ধের সময় সৈন্য সংগ্রহের জন্য পাঞ্জাবীদের উপর কি রকম নির্মম অত্যাচার করা হয় তার বর্ণনা দিলেন।

এরপর তিনি রৌলট আইনের সমালোচনা করলেন বিশদভাবে। রৌলট বিলের আন্দোলনের ফলস্বরূপ মহাত্মাগান্ধী প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় মার্শাল ল প্রয়োগের ফলে দীর্ঘকালের জন্য পাঞ্জাব পৃথিবীর অন্যান্য অংশ

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সত্য গোপন করে গভর্ণমেন্ট প্রচার করল একমুখী বিবরণ। বাইরের কোন লোককে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। এমনকি রেভারেণ্ড এনড্রুজ সাহেবকে পর্য্যন্ত পাঞ্জাব থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল।

মার্শাল ল জারি হওয়ার অব্যবহিত পরে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী গভর্ণমেন্টের নিকট একটি তদন্ত কমিটী গঠনের দাবি করল। গভর্ণমেন্ট দাবি মেনে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটী গঠন করল। কিছুদিন পরে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীও তদন্ত কমিটী গঠন করল। এই কমিটী ৬ মাস ধরে পরিশ্রম করে বহু প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং স্থির হয় যে সরকার যে কমিটী নিযুক্ত করেছে তার নিকট কংগ্রেস কমিটীর রিপোর্ট দাখিল করা হবে।

গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিটী যা হাণ্টার কমিটী নামে খ্যাত তা হতাশাব্যঞ্জক হলেও জনসাধারণের পক্ষের আরজি পেশ করার সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেলে এবং সাক্ষ্যগ্রহণের সময় একজন বা দুজন সংশ্লিষ্ট নেতাকে পুলিশ পাহারায় হাণ্টার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দিলে কংগ্রেস তদন্ত কমিটি হাণ্টার কমিটীর সহিত সহযোগিতা করা স্থির করেছিল কিন্তু গভর্ণমেন্ট রাজি না হওয়ায় উক্ত সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হল।

অতঃপর সভাপতি মশায় হাণ্টার কমিটির নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্য থেকে উদ্ধৃত করে পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করেন।

কয়েকটি ঘটনার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

অমৃতসরে ৬ই এপ্রিল সত্যগ্রহ দিবস যথারীতি পালিত হয়। ৯ই এপ্রিল মুসলমানগণও হিন্দুদের সহিত মিলিত হয়ে রামনবমীর উৎসবে যোগদান করেন। সমস্তই অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়। এমনকি শোভাযাত্রার সময় ডেপুটী কমিশনারের সম্মানার্থ ইংরাজের জাতীয় সঙ্গীত পর্য্যন্ত বাজান হয়। তার পরই অঘটন ঘটল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জানা গেল যে তাদের প্রিয় নেতাদের দুজনকে (ডাঃ সত্যপাল ও ডঃ কিচলু) গ্রেপ্তার করে নির্বাসিত করা হয়েছে। শোকগ্রস্ত জনতা শোকের চিহ্নস্বরূপ মাথায় পাগড়ী ও জুতা পরিত্যাগ করে নেতাদের মুক্তির জন্য আবেদন করতে ডেপুটী কমিশনারের বাংলোর দিকে অগ্রসর হয়। ডেপুটী কমিশনার মিঃ মাইলস আরভিং পাগড়ী ও পাদুকা বর্জনকে হিংসাত্মক কার্য্যের প্রতীক ধরে নিয়ে তাদের উপর গুলিবর্ষণের হুকুম দেন। ফলে বহু লোক হতাহত হয়। এর ফলে প্রতিহিংসার জন্য জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ইংরাজ-মহিলাকে আক্রমণ প্রভৃতি পৈশাচিক কার্য্যে লিপ্ত হয়।

তারপর সভাপতি মশায় ১৩ই এপ্রিল বৈশাখী দিবসে জালিয়ানওয়ালা বাগে (পরে খুনীবাগ বলে পরিচিত হয়েছিল) নিরস্ত্র নরনারী বালকবালিকার উপর জেনারেল্ ডায়ারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিলেন।

যে রাস্তায় ইংরাজ-মহিলা নির্যাতিতা হয়েছিলেন সেই রাস্তায় চলার সময় পথচারীদের সরীসৃপের ন্যায় পেটের উপর ভর দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে বাধ্য করেছিল জেনারেল ডায়ার।

লাহোরের ডেপুটী কমিশনারের লেফটনাণ্ট কর্ণেল ফ্রাঙ্ক জনসনের হুকুমে লাহোরের নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে একটি মুসলমান-বিবাহসভায় উপস্থিত সকলকে এমনকি বর ও মোল্লাকেও বেত্রাঘাত করা হয়। তাদের অপরাধ মার্শাল ল প্রচলনের সময় বিবাহ সভায় উপস্থিত হওয়ার দুঃসাহস। অবশ্য এর জন্য তিনি দুঃখ করে বলেছেন যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিবেচনার অভাবেই এটা ঘটেছে।

কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি দ্বারা মার্শাল আইনের নোটীশ নষ্ট করার অপরাধে সনাতন ধর্ম কলেজের ৫০০ জন ছাত্র এবং অধ্যাপকদের সকলকে গ্রেপ্তার করে লাহোর দুর্গে বন্দী করা হয়। তাঁর আরও কুকীর্তির কথা সভাপতি মশায় শোনালেন।

তারপর তিনি কসুর ও গুজরানওয়ালায় অনুষ্ঠিত অত্যাচারের বিবরণ দিলেন।

পাঞ্জাবের কর্মচারীরা লোকের মনে ত্রাস সঞ্চার করা ছাড়াও হিন্দুমুসলমানের মিলনের উপর আঘাত হানতে লাগল। সাম্প্রতিক গণ্ডগোলের সময় হিন্দু মুসলমান পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাবে আকৃষ্ট হয়ে মেলামেশা করছিল। ইংরেজের চোখে এটা অপরাধ বলে গণ্য হল।

মার্শাল আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অতঃপর সভাপতি মশায় আলোচনা করলেন। তিনি বললেন যে হান্টার কমিটার প্রদত্ত সরকারী সাক্ষী দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, শাসন কার্য্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে মার্শাল ল প্রয়োগের কোন অবশ্যক ছিল না। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য গণ্ডগোল (trouble) নিবারণের জন্য জনসাধারণের মনে ত্রাস সঞ্চার করাই এর উদ্দেশ্য ছিল।

মার্শাল আইনানুসারে প্রদত্ত শাস্তি সম্বন্ধে একটা ধারণা করার জন্য সভাপতি মশায় জানালেন যে মোটের উপর ১০৮ জনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়েছিল। কারাগারের মেয়াদের সময় যোগ দিলে দেখা যাবে যে সংসাকুল্যে ৭০৭১ বৎসর ৫ মাসের জন্য কারাগারে অবরুদ্ধ রাখার হুকুম হয়েছিল।

এই সকল কার্য্যের জন্য পাঞ্জাবের ছোটলাট স্যার মাইকেল ওডেয়ার ও বড়লাট লর্ড চেলমসফোর্ডের দায়িত্ব সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় আলোচনা করে বললেন যে যদি লোকের মান ও প্রাণ দায়িত্বহীন কর্মচারীর ও সৈন্যবাহিনীর উপর নির্ভর করে, যদি মানুষকে তার সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তা হলে শাসন সংস্কারের সকল কথাই বিদ্রূপাত্মক হয়ে পড়ে।

এরপর সভাপতি মশায় মন্টেগু চেলমসফোর্ড পরিকল্পনার উপর রচিত ভারত আইন (The Government of India Act) সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে দেশের কতক লোক একে অভ্যর্থনা করেছে এবং অনেকে এর নিন্দা করছে। এখন কংগ্রেসের দায়িত্ব হচ্ছে, এ সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেশের সম্মুখে অভিমত প্রকাশ করা।

সভাপতি মশায় নূতন ভারত আইন বিশ্লেষণ করে বলেন যে এই আইন দ্বারা কিছু ক্ষমতা দেশের লোককে দেওয়া হয়েছে এবং কতকগুলি চাকুরির পথও খোলা হয়েছে। তাঁর মতে বর্তমানে যা পাওয়া গিয়েছে তার যথোচিত সদ্ব্যবহার করে অন্যান্য ন্যায্য দাবির জন্য আন্দোলন চালনা প্রয়োজন।

নূতন আইনে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে কোন ঘোষণা নেই। এই ঘোষণা ছাড়া স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই।

তিনি তারপর বললেন যে সৈন্যবাহিনী ও নৌবহরে ভারতীয়দের নিয়োগ করতে হবে কারণ দেশের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে যদি ভারতবাসী অংশ গ্রহণ করতে না পারে তা হলে স্বায়ত্তশাসনের কোন অর্থই হয় না।

অতঃপর তিনি খিলাফৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। খিলাফৎ প্রশ্ন মুসলমান ভাইদের নিকট অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সেই কারণেই সকল ভারতবাসীর নিকটও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কে খলিফাৎ উল্ ইসলামের প্রকৃত অধিকারী তা নিয়ে ঐতিহাসিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। লর্ড রবার্ট সেসিল পার্লামেন্টের কমনস্ সভায় বলেছেন যে খিলাফতের প্রশ্ন একমাত্র মুসলিম জনমতই মীমাংসা করবে এবং এই নীতি থেকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বিচ্যুত হয় নি। মুসলিম জনমত তুর্কীর পক্ষে।

বৃহত্তর ভারতে বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা ও ফিজিতে ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের দুরবস্থার বর্ণনা করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করার কথা বললেন।

তৎপর তিনি স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনডাসট্রিজ কমিশন সম্বন্ধে কিছু বলে ভারতবন্ধু ইংরাজ বি, জি, হর্ণিম্যানের ভারতবর্ষ হতে নির্বাসনের আদেশের সমালোচনা করে বললেন তাঁকে রোগশয্যা হতে অপসারিত করে এবং বিশ্রামের কিছুমাত্র অবসর না

দিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের কমনস সভায় যে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছিল তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তথাপি তাঁকে এদেশে ফেরবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি এখন বিলাতে ভারতের সেবায় নিযুক্ত আছেন।

পরিশেষে তিনি বললেন যে এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য আদর্শে ভারত গভর্ণমেন্টের সংস্কারের চেষ্টা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এতে লোক সন্তুষ্ট হবে কিনা তিনি বলতে পারেন না। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সকল রোগের ঔষধ নয়। এ দ্বারা এখন পর্য্যন্ত বহু সমস্যার সমাধান হয় নি। ইউরোপ শ্রমিক ধনীর সংঘর্ষে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। প্রলিটেরিয়েটরা ভদ্রলোকের শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। আমরা যখন—আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলবার ক্ষমতা পাব তখন আমরা পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি মিলিয়ে একটা নূতন ধরণের গভর্ণমেন্ট গড়ে তুলতে পারব। পাশ্চাত্যের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যেসকল মন্দ রীতিনীতি আমাদের আঁকড়ে ধরে আছে সেগুলিও বর্জ্জন করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হবে সেই ভারতবর্ষ গড়ে তোলা যেখানে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং সমস্তপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাবে, যেখানে নারীগণ বন্ধনদশা হতে মুক্ত হবে এবং জাতিভেদের কঠোরতা দূরীভূত হবে, যেখানে কোন বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী থাকবে না। যেখানে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। যেখানে ধনিকশ্রেণী এবং জমির মালিক শ্রমিক ও রায়তের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। যেখানে শ্রমিককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও সম্মান দেওয়া হবে এবং যেখান থেকে দারিদ্র্য বিদূরিত হবে। এ অবস্থায় পৌঁছুতে আমাদের বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে হবে। নিষ্ঠা ও সাহসের সহিত অগ্রসর হলে আমাদের অভীপ্সিত গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে দেরী হবে না।

দীর্ঘকালব্যাপী হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতিমশায় তাঁর অভিভাষণ শেষ করলেন।

সভাপতি আসন গ্রহণ করলে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত গোকরণ মিশ্র (ইনি পরবর্তী কালে লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন) বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণকে তাঁদের নির্দিষ্ট ব্লকে উপস্থিত হয়ে স্ব স্ব প্রদেশের বিষয় নির্বাচনী সভার সদস্য নির্বাচন করার নির্দেশ দিলেন। বাংলার প্রতিনিধিগণকে বৈজনাথ হাই স্কুলে তাঁদের সদস্য নির্বাচনের নির্দেশ দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে পরদিন ২৮ শে ডিসেম্বর বেলা ১১টার বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত মণ্ডপে উক্ত সভার অধিবেশন হবে। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন ২৯ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবি রইল।

বাংলার প্রতিনিধিগণ বৈজনাথ হাই স্কুলে, মিলিত হয়ে বাংলার পক্ষ থেকে বিষয় নির্বাচনী সভার সদস্য নির্বাচন করল। নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে আমারও স্থান হল।

(৫)

বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনের জন্য একটি পৃথক মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে ২৭ শে ডিসেম্বর বেলা ১১ টার সময় বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হল।

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে ভারত সম্রাটকে তাঁর রাজকীয় ঘোষণার জন্য এবং যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতভ্রমণের সিদ্ধান্তের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বিষয় নির্বাচনী সভায় উপস্থিত করা হল। এই প্রস্তাব নিয়ে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী

বাদ-প্রতিবাদের পরও কোন মীমাংসা না হওয়ায় প্রস্তাবটি পরবর্তী অধিবেশনের জন্য মুলতুবি রইল।

অন্য কতকগুলি বিষয় আলোচনার পর লর্ড চেলমস ফোর্ডকে ভারত থেকে বিলাতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর ইমপিচমেন্ট, গুরুতর অপরাধ ও অত্যাচারের জন্য মাইকেল ওডেয়ারের গ্রেপ্তার ও বিচার এবং পাঞ্জাবে যে সকল কর্মচারী অত্যাচারের জন্য দায়ী তাদের প্রতি কঠোর শাস্তি প্রদানের শর্তে গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করার প্রস্তাব সুপারিশ করা হল।

এই প্রস্তাব দুটি আলোচনা করতেই প্রায় সমস্ত দিন কেটে গেল। কিছুক্ষণ বিরতির পর পুনরায় সন্ধ্যার পর সমিতির অধিবেশন হয়।

লর্ড চেলমস ফোর্ডের ইমপিচমেন্ট নিয়ে নেতাদের প্রায় সকলেই নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করলেন। শ্রী বি এন্ শর্মা যিনি জালিয়ানওয়ালা বাগের নিষ্ঠুর হত্যা কাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ দিল্লীর ইম্পিরিয়াল কাউনশিলের সদস্য পদ ত্যাগ করেছিলেন, তিনি প্রবল ভাবে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

অমৃতসরে এবার প্রচণ্ড শীত পড়েছিল। সভাস্থলে আমাদের হাত পা অসাড় হয়ে পড়ছিল। হাত পা সেঁকার জন্য বহুসংখ্যক আগুনের মালসা সদস্যদের পায়ের কাছে রাখা হয়েছিল। আমরা মাঝে মাঝে হাত পা সেঁকে নিচ্ছিলাম।

নেতাদের দর্শনের জন্য পাঞ্জাবের সুদূর পল্লী হতে দলে দলে কৃষক অমৃতসরে আসতে লাগল। ওদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাও কম ছিল না। বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সভাগৃহের সম্মুখে হাজার হাজার নরনারী সমবেত হয়ে মহাত্মা গান্ধী কি জয়, তিলক মহারাজ কি জয় ধ্বনি দিতে লাগল এবং এই দুই শ্রেষ্ঠ জননায়ককে দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। অগত্যা মাঝে মাঝে মহাত্মা গান্ধী ও লোকমান্য তিলক সভামণ্ডপের বাইরে এসে দর্শন দিতে লাগলেন।

এদিন মুসলিম লীগের সভ্যগণ ঐ সভামণ্ডপে একটি চাপার্টির আয়োজন করে আমাদের আপ্যায়ন করেছিলেন। খুলনার নগেন্দ্রনাথ সেন এবং আমি মাত্র ফল খেয়েছিলাম।

(৬)

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হল ২৯শে ডিসেম্বর দ্বিপ্রহরে। যথারীতি সভাপতি মহাশয় অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সভাগৃহে প্রবেশ করে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। এদিনও সভায় খুব ভীড় হয়েছিল।

প্রথমে জলন্ধরের শ্রীমতী প্রসন্নী দেবী একটি জাতীয় সংগীত গাইলেন। তারপর শ্রীমতী সরলা দেবীর পরিচালনায় একদল মহিলা বন্দেমাতরম গাইলেন।

সংগীত শেষ হওয়ার পর সভার কার্য্য সুরু হল। সভাপতি মশায়ের নির্দেশে পণ্ডিত গোকরণ নাথ মিশ্র বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত কংগ্রেসের সাফল্য-সূচক বাণী পাঠ করলেন। কানাডার প্রবাসী ভারতীয়-গণ কর্তৃক প্রেরিত টেলিগ্রাম তিনি পড়ে শুনালেন।

তার পর তিনি জানালেন যে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বাণী প্রেরণ করেছেন। তিনি সেই বাণী পাঠ করে জানালেন। নিম্নে বাণীটি উদ্ধৃত হল।

Light the Signal for us, Father who have Strayed away from thee
Our dwelling is among ruins Haunted by lowering shades of fear.
Our heart is bent under the load of despair and we insult Thee when we grovel to dust at every favour or threat that mocks our manhood.
For thus is desecrated the dignity of Thee in us thy children, for thus we put

out the light and in our abject
fear make it seem that our orphaned
world is blind and Godless.
Yet I can never believe that You are
lost to us, my King, though our poverty
is great and deep our shame,
You will work behind a vail of despair
and in Your own time open the gate
of the Impossible
You come as unto Your own house into
the unprepaired hall on the unexpected
day.
Dark ruins at Your touch become like
a bud nourishing unseen in its
bosom the fruition of fulfilment
Therefore I still have hope, not that the
wrecks will be mended but a new world
will arise
If it is Thy will let us rush into the thick of
conflicts and hurts
Only give us Thy weapon, my Master, the
power to suffer and to trust,
Honour us with difficult duties and pain
that is hard to bear.
Summon us to efforts whose fruit is not in
success and to errands which fail and yet
find their prize.
And at the end of our task let us
proudly bring before Thee our scars
and lay at Thy feet the soul that
is ever free and Life that is deathless.

সাধারণ সম্পাদক মশায় তারপর ব্রিটিশ লেবার-পার্টীর চেয়ারম্যান মিঃ এডামস, নিউ ইয়র্ক থেকে লালা লাজপত রায় এবং শ্রীমতী সরোজনী নাইডু যে শুভেচ্ছাসূচক পত্র লিখেছেন তা পড়ে শোনালেন।

এর পর সাধারণ সম্পাদক একটি সুসংবাদ দিলেন। তিনি জানালেন যে মৌলানা মহম্মদ আলী ও মৌলানা শৌকত আলী মুক্তিলাভ করেছেন। তাঁদের মাতা সুস্থ থাকলে তাঁরা ৩০শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে অমৃতসর পৌঁছবেন—এই সংবাদ টেলিগ্রাম দ্বারা জানিয়েছেন। খবর পেয়ে সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

সাধারণ সম্পাদক উপবেশন করলে সভাপতি মশায় স্বয়ং সম্রাটের ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

তাঁর প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ২৩ শে তারিখের সদয়-ঘোষণার জন্য এই কংগ্রেস ভারত সম্রাটকে সসম্মানে ধন্যবাদ প্রদান করছে এবং আগামী শীতকালে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতে আগমনের সংবাদকে স্বাগত জানিয়ে দেশের জনগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর প্রস্তাব উত্থাপন করলেন মহাত্মা গান্ধী—এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকায় বিশেষতঃ ট্রান্সভালে ভারতীয় ঔপনিবাসিক-গণ এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল সম্পত্তি অর্জন ও ব্যবসা করার জন্য যেসকল অধিকার ভোগ করছিল এখন তা থেকে তাদের বঞ্চিত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে এই কংগ্রেস প্রতিবাদ করছে এবং আশা করছে যে সম্প্রতি এ সম্বন্ধে যে আইন পাশ হয়েছে তা রদ করে বা অন্য প্রকারে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় ঔপনিবাসিকদের পদমর্য্যাদা বজায় রাখার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দেবেন।

প্রস্তাবের দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে যে পূর্ব আফ্রিকায় সম্প্রতি ভারতবিরোধী যে আন্দোলন চলছে এই কংগ্রেস তা বিবেকহীন মনে করছে এবং আশা করছে যে ভারত হতে পূর্ব আফ্রিকা প্রবেশের অবাধ অধিকার এবং তথাকার ভারতীয়দের পূর্ণ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভারত গভর্ণমেণ্ট অক্ষুণ্ণ রাখবে।

এই প্রস্তাব উপস্থিত করে মহাত্মা হিন্দীতে বললেন যে পাঞ্জাবের ভ্রাতৃগণের উপর সম্প্রতি যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে তা মর্মভেদ এবং ভারতে এমন লোক নেই যে, তাদের এই দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ না করে কিন্তু

দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকার অবস্থা এর চেয়েও খারাপ। তার পর গান্ধীজি নেটালের অনুরোধে কি ভাবে ভারতীয়গণকে দক্ষিণ আফ্রিকায় চুক্তিবদ্ধ মজুররূপে পাঠান হয় তার বিবরণ দিলেন। স্যর উইলিয়াম হান্টার একে দাসত্বরূপে বর্ণনা করেছেন। চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে যখন তারা স্বাধীন ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে সাফল্য অর্জন করতে লাগল তখন তারা শ্বেতাঙ্গগণের বিষনজরে পড়ল এবং তাদের উপর নানাপ্রকার নির্য্যাতন আরম্ভ হল।

পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয়রা চুক্তিবদ্ধ মজুররূপে যায় নি। সেখানে তারা ব্যবসা উপলক্ষে গিয়েছিল। বহু মুসলমানভ্রাতৃগণ জাঞ্জিবারে গিয়ে ব্যবসাতে এমন সাফল্যলাভ করেছে যে আফ্রিকানরা তাদের বশীভূত হয়ে পড়েছে। তারা গভীর শঙ্কাকুল অরণ্য অতিক্রম করে ব্যবসা চালু করেছে এবং স্থানীয় লোকের ভালবাসা অর্জন করে ব্যবসা করছে। শিখভ্রাতৃগণ উগাণ্ডায় গিয়ে রেলপথ স্থাপন করেছে। এখন তাদেরই সেই সকল স্থান থেকে শ্বেতাঙ্গগণ—বিতাড়নের চেষ্টা করছে। এই উপলক্ষে এনড্রুস সাহেবের পত্র ইংরেজিতে পড়ে গান্ধীজী শোনালেন। এনড্রুস সাহেব তখন ভারতীয়দের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য পূর্ব আফ্রিকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

পূর্ব আফ্রিকা হতে আগত শ্রীনাশির সা কামা হিন্দীতে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

প্রসিদ্ধ সমাজসেবী কে, নটরাজন, পূর্ব আফ্রিকা থেকে আগত এস্, ভি, ঠক্কর ও অনন্তানী কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব ফিজি সম্বন্ধে। প্রস্তাব উপস্থিত করলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে চুক্তিমূলক শ্রমিক ফিজিতে পাঠানোর ব্যবস্থা বর্তমান বর্ষের শেষভাগে রহিত করা হবে বলে যে বড় লাটের ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে তজ্জন্য এই কংগ্রেস সকৃতজ্ঞ সন্তোষ প্রকাশ করছে এবং আশা করছে যে ভারত গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক চূড়ান্ত ঘোষণা বর্ষশেষ হওয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে এবং এই কংগ্রেস আরও আশা করে যে কোন প্রকার চুক্তিমূলক শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুনরায় প্রবর্তিত হবে না।

প্রস্তাবের শেষাংশে এণ্ড্রুজ সাহেব বিপন্ন পাঞ্জাবের জন্য এবং পরে চুক্তিবদ্ধ মজুরের জন্য যে নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন এবং বর্ত্তমানে পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতপ্রবাসীদের জন্য যা করেছেন তজ্জন্য এই কংগ্রেস কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে পণ্ডিতজী হিন্দীতে বক্তৃতা দিলেন। মালব্যজি যখন দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের এবং ফিজির ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা দিচ্ছিলেন তখন শ্রোতাদের অনেকের পক্ষে অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিতজির চোখও শুষ্ক ছিল না।

মাদ্রাজের বি এন্ শর্মা এই প্রস্তাব ইংরাজিতে সমর্থন করলেন।

বিহারের শ্রীভবানী দয়াল হিন্দীতে প্রস্তাব সমর্থন করার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হল।

এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর সেদিনের মত কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হল। পরবর্তী অধিবেশন ৩০শে ডিসেম্বর ১২টার সময় হবে স্থির হল।

(৭)

কংগ্রেস অধিবেশনের পর ২৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হল, সেখানে অমৃতসরে প্রচণ্ড শীত পড়েছিল। অধিকাংশ সদস্য পশমের কোট প্যান্টালুন পরে সভায় যোগ দিয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অভিজ্ঞতার পর আমি কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় আর কোট প্যান্টালুন পরি নি। আমার মতে শীত নিবারণের পক্ষে গরম

জামার উপর আলোয়ান মুড়ি দিয়ে বসলে শীত কম লাগে। যাইহোক ভীষণ শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের মাঝে মাঝে ইতঃস্তত রাখা আগুনের মালসায় হাত পা সেঁকে নিতে হচ্ছে।

প্রথমেই মুলতুবি রাজকীয় ঘোষণার জন্য ধন্যবাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হল। মাদ্রাজের নবীন নেতা তেজস্বী সত্যমূর্তি ধন্যবাদ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে যে উপদেশের উপর নির্ভর করে রাজকীয় ঘোষণা করা হয়েছে তা সমর্থনযোগ্য নয়। সুতরাং এর জন্য ধন্যবাদ দেওয়া চলতে পারে না। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সত্যমূর্তির মতের বিরোধিতা করলেন। ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যমূর্তিকে সমর্থন করলেন। অ্যানি বেশান্ত ও সি, পি, রামস্বামী আয়ার ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। বহু বাক-বিতণ্ডার পর ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হল। অদমনীয় সত্যমূর্তি নোটিশ দিলেন যে তিনি প্রকাশ্য সভায় এর বিরোধিতা করবেন।

কংগ্রেস তদন্ত কমিটির সদস্যগণ হান্টার কমিটির সহিত সহযোগিতা বর্জনের যে সিদ্ধান্ত করেছেন বিষয়নির্বাচনী সমিতি এক প্রস্তাব দ্বারা তা অনুমোদন করল।

পাঞ্জাব এবং অন্যত্র জনতা কর্তৃক অনুষ্ঠিত, হিংসামূলক কার্য্যের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব আলোচনান্তে গৃহীত হল?

জেনারেল ডায়ার ও স্যার মাইকেল ওডেয়ারের পদচ্যুতি দাবি করে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হল।

সেদিনের মত বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন শেষ হল।

(৮)

বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভার শেষে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে জানলাম যে স্বেচ্ছাসেবকেরা বাংলার একজন প্রতিনিধির উপর অভদ্রোচিত আচরণ করে তাঁকে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করতে দেয় নি। প্রথম দিনের অধিবেশনের ন্যায় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনেও প্যাণ্ডেলের ভিতর অসম্ভব ভীড় হয়েছিল। যাঁরা দেরী করে এসেছিলেন লোকের চাপে তাঁদের পক্ষে ভিতরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে, ভীড় সামলান কঠিন হয়ে ওঠায় স্বেচ্ছাসেবকগণ আর কাউকে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না। বাংলার অন্যতম প্রতিনিধি পাবনার উকিল আবদুল গফুর কিছু দেরীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হতে গিয়েছিলেন তিনি সেরোয়ানী পরে এবং পাঞ্জাবীদের মত মাথায় পাগড়ী বেঁধে প্যাণ্ডেলের গেটে উপস্থিত হয়ে ভিতরে প্রবেশে উদ্যত হলে দ্বাররক্ষী স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁকে বাধা দেয়। তখন তিনি জানান যে তিনি একজন প্রতিনিধি এবং তাঁর নিকট প্রতিনিধির কার্ড আছে। তিনি কার্ড বের করে দেখালে—গরম মেজাজি স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁর কাছ থেকে কার্ড কেড়ে নিয়ে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করতে দেয় না। এই সংবাদে বাংলার প্রতিনিধিরা বিচলিত হয়ে পড়ল এবং বাংলার নেতাদের নিকট সংবাদ পাঠান হল।

পরদিন সকালে আমাদের ক্যাম্পে বাংলার প্রতিনিধিদের একটি সভা হয়। ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি সকল নেতাই উপস্থিত ছিলেন। সভায় সাব্যস্ত হল যে এই অপমানের প্রতিকার না হলে বাংলার প্রতিনিধিগণ কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে যোগ দেবে না।

সংবাদ পেয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সেই সভায় উপস্থিত হয়ে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। গোলমাল মিটে গেল।

(৯)

৩০শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের তৃতীয় দিবসের অধিবেশনের নির্দিষ্ট সময় দ্বিপ্রহর ১২ টার বহু পূর্বেই প্যাণ্ডেল দর্শক ও প্রতিনিধি দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। প্রায় ১২ টার সময় যথারীতি নেতৃবর্গসহ সভাপতি মশায় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে তাঁর আসনে উপবেশন করলেন।

সভার প্রারম্ভে শ্রীমতী সরলা দেবীর পরিচালনায় একদল তরুণী কর্ত্তৃক জাতীয় সঙ্গীত গীত হল। তার পর পণ্ডিত বুধ দেও মশায় একটি হিন্দী গান গাইলেন।

সঙ্গীত শেষ হলে সভাপতি মশায় উঠে বললেন যে, কতকগুলি সংবাদপত্রে বিষয় নির্বাচনী সমিতির কার্য্যের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন যে এই সকল সংবাদ প্রকাশ করা বিশ্বাসভঙ্গজনিত অপরাধ। তিনি সাংবাদিকগণকে সতর্ক করে জানিয়ে দিলেন যে এইভাবে বিষয় নির্বাচনী সমিতির সংবাদ প্রকাশিত হলে তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে কংগ্রেস থেকে বের করে দিতে বাধ্য হবেন।

সভাপতির উক্তির পর সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে 'শক্তি' পত্রিকার সম্পাদক কিছু বলার অনুমতি চাইলে সভাপতি মশায় জানালেন যে তাঁর এখানে বলার কোন অধিকার নেই।

তখনকার দিনে বিষয় নির্বাচন সমিতির আলোচনা সকল গোপনে রাখা হত। উক্ত সমিতির সদস্য ব্যতীত অন্য কোন দর্শক বা সাংবাদিকের সমিতির মণ্ডপে প্রবেশাধিকার ছিল না। এ ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে দর্শক ও সাংবাদিক-দের প্রবেশ অধিকার দেওয়া হয়েছে।

এদিনের প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করতে সভাপতি মশায় ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে আহ্বান করলেন।

এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে পাঞ্জাবের ছোট লাট এবং মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মধ্যে যে সকল চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে তা আলোচনা করে এই কংগ্রেস অভিমত প্রকাশ করছে যে সকল গভর্ণমেণ্ট কর্মচারীর কার্য্য হাণ্টার তদন্ত কমিটীর বিচার্য্য বিষয় সেই সকল কর্মচারীরা যেভাবে গভর্ণমেণ্টের পক্ষের আইনজীবিদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করছে সেইভাবে যেসকল পাঞ্জাবের নেতাগণ কারারুদ্ধ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে পুলিস হেপাজতে কয়েদীরূপে কমিটী রুমে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পক্ষের আইনজ্ঞদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করার অনুমতি না দেওয়া ছোট লাটের গুরুতর অবিচার হয়েছে এবং এর ফলে কংগ্রেসের সব কমিটী যে পন্থা অবলম্বন করেছে তা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং কংগ্রেস তাদের এই দৃঢ় এবং মর্য্যাদাসম্পন্ন কার্য্যের এবং তদন্ত করে রিপোর্ট দাখিলের জন্য যে কমিশন নিযুক্ত করেছে তা সমর্থন ও অনুমোদন করছে।

প্রস্তাব পেশ করে চক্রবর্তী মশায় প্রস্তাবের সমর্থনে ইংরাজিতে বক্তৃতা করলেন। তিনি জানালেন যে গত এপ্রিল মাসের পাঞ্জাবের ধিক্কারজনক ঘটনাবলী যখন অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর গোচরে এল তখন তারা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটি সব কমিটী গঠন করল এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঞ্জাবের ঘটনাবলী তদন্ত করার জন্য একটি রাজকীয় তদন্ত কমিটী গঠনের দাবি করল। সে দাবি অগ্রাহ্য করে ভারত গভর্ণমেণ্ট নিজেরা একটি তদন্তকমিটী গঠন করল যা হাণ্টার কমিটী নামে খ্যাত হয়েছে। কংগ্রেসের কমিটী তখন হাণ্টার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে এবং কতকগুলি সর্তাধীনে সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। তদনুসারে চিত্তরঞ্জন দাশ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কিছুদিন হাণ্টার কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত হন কিন্তু তাঁদের সাক্ষীকে জেরা করার অধিকার ও অন্যান্য সুযোগ দেওয়া হয় না।

এই বক্তৃতার সময় সদ্যমুক্ত লালা দুনীচাঁদের উপস্থিতিতে তুমুল হর্ষধ্বনি এবং ঘন ঘন "ভারত মাতাকি জয়" এবং 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দ্বারা সমবেত জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। লালাজীকে গলায় ফুলের মালা পরিয়ে সকলকে দেখানোর জন্য বক্তৃতামঞ্চে নিয়ে যাওয়া হল।

জনতা শান্ত হলে চক্রবর্তী মশায় পুনরায় বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। তিনি যে পণ্ডিত মালব্য লর্ড হাণ্টারের সঙ্গে দেখা করে কারাপ্রাপ্ত নেতাদের পুলিশের হেফাজতে কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করে

তাদের কাউনসেলকে সাহায্য করার অনুমতি দেবার জন্য পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের নিকট সুপারিশ করতে তাকে (হান্টার সাহেবকে) অনুরোধ করেন, তাতে কোন ফল হয় নি। অগত্যা কংগ্রেস হান্টার কমিটী বর্জন করল এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহাত্মা গান্ধী, আব্বাস তায়েবজী, চিত্তরঞ্জন দাশ ও ফজলুল রহমনকে সদস্য করে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি অনুসন্ধান কমিটী গঠন করা হল। এই কমিটী প্রশংসাজনক কাজ করেছে। (সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু উক্ত কমিটীর সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন।

এই প্রস্তাব যথারীতি পাঞ্জাবের রায় সাহেব পাঁচরাম সাহানী এবং যুক্তপ্রদেশের মৌলানা ফজলুল রহমন দ্বারা উর্দুতে সমর্থিত হওয়ার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

এমন সময় সদ্যকারামুক্ত আলী ভ্রাতৃদ্বয় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলীর নিকট উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা লাভ করলেন। আলীভ্রাতাদের জয়ধ্বনিতে প্যাণ্ডেল যেন ভেঙ্গে পড়ল। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাল। ডায়াসের উপর উপস্থিত হওয়ার পর মৌলানা সৌকত আলী লোকমান্য তিলকের পদস্পর্শ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করলেন। তিলকের প্রতি সৌকত আলীর প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। লোকমান্যের তিরোভাবের পর তাঁর শবাধার-বাহকগণের অন্যতম ছিলেন মৌলানা সৌকত আলী।

আলীভ্রাতৃদ্বয় আসন গ্রহণ করার পর সভাপতি তাঁর পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে আহ্বান করলেন।

মহাত্মা গান্ধী মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতেই সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক মুহুর্মুহু 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তুলতে লাগল।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর দুর্বল শরীরের জন্য বসে প্রস্তাব উত্থাপন করে বক্তৃতা করার প্রার্থনা করায় তাঁর জন্য মঞ্চোপরি একটি চেয়ার স্থাপিত হল। তিনি তখন চেয়ারে বসে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে—গুরুতর উত্তেজনা জনতাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল এটা সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েও পাঞ্জাব এবং গুজরাতের কোন কোন স্থানে জনতার উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য গত এপ্রিল মাসে বহু ধন ও প্রাণ নষ্ট হয়েছে এবং কংগ্রেস ও তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ঐ সকল কার্য্যের নিন্দা করছে।

প্রস্তাব উত্থাপন করে মহাত্মা প্রথমতঃ হিন্দীতে পরে ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন যে, তিনি যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন তদপেক্ষা গুরুতর প্রস্তাব কংগ্রেসের সামনে নেই। তিনি স্বীকার করেন যে ডাঃ কিচলু ও ডাঃ সত্যপালের গ্রেপ্তারের সংবাদ এবং ডাঃ সত্যপাল ও স্বামীজী (শ্রদ্ধানন্দ) আহ্বানে যখন তিনি (মহাত্মা) শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় পাঞ্জাবে আসছিলেন তখন তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ জনতাকে ভয়ানকভাবে উত্তেজিত করে তথাপি যদি বিরাম গ্রামে, আমেদাবাদে এবং বোম্বাইতে জনতা কর্তৃক হিংসাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠিত না হত তা হলে এই-সকল বিপদ ঘটত না। গভর্ণমেন্ট সেসময় পাগল হয়ে গিয়েছিল এবং আমরাও পাগল হয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সকলকে পাগলামির দ্বারা পাগলামির জবাব দিতে নিষেধ করলেন এবং তাঁর পরিবর্তে পাগলামির জবাব শান্ত মনোভাব দ্বারা দিতে বললেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে হিন্দীতে বললেন। অন্যান্য কথার পর তিনি সকলকে ভালবাসা দ্বারা ঘৃণা, সত্য দ্বারা মিথ্যা এবং অহিংসা দ্বারা হিংসার মোকাবেলা করতে উপদেশ দিলেন।

পাঞ্জাবের রায়বাহাদুর রায়জাদা জগৎরাম উর্দুতে এই প্রস্তাব সমর্থন করার পর সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও নেতা বিপিনচন্দ্র পাল প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তিনি মহাত্মাজীর ও স্বামীজীর ভাবধারা অনুসরণ করলেন।

সভাপতির পক্ষ থেকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রস্তাবটি ভোটে দিলেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত। তিনি দাঁড়াতেই সকলে তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করল।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, যদিও হান্টার কমিটী বা কংগ্রেস কমিশন সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ শেষ করে এখনও কোন রিপোর্ট দাখিল করে নি তথাপি এ পর্য্যন্ত যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে তজ্জন্য এই কংগ্রেস ত্রাস এবং ঘৃণা প্রকাশ করছে এবং যেসকল অমানুষিক অত্যাচার স্বীকৃত হয়েছে এই কংগ্রেস তার তীব্র নিন্দা করছে। যদিও এই কংগ্রেস অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন বিশেষ ব্যবস্থার দাবি করছে না তথাপি নিরপরাধ লোকের ও শিশুদের অশ্রুতপূর্ব হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর-হত্যার জন্য ভারত গভর্ণমেন্টকে এবং ভারত-সচিবকে আইনানুসারে বিচারের প্রাথমিক পদক্ষেপস্বরূপ জেনারেল ডায়ারকে তার সৈন্যচালনার কার্য থেকে অবিলম্বে অপসারণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করছে।

এই কংগ্রেস আরও মনে করে যে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যার প্রকৃত বিবরণ জনসাধারণের এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট প্রকাশ করার বিলম্বের জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট এবং পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট সম্পূর্ণভাবে দায়ী ও ক্ষমার অযোগ্য।

শ্রীমতী বেশান্ত তাঁর অনন্যসাধারণ বাগ্মীতায় প্রস্তাবটি সভার নিকট বিশ্লেষণ করলেন।

এই প্রস্তাব সমর্থন করতে লোকমান্য তিলক দাঁড়াতেই তিনি "তিলক মহারাজ কি জয়" ধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থিত হলেন।

লোকমান্য তাঁর স্বাভাবিক যুক্তিপূর্ণ বাক্যে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এরপর প্রসিদ্ধ বাগ্মী জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন যে, প্রস্তাব সমর্থন করতে আসার সময় তাঁর মনে হতে লাগল যে একজন পাপী সাধু সন্তের দলে অনধিকার প্রবেশ করছে। কিছু পূর্বে মহাত্মা গান্ধী রোষ সম্বরণ করে ঘৃণাকে প্রেম দ্বারা জয় করার উপদেশ দিলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর অনুসরণ করলেন এবং এমন কি বিপিনচন্দ্র পাল পর্য্যন্ত তাঁদের নিকট-সান্নিধ্যের জন্য সাধুতার ছোঁয়া পেয়ে বাইরের পশু-শক্তিকে আমাদের অন্তর্নিহিত দৈবশক্তি দ্বারা জয় করার উপদেশ দিলেন। এ সমস্তই অতি সুন্দর কথা কিন্তু তাঁর (বক্তার) পক্ষে অত উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় ওঠা সম্ভব নয়। তিনি তীব্র ভাষায় ডায়ারের নৃশংস হত্যা কাহিনীর বর্ণনা করে বললেন যে এই সকল ঘৃণ্য কাজ সত্ত্বেও জেনারেল ডায়ারের নাম ভারতের ইতিহাসে ধন্য হয়ে থাকবে কারণ তিনি জালিয়ান-ওয়ালা বাগকে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছেন। পরিশেষে তিনি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে জানতে চাইলেন যে কবে আবার আমাদের প্রিয় দেশে স্বাধীনতা সূর্য্যের উদয় হবে।

মাদ্রাজের টি ভি গোপাল স্বামী মুদেলিয়ার এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তাঁর প্রদত্ত ইংরাজী অভি-ভাষণের সময় উর্দু উর্দু শব্দে পুনঃপুনঃ বাধাপ্রাপ্ত হয়েও তিনি অভিভাষণ শেষ করলেন।

প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

এর পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য সভাপতি মশায় রায় সাহেব রুচিরাম সাহানীকে আহ্বান করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে পাঞ্জাবে স্যার মাইকেল ওডেয়ারের অত্যাচারী শাসন এবং জেনারেল ডায়ারের জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যার অনুমোদন ও সমর্থনের জন্য (যা হান্টার কমিটীর নিকট প্রমাণিত হয়েছে) প্রয়োজনীয় বিচারের প্রাথমিক কার্য্যরূপে তাঁকে কমিশনের সদস্য পদ থেকে অপসারণের দাবি এই কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট করছে।

এই প্রস্তাব পেশ করে রায় সাহেব উর্দুতে বক্তৃতা দিলেন।

প্রস্তাব সমর্থন করলেন পাঞ্জাবের মৌলভী গোলাম মহীউদ্দিন।

তারপর সভ কারামুক্ত মৌলানা সৌকতআলী প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়ালেন। চতুর্দিক থেকে হিন্দী উর্দু ইংরাজী রব উঠতে লাগল। তিনি উর্দুতেই তাঁর অভিভাষণ দিলেন। তিনি জানালেন যে যখন তিনি শুনলেন যে জালিয়ানওয়ালা বাগে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্ত প্রবাহিত হয়েছে এবং দুই হাজারেরর উপর লোক নিহত হয়েছে তখন তাঁরা (আলী ভ্রাতৃদ্বয়) এটাকে ভারতের পক্ষে জয়ের আশা-চিহ্নস্বরূপ মনে করলেন। তিনি বললেন যে মুসলমানদের বিপদের সময় হিন্দুরা যেরকম গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছে, তাতে যতদিন তাঁরা ঈশ্বরে এবং পয়গম্বরে বিশ্বাস রাখবেন ততদিন পর্যান্ত মুসলমানগণ হিন্দুদের প্রতি দায়িত্ব ভুলবে না।

সৌকত আলীর বক্তৃতার পর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌলানা মহম্মদ আলী প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়ালেন। তখন পুনরায় হিন্দী, উর্দু, ইংরাজী রব উঠতে লাগল। একজন প্রতিনিধি উঠে বললেন যে যখন এক ভাই উর্দুতে বক্তৃতা করেছেন তখন যাঁরা উর্দু বোঝেন না, তাঁদের বুঝবার জন্য আর এক ভাইয়ের ইংরাজীতে বলা উচিত। মহম্মদ আলী প্রথমে উর্দুতে এবং পরে ইংরাজীতে ভাষণ দিলেন।

অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন যে, ওডেয়ার ও ডায়ারকে তাদের সর্ব্বাপেক্ষা হিতাকাঙ্ক্ষী স্বীকার না করা অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত হবে কারণ তাদের আচরণের ফলেই কংগ্রেসে এরূপ সুবৃহৎ জনতার সমাবেশ সম্ভব হয়েছে। এইরকম জনসমাবেশ ইতিপূর্ব্বে কোন কংগ্রেসে দেখা যায় নি।

মহম্মদ আলী তারপর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করে আসন গ্রহণ করলেন।

তিনি উপবেশন করলে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মৌলানা মহম্মদ আলীর জন্য "থ্রি চিয়ার্স" দিলেন। সকলে তাতে যোগ দিল।

প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

এর পর সেদিনের মত অধিবেশন শেষ হল। পরবর্তী অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হল ৩১ শে ডিসেম্বর বেলা ১১ টা। ক্রমশঃ

যাদুকর

করুণাময় বসু

সোনালি রোদের মায়া সন্ধ্যেবেলা জ্যোৎস্না হয়ে ঝরে,
শ্রাবণে মালতী বনে টপটুপ বৃষ্টি ফোঁটা পড়ে ;
কার মুখ ভালো লাগে. ভাবি কোন যাদুকর বুঝি
এনেছে মায়ার খেলা, কতো খেলা আছে তার পুঁজি ?
ঘুম ঘুম চাঁপা বনে ঝিম ঝিম ফাল্গুনের রাত,
ভাবি যদি কেউ এসে হাতে মোর রাখে তার হাত,
মালা ছিঁড়ে রেখে যাবে এক ফোঁটা ফুল,
তারপর ? শুধে যাবে চিরকাল জীবনের ভুল !
ভাবি কোন যাদুকর বুঝি
এনেছে মায়ার খেলা, কত খেলা আছে তার পুঁজি ?

ঝিকিমিকি ঝাউবনে ঝলোমলো ভোরের আলোয়
রঙের বাঁশির সুর হাসি হয়ে হিম ভেজা ঘাসে
ঘাসে ছোঁয় ।

কঁ চারোদে কাঁচপোকা করে ঝিলমিল,
কিছু রঙ খুঁজে আনি, মনে মনে খুঁজি কিছু মিল ।
তবু ভাবি হাতে কোন রঙ নেই, শুধু তাস খেলা
ফুলের বাসর নয়, ভুলের আসর নিয়ে
মিছ'মিছি কেটে গেল বেলা ।
তারপর চলে যাই দূর আরো দূর,
পার হয়ে ঢেউ ভাঙা বিস্মৃতির ছায়: সমুদ্দুর,
পার হয়ে চাঁপাবন, কৈশোরের দূর ছায়াবীথি,
কবেকার ভালোবাসা, কবেকার ভুলে যাওয়া স্মৃতি :
পেরিয়ে এলাম চলে রিনিঝিনি কাঁকনের সুর
মায়াময় বিধুর মধুর ।

চাঁপাবনে চাঁদ বলে, তবে যাই যাই,
হাওয়ায় নূপুর বাজে, স্মৃতির খেলেনাগুলি
আনমনে পথে পথে ধুলোয় সাজাই ।

তারপর আ র শুধু খালি হাতে ভাঙা হাট দিয়ে
পার হয়ে চলে যাই মাঠঘাট, বনলতা,
চাঁদ, ফুল, প্রজাপতি সময়ের সীমানা পেরিয়ে ।

সে আজও আমাকে ডাকে

সন্তোষকুমার অধিকারী

সে আজও আমাকে ডাকে—বঞ্চনা ভেবেছি আমি যাকে,
জীবনের মধ্যদিনে উচ্চকিত আলোর বিস্ময়ে
ভেবেছি ছলনা যাকে, ফেড়ে গেছি রিক্ত বেদনাতে,—
রাত্রির বিজনে আজ মোর ক্লান্ত হাত নিতে হাতে
সে আজও আমাকে ডাকে।
কত রাত্রি রয়েছি জাগর;
কত ব্যর্থতার পথ হেঁটে হেঁটে হয়ে গেছি পার।
দেখেছি অনেক মুখ, বিস্ময়ে অধীর চেতনায়
ছুঁয়েছি অনেক মন; রঙিন নিমেষে জলে ওঠা
মৌসুমী মেঘের মত দিন শেষ হলে নিভে গেছে,
সায়াহ্নের নিঃসঙ্গ বিজনে শুধু আমি একা একা
বসে বসে বসন্তের খসে পড়া পত্রগুচ্ছ গুনি।

সে তবু আবার ডাকে: শ্রাবণের দুর্যোগে ব্যাকুল
অবার বৃষ্টির রাতে সে শুধু আমার পাশে পাশে।
যতবার চলে যাই, ভুলে যাই কণ্ঠস্বর তার
সে কেবল শব্দহীন সঞ্চরণে থাকে সাথে সাথে;
বিদীর্ণ ঝড়ের রাত্রে শুনি তার স্থির কণ্ঠস্বর—
সে আজও আমাকে ডাকে, তুলে নিতে মোর ক্লান্ত কর।

কবি-জীবনী

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

কবির জীবনী শুধু কবিতা তাহার,
কবিকে খুঁজিও তার কবিতার মাঝে;
ভালো-মন্দ খুঁটিনাটি তাহাতে বিরাজে,
খুলিয়া বলেছে, কিছু আভাসে আবার।
অনেক অস্পষ্ট থাকে স্পষ্টের মাঝার,
ভেবে বুঝে নিতে হয় যেখানে যা সাজে;
কবিত্ব ফুটিয়া ওঠে অকারণ কাজে,
রসিক ডুবিয়া রয় রসে কবিতার।

কবিকে খুঁজো না কভু তাহার বাহিরে!
বেশভূষা প্রকাশিছে বাহ্য রুচি শুধু;
সে আছে বিচিত্র রূপে বুকের গভীরে,
রত্নগর্ভ পারাবার করিতেছে ধুধু!
মস্তিষ্কের কথা আছে গদ্য রচনায়,
হৃদয়ের ভাষা পড়ো শুধু কবিতায়।

মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক স্বরূপ

অশোক চট্টোপাধ্যায়

মানবতা বা মনুষ্যত্বের দুইটি দিক্ আছে। প্রথমটি হইল মানুষের একান্ত নিজের ব্যক্তিগতঃ জন্ম, জীবন যাপন, উন্নতি, অবনতি, গঠন, মৃত্যু, বিকাশ, কর্ম্মশক্তির প্রকাশ ও বিলুপ্তি ইত্যাদির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত; ও অপর দিকে আছে বহু ব্যক্তির মিলিত ও সমষ্টিগত গোষ্ঠী, গোষ্ঠী, সমাজ, জাতি বা বিশ্বমানবীয় সত্তা। সাধারণভাবে বিচার করিলে ইহাই ধার্য্য হইবে যে প্রায় সকল মানুষেরই নিজ জীবনে উপরোক্ত দুইটি দিকই বিকশিত হইয়া থাকে। মানুষ একদিকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের গঠন উন্নয়ন লইয়া ব্যস্ত থাকে এবং অপরদিকে সে দেখে তাহার সমাজ, জাতি ও মানবীয় দায়িত্ব ও অধিকারের হিসাব। ব্যক্তি যেরূপ পরিবেশেই অবস্থান করুক না কেন, বা তাহার অবস্থা বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, আভিজাত্য প্রভৃতির দিক দিয়া যেমনই হউক না কেন, তাহার নিজের ব্যক্তিগত আত্মপ্রতিষ্ঠার ও গঠনের একটা দিক্ এবং অপরাপর মানুষের সহিত মিলিত সমষ্টিগত বা সামাজিক ভাবে অবস্থিতির একটা দিক্, এই দুই দিকই তাহার জীবনে পরিলক্ষিত হইবে। আদিম জাতির মানুষ যে, তাহাকে ব্যক্তিগত আত্মগঠনের কার্য্যে যেমন মনোনিবেশ করিতে হয়, তেমনি সামাজিক আচার-ব্যবহার, নৃত্য, ক্রীড়া, যুদ্ধ, শীকার প্রভৃতি শিক্ষার জন্যও তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়। যাহারা আজকালকার উন্নত, সুসভ্য ও ঐশ্বর্য্যশালী জাতির লোক তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে যেমন বহু চেষ্টা করিয়া শরীর মনের গঠন সুসম্পন্ন করেন, তেমনিই তাঁহারা অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কার্য্যে অসংখ্য মানুষের সহিত মিলিতভাবে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সমষ্টিগত জীবন যাপন করিতে শিক্ষালাভ করেন। এক কথায় মানুষের যে ব্যক্তিত্ব তাহার পূর্ণ গঠন করিতে পারিলেই মানুষ যথার্থ মানুষ হইতে পারে এবং যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে না পারিলে, অপরিণত দেহমনের আধার যে মানুষ, সে কখনও উন্নত সমাজ বা জাতি গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং মানুষের যে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তাহার গঠনের উপরেই মানব সমাজ ও জাতির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। যেখানে ব্যক্তির শরীরে মনে ক্ষমতা বিদ্যা, বুদ্ধি, কৃষ্টি ও সভ্যতা পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে নাই, সেখানে ঐ সকল ব্যক্তি সমষ্টিগত ভাবে রাষ্ট্রগঠন করিলে সেই জনসমষ্টিও অক্ষম জ্ঞানহীন ও বর্ব্বরতা দোষদুষ্ট হইয়া ওঠাই সম্ভব ও স্বাভাবিক। গৃহনির্ম্মাণকালে যেরূপ প্রত্যেকটি ইষ্টক সুগঠিত হওয়া আবশ্যক হয় সমাজ বা রাষ্ট্রগঠন করিতে হইলেও তেমনি সমাজের সকল ব্যক্তির দেহ মন সুগঠিত হওয়া প্রয়োজন হয়। ইষ্টক যদি উত্তমরূপে গঠিত ও দগ্ধ না হইয়া অর্দ্ধপক হয় তাহা হইলে তাহা দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিলে সে গৃহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। মানুষ যদি অশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত হয়, তাহার শরীরে যদি স্বাস্থ্য ও শক্তি না থাকে, চরিত্রে সে যদি অসৎ ও দুর্ব্বল এবং আদর্শ অনুসরণে সে যদি নিস্তেজ ও অসাড় হয়, তাহা হইলে সেইরূপ মানুষ সংখ্যায় অনেক হইলেও তাহাদিগকে সমাজ বা রাষ্ট্রে একত্র করিলে কোন শক্তিমান্ ও মহৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে না। অযোগ্য ব্যক্তি সমষ্টি কখনও শুধু সংখ্যাধিক্যহেতু যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া ফেলে না। ইহা দ্বারা এই সত্যই প্রমাণ হয় যে ব্যক্তির গুণের ও সক্ষমতার উপরেই রাষ্ট্রের গুণাগুণ নির্ভর করে। ব্যক্তি

যদি ছিন্নরজ্জু গাভীর ন্যায় দিক্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান্‌ হইয়া মনে করে যে সেই দিগ্‌ভ্রান্ত গতিবেগের জন্যই সে কোনও সফলতা অর্জন করিয়া ফেলিবে; তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেই ভুল ধারণার মূলে আছে তাহার বিচারবুদ্ধির অভাব। লক্ষ্য বিচার করিতে হইলে জ্ঞানের দ্বারাই তাহা করা সম্ভব হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্দ্ধারণ সহজ হয় না। যাঁহারা মনে করেন যে উদ্দাম আবেগ থাকিলেই সমষ্টিগতভাবে মানুষ অগ্রগমনে সক্ষম হইবে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, আবেগ, বিচারবুদ্ধি ও কর্ম্ম কৌশল এক জিনিস নহে। বিচারবুদ্ধি না থাকিলে স্থির-নিশ্চয় ভাবে কোন কিছুই কেহ বুঝিতে পারে না। কর্ম্ম-কৌশল শিক্ষা না করিয়া কাহারও মধ্যে তাহা নিজ হইতে জাগ্রত হওয়া সম্ভব বা স্বাভাবিক নহে। সুতরাং ব্যক্তিকে সংযত ভাবে দৈহিক শক্তি ও বিদ্যা অর্জ্জন এবং বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া নানা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্ম্ম-কৌশল আহরণ করিতেই হইবে। নতুবা ব্যক্তি দুর্ব্বল, জ্ঞানহীন ও সকল কর্ম্মে যোগ্যতা-বর্জ্জিত হইবে ও তাহার সাহায্যে সমষ্টিগত ভাবেও সমাজ বা রাষ্ট্র কোন আদর্শ উপলব্ধি অথবা কার্য্যসিদ্ধি করিতে সক্ষম হইবে না। এখন সাময়িক ও স্থানীয় কারণে অর্থবৈকল্যের প্রবল বাত্যা-খাদে জড়াইয়া পড়িয়া অপরিণত বয়স্ক ব্যক্তিগণ কি বলিতেছেন বা কি বুঝিতেছেন তাহা কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। কোন এক মহাদেশে কিছুকাল সকলকে বুঝান হইয়াছিল যে বিদ্যালয়ের শিখান বিদ্যা শ্রেণীবিশেষের লোকদের মতলব হাসিল করিবার উপায় মাত্র। সেরূপ বিদ্যালাভ করিয়া মানব-প্রগতির পাথেয় সংগ্রহ হয় না। সুতরাং উপযুক্ত বিদ্যা আহরণের জন্য যাইতে হইবে চাষীদিগের নিকট। তাহারাই যাহা শিখাইবার তাহা যথাযথভাবে শিখাইয়া মানুষকে জীবনের পথে উন্নত আদর্শ অবলম্বনে চলিতে সক্ষম করিতে পারে। এই কৃষক-প্রেমজাত জ্ঞানের বার্ত্তা শুনিয়া কোন কোন দেশের অল্পবয়স্ক লোকেরা বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কিছুদিন গ্রামে গ্রামে চাষীদের সাহচর্য্য লাভ করিয়া অভিনব জ্ঞানের আলোক দেখিবার চেষ্টায় নিবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল না হওয়াতে তাহারা আবার পুরাতন পথে ফিরিয়া যাইতে আরম্ভ করিল সেই প্রত্যাবর্তনের কাহিনী অলীক কল্পনাবিলাস-প্রবণতার দিক্‌ হইতে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হইবে না বুঝিয়া সমাজবাদের পয়গম্বরগণ কথাটা চাপিয়া গেলেন এবং ঐ দেশের বিদ্যালয়গুলি আবার ছাত্রবহুল হইয়া উঠিল। আর একবার শুনিলাম যে, অভ্রান্ত সত্যানুসন্ধান করিতে হইলে মিথ্যাকে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিতে হইবে। মিথ্যা কি তাহা অন্বেষণ করিয়া দেখা যাইল যে, মানুষ অনাদিকাল যাহা কিছুকে উন্নত ও উৎকৃষ্ট রসের আধার বলিয়া বিচার করিয়া আসিয়াছে তাহার সবই বর্জ্জনীয় ও অসত্যের কালিমালিপ্ত। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সাহিত্য প্রভৃতি সভ্যতার সকল নিদর্শনই সেই অজানা অচেনা পরম ও চরম সত্যের অন্তর্গত নহে। ঐ সার সত্যটি যে কি তাহা খুব পরিষ্কার ভাবে কেহ বুঝিয়াছে কি না আমরা জানি না। জমি চাষ করিলে কেন বুদ্ধির উন্মেষ বিশেষ করিয়া হয়; অপর কার্য্য করিলে কেন হয় না; শ্রম করিলে অপরের উপর প্রভুত্বের অধিকার কি কারণে লাভ করা যায় এবং শ্রম না করিয়া বনে বা পাহাড়ে ফলমূল খাইয়া তপস্যা করিলে কেন সে অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে না; ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বড়ই কঠিন। বুদ্ধ অথবা খ্রীষ্টের উপদেশ শুনিলে তাহা কেন ভুল কাজ এবং অপর কোন অপেক্ষাকৃত অল্প খ্যাতিমান্‌ ব্যক্তির কথা মানিয়া চলাই বা কেন ঠিক, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। তর্কের খাতিরে কেহ বলিতে পারেন যে ধর্ম্ম, ঈশ্বরে বিশ্বাস, মোক্ষলাভ অথবা মহাপরিনির্ব্বাণ প্রভৃতি লইয়া মানুষের চিন্তা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাস্তব জগতে যাহা সাক্ষাৎভাবে মাপিয়া ওজন করিয়া দেখা যায় তাহাই শুধু দারিদ্র্য-পীড়িত মানব-জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারে। ন্যায়-অন্যায়, দেনা-

পাওনা, অধিকার অনধিকার প্রভৃতি সকল কিছুই বাস্তব জগতের মাপজোখের বিষয়বস্তু। কথাগুলি অতি সহজ সরল এবং স্থূলার্থের জীবনদর্শনের একটি অতি প্রকট সত্য হইলেও প্রশ্ন করিতে হয় যে, জীবনের সকল সমস্যার কি অত সহজ সরল সমাধান সকল সময়ে সম্ভব? দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, ভয়, আশা, নিরাশা, শান্তি, অশান্তি, অধ্যাত্মবোধ, ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি যত অনুভূতির কথা তাহার অধিকাংশই মাপিয়া বা ওজন করিয়া দেখা যায় না। এবং সমাজের নেতাগণ কাহাকেও খাদ্য, বসন উপভোগের উপকরণ ইত্যাদি নির্দিষ্ট কোন নূতন রীতি অনুসরণে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেই সেই ব্যক্তির প্রাণে শান্ত স্নিগ্ধ পরিতৃপ্তির আবেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, ইহাও একটা অসম্ভব কল্পনার কথা। মানুষের দুঃখ কষ্ট সকল সময়েই যে আর্থিক কারণে ঘটে একথা কেহ বলিতে পারে না। বহু বিত্তবান ব্যক্তি নিদারুণ মনের দুঃখে কাল যাপন করে, একথা সকলেই জানে। বহু দরিদ্র লোকে কখন কখন অভাবের মধ্যেও সুখে শান্তিতে বাস করে তাহাও জানা যায়। শুধু আর্থিক ভাগ বাট লইয়াই, অথবা রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়াই মানব জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের হিসাব সম্পূর্ণ হয় না। অথচ আধুনিক বস্তুবাদীদিগের কথা হইতে মনে হয় যে মানবীয় সকল প্রয়োজন আয়োজনই বাস্তবের মাপকাঠি দিয়া মাপিয়া ও সেই প্রকার দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়া তাহার মূল্য বিচার কার্য্য নিশ্চয়তার সহিত সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু সত্যই কি তাহা সম্ভব? কারণ সুখদুঃখ, শান্তি-অশান্তি, রসানুভূতি বর্জিত বিষণ্ণতাপূর্ণ বা পুলকিতচিত্ত অবস্থা, সকল কিছুই বস্তুগত্ত বিহীন মানসিক ভাব। তাহার কোন বস্তুভিত্তিক মাপ বা ওজন নাই। সম্পূর্ণরূপে একই প্রকার পারিপার্শ্বিক ও বাস্তব পরিবেশ থাকিলেও বিভিন্ন মানুষের মনে ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব বা অনুভূতির আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। বাস্তব যন্ত্রে অবাস্তবের দমন ও নিয়মন করা যায় না অভাব মানব জীবনকে গ্রাস করিয়া মনুষ্যজাতিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিবে ইহাই বস্তুতন্ত্রের আবির্ভাবের কারণ জানিয়াও বলিতে হয় যে যাঁহারা বস্তুপূজার ভিতরেই সৃষ্টির সকল সমস্যার সমাধান ও সকল দুঃখ ও অন্যায়ের অবসান সাধিত হইবে মনে করেন, তাঁহাদের চিন্তাশক্তির প্রখরতার প্রশংসা করা চলে না।

ব্যক্তিকে কোন বিরাট যন্ত্রের খণ্ডবিশেষ ও ব্যক্তিসমষ্টি বা সমাজকে একটা মহাযন্ত্র বলিয়া বিচার করিলে অল্প লোকের সমগ্র জাতির উপর নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। অবশ্য সেই নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব চিরস্থায়ী হয় না এবং কোনও না কোন সময় তাহা শেষ হইয়া নূতন চিন্তা নূতন সহানুভূতি ও নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন পুনরাবৃত্ত হয়। মনের ক্ষেত্রে নূতন নূতন কল্পনা প্রস্ফুটিত হইয়া মানুষকে আবার সীমাহীন প্রগতির পথের যাত্রী করিয়া সচল করিয়া তোলে। যুগে যুগে মানুষ চঞ্চল হইয়া "সুদূরের" "পরশ পাথর প্রয়াসী" হইয়াছে, শত সহস্র মানুষ তাহার জন্য সর্বত্যাগী হইয়াছে, অসংখ্য লোকে প্রাণ দিয়াছে; সুতরাং বিষয়টা বস্তুতন্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া এক পাশে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেই প্রমাণ হইয়া যায় না যে বস্তুবাদই সাচ্চা আর অনন্তের পিপাসা একটা ঝুটো আবেগের নিদর্শনমাত্র। একথাও বলিলে কোন ন্যায় বিরুদ্ধতা হয় না যে যাহা নাই বলিয়া মনে হয় তাহা মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি ও মানব ইন্দ্রিয়গুলির অতীক্ষ্ণতার জন্যই বোধগম্য হইতেছে না। মানুষ মনের সীমিতভাব যদি কাটাইয়া উঠিতে পারে তাহা হইলে সে অতীন্দ্রিয় সত্তা সকলের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতে পারে। মুনি-ঋষিদিগের মধ্যে বহু মহাপুরুষই সাধারণ মানুষ যাহা নাই বলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শত শত মহাজ্ঞানী তপস্বীদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়া অম্লান "সবজান্তাওয়ালাদিগের" কথা দিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও অর্থ বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা আমরা দেখিতে পাই না। একদিন ছিল যখন পৃথিবী তক্তাপোশের মতই সমতল বলিয়া সকল মানুষ মনে করিত। পরে দেখা যাইল বস্তুত পৃথিবী গোলাকার। সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল পৃথিবী এবং পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল

যোগ, একথাও বহুকাল নির্বিবাদে সকলে মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু আজ লোকে তাহা মানে না। সৃষ্টির কেন্দ্রস্থল কোথায় তাহা কেহ জানে না; শুধু জানা গিয়াছে যে সূর্য্যকে ঘিরিয়া অনেকগুলি গ্রহ প্রদক্ষিণরত এবং পৃথিবী তাহার মধ্যে অন্যতম। এই ধরণীর কেন্দ্রস্থল চার হাজার মাইল মাটির নীচে।

পূর্ব্বে চোখে যাহা দেখা যাইত না তাহার মধ্যে বহু বহু সংখ্যক বস্তু আজ অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। কর্ণে যাহা শোনা যাইত না আজ তাহা যন্ত্রের সাহায্যে "শোনা" যায়। বহু বস্তুকণা আলোকশক্তির সাহায্যে বোধগম্য ও বহু অন্য বস্তুকণা তাহা নহে। কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হয় না যে এই সকল বস্তু নাই। মনের সূক্ষ্মতম অনুভূতিই যে কোনদিন যন্ত্রে ধরা যাইবে না তাহাই বা কে বলিবে? আধ্যাত্মিক আবেগের স্বরূপ বিচার ও উৎস অনুসন্ধান করিয়াও যে কোন কিছু কখনও পাওয়া যাইবে না তাহাই বা কে স্থিরনিশ্চয়ভাবে বলিয়া দিতে পারে? বাস্তব কি এবং অবাস্তবই বা কি তার বিচার এখনও সঠিক ভাবে শেষ করা হয় নাই। নিত্য নূতন উপায়ে অবাস্তব বাস্তবতা লাভ করিতেছে অজানাকে জানা যাইতেছে এবং মানুষের পুরাতন বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া নূতন আকারে গড়িয়া উঠিতেছে।

আজকাল যেসকল কথা প্রায় সকল মস্তিষ্কই আলোড়িত করিতেছে তাহার মধ্যে জমি চাষ, যন্ত্র চালনা বা সৈন্যের কার্য্য করার আভিজাত্য একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিতেছে। যে হাল চালায় ও যে নৌকার হাল ধরে এবং দুইএর মধ্যে জলময় ক্ষেত্রে বিচরণকারী অধিক বিপদের সম্মুখীন হয় এবং বৎসরে বারমাস পরিশ্রম করে। কিন্তু তাহার স্থান যে জমিতে লাঙ্গল চালায় তাহার তুলনায় উচ্চে দেওয়া হয় নাই কেন? পরিশ্রম করিয়া জীবনযাত্রা সুখময় করা জীব মাত্রেরই মধ্যে প্রায় লক্ষ্য করা যায়। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতির স্বভাব মহা পরিশ্রম করিয়া খাদ্য সঞ্চয় করা। কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগের পূজা কেহ করে না। পাখীরা বাসা বাঁধে বড় কষ্টে এক একটি করিয়া তৃণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া। উইপোকার বাসা বাঁধা, মাকড়সার জাল বোনা এই সকল কার্য্যই পরিশ্রম; কিন্তু সে পরিশ্রমের কোন মাহাত্ম্য আছে কেহ বলে না কারণ তাহা জীবের সহজাত স্বভাব। মানুষ পরিশ্রম করে নানা কারণে। নিজের সুবিধার জন্য পরিশ্রম করিলে তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না; কিন্তু অন্যের লাভের জন্য পরিশ্রম করিলে তাহা লইয়া বহু ন্যায়-অন্যায় বিচার করা হইয়া থাকে। কারণ ঐ জাতীয় পরিশ্রম ব্যবস্থায় মানুষের দেনা পাওনার কথা থাকে। ন্যায্য বেতন কি ন্যায্য লাভ কতটা তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হয়। কিন্তু যাহারা বেতন না লইয়া পরের সুখ-সুবিধার জন্য পরিশ্রম করে তাহাদের কথা কেহ তোলে না। সমাজসেবকগণ পরহিতের জন্য পরিশ্রম ত করেনই উপরন্তু নিজেদের উপার্জ্জিত ও সঞ্চিত অর্থও ব্যয় করেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহারা পান শুধু কিছু কিছু শ্রদ্ধাভক্তি মাত্র।

এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে পরিশ্রম করাইয়া লাভ করিলে তাহা অন্যায় বলিয়া ধার্য্য হয়। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্র যখন কাহাকেও পরিশ্রম করাইয়া উপযুক্ত বেতন দেয় না অথচ প্রচুর লাভ করে তখন সেই লাভ করাকে শোষণ বলা হয় না। সমষ্টিগতভাবে কি অন্যায় কার্য্য করা যায় না? সমষ্টিগতভাবে পরদেশ লুণ্ঠন করা যায়, সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র অন্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে, যে কোন রাষ্ট্রতন্ত্রে অন্যায়ভাবে বিনাবিচারে মানুষকে কারারুদ্ধ করা বা নির্ব্বাসনে পাঠান যাইতে পারে। নিজ দেশবাসী কর্ম্মীদিগকে উপযুক্ত বেতন না দিলেও শোষণ করা হয় না যদি শোষক কোন ব্যক্তি না হয়। ইহা ঠিক সুতর্কের কথা নহে; কিন্তু সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রে শোষণ রীতির প্রচলন আছে এ কথা কেহ মানিতে চাহিবে না। শোষণ কথাটার অর্থ সমাজবাদীরা ব্যক্তিগত লাভের কথা না উঠিলে ব্যবহার করেন না। সমাজ যদি অসংখ্য কর্ম্মীকে কাজ করাইয়া তাহাদিগের উৎপাদিত উপভোগ্য বস্তু ইত্যাদির অধিক ভাগ উৎপাদকদিগকে না দিয়া সমাজ শাসকদিগের ইচ্ছামত ব্যয় বা ব্যবহার

করে ; তাহা হইলে উৎপাদক কর্ম্মীদিগের জীবনে যে অভাবের সৃষ্টি হয় তাহা শোষণের ফলে হয় নাই বলিলে কথাটা খুব সুবিচার ও ন্যায়সঙ্গত হয় না। ভারতের "পাবলিক সেক্টার" যদি কর্ম্মীদিগকে অল্প বেতন দিয়া কাজ করিতে বাধ্য করে তাহা হইলে তাহা কি শোষণ হইবে না, যেহেতু ঐ জাতীয় ব্যবসায় ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে চালান হয় না ? "প্রাইভেট সেক্টার"এও অনেক সময় রাষ্ট্র অংশ ক্রয় করে ও "ডিভিডেণ্ড"ও লইয়া থাকে। যতটা লভ্যাংশ রাষ্ট্রকে দেওয়া হয় ততটা তাহা হইলে শোষণজাত লাভ নহে। শুধু যেটুকু ব্যক্তিরা পাইয়া থাকে সেইটুকুই শোষণের ফল। এই জাতীয় কূট তর্ক করিয়া অর্থনৈতিক কোন সত্যই প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যে যাহা উৎপাদন করে তাহাকে সেই উৎপাদনে তাহার প্রাপ্য পূর্ণ অংশ না দিলেই ধরিতে হইবে শোষণ বা "এক্স্‌প্লয়টেশন" আছে। এই উৎপাদনের শ্রমিকের পাওনা কোন ভাগ পরহস্তগত হইলেই তাহা শোষণের উপস্থিতির প্রমাণ বলিয়া ধরিতে হইবে। কয়েখাড়া হস্ত তাহা লইয়াছে বা সেই লওয়া ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, রাষ্ট্রীয়, সাধারণের মঙ্গলের জন্য অথবা রাষ্ট্রীয় দলের সুবিধার জন্য কি না, এই সকল কথা দিয়া বিষয়টাকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া তোলা বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসার সহায়ক নহে। ব্যক্তিগত লাভ ব্যবসায়ের আয়োজন ও পরিচালনা হইতে অনেক সময় শোষণবর্জ্জিতভাবেই সৃষ্টি হইতে পারে। এমনকি পরিশ্রমের পূর্ণমূল্য হইতেও অধিক পারিশ্রমিক শ্রমজীবীরা কখন কখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পরিস্থিতির গুণে পাইয়া যায়। ইহাকে "সারপ্লাস ভ্যালু"ও বলাই যায় না ; "উইণ্ডফল" বা পাওনার উপরি অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া লভ্য বলাই সঙ্গত। মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়াস বা পরিশ্রম হইতে যাহা উৎপন্ন হয় না ; উৎপন্ন হয় সামাজিক, জাতিগত কারণে ; বহু মানুষের একত্রবাসের ফলে, তাহা মানুষে সমষ্টিগত সত্তায় অধিকার হইতে পাইতেছে বলিলেও ভোগের হিসাবে তাহা ব্যক্তির উপভোগের তালিকাতেই লিখিত হয়। সুতরাং যেখানে ব্যক্তির উৎপাদনের পূর্ণমূল্য তাহাকে উপভোগের জন্য দেওয়া হইতেছে না সেখানে ব্যক্তির সেই শোষিত প্রাপ্যকে সমাজের পাওনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া এবং যেখানে ব্যক্তি নিজ উৎপাদনের তুলনায় অধিক পাইতেছে সেখানে ব্যক্তির সমাজের অঙ্গ বলিয়া তাহার কিছু অতিরিক্ত পাইবার অধিকার আছে ; এই প্রকার তর্ক ও বিচার করিয়া ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা অথবা পাওনার অধিক দিবার ব্যবস্থার কণ্টকাকীর্ণ সমর্থন চেষ্টার কোন যাথার্থ্য থাকে না।

ইংরেজীতে একটা প্রবচন প্রচলিত আছে তাহা হইল "বার্ডস অফ এ ফেদার ফ্লক টুগেদার", অর্থাৎ এক প্রকার পালক-বিশিষ্ট পাখী (এক জাতীয়) সব সময়েই এক স্থলে সমবেত হয়। মানুষও আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়াই পরস্পরের সাহচর্য্য, সান্নিধ্য ও একত্রবাস প্রার্থনা করে। এই কারণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক এক দেশে এক এক জাতির মানুষ একত্র বাস করে। এই যে এক দেশীয় ও এক জাতীয় মানুষের একত্র বাস ইহার মধ্যে দেখা যায় আচার, ব্যবহার, ভাষা, খাদ্য, বস্ত্র, প্রভৃতির ঐক্য। দেশ ছাড়িয়া গ্রাম ও শহরে গমন করিলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন পেশার ও বৃত্তিভোগীর মানুষের একত্র সমাবেশ। জেলে পাড়া, কাঁসারী পাড়া, সোনা পট্টী, তুলা পট্টী, দফতরী পাড়া, প্রভৃতি পাড়ার সৃষ্টি হইয়াছে একপ্রকার কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের পরস্পরের নিকটে থাকিয়া কাজ কারবার ও জীবন নির্ব্বাহ করিবার ইচ্ছা হইতে। সুতরাং পেশা অনুসরণ করিয়া নানা কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণও শহরের এক এক ভাগে বাস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রকারেই মানব সমাজে বহু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর গঠন হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যে কোন সাদৃশ্য না থাকিলে একত্রবাসের চেষ্টা দেখা যায় না। বৃহৎ ও ব্যাপক শ্রেণী, যেমন ব্যবসাদার অথবা শ্রমিক বলিয়া কোন শ্রেণী গঠন হয় নাই এই কারণে, যে, সকল ব্যবসাদারেরা সকল সময়ে পরস্পরের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করে না ; সকল শ্রমিকও কোন সাধারণভাবের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বাচ্ঞা করে

না। লোহার লোহারের সঙ্গ চায় এবং মৎস্য-বা বস্ত্র বিক্রেতা চাহে সমজাতীয় ব্যবসাদারের নৈকট্য। সমাজ-দর্শনের যে শ্রেণী-সংঘাত লইয়া তথাকথিত বামপন্থীরা বাক্যালোড়ন করিয়া থাকেন সে শ্রেণীগুলি ঠিক যে কি তাহা সহজে বোধগম্য নহে। কর্ম্মী বা শ্রমিক বলিয়া কোন একটা কাল্পনিক শ্রেণী আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; কিন্তু সত্যই কি সেরূপ কোন শ্রেণী আছে? যে সকল শ্রমিকের কোন শিক্ষা বা যন্ত্রকৌশল নাই অর্থাৎ যাহারা শুধু মোট বহিতে বা কোন কিছু টানিতে বা ঠেলিতে পারে মাত্র তাহারা হইল অশিক্ষিত, কৌশল-বা কারিগরী-বিদ্যাহীন শ্রমিক। এই "আনস্কিল্ড" শ্রমিকদিগকে এক শ্রেণীর শ্রমিক বলিয়া ধরা হয়। অপর শ্রমিক শ্রেণী হইল অর্দ্ধশিক্ষিত বা কিছু কৌশল আছে এইরূপ "সেমি স্কিল্ড" শ্রমিক। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর শ্রমিক হইল পূর্ণ যন্ত্রকৌশল যাহাদিগের আয়ত্ত হইয়াছে সেই "স্কিল্ড" শ্রমিক শ্রেণী। এই তিন শ্রেণীর শ্রমিকগণ সকলে সকলকে এক গোত্রের বলিয়া মানিতে চাহে না। ব্যবসাদার যাহারা তাহারাও বিভিন্ন শ্রেণীর। পানের দোকান যাহার এবং বৃহৎ কারখানার মালিক বা বড় আড়তদার এক শ্রেণীর লোক নহে। ইহা ব্যতীত যাহারা স্বাধীনভাবে চিকিৎসা, আইন কিংবা যন্ত্রবিদের কার্য্যে লাগিয়া আছেন তাঁহারাও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক। তার পরে আছে চাকুরে কর্ম্মচারী, সৈন্য, সেনাপতি ইত্যাদি। সকলকে নির্ব্বিচারে এক শ্রেণীতে বসাইয়া দেওয়া তর্কের খাতিরে করা হইলেও কার্য্যে অসম্ভব হয়। "পৃথিবীর সকল শ্রমিক" বলিয়া একটা কাল্পনিক শ্রেণী ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহা আছে কি? যখন কম্যুনিজম কোন কোন দেশে প্রথম চালিত হয় তখন শ্রমিকদিগকে শিক্ষিত কর্ম্মচারীদিগের উপরে বসাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। শিক্ষা ও কৌশল যাহাদের তাহারা শীঘ্রই নিজেদের পদমর্য্যাদা পুনরধিকার করিয়া নিজেদের উচ্চতর শ্রেণীর কর্ম্মী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল। যে নিছক জল তোলা, মাটি কাটার কার্য্যে নিযুক্ত সে আবার অপরের হুকুমের চাকরই হইয়া রহিল। যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য বুঝিত তাহারা আবার ক্রমে ক্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তা হইয়া আদেশ নির্দ্দেশের প্রভু হইয়া সামাজিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিল। কিছুদিন হইতেই সরকারী কেন্দ্র হইতে বহু কারখানার পরিচালনা রীতি কম্যুনিষ্ট জগৎ হইতে উঠিয়া যাইতেছে ও তৎপরিবর্ত্তে পরিচালনাভার দেওয়া হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন কারখানার অধ্যক্ষ ও ব্যবসাবিদ্‌দিগকে। এই "ডিসেন্ট্রালাইজেশন্" বা কেন্দ্রীয় পরিচালনা মুক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রতিষ্ঠানের নিজ নিজ পরিচালনা ব্যবস্থা এখন রুশিয়াতে বহু বৎসর হইতে করা আরম্ভ হইয়াছে। বহু ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এক মহা-প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যেরূপ বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ, বহু বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীকে এক কাল্পনিক মহা-শ্রেণীর অংশ বিবেচনা করাও সেইরূপ কল্পনা প্রবণতা ব্যতীত আর কিছু নহে। যুদ্ধকালে বহু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এক সেনাদলে যোগ দিতে পারে কিন্তু পরে, শান্তি স্থাপিত হইলে, সেইসকল লোক আর এক দলে মিলিতভাবে থাকিতে পারে না। শ্রেণী সংগ্রামের আহ্বান অন্যান্য যুদ্ধ নিনাদের মতই মানুষকে উত্তেজিত করিতে পারে, কিন্তু এই গর্জ্জনের ভিতরে কতটা বস্তু আছে ও কতটা শুধু শব্দ তাহা বিবেচনা করিবার বিষয়।

ব্যক্তিত্বনিষ্ঠ অথবা সমষ্টিগত উভয়ভাবেই মানুষকে তাহার নিজত্ব ব্যক্ত করিতে দেখা যায়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ কিছুটা সত্য অনুভূতি প্রকাশ করে; আর অপরাংশে করে শুধু অভিনয়। কোন্‌খানে মানুষ তাহার নিজের স্বরূপের অভিব্যক্তিতে নিবিষ্ট আর কখন্ সে একটা কাল্পনিক ভূমিকায় জীবন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ, ইহা সঠিকভাবে বলা বড়ই কঠিন কার্য্য। কারণ মানুষ যখন সর্ব্বান্তঃকরণে নিজেকে সর্ব্বত্যাগী আত্মবলিদানকারী আদর্শ যুদ্ধে নিযুক্ত মহাযোদ্ধা বলিয়া বিশ্বাস করে, তখন তাহার অভিনয়ই প্রায় সত্য হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ যখন ভাবে যে, সে সমষ্টিগত একটা মহাব্যক্তিত্বের অংশীদার

এবং তার ক্ষুদ্রতর নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে সে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, সে তখন মানুষের স্বভাব ও স্বরূপ অস্বীকার করিয়া কল্পনার আশ্রয়ে চলিবার চেষ্টা করে। কারণ মানুষ নিজের স্বভাব ও সহজাত প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে উঠিতে অক্ষম। সে নিজেকে যেভাবে যেখানেই নিযুক্ত করুক না কেন, তাহার আত্মবোধ কখনও লুপ্ত হইয়া যায় না। ছদ্মবেশ ধারণ করিতে পারে, আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া মনকে চোখ ঠারিয়া বুঝাইতে পারে যে সে যাহা নয় তাহাই, কিন্তু আত্মপরীক্ষা করিলেই দেখিবে যে তাহার নিজের ব্যক্তিত্বই তাহার প্রধান আশ্রয়। ট্রেনে চড়িলে সে এক হাজারের একজন যাত্রী; কিন্তু ট্রেন হইতে অবতরণ করিলেই সে আবার নিজের নিজত্বে ফিরিয়া যায়। কুম্ভ মেলায় যাইলে সে লক্ষ মানুষের মিলিত সত্তার অংশ মাত্র; কিন্তু মেলা শেষে সে আবার একেলা আত্ম-উপলব্ধি করিতে ব্যস্ত ও সক্ষম হয়। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় দল কী[illegible] ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য, ফুটবল মাঠের দর্শক, দাঙ্গাক রী দলের শক্তিমান সৈন্য, রথের রজ্জু আকর্ষণকারী ভক্ত; নানারূপেই মানুষ নিজেকে বৃহত্তর সমষ্টিগত আকারে দেখিতে চেষ্টা করে; কিন্তু ভিতরে তাহার নিজের নিজস্বটুকু সারবস্তুর মতই পূর্ণ বিদ্যমান থাকিয়া যায়। আসল ও নকল নিজস্ব, সাচ্চা ও ঝুটো স্বভাব ও স্বরূপ, সত্য আবেগজাত কার্য্যকলাপ ও ছলনা প্রবঞ্চনা চেষ্টা-শীলের মিথ্যা অভিনয়, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার খেলা ইত্যাদি বর্ত্তমান যুগের মানবতার সহিত গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। "হে বিশ্বমানব, শ্রবণ কর! আমরা সকলে অমরত্বের অধিকারী!" বলিয়া কোন ঋষি আর বিশ্ববাসীকে সত্যজ্ঞানের আকাঙ্খায় জাগ্রত করিতে চেষ্টা করেন না। চাহিদা—মাল সরবরাহ, দেনা পাওনা, দাবীদাওয়া, অর্থনৈতিক লাভ লোকসান ও রাষ্ট্রীয় দলের গঠন ও প্রভুত্ব চেষ্টা লইয়াই মানুষ সক্রিয়। সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়বোধ্য পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে নিজের সুখ সুবিধা সামলাইতে দিন কাটিয়া যায়। অন্তরের গভীরতম কেন্দ্রে গমন করিবার সময় কাহারও নাই। আধ্যাত্মিক জীবনকে অস্বীকার করিয়া চলাই শ্রেয় কারণ সে জীবন রাষ্ট্র বা অর্থনীতি গ্রাহ্য নহে।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রশংসনীয় নিষ্ঠা !

দেশে হাজারো রকমের সমস্যা প্রকট থাকিলেও, হিন্দী-প্রেমীদের ভাষা বিষয়ে পরম একাগ্রতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিতেই হইবে। বিষয়টি আর কিছুই নহে, বিহার রাজ্য হইতে বাঙ্গলা এবং অন্য চারিটি ভাষাকে কোণঠাসা করিয়া উদ্বাস্তু করিবার প্রবল বাসনা এবং তাহা কার্যকর করিতে সকল প্রকার অপচেষ্টা করা ! বিহারে বাঙ্গালীর সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২৫ লক্ষ এবং এই বাঙ্গালীদের মধ্যে শতকরা ৮০।৮৫ জনই এ রাজ্যে গত তিন চার পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছে এবং তাহাদের সহিত খাস বাঙ্গলার যোগসূত্র একমাত্র মাতৃভাষা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নাই। এ-রাজ্যে উর্দ্দু ভাষীর সংখ্যাও অবহেলার নহে। বলা বাহুল্য উর্দ্দু ভাষাকেও বিহারী বীর ভাষা-যোদ্ধারা সর্ব্বতোভাবে উৎখাত করিতে সদা সচেষ্ট !

গত দুইটি আদমশুমারিতে বিহারে বাঙ্গালীর সংখ্যা কম করিয়া দেখানোর অনেক অপপ্রয়াস করা হয়। সেন্‌সাস্ কর্ম্মচারীদের (প্রায় সবাই বিহারী) হিন্দীতে করা প্রশ্নের জবাব বহু বাঙ্গালী হিন্দীতেই দেন—এবং এই অপরাধে তাঁহাদের 'মাতৃভাষা হিন্দী'-সেন্‌সাস্ ফর্ম্মে লিখিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে ইহা জানি। ১৯৬১ সালের সেন্‌সাসে ঘাটশিলায় ছিলাম, সেই সময় ঐ অঞ্চলের শতকরা ২০ জন বাঙ্গালীর 'মাতৃভাষা' হিন্দী বলিয়া লিখিত হয়, কারণ তাহারা হিন্দীতে করা প্রশ্নের জবাব চলিত হিন্দীতেই দেন এবং হিন্দী বুঝিতে পারেন !

১৯৭১ সাল হইতে বিহারের মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল কলেজের সকল ছাত্রকেই সকল পরীক্ষার সকল প্রশ্নপত্রের জবাব হিন্দীতে দিতে হইবে, বাঙ্গলা, উর্দ্দু, উড়িয়া প্রভৃতি প্রভূত প্রচলিত ভাষাগুলি বেকার হইবে এবং এই ভাষাগুলি যাহাদের 'মাতৃভাষা' তাহাদের আপন 'মাতাকে' পরিত্যাগ করিয়া 'বিমাতা' হিন্দীকেই মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে গায়ের জোরে বাধ্য করা হইবে ! বিহার সরকার এ-ব্যাপারে এখনো নির্ব্বিকার !

কিন্তু একটা অর্দ্ধপক্ব দুর্ব্বল ভাষাকে জোর করিয়া রাজতক্তে বসানো যাইবে কি ?

মাগধী ফতোয়া কি ?

কিছুকাল আগেও যাহা ছিল আশঙ্কা, তাহাই আজ বাস্তবে পরিণত। বিহারের মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ফতোয়া জারি করিয়াছেন, অতঃপর হিন্দী ছাড়া আর-কোনও ভাষায় পড়াশুনা করা চলিবে না।

কলেজগুলিকে বলা হইয়াছে যে-সব ছাত্র-ছাত্রী প্রাক্‌-বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে যাবতীয় পরীক্ষা হিন্দীতে দিতে রাজী, একমাত্র তাহাদেরই যেন কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। হিন্দীওয়ালাদের হঠকারিতার নানা নমুনা ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। তাঁহারা হিন্দীর জন্য শুধু অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা আদায় করিয়াই তৃপ্ত হন নাই, মনোগত বাসনা হিন্দীই হোক এক এবং অদ্বিতীয় সরকারী ভাষা। শুধু তাহাই নহে, উগ্র হিন্দীপন্থীদের মতলব, সরকারী খাস মহলের বাহিরেও হিন্দীই

হোক ছত্রপতি, আর কোনও ভাষা না থাকাই ভাল, একান্ত যদি থাকে ত ঠিকে প্রজা হিসাবে থাকিবে। প্রতিবাদ এবং এবং প্রতিরোধের সামনে পড়িয়া হিন্দী-ওয়ালারা তখনকার মত লেজ গুটাইয়া লইলেও সেটা যে সাময়িক রণকৌশল মাত্র, সেটা ক্রমে বোঝা যাইতেছে। এই মাগধী হনুমনামা বোধ হয় তাহারই ইঙ্গিত। বলা নিষ্প্রয়োজন, মাতৃভাষার গৌরববৃদ্ধির নামে আসলে ইহা অন্যদের মাতৃভাষাকে গলা টিপিয়া হত্যার ষড়যন্ত্র মাত্র।

মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা বলিয়া একটা কথা চারিদিকে রটিয়াছে বটে। সেটা অসম্ভব স্বপ্ন এমন কথা কেহ বলিবেন না। কিন্তু তাহার আগে যে ব্যাপক প্রস্তুতি প্রয়োজন কোথায় তাহা? যে ভাষায় এখনও "হাঁটি হাঁটি পা পা" অবস্থা তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব ভাষাপ্রীতির নামে আহাম্মকি মাত্র। কোনও ভাষার মোড়লেরা যদি স্বেচ্ছায় নিজেদের এভাবে ধোঁকা দিতে চাহেন আমাদের কিছু বলার নাই। হিন্দীতে শুধু পারমাণবিক বিদ্যাচর্চা কেন, হয়তো গাড়ি চালানোও সম্ভব। কিন্তু নিজেদের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রাভঙ্গের এই চেষ্টা কেন? মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় যাঁহাদের নিবাস তাঁহাদের সকলের মাতৃভাষা যে হিন্দী নহে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় সে সংবাদ রাখেন। ওই এলাকায় বিপুল সংখ্যক পড়ুয়া রহিয়াছেন যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী নহে। সংখ্যায় তাঁহারা লক্ষ লক্ষ। বাংলা ছাড়াও আছে উর্দু, মৈথিলী—ইত্যাদি। তা সত্ত্বেও মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জবরদস্তি সত্যই তুলনারহিত। পাটনায় এক সাংবাদিক বৈঠকে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের তরফ হইতে এই সিদ্ধান্তকে বলা হইয়াছে—একনায়কত্বমূলক। আমরা মনে করি, এই ফতোয়া শুধু স্বেচ্ছাচারী নহে, ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে রীতিমত বিপজ্জনক।

সংবিধানে সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজী ও হিন্দী—এই দুইটি ভাষা স্বীকৃত হইলেও কোনও ভাষা অস্বীকৃত নহে। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের জন্য কি করা উচিত—রাজ্য পুনর্গঠনের সময় সেসব কথাও বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কেহ কখনও কোথাও এমন কথা বলেন নাই এক এলাকার মানুষ অন্য এলাকায় গেলেই তাহাকে মাতৃভাষা বিসর্জন দিতে হইবে। ভারতের মত বিশাল দেশে জাতিগঠনের লগ্নে সে ধরণের কোন অপপ্রয়াস যে কীভাবে বিপর্যয় ডাকিয়া আনিতে পারে একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করিলেই মগধের হিন্দীওয়ালারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। বুঝিতে পারিবেন তাহারা যাহ করিতেছেন তাহা শুধু নাগরিক অধিকার-বিরোধী নহে, অন্তে নিজেদেরও স্বার্থবিরোধী। কারণ, এ এমন একটা খেলা যাহা অনায়াসে অন্যেরাও খেলিতে পারে। হিন্দীপ্রেমিকরা নিজেদের লেজের আগুনে ইতিমধ্যেই বিস্তর সৎ চিন্তা এবং ধ্যানকে আধপোড়া করিয়া ছাড়িয়াছেন, এবার যাহা করিতে চলিয়াছেন তাহাতে শেষ পর্যন্ত নিজেদের মুখও পুড়িতে পারে। মগধ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যেসব ছেলে-মেয়ে বিশুদ্ধ হিন্দীতে তকমা লাভ করিবে তাহাদের সকলেই কি পাটনা আর দিল্লীতেই দানাপানি জোগাড় করিতে পারিবে? অথচ হায়, আজ যাহারা "আংরেজী হঠাও"-এর ফাঁকা বুলিতে পড়িল অন্যত্র কাল তাহাদের পক্ষে গলা ধাক্কা ছাড়া আর কিছু না মিলিবারই সম্ভাবনা। তাই গুজরাটকে আবার এ-বি-সি-ডি পড়িতে হইতেছে এবং ইংরাজী-বিদায়ের নামে তামিলনাড়ুতে আন্দোলন চলিতেছে। সুতরাং শুধু অন্যদের মাতৃভাষার প্রতি সম্মান বা সৌজন্য দেখানোর জন্যই নহে, নিজেদের বাঁচানোর জন্যও মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত এই অসঙ্গত অন্যায্য, অহিতকর ফতোয়া অবিলম্বে প্রত্যাহার। আনন্দবাজারের উপরিউক্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধে কাহারও, এমন কি 'কট্টর হিন্দীপ্রেমীদেরও' কিছু বলিবার থাকিতে পারে না কিন্তু সুবুদ্ধি এবং যুক্তির বালাই যেখানে নাই সেখানে যুক্তির কথা বলাটা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। সেই গোবিন্দ দাস এবং অন্যান্য হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীরা যেখানে হিন্দী বানর-সেনাদের ক্ষেপাইয়া দিয়া

উত্তেজিত করিয়া, হিন্দী বানর-সেনাদের লেজের আগুনে বিহারে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র আবার একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধাইতে চাহেন, তাঁহাদের গতবারের শিক্ষা হয়ত এখনো মনে থাকিতে পারে, কিন্তু সে শিক্ষা বোধ হয় যথেষ্ট হয় নাই।

আমরা আশঙ্কা করি মাগধী টেকনিক বিহার এবং অন্যান্য হিন্দী ভাষী রাজ্যেও হয়ত অনতি-বিলম্বে অনুসৃত হইবে! কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে ভারতের অহিন্দী-ভাষীরা এবার হয়ত ভীত ত্রস্ত দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করিবে না। আরো মনে রাখা দরকার যে, কেন্দ্রে এখন আর হিন্দীওয়ালাদের প্রভাব এবং দাপট বিশেষ নাই এবং ক্রমশ ইহা আরো কমিতে কমিতে শেষ পর্য্যন্ত অস্তাচলে যাইতে বাধ্য! এমন কি, আত্মরক্ষা এবং গদি অনড় রাখিতে স্বয়ং কর্ত্রী ঠাকুরাণী মাতা ইন্দিরাকে অহিন্দীভাষীদের পক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে বাধ্য হইয়া, হয়ত অনিচ্ছাসত্বেও!

ভাষার ব্যাপারে বিহারবাসী বাঙালীদের কর্ত্তব্য কি?

অতীব দুঃখের কথা যে এ-রাজ্যের (বিহার) বাঙালীদের নিজেদের মাতৃভাষা রক্ষার জন্য যাহা করা উচিত তাহা হইতেছে না। সাধারণভাবে বলা যায়—এখানে বাঙালীর বাঙলা ভাষার দাবি রক্ষার জন্য বিশেষ কোন সচেতনতা নাই। সবাই যেন স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন এবং হিন্দীকেই বাঙালীদের পক্ষে অবশ্য গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিতেছেন, কারণ রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধে কিছু করা বাঙালীরা অসম্ভব অসাধ্য কাজ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন! বলিতে লজ্জা হয় বিহারের বাঙালী-প্রধান ছোট বড় বহু শহরে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত-পরিচালিত নেহাত শিশু-বিদ্যালয়গুলিতেও বাঙলা পড়ানোর ভাল ব্যবস্থা নাই, এমন কি বাঙালী পরিচালিত কে জি বিদ্যালয়গুলিতেও বাঙালী ছাত্রছাত্রী-দের পড়াশুনা হিন্দীর মাধ্যমেই হয়। অথচ এই সব বিদ্যালয়ে সরকারের কোন প্রকার আর্থিক সাহায্যও নাই। হিন্দী মাধ্যম না হইলে সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে না বা পাওয়া যাইবে না, ইহাও বাজে কথা।

দু-একটি বাঙালী সমিতি দ্বারা, বিশেষ করিয়া পাটনা এবং রাঁচি শহরে, বাঙলা চালু রাখিবার পক্ষে কিছু কিছু প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে সত্য, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বাঙালী সমাজ একাভাবদ্ধ হইয়া বাঙলা রক্ষাকল্পে যদি সজোর আন্দোলন না করে, তাহা হইলে ছাড়া-ছাড়া প্রচেষ্টা বিফল হইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে বিহারবাসী বাঙালীদের সতর্ক থাকিতে হইবে, যাহাতে ১৯৭১ সালের সেন্‌সাসে বাঙালীদের মাতৃভাষা হিন্দী বলিয়া উল্লিখিত না হয়। বিহারী সেন্‌সাস্ কর্ম্মীরা "মাতৃভাষা" শিরোনামার কলমে কি লিখেন তাহা যেন বাঙালী মাত্রেই বিশেষ সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করেন, যাহাতে ১৯৫১ এবং ১৯৬১ সালের সেন্‌সাসের অনাচার আবার না অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আমরা ধরিয়া লইতে পারি বিহার রাজ্যে বাঙালীর সংখ্যা যতদূর সম্ভব কম করিবার চেষ্টা চলিতে থাকিবে—এবং এই ভাবে যদি সেন্‌সাস্ অপকর্ম্ম অব্যাহত চলিতে থাকে তাহা হইলে আগামী ৫০।৬০ বছরে বিহারে বাঙালীর সংখ্যা প্রতি দশকে কমিতে কমিতে শেষ পর্য্যন্ত কয়েক হাজারে দাঁড়াইয়া যাওয়া কিছুই অসম্ভব বা অবাস্তব কল্পনা নহে!

কর্ত্তব্য কি?

বিগত কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে, আমাদের কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি পরম 'চাপ-নিষ্ঠ'। সহজে এবং প্রেসক্রুপ্তি যাহা দেওয়া যাইতে পারে, বর্ত্তমান প্রশাসকবৃন্দ তাহাতে বিশ্বাস করেন না, এ-বিশ্বাসকে তাঁহারা বোধহয় প্রশাসনিক দুর্বলতার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন, সেই কারণে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গণ-আন্দোলন, বন্ধ্, বিক্ষোভ, ঘেরাও, মহাকরণের সামনে অনশন অবস্থান প্রভৃতি আরম্ভ না হয়, প্রশাসকবৃন্দ ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরম বীরত্বের সঙ্গে জনগণের ন্যায় অন্যায় সকল প্রকার দাবীকে—'কভি নাহি হোগা' বলিয়া উপেক্ষা করেন, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বিবিধপ্রকার গণ-বিক্ষোভ এবং আন্দোলন সুরু হইবে, সেই মুহূর্ত হইতে ভীষণ কঠিনমনা প্রশাসকবৃন্দ মাউণ্ট এভারেষ্ট হইতে নামিতে নামিতে শেষ পর্য্যন্ত

তরাই-এর নিবিড় অরণ্যে অবতরণ করিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলেন এবং জনদাবি বলিয়া কথিত সকল প্রকার সম্ভব-অসম্ভব দাবি-দাওয়া পরম তৎপরতার সহিত মানিয়া লইতে দ্বিধা করেন না। ইহা সুরু হয় অন্ধ্ররাজ্য গঠন হইতে, শেষ কোথায় কেহ জানে না। অতি অল্পকাল পূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে তিনটি ইস্পাত কারখানার দাবি ও চাপে পড়িয়া মহারাণী কেন্দ্রকর্ত্রী ইন্দিরা ঠাকুরাণী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এইবার ওড়িষার দাবিও স্বীকৃত হইবে (হয়ত এতদিনে ইহা ঘটিয়াছে)।

কাজেই বিহারে বাঙ্গলা ভাষার দাবি এবং অধিকার যদি রক্ষা করিতে হয়, বাঙ্গলা ভাষাকে যদি তাহার ন্যায্য মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হয় তাহা হইলে বিহারের বাঙ্গালীদের (সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমে বঙ্গেও) অবিলম্বে সরকার যাহাতে বিশ্বাস করে সেই গণ-আন্দোলন, বিক্ষোভ, মহাকরণের সামনে অনশন, অবরোধ প্রভৃতি চাপের কথা চিন্তা করিতে হইবে শেষ পর্য্যন্ত। আমাদের স্থির বিশ্বাস বিহার সরকার এবং কেন্দ্রের মহাকর্ত্তারা সহজে টলিবেন না, কাজেই তাঁহারা যাহাতে টলেন এবং মানুষের সহজ দাবি, বাঙ্গালীর মাতৃভাষার দাবি, যেভাবে যে পথে এবং যে উপায়ে স্বীকৃত হইবে, তাহাই আমাদের গ্রহণ করা ছাড়া অন্য পথ নাই। মাদ্রাজে ডি-এম-কে সরকার এবং পার্টি যে পদ্ধতিতে হিন্দীকে দেশছাড়া করিয়াছে, সেই পথই কি শেষ পর্য্যন্ত আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে এবিষয়ে কিছু সহায়তা আশা করিবার নাই, কাজেই দেশের সমগ্র বাঙ্গালী সমাজকে একতাবদ্ধ হইয়া বিহারে মাতৃভাষা রক্ষার মহান্ সংগ্রামের পথ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে পলিটিক্যাল পার্টিগুলির জমিদারী পুনঃপ্রবর্ত্তন ?

সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক (?) দল নিজ নিজ পার্টির তরফ হইতে 'ভূমি-রাজস্ব' আদায়ের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছে। বলা বাহুল্য ইহা সরকারী রাজস্বের উপরে এবং রাজ্য সরকার এই ভাবে আদায় করা অর্থের কোন অংশ পায়েন না!

এ-রাজ্যে সি পি এম কট্টর নেতা রামবল গোঁয়ার বে-আইনী জমি দখল—(জমি রাহাজানি কিংবা লুটও বলা যাইতে পারে) পুণ্য কর্ম্মের সূচনা করেন। তথা-কথিত যুক্ত-ফ্রন্ট বিযুক্ত এবং গদিচ্যুত হইবার পর রাষ্ট্রপতির শাসনকালে রামবল গোঁয়ারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হইয়া 'land grab'—অর্থাৎ পরের জমি দখল নামক জনহিতকর কর্ম্মে প্রায় সব কয়টি দলই আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এইভাবে বেদখলী জমি পার্টি মহারাজগণ তাঁহাদের দলীয় ভক্তদের মধ্যে কৃষক অকৃষক নির্ব্বিচারে বিলি করিতেছেন এবং এই জমিতে ফসল যাহা হইয়েছে বা হইবে তাহার শতকরা অন্তত ৫০ ভাগ কিংবা তাহার বদলে ঐ ফসলের বাজারে চলতি মূল্য পার্টি-ফাণ্ডে জমা দিতে হইয়েছে এবং হইবে। প্রকাশ, এইভাবে প্রায় দুই কোটি টাকা ইতিমধ্যে আদায় হইয়া বিশেষ দুই তিনটি পার্টির তহবিলে জমা পড়িয়াছে। সরকারী রাজস্ব বিভাগের অভিজ্ঞ কয়েকজন অফিসার ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াও প্রকাশ! পার্টি সমর্থক ভক্তেরা প্রায় ১,০০,০০০ একর জমির 'দখল' পাইয়াছেন পার্টি প্রশাসকদের দয়ায়।

এতদিনে জমি জবর দখলের রহস্য এবং পার্টি লিডার-দের হঠাৎ এই ব্যাপারে এত উৎসাহের কারণ বুঝা গেল। এক পার্টির সহিত আর এক পার্টির সংঘর্ষের কারণও উদ্ঘাটিত হইল। এক পার্টি অন্য পার্টির 'জমিদারীতে' অনুপ্রবেশ কিংবা পার্টির যৌথ আদায়ের ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করাতে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং খুন জখমের অতি প্রাবল্য গত কিছুকাল হইতে প্রকট হইয়াছে। একই রাজ্যের মধ্যে দুইটি প্যারালেল 'রাজস্ব-বিভাগ'—প্রশাসন ক্ষেত্রে এক বিচিত্র দৃশ্য! রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি তথা প্রধান মন্ত্রীর প্রতিনিধি রাজ্যপালের কর্ম্মক্ষমতারও ইহা একটি জলন্ত নিদর্শন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণে

অকারণে দিল্লী ধাবন করিয়া রাজ্যপাল শ্রীধাবন প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়েছেন। কে বলিতে পারে, প্রধান মন্ত্রীর উপদেশ কিংবা নির্দ্দেশ অনুযায়ী শ্রীধাবন রাজনৈতিক দলগুলিকে (বিশেষ করিয়া সি পি আই) ঘাঁটাইতে সাহস পাইতেছেন না ১৯৭১ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের কথা মনে করিয়া।

বাস্তবে দেখা যাইতেছে জমিদার জোতদারের পক্ষে যাহা পরম অপরাধ এবং জনস্বার্থবিরুদ্ধ, পশ্চিমবঙ্গের জনহিতে নিবেদিত প্রো-পলিটিক্যাল পার্টিগুলির পক্ষে তাহাই হইয়াছে পরম পুণ্যকর্ম্ম এবং গণতন্ত্র-সহায়ক প্রচেষ্টা! রাজ্যসরকার বহু বৎসর পূর্ব্বে এ-রাজ্যে জমিদারী প্রথা আইন করিয়া তুলিয়া দিয়াছেন কিন্তু বর্ত্তমানে যে নয়া জমিদারী প্রথা চালু করা হইয়াছে তাহা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কি বর্ত্তমান রাজ্য সরকারের নাই? ক্ষমতা অবশ্যই আছে, কিন্তু ঐ-ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ঝুঁকি লইতে রাজ্য সরকার বিবিধ কারণে রাজী নহেন। প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলা উচিত, সি পি এম নেতা রামবল গোঁয়ার যখন হাই কোর্টের আদেশ অমান্য করিয়া 'নামী' বেনামী এবং সরকারের খাস জমিও লুট করিতে একশ্রেণীর পার্টি-সমর্থকদের প্রকাশ্য প্ররোচনা দিতে থাকেন, সেই সময় সি পি আই এবং ফ্রন্টভুক্ত অন্য কয়েকটি শরিক রামবল গোঁয়ায়ের তীব্র সমালোচনা করেন। অবস্থার পরিবর্ত্তনে আজ ঐ সব বিরুদ্ধবাদী দলগুলিও পরম আন্তরিকতার সহিত 'জমি লুট', তথা পার্টি জমিদারীর সৌধ রক্ষিকরা রূপ পরম পুণ্যব্রত পালনে কোন দ্বিধা করিতেছেন না। এমন কি সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে অন্ধ কিন্তু অন্যদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অতি প্রখর দৃষ্টিযুক্ত সংসদ সদস্য ভূপেশ গুপ্ত নামে পরিচিত ব্যক্তিটিও এবিষয়ে নির্বাক্। এরাজ্যের রেণুদেভ., প্রমোদ দাসগুপ্ত এবং কোসিগীন জ্যোতি বসুও আজ তফাতে থাকিয়া মজা দেখিতেছেন!

ক্লীব পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কাহার নির্দ্দেশে জানি না, রাজ্যের প্রায় সর্ব্বপ্রকার বে-আইনী কার্য্যকলাপের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি—কেবল দেখাতেই সীমাবদ্ধ। দেখার সহিত কর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই! আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এমন অপদার্থ সরকার তথা রাজ্যপাল দেখা যায় নাই। রাজ্যপালের উপদেষ্টা সংখ্যা পাঁচ, তাহার উপর আছে পঞ্চাশজনের সংসদ-সদস্যদের লইয়া এক সুপার উপদেষ্টা-কমিটি! সন্ন্যাসীর অতি-সমাবেশ এবং সমারোহেই যুক্ত গাজনের পারলৌকিক কর্ম্ম সমাধা হইয়াছে!

রবীন্দ্রনাথ ও ধ্রুপদ

সলীল বিশ্বাস

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে উত্তর ভারতের ধ্রুপদী ঘরাণার স্বকীয় প্রাণস্রোত কি গতিস্পন্দনহীন হয়ে আসছে এবং যা বর্ত্তমান—তা, অতীতের মৃত সত্তার বিক্ষিপ্ত মাত্র? অনেক সঙ্গীত-সমালোচক যখন প্রত্যায়িত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে—ধ্রুপদী ঘরানাই মাত্র নয়, -ভারতীয় মার্গ-সঙ্গীতেরই কোন মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎ নেই—তখনই কি উত্তরভূমির সঙ্গীত-সমালোচক সচেতন হয়ে উঠছেন যে,—রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও মননা ব্যতীত ধ্রুপদ ও রাগসঙ্গীতের প্রাণধারাকে স্রোতস্পন্দিত রাখা যাবে না? উত্তর ভারতের ধ্রুপদ ও রাগ-সঙ্গীত সমালোচকের এই ধ্রুব-প্রত্যয়ের আলোকে আবহপটের স্বচ্ছ রূপটি দেখে নিলেই সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি সহজ হবে।

সমালোচক বলছেন,—ধ্রুপদ ইতিমধ্যেই তার প্রাণ-ধারা হারিয়েছে; খেয়াল বা অন্যান্য রাগসঙ্গীতও অনতি ভবিষ্যতে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। স্বর্গত ফৈজ (ফৈয়াজ?) খান, আবদুল করিম খান এবং সাম্প্রতিক ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান এই সঙ্গীতধারার প্রাজ্ঞ-প্রতিভূ।

সমালোচকের মতানুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়, আকাশ-বাণী এবং সঙ্গীত সম্মেলনের মাধ্যমে এই সকল সঙ্গীত-সংস্কৃতির অনুশীলন ও প্রচারের -একাডেমিক ভ্যালু-' ছাড়া সাম্প্রতিক জীবন ও মানসিকতায় সঙ্গীতের রস-মাধুর্যের পরম উপলব্ধির তরঙ্গমূহ নাস্থির ক্ষমতা নেই। ভারতীয় মার্গসঙ্গীত-সংস্কৃতির সপক্ষে এই সমালোচনাকে প্রতিবাদী মানসিকতায় গ্রহণ করলেও আধুনিক জীবনের অনুশীলিত সিদ্ধ-সাধনার শক্তি ভিন্ন শুধু মাত্র বিদগ্ধ 'যুক্তি-তর্কে এই ক্রমবর্দ্ধিত ধারণাকে প্রতিহত করা যাবে না।

যদিও এই সকল সমালোচকের সমালোচনা-ভাষ্যে উত্তর ভারতের রাগ-সঙ্গীত ইত্যবসরেই বিগত, কিন্তু দক্ষিণ ভূমিতে এর ভিন্ন চিত্র দেখি। এই ভূ-খণ্ডের রাগৎসঙ্গীতের সাধক রাগসঙ্গীত-ধারার অবিনশ্বরতা সম্পর্কে যেমন শ্রদ্ধাবান্, তেমনি এই ভূমির অতি-আধুনিক অশাস্ত্রীয় গায়কও রাগসঙ্গীতের চিরন্তনতায় বিশ্বাসী। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত-সমালোচককুলে এমন কেউই নেই, যিনি সনাতন রাগসঙ্গীতের প্রাণধারার তরঙ্গ-স্পন্দনের ভবিষ্যৎ বিলুপ্তির সম্ভাবনার ধারণা পোষণ করেন।

ধ্রুপদ ও রাগসঙ্গীতের এই আবহপটে রবীন্দ্রনাথের নামটি মনে উঠে আসছে। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন না,—তিনি তাঁর অ-সংখ্যায়িত গীতিরাশির ভেতর দিয়ে সঙ্গীতের সৃজনধর্মিতায় নব-দীক্ষিত প্রাণের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। কবিগুরু তাঁর সৃজনধর্মী সঙ্গীত-সাধনায় রাগসঙ্গীতের পূর্ব নিয়ন্ত্রণ সীমা ভেঙে ফেলে নতুন ধারার প্রবর্ত্তন করেছেন,—যা' 'কাব্য সঙ্গীত' নামে শ্রদ্ধা-স্বীকৃত। শব্দের গূঢ় ব্যঞ্জনা ও মনের ভাব-সৌষম্যের পূর্ণতা আনার জন্যে কবিগুরু তাঁর গীতি-কবিতায় বিভিন্ন ভিন্নায়ত 'রাগ' ব্যবহার করেছেন। তিনি বাংলার লোকসঙ্গীত ও কীর্ত্তনকেও পূর্ব নিয়ন্ত্রণ ধারা থেকে মুক্তি দিয়ে তার এমন বাণীগ্রহন ও স্বরগ্রাম রচনা করেছেন, যা এক অপূর্ব শৈল্পিক-সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।

কবিগুরু তাঁর সঙ্গীত রচনার ঊষা-দিনে যে 'ব্রহ্ম সঙ্গীত' রচনা করেন তা, সনাতন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ ও তালের পরিমিত-নির্দেশনায় রচিত হয়েছিল, বিশেষতঃ এই সব সঙ্গীতে 'ধ্রুপদ' আঙ্গিক

যথাযথরূপে অনুসৃত হয়। এই সকল সঙ্গীতের সঙ্গীত-ধর্মের মূল্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু সমালোচকের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বলায় ও লেখায় এ কথা সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, 'ধ্রুপদ'-নির্ভর এই সঙ্গীত রচনার প্রবণতা তাঁর পরিণত কালের গীতিরাশি রচনাকে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছে। তিনি বলছেন, বিশেষ আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যে বাংলা সঙ্গীত ও গীতিকবিতার মেলবন্ধন রচিত হওয়া উচিত কিন্তু সনাতন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সনাতন 'রাগ'-নির্ভর সঙ্গীত রচনা অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ও পশ্চিম ভারতের 'কালেয়া' ও রাগসঙ্গীতের সমান্তরাল অনুশীলনের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। রাগসঙ্গীতের ক্রমবিবর্তন প্রসঙ্গে ধ্রুপদসঙ্গীতের প্রতি তিনি শুধু যে গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ করেছেন তাই নয়, শ্রদ্ধা মননায় বলছেন যে ধ্রুপদ-ই সকল রাগসঙ্গীতের প্রস্থানভূমি হওয়া উচিত। কবি যদিও তাঁর রাগসঙ্গীতের প্রীতি-চাহিদা পরিপূরণার্থে খেয়াল আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য ও তানের সমন্বয় এবং টপ্পা রীতির মুক্ত ব্যবহার করেছেন তবুও ধ্রুপদ-ই ছিল তাঁর মার্গসঙ্গীত সাধনার প্রস্থানভূমি এবং 'রবীন্দ্র রাগসঙ্গীত'—অধিকাংশই ধ্রুপদকোটার সঙ্গীত।

সামগ্রিকতার বিচারে এ কথা মানতেই হবে যে, 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' সনাতন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কোন একটি বিশেষ আঙ্গিকে রচিত হয়নি, 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' সমকালীন যুগের মহাকবির অতি অপূর্ব স্বর্গীয় সৃষ্টি। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট স্বীকৃতি-যোগ্য যে, কবি রাগ-মাত্রিক সঙ্গীত রচনায় ধ্রুপদ ঘরানাকেই আদি উৎস হিসেবে আত্মীকরণ করে নেন। এ কথা স্বীকৃত যে কবি রাগ সঙ্গীত সাধককে স্বীয় সাধনার প্রেরণা—পথ-নির্দেশক রূপে ধ্রুপদ ঘরানার অনুশীলনকে অভিনন্দিত করেছেন এবং ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রতি আধুনিক গীতিকারদের দুর্বিনীত মানসিকতায় তিনি গভীর বেদনা বোধ করেছেন।

উত্তর ভারতের সনাতন সঙ্গীতের ক্রমস্ফূর্তি প্রসঙ্গে কবি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন যে, ধ্রুপদ-ঘরানার প্রাণশক্তি যদি ভবিষ্যতের সঙ্গীতস্রোতোধারাকে প্রাণস্পন্দিত না করে, তবে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের যথার্থ উন্নত বিকাশ সম্ভব নয়। কবি বলেছেন যে, রাগসঙ্গীতের উন্নত স্ফূর্তিকল্পে অনেক পরিবর্তন,—বিস্তৃত প্রয়োগ ও রাজ্য-প্রসারের ভেতর দিয়ে আমরা ধ্রুপদ সঙ্গীতের নূতনতর সিদ্ধি ও ঘরানা সৃষ্টি করতে পারি।

রাগসঙ্গীতের প্রতি রবীন্দ্র মনের হার্দ্য আবেদনের নিহিত সত্য এই যে, কবি-আত্মা ধ্রুপদের তিনটি বিভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ধ্রুপদ একটি প্রশান্ত উন্নত ভাব আবহমণ্ডলের সৃষ্টি করে, ভজনমূলক সঙ্গীত হিসেবে ধ্রুপদ সঙ্গীতের অবিকৃত সুষমা মানব-মনের গভীর ভাবানুরাগ সৃষ্টি করে এবং ধ্রুপদ সঙ্গীতেই আমরা সঙ্গীতের যতি, তান ও ছন্দের সুষমাসৌম সমন্বয়নের গূঢ় চেতনা প্রবৃত্তি অর্জন করি। এই নবার্জিত প্রবৃত্তিকেই কবি সঙ্গীতের 'সুমিতি-বোধ' নামে অভিহিত করেছেন।

সঙ্গীতের লীলানিকেতন বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত সঙ্গীত-তাপস বাহাদুর খান প্রবর্তিত 'সেনী ঘরানার' বিখ্যাত উত্তরসাধক যদুভট্ট এবং বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে কবির আকৈশোর যৌবনের সপ্রাণ মনযোগিতায় ধ্রুপদী-দীক্ষাই তাঁকে ধ্রুপদ সাধনমার্গের গতিচ্ছন্দী যাত্রী করে তুলেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যদুভট্ট এবং বিষ্ণু চক্রবর্তীর সঙ্গীত-সাধনাকে প্রীত ও পোষিত করেছিলেন; কারণ তাঁদের অনুপম সঙ্গীত ব্রাহ্ম মন্দিরে একটি অধ্যাত্ম ভাবস্নিগ্ধতার প্রশান্ত পরিমণ্ডল রচনা করত। দেবেন্দ্রনাথ ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার যে জগৎ রচনা করেছিলেন তারই কলশ্রুতির দাক্ষিণ্যে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য এক স্বভাবজ আধ্যাত্মিকতা ও সঙ্গীতপ্রেমের পরমভাব উপ্ত হয়েছিল যা পরিণতকালে তাঁর বোধসত্তার গভীরে স্থিত ধ্যানে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছিল।

'খেয়াল' থেকে টপ্পায় আগমনের মত 'কাওয়ালী' রীতি হতে আগত 'তানের' ধ্রুপদী অন্বয়ের অনিবার্য

পরিণতিতেই 'খেয়াল' রূপাঙ্গ সৃজিত। গহন অনুভূতি এবং আত্মমগ্ন সঙ্গীতাঞ্জলির প্রস্থানভূমি হিসেবেই কবি এই ভিন্ন 'রাগ' রূপের সাধক হয়ে উঠেছিলেন। উত্তরদিনে নিম্নতর সঙ্গীত সাধকদের সাধনায় অ-স্বচ্ছ বাণী ও তালের পীড়নে ধ্রুপদের স্বর্গীয় রূপ যখন বিকৃত হয়ে এলো তখনই রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ ঘরানায় এই বিকৃতি ও অ-সিদ্ধ সাধনাকে অনুৎসাহিত করেন। সঙ্গীতের অসীম প্রতীকের পরমতা পীড়িত হয় বলেই খেয়াল রূপাঙ্গ ও আলাপের ক্ষেত্রে আঙ্গিক রাগ বিস্তারের নিয়ম সম্পর্কে কবির অন্তরের গভীর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। খেয়াল রূপাঙ্গের 'ঝলক' তানের অতিরঞ্জন কবি-আত্মাকে পীড়িত করেছে। কবি রাগসঙ্গীতের ভাবমণ্ডলের গহনে প্রবেশ করে তার অন্তর্লীন রসধারাকে উৎসারিত করার ব্রত নিতে সঙ্গীত-রসপিপাসুদের অবিরাম উৎসাহিত করেছেন।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পেশাদার সাঙ্গীতিক যখন রাগসঙ্গীতকে তার ভাবশক্তির মন্দির থেকে তাদের পার্থিব মন্দিরের ছায়াতলে এনে সঙ্গীতরসের অতৃপ্ত মন শ্রোতাকুলকে গভীর আনন্দের যোগান দিচ্ছেন, তখন যেমন বুঝতে কষ্ট হয় না যে 'খেয়াল' রূপাঙ্গের আগামী দিন অন্ধকারের ইঙ্গিত বহন করছে, তেমনি দেখি মমতাহীন প্রাণের অসিদ্ধ মাত্রারীতির পীড়নে ধ্রুপদ ছান্দসিও লাঞ্ছিত হচ্ছে।

কিন্তু এই স্বৈরতন্ত্রী অনুবর্তনা সত্ত্বেও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভাবশক্তি নিঃসীম মৃত্যুতে হারিয়ে যাচ্ছে না। ধ্রুপদ, খেয়াল এবং অন্যান্য সঙ্গীতের কতিপয় উচ্চ গ্রামের সঙ্গীতসাধক তাঁদের প্রাণাশ্রয়ী তপস্যায় রাগ সঙ্গীতের বাণী ও রসধারাকে গতিতরঙ্গে স্পন্দিত রেখেছেন। এই শতকের প্রথমার্ধে রাধিকা গোস্বামী এবং নাসিরুদ্দিন খানের মত এমন কয়েকজন ধ্রুপদ ঘরানায় সঙ্গীত-তাপসের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা কালের মাত্রায় নতুন পরীক্ষাতেও রস, রাগ ও বাণীর অপূর্ব সম্পূর্ণতার সমন্বয়ে রাগ-সঙ্গীতের প্রাণবেদ ধ্রুপদ-ধারার আলোক-উজ্জ্বল ভাবশক্তি-মণ্ডল রচনা করেছেন।

এ সত্য ঐতিহাসিক যে ধ্রুপদ মাত্র রবীন্দ্র-আস্বাদনেই আস্বাদিত নয় একালের মহাযোগী অরবিন্দও ধ্রুপদকে জীবনের পরমাত্ম ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের প্রতীক-রূপে আস্বাদন করেছেন।

মাদ্রাজে ক'মাস

শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি কর্ম উপলক্ষ্যে মাদ্রাজে (এখনকার তামিল নাড়ু) যেতে হয়েছিল মাস তিনেকের কাছাকাছি সময়ের জন্য। এই প্রথম নয়। বছর দুয়েক আগে আর একবার সেখানে গেছলাম। সে কারণে মাদ্রাজকে খুব কাছ থেকে ভাল করে জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল এবং সেটা বর্ণনা করার চেষ্টা আমি করছি। সেটা ছিল শুক্রবার। চৈত্র মাসের শেষাশেষি এক সন্ধ্যায় তিন নম্বর আপ হাওড়া-মাদ্রাজ মেলটা আমাদের নিয়ে যাত্রা সুরু করল। সময় দ্রুতগতিতে পালটে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে আমাদের চারিধারের অনেক কিছুই। কয়লার বদলে ডিজেল্ ইঞ্জিন গাড়ীটাকে খানিকটা ক্ষিপ্র গতিতেই প্ল্যাটফর্মের বাইরে নিয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে যাঁরা দেখা করতে এসেছিলেন ট্রেণের দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁদের হাতছানি দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে তাঁদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলাম। আমি হাতটা তখনও নাড়াচ্ছিলাম। একে ঠিক বিদেশ যাত্রা বলে না—নিজের দেশেরই এক অংশ থেকে আরেকটা অংশে যাওয়া। কিন্তু দূরত্বের কথা চিন্তা করে এবং যে দীর্ঘ সময় বাড়ী ছেড়ে থাকতে হবে সেটা ভেবে মনট্য একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এটা না বললে সত্য বলা হবে না। বাড়ী থেকে যাত্রা করার ছবিটা মনের মধ্যে ভেসে উঠল—ছোট পাঁচীল ঘেরা বাড়ী। তারই রোয়াকে দাঁড়িয়ে আমার ছোট ছেলে আর মেয়ে দুটি এবং পাশে তাদের মা। সকলেরই মুখে হাসির ভাব। কিন্তু চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় একটা করুণ চাহনি যার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে বিচ্ছেদের ব্যথা, তা যে কদিনেরই হোক। আমি বিদায় উঠলাম। ছেলে-মেয়েরা "দুগ্গা, দুগ্গা" "হরি হরি" বলে আমাকে বিদায় দিল।

একটা পুরো দিন ও দুটো রাত পার হবার পর সোমবার খুব ভোরে গাড়ীটা হড় হড় করে মাদ্রাজ ষ্টেশনে ঢুকে পড়ল। আমার বিছানাটা তখনও বাঁধা শেষ হয়নি, মনে আছে।

মাদ্রাজ সহরটা বেশ বড়ই। তুলনামূলক ভাবে নয় অবশ্য। রাস্তাগুলো খুবই চওড়া। আর বেশীর ভাগই সোজা। সুপ্রশস্ত মাউন্ট রোড ধরে আমাদের ট্যাক্সীটা ছুটে চলল। তখনও দিনের আলো ভাল ফোটেনি। শীত শীত লাগছিল। রাস্তাটা ঝক্ ঝক্ করছিল। ধুলো ওখানে খুবই কম, বালির দেশ, আর বালি ভারী, হাওয়ায় ভাসে না। ভোরের পরিবেশটা আমাদের ভালই লাগল। ট্যাক্সী থেকে নামতেই ড্রাইভার বলল 'ফোর রুপীজ সার', অর্থাৎ চার টাকা দিতে হবে। মিটারে অবশ্য তিনটাকা কত পয়সা যেন উঠেছিল। ওখানকার হাল চাল আমার আগেই জানা ছিল। ট্যাক্সী ওয়ালা কেন, যে ঘর ঝাঁট দেয়, যে কাপড় কাচে, জল বা চা দেয়, এমন কি যে জুতো সেলাই করে সে পর্যান্ত ইংরাজীতে কথা বলছে—পরিষ্কার না হলেও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে তার বক্তব্য সে ভালভাবেই বোঝাতে পারে এবং আমার বক্তব্যও নিজে বোঝে। হিন্দী বড় একটা শোনা যায় না। বরং জায়গায় জায়গায় দেখেছি আমরা হিন্দী বললে তারা উত্তর দিচ্ছে ইংরেজীতে। অথচ পোশাকে তারা সম্পূর্ণ মাদ্রাজী। এটা ওখানকার বৈশিষ্ট্য। এখানে বলে রাখি, ওদের ভাষা কিন্তু আমাদের কাছে পুরাপুরি দুর্বোধ্য রয়ে গেছে। 'রেন্ডা' মানে দুই, 'মুন' মানে তিন, 'নাল্লি' মানে চার—এসব জানতে বা বুঝতে আমাদের বেশ কিছু সময় লেগেছিল।

মাদ্রাজে কি দেখলাম এবং কেন এ লেখার

অবতারণা এ প্রশ্ন করছেন কি? বলার অনেক কিছু আছে, যেমন ধরুন, মেরিনা-ট্রিপলিকেন্ বীচ্ বা ইলিয়ট বীচ্ বা মুর মার্কেট, প্যারিস কর্ণার, হাইকোর্ট, ফোর্ট, লাইটহাউস, ইউনিভার্সিটি, রেসকোর্স অথবা আরও ছোট জিনিষের মধ্যে টীনগরের প্যানাগল্ পার্ক, সুপার মার্কেট বা কামধেনু, আমেরিকান ইনফরমেশন্ সার্ভিসের অফিস বা অক্সফোর্ড প্রেস, অথবা মায়লাপুরের কাপালেশ্বরের মন্দির, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রভৃতি। কিন্তু এসবের কিছুরই আলোচনা করার ইচ্ছা আমার নেই, কেননা সেটা একটা মামুলী বর্ণনা বা ভ্রমণকাহিনী গোছের হয়ে দাঁড়াবে। সম্পূর্ণ অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি মাদ্রাজের যা দেখেছি সেটাই বলবার চেষ্টা করব।

প্রথমেই আসুন ডিসিপ্লিন বলে জিনিষটাতে। একটা বড় সহর—যেখানে জনসংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ। তা যে কত শান্ত ও সংযত হতে পারে তা দেখতে হলে আপনি আসুন মাদ্রাজে। এটা ঠিক যে কলকাতা বা বোম্বাই এর তুলনায় মাদ্রাজে পথে-ঘাটে বা গাড়ীতে ভীড় কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানেও সকাল সন্ধ্যের ভীড়ের সময় বা পীক্ আওআর আছে যখন বাস্গুলিতে বেশ ভীড় হয়। যান বা গাড়ি বলতে অবশ্য মাদ্রাজে বাস্ ট্যাক্সী ও স্কুটারই প্রধান। মাঝে মাঝে দুটো একটা সাইকেল-রিক্সা ও মানুষে টানা রিক্সা যাতে একজন লোক বসতে পারে, চলতে দেখা যায়। আর দেখা যায় এক ঘোড়ার টাঙা যেগুলো সাধারণতঃ মাল বহন করে, কিন্তু বেশ জোরে দৌড়ে যায়। মাউন্ট রোডে ছুটন্ত টাঙা দেখতে বিকেলে বেশ ভাল লাগত। আমাদের আলোচ্য-বিষয়ে আসা যাক। মাদ্রাজের অধিবাসীদের ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে বলছিলাম। রাস্তা পার হবার সময় এরা চিহ্নিত অংশের বাইরে যান না বড় একটা। বাস্-গুলোতে ওঠার এবং নামার দরজা আলাদা এবং যাত্রীরা সেটা কঠোরভাবে মেনে চলেন। কণ্ডাক্টররা এ বিষয়ে খুব কড়া এবং যাত্রীরা কণ্ডাক্টরের শাসন খুসী মনে মেনে নেন। বাস্গুলোতে চড়ার ও নামার নিয়মও বড়

সুন্দর। 'ষ্টপ' ছাড়া কোন স্থানে কেউ বাসে উঠতে নামতে পারবেন না। মাদ্রাজ যাওয়ার দু-একদিন প আমরা দুজন কলকাতাবাসী মাউন্ট রোড ধরে হাঁটা 'জেমিনি' ষ্টুডিওর কাছে পুলিশের হাত দেখানয় এক খালি বাস্ দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমার বন্ধু ও আমি ট করে যেই বাস্টাতে উঠতে যাব অমনি কণ্ডাক্টর রু দাঁড়াল। 'রুল ভায়লেট' করা অর্থাৎ শৃঙ্খলা ভাঙ্গা সহরে সহজে করা যায় না। আমরা কলকাতার লো একটু অবাক হয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু পরে এজিনিষ ভাল লেগেছিল। আর বাসের ভেতর? কলকাতা বাদুড়ঝোলা হয়ে যাত্রী-ভর্তি বাস্ আপনার ম থেকে মুছে ফেলুন। ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো সেখানে একেবারে প্রহিবিটেড বা নিষিদ্ধ। বাসের অন্দ দাঁড়িয়ে যাওয়ারও একটা সংখ্যা বা সীমা আছে যেটা পার হয়ে গেলে বাস্ আর কোন ষ্টপে দাঁড়াবে না। যাত্রীদের আমরা বাস্ ষ্টপে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি কিন্তু ওগুলোকে ওভারক্রাউডে বা অত্যধিক ভীড়ে ভর্তি করে চালিয়ে নিয়ে যাবা কোন দাবী এঁরা করেন না। বেশীরভাগ ষ্টপগুলোতে কিউ বা সারি দিয়ে বাসে ওঠার রীতি আছে। অতদিন মাদ্রাজ সহরে ঘোরাফেরা করেছি কিন্তু একদিনের জন্যও ওখানে পথে ঘাটে দুজন লোক কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া মারামারি করেছে এ দৃশ্য চোখে পড়েনি। চায়ের দোকানে হল্লা বা সিনেমা সামনে উত্তেজিত জনতার চীৎকার, এসব তো কো দিন দেখিইনি; এমন কি কোন রাজনৈতিক রেষারেষি বা প্রসেসনও চোখে পড়ল না। অথচ রাজনীতির ক্ষেত্রে মাদ্রাজের লোকেরা ভারতের অন্য অংশে চেয়ে এগিয়ে আছেন বললে ভুল হবে না। সহরে অনেক বস্তি অঞ্চল আছে। জলকষ্টের দরুণ রাস্তার মোড়ে মাঝে মাঝে যেখানে জলের কল আছে সেখানে লাইন দিয়ে লোক জায়গা নিয়ে জলের জন্য দাঁড়িয়ে আছে এবং পরপর জল নিয়ে চলে যাচ্ছে। কোন কলরব পর্যন্ত নেই ঝগড়ার কথা না তোলাই ভাল। আমার

মনে হল ওরা ঝগড়া কি জিনিস জানে না। শহরে গরীবের সংখ্যা অনেক, পথে ঘাটে রাত্রে শুয়ে থাকার লোকও অনেক। কিন্তু বস্তি-জীবনের দ্বন্দ্ব বা হৈ-হল্লোড় নজরে আসেনি। ও জিনিস একদম নেই হয়ত বলা যাবে না। কিন্তু থাকলেও তার ঘটন সামান্যই। সাধারণ মানুষ মাদ্রাজে অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও সাধাসিধে। পোশাকে চালচলনে তারা ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খোলা মন। ওদের মেয়েরা খুব ফুলের ভক্ত। সাজগোজ সাধারণ কিন্তু রুচিসম্পন্ন এবং মাথায় ফুল ওদের অপরিহার্য্য। পথে ঘাটে দোকানে বাজারে সংসারের কাজে মা বোনেরা নিজেরাই অনেকখানি দায়িত্ব নেন দেখলাম। ওদের শালীনতা ও সৌন্দর্য্যবোধ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মাদ্রাজের বাড়ীগুলো বড় সুন্দর ডিজাইনের। বসতবাড়ীগুলি বেশীর ভাগই একতলা বা দুতলা। বড় বড় স্কাইস্ক্রেপার ওখানে চোখে পড়ে না বড় একটা। লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন বা কয়েকটা ব্যাঙ্কের বাড়ী ছাড়া বিরাট বিরাট বাড়ী খুব বেশী নেই। এল আই সির বারতলা বাড়ীটা ওখানে টলেষ্ট। প্রায় প্রতিটি বসতবাড়ীর সঙ্গেই প্রশস্ত উদ্যান। সেখানে নানারকমের ফুল ও ফলের গাছ বাড়ীর শোভা বাড়িয়ে দিচ্ছে।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে মাদ্রাজের শান্ত ও সুন্দর পরিবেশ আমাদের বেশ ভাল লেগেছিল। কর্ম-চঞ্চলতাও আছে। মানুষ কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। ব্যবসা বাণিজ্যও চলছে। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে একটা সংযতভাব। একটা নিয়মানুবর্ত্তিতা যেন একটা ছন্দের সৃষ্টি করেছে যেটা অনুভব করা যায়, লিখে ঠিক প্রকাশ করা যায় না। এ জিনিসটা মাদ্রাজের বড় সুন্দর। এটা আমাদের মনে যে ছাপ রেখেছে তা অনেকদিন থেকে যাবে।

দেখতে দেখতে দিনগুলো কেটে গেল। আমাদের কাজ এত বেশী ছিল যে আমরা বুঝতেও পারিনি কোথা দিয়ে দুমাসেরও ওপর সময় কেটে গেল। ফেরার দিনটি শেষে একদিন এল। কিন্তু ফেরার সময় প্রকৃতিদেবী আমাদের উপর রুষ্টা হলেন। অন্ধ্রে অত্যধিক জল, ঝড় ও বন্যায় রেললাইন সব ভেঙ্গে ডুবে তচনচ হয়ে গেল। কলকাতার অনেক গাড়ী ঘুরে বোম্বাই মেলের রাস্তা ধরে চলতে লাগল- প্রায় হাজার কিলোমিটার বাড়তি রাস্তা। ঘণ্টা হিসেবে প্রায় ত্রিশ ঘণ্টার বেশী জার্নি। দুটো দিন ও তিন রাত গাড়ীতে কাটানোর পর শেষ রাতে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। বাঙ্ক থেকে নেমে দেখি একটা বড় ষ্টেশনে এসে গাড়ীটা দাঁড়িয়েছে। কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নামলাম। টাটানগর। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল, তাহলে বাংলাদেশ প্রায় এসে গেছে! সামনেই একটা জলের কল ছিল। চোখে মুখে জল দিয়ে একটু জল খেলাম, মিষ্টি জল, সত্যি ঘরের কাছাকাছি এসে গেছি তাহলে। দেখতে দেখতে গিডনী খাটশীলা ছাড়িয়ে গাড়ী এসে দাঁড়াল ঝাড়গ্রামে। ট্রেণটা সিগন্যাল পায়নি। গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। দুধারের সবুজ মাঠ, সবুজ বন আর মাঝে মাঝে পুকুর আমাকে জানিয়ে দিল আমি আমার বাংলা মায়ের কোলে এসে পড়েছি। বাংলার মাটি আমি ভালবাসি সবথেকে বেশী। বাংলার জল বাতাস, গাছপালা, গাছের পাখী আমার মনকে কতটা উতলা করে সেটা যেন হঠাৎ বুঝতে পারলাম। সত্যিই খুব ভাল লাগছিল। কোন মাদ্রাজী যখন কলকাতা থেকে মাদ্রাজে ফেরেন অথবা কোন পাঞ্জাবী পাঞ্জাবে যান, তাঁদের মনেও হয়ত ঐ একই ধরণের পুলক জাগে। বিরাট ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। কিন্তু এরই মাঝে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে স্থান বা অংশ আছে যেখানে এলে আমরা যেন সবকিছু নিজের বলে বুঝতে পারি একটা পরম আত্মীয়তা-বোধ মনের মধ্যে জাগে।

এটা ভাবপ্রবণতা নয়। এটা সত্য জিনিস এবং দোষের জিনিস মোটেই নয়। গোটা ভারতবর্ষকেই আমরা ভালবাসব। আবার আমাদের যে যার অঞ্চলকে

ও ভালবাসব এবং এই টুকরো টুকরো অংশ জুড়েই না আমাদের দেশটা গড়া? নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তরুণের স্বপ্নের কটা লাইন বা ছত্র মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন, অনেকে বলে বাঙ্গালী ভাটিয়া বা মাড়োয়াড়ী হল না কেন? কিন্তু আমি বলি বাঙালী বাঙালীই থাক। বাংলা মায়ের খাঁটি ছেলে ঠিক কথাই বলেছেন।

কয়েক ঘন্টা কেটে গিয়ে ঘড়ির কাঁটা যখন সকাল দশটায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন আমাদের গাড়ী আস্তে আস্তে হাওড়া ষ্টেশনে ঢুকছে। গাড়ীটা শেষে দাঁড়িয়ে গেল। প্লাটফর্মে মালপত্তর নিয়ে নামলাম। এত ভীড়, এত পণ্য একটা রেলের ষ্টেশনে? হ্যাঁ, হাওড়া ষ্টেশনের ছবিই এই।

আমি কলকাতার বাইরে থাকি। মফঃস্বলের এক গাড়ী ধরে যেতে হবে। গাড়ীটা ছাড়ার বেশ খানিকটা দেরী ছিল। প্রায় তিনমাস পরে বাড়ী ফিরছি। ষ্টেশনের বাইরের দৃশ্য দেখার একটা বাসনা মনে জাগল। মালপত্তর কুলীর মাথায় দিয়ে চলে এলাম প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে দোতলার ওপর। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওড়া ব্রীজের দিকে তাকালাম। অতবড় ব্রীজটা অগণিত চলন্ত মোটর—বাস—লরীর বিপরীত-মুখী সারিতে ভর্ত্তি। আর দুধারে শুধু মানুষের মাথা একটানা হেঁটে চলেছে ধীরে ধীরে। ব্রীজের ওপারে কলকাতা সহরের যে অংশ দেখা যাচ্ছে তা থেকে অনুমান করা যায় কি বিরাট এই সহর। এতবড় প্রাণ-চঞ্চল, কর্ম্মমুখর আর জীবন্ত সহর সত্যি ভারতে নেই। কলকাতার বিরাটত্ব মনের মধ্যে একটা অনবদ্য ভাব জাগাল। দীর্ঘ তিন মাস পরে আবার আমি আমার প্রিয় কলকাতায় ফিরে এলাম।

সঙ্কলন

পশ্চিমবাংলার ভূমি সংস্কার

পশ্চিম বাংলায় আজকাল সর্ব্বত্রই সকল কথা লইয়া বৃহৎ হাল্লা হাঙ্গামার সৃষ্টি করা হয়। এইগুলির নাম বিপ্লব। এই দেশে যত লোক চাষ করিতে ইচ্ছুক তত লোকের ব্যবহারের উপযুক্ত প্রমাণ জমি এদেশে নাই। চাওয়া এবং পাওয়ার অসামঞ্জস্য শুধু চাষের জমিতেই নহে। অপর সকল কার্য্য ক্ষেত্রেও আছে। কিন্তু অফিসের চাকুরি, ভাড়াটে বাড়ীর ঘর, বিবাহের বরকনে ইত্যাদি অপরের নিকট ছিনাইয়া লইয়া কাহারও নিজ কার্য্যে লাগানর কথা এখনও ওঠে নাই। উঠিলে সেগুলিও হয়ত বিপ্লব বলিয়াই বিজ্ঞাত হইবে। পশ্চিম বাংলার ভূমি সমস্যা লইয়া র‍্যাডিক্যাল হিউমানিষ্ট লীগ একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন; লেখক শ্রীশক্তি সরকার। ঐ পুস্তিকার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পশ্চিমবাংলায় কৃষিযুক্ত জমির পরিমাণ ১ কোটি ৩৪ লক্ষ একর। পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা সরকারী মতে সাড়ে চার কোটী। আমরা এই সংখ্যার সংগে দ্বিমত পোষণ করি। ১৯৬৬ সালের জনসংখ্যা, লাহিড়ী কমিশন অনেক অনুসন্ধানের পর বলেছিলেন ৩.৯৬ লক্ষ এবং প্রফুল্ল সেনের দাবী ৪ কোটী ২০ লক্ষকে তিনি অবাস্তব বলেছিলেন। এই ভিত্তিতে আমরা চার বৎসরে তার পরিমাণ ৪ কোটি ২৫ লক্ষ ধরতে পারি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৬৬ সালের ভিত্তিতে ৩০ লাখ বেড়েছে ধরে আমরা মোটামুটি ৩০ লাখের ভিত্তিতে ঐ ৪ কোটি ২৫ লক্ষ ধরছি। আমরা বর্তমানে পশ্চিম বাংলার ভূমিহীন ও ভূমি দরিদ্র ভাগচাষী ও ক্ষেত মজুরের সংখ্যা পাই ১,০২,৯৪,২০০ জন বা প্রতি ৫ জনে একটি পরিবার ধরলে ২০,৫৮,৮৪০ জন/পরিবার পাই। অর্থাৎ প্রায় ২১ লক্ষ পরিবারকে ভূমিক্ষুধা মিটোতে ভূমি বন্টন করতে হবে।

সর্ব্বপ্রথমে আমাদের জানা দরকার যে পশ্চিমবংগে ভূমি বিস্তৃতির আর কোন অবকাশ নেই। খাদ্য ঘাটতির দাবী মিটোতে মার্জিনাল ও সাবমার্জিনাল সব জমি আমরা কৃষির আওতায় টেনে এনেছি। দেশের উর্ব্বরতা উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখতে বৈজ্ঞানিক কারণে বনভূমি প্রয়োজন হয় অন্ততঃপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ। আমরা আমাদের ক্ষুধার দাবী মিটোতে তাকে ১৩.৪ ভাগে নামিয়ে এনেছি। তাছাড়া ১ কোটি ৩৪ লক্ষ একর যে কৃষি জমি আছে তা ভাল, মন্দ, মাঝারি, সেচযুক্ত, সেচহীন, পাট তৈলবীজ ইত্যাদির—সর্বমোট জমি। খাদ্য ফসল (ফুডক্রপ) ও অর্থ ফসল (ক্যাশক্রপ) এই দুরকমের জমি থাকা প্রয়োজন সংসারের দাবী মিটোতে। আমরা কোন জমি কতটা দেব একটি পরিবারের জন্য? ভূমি বন্টন হবে কোন দৃষ্টিভংগী দিয়ে? সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু, না সার্বাসসট্যান্স ভ্যালু না ইকনমিক ভ্যালু—কোন ভিত্তিতে আমরা ভূমি বন্টন করবো?

বাংলাদেশে একটি পরিবারের জন্য ইকনমিক হোল্ডিং ধরা হয়েছে ৮ একর। আমরা যদি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাথাপিছু ৪ বিঘা বা পরিবার পিছু ২০ বিঘা ধরি তা হ'লে আমাদের ২১ লক্ষ পরিবারের জন্য জমি লাগবে ৪,২০,০০০০০ বিঘা বা ১ কোটি ৪০ লক্ষ একর। শুধু ভূমিহীনদের মাথাপিছু ৪ বিঘা করে দিতে হলে ৭ লক্ষ একর কম পড়ছে, অবশ্য তার আগে ভূমিবানদের সকল জমি কেড়ে নিতে হবে। এর পরে আছে মালিক

চাষীদের কথা। ভূমি মালিকরা পশ্চিমবাংলার কৃষিজীবী জনসংখ্যার ৫৭ ভাগ অংশ ও তাদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩৮ লক্ষ বা ২৭ লক্ষ ৬০ হাজার পরিবার। এদের মধ্যে যে ১বিঘা জমি থেকে ৭৫ বিঘার মালিকরা মিলেমিশে আছে, ও যদি কারো সীমাতিরিক্ত জমি থাকে তারাও এই মালিকগোষ্ঠীর মধ্যে আছে। আমরা যদি বর্তমানের সীলিং বা সীমা ৭৫ বিঘা কমিয়ে সমবন্টনের নামে ব্যক্তি পিছু ৪বিঘা করতে চাই তাহলেও বা কি চিত্র পাই? তাহলেও ১ কোটি ১৮ লক্ষ একর জমি চাই ও এখানে ৪৪ লক্ষ একর জমি কম পড়ছে। মোদ্দা কথা, এই ২০ বিঘা করে পরিবার পিছু ভূমিবন্টন করার চেষ্টা করলে তাতে কি ভূমিহীন ক্ষেত মজুর, বা কৃষি নির্ভরশীল ভূমিবান পরিবারদের—কারোর চাহিদা পূরণ করা যায় না। সুতরাং ভূমি ক্ষুধা মিটানোর নামে বাংলা দেশে যে আন্দোলন চলছে তা অবৈজ্ঞানিক চিন্তা দৈন্য প্রসূত অথবা কপট অভিসন্ধিপরায়ণ শ্রেণীসংঘর্ষ বজায় রাখার রাজনৈতিক চাতুরির বলতে বাধা কোথায়? সম্প্রতি (৩০-১২.৬৯) পশ্চিমবাংলার ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে স্বীকার করেছেন যে "ভূমিহীনদের দেবার মত যথেষ্ট উদ্বৃত্ত জমি নেই। তবে ভূমি নিয়ে যে আন্দোলন বর্তমানে চলছে তা নাকি গ্রামের অস্বাভাবিক ভূমি সম্পর্কের একটা সামঞ্জস্য বিধান বা স্বাভাবিকরণ করবে।"

সমস্ত বাঙালীর জীবন যাত্রাকে যদি উন্নত করতে হয় পশ্চিমবাংলার পরিকল্পনাকে দুটো ভাগে ভাগ করতে হবে। একটি স্বল্পমেয়াদী ও একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্ল্যান করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদীর বিষয়বস্তু হবে কেমন করে জমির উপর জনচাপ হ্রাস করা যাবে। যে দেশ যত উন্নত সে দেশে কৃষির নির্ভরশীলতা তত কম। ইউরোপের পশ্চিমদেশ সমূহে ও আমেরিকাতে জমির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে গড়ে শতকরা ১০ ভাগ নীচে নামানো হয়েছে। এশিয়ার সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ জাপানে কৃষিনির্ভরশীলতা ৩০ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে। উন্নত পরিকল্পনার মাপকাঠি হবে কোন্ বা কি উপায়ে কৃষি অতিরিক্ত জন সংখ্যাকে সহজেই শুষে নিতে পারে। সেই ১৯৩৮ সালে ফ্লাউড কমিশনও Increasing pressure of population on agricultural land সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন।

উপরোক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণে ভূমিবন্টনরূপী ভূমিসংস্কার অপরিহার্য্য কি না? প্রাক স্বাধীনতার আমল থেকে যে ভূমি সংস্কারের কথা নানা কমিশন, এগ্রপার্ট ও পণ্ডিতেরা বলে আসছেন তা জনসংখ্যার বর্তমান স্ফীতকায় অবস্থার সংগে সামঞ্জস্য রেখে একই রূপে ও আকারে চলবে কিনা? ১৯৩৮ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত বিখ্যাত ফ্লাউড কমিশন যে ভূমি সংস্কারের কথা বলেছিলেন তা আজও প্রচলন সম্ভব কি না? মনে রাখতে হবে প্রাক স্বাধীনতাকালীন বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল ও রেঙ্গুন থেকে আমাদের চাল আমদানী করতে হতো। ভূমিহীন ও ভূমিবানদের অসম হারও তীব্র ছিল আর ধনবৈষম্য সেই হেতু নিষ্ঠুরতা পর্যায়ে বজায় ছিল। তখন বাংলাদেশে প্রতি একরে ০.৪৮ টন ছিল খাদ্য উৎপাদন ও সারা ভারতে এই উৎপাদন ছিল সর্বাধিক। সেই সময়ে ভূমিবানদের হাতে জমির পরিমাণ ছিল—শতকরা ৪২.৭ ভাগ পরিবারের হাতে ছিল ২ একরের নীচে; ১১.২ ভাগ পরিবারের হাতে ছিল ২ থেকে ৩ একরের মধ্যে; ৯.৪ ভাগ পরিবারের ভাগে ৩ থেকে ৪ একরের মধ্যে, ৮ ভাগ পরিবারের ছিল ৪ থেকে ৫ একরের মধ্যে; ১৭ ভাগ পরিবারের হাতে ৫ থেকে ১০ একরের মধ্যে আর ৮.৪ পরিবারেরা ভোগ করত ১০ একরের উর্দ্ধে। সে দিন কৃষিজাত পণ্যের দাম এত কম ছিল যে রায়তরা প্রতি বৎসর খাজনার টাকা শোধ দিতে পারত না ও ফলে জমির অতিরিক্ত হস্তান্তর হয়ে যেত। খাদ্য ঘাটতি, কৃষিজীবিদের দুর্দশাপূর্ণ জীবনযাত্রা ও জমিদার গোষ্ঠীর তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের পোষকতা ইত্যাদি কতকগুলো কারণকে তুলে ধরে

তদানীন্তন কংগ্রেসী আন্দোলন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সে দিনের ভূমি সংস্কারের মূলতঃ দাবী ছিল সরকার ও রায়তের মধ্যের মধ্যস্বত্বাধিকারী বা রাজস্ব গ্রহণকারী শ্রেণীর ধ্বংস সাধন। সে দিনও অন্যতম যুক্তি ছিল জমিতে লাঙল-ধারীর মালিকানা দিলে দেশের খাদ্য ঘাটতি মিটবে। জমিতে স্বাধিকারবোধ জন্মালে যে মমত্ববোধ সৃষ্টি হবে তা খাদ্য-উৎপাদনকে বাড়িয়ে দেশের খাদ্য ঘাটতি মেটাবে। সেদিনও ব্রিটিশ সরকার তার উত্তরোত্তর প্রশাসনিক দায় দায়িত্বের ব্যয় বৃদ্ধি দেখে রাজস্ব আয় বাড়াবার জন্য জমিদারী তুলে দেওয়ার বিষয় চিন্তা করেছিলো, কেন না ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে ভূমি রাজস্ব ঠিক হয়েছিলো তা আর কোন মতেই বাড়ান যাচ্ছিল না। এখন জমিদারী ও সকল মধ্যস্বত্বের অবসান হয়েছে। সুতরাং ভূমি সংস্কারের রূপ ও গুণের মূলগত পার্থক্য ঘটেছে।

যদি দেশের ঘাটতি মিটাতে বা খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে ভূমি সংস্কার দরকার হয় তা হলে দেশের বর্তমান চিত্রটা ধরা যাক। ইতিমধ্যেই দেশে সবুজ বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে বলে ঘোষণা হয়েছে। সারা ভারত আর কয়েক বৎসরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা গ্রহণ করতে চলেছে। যখনই মার্কিন গমের আমদানী নিশ্চিতভাবে কমে গেছে তখনই সবুজ বিপ্লবের পদ-ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে – এর মধ্যে রাজনীতি আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যুক্তির খাতিরে বলতে হবে যদি দেশে সবুজ বিপ্লব আরম্ভ হয়ে থাকে তা হলে ভূমি সংস্কারের গুরুত্ব কমে যায়। পশ্চিম বাংলার অস্বাভাবিক জন ভার ও সেই অনুপাতে তার ভৌগোলিক আয়তনের ক্ষুদ্রতার চিত্রকে সামনে রাখলেই বা কি চিন্তা করতে পারি? এ বৎসরের ৪ কোটি ২৫ লক্ষ লোকের প্রয়োজনকে ভিত্তি করে আমরা দেখতে পারি। দৈনিক মাথাপিছু প্রয়োজন ধরা হয় ১৬ আউন্স বা ৪৫০ গ্রাম। তা হলে (৪,২৫,০০০০০ × ৪৫০ × ৩৬৫) অর্থাৎ ৬৯,৮১,৬২৫ টন বা গড়ে ৭০ লক্ষ টন। কৃষিমন্ত্রী ডঃ কানাই ভট্টাচার্যের মতে এ বৎসরে আমন, আউস ও গম মিলিয়ে সর্বমোট উৎপাদন ৭০ লক্ষ টন। অধিক ফলনশীল শস্যের ফলন ধরলে আর ২/৪ লক্ষ টন ধরা যায়। তা না ধরে আমরা ৭০ লক্ষ টন উৎপাদন ধরে শতকরা ১০% ভাগ বীজ ও ঝড়তি পড়তি খাতে বাদ দিলে ৬৩ লক্ষ টন খাদ্য পেতে পারি। তা হলে (৭০—৬৩) ৭ লক্ষ টন ঘাটতি ধরতে পারি। কিন্তু এই ৭ লক্ষ টন ঘাটতি থাকে না। কেন না ৪৫০ গ্রাম ভিত্তিতে কখনও রেশন দোকানে পুরো খাদ্য দেওয়া হয় না। তা ছাড়া চার কোটী পঁচিশ লক্ষ লোকসংখ্যার সবাই সাবালক নয়। বৈজ্ঞানিক মতে প্রতি ৫ জনে ৪ জন সাবালক ধরা হয়। অর্থাৎ (৪২৫ ÷ ৫ × ৪) ৩ কোটি ৪০ লক্ষ জন সাবালক হবে। তা ছাড়া আছে রোগী, বৃদ্ধ, অনাথ, ভিক্ষুক ও আণ্ডারফেড এক বৃহৎ শ্রেণী। সাবালকের ভিত্তিতে ধরলে ৫০ লক্ষ টন লাগবে। তা হলে পশ্চিম বাংলা খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত হয়ে যায়। যদি উদ্বৃত্ত না হয়ে ঐ ৭ লক্ষ টন ঘাটতি হয় তা হলে ভারতবর্ষের পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যার উদ্বৃত্ত খাদ্যে ঘাটতি মেটানো যায়। অবশ্য যদি আমরা পণ করি যে পশ্চিম বাংলার খাদ্যেই আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চাই তা হলে একটু ভেবে দেখতে হয়। আমাদের কৃষিযুক্ত জমি ১৩৪ লক্ষ একরে যদি আমরা একরে দেড় মণ বা বিঘাতে ২০ সের অতিরিক্ত ফলাই তা হলে এক বৎসরে সাড়ে সাত লক্ষ টন উৎপাদন হতে পারে। তা হলে ঘাটতিকে বড় করে ধরে ভূমি সংস্কার করার নামে এত হৈ চৈ চীৎকার করার কোন যুক্তি থাকে কি?

জীবন যাপন কঠিন হইয়াছে

পশ্চিম বাংলায় মানুষের দিন গুজরাণ ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। "সাপ্তাহিক বারাসাত বার্তা"র নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে এই অবস্থার যে চিত্র দেখিতে

পাওয়া যায় তাহা হইতে বুঝা যায় যে দেশের মানুষ কেমন করিয়া দিন কাটাইতেছে।

দিন আর চলে না বলছেন সহরবাসী—শাকপাতা থেকে আলু পটল কিনে খাওয়া মানুষ। আধুনিক সভ্যতায় সহরবাসের সুবিধে অনেক আবার ট্যাকের যদি উপযুক্ত জোর না থাকে তবে চোখের জলে নাকের জলে একশেষ হ'তে হয়। গ্রামের সহর আমাদের বারাসাত বলুন, বসিরহাট বলুন, বনগাঁ বলুন এখানে স্বল্প রোজগারী মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ও রোজ মজুরীর শ্রমিক শ্রেণীর আজকের দুর্দশা বাজারে এসে দেখুন। মাছের কথা বাদ দিলাম,ওখানে প্রবেশ করার চেয়ে আমেরিকান রকেটে চাঁদে যাওয়া অনেক সহজ। বাঙালীর ডাল ভাত কিম্বা রুটি তরকারীর কথা ভাবা যাক। বাজারে কাটা কুমড়োর দর ৩০ পয়সা কেজি, আলু এক টাকা বিশ পয়সা, ঝিঙা ৪০ পয়সা, পটল এক টাকা দশ, কাঁচা লংকা ২০ নয়ায় ১০০ গ্রাম, জলেভেজা শাকপাতা ডাঁটা ৩০ পয়সা কেজি। একটা ছোট পরিবারের রোজকার আনাজে ঢালতে হ'বে কমসে কম দু'টি টাকা। এবার আসা যাক মুদিখানায়—ডাল ১-৫০ কেজি, সরষের তেল ৫ টাকা ২০ পয়সা লবণ, ২০ পয়সা কেজি, জিরা-ধনে ইত্যাদি মশলা পাতি রোজ কমসে কম ২৫ পয়সা টেনে নেবে। এখানে ছোট সংসারের দু'টি টাকা ঢালতে হবে। চালের বাজারে আসা যাক, মোটা চাল কিলো প্রতি ১ টাকা ৮০ পয়সা। আটার কিলো এক টাকা পাঁচ পয়সা। ছোট সংসারের এক বেলা ভাত এক বেলা রুটিতে কমসে কম চার টাকা টেনে নেবে। অর্থাৎ রোজকার বাজারে দরকার কমপক্ষে ৮ টাকা। এছাড়া কয়লা, কেরোসিন, চা জলখাবার, বাচ্চাদের দুধ, আত্মীয়তা লৌকিকতা নিত্য-নূতন রয়েছে। বাড়ীভাড়া, শিক্ষা, ওষুধ ডাক্তার সভ্য সমাজে বাস করার সেলামী সব মিলে একটি ছোট পরিবারের রোজ পনেরটি নগদ টাকা দরকার। মধ্যবিত্ত পরিবারকর্তার মাসিক আয় ৩০০ টাকা অর্থাৎ রোজ হিসাবে দশ টাকা, নিম্নমধ্যবিত্ত কর্তার আয় রোজ চার টাকা, রোজ মজুরের গড় আয় রোজ তিন টাকা। মোটামুটি খেয়ে পরে থাকার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সংসারের রোজ ঘাটতি ৫ টাকা, নিম্নমধ্যবিত্তের ১১ টাকা, রোজ মজুরের ১২ টাকা। উপরের দৈনিক আয় ও ব্যয়ের ঘাটতির হিসাবে সংসারযাত্রার মান কোথায় এসে ঠেকেছে সেটা অনায়াসে বোঝা যায়। কেনাকাটার পাট কমে যেখানে এসেছে সেটা হচ্ছে এক বেলার গোটা পরিবারের নির্জলা উপবাস। নিম্নমধ্যবিত্ত রোজ মজুর পরিবার সপ্তাহের তিনদিন উপবাসে দিন কাটাচ্ছে। এই উপবাস আর এই অভাব রাজনৈতিক দলের ক্যাপিটালে পরিণত হ'তে চলেছে যাদের মানুষকে দু'মুঠো খেতে দেবার মুরোদ নেই সেই রাজনৈতিক দলগুলি ঝাণ্ডা সেলাই করে শীঘ্র আসছেন—দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে হবে। নির্বাচন আসছে—আসছে ভাঁওতাবাজী যাতে মানুষের পেট ভরে না।

পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করিবে

"যুগবাণী"তে সম্পাদকীয়ভাবে লিখিত হইয়াছে :

পাকিস্থানে অক্টোবরে নির্বাচন; দিন যত কাছে আসিতেছে ভারতের পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা তত বাড়িতেছে। নির্বাচনের প্রথম বলি হইয়াছে পাকিস্থানের হতভাগ্য হিন্দুগণ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বড় আকারে বাধে নাই, কারণ পাকিস্থানে উহার আর প্রয়োজন নাই। সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি বা প্রতিরোধ স্পৃহা পর্য্যন্ত অবশিষ্ট নাই। ধান, জমি, সম্পত্তি, নারী; সর্বস্ব লুঠ হইয়া গেলেও তারা নীরবে সহ্য করে, অত্যাচার অসহনীয় হইলে উপায়ান্তর না দেখিয়া পা বাড়ায় ভারত সীমান্তের দিকে। পাক সরকার সীমান্ত খুলিয়া দিয়াছে, কারণ হিন্দুদের দেশ হইতে তাড়ানোই সরকারের উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে দুলক্ষ লোক ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আগামী দু-তিন মাসে হয়তো এর চেয়েও বেশি লোক আসিয়া পৌঁছিবে। দিল্লীর কোন কোন মহল দাবী তুলিয়াছে

ভারতের পক্ষ হইতে সীমান্ত বন্ধ করিয়া দিতে, কারণ নবাগত উদ্বাস্তুদের ভার বহনের ক্ষমতা ভারতের নাই। পার্লামেন্টে যখন এই বিষয়ে বিতর্ক হইতেছিল তখন সবচেয়ে অদ্ভুত মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন রুশপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যরা। রাজ্যসভায় ২৭শে জুলাই শ্রম ও পুনর্বাসন মন্ত্রী ডি, সঞ্জীবায়া যখন বলিতেছিলেন যে সীমান্তের ওপারে প্রায় আরও দুলক্ষ হিন্দু ভারতে চলিয়া আসার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ও আসিবে এবং নবাগত উদ্বাস্তুদের এখানে অতিশয় অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে বাস করিতে হইতেছে তখন সভার চারিদিক হইতে দাবি ওঠে যে পাকিস্থানের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হোক, বিষয়টি আন্তর্জাতিক দরবারে উপস্থাপিত করা হোক, পাকিস্থানের নিকট হইতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য জমি দাবি করা হোক, ফরাক্কা সম্পর্কিত আলোচনা বন্ধ করা হোক এবং নব কংগ্রেস সদস্য আকবর আলি খান জোরালো ভাষায় বলিলেন যে পাকিস্থান সংখ্যালঘুদের যখন রক্ষা করিতে পারে নাই তখন তাদের পুনর্বাসনের জন্য জমি ছাড়িয়া দিতে তারা বাধ্য, তখন মহান কমরেড ভূপেশ গুপ্ত—যিনি ময়মনসিংহ জেলার লোক, যিনি বাংলাদেশ হইতে বাঙাল ভোটে রাজ্যসভায় নির্বাচিত, তিনি উঠিয়া কণ্ঠস্বর সপ্তগ্রামে তুলিয়া কহিলেন, উদ্বাস্তুদের লইয়া মাথা গরম করা অন্যায়, তাসখন্দ চুক্তির স্পিরিট বা মর্ম অনুসারে পাক সরকারের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করিয়া ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করিতে হইবে। আর একজন সি পি আই সদস্য কল্যাণ রায় একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনিয়া কহিলেন ভারত সরকার পাকিস্থানের প্রতি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহা যথার্থ ও পর্যাপ্ত, ঐ নীতির আর কোন নড়চড় করার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গালীর সর্বনাশ হইবে—ইহাই মনে হয় আমাদের চিরাচরিত বিধিলিপি, তাই এই নবতম বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্তে আমরা বিস্মিত হই নাই। তাসখন্দ স্পিরিট বস্তুটাই বা কী? ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পাকিস্থান যখন ভারতের কাছে মার খাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ার দশায় আসিয়াছে তখন রাশিয়া আসিয়া তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব লয়, তাসখন্দে যাইতে লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে বাধ্য করে ও আয়ুব খাঁকে পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। রাশিয়ার আসল উদ্দেশ্য ইহাতে ভালোই সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ তাসখন্দ চুক্তি উপলক্ষেই রাশিয়া পাকিস্থানকে পক্ষপুটে আনিতে সক্ষম হইয়াছে, ভারত-পাক উপমহাদেশের রাজনীতিতে নিজেকে মুখ্য মাতব্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে। তাসখন্দ চুক্তি ভারতের বিজয়শ্রীকে হরণ করার ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।

পাকিস্থান সরকার কয়েক লক্ষ হিন্দুকে তাড়াইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইবে না। নির্বাচনের আগেই তারা ভারতকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। দুটি লক্ষণের উল্লেখ করিতেছি। ১৯৬৫ সালে ভারত আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে কাশ্মীরে পাকিস্থান কয়েক শত হানাদার পাঠাইয়াছিল। ৫ই আগষ্ট হানাদাররা ধরা পড়ে, তখন হইতেই অল্প আকারে সংঘর্ষ সুরু হয়, তারপর সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ পুরামাত্রায় বাধে। এবার কাশ্মীরে, আসামে, ত্রিপুরায় ও পশ্চিমবঙ্গে হানাদারে ছাইয়া গিয়াছে। কাশ্মীরে খোলা জায়গায়, মাঠে পথে দলে দলে লোক পাকিস্থান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়া পাকিস্থানী পতাকা তুলিতেছে,জি এম সাদিকের সরকার তাহা সমর্থন করিতেছে। প্রধানমন্ত্রী জুলাই মাসের মাঝামাঝি যখন কাশ্মীরে যান তখনও পাকিস্থানী চরেরা সরকারী অফিসে, বাসে ঢিল ছুড়িয়াছে, গোল-যোগ বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সাদিক তখন এক সভায় সাফ বলিয়াছেন যে এদের তিনি দমন করিবেন না। পাকিস্থানের দিক হইতে অলবুর্ক ও দফাই মুজাহিদ পঞ্চাশ হাজার হানাদার কাশ্মীরে পাঠানোর প্রোগ্রাম লইয়াছে, অনেকেই আসিয়া গিয়াছে। আর আসামে? মাত্র কয়েক মাসে ভারত সরকারের হাতে ১৫০০ হানাদার ধরা পড়িয়াছে—তার দশগুণ অর্থাৎ পনেরো হাজার হানাদার গত ছয় মাসের মধ্যে আসামে আসিয়া

আত্মগোপন করিয়া আছে বলিয়া সরকার মনে করে। আসামের মুসলমান নেতারা, কংগ্রেসের কয়েকজন চাঁই ও বিশেষত কমিউনিষ্ট নেতারা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আমেদ এদের আশ্রয় দিতেছেন বলিয়া আসামের রাজ্যপাল বি কে নেহরু দিল্লীতে খবর পাঠাইয়াছেন। গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও ত্রিপুরা হানাদারে ছাইয়া গিয়াছে। রেলমন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দ পার্লামেন্টে বলিয়াছেন যে এন এফ রেলওয়ের কর্মচারীদের দিয়া যারা ধর্মঘট করাইয়া আমাকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করাইয়াছিল তাদের মধ্যে বিদেশী চর আছে। পাকিস্থানী টাকাও ধর্মঘটের পক্ষে ব্যয়িত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেও যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আসিতেছে। তাদের সঙ্গে যে কত পাকিস্থানী গুপ্তচর ও হানাদার আসিতেছে তার কি ঠিক আছে ?

১৯৬৫ সালের ভারত আক্রমণের আগে এপ্রিল মাসে আয়ুব খান মস্কো গিয়াছিলেন। আয়ুব ভারত আক্রমণ করিলে রাশিয়া যেন নিরপেক্ষ ভূমিকা নেয় এ বন্দোবস্ত তিনি সেখানে করিয়া আসিয়াছিলেন। এবারেও ইয়াহিয়া খান মস্কো গিয়া রাশিয়ার নেতাদের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি করিয়া আসিয়াছেন। রাশিয়া পাকিস্থানকে অস্ত্রশস্ত্র জোগাইয়া যাইতেছে অস্ত্রগুলি ভারতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে বলিয়া।

এই সব লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে পাকিস্থানে নির্বাচনের আগে একটা বড় রকমের ঝড় উঠিবে, যার ফলে হিন্দু বিতাড়ন ছাড়াও ভারত আক্রমণের কর্মসূচী লইতে হইবে বলিয়া পাক সরকার মনে করে। শেখ মুজিবর রহমানের মতো নেতারা দেখিতেছেন যে নির্বাচন বাতিল করার জন্য ইয়াহিয়া খান সকল ঘৃণ্য পন্থার আশ্রয় লইবেন। মুজিবর তাই মুসলমানদের আহ্বান জানাইয়াছেন যে প্রাণ বিসর্জন দিয়াও যেন তারা হিন্দুদের ধন প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে, হিন্দুরা যেন দেশত্যাগী না হয়। কতটা তিনি সফল হইবেন জানি না। তাঁর যত আন্তরিকতাই থাকুক যুদ্ধ ব্যাপারে তাঁর পক্ষে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না।

সাময়িকী

আপনারা প্রস্তুত থাকুন

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রখ্যাত সি পি এম নেতা (আমাদের প্রাক্তন ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী) শ্রীল শ্রীযুক্ত রামবল গোঁয়ার এক প্রকাশ্য সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে –"হয়ত বা অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলার জনগণকে ভিয়েতনামের মত লড়তে হতে পারে। কেননা কেন্দ্রীয় সরকার এখানে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতে উদ্যত হয়েছেন।" শ্রীগোঁয়ার মহাশয়ের এই প্রকার হুমকী এই প্রথম নহে। বলা বাহুল্য, জনগণও তাহার মত তথাকথিত নেতার কথার কোন মূল্য আজকাল আর দেয় না। শ্রীগোঁয়ারের শ্রীমুখে গণতন্ত্রের কথা অতি বেমানান। যে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সি পি এম হঠাৎ আদাজল খাইয়া বিষম হট্টগোল সুরু করিয়াছে, সেই গণতন্ত্রকে হত্যা করিয়া 'সি পি এম তন্ত্র' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সবাই জানেন আর এই কট্টর কম্যু-মার্কা গণতন্ত্র যে কি বিষম তন্ত্র তাহাও সকলের জানা আছে। আজ একবার সোঃ-রা-শিয়া, চীন, পোলাণ্ড, ইঃ-জার্ম্মান এবং অন্যান্য কম্যুশাসিত রাষ্ট্রগুলির প্রতি ভাল করিয়া দৃষ্টিদান করিয়া দেখুন, সেখানে সাধারণ জনগণের অবস্থা কি এবং কোন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে কতটুকু কি আছে। এই সব রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের নামে চলিতেছে মাত্র জনকয়েক নেতার স্বেচ্ছা-শাসনের নির্ম্মম পরিহাস!

শ্রীগোঁয়ার ত যুদ্ধের হুমকী দিয়াই সার্থক কম্যুনেতার কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই ভিয়েতনামী নকলী যুদ্ধটা করিবে কোন জনগণ সি পি এম বাহিনীতে বোধহয় কমবেশী পাঁচ লক্ষ বরকন্দাজ আছে—ইহারাই কি পশ্চিমবঙ্গের 'জনগণ'? এ-রাজ্যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বাহিনীগুলি গোঁয়ার ঘোষিত জন যুদ্ধে কখনই যোগ দিবে না অন্য পার্টির বরকন্দাজ বাহিনী সি পি এমের বিরুদ্ধেই যাইবে, ইহাও নিশ্চিত। তাহা হইলে গোঁয়ার যে জন যুদ্ধের আহ্বান দিতেছেন তাহা শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এক বিষম দলীয় যুদ্ধের রূপ লইতে বাধ্য।

"জনযুদ্ধ" যদিও বা ঘটে, সেই ক্ষেত্রে কম্যুনেতারা —বিশেষ করিয়া সি পি এম "কোসিগীন" কমরেড বাসু, 'ব্রেজনেভ' কমরেড দাশগুপ্ত এবং পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গোঁয়ার—যুদ্ধটা লাগাইয়া দিয়াই নিরাপদ আশ্রয়ে গা-ঢাকা দিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতে থাকিবেন, কারণ রণক্ষেত্রে ইহারা আসিতে পারেন না, সাহসও করেন না। জনগণের জন্যই তাহাদের বাঁচাটা একট Must। ভ্যালারে নন্দলাল!

সমাজতন্ত্র সার্থক করিতে বেসরকারী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ—তারপর দেড়বৎসর

প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে ইন্দিরা মার্কা নিও সোস্যালিজম সার্থক করণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিস্তর ঢাক-ঢোল কাঁসি সানাই বাজাইয়া এবং ধানাই পানাই করিয়া চৌদ্দটি প্রধান ভারতীয় ব্যাঙ্ক সরকারী আওতায় চালান করা হয়। ইন্দিরা ঠাকুরাণী ভারতে তাঁহার নূতন সোস্যালিজম চালু করিতে এতই ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করেন যে সংসদের বৈঠকের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ কার্য সমাধা করা হয় কাজটা এমন দ্রুততার সঙ্গে করা হয় যেন আর দিন দুইচার বিলম্ব হইলে দেশ রসাতলে যাইত এবং দেশবাসীর সর্ব্বনাশ হইত সব দিক হইতে!—এ বিষয়ে বলেন আনন্দবাজার :—

"সুপ্রীম কোর্টের রায়ে প্রথম অর্ডিনান্স বাতিল গেলেও সরকার নিজেদের মত পালটান নাই আর একটা অর্ডিনান্স জারি করিয়া ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখিয়াছিলেন। পরে অবশ্য সে অর্ডিনান্স সংসদের অনুমোদন লাভ করিয়া পাকাপাকি আইনে পরিণত হইয়াছে। যত তাড়াহুড়া করিয়া আইন পাস করা হইয়াছিল তত তাড়াতাড়ি কিন্তু খুঁটিনাটি গুলি সারিয়া লওয়া হয় নাই। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পুরাতন ডিরেক্টর-বোর্ডগুলি সরকারের পরিচালনায় ব্যাঙ্ক আসার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া গিয়াছিল, কিন্তু নূতন পরিচালকমণ্ডলী নিয়োগ করিতে সরকার বিস্তর

টালবাহানা করিয়াছেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে একজন করিয়া অছি সরকার সঙ্গে-সঙ্গেই বসাইয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পুরা পরিচালকমণ্ডলী গঠন করিতে তাঁহাদের এক বৎসর লাগিয়া গিয়াছে। সে পর্ব গত সপ্তাহে মাত্র চুকিয়াছে।

নোঙর-ছাড়া নৌকার মত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি চলিয়াছে এক বৎসর। কোনও মতে দিনগত পাপক্ষয় তাহারা অবশ্য করিয়াছে। কিন্তু সরকারের তরফ হইতে তাহাদের কাজকর্মের যে উজ্জ্বল চিত্র আঁকা হইয়াছিল তাহার কোনও পরিচয় তো এ এক বৎসরে মেলে নাই। রাষ্ট্রের অধীনে আসিলে ব্যাঙ্কগুলি সাধারণ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল সেটা আজও অপূর্ণ রহিয়াছে তো বটেই, ভবিষ্যতেও কখনও যে পূর্ণ হইবে তাহার সম্ভাবনাও তো দেখা যায় না। ব্যাঙ্কগুলি আজ সরকারী প্রতিষ্ঠান, কাজেই লালফিতার ফাঁস তাহাদের গলায় ক্রমেই আঁটিয়া বসিতেছে। তাহার ফল ভুগিতেছেন ব্যাঙ্কের সঙ্গে যাঁহাদের লেনদেন আছে তাঁহারা। ব্যাঙ্কের কাজে প্রতি মুহূর্তে যদি নিয়মকানুন হাতড়াইতে হয়, একজনের টেবিল হইতে আর এক জনেরটেবিলে যদি ফাইল চালাচালি করে তাহা হইলে ব্যাঙ্কের কারবারই বন্ধ হইয়া যাইবে। আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আর যাহাই চালানো যাক, ব্যাঙ্ক চালানো চলে না। সেখানে দরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত লওয়ার ক্ষমতা, দূরদৃষ্টি, তৎপরতা ও উদ্যোগ; আমলাতন্ত্রের ঠিক ওই সব গুণেরই একান্ত অভাব।

শোনা যাইতেছে রষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। কাহাকেও কাহাকেও তুষ্ট করিতে না পারিলে নাকি ব্যাঙ্কের দক্ষিণা মেলে না। এসব বালাই আগে কিন্তু ছিল না। এখন যদি ওগুলি দেখা দিয়া থাকে তাহাতেও অবাক হইবার কিছু নাই, কেননা আমলাতন্ত্রের সঙ্গে দুর্নীতির তো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর খাতকদের দাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির নীতি। কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, স্বাধীন পেশার লোক, ছোট দোকানদার—ইহাদের প্রয়োজন মিটাইবার দায়িত্ব তাহারা লইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজন কি সত্যই মিটিয়াছে? খাতাপত্রে অবশ্য দেখা যাইবে বেশ কিছু টাকা কৃষি-ঋণ বাবদ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি মঞ্জুর করিয়াছে। কিন্তু সে টাকার কতটা সত্যকারের চাষীর হাতে পৌঁছিয়াছে তাহার হিসাব কেহ কি রাখে? রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আনুকূল্য পাইয়া কয়টা ছোট দোকানদার বড় হইয়াছেন এই এক বৎসরে? অন্তত সাফল্যের পথে পা দিয়াছেন কয়জন? যাঁহাদের স্বাধীন জীবিকা তাঁহাদের কয়জনেরই বা ব্যাঙ্কের দৌলতে বাড়বাড়ান্ত হইয়াছে? অথচ মুশকিলে পড়িয়াছেন তাঁহারা যাঁহারা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইয়া কাজকারবার এতদিন চালাইয়া আসিয়াছেন। আর আজ পড়িয়াছেন বঞ্চিতদের দলে।

ব্যাঙ্কের সাফল্যের মাপকাঠি আমানতের পরিমাণ। যে ব্যাঙ্কের উপর লোকের যত বেশী বিশ্বাস তাহার আমানত তত দ্রুত বাড়িয়া যায়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানত গত এক বৎসরে ২৯৭.৯ কোটি টাকা বাড়িয়াছে বলিয়া আনন্দে নৃত্য করার কোনও হেতু নাই। কেননা আগের বৎসর যে আমানত বাড়িয়াছিল ৩৩৪ কোটি টাকা অর্থাৎ হারটা কমিয়াছে। নিশ্চয়ই সেটা শুভ সঙ্কেত নয়। কাজের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বিস্তর শাখা অফিস খুলিয়াছে। যে সব অঞ্চলে ব্যাঙ্কের নামও লোকে শোনে নাই সেখানেও নূতন শাখা চালু হইয়াছে, এমনই করিয়া নাকি অবহেলিত গ্রাম-অঞ্চলে সমৃদ্ধির চাবিকাঠি সরকার নিজে পৌঁছাইয়া দিতেছেন। উত্তম কথা। কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে কেমন যে একটা গরমিল দেখা যাইতেছে। বিস্তর অখ্যাত শহরে বা গণ্ডগ্রামে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সাইনবোর্ড দেখা দিয়াছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক চালাইবার লোক কোথায়। ব্যাঙ্কের অছিরা দুঃখ করিতেছেন নানা প্রলোভন দেখাইয়াও তাঁহারা ব্যাঙ্কের গ্রামীণ শাখায় লোক পাঠাইতে পারিতেছেন না। অনেক কর্মী গ্রামে বাস করিতে নারাজ। সব মিলাইয়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রসার তাই এক প্রহসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

কেন্দ্র সরকার বিস্তর ঘটা করিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির শাখা গ্রামাঞ্চলে বাড়াইয়া যাইতেছেন এবং আজ পর্যন্ত বোধহয় ১৭৬০টি শাখা এইভাবে স্থাপিত হইয়াছে। ভাল কথা, কিন্তু এক একটি শাখার মাসিক কম সে কম খরচা কত হইবে তাহা সরকার গোপন রাখিয়াছেন। ১০,০০০ হাজার লোক বাস করে এখন এমন সবগ্রামে ব্যাঙ্কে যে টাকা আমানত পড়িবে তাহাতে কি শাখার ন্যূনতম ব্যয়ও মিটিবে? 'পরের ধনে পোদ্দারী করা' একটা কথা আছে কিন্তু এ ক্ষেত্রে নেহাত অশিক্ষিত পোদ্দারের যে বুদ্ধি বিবেচনা আছে সরকারের তাহারও অভাব দেখা যাইতেছে।

দেশ-বিদেশের কথা

হরতালের মূল্য বিচার

আজকাল কথায় কথায় হরতাল ঘোষণা করা হয়। ইহার এখনকার নাম হইয়াছে "বন্ধ"। কারণে অকারণে এই বন্ধ সেই বন্ধ করিয়া জনসাধারণের অসুবিধা ও ক্ষতি করিয়া রাষ্ট্রীয় দলের লোকেরা নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। মহাত্মা গান্ধী দুইপ্রকার "বন্ধ"এ বিশ্বাস করিতেন। এক খাওয়া বন্ধ ও দুই মুখ বন্ধ। কিন্তু এখনকার সস্তার নেতাদিগের খাওয়া বা কথা কখন বন্ধ হয় না। খানাপিনা বাতাবাতির উপরেই তাঁহারা চলিয়া থাকেন। জনসাধারণ তাঁহাদিগের হরতাল ও বন্ধ বিষয়ে কিরূপ মনোভাব পোষণ করেন তাহা "ময়ূরাক্ষী" পত্রিকার নিম্নে উদ্ধৃত "গরীবমারা হরতাল" শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ হইতে কিছুটা জানা যায়।

গত ১৪ই জুলাই সারা পশ্চিমবাংলার অধুনালুপ্ত যুক্তফ্রন্টের ৬ পার্টি+৮ পার্টি হরতাল ডেকেছিল। দাবী ছিল কেন্দ্রিয় পুলিশ উঠিয়ে নাও, বিধানসভা ভেঙ্গে দিয়ে আবার ভোট কর ইত্যাদি। মোটামুটি হরতাল হয়েছে কারণ হরতালের উদ্যোক্তা কাঠ-বিপ্লবীদের ভয়ে বা শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায়। সিউড়ী শহরে দেখা গেছে দোকান পাট বন্ধ ছিল, বিকালের পর আস্তে আস্তে খোলে। বাধা পাওয়া সত্বেও রিক্সা চলেছে, নইলে তারা খাবে কি? অবশ্য রোজগার তেমন হয়নি। বাইরের লোক আসেনি। কালেক্টরী সহ অনেক অফিস চলেছে কোর্ট কাছারী আংশিক হয়েছে কারণ বহু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী এ হরতালকে সমর্থন করেনি। তারা বলেছে এ হরতাল পার্টি স্বার্থে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে নয়। পিকেটিং হওয়ার জন্য ডাক ও তার বিভাগ সহ কয়েকটি অফিস বন্ধ ছিল, টেলিফোনও প্রায় অচল। ট্রেন চলেনি ক্ষতির আশঙ্কায়।

হরতালে লাভ হল কাদের? যারা দলীয় রাজনীতি করে এবং যাদের কাছে দেশের চেয়ে দল বড়, তাদের। একদিনের হরতালে দেশের কয়েক কোটি টাকার সম্পদ সৃষ্টি হয়নি, কল-কারখানা বন্ধ করার জন্য। স্থায়ী চাকুরে বাবুদের, হরতাল যারা করেছেন তাদের, হরতালের দিন মাইনে কাটা যাবে না। এবং তারা কেউ অভুক্তও থাকেন নি। উল্টো দিকে যারা রোজ আনে রোজ খায়, দিন মজুর আর ফিরিওয়ালা, সব্জি-ওলা, রিক্সাওলা প্রভৃতি প্রায় সবাই এদিন খেতে পায়নি কারণ রোজগার হয়নি পয়সা নাই। এদেরও চেতনা এসেছে। এরাও বলছে—হরতাল আর করা চলবে না। হরতাল বাবুরা অন্য রাস্তা ধরুণ, নইলে আমরাও অন্য রাস্তা ধরবো তার সন্ধান পেয়েছি। হরতাল বাবুরা সারাদিন খেয়েদেয়ে হরতালের বিপ্লব করবেন, আর আমরা খেতে পাব না এ জিনিস আর চলবে না। কয়েকজন গরীব রিক্সাওয়ালা বললো হরতাল বাবুরা যদি রোজ ৫ টাকা করে আমাদের দেন তবে আমরা এবার থেকে হরতাল করবো নইলে নয়। এ গরীব মারা হরতাল আমরা সমর্থন করি না, তবে বিপ্লব চাই।

সে বিপ্লবের পথ কি গদীলোভী তথাকথিত বিপ্লবীরা দেখাবেন! না এদের মতিচ্ছন্ন ঘটেছে! তাই বিপ্লবের নতুন পদক্ষেপ শোনা যাচ্ছে দেশময়। সে বিপ্লব আসবেই।

রেলভাড়া হ্রাস আন্দোলন

আসামের ব্যবসায়ীগণ মাল বহনের রেলভাড়া কমাইবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন। রেলভাড়া হ্রাস করিলে উৎপাদন কেন্দ্র হইতে দূরের বাজারে মাল বিক্রয় করিতে সুবিধা হয় বলিয়া মাশুল কমাইলে স্থানবিশেষের ব্যবসায়ীদিগের লাভ হয়। কিন্তু তারও

সরকারের এই উদ্দেশ্যে মাশুল হ্রাস করিবার ইচ্ছা হইলে রেলের কর্তৃপক্ষের দেখিতে হইবে যাহাতে ঐরূপ মাশুল হ্রাসের ফলে আসামের ব্যবসায়ীদিগের বিক্রয় বৃদ্ধি হইয়া অপর প্রদেশের ব্যবসায়ীদিগের মাল বিক্রয় কমিয়া গিয়া তাহাদিগের ক্ষতি না হয়। কারণ ভারত সরকার রেলের ভাড়া ও মাশুল প্রভৃতি স্থির করিবার সময় নিরপেক্ষভাবে সেই কার্য্য করিবেন ইহাই সকল প্রদেশের চাওয়া স্বাভাবিক হইবে। আসাম হইতে চা অথবা অন্য কোন বিক্রয় বস্তু সস্তায় দূরদেশে পাঠাইবার সুবিধা করিয়া দিয়া যদি জলপাইগুড়ি অথবা দার্জ্জিলিং এর চা বা অপর বস্তু বিক্রয় কমিয়া যায় তাহা হইলে সেইরূপ ব্যবস্থা আপত্তিজনক হইবে। ভারত সরকার কলিকাতা বন্দরের ক্ষতি করিয়া কান্দলা অথবা পারাদ্বীপ বন্দরের উন্নতি সাধন চেষ্টা করিতে অপারগ নহেন। তেমনি ভারত সরকারের পক্ষে রেলের মাশুল বাড়াইয়া কমাইয়া কোন প্রদেশের ব্যবসার ক্ষতি করিয়া অপর কোন প্রদেশের ব্যবসায়ীদিগের লাভের ব্যবস্থা করাও অসম্ভব নহে। সুতরাং যখনই রেল মাশুল বৃদ্ধি বা হ্রাসের কথা হয় তখনই সকল প্রদেশের শাসকদিগের নিজ নিজ প্রদেশের স্বার্থ রক্ষার কথা বিচার করিয়া সেই মাশুল পরিবর্তন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা আবশ্যক। বাংলাদেশে এখন কোন নিজস্ব শাসকগোষ্ঠী এই কার্য্য করিতে পারিবে না কারণ বাংলা এখন দিল্লী হইতে শাসিত হইতেছে। এই সুযোগে যদি বাংলার ক্ষতিকর নানান ব্যবস্থা রেল কর্তৃপক্ষ করিয়া ফেলেন তাহা হইলে সেই কার্য্যের যথাযথ সমালোচনা বাংলা সরকার করিতে নাও পারেন। এমত অবস্থায় বাংলার দেশবাসীদিগের কর্তব্য অধিক সজাগ হইয়া সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করা। রাষ্ট্রীয় নেতাদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ দিল্লীর কথায় উঠেন বসেন। তাঁহারা কে তাহাও দেশবাসী ঠিক জানেন না। সুতরাং রাষ্ট্রীয় দল অথবা তাহার কোন সভ্যের উপর নির্ভর করা ঠিক নিরাপদ নহে। আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা স্বাবলম্বন। দেশবাসী দল গড়িয়া নিজেদের ভবিষ্যত পরহস্তগত করিয়াই আজ একটা মহা বিপদসঙ্কুল অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছেন।

মুসলমানদিগের নিরীশ্বরবাদী প্রীতি

মুসলমানদিগের ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্বন্ধে জগতের কোন লোকেরই কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঈশ্বর ভক্তির জন্য মুসলমান ধর্মাবলম্বিগণ বিশ্ববিখ্যাত। তাহারা ধর্মের জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য কত যুদ্ধ করিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে ও কষ্ট করিয়াছে তাহার হিসাব করা যায় না। কিন্তু বর্তমান যুগে মুসলমানদিগের সেই ধর্মপ্রাণভাবে কোথাও কোথাও এরূপ অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে যে তাহার কোন অর্থ কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। যথা যখন ভারত বিভাগ করিয়া মুসলমানদিগের জন্য একটি ভিন্ন "পবিত্র" রাষ্ট্র "পাকিস্থান" গঠন করা হইল তখন সেই গঠনের প্রেরণা আসিয়াছিল খৃষ্টান ইংরেজের নিকট হইতে। তৎপরে পাকিস্থান একদিকে অমুসলমান "কাফেরদিগকে, অর্থাৎ শুধু হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভারতীয় লোকেদের, বিতাড়িত করিতে আরম্ভ করিল ও সেই সঙ্গেই নিরীশ্বরবাদী কম্যুনিষ্ট চীন ও রুশিয়ার সখ্যতার আগ্রহে "ব্যস্ত" হইয়া উঠিল। ধর্মরাষ্ট্র গঠন-কারী মুসলমানদিগের এই নিরীশ্বরবাদী প্রীতির আবির্ভাবে বিশ্ববাসী অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন যে সুবিধাবাদ কেমন করিয়া সকল ধর্মের উপরে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হয়। পাকিস্থান বলিবে যে এই প্রকার শুকর মাংস ভক্ষক ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী চীনাদিগের সহিত সখ্য কূটনীতির চরম অভিব্যক্তি-আর কিছু নহে। কিন্তু কূটনীতি একটা রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপার তাহা সাধারণ মানুষের কার্য্যে কখন প্রযুক্ত হয় না। অথচ দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় মুসলমানগণও চেষ্টা করিয়া ভারতের বামপন্থী কম্যুনিষ্টদিগের সহিত মিলিত হইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাম-কম্যুনিষ্টগণ অবশ্য চীনভক্ত ও

তাঁহাদের অনেকেই মাও ভক্ত। কারণটা তাহা হইলে ঐ চীনের সহিত সংযোগই এবং সেই সংযোগের ব্যবস্থা কারক হইল পাকিস্থান। অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমান দিগের কেহ কেহ এবং ভারতের বাম-কম্যুনিষ্ট দল চীন ও পাকিস্থানের সহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্ত উদগ্রীব। এই আগ্রহ উভয় দলের ভারতবাসীর পক্ষেই দেশদ্রোহিতা; কেননা পাকিস্থান ও চীন এই দুই দেশই ভারত শত্রু এবং ভারতের বহুস্থান বেআইনীভাবে ইহারা দখল করিয়া আছে। তাহা ব্যতীত ইহা সর্বজন বিদিত যে ঐ দুই দেশ সকল সময়েই ভারত আক্রমণ ইচ্ছুক। কম্যুনিষ্ট সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয় মুসলমান এবং পাকিস্থানের মুসলমান এক জাতীয়। ভারতে ঐ জাতীয় মুসলমানদিগকে পাকিস্থানের গুপ্তচর ও পঞ্চম বাহিনীর অন্তর্গত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

অতএব ভারত সরকারের কর্তব্য বাম-কম্যুনিষ্ট এবং তাহাদিগের সহচর মুসলমানদিগকে নিজেদের মতলব হাসিল করিতে না দিবার ব্যবস্থা করা। ভারতের নিরাপত্তার জন্তই ইহার আবশ্যক।

পোসাইডন পাশুপতাস্ত্র

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যে ডুবো-জাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত আনবিক হাওয়াই অস্ত্র পরীক্ষা করিয়াছে সেই হাওয়াই বা রকেটাস্ত্রকে পাশুপত অস্ত্র নাম দিলে ভুল হয় না। কারণ পাশুপতাস্ত্র সৃষ্টি ধ্বংশ করিয়া প্রলয়ের সৃষ্টি করিতে সক্ষম ছিল এবং এই অস্ত্রও একাধারে বারটি হাইড্রোজেন বোমা বহন করিয়া সেইগুলিকে দূরে দূরে নানা দিকে নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া ইহার সংহার শক্তি উপাখ্যানে বর্ণিত পাশুপতাস্ত্রেরই সহিত তুলনীয়। রুশিয়া যে সকল আনবিক অস্ত্রনাশ ব্যবস্থা করিয়াছে ও যাহার সাহায্য আগন্তুক আনবিক অস্ত্রগুলিকে লক্ষ্যস্থলে পৌছাইবার পূর্ব্বেই আকাশে নষ্ট করিয়া দেওয়া সম্ভব হয়। আমেরিকা সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কাটাইয়া যাহাতে আনবিক আক্রমণ করা সম্ভব হয় সেই জন্ত এই পোসাইডন রকেট নির্ম্মাণ করিয়াছে। অতঃপর রুশিয়াকে আত্মরক্ষার অপর ও নূতনতর উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। তাহা সম্ভব না হইলে আনবিক অস্ত্র ব্যবহার নিরোধ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইবে।

কমনওয়েল্‌থ্‌ ক্রীড়া প্রতিযোগীতা

এডিনবরা শহরে যে বৃটিষ কমনওয়েল্‌থ্‌ অন্তর্গত দেশগুলির নানান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে ভারত কুস্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কমনওয়েল্‌থের অন্যান্য দেশের মধ্যে এক পাকিস্থানই কুস্তি প্রতিযোগীতায় ভারতের সহিত সমানে সমান হইতে সক্ষম। অন্য দেশগুলি অপরাপর ক্রীড়াতে কৃতী হইলেও কুস্তিতে কাহারও বিশেষ সক্ষমতা দেখা যায় নাই। সুতরাং কুস্তির প্রতিযোগীতা হইয়াছিল ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যেই। ইহাতে ভারত জয়লাভ করায় সকল ভারতবাসীই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

ভারত সরকার সচরাচর ভারতীয় কোন ক্রীড়া প্রতিযোগীতার দল বিদেশে যাইতে চাহিলে নানাভাবে প্রতিযোগীর সংখ্যা হ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়া ভারতের জয়লাভের সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া থাকেন। ভারত সরকার এইরূপ করিবার কারণ দর্শন করান বিদেশী মুদ্রার ব্যয় সঙ্কোচ করার আবশ্যকতা। ভারত সরকার কিন্তু বহু "প্রতিনিধি"র দলকে বিদেশে পাঠাইয়া অর্থ অপব্যয় করিতে কোনও দ্বিধা করেন না। ঐ সকল ব্যক্তি বিদেশে গমন করিয়া যে ভারতের যশবৃদ্ধির কারণ হইয়া অর্থব্যয় সার্থক করেন, এমন কথাও বলা যায় না। সে যাহা হউক, কুস্তির দল কমাইয়া যে ভারত সরকার এইবারে আমাদের জয়লাভে বাধা দেন নাই তাহার জন্ত আমরা ভারত সরকারের সুবুদ্ধির প্রশংসা করিতেছি!
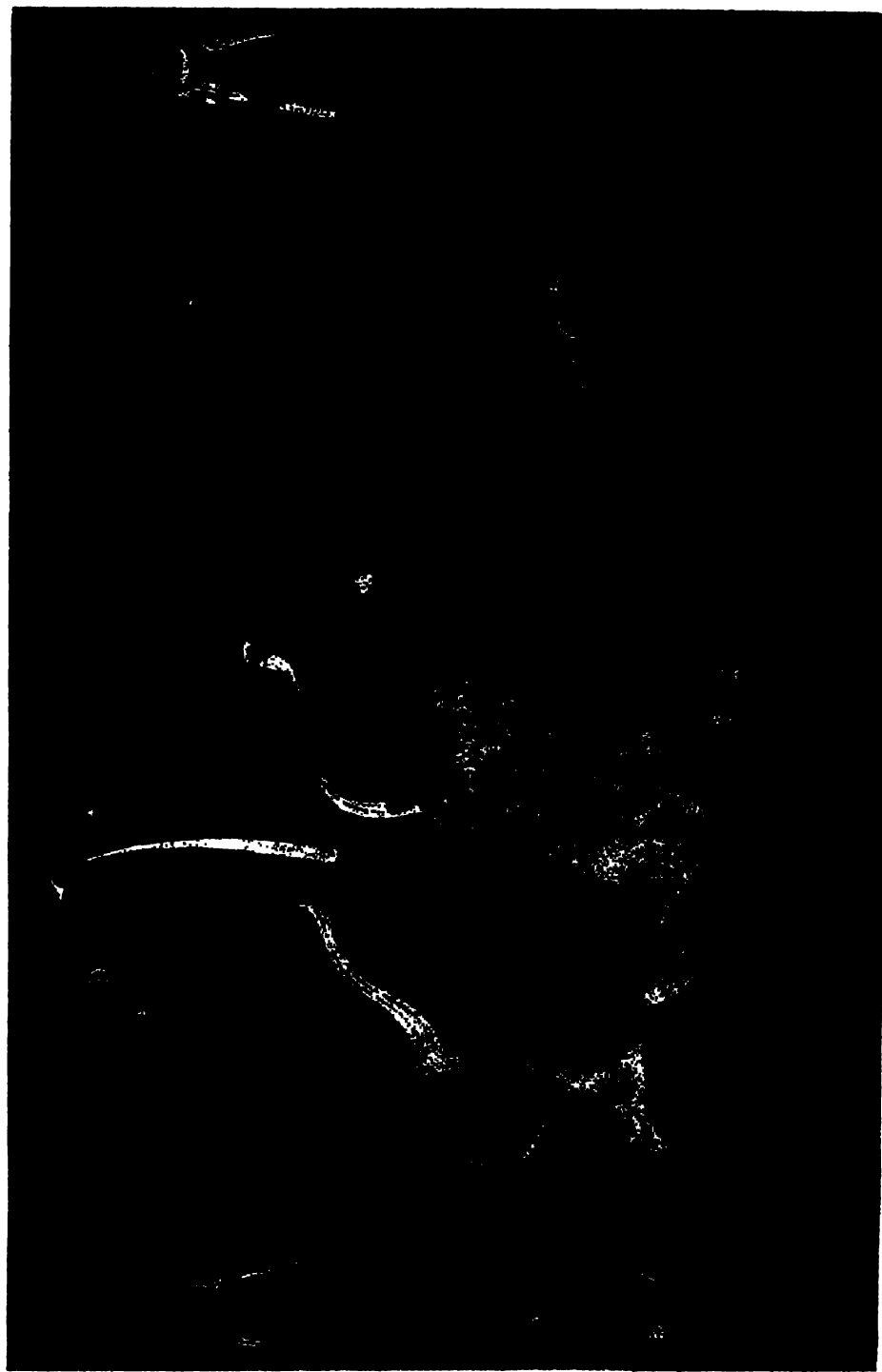
মহিষমর্দ্দিনী

শিল্পী : শ্রীপ্রভাতেন্দুশেখর মজুমদার

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭০তম ভাগ
প্রথম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৭৭

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বন্যা

কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বাংলা দেশের অনেক অঞ্চল বন্যা বিধ্বস্ত হওয়াতে দেশবাসীর অবস্থা অত্যন্তই বিপন্ন হইয়াছে। কয়েকদিন ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে নদীর জল সর্বত্র ফাঁপিয়া উঠিয়া মাঠের জল নিঃসরণ অসম্ভব করিয়া তোলে ও ফলে ধানক্ষেত অপরাপর আবাদের জমি ও গ্রামের পথঘাট গৃহাদি অংশতঃ বা সম্পূর্ণরূপে জলের তলায় চলিয়া যায়। অনেক জেলার নদীপার্শ্বস্থ অংশ এখনও বন্যার জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। জল যে বৃষ্টিপাত থামিয়া যাইবার পরেও নামিয়া যাইতেছে না ইহার কারণ নদীর জল স্ফিতি অন্য কারণে হ্রাস হইতেছে না। ভারতের সেচন ও বন্যার নিরোধ উদ্দেশ্যে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ বাঁধ গঠন করা হইয়াছে সেই বাঁধগুলির পিছনে রহিয়াছে বহু বর্গমাইল জুড়িয়া কৃত্রিম হ্রদের মত বিরাট বিরাট জলাশয়। এই বৃষ্টিপাতের ফলে সেই সকল জলাশয়ে এত অধিক জল জমিয়াছে যে বাঁধগুলি জলের চাপে ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই জন্য সকল বাঁধ হইতেই জল ছাড়া হইতেছে। অর্থাৎ বরাকর, দামোদর, অজয়, কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতির জলধারা বৃষ্টির দ্বারা পুষ্ট না হইলেও তিলাইয়া, মাইথান, পাঞ্চেত, দুর্গাপুর ইত্যাদি বিভিন্ন বাঁধের ছাড়া জল পাইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে এবং ফলে ঐ সকল অঞ্চলের বন্যার জল নদী-পথে বাহির হইয়া যাইতে পারিতেছে না। অর্থাৎ বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা বন্যা নিবারণ না করিয়া বন্যা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়া দামোদর ভ্যালি প্রজেক্টের অপযশের কারণ হইয়াছে। বিদেশী বন্যা নিরোধ

ব্যবহার অন্ধ অনুকরণ করিতে গিয়া ভারতের রাষ্ট্রনেতাদিগের এই যে শত শত কোটি টাকা অপব্যয়ের কাহিনী ইহাদ্বারা ঐ সকল নেতাদিগের সুনাম রক্ষা করা সহজ হইবে না। এই আক্কেল সেলামী দিবার পরেও যে তাঁহারা টেনেসি ভ্যালি অর্থারিটির মোহমুগ্ধ ভক্তের পদত্যাগ করিয়া নিজদেশের কোন পুরাতন প্রেরণা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন এরূপ আশা করাও নিরাপদ হইবে না। কারণ আমাদের রাষ্ট্র নেতাগণ বিদেশী সভ্যতা ও জ্ঞান সম্বন্ধে যত অধিক অজ্ঞ তাঁহাদের বিদেশ ভক্তি ততই প্রবল হইয়া উঠে। এই দোষ না থাকিলে তাঁহাদিগকে বুঝান সম্ভব হইত যে পূর্ব্বকালে বন্যা নিরোধ অন্য উপায়ে করা হইত। বর্ষার ফলে যখন নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া প্রায় তীরে উঠিবার মত হয় তখন সেই জল পূর্ব হইতে কাটা উচ্চতল খাল বাহিয়া এক একটা বৃহৎ জলাশয়ে জমা হয়। জলাশয়ের জল যথেষ্ট জমা হইলে পরে সেই জল কাটা নালা দিয়া আরও অন্য জলাশয়ে লইয়া যাওয়া হয়। এইরূপে দেশের সর্ব্বত্র ভিন্ন ভিন্ন বৃহৎ জলাশয়ে বর্ষার জল জমান হয় ও পরে সেই জল সেচনে ব্যবহার হয়। বন্যা নিরোধ ও সেচন ব্যবস্থা এইভাবেই পূর্ব্বযুগের নৃপতিগণ করিতেন। বিষ্ণুপুর রাজ্যের অন্তর্গত সপ্তভূমির সর্ব্বত্র শত শত জলাশয় শুকাইয়া যাইলেও এখন প্রত্যক্ষভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে পুনঃপরিচালিত করিবার চেষ্টা করিলে মনে হয় তাহা করা অসম্ভব হইবে না। উপরন্তু এই উপায়ে জল সঞ্চয় করিলে তাহাতে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেশ ভাসিয়া যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। কয়নার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাহা ঘটিয়াছিল তাহা দ্বারা বাঁধ ভাঙ্গার ভয়াবহতা উত্তমরূপে উপলব্ধি করা যায়। বর্ষার প্রকোপে বাঁধ ভাঙ্গিলে তাহার ফল আরও ভয়ানক হইবে কারণ ভূমিকম্পে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যতটা জল তোড়ে বাহির হইয়াছিল বর্ষার জন্য তাহা হইলে জলের তোড় আরও অনেক প্রবল হইবে।

বর্ষার জল যদি বৃহৎ বৃহৎ বাঁধ হইতে বাহির করিয়াই দিতে হয় তাহা হইলে জল সঞ্চয়ের কার্য্য ঐ প্রকার বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া সুসাধিত হইতে পারে না। উপরন্তু জল ছাড়িয়া দিবার প্রয়োজনে বন্যা নিরোধ কার্য্যও উপযুক্তরূপে করা হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য আদর্শের পরিকল্পনা যখন সক্ষম হইতেছে না তখন পুরাকালের রীতি অনুসরণ করিলে কোন দোষ হইবে না। এই কথা বহুবৎসর ধরিয়া বলা হইতেছে কিন্তু তাহা শুনিয়া কেহ কোন নূতন পন্থা অবলম্বন করিতেছেন না। এইবার শুনা যাইতেছে যে বন্যার লোকসান কয়েক শত কোটি টাকাতে দাঁড়াইবে। সুতরাং বন্যা নিরোধ ব্যবস্থার নূতন আয়োজনে যদি টাকা লাগে তাহাতে আপত্তি করা কাহারও পক্ষে সমীচীন হইবে না। কিন্তু তাহা করা হইবে কি?

কলিকাতার অবস্থা যাহা হইয়াছিল তাহাও বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া ভবিষ্যতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বহু প্রথম শ্রেণীর রাজপথের উপর নির্ম্মিত প্রাসাদ সদৃশ গৃহের একতালা পূর্ণরূপে জলের তলায় চলিয়া গিয়াছিল। কয়েক সহস্র মোটরগাড়ি জলে ডুবিয়া থাকার ফলে বেকার হইয়া যায় ও পরে সেগুলি অনেক অর্থব্যয় করিয়া পুনরায় চালাইবার উপযুক্ত করা হয়। কলিকাতার রাস্তা ঘাট হইতে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে করা হইলে তাহার ব্যয়ভার কলিকাতাবাসীদিগকেই বহন করিতে হইবে। এবং মনে হয় যদি আদায় করিয়া টাকা চুরী বা অপব্যয় করা না হয় তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই নূতন ও বৃহত্তম জল যাইবার ভূগর্ভস্থ নালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া ফেলা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না যে কোন নূতন ব্যবস্থা কেহ করিবে। কারণ এ দেশে প্রাচীনকাল হইতেই কথা বলিয়াই সকল কর্ম্মের প্রচেষ্টা শেষ হইয়া যায়। আমরা কর্ম্মক্ষমতা অথবা কর্ম্মের ইচ্ছা কাহার আছে কাহার নাই তাহা কখনও বিচার করি না। দেখি কে বৈষ্ণব বা কে শাক্ত। কিম্বা কে গান্ধীভক্ত অথবা মার্কস মাও এর পরম অনুগত। রাস্তা মেরামত বা নালার জল বাহির করার কথা ছোট কথা;

অন্তরের প্রেরণা যাহাদের অত্যুচ্চ ও মহাপ্রগতির পরিচালনার মূলশক্তি তাহারা সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতে পারে না।

কিন্তু আমরা দেশবাসীরা রাজস্ব দিয়া প্রাণপাত করি কেন? সহরের মিউনিসিপালিটিকেই বা টাকা দিয়া নিঃসম্বল হই কেন? যদি উচ্চাঙ্গের রাজনীতি বা সমাজ দর্শনের তথ্য বিচার করাই খাজনা মাশুল ও রাজস্ব দিবার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সে ব্যবস্থা ত অনেক অল্প-ব্যয়ে করা যাইতে পারে। শতকরা পঞ্চাশ-ষাট টাকা আয়কর দিয়া দিল্লীর বক্তৃতা শুনা এবং বাড়ীর আয়ের টাকার চার আনা হইতে দশআনা অবধি মিউনিসি-পালিটিকে দিয়া হাঁটুজলে বাস করিয়া কলিকাতার রাষ্ট্রীয় পণ্ডিতদিগের বুকনি শুনিয়া দিন কাটাইবারই বা কি সার্থকতা থাকিতে পারে? বিবেকানন্দের যুগ হইতেই কর্মচারিদিগের কথা শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা কোথায়? বাক্যবীর ও বাক্য-বাগীশ-দিগেরকথার তোড়ে দেশবাসীর জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে।

আর একটি নূতন রাষ্ট্র-তীর্থ

রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাঁহারা শুধু কথা বলিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন তাঁহারা নিত্য নূতন স্থান মাহাত্ম্যের সৃষ্টি করিতে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইতিহাসে ঐ জাতীয় মানুষ যুগে যুগে সর্ব্বদেশেই দেখা গিয়াছে। সকলের কথা লিখিতে হইলে কয়েকখণ্ড বৃহদাকার গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইবে। কিন্তু সকলের কথা না বলিয়া শুধু যদি বিগত পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের ইতিবৃত্ত লইয়াই আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে বহুবার বহুস্থানে বহুব্যক্তি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, সকল যুদ্ধের অবসান করা, দারিদ্র্য নির্ম্মূল করণ, কোন জাতির অপর জাতির উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার বন্ধ করা, অর্থ নৈতিক শোষণ নিবারণ ইত্যাদি কত কিছুই যে সাধিত করিবার কথা উঠাইয়াছেন তাহার পূর্ণ বর্ণনা এস্থলে করা সম্ভব নহে। জিনিভাতে লীগ অফ নেশন্‌স্‌ হেগের আন্তর্জাতিক আদালত, জিনিভাও ওয়াশিংটনে ইউনাইটেড নেশনস্‌, নিকোসিয়া, কলম্বো, ম্যানিলা, তাসখন্দ প্রভৃতি এত স্থানের খ্যাতি সময়ে অসময়ে বিশ্ব সভ্যতার বিস্তার ও গঠন ক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছে যে সকল স্থানের নাম একত্র করিলে একটা ভূগোলের পুস্তক লিখিত হইয়া যায়। কিন্তু যে সকল বাণী ঐ সকল স্থানে উচ্চারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই শুধু কথাই থাকিয়া গিয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ কিছু কাজ কোথাও হয় নাই। সম্প্রতি যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লুসাকাতে উচ্চশিখর সভা (Summit) করিয়া আসিলেন তাহাও মনে হয় শুধু কথাতেই শেষ হইবে। কারণ যুদ্ধ এমনই ন্যায় অন্যায় বিচার বর্জ্জিত প্রলয় কাণ্ড যে যদি যুদ্ধ সেভাবে কখনও হয় তাহাহইলে তাহার বিস্তার কেহ রোধ করিতে পারিবে না। পূর্ব্বকালেরও যুদ্ধের প্রাবল্যে বহু সন্ধিই" কাগজের টুক্‌রা মাত্র বলিয়া (Scrap of paper) উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ও যুদ্ধ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শক্তিহীন রাষ্ট্র সংঘের পক্ষে "আমরা কোন দলের নই" বলিলে তাহার কোনই মূল্য থাকে বলিয়া মনে হয় না।

আফ্রিকার যে সকল রাষ্ট্র ঐ আন্তর্জাতিক নির্দলীয় সংঘের "উচ্চ শিখরে" বসিয়া উচ্চ আদর্শ আওড়াইলেন তাঁহাদের মধ্যেই যে কেহ কেহ পরস্পরকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসিবেন না ইহাই বা কে নিশ্চয়তার সহিত বলিবে? আর যদি একটি রাষ্ট্র অপর আর একটিকে আক্রমণ নাও করে তাহা হইলেও নিজেদের ভিতরেই যে লড়াই বাধিয়া যাইবে না তাহাও বলা যায় না। অর্থাৎ যুদ্ধ যে কোন সময়ে লাগিয়া যাইতে পারে। ইউগোস্লাভ রাষ্ট্রপতি টিটো একটি আগ্নেয়গিরির চূড়ায় বসিয়া আছেন। তিনি খুব সাহসী লোক এবং কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে প্রাণ দিয়া লড়িবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি রুশিয়া তাঁহার দেশ আক্রমণ করে তাহা হইলে তাঁহার দেশের আত্মরক্ষা কঠিন হইবে। সে অবস্থায় শ্রীমতী ইন্দিরা কি রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন? যদি না করেন তাহা

হইলে নির্দলীয় গোষ্ঠীর "উচ্চ শিখরের" উচ্চতা রক্ষা কি করিয়া হইবে?

অর্থাৎ কেহ কাহারও সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না অথচ সকলে উচ্চ শিখরে বসিয়া বৈঠক চালাইবেন এইরূপ ব্যবস্থার নাম কি হইবে? সন্ধি ত নয়; কোন প্রতিশ্রুতিও নাই। দলবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আছে কি নাই বলা যায় না। অথচ সকলেই মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধা। বিষয়টা কিছু জটিল বলিয়া মনে হয়। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের আসরে অত ঢিলা ঢালা নিছক প্রেমের উপর নির্ভর করা চলে না। পাকিস্থান যদি ভারতকে আক্রমণ করে তাহা হইলে পাকিস্থানকে অন্য কোন কোন জাতি সাহায্য করিবে। ভারতের কি অবস্থা হইবে তাহা অনিশ্চিত ও অজানাই থাকিয়া যাইবে। উচ্চশিখর হইতে ভারত বন্ধুরা শুধু তাকাইয়া থাকিবে। হাত তুলিয়া কিছু করিবে না।

শ্রীমতী ইন্দিরা শিখর বৈঠকের দ্বিতীয় দিবসে যে বক্তৃতা দিলেন তাহাতে তিনি বলিলেন যে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জগতে বিপ্লব এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। অর্থাৎ বিপ্লব আরও চলিবে ও চলা আবশ্যক। পরে তিনি বলিলেন যে এই শিখর বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা। বিপ্লব জীবন্ত রাখিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা কেমন করিয়া হইবে সে রহস্যময় গোপন কথাটি শ্রীমতী না বলিয়াই বক্তৃতা শেষ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী লুসাকাতে যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে সকলে বুঝিল যে তিনি বিপ্লববাদী বামপন্থী এবং তিনি ইসরায়েলের সমালোচনা ও নাসেরের প্রশংসা করিয়া নিজের মানসিক অবস্থা আরই পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিয়া দিলেন। তিনি কয়েকবার নিজ পিতার নাম গ্রহণ করিয়া শ্রোতাদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। লুসাকার শিখর বৈঠকের আলোচনায় কি সাধিত হইল তাহা বলা বড়ই কঠিন। বিপ্লব চলিতেই থাকিবে রাষ্ট্র ও অর্থনীতির দুই ক্ষেত্রেই। শান্তিস্থাপন আদর্শও সম্মুখে রাখিয়া ঐ বিপ্লব চালাইতে হইবে। বিপ্লব ও শান্তিস্থাপন এই দুইয়ের মধ্যে বৈষম্য ঘটিলে কোনটিকে রাখিয়া কোনটিকে বিসর্জন দেওয়া হইবে?

শ্রীমতী ইন্দিরা দেশের ভিতরে রাষ্ট্রীয় বিলিব্যবস্থায় শান্তিস্থাপন করিতে পারেন নাই। দলাদলি প্রভৃত পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। বহুস্থলে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইয়াছে। আন্তর্জাতিক আসরে যদি ঐ অবস্থাই হয় তাহা হইলে শিখর বৈঠকের শান্তির আদর্শ বিপ্লবের ঝড়ে কোথায় উড়িয়া যাইবে তাহা বলা শক্ত। আর একটা কথা এই যে বিপ্লব ও বামপন্থার শেষ কোথায় তাহা কেহ জানেনা। শ্রীমতী ইন্দিরার বিপ্লবকে নকসালপন্থীরা রক্ষণশীলতা মনে করে। চরম নকসালবাদী যাহারা তাহাদের বিপ্লব কোথায় আরম্ভ কোথায় শেষ হয় তাহা বোধহয় তাহারা নিজেরাও জানেনা। বিপ্লব চির জাগ্রত রাখিতে শ্রীমতী ইন্দিরাকে কোন শক্তি ব্যয় করিতে হইবে না। শান্তিস্থাপনই বিশেষ কঠিন কার্য্য হইবে।

রাজা মহারাজাদিগের মাসহারা প্রভৃতির কথা

ভারতবর্ষের যে সকল রাজা মহারাজাগণ ভারত সরকারের নিকট একটা বৃত্তি, বেতন, লভ্যাংশ বা মাসহারা (যে নামই দেওয়া যাক না কেন) পাইতেন তাহা বন্ধ করিবার জন্য একটা আইন প্রনয়ণ চেষ্টা করা হয়। ঐ আইন ঠিকমত করা যাইল না কারণ রাজ্য সভায় ঐ আইন এক বা দুই ভোটে পাশ হইতে সক্ষম হইল না। ভারত সরকার তখন একটা রাষ্ট্রপতির হুকুম বাহির করিলেন যে রাজা মহারাজগণ অতঃপর আর নিজেদের উচ্চ ও বহু সুবিধাদায়ক পদমর্য্যাদা রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা টাকাত পাইবেনই না উপরন্তু তাঁহাদিগকে আর কেহ রাজা মহারাজাও বলিতে পারিবে না। তাঁহারা অতঃপর শ্রীঅমুক বা শ্রীমতী অমুক বলিয়া পরিচিত হইবেন। এই রাষ্ট্রপতির হুকুমের বিরুদ্ধে রাজা মহারাজাগণ সুপ্রীম আদালতে নালিশ রুজু করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে এই হুকুম অন্যায় মতলব হাসিল করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে ও উহার কোনও ন্যায়সঙ্গত উদ্দেশ্য নাই সুতরাং ইহা রদ হওয়া আবশ্যক। সুপ্রীম আদালত নালিশ

করিতে কোন আইনের বাধা দেন নাই এবং মনে হইতেছে যে নালিশের শুনাইও শীঘ্রই সুরু হইবে। ভারতসরকার ঐ সকল রাজা মহারাজাদিগকে যে সর্ত্তে নিজেদের সকল অধিকার ছাড়িয়া দিতে বলেন ও এতকাল যে সর্ত্তের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ ও অপরাপর সুবিধা দিয়াছেন সেই সকল সর্ত্ত বিনা কারণে অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে ও তাহা সংবিধান বিরুদ্ধ; এই কথাই হইল নালিশের বিষয়। সুপ্রীম আদালত সকল কথা শুনিয়া কি রায় দিবেন তাহার উপরেই রাজা মহারাজাদিগের ভবিষ্যত অবস্থা নির্ভর করিবে।

রাজা রামমোহন রায়ের কলিকাতাস্থ গৃহ

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে রাজারামমোহন রায়ের যে গৃহ ও বাগান আছে তাহা শুনা যাইতেছে কালোয়ার দিগের হস্তে চলিয়া যাইতেছে ও ঐ স্থলে পুরাতন লৌহ ইস্পাত স্তুপাকার করিয়া রাখিয়া কালোয়ারগণ নিজেদের ব্যবসা চালাইবে। রাজা রামমোহনের নাম ক্রমে ক্রমে ঐ স্থলে ভাঙ্গা কাটা ময়লা লোহার পাহাড়ের তলায় বিলুপ্ত হইবে। কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রামমোহন রায়ের দ্বিশত বার্ষিকী জন্মোৎসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে রাধানগরে গমন করেন ও সেইখানে একটা স্মৃতিরক্ষার আয়োজন সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। রাজা রামমোহন রায়ের কর্ম্মজীবনের কেন্দ্র ছিল কলিকাতায় ও উপরোক্ত গৃহটির সহিত তাঁহার কর্ম্মজীবনের স্মৃতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত আছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার জন্য যদি কোন স্মৃতি সৌধ নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে তাহার শ্রেষ্ঠ স্থান হইবে কলিকাতায় এই কারণে যে কলিকাতাই বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর বুদ্ধিমত্তা ও আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রস্থল। কিন্তু, যে কারণেই হউক শ্রীমতী ইন্দিরার পরামর্শদাতাগণ তাঁহাকে গ্রামদেশ রাধানগরে লইয়া গিয়া সেই স্থলে রাজা রামমোহনের স্মৃতি রক্ষার আবশ্যকতা জানাইয়াই নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এইরূপ পরামর্শদাতাগণ অবশ্যই একথা বুঝিতে সক্ষম ছিলেন যে রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি রক্ষা শুধু তাঁহার জন্ম স্থানে একটা মন্দির গাঁথিয়া দিলেই হয় না। তাঁহার কর্ম্মজীবনের কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় তাঁহার নিজের গৃহ যদি কালোয়ারদিগের হস্তে গিয়া আবর্জ্জনার স্তুপে পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে তাঁহার স্মৃতিরক্ষাত যথাযথভাবে হইবেই না উপরন্ত ভারতবাসীদিগের মুখে তাহাতে চুনকালি লাগিয়া একটা বিশেষ দুর্নামের কারণ ঘটিবে। যখন ইউনাইটেড ফ্রন্ট বাঙ্গলা দেশ শাসন করিতেছিল তখন ঐ গৃহটি ক্রয় করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শিক্ষাস্থল সেখানে গঠন করা হইবে স্থির করা হয়। ঐ কার্য্য সাধিত হইবার পূর্ব্বেই ইউ এফ সরকার শাসনভার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে সম্ভবত রাজা রামমোহন রায়ের নিবাস স্থলের ক্রয় ও তাহার উপযুক্ত ব্যবহারের কথাটাও চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা এখন রাষ্ট্রপতির শাসনে রহিয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারই এখন বাঙ্গলার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। এই অবস্থায় রামমোহন রায়ের বাসস্থান যাহাতে কালোয়ারের মূল্যবান আস্তাকুড়ে পরিণত না হয় তাহার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারকেই করিতে হইবে ও সেই জন্য দিল্লীবাসী বাঙ্গালীদিগকে বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রের কর্ম্মীদিগকে তৎপর হইতে হইবে। আমরা আশাকরি দিল্লীর প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালীরা এই কার্য্যে অবিলম্বে আত্মনিয়োগ করিবেন।

পুলিশের উপর আক্রমণ

বাংলাদেশে পুলিশের উপর আক্রমণ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। পুলিশের অনেক কর্ম্মচারী সম্প্রতি হতাহত হইয়াছেন ও ঐরূপ আক্রমণের কোন প্রতিকার হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে না। পুলিশ কর্ম্মচারীগণ হুকুমের চাকর ও তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য। তাঁহারা অপরাধপ্রবন ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে ধরপাকড়ের কার্য্য করেন ও সেইজন্য অপরাধী জাতীয় গুণ্ডা, চোর ডাকাতগণ তাঁহাদের শত্রুতা করিতে

সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। ইহার মধ্যে কিছু কিছু রাষ্ট্রক্ষেত্রের আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিও আছে এবং তাহাদেরও আক্রোশ ঐ পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের উপর। কিন্তু জনসাধারণ একথা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে পুলিশ যদি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকে তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি চুরী ডাকাইতি করে, মেয়েদের গায়ের গহনা ছিনাইয়া লয়, বোমা ছুঁড়িয়া স্কুল কলেজের পাঠ বন্ধ করিতে চেষ্টা করে এবং দেশের অতীত গৌরবের আধার মহাপুরুষদিগের আলেখ্য মূর্ত্তি প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহাদিগের প্রতি নিজেদের অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, সেই সকল লোকদের দুষ্কর্ম আরই প্রবলভাবে চলিবে এবং কাহারও পক্ষে তাহা হইলে সমাজে বাস করা আর সম্ভব থাকিবে না। এই কারণে সকল এলাকার জনসাধারণের কর্ত্তব্য হইবে গুণ্ডাবৃত্তির কোন প্রশ্রয় না দেওয়া এবং পুলিশের সহিত সহযোগীতা করা। একথা যদিও সত্য হয় যে পুলিশ সকল সময়ে জনসাধারণের প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পূর্ণরূপে করে না, এমন কি কখন কখন সাধারণের মঙ্গল বিরুদ্ধ কার্য্যও করে; তাহা হইলেও মূলতঃ পুলিশ সর্ব্বসাধারনের সুবিধা, নিরাপত্তা ও সাহায্যের জন্যই আছে। পুলিশকে বাদ দিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং পুলিশের কার্য্যকলাপ সমালোচনার বিষয় হইলেও এবং পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের চারিত্রিক উন্নতির আবশ্যকতা বর্ত্তমান থাকিলেও পুলিশ প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের হিতকর বলিয়া ধার্য্য হইবে। ইহা ব্যতীত মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করা হইতেছে তাহাদের একমাত্র দোষ হইল কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা। যাহারা কর্ত্তব্য করে না তাহাদের উপর কোন আক্রমণ হইতেছে না। এই কারণে পুলিশের উপর আক্রমণ আরই সমাজবিরুদ্ধ ও দমনীয়। ইহার প্রতিকারও অনেকাংশে সমাজের উপর নির্ভর করে। সকলপ্রকার অপরাধ সমাজের চেষ্টা থাকিলে হ্রাস হয় ও সমাজ দমনচেষ্টা না করিলে বৃদ্ধিলাভ করে। এই ক্ষেত্রে সমাজের কর্ত্তব্য সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

বলপূর্ব্বক বিমান দখল ও ধ্বংস করা

আরবদিগের অভিযোগ যে তাহাদের দেশে কেন ইহুদি রাষ্ট্র ইসারায়েল গঠন করা হইয়াছে। ইহুদিরা প্রায় দুই হাজার বৎসর তথাকথিত আরব মুলুকে কোথাও নিজরাষ্ট্র স্থাপন করিয়া বাস করে নাই। তৎপূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনের আশপাশ ধরিয়া বহু স্থানই ইহুদিদিগের রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। সেই রাষ্ট্র যখন ভাঙ্গিয়া গিয়া ইহুদিগণ বিশ্বের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িল তাহার পরে ইসরায়েল গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহুদিদিগের ,নিজ দেশ আর কখন কোথাও গঠিত হয় নাই। যে সকল দেশে ইহুদিরা গিয়া বাস করিত প্রায় সর্ব্বত্রই তাহাদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করাই একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহুদিগণ ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি করিতে সক্ষম হওয়ায় উৎপীড়ন আরও প্রবলভাবেই চালিত হইত। ইহুদিদিগের পাড়ার নাম ছিল ঘেটো এবং তাহাদের ঘরবাড়ী লুটপাট ও তাহাদিগকে মারপিট করার নাম ছিল পগ্রম। বহু ইহুদিকে পগ্রমের সময় হত্যা করা হইত ও ইহুদি রমণীদিগের উপরেও অত্যাচার করিতে সুসভ্য ইউরোপীয়গণ দ্বিধা করিত না। অ্যাডলফ হিটলারের ইহুদি ধ্বংস অভিযানের ফলে বহু লক্ষ ইহুদি নরনারী শিশু বৃদ্ধের প্রাণ যায় এবং এই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিশ্ব-ইহুদি জগতের নেতাগণ সহানুভূতিশীল ইউরোপীয় ও আমেরিকানদিগের সাহায্যে ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা ইহুদিদিগকে সাহায্য করিয়া আরও দৃঢ় করিয়া তোলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই ইহুদিদিগের নিবাস ভূমি ও নিজ রাজত্ব স্থাপনের পরিকল্পনা ব্যালফুর প্রমুখ বৃটিশ রাষ্ট্রনেতাগণ কার্য্যকরীভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় ৩০০০০০ ইহুদি প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে ঘরবাড়ী করিয়া চাষ বাস আরম্ভ করে ও এই সকল ইহুদিদিগের সংগঠন ও চেষ্টার ফলে ১৯৪৮ খৃঃ অব্দে ইহুদিদিগের রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সময় ইহুদি বিপ্লবীগণ কিছু কিছু হামলা হাঙ্গামাও করিয়াছিল।

আরবদিগের আদিম বাসভূমি প্যালেষ্টাইনে ছিল না। আরবগণ সপ্তম শতাব্দীতে ঐ অঞ্চল গায়ের জোরে দখল করে। তাহার পরে একাদশ শতাব্দীতে খৃষ্টান ধর্মযোদ্ধা ক্রুসেডারগণ এই দেশ দখল করিয়াছিল ও ষোড়শ শতাব্দীতে তুর্কী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং আরবদিগের দেশ বলিয়া ঐ অঞ্চলটিকে বর্ণনা করা উচিত কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। মিশর দেশও আরবগণ জয় করিয়া দখল করে। উহাও তাহাদিগের নিজের দেশ নহে।

যাহা হউক প্যালেষ্টাইনের আরবগণ এ দেশ হইতে ইহুদি বিতাড়ন করিয়া স্বরাজ স্থাপনের জন্য নানা প্রকার জোরজুলুম আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ইহুদি তাড়াইবার অজুহাতে এমন সকল কার্য্য করিতেছে যে তাহার কোন সমর্থন কেহই করিতে পারে না। যথা অপর দেশের বিমান বন্দরে গিয়া অপর দেশের বিমান আক্রমণ করিয়া ইহুদি মারিবার চেষ্টা করা। ইহার ফলে ইহুদি কেহ না মরিলেও অন্য বিদেশী কেহ কেহ হতাহত হয় ও কোন কোন আরব কমাণ্ডোকে অপর দেশের লোকেরা ধরিয়া কারাগারে বদ্ধ করে। যাহাতে সেই সকল আরব মুক্তিলাভ করিতে পারে সেইজন্য এখন আকাশ পথে বিচরণ করিবার সময় চালককে পিস্তল দেখাইয়া বিমানকে যাত্রীসমেত অন্যত্র লইয়া যাইতে বাধ্য করিয়া আরব কমাণ্ডোগণ বিদেশী রাষ্ট্রগুলির উপর চাপ দিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন অবধি কয়েকটি বিমান এইভাবে লইয়া গিয়া সগুলিকে নষ্ট করিয়া দিয়া আরব যোদ্ধাগণ নিজ কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিয়াছে।

এইভাবে বিমান চুরি করিয়া সেগুলিকে নষ্ট করিয়া যাত্রীদিগকে আটকাইয়া রাখিয়া আরবগণ বিদেশী রাষ্ট্রের উপর চাপ দিবার যে চেষ্টা করিতেছে তাহার ফলে আরবদিগের বিরুদ্ধেই বিশ্বজনমত যাইতেছে। আরবগণ যে প্রাচীন মিশর, অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলন ও প্যালেস্টাইনের, আদিম অধিবাসী নহেন তাহা সকলেই জানে। পরে যে বিরাট তুর্ক সাম্রাজ্য ভূমধ্য সাগরের উপকূল হইতে আরবসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহাও সমপ্রভাবে আরবদিগের দেশ কখনও ছিল না। সুতরাং আরবদিগের রাষ্ট্রীয় আবদার সকলে মানিয়া লইবে ইহা আশা করা আরবদিগের পক্ষে ন্যায় সঙ্গত হইতেছে না। তাহা ছাড়া আর একটা কথা আরবদিগের মনে রাখা উচিত। জোর যার মুলুক তার কথাটা যদি সত্য হইত তাহা হইলেও আরব দিগের জোর নাই বলিয়া মুলুকের উপর দাবিও কেহ স্বীকার করিবে না। অধিক বিমান কাড়াকাড়ি করিলে বিদেশীগণ যদি প্যালেস্টাইনে সৈন্য পাঠায় তাহা হইলে রুশিয়া আসিয়া আরবদিগকে রক্ষা করিবে বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ বিদেশী সৈন্যগণই বলীয়ান হইয়া উঠিয়া আরবদিগকে দমন করিবে বলিয়াই মনে হয়। যদি বিদেশী সৈন্য নাও নামে তাহা হইলেও অস্ত্র ও অর্থ পাইলে ইসরায়েল অনায়াসেই আরব কমাণ্ডোদিগকে দমন করিয়া তাহাদিগের গুণ্ডামী বন্ধ করিয়া দিতে পারে। এরূপ ঘটনাও ঘটা অসম্ভব নহে।

ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রন

শ্রীত্রিগুণা সেন ঔষধের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাঁহার নিয়ন্ত্রণের ফলে কোন কোন প্রয়োজনীয় ঔষধের মূল্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, কোন কোন ঔষধ বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে এবং কোন কোন ঔষধ ভেজাল মিশাইয়া নতুন দামে বিক্রয় করা হইতেছে। এই ত্রিবিধ পরিণতির কারণ এই যে সকল ঔষধের মূল্য কমান হইবে কিন্তু সকল ঔষধের তৈয়ার খরচ এক রকম নহে। কোন কোন ঔষধের উচ্চমূল্য থাকিলেও তাহা বেচিয়া লাভ অধিক ছিল না। নতুন দামে বেচিলে তাহা লোকসানের কারণ হইত। সেই কারণে যে সকল ঔষধের তৈয়ার খরচা বা পড়তা অধিক সেগুলি কালোবাজারে অন্তর্দ্ধান করিল। অথবা তাহাতে জল মিশান আরম্ভ হইল। এবং যে গুলির চাহিদা যথেষ্ট

এবং লাভও ছিল অনেক সেগুলির মূল্য কমাইয়া বিক্রেতারা সুনাম অর্জ্জন করিল।

ত্রিগুণা সেন ঔষধের দাম কমাইবার চেষ্টা করিতেছেন ঔষধ প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া। ঔষধ না পাইলে মানুষের প্রাণ বাঁচেনা ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু খাদ্যবস্তু না পাইলেও ত প্রাণহানীর ভয় আরও বহুগুন বৃদ্ধি পায়। খাদ্য বস্তুর মূল্য হ্রাসের কথা ত কেহ তুলিতেছেন না। খাদ্য বস্তু উৎপাদনে যে সকল বাধার সৃষ্টি হইতেছে সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু রাষ্ট্রীয়। যথা সিলিং বাঁধিয়া জমি চাষের খরচা বাড়ান। ধান গম লুঠ করিলে তাহার জোরালো প্রতিকার ব্যবস্থা না করা। কন্ট্রোল করিয়া মূল্য বাড়ান ও কালো বাজার জোরাল করা ইত্যাদি ইত্যাদি। খাদ্য মূল্য হ্রাস কবে হইবে? তারপর আছে পাঠ্য পুস্তক, খাতা পেনসিল ইত্যাদির মূল্য। বাড়ীভাড়ার গগন স্পর্শীরূপ; তাহাও ত দমন করিলে গরীবের প্রাণ রক্ষা হয়। কিন্তু হইতেছে কোথায়? ডাক টিকিট রেলভাড়া প্রভৃতি যেভাবে বাড়িয়া চলিতেছে তাহারই শেষ বা কোথায় ও কবে হইবে? ঔষধের মূল্য কমাইলে রুগীমানুষ আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু তাহার খাদ্যাভাব হইবে। বাসস্থান জুটিবে না, ভ্রমণ, পাঠ, চিঠিপত্র লেখা দুঃসাধ্য হইবে। অধিক দিন বাঁচিয়া উপভোগ কতটা হইবে জানা যায় না তবে কষ্টভোগ পূর্ণরূপেই হইতে থাকিবে।

সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ধর্ম্মঘট

জুলিয়াস সিজার তিনটি কথা বলিয়াছিলেন যাহার জন্য ইতিহাস তাঁহাকে অল্পকথায় বৃহৎ বিষয়ের বর্ণনা সম্পূর্ণ করিবার জন্য খ্যাতির উচ্চতম শিখরে বসাইয়া রাখিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন Veni vedi vici অর্থাৎ I came I saw I conquered, আসিলাম, দেখিলাম জয়লাভ করিলাম। সরকারী কর্ম্মচারীরা বঙ্গালা দেশে বহু হাল্লা হাঙ্গামা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনদিন ধর্ম্মঘট করিলেন। উহার সম্বন্ধে বলা যায় আরম্ভ হইল, চলিল ও শেষ হইল। কেহ কিছু বুঝিল না, কেহ কিছু দেখিবার মত দেখিল না এবং কাহারও কোনও লাভ হইল না। ২৬, ২৭, ২৮ আগস্ট ঐ বহু বিজ্ঞাপিত ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। প্রায় সকল সরকারী অফিসেই ঐ ধর্ম্মঘট পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল, অর্থাৎ কেহই প্রায় কাজে আসে নাই। কিন্তু উহার ফলে সরকার বাহাদুর অর্থাৎ রাজ শক্তি কিছুমাত্র শক্তিহীন হইল না। কর্মচারীদিগের দাবী কিছুমাত্র মানিয়া লইল না। বরঞ্চ মাহিনা কাটা যাইবে বলিয়া সকল ধর্ম্মঘটকারীকে জানান হইল। শতকরা ১০ টাকা কাটা যাইলে গরীব-লোকের খরচ চালান মুস্কিল হইবে। সুতরাং যে নেতারা ধর্ম্মঘট করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন তাঁহাদের সুখ্যাতি হবেই বলিয়া মনে হয় না। আজকাল ধর্ম্মঘট করা একটা মহামারীর মতই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কোথাও কাহারও কোন লাভ হইতেছে বলিয়া শোনা যায় না। হৈ হাল্লা পাঁয়তারা লাঠি ঘুরান প্রচুর হয় কিন্তু তাহার অধিক আর কিছু হয় না। ক্ষতির অঙ্কই ভারি হইয়া উঠে লাভের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় ধর্ম্মঘট করা অপেক্ষা না করা অধিক লাভ-জনক বলিয়া মনে হয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর

সন্তোষকুমার অধিকারী

বাংলাগদ্য রচনার ইতিহাসে অক্ষয়কুমার দত্তর একটি সুনির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। যদিও তাঁর সমকালীন অনন্ত শক্তির অধিকারী বিদ্যাসাগরের শিল্পসুষমাযুক্ত বাংলাগদ্যই ভাষার সিংহদ্বারকে উন্মুক্ত করেছে, তবুও অক্ষয়কুমার দত্তর বাংলা ভাষায় এমন একটি স্বাতন্ত্র ছিল যার শক্তিকেও ইতিহাস স্বীকার করে নিয়েছে। অক্ষয়কুমারের ভাষা সৃষ্টি প্রধানতঃ সাংবাদিক হিসেবে। তাই তাঁর গদ্যে যে যুক্তি ও বিচার প্রয়োগের প্রবণতা দেখা গিয়েছে তা অন্যত্র দুর্লভ। অবশ্য বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ' এবং 'বহুবিবাহ' এই গ্রন্থ দুটিতেও ভাষার ঋজুতা, যুক্তিশীলতা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের প্রয়োগ অনুন-করনীয়। তা সত্বেও অক্ষয়কুমারের মনোভাবে যে বৈজ্ঞানিকচিন্তার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল, তাঁর ভাষাতেও তা পরিস্ফুট।

অক্ষয়কুমারের রচনাশৈলীর আভাস পাওয়া যায় ৺রমেশচন্দ্র দত্তর বর্ণনা থেকে :

"In Akhaykumar's style we admire the vehemence and force of the mountain torrent in its wild and rugged beauty"

তাঁর রচনাশৈলীতে এই দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল আর একটি কারণে। অক্ষয়কুমারমূলতঃ প্রবন্ধ লেখক ; এবং সে প্রবন্ধও তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শে জাত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রতিফলন। 'চারুপাঠ' বিদেশী গ্রন্থের অনুসরণে ও অনুবাদে গ্রথিত হলেও এর বিষয়বস্তু জ্ঞান ও চিন্তার পরিপূরক। 'পদার্থবিদ্যা' বিজ্ঞান চিন্তার পরিচায়ক। সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' অক্ষয়কুমারের অনুসন্ধিৎসু ও বিচারপরায়ণ চিন্তা-ধারাকেই প্রকাশ করে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও তথ্য সন্ধান, তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বিচার মূলক চিন্তার সমন্বিত বিন্যাস। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে লেখা প্রবন্ধগুলিও এই ধারণার সমর্থক। তখনকার দিনে যখন বাংলা ভাষা অবিন্যস্ত ও সৌষ্ঠবহীন, অক্ষয়কুমারের সাবলীল রচনাভঙ্গি নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক স্বীকৃতির যোগ্য।

অক্ষয়কুমারের বাংলা রচনাভঙ্গির উৎকর্ষকে যিনি প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মজীবনী'তে বলেছেন "বাংলা গদ্যসাহিত্যের যে দুইজন প্রতিভাবান পুরুষ এক নবযুগ আনিতে চাহিয়া ছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত—তাঁহারা দুজনেই আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নৈতিকতাকেই বড় বলিয়া জানিতেন।"

দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যেই অক্ষয়কুমারের চরিত্র সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দেই অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ওই বছরেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং দেবেন্দ্র-নাথ অক্ষয়কুমারকে পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত করেন। দেবেন্দ্রনাথের এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকেও অক্ষয়কুমার আত্মসমর্পণ করেন নি। বরং পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। দেবেন্দ্রনাথের মত তিনি নিছক ভক্তিবাদী হতে চাননি। ভক্তির চেয়ে নীতি তাঁর কাছে বড় ছিল ; জ্ঞানার্জন ও সত্যানুসন্ধানই তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল। বিনা বিচারে বেদের অভ্রান্ততাকে স্বীকার করে নিতে তিনি রাজি ছিলেন না। অক্ষয়কুমারের এই

ভূমিকা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণনাতে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে :

"অক্ষয়বাবু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের জ্ঞানমার্গের প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন।"

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতান্তরের একমাত্র কারনই তাই। দেবেন্দ্রনাথ সেইজন্যই বলেছেন যে, অক্ষয়কুমার আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নৈতিকতাকে বড় বলে জানতেন, তিনি প্রার্থনায় বিশ্বাসী ছিলেননা, জ্ঞানান্বেষণই তাঁর সান্ত্বনা ছিল। অক্ষয়কুমারের এই চারিত্র বৈশিষ্ট্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল 'আত্মীয়সভার' সম্পাদক হিসেবে। অক্ষয়কুমারকে দেখা যায় বিচারশীল জ্ঞানান্বেষী সাধক হিসেবে। বিনা-বিচারে শুধুমাত্র বিশ্বাসে তিনি কিছুই গ্রহণ করতে রাজি নন।

এদিক থেকে তাঁর হৃদয়গত যোগ ছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। নীতিধর্মের প্রতি অক্ষয়কুমারের প্রবণতার কারণও বিদ্যাসাগরের প্রভাব। 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদসমিতির মূল উদ্দ্যেশ্যগুলি যেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁর দুর্মসংগ্রামে সহায়তা দেবার জন্যই রচিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার এই সমিতির যুগ্মসম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত এবং দেবেন্দ্রনাথের আশ্রিত হয়েও অক্ষয়কুমারের হৃদয় যে বিদ্যাসাগরের মধ্যেই আদর্শের সন্ধান পেয়েছিল তার পরিচয় অক্ষয় কুমারের সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলির মধ্যেই মেলে। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবা বিবাহের বিস্তৃত সংবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। (দ্রষ্টব্যঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—দ্বিতীয় ভাগ পৌষ ১৭৭৮; পৃঃ ১২৯)

..."এই মহৎ ব্যাপার যে কয়েকটি ব্যক্তি অসামান্য ধীসম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তন্মধ্যে মহামান্য ও সর্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন সত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (৪র্থ কল্প চৈত্র, পৃঃ ১৬৯) বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার সমর্থনে লেখা হয়—"যাহাতে এদেশীয় বিধবাগণের দুঃসহ চির বৈধব্য যন্ত্রণা ও চির বৈধব্য নিবন্ধন নানা অবৈধ ব্যাপারের নিবারণ হয়, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কতিপয় বিচক্ষণ বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া সে বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। জগদীশ্বর তাঁহার শুভ সংকল্প সিদ্ধ করিবেন।"

অক্ষয়কুমার দত্তর জীবনে যে এই দুই মণীষীর—দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর—প্রভাব অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল তা ৺রাজনারায়ণ বসুর রচনা থেকেও জানা যায়—"অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।"

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হলেন তখনও বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিকখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে। আর অক্ষয়কুমারের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা প্রকাশিত হয় ১৮৪৫এ। তা'সত্বেও বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এবং তত্ত্ববোধিনী সভার প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার (Paper Committee) সভ্য হিসেবে তিনি অক্ষয়কুমারের ভাষা এবং রচনা সংশোধন করে দিতেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ ঘটে পেপার কমিটির অন্যতম সদস্য আনন্দকৃষ্ণ বসুর মাধ্যমে। এই আনন্দকৃষ্ণ বসু বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন এবং তিনিই বিদ্যাসাগরকে পেপার কমিটিতে নিয়ে এসেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তর এই যোগাযোগ অক্ষয়কুমারের জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান ও স্মরণীয় ঘটনা। এই বন্ধুত্ব দুজনেই

রক্ষা করেছিলেন। অক্ষয়কুমার নীতি ও আদর্শের দিক থেকে বিদ্যাসাগরের অনুগামী ছিলেন। আর বিদ্যাসাগর তাঁর এই সাহিত্য সাধক বন্ধুর সহায়তায় চিরকাল এগিয়ে এসেছেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে অক্ষয়কুমার ১৮৫৫ খৃঃ পর্য্যন্ত যুক্ত ছিলেন। ওই বছরে বিদ্যাসাগর নদীয়া মেদিনীপুর ও বর্ধমানে কতকগুলি আদর্শ বিদ্যালয় (Model School) প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। এই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক তৈরীর জন্য তিনি একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন। তিনি তখন এই প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগের জন্য বন্ধু অক্ষয়কুমারের নাম অনুমোদন করলেন। এই অনুমোদন পত্রে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন—

. . . He is one of the very few of the best Bengali writers of the time. His knowledge of the English language is very ;respectable and he is well informed in the elements of general knowledge."

দুর্ভাগ্যক্রমে অক্ষয়কুমার অসুস্থ হয়ে চাকরী থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। তখনও বিদ্যাসাগরই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি উদ্যোগী হ'য়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অক্ষয়কুমারের কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রসংশাসূচক প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনীর সভায় গৃহীত করান। বিদ্যাসাগর অগ্রনী হ'য়েছিলেন বলেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে অক্ষয়কুমারকে মাসিক পঁচিশ টাকা হিসেবে বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্রে পরিণত করাই দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল; কিন্তু অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেও তাঁর মনকে পুরোপুরি যুক্তিবাদী করে রেখেছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিছক ধর্মপত্রিকায় পরিণত হয়নি। এই পত্রিকাতে সাহিত্য বিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব ও নানাবিষয়ে প্রবন্ধাদি ছাপা হ'ত। তাঁর আগ্রহেই এই পত্রিকায় বিদ্যাসাগর অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের একই কারণে সংঘাত হ'য়েছিল; পত্রিকা পরিচালন নীতি। বিদ্যাসাগর ছেড়ে চলে যান কিন্তু অক্ষয়কুমার আপন ব্যক্তিত্বে দেবেন্দ্রনাথের অনুগত থেকেও পত্রিকার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের প্রতি হৃদয়ের অপরিসীম শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করতে তিনি কোন সময়েই কুণ্ঠিত হননি। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটা চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"বিদ্যাসাগরকে মনের সহিত আশীর্বাদ করিতেও ত্রুটি করিবেন না।" বিধবাবিবাহ আইনে পরিণত হ'লে অক্ষয়কুমার ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্তাব আনেন। "বন্ধুবর্গ সমবায় সভা" (বঙ্গীয় সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতির) সম্পাদক হিসেবে অক্ষয়কুমার যে প্রস্তাব গৃহীত করান তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর গভীর আনুগত্যের প্রকাশ—"স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বহু-বিবাহ প্রতিরোধ নিমিত্ত সমিতির সংশক্তি প্রয়োগ করা হউক।"

বাংলা গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম ইতিহাসে স্বীকৃত। কিন্তু বাংলাগদ্যে বৈজ্ঞানিকও যুক্তিমূলক চিন্তাধারা সম্পন্ন প্রবন্ধের পথপ্রদর্শক হিসেবে অক্ষয়কুমার দত্তর নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ

সমর বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা কথায় কথায় প্রায়ই বলে থাকি মানুষের মধ্যে একটা dynamic force কাজ করছে। সে তাকে স্থির থাকতে দেয় না। তারই চাপে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষ। কোনও একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ থেকে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 'চরৈবেতি' তার চলার মন্ত্র, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে' তার অন্তরে নিয়ত রণিত হচ্ছে এই সুর। সুতরাং কোন্ অনাগত ভবিষ্যতে তার সত্তার মধ্যে যে এক উচ্চতর চেতনার উন্মীলন সম্ভব হবে আজকের তীব্র অভীপ্সাই তার সূচনা। অতএব এ-কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে মানুষের মন হল সেই যোগসেতু যার এক পারে আছে অবমানব আর অন্য পারে অতিমানব। এক পারে Infra rational অন্য পারে Supra rational.

হঠাৎ পীযুষবাবু জিজ্ঞেস করলেন,—মানুষ যে চিরকাল মানুষ হয়েই থাকবেনা, কোনও উচ্চতর চেতনায় যে তাকে অতি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এ-নিশ্চয়তা কোথায়? যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যার নাগাল পাবোনা বুদ্ধিবাদী মানুষ হিসাবে তাকে মেনে নিই কি করে?

নীতিনদা বললেন,—যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে যখন কোনও তত্ত্বকে আমরা সত্য বলে প্রমাণ করতে চাই তখন প্রথমে কতকগুলো facts অথবা উপকরণকে hypothesis বলে আমরা ধরে নিই, তারপর তাকে অবলম্বন করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং তার থেকে সাধারণ সূত্র নির্ণয় করে বলে থাকি,—such and such condition will produce such and such result.

এখানে আমরা কি দেখছি,—। আমরা দেখছি জড়ের মধ্যে অবগুন্ঠিত ছিল যে-চেতনা তার ক্রমোন্মীলন। এখন জড়ের মধ্যে যে-চেতনা আবরিত ছিল সে-চেতনার স্বরূপ কি তা যদি আমরা ধরতে পারি, তা হলে ক্রমোন্মীলনের কোনও পর্যায়ে এসে এ-কথা বলা আমাদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন হবে না যে, উন্মীলন এখনও বাকী আছে কি নেই। ১০০ ফুট দীর্ঘ একটি ফিতেকে যদি একটি আধারে গুটিয়ে রাখা যায়, তাহলে খুলতে খুলতে যখন ৯০ কি ৮০ ফুট বেরিয়ে আসে তখন আমরা কি বলতে পারিনা যে, এখনও সবটা খোলেনি, এখনও দশ কি বিশ ফুট বাকী আছে।

—হ্যাঁ, তা বলতে পারি।—একটু যেন উৎসাহিত হয়ে পীযুষবাবু বললেন কথাগুলো।—কিন্তু আমরা যদি না জানি ফিতেটা কত দীর্ঘ তা হলে আমাদের পক্ষে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

—তাতো বটেই।—নীতিনদা আশ্বস্ত হয়ে বললেন। —সেই জন্যেই আমি আগে বলেছি,—জড়ের মধ্যে যে চেতনা অবগুন্ঠিত ছিল তার স্বরূপ কি এ-কথা বিনি

জানেন তিনিই একমাত্র বলতে পারেন,—মানুষের মধ্যে যে মনশ্চেতনা বিকশিত হয়েছে,—ক্রমোন্মীলনের ধারায় সেই চেতনাই শেষ স্তর কিনা। —এ-বিষয়ে আপনার কোনও মন্তব্য আছে পীযুষবাবু?

—না, এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত।

—তা হলে পরম চেতনা অর্থাৎ Supreme Consciousness যদি আবরিত হয়ে থাকে তা হলে process of unfolding ততক্ষণ অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না সেই পরম চেতনা পুরোপুরি অভিব্যক্ত হচ্ছে। Supreme Consciousness বা পরমচেতনাই জড়ের মধ্যে আবরিত ছিল কিনা তা আমরা পরে আলোচনা করব। এখন, মানুষ যে চেতনার অধিকারী হয়েছে—অর্থাৎ মনশ্চেতনা, তার স্বরূপ কি এবং তার শক্তি কতখানি তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। কেননা তাহলেই আমরা বুঝতে পারব যা পেয়েছি তাইতেই আমাদের চলবে কিনা।

মানুষ প্রথমে চায় গ্রহণে বর্জনে এই দেহটিকে রক্ষা করতে। তারপর সে চায় নানা রকম কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে জীবন্ত রাখতে, সবশেষে তার আছে কৌতূহল,—সে জানতে চায়, বুঝতে চায়। মানুষের এই ভোগৈষণা, কর্মৈষণা ও জ্ঞানৈষণা যথাক্রমে তার দেহ, প্রাণ ও মনের কাজ। দেহ হল ভোগের আয়তন, প্রাণ হল কর্মের এবং মন হল জ্ঞানের আয়তন। দেহ ও প্রাণ নিয়ে মানুষের পশুভাব, মন নিয়ে মানুষের মানুষীভাব, আর তুরীয় জ্ঞান ও আনন্দ নিয়ে মানুষের দেবভাব।

যে চারিটি ভাবনার সোপানকে অবলম্বন করে মানুষের ক্রমোন্নতি তা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে মানুষের প্রাথমিক পরিচয় হল যে সে স্বার্থপর। তার প্রথম ভাবনা হল কি করে সে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করবে। তারপর তার দ্বিতীয় ভাবনা হল,—কি করে সে গোষ্ঠীগত জীবনের আইন কানুন মেনে সকলকার জন্যে বেঁচেবর্তে থাকবে, শুধু একলার জন্যে নয়। তার তৃতীয় ভাবনা—সুনীতির আদর্শ অনুসরণ করা এবং শেষ ও উচ্চতম ভাবনা হল—দিব্য নীতি ও দিব্য প্রকৃতিতে নিজেকে উন্নীত করা।

এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথকেও স্মরণ করতে পারি। —কাছের পাওনাকে নিয়ে কামনার যা দুঃখ তা পশুর, দূরের বাসনাকে নিয়ে আকাঙ্খার যা বেদনা তাই মানুষের।—এই ধরণের কথা তিনিও বলেছেন।

মানুষকে পশুভাবের থেকে মানুষীভাবের ভেতর দিয়ে দিব্যভাবে উন্নীত হতে হবে। তার অন্তঃপ্রকৃতি সেই লক্ষ্যের দিকেই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে—অন্তরে বাইরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে এ যাত্রা সুরু হয়েছে মানুষের; অবমানব স্তর থেকে ক্রমশঃ উন্নীত হয়ে মানুষ আজ এই বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বলতম সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। কিন্তু এখনও তার চলার বেগ থামেনি। ক্রমোন্নতির এই গতিধারা যদি আমরা একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করতে চেষ্টা করি, তাহলেই আমরা বুঝতে পারি একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে—একটা উচ্চতর চেতনায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে। কিন্তু তার এই অগ্রগতি সহজ এবং সাবলীল নয়। তার সত্তার সঙ্গে নিগূঢ় হয়ে রয়েছে পরস্পর বিরোধী দুইটি প্রবেগের তীব্র আকর্ষণ-বিকর্ষণ। একটিতে সে ব্যক্তিগত মানুষ, অন্যটিতে সে সমাজগত। সে প্রথমে চায় তার নিজের কতকগুলি দাবীদাওয়া মেটাতে, কিন্তু তার উপর সমাজেরও অনেক দাবীদাওয়া। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে তার প্রকৃতি যখন ছিল দুরন্ত এবং আরও স্থূল, তখন তাকে সুস্থির করার জন্যে তার ব্যক্তিগত দাবীগুলোকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে প্রয়োজন ছিল সমাজের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু এখন সে সভ্য হয়ে উঠেছে এখন সে চায় নিজেকে প্রসারিত করে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে। এখন যদি সমাজ তার স্থূল হস্ত অবলেপে মানুষের এই স্বাভাবিক বিকাশকে

প্রতিহত করে, তাহলে সমাজ এবং ব্যক্তি—উভয়েরই অগ্রগতি হয় ব্যাহত। এই দুই পরস্পর বিরোধী প্রবেগ মানুষের সমস্ত কর্মপ্রবণতার উপর খবরদারী করে বলেই তার অগ্রগতির পথ এমন আঁকাবাঁকা। পরস্পর বিরোধী এই দুইটি প্রবেগকে সুনিয়ন্ত্রিত করে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে সমাজ জীবনে নৈতিক আদর্শ গড়ে উঠেছে। মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে নীতিবোধ। কিন্তু তবুও পারস্পরিক সংঘর্ষের অবসান ঘটানো সম্ভব হয়নি। বরং তা ক্রমশঃ আকারে প্রকারে বৃদ্ধি পেয়েছে

এর অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ যে **moral ideals** বা নৈতিক আদর্শ আমরা গড়ে তুলেছি তার মধ্যে আত্মিক সত্যকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি —এই জন্যে যে, আমাদের মনঃশক্তির সীমায় সে সত্য এখনও ধরা পড়েনি। তাছাড়া নৈতিক আদর্শের বিধানগুলো ক্রমশঃ এমন **authoritative** এবং **dogmatic** হয়ে ওঠে যার ফলে সমাজ মানুষের অগ্রগতির পথে তারা হয়ে পড়ে বাধাস্বরূপ। তাই এক যুগের সামাজিক বিধান অন্যযুগে অচল হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ আর তা মানতে চায় না। তখন মানুষই আবার নূতন বিধান, নূতন রীতি-নীতি সব প্রনয়ণ করে, কালক্রমে আবার তারও প্রভাব যায় কমে।

গোষ্ঠীগত মানুষ আর তার ছোট্ট পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ নেই। ছোট্ট পরিবারের সংকীর্ণ সীমা পেরিয়ে কুল, বংশ, উপজাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদির বেড়া ডিঙিয়ে 'নেশনে'র মধ্যে সে সম্প্রসারিত করেছে তার গোষ্ঠীগত পরিচয়কে। কিন্তু ভবিষ্যতে সে 'নেশনে'র মধ্যেও আবদ্ধ থাকবে না; বিশ্ববোধে সে উদ্বোধিত হবে, তার পরিচয় হবে যে সে বিশ্বজনীন মানুষ। সুতরাং কোন বাঁধা নিয়ম কানুনের মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। অথচ বাইরের বিধিবিধানের সাহায্যেই তাকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা চলেছে। এ-চেষ্টা যখন ব্যর্থ হবে, তখন মানুষ নূতন পথের সন্ধানে ফিরবে। এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে মানুষ—নানারকম পরস্পর বিরোধী ভাবনার পারস্পরিক সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে পথ করতে করতে। বাইরের জীবনে মানুষের এই যে অগ্রগতি এর থেকে একটি সত্যই উদ্‌ঘাটিত যে, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ভেতর থেকে এমন তীব্র আকুতির সৃষ্টি করছে যে বাইরের জীবনে মানুষ স্থির থাকতে পারছে না। নূতন নূতন পথের সন্ধানে দিশাহারা হয়ে ছুটো ছুটি করছে। উন্নততর চেতনার অবতরণের জন্য নীচের থেকে প্রয়োজন এই তীব্র আকুতির।

এতক্ষণ নীতিনদা থামলেন। সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর দিকে ভাল করে চোখ মেলে তাকালেন। দেখলেন একান্ত অনুগত ছাত্রের মত সকলেই তাঁর আলোচনা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। আশ্বস্ত হয়ে নীতিনদা বললেন,—এতক্ষণ যা বললাম আশাকরি সকলেই তা বুঝতে পেরেছেন এবং এর বিরুদ্ধে আপনাদের কোনও মন্তব্য নেই।

পীযূষবাবু স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—বিধাতার অভিপ্রায়ের প্রসঙ্গটি কিন্তু বাদ পড়ে গিয়েছে, তাছাড়া **Supreme Consciousness** সম্বন্ধে যা বলবেন বলে-ছিলেন তাও বলা হয়নি।

নীতিনদা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, আমার তা মনে আছে। ও-প্রসঙ্গ নিয়ে পরে আলোচনা করছি। **Evolution** সম্বন্ধে আরও দুএকটা কথা বলার আছে। সুতরাং সেই কাজটা আগে সেরে নিই।

বহির্জীবনে মানুষ যে ভাবে এগিয়ে চলেছে অন্ত-র্জীবনের অগ্রগতি অর্থাৎ প্রসার কিন্তু তদনুযায়ী ঘটছে না। প্রাকৃত জীবনের রহস্য সন্ধানে মানুষ আজ অনেক অগ্রসর। বুদ্ধির সাহায্যে জড় প্রকৃতিকে নানা ভাবে বশীভূত করতে এবং তাকে নিজের প্রয়োজনে নিয়োগ করতে আগের চেয়ে মানুষ অনেক বেশী সক্ষম। বাইরের জীবনের এই বৃদ্ধি মানুষকে আজ এমন শক্তি-

শালী করে তুলেছে যে তার সঙ্গে সমানভাবে অন্তর্জীবনের প্রসার না ঘটলে, মানুষ, তার বুদ্ধি বলে আহৃত শক্তির সাহায্যে নিজেকেই ধ্বংস করবে। এই জন্যেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন,—"**without an inner change man can no longer cope with the gigantic development of the outer life**".

—কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলাম না নীতিনদা। আরও ব্যাখ্যার দরকার।—শ্রোতাদের মধ্য থেকে কে যেন হঠাৎ এই অনুরোধ জানালেন।

নীতিনদা বললেন,—আমি তো এখনও ব্যাখ্যা করে কিছু বলিনি। মূল কথাগুলো বলেছি শুধু। ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বৈকি। উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করলে বোধ হয় আরও সহজ হবে। সুতরাং আমি সেই চেষ্টাই করছি। জড় বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় আমরা দেখছি মানুষ প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হয়েছে। বহুতর পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার জাতিগত অহং এর প্রসার ঘটেনি। তার মধ্যে বিশ্ববোধ জেগে ওঠেনি। এবং সেই জন্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে। সামঞ্জস্য ও সমতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছে না। রাষ্ট্রের নির্দেশে মানুষের বুদ্ধি মারণাস্ত্র আবিষ্কারে নিয়োজিত। যে শক্তি মানুষকে আরও উন্নততর অবস্থায় তুলে ধরতে পারত, সেই শক্তিই মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণেই ব্যস্ত। বিজ্ঞান অর্থাৎ সায়েন্সের সহায়তায় বাইরের জীবনে মানুষ আজ অনেক উন্নত স্তরে উঠতে পেরেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার অন্তর্জীবনকেও যদি সে উন্নত করতে পারত তাহলে তার জাতিগত 'অহং' কবে ঘুচে যেত। বাইরের উন্নতি অন্তর্জীবনকে সমানভাবে উন্নত করতে পারেনি বলেই Atomকে সে ধ্বংসের দানবে পরিণত করেছে। যা হতে পারত নব নব শক্তির পরমস্রষ্টা, তা'হয়ে গেল প্রলয়ংকর যুদ্ধের মারণ আয়ুধ। সেই জন্যেই বলা হয়েছে অন্তর্জীবনের পরিবর্তন সাধন না করতে পারলে অর্থাৎ উচ্চতর চেতনায় মানুষ উন্নীত না হলে নিজের অস্ত্রে মানবজাতি নিজেই বিনষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথেরও ছিল এই উদ্বেগ—"ভেবে না পাই কে বাঁচাবে আপনহারা অন্ধ মানুষেরে।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমরা যখন বাড়ী তৈরী করাই তখন আগের থেকে স্থির করে নিই,—বাড়ী কত উঁচু হবে। অর্থাৎ দোতলা, তিনতালা না তার চেয়েও বেশী। এখনই যে হবে তা নয়, ভবিষ্যতে যদি কোনও দিনও হয় তাহলেও, গোড়া থেকেই সেটা ভেবে নিই,—কেননা, তদনুযায়ী ভিত দিতে হবে এবং গাঁথুনি মজবুত করতে হবে। একতালার ভিতে পাঁচতালা বাড়িকে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। অথচ মানুষের বেলায় আমরা একবারও ভাবি না যে, ভবিষ্যতে মানুষ কি হবে। আজ সে যেমন মানুষ আছে আগামী দিনেও অর্থাৎ নিকট কিংবা সুদূর ভবিষ্যতেও সে ঠিক তেমনি 'মানুষ'ই থাকবে একথা ভেবে নিয়েই আমরা রীতি-নীতি, বিধি-বিধান সব প্রবর্তন করি এবং ভাবি যে মানুষ যদি এই সব রীতি-নীতি অনুসরণ করে চলে তাহলেই সমাজ সুখী এবং সমৃদ্ধ হবে। ভবিষ্যতে মানুষ কি হবে এ-ধারণা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে যতই আইন কানুন প্রয়োগ করিনা কেন তা কখনই সফল হবেনা। তাছাড়া মানুষের জীবনটা Iceberg এর মত। Surfaceএ যা দেখা যায় তা হল সমগ্রের এক দশমাংশ মাত্র বাকী ন'ভাগ জলের তলায় লুকোন। সুতরাং বহির্জীবনই মানুষের যথার্থ পরিচয় নয়। অন্তর্জীবনের রহস্যকেও ভাল করে জানার প্রয়োজন। বাইরের ঐটুকু জ্ঞান নিয়ে গোটা মানুষ সম্বন্ধে মন্তব্য করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। অথচ আমরা সেই চেষ্টাই করছি। যার মধ্যে ঘটবে অসীমের পরম প্রকাশ, তাকে বার বার সীমার বাঁধনেই বাঁধতে চাইছি। ভবিষ্যতে যে বাড়ী হবে আকাশচুম্বী, একতালার ভিত দিয়ে তাকে খাড়া করবার চেষ্টা করছি। আমাদের এই প্রয়াস যতই ঐকান্তিক হোক না কেন, বার বার ব্যর্থ হচ্ছে তবুও আমরা সঠিক পথের সন্ধান করতে পারছি না। কেননা আমাদের বুদ্ধি—বাইরের জীবনকেই

জানে বা জানার শক্তি তার আছে। অন্তর্জীবনকে জানা তার সাধ্য নয়। অথচ এই অন্তর্জীবনের রহস্য যদি আবিষ্কার না করা যায় তাহলে পরবর্তী উন্নততর অবস্থায় মানুষ কি করে উন্নীত হবে। শুধু বাইরের জীবনের পরিবর্তন ঘটালেই তো হবে না, অন্তর্জীবনের রূপান্তর ঘটাতে হবে। অর্থনৈতিক কাঠামো এবং উৎপাদন ব্যবস্থার রীতি-নীতি বদলালেই মানুষ চরম উৎকর্ষ লাভ করবে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বাইরের থেকে আমরা যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করি না কেন পরিণামে তা ব্যর্থ হবেই। Inner change ঘটাতে গেলে Inner lifeকে অবশ্যই জানতে হবে। তা না হলে আপনহারা অন্ধ মানুষকে কেউ আর রক্ষা করতে পারবে না। সেই জন্যই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন,—If **humanity is to survive a radical transformation of human nature is undispensable."** মানুষকে যদি বাঁচতেই হয় তাহলে অবশ্যই তার অন্তপ্রকৃতির রূপান্তর ঘটাতে হবে।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব?

শ্রীঅরবিন্দ তারও সন্ধান দিয়েছেন। সে-কথা পরে বলব। এতক্ষণ যা বললাম সেই সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে কারও যদি কোনও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে তাহলে আমাকে জানাতে পারেন।

একটু ইতস্তত: ক'রে পীযুষবাবু বললেন,—পাশ্চমী দার্শনিকেরা,—যেমন ধরুন হেগেল,—যে-সব তত্ত্ব প্রচার করেছেন তা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। তাঁরা যুক্তি-বুদ্ধি-গ্রাহ্য তত্ত্বকেই সত্য অর্থাৎ Real বলেই ধরে নেন। এবং যা যুক্তি-বুদ্ধিতে ধরা যায় না তাকেই তাঁরা বলেছেন—Unreal. তাঁদের মত হল—**whatever is real is rational and whatever is rational is real.** অথচ আমাদের মত হল,—সত্য যা তা মনোবুদ্ধির অগোচর। এই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে ওঁরা Realistic বলেন না, বলেন Idealistic. তাই জড়জীবনের উন্নতির জন্যে তাঁরা Idealistic বা ভাববাদী কোনও তত্ত্বের উপর নির্ভর করে কোনও মতবাদ গড়ে তুলতে চাননা। কেননা তাঁরা জানেন ভাববাদী তত্ত্ব বায়ুতে সঞ্চরণশীল। পৃথিবীর কঠিন মাটির সঙ্গে তার কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। আপনি যে বলেছেন—**without an innerchange man can no longer cope with the problems of his outer life,**—অতীন্দ্রিয় কোনও তত্ত্বের সাহায্যে এই Innerchange কি সম্ভব? বাইরের পরিবেশ; শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই তো মানুষের অন্তরের পরিবর্তন আপনা থেকেই ঘটবে।

—কিন্তু তাই কি ঘটেছে? শান্তগলায় প্রশ্ন করলেন নীতিনদা। তারপর বললেন,—বাইরের জীবনের উন্নতির সঙ্গে অন্তর্জীবনের প্রসার ঘটেনি। আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি পীযুষবাবু যে, বাইরের কোনও বিধি-বিধানের সাহায্যে অথবা অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক কিংবা সমাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাহায্যেও মানুষের অন্তর্জীবনের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। কেননা—**Man is not a political animal, —inspite of Aristotle—nor is he an economic animal—in spite of Marx and Engels.** এর জন্যে উচ্চতর চেতনায় মানুষকে উন্নীত হতে হবে। অতীন্দ্রিয় কোনও তত্ত্বের সাহায্যে কিংবা অন্য কোনও উপায়ে সেই রূপান্তর সংগঠিত হবে কিনা সেটা পরে বিবেচনা করে দেখা যাবে,—প্রকৃতপক্ষে সেইটাই হল আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়; এখন শুধু আমরা জানলাম,—যে, মানুষের অন্তর্জীবনের পরিবর্তন প্রয়োজন কেননা, তা না হলে মানুষ আর নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

হেগেলীয় দার্শনিক তত্ত্বের বিষয়ে আপনি যে-কথা বললেন সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও মন্তব্য নেই। পাশ্চমী দার্শনিকদের মধ্যে যদি কেউ কেউ মনে করেন বুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের অন্তপ্রকৃতির সবকিছু রহস্যই

জানা সম্ভব এবং তা যদি না জানা যায় তাহলে তাকে Unreal বলে নস্যাৎ করাই বিধেয়, তাহলে আমরা আর কি করতে পারি। বুদ্ধির গোচরে আজ যাকে ধরা গেলনা ভবিষ্যতে যে কোনও দিনই তাকে ধরা যাবে না এমন কথা জোর করে কি বলা যায়? অথচ তাঁরা তাই বলেন। বলেন যা জানা গেল না তাই Unknowable। আমরা বলি তা নয়,—বর্তমানে সেটা Unknown কিন্তু Unknowable কখনই নয়। চিন্তার দিক থেকেই আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে এক মৌল প্রভেদ। আমাদের সাধনা ভেতর থেকে বাইরে। ওদের সাধনা বাইরের থেকে ভেতরে। আমাদের গতি কেন্দ্রের থেকে পরিধির দিকে। যেভাবেই যাইনা কেন পরিধিতে উপস্থিত আমরা হবই; কিন্তু ওদের গতি পরিধির থেকে কেন্দ্রের দিকে। পথ একটু ভুল হলে কেন্দ্রে পৌছুনো আর সম্ভব হয় না। কেন্দ্র তখন অজ্ঞেয় হয়েই থাকে। পরিপূর্ণ সত্যের আলোয় আমরা বস্তুর পরিচয় পাই, ওরা বস্তুর মধ্যে বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত সত্যকে পেয়ে পূর্ণ সত্যকে জানতে চায়। দৃষ্টিভঙ্গীতে যখন এত প্রভেদ তখন তত্ত্বের মধ্যেও প্রভেদ থাকবে বৈকি। আর আপনি যে ভাববাদী আদর্শের কথা বললেন, সে সম্বন্ধেও অনেক কিছু বলার আছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর **Ideals and Progress** নামক ছোট্ট গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিশদভাবে অনেক আলোচনা করেছেন। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে এই তত্ত্বটি সংশ্লিষ্ট নয় বলে, এ-বিষয় নিয়ে এখানে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে চাই না। সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলব এবং সেই সঙ্গে পীযুষবাবুকে অনুরোধ করব মূল বইখানা একবার ভাল করে পড়ে নেবার জন্যে।

আমাদের জড়জীবনের স্তরে যে সত্য এখনও প্রতি-ফলিত হয়নি, অনাগত ভবিষ্যতে যার প্রতিফলন সম্ভব হবে, সেই সত্য সৃজনশীল মানুষের অন্তরে যখন প্রতিভাত হয় তখনই তাকে Ideal রূপে মানুষ গ্রহণ করে। সেই Ideal কে সামনে রেখে মানুষ এগিয়ে চলে। একথা অবশ্যই সত্য যে, Ideals are not the Ultimate Reality. কেননা যে স্তরে পরম সত্যের অধিষ্ঠান, Ideal এর সীমায় সে স্তরের আভাসটুকুও ধরা দেয়না। তবে Ideal হল পার্থিব চেতনায় নিক্ষিপ্ত পরম সত্যের কিছু ভাব; যার উপর ভিত্তি করে পার্থিব শক্তির ক্রিয়াশীলতা গড়ে উঠতে পারে।

কর্মসম্পাদন করাই যাঁদের কাজ অর্থাৎ যাঁদের বলা হয় Executive, তাঁরা Idealist না হতেও পারেন, কিন্তু যাঁরা সৃজনশীল অর্থাৎ creative তাঁদের Idealist হতে হয়। যাঁরা বাস্তব ধর্মী অর্থাৎ যাঁদের বলা হয় pragmatic, তাঁরা সেই তত্ত্বই গ্রহণ করেন,—যাকে বুদ্ধির সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা Idealist দের ভাল চোখে দেখেন না। কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে কোনও তত্ত্বকে জানার পুর্ব্বেই যদি সে তত্ত্ব মানুষের চিন্তার রাজ্যে ধরা দেয় এবং তদনুযায়ী মানুষ যদি তার কর্মপদ্ধতি নিরূপণ করেন তাহলে মানুষের অগ্রগতি যে দ্রুততর হতে পারে—এ-সম্বন্ধে বোধ করি কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

বিবর্তনের ধারাটি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে **The animal is executive and not creative.** পশু হল জড় ও জীবনের এমন যন্ত্র যার নিজে চলার কোনও ক্ষমতা নেই। কেননা চিন্তা অথবা মননশীলতার সাহায্যে কোনও কিছু উদ্ভাবন করে আপন জীবনে তাকে প্রতিফলিত করা পশুর সাধ্য নয়; বর্তমানই তার সব, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। যে পরিবেশে যে গড়ে ওঠে তার চেয়ে ভিন্নতর কোনও পরিবেশ আছে কিনা, তা জানবার কোনও শক্তিরই সে অধিকারী নয়। সেই কারণেই সে Executive হয়ে রয়েছে creative হতে পারেনি কিন্তু মানুষ মননশীল। স্বতঃই সে সৃজনশীল। কিন্তু শুধু Idealist হয়ে থাকলে চলবে না, মানুষকে pragmatistও হতে হবে। কেননা,—**Man approaches nearer his perfection when he combines in himself the idealist and the pragmatist, the orginative soul and the executive power.**

দুঃসাধ্য সাধন করার জন্য যে সব শক্তিধর মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মেছেন তাঁদের মধ্যেও দেখা গিয়েছে এই দুইটি,—আপাতঃ বিচারে পরস্পর বিরোধী, প্রবণতার অপূর্ব সমন্বয়। তাই তাঁদের কর্মের মধ্যে দেখা যায় আদর্শের আশ্চর্য প্রতিফলন। তাঁরা চিন্তাশীল কর্মী এবং **Practical dreamers.** এমনি মানুষ ছিলেন নেপোলিয়ন এবং আলেকজাণ্ডার। আমাদের মনে হয় লেনিনও ছিলেন এই ধরণের শক্তিধর মানুষ। নেপোলিয়ন মুখে অবশ্য, যাঁরা আদর্শবাদী, যাঁরা স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সব সময়ে সোচ্চার ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি নিজেছিলেন অতিমাত্রায় স্বপ্ন দ্রষ্টা এবং অবিচল আদর্শবাদী। হয়তো তিনি তা জানতেন না। যাই হোক, মানুষের মধ্যে যদি **Idealism** এবং **Pragmatism** এর সমন্বয় ঘটে, তাহলে মানুষের অগ্রগতির বেগ দ্রুততর হয়। সুতরাং ভাববাদীর যে নিস্তার্হ এ-কথা কখনই বলা চলে না।

এ-প্রসঙ্গ এখন থাক, আমাদের মূল প্রশ্নে আবার আমরা ফিরে আসি। আমাদের প্রশ্ন ছিল শ্রীঅরবিন্দ-কে মহাবিপ্লবী বলা যায় কিনা ?

এই প্রশ্নটির সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে বিপ্লব বলতে আমরা কি বুঝি। পীযুষবাবু এ-বিষয়ে আপনার অভিমত কি।

—সাধারণ ভাবে আমরা জানি **Evolution**কে ত্বরান্বিত করার নাম **Revolution.**

পীযুষবাবুর এই উত্তর মেনে নিয়ে নীতিনদা বললেন, এখন তাহলে প্রথমে **evolution** এর তত্ত্বটিকে ভাল করে বোঝা দরকার। তারও আগে বোঝা দরকার **Involution** অর্থাৎ সংবৃতির তত্ত্বটি। যে অবস্থায় থেকে বিবর্তনের কাজ সুরু হল সেই অবস্থাটি কেন এবং কি ভাবে গড়ে উঠল তা যদি আমরা না জানি, তাহলে বিবর্তনের তত্ত্বটিকে সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং **Involution** এর তত্ত্বটি আমাদের সর্বাগ্রে জানতে হবে। এতক্ষণ **evolution** সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি, কিন্তু **Involution** সম্বন্ধে কিছুই বলিনি। কেন বলিনি তা বোধ হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন। এই সংবৃতির তত্ত্বের সঙ্গে বৈদিক ও ঔপনিষদিক চিন্তাধারা গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট; কিন্তু **Revolution** এই শব্দটির থেকেই বুঝতে পারা যায় যে ওর মধ্যে পশ্চিমী ভাবনাই বিধৃত। বাস্তবিক পক্ষে **Involution** এর তত্ত্বটি পশ্চিমী মনীষীরা বিশেষ করে জড়বাদী দার্শনিকেরা একেবারেই গ্রহণ করেননি। এবং সেই জন্যেই **evolution** এর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা একদিকে যেমন **'Missing LINK'** এর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, অন্যদিকে মানুষের পর কি, তা আর তাঁদের মাথায় আসছেনা। গোড়াতেই **Involution** এর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি দুরূহ হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় আমি **Evolution** সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করেছিলাম। এবং ঐ তত্ত্বটি সম্বন্ধে আরও দু'চারটি কথা বলার পর আমরা **Involution** সম্বন্ধে আলোচনা করব।

Evolution এর তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, মানবজাতিকে বেঁচে বর্তে থাকতে হলে তার স্বভাবের রূপান্তর ঘটাতে হবে। এটা হল বিবর্তনের একটা দিক। অন্যদিক মানুষের বাহির্জীবনের পরিবর্তন। জীবনের এই দিকটাতেই 'বিপ্লব' কথাটির বহুলব্যবহার। অর্থাৎ অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে, নূতন সমাজ ও নূতন রাষ্ট্র গঠন করে নূতন অর্থনৈতিক ও উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে মানুষকে দ্রুত সুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হলে যে উপায় মানুষকে অবলম্বন করতে হয় তারই নাম হল বিপ্লব। যেমন—শিল্প বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব ইত্যাদি। এবং এই অর্থেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্বল্প পরিসর রাজনৈতিক জীবনে ছিলেন বিপ্লবী। কেন না, ইংরাজের অত্যাচারী শাসন ও শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করে তিনি চেয়েছিলেন দেশের মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলতে। কিন্তু পরবর্তীকালে যে জীবন তিনি বরণ করে নিলেন,

সে জীবন, বিপ্লব যে অর্থে ব্যবহৃত, তার থেকে অনেক দূরে। সুতরাং ১৯০৫-০৯ সালে শ্রীঅরবিন্দকে যদিও বা বিপ্লবী বলা যায়, পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দকে নৈব নৈব চ। —এই হল সাধারণ মানুষের ধারণা। কেন না, ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান থেকে যথা প্রয়োজন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে মনুষ্য সমাজকে উন্নততর অবস্থার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্ম মানুষ যে সব বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করে, তার মধ্যে অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধনের কোনও কার্যক্রম অর্থাৎ programme নেই। না থাকবারই কথা। কেন না, পশ্চিমের মানুষ; যাঁরা জড়বাদী দর্শনের প্রবক্তা বা অনুরাগী, তাঁরা অন্তর প্রকৃতির রহস্ত হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি আয়ত্ত করার কোনও চেষ্টাই করেন নি। তাই তাকে অস্বীকার করেই তাঁরা এগোতে চান। এবং তাঁদের চিন্তা চেতনা, ধ্যান ধারণার দ্বারা যেহেতু আমরা এ-দেশের বুদ্ধিবাদী আধুনিক মানুষ বিশেষ ভাবে প্রভাবিত, সেই হেতু অন্তঃপ্রকৃতির প্রকৃত মূল্যায়ণে আমাদেরও যথেষ্ট অনীহা এবং সেই হেতু শ্রীঅরবিন্দের জীবনব্যাপী এই দুরূহ তপস্তাকে যে বৈপ্লবিক আখ্যা দেওয়া যায় সে ধারণাও আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

বুদ্ধি পরিচালিত কর্মানুশীলনের সাহায্যেই পরিবর্তন সাধন সম্ভব এই ধারণাই আমাদের মনে বদ্ধমূল। তপস্তার শক্তিকে আমরা অবশ্য পাশ্চমী মানুষদের মত পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিতে পারি না, তবুও তাকে বৈপ্লবিক বলতে গিয়ে কেমন যেন খটকা লাগে। তপস্তার সঙ্গে যেহেতু ঐশ্বরিক ভাবনা একান্ত ভাবে সংশ্লিষ্ট এবং যেহেতু ঈশ্বর নামক বস্তুটি সমাজে সুবিধাভোগী শ্রেণীদের দ্বারা সৃষ্ট, সেই হেতু তপস্তার সাহায্যে বিপ্লব সাধন কথাগুলো শুনলেই যেন সন্দেহ জাগে। তাই বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দকে ১৯০৫-০৯ সালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে আমরা নিশ্চিন্ত হই।

যাইহোক আমাদের এখন বিচার করে দেখতে হবে বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার জন্তে শ্রীঅরবিন্দ কি চেষ্টা করেছিলেন। বিবর্তনধারার ক্রমগতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি,—মানুষ আজ যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে তার থেকে উন্নততর অবস্থায় উঠতে না পারলে সমাজ-মানুষকে ঘিরে যে সব সমস্তা দেখা দিয়েছে তার সাধনার সম্ভব নয়। আমরা এ-কথাও বলেছি,—বাইরের জীবনের পরিবর্তন সাধন করে অন্ত-র্জীবনকে পরিবর্তন করা যাবে না। অন্তঃপ্রকৃতির রহস্ত না জানতে পারলে, মানুষের পক্ষে এমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয় যার সাহায্যে অন্তর্জীবনের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে সুতরাং আমাদের এখন বিচার করে দেখতে হবে যে, উচ্চতর চেতনায় মানুষকে উন্নীত করা এবং উচ্চতর চেতনাকে পার্থিব চেতনায় নামিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দ কি চেষ্টা করেছিলেন।

—কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে নীতিনদা,—পীযুষবাবু খুব স্পষ্ট গলায় বললেন,—আধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধ বহু ঋষি, সাধক ও মহাপুরুষ এই ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্তত্র জন্মগ্রহণ করেছেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্বয়ং ভগবান তাঁকেও এখানে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, কিন্তু তবুও মানুষের দুর্দশা আজও ঘুচল না। মানুষ যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেল। সুতরাংআমার প্রশ্ন হল, ঐ অধ্যাত্ম সাধনার পথে কি বিপ্লব আনা সম্ভব? শ্রীঅরবিন্দ কি কোনও নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন? যে কাজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ করতে পারেননি,—সেই কাজ সম্পন্ন করতে শ্রীঅরবিন্দ সাহসী হলেন কি করে?

মৃদুহেসে নীতিনদা বললেন,—আপনার প্রশ্ন শুনে খুব খুশী হয়েছি। কেন না, আমার বক্তব্য নিবেদনে এ-গুলো যেমন সাহায্য করবে,—তেমনি সকল শ্রোতার পক্ষেও আমার বক্তব্য বোঝা খুব সহজ হবে।

এই আলোচনার সুরুতে চেতনার ক্রমোন্মীলনের প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম,—পরমচেতনা অর্থাৎ Supreme Consciousness অর্থাৎ ব্রহ্ম, জড়ের মধ্যে

আবৃত ছিল, ক্রমশঃ তার উন্মীলন ঘটছে। এই ভাবে মানুষে এসে উন্মীলিত হয়েছে মনশ্চেতনা। এখন Supreme Consciousness জড়ের মধ্যে আবৃত ছিল কিনা সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়নি।—বলতে বলতে নীতিনদা পীযুষবাবুর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন,—আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে পীযুষবাবু যে আমি বলেছিলাম এই বিষয়টি পরে আলোচনা করব।

পীযুষবাবু সহাস্যে সম্মতি জানালেন।

নীতিনদা অন্য শ্রোতাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'পরমচেতনা' জড়ের মধ্যে আবৃত ছিল কিনা তা জানতে গেলে সংবৃতি অর্থাৎ Involution এর তত্ত্বটি জানতে হয়। একটু আগেই আমি বলেছি Involution হল Evolution এর গোড়ার কথা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—**An Involution of the Divine Existence, the spiritual reality in the apparent inconscience of Matter is the starting point of the evolution...the evolution must then be an emergence of the Existence, Consciousness, Delight of Existence.**

সংবৃতি অর্থাৎ Involution এর তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি জড়ের আপাতঃ নিশ্চেতনার মধ্যে নিগূঢ় হয়ে আছে যে শক্তি তা-ই হল—Divine Existence অর্থাৎ দিব্য সৎস্বরূপ। যাকে আমরা বলেছি পরম-চেতনা। সৎ, চিৎ এবং আনন্দই হল সেই সত্যবস্তুর শাশ্বত স্বরূপ। সুতরাং অভিব্যক্তিবাদের পথে এই শক্তিরই উন্মীলন অর্থাৎ প্রকাশ ঘটবে। ক্রমশঃ

আফশোষ

সুবোধ বসু

ফাউ হিসেবেই অমৃতসর গিয়েছিলাম। কাশ্মীর দেখাটাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কাশ্মীর পরিক্রমা শেষ করে পাঠানকোটে ফিরে এসে মনে হলো, শিখদের পীঠস্থান গোল্ডেন টেম্পলের শহর অমৃতসর দেখে এলে মন্দ কি?

মামার বড় শ্যালক অসীমবাবু অমৃতসরের বাসিন্দা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি উপলক্ষে তাঁকে এত বছর অমৃতসর কাটাতে হয়েছে যে, জায়গাটার ওপর মায়া পড়ে গেছে। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন বছর তিন চার। কিন্তু অমৃতসরেই রয়ে গেছেন। কলকাতায় দুই তিন বছর পর পরই বেড়াতে যেতেন। মামার বাড়িতে বহুবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। হাসি-খুশি দিল-দরিয়া লোক। হৈ-চৈ করছেন, রসিকতা করছেন, দলবল নিয়ে থিয়েটার সিনেমায় যা.চ্ছেন, টাকা ব্যয় করতে সামান্য কার্পণ্য করছেন না। এমন লোকের সঙ্গে মিলে যাওয়া খুব সহজ।

বছর দুয়েক হল স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। তারপর আর কলকাতায় আসেন নি। এই দুবছরে তাঁর কতটা পরিবর্তন হয়েছে জানিনা, কিন্তু তাঁর অতীতের চিত্রটি এতই আকর্ষণীয় যে, তাঁর কাছে যেতে কোন দ্বিধা হয় না।

পাঠানকোট থেকে ট্রেন না ধরে বাস-এ চেপে বসলাম। পাঞ্জাবের পল্লীপ্রান্তর সবুজ শস্যের সমারোহে রমনীয়। চওড়া পিচের মসৃণ রাস্তা দিয়ে ঊর্দ্ধগতিতে ছুটে চলেছে বাস। যেন চলচ্চিত্রের রীলের মধ্য দিয়ে গুরুদাসপুর, ধারিওয়াল, বাটালা পার হয়ে যাচ্ছি। ধারিওয়ালের কম্বল আর গুরুদাসপুর গুড় বাঙালি মাত্রেরই জানা। চাক্ষুস পরিচয় হলো। অমৃতসরের দূরগামী বাসসমূহের জন্য নির্দিষ্ট বাসষ্টেশনে যখন হাজির হলাম, তখন বিকেল চারটেও নয়। অর্থাৎ অসীমবাবুর ম্যালরোডের বাঙলো খুঁজে নেবার জন্য যথেষ্ট দিনের আলো হাতে আছে।

প্রকাণ্ড ব্যাপার এই বাসষ্টেশনটি। ছোটখাট একটা এরোড্রাম বলা চলে। কিন্তু এই ময়দান থেকে শহরের নিয়ে যাওয়ার যানবাহনের অভাব নেই। টাঙ্গা, ট্যাক্সি, সাইকেল-রিকৃসা। ধীরে সুস্থে শহর দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে ভেবে শেষোক্তটি পছন্দ করলাম। দেখি প্রথম দর্শনে শহরটির সঙ্গে প্রেমে পড়া যায় কিনা।

কিন্তু প্রথমেই ধাক্কা। 'পুল আগিয়া' বলে শিখ রিকৃসা-চালক রাস্তার ফুটপাথের গায়ে রিকৃসা-ভেড়ালো।

'পুল!' আমি চমকে উঠে সামনে তাকালাম।

দেখি কাছাকাছির সব রিকৃসা থেকেই সব লোক নেমে পড়ছে। মহাজনদের যে পথ আমারও তাই বলে আমিও নেমে পড়লাম। রাস্তা ক্রমোচ্চ হয়ে প্রায় টেনিসকোর্টের মত বড় একটা মালভূমিতে উঠে গেছে। সাইকেল-রিকৃসা টানতে পারে না বলে যাত্রীদের হেঁটে চড়তে হয়। টাঙ্গা বা মোটরের সে হাঙ্গামা নেই। কিন্তু মহানন্দে মালভূমির উপরে উঠে এলাম। অমৃতসরের বড়া পুলের তলা দিয়ে রেলগাড়ি যায় আর পাঁচ দিকে পাঁচটা রাস্তা এখান থেকে শহরের দিকে গড়িয়ে পড়ে।

পুলের উপরে আমার সাইকেল-রিকৃসা আবার আমাকে কুক্ষিগত করে ডান দিকে গড়িয়ে চলল। শুরু হয়ে গেল অমৃতসরের ফ্যাশনের অঞ্চল। সুন্দর সুন্দর দোকান, হোটেল আর রেস্তরাঁ। বিকেল হয়েছে। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। পাঞ্জাবী কি মেয়ে কি পুরুষ সবারই সাজের দিকে নজর আছে। চকচকে

রাস্তা আর বল্‌মলে দোকানপাটের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গিয়েছে জনতা।

'মাল রোড় আগিয়া' আবার ঘোষণা করলে রিক্সা-চালক আরেকটা চওড়া রাস্তার সংযোগস্থলে পেঁৗছে। বাঁ দিকে মোড় নেবার উদ্যোগ করেছিল, কিন্তু সহসা ট্রাফিক-পুলিসের সঙ্কেতে বামালসহ মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

পেছন থেকে একটা মোটরগাড়ী কিছুক্ষণ আগে থেকেই 'পথ ছেড়ে দাও' বলে হুঙ্কার ছাড়ছিল। পুলিসের নির্দেশের দরুণ ইচ্ছে থাকলেও দামীগাড়ীকে সেলাম করে পথ ছেড়ে দেবার কোনও উপায় ছিল না, কিন্তু তিনি হর্নের ধমকানি দিয়েই চললেন। এবার বিরক্ত হয়ে রিক্সা-চালক এবং তার সঙ্গে আমিও পেছনে তাকালাম।

'কে, ঘন্টু না!

.আরে অসীম মামা!

'আয়, আয় নেমে আয়।' গাড়ী ষ্টিয়ারিং হুইলের পেছন থেকে মামার শ্যালক অসীমবাবুর প্রায় যেন স্বপ্নের মধ্য থেকে উদিত হয়ে হাতের ইঙ্গিতে এবং উচ্চকণ্ঠে ধাকা-খাওয়া কণ্ঠে নেমে পড়তে আহ্বান জানালেন। রিক্সা-চালককে বিস্মিত করে নেমে পড়লাম রাস্তায়।

অমৃতসর যে আমাকে সত্যাই স্বাগত জানিয়েছে, এতে আর সন্দেহ রইল না!

সন্দেহ হলো, অমৃতসরের রাস্তায় হুবহু আমাদের ঘন্টুবাবুর আবির্ভাব হয়েছে! কিন্তু ফস্ করে, ডেকে বসে বোকা-বনা সমীচীন হবে না ভেবে অনুসরণ করছি আর শিঙা ফুঁকছি!, গাড়ীর দরজা খুলে অসীমবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় অভ্যর্থনা জানালেন।

তাঁর অভ্যর্থনা যে কি প্রাণবন্ত ব্যাপার তা যারা তাঁকে জানে তাদের অবিদিত নয়। 'শিঙা ফুঁকছেন' আর প্রাণের প্রাচুর্য্যে টগবগ করছেন। বাগানে আর লন্-এ শোভিত সুন্দর বাংলো। আধুনিক আরামের সকল ব্যবস্থার মধ্যে পুরানো দিনের হৃদ্যতা। এই হৃদ্যতা বাড়ীর কর্তার কাছ থেকে বেয়ারা-কাম-কুক্ কাঙড়াবাসী রতন এবং উত্তরপ্রদেশবাসী মালী হরবারীলালে পর্য্যন্ত সংক্রমিত হয়েছে।

বাঙালী রীতি অনুযায়ী খাওয়ার প্রচুর আড়ম্বর। মাছের ঝোল-ঝাল, চচ্চড়ি সুক্তো থেকে শুরু করে মুর্গীর রোষ্ট, লেগ-রোষ্ট, ফিশ্ ফ্রাই, মেওনাইজ, পুডিং। বাঙালী ও সাহেবী খাদ্য তো আছেই তার উপর পাঞ্জাবী খানা:—মটর আলু পালক পনীর, বটুরা-ছোলে। আরও কত কি। কিন্তু শুধু কি এই! গাড়ীর শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে অসীমবাবু এখানে নিয়ে যাচ্ছেন, ওখানে নিয়ে যাচ্ছেন দুরন্ত ঝড়ের মতো, আর এই উপলক্ষ্যে হোটেল রেঁস্তরা চষে বেড়াচ্ছেন, ফলের দোকা ন চুঁ মেরে সেও (আপেল) আর আঙুরের স্তপ তুলে নিচ্ছেন।

জীবনে এই বয়সে আর কি আকর্ষণ আছে? এই খাওয়াই তো? আমার প্রতিবাদকে তিনি সহজেই নিরস্ত করছেন।

তিন দিনে অমৃতসরের যতটা দেখেছি এবং যতটা উপভোগ করেছি, অসীমবাবু না থাকলে তা অসম্ভব হতো। পাঞ্জাবকে তিনি জানেন, পাঞ্জাবীদের জানেন। এখানকার রীতিনীতি তিনি যতটা সহানুভূতির সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে পারেন, তেমন আর কাউকে পাওয়া যেত না। রসিকতা দিয়ে সরস করে তিনি সকল বক্তব্য জীবন্ত করে তুলছেন।

'হাল গেট!' হালবাজার হয়ে গোল্ডেন টেম্প্‌ল ও জালিয়ানওয়ালাবাগ যাবার পথে ফটকটির সামনে গাড়ি পৌঁছলে তিনি বললেন। 'কিন্তু খুব হালেরগেট নয়, তা দেখেই বুঝতে পারছ। ইংরেজিতে যাকে হল্ বলে, আর বাঙালিরাও যাকে হল্ বলে জানে, উত্তর ভারতে সেই হলের এই হাল হয়েছে। যেমন অর্ডার আর্ডার, অরগেনিজেশান আরগেনিজেশান, অরিজিনেল আরিজিনেল। কিন্তু এঁরা উচ্চারণের গলতি স্বীকার করে না। এঁদের ভাষাবিদেরা অভিযোগ করেন, ওদের অ-কার আমরা উচ্চারণ করতে পারি না। তাকে আ-কার মনে করে বসি...কিন্তু ভাষাতত্ত্ব রেখে এবার বাজারের জলুস লক্ষ্য করো। সারা ভারতবর্ষের সব বড়

বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলি কি অবলীলাক্রমে হালবাজারে এসে হাজির হয়েছে দেখো···এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে শত কোম্পানীর ধারা।'

হালগেট থেকে গোল্ডেন টেম্পল পর্যন্ত রাস্তার প্রায় দু'ধারে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে দেখা সব অতি-পরিচিত নাম দেখতে দেখতে আমরা সুবিখ্যাত শিখ ধর্মপীঠের প্রধান ফটকের কাছে হাজির হলাম। 'ভয় পেয়োনা।' অসীমবাবু গাড়ীর দরজা খুলতে খুলতে অভয় দিয়ে বললেন 'এ কোনও দুর্গ নয়। তোমরা যাকে বলো গোল্ডেন টেম্পল, তাই আছে এই সব অপিস-ফ্ল্যাট ডিঙিয়ে যেতে পারলে। বিখ্যাত দরবার সাহেব। পকেট থেকে রুমালটা বের করে চট্ করে মাথায় বেঁধে নাও। না, মাথাকাটা পড়বার ভয় নেই, তবে 'নাঙ্গা' শিরে শিখ ধর্মস্থানে প্রবেশ করলে অসৌজন্য হয়। প্রথমবার লজ্জায় আমার মাথাকাটা গিয়েছিল···

বহু শিখবন্ধু বেরিয়ে এল অসীমবাবুর সরোবর মধ্যবর্তী স্বর্ণখচিত শির দরবার সাহেবে। কখনও ইংরেজি, কখনও বা পাঞ্জাবীতে অবলীলাক্রমে কথাবার্তা চালাচ্ছেন, রসিকতা করছেন। আর আমি দেখছি ভেতরটা। নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রন্থসাহেব পাঠ হচ্ছে। ভজন হচ্ছে গাওয়া। সরোবরের জলে প্রতিধ্বনি উঠছে। এদের ভাষা আমার অবোধ্য। মেয়ে-পুরুষের সাজ ভিন্ন রকমের। মন্দিরের ভেতরটা আর পূজার রীতিনীতি আলাদা। তবু ভারতের মূল রকমটার সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য মিল আছে। অসীমবাবু যাকে বলেন, 'একই শব্জি আলাদা ফোড়ন দিয়ে রান্না করা!

'চলো'। জালিয়ানওয়ালাবাগটাও ঘুরিয়ে নিয়ে যাই। অবশেষে অসীমবাবু বন্ধুদের হাত ছাড়িয়ে কাছে এসে বললেন। পাঞ্জাবিরা খুব বন্ধুপ্রিয়। তাই ওদের শুধু 'নড্' করে চলে আসা মুস্কিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগ। অসীমবাবু পর্য্যন্ত চুপ হয়ে গেলেন। ভারতবাসীর বেদনা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জড়ানো রয়েছে এই জালিয়ানওয়ালার স্মৃতির সঙ্গে। আজ এই বধ্যভূমি সুন্দর বাগিচায় পরিণত হয়েছে। শত শহীদের রক্ত ফুল হয়ে, সবুজ সুন্দর ঘাস হয়ে ফুটে উঠেছে সেই মাটির উপর যেখানে একদা তাদের নৃশংস-ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের আর্তনাদ আজ ক্রীড়ারত শিশুদের আনন্দধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে।

'দেখে যা. পাঞ্জাব কতটা সম্মান দিয়েছে তোদের বাঙলা ভাষাকে।' বাগান থেকে বেরিয়ে আসবার সময় গেটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গেলেন অসীমবাবু। 'পড় এই ফলকটা।'

পড়লাম। এই স্মৃতিস্তম্ভ, এই বাগান শহীদের স্মৃতিতে উৎসর্গ করা হয়েছে—তিনটি ভাষায়। প্রথমে পাঞ্জাবীতে, গুরুমুখী অক্ষরে। শেষে ইংরেজিতে। আর মাঝখানে, আশ্চর্য্য বলতে হবে—বাংলা ভাষায়! চেয়ে দেখি, অভয়বাবু মিটিমিটি হাসছেন। ভাবটা এই দেখো, কেন পাঞ্জাবে রয়ে গেছি।

আর কোন্ টাওয়ারের কথা বলছিলেন? ঘড়ির প্রতি অসীমবাবুর সোদ্বেগ দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললাম। 'কাজেই কি?'

'দরবার সাহেবের গায়েই বাবা অটলের টাওয়ার। কিন্তু বেলাও একটু বেশি এগিয়ে গেছে। বাবা অটলের আখড়ায় তো পাত পাততে পারব না। কাজেই এবার বাড়িই চল।···বাবা 'টল' পক্কী পকাই কল্।' মাঝে মাঝেই মজা করে অসীমবাবু পাঞ্জাবী বয়েত ছাড়েন এবং আমাকে বোকা বানাতে সমর্থ হয়েছেন দেখে খুব মজা পেয়ে নিজেই তার অর্থ ব্যাখ্যান করেন।

বাবা অটলের টাওয়ারে রোজই বহু অতিথিসৎকার করা হয়। যারই খাওয়ার নেই সে-ই ওখানে গিয়ে হাজির হতে পারে। এই অনায়াসে খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারটা একটা রসিকতার পর্য্যায়ে দাঁড়িয়েছে। যারই রান্না করতে ইচ্ছে হচ্ছে না, খাওয়ার কিনে আনতে আলস্য হচ্ছে, মাসের শেষে খরচের টাকা ফুরিয়ে আসছে, সেই তামাস করে হাঁক ছাড়বে 'বাবা' টল, পক্কী পকাই কল। বাবা অটল, তৈরী রান্না পাঠিয়ে দাও ...

কিন্তু অবিলম্বেই বোঝা গেল, পক্কীর জন্য অসীমবাবু

এমন কোনও অস্থির হয়ে পড়েননি। অমৃতসরের গলির গোলকধাঁধার মধ্যে গাড়ী ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, একটা সারাদিন দরকার হবে এইসব কাশী-বিনিন্দিত গলি দেখাতে। অসংখ্য গলিতে অসংখ্য দালান, অসংখ্য বাসিন্দা, বাজার কাটরা, অসংখ্য সাইকেল রিকসা, দ্রুতগামী কিন্তু ধাক্কা এড়িয়ে যাওয়া বাইসাইকেল আর স্কুটার এবং দুর্বার প্রাণচাঞ্চল্য। কলকাতা হলে হাজার অ্যাকসিডেন্ট, গালাগালি হাতাহাতি হয়ে যেত। এখানে সবাই গলি আর ভিড়ের অসুবিধা মেনে নিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ গলিতে মোটরগাড়ী ঢোকান যাবে না— একদিন পায় হেঁটে বা সাইকেল রিকসায় চেপে দেখতে হবে। আজ শুধু চাব খাটিকা আর চিট্টা কাটরা। চিট্টা কাটরায় ব্ল্যাকমার্কেট চলে কিনা জানিনে, কিন্তু চিট্টা মানে হলো সাদা। এখানে বন্ধু রালেয়ারামের বাড়ীতে একবার ঢুঁ মেরে যেতে হবে। বেচারির মা মারা গেছেন...আজ চতুর্থ দিন বা চৌথা...।

অপেক্ষাকৃত বড় গলি ধরে আমরা চিট্টা কাটরায় হাজির হলাম। গাড়ী পার্ক করে অসীমবাবু বললেন, পাঁচ-সাত মিনিট বসো। বাজারের শোভা আর ভিড় নিরীক্ষণ করো। বেড়াতে এসেছ, শোকের মধ্যে আর তোমাকে নিয়ে যাব না। আমি চট করে ঘুরে আসছি। পাঞ্জাবে শোকের জন্য আফশোষ এবং বিবাহাদির জন্য মুবারক খুব নিষ্ঠার সঙ্গে জানাতে হয়...

পাঁচ সাত মিনিট কিন্তু আধঘণ্টায়ও শেষ হলো না। সামনের যে এঁদো গলি দিয়ে অসীমবাবু অদৃশ্য হয়েছেন, একবার মনে হলো সেটা ধরে এগিয়ে যাই। থেমে থাকা গাড়ীতে বসে থাকার মত কষ্টকর আর কিছু নেই। কিন্তু গলির ইমারতের অরণ্যে তাঁকে কোথায় খুঁজে বের করব? গোলকধাঁধার মধ্যে নিজেই বরঞ্চ হারিয়ে যেতে পারি। গণ্ডীর বাইরে পা না বাড়ানোই ভালো!

বসে বসে ট্যাঙে সাইকেল রিক্সার ভিড়, ওষুধের দোকান, হালওয়াইর ও ফলের দোকান, শাড়ীতে জরির নকসা তোলবার কারিগরী প্রভৃতি অলসভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। এত অল্প এবং অপরিসর জায়গায় লোকের এত ভিড় কমই দেখা যায়। অথচ অমৃতসরের হালের অংশে চওড়া রাস্তা, বাগান ও খোলা জায়গার অভাব নেই। একদা যখন দেশে নিরাপত্তার অভাব ছিল, তখন জনসাধারণ গলির ভেতরে ঠাসাঠাসি হয়ে থেকে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা করেছে। এখন শহরটাকে ঢেলে সাজানো প্রায় অসম্ভব।

অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি কেমন? চিন্তায় অকস্মাৎ বাধা দিয়ে অসীমবাবু সশব্দে গাড়ীর দরজা খুললেন। একটু ধৈর্য্য শিক্ষা করা ভালো। বলেইছি তো এখানে শোক প্রকাশও একটু আড়ম্বরের সঙ্গেই করতে হয়। খুব ভীড়। মহিলারা বুক থাপড়াচ্ছেন আর শোক করছেন। নাপতানী ইনিয়ে বিনিয়ে...কিন্তু দাঁড়াও, সেসব কথা হবে দুপুরের খাবার পর আমাদের বছর কুড়ি আগেকার প্রথম অভিজ্ঞতার কাহিনী। এবার লোগড় ফটকের উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু করা যাক। লোগড় মানে লৌহগড়। দেওয়ালে ঘেরা প্রাচীন শহরের অন্যতম প্রধান ফটক।

রাস্তায় যেতে যেতে আরও একটু গড় দেখিয়ে দিলেন অসীমবাবু। বললেন, এই গড়টির নাম ইতিহাসে পড়ে থাকবে। ফোর্ট গোবিন্দগড়। একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এটি দেখাবার জন্য। আরও যদি ক'দিন থেকে যেতিস, ধীরেসুস্থে কাছের এবং আশেপাশের সব দেখানো যেতো। কিন্তু টুরিস্টরা কি দেখতে জানতে আসে? তারা কোথায় কোথায় গিয়েছে তার লিস্টি বাড়াতে চায় মাত্র। কলকাতায় গিয়ে গল্প মারবার মতো যথেষ্ট দেখা হয়েছে, তবে আর ভয়টা কি? ...এইবার রেল পুল, জি টি রোড—বাঁ দিকে চলে গেলে সিধা পাকিস্তানের সীমান্তে ওয়াহগায়। কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছতে হলে ডান দিকে। বলে অসীমবাবু শিস্ ফুঁকতে ফুঁকতে ডান দিকে মোড় নিলেন।

দুপুরের আহার আর দুঘণ্টার দিবানিদ্রার মাঝখানে আধঘণ্টা খানিক ফাঁক থাকে। এই অবকাশটা অসীম-বাবু সিগারেট ফোঁকা আর গল্প করায় ব্যয় করেন। আজকের গল্প তাঁর শোকসভায় আমন্ত্রণের প্রথম অভিজ্ঞতার কাহিনী। প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। রীতিনীতি ইতিমধ্যে কিছুটা বদলে গেছে—তবে আমূল বদলায় নেই।

একদিন বিকেলে চা খাচ্ছি। অসীমবাবু বলে গেলেন। 'নতুন অমৃতসরে এসেছি। বিকেল হওয়া মাত্র বেরিয়ে পড়ি শহর দেখতে ও চিনতে। ড্রাইভার গ্যারাজ থেকে গাড়ী বের করে গাড়ী বারান্দায় নিয়ে এসে অপেক্ষা করছে। তোর মামামা তখনও তৈরী হয়ে আসতে পারেন নি। আমি মাঝে মাঝে হাঁক ছেড়ে তাড়া দিচ্ছি। এমন সময় অকস্মাৎ আমার হাঁককে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে বাজখাঁই কণ্ঠে একটা হাঁক উঠল গাড়ী বারান্দার কাছাকাছি থেকে। কিন্তু এ হাঁকেরও বেশী! থামছেই না। তারস্বরে কে এক-জন পাঁচালী পড়ে যাচ্ছে। পাঞ্জাবী ভাষার তখন এক বর্ণও বুঝি না ভাবলাম, কেউ কোনও পূজোর জন্য চাঁদা বা ভিক্ষে চাইছে। চাকর-বাকরেরা কেউ তাকে নিরস্ত বা আমাকে খবর দিচ্ছে না দেখে চায়ের পেয়ালা ত্যাগ করে বাইরে বের হলাম। ইতিমধ্যে যেমন অকস্মাৎ পাঁচালী নির্ঘোষ শুরু হয়েছিল তেমনি সহসা তা থেমে গেছে। বেরিয়ে দেখলাম, লম্বা, রোগা, আধময়লা কাপড়পরা একটা নিম্নশ্রেণীর লোক লনের পাশের রাস্তা ধরে গেটের দিকে হনহন করে ফিরে যাচ্ছে।

"উহ কোন্ থা, সুন্দরলাল?"

"শেঠ কুন্দনরামজীর ছেলে দুপুর বেলা মারা গেছে, সেই খবর জানিয়ে গেল।"

'অমৃতসর এসে প্রথমেই যাদের সঙ্গে চেনা ও হৃদ্যতা হয়, কুন্দনরাম তাদের অন্যতম। এই মৃত্যুসংবাদে স্তম্ভিত হলাম। ক'দিন আগেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ চলছে, তাও বলেন নি।

"কিন্তু এ লোকটি কে?" প্রশ্ন করলাম। এ রকম চিৎকার করে যে শোকসংবাদ দিয়ে যায়, তার সম্বন্ধে কৌতূহল না হয়ে উপায় কি?

"ও তো নাই। শোকসংবাদ দেবার লোক, বাড়ীতে বাড়ীতে খবরটা জানিয়ে দেয়।' ড্রাইভার সুন্দরলাল নাপীর প্রথাসম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দূর করলে। সবাইকে ওই অবস্থায় খবর দেওয়া তো সোজা কথা নয়। তাই বাড়ীর লোক এদের সাহায্য নেয়—

'তাজ্জবের কথা হলেও সুবিধাজনক সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে আর আলোচনা না করে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে এলাম। তোর মামীমাকে খবরটা জানালাম। মিসেস কুন্দনরামের সঙ্গে তাঁরও পরিচয় হয়েছিল। বিকেলের সফর বিসর্জন দিয়ে দুজনেই কুন্দনরামের জমাদার দী হাভেলীর বাড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

গলিতেই সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। তাতে বহু লোক মাথা নিচু করে বসে আছেন। এরা সবাই পুরুষ এবং সবাই নীরব। গলি থেকে বাড়িতে উঠেই মেয়েদের জায়গা। সেখানে ভিড় এবং এই ভিড়ের কেউই নীরব নয়। বিলাপের একটা ঢেউ চলছে সেখানে।

শোকের বাড়ীতে কেউ অভ্যর্থনায় অপেক্ষা করে না। আমি গলির চাদরের উপর আর তোর মামীমা তার সামান্ত দূরে ঘরের ভেতর আসীন হলেন। সুযোগ পেলে কুন্দনরাম আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আফশোষ জানাব।

ঘরের ভেতর যিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুক-ফাটা চিৎকার করে বিলাপ করছেন তিনি কিন্তু কুন্দনরাম-পত্নী নয়। মধ্যবয়স্কা মোটাসোটা কোন গরিব আত্মীয়া হবেন, অন্তত সাজপোষাক দেখে তাই মনে হয়।

"কি সর্বনাশের কথা, কি ভয়ংকর আফশোষের কথা. শেঠ জোয়ান, নওজোয়ান মরে গেল—হায় হায়' বলে সে বুক চাপড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের মহিলারাও নিজ নিজ বুক চাপড়ে সমবেতস্বরে বললেন, 'হায় হায়।'

প্রধান শোকার্থিনী আবার শুরু করলেন, 'কি সুন্দর

রূপ ছিল নওজোয়ান শেঠ জোয়ানের, কত বড় মহিম তার খানদানী পিতাজী, কত সুখের সংসার, ধনদৌলতের ছড়াছড়ি, এর মধ্যে হঠাৎ কোথায় চলে গেল শেঠ জোয়ান, হায় হায়—

আমার মেয়েরা বুক চাপড়ালেন। বললেন, 'হায় হায়।'

লক্ষ্য করে দেখলাম, তোর মামীমা রীতিমত হকচকিয়ে গেছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। বুক না চাপড়ালে অশোভন হবে না তো? পাশে সম্রান্ত চেহারার এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা খুব অভিভূত হয়ে কাঁদছিলেন। বিব্রতকর অবস্থার সমাধান হিসাবে তোর মামীমা তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতে ফল বিপরীত হলো। বৃদ্ধা মহিলা রুদ্ধ শোকে আরও যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন। মূলশোকাখনা একটা শোকোক্তি করছেন, আর তিনি ভেঙে ভেঙে পড়ছেন।

আফশোষের পাট মেটাতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লেগে গেল। তখনও ভিড় কমেনি। বিলাপ ও হায়! হায়! সমানে চলছে। আমাদের গাড়ী কিছুটা দূরে অপেক্ষাকৃত চওড়া রাস্তায় পার্ক করা ছিল। হেঁটে গিয়ে চড়তে হলো।

'বহীনজী!' বলে বাইরে থেকে এক মহিলা এসেছে আমার স্ত্রীর পিঠে হাত রাখলে। মুখনেই তাকিয়ে দেখি, শোকসভার সেই বৃদ্ধা যার পিঠে হাত রেখে আমার স্ত্রী সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

'আপনি কি কোথাও যাবেন?' আমার স্ত্রী বললেন 'আমরা পৌঁছে দিতে পারি।

'না আমি কাছেই থাকি। শুক্রিয়া।

'আপনি কে হন এদের?'

'যে বাড়ীর ছেলে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'না, ওদের আমি জানিনে।' বৃদ্ধা জবাব দিলেন। 'রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, সবাই শোক করছে। শুনলাম, জোয়ান ছেলে মারা গেছে। মায়ের কত কষ্ট। তাই আমিও এদের সঙ্গে একটু কেঁদে গেলাম। সহানুভূতিতে ভেজা গলার আওয়াজ।

'আমরা এঁদের কর্তা গিন্নীকে চিনি।' তোর মামীমা বললেন। 'অন্য আত্মীয়স্বজনদের জানিনে। ভাবছিলাম কাউকে জিজ্ঞেস করব—কিন্তু আপনিও তো বলতে পারবেন না—যে মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিলাপ করছিলেন, তিনি এঁদের কে হন?

'ওটা!' বৃদ্ধা প্রায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন। 'ওটা তো নাপ্তানী! পেশাদার আফশোষ করনে-ওয়ালী! যেখানেই কেউ মারা যায়, সেখানেই নাপতানী ইনিয়ে বিনিয়ে শোক-বিলাপ আওড়াবার জন্য হাজির হয়।

যত আঁধার তত আলো

(উপন্যাস)

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

॥ ২৬ ॥
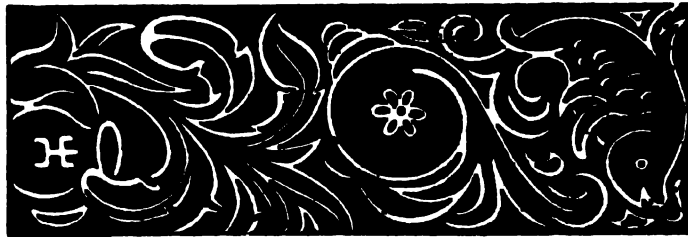
অঞ্জন ভাল হ'য়ে গেছে। অসুখের প্রায় সমস্ত ধকলটাই একা মনোরমাকে পোহাতে হ'য়েছে। অন্ন পথ্য করলেও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সময় নেবে। রঞ্জন বহুদিন ধরেই নিয়মিত অপিস করতে সুরু করেছে। মনোরমার উপর তার নির্ভরতার অন্ত নেই। তাই ব'লে এভাবে আর কতদিন চলতে পারে। কথাটা রঞ্জন বিশেষভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু মুখ ফুটে একটা ধন্যবাদ দিতেও সে পারে নি। রঞ্জনের বুদ্ধি তাকে নিরস্ত ক'রেছে। ধন্যবাদ দিয়ে মনোরমাকে সে ছোট করতে পারে নি। অঞ্জন অত ভাবনা চিন্তার ধার ধারে না। সে বলে, তুমি তো আমাদের কেউ নও মনোদি।

মনোরমা চোখ পাকিয়ে বলে, অসুখে তোমার মাথাটি একেবারে গেছে দেখছি। নইলে এ কথা বলতে তোমার আটকাতো অঞ্জন ভাই।

অঞ্জন থামতে পারে না। বলে, তা হ'লে কথাটাতো আর মিথ্যে নয় মনোদি। অথচ তুমি নাকি আমার জন্য নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলে। এ কেমন করে সম্ভব হয়।

মনোরমা বলে, আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'রে নিশ্চয় কেউ তোমাকে মিথ্যে বলেছে। মানুষের জন্য মানুষের যতটুকু করা উচিত তার বেশী কিছুই তোমার জন্য করা হয়নি। তোমার মনোদি যদি কোনদিন অসুস্থ হয় তুমিও ঠিক এমনি ক'রেই ক'রবে ভাই।

অঞ্জন অল্প হেসে বলল, অঞ্জনকে তুমি খুব ছেলেমানুষ মনে করো তাই না মনোদি।

মনোরমা সস্নেহে বলে, অঞ্জন যা আমি ঠিক তাকে তাই ভাবি অঞ্জন ভাই। কিন্তু অত বকর বকর ক'রো না। ঘুমাও। আমি বরং তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

আচ্ছা মনোদি—অঞ্জন ডাকে।

মনোরমা সাড়া দেয়, কি ভাই।

অঞ্জন বলে, তোমার নিজের মাকে মনে পড়ে?

মনোরমা একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে, কেমন করে পড়বে ভাই। আমি জন্মাবার কয়েকদিনের মধ্যেই নাকি তিনি মারা যান।

ও......আমি জানতাম না ভাই—আমার কিন্তু মাকে স্পষ্ট মনে পড়ে। অঞ্জন মৃদু কণ্ঠে বলে।

মনোরমা ফিস ফিস করে বলে, পড়াইতো উচিত ভাই।

অঞ্জন একটু হেসে বলে, দাদা বলেন তুমি নাকি আমাকে মায়ের মত বুক দিয়ে আগলে ছিলে। আর বোনের মত সেবা আর যত্ন দিয়ে অসুখের কষ্ট দূর করেছো।

মনোরমা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, তোমার নিজের কথা বলো দাদার কথা থাক।

অঞ্জন ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বলে, দাদাকে বাদ দিয়ে আমার কোন কথা আসে না।

ওর বলার ধরণে মনোরমা কতকটা বিস্মিত হ'য়ে বলল, তোমার দাদা সত্যিই ভাগ্যবান।

অঞ্জন আপত্তি জানিয়ে বলে, তুমি উল্টো কথা বলছো মনোদি।

মনোরমা জবাব দিল, আমার ভাগ্য হয়তো আমাকে দিয়ে উল্টো কথা বলাচ্ছে অঞ্জন। কিন্তু তুমি এবারে চুপ করবে কি? না আমি চলে যাব?

অঞ্জন তথাপি থামতে পারে না। বলে, তুমি চুপ ক'রতে বলছো কেন মনোদি?

মনোরমা হেসে বলে, আমার শুনতে ভাল লাগে না ভাই।

অঞ্জন অন্য প্রসঙ্গে এল, তোমরা নাকি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে?

মনোরমা বলে, সেই রকমই শুনছি।

অঞ্জন বলে, আমাদেরও বোধ হয় চলে যেতে হবে।

মনোরমা হাসিমুখে বলল, তোমরা কোন দুঃখে চলে যাবে অঞ্জন?

দাদা বলছিলেন এ বাড়ীর হাওয়া ভাল নয়। অঞ্জন বলল, এখানে থাকলে মন ছোট হ'য়ে আরও নোংরা হ'য়ে যাবে।

মনোরমা হেসে ফেলল।

অঞ্জন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি হাসছো কেন মনোদি?

মনোরমা তেমনি হাসিমুখেই বলল, যাদের মনের সংযম নেই তারা যেখানেই যাক নিজেদের বাঁচাতে পারবে না অঞ্জন।

অঞ্জন বলল, তাহলে তোমরা চলে যাবার কথা ভাবছো কেন?

মনোরমা গভীর কণ্ঠে জবাব দিল, সে কথা শুনলে তোমরা দুঃখ পাবে অঞ্জন।

অঞ্জন বলল, তুমি না বললেও দুঃখ পাব মনোদি, কিন্তু বলতে যখন আপত্তি আছে তখন আর জিজ্ঞেস করবো না।

অঞ্জন মুখ ভার করে ফিরে শুল।

মনোরমা সস্নেহে ডাকল, অঞ্জন ভাই—

অঞ্জন সাড়া দিল না।

মনোরমা বলল, এর নাম বুঝি শুনতে না চাওয়া?

অঞ্জন তথাপি নীরব।

মনোরমা থামতে পারে না। বলতে থাকে, ভুল ক'রে তোমার মনোদির উপর অবিচার ক'রো না ভাই। শোন। মুখ ফেরাও।

অঞ্জন পুনরায় মুখ ফিরে শুতেই মনোরমা তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে, যেখানেই যাই তোমাদের আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। কিন্তু আমার সবকথা বলবার নয় বলেই বলতে পারছি না। শুধু এইটুকু শুনে রাখ অঞ্জন তোমাদের জন্য যতটুকু আমি করেছি তার চেয়ে ঢের বেশী আমি পেয়েছি। তাই আমার এত ভয়। পাছে আমার এই পাওয়াটুকুও শেষ পর্য্যন্ত হারিয়ে যায়। এর গায় ময়লা লাগে।

একটু থেমে মনোরমা পুনরায় ব'লতে থাকে, এতদিন যাদের জন্য যাকিছু ক'রেছি তারা শুধু স্বার্থপরের মত নিয়েছে কিছু দেয় নি।

অঞ্জন হেসে মানুষের মত প্রশ্ন করে, আর আমরাই বুঝি তোমাকে কিছু ফিরিয়ে দিয়েছি?

মনোরমা স্নিগ্ধ হেসে বলে, দিয়েছো বইকি ভাই? এতো দিয়েছো যে আমার বুক ভরে গেছে।

অঞ্জন বলল, অথচ যাদের কাছ থেকে পেয়েছো বললে তারা কিছুই জানে না। এমন আশ্চর্য্য কথা এর আগে আমি কোনদিন শুনিনি মনোদি।

মনোরমা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, তাই হয় অঞ্জন। যারা দিতে জানে তারা হিসেব করতে জানে না, যারা হিসেব করে তারা দিতেও পারে না নিতেও জানে না।

অঞ্জন বলে, তোমার সব কথা আমার মাথায় ঢোকে না মনোদি।

মনোরমা বলল, না বোঝায় দুঃখ কম। বুঝতে পারায় অনেক জ্বালা। তুমি আমার এমনি অবুঝই চিরদিন থাক ভাই।

মনোরমার কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে উঠলো। চোখ দুটিও ছল ছল করতে থাকে।

অঞ্জন বলে, আমি দাদা হ'লে খুব ভাল হতো মনোদি।

মনোরমা সহাস্যে বলল, হঠাৎ দাদা হবার সখ হ'লো কেন তোমার? মনোদিকে তাহলে শাসন করতে বুঝি?

অঞ্জন গভীর কণ্ঠে বলল, সব কথা সকলকে শোনান উচিত নয়।

মনোরমা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, তাহলে এমন অনুচিত কাজ কখন করো না অঞ্জন। তুমি ছোট ভাই আছ ছোট ভাই-ই থাক।

অঞ্জন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, দশজনে মিলে আর থাকতে দিচ্ছ কোথায়।

মনোরমা স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলল, কি ছেলেরে বাপু! চোখের আড়াল হলেই বুঝি মানুষ মনের আড়ালে চলে যায়।

অঞ্জন বলে, তাই যায় মনোদি।

মনোরমা হাসিমুখে বলে, অপরের কথা জানিনে ভাই—

অঞ্জন জোর দিয়ে বলে, আমি অসংখ্য নজির দেখাতে পারি তা জান?

মনোরমার মুখভাব কোমল হ'য়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে বলল, সেই অসংখ্যের মধ্যে তোমার মনোদি নেই। যাদের অনেক আছে তাদের কথা আলাদা। আমার সম্বল কম বলে সমস্ত মন একটি জায়গায় বন্দী হয়ে আছে ভাই। চোখ ফেরাতেও ভয় পাই পাছে এটুকুও হারিয়ে ফেলি।

অঞ্জন কতকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কথা বলে না। মনোরমা কিন্তু থামতে পারে না ব'লতে থাকে, অঞ্জন ভাই তোমার মনোদি একমাত্র তার দাদুর স্নেহ ছাড়া আর কিছু কোনদিন পায়নি। আমার কথাটা বুঝতে পারছ তুমি?

অঞ্জন চুপ করে থাকে। মনোরমার কথাকটির তাৎপর্য্য সে ঠিক ঠিক উপলব্ধি ক'রতে পারল না।

মনোরমা বলে, এমন সহজ কথাটাও তোমার মাথায় ঢুকলো না?

অঞ্জন হতাশ ভাবে জবাব দিল, তোমার এইসব হেঁয়ালী কোনদিনই আমার মাথায় ঢুকবে না।

মনোরমা হেসে বলে, তোমার মাথায় গোবর পোরা বুঝবে কেমন ক'রে। একটু থেমে একটু হেসে সে পুনরায় বলে, আচ্ছা অঞ্জন তুমি তোমার মনোদিকে খুব ভালবাস—তাই না?

স্মিত হাস্যে অঞ্জন জবাব দেয়, তোমার কোন সন্দেহ আছে নাকি মনোদি?

মনোরমা হেসে উঠল। বলল, বড্ড রেগে গেছো আমি কি সন্দেহের কথা তোমাকে বলেছি।

অঞ্জন বলল, তাহলে প্রশ্ন করছো কেন?

মনোরমা বলল, এটা প্রশ্ন নয় আমার মনের কথার একটা সায় পেতে চাইছিলাম। কিন্তু থাক গে ওসব কথা। তুমি আমায় খুব ভালবাস এই আমার আন্তরিক বিশ্বাস আর এই বস্তুটিকেই আমি বলছিলাম দুর্লভ।

অঞ্জন একটু হাসল।

মনোরমা . বলল, হাসলে যে বড়? কথাটা ভাল লাগলো না বুঝি।

অঞ্জনের কণ্ঠস্বর সহসা ভারী হয়ে উঠল। বলল, তোমার যেমন দাদু মনোদি আমার তেমনি দাদা। বোধহয় সেই জন্যই তোমাদের চলে যাওয়ার কথাটা খুসী মনে ভাবতে পারছি না। ভয় পাচ্ছি—দুঃখ পাচ্ছি।

মনোরমা অঞ্জনের মুখের পানে খানিক একদৃষ্টে চেয়ে থেকে একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তবুও তোমার আর একটা জগৎ আছে—সামনে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ আছে। কতো তোমার বন্ধু আছে সময়ে হয়তো বান্ধবীও জুটবে কিন্তু আমার কথাটা একবার ভাবতো অঞ্জন। সামনে তাকাও এগোবার পথ নেই। পিছনে তাকাও ধূ ধূ করছে কোথাও কেউ নেই। ডাইনে তাকাও একমাত্র ভরসাস্থল বৃদ্ধ দাদু। বাঁয়ে তাকাও হরেন মাষ্টারের দল চোখে দূরবীন লাগিয়ে বসে আছে।

মনোরমা অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে। কিন্তু অঞ্জনের চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল। মনোরমা দেখেও দেখে না। সে বলতে থাকে, দেখে শুনে মনটা আমার বিষিয়ে উঠেছিল অঞ্জনভাই। কারুর ভাল

করবার চিন্তা মনে এলেও অন্তরের সায় পেতাম না। একটা বিশ্রী সন্দেহ আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে আমার মনের সবটুকু সৌন্দর্য্যকে গ্রাস করবার উপক্রম করেছিল। এমনি দিনে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত এলে তোমরা। আমি আবার নিজেকে ফিরে পেলাম।

অঞ্জন ব্যথিত কণ্ঠে বলল, তোমার আজ কি হয়েছে মনোদি?

মনোরমা অঞ্জনের মুখের পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বলে, কিছু হয়নি ভাই। শুধু তোমার কথার জবাব দিতে গিয়েই এতো কথা এসে পড়লো। দূরে চলে গেলেই সবকিছু মুছে যায় না ভাই। তাহলে মানুষ বাঁচতে পারে না।

অঞ্জন গভীর কণ্ঠে ডাকে, মনোদি—

মনোরমা জবাব দেয়, কি ভাই—

অঞ্জন বলে, তোমাকে না জেনে আমি দুঃখ দিয়েছি। দুঃখ পাবে জানলে কখনই এতকথা বলতাম না।

মনোরমার মুখে ভারী মিষ্টি একটুখানি হাসি ফুটে উঠল। বলল, আমি জানি অঞ্জন।

অঞ্জন চুপ করে থাকে।

মনোরমা বলতে থাকে, মানুষ হ'য়ে মানুষকে ভালবাসতে না পারায় কি যে ব্যথা তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে জানি অঞ্জন। কিন্তু স্থান, কাল আর পাত্র ভেদে নিজেকে গুটিয়ে না নিলেও চলে না। এই প্রভেদটাই তোমার মনোদি ঠিক বুঝতে পারে না। তাই হয়তো মিথ্যা অনেক লাঞ্ছনা তাকে পেতে হয়।

অঞ্জন বিস্মিত কণ্ঠে বলে, তোমার এ অভিযোগ কার বিরুদ্ধে মনোদি?

মনোরমা বলে, যদি বলি তোমার বিরুদ্ধে?

অঞ্জন জবাব না দিয়ে মিটি মিটি হাসতে থাকে।

মনোরমা তার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে, বিশ্বাস হ'লো না বোধ হয়? সত্যিই তোমার কাছ থেকে ভালবাসার একটা নতুন দিকের স্বাদ পেয়েছি। যে বস্তু আমার কাছে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল।

অঞ্জন দুষ্টামির হাসি হেসে বলে, সেইজন্যই বুঝি পালিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছো তোমরা?

দাঁড়াও অঞ্জনভাই দাঁড়াও—মনোরমা বলল, কথাটা আর একবার বলো দেখি। মনে হচ্ছে সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু বলে ফেলেছো তুমি। যেটা অন্ততঃ তোমার মুখ থেকে শুনবার আশা করিনি।

অঞ্জন হকচকিয়ে গেল। চোখে মুখে একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠল।

ওর মুখের ভাব লক্ষ্য করে মনোরমা হেসে উঠল। বলল, খুব ভয় পেয়ে গেছ বুঝি অঞ্জন?

অঞ্জন আশ্বস্ত হ'য়ে বলল, তা পেয়েছি কিন্তু তোমার হাসি আমাকে অভয় দিয়েছে। যদি কোন দিন কোন কারণে তোমাকে ব্যথা দিয়ে বসি—জেনো তা ইচ্ছাকৃত নয়। ভুল করলে সংশোধন করে দিও। অন্যায় করলে শাসন করো। মনোদি তোমারও যেমন ভাই নেই আমারও তেমনি বোন নেই। আমরা সহজেই মিটমাট করে নিতে পারবো। রাগ করে কোনদিন যেন মুখ ভার করে থেকো না মনোদি—ও আমার সহ্য হবে না।

অঞ্জন ধীরে ধীরে ওর মাথাটা মনোরমার কোলের কাছে সরিয়ে নিয়ে গেল। একখানা হাত ওর হাতের উপর রেখে নিঃশব্দে পড়ে রইল। মনোরমা পরম স্নেহে ওর পিঠে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। এই অসঙ্কোচ স্নেহ স্পর্শের ভিতর দিয়ে উভয় উভয়ের আরও অনেক কাছে এগিয়ে গেল।

এমনি অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর একসময় মনোরমাই কথা কইল, এবারে যে আমাকে যেতে হবে অঞ্জনবাবু। আমারও ঘর সংসার আছে যে। তাছাড়া তোমার দাদাও হয়তো এক্ষুনি এসে পড়বেন।

অঞ্জন মাথাটা একটু সরিয়ে নিয়ে বলল, আসলে তোমার দাদু নন্ আমার দাদা। আচ্ছা মনোদি

তুমি আমার দাদাকে এতো সংকোচ করো কেন? আমার দাদাতো আর দূরবীন নিয়ে বসে নেই।

ওর কথার ধরনে মনোরমা হেসে উঠল। বলল, দূরবীন ব্যবহার করেন না বলেই তো এতো ভয় অঞ্জন বাবু। নইলে একতরফা ঘৃণা করেই সরে যেতে পারতাম।

অঞ্জন বলল, মাঝে মাঝে তোমার কথা বড্ড শক্ত মনে হয়—কিছুই বুঝি না। আচ্ছা মনোদি তুমি কতদূর পড়াশুনা করেছো।

মনোরমা উচ্ছ্বসিত হেসে বলল, কাছেরটাই শেষ করে উঠতে পারলাম না দূরের কথা আর কি বলবো, কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন অঞ্জন?

অঞ্জন গভীর কণ্ঠে বলে, তোমাকে নিয়ে আমি অনেক ভাবি মনোদি কিন্তু কিছুতেই হিসেবের মধ্যে পাই না। মনে হয় এতবড় অঙ্কটার এতটুকু ফল? নিশ্চয় কোথাও যোগে ভুল করেছি।

মনোরমা মিষ্টি হেসে জবাব দিল, ভুল হ'তেই হবে অঞ্জন আমি যে আগাগোড়াই বিয়োগ।

অঞ্জন গম্ভীর হয়ে উঠল, আবার তুমি দূরে সরে যাচ্ছ। তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না।

একটা জবাব দেবার জন্যই মনোরমা প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু রঞ্জনের উপস্থিতিতে তাকে থামতে হল।

অঞ্জন দাদাকে দেখে বলল, আজ তো বেশ সকাল সকাল এসেছো দাদা।

রঞ্জন বলল, সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেল...কিন্তু আপনি চলে যাচ্ছেন কেন?

মনোরমা একটু হেসে মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল; দুপুর থেকেই অঞ্জন আটক করে রেখেছে—

রঞ্জন লজ্জিতভাবে বলল, অঞ্জনের খুব অন্যায়। আপনার দাদুর উপর কর্তব্য প্রথম। আপনি এভাবে আর ওকে প্রশ্রয় দেবেন না।

অঞ্জন অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, তাতো বলবেই। ঘরে একটা লোক নেই যে রোগী লোকটারে একগ্লাশ জল গড়িয়ে দেয়। তোমার আছে অফিস। মনোদির আছে নিজের সংসার।

রঞ্জন অপ্রতিভ ভাবে বলল, দেখলেন তো অঞ্জন কি সুন্দর কথা বলতে শিখেছে আজকাল।

মনোরমা অঞ্জনকে সায় দিয়ে রঞ্জনকে ব'লল, অঞ্জন কিছু মিথ্যে বলেনি রঞ্জনবাবু। ওর পক্ষে এমন ওঠানামা করা মোটেই উচিত হবে না।

অঞ্জন খুশী হয়ে উঠে দাদাকে বলল, তুমি তো সবসময় আমার দোষটাই দেখতে পাও। দাও এবারে মনোদির কথার জবাব।

রঞ্জন বলল, কথাটা যখন সত্যি তখন জবাব দিয়ে কি হবে তার চেয়ে দেখি চেষ্টা করে যদি আর দিন কয়েকের ছুটি নিতে পারি।

মনোরমা বলে, আপনি কি সত্যিই ছুটি নেবার কথা ভাবছেন? ও পাগলের কথায় আপনি কান দেবেন না।

অঞ্জন বলে, তোমরা সবাই সমান। কোথায় তোমার হয়ে ওকালতী করবার জন্য একটা ধন্যবাদ দেবে না অঞ্জন একটা পাগল।

রঞ্জন হেসে বলে, পাগলকে সকলেই পাগল বলে।

অঞ্জন রাগ করে বলল, পাগলের কথা শুনবার দরকার নেই দাদা। তুমিও ছুটি নিও না। লোকের ব্যবস্থাও করো না। মনোদিতো আছেনই। না পেলেই বা একজন বুড়ো মানুষ এক পিয়ালা চা এক ছিলিম তামাক।

ওর কথার ধরণে মনোরমা হেসে উঠল। বলল, অঞ্জন তার মনোদিকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু কথাটা ঘুরিয়ে না বলে পটাপট্টি ব'লে দিলেই তো পার। আর আসবো না।

অঞ্জন আকাশ থেকে পড়ল। বিস্মিত ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, তুমি যে দিনকে রাত বলে কাটাতে চাও মনোদি। মানুষটিতো তুমি খুব সোজা নও।

মনোরমা হাসিমুখেই জবাব দিল, এ আর এমন কি নতুন কথা শোনালে অঞ্জনবাবু। ওটা তোমার মনোদির ভাগ্য কিন্তু রঞ্জনবাবু আপনি যেন আবার সত্যসত্যিই ছুটি নিয়ে বসবেন না। বরং আপনার আর আমার

ঘরের মধ্যে একটা কলিং বেলের ব্যবস্থা করে দেবেন দরকার মত অঞ্জনের জল যোগাতেও পারবো আর দাদুর চা তামাকের ব্যবস্থাও হবে। বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না রেখে হাসি মুখে সে প্রস্থান করল।

॥ ২৭ ॥

আগুন ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। বৈশাখ যায় যায়। আজও এক ফোঁটা বৃষ্টির দেখা নেই। পশ্চিমের গরমে বাংলা দেশকে ঝলসে মারছে। এই আগুন মাথায় করে জগন্নাথ বার হয়ে গেছেন তাঁর পেন্সনের টাকা তুলবার জন্য। এখনও ফেরেন নি। এত দেরী ইতিপূর্ব্বে আর কোনদিন তিনি করেন নি। বুড়ো মানুষ—উদ্বিগ্ন ভাবে সে বারে বারে ঘর—বার ক'রছে। দিন কয়েক ধরে দাদুর প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেনি মনোরমা। যদিও এনিয়ে দাদু একদিনের জন্যও অনুযোগ দেননি। বরং এই কথাটাই বারে বারে বলেছেন, অসুস্থ ছেলেটার যেন কোন অযত্ন হয় না দিদি, দাদুর জন্য তোকে আপাতত ভাবতে হবে না। তাই ব'লে একটা গা ছেড়ে চলাও উচিত হয়নি। অঞ্জনের অসুস্থকালিন সকল দায়িত্ব সে পরমনিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছে কিন্তু দাদুকে সে যেন রীতিমত অবহেলাই করেছে। ইস দাদুর গেঞ্জিটার কি হাল হ'য়েছে—কি হাল হ'য়েছে ঘর দোরের। অথচ...মনোরমা মনে মনে লজ্জা পেল। রঞ্জনদের ঘরের চেহারা কিন্তু পাল্টে গেছে। পাল্টে দিয়েছে মনোরমা নিজে হাতে। মেঝে থেকে বিছানা—বিছানা থেকে টেবিল চেয়ার সবকিছুই তার হাতের ছোঁয়া পেয়ে হেসে উঠেছে। মনোরমা নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করে, এ সবই কি অঞ্জনের সেবার জন্য প্রয়োজন হ'য়েছিল না অন্য কোন কারণও ছিল। রোগীর ঘরে পরিচ্ছন্নতা যদিও চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গ তবুও এই মুহূর্ত্তে তার মনে হ'চ্ছে যে, সে যেন খানিকটা বাড়াবাড়িই করছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়েছে।

নিঃশব্দ চিন্তায় মনোরমার অনেকক্ষণ কেটে গেছে। দাদু এখনও ফিরে এলেন না। মনোরমা শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে। এভাবে আর বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা ঠিক হবে না। সর্ব্বপ্রথমেই তার রঞ্জনের কথা মনে হলো। সে পায় পায় তাদের ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল।

রঞ্জন প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, বলেন কি সেই দুপুরে গেছেন আর এখনও ফেরেন নি। আপনার আরও আগে আসা উচিত ছিল।

মনোরমা ব্যাকুল ভাবে বলল, এমন তো কোনদিন দাদুর দেরী হয় না—এখন আমি কি করি বলুন তো?

রঞ্জন শান্ত কণ্ঠে বলল, আপনি আবার কি করবেন। যা করবার আমরাই ক'রবো ভয় পাবেন না। আমার মনে হয় অন্য কোন কাজে তিনি আটকে পড়েছেন।

মনোরমা ব্যাকুল আগ্রহে বলল, তাই যেন হয় রঞ্জনবাবু। ভয় ভাবনায় সত্যিই আমি অস্থির হ'য়ে উঠেছি।

রঞ্জন তেমনি শান্ত গলায় জবাব দিল, হবারই কথা। কিন্তু জানেন কি কোন অপিস থেকে উনি টাকাটা তুলে আনেন? অন্তত সেখানে একটা খবর নিয়ে তার পরে থানা আর হসপিটালে খোঁজ করবো। কিন্তু ওকি আপনি অত ভয় পেয়ে গেলেন কেন।

অঞ্জন এতক্ষণ চুপ করে ছিল সহসা তার দাদাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলল, এতেও উনি ভয় পাবেন না। তুমি যে ভাবে থানা আর হসপিটাল দেখালে দাদা।

একটু থেমে সে মনোরমাকে বলল, আমার মন বলছে দাদুর কিছু হয়নি। এখুনি এসে পড়বেন মনোদি।

রঞ্জন বলল, আমি কিন্তু ভয় দেখানোর জন্য কোন কথা বলিনি। এ অবস্থায় যেগুলি আমাদের করণীয় কাজ তাই আপনাকে জানিয়েছি। আপনি যান আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি। আপনার কাছ থেকে ঠিকানা পত্তর নিয়ে তারপরে বার হবো।

রঞ্জনকে শেষ পর্য্যন্ত বার হ'তে হয়নি। জগন্নাথ ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছেন।

মনোরমা জলভরা চোখে আর হাসিমুখে এগিয়ে গেল, আঃ তুমি এতক্ষণে এলে দাদু!

পরম স্নেহে মনোরমার পানে খানিক চেয়ে থেকে একমুখ হেসে তিনি বললেন, খুব ভয় পেয়ে গেছিলি বুঝি দিদি?

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মনোরমা জবাব দিল, না ভয় পাবো কেন।

মনোরমা জগন্নাথের হাত থেকে ছাতাটি তুলে নিয়ে পুনরায় বলে, জামা ছেড়ে বিশ্রাম করো দাদু আমি ততক্ষণে তোমার জন্য চা আর তামুক নিয়ে আসি। তারপরে শুনবো কেন এতো দেরী করেছো আজ।

মনোরমা পাশের ঘরে চলে গেল। ওর ভিতরের উদ্বেগ এতক্ষণে অশ্রুর রূপ নিয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়তে লাগল।

জগন্নাথ ধীরে সুস্থে জামা কাপড় বদলে নিয়ে হাঁক দিলেন, মনোদিদি—

মনোরমা দ্রুতপদে এ ঘরে চলে আসতেই জগন্নাথ বলেন, আগে এক ছিলিম তামাক তারপর—সহসা ওর মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই তাঁর কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, মনোদি তুই কাঁদছিলি ভাই।

মনোরমা ক্ষীপ্র হাতে চোখের জল মুছে ফেলে বলল, কাঁদব কেন দাদু—এইতো হাসছি আমি।

জগন্নাথ বার কয়েক মাথা নেড়ে বললেন, একবার আমার কাছে আয়তো দিদি।

মনোরমা জগন্নাথের পাশে এসে দাঁড়াল। খানিক নিঃশব্দে তার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, এইবার বল ভাই।

মনোরমা আস্তে আস্তে বলে, কি বলবো দাদু—

ঐ যে তোর চোখে জল কেন ভাই—জগন্নাথ পুনরায় একই প্রশ্ন করেন।

বেশ যা হোক—মনোরমা বলে, জল আসবে না তো কি আসবে? বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম দাদু।

জগন্নাথ বলেন, সেতো আমি না আসার জন্য—

জবাব দিচ্ছি, মনোরমা হেসে বলল, কিন্তু কথা দাও একটাও বাজে ঠাট্টা করবে না।

দিলাম কথা—জগন্নাথ সস্নেহে বলেন।

আনন্দে কেঁদেছি দাদু—মনোরমার চোখ দুটি পুনরায় সজল হ'য়ে উঠল।

জগন্নাথ সত্য সত্যই একটি কথাও বললেন না। শুধু মনোরমাকে কাছে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন।

মনোরমা ডাকল, দাদু—

জগন্নাথ জবাব দিলেন, কি দিদি—

মনোরমা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তুমি দেরী করে এসে খুব ভাল করেছো।

জগন্নাথ বিস্মিত হ'য়ে বলেন, ব্যাপার কি মনোদিদি। কোথায় দেরী করবার জন্য ধমকাবে তারই ভয়ে মনে মনে আমি কত রকমের কৈফিয়ৎ তৈরী করতে করতে এলাম আর তুমি ব'লছো ভাল করেছি। আমার ভাগ্য কি রাতারাতি পাল্টে গেল দিদি ভাই?

মনোরমা স্মিত হাস্যে ব'লল, বোধহয়।

জগন্নাথ পরিহাস তরল কণ্ঠে জবাব দিলেন, আপাতত তার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না কিন্তু। এই দেখনা দরকার এক পিয়ালা চায়ের উপচার পেলাম চোখের জল। প্রয়োজন তামুকের আর—

বাধা দিয়ে মনোরমা বলল, তুমি ডাক দিয়ে দেরী করিয়ে দিলে যে দাদু।

জগন্নাথ বার কয়েক মাথা নেড়ে বলেন, আচ্ছা দিদি হঠাৎ তুই এমন শান্ত হ'য়ে গেলি কেন ভাই। এ কিন্তু তোকে ঠিক মানাচ্ছে না।

একবার কোন জবাব না দিয়ে একটু হেসে মনোরমা পাশের ঘরে চলে গেল। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এক পিয়ালা চা আর ধূমায়িত তামাক নিয়ে হাজির হ'ল।

জগন্নাথ কয়েক চুমুক চা গলাধঃকরণ করে তারপরে মনোরমাকে তার পাশে বসতে বললেন।

মনোরমা বসতেই তিনি পুনরায় বলেন, তোকে একবার ভাল করে দেখতে ইচ্ছে দিদি।

মনোরমার দুই গণ্ড নিতান্ত অকারণেই লাল হ'য়ে উঠল।

গ্রহের ফের আর কাকে বলে, জগন্নাথ বলেন, পেন্সন নিয়ে সবে রাস্তায় পা বাড়িয়েছি…আর একেবারে ধরণীতলে—

মনোরমা চমকে উঠল। উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠে বলল পড়ে গেলে দাদু—

জগন্নাথ হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আমি নয় দিদি আমারই মত আর এক বৃদ্ধ। পেন্সন নিয়ে আমার আগে নামছিলেন।

মনোরমা ব্যথিত কণ্ঠে বলে, আহা ভদ্রলোক পড়লেন কেমন ক'রে?

জগন্নাথ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিলেন, কলার খোসায় পা পিছলে। কেউ হয়তো খেয়ে ফেলে রেখে গেছেন। বুড়ো ভদ্রলোক এই শেষ বয়েসে পা খানি ভাঙলেন। কি করি বলো—নিয়ে যেতে হলো হাসপাতালে। তাই কি সহজে কিছু হবার যো আছে। কে কার দুঃখ বোঝে দিদি। অনেক কাটখড় পুড়িয়ে তবে ফটো তোলার ব্যবস্থা হলো। প্লাস্টার করা হলো তারপর এক বুড়ো আর এক বুড়োকে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তবে ছুটি পেল।

জগন্নাথের কথা শুনতে শুনতে মনোরমা বার কয়েক চমকে উঠল। জগন্নাথ থামতেই সে প্রশ্ন করল, জোড়া লাগবে তো দাদু?

জগন্নাথ জবাব দিলেন, কেমন করে বলব ভাই। একে বুড়ো মানুষ তায় পেন্সনভোগী বুড়ো। তবে ভাগ্য ভাল হলে জোড়া লাগতেও পারে।

মনোরমার একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল।

জগন্নাথ বললেন, অমন করে নিঃশ্বাস ফেললি দিদি?

মনোরমা জবাব দিল, ভাবছিলাম দাদু—

জগন্নাথ বলেন, কি ভাবছিলি ভাই।

মনোরমা ভীত কণ্ঠে বলল, আজ যদি তোমার এই অবস্থা হ'তো তাহ'লে কি করতাম। না দাদু এরপরে তোমাকে আমি আর পেন্সন আনবার জন্যও বার হতে দেব না। হয় তারা মনিঅর্ডার করে পাঠাবে নয়তো আমি নিজেই ব্যবস্থা করবো।

জগন্নাথ হেসে বলেন তুমি নিজে যাবে নাকি দিদি?

মনোরমা দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয়, দরকার হ'লে যাব দাদু।

জগন্নাথ হেসে উঠলেন।

মনোরমা রেগে উঠে বলে, হাসছো হাস দাদু কিন্তু এরপরে আমার অবাধ্য হলে বাকী রাখবো না কিছু এ কথাটা জেনে রেখো।

জগন্নাথ গড়গড়ার নলটি তুলে নিয়ে গোটা কয়েক টান দিয়ে বলেন, তোমার প্রস্তাব আমার মনে থাকবে মনোরমা। এখনও পুরো একটি মাস যখন হাতে আছে তখন ভেবে চিন্তে যাহোক একটা স্থির করা যাবে। তবে ভাবছিলাম কি…তিনি পুনরায় নলটি তুলে নিয়ে টানতে সুরু করেন।

মনোরমা অধৈর্য্য হয়ে বলে, কি ভেবেছিলে দাদু—

নলটা পুনরায় নামিয়ে জগন্নাথ বলেন, ভাবছিলাম পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে কিছুদিন শুয়ে থাকলে মন্দ হয় না। মনোদির শ্রীহস্তের সেবা পেয়ে দিন কয়েক আরাম করা যেতো।

মনোরমা করুণ দৃষ্টিতে জগন্নাথের মুখের পানে চেয়ে রইল। কথা বলল না। কথাকটি নিছক পরিহাসের ছলে বললেও মনোরমার মুখের চেহারা দেখে তিনি কুণ্ঠিত হয়ে ডাকলেন, মনোদিদি—

মনোরমা পিছন ফিরে বসল।

জগন্নাথ অপ্রস্তুত হ'লেন। বিব্রত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁরে দিদি তুই কি ঠাট্টাও বুঝিস নে ভাই।

মনোরমা অভিমানহত কণ্ঠে জবাব দিল, আমার দুনিয়ায় আর কেউ কোথাও নেই বলেই তুমি এমন মারাত্মক ঠাট্টা করতে পারলে দাদু।

জগন্নাথ চমকে উঠলেন। তাঁর বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উঠল। তিনি হাত বাড়িয়ে মনোরমাকে একেবারে বুকের কাছে টেনে এনে তার পিঠে এবং মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে গভীর আবেগের সঙ্গে ডাক দিলেন মনোদিদি—

ম্লান কণ্ঠে জবাব দিল মনোরমা, বলো—

জগন্নাথ অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, বড় দুঃখ পেয়েছিস ভাই? কিন্তু বিশ্বাস কর দিদি তোকে ব্যথা দেবার জন্য আমি একথা বলিনি।

মনোরমা নীরব।

জগন্নাথ পুনরায় বলেন, চুপ করে থাকিসনে দিদি—

মনোরমা মৃদু কণ্ঠে বলল, কি কথা বলবে দাদু—

জগন্নাথ ঠিক বুঝতে পারছেন না কি ভাবে মেয়েটাকে তিনি ঠাণ্ডা করবেন। নিতান্ত পরিহাসের ছলে একটা কথা বলার পরিণাম যে এতদূরে যাবে এ তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। ইতিপূর্ব্বে এই ধরণের পরিহাস তিনি বহু করেছেন। মনোরমা উপভোগ করেছে, কোমর বেঁধে ঝগড়া করেছে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করতে উঠে পড়ে লেগেছে। জগন্নাথ কখনও যুক্তি-জালে মনোরমাকে পরাস্ত করে জয়ের আনন্দে হেসেছেন কখনও পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, একেবারে পাকা ব্যারিস্টার আমার মত নিরীহ ভদ্রলোকের সাধ্য কি মুখের কাছে দাঁড়ায়। তাঁর সেই মনোরমা যেন কোথায় আজ হারিয়ে গেছে। এমেয়ে ঝগড়া করে না কাঁদে। ওর চলার পথে এমন কোন্ বিপর্য্যয় দেখা দিল যা ওকে এতখানি দুর্ব্বল করে ফেলেছে? জগন্নাথ অন্যমনস্ক ভাবে এই কথাই ভাবছেন।

মনোরমা একটু নড়ে চড়ে উঠে বসতেই জগন্নাথের চিন্তার ঘোর কেটে যায়। তিনি প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করেন, তোমার অঞ্জন ভাই ভাল আছে তো দিদি?

এই আকস্মিক প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনে মনোরমা কিছুটা অবাক হলেও সহজ কণ্ঠেই জবাব দিল, ভালই আছে কিন্তু অঞ্জনের কথা কেন দাদু?

জগন্নাথ সাবধান হয়ে উঠেছেন। বললেন, ভাবছিলাম ছোকরাকে একবার দেখে আসি গিয়ে।

মনোরমা বলল, ছোকরাকে সারাদিন ধরেই আমি দেখেছি তোমাকে আর না গেলেও চলবে, তার চেয়ে নিজে দয়া করে একটু বিশ্রাম করো।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করেও কোন লাভ হল না। জগন্নাথ ভাল মানুষের মত বললেন, মনে হচ্ছে ভাল কথাই বলেছো দিদি। হাত পা ছড়িয়ে খানিক বিশ্রামই করা যাক।

মনোরমা আর কথা না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলে গেল।

ক্রমশঃ

হনুমানের অনশন

সন্তোষকুমার ঘোষ

বাল্মীকির অনবধানতাবশতঃ রামায়ণে বহু কথাই লিখিত হয় নাই। নিম্নবর্ণিত ঘটনাটির কথাও আদিকবি লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন —

কয়েকদিন হইল কোশলরাজ্যে মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র মহাউৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতেছেন। পরিস্থিতি একেবারে চরমে উঠিয়াছে। অন্য কেহ নহে—স্বয়ং হনুমান জীবনপণ করিয়া অনশন শুরু করিয়াছে। এক-আধদিন নয়—অষ্টোত্তরশতদিবস হইল নির্জলা অনশন চলিতেছে। মারুতির ধাত ছাড়িবার উপক্রম হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র মহাফাঁপরে পড়িয়াছেন। সীতাহরণকালে কি শক্তিশেলাঘাতে লক্ষ্মণের দফা-রফা হওয়ার সময়েও বোধ করি তিনি এত অধিক বিচলিত হন নাই। তিনি যে কী করিবেন—ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার দেহের অমন নবদূর্বাদলশ্যামকান্তি দিন দিন পীতাভ হইয়া উঠিতেছে।

দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক—কোশল-রাজ্যের সব রকম পত্রিকাই সম্পাদকীয় নিবন্ধে শ্রীরামচন্দ্রকে যৎপরোনাস্তি ধিক্কার দিতেছে। প্রতি সন্ধ্যায় গোপন সংবাদ নিতে আসিয়া দুর্মুখও একই রূপের কথা বলিতেছে। —মহারাজ, রাজ্যের কোথাও কান আর কর্ণপাত করিবার জো নাই। রাম-নিন্দায় দেশ ভরিয়া গেল। প্রজারা প্রকাশ্যে আপনাকে ছি-ছি দিতেছে। সভায় সভায় আপনার নিন্দা প্রচারিত হইতেছে। হয় রাজমুকুট ও রাজদণ্ড ত্যাগ করুণ—নয়ত হনুমান যাহাতে অনশন ভঙ্গ করে অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করুন। আর্য্যা জানকীর উদ্ধারের সময়ে কপিবর লম্ফঝম্ফ ইত্যাদি করিয়া যে মহাকীর্তি দেখাইয়াছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাহার আর তুলনা নাই। মারুতির ভাল-মন্দ কিছু একটা ঘটিলে, অকৃতজ্ঞ বলিয়া ত্রিভুবনে আপনার দুর্নাম রটিবে। নিষ্কলঙ্ক রামনামে চিরকালের মত কালির পোঁচ পড়িবে।

হ্যাঁ, শুধু এই দুর্নামের ভয়েই শ্রীরামচন্দ্র এত অধিক বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। দুর্নামের ভয়েই তাঁহার সসেমিরাগোছ অবস্থা হইয়াছে। না হইলে সীতা উদ্ধার-পর্ব কবে শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন হনুমান না খাইয়া শুখাইয়া শুখাইয়া আমসি হইয়া গেলেও এমন কিছু যায় আসে না। কিন্তু রাজা তিনি। সত্যব্রতধারী তিনি। নিজের—সেইসঙ্গে রঘুবংশের গৌরবচূড়াকে তো অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে। কিন্তু হনুমানের এই অনশনের কারণ কী? বহু চেষ্টা করিয়াও শ্রীরামচন্দ্র ইহার কারণ অনুধাবন করিতে পারেন নাই। নগরপাল হইতে শুরু করিয়া প্রধান অমাত্য পর্যন্ত অনেককেই তিনি হনুমানের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই মারুতির মনস্তত্ত্বের হদিস পায় নাই। সকলেই হিমসিম খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অযোধ্যার অমন নামকরা গোয়েন্দাবিভাগও কোনরকম পাত্তা না পাইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। মহা মুসকিল হইয়াছে এই যে, মহাবীর অনশন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যালাপও বন্ধ করিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র যে

কী করিবেন—ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

এই বানরবীরের মনমেজাজ বিচিত্র ধরণের। শুধু দুমু খের মুখ হইতে শুনিয়া শুনিয়াই তিনি প্রজাসাধারণের প্রায় সকলেরই মনমেজাজ কিরূপ, তাহা বুঝিয়া লইয়াছেন। প্রত্যেকের ধাতেরও হদিস পাইয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি এই মহাবীরের মতিগতি বা ধাতু-মেজাজের কিছুই পাত্তা করিতে পারেন নাই। যে ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পকাল পরেই ক্ষুধার তাড়নায় লাফ্ দিয়া বহুলক্ষ যোজন ঊর্দ্ধ-আকাশে উঠিতে পারে, যে ভগবান ভাস্করকে সুপক্ব রসাল ভাবিয়া হাত দিয়া ধরিতে যায়, যে সুখাদ্য ভাবিয়া ইন্দ্রের ঐরাবতকে গলাধঃকরণ করিতে উদ্যত হয়, যে এক লাফে সাগর লঙ্ঘন করিতে সক্ষম, বিশল্যকরণী আনিতে বলিলে যে গোটা গন্ধমাদনকেই আনিয়া হাজির করে যে পদে পদে মহাকাব্যিক বীরত্ব দেখাইয়া ত্রিভুবনকে চমকাইয়া দিয়াছে—তাহার ধাত-মেজাজের হদিস পাওয়া বুঝি বা শ্রীরামচন্দ্রেরও সাধ্য নয়।

কাঠ-বিড়ালী হইতে শুরু করিয়া যে কেহ সীতা উদ্ধারের কাজে হাত লাগাইয়া ছিল তাহারা প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রকারে পুরস্কৃত হইয়াছে। কেহ উচ্চ রাজপদ, কেহ মোটা রকমের মাসিক বৃত্তি, কেহ ভূসম্পত্তি, কেহ বা মহাগৌরবময় উপাধি লাভ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে। কিন্তু চরম আপসোসের বিষয় এই যে, একা হনুমান মর্যাদা হারাইবার ভয়ে প্রত্যেক প্রকারের পুরস্কারই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের শত অনুরোধ সত্ত্বেও কোন রকম রাজ-অনুগ্রহই গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। কিন্তু কী এমন হইল—যাহার জন্য মারুতি হঠাৎ এমন-ভাবে অনশন করিয়া শুখাইয়া মরিতে উদ্যত হইয়াছে! হনুমান কি তবে কিছু পাইবার মতলবেই অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছে! এতদিনে কি মহাবীরের মতিগতি ফিরিল! হইলেও হইতে পারে। হাজার হউক—আসলে জাতিতে বানর তো বটে। কিন্তু আর অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া শুধু আকাশ-পাতাল ভাবিয়া ভাবিয়া কালক্ষেপ করিলে চলিবে না। যথাসম্ভব এব্যাপারের যা হয় একটা হেস্তনেস্ত করিতেই হইবে। যেমন করিয়াই হউক মহাবীরের অনশন ভাঙতেই হইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র হনুমানসকাশে নিজেই যাইবেন এইরূপ স্থির করিলেন। রাজদরবারে সকলের সমক্ষে আপন ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। স্তাবকদের মুখ হইতে 'সাধু—সাধু' রব উঠিল।

শ্রীরামচন্দ্র অমাত্যবর্গ—সমভিব্যাহারে অযোধ্যার উপকণ্ঠস্থ হনুমানের বর্তমান উপবনাবাসে পদার্পণ করিলেন। সময়—নিদাঘ মধ্যাহ্ন। সমগ্র উপবন নিবাত-নিষ্কম্প। মাথার উপরে প্রজ্জ্বলন্ত নভোমণ্ডল। মার্তণ্ডদেব রুদ্রমেজাজে অগ্নিবর্ষণে মাতিয়াছেন। স্থাবর-জঙ্গম পুড়িয়া পুড়িয়া খাক হইতেছে। জরাজীর্ণ এক খর্জুরবৃক্ষতলে ধূলিধূসর ভূমিশয্যায় মহাবীর কাত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার নেত্রদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত। দেহ কম্পনরহিত। শ্বাসবেগ নিতান্ত স্তিমিত। নাড়ী নিস্পন্দপ্রায়। হৃৎপিণ্ডের অবস্থাও তথৈবচ। শুধু ধূল্যবলুণ্ঠিত লাঙ্গুলের অগ্রভাগ মধ্যে মধ্যে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। মারুতির অবস্থা সুবিধাজনক নয় বলিয়াই শ্রীরামচন্দ্রের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তিনি অত্যধিক বিচলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ হনুমানের পার্শ্বদেশে অবস্থিত একটি উপলখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন। কোন রকম ভূমিকার আশ্রয় না লইয়াই বলিলেন—মারুতি, তোমার কী হইয়াছে? কী জন্য জীবনপণ করিয়া অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছ? সত্বর তোমার মনোবেদনার কারণ নিবেদন কর। আমি শপথ করিতেছি—কারণ জানিতে পারিলেই অবিলম্বে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিব।

মহাবীর কিন্তু পূর্ববৎ অনুত্তরঙ্গ সমুদ্রের মত অনড় ও অচঞ্চল রহিল। মুখ দিয়া কোন রকম বাক্যস্ফুরণও

হইল না। শ্রীরামচন্দ্র তখন তাহার পৃষ্ঠদেশে মৃদু মৃদু অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন—হে অঞ্জনানন্দন, তুমি অভিমান ত্যাগ কর। তোমার অনশনের হেতু কী? কী জন্যই বা মৌনব্রতী হইলে? দেখ, তোমার জন্য এই প্রচণ্ড নিদাঘমধ্যাহ্নে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত রাজপুরী ছাড়িয়া তোমার উপবনাবাসে আসিয়া আতপতাপে কি ভাবে দগ্ধ হইতেছি। তোমার জন্য আমার আর সময়ে স্নানাহার নাই। নয়নে নিদ্রা নাই। প্রাণে স্বস্তি নাই। নিয়মমাফিক রাজকার্যেও আর মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না। পূর্বে তুমি রামনিন্দা অপনোদনের জন্য প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতে না। আর আজ! রাম-নিন্দায় দেশ ভরিয়া গিয়াছে। তুমি তো অবিবেচক নও। মারুতি, শীঘ্র কথা কও।

হঠাৎ হনুমানের নয়নযুগল বিস্ফারিত হইল। তাহার দৃষ্টি বারবার শ্রীরামচন্দ্রের দিক হইতে অমাত্য-বর্গের দিকে ফিরিতে লাগিল। ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীরামচন্দ্র অমাত্যদিগকে সেই মুহূর্তেই স্থানত্যাগ করিতে বলিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ব্যতীত সন্নিকটে আর কেহ নাই দেখিয়া হনুমান করজোড়ে 'জয়রাম' ধ্বনি তুলিয়া মৌনব্রত ভঙ্গ করিল।

শ্রীরামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যাজাত কয়েক কাঁদি সুপক্ব কদলী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত অনুরোধে হনুমান সেইগুলি জলযোগ করিয়া অনশন ভঙ্গ করিল এবং কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হইল। শ্রীরামচন্দ্রও স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অতঃপর রাঘব মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—হে পবননন্দন, শীঘ্র তোমার অনশনের হেতু জানাও। বনবাসকালের মত আমার শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ইত্যাদি সহ্য করিবার শক্তি নাই। এখানে পর্যাপ্ত বাতাস নাই। সুশীতল ছায়া নাই। স্বর্ণভৃঙ্গারে রক্ষিত পরিশুদ্ধ পানীয়ও নাই। দেখ, প্রচণ্ড উত্তাপে আমি কিভাবে গলদঘর্ম হইতেছি।

হনুমান করজোড়ে কহিল—হে রাঘব, অপরাধ মার্জনা করিবেন। অন্য কোন কারণ নহে। শুধুমাত্র বানরত্ব হারাইবার ভয়েই আমি অনশন ব্রত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীরামচন্দ্র বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিলেন। অস্ফুটে বলিলেন—বানরত্ব হারাইবার ভয়ে! সে আবার কী!

মহাবীর নিতান্ত উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল—প্রভো, চমকাইয়া উঠিবেন না। আপনার কোশল-রাজ্যের অপার মহিমা। এখানকার জলবায়ু পশুদেরও পুরাপুরি মনুষ্য করিয়া তোলে। ক্ষুরশৃঙ্গাদিবিশিষ্ট খাঁটি চতুষ্পদরাও দ্বিপদে পরিণত হয়। না হইলে—দিন দিন আমার এ কী দশা হইতেছে! হে পদ্মপলাশলোচন প্রভো, আমার মস্তকের দ্বি-তৃতীয়াংশ স্থান একভাবে তৃণলেশহীন মরুস্থলীর মত সম্পূর্ণ কেশবিরহিত হইয়াছে তাহা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করুন। হায়, এই কয় বৎসরের মধ্যেই আমার সার্দ্ধহস্তপরি-মিত লাঙ্গুলাগ্রভাগও আমার অলক্ষে কখন খসিয়া পড়িয়াছে। কিষ্কিন্ধ্যার ভাষাও ভুলিতে বসিয়াছি। এখন কথায় কথায় মুখ দিয়া শুধু আর্যভাষা বাহির হইতেছে। হায়, আমার কী দশা হইল!

শ্রীরামচন্দ্রের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ হনুমানের উত্তমাঙ্গের উপর নিবদ্ধ হইল। —সত্যই তো, মারুতির মস্তকের উপরিভাগ সুবিস্তীর্ণ টাকে ভরিয়া গিয়াছে! লাঙ্গুলের দিকে চাহিয়াও তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। মারুতির অভিযোগ নিতান্ত মিথ্যা নহে। প্রলম্বিত লাঙ্গুলটিও কিয়ৎপরিমাণে হ্রস্ব হইয়াছে বটে! তিনি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন—মারুতি, তুমি চিন্তিত হইও না। অচিরে অযোধ্যার কোন প্রথিতনামা আয়ুর্বেদশাস্ত্রীর শরণাপন্ন হও। শুনিয়াছি, মদীয় পূজ্যপাদ প্রবৃদ্ধ পিতামহের বান-প্রস্থের বয়সে পৌঁছিবার বহু পূর্বেই একবার নিদারুণ কেশস্খলন রোগে ভুগিয়াছিলেন। বিরলকেশ ও স্খলিত শ্মশ্রুগুম্ফ হইয়া তিনি নাকি পুরাপুরি টেকো ও মাকুন্দ বনিয়া যান। তিনিও মাতৃভাষা ভুলিতে

বসিয়াছিলেন। রোগের প্রকোপে শুধু অনার্যভাষায় প্রলাপ বকিতেন। আয়ুর্বেদসম্মত ঔষধেই তদীয় শিরদেশ ও মুখমণ্ডল পুনরপি বর্ষাসমাগমে শস্পশোভিত ক্ষেত্রের মত কেশরাজীমণ্ডিত হইয়া উঠে। অনার্য ভাষায় উৎপাত হইতেও মুক্তিলাভ করেন।

মহাবীর কাতরকণ্ঠে কহিল—প্রভো, মদীয় মস্তকের ইন্দ্রলুপ্তপ্রসার কি লাঙ্গুলের ক্রমস্খলন নিবারণ করা কোন আয়ুর্বেদশাস্ত্রীর কর্ম নয়। অশ্বিনীকুমারেরাও হালে পানি পাইবেন কিনা সন্দেহ। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি—অযোধ্যায় আর কিছুদিন থাকিলেই—আমার শরীর, মন ও আত্মার বিলকুল বিবর্তন ঘটিবে। মণ্ডূকশিশুর মত আমার লাঙ্গুলটি তো ইতিমধ্যেই অল্প অল্প পরিমাণে স্খলিত হইতে শুরু করিয়াছে। বৎসর কয়েকের মধ্যেই অযোধ্যাবাসী মনুষ্য ও ঋষিদের মত আমার পুরাপুরি নির্লাঙ্গুল আকার হইবে। হায়, দেবী জানকী আমার ঘনলোমসমাচ্ছন্ন লাঙ্গুলবিভূষিত নয়নরঞ্জন অবয়বের কতই না প্রশংসা করিতেন দেখিতে দেখিতে আমার সর্বাঙ্গ জুড়িয়া টাকও পড়িবে। মহাবীর আমি। কপিকুলশ্রেষ্ঠ আমি। মানুষের মত আমার সেই লাঙ্গুলহীন আকার ও মসৃনচর্মাবৃত অঙ্গরুচি দেখিলে ত্রিভুবনের সকলেই আমাকে ছি-ছি করিয়া ধিক্কার দিবে। আমার বয়োজ্যেষ্ঠ স্বজনবর্গ এবং স্বর্গত পিতৃ-পিতামহগণ—'হায়, আমাদের হনুর কী দশা হইল'—বলিয়া ললাটে করাঘাত করিয়া নানাভাবে আক্ষেপ করিতে থাকিবেন। অধিক কি। সখ করিয়া কোনদিন কিষ্কিন্ধ্যায় পদার্পণ করিলে সেখানকার নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য বানর-শিশুরাও আমার তাদৃশ মূর্তি দেখিলে হাসিয়া লুটোপুটি যাইবে। আর কপিশলোমাচ্ছন্না ললিতলাঙ্গুলী কপিললনারাও আমাকে দেখিয়া ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিয়া 'হ্যাক-থু' ধ্বনি সহকারে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে থাকিবে। হায়, আমার কী দশা হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র বিস্ময়ঘন দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন—মারুতি, তোমার ভয় নিতান্ত অমূলক। তুমি নিশ্চয়ই স্নায়ুদৌর্বল্যে ভুগিতেছ।

মহাবীর করজোড়ে কহিল—প্রভো স্নায়ুদৌর্বল্য আমার শত্রুর হউক। সে জন্য নহে। কোশলবাসীদের হালচাল আপনি দুর্মুখের মুখ হইতে শুনিয়া শুনিয়া অনুমান করিয়া থাকেন মাত্র। এখানকার মানব-মানবীদের লীলাকলাপ যে কী ধরণের তাহা আপনার প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। স্বচক্ষে সবকিছু দেখিলে আমার মত আপনারও অস্থিমজ্জা হিম হইয়া আসিত। অপোগণ্ড-অর্বাচীনদের কথা বাদ দিতেছি। যুব বৃদ্ধ, এমন কি দুর্ধর্ষ ও দোর্দণ্ডপ্রতাপশালীদের জন্যও আমার আদৌ মাথা ব্যথা নাই। আপনার রাজ্যের সর্বশ্রেণীর পুরুষমহাত্মাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সকল প্রকার উৎপাত ও প্রকোপ আমি ভুজবলে ঠেকাইয়া রাখিতে সক্ষম। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি—আমি অকৃতদার বলিয়াই কিনা জানি না, পথে-ঘাটে কোশলবাসিনীদের কটাক্ষের ঘটা দেখিলে আমার হৃৎকম্প শুরু হয়। প্রভো, আমি এ জীবনে অনেক দেবী ও দানবী দেখিয়াছি—গণ্ডা গণ্ডা উগ্রচণ্ডা রাক্ষসী দেখিয়াছি—কিষ্কিন্ধ্যায় থাকিতে কত চতুরিকা ও নিপুণিকা প্রলম্বিতলাঙ্গুলীদের অম্লমধুর প্রণয় সম্ভাষণ উপেক্ষা করিয়াছি—কত কপিশলোহিতবদনা তড়িৎচকিতনয়না বানরাঙ্গনাদের লোলাপাঙ্গের তীব্র দহন জ্বালাকেও 'দূর ছাই' জ্ঞান করিয়াছি।—কিন্তু অযোধ্যাবাসিনী এই মায়াবিনীদের বোধ করি তুলনা নাই। এই অধিবাসীরা না করিতে পারে এমন কাজ নাই—না যাইতে পারে এমন স্থান নাই—না খাইতে পারে এমন খাদ্য নাই-না বলিতে পারে এমন বাক্যও নাই। ইহাদের চলাবলা, ইহাদের ছলাকলা, ইহাদের প্রণয়লীলা স্বয়ং পঞ্চশরের চাতুরীকেও হার মানায়। বিকৃত দন্তভঙ্গী সহযোগে উগ্র কটাক্ষপাত—বিরাশি ওজনের চপেটাঘাত-উপ্ উপ্ ধ্বনিসহকারে প্রলয়ঙ্কর উৎপাত—প্রচুর বানরশাস্ত্রসম্মত

বিধিব্যবস্থা অনুসারে ইহাদের সিধা করা অসম্ভব। শুনিয়াছি, এই মায়াবিনীরা নাকি প্রিয়তমদের আজীবন অঞ্চলের উপবন্ধনে ঝুলাইয়া প্রনয়লীলা চরিতার্থ করিয়া থাকে। নিতান্ত কর্কশমনা, দারুণ দুর্দ্ধর্ষ অথবা অতীব দুর্বিনীত পতিদেবতাদেরও ইহারা দলন পেষনাদি প্রক্রিয়ায় দুদিনেই নিতান্ত কমনীয়, নমনীয় এবং একান্ত সহনীয় করিয়া ছাড়ে। আমার স্পষ্ট ধারণা—আমি নির্লাঙ্গুল ও নির্লোম হইলেই অযোধ্যাবাসিনী কোন মায়াবিনী আমাকে সাতপাকে বাঁধিয়া চিরকালের মত আমার স্কন্ধদেশে আশ্রয় লইবে। নিতান্ত প্রৌঢ় বলিয়াও আমাকে রেহাই দিবে না। আমি গন্ধমাদন বহিবার মত হিম্মৎ ধরিলে কি হইবে—অযোধ্যার এই জগদ্দলনী মায়াবিনীদের ভার বহন করা আমার মত মহাবলশালী বীরের কর্ম নয়। মানবী প্রিয়ার চাপে ও দাপে পড়িয়া দুদিনেই আমার দেহ মন আত্মা সম্পূর্ণরূপে বানরসংস্কার-মুক্ত হইবে। আমার মধ্যে বানরত্বের আর বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব থাকিবে না। আমি খাঁটি মানুষ বনিয়া যাইব। হায়, আমার সে কী দশা হইবে!

মৃদুহাস্যসহকারে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—মারুতি, বৃথা শঙ্কান্বিত হইতেছ। বানরত্বের বিনিময়ে যদি মনুষ্যত্ব পাও—সে তো তোমার পক্ষে পরম লাভ।

হনুমান দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—প্রভো, আমার লাভে কাজ নাই। মনুষ্যত্ব তো কোন্ ছার! আমি বানরত্বের বিনিময়ে দেবত্বও কামনা করি না।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন রকম বাক্য নিঃসৃত হইল না।

মহাবীর ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে পুনরপি কহিল—হায়, ভাবিতেও ভয় হয়। আমি পুরাপুরি মানুষ বনিয়া গেলে এই প্রৌঢ় বয়সে আমার হয়ত আবার আর্যমতে উপনয়ন সংস্কার হইবে। রীতিমত—আর্যপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আমাকে পথেঘাটে চলিতে ফিরিতে হইবে। কোশলবাসী মনুষ্যদের মত আমাকেও তখন বৃত্তিপ্রলোভন, উচ্চরাজপদ, উপাধি ইত্যাদি লাভের আশায় তৃতীয় রিপুর বশবর্তী হইয়া ইঁহার, তাঁহার ও উঁহার পদ-পল্লবে উদয়-অস্ত তৈল লেপন করিতে হইবে। হায়, আমার কী দশা হইবে!

শ্রীরামচন্দ্র বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে কহিলেন—মারুতি মনুষ্যত্ব লাভের ভয়ে তুমি বৃথাই এত শঙ্কিত হইতেছ। আর্যশাস্ত্রের সহিত তোমার আদৌ পরিচয় নাই। আত্মতত্ত্ব এবং বিবর্তনবাদ সম্বন্ধেও তুমি নিতান্ত অজ্ঞ। কোটি কোটি কীটজন্ম ও লক্ষ লক্ষ পশুজন্ম অতিক্রম করিয়া তবে জীবাত্মা মনুষ্যদেহ লাভ করিতে সক্ষম হয়। তুমি যদি এই জন্মেই খাঁটি মানুষ বনিয়া যাও এবং মনুষ্যত্বের অধিকারী হও—তাহাতে তোমার আত্মারই উন্নতি হইবে। আত্মাই গৌরবান্বিত হইবে।

হনুমান আকুলভাবে কহিল—প্রভো, আমি বানরসমাজভুক্ত। আত্মতত্ত্বের ধার ধারি না। মনুষ্যত্বের মর্যাদা বুঝি না। বানরত্বেই আমার শ্রেষ্ঠ গৌরব। বানরত্বের তুলনায় আমি ব্রহ্মত্ব কি শিবত্বকেও নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করি।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। হনুমান পূর্ববৎ আকুলভাবে কহিল—প্রভো, মানুষের স্বভাবধর্মও বড় কম ভয়াবহ নহে। আমি মনুষ্যত্বের অধিকারী হইলেই—আমার মধ্যে মানুষের স্বভাবধর্মও মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে। আমাকে হয়ত কোশলবাসীদের মত কথায় কথায় মিথ্যা বলিতে হইবে, পদে পদে জুয়াচুরি করিতে হইবে, প্রয়োজনমত বুজরুক সাজিতে হইবে—হয়ত বা শয়তানিও করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ব্যাপার—আমার মন হইতে পরমারাধ্য মাতৃমূর্তি চিরকালের মত মুছিয়া যাইবে। স্বর্গাদপী গরীয়সী মাতৃভূমির স্মৃতিও চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। সেই সঙ্গে আমার বড় সাধের মাতৃভাষাও আমাকে চিরদিনের মত ভুলিতে হইবে। হায়, সব ভুলিয়া আমাকে তখন খাঁটি আর্য ভাষায় প্রলাপ বকিতে হইবে।

মৃদু হাস্যসহকারে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—মারুতি, সে তোমার পক্ষে পরম গৌরবের কথা। তুমি

আর্যভাষাবিদ হইলে তোমার জ্ঞানের পরিধি বাড়িবে। তুমি অচিরে দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হইবে।

হনুমান আকুলভাবে কহিল—প্রভো, আমার দিব্যজ্ঞানে কাজ নাই। আমি বানরোচিত জ্ঞান ও স্বভাবধর্ম বজায় রাখিয়া কোনরূপে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিলেই নিজেকে ধন্য মনে করিব। প্রভো, আপনাদের ওই আর্যভাষার মাদকতাও বড় ভয়াবহ। ইহা নিতান্ত নিরেটকেও কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া রীতিমত ভাবপ্রবণ করিয়া তুলে। কোন সুযোগে মগজে ভাবলক্ষ্মী ভর করিলে আমার আর আদৌ রক্ষা থাকিবে না। হায়, আমি আকাট গদ্যমনা হইলে কি হইবে। আমার এই দন্তাননের দশনপঙক্তির ফাঁক দিয়া তখন হয়ত ঝুড়ি ঝুড়ি গদ্য কবিতা ঝরিয়া পড়িবে। ভাবের প্রচণ্ড তাড়নায় হয়ত বা সত্যমিথ্যার টানাপোড়েন দিয়া সপ্তকাণ্ড স্মৃতিকথা রচনা করিয়া বসিব। আর তাহাই হয়ত আর্যভাষার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া বিবেচিত হইবে। দিকপাল পণ্ডিতেরা তখন কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত মহা মাতামাতি করিয়া ঢাকঢোল ইত্যাদি বাদ্যধ্বনি সহকারে আমার কণ্ঠদেশে বিরাট এক বরণমাল্য ঝুলাইয়া দিয়া আমাকে মহাকবি আখ্যা দিবেন। শুনিয়াছি, কবি-মহাকবিরা ঋষি-মহর্ষিদেরই সমতুল্য। ঢক্কানিনাদ ও মাল্যভূষণের মহিমায় আমি হেন বানরও হয়ত বা খাঁটি ঋষি বনিয়া যাইব। সে আরও ভয়াবহ। প্রভো, আপনার অমাত্যবর্গ বহুদিন ধরিয়া তাক করিয়া আছেন। আমার মধ্যে ঋষিত্বের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব দেখিলে তাঁহারা উল্লাসে নাচিয়া উঠিবেন। আমাকে জাতিচ্যুত করিবার মতলবে হয়ত বা মহামহিমময় 'কোশলরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করিয়া ছাড়িবেন। বুঝিয়া দেখুন, বাল্মীকি, বশিষ্ঠাদি ঋষিমহর্ষিগণের সহিত আমিও তখন একাসনে উপবেশনের অধিকার পাইব। সকল ব্যাপারে সমমর্যাদার অধিকারী হইব। ধিক্ ধিক্! আমার বানরজন্মে ধিক্! হায়, কপিকুল-চূড়ামণি আমি। আমার বানরত্ব লোপ পাইলে গর্ব করিবার মত কি আর অবশিষ্ট থাকিবে! অধিক কি, আমার হাতের পিণ্ডও তখন অচল হইবে। আমি পিণ্ডদানের অধিকার হারাইব। ফলে, আমার স্বর্গত পিতৃগণ বৎসরান্তে একবার করিয়া কদলী-পনস রসালাদির যে অমৃতোপম স্বাদ উপভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহা হইতেও চিরতরে বঞ্চিত হইবেন। আমিও অনন্ত নরকস্থ হইব। হায়, আমার কী দশা হইবে!

শ্রীরামচন্দ্র এবার প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। ইহার পর কী যে বলিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

হনুমান পূর্ববৎ উৎকণ্ঠাব্যাকুল কণ্ঠে কহিল—বানরত্ব হারাইলে আমার আর কি মর্যাদা থাকিবে! মর্যাদা হারাইলে কে আর আমাকে 'বীর হনুমান' বলিয়া শ্রদ্ধা করিবে! প্রভো, উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি তাই অযোধ্যাত্যাগের মহাসংকল্প গ্রহণ করিয়াছি। একটিমাত্র লম্ফ প্রদানের ওয়াস্তা। উত্তরে সুমেরু প্রদেশ, দক্ষিণে কিষ্কিন্ধ্যা। যেখানে হউক গিয়া পদার্পণ করিতে পারিলেই আমার জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু সম্ভবতঃ বানর বলিয়াই লাফ দিতে বিবেকে বাধিল। ভাবিলাম—প্রভুর অনুমতি ব্যতীত কেমন করিয়া অযোধ্যা ত্যাগ করি! অনুমতিপত্র চাই। কিন্তু তাহা সংগ্রহ করাও তো রীতিমত সময়সাপেক্ষ। বহুজনের দ্বারস্থ হইতে হইবে। বহু উমেদারি করিতে হইবে। বহু উৎকোচ ও উপঢৌকন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক কথায় বহু কাষ্ঠ ও শুষ্ক তৃণাদি দগ্ধ করিতে হইবে। তাই সাত-পাঁচ ভাবিয়া সত্বর সিদ্ধিলাভের আশায় এই অনশনের পথ ধরিয়াছি। প্রভো, আমি যথাবৎ রামদাসই আছি। আমার এই অপরাধ নিজগুণে মার্জনা করিবেন।

বিস্ময়বিমিশ্রিত কণ্ঠে শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—মারুতি, তুমি তো কোন রাজপুরুষ মারফৎ আমাকে একবার বলিয়া পাঠাইলেই আমার নির্দেশ প্রাপ্ত হইতে। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য তোমার মত বীরের এত অধিক বিচলিত হওয়া আদৌ উচিত হয়

নাই। অনশন শুরু করা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। দেখতো, তোমার জন্য রাজ্যময় আমার কি ভাবে কলঙ্ক রটিয়াছে।

হনুমান করজোড়ে কহিল—প্রভো, আপনি স্বয়ং যে পরম করুণাময় ত্রিভুবনে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন—রাজা হইলেও আপনাকে সংবিধানমত চলিতে হয়। আপনার দরবার আছে—দপ্তরখানা আছে। দপ্তরখানার নানা বিভাগ আছে। দরবারেরও নানা মতামত আছে। বহুরকমের ছলছুতা ইত্যাদি আছে। তাহা ছাড়া, সকলের সুপরিচিত 'লাল ফিতার' কেরামতি তো আছেই। যথাবিহিত সড়ক ধরিয়া অগ্রসর হইলে ফলপ্রাপ্তির আশায় আমাকে দিন, সপ্তাহ, মাস—হয়ত বা বৎসরের পর বৎসরও গণিতে হইত। ততদিনে আমার শরীরের পুরাপুরি নির্লোম অবস্থা হইত। আমার পশ্চাদ্দেশের লম্বমান প্রত্যঙ্গটিও সম্পূর্ণরূপে খসিয়া পড়িত। ভাবিয়া দেখুন, তখন আমার কীদৃশ অবস্থা দাঁড়াইত। তাহা ছাড়া, হে রাঘব, অনশন করিয়া মরিতে না বসিলে আপনিও কি এত শীঘ্র এমনভাবে বিচলিত হইতেন? এত সত্বর কি মদীয় উপবনাবাসে আপনার পদধূলি পড়িত?

শ্রীরামচন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন হনুমান নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। দুর্মুখও তাঁহাকে অযোধ্যার এই দরবার, দপ্তরখানা এবং লাল-ফিতা ইত্যাদির বদনামের কথা প্রায়শই শুনাইয়া থাকে। রাজ্যের সর্বত্রই নাকি এসবের বিরুদ্ধে নানাধরণের চাপা গুঞ্জনধ্বনিও শুনা যায়। অতঃপর তিনি যৎপরোনাস্তি অস্থিরচিত্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মুখ দিয়া আর কোন বাক্যই নির্গত হইল না।

এই ঘটনার তিনদিন মাত্র পরে 'কোশলবার্তায়' নিম্নলিখিত সংবাদটুকু প্রকাশিত হইল।

মহাবীর হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের একান্ত অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করিয়াছে এবং অনিবার্য কোন কারণবশতঃ কল্য নিশাবসানকালে কোশলরাজ্য ত্যাগ করিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র সানন্দে তাহাকে অযোধ্যাত্যাগের অনুমতি দান করিয়াছেন। মহাবীর যে কোথায় গিয়াছে সে সম্বন্ধে এখনও কিছুই জানা যায় নাই।

মারুতি কি কারণে অনশন করিয়াছিল—কি জন্যই বা অযোধ্যাত্যাগ করিল—ত্রিভুবনের কেহই তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না।

প্রতিধ্বনি

শ্রীশান্তা দেবী

এখন থেকে শান্তিনিকেতন আমাদের একটা তীর্থ-স্থান হয়ে উঠল। যখনই আশ্রমে কোনো উৎসব হত, তখনই আমরা দল বেঁধে বাবার সঙ্গে আশ্রমে যেতাম। নলিনী সরকার ও নীলিমা মহলানবিশ সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে যেতেন। যেতাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে, ফিরে আসতাম ম্লান মুখে। কেউ কেউ চোখের জলও ফেলত। তখনকার আশ্রম ছিল একটা অন্য জিনিষ। অতিথিদের পয়সা খরচ করে খেতে হত না। বরং তাদের পেয়ে আশ্রম যেন ধন্য হয়েছে এই রকম করে আদর অভ্যর্থনা করা হত। একবার একটি অতিথি বালক রাত্রে শোবার জায়গা খুঁজে না পেয়ে রবীন্দ্রনাথের বিছানায় গিয়ে শুয়েছিলেন। অনেক রাত্রে শুতে এসে ঘুমন্ত বালককে নিজের বিছানায় দেখে তিনি অন্য ঘরে গিয়ে শুলেন।

প্রথম প্রথম আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলকী-কুঞ্জের মধ্যস্থিত নীচু বাংলায় উঠতাম। সেখানে তাঁর পুত্রবধূ হেমলতা দেবী এবং পৌত্রবধূ কমলা দেবী থাকতেন। পরে কমলা অন্য বাড়ীতে উঠে যান। আমাদের সঙ্গে দুদিনেই এঁদের আত্মীয়তা হয়ে গেল। আশ্রমপতি ছাড়া আর একজনের আতিথ্যে ও ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম—তাঁর নাম সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। ওরকম ভদ্র নম্র মার্জ্জিতরুচি ও অতিথিবৎসল মানুষ বেশী চোখে পড়ে না। অতিথিদের জন্য কি পরিমাণ পরিশ্রম যে তিনি হাসিমুখে করতেন বলা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর মায়া তিনি অল্পবয়সেই কাটিয়ে চলে যান। তাঁর স্থান আর পূর্ণ হয়নি। ইনি ছিলেন কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের পুত্র।

শান্তিনিকেতনে যখন আমরা যেতাম তখন তাঁর রচিত কোনো কোনো গল্প রবীন্দ্রনাথ আমাদের পড়ে শোনাতেন। একটি গল্পের নাম "তপস্বিনী" বোধহয়। স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন মনে করে তপস্বিনীর বহু তপস্যার পর তাঁর স্বামী যখন অকস্মাৎ একদিন বিলাত থেকে মস্ত সাহেব হয়ে ফিরে এলেন তখন আমরা খুবই চমকিত হয়েছিলাম।

এই সময় মাঝে মাঝে অনেক মজার খেলা হত। তাকে বোধহয় 'প্যারাড' বলে। সুকুমারবাবু সবচেয়ে বেশী মজা করতেন। একটা গল্পে তিনি সব কথাতেই বারে বারে "আমার মেজ মামা" বলে বাধা দিয়ে নিজের বক্তব্য বলতে গিয়ে সবাইকে হাসাচ্ছিলেন।

কলেজের জীবনের সঙ্গেই এইসব তীর্থ যাত্রা চলছিল। তারই মধ্যে বি এ পাশ করেছিলাম এবং কপাল ক্রমে "পদ্মাবতী" মেডাল পেলাম। খুবই আনন্দ হল; কিন্তু তারই কিছুদিন আগে দাদাকে বিলেত পাঠিয়ে দেওয়াতে বাড়ীটা বড়ই খালি হয়ে পড়ল। আমাকে স্কুলে চাকরী নিতে দুই একজন বললেন, কিন্তু বাবা দিলেন না। তাতে একজন মন্তব্য করলেন, "মেয়েকে কি **glass case** এ সাজিয়ে রাখবেন?" অগত্যা বেকার হয়ে বাড়ীতে বসে মায়ের সংসার সামলাতে লাগলাম। এই সময় ছাত্রসমাজ, যুবসমিতি প্রভৃতিতে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পড়তাম, প্রবাসীর জন্য কিছু কিছু অনুবাদ করতাম। এই সময়েই বোধহয় দুই বোনে মিলে "হিন্দুস্থানী উপকথা" অনুবাদ করেছিলাম। বছরটা ঠিক মনে নেই। প্রবাসীতে অনুবাদ করতাম 'জগদ্দুর্লভ ভট্টাচার্য্য' নাম নিয়ে। কিছুদিন পরে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রী হবার জন্য ডাক পড়ল। তখন সীতা ও বি এ পাশ করেছে।

বোধহয় লেডি বসুই আমাদের দুই বোনকে ডাকেন। তাঁর সঙ্গে কবে পরিচয় হয় মনে নেই। তবে আমরা যখন কলেজে পড়ি তখনই জগদীশচন্দ্র বাবার সঙ্গে আমাদের দুই বোনকেও মাঝে মাঝে তাঁর বাড়ীতে চা খেতে ডাকতেন। বাবার গুরু বলে উনি আমাদের নাতনী বলতেন। নন্দলাল বসুর ছবিতে অলঙ্কৃত তাঁর বসবার ঘরে অনেকবার গিয়েছি বড় বড় লোকদের মাঝখানে। প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন তিনি বড় বড় বক্তৃতা দিতেন আমরা দুই বোন নিমন্ত্রণ পত্র পেতাম, ও খুব আনন্দের সঙ্গে বক্তৃতা শুনতাম। এর কিছুদিন পরেই বোধহয় ব্রাহ্মবালিকা স্কুলে যাওয়া সুরু করি। বেশীদিন পড়াইনি। সে সময়ে প্রিয়ম্বদা দেবীও ওখানে পড়াতেন। তাঁকে আনবার জন্য একটা ফিটন গাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল। সেই গাড়ীতেই আমরাও যেতাম। দুজনেই পড়াতাম।

ডিগ্রি নেওয়ার কথা আজও মনে আছে। ডিগ্রি নিতে যখন সেকালের থামওয়ালা সিনেট হলে যাই, তখন আজকালকার মত পাইকারী দরে ডিগ্রি দেওয়া হত না। আমরা ভাইস্ চ্যান্সেলার আশুবাবুর হাতে ডিগ্রি নিলাম। তিনি "I charge you . . . . ." বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

স্কুলের কাজ ছাড়া আর একটা কাজ হল গান-বাজনা শেখা। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় সমাজ মন্দিরের দোতলার গ্যালারীতে একটি ক্লাশ খুলে ছিলেন। তাতে তিনি এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শেখাতেন। সুরেন্দ্রবাবুর "গীতলিপি" থেকেই গান শেখানো হত। তাছাড়া এস্রাজ বাজানো শিখতাম। ছাত্র মাত্র একজনই ছিলেন, বাকি কয়েকজন ছাত্রী। উপেন্দ্রবাবুর চেহারাও যেমন সুন্দর ছিল, কথা বলার ধরণও সেইরকম মোলায়েম ছিল। তাঁর কথা বলার বেশ একটা মিষ্টি সুর ও accent ছিল; হাতের লেখায় একটা বিশেষত্ব দেখতাম—আগে লাইনটা লিখে নিতেন, তারপর যথাস্থানে ি, ী, ু, ূ ইত্যাদিগুলি বসিয়ে দিতেন।

উনি আমাদের গানের ক্লাশের একটা উৎসবও একবার করেছিলেন সমাজ মন্দিরে। তাতে আমরাই গান করেছিলাম, উপেন্দ্রবাবু বক্তৃতা করেছিলেন। একটা গান ছিল "জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে।" অন্যান্য কিছু কিছু গান ছিল সব আজ মনে নেই। উপেন্দ্রবাবু আমাদের সংস্কৃত শ্লোক বলে বলে তাল শেখাতেন:

> "অভূন্নৃপঃ বিবুধসখঃ পরন্তপঃ
> শ্রুতান্বিতঃ দশরথঃ ইত্যুদাহৃতঃ
> গুণৈঃ বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যঃ
> সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ং॥"

ভট্টিকাব্যের এই শ্লোকটা এখনও মনে আছে। কি কারণে জানি না ক্লাশটা কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সঙ্গীত সঙ্ঘে কিছুদিন বাজনা শিখতে গিয়েছি। সেখানে আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী প্রতিভা দেবীই বেশীর ভাগ দেখাশুনা করতেন। অনেক নাম-করা বাড়ীর মেয়েরা শিখতে আসতেন। কিন্তু সকলে সকলের সঙ্গে মিশতেন না, যে যার নিজের গণ্ডীর মধ্যেই থাকতেন। আমি ও নীলিমা মহলানবিশ সমাজপাড়া থেকে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে যেতাম। আমাদের যিনি বাজনা শেখাতেন তাঁর নাম বোধহয় ছিল শ্যামসুন্দরবাবু। সঙ্ঘে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীকেও প্রায় দেখতাম। এঁর রন্ধনবিদ্যা বিষয়ে 'আমিষ ও নিরামিষ' বলে একটা বই ছিল। সঙ্গীতসঙ্ঘে তিনি স্কুল তদারক করতে আসতেন। অনেকগুলি ক্লাশ ছিল।

দাদা বিলাত যাবার আগে ও পরে "আবোল তাবোল"র লেখক সুকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল। সুকুমার বাবুদের একটা "মন্ডা ক্লব" ছিল। তাতে অবশ্য আমরা যেতাম না। কিন্তু মাঝে মাঝে উনি "শব্দকল্পদ্রুম", "অদ্ভুত রামায়ণ" প্রভৃতি নানা অভিনয় করতেন, সেগুলি আমরা খুব উপভোগ করেছি। তাঁর গান:

> "ওরে ভাই, তোরে তাই কানে কানে কই রে,
> ওই আসে, ওই আসে, ওই ওই ওই রে।"

মুলুদের খুব প্রিয় ছিল।

সুকুমারবাবু বিবাহ করেন আমার সহপাঠিনী ও বন্ধু টুলুকে। তারপর ওঁদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে চায়ের নিমন্ত্রণে যেতাম। চিঠি আসত এইরকম :

"আসছে কাল শনিবার
অপরাহ্ণ সাড়ে চার
আসিয়া মোদের বাড়ী
শুভ পদধূলি ঝাড়ি
কৃতার্থ করিলে সবে, টুলু পুপু খুশী হবে।"

পুপু সকুমারবাবুর ভ্রাতা সুবিনয়ের পত্নী।

কিছুদিন পরে আমরা দুইবোন বাবার সঙ্গে মুলুকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে পড়াতে গেলাম। তার শরীর ভাল ছিল না, তাই আশা করা গিয়েছিল যে ওখানে পড়াশুনার সঙ্গে শরীরটারও তার উন্নতি হবে। মা বেশীর ভাগ সময় সুহৃকে নিয়ে কলকাতায় থাকতেন। সে সময় কলকাতায় Light Horseএর একটা camp হয়েছিল। সুহৃ তাতে ভর্ত্তি হয়েছিলেন, ভূপতি সেন প্রভৃতি বড়রাও অনেকে ভর্ত্তি হয়েছিলেন।

ঠিক কোন্ বৎসর মনে নেই, তবে শান্তিনিকেতনে যাবার আগেই মুলু রামমোহন লাইব্রেরী হলে আশামুকুল নামে তার এক বন্ধুকে নিয়ে "ডাকঘর" অভিনয় করেছিল। মুলু বোধ হয় মোড়ল কিংবা পিসেমশায় হয়েছিল আর আশামুকুল "অমল"। অভিনয় খুব সুন্দর হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের কাছে খবরটা পৌঁছয়। তাই তিনি তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে "ডাকঘর" অভিনয়ের সময় আশামুকুলকে 'অমলে'র পার্ট দেন। গগনেন্দ্রনাথ 'পিসেমশাই' সেজেছিলেন। তাই আশামুকুল তখন থেকে বরাবরই গগনবাবুকে 'পিসেমশাই' বলে ডাকত। তিনি তাকে খুব ভাল বাসতেন। কতকটা মুলুর চেষ্টাতেই আশামুকুল পরে শান্তিনিকেতনে পড়ার সুযোগ পায়। মুলুর নাক-মুখ ভারী সুগঠিত ছিল, কিন্তু চুলগুলি ছিল সোজা সোজা। অল্প বয়সে সে খুব লম্বা হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন "মুলু আশ্রমের তালগাছগুলির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে।" মুলুর দলের ছেলেদের সুকুমারবাবুর রামায়ণের অনেক গানও খুব প্রিয় ছিল। তার মধ্যে একটা :

"রাবণ ব্যাটায় মার, সবাই রাবণ ব্যাটায় মার।
তার মাথায় ঢাল ঘোল, তারে উল্টো গাধায় তোল।
তার কাণের কাছে পিটতে থাক চোদ্দ হাজার ঢোল।"

চারুবাবুকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "রামানন্দবাবুকে আমাদের এই আশ্রমে আবদ্ধ করবার জন্য বহুদিন থেকে সাধনা করছি।" স্থায়ীভাবে যাবার আগেই ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁরই আগ্রহে আমরা শান্তিনিকেতনে নেপালবাবুর কুটিরে কিছুদিন ছিলাম। তারপর জুলাই মাসে ওখানে একটি মাটির বাড়ী কিনে আমরা নিজেদের ঘর সংসার পাতলাম। ছোট বাড়ী, তিনখানা মাত্র ঘর, খড়ের চাল। চার দিকে বারান্দা, বারান্দারই কোণ ঘিরে একদিকে রান্নাঘর ও আর একদিকে স্নানের ঘর হল। বারান্দার কাঠের খুঁটিগুলি বদলে ইটের মোটা থাম হল, প্ল্যাষ্টার চূণকাম কিছুই বাদ গেল না। বাড়ীর চারধারে লাল সুরকি ঢেলে বেশ ছবির মত দেখতে হল। আপনা থেকেই একটা পেয়ারা গাছ গজিয়ে উঠল। এই গাছটির কথা রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠিতে আছে।

আমাদের বাড়ীর পরে একটা মাঠ, সেই মাঠের পরেই রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহ দেহলি। আমাদের বাড়ীথেকে তাঁকে সর্ব্বদাই দেখা যেত অর্থাৎ যদি তিনি উপরতলায় দরজা খুলে থাকতেন। ভোরে আমরা বিছানা ছাড়বার অনেক আগেই তিনি পূর্ব্বমুখে উপাসনায় বসতেন। তারপর সারাদিন নানা কাজকর্ম। খাবার সময় একতলায় নামতেন। একতলায় অনেক সময় মীরাদেবী থাকতেন। সন্ধ্যায় আবার উপরের ছোট ছাদটিতে কবি ক্যাম্প চেয়ারে বিশ্রাম করতেন। তখন আমরা এবং আরও অনেকে সেখানে গিয়ে হাজির হতাম। কত রকমের গল্প আর আলোচনা যে হত তার ঠিক নেই। তার মধ্যে থেকে থেকে শিশুরা এসে নানা আর্জি পেশ করে যেত। সে এক যুগ গিয়েছে যা কেউ আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। মনে পড়ে এই সময়ই রবীন্দ্রনাথ লিখে-

ছিলেন, "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না, রইল না।"

ঐ বাড়ী থেকে মীরা দেবী অনেক সময় আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসতেন। কিন্তু বিকালে দেহলির ছাদে তাঁকে কখনও দেখতাম না। প্রতিমা দেবী অনেক সময় আসতেন। কবি প্রতিমা, সীতা ও আমাকে তাঁর three graces বলতেন। আমাদের দিন কয়েক 'শেলি' পড়িয়েছিলেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন স্কুলের ২।১টা ক্লাশে ইংরেজী পড়াতেন। তাঁর পড়ানো শুনতে অনেক বড়রাও এসে উপস্থিত হতেন। বাবাও মাঝে মাঝে যেতেন। বাবাকে দেখে কবি একটু সঙ্কুচিত হতেন। কলকাতা থেকে একবার অধ্যাপক জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় গিয়ে ছেলেদের ক্লাশে বসলেন। রবীন্দ্রনাথের পড়াবার একটা নূতন পদ্ধতি ছিল।

দেহলির ছাদে নানা বিষয়ের মধ্যে "কাবুলীওয়ালা" "দুরাশা" "সমাপ্তি" প্রভৃতি অনেক ছোট গল্পের জন্মকথা আলোচিত হত। কবি বলতেন যে একসময় তাঁরা মুখে মুখে তিন চারজনে মিলে গল্প রচনা করতেন। তারপর কেউ একজন একটা প্রকাণ্ড সমস্যার সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথের হাতে গল্পটিকে ছেড়ে দিতেন। কবির এইসব বন্ধুদের মধ্যে মহারাণী সুনীতি দেবী প্রভৃতিও ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কবিই তার উদ্ধার সাধন করতেন। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ আমাকে একটা ভূতের গল্প লিখতে বলতেন। নেপালবাবু বোধহয় আমার লেখা কোনো গল্পের প্রশংসা তাঁর কাছে করেছিলেন। তখন আমরা সবে গল্প লেখা আরম্ভ করেছি। সীতা আর আমি তখন সংযুক্তা দেবী নাম নিয়ে প্রবাসীতে "উদ্যানলতা" উপন্যাস লিখেছিলাম। ছাত্রছাত্রী মহলে উপন্যাসটির বেশ নাম হয়েছিল। পরেও অনেকে একথা বলেছে। কারণ আমাদের আগে স্কুল কলেজের মেয়েদের নিয়ে বাংলা গল্প কেউ লেখেনি। একজন গবেষক ইংরেজী একটা কাগজে এ-কথা লিখেছেন। সংযুক্তা দেবীকে আবিষ্কার করবার জন্য তখনকার অনেক খ্যাতনামা লেখক লেখিকা নানা সন্ধান করেন। একবার বোধহয় মাঘোৎসবের সময় শারীরিক অসুস্থতার জন্য সুবিখ্যাত লেখিকা নিরুপমা দেবী একটু বিশ্রামের জন্য আমাদের বাড়ী এসে হাজির। আমরা সংযুক্তারা যে বয়স্কা মহিলা নই দেখে তিনি বিস্মিত ও পুলকিত হলেন। তারপর তাঁর বন্ধু লেখিকা হেমনলিনী দেবীর বাড়ী আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। হেমনলিনী 'নাইকা' বলে একটি গল্পের বই লিখেছিলেন। এই বাড়ীটা তাঁর ভাই কালিদাস পাণ্ডের বাড়ী। লেখিকা সম্মেলন হবে বলে সেখানে কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীকে আনা হয়েছিল এবং আমাদের দিয়েই কবি প্রিয়ম্বদা দেবীকেও যোগাড় করা হয়েছিল। গিরীন্দ্র মোহিনী একটা পাশের ঘরে বসে ছবি আঁকছিলেন দেখলাম। সকলে মিলে আমাদের খুব আদর আপ্যায়ন করলেন। কিছুদিন নিরুপমা চিঠিপত্রও লিখেছিলেন। তার অনেক পরে পার্ক সার্কাসে All India Women's Conference এ তাঁকে দেখি। সেখানে সেদিন Divorce Bill পাশ করাবার চেষ্টা হচ্ছিল। আগেকার সেই হাস্যময়ী নম্র নিরুপমা দেবী আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে এসেছিলেন। Bill পাশ হলে হিন্দুর সংসারে যে কি অনন্ত অকল্যাণ হবে রেগে রেগে বলছিলেন।

শান্তিনিকেতনে থাকতে আমরা আশ্রমের মেয়েরা সবাই মিলে "শ্রেয়সী" নাম দিয়ে হাতের লেখা একটা মাসিক পত্র বার করেছিলাম। আমাকেই সম্পাদনা করতে হত। উৎসাহদাত্রী ছিলেন হেমলতা দেবী, তিনি লেখাও দিতেন। মলাট একবার প্রতিমা দেবী এঁকেছিলেন, একবার আমার মা এঁকেছিলেন। আমার "শিকার পরীক্ষা" গল্পটি আমি প্রথমে এই কাগজেই লিখি। পরে তা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় এবং হিন্দি, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি নানা ভাষায় অনূদিত হয়। দাক্ষিণাত্য থেকে কোনো ভাষাতেও অনুবাদ হয়েছিল। "শ্রেয়সী" বেরোলে দিনুবাবুদের চা-চক্রে সেটা একবার হাতে হাতে ঘুরত। কেউ যে বিশেষ পড়তেন তা নয়,

তবে কে কি লিখেছে দেখতেন এবং ঠাট্টা করবার কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজতেন।

"শ্রেয়সী" নামটা বোধহয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দেওয়া। আমাদের হাতের লেখা এই কাগজে বড়দের মধ্যে কিরণবালা সেনও লেখা দিতেন; আমার মা মনোরমা দেবীও একবার একটা লেখা দিয়েছিলেন। বাকি সব যাঁরা লিখতেন তাঁদের লেখিকা বলে আজ কেউ চিনবে না। এই রকম অখ্যাতনামাদের কাছ থেকে আমি মাঝে মাঝে লেখা আনতে যেতাম। একদিন দুপুর রৌদ্রে কার একটা লেখা নিয়ে ফিরছি, হঠাৎ শুনলাম দেহলির ছাদ থেকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "শান্তা, এই দুপুর রোদে লেখা খুঁজে বেড়াচ্ছ? আমার কাছেও ত একবার আসতে পারতে। আমি কি শ...এর চেয়েও খারাপ লিখি?" তিনি একটি তরুণী বধূর নাম করলেন। একবার কবিতার অভাবে আমি নাম না দিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম। সেটা পড়ে রবীন্দ্রনাথ হেমলতা দেবীকে বললেন, "এযে দেখি পাকা হাতের লেখা!" আমরা কলকাতা চলে আসার পর এই "শ্রেয়সী" ছাপার অক্ষরে কিছুদিন বেরোত।

আশ্রমে এসেই মুলু খুব নানা কাজে মেতে উঠেছিল। সভা সমিতি, রান্না খাওয়া তদারক, যখন তার যা কাজের ভার থাকত, সব মন দিয়ে করত। পড়াশুনা ত ছিলই, তার উপর আবার সে এবং তার বন্ধু বিজয় বাবু প্রভৃতি মিলে ভুবনডাঙায় ছেলেদের জন্য একটা নাইট স্কুল করেছিল। বাবা এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পুরাণো খবরের কাগজ নিয়ে তারা বাজারে বিক্রী করে ছাত্রদের সেই পয়সা দিয়ে বই-স্লেট-খাতা-পেন্সিল কিনে দিত। মাঝে মাঝে আবার তাদের ঘটা করে আমাদের বাড়ীর সামনে খাওয়ানো হত। খাওয়া শেষ হলে ছেলেরা "ওয়া মনোরমা দেবী জি কী জয়" বলে জয়ধ্বনি দিয়ে যেত।

একবার আশ্রমের আনন্দমেলায় মুলু "সীতা দেবীর চরণরেণু", "রামের পাদুকা", "ভীমের গদা" প্রভৃতি পৌরাণিক জিনিষের একটা প্রদর্শনী করেছিল আধুনিক জগৎ থেকে সংগ্রহ করে। তারপর থেকে বহুদিন আশ্রমের ছেলেরা এইরকম পৌরাণিক দ্রব্যের প্রদর্শনী করে এসেছে।

কিন্তু মুলুকে আমরা বেশীদিন ধরে রাখতে পারিনি। আমরা বছর দুই শান্তিনিকেতনে থাকার পর কলকাতায় মা প্রায় সকলকে ছেড়ে থাকাতে তাঁর শরীর মন দুই খারাপ হতে লাগল। ডাক্তারেরা বললেন, "আপনারা সকলে এক জায়গায় থাকলে ওঁর উন্নতি হবে মনে হয়।" অগত্যা আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। মুলুকে এখানকার স্কুলে ভর্তি করা হল। দাদাও এই সময় প্রায় সাত বছর পরে দেশে ফিরে এলেন বিলেত থেকে। মায়ের মুখে হাসি দেখা দিল। কন্যার মাতারা অনেকে এসে দাদাকে জামাই করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন। এমনি করে দিন কাটছিল, বেশী দিন যায়নি। দাদা ফিরে আসার মাস দুই পরে মুলু একদিন খেলতে খেলতে পড়ে গিয়ে কোথায় যেন লাগাল। ব্যথাটা কিছুই না, কোথায় তাও বলতে পারল না। একেবারে ১০৫° জ্বর এল। বাড়ীর ডাক্তার বড় ডাক্তার আনতে বললেন। নীলরতনবাবু অসুস্থ ছিলেন, তাঁকে পাওয়া গেল না। যাই হোক, যাঁরা এলেন তাঁরা রক্ত দিতে বললেন। ক্ষুদুর রক্ত নিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ফল হল না। চার-পাচ দিনেই মুলু সকলের বুক ভেঙে দিয়ে চলে গেল। মা একেবারে চিরকালের মত ঘর সংসার সমাজ সব ছেড়ে দিলেন। আগের মত সহজ হাসি আর তাঁর মুখে কেউ দেখল না। বাবা অমল হোমকে লিখেছিলেন, "সেই পূর্ব্বের মত দিন আমার জীবনে আর আসবে না।"

ঠিক কোন বছরে মনে নেই, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনের জন্য ভর্তি হবার আগে সীতা ও আমি বাড়ীতে চারুবাবুর কাছে ফ্রেঞ্চ পড়া শুরু করেছিলাম। বেশ খানিকটা এগিয়েছিলাম। দু-চারটে গল্প বাংলায় অনুবাদ করে প্রবাসীতে ছাপিয়েছিলাম। যখন

Universityতে ভর্ত্তি হই তখন প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার ফ্রেঞ্চ পড়ার বিষয়ে। তাইতেই বুঝলাম তিনি প্রবাসীতে আমাদের অনুবাদ দেখেছিলেন। ফ্রেঞ্চ পড়া কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে গেল। তার অনেকদিন পরে যখন বিশ্বভারতী একটু একটু করে সুরু হচ্ছে তখন আমি কয়েক মাসের জন্য ওখানে ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিলাম। ওখানে জলরঙা ছবির সঙ্গে আর কি কি শেখা যায় তার ব্যবস্থা করছিলাম। এইসময় শ্রীমতী আন্দ্রে কার্পেলেস্ আশ্রমে এসেছিলেন। তাঁর কাছে আমি তৈলচিত্র ও কাঠ খোদাই চিত্র শিক্ষা সুরু করি এবং অধ্যাপক বেনোয়া (ফরাসী) মহাশয়ের ফ্রেঞ্চ ক্লাশেও ভর্ত্তি হই। বেশ খানিকটা আবার পড়লাম। মিস্ গ্রীণনাম্নী একজন আমেরিকান মহিলা তখন ওখানে ছিলেন, তাঁর কাছে কেক্ তৈরী শিখতাম। রবীন্দ্রনাথ আমার এইরকম সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হবার চেষ্টাকে বেশ ঠাট্টা করে ছিলেন। কিন্তু আমি দমিনি। কপালদোষে কলকাতার বাড়ীতে মায়ের অসুবিধার জন্য আমাকে ফিরে আসতে হল। তার অল্পদিন পরেই সীতার বিবাহ হয়ে গেল। আমার আর আশ্রমে যাওয়া হল না। সীতা স্বামীর সঙ্গে রেঙ্গুনে চলে গেল। শেষবার যখন আশ্রম থেকে ফিরছিলাম তখন হাওড়া ষ্টেশনে একটা কুলি আমার একটা বাক্স খুব ভারী দেখে নিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল জানি না। বাড়ী ফিরে দেখলাম বাক্সভর্ত্তি আমার যত ফ্রেঞ্চ বই অভিধান আর রবীন্দ্রনাথের ম্যাকমিলানের বই ছিল। কুলির কতটা লাভ হল জানি না। আমার বাড়ী বসে ফ্রেঞ্চ পড়ার উপায়ও রইল না।

১৩২৪ সালে যখন শান্তিনিকেতনে বাস করতে যাই, তখন ওখানে কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথমা পত্নী সুকেশী থাকতেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু নিজের ভাসুরের ছেলেকে মানুষ করেছিলেন। সুকেশী দেবী খুব মিশুক ছিলেন এবং নানা রকম মজা করে গল্প করতেন। একবার তিনি বিলাত প্রবাসী এক নামকরা বরের সঙ্গে সীতার সম্বন্ধ এনেছিলেন, বললেন, "তাঁর কিন্তু দুটি মেয়ে আছে।" সীতা যেই বলেছে, "ও বাবা!" অমনি সুকেশী দেবী বললেন, "তোমার জন্যে কি তারা মরবে নাকি?" মেয়েদের আধুনিক পোষাক, প্রেমে পড়া সব নিয়েই তিনি নানা হাসির গল্প করতেন। সব গল্পই কাগজে কলমে লেখবার মত নয়। ১৯১৮ কি ১৯শে যখন একটা influenza মহামারী হয় সেই সময় শান্তিনিকেতনে অনেকের সঙ্গে সুকেশী দেবীও পীড়িত হন। তিনি রোগ থেকে সেরে উঠতে পারলেন না। সুন্দরী সুরসিকা সুকেশী আত্মীয় বন্ধুদের বেদনা দিয়ে অকালেই চলে গেলেন। চারিধারে যেন মৃত্যুর একটা ছায়া ঘুরে বেড়াত মনে হত। অজিত কুমার চক্রবর্তীও এই সময় গেলেন। এই ১৯১৯ সালেই মুলুকেও আমরা হারালাম।

এর পর আমাদের সংসারে ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল। ক্ষুদু বি,এ পাশ করার পর কেমব্রিজে পড়তে চলে গেলেন। বছর দুই তিন তার সেখানেই কাট্‌ল। ক্ষুদু বাড়ী ফিরে আসবার আগেই দাদার বিবাহ হয়ে গেল ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার সঙ্গে। নূতন বউ আসবেন বলে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের এতদিনের বাসা ছেড়ে আমরা রাজা রামমোহন রায় রোডের একটা নূতন বাড়ীতে উঠে গেলাম। প্রবাসী আপিস রইল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটেই।

আমাদের সেই ছেলেবেলার পরিচিত সংসার প্রায় সকল দিক দিয়েই বদলে গেল। কোথায় গেল ক্ষুদু মুলুর কলরব আর গান, কোথায় গেল মায়ের হাতের মিষ্টি রান্না? প্রতি জন্মদিনে আর ভাইফোঁটায় ক্ষুদু কি উপহার পাবে তার জন্য দিদিদের কাছে canvas করত, সে এখন Cantab হয়ে আসবে। দিদি ছাড়া সীতার এক মিনিট চলত না, সে পরের গৃহিণী হয়ে বিদেশে চলে গেল। বাবাও অসুস্থ হয়ে কিছুদিন গিরিধিতে শরীর সারতে গেলেন। বাবার অসুস্থতাটা প্রধানতঃ মানসিক বেদনা থেকেই হয়েছিল।

সীতার বিবাহের কিছুদিন আগে যখন একলা ছবি

আঁকা শিখতে আশ্রমে গিয়েছিলাম তখন মিসেস লটি সেন মেয়েদের বোর্ডিঙের ভার নিয়েছিলেন। সেখানেই আমি একটা ছোটঘর একলা পেয়েছিলাম। বাড়ীটার নামছিল লেবুকুঞ্জ। ছবির ক্লাশে গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল, তিনি কৃতীবাবুর দ্বিতীয়া পত্নী সবিতা দেবী। ইনি ভাল আঁকতেন এবং ভাল নাচতে পারতেন। বোর্ডিঙের বাড়ীতে লেবুকুঞ্জের আর একটা ঘরে তটিনী দাস এসেছিলেন। তিনি ওখানে লেসনি ও উইন্টারনিজ সাহেবের কাছে মোটা মোটা বই নিয়ে পড়াশুনা করতেন। তাঁর স্বামী সরোজবাবুও প্রতি সপ্তাহে একবার আসতেন, বিশ্বভারতীতে কিছু পড়াতেনও বোধহয়। তটিনীর সংসারের বেশীর ভাগ কাজই সরোজবাবু করে দিতেন, খুব কাজের লোক ছিলেন। এই সময় ফণীভূষণ অধিকারীর কন্যা আশা অধিকারী আশ্রমে ছিলেন। ভারী সরল স্বভাবের মেয়ে। কয়েক বৎসর পরে তিনি আর্য্যনায়কম্‌কে বিবাহ করেন। আর্য্যনায়কম্ আগে খৃষ্টধর্ম্মী ছিলেন। শান্তিনিকেতনে বাবা একবার পীড়িত হয়ে পড়ায় ইনি বাবার সেবা করেছিলেন মনে আছে। বাবাই এঁদের বিবাহ দেন।

বিশ্বভারতীর প্রথম যুগে অশোক ও কালিদাস নাগ কলকাতা থেকে প্রতি সপ্তাহে ওখানে পড়াতে যেতেন। তখনই প্রফেসর লেভ্‌নিও উইন্টারনিজ প্রভৃতি এখানে পড়াতে এসেছিলেন।

আমার বিবাহের পর আমি রামমোহন রায় রোড ছেড়ে দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের একটা ভাড়া বাড়ীতে যাই। মাকে দেখতে প্রতিদিন আসতাম রামমোহন রায় রোড়ে। মা রাঁধুনীর রান্না খেতেন না বলে হয় নিজেই রাঁধতেন, নয় আমি রান্না করে দিতাম। আমার বিবাহের আগেই অশোক বিলাত থেকে ফিরে আসেন। এখানে এসে অশোক Welfare বলে একটা কাগজ বার করেন এবং প্রধানতঃ অশোকের চেষ্টাতেই সার্কুলার রোডে প্রবাসীর নিজস্ব প্রেস স্থাপিত হয়।

এতদিনে সীতা ও আমি বাংলা গল্প ও উপন্যাস লেখায় অনেকটা এগিয়ে ছিলাম। সংখ্যায় সীতা আমার চেয়ে অনেক বেশী লিখতেন এবং এখনও মাঝে মাঝে লেখেন। আমি কোন দিনই অত দ্রুত কলম চালনা করতে পারি না।

বিবাহের আগে মাঝে কিছুদিন ছবি আঁকায় খুব মন দিয়ে ছিলাম। নন্দলাল বসু ও অবনীন্দ্রনাথ দুজনের কাছেই কিছু কিছু শিখেছিলাম। দুই তিনটা ছবি বিক্রীও হয়ে ছিল এবং কয়েকটা প্রদর্শনীতে গিয়েছিল। আমার মায়ের একটা পেনসিল স্কেচ করেছিলাম, সেটা O. C. Gangolyর ভাল লেগেছিল বলে তিনি "রূপম" কাগজে ছেপেছিলেন। তখন আর্ট সোসাইটির হলে নিয়মিত প্রদর্শনী হত। হলটি দিশী ভাবে সাজানো থাকত। অবনীবাবু বলতেন, "যখন আমাদের জোর ইণ্ডিয়ান আর্টের চর্চ্চা চলছে তখন ভাবলুম সব দিকেই এর চর্চ্চা করতে হবে।" দিশী আসবাব দিয়ে দিশী ঘরদোর এমন কি আর্ট সোসাইটির হল ও তাঁরা দুইভাই সাজিয়ে ছিলেন। নিজেদের বাড়ীর পুরাতন মূল্যবান আসবাব বিক্রী করে ফেলে নিজেরা দেশী নমুনা দিয়ে নূতন আসবাব করতে সুরু করলেন।

জোড়াসাঁকোয় তাঁদের বড় ঘরের মেঝেতে তখন জাপানী মাদুরের গদি পাতা থাকত। দেয়ালে সবচেয়ে চোখে পড়ত তাঁর আঁকা "পদ্মপত্রে অশ্রু বিন্দু"র এবং তাঁর মাতৃ দেবীর ছবিটি। মোগল আর্টের ছবিতে দেয়াল ভর্ত্তি। দাক্ষিণাত্যের পিতলের বড় বড় প্রদীপাধার ঘরে ও বারান্দায় সাজানো, মাঝে মাঝে চীনা কি জাপানী টবে বামন মহীরুহ। তিনখানি চেয়ারে এই খানেই তিনভাই বসতেন। গগনেন্দ্র তখন বেশীর ভাগ কার্টুন আঁকতেন, অবনীন্দ্র জলরঙের ছবি। ছবি আঁকতে আঁকতে তিনি তাঁর সাদা পাঞ্জাবীতে তুলি মুছতেন। এই খানেই সব বাইরের লোকেরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। অনেক সময় ছবির থেকে চোখ না তুলেই তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। আমি তাঁর কাছে ছবি দেখাতে বাবার

সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে যেতাম। যখনই যেতাম দেখতাম তিনি ওই দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছবি আঁকছেন। ঐ সময় তাঁর আঁকা চীন পরিব্রাজকের একটি ছবি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। তাঁদের বসবার ঘরে তাঁর মায়ের যে ছবিটি ছিল তা মা জীবিত থাকতে আঁকা নয়। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কোনো ছবি আঁকা বা ফোটো তোলা হয় নি শুনেছি। পরে অবনীবাবু নিজের মন থেকেই এই ছবিটি এঁকেছিলেন। একদিন দেখলাম তিনি শ্বেতপাথরের একটি ভাঙা থালা নিয়ে ছোট বাটালি দিয়ে কি খোদাই করছেন। ধীরে ধীরে সেটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি হয়ে উঠল। এটিও দ্বিজেন্দ্রনাথকে না দেখেই করা। অবনীবাবু বলতেন "আমরা অধিকাংশ জিনিষই ভাল করে দেখি না। ছবি আঁকবার আগে দেখতে শেখা দরকার। গোলদীঘির ধারে যে রোজ বেড়ায় তাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, ওখানের রেলিঙের ডিজাইনটা কি রকম, সে বলতে পারবে না।"

জলরঙের wash দেওয়া, একটানে চুল আঁকা এই সব করে আমাকে দেখতেন। বলতেন, "ভোঁতা তুলি দিয়ে চুলের লাইনগুলি ভাল আঁকা যায়।" নূতন আর্টিষ্টরা বড় রং নষ্ট করে বলে দুঃখ করতেন। আবার বলতেন "কাগজ তুলি রংকে ভয় পেতে নেই। গেলোই বা একটা ছবি নষ্ট হয়ে, যা চাও সাহস করে আঁকতে চেষ্টা কোরো।" একবার আমি একটা ছবি নিয়ে যাওয়াতে বলেছিলেন, "হয়েছে বটে, তবে একটা নয় দুটো ছবি।" এই বলে একজন নামকরা আর্টিষ্টের গল্প করলেন:—"সে আমাকে ছবি দেখাতে এনেছিল। আমি একটা কাঁচি এনে ছবির মাঝখান দিয়ে কেটে দিয়ে বল্লুম—এইবার হয়েছে।" সমস্ত ছবিখানির গতির দিক যে একমুখী হওয়া উচিত, তার রসের উৎসও যে একই কেন্দ্রে এই কথাই তিনি বোঝাতে চাইলেন।

কত সময় দেখতাম অবনীবাবু সুন্দর আঁকা ছবিকে জলে ডুবিয়ে ঘসে ঘসে রং তুলে দিচ্ছেন। আমি ভাবতাম গেল বুঝি ছবিটা। উনি জল থেকে টেনে তুলে বলতেন, "এইবার ঠিক effect হয়েছে।"

ক্রমশঃ

মৃচ্ছকটিক ও তৎকালীন সমাজ

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তি

সংস্কৃতে রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাট্যগ্রন্থটি একটি যুগদর্পন। গ্রন্থটিতে একটি বিশেষ যুগের সমাজচিত্র সুচারুরূপে বিবৃত হয়েছে। সমাজ ও জীবনের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটি সাহিত্যে বিদ্যমান, 'মৃচ্ছকটিক' তারই রূপাশ্রিত বাণীবিগ্রহ। বলাবাহুল্য, সমাজকে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত করা হয় সাহিত্যেরই প্রয়োজনে। সাহিত্যে এই প্রতিবিম্বিত সমাজরূপ এবং জীবনের প্রভাব যেখানে একটি যুগের সকল কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, সেখানেই সাহিত্যের প্রকৃত অমরাবতী। 'মৃচ্ছকটিক' এমনি একটি যুগের সমাজ-জীবনালেখ্যের সার্থক রূপায়ন।

মৃচ্ছকটিকের সুপ্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মনীষী বিদ্যাসাগর গ্রন্থটিকে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি সুপ্রাচীন নিদর্শনরূপে বর্ণনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেছেন, সংস্কৃতে যতগুলি নাটকগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকটি সর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রাচীন। এ প্রসঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থকার ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মন্তব্যটি ঐতিহাসিকোচিত। ক্লাশিকাল যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সমালোচ্য-গ্রন্থটিকে বৌদ্ধাধিকারের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। যাইহোক, বৌদ্ধাধিকারে রচিত হলেও মৃচ্ছকটিকের রচনাকাল সম্পর্কে কোন প্রমান্য পরিচয় আবিষ্কৃত হয়নি। পণ্ডিত মহলেও রচনাটির কালনির্ণয় সম্পর্কে যথেষ্ট মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতে রচিত একাধিক গ্রন্থে সন তারিখের উল্লেখ আছে। যে কোন রচনার কালনির্ণয় ব্যাপারে ঐ নিদর্শনগুলি যথেষ্ট সাহায্য করে। অনেক সময় প্রত্নতাত্বিক উপাদান বিচারে এবং রাজ-পঞ্জির ঘটনা-মূলক বিবরণ হ'তেও প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের আনুমানিক কাল পরিমাণ স্থিরীকৃত হতে পারে। কিন্তু সাহিত্য-জগতের অন্যতম সুপ্রাচীন গ্রন্থ মৃচ্ছকটিকে অনুরূপ এমন কোন নিদর্শন নেই, যার ভিত্তিতে উক্তগ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

যাইহোক, কালনির্ণয় সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে নানা সংশয় থাকিলেও, এইটুকু অনুমান করা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় সমাজের এক বিস্তৃত চিত্ররূপ ও জীবনালেখ্য 'মৃচ্ছকটিক' গ্রন্থে রূপায়িত হয়েছে। শুধু তাই নয়, একটি বিশেষ যুগের ভারতজীবনাদর্শের প্রভাবও সেই সঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছে। ভারতের সামাজিক ইতিহাসে এই সুদীর্ঘ সময়কাল যে এক যুগান্তকারী অধ্যায়, সন্দেহ নেই। একদিকে বৌদ্ধ ধার্মিক ও সামাজিক আদর্শ ও ভাবধারার প্রসার, অন্যদিকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও সমাজচিন্তার পরিপোষণ প্রচেষ্টা; একদিকে জ্ঞান সাধনা, ধর্ম সাধনা এবং চারিত্রগুণের নব রূপায়ন, অন্যদিকে সামাজিক ক্রিয়াকর্মে নীরস অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞে নিষ্ঠুর প্রথা এবং [illegible] অবিশ্বাস। সব নিয়ে এক বিক্ষুব্ধ সামাজিক পটভূমিকায় ভারত ইতিহাসে একদিন নতুন সমাজ-বিন্যাসের প্রচেষ্টা প্রবল ভাবে অনুভূত হয়েছিল। সেই প্রচেষ্টার সূচনা ও ক্রমবিকাশ তৃতীয় শতকের সূত্রেই লক্ষ্য করা যায়। ইতিপূর্ব্বে সামাজিক ও ধর্মীয় সূত্রগুলি আধ্যাত্মিক ও অবৈজ্ঞানিক আতিশয্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে সমাজচেতনার ক্রমবিকাশে সেগুলি ক্রমশঃ সুসংহত এবং পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশ পায়। এবিষয়ে আরও উল্লেখযোগ্য, সমাজচেতনার মতপথগত বৈশিষ্ট্য প্রাক্ বৌদ্ধযুগে পরিপূর্ণ স্বতন্ত্রতায় চিহ্নিত হতে

পারেনি। বৌদ্ধযুগে এক সামাজিক প্রলয়ের পটভূমিকায় তা ক্রমশঃ নিয়মাবদ্ধ হতে সুরু করে। বৌদ্ধ প্রভাবে সমাজের বিভেদ ও বৈপরীত্যের সমস্ত বেড়াজাল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ধর্ম-সংস্কারের ক্ষেত্রেও ঐযুগে এক নতুন জীবনাদর্শ গড়ে ওঠে। ধর্মসূত্রগুলি নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্রতার মধ্যে ঐক্যসূত্র বিস্তার করে এক নতুন জীবনবোধের সূচনা করে। সমাজগঠনের ক্ষেত্রেও ঐযুগে এক অভিনব রূপান্তর ঘটে। বৌদ্ধবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজমানসের যথেষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সমাজ-ধর্মনীতিতে নানা জাতির সংমিশ্রণ মানুষকে এক নতুন সমাজচেতনায়-উদ্বুদ্ধ করে। এই ইতিহাসানুগামী সমাজচেতনার স্পর্শে 'মৃচ্ছকটিক' সঞ্চারিত। গ্রন্থে বিবৃত সমাজচিত্র তাই একটি বিশেষ যুগের চাঞ্চল্যটুকুই বহন করে না, চিত্ররসের মাধুর্য্যে তা আগামী কালের স্বপ্নচেতনাকেও উদ্দীপ্ত করে।

প্রাচীন ভারতে ধর্ম ও সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। সে যুগে ধর্মাদর্শে রাজধর্ম পরিচালিত হত। উভয় সমাজ ও ধর্মনীতির বিকাশ সাধনে রাজানুগ্রহের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তাছাড়া রাষ্ট্রানুকূল্যের তারতম্য ও বিশিষ্টতা অনেকাংশে কোন বিশেষ ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা প্রাসারতার দ্যোতক'। বৌদ্ধধর্ম, রাজমান্যতায় একদিন গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছিল। য়ুয়ানচোয়াঙ, ইৎসিঙ, সেংচি প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকদের বিবরণী থেকে বৌদ্ধযুগের সংস্কার ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। অবশ্য একথা সর্বথা স্বীকার্য্য যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মূলে বৌদ্ধদের দান অপরিমেয়। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ-বিপ্লবে ব্রাহ্মণ্যসমাজবিন্যাসে কিংবা বর্ণাশ্রম রীতি এতটুকু বিঘ্নিত হয়নি। বৌদ্ধনৃপতিগণ বেদ-বিরোধী হলেও, আর্য্য সংস্কারের কোনদিন বিরোধিতা করেননি। সামাজিক ঐতিহ্যের স্রোতে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে তাঁরা জনমানসকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে দুঃসাহস প্রদর্শন করেন নি। বৌদ্ধাধিকারে আর্য্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কার তাই যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলোচ্যপ্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ" গ্রন্থে তিনি লিখেছেন বৌদ্ধপণ্ডিতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে ধর্ম ও সামাজিক মতামত লইয়া দ্বন্দ্ব কোলাহলের প্রমাণ কিছু কিছু আছে, কিন্তু বৌদ্ধরা পৃথক সমাজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। বৌদ্ধনৃপতিগণ আর্য্য সমাজের জীবন ও সমাজের, মূল ভিত্তিকে সহজে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রাজকার্য্য পরিচালনে তাঁরা ধর্মীয় ও সামাজিক, অনুশাসনগুলিকে সেইমত সাজিয়ে নিয়েছিলেন। বৌদ্ধ বলেই হোক কিম্বা সামাজিক কারণেই হোক, সে যুগের সামাজিক অনুশাসনে একটা ঔদার্য্য ছিল। বৌদ্ধ বাদীরা ব্রাহ্মণ্য সামাজিক আদর্শকেই একটা বৃহত্তর সমন্বিত ও সমীকৃত আদর্শের রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন।১ কিন্তু প্রচেষ্টার মূলে সক্রিয় মনোবৃত্তির যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলেই সেই রূপায়ন সার্থক হতে পারেনি। সমাজব্যবস্থায় আর ঐ ঔদার্য্য ও আদর্শের স্বীকৃতি থাকেনি, ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কার ও বর্ণপ্রথা একান্ত হয়ে ওঠে। রাজানুকূল্যে পুনরায় ব্রাহ্মণেরা সমাজের উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তারপর রাষ্ট্রেরই ইচ্ছায় এবং নির্দেশে তাঁদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃচ্ছকটিকের সমকালীন সমাজ আর্য্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ঘটনাচাঞ্চল্যে আন্দোলিত। এই সংস্কার ও সংস্কৃতির মধ্যেই ভারত ঐতিহ্যের সকল মর্মবাণী নিহিত।

ভাষার দিক হ'তে বিচার করলে মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব সহজেই ধরা পড়ে। বৌদ্ধযুগে প্রাচীনভাষা ও ভাবের ক্ষেত্রে একটা বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ধর্মে নানা জাতির সমন্বয়ের ফলে ভাষা সংস্কারের এক প্রবল প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করে। এ সকলের মূলে ছিল, ধর্মীয় চেতনা। এই ধর্মীয় চেতনাই মানুষকে ভাষার অনিয়ম ও অসংগতি দূরীকরণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সংরক্ষণ শীল সংস্কৃতভাষার

উপভাষাগত বিভেদ ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ধর্মীয় শাসনে আবদ্ধ এবং সংরক্ষিত সংস্কৃত ভাষা অতঃপর সাধারণ্যে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে সমতালে অগ্রসর হতে পারেনি।২ নানা কারণে এই ভাষা তৎকালীন সমাজে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ভাষার বিরতি মূলে ছিল আঞ্চলিকতা, শ্রেণীগত বৈষম্য এবং নানা অনভিজাত ভাষার পৌনঃপুনিক অনুপ্রবেশ। এসমস্ত কারণেই সংস্কৃত ভাষার একাধিপত্য বেশীদিন অক্ষুণ্ণ থাকেনি। অবশেষে রাজমর্য্যাদা হারিয়ে এই ভাষা একদিন লোকচক্ষু হতে অন্তর্হিত হয়েছিল।৩

স্বয়ং বুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার বিরোধিতা করেছিলেন(৪), তার প্রমাণ, বুদ্ধবাক্য ও ত্রিপিটক সংস্কৃত ভাষায় রচিত না হয়ে পালি ভাষায় রচিত হয়েছিল। সম্রাট অশোকও সংরক্ষণশীল সাধু সংস্কৃতের প্রাধান্য স্বীকার করেননি। ধর্মনীতি প্রচারে তিনি সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে পালি ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন।৫ সৌর-সেনী, মাগধী ইত্যাদি কয়েকটি কথ্য ভাষার সমন্বয়ে যে একটি সাহিত্য-ভাষা গড়ে ওঠে, তাই পালি বলে প্রসিদ্ধ। প্রাকৃত ছিল সে যুগের কথ্য ভাষা। সংস্কৃতের সঙ্গে তার পার্থক্য বেশী নয়। কথ্য ভাষার মত প্রাকৃত ভাষারও স্থানবিশেষে ভিন্ন রূপ আছে। স্থানবিশেষে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন আর্য্যগ্রন্থগুলিতে এর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রাকৃতের স্বরূপ কোথাও বা সৌরসেনী, কোথাও বা মাগধী, আবার কোন ক্ষেত্রে অপভ্রংশ। মহাকবি কালিদাস তাঁর অভিজ্ঞান শকুন্তলা গ্রন্থে প্রিয়ংবদার সঙ্গে অনুসূয়ার কথোপকথনে (৪র্থ অঙ্ক) যে ভাষাটি ব্যবহার করেছেন, তার স্বরূপ সংস্কৃত নয়, প্রাকৃত। মৃচ্ছকটিকেও এরূপ দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নয়। নাট্যগ্রন্থের মুখ্য নায়িকা বসন্তসেনাকে অধিকাংশ সময় প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে লক্ষ্য করা যায়। আবার, অন্যান্য চরিত্রগুলির বাক্যসংলাপেও নাট্যকার বিভিন্ন ভাষার প্রয়োগ করেছেন। তবু একথা স্বীকার্য্য যে মৃচ্ছকটিকে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার যেন অধিক মাত্রায় পরিদৃষ্ট। তাই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের ভাষায়, মৃচ্ছকটিক যতটা সংস্কৃত নাটক, ততোধিক প্রাকৃত নাটক।

'মৃচ্ছকটিক' নাট্যগ্রন্থের রচয়িতা শূদ্রক নামে প্রসিদ্ধ। নাট্যকারের ব্যক্তি পরিচয় এবং আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে পণ্ডিতপ্রবর ভাসের উত্তরসূরী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।৬ অনেকের মতে, শূদ্রক ছিলেন তৎকালীন ভারতের কোন এক অঞ্চলের সম্রাট। নাটকের প্রস্তাবনায় তাঁকে রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর রাজত্বের সময় কাল, রাজ্যের সীমানা এবং রাজধানীর অবস্থান সম্পর্কে কোন সবিশেষ তথ্য আজও নির্নীত হয় নি, ঐতিহাসিক কল্হনের বিবরণ থেকে জানা যায় শূদ্রক ছিলেন সম্রাট বিক্রমাদিত্যেরই এক পূর্ব্ব পুরুষ, কিন্তু ঐতিহাসিকের এই মন্তব্যটিও দ্বিধান্বিত, কারণ সন তারিখের বৈষম্য ও ত্রুটি লক্ষ্য করে এরূপ মন্তব্যের সার্থকতা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।৭ জয়াসোয়ালের মতে, শূদ্রক তৃতীয় শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কনো-এর অভিমতও অনেকটা তাই। কেবল জেকবির মন্তব্যটি একটু ভিন্ন ধরনের। জয়াসোয়াল এবং কনোর মন্তব্যকে সোজাসুজি অনুসরণ না করে তিনি বলেছেন, শূদ্রক নামে ব্যক্তি পুরুষটি কোন মতেই চতুর্থ শতকের পূর্ব্বে আবির্ভূত হননি। জার্মানপণ্ডিত পিসলে মনে করেন, শূদ্রক বিরচিত 'মৃচ্ছকটিক' প্রকৃতপক্ষে শূদ্রকের রচনা নয়, পণ্ডিতপ্রবর দণ্ডিই গ্রন্থটির প্রকৃত রচনাকার। নাটকটি তিনি রচনা করে শূদ্রকের ঐতিহাসিক নামে চালিয়ে দিয়েছেন, আবার অনেকের ধারণা, ভাসের লেখা একটি নাটকের ওপর ভিত্তি করে 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটি রচিত। কোন অজ্ঞাতনামা কবিযশঃপ্রার্থী নাটকখানি রচনা করে রাজা শূদ্রকের রচনা বলে প্রচার করেছিলেন। কারুর মতে শূদ্রক নামে আদৌ কোন ব্যক্তি বা রাজা সে যুগে ছিল না। কোন এক কীর্ত্তিমান পুরুষ ঐ ছদ্মনামে 'মৃচ্ছকটিক' রচনা করেছিলেন, যাইহোক, গ্রন্থকারের ব্যক্তিপরিচয় সম্বন্ধে মন্তব্যের

শেষ নেই; কিন্তু সঠিক তথ্য বিচারে কোনটিই নিঃসংশয়িত নয়। এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ করা যায়, নাটকের প্রস্তাবনায় নাট্যকার সম্বন্ধে কতকগুলি উদ্ভট বর্ণনা আছে; যেমন তাঁহার গমন করীন্দ্রের ন্যায়; নয়ন চকোরপক্ষীর তুল্য, মুখ পূর্ণচন্দ্রের সমান এবং শরীর পরম সুন্দর ছিল এবং তিনি ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে প্রধান ও অমিতবলশালী ছিলেন। (প্রথমাঙ্ক-মৃচ্ছকটিকম॥ শ্রীঃ হরিদাস সিংহ সম্পাদিত) গ্রন্থের আর একস্থানে বলা হয়েছে; শূদ্রক ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, অঙ্কশাস্ত্র, নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যা' কৃষিবাণিজ্য বিদ্যা ও হস্তিশাস্ত্র জানিয়া মহেশ্বরের অনুগ্রহে তিমিররোগবিহীন নয়নযুগল লাভ করিয়া, পুত্রকে রাজা দেখিয়া, বিপুল আয়োজনে অশ্বমেধ যাগ করিয়া এবং একশত দশদিন আয়ু পাইয়া, পরে অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন (প্রথমাঙ্ক॥ ৭॥) এক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নাটকের সৌকুমার্য্য ও অসামান্য কলানৈপুণ্য যেভাবে প্রদর্শিত হয়েছে তার সঙ্গে প্রস্তাবনার কোন সামঞ্জস্য নেই। তবে প্রস্তাবনাটি আদৌ গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কয়েকজন পণ্ডিতদের ধারণা রাজা শূদ্রকের সমকালীন কোন কবি কিংবা তাঁর সভাকবি উক্ত প্রস্তাবনাটির রচয়িতা। রচনাটিও শূদ্রকের মৃত্যুর পর সম্পাদিত হয়েছিল।

মৃচ্ছকটিকের সূত্রধারে লিখিত আছে, শূদ্রক ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে প্রধান ও অমিতবলশালী ছিলেন, গ্রন্থকারের এরূপ অদ্ভুত পরিচয় পাঠকের মনে স্বভাবতই সন্দেহ সৃষ্টি করে। শূদ্রক নামে পরিচিত হলেও কর্ম জীবনে তিনি একজন অতি পরাক্রমশালী ক্ষিতিপাল। আচার-ব্যবহারে তাঁর শূদ্রত্বের কোন চিহ্ন নেই। সেখানে আছে অসামান্য বীরত্বের বহ্নিদীপ্ত প্রকাশ। স্বভাবে এই ব্যক্তিপুরুষটি একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ; বেদ ও বিভিন্ন কলাবিদ্যায় তাঁর প্রগাঢ় অধিকার। এই ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ যুদ্ধাভিলাষী রাজপুরুষটি আবার কবি-স্বভাবিত। কালজয়ী নাটকটি তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কিন্তু গ্রন্থকারের নামগ্রহণের ব্যাপারটি যেন পাঠকের কাছে নিতান্ত কষ্টকল্পিত। এক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় প্রবন্ধকার ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ধারণায়, শূদ্রক নামটি কল্পিত। আর্য্য গ্রন্থকারেরা বৈদিক সংস্কার বশে নিজেদের নাম প্রকাশে কখনও বড় একটা উৎসাহ প্রকাশ করতেন না। লৌকিক সমাজের চিত্র-চিত্রণে প্রবৃত্ত সেকালের গ্রন্থকারেরা নিজের নাম প্রকাশে প্রায়ই বিরত থাকতেন। সমাজের পরোপকার সাধন করতে পারলেই তাঁরা যেন কৃতার্থ হতেন।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, 'মৃচ্ছকটিক একটি বিশেষ যুগের সমাজদর্পণ। ঐযুগে সমগ্র দেশে হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির চূড়ান্ত বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নাট্যখানির উপাখ্যান ভাগে যে চিত্রগুলি বিধৃত হয়েছে, তা তৎকালীন সমাজ-জীবনের অখণ্ড প্রতিরূপ। তা ছাড়া শূদ্রকের আর একটি বড় পরিচয় আছে। তিনি একজন প্রখ্যাত সমাজদর্শী। সমকালীন সমাজের সামগ্রিক চেতনার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল; স্বকীয়তাও ছিল অতুল্য এবং পরিবেশ সচেতনতাও ছিল অসাধারণ। 'মৃচ্ছকটিক' রচনাটি সমাজদর্শীর প্রত্যক্ষ বিবরণ। শূদ্রকের নাম ভূমিকায় প্রত্যক্ষদর্শী নিজেকে সমাজের প্রতিভূ অর্থাৎ রাজা বলে চিহ্নিত করেছেন। সমাজের বৃহত্তম অংশ জুড়ে ছিল শূদ্র জাতি। সমাজে তাঁরা একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তৎকালীন যুগে খ্যাতি ও মর্য্যাদায় তাঁরা ব্রাহ্মণদের সমতুল্য না হলেও তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৌদ্ধ আমলে স্বকীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। শূদ্রক এই বৃহত্তম ক্ষুদ্র জাতির প্রতিরূপ হিসেবে ক্ষত্রিয়গুণে নিজেকে বিভূষিত করেছেন। পুরাণগুলিতে 'শূদ্র' শব্দের যে বৃহত্তম সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে তা থেকে ধারণা করা যায়; অব্রাহ্মণেরাই শূদ্ররূপে পরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত; "বাঙলার ইতিহাস" (প্রথম ভাগ) গ্রন্থে এই মর্শ্মে একটি উল্লেখ আছে, পুরাণে শূদ্র বলিতে শুধু চতুর্থ বর্ণকেই নির্দ্দেশ করা হয় নাই, অন্য তিন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও যাঁহারা অব্রাহ্মণ্য ও তান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁহাদেরও শূদ্র পর্য্যায়ে

গণ্য করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রভাব অনেক বেশী ছিল বলিয়াই সম্ভবত বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বাংলাদেশের সকল উল্লেখযোগ্য জাতগুলিকেই শূদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। শূদ্রক ক্ষত্রিয়গুণে সমন্বিত। বাংলাদেশে কোন কালেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুনির্দিষ্ট বর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি বলে মনে হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র নিয়ে যে চতুর্বর্ণ সমাজ, বাংলাদেশে তার কোন সময় প্রচলন ছিল না। এ-থেকে অনুমান করা যায়, ক্ষত্রিয়প্রধান শূদ্রক কোন সময় বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন না।

ব্রাহ্মণ্য সমাজের মাপকাঠি ছিল, ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও ধর্ম। সমসাময়িক কালে তাঁদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি নানাদিক হতে সুস্পষ্ট। ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক। বেদ-বিদ্যাবিদ এবং স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের ধর্ম ও ভাবাদর্শের প্রতি মহামতি শূদ্রক যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পরম পবিত্র চারিত্রিক আদর্শ তাঁকে গভীর জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই তাঁর চরিত্রে ব্রাহ্মণ-প্রীতি কিছু অস্বাভাবিক নয়। ক্ষত্রিয়গুণে তিনি যেমন অসম-সাহসী, বীরযোদ্ধা ; ব্রাহ্মণগুণে তেমনি আবার তিনি দ্বিজমুখ্যতম সুগভীর বেদবোদ্ধা ; অর্থাৎ তিনি যেন উভয় জাতির ঐতিহ্য ও আদর্শের সমন্বিত প্রতিরূপ। এ কারণেই মনে হয়, 'মৃচ্ছকটিক' রচয়িতা উভয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গুণ সমন্বিত এবং লোকসমাজের প্রতিভূস্বরূপ জনসাধারণের 'রাজা' বলে নিজের ব্যক্তিপরিচয় রেখে গেছেন। উভয় জাতি, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করেই যে গ্রন্থকারের নাম ও ব্যক্তিপরিচয় প্রদত্ত হয়েছে, এ ধারণা তাই নিতান্ত অমূলক নয়।

মৃচ্ছকটিকের উপাখ্যান দশটি অঙ্কে পরিসমাপ্ত। নাটকের বিষয়বস্তু একটি কল্যাণপরিণামী রোমান্টিক প্রণয়গাথা। উপাখ্যানভাগে চারুদত্তের অকৃত্রিম প্রেম যেন কামনার শতদল বিস্তার করে পূর্ণ প্রস্ফুটিত। নাট্যরঙ্গে বহুমুখী ঘটনার সমাবেশ থাকলেও তার রসবেদন তীব্রতা হারিয়ে ফেলেনি। নাট্যকার সহজ কথায় একটি হৃদয়স্পর্শী শিল্পরচনা করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর রচনাশৈলী ও ভাষার প্রকৃতি যুগানুক্রমে নবীন নাট্যকারগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে নবীন নাট্য রচনায়। লৌকিক প্রণয়গাথার প্রতি কবি-নাট্যকারের অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম। সেই সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতাও ছিল অপরিসীম। ফলে, তাঁর সেই সচেতনতা স্বাভাবিক পরিবেশ চিত্রণ এবং ঘটনা সংস্থাপনের মধ্য দিয়ে সফল নাট্যরূপ রচনা করতে সক্ষম হয়েছে। মোহমুক্ত বলেই কবি-নাট্যকারের শিল্পদৃষ্টি অতিশয় প্রখর। তাঁর বাস্তব দৃষ্টির যথাযথ্য ও চরিত্রায়নের পুঙ্খানুপুঙ্খতা বিস্ময়কর। তার চেয়ে বিস্ময়কর তাঁর রুচির শুচিতা ও প্রকাশের শালীনতা। নাটকের সংলাপ ও ঘটনা বিন্যাসেও শুচি ও শালীনতার পরিচয় অতি সুস্পষ্ট। সাধারণ শব্দচাতুর্যে নাট্যকার যে চিত্র সৃষ্টি করেছেন, তা যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবি-শক্তির অপেক্ষা রাখে। চিত্রাঙ্কনের জন্য যে আলঙ্কারিক কৌশলের প্রয়োজন, নাট্যকার তা অতি নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন। উৎপ্রেক্ষা, উপমা, ছন্দ ও শব্দবিন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁর কুশলতা তুলনা-রহিত। মনে হয়, নাট্যকার পরিণত মনের গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তাই তাঁর সৃষ্টিক্ষম নাট্যকৃতি সার্থকতা লাভ করেছে। উপকরণের মধ্যে বিশেষ কোন অভিনবত্ব না থাকলেও মৃচ্ছকটিক যেন শূদ্রকের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সাক্ষর আপন অঙ্গের সর্বত্র বহন করছে।

মৃচ্ছকটিক দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ভুক্ত। দৃশ্যকাব্যের প্রধান দুইটি ধর্ম, কাব্য ও দৃশ্যত্ব। দৃশ্যত্ব অর্থে, অভিনয়ত্ব। এই দৃশ্যত্ব শব্দটির জন্য সাধারণ নাটকের মত দৃশ্য কাব্যকেও পরমুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। যেহেতু দৃশ্যকাব্যও নাটকের পর্যায়ভুক্ত, রসনিষ্পত্তির জন্য এও অভিনয়ের অপেক্ষা রাখে। নাট্যমঞ্চে

অভিনীত না হলে, এর নাট্যরসটি ঠিক উপলব্ধি করা যায় না।

উজ্জয়িনীর চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রণয়সংঘাত ও মিলনের কাহিনী নিয়ে মৃচ্ছকটিকের গল্পাংশ রচিত। অনেকের বিচারণায়, ভাসের চারুদত্ত নাটক অবলম্বনে শূদ্রক এই নাটকটি রচনা করেছিলেন। ভাসের উক্ত নাটকের পটভূমি উজ্জয়িনী। এই উজ্জয়িনী নগরী তখন এক পতনোন্মুখ রাজত্বের রাজধানী। মৃচ্ছকটিক নাটকের পটভূমিও উজ্জয়িনী নগরী। তবে এ নাটকে বিধৃত নগরীর চিত্রগুলি যেন ভিন্ন স্বরূপতায় চিহ্নিত। ভাসের নাটকে বিধৃত চিত্রসমূহের সঙ্গে এগুলির তেমন একটা পারম্পরিক সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না; কিন্তু ভাষা ও উপমার দিকে এক আশ্চর্য্য রকমের ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

মৃচ্ছকটিকের নায়ক নায়িকাকে নিয়ে ঘটনা পরম্পরা। নানা বৈচিত্রময় ঘটনার সমাবেশ নাট্যবৃত্তে এমন সুনিপুণভাবে সম্পাদিত যে উভয় দর্শক এবং পাঠক চিত্তের উত্তেজনা ও কৌতূহলকে সজাগ করে রাখে। এরিষ্টটলের বিচারে নাটকের প্রাণশক্তি, ঘটনা সংহতি ও চিত্তাকর্ষক ঘটনার বিচিত্রতা। নাটকের বিশেষ ধর্মটি মৃচ্ছকটিকে সুপ্রযুক্ত, তাছাড়া গতিশীল ঘটনার প্রত্যক্ষতা সংঘাত বা দ্বন্দ্ব, শঠতা অপ্রত্যাশিত ঘটনার চমক, সংকট কৌতূহল ইত্যাদি নাটকীয়ত্ব সৃষ্টি মূলে সহায়ক হয়েছে। নাট্যের ঘটনাধারা আরম্ভ থেকে ক্রমপরম্পরা একখানি গাড়ী বিভ্রাটের মাধ্যমে বৃত্তাকারে গ্রথিত। এরই মধ্যে নাট্যকার মানব-জীবনের গতিশীল পরিণামমুখী রূপটিকে দেখিয়েছেন। অবশেষে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার মিলন ও পরিণয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি।

নাট্যকৃতির সংজ্ঞা বলতে, সুখ-দুঃখ সমন্বিত লোক-জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা দৃশ্য রীতিতে উপস্থা-পিত করা। সেগুলি উপস্থাপিত করা হয় অভিনয়ের মাধ্যমে; সেই কারণেই নাটক। নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত বলেছেন, 'অভিনয়োপেতো লোক বৃত্তানুকরণং নাট্যম।' লোকবৃত্ত অর্থে লোকজীবনের ঘটনা। পূর্ব্বে বলা হয়েছে, মৃচ্ছকটিক রোমান্স নিবিড় গাথা। নাটকের কাহিনী মূলে আছে লৌকিক প্রেমের নিবিড় স্পর্শ। কিন্তু নাট্যকারের শিল্পীমন কবি স্বভাবিত। লৌকিক প্রেমের ঘটনা চিত্রগুলি তাই প্রত্যক্ষ আবিলতা থেকে পরিস্রুত হয়ে কাব সমন্বিত হয়ে উঠেছে। নাট্যকৃতির সকল ধর্ম মৃচ্ছকটিকে বিদ্যমান। রচনায় যে উচ্চাঙ্গের কলানৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে, তা সংস্কৃত নাট্য ইতিহাসে অতি বিরল। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দিক হতে আলোচ্য নাটকটি অতুলনীয়। কালিদা-সের শকুন্তলা ও শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, এই দুটি নাটকের উপাখ্যান, নাট্যকৃতি এবং রচনাশৈলি ইত্যাদি বিচার করে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মন্তব্য করেছেন 'কাব্যাংশে শকুন্তলা অতুলনীয় হলেও, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দিক দিয়ে আমার মনে হয় মৃচ্ছকটিক শকুন্তলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নাটক।

আলোচ্য নাটকে বৌদ্ধাতিসত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। গ্রন্থে সন্নিবেশিত চিত্রগুলি বৌদ্ধসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করে। নগর বর্ণনায় কবি নাট্যকার যে চিত্ররূপ সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর শিল্পী-মনেরই পরিচায়ক।

নাট্যকাহিনীর ঘটনাস্থল উজ্জয়িনী নগরী। উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধশালী রূপ কবির রচনায় সুপরিস্ফুট। বৌদ্ধযুগে উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধি ও শিল্প-সুষমা এক মহা গৌরবের বস্তু ছিল। সৌধাদৃশ্য প্রাসাদ সমূহে পরিবৃত অনিন্দ্য শিল্প-সুষমায় পরিমণ্ডিত উজ্জয়িনী ছিল সে যুগে এক পরম আকর্ষণীয় মানব নিবাস।

বসন্তসেনার প্রাসাদতুল্য বাসভবনটি পুণ্যময় উজ্জয়িনীনগরীরএক অন্যতম শিল্প নিদর্শন। এই সৌধাদৃশ্য বাসভবনটির বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বসন্তসেনার নানা চারিত্রিক বৈশিষ্টের কথা প্রচার করেছেন। গণিকা বসন্তসেনা একদিকে যেমন ধনবতী, অন্যদিকে তেমনি অশেষ গুণসম্পন্না,—নানা শিল্প-কলায় পারদর্শিনী।

ক চরিত্র চিত্রণে, কি বর্ণনা রীতিতে রচনাটি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ লিপিতেও অনুরূপ একটি বিবরণ পাওয়া যায়। মৌর্যশাসন ও তৎকালীন জনসমাজ সম্বন্ধে তিনি যে তথ্যবহুল বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তার মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের প্রাসাদ সম্পর্কে বর্ণনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; কিন্তু তার এই বিশেষ বর্ণনা প্রসঙ্গে যে রীতি ও কৌশল প্রকাশিত হয়েছে, তার সুস্পষ্ট প্রভাব মৃচ্ছকটিকেও পরিলক্ষিত। ভারত-পর্যটক মেগাস্থিনিসের বিবরণলিপিতে উদ্ধৃত মৌর্যপ্রাসাদের চিত্ররূপ এবং বর্ণনালেখ্য সম্ভবত শূদ্রককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বসন্তসেনার প্রাসাদতুল্য বাসভবনটির চিত্র যেন মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদেরই এক অভিন্ন প্রতিরূপ।

আলোচ্য নাটকে শূন্যতাবাদ প্রচারিত হয়েছে। নান্দীর প্রথম শ্লোকটিতে বলা হয়েছে,—মহেশ্বরের অবস্থান মহাশ্মশানে। সেখানে তিনি ধ্যানিমগ্ন—আত্মসমাহিত। জগৎশূন্য—সংসার শূন্য।

নাটকের নায়ক চারুদত্ত দরিদ্র। তাঁর কাছে সংসারের সমুদয় বস্তু চির শূন্যতায় প্রতিভাত। নাটকের প্রস্তাবনায় উদ্ধৃত একটি গানে বলা হয়েছে,—সর্বং শূন্যং দারিদ্র্যস্য। নান্দীভাগে নিহিত শূন্যতার বীজমন্ত্রটি যেন প্রস্তাবনায় গানের আকারে সুরের লহর তুলেছে। সমগ্র নাটকটিতে গানের ঐ সুরস্পর্শ সঞ্চারিত। কিন্তু বিত্তহীন দুর্গত চারুদত্ত শূন্যতার প্রতীকরূপে চিহ্নিত হলেও লৌকিক জীবনে তিনি একটি জীবন্ত ব্যক্তি বিগ্রহ। তাঁর চরিত্রে মানবাত্মার একটি বলিষ্ঠ রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। একমাত্র গভীর জীবনের মাঝ দিয়েই মানুষ তার এই বলিষ্ঠ সত্তাটিকে আবিষ্কার করতে পারে। গভীর জীবনের মাঝে রয়েছে, মানবাত্মার সকল মহিমা,পবিত্রতা,সৌন্দর্য্য ও গৌরব। দার্শনিকেরা বলেন,—একটি পরম নীরবতার মাঝ দিয়ে গভীর জীবনে বা মানবাত্মার অন্তর্লোকে প্রবেশ করা সম্ভব। মাত্র [illegible] রীতিরই নামান্তর। বৌদ্ধধর্মে ব্যক্তিসত্তা স্বীকৃত নয়। 'আমি'র কোন আসল সত্তা নেই। সেখানে রয়েছে শূন্যতা বা অনস্তিত্ববাদ। মানুষ সেখানে একটা তত্ত্বময় অস্তিত্বের বিগ্রহ মাত্র হয়। চিত্তের সঙ্গে বিষয় সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সমস্ত ভেদাভেদ দূর করে তাকে (চিত্তকে) শূন্যবোধে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এই শূন্যতা বোধের সঙ্গে করুণার সংযোগ ঘটলেই চিত্ত-নির্বাণ লাভ হবে, অর্থাৎ মহাসুখের গভীরতায় বিলীন হয়। বৌদ্ধবাদের এই ধ্যানধারণা 'সর্বারিক' চারুদত্তের চরিত্রে অনেকাংশের প্রতিফলিত।

গণিকা হলেও বসন্তসেনার প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজে কম ছিল না। প্রাচীন ভারতে গণিকারা সম্মানীয়া ছিলেন। নাগরিক জীবনের সংগেও তাঁদের ঘনিষ্ট-সম্পর্ক ছিল। গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করলেও তাঁরা লোক-সমাজে ঘৃণ্য ছিলেন না। গণিকাবৃত্তি পরিহার করে তাঁরা আবার গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করতে পারতেন। বসন্তসেনা এবং চারুদত্তের প্রণয় ও পরিণয়ের ঘটনাটি তৎকালীন সমাজের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বৈদিক যুগেও গণিকাবৃত্তির প্রচলন ছিল। বৈদিক-সাহিত্যে দেখা যায় কলাকুশলা গণিকারা নানা বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা হয়ে 'সমন' উৎসবে নৃত্য করতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগেও গণিকাদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। অযোধ্যার রাজসভাতেও গণিকা—নর্ত্তকী ছিল বলে রামায়ণে উল্লেখ আছে। (৯) রামচন্দ্রের চিত্ত-বিনোদনের জন্য গণিকারা উপস্থিত থাকতেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে সন্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হলে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে নর্ত্তকীদের দ্বারা অভ্যর্থনা করেছিলেন। রাজসভায়, উৎসব-অনুষ্ঠানে শোভাযাত্রায় নৃত্যপটীয়সী গণিকারা অংশ গ্রহণ করতেন। ঐ সকল গণিকারা শুধু রূপসী ও নৃত্য সঙ্গীত কলাতেই কুশলী ছিলেন, তা নয়—উচ্চশিক্ষা মার্জিত রুচিসম্পন্না রমণী হিসেবেও সমাজে যথেষ্ট মর্য্যাদা অর্জন করতেন। রাজনটীরা রাজগণিকা বলে পরিচিতা ছিলেন। রাজসভার অপরিহার্য্য অঙ্গ

ছিলেন তাঁরা। রাজমাতার সমাজে তাঁদের প্রভাবও ছিল অপরিসীম। রূপ-যৌবন ও শিল্পকলার সাহায্যে তাঁরা জীবিকা অর্জন করতেন বলে তাঁদের বলা হত রূপজীবা। বৌদ্ধযুগে এমনি কয়েকজন সুরূপা, সুশিক্ষিতা, চৌষট্টিকলা রসিকা গণিকার পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে রূপবতী, সুন্দরী, অম্বাপালী, পদ্মাবতী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

বৈশালীর অম্বপালী বৌদ্ধযুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিকা। সে যুগের শ্রেষ্ঠ নৃপতি, সমাজশ্রেষ্ঠ এবং ধন বিলাসীরা সকলেই ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ ও প্রণয়াকাঙ্খী। মগধের রাজা বিম্বিসার এক সময়ে অম্বাপালীর রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাথে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। ফলে, অম্বপালীর একটি পুত্র সন্তান হয়, ঐ পুত্রের নাম অভয়। উত্তরকালে অভয়ের প্রচেষ্টায় অম্বপালী ভগবান বুদ্ধের করুণাকণা লাভ করেছিলেন। বৌদ্ধজগতে আজও প্রব্রজ্যা অম্বপালী পরম পূজ্যা।...উজ্জয়িনী রাজসভার রূপবতী গণিকা পদ্মাবতীর কাহিনীও অনুরূপ। বুদ্ধের কল্যাণস্পর্শে তিনিও পতিতা-জীবন পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা হয়েছিলেন। যাইহোক, অম্বপালীর চরিত্র প্রতি-মাটির সঙ্গে বসন্তসেনার অন্তর্বিত্তর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়ই রূপবতী নৃত্য-গীত কলানিপুণা সম্রান্ত গণিকা। তাঁদের চরিত্রগত অসাম্যের মধ্যে শুধু,—অম্বপালী পরিণত জীবনে আধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন,—বসন্তসেনা প্রেম ও সুন্দরের পূজারিণী হয়ে গার্হস্থ্যজীবনে দেহময় আধারকে আঁকড়ে ধরেছিলেন; দেহজ কামনা-বাসনাকে আঁকড়ে ধরে কল্যাণের আরতি-প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন।

মৃচ্ছকটিকে লৌকিকসমাজের যে অখণ্ড চিত্রসমূহ বিধৃত হয়েছে, সেগুলি জীবন রসিক কাব্য পাঠক ঐতিহাসিকদের কাছে মূল্যবান সামগ্রী। দৃশ্যকাব্যে কেবল রাজা উজিরের কথাই নেই, আছে সেকালের ছোট বড় সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা ও দৈনন্দিন আচার-আচরণের সহজ সুন্দর বর্ণনা। সেকালের সাধারণ লোকের জীবন ও জীবিকা, শ্রম ও বিশ্রাম ক্রিয়া-কর্ম উৎসব অনুষ্ঠান, অপরাধ ও বিচারপদ্ধতি ইত্যাদি বহু বিষয়ের শুদ্ধ শিল্পসম্মত বিবরণ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

মৃচ্ছকটিকের যুগে দাসত্ব প্রথার প্রচলন ছিল। গ্রন্থে দেখা যায়, দ্যূতকর ও মাথুরের হাত থেকে সংবাহক এবং বসন্তসেনার হাত থেকে মদনিকা দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করেছে। সমাজে ব্রাহ্মণদের খ্যাতি ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। গর্হিত অপরাধ করলেও তাদের প্রাণদণ্ড হত না। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে একটা গুপ্ত বিরোধ এবং অবিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। বর্ণভেদ প্রথার প্রাবল্যে সমাজে নানা ধরণের বর্ণগত বিধি-নিষেধ দেখা দিয়েছিল। প্রতিটি বর্ণের মধ্যে যে একটা বিভেদের প্রাচীর গড়ে উঠেছিল, তা বীরক ও চন্দনের গালাগালির দৃশ্যটি অবলোকন করলেই বুঝা যায়। জাতিভেদ প্রথাও ব্রাহ্মণ সমাজে পুরোমাত্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। সামাজিক-জীবনে এ প্রথা যদিও জাতির জীবনে দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপ, তবু ঐ কলঙ্ক দূরীকরণে কোনরূপ সার্থক প্রচেষ্টা তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজে পরিদৃষ্ট হয়নি।

সমাজে ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ছিল। বণিকের ধনসম্পদ সকলের কাছে এক মহা আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। সম্রান্ত ধনীরা অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ছিলেন। বিলাস-ব্যসনে তাঁরা প্রভূত ব্যয় করতেন। ধনীদের গৃহে সোনার ভাঁড়ার কম ছিল না। সোনার খেলনা গড়িয়ে তাঁরা পুত্রদের মনোরঞ্জন করতেন। সেকালের রমণীসমাজ নিজেদের দেহ স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত করতেন।

সোনা-চোরের উপদ্রব সমাজে কম ছিল না। চোর শার্বিলকের উক্তি হতে জানা যায়, ব্রাহ্মণের সোনা কিংবা যজ্ঞের রক্ষিত সোনা অপহরণ করতে সাহস পেতনা; কারণ ঐ ধরণের অপহরণ সমাজের চোখে অপরাধ এবং শাস্ত্রবিগর্হিত বলে বিবেচিত হত।

রাজা ছিল রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা। মন্ত্রীদের সাহায্যে তিনি শাসন কার্য্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু

রাজসভার চরিত্র ভাল ছিল না। দেহগত বিলাস, ধর্মাচারণে ভেদবুদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত দুর্নীতির বেড়াজালে সমাজজীবন ভারগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল। প্রজাদের প্রতি রাজার অত্যাচার ও পীড়নের ভূমিকা দেখলে মনে হয়, তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাচারী শাসক। গ্রন্থের একটি অঙ্কে দেখা যায়, রাজার বিরুদ্ধে অত্যাচারিত প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

বিচার ব্যাপারে রাজার বিধান সকলকে মেনে নিতে হত। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। দোষ সাব্যস্ত হলে দোষীকে নিজের দোষ স্বীকার করে নিতে হত।

অনেক সময় প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিয়েও দোষী মুক্তি লাভ করত। অনেক সময় আবার হঠাৎ কোন রাষ্ট্রবিপর্যয়ের ঘটনা ঘটলে দোষীরা মুক্তি পেত। চারুদত্তের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। রাষ্ট্রবিপর্যয়ের কারণেই তাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব হয়েছে।

রাজকর্মচারীরা নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা সবসময়ে সচেতন থাকতেন। তাঁদের মধ্যে কোনরূপ শঠতা, লোভ এবং ভীরুতা ছিল না। বীরক ও চন্দনের চরিত্রে উপরোক্ত গুণাগুণগুলি সুপরিস্ফুট।

মৃচ্ছকটিকে লৌকিকসমাজ ও জীবন সম্পর্কে চিত্রগুলি সত্য ও তথ্যের সারসংকলন মাত্র। নাট্যকার সমাজ ও জীবন সম্পর্কিত হৃদয়ের উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন সহজ ও অনাড়ম্বর ভাষায় এবং একটি বিশেষ বাণী ভঙ্গিতে। সাহিত্য স্বরূপটি এখানে লৌকিক। নাট্যকার যেহেতু লৌকিক জগতের মানুষ মানবজীবনের আনন্দ বেদনার উপলব্ধিকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। ফলে, মানুষের সমাজ তাঁর রচনায় কোন সময় উপেক্ষণীয় নয়; বরং সাহিত্যের অন্যতম উপাদান হিসাবে গৃহীত। সমাজ ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্কটি তাঁর রচনায় যেন একটি গভীর সূত্রে আবদ্ধ, আর এরই পটভূমিকায় গ্রন্থকার সাহিত্যের রসানুভূতির স্পন্দনটিকে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন।

জীবন ও চতুষ্পার্শের দৃশ্যমান লৌকিক-জগতের সংগে যে সাহিত্য অধিকমাত্রায় জড়িত, সেই সাহিত্যের আকর্ষণ আর আবেদন তত গভীর। সাহিত্য-বিচারে মৃচ্ছকটিক তাই একটি কালজয়ী রচনা এবং গ্রন্থের রচনাকারও একজন ব্যক্তি পুরুষ।

১। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

২। ভাষাতাত্ত্বিক পানিনি : পরেশচন্দ্র মজুমদার।

৩ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস : ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

৪। "আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিওনা, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যে মত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা প্রশ্নাদিতে ব্যবহার করিবে।" (দীনেশচন্দ্র সেনের' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত পৃঃ ১৩)

৫। King Ashoke used, not in Sanskrit but dialects similar to Pali, Buddha too as early as the sixth and fifth centuries B.C. preached not in Sanskrit but in popular language Indian Literature [Epics & Purans] vol. II By M. Winternitz.

৬। "He is certainly later than Bhasa" : A short History of Sanskrit Literature H.R. Agarwall and Dr. Lakshman.

৭। According to Kalhana, he is a predecessor of Vikramaditya, but the latter's identitication with the founder of the Vikrama era connot be claimed with certainty. (A short History of Sanskrit Literature)

৮। বৌদ্ধধর্ম ও চর্য্যাগীতি : ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত।

৯। কাঞ্চন গণিকানানাং কুশলক ভূপ্যাম : বাল্মীক রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড)

উপন্যাস

জন্ম-জন্মান্তর

রামপদ মুখোপাধ্যায়

ছেলে বৌ আর নাতনীদের দেখে মা আহ্লাদ করলেন—রমার মনে হল শাশুড়ী খুসী হন নি। উনি হাসলেন আশীর্ব্বাদ করলেন—মন ভরল না। কেমন ভাসা ভাসা, প্রাণহীন শুকনো শিষ্টাচারের মত লাগল। অনেক দিন পরে এসেছে বউ—অথচ তার ভাগ্যে আলাদা একখানা ঘর বন্দোবস্ত করতে পারলেন না। বললেন, আমার ঘরেই জিনিস পত্তর তোল বউমা। তোমার ছোট দেওর আবার একলা না থাকলে ঘুমুতে পারে না। দক্ষিণের ঘরটা নিয়েছেন মেজ বৌমা। দু'চার দিন বৈত না কোন রকমে কেটে যাবে।

রমা ক্ষুণ্ণ হল। শাশুড়ী ওঁর দুই ছেলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই ভাবছেন সে যে বাড়ীর বড় বউ তারও কষ্ট সুবিধা আছে এটি ভুলে গেছেন। এই বাড়ীতে তারও ন্যায্য অংশ রয়েছে—উনিও বাড়ীর জন্যে যথেষ্ট টাকা দিয়েছেন সেটা মনেই আনছেন না।

কিন্তু এই সব তুচ্ছ চিন্তা কখনোই অবাঞ্ছিত ও প্রবল হয়ে উঠতো না যদি ব্যবহারে উনি সামঞ্জস্য আনতে পারতেন। দুদিনের অতিথি বলে তার মেয়েদের দিকে একটু বেশি মনোযোগ দিলে কি ক্ষতি হতো। ওরা কি ওঁর আপন নাতনী নয়? ছেলেকেও আদর যত্ন করলেন কই।

আমি না হয় পরের মেয়ে রক্তের টান নেই, কিন্তু প্রথম সন্তানের উপর এই রকম উপেক্ষা।

দুদিনেই অতিষ্ট হয়ে উঠল রমা। মহেশকে বলল, চল কালই আমরা লক্ষ্ণৌ যাই।

কাল, আরোও পাঁচদিন ছুটি রয়েছে—

রমা মুখ ভার করে বলল, রক্ষে কর—। গঙ্গা স্নান হল—ওঁদেরও দেখলাম, আর কি কাজ।

মহেশ অজ্ঞ নয়, রমার কথার সুর ধরতে পারল, কোথায় আঘাত কতখানি বেদনা দু'টি দিনেই সে জেনেছে; তারও মন চাইছিল না পরম আত্মীয়ের মাঝখানে নিঃসম্পর্কীয়ের মত বাস করতে এই দুটি দিনেই সংসারের ছদ্ম আবরণটুকু খসে পড়েছে, জুড়োবার বদলে জ্বালাই জমছে মনে, রমার শ্লেষ বাক্য আরও জ্বালা ধরাল—। কোন কথা না বলে সোজা বার হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় অপূর্ব গঙ্গার ঘাট। কথকতা কীর্ত্তনের আসর ভেঙ্গে গেছে জোয়ারের জলের মত বেরিয়ে গেছে ভ্রমণ বিলাসীর দল। এখন এখানে ওখানে দলছুট আধা বৈরাগী মন ধ্যান জপ ইষ্ট আরাধনায় মগ্ন। মাঝিরা নাওয়ে যাবার জন্য কচিৎ কখনও হাঁক দিচ্ছে—কোন পণ্ডিত তাঁর সমধর্মীর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছেন, সমবয়সী বন্ধুরা মিলে রাজনীতি বা রোমান্স গীতি নিয়ে তর্ক তুলছে কোন বর্ষীয়সী আউড়ে যাচ্ছে মহিম্ন স্তোত্র অথবা দেবদেবীর বন্দনা; সমস্ত প‍‌ৰ্বটাই অনুচ্চ কণ্ঠের আলাপে নিবদ্ধ। উঁচু একটা চৌতারার উপরে এসে বসল মহেশ। তার সামনে গঙ্গা ওপারে ধূ ধূ বালুচরের বিস্তার—মাথার উপরে তারার চুমকি বসানো উপুড় করা আকাশ। চারিদিক ধূসর হয়ে উঠছে—পাতলা অন্ধকারে, নদীর স্রোতে ভেসে চলেছে কয়েকটি দীপ—এইমাত্র ভাসিয়ে দিয়েছে পুণ্যার্থীরা। অলস তরঙ্গে ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে প্রদীপগুলি। কোনটা সামান্য পথ আসতে না আসতে নিভে যাচ্ছে, কোনটার শিখা কাত হয়ে নিভু নিভু হয়েছে—কোনটা আলোর নিশানা টেনে অনেক দূরের নদীকে স্পষ্ট করছে—, কোনটা মিলিত হচ্ছে অন্যের সঙ্গে কোনটা বা বিছিন্ন হচ্ছে। হুবহু বাস্তব

জীবনের ছবি তরঙ্গ ও দীপের মেলায় স্পষ্টতর হচ্ছে। জপ করবে বলে চৌতারায় এসে বসেছিল মহেশ—জপ ভুলে এক মনে দীপ জ্বলা দীপ নেভা আলো আঁধারের মিলন বিচ্ছেদের খেলা দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে মনে হল সেই দুটি ছত্র:

অৰ্দ্ধ নিশীতে নিভৃতে নীরবে
এই দীপখানি নিভে যাবে যবে,
বুঝিব কি কেন এসেছিনু ভবে
কেন জ্বলিলাম প্রাণে ?

হাঁ, তার পরেও বারো বছর ধরে স্রোত বইল একটানা। সাধারণ জীবন—চাকরী জীবীর জীবন—বৈচিত্র্যের বড় অভাব। তবু নিত্য দিনের সুখঃদুঃখের পসরা সাজানো জীবন নীরস নয় বর্ণস্বাদহীন নয়। সাধারণ জীবনের কল্পনার প্রসার কম হলেও স্বল্প সীমায় মাধুর্য্যের অভাব নাই। সাচ্ছল্য নয়-কৃচ্ছ্রতাও নয়-যেমন বেশির ভাগ মানুষ পথ চলে—তেমনি করেই কেটে গেল বারো বছর।

কাশী থেকে কেউ আসেনি—কচিৎ কখনো দুই একখানা পত্র আসত। এলাহাবাদের সম্বন্ধটার আরও দুই একটি গ্রন্থি অবশ্য পড়েছে। ছোট শ্যালকটি প্রায় আসা যাওয়া করে -শাশুড়ি এসেছেন কয়েক বার। অতীতের তিক্তস্মৃতি অনেকখানি ঝাপসা হয়েছে কিন্তু সংসার সম্বন্ধে মহেশ এখনও কঠিন সমালোচক। বাঁকা চোখে দেখার অভ্যাস ছিল না; এখন মানুষ যাচাই এর প্রয়োজন না হলেও দৃষ্টিটা তেরছা ভাবেই পড়ে। বিশ্বাসের ঘরে পুঁজি কম , নিজেকে সর্বদাই দেউলে মনে হয়। মানুষটাকে যদি বিশ্বাস করতে না পারলাম ভগবানকে কার মাধ্যমে ধরব। বহুরূপে যারা সামনে আসে তারা বহু পথের ছক কেটে কেটে আসল পথটিকে করে গোলক ধাঁধা। আসলকে খুঁজে মেলা ভার।

একবার শাশুড়ী একটা প্রস্তাব দিলেন: ছেলেদের আখের ভাবছ কি বাবা—যাহোক করে মাথা গুঁজবার একটা ঠাঁই করে নাও—না হলে আমাদের মতই অকূল পাথারে পড়বে।

এই উপার্জনে ও আশা করি না।

কেন করবে না ? সবাই তো করছে। একবারে না হোক—ক্রমে ক্রমে হবে। ছোটকুরা জমি কিনছে—মাসে মাসে কিস্তিতে টাকা দেবে তুমিও খানিকটা জমি নাও। এক সঙ্গেই থাকব আমরা।

ভেবে দেখি।

কয়েকদিন পরে রমা বলল, মা সেদিন যা বলছিলেন জমি কেনার কথা কি ঠিক করলে ?

মহেশ বলল, ভেবে দেখলাম এখন থাক ওখানে সুবিধা হবে না।

কেন ? অসুবিধা কি ?

কথায় আছে হাঁড়ি কলসী কাছাকাছি থাকলে ঠোকা-ঠুকি হয়। ঈষৎ হাসলো মহেশ।

ভ্রু-কুঁচকে রমা বলল, মানুষ বুঝি হাঁড়ি কলসী ?

দৃষ্টান্তটা একটুও বাড়ানো নয়। ভেবে দেখ বুঝতে পারবে।

রমা গম্ভীর হয়ে বলল, তা কাছাকাছি নাই বা হল—জমি খানিকটা নিয়ে ফেল। না হলে কোথায় ভেসে ভেসে বেড়াবে ওদের নিয়ে, ওদের পৈত্রিক ভিটেয় ওরা যে জায়গা পাবে না সে তো দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

মহেশ কথা বাড়াল না। রমার কথাটা অন্যায্য নয় বলে তর্ক তুলল না, শুধু বলল, আগে কিছু টাকার যোগাড় করি তারপর—

কেন আপিস থেকে ধার নাও—মাস মাইনেতে শো যাবে।

আপিসের বন্ধুরাও সেই পরামর্শ দিল। টাকা ধার নিয়ে জমি কিনে ফেল। এরপর জমির দাম অনেক চড়ে যাবে। তখন ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকবে না।

সকলের মিলিত ইচ্ছা শক্তিকে অস্বীকার করল মহেশ। এলাহাবাদেই জমি কেনা হল শ্বশুর বাড়ী থেকে খানিকটা দূরে। শাশুড়ী অসন্তুষ্ট হলেন, মন্দের ভাল বলে উচ্চ-বাচ্য করলেন না। মাঝে মাঝে মেয়েকে পরামর্শ দিতে লাগলেন, জমি কিনে ফেলে রাখিসনে মা দুখানা ঘর অন্তত তুলে নে, কথায় আছে ভাল কাজ

ফেলে রাখলেই বাগড়া পড়ে। রাবণ রাজা স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করব বলে ফেলে রেখেছিল—সে সিঁড়ি আর তৈরী হল না। তোরা বদলি নিয়ে এলাহাবাদে চলে আয়—নিজের সংসারে থিতু হ।

জমি কেনা যদি হল—বাড়ী করার সাধ কেন জাগবে না, সংসারী মনে ভোগের ছক-কাটা ছবিগুলো তো পর পর সাজানোই থাকে। একটু এদিক ওদিক হবার যো নাই। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিষয় বুদ্ধি—সামাজিক সম্মান আদায়ের সর্তগুলি নির্দ্বিধায় পূরণ করতে চায়। মহেশের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটলো না।

রমা বললো, তাহলে ট্রানসফার নিয়ে নাও।

মহেশ বলল, ট্রানসফার বললেই ট্রানসফার হয় না চেষ্টা করে দেখব।

তাহলে আমাদের পাঠিয়ে দাও ওখানে আমরা মিস্ত্রি খাটাতে পারব। চরণ ওখানেই রয়েছে—ওরও সাহায্য পাব।

স্থির হল :

এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এলাহাবাদে যাবে মহেশ, ওর বন্ধু রমেনের বাড়ীর কাছাকাছি দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে রমাদের সেখানে রাখবে। বন্ধুর ভরসাতেই আপাতত ওরা থাকবে। কারণ ওর শ্বশুড় বাড়ী থেকে জায়গাটা বেশ খানিকটা দূরে।

আপাতত এই ব্যবস্থা—পরে ট্রানসফার নিয়ে এসে বাড়ী তৈরী করাবে। ততদিনে আরও কিছু টাকা যোগাড় হয়ে যাবে।

* * *

হিসাবের খানিকটা মিললো, খানিকটা হল গরমিল। রমারা যথাকালে এলাহাবাদে এলো ছেলে মেয়েরা ভর্ত্তি হল ইস্কুলে—বন্ধুর সাহায্যও পাওয়া গেল ষোল আনা। কিন্তু ট্রানস্ফার নেওয়া হল না অত তাড়াতাড়ি। হঠাৎ ওর জানা অফিসারটি প্রমোশন নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন, নতুন যিনি এলেন—তিনি চার্জ বুঝে নিয়েও সহসা কিছু অদল বদল করতে চাইলেন না সামনে বাজেট তৈরীর হাঙ্গামা আছে—মার্চের মধ্যেই সেটা শেষ করতে হবে। নতুন মনিব নিজের সুনাম বজায় রাখতে কোন ঝুঁকিই নিলেন না। বললেন, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ভটচায মশায়, আমাকে ভাল করে সব বুঝে নিতে দিন, সময় হলে আপনাকে কিছু বলতে হবে না—আমি নিজেই ব্যবস্থা করব। বাড়ী তৈরী করাবেন, উত্তম কথা, কো-অপারেটিভ কিংবা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে যতটা ড্র করতে পারেন বেকমেণ্ড করে দিচ্ছি। আপনার স্ত্রী তো অকুস্থলে রয়েছেন উনি নিশ্চয় দেখা শোনা করতে পারবেন। যদি বলেন পারবেন না—তাহলে বলব মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও সেই মধ্যযুগের। যেমন ঘর গুছোনোর কাজ তেমনি ঘর তৈরীর কাজ...ওঁদের তুলনা নেই।

শুধু কথায় চিড়া না ভিজুক কিছু সাহায্য করলেন উনি। কিছু বেশি টাকা ফাণ্ড থেকে তুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও হিসাবের গরমিল হল। গরমিল করল দৈব।

মহেশরা তিনপুরুষে উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা হলেও বাংলা দেশে ওদের বংশ তালিকার ভিত পত্তন। মেদিনীপুর জেলার এক দূর পল্লী থেকে মহেশের ঠাকুরদা বংশীধর ভট্টাচার্য্য কাশীতে এসেছিলেন বেদান্ত পড়তে। দেশে তাঁদের জন্মভিটায় সেকালের প্রথানুযায়ী ছোট মত একটা টোল তখনও টিম টিম করছিল। সেইকালে নব্যবঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার ঢেউ রীতিমত ঢেউ তুলেছিল; ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যারা চাকরী নিয়ে শহরবাসী হয়েছিল তাদের সম্মানই ছিল আলাদা। লাট-বেলাটের দরবারে তাদের যাতায়াত এবং প্রভূত অর্থ উপার্জনের কাহিনী কিংবদন্তীর পর্য্যায়ে ওঠাতে সাধারণ মানুষ ঝুঁকেছিল ওই দিকে। যেমন তেমন চাকরী দুধভাত এই ছিল প্রবাদবাক্য। এই কারণে দেখতে দেখতে একটু উঁচুদরের গ্রামে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় খুলে গেল কয়েকটি—আর তারই দাপটে টোলের চালাঘর ধরাশায়ী হবার উপক্রম, টোলগুলির অবস্থা ক্রমশঃই দুর্বল হতে

লাগল—বেশির ভাগ উঠেই গেল। বাড়ের সবেত পেয়ে বংশীধর কাশীতে এসেছিলেন—বিস্তার ভিৎপত্তনটি পাকা করে নিতে। তখনও নাকি ওই প্রদেশে শাস্ত্রচর্চা ও দেব ভাষার মর্য্যাদা ছিল। বিবেকানন্দ বলেছিলেন বার্দ্ধক্যের বারানসী বংশীধর দেখলেন যৌবনেও সে স্থান কম লোভনীয় নয়। সেকালে জীবন যাপনের মান সর্বত্রই ছিল সুলভ—বারানসী তারও উপরে স্বর্ণযুগের গৌরবে গরীয়ান এটি একাধারে মুক্তি এবং ভোগের ক্ষেত্রও বটে। এখানে পরিচিত আত্মীয় স্বজন না থাকলেও অপরিচয়ের অন্ধকার সূচীভেদ্য নয়; দশাশ্বমেধ ঘাট যেন প্রভাত কালের পূর্ব দিগন্ত। অপরিচয়ের অন্ধকার এখানে দীর্ঘকাল জমে থাকে না। ধর্মাচরণের সূত্র ধরে মানুষ এখানে মানুষের আত্মীয় হয়ে ওঠে তাড়াতাড়ি।

সামান্য দিনের মধ্যেই মেদিনীপুরের ভট্টাচার্য্য সজ্জনমান্য ব্যক্তিতে উত্তীর্ণ হলেন। কাশী ছেড়ে তাঁর আর দেশে ফেরা হল না।

দ্বিতীয় পুরুষ মহেন্দ্রের তো এই দেশেই জন্ম। শৈশব থেকে শেষ বয়স পর্য্যন্ত কাশীতেই রয়ে গেলেন, দেশে অল্প কয়েকবারই গিয়েছিলেন সেটা প্রবাসযাত্রারই সামিল। আত্মীয় বাড়ীর আদর আপ্যায়ন খেয়ে—বাংলার নামকরা কিছু খাদ্য সামগ্রী যেমন খেজুর গুড়ের পাটালি, নারিকেল কিংবা ওই জাতীয় কিছু আনাজপাতি বা মিষ্টান্ন যা কাশীতে দুষ্প্রাপ্য পুঁটুলিতে বেঁধে এনে দেশের স্মৃতি চারনার সুযোগ লাভ করতেন। তাছাড়া বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার টানে ওঁর আত্মীয় স্বজনরা এধারে প্রায়ই আসতেন। এসে উঠতেন মহেন্দ্রের বাড়ীতে। অন্যত্র উঠলেও তাঁদের সঙ্গে দেখা হবামাত্র মহেন্দ্র নিজের আলয়ে টেনে আনতেন। আত্মীয়তার বন্ধনের চেয়েও বড় বন্ধন ছিল স্বদেশের বন্ধন। মমত্ব বন্ধন। এই বিষয়ে মহেন্দ্র ছিলেন অতিশয় অনুভূতি প্রবন। দেশের জ্ঞাতি যত কাছের—দূরেরও ততখানি। অনুরাগে বিরাগে তুল্য মূল্য। সেটা অবশ্য দেশের মাটিতে পাশাপাশি দাঁড়ালে মর্মে মর্মে বোঝা যায়। কিন্তু দূরপ্রবাসে দেশ অনুরাগের তেল-সলিতা ভরা মাটির প্রদীপ। তার স্নিগ্ধ আলো সর্ব অবস্থায় প্রাণ জুড়ানো আনন্দ।

মহেন্দ্রের আগ্রহে আত্মীয়তার উত্তাপে আত্মীয়রা কোনদিন অনাত্মীয় হননি।

বাপের কাছে ছেলেবেলায় দেশের গল্প অনেক শুনেছিল মহেশ—তাদের কাশীর বাড়ীতে দেখেছিলও অনেককে। তাদের দেওয়া খাবার পোশাক খেলনা আদর, দেশকে জীবনে না দেখেও, দেশের সঙ্গে স্নেহ বন্ধনটি অটুট ও ঘনিষ্ঠ করে দিয়েছিল। দেশের মানুষকে পেলে মহেশও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো, কেমন করে তাদের অভ্যর্থনা করবে—স্বাচ্ছন্দ্য দেবে—খুসী করবে ভেবে পেতো না।

এখন এই ভাবপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে দৈব ছলনা করল মহেশকে।

—আগের দিন কাণ্ড থেকে টাকা তোলা হয়েছে। আগামীকাল সেই টাকা নিয়ে যাবে এলাহাবাদে। চিঠি এসেছে আগামী পরশ শুভদিন আছে। ঐদিন নতুন ভিটেয় বাস্তুপূজার ব্যবস্থা হবে। কর্মমাঙ্গিক কয়েকটি জিনিস সংগ্রহও করে এনেছে মহেশ, আরও কিছু সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বাসার বাহিরে এসেছে—একখানা টাঙ্গা এসে থামল ওর সামনে।

টাঙ্গার সামনে বসা লোকটি ওকে দেখে চীৎকার করে উঠলো না—মহেশ না।

মহেশ ফিরে দাঁড়াল মন্টিদা।

হাঁ হরিদ্বার থেকে আসছি। আসবার সময় কাশীতে নেমে ছিলাম। তোদের বাড়ীতেও একদিন গিয়েছিলাম—খুড়িমা বললেন—তোরা লক্ষৌতে। তাঁর কাছ থেকেই ঠিকানা নিয়ে…তা ভাল আছিস তো?

এস—বলছি।

তালা খুলে মালপত্র সমেত মানুষগুলিকে বাসায় তুলল মহেশ।

বৌদিকে প্রণাম করে বলল, ওরা এখানে নেই—আপনাকেই কিন্তু সব দেখেশুনে নিতে হবে।

বৌদি বললেন, কুটুম বাড়িতে এসেছি নাকি ঠাকুরপো—তাই এমন করে বলছ। বললেও থাকব, না বললেও থাকব।

তা ওঁরা কয়েকদিন থেকেই গেলেন। ওঁরা থাকতে চাইছিলেন না—দু'সপ্তাহ দেশ ছাড়া—, ঘরবাড়ী আগলাবার ভার একজন প্রতিবেশীর উপর দিয়ে এসেছেন—বেশি দেরি হলে ক্ষতি অপচয় হবার ভয় আছে।

বউদি বললেন, তা ছাড়া তোমারও তো একটা শুভকাজ রয়েছে বললে—

মহেশ বলল, পাঁজীতে শুভকাজের দিন ওই একটিই নয়, কিন্তু এই দূর বিদেশে আপনাদের কতদুগ পরে পেলাম বলুন তো? অন্তত তিনটি দিন তো ছাড়ছি নে। এখানে অনেক দেখবার জিনিস আছে। ইমামবাড়া, জু, বেলিগার্ড, নবাববাড়ী, ছত্রমঞ্জিল... ..

ছেলেমেয়েরা কলরব করে উঠলো—দাদা বৌদিদির আপত্তি টিকলো না।

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে গেলেন ওঁরা। যাবার আগে বৌদি বললেন, ঠাকুরপো যা আদর যত্ন পেলাম চিরজীবন মনে থাকবে। একটা কথা আমার রাখবে বল? জন্মে তো দেশ দেখলে না—একবার যাবে বল? একা নয়—সবাইকে নিয়ে যাবে—আর মাসখানেক থাকবে?

অতদিন। হাসল মহেশ।

ভারি তো একমাস। না—না—কোন কথা শুনবো না। আমাকে ছুঁয়ে বল যাবে? তোমার ঠাকুরের সামনে সত্য করে বল ভুলবে না আমার কথা—দেশে যাবে?

মহেশ বলল, ভারি মুশকিলে ফেললেন বৌদি—দেখছেন তো পরের চাকরি করছি নিজের ইচ্ছেয় কিছুই করতে পারি না।

আহা—আমি যেন জানি নে—যারা চাকরি করে তারা ছুটি পায় না। এ যেন আমাদের সংসারের চাকরি। ওসব ছেঁদো কথায় ভুলছিনে—বল যাবে? না গেলে সত্যি বলছি—আর আসব না খোঁজ করব না।

মহেশ বলল, বেশ যাব।

বৌদি চেপে ধরলেন, ও রকম ঠেলামারা জবাব চাইনে। বল যাবে? আসচে মাসে—

মহেশ বলল, যাব—তবে আসচে মাসে হবে না। যাব।

কবে? পুজোর সময়ে? তাও না? বেশ না হয় এক বছরের মধ্যে, কেমন ঠিক তো? তোমার ঠাকুরসাক্ষী রইলেন—আমরা দিন গুনবো আজ থেকে।

মহেশ হেসে ফেলল, দোহাই বৌদি—আজ থেকে ওই কাজটি করবেন না। অন্ততঃ দেশে পৌঁছে মাস কাবার হওয়ার পর থেকে দিন গুণতে থাকবেন। তবু আরও কটা দিন হাতে পাব প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য।

বৌদি হেসে বললেন, আচ্ছা—মঞ্জুর। কিন্তু তার বেশি একটি দিনও নয়—মনে থাকে যেন।

ক্রমশঃ

আধুনিক ও প্রাচীন

অশোক চট্টোপাধ্যায়

রীতি-নীতি আচার ব্যবহার সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত পদ্ধতি শিল্পকলা খাদ্যবস্ত্র বাসস্থান যানবাহন ভাষা ভালমন্দ বিচার মতামতের চুলচেরা অভিব্যক্তি এবং মানবজীবনের সকল অঙ্গের আকৃতি প্রকৃতি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কাল বিভেদ বিচারে সে সকলেরই দুইটি রূপ আছে। সর্বক্ষেত্রে ও সকল বিষয়েই যাহা অদ্যাবধি হইয়া আসিয়াছে তাহাকে প্রাচীন ও যাহা পূর্ব্বে ছিল না, এখন নূতন করিয়া গঠিত রচিত বা কল্পিত হইয়াছে তাহাকে আধুনিক বলা হয়। জীবনযাত্রার ধারা যদি অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অনুসরণ করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথা ও পরিস্থিতি প্রভৃতি পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে আলোড়িত হইয়া বারম্বার নব নব আকার ধারণ করিয়াছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিবর্ত্তনীয়তা এতই প্রবল ছিল যে প্রাচীন ও আধুনিককে বিশ্লেষণের কষ্টিপাথরে কষিয়া কোনও পার্থক্যই লক্ষিত হয় নাই। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন পার্থক্য না পাওয়া যাইলেও অনেক স্থলে ভিতরের অর্থ ও উপলব্ধ মর্ম্মবোধ সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ বাহিরে যাহা দেখা যায়, শোনা যায় ও যাহার বাহ্যিক রূপ সহজে উপলব্ধ হয় সেই সকল রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার আপাতদৃষ্টিতে পূর্ব্বের মতই থাকিয়া যাইলেও অনেক ক্ষেত্রে ভিতরের অর্থ, মানব মনের উপরে প্রভাব ও মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা আর পূর্ব্বাপর একইভাবে স্থিতিশীল থাকে না। পরিবর্ত্তন হয় নাই মনে হইলেও ভিতরে ভিতরে অনেক কিছুই গতিহীন প্রাণহীনভাবে শুধু একটা বাহ্যিক উপস্থিতি মাত্র রক্ষা করিয়া বজায় থাকে। যে সকল সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে ও যে সকল সমাজে রীতি-নীতি পদ্ধতি প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল সভ্যতার মধ্যেই সামাজিক আচার ব্যবহারের আকৃতি প্রকৃতির ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা লক্ষিত হয়। বাহ্যিক আকার রক্ষা করা সহজ, অন্তরের মর্ম্মার্থ অপরিবর্ত্তিত রাখা তত সহজ নহে। সুতরাং প্রায়ই দেখা যায় যে প্রাচীন সভ্যতা সংরক্ষিত হইলেও সে সংরক্ষণ কখনও পূর্ণাঙ্গ হয় না। মূর্ত্তি গঠিত হইতেছে, পূজারী মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতেছে, আরতির আয়োজন অক্ষুণ্ণ, নৈবেদ্য সাজান পূর্ব্বের মতই চলিতেছে; কিন্তু প্রাণে সেই গভীর আবেগ আর নাই যাহা পুরাকালে জনগণকে ভক্তিরস বিচলিত বিহ্বলতার তরঙ্গে ভাসাইয়া ভাববারিধির দূরান্তরে লইয়া যাইত। মন্ত্রের গূঢ় অর্থ আর অন্তরে সেইভাবে প্রাণবান হইয়া জাগ্রত প্রেরণার আলোকময় রূপ ধারণ করে না। গতানুগতিকতা বহুযুগ ধরিয়া প্রচলিত থাকিয়া আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে শুধু একটা বাহিরের অবয়ব বহুল প্রথায় পর্য্যবসিত করিয়াছে ও তাহার ফলে মোক্ষলাভ স্বর্গসুখ উপভোগ সিদ্ধিলাভ বা নিষ্কাম নির্বিকার বাসনামুক্ত তুরীয় অবস্থা প্রাপ্তি শুধু কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভিনয় শক্তি অনন্যসাধারণ হইলে কোন কোন ব্যক্তি সমাজে মহাপুরুষ বলিয়া এখনও চলিতে পারেন; কিন্তু জনসাধারণ ক্রমশঃ সালফা বটিকা অথবা অ্যান্টিবায়োটিক সূচি প্রয়োগ সম্বন্ধে অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাহ্যিক আকার যদি এক থাকে আনুসঙ্গিক সাজসজ্জা মন্ত্র সঙ্গীত বাদ্য ঢক্কা নিনাদ বা ঘণ্টাধ্বনি যদি সমানভাবে বর্ত্তমান রাখা যায় তাহা হইলেই প্রাচীন প্রতিষ্ঠান পূর্ণ সংরক্ষিত হয়

না। সেই পূর্ব্বযুগের মনোভাব, অন্তরের অনুভূতি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সংযোগ ঘনিষ্ঠতা ও জীবন্ত প্রেরণা যদি না থাকে তাহা হইলে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে কলোরোলের সৃষ্টি করিয়া কোনপ্রকারে মান বাঁচান চলিতে পারে কিন্তু ধর্ম্মের প্রাণ রক্ষা হয় না। সোনার খাঁচায় মৃত পক্ষীর পক্ষাবৃত দেহ সাজাইয়া রাখিয়া রেকর্ড বাজাইয়া তাহার কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিলে পক্ষীর জীবন্তস্বরূপ রক্ষা করা হয় না। তাহার প্রাণহীন অনুকরণ মাত্র করা হয়। সুতরাং ভক্তি বিশ্বাস ও অকৃত্রিম আন্তরিক শ্রদ্ধার ক্ষেত্র হইতে প্রাচীন ক্রমশঃ অপসৃত হইয়া সেই স্থলে মুদ্রাযন্ত্র, বেতার বক্তৃতা ছায়াচিত্র ও রঙ্গমঞ্চ সমর্থিত অপপ্রচারের শক্তি ক্রমবর্দ্ধনশীল ভাবে মানব মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে তাহার তুলনা পূর্ব্ব যুগের কোন কিছুর মধ্যেই কখন পাওয়া যায় নাই। সকলে বলিবেন কেন এই দেশের মানুষ ত ঠিক পূর্ব্বের মতই জগন্নাথধাম, বদরিকাশ্রম ও কুম্ভ মেলায় যাতায়াত করিতেছে বহু অর্থব্যয় করিতেছে কখন কখন বাস উল্টাইয়া নৌকা ডুবিয়া অথবা মহামারিতে প্রাণও দিতেছে, তাহা হইলে তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস চালিত নহে বলিবার কি কারণ আছে। সংখ্যা দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ধর্ম্মের আগ্রহে যদি পঞ্চাশলক্ষ বা এককোটি লোক বৎসরে তীর্থ ইত্যাদি করিয়া ফেরে তৎস্থলে দেশের বহু সহস্র ছায়াচিত্র প্রদর্শন কেন্দ্রে দৈনিক এককোটি লোক টিকিট ক্রয় করিয়া অতীন্দ্রিয়কে ভুলিয়া ইন্দ্রিয়ের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া থাকে। দৈনিকশত সহস্র মুদ্রিত কথা পাঠ করে যাহারা তাহাদের সংখ্যাও এককোটির অধিক হইবে এবং তাহারা বৎসরে অন্ততঃ মাথা পিছু পঞ্চশত ঘন্টা সময় ঐ কার্য্যে ব্যয় করে। ইহার সহিত তুলনায় তীর্থগমণ বা সঙ্গমে ডুব দেওয়ায় মানব-ঘন্টার (man hour) হিসাব একান্তই তুচ্ছ ও অত্যল্প। অর্থের দিক দিয়াও ছায়াচিত্র দর্শন বা পুস্তক পত্রিকা পাঠের খরচ তীর্থ ও স্নানের খরচ অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক।

কোন মানুষই প্রায় প্রতিবৎসর তীর্থে গমণ করে না। করিলেও তাহা অল্প লোকেই করে। তাহাতে পঞ্চশত কোটি মানব-ঘন্টা সময় ব্যয় হয় না এবং অর্থের হিসাবে দিনের পর দিন তিন চার কোটি মুদ্রা ব্যয় করাও হয় না। সকল হিসাব যথাযথ ভাবে করিলে দেখা যাইবে যে মানুষ পুরাতন ধর্ম্মের আকর্ষণে যাহা করে আধুনিক আগ্রহ ও আবেগের তাড়নায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সময় অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিয়া থাকে। পুরাতন যাহা তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনেকে জীবন কাটাইয়া যান। আবার অপর অনেক ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে পুরাতন রীতিনীতি পদ্ধতি আচারব্যবহার প্রতিষ্ঠান সকল কিছুই মানব প্রগতি ও উন্নতির সহায়তা করিতে অক্ষম; এমন কি পুরাতন হইলেই তাহা সভ্যতার পথে অগ্রগমণে বাধা সৃষ্টি করিবে। নুতন যাহা, আধুনিক যাহা তাহাই মানব সভ্যতার উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহনের সোপান ইত্যাদি ইত্যাদি। পরস্পর বিরোধী কথার স্রোত বহাইয়া শুধু এইটুকু প্রমাণ হয় যে প্রাচীন পন্থী যাঁহারা তাঁহারা পুরাতনের পূজাতেই নিমগ্ন। নুতন পথের পথিক যাঁহারা তাঁহারা নূতন ব্যতীত আর কিছুই মানবহিতকর বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। বর্ত্তমানকাল জীবন্তকাল, প্রাচীনকাল মৃত ও তাহার সহিত কোনও ঘনিষ্টতা আধুনিক মানুষ রক্ষা করিতে অক্ষম। বর্ত্তমান যুগের মানুষের অহংকার ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার আগ্রহ তাহাকে নিজের পারিপার্শ্বিক ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহকালেরও পূজারী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা শ্রেষ্ঠ, আমাদের সহিত সংযুক্ত সকল কিছুই শ্রেষ্ঠ, আমাদের যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ, আমাদের চিন্তাধারা, চালচলন, আকাঙ্খা আগ্রহ বিশ্বাস আস্থা রুচি কামনা বাসনা সবই শ্রেষ্ঠ। যাহা কিছু আমরা করি সবই উত্তম আমরা যাহাতে বিশ্বাসী সে সকল ধারণাই অভ্রান্ত, আমাদের গতি এদিক ওদিক উপর নিচ যে দিকেই আমাদের লইয়া যায় তাহাই অগ্রগমণ ও প্রগতি। অহম্ প্রবল যাহারা তাহারাই প্রাচীনের বিরুদ্ধবাদী ও আধুনিকতার মহাশক্তিশালী সমর্থক।

যাঁহারা আত্মবিলোপ করিয়া অন্যকে উচ্চ আসনে বসাইয়া ভক্তি গদ গদ ভাবে অপরের গুণমুগ্ধ হইয়া জীবন কাটাইয়া দেন তাঁহাদিগের মধ্যেই বিগত যুগের মহাপুরুষদিগের আরাধনা নিরবকাশ ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। অতীতের চিন্তা অতীতের ভাব মৃতজনের উপলব্ধি ও আদর্শ ইহা লইয়াই এই সকল ঐতিহ্যের পূজারীদিগের কারবার। নতুন যাহা তাহা সবই ভুঁইফোড়দিগের কর্ম্মপ্রসূত। হৃতবুদ্ধি চিন্তাশক্তি বর্জ্জিত আত্মপ্রবঞ্চক অর্ব্বাচীনদিগের মস্তিষ্কজাত, কুটকল্পনার কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রান্তরে আধুনিক মানুষ ঘুরিয়া মরিতেছে তাহাদের সত্যই কোন লক্ষ্য নাই উদ্দেশ্য নাই, নাই কোন আদর্শ, আছে শুধু কষ্ট কল্পনার আগ্রহের আবেগ। এই জাতীয় সমালোচনা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে ও তাহাতে মনে হয় যে আধুনিক সৃজন অভিনবত্বের মানবীয় প্রগতির দিক দিয়া কোন মূল্যই নাই। প্রাচীন একটা প্রাণহীন কঙ্কাল মাত্র এ কথাটা যত অসত্য বর্ত্তমান নিছক অর্থহীন আবেগ ব্যতীত আর কিছুই নহে সে কথাটাও ততই যুক্তিহীন মূঢ় মনোভাবের অভিব্যক্তি। বস্তুত পুরাতন সভ্যতার মধ্যে এরূপ-বহু কিছু রহিয়াছে যাহা মানবতার পূর্ণ বিকাশের অতি প্রয়োজনীয় এবং ঘনিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। প্রাচীনের নিকট আমরা যাহা পাইয়াছি ও যে প্রাপ্তির ভিত্তির উপরেই বর্ত্তমানের মানব প্রগতি ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত তাহা অস্বীকার করিবার চেষ্টা উম্মাদের প্রত্যক্ষ প্রমান বিমুখতার সহিত তুলনীয়। বুদ্ধির ক্ষেত্রে যাহারা অতি সহজ ও অতি সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজিয়া খানাখন্দে পতিত হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে ভ্রান্তি মুক্ত করা এক কঠিন মনোরথ পূরণ প্রচেষ্টা। কিন্তু সত্যের প্রচার ও সকল মানুষের সত্য উপলব্ধির জন্য সে চেষ্টা না করিলে চলে না। ভুল পথের যাত্রী অসংখ্য। তাহাদিগকে যথাযথ পথ অনুসরণ করিতে শিখান মানব জাতির একটা চিরপ্রচলিত ও সদা অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের যুগেও জনসাধারণের মধ্যে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের অভাব ছিল না। মহামহা পণ্ডিতজনের সান্নিধ্যে অসংখ্য আকাট মূর্খ বিচরণ করিত ও তাহাদিগকে কার্যকলাপ সর্ব্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ সত্যবিধ্বংসী ও সুবুদ্ধিনাশক অজ্ঞানতার আবেগজাত ছিল। কিন্তু পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ সেই কারণে নিজ নিজ অনুসন্ধিৎসার পথ ছাড়িয়া নিরেট মস্তিষ্কের গভীরে অজ্ঞানতার বিভ্রান্তির বৌচক্রচর্চ্চা করিয়া সময় নষ্ট করিতেন না? তাঁহারা নিজেদের ও নিজেদের শিষ্যদিগকে অসত্য হইতে সত্যতে এবং অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইতে সকল শক্তি নিয়োগ করিতেন। সে সময়ে হয়ত জাতিগত ভাবে বুদ্ধির বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হইত। যদিও কখন কখন অনধিকার থাকা সত্বেও অনেকে জ্ঞানমার্গ ধরিয়া বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া অসূর্য্যালোক হইতে জ্যোতির্ম্ময় লোকে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইতেন। অন্ততঃ তখন কোথাও কোনও ব্যক্তি জোরগলায় ভ্রান্তিকে সত্যের আসনে বসাইতে চেষ্টা করিত না।

তারপর আসিল দার্শনিক আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সহিত বাস্তব ক্ষেত্রের নানা শাস্ত্র ও বিভিন্নকলার চরমোৎকর্ষের সকল আয়োজন ও প্রচেষ্টার যুগ। ইহার ফলে বাস্তব জ্ঞান চূড়ান্ত পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া বিজ্ঞানের আলোচনা ও চর্চ্চা ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়া বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে প্রয়োজন পরীক্ষা, গবেষণা, প্রকল্প (Hypothesis) ও প্রমাণ। গবেষণার উপর পরীক্ষা নির্ভর করে এবং পরীক্ষা অন্তে প্রকল্প ও প্রমাণের কথা উঠে। এবং এই বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান কার্য্যে পদে পদে ভুলের সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর জন্ম, পূর্ণতাপ্রাপ্তি প্রজনন ও বার্দ্ধক্য, জীবনাশ ও বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি সকল বিষয়েই শতশত বৎসরের অনুসন্ধান পরীক্ষা প্রভৃতির দীর্ঘ ইতিহাস আমরা জানিতে পারি ও তাহার মধ্যেই বিজ্ঞানের শৈশব কথা বর্ণিত রহিয়াছে। মানুষ ঐ সকল ক্ষেত্রে কত ভুল করিয়া পুনঃপুনঃ সেই সকলের সংশোধন করিয়া

তবে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহারও একটা বৈচিত্রময় কাহিনী আছে। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, জীববিদ্যা, অস্থি, মাংসপেশী স্নায়ু প্রভৃতির বিশ্লেষণ অনুশীলন বহু শতাব্দী ধরিয়া চালিয়া বিজ্ঞানের ভিত্তি গঠনে বিশেষ সাহায্য করে। রসায়নের ইতিবৃত্ত চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে কোন কোন রাসায়নিক কার্য্যে মানুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই আত্মনিয়োগ করিত। ধাতব খনিজ প্রস্তর হইতে গালাইয়া ধাতু নিষ্কাশন কখন আরম্ভ হইয়াছে তাহা স্থির নিশ্চয় ভাবে বলা যায় না। মিশ্রধাতু যথা ইস্পাত ও ব্রন্‌জ (তাম্র ও টিন মিশ্রিত ধাতু) বহুকাল হইতেই মনুষ্য সমাজে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। ব্রন্‌জযুগ লৌহ ইস্পাত-যুগের পূর্ব্বের এবং ব্রন্‌জ নির্ম্মিত বর্ম্ম ও অস্ত্র তৎপূর্ব্বের প্রস্তর ও তাম্রের অস্ত্রশস্ত্রকে সহজেই পরাস্ত করিতে সক্ষম হয়। প্রারম্ভকালে রসায়নে যে সকল ধারণা বদ্ধমূল ছিল যেমন মূল বস্তু চার বা পাঁচ প্রকার (পাশ্চাত্যে মাটি হাওয়া আগুন ও জল এবং ভারতে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম), তাহা হইতে পরে ক্রমে ক্রমে রাসায়নিক জ্ঞান সত্য ও নিশ্চয়তার দিকে অগ্রসর হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রবার্ট বয়েল ও তৎপরে ব্ল্যাক, লাভোয়াসিয়ে, প্রিষ্টলি, ক্যাভেণ্ডিশ ও ডলটন নানান আবিষ্কারের দ্বারা রসায়নকে পূর্ণতর পরিণতির পথে চালাইয়া দিলেন। বস্তুর তিন অবস্থা বাষ্পীয়, তরল ও নিরেট, বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ অণু, পরমাণু; মূল বস্তু, মিশ্র বস্তু প্রভৃতির পার্থক্য ইত্যাদি নানান বৈজ্ঞানিক তথ্য বিগত তিন শত বর্ষের মধ্যে প্রাচীন জ্ঞান ও বিদ্যাকে বর্তমানের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল।

পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উষ্ণতা, বৈদ্যুতিক শক্তি, আলোক, শব্দ, জলের গতি, মধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বহু বিষয়ের সম্যক বিচার বর্ত্তমানে এই বিজ্ঞানকে বাস্তব জ্ঞানের কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। পরমানবিক পদার্থ বিজ্ঞান মানুষের সহিত বস্তুর পরিচয় চূড়ান্ত পর্য্যায়ে লইয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই বিজ্ঞানের কোন কোন অঙ্গের বিশেষ চর্চ্চা ও আলোচনা হইয়াছে। পুরাকালে আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও বর্ত্তমান যুগের আরম্ভে নিউটন, ক্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল, কেলভিন, রাদারফোর্ড টমসন, জগদীশচন্দ্র বোস, সি ভি রামন প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মানুষ এখন অনন্ত শূন্য পথে গ্রহ গ্রহান্তরে বিচরণ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। তাহার চন্দ্র অভিযানের সফলতা মানব ইতিহাসের একটা পরম গৌরবময় অধ্যায়ের আরম্ভ মাত্র। সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের সুদূর প্রান্তে আরও কত প্রাণীজগত থাকিতে পারে তাহার অনুসন্ধানের এই আরম্ভ। মানুষ এখন ঘণ্টায় ত্রিশ হাজার মাইল গতিবেগ সহজ সম্ভাবনার কথায় আনিয়া ফেলিয়াছে। পরে যে সেই গতিবেগ আরও লক্ষগুণ বাড়িয়া যাইবে না এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। বিজ্ঞানের আরও বহু শাখায় অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। যথা কৃত্রিম উপায়ে প্রাণের সৃষ্টি। বেতারে চলচ্চিত্র প্রচার। শূন্য পথে পৃথিবী ঘিরিয়া ভ্রাম্যমান কৃত্রিম উপগ্রহের পরিচালনা ও আরও কত কিছু। চিকিৎসাক্ষেত্রে নূতন নূতন পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার। নূতন নূতন ঔষধের সাহায্যে দুরারোগ্য ব্যাধি দমন। মৃত ব্যক্তির চক্ষু বসাইয়া জীবন্ত মানুষের হারান দৃষ্টি-শক্তি ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা। আরও অনেক অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমানের মানুষ কিন্তু অতীতের বহু গৌরবময় কর্ম্মকৌশল হারাইয়া নূতন কোন প্রতিভাময় সৃজনের সাহায্যে সেই ক্ষতি পূর্ণ করিয়া লইতে সক্ষম হয় নাই। বেদ বেদান্ত রচয়িতা ঋষিদিগের শূন্য আসনে কেহ আর বসিতে পারে নাই। বাল্মীকি কি ভবভূতি অথবা হোমার, প্র্যাক্সিটিলিস, ফিডিয়াস, ভান্‌চি-কালিদাস, তানসেন, বেটোফেন, মিকালঅঞ্জেলো, হকুসাই, র‍্যাফেল আর সহজে কোথাও জন্মলাভ করিতেছে না। তাজমহল, অজন্তা, পার্থেনন, আংকোর, বোরো-বুদুর, মহাবালিপুরম, আর গঠিত হইতেছে না। আধুনিক বিজ্ঞানের অলৌকিক ও অসম্ভব শক্তি কি অতীতের মানুষের মহা গৌরবময় প্রতিভা ও সৃজনক্ষমতা

চিরতরে বিনষ্ট হওয়ার ক্ষতি মিটাইতে সক্ষম হইবে। লক্ষ লক্ষ গৃহের বেতার সঙ্গীত কি এক একটি শোপ্যা ও সদারঙ্গের অভাব পৃথিবীকে ভুলাইয়া দিতে পারিবে? এককোটি ছাপা ছবির সহিত তুলনায় সিষ্টিন চ্যাপেলের ছাদে অঙ্কিত মিকাল অঞ্জেলোর "সৃষ্টি" কিরূপ স্থান অধিকারে সক্ষম হয়? কোনারকের সূর্য্য মন্দির মানব সভ্যতার প্রতীক হিসাবে অধিক মূল্যবান প্রমাণ হইবে, না নিউদিল্লীর সেক্রেটারিয়েট ও পার্লামেন্ট ভবন তুলনায় উচ্চতর স্থান অধিকার করিবে?

চিন্তা কল্পনা ও সৌন্দর্য্যবোধ অথবা শিল্পকলা সুসাহিত্য কাব্য সঙ্গীত সুর ইত্যাদি বিচার করিলে প্রাচীন সভ্যতা আধুনিক প্রগতিকে অনায়াসে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রে চলিয়া যায়। রোমানদিগের দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাজপথ, গ্রীস ও রোমের পুরাতন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ ফ্রান্সের নোতরদাম গির্জ্জা, কোলন ক্যাথিড্রাল, টিকান কীর্থে বা ইয়র্ক মিনিষ্টার প্রভৃতিকে আধুনিক স্থাপত্য সহজে পরাজিত করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। আজকালকার তার্কিকগণ বলিবেন আমাদের রস অনুভূতির অভিব্যক্তি "ফাঙ্কশানাল" দৃষ্টিভঙ্গীর সীমা ছাড়াইয়া তাহার বাহিরে যাইতে পারে না। কিন্তু আমাদের "ফাঙ্কশান" বা কার্য্যকারীতা বোধ কোথায় শেষ হয় ও সৌন্দর্য্যবোধ কখন ব্যক্ত হইতে সুরু করে তাহা কাহারও বোধগম্য হয় না। ইহা ব্যতীত এ কথাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে বিরাট কাঠের বাক্সের মত অট্টালিকাতে বাস করিলে মানুষের কর্ম্মশক্তি কেন বাড়িয়া যায় এবং ঐ সকল আধুনিক প্রাসাদের প্রাকার নির্গত ডানা পাখনা ছুরির ফলায় অনুকরণে নির্ম্মিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোন কর্ম্ম-সাধনে সাহায্য করে। হাওয়ার গতিরোধ করে অথবা সূর্য্যালোক প্রতিরোধ করে (wind and sun breaker) বুঝিলাম; কিন্তু তাহার ফলে হাওয়া ও রৌদ্র আটকাইয়া দেশের মানুষের কি উপকার হয়। এই দেশের মানুষ (সকল দেশের মানুষই) রোদ হাওয়া গায়ে লাগিলে উপকৃতই হয়। ইহা দ্বারা স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও সুগঠি জনবহুল বাসস্থান কিছুটা বাসযোগ্য হয়। এই কারণে ফাঙ্কশানবর্জ্জিত ফাঙ্কশানাল গঠন রীতির কোন মূল্য থাকে না। আধুনিক যুগের যাহারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী তাহারা কি ঐ প্রকার গৃহে থাকিয়া নিজ নিজ আবিষ্কার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সভ্যতার বহু আনুসঙ্গিক কিছুকাল প্রচলিত থাকিয়া আর আত্মরক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তীব্র বিষাক্ত ঔষধ ব্যবহারে পোকামাকড় মারিবার ব্যবস্থা করিয়া পরে তাহার ফলে যখন মানুষ মরিতেছে সন্দেহ হইল তখন সকলকে সাবধান করিয়া একটা মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করা এবং ধোঁয়া, বাষ্প ও অন্যান্য ক্ষতিকর জীবন-যাত্রার অঙ্গগুলিকে ক্রমশঃ বাড়িতে না দিবার চেষ্টায় এখন মোটর গাড়ী ও রেলের ইঞ্জিনও না চালাইবার ব্যবস্থা চেষ্টায় সভ্যতার গতি নূতন পথে চালাইবার প্রয়োজন জানাইয়া মানুষের মনে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতা সম্বন্ধে প্রগাঢ় সন্দেহ জাগ্রত করা ইত্যাদি যাহা সর্ব্বত্র ঘটিতেছে তাহাতে আধুনিকতার খ্যাতি বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

অন্যদিকে আধুনিক সভ্যতা মানবজাতির বহু উন্নতি সাধন করিলেও আণবিক আবিষ্কারে মানুষ প্রায় সম্পূর্ণ-রূপেই মানব সভ্যতা ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতেছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস। আণবিক "মস্তক"যুক্ত বিরাট বিরাট হাউইট অস্ত্র, পোলারিস রকেট অথবা বিমান হইতে নিক্ষেপ করিবার নিউক্লিয়ার ও হাইড্রোজেন বোমা —সকল কিছুই ধ্বংসের উপকরণ। আরও ভয়ের কথা যে এই সকল অস্ত্র ব্যবহার করিলে ধ্বংসকার্য্য সম্পন্ন করিয়াই অস্ত্রগুলির বিনাশ ক্ষমতা শেষ হইয়া যায় না। ঐ সকল অস্ত্রের বিস্ফোরণে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ ও সর্ব্ব সম্পদ নষ্ট হইবার পরেও তাহার প্রাণবিনাশক তেজ বিকিরণ শেষ হয় না। এই সর্ব্বনাশা রশ্মি বিকিরণের ফলে মানুষ বিকল ও বুদ্ধিহীন হইয়া বংশানুক্রমিকভাবে জন্মাইতে থাকে; বহু লোক অনেক বৎসর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করে এবং পশুপক্ষী গাছগাছড়া সকল কিছুই ঐ তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকীর্ণ হইবার ফলে

নানাভাবে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু ঔষধ হইয়াছে যাহা দ্বারা পূর্ব্বকালের অনেক মহামারি আর বিস্তারলাভ করে না। টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি এখন দমিত হইতেছে ও সাধারণ-ভাবে বলা যায় মানুষ আর অত অধিক সংখ্যায় অল্প বয়সে মারা যায় না। কিন্তু ইহার একটা অন্যদিকও আছে। বর্ত্তমান যুগের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বহু রোগ হইয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাইতেছে যাহা পূর্ব্বে কখন অত ব্যাপকভাবে হইত না। ক্যানসার, হৃদরোগ ও দুর্ঘটনার ফলে প্রাণহানী এখন পূর্ব্বযুগের তুলনায় শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আধুনিক মানুষ তুলনামূলক-ভাবে এখন মহা অভাবের দাস। পৃথিবীতে পূর্বে যে স্থলে দুই চারিজন মাত্র ধনবান ব্যক্তি থাকিত এখন সেইখানে সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিরাট বিরাট গাড়ী-বাড়ীর মালিক এবং হীরা-জহরতের ছড়াছড়িতে সর্বত্র গরীবের চোখ ঝলসাইয়া তাহাদিগের অন্তরে অভাবের অনুভূতি প্রবলতর করিয়া তোলে।

প্রাচীন কালেই যে মানব প্রতিভার সমাদর মানবতার অধিকার স্বীকার ও মনুষ্যত্বের সকল আদর্শ পূর্ণতরভাবে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল এমন কথাও কেহ বলিতে পারে না। বহু মহাপ্রতিভাবান ব্যক্তি সে যুগে অনাদৃত থাকিয়া অনাহারে দিন কাটাইয়াছেন। একটা কথা ইয়োরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রে শুনা যায় যে গ্রীসের সাতটি সহর পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে তাহাদের মধ্যে কোন সহরে হোমার অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। র‍্যাফেলের মত চিত্রকর নিদারুণ দারিদ্র্যে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশেও গুণের আদর কখন হইয়াছে কখন হয় নাই। এখনও যে বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি অজানা অচেনা থাকিয়া যান, কষ্টে দিন যাপন করেন, নিজ ক্ষমতার সমাজে কোন আদর নাই বলিয়া তাহার অপব্যবহার করিতে বাধ্য হন, ইহাতে আধুনিক সভ্যতার একটা মহা অভাবের কথাই প্রমাণ হয়। ভারতবর্ষে এখন ধ্রুপদ সঙ্গীতের আদর আর নাই বলিলেই চলে, বীনা অপেক্ষা বিদেশী নিকৃষ্ট বাদ্যযন্ত্র গিটার লইয়া অনেকে মাতামাতি করেন। নৃত্যকলা হৃত গৌরব। হাউ নাচ, মৃদঙ্গ বিলাস চলে না বলিলেই হয়। কথাকলি, ভারতনাট্যম ও কথক চলে কিন্তু বিদেশীর অনুকরণে চালিত উচ্চমূল্যের রেস্তর াঁতে উৎকট বাদ্যের সঙ্গতে অল্প পরিসর কাঠের মেঝের উপর স্ত্রীপুরুষে ধস্তাধস্তি নৃত্য আজকালকার সভ্যতার নিদর্শন। খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা শিখিবার মেহন্নতকে পাশ কাটাইয়া যে সুরঘটিত আর্ত্তনাদ আধুনিক সঙ্গীত নামে চলে তাহার কোন কৃতিকলা অনুগত আলোচনা কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। বহু ক্ষমতাশীল লেখক দেশের সাহিত্য সম্পদ বৃদ্ধি না করিয়া ছায়া চিত্রের ডায়লগ লিখিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন ও বহু গুণবান গায়ক প্লে ব্যাক গান করিয়া দিন গুজরান করেন। যাঁহারা উপন্যাস গল্প কবিতা লেখেন তাহাদিগের মধ্যেও অর্থোপার্জ্জনের কথাটা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া থাকায় প্রকাশকদিগের বায়না অনুসারে লেখা সরবরাহ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে। ইহাতে প্রেরণার অভিব্যক্তি কখন কখন রস অনুভূতির পথ ছাড়িয়া বায়নার নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া সাহিত্য প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করে। গান যাঁহারা করেন তাঁহারা গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রস্তুত ও বেতারের অর্ডারী রীতি অনুসরণ করিতে গিয়া অনেক সঙ্গীতের ভাব ও রাগিনীর রূপ ভুলিয়া কনট্রাক্টের ক্লজ বাঁচাইয়া চলিতে গিয়া সুন্দরের সাধনা অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান।

চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যে ব্যবসাদারীর অনুপ্রবেশ প্রবল ভাবেই হইয়াছে দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের ছবি, বিশেষ করিয়া চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন চিত্র শিল্পকে যে ভাবে লজ্জা দেয় তাহা অবর্ণনীয়। পোট্রেট আঁকাইয়া এক আমেরিকান তাঁহার চিত্রকরকে বলিয়াছিলেন, "এতটা জায়গা খালি নীল রং কেন; ওখানে দুটো চারটে উট ও খেজুর গাছ বসাইয়া দেও না।" চিত্রকর বলিলেন "ঐ নীল জায়গাটা যে আকাশ!" ব্যবসাদার বলিলেন "পয়সা দিলে উট ঘোড়া আর অন্য সব জানোয়ার

আকাশে ঝুলিতে কোনও আপত্তি করিবে না।” যাহারা অঙ্কন ও গড়া ঢালায় পূর্ণ আবেগে নিযুক্ত তাঁহারা প্রথমতঃ বায়নার কাজত করেনই ; উপরন্তু তাঁহারা জানেন যে ফ্যাশনের নির্দ্দেশ মানিয়া না চলিলে বাজারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং তাঁহাদের চিত্র ও ভাস্কর্য্য অনেক সময়ই নিজ অনুভূতি অবহেলা করিয়া খরিদ্দারের অভিরুচি অনুসারেই রূপায়িত হয়। ইহাতে শিল্পের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। ইহা দেখিয়া শুনিয়া বলিতেই হয় যে এই অবস্থা সভ্যতা ও কৃষ্টির স্বাস্থ্যবান সবল অবস্থা নহে।

আগেই বলা হইয়াছে যে প্রাচীনকালের বহু বর্ব্বরতা প্রায় অপরিবর্ত্তিত ভাবেই আধুনিক কালেও প্রচলিত রহিয়াছে। যাহারা চরম এমন কি অতি গরমভাবে বর্ত্তমান প্রগতিশীলতার উপাসক তাহারাই আবার পূজার আয়োজনে যান্ত্রিক নিনাদের চূড়ান্ত করিয়া সর্ব্ব মানবের নিদ্রাভঙ্গের ব্যবস্থা করে। বিসর্জ্জনকালে তাহাদের নৃত্যে উন্মাদনা লক্ষিত হইলেও সুরুচির লালিত্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বিবাহের সময় বরপণ আদায়, পূজার সময় চাঁদা আদায়, অফিসে দফতরে উৎকোচ গ্রহণ, ব্যবসাতে লোক ঠকান ইত্যাদি পূর্ব্ব-কালীন সকল সমাজ বিরুদ্ধ বদঅভ্যাস বিশেষ কেহ ছাড়িয়া দিয়া নূতন পথে চলা আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মহৎ কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেও বর্ত্তমানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কর্ম্মীদিগের কার্য্যে প্রায়ই কোনও সফলতা প্রাপ্তি ঘটিতে দেখা যায় না। রাষ্ট্রক্ষেত্রে নানান দলের লোকে নানান আদর্শের পূর্ণ দার্শনিক বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া পরে প্রায় সকলেই একই গতানুগতিক রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পুরাতন পাপকে সজীব রাখিয়া নূতন আদর্শকে বরখাস্ত করিয়া অন্যায় অবিচার ও অমঙ্গলকে অনবরত দান করেন। প্রাচীন সভ্যতা শক্তি হীন হইয়া নিস্তেজভাবে কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকে। প্রাচীন বর্ব্বরতা কিন্তু সতেজ ও সবল ভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছে। মনের অন্তরতম অনুভূতি যাহা, গভীর চিন্তার ফলে যাহা পাওয়া যায় ; যাহা প্রায় দৈব প্রেরণাজাত বলিলেও ভুল বলা হয় না ; সেই সকল পরম রহস্যময় তথ্য পুরাকালে মানবপ্রাণে প্রস্ফুটিত ভাবে জাগিয়া উঠিত, এখন তাহা প্রায় পূর্ণ বিলুপ্তির গহ্বরে অদৃশ্য বলিলেই চলে। এখন জীবন সহজ সরল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার খেলাঘর। সহজ সরল কিন্তু নির্দ্দোষ নহে। উচ্চ মানবীয় আদর্শ প্রবল আগ্রহে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও মানুষ নিজের শত দুর্ব্বলতা ও দোষ বর্জ্জন করিতে পারে নাই। দুর্নীতিকে মানুষ অস্বীকার করিলেও ত্যাগ করিতে পারে নাই। বস্তুতন্ত্র বাস্তব ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিয়া অন্তরের দারিদ্র্য দূর করিতে সক্ষম হয় নাই।

দুটি চিঠি

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(এক)

৮, ১১, ৬১

কল্যাণী,

আমি তোমার বাবা-মার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞ। কেন, তা আন্দাজ করতে পার? তুমি হয়তো বলবে আমার জন্যে তোমায় সংসারে এনে দিয়েছেন বলে। তা যদি বল তো আমি জিজ্ঞেস করব, তার জন্যে কৃতজ্ঞ কথাটা কি নিতান্তই হালকা, নিতান্তই অল্প—নয়?

আমি কৃতজ্ঞ তোমার এই মিষ্টি নামটি রাখবার জন্যে—।

আমি তোমায় এখনও একেবারে আপন হয়ে যাওয়ার মতো ক'রে চিঠি লেখবার অধিকার তো পাইনি; যখন এইবার পাব, তখন কল্যাণীর জায়গায় যে কথাটি ব্যবহার করব তার বাছা বাছা তেইশটি জোগাড় করে আমার নোটবুকে টুকে রেখেছি, 'প্রিয়ে', থেকে আরম্ভ ক'রে। আরও সন্ধানে আছি। আমার প্ল্যানটা কি জান কল্যাণী? কোন কথা বাসি হতে দোব না; প্রত্যেক চিঠিতে একটি করে নতুন কথা ব্যবহার করব; মিষ্টি, নরম, রসে টুলটুল। বাসি ফুলে কি কল্যাণীর পূজো হতে পারে? তার মানে তোমায় তেইশটি চিঠি লেখবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে আমার এখন পর্যন্ত। চিঠির ভেতরে কি কি থাকবে তারও একটু একটু ক'রে নোট রেখে যাচ্ছি, যেমন যেমন মনে পড়ে। কবিরা যে-সব করে তাদের কাব্যের খসড়া ছ'কে রাখে শুনেছি কাজের ফাঁকে ফাঁকে। তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করবে আমিও তাহলে কবি হয়ে গেলাম নাকি? তা হয়েছি বৈকি, কল্যাণী; তোমার ভালোবাসা যে অধম পেয়েছে সে কবি না হয়ে পারে? 'অধম' কথাটা আমি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম এখানে। বৈষয়িক মানদণ্ডে, তার মানে তোমার মামার দোকানদারি বেচাকেনার হিসাবে বিমলের তুলনায় আমি এখনও নীচুতেই বৈকি। বিমল পাশ করে চাকরিতে, আমি এখনও ফাইনাল ইয়ারে। এক বছরের মাত্র তফাৎ, তবে সংসারের পাটোয়ারি বিচারে এটা যে মস্ত তফাৎ তা কি আমি বুঝি না? এও কি আমি বুঝি না যে, বিমলের বাবার খাঁইটুকুই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। তিনি এও জানেন আমার বাবা এ-বিষয়ে কত উদার; পাশ করবার আগে যে-কথাটা দিয়ে দিয়েছেন একবার, সে কথাটার আর নড়চড় তাঁর কাছে হবে না। নৈলে তোমার মামা আমাদের ভালোবাসার মূল্য দেওয়ার পাত্র? যাঁর নাকি এক এক করে তিন তিনটি বিবাহ তিনিও ভালোবাসার মর্ম বুঝবেন এমন আশাও করতে হবে?

তা যদি বুঝতেন তো বিবাহের আগে আমাদের মেলামেশাটা তিনি এত অপছন্দ করেন কেন? যার জন্যে দু'টি চক্রবাক-চক্রবাকীর মতন প্রেম-প্রবাহিনীর এপার-ওপার দু'টি তীর থেকে এই আমাদের কাতর

বিরহ-কাকলী ? এ-ব্যথা বোঝবার আছে ক্ষমতা ওঁদের ?

তা যদি বল কল্যাণী তো, ওঁদের যুগ—শুধু ওঁদের-টুকুই বলি কেন, সেই আদি যুগ থেকে ওঁদের পর্যন্ত, ভালোবাসা যে কী জিনিস সেটা জানবে না, সেকালে কাব্যে-উপাখ্যানে, এ-যুগে এসে নাটকে-উপন্যাসে যতই না কেন বড়াই করুক। তুমি মিলিয়ে ভাখো কল্যাণী —এ পর্যন্ত যে যুগ গেছে তাতে শুধু ঘটকালি করে, জাত-কুল-ঠিকুজি-কুষ্ঠি মিলিয়ে বিবাহই হয়ে এসেছে। একটা-আধটা নয়, যে যত পেরেছে। আট বছরের থেকে নিয়ে আশি বছরের পর্যন্ত। এ-ভিড়ের মধ্যে ভালোবাসার স্থান কোথায় ? প্রাণের ও প্রাণের নিতান্তই কুসুম-পেলব একটা বস্তু, চাপে দম আটকে যাবে না ?

না, যতই গলাবাজি করুণ, আমরা আধুনিকেরা এ-কথা কোন মতে মানব না যে, ভালোবাসা কি তা ওঁরাও বোঝেন, মূল্য দেন। তাহলে মামা-কাকা-জ্যাঠা-মেসোর দল এ-রকম মাঝখানে এসে দাঁড়াতেন না।

তুমি মনে ব্যথা পাচ্ছ না তো কল্যাণী। আমি জানি তুমি মামার ভারি ভক্ত। মনে আছে আমার সেদিনের কথা। তোমার দিদির বিয়ের রাত্রে কাজের ভিড়ের মধ্যে থেকে একটু সময় চুরি করে তোমাদের দোতলার ছাতে তুমি আর আমি একা (মাত্র সাতটি মিনিট, আমার হাতঘড়িতে মিলিয়ে ছিলাম)—তোমার মামার এই হৃদয়হীন বিধানের কথা তুলতে তোমার চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছিল, বললে—বাবা বেঁচে থাকলেও বোধ হয় মামার মতন আদর পেতে না। মনে আছে বৈকি কল্যাণী। যে হৃদয় আমার মতন অযোগ্যকে এতখানি দিতে পেরেছে সে পিতার অধিক মামার ওপর অকৃতজ্ঞ থাকবে এতবড় একটা অঘটন মনে স্থান দিতে পারি ? আর, যোগ্য হোক, অযোগ্য হোক, যিনি তোমার শ্রদ্ধা পেয়েছেন, তিনি যে আমারও কত শ্রদ্ধেয় তা কেমন করে তোমায় বোঝাই ? কেমন করে বোঝাই, তাঁকে কবে তোমার মতনটি করে 'মামা' বলে ডাকতে পারব সেই দিনটির দিকে চেয়ে আছি। না লক্ষ্মীটি, ব্যথা পেয়োনা। করে ওঠেনি তো ছলছল চোখ দুটি, ভেসে ওঠেনি তো দুটি পদ্মপলাশ চোখের জলে ?

শ্রদ্ধা করি বৈকি তাঁকে, তাঁর আদেশকে। তাই না দর্শনের আশা ছেড়ে দিয়ে, কিংবা একটু চকিতদর্শন সম্বল করে, বিনিদ্র রজনীতে (ঘড়িতে দেড়টা আমার এখন) অন্ধকারের বুকে বিরহ-ব্যথা উজাড় করে দিয়ে যাচ্ছি ?

আর জান কল্যাণী, আজকাল আমার প্রায় সব রজনীই তোমায় পাওয়ার তপস্যায় এইরকম বিনিদ্রই কাটছে, শুধু পাওয়াই নয়তো, তোমার যোগ্য হয়ে পাওয়া। বিমল শুধুই পাস করেছে, আমি বিশিষ্ট হয়ে পাস করব এই আমার সংকল্প। আমার এখনও একটা সন্দেহ মনে উঁকি মারে মাঝে মাঝে—তোমার মামা বোধ হয় আমায় আর বিমলকে এখনও তাঁর মানদণ্ডে তৌল করে ভাখেন মাঝে মাঝে। তাঁর চূড়ান্ত মীমাংসা নির্ভর করবে আমার পরীক্ষার ফলাফলের ওপর। আর মাত্র আড়াইটে মাস তো। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিঙের রেজাল্ট বেরুতে তেমন বিলম্বও হয় না। আমি তাই, আজ থেকেই নয়, চার পাঁচ মাস আগে থেকেই এই কঠিন তপস্যা করে যাচ্ছি। আমি খারাপ ছেলে নয় লেখা-পড়ায় সে তুমি জানই, (খারাপ হলেই কি তোমার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হতাম ? একথা ভাবতেও যে ব্যথা পাই কল্যাণী) ভালো হয়েও আরও ভালো হওয়ার এই তপস্যা আমার। সিদ্ধিলাভ করতেই হবে আমায়। তোমার মামার হাত থেকে তোমায় নেবই কেড়ে একদিন। আমি তো আজ শুধু আমার ছোট্ট গণ্ডীটুকুর মধ্যে আবদ্ধ নয় রাণী, আমি যে আজ তোমার ভালোবাসার অসীম আকাশের মুক্ত বিহঙ্গম।

ক্লান্তি আসে বৈকি। সাহিত্যও নয়, ইতিহাস-

দর্শনও নয়, ইঞ্জিনিয়ারিঙের কর্কশ কচকচানি। তখন কি করি জান? খোলা ছাদে এসে তোমার মুখখানি কোনও জলগ্নে নক্ষত্রের দীপ্তির মাঝখানে বসিয়ে চেয়ে থাকি আকাশের পানে। তুমি তখন গভীর সুপ্তির কোলে, হয়তো কোন সুখস্বপ্ন দেখে মুখে মৃদু হাসি ফুটেছে; হয়তো কোন বেদনার স্বপ্নে কোমল হৃদয়টি গলে অশ্রু হয়ে জমে উঠেছে চোখে। এ অভাজনও কি কোনও ব্যথাতুর নিশায় স্বপ্নের আবেশে এ-অশ্রু-মুক্তার প্রসাদ পেয়েছে কল্যাণী?

এক এক দিন আকাশ থাকে ঘনঘটাচ্ছন্ন, আমার মনের মেঘই যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে প'ড়ে নক্ষত্রগুলোকে অবলুপ্ত ক'রে দেয়। তখন আমি কি করি জান? তখন, তুমি হয়তো যখন বর্ষার রিম ঝিম বীণা-গুঞ্জনে আরও গভীর নিদ্রার কোলে লুটিয়ে পড়েছ, আমার অবলম্বন তখন কবিতা। যত বিরহের কবিতার মধ্যে মিলনের প্রত্যাশা ফুটে উঠেছে, আবার যত মিলনের কবিতার মধ্যে আসন্ন বিরহের উদ্বেগ,—আমি সঞ্চয় করে রেখেছি একখানি খাতায়। পড়ি এই সময়, যখন অকরুণ আকাশ আমায় নক্ষত্রের সঙ্গটুকু থেকেও করে বঞ্চিত।

তাছাড়া লিখি। হ্যাঁ, লিখি বৈকি কবিতা আমিও। হ্যাঁ, আমিও, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন লোহা-পেটা ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, যার নাকি এতদিনে নিজেরই লোহা হয়ে যাওয়ার কথা। তুমি আশ্চর্যই হচ্ছ, কিন্তু তুমি একথা তো জাননা যে, এই লোহাই কি করে অতি উগ্রতাপে সোনার রং নিয়ে গলে পড়ে।

লিখি পদ্য আমি। তার জন্যে যে খাতা সেটিও একটি একটি করে ভরে আসছে। তোমার মেঘবর্ণের মেঘের স্তূপের মতন কেশ নিয়ে এ পর্যন্ত তেরোটি হয়েছে। বেণী শুদ্ধ। তোমার স্বভাব-কাজল-পরা টানা টানা চোখ দুটি নিয়ে সাড়ে সতেরোটি (একটি আজ এই চিঠি লেখার পর শেষ করব মনে করছি), তাছাড়া তোমার অধর-পল্লব নিয়ে জমেছে সাতটি; চাঁপার কলির মতন দশটি আঙুল দিয়ে সাজানো দুটি তুষার ধবল বাহু নিয়েও সাতটি।

তোমায় কিছু তুলে দিতে পারতাম এখানে, কিন্তু কেন দিলাম না জান রাণী? বলি তোমায়—চিঠি জিনিসটাই পড়বার; একজন লিখবে, একজন পড়বে। চিঠি হোল দুটি হৃদয়ের মৌন আলাপন। কবিতা হোল অন্য জিনিস, একজন পড়বে, একজন শুনবে। কবিতা যে সঙ্গীত, মধু-উৎসারী শ্যামনাম—কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে প্রবেশ করবার জিনিস।

তাই আমার কবিতা তোমার শোনাবার জন্যেই রেখে দিয়েছি।

কবে শুনবে বলে অধীর হয়ে উঠেছ? আমি তোমায় শোনাব আমার জীবনের সব চেয়ে শুভলগ্নে, আমাদের প্রথম মিলন-বাসরে। তুমি থাকবে সেদিন ফুলের সাজে, ফুলের রাজ্যে ফুলের রাণীর মতন শুয়ে, আমি মুগ্ধ ভ্রমর তোমার কানে আমার কবিতার মৃদু গুঞ্জন বর্ষণ করে যাব।

অধীর আগ্রহে চেয়ে আছি। আজ শুধু আমার ভালোবাসা পাঠিয়ে দিলাম।

একান্ত তোমারই

অমিত

দুই

১২.২.৭০.

কল্যাণী,

তুমি ছিলেনা মাসখানেক, তবে এসে নিশ্চয় সব কথা শুনেছ; এখন আমার কথাটা শোনবার প্রতীক্ষায় আছ। আমি কিন্তু কি ভাবে কোন্‌খানে যে আরম্ভ করব যেন বুঝে উঠতে পারছি না। হ্যাঁ, আমি আমার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছি বটে; দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করে আমি পরীক্ষায় প্রথম স্থানই অধিকার করে

বেরিয়ে এসেছি; কিন্তু আমার সিদ্ধি আমায় আমার পুরস্কার এনে দিতে পারল না। যখন পারলই না তখন তা নিয়ে অনুতাপ আর নিরর্থক বাগ্‌বিস্তার করে কি হবে? সংক্ষেপেই জানাই তোমায় আমার মনের প্রতিক্রিয়াটুকু।

হ্যাঁ, আমার রেজাল্ট্ বের হওয়ার পর বাবা তাঁর ডিম্যাণ্ডের ওপর আরও কিছু বাড়িয়েছেন (মাত্র তিন হাজার টাকা)। এ-কথাও সত্যি যে, আমার নূতন যেখানে সম্বন্ধ হচ্ছে (এবং এক রকম ঠিক) তাঁরা তোমার মামার নগদের ওপর তিন হাজার টাকা বেশি ছাড়া দান সামগ্রী এক রকম ঢেলে দিচ্ছেন—খাট-বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, গডরেজ, রেডিওগ্রাম, ট্রানজিস্টার, মোটর-বাইক; আর সবই দামী দামী। বেশ বোঝা যায়, পাত্রপক্ষ এবং পাত্রকে লুব্ধ করার জন্যেই। তারা হোল কিনা লুব্ধ এ-কথা তো কেউ জিজ্ঞেস করবে না, হয়েছে বলেই তো ধরে নেবে?

সমস্তটাই সামলে যেত যদি তোমার মামা বাবার কথাটুকু মেনে নিতেন; কিন্তু তিনি তো আমার তপস্যার একেবারেই কোন মর্যাদা দিতে চাইলেন না; এইখানেই বাধল গোল। এখন দুজনের মধ্যে জেদা-জেদি দাঁড়িয়ে গেছে, বাবাও তাঁর বর্ধিত ডিম্যাণ্ড ন্যায্য বলেই মনে করেন, তোমার মামাও পূর্বে থেকে যা ঠিক হয়ে ছিল তার ওপর একটি পয়সা বাড়াতে রাজি নয়।

এই নিয়ে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটেছে কল্যাণী। আমি যদি বাবাকে তাঁর পূর্বের ডিম্যাণ্ডেই স্থির থাকতে অনুরোধ করি, অর্থাৎ মাকে দিয়ে বলাই তো তিনি যে শুনবেন না এমন মনে হয় না, তাঁর একমাত্র সন্তানের জীবন-মরণ নিয়ে অনুরোধ। কিন্তু অনেক ভেবে দেখেছি নিজের স্বার্থে পিতা-হেন গুরুজনকে তাঁর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করা ঠিক হবে না। তুমিও তো তোমার মামাকে পিতার চেয়েও বড় স্থান দাও; ভেবে দেখলাম সেক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তাঁর জিদই বজায় থাকে সেই ভালো। তাতে বিমলই জয়ী হয় তো হোক।

এ দুঃখের চিঠি (এবং শেষ চিঠি) এইখানেই শেষ করি।

ভাগ্যহীন
অমিতাভ

●★★সম্পূর্ণ উপন্যাস★★●

●●★★গৌতম সেন★★●●

১
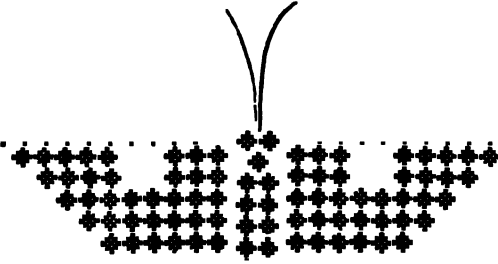
কি কুক্ষণে অরিন্দম কাশ্মীর গিয়েছিল। গিয়েছিল বেড়াতে। এই বেড়াতে যাওয়াই তার কাল হলো। ফিরে এলো যেন সে আর এক মানুষ! এ-অরিন্দম যেন সে-অরিন্দম নয়। কিন্তু চিরকাল তো সে এমন ছিল না। সে ছিল সাধারণ মানুষের মতোই সদা-হাস্যময়, আমোদপ্রিয়। অগণিত বন্ধু-বান্ধবের সে ছিল মধ্যমণি। সে কোনোদিনই এক জায়গায় বসে থাকেনি, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো ছিল তার নেশা। যেমন মজবুত তার দেহ, তেমনি সুন্দর সুশ্রী তার গড়ন। ঘন কালো চুল, আয়ত চক্ষু তার বৈশিষ্ট্য। সেই চোখ যেমন উজ্জ্বল তেমনি আর্দ্রতার স্নিগ্ধ। দেখলেই তাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করতো। খেলাধুলাও তার প্রিয় ছিল। সব খেলাই সে জানতো। বন্ধুরা একদিন তাকে মাঠে নিয়ে গেল। সেদিন মোহনবাগানের খেলা ছিল, কিন্তু পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই সে মাঠ থেকে চলে এলো। বন্ধুরা অবাক হয়, কত প্রশ্ন করে। বলে, ভাল লাগে না। কিন্তু কেন লাগে না, সেখানেই সে নিরুত্তর। মা কত কথা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু কিছুই সে বলে না, অথবা বলতে চায় না।

ডাক্তার এলো, কিন্তু রোগ যে কি তাই ধরা গেল না। টাকার অভাব ছিল না। কলকাতা শহরের বড় বড় ডাক্তারকে ডাকা হলো। পরামর্শ অনেক হলো, ওষুধও অনেক এলো, কিন্তু কিছুই হলো না।

মা তার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, বুঝবার চেষ্টা করেন, শেষে কেঁদে ফেলেন। বন্ধুরা গোপনে

অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে। শেষে এক বন্ধু ধমক দিয়ে বলে, প্রেমে পড়েছিস? সত্যি কথা বল।

অরিন্দমের সেই শূন্য দৃষ্টি। মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ে, কিন্তু কথা বেরোয় না। মা বললেন, কেউ কি ওষুধ খাওয়ালো? এইবারে অরিন্দম চিৎকার করে বলে উঠলো: না।

মা বলেন, তবে কি হয়েছে বল?

আর কথা নাই অরিন্দমের মুখে।

মা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসান, সেদিকে অরিন্দম চেয়েও দেখে। কিন্তু কথা বলে না। অথচ এই অরিন্দম আগে মায়ের কান্না সহ্য করতে পারতো না। ছোটবেলা থেকে সে এই মাকেই দেখে আসছে, বাবা কি বস্তু সে জানে না। শিশুকাল থেকেই সে পিতৃহীন। সেই মার কথা মনে করে তার কষ্ট হয়। বুঝতে সে সবই পারছে। সে সব হারিয়ে বসলেও স্মৃতি হারায়নি।

কেউ বলে, পাগল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পাগলামির কোনো লক্ষণই নাই। তবে কি? জ্বর নাই, কাসি নাই, কিন্তু ক্ষয় আছে। সে-দেহ যেন অর্দ্ধেক হয়ে গিয়েছে। একদিন যার মুখে কথার খই ফুটতো, আজ সে কথা বলতে ভুলে গিয়েছে। বিষণ্ণতায়-মাখা মুখখানা, অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে সে বসে আছে। নিঃসঙ্গতায় কঠিন মুখমণ্ডল।

কতবার তার মনে হয়েছে, এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সে চলে যায়। কিন্তু সেখানেও তো এই মনই যাবে। মনকে কোথায় রেখে আসবে?

কত জনের উপদেশ, কিছুতেই কিছু হয় না। দিন দিন সে মনমরা হয়ে যাচ্ছে। ঘরদোরের দিকে যত্ন নেই। অথচ একদিন এই ঘরই ছিল আসবাব-পত্রে বোঝাই। তার রুচিও ছিল, আজ তার ঘরের দিকে চাইলে সেটা বোঝা যায়। আজ সেদিকে কে দৃষ্টি দেবে? ফুলদানীতে কবেকার-রাখা ফুলের তোড়া আজ শুকিয়ে পড়ে আছে। শিল্পীর হাতের ভাল ভাল ছবি ফ্রেমেই ঝুলছে, ধুলোয় তাদের চেনা যায় না। চাকর আছে, কাজও করে, যেটুকু না করলে নয়। বইগুলো যেখানে-সেখানে ছড়ানো। টেবিলের ওপর রয়েছে একটা অসমাপ্ত চিঠি, আজ তার রং বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। ঘর নয় যেন কবরখানা। কবরের মতোই ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এসে লাগে।

তবু ভাল লাগে অরিন্দমের। মনে হয় আরামেই আছে। এমন আরাম সে বুঝি আর কোনোদিনই পায়নি। আজ মনে হয়, এই নিস্তব্ধতা, এই বিষণ্ণতা এই এলোমেলোভাব সে চিরকালই দেখে আসছে।

এমন তরুণ বয়স, এমন সুশ্রী ধনবান—সুখী হবার সকল উপকরণই যার মধ্যে ছিল, সে পারলো না জীবনে সুখী হতে— এই আশ্চর্য॥

আবার ডাক্তার আসে—আবার নতুন করে পরীক্ষা সুরু হয়। অদ্ভুত রোগ—ডাক্তারও কৌতূহলবোধ করেন। যত্নের ত্রুটি নেই, সেবার ত্রুটি নেই—ওষুধেরও কমতি নেই। মুখ বুজে অরিন্দম ওষুধ গিলে যায়—কোনো বিরক্তি নেই, বিক্লান্তি নেই। এদিক দিয়ে অরিন্দমের আশ্চর্য সহ্যশক্তি। বিরক্তিকর পরিবেশকেও সে আশ্চর্যরকমে পরিপাক করছে। ডাক্তাররা বলেন, ও যদি রাগ করতো, তা হ'লেও পথ পাওয়া যেতো।

কিন্তু রাগতে সে জানে না, অথবা রাগতে সে ভুলে গিয়েছে।

এখন দরকার প্রকাণ্ড একটা বিস্ফোরণের। বড় আঘাতে স্নায়বিক পরিবর্তন হলেও হতে পারে। কিন্তু সাহস করে সে-পরীক্ষা করাও বিপজ্জনক। ডাক্তাররা হতাশ হলেন। রোগ-বিজ্ঞানে এ-রোগ ধরা পড়ে না, এ কি রোগ? না পড়বারই কথা। ডাক্তাররা শব-দেহের ব্যবচ্ছেদই করে এসেছেন, আত্মার ব্যবচ্ছেদ করেন নি।

কিন্তু আত্মাকে যে জানে এমন গুণীর সন্ধানও পাওয়া গেল। তিনি ডাক্তার নিরালম্ব। বাড়ি তুর্কিস্থান। জাতিতে মুসলমান। বহুকাল থেকেই ভারতবর্ষে আছেন। সবাই বলে ডাক্তার নিরালম্ব যাদু জানেন।

অনেক চেষ্টা করে নিরালম্বকে বাড়ি নিয়ে এলো অরিন্দম।

॥ ২ ॥

নিরালম্বর অদ্ভুত চেহারা অরিন্দমের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রোদে-পোড়া তার গায়ের রং, মাথার প্রকাণ্ড খুলিটা মুখখানাকে যেন গ্রাস করে আছে। মাথায় চুল নেই। আর সবচেয়ে চোখে পড়ে ডাক্তারের চোখ। একটা কংকালের মুখে যেন জ্যান্ত মানুষের চোখ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পোষাকও অদ্ভুত। সেকেলে ডাক্তারি পোষাকের মতো একটা কালো কাপড়ের কোর্তা আর পাজামা। তাও জামাটা ভাল হয়ে গায়ে বসেনি—যেন কাঠের ওপর ঝুলছে। দেহের এই অসাধারণ শীর্ণতা দেখলেই ভারতের যোগীদের কথা মনে হয়।

অরিন্দম ইংগিতে ডাক্তারকে বসতে বললেন।

ডাক্তার বসলেন চেয়ারের ওপর হাঁটু দুমড়ে। মনে হলো এইভাবে হাঁটু-দুমড়ে বসাই তাঁর অভ্যাস।

ডাক্তার তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অরিন্দমকে দেখতে লাগলেন। ভয়াবহ সে-দৃষ্টি। অরিন্দমের মনে হলো, সে-চোখ দিয়ে জলন্ত ফস্‌ফরাস নির্গত হচ্ছে। ডাক্তার হাত দেখতে চাইলেন, অরিন্দম ভয়ে ভয়ে তার হাতটা বাড়িয়ে দিলো। ডাক্তার সেই হাতখানাকে এমনভাবে চেপে ধরলেন—অরিন্দমের মনে হ'লো, সেই নির্মম পেষণে তার আত্মা বুঝি বাইরে বেরিয়ে আসছে। ভয়ে অরিন্দম শাদা হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার তার হাত ছেড়ে দিলেন। বললেন, আপনার আত্মা অলক্ষিতে আপনার দেহ থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। এখন সেই আত্মা রয়েছে আপনার শরীরের মধ্যে একটি সূত্র অবলম্বন করে।

অরিন্দম বিস্মিত হ'লো না। বললে, আমি জানি না, আপনি আমাকে সারাতে পারবেন কি না—অবশ্য সেরে উঠতে আমার ইচ্ছেও নেই। কিন্তু একথা আমি স্বীকার করছি, আপনি আমার রোগের রহস্যটা ধরতে পেরেছেন। আমার শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে ডাক্তার! ঝাঁঝরার ছিদ্র দিয়ে যেমন জল বেরিয়ে যায়, আমার 'আমি'টাও তেমনি শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন অসীমের সঙ্গে মিশে যাচ্ছি। আমি সবই করছি, কিন্তু সে-আমি নয়। যেন জীবনটা আমার কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছে। আমার কোনো কাজেই আমি নিজে যোগ দি'না—খেতে বসি, খেয়ে যাই কিন্তু কোনো স্বাদই পাই না। সূর্যের আলো আমার কাছে চাঁদের আলোর মতো ফ্যাকাশে। আগুনের শিখা আমার চোখে কালো দেখায়। গ্রীষ্মের গরমে আমার শীত করে—একটা মহা নিস্তব্ধতা, যেন হৃৎপিণ্ডটা পর্যন্ত থেমে গিয়েছে।

ডাক্তার মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়েন। চিন্তা এমন একটা শক্তি যা প্রুসিক এসিডের মতো, লাইড বোতল নিঃসৃত স্ফুলিঙ্গের মতোই মারাত্মক—যদিও চিন্তাজনিত ক্ষতিগুলো সচরাচর বিজ্ঞান-ব্যবহৃত বিশ্লেষণের দ্বারা ধরা যায় না। আচ্ছা, আপনি কি কখনো খুব বড় রকমের দুঃখ পেয়েছেন? বা কোনো উচ্চাভিলাষ ছিল যা আপনার পূর্ণ হয়নি? একটা নৈরাশ্য যা জীবনভোর আপনি রোমন্থন করে চলেছেন? কিংবা প্রভুত্বের তৃষ্ণা? মানুষের যা সাধ্যাতীত এমন কোনো সংকল্প আপনার ছিল যা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন? যদিও ত্যাগের বয়স আপনার হয়নি। আচ্ছা, কোনো রমণী কি আপনাকে প্রবঞ্চনা করেছে?

অরিন্দম ঘাড় নাড়ে।

ডাক্তার ধমক দিলেন। বললেন, আপনার ঐ নিষ্প্রভ চোখ আর আপানার দেহের নিরুৎসাহ ভঙ্গির মধ্যে, আপনার কণ্ঠের বিকৃত আওয়াজের মধ্যে লুকোনো রয়েছে একটা বিরাট ট্র্যাজেডি।

অরিন্দম আর কোনো উত্তর দিতে পারলো না। সে যেন আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বসে রইলো।

ডাক্তার আরো এগিয়ে এসে তার সামনা-সামনি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলেন। বললেন, আমার কাছে তোমার মনের দ্বার খুলে দাও—আমি তোমার ডাক্তার, তুমি এখন আমার অধীন। আমি তোমাকে আদেশ করছি, সব কথা আমার কাছে খুলে বলো।

অরিন্দম ম্লান হাসলো। বললে, এতে কি লাভ? ধরে নেওয়া যাক্‌, আপনি আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝেছেন—কিন্তু আমি জানি, আপনার কাছে আমার কষ্টের কথা খুলে বললে, কোনো প্রতিকারই আপনি করতে পারবেন না। আমার যে কষ্ট, তা বাক্যের অতীত। কোনো মানুষের সাধ্য নেই—

ডাক্তার হাসলেন।

অরিন্দম সাহস করে বললে, আমি জানি, আপনি কিছুই করতে পারবেন না। তবু আপনাকে আমি খুলে বলবো। অন্তত দেখে যাবো, আমার বেলায় আপনার যোগ-শক্তি ব্যর্থ হলো।

ডাক্তার হাসলেন।

অরিন্দম সোজা হয়ে বসলো। বললে, সত্যি ডাক্তার, আমি প্রেমের যন্ত্রণাতেই মারা যাচ্ছি। আমার এই বিবরণে কোনো অদ্ভুত ব্যাপার কিংবা রোমান্টিক কিছু প্রত্যাশা করবেন না। অতি সাধারণ ঘটনা যা সচরাচর হয়ে থাকে। তবে শুনুন বলি—

গতবার গ্রীষ্মের শেষভাগে আমি কাশ্মীর বেড়াতে যাই। বেড়ানো আমার একটা নেশা। যখন-তখনই বেরিয়ে পড়ি। টাকাও আছে, সময়েরও অভাব নেই। কাশ্মীর আমার খুব ভাল লাগলো—বিশেষ করে তাদের নাগরিক জীবন। বেশির ভাগ পরিবার বোটেই কাটাতো—সেই তাদের ঘর-বাড়ি। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ অদ্ভুত। ভাল লাগতো তাদের আমোদ-প্রবণ চালচলন, কথাবার্তা, রং-তামাসা। কাশ্মীরে অনেকদিন ছিলাম। শুধু ঘুরে বেড়াতাম। ঘুরে ওরাও বেড়ায়। সর্বত্রই জটলা।

এমনি করে কয়েকমাস বেশ কেটে গেল। কিন্তু সে সুখের দিন স্থায়ী হলো না। একদিন একটা খুব জমকালো খোলা গাড়ি আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নামলেন এক অনুপমা রূপবতী রমণী। আমি সেই বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম, তাই অমন ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। গেটের সামনেই সিপাই-বরকন্দাজ। তারা সেলাম করে দাঁড়ালো। গেট পার হলেই সুদৃশ্য বাগান। এই বাগানের পশ্চাতে প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। রমণী সেই বাগান পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি এমন অপরূপ সুন্দরী আর কখনো দেখিনি। তার পরিচ্ছদের জৌলুষ দেহ-সৌন্দর্যের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে। তার ললাটদেশ তুষার-শুভ্র, নেত্র-পল্লবের দীর্ঘ-পক্ষ-রাজিতে তার নীলাভ চক্ষু অর্ধ-আচ্ছন্ন। চিত্রকর সে-রূপ ফোটাতে পারে না—সে রূপসৃষ্টি মানব-কল্পনার বাইরে।

ডাক্তার, এই অপরূপ লাবণ্যময়ীকে আমি ভালবাসলাম। কিন্তু সে আমার কাছে আকাশের চাঁদ—শুনলাম, ইনি বেগম জেবউন্নিসা। এঁর স্বামী বিখ্যাত নবাব ওয়াজেদ্‌ আলী। সম্প্রতি ইয়োরোপ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

তবু আমি আশা ছাড়লাম না। অনেক কৌশল ক'রে একদিন দেখা করবার অনুমতি পেলাম। আমার চোখ ঝলসে গেল। আমি আত্মহারা হয়ে পড়লাম। বেগম ছাড়া তখন আমার কোনো চিন্তা নাই। এমনি করেই তিনি আমার মন অধিকার করেছিলেন। সারাক্ষণ তাঁর নামই জপ করতাম। এই চিন্তা থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা যে না করেছি এমন নয়, কিন্তু পারিনি। জানি তাকে কোনোদিনই পাবো না—সে চেষ্টাও আমার বৃথা। তবু নিজেকে বিলিয়ে দিলাম। আমি ভালবেসেই তুষ্ট ছিলাম, সে ভালবাসার প্রতিদান আমি চাইনি।

ডাক্তার নিরালম্ব তার কথা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন—কেন না, তাঁর কাছে অরিন্দমের এই আত্মকাহিনী শুধু তো একটা রোমান্টিক গল্প নয়।

অরিন্দম বললে, তারপর শুনুন—

বেগমকে দেখে আমার তৃপ্তি হচ্ছিলো না—মনে হতো, বার বার যাই, সেখানেই পড়ে থাকি। তাই সময়ের হিসেবও আমার ছিল না। একদিন অসময়েই গিয়ে পড়লাম। বেগম তাঁর বৈঠকখানায় ছিলেন না—তাঁকে পেলাম, বাগানের এক নিভৃত অংশে।

ঝাউবনের আড়ালে একটি বেতের কৌচে বেগম অর্ধ-শায়িতা। চোরের মতোই গিয়ে পড়েছিলাম। কি সুন্দরই তাঁকে দেখাচ্ছিল। ভারতের শুভ্র স্বচ্ছ মসলিন-বস্ত্রে তাঁর দেহ আবৃত। যেন সাগরের অপ্সরা সাগরের ফেনপুঞ্জে পরিস্নাত। পা পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে সেই শুভ্র বসন। সেই বসনের অন্তরাল থেকে ফুলের মতো শুভ্র বাহুযুগল বেরিয়ে এসেছে। কটিদেশে একটি কালো ফিতে বাঁধা—ফিতের প্রান্তভাগ সবুজ ঘাসের ওপর ঝুলছে।

বই পড়ছিলেন। আমাকে দেখে পড়া বন্ধ করলেন। মাথা নেড়ে ইসারায় আমাকে বসতে বললেন।

বেগম একাকী ছিলেন। এমন অনুকূল অবস্থা বড় একটা পাওয়া যায় না।

কয়েকটা মিনিট। নিস্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্ত; কিন্তু কি দীর্ঘ সেই মুহূর্ত—কি কষ্টদায়ক সেই ক্ষণমুহূর্ত। কথা বলতে চাই, কিন্তু বলতে পারি না। বেশ বুঝতে পারছি, এমন সুযোগ আর পাবো না, তবু যেন সকল কথা আমার হারিয়ে গেল।

কি করেছিলাম জানি না, হঠাৎ দেখি, বেগম তাঁর কৌচের ওপর উঠে বসে ইঙ্গিতে আমার মুখ বন্ধ করতে বললেন: একটি কথাও বলো না অরিন্দম, তুমি আমাকে ভালবাসো—আমি জানি, আমি বেশ অনুভব করি—বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যে তা চাই না অরিন্দম—চাইতে পারি না। কারণ ভালবাসা ইচ্ছাধীন নয়। অন্য কেউ হলে তোমার ওপর হয়ত রাগ করতো, কিন্তু আমি তা পারি না। আমি ভালবাসতে পারছি না বলে দুঃখ পাচ্ছি। আমি তোমার দুর্ভাগ্যের কারণ হলাম এই আমার একমাত্র দুঃখ। আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হওয়াই ভাল ছিল। কি কুক্ষণেই আমি কলকাতা থেকে কাশ্মীরে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম, তোমাকে উপেক্ষা করলে তুমি হয়ত দূরে সরে যাবে, কিন্তু তুমি তা গেলে না। আমি জানি প্রকৃত ভালবাসা—যার সবকিছু চিহ্ন তোমার চোখে আমি দেখেছি, সে-ভালবাসা যে কোনো বাধাই মানে না, কোন কিছুতে দমে না সেও আমি জানি। কিন্তু আমার অন্তঃকরণের এই কোমলভাব, তোমার মনে যেন কোনো বিভ্রম না আনে, কোনো স্বপ্ন না জাগায়। তোমাকে অনুকম্পা করছি বলে মনে করো না, তোমার প্রেমে আমি উৎসাহ দিচ্ছি। হয়ত তোমার এই সৌন্দর্যে আমিও প্রলুব্ধ হতাম, কিন্তু এক জ্যোতির্ময় দেবদূত আমাকে সমস্ত প্রলোভন থেকে সবসময় রক্ষা করছেন—তিনি ধর্ম থেকেও শ্রেষ্ঠ। এই দেবদূত কে জানো? আমার স্বামী—যাঁকে আমি দেবতার মতো পূজা করি।

এই অকপট আন্তরিক পতি-ভক্তির কথা শুনে আমার চোখে জল এলো। আর সেই সঙ্গে আমার জীবনের মর্মগ্রন্থিটিও যেন ছিন্ন হয়ে গেল।

আমার অবস্থা বেগম বুঝেছিলেন—বেশ বুঝতে পারলাম, তিনি আমার কষ্টে বিচলিত হয়েছেন, নারী-সুলভ স্নেহ-মমতায় তাঁর হাতের রুমাল দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিলেন। বললেন, ছিঃ, কেঁদো না। আর কোনো বিষয় ভাবতে চেষ্টা করো—মনে করো, আমি চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছি, আমি মরে গিয়েছি। আমাকে ভুলে যাও। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে বেড়াও, কাজ করো, লোকের উপকার করো—সচেষ্টভাবে বিশ্বমানবের কাজে যোগ দাও। কিংবা আর্টের চর্চা করো, আর কাউকে ভালবেসে মনকে শান্ত করো।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বেগম আবার বললেন, তুমি কি মনে করো, আমার সঙ্গে এইভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করলেই তোমার কষ্টের লাঘব হবে? বেশ, তুমি এসো—আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু এতে জ্বালাই বাড়বে। না-পাওয়ার কষ্ট তুষানলের সমান। তাই আমার মনে হয়, বিচ্ছেদই এর একমাত্র ওষুধ। দেখবে, দু-বছর পরে আমরা সহজভাবে মিশতে পারবো।

ডাক্তার, তার পরদিনই আমি কাশ্মীর ত্যাগ করলাম।

ডাক্তার বললেন, তারপর বেগমের সঙ্গে আর কি দেখা হয়েছে?

অরিন্দম উত্তর দেয়, না। যদিও তিনি থাকেন এই কলকাতাতেই - আলিপুরে।

ডাক্তার একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার কথা আমি বেশ মন দিয়ে শুনলাম এবং এও বুঝলাম, তোমার পক্ষে এখন কোনো আশা করা পাগলামী।

অরিন্দম বলে, তবে? আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা কেন ডাক্তার?

ডাক্তার বললেন, সাধারণ উপায়ে তোমাকে বাঁচাবার কোনো আশা নেই। কিন্তু সে ছাড়াও তোমার বাঁচবার ব্যবস্থা আছে। এমন সব গুহ্যতত্ত্ব ও নিগূঢ় শক্তি এই পৃথিবীতে আছে, যার সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান একেবারে অনভিজ্ঞ। মূর্খ সভ্যতা যেসব দেশকে অসভ্য বলে, সেসব দেশেই আছে এই গুহ্যবিদ্যার চর্চা—এ চর্চা তাদের বংশপরম্পরায় চলে আসছে। বুঝতে পারছো, আমি কোন্ দেশের কথা বলছি? ভারতবর্ষ তার নাম। ভারতের তপস্বীরা আধ্যাত্মিকতার কত উঁচু স্তরে উঠেছেন তা সাধারণ মানুষ ধারণা করতেও পারবে না। কত কত বৎসর ধরে দুঃসাধ্য আসন রচনা করে তাঁরা বসে আছেন—বড় বড় হাতের নখ হাতের তালুতে গিয়ে বিঁধেছে, না আছে অনুভূতি, না আছে চৈতন্য। যেন ইজিপ্সিয়ান ম্যামি এক-একটা। কি কৃচ্ছ্রসাধনা তাঁদের! কেউ সূর্য-তাপে পুড়ছেন, কেউ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে বসে শরীরকে শোষণ করছেন। সারা ইউরোপ যা ভাবতেও পারে না। আর জানেই বা কজন! তুমিই কি জানো তোমার দেশের এই মুনি-ঋষিদের কথা? আমি কিন্তু শুনেছিলাম সুদূর তুর্কিস্থান থেকে।

আমি দেখেছি তাঁদের বাহ্যাবরণটা যেন প্রজাপতির খোলস। প্রজাপতির মতো তাঁদের অমর আত্মা ইচ্ছামত দেহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, আবার দেহে প্রবেশ করতেও পারে। এই আত্মা সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ইচ্ছামত গগনাতীত উচ্চপ্রদেশে অলৌকিক জগতে উড়ে যেতে পারে। অনন্তের সাগরবক্ষে যুগ-যুগান্তের যেসব তরঙ্গ উঠে বিলীন হয়ে গিয়েছে, তারা যোগানন্দের উচ্ছ্বাসে সেইসব তরঙ্গের অনুসরণ করেন। তাঁরা বিধাতার সৃষ্টিকার্যেও সাহায্য করছেন—এক কথায় তাঁরা অসীমের মধ্যে বিচরণ করেন। প্রলয়ের মাঝে যেসব বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, সেইসব বিজ্ঞান এবং আদিম মানব ও পঞ্চভূতের বিবরণ তাঁদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই উদ্ভট অবস্থার মধ্যে তাঁরা এমন এক ভাষা ব্যবহার করেন, যে ভাষায় আর কেউ কথা বলে না। সেই আদিম শব্দ-ব্রহ্মকে আবার তাঁরা পেয়েছেন—যে-শব্দব্রহ্ম পুরাতন অন্ধকারের মধ্য হতে, একদিন আলোকের উৎসধারা ছুটিয়ে দিয়েছিল। লোকে আজ তাদের পাগল বলে।

অরিন্দম বুঝতে পারে না, একথার সঙ্গে তার চিকিৎসার কি সম্বন্ধ!

ডাক্তার তার মনের ভাব বুঝতে পারলেন। বললেন, শোনো বলি: পরীক্ষাগারে শবদেহের ওপর ছুরি চালিয়ে এতকাল ক্লান্ত করেছি—কোনো সাড়া তার থেকে পাইনি। জীবনকে খুঁজতে গিয়ে কেবল মৃত্যুকেই দেখতে পেয়েছি। তাই আত্মাকে জানবার একদিন কৌতূহল হলো। ইচ্ছা হলো, তাকে বিশ্লেষণ করবো, শবচ্ছেদের মতো তাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখবো। কতকগুলো আকারের ওপর পরীক্ষা করা, কতকগুলো বিচ্ছিন্ন পরমাণুরাশির ওপর অনুসন্ধান চালানো—এ তো স্থূল প্রত্যক্ষবাদের কাজ। তাই একদিন বেরিয়ে পড়লাম। এলাম ভারতবর্ষে। জানি ভারতবর্ষ ছাড়া এ বিদ্যা আমাকে কেউ দিতে পারবে না। কিন্তু আমি জাতিতে মুসলমান। তুর্কিস্থানে আমার বাড়ি। আমার পক্ষে এ আশা করা দুরাশা। তবু আমি আশা ছাড়লাম না। তারপর ভারতবর্ষ এসে প্রথমেই আমি সংস্কৃত ও প্রাকৃত শিখতে লাগলাম।

নইলে ভারতীয় শাস্ত্রে অনুপ্রবেশ করবো কি করে? তারপর ভারতের সর্বত্র যোগীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ক্রমে ক্রমে আমার চোখ খুলতে লাগলো। একদিন বুঝতে পারলাম, আমরা কতকগুলো আকার বই আর কিছুই নই—আসলে আত্মাই জড়চালক।

একদিন এক সিদ্ধপুরুষের সন্ধান পেয়ে দুর্গম পর্বতগুহায় প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তিনি বসে আছেন—মৃত, না জীবিত বুঝতে পারলাম না। গায়ের চামড়ায় কষ ধরেছে। চর্ম অস্থি-লগ্ন। চুল জট পাকিয়ে পিছনে ঝুলে পড়েছে, দাড়ি দুভাগে বিভক্ত হয়ে লুটোচ্ছে, হাতের নখগুলো বেঁকে ঘুরে গিয়েছে।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর এই সিদ্ধপুরুষের সেবা করেছি। তুমি নিশ্চয় শুনেছো, এইসব মুনি-ঋষিরা তাঁদের ইচ্ছামতো আত্মাকে দেহ-বিমুক্ত করতে পারতেন। আমি দেখেছি, দিনের পর দিন তিনি এইভাবে অন্যত্র বিচরণ করতেন। আমাকেই সেই পবিত্র দেহ রক্ষা করতে হতো।

এইভাবে সেবা করেই চলেছি। তিনিও নিশ্চিন্ত হয়ে দেহ রেখে চলে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। আমাকে কোনো প্রশ্নও করেন না—কি চাই আমি, সেকথা আমরাই বুকে গুমরে মরে। সাহস করে যেদিন বললাম, তিনি শুনে হাসলেন। বললেন, আগে নিজেকে প্রস্তুত করো—কঠোর সাধনা। প্রথমে অভ্যাস করো অনাহারে থাকতে।

বললাম, কি খেয়ে বাঁচবো তাহলে?

—জল আর বাতাস।

এই সাধনাই চললো কিছুদিন ধরে। তারপর সুরু হ'লো প্রাণায়াম কুম্ভক। এই কুম্ভকের মধ্যেই আছে প্রাণ-শক্তি। প্রাণকে ইচ্ছামত দেহের যে-কোনো স্থানে নিবদ্ধ করার মধ্যে যে কি আনন্দ—সে বলে বোঝানো যায় না।

প্রাণ তখন আমার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছামত প্রাণের গতি স্তব্ধ করে বসি। ঠিক মরা-মানুষের মতো। কোনো স্পন্দন নাই। বুকের স্পন্দনও স্তব্ধ। এ নেশা আমাকে পেয়ে বসলো। তিনি বললেন, ব্যস্ত হয়ো না। সংযম হ'লো বড় বিদ্যা। সেই সংযম তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। চললো সংযমশিক্ষা।

এরপর শুরু হলো আমার দেশ-ভ্রমণ। বললেন, ভারতবর্ষকে জানো। এই ভারত-আত্মার সঙ্গে পরিচয় না হলে সকল সাধনাই বৃথা। আমাকে বের করে দিলেন ভারতের পথে। আমাকে মানে আমার আত্মাকে। আমার দেহ রইলো তাঁরই কাছে।

দেখলাম, কায়া দুরকম। মৃন্ময় ও চিন্ময়। মৃন্ময়ের সীমা এই দেহেরই মধ্যে। চিন্ময় কায়াকে কর্মজ্ঞান ও প্রেমের দ্বারা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পারা যায়। নিস্বার্থ নিষ্কাম অহেতুক ব্যাপ্তির মূলে চাই বৃহৎ বীর্য ও সাধনা। মানুষের সাধনা কি? এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা। প্রদীপ যেমন আপন মৃৎপাত্রে যতদিন সীমাবদ্ধ ততদিন সে সুখেই থাকে। যে মুহূর্তে সে আলোক-পরিবেশনের দ্বারা আপনাকে বহুদূরে ব্যাপ্ত করতে চায় তখন থেকেই তাকে আপন সকল সঞ্চয় ক্ষয় করে পলে পলে জ্বলে মরতে হয়। অথচ এই ব্যাপ্তি ছাড়া তার সার্থকতাই নাই। সাধুরা তো তাই করছেন দেখলাম। বাঁচবার চেষ্টাতেও মানুষ অনেক সময় মরে। মানুষের প্রাণান্তিক উদ্যম দেখা যায় এমন কিছুর জন্যে, যার সঙ্গে বাঁচবার প্রয়োজনের কোনো যোগই নেই।

আমার উদ্যম দেখে তিনি খুব সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, এইবারে হবে তোমার সাধনা সুরু। সে কি কঠিন তপস্যা। চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে শীর্ষাসনে অবস্থান। বললেন, অনুভূতিকে লোপ করো। ঝলসে গেল দেহের চামড়া।

অরিন্দম অধৈর্য হয়ে উঠলো। ভাবলো, আমার চিকিৎসার সঙ্গে এসবের কি সম্বন্ধ। কিন্তু শুনতে হয়।

তিনি বললেন, আত্মার বিনিময় হয় শুনেছো? তোমাদের শঙ্করাচার্য মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করেছিলেন। এও সাধনাসাপেক্ষ। তোমার আত্মা

আমার দেহে, আমার আত্মা তোমার দেহে যোগশক্তি-বলে অনায়াসে চালনা করা যায়।

আমি এই গুপ্তমন্ত্র তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা করেছি। এ বিদ্যা সকলে পায় না—আমি ভাগ্যক্রমে পেয়েছিলাম। তুমি আশ্চর্য হবে, আমি আত্মাকে অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। শুধু নিজের আত্মা নয়—তোমার আত্মাকেও পারি অন্যদেহে চালিত করতে। যে কোনো জীব বা জন্তু—

অরিন্দম ব্যাকুল হয়ে বললে, এখন আপনি কি বলতে চান?

—অবশ্য একথা আমি বলবো, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা মানুষের উচিত নয়। মৃত্যুরও আছে যুক্তিসঙ্গত হেতু। এই মৃত্যুতে যদি বাধা দেওয়া যায়, তাহলে সমস্ত বিশ্বযন্ত্রে একটা বিশৃংখলা উপস্থিত হবে। এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছো, ডাক্তার নিরালম্ব একজন সৃষ্টিছাড়া লোক, বাতিকগ্রস্ত লোক—যে-বাতিক তোমাদের এই ভারতবর্ষ থেকে অর্জন করেছে।

(৩)

ডাক্তার যে-বাড়িতে বাস করতেন, সে-বাড়িটি একতলা। তার চারদিক পাইনগাছ দিয়ে ঘেরা। এই বালিগঞ্জের বাড়িতে তিনি অনেকদিন থেকে বাস করছেন। নিয়ত অগ্নিকুণ্ডে সাধনা করে করে তাঁর সেই-তাপই দেহের অনুকূল হয়ে উঠেছিল, তাই ঘরখানাকে অনুরূপ তাপ সৃষ্টি করবার জন্যে তাপ-প্রবাহ যন্ত্র বসানো হয়েছে। দেহকেও রেখেছেন পশুলোমের আলখাল্লায় ঢেকে।

ঘরখানাকেও সাজিয়েছেন ভারতীয় রুচির অনুরূপ। ঘর নয় যেন রাসায়নিক ল্যাবরেটোরী। কোথাও তাপ কম, কোথাও বেশি। নিরালম্ব যে-ঘরে সচারাচর বসেন, সে-ঘরে আছে অসংখ্য সংস্কৃত পুঁথি। পুঁথির মধ্যেই তিনি বাস করেন।

নিরালম্বের নাম তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। নবাব ওয়াজেদ আলীও শুনেছেন তাঁর নাম। কৌতূহল দমন করতে না পেরে, একদিন তিনিও এলেন নিরালম্বকে দেখতে।

যখন নবাব ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মনে হলো যেন অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেছেন। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই তাঁর রগের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করতে লাগলো। মাতালের মতো টলতে টলতে তিনি ডাক্তারের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন।

ডাক্তার হেসে বললেন, বড্ড গরম বোধ হচ্ছে, নয়?

'ও কিছু নয়' বলে তিনি হাতটা একবার নাড়া দিলেন। কোথায় গেল সেই প্রচণ্ড গরম—যা নবাবের এই কিছুক্ষণ আগেও অসহ্য বোধ হচ্ছিলো। ভোজবাজীর মতো নিমেষে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে গেল। নবাবের দেহ গেল যেন জুড়িয়ে।

নবাবের পরিচয় পেয়ে ডাক্তার তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। বললেন, আপনি যে-ঋতুতে অভ্যস্ত, আমি সেই বসন্ত হাওয়ায় ঘর ভরিয়ে দিয়েছি। এবার আপনি আরাম করে বসতে পারবেন। আমি এ-হাওয়া সহ্য করতে পারি না, তাই ঘরকে গরম রাখতে হয়েছে। যে-কৌতূহল আপনাকে এখানে টেনে এনেছে, আশা করি তার কতকটা পরিচয় আপনি পেয়েছেন।

নবাব হেসে বললেন, আমি অত অল্পে খুশি হবো না—আমি অত্যাশ্চর্য কিছু দেখতে চাই।

ডাক্তার বললেন, আমি তো বৈজ্ঞানিক নই। বরং বিজ্ঞান যে-জিনিসকে সবচেয়ে বেশি অবজ্ঞা করে, আমি তারই অনুশীলন করে থাকি। আমি বিজ্ঞান জানি না, আমি জানি আত্মাকে। আত্মাই সব, জড়-জগৎ শুধু একটা বাহ্যিক আবির্ভাব। এই বিশ্বজগৎ সম্ভবতঃ ঈশ্বরের একটা স্বপ্ন, কিংবা অসীমের মধ্যে শব্দব্রহ্ম থেকে নিঃসৃত একটা বহিঃপ্রকাশ। আমি ইচ্ছামত শরীরকে সংকুচিত করতে পারি—জীবনী-শক্তিকে বন্ধ করতে পারি বা দ্রুত চালনা করতে পারি। আর পারি ক্লোরোফরমের সাহায্য না নিয়েও কষ্টকে দূর করতে। আমি জীবন দান করতেও পারি, আবার তা

নষ্ট করতেও পারি। আমার চোখে কোনো জিনিসই অস্বচ্ছ নয়—চিন্তার রশ্মিগুলি আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। বেলোয়ারি কাচের ওপর সূর্যের বর্ণচ্ছটা যেমন প্রতিফলিত হয়, আমার মস্তিষ্কে তেমনি চিন্তা-রশ্মির প্রতিচ্ছবি পড়ে। যদিও ভারতের সিদ্ধপুরুষ আরো বেশি পারেন—আমি তার কাছে কিছুই নই। কারণ আমি তুর্কিস্থানের লোক—অত্যন্ত লঘুপ্রকৃতি, বিক্ষিপ্ত-চিত্ত। এই বাস্তবজগৎকেই চিনেছি একমাত্র বলে, অনন্ত ও অসীমের খবর রাখি এমন সাধ্য নেই। তবু আমি চেষ্টা করেছি, কৃতকার্যও হয়েছি। একটা পরীক্ষা দেখাচ্ছি। বলে, ডাক্তার দরজার পর্দাটা সরিয়ে দিলেন।

নবাব সবিস্ময়ে দেখলেন, সেই ঘরে টেবিলের ওপর শোয়ানো আছে একটি যুবকের অর্দ্ধ-নগ্ন দেহ। কটিদেশ পর্যন্ত তার নগ্ন। মৃতদেহের মতো নিশ্চল। শুধু তাই নয়, তার সর্বাঙ্গে শরবিদ্ধ। মহাভারতের ভীষ্ম যেমন করে শরশয্যায় শুয়েছিলেন।

এই দৃশ্য দেখে নবাবের মতো অতিসাহসী লোকও শিউরে উঠলেন। কিন্তু নবাব সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, বাণবিদ্ধ দেহে কোথাও রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

ডাক্তার হেসে বললেন, কৃত্রিম দেহ নয়, জীবন্ত দেহ। ওর কিছুই কষ্ট হচ্ছে না—এই দেখুন, তীরগুলো আমি টেনে টেনে বের করছি।

সত্যিই ডাক্তার তার দেহ থেকে শলাকাগুলো একটি একটি করে টেনে বের করলেন। রক্ত তখনও দেখা গেল না। এরপর ডাক্তার কয়েকবার তার দেহের ওপর হস্ত-সঞ্চালন করলেন, লোকটা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো। যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো।

নবাবের মুখের দিকে ডাক্তার একবার চাইলেন, তারপর বললেন, বুঝতে পারছি আপনি খুব ভয় পেয়েছেন। আমি যদি ওর একটা পাও কেটে নিতাম, ও জানতেও পারতো না। কিন্তু আমি তা করলাম না কেন জানেন? কারণ, আমি এখনো সৃষ্টি করতে পারি না। তবে সৃষ্টি করতে না পারলেও, নবযৌবন এনে দিতে পারি। বলেই ডাক্তার একটি কক্ষের দ্বার উন্মোচন করলেন।

নবাব দেখলেন, একটা আরাম-কেদারায় এক বৃদ্ধা আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে। ডাক্তার বললেন, বেশ ভাল করে চেয়ে থাকুন—দেখবেন, কেমন করে একটু একটু করে ঐ বুড়ির যৌবন ফিরে আসে। বলেই ডাক্তার তাঁর সম্মোহন-দৃষ্টি বৃদ্ধার দিকে নিবদ্ধ করলেন।

কয়েক মিনিট—মাত্র কয়েকমুহূর্ত পরে, বৃদ্ধা যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। তার লোল-চর্ম ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে দেখা গেল। নবাব সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, কুমারীসুলভ বক্ষের সুগোল গঠন আবার তার ফিরে আসছে, গালের রং লাল হয়ে উঠছে, যৌবনের মদালসা আঁখি যেন কি সন্ধান করে ঘুরছে। নবাবের সামনেই যেন যাদুমন্ত্রের মতো সেই বৃদ্ধার মুখোসটা খসে পড়ে গেল।

ডাক্তার নবাবের পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, কি মনে হয়? আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, কিন্তু আমি জানি, মানুষ নতুন কিছুই উদ্ভাবন করতে পারে না। মানুষের প্রত্যেক স্বপ্নই একটা ভবিষ্যৎ দর্শন কিংবা অতীতের স্মৃতি। আচ্ছা, আর একটি মেয়েকে দেখুন, কেমন শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি ওকে জাগিয়ে দিচ্ছি, আপনি ওকে যেখানে যেতে বলবেন—সে যত দূরেই হোক, যাবে। অবশ্য ওর দেহ যাবে না, যাবে আত্মা। অতি গোপনীয় যদি কোথাও কিছু আপনার থাকে ও বলে দেবে। সেখানে পৌঁছুতে ওর এক সেকেণ্ডও লাগবে না। আপনার প্রশ্ন মনে মনে স্থির করুন, তারপর ওর হাতে হাত রাখুন—আপনার মনের কথা ও জানতে পারবে।

নবাব যথানির্দেশ কাজ করলেন। মেয়েটি ক্ষীণ-স্বরে উত্তর দিলে, মেহগনি কাঠের সিন্দুকের ভেতর অতিসূক্ষ্ম বালির গুঁড়োর মতো খানিকটা মাটি—সেই মাটির ওপর আছে পায়ের ছাপ।

নবাবের গাল লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। মেয়েটি ঠিকই বলেছে, তাদের ভালবাসার প্রথম অবস্থায়—একটা

উপবনের বালুময় গলিপথে তরুণী জেবউন্নিসার পায়ের যে-ছাপ পড়েছিল, সেই পায়ের ছাপটি মাটিসমেত নবাব তুলে এনেছিলেন। তারপর সেই স্মৃতিচিহ্ন একটা রূপোর বাক্সয় মেহগনি সিন্দুকের মধ্যে রেখে দেন। এ বাক্সের খবর আর কেউ রাখতো না—এমন কি বেগমও নয়। অতি গোপনীয়ভাবেই তা রক্ষিত ছিল। তাছাড়া তাঁর প্রাসাদ অতি নিকটেও নয়—খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলেও, অন্তত একঘন্টা সময় লাগা উচিত।

নবাবের লজ্জা দেখে ডাক্তার সে-সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। বললেন, এই জলপাত্রের দিকে চেয়ে থাকুন,আমি আরও আশ্চর্য ঘটনা দেখাবো। ঐ জলের দিকে চেয়ে, আপনি এখানে যাকে আনতে চান, একাগ্রচিত্তে তাকে চিন্তা করুন। সে জীবিত হোক, মৃত হোক—দূরে থাক বা নিকটে থাক, জগতের শেষ প্রান্তে হোক, ইতিহাসের গহন রসাতল থেকেও সে আপনার ডাকে এসে উপস্থিত হবে।

ডাক্তারের কথামত নবাব জলপাত্রের ওপর ঝুঁকে রইলেন। একটু পরেই তাঁর দৃষ্টির প্রভাবে, পাত্রের জল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো, তারপর স্থির হয়ে গেল। পরিষ্কার ছবি—নবাব সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, বেগম জেবউন্নিসা। নবাবের আবেগময় আহ্বানে, যে-শিথিল-পরিচ্ছদে তিনি গৃহকাজ করছিলেন, সেই পোষাকেই এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ডাক্তার এগিয়ে এসে নবাবের একখানি হাত সেই জলপাত্রের পায়ার ওপর রাখলেন। বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তিতেভরা যেন ঐ ধাতুখণ্ড—একটু স্পর্শেই নবাব মূর্ছাহত হয়ে পড়ে গেলেন।

ডাক্তার হেসে একটি পালঙ্কে তাঁকে শুইয়ে দিলেন।

নবাব ওয়াজেদ আলীর পূর্বপুরুষ ছিলেন মুর্শিদাবাদে। তখন মুর্শিদাবাদের নবাব ছিলেন সিরাজদ্দৌলা। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্যে ঘসেটি বেগম অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছিলেন। অর্থও ছিল তাঁর প্রচুর। সৈন্যদের মধ্যে তিনি লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে তাদের বশ করেছিলেন। এ সব বিষয়ে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন মীর নজর আলী। উত্তরকালে ঘসেটির অনুগ্রহে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু নজর আলী ছিলেন সুচতুর। তাঁর সমস্ত কাজই ছিল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ঘসেটি যখন ধরা পড়েন, তিনি তখন দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন। লর্ড ক্লাইব এই লোকটিকে হাতে রাখলেন। এবং তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'নবাব' খেতাব দেন। ইংরেজ-শাসন যখন কায়েম হলো তখন তাঁরা এসে কলকাতায় আলীপুরে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। এই নজর আলীই ছিলেন ওয়াজেদ আলীর পূর্বপুরুষ।

ওয়াজেদ আলী ছিলেন বিলাসী। কাশ্মীরে প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। বছরের অধিকাংশ সময় তিনি কাশ্মীরেই থাকতেন। সেইসময় জেবউন্নিসার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। এই পরিচয়ই পরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ওয়াজেদ আলী ছিলেন সুপুরুষ। জেবউন্নিসাও তাঁকে দেখে মুগ্ধ হোন। কাজেই তাঁদের বিবাহ হতে বেশি দেরী হলো না।

ওয়াজেদ আলী ছিলেন কবি। জেবউন্নিসাকে নিয়ে তিনি বহু কবিতা সেসময় লিখেছেন—অবশ্য তাঁর মাতৃভাষায় উর্দুতে। সেগুলি পূর্বরাগের নিদর্শন হিসেবে জেবউন্নিসা নিজের কাছেই সযত্নে রেখে দিয়েছেন।

৪

ওয়াজেদ আলীর সংজ্ঞাহীন দেহের দিকে চেয়ে ডাক্তার হাসলেন। চাকরটাকে ডেকে বললেন,যা আরিন্দমকে এখানে নিয়ে আয়।

আরিন্দম আসতেই ডাক্তার ওয়াজেদ আলীকে দেখালেন। সে ভয় পেয়ে দু-পা পিছিয়ে এলো। তার মনে হলো, ওয়াজেদ আলীকে বুঝি হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু তারপর সে লক্ষ্য করে দেখলে, ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাস একবার উঠছে আর পড়ছে।

ডাক্তার বললেন, তোমার ছদ্মবেশ প্রায় প্রস্তুত হয়েছে, এবারে তুমি তৈরী হয়ে নাও।

অরিন্দমকে ইতস্ততঃ করতে দেখে ডাক্তার আবার বললেন, ভয় পাচ্ছো নাকি? রোমিও যখন ভেরোনার বারান্দার ওপরে উঠেছিল, তখন সহস্র মৃত্যুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও সে ফিরে আসেনি। সে জানতো, জুলিয়েট তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তোমার জেবউন্নিসার মূল্য কি তার চেয়ে কম?

অরিন্দম কোনো উত্তর দিতে পারলো না সে শুধু অপলক চেয়ে রইলো ওয়াজেদ আলীর দিকে। তার কেবলই মনে হতে লাগলো, সে নির্মমের মতো ঐ দেহকে দখল করতে যাচ্ছে।

ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরিন্দমকে দেখছেন, বললেন, তুমি যদি মন স্থির করে না উঠতে পার—তা হলে বলো, আমি বৃথা সময় নষ্ট করবো না, নবাবকে জাগিয়ে দি। কিন্তু খুব ভাল করে ভেবে দেখ, এমন সুযোগ আর আসবে না। জেবউন্নিসা এখন তোমার। ইচ্ছা করলেই তাকে পেতে পারো। এ ব্যাপারে আমার যে কোনো স্বার্থ একেবারে নেই একথা বলবো না। আমার কৌতূহল হয়েছে, কারণ এ ধরনের পরীক্ষা আমি আর কখন করিনি। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো, এইভাবে আত্মার বিনিময় করার বিপদ কতখানি! তোমার বুকে হাত দিয়ে তোমার অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করো, জেবউন্নিসাকে পাবার জন্যে তুমি জীবনকে বিপন্ন করতে পারো কিনা।

অরিন্দম মাথা নিচু করে বললো, আমি প্রস্তুত।

ডাক্তার উল্লসিত হলেন। বললেন, বেশ বেশ। শোনো, এ-জগতে দুটিমাত্র জিনিস আছে, আবেগ আর ইচ্ছাশক্তি। তুমি যদি সুখী না হও, সে নিশ্চয়ই আমার দোষ নয়। এবারে বসো এই চেয়ারটিতে। আমার শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, আত্মসমর্পণ করো। কারণ, নির্ভর না করতে পারলে জগতে কোনো কাজই হয় না। আমার চোখের ওপর চোখ রাখো, আমার হাতে হাত দাও। বুঝতে পারছো আমার শক্তির প্রভাব? বুঝতে পারছো, আকাশ ও কালের ধারণা ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছে, অহংজ্ঞান ও আত্মচৈতন্য কেমন অপনীত হচ্ছে—চোখের পাতা নেমে এসেছে, বুঝতে পারছো মাংসপেশী মস্তিষ্কের কথা আর শুনছে না—শিথিল হয়ে গিয়েছে। চিন্তা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে। যেসব সূক্ষ্ম বন্ধনে আত্মা শরীরের সঙ্গে আবদ্ধ সে-বন্ধন-গ্রন্থি ছিন্ন হয়েছে।

এইসব কথার মধ্যে ডাক্তারের হাতের কাজ কিন্তু একমুহূর্তের জন্যে বন্ধ ছিল না। তিনি সমানে হস্তসঞ্চালন করে চলেছেন।

ডাক্তার শাদাবস্ত্র পরিধান করে জড়পিণ্ডবৎ দুই দেহের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখলেন, দুই দেহই সম্পূর্ণরূপে সমাচ্ছিত। এবার ধীরে ধীরে নবাবের দেহের দিকে ডাক্তার এগিয়ে গেলেন এবং গম্ভীর-কণ্ঠে তাঁর মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। এসময় ডাক্তারকে ভারতের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতো দেখাচ্ছিল।

ডাক্তার সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, দুই দেহই অল্প একটু নড়ে উঠেছে। বুঝলেন, তাঁর মন্ত্র-উচ্চারণ সফল হয়েছে। অরিন্দমের আত্মা নবাবের শরীর অধিকার করেছে। অরিন্দমের দেহও নড়ে উঠেছে। ডাক্তার উল্লসিত হয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর তিনি সম্মোহন-নিদ্রার অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্যে আবার পূর্বের মতো হস্ত-সঞ্চালন করতে লাগলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অরিন্দম—এখন থেকে আমরা তাকে নবাব-অরিন্দম বলবো, সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলো এবং বিস্মিত হয়ে চারদিক দেখতে লাগলো, এখনো তার অহং-চৈতন্য ফিরে আসেনি। যখন ফিরে এলো তখন সে দেখলে, তার আপনার বাইরে তার আকৃতিটা একটা পালঙ্কের ওপর প'ড়ে আছে। দেহের মায়া—ছুটে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করলো, কিন্তু ছুটতে না পেরে চিৎকার করে উঠলো।

ডাক্তার হাসলেন। বললেন, কেমন মনে হচ্ছে তোমার এই নতুন দেহকে? ঐ দেখ আয়না—চেহারাটা ভাল করে দেখে নাও। ভুলে গেলে চলবে না, তুমি এখন নবাব ওয়াজেদ আলী। নবাব-প্রাসাদের

সমস্ত দ্বারই তোমার নিকট এখন খোলা। বেগম জেবউন্নিসা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।

—আপনার ঋণ পরিশোধ করবার নয়।

ডাক্তার উচ্চহাস্য করে উঠলেন। বললেন, তুমি আমার কাছে মোটেই ঋণী নও। আমার কাছে তুমি সকল কথা প্রকাশ করেছিলে, বুড়োর কাছে আবেগ জিনিসটা বড়ই প্রবল। তা ছাড়া, এও জেনো, আমাদের মধ্যে কেউ বা একটু রাসায়নিক, কেউ বা ঐন্দ্রজালিক, আবার কেউ দার্শনিক—কোন না কোন আকারে সবাই আমরা স্বপ্নদর্শী, আমরা অন্নবিস্তর সবাই পরিপূর্ণ অসীমের সন্ধান করে থাকি। সে যাক, তুমি এখন ওঠো—চলাফেরা করো, বেড়িয়ে বেড়াও—তোমার নতুন দেহাবরণের দরুন আড়ষ্টতা দূর হোক্‌।

নবাবের শরীরের মধ্যে অন্য আত্মা বাস করলেও, পূর্ব-অভ্যাসগুলোর একটা ঝোঁক, একটা বেগ নবাবের দেহে তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। সেগুলোকে নিজের মতো করে নিতে নতুন নবাবের একটু সময় লাগবে বই কি।

ডাক্তার বললেন, এখনি রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজবে, এইবেলা তুমি বেগমের কাছে যাও। ততক্ষণ আমি তোমার পুরনো খোলসটাকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করি।

ডাক্তারের কথামত নবাব অরিন্দম ঘরের বাইরে এসে দেখলো, ওয়াজেদ আলীর জাঁকালো লালঘোড়ার জুড়ি গাড়ি তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তাকে দেখে সহিসটা ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিলে।

অনভ্যাস হলেও তাকে আয়ত্ত করতে হচ্ছে নবাবের চাল-চলন। তাকে ভুললে চলবে না সে নবাব। যথাসময়ে গাড়ি প্রাসাদে পৌঁছে গেল।

নবাব অরিন্দম একনজরে স্থানটা দেখে নিলে। প্রাঙ্গণটা বিশাল। দীপদণ্ডের ওপর কাচের ফানুসের মধ্য-স্থিত দীপ থেকে শুভ্র আলোকছটা প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে। অলিন্দে কতকগুলি কমলালেবুর টব, অ্যাসফেল্‌টের কিনারার ওপর একটু দূরে স্থাপিত হয়েছে। মধ্যস্থলে বালুময় ভূমি—এইঅ্যাসফাল্‌ট কিনারাটা গালিচার কিনারার মতো মধ্যস্থিতবালুভূমিকে ঘিরে রয়েছে।

কিন্তু নবাব-অরিন্দম দরজার কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালো। তার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। কারণ সে বেশ জানে, তার দেহ ওয়াজেদ আলীর হলেও, সে বাহ্যিক-দেহ মাত্র। আসলে সে অরিন্দম। এবাড়ির কিছুই তার পরিচিত নয়। এখানকার আচার-ব্যবহারের সঙ্গেও তার কোনোই যোগ নাই। তবু কপাল ঠুকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। ঘসা-মাজা পাথরের ধাপগুলো চক্‌চক্ করছে—মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ গালিচা পাতা। সিঁড়ির শেষে পশমী কাপড়ের উঁচু পর্দা। নবাব-অরিন্দম সেই পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো, দেখলো: কয়েকজন ভৃত্য জমকালো সাজে সজ্জিত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। কিন্তু নবাব-অরিন্দমের পায়ের শব্দে তারা ধড়মড় করে উঠে পড়লো এবং সেলাম করে পাশে সরে দাঁড়ালো। নবাব অরিন্দম কাউকে কিছু না বলে সোজা এগিয়ে গেল। একটি ঘরে দেখলো, কয়েকজন রমণী। বুঝতে পারলো, তারা এই বাড়িরই দাসী। গম্ভীরকণ্ঠে নবাব-অরিন্দম জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বেগম কোথায়?

একজন উত্তর দিলে, পাশের ঘরেই আছেন।

(৫)

এদিকে অরিন্দমের শরীরে নবাব ওয়াজেদ আলীর আত্মা প্রবেশ করেছে। তিনি যেন এক গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠলেন। বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, একখানা এক্কা গাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। তিনি কোনো কথা না বলে গাড়িতে উঠে বসলেন। এখন থেকে আমরা এঁকে ওয়াজেদ-অরিন্দম বলবো।

কোচম্যান জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় যাবেন?

স্বর শুনে ওয়াজেদ অরিন্দম চমকে উঠলেন, এ স্বর তো তাঁর কোচম্যানের নয়। তবু বিরক্ত হয়েই বললেন, বাড়ি যাব, আবার কোথায় যাবো!

গাড়ীতে বসে তিনি অনুভব করলেন, এগাড়িও তাঁর গাড়ি নয়, সবচেয়ে অবাক হয়ে গেলেন তাঁর দেহের দিকে চেয়ে। তিনি তো এ-পোষাক পরে আসেন নি এবং যতদূর মনে আছে, তাঁর গায়ে ছিল একটা লম্বাকোট। এ যে একটা পাতলা কাপড়ের আলখাল্লা। এরকম পোষাক তো তাঁর একটিও নেই। তাঁর নিজের মনে একটা সংকোচ এলো। চিন্তা যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। মনে করবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সকল কথা স্পষ্ট করে মনে আনতে পারছেন না। হতাশ হয়ে শেষে গাড়ীর কোণে মাথা রেখে একটা এলোমেলো চিন্তাপ্রবাহে—না নিদ্রা, না জাগরণ এমনি এক তন্দ্রাবস্থার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিলেন।

গাড়ি এসে যেখানে থাম্‌লো, তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, সেটা তাঁর বাড়ি নয়।

ওয়াজেদ কিছুতেই ভেবে পেলেন না, তাঁকে না বলে তাঁর গাড়ি চলে গেল কেন? তিনিই বা অপরের গাড়িতে উঠে বসলেন কেন? এও কি ডাক্তারের কোনো ভোজবাজী? না, এখনো তাঁর আচ্ছন্নভাব কাটেনি? কোচম্যানকে ডেকে বললেন, আমাকে একবার নবাব ওয়াজেদ আলীর বাড়ি পৌঁছে দিতে পারিস?

—হাঁ হুজুর! বলে কোচম্যান সেইদিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিলে।

ফাটকের সামনে এসে কোচম্যান দরোয়ানকে ফাটক খুলে দিতে বললে।

দরোয়ান জানালে, আজ রাত্রে আর ফাটক খোলা হবে না। হুজুর বাড়ি এসেছেন, বেগমও বিশ্রামের জন্যে তাঁর মহলে চলে গেছেন।

যে ভীমকায় দরোয়ানটা ফাটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে এইসব কথা বলছিলো, তাকে এক ধমক্ দিয়ে ওয়াজেদ-অরিন্দম বললেন, কাকে কি বলছিস, তুই কি মাতাল হয়েছিস?

দারোয়ান চীৎকার করে উঠলো: আমি মাতাল, না তুমি মাতাল?

ওয়াজেদ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, হতভাগা পাজী, নচ্ছার! তোকে আমি জবাব দিলাম।

গোলমাল শুনে আশ-পাশ থেকে আরো ভৃত্য ছুটে এলো। তারাও এইকথা শুনে উচ্চহাস্য করে উঠলো।

এই ব্যঙ্গের হাসি শুনে, ওয়াজেদ আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। বললেন, নিমকহারাম, কুকুরের জাত!

চিৎকার শুনে নবাব-অরিন্দম সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো। ভৃত্যেরা সেলাম করে সরে দাঁড়ালো। নবাব-অরিন্দম সম্মুখে যেন প্রেত-মূর্তি দেখ্‌ছে। দেখ্‌ছে, তারই দেহ এগিয়ে এসেছে তাকেই চ্যালেঞ্জ করতে। কিন্তু একি পরীক্ষা! নবাব-অরিন্দম মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সাম্‌লে নিলো! ভয় পেলে চলবে না। গম্ভীরকণ্ঠে আগন্তুকের দিকে লক্ষ্য করে বললে, এত রাত্রে নবাবের সঙ্গে দেখা হবে না—বেগমও এখন বিশ্রাম করছেন। বলে নবাব-অরিন্দম আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল।

ওয়াজেদ-অরিন্দম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অবিকল তারই প্রতিচ্ছবি—ও ব্যক্তি কে? ওয়াজেদ-অরিন্দম ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। তাঁদের বংশে একটা প্রাচীন কাহিনী আছে—মৃত্যুর পূর্বে অমনি এক প্রতিচ্ছবি এসে অশুভ সংবাদ জানিয়ে যায়। তবে কি তাঁরও মৃত্যুদিন ঘনিয়ে এসেছে?

অতবড় শক্তিমান ওয়াজেদ-অরিন্দম—এইকথা মনে হওয়ামাত্র তাঁর দেহ বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

যখন তাঁর জ্ঞান হলো, দেখলেন, এমন একটা শয্যায় তিনি শুয়ে আছেন, যে-শয্যায় তিনি এর পূর্বে কখনো শোন নি, এমন একটা ঘরে রয়েছেন, যে-ঘরে তিনি আর কখনো প্রবেশ করেছেন বলে মনে পড়ে না। একজন অপরিচিত চাকর দাঁড়িয়ে ছিল—সে মনিবের জ্ঞান হতে দেখে চলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে ওয়াজেদ-অরিন্দম বললেন, একগ্লাস জল।

ওয়াজেদ আরিন্দমের মনে হলো, তাঁর ভেতরটা সব শুকিয়ে গিয়েছে। জল খেয়ে তিনি বাঁচলেন। এইবার ঘরখানাকে ভাল করে দেখবার তিনি সুযোগ পেলেন। অতি সাধারণ আসবাবে সজ্জিত ঘরখানা। কিন্তু এ-ঘরের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক? এ কি দুর্দৈব! দেয়ালে-টাঙানো একটা বড় আয়না দেখতে পেয়ে, কি মনে করে সেইদিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু আয়নার সামনে এসে তিনি ভূত দেখার মতো চমকে গেলেন। এ কার গায়ের চামড়া তিনি পরে এসেছেন? এতো তাঁর দেহ নয়! কি আশ্চর্য, তিনি জেগে আছেন, না এখনো স্বপ্ন দেখছেন? নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখলেন, না, তিনি জেগেই আছেন। তবে এ কি করে সম্ভব হলো? এ-মুখ তবে কার? পিছনের দেয়ালের দিকে চেয়ে দেখলেন, অন্য কোনো মুখের প্রতিবিম্ব পড়েছে কিনা। কিন্তু দেয়ালে তো কিছুই নেই। আয়নাটা ভাল করে পরীক্ষা করলেন। নিজের হাত নিজে টিপে দেখতে লাগলেন। না, এ-হাতও তাঁর নয়—এত সরু আর লম্বা হাত কোনদিনই তাঁর ছিল না। হাতের আঙুলে একটা আংটি, এ আংটিও তাঁর নয়। জামার পকেট হাতড়ে কতকগুলো চিঠি পাওয়া গেল, তাতে নাম লেখা আছে আরিন্দম।

এখন মনে পড়লো, তাঁর প্রাসাদে সেই ভৃত্যদের অট্টহাস্য। এ-মূর্তি দেখলে, কেই বা বিশ্বাস করবে আমি নবাব ওয়াজেদ আলী। আচ্ছা, আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? কিন্তু এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতিবাদ করাও তো এখন চলে না।

ওয়াজেদআলী এখন বুঝতে পারছেন, তাঁর অজ্ঞাতসারেই তাঁর সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো যাদুকর কিংবা দানব তাঁর আকৃতি, তাঁর আভিজাত্য, তাঁর নাম—এমন কি তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত হরণ করেছে। শুধু রেখেছে তাঁর আত্মাকে—অথচ সে-আত্মার নিজেকে ব্যক্ত করবার কোনো উপায়ই সে রেখে যায়নি।

এখন নবাব ওয়াজেদ আলী বলে নিজেকে পরিচয় দিতে গেলে লোকে তাঁকেই পাগল বলবে। এখন তাঁর স্ত্রীও তাঁকে চিনতে পারবে না। তাঁকে কেই বা এখন সনাক্ত করবে? তাছাড়া, তিনি নিজেই বা কি করে নিজেকে প্রমাণ করবেন? অবশ্য এমন অনেক কথা আছে যা তাঁরা দুজন ছাড়া আর কেউ জানে না। জেব উন্নিসাকে সেইসব ঘটনা বা গোপন কথা বললেও কি সে তাঁকে চিনতে পারবে না? কিন্তু তাতেই বা কি হবে? সমস্ত লোকের মতের বিরুদ্ধে সেই বা কি করে যেতে পারে?

আচ্ছা, তাঁর এই রূপান্তরীকরণ শুধু কি বাইরের আকার ও মুখশ্রীর পরিবর্তন, না তিনি সত্যিই আর কারু দেহে বাস করছেন? তাই যদি হয়, তবে তাঁর নিজের শরীরটা কোথায় গেল? মনে পড়লো, তাঁর প্রাসাদে অবিকল তাঁরই মতো দেখতে যে ব্যক্তিটিকে দেখেছেন, সেই কি তবে তাঁর দেহ অধিকার করে বসে আছে?

ওয়াজেদ আরিন্দম কিছুক্ষণ চুপ করে বসলেন। অনেক কিছুই ভাববার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তেই আসতে পারলেন না। ডাক্তারের কথা মনে পড়লো, ঐ যাদুকরই কি তবে তাঁর গাত্রচর্ম খুলে এই খেল খেলেছে? বিষাক্ত সাপের মতো এই চিন্তা তাঁর অন্তরকে দংশন করতে লাগলো।

কিন্তু সে যাই হোক, লোকটা হয়ত এতক্ষণ আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছে, সেই কক্ষ— যেখানে গেলে আমি প্রথম রাত্রির মতোই পুলকিত হয়ে উঠতাম। হয়ত এখন জেব উন্নিসা সেই হতভাগারই কণ্ঠালিঙ্গন করে রয়েছে, হয়ত সেই প্রবঞ্চককেই 'আমি' বলে নিজেকে সমর্পণ করে বসে আছে।

ওয়াজেদ-আরিন্দমের মস্তিষ্ক অগ্নিময় আবেগ-তরঙ্গে আলোড়িত হতে লাগলো। স্থির হয়ে তিনি বসতে পারলেন না, ঘরের মধ্যে হিংস্র পশুর মতো অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগিলেন। তাঁর অস্পষ্ট অহংজ্ঞান, যেন উন্মাদনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তিনি

ছুটে আরিন্দমের প্রসাধনকক্ষে গেলেন, জলের টবে তাঁর মাথা ডুবিয়ে দিলেন। যখন মাথা তুললেন তখন মনে হলো, তাঁর মাথা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে।

একবার মনে হলো, এই বা কি আশ্চর্য, যাদুগিরি বা ডাইনি-মন্ত্র-তন্ত্রের দিন তো আর নেই—কেবল মৃত্যুই পারে আত্মাকে শরীর থেকে বিযুক্ত করতে। একজন খ্যাতনামা নবাব সে, বড় বড় অভিজাত-বংশের সঙ্গে যে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ—অপরূপ সুন্দরী যাকে পতিত্বে বরণ করেছে, যে প্রথমশ্রেণীর রাজ-সম্মানে ভূষিত, তাকে কি কোন ব্যক্তির এইভাবে চোখে ধুলো দিতে পারে? এ নিশ্চয়ই সেই ডাক্তারের কাজ। আমাকে নিয়ে একটু মজা করছে। কিন্তু এ কি রসিকতা! এতে তার কুরুচিরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে ওয়াজেদ-আরিন্দম একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন ঘুম ভাঙলো তখন তিনি দেখলেন, চাকরটা আজকের ডাকের চিঠিপত্র কখন এসে টেবিলের উপর রেখে গিয়েছে।

তাঁকে জাগতে দেখে, চাকরটা আবার এসে জামা কাপড় দিয়ে গেল। সাধারণ পরিচ্ছদ—একটা ধুতি ও পাঞ্জাবী। পরের কাপড় পরতে অনিচ্ছা হলেও বাধ্য হয়ে তাঁকে পরতে হলো। নইলে আর কাপড় পাবেন কোথায়! তিনি ঠিক করলেন, আর কোনো বাধা দেবেন না। তাঁর এই দৈহিক পরিবর্তনকে যখন মেনে নিতেই হবে তখন মিছিমিছি অস্বীকার করে আর কি হবে! এবারে স্থির হয়ে বসে ডাকের চিঠিগুলো তিনি খুললেন। তিনি আশা করেছিলেন, এই ডাকে হয়ত তাঁর রূপান্তর সম্বন্ধে কোনো খোঁজ-খবর থাকবে। কিন্তু সেরকম কোনো চিঠিই তিনি পেলেন না। একখানা চিঠিতে প্রণয়-ভৎ'সনা আছে। লেখিকা লিখেছেন, কেন বিনা কারণে তাঁর বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করা হলো। আর একখানি পত্র এক উকিলের। তিনি জানিয়েছেন, ভাড়া হিসেবে তিনি যে টাকা পাবেন, তার চতুর্থাংশ যেন কোনো লাভজনক কাজে খাটানো হয়।

ওয়াজেদ-আরিন্দম মনে মনে হাসলেন। তবে তো দেখছি, যার শরীরে আমি বাস করছি—সেই আরিন্দম নামে একজন লোক সত্যিই আছে, কাল্পনিক জীব নয়। এবং তার ঘর-বাড়ি আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, টাকা খাটাবার মূলধনও আছে। একজন ভদ্র-লোক গৃহস্থের যা থাকা উচিত, সবই আছে।

বড় আয়নাটার সম্মুখে চোখ পড়তেই আবার তিনি চমকে উঠলেন। নাঃ, আমি তাহলে সত্যিই আরিন্দম। আমি যত চিৎকার করেই বলি নবাব ওয়াজেদ আলী, কেউ তাতে সায় দেবে না, বারবার আয়নাতে যখন সেই একই মুখ ভেসে উঠছে।

টেবিলের দেরাজটা খুলে দেখলেন, কতকগুলো ভূ-সম্পত্তির দলিল। আর দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ। আর এক দেরাজে পাওয়া গেল, ছোট পত্র-পেটিকা। সেটা আবার একটা সাঙ্কেতিক তালা দিয়ে বন্ধ।

চাকর এসে জানালে, সুশীলবাবু এসেছেন। চাকরের উত্তর আনবার অপেক্ষা না করেই আরিন্দমের পুরনো বন্ধু হড়মুড় করে এসে ঘরে ঢুকলো। বেশ, সরল দিল-খোলা ভাব। বললে, এই যে অরিন্দম, তোমার হলো কি বলো দেখি? বেঁচে আছো, না, মরেছো? কোথাও দেখা পাওয়া যায় না—চিঠি লিখলেও উত্তর দাও না। ছোটবেলার বন্ধু তাই না বলে পারি না, এইভাবে অন্ধকার ঘরে একা-একা থেকে যে মরে যাবে! কিছু হয়নি তোমার—মনে জোর করে উঠে পড়। আজ তোমাকে কিছুতেই ছাড়বো না, চলো একটা পার্টিতে। অনেক পুরনো বন্ধুর দেখা পাবে।

ওয়াজেদ-আরিন্দম বুঝলেন, তাঁর জীবন-নাট্যে এবারে একটি শ্রেষ্ঠ ভূমিকা অভিনয় করতে হবে, তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন। বললেন, না

তাই, আমার শরীর খুবই খারাপ—খাবার উপায় নাই। যন্ত্রনাটাও বেড়েছে, শরীরও দুর্বল।

সুশীল চেয়ে দেখলো, সত্যিই মুখটা বড় ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে—একটা ক্লান্তির ভাবও রয়েছে। সুশীল আর পীড়াপীড়ি না করে চলে গেল।

এই আগন্তুকের আগমনে ওয়াজেদ-অরিন্দমের বিস্ময়তা আরও বেড়ে গেল। চাকরটা তাঁকেই তার মনিব ঠাউরেছে, সুশীল বন্ধু জেনেই সম্ভাষণ করে গেল। এখন কেবল একটা প্রমাণ বাকি—যা চূড়ান্ত প্রমাণ। যার উদ্‌ঘাটিত হলো। একজন মহিলা প্রবেশ করলেন।

—কেমন আছিসরে অরিন্দম? চাকরটা বলছিল, কাল তুই খুব দেরী করে বাড়ি ফিরেছিস—আর ভয়ানক দুর্বল অবস্থায়। কতবার বলেছি, শরীরের যত্ন কর্। কেন তুই এমন মন-মরা হয়ে থাকিস - আমার কাছে কি কিছুই খুলে বলবি না? তোর এই অবস্থা দেখে আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে। কি কষ্টে যে তোকে মানুষ করেছি সে আমিই জানি। বাপ-মরা ছেলে যে মায়ের কতখানি সে তুই বুঝবি না রে।

ওয়াজেদ-অরিন্দম বুঝলেন, ইনি অরিন্দমের জননী। তিনি পুত্রের মতোই উত্তর দিলেন, ভয় নেই মা, ও কিছুই নয়। আজ অনেকটা ভাল আছি।

মা আশ্বস্ত হলেন। তিনি জানতেন, তাঁর পুত্র একাকী থাকতে ভালবাসে। বেশিক্ষণ কেউ তার কাছে থাকে সেটা পছন্দ করে না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন।

বৃদ্ধা চলে গেলে, ওয়াজেদ-অরিন্দম আপন মনেই বলে উঠলেন, আমি তবে নিশ্চয়ই অরিন্দম—তার মা যখন আমাকে অরিন্দম বলেই চিনলেন—একবারও ভাবলেন না, তাঁর পুত্রের শরীরে এক অপরিচিত আত্মা বাস করছে। তবে তো দেখছি, আমাকে এই-ভাবে চিরদিন বদ্ধ থাকতে হবে। অন্যের শরীরে আত্মা আবদ্ধ—আত্মার একি অদ্ভুত কারাযন্ত্রণা। তথাপি তিনি তাঁর অস্তিত্বকে, তাঁর কুলচিহ্নকে, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর ঐশ্বর্য্যকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। একবার মনে হলো, তিনি তাঁর প্রাসাদে ফিরে যাবেন। কিন্তু তাতে কেলেঙ্কারিই বাড়বে।

একটা দেরাজ থেকে অরিন্দমের পোর্টফোলিও বেরুলো। খুলবার চেষ্টা করতেই একটা স্প্রিং খুলে গেল। ওয়াজেদ-অরিন্দম চামড়ার পকেট থেকে কতকগুলো কাগজ টেনে বের করলেন। কিন্তু একটা কাগজ দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। পেন্‌সিলে-আঁকা একটি স্কেচ—ছবিটি বেগম জেবউন্নিসার।

বেগমের ছবি কেমন করে এই অপরিচিত যুবকের গুপ্ত-পত্র-পেটিকায় এলো, আর কেই বা দিলে? যাকে তিনি দেবীর মতো পূজো করে এসেছেন, সে কি তবে বিশ্বাসঘাতিনী? যে-রমণীকে তিনি এতদিন নিষ্কলঙ্ক বলে জানতেন—তাঁর এতবড় বিশ্বাস আজ একমুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল? ভগবানের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

এইসময় চাকর এসে খবর দিয়ে গেল, খাবার প্রস্তুত। কিন্তু সে-কথায় তখন তাঁর কান দেবার অবসর ছিল না। পত্র-পেটিকার আরও অনেকগুলো টুকরো লেখা বেরিয়ে পড়লো। লেখাগুলো সুসংবদ্ধ নয় এবং এক সময়ের লেখাও নয়। যখন যেমন মনে হয়েছে লেখক তেমন-ভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন। ওয়াজেদ-অরিন্দমের আগ্রহ হলো। না জানি, আরো কি গুপ্ত-তথ্য বেরিয়ে পড়বে। তিনি এক-এক করে পড়তে লাগলেন।

কাগজের একটুকরোতে লেখা আছে—

"সে কখনোই আমাকে ভালবাসবে না—তার চোখের দৃষ্টি এমন কোমল, কিন্তু ঐ কোমল-দৃষ্টির মধ্যে সেই নিষ্ঠুর কথাটি আমি পাঠ করেছি—যার চেয়ে কঠোর কথা আর নেই। যে-কথাটি কবি দান্তে তাঁর বিষাদপুরের তোরণ-দ্বারের ওপর লিখে রেখেছেন: সব আশা ত্যাগ করো।

আমি কি-এমন করেছি যে ভগবান আমাকে এমন শাস্তি দিলেন। বুঝতে পারছি, এইভাবেই আমাকে চলতে হবে। গ্রহে গ্রহে সংঘর্ষ হয়েও পথ পরিষ্কার হয়, কিন্তু আমার অবস্থার কোনো পরিবর্তনই হবে না। আমার স্বপ্ন—এমন করে শূন্যে কে মিলিয়ে দিলো? কত অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে, কত মিথ্যা সত্য হচ্ছে—জগৎ পরিবর্তিত হলেও আমি এইভাবেই থাকবো। ভাগ্যের খেলায় কত লোক বদ্‌লে যাচ্ছে, কিন্তু আমার ভাগ্যে সেই একই খেলা চলেছে।'

আর একটিতে আছে—

"আমি হতভাগ্য, আমি বেশ জানি—স্বর্গের দ্বারদেশে আমি মূঢ়ের মতো বসে আছি, আমি নীরবে অশ্রুপাত করছি—সে ধারার আর বিরাম নেই। আমার সাহস নেই যে এখান থেকে উঠে গিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করি।"

আর একটি ছিন্ন অংশ—

"রাত্রে যখন ঘুম হয় না—জেবউন্নিসাকে ধ্যান করি, ঘুম এলে তাকেই স্বপ্ন দেখি। কাশ্মীরের সেই বাগান-বাড়ির কথা আমি কোনদিনই ভুলবো না—সেই ঝাউবনের ধারে, সেই শুভ্র পরিচ্ছদ, সেই কালো ফিতে। একদিকে জীবন, একদিকে মৃত্যু। ঐ মৃত্যুচিহ্ন বুঝি আমারই জন্যে রাখা ছিল।"

ওয়াজেদ-অরিন্দমের ললাটে এই শীতেও স্বেদবিন্দু দেখা দিল। টুকরোগুলি তিনি এক নিঃশ্বাসে পড়ে চলেছেন। আর একটিতে দেখলেন—

"কি অদৃষ্টের ফের! আমি দার্জিলিং-এ যাব মনে করেছিলাম, যদি যেতাম তাহলে তার সঙ্গে দেখা হতো না। আমি কাশ্মীরে থেকে গেলাম—তাকে দেখলাম, আর সেই দেখাই আমার কাল হলো।"

আর একটি খণ্ডে আছে—

"আমার মরণ হলেই ভাল, কিন্তু জীবিত থাকতে থাকতে তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমার নিঃশ্বাস যদি একবার মেশাতে পারতাম! হ'লো না, এ জীবনে সে-স্বপ্ন আমার সফল হলো না। পরলোকে গিয়েও কি তাকে পাবো না?"

ওয়াজেদ-অরিন্দমের আর একটি টুকরোর দিকে নজর পড়লো—

"যে রমণী আমাকে ভালবাসে না, তাকেই যে আমাকে ভালবাসতে হবে, এই বা কি কথা! জীবনে কত রমণীই তো এসেছে, কিন্তু কই, কেউ তো এমন করে আমার হৃদয় হরণ করতে পারেনি। ভাগ্যবান তার স্বামী লোকটি, যে তার ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছে।"

ওয়াজেদ-অরিন্দম চিঠিগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে উঠে পড়লেন। আর তাঁর পড়বার প্রয়োজন নাই। জেবউন্নিসার পেনসিলে-আঁকা ছবি দেখে তার সম্বন্ধে যে-ধারণা হয়েছিল, এখন এই চিঠিগুলো পড়ে ওয়াজেদের সে-ধারণা দূর হলো। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, যুবকটি হতাশ-প্রেমিক। ছবি এঁকে তার নিরাশ-প্রেমের অঞ্জলি দিচ্ছে। আসলকে না পেয়ে নকলের পূজো করছে।

কিন্তু এমনো তো হতে পারে, অরিন্দম তার দেহ ধারণ করে জেবউন্নিসার প্রেম আকর্ষণ করছে। কিন্তু এও কি আজকের দিনে সম্ভব?

তবু চিন্তিতমনেই আহারপর্ব সমাধা করলেন। তারপর পোষাক পরিবর্তন করে গাড়ি নিয়ে ডাক্তার নিরালম্বের কাছে গেলেন।

ডাক্তার তাঁকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, অরিন্দম তুমি! আমি তো তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

অরিন্দম, অরিন্দম! এই সম্বোধনে ওয়াজেদের আপাদ-মস্তক জ্বলে গেল। নিয়ত এই সম্বোধন শুনে শুনে তাঁর মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি জোর গলায় বললেন, ডাক্তার নিরালম্ব, আপনি বেশ ভাল করেই জানেন, আমি অরিন্দম নই—আমি নবাব ওয়াজেদ আলি। আপনিই যাদুমন্ত্রে আমার দেহ অপহরণ করেছেন।

ডাক্তার চিৎকার করে হেসে উঠলেন। বললেন, তুমি কি নেশা করেছো? কিন্তু ভুলে যেও না, তুমি আমার রুগী, আমি তোমার চিকিৎসক।

—আমার রোগবালাই কিছুই নেই।

ডাক্তার আবার জোরে হেসে উঠলেন।

ওয়াজেদ এবার চিৎকার করে উঠলেন: তোমার হাসি থামাও, নইলে গলা টিপে তোমাকে হত্যা করবো।

ডাক্তার তীব্রদৃষ্টিতে তাঁর চোখের দিকে চাইলেন, সেই-দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো ওয়াজেদ অভিভূত হয়ে পড়লেন।

ডাক্তার বললেন, রোগী অবাধ্য হলে তাকে সোজা করবার কৌশল আমার জানা আছে। যাও বাড়ি যাও। বাড়ি গিয়ে ভাল করে স্নান করে ফেলো।

ওয়াজেদ একটি কথাও না বলে ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

কিন্তু এইভাবে জীবনকে ব্যর্থ হতে দেবার আগে, একবার অন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে দেখবেন তিনি।

শহরের বিখ্যাত ডাক্তার—বয়সেও প্রবীণ,ওয়াজেদ তাঁর সঙ্গেই দেখা করলেন। বললেন, আমি এক অদ্ভুত চক্ষু-বিকারে আক্রান্ত হয়েছি। আমি যখন আয়নায় মুখ দেখি, তখন আমার মুখের স্বাভাবিক অবয়বগুলো তাতে দেখতে পাই না। আমি যেসব পদার্থে বেষ্টিত থাকতাম, সেসব পদার্থ এখন বদলে গেছে। এখন আমি আমার ঘরের দেওয়ালগুলোও চিনতে পারি না —আমার মনে হয়, আমি যেন সে আমি নই, আমি যেন অন্য লোক।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজেকে কি-রকম দেখো বলো দেখি? ভ্রমটা চোখ থেকেও উৎপন্ন হতে পারে, মস্তিষ্ক থেকেও হওয়া বিচিত্র নয়।

—আমি দেখতে পাই, আমার চুল কালো, আয়ত চোখ, বেশ টানাটানা, মুখ ফ্যাকাশে আর সে-মুখ ব্যক্তিত্বে ভরা।

ডাক্তার হাসলেন। বললেন, তোমার বুদ্ধি-বিভ্রমও হয়নি, দৃষ্টি-বিভ্রমও হয়নি। তুমি আসলে যা, ঠিক তাই আছ।

—কিন্তু না, তাতো নয়। আমার চুল এত কালো নয়, চোখ আমার আয়ত এবং স্বপ্ন-মদির, রং ফ্যাকাশে মোটেই নয়—গোলাপ ফুলের মতো রং, সুন্দর সতেজ পুরুষ আমি।

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বললেন, এইখানেই একটু বুদ্ধি-বৃত্তির বদল দেখছি।

—যাই হোক ডাক্তার, আমি পাগল নই, এটা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

—দৈহিক শ্রান্তি, একটু অতিরিক্ত পড়াশুনা কিংবা অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ থেকে এই অসুখটা হয়েছে। তুমি ভুল করছো, আসলে তুমি যা চোখে দেখছো তাই বাস্তব, আর যা মনে ভাবছো—সেইটাই কাল্পনিক। তুমি আসলে ফ্যাকাশে, কল্পনা করছো গোলাপ ফুল।

—সে যাই হোক, আমি যে নবাব ওয়াজেদ আলী সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কাল থেকে সবাই আমাকে অরিন্দম বলছে।

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বললেন, হুঁ, কাল থেকে ব্যারামটা দেখা দিয়েছে। তুমি আসলে অরিন্দম, কিন্তু মনে করছো, তুমি নবাব ওয়াজেদ আলি। কিন্তু আমি তো নবাবকে দেখেছি—তাঁর রং ফর্সা। আয়নায় যে-অন্যমুখ তুমি দেখতে পাও, তার কারণই হলো, তোমার আসল মুখের সঙ্গে, তোমার মনোগত কাল্পনিক মুখের মিল হচ্ছে না। সবাই যখন বলছে তোমাকে অরিন্দম, তখন তুমি তোমার নিজের বিশ্বাসে ভুলো না। দিন পনের আমার কাছে থাকো—স্নান, বিশ্রাম এবং বেড়ানো,—দেখবে, তোমার মনের বিকার কেটে যাবে।

ওয়াজেদ আর কিছু না বলে, আবার তিনি দেখা করবেন বলে চলে গেলেন।

(৬)

যেসময়ে নবাবের প্রাসাদের ভৃত্যেরা প্রকৃত নবাবকে গাড়িতে উঠিয়ে দেয় এবং নবাব নিজের ভূদর্গ থেকে

বিতাড়িত হয়ে অরিন্দমের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন, সেসময় রূপান্তরিত নবাব-অরিন্দম ধবধবে শাদা একটি ক্ষুদ্র বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে কখন বেগমের ফুরসৎ হবে তারই প্রতীক্ষা করছিলো।

সামনের আয়নাটায় তার ছায়া পড়লো। নবাব-অরিন্দম সেই ছায়া দেখে চমকে উঠলো। পরে নিজেকে সামলে নিলো বটে, কিন্তু এই প্রতিবিম্ব দেখে নিজেকে আর বিশ্বাস করতে পারছিলো না। রূপান্তরের এই গুপ্ত-তথ্য যদিও তার অজানা নয়, তবু আয়নার ছায়া দেখে সে মুগ্ধ-বিস্ময়ে সেই আয়নার দিকে চেয়ে রইলো—চোখ আর ফেরাতে পারলো না।

পরিচারিকা এলো তাকে বেগমের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে। নবাব-অরিন্দমের বুকটা ধড়াস করে উঠলো। অথচ এই শুভ-মুহূর্তটির জন্যেই সে এতক্ষণ ধরে প্রতীক্ষা করছিলো।

নবাব-অরিন্দম পরিচারিকারই অনুসরণ করে চললো। কারণ এ-প্রাসাদের আঁক্-সাঁক্ তার জানা নেই।

যে-ঘরে নবাব-অরিন্দম প্রথম প্রবেশ করলো, সে-ঘরটি বেগমের প্রসাধন-কক্ষ।

বেগম এলেন, এক লঘু স্বচ্ছ বহিরাচ্ছাদনের নীচে কার্পাসের একটা শিথিল বন্ধনহীন নৈশ-পরিচ্ছদ।

কাশ্মীরের বাগানবাড়িতে নবাব-অরিন্দম বেগমকে যখন দেখেছিলো, তার চেয়ে এখন তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিলো, সে আত্মহারা হয়ে পড়লো।

এই আত্মহারা ভাব, এই মূঢ়তার ভাব, কোনো প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ীর পক্ষেই সাজে, কিন্তু কোনো স্বামীর পক্ষে নিতান্তই হাস্যকর। নবাব-অরিন্দম মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দেখতে দেখতে তার চোখ-দুটো ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো জ্বলে উঠলো। এই লালসা-দীপ্ত দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে বেগম তার সর্বাঙ্গ আলখাল্লায় ঢেকে দিলো। ডাক্তারের যাদু-মন্ত্রের কথা তো বেগমের জানবার কথা নয়—শুধু বেগম কেন, কোনো মানুষেরই তা অনুমান করা শক্ত। তবু যেন মনে হলো, এ-দৃষ্টি তার স্বামীর নয়—এ-দৃষ্টিতে সে দেখছে পার্থিব লালসার আগুন।

বেগম তার এই আচরণে ব্যথিত ও লজ্জিত হলো। ঠিক কি ঘটেছে বুঝতে না পারলেও, তার মনে হলো, কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। আমি কি আমার স্বামীর চোখে শুধু একটা ইতর রমণী—এক বারাঙ্গনা মাত্র? কিন্তু এমন তো ছিল না সে। আমাদের দুটি আত্মার কেমন মিল ছিল—দুটি হৃদয়বীণা যে একই সুরে বাজতো? কেন এমন হ'লো? তার স্বামী কি আর কাউকে ভালবাসতো? কাশ্মীরের পঙ্কিল মলিনতা কি ঐ অকলঙ্ক হৃদয়কে কলঙ্কিত করেছে?

বেগম বিচলিত হয়ে উঠলো। শয়ন-কক্ষের দিকে এগিয়ে যেতেই নবাব-অরিন্দম দ্রুত এগিয়ে এলো। বেগম থমকে দাঁড়ালো, তারপর যেন ভয় পেয়ে ছুটে দরজা বন্ধ করলো। ও যে অরিন্দমের দৃষ্টি।

ঘরে এসেও বেগমের কম্পন থামে না। তবু বার-বার মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলো, এ কি করে সম্ভব? কিন্তু সে-দৃষ্টি আমি যে কোনদিনই ভুলবো না। সেই বিষণ্ণ-হতাশ-হৃদয়ের অগ্নিশিখা আমার স্বামীর চোখের ওপর জ্বলে উঠলো কি করে? অরিন্দমের কি মৃত্যু হয়েছে? আমার কাছে চির-বিদায় নেবার জন্যে তার আত্মা কি মুহূর্তের জন্য আমার সম্মুখে দপ করে একবার জ্বলে উঠলো! ওগো স্বামী! যদি আমি ভুল করে থাকি, যদি পাগলের মতো মিথ্যাভয়ে আকুল হয়ে থাকি, তবে আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

কি এক অনির্দেশ্য বেদনা তার বুকে চেপে রইলো। সারারাত ঘুম হলো না তার। ভোরের দিকে একবার ঘুম এলো। কত অসংলগ্ন অদ্ভুত স্বপ্ন এসে তার গভীর নিদ্রায় ব্যাঘাত করলো। আগুনের মতো জ্বলন্ত সেই অরিন্দমের চোখ কুয়াশার ভিতর থেকে তারই ওপর একদৃষ্টে চেয়ে আছে এবং তারই ওপর আগুনের হল্‌কা নিক্ষেপ করছে। আর সেই সময় তার খাটের নীচে একটা কালো মূর্তি—মুখ

বাঁদি-বেগম আসছে, উবু হয়ে বসে আছে। এই অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে তার বাদীও আছেন, কিন্তু তাঁর নিজের আকৃতিতে নয়—অন্য এক আকৃতিতে।

নবাব-অরিন্দম যখন দেখলে, তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে গেল। ভাবলে, এ আমি কি করলাম মুহূর্তের ধৈর্যের অভাবে আমি সমস্তই হারালাম।

নবাব-অরিন্দম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে হতাশ হয়ে নবাবের শয়ন-কক্ষ খুঁজতে লাগলো। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান—কোথায় পাবে সে-কক্ষ? এঘর, ওঘর করে সর্বত্র ঘুরে বেড়ালো নবাব-অরিন্দম। শেষে দেখলে, একখানি সজ্জিত ঘরে শুভ্র পালংক রয়েছে, নবাব-অরিন্দম ক্লান্ত হয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লো।

একটু পরেই সে দেখলো, সামনে এক অপরূপ সুন্দরী। তার কোমলে-কঠিনে-মেশা নিটোল অঙ্গে আগুনের উত্তাপ থাকলেও সান্নিধ্য জ্বালাময় নয়। গঠনের মাধুর্যে প্রতিটি অঙ্গ যেন প্রতিটির সঙ্গে মিশে আছে। নবাব-অরিন্দম মুগ্ধ হয়ে গেল। ঐ নারীর যৌবন-দীপ্তি ক্রমে তার দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিতে লাগলো। নারী তাকে চোখের ইসারায় অনুসরণ করতে বললো। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার অনুসরণ করলো।

অন্ধকারের ভিতর কিভাবে যে সে অগ্রসর হচ্ছিলো তা বলতে পারে না। একটার পর একটা ঘর পার হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি বাঁধানো সিঁড়ির সামনে এসে উপস্থিত হলো। বেশ চওড়া সিঁড়ি।

মেয়েটি শেষ ধাপ অতিক্রম করে চাতালের ওপর উঠে দাঁড়ালো। চাতালের সামনেই বৃহৎ দরজা। ভিতরে মস্ত বড় ঘর। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকে অনুসরণ করে চলেছে সে। ঘরের পর ঘর পার হয়ে চলেছে। অনেকটা চলার পর একটি দেয়ালের সামনে এসে মেয়েটি দাঁড়ালো—ডাকলো আরো নিকটে যেতে। ভয় হলো। বুকের ভেতর দুরু দুরু করে উঠলো। কিন্তু এগিয়ে যেতেই দেখলো, মেয়েটি আর নেই! কিন্তু অরিন্দম আর পিছিয়ে আসতে পারে না, যার খোঁজে সে এসেছে তাকে খুঁজে বের করবেই। সে যেখানেই থাক—সে যে তার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু কোথায় যাবে সে? পথ কোথায়? কার যেন নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল, অরিন্দমের আশা হলো। মন আনন্দে ভরে উঠলো। কিন্তু আবার যে-অন্ধকার সেই-অন্ধকার! অরিন্দম চিৎকার করে উঠলো: তুমি হৃদয়হীন, তুমি অসাড়, তুমি জড়—মজ্জাহীন কংকাল!

কংকালের কথা মনে হতেই সমস্ত শরীর তার হিম হয়ে গেল। উন্মাদের মতো সে পথ খুঁজতে লাগলো। মনে হলো, অন্ধকূপ থেকে বার হতে না পারলে সে মরে যাবে।

দেখলো, সেই কংকাল তার দিকেই এগিয়ে আসছে। এ কি! এ যে তারই কংকাল!

ভয়ে চিৎকার করে উঠে বসলো। চোখ খুলে দেখে রৌদ্রে ঘর ভরে গিয়েছে। কোথায় রাত্রি? কোথায় অন্ধকার? কোথায়ই বা কংকাল।

অরিন্দম অনেকক্ষণ ধরে চোখ রগড়ালো।

এতক্ষণ ধরে এসব কি দেখলো তবে?

সবই কি স্বপ্ন?

পরিচারিকা এসে জানালে, প্রাতরাশ প্রস্তুত, বেগম তাঁর অপেক্ষা করছেন।

নবাব-অরিন্দম তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিলো, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, এবার থেকে সে খুব সংযত-ভাবে চলবে। ব্যস্ত হলে তার কোনো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না। অতঃপর স্বামীর গাম্ভীর্য নিয়ে সে বেগমের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

বেগম অপেক্ষা করছেন একতলার খানার-ঘরে। ঘরটা খুব বড়। তার সামনেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। ঘরের দেওয়ালে সুন্দর ঘর-কাটা-কাটা কাঠের কাজ। ভোজন-শালার দুই প্রান্তে বড় বড় কাষ্ঠমঞ্চ। তার ওপর নবাব-বংশের পুরাতন রূপার বাসনকোসন সাজানো রয়েছে।

ঘরের মাঝখানে খাবার-টেবিল, আর তাকেই ঘিরে রয়েছে সবুজ মরক্কোচামড়ায়-মোড়া সারি সারি চেয়ার। মাথার ওপরে ঝুলছে খুব বড় একটা বেলোয়ারি ঝাড়। দুজন খানসামা নিশ্চল ও নিস্তব্ধভাবে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে।

নবাব-অরিন্দম একনজরে সবকিছুই দেখে নিলে—পাছে অপরিচিতের মতো তার মুখে-চোখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে। নবাব-অরিন্দম এবার সাবধান হয়েছে - সে চেষ্টা করে তার চোখের আগুনকে ঢেকে রেখেছে, মনের উচ্ছ্বাসকে দমন করেছে। বেগমও স্মিতহাস্যে স্বামীকে অভিবাদন করলো। বেশ বোঝা গেল, গত রাত্রির চিন্তা আর তার মনের মধ্যে নেই। বরং গত রাত্রির ব্যবহারে সে নিজেই এখন অনুতপ্ত। নবাব-অরিন্দম কাছে বসতেই, সে আদর করে উর্দু ভাষায় কি একটা বললো।

মন খুলে কথা বলবার সময়—বিশেষ করে চাকর-বাকরদের সামনে তারা মাতৃভাষাতেই কথা বলতো।

কিন্তু মুস্কিল হলো ছদ্মবেশী নবাব-অরিন্দমের। সে এই ভাষার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কি উত্তর দেবে সে ভেবে পেলো না। বেগমের কথা তার মাথায় জট-পাকাতে সুরু করলো। নবাবের দেহ-ধারণ করবার সময় তার এতসব কথা একবারও মনে হয়নি। এবারে বিপদ বুঝে তার মুখ শুকিয়ে গেল।

বেগম তার স্বামীর নীরবতায় বিস্মিত হলো। ভাবলো, অন্য কোনো চিন্তায় তাঁর কথা কানে যায় নি। আবার একবার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করলো সে। কিন্তু এবারেও নবাব-অরিন্দম নীরব। কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে সে খাবার দিকে মন দিলে।

বেগম বললো, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না? কি হয়েছে বলো দেখি তোমার?

কি উত্তর দেবে নবাব-অরিন্দম সহসা ঠিক করতে না পেরে, নির্বোধের মতো বলে ফেললে, এই লক্ষ্মীছাড়া ভাষাটা দেখছি আমি ক্রমেই ভুলে যাচ্ছি।

বেগম বিস্মিত হয়ে বললেন, বলো কি! যে-ভাষা তোমার মাতৃভাষা—যে-ভাষা মায়ের কোলে একদিন আমন্ত্র দিয়েছে, যে-ভাষা প্রাণবায়ুর মতো, প্রবাহের মতো যার মুখ দিয়ে আজন্মনিঃসৃত হয়েছে—সে কি পারে কোনোদিন সেই ভাষা ভুলতে?

নবাব-অরিন্দম আমতা আমতা করে বললে, সেকথা সত্যি। কিন্তু এমন এক-একটা মুহূর্ত আসে, যখন মনে হয় আমি ওর কিছুই জানি না।

—তুমি বলছো কি কবি! তোমার পিতৃ-পিতামহের ভাষা, তোমার পবিত্র জন্মভূমির ভাষা, যে-ভাষায় স্বজাতীয় ভাইদের চিনতে পারো, যে-ভাষায় তুমি আমাকে প্রথম বলেছিলে, তোমাকে আমি ভালবাসি, যে-ভাষায় তুমি অজস্র কবিতা লিখেছো আমাকে উদ্দেশ করে সেই ভাষা তুমি ভুলে গেলে!

নবাব-অরিন্দম এর সঙ্গত উত্তর খুঁজে পেলো না।

বেগম এবারে ভর্ৎসনা করে বললেন, দেখছি প্যারিসে বেড়াতে গিয়ে তোমার মাথা বিগড়ে গিয়েছে।

নবাব-অরিন্দমের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো। বেগমও খুব দুঃখিত হলো। তার স্বামীর এই অদ্ভুত বিস্মৃতি তার অন্তরে দারুণ আঘাত করলো।

আহারের অবশিষ্ট সময়টা নিস্তব্ধভাবেই কাটলো। নবাব-অরিন্দমের ভয় হচ্ছিলো, কোন্ মুহূর্তে সে সকল-রকমে বুঝি বা ধরা পড়ে যায়।

কিন্তু এইভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। বেগমের মনে কোনো সংশয় উপস্থিত হোক, না হোক, তবু তার ভাল লাগছিলো না। সে হঠাৎ উঠে চলে গেলো।

নবাব-অরিন্দম একলা বসে বসে মাংস কাটবার ছুরিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। এক-একবার মনে হচ্ছিলো, ঐ ছুরিটা তার গলায় বসিয়ে দেয়। কত আশাই না তার ছিল - নতুন এক জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করবে, সেই জীবন—যাকে পাবার জন্যে সে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু তার এই নতুন জীবন সম্বন্ধে সে যে সম্পূর্ণ অপরিচিত। নবাব ওয়াজেদ আলীর দেহ ধারণ করেছে বটে, কিন্তু তার নিজস্ব সত্তা, তার সংস্কার,

তার মনোবৃত্তি কিছুই সে ত্যাগ করে আসতে পারেনি। এমন কি সে যার দেহ ধারণ করেছে, তার আচার-ব্যবহার, তার শৈশবের স্মৃতি, অসংখ্য খুঁটিনাটির কিছুই জানে না সে—তার ভাষা পর্যন্ত জানে না! এ অবস্থায় শুধু বাইরের খোলসটা নিয়ে তার অভিনয় করাই সাজে, আসল মানুষ হওয়া যায় না। দেখছি, ডাক্তার নিরালম্ব সবই পেরেছেন, কিন্তু পারেন নি তার আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আনতে। কিন্তু এখন এ চিন্তা বৃথা।

এদিকে ঘরে এসে বেগম স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলো না। তার কেবলই মনে হতে লাগলো, এ কি করে সম্ভব হ'লো! এ তো সে নয়! মনকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করে, মন ততই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ঘরময় পায়চারি করে আর পাগলের মতো ব'কে চলে। শেষে মাথা গরম হয়ে উঠলো জেবউন্নিসার কিছুতেই শান্তি না। ভাল করে মুখ-হাত ধুয়ে এলো। তবু চিন্তা যায় নাই। এক একটি করে কত ছবিই না তার চোখের উপর ভেসে ওঠে—অতীতের সেই স্মৃতি, কত কথা, কত ছবি।

মনে পড়ে ঝিলম নদীর ধারে কবির সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা।

কবি এসে দাঁড়ালেন—মূর্তিমান বিস্ময়! বললেন, তুমি এত সুন্দর! তোমাকে দেখেই বুঝি কবি বলেছিলেন :

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি

কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী!

****

তোমার মদিরগন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,

মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিত্তে

উদ্দাম সংগীতে।

সার্থক আমি, তৃপ্ত আমি।

বললেন, জানো, এই ঝিলমই তো কাশ্মীরের সম্পদ। এই ঝিলমই তার বাহুবেষ্টনে ঘিরে রেখেছে সমগ্র কাশ্মীরকে—তোমাকেও।

গুলমার্গ দেখে কবি বললেন, অপূর্ব। হিমশুভ্র ঐ গিরিমালা কাশ্মীরের অবগুণ্ঠন। প্রকৃতিদত্ত অবগুণ্ঠন। আহা! পাহাড়ের গা ঘেঁষে ডালহ্রদের মন-মাতানো নীলিমা আর চারদিকে তার তুষারের গিরিশৃংখল। এই তো কাব্য।

যা-কিছু দেখতেন, তাঁর চোখে সবই কাব্য হয়ে উঠতো। একদিন বলেছিলেন, তুমি জলপরী। ঐ ঝিলম থেকেই উঠে এসেছ।

কবির কল্পনার যেন অন্ত ছিল না। কখন বলতেন খঞ্জন আঁখি, কখন বলতেন কাশ্মীরি ফুল।

বলেছিলাম, লোকে তোমাকে পাগল বলবে। উত্তরে বলেছিলেন, বাইরের লোক তোমার কতটুকু জানে। তারা তোমার বাহিরটাই দেখে—তোমার অন্তরের লালিমার খবর তারা কি করে রাখবে।

"দর্ নিঠা শুনম্, জাঁকের গরচে রঙ্গ-ই-নাজুকম্।
রঙ্গ-ই-মন্ দর মন্ নিঠা, চুরঙ্গ-ই-সুরখ
আন্দর-হেনাস্ত ॥"

যে মেহেদির শুধু বাহির দেখে, সে জানে মেহেদি তাজা সবুজ, কিন্তু যে মেহেদির অন্তরের খবর রাখে, সে জানে তার অন্তর রক্ত-রাঙায় লাল।

জেবউন্নিসা আর ভাবতে পারে না—তার চোখে জল এসে পড়লো। সেই স্বামীর আজ একি পরিবর্তন! সে যেন আজ অন্যমানুষ হয়ে এসেছে! তার স্বামীর আকৃতি ধরে আর কেউ! জেবউন্নিসার হাসি পেলো। এও কি সম্ভব? অথচ চেহারার দিক থেকে একেবারে নিখুঁত—হাতের আঙুল পর্যন্ত তার! তবে?

নিশ্চয় মাথার কোনো গোলমাল হয়ে থাকবে। নইলে মাতৃভাষা সে ভোলে কি করে? তারই বাড়ি—অথচ সে নিজের শয়ন-ঘর পর্যন্ত জানে না! ঘরের কোথায় কি আছে তাও তার অজ্ঞাত! সম্পূর্ণ অপরিচিত যে—তার আচার-আচরণেও তা প্রকাশ পেয়েছে। একি রহস্য! কিন্তু এও তো আশ্চর্য, তার স্বামীর চোখে অরিন্দমের ক্ষুধার্ত-দৃষ্টি কি করে আসে। তার এ-দৃষ্টি তো কোনোদিনই ছিল না। প্রথম আলাপেও সে

দেখেছে মদির-বিহ্বল দৃষ্টি। যৌবনের প্রগলভতা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ।

প্রথম যৌবনের প্রতিটি কথা আজো তার মনে আছে। সে কি ভুলবার?

সেই স্বামীর আজ এই ভাবান্তর দেখে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। কেন এমন হলো? এ রহস্য তাকে কে বলে দেবে? কেউ কি কোনো তুকতাক্ করেছে?

একবার তার মনে হ'লো—এ তারই পাপ। লোকে বলে অত্যধিক নেশা করলে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। কিন্তু তার স্বামী তো মোটেই নেশা করে না। তবে কি তবে কি এই সংশয়ের মধ্যে থেকেই তাকে জীবন কাটাতে হবে? এত পেয়েও সে সব হারালো।- এ তার ভাগ্যালিপি।

মাথা গরম হয়ে উঠলো। উঠে গিয়ে মাথায় খুব খানিকটা জল ঢাললো।

একবার মনে হ'লো হয়তো তারই মনের ভুল। দেহ ধারণ করে অপরে আসবে—আজকের দিনে এ-কল্পনা করাও পাগলামি। কিছু-একটা গোলমাল হয়ত হয়েছে—কিন্তু সেই অপরাধে স্বামীর প্রতি এতটা কঠোর হওয়া তার উচিত নয়। মানসীক বৈকল্যে মানুষের অভাবিত পরিবর্তনও তো লক্ষ্য করা যায়। তাকে এখন সহজ হতে হবে—সবকিছুকেই এখন উড়িয়ে দেওয়া দরকার। নইলে যে তারই সর্বনাশ। সময়ের প্রলেপে হয়ত সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এখন সবচেয়ে বড় দরকার—ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা।

এমনও তো হতে পারে, আত্মভোলা কবি সবকিছু ভুলে বুঁদ হয়ে আছেন। সেইজন্যেই তো লোকে বলে, সংসারী লোকের কবি হওয়া সাজে না।

এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে নবাব-অরিন্দম। তার মনে হল ছুটে কোথাও চলে যায়।

এমন সময় সহিস এসে অরিন্দমকে অভিবাদন করে দাঁড়াল: আজ কোন্ ঘোড়াটা আনব?

নবাব-অরিন্দম চমকে উঠলো। সম্মুখে আবার এক পরীক্ষা। বুঝতে পারলো, আসল নবাবের এখন ঘোড়ায় চড়বার সময়।

প্রভুকে চুপ করে থাকতে দেখে, সহিস আবার জিজ্ঞাসা করলো, কাকে আনবো 'তুলটুর'কে, না রোস্তমকে?

নবাব-অরিন্দম বিজ্ঞের মতো জানালো, রোস্তমকে।

খুব খানিকক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে এসে নবাব-অরিন্দমের মাথাটা একটু পরিষ্কার হলো। বেগমও সেই কথা বললো, মনের আর সে-বিমর্ষভাব নেই।

—না, তা নেই। তাই তো একটা কথা তোমাকে বলতে এলাম—খুব গোপন কথা।

বেগম হেসে বললো, গোপন কথা আমাদের মধ্যে কি এখনো আছে?

—সে কথা নয়। আমি যা বলবো তা অতি বিস্ময়কর কথা। যে ডাক্তারের কথা দেশের সকলেই জানে, আমি সেই যাদুকর ডাক্তারের বাড়ি কাল গিয়েছিলাম।

—হাঁ, ডাক্তার নিরালম্ব। তার কথা আমিও শুনেছি। সে নাকি ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে অনেক গুপ্তবিদ্যা শিখে এসেছে।—কিন্তু তার সম্বন্ধে আমার কোনো কৌতূহল নেই—কেন না, আমি বেশ জানি তুমি আমাকে ভালবাসো। আমার এই যাদুই আমার কাছে যথেষ্ট।

নবাব-অরিন্দম একটু থেমে আবার বললে, কিন্তু তিনি যেসব প্রয়োগ-কৌশল আমাকে দেখালেন, সে অতি বিস্ময়কর। শুধু তাই নয়, তাঁর চোখের সামনে আমি কেমন অভিভূত হয়ে পড়লাম। তিনি যেন একটু-একটু করে আমাকে গ্রাস করে ফেললেন। যখন জ্ঞান হলো তখন মনে হলো,আমি সবকিছু ভুলে বসে আছি। এখনো পর্যন্ত আমি পূর্বের সে-স্মৃতি ফিরে পাইনি আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার অতীতটা যেন একটা কুয়াশার মতো ভাসছে। শুধু তুলিনি তোমাকে সেইটেই মনে আছে দেখছি।

—তোমার ভারি ভুল হয়েছে কবি। ঐসব লোকের কবলে কি কখনো যেতে আছে! ঈশ্বর—যিনি আমাকে

সৃষ্টি করেছেন, আত্মাকে স্পর্শ করবার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। কোনো মানুষের সে-চেষ্টা করা মহাপাপ। আর কখনো তুমি তার কাছে যেওনা।

নবাব-অরিন্দমের এই কৌশলেই হয়ত কাজ হতো, কিন্তু বিপদ এলো আর একদিক দিয়ে। একটি ভৃত্য এসে জানালে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—তাকে বাইরের ঘরে বসাও।

নবাব-অরিন্দম যখন বাইরের ঘরে প্রবেশ করলো এবং যাকে সম্মুখে দেখলো—তাকে দেখে তার হৃৎকম্প হলো। এযে তারই দেহধারী নবাব ওয়াজেদআলী। নবাব ওয়াজেদআলী দেখলেন, তার দেহ অধিকার করে দাঁড়িয়ে আছে সেই ভণ্ড প্রতারক। তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হলো, লাফিয়ে এসে সেই শয়তানের টুঁটি চেপে ধরলেন—শয়তান, আমার দেহ ফিরিয়ে দে।

কিন্তু পাইক-পেয়াদা ছুটে আসবার আগেই তিনি সেই শয়তানের হাতে একখানা চিঠি গুঁজে দিয়ে ছুটে পালালেন।

চিঠিখানা খুলে নবাব-অরিন্দম পড়তে লাগলো:

"কতকগুলো অভাবনীয় ঘটনার পাকচক্রে বাধ্য হয়ে আমি এমন একটা কাজ করতে চলেছি—যা আজ পর্যন্ত কেউ কখনো করেনি। সবচেয়ে আশ্চর্য, এ চিঠি আমি নিজেকেই নিজে লিখছি—ঠিকানায় যার নাম লিখছি, বিধাতার অভিশাপ, সে আমারই নাম। যে-নাম তুমি আমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে চুরি করেছো। জানি না, কার কূটচক্রান্তে আমি পড়েছি তুমি হয়ত তা জানো। তুমি যদি ভীরু কাপুরুষ না হও, তাহলে আমার 'চ্যালেঞ্জ'কে তুমি প্রত্যাখ্যান করবে না। আগামী কাল আমাদের মধ্যে একজনকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। হয় পিস্তল, নয় অসির আঘাত—যা তুমি পছন্দ করো। আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি। এখন আমাদের দুজনের পক্ষে এই বিশাল জগৎ অতি সংকীর্ণ—তোমার প্রতারক আত্মা যে-শরীরে বাস করছে, আমার সেই শরীরকে আমি নিজের হাতে বধ করবো, অথবা যে-শরীরে আমার ক্রুদ্ধ আত্মা আবদ্ধ হয়ে আছে—তোমার সেই শরীরকে তুমি বধ করবে। আমাকে পাগল বলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করো না। মনে রেখো, আগামী কাল আমাদের মধ্যে একজনকে আকাশের আলোক-দর্শনে চিরকালের মতো বঞ্চিত হতে হবে। কারণ এই অবস্থা আর বেশিদিন চলতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

চিঠিখানা পড়ে নবাব-অরিন্দমের মাথা ঘুরে গেল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিণাম কি হবে, সে বিলক্ষণই জানে। কিন্তু এ-আহ্বানকে সে এখন প্রত্যাখ্যানই বা করবে কি করে?

দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থান নির্দিষ্ট হলো। কিন্তু মুস্কিল হলো যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে, কে কার গায়ে অস্ত্রাঘাত করবে? নবাব-অরিন্দম অস্ত্রাঘাত করতে গিয়ে দেখে, এ যে তারই দেহ। ওয়াজেদ আলীও তরবারি তুলে স্তব্ধ হয়ে গেলেন—এ কার গায়ে তিনি অস্ত্রাঘাত করতে চলেছেন। এ তো যুদ্ধ নয় এ যে আত্মহত্যা।

কিন্তু ওয়াজেদ আলীকে যুদ্ধ করতেই হবে। তার নিজের জন্যে নয়, বেগম জেবউন্নিসার জন্যে তাকে এ প্রতারককে হত্যা করতেই হবে। ওয়াজেদ সজোরে অস্ত্রাঘাত করলেন।

নবাব-অরিন্দম যোদ্ধা না হলেও, সে এখন ওয়াজেদের দেহধারী—যে-দেহে একদিন ছিল সিংহের মতো শক্তি, যে-দেহ প্রকৃত যোদ্ধার দেহ। নবাব-অরিন্দম মুহূর্তে প্রতি-আঘাত করলো।

ক্ষীণ দেহধারী ওয়াজেদ সে-আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর হাত থেকে তরবারি খসে পড়লো।

নিরস্ত্র ওয়াজেদ। ইচ্ছা করলে নবাব-অরিন্দম তাকে এই মুহূর্তেই হত্যা করতে পারে। কিন্তু তা সে করতে পারলো না। নিজের দেহের গায়ে কি কেউ অস্ত্রাঘাত করতে পারে? সে তার হাতের অস্ত্র দূরে ফেলে দিয়ে ওয়াজেদকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গেল।

ওয়াজেদআলী বললেন, কেন তুমি ডাকলে? তোমার মতলব কি? তুমি অনায়াসে তো বধ করতে

পারতে তাই বা করলে না কেন? নিরস্ত্র বলে যুদ্ধ না করতে চাও, আমাকে অস্ত্র দাও। যুদ্ধ ছাড়া কোনো উপায় নাই—আমাদের দুজনের একজনকে যেতেই হবে।

নবাব-অরিন্দম ধীর শান্তকণ্ঠে বললে, আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো। এখন তোমার বাঁচা-মরা আমার হাতে। যে-দেহের মধ্যে এখন আমি বাস করছি—ইচ্ছা করলে সে-দেহ আমি বরাবর রাখতে পারি। কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলেও আর এ-দেহ ফিরে পাবে না। কারণ, আমি তোমার সকল চেষ্টাকেই বাধা দেবো। বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমাকেই লোকে পাগল বলবে। সে-পরীক্ষাও তোমার হয়ে গিয়েছে। আমি জানি, তুমি আমার দেরাজ খুলে সকল কথাই জানতে পেরেছো। আর এও হয়ত জানো, বেগম জেবউন্নিসার জন্যে আমি উন্মাদ। তাকে পাবার সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো তখন দেখা পেলাম ডাক্তার নিরালম্বের। তিনি এমন এক উৎকট উপায় করলেন যা কোনো দেশের কোনোকালের যাদুকর এ পর্যন্ত করতে পারে নি। আমাদের দুজনকে অভিভূত করে তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে আত্মাকে স্থানান্তরিত করলেন। কিন্তু এই অলৌকিক কাণ্ড আমার কোনো কাজে এলো না। তাই আমি তোমার শরীর,তোমাকেই ফিরিয়ে দিতে চাই। আমি এই কয়দিনে বেশ বুঝতে পারলাম, জেবউন্নিসা আমাকে ভালবাসে না। স্বামীর আকৃতির মধ্যে প্রেমিক-অরিন্দমের আত্মাকে তিনি হয়ত চিনতে পেরেছেন।

অরিন্দমের কণ্ঠস্বরে এমন একটা দুঃখের ভাব ছিল, যাতে তার কথায় অবিশ্বাস করবার কিছু ছিল না।

একটু থেমে অরিন্দম আবার বলতে লাগলো, কিন্তু আমি চোর নই ..জয় করতে এসেছিলাম, চোরের মতো তাকে নিতে আসিনি। যখন দেখলাম, সে আমার কিছুতেই হবে না, তখন কি হবে এই অতুল ঐশ্বর্য, বিপুল সম্মানের বোঝা নিয়ে। এতো আমি চাইনি। যে-ধনের আকাংখা আমার ছিল, তাকেই যখন পেলাম না, তখন ফিরিয়ে নাও তুমি তোমার অতুল ঐশ্বর্য। এস হাতে হাত দাও। এবারে চলো ডাক্তার নিরালম্বর কাছে। যে-অঘটন তিনি ঘটিয়েছেন—তিনিই পারবেন আমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে।

দুজনেই এলো ডাক্তারের কাছে।

(৭)

ডাক্তার নিরালম্ব সকল কথা শুনে চিন্তিত হলেন। বললেন, বেগমের কাছে তুমি কি কোনো সমাদরই পেলে না অরিন্দম? অরিন্দম বললে, আপনি সবই পেরেছেন, কিন্তু পারেন নি প্রকৃতি বদল করতে। যে-স্বাতন্ত্র নিয়ে প্রত্যেকটি মানুষ স্বতন্ত্র—তা বদল করতে পারেন নি, তার সেই আচার-ব্যবহার, তার দোষ-গুণ—যে-দোষ-গুণই তার বৈশিষ্ট, কিছুই পেলাম না আমি তার। দেহ পেলাম, পেলাম না তার স্বভাব। তাই তো সে চিনতে পারলো। সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো, তার স্বামীর দেহে আর কেউ ভর করেছে।

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন। আত্মার শক্তি-সীমা কে নির্ধারণ করতে পারে! বিশেষ করে যে-আত্মাকে কোনো পার্থিব চিন্তা স্পর্শ করে নি—স্রষ্টার হাত থেকে যেমনটি বেরিয়েছিল, ঠিক তেমনটিই রয়েছে। তুমি ঠিকই অনুমান করেছো তিনি তোমাকে চিনতে পেরেছেন—লালসাময় দৃষ্টির সম্মুখে, তাঁর সতীসুলভ বিশুদ্ধ লজ্জা শিউরে উঠেছিল এবং সহজ-সংস্কারবশে আপনা হতেই তিনি সতীত্বের রক্ষাকবচে আপনাকে আবৃত করেছেন। কিন্তু আমার এ পরীক্ষা করতে যাওয়া ভুল হয়েছে। তুমি তো জানো, আমি জাতিতে মুসলমান, ভারতীয় শাস্ত্রে অধিকার একমাত্র ভারতীয় ব্রাহ্মণের। ঐসব গুহ্যবিদ্যা আয়ত্ত করবার শক্তি ভিন্নধর্মীর নেই। তবু আমি যেটুকু পেয়েছি সে তাঁর উদারতায়। যা আমার পাবার কথা নয় তা পেয়েছি। আরও আমার ভুল হয়েছিল অরিন্দম, তোমাদের আত্মার বিনিময় করে সপ্তাহখানেক

বিছানায় শুইয়ে রেখে পরীক্ষা করা উচিত ছিল। সম্মোহন-নিদ্রার নির্দিষ্ট সময় তোমাদের দেওয়া হয়নি। ভুল আমার সেইখানেই। তাছাড়া আরও বুঝতে পারছি, শিক্ষা আমার সম্পূর্ণ হয়নি। আর সময়ও নেই। আচ্ছা, এখন বলো দেখি, তোমরা কি স্বেচ্ছায় আত্মার বিনিময় করতে চাও?

অরিন্দম বললে, নিশ্চয়। আমি এই মিথ্যা দেহের বোঝা আর বইতে পারছি না।

ডাক্তার হাসলেন। তারপর তাঁর সম্মোহন-শক্তি প্রয়োগ করলেন। দুজনেই সংজ্ঞাহীন হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। ডাক্তার প্রবলবেগে হাত নেড়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নবাব ওয়াজেদ আলীর আত্মা তাঁর আপন দেহে ফিরে এলো। কিন্তু অরিন্দমের আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে লাগলো।

ডাক্তার নিরালম্ব অস্থির হয়ে উঠলেন। ঊর্ধ্বগামী-আত্মাকে আকর্ষণ করবার সকলরকম চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হলো। দেখলেন, সেই মুক্তিকামী-আত্মা তাঁর নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। কিছুতেই আর তাকে নীচে নামানো গেল না।

ডাক্তার বিচলিত না হয়ে ওয়াজেদ আলীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হলেন। একটু পরেই ওয়াজেদ বিছানায় উঠে বসলেন। আয়নায় তিনি তাঁর প্রতিবিম্ব দেখে উল্লসিত হয়ে ডাক্তারকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। তাঁর আর মুহূর্ত বিলম্ব সইছিলো না—জেবউন্নিসা না জানি কি মনোকষ্টে আছে!

ডাক্তার নিরালম্ব স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। সম্মুখে অরিন্দমের মৃতদেহ। মুহূর্ত পরেই জানাজানি হবে, হত্যাকারী বলে তাঁকে ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু এ-কলংক তিনি সহ্য করতে পারবেন না। মনস্থির করতে তাঁর বেশিসময় লাগলো না। তিনি একটা কাগজ টেনে নিয়ে ক্ষিপ্রহাতে লিখতে লাগলেন:

"আমার কোনো আত্মীয় বা উত্তরাধিকারী না থাকায়, আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি অরিন্দমকে দিয়ে যাচ্ছি—কারণ, আমি তাকে স্নেহ করি।

এর মধ্যে একলক্ষ টাকা বিভিন্ন হাসপাতালে এবং আতুরাশ্রমের জন্য দান করিয়া গেলাম। এবং আমার বিশ্বস্ত ও অনুগত ভৃত্যকে বারো হাজার টাকা দিলাম। বাকি সমস্ত সম্পত্তি অরিন্দমই ভোগ করিবে।"

একজন জীবিতব্যক্তি মৃতব্যক্তির নামে এইভাবে উইল করে দিলেন—এ অভিনব।

অরিন্দমের পরিত্যক্ত দেহে তখনও উত্তাপ ছিল। ডাক্তার সেই দেহ একবার স্পর্শ করলেন। তারপর নিজের মুখখানা আয়নার মধ্যে দেখে নিজেই ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলেন। দেখলেন, সারা মুখখানায় বলি-রেখা। মুখের চামড়া হাঙরের মতো শুষ্ক ও কর্কশ। ডাক্তার প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, না, এ-দেহ পরিবর্তন করাই ভাল। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, বিদায়! ওরে অপদার্থ মাংসখণ্ড, বিদায়! সত্তর বছর তোকে টেনে এনেছি - আর নয়। যদিও অনেকদিনের সঙ্গী তুই—ছেড়ে যেতে মায়া হচ্ছে, তবু তোকে যেতে হবে। আমার এখনো অনেককিছু করবার আছে। এই যুবকের দেহ পেয়ে আমার আবার নতুন আশা হচ্ছে। আমি আবার পরিশ্রম করবো, নতুন নতুন অনুশীলন করবো। এখনো যা অজ্ঞাত, তাকে আমার জানতে হবে।

কিন্তু আর দেরী করা উচিত হবে না, অরিন্দমের পরিত্যক্ত দেহের তাপ কমে আসছে।

ডাক্তার মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। একটু পরেই তাঁর আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। শুকনো কাঠের মতো ডাক্তারের দেহ সেইখানেই গড়িয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে অরিন্দমের দেহে প্রাণ-স্পন্দন ফিরে এলো। দেহ সবল হয়ে উঠলো। অরিন্দম উঠে বসলো।

বেগমের মনে শান্তি নাই। তার ঐ এক চিন্তা—কেন এমন হলো? সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, তার স্বামীর এ-পরিবর্তন কি করে হলো?

সবচেয়ে আশ্চর্য, তাঁর স্বামীর চোখে অরিন্দমের ক্ষুধিত-দৃষ্টি! এ-দৃষ্টি তার স্বামীর চোখে কি করে আসে? এ কি তারই চোখের ভ্রম? কিন্তু তার স্বামীর স্বাভাবিক আচরণই বা গেল কোথায়? একটা অন্য মানুষ যেন! এও কি সম্ভব, তার স্বামীর দেহে অরিন্দমের আত্মা বাস করছে?

এই উদ্ভট কল্পনা বেগমকে পেয়ে বসলো। এ কাউকে বলবারও নয়, তাই নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। প্রতিকার করবারও কিছু নেই, তাই অসহায়ের মতো সহ্য করে চলেছে। কিছু ভাল লাগে না—শুয়ে বসেও সময় কাটতে চায় না। আজকাল তাই বই মুখে করে প্রায়ই বসে থাকে।

একখানি বই তার হাতে এসেছে—প্রেতাত্মাবাদ সম্বন্ধে। লিখেছেন এক জার্মান গ্রন্থকার। তার স্বামীর পরিবর্তন বেগমকে এই তত্ত্বে অনুসন্ধিৎসু করেছে। নবাব ওয়াজেদ আলী যখন ঘরে এলেন, তখন এই বইখানিই বেগম পড়ছিলো। বই পড়তে পড়তে বেগম একবার মুখ তুলে চাইলো—বোধ হয় ভয়ও পেয়েছিলো। ভেবেছিলো, আবার হয়ত সেই-দৃষ্টি দেখবে। কিন্তু নবাবের চোখে ছিল একটা প্রশান্ত হাসি। তিনি হেসেই বললেন,—অবশ্য উর্দু ভাষায়, কি ভয় পেলে নাকি?

—যাক বাঁচালে। এ কদিন তো মাতৃভাষায় কথাই বলতে পারোনি। বলেছিলে, মাতৃভাষা ভুলে গেছি।

নবাব হেসে উঠলেন: তাই নাকি, মাতৃভাষা ভুলে গিয়েছিলাম? তুমি হাসালে জেব, এ কি কেউ ভোলে নাকি? অনন্ত বিস্মৃতির মধ্যেও কেউ মাতৃভাষা ভোলে না।

—আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, এ কি করে সম্ভব হলো! তোমার এই চোখে কি করে লালসার দৃষ্টি এলো! কি ভয়ে যে কাটিয়েছি কদিন সে আর কি বলবো! একদিন তোমাকে অন্য লোক ভেবে কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি। তুমি বলতে পারো, এ-রহস্যের মূল কোথায়?

—হাঁ পারি। এ কদিন আমার দেহে শয়তান অরিন্দমের আত্মা বাস করেছে। কি চমকে উঠলে যে! অরিন্দমকে তুমি চেনো নাকি?

—হাঁ চিনি। তুমি যখন প্যারিসে, সে প্রত্যহই আমাদের কাশ্মীরের বাড়িতে আসতো। সে আমাকে দেখে পাগল হয়েছিলো। আমি বিরক্ত হয়েছি, কিন্তু কটুকথা কোনোদিনই বলতে পারিনি। শেষে একদিন বাধ্য হয়েছিলাম বলতে, তুমি আর এসো না। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, তোমার আর না আসাই উচিত। কারণ আমি বিবাহিতা। তোমার লিপ্সা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে—এতে তোমার ক্ষতিই হবে। মনকে সংযত করো। আমার দেবতার মতো স্বামী—যিনি আমাকে সর্বক্ষণ রক্ষা করছেন। তুমি ফিরে যাও, কাল থেকে আর এসো না। এলে জ্বালাই বাড়বে। বরং অদর্শনে দেখবে আস্তে আস্তে ভুলে যাবে। কাজকর্মে মন দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। বিয়ে-থা করে সংসারী হও—দেখবে, জলের আল্পনার মতো সব মুছে যাবে। সে চলে গেল। ভেবেছিলাম বুঝি ভুলে গেছে। সে যে আবার নতুন ষড়যন্ত্রে মাতবে এ ভাবতে পারিনি।

—শয়তানটা শেষে কূলকিনারা না পেয়ে ডাক্তার নিরালম্বর শরণাপন্ন হয়েছিল।

বেগম বিস্মিত হ'য়ে বললো, তার এতবড় শক্তি —আত্মার বিনিময় করতে পারে?

—বিশ্বাস আমিও হয়ত করতাম না। কিন্তু নিজে ভুক্তভোগী, অনেককিছুই প্রত্যক্ষ করলাম। এমন যন্ত্রণাদায়ক উপলব্ধি যেন শত্রুকেও না করতে হয়। সত্যিই লোকটা অসাধারণ ক্ষমতা ধরে। নিজের চোখেই দেখলাম এক বৃদ্ধাকে যৌবন ফিরিয়ে দিতে।

বলো কি!

শেষে চরম খেল দেখালো আমাকে নিয়ে।

—কি অবস্থায় যে কদিন আমার কেটেছে! পরের দেহে বাস এ কি কম জ্বালা! আমার আপনজন সব পর হয়ে গেল—পর হলো আপন! অরিন্দমের

আত্মীয়-বন্ধুরা সবাই ভিড় করে আসে—আমি তাদের চিনিও না, তবু অভিনয় করে যেতে হয়। সে যে কি নরক-যন্ত্রণা জেব, আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না। এ কদিন আমার মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে। প্রাণ পড়ে থাকতো এখানে, কিন্তু আসবার অধিকার নেই। তবু চেষ্টা করেছিলাম—মরীয়া হয়ে এতদূর ছুটে এসেছি, শেষে সিপাইরা পাগল বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওদের দোষ কি, আমি তো অরিন্দমের খোলস পরে এসেছি।

জেব উন্নিসার চোখে জল এসে পড়লো।

ওয়াজেদ পূর্বের অবস্থা মনে করে শিউরে শিউরে উঠছে। ভাবতে ভয় হয়, ঐ অরিন্দমের দেহে যদি আমাকে সারাজীবন কাটাতে হতো! ভগবান রক্ষা করেছেন, তাই অরিন্দমের সুমতি হলো। না হলে তোমাকেও ঐ অরিন্দমের সঙ্গে বাস করতে হতো।

—আমাকে আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা জুড়োতে হতো আর কি! এই দুদিনেই যে কি অবস্থা হয়েছিলো আমার, সে আমিই জানি।

—অরিন্দমও জানলো, সে তোমাকে কিছুতেই পাবে না। সে আরও বুঝতে পেরেছিলো, তুমি তাকে চিনতে পেরেছো। মিছে এখানে পড়ে থেকে জ্বালা বাড়িয়ে লাভ কি! তাই তো সে স্বেচ্ছায় আমার দেহ আমাকে ফিরিয়ে দিলে। দু'জনেই আমরা গেলাম ডাক্তার নিরালম্বর কাছে। ডাক্তার সব শুনে বললেন, সতীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন। বলে, তোমার খুব প্রশংসা করলেন। শেষে আমাদের উভয়ের সম্মতি নিয়ে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন।

—ফিরে এলাম বটে, কিন্তু মনকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না। মনটাকে যেন কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। ভয় যেন আমার এখন নিত্যসঙ্গী। কি করবো কিছুই ঠিক করতে পারছি না। চলো, কোথাও দিনকতক ঘুরে আসি। বেড়ালে হয়ত মন প্রফুল্ল হবে। নইলে কিছুতেই আমি সুস্থির হতে পারছি না।

—তাই চলো। আমারও কিছু ভাল লাগছে না।

—কোথায় যাবে বলো দেখি?

—যেখানে হয়। এই আবহাওয়া কাটানো দরকার।

—চলো দক্ষিণ ভারতে যাই। শিল্পের পীঠস্থান।

পরদিন সকালে সংবাদপত্রে খবর বেরুলো:

"ডাক্তার নিরালম্ব—যিনি শল্যবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য এবং রোগ-আরোগ্য করবার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য প্রখ্যাত হয়েছিলেন, গতকল্য অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ পরীক্ষা করে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নি। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমই বোধহয় তাঁর মৃত্যুর কারণ। তাঁর দেরাজ থেকে একখানি দানপত্র উদ্ধার করা হয়েছে—তাতে তিনি অরিন্দমকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছেন।"

সংবাদ পড়ে ওয়াজেদ চিৎকার করে উঠলেন। জেব ছুটে এলো, বললে, কি হয়েছে?

—এই দেখ।

জেব উন্নিসাও স্তম্ভিত হয়ে গেলো। বললে, মৃত্যু এ লোককেও রেহাই দিলো না!

—সত্যিই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন! কিন্তু ভগবান আমাদের রক্ষা করেছেন। এ-মৃত্যু দু'দিন আগেও হতে পারতো, তাহলে কে আমাদের দেহ ফিরিয়ে দিতো? সেই নরকে পচে মরতে হতো। এ-যেন আমাদের জন্যেই তিনি অপেক্ষা করছিলেন, আমাদের যথাস্থানে সন্নিবেশ করে মৃত্যুর হাতে ধরা দিলেন। ভাগ্যবান অরিন্দম, প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হলো।

(৮)

দক্ষিণ ভারতে এসে জেবউন্নিসা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লো। পৃথিবীর বিস্ময় নিয়ে যেন এই ভারত সৃষ্টি হয়েছে। কত দেশ ঘুরে ঘুরে দেখলো তারা—কত কীর্তি, কত নরনারী।

পৃথিবীটা যে ছোট নয়, ঘরের বাইরে পা না দিলে

তা বোঝা যায় না। আর বোঝা যায় না, মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার কথা। ইটের দেয়াল-ঘেরা ঘর আর বারান্দায় ঘুরে আপনজন মনে হয় শুধু স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে। পথে বেরিয়ে আত্মীয়ের সংখ্যা বাড়ে—মনে হয়, পৃথিবীটাই নিজের ঘর, আর মানুষ মানেই আত্মীয়।

জেবউন্নিসা বললো, সত্যিই তাই।

—বাংলা দেশ থেকে এতদূরে এসেও যদি আমরা এস্থানকেও নিজের দেশ ভাবি, তাহলে মন আর আমাদের খাঁচার মধ্যে বন্ধ থাকবে না।

ঔরাঙ্গবাদ থেকে তারা গেল অজন্তা ইলোরা। অজন্তা আর ইলোরাকে নিয়ে মানুষের কল্পনার আর শেষ নাই—সৌন্দর্যের যেন শেষ কথা সেখানে লেখা আছে।

জেবউন্নিসা হেসে বললো, কবির কল্পনাও এর নাগাল পাবে না।

—এটা তুমি ভুল বললে জেব, কবি না হলে এমন সৃষ্টি কে করতো? পাথর কুঁদে এমন মূর্তি-পরিগ্রহ করতে একমাত্র শিল্পীই পারে। কবির দৃষ্টি ধ্যানের দৃষ্টি। এইসব ধ্বংসস্তূপ পড়ে না থাকলে ইতিহাস থেকে কত দেশের কথা মুছে যেতো। এইসব আছে বলেই দক্ষিণ ভারতের রাজবংশগুলি উজ্জ্বল হয়ে বেঁচে আছে। স্থাপত্যের এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভারতে আর কোনোখানে নেই।

ওয়াজেদ আলীর ছিল বেড়ানোর নেশা। সে থামতে জানতো না।

জেবউন্নিসা হাঁপিয়ে উঠলো। বললো, তুমি কি থামতে জানো না? আর কত ঘুরবে?

ওয়াজেদ উত্তরে বললো, পৃথিবীর শেষ না হ'লে মানুষের যাত্রার শেষ নেই। পৃথিবীটা তো কোনো-সময় স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ায় না, সারাক্ষণ লাট্টুর মতো ঘোরে—ঘুরতে ঘুরতেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর মানুষ তাই কি ক'রে স্থির হয়ে থাকবে? তাকে ঘুরতেই হবে, চলতেই হবে। তার যাত্রার শেষ কোনোদিনই হবে না। যতদিন ভ্রমণ ততদিনই সান্নিধ্য। নইলে দেখতে আর কতটুকু সময় লাগে! একদিনে জানা যায় না, এক জীবনেও হয়ত বাকি থেকে যায়।

এরপর তারা এলো বিন্ধ্য ও সাতপুরার দক্ষিণে, তাপ্তি ও গোদাবরীর উপত্যকায়। এরই দক্ষিণে নাঞ্জনগুড, পশ্চিমে সোমনাথপুর আর শিবসমুদ্রম। উত্তরে বামহাতে কৃষ্ণরাজসাগর আর দক্ষিণে শ্রীরঙ্গ-পাটনা। উত্তর-পশ্চিমে গেলে ব্যাঙ্গালোর। এইখান থেকেই তারা কোলার স্বর্ণখনি দেখতে গেল।

একদিকে পাথরের গুঁড়ো, অন্যদিকে সোনার কণা। তাল তাল সোনা। সোনা চুরি না হয় তার কত ব্যবস্থা তবু কি চুরি হয় না? চুরির শিক্ষা যে আমাদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে। নিজেদের জিনিস আমরা নিজেরাই চুরি করি। যে-দেশ সোনায় ভরে যেতে পারতো, সে-দেশে আজ খাদ্য নেই। দুমুঠো খেতে দেবার আশ্বাসও কেউ দেয় না। জানো জেব—

পৃথিবীর মানুষ আজ একটা জিনিস আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে—সে টাকা। এই টাকাই আজকাল মনুষ্যত্বের মান, সমাজের ছাড়পত্র। যার টাকা আছে তার সব আছে, যার নেই তাকে সমাজ মানুষ ভাবে না। টাকা দিয়ে মানুষ সমস্ত পাপকে ঢেকে রেখেছে।

তারপর তারা এক এক ক'রে অনেক কিছুই দেখলো। দেখলো শ্রীরঙ্গপত্তন। শ্রীরঙ্গপত্তন একটি স্বাভাবিক দুর্গ। কাবেরী নদী হঠাৎ দুইভাগ হ'য়ে আবার যুক্ত হয়েছে। যেমন শ্রীরঙ্গমে। শহর একটি নদীবেষ্টিত দ্বীপ। দ্বীপ নয়, দুর্গ। দুধারে দুটো সেতু দিয়ে দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

জেবউন্নিসা হেসে বললো, তুমি যে ভূগোলের মান-চিত্রের আর কিছু রাখলে না।

—তোমারও ভূগোল শেখা হ'লো।

জেব হেসে বললো, হাঁ, শেখা ব'লে শেখা।

যে-বাংলোয় তারা এরপর এসে উঠলো, তার সামনে ছিল এক কৃষক-দম্পতি। তাদের ঝগড়া প্রায়ই লেগে থাকতো। একদিন বৌটাকে ডেকে জেবউন্নিসা জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা রাতদিন ঝগড়া করো কেন?

বৌটা বললো, আমাদের জাতের একটা নিয়ম আছে—বিয়ের প্রথম দশ বছর স্বামী কথা বলবে, বৌ শুনবে। আর পরের দশবছর বৌ কথা বলবে, স্বামী শুনবে। তারপর তারা দুজনেই কথা বলবে—কেউই শুনবে না। আমাদের এখন পরের দশবছর চলছে, ওরই তো শোনবার কথা—কিন্তু শোনে না কেন?

ওয়াজেদ আলি জেবউন্নিসা দুজনেই হেসে উঠলো।

জেবউন্নিসা বললে, এবার থেকে আমরাও ঐ নিয়ম করবো।

ওয়াজেদ হেসে বললো, আমাদের তবে এখন কোন্ দশক চলবে?

দ্বিতীয় দশক। আমি বলবো, তুমি শুনবে।

কিন্তু এই দশকে যদি হঠাৎ আমাদের মাঝখানে অরিন্দম এসে উপস্থিত হয়?

জেবউন্নিসার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল: অমন কথা মুখেও উচ্চারণ ক'রো না।

তুমি পাগল হ'লে নাকি? সে এখানে কি করতে আসবে। আর কেনই বা আসবে? সে স্বেচ্ছায় আমার দেহ আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমাকে সে পাবে না জেনেই ফিরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য্য! কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অরিন্দম সশরীরে এসে উপস্থিত হ'লো।

জেবউন্নিসা ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো।

অরিন্দম হাসতে হাসতে বললো, ভয় নেই বেগম-সাহেবা! আমার কাছ থেকে তোমার আর কোনো ভয় নেই। আমার এই দেহে ডাক্তার নিরালম্বর আত্মা বাস করছে।

ওয়াজেদ বিস্মিত হ'য়ে বললো, তবে তুমি এখানে কেন অরিন্দম?

অরিন্দম উত্তরে বললো, গুরুর সন্ধানে বেরিয়েছি। ডাক্তার নিরালম্বর অসমাপ্ত সাধনা সম্পূর্ণ করতে হবে। এই তাঁর নির্দেশ। তাঁর সমস্ত শক্তির অধিকারী এখন আমি। আমি চললাম। আবার দেখা হবে।

সত্যিই অরিন্দম চলে গেল।

জেব উন্নিসা তখনো প্রকৃতিস্থ হ'তে পারে নি।

—তোমার কি এখনো ভয় গেল না?

জেব উন্নিসা হাসবার চেষ্টা করে বললো, না, ভয় নয়। তবে আর ভাল লাগছে না। চলো, এবার আমরাও ফিরি।

বাংলা ও বাঙালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'কলাম্বাসী' আবিষ্কার !!

কমিউনিষ্ট মতবাদ প্রচারে এবং 'জেমে' আমাদের দেশের তথা ভারত, তথা সারা বিশ্বের গৌরব শ্রীল শ্রীমৎ ঠাকুর জ্যোতি বসু কার্ল্ মার্ক্সকেও অতিক্রম করিয়াছেন। নিত্য এবং 'অভিনব' ঘোষণা দ্বারা তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কল্যাণের জন্য জীবনপাত করিতেছেন! মাত্র কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজ্যোতিঠাকুর ঘোষণা করিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার বে-আইনী, অতএব এই সরকারকে ঠেঙাইয়া ল্যাঙড়া করিয়া অচল করাটা নিশ্চয়ই কোন অপরাধজনক কার্য হইবে না। এবং এই মহৎ কার্য বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার জন্য সি পি এম দলের সর্ব্বস্বার্থত্যাগী (একমাত্র ক্ষমতা ছাড়া') মহানেতারা এক বিরাট কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়াছেন। আশা করি কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকার অবহিত হইবেন এবং আত্মরক্ষার জন্য যাহা কিছু দরকার তাহা অবশ্যই করিবেন—যদি এখনো না করিয়া থাকেন! কিন্তু হঠাৎ শ্রীশ্রীজ্যোতিঠাকুর এমন ক্ষেপিয়া গেলেন কেন এবং এই ক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রলাপ বকিতেই বা আরম্ভ করিলেন কেন? আজ জ্যোতিঠাকুর এবং সি পি এম এর অন্যান্য অপদেবতাদের কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হইতেছে ('গত্যান্তরবিহীন অবস্থায়) চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া, পালাইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া সি পি এম যাহাকে সামনে এবং বাগে পাইবে তাহাকেই বিষাক্ত দাঁতে মরণকামড় দিবার বিষম প্রয়াস করিতেছে!

বর্ত্তমান রাজ্যসরকার জ্যোতিঠাকুরের বিচারে আজ বে-আইনী হইল, কিন্তু মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেই এই বে-আইনী সরকারের বে-আইনী রক্ষকের নিকট হইতে জ্যোতিঠাকুর বে-আইনী আবদার করিয়া কিছু বে-আইনী 'সুবিধা' আদায়ের চেষ্টা করেন নাই কি? তখন ত এই মার্ক্সীয় যোদ্ধার একবারও মনে হয় নাই যে বর্তমান রাজ্যসরকার বে-আইনী! রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পরেই, শ্রীমৎজ্যোতিঠাকুর তাঁহার ভক্তদের লইয়া একটা মাইনরিটি সরকার গঠনের আশায় রাজ্যপালের শ্রীচরণে বহু পিপা ভেজাল তৈলও ঢালেন! সর্ব্বভাবে আশাহত হইয়া আজ সি পি এম নেতারা উন্মত্ত হইয়া জনসমাজের পক্ষে বিপদের কারণ হইয়াছেন কিনা বিচার করা দরকার। সি পি এমের ব্যাদাচি নেতারাও কেহ কম যান না! ভক্তপ্রবর মহারাজ সুধীনকুমার বলিতেছেন:

> "বাংলা কংগ্রেস এবং আর্ট পার্টি জোটের বিশ্বাসঘাতকার জন্য আজ সারা রাজ্যে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে!"

কে কাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিল বুঝিতে পারা গেল না। সি পি এমকে যদি তাহাদের দেশ এবং জাতির সর্ব্বনাশকর সর্ব্ববিধ ধ্বংসাত্মক কাজে বাংলা

কংগ্রেস বাধা দিয়া থাকে, তবে তাহা 'বিশ্বাসঘাতকতা' নহে, ইহা দ্বারা এই পার্টি দেশের প্রতি মহত্তর কর্তব্য পালন করার সঙ্গে সঙ্গে সি পি এমের বিষ দাঁত ভাঙ্গিবার চেষ্টাই করিয়াছে। যুক্ত-ফ্রন্টের কোন শরিক যদি 'বিশ্বাসঘাতকতা' করিয়া থাকে, তবে সেই শরিক সি পি এম ছাড়া আর কেহ নহে। দেশ এবং জাতির প্রতি যে পরম বিশ্বাসঘাতকতা সি পি এম করিয়াছে, তাহার বিচার এবং উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা দেশবাসী অচিরে করিবে—ইতিমধ্যে তাহার সুচনাও পরিস্ফুট হইতেছে।

বর্তমানে সি পি এমের প্রধান কাজ হইয়াছে এ-রাজ্য হইতে কেন্দ্র কেন্দ্রীয় সি-আর-পি প্রত্যাহার করিয়া রাজ্যের সুখ শান্তি আইনকানুন সব কিছু সি পি এম নেতা সর্বাধিনায়ক শ্রীশ্রীঠাকুর জ্যোতির হস্তে সমর্পণ করা, এক কথায় রাজ্যবাসীদের মাথা কাটিবার পূর্ণ অধিকার সি পি এমকে দেওয়া। সি-আর-পি বর্তমান থাকায়, গণতন্ত্ররক্ষার অজুহাতে গণতন্ত্রকে গলাটিপিয়া হত্যাকারী সি পি এম বাহিনীর পুন্যকাজে ব্যাঘাত হইতেছে। তাহাদের সর্বনাশা আদর্শকে নিরীহ জনগণের রক্তস্রোতে রাজপথে প্রবাহিত করা যাইতেছে না!

পুণ্যশ্লোক রামবল গোঁয়ার কি বলেন দেখুন। গোঁয়ার বলিতেছেন:

"সি আর পি ও রাজ্যপুলিশের হাতে অনেক রক্ত ঝরছে, তাই আন্দোলন তীব্র করতে হবে।"

গোঁয়ার ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গত দেড় বছরে যদি ১০০ কেজি রক্ত ঝরিয়া থাকে, তবে তাহার মধ্যে ৯০ কেজি রক্ত ঝরাইয়াছে সি পি এম হামলাবাজের দল! সি পি এম নেতারা চাহেন, পুলিশের উপর যাহার ইচ্ছা যত বোমা বর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু পুলিশকে সকল প্রকার আক্রমণ উপদ্রব মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইবে! পুলিশের আত্মরক্ষারও কোন অধিকার থাকিতে পারে না!

ভাবিতেও ভয় হয়, সি পি এম যদি আর একবার গদিতে বসিতে পারে—তাহা হইলে এ-রাজ্যের কি অবস্থা হইবে। আমাদের সামনে দুটি মাত্র পথ আছে। প্রথম সি পি এমকে দমন করা। দ্বিতীয় আমাদেরই নির্বাণের পথে মহাযাত্রা করা। অবিলম্বে পথ নির্দ্ধারণ করিতেই হইবে।

একখানি পত্র

"ভারতীয় ঐতিহাসিকরূপে যে ক'জন বাঙালী ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে স্যার যদুনাথ সরকারই সর্বাগ্রগণ্য বলে পরিচিত। বাংলা অথবা ভারতবর্ষ নয় সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে স্যার যদুনাথ একজন প্রকৃত আদর্শবাদী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসাবে সুপরিচিত। শুধু তাই নয় উর্দু ও পারসী ভাষাতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন বলে খ্যাতি আছে।

"আগামী ১০ ডিসেম্বর তারিখে স্যার যদুনাথের জন্ম-শতবর্ষ-পূর্তি হচ্ছে। এই উপলক্ষে বাংলা দেশে যদুনাথের জন্ম শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়া কি উচিত নয়? আজ পর্যন্ত এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন কোথাও হচ্ছে কিনা আমার জানা নেই। রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারও এরূপ অনুষ্ঠানের কোন আয়োজন করছেন কিনা তাও অজ্ঞাত। সরকারী পর্যায়ে এরূপ অনুষ্ঠান হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। সরকারী উদ্যোগে যদুনাথের জন্ম শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত না হলেও অন্ততপক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত।"
—নির্মলকুমার খাঁ, হাওড়া—১।

"আচার্য্য যদুনাথ সরকারকে এদেশের ঐতিহাসিক গবেষণার জনক বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। যদুনাথের মত এমন কঠোর সত্যনিষ্ঠ—সত্য তথ্য নির্ভর গবেষণা, প্রতিটি তথ্যকে এমনভাবে যাচাই করিয়া দেখা, সাক্ষ্য প্রমাণ উত্তীর্ণ হইলেই তবে তাহা গ্রহণ করার অভ্যাস পূর্ব্বে এতটা এদেশে ছিল না। ইতিহাসের মূল উৎস পরীক্ষা করার সুবিধার জন্য মুঘল রাজবংশ ও শিবাজীর ইতিহাসসন্ধিৎসু এই মহান ঐতিহাসিক রীতি-

মত ফারসী ও মারাঠী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তবে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়, আচার্য্য যদুনাথ এখনও ভারত সরকারের চোখে স্মরণীয় বলিয়া গণ্য হন নাই, সামান্য সাধারণ মানুষই রহিয়া গিয়াছেন।" (কথা সাহিত্য)

আগামী ১০ই ডিসেম্বর আচার্য্য যদুনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা হিষ্টরিকেল সোসাইটি একটি স্মারক ডাকটিকিট বাহির করার জন্য ভারত সরকারের ফিলাটেলিক বিভাগকে অনুরোধ করেন। বেশ কয়েকমাস অতিবাহিত হইবার পর অনুরোধের জবাব মিলিয়াছে। "যেহেতু এবছর কি কি এবং কতগুলি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হইবে তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়া গিয়াছে, সেইহেতু কলিকাতা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটির অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।" ইহার উপর আর কি বলিবার থাকিতে পারে।

কিন্তু আমরা বৃথা অনুযোগ করিতেছি! কেন্দ্র সরকারে যদি একজনও প্রকৃত শিক্ষিত এবং দেশপ্রেমী মানুষ থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতের সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানী এবং গুণীদের এমন হেনস্থা হইত না। কেন্দ্র সরকারের অবিরাম বকবকম্ গুজরাল নামক এক অতি বিদ্বান মন্ত্রী ভারতসরকারের মুখপাত্র হইয়াছেন। সারাবিশ্বে এমন কোন বিষয় নাই যে বিষয়ে এই হঠাৎ আবির্ভূত অভিমানবটি কথা বলেন না। সংবাদপত্রের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের কর্ত্তব্য কি সংবাদ পত্রমালিকদেরও ছাড়িয়া কথা বলা হয় নাই। গুজরাল মতে মালিক কেবল মাত্র পয়সা চা লয়া যাইবেন এবং সংবাদপত্র কর্ম্মীরা—(সাংবাদিক এবং সাধারণ কর্ম্মী) তাহাদের খেয়াল খুশি মত কাজ করিবেন! ইহা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রসরকারকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত চিত্তে সংবাদপত্রের পরিচালন দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞানী 'সদা-বকবকম এই গুজরালই প্রকৃতপক্ষে বেতার, জনসংযোগ, তথ্য প্রচার এবং পোষ্টাল বিভাগের মালিক। 'সিংহ' ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হইলেও গুজরালী দাপটে তিনি প্রায় মেকুরে পরিণত হইয়াছেন। গুজরাল পণ্ডিত যখন এতই জানেন এবং এতই খবর রাখেন, তখন আচার্য্য যদুনাথ বিষয়ে কেন্দ্রের অন্যান্য পণ্ডিতদের তিনি কি সামান্য একটু জ্ঞান বিতরণ করিতে পারিলেন না? তবে বোধহয় এখানেও আমরা ভুল করিতেছি! আচার্য্য যদুনাথের মত সামান্য একজন ইতিহাস-শিক্ষকের বিষয় কিছু জানা বোধহয় গুজরাল পণ্ডিত প্রয়োজন মনে করেন না।

শুনিয়াছি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দায়িত্ব যৌথ-দায়িত্ব। তাহাই যদি হয়, তবে আমাদের ত্রিগুণা সেন মহাশয় আচার্য্য যদুনাথ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশে প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন না কেন? সংসদের বাঙ্গালী সদস্যরাই বা এ বিষয়ে কি করিতেছেন? নিজ দলীয় স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া তাঁহাদের কি পশ্চিম বাঙ্গলার প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই, একমাত্র ভোট ভিক্ষার সময় ছাড়া? অন্যদের কথা ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু অধ্যাপক হীরেন মুখার্জ্জী শিক্ষিত, পণ্ডিত, ভদ্রব্যক্তি, তিনিও কি আজ সঙ্গদোষে 'দুষ্ট' হইলেন? বেশী আর কি বলিব,-দিল্লীতে কলসী আর দড়ির অভাব নাই, যমুনার জলেও স্নানের অভাব নাই, এই তথ্যটা মহামান্য বাঙ্গালী এম পিদের গোচরে আনিলাম। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ তাঁহারা নিজেরাই করিতে পারেন।

প্রসঙ্গতঃ—

একটি পুরান ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। নেহেরু রাজত্বকালে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে ভারতে স্বাধীনতার ইতিহাস লিখিবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। ইতিহাসের প্রথমখণ্ড যখন সমাপ্ত প্রায়, হঠাৎ মহারাজ নেহেরু পাণ্ডুলিপি দেখিতে চাহেন। পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মহারাজজী ক্ষেপিয়া লাল! —কারণ পাণ্ডুলিপিতে সত্যকথা লেখা হয়, স্বাধীনতার যুদ্ধে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর অনন্ত অবদানের কথা বর্ণিত হয়। ইহা তৎকালীন মুকুটহীন ভারত (খণ্ডিত) সম্রাট সহ্য করিতে পারেন নাই। ইতিহাসে উত্তর প্রদেশের স্বাধীনতা

প্রয়াসের বিশেষ কোন কথা ছিল না, কারণ প্রথম যুগে উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশের কোন অবদান ছিল না বলা যায়! রমেশবাবুর চাকরীগেল—এবং তাঁহার স্থলে অজ্ঞাতনামা এক ডঃ ঐতিহাসিকের সত্য মিথ্যা মিশ্রিত নেহেরু নির্দ্দেশিত পথে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস রচিত হইল এবং এখনো হইতেছে!

রাজ্যপাল VS. গণপতি

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের এখন প্রধানতম কাজ হইতেছে গণপতি জ্যোতি বসুর চার্জ-শীটের জবাব দেওয়া। শ্রীযুক্ত বসু রাজ্যপালকে যেভাবে এবং ভাষায় পত্র লিখিতেছেন তাহাকে ভদ্র বলা শক্ত। শ্রীবসুর 'অনুরোধ-পত্রগুলি' হুকুম ছাড়া আর কিছুই নহে। রাজ্যপাল মহাশয়ও সি পি এম নেতার হুকুমগুলি নত শিরে ভীত সন্ত্রস্তচিত্তে গ্রহণ করিতেছেন এবং তাহার বিনীত জবাবও দিতেছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে জ্যোতিবাবু রাজ্যপালকে এক পত্রে জানান যে চলতি বৎসরের নভেম্বর মাসে এ-রাজ্যের অন্তর্বর্তী নির্ব্বাচনের দাবি পশ্চিমবঙ্গের 'জনগণ' যাহা করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার সে দাবি যেন স্বীকার করেন, তাহার ব্যবস্থা করা। বলা বাহুল্য জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বলিতে রাজ্যের সাধারণ জনের কথা বলিতেছেন না, এখানে জনগণ বলিতে বুঝাইতেছে সি পি এম এবং এই দলের প্রতিভূ জ্যোতি বসু মহাশয়কে। আজ এ-রাজ্যের জনগণের গণপতি হিসাবে শ্রী শ্রী ঠাকুর জ্যোতি মহারাজের যেকোন বেয়াড়া এবং হাস্যকর দাবিকে সারা বাঙলার সকল জনের দাবী বলিয়া রাজ্যপাল তথা কেন্দ্র সরকারকে অবশ্যই মানিতে হইবে! কারণ এই মার্ক্সীয় ঠাকুরের নির্দ্দেশ এবং বিধি ব্যবস্থাই চরম!

আমরা বুঝিতে পারি না, রাজ্যপাল শ্রীধাবন শ্রীজ্যোতি বসুকে মনে মনে এত ভয় এবং প্রকাশ্যেই বা এত সমীহ করেন কেন? রাজ্যপাল হিসাবে তাঁহার একমাত্র কাজ কি জ্যোতি বসুর অকারনের পত্রাবলীর জবাব দেওয়া, ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় কাজ কি আর তাঁহার নাই? অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে একটা রাজ্যের প্রধান প্রশাসকের নিকট হাজারো জনের হাজার পত্র এবং আবেদন নিবেদন আসিবে, কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক পত্রাদির জন্য ত একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। যে পত্রাদি এবং আবেদন নিবেদন বিচার বিবেচনার অযোগ্য সেই সবের নির্দ্ধারিত স্থান 'ডাবলু বি পি' অর্থাৎ ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট্! গত কিছুকাল হইতে সি পি এমের ত্রয়ী নেতা যে ভাবে এবং ভাষায় মাননীয় রাজ্যপালের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন, তাহা আর যাহাই হউক ভদ্রজনোচিত নহে। আমরা আশা করিব, শ্রীধাবন সি পি এম নেতাদের নিকট হইতে বহুপ্রকারে বহুভাবে বহু অপমান হজম করিয়াছেন। এবার মেরুদণ্ড শক্ত করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করুন। রাজ্যপালের আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত, সি পি এমের বাঙালী কোসিগীন শ্রী জ্যোতি বসুর রাজভবনে বিনা হুকুমে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। জ্যোতিবসুরও মনে রাখা উচিত যে কলিকাতার রাজভবন এবং মহাকরণ কোনও মহানুভব ব্যক্তি বিশেষভাবে [তাঁহাকে উইল্ করিয়া দিয়া যান নাই। এ-বিষয় আর বেশী বলা নিরর্থক। চারিদিকে যেভাবে সি পি এমের ভাগ্যাকাশে ঘন কালো মেঘ জমিতেছে, তাহা ভারত জয় করিবার স্বপ্নে বিভোর এই বিশেষ রাজনৈতিক দলটির নেতাদের মনে যে প্রকার ভীতির উদ্রেক করিয়াছে, তাহাতে অতি সুস্থ মানুষও উন্মাদ হইয়া যাইতে পারে, এবং এই প্রকার উন্মাদ অবস্থায় মানুষ পথে ঘাটে যাহাকে সামনে পায় তাহাকেই কামড়াইতে চেষ্টা করে! ইহার কিছু কিছু প্রমাণ এবং দৃষ্টান্ত আমাদের গোচরে আসিতেছে। বিপদ যখন মাথার উপর আসিয়া পড়ে, সেই সময় মানুষের মতিভ্রম ঘটে। পশ্চিম বঙ্গের স্বনির্ব্বাচিত গণপতির পায়ের তলা হইতে 'গণ' মাটি সরিয়া যাইতেছে —এখন গণপতির একমাত্র ভাবনা নূতন 'মাটির' সন্ধান করা কিন্তু গণপতি মহারাজ মাটির বদলে চোরাবালির উপর বেশী ভরসা করিতেছেন!

নকশালীরা সাবধান!

শ্রী জ্যোতি বসু নক্‌শালীদের হুমকী দিয়াছেন—যেন তাহারা অবিলম্বে সি পি এম ভক্তদের খুন জখম বন্ধ করে। ইহা না করিলে জ্যোতি বসুর দল Life for Life অর্থাৎ খুনের বদলে খুন নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। এই সঙ্গে জ্যোতি বাবু রাজ্যপুলিসের 'নিষ্ক্রিয়তার কথাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। জ্যোতিবাবুর কথা শুনিয়া আমরা হাসিব না কাঁদিব তাহা বুঝিতে পারিতেছিনা। ক্ষীণদেহ কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিধর এই মার্ক্সীয় বীর, পুলিস তাহার কর্ত্তব্য পালন করিলে, অর্থাৎ হাঙ্গামাকারীদের ধরপাকড় করিলে পুলিসকে 'অত্যাচারী 'জন নির্য্যাতনকারী' বলিয়া নির্জ্জলা গালাগালি করিবেন আবার অন্যদিকে নিজেদের অর্থাৎ পার্টির লোকদের উপর যখন নক্‌শালীরা হামলা করিবে তখন পুলিসকে এই মহাবীর কর্ত্তব্য পালন না করিবার দায়ে অভিযুক্ত করিবেন! জ্যোতি বসু নিজে জানেন, ক্ষমতার গদিতে বসিয়া তিনি কলিকাতা এবং রাজ্যপুলিশকে কি ভাবে তাঁহার খাস বরকন্দাজ বাহিনীতে পরিণত করেন। যে বিষ-বৃক্ষের বীজ তিনি বপন করেন, তাহার ফল-ভক্ষণ জ্যোতি বসু ছাড়া আর কে করিবে?

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। জ্যোতি বসু নক্‌শালীদের কেবলমাত্র সি পি এম মার্কা লোকেদের খুন জখম করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যদের সম্পর্কে তাঁহার কোন দায় নাই। সি পি এমকে বাদ দিয়া তিনি নক্‌শালীদের কি-হ্যাও দিয়াছেন, অর্থাৎ কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার পবিত্র মার্ক্সীয় টেক্‌নিক অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ভয় হইতেছে নক্‌শালীরা জ্যোতি বসুর ধর্ম্মের কথা শুনিবে কী? কথায় বলে ...না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। জ্যোতিবাবু নিজের সম্পর্কেও চিন্তার কারণ আছে! এ-কথাটা তিনি নিজেও জানেন। মুখে বীরত্ব প্রকাশ করিলেও আসলে তিনি যে কত বীর তাহা সবাই জানে। ভীরু না হইলে যে ব্যক্তি সাধারণ মানুষকে সর্ব্বভাবে বে-আইনী কাজে প্ররোচনা দেয়, সেই ব্যক্তি দুর্গাপুরে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মঘটের সময় জনসমাবেশে বীরত্বপ্রকাশ করিতে না গিয়া হঠাৎ পশ্চাদপসরণ করিল কেন? সাধারণ মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়া সেনাপতির কেল্লার আশ্রয়ে থাকাই যুদ্ধের নূতন কৌশল?

সম্পূর্ণ নাটক

মোতির মালা

কুমারলাল দাশগুপ্ত

পাত্র-পাত্রী

(নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র কাল্পনিক)

কনক রায়	—	জুয়েলার
বিমলা	—	ঐ স্ত্রী
নিপুণা	—	কন্যা
মলয় গুপ্ত	—	কবি
অভ্র সেন	—	কথা শিল্পী
রমেশ চক্রবর্তী	—	ঐ বন্ধু
অনুপমা সরকার	—	প্রাঃ সেক্রেটারী
মালতী বন্দোপাধ্যায়		
করবী দত্ত	—	গায়িকা
প্রবাল দত্ত	—	ঐ স্বামী

ও অন্যান্য

জুয়েলার কনক রায়ের আপিস ঘর। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একখানা টেবিল, তার উপর একদিকে একগাদা ফাইল, আর একদিকে ফোন। টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে কনক রায়, আধাবয়সী মানুষ, কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা। ডালাখোলা একটা কাসকেটের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে তিনি বসে আছেন।

ঘরে ঢোকেন কনক রায়ের স্ত্রী বিমলা। মোটাসোটা আধবয়সী মহিলা। সর্বাঙ্গে গহনা, চলতে ফিরতে ঝকমক করে ওঠে? বিমলা এগিয়ে এসে কনকের পাশে দাঁড়ান। কনক রায় এত তন্ময় যে বিমলার উপস্থিতি টের পান না।

বিমলা—(একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে) অত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছো ?

কনক—(এতক্ষণে সজাগ হয়ে) সামনে রয়েছে, দেখো।

বিমলা—(ঝুঁকে পড়ে দেখে) ওমা, এ-যে একছড়া মোতির মালা! কত বড় বড় মোতি, নিটোল, কি সুন্দর!

কনক—পছন্দ হচ্ছে ?

বিমলা—পছন্দ! এমন সুন্দর মোতির মালা কার না পছন্দ হয়? কোথা থেকে আনলে ?

কনক—আমেরিকার বাজার থেকে।

বিমলা—কোন রাজ রাজড়ার জন্যে বোধ হয়।

কনক—না, জনসাধারণের জন্যে।

বিমলা—কি যে বলো, বিদেশ থেকে আমদানী এতদামী মোতির মালা জনসাধারণের জন্যে!

কনক—হ্যাঁ, তাই। খুব সস্তায় বাজারে ছাড়বো, হাজার টাকা করে।

বিমলা—(আশ্চর্য্য হয়ে) এত কমদামে বেচবে! লোকসান যাবে না ?

কনক—(হেসে) না, কিনেছি তিন ডলার করে অর্থাৎ ২২৫০ পয়সা করে এক এক গাছা মালা।

বিমলা—তা'হলে নকল মোতি বলো ?

কনক—জুয়েলারের স্ত্রী, তোমার চিনতে এত দেরী হোলো? তুমি যখন চট্ করে ধরতে পারলে না তখন কেউ ধরতে পারবে না। হু হু করে বিক্রি হবে। এতদিন লাখপতি ছিলাম, এবার কোটিপতি হবো।

বিমলা—তাহলে এবার আমাদের পৃথিবী ঘুরিয়ে এসো।

কনক—চারধাম ঘুরিয়ে আনবো।

বিমলা—(দুহাত জোড়করে কপালে ঠেকিয়ে) চারধাম এখন মাথায় থাকুন, ও পরে হবে। আগে প্যারিস, লণ্ডন, মস্কো, নিউইয়র্ক ঘুরিয়ে আনো।

কনক—আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন ব্যাপার কি বলো।

বিমলা—একটা দরকারী কথা আছে।

কনক—বলে ফেলো।

বিমলা—(একখানা চেয়ার টেনে পাশে বসে) কাল আমাদের এখানে আমাদের মিলন মালঞ্চের অধিবেশন হবে।

কনক—ওতো মাঝে মাঝে হয় জানি। এবার বিশেষত্ব কিছু আছে বুঝি তাই বলতে এসেছো।

বিমলা—ঠিক ধরেছো, এবার বিশেষত্ব আছে। নিপুণা এ বছরের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে।

কনক—(খুশী হয়ে) বলো কি, নিপুণা মালঞ্চের সভাপতি হয়েছে! ওর টেলেন্ট আছে, ও আমার মত হয়েছে।

বিমলা। আহা, কি কথাই বল্লে। নিপুণা গান গায়, কবিতা লেখে লোকে বলে মেয়ে আমার মত হয়েছে।

কনক। আর সব তোমার মত হতে পারে কিন্তু বুদ্ধিটা আমার মত ভয়ানক তীক্ষ্ণ। ইংরেজিতে এম, এ পাশ করে সংস্কৃত পড়ছে। অথচ মাত্র চব্বিশ বছর বয়স। আমি অবশ্য ওর চেয়েও কম বয়সে—

বিমলা। (থামিয়ে দিয়ে) থাক, থাক, ওর আর আমাকে বলতে হবে না। তারপরে শোনো, মালঞ্চের সেক্রেটারী হয়েছে কবি অনুপমা সরকার।

কনক। বড় কবি নাকি? নামটা শুনেছি মনে হচ্ছে।

বিমলা। শুনেছো বই কি, ও তোমার টাইপিষ্ট অনু যে।

কনক। অনু কবি! আমার টাইপিষ্ট অনু কবি! বলো কি!

বিমলা। হ্যাঁ, কবি। ভাল কবিতা লেখে। আধুনিক কবিদের মধ্যে ওর বেশ নাম আছে। প্রখ্যাত আধুনিক কবি মলয় গুপ্তের শিষ্যা।

কনক। (চিন্তিত ভাবে) ভাবনায় পড়লাম।

বিমলা। এতে আর ভাবনার কি আছে?

কনক। ও তুমি বুঝবে না। এখন বলো, কথা শেষ করো।

বিমলা। বুঝতেই পারছো সমিতির এটা একটা বিশেষ অধিবেশন। সভার শেষে খাওয়া-দাওয়া আছে। কিছু বেশী খরচ হবে।

কনক। মঞ্জুর।

বিমলা। (চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়) থ্যাঙ্কস্।

কনক। আরে, বোসো বোসো, এখনই উঠলে কেন?

বিমলা। (আবার বসে) কথা তো শেষ হয়েছে।

কনক। তোমাদের মালঞ্চের পুরো নাম যে কি তা এখনও জানি নে। উদ্দেশ্যও জানিনে।

বিমলা। পুরো নাম আধুনিক সাহিত্যিক কবি শিল্পীদের মিলন মালঞ্চ, সংক্ষেপে আসাকশিমিমা। নামেই তো সব বোঝা যাচ্ছে। এই মিলন মালঞ্চ হচ্ছে নতুনের উপাসক যত আধুনিক শিল্পী সাহিত্যিকদের মিলন ক্ষেত্র।

কনক। বেশ বেশ, এ-মিলন ফলপ্রসূ হোক। চিন্তায়, শিল্পে, সাহিত্যে পোষাক পরিচ্ছদে, বসনে-ভূষণে নতুনের উপাসনা খুবই প্রয়োজন। এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বলবো, খরচটা যাতে আমার ব্যবসার উপকারে আসে সেটা দেখতে হবে। অর্থাৎ তোমাদের মালঞ্চের মাধ্যমে আমার দোকানের অলঙ্কার রূপসজ্জার জন্যে যে অতি প্রয়োজনীয় সেটা প্রচার করতে হবে।

বিমলা। ওসব আমি বুঝি নে।

কনক। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের মালঞ্চে শিল্পীসাহিত্যিকরা তো সমবেত হবেনই, কয়েকজন মন্ত্রী ও অন্তত একজন সিনেমার তারকাকে আমন্ত্রণ করে আনো।

বিমলা। সিনেমা তারকা শিল্পীদের দলেই পড়ছেন,

কিন্তু মন্ত্রী ডেকে আনবো কেন? ওঁরা আর্টের কি বোঝেন?

কনক। জেনে রাখো, অ্যাডভারটাইজমেন্টের দিক দিয়ে সিনেমার তারকার পরেই মন্ত্রী।

বিমলা। দেখা যাবে চেষ্টা করে। এখন আমি চলি, অনেক কাজ। (উঠে দাঁড়ায়)

কনক। আর শোনো, তোমাদের মা মেয়ের গলায় থাকবে এই মোতির মালা।

(মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বিমলার প্রস্থান)

কনক। (চাকরকে ডাকে) ওরে, কে আছিস রে।

(চাকরের প্রবেশ)

চাকর। আজ্ঞে আমি।

কনক। অনুপমাকে ডেকে দে তো।

(চাকরের প্রস্থান, একটু পরে অনুপমার প্রবেশ। সাজসজ্জাতে, ভাবে, ভঙ্গিতে অনুপমা আধুনিকা)

অনুপমা। ডেকেছেন।

কনক। হুঁ, তোমার ঘরের সব ফাইল নিয়ে এসো তো।

অনুপমা। (আশ্চর্য হয়ে) সব ফাইল নিয়ে আসবো!

কনক। হুঁ।

অনুপমা। সব ফাইল দিয়ে কি করবেন, কোন্ ফাইলটা চান বলুন, আমি নিয়ে আসছি।

কনক। আমি সব ফাইল চাই।

অনুপমা। সে তো কয়েক আলমারি।

কনক। আচ্ছা থাক, সব আনতে হবে না, মাঝখান থেকে কয়েকটা নিয়ে এসো।

(একটু ইতস্তত করে অনুপমা চলে যায়, একটু পরে এক গাদা ফাইল নিয়ে ফিরে আসে—টেবিলের উপর রাখে।

কনক একখানা ফাইল তুলে ঘাটাঘাটি করে রেখে দেয়, আর একখানা তুলে নেয়)

অনুপমা। কি দেখছেন? আমাকে বলুন, আমি খুঁজে বার করে দিচ্ছি।

কনক। তা মন্দ বলোনি (একখানা ফাইল অনুপমার হাতে দিয়ে) তুমি খুঁজে বার করে দাও।

অনুপমা। কি খুঁজবো বলুন।

কনক। তোমার কবিতা।

অনুপমা—(আশ্চর্য হয়ে) আমার কবিতা! আমার কবিতা এ ফাইলে থাকবে কেন?

কনক। শুনলাম তুমি কবি, কবিদের ভাবাবেগ এলে তো জ্ঞান থাকে না, রামপ্রসাদ হিসেবের খাতায় কবিতা লিখতেন, তুমি হয় তো ইনভয়েসের পিছনে কবিতা লিখেছো।

অনুপমা। এসব কি বলছেন!

কনক। যদি লিখে থাকো তাহলে লজ্জার কিছু নাই। আমাকে বন্ধুভাবে খুলে বলো আমি তোমাকে একটা মোটা পেনসান দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পারি, তুমি বাড়ী- বসে নিশ্চিন্ত মনে কবিতা লিখতে পারবে।

অনুপমা। আমি আপিসে বসে কবিতা লিখি না; বাড়ীতে বসে নিজের খাতায় কবিতা লিখি।

কনক। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে) বেশ, বেশ তাই কোরো। তুমি কবি এতো আমাদের গর্বের কথা। সকলে তো কবি হয় না, ভগবান শক্তি দিলে তবেই মানুষ কবি হয়। মিলদিয়ে কবিতা লেখা বড় কঠিন।

অনুপমা। আমার লেখা কবিতা আপনি পড়বেন?

কনক। এখন থাক, পরে হবে।

অনুপমা। আমি একটা কবিতা পড়ে শোনাই।

কনক। (আতঙ্কিত কণ্ঠে) না, না এখন কবিতা শোনবার সময় হবে না, আজ অনেক কাজ।

অনুপমা। খুব ছোট্ট একটা কবিতা। আমার সংগেই আছে।

কনক। (হাত তুলে) অন্য সময়ে, অন্য সময়ে। যাও, চিঠি গুলো টাইপ করে ফেলো।

(দুঃখিতভাবে অনুপমা প্রস্থান করে
কনক আবার ধ্যানমগ্ন হয়)

। পটক্ষেপ

দ্বিতীয় দৃশ্য

শহরতলির গলিতে পুরোনো বাড়ীর একতলার একখানি ঘর। ঘরের এক পাশে তক্তপোশ ও বিছানা। জানালার ধারে বড় একখানা টেবিল তার উপর অনেক শিশিবোতল, অ্যালুমীনিয়ামের প্যান, ডেক্‌চি, বাটি, একটা ষ্টোভ ও আরো অনেক কিছু। পিছন ফিরে টেবিলে কর্মরত একটি যুবক, ময়লা কাপড় জামা।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে কথাশিল্পী অভ্র সেন, বয়স তিরিশের কাছাকাছি, বগলে ফাইল, মুখে সিগার। কিছুক্ষণ কেটে যায়, হঠাৎ সে চোখ মেলে।

অভ্র। চা বানা।

(যুবক সাড়া দেয় না, কাজ করে চলে)

অভ্র। এই রমেশ চা বানা।

রমেশ। (না ফিরে) কখন এলি?

অভ্র। অনেকক্ষণ।

রমেশ। বোস

অভ্র। শুয়ে আছি।

রমেশ। একটু ঘুমিয়ে নে।

অভ্র। ঘুম হবে না, তুই এক পেয়ালা চা খাওয়া। চিন্তা দানা বাঁধছে না।

রমেশ। খাওয়াচ্ছি, একটু সবুর কর।

(ষ্টোভে চাএর জল চাপিয়ে দেয়। চা তৈরী হয়ে গেলে পেয়ালায় ঢেলে ফিরে দাঁড়ায়। রমেশের মাথায় বড় বড় চুল, একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সুন্দর চেহারা। চাএর পেয়ালা নিয়ে এগিয়ে অভ্রের সামনে এসে দাঁড়ায়।)

অভ্র। (পেয়ালা হাতে নিয়ে) তোর এখানে কেন আসি জানিস? এই পরিবেশ লেখার পক্ষে বড় অনুকূল।

রমেশ। কি লিখছিস আজকাল? ছোট গল্প?

অভ্র। এখন আর ছোট নয়, সব বড়। একখানা উপন্যাস লিখছি। আমার লেখা কেমন লাগে রে! দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্ব আছে, তাই না?

রমেশ। (নিঃশব্দে মাথা নাড়ে)

অভ্র। ওরা বলে আমি নাকি বিরাট প্রতিভা!

রমেশ। পাঁচ-ছ'দিন আসিস নি কেন? আজ এসে পড়লি, তা নাহলে খোঁজ নিতে তোর বাড়ী যেতাম।

অভ্র। টাকা চাই বুঝি?

রমেশ। অন্তত গোটা তিরিশ।

অভ্র। (খালি চাএর পেয়ালা রেখে) বল্লাম চাকরি কর, একটা ভাল চাকরি হাতে আছে, তা করবি নে। এম, এস, সি পাশ করে ভেবেছিস মস্ত বৈজ্ঞানিক হয়েছিস, ওরে বাবা আবিষ্কারক সবাই হয় না। ছ'মাস ধরে গবেষণা করেও একটা দাঁতের মাজনও তৈরী করতে পারলিনে।

রমেশ। দাঁতের মাজনটার তৈরী খরচ বড় বেশী পড়ে গেল, বাজারে চলল না। এবার লেখার কালি তৈরী করছি—খুব চাহিদা।

অভ্র। তৈরী হলে আমাকে এক বোতল দিস।

রমেশ। কেমন কালি হয়েছে দেখবি? এই দেখ (আঙুলে খানিকটা কালি লাগিয়ে একখানা কাগজের উপর দাগ টানে) দেখ,—পাকা রং, উজ্জল বর্ণ, তাড়া-তাড়ি শুকিয়ে যায়—

অভ্র। (কাগজখানা রমেশের হাত থেকে নিয়ে ভাল করে দেখে) রমেশ!

রমেশ। কি রে?

অভ্র। অদ্ভুত ব্যাপার।

রমেশ। কি হোলো?

অভ্র। (কাগজখানা কখনো কাছে কখনো দূরে রেখে) অপূর্ব!

রমেশ। বল না কি হয়েছে?

অভ্র। তুই জিনিয়াস্! বিরাট প্রতিভা!

রমেশ। আমি জিনিয়াস্! (হেসে ওঠে)

অভ্র। হাসিস নে সত্যি বলছি।

রমেশ। থাম, রাখ ওসব বাজে কথা, এখন বল কালিটা কেমন হয়েছে।

অভ্র। তুই নিজে বুঝতে পারছিস নে তুই কি সৃষ্টি করেছিস্!

রমেশ। (হেসে) কি আবার সৃষ্টি করেছি!

অভ্র। সৌন্দর্য্য রে সৌন্দর্য্য! তুই born artist.

রমেশ। আজকাল বেশ সূক্ষ্ম রসিকতা করতে শিখেছিস্ অভ্র।

অভ্র। রসিকতা! আর্ট নিয়ে রসিকতা আমি করি নে। (কাগজখানা রমেশের সামনে ধরে) দেখ, আঙুলের একটি টানে কি অপূর্ব সৃষ্টি তুই করেছিস্। কতবড় আর্টিষ্ট হলে এই গতিশীল, সর্পিল, বলিষ্ঠ টানটি দেওয়া যায়।

রমেশ। আরে, ওতো হঠাৎ হয়ে গেছে।

অভ্র। ভিতরে ছিল, আজ হঠাৎ প্রকাশ পেলো। (রমেশের হাত ধরে) রমেশ, ফেলে দে এইসব শিশি-বোতল, হাঁড়িকুড়ি, ওসব করে তোর কিছু হবে না, তুই ছবি আঁক, তুই born আর্টিষ্ট।

রমেশ। (একটু ভেবে) ছোটবেলায় একটু আধটু আঁকতাম। একদিন পড়ার সময় দাদুর চটিজুতোজোড়া এঁকেছিলাম। দেখে বাবা বল্লেন "দুর্দ্ধর্ষ" বানান কর, না পারলে ঐ চটি তোর পিঠে পড়বে।

অভ্র। (মাথা নেড়ে) সবাই কি আর্ট বোঝে রে। ছেলেবেলায় মারের ভয় দেখিয়ে তোর সর্বনাশটি করা হোলো, তোর সৃজনীশক্তি চাপা পড়ে গেল। কতবড় দুঃখের কথা। গোড়া থেকে উৎসাহ পেলে একটা অতি অকেজো বাজে বৈজ্ঞানিক না হয়ে মস্ত বড় আর্টিষ্ট হতে পারতি।

রমেশ। ভাই, কি হতে পারতাম তা ভেবে আর এখন কি হবে।

অভ্র। ভেবে কি হবে! কি অদ্ভুত কথা। যে যা তাকে তাই হতে হবে। আমাকে সাহিত্যিক, তোকে শিল্পী হতে হবে। লেগে যা ছবি আঁকতে। আমি চোখ বুঁজে ভবিষ্যৎ বাণী করছি, তুই বিখ্যাত হবি।

রমেশ। খ্যাতির সঙ্গে টাকা আসবে তো? টাকার খুব দরকার রে, অনেক দেনা শোধ করতে হবে।

অভ্র। টাকাও আসবে। তুই তুলি, রং, ক্যানভাস ইত্যাদি কিনে আন, আজ থেকেই আঁকতে শুরু কর।

রমেশ। কিনে আন বল্লেই তো হয় না (পকেটে থাবড় মেরে) এই চাই। তুই বড়লোকের ছেলে, তোর কথা আলাদা।

অভ্র। আমি টাকা ধার দিচ্ছি, তুই ছবি আঁকার সব জিনিষ পত্তর কিনে আন।

রমেশ। যখন এতকরে বলছিস তখন চেষ্টা করে দেখতে পারি।

অভ্র। (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে) রমেশ!

রমেশ। কেন রে, আবার কি হলো।

অভ্র। যাবি আমার সঙ্গে?

রমেশ। কোথায় রে? রেস্তোরাঁয়? আছে মোড়ে একটা ভাল রেস্তোরাঁ।

অভ্র। আরে না, না, রেস্তোরাঁতে নয়, মিস্ নিপুণা রায়ের বাড়ী।

রমেশ। তোর মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে। কে মিস্ নিপুণা রায় তাই জানিনে, আমি তার বাড়ী যাব কেন?

অভ্র। বলি শোন তাহলে। নিপুণা দেবী আমার খুবই চেনা। বয়স ২৪।২৫ হবে তন্বী, গৌরী, ধনিক নন্দিনী, বহু বিদ্যাপারঙ্গম, রসবোদ্ধা, মহীয়সী মহিলা, অতি দরদীমন, সাহিত্যিক ও শিল্পীর পৃষ্টপোষক—

রমেশ। (অধৈর্য হয়ে) আরে আসল কথাটা বল না।

অভ্র। নিপুণা দেবীর পরিচয় দু'চার কথায় দেওয়া যায় না, আশ্চর্য সেই নারী। কাল সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে মিলন মালঞ্চের মাসিক অধিবেশন। অতি আধুনিক কবি, সাহিত্যিক শিল্পীরা মিলিত হচ্ছেন। তুই শিল্পী, তোর সেখানে যেতে কোন বাধা নাই। আমার সঙ্গে যাবি, আমি পরিচয় করিয়ে দেবো।

রমেশ। কি হবে সেখানে গিয়ে?

অভ্র। আরে কূপমণ্ডুক, তোরা এখনও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদি অতি প্রাচীন কবি, কথা শিল্পী কলাকারদের নিয়ে আছিস, আজকাল সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প যে কোথায় এগিয়ে গেছে দেখে আসবি। অবাক হয়ে যাবি রে, অবাক হয়ে যাবি। আমার

আসল উদ্দেশ্য জানিস্, (রমেশের কাঁধে হাত রেখে) এই নব আবিষ্কৃত প্রতিভাকে জগতের সামনে তুলে ধরা। বুঝলি।

রমেশ। তা যাব তোর সঙ্গে, কিন্তু-দেখিস্, বাড়াবাড়ি করিস নে।

অভ্র। সে আমি বুঝবো। এই ছবি আমি সংগে করে নিয়ে যাব, তাদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবো।

রমেশ। তাক অবশ্যই লাগবে আমার চুলদাড়ি দেখে।

অভ্র। তুই কি ভাবছিস এই চেহারা নিয়ে শিল্পী সাহিত্যিকদের সমাজে যাবি? তা কি হয়। (কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে) বড় চুলে আপত্তি নাই, প্রতিভার ওটা একটা লক্ষণ। কিন্তু খোঁচা খোঁচা দাড়ি চলবে না, লম্বা হলে চলতো। দাড়ি কামিয়ে ফেল।

রমেশ আর ক'দিন রেখে বরং বড় করে নি।

অভ্র। এ ক'দিনে আর কত বাড়বে-কামিয়ে ফেল।

রমেশ। (বিরক্ত ভাবে) মহা ফ্যাসাদে ফেল্লি। কোথায় খুর, কোথায় বুরুশ, কোথায় সাবান, কোথায় আয়না খুঁজে পেলে হয়। (নানা স্থান থেকে কামানোর সরঞ্জাম খুঁজে বার করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামায়। কামানো শেষ হলে চুল আঁচড়ে ঘুরে দাঁড়ায়)

অভ্র। বা নতুন মানুষ।

রমেশ। (হেসে) বৈজ্ঞানিক গুটিপোকা কোকুন কেটে আর্টিষ্ট প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে এলো। কিন্তু দু'দিনের জন্তে।

অভ্র। নারে, না—এতদিন পরে আসলে মানুষটি প্রকাশ পেলো। কাল বিকেলে আমার বাড়ী যাবি, সেখান থেকে দুজনে নিপুণা দেবীর বাড়ী যাব।

(ফাইল বগলে নিয়ে সিগার টানতে টানতে প্রস্থান করে) রমেশ কিছুক্ষণ টেবিলে সাজানো বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপরে কয়েকটা তুলে নিয়ে বাইরে যায়)

পটক্ষেপ

তৃতীয় দৃশ্য

সাজানো বসবার ঘর। সব জিনিষই ঝকঝকে নতুন, আধুনিক রুচি সম্মত। বিমলা ঘুরে ফিরে শেষবারের মত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করছেন। পাশের ঘর থেকে রবীন্দ্রসংগীতের রেশ ভেসে আসছে। সময় সন্ধ্যা।

বিমলা। (পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে) নিপুণা।

নিপুণা। (ভিতর থেকে) আসচি মা।

(একটু পরে পর্দা ঠেলে গুণগুণ করে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গাইতে ঘরে ঢোকে নিপুণা, বিমলার সামনে এসে দাঁড়ায়)

বিমলা। (নিপুণার সাজসজ্জা ও প্রসাধন লক্ষ্য করে) বেশ হয়েছে। তোমার গলায় মোতির মালা সুন্দর মানিয়েছে।

নিপুণা। (মালায় হাত দিয়ে) নকল মোতির মালা গলায় দিয়ে দশজনের সামনে যেতে আমার একটুও ভাল লাগছে না বাবা বলেছেন, তাই পরেছি।

বিমলা। মন খারাপ কোরো না নকলের যুগই এটা।

নিপুণা। হয় তো তাই। কিন্তু খাঁটি জিনিষের সংগে নকল মিশে হাততালি পাচ্ছে, কত বড় লজ্জার কথা মা।

(প্রবেশ করে অনুপমা। দেহের অনাবৃত অংশ আরো বিস্তৃত, খোঁপার উচ্চতা আরো বেশী)

বিমলা। এই যে অনু, এসে পড়েছো। দেখে শুনে নাও। তুমি মালঞ্চের সেক্রেটারী, সব ঝুঁকি তোমার মাথায়।

অনুপমা। আপনি সাহস দেবেন, আমি চালিয়ে নেব।

নিপুণা। (হাত ঘড়ি দেখে) ওদের আসবার সময় হয়ে গেছে।

(বান্ধবী রুবির প্রবেশ)

নিপুণা। এসো ভাই রুবি। মা, মা, দেখো, রুবিকে কেমন wonderful দেখাচ্ছে।

রুবি। (হাসতে হাসতে) তাই নাকি ?

বিমলা। হ্যাঁ, রুবি, সত্যিই তোমাকে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে।

রুবি। থ্যাঙ্কস্ মাসীমা।

অনুপমা। রুবিদি আপনি প্রজাপতির মত colourful, আপনার পাশে আমাকে dull মনে হবে।

রুবি। রং না হলে মেয়েদের রূপ খোলে না ভাই।

নিপুণা। লিলি আবার অন্য কথা বলে, less colour, more contour.

রুবি। (একটু হেসে) তার যথেষ্ট কারণ আছে। লিলির পরিধি কি রকম বেড়েছে দেখেছো।

(সকলে হাসে)

অনুপমা। আসুন রুবিদি, এইখানে বসবেন।

(লিলির আসন দেখিয়ে দেয়)

(গায়িকা করবী দত্ত ও স্বামী প্রবাল দত্তের প্রবেশ)

অনুপমা। (এগিয়ে গিয়ে) আসুন করবীদি, আসুন মিঃ দত্ত, নমস্কার।

(করবী ও প্রবালের প্রতিনমস্কার)

করবী। (নিপুণার দিকে এগিয়ে) তোমার বাড়ী ঢুকলেই ভাই ভিতরে একটা নতুন সুর বেজে ওঠে।

নিপুণা। (কাছে এসে) তুমি গায়িকা বলে যেখানে সেখানে সুর শুনতে পাও। কি মিষ্টি তোমার গলা।

করবী। (খুশী হয়ে) শুনেছো আমার গানের নতুন রেকর্ড ?

নিপুণা। শুনি নি তো।

প্রবাল দত্ত। আপনি শোনেন নি ? অদ্ভুত হয়েছে। দিল্লীতে রেকর্ড খানার খুব demand-যোগাতে পারছে না।

অনুপমা। আপনারা এইখানে বসুন।

(বসবার স্থান দেখিয়ে দেয়)

(প্রবেশ করেন মালতী বন্দোপাধ্যায়, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি পোষাক ও প্রসাধনের অতিরিক্ত পারিপাট্য। মাথায় নকল খোঁপা, চোখে মাসকারা, ঠোঁটে রুজ, মুখে বাঁধান দাঁতের ঝকমকে হাসি)

নিপুণা। (এগিয়ে) আসুন মালতীদি।

মালতী। (কাছে এসে নিপুণার হাত ধরে) তোমাকে দেখতেই আমি ছুটে ছুটে এলাম। তোমাকে কাছে পেলে আমি ভারি খুশী হই। তোমাকে বড্ড ভালবাসি, সত্যি বলছি।

নিপুণা। আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম মালতীদি।

মালতী। আহা, মোতির মালা পরে কি সুন্দর তোমাকে দেখাচ্ছে। চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

নিপুণা। মা এদিকে আসছেন আপনাকে দেখে।

মালতী। (তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে) বিমলাদি, আপনাকে দুদিন না দেখলেই আমার মন কেমন করে। আপনাকে আমি বড্ড ভালবাসি, সত্যি বলছি,

বিমলা। (হাত ধরে) ভাল আছেন ?

মালতী। (হেসে) খুব।

(প্রবেশ করে কবি মলয় গুপ্ত, শিল্পী অজয় ঘোষ, স্ত্রী লিলি ঘোষ, এবং একটু পরে একসংগে প্রবেশ করে অনেকে। অনুপমা তাদের অভ্যর্থনা করে বসায়, মৃদু হাসি-গল্পে ঘর ভরে যায়।)

অনুপমা। (নিপুণার কাছে এসে) সবাই এসে গেছেন, এখন কাজ আরম্ভ করলে কেমন হয় ?

নিপুণা। সবাই কি এসেছেন ? কেন যেন মনে হচ্ছে কে একজন এখনও আসেন নি।

অনুপমা। (চারিদিকে তাকিয়ে) মলয়বাবু, অজয়-বাবু, প্রবালবাবু, নরেনবাবু, বিদ্যুৎবাবু, লিলিদি, করবীদি, উমাদি, মালতীদি—সবাইকে তো দেখছি।

নিপুণা। কোন একটা বিখ্যাত নাম যেন বাদ গেল।

(প্রবেশ করে অভ্র, সংগে রমেশ)

নিপুণা। (এগিয়ে গিয়ে) তাই তো আমি ভাবছিলাম কে একজন এখনও আসেন নি। আপনার আসতে এত দেরী হোলো কেন অভ্রবাবু ?

অভ্র। একটি অমূল্য সম্পদ সংগে এনেছি নিপুণা দেবী তাই একটু দেরী হয়ে গেল।

নিপুণা। (রমেশের দিকে তাকায়)

অভ্র। এই সেই সম্পদ, আমার বন্ধু রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রখ্যাত শিল্পী, বিরাট প্রতিভা। (রমেশকে) ইনি নিপুণা দেবী।

(উভয়ে পরস্পরকে নমস্কার করে)

অভ্র। আপনার অনুমতি না নিয়েই ওকে নিয়ে এসেছি, কিছু মনে করবেন না।

নিপুণা। সে কি কথা! এমন একজন গুণী আমাদের বাড়ী এসেছেন, এতো পরম সৌভাগ্যের কথা। আসুন মিঃ চক্রবর্তী, আসুন অভ্রবাবু, এইখানে আপনারা বসুন।

(সোফায় দুজনে বসে, পাশে বসে নিপুণা)

অনুপমা। (নিপুণার কাছে এসে) এবার তাহলে কাজ আরম্ভ করা যাক।

নিপুণা। (উঠে দাঁড়িয়ে) বন্ধুগণ ও গুণীগণ, আজ আপনারা এখানে একত্রিত হয়ে আধুনিক শিল্পী, সাহিত্যিক, কবিদের মিলন মালঞ্চকে সার্থক করেছেন। আমি আপনাদের স্বাগত করছি, অভিনন্দিত করছি।

(হাততালি) এখন আমরা আজকের কাজ আরম্ভ করতে চাই। আমার অনুরোধ প্রথমে করবী দেবী আমাদের একটা গান শোনাবেন।

অনেকে। বেশ, বেশ।

(করবী উঠে গিয়ে হারমোনিয়ামের সামনে বসে, গীটার নিয়ে পিছনে বসেন প্রবাল)

করবী। কি গান গাইব?

নিপুণা। একটা রবীন্দ্র সঙ্গীত।

করবী। আমি প্রাচীন কবিদের লেখা গান গাইনা। প্রাণে যা সাড়া জাগায় না তা কি গাওয়া যায়!

লিলি। তুমি তাই যে গান গাইতে ভালবাসো সেই গানই গাও।

(করবী একটু হেসে গান সুরু করে)

কালো কাক, কালো কাক, ও কালো কাক,
দুপুরে দেয়ালে বসে কারে দাও ডাক,
ও কালো কাক, ও কালো কাক।
কা, কা, কা, কা—কি, কি, কি,
না, না, না, না—ছি, ছি, ছি,
আজ থাক থাক, ও কালো কাক।

(গান শেষ হয়, হাততালি পড়ে)

মালতী। যেমন কথা তেমনি সুর, অপূর্ব! অপূর্ব!

লিলি। করবীর গান আমাকে কোথায় যেন নিয়ে যায়, একটা নতুন জগতে, অনেক দূরে।

নিপুণা। (উঠে দাঁড়িয়ে) এখন একটা কবিতা পাঠ হলে কেমন হয়।

অনেকে। মলয়বাবুর কবিতা পাঠ শুনতে চাই।

অনুপমা। আমরাও শুনতে চাই।

(মলয় উঠে দাঁড়ায়, গলাটা পরিষ্কার করে পড়তে শুরু করে)

প্রতি মুহূর্তেই ছায়া পথে পথে
বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে, এবং কোথাও
ফেরিওয়ালা ডেকে যাচ্ছে বিপন্ন বিস্ময়ে
হায়, হায়, এল এস ডিও ভীষণ নিস্তেজ
আরো তীব্র মাদকের হয়েছে এখন প্রয়োজন।
ছি পি চেতনা অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে।
ভল্গা, গঙ্গা, বা মেকং এর জলে
লেশমাত্র শীতলতা নাই। অবক্ষয়, অবক্ষয়,
ভেঙ্গে পড়ছে রোমক সাম্রাজ্য।
বিপুল নিঃশব্দে ধেয়ে চলেছে সুপার মোনির্ক।
এখনও সময় আছে লাষ্ট্রাম ধরতেই হবে।
প্রসারিত চেতনার হাত।

(পাঠ শেষ হয়। প্রচণ্ড হাততালি পড়ে। সকলে থেমে গেলেও অনুপমা থামতে চায় না)

নিপুণা। (উঠে দাঁড়িয়ে) অভ্রবাবু আপনাকে একটা ছোটগল্প পড়তে হবে।

অনেকে। উঠুন, পড়ুন।

অভ্র। (উঠে দাঁড়িয়ে) বন্ধুগণ, নিপুণাদেবী ও আপনারা অনেকেই আমাকে একটা ছোটগল্প পড়তে অনুরোধ করেছেন। পড়তে আমি প্রস্তুত, গল্পটি আমি লিখে এনেছি, পকেটে আছে। কিন্তু আজ গল্প না পড়ে আপনাদের আমি একটি বিশেষ সংবাদ দেব, আমার আবিষ্কারের সংবাদ।

অনেকে। কি আবিষ্কার করেছেন, নতুন কোনো টেকনিক?

অভ্র। (পকেট থেকে ধীরে ধীরে একখানা কাগজ বার করে) না নতুন টেকনিক নয়, এক বিরাট প্রতিভাবান শিল্পীর আবিষ্কার। দেখুন আপনারা (কাগজখানা উঁচু করে ধরে) চেয়ে দেখুন, কাগজের বুকে শিল্পী, একবার, মাত্র একবার তাঁর তর্জনী বুলিয়ে এই অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছেন। কতবড় কলাবিদ তা আপনারা বিচার করুন।

(অনেকে উঠে আসে, কখনো এগিয়ে, কখনো পিছিয়ে কাগজখানা দেখে)

কেউ কেউ। আশ্চর্য!

কেউ কেউ। কি বলিষ্ঠ।

কেউ কেউ। একটা রেখার উচ্ছ্বাস।

কেউ কেউ। Abstract Expressionism এর শেষ কথা।

মলয়। অভ্রবাবু, এই শক্তিধর শিল্পী কোথায় থাকেন?

অভ্র। শিল্পী এখানেই আছেন আমি তাঁকে সঙ্গে করে এনেছি। (রমেশের হাতধরে সামনে এনে) এই দেখুন, ইনিই সেই শিল্পী, আমার বন্ধু শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

করবী। মিঃ চক্রবর্তী, আপনাকে দেখেই চিনতে পারা যায় আপনি শিল্পী, আপনি অসাধারণ।

লিলি। কোন রহস্যলোকে আপনি লুকিয়েছিলেন মিঃ চক্রবর্তী।

মালতী। শিল্পীদের আমি বড্ড ভালবাসি, সত্যিই বলছি।

মলয়। অভ্রবাবু, আপনার এই আবিষ্কার ইতিহাসে লেখা থাকবে।

নিপুণা। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমাদের সকলের পক্ষথেকে আমি এই প্রতিভাবান শিল্পীকে স্বাগত করছি।

(হাততালি পড়ে এবং একে একে যে যার আসনে ফিরে যায়)

বিমলা। মিলন মালঞ্চের আজকের মিলন তো শেষ হলো। এখন আপনাদের একটু মিষ্টিমুখ করাতে চাই। সামান্য আয়োজন। আপনারা পাশের ঘরে আসুন।

(সবাই পাশের ঘরে ঢোকে। রমেশ দাঁড়িয়ে থাকে)

অভ্র। (ফিরে এসে) আরে তুই দাঁড়িয়ে কেন চল।

রমেশ। আমি বাড়ী যাচ্ছি।

অভ্র। সে কি রে, খাবিনে! বিকেলে বল্লি খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেশ। আমি খাব না।

অভ্র। কেনরে, কি হলো?

রমেশ। তুই যে কাণ্ড কর্লি, এখন আমি পালাতে পারলে বাঁচি।

অভ্র। কাণ্ড কি করলাম। ওদের কাছে তোর সত্যিকার পরিচয় দিলাম। চল চল।

রমেশ। (মাথা নেড়ে) না।

(রমেশ ও অভ্রকে দেখে নিপুণা এগিয়ে আসে)

নিপুণা। আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? চলুন ওঘরে।

রমেশ। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমাকে এখনই যেতে হবে, একটা কাজ আছে।

নিপুণা। কাজটা পরে করবেন, এখন চলুন।

রমেশ। বিশেষ কাজ কিনা, তাই তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে।

নিপুণা। (সামনে এসে) আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি একটু পরে যাবেন। এখন চলুন ও ঘরে।

অভ্র। নিপুণা দেবীর অনুরোধ উপেক্ষা করিস নে, চল।

নিপুণা। আসুন।

(অভ্র, রমেশ নিপুণাকে অনুসরণ করে)

(চতুর্থ দৃশ্য)

(নিপুণার বসবার ঘর। ফোন বেজে ওঠে, পাশের ঘর থেকে আসে নিপুণা—ফোন ধরে)

নিপুণা। হ্যালো, মলয় বাবু! হ্যাঁ, বাড়ীতেই আছি, কিছুই করছি না। আসবেন? আসুন। নতুন কবিতা লিখেছেন? সংগে নিয়ে আসুন, পড়ে শোনাবেন। শোনাতেই আসছেন? আসুন।

(ফোন ছেড়ে দেয়। টেবিল থেকে একখানা বই নিয়ে এসে সোফায় বসে। একটু পরে প্রবেশ করে মলয়)

নিপুণা। (বই রেখে উঠে দাঁড়িয়ে) আসুন মলয়বাবু।

মলয়। এমন সময় আসা কি উচিত হোলো? কিছু করছিলেন নাকি?

নিপুণা। কিছু না। চুপচাপ বসেছিলাম। দুপুরটা বড্ড ফাঁকা মনে হচ্ছিল, এমন সময় আপনার ফোন পেলাম। আসুন, বসুন।

মলয়। (নিপুণার পাশে বসে) সকালে একটা কবিতা লিখেছি।

নিপুণা। সংগে এনেছেন তো?

মলয়। হ্যাঁ। কবিতা লিখে যতক্ষণ না আমি কাউকে পড়ে শোনাই ততক্ষণ আমার শান্তি নাই। যাকে তাকে তো পড়ে শোনাতে পারিনা।—যে রসগ্রহণ করতে পারে তার কাছেই ছুটে আসি।

নিপুণা। আমার মনে হয় রসবোধ আমার তেমন নাই। তবু কবিতা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। আপনি পড়ুন, আমি শুনি।

মলয়। (পকেট থেকে কাগজ বার করে) পড়ছি, শুনুন।

তোমার মনের নীল ছায়া পড়েছে কি আকাশে?
কালো চাঁদ কাঁদে কেন সারারাত বলতে পারো?
বলতে পারো গঙ্গার বুকে কখন আসে জোয়ার?
বিকাশবাবুর মনের কথা কি জেনেছো?

(কবিতা পড়া শেষ করে নিপুণার দিকে তাকায়)

নিপুণা। (বিব্রতভাবে) বাঃ, বেশ, সুন্দর!

মলয়। (খুশী হয়ে) তাহলে ভাল লেগেছে?

নিপুণা। ভাল লেগেছে, কিন্তু—

মলয়। কিন্তু কি?

নিপুণা। খুব ভাল লেগেছে, কিন্তু মানে বুঝতে পারিনি।

মলয়। (আশ্চর্য হয়ে) কেন বুঝতে পারেন নি, মানে তো অতি স্পষ্ট।

নিপুণা। আমার রসবোধ ও বুদ্ধি দুটোই কম কিনা তাই চট্ করে মানে বুঝতে পারি না।

মলয়। আপনি তামাশা করছেন নিপুণা দেবী, আপনি নিশ্চয় মানে বুঝেছেন।

নিপুণা। আমি কি আপনার সংগে তামাশা করতে পারি? আমি সত্যিই মানে বুঝি নি, আপনি বুঝিয়ে দিন।

মলয়। কবিতার মানে অনেক সময়ে বোঝানো যায় না; পাঠককে বুঝতে হয়।

নিপুণা। তাই নাকি, খুব আশ্চর্য্য লাগছে।

মলয়। আমার কবিতার মানে আছে, আবার নাই।

নিপুণা। মানে নাই?

মলয়। আছে এবং নাই। মানে দিয়ে কবিতা ঘিরে দিলে কবিতা ছোটো হয়ে যায়।

নিপুণা। আশ্চর্য্য।

মলয়। (খুশী হয়ে) আর একবার পড়ছি, দেখুন তো এবার কিছু অনুভব করেন কিনা?

তোমার মনে নীলছায়া পড়েছে কি আকাশে?

কালো চাঁদ কাঁদে কেন সারারাত বোলতে পারো?

নিপুণা। হ্যাঁ, এবার ভিতরে বিস্ময়কর কিছু অনুভব করছি।

মলয়। (উৎসাহের সংগে) আপনার বুদ্ধি ও রসবোধ কোনটাই কম নয়।

(ফোন বেজে ওঠে, নিপুণা উঠে গিয়ে ফোন ধরে)।

নিপুণা। হ্যালো, অভ্রবাবু! কি সৌভাগ্য! আসবেন? আসুন, খুব খুশী হবো। হ্যাঁ, নতুন উপন্যাস সংগে নিয়ে আসবেন।

(ফোন ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে)

কথা-শিল্পী অভ্রসেন আসছেন। নতুন উপন্যাসের আরম্ভটা পড়ে শোনাবেন। খুব ভাল লেখে-তাই না।

মলয়। মন্দ না।

নিপুণা। খুব নাম করেছেন।

মলয়। ছাত্রছাত্রী মহলে।

নিপুণা। আমার অনেক সময় উপন্যাস লিখতে ইচ্ছে করে।

মলয়। আমি বলি আপনি কবিতা লিখুন, আপনার মধ্যে কবি প্রতিভা রয়েছে।

নিপুণা। কবিতা লেখা বড় কঠিন।

মলয়। কঠিন নিশ্চয়, সাধনা সাপেক্ষ। কবিরা একটা আলাদা জাত। আপনি নিষ্ঠার সংগে সাধনা শুরু করুন। আপনি পারবেন।

নিপুণা। না, আমি পারবো না, আমার চিন্তা মানে দিয়ে যেরা, আমার কথা মানে দিয়ে যেরা।

(বগলে ফাইল প্রবেশ করে অভ্র)

নিপুণা আসুন অভ্রবাবু, আসুন. আসুন। আজ আমার কি সৌভাগ্য বাংলা দেশের দুজন বিখ্যাত লোক আমার বাড়ীতে এলেন।

অভ্র। (মলয় কে দেখে) মলয়বাবু যে—কখন এসেছেন?

মলয়। এই একটু আগে।

নিপুণা। অভ্রবাবু বসুন, আপনারা গল্প করুন, ততক্ষণ আমি মা কে বলে আসি। আপনারা এলে মা খুব খুশী হন।

(নিপুণা ভিতরে যায়)

মলয়। (অভ্রকে একটা সিগারেট দিয়ে, নিজে একটা ধরিয়ে) কুহেলীর পুজোসংখ্যায় আপনার লেখা গল্পটি পড়েছি। পড়ে অবাক হয়ে গেছি। বিস্ময় কর। কতকাল এত উঁচুদরের লেখা পড়িনি।

অভ্র। (হেসে) আপনার ভাল লেগেছে জেনে আনন্দিত হলাম। এমাসের উর্মীতে আপনার কবিতা পড়লাম। অপূর্ব লাগলো। পড়তে পড়তে মনে হোলো যেন এক নতুন দেশে চলে এসেছি।

মলয়। যাকে আধুনিক কবিতা বলা হয় তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না, আমি খুঁজছি আমার স্বকীয় পথ; আমি চাচ্ছি আরো এগিয়ে যেতে।

অভ্র। আপনি এগিয়ে যান মলয়বাবু, আরো এগিয়ে যান, আর ফিরবেন না।

(নিপুণার প্রবেশ)

নিপুণা। অভ্রবাবু, এইবার আপনার উপন্যাস বার করুন। আমি শোনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি।

অভ্র। আমিও উদগ্রীব। আপনি বসুন (ফাইল খোলে)

(নিপুণা অভ্র ও মলয়ের মাঝখানে বসে)

মলয়। (পকেট থেকে কাগজ বার করে) আমার আর একটা কবিতা ছিল।

নিপুণা। (মলয়ের হাতের উপর হাত রেখে) একে একে।

অভ্র। (ফাইল থেকে একগোছা কাগজ বার করে) শুনুন।

নিপুণা। অভ্রবাবু, আগে বলুন আপনি কেমন করে উপন্যাস লেখেন। আমার উপন্যাস লিখতে ইচ্ছে করে।

অভ্র। আপনি লিখুন, আপনি লিখতে পারবেন। আপনার দৃষ্টির গভীরতা আছে, প্রকাশ করবার ক্ষমতা আছে, আপনি যা লিখবেন তাই রসোত্তীর্ণ হবে।

নিপুণা। আমার কিন্তু ও সব আছে বলে মনে হয় না। বড় বড় লেখকরা কেমন করে উপন্যাস লেখেন আমার তা খুব জানতে ইচ্ছে করে। আপনি কেমন করে লেখেন অভ্রবাবু?

অভ্র। জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে আমি জানতে চেষ্টা করি। সমাজ অচেতন মন নিয়ে আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখি। আমি দেখি মানুষের ভিতরের রূপটি, দেখি তার সুখদুঃখ, ভয়-ভাবনা আলো অন্ধকার মিশ্রিত অন্তর্লোক। নেমে যাই তার অচেতন মানসে।

নিপুণা। আশ্চর্য!

অভ্র। সেই অন্ধকার অচেতন মানসের অলিতে-গলিতে যে সব আদিম ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, তাদের সংগে পরিচয় হয়।

নিপুণা। সেই ইচ্ছাগুলোকে টেনে আনেন আলোয়-দুর্জয় সাহস আপনার!

অভ্র। (খুশী হয়ে হেসে) আমার প্রথম উপন্যাস-খানা পড়েছেন?

নিপুণা। না, পড়িনি তো! আপনি পড়েছেন মলয় বাবু?

মলয়। পড়েছি।

নিপুণা। বলুন না সংক্ষেপে।

মলয়। বলছি—নরেন শিক্ষিত ছেলে, ডলি শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে, বিয়ে হয় দুজনের। কিছুদিন আনন্দে কেটে যায়। একবার নরেন আর ডলি যায় কাশ্মীর বেড়াতে। সেখানে পরিচয় হয় উদ্দামের সঙ্গে। অদ্ভুত ছেলে উদ্দাম, দেখতে সুন্দর, মস্ত বড় লোক, ঘোড়ায় চড়ে, গল্‌ফ খেলে, একটু ড্রিঙ্কও করে। উদ্দামকে ভাললাগে ডলির। ক্রমে ভাললাগা পরিণত হয় ভালবাসায়। একদিন নরেন বাড়ী ফিরে দেখে ডলি নেই, টেবিলের উপর একখানা খোলা চিঠি, লিখেছে ডলি "আমি চল্লাম উদ্দামের সংগে দিল্লী। রাগ কোরো না, আমার অন্তরের আকৃতির সন্ধান তুমি দেবে জানি, আমি অসতী নই।"

অভ্র। কেমন লিখেছি?

নিপুণা। আপনার কিন্তু একটা বলবার আছে বুঝতে পারছি। আপনি সেটা বুঝিয়ে বলুন না অভ্রবাবু।

অভ্র। (চোখ বুজে একটু ভেবে) ডলি তার স্বামীর সীমিত প্রেমে হাঁপিয়ে উঠেছিল। স্বামীর স্বার্থপর, সংকীর্ণতা ডলির স্বকীয় সত্তার গলাটিপে ধরেছিল, তার নারীহৃদয়ের বিরাট আকৃতি মুক্তি চেয়েছিল।

নিপুণা। বাপরে, কতবড় তত্ত্ব! আমি ভেবে-ছিলাম উপন্যাস লিখবো কিন্তু বড় বড় তত্ত্ব আমার মাথায় আসে না।

অভ্র। আপনি লিখুন, তত্ত্ব আমরা খুঁজে বার করবো।

(বিমলার প্রবেশ। অভ্র ও মলয় উঠে দাঁড়ায়)

বিমলা। বোসো, বোসো। নিপুণার কাছে শুনলাম তোমরা এসেছো। তোমরা এলে খুব ভাল লাগে।

(অভ্র ও মলয় বসে)

বিমলা। অভ্র, নতুন কিছু লিখছো নাকি?

অভ্র। আর একখানা উপন্যাস আরম্ভ করেছি।

বিমলা। মলয়ের কবিতা পাঠ আমি ও ঘর থেকে শুনছিলাম।

মলয়। ওটা আজ সকালেই লিখেছি।

বিমলা। নিপুণা, চারটেতে মার্কেটে যাবার কথা আছে, মনে আছে তো!

নিপুণা। হ্যাঁ মা, মনে আছে।

মলয়। (উঠে) তাহলে আমি উঠি। আর একদিন এসে কবিতা শোনাবো।

অভ্র। (উঠে) আমি একবার যাব রমেশের বাড়ী, নতুন ছবি কিছু আঁকছে কিনা দেখে আসি।

নিপুণা। (অভ্রের কাছে এসে) অভ্র বাবু আমি ছবি আঁকা শিখবো।

অভ্র। (আশ্চর্য হয়ে) ছবি আঁকা শিখবে!

নিপুণা। হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে আমি ছবি আঁকতে পারবো। আপনার বন্ধু শেখাবেন আমাকে? বলবেন তাঁকে একবার?

অভ্র। বলবো। কিন্তু আমি আবার বল্লি আপনি

উপন্যাস লিখুন। আপনার প্রতিভা বিকশিত হবে কথা-শিল্পের মাধ্যমে।

(মলয় ও অভ্র প্রস্থান করে। বিমলা ও নিপুণা ভিতরে যায়)

(পঞ্চম দৃশ্য)

রমেশের ঘর। রমেশ চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে চিন্তামগ্ন। একটু পরে উঠে দাঁড়ায়, একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে টানে।

প্রবেশ করে অভ্র, বগলে ফাইল।

অভ্র। কিরে, কি করছিস?

রমেশ। (ঘুরে দাঁড়ায়—জবাব দেয় না)

অভ্র। ভাবলাম এসে দেখবো তুই ছবি আঁকছিস, তা, কোথায় ইজেল, কোথায় ক্যানভাস, কোথায় তুলি কোথায় রং, তুই মুখভার করে দাঁড়িয়ে আছিস। কি ব্যাপার?

রমেশ। ছবিটবি আমি আঁকবো না।

অভ্র। বলিস্ কিরে! রাতারাতি তোকে বিখ্যাত করে দিলাম, ছবি আঁকবিনে মানে? অন্তত একখানা মাষ্টার পিস্ আঁক।

রমেশ। (সিগারেটের শেষটুকু ফেলে দিয়ে) যে ছবি আঁকতে জানেনা সে মাষ্টারপিস্ আঁকে কেমন করে? তুই আমাকে ডোবালি। গরিবের ছেলে, দুপয়সা উপার্জনের চেষ্টা করছিলাম, করেও ফেলেছিলাম ব্যবস্থা, কালিটা বাজারে চালু হলে পকেটে কিছু আসতো। তুই মাঝখান থেকে সব পণ্ড করলি।

অভ্র। (কাছে এসে পিঠে হাত রেখে) তুই হঠাৎ এত দমে গেলি কেন? বিখ্যাত হবার এতবড় সুযোগ হেলায় নষ্ট করিস নে। ছবি আঁক, ছবি আঁক, তুই যে বিরাট প্রতিভারে।

রমেশ। আমি ছবি আঁকতে জানিনে, আমি আঁকবো না।

অভ্র। (চিন্তিত ভাবে মাথা নেড়ে) বড় বড় শিল্পীর জীবনে এমন অবসাদ এসেছে। ভাই রমেশ এ দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলো, ওঠো, জাগো, বলিষ্ঠ হাতে তুলি ধরো, ও বিশ্ব জয় করো।

রমেশ। আর ইয়ার্কি করিসনে। পেটে অন্ন নাই বলিষ্ঠ হাতে তুলি ধরতে হবে। বিখ্যাত হবার আগে আমি বাঁচতে চাই। আমাকে টাকা রোজগার করতে হবে খেতে হবে। রান্নে খাওয়া হয়নি, যে তো গোটা কয়েক টাকা ধার, হোটেল থেকে খেয়ে আসি।

অভ্র। টাকা রোজগার করবি এই কথা?

রমেশ। হ্যাঁ, এই কথা।

অভ্র। এই সামান্য কথা?

রমেশ। (বিরক্তির সঙ্গে) সামান্য নয়, বড় কথা।

অভ্র। সে ব্যবস্থা হয়েছে।

রমেশ। কি ব্যবস্থা হয়েছে?

অভ্র। গুরুগিরি করতে হবে, নিপুণাদেবীকে ছবি আঁকা শেখাতে হবে। মোটা দক্ষিণা পাবি।

রমেশ। আমি নিজেই জানিনা ছবি আঁকতে, নিপুণাদেবীকে কি শেখাবো? গুরুদক্ষিণা হাতে না পড়ে পিঠে পড়বে।

অভ্র। প্রতিভাকে ছবি আঁকা শিখতে হয় নারে, তার প্রথম তুলির টানই ছবি। সেদিন নিজের কানে শুনলি তো তোর প্রথম ছবির প্রশংসা। ওঁরা সব বড় বড় সমাজদার, কাগজে ছবির সমালোচনা করেন।

রমেশ। শেখাতে গেলে কিছু আঁকতে তো হবে।

অভ্র। তোকে কেন আঁকতে হবে, তুই গুরু, তুই আঁকতে বলবি, তিনি শিষ্যা, তিনি আঁকবেন। তুই উৎসাহ দিয়ে যাবি, প্রেরণা যুগিয়ে যাবি। কিছু উপদেশ দিবি।

রমেশ। আমি আর্টের কিছুই জানিনে, উপদেশ দেব কিরে!

অভ্র। শোন, বলবি—আপনার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ বদলে ফেলুন, স্থূলদৃষ্টিতে যা দেখছেন তা ঠিক দেখা নয়, ইত্যাদি।

রমেশ। এই বল্লেই হবে?

অভ্র। নিশ্চই হবে। নিপুণা দেবী আসলে কথাশিল্পী, ওঁর প্রতিভা বিকশিত হবে গল্পউপন্যাসের

মাধ্যমে। আমি বলেছি ওঁকে উপন্যাস লিখতে। হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে ছবি আঁকবার, দুদিন তুলি রং নিয়ে খেলা করুন। তার পরে তুলি ছেড়ে লেখনী ধরবেন। তখন আমি আছি।

রমেশ। তা হলে তাই হবে।

অভ্র। কিন্তু ভাই, একটা কথা বলি, তুই তোর প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন হ। তুই born artist, ছবি আঁক, ছবিআঁক।

রমেশ। এতকরে বলছিস যখন তখন আঁকতে চেষ্টা করবো।

অভ্র। আর দেরি করিস নে, ইজেল, ক্যানভাস রং তুলি ইত্যাদি সবই তো কিনেছিস্, আজকে থেকেই শুরু কর। ঘরটা অন্যভাবে সাজাতে হবে (চারিদিকে তাকিয়ে) মাঝখানে একটা পর্দা টানা, এ-পাশে হবে ষ্টুডিও, ওপাশে থাকবে তোর বিছানাপত্তর। আছে পর্দাটর্দা? আন, আমি টানিয়ে ঠিক করে দি।

রমেশ। খুঁজে দেখতে হবে (খুঁজে একখানা চাদর আনে) এইটেতে হবে?

অভ্র। আপাতত চলবে। আয়, ধর—

(দুজনে ঘরের মাঝখানে পর্দা টানায়)

অভ্র। জানালাটা উত্তরদিকেই আছে—এই খানে ইজেল রাখ।

(রমেশ ইজেল খাড়া করে)

এই টুলটার উপর রং তুলি সব গুছিয়ে রাখ।

(রমেশ নির্দেশ মত সব গুছিয়ে রাখে)

বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে—গরিব অথচ প্রতিভাবান শিল্পীর ষ্টুডিও।

রমেশ। এতো হোলো, কিন্তু (পেটে থাপড় মারে)।

অভ্র। চল, এইবার একটা ভাল রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকি।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

নিপুণার বাড়ীর একখানা সাজানো ঘর। দক্ষিণে ব্যালকনি। ঘরের মাঝখানে ইজেল পাতা, তার উপরে রাখা ফ্রেমে আঁটা ক্যানভাস, পাশে টুলের উপর তুলি, রং ও প্যালেট। একধারে কয়েকখানা বেতের চেয়ার, তারই একখানায় বসে আছে রমেশ। একটু পরে প্রবেশ করে নিপুণা।

নিপুণা। নমস্কার, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।

রমেশ। (উঠে দাঁড়িয়ে) নমস্কার, বেশীক্ষণ বসতে হয়নি, এই কয়েক মিনিট হোলো এসেছি।

নিপুণা। বসুন, উঠলেন কেন।

(রমেশ বসে, একখানা চেয়ার টেনে নিপুণা পাশে বসে)

নিপুণা। আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, আবার ভয়ও করছে।

রমেশ। কেন বলুন তো?

নিপুণা। আপনার মত এতবড় শিল্পীর কাছে ছবি আঁকা শিখবার সুযোগ পেয়ে আনন্দ হচ্ছে, আবার নিজের দিকে তাকিয়ে ভয় হচ্ছে, আমার যে কোন গুণ নাই।

রমেশ। প্রথম তুলি ধরতে যাচ্ছেন কিনা তাই একটু নার্ভাস হয়েছেন, আর কিছু নয়।

নিপুণা। (হেসে) হয়তো তাই।

রমেশ। আপনি তাহলে আঁকতে শুরু করুন।

নিপুণা। পরে হবে। জানেন রমেশ বাবু, শিল্পীকে আমার একটা বিরাট রহস্য বলে মনে হয়। কত উঁচুতে তিনি। মনে জাগে কৌতুহল, সেখান থেকে কি দেখেন তিনি, কেমন দেখেন তিনি।

রমেশ। (একটু হাসে)

নিপুণা। রমেশ বাবু, আপনার শিল্পীমনের জগৎটা আমার জানতে ইচ্ছে করে।

রমেশ। (হেসে) তাই নাকি?

নিপুণা। হ্যাঁ, আমি অনেক বড় বড় শিল্পীর জীবনী পড়েছি। বিচিত্র সে সব কাহিনী। তাঁরা আমার মত মানুষ হয়েও যেন আমার মত মানুষ নয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁরা অসাধারণ।

রমেশ। (একটু হাসে)

নিপুণা। ছেলেবেলায় আপনি কেমন ছিলেন রমেশ বাবু? নিশ্চয় আর দশজন সাধারণ ছেলের মত খেলা করে বেড়াতেন না, নির্জন মাঠে ঘাটে একা একা ঘুরে বেড়াতেন। কখনো প্রজাপতির পিছনে ছুটতেন, কখনো নীল আকাশের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতেন—তাই না?

রমেশ। (একটু হেসে) হ্যাঁ, ঐ রকম।

নিপুণা। একটা অজানার ডাক নিশ্চই আপনাকে অশান্ত করে তুলতো।

রমেশ। হ্যাঁ।

নিপুণা। একদা আপনার ভিতরে একটা স্বপ্ন দেখা দিয়েছিল।

রমেশ। (মাথা নাড়ে)

নিপুণা। একসময় আপনার অন্তরে একটা অব্যক্ত, গভীর ক্রন্দনময় আকুতি জেগে উঠেছিল, তারই ফলে আপনি পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখেছিলেন, তাই না?

রমেশ। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমি যাচ্ছি নিপুণা দেবী।

নিপুণা। (আশ্চর্য হয়ে দাঁড়ায়) সে কি, যাবেন কেন রমেশবাবু, কি হোলো।

রমেশ। আমি যাচ্ছি, আমি আর মিছে কথা বলতে পারছি না, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

নিপুণা। আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না রমেশবাবু।

রমেশ। আমি বলছি আমি আর মিছে কথা বলতে পারছি না, এতক্ষণ অনেক বলেছি। ছেলেবেলায় আমি মোটেই অসাধারণ ছিলাম না, আর দশজন ছেলের মতই খেলে বেড়িয়েছি, আমি আকাশের দিকে তন্ময় হয়ে কোনদিন তাকিয়ে থাকিনি, আমার মনে কখনো কোন অব্যক্ত, গভীর ক্রন্দনময় আকুতি জেগে ওঠেনি।

নিপুণা। (অবাক হয়ে) সত্যি বলছেন?

রমেশ। সত্যি বলছি। আমি একজন থার্ডক্লাশ এম, এস, সি, লেখার কালি তৈরি করছিলাম, এমন সময় বন্ধু অভ্র আমার মধ্যে বিরাট শিল্প-প্রতিভা আবিষ্কার করে ফেললো, তার ফলে এই পরিস্থিতি। আমি আদপেই শিল্পী নই। আমি চল্লাম নিপুণাদেবী।

নিপুণা। যাবেন না রমেশবাবু, বসুন।

রমেশ। আর বসবার দরকার তো দেখছি না।

নিপুণা। (হাত ধরে) বসুন, আমার একান্ত অনুরোধ বসুন।

রমেশ। (বসে) আমি শিল্পী নই, বিরাট প্রতিভা নই, সাধারণ হরি, মধু, যাদবের মত আমি রমেশ। আর কি আমাকে আপনার ভাল লাগছে নিপুণা দেবী?

নিপুণা। (হাসতে হাসতে) খুব ভাল লাগছে।

রমেশ। কি বলছেন!

নিপুণা। খুব, খুব ভাল লাগছে।

রমেশ। (আশ্চর্য্য হয়ে) কেন বলুন তো?

নিপুণা। আপনি প্রতিভা নন বলে।

রমেশ। এখন তামাশা করলেও আমি রাগ কোরবো না।

নিপুণা। না, না আমি তামাশা করছি না, আমি যা বলছি সত্যি বলছি। আপনি প্রতিভা নন বলে আমার ভাল লাগছে। এ কয়দিনে আমি প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, আমার ডাইনে প্রতিভা, বাঁয়ে প্রতিভা, সামনে প্রতিভা, পিছনে প্রতিভা। এত প্রতিভার আলোয় আমার দুই চোখে ধাঁধা লেগেছে।

রমেশ। অভ্র বলে আপনি ও প্রতিভা।

নিপুণা। না রমেশবাবু, আমি প্রতিভা নই, আমি অতি সাধারণ মেয়ে আর দশজন সরলা কমলার মতই আমি নিপুণা।

রমেশ। (হাসতে হাসতে) আমার খুব ভাল লাগছে।

নিপুণা। রমেশবাবু, আপনি কোথায় থাকেন?

রমেশ। বেহালা, ২২ নং রাম দত্তের লেন। একটা ঘর ভাড়া করে আছি। বাবা অনেকদিন হোলো মারা গেছেন, খুব কষ্ট করে পড়াশুনো করেছি, আমরা গরিব তো। লেখার কালিটা বাজারে চালু করতে পারলে যদি কিছু সুরাহা হয়।

নিপুণা। আপনার মা আছেন ?

রমেশ। হ্যাঁ, মা আছেন। দেশে থাকেন। বর্ধমানে আমাদের বাড়ী। দামোদরের ধারে গ্রাম, কি যে সুন্দর।

নিপুণা। আমার গ্রামে থাকতে ইচ্ছে করে।

রমেশ। আপনি বুঝি গ্রামে কখনো থাকেন নি।

নিপুণা। না মাঝে মাঝে দার্জীলিং যাই, সেখানে বাড়ী আছে। পুরীতেও একখানা বাড়ী আছে। গাড়ী চালাতে শিখে গাড়ী নিয়ে বাবার সংগে আমি একবার বর্ধমানে গিয়েছিলাম। পথের দুপাশে গ্রাম, কত ভাল লেগেছিল।

রমেশ। আপনাকে একবার আমাদের গ্রামে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

নিপুণা। আমারও খুব যেতে ইচ্ছে করছে।

রমেশ। গেলে খুব মজা হবে।

নিপুণা। কি মজা ?

রমেশ। আপনাকে কত নতুন জিনিষ দেখাবো।

নিপুণা। (চেয়ার টেনে আরো কাছে এনে) কি দেখাবেন ?

রমেশ। খোড়ো ঘর দেখাবো, মাটির দাওয়া, মাটির দেয়াল। চালে উঠেছে লাউকুমড়োর লতা।

নিপুণা। কি সুন্দর।

রমেশ। আর দেখাবো ধানের মরাই।

নিপুণা। কি মজা হবে।

রমেশ। আর দেখাবো তালপুকুর, কালো জল, তাতে সাদা সাদা শালুক ফুল ফুটে আছে।

নিপুণা। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটবো।

রমেশ। আপনি জানেন সাঁতার ?

নিপুণা। না তো।

(দুজনেই হেসে ওঠে)

(ঘরে ঢোকে দাসী)

দাসী। দিদিমনি, একবাবু এসেছেন, বাইরের ঘরে বসে আছেন।

নিপুণা। বলো গিয়ে দিদিমণি ছবি আঁকছেন, যেতে দেরী হবে।

(দাসীর প্রস্থান

নিপুণা। চলুন রমেশ বাবু, আমরা ব্যালকণিতে গিয়ে বসি।

রমেশ। চলুন।

(দুজন ব্যালকণিতে যায়)

—পটক্ষেপ

(সপ্তম দৃশ্য)

নিপুণার বসবার ঘর, নিপুণা সোফার কোনে বসে বই পড়ছে। সময় দুপুর। প্রবেশ করে অনুপমা।

নিপুণা। (সাড়া পেয়ে) অনু যে, এসো।

অনুপমা। (এগিয়ে এসে) কেমন আছেন নিপুণা দি ?

নিপুণা। ভাল আছি। তোমাকে কিন্তু শুকনো দেখাচ্ছে, কেন বল তো ?

অনুপমা। (একটু হেসে) কাজ পড়েছে।

নিপুণা। বোসো দাঁড়িয়ে থাকলে কেন ?

(অনুপমা নিপুণার পাশে বসে)

অনুপমা। জানেন নিপুণাদি, অপিস পালিয়ে এসেছি।

নিপুণা। (হেসে অনুপমার পিঠে হাত রেখে) বেশ করেছো। বাবা তোমাকে খুব ভালবাসেন, কিছু বলবেন না।

অনুপমা। (একটুক্ষণ চুপ করে থেকে) একটা কথা আছে নিপুণাদি।

নিপুণা। বলো।

অনুপমা। (একটু ইতস্তত করে) একটা কবিতা এনেছি।

নিপুণা। (হাসতে হাসতে) পড়ে শোনাবে ?

অনুপমা। (লজ্জিত ভাবে) হ্যাঁ।

নিপুণা। বেশ তো। জানো অনু আজকাল আমার অনেক উন্নতি হয়েছে, আধুনিক কবিতার মানে না বুঝলেও কিছু একটা অনুভব করি। তোমার কবিতা পড়ো, আমি শুনছি।

অনুপমা। (ব্যাগ থেকে কাগজ বার করে পড়ে

নীল আকাশ হঠাৎ হোলো ম্যাকাশে সাদা;
বজ্রডমরু বেজে উঠলো পলাশের লাল ফুলে,
সোনার পিঞ্জরে বন্দী করে রাখি কথাটিরে,
বহুদূর চলেগেছে গতকালের সন্ধ্যা।

নিপুণা। সুন্দর।

অনুপমা। কি বুঝলেন নিপুণাদি?

নিপুণা। অর্থাৎ কি অনুভব করলাম, তাই না।

অনুপমা। (একটু হেসে) তাই

নিপুণা। (শোনো তাহলে, চোখ বুঁজে) একটি পুরুষ হৃদয় দেখছিলুম অতীতের লালস্বপ্ন। শুনছিল বিদ্রোহের বজ্রডমরু।

অনুপমা। (লজ্জিতভাবে) কিন্তু ওটি পুরুষ হৃদয় নয় নিপুণাদি, ওটি নারী হৃদয়।

নিপুণা। (বিব্রত ভাবে) নারী হৃদয়। তাই নাকি।

অনুপমা। আর এতে আছে ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন। বিদ্রোহ নাই, আছে নিবেদন, একটি ভিরু নারী-হৃদয়ের নিবেদন।

নিপুণা। (আশ্চর্য্য হয়ে) তাহলে এটা প্রেমের কবিতা?

অনুপমা। (একটু হেসে) হ্যাঁ।

নিপুণা। তাই তো ভাই, আমি ঠিক অনুভব করতে পারি নি।

অনুপমা। নিপুণাদি।

নিপুণা। বলো।

অনুপমা। তাহলে কি এ কবিতা পড়ে একটি ব্যাকুল নারীহৃদয়ের আত্মনিবেদন বুঝতে পারা যাচ্ছে, না?

নিপুণা। আমি তো তাই বুঝতে পারলাম না।

অনুপমা। তাহলে কি এ কবিতা দেবো না?

নিপুণা। (আশ্চর্য্য হয়ে) কাকে দেবে না?

অনুপমা। (একটুক্ষণ চুপ করে থেকে) নিপুণাদি, তাহলে আপনাকে বলি।

নিপুণা। কি ব্যাপার বলো।

অনুপমা। (লজ্জিতভাবে) আমি মলয়বাবুকে ভালবাসি।

নিপুণা। ওমা, তাই নাকি।

অনুপমা। হ্যাঁ নিপুণাদি। সারারাত জেগে কবিতাটি আমি লিখেছি। এটি তাঁর হাতে দিতে চাই। কিন্তু যদি—

নিপুণা। (চিন্তিতভাবে) ঠিক অর্থটা ধরতে না পারেন। তাইতো।

অনুপমা। (একটু চুপ করে থেকে) আমি আর একটা কবিতাও লিখেছি, প্রাচীন ট্র্যাডিশনে—পড়বো?

নিপুণা। পড়ো।

অনুপমা। (আর একখানা কাগজ বার করে পড়ে)

হয়তো অনেক কথা আছে বলবার
কি হবে ব'লে?
অনেক বোঝাতে এসে আনমনে শুধু
যাই যে চলে।
হয়তো বলতে চাই বহু অনুরাগে
এতো সুন্দর তুমি, এত ভাল লাগে।
কিছুই হয়না বলা—অকারণে বুক
ওঠে যে টলে।
তোমাকে বাসতে ভালো এ হৃদয় চায়—
বলবো ভাবি—
তাও যে হয় না বলা—হে প্রিয় আমার
কিসের দাবি।

নিপুণা। বুঝেছি, বুঝেছি—পরিষ্কার বুঝেছি। আহা কি গোপন ভিরু অনুরাগ, কি মধুর, কি সুন্দর।

অনুপমা। নিপুণাদি।

নিপুণা। বলো ভাই—

অনুপমা। তাহলে আমি এইটাই তাঁর হাতে দেব।

নিপুণা। তাই দিও।

অনুপমা। (কাগজগুলো ব্যাগে রেখে) আমি তাহলে উঠি নিপুণাদি।

নিপুণা। (পিঠে হাত রেখে) আচ্ছা অনু, তুমি কখনো বেহালা গেছো?

অনুপমা। গেছি নিপুণাদি, বেহালা আমার মামাবাড়ী।

নিপুণা। তাহলে তুমি চেনো রামদত্তের লেন?

অনুপমা। চিনি বইকি।

নিপুণা। আমাকে নিয়ে যেতে পারো সেখানে?

অনুপমা। আপনি যাবেন নিপুণাদি?

নিপুণা। (একটু হেসে) হ্যাঁ ভাই, যাব।

অনুপমা। যেদিন যাবেন বলবেন, আমি সংগে করে নিয়ে যাবো।

নিপুণা। আজই—এখনই।

অনুপমা। (আশ্চর্য্য হয়ে) চলুন তাহলে।

(নিপুণা ও অনুপমা সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়)

পটক্ষেপ

অষ্টম দৃশ্য

রমেশের ঘর। রমেশ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাহিরের দিকে তাকিয়ে আছে। দরজা ঠেলে প্রবেশ করে নিপুণা, একটু আওয়াজ হয়।

রমেশ। (না ফিরে) কে?

নিপুণা। (একটু কাশে)

রমেশ। কে?

নিপুণা। আমি।

(ঘুরে দাঁড়ায় রমেশ, নিপুণাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসে)

রমেশ। কি আশ্চর্য, আপনি!

নিপুণা। চলে এলাম।

রমেশ। আসুন, বসুন (চেয়ারের ধুলো ঝাড়ে)

নিপুণা। ব্যস্ত হবেন না, আমি বোসবো না।

রমেশ। আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, তা কি হয়।

নিপুণা। আপনিও তো দাঁড়িয়ে আছেন (রমেশের পাশে এসে দাঁড়ায়)

রমেশ। আমাদের সরু গলিতে তো বড় গাড়ী ঢোকে না, গাড়ী কোথায় রাখলেন?

নিপুণা। গাড়ী আনি নি।

রমেশ। তবে কেমন করে এলেন?

নিপুণা। যদি বলি পায় হেঁটে এসেছি, বিশ্বাস করবেন।

রমেশ। আপনার এখানে আসাটাই এমন আশ্চর্য ঘটনা যে আমি এখন সব বিশ্বাস করবো।

নিপুণা। হেঁটে আসিনি, বাসে এসেছি।

রমেশ। সংগে কে আছেন?

নিপুণা। কেউ না, একা।

রমেশ। আজ দেখছি সব অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে।

নিপুণা। দিনটা ভাল, মনে করে রাখবেন।

রমেশ। (জবাব না দিয়ে নিপুণার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে)

নিপুণা। হাসছেন কেন?

রমেশ। আজ আপনাকে চেনা চেনা লাগছে।

নিপুণা। কেন, এর আগে কি আমাদের চেনা শোনা ছিল না?

রমেশ। খুব চেনা লাগছে, যেন কত কালের চেনা।

নিপুণা। কেন বলুন তো?

রমেশ। আপনাকে গেঁয়োমেয়ের মত দেখাচ্ছে। শাড়ীখানা সাধারণ ভাবে পরা, চোখে কাজল নেই, ঠোঁটে রং নেই, গলায় মোতির মালা নাই।

নিপুণা। (একটু হাসে)

রমেশ। আমি ক'দিন থেকে ভাবছিলাম গেঁয়ো মেয়ের মত সাজলে আপনাকে কেমন দেখায়।

নিপুণা। কেমন দেখায়?

রমেশ। সুন্দর।

নিপুণা। আমাকে গ্রামে নিয়ে যাবেন?

রমেশ। যাবেন আপনি?

(বাহির থেকে কেউ দরজায় ধাক্কা দেয়। নিপুণা তাড়াতাড়ি পর্দার ওপাশে চলে যায়। ঘরে ঢোকে অভ্র।)

অভ্র। কি রে কি করছিস?

রমেশ। কিছু না দেখছিস তো দাঁড়িয়ে আছি।

অভ্র। দাঁড়িয়েই যখন আছিস তখন এক কাজ কর চা বানা। আমি বসি।

(চেয়ারে বসে)

রমেশ। অভ্র ভাই, আমার চা নেই, চিনি নেই, দুধ নেই দেশলাইটি পর্যন্ত নাই, চা করতে পারবো না। তুমি বাইরে থেকে চা খেয়ে এসো।

অভ্র। বরং তুই চট্ করে দুপেয়ালা চা বাইরে থেকে নিয়ে আয়।

রমেশ। আমার অনেক কাজ, অনেক ভাবতে হচ্ছে আজ আমাকে একটু একা থাকতে দে।

অভ্র। (হঠাৎ পর্দার দিকে তাকিয়ে) রমেশ।

রমেশ। কি রে।

অভ্র। তোর ঘরে চোর ঢুকেছে।

রমেশ। অসম্ভব আমার ঘরে চোর ঢুকবে কখন।

অভ্র। ঢুকেছে, নিশ্চয় ঢুকেছে।

রমেশ। না, ঢোকে নি, ঢুকতে পারে না।

অভ্র। ঐ পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছে—আমি পা'দুটো দেখতে পাচ্ছি।

রমেশ। দূর, তুই পাগল হলি নাকি।

অভ্র। পাগল হবো কেন আমি পরিষ্কার দুটো পা দেখছি।

(উঠে পর্দার দিকে এগিয়ে যায়)

রমেশ। (সামনে এসে) ও কিছু না।

অভ্র। কিছু না কি, আমি দেখছি।

(এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে)

রমেশ। (বাধা দিয়ে) তুই স্থূলদৃষ্টিতে যা দেখছিস সেটা ঠিক দেখা নয়।

অভ্র। (সেদিকে তাকিয়ে) নড়ছে রে।

রমেশ। (ধরে ঠেলতে ঠেলতে) তোর দৃষ্টিভঙ্গীটা বদলে ফেল, বদলে ফেল।

(অভ্রকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে যায় একটু পরে ফিরে আসে)

নিপুণা। (হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে) আর একটু হলেই আমি হেসে গড়িয়ে পড়তাম। আবার ফিরে আসবেন না তো?

রমেশ। না—আমি রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেছি।

নিপুণা। কি যেন বলছিলাম—কথাটা শেষ হয় নি।

রমেশ। বলছিলেন গ্রামে নিয়ে যেতে। যাবেন আপনি?

নিপুণা। যাব।

রমেশ। সত্যি বলছেন?

নিপুণা। সত্যি।

রমেশ। (কাছে এসে হাত ধরে) নিপুণা।

নিপুণা। (একটু হেসে) কি?

রমেশ। একটা কথা বলবো।

নিপুণা। চলো ঐ জানালার ধারে।

(দু'জনে জানালার সামনে গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ায়)

যবনিকা

লীলাময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

জেনেছি শ্যামল, তুমি সুধাসম্পদ
জীবনে চিরসহায়, মরণে বরদ,
অমল দীপশিখারি—অকূলপাথারে
তারকামন্ত্রে দাও দীক্ষা আঁধারে।
হৃদয়-সিংহাসনে তুমি যে আসীন—
জানি, তাই জানি আমি, হে নির্মলিন,
তোমারি কৃপাকিরণ বরে অন্তর
লভিবে শেষবিশ্রাম শ্যাম সুন্দর।
স্বপনে প্রসাদমধু পেয়েছি তোমার,
লভিব জাগরণেও স্নেহাশিস তার।
তোমার চিরচরণে যেন পাই ঠাঁই
পরম প্রেমশরণে—এ-ই শুধু চাই।
ঐন্দ্রজালিক ওগো অনিন্দ্যতনু।
বাদলের অশ্রুতে হাসি—রামধনু
ফুটায়ে অভাবনীয় অঘটন কত
ঘটাও করুণাবাণী বর্ষ' নিরত।
তবুও ক্ষণে ক্ষণে কেন মনে হয়—
তোমার সাধনপীঠ নয় নাথ নয়
ধূলিধূসপঙ্কের ম্লান ভূমিকায়?

কেমনে মাণিকমালা গাঁথিবে হেথায়—
কোমল পুলককলি প্রতি পদে যেথা
উন্মেষে ঝরে যায়—থাকে শুধু ব্যথা?
পট পরিবর্তন হয়। দেখা দাও
ঝলকি' নীলনিশান, আনন্দে গাও:
"রঙের দোললীলায় উচ্ছলি আমি
রক্তকাঁটায় গোলাপিয়া দিনযামী।
চেতনা-প্রগতি নয় কবিকল্পনা,
বাধা করে বিকাশের সোপান রচনা।
নিরাশাঙ্কুরে ফলে আনন আগার,
বেদনা বিধুরে হায় জয়ঝঙ্কার।
"নিষ্ঠুর আড়ালের কালো যবনিকা
দীর্ণ করিয়া বলে আলোলুপ্ত্রিকা:
সে-শুভদা নটিনীর প্রসাদে বাঁধন
কাটিয়া হৃদয় দেখে অসীম স্বপন।
মেঘ নয় বিজলির বিরোধী ধরায়,
চারণী সে দামিনীর চমক-প্রভায়।
পঙ্ক পঙ্কজের অন্তক নয়,
তারি কোলে হেসে দোলে কমল অভয়।
"জ্যোতির্নন্দিনী ঘুম যায় নিশাবুকে
উষারি মহিমা ডাকতে যুগে যুগে।
লুকাই লীলায় আমি— শেষে ধরা দিতে,

শূন্য মন্দিরে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তুমি চলে গেছ দূরে। ঘরে আমি একা।
কত দিন হয়ে গেল। নাই তব দেখা।
কাননে কপোত কাঁদে। পড়ন্ত রোদ্দুর।
জীবন-বাঁশিতে বাজে পূরবীর সুর
নয়ন-সলিলে সিক্ত। এই বসুন্ধরা
একদা অধরপ্রান্তে দিব্যরসে ভরা
ধরেছিল পান পাত্র। তুমি ছিলে ঘরে।
শতস্মৃতি-শরশর-শয্যার উপরে
শূন্য এ মন্দিরে আজ একা পড়ে আছি।
মৃত্যুরে দেখিনি আগে এত কাছাকাছি।
একের অভাবে বিশ্ব শূন্য হয়ে যায়—
নিঠুর, বেদনা দিয়ে বুঝালে আমায়।
বুঝিনি, যাআ জ বুঝি নয়নের জলে—
কেন এলো রাজপুত্র বোধিদ্রুমতলে।

কালের রাখাল

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

কে এই সময়,—যিনি বিশ্বের অতীত,
এই বিশ্বে উপস্থিত,
প্রতিপাদ্রে উদ্গত ভবিষ্যৎকাল।
তিনি মহাকাল, তিনি কালের রাখাল।
মহাবিশ্ব তাঁরই দেহ, তবু এ-ভূগোলে
তাঁর মাথা, চোখ, কান, নাক, মুখ খোলে।
কেবল এখানে
অচেতন জড় থেকে অবচেতনার প্রাণে,
সচেতন মনে তিনি এত বিবর্তিত।
তিনি এই ভূগোলেই এত উন্মোচিত,
আরও উন্মোচনের আভাস—
ভূগোলে তিনিই ইতিহাস।
পূর্বশিয়রী তিনি, উদয়ের পথে
দুই চোখ জাগে এ-ভারতে।
চোখেরও অতীত তাঁর তৃতীয় নয়ন—
বঙ্গোপসাগরীয় তটের অঞ্জন :
দণ্ডকারণ্য থেকে রামেশ্বর,
প্রভাস, নবদ্বীপ থেকে পুরী, দক্ষিণেশ্বর,
জোড়াসাঁকো থেকে পণ্ডিচেরী।
[illegible]

আদি পাপ

জ্যোতির্ময়ী দেবী

আমরাও সকলেই সেই স্বর্গ আর পৃথিবীর মেয়ে
হে আদি অনাদি নারী ইভ্ তোমারি মতন।
মনে হয় জানি সেদিনের পৃথিবীতে একসাথে জন্ম করেছি গ্রহণ
দেখিয়াছি সেই গাছটাও যাতে ফলে চিরকাল
অতি মিষ্ট অতি কটু তিক্ত লোনা আর অতি ঝাল.
জ্ঞানের অদ্ভুত ফল রং রামধনু।
বিষাক্ত সেই সাপটার উচ্ছিষ্ট সেই ফলটাকে করেছি ভক্ষণ
তোমার সঙ্গেই। একা নয়।—
—সাথে ছিল দেব দৈত্য দানবের মানবের মাতা—
দিতিও অদিতি মনু পত্নী-দনু।

আর চোখে দেখা দিল লজ্জা। সে সময়ে টেনে বৃক্ষছাল
পরেছিল বল্কলবসন।
অভিভূত ভীত নয় বলে ওরে নারী করেছিস একি মহাপাপ
দেখ্ নেমে আসে শিরে বিধাতার রুদ্র অভিশাপ।
বলেন ঈশ্বর, রে দুরাচারিণী আর রবি না অমর।
ও অমর জ্ঞানফলে মৃত্যুকীট আছে মর্ত্ত্যলোকে জন্ম হোক তোর
জন্মিবি মরিবি তোরা খেয়ে ওই মহাজ্ঞান ফল,
সুস্বাদ বিস্বাদ মিষ্ট কটু অমৃত গরল।

নামিলাম পৃথিবীতে।
আর জন্ম নিল দেব দৈত্য দানব মানব সকলের সঙ্গে অজানিতে।
সেই হতে অভিশপ্ত মানবীর সৃষ্টি যন্ত্রণায় মৃত্যু কোলে কোলে
জন্ম নেয় জীব।
তারা ভ্রষ্টস্বর্গ। বিহ্বল মানুষ তারা। খায় সেই মনোহর
ফল মধুর ও ঝাল।
আর মহাক্ষোভে সৃজন করিতে মর্ত্তে চাহে ঈশ্বরের সেই
স্বর্গ। আকাশ পাতাল।
মনের মৃত্তিকা ছানি প্রত্যহ গড়িতে চাহে সেই স্বর্গ। শিব।
হে ক্রুদ্ধ বিধাতা তোমার অমোঘ শাপে মেলে না স্বর্গের দিশা,—
কোথা শিব। কোথা জীব। শিব হয় ক্লীব।

এক দেহে লীন

দিলীপ দাশগুপ্ত

আমি আজ সেই মুক্তা সাগরের তলে
স্বাতী নক্ষত্রের প্রজ্ঞা-ধৌতর বিন্দু জলে
নবজন্মক্ষণে আমি অধ্যাতিত হংস—
মাধুকরী তৃষ্ণা নিয়ে ঝরাই মুকুলে।
আমি সেই প্রত্যাখ্যাতা অশ্রু ইন্দ্রানীর
কলংক রাষ্ট্রের আমি—বেদনা জাতির।
দ্বিতীয় রহিত দন্তী আমি দুই হাতে
পূর্ণিমাকে গ্রাস করি অমাবস্যারাতে।
সুধাপাত্রে ঢেলে দিয়ে মৃত্যুর নির্যাস—
নিজে পান করে আজ বিশ্বের সন্ত্রাস।

অমর্ত্তের ঐশ্বর্যকে পাতালেতে ফেলে
কালজয়ী অগ্নি হোয়ে কামানল জেলে
আমি হই দীর্ঘশ্বাস আমি হাহাকার,—
আমি রাহু বাহুলগ্না চির ধর্ষিতার।
ব্যর্থতার—বিচ্ছেদের আমি তীব্র জ্বালা
বাসর-বঞ্চিতা-বক্ষ বিদূরিত মালা।
অভাগার আর্তনাদ, অভাব নিঃস্বের
আমি মহা-অপমান নিখিলবিশ্বের।
বিষাময়ী কুমারীর রতিক্লান্ত চোখে—
তবু আমি রাঙা-রবি প্রণয় আলোকে।
আমি প্রেম, আমি ক্ষমা, সৃষ্টি ও প্রলয়—
নিজে আজ স্রষ্টা হোয়ে নিজেই বিলয়।

কংগ্রেস স্মৃতি

(প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ)

চতুস্ত্রিংশ অধিবেশন—অমৃতসর—১৯১৯

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(৪)

(১০)

৩১শে ডিসেম্বর বেলা ১১টার সময় অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল। অন্যান্য দিনের পর এ দিনেও প্যাণ্ডেল বহপূর্ব থেকেই পরিপূর্ণ হয়েছিল।

সময়মত সভাপতি মশায় না আসায় সভার কার্য্য আরম্ভ করতে দেরী হতে লাগল। ১১॥টার সময় শ্রীমতী বেশান্ত জানালেন যে সভাপতি মশায় খবর পাঠিয়েছেন যে তাঁর আসতে কিছু দেরী হবে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে শ্রীআব্বাস তায়েবজীকে সভাপতির আসনে বসিয়ে সভার কাজ চালানোর জন্য অনুরোধ করেছেন। তদনুসারে তিনি অস্থায়ী সভাপতি পদের জন্য তায়েবজী সাহেবের নাম প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাব সমর্থিত ও গৃহীত হওয়ায় তায়েবজী সাহেব ১১-৩৫ মিনিটের সময় সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন।

তারপর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্বন্ধে যে কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন তা শ্রীমতী বেশান্ত সভায় পাঠ করলেন। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হল ;

Motto,

"By love serve one another"
All India Congress, Amritsar
The Punjab, 1919

How shall our love Console thee,
or assuage thy helpless woe
How shall our grief requite
The hearts that scourge thee,
And the hands that smite
Thy beauty with thy rods of bitter rage
Lo, let our sorrow be thy battle gage
So wreck the terror of the tyrants' might
Who mocks with ribald wrath thy tragic plight
And stains with shame thy radiant heritage
O beautiful ! O broken ! And betrayed !
O mourneful queen ! O martyred Draupadi !

Endure thy still
Unconquered, undismayed,
The sacred river of thy stricken blood
Shall fold the five fold stream of freedoms flood
To guard the watch towers of our Liberty.

কবিতা পড়া হলে সকলে গভীর আনন্দ প্রকাশ করল।

কবিতা পাঠের পরও সভার কার্য্য আরম্ভ না হওয়াতে বহু প্রতিনিধি বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন। ডায়াসে দাঁড়িয়ে মাদ্রাজের সত্যমূর্ত্তি অধীরতা প্রকাশ করলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের অনেক প্রতিনিধিও তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন।

এই সময় পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী জানালেন যে ডাঃ সত্যপাল স্যার শঙ্করণ নায়ারের পদত্যাগ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করবেন।

ডাঃ সত্যপাল প্রস্তাব পেশ করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, পাঞ্জাবে সাধারণ বিচারালয়গুলিকে দাবিয়ে ভারত গভর্ণমেন্ট ও পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট জঙ্গি আইন ও তা চালু রাখার পলিসির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ স্যার শঙ্করণ নায়ারণের বড়লাটের কার্য্যকরী সভার (এক্জিকিউটিভ কাউনসিল) পদত্যাগ এই কংগ্রেস কৃতজ্ঞতার সহিত appreciate করছে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে ডাঃ সত্যপাল হিন্দীতে মার্শাল ল (জঙ্গী আইন) প্রয়োগের ভয়াবহ চিত্র কংগ্রেসের সামনে উদ্ঘাটন করলেন। প্রকাশ্য রাজপথে লোকজনের উপর বেত্রাঘাত এবং মহিলাগণকে পর্য্যন্ত রাস্তার বুকে হেঁটে চলতে বাধ্য করার মর্মন্তুদ কাহিনী ডাঃ সত্যপাল সভার নিকট বর্ণনা করলেন। এই সকল কার্য্য সহ্য করতে না পারে ভারতমাতার সুসন্তান প্রতিবাদ স্বরূপ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

মাদ্রাজের এন্, এস, রামস্বামী আয়েঙ্গার দীর্ঘ ভাষণে স্যার শঙ্করণ নায়ারের গুণাবলী বর্ণনা করে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

(এই সময় সভাপতি মশায় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন।)

বোম্বাইয়ের ডবলু, টি হালাই কর্তৃক সমর্থিত হয়ে এই প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত গোকরণনাথ মিশ্র।

এই প্রস্তাবের প্রথমাংশে বলা হয়েছে যে এপ্রিল মাসের হাঙ্গামার সময় যে সকল লোক, ইংরাজ এবং ভারতীয় নিহিত হয়েছে তাদের আত্মীয়স্বজনের নিকট এই কংগ্রেস শোক প্রকাশ করছে এবং যারা আহত হয়েছে বা যাদের কর্মশক্তি লোপ পেয়েছে তাদের প্রতি কংগ্রেস সহানুভূতি প্রকাশ করছে।

প্রস্তাবের দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করছে যে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ জাতির পক্ষ থেকে খরিদ করা হোক এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে ট্রাষ্টি করে গত ১৩ই এপ্রিল জেনারেল ডায়ারের হত্যাকাণ্ডে যাঁরা জীবন দান করেছেন অথবা আহত হয়েছেন তাঁদের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই স্থানটি স্মারক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হোক এবং কংগ্রেসের এই উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মহাত্মা গান্ধী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লালা গিরধারীলাল, ডাঃ কিচলু ও লালা হরকিষণ লালকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক।

পণ্ডিত মিশ্র প্রস্তাব উপস্থিত করে হিন্দীতে ভাষণ দিলেন।

বোম্বাইয়ের শেঠ মাতাজী গোবিন্দজী হিন্দীতে সিন্ধু প্রদেশের চৈতরাম উর্দু'তে এবং মাদ্রাজের প্রফেসর মেহন সি, আর, ডি, নাইডু ইংরাজিতে প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হল।

রৌলট আইন প্রত্যাহার কর্মচারিদের অপরাধের জন্য তাদের দায়ী না করা সম্বন্ধে আইন এবং রাজকীয় ঘোষণায় বন্দী মুক্তি সম্বন্ধে প্রস্তাব তিনটি সভাপতি মশায় স্বয়ং পেশ করলেন।

প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য সভাপতি মশায় সৈয়দ হোসেনকে আহ্বান করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে লর্ড চেলমস ফোর্ড এ দেশের লোকের আস্থা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলায় অবিলম্বে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই কংগ্রেস মহামান্য সম্রাটের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করছে।

প্রস্তাব উত্থাপন করে সৈয়দ হোসেন বললেন, চেলমসফোর্ডের মত এমন অযোগ্য, অদূরদর্শী এবং কল্পনাহীন কোন ব্যক্তি এর পূর্বে বড়লাট পদে নিযুক্ত হয় নি। সুদক্ষ গভর্ণর জেনারেল হওয়ার জন্য যে সকল গুণের আবশ্যক তার একটিও চেলমসফোর্ডের নেই

তিনি সবিস্তারে বড়লাটের প্রতিক্রিয়াশীল কার্য্যাবলীর নিন্দা করলেন এবং বললেন যে তাঁর শাসন নীতির চরম ফল পাঞ্জাবের নৃশংস ঘটনাবলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বললেন যে কংগ্রেসের প্রধান কর্তব্য হবে সমস্ত জাতির পক্ষ থেকে দাবি করা যাতে অবিলম্বে লর্ড চেমসফোর্ডকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক কস্তুরির আয়েঙ্গার সুযুক্তিপূর্ণ কারণ দেখিয়ে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এর পর মাদ্রাজের বি এন শর্মা দাঁড়িয়ে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন যে তিনি ১৯১৬ সালের আগষ্ট মাস থেকে গভর্ণমেন্টের কঠোর সমালোচনা করে আসছেন। তিনি রৌলট আইনের বিরোধিতা করেছেন এবং তিনি পাঞ্জাবের লোকদের জন্যও কিছু করতে পেরেছেন বলে গর্ব অনুভব করেন। তা সত্ত্বেও তিনি মনে করেন না যে লর্ড চেমসফোর্ডের শাসন সর্ব প্রকারে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি নানা যুক্তি দেখিয়ে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন।

তারপর বোম্বাইয়ের বিখ্যাত শিল্পপতি এস আর বোমানজী, ডঃ কিচলু (উর্দ্দুতে) জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতসরের মকবুল মামুদ (উর্দ্দুতে) বিহারের পি কে সেন সিংহ, বিপিন চন্দ্র পাল। সত্যমূর্ত্তি, জগতরামপুরী (উর্দ্দুতে) এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এঁদের প্রায় সকলেই শর্মাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন।

এই প্রস্তাবের উপর ভোট নেওয়ার সময় দেখা গেল একমাত্র বি এন্ শর্মা বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। *(১) প্রস্তাব গৃহীত হল।

(১) বি এন্ শর্মা রৌলট আইনের প্রতিবাদে দিল্লীর ইম্পিরিয়াল কাউনসিলের পদত্যাগ করেন কিন্তু অমৃত কংগ্রেসে চেমসফোর্ডের স্বপক্ষে বলায় পুরস্কার সঙ্গে সঙ্গে পেলেন। অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি বড় লাটের একজিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য নিযুক্ত হন এবং পরে স্যার উপাধিতে ভূষিত হন।

এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ওজস্বিনী ভাষায় জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি রক্ষার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানালেন। এবং বললেন যে হিন্দু মুসলমানের মিশ্রিত রক্তে যে ঐক্য গড়ে উঠেছে সেই ঐক্যের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, তিনি জানালেন যে জালিয়ানওয়ালাবাগের পৌনে ষোল আনা অংশ খরিদ করা হয়েছে এবং তিনি আশা করেন যে অনতিবিলম্বে বাকী অংশটুকু খরিদ করা হবে। এই জমির মূল্য বাবদ ৫ লক্ষ টাকা ও স্মৃতিভবন নির্মাণের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। তিনি ঘোষণা করলেন যে বোমানজি ২৫০০০্ এবং লালা হরকিষণ লাল ১০০০০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই আবেদনের ফলে চার দিক থেকে টাকা আসতে লাগল এবং অবিলম্বে এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হল।

তারপর সেদিনের মতো অধিবেশন শেষ হল।

(১১)

১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী বেলা ১১টার সময় শেষ দিনের অধিবেশনের সময় নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসের কোন অধিবেশন এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। কোনবারেই অধিবেশনের সময় ডিসেম্বর মাস পেরিয়ে যায় নি।

এ দিনেও কংগ্রেসের অধিবেশনে খুব ভীড় ছিল। যথারীতি সভাপতি মশায় অন্যান্য নেতাগণ সহ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন।

প্রথমে ভগ্নী বালাম্বাল তামিল ভাষায় রচিত একটি জাতীয় সংগীত গাইলেন।

সঙ্গীতের পর পণ্ডিত গোকরণ নাথ মিশ্র কংগ্রেসের প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক টেলিগ্রাম ও পত্র পড়ে শোনালেন। তিনি বললেন যে খুব আনন্দের বিষয় এই যে এই কংগ্রেস সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতাদের নিকট থেকে আশীর্বাদ লাভ করেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌয়ের মৌলানা আবদুল বারি, কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

এখন বোম্বাইয়ের করবির পীঠের শ্রীশঙ্করাচার্যের শুভেচ্ছামূলক টেলিগ্রাম পাওয়া গেল। ঐ টেলিগ্রামে তিনি দুগ্ধবতী গাভী ও প্রজননের জন্য ষাঁড় বিদেশে রপ্তানি বন্ধ করার প্রস্তাব পাশ করতে কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছেন। লণ্ডন থেকে প্রেরিত ব্রিটিশ কংগ্রেস কমিটির টেলিগ্রাম পড়ে শোনালেন। এ কে ফজলুল হক, রঙ্গচারী, রামচন্দ্র শর্মা প্রভৃতি নেতাগণও টেলিগ্রাম করেছেন জানালেন।

এরপর সভাপতি মশায়ের নির্দেশে তিনি চিত্তরঞ্জন দাশকে এই কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করতে আহ্বান করলেন।

দাশ মশায় প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন যে তিনি এ সম্বন্ধে এখন কিছু বলবেন না, কারণ এই প্রস্তাবের কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হবে সুতরাং তিনি সেগুলি পেশ হওয়ার পর তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করবেন।

প্রস্তাবটি তিন অংশে বিভক্ত ছিল।

প্রথমাংশে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস গত বৎসরের ন্যায় ঘোষণা করছে যে ভারতবর্ষ পূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন গভর্ণমেন্ট পরিচালনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং এর বিরুদ্ধে যে সকল অভিমত ও ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তা যেখান থেকেই হোক না কেন তা অগ্রাহ্য করছে।

দাশ মহাশয় স্মরণ করিয়ে দিলেন যে কংগ্রেস ১৯১৭ সালে কলকাতায় এবং ১৯১৮ সালে বোম্বাই ও দিল্লীতে অনুরূপ প্রস্তাব পাশ করেছে।

দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস দিল্লী অধিবেশনে গৃহীত শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাব স্বীকার করেও এই অভিমত প্রকাশ করছে যে শাসন সংস্কার অপর্যাপ্ত ও নৈরাশ্যজনক।

দাশ মশায় মনে করিয়ে দিলেন যে এই অংশে দিল্লীতে যা বলা হয়েছে তাই বলা হয়েছে।

তৃতীয় অংশে বলা হয়েছে এই কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য পন্থা অবলম্বন করার দাবি পার্লামেন্টের নিকটে করছে।

দাশ মশায় বললেন যে এই অংশ প্রথম দুই অংশের পরিণতি মাত্র।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়ান মাত্র চতুর্দিক থেকে "বন্দে মাতরম্" এবং 'তিলক মহারাজ কি জয়' ধ্বনি হতে লাগল। লোকমান্য সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় এই প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করলেন, তিনি অন্যান্য কথার পর বললেন যে এটা ভুল করা হবে যদি মনে করা হয় যে বর্তমান শাসক সংস্কার আইন ভারতে আন্দোলনের ফলে পাশ হয়েছে। বস্তুত এটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফল। মণ্টেগু সাহেব নিজেও একথা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে বর্তমান আইন সন্তোষজনক নয় এই কথা পুনঃ পুনঃ বলা হতে থাকলে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যার ফলে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্ণমেন্ট প্রদান করতে বাধ্য হবে।

এই বক্তৃতায় তাঁর রসজ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া গেল। বক্তৃতায় সময় কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁদের দিকে ফিরে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করায় লোকমান্য জবাব দিলেন যে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত যে তিনি চতুর্মুখ নন। তিনি ব্রহ্মা নন এমনকি ত্রিমূর্তিও নন।

উপসংহারে তিলক মহারাজ উপদেশ দিলেন যে শাসন সংস্কারে যে সকল ক্ষমতা পাওয়া গিয়েছে তার সদ্ব্যবহার করে আরও ক্ষমতা লাভের জন্য আন্দোলন চালাতে হবে।

লোকমান্য আসন গ্রহণ করলে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য মঞ্চের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি দাঁড়াতেই বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা সকলে তাঁকে অভ্যর্থনা করল। শারীরিক দুর্বলতার জন্য মঞ্চে তাঁর জন্য একটি চেয়ার রক্ষিত ছিল। সকলের অনুমতি নিয়ে তিনি সেই চেয়ারে বসে তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করলেন।

উপবিষ্ট অবস্থায় সকলে তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল

না। শ্রোতৃবর্গের কয়েকজন জানালেন যে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। মহাত্মা উত্তর দিলেন—আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না? আমি দুঃখিত।

মহাত্মা তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা মূল প্রস্তাবের শেষ শব্দ 'নৈরাশ্যজনক' বাদ দিতে বললেন এবং তৃতীয় অংশের পর নিম্নলিখিত ধারা চতুর্থ অংশ রূপে—সংযোজন করতে বললেন :—

শাসন সংস্কার প্রবর্তনের সপক্ষে রাজকীয় ঘোষণায় যে ভাবাবেগ প্রকাশ পেয়েছে যথা "আমার প্রজা ও কর্মচারীরা একযোগে একই উদ্দেশ্যে দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করে একটি নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করবে" তা এই কংগ্রেস আনুগত্যের সহিত মেনে নিচ্ছে এবং আশা করছে যে কর্মচারীরা এবং জনসাধারণ সমবেত ভাবে শাসন সংস্কার কার্য্যকরী করবে যাতে পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট অনতিবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাইট অনারেবল ই এস মণ্টেগুকে শাসন সংস্কার ব্যাপারে তাঁর পরিশ্রমের জন্য এই কংগ্রেস তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

মহাত্মা প্রথমে হিন্দিতে অভিভাষণ দিলেন, পরে তিনি ইংরাজীতে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে এই অধিবেশনে মতভেদ প্রকাশ না হলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হতেন কিন্তু যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে এ সম্বন্ধে তাঁর কিছু বলা দরকার তখন তা দেশের সম্মানিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এবং এমন কি যাঁরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে হলেও তাঁকে তা বলতে হবে। তিনি জানালেন যে তিনি সারাজীবন আপসের ভাব পোষণ করে এসেছেন। তিনি গণতন্ত্রের নীতি বোঝেন কিন্তু মানুষের জীবনে এমন সময় উপস্থিত হয় তখন বিবেকানুসারে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। দুই দিন পূর্বে এই রকম পরিস্থিতি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। তিনি এই কারণে নৈরাশ্যজনক (Disappointing) শব্দটি মূল প্রস্তাব থেকে বাদ দিতে চান। তিনি বললেন যে যদি কেউ তাঁকে নিরাশ করে তা হলে তিনি তাঁর সহিত সহযোগিতা করবেন না। তিক্ত রুটি পেলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন—গ্রহণ করবেন না কিন্তু তিনি যদি এমন রুটি পান যা পর্য্যাপ্ত নয় এবং যাতে যথেষ্ট পরিমাণে মিষ্টতা তা হলে তিনি তা খাবেন এবং চেষ্টা করবেন যাতে পরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিষ্ট রুটি পাওয়া যায় তাহলে সেটা নৈরাশ্যজনক হবে না। তিনি বললেন যে তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবে তাই বলা হয়েছে। তারপর তিনি বললেন যে লর্ড সিডেনহাম প্রভৃতির প্রতিরোধ অতিক্রম করে মণ্টেগু সাহেব যে শাসন সংস্কার বিলে কিছু ভাল ব্যবস্থা ঢোকাতে পেরেছেন তজ্জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য। তিনি শ্রীযুক্ত দাশ ও তিলক মহারাজকে তাঁর সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করতে আবেদন জানালেন। পরিশেষে তিনি ভগবদ্গীতার ভাষ্যকারকে গীতার শিক্ষা গ্রহণ করে মিঃ মণ্টেগুর প্রতি আত্মীয়ভাব প্রদর্শন করতে অনুরোধ করলেন।

মহম্মদ আলী জিন্না সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

জিন্না সাহেব আসন গ্রহণ করার পর শ্রীমতী এ্যানি বেশান্ত আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। তিনি মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতেই সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ তুমুল হর্ষধ্বনি করে তাঁকে অভিনন্দন জানাল।

বেসান্ত মহোদয়ার সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস শাসক সংস্কারকে অভিনন্দন করছে কারণ এর দ্বারা ভারতীয় নেশনের স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং ভারতকে দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্টের দিকে নিজ পায়ে অগ্রসর হবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং এই কংগ্রেস যথাসম্ভব অল্পসময়ের মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছনর জন্য শাসন সংস্কারের পূর্ণ সুযোগ নিতে জনসাধারণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছে। এই কংগ্রেস ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে প্রবল বাধার বিরুদ্ধে তাঁদের

অবিশ্রাম কার্য্যের জন্ত মিঃ মণ্টেগু ও লর্ড সিংহের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে শ্রীমতী বেশান্ত তাঁর অনবত্ত ভাষায় শাসন সংস্কারের প্রস্তাবগুলি বিশ্লেষণ করে দেখালেন।

এস্ আর, বোমানজী নাতিদীর্ঘ ভাষণে শ্রীমতী বেশান্তের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এরপর বিপিনচন্দ্র পাল মশায়ও আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করলেন।

এই সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস অনতিবিলম্বে পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্ণমেন্ট অর্জনের জন্ত শাসন সংস্কারের প্রস্তাবগুলি যথাসম্ভব ব্যবহার করার সুপারিশ করছে এবং এর জন্ত মিঃ মণ্টেগু যে পরিশ্রম করেছেন তজ্জন্ত তাঁর প্রতি ধন্তবাদ জ্ঞাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করছে।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করতে উঠে পাল মশায় বললেন যে যৌবনে পার্শিয়ান, উর্দ্দু, এমনকি হিন্দী না শেখার জন্ত এখন তার অনুতাপ হচ্ছে।

পাল মশায় তাঁর বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধীর সংশোধনী প্রস্তাবের সমালোচনা করে তাঁর নিজের সংশোধনী প্রস্তাবের স্বপক্ষে যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখালেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী বিপিনবাবুর সমর্থন করে উর্দু'তে বক্তৃতা দিলেন।

তারপর সত্যমূর্তি উঠে ওজস্বিনী ভাষায় দাশ মশায়ের মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

মৌলানা হজরত মোহনী উর্দু'তে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

টি প্রকাশন বিপিনবাবুকে সমর্থন করলেন এবং পি কে তেলাং শ্রীমতী বেশান্তের পক্ষে বললেন।

পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী বিপিনবাবু সংশোধিত মূল প্রস্তাব উর্দু'তে সমর্থন করলেন।

দত্ত চৌধুরী মশায়ের বক্তৃতার সময় সভাপতি মশায় আসন ত্যাগ করে বাইরে যাওয়ার দরুণ কিছুক্ষণের জন্ত মালব্যজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সি. এফ. রঙ্গ আইয়ার এবং অন্ধ্রের স্বনামধন্ত নেতা বি, পট্টভি সীতারামায় মহাত্মা গান্ধীর সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বিহারের চন্দ্রবংশী সহায় হিন্দীতে মূল প্রস্তাব সমর্থন করার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাত্মা গান্ধীর সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়ালেন। তিনি প্রথমে হিন্দীতে কিছুক্ষণ বলে পরে ইংরাজিতে সুদীর্ঘ অভিভাষণ দেন।

সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বহু যুক্তি প্রদর্শন করে অভিমত প্রকাশ করলেন যে শাসক সংস্কার সম্পর্কীয় প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেসে মত ভেদ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মহাত্মাজীও তা চান না। তিনি আশা করেন যে ইতিমধ্যে মতভেদ মেটান সম্ভব হবে।

বক্তৃতায় বিরতি দিয়ে তিনি জনকতক নেতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বক্তৃতা মঞ্চে ফিরে এসে সন্তোষের সঙ্গে জানালেন যে একটা আপসের ব্যবস্থা হয়েছে। যখন বিষয়টি মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্ত তিলক ও শ্রীদাসের বিবেচনাধীন তখন অন্যরূপ হওয়ার আশঙ্কা নেই।

পণ্ডিতজী তারপর শ্রীমতী বেশান্তের নিকট গিয়ে জানতে চাইলেন যে তিনি এই আপসে রাজি আছেন কি না। বেশান্ত মহোদয়া আপসের প্রস্তাব দেখে তাতে সম্মতি দিতে অস্বীকার করলেন।

মালব্যজী তখন জানালেন যে আপস অনুসারে দাশমশায়ের মূল প্রস্তাবের সঙ্গে ৪র্থ অংশ স্বরূপ নিম্নলিখিত ধারা সংযোজিত হবে।

এই কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে ভারতবাসীগণ অনতিবিলম্বে পূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন শাসন প্রতিষ্ঠার জন্ত যথাসম্ভব শাসন সংস্কার কার্য্যকরী করবে এবং শাসন সংস্কার সম্বন্ধে পরিশ্রমের জন্ত রাইট অনারেবল মিঃ ই, এস্ মণ্টেগুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

এরপর পণ্ডিতজী হিন্দীতে কিছু বলতে উদ্যত হলে

দাশমশায় তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন যে আর মুস্কিল বাড়াবেন না।

জিন্নাসাহেব এই সময় উঠে পয়েন্ট অব অর্ডার তুলে বলে বসলেন যে সংশোধনী প্রস্তাব সভার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে। এখন এ গ্রহণ করা না করা প্রতিনিধিদের ইচ্ছা। তিনি বললেন যে আর কোন বক্তৃতার প্রয়োজন নেই। এখন প্রতিনিধিগণ ভোট দ্বারা মীমাংসা করবে।

সর্বশেষে দাশমশায় উঠে জানালেন যে আপসে যে প্রস্তাব স্থির হয়েছে তাতে দুটি বিষয় আছে (১) সহযোগিতা এবং (২) ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

সহযোগিতা সম্বন্ধে তিনি বললেন যে এই মনোভাব নিয়ে তিনি আপস করেছেন যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সহযোগিতা করা হবে কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যদি প্রতিরোধ করা প্রয়োজন হয় তাহলে প্রতিরোধ করা হবে।

দাশমশায়ের আসন গ্রহণ করবার পর মালব্যজী সভাপতির নির্দেশে শ্রীমতী বেশান্তের সংশোধনী প্রস্তাবের জন্য ভোট গ্রহণ করলেন। বিপুল ভোটাধিক্যে তা অগ্রাহ্য হল।

তারপর সংশোধিত মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী খিলাফৎ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করলেন বিপিনচন্দ্র পাল।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে খিলাফৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর কয়েকজনের যে বিরুদ্ধ মনোভাব তাঁদের কথাবার্তায় প্রকাশিত হয়েছে, এই কংগ্রেস তার নিন্দা করছে এবং ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও ভাবপ্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তুর্কীর সমস্যা সমাধান করবে এই কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন জানাচ্ছে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে পালমশায় বললেন ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এক বাক্যে তুর্কী সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন করার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের চেষ্টার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে।

পালমশায় জানালেন যে মুসলমানেরা ধর্মের জন্য এর বিরোধিতা করছে কিন্তু তিনি রাজনৈতিক কারণে এর বিরোধিতা করছেন।

পণ্ডিত রামভূজ দত্তচৌধুরী ও সিন্ধু প্রদেশের সাত দাশ উর্দুতে এবং শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরাজিতে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর বেগম হসরত মোহানী প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়ালেন। তাঁকে সকলে হর্ষধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা জানাল। বেগম সাহেবা উর্দুতে সমর্থন করার পর প্রস্তাব গৃহীত হল।

সভার সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য আরও বহু প্রস্তাব ছিল। সময়ের অভাবের জন্য সভাপতি মশায় স্বয়ং নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করলেন।

স্বদেশী, দুগ্ধবতী গাভীর রপ্তানী, লেবর পার্টীর কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ, ইণ্ডিয়া পত্রিকা, বাইরে প্রচার-কার্য্য লালা লাজপত রায়ের আমেরিকার কার্য্যাবলী কংগ্রেস ডেপুটেসন, ব্রিটিশ কংগ্রেস কমিটী, গোহত্যা নিবারণ, পাঞ্জাবের জঙ্গী আইনানুসারে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের ছাত্রদের উপর অত্যাচার, ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে পাঞ্জাব, বোম্বাই ও ভারত গভর্ণমেন্ট যে সকল হুকুম জারি করে সেগুলির প্রত্যাহার: আয়ুর্বেদীয় ও উনানী চিকিৎসা, ভারত প্রেস আই, বি, জি, হর্ণিম্যানের নির্বাসন, রেল বিভাগ, গভর্ণমেন্টের রাজনীতি, দিল্লীকে প্রাদেশিক মর্য্যাদা দান, আজমীঢ়-মাড়ওয়ার শাসন সংস্কার, ব্রহ্মদেশের শাসন সংস্কার, বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের জন্য সংগৃহীত চাঁদা যা বিভিন্ন লোকের নিকট আছে তা আদায়ের ব্যবস্থা, অভ্যর্থনা সমিতির হিসাব অডিট করা। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী এবং বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে দিল্লী মাড়োয়ারা ও ব্রিটিশ রাজপুতানার প্রতিনিধি গ্রহণ। প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন সভাপতি মশায়।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে—কংগ্রেসের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থে

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভারতীয় প্রজার নাগরিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্ত নিম্নলিখিত সর্ত সম্বলিত একটি আইন পার্লামেন্টে অবিলম্বে পাশ করা জরুরী প্রয়োজন।—

(১) ব্রিটিশ ভারত এক এবং অবিভাজ্য এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তান্ত জাতির ন্তায় সমস্ত ক্ষমতা জনসাধারণের সহজাত।

(২) ভারত সম্রাটের ভারতীয় প্রজা এবং অন্ত যারা ভারতবর্ষের বাসিন্দা আইনের চোখে তারা সকলেই সমান এবং এ দেশে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আইন করা চলবে না।

(৩) আইনসঙ্গত প্রকাশ্য বিচারে সাধারণ আদালতের দণ্ডাদেশ ব্যতীত সম্রাটের ভারতীয় প্রজার স্বাধীনতা, প্রাণ বা সম্পত্তি হরণ করা চলবে না এবং স্বাধীন মত প্রকাশ ও লেখার বা এক সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্ত কেউ কোন প্রকার শাস্তি ভোগ করবে না।

(৪) গ্রেট ব্রিটেনের মত ভারতীয় নাগরিকের লাইসেন্স গ্রহণ করে অস্ত্র রাখার অধিকার থাকবে এবং এই অধিকার থেকে সাধারণ বিচারালয়ের রায় ব্যতীত কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না।

(৫) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থাকবে এবং কোন মুদ্রাযন্ত্র বা সংবাদপত্র রেজেষ্টারি করার জন্ত কোন লাইসেন্স বা জামানত আবশ্যক হবে না।

(৬) সম্রাটের অন্তান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে অবস্থাধীনে কায়িক শাস্তি দেওয়া হয়—অনুরূপ অবস্থা ব্যতীত কোন ভারতীয় প্রজাকে কায়িক শাস্তি দেওয়া হবে না।

(৭) যে সকল আইন অর্ডিনান্স ও রেগুলেশান যা বর্তমানে চালু আছে বা ভবিষ্যতে হবে সেগুলি যদি এই আইনের ধারাগুলির পরিপন্থী হয় তা হলে সেগুলি বাতিল ও অবৈধ বলে গণ্য হবে।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব দ্বারা ১৯২০ সালের জন্ত ভি জে প্যাটেল (বিঠল ভাই ঝাবর ভাই প্যাটেল—বল্লভ ভাই ঝাবর ভাই প্যাটেলের জ্যেষ্ঠ সহোদর)। পণ্ডিত গোকরণ নাথ মিশ্র এবং ডাঃ এম্ এ আনসারী কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হলেন।

তারপর ডাঃ মুঞ্জে নাগপুরের পক্ষ থেকে পরবর্তী কংগ্রেসের অধিবেশনের আমন্ত্রণ জানালে সকলে

কর্ণধ্বনি দ্বারা তা গ্রহণ করল এবং একটি প্রস্তাব দ্বারা পরবর্তী কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান নাগপুর স্থির হল।

এর পর মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর ডি পি মাধবন প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বিশেষ করে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নিঃস্বার্থ সেবাকার্যের প্রশংসা করলেন।

স্বামীজী ধন্যবাদ গ্রহণ করে হিন্দিতে দীর্ঘ ভাষণ দিলেন।

তারপর ডাঃ সত্যপাল উর্দুতে যথোচিত ভাষায় সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

পণ্ডিত স্বরূপ নারায়ণ উর্দুতে ডাঃ সত্যপালকে সমর্থন করলেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভাপতি মশায়কে পুষ্প-মাল্যে ভূষিত করা হল।

ডঃ কিচলু সভাপতির নির্দেশে তাঁর বিদায় অভিভাষণ প্রথমতঃ উর্দুতে এবং পরে ইংরাজীতে পড়ে শোনালেন। এই অভিভাষণে তিনি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন।

শেষ দিনের অধিবেশন পরিসমাপ্ত হল রাত্রি ৮টার সময়। "বন্দে মাতরম" "মালবীয়া জী কি জয়" "মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়" "তিলক মহারাজ কি জয়" ধ্বনির মধ্যে কংগ্রেসের সুদীর্ঘ অধিবেশন সমাপ্ত হল।

এবারকার কংগ্রেসে যত লোকসমাগম হয়েছিল ইতিপূর্বে কোন কংগ্রেসে তা হয় নি। এত অধিক সংখ্যক প্রতিনিধিও পূর্বে কোন কংগ্রেসে যোগ দেন নি। উপস্থিত প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ১০৩১। তাছাড়া কৃষক প্রতিনিধির সংখ্যাও ছিল ৪৩৯।

এবার কংগ্রেসের পর আর কোথাও যাওয়া হয় নি। পরদিন প্রাতঃকালে প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। বাংলা, বিহার ও উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিগণ একই ট্রেনে দেশে ফিরলেন। ফেরবার পথে এলাহাবাদ ষ্টেসনের ডাইনিং হলে শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার প্রতিনিধিদের এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। এই ভোজে আমার পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভবপর হয় নি।

কলকাতায় ফিরে সেখানে ২।১ দিন থেকে রাজসাহী ফিরে গেলাম।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

গ্রামছাড়া মানুষ

বারাসত বার্ত্তা"র সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছে :

বসিরহাটের আমবাগান আজ প্রসিদ্ধ—ওখানে হাজার হাজার পূর্ব্ব বাংলার গ্রাম ছেড়ে আসা মানুষ আশ্রয় নিয়েছে, আশ্রয় নিয়েছে খানিক দূরে বসিরহাট রেল ষ্টেশনে। ওরা সব ছেড়ে এসেছে, সব ফেলে এসেছে—ওরা আজ রিক্ত, ওরা আজ সবহারা। রাজনীতি ওরা জানে না, রাজনীতি ওরা বোঝে না—রাজনীতির শিকারে ওরা পরিণত। ওদের আস্তানার চারদিকে বিশ্রী নোংরা, বিশ্রী গন্ধে ভরা বসিরহাট ষ্টেশন চত্বর। তাঁবুর ঘরে বহু মানুষ—স্ত্রী শিশুর ঠাসাঠাসি নিজেদের কয়েক হাত জায়গার মধ্যে ওদের যা কিছু জালানী, মাটির পাত্র। বসেছিলাম ওদের ভিতরে—ওদের অন্তরের বেদনা জানি, জানি ওদের মুখের ভাষা তথাপি লৌহ যবনিকার ওপারে খবর জানার কৌতুহল সামলাতে পারিনে। দেশ বিভাগ হয়েছে বাইশ বছর আগে। একটি বৌ কোথা থেকে এসে চিপ করে প্রণাম করল—চমকে উঠি, কি জানি ভুল করেছে কাকে ভেবে কাকে প্রণাম করল। আমার চেনা মুখ নয়—মুখের ছাদে চেনা বাড়ীর ছাদ খুঁজে পাইনে। সে তার পরিচয় দিল—একদা ওর বাবা ছিল আমাদের বাড়ীর কর্ম্মচারী।

দেশের মানুষ, গাঁয়ের মানুষ মন নেচে উঠল। আমি যখন গ্রাম ছেড়ে আসি ও তখন পৃথিবীতে এল, মায়ের কোল ছেড়ে চলে গেল তিন গাঁয়ের মিত্রী বাড়ী—কোলে উঠল খোকা। খোকার বয়স এখন চার বছর। আমাদের পাশের গ্রামের কয়েক ঘর চলে এসেছে—দের আস্তানায় বসেছিলাম। গুমোট গরম পরিবেশ সব মিলে এক নরককুণ্ড। দেশকে যারা নরকে পরিণত করল তারা আছে প্রাসাদে দণ্ড পাচ্ছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ। না ভুল বললাম ওরা ত মানুষ নয় ভোটার এক দেশের ভোটার চলে এসেছে অপর দেশে। ভোটার বলেই ওদের এই দশা। বিবেকানন্দের দেশের নর-নারায়ণ হলে এদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হ'ত অন্যরকম। গত মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের বহু দেশের মানুষ ভিটে ছাড়া হয়েছে ওদের আশ্রয় শিবিরে হয়ত পর্য্যাপ্ত খাদ্য ছিল না কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল। এখানকার পরিবেশ সরকারী লাল ফিতায় ফাইলবন্দী—চিড়িয়াখানায় যেমন খাঁচায় পশুদের দেখতে দর্শক আসে, এখানকার হতভাগ্যদের দেখতে দামী দামী মোটর চেপে আসেন কলকাতার পার্টি-আলারা, আসেন দিল্লীর খানদামী এম, পি তথা মন্ত্রীমহোদয়গণ। শ্মশান গোরস্থানে গেলে মানুষের ভাবান্তর ঘটে দার্শনিকতা চাঙ্গা হয়ে ওঠে—এখানে এলে পার্টি আলা তথা এম, পি ও মন্ত্রিদের সহজাত ভাবান্তর ঘটে গামছা নিঙরানো জলের মত মিঠা কথা জিহ্বা থেকে ঝরে পড়ে। ওরা মানুষ নয় জানি, উদ্বাস্তু হলে সাময়িক থাকার জায়গা ভালভাবে করা যেত না? বসিরহাট থেকে গোলাবাড়ী পর্য্যন্ত আধ ডজনের বেশী সিনেমাহল রয়েছে—ওগুলোতে অনায়াসে এবং ভাল ভাবে এদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়। এটা নর-নারায়নের দেশ, ভণ্ডামীর দেশ —এখানে মাটির দেবতার স্থান মন্দিরে রক্ত মাংসের মানুষের স্থান আস্তাকুঁড়ে। ১৯৪১ ৪২ সালে গোয়ালন্দ-ঘাটে বার্মা ফেরত ইভাকুয়িসদের সেবায় কংগ্রেস মেডিকেল ক্যাম্পের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আমার

প্রধান কাজ ছিল পথের ধকলে নানা রোগে মৃত শিশু পুরুষ-নারীর মৃতদেহ জড় করে পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেওয়া। গ্রাম ছেড়ে আসা মানুষের মাঝখানে দেখছি এই আধমরা মানুষগুলোর বাঁচার নিঃশ্বাস কত ভারী হয়ে উঠেছে। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীরা দেহপ্রাণ ঢেলে খাটছেন বলে গাদা গাদা লাশ নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু মানুষের মন বলে একটা পদার্থ আছে গ্রাম ছেড়ে আসার পূর্ব্বে নিপীড়িত দিনগুলিতে স্বপ্ন দেখেছে সীমান্তের ওপারে গেলে জর্জ্জরিত জীবন-যন্ত্রণার অবসান ঘটবে, আশ্রয় জুটবে—জুটবে স্বদেশবাসীর সহানুভূতি সান্ত্বনা। ওদের মন ভেঙে পড়ছে কোথায় সেই স্বপ্নের দেশ। ওরা বসে আছে সরকারী খাতার ডাকের প্রতীক্ষায়—কবে ডাক আসবে চলো পুনর্বাসিত নেবে অপর রাজ্যের কোন অচেনা স্থানে। এখন ওরা আসছে দলে দলে এরপর আসবে নদীর জলের মত। পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের চারিদিকে অর্থনৈতিক বেড়াজালে ঘিরে ধরা হচ্ছে—মানুষ প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে আসছে। রাষ্ট্রনীতি যে প্রজাদের ন্যায্য অধিকার দিতে পারে না সেখানে মানুষের জীবন সংসার বুদবুদের মত, চাপ যত আসে ওরা পালায়।

উদ্বাস্তুদের কথা

"যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিকে গীতা সাহা লিখিয়াছেন :

এ বছরে জুন পর্য্যন্ত প্রায় দেড় লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছেন। তাঁরা পথে ঘাটে বাস করছেন, রোদে পুড়ছেন, বৃষ্টিতে ভিজছেন, এমনকি বৃষ্টির জলের উপরেই দিন কাটাচ্ছেন। ক্ষুধার কান্নার রোল উঠছে, প্রতিদিন অসংখ্য শিশুর মৃত্যু হচ্ছে। কংকালসার মানুষের যেন মেলা বসেছে। ভয় করছে ওদের দেখে। এইভাবে নরক যন্ত্রণার মধ্যে ওঁদের দিন কাটছে। এই মানবতার কান্নার রোল ইন্দিরা দেবীর কর্ণে প্রবেশ করেনি, কলকাতায় এসেও এই হতভাগ্যদের দেখে যাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি, যদিও সুদূর দিল্লী থেকে ছুটে এসেছিলেন একবার রাজাবাজারে মুসলমানের ত্রাণ-কর্ত্রীরূপে। কি নিষ্ঠুর উদাসীনতা! কী অমানুষিক বর্ব্বরতা! রামজী এসেছিলেন, ভক্তদের সামনে কত কথা বললেন কিন্তু বললেন না শুধু উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে, গেলেন না নিপীড়িতদের দেখতে।

এসেছিলেন কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী ও শ্রম মন্ত্রী। কিন্তু মানবতার ডাকে নয়, এসেছেন জনমতের চাপে। আর দেশব্যাপী সে জনমত সৃষ্টি করেছেন জনসংঘ। সুদূর কাশ্মীর পাঞ্জাবেও ওঁরা 'পূর্ব্ববঙ্গ দিবস' পালন করেছেন। দিল্লীতে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালী সমাজের মুখে কালি মেখে এই 'বাঙ্গালী বিদ্বেষীরা' বাঙ্গালীদের জন্যে দিল্লীর ঘরে ঘরে সাহায্য সংগ্রহ করেছেন। ওদের নেতৃবৃন্দ প্রমাণ করে দিয়েছেন ওরাই দিল্লীর প্রাণ, বাঙ্গালীরা বাংলার প্রাণ নয়। এ বিষয় শ্রীসমর গুহের ভূমিকাও মানবতায় পূর্ণ। অপরদিকে, কম্যুনিষ্টদের, পিষে মারার জন্যে যারা প্রতিনিয়ত ধর্ম যুদ্ধের ডাক দেয় সেই আরবদের জন্যে দরদ যাদের অফুরন্ত তাদের ভূমিকা কিন্তু প্রত্যাশিত,নয়। ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে, এদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতি প্রকৃতিই এই রকম। শুধু বামপন্থী কেন, দক্ষিণ পন্থীদের রূপও কম নিন্দনীয় নয়। পূর্ব্ব বাংলার এই নির্য্যাতীত মানুষের সম্পর্কে স্বতন্ত্র পার্টি ও নীরব। মোট-কথা, যে সকল দলের আনুগত্য বিদেশের প্রতি বলে লোকের ধারণা, তারাই স্বদেশের নির্য্যাতীত মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর উদাসীন।

ইন্দিরা দেবীর তথাকথিত তপশিল প্রীতি যে ভোট প্রীতিরই নামান্তর তা এবার প্রমাণিত হয়েছে। হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের সকলেই তথাকথিত তপশিলী বর্ণের হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি ইন্দিরা দেবী যেহেতু ওদের ভোটাধিকার নেই। ঐস্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে যে তপশিলী হিন্দুদেরও স্থান নেই এই নিষ্ঠুর সত্যটি উপলব্ধি করতে বলি সেই সকল তপশিলী বর্ণের লোকদের যারা মুস্লীম সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে .

গাঁটছড়ায় আবদ্ধ। আমি সতর্ক করে দিই সেই সকল লোকদের যারা মুস্লীম লীগের কাঁধে পা দিয়ে লীগের প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন পশ্চিমবাংলার বিগত নির্বাচনে। এরা কারা? এদের নাম—সর্বশ্রী গোবিন্দ মণ্ডল, হরবল্লভ মণ্ডল, রাজেন মণ্ডল, বিশ্বম্বর মণ্ডল, বলাই ধীবর, কার্তিকচন্দ্র বায়েন, অঞ্জলি হালদার এরা প্রার্থী যথাক্রমে নাকাশীপাড়া, হাড়োয়া বিষ্ণুপুর পূর্ব, আউশগ্রাম, ময়ূরেশ্বর ও হাঁসান থেকে। এদের বাড়ী যথাক্রমে—উত্তর বহীর গাছি, নদীয়া, সোনাপুকুর, ২৪ পরগণা, ক্যানিং, ২৪ পরগণা, গান্ধীবাহুহী, বিষ্ণুপুর ২৪ পরগণা, ভেদিয়া, বর্দ্ধমান, মলকপুর, বীরভূম, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। এদের সম্পর্কে দেশবাসীরও সতর্ক হবার সময় এসেছে।

জনমতের চাপে অতি সম্প্রতি ইন্দিরা প্রতিনিধি বারাসাত বসিরহাট ভ্রমণ করে গেছেন। আশ্বাস দিয়ে গেছেন। অনেক পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছেন। এসব শুনে আমাদের ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয় জাগে। নন্দজী তারপর বললেন পাতাল রেল। এখন শুনছি কোন রেলই নয়। নেহেরু পরিবার বলছেন—এই পরিকল্পনায় এত লোকের চাকুরী হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে, দশ বৎসর পূর্বে যে সকল উদ্বাস্তদের বিভিন্ন ক্যাম্পে দিয়ে ফেলা হয়েছে, ক্যাম্পের যন্ত্রণা থেকে তারা এখনও মুক্তি পান নি। সেদিন শ্রী এন, সি, চ্যাটার্জী বলছিলেন—উদ্বাস্তদের দিয়ে দণ্ডকারণ্যের ভূমি চাষযোগ্য করা হয়েছে, কিন্তু তা বিলি করা হয়েছে আদিবাসীদের মধ্যে। "এই অবস্থায় কোন পরিকল্পনা গ্রহণ না করেই যদি এই সকল ছিন্নমূল উদ্বাস্তদের নিয়ে তার মধ্যে ঠেলা দেওয়া হয়, তবে এদের জীবনে অনিশ্চয়তা নেমে আসবে, অনেকে প্রাণ হারাবেন, যাঁরা বেঁচে থাকবেন তারা পশু জীবন যাপনে বাধ্য হবেন। বাংলা দেশের রাজনৈতিক দলগুলো চান উদ্বাস্তদের বাংলাদেশ থেকে দূরে সরানো হোক। চোখের আড়াল করেই ওরা সমস্যার সমাধান করতে চান। কী নির্দয়তা! কিন্তু বাঙ্গালী সমাজে খণ্ডিত করার বিরোধী যারা তাঁরা চান বাংলা দেশেই উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। মুর্শিদাবাদ সহ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আবাদ যোগ্য জমি কম নেই। সেখানে এদের পুনর্বাসন হতে পারে। পাকিস্তান থেকেও জমিও দাবী করা প্রয়োজন। কারণ পাকিস্তান এ বিষয়ে তার নৈতিক দায়িত্ব এড়াতে পারে না। আর প্রয়োজন উদ্বাস্তদের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা, এদের প্রশ্নটি রাষ্ট্র সংঘে তুলে ধরা। তবেই মানবতার কান্না থামতে পারে, অন্যথায় নয়। 'ভারতীয়তা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলরা' এতে বাধা দেবে আর 'নয়া ওরঙ্গজেব' ইন্দিরাও তা মেনে নেবেন না। কিন্তু দেশবাসী কি তা মেনে নেবে? হতভাগ্য উদ্বাস্তদের পাশে গিয়ে কি তারা দাঁড়াবেন না?

গরীবদের দিকে তাকান

শ্রীপান্নালাল দাসগুপ্ত "ময়ূরাক্ষী" সাপ্তাহিকে লিখিয়াছেন।

প্রতি বৎসরেই এই ভাদ্র-আশ্বিন মাসটা গ্রামের গরীবদের পক্ষে মারাত্মক সময়। কিন্তু এবারে চারটি কারণে অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

এক গত বৎসর ধান রোগ ও পোকার জন্য অনেক কম ফলেছিল।

দুই, জমি দখল আর ধান কাটাকাটি নিয়ে যে অশান্তি হয়, তার ফলে সম্পন্ন চাষীরা অনেকেই ধান বিক্রয় করে দেয়, গ্রামে নিজ গোলায় রাখা নিরাপদ মনে করে না। ফলে দেড়ে বাড়ি হিসাবেও যে ধানটা পেতো তা একেবারে পাচ্ছে না। তা ছাড়া সরকারী কৃষিঋণের বিনিয়োগও অনেক কম হয়েছে, বেশীরভাগ চাষী ডিফল্টার হয়ে গেছে, অনেক সমবায় ফেল করে বসে আছে।

তিন, অবস্থাপন্ন পরিবারের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে এবং নানা কারণে গ্রামদেশে কোন কাজ নেই দৈনিক একটাকা মজুরীতে কোথাও কাজ মিলছে না এখন।

চার, লোকদের উপর বিষফোঁড়ার মত এবারে হঠাৎ অতিবৃষ্টি হয়ে গেলো। ৪।৫ দিনের অবিরাম ধারায় বৃষ্টির জন্ত এ জেলার সব নদীতে বান আসে এক ময়ূরাক্ষী ছাড়া। বন্তাপ্লাবিত লাভপুর, কীর্ণাহার লোয়ার নান্নুর ও অজয়ের যিদহ-সাউদহ অঞ্চলের প্লাবনের খবর সবাই জানেন, এসব অঞ্চলের কিছু রিলিফের কাজ চালু হয়েছে বটে। কিন্তু সারা মহকুমায় সর্বত্র আকাশ থেকে প্লাবন নেমে এসেছিল অবিরাম মুসলধারায় তার ফলে সর্বত্র গরীবদের অবস্থা সত্যিই শোচনীয়—অবর্ণনীয়। মধ্যবিত্ত চাষীদের ঘরেও আজ একমুঠো খাবার নেই সবাই গরীব হয়ে পড়েছে। কোন কাজ নেই। বহু জমির ফসল নষ্ট হলো, আবার ধান পোতার সময় নেই, বীচন নেই।

টেষ্ট রিলিফ করার মত সময় নাকি এটা নয়। জি আর এর ব্যবস্থা আছে শতকরা ২ জনের জন্ত—যেখানে আজ শতকরা ৯০ জনকেই কোন না কোন ভাবে সাহায্য করা দরকার। কাজও সৃষ্টি করা দরকার। বাঁধ সংস্কার করার কাজ বাকী আছে—প্রায় সব নদীতীরেই—অজয় সহ। তাছাড়া 'হিজলো প্রকল্পটির' অনেক কাজ এখনই করা চলে। রাস্তাঘাট করার কাজও নিশ্চয়ই কোথাও বের করা চলে।

আজ যদি এই গ্রাম্য গরীবদের দুর্দশা একটা আপৎকালীন কর্তব্য মনে করে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ না করা হয়, তবে লোক যা মরবে তা মরবেই উপরন্তু বর্তমান সামাজিক অশান্তির যুগে আরও গভীর তিক্ততার সৃষ্টি হবে। ফসল তোলার সময় তার ফলশ্রুতি দেখা যাবে। একথা একটি নিষ্ঠুর পরিহাসের মত শোনায় যে গত বৎসর নাকি পশ্চিম বাংলায়ই সবচেয়ে বেশী ধান হয়েছিল এবং বীরভূম একটি উদ্বৃত্ত জেলা—বোধহয় সবচেয়ে বেশী ধান যোগায়। সে জেলায় শতকরা ৭৫টি লোক আজ অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে—শিশুরা কাঁদছে। গ্রামে ঢোকা প্রায় অসম্ভব। আজকের দিনে এর রাজনৈতিক ফলাফলের তাৎপর্য্য—কি সরকার, কি রাজনৈতিক দল—সবারই ভাল করে অনুভব করা উচিত, এবং যা করা যায়, যতটুকু করা যায় তা উঠে পড়ে করার জন্ত লেগে যাওয়া দরকার।

সাময়িকী

অর্থনৈতিক অসাম্য হ্রাস!

কিছুদিন পূর্ব্বে লোক সভায় একটি বেসরকারী বিল পেশ করা হয়। এই বিলের উদ্দেশ্য সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির সর্ব্বোচ্চ আয় কি হইবে তাহার সীমা ঠিক করিয়া দেওয়া। বলা বাহুল্য—এই অপূর্ব্ব অদ্ভুত বিলের উত্থাপক—শ্রী কানোয়ার লাল গুপ্ত নামধেয় একজন বিশ্ব-বিখ্যাত অর্থনৈতিক পণ্ডিত (?) এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন ব্যাপারে যিনি অতি অতি অভিজ্ঞ, তবে কিভাবে তিনি এত গভীর জ্ঞানের অধীশ্বর হইলেন, তাহা প্রকাশ পায় নাই, সব কিছুই গুপ্ত মহাশয় গুপ্তভাবে অর্জ্জন করিয়াছেন!

সে কথা যাক—এই অভিনব বিল যদি ভোটের জোরে পাশ হইয়া আইনে পরিণত হয় তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গের যে দু-চারটি বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, সে গুলিই সর্ব্বপ্রথম 'আহত' হইবে। মানুষের হাতে কোন কাজ না থাকিলে সে স্বপ্ন-প্রয়ানে নিমগ্ন থাকে এবং এই না-ঘুমন্ত না-জাগা অবস্থায় মানুষের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী হইয়া থাকে। আমাদের বর্ত্তমান পার্লামেন্টের শতকরা ৯৫ জন সদস্যের প্রকৃত পক্ষে কাজের কাজ কিছুই নাই—কেবল মাত্র দলপতিদের হুকুম মত ভোট দেওয়া এবং মাসান্তে বেতন, ভাতা প্রভৃতি কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লওয়াই এই শতকরা ৯৫ জন সংসদ সদস্যদের কাজ বলা যাইতে পারে!

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গুলির আয়ের সর্ব্বোচ্চ সীমা কোথাও সরকারীভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হয় না,হইতে পারেনা বলিয়াই জানি। আমাদের দেশে আজ ইন্দিরা মার্কা সোস্যালিজমের কল্যাণে সবই সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে একটা বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। পাবলিক সেক্টারের সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানাগুলির লাভের সর্ব্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দিবার কোন কথাই উঠিতে পারে না, কারণ সরকারী সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমিক লোকসানের কার-বার, কাজেই ইহাদের সম্পর্কে যদি লোকসানের একটা সর্ব্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে গরীব করদাতারা খানিকটা বুঝিতে পারিবে, আর কয় শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের গাঁটের কষ্টার্জ্জিত পয়সা সরকারী বেকুফী নবাবীর জন্য খেসারত দিতে হইবে!

নেহেরুর আমল হইতেই দেখা যাইতেছে, বেসরকারী সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর আমাদের লোকপ্রিয় এবং জনকল্যাণব্রতী সরকারের একটা বিষম রাগের ভাব, ইহাদের প্রতি সরকারের বিমাতা সুলভ ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, যেন বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গুলি বিদেশ হইতে এখানে আসিয়া টাকা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে। সোজা কথা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেকায়দায় ফেলিয়া তাহাদের কাজে কর্ম্মে সর্ব্বস্তরে বাধার সৃষ্টি করিয়া, এই প্রতিষ্ঠানগুলির সর্ব্বনাশ করা। এবং এই উদ্দেশ্য সাধিত হইলে, সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলি আর কাহারো সমালোচনার বিষয় বস্তু হইবে না, ইহাদের কোটি কোটি টাকার লোকসানকেও লাভ বলিয়া দেখানো, তখন কিছু কষ্টসাধ্য কর্ম্মও হইবে না।

দেশের ব্যবসায়, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি দেখিলে ইহাই মনে করা স্বাভাবিক যে আমাদের সরকার উন্নত এবং উন্নতি-শীল সকল বে সরকারী প্রতিষ্ঠানকে সকল দিক হইতে বেয়াড়া আইনের কাঁটাতারে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের নিও-সোস্যালিজম্ সার্থক করিতে বদ্ধপরিকর এবং ইহাতে সার্থকতা অর্জ্জন করিতে সরকার বড় বড় সব প্রতিষ্ঠানকে ঠ্যাঙ্গ ভাঙ্গিয়া নিম্নস্তরের প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এক সারিতে বসাইয়া, সব কিছুর মান খর্ব্ব করিয়া

সব সমান হো গিয়া' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবেন। আমাদের জাতির জননী উদ্ভাবিত সোস্যালিজম্‌কে প্রকৃত রূপ (?) দিতে হইলে উপরের সব কিছুকে ঘাড় ধরিয়া নামাইতে পারিলেই, ক্লাসলেস্‌ সমাজ সর্ব্বত্র পাকা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর এই মহৎ কর্ম্ম এবং ব্রতে দেশের জননীর সহায় একদল হঠাৎ আবির্ভূত চ্যাঙড়া কিম্ভুত মস্তিষ্ক অল্পবুদ্ধি এম্‌-পির দল। এই শ্রেণীর সদস্যদের কথাবার্ত্তা এবং বিচিত্র ক্রিয়া কর্ম্ম দেখিয়া বলা যায়, ইহারা দেশের বড় বড় শিল্প-পতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন নিছক দেশ-কল্যাণের জন্য নহে, ইঁহারা ভাবিতেছেন, বড় বড় শিল্পপতিরা বহু অর্থ ব্যয়ে, বহু পরিশ্রমে যাহা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এখন তাঁহাদের গলা ধাক্কা দিয়া খেদাইয়া, তাঁহাদের স্থানে নিজেদের বসাইতে। আসল কথা—"তোমরা বাপু অনেক ভোগ করিয়াছ, এবার সরিয়া পড়, আমাদেরও কিছু অবকাশ না দিলে চলিবে না! লুটের মালে যথাযোগ্য বখরা চাই।'

সরকার আর যাহাই করে করুক, ব্যবসা চালাইতে বা ব্যবসায় নীতি নির্দ্ধারণ করিবার মত বুদ্ধি সরকারী মহলে বিরল, নাই বলিলেও চলে। মাত্র অল্প দিন তৈলমন্ত্রী শ্রী ত্রিগুণা সেন দেশের ঔষধাদির মূল্য নিয়ন্ত্রন করিতে গিয়া দুই গালে যে দুইটি চড় খাইয়াছেন, তাহাতে সরকারী মহলের শিক্ষা হওয়া উচিত, কিন্তু উচিত কার্য্য করিতে সরকার কখনো সাহসী নহে॥

দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধে সরকারী কেরামতী

এই সম্পর্কে শ্রী গজেন্দ্র কুমার মিত্র লিখিত এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত একখানি পত্রের উদ্ধৃতি করিলেই যথেষ্ট হইবে। গজেনবাবু লিখিতেছেন:

মহামান্য ভারত সরকারকে করজোড়ে বলছি—দয়া করে দয়া করবেন না আমাদের। কী ভারত সরকার কী রাজ্য সরকার যখনই আমাদের কোন কষ্ট মোচন করতে আসেন—হিতে বিপরীত হয়। আমরা বরাবরই দেখে আসছি—সরকার থেকে কোন জিনিসের দাম কমাতে গেলেই কিছুদিন সে বস্তু দুষ্প্রাপ্য হয়। তারপর তার দাম আরও অনেক বেড়ে যায়। সে বৃদ্ধি সরকারী অনুমোদনও লাভ করে ক্রমশঃ। সরষের তেল, মাছ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের বেলাতে এ প্রহসন অনেকবার দেখেছি আমরা। তাই এবার যখন ত্রিগুণা সেন মশাই ওষুধের দাম কমাতে এলেন তখনই আমাদের বুক কেঁপে উঠেছিল। এর পরিণাম কি হবে তা আগেই জানতাম। সরষের তেল না হলে তিলের তেল খাওয়া যায়, মাছের বদলে ডালের বড়া চলে—কিন্তু ওষুধের বদলে কি খাবে মুমূর্ষু রোগীরা—এমনিই তো হুকুম দেবার সাত দিনের মধ্যে সে হুকুম বদল করতে হল—তারপর মোদ্দা কথাটা কি দাঁড়াল? অর্দ্ধেক ওষুধ বাজারে নেই, যাঁদের ঘরে আছে তাঁরা ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দেখার জন্য সাফ করে ফেলেছেন—আর যা বিক্রী হচ্ছে তারও প্রায় দেড়া দাম দাঁড়িয়েছে। সাধারণ বলতে গেলে নিত্য ব্যবহার্য ওষুধ মেকসাফরম ১৬ পয়সা বড়ি ছিল। ২২ পয়সা দিতে হচ্ছে। নোভালজীন ১৮ পয়সা থেকে ২৫ পয়সা। একটি ঘুমের ওষুধ ১০ পয়সা ছিল সেটি অদর্শন হয়েছে—অতি কষ্টে এক প্যাকেট কাল পাওয়া গেছে ৪.৫০এ। এ হবে, আমরা সাধারণ লোক সবাই জানতাম। প্রধান-মন্ত্রী বাজেটের পর "বিশেষ মূল্য বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা। নেই যেদিন বলেছেন, সেইদিনই ৫.৫০ টাকার একটি বিখ্যাত দুগ্ধজাত রোগীর খাদ্য ৬.৭৫ দাম হয়ে গেছে বাজারে—স্বীকৃত মূল্য। ডঃ ত্রিগুণা সেন কি এদেশের লোক নন, না ইতিপূর্ব্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ চেষ্টার কি শোচনীয় পরিণাম হয়েছে তা তিনি জানতেন না? আমরা দেখেছি অতি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোকও সরকারী গদীতে বসলে কেমন বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান—কল্পিত হস্তিদন্ত নির্মিত গম্বুজবাসী হয়ে—পড়েন দেশ-বাসীর বাস্তব জীবনযাত্রার সঙ্গে কোন যোগ থাকে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রদ করার প্রধান উপায় হচ্ছে, সেই জিনিষের সরবরাহ বৃদ্ধি করা—তা না করে আইনের সাহায্যে করতে গেলে এই অবস্থাই হবে। এর চেয়ে

ডঃ সেন যদি ঔষধ নির্মাতাদের বিনয়-বচনে বশ করার চেষ্টা করতেন তো হয়তো অবস্থা এত জটিল হয়ে উঠত না।

শ্রী ত্রিগুণা সেন মহাশয় চিরকাল শিক্ষার ব্যাপারে নিজেকে জড়িত রাখেন, তাহার পর তিনি কেন্দ্র সরকারী শিক্ষা মন্ত্রীর পদে আসীন হইলেন—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রিত্বের অবসান হইল হঠাৎ এবং তাঁহার স্থলে শিক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন এ-বি-সি-ডি-ই-এফ-জি-এইচ-আই-জে-কে রাও নামক জনৈক মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। এবং ত্রিগুণা সেন মহাশয় তৈল মন্ত্রীর পদে বহাল হইলেন। তৈল দান সম্পর্কে সেন মহাশয়ের কিছু জ্ঞান আছে, কিন্তু যে ব্যবসায় এবং বাজার সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেই ঔষধ ব্যবসায় এবং ব্যবসায়ীদের সায়েস্তা করিতে গিয়া তাঁহার ভাগ্যে কি জুটিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলার দরকার নাই।

আমাদের বিশ্বাস ছিল, সেন মহাশয় তাঁহার শিক্ষা মন্ত্রিত্ব অবসান হইবার পর মানে মানে কেন্দ্র-সরকার হইতে সরিয়া পড়িবেন। কিন্তু এ বিশ্বাস করিবার পূর্বে আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের বিষয় আঠামুক্ত গদির কথা চিন্তা করি নাই। এ আসনে একবার বসিলে পণ্ডিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদেরও চিত্ত বিভ্রম ঘটে এবং শত প্রকার অপমানেও মন্ত্রীর গদীতে আসীন ব্যক্তিকে টলাইতে পারে না।

বাজে কথা বলিয়া লাভ নাই, কারণ মন্ত্রিত্বের কি যাদু এবং মধু আছে তাহা আমরা জানি না, কাজেই মন্ত্রী মহাশয়দের যথাযথ বিচার এবং স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। একবার মন্ত্রী হইতে পারিলে আমরা হয়ত কিছু বুঝিতে পারিতাম।

এখন আমাদের নিবেদন শুধু এইমাত্র যে সরকার দয়া করিয়া দীন জনকে দয়া-করা বন্ধ করুন এবং বাজারকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করুন। ভরসা করিয়া সরকারী অব্যবসায়ী কর্তারা যদি ইহা করিতে পারেন, অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের জব্দ করিতে গিয়া সরকার বার বার নিজেদের মূর্খ প্রমাণিত করিবে না। —
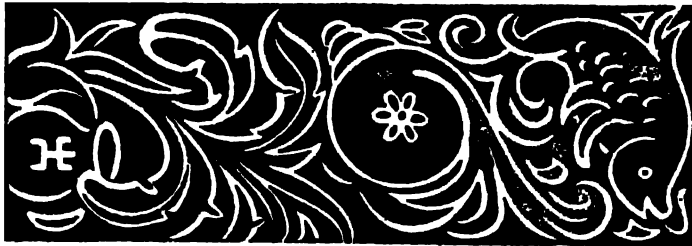
দেশ-বিদেশের কথা

প্যালেষ্টাইন কমাণ্ডোদিগের বিশ্বমানব শত্রুতা

যুদ্ধ যখন সুনীতি ও ন্যায়ধর্ম্মের মাপকাঠিতে মাপা হইত তখন ধর্ম্মযুদ্ধ ও অধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণ কার্য্যের বিচার হইত। সম্মুখ সমর অর্থাৎ লুকাইয়া পিছন হইতে অথবা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ না করিয়া সামনাসামনি যুদ্ধ করা, ধর্ম্মযুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত। অশ্বে অশ্বে গজে গজে রথে রথে যুদ্ধ করাই ধর্ম্মযুদ্ধের আদর্শ ছিল। নিরস্ত্র শত্রুকে আক্রমণ করা অন্যায় যুদ্ধ বলিয়া বিচার করা হইত। রথের চাকা কাদায় বসিয়া যাওয়া অবস্থায় কর্ণকে আক্রমণ অর্জ্জুনের মহা অখ্যাতির কারণ হয়। পূজানিরত ইন্দ্রজিতকে আক্রমণ করিয়া লক্ষ্মণ দুর্নামের ভাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের যুদ্ধধর্ম্ম সুবিধাবাদ অনুসরণে চলিত। আলেকজাণ্ডার পুরুরাজকে রাত্রির অন্ধকারে পিছনের নদী পার হইয়া আসিয়া আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন ও তাহাতে তাঁহার যোদ্ধা ও মহাবীর বলিয়া খ্যাতি ভারতীয়দের চক্ষে ম্লান প্রতীয়মান হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে যুদ্ধ শুধু সৈন্যদিগের উপর চালিত হয় না। Total War বা পূর্ণযুদ্ধ নামে নরনারী শিশু নির্ব্বিশেষে শত্রুপক্ষের সকল ব্যক্তিকে বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত করা একটা যুদ্ধের রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামরিক কেন্দ্র বলিয়া আর কিছু নাই। হাসপাতাল গির্জ্জা স্কুল কলেজ সকল কিছুই বোমার লক্ষ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সম্মুখ সমর বলিয়া আর কিছু নাই। সমান সমান অস্ত্রের কথাও আর শোনা যায় না। বিষাক্ত বাষ্প অথবা আনবিক অস্ত্রের সর্ব্বনাশা শক্তি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া শত্রুপক্ষের বাহিরের অন্য দেশীয় লোকেরও প্রাণনাশ করিতে পারে। কিন্তু তাহা হয় কোন মহাযুদ্ধ ঘটিলে। অবশ্য যুদ্ধ ঘোষণা আজকাল আর প্রয়োজন হয় না। গেরিলা, কমাণ্ডো প্রভৃতি সৈন্যগণের যুদ্ধের কোন রীতিনীতি নাই। যথেচ্ছা আক্রমণই তাহাদের যুদ্ধ পদ্ধতি। পাকিস্থান ইহা ব্যতীত কাবালি নামক অজানা অচেনা সৈন্য নিয়োগ করিয়াও অপর রাষ্ট্রের জমি দখল করার ব্যবস্থা করে।

সম্প্রতি প্যালেষ্টাইনের কমাণ্ডো নামধেয় বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী যোদ্ধাগণ সকল রীতিনীতি বর্জ্জন করিয়া যেখানে সেখানে যাহার তাহার অসামরিক যাত্রীবহনরত বিমান জোরালো হস্তে কাড়িয়া লইয়া যত্রতত্র লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাত্রীরা যে দেশের লোকই হউক তাহারা প্যালেষ্টাইন কমাণ্ডোদিগের নিকট যুদ্ধের বন্দী হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং বিমানগুলি যাহারই হউক কমাণ্ডোদিগের দাবী না মিটিলে সেগুলি উড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। দাবীগুলি করা হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের উপর। বিমানগুলি কোনও রাষ্ট্রের নহে, অনেক ক্ষেত্রেই নানান ব্যবসাদার প্রতিষ্ঠানের। সুতরাং সেগুলি উড়াইয়া দিয়া কোন কার্য্য সাধন করা যাইতেছে না।

অতঃপর মনে হয় বিশ্বজাতি সংঘ হইতে প্যালেষ্টাইন দখল করার প্রস্তাব উঠিবে এবং ফলে আরবদিগের অবস্থা বিশেষ কাহিল হইবে।

গেঁও যোগী ভিখ্ পায় না!

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত রাজা রাম-মোহন রায়ের বাসভবনটি তাঁহার উত্তরাধিকারী ধরণীধর রায়ের মৃত্যুর পর এখন 'কালোয়ার কাটরাতে' পরিণত হইতে চলিয়াছে! শুনা যাইতেছে ইতিমধ্যেই ঐ বাসভবন সংলগ্ন বিরাট উদ্যানটিকে ক্রেতা লৌহব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগী করিয়া লইয়া কতকগুলি

শেড্ নির্মাণ করিয়া লোহার গুদামে পরিণত করিয়াছে। লৌহ-ব্যবসায়ীদের কোন দোষ নাই, কারণ তাহারা উপযুক্ত মূল্য দিয়া রামমোহনের বাড়ীঘরবাগান ক্রয় করিয়াছে এবং ঐস্থানে তাহারা নিজেদের প্রয়োজন এবং সুবিধামত শেড্, গুদাম এবং বাসভবনও নূতন করিয়া নির্মাণ করিতে পারে। আইনত ইহাতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা বাঙ্গালী এবং অন্য প্রদেশের লোক যাহারা কলিকাতায় পাকাপাকিভাবে বসবাস করিতেছি, তাহাদের মনোভাব এবং দায়িত্ব-বোধের কথা চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইতেছি। পৃথিবীর অন্যকোন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে রামমোহনের মত মহান বিরাট পুরুষের স্মৃতি রক্ষার জন্য সমস্ত দেশের লোক আগাইয়া আসিত, স্মৃতি রক্ষার প্রয়োজনে কোটি কোটি টাকার ধনভাণ্ডার কয়েকদিনের মধ্যেই পূর্ণ হইত। কিন্তু আজকার বাঙ্গালী এবং পশ্চিমবঙ্গ এত তীব্রগতিতে উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে যে পুরাণ কথা ভাবিবার, যেসব মহাপুরুষ বাঙ্গালীকে বাঁচিবার পথ দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের কথা জানিবার, শুনিবার এবং মনে করিবার সময়ও তাহাদের নাই!

রামমোহনের বসতবাটিটি দখল করিবার জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী একবার চেষ্টা করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই বাড়িটি পাইবার জন্য বহু চেষ্টা করেন, এবং ঐ স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের দরজায় বহুবার মাথা ঠোকেন, কিন্তু ভিক্ষুকের কাতর নিবেদনে কোন মহল হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই! সকলেই বৃহত্তর পরিকল্পনার দ্বারা এক মহত্তর ভারত গঠনের চিন্তায় বিভোর। সর্ব্ব ভারতীয় নেতারা রামমোহনকে এক জন সামান্য বাঙ্গালী বলিয়াই মনে করেন। রামমোহন যে বর্ত্তমান ভারতের প্রকৃত জনক—একথা তাঁহারা স্বীকার করেন না, অনেকে হয়ত রামমোহনের নামও কখনও শুনেন নাই। এমন কি স্বয়ং গান্ধিজীও একবার রামমোহনকে 'পিগ্‌মী' বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধা করেন নাই। পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া তিনি তাঁহার অজ্ঞানতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আজ আমাদের দেশে আর তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষের মত দানবীর মহাপ্রাণ মানুষ নাই কিন্তু এখনো এমন অনেকে আছেন যাঁহারা সমবেতভাবে ভারতপথিক রামমোহনের বাসভবনটিকে কালোয়ার কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন, এখনো হয়ত পারেন। এ-বিষয় কলিকাতা করপোরেশনের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? পৌরসভা ভারতবন্ধু (?) হো চি মিন এবং ভারতের নিপীড়িত জনের ত্রাতা (?) লেনিনের এবং অন্যান্য বিদেশী গুরুদের স্মৃতি রক্ষার কাজে আজ অতি তৎপর, কিন্তু দেশীয় গুরু এবং গেঁও যোগীদের কথা পৌরসভার কর্ত্তব্য তালিকায় পড়ে না!

জানিতে পারিলাম বেলেঘাটায় যে বাড়ীটিতে ১৯৪৬-৪৭ সালে গান্ধিজী কিছুদিন ছিলেন, সেই বাড়িটি ক্রয় করিয়া (আর) একটি গান্ধী স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ করা হইবে। খুবই ভাল কথা। আমরা ইহাও জানি যে এই পুণ্য কর্ম্মের জন্য টাকার অভাব হইবে না। কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকার এই মহত কর্ম্মের জন্য নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিতে কোন দ্বিধা করিবেন না! অন্যত্র শ্রীবিনোবা ভাবের ভাবধারা প্রচারের জন্য তাঁহাকে তাঁহার আগামী জন্মদিনে একটি সামান্য দুই-কোটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হইবে। উপরে উক্ত দুইটি কাণ্ডের পুষ্টির জন্য এই দরিদ্রবাঙ্গলা দেশ হইতেও ৮০।৯০ লক্ষ কিংবা তাহারও বেশী টাকা দান হিসাবে পাওয়া যাইবে!!

রামমোহনের স্মৃতি রক্ষার জন্য কাহারো মাথা ব্যথা নাই, এমন কি এ দেশের যে নারীজাতিকে তিনি নিজের জীবন সংশয় করিয়া নিষ্ঠুরতম সামাজিক প্রথার কবল হইতে রক্ষা করেন, বাঙ্গলার অগুকার শিক্ষিতা এবং উন্নততর রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেই বাঙ্গালী নারীসমাজও রামমোহনের (সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগরেরও) নামও ভুলিয়া গিয়াছে!

বাংলার মহামানবদের যেসকল মর্ম্মর মূর্ত্তি, চিত্র প্রভৃতি বিবিধস্থানে রক্ষিত আছে, গত কিছুকাল হইতে সেগুলিকে আলকাতরা লিপ্ত করিয়া, আগুনে পোড়াইয়া নষ্ট করার দেশহিতকর কাজে এক শ্রেণীর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক, বিদেশী এক মহাগুরুর আদর্শ অনুসরণ করিবার মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছে। একদিক দিয়া বিচার করিলে ইঁহাদের কাজ ঠিকই হইতেছে বলা যায়। দেশের সাধারণজনের অবহেলায় ধূলাকাদা মাখা নোংরা অবস্থায় মর্ম্মরমূর্ত্তিগুলি যত শীঘ্র সম্ভব বিলুপ্ত হয়, ততই ভাল! অবস্থা যেমন দেখা যাইতেছে এবং যে-দিকে গড়াইতেছে, তাহাতে একটি শুভদিন নির্দ্ধারণ করিয়া—রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালী মহাপুরুষদের সকল প্রকার স্মৃতি এবং স্মারকচিহ্ন—ডিনামাইট দিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়াই হইল আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। মহাপুরুষদের দৈনিক অবমাননার হস্ত হইতে রক্ষা করার ইহাই হইবে প্রকৃষ্ট উপায়।

কেন্দ্র সরকার যথোপযুক্ত খেসারত দিয়া দিল্লীর বিড়লা ভবনটি (এখানে মহাত্মাগান্ধী নিহত হয়েন) দখল করিতে অযথা সময় নষ্ট করিল না।

মহাত্মার গৌরব এবং যশ কোন প্রকার ক্ষুণ্ণ করিবার কোন ইচ্ছা না লইয়া একথা অবশ্যই বলা যায় যে রামমোহন নামক ব্যক্তিটি গান্ধীজী অপেক্ষা কোন দিক দিয়েই খাটো ত ছিলেনই না, বরং বহু দিক দিয়া অনেক 'বড়ো' ছিলেন। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে—এদেশ যখন বিবিধ প্রকার সামাজিক কুপ্রথা এবং অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় ভারতবর্ষে একমাত্র বাঙালী রামমোহনই দেশ এবং জাতিকে বহু সামাজিক কুপ্রথা এবং অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃত জ্ঞান এবং আলোকের সন্ধান দান করেন। রামমোহন সেই সময় না থাকিলে আজ সারা দেশই হয়ত কৃষ্টির অতি নিম্নস্তরে থাকিয়া যাইত। হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং প্রচার দ্বারা রামমোহন দেশকে নূতন পথ দেখান।

যে রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ আমাদের গৌরব, ইঁহারা রামমোহনের নিকট বহু প্রকারে ঋণী এবং রামমোহনের আদর্শেই নানাভাবে অনুপ্রাণিত; এই কথা বলিবার একমাত্র কারণ এই যে কেন্দ্র সরকার ইচ্ছা করিলে সামান্য কয়টা টাকা (কাহারও পৈতৃক ধনভাণ্ডার হইতে নহে, সবই গরীব করদাতাদের) ফেলিয়া দিয়া বাঙ্গালী রামমোহনের বাসভবনটিকে কি জাতীয় স্মৃতিসৌধ করিতে পারিত না?

রামমোহনের যে তৈলচিত্রটি এখনো বিলাতে বৃষ্টল শহরে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে, তাহা ভারতের লোকসভার হলে পাঠাইবার প্রস্তাব যখন ইংরেজ ভদ্রলোক করেন পত্র মারফত, পত্রপ্রাপ্তির প্রায় দশ বৎসর পরে পণ্ডিত নেহরু তাহাকে জানান যে ভারতীয় পার্লামেণ্টের একান্ত স্থানাভাব, কাজেই রামমোহন বিলাতেই থাকুন দেশে তাঁহাকে পুনর্বাসন দেওয়া যাইবে না। যে পিতার রামমোহনের প্রতি এত ভক্তি, সেই পিতার কন্যার নিকট হইতে বেশী কিছু কি আশা করা যায়?

যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী

বাঘা যতীন

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্র ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭০তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৭৭

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ

মানব ইতিহাস চর্চা করিলে দেখা যায় ব্যক্তির স্বার্থপরতা ও অপর ব্যক্তিদিগের উপর প্রভুত্ব ও প্রভাব বিস্তার চেষ্টার যেমন কোন সীমা নাই তেমনি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরোপকার ও অপরের সুবিধা ও সুখের জন্য নিজ স্বার্থ বিসর্জন করারও কোন শেষ দেখা যায় না। কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমরা বলিতে বাধ্য হই যে ব্যক্তিকে যদি যথা ইচ্ছা কার্য্য করিবার স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির স্বার্থপরতাই প্রকট হইয়া দেখা দেয় ও সে অপরের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা অগ্রাহ্য করিয়া পরস্ব গ্রাস ও পরকে দাসত্বে বাঁধিয়া শুধু নিজের আনন্দ ও ভোগের ব্যবস্থাই করিয়া লইবার চেষ্টা করে। পরহিতব্রত যাঁহারা অন্তরে অন্তরে মানিয়া লয়েন তাঁহারা সংখ্যায় অতি অল্প এবং তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া লক্ষ লক্ষ স্বার্থানুসন্ধানী শোষক শ্রেণীর মানুষকে জন সমাজে যথেচ্ছাচার করিবার অধিকার দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া কদাপি জন কল্যাণকর হইতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তির অপরের উপর প্রভুত্ব ও অপরকে দাসভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য করিয়া নিজের লাভের ব্যবস্থা করার চেষ্টা দমন ও নিয়মাবদ্ধ করা সমাজ মঙ্গলের জন্য একান্ত ভাবেই আবশ্যক। এবং জগতের বহু দেশেই বর্ত্তমানকালে যে সকল ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে মহা প্রতিভাবান ও শক্তিশালী তাঁহারা নিজেদের সুবিধা সাধন করিতে হইলে যেরূপ পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হ'ন, সেই ভাবে চলিয়া তাঁহারা বহুলোকের অশেষ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করিয়া তবেই ব্যক্তিগত ভাবে নিজেরা লাভবান হইতে পারেন। ব্যক্তিগত যথেচ্ছাচারের অধিকার আজকাল কোন দেশেই নাই। একশত বৎসর পূর্ব্বে যেভাবে মানুষ মানুষকে শোষণ করিয়া নিজ সুবিধা করিয়া লইতে পারিত, এখন তাহা আর কেহ কোথাওই করিতে পারে না। আইন করিয়া এখন মানুষকে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পরশ্রমলব্ধ ঐশ্বর্য্য আহরণ করিতে হইলে অন্ততঃ সেই ঐশ্বর্য্যের একটা বৃহৎ অংশ কর্মীকে দেওয়া প্রয়োজন হয়। তাহা

ব্যতীত কর্মীর কার্য্য করিবার সময়, পারিপার্শ্বিক ও তাহার বাস, চিকিৎসা, আমোদ প্রমোদ, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ের কথাও রাষ্ট্রনীতি অনুগত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে কর্মীর নিয়োগ কর্ত্তাদিগকে বাধ্য করা হইয়া থাকে। মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করিয়া ও মানুষের স্নায্য দাবী তাহাকে দিয়া তবেই মানুষকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া নিয়োগকর্ত্তাগণ নিজ লাভের ব্যবস্থা করিতে আইনতঃ সক্ষম হ'ন।

অবশ্য মানুষ চিরকালই নিজ দাবী যাহা পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা অধিক করিয়াই স্থির করিতে অভ্যস্ত। সুতরাং পাওয়া এবং চাওয়া কখন এক হইতে পারে না। এই কারণে অনেকের ধারণা এই যে কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণই মানুষকে তাহার পূর্ণ প্রাপ্য পাইতে সক্ষম করে না এবং সেই জন্য কোন মানুষকেই অপরের দ্বারা কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে। যে সকল রাষ্ট্র পূর্ণ সমাজবাদে বিশ্বাসী সে সকল রাষ্ট্রে সকল কার্য্যই সমাজের দ্বারা চালিত হয়; ব্যক্তিগত শ্রমিক নিয়োগ অধিকার কাহারও থাকেনা। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় যে ঐ সকল সমাজবাদী রাষ্ট্রের শ্রমিকদিগের উপার্জ্জন যে দেশে ব্যক্তিগত ব্যবসার অধিকার আছে সে সকলদেশের তুলনায় বহুল অংশে অল্পই হইয়া থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, সুইৎজারল্যাণ্ড, বৃটেন, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশের তুলনায় রুশিয়া কিম্বা চীন দেশের কর্মীদিগের উপার্জ্জন অনেক কম। অপরাপর ভোগের ব্যবস্থাও তেমন নাই। এই কারণে মনে হয় ব্যক্তির ব্যবসার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমাজের যে লাভ হয়; সে স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে রহিত করিয়া দিলে লাভ ততটা হয় না।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা লাভ

গত ৯ই অক্টোবর ফিজি দ্বীপপুঞ্জকে বৃটেনের তরফ হইতে রাজকুমার চার্লস স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। ফিজি ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে বৃটেনের অধিকারে আসে এবং প্রায় একশত বৎসর বৃটিষ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়া এখন স্বাধীন হইল। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপ সংখ্যা ৮৪৪টি। ইহার মধ্যে মাত্র ১০৬টিতে মানুষের নিবাস আছে। সকল দ্বীপের মোট আয়তন ৭০৫৫ বর্গ মাইল। ইহার মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ দ্বীপ ভিতিলেভু ৪০১০ বর্গ মাইল এবং দ্বিতীয় ভানুয়া লেভুর আয়তন ২১৩৭ বর্গ মাইল। ফিজির মোট জন সংখ্যা ৪৭৬৭২৭। ইহার মধ্যে ২০২১৭৬ জন হইলেন ফিজিয়ান, ২৪০১৬০ জন ভারতীয় এবং বাকি লোকেরা ইয়োরোপীয়, মিশ্রজাতি, চীনা ও অন্যান্য দেশীয়। অর্থাৎ ভারতীয়েরা সংখ্যায় সর্ব্বাধিক। ফিজির অর্থ নৈতিক উন্নতির মূলেও আছে ভারতীয়দিগের পরিশ্রম। কারণ ফিজিতে বহুকালাবধি ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক লইয়া গিয়া তত্রস্থ কারখানা প্রভৃতি চালান হইত। এখন অবশ্য ফিজিয়ানদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই প্রকটভাবে দেখা দিবে এবং বৃটেন প্রাণপণ চেষ্টা করিবে যাহাতে ভারতীয়দিগের কোন প্রাধান্য ঐ নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রে গড়িয়া না উঠে। অমরা শ্রীমতী ইন্দিরার রাজত্বে ফিজিবাসী ভারতীয় দিগের প্রতিষ্ঠা কিভাবে কতদূর রক্ষিত হয় তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

ক্ষেমর রিপাবলিক

প্রিন্স নরোত্তম সিহানুকের দেশত্যাগ করিয়া পলায়নের পরে বিগত ৯ই অক্টোবর বেলা ৪টার সময় ফ্নমপেন জাতীয় বিধান সভায় কাম্বোডীয় রাষ্ট্রকে ক্ষেমর রিপাবলিক নাম দিয়া নব রাষ্ট্রগঠন ঘোষণা করা হইয়াছে। ক্ষেমর জাতীয় লোকেরাই কাম্বোডিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বাসীন্দা এবং ক্ষেমর ভাষাই কাম্বোডিয়ার ভাষা। এই জাতির উপর ভারতের প্রভাব বহুশত বৎসর হইতেই প্রবলভাবে বিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে। আংকোরের বিরাট মন্দিরগুলি হিন্দু মন্দির এবং সেগুলি স্থাপত্যের-ভাস্কর্য্যের ইতিহাসের বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য শিল্প নিদর্শন। প্রিন্স সিহানুক ছিলেন চীন বন্ধু। বর্ত্তমান রাষ্ট্র কোন দিকে যাইবে এবং কাহার সাহায্য গ্রহণ করিবে অথবা কাহাকে সাহায্য দান করিবে তাহা ক্রমশঃ বুঝা যাইবে। কাম্বোডিয়াতে বহু কারবার কারখানা আছে এবং

সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ক্রমকেন হইতে অল্প দূরেই পোচেনতঙ্গ বিমান বন্দর। এই বন্দরে বৎসরে প্রায় ৫০০০ বৃহৎ যাত্রীবাহী বিমান যাতায়াত করে। আন্তর্জাতিক বিমান পরিচালনা ক্ষেত্রে পোচেনতঙ্গ একটি মহা সঙ্গম কেন্দ্র। এই সকল দিক হইতে দেখিলে মনে হয় যে কাম্বোডিয়ার ক্ষেমর রিপাবলিকের সহিত বিশ্বের সকল রাষ্ট্রেরই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ শীঘ্র ও সহজেই গঠিত হইয়া উঠিবে। যদিও নুতন রাষ্ট্র গঠন করিবার সময়ে কাম্বোডিয়ার জন সাধারণ একথা অতি পরিষ্কার ভাবেই ব্যক্ত করিয়াছে যে তাহারা রাজতন্ত্র কোনও ভাবেই চাহে না।

নকশালদিগের পূজা বিরুদ্ধতা

তথাকথিত নকশালপন্থী বিপ্লবীদিগের এবার পূজার পূর্ব্বে একটা নুতন প্রচার চেষ্টা হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল লোকে যাহাতে পূজা না করে সেইরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করা। কম্যুনিষ্টগণ ঈশ্বরে বা কোন দেব-দেবী ও অলৌকিক সত্বার প্রতীকে বিশ্বাস করে না। ধর্ম্ম, তাহাদের মতে, একটা লোক ঠকাইবার উপায় মাত্র। ধর্ম্ম বিশ্বাস শোষিত জনগণকে অহিফেনা-শক্ত নেশাখোরদিগের মতই অন্ধ বিশ্বাস বিভোর করিয়া রাখিয়া নিজেদের ন্যায্য অধিকার দাবী না করিয়া শোষকদিগের শোষনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। কম্যুনিষ্টগণ আজকাল যে সর্ব্বত্র সত্য সত্যই আফিম ও গাঁজার নেশার প্রবর্ত্তন হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রচার করিতেছে না। হিপিদিগের গঞ্জিকা সেবন অথবা অপরাপর ভক্তদিগের হরিকীর্ত্তন ও মহা মহা সাধুদিগের অনুসরণ বন্ধ করার চেষ্টা কম্যুনিষ্টগণ করিতেছে না। অন্য দেশের কোন নেতাকে অন্ধভাবে পূজা করা অথবা অন্য দেশের নেতাই আমাদের প্রভু ইত্যাদি দুবিচার বর্জ্জিত কথা পরম সত্য বলিয়া প্রচার করাও কি এক প্রকার মানসিক বিকার নহে? সে যাহাই হউক, নকশালপন্থীদিগের প্রচারের ফলে পূজা বন্ধ হয় নাই। প্রায় এক হাজার মণ্ডপে সকল আয়োজন পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়া নানান স্থলে পূজা হইয়াছিল এবং আলোক বাজ পটকা ও হট্টগোলের কোন অভাব লক্ষিত হয় নাই। ইহাতে প্রমান হয় যে দুই প্রকার নেশার সংঘাতে পুরাতন নেশাই জয়যুক্ত থাকিয়া গিয়াছে।

এডওয়ার্ড হীথের শক্তিশালী বৃটেন গঠন সঙ্কল্প

বৃটেনের নুতন প্রধান মন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ৫০০০ হাজার রক্ষণশীল ভক্ত পরিবৃত হইয়া একটা সভায় সেদিন জোরগলায় ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি বৃটেনকে শীঘ্রই তাহার হারান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ফিরাইয়া আনিয়া দিবেন। জগৎ জাতি সভায় বৃটেন আবার পূর্ব্বের ন্যায় সকলের সুমন্ত্রণাদায়ক বিশ্বস্ত বন্ধুর পদে অধিষ্ঠিত হইবে। হীথের এই সঙ্কল্পের সহায়তা করিতে বহু বৃটিশ নরনারীই যে অগ্রসর হইবেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ বৃটেন এখন যে কার্য্য গোপনে আমেরিকার সাহায্যে ও আশ্রয়ে করিয়া চলিয়াছে তাহা প্রকাশ্যে নিজ ক্ষমতায় করিতে পারিলে বৃটেনের দুইটি সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ জগত সভায় আমেরিকার ভৃত্যের স্থান হইতে উঠিয়া উপদেশক ও সহকর্ম্মীর আসনে বসা সম্ভব হইবে। দ্বিতীয়তঃ আজকাল বহুক্ষেত্রে আমেরিকার বিরুদ্ধাচরণ করিলে বৃটেনের সুবিধা ও নিজ কার্য্যসিদ্ধি সহজ হয়। সুতরাং কূটনীতি বলে' বৃটেনের আর অত অধিকভাবে আমেরিকার আনুগত্য স্বীকার করিয়া না চলাই বিধেয়। অপর দিকে আর একটা কথাও ক্রমশঃ প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে তাহা হইল আমেরিকার ইয়রোপে লোক প্রসিদ্ধির অভাব। আজকাল বহু ইয়োরোপীয় দেশেই আমেরিকার প্রতিপত্তির বিশেষ হানী হইয়াছে। সুতরাং আমেরিকার সংসর্গ অন্ততঃ লোক দেখাইয়া ত্যাগ না করিলে বৃটেনেরও খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার অভাব হইবে বলিয়া মনে হয়। সেই জন্য আরই বৃটেনের নিজ স্বাধীন প্রতিষ্ঠা গঠন চেষ্টা করা আবশ্যক। আমেরিকাও এই নতুন পরিকল্পনার সহায়তা করিবে; কেননা যে কার্য্য তাহার পক্ষে নিজে করা সম্ভব হইবে

না, তাহা যদি বৃটেনের দ্বারা করান যায় তাহাতে আমেরিকার সুবিধাই হইবে বলিয়া মনে হয়। চীনের সন্ধান ঐ কারণে আমেরিকার সমর্থিত চেষ্টা বলিয়াই আমাদের মনে হয়। আরও মনে হয় যে বৃটেনের এই কূটনৈতিক নবজাগরনের ফলে জগতের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হইবে না। কারণ আমেরিকা দুর্দ্ধর্ষ হইলেও ষড়যন্ত্র, প্ররোচনা ও প্রতারণায় কখনও বৃটেনের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। এই জন্য আমরা চীনের নূতন সন্ধানের কথা শুনিয়া সন্ত্রস্ত হইতেছি।

জর্ডনের যুদ্ধে পাকিস্থানী সৈন্য

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে জর্ডনের রাজা হোসেন ও প্যালেষ্টাইনের কমাণ্ডোদিগের মধ্যে যে সংঘর্ষণ হয় তাহাতে তেরজন পাকিস্থানী সৈন্যের মৃত্যু হইয়াছে এবং সতের জন পাকিস্থানী সৈন্য আহত হইয়াছে। ঐ পাকিস্থানীগন যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল কি না, অথবা যুদ্ধে যোগ না দিয়াই হতাহত হইয়াছে তাহা সংবাদ-পত্রের সংবাদ হইতে বুঝা যায় নাই। যদি যুদ্ধে যোগ দিয়াই থাকে তাহা হইলে তাহারা রাজা হোসেনের পক্ষে ছিল কিম্বা কমাণ্ডোদিগের সহিত মিলিত ছিল সে কথাও পরিষ্কারভাবে জানা যায় নাই। তবে পাকিস্থানের স্বভাব সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহাতে মনে হয় যে বৃটিষের খয়ের খাঁ হোসেনের সহিতই পাকিস্থান সহযোগীতা করিবে। তাহাই যদি করিয়া থাকে তাহা হইলে স্বাধীনতাকাম্খী আরবদিগের বিরুদ্ধে পাকিস্থানী সৈন্যগণ যুদ্ধ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহা পাকিস্থানের ইসলাম রক্ষা ব্রতের সপক্ষে না বিপক্ষে যায় সে কথার বিচার আমরা করিতে পারি না। তবে রাজা হোসেন আরব স্বাধীণতা, আরবদিগের বিপ্লববাদ অথবা আধুনিক প্রগতিশীলতা; কোনও কিছুরই সমর্থক নহেন এবং তাঁহার সহায়তা করা সাধু বৃটিশের মতলববাজীর সহায়তা করা ইহাই বুঝিতে হইবে। কমাণ্ডোগণ ইসরায়েলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং রাজা হোসেনেরও তাহারা বিরুদ্ধে। কিন্তু তাহারা আরব জাতীয়তার বিরুদ্ধে নহে। পরলোকগত আরবনেতা গামাল আবেদল নাসের রাজা হোসেন ও প্যালেষ্টাইনের কমাণ্ডোদিগের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহাতে মনে হয় যে রাষ্ট্রপতি নাসের নিজ জীবদ্দশায় উপরোক্ত কমাণ্ডোদিগকে আরবদিগের শত্রু বলিয়া মনে করিতেন না। সুতরাং যদি পাকিস্থানীগণ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে তাহা আরবজাতীয়তার বিরুদ্ধাচরণ হইয়াছে মনে করাই স্বাভাবিক। অবশ্য পাকিস্থানীগণের জর্ডানে সৈন্য পাঠান অত্যন্তই গর্হিত কার্য্য হইয়াছিল। উভয় পক্ষই যেখানে মুসলমান সেখানে এক পক্ষের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণা কোন উচিত বিবেচিত হইতে পারে না।

গায়ের জোর—মনের জোর

বর্ত্তমানকাল হইল আদর্শের যুগ। অন্তত যাহারা বর্ত্তমানকে অতীতের তুলনায় সভ্যতায় মানবতায় অতি উচ্চস্থানে বসাইতে চাহেন তাঁহারা বলেন যে অতীতের মানুষ ছিল গতানুগতিক, কর্ত্তার ভূতের ভয়াবিষ্ট, আর এখনকার নবীনরা হইয়াছেন উন্নতিশীল, প্রগতির আহ্বানে দ্রুত ধাবমান এবং অতীতের সকল দোষ ক্লেদমুক্ত। অতি উত্তম কথা। যাহারা পূর্ব্ব স্থানীয় তাহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে কাহারও কোন লজ্জা বা দুঃখ হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা নূতন সভ্যতা ও মানবতা গড়িয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে সভ্যতা ও মানবতা বিশেষ করিয়াই মানসিক ব্যাপার। শারীরিক যাহা তাহা মানুষের জান্তব বংশ পরিচয়ের কথাই বড় করিয়া দেখায়। মানব সভ্যতা কৃষ্টি, আদর্শবাদ, আধ্যাত্মিক প্রেরণা, সুন্দরের আকর্ষণ ইত্যাদি বিশেষ কোনও শরীরগত নির্ভরশীলতা ব্যক্ত করে না। কিন্তু আমরা দেখি যে মনের দাবী বর্ত্তমানকালে ক্রমাগতই গায়ের জোর দেখাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। অতীতে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কদাপি

শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া অপরকে নিজমতে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করেন নাই। কালিদাস নিজের "স্টাইল" এর শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার জন্য কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূচনা করেন নাই। খেয়ালী গায়কদিগকে ধ্রুপদের অসারতা প্রমাণ করিবার জন্ত কোনও উৎকট আন্দোলন করিতে দেখা যায় নাই। এমনকি রবীন্দ্রনাথের যাঁহারা সমালোচক ছিলেন তাঁহারাও মানসিক অস্ত্র বর্জ্জন করিয়া ইটক অথবা সোডার বোতলের আশ্রয়ে কখন নিজেদের সাহিত্যিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। অবশ্য বর্ত্তমানের কবি ও গায়কদিগের সাক্ষাৎভাবে পাশবিক শক্তি ব্যবহার করিতে কেহ দেখে নাই, তবে তাঁহাদের রাষ্ট্রক্ষেত্রের বান্ধব যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে গায়ের জোরের প্রচলন অধিক মাত্রাতেই লক্ষিত হয়। ছোরা-ছুরি বোমা বন্দুক ব্যবহার অভ্যাস হইয়া যাইলে তাহা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতে পারে। অতীতে কংগ্রেসের "মডারেট" ও "একস্ট্রীমিষ্ট" দলের মধ্যে বোমাবাজী চলিতে কখনও দেখা যায় নাই। বোমা বিদেশী শত্রুদের জন্যই রাখা হইত। এখন বাহিরের শত্রু কেহ থাকিলেও তাহাদের উপর কোন আক্রমণ করা হয় না বরঞ্চ দেখা যায় যে এক শত্রুর সাম্প্রদায়িক অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ পঞ্চম বাহিনীরূপে ভারতে অবস্থিত রহিয়াছে, এবং অপর শত্রুর পঞ্চম বাহিনীও কলিকাতার গৃহ সকলের প্রাকার ও বাঙ্গালী জাতির মুখ মসীলিপ্ত করিয়া নিজেদের শক্তির অভিব্যক্তি করিতেছে। ঐখানেই বিষয়টার শেষ হইলে এক প্রকার মন্দ হইত না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে মতবাদের দ্বন্দ্বটা ক্রমশঃ গায়ের জোরের ব্যবহারে চালিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মানসিকভাবে কেহ নিজের মতের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ চেষ্টা না করিয়া বোমা ও বন্দুক ব্যবহারে অপরদলের ব্যক্তিদিগকে আদর্শের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলাইতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ফলে পথে ঘাটে যুদ্ধ হইতেছে ও নির্লিপ্ত জনগণ অনেক সময় হতাহত হইতেছেন।

গায়ের জোর যে মীমাংসাক্ষেত্রে একান্তভাবে অব্যবহার্য্য এমন কথা আমরা বলিতেছি না। তবে গায়ের জোরের অবতারণা করিলে প্রথমে দেখিতে হয় গায়ের জোর আছে কি না। দুই দশটি বোমা অথবা পাইপ বন্দুক থাকিলে তাহাকে সামরিক শক্তি বলা চলে না? সুতরাং যে স্থলে শক্তি প্রয়োগ করিলে শেষ অবধি যুদ্ধই লাগিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে বাহির হইতে সৈন্য আসিবে আশা করিয়া অযথা মার খাইয়া মরা সুবুদ্ধির কথা নহে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জার্ম্মানী কয়েক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র এদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল জানিয়াই তৎকালীন সশস্ত্র বিদ্রোহ চেষ্টা করা হইয়াছিল। নেতাজী সুভাস চন্দ্রও জাপানের নিকট পূর্ণ সামরিক সাহায্য পাইয়া তবেই ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এবং ইঁহাদিগের ভারতীয় কোন বিরুদ্ধ দল ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে যাঁহারা বিদেশী সৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে রাজা করিয়া দিবে ভাবিতেছেন তাঁহাদের অসংখ্য বিরুদ্ধবাদী ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যেই রহিয়াছে। এবং তাঁহারা নিজেরাই দেওয়ালে লিখিতেছেন যে অপর দেশের রাষ্ট্রপতি তাঁহাদের রাষ্ট্রপতি। অর্থাৎ তাঁহারা বিদেশীর প্রভুত্ব এদেশে কায়েম করিতে চাহেন। এই আদর্শ কখনও ভারতে সর্ব্বজন গ্রাহ্য হইতে পারে না। হইবেও না। সুতরাং তাঁহাদের বোঝা উচিত যে তাঁহাদের ঐ প্রচেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব নহে এবং ঐ চেষ্টা শুধু নিজেদের মধ্যেই বিরোধ প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া তুলিবে। আর একটা কথা এই যে মতবাদের ঝগড়া শুধু গায়ের জোর দিয়াই নিষ্পত্তি হইতে পারে না। মতবাদ কি তাহার আলোচনা ও বিচার খোলাখুলি ভাবে হওয়া প্রয়োজন। যদি অধিকাংশ ভারতবাসী অপর দেশের রাষ্ট্রপতি অথবা রাষ্ট্রনেতাকে নিজেদের রাষ্ট্রপতি বলিয়া মানিয়া লইতে না চাহে তাহা হইলে তাহাদিগকে বোমা মারিয়া মানাইয়া লওয়া সম্ভব অথবা উচিত হইতে পারে না।

আমেরিকা ও রুশিয়ার পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ

কিছুকাল হইতেই আমেরিকা ও রুশিয়া পাকিস্থানকে নূতন করিয়া অস্ত্র সরবরাহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শুধু কোন কোন অস্ত্র কি পরিমাণে কখন পাকিস্থানকে দেওয়া হইবে তাহাই পুরাপুরি ঠিক করা হয় নাই। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে আমেরিকা একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক অস্ত্র পাকিস্থানকে বিক্রয় করিবে বলিয়া জানাইয়াছে। এই সম্বন্ধে ভারত সরকার আমেরিকাকে তাঁহাদের বিশেষ আশঙ্কা ও আপত্তি জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে এখন পর্য্যন্ত তিনবার পাকিস্থান আমেরিকার নিকট প্রাপ্ত অস্ত্র ব্যবহারে ভারত আক্রমণ করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে আবার অস্ত্র সরবরাহ করা হইলে ভারত সরকার মনে করেন যে পাকিস্থান পুনর্ব্বার ভারত আক্রমণ করিবে।

রুশিয়া সম্ভবতঃ কোন তালিকা প্রস্তুত করিয়া পাকিস্থানকে অস্ত্র বিক্রয় করিবে বলিয়া কাহাকেও জানায় নাই। কিন্তু পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ করিবে একথা বারম্বার বলিয়াছে। অর্থাৎ রুশিয়া সম্ভবতঃ অস্ত্র দান কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে ও পাকিস্থান রুশিয়ার দেওয়া অস্ত্র অনেকাংশে হাতে পাইয়াছে। রুশিয়ার দেওয়া অস্ত্র ব্যবহার করিয়া পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করিতে পারে না এমন কোন কথা নাই। আক্রমণ করা না করা পাকিস্থানের ইচ্ছা ও নিজ ক্ষমতায় বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে; কোন অস্ত্র পাওয়া না পাওয়া ততটা বড় কথা নাও হইতে পারে। কারণ পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করা কোনও বিপদজনক কার্য্য বলিয়া মনে করে না। কারণ এই যে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেও পাকিস্থান জানে যে রুশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি সামরিকভাবে প্রবল জাতিগুলি পাকিস্থানকে বাঁচাইয়া দিবে। ভারত যদি কাহারও কথা না শুনিয়া পাকিস্থান দখল করিয়া ভারতের অন্তর্গত করিয়া লইবে এইরূপ ভয় দেখাইতে সমর্থ থাকিত তাহা হইলে পাকিস্থান অন্য সুরে গান গাহিত। কিন্তু ভারত যদি রুশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের অনুগত ভৃত্যের ন্যায় চলে এবং ঐ সকল দেশের আজ্ঞাবহ হইয়া তাহাদের ইচ্ছায় উঠে বসে তাহা হইলে পাকিস্থান সদা সর্ব্বদাই ভারতকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। আমেরিকা সকলকে জানাইয়া পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ করে, বৃটেন ও ফ্রান্স কি করে তাহা কেহ জানিতে পারে না, রুশিয়া গোপনে যুদ্ধের মাল মসলা পাকিস্থানে পাঠায় এবং পাকিস্থানও নানা স্থান হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া থাকে। সুতরাং অস্ত্রের অভাব কখনও পাকিস্থানের হইতে পারে না। যুদ্ধের ইচ্ছা, শক্তির ও সাহসের অভাবই যুদ্ধ নিবারণ করে। এই ইচ্ছা ও সাহস জাগ্রত হয় অবস্থা বিশেষে। যখন পাকিস্থান দেখে যে ভারত আক্রমণ করিলে দেশের জনসাধারণ শাসক গোষ্ঠীর সমর্থনে উৎসাহ দেখাইবে এবং ঐ জাতীয় অবস্থার সৃষ্টি না করিলে শাসন ভার ত্যাগ করিয়া তাহাদের নিজেদেরই বিদায় লইতে হইবে, তখন ভারত আক্রমণ করা আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হইয়া দাঁড়ায়।

এখন দেখিতে হইবে যে পাকিস্থানের নেতাদিগের সাধারণের নিকট প্রতিপত্তি কতদূর কম জোর হইয়া পড়িয়াছে। যদি এমন অবস্থা হইয়া থাকে যে ভারতের সহিত যুদ্ধ না করিলে পাট তুলিতে হইবে তাহা হইলে ভারত আক্রমণ অনিবার্য্য। তবে ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ মনে হয় যে আমেরিকা ও রুশিয়াই উৎসাহ দিয়া পাকিস্থানকে যুদ্ধের পথে আগাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার কারণ কি তাহা অনুমানের উপরই এখন বলা সম্ভব। জগতের কোথাও না কোথাও যুদ্ধ ঘটিতে না থাকিলে জগতের অনেক জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা বিকল হইয়া পড়ে। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম এশিয়াতে যুদ্ধ পুরাদমে চলিলে আমেরিকা ও রুশিয়া তাহাতে জড়াইয়া পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ভারত ও পাকিস্থান যদি লড়াই করে তাহা হইলে মহা মহা সামরিক শক্তির কেন্দ্র দেশগুলি সাক্ষাৎ

ভাবে তাহাতে অংশ গ্রহণ করিবে না নিঃসন্দেহ। যুদ্ধ শেষ হইলে পর তাহাদের খেলা আরম্ভ হইবে। পাকিস্থান লড়াই করিলে তাহার লাভ লোকসান যাহাই হউক মুরুব্বিগণ খরচও দিবে এবং মার খাইলে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইয়াও রাখিবে। এইরূপ যুদ্ধে পরাজয় হইলেও পাকিস্থানী নেতাদিগের পক্ষে তাহা লাভজনক হইতে পারে। মুরুব্বিদিগের হুকুম তামিল করার পুরস্কার সর্ব্বদাই লোভনীয় হয়। কিন্তু ভারত সরকারের রুশিয়া ভক্তি এই সকল অনুমানের মধ্যে ঠিক ছন্দরক্ষা করিয়া চালিত থাকিতে পারে না। জানিয়া শুনিয়া ভারত সরকার রুশিয়ার খেলার পুতুল হইবে ইহাও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু রুশিয়ার চালচলন ব্যবহার ঠিক ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলে না। তাহা দেখিয়াও শ্রীমতী ইন্দিরার সভাসদগণ রুশ গুণ মুগ্ধ কেন? ভারতের সোসিয়ালিষ্ট প্যাটার্ণ ভারতের নিজস্ব। তাহা সোসিয়ালিজম কিনা সে কথাও বিবেচ্য, কিন্তু কংগ্রেস (আর) গোষ্ঠী ঐ প্যাটার্ণকেই সম্মুখে রাখিয়া সি পি আই দলের সহিত মিতালি করিয়া চলে। সি পি আই থাকিলে সি পি এম বা চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদিগের সহিত লড়াই ঝগড়া কংগ্রেসকে নিজ হস্তে চালাইতে হয় না এবং চীনের সহিত যদি কোন সময় সদ্ভাব পুণঃস্থাপিত হয় তাহা হইলেও ঝগড়াটা চালিত থাকিয়া যাইবার পথে কোন বাধা পড়িবে না। সি পি আই এর সহিত মৈত্রী রক্ষার উহা একটা বড় কারণ। রুশিয়ার সহিত বন্ধুত্বের একটা বৃহৎ কারণ ঐ সি পি আই। এই জন্যই অস্ত্র সরবরাহ লইয়া আমেরিকার সহিত যেরূপ খোলাখুলি ভাবে আপত্তি জ্ঞাপন করা হইতেছে রুশিয়াকে সেরূপ কিছু বলা হইতেছে না। ইহা ব্যতীত এ কথাও সত্য যে আজকাল পাকিস্থান নিজ রাষ্ট্রীয় বার্ষিক বাজেটের শতকরা ৫৬ ভাগ সামরিক ব্যয় হিসাবে খরচ করিতেছে। পাকিস্থানের অধিক খরচও হইতেছে যুদ্ধ জাহাজ বিশেষতঃ ডুবুরি জাহাজ ক্রয় করিতে। ইহার কারণ পূর্ব্ব পাকিস্তান বর্ত্তমানে পশ্চিম পাকিস্থান হইতে পৃথক হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; এবং পশ্চিম পাকিস্থান তাহার অনুমোদন করে না। পৃথক হইবার চেষ্টা হইলে দুই পাকিস্থানে লড়াই হইবে এবং সেইজন্য জাহাজের প্রয়োজন। কারণ স্থল পথে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পাকিস্থানে গমন সম্ভব নহে। আকাশ পথে যাইতে হইলে তাহা কষ্টকর এবং সামরিক বিমান অনেক সংখ্যায় থাকা প্রয়োজন। পাকিস্থান এই কারণে বিমান ক্রয়ও নানা দেশ হইতে করিতেছে। আমেরিকা, ফ্রান্স, রুশিয়া, চীন, ইংলণ্ড কোন দেশই বাদ পড়ে নাই। ইহার উদ্দেশ্য ভারত আক্রমণ অথবা পূর্ব্ব পাকিস্থানকে সবল হস্তে ধরিয়া রাখা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। দুই উদ্দেশ্যই বর্ত্তমান আছে বলা যায়। এবং ভারত আক্রমণ না করিবার একটা জোরালো কারণও ঐ পূর্ব্ব পাকিস্থানেই পাওয়া যায়। ভারত যদি পূর্ব্ব পাকিস্থানকে সাহায্য করে তাহা হইলে পাকিস্থান দুই ভাগ হইয়া যাওয়া কেহই রোধ করিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং পাকিস্থান সহজে ভারতের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চাহিবে না।

অরুন্ধতী দেবীর পরলোক গমন

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর বৈকাল চারটার সময় অরুন্ধতী দেবী হায়দ্রাবাদ সহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি প্রবাসীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী ছিলেন। ডাঃ স্যার নীলরতন সরকারের দ্বিতীয়া কন্যা অরুন্ধতীর মৃত্যুকালে ৭৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীত বাদ্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া ছিলেন। রাগ সঙ্গীতে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর মিশ্র, সেতারে কৌকুবখান রবীন্দ্র সঙ্গীতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং পাশ্চাত্য বাদ্য সঙ্গীতে (বেহালা) ডাঃ স্যাম্রে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। তিনি ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক, ক্যালকাটা সিম্ফনি অরকেষ্ট্রাতে পাশ্চাত্যের উচ্চাঙ্গ রীতিতে বেহালা বাজাইতেন এবং বহু আসরে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ছিল। দিল্লী, বোম্বাই,

জব্বলপুর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি ভারতের বহু সহরে তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল ও তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে বহু লোকে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার চার কন্যা, পাঁচ দৌহিত্র ও এক দৌহিত্রী প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তিন কন্যা ও চার দৌহিত্র তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট নাস্তের

১৯১৬ খৃঃ অব্দে ডাক বিভাগের এক কেরাণীর গৃহে গামেল আবদেল নাস্তেরের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই নাস্তের দুঃসাহসী ও শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই মিশরের সামরিক শিক্ষা কেন্দ্রে যোগ দান করেন ও সেইখান হইতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া মিশরের সৈন্য বাহিনীতে সেনা নায়ক হিসাবে কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি ১৯৪৮।৪৯ খৃঃ অব্দে প্যালেস্টাইনের যুদ্ধে যোগদান করেন ও সেই যুদ্ধেই আহত হন। ১৯৫৪ খৃঃ অব্দে তিনি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জেনারেল নেগুইব এর নেতৃত্বে যে রাষ্ট্রীয় জোর-দখল কার্য্য সাধিত হয় তাহাতে অংশ গ্রহণ করেন। জেনারেল নেগুইব অতঃপর মিশরকে একটি রিপাবলিক ঘোষণা করেন (১৯৫৩) এবং নিজে ঐ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির আসন গ্রহণ করেন। নাস্তের হ'ন ঐ রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী। নেগুইবকে ১৯৫৪ খৃঃ অব্দে নাস্তের রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসৃত করেন এবং নিজে ১৯৫৬ খৃঃ অব্দে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। ঐ বৎসর মিশর হইতে সকল বৃটিশ সৈন্য চলিয়া যায় ও ২৬ শে জুলাই ১৯৫৬ তে নাস্তের সুয়েজ খাল জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া রাষ্ট্র-পরিচালিত করিয়া লয়েন। অতঃপর ইসরায়েলের সহিত দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং সুয়েজ খাল রক্ষার নাম করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সমবেত ভাবে মিশরে সৈন্য প্রেরণা করেন। নাস্তের ক্ষিপ্রগতিতে সুয়েজ খালে ৫১টি জাহাজ ডুবাইয়া এবং দুইটি সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কার্য্য নিষ্ফল করিয়া দেন। ১৯৫৭ খৃঃ অব্দে সুয়েজ জাতীয় সম্পদ বলিয়া স্বীকৃত ভাবে আবার খোলা হয়। ১৯৫৭ খৃঃ অব্দে সিরিয়া ও মিশর একত্র হইয়া ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক (ইউ, এ, আর) গঠন করে ও নাস্তেরকে তাহার রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়। সিরিয়া ১৯৬১ খৃঃ অব্দে ঐ রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া নিজ রাষ্ট্র পুনরায় পৃথক করিয়া লয়। মিশর কিন্তু ইউ, এ, আর নাম ব্যবহার করিতে থাকে।

সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়া মিশরের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি ও জেনারেল নাস্তেরের রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষমতা বিশেষভাবে আক্রান্ত হয় তাহার মধ্যে ইসরায়েলের সহিত ছয় দিনের যুদ্ধ বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই যুদ্ধে মিশর ও তাহার সহযোগী রাষ্ট্রগুলিকে ইসরায়েল সাংঘাতিক ভাবে জখম করে ও আরবের বহু স্থান ইসরায়েলের করায়ত্ব হইয়া যায়। নাস্তের অতঃ-পর নিদারুণ পরিশ্রম ও কূটনৈতিক মারপ্যাচের মধ্যেই দিন কাটাইতেন। তিনি যেভাবে ইয়োরোপ ও আমেরিকার শক্তিমান জাতিগুলির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া ইসরায়েলের সর্ব্বগ্রাসী আক্রমণ হইতে নিজ দেশকে বাঁচাইয়া চলিতেছিলেন তাহাতে বিশ্ববাসী স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে নাস্তের বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিদ ও পরমদেশভক্ত মহা-শক্তিমান পুরুষ। তিনি ২৮ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে আরব জগতের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ চলিয়া গিয়া আরবদিগের যে মহা ক্ষতি হইল তাহার পুরণ সহজে হওয়া সম্ভব হইবে না। গামাল আবদেল নাস্তের বিংশ শতাব্দীর আরব নেতাদিগের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও একজন মহা কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিলেন না। ইহাতে আরবদিগের তথা এশিয়ার একটা মহাক্ষতি হইল।

স্বামীজীকে যেমনটি বুঝেছি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কলম্বো থেকে আলমোরা—সর্বত্র ঘুরে ঘুরে স্বামীজী অনেকগুলি বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতাগুলি আবার পাঠ করছি আর ওদের মধ্যে শুনতে পাচ্ছি একটি মূল সুরের অনুরণন। এই মূল সুরটি প্রেমের। স্বামীজী ভারতবর্ষের দীনদুঃখী উৎপীড়িত জনসাধারণকে কত গভীর ভালবেসে ছিলেন তা বুঝতে পারা যায় এই বক্তৃতাগুলি পাঠ করলে। প্রায় সব বক্তৃতারই ধুয়া একটাই: ঐ লক্ষ লক্ষ মানুষ ডুবছে। ডুবতে ডুবতে ওরা দুর্গতির এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে যার নীচে মানুষ আর নামতে পারে না। পৃথিবীতে আর কোন দেশে মানুষকে ঘুমাতে হয় গবাদি পশুর সঙ্গে? ত্যাগ করো সবকিছুই, নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত। নিমজ্জমান ঐ লাখো লাখো মানুষকে সাহায্য করো। এর মতো পুণ্য কাজ আর কিছু নেই।

যারা সকলের পিছে, সকলের নীচে, যারা লুণ্ঠিত হচ্ছে পথের ধুলায় তাদের উদ্ধার সাধনই যে যুগধর্ম, এই কথাটি স্বামীজী বক্তৃতার পর বক্তৃতায়, আমেরিকা থেকে লেখা চিঠির পর চিঠিতে ঘায়ে ঘায়ে বসিয়ে দিয়ে গেলেন নব্যভারতের চেতনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেও এই যুগধর্মের একটা সুন্দর ইঙ্গিত আগেই আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। বিবেকানন্দ তখন কৈশোর থেকে যৌবনের পথে। "বঙ্গদেশের কৃষক" সম্বন্ধে সর্ব্বহারা কিষাণের জন্য বঙ্কিমের অশ্রুজল আজও টলটল্ করছে। বিবেকানন্দের সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথের রুদ্রবীণায় যুগধর্মের একই তূর্য্যধ্বনি শুনে আমরা চমৎকৃত হই। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লেখা। "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।" এর মধ্যে যুগধর্মের আহ্বানই ধ্বনিত হচ্ছে, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। পদ্মাচরের নির্জনে চখা-চখীর কাকলিকল্লোল শুনে মধুর কে নিয়ে কবির জীবন কাটছিল আনন্দেই। হঠাৎ বৃহৎ জগৎ থেকে ভেসে এলো নিপীড়িত আর্ত্ত-মানবের ক্রন্দন সেই মধুর পরিবেশের মধ্যে। সেই ক্রন্দন শুনে দুলে উঠলো কবির প্রাণ, বাঁশিতে বেজে উঠলো!

কী সাজবে, কী শুনাবে। বলো মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডি পেরিয়ে একটা বৃহত্তর জীবনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার আহ্বান রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়। স্বামীজীও একই কথা বললেন। বললেন, expansion is life, contraction is death, নিজেকে নিয়ে কেবলই বিব্রত থাকা, স্বার্থের মধ্যে নিজেকে অনবরত সঙ্কুচিত করে রাখা। এই সঙ্কোচকেই স্বামীজী বলেন পরম মৃত্যু। জীবন হচ্ছে সম্প্রসারণ অর্থাৎ মহাবিশ্ব জীবনের মধ্যে সমস্ত সত্তার আনন্দিত বিস্তার। লাহোরে বেদান্তের উপরে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়চ' ক্ষুদ্র সত্তাকে বিসর্জ্জন দেবার আহ্বানই ধ্বনিত হয়েছে।

"Aye, you are always talking bold words, but here is practical Vedanta before you. Give up this little life of yours. What matters it if you die of starvation, you and I and thousands like us, so long as this nation lives ?

"অর্থাৎ" লম্বা চওড়া বুলি তোমরা সর্ব্বদাই আওড়ে চলেছো। কিন্তু বেদান্তের উপদেশ অনুযায়ী কাজ

করার সুযোগ তো তোমাদের সামনেই। তোমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনকে বিসর্জন করো। অনাহারে তুমি, আমি এবং আমাদের মতো মানুষ যদি হাজারে হাজারে মরে, ক্ষতি কি? জাতি তো বাঁচবে। স্বামীজী বৈরাগ্যের দুর্গম পথে চলবার জন্য আহ্বান করেছিলেন লাহোরের যুবসমাজকে। বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও দুঃখের পথে যাত্রা করবার তূর্য্যধ্বনি। জীবন সঁপে দিয়েই জীবনেশ্বরের পরিচয় দিতে হবে।" "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।' উপনিষদ ব্যক্তিগত কামনাগুলিকে বর্জন করার কথাই বলেছে। উপনিষদে সর্বজীবের মধ্যে নিজেকে দর্শন করাকেই পরমসত্য বলে বিঘোষিত হয়েছে। সকলের সঙ্গে ঐক্যের অনুভূতি যেখানে একটা গভীরতায় পৌঁচেছে সেখানে তো রসনা দিয়ে আমরা ভালবাসিনে। আত্মোৎসর্গের আনন্দের মধ্যে আমাদের প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশসাধনে ঔপনিষদিক প্রভাব অপরিমেয়। নব্যভারতবর্ষকে দুজনেই উপনিষদ শুনিয়েছেন নিজ নিজ ভঙ্গীতে যাতে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষই থাকে, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে আত্মঘাতী না হয়। কবি এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই প্রেরণার মূল উৎস যখন উপনিষদ তখন ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে সকলের মাঝে বিকীর্ণ করার বাণী দুজনেই প্রচার করবেন, এতো স্বাভাবিক। কবি তো ঠিক preacher নন। তাই প্রকাশভঙ্গী দুজনের এক নয়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি লেখেন। তার দু-বছর আগে বিবেকানন্দকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিব্রাজকের ভূমিকায়। পদব্রজে স্বামীজী চলেছেন কন্যাকুমারীর দিকে। চাষীর খাটিয়ায় বসে তার হুঁকোতে তামাক খাচ্ছেন। খামারে বসে কাশ্মীরের চাষীঘরের মেয়েদের মুখে তাদের দৈনন্দিন দুঃখ সুখের কথা শুনছেন। এরই মাঝে মাঝে পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা চলেছে। কচিৎ কখনো রাজা-মহারাজাদের প্রাসাদে অতিথি হয়ে আরামের মধ্যে দিন যাপন করছেন। পরিব্রাজকের জীবনে স্বামীজী বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। সেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোয় তিনি জন্মভূমিকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন। উন্মীলিত জ্ঞান-চক্ষু দিয়ে স্বামীজী দেখলেন, আমাদের সমস্ত তেজ-বীর্য্য, আমাদের সমস্ত শক্তি, আমাদের জাতির গোটা জীবন রয়েছে আমাদের ধর্মের মধ্যে। জাতির ধর্মমূলে ধর্মের আসন চিরকালের জন্য। জাতির প্রাণকেন্দ্রকে অধিকার করে আছে ধর্ম এবং ভবিষ্যতেও ধর্মই জাতির প্রাণকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত থাকবে, এ বিষয়ে স্বামীজী নিঃসংশয় ছিলেন। কিন্তু ধর্ম তো ভারতবর্ষে স্থাণু হয়ে আছে। কি করে তার মধ্যে গতিবেগ সঞ্চার করে ধর্মকে 'dynamica' করা যায়, তাকে প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিদিনের জীবনের অঙ্গীভূত করা যায়, সেই সমস্যাই স্বামীজীর কাছে গুরুতর হয়ে দেখা দিয়েছিল। স্বামীজী বলেছিলেন, I want it to be brought into the life of everybody।

সারাদেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং নিবিড় পরিচয়ের ফলে স্বামীজী জন্মভূমির আর একটা চেহারাও খুব স্পষ্ট করে দেখতে পেলেন। দেশের কোটী কোটী মানুষ অনশনের কী দুঃসহ যাতনার মধ্যে জীবন যাপন করে। কী অপসীম তাদের অজ্ঞতা। কী অপরিমেয় তাদের জড়তা। স্বামীজী যেন একটা মহাশ্মশানের মধ্য দিয়ে চলেছেন। তাঁর স্বদেশবাসীরা প্রাণ-চঞ্চল মানুষ, না চলমান কঙ্কাল? কন্যাকুমারীতে স্বামীজী পৌঁছালেন যখন তাঁর সমস্ত চেতনার অনুপরমাণুতে অনুস্যূত হয়ে আছে একটিমাত্র ভাবনা। ভারতের কোটী কোটী নিরন্ন মানুষের ভাবনা। স্বামীজী পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, এখন থেকে তাঁর জীবন ব্রত কি হবে তা ঠাকুরের ইচ্ছায় পূর্ব থেকেই নির্দ্ধারিত হয়ে আছে। তাঁর জীবন ব্রত হবে ভারতের দীন-দুঃখী উৎপীড়িত যারা তাদের সেবা করা শিব জ্ঞানে। তাদের আর্তিনাশের জন্য আ-মৃত্যু তিনি কাজ করে যাবেন।

কন্যাকুমারীতে স্বামীজী ভারতের নিরন্ন মূর্খ জন-সাধারণের সেবায় নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দিলেন। তাঁর পালানোর কোন পথ ঠাকুর খোলা রাখেননি।

বিবেকানন্দ যেন বেদান্তের অদ্বৈত ভাবের মূর্ত্ত-বিগ্রহ। 'বহু জনহিতায়, বহু জনসুখায়চ' কর্ম্মসাগরে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন শুষ্ক কর্ত্তব্যবোধ থেকে নয়, জন-সাধারণের সঙ্গে ঐক্যের একটা জীবন্ত অনুভূতি থেকে এই অনুভূতি কোন কোন ক্ষেত্রে এমন একটা স্তরে পৌঁছাতে পারে যেখান থেকে মার্কিন কবি হুইটম্যান লিখে ছিলেন, I do not ask the wounded person how he feels I myself become the wounded person. আমি নিজেই তো আহত ব্যক্তি হয়ে যাই। সুতরাং আহতকে 'কেমন আছ' জিজ্ঞাসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ভারতের নিরন্ন জনগণের ক্ষুধার যাতনাকে স্বামীজী নিশ্চয়ই সমস্ত সত্তা দিয়ে নিজের মধ্যে অনুভব করতেন। তিনি কি স্বদেশের ক্ষুধাতুরদেরই একজন নিজেই হয়ে যেতেন না? আমেরিকায় ধনী গৃহের পালঙ্কে শুয়েও স্বদেশের ক্ষুধার্ত্ত মানুষগুলির কথা ভেবে বিবেকানন্দ অনেক সময়ে রাত্রে ঘুমাতে পারতেন না। জন-সাধারণের প্রতি প্রেম কত গভীর হলে এমনটি হতে পারে, তা অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ বিবেকানন্দের জীবনের একপ্রান্তে ব্রহ্ম, অন্য প্রান্তে দুঃখতপ্ত আর্ত্ত জন-সাধারণ। এ দুয়ের মধ্যে অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে বিবেকানন্দের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জীবন সংগ্রাম থেকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দুর্ব্বারগতিতে এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষের মৃতকল্প জন-সাধারণের অবসন্ন স্নায়ুগুলীতে প্রাণের স্পন্দন জাগানোর কাজে বিবেকানন্দের অবদান নিঃসংশয়ে আর সকলের অবদানকে ছাড়িয়ে আছে।

স্বামীজী বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিতে দিতে চলেছেন কলম্বো থেকে আলমোড়া পর্য্যন্ত। নব্যভারতের ধর্ম্মের গভীর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অগ্নি তুলতে তুলতে স্বামীজী চলেছেন যেন মূর্ত্তিমান একটা সাইক্লোন। কথায় বারুদের গন্ধ, খরখড়্গের ঝলক। নিবেদিতা ঠিকই বলেছিলেন, স্বামীজীর গৈরিক কতবার খসে খসে পড়তো আর বেরিয়ে পড়তো যোদ্ধার বর্ম্ম। বক্তৃতা-গুলিতে কি প্রচণ্ড কশাঘাত আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষিত সমাজের হৃদয় হীনতার এবং কপটতার উপরে। আমাদের জড়তা, ভীরুতা, কিছুকেই স্বামীজী রেহাই দিলেন না। কিন্তু একটি মূল সুরকে কেন্দ্র করে স্বামীজীর আর আর সুরগুলি ধ্বনিত হচ্ছে। এর মূল সুরটি হোল জন-সাধারণের কল্যাণসাধনের সুর। বিবেকানন্দের সব গানেরই ধুয়া, "প্রেম, প্রেম, এই-মাত্র ধন।"

আমাদের দুটো মহাপাপ স্বামীজীকে কাঁটার মতো বিঁধতো। একটি দুর্ব্বলতা, অপরটি হৃদয়হীনতা। এই দুটো মহাপাপের মূলচ্ছেদ করবার জন্য বিবেকানন্দ আশ্রয় করলেন উপনিষদকে। উপনিষদ ঘোষণা করেছে, মানুষ আসলে আত্মা এবং আত্মার শক্তির কোনো সীমা নেই। স্বামীজী বললেন, সমস্ত পাপকে, সমস্ত অনর্থকে যদি একটি মাত্র শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয় তবে সেটি হল দুর্ব্বলতা। শত শত বৎসর ধরে আমাদের দেশের মানুষগুলি অবহেলিত হয়ে এসেছে। বঞ্চিত থেকেছে তারা মানুষের বিধিদত্ত অধিকারে। পুরুষানুক্রমে দাসত্ব করতে করতে তারা একদিন ভুলে গেল, তাদেরও জীবনের একটা মূল্য আছে। জীবনের অভিমানকে নিজের রুচিমতো, ইচ্ছামতো পরিচালিত করবার স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষেরই আছে, এমন কথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাস নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছে তারা। স্বামীজীর বক্তৃতার পর বক্তৃতায় দেশবাসীর এই আত্ম-অবিশ্বাসের উপরে অশনির পর অশনিপাত। মাদ্রাজে বেদান্ত দর্শনের উপর এক বক্তৃতায় বললেন, "তেত্রিশ-কোটী পৌরাণিক দেবতায় প্রত্যেকটীতে যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, বিদেশীরা মাঝে মাঝে তোমাদের মধ্যে যেসব দেবতা আমদানি করেছেন তাদের উপরেও তোমরা যদি বিশ্বাস রাখো এবং তবুও আত্মবিশ্বাস

যদি তোমাদের না থাকে, তবে তোমাদের মুক্তি নেই। **"Have faith in yourselves, and stand up, on that faith, and be strong; that is what we need."**

স্বামীজী সাঁড়াশি-অভিযানের এই একটা তো গেল দুর্বলতার বিরুদ্ধে। অপর অভিযানের প্রসঙ্গে আগেই এসেছি আবার আসা যাক। আত্মবিশ্বাস, ভীরুতা, ক্লৈব্য-এসবের উপরে আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে স্বামীজী যেমন উপনিষদকে আশ্রয় করলেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আত্মকেন্দ্রিকতার ও কপটতার উপরে আঘাত হানার ব্যাপারেও তেমনি উপনিষদের আশ্রয় নিলেন। অবহেলিত উৎপীড়িত জনগণের প্রতি শিক্ষিত সমাজের অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেকের জন্য স্বামীজী গীতার দুটি শ্লোক প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন। এই শ্লোক দুটি হচ্ছে:

> সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
> বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।
> সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
> ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।

এই শ্লোক দুটি সম্পর্কে স্বামীজী এক বক্তৃতায় বলেছেন:

"And if there is anything in the Gita that I like, it is these two verses, coming out strong as the very gist, the very essence of Krishna's teaching—" He who sees the Supreme Lord dwelling alike in all beings, imperishable in things that perish, he sees indeed. For seeing the Lord as the same, everywhere present, he does not destroy the Self by the Self and thus he goes to the highest goal.

একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। গীতা বেদান্তেরই ভাষ্য। এমন ভাষ্য আগেও ছিল না, পরেও হবে না। ভগবান গীতায় উদ্গাতার ভূমিকায় স্বয়ং এলেন শ্রুতির বা উপনিষদের যথার্থ অর্থে উদ্ঘাটিত করতে। উপনিষদের সত্যসূর্য্য নানা মুনির নানা তর্কের মেঘে আবৃত ছিল ভগবান কৃষ্ণ এসে গীতায় শ্লোকের পর শ্লোকে উপনিষদের অর্থকে অবারিত করলেন। এখানে যা বলা হোল বিবেকানন্দেরই মন্তব্য।

গীতার যে দুটি শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করা হোল এবং যাদের কথা স্বামীজী আবেগভরে সভায় সভায় বলতেন তাদের মূল কথা অদ্বৈত। একই ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখার কথাই গীতার মর্ম্মবাণী। একই পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখলে অন্যকে হিংসা করা সম্ভব নয়। অন্যকে হিংসা করা মানে তো নিজেকেই হিংসা করা। ঠাকুর বললেন নারায়ণই তো এই সব রূপ ধরে রয়েছে। এই অদ্বৈত গীতার পাতায় ছিলো একটি দার্শনিক পরম-তত্ত্ব হয়ে। জাতির জীবন জন-সাধারণের খুঁটিনাটি আচরণে এই অদ্বৈতত্ত্বের কোনো practical application ছিল না। উপনিষদে প্রচারিত এবং গীতায় ব্যাখ্যাত মানুষে মানুষে যে একটি পরম ঐক্য রয়েছে—এই ঐক্যতত্ত্বকে জন-সাধারণের প্রাত্যহিক জীবনে অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্যেই বুদ্ধের অষ্টমার্গের পরিকল্পনা। ঐ অষ্টমার্গের মধ্যে যে scheme of conduct রয়েছে সেগুলিতে সমগ্র জীবজগতের প্রতি সহানুভূতির ও সদিচ্ছারই প্রকাশ। এই সহানুভূতি প্রজ্ঞার আলোয় প্রোজ্জ্বল।

স্বামীজীও বুদ্ধের মতোই নিজের জীবনব্রত করলেন, উপনিষদের অদ্বৈত-ভাবের প্রেরণায় জাতির শুকিয়ে-যাওয়া-হৃদয়ে যাতে প্রেমের প্রবাহ আবার বইতে সুরু করে, যাতে জন-সাধারণের প্রতি করুণার বশে শিক্ষিত সমাজ তাদের সেবায় ব্রতী হয়, উচ্চ-বর্ণের লোকেরা অস্পৃশ্যদের বুকে টেনে নেয়, ধনীরা সম্পদের প্রাচুর্য্যে গরীবদের ভাগ দেয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে। বুদ্ধের মতোই স্বামীজী চেয়েছিলেন উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বকে স্বর্গ হতে মর্ত্তে নামিয়ে আনতে। লাহোরের বক্তৃতায় আছে: **The time has come when this Advaita has to be worked out practically.** অদ্বৈতকে হাতে কলমে কর্ম্মে প্রকাশ করতে হবে, প্রেমের পরিচয় দিতে হবে আত্মোৎসর্গের মধ্যে।

বিবেকানন্দের সমস্ত লেখায় ও ভাষণে যে-আবেদন রয়েছে নব্য ভারতের কাছে, তার মধ্যে বীর্য্যের এবং জনগণের প্রতি সহানুভূতির দিকটাই বিশেষ করে লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা এবং রবীন্দ্রনাথের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু একজনের কথা বলা হয় নি। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কথা। তিনি উপনিষদের শক্তি বাদের practical application করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মধ্যে। শক্তির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে স্বামীজী বলতেন ভারতের সেই উলঙ্গ সন্ন্যাসীর কথা যাকে আলেকজাণ্ডার মৃত্যুর ভয় দেখালে তিনি উপেক্ষার হাসি হেসেছিলেন। যার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, যে আত্মা তাকে কে মারবে? আত্মার শক্তি অপরাজেয়, গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় হাতে কলমে তা প্রমাণ করলেন। গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ সুরু করলেন বিবেকানন্দ তখন আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করছেন এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন কাটছে পদ্মাতীরের নির্জ্জনে। জনসাধারণের প্রতি বিশাল সহানুভূতির বশেই গান্ধী বৈরাগ্যের পথ গ্রহণ করলেন। গর্ব্বোদ্ধত শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে প্রবাসী ভারতীয়গণকে রক্ষা করবার প্রেরণায় ব্যারিস্টার গান্ধী বৈরাগী হলেন যৌবনেই। রবীন্দ্রনাথের জীবনসন্ধ্যায় লেখা একটা ছোট গদ্যকবিতায় আছে:

> সত্য যে কঠিন,
> কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
> সে কখনো করে না বঞ্চনা।"

গান্ধী, বিবেকানন্দের মতোই কঠিনকে ভালোবেসে ছিলেন, সত্য বলে যা বিশ্বাস করতেন কর্ম্মে তা পালন করতে মরিয়া হতে পারতেন। সত্যের আহ্বানেই গান্ধীর জীবন কেটেছে নব নব দুঃখবরণের ভিতর দিয়ে। বিবেকানন্দের যে আহ্বান ভারতের যুবসম্প্রদায়ের কাছে, তার মধ্যেও কোথাও আরামের কথা নেই। বিবেকানন্দ বলতেন, "শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই উপনিষদগুলির মন্ত্রবাণী।" উপনিষদ প্রচারক বিবেকানন্দের হাতে তাই স্বাধীনতার জয়ধ্বজা। গান্ধী স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্যে ভারতবর্ষকে নিক্ষেপ করে এবং ঐ সংগ্রামে আত্মিক শক্তিকে ব্যবহার করে বিবেকানন্দের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন। গান্ধী ও বিবেকানন্দ উভয়েরই জীবন জনগণের সেবায় আত্মাহুতি, উভয়ের কণ্ঠে কর্ম্মের স্তবগান, শক্তির অগ্নিবাণ, স্বাধীনতার মহাসঙ্গীত, প্রেমের অমৃতবাণী।

মধ্যবর্ত্তী নির্বাচন

চিত্তরঞ্জন দাস

পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনের দাবী নিয়ে বর্ত্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। একদলের দাবী নভেম্বরেই নির্বাচন এবং অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ অবিলম্বে ঘোষণা, অন্যদল চাইছেন ফেব্রুয়ারীমাসে নির্বাচন, আবার আর একদল বলছেন পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্য্যন্ত কোন নির্বাচনই সম্ভব নয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের মহা ফ্যাসাদ। "শ্যাম রাখি না কি কুল রাখি।" কারণ যে দলের দাবী অগ্রাহ্য হবে, অমনি সেই দল ছুরি, কাঁচি, ঢাল, তলোয়ার নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে শুরু করবেন গণ-আন্দোলন। আন্দোলনে কেন্দ্রের বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না বটে, কিন্তু ক্ষয়-ক্ষতি অনেক কিছুই হবে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের। অথচ এই নির্বাচন কিম্বা তদুদ্দেশ্যে কোন আন্দোলনের ব্যাপারে জনগণ একেবারেই নিস্পৃহ। কারণ এ জাতীয় নির্বাচন দ্বারা অদ্যাবধি সাধারণ মানুষের কোন উপকার হয়নি এবং ভবিষ্যতেও যে হবে না, ইহা সুনিশ্চিত। তবে জনসাধারণ বলতে যদি কেবলমাত্র রাজনৈতিক দলের মুষ্টিমেয় নেতা এবং কর্মীবৃন্দকেই বুঝায়, সে স্বতন্ত্র কথা। কারণ তারা হয়ত নির্বাচনের মাধ্যমে অনেকেই লাভবান হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে অধিকতর লাভের আশায় আশু নির্বাচনের দাবী নিয়ে গণ-আন্দোলন কিম্বা বিপ্লবের বুলি আওড়ান।

সুতরাং দেখা উচিত প্রকৃতপক্ষে কার স্বার্থে বিপুল অর্থব্যয় এ জাতীয় নির্বাচন পর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জনস্বার্থে নিশ্চয়ই নয়। কারণ তাহলে জনগণের এই হাঁড়ির হাল হোত না। সাধারণ মানুষকে যে আজ কি চরম দুঃখ দুর্দশার মাধ্যমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হচ্ছে, সেদিকে কোনও নেতা বা দলের লক্ষ্য আছে বলে মনে করি না। কারণ তা যদি থাকত কিম্বা কেহ যদি জনস্বার্থে অন্তত কিছুমাত্র কর্ত্তব্যবোধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বা প্রতীকারের চেষ্টা করতেন, তাহলে হয়ত মানুষের জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য এতটা গগণস্পর্শী হোত না। যে কারণে ক্রয়-ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের জীবন আজ এত দুর্বিসহ। তদুপরি জনদরদী রাজনৈতিক দলগুলির ক্রমবর্দ্ধমান হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ রাজ্যের সর্বত্র যে আতঙ্ক ও অরাজকতার সৃষ্টি করেছে, তাতে মানুষের শান্তি এবং নিরাপত্তা বলে আর কিছুই নেই। সুতরাং এ অবস্থায় রাজ্যে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের পক্ষে একটা অভিশাপ সদৃশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলের দাবী আশু নির্বাচন যার মাধ্যমে নেতৃবৃন্দ বৈতরণী পার হয়ে যেন-তেন প্রকারে গদি দখলের পুনরায় একটা সুযোগ পান। অথচ সুযোগ ত অনেকেই পেলেন, কিন্তু তার ফলশ্রুতি কি?

বলা বাহুল্য সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য—গদি এবং যার জন্য হয়েছে এত অধিক দলেরও সৃষ্টি। ন্যায়, নীতি, আদর্শ কোন কিছুরই বালাই নেই। কারণ তার যথেষ্ট প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে জনসাধারণ পেয়েছেন। যেমন সংবিধান মতে গদি দখলের নিমিত্ত প্রয়োজন দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সুতরাং সেই গরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য গঠিত হয় নির্বাচনী আঁতাত এবং বিভিন্ন দলের আদর্শ। কথা মত ও পথের প্রশ্ন তখন থাকে অমিমাংসীত অতঃপর আঁতাতের উদ্দেশ্য সফল হলে শুরু হয় পরস্পর ক্ষমতার লড়াই এবং শেষ পর্য্যন্ত আঁতাত যায় ভেঙে। তখন একে হয় অপরের পরম শত্রু এবং শুরু হয় পরস্পর সশস্ত্র সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের পরিণতিই পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান চরম অরাজকতা। সুতরাং এ জাতীয়

রাজনৈতিক দল কিম্বা নির্বাচন যে জনস্বার্থবিরোধী, তাতে আর কোন সন্দেহই থাকা উচিত নয়।

জনগণের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক শুধু ভোটের এবং সেই ভোট সংগ্রহের নিমিত্ত স্বয়ংক্রীয় নেতৃবৃন্দ জনদরদীর মুখোশ পরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে ভোটারদের নিকট বহু আবেদন নিবেদন, জনস্বার্থে কর্ম্মসূচীর বিরাট তালিকা পেশ এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে স্বর্গের সোপান পর্য্যন্ত দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু নির্বাচনের পরেই আবার তাদের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সুতরাং নির্বাচন যে প্রয়োজন শুধু এইসব মহামান্য নেতাদের স্বার্থে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। অথচ নির্বাচনের এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হয় জনসাধারণকে এবং তার বিনিময় এযাবৎকাল তারা শুধু পেয়ে আসছেন ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য। বলা বাহুল্য স্বাধীনোত্তর ভারতে সংবিধান অনুযায়ী অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত একাধিক নির্বাচন শুধু প্রহসনেই পরিণত হ'য়েছে। সুতরাং জনস্বার্থ বিরোধী এ জাতীয় প্রহসনে জনগণের কোন আস্থা, উৎসাহ বা সমর্থন আছে বলে মনে করি না। তার প্রমাণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সাধারণত দেখা যায় অধিকাংশ লোকই ভোটদানে বিরত থাকেন, অবশিষ্ট যারা ভোট প্রদান করেন বহু ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় নয়, দলীয় চাপ ও হুমকীর ভয়ে নির্বিচারে তারা গণতন্ত্র পালন করেন। সুতরাং যথোপযুক্ত প্রতীকার ভিন্ন এই নির্বাচন প্রহসনের সার্থকতা কি?

মহামান্য নেতৃবৃন্দ যদি প্রকৃতপক্ষে জনদরদী বলেই নিজেদের প্রতিপন্ন করতে চান এবং জনসেবাই যদি হয় তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহলে তাঁদের উচিৎ গদির লড়াই পরিত্যাগ করে রাজ্যের বহুবিধ সমাজকল্যাণমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা। বলতে বাধা নেই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান গদির লড়াই মোগল মসনদের লড়াইকেও হার মানিয়েছে। সুতরাং এই নোংরা রাজনীতির পরিবর্তে জনহিতকর কার্য্যে অতি সামান্য অবদান দ্বারাও জনসাধারণের নিকট তাঁরা শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হতে পারেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে জনগণই এগিয়ে আসবেন তখন সার্থক নির্বাচন অনুষ্ঠানে তাঁদের জয়যুক্ত করতে।

সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ পূর্ব্ব-পাকিস্তান থেকে সহস্র সহস্র সর্ব্বহারা নতুন উদ্বাস্তু এসে পশ্চিম বাংলার পথে ঘাটে সামান্য কুকুর বিড়ালের ন্যায় অবস্থান করছে, এমন কি খাদ্যাভাবে কিছু সংখ্যক প্রাণত্যাগও করেছে। কত অত্যাচার উৎপীড়ন হলে বাপ পিতামহের ভিটে-মাটি ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করে অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের সন্ধানে পররাষ্ট্রে এসে উপস্থিত হতে পারে, অতি সহজেই তা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু কৈ? তাদের সম্বন্ধে ত কেহ বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করছেন না। অথচ আশু মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনের দাবী নিয়ে ত প্রায় সকলেই সোচ্চার। এই হতভাগ্য উদ্বাস্তুরাও ত মানুষ এবং আমাদেরই স্বজাতি—বাঙালী। সুতরাং বাঙালী হয়ে যদি এই সমস্ত ছিন্নমূল বাঙালীর সঙ্কট ত্রাণের কথা একবার চিন্তাও না করি, কিম্বা তাদের বর্তমানে শোচনীয় অবস্থা এবং পুনর্ব্বাসনের জন্য প্রকৃতপক্ষে যারা দায়ী, সেই কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত বাধ্য করাতে সক্ষম না হই, আমাদের পক্ষে তাহলে আর মানবতার পরিচয় দেওয়া শোভা পায় না।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে পশ্চিমবাংলার বর্তমান জনদরদী নেতৃবৃন্দ এই সব উদ্বাস্তুর ব্যাপারে একেবারেই নীরব। তাদের প্রতি কি নেতাদের কোন কর্ত্তব্য নেই? নেতৃবৃন্দ কি পারেন না সর্ব্বদলীয় চাপ সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে এই সমস্ত নবাগত উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে? না তাদের নিকট থেকে আগামী নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তির কোন আশা নেই বলেই, তাদের ব্যাপারে নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ উদাসীন? তাই বলি প্রকৃত-পক্ষে যদি কোন দরদী নেতা থাকেন ত এগিয়ে আসুন, মৃত্যু পথযাত্রী উদ্বাস্তুদের মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করুন। সম্ভব হলে তাদের পশ্চিমবঙ্গেই অবিলম্বে পুনর্বাসনের ব্যবস্থায় জন্য সক্রিয় হোন। মানবতার

দিক থেকে বর্ত্তমানে উক্ত কার্য্যই আশু এবং মুখ্য কর্ত্তব্য বলে মনে করি।

পরিশেষে মধ্যবর্ত্তী নির্বাচন প্রসঙ্গে শুধু এই কথাই বলতে চাই, যে রাজ্যের বর্ত্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্য্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ তাতে কল্যাণের পরিবর্ত্তে হবে ঘোরতর অকল্যাণ। তবে এই জটিল সমস্যার সমাধান অতি সহজেই হতে পারে, যদি নেতৃবৃন্দের কথঞ্চিৎ শুভ বুদ্ধির উদয় হয়। রাজ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ যদি এক জোট হয়ে অরাজকতা দমনে বদ্ধপরিকর হন, তবেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব। নচেৎ রাজ্য সরকারকে অবস্থা আয়ত্তে আনতে হলে একমাত্র কঠোর দমন নীতি ভিন্ন অন্য কোন উপায় নেই। সুতরাং সেই দমন নীতির পরিণাম যে কি হতে পারে, তা অনুমান করাও কঠিন। তদ্ভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যতদিন না হিংসাত্মক কার্য্য কলাপ বন্ধ করে, যথা সম্ভব নিস্বার্থ ভাবে—সর্ব্বদলীয় সমন্বয়ে এক গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারেন, ততদিন এই নির্বাচন দ্বারা শুধু দলীয় প্রতিযোগীতা, শরিকী সংঘর্ষ, হত্যা, লুণ্ঠন, অরাজকতাই বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে পশ্চিম বাংলা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং বাংলাকে ধ্বংস করাই যদি হয় রাজনৈতিক দলের একমাত্র কাম্য; তাহলে আর ব্যয়বহুল নির্বাচনের প্রয়োজন কি; শরিকী বিবাদ আরও জোরদার করুন, সফলকাম হতে পারবেন।

রাজনীতি যাঁদের পেশা এবং দলীয় প্রভাবে যাঁরা ক্ষমতাসীন হন, তাঁদের সব সময়ই ইহা স্মরণ রাখা উচিৎ যে ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থ কায়েম করাই হয় যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁরা যত ক্ষমতা এবং প্রভাবশালীই হোন না কেন, কখনও জনপ্রিয় হতে পারেন না। জনপ্রিয়তার জন্য প্রয়োজন জনস্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করা। পশ্চিম বঙ্গের এই চরম সঙ্কট-কালে শুধু এই কথাই মনে রাখা প্রয়োজন যে জনস্বার্থে একান্ত আবশ্যক, নেতৃবৃন্দের পক্ষে ত্যাগের মহান আদর্শ গ্রহণ করা, ভোগের নয়। সুতরাং পশ্চিম বাংলার তথা ভারতের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের উচিৎ ভোগ বিলাসের বাসনা পরিত্যাগ করে, ত্যাগী দেশ নেতাদিগের প্রদর্শিত মহান ত্যাগের আদর্শ অনুসরণ করা। নিঃস্বার্থ দেশ-প্রেমিকদের পক্ষেই শুধু সম্ভব, জনচিত্ত জয় করে কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করা এবং তাঁরাই হলেন দেশের প্রকৃত জনপ্রিয় নেতা। তদ্ভিন্ন শুধু ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থ কায়েম করবার জন্য যাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের আশায় নির্বাচন প্রার্থী কিম্বা বিজয়ী হন, তাঁদের স্থান জন মানসে থাকা কখনও সম্ভব নয়।

আলোয় ফেরা

পুলক দাশগুপ্ত

না · না…এ কথাটাও তুষার বাদ দিতে পারছে না; কারণ এ কথাটা বাদ দেওয়া যায় না। তুষার কিছুতেই বুঝতে পারছে না, জীবনের এই ছাব্বিশটা বছর ও কী করল। এলোমেলোভাবে এই সমস্ত কথা চিন্তা করতে করতে হাঁটছে। ডালহৌসির চোখ ধাঁধানো আলোক-সজ্জা চোখে পড়ছে না। ধূসর অন্ধকারময় কতকগুলো সোপান হাতড়ে হাতড়ে অস্বচ্ছন্দভাবে এগিয়ে চলেছে। শেষ কোথায় জানা নেই। ও এক অসীম পথের পথিক। অন্ধকার গলিতে পথ হারিয়ে ফেলেছে। যতই বাঁক ঘুরছে ততই হতাশ হয়ে পড়ছে; আবার সেই জায়গাতেই ফিরে আসছে, পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বিরাট দীঘির জলে কেউ যেন এক টুকরো ঢিল ছুঁড়েছে, দীঘির জলরাশি বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়েছে, আর সেই জলের রন্ধ্রপথে তুষার পাক খাচ্ছে; কিছুতেই উঠতে পারছে না। তুষার এখন বাইরের জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন। পৃথিবীর আলো, বাতাস সবকিছু ম্লান হয়ে গেছে, পৃথিবীর মানুষগুলো মরে গেছে তুষারের চোখে; ও এখন শুধু আত্মোপলব্ধিতেই ব্যস্ত। হঠাৎ সচেতন হ'ল। কে একজন ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। তুষারের ভ্রুজোড়া ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল। সুন্দর একটা গন্ধ, কোন এসেন্স-টেসেন্সের হবে, ওগুলোর নাম ভাল করে জানে না তুষার। দেখল একটি সুন্দরী মেয়ে। নতুন কিছু নয়। এ অঞ্চলে এসব অনেক পুরোনো,—বিশেষ করে তুষারের কাছে; কারণ ওকে ত রোজই এ রাস্তা ধরে হেঁটে আসতে হয় শ্যামবাজারের মোড় পর্য্যন্ত। তবুও আজ অনুভূতি শক্তি তীব্র হ'ল। মেয়েটির বেশবাস বেশ আঁটসাঁট, চৌরঙ্গী পাড়ার মেয়েদের কায়দায় চুল বাঁধা। ভাল করে দেখতে ইচ্ছে করল, যতটুকু দেখা যায় মানুষের মাথার আর কাঁধের ফাঁক দিয়ে। তুষার কিসের যেন অভাব বোধ করল। মানসিক উত্তেজনায় এ শীতের সন্ধ্যায়ও ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে। হঠাৎ নজর পড়ল নিজের জামাকাপড়ের দিকে।—কাপড়টা ভীষণ নোংরা হয়ে গেছে। মোটা কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে কালসিটের দাগ। দু'সপ্তাহ কাচা হয়নি। সাদা জামাকাপড় পরা কলেজ জীবনের অভ্যেস। অনেক চেষ্টা করেও ছাড়তে পারেনি। এখন আর ভাল ধুতি বা জামার কাপড় কিনতে পারে না; তবুও সাদা—এ সান্ত্বনাটাই বড় সান্ত্বনা। তুষার ডান হাতের চেটো দিয়ে ঘাম মুছতে গিয়ে অনুভব করল সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অবিন্যস্ত চুলগুলোর মধ্য দিয়ে হাত চালাতে গিয়ে বাধা পেল, দু'তিন দিন মাথায় তেল দেওয়া হয়নি।…বাড়ীর কথা মনে পড়ল। 'বাড়ী' বললে ভুল হবে। চোখের সামনে বস্তির সেই নির্দিষ্ট স্যাঁতসেঁতে মাটির ঘরটার দৃশ্য ভেসে উঠল। যেখানে ও থাকে। শুধু ও না…ওর আরও পাঁচটা ভাই-বোন…আর…আর…ওর…'মা'। তুষার কী কোনদিনই ওর মা-কে 'মা' বলে মেনে নিতে পেরেছে? অন্ততঃ মনের নিভৃত কোণ থেকে কোনদিন চল্লিশ বছরের ঐ মহিলাকে মায়ের প্রাপ্য শ্রদ্ধা দেখাতে পেরেছে?—অনেক চেষ্টা করেও তুষার পারেনি।…তুষার অস্বস্তি বোধ করছে। ভীষণ রাগ হ'ল বাবার ওপর। কী দরকার ছিল এভাবে তুষারকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার?—তুষারের মাথাটা টনটন্ করে উঠল। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অনেক কষ্টে মনে করতে চেষ্টা করল সেই দিনটার কথা…।

…বাড়ীতে অনেক লোকজন। আত্মীয়-স্বজন কেউ নয়। সবাই বাবার জুয়োড়ী বন্ধু-বান্ধবের দল।

প্রিয়তোষবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আসছে। তুষার তখন বেশ ছোট। তবুও ভুলতে পারেনি। বোধ হয় ভুলতেও পারবে না কোনদিন। সেদিন রাতে ঘরের কোণে পিসিমার কোলে মাথা রেখে তুষার খুব কেঁদেছিল। ও তখন সবকিছু বুঝত না। সেদিন সকালবেলা পাশের বাড়ীর মাসীমা বলেছিল, "তুষার, তোর 'নতুন মা' আসছে, এবার তোর মুখে ঝাঁটা মারবে।"—অবাক হয়ে শুনেছিল। 'নতুন মা' কথাটা সঠিক বুঝতে পারেনি। পরের কথাটা শুনে বুঝতে একটুও অসুবিধে হয়নি যে কোথায় যেন খুব একটা খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে, অন্ততঃ ওর পক্ষে। তুষার তখনও ওর 'মা-মণি'কে ভুলতে পারেনি। আজও চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'মা-মণি'র কান্নাভরা চোখ দুটো আর কথাগুলো, "খোকা, তোকে কিন্তু খুব ভাল হতে হবে, আর...আর আমার দুঃখ ঘোচাতে হবে, আমরা দু'জন এখান থেকে এখান থেকে অনেক অনেক দূরে চলে যাবো।"—এমনি সব কথা শুনতে শুনতেই রাতে ঘুমিয়ে পড়ত। 'মা-মণি'র স্নেহকেই আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছিল। তুষার সেদিন ভেবেছিল, তাহলে 'মা-মণি' কী মরে যায়নি? সেদিন লোকগুলো যে খাটে করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে কী সব বলতে বলতে নিয়ে গেল। তাহলে ওসব কী মিথ্যে? —সেদিন রাতেই সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। পাশে বাড়ীর মিণ্টুদির মত একটা গোলগাল মেয়ে লাল কাপড় পরে, টোপর মাথায় দিয়ে বাবার সাথে মহা-সমারোহে বাড়ীতে এল। 'নতুন-মা'র ঘটনাটা আরও স্পষ্ট হ'ল যেদিন রাতে বাবা ওকে খুব মেরেছিল, তার কারণ কিছুতেই তুষার হঠাৎ-চেনা মেয়েটাকে মা বলতে রাজী হয়নি। সে-রাত থেকেই ওর জীবনের গতি ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করেছিল। সে দিনগুলো কী নিদারুণ দুঃখের মধ্যদিয়েই কেটেছে...।...ফাঁকা মাঠে পুকুরের ধারে বসে মা...মা...বলে ডাকত। কেউ সে করুণ আকুতি শুনতে পেতনা, তবুও হৃদয়ের গুমরে ওঠা বেদনাটা কেঁদেই স্বস্তি পেতে চাইত। সবচেয়ে বেশী কষ্ট হ'ত রাত্রিবেলা।—কত রাত ঘুমোতে পারেনি। দু'চোখ মেলে অন্ধকার ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবত, 'মা-মণি' নিশ্চই আসবে, গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াবে। কিন্তু সে শুভক্ষণ জীবনে আর ফিরে আসেনি। কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ত। কখনও কখনও মাঝরাতে স্বপ্ন দেখত,—'মা-মণি' এসেছে, কোলের ওপর মাথা রেখে চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে। 'মা-মণি'কে আঁকড়ে ধরতে গেলেই স্বপ্ন ভেঙ্গে যেত। ভয় পেয়ে বিছানার উপর উঠে বসত। দু'চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত।

এমনি সব দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে তুষার পার হয়ে এসেছে কৈশোরকাল। শুধু কৈশোর কেন, যৌবনেও ত ভরা ট্র্যাজেডি। তুষার ওর বাবার মৃত্যুর কথাটা ভাবতে চেষ্টা করল।...চিন্তাসূত্রের তাল কেটে গেল। বুকটা কেঁপে উঠেছে। এখনই গাড়ীর তলায় পড়ত। ভীত সন্ত্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভদ্রলোক নিতান্তই ভাল। তা না হ'লে ইচ্ছে করলেই চাপা দিতে পারত। শুধুতো ও নয়। সাথে সাথে আরও ছ'জন মানুষ সহায় সম্বলহীন হয়ে রাস্তায় দাঁড়াত। এখন 'মানুষ' নাম নিয়ে কুকুরের মত বেঁচে আছে; ওর সৎ-মা, আর তার ছেলেমেয়েগুলো।—কিছুদূরে সাইড নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ীটা। গাড়ীটা অর্থাৎ যে গাড়ীটা ছোট্ট হলেও দৈত্যের মত হাঁ করে নিমেষে তুষারকে মাংস-পিণ্ডের মত তালগোল পাকিয়ে ফেলতে পারত। পরের অবস্থাটার কথা চিন্তা করে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে একটা হাতের মুঠো আর একটা হাতের মুঠিতে এসে ভয়ের পরিমাণটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে ও! ভয়ে মুখ-খানা কালো হয়ে গেছে।...তুষারের সামনে দাঁড়িয়ে বছর পাঁচিশ-ছাব্বিশের দীর্ঘকায় সুন্দর এক যুবক আর তার সাথে সত্যবিবাহিতা আধুনিক সজ্জায় সজ্জিতা এক সুন্দরী তরুণী। যুবকটির হাতে সিগারেটের টিন। চোখে রিমলেস চশমা। শ্যাম্পু করা চুলগুলো কপালের ওপর এসে পড়েছে। গলার টাইটা হাওয়ায় উড়ছে। দু'চোখের দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের উপর অবজ্ঞা আর

সমস্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করার দুরন্ত বাসনা। তুষার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। সঞ্জয়কে চিনতে একটুও অসুবিধে হয়নি। নামজাদা ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট রথীন সান্যালের একমাত্র ছেলে। সঞ্জয়ের পাশে রুমাকে দেখে ধাক্কা খেল তুষার। কে যেন তুষারের মাথায় হাতুড়ী দিয়ে ঘা মারল। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। স্নায়ুগুলো উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হচ্ছে। মুখখানা ফাঁসির আসামীর মত পাংশু দেখাচ্ছে। তুষার যন্ত্রণাবোধ করছে। সঞ্জয়, তুষারের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল,—

—কীরে এতদিন পর দেখা, তুই যে একেবারে নিখোঁজ, কী ব্যাপার? এখন কোথায় আছিস্, কী করছিস্, বিয়ে করেছিস্?—ঝড়ো হাওয়ার মত এক নাগাড়ে বলে গেল সঞ্জয়।

—কোন্ প্রশ্নটার আগে উত্তর দেবো? একটা একটা করে শোন্। আপাততঃ আছি একটা বাস্তবে, ছোট-খাটো কোম্পানীর সস্তাকুলো একশো টাকা মাইনের কেরাণী। আর তোর শেষের প্রশ্নটার কোন উত্তর নেই,—ওটার কথা চিন্তা করবার সময় করে উঠতে পারিনি।

তুষারের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি এসে আচরেই মিলিয়ে গেল। সঞ্জয় অশান্ত বোধ করছে। তুষার সম্পর্কে আগে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ওর সাথে এভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি। তাছাড়া সাথে যখন মাস ছয়েক আগে বিয়ে করা রুমা রয়েছে। যদিও রুমা আর তুষারের পরিচয় অনেক পুরোনো। একথা ভেবেও সঞ্জয় নিজের কাছে নিজেই অপদস্থ হ'ল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কথাগুলো ভেবে নিজেকে সামলে নিয়ে তুষারের কথার খেই ধরে কিছুটা দ্বিধাজড়িত গলায় বলল—

—চলে আয়না আমাদের ফার্মে। এখনই মাসে শ' দুয়েক দেবো। তারপর চিন্তা করে দেখব, কী করা যায়। I mean . . . if you don't take it otherwise, যদিও তোর আমার আসল পরিচয়টা গোপন থাকবে, ব্যাপারটা কিছুই নয় . . . . Business sake বলছি,—হাসতে হাসতে রিমলেস চশমাটা খুলে তুষারের দিকে তাকাল সঞ্জয়।

—ধন্যবাদ, তুই অনেকদূর ভেবে ফেলেছিস্। অতটা দরকার হবে না।...হঠাৎ তুষারের কথার জের টেনে রুমা বলল,—

—কেন দরকার হবে না তুষার। Be practical. জীবন সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখো। জীবনের সবক্ষেত্রে emotion চলে না। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সঞ্জয়ের একটা name card বের করে তুষারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ওর সাথে দেখা করো তুষার, তোমার উপকারই হবে।'

তুষারকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সঞ্জয়ের হাত ধরে রুমা গাড়ীতে উঠল।

তুষার কী স্বপ্ন দেখছিল? ও কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, না বাস্তর পুরানো ঘরটার স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে, বছর দশেকের ছেঁড়া একটা তোষকের উপর শুয়ে আছে বাজে স্বপ্ন দেখছে। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বাস্তববোধ হারিয়ে ফেলেছিল। ওযেন অসীম শূন্যে নিরাকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ যেন অনেক উঁচু একটা বাড়ীর ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। এখন ও মাটি আঁকড়ে ধরতে চাইছে। জামাটা ঘার্মোভিজে সপসপে হয়ে গেছে। তুষার ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। সমস্ত মুখখানার উপর কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। ভীষণ বেদনার্ত দেখাচ্ছে। বিষণ্ণতা ওকে পেয়ে বসেছে। সঞ্জয় চলে যাওয়ার পর এক পা এগোতে পারেনি তুষার। এক কাপ গরম চা খেতে ইচ্ছে করল। এই সময়টায় রোজই এক কাপ চা খায় তুষার। এটাই একমাত্র অবশিষ্ট নেশা, যা অনেক চেষ্টা করেও ছাড়তে পারেনি। পকেটে হাত ঢোকাল। একটা আধুলি। বেদনার্ত মুখখানা দিয়ে কী এক কঠিন চিন্তার রেখা! মাস শেষ হতে এখনও দিন তিনেক বাকী, পয়সাটা খরচ করা উচিৎ হবে না ভেবে একগ্লাস জল খেয়ে হাঁটতে সুরু করল। আগের চেয়ে অনেকটা শান্ত হয়েছে তুষার। চেতনা শক্তি আস্তে

আস্তে ফিরে আসছে। —শেষ পর্যন্ত রুমা ওকে Practical হওয়ার সদুপদেশ দিয়ে গেল। তাহলে কী ও Practical নয়। রুমা কী বোঝাতে চেষ্টা করল তুষারকে। রুমা কী তুষারের সবকিছু জানে না? রুমা ত একদিন এই তুষারকে নিয়েই অনেক স্বপ্ন রচনা করেছিল। অবশ্য তখন তুষারের এ অবস্থা ছিল না। তুষার তখন যৌবনের উদ্দীপনা নিয়ে জীবনকে যাচাই করে দেখছিল। অমাবস্যার কালরাত্রি তখনও ওকে ঘিরে ধরেনি। তুষারের মাথায় আবার যন্ত্রণা সুরু হল। কপালের রগগুলো ছিঁড়ে যেতে চাইছে। চোখের সামনে ভিড় করে এল রুমার সেদিনের কথাগুলো। কথাগুলো অবশ্য রুমা তুষারের কথার উত্তরেই বলেছিল, "তুষার, কেন তুমি এত ভয় পাচ্ছ? —কেন তুমি আমাদের সম্পর্কটাকে সহজ সরলভাবে নিতে পারছনা, আমাদের সম্পর্কটা খুবই স্বাভাবিক, এত আজকাল সমস্যাই নয়, বরঞ্চ এটাই জীবনের পূর্ণতার সহজ সরল সমাধান।"

তুষারের মনের দরজায় ভীড় করে এল সেই দিনগুলো .....। তুষার তখন ওর নিঃসঙ্গ জীবনকে মেনে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। বাইরের সমাজ সম্পর্কে ছিল চরমতম নিস্পৃহতা। তার কারণ ও ভাবত সমাজ-সংসার ওর জন্য নয়। ওখানে পদে পদে কাটা ছড়িয়ে আছে। এক-কথায় ভীষণ ভয় পেত। পড়াশুনার মধ্যে শান্তি খুঁজে, নিজের মত বাঁচতে চেষ্টা করছিল। একেবারে যে বিফল হয়েছে, তাও নয়। স্কুলের শেষ পরীক্ষার ফলটাই তার নজীর। তুষার কলেজে ভর্তি হয়েছিল আর পাঁচটা ছেলের মতই। তবুও জীবনের নিঃসঙ্গতার মধ্যদিয়ে 'জীবন' সম্পর্কে চিন্তা করবার অবকাশ পেয়েছিল। —জীবন' কী? 'জীবনে'র উদ্দেশ্য কী? 'জীবনে'র সত্য কী? তুষার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করত। কোন প্রকৃত সত্যই উদ্ঘাটন করতে পারত না। অনেক সময় চেনা জানা দু'চারজন ওকে বোকা মনে করত। ওদের ভাবায় তুষারের কিছু যায়-আসে না ভেবে সান্ত্বনা পেত। মাঝে মাঝে মনে হত ও কী কোন মানসিক রোগে ভুগছে? নিজের বুদ্ধির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে নিজেই সমাধান করার চেষ্টা করত। এমনি সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা যখন অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরে আছে, তখন রুমার সাথে তুষারের পরিচয়। তুষার অনেকদিন পরে আবার যেন শান্তি খুঁজে পেয়েছিল। ওর জীবনে তখন স্নেহ-ভালবাসার একান্ত প্রয়োজন ছিল। একদিন এই রুমার কথা ভেবে ভেবে কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে, আর কোনদিন কখনও রুমার সম্পর্কে কিছু চিন্তা করতে হবে না ভেবে দুঃখ পেল। তুষার উপলব্ধি করেছিল, ভালবাসা ওর সয় না, সহ্য করতে পারে না। বুঝেছিল, ওর নিঃসঙ্গ জীবনে কাউকে ভালবাসা উচিৎ নয়, তার কারণ হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে। তুষার জানত, কোনোদিন কোন কারণে যদি অস্বীকৃত হয়, তাহলে সহ্য করতে পারবে না।

তুষারের অনুভূতির তারগুলো অত্যন্ত সজাগ ছিল বলেই ওর প্রতি রুমার প্রবল আকর্ষণের কথা বুঝতে পেরেছিল। অবশ্য বুঝতে পেরেছিল বেশ কিছুদিন পর। রুমা তখন এক অদৃশ্য শক্তির বন্ধনে তুষারকে বেঁধে ফেলেছে। তুষারের অনুপস্থিতি রুমার কাছে তখন এক বিরাট দুঃস্বপ্নের মত। শুধু রুমারই নয়, তুষারও কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে রুমার সুখ-দুঃখের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। তুষার, রুমার ভালবাসাকে অশ্রদ্ধা করেনি। মধ্যে মধ্যে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। তুষার বুঝতে পেরেছিল সমাজের আর পাঁচটা ছেলের মত ওর মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। তাই নিজেকে দুঃখ দিয়েও, অস্থায়ী স্বাচ্ছন্দের হাত থেকে পালিয়ে এসে সার্বিক মুক্তি পেতে চেয়েছিল। আজকের বিপর্যয় যেন তখনই দেখেছিল আর ভেবেছিল দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে এনে দুঃখ দেওয়ার চেয়ে না আনাই ভাল।

......হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা ভেবে বেশ আনন্দ অনুভব করছে; তুষার ভাবছে ও ঠিকই করেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে রুমা যে কথাগুলো

শুনিয়ে গেল, সেগুলো কিছুই বুঝতে পারছে না। অনেক চেষ্টা করেও তুষার বুঝতে পারছে না, রুমা অনেকদিন আগের বলা কথাটার পুনরুক্তি করে ওকে Practical হতে বলল কেন আর কেনই বা ওকে emotional বলল। রুমার সাথে সমস্ত সম্পর্ক মুছে ফেলার পরও রুমা ওর অনেক কথাই জানে। বর্তমান অবস্থার কথা নিশ্চয়ই অবিদিত নয়। ও-কী আকারে-ইঙ্গিতে সেই কথাই বোঝাতে চাইল। ওরা Practical কথার কী অর্থ করে তুষার জানে না। ও কী কোন ভুল করছে? মধ্যে মধ্যে অবশ্য নিজেই ভেবেছে। ও হয়ত ভূতের বোঝা বয়ে চলছে। কী দরকার ছিল সৎমা আর তার পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়েকে খাওয়ানোর। অনেকবার ভেবেছে আজ আর অফিস থেকে বাড়ী ফিরবে না, ওদের কথা চিন্তা করবে না। ওদের প্রতি যে কোন দায়-দায়িত্ব আছে, এ-কথাও তুষারের অনেক সময় অর্থহীন বলে মনে হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় শায়িত বাবাকে কথা দিয়েছিল; কথা দিয়েছিল বললে ভুল হবে,—কথা দিতে বাধ্য হয়েছিল। রোগে জরাজীর্ণ, মৃত্যুপথযাত্রী, অনুতপ্ত বাবাকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। শেষদিকে বাবা বোধহয় নিজেকেও ক্ষমা করতে পারেনি: তাই শেষ সময় তুষারের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন,—"খোকা, তোর মার কাছে ক্ষমা চাইতে পারলাম না, তার আগেই...তার আগেই...সে অভিমান করে চলে গেছে। তুই · তুই ··আমাকে ক্ষমা...ক্ষমা...করিস; পারবি না...পারবি না ··ক্ষমা করতে।" বলতে বলতে দু'চোখের কোল বেয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে।... তুই...তুই...ওদের দেখিস খোকা। —বহুদিনের পুঞ্জীভূত রাগ, অভিমান, ঘৃণা ভুলে গিয়ে বাবার বুকে মাথা রেখে নিজেই অঝোরে কেঁদেছিল তুষার। সেই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তের প্রতিশ্রুতিই যে ও চিরদিন বয়ে বেড়াবে এরই বা কী অর্থ? তুষার ওদের আবেষ্টনীর থেকে সরে আসতে পারেনি কেন? নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করেছে অনেকবার। নিজের জীবনের সামান্যতম স্বপ্নও কী ছিল না?—নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু কিছুতেই ভিতরের 'আমি'কে দাবিয়ে রেখে বাবার শেষ অনুরোধকে ঠেলে দিতে পারেনি। এটাই কী একটা emotion এখানেই কী ও ভীষণ ভাবে emotional হয়ে পড়ছে? তুষারের আবার রুমার কথাগুলো মনে পড়ল, "ওর সাথে দেখা করো তুষার, তোমার উপকারই হবে।"—রুমা কী তুষারকে ভীষণ ভাবে বিদ্রুপ করল না? অন্যের অযাচিত সাহায্যকে কোনদিনই তুষার সম্ভ্রমের চোখে দেখে না, এ-কথা রুমা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল কী করে? তুষার ভাবল, "ভালবেসে বিফল হলে মেয়েরা কী প্রতিহিংসা নেওয়ার সুযোগ খোঁজে?"—তাই বোধহয় আজ উপহাস করে গেল। রুমা বোধহয় সেদিন তুষারের মানসিক দ্বন্দ্বের কথা উপলব্ধি করেছিল। তারই জের টেনে তুষারকে emotional না হয়ে Practical হওয়ার উপদেশ দিয়ে গেল। রুমার এ-কটু অভিনয়টুকু কী না করলেই চলত না? রুমাত কথার মধ্য দিয়ে ওর দুর্বলতার চিহ্নটুকুই বেশী করে রেখে গেল। যৌবনের প্রথম লগ্নের সুখস্মৃতি আজও কাঁটার মত বিঁধে আছে রুমার বক্ষ-পিঞ্জরে, তারই প্রমাণ দিয়ে গেল নিজের অজান্তে। রুমা সঞ্জয়ের পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনেক বড় বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করল। তুষারকে কী বুঝিয়ে দিল যে ওর কাছে অস্বীকৃত হলেও রুমা মূল্যহীনা নয়?—নারীচরিত্র সম্পর্কে ধারণা খুব কম; রুমা সম্পর্কে তুষার এ-ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারল না। তবুও রুমার জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য দেখে শান্তি পেল তুষার। ওর জীবনের সর্বাঙ্গীন কল্যান প্রার্থনা করল। পরক্ষণে নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগল।—সবার জীবনে সবরকম সুখ আসে না; তুষার ওর ভালবাসা ছড়িয়ে দেবে পথে-প্রান্তরে,—এই ভেবে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করল।

তুষার ওর জীবনের এমনি সব জটিল প্রশ্নের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পথ অতিক্রম করে চলেছে। হঠাৎ চমকে উঠল। পায়ের সামনে একটা ভিখিরী। তুষার

রোজই ভিখিরী দেখে পথে ঘাটে। কলকাতা শহরে এটা নতুন কিছু নয়। তবু আজ নতুন বলে মনে হল। একটা লোক ভিখিরীটাকে পয়সা দিল। ভিখিরীটার বিবর্ণ মুখখানা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হল। ভদ্রলোকের সামান্য দু'চার পয়সার বিনিময়ে একটা ডুবন্ত মানুষ বাঁচবার নিশানা খুঁজে পেল। এই পঙ্গু, অসহায়, অত্যাচারিত লাঞ্ছিত মানুষগুলোও পৃথিবীতে বাঁচতে চায়। বাঁচবার জন্য কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। গুরুদেবের কবিতার লাইনটা মনে পড়ল তুষারের, "মরিতে চাহিনা আমি এ সুন্দর ভুবনে।" এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে কেউ মরতে চায় না। তুষার ভাবল, জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথেই এ পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য সুখ-শান্তি ভোগ করার অধিকার আমরা পেয়েছি। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারও নেই। তুষার নতুন করে বাঁচবার, প্রেরণা খুঁজে পেল। পরমুহূর্তে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল, বাড়ীর একগাদা পরিজনের কথা চিন্তা করে। কিন্তু অনুভূতি শক্তির তাড়নায় বুঝতে পারল, এ সমস্যা শুধু ওর 'ব্যক্তিগত' সমস্যা নয়, 'সমষ্টিগত' সমস্যা। সমাজের একটা বিরাট অংশ আজ পথেপ্রান্তরে ধুকে মরছে দু'মুঠো অন্নের জন্য। এটাই আজ সাধারণ মানুষের জীবনের অত্যন্ত স্বাভাবিক রূপ। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোর এটাই বোধহয় অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি। তাই চারিদিকে মিটিং, ধর্মঘট, শ্লোগান। নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানুষ আজ মরিয়া হয়ে নেমে পড়েছে কলকাতার বিশাল রাজপথে তাদের দাবী জানাতে, দু'মুঠো খেয়ে পরে বাঁচবার তাগিদে। কাজেই ওকেও সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে। সমস্যাজর্জরিত সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করে যেতে হবে।

তুষার সুস্থতা অনুভব করছে। মনে হচ্ছে, কাল রাতেও নিটোল একটানা ঘুম দিয়েছে; সারামুখে প্রশান্তি ফুটে উঠেছে। হাতে পায়ে অস্বাভাবিক বল পাচ্ছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে সারা মন। অদৃশ্য হস্তের চালনায় তুষারের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ও এতদিনে জীবনের মূলমন্ত্র খুঁজে পেয়েছে। তুষার সূচীভেদ্য অন্ধকারময় সোপানগুলো পায়ে পায়ে অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে...। চারিদিকের জনকোলাহলে তুষারের খেয়াল হল ও শ্যামবাজারের কাছাকাছি এসে পড়েছে। পকেটের আধুলিটা দিয়ে কয়েকটা লজেন্স বিস্কুট কিনল ভাইবোনেদের জন্য, ভাবল, প্রথম মুক্তির আনন্দটা আজ এভাবেই সেলিব্রেট করা যাক্‌না। রাস্তার লোকজন আর আর নিওন আলোগুলো নতুনের আহ্বান নিয়ে তুষারের চোখে ধরা পড়ল। তুষার বুঝল, ও অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার পেরিয়ে পূর্ণিমার আলোয় ফিরে এসেছে।

নাট্যতত্ত্ববিশারদ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও তাঁর গ্রন্থপঞ্জী

সন্তোষকুমার বসাক

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের প্রধান ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১০ই জুলাই শুক্রবার আকস্মিক পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বৎসর।

ডঃ ভট্টাচার্য ১লা আগষ্ট ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্থানের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ মহকুমার পিঙ্গোলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ৺অমৃতলাল ভট্টাচার্য। তিনি এক বৎসর বয়সে পিতৃহীন ও পাঁচ বৎসর বয়সে মাতৃহীন হন। জেঠিমা ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবীর স্নেহচ্ছায়ায় তিনি লালিত পালিত হন। দারিদ্র্যকে শিরোধার্য করেও জ্ঞানানুশীলন চালিয়ে তাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হয়েছিল। সুপণ্ডিত ৺শশধর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহায়তায় তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তিনি বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯৩৫ সালে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি, এ, পাশ করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ১৯৩৮ সালে সংস্কৃত ও ১৯৪০ সালে বাংলায় এম, এ, পাশ করেন।

তাঁর অধ্যাপক-জীবন শুরু হয় পাটনার বি, এন কলেজে। ১৯৪১ এ তিনি যশোহরের মাইকেল মধুসূদন কলেজে বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। ১৯৪৭ সালে বঙ্গবাসী কলেজে যোগদান করেন। এই কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসুর সহযোগিতায় "আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত ভবন"—এর (স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র) প্রধান অধ্যাপক হয়েছিলেন।

১৯৫২ সালে ডঃ ভট্টাচার্য এরিষ্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে ডি, ফিল ডিগ্রী লাভ করেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য নাট্য সঙ্গীত অকাদেমীতে ডঃ ভট্টাচার্য ১৯৫৫ সালে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের ৮ই মে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হলে এই অকাদেমী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। ডঃ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা কাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে নাট্যকলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, বাংলা ও নাটক বিভাগের অধ্যক্ষ ও কলা বিভাগের সভাধ্যক্ষের পদগুলি অলঙ্কৃত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

বাংলা নাট্যসাহিত্যতত্ত্বে ডঃ ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্য ছিল অসীম। ব্যক্তিগতভাবে যারা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁরাই এখবর রাখেন। তাঁর সাহিত্য কীর্তি লুপ্ত হবার নয়। তিনি মৌলিক ও অনুবাদ মিলিয়ে ১৬ টি গ্রন্থের গ্রন্থকার এবং চারটি পুস্তক এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে।

ডঃ ভট্টাচার্য সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে দেখতে পান বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যতত্ত্বের কোনও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নেই। যাদের বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানা নেই, তাঁদের সাহিত্যতত্ত্বের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবেশ করবার সৌভাগ্য হবে না, তখন তিনি মর্মে তীব্র জ্বালা অনুভব করেছিলেন, এরই ফলশ্রুতিরূপে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্য পূর্ণ পুস্তক-

গুলি রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বাংলা ভাষায় তথা ভারতীয় ভাষায় পোয়েটিক্‌সের অনুবাদ ও আলোচনা তাঁর হাতেই প্রথম হয়েছে।

বাংলা ভাষায় নাট্যতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্বের পঠন-পাঠন ও অনুশীলনে পরম পাণ্ডিত অধ্যাপক ভট্টাচার্য ছিলেন একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রশান্ত চিত্তের স্নিগ্ধ মাধুর্য। তিনি ছিলেন ছাত্রছাত্রীদের পরম প্রিয় অধ্যাপক। জ্ঞানের সাধনায় তাঁর নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। সমৃদ্ধিশালী বাংলাভাষার মাধ্যমে ডঃ ভট্টাচার্যের রচনা সাহিত্যের মধ্যে একটি ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করেছে। তাঁর রচনাবলী বাংলা সাহিত্যের একটি অনাবিষ্কৃত দিক। এই দুরূহ বিষয়ে এযাবৎ কোনও ব্যক্তি আলোচনা করতে ভরসা পান নাই।

তিনি 'নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার' (১ম-৫ম খণ্ড) গ্রন্থগুলিতে নাট্যশিল্পের তাত্ত্বিক দিক ও প্রধান প্রধান নাটকগুলিকে অবলম্বন করে পৃথক পৃথক আলোচনা করে উচ্চশিক্ষার পঠন-পাঠনের জন্য নাটকের সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থের অভাব দূর করতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্বন্ধে ৺ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'সাধনকুমারের নাট্যসাহিত্য আলোচনা, নাটকের প্রকৃতি বুঝিবার ও উহার রস আস্বাদন করিবার যে নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছে ও তাঁহার জন্য পথিকৃতের কৃতিত্ব তাঁহার সর্বতোভাবে প্রাপ্য ও তিনি প্রত্যেক নাট্যামোদী পাঠকের কৃতজ্ঞতা ভাজন।' অধ্যাপক ৺শ্যামাপদ চক্রবর্তী বলেছেন—'সর্বক্ষেত্রেই নৈয়ায়িক বিচাররীতি প্রয়োগ করিয়া তিনি যুক্তিকেই বড় আসন দিয়াছেন। যুক্তি প্রাধান্য তাঁহার রচনার প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য।...প্রতীচ্য ও প্রাচ্য সাহিত্যশাস্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় আলোচনা কোথাও একদেশদর্শী হইয়া পড়ে নাই। চরিত্র বিশ্লেষণে অধ্যাপক সাধনকুমারের গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়।'

ডঃ ভট্টাচার্যকে শিল্পতত্ত্ব অধ্যাপনা করতে গিয়ে সঙ্গীত শিল্পতত্ত্বের গ্রন্থাদি পাঠ করতে হয়েছিল। এই অধ্যাপনা সূত্রেই হ্যান্‌সলিক রচিত The Beautiful in Music গ্রন্থখানির সঙ্গে তিনি পরিচিত হন ও বাংলায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। অনুবাদিত পুস্তক 'সঙ্গীতে সুন্দর' ১৩৭৬ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর পুস্তকটি পাঠ করে অনেক সঙ্গীত-তত্ত্ব-বিশারদ আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বাংলাদেশের নাট্যআন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং বহু নাট্য প্রতিযোগিতায় বিচারকের ভূমিকা নিয়েছেন। মে মাসে মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরে সপ্তাহব্যাপী নাট্য-প্রতিযোগিতায় তাঁর শেষ উপস্থিত ছিল।

তাঁর অকাল মৃত্যুতে নাট্যতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্ব ইত্যাদির দুরূহ আলোচনায় একটি বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হলো এতে সন্দেহ নেই।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার (১ম-৫মখণ্ড)। কলিকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ; পুঁথিঘর; জিজ্ঞাসা; ১৩৫৫-১৩৬১। (১ম খণ্ডঃ তত্ত্ব আলোচনা, চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান; ২য় খণ্ডঃ প্রতাপ-আদিত্য, আলমগীর, প্রফুল্ল, ৩য় খণ্ডঃ বিষমঙ্গল, সিরাজদ্দৌলা, নূরজাহান, নীলদর্পণ; ৪র্থ খণ্ডঃ দিগ্বিজয়ী, নরনারায়ণ, শ্রীমধুসূদন; ৫ম খণ্ডঃ...)।

২। এরিষ্টটলের পয়েটিক্‌স ও সাহিত্যতত্ত্ব। কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৩।

৩। হোরেসের আর্স পোয়েটিক: কাব্যকলাতত্ত্ব—হোরেস। অনুবাদ, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৫৬ খ্রীঃ।

৪। নাটক ও নাটকীয়ত্ব। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৫৭ খ্রীঃ।

৫। রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৫৭ খ্রীঃ।

৬। নাটক লেখার মূলসূত্র (নাটকের তত্ত্ব, রচনা ও সমালোচনা-সূত্র)। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩৬৬।

৭। শিল্পতত্ত্বের কথা। কলিকাতা, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিঃ, ১৯৬০ খ্রীঃ।

৮। একাঙ্ক সঞ্চয়ন (সাধনকুমার ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত)। কলিকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৭।

[ভূমিকা প্রবন্ধ: একাঙ্ক নাটিকার সংজ্ঞা ও স্বরূপ, ১-২০ পৃঃ]

৯। মহাকাব্য জিজ্ঞাসা। কলিকাতা, নবারুণ প্রকাশনী ১৯৬১ খ্রীঃ।

১০। নাটকের রূপরীতি ও প্রয়োগ। কলিকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৯।

১১। ক্রোচের 'এস্থেটিক' ও 'এসেন্স অফ্ এস্থেটিক'— বেনেডেট্টো ক্রোচে' অনুবাদ, কলিকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭০।

১২। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা। কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী' ১৯৬৩ খ্রীঃ।

১৩। শিল্পতত্ত্ব পরিচয়, কলিকাতা জাতীয় সাহিত্য পরিষদ' ১৩৭৫।

১৪। শিল্পতত্ত্ব-বেনেডেট্টো ক্রোচে। অনুবাদ কলিকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৭৬।

১৫। সঙ্গীতে সুন্দর (Bengali version of the Beautiful in Music by Eduard Hanslick)। অনুবাদ। কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩৭৬।

১৬। রাজা ঈডিপাস—সফোক্লেস। অনুবাদ। কলিকাতা, প্রতিভা প্রকাশন, [N. D.].

অপ্রকাশিত:

১৭। প্লটাইনাসের দর্শন ও সৌন্দর্যতত্ত্ব [সঙ্গীতে সুন্দর পুস্তকের বিজ্ঞাপন দ্রঃ]

১৮। ভারতের নাট্যশাস্ত্র ও অভিনব ভারতী।

১৯। বাংলার নাট্যকার ও নাটক।

২০। বিশ্বনাট্য পরিক্রমা।

[ক্রোচের 'এস্থেটিক' ও 'এসেন্স অফ্ এস্থেটিক', পুস্তকের বিজ্ঞাপন দ্রঃ]

আধুনিক নাট্য-আন্দোলনে দার্শনিক পটভূমি। আসর পত্রিকা (মাসিক) ২১ বর্ষ, নবম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৭৭। পৃঃ ৭৭-৮৫।

তারা রূপবতী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

তারা তিনটী রূপবতী কন্যা।

নাম হল চিত্রকূট বাঈ, অহল্যা বাঈ, পম্পাবতী বাঈ।

রামায়ণ ভক্তের দেশে নামকরণে রামায়ণেরই নানা পুণ্য নাম নেওয়া হয়েছে। পিতা মাতার দেওয়া নাম কি ছিল তাদের কেউ জানে না। তারাও জানে না বোধহয়। কবে বেচাকেনা কিংবা দুর্ভিক্ষের দিনে কৈশোরেই পরিত্যক্ত হয়ে এই রাজ্যের অন্তঃপুরে বা 'হারেমে' এসেছিল কারুর জানা নেই।

যদিও রাজকন্যা বা রাণী নয়। কিন্তু রূপেও তাদের চেয়ে এরা কম রূপবতী নয়। এবং নাচ গানের পটুত্বেও কম নয়। বাকি থাকে রাজপ্রাসাদ বাসের ভাগ্য। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য! সেটা বিধাতার কলমের ব্যাপার।

সেকথা যাক্। সেদিন সবে ভোর হয়েছে। মন্দিরে মন্দিরে গোপালজী লাড়লীজী (শ্রীরাধা) গঙ্গাজী রাধা-গোবিন্দজীর মন্দিরে মঙ্গলআরতির শাঁক, ঘণ্টা, কাঁসর কাঁসি বেজে থেমেছে।

সহরের সাতটা তোরণের মাথায় মাথায় নহবৎখানা-গুলোতেও প্রথামত ভোরের রাগিনী আলাপ হয়ে থেমেছে। কিছু দোকান পসার খুলেছে। কিছু বেলা হলে খুলবে। তখনও ঝাঁপ দরজা তোলেনি দোকানীরা। শীতের সকাল রোদ্দুরে ঝলমল। কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডা।

অকস্মাৎ পাঁচীল ঘেরা সহরের ভেতরের আবার এক দৃঢ় অন্তঃপুর প্রাচীরবেষ্টনীর এক অত্যন্ত নোংরা প্রান্তে যেখানে অন্তঃপুরের ময়লা জলের পয়প্রণালী পথ। সেইখানে শাবল, গাঁতি, কোদাল, কুড়ুল, খন্তা, হাতুড়ী নিয়ে একদল মজুর জড় হল।

আর তাদের আগে পিছনে রাজপ্রাসাদের কর্মচারী (কামদার) নায়েব নাজির কোতোয়ালসাহেবদেরও সমাগম হচ্ছে দেখা গেল। কাছাকাছি অনেকগুলো অন্ত্যজজাতীয় হাড়ি, বাগদী, ডোম (বলাই, মীনা) শ্রেণীর লোকও রয়েছে।

চারদিকে কৌতূহলী জনতা জমছে। 'সাত' সকালে রাজপ্রাসাদের পাঁচীল ভাঙে কেন? এবং তা আবার অন্তঃপুরের 'রাওকার' দেওয়াল। মূর্খ দর্শক তারা। আশ পাশের হোমরাচোমরা গম্ভীরমুখ সরকারী কর্মচারীদের প্রশ্ন করবার ভরসা তাদের নেই। শুধু তাদের জন্য কখনো একটা চৌকি চেয়ার এনে দিচ্ছে। কখনো বাঁধানো বট অশথ গাছতলাগুলো রোয়াকের পাশ ঝেড়ে বসবার জায়গা করে দিচ্ছে। এবং নিজেরা সেইখানে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা জানা ও শোনার চেষ্টা করছে।

কিন্তু ঐ মহামান্য কর্মচারীরা নীরব।

কাজেই চুপি চুপি জল্পনা কল্পনা চ.ল জনতার দলে জনান্তিকে ও প্রকাশ্যে। কেউ বিজ্ঞের মত বলে, মহলে সাপ বেরিয়েছে মনে হচ্ছে। তাই দেওয়ালের মধ্যে তার কোথায় বাসা আছে খুঁড়ে দেখছে সব।

তার চেয়ে আরেকজন বলে, শীতকালে জাড়ার দিনে সাপ? পাগল নাকি? তারা এখন সব 'রসোড়ার' মহলে (রান্না মহল) উনুনের তলায় ঘুমচ্ছে। সাঁপ 'শ্যাপ যে কদেই কোনে নিকলে'। (সাপ শীত-কালে কখনোই বেরোয় না) জানিসনে।

'তবে আস্ত দেওয়াল ভাঙে কেন?' একটা বুড়ো বলে, 'রাম জানে কেন ভাঙে'। যেখানটা ভাঙা হচ্ছে সেটা একহারা দেওয়াল। তার মানে, যেখানে যেখানে পাহারারত শান্ত্রীরা থাকে প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেখানে দুই দেওয়ালের প্রাচীরের মাঝখানে ছোট ছোট সরু লম্বা ঘরের সারি থাকে সিপাইদের ব্যারাকের মত। তাতে তারা স্ত্রী পরিবার নিয়ে থাকে। সেগুলোর দরজা কিন্তু বাইরের দিকে। অন্তঃপুরের দিকে যদি

থাকে তাহলে তা চাবী দেওয়া এবং প্রধান খোজা আর প্রধান 'কামদারের' হাতে সে চাবী।

কিন্তু সেখানটা ভাঙা হচ্ছে না। হচ্ছে, নর্দ্দমার জল যাবার পথের পাশে একটা জায়গা। সেটার পাশে মেথরাণীদের ঘর। খানিকটা ভাঙা হয়ে গেল।

শীতের সকাল। রোদ্দুরের জোর নেই অথচ বেলা হয়েছে। ভাঙা দেওয়ালের মধ্যে থেকে 'হারেমের' বাড়ীটার হলদে রংয়ের ছোট ছোট 'ঘুলঘুলি'খচিত জানলাদরজাহীন একটা অংশ চোখে পড়ে।

কৌতূহলী উৎসুক জননেত্র উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। চিররহস্যময় রাজপ্রাসাদে 'খিস্‌দা' রূপকথার মত রাজার বাড়ীতে রাজকন্যা রাজরাণীদের কারুকে হঠাৎ যদি ওখানে দেখতে পাওয়া যায়।

না! বেরিয়ে এলো কয়েকটা নানাবয়সী নারী। ছেলেমেয়ের হাত ধরে ঐ ভাঙা পথ থেকে। তারা হল কয়েকটা মেথরাণী এবং অন্তঃপুরের ঝি দাসী। যারা পর্দা সীন নারী রূপবতী কন্যা সখির দল নয়—হারেম-বাসিনী নয়। সাধারণ গৃহস্থ নারী মাত্র। পরিচারিকা সেবিকাশ্রেণীর মেয়ে।

তাদেরও মুখ শুষ্ক গম্ভীর। অবগুণ্ঠনের নিচে যেটুকু দেখতে পাওয়া গেল। বাইরের জগতের কৌতূহলী বর্ষীয়সী কয়েকজন নারী আধ ঘোমটা দিয়ে পুরুষদের পাশকাটিয়ে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছাই যদি অন্তঃপুরের গণ্ডীতে ঐ পথে একটীবারও ঢুকতে পারে! যদি কোনো রাজরাণী 'পর্দাবেত' (পদস্থ 'রক্ষিতা' নারী) পাত্রী, সখিদের দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ভাঙা দেওয়ালের সামনে কাছাকাছি স্বয়ং কোতোয়ালসাহেব এবং তাঁর সঙ্গেসঙ্গে পুলিস চৌকীদারের 'পাহারাওয়ালার' দল। সে ব্যূহ ভেদ করার সাধ্য বা ভরসা কারুরই নেই। মেয়েদের তো নেই ই।

মেথরাণীরাই লাল নীল হলদে রংয়ের ওড়না এবং ঘাগরাপরা একে একে বেরিয়ে এলো। এবং মেয়েদের দল একে একে মেয়েদের কাছেই জড় হতে লাগল। লোক সে মেথরাণী বা 'টহলনী' (দাসী)।

স্বল্প ও দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের মধ্যে থেকে ওদেশের প্রথা মতই এক চোখ বের করে তারা একদিকে এসে দাঁড়ায়। চুপি চুপি প্রশ্নোত্তর চলে।

'কাই হুঁয়াচে' (কি হয়েছে) 'সাপ বেরিয়েছে'? 'চোর ঢুকেছিল রাত্রে বেরুতে পারেনি?' তাহলে দেওয়াল ভাঙবে কেন! 'কোই গুজর গয়ি? বাইর্'। (বাইরা কেউ মরে গেছে?) 'কারুর অসুখ?

প্রশ্ন কিন্তু সে যাই হোক দেওয়াল ভাঙার সঙ্গে ঐ-সব সমস্যা খাপ খাচ্ছে না।

একজন বয়স্কা মেথরাণী বললে 'কি হয়েছে তা তো আমরা জানি না। 'মোরী' গেট নর্দমার ছোট দরজা দিয়ে সকালে জমাদার সাহেবরা আমাদের স্বরূপ রায়ের 'রওলায়' যেমন কাজ করতে ঢুকিয়ে দেয় ঢুকেছি…

কাছাকাছি একটা গালপাট্টা পরা চৌকিদার ছিল। ধমক দিলে, 'কাঁই বাত বনা রহি। গম খা। (বাজে গল্প করছিস। থাম্) চুপ র‍্যা।' (চুপ করে থাক।)

চুপ আর কি কেউ সহজে করে।

তারা কেউ অশথতলায় কেউ আর একটু দূরে কোনো দেওয়ালের ধারে দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আর জনান্তিক কথাবার্ত্তা চলতে লাগল।

* * *

হঠাৎ ভিড় সচকিত হয়ে উঠল।

একটী 'চাক ডোল' শব বহনের খাটিয়া বেরিয়ে আসছে দেখা গেলে। হলদে বা লাল চাদর ঢাকা নয়, সৌভাগ্যবতী নারী শবদেহের রক্তপীত পবিত্র আবরণী নয়—, ময়লা সাদা চাদর ঢাকা সাধারণ খাটিয়া। লোকেরা আশ্চর্য্য হয়ে স্তম্ভিতমুখে দেখল। না। একটা নয়। আরেকটাও আসছে তার পিছনে একটু দূরে। এবং বিমূঢ় চোখে আবার দেখল আরো একটা।

জনতা দর্শকরা স্তম্ভিত। একসঙ্গে তিনটে? তিনটী দেহ? এক দিকে এক সঙ্গে তিনজন! কার-কার? আর সকলেরই স্বরূপ রায়ের বাঙলাতে মৃত্যু! কি হয়েছিল 'হায়জা'? 'মাতা'? (কলেরা-বসন্ত) কি করে এ মৃত্যু হল? কারো প্রশ্ন করার সাহস নেই। সকলে সভায় ভাঙা পাঁচিলের পথের দিকে চেয়ে। সহরের বয়স্ক নরনারীদের রাজপুরীর বহুরহস্যময়-হারেমের অনেক কাহিনী শোনা এবং জানা আছে, তারা মূক পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। কমবয়সীদের মধ্যে গুঞ্জন চলে 'কাঁই হো গয়া রে।' কৈঁসা মরি? (কি করে মরল, কি হয়ে ছিল)? বোধহয় অপদেবতার ভূতপ্রেতের কাণ্ড। তা না হলে এক রাত্রে এক বাড়ীতে তিনজন মরে! রাত্রে ভূতে গলাটিপে মেরে গেছে। হারেমের সুড়ঙ্গ সুড়ঙ্গে তো কত লোক কত ভূত দেখেছে!

পনের কুড়িজন জোয়ান মানুষ 'বলাই' 'মীনা' জাতীয় (ডোম হাড়ি) অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ—সেই খাটিয়াগুলো বহন করে বাইরে এনে রাখল। কোতোয়ালসাহেব আর মুনসী কামদার রাজকর্মচারী এবং ঐ অন্তঃপুরের কর্মচারীর দলও জমেছেন।

তাদের হাতে টাকার থলে। এবং দেশী 'দারুর (মদা) গোটা ২০-২৫ ছোট বড় বোতল নিয়ে চৌকিদারের ও পাহারাদারের দলও এসে দাঁড়িয়েছে। জন প্রতি দু'বোতল হিসাবে। খাবে। বাড়ী আনবে। যা খুসী।

* * *

অকস্মাৎ একটা সুতীক্ষ্ণ ভয়ার্ত আকাশ বিদীর্ণকারী অমানুষিক ত্রস্ত চিৎকার শোনা গেল, আরে বারে! মরো৷ রে! আরে বারে! (ওরে বাবারে! মরে যাবো রে। বাপরে)। আর সঙ্গে সঙ্গে একটী কালো কোলো বলিষ্ঠ দেহ, মাথায় পাগড়ী, গায়ে মেরজাই আঁটধুতি পরা যুবক একটা ঐ খাটিয়ার পাশ থেকে তীর বেগে ভিড় ঠেলে জনতাকে ধাক্কা দিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে চেঁচাতে চেঁচাতে ভিড়ের পিছনে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তার চিৎকারে বাহকদের আরও দু'একজন শবদেহের ঢাকা সরিয়ে দেখল। এবং তৎক্ষণাৎ তিন খানা 'চাক ডোলের' বাহকদল থেকে আরো ৪।৫ জন 'আরে বারে! মশান যাবাকা আগেই কৈঁসা অল গয়িরে'। জিতে মরি! মরনেই জীতে জল মরি। 'কালি কোয়লা বন্ বৈঠি কৈঁয়ারে'। ভূতনীছে। (ভূত হয়েছে) 'ওরে বাবারে। শ্মশানে যাবার আগেই কি করে পুড়েছে? 'মরে জ্যান্ত মরেছে। পুড়ে মরেছে মরেই'। কালো কয়লার মত কালো হয়ে গেছে। কেমন করে রে মশান ঘাটে যাবার আগেই। (ওদেশে নদীর ঘাট নেই শুধুই শ্মশান।)

চৌকিদার বা সেপাই পুলিসরা কর্মচারীরাও থত-মত খেয়ে গেল প্রথমটা। তারপর কেউ বা তাদের ধরে আনতে গেল। কেউ হাকাডাকি করতে লাগল। কোতোয়ালসাহেব এবং বড় কর্মচারীরা তাদের ইঙ্গিত করলেন মৃদুস্বরে আদেশও দিলেন ভালো করে দেহগুলি ঢেকে দিতে।

যে বাহকটা প্রথমে চেঁচিয়েছিল, তার 'চাক ডোলের' (খাটের) অর্দ্ধেকটা আবরণ সরে গিয়েছিল টলমল পায়ে ভাঙা পথে এসে নাবানোর সময় দেওয়ালের ধাক্কা লেগে।—কারণ তাদের ঐ সকালেই প্রচুর মদিরপানীয় পানকরানো হয়েছে। বহন কাজের জন্য টাকা এবং 'দারুর' অভাব হবে না বলেই তাদের ঘুম ভাঙিয়ে ভোরের ঘুমন্ত 'কলালের' দোকান জাগিয়ে (শুঁড়িখানা) সেখানে বসিয়ে 'দারু' পান করানো হয়েছে। এবং সঙ্গেও সকলের জন্যই যদি পথেই খেতে চায় বা দাহ করার সময়ে যদি শ্মশানে বসেই খেতে চায় তার জন্যও ব্যবস্থা রাখা প্রচুর হয়েছে। ওপরওয়ালার হুকুমে চৌকিদার ও কামদারের কাছে সেই টলমলে দেহে ও পায়ে খাট নাবানোর সময় প্রথমে সেই লোকটাই দেখতে পায় একখানি কালো পোড়া হাত। আর একখানি কালো অঙ্গার ভূত মুখের একটা পাশ। হারেমের কোনো রূপবতী রাজকন্যার মুখ নয়, দেহ নয়।

তার চিৎকারে অন্য খাটের বাহকরা ও এই খাটের বাহক ও সবারির নিজেদের বাহিত খাটের শবাবরণ সরিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। এবং দেখবার সঙ্গেই

উৎকট বিকট ভীত চিৎকারও করে। আর পালায়ও আরো কয়েকজন। অন্য খাটের কয়েকজন যারা দেখতে পায় নি তারা হতবুদ্ধি হয়ে পালিয়ে যাবার এবং দূরে সরে যাবার চেষ্টা করল। পারল না। পুলিস চৌকিদার ততক্ষণে তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

যোলো সতেরো জন থেকে কয়েকজন পালিয়েছে। বাকি ক'জন সকাল বেলাই প্রচুর পান করে নেশায় অপ্রকৃতিস্থ। এবং সঙ্গে সঙ্গে কোতোয়াল পুলিশের ভয়েও ভীত। তারা দূরে দূরে সরে বসবার চেষ্টা করতেও লাগল। আর বলতে লাগল মশানে যাবার আগেই যারা পুড়ে মরে আছে তারা সব অশরীরি ভূত অপদেবতা হয়ে রাত্রে ওদের ঘাড়ে চেপে গলাটিপে মেরে ফেলবে। ওরা এই অপমৃত দেহ বহন করবে না। স্বয়ং হুজুরসাহেব (রাজা) এবং মহারাণীজী বললেও না। বহন করতে পারবে না এদের। এরা এখনি ভূত হয়ে গেছে। তারা রাজরোষের ভয়ে ভূতের প্রেতমূর্ত্তির রূপে রাত্রে দেখবার ভয়ে কোতোয়াল-সাহেবের শাসনের ভয়ে একসঙ্গে সমান অভিভূত হয়ে গেছে। শুধু কাঁদছে, বলছে—আরে বাপরে। কোনে বাঁচাবে। কোনে মাও রূপেয়ারে। (ওরে বাবারে। যাব না রে। টাকা চাই না রে।) এক সঙ্গে তিনজনেই কি করে পুড়ে গেছে রে। 'কৈঁয়া লায় লগি পাকা মোকান মে' (পাকা ঘরে কি করে আগুন লাগল। 'লায়' আগুন)

অর্দ্ধেক সংগৃহীত শববাহক পালিয়েছে যে ক'জন আছে নেশায় আচ্ছন্ন। ভয়ে বিমূঢ়। অপদেবতার ভয় তার রাত্রে আবির্ভাবের ভয়, রাজরোষের ভয় টাকায় ও পানীয়ের লোভকে কোথায় ঠেলে চেপে দিয়েছে।

রৌদ্র বাড়ে বেলা বাড়ে। জনতাও বেড়েছে। কমে নি। জল্পনাও বাড়ে। এই জনতায় দলে মেথরাণীদের দলই বড়। আর উচ্চ-নিম্ন ব্রাহ্মণ বেনিয়া রাজপুত নরনারী শ্রোতা। এখানে ওখানে গাছতলায়, নর্দ্দমার ধারে কারুর বাড়ীর উঠানে প্রাঙ্গণে গুঞ্জন চলে।

জানে। তারা জানে। অনেক কিছু ব্যাপারই জানে।' কিন্তু কোতোয়ালসাহেবেরা ও তো সামনে বসে আছেন দেখছ তো। চোখটিপে কাছাকাছি এসে ফিস ফিস করে গলা নামিয়ে বলে 'এই বলছি শোনো। ব্যাপার হল গিয়ে সেদিন সুরূপ রায়ের বাঙলাতে এক জলসা ছিল। মানী সাহেবরাও এসেছেন। তাঁদের সখিদেরও গান গাইতে বলা হয়েছে। মহারাণী আর অন্য তিন রাণী এলেন। তাঁদের সখিরাও নাচ গানটান করবে।

সারারাতের জলসা। সবাই উসখুস করছে ঘুমে চোখ ভরা। কিন্তু রাজা আর রাণীরা পর্দায়েত পাশোয়ানরা তো মদ খাচ্ছে আর ঠায় বসে আছে। ওদের যেন আলিসা নেই। আর গানও তো হচ্ছে খুব চমৎকার সব রাধাকৃষ্ণের গান। সে সব আমাদের মনে নেই মীরাবাঈ সুরদাসজীর গান! সুরূপ রায় হঠাৎ বললেন 'আজকে হুজুরসাহেব দেখবেন কোন রাণীর সখিরা ভালো নাচ গান শিখেছে।'

এ রকম বলা বা পাল্লা দেওয়া-দেওয়ি তো 'মহলের' নিয়ম নয়।

হুজুরসাহেব রাজা একটু অবাক হলেন। কিন্তু রূপবতী সুরূপ রায় তো যা ইচ্ছে করে আজকাল। হুজুর সাহেবই তো তাকে বাড়তে দিয়েছেন। রাজা বললেন, তা গান হোক না। ভালো মন্দর কথা পরে কোনো সময় ভাবা যাবে।'

এল চিত্রকূট বাঈ, অনেকদিন আগে দেখেছিলাম। সেদিন আবার হঠাৎ দেখলাম। কি রূপ! আর অহল্যা পম্পাবাঈও এলো। আমরা তো 'ভাঙ্গী' দূর থেকে দেখছি। (মেথর)

তাদের সে যেমন গান তেমনি নাচ আর তেমনি কি রূপ। কখন কোথা দিয়ে সকাল হয়ে দশটা বেজে গেল। আমরা কাজে যাব হুজুরসাহেব ও দরবারে যাবেন। কারুরই যেন মনে নেই সেকথা। সে এমন নাচ গান। এমন রূপ।

একজন। 'তা কি হল? নাচ গানের সঙ্গে আজকের এই তিনটে মেয়ের কি সম্পর্ক? এরা কে?

আর একজন। 'এরা কারা? সেই চিত্রকূট খর্ব্য-মুক বাঈরা?

'না, এতে খর্ব্যমুক বাঈ নেই।

অন্য কে একজন বলে কিন্তু আসল কথা হল সুরূপ রায়েরও তো বয়স বাড়ছে। রূপ যৌবন কমছে —সহসা পিছন থেকে কে মোটা ভারি গলায় ধমক দিলে। 'কি গল্প বনাচ্ছিস্। যা' কাজে যা'।

নারীর দল সভয়ে চুপ হয়ে গেল। মেথরাণীর দলও ঝাঁট্ হাতে করে কাজের ভান ভঙ্গী করে এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগল। কৌতূহলের আর গল্পের নেশা ধরে গেছে মনে সকলের। সবাই চুপি চুপি বলে 'তা' তিনজন পুড়ে মরল কি করে!

কেউ। সুরূপ রায়ের কত বয়সরে ভাই। কেমন দেখতেরে? মহিমের মেয়ে ছিল নাকি সে আগে?

* * *

কেউ বলে তা দেওয়াল ভেঙে ওদের বার করল কেন? একজন বুড়ী বললে অকাট্য ভাষায়, ওরা তো সেই গণিকা ওরা যতই হোক মহল সদর রাজপথের তোরণ দিয়ে ওদের বার করার নিয়ম নেই। সে পথে শুধু রাজপরিবারের শবই বেরোয়। এবারে দেখা গেল আবার একদল জোয়ান যুবকদের। পলাতক তারাই হয়ত কেউ কেউ—অথবা অন্য লোক। যাই হোক ঘটনা সবটা না জানিয়ে এবং টাকার লোভ আর প্রচুর পরিমাণ 'দারুর' লোভ দেখিয়ে তাদের আনা হয়েছে।

জনতা মূঢ় নীরব মুখে শবদেহ ছোঁয়ার অশুচি হবার ভয়ে অপমৃত্যু মৃত দেহীর আক্রোশ ও কোপে রাত্রে নিজেদের ঘরে প্রেতরূপে আবির্ভাবের ভয়ে ভীতভাবে রাম নাম স্মরণ করতে করতে অনেকটা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে শবযাত্রার আয়োজন দেখতে লাগল। যত ভয় তত কৌতূহল তাদের।

তিনটি খাটে তিনটী, পরিচয় খ্যাতি সম্পর্ক নামহীন, সামাজিক সম্পর্কের মান-মর্য্যাদায় পরিচয়ও হীন। তিনটী কন্যা;—কালও যারা অসামান্য রূপবতী অপূর্ব নৃত্যগীতপটিয়সী রাজনেত্র মোহিনী ছিল, সঙ্গিনীদের মুগ্ধ ঈর্ষার পাত্রী ছিল তাদের অলঙ্কারমুক্তিতনু শায়িত।

গতকালও যারা 'রূপ রায়' 'বসন্ত রায়' সুরূপ রায় স্বরূপ রায়দের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হতে পারত; পর্দায়েত পাশোয়ান হয়ে মহামান্য 'রায়'উপাধি লাভ করতে পারত। রাণীদের পরেই যে উপাধির সম্মান ও স্থান সেই রক্ষিতার পদ। যদিও ঐখানেই সমাপ্তি সে মান সম্মানের। ঐটুকুই শুধু। কন্যা নয়! ভার্য্যা নয়! জননী নয়। বোন নয়। কিছু নয়; শুধু ভোগ্যা, শুধু ভোগ্যা পণ্য নারী। যে কোন পুরুষের ভোগ্যা। এ ক্ষেত্রে রাজ ভোগের জন্য উৎকৃষ্ট রূপ-যৌবনবতী নারী। গণিকা বহুভোগ্যাদের দলের মেয়ে তারা।

যাদের জন্মদিনের কথা কেউ আমরা জানি না। কোন্ জননী, কোন্ পিতা পরিজন সেই রূপবতী কন্যাকে বুকে নিয়ে কি ভেবেছিলেন, কি করবেন ভেবেছিলেন, অথবা মোটেই কোনো পিতামাতা ছিলেন কিনা কারুর জানা নেই। পথ পাওয়া শিশু কিনা তাও জানা নেই।

শুধু একটী চিরকালের পরম ও কঠোর সত্য এই যে তাদের পাশে কোনো পিতা ব্যাকুল শোককাতর মুখে দাঁড়িয়ে নেই। কোনো শোকার্ত্ত জননী দুহিতার মৃতদেহ আলিঙ্গন করে রোদন করবেন না। কোনো বিয়োগ-কাতর পতি মৃতার হাত ধরে বিচ্ছেদের আতুর বেদনায় মুখের দিকে চেয়ে নেই। কোনো মাতৃহীন সন্তান এসে শেষ প্রণতি জানিয়ে যাবে না।

* * *

এবার সভয় শঙ্কিত মৃদুকণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল পরম যাত্রার পরম বাণী "রাম নাম সত্য হ্যায়" "সত্য হ্যায়"। এসে পড়ল শ্মশান। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ইহলোকের ও পরলোকের সামাজিক আনুষ্ঠানিক শেষ-কৃত্য—স্বর্গ কামনা লোকান্তরিতাদের সদগতি কামনা করার জন্য কেউ ছিল?

নাঃ! কোথায় তাদের ইহলোকের সাথী, সঙ্গী পরিজন, প্রিয়জন। কোনো স্বজন কেউ তো ছিল না।

কেউ তো নেই। কোথায় তাদের রূপমুগ্ধ রাজা। কোথায় লালজী সাহেবরা? অত বড় প্রাসাদের কারুর কি তাদের জন্য এক বিন্দু চোখের জল পড়েছিল? না! এবং না। তাদের পরলোকও কোথায়--পৃথিবীর সমাজের মানুষের জানা নেই। স্বর্গ না রৌরব নরক? মহা নরক। পিঙ্গলা অহল্যা উর্বশী মেনকাদের স্বর্গ বা নরক—মর্ত্য-জীবনের পর স্বর্গ কোথাও ছিল? অপ্সরাদের পরলোক কোন্ স্বর্গে? সতীনারী পতি পুত্রবতী সতীনারীদের সেই পুণ্য স্বর্গে এদের জায়গা আছে কি? কেউ জানে না সে পরলোক কোথায়! সেকি শাস্ত্রকথিত ভয়াবহ নরক? অথবা সুখ স্বর্গ। সতীলোক। মরণের পরও জাত শ্রেণী কুল সৎ-অসৎ, সতী অসতী, পতিতা গণিকা বিচার থাকে কি? কিন্তু জগতে এদের শ্মশানও তো আলাদা পৃথক। এবং ওদের সবায়ের জাত একটাই। দেখতে দেখতে কোনো বিশেষ জাতিহীন সেই দেহগুলি নিঃসম্পর্কীয় নিম্ন শ্রেণীর, অন্ত্যজ শ্রেণীর স্কন্ধে বাহিত হয়ে 'গন্ধি' নালার শুষ্ক মরু বালিময় পথ ধরে—চৌকীদার পুলিস কোতোয়াল কায়দারসাহেবদের তত্ত্বাবধানে এক অন্ত্যজ শ্রেণীর মহা শ্মশানের এলাকা পার হয়ে, এক গণিকা পতিতা সম্পর্কহীন চিরকালিনী ভোগ্যা নারীদের জনির্দিষ্ট আরেক মহা শ্মশানে এসে পৌঁছিল। যাদের মৃতদেহের বাইরে আনার পথও পৃথক। শ্মশানও পৃথক। শাস্ত্র মন্ত্র, নববস্ত্র, সোনা-রূপা, ব্রাহ্মণ গঙ্গোদক মুখাগ্নি শেষকৃত্যে নানা কিছু কৃত্য কি তাদের হয়? হল কি? কেউ জানে না।

আর চিতা নির্বাণ 'ক্রিয়া'? তিনদিনের লৌকিক ক্রিয়া? তৃতীয়দিনের পারলৌকিক শান্তি-ক্রিয়া?

* * *

বেলা পড়ে এলো। সব কর্মচারী ও প্রহরী চৌকীদারের দল ফিরে এলো শোক নয়, দুঃখ নয়,—মহা আতঙ্ক, মহা ভয় নিয়ে অপমৃতাদের ভৌতিক আবির্ভাবের ভয়ে ইষ্টনাম দেবতার নাম স্মরণ করতে করতে। কোথায় কখন ঘরে পথে অন্ধকারে তারা এসে দাঁড়াবে অঙ্গারমূর্তিতে জ্বালাময় দেহ নিয়ে সবাই ভাবে। খুব নির্ভীকরাও ভাবে।

আর হারেমের ভিতর রূপবতী সুন্দরী যুবতী নারী সখিদের দল স্তম্ভিত মানুষকে একসঙ্গে জড়সড় হয়ে বসে থাকে—তাদেরও ঐ রকম এক অপমৃত্যুর ভয়ে। দিনে ও রাত্রে ও সন্ধ্যায়ও। আকস্মিক ঐ মৃত্যুর কারণ তাদের কাছে খোজারা বলেছে, শীতের রাত্রে আগুনের গামলা নিয়ে ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। বিছানায় আগুন লেগে গেছে। আহা! আহা বেচারী! কিন্তু 'জন-ভিন্না হারেমবাসিনীদের' কানে পৌঁছে দেয় কারা তাদের তিনজনের মাথায় চোটী (বেণী) এক সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ছিল রাত্রে। আর লেপ-বিছানা দিয়ে মুখ চেপে রেখে-ছিল। ঘরের দরজা বাইরে থেকে শিকল বন্ধ ছিল। আর রাত্রে পা টিপে টিপে কারা ওদের ঘরে ঢুকেছিল। ভোরণজী? সর্দার খোজা খুদবকসজী? পাশের ঘরের সখিদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কিসের যেন গোঙানোর শব্দে। তারা ভেবেছিল অপদেবতা প্রেতিনীর ডাক। ভৌতিক ব্যাপার তারা শুনেছে চিরকাল সকলের কাছে, জড়জে মুড়জে তাদের আস্তানা আছে। কিন্তু এক ঘরে অনেক সখিই তো থাকে।

সেদিন কিন্তু চিত্রকূট বাঈদের ছোট একটা ঘর দেওয়া হয়েছিল। শ্রোত্রীরা নিস্পন্দ ভীতমনে ভাবে রূপ তো সবারির আছে তাদের। আর 'পাশোয়ানীদের' প্রতাপও তেমনি! কার পালা আসে আবার কে জানে।

আর ছোট ছোট বালিকা সুন্দরী পাত্রীরা যারা অত বোঝে না। ভীত কল্পনায় চোখে তারা সর্বত্র সন্ধ্যা রাত্রে শোবার ঘরে, খাবার ঘরে, ছাতে সুড়ঙ্গপথের কোনে কোনে মিট্‌মিটে প্রদীপের আলোয় দেখতে পায় পন্নাবাঈ চিত্রকূট বাঈকে অহল্যা বাঈকে জরিদার সবুজ ওড়না হলদে ঘাগরা পরা নাচের জলসার দিনের সাজে। হাতে পায়ে মেহেদীর ফুলকারী রূপার নূপুর মল মুরাঠা পায়ে। হাতে কঙ্কন পৈঁছা। ভয়ে দল ছাড়া হয়ে চলে না তারা।

সহর নির্বাক রাজা নীরব। হঠাৎ শোনা গেল ভয়হীন মেথর যুবকরা গান বেঁধেছে। ডোম পাড়া মেথর পাড়াতে 'কলালের' দোকানে গান রচিত হয়েছে।

"গোরী গোরী ছোরীয়াঁ রে। (গৌরী গৌরী মেয়েরা রে)

গোরী গোরী বাঈয়াঁ রে। কিন্তু দেখতে পেলাম রাজবাড়ীতে মরা দেহ নিতে

ওরে ভাই গোরী নয় ওরে ভাই সব কালি কালি ছোরী রে। (মেয়ে)

"অরে গোরী গোরী বাঈয়াঁ রে—

কালি বনি কৈঁয়ারে!—কালি হয়ি কৈঁয়ারে। (কালো হল কি করে)

ধুয়াতে দেয় পাশোয়ানজী রূপরায়ের নাম।

যে যুবকটী দেখেছিল সেই একটী দেহকে। তার মুখে শোনা বিবরণ নিয়ে গান। সহর ভরে যায় গানে। ব্যঙ্গের দুঃখের সুরে জনতা জেনে না জেনে সেই গান গায়।

* * *

প্রথামত সেইদিনই ভাঙা প্রাচীর গাঁথা হয়ে গেছে। মেথরাণীরা যে যার কাজকর্ম করছে সহজভাবেই। তবু সুরূপ রায়ের কানেও গানের কথা পৌঁছয়। রাগে আগুন তিনি। ওরা কে? কারা এমন গান গায়। এত আস্পর্দ্ধা কার।

কিন্তু ধরবেন কাকে? যাদের গারদের ফাটকের ভয় নেই। নানা অপরাধে তারা গারদে যায়ই। তাদের কে গান বেঁধেছে তাও তো জানা নেই। শত শত কণ্ঠে গলি ঘুচিতে দোকানে দোকানে হৈ হল্লার মাঝে গান গেয়ে ওঠে কারা। রাগে ধিক্কারে ব্যঙ্গ শ্লেষে গায়।

গায় কলালের দোকানে সন্ধ্যাবেলায়। স কলালের দোকানেই গানের রকমফের হয়। ধুয় বদলায়।

সহরের শান্ত নিরীহ ধর্মভীরু নরনারী গানে রচিত ঐ ব্যঙ্গময় করুণ কাহিনী আড়ালে অন্তরালে দুঃখিত মনে শোনে। সুরূপ রায়ের নিষ্ফল রাগের কথাও শোনে। ব্রাহ্মণ বেনিয়া রাজপুত সবাই শোনে। অনেকে জনান্তিকে দুঃখিত মনে হাসে। আর আর মেয়েরা সভয়ে চোখের জল মোছে। তারা অনেক দুঃখের কথাই বোঝে তো। কিন্তু এর বেশী ভাববার ক্ষমতা কারুর নেই। সবাই জানে, ওরা মরে চিরকাল কখনো রূপের দায়ে, কখনো সুকণ্ঠের অপরাধে, কখনো বা অলৌকিক ললিত নৃত্যের পটুতায়। কারও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার ভয়ে তাদের সে অপঘাত।

* * *

কতকাল ধরে কত মরেছে এমন নারী। কত হারেমে কত শুদ্ধান্তঃপুরে। ক'জনের বা ইতিহাস জানা আছে। কারুর ভোগের মহা রাজ পথে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিল।

* * *

সেই সব কালের ক্ষণিক পথে আমি শুধু তাদের তিন জনকে দেখেছিলাম মাত্র। দেখেছিলাম আশ্চর্য্য রূপ। শুনেছিলাম আশ্চর্য্য কণ্ঠে গান। দেখেছিলাম অপূর্ব নৃত্য। সে রূপ গান নাচ বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। সম্ভব নয় বর্ণনা করা। শুধু মনে হয়েছিল, 'আনার কলি' নূরজাহানের চেয়ে রূপবতী ছিল। ফৈজীবেগম সিরাজের সব বেগমের চেয়ে রূপবতী ছিল নিশ্চয়।

প্রতিধ্বনি

শ্রীশান্তা দেবী

গগনেন্দ্র সমরেন্দ্র অবনীন্দ্র তিন ভাইকেই অভিনয় করতে দেখেছি। অবনীন্দ্র ছবিতে মানুষের মনের স্নেহ প্রেম করুণা প্রভৃতি গভীররস ফুটিয়ে তুলতেন, কিন্তু অভিনয়ে তাঁকে হাস্যরসটাই সব চেয়ে বেশী খোরাক দিত। গগনেন্দ্র আঁকতেন কার্টুন বেশী, কিন্তু অভিনয়ে রাজোচিত গাম্ভীর্যটাই তাঁকে মানাত। "ফাল্গুনী" অভিনয়ে অবনীন্দ্র শ্রুতিভূষণ সেজেছিলেন। তাঁর গলায় মালা ও হাতে পুঁথি তাঁর পুঁথি পড়ার ভঙ্গীর সঙ্গে অনবদ্য হয়েছিল। এখনও মনে পড়ে "ওহে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ, ফল দিয়া রক্ষা পায় বৃক্ষ" তিনি কি সুরে বলেছিলেন! এই অভিনয়ে পিয়ার্সন সাহেবের একটি ভূমিকা ছিল। বোধহয় সেনাপতি সেজেছিলেন।

হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে অবনীন্দ্রের মন বেশী খুলত বলে বৈকুণ্ঠের খাতায় তিনি 'তিনকড়ি' সেজেছিলেন। তাঁকে দেখে তাঁর মা বলেছিলেন, "তুই এ কি লক্ষ্মীছাড়া সাজ করেছিস্।" অবনবাবুর সঙ্গে সুকুমার রায়ও এই অভিনয়ে একবার নেমেছিলেন। তাঁরা কিছু কিছু স্বরচিত কথা ঢুকিয়ে পরস্পরকে ঠকাবার চেষ্টা করছিলেন।

সে সময় দেশে ভাল কাঠ পাওয়া যেত, তখন অনেক বাড়ীতে বার্ণিশবর্জ্জিত মোমপালিশের আসবাব করার চলন হয়েছিল। অবনবাবুদের বাড়ীতেই আমি প্রথম রংহীন সেই রকম আসবাব দেখেছিলাম। অবন ও গগনবাবুরাই ডিজাইন করতেন আর তাঁদের ধনকোটি বা আচারি নামের একজন মিস্ত্রী সেগুলি তৈরী করত। মাটিতে বসে ছবি আঁকবার জন্য সে একরকম ডেস্ক করত। এখনও বোধহয় শান্তিনিকেতনে সেই রকম ডেস্ক কিছু আছে। ঐ মিস্ত্রী আমার জন্যও একটি ডেস্ক করে দিয়েছিল।

আমাকে অবনীন্দ্র প্রায়ই বলতেন, "আর্টিষ্ট আর সাধারণ মানুষে প্রভেদ এই যে আর্টিষ্ট দেখে, সাধারণ মানুষ দেখে না।" আমরা যে আমাদের আত্মীয় বন্ধু জনের মুখও মন থেকে আঁকতে পারি না, তার কারণ আমরা তেমন ভাল করে দেখি না। জিজ্ঞাসা করলে তার ভুরু চোখ নাক ঠোঁটের বর্ণনা সঠিক দিতে পারি না। আমরা বই পড়ি, কিন্তু অক্ষরগুলো সমস্ত দেখি না, অনেক আন্দাজে পড়ে যাই।

মুলু মূর্ত্তি গড়তে ভালবাসত, কিন্তু তাকে কিছু শেখানো হয় নি, শেখাবার অবসরও মেলে নি। তাই বাবা আমাকে ছবি আঁকতে শেখাতে চাইলেন। তিনি কিছুদিন নন্দলালবাবুকে আমার জন্য শিক্ষক রেখেছিলেন। সেটা অবনবাবুর কাছে শিখতে যাবার আগে। নন্দলালবাবু কতদিকে আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন যা আগে কখনও ভাবি নি। প্রকৃতির সমস্ত জিনিষই যে একটা ধরা বাঁধা নিয়মে চলে আগে তা ভাবতাম না। আমরা ভাবি গাছ এলো-মেলো যেদিকে খুসী বাড়ে, কিন্তু তা নয়, তাদের কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট রূপ আছে, তারা তাই মেনে চলে—কোনোটা গোলাকার, কোনটা ত্রিভুজাকৃতি কোনোটা সূচ্যগ্র, কোনোটা মোটা মাথা এইরকম। কাঠ, পাথর, ধাতুর জিনিস সবের নিজস্ব character আছে। এই রকম নানা জিনিষ তিনি বোঝাতেন এবং সেই বুঝে আঁকতে বলতেন। অজন্তার ড্রয়িং নকল করতে দিতেন কিন্তু নিজস্ব ছবি মন থেকে compose করতে বলতেন। তাঁর কাছে অল্পদিন শেখার পরই তিনি শান্তিনিকেতনে চলে যান।

কিছুদিন শিক্ষা বন্ধ রইল। সেই সময় একদিন Art societyর প্রদর্শনীতে গগনবাবু বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন "মেয়েরা ছবি টবি আঁকে?" বাবা বললেন, "চেষ্টা করে। নন্দলালবাবুর কাছে আঁকত; তিনি ত এখন শান্তিনিকেতনে।" গগনবাবু বললেন, "অবনের কাছে নিয়ে যাবেন।" তারপর অবনবাবুর কাছে অনেকদিন গিয়েছি, আরো কিছু শিখেও ছিলাম। নিজের সময়ের অভাবেই সে চর্চ্চাতে মর্চে পড়ে গিয়েছে।

কলকাতায় একবার একটা প্রদর্শনী হয়েছিল পোড়াবাজারে। নামেও পোড়াবাজার কাজেও পোড়াবাজার। ওই প্রদর্শনীতে আমি অনেকগুলি ছবি দিয়েছিলাম। আগুন লেগে প্রদর্শনী পুড়ে যায়। অন্যদের সঙ্গে আমার ছবিগুলিও অগ্নিদেব গ্রাস করলেন। এই রকম অঘটন আরো ঘটেছিল। গগনবাবু একবার জাহাজ করে ইউরোপে কোথায় যেন ছবি পাঠান। আমার দুটি—অয়েল পেণ্টিং তাঁর ভাল লেগেছিল। আশ্রমের মাটির ঘরের দৃশ্য। গগনবাবু বললেন "ঐ দুটি দাও।" ছবি দিলাম। বোধহয় জাহাজ ডুবি হয়ে এবার সব ছবি জলগর্ভে চলে গেল। বাইরে যা ছবি পাঠাতাম তার মধ্যে রেঙ্গুনে পাঠানো ছবিগুলি ফিরে আসে এবং সেই সঙ্গে আসে একটি bronze medal পুরস্কার স্বরূপ। একসময় ভাবতাম আমি হয়ত ভাল artist হতে পারব। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হল না। মনে করে খুসী হই যে কোনো কোনো ছবির জন্য সমঝদারদের প্রশংসা পেয়েছিলাম। অথচ এখন সামান্য একটা ছবিও আঁকতে পারি না।

বিশ্বভারতীর শৈশবকালে কয়েক মাস শান্তিনিকেতনে ছিলাম প্রধানত ছবি আঁকা শিখতে। আইন কানুন তখনও বিশেষ তৈরী হয় নি। আশ্রম পতির ইচ্ছাতেই বিশ্বভারতীর নানা বিভাগ চলত। বিভাগগুলি এত ছাঁটা কাটা ছিল না। একই মানুষ নানা বিভাগের ছাত্র হয়ে এবং অন্য কাজ করেও সেখানে শিক্ষা এবং আনন্দলাভ করতেন। কলাভবন নামটা তখন চলতি হয়েছিল কিনা মনে নেই। তবে ছবি আঁকার ক্লাশ হত। পিয়ার্সন সাহেবের বাংলোর দোতলায়। সেটা বোধহয় ১৩২৮ কি ২৯ সালে। একটি ছোট আর একটি বড় ঘরে ক্লাশ বসত। বড় ঘরটি ছেলেদের আর ছোটটি মেয়েদের। তার কাছেই নেবুকুঞ্জেই আমাদের বাসস্থান ছিল। সকালে উঠেই নিজের তৈরী ডিমের ওমলেট খেয়ে চলে আসতাম। সারাদিনই প্রায় সেখানে কেটে যেত। তখন একটাকায় ছোট এক টুকরি ডিম পাওয়া যেত। শ্রীমতী হাথিসিং ছিলেন তখনকার একজন ছাত্রী। আর যে সব মেয়েরা আসতেন তাদের মধ্যে শুধু আর্টের চর্চ্চা নিয়ে থাকতেন এমন প্রায় কেউ ছিলেন না বলা চলে। শ্রীমতী একটা ছোট বাড়ীতে এই উপলক্ষেই নিজের একলার সংসার পেতে থাকতেন। সবিতাঠাকুর তাঁর সাংসারিক কাজের উদ্বৃত্ত সব সময়ই আর্টের পিছনে চালতেন। অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে নন্দলালবাবুর কন্যা গৌরী ও যমুনা এবং সন্তোষবাবুর ছোট বোন বাসুকে মনে পড়ে। তাঁরা এই সঙ্গে শিক্ষাভবন বা পাঠভবনে পড়াশুনা করতেন। পড়ার ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে অকস্মাৎ আঁকার ক্লাশে তাঁদের আবির্ভাব হত। শ্রীযুক্তা কিরণবালা সেনের ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক ছিল। কয়েকদিন অন্তর অন্তর একখানা ছবি নিয়ে ব্যস্ত ভাবে এসে হাজির হতেন। এখনও মনে পড়ে প্রদীপ-হাতে একটি মেয়ের ছবি নিয়ে তাঁকে দিনকয়েক দেখতাম। তাঁর সময় ছিল কম, কিন্তু আঁকবার ইচ্ছা ছিল জোরালো। কিছুদিন পরে প্রবাসীতে তাঁর আঁকা "ঘরে বাইরে" নামের একটি ছবি দেখি।

আমাদের ক্লাশ নিতেন নন্দলালবাবু। আগের মতই প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলতেন, যা এখনও মনে আছে। যদি সংসারের তলায় তলিয়ে না যেতাম, ঐ পর্যবেক্ষণের দীক্ষা বড় কোনো কাজে দিয়ে যেতে পারতাম। পৃথিবীর নানা ঐশ্বর্য্যের ভিতর যে রেখা ও রঙের ছন্দ অনুক্ষণ নানাভাবে ফুটে আছে এবং

ফুটে উঠছে, তা দেখবার শক্তি অল্পদিনেই কিছু লাভ করেছিলাম, কিন্তু পরে নানা তুচ্ছতার ধোঁয়ায় সে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে মনে করে দুঃখ পাই।

মাষ্টার মশায়ের তখনকার দিনের ছাত্রেরা অনেকে জীবনে কৃতিত্ব ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছিলেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ও সে সময় আশ্রমে ছিলেন মনে হচ্ছে। যতদূর মনে পড়ে ছেলেদের ক্লাসে দেখতাম রমেন্দ্রনাথ, প্রভাতমোহন, মণীন্দ্রভূষণ ধীরেন্দ্র দেববর্ম্মা, ভি,মাসোজি এবং আরও কয়েকজন। তখন ছেলেরা এবং মেয়েরা আলাদা শিখতেন, কারও সঙ্গে কারুর পরিচয় বিশেষ হত না। দুই একজন আপনা থেকেই পরিচয় করে নিতেন মাঝে মাঝে।

তখন একটা কারখানা ঘর হয়েছিল প্রতিমা দেবীর বিশেষ আগ্রহে। সেখানে বই বাঁধানো, কাঠের পুতুল তৈয়ারী ও রং করা এবং নানারকম সেলাই প্রভৃতি হত। মাসিমা বলে পরিচিতা একজন মহিলা আলপনা ও সেলাইয়ে পাকা ছিলেন। এঁর নাম সুকুমারী দেবী। কাঠের উপর সুন্দর রঙে গালার কাজ নন্দলাল বাবুও করতেন, ছাত্ররা শিখে নিত। এই সময় থেকে ধীরে ধীরে ভারতীয় নক্সা ও সেলাইয়ের কোঁড় দেশে আবার চলতে থাকে। আগে বাংলা দেশে অন্তত সবাই বিলাতী ধরণে ছুঁচের কাজ করত। কিছুদিন কাঠোয়ারী কাজের খুব চলন শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় চলেছিল। কাঁথার কাজ এবং কাশ্মিরী কাজও অনেকে তখন শিখত।

স্মৃতি কথা লিখতে গেলে অনেক সময় আগের কথা পরে এবং পরের কথা আগে মনে হয়। অবনীন্দ্র-নাথের কথা বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছিল। আমাদের কলকাতার বাসার পাশে শশিপদ বন্দোপাধ্যায়ের যে "দেবালয়" ছিল, সেখানে একবার রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ পড়তে এসেছিলেন। সে বোধ হয় বাংলা ১৩১৬ সাল। আমরা ছুটলাম তাঁকে দেখতে। আমার জীবনে এই তাঁকে দ্বিতীয়বার দেখা। এবার সম্পূর্ণ স্বদেশী পোষাক। দেবালয়ের ঘরটি ছোট, কাজেই বাহিরের গলিতে ও সমাজের প্রাঙ্গণে প্রচুর লোক এসে জমে গেল। গলি ও প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটা দেয়াল, লোকদের দৃষ্টিকে বাধা দিচ্ছিল, কিন্তু উপায় কি? প্রবন্ধ পড়ার পরেই শ্রোতাদের গানের অনুরোধ আরম্ভ হল। কবি বোধহয় সঙ্গে গানের খাতা নিয়েই ঘুরতেন। তখনই খাতা খুলে "মেঘের পরে মেঘ জমেছে" গান ধরলেন। গানের শব্দে আরও প্রচুর লোক ভীড় করে এল। বোঝবার বয়স হবার পর এই তাঁকে প্রথম দেখা। এলাহাবাদে যখন দেখি তখন আমরা শিশু। মানুষের চেহারা যে এমন সুন্দর হতে পারে এবং তদুপরি আবার এমন কণ্ঠস্বর আগে তা কখন ভাবিনি। শুভ্র ধুতি পাঞ্জাবী চাদর পোষাক কিন্তু নিখুঁত। ছেলেবেলা ৫।৬ বছর বয়সে এলাহাবাদে তাঁকে যখন আমাদের বাড়ীতে দেখেছিলাম তখন তিনি মোগলাই পোষাকে আসেন।

এর ২।১ বছর আগেই আমরা কলকাতায় আসি এবং তখন "গোরার" কাঁপ নেওয়া ও প্রুফ দেওয়ার জন্ত শান্তিনিকেতনে লোক ছোটাছুটি করতে হত। কাজেই বাবার সঙ্গে কবির পত্রালাপ বেড়ে গেল। সব পত্র রক্ষিত হয়নি। "গোরা" আরম্ভ হয় এলাহাবাদে। বাবা অগ্রিম টাকা পাঠিয়ে কবিকে একটা লেখা দিতে বলেছিলেন।

কলকাতায় বাবা স্থায়ী বাসিন্দা হবার পর রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়ী যাওয়া-আসা সুরু করেন। বাবাও প্রায়ই যেতেন। মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের সরু গলি দিয়ে এই যাওয়া আসা চলত। তখন কবির মোটর গাড়ী ছিল না। তিনি প্রায়ই হেঁটে চলে আসতেন। ফিরবার সময় একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে দেওয়া হত। একদিন তিনি প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক চারুবাবুকে বললেন, "চারু, দেখত হে, একটা যান বাহন কিছু পাও কিনা।" চারুবাবু অনেক কষ্ট করেও একটা নীচু চাল দেওয়া থার্ড ক্লাস গাড়ী ছাড়া কিছু যোগাড় করতে পারলেন না। তাঁর লজ্জিত

বিব্রত মুখের ভাব দেখে রবিবাবু বললেন, "কি আর হয়েছে? এ ত বিনয় শিক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়।" এই বলে তিনি মাথা নীচু করে গাড়ীতে উঠে পড়লেন। এইরকম বিনয় শিক্ষা তাঁকে মাঝে মাঝে অন্য জায়গাতেও করতে হত। একবার তিনি মহলানবিশ মহাশয়ের বাড়ীতে একটা ছোট ঘরে ঢোকবার সময় মাথাটা নীচু করে তবে ঢুকতে চেষ্টা করলেন। মহলানবিশ মশায় বললেন, "আমি ত আর জানতাম না যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র কোন দিন আমার বাড়ীতে আসবেন। তাহলে দরজাগুলো আরও একটু উঁচু করতাম।" তিনি আশ্রমের ছাত্র দুলার অসুখ শুনে দেখতে এসেছিলেন।

এর পর রবীন্দ্রনাথকে কতবার দেখেছি, কিন্তু তা ডায়েরীর মত লিখে রাখিনি। পুরাকালে যখনই রামমোহন স্মৃতিসভা হত সিটি কলেজের পুরানো বাড়ীতে তখনই রবীন্দ্রনাথ আসতেন, এত লোক হত যে নীচের তলায় Overflow meeting করতে হত। সেই সব সভায় কয়েকবার এক অতিবৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলতে শুনতাম—তিনি রাজা রামমোহন রায়কে দেখেছিলেন। খুব দ্রুত "বাবু অথবা বাবুমশায়" বলে তাঁর বিষয় অনেক কথা বলে যেতেন, বোধহয় প্রতিবারই একই কথা, আজ তার ভাবার্থও মনে নেই।

রামমোহন লাইব্রেরী এবং পরে Madan প্রভৃতিতে বর্ষামঙ্গল হত কয়েক বছরই দেখেছি, তার ফর্দ দিয়ে লাভ নেই। এই সব বিষয়ে অনেক মানুষই অনেক কথা লিখেছেন, পুনরুক্তি করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছু হবে না। জোড়াসাঁকোর বিচিত্রার বাড়ীতে কবিকে যখন তুলাদানের জন্য তাঁর বইএর সঙ্গে ওজন করা হয়েছিল তখনকার কথা কেউ লিখেছেন কিনা জানি না। সেই সভাতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সুন্দর কবিতা পড়েছিলেন। মনে আছে,

"চির নবীনতা শিশুশশী সম অঙ্কিত ভালে যাঁর।
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের চরণে নমস্কার।"

কবির দিদিরা দুই তিন জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, বোধহয় সৌদামিনী এবং শরৎকুমারী। তাঁদের উজ্জল গৌরবর্ণ এবং লক্ষ্মী প্রতিমার মত চেহারা দেখে মনে হল কুন্তলীনের একটি বস্তু বোধহয় এই সৌদামিনীকে দেখেই লিখেছিলেন—

"সৌদামিনী সরলার শ্রীকরকমলে
হতমান ল্যাভেণ্ডার, কাঁদে ম্যাকাসার।"

অবশ্য সৌদামিনী গুপ্ত সেকালে একজন নামকরা মহিলা ছিলেন। সরলা ছিলেন ডাক্তার পি কে রায়ের পত্নী।

মণিকা মহলানবিশের বাড়ীতে সমাজপাড়ায় এবং পরে পার্ক ষ্ট্রীটে রবীন্দ্রনাথ কখনও কিছু পাঠ করতে কখন বা শুধু নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। আমারও নিমন্ত্রণ থাকত। একবার মহারাণী সুচারু দেবীও সেই সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি যদিও পোষাক-পরিচ্ছদে হিন্দু বিধবার মত ছিলেন, কিন্তু কথা বলতেন খুব হাসিয়ে হাসিয়ে। মণিকা দেবী আরও একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। মহারাণী আমার সঙ্গে এমন করে কথা বলতেন যেন আমি তাঁর সমবয়সী।

বোধহয় আমার বিবাহের কিছুদিন আগে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা মঞ্জুশ্রী ও ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। সেই বিবাহে রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করেন। আমার বিবাহে রেজিষ্ট্রী হবে না বলে বাবার ও নেপালবাবুর ইচ্ছা ছিল যে রবীন্দ্রনাথকে এই বিবাহেও পৌরোহিত্য করতে বলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই কলকাতায় এসে বিবাহ দিতে রাজী হলেন না। বললেন, "শান্তার বিবাহ শান্তিনিকেতনে দিন, তাহলে আমি পৌরোহিত্য করব।" কিন্তু আমার মা অসুস্থ ছিলেন বলে শান্তিনিকেতনে যাওয়া হল না। তারপর বোধহয় আমরা ক্ষুণ্ণ হয়েছি মনে করে একদিন আশীর্ব্বাদ করবেন বলে আলিপুরে প্রশান্ত মহলানবিশের বাড়ীতে, আমাদের ডেকে পাঠালেন। সেখানে দেখলাম পুরোপুরি বিবাহের আয়োজন। বরণ করারও ব্যবস্থা আছে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের মুখোমুখি বসিয়ে বিবাহের মন্ত্রাদি সব পড়ালেন। বলতে গেলে লোক নিমন্ত্রণ করা ছাড়া আর প্রায় সব অনুষ্ঠানই হয়েছিল। এদিকে কলকাতায় আমার বিবাহের দিন স্থান ও পুরোহিত ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই নির্দিষ্ট দিনে আবার মন্ত্রাদি পড়িয়ে ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয় পৌরোহিত্য করে বিবাহ দিলেন। বিবাহের পৌরোহিত্য করা নীলরতনবাবুর জীবনে বোধহয় এই প্রথম ও শেষ।

বিবাহের পর আমরা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলাম। তাকে অবশ্য ঠিক ফ্ল্যাট বলা যায় না—একতলায় একটা, দেড়তলায় একটা, তিনতলায় দুটো এবং চারতলায় দুটো ঘর নিয়ে সেই ফ্ল্যাট ছিল। চারতলায় ঘর ছিল টালি দিয়ে ঢাকা। বাবা কিছুদিন আমার এই বাসাবাড়ীতে এসে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "শান্তা কি নিজের বাবার চেয়ে একটু দূর সম্পর্কের কাউকে নিমন্ত্রণ করতে পারেন না?" কিন্তু বাড়ীটা এমনই অদ্ভুত ছিল যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করার সাহস আমার হয় নি।

সেই সময় হিন্দু মুসলমানে খুব দাঙ্গা চলছিল। বাবা রাস্তা দিয়ে রোজ হেঁটে দাদা ও অশোক দের দেখতে যেতেন, প্রবাসী অফিসেও যেতেন। বাবার দাড়ি ছিল বলে সাধারণ লোকে কেউ কেউ বাবাকে মুসলমান মনে করত। তাই একজন বৃদ্ধা প্রায়ই বাবাকে সাবধান করে দেবার জন্য বলত, "বাবা, তুমি বুড়ো মানুষ, কোনদিন কার হাতে মারা পড়বে,অমন করে পথে বেরিও না।" বাবা অবশ্য রোজই বেরতেন। আমিও মাকে দেখবার জন্যে রোজ বেরতাম। সে সময় অশোক আর ডাঃ নাগ দুজনে দুটো বন্দুক কিনেছিলেন গুণ্ডাদের ভয়ে। আমি আশ্রমে থাকতে সন্তোষবাবুর কাছে বন্দুক ছোঁড়া শিখতে চেষ্টা করতাম কিন্তু পারতাম না। সুতরাং বন্দুক থেকেও আমার লাভ ছিল না। ডাঃ নাগ আমারই মত আনাড়ী ছিলেন। দুবাড়ীতে দুটো ভীষণ ধারালো এবং বড় কুড়োল ও কেনা হয়েছিল। ভৃত্যরা সময় বুঝে তা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে ছিল।

আমার বিবাহের কিছুদিন অর্থাৎ ৭।৮ মাস পরে অশোকের বিবাহ হল নীলরতন বাবুর ছোট মেয়ে কমলার সঙ্গে। বিবাহের সময় সীতা ছিলেন রেঙ্গুনে। তাই তাঁকে একটা চিঠিতে বিবাহের বর্ণনা দিয়েছিলাম। তার থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি। আশা করি কিছু অশোভন হবে না।

"শনিবার ২৮ শে নভেম্বর সকাল বেলা মার খেয়াল হল যে ক্ষুদুকে আমার স্নান করিয়ে দিতে হবে এবং ওকে শাঁখ বাজাতে হবে। সকাল বেলা সে সব একপালা হল, তারপর ক্ষুদুকে সন্দেশ লেবুর সরবৎ ও অন্যান্য ফল কিনে খাওয়ালাম। ও সেদিন ভাত ইত্যাদি খেল না। ওকে যেদিন আইবুড়ো ভাত দিয়েছিলাম, সেদিন তোমার দেওয়া ধুতি পরেছিল, বিয়ের দিন সকালে আমার দেওয়া ঢাকাই ধুতি পরল, আমার **hair lotion** মাখল এবং আমার দেওয়া সন্দেশ খেল। দুপুরবেলা বৌঠান বাপের বাড়ী থেকে এ বাড়ী এলেন। তারপর আমরা একতলার ঘরে বরযাত্রীদের জায়গা করলাম। ফরাস এবং চেয়ার দুই রকমই ছিল। খাবারের মধ্যে খুব ভাল দুটো কেকও আনিয়েছিলাম, সেটা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। বরযাত্রীরা বেশীর ভাগই— ক্ষুদুর বন্ধু। বড়দের মধ্যে ছিলেন অবনবাবু, গগনবাবু, সমরবাবু তিনভাই, আমার মামাশ্বশুর মশাই, পুলিন-বিহারী দাস ইত্যাদি কয়েকজন। মেয়েরা খুবই কম।

রথীঠাকুর মশায়ের গাড়ীটা বর পাঠানোর জন্য আনিয়ে রেখেছিলাম। সেটা চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি ফুল দিয়ে অল্প একটু সাজানো হল। বরের গাড়ীতে নিতবররূপে হাবল (সান্যাল) বিকট একটা কালো কোট পরে বসল। খুকু অভিভাবিকা হয়ে সবুজ বেনারসী এবং একগা গয়না পরে হাবলের কোলে বসলেন। ড্রাইভারের পাশে সজনী (দাস) ছিল। ক্ষুদুকে তার ভগ্নীপতি চন্দন পরিয়ে দিলেন।

মোটর, বস, ট্যাক্সি ও প্রাইভেট গাড়ী ইত্যাদি নিয়ে রওনা হওয়া গেল। লাউডন ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছে

দেখি, কনের বাড়ীর গাছপালাতে হাজার হাজার electric light জ্বলছে। আমরা বর নিয়ে নামবা মাত্র মত্ত মত্ত তুবড়ি জ্বালিয়ে দিল। পথঘাট যা সাজিয়ে ছিল ভীষণ। ওদের বাড়ীর সকলের বিয়ের চেয়ে এই ছোট মেয়ের বিয়েতেই বেশী ঘটা হয়েছিল।"

কনে তোলা বৌভাত ইত্যাদির বর্ণনা আর দিলাম না। বৌভাতের পর দুজনে দার্জ্জিলিং চলে গেল। বৌভাতে বাঁকুড়ার রাঁধুনিরা ভালো রান্না করেছিল সবাই বিশেষত দিছুঠাকুর খুব প্রশংসা করলেন।

এই বিবাহের কিছুদিন পরে League of Nations এর পক্ষ থেকে অতুল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাবাকে জেনিভা যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তখন বাবা আমার কাছে ছিলেন। বাবা ছিলেন নিরামিষাসী-পাছে ও দেশে অনাহারে থাকতে হয়, তাই আমরা তাঁকে রোজ ডিম খাওয়া অভ্যাস করাতাম। এলাহাবাদে থাকতে বাবাকে সাহেবরা নিমন্ত্রণ করলে তিনি প্রায়ই শুধু কড়াই সুঁটি সিদ্ধ আর আলুসিদ্ধ খেয়ে বাড়ী ফিরতেন। ইউরোপে ও নিরামিষ রান্না Lard দিয়ে করত বলে তিনি খেতে পারতেন না। তাঁর যৌবন-কালে যখন তিনি মাছ খাওয়া ছেড়ে দেন, তখন আমার ঠাকুরমা মাছের ঝোল থেকে মাছটা তুলে নিয়ে বাবাকে খেতে দিতেন। যাতে একটু পুষ্টি যেন তাঁর হয়। বাবা বুঝতে পারতেন কিন্তু তাঁর মা দুঃখ পাবেন বলে কিছু বলতেন না। এলাহাবাদে আমরা যখন ছিলাম তখন মাছ প্রায় পাওয়াই যেত না। কাজেই আমরা সকলেই প্রায় নিরামিষ খেতাম। আমরা অবশ্য মাছ পেলে বাবাকে বাদ দিয়ে আর সবাই খেতাম। ইলিশ মাছের সময় ওখানে খুব বড় বড় ডিম ভরা ইলিশ পাওয়া যেত। বিদেশ থেকে আগত আমাদের বাড়ীর অতিথিরা অনেক সময় ইলিশ মাছ কিনে ডিমগুলি কেটে আমাদের দিয়ে মাছগুলি বাড়ী নিয়ে যেতেন। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় এটা খুব ভালবাসতেন।

বাবা জেনিভা থেকে খুব অসুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। সেখানে ট্রেনে হিটিং যন্ত্র করে দেওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে তাঁর নিউমোনিয়ার মত হয়েছিল। এই সময় ডাঃ রজনীকান্ত দাস ও তাঁর ইউরোপীয় পত্নী সোনিয়া বাবার খুব সেবা যত্ন করেছিলেন। ইউরোপীয় নার্স যে সব কাজ করতে চাইত না, সোনিয়া স্বয়ং তা করে দিতেন। সোনিয়া চিরদিনই বাবাকে খুব ভক্তি করতেন। তিনি বলতেন, "Ramananda Babu, you are India to us" রজনীবাবু পরে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কাজ করে ছিলেন। বাবাও তখন শান্তিনিকেতনে।

বহু বৎসর পরে আমরা যখন তিন কন্যা নিয়ে জেনিভা হয়ে আমেরিকা যাই তখন জেনিভায় একটা হোটেলে হঠাৎ সোনিয়া ও রজনীবাবুকে দেখি। তাঁরা আমাদের অকস্মাৎ দেখে খুব খুশী হন। League of Nations এর বাড়ী ঘুরে ঘুরে দেখান। জেনিভার লেকের ধারে বসে আইসক্রীম খাওয়ান। সোনিয়া মেয়েদের বললেন, "আমেরিকা গিয়ে কখ্খনো ইউরোপীয় পোষাক পোরোনা, ওরা নিগ্রো বলবে।"

আবার পুরাতন কথা মনে পড়ছে। বিবাহের পর জীবনের পথে আর একটা মোড় ফিরে গেলাম। নূতন কত মানুষ কাছে এল পুরাতন অনেকে দূরে পড়ে রইল। স্কুল কলেজের যে সব বন্ধু এত প্রিয় ছিল, জীবনে তাদের অনেককে আর দেখিই-নি। এ যেন আর একটা নূতন জীবন। নানা নূতন ধরণের দুঃখ ও সুখ জীবনকে ঘিরে ধরতে লাগল। সুখের বিষয় বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন বাবার সঙ্গে যোগ কখনও ছিন্ন হয়নি। বাবা কলকাতায় ও ঘাটশিলায় আমার বাড়ীতে আমার কাছে কতবার থেকেছেন। নানারকম অসুবিধা হলেও বাবা গ্রাহ্য করতেন না। কলকাতায় চারতলায় থাকা পর্যন্ত অনায়াসে অভ্যাস করে নিয়েছিলেন। লোকের সঙ্গে দেখা করতে হলে প্রতিবারই নীচে নেমে আসতেন। কিন্তু আমরা কাছে ছিলাম বলে বাবা আনন্দেই ছিলেন।

ঘাটশিলা তিনি বিশেষ করে ভালবাসতেন। তাছাড়া সেখানে গেলে তাঁর দুই মেয়েও পাঁচ দৌহিত্রীকে

কাছে পেতেন। সেটাও তাঁর একটা আনন্দ ছিল। যেদিন ঘাটশিলা ছেড়ে কলকাতায় ফিরতেন, সেদিন বাবার মন এত খারাপ হত যে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আর আমাদের দিকে ফিরে তাকাতেন না। পিছন ফিরেই গাড়ীতে উঠে যেতেন। আমাদের বোধহয় তখনকার মত ভুলে যেতে চাইতেন।

ছেলেবেলা আমাদের স্কুলে রেখে আসতে বাবার যে রকম মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, অনেক বয়সেও আমাদের ছেড়ে যেতে তাঁর সেই রকমেই খারাপ লাগত মনে হয়। যখন আমি অন্য বাড়ীতে থাকতাম বাবা ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট অথবা পার্ক ষ্ট্রীট থেকে হেঁটে পার্ক-সার্কাস পর্য্যন্ত এসে প্রায়ই আমাদের দেখে যেতেন। সীতা বহুদিন রেঙ্গুনে ছিল, সেটা বাবার খুবই কষ্টের কারণ ছিল। নিজের নাম করে কখন কিছু বলতেন না। কিন্তু যদি আমাদের কখনও বিদেশে যাবার কথা হত বাবা বলতেন "যতদিন তোমার মা আছেন কলকাতার বাইরে চলে যেও না।" সেই জন্য বাইরে ভাল কাজের সম্ভাবনা থাকলেও ডাঃ নাগকে আমি বাইরে যেতে বারণ করতাম। একলা অবশ্য তিনি বহুবার বিদেশে যেতেন কিন্তু আমি মা থাকতে কোথাও যাইনি। মা চলে যাবার পর আমি জাপান গিয়েছিলাম। ফেরবার সময় আমার সঙ্গী ছিল মাত্র আমার দশ বছরের মেয়ে।

জীবনের পথে চলতে চলতে যাত্রা পথের যে সব সুর মনে বেজেছিল তারই কিছু কিছু প্রতিধ্বনি এই পাতা-গুলিতে ধ্বনিত হয়েছে। অনেক আনন্দ ও গভীর বেদনার সুর দশজনের কাণের জন্য নয়, তা যার মনে বেজেছিল শুধু তারই জন্য রইল তবু অনেক সুর ও ছবি নানা দিকে ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যায়। সব ধরা দেয় না। তাছাড়া প্রথম জীবনের কথা মানুষের কাছে সদ্যফোটা ফুলের মত প্রাণবন্ত থাকে, পরে আর সেরূপ থাকবেনা। ভ্রমণ অনেক লিখেছি, ঘুরেওছি বহু দেশে দেশে, কিন্তু সে সবই অন্য রকম জিনিষ, যেন পূর্ব্বজন্মে সবই দেখেছিলাম। প্রথম জীবনে সবই নূতন চোখে দেখতাম।

সমাপ্ত

আমার গ্রামের কথা

কানাইলাল দত্ত

খ্যাতিহীন বৈশিষ্ট্যহীন বর্ণহীন একটি অতি সাধারণ দরিদ্র পল্লীতে আমার জন্ম। সেখানেই আমার বাল্য কৈশোর ও যৌবনের অনেকগুলি দিন কেটেছে। অমন একটা বিত্ত-বৈভব-গৌরবহীন গ্রামে জন্মগ্রহণ করার জন্য আমি আমার ভাগ্যবিধাতাকে অভিসম্পাত করেছি। বিধাতাপুরুষ বোধহয় তারই শোধ তুলে নিয়েছেন আমাকে জন্মভূমির আশ্রয়চ্যুত করে।

গ্রাম ছেড়ে আমার দুঃখ ও বেদনার ভার দুঃসহ। তবু তা বইতে পেরেছি এই ভেবে যে, এই বিচ্ছেদ সাময়িক। আমার মর্মপীড়ার প্রায়শ্চিত্তে বিধাতার রুদ্ররোষ শান্ত হবে আর ইতিহাসের নিয়মে মানুষ তার শুভ বুদ্ধি আবার ফিরে পাবে, ভাঙা বাঙলা জোড়া লাগবে, আমরা দেশে ফিরে যাব। আজও সে-স্বপ্ন সফল হয় নি। তবু আশা ছাড়ি নি। নিরাশ হবার কারণও ঘটেনি। ফিরে আমরা যেতে পারবই এ বিশ্বাস এখনও পোষণ করি।

আমার গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ—যাদের প্রত্যেককে আমি চিনতাম, কেবল আমি নই, সকলে সকলকে চিনতেন জানতেন—তারা আমার চোখের সামনে ছবির মত ফুটে রয়েছেন। সেখানকার প্রতিটি তরুলতা, পশু-পক্ষী মাঠ ঘাট বন বিল আজও আমার সমগ্র চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাঁদের সঙ্গ বর্জিত হয়ে আমি যন্ত্রণা-কাতর জীবন যাপন করি। কিন্তু আমার সে ব্যথা বেদনা যত তীব্রই হোক না কেন তা তো একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। উচ্চরবে পাঁচজনকে ডেকে জাঁক করে তা শোনাতে গেলে হাসি-তামাসার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা করি। আশঙ্কা-আতঙ্কিত মানুষ স্বাভাবিক হতে পারে না। তার বিকাশ হয় বিঘ্নিত ও প্রকাশ কুণ্ঠিত। তাই এই লেখায় আমার গ্রামের সত্য-স্বরূপ প্রকটিত হবে বলে ভরসা করি না।

আমার গ্রামের জন্য আমার এই মন পোড়ানি নিয়ে অনেকেই উপহাস করেছেন। কেউ বলেন এ এক রকম ব্যাধি, মানসিক ব্যাধি। আবার কেউ বা বলেন ভাবালুতা। তর্ক করি না। তবু তারা ছাড়েন না; তাঁদের বক্তব্য যুক্তি দিয়ে না বুঝিয়ে শান্তি পান না! তাঁরা যা বলছেন সেটাই একমাত্র সত্য একথা না স্বীকার করে আপনার রেহাই নেই। আমার এক বিত্তশালী আত্মীয় এই রকম একটি আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেন: সোনা দিয়ে গয়না গড়ালে খানিকটা খাদ তাতে দিতেই হয়। খাঁটি সোনায় গয়না হয় না। তার ধারণা গ্রামকে আমরা ভালবাসি ওটা উন্নতির সহায়ক বলে। ভালবাসার মধ্যে এই বিচার না থাকলে সে মানুষ সব কাজের বা'র হয়ে যায়। এতে যে মিথ্যাচার হয় সেটা কোন ধর্তব্যের মধ্যেই তিনি আনেন না। যে মিথ্যা আমার উন্নতির সহায়ক অথচ অপরের কোন ক্ষতি করে না সেটা ঐ সোনার খাদ—আজকের পৃথিবীতে এ না হলে চলেই না, টিকে থাকা যায় না। প্রতিবাদ করা নিরর্থক। কিন্তু তাঁকে আমার গ্রামের পুরোহিত ঠাকুর মশাইয়ের গল্প শুনিয়েছিলাম। ঠাকুর মশায়কে তিনি চিনতেন, জানতেনও বিশেষ করে। গল্পটা শুনবার পর আর কোন কথা না বলেই তিনি উঠে পড়েছিলেন। সেই গল্পটা দিয়েই আমার গ্রামের কথা শুরু করি।

একশো তিন ঘর হিন্দুর বাস ছিল আমার গ্রামে। ঠাকুর মশায় ছিলেন গ্রামের একমাত্র পুরোহিত ও শিক্ষক। তিনি আমারও প্রথম শিক্ষাগুরু। ইনি ইংরেজি জানতেন না। তথাপি আমার বুদ্ধি-বিবেচনায় তিনি একজন খাঁটি মানুষ ও আদর্শ কুলপুরোহিত এবং

শিক্ষক ছিলেন। এই মহৎগুণ অতিক্রম করে উদ্ভাসিত ছিল তাঁর সত্যাশ্রয়ী জীবন। তিনি হাটে-বাজারে কোনো দিন কোন জিনিস দর দস্তর করে কিনতেন না। আমাদের ও অঞ্চলে একদামে কেনাবেচা ছিলই না। বিক্রেতা চাইতেন সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করতে, ক্রেতা চাইতেন সবচেয়ে কমদামে কিনতে। এর জন্য দরকষাকষি চলতো খুব। লাভ লোকসান যাই হোক না কেন, এর ফলে যে অবিশ্বাস সন্দেহ ও অসত্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয় তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। আমরা কিশোর বয়সে পণ্ডিতমশায়ের দর দস্তর না করে কেনাকাটা দেখে অবাক হতাম। অনেক সময় ভেবেছি লোকটি কী বোকা। যে মাছটা তিনি এক টাকা দিয়ে নিয়ে গেলেন আমি হলে নির্ঘাৎ চৌদ্দ আনায় ওটা কিনতে পারতাম। কিন্তু বড় হয়ে দেখলাম পণ্ডিত মশাইকে সকল বিক্রেতাই সেরা জিনিসটি দেন; মাল খারাপ থাকলে বলেন—তোমায় কাছে বেচব না। বাজার দর থেকে বেশি দাম তো কখনই নিতেন না বরং দু'এক পয়সা কম নিতেন। গোড়ার দিকে অর্থাৎ তাঁর জীবনের প্রারম্ভকালে লোকসান দিতে হয়েছিল কি না বলতে পারব না। তবে জ্ঞান হবার পর আমরা কোন দিন দেখি নি যে কেউ ঠাকুরমশায়কে ঠকিয়ে নিয়েছেন। সত্যাশ্রয়ী জীবন ও সর্বজনীন বিশ্বাসের ফল শেষ পর্যন্ত যে সর্বাবস্থাতেই সর্বদাই কল্যাণকর হয় আমার গ্রামের আমার প্রথম শিক্ষাগুরুর বাজার করা দেখে আমরা শিখেছি। গ্রামের বাইরে এ শিক্ষা বোধহয় অসম্ভব।

আমার গ্রামে দারিদ্র্য ছিল, দুঃখ ছিল, ছিল কলহ এবং নীচতাও। কিন্তু সব ছাড়িয়ে উঠেছিল আত্মতৃপ্ত মানুষের স্থৈর্য, ধৈর্য ও আন্তরিক সমবেদনা এবং সামাজিকতা। এরই সামান্য একটু বলি।

আমাদের ও-অঞ্চলের সব গ্রামেই যেমনই হোক একটা হরি সংকীর্তনের দল থাকত। একটি মৃদঙ্গ ও একজোড়া করতাল ছাড়া আর কোন যন্ত্র বা উপচার প্রয়োজন হতো না। আমাদের গ্রামের দলটির নায়ক ছিলেন কেলা শীল। তাকে আমরা কেলা কাকা বলে ডাকতাম। তিনি আমাদের চুল কাটতেন। কিন্তু কীর্তনের আসরে তিনি ছিলেন সবার আগে—সব থেকে বড় মালাটি ছিল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। তিনি চলতেন আগে আগে আর সকলে তার পেছনে—পল্লীর সংকীর্ণ পথে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে সেই নগর সংকীর্তন দলের সঙ্গী হবার যে কি দুর্বার আকর্ষণ তা আজকের ছেলেরা কিছুতেই বুঝতে পারবেন না।

অচ্ছুৎ যে একটা সমস্যা সেটা জানতে আমাদের সময় লেগেছিল। গ্রামে দশ দশের বারুই বা চুনারি ছিল। বাঁশ থেকে ডালা কুলো ঝুড়ি বানাতো, পূজা পার্বণে ঢাক বাজাতো আর এক রকম লম্বা লম্বা সামুদ্রিক শামুক পুড়িয়ে চুন তৈরী করতো। এ চুন সাধারণত পান খাবার জন্য বিক্রী হতো। ওদের কাছ থেকেই গুঁড়ো চুন কিনে খেলে দোষ নেই, কিন্তু জল দিয়ে তৈরি করা চাংড়া চুন বর্ণ হিন্দুরা স্পর্শ করতেন না। আমরা বড় হয়ে গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা-নিবারণ কর্মসূচি সম্পর্কে যখন সচেতন হলাম তখন এই কেলা শীল অনেকের অনেক ধমকানি উপেক্ষা করে আমাদের আশ্বাসে চুনারিদের চুল দাড়ি কাটতে সুরু করলো। প্রথম প্রথম ওদেরই কুণ্ঠা দেখেছি বেশি। ছোঁয়াছুঁয়ির বাছবিচার ছিল, অথচ ঘৃণা ছিল না, অপমান ছিল না —একথা বললে আজ বিশ্বাস হবে না অনেকের কিন্তু তা সত্যিই আমার গ্রামে ছিল।

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অপূর্ব প্রকাশ আমি আমার গ্রামে দেখেছি। জীবনের প্রারম্ভকাল থেকে ও নানা দৈনন্দিন কাজের মধ্যে এর স্বীকৃতি না থাকলে মানুষ ইচ্ছে করলেই বিশ্বাসবান ও শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না। সেই শিশু-জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ কাজের সূচনা হয় নানা উৎসবের মধ্য দিয়ে। এ গুলি আমার জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। একটি অতিশয় আনন্দময় পবিত্র উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা তালপাতা ছেড়ে কাগজে লিখবার অধিকার পেয়েছিলাম। শীতের এক সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে

স্নান করে ঠাকুরমশায়ের নারায়ণ-মন্দিরে আমরা সমবেত হয়েছিলাম। পূজার পর ঠাকুরমশাই সকলকে এক টুকরো কাগজ দিলেন। সেই কাগজে কঞ্চির কলম দিয়ে ঠাকুরের নাম লিখেছিলাম। কাগজখানাকে পুকুরের জলে ডুবিয়ে দিতে হলো। ঠাকুরের নাম লেখা কাগজে পা লাগলে পাপ হবে—অতএব ঐ সাবধানতা। পুরোহিত-পত্নী সকল ছাত্রকেই কিছু না কিছু খাইয়ে দিতেন। দক্ষিণা ছিল একটি সিধে এবং নগদ কিছু পয়সা। এই সামান্য অনাড়ম্বর উৎসবে যে শ্রদ্ধা ও শুচিতা ছিল তা আমার জীবনে আজও কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। ঐ সময়কার আরো অনেক জনের 'পরে অনুরূপ প্রভাব আমি দেখেছি। সকাল সন্ধ্যায় পড়তে বসার সময় বই খাতাপত্র মাথায় ঠেকিয়ে খোলা বা কাগজপত্রে পা লাগলে নমস্কার করা—এ সবের এমনিতে কোন দাম নেই। কিন্তু শ্রদ্ধা যে জ্ঞানলাভের উপায় তা তো আমরা স্বীকার করি। সে শ্রদ্ধা অর্জন করার এর চেয়ে সহজ আর তো কোন উপায় দেখি না। আমার গ্রামের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র সকলের গৃহেই ছোট্ট একটি ঠাকুরের ছবি থাকত। নেহাৎকল্পে প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীব্রতকরতেন না এমন গৃহস্থ ছিলনে না। এর ফলে সকলের বাসগৃহ, আর কিছু না হোক, মন্দিরের পবিত্রতা লাভ করেছিল। সকাল সন্ধ্যা বসে যাঁরা পূজা প্রার্থনা করবার অবকাশ পান না বা প্রয়োজনবোধ করেন না তাঁদের কথা যাক। কিন্তু প্রায় সব বাড়িতেই দেখেছি ঐ বিগ্রহসেবার জন্য বাইরের শুচিতা রক্ষা করে চলবার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেছেন। বাইরে শুচিতা থাকলেই যে মানুষের অন্তরটা শুচিস্মিত হবে তার অবশ্য কোন মানে নেই। কিন্তু ভেখ থাকলেই তো ভিখ মেলে। অর্থহীন অনুবর্তন হয়তো একদিন অর্থবহ হয়ে দেখা দেয়। এর ফলেই গ্রামের বড় চাকুরিয়া ও স্কুল কলেজের শিক্ষক প্রতিবেশিরা বৎসরান্তে পূজাবকাশে বাড়ি এলে নিরক্ষর গুরুজন পড়শিকেও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। এটা আজ অনেকে অপ্রয়োজনীয় বলেন বটে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করতে পারি নি। আমার গ্রামেও প্রণাম না করনে-ওয়ালা দুই চার জন হয়ে উঠেছিলেন শেষের দিকে। তাঁরা কেউই বিশেষ হতে পারেন নি কোন দিক থেকেই। ও কথা যাক। সব গ্রামেই ও রকম দু-চার জন থাকেন। অন্ধকার না থাকলে আলোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ ঘটে না। তাই সমাজে ওদেরও প্রয়োজন রয়েছে। পূজার কথা থেকে আর একটি আনন্দময় স্মৃতি মনে পড়ছে। দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে প্রবাসী সকলেই বাড়ী ফিরে আসতেন। ছুটি আরম্ভ হবার তিন চার দিন আগে থেকে লোক আসা আরম্ভ হতো। আমরা প্রত্যেকের জন্য কি আগ্রহই না বোধ করতাম। যদি কোন কারণে কারো আসা বন্ধ হয়ে যেতো তা যেন সারা গ্রামের দুঃখের কারণ হয়ে পড়তো।

গ্রামের পারস্পরিক প্রীতি মধ্যে মধ্যে নানা ছোট-বড় কারণে ক্ষুণ্ণ হতো। খুলনা-কলকাতা রেলপথ গ্রামটাকে দুভাগ করে দিয়েছে। এই দুভাগের মানুষ কেমন করে দলে পরিণত হয়েছে। সব বিষয়ে তাদের রেষারেষি, ঝগড়া দ্বন্দ্ব মারামারিও ঘটতো। পশ্চিম পাড়ায় লোক বেশী, কিন্তু অর্থ ও বিদ্যাবিত্তায় পুব পাড়ায় তার বেশী। অতএব কেউ কারো কাছে হটে আসে না। মধ্যে মধ্যে কোন কোন বড় ব্যাপারে মিলও হয়ে যায়। পুব পাড়ার ভেতরের রাস্তা দিয়ে পশ্চিম পাড়ার বরের পাল্কী যেতে দেওয়া হবে কি না তাই নিয়ে একবার বেদম মারামারি হয়ে গেল। অনেক দিন ধরে তার জের চলেছিল। তবে কোর্ট কাছারি থানা-পুলিশ কেউ করে নি। মিথ্যা অভিমান একদিন আপনা থেকে ঝরে পড়ে গিয়েছিল।

গ্রামের অধিকাংশ গোলমাল সালিশ ডেকে মেটানো হতো। এই সালিশ খুব বিচক্ষণ হতেন। অনেকে নিরক্ষরও ছিলেন। এক দুই মানুষ ছাড়া আর কেউ তাদের বিচারে বিশেষ অসুখী হতেন না।

গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে ওঅঞ্চলের সবচেয়ে বড় বিল—বিল ডাকাতিয়া। আমরা বলতাম ডাকাতের বিল কয়েক মাইল চওড়া জলাভূমি। গ্রামপ্রান্তে ওই বিলের কিনারায় আমরা মধ্যে মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতাম। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কিছুক্ষণ এখানে চুপচাপ থাকলে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির বিশালতা ও নিজের ক্ষুদ্রতা সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। বিলের বুকে একমাত্র যান ছিল তাল গাছের ডোঙ্গা। অভ্যাস না থাকলে তাতে চড়া যায় না। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তার সওয়ারি হয়েছি। জীবন সেখানে নিরাপদ নয়, মৃত্যুকে মুখোমুখি দেখা যায়। আর ঐ দর্শনের সৌভাগ্য ফলে মানুষ একদিকে যেমন দুর্জয় সাহসী হয় অন্যদিকে তেমনি প্রসন্ন ও উদার হয়। গ্রামের যে কোন মানুষ আমার একথা স্বীকার করবেন বলেই আশা করি।

এ বিল ও তার সীমান্তবর্তী এলাকায় কিছু কিছু জমিতে ধান চাষ হতো। বিলে ছিল প্রচুর মাছ ও বুনো হাঁস। এই ছিল অধিকাংশ মানুষের জীবিকার সংস্থান। কিন্তু ওতে পেট চলে না। জমি-জমা বিকে-বেচে অনেকে নিঃস্ব হয়ে বসলো। বড়লোকেরা ঠকিয়েও নিয়েছিল অনেককে। এই নিয়ে গ্রামে মনকষাকষি চলতে থাকে। ফজলুল হক সাহেবের ঋণ-সালিসী বোর্ড আইনের দৌলতে সে যাত্রা আমার গ্রাম সামলে উঠেছিল। যুদ্ধ অনেকের পক্ষে আশীর্বাদ-স্বরূপ হয়েছিল। বহুজনে এই সময় প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যোগদান করেন এবং সহায়ক কাজকর্মের দ্বারা জীবিকাও নির্বাহ করতে সমর্থ হন। অনাহারক্লিষ্ট পরিবারদের দুবেলা দুমুঠো অন্ন জুটেছিল এইভাবে। এর মধ্যে এলো পঞ্চাশের মহামন্বন্তর, তখন আমার গ্রামের অনেকেরই না খেয়েমরে যাবার কথা, কিন্তু তেমন দুর্ঘটনা কিছু ঘটে নি। কারণ গ্রামের এক ব্যক্তি এক গোলা ধান বাকিতে বিক্রী করলেন এদের কাছে। সে টাকা তাকে কেউই দেন নি বলা চলে। আর পাশের গ্রাম মহেশ্বরপাশার গোপালচন্দ্র মজুমদার রামকৃষ্ণ মিশনের সাহায্যে দুর্গত মানুষের সেবা করতে এগিয়ে এলেন। মুখ্যতঃ এ দুটি কাজের জন্য আমার গ্রামের মানুষ সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল।

আমরা তখন যুদ্ধ বিরোধী প্রচার করি। না এক ভাই, না এক পাই। কিন্তু আমার এক ভাই যুদ্ধে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম এইবার অনেক লোকের কটু কথা শুনতে হবে। কিন্তু না, গ্রামের কেউই আমাকে এ ব্যাপারে কোন দিনই কিছুই বলেন নি। গ্রামের এই সহজ আত্মীয়তা বহুদূর বিস্তৃত ছিল।

আমরাই দেখেছি প্রতিবেশির বাড়িতে কোন আত্মীয় কুটুম্ব এলে তাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো এটা অবশ্য কর্তব্য বলেই বিবেচিত হতো। এমন কি গ্রামের কোন প্রবাসী সন্তান ফিরে এলে পাড়ার সব বাড়ীতে তার এক-আধবার খেতেই হতো। অতিথি-অভ্যাগত এলেও এই দরিদ্র গ্রাম থেকে ফিরে যেতে হতো না। শেষের দিকে গ্রামের উপান্তে একটি মুসলমান বাড়ি হয়েছিল। আমরা তখন কৈশোর অতিক্রম করেছি। এই ভদ্রলোক সাম্প্রদায়িক ছিলেন। তথাপি তাঁর বাড়ি থেকে অতিথিকে ফিরে যেতে হতো না।

গ্রামের সব বাড়ীতে পুকুর ছিল না। এক-একটা পুকুরে দশ বার বাড়ির স্নানাহার ও পানীয়ের প্রয়োজন মেটাতো। গরমের দিনে জলটা যেত কমে। আর ছেলেদের দৌরাত্ম্য যেতো বেড়ে। ফলে জল ঘোলা হয়ে পড়তো। মাছেরও ক্ষতি হবার কথা। কিন্তু সেজন্য কোন পুকুরের মালিক কোন দিন কাউকে স্নান করতে নিষেধ করেছেন বলে শুনিনি। আর এই শহরে একবাড়ির কলে দুদিনের জন্য জল আনতে গেলেও স্পষ্ট নিষেধ শুনতে হয় প্রায় সর্বত্রই।

কালীদা বাড়ী বাড়ী জল খাটত। তার একটা আভিজাত্য ছিল। সে ভদ্রলোকের বাড়ী ছাড়া জন খাটতো না। দিনে মজুরি ছিল মাত্র চার আনা। কিন্তু খেতে দিতে হতো দুবার। দুবারই ভাত। গড়ে একসের চালের ভাত তার লাগতো। দুর্ভিক্ষের সময়

হঠাৎ চালের দাম খুব বেড়ে যাওয়ার ফলে বাইরের লোকদের খেতে দেবার ব্যবস্থা সংকুচিত হতে থাকে। ফলটা ভাল হয়নি। খেতে দেবার ফলে, কর্মী লোকটার সঙ্গে গৃহস্থের একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সংকোচনের ফলে আর্থিক কিছু লাভ হয়েছে গৃহস্থের কিন্তু অন্যদিকে অনেক ক্ষতির কারণ হয়েছে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তীব্র হয়েছে। কালীদার যদি কোনদিন কাজ না জুটতো (বহুদিনই তার কাজ জুটতো না) তবে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে এসে বলতেন মেজদি আজ আর কাজ হলো না। আমার জন্য দুমুঠো চাল নিস্। দুপুরে খাব তোর এখানে। মাঝে মাঝে এতে লোকজন বিরক্ত হতেন—কিন্তু একমুঠো চাল তার জন্য ঠিকই নিতেন।

এই রকম বিরক্তি অন্য অনেক কাজেও প্রকাশ পেত, কিন্তু সে জন্য কল্যাণকর কোন কাজের প্রতিবন্ধকতা কেউ সৃষ্টি করতেন না। গ্রামের পথঘাটের অধিকাংশই আমরা নিজেদের হাতে কোদাল চালিয়ে তৈরী করি। বহু জনের ফলন্ত গাছগাছালি কেটে রাস্তা প্রসারিত করতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি হয়েছে, লোকে আন্তরিক দুঃখিত হয়েছেন, কিন্তু কাজে বাধা দেন নি।

গ্রামের অনেক কথা অনেক ছবি ভিড় করে আছে মনে। তার প্রতিটি মানুষ নিয়ে এক একটি প্রবন্ধ লেখা যায়। আমার পণ্ডিতমশায় সম্পর্কে তো একটা বইই লেখা যায়। ভাজ করা একখানা গামছা মাথায় দিয়ে নগ্ন দেহে নগ্ন পদে তিনি চলাফেরা করতেন। স্কুল ছুটির পর এবাড়ি সে বাড়ি ঘুরে নানা জনের খোঁজ-খবর করে সন্ধ্যায় নারায়ণের বৈকালি দেবার পূর্বে বাড়ি ফিরতেন। ম্যালেরিয়া তখন গ্রাম জীবনকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। বছরে চার ছ-মাস ভোগেন নি এমন মানুষ কোন গ্রামেই খুঁজে পাওয়া যেত না। ঔষধ পথ্য কেনার পয়সা নেই অধিকাংশের, ডাক্তার বদ্যি তিন চার মাইল দূরে। কেউ সারতেন কেউ মরতেন। পণ্ডিতমশায় এদেরই দু চারটি আশার কথা শোনাতেন। তিনি নিজে ঔষধ খেতেন না। হরিবোলা ছিলেন। জ্বর হলে তেতুল গোলা খেতেন স্নান করতেন। উপবাস থাকতেন। একবার ছ মাস ধরে ভুগে ভুগে আমি কঙ্কালসার হয়েছিলাম। তখনও জ্বর হয়, ভাত খাই। পণ্ডিত মশায় আমাকে এই সময় নবগ্রহ স্তোত্র শেখালেন। স্তোত্রের মহিমায় হোক আর কাকতালীয় কোন ব্যাপারেই হোক জ্বরটা আমার বন্ধ হয়ে গেল।

পূর্বেই বলেছি পণ্ডিতমশায়ের বাড়িতে গৃহদেবতা নারায়ণের মন্দির ছিল। সকালে পূজা ও সন্ধ্যায় বৈকালি হতো। উপকরণ সামান্য। কিন্তু নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সঙ্গে কাঁসর ঘন্টা শঙ্খধ্বনি সমগ্র পরিমণ্ডলটিকে অপার্থিব করে তুলত। গ্রামের প্রতিটি বাড়ির প্রত্যেকটি গাছের প্রথম ফল, গরুর দুধ, খেজুরের গুড় প্রভৃতি নারায়ণকে উৎসর্গ করার রেওয়াজ ছিল। নারায়ণকে না দিয়ে আগে খাওয়া খুব গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হতো। অনেক মুসলমানও ফলমূল দিয়ে যেতেন। তবে তারা প্রসাদ নিতেন না। দু-এক পুরুষ আগে ওরাও হিন্দু ছিলেন। আমার মনে হয়েছে, যেসব বর্ণ-হিন্দু মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের অনেকে আচারটা ভুলতে পারেন নি। এরা পাঁজি দেখে বিয়ের দিন ঠিক করেন।

পূজা-অর্চনার কথায় শারদীয়া দুর্গোৎসবের কথা এসে পড়ে। গ্রামে একটি মাত্র বারোয়ারি দুর্গাপূজা হতো। যেবার ঝগড়াঝাটিটা বেশি থাকত সেবার পূবপাড়া পশ্চিমপাড়ায় দুটো পুজো হতো। কিন্তু ঠাকুর এক ঐ পণ্ডিতমশায়। তিনি লোকজন ধরে এনে কোন রকমে দু'জায়গায় পুজোর ব্যবস্থা করতেন। আমরা একদল ছিলাম দু'পুজোরই প্রসাদ খেয়ে বেড়াতাম। দু'মণ্ডপেই সমান আড্ডা জমাতাম। এরজন্য কেউ কোনদিন আমাদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছেন বলে মনে পড়ে না।

এ ছাড়া গ্রামে মনসাতলা, শীতলাতলা ও হরিতলা ছিল। শীতলাতলা মনসাতলা খুব সাধারণ ব্যাপার। একটা রাজসিক কাণ্ডকারখানা ঘটতো ঐ হরির

বটতলায়। অগ্রহায়ণের নরম নরম শীতে সারা দিন ধরে নামকীর্তন পূজা ও বাতাসার হরির লুঠ হতো। তার আগে মাসখানেক ধরে নগর-সংকীর্তন করে পয়সা ও চাল সংগ্রহ করা চলত। গ্রামের উপান্তে একটি নাম-না-জানা গাছ। এর পর গ্রামে আর কোন বড় গাছ ছিল না। তারপর বিল সুরু। গাছটার নাম কেউ জানে না। ও-অঞ্চলে এমন দ্বিতীয় আর গাছ নেই। প্রচীনেরা গল্প করতেন—ঐ গাছে চড়ে আগের দিনে সিদ্ধ-পুরুষেরা একস্থান থেকে আর এক স্থানে যেতেন। এক যোগী এই গাছে চড়ে এখানে আসেন। তার স্মৃতিতে স্থানটির চলতি নাম যুগির কাদর। সেই মাঠ পেরিয়ে যে গ্রাম তার নাম যুগীপোল। আমার গ্রাম। আমাদের অগ্রজেরা যুগী শব্দটিকে যোগী করে নামটিকে ভদ্ররূপ দিতে চেয়েছিলেন তাই যুগী পোল হয়েছিল যোগীপল্লী।

এই হরিবটতলার পাশেই ছিল চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা। লোকে বলতো পাটপূজোর মেলা। হিন্দু মুসলমান সকলেই আসতেন। আমাদের বাড়ি সারা বছর যে মৌরী দরকার সেটা এখান থেকেই কেনা হতো। আর কেনার ছিল তালপাতার পাখা, মাটির জিনিসপত্র ও পুতুল।

জেলা শহর খুলনা সাত মাইল দূর, শিক্ষাতীর্থ দৌলতপুর আদর্শগ্রাম মহেশ্বরপাশার সংলগ্ন ছিল আমার গ্রাম। গ্রামের পূবের দিক যশোর রোড অর্থাৎ খুলনা-কলকাতা রাজ পথ তারপর ধানক্ষেত, ধানক্ষেত পেরিয়ে ভৈরব নদী। রাজপথ রেলপথ নদীপথ এ যুগের তিন জীবনধারা আমার গ্রামকে স্পর্শ করে গেছে—অতএব বড় হবার সম্ভাবনা এর অনন্ত। শুনতে পাই আমার গ্রাম আজ বিজলি আলো ঝলমল টেলিফোন বহুল আধাশহর হয়ে উঠেছে। তা হোক, ইতিহাসের অনিবার্যতা কে অস্বীকার করবে? কে জানে দলাদলি দারিদ্র্য ও নীচতা সত্বেও আমার গ্রামের সেই স্নিগ্ধ শান্তি, সহজ আত্মীয়তা আর উদার প্রসন্নতায় এখনো সেখানকার মানুষ সঞ্জীবিত হচ্ছেন কি না? বিজলি আসার ফলে গাব গাছ আর চালতে গাছ ও সেওড়া যে সব ভূতেরা বাস করতো তাদের সঙ্গে সঙ্গে ওগুলিও পালিয়ে যায়নি তো? না ফিরে গিয়ে তো আর জানা যাবে না—তাই অপেক্ষা করে আছি। কিন্তু বসে নেই, অতীতের মোহে বর্তমানকে বিসর্জন দেবার মূঢ়তা আমাকে যেন গ্রাস না করে সেই প্রার্থনা নিয়ে আমার নতুন বাসভূমি নবব্যারাকপুরের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া গ্রামকে দেখবার সাধনা করছি।

উপন্যাস

জন্ম-জন্মান্তর

রামপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাস্তুপূজার কাজটি যথাসময়ে হল না—হিসাবের গরমিলটা প্রথম ধরা পড়লো রমার মায়ের কাছে।

মেয়েকে বললেন, আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না মা' জামাই একাজটি কেন ফেলে রাখছেন।

রমা বলল, ওঁর না আসার কারণটা তো চিঠিতেই জানিয়েছেন—দেশ থেকে খুড়তুতো দাদা বৌদি ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ এসে পড়লো বলে।—মা বললেন, কুটুম মানুষ হঠাৎই এসে পড়ে থাকেও না বেশীদিন। বিশেষ করে যারা তীর্থ-ধর্ম করে বেড়ায়। তার জন্য শুভ কাজটি ফেলে রাখে কোন মানুষ! এক যে-মানুষের হিসেব-বুদ্ধি নেই উত্তর-পূব জ্ঞান নেই—, আর আর যে-মানুষ মোহিনী মায়ায় মজে জ্ঞান হারায়—

রমা শিউরে উঠলো মনে মনে। মুখে ধমক দিলে মা-কে, আঃ কি বলছ!

মা বললেন, বলছি যা—সংসারে তাই যে আকছার ঘটছে। ভগবান করুন তেমন কুমতি যেন জামায়ের না হয়। কিন্তু হলেই বা তুই কি করবি?

কথা শেষে জোর দিয়ে মেয়ের মুখের উপর খরদৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

আবারও কেঁপে উঠলো রমা—। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে বলল, আঃ—থামবে তুমি!

থামলাম। বলে মুখখানা গম্ভীর করলেন মা। কিন্তু আমি থামলেই তো কেলেঙ্কারি থামবেনা। শক্ত হ—শক্ত হ, না হলে শেষকালে পস্তাতে হবে এই বলে রাখলাম।

দু'সপ্তাহ পরে মহেশ এলো এলাহাবাদে। টাকার ব্যাগটা রমার হাতে দিয়ে বলল, এটা তুলে রাখ।

কত টাকা আছে?

প্রায় তেরোশো।

অত কম কেন? তুমি তো লিখেছিলে পুরোপুরি দেড় হাজার পাচ্ছি। রমা সন্দেহ প্রকাশ করল।

মহেশ বলল, দেড়হাজারই পেয়েছিলাম। দাদা বৌদিরা এলেন কিছু খরচপত্র হল। আবার যাবার সময় একশো টাকা চেয়ে নিলেন—হাতে কিছু ছিল না বলে। তা ওটাও শীগগির পেয়ে যাব, মাসখানিকের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন।

রমা গম্ভীরস্বরে বললো, এক সপ্তাহে একশো টাকা খরচ—বড্ড বেশী হলনা।

কি করব-বৌদি তো কখনো আমাদের বাসায় আসেন নি ছেলেমেয়েরাও নয়। ওদের কাপড় জামা এটা ওটায় কিছু গেল।

রমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে প্রশ্ন করলো, আর কিছুতে খরচ হয়নি?

খাওয়া-দাওয়া বাজার-হাটেও কিছু গেল বইকি।

সে আর কত দশবিশ বড়জোর পঞ্চাশ। তা ছাড়াও, থাকগে তোমার টাকা তুমি খরচ করেছ এতে আমার কি বলবার আছে।

অভিমানের সুরটা ধরতে পারল মহেশ, অভিমান ভাঙার চেষ্টা করল না, বয়সটা ওদের মান-অভিমানের সীমানা না পেরুলেও (মান অভিমানের সীমানা পার হয় এমন বয়স আদর্শদম্পতির হয় নাকি?) কাঁচা বয়সের ছিঁচকাঁদুনে ভাব থাকবে কেন? সুতরাং মান-ভঞ্জনের প্রয়াসটাও নিরর্থক। সে চেষ্টা করল না মহেশ। বলল, পাঁজিটা দেখি বাস্তুপূজার একটা শুভ দিন দেখে —

রমা বলল, বাস্তুপূজা এখন মাথায় থাক, অন্য কাজের শুভদিন পাও তো খুঁজে দেখ।

অন্য কাজটা কি? মহেশ আশ্চর্য হল।

বলি মেয়ের বয়স বাড়ছে কিনা? ওর বিয়ের চেষ্টা করতে হবে কিনা?

এই তো সবে পনেরো এখন বিয়ে দিলে আইনে বাধবে না?

ভারী তোমার আইন—। অরক্ষণীয়া কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারে? তা যদি না পারে, তো বিয়ে আটকাবার কোন অধিকার ওর নেই।

মহেশ হাসলো, ভাগ্যিস তুমি হাইকোর্ট নও—।

রমা রাগ করে বলল, ঠাট্টার কথা নয়, একটি ভাল সম্বন্ধ এসেছে হাতছাড়া করলে পস্তাতে হবে।

মহেশ বলল, আগে ভিটের ঘর তোলার ব্যবস্থা হোক—

না, আগে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর। একেবারে নিশ্চিন্দি হয়ে তবে অন্য কাজ।

এই নিয়ে অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক হল।

রমা বলল, বাড়িটা যখন খুশী করতে পারবে, ভাল সম্বন্ধ হাত ছাড়া হলে পাবে?

মাথা নেড়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, না আজই তুমি চলে যাও চরণকে নিয়ে পাত্র দেখে এসো, এই তো মৌৎসিমগঞ্জে—

একা একা পাত্র দেখা রীতি নয়, চরণ চলল সঙ্গে। বলতে গেলে ওরাই সম্বন্ধটি খুঁজে পেয়ে বার করেছে। ছেলে রেল-অফিসে কাজ করে লাইনের কাজ। বাঁধা মাইনে ছাড়া মাইলেজ অ্যালাউন্স আছে এবং হিসাব মত চলতে পারলে উপরিও কিছু। এখানের দু'খানা বাড়ী আছে—দু'খানাই ভাড়া দেওয়া। নিজেরা থাকে মৌৎসিমগঞ্জে পিতৃ বসতির মধ্যে একখানা পুরানো বাড়ীতে। সেকালের সস্তায় ভাড়া নেওয়া বাড়ী। ওই বাড়ীর আয় পেয়েই দু'খানা নিজস্ব বাড়ী হয়েছে লক্ষ্মীর বাসগৃহ বলে ভাড়া বাড়ীতেই ওরা রয়ে গেছে। তা দুটো বাড়ী ভাড়ার যা আয়, তাতে চাকরি না করলেও ভালভাবে একটা বড় গৃহস্থের সংসার চলে যায়। ভদ্রলোকের দুটি মাত্র ছেলে, মেয়ে নেই। নিজেও মোটা টাকা পেনসন পান। ছোট ছেলেকে একখানা মনিহারী দোকান করে দিয়েছেন চকে। নিজে তালিম দেন ছেলেটিকে—। এ শহরে ধূর্ত মানুষের তো অভাব নাই, কে জানে কোন ফাঁকতালে বন্ধুর দল দোকানে ঢুকিয়ে গণেশ বাং ধরার ব্যবস্থাটি না পাকা করে দেয়। কাঁচা টাকা পয়সার ব্যাপারে চারটি চোখ সজাগ রাখাই ভাল।

এই সমস্ত বিবরণই ভদ্রলোক প্রথম আলাপেই মহেশদের সামনে পেশ করলেন। বললেন, আমি মশাই খোলাখুলি কথাই পছন্দ করি। ওই দোকানখানাকে যদি চালু করতে পারি, আমার সংসার তা সে যত বড়ই হোক চালু থাকবেই থাকবে। ওই দোকানে বেশ কিছু টাকা ঢেলেছি, আরও ঢালতে হবে। এখন বিয়ের সাধ-আহ্লাদ বলে যা কিছু খরচপত্তর নিজস্ব তবিল ভেঙ্গে করব না—এইটিই স্থির করেছি। আপনি কি বলেন সেটা করা ঠিক হবে কি?

সম্বন্ধটি কায়া। একটি অপ্রিয় সত্য স্পষ্টভাবে এলেও চরণের অর্জনীর চাপ পিঠের উপর অনুভূত হতেই সামলে নিলে মহেশ এবং ভাবী বেয়াইয়ের দাবীটাকেই ন্যায্য বলে সমর্থন করল। প্রথম রাউণ্ড উতরে গেল মোটামুটি।

দু'পক্ষই দুপ্রস্থ দেখাশোনা করল। এ বাড়ীর মেয়েদের চোখে ছেলের স্বাস্থ্য সম্পত্তি চাকরি ভাল লাগল,—

ও বাড়ীর মেয়েরাও কনের খুঁত ধরল না। মেয়ে অপরূপ সুন্দরী নয়—তবু মেয়েরা খুঁত বার করে আরও পাঁচটা দৃষ্টান্ত সামনে তুলে ধরল না। মেয়ে কানা খোঁড়া কালো কুৎসিত নয় - এইগুলি দেখেই ওরা সন্তুষ্ট। দেনা-পাওনার কথাটাও প্রায় এক তরফা পাকাপাকি হল। মহেশ কিছু বলল না—শুধু স্বীকার করে নিল, ও পক্ষের দাবিদাওয়া অন্যায্য নয়। চরণ তো কিছুই বলল না। মহেশ বা চরণ কারও এ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সঙ্গে যে বন্ধুটি গিয়েছিল—তারও নয়। বাজারের আনাজপাতির মত দরদস্তর করাটা কেমন যেন হীনতার কাজ মনে হচ্ছিল। অতএব সমস্ত দাবিই স্বীকার করে নিল নিরাপত্তিতে।

পথে এসে চরণ বলল, টাকার অঙ্কটা বেশি হল কি জামাইবাবু?

বন্ধু বলল, তিন হাজার কি এমন বেশি। ভদ্রলোক কনসিডারেট।

হাঁ-না-কোন মন্তব্যই করল না মহেশ। মহেশ জানে টাকার অঙ্ক ওর অর্দ্ধেক নামলেও যা দু'পাঁচশো উঠলেও তাই, ওর মোট পুঁজি তেরশো—জমার ঘরে এর বেশি বড় জোর বিশ পঁচিশ বাড়তে পারে। লৌকিকতার দরুণ। তা সে অঙ্ক তো কুটুম্ব সমাগমে তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম। ঋণের আশা আপিসে তো শেষ হয়েছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর কো-অপারেটিভ কানায় কানায় ভর্তি, বন্ধু বান্ধব তারই মত নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে যাদের ভরসা চাকরির টাকা। পিতৃকুল-শ্বশুরকুল—দুই কুলেই ধু ধু বালুচর। তাহলে কোন যাদুদণ্ডে বরপণ সংগ্রহ করে বিয়ের আসরে বসাবে কন্যাকে। কিন্তু এই চিন্তা নিরর্থক। শেষ পর্য্যন্ত কি গীতার শ্লোকটিতেই নির্ভর করতে হবে? দ্বাপরের বাণী কোন অটল বিশ্বাসের বলে কলিযুগে মন্ত্র-চৈতন্যে উজ্জীবিত হবে। অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাম্যে হম্। আমার উপর যার অনন্ত নির্ভরতা আমি তার যোগক্ষেম বহন করে থাকি। আমি, আমি দ্বিতীয় কোন সত্তা নয়, মূর্ত্তি নয়, প্রতিষ্ঠান নয়। ম্যাজিক লটারি—হঠাৎ ধন-সম্পদ প্রাপ্তি উত্তরাধিকারের আশা নিকটে দূরে অতীতে ভবিষ্যতে বর্তমানে কোথায় কে আছে কি আসতে পারে কোনসূত্রে...চিন্তার তুফানে যত উত্তাল হচ্ছে সর্বত্র ততই বেঁপে আসছে কুয়াশা। সমুদ্র কূলহারা, কুয়াশা দিগ-দিগন্ত জোড়া, পথের মাঝেই কি জ্ঞানহারা হবে মহেশ?

রমা বলল, কি হল—কথাবার্তা পাকা করে এলে?

হাঁ, বলে হাত পা না ধুয়েই চেয়ারে বসে চোখ বুজল মহেশ।

ওকি বড্ড কি ঘেমে গেছ। বাতাস করব? ব্যস্ত হল রমা।

হাত উঠিয়ে নিষেধ করল মহেশ। বলল, এক গ্লাস জল দাও - গলাটা কেমন শুকিয়ে উঠছে।

* * *

এর পরে একখানা চিঠি আমার হাতে তুলে দিয়ে বন্ধু বলেছিল, পড়। ওই ঘটনার পর মহেশ আমাকে লিখেছিল এলাহাবাদ থেকে। দু'চারদিন পরে লক্ষৌতে এসে সাক্ষাতে জানাতে পারত, ততটুকু সবুর সয়নি। ওর মনে তখন প্রচণ্ড আলোড়ন চলছিল—চিন্তার প্রবল ঘূর্ণী ঝড় বয়ে চলছিল। সেই দণ্ডে কাউকে জানাতে না পারলে দারুণ অস্বস্তিবোধ এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়তো। বলতে জোর জানাবার লোকতো কাছেই ছিল। সহধর্মিণী-সহকর্মিণী সর্বকর্ম ও সর্ব্ব-চিন্তার অংশে যে অংশভাগিনী বেদ-মন্ত্রোচ্চারণে পবিত্র শপথ-ডোরে যার সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ওর মনে হয়েছিল এই গুরুচিন্তার ভার ওকে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। ওর থাকুক অন্তঃপুরের চিন্তা—সংসারের শ্রীরচনার চিন্তা। উপার্জনের চিন্তা পুরুষের কঠিন জীবন

সংগ্রামের দায়িত্ব—শ্রম ধর্ম সংঘর্ষ বাইরের যতকিছু সংগ্রহের দক্ষিণা ষোল আনা পুরুষেরই দেয়। এই কর্তব্যবোধে উৎপীড়িত মহেশ সেই রাত্রিতেই সুদীর্ঘ পত্র লিখে মনের ভার লঘু করতে চেয়েছিল। আমাকে জানিয়েছিল অকপটে।

মহেশ লিখেছিল: এইবার একটি কঠিন পরীক্ষা সামনে এসেছে ভাই—হয় জীবন, নয় মরণ। আমার ধর্ম-চিন্তা ঈশ্বর-বিশ্বাস ভান বা ক্ষণকালের চিন্তা বিলাস এটি প্রমাণিত হয়ে যাবে। ভেবে দেখছি এখন আমার সামনে এমন কোন জগতের বস্তু নাই যা ধরে নিশ্চিন্ত হতে পারব। অতএব অকূলেই ভাসিয়ে দিলাম তরী। যার কেহ নাই তুমি আছ তার এই ভাবনাকে সাথ করে নিয়েছি। ভাবছ হতাশাস হয়েছি? ভাবছ ভেঙ্গে পড়ার আগে এ আমার চিত্তবৈকল্যের লক্ষণ? সত্যি বলছি—এ সব কিছুই নয়। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে যখন দেখছি সমুদ্র কুলহারা তখনই মনে জাগছে আশা আশ্বাস। চরম নিরাশার ক্ষণে পরম আশ্বাসবাণী শুনছি। এই পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হতে পারি—আমি বেঁচে যাব। আমাকে বাঁচতেই হবে মনের মধ্যে জোর দিয়ে কোন শক্তি যেন প্রেরণা যোগাচ্ছে। এমন পরীক্ষা বারে বারে আসে না—একবারই আসে। অনন্ত শক্তির উৎস থেকে উৎসারিত ইচ্ছা-শক্তির কি বেগ তোমায় বোঝাতে পারব না ভাই, শেষ পর্য্যন্ত এর পরেই নির্ভর করে থাকতে হবে। থাকতে হবে যে হেতু আমার উপায় নাই। থাকব এই শক্তিকে ধরে—যা আমাকে অন্য চিন্তার ধারে-কাছে ঘেসতে দেবে না। আমি উত্তীর্ণ হব—উত্তীর্ণ হব—একজীবন থেকে আর এক জীবনে।

মনে করছি—মাসখানেকের ছুটি নেব অন্তত দু'সপ্তাহকাল। আমাকে এখন অন্য ভাবনা থেকে ছুটি নিতে হবে। আমাকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে—তাঁর মহিমা। যিনি ইচ্ছা করলে মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং। এখন পরমানন্দ মাধবের শরণ নিয়েছি—অন্য কর্ম অন্য চিন্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছি মনকে।

সত্যিই কি অন্য চিন্তা থেকে সরিয়ে নিয়েছিল মন? মনকে কি সরানো যায় পার্থিব ভূমি থেকে—বিষয়বস্তু থেকে আসক্তি আসঙ্গ আপাত রমণীয় সুখাভিলাষ কল্পনা থেকে?

ওই কটা দিন যারা মহেশকে দেখেছে ওর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছে—তাদের মুখেই কিছু কিছু জেনেছি অবিশ্বাস্য এই কাহিনীর শেষাংশ। সেই ভাবটুকু সংক্ষেপে এখানে তুলে দিচ্ছি। এর সঙ্গে মহেশের জীবনীতে যা প্রকাশ পেয়েছে তাও বলছি।

তখন বিয়ের সাতদিন বাকি। পুঁজি ওই তেরশো টাকা—আর মাসের মাহিনা দুশো। সেটা তো সংসার খরচেই লাগবে। সাতদিন মাত্র বাকি—অথচ কেনা-কাটা কিছুই হয়নি। সে না হয় দু'একদিনের মধ্যেই দোকান থেকে যোগাড় হয়ে যাবে—গহনা গড়াবার জন্য কিছু সময় তো চাই। মহেশের কিন্তু কোন উদ্যম নাই। বাজারহাট যথারীতি করছে—আর ঠাকুর ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে পূজা পাঠ চালাচ্ছে, গীতার ওই শ্লোকটি ওর মনে গেঁথে গেছে—অনেকক্ষণ ধরে ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে আবৃত্তি করে চলেছে—অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে—

রমা এদিকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। একদিন বলল, কেনাকাটা কিছুই তো করছ না—কি করে যে কি হবে জানি না।

মহেশ বলল, হবে—হবে।

রমা বলল, গহনাগুলো তৈরী করিয়ে নাও—নেমন্তন্ন চিঠিগুলো ছাড়—কাকে কি ভার দিতে হবে।

মহেশ হেসে বলল, সব ভার একজনকেই দেব ভেবেছি।

ঠাট্টা রাখ—একটা কাজের কথা শোন। আমি বলছিলাম কি—যা টাকার যোগাড় আছে—কি হবে, তাতে গহনায় কুলোবে না, খুকীর গায়ে যে টুকিটাকি

আছে—তার সঙ্গে আমার পুরনো ক'খানা মিলিয়ে হার চুড়ি গড়িয়ে দাও।

মহেশের মুখ উজ্জল হয়ে উঠলো। বলল, খুব ভাল কথা।

আর কাপড় চোপড়ও কিছু কিনে কেটে রাখ এই বেলা। টাকাটা বার করে দিচ্ছি।

মহেশ মনে মনে বলল, অনন্যা নিশ্চয়ন্তা মাং—

সমস্যার কিছু পূরণ হল—তবুও রইলো অনেকখানি। নগদ পাঁচশো বরাভরণ—ফুলশয্যা দান সামগ্রী—আর নিমন্ত্রিত জনকে আদর-আপ্যায়ন ইত্যাদি। ভূরিভোজের জন্য কম করেও চার পাঁচশো টাকা চাই। দেখা যাক এখনও সপ্তাহকাল বাকি। পরীক্ষার শেষ কটি দিনই তো প্রাণান্তকর।

বিয়ের আগের দিন। হাতের কড়ি একেবারে ফুরিয়েছে, বরপণ বরাভরণ ভোজের দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ—ফুলশয্যার উপকরণ কোন ব্যবস্থাই হয়নি। হওয়া সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে কিছু কুটুম্ব সমাগম হয়েছে—তাদের পরিতোষের জন্য মাইনের টাকা অর্দ্ধেক শেষ হয়ে গেছে। রাত পোয়ালে বিয়ে—এখনও ঠাকুরঘরে বসে শ্লোকের বাণী গভীরভাবে উপলব্ধি করার সময় আছে নাকি? মহেশ কিন্তু ঠাকুরঘরেই বসে ছিল বাহ্য-জ্ঞান হারা হয়ে।

রমা বারকয়েক উঁকি মেরে গেছে—ডাকতে সাহস হয়নি। ওদিকে চরণ এসে বার বার তাগাদা দিচ্ছে—মাছের বায়না দিয়ে রাখতে হবে। দোকানে দই মিষ্টির কথা বলতে হবে, বরের চেলির জোড়—টোপরে—মালা, ঘড়িটাও কেনা হয়নি, তুমি তাড়া দাও দিদি, সময় থাকতে যোগাড় না হলে মুশকিল।

রমা বলছে—একটু সবুর কর ভাই, ঠাকুরঘরে বসলে ডাকতে মানা আছে। এমনিতেই মাটির মানুষ—কিন্তু পুজোর বিঘ্ন হলে..... একটু সবুর কর ভাই। দেখছ কতখানি বেলা হল—গোয়ালা রাগ করে চলে গেল। মেছো বললে—বারোটার মধ্যে জানিও, না হলে বায়না নিতে পারব না, মিষ্টির দোকানেও ও বেলা, বায়না দিতে হবে।

রমা আর একবার ঠাকুরঘরের দুয়োরে উঁকি মারল। প্রার্থনা অন্তে প্রণাম করছে মহেশ। আর কি দীর্ঘ প্রণাম—মাটি থেকে মাথা আর উঠে না।

এমন সময়ে পিয়নের গলা শোনা গেল: পোষ্ট-ম্যান, মনিঅর্ডার আছে বাবু।

রমা আর থাকতে পারলো না। বলল, শুনছো, মনিঅর্ডার এসেছে—

তবে কি—তবে কি পরীক্ষার ফল বার হবার সময় হয়েছে?

মনিঅর্ডার ফরমে সই করে টাকাটা নিলে মহেশ। মাত্র ত্রিবিশটি টাকা। পাঠিয়েছে অফিসের সহকর্মীর দল। এই টাকা দিয়ে মেয়েকে আশীর্বাদ জানিয়েছে। মাত্র ত্রিশটি টাকা, পরীক্ষক কঠিন সন্দেহ নাই।

না, পরীক্ষার শেষ এখানেই নয়—আরও প্রশ্নপত্রের ফলাফল বাকি। আর একখানা ফরম বার করে সামনে ধরল পিয়ন। পাঁচ টাকার মনিঅর্ডার কাশী থেকে মা পাঠিয়েছেন—আশীর্বাদী।

আরও একটা ফরম সই করে গুনে নিলে একশো টাকা। পাঠিয়েছেন মামাতো ভাই। অনেকদিন আগে ওঁরাও একবার হরিদ্বার থেকে ফিরবার পথে লক্ষ্ণৌ নেমেছিলেন। আদর-আপ্যায়নে তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন বাংলা দেশে গেলে অতি অবিশ্যি আমাদের ওখানে যাবি। মা নেই আমরা তো আছি।

মেয়ে তখন ছোট, ওর হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে আদর করেছিলেন। ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন নিজের হাতে, আর বলেছিলেন—খুকির বিয়েতে যেন ফাঁকি দিসনে, চিঠি দিবি—আসব ভোজ খেয়ে যাব।

সপ্তাহখানেক আগে সব কটি ঠিকানা যোগাড় করে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিল। তার উত্তরে একশো টাকা পাঠিয়ে আশীর্বাদ জানিয়েছে মামাতো ভাই।

আজ এই পর্য্যন্ত। যা হোক এই দিয়ে কেনা-কাটার কাজ কিছু এগিয়ে রাখা যাবে। সে রাত্রিতে বারুণ

দুশ্চিন্তা পরের দিন কি হবে? মান সম্মান কেমন করে বাঁচবে। সভার মাঝে অন্যরকম কিছু ঘটবে না তো, হে ভগবান, তোমাকেই আশ্রয় করে আছি —আমার আর এমন কোন আত্মীয় নাই, যার হাত দিয়ে তোমার দান পাঠাতে পার, আমি নিঃসম্বল নিঃসহায়।

সকালে উঠে সঙ্গমে চলে গেল মহেশ। একবার ইচ্ছে হল ঝুঁসির মঠে সাধুবাবার কাছে ধরণা দেয়। আবার ভাবল না, তা কেন। ভগবানের দয়ার উপর তাহলে সন্দেহ করা হবে। টাকার সংস্থান যদি হয় —এমনিতেই হবে। তাঁর ইচ্ছে হলে নিজে বহন করে আনবেন—পূরণ করবেন, না হলে সাধুর সাধ্য কি দুঃখ মোচন করবেন। আমি এই সঙ্গমে বসে তাঁর নাম করব—যা করেন তিনি।

অনেকক্ষণ ধরে জপ পূজা সেরে প্রসন্নমনে ঘরে ফিরলো মহেশ। রোদ বেড়েছে—হাট বাজার সেরে মানুষজন ঘরে চলেছে। বাড়ীর দুয়ারে আসতেই দেখল পিয়ন দাঁড়িয়ে আছে।

মনিঅর্ডার আছে।

এগিয়ে দিল ফরম। কলম তুলে সই করতে করতে চমকে উঠলো মহেশ। এক হাজার টাকা। কে পাঠালো? ভুল করে পাঠায় নি তো? একশোর জায়গায় হাজার। হাঁ এই যে মন্টিদার নাম--যোগেশ ভট্টাচার্য্য। এই যে লিখেছেন—তোমার কাছে হাওলাত ১০০৲ টাকার সঙ্গে আরও ৯০০৲ টাকা পাঠাচ্ছি আশীর্বাদী বলে। স্নেহলতাকে আমাদের আন্তরীক আশীর্বাদ।

আরও চারখানা ফরম সই করে গোটা পঞ্চাশেক টাকা হলো।

মহেশের দু'চোখ বেয়ে দর দর ধারে জল গড়াতে লাগল।

টাকা নিতে এসে রমা অবাক হয়ে ওর পানে চেয়ে বলল, শুভদিনে চোখের জল ফেলছ! তুমি কি গো? মেয়ের অকল্যাণ হবে যে।

মহেশ গদগদ কণ্ঠে মাথা নাড়ল, না না, কল্যাণ হবে। ভগবান ওদের আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন—ওদের কল্যাণ হবে। ক্রমশঃ

লছমন ঝোলার পথে

পুষ্প দেবী

সদ্য কাশ্মীর লিটারারী কনফারেন্স থেকে ফিরে এসেছি। সেখানে অধ্যাপক মশায়ের অসুখ নিয়ে বাবু ভুগও পেয়েছি তবুও লোভ সামলাতে পারলুম না। আমার একান্ত স্নেহাস্পদা ডাঃ বাসন্তী চৌধুরী যখন ফোন করে বললে "জানো মা আমি বিটি ক্লাসের মেয়েদের নিয়ে এক্সকার্শনে যাচ্ছি তুমি আর নীও চলো। বিনা দ্বিধায় মত দিলুম। শুধু মত দেওয়া মাত্র, আর কিছুই করতে হল না। সেই নগর থেকে বালিগঞ্জে এসে রসা রোড বুকিং অফিস থেকে টিকিট কেনা থেকে আরম্ভ করে সব ঝঞ্ঝাট হাসিমুখে সে নিজের কাঁধে তুলে নিল। আমি পর্যাপ্ত বসে ছিলুম। "দেখ বাপু আমি রাস্তায় ব্যাপারে জড়সড় নই। যথাসময়ে দেখা যাবে যেটি কার সেটি ফেলে গেছি। ট্রেনে যেগুলো লাগবে গুলো বাক্সর সবচেয়ে তলায় রাখতে আমি খুব " এরকম অকপট স্বীকারোক্তিতেও বাসন্তী দমল বললো। চলোত দেখি যা হয় হবে। কাজেই নন্দময়ী মার আনুগত্য স্বীকার করে যাত্রার আয়োজন লুম।

হাওড়া ষ্টেশনে আমরাই আগে পৌছলুম। খানিক পরে হৈ হৈ রবে হাওড়া গার্লস কলেজের ছাত্রীরা এসে হাজির। পুরোধায় লাল পাড় গরদের শাড়ী আর লাল টুকটুকে সিঁদুরের টিপ পরা আনন্দময়ী মূর্ত্তি। আমার সঙ্গে বাসন্তীমার গর্ভধারিণীর আগেও চাক্ষুষ দেখা সাক্ষাৎ হয়নি যদি কোনদিন দেখা হয় বলবো ওর বাসন্তী নাম না রেখে আনন্দময়ী নাম রাখলে যথার্থনামা হত। অবিশ্যি ওর মা কি করেই বা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হবেন? অনেক সময়ই ত কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনই রাখি তাছাড়া বাসন্তী আর আনন্দময়ী দুইই একই অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

হাসিছাড়া বাসন্তীকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আবার অদ্ভুত কোমল ওর মন অপরের দুঃখে অমন ঝর ঝর করে কাঁদতেও বড় দেখা যায় না। দিনে দিনে যত দেখছি ততই যেন মুগ্ধ হচ্ছি। পিতৃবন্ধু ডাঃ বিনয় সরকার মশায়ের ভাষায় একেবারে মাতৃ মুখে আর বাকি্য নেই। হাওড়া ষ্টেশানে গাড়ী ত ইন কোরলো। হৈ হৈ রবে মেয়েরা গাড়ীতে মাল তুললো। আমার এসব কাজে অধিকার নেই উপযুক্ততাও নেই। অবাক হয়ে আনন্দময়ী মার কর্মপটুতা দেখলুম। মায়ের কর্মসঙ্গিনী মনোরমা মার কথা এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অমনসেবাপরায়না মেয়ে আজকালকার যুগে সত্যই দুর্লভ।

প্রথমে একটা লেডিশ কম্পার্টমেন্টে আমাদের বসিয়ে বাসন্তীমা সব ঢেলে সাজালো। তার ধারণা বানী মা ননীর পুতুল। হাতে ধরলে গলে যাবে। ফলে যা হবার হল, একেবারে জামাই আদরে বসলুম। মেয়ে হয়ে জন্মেছি। জামাই আদর পাবার কথা নয়। তার চেয়ে বরং মার কোলে চড়ে বললুম বলাই ভালো। কাশ্মীরে ফার্ষ্টক্লাসে গেছলুম। তাই বাসন্তী মা বারে বারে বলেছে—তোমার জামাই বলছে থার্ডক্লাসে যেতে ওদের কষ্ট হবে না ত? আমি বল্লুম একবার ফার্ষ্টক্লাসে গেছি বলেই যে আমি চিরকালই ফার্ষ্টক্লাসের যাত্রী একথা ভাবলে কেন? সত্যিই তারপর মহারাজ মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের সঙ্গে আমরা থার্ডক্লাসেই দ্বারকা গেলুম, মহারাজজীবাড়ি ফার্ষ্টক্লাসে

ছিলেন। যাইহোক ওখানে ত থার্ডক্লাস কামরার ট্রেনের তিন থাক টিফিন ক্যারিয়ার বেঞ্চগুলিতে মেয়েরাই অধিকারী হল। বয়েস বেশীর সম্মানে আমরা পাশের বেঞ্চির অধিকারী হলুম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল দীনবন্ধু—সার্থক নামা দীনবন্ধু। যেখানেই আমাদের যা দরকার হয়েছে শুধু একবার দীনবন্ধু বলে ডাকার ওয়াস্তা—। বাসন্তী মা হাওড়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বলে নয়। তার স্নেহময়ী অন্তরের পরিচয়ে পিয়ন থেকে অধ্যাপকরা অবধি দিদি বলতে অজ্ঞান। তাকে দিদি বলে, মনে জানে মা। পিয়নকে পাশের চেয়ারে নিয়ে যাওয়া এক আমার অবাধ্য পিতৃদেব (স্বর্গত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়) মশায়ের দেখেছিলুম আবার দেখলুম বাসন্তীমার। সত্যকারের আভিজাত্য যাদের থাকে তারাই একাজ পারে। তাদের সম্মান কাঁচের বাসনের মত ঠুনকো নয়। মনে পড়লো একটি বিশেষ জায়গায় পিতৃদেব আমন্ত্রিত হয়েছেন। তখন যতদূর মনে পড়ে তিনি ইনস্পেক্টার জেনারল অব রেজিষ্ট্রেশান। খেতে বসে মনে হল তাই ত পাঁচু ভাত খায়নি। গৃহকর্তাকে বললেন গাড়ীতে আমার বন্ধু আছে তাঁকে খেতে ডাকুন। গৃহকর্তা শশব্যস্তে তাই তাকে ডেকে নিয়ে গেল। বাবা পাশের চেয়ার দেখিয়ে বল্লেন বসে পড় হে লজ্জা কিসের? এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখলুম বাসন্তীর চরিত্রে—। এখানেও সেই একান্ত সহৃদয়তা। যাক যা বলছিলুম বাসন্তী মা আমাদের বিছানা দেখিয়ে দিতেই দীনবন্ধু নিপুণ হস্তে শয্যা প্রস্তুত করে দিলো। ট্রেন কিন্তু তার কথা রাখলো না। সাড়ে দশটায় তার ছাড়বার কথা। ছাড়লো এগারোটায়। পূর্ণিমা রাত চাঁদের আলোয় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে—। আমার মনও জয়ধ্বনি করে উঠলো তীর্থ পথের সন্ধানে। অনেক দূরে দ্রুত ধাবমান দৃশ্য-পটগুলি যেন নিজের অতীত জীবনের ছবি দ্রুত পট-পরিবর্তন হচ্ছে—। এরপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা। ঘুম ভাঙলো একেবারে ধানবাদে। ধারে সাঁওতাল পরগণার মত প্রাকৃতিক দৃশ্য—। দেখতে দেখতে গুমো স্টেশানে গাড়ী এসে পৌছাল। এখানের দৃশ্য ভারি চমৎকার। যেন পাহাড়ের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি সুন্দর রাজ্য ভারি বাহার সেই পাহাড়ের। বাসন্তী মা গল্প করলো তার একমামা এখানের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে এখানেই আজীবন বসবাস করেন। সত্যি থাকবার মত দেশ। এরপর হাজারীবাগ গয়া ছাড়িয়ে সোন ব্রীজের ওপর গাড়ী উঠলো। বিরাট নদী কলকল চলছল করে জল বয়ে চলেছে চোখ যেন জুড়িয়ে দেয়। এরপর এলো বিন্ধ্যপর্ব্বত—কী উঁচু পাহাড়। এই বিন্ধ্যপর্ব্বতকে আর উঠতে না দেয়ার জন্যে অগস্ত্য মুনি অগস্ত্য যাত্রা করেছিলেন সে গল্প ত সকলের জানা। এবার দেখা গেল বারানসী। দূর থেকে বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালুম। এবার এল অযোধ্যা—। মনে তখন নানাভাবের আবির্ভাব। শেষে থাকতে না পেরে একটি কুলি জাতীয় লোককে বল্লুম একটু মাটি দিতে। নিজেই নেমে নিতে পারতুম কিন্তু মনে হল কী করে মাথায় না ঠেকিয়ে এখানের পবিত্র রজে পা দেব? আমার সৌভাগ্যক্রমে কুলিটি কিন্তু আমার কথা বুঝলে, সেই পবিত্র রজ আঁচলে করে নিয়ে মাথায়ঠেকালুম। রাত আটটায় লক্ষ্ণৌ পৌছলুম। আবার একটি রাত কাটলো। ভোরে ট্রেন রেয়ালিতে পৌছুল। সকালেই হিমালয় পাহাড়ের দর্শন মিললো—চারিধারে আখের ক্ষেত তাতে ময়ূর বেড়াচ্ছে। দৃশ্য মনোরম তাতে সন্দেহ নেই। এবার আমরা দেরাদুন পৌছুলুম। বাসন্তীমার চেষ্টায় চমৎকার একটি মার্ব্বেল মোজেক করা ধর্মশালায় আমরা জায়গা পেলুম। তেতলা পুরো বাড়ীটি আমাদের জন্য পেলুম। ইলেকট্রিক আলো পাখা কিছুরই অভাব নেই। এখানে খেয়ে দেয়ে আমরা ট্যাক্সী করে টপকেশ্বর দেখতে গেলুম—দেরাদুন থেকে ছয় মাইল দূরে এখানে দ্রোনাচার্য্য তপস্যা করেছিলেন বলে কিম্বদন্তী আছে।

এখানে এই টপকেশ্বর টপকেশ্বর নয়
তপের বাঘাতে অর্জিত তাই তপকেশ্বর হয়

অপূর্ব শিলা গুহা কত শত
তারি মাঝে শিব যেন ধ্যানে রত
পাথর বাহিয়া টপ টপ করি জল অবিরত পড়ে
বৈশাখ কালে ঝরা যেন বাঁধা শালগ্রামের পরে।
বাঙ্গালী সে সাধু একাকী বিরলে সেইখানে দেখি রয়
মানব সঙ্গ নীরবে তেয়াগী হরির নামে তন্ময়
সাথে মার্জ্জার সাথী শুধু রয়
কোন পুণ্যেতে সাধু সাথী হয়
দেখি মনে মনে মানি বিস্ময় কী প্রেম হরির লাগি
সবতেয়াগিয়া কি ধন লভিয়া হল হরি অনুরাগী
মনে হয় ঠিক শিলা রূপ ধরি বাসুকী সে ফণা ধরে
মহাদেব সেই বিশ্বনাথেরে রয়েছে আড়াল করে
পাদমূলে নদী বহে চলে যায়
ধন্য হইয়া চরণ ধুয়ায়
ঝরণা ধারা সে কিন্নরী প্রায় গায় তব কলতান
কিবা অপরূপ ধেয়ান মগন হয়েছেন ভগবান।
বিশ্বকর্ম্মা যেখানে যাকিছু শুনেছি সৃষ্টি করে
অপূর্ব এই বিশ্বনাথের সৃষ্টি হৃদয় হরে
স্বয়ম্ভূ যিনি কে তাহাকে গড়ে
দেখি আঁখি মেলি বিস্ময় ভরে
করি প্রণিপাত ও চরণ পরে আমি দুটি কর জুড়ি
তপকেশ্বর সে শিবলিঙ্গ এ মনে মুরতি স্মরি।

এখানের সম্বন্ধে একটি মজার কিম্বদন্তী আছে। এইখানে নাকি পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে বিয়ে করেছিলেন। সেকারণ এখানে মেয়েদের মধ্যে বহু বিবাহ শুধু প্রচলিতই নয় গৌরবজনক। যে মেয়ের যত বেশী স্বামী সে তত বেশী সম্মানের অধিকারিণী। ওখানকার সাধু আমাদের দেরাদুন কথাটার অর্থ বোঝালেন যে দ্রোণের ডেরা ছিল বলে এটার নাম দেরাদুন। এখান থেকে আমরা সহস্রধারা দেখতে গেলুম। সহস্রধারা দেরাদুন থেকে দশ মাইল। এখানের দৃশ্য যে কী অপূর্ব্ব সুন্দর তা বলে বোঝানর নয়। পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের দিকে আমাদের ট্যাক্সী নামতে লাগলো। তখন গোধূলি বেলা—। অস্তমিত সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণে পর্ব্বতমালার মধ্যে ঝরণার সে কী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য তা লেখনীতে প্রকাশ করা সহজ নয়। তবুও আমি সে চেষ্টায় বিরত হইনি—জানিনা সফল হয়েছি কিনা—

সহস্র ধারা সার্থক নাম সহস্র ধারা বয়
শ্রীহরির পাদ পদ্মেতে যেন গঙ্গা জনম লয়
শঙ্কর জটা বহি অবিরত
ছুটে জলধারা পাগলের মত
দেখে দেখে মন মেটেনা তিয়াত মৃগ তৃষিকার মত
কোথা ছুটে যায় কারে পেতে চায় হায় সে যে দূরে কত!

চপল ঝরণা চটুল চরণে দ্রুত পদে ধেয়ে যায়
পদে পদে তার উপলের ধাঁধা তবুও বাধা না পায়
পায়েতে নূপুর তুলে কলতান
গুণ গুণ করি করে গুণগান
মন্দ মধুর সেকি কলতান বেদমন্ত্রের প্রায়
শুনেছে যেজন ভুলিবে না কভু মধুর মূর্চ্ছনায়
পাষানের মাঝে রং এর কী খেলা নিপুণ চিত্রকর
ফুটালে সে কোন অরূপ মাধুরী কোন সেই ভাস্কর
যদি কভু তাঁর পাই দরশন
শুধাতে ব্যাকুল হয় মোর মন
হে চিত্রকর কত সুন্দর অপূর্ব সঞ্চয়
সেইখান হতে সৃষ্টি আবার সেইখানে হয় লয়
আমার এ মনে সহস্র ধারা শুধুই কামনাময়
কবে বলো তাহা যাবে তব পানে আর কোনখানে নয়
সকল বাসনা পেতে দরশন
সকল কামনা শুধু ও চরণ
সকল চেতনা তোমাতে মগণ তুমি ছাড়া কিছু নয়
আমার মনের সহস্র ধারা তোমাতে বিলীন হয়।

এর পরদিন আমরা চক্রতা গেলুম। আমার খুব আগ্রহ ছিল না কারণ ওখানে কোন মন্দির বা ঠাকুর নাই শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি অপূর্ব্ব। বাসন্তী ছুটলো এস ডি-

ওর পারমিশান আনতেকারণ চক্রতা মিলিটারী এরিয়া। চীনদেশের সঙ্গে ওটাই বর্ডার। দেরাদুন থেকে চক্রতা বাট মাইল। সবচেয়ে অপূর্ব পাহাড় ছেয়ে অপূর্ব ফুলের বাহার মনেহয় কে যেন কত যত্ন করে সাজিয়েছে—। হলদে নীল ভায়লেট লাল কত রকমের রকমারি ফুল, আর কি সুন্দর সুন্দর পাতা-বাহারের গাছ। মনেহয় রকমারি যেন কারুকার্য করা ফুলের গালচে পেতে রেখেছে। আর পাথরেরই বা কত রং। পথে চেকিং পোষ্ট। কালসী চেকিং পোষ্ট থেকে ওয়ান ওয়ে শুরু হল। সমস্ত গাড়ী ওখানে আটক পড়লো দশটা বাজতে গাড়ী ছেড়ে দিলে। প্রথম গাড়ীতে লাল নিশান পরেরটিতে সবুজ নিশান। মোটরগুলি এক পাহাড় ছেড়ে আর এক পাহাড়ের পথে পাড়ি দিলো। যমুনা নদীর ওপর দিয়ে গেলুম আমরা। ওখানে একটা বাঁধ আছে নাম ডাক পাথর। তারপর ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে ট্যাক্সি থেমে গেল। এবার কিছু সিঁড়ি আর কিছু চড়াই উঠতে হল। পথে আপেলের ক্ষেত বলা বাহুল্য আপেল খুব সস্তা। এইখানের দৃশ্য আমাদের অভিভূত করলো হাতে অনেক সময় বাসন্তী মা মেয়েদের নিয়ে কীর্তন শুরু করলো—। সুরের টানে নানা জাতের মানুষ পথে দলে দলে দাঁড়িয়ে গেল—। বাসন্তী মা গলা ছেড়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত ধরলো। চেয়ে দেখি মিলিটারীরাও মাথা নেড়ে তাল দিচ্ছে—। ফিরতে সন্ধ্যে হল। ওই পাহাড়ের ওপর সূর্য্যাস্ত যে অপূর্ব দৃশ্য তা লিখে বোঝানর নয়।

সন্ধ্যার পর আমরা দেরাদুনে ফিরলুম। পরদিন আমাদের যাত্রাহল শুরু—এবার লক্ষ্য পথ মসৌরী। দেরাদুন থেকে মসৌরী বাইশ মাইল রাস্তা। দুধারের দৃশ্য যেমনি মনোরম তেমনি অপরূপ—। আমারও কাশ্মীরের চেয়ে মসৌরীর পথ বেশী ভালো লাগলো। মসৌরীতে যাবার খুব ইচ্ছে যে আমাদের ছিল তা নয়। তবে এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কি করে? যদি মসৌরী না যাই তা হলে দেরাদুনে অপেক্ষা করতেই হত। শুধু শুধু ধর্মশালায় বসে থেকে করাই বা কি? কিন্তু পরে দেখলুম গিয়ে ভালোই করেছিলুম।

ওখানে সহরে নেমে রিক্সায় করে সহর দেখতে বেরুলুম। বাসন্তীমা সব কাজে সমান পারদর্শিনী। আমাদের দুজনের রিক্সায় বসা মসৌরীর ছবি তুললো। মসৌরী সমুদ্র থেকে সাড়ে ছয় হাজার ফিট উঁচু। ওখান থেকে লালটিবা আরো প্রায় দু হাজার ফিট উঁচু। মেয়ের দল উৎসাহে চড়াই ভাঙ্গতে চললো। আমরামসৌরীতেই ঘোরাফেরা করলুম। ওখানে একটি উট গড়নের পাহাড় আছে। তার নাম "ক্যামেলস্ ব্যাক"। যাইহোক সন্ধ্যায় আমরা আবার দেরাদুনের ধর্মশালায় ফিরলাম। প্রকাণ্ড একটি হলে ঢালাও বিছানা পেতে আমরা সবাই শুয়েছিলুম। শুধু অধ্যাপক মশায়ের একটি খাটিয়া ছিল উচ্চাসন পেতে। তেতলার হলে মেয়ের দল। দুটি তলাতেই দুটি দুটি ছোট ঘরে দুচার জন করে লোক ছিলেন। আমি ঐ ঘরের অগ্রাধিকার পেয়েও নিতে রাজী হইনি। কারণ যে বাসন্তীমার সঙ্গ পিপাসু হয়ে আমি এসেছিলাম, নিজের আলাদা ঘর পেলে তা থেকে আমায় বঞ্চিত হতে হত। ঐ শীতের ভোরে বাসন্তী মা স্নান সেরে তার গোপালের সামনে ধ্যানস্থ হত। আমি চাদর মুড়ি দিয়ে চেয়ে চেয়ে তার সেই দেবীমূর্ত্তি দেখতুম।

এর পরদিন আমরা ট্রেনে করে হরিদ্বার গেলুম। হরিদ্বারে নেমে আমরা ভোলাগিরির আশ্রমে উঠলুম। তেত্রিশ শব্দটি সহজ নয়। তা আমরা তেত্রিশ কোটি দেবতা দেখেই অনুভব করি। কাজেই তেত্রিশ জন মানুষের বিরাট দল দেখে আমরা ভাঙ্গা বাড়ীর পেছনে স্থান পেলুম। সেখানে বাথরুম নিচে। বাসন্তীমা তার স্নিগ্ধ মধুর ব্যবহারে জয়ী হল। সেখানকার সাধুকে আমার কথা বলে আমার অপারক অবস্থার কথা স্মরণ করে সে সামনে গঙ্গার ওপর যে ধর্মশালাটি আছে তাতে আমাদের জন্য একটি ঘর সংগ্রহ করলো।

অপরূপ ধর্মশালা—। তাতে একটি বড় ছাদ। থামদিয়ে গঙ্গার ওপর পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। ধর্মশালার মধ্যে দিয়ে গঙ্গা কুলকুল করে বয়ে চলেছে। ঘরে জানলা খুলে বসলে শুধু গঙ্গার দিকে চাইলেই মন

ভরে যায়। কত জায়গায়ইত গঙ্গা দেখেছি? কিন্তু হরিদ্বারের গঙ্গার সঙ্গে যেন কোন জায়গার তুলনা হয় না এরপর "হরকে পেয়ারী ঘাটে" গেলুম। গঙ্গারধারে একটি হিন্দুস্থানী কথক ঠাকুর বসে কথকতা কচ্ছিলেন। বাসন্তীমা বললো মা কথকতা শুনলে সেখানে একটু বসতে হয়। বাধ্য হয়ে বসলুম। ইচ্ছে যে খুব ছিল তা নয়। কিন্তু বসে সত্যি সত্যি আকৃষ্ট হলুম। সেদিন মহাত্মাজীর জন্মদিন ছিল—। কথক-ঠাকুর ভগবানের সঙ্গে সাদৃশ্য দিয়ে দিয়ে মহাত্মাজীর জীবনাদর্শের যেকথা বললেন তা সত্যিই মর্ম্মস্পর্শী—। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের পর তিনি ধুয়া গাইছিলেন। বোলে কানাইয়া। খুব ভাল লাগলো খানিক শোনার পর আমরা উঠে গঙ্গার ধারে গেলুম। দুধারে পুজার নানা উপকরণ। কাঞ্চন ফুলের পাতার নৌকায় করা ঘীয়ের প্রদীপ আর ফুলের অর্ঘ্য সাজানো যে যার সামর্থ্য অনুসারে কিনে ভাসাচ্ছে—। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে সে যে গঙ্গাবক্ষে আলোর প্রদীপের নৌকার কী অপূর্ব্ব শোভা তা লিখে বোঝানর নয়।

এখানে আমার হরকে পিয়ারী ঘাটের ওপর লেখা একটা কবিতা দিলুম।

হর কি পিয়ারী নাম শুনে মোর মনে পড়ে কত কথা
হরের জটায় উদ্ভূতা হয়ে হলে কিমা জটাচ্যুতা
বিগলিত হয়ে রজত ধারায়
উদ্ধার তরে এসে এ ধরায়
একি অপরূপ বিগলিত রূপ করুণা মূর্ত্তিমতী
হরের পাশেতে অপূর্ব সাজে তুমি যে মা পার্বতী
সন্ধ্যা আরতি ফুলসজ্জায় সাজায় তোমায় যবে
সেকী দীপমালা আলোর নৌকা পুষ্পের সৌরভে
আলো আর ফুল কিরণ ছড়ায়
দৃষ্টি মোহিত কূল নাহি পায়
কূলেতে দাঁড়ায়ে পুরোহিত সব জ্বালায়ে প্রদীপ হায়
পূর্ণিমা চাঁদে করে যে আরতি যেন খদ্যোত প্রায়।
শোক ভরা মন কীবে পরশন স্নিগ্ধ প্রলেপমত
আপনার হাতে বুলালে মা হায় যেখানে গভীর ক্ষত
মনে হল হেথা শান্তি গভীর
বেদনা ধুয়াতে সুশীতল নীর
ফিরিতে না চায় আর গৃহ নীড় শুধু মার কোল চায়
তরঙ্গ তুলে মা যে ডেকে বলে আয় আয় কোলে আয়।
পাশে বসে মোর বাসন্তী মাতা সুমধুর সুর তুলে
গঙ্গা মায়ের স্তোত্র যে গায় পথিকের মন ভুলে
দাঁড়াইয়ে লোক কাতারে কাতার
প্রাণঢালা সে কী সুর ঝঙ্কার
দেবীর স্তোত্র মূর্ত্ত হইয়া জাগ্রত যেন হয়
আমি সব ভুলে হই নিমগণ হই আমি তন্ময়
চাঁদের আলোয় তরঙ্গ নীর রজত আলোয় ভরা
ছল ছল জল করে টলোমল মুনিজন মনোহরা
সেকী সুগভীর শান্তি প্রতিমা
দেব সুর নরে দিতে নারে সীমা
কি করে বলিব তাঁহার মহিমা ভাষা লাজে হেরে যায়
তুষার ধবল সেরূপ মায়ের তরল চাঁদের প্রায়।

অনেক রাতে ধর্মশালায় ফিরলুম মন পরম প্রশান্তিতে ভরা—। রাতে দুপাশে দুই মাকে নিয়ে ঘুমলুম। একপাশে বাসন্তী আর এক পাশে সার্থক নামা নির্ম্মলা বাসন্তীর বড় বোন। অমন দেবীর মত মানুষ বড় দেখা যায় না—তবে বাসন্তী যেমন অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল নির্মলা তেমনি ধীর শান্ত স্নেহময়ী—। যতই দেখি বাসন্তীর গর্ভধারিণী মাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। মাঝ রাত্তিরে দড়াম করে আছাড় খেয়ে এক কাণ্ড করলুম। দুবোনে কি হল মা কি হল মা বলে জড়িয়ে ধরলো। হবে আর কি চির জীবনের সাথী মাথাঘোরার আবির্ভাব। সকালে উঠে সর্ব্বাঙ্গে কালসিটে—। সবধারের জিগ্যেসের চোটে ব্যাথার চেয়ে লজ্জা হল বেশী। পাথরের দেয়াল ও তার সঙ্গেই পাথরের চেয়ে শক্ত হাড়ের ঠোকাঠুকি মাঝরাতে সে যা ঠকাস্ করে আওয়াজ আর এই বিরাট দেহ নিয়ে আছাড় খাওয়া সে আর ভোলার নয়।

সকালে আবার রিক্সা করে আমরা রওনা হলুম। প্রথমে গেলুম অবধূত মণ্ডলে। সেখানে প্রথমে দুর্গার

জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি, সাদা মার্বেল পাথরের মূর্ত্তি, কিন্ত পাশে এমন কায়দা করে আরসী বসানো যে দেখলে মনে হয় সার সার অজস্র মা জগদ্ধাত্রী বসে আছেন। আবার ঠিক সেই কায়দায় গণেশ। নর নারায়ণ। রামসীতা নরসিংহ মূর্ত্তি। একটি বাসন্তীমার ছাত্রী নরসিংহ মূর্ত্তি দেখে বল্লো দেখ ভাই দেখ প্রহ্লাদ বধ হচ্ছে আর একজন বললো নারে না নরসিংহ বধ হচ্ছে—। বাসন্তী শুনে হেসে উঠলো, বললো থাক আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। শেষে মা এই নিয়ে না গল্প লেখে—। হেসে বল্লুম দোষটা ওদের চেয়ে বেশী তোদের। এই মেয়েদের বি টি ডিগ্রী দিয়ে তোমরা ছেড়ে দেবে। এরা প্রহ্লাদ বধ শিখিয়ে বেড়াবে।

ওখান থেকে আমরা গুরুকুল ঋষিকুল কলেজে গেলুম কিন্ত সেদিন ২রাঅক্টোবর বলে কলেজ বন্ধ। অদৃষ্টে দর্শন হল না। ওখান থেকে আমরা কনখলের দিকে রওনা হলুম। রাস্তায় আমার ও বাসন্তীর রিক্সা হঠাৎ রাস্তা ছাড়িয়ে সামনের দিকে দারুণ ধাক্কা খেলো—আমি বাসন্তীকে বল্লুম দেখ আমার আজ পতন যোগ আছে। নেহাৎ তোর সঙ্গে আছি তাই তোর ভাগ্যে বেঁচে গেলুম। বাসন্তীর চোখদুটি ছলছল করে উঠলো, বললো আবার তোমার লাগেনি ত? কণখলে একটি শীর্ণকায় গঙ্গা দেখলুম। সেখানে সতী দেহত্যাগের আগে স্নান করেছিলেন। এক ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করে সেখানে আমাদের জলস্পর্শ করালেন। উঠে দেখি একটি বিরাট অশথ গাছের তলায় একটি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বসে তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করছেন। সে যে কী প্রাণঢালা আবৃত্তি যে না শুনেছে বলে বোঝানর নয়। বাসন্তীমাও মন্ত্রমুগ্ধ আমার অবস্থাও তথৈবচ—। আমরা গোল করে তাঁকে ঘিরে রামায়ণ শুনতে বসে গেলুম। খানিক বাদে উঠে তাঁকে প্রণামী দিতে সাধু সামনের পেতলের ছোট হনুমান মূর্ত্তিকে দেখিয়ে বল্লেন, আমার আমারও এহিকাজ উনকে রামনাম শুনানেকে—। ধন্ত রামায়ণ গাথা আর ধন্ত পাঠক আর ধন্ত ভক্ত-চূড়ামণি হনুমান।

ওখান থেকে আমরা দক্ষ-যজ্ঞ দেখতে গেলুম। সেখানে মায়ের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। দক্ষ যজ্ঞের স্থান, মার্বেল পাথরের কারু কার্য্যময় মন্দির—। দক্ষরাজার একটি পৃথক মন্দির রয়েছে। আবার বাসন্তীমার ক্যামেরা আমাদের সঙ্গে সেই মন্দির টিকে বন্দী করার চেষ্টা করলো—।

এখান থেকে আমরা গেলুম মানব কল্যাণে—এখানের ঠাকুরগুলি যে কী নয়নাভিরাম কি বলবো। প্রথমে যুগলমূর্ত্তি রাম সীতার সৌম্য লাবণ্যভরা দুটি অপরূপ মূর্ত্তি তার পর হরগৌরী তার পর রাধাকৃষ্ণ। তাছাড়া দেয়াল ভরা কতযে ঠাকুর দেবতার পট তার লেখা জোখা নেই। রামায়ন মহাভারত ভাগবতের নানা ঘটনার ছবি। সেখান থেকে ফেরার পথেপথথেকেই দেবী পাহাড় দেখলুম কারণ সময়ও সংক্ষেপ সামর্থ্য ও সীমিত। তার পর আমরা গীতা ভবন দেখে ধর্মশালায় ফিরলুম। পথে বাসন্তীমা প্রচুর রাবড়ী কিনলো সকলকে খাওয়াবার জন্ম। ঐখানেই বাসন্তীর বৈশিষ্ট্য সে শিক্ষয়িত্রী হয়ে তার মাতৃহৃদয়কে দিকেদিকে প্রসারিতই করেছে হারিয়ে ফেলেনি।

পরদিন সকালে আমরা ট্যাকসী করে হৃষিকেশ রওনা হলুম। এখানে আমরা বিখ্যাত কালী কমলির ধর্মশালায় উঠলুম। ধর্মশালার পরিধি দেখলে অবাক হতে হয়। ওখানে মাল পত্র রেখে আবার ট্যাকসী করে লছমন ঝোলা রওনা হলুম। ওখানের দৃশ্য অতি মনোরম। যেমনি অপূর্ব্ব শৈলমালা তেমন তার কোলে তরঙ্গময়ী গঙ্গার প্রবাহ। পাশে মনিকূট আর অন্ত পাশে ঋষিকূট পাহাড়। ঐ ঝুলন্ত জলে দোলায়মান অবস্থায় আবার বাসন্তীমার ক্যামেরায় বন্দী হলুম। কলকাতায় ফিরে ছবি যখন এনলার্জ হয়ে এলো তখনও দেখলেই বোঝা গেল যে আমার মাথা কী পরিমাণে ঘুরছিল তা স্পষ্ট আঁকা আমার উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে। এই সময় একটি মানব শিশু এগিয়ে এলো বীরোচিত ভঙ্গীতে। শুনলুম তার নাম রাজু গাইড। সে

আমাদের চুপ করে শুনতে বলে টপ করে লাফিয়ে একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে নাতি দীর্ঘ এক বক্তৃতা দিলো—। তার দুপায়ে দুপাটি জুতো পরনে শতছিন্ন একটি পাজামা। ওজস্বিনী ভাষায় সে যা বক্তৃতা দিলো তা সত্যিই তার প্রতিভার পরিচয় দেয়। তক্ষুনি দলে দলে ক্যামেরাম্যান এসে আমাদের ঘিরে ফেলল। ইতিমধ্যে রাজু বাসন্তী মাকে আশ্রয় করেছে। বাসন্তীমার অগাধ স্নেহের প্রশ্রয়ে রাজুর সঙ্গে আমাদের একত্র একটি ছবি তোলা হল। ক্যামেরাম্যান অনেক এলো কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় রাজুর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। ঝুলন্ত ব্রীজ পার হয়ে কান যানই আমরা পেলুম না। অশক্ত অবশ চরণ দুটি সম্বল করেই হাঁটতে শুরু করলুম। হাঁটছি ত হাঁটছিই। রাজু ইতিমধ্যে অনেক কথাই বলেছে। বাড়ীতে আরো ভাইবোন বাবা আর সৎমা তার আছে। সকাল থেকে খেয়েছে শ্রেফ চা। এবার শুধু বাসন্তীই নয় আমাদের সব মায়েরই মন বিগলিত। বাসন্তী বললো তুই আমাদের সঙ্গে হৃষিকেশ চল তোকে সার্ট প্যান্ট জুতো সব কিনে দোব। টাকা নিয়ে কী করবি বল? তোর সৎমা ত নিয়ে নেবে। সিঁড়িতে উঠে রাজু গাইড বলল টাকা না নিয়ে গেলে আমায় মারবে। যাই হোক পথে অন্ধ গায়ক সুরদাসের দর্শন মললো। তিনি বল্লেন আর একটু গেলেই আমরা হোটেল পাব। আবার চলেছি ত চলেছি—বাসন্তীমা রাজুকে নিয়ে খানিকটা এগিয়ে চলেছে। এক জায়গায় দেখি গাছের তলায় এক সাধু ধুনী জ্বালিয়ে বসে আছেন চোখের পলক পড়ছে না। বাসন্তী বললো জানোমা আমি ঘড়ি ধরে কুড়ি মিনিট দাঁড়িয়ে এই এক অবস্থা দেখছি। আমরাও অবাক হয়ে দাঁড়ালুম। মনে হয় আরো পনের কুড়ি মিনিট পরে সাধুর পলক পড়লো বা সম্বিৎ ফিরলো। তিনি প্রথমে ইংরাজীতে তারপর বাংলায় যা বললেন তার মর্মার্থ হচ্ছে বাংলা বিভাগের ফলে তিনি দেশত্যাগী হয়ে সাধু হয়েছেন। কারণ যাই হোক এবে যোগশক্তি অস্বীকার করা যায় না। এবার আমরা হোটেলের দর্শন পেলুম। মাত্র দশ পনের মিনিটের মধ্যে তারা ডাল ভাত তরকারি দই মিষ্টি দিয়ে আমাদের পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়ে দিলো। দেখলুম রাজুর সঙ্গে পাঁচক থেকে পরিচারক সকলেরই হৃদ্যতা রয়েছে। এক এক টেবিলে চারজন বসেছি। একটা টেবিলে বাসন্তী আমি অধ্যাপক মশাই আর রাজু বসলুম। বাসন্তী বললো রাজু তোর যা ইচ্ছে পেট ভরে খা। রাজু অম্লান বদনে চার প্লেট দই টেনে নিলো। তরকারী ডাল স্পর্শও করলো না বললো শ্রেফ দই আর মিঠা আর ভাত। টেবিলের মধ্যের বোয়েমের সব চিনিটা ভাতে ঢেলে পরিতৃপ্তি সহকারে খেলো।

এখানে একদল হিপির সঙ্গে আমাদের দেখা হল। তাদের গাঁজার ধোয়ার চোটে সেই হোটেলে একটি ধূম্রলোকের সৃষ্টি হল। সবচেয়ে মজার ঘটনা হল তাদের স্নানরত অবস্থায় দেখে একজন শিক্ষক তাদের কোন শ্বেতকায় জন্তুর দল মনে করে ছিলেন। তারপর আমরা একটি বিরাট হোটেলে এসে পড়লুম। এ হোটেলের নাম টুটকী কলের হোটেল—। বিজ্ঞাপন স্বরূপ দরজার কাছে একটি আগাগোড়া পেন্ট করা নাদুস নুদুস ছেলেকে গলায় রুদ্রাক্ষ্যের মালা কপালে ত্রিপুণ্ডক গায়ে নামাবলী ও মুণ্ডিত মস্তকে সূচাগ্র এক শিখা মনে হয় মোম বা ঐ জাতীয় কিছুর সাহায্যে উড্ডীয়মান করে রেখেছে। রাজু বললো ঐ ছেলেটি তার সৎমার ছেলে।

এখান থেকে কিছু হেঁটেই আমরা গীতা ভবনে গিয়ে পৌছলুম। সমগ্র মন্দিরটি গীতার শ্লোকে ও ছবিতে ভরপুর। এর পরেই পরমার্থ মন্দির। এখানে কত যে ঠাকুর কি বলবো? শ্বেত পাথরের বিরাট শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ মূর্ত্তি ঠিক মানব কল্যাণের মত আয়নার সাহায্যে দিকে দিকে প্রতিফলিত। ঠাকুরের যেন হাট বসে গেছে। যেদিকে ফিরাই আঁখি তাহারই মূরতি দেখি। ফিরতে হবে এবার কিন্তু ফিরতে মোটেই ইচ্ছে কর্চ্ছে না। আবার খানিক হেঁটে মটোর লাঞ্চের ঘাটে এলুম। পার হতে পয়সা লাগে না এত তীর্থযাত্রীর

জন্ত বিড়লার ব্যবস্থা। আবার মটোরে করে হোটেলে ফিরলুম। আমাদের গাড়ীতে উঠলো রাজু গাইড—। সারা রাস্তা বুক অবধি ঝুঁকে শিশু কণ্ঠে সকলকে জানালো রাজু গাইড যাচ্ছে মটোরে। প্রতি মটোরে চারজন করে যাত্রী নেবার কথা বাড়তি হলে মাথা পিছু দুটাকা কিন্তু রাজু অন্য গাড়ীতে জায়গা থাকলেও তার দিদির গাড়ীতে যাবে। স্নেহে বনের পশুও বশ হয় আর ও ত স্নেহের কাঙ্গাল মানুষ মাত্র। কালি কমলী-বালার হোটেলে নেমে আমরা বিশ্রাম করলুম কিন্তু বাসন্তী তখন রাজুকে নিয়ে অন্তর্দ্ধান করেছে। খানিক বাদে যে রাজুকে নিয়ে বাসন্তী ফিরলো তাকে আর পুরনো রাজু বলে চিনার উপায় নেই। কোট থেকে প্যান্ট থেকে গেঞ্জি থেকে জুতো থেকে বেল্ট অবধি নতুন ছেঁড়া জামা কাপড় প্যাকেট করে রাজু এসে দাঁড়ালো। বাসন্তী মা বললো এবার তোমারা ওকে কী দেবে দাও। আমি পাঁচটি টাকা দিলুম আর সব মেয়েরা মিলেও দিলো মন্দ নয়। ঐ রাতটি হৃষিকেশে কাটিয়ে আমরা আবার মোটারে করে দেরাদুন রওনা হই। এখানে একটি সাধুসঙ্গ ঘটেছিল। সাধুটির সঙ্গে দেখা হলেই তিনি জয় জয় মা বলতেন বলে তাঁকে সবাই জয়মা সাধু বলে চেনে। তাঁর আগ্রহে বাসন্তী আমাদের নিয়ে তাঁর আশ্রমে গেলো অতি মনোরম শান্ত পরিবেশ—। সাধুটির একটি কথা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। সাধুটি বলেছিলেন আমার পরে আ কথাটি বাদ দিতে হবে। তাহলে সবই মার—। আর মারে কে? বড় সুন্দর কথা। আমরা অবার দেরাদুনে ফিরে এলুম। আমার একান্তই কন্যাতুল্য শ্রীমতী অর্চ্চনা দত্তর বড় ভাসুর কর্নেল মন্দীম মুকুল দত্ত দেরাদুনে জিওলজি-কাল সার্ভেতে উচ্চ পদে নিযুক্ত। আমি দেরাদুন যাচ্ছি শুনে আলোমণি (অর্চ্চনার ডাক নাম) বললো মাসীমা আপনার যা শরীর আপনি কি করে ধর্মশালায় থাকেন? এই ফোন নং টা নিয়ে যান আমিও চিঠি লিখে দিচ্ছি। দাদার কাছে উঠবেন। আমার জা আমার চেয়ে ভালো। আলোমনির চেয়ে ভালো যে কী বস্তু তা জানবার আগ্রহ হলেও আমি বাসন্তীকে ছেড়ে সেদিকে হাত বাড়াইনি। কিন্তু ভাগ্য যখন ভালো হয় চাঁদ আকাশ ছেড়ে নেমে আসে। ডাঃ চাটার্জ্জীর মুখে খবর পেয়ে প্রতিমা এসে দাঁড়ালো মন্দীমের প্রতিনিধি হয়ে। ভারি চমৎকার মেয়ে। ঐসময় ওখানকার যোমিনা পত্রিকায় বাসন্তীর ডিলিটের খবর সবে বেরিয়েছে তারা এসে ধরলো—বাসন্তীকে পাঠের জন্য। কিন্তু তারো আগে প্রতিমা মায়ের হাতের রান্না খাইয়ে প্রতিমা মা আলোমনির কথার সত্যতা প্রমাণ করে দিলো—। তবে আলোমনির চেয়ে ভালো একথা বলতে আমি রাজী নই তাই বলছি সমান সমান।

বাসন্তীমা প্রতিদিন "কলিবিক্রায়নী" পাঠ করলো দ্বিতীয় দিন আবার ডাক ঐদিন দামবন্ধন পাঠ করে বাসন্তীমার জয়ধ্বনিতে তৃপ্ত হয়ে আমরা বাড়ী ফিরলুম। ডাঃ চ্যাটার্জ্জী সমস্ত বি টি ক্লাসের মেয়েদের ও আমাদের প্রচুর আহারে পরিতৃপ্ত করলেন। মিসেস চ্যাটার্জ্জী ও তাঁর মেয়ের আন্তরিকতাও আমাদের স্মরণীয় হয়ে রইল। এবার ফেরার পালা। কদিনের বন্ধন তবুও সকলকে ছাড়তে হবে ভেবে মনটা বেদনায় গভীর হয়ে উঠলো—। এরি মধ্যে বাসন্তীমা সারা রাস্তা কীর্ত্তন ও স্তোত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে যতটা পারলো ভরিয়ে রাখলো—। আবার হাওড়া ষ্টেশান।

যত আঁধার তত আলো

(উপন্যাস)

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২৮

যোগেন আচার্য্যির যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। গন্নাথও একপ্রকার স্থির করে বসে আছেন এখানের মা কাটাবার জন্ত।

হরেন মাষ্টারের মনের বিষ :জবকে আশ্রয় করে ণে ক্ষণে ঝরে পড়ছে। নতুন আমদানি অনেকেই মন মাষ্টারের সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। পুরোনো মা তাঁদের বিরক্তি আর অশান্তি দিন দিন বেড়ে ছে। প্রকাশ্যে কেউ প্রতিবাদ করেন না। হয়ত মা মনে করেন যে প্রতিবাদের অভাবে ক্লান্ত হয়ে সময় ওরা আপনি থামবে।

দিন কয়েক ধরে অসহ্য গরম পড়ছে। মলয়ের মা আশানুরূপ এগুচ্ছে না। মনোরমা ইতিমধ্যে রও বারকয়েক আসা যাওয়া করেছে। হঠাৎ যেন ও ন্ত গভীর হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে অন্তমনস্ক যায়। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষন করলে অকারণে ার লাল হয়ে ওঠে। প্রশ্ন করলে বড় বড় চোখে শর মত চেয়ে থাকে। অথচ এই মেয়ের কথায় এবং তার একদিন তাকে হতবাক করেছে।

ইতিমধ্যে বারকয়েক ভালমন্দ গোটাকয়েক করে মনোরমা তাকে খাইয়ে গেছে। মলয় বাধা দিয়েছিল। দুঃখ করে বলেছে, এই খাওয়ায় কখন মানুষ বাঁচতে পারে? এতো পরিশ্রম করছেন বাঁচবেন কি করে। ভারী মিষ্টি করে মনোরমা হাসে। মলয় মুগ্ধ হয়। বুকের মধ্যে সপ্ত সিন্ধু উথলে ওঠে। মুখ ফুটে বলতে পারে না ওর জন্ত মলয়ের এ দুর্ভাবনা কেন কেনই বা সব ভালমন্দ নিয়ে তার এত দুশ্চিন্তা।

মনোরমা বলে, আরও অনেকের মত আপনিও আমার কেউ নন কিন্ত কিজানি ,কেন তবুও আপনার কাছে ছুটে আসতে আমার ভাল লাগে। রোজ একবার করেও অন্তত আপনার কথা আমার মনে পড়ে। আপনার ফুকারটাকেও আমি ভুলতে পারি না।৮ কেন এমন হয় বলতে পারেন আপনি?

প্রশ্নটা সহজ নয় উত্তরটাও মলয় সহজে দিতে পারে না। কিন্ত মলয়ের বুকের মধ্যে আচমকা ঝড় বইতে সুরু করে। মনকে সবলে নাড়া দেয় কত সুখ-দুঃখের কাহিনী। মলয় মনে মনে নিজেকে .সংশোধন করে। একে কাহিনী বলা ঠিক হয়নি—সত্য ঘটনা। দুর্ঘটনার আবর্ত্তে পড়ে কলঙ্কত—পরিচয় হীন......

মলয় জবাব দিতে পারে না—শুধু সতৃষ্ণ নয়নে সে চেয়ে থাকে মনোরমার মুখের পানে।

মনোরমা ধীরে ধীরে বলতে থাকে, আমি জানি

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া মোটেই সহজ নয় তবুও দেখুন এই একটা কথা প্রায়ই আমার মনে দোলা দেয়।

মলয়ের সমস্ত সত্তা জেগে ওঠে। ওর বুকের অভ্যন্ত কোমল হৃদয় আলোড়িত হয়ে ওঠে। মলয় কতকটা আত্মহারা ভাবে বলে, পূর্বজন্মে তুমি হয়তো আমার মা ছিলে মনোরমা। অনেক পাপের ফলে এ জন্মে এতো কাছে পেয়েও—মলয় সহসা হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ায়।

মনোরমা অবাক বিস্ময় মলয়ের মুখের পানে চেয়ে ছিল ওর কথার মধ্যে যে ধরণের আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে মনোরমার কাছে তা সম্পূর্ণ নতুন। সে বিহ্বল কণ্ঠে বারে বারে শুধু বলতে থাকে কি যে আপনি বলেন—

মনোরমা বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করতে পারে না। মলয় তার চলে যাওয়ার পরে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার দৃষ্টি যতদূর যায় সবটাই যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে। অস্থির ভাবে বহুক্ষণ ধরে ঘরময় পায়চারি করতে থাকে মলয়। তারপরে একসময় আবার তার খাতা কলম নিয়ে বসে।

মলয় লিখতে থাকে :—

মৃদুলাদের বাড়ী থেকে বার হয়ে এসে মৃগাঙ্ক যেন হাওয়ায় ভর করে এগিয়ে চলল। আজকের সন্ধ্যাটা তার বড় ভাল কেটেছে। জীবনের একটা অভিনব দিকের সন্ধান আজ সে পেয়েছে। যার সৌন্দর্য্য মৃগাঙ্ককে মুগ্ধ করেছে চঞ্চল করে তুলেছে। কিন্তু এই অনাবিল আনন্দের স্বাদ তার ভবিষ্যৎ জীবনকে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারে সেকথা তার অন্তর্যামীই জানেন।

মৃগাঙ্ক গুণ্‌ গুণ্‌ করে গান গাইতে গাইতে ঘরে এসে প্রবেশ করতেই মা অনুযোগ দিয়ে বললেন, হ্যাঁরে এই এতখানি রাত তুই কোথায় ছিলি। তোর খাবার কোলে করে সেই কখন থেকে বসে আছি আমি।

মৃগাঙ্ক জামা খুলতে খুলতে বলল, তুমি শুয়ে পড়গে মা। আমি খেয়ে এসেছি।

মা প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে খেয়ে এলি।

চৌধুরীদের জগময় বাবু ধরে নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়ালেন। মৃগাঙ্ক জানাল।

মা অনুযোগ দিলেন, খাবিনে তা বলে গেলেই হ'তো।

মৃগাঙ্ক হাসিমুখে বলল, জানি জানলে তবে তো তোমাকে জানাবো মা।

মা অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন, কেতকী জানে আর তুই জানিস নে।

মৃগাঙ্ক রাগ করে বলল, কেতকী, এমন অনেক কথা জানে যে কথা আমরা কেউ জানি না। কাল দেখা হ'লে আমি মোকাবিলা ক'রবো।

তুমি তা পার, মা বললেন, কিন্তু কেতকী কোন অন্যায় কথা বলেনি। বলেই মা চলে গেলেন।

মৃগাঙ্ক মনে মনে একটু হাসল। মাকে অবশ্য আর উত্যক্ত করল না। তবে আগামী কাল সে কেতকীকে তার এই অনধিকার চর্চ্চার জন্য বেশ দুকথা শুনিয়ে দেবে।

সারাটা রাত একটা অদ্ভুত সুখানুভূতি মৃগাঙ্কর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখল। মৃদুলা তার অন্তচেতন মনের তারে আস্তে আস্তে আঙুল বুলিয়ে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি ক'রেছে। ঘুমের মধ্যেও মৃগাঙ্ক অনুভব করেছে ওর উষ্ণ স্পর্শের মধুর ব্যঞ্জনা। একটা অশরীরী উপস্থিতি। মাঝে মাঝে কেতকীর আবির্ভাবে স্বপ্ন কেটেছে।

পরদিন ঘুম ভেঙে আলস্য জড়ান, চোখ মেলে একবার আশে পাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল। তার সর্বাঙ্গে তখনও স্বপ্ন স্বর্গের মাদকতা জড়িয়ে আছে।

খোলা জানালা দিয়ে খানিকটা কাঁচা রোদ ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। একজোড়া চড়ুই পাখী ঝগড়া করতে করতে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেই আবার বার হয়ে গেল। একটা কাক অদূরে নিমগাছের ডালে বসে বিচিত্র সুরে ডাকছে।

মৃগাঙ্ক পুনরায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আরও খানিক গড়িয়ে নিতে পারলে মন্দ হয় না।

মার ডাক শোনা গেল। আর কতক্ষণ শুয়ে থাকবি এবারে ওঠ মৃগু।

মৃগাঙ্ক, সাড়া দিয়ে বলে, আর একটু গড়াতে দাও না।

মা বললেন, তোর চা জলখাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মৃগাঙ্ক বলে, একদিন না হয় ঠাণ্ডাই খাব।

মা ধমক দিলেন। বাজে বকিসনে বাপু। মুখ হাত ধুতে তো আরও একটি ঘণ্টা কাটিয়ে আসবি।

মৃগাঙ্ক হেসে বলে, এই একঘণ্টা হাতে রেখে ঠাণ্ডা হবার কথা বলেছো তো মা?

মা বলেন, ও আবার কোন দেশী কথা হলো মৃগু?

মৃগাঙ্ক বলল, আরও আধঘণ্টা অনায়াসে গড়িয়ে নিতে পারি তার হুকুম পাওয়া গেল—তাই বলছিলাম।

মা ধমক দিলেন, ছেলেমানুষী করিস নে মৃগু। এরপরে আবার ঝাট পাট দিতে হবে বাবু।

মৃগাঙ্ক উঠে বসল। বিরক্তির ভরে বলল, তোমার জালায় যে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমবো তারও উপায় নেই মা।

নিমগাছের উপবিষ্ট কাকটা মৃগাঙ্কর সুরে সুর মিলিয়ে ডাকল, ক-ও-য়া, মৃগাঙ্ক একবার সেই দিকে চেয়ে দেখে গুন গুন করতে করতে চলে গেল।

মা তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলতে থাকেন, পুকুর পারে আবার ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে এসো না। তোমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমাকে বসে থাকতে হবে কিন্তু।

মৃগাঙ্ক চলে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলে যায়, দেরি হবে না মা—আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি।

মা বলেন, তবু ভাল—তোমার তো বাপু গুনের ঘাট নেই।

মৃগাঙ্ক নিমগাছ থেকে এক খানা দাঁতন যোগ্য ডাল ভেঙে নিল। কাকটা আর একবার কর্কশ রবে বিরক্তি জানিয়ে উড়ে গেল।

বড় ভাল লাগছে আজকের মিষ্টি সকালটি। মৃগাঙ্ক গুন গুন করতে করতে পুকুর পারে এসে দাঁড়াল। ছোটঠাকুর্দার তৃতীয় পক্ষ কলসী কাঁখে চলে যেতে গিয়েও মুচকি হেসে থমকে দাঁড়াল। মৃগাঙ্ক বলে, কিছু বলবে নাকি গো ছোট ঠানদি—

ঠানদি ভ্রূ নাচিয়ে চলে গেল। খানিকটা জল ছলকে পড়ল ভরা কলসী থেকে। পথটা ভিজিয়ে দিয়ে গেল ছোটঠাকুর্দার তৃতীয় পক্ষ। কে জানে কে আছাড় খেয়ে পড়বে... ভাবছিল মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক মুখ হাত পা ধুয়ে দ্রুত বাড়ীর পথে এগিয়ে চলল মাকে সে কথা দিয়েছে। দেরি হলে আজ আর রাখবেন না। কাল রাত থেকেই মার মেজাজ বিগড়ে আছে।

মৃগাঙ্ক দেরি করতে না চাইলেও ভাগ্য তাকে দেরি করিয়ে দিল। হরিহর খুড়োর সঙ্গে আকস্মিক ভাবে দেখা। মৃগাঙ্ক না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। হরিহর ডাক দিলেন, বলি ও মৃগাঙ্ক চোখ তুলে একবার এদিক ওদিক দেখে চলো বাবা। শুনেছি অনেকদিন এসেছো। নেহাৎ আজ দেখা হয়ে গেল তাই নইলে একদিনের জন্যেও একবার গেলে না তো বাবা। তোমার খুড়ি সেদিনে কত দুঃখ করছিলেন।

মৃগাঙ্ক একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, করলেন বুঝি তা আর করবেন না। হরিহর বললেন, আজই না হয় গোটা কয়েক পাশ করে একজন হয়েছো। নইলে এই সে দিনেও তোমরা কত কাণ্ড করে বেড়িয়েছো তাকি ভুলে গেছি মনে করো?

মৃগাঙ্ক যেন খুব লজ্জা পেয়েছে এমনি মুখ ভঙ্গি করে বলল, এসব কথা বলে কেন মিছে লজ্জা দিচ্ছেন খুড়ো।

হরিহর হা হা করে হেসে উঠলেন। তারপরে যেন কোন গোপনীয় কথা এমনিভাবে প্রায় কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন, তোমার খুড়ি আবার ঐ দস্যি পানাই বেশী পছন্দ করেন। একবার যেও মৃগাঙ্ক বড্ড খুশী হবেন।

মৃগাঙ্ক আগ্রহভরে বলল, নিশ্চয় যাব খুড়ো।

হরিহর পুনরায় ফিস ফিস করে বললেন, অত বড় ছেলেটা গেল বছর বিনা চিকিৎসায় গেল। তোমার খুড়ী সেই থেকেই কেমন যেন থেমে গেছেন। এই বুড়ো বয়েসে আমার হয়েছে মহা জ্বালা। না বাইরে গিয়ে কোথাও দুদণ্ড বসতে পারি না বাড়ীতেই মন টেকে। ওঁর যত রাগ আমার উপর। যেন ছেলেটার মৃত্যুর জন্ত আমি দায়ি। বলো দেখি মৃগাঙ্ক আমার যে পয়সা নেই সেও কি আমার অপরাধ। একবার যেও বাবা। একটু বুঝিয়ে বলে এসো। তোমার কথা হয়তো শুনবেন।

মৃগাঙ্ক কথা বলতে পারে না। আজকের সকাল বেলার সবটুকু মাধুর্য্য যেন কেমন ম্লান হয়ে গেল। ওর নীরবতা অস্বীকৃতি মনে করে হরিহর পুনরায় অনুরোধ করে বলেন তোমার খুড়ির মাথার ঠিক আছে কিনা আমার সন্দেহ হয়। বাইরে থেকে অবশ্য কিছু বুঝবার উপায় নেই: রান্না বান্নাও করেন— খাওয়া দাওয়াও করেন। আবার একসময় হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেন। শান্তনা দিতে গেলে বাপান্ত করেন। কিছু না বললে কান্না আরও বাড়তে থাকে। সবই বোঝেন আবার কিছু বোঝেন না।

মৃগাঙ্কর বলে, যা বলছেন তাতে আমি গেলে হয়তো হিতে বিপরীত হতে পারে।

তা হোক—হরিহর বলেন, তবুও একবারও যেও বাবা।

মৃগাঙ্ক কথা দেয় যে, যাবার আগে সে নিশ্চয় একবার যাবে।

তারা…তারা…তারা ব্রহ্মময়ী মাগো…হরিহর আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন।

মৃগাঙ্ক বাড়ীতে ফিরে এসে বিমর্ষভাবে নিজের ঘরে প্রবেশ করতেই মা এসে উপস্থিত হলেন চা এবং খাবার নিয়ে। পুত্রের আনত চিন্তিত মুখের পানে দৃষ্টি পড়তে প্রশ্ন করলেন কি হলো তোর মৃগু? অমন মুখ বুজে ভাবছিস কি?

একটি নিঃশ্বাস ফেলে মৃগাঙ্ক কাতর কণ্ঠে বলল, পুকুর মাঠে হরিহর খুড়োর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেই কথাই ভাবছিলাম। কেমন যেন হয়ে গেছেন উনি। বার বার করে একবার যেতে বললেন।

মা ছেলের পাশের আসনে বসে দুঃখের সঙ্গে বললেন, ওর ছেলের বয়সী যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই ঐ এক কথা বলেন। আমার তখন নিজেদেরও অপরাধী বলে মনে হয় বাবা।

থালা থেকে একখানা লুচি মৃগাঙ্ক মুখে তুলছিল মার কথায় হাত নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, এ কথা বলছো কেন মা।

মা দুঃখ করে বলেন, ছেলেটার অসুখের সময় হরি ঠাকুরপো এসে কিছু টাকার জন্ত বিস্তর কান্না-কাটি করেও পাননি। ওর সেই এক কথা আগের পাওনা শোধ না হলে একটি পয়সাও না।

মৃগাঙ্ক বলল, এতবড় বিপদেও বাবা দিলে না?

মা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলেন আমি অনেক করে বলেছিলাম। উনি জবাব দিলেন ব্যবসায় এ ধরণের দুর্বলতা দেখান পাপ।

মৃগাঙ্ক বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তুমি ইচ্ছা করলে কিছু টাকা অনায়াসে দিতে পারতে মা।

মা বললেন ইচ্ছে থাকলেও সব সময় সব কাজ করা সম্ভব হয় না বাবা। ওঁর চোখ এড়িয়ে যেদিন আমি টাকা নিয়ে গেলাম তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। হরি ঠাকুরপো নিলেন না।

মার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল।

মৃগাঙ্ক ডাকল, মা—

মা করুণ হেসে বললেন, তুই একটু শিগগির শিগগির নিজের পায়ে দাঁড়া মৃগাঙ্ক। তোর কাছে জীবনের বাকী কটা দিন কাটিয়ে দেব।

মৃগাঙ্ক কোন জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল।

মা পুনরায় বলেন, নিত্য তিরিশ দিন শোকের কান্না শুনে শুনে আমার বুক কাঁপে। ভগবানকে ডেকে

বলি, তাদের তাদের আগে ভাগে আমি যেন সরে পড়তে পারি।

সহসা মৃগাঙ্কর খাবারের থালার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তিনি বললেন, তুই কিছুই ছুঁলি নে তো মৃগু? একটু থেমে তিনি নিজেই তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলেন, আমারই ভুল হয়েছে এ সব কথা এখন না তুলাই আমার উচিত ছিল।

মৃগাঙ্ক জোর করে একটু হেসে বলল, আমার খাবার কথা বলছো তো মা? তুমি রেখে দিও আমি খুব পারবো। কিন্তু তারপরে কি হলো সেই কথা বলো।

মা ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, তোর হরিকাকাকে বললাম, তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছো কেন ঠাকুরপো এ টাকা তোমার দাদার নয়। তাঁর চোখ দুটো বাঘের মত জ্বলে উঠলো। তিনি জোর করে বললেন, ও টাকা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও বৌঠান তোমার নিজের ছেলেদের জন্য খরচ করো। আমি চমকে উঠলাম। তোর কাকী সজল চোখে বলেছিল ঠাকুরপোর কথা শুনে আর্তনাদ করে উঠল, ছি ছি এ কথা তুমি বলতে পারলে কোন মুখে। আমার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, অভাবে অনটনে ভাবনায় চিন্তায় ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার আশীর্বাদ তোমার ছেলেদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না দিদি।

মাথা নিচু করে চলে এলাম মৃগু। তারপরে আর একদিনও যেতে পারিনি। একবার যাস।

মৃগাঙ্ক অন্যমনস্ক ভাবে বলল, যাবো মা। তুমি যখন বলছো নিশ্চয়ই যাবো।

মা বললেন, তোর কাকী সত্যিই তোদের স্নেহ করেন মৃগু।

হরিহর খুড়োর বাড়ীতে মৃগাঙ্ক ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই উপস্থিত হল। খুড়ি দাওয়ার উপর শুয়ে হয়ে পড়ে আছেন আর খুড়ো পাকশাহি চিৎকার করছেন, তুইও একসঙ্গে গেলিনে কেন। আমিও বাঁচতাম তুইও বাঁচতিস। রোজ রোজ এ ঝামেলা আমার সহ্য হয় না। রাগের বশে হরিহর জ্ঞান হারিয়েছেন।

মৃগাঙ্কর সাড়া পেয়ে তিনি একেবারে নিভে গেলেন। কাকীর চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো। তারী করুণ একটুখানি হাসি মুখে টেনে এনে বললেন, লোকের কাছে শুনি মৃগু এসেছে—কথাটা শেষ না করেই তিনি চুপ করেন। বহুক্ষণ আর একটি কথাও তিনি বলেন না। হয়তো ভিতরের চাঞ্চল্য আর পুত্র বিয়োগ ব্যথা কতকটা আয়ত্বে আনবার জন্যই তাঁকে সময় নিতে হয়েছে। তারপরে একসময় মৃগাঙ্ককে পাশে বসিয়ে তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। ভুলেও তিনি একবার মৃত পুত্রের নাম মুখে আনলেন না। শুধু মৃগাঙ্ক চলে যাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সতৃষ্ণ নয়নে ওর মুখের পানে চোখ রেখে বললেন, যে কদিন আছিস রোজ একটিবার করে দেখা দিয়ে যাস বাবা। তোদের দেখলেও ভাল লাগে।

(২৯)

মৃগাঙ্ককে একলা পেয়ে কেতকী হেসে বলল, একটা খোস খবর দিলে কি খাওয়াবে মৃগুদা?

মৃগাঙ্ক জবাব দিল, খোস খবরটা কি তা না জেনে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।

কেতকী একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কি কাণ্ড করে এসেছো ওকি অমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? বুঝতে পারছো না বোধ হয় আমি কোন কথা বলতে চাইছি?

মৃগাঙ্ক বলল, তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছো। এবারে খবরটা শুনিয়ে আরম্ভ কর।

কেতকীর চোখে এক বিচিত্র ধরণের হাসি। সে বলল, মৃদুলা অসুস্থ তা জান?

মৃগাঙ্ক বলল, না জানি না—

বিস্মিত হবার ভান করে কেতকী বলল, ওমা

এতবড় খবরটা তোমাকে এখনও মৃদুলা জানায়নি। ভারী আশ্চর্য কথা দেখছি।

মৃগাঙ্ক বিরক্ত হয়ে বলল, আবোল তাবোল বলো না। আর কিছু বলবার থাকে তো তাই বলো।

কেতকী টিপে টিপে হাসতে থাকে কোন জবাব দেয় না।

মৃগাঙ্ক অধৈর্য্য হয়ে বলে, মৃদুলা অসুস্থ এই সংবাদটাই তাহলে তোমার কাছে খোস খবর।

কেতকী জবাব না দিয়ে উল্টো প্রশ্ন করে, তোমার কি মনে হয়?

মৃগাঙ্ক বলে, আমার কথা থাক তোমার কথা বলো।

ঠিক তাই। কেতকী খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, অসুস্থ হয়ে পড়াটা নয় অসুস্থতার ছল করা। আরও দিন কয়েক থেকে গেল ওরা......

মৃগাঙ্ক গম্ভীর হয়ে বলল, তোমার মন অত্যন্ত ছোট কেতকী।

কেতকী বাঁকা দৃষ্টিতে খানিক মৃগাঙ্কর মুখের পানে চেয়ে থেকে বলল, আমার উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছি। কেতকী তোমার চোখে আর কোনদিন বড় হতে পারবে না এতো জানাই ছিল তবুও কেন যে আমার মাথায় এ দুর্বুদ্ধি দেখা দিল তা আমি নিজেই বুঝি না। তবে একটা কথা আমায় বিশ্বাস করো, কেতকী তোমাকে মিথ্যে বলেনি এবং তোমার পথ আটকে দাঁড়াবার চেষ্টাও করেনি।

কেতকী তুমি মিথ্যে রাগ করছো। মৃগাঙ্ক বলল, আমি সে কথা তোমাকে বলিনি।

কেতকী জ্বলে উঠল, আবার কি করে বলবে! আশ্চর্য্য! তুমি আমায় কি মনে করো? এটুকু বুঝবার মত সাধারণ বুদ্ধি ও কি আমার নেই। শোন মৃগুদা কেতকী হয়তো স্বপ্ন দেখতে পারে কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করে স্বপ্নকে সত্য ভেবে তার পিছনে ছুটতে সে চায় না। কেতকী ভালবাসা চায় কিন্তু নিজেকে সে অনেক বেশী ভালবাসে।

মৃগাঙ্ক বিস্মিত কণ্ঠে বলে, তোমার কথা বুঝলাম না।

কেতকী বলল, আমার দুর্ভাগ্য।

মৃগাঙ্ক বলল, আর একটু সোজা করে বলো। তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছো তাই হয়তো —

তাকে বাধা দিয়ে কেতকী বলল, উত্তেজিত নই—দুঃখ পেয়েছি। আর তুমি জেনে শুনেই সে দুঃখ আমাকে দিয়েছো। কিন্তু আমি তো সরেই গেছি তবু কেন আমাকে এভাবে অপমান করছো বুঝি না। তোমাকে আমি খোলাখুলি জানিয়ে দিচ্ছি যে, একটা দেউলিয়া মনের অধিকারীকে নিয়ে জীবনে কারবার করতে আমি চাই না।

মৃগাঙ্ক বলল, এ সব কি বলছো তুমি কেতকী?

কেতকী সংযত কণ্ঠে বলল, ভাবছো মিথ্যে বলছি! একবিন্দুও না। আমি যদি চেয়ে থাকি—একটা গোটা মানুষকেই চেয়েছি। একটা হৃদয়হীন মানুষকে নিয়ে কি লাভ হবে আমার—বরং মনের অশান্তিকেই ডেকে আনবো।

হৃদয়হীন! অজ্ঞাতেই মৃগাঙ্কর মুখ থেকে কথাটা বার হয়ে এল।

একটু হাসবার চেষ্টা করে কেতকী জবাব দিল, বলবার একটু উনিশ বিশ হতে পারে কিন্তু বিচার করে দেখলে অর্থ একই দাঁড়ায়।

মৃগাঙ্ক বলে, অর্থাৎ—

কেতকীর কণ্ঠস্বর পুনরায় পাল্টে গেল। সে কঠিন কণ্ঠে বলল, কেতকীর পরাজয়ে খুব মজা লাগছে তোমার তাই না? কিন্তু জেনে রাখ তার মন অন্য ধাতুতে গড়া। যাকে তুমি পরাজয় মনে করে বিদ্রূপ করলে ওটা তার জয়।

ভাল বিপদেই পড়া গেল দেখছি। মৃগাঙ্ক হতাশ কণ্ঠে বলল, তুমি কি আজ ঝগড়া করবার জন্যই কোমর বেঁধে এসেছো। আমি না হয় তোমার ছোট মন বলে ফেলে অন্যায় করেছি কিন্তু তোমার কথাগুলি কি খুব সম্মান জনক?

কেতকী পুনরায় শান্ত মূর্তি ধারণ করল। মৃদু কণ্ঠে বলল, সম্মান কেউ কাউকে এমনি দেয় না। যে অপরের

সম্মান রেখে কথা বলতে জানে না অপরের কাছ থেকে সে তা আশা করে কোন যুক্তিতে।

মৃগাঙ্ক এ কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

কেতকী থামতে পারে না বলতে থাকে, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করলেও তোমাকে আজও আমি বিশ্বাস করি তাই ছুটে এসে খোস খবরের বিনিময় কি খাওয়াবে এ কথা বলতে পেরেছি। কিন্তু তুমি সহজ ভাবে কথাটা নিতে পারলে না মৃগুদা।

একটু ইতঃস্তত করে সে পুনরায় বলল, তুমি সময় অসময়ের সুযোগ নাও। আমিও মানুষ একথা ভুলে যাও। তোমাকে ভালবেসে হয়তো আমি ভুল করেছি কিন্তু অন্যায় করিনি—

কেতকীকে থামিয়ে দেবার জন্য মৃগাঙ্ক ডাক দিল, কেতকী—

কেতকী পুনরায় উত্তেজিত হয়ে উঠল, আমাকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করো না। যখন বলতে সুরু করেছি তখন শেষ করতে দাও।

কেতকী হাঁপাচ্ছে। চোখদুটো জলছে। মৃগাঙ্ক যেন দেখেও দেখছে না এমনি ভাবে চুপ করে বসে আছে।

কেতকী পুনরায় বলতে থাকে, আমার ভালবাসা শুধু দিয়ে তৃপ্ত নয়। সে ষোলআনা পেতেও চায়। কিন্তু তোমার কাছে আমার পাবার আশা কতটুকু। তার চেয়ে যার জন্য তুমি দেউলিয়া তাকেই অংশীদার করে নাও—আমি কোনদিন তোমার কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াব না। একটা নিঃস্ব লোকের কাছে হাত পেতে আমার এই সুন্দর জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে লজ্জা দেব কিসের জন্য? তোমার খুব বেশী অহংকার কিন্তু সে অহংকার যে অপরেরও থাকতে পারে তা ভুলে যেও না। বলতে বলতে কেতকী ঝড়ের বেগে চলে গেল।

কেতকীর কথা শুল যে কত সত্য তা বুঝতে মৃগাঙ্কর কিছু বিলম্ব ঘটলেও একদিন সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। তার অহংকারই একদিন তাকে আদর্শচ্যুত করেছিল। জীবনের মূল্য দিতে দ্বিধা করেছিল বলেই সবকিছু হাতের মুঠোয় পেয়েও সর্বস্ব হারিয়ে আজ সে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা তার বড় আপন তাদের কাছেও নিজের পরিচয় দেবার উপায় নেই। এগুতে গিয়েও এগুতে পারছে না। পিছনে যেতে গিয়েও বারে বারে ফিরে আসতে হচ্ছে। জীবনে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে।

জীবনের এই মধ্যাহ্ন বেলায় উপস্থিত হয়ে সেদিনের সেসব কথা ভাবতে বসে আজ কত কথাই মৃগাঙ্কর মনে পড়ছে। কি সে হতে পারত আর কি সে হয়েছে একটি মাত্র মারাত্মক ভুল সে করেছিল। তারই জের বছরের পর বছর তাকে একটা বিপর্যয় থেকে আর একটা বিপর্যয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে। কেতকী ঠিকই চিনেছিল তাই সংসারের দেনা পাওনার খাতায় জমার ঘর তার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর মৃগাঙ্ক মূলধন খুইয়ে রিক্ত হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজের শূন্য হাতের পানে ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে হতাশার নিঃশ্বাস ফেলছে। তার একান্ত প্রিয়জনকেও নিজের পরিচয় দিতে পারছে না। পর্বতপ্রমাণ শঙ্কা আর সঙ্কোচ তার কণ্ঠরোধ করে ধরে। কি হবে তার পরিচয় দিয়ে যে পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা গ্লানিমা অতীত।

* * *

মলয় থামল। হাত আর চলছে না। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে সপ সপ করছে। মাথার ভিতরটা কেমন যেন খালি হয়ে গেছে। ঘটনা সঙ্গতি হারিয়ে ফেলেছে। ভবিষ্যৎ অতীতের পথ আটকে দাঁড়াতে চায়। মলয় একটা সিগারেট ধরাল। জোরে টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল। আবার টানল আবার ছাড়ল পাগলের মত সিগারেট টেনে চলেছে মলয়। ঘরখানা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে। ঢেকে ফেলতে চায় তার উপন্যাসের শেষের দিকের অধ্যায় গুলিকে—

বহুক্ষণ চুপ চাপ বসে রইল মলয়। শান্ত হয়েছে

ওর চিত্তচাঞ্চল্য। আত্মহারা ভাব গেছে কেটে। পুনরায় স্থির হয়ে বসে মলয় সুরু করল।

* * *

কথা বলার অবকাশ না দিয়েই কেতকী চলে গেল। কিন্তু যে কথাগুলি সে বলে গেল তার জের টানতে গিয়ে আজ সর্ব্বপ্রথম নিজেকে সে প্রশ্ন করল যে, কাজটা কি সে ভাল করেছে। নিজের কাছে মৃগাঙ্ক যেন খানিকটা ছোট হয়ে গেছে।

দিন কয়েক ধরেই কেতকীর ব্যবহারের মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন সে লক্ষ করে আসছে তবুও ওর কোন কথাই মৃগাঙ্ক বরদাস্ত করতে পারে না কোন একটা আলোচনা উঠলেই সে তাকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করে কিন্তু আজ কেতকী সুদ সহ আদায় করে নিয়েছে।

কেতকীকে মৃগাঙ্ক আজ নতুন চোখে দেখল। যে মেয়েটিকে এতদিন সে রীতিমত অবজ্ঞা করে এসেছে সেই মেয়েই আজ তাকে জানিয়ে দিল যে, ততখানি অবজ্ঞার পাত্রী নয়।

আজকের দিনটা মৃগাঙ্কর ভালভাবে কাটলে হয়। সকাল থেকেই যেভাবে তাকে একটার পর একটা পীড়াদায়ক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাতে মনের স্বাভাবিক সাচ্ছন্দ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

মৃগাঙ্ক বহুক্ষণ রাস্তায় ঘুরে এইমাত্র ঘরে ফিরে এসেছে। সর্ব্বপ্রথমেই দেখা হল মার সঙ্গে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, এতক্ষণে ফিরলি মৃগু। সকালে এককাপ চা পর্য্যন্ত খেলিনে। ফিরেছিস বেলা শেষ করে। পিত্তি পড়ে একটা অসুখ বিসুখ না হলেই বাঁচি। কিন্তু ছিলি কোথায় এতক্ষণ?

মৃগাঙ্ক জবাব দিল, হরি কাকার ওখানে গিয়েছিলাম। কাকীর মুখের দিকে তাকান যায় না মা।

মুখের আর অপরাধ কি। মা বললেন, কিন্তু হরিঠাকুরপোদের কথা এখন থাক তুই বরং চট্ করে একটা ডুব দিয়ে আয়। তোলা জলও আছে ইচ্ছে করলে ঘরে বসেও স্নান করতে পারিস মৃগু।

মা আর দাঁড়ালেন না। ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। মৃগাঙ্ক জামা গেঞ্জি খুলে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। দৃষ্টি গিয়ে থমকে দাঁড়াল নিমগাছের একটি ডালের উপর। সকালে বসেছিল একজোড়া কাক। এখন এসে বসেছে দুটো ঘু-ঘু। ঠোঁট দিয়ে দেহের অসংযত পালকগুলিকে ঠিক করে নিয়ে গলা ফুলিয়ে ডাকতে সুরু করেছে। এক সময় ডাক বন্ধ করে ঘন হয়ে বসল।

মার আহ্বান পুনরায় শোনা গেল, এখন আবার শুয়ে পড়েছিস। তোর কি ক্ষিদে তেষ্টাও নেই মৃগু?

মৃগাঙ্ক উঠে বসে বলল, তুমি ভাত বাড়ো মা আমি দু'মিনিটের মধ্যেই আসছি।

মৃগাঙ্কর ঘরের জানালার পাশে দুটো কুকুর হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। শান্তি ভঙ্গ হওয়ায় ঘু-ঘু দুটো উড়ে গেছে। খানিকটা দমকা হাওয়া গাছের পাতা নড়িয়ে দিয়ে গেল। মৃগাঙ্ক এক খাবলা তেল মাথায় দিয়ে স্নান করতে চলে গেল।

ক্রমশঃ

নেতা ও নেতৃত্বের স্বরূপ

অশোক চট্টোপাধ্যায়

নেতা কথাটার আভিধানিক অর্থ নায়ক পরিচালক অগ্রণী বা পথপ্রদর্শক। ঐ কথাটার ইংরেজী হইল **Leader** অথবা যে ব্যক্তির পিছনে পিছনে কিম্বা যাহার পরিচালনায় অপর লোকেরা দলবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হয়। জর্ম্মন কথা **Fuehrer** এরও ঐ একই অর্থ হিটলারকে জর্ম্মনগণ **Fuehrer** বলিত; তাহার পশ্চাতে থাকিয়া ও তাহার কথা মানিয়া সকলে চলিত বলিয়া। গুরু গোবিন্দ সিংহ যখন খালসা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন তখন শিখদের নেতার নাম হইয়াছিল গুরু ও শিখেরা গুরুর আজ্ঞাতেই চলিত। যুদ্ধও করিত তাঁহার নির্দ্দেশ মানিয়া। বস্তুতঃ দলবদ্ধভাবে বহু সংখ্যক মানুষ কোন কার্য্য করিতে যাইলেই সকল ক্ষেত্রেই নেতৃত্বের আবশ্যক একান্তভাবেই উপস্থিত হয় এবং সফলতা নেতার চিন্তা প্রেরণা ও কর্ম্মকৌশলের উপরেই বিশেষ করিয়া নির্ভর করে। নেতা যদি চিন্তায় ভ্রান্ত ও কর্ম্মে অপারগ হন; প্রেরণা ও প্রতিভা যদি তাঁহার মধ্যে জাগ্রতভাবে না থাকে; তাহা হইলে তাঁহার অনুচরদিগকে বিফলতা হইতে কেহই বাঁচাইতে পারে না। যুদ্ধের নেতৃত্ব যুদ্ধবিদ্যার জ্ঞানের ও সৈন্য সামন্ত পরিচালনার বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে। জাতির কোন মহা আন্দোলনে অথবা ধর্ম্মে কোন নূতন পথে চলিবার ক্ষেত্রে অন্য প্রকার নেতৃত্ব আবশ্যক হয়। আবেগ, প্রেরণা, চিন্তার গভীরতা ও ব্যক্তিগত আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে বহু নরনারীকে মাতাইয়া তুলিয়া নূতন পথে চালান সম্ভব হয় না। বুদ্ধ, খৃষ্ট কিম্বা মহম্মদের মধ্যে সেইরূপ মহাশক্তি সঞ্চারিত ছিল। শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেও ঐ জাতীয় শক্তির আবির্ভাব হইতে দেখা গিয়াছে। মার্টিন লুথার কিম্বা ক্যালভিন জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া পুরাতন রীতিনীতি পদ্ধতির সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করাইতে বিশেষ প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন। আমাদের দেশেও বর্ত্তমান সময়ে রাজা রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে অসাধারণ ক্ষমতা ও কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে যাঁহারা যুগ প্রবর্ত্তক ও পথ প্রদর্শক বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারা যে সকল সময়ে বহু অনুচর পরিবৃত ভাবে জীবন কাটাইয়াছেন তাহা নহে। অনেক সময়ে তাঁহাদের জীবদ্দশাতে হয়ত তাঁহাদের মতামতের আলোচনা বিশেষভাবে কেহ করে নাই এবং তাঁহাদের খ্যাতি হয়ত তাঁহারা পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পরেই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। অনেকে হয়ত নিজেদের মতামত প্রচার-করিতে ও বাস্তব আন্দোলন চালাইতে গিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। যথা সোক্রাটিস দার্শনিক ছিলেন ও তাঁহাকে নিজ মতবাদের জন্য বিষপান করিয়া মরিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। জোন দ'আর্ক ছিলেন বালিকামাত্র কিন্তু তাঁহার মধ্যে দেশপ্রেম জলন্ত অগ্নিশিখার মতই প্রবলভাবে দীপ্ত ছিল। তাঁহাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে পুড়াইয়া মারা হইয়াছিল। কিন্তু এই মহাপুরুষ ও মহামানবী মৃত্যুর পরে শত লক্ষ ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও ভক্তি আহরণে সক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রী শঙ্করাচার্য্য দর্শনের প্রচার করিয়া ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপ ও হিন্দুধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সাধন করেন। তাঁহার অনুসরণে লক্ষ লক্ষ বিদ্বান তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করিয়াছিলেন। নিউটন কখন বহু অনুচর পরিবৃতভাবে কোন কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান নিউটনকে অনুসরণ করিয়াই বিশ্লেষণ ও অনুশীলনে বহুদূর অগ্রগামী

ছিল। ইরাসমাস, বেকন, সেক্সপিয়র, মলিয়ের কেহই অনুচর বা শিষ্যের দল গঠন করিয়া সময়নষ্ট করেন নাই। কিন্তু কৃষ্টি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহাদের অনুচরের অভাব ছিল না। কারণ তাঁহাদের ভক্তগণ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিয়া না থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা কম ছিল না। কৃষ্টির নানা ক্ষেত্রে যে সকল মহামানব নূতন আদর্শ ও পন্থা গঠন ও সৃজন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বদা পরিজন পরিবৃত না থাকিলেও তাঁহাদের অনুগমনকারীর অভাব ছিল না। লিউনার্ডো ডা ভিঞ্চি, মিকাল আঞ্জেলো, বেনভেনুতো চেলিনি; আরভিং সারা বের্নার, এলেন টেরি; নিজিনস্কি, পাবলোভা, লপকোভা, গেটে, ব্রাম্‌স্‌, মোৎসার্ত্ত, ভাগনার, বেত্তোফেন ভিক্টর হুগো টলষ্টয়, ইবসেন; ফ্রয়েড, ইউঙ্গ, আডলের; ক্রমওয়েল কস্যুথ, গারিবাল্ডি, মাৎসিনি; মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেল্‌স্‌ লেনিন, মাওৎসেতুঙ; বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র; মাইকেল মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র, গগণেন্দ্র, নন্দলাল, ইহাদিগের মধ্যে দেখা যায় যাঁহারা রাষ্ট্রবিপ্লবের ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁহাদের পশ্চাতে বহু অনুচর সমাগম হইয়াছিল। যাঁহারা ধর্মমত লইয়া জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের আশে পাশেও জনতা সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যাহারা মনের ক্ষেত্রে আলোক বিকিরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুগমন বাস্তবে ও সাক্ষাৎভাবে প্রায়ই কেহ করে নাই। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, নাট্য, নৃত্য প্রভৃতিতে যাঁহারা নেতৃত্ব করিয়াছেন তাঁহাদের নেতৃত্ব অনেক সময়েই সাক্ষাৎভাবে পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে নাই। তাঁহাদের ভক্ত কে বা কাহারা তাহাও তাঁহারা অনেক সময়েই জানিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানকালে সংবাদপত্র ও বেতার প্রচারের ভিতর দিয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিজ্ঞাপিত হয় কিন্তু পূর্ব্বকালে তাহাও হইত না। সেই কারণে তাঁহাদের মাহাত্ম পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে করিতেই যুগাবসান হইয়া যাইত ও অনেক সময়েই তাঁহারা জন সমাজে যথাযথভাবে সমাদৃত হইলেন না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিতেন। নেতা হইয়াও নেতা হইলেন না; নেতৃত্বের পূর্ণ অধিকার থাকিয়াও থাকিল না। এইরূপ অবস্থা পূর্ব্বকালে অনেকেরই হইয়াছে। যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে বাস্তবে নেতৃত্ব করিয়াছেন তাঁহারা অনেক সময়ে নেতৃত্ব সুখ উপভোগ করিয়া তৎপরে নেতৃত্ব হারাইবার কষ্ট ও অপমানও ভোগ, করিয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্র ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে এ দুঃখ অনেকেই পাইয়াছেন। নেপোলিয়ান, হিটলার, ট্রট্‌স্কি, চিয়াংকাই শেখ, রোমেল, সোকার্নো প্রভৃতি কাহারো কাহারো নাম এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইতে পারে। গান্ধী রাষ্ট্রক্ষেত্রে নেতৃত্ব হারাইলেও আদর্শবাদের জন্য তাঁহার ভক্তের অভাব ছিল না। যাঁহারা শিক্ষা ও জ্ঞানের আসরে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া পৃথিবীর নানান সমাজে যুগে যুগে বিস্তার বিস্তার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন সেই সকল গুরু স্থানীয় ব্যক্তিদিগের নেতৃত্ব দূরদূরান্তরে ব্যাপ্ত না হইয়া থাকিলেও নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁহাদের বৈশিষ্ট ও তাঁহাদের অনুচর ও শিষ্যদিগের ভক্তি শ্রদ্ধার পূর্ণতা সর্ব্বজন স্বীকৃত ও চিরপ্রতিষ্ঠিত। ঐ সকল মহা পণ্ডিত ঋষি ও ঋষিতুল্য ব্যক্তিদিগের খ্যাতি তাঁহাদের শিষ্য, শিষ্যের শিষ্য ও অন্য শিষ্যদিগের বিদ্যা অনুসরণে বহু যুগ ধরিয়া জীবন্ত থাকিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের পার্থিব জীবনের অবসানের শত শত বর্ষ পরেও তাঁহাদের শিষ্য গোষ্ঠীর পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নাম লইয়াই নিজেদের অনুশীলন ব্যাখ্যান প্রভৃতি করিয়া গিয়াছেন। ভারতের যে আশ্রমিক সভ্যতা, বিদ্যাচর্চ্চা সাধনা ও সত্য অনুসন্ধিৎসার যে ঐতিহ্য, তাহার প্রধান অঙ্গ ছিলেন অশেষ চিন্তাশীল জ্ঞান মার্গের পথিকৃৎ ঐ সকল মহা মহাঋষিগণ যাঁহারা জ্ঞানের অনন্ত শাখা প্রশাখার দূরে গভীরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও অনুশীলন অবলম্বনে ভারতের শাস্ত্রজ্ঞানকে সেই সর্ব্বব্যাপ্ত আকার দিয়া গিয়াছেন যাহার তুলনা অপর কোনও সভ্যতায় কোথাও পাওয়া যায় না। ন্যায়, নীতি, শিল্পকলা, ব্যাকরণ, বাস্তব উপকরণ সব কৃষ্টি ও

তোগের সূক্ষ্ম বিচার, যেখানে যাহা জানিবার আছে সকল কিছু জানিবার প্রগাঢ় চেষ্টা ও আগ্রহ ; এই বিস্তৃত বিদ্যা অর্জন প্রচেষ্টা সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া চলিয়া ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সে যুগের হিসাবে এক সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণরূপ দান করে। এই কার্য্যে কত শত বিদ্যানুরাগী নরনারী সকল ভোগ বাসনা প্রত্যাহার করিয়া আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতির সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন তাহার কোনও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস কেহ লিখিয়া রাখে নাই। কিন্তু আশ্রম ছিল শত শত সেগুলি এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যাকেন্দ্র হইলেও কার্য্যে মহাশক্তি প্রেরণার ও প্রতিভার আধার ছিল। আশ্রম পরিচালক গুরুদিগের নেতৃত্ব অল্পপরিসর ক্ষেত্রে স্থিতিবান হইলেও সে নেতৃত্বের বিকাশ কখন কখন বহুদূরে ব্যাপ্ত হইতে দেখা যাইত। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যেরূপ উজ্জয়িনী, রাজগৃহ ও পাটলিপুত্রে রাজশ্রেষ্ঠ সম্রাটের সিংহাসন থাকিলেও দূরে দূরে বহু নৃপতি নিজ নিজ শক্তিতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন ; জ্ঞানের জগতেও তেমনি কখন কখন কোন মহাজ্ঞানী ঋষি শ্রেষ্ঠ সকলের গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেও অপর ঋষিগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিতে হয় বলিয়া নিজ নিজ স্বাধীন চিন্তার অধিকার কদাপি বিসর্জন দিতেন না। যখন সকল রাজশক্তি পারস্পরিক কলহের ও যুদ্ধের ফলে শক্তি হারাইয়া ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া যায় ; সম্রাটের শক্তিও যখন ব্যাপক বিদ্রোহ বা বৈদেশিক আক্রমণের ফলে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়, তখন যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত ও সেনাপতিগণ নিজ নিজ ক্ষুদ্র সেনাদল গঠন করিয়া যুদ্ধের নামে লুটপাঠ ও ডাকাইতি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে ; জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি কখন কখন জ্ঞানা-কাশের সূর্য্য চন্দ্র তারকাদি নিষ্প্রভ হইয়া গিয়া অন্ধ-কারের আবির্ভাব হয়। তখন খদ্যোত ও ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের আলোকই একমাত্র জ্যোতির উৎস হইয়া দাঁড়ায়। তেজোময় জ্ঞানরশ্মি আর বিকীর্ণ হয় না, বুদ্ধির গতি ও প্রসার ক্ষুদ্রতার আক্রমণে সামান্য চালাকিতে পর্য্যবসিত হয়। জ্ঞান তখন অল্পবুদ্ধি অপাঙক্তেয়দিগের উৎপীড়নে জর্জরিত বিকার গ্রস্ত ও অভিভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে পিণ্ডারী ও বর্গীর হাঙ্গামা যেরূপ পীড়াদায়ক ও সামাজিক স্বাস্থ্যনাশক হয় ; কৃষ্টি ও বিদ্যার আসরে নীচমনা বর্বরদিগের উপস্থিতি তেমনই মূর্খতাকে বলবান করিয়া তোলে। সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পকলায় ও মানবীয় আদর্শ গঠনেও যখন মহান প্রতিভা আর দেখা যায় না ; প্রেরণার নামে যখন কষ্ট কল্পনাজাত, রসবোধের সহিত সকল সম্বন্ধ বর্জিত, কৃষ্টিভাণ্ডারের আবর্জনা বিতরণ করা আরম্ভ হয়, তখন মানব সভ্যতাও কল্পিবাজের ফিকিরের তাড়নায় বিদীর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া নিজ স্বরূপ ও উৎকর্ষ হারাইয়া ফেলে।

ইতিহাসে সকল মহা সভ্যতাই বারে বারে উন্নতির চরমে উঠিয়া ; জ্ঞান ও রস অনুভূতির পূর্ণতা দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে না পারিয়া, অধোগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ তখন বহু অন্যায় অসমর্থতা ও নিকৃষ্ট আবেগের প্রকাশ মহান উৎকর্ষের পরিচায়ক বলিয়া প্রচার করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে অক্ষমতার অন্ধকারাচ্ছন্ন বিফল প্রেরণা ও অবসন্ন প্রতিভার গহ্বরে নিস্তেজ অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। এই যে অবনতির ব্যাপক প্রসার ইহাকেই সভ্যতার ইতিহাসে অন্ধকারের যুগ বা **Dark Ages** বলা হইয়াছে। ইহা নেতা ও নেতৃত্বের অভাব হইতেই আরম্ভ হইয়া থাকে। রোমের সভ্যতা বর্বর জাতিদিগের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া ইয়োরোপে অন্ধকারের যুগ আরম্ভ হয়। রোমের সভ্যতা কনস্টান্টিনোপলে (পরে ইস্তাম্বুল) পলাইয়া কিছুটা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় ও বহু শতাব্দীর পরে যখন কনস্টান্টিনোপল মুসলমানের দখলে চলিয়া যায় তখন তাহা রোমে পুনরাগমন করে। ইহারই নাম হইল ইয়োরোপীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম বা **renaissance**। খৃঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালিতে যে ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্য দর্শন ও ললিতকলার চর্চ্চার আরম্ভ হয় ও যাহার ফলে দান্তে, পেট্রার্ক, প্রভৃতির আবির্ভাব হয়, এবং তৎপরে ইরাসমাসের (ষোড়শ শতাব্দী) দ্বারা যে শিক্ষার নবজাগরণ প্রবর্ত্তিত হয়,

তাহাদ্বারা স্পেন, ফ্রান্স ও বৃটেনে গ্রীক ও ল্যাটিন সভ্যতা ও কৃষ্টির বিস্তার হয়। সভ্যতার নবজাগরণের ফলে ইয়োরোপে যে সকল মহামানবের আবির্ভাব হয়, তাঁহাদের মধ্যে ইতালিতে ম্যাকায়াভেলি, আরিয়োস্তো; ভার্জিল, টাসসো, গ্যালিলিয়ো; ফ্রান্সে র‍্যাবেলে, মন্তেন; স্পেনে সেরভান্তেস; হোলাণ্ডে কোপার্নিকাস ও ইংলণ্ডে সিডনি, মারলো, শেকস্‌পিয়র ও বেকন প্রভৃতির নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। এই সকল মহামানবদিগকেই নবজাগরণের নেতা বলা যাইতে পারে। ইঁহাদিগের দ্বারাই সভ্যতার পুনর্জন্ম সম্ভব হয় ও তাহার প্রগতি ক্রমশঃ বলশালী হইয়া উঠে।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পরে ভারতেও একটা মহা অন্ধকারের যুগ আরম্ভ হয়। সে যুগের অন্ধকার ভেদ করিয়া কোনও জ্ঞান বা কৃষ্টির আলোক কোথাও সামান্যভাবেও দেখা যায় নাই এবং তাহা প্রায় এক হাজার বৎসর ভারতের সকল প্রেরণা ও প্রতিভাকে নিষ্ক্রিয়তায় ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ সভ্যতার আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত মানব প্রতিভার রশ্মি কোথাও বিকীর্ণ হইতে দেখা যায় নাই। ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির এই নবজাগরণের যুগ প্রায় দেড় হাজার বৎসর কাল পূর্ণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মানব সভ্যতার সকল অঙ্গেই তাহার সৃজনীশক্তি ক্রিয়াশীল ভাবে প্রতিভাত হইয়া ছিল। মধ্যে মধ্যে বিদেশী বর্ব্বর জাতিদিগের আক্রমণে ভারতীয় সভ্যতার গতি ও ধারা অল্প সময়ের জন্য আড়ষ্ট হইয়া যাইলেও মুসলমানদিগের অনুপ্রবেশের পূর্ব্বে ঐ সভ্যতার নিজস্ব রূপ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত ছিল বলা যাইতে পারে। ব্যাকরণ দর্শন, নাটক, গণিত প্রভৃতি বহু বিষয়েই খৃঃপূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃঃ দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত সংস্কৃত কৃষ্টির ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, বাদ্য, বিভিন্ন ধাতুশিল্প, পশুপালন, কৃষিকার্য্য, বয়ন, রঞ্জন, হস্তিদন্ত কাষ্ঠ ও প্রস্তরের কারুকার্য্য, ঔষধি, চিকিৎসা, সাজ-সজ্জা, পুষ্পের ও নানাপ্রকার ফলবৃক্ষের ব ও রোপণ ব্যবস্থা, রাজপথ ও জলাশয় নির্ম্মাণ, কূপ খনন, অন্নসত্র-জলসত্র স্থাপন ইত্যাদি বহুদিকে ও বহু বিষয়ে ভারতীয়দিগের চিন্তা, কর্ম্মশক্তি ও কলাকৌশল সম্যকরূপে ব্যক্ত হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার যে সকল নিদর্শন কালের কঠোর হস্তের স্পর্শ কাটাইয়া উঠিয়া এখনও অস্তিত্ব হারায় নাই, তাহার চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে ভারতীয়গণ সেইযুগে কিভাবে বাস্তব সৃজন গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

একটা কথা কিন্তু এই বিষয়ে বলা আবশ্যক। তৎকালীন ভারতীয়দিগের মধ্যে আত্মগৌরববোধ প্রকট ছিল না এবং মহা প্রেরণা ও প্রতিভার আধার বহু ভারতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া ও সৃজন ক্ষমতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াও নিজেদের নাম প্রকৃষ্টরূপে উত্তরপুরুষদিগের জন্য লিখিয়া বা খোদাই করিয়া রাখিয়া যান নাই। এই আত্মবিলুপ্তির অভ্যাস ভারতীয়দিগকে যথাযথভাবে ইতিহাস রচনা করিয়া যাইতে শিখায় নাই। কিম্বদন্তি ও পরযুগের গ্রন্থ ইত্যাদি হইতে কিছু তথ্য আহরণ ও কিছু অনুমান করিয়াই আমরা প্রাচীনকালের মহা কর্মী ও গুণীজনের অল্প অল্প পরিচয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে যাঁহারা পথপ্রদর্শক ছিলেন তাঁহাদের বিষয় আমাদের জ্ঞান অত্যল্প। কোন ক্ষেত্রে কে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কাহার অনুগমন করিয়া বহুলোকে কোন কার্য্যে বৈশিষ্ট অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেকথা বহু স্থানেই অজানা থাকিয়া গিয়াছে। কারণ নেতৃগুণ থাকিলেও নেতৃত্বের আকাঙ্খা না থাকায় নেতা বলিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করা অথবা নিজের নাম জাহির করার ইচ্ছা বহু মহাগুণবান ব্যক্তির মধ্যেই প্রাচীন ভারতে ছিল না এবং সেই কারণে রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের ইতিহাস আবছা ও অসম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাইলেও সভ্যতা ও কৃষ্টির কথা ব্যক্তি পরিচয়ের দিক দিয়া প্রায় অনেকাংশে অজানা রহিয়াছে। জৈন তীর্থঙ্করদিগের ও তাঁহাদের অনুচরদিগের মধ্যে অনেক অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ধর্ম্ম ও দর্শনের

ক্ষেত্রে তাঁহারা মহা মহা নেতা ছিলেন সন্দেহ নাই। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও ঐরূপ বহু নেতা দেখা যায়। স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ বা সম্রাট অশোকের তুলনায় তাঁহারা হয়ত ততটা মহা শক্তিশালী ছিলেন না; কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধের সহচর ছিলেন ও যাঁহারা অশোকের দ্বারা প্রচারের জন্য সিংহলে ও অপরাপর দেশে ও অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনন্যসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন অনেকেই। অশোক যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন ও তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে যখন ভারতীয় সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে মহা শৌর্য্য ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেন তখনও বহু যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ মহারথী ও সেনাপতি ছিলেন যাঁহাদের নাম আজ আমরা জানিনা। কারণ নিজের ঢাক নিজে পিটান তখনও ভারতবর্ষে অজানা ছিল। ঢাক পিটানই প্রায় কখনও হইত না। কর্ম্মসূত্রে কিছু কিছু ব্যক্তি পরিচয় আসিয়া পড়িত নতুবা কাজই ছিল আসল কথা, নাম লইয়া কেহ মস্তক ঘর্ম্মাক্ত করিত না।

ভারতের মানুষের প্রাণে কখন যে খ্যাতির ও যশের তৃষ্ণা প্রবল হইয়া দেখা দিল তাহা সঠিক বলা সহজ নহে। তবে একথা বলা যায় যে যখন কর্ম্মের প্রেরণা ও প্রতিভা পূর্ণ জাগ্রত ও বিকশিত ছিল ভারতীয় মানুষ সেসময় খ্যাতিলাভের মোহে সত্য মিথ্যা বোধ রহিত ভাবে হাটে বাজারে দৌড়াইয়া ফিরিত না। সম্ভবতঃ কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিলে খ্যাতির আগ্রহ মানুষের প্রাণে জাগ্রত হয় না; তাই কর্ম্মশক্তি যখন কমিয়া যায় তখনই মানুষ নাম জাহির করিতে ব্যাগ্র হইয়া উঠে। তাহা নহিলে শত শত অপরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্থপতেরা নিজনাম প্রচার করেন নাই কেন? সহস্র সহস্রমূর্ত্তিগঠন করিয়া ভাস্করগণ অজ্ঞাতনামা কেন? গুণমুগ্ধ শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়াও পূর্ব্বকালের কৃতকর্ম্মা মহামানবগণ অনুচর সন্ধানে সংসার পথে ধাবমান হইবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। করিবার সময়ও তাঁহাদের হইত না। ইহা ব্যতীত একথাও অন্ততঃ চিন্তাশীল গুণীজনে জানিতেন যে মানুষের নামযশ চিরস্থায়ী হয় না। তাহাই শুধু মানব আত্মাকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ফলদানে সক্ষম।

খ্যাতি যশ ও নেতৃত্বের প্রাধান্য উপভোগ করিবার আকাঙ্খা ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রাচীনকালে বিশেষ ছিল না। থাকিলে শত শত ব্যক্তি নিজেদের নাম জাহির করিতে সহজেই পারিতেন; কেননা সকল অবস্থা বিচার করিলেই বুঝা যায় যে ভারতে নেতৃত্বের যোগ্যতা যুগে যুগে অনেকের মধ্যেই ছিল। ছিলনা শুধু আত্ম প্রচার ও আত্ম প্রতিষ্ঠার লালসা। যেসকল মহাগুণীজনের কথা আমরা সাহিত্য নাটক ও শাস্ত্রগ্রন্থের ভিতর দিয়া জানিতে পারি তাঁহাদের উপস্থিতি ইহাই প্রমাণ করে যে তাঁহারা যে উচ্চ সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতীক ছিলেন সে উন্নত পরিবেশে শুধু যে তাঁহারাই জন্মিয়াছিলেন এমন অবস্থা কখনও কোথাও হইতে পারে না। তাঁহারা যখন যেখানে ছিলেন সেখানে আরও বহু গুণীজনও নিশ্চয় জন্মলাভ করিয়াছিলেন যাঁহাদের নাম পরবর্ত্তী যুগের মানুষ মনে রাখে নাই তাঁহাদের নিজেদেরই খ্যাতি সম্বন্ধে ঔদাসিন্যের জন্যই। ব্যাসদেব বা বাল্মীকির যুগ ঠিক কোন সময়ে তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাঁহাদের সময়ে যে অসংখ্য মহা শক্তিশালী ব্যক্তি জন্মলাভ করিয়া ছিলেন তাঁহাদের রচনা হইতেই তাহা জানা যায়। ঐতিহাসিক যুগে যাঁহারা সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সমসাময়িক বিশিষ্টজনের কথা আমরা অল্পই জানি। কিন্তু বহু মহা গুণী লোক সে সময়ে নিশ্চয়ই ছিলেন। অশ্বঘোষ, শূদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, দণ্ডিন, সুবন্ধু, বাণ, সোমদেব, কলহান, পাণিনি, পতঞ্জলি, চরক, সুশ্রুত, আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, মহাবীর, শঙ্করাচার্য্য, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি অতিমানবদিগের সান্নিধ্যে অপর যাঁহারা সমসাময়িকভাবে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের কথা আমরা না জানিলেও বলিতে পারি যে তাঁহারা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে জনসাধারণের পথ প্রদর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পথ দেখাইয়া তৎকালীন মানুষকে শুভ ও মঙ্গলের

দিকেই লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ সেই সময়ের মানুষের ক্রমোন্নতি এবং সক্ষমতা ও আদর্শ উপলব্ধিতে সাফল্য অর্জন। তাঁহারা ছিলেন সত্য সত্যই নেতা। তাঁহাদের মধ্যে দল ও গণ্ডি গঠন বা অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন প্রচেষ্টা ছিলনা। কিন্তু ছিল সত্য উপলব্ধি, অন্তর্দৃষ্টি, ন্যায়জ্ঞান ও নীতিবোধ। সেইজন্য তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া মানুষ কিছু পাইয়াছিল। হারায় নাই কিছুই। বর্ত্তমানকালে নেতাগণ দাবি করেন যে অনুগামী পরিজনদিগের নেতাকে পূর্ণরূপে মানিয়া চলিতে হইবে। স্বাধীন চিন্তার অধিকার ত্যাগ করিয়া নেতার চিন্তাধারা বা নির্দ্দেশকেই নিজ মতামতের সার বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। নেতার সকল অন্যায়, সকল প্ররোচনা, সকল প্রবঞ্চনাকে আদর্শ উপলব্ধির উপায় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন কালের নেতৃত্বের ঐরূপ কোনও সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা ছিল না। অনুচর নেতাকে অনুসরণ করিলেও তাহার নিজত্ব বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইত না। নেতাগণও নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মনিবিষ্ট থাকিতেন; তাঁহাদের প্রচেষ্টার একটা সীমা থাকিত। দোকানদার পণ্য বিক্রয় করিত; রাষ্ট্রীয় দল বা গণ্ডির অংশ গ্রহণ করিয়া অথবা কোন বিশ্বমানবীয় আদর্শের প্রচার চেষ্টা করিয়া নিজেকে বা ক্রেতাদিগকে কোনওভাবে ব্যস্ত উত্যক্ত করিত না। ছাত্র গুরুগৃহে পাঠ করিত ও অপর কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছাত্রজীবন কাটাইত। সে বাহিরের আন্দোলন, বিপ্লব, বিদ্রোহ যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া কোনওভাবে উন্মত্ত হইয়া যাইত না। গুরুই তাহার নেতা, শিক্ষাই তাহার মন্ত্র ও কর্ত্তব্য সাধনাই তাহার জীবনের ব্রত ছিল। সেই কারণেই সে পাঠ সমাপনান্তে পানিনি, শঙ্করাচার্য্য বা ভাস্করাচার্য্য হইতে সক্ষম হইত। একথা অবশ্য গ্রাহ্য যে প্রাচীনকালেও কোনও মহা অন্যায় বা অধর্ম্ম ঘটিলে সর্ব্বমানবের মিলিত চেষ্টা দ্বারাই তাহার অপসারণ সম্পন্ন হইত, কিন্তু শুধু নেতা বা নেতাদিগের মতবাদের জন্যই কোন মহা আন্দোলনের সূচনা হইতে দেখা যাইত না। প্রাসাদ অভ্যন্তরের ষড়যন্ত্র প্রাসাদের অন্ধকার কোণেই থাকিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত অথবা নির্ব্বাপিত হইত। বাহিরে তাহার কোনও প্রকাশ বা প্রচার হইত না। রাজশক্তির ন্যায় অন্যায় বিচার রাজশক্তি যাহার অথবা যাহার হইতে পারে তাহারই মধ্যে উদ্ভূত হইতে দেখা যাইত। বাজারের শাক সব্জি বিক্রেতা, শকট চালক, মোট বাহক ও গুরুগৃহবাসী ছাত্রগণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিত না। বর্ত্তমান কালে রাজশক্তি সকলের হস্তেই আছে বলিয়া সকলেই ষড়যন্ত্রের অংশীদার ও অধিকারী। কিন্তু ইহার ফলে যদি অপর সকল কার্য্য স্থগিত রাখিয়া সকলে শুধু ষড়যন্ত্রই চালাইতে থাকে তাহা হইলে রাজশক্তির সেই ব্যাপক অপব্যবহার একটা সামাজিক ব্যাধি হইয়া দাঁড়ায়। সমাজকে তখন ব্যাধিমুক্ত করিতে হইলে দেখিতে হয় যে রাজশক্তির ঐ বিস্তৃতি কিভাবে সমাজের গঠন কার্য্যে নিয়োগ করিয়া সমাজের উন্নতি সাধিত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান কালের নেতৃত্ব পাশ্চাত্যের অনুকরণে ক্রমে ক্রমে যেরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা তুলনায় প্রায় অতীতের শত শত ডিউক, কাউন্ট ও ব্যারণ অথবা ভারতের বিদ্রোহ প্রবন মনসবদার, সুবাদার ও করদ রাজাদিগের রাজশক্তি নষ্টকর ও সদা-সম্ভব সশস্ত্র বিরুদ্ধতার মতই প্রায় সমাজ ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা শুধু রাষ্ট্র ক্ষেত্রেই আছে এমন নহে। এখনকার রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব যেরূপ রাজশক্তিকে বারম্বার আঘাত করিতে উদ্ভূত হয় ও যাহার ফলে শাসনের আদর্শ একটা চির ব্যাহত রূপ ধারণ করে; অপরাপর ক্ষেত্রেও নূতন কিছু করিবার আগ্রহে ও কল্পিত অভিনবত্বের আহ্বানে অপরাপর মানবেরও নিত্য নূতন পথ নির্ম্মাণ করিয়া অনির্দ্দিষ্টের অজানা শীর্ষে গমন চেষ্টা সেইরূপে সর্ব্বদাই হইতে থাকে। যাহারা কাব্যে, সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, বাদ্যে, নৃত্যে ও কারুকার্য্যে সৃজন সাধন চেষ্টা করেন, তাহারা অনেক সময়েই অকর্ম্মণ্য প্রমাণ হন এবং তাহাদের সৃজন চেষ্টার মধ্যেও গঠনের

কোনও চিহ্ন না থাকিয়া যাহা ছিল তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টাই প্রবলভাবে লক্ষিত হয়। এই অবস্থায় নিত্য নূতন চিন্তার ও কর্মের আদর্শ ক্রমাগতই সাধারণের নিকট খাড়া করা হয় এবং মানুষও বিভ্রান্ত চিত্তে সকল কিছুই বাহবা বাহবা বলিয়া একবার দেখিয়া বর্জন করিতে আরম্ভ করে। এই যে অস্থির মনোভাব ইহা কোন গঠন শীলতার সহায়ক কদাপি হইতে পারে না। এবং গড়া যদি না থাকে তাহা হইলে শুধু ভাঙ্গাকে আশ্রয় করিয়া সভ্যতা ও কৃষ্টি কখন প্রগতির পথ খুঁজিয়া পাইতে সক্ষম হয় না। পথও যদি পৃথিবীর বক্ষ ছাড়িয়া আকাশ মার্গে স্থিতি অন্বেষণ করে তাহা হইলে সে পথে অগ্রগমন মানুষের পক্ষে কখন সম্ভব হইতে পারে না। সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বক্ষ বলিতে বুঝিতে হইবে তাহাই যাহার ভিতরে কোন কিছুর ভিত্তি ছিল, আছে, অথবা থাকিতে পারে। যেখানে কিছু কখনও ছিলনা, এখন নাই অথবা ভবিষ্যতে থাকিতে পারে না সেখানে পথ নির্মাণ হইতে পারে না। নেতা কষ্ট কল্পনার আশ্রয়ে প্রলাপ বকিতে থাকিলেও সে কথার কোনও ন্যায় বা দর্শন সঙ্গত অস্তিত্ব কেহ স্বীকার করিবে না। কিন্তু শুধু কথার মারপ্যাঁচ অবলম্বন করিয়া অপরিণত বুদ্ধি ব্যক্তিদিগকে অস্থায়ীভাবে উত্তেজিত করা কিছু একটা অসম্ভব কাজ নহে। উন্মাদনা সংক্রামক, ব্যাধি এবং যাহারা একটা কিছু কথার নেশায় বিভোর তাহাদের সহজেই নাচাইয়া তোলা সম্ভব হয়। এবং আজকালকার নেতাদিগের শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানের গভীরতা না থাকিলেও তাহাদের অপরকে নাচাইবার ক্ষমতা উত্তম রূপেই আছে দেখা যায়। এখন যেরূপ বিজ্ঞাপনের জোরে মূল্যহীন বস্তুও বহুমূল্য বলিয়া বিক্রয় করা চলে, মূল্যহীন ও অর্থহীন কথাও তেমনি আয়োজন ও অলঙ্কারের সাহায্যে দার্শনিক তথ্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এবং সেইরূপ প্রচেষ্টা নানা ক্ষেত্রে ক্রমাগতই পরিচালিত হইয়া থাকে। অভিনবত্বের দাবি যেখানে শুধু বিজ্ঞাপন ও প্রচারের উপরই নির্ভর করে সেক্ষেত্রে কিছু অর্থব্যয় করিয়া, বক্তৃতা মঞ্চ ভাড়া করিয়া, পুস্তক পুস্তিকা মুদ্রিত করাইয়া, শিষ্যমণ্ডলীকে আদর আপ্যায়ন করিয়া, পাঠ, আসর, আলোচনা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া অনেকদূর অবধি অগ্রসর হওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান, বিদ্যানুশীলন, রসানুভূতির অভিব্যক্তি ও সাধনা যেখানে পূর্ণরূপে জাগ্রত নাই সেখানে শুধু সহজে প্রভাবিত ভক্ত ও বিশ্বাসীদিগের উপর নির্ভর করিয়া কোনও তথাকথিত সৃজন কার্য্য সভ্যতা ও কৃষ্টির আকাশে নবজাত সূর্য্য হইয়া আলোক বিকিরণ করিতে সক্ষম হয় না। জাল নেতৃত্ব অথবা অক্ষম নেতা কখনও শক্তিমান শিষ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। এবং শিষ্যগণ যদি কৃষ্টিক্ষেত্রে উচ্চস্তরে অবস্থিত না হইতে পারে তাহাদিগের ভক্তি ও বিশ্বাসও কদাপি সাধারণে সংক্রমিত হয় না। গুণহীন অভিনব কৃষ্টি তখন স্বভাবতই লয়প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্য অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে প্রচারের জোরে যাহা তাহা বিশ্বাস ও অনুসরণ করান যায়; কিন্তু সে বিশ্বাস দীর্ঘকাল স্থায়ী অথবা সর্বব্যাপ্ত হইতে কখনও পারে না। সে প্রসার শুধু সৃজনের যাথার্থ্য, বৈশিষ্ট ও উন্নত স্বরূপের উপরেই ন্যস্ত হইতে পারে। অসত্য, অপকৃষ্ট, অসার, নিরস, অসুন্দর ও অর্থহীন যাহা তাহাকে প্রচারের প্রাবল্যের সাহায্যে উত্তমের আসনে বসান যায় না।

আধুনিক যুগে জনমত দিয়া ব্যক্তির প্রাধান্য সৃজন পরিলক্ষিত হয়। ঐ জনমত সৃজনের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হইল প্রচার। প্রচার করিয়া ছোটকে বড়, উচ্চকে নীচ, জ্ঞানীকে মূর্খ ও মূর্খকে জ্ঞানী প্রমাণ করা যায়। কিন্তু সে প্রমাণ চিরস্থায়ী হয় না। আজকালকার নেতা, নেতৃত্ব, মতবাদ কৃষ্টি ও রসের আদর্শ, কোন কিছুই এই কারণে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যত শীঘ্র আইসে তত শীঘ্রই চলিয়া যায়। ভিতরে সার পদার্থ না থাকিলে সকল কিছুই সহজে উড়িয়া যায়। সার বস্তু শুধু সেখানেই অস্তিত্ব লাভ করে যেখানে গভীর অনুভূতি, প্রগাঢ় চিন্তা, অনন্ত পরিশ্রম ও সাধনা

আছে। দ্রুত পরিবর্তন শীলতার সহিত প্রেরণার নিবিড়তা ওপ্রতিভার উদ্ভাসন কখনই প্রায় একত্র সমাবিষ্ট হইতে দেখা যায় না। যদি নেতৃত্বাকাঙ্খা সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া যায় ও বহু লোকে যদি অসামান্যতার দাবিদার হইয়া নূতন কথা, নূতন কাব্য, নূতন রাষ্ট্রমত ও নূতন পথে চলিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে; তাহা হইলে কোন কিছুই পূর্ণ গঠিতরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। হঠাৎ আসিয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার যে আকস্মিকতা দোষ তাহা সেইখানেই প্রকট হইয়া উঠে যেখানে বারে বারে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ বর্জ্জন করার ইচ্ছা বা অভ্যাস কাহারো মধ্যে থাকে না। অসহিষ্ণুতা মানুষকে বিচার বুদ্ধিহীন করিয়া তোলে এবং খ্যাতির উচ্চশিখরে অতি দ্রুত আরোহণ চেষ্টা যে অধীরতার সৃষ্টি করে তাহাও মানুষকে সুবিবেচনার পথভ্রষ্ট করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতায় আবিষ্ট করিয়া দেয়।

সাধনার পথ ছাড়িয়া হঠাৎ পাওয়া প্রেরণার অন্বেষণে যেখানে বহু হবু-নেতা পর্য্যটনশীল; সেখানে নিত্য নূতন কথা, রস ও আদর্শের উত্থাপন হইলেও কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু হয় না। কারণ রীতি যেখানে সৃজনের সকল নীতি ও পদ্ধতি অগ্রাহ্য করিয়া চলে, সৃজন সেখানে হইতেই পারে না। তারপরে আছে আদর্শের বৈচিত্র ও উদ্ভটভাব। যাহা যত অসম্ভব, অজ্ঞাত ও দুর্বোধ্য তাহাই তত বাঞ্ছনীয় হইলে কিছু না পাইয়াই সব পেয়েছির দেশে পৌঁছিয়া যাওয়াই নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। অজানা গুরুর অজানা মন্ত্র অনির্দ্দিষ্ট সুরে উচ্চারন করিয়া পূজার সমাপ্তি হয়। যে চির পরিচিত ও যাহার মন্ত্রে যুগে যুগে মানুষ অনন্তের পথে অগ্রগমনে সক্ষম হইয়াছে তাহাকে আজ ভুলিতে হইবে, কারণ—"আমরা কোনও কারণে আর বিশ্বাস করি না। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের যে সংস্কার তাহাও আমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি; অকারণ আবেগে ও নিষ্ফলতার আগ্রহে।" এই জাতীয় উক্তি বাক্‌চাতুর্য্য প্রমাণ করিলেও কলা-চাতুর্য্য; রসজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য প্রমাণ করে না। স্বাভাবিক বোধ ও উপলব্ধি সঙ্গত অভিনবত্ব সৃজন সম্ভব না হইলে অসামঞ্জস্য অসম্ভবতা ও বৈপরীত্যের অসঙ্গতির অরণ্যে ঘুরিয়া দেখিতে হয় যে কথা, ভাব রস, রেখা, বর্ণ, আকৃতি প্রকৃতির বৈষম্য কেমন করিয়া আহরণ করিয়া কৃষ্টির উপকরণ বলিয়া সভ্যতার হাটের পণ্য হিসাবে উপস্থিত করা যায়। সাজাইয়া গুছাইয়া ও কুতর্কের অবতারণা করিয়া কিছু লোককে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলা ও অল্প সময়ের জন্য যাহা নাই তাহা "দেখাইয়া" দেওয়াও যায়; কিন্তু মানুষের বুদ্ধি দীর্ঘকাল প্রবঞ্চিত হইয়া থাকিতে চাহে না। ঔচিত্য ও সঙ্গতি অন্বেষণ মানুষের স্বভাব। তাহা যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে মানুষ সে অবস্থাকে মানিয়া লইয়া চলিতে থাকে না। অর্থ ও সভ্যতা, সরসতা অথবা রসহীনতা এবং গুঢ় তথ্যের রহস্যভেদ বিচার ও চেষ্টা মানব মনের প্রকৃতিগত আবেগ। ঐ জাতীয় অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইবেই এবং হইলে পর শীঘ্রই আসল নকল, সত্য মিথ্যা, অর্থপূর্ণতা ও অর্থহীনতা, রসের উপস্থিতি বা অভাব; সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ফলে জাল নেতৃত্ব ও গুণহীন অসমর্থ নেতাগণ ধরা পড়িয়া যাইবে এবং অকারণে গঠিত ও রচিত দল ও আদর্শ ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতে বাধ্য হইবে। মিথ্যার আশ্রয়ে কোন রাষ্ট্র, সমাজ, সভ্যতা বা কৃষ্টি দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না। এমন কি যদি রীতি নীতি আদর্শ নিকৃষ্ট ও সমাজ-বিধ্বংসী হয় তাহাও অধিক দিন থাকে না। সমাজ মঙ্গল অনুসরণে আত্মরক্ষা করিয়া চলে। অমঙ্গলের বিষ যাহা কিছুর মধ্যেই থাকে সমাজ যথাশীঘ্র তাহার উৎপাটন সম্পন্ন করে। এই সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৃজন বৈচিত্র এই নিয়মেই প্রাণবান হইয়া নিজ অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত আছে। বঞ্চনা ও প্রতারণার গতি জীবনের ধারার বিপরীত পথে ধাবমান। তাহার গতিশক্তি অত্যল্প ও তাহা জীবনের "বিরাট নদীর" মহাস্রোতের উজানে বহিতে কদাপি সক্ষম হয় না।

মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ

সমর বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এ-তত্ত্বটি জানলেন কোথা থেকে? —পীযুষবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন।

—নীতিনদা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন,—জেনেছেন উপনিষদ থেকে, জেনেছেন আত্মোপলব্ধির সাহায্যে। আপনি তো দর্শনের অধ্যাপক। সুতরাং আপনি তো জানেন—যে, বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক দর্শন ছাড়া আমাদের সবকটি দর্শনকেই বলা হয় আস্তিক দর্শন। কেননা সবকটি দর্শনই বেদ ও উপনিষদে স্বীকৃত ঈশ্বরকে স্বীকার করেই রচিত হয়েছে। সেই হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনকেও বলা যেতে পারে আস্তিক দর্শন। অবশ্য আধ্যাত্মজীবন ও পরমচেতনার তত্ত্ব নিয়ে যে-সব প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন তাকে যদি দর্শন হিসাবে আমরা গ্রহণ করি। শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে ঠিক দার্শনিক বলতেন না। কিন্তু তাঁর রচনাগুলো যে আপন থেকেই দর্শনে পরিণত হয়েছে এ-কথা তিনি জানতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীদিলীপ কুমার রায়কে যে চিঠি খানি দিয়েছিলেন তার থেকে কিছু অংশ আপনাদের জানিয়ে রাখি,- **because I had only to write down in the terms of intellect all that I had observed and come to know in practising yoga daily and the philosophy was there automatically, but that is not being a philosopher !**

প্রত্যহ যোগসাধনার সাহায্যে তিনি যে-সত্য উপলব্ধি করতেন,—তাই বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষায় প্রকাশ করতেন আর্যপত্রিকায়। সুতরাং যে-তত্ত্ব সেখানে বিবৃত, তা-সবই হল তাঁর কঠোর সাধনার উপলব্ধ সত্য। সেই জন্যই সেই রচনাগুলো আপনা থেকেই 'দর্শন' হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া তিনি যখন এই সব প্রবন্ধগুলো রচনা করতেন তখন তাঁর মনোবুদ্ধি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকত। সুতরাং ঐ সব তত্ত্বে বুদ্ধির রঙ মিশে যায়নি। তাই উপলব্ধির বিকৃতি ঘটবার কোনও অবকাশ সেখানে ছিল না। বৈদিক ঋষিরা যেমন সাক্ষাদ্দর্শন কিংবা অপরোক্ষানুভূতির সাহায্যে যে-সব সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন শ্রুতিতে তাই ব্যক্ত করেছেন, শ্রীঅরবিন্দও ঠিক তেমনি ভাবেই যা'কিছু জেনেছেন,—ভাষায় রূপান্তরিত করে তাকে প্রকাশ করেছেন আর্যপত্রিকায়। আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে বেদ অধ্যয়নের আগে শ্রীঅরবিন্দের যে-সব উপলব্ধি হয়েছিল,—বেদ অধ্যয়ন কালে তিনি দেখলেন,,—সেই সব তত্ত্বই সেখানে সুন্দর ভাবে বিবৃত করা হয়েছে।

আপনারা যাঁরা Life Divine পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, প্রতিটি অধ্যায়ের সুরুতেই, বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি গ্রন্থের থেকে উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সম্পূর্ণ অধ্যায়টি যেন সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিরই বিশদ ব্যাখ্যা। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের দর্শনকে বেদ ও উপনিষদের উপসংহার বললে বোধ-করি অত্যুক্তি হবে না।

সে-যাই হোক, এখন সংসৃতির তত্ত্বে ফিরে

আসা যাক। আমি বলেছি সংবৃতির তত্ত্ব উপনিষদে আছে। শ্রীঅরবিন্দ তাকে বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর Life Divine গ্রন্থে—Book II, Part II The progress to knowledge—God—Man and Nature শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়।

মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে—

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্॥

তপঃশক্তিতে ব্রহ্ম ঘণীভূত হন। তার থেকে উদ্ভূত হল অন্ন। অর্থাৎ জড় অর্থাৎ matter এবং অন্নের থেকে প্রাণ ও মন ও লোক সমূহ জাত হয়। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে,—তিনি ইচ্ছা করলেন বহুরূপে আমি জাত হব। তপঃশক্তি সাহায্যে তিনি কেন্দ্রীভূত হলেন এবং তপঃশক্তির দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করে তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হলেন,—অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তিনি সৎ ও ত্যৎ, অর্থাৎ মূর্ত ও অমূর্ত, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, চেতন ও অচেতন সত্য ও অনৃত্য, যা কিছু আছে সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম তাই হলেন। সেই জন্যে তারা তাঁকে তৎ-সৎ অর্থাৎ সেই সত্যবস্তু বলে।

উপনিষদের এই তত্ত্ব থেকেই আমরা জানতে পারি—যে, পরম চেতনা নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ঘনীভূত হয়ে matterএ পরিণত হয়েছিলেন। তাহলে আমরা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি ক্রমপরিণামবাদের ধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে যতদিন না এই শাশ্বত সত্য স্বরূপের অর্থাৎ এই পরম চেতনার উন্মীলন ঘটছে। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে চেতনা প্রকট হয়েছে তাই অভিব্যক্তির শেষ পর্যায় নয়। উন্নত চেতনা এখনও রয়েছে প্রকাশের অপেক্ষায়। এবং মনের ভিতর থেকেই সেই উন্নত চেতনার উন্মীলন সম্ভব হবে। Life Divine গ্রন্থের Man and the Evolution শীর্ষক অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে যে বিশদ বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়েছে তার থেকেই আমরা জানতে পারি যে, চেতনার অভি-ব্যক্তিবাদের তত্ত্বের মূলে আছে যে সত্য তা হল এই যে, জড়ের থেকে যখন দেহ গড়ে উঠেছিল, দেহের মধ্যে যখন সঞ্চারিত হয়েছিল প্রাণ এবং দেহ ও প্রাণের আধারে যখন জাগ্রত হল মন তখন যে-শক্তির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছিল, অর্থাৎ যে-শক্তির অভিপ্রায়ে ঐ চেতনা সব অভিব্যক্ত হতে পেরেছিল, সেই শক্তিকেই বলা যেতে পারে স্রষ্টা বা ঈশ্বর। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—Supraphysical force অর্থাৎ জড়াতীত শক্তি।

শ্রীঅরবিন্দের রচনার মৌলরীতি হল এই যে, যোগ-সাধনার সাহায্যে যে-সত্য তিনি উপলব্ধি করে-ছিলেন তা তিনি সোজাসুজিভাবে কোথাও ব্যক্ত করেননি। প্রথমে তিনি কোনও একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে যুক্তিবাদী মানুষেরা,—তাঁরা দার্শনিকও হতে পারেন আবার বৈজ্ঞানিকও হতে পারেন,—কি কি যুক্তির অবতারণা করতে পারেন তা বিশদভাবে বিবৃত করেন, তারপর সেই সেই যুক্তির মধ্যে কোথায় ফাঁক, কোথায় ত্রুটি তা বিশ্লেষণ করে দেখান, এবং সব শেষে যে সিদ্ধান্ত বা মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় তা বিবৃত করেন এবং সেইটাই হ'ল তাঁর উপলব্ধ সত্য। এই বিচার-পদ্ধতির সাহায্যেই তিনি দেখিয়েছেন যে, অভি-ব্যক্তিবাদের কার্য্যধারা চেতনার দুইটি ভিন্নমুখী ক্রিয়াশক্তির উপর নির্ভরশীল। একদিকে চাই নীচের থেকে অর্থাৎ পৃথিবীতে যে-চেতনা অভিব্যক্ত হয়েছে তার তীব্র আকুতি অন্যদিকে তেমনি চাই এই Supra-physical শক্তির হস্তক্ষেপ যার ফলে উর্দ্ধের উন্নততর চেতনার ঘটে অবতরণ। এইভাবেই দেহ ও প্রাণচেতনার তীব্র অভীপ্সার ফলে মনশ্চেতনার উন্মীলন সম্ভব হয়েছে। পরবর্তী উন্নততর চেতনার অভিব্যক্তি যাতে সম্ভব হয় তার জন্য মনের মধ্যে যাতে তীব্র অভীপ্সা জাগে তার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। কেননা সেই উন্নত চেতনাকে আমাদের সত্তার মধ্যে অভিব্যক্ত করাই হ'ল আমাদের পরম লক্ষ্য। দেহ-প্রাণ ও মন নিয়ে আমাদের যে-সত্তা গড়ে উঠেছে তাকে প্রসারিত

করে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হবে। তারমধ্যে নিগূঢ় যে-খণ্ড-চেতনা তাকে পূর্ণ চেতনায় রূপান্তরিত করতে হবে, তাকে তার পরিবেশের প্রভু হতে হবে, এবং সেইসঙ্গে সমগ্র বিশ্বকে সমন্বয়, সামঞ্জস্য ও একত্রে গ্রথিত করতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে প্রাকৃত মানুষকে হতে হবে দিব্যমানুষ। মৃত্যুর পুত্রগণকে স্মরণে রাখতে হবে যে তারা অমৃতস্য পুত্রাঃ। এই জন্যেই বলা হয় অভিব্যক্তি-বাদের পথে মানুষ হ'ল একটা turning point—the critical stage in earth nature.

—কিন্তু কেন? —মানুষকে দিব্যমানুষ হতে হবে কেন।

এর উত্তর আগেই দিয়েছি। If humanity is to survive a radical tranformation of human nature is indispensable.

মানুষকে ঘিরে আজ যে-সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধানের জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু তবুও মানুষ সফল হতে পারছে না, মানুষ একদিন আশা করেছিল—উন্নত ধরণের শিক্ষা ও বুদ্ধির চর্চার দ্বারা মানুষ উন্নত হবে, মানুষের স্বভাবের রূপান্তর সম্ভব হবে। একটু আগে—আপনিও এ-অভিমত প্রকাশ করেছেন পীযূষবাবু,—কিন্তু মানুষের সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য আত্মার বিকাশ সাধন,—সে উদ্দেশ্য সার্থক করে তুলতে মানুষ সক্ষম হয়নি। শিক্ষার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত অহংকে স্ফীত করা হয়েছে শুধু।

বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ মনকে অন্তর্মুখী করতে পারেনি। তাই অন্তঃপুরুষকে জানা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। জীবনের পরিচালক অর্থাৎ Governor of life হিসাবে Reasonকে সে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে Reason হল উচ্চতর শক্তির minister এ-বোধে সে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মানুষ ভেবেছিল Religion তাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ-ব্যাপারেও সে নিরাশ হয়েছে। Religion এখন বাহিক আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। মানুষ মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে পূজা করে, মসজিদে গিয়ে আজান দেয়, নমাজ পড়ে, চার্চে গিয়ে করে উপাসনা,—এ-সবই হয়ে গিয়েছে formal এই সব আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ নিজের অহংকে পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা করে। অথচ সমস্ত ধর্মের সার কথা হল,—পরমপুরুষের সন্ধান করা, পরমপুরুষকে জানা। ধর্মের এ-উদ্দেশ্যও অসার্থক থেকে গিয়েছে।

রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার সাম্প্রতিক চেষ্টাও ব্যর্থ হতে চলেছে। ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে ব্যাহত করে সমষ্টির কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। ব্যক্তিকে যেমন নিজের অহংকে খর্ব না করে কিন্তু প্রসারিত করে সমষ্টিগত 'অহং' এর সঙ্গে মিলে মিশে যেতে হবে, তেমনি জাতিগত অহংকে খর্ব না করে, পর্যুদস্ত না করে, পরন্তু তাকে প্রসারিত করে বিশ্বগত ঐক্যে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু তার জন্যে অন্তর্জীবনের যে পরিবর্তন দরকার, বাইরের জীবনে প্রযুক্ত কোনও ব্যবস্থা সে-পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে যেমন,—Human cycle, The Ideal of human Unity, war and self determination ইত্যাদি, মনুষ্যজীবনের বিভিন্ন সমস্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। শাণিত যুক্তির সাহায্যে সে-সব সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সে-সব সমস্যার সমাধানে মানুষের মনোগত শক্তি কত অপ্রতুল,—কত অসহায়। তবেই তিনি বলেছেন অন্তর্জীবনের পরিবর্তন ছাড়া মানুষ বহির্জীবনের অতিকায় সব সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে সক্ষম হবে না।

এখন এই অন্তর্জীবনের রূপান্তর সাধনের জন্য একদিকে প্রয়োজন উচ্চতর চেতনার উন্মীলনের জন্য—এই দেহ-প্রাণ ও মনকে পরিণত করে তোলা, অন্যদিকে উর্ধ্বভূমির অতিমানস চেতনার অবতরণ সম্ভব করা।

আমরা আগেই বলেছি,—উচ্চতর চেতনায় মানুষকে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে—অর্থাৎ অতিমানস চেতনায়

অবতরণকে সম্ভব করে তুলতে হলে,—আগে জানতে হবে—জড়াতীত সেই চিন্ময়ী শক্তির কি অভিপ্রায়। পার্থিব চেতনায় তার অবতরণ সম্ভব কিনা ?

হঠাৎ নীতিনদা থামলেন। গম্ভীর হয়ে সকলকার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর অত্যন্ত ধীর অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন,—আমার মুখ দিয়ে প্রশ্নটি অতি সহজ ভাবে বেরিয়ে এল বটে,—কিন্তু এ এক বিরাট প্রশ্ন। সমগ্র মানবজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান হিসাবে এই ধরণের কোনও উপায়, কোনও পন্থা যে থাকতে পারে এমন ভাবনা, সুদূর অতীত থেকে অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কোনও দেশের কোনও মানুষকে এমন গভীর ভাবে ভাবিত করে নি। এবং এর জন্যে যে কঠোর সাধনার দরকার কোনও দেশের কোনও যোগী, ঋষি কিম্বা সাধু সন্তরা সে-সাধনার কথা চিন্তাও করেন নি। বিগত কয়েক শতাব্দীতে পূর্ব ও পশ্চিমে বহু মনীষী, জ্ঞানী ও গুণীজনের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু বিশ্বমানুষের যে সমস্যা সে-সমস্যা থেকেই গিয়েছে, আকারে প্রকারে বরং তা আরও জটিল হয়েছে।—কিন্তু কেন ?—এই বিরাট প্রশ্নটি যে-মহাপুরুষের মনে প্রথম উদয় হল, এবং সেই প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যে যিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন, তিনি কি শুধু মহাবিপ্লবী। না সমগ্র মানবজাতির মুক্তিদাতা ?—এ-বিচারের ভার ভবিষ্যৎ মানবজাতির জন্য তোলা থাক, আমরা এখন তাঁর বৈপ্লবিক কর্মধারা নিয়েই আলোচনা করি।

ক্রমপরিণামবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ অর্থাৎ Evolutionএর ফলে হাজার হাজার বছর পরে মানুষের চেয়েও উন্নততর চেতনার অধিকারী অতিমানবের উদ্ভব,—অবশ্য নীট্‌শের Superman নয়,—এই পৃথিবীতে হয়ত সম্ভব হবে। কিন্তু সে-সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করা যায় কিনা। যদি যায় তাহলে কি উপায়ে ?—দুরূহ তপস্যার সাহায্যে সে-তত্ত্বও তিনি জেনেছিলেন। এবং প্রাচীন ভারতের ঋষিদের মত সে তত্ত্বের কথা বিশ্ববাসীদের, যাঁরা অমৃতের পুত্র—তাঁদেরও শুনিয়েছেন। কঠোর তপস্যায় যেদিন তিনি ভগবানের প্রত্যাদেশ পেলেন—সেইদিন হল তাঁর মহাসিদ্ধি। তিনি জানতে পারলেন—অতিমানস রূপান্তর পৃথিবীতে ঘটবেই—The Supramental change is a thing decreed and inevitable in the earth consciousness. অর্থাৎ জানতে পারলেন বিধাতার অভিপ্রায়।

কিন্তু তার আগে দেহ-প্রাণ ও মনোগত মানুষকে প্রস্তুত হতে হবে। পার্থিব চেতনাকে সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে উচ্চতর চেতনার অবতরণ যখন ঘটবে তখন তা ধারণ করবার শক্তি যেন সে অর্জন করে।

এইবার আপনার প্রশ্নে ফিরে আসা যাক পীযুষবাবু ; আপনি বলেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে-কার্য্য সম্পন্ন করেননি সে কার্য্য সাধন করতে শ্রীঅরবিন্দ সাহসী হলেন কি করে।

আপনার আগে অনেকেই এ-প্রশ্ন করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং তার জবাবও দিয়ে গেছেন—আমি তাঁর জবাবটাই এখানে পড়ে শোনাচ্ছি,—১৯৩৫ সালে একটি চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন,—

"আমি চাইছি এক উচ্চতর সত্যকে। তাতে মানুষের চেয়েও বড় হতে পারবে কিনা সে-প্রশ্নই নয় ; কিন্তু যাতে তাদের জীবনের মধ্যে আসে শান্তি, সত্য ও আলো, তাদের জীবন যাতে এখনকার অজ্ঞতা ও অসত্য ও জ্বালা যন্ত্রণা, ও দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে নিত্য সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে থাকার চেয়ে ভালরকম কিছু হয়ে ওঠে।......অতিমানসকে আমি নামিয়ে আনতে চাই নিজেকে বড় করবার জন্যে নয়। মানুষের বিচারে আমি বড়ই হই আর ছোটই হই—তার জন্যে আমি কিছু গ্রাহ্য করিনা। আমি কেবল চাই যে, এই পার্থিব চেতনায় কিছু আভ্যন্তরীণ সত্য এবং আলো এবং সঙ্গতি এবং শান্তি এসে পড়ুক।... আমার চেয়েও মহৎ পুরুষেরা এটা যদি না দেখে

থাকেন এবং এ-আদর্শ যদি তাঁদের দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত না হয়ে থাকে, তথাপি আমি যে সত্য দৃষ্টি ও সত্যানুভব পেয়েছি, নিশ্চয়ই তাকে অনুসরণ করতে আমি নিবৃত্ত থাকব, এমন হতে পারেনা। শ্রীকৃষ্ণও যে চেষ্টা করেননি আমি সেই চেষ্টাই করতে যাচ্ছি বলে লোকের বুদ্ধির কাছে আমি যদি নির্বোধ বলে প্রতিপন্ন হই, তাতেও কিছু যায় আসেনা। এখানে অমুক কিংবা তমুক কি বলছে তা নিয়ে প্রশ্নই নয়। এ-হল কেবল ভগবান ও আমার নিজের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রশ্ন। স্বয়ং ভগবানের তাই ইচ্ছা কি না। তিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন সেই জিনিসকে নামিয়ে আনতে কি না। অথবা তার অবতরণের পথ খুলে দিতে কিনা। অথবা অন্ততঃপক্ষে সেটা অপেক্ষাকৃত আরও সহজ করে তুলতে কিনা।—তাই নিয়ে কথা। আমার এই দুঃসাহসিক ধারণা পোষণ করার জন্যে সকল লোকে আমাকে যতই টিট্‌কারী দিক কিংবা আমার উপর নরকপাতই ঘটুক—তবু আমি একাজ শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাব। তাতে আমি জয়ী হই কিংবা ধ্বংস হয়ে যাই—এই মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই আমি অতিমানসকে এখানে চাইছি—নিজেকে বা অন্য কাউকে বড় করে তোলার মতলব নয়।"

শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—**The Complete Divine Manhood.** তিনি এসেছিলেন মানুষকে দিব্য জন্মে ও দিব্য কর্মে দীক্ষা দেবার জন্যে। এ বিষয় নিয়ে এর আগে এখানে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে ভবিষ্যতেও হবে। সেসময় আপনি যদি আসেন তো আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন। যাই হোক, আপনার আরও প্রশ্ন ছিল—শ্রীঅরবিন্দের আগে অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন—তবুও মানুষের কোনও উন্নতি হয়নি।—এর উত্তর আমি আমার আলোচনার মধ্যেই দিয়েছি, এবং শ্রীঅরবিন্দের এই চিঠিটার মধ্যেও এর কিছুটা ইংগিত আছে। তবে আপনার অবগতির জন্য সংক্ষেপে আরও দু'একটি কথা বলতে চাই।

শ্রীঅরবিন্দের যোগের সঙ্গে অন্যসব যোগের কিছু পার্থক্য আছে। মোটামুটিভাবে আমরা তিনটি পার্থক্য দেখতে পাই:—

প্রথম,—শ্রীঅরবিন্দের যোগ এই জগৎকে অস্বীকার করেনি। পার্থিব চেতনার সমস্ত সম্পূর্ণতা, অজ্ঞানতা ও অন্ধতার অপসারণ ঘটিয়ে তার শাশ্বত পরিবর্তন সাধনই এ যোগের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ— শ্রীঅরবিন্দের যোগ ব্যক্তিগত মুক্তি বা নির্বাণ লাভের জন্য নয়। সমগ্র মানবজাতির চেতনার রূপান্তর সাধনের জন্যই এই যোগ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য এ-যোগ নয়, এ-যোগ ভগবানের জন্য, ভগবানের অভিপ্রায়কে সার্থক করার জন্য।

তৃতীয়তঃ—এ-যোগের পথ আলাদা। যার জন্য এ-যোগকে বলা হয় পূর্ণযোগ বা **Integral yoga.**

এই পূর্ণযোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থে। তাছাড়া বহু ভক্ত সাধকেরাও এ-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন। সময় ও সুযোগমত সে-সব বই আপনি পড়ে নিতে পারেন। এখানে এখন সে আলোচনার অবকাশ নেই।

—কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে নীতিনদা,—খুব নরমগলায় কথাগুলো বললেন পীযুষবাবু—।

নীতিনদা তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি আবার বললেন—পরবর্তী উন্নততর চেতনায় উত্তীর্ণ হতে হলে মানুষকে সর্বাগ্রে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে, এ-কথা আপনি বলেছেন। কিন্তু কি করে সেই পরিপূর্ণতা বা **perfection** সে অর্জন করবে?

পীযুষবাবুর এই প্রশ্নে সকলেই একটু উৎসাহ বোধ করলেন। প্রশ্নটা যেন সকলকারই।

নীতিনদা বললেন,—প্রশ্নটা নিয়ে আগেই আলোচনা করা যেত, এবং তা করব একথাও আমি বলেছিলাম, কিন্তু মূল প্রশ্নের সংগে এই বিষয়টির বিশেষ সম্বন্ধ নেই বলে আলোচনা করিনি। তাছাড়া এ-সম্বন্ধে কিছু

আলোচনা করতে গেলে—মানুষের অন্তঃপুরুষের অধিষ্ঠান কেন্দ্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হয়।—সেই জন্যে এই প্রশ্নটি আমি উত্থাপন করিনি। যাই হোক আপনারা যখন জানতে চেয়েছেন তখন সংক্ষেপে কিছু বলছি।—

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন-

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥

এই শরীরকে বলা হয় ক্ষেত্র এবং যিনি এই ক্ষেত্রের সমস্ত রহস্য অবগত হন, তাঁকেই বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ।

তাহলে সর্বাগ্রে মানুষের এই শরীরটাকে ভালভাবে জানতে হবে। আমি আগেই বলেছি—দেহ, প্রাণ ও মন নিয়েই মানুষের শরীর। দেহ হল ভোগের আয়তন, প্রাণ শক্তির এবং মন হল জ্ঞানের আয়তন। মানুষের এই শরীরটিকে এই তিনটি আয়তন অনুযায়ী তিনটি কেন্দ্রে ভাগ করা যায়।

ভোগের আয়তনের কেন্দ্র হল—পা থেকে নাভিমূল পর্যন্ত দেহের বিস্তীর্ণ অংশ। কর্ম-আয়তনের কেন্দ্র—নাভিমূল থেকে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এবং জ্ঞানায়তনের কেন্দ্র হল—হৃৎপিণ্ড থেকে মূর্ধা পর্যন্ত দেহের অংশ।

যে অন্তঃপুরুষের কথা আগে বলেছি, যাঁকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন psychic being বা চৈত্যপুরুষ এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—'পাকা আমি'—সেই অন্তঃপুরুষ যে কোনও একটি কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করেন। আমরা বাইরের জীবনে যে ধরণের কর্ম-বৃত্তি গ্রহণ করি আমাদের অন্তঃপুরুষ ঠিক সেই ধরণের কেন্দ্রে অবস্থান করেন। যদি আমরা দেহের কামনা বাসনা নিয়েই আমাদের সমস্ত কর্মপ্রবণতাকে ব্যস্ত রাখি অর্থাৎ শারীর ভোগের প্রেরণাতেই যদি আমরা সব কাজ-কর্ম করি, তাহলে আমাদের অন্তঃপুরুষ আশ্রয় নেন নাভিমূলের নীচে। যখন আমাদের মধ্যে জাগে এমন কর্মোন্মাদনা যার সার্থকতায় আমাদের 'অহং, অর্থাৎ 'কাঁচা আমি' পরিতৃপ্ত হয়,—যশঃ, খ্যাতি, অর্থ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি লাভ হয়, তখন আমাদের অন্তঃপুরুষ হৃৎপিণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থান করেন। এবং যখন আমাদের জ্ঞানৈষণা প্রবল হয়,—ইতিহাস, সাহিত্য-কাব্য-শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ে আমরা আগ্রহী হই, নিজে কিছু সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হই অথবা অপরের সৃষ্টির রস আস্বাদন করে আনন্দ পাই—অথবা আমাদের অন্তঃপুরুষ অধিষ্ঠান করেন তৃতীয় কেন্দ্রে।

আমরা আগেই বলেছি যে, আমরা মনোময়পুরুষ অর্থাৎ mental being সুতরাং আমাদের অন্তঃপুরুষের সঠিক কেন্দ্র হল—মস্তিষ্ক বা মূর্ধাকেন্দ্র। অপর দুইটি কেন্দ্রে যখন তিনি ওঠানামা করেন তখন বুঝতে হবে তিনি কেন্দ্রচ্যুত হয়েছেন। অর্থাৎ বাইরের জীবনে মনুষ্যত্বের অবস্থায় আমাদের অবনতি ঘটেছে। কেবলমাত্র দেহ ও প্রাণের বাসনা কামনাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্য আমরা যদি মনঃশক্তিকে নিয়োগ করি তাহলেই আমাদের অন্তঃপুরুষ কেন্দ্রচ্যুত হন। কেননা দেহ ও প্রাণ নিয়ে মানুষের পশুভাব; দেহ ও প্রাণ চেতনার অনেক পরে মনশ্চেতনার উন্মীলন ঘটেছে। সুতরাং মনের শক্তি অনেক বেশী। সে শক্তিকে দেহ আর প্রাণ যদি দাস করে রাখে, প্রভু হতে দেয় না, তাহলে মন তার স্বধর্ম অনুসরণ করবে কি করে। মনের কাজ হল দেহ ও প্রাণের বাসনাগুলোকে পরিশুদ্ধ করে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ঠিক পথে পরিচালিত করা। কিন্তু আমরা দেহ ও প্রাণের দ্বারাই মনকে পরিচালিত করছি। তাই এই বিংশ শতাব্দীর শেষেও সমগ্র পৃথিবীর গোষ্ঠীগত মানুষ আধাপশুই থেকে গিয়েছে। পুরোপুরি মানুষ হতে পারেনি।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন,—মনের ত্রিধা শক্তি—Willing Thinking এবং Feeling ইচ্ছা, জ্ঞান ও বেদনা এই তিনটি শক্তিকে কিংবা তার যে-কোনও একটিকে অবলম্বন করে মানুষ যদি অন্তর্মুখী হয় তাহলে সে 'বোধি'র সন্ধান পায়। এবং এই 'বোধি'র সাহায্যেই সে জানতে পারে তার অন্তঃপুরুষকে। এই তিনটি

শক্তিকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে—যথাক্রমে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি যোগ।

আশাকরি এবার আপনি বুঝতে পেরেছেন—আমাদের কি করা উচিত আর আমরা কি করছি। এবং কেন আমরা পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারছি না।

এবার আমরা আবার আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে যাই।—মানুষকে উন্নততর অবস্থায় দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বাইরের জীবনে যে-সব পন্থা আমরা অবলম্বন করি—তাকেই বলে থাকি বৈপ্লবিক পন্থা। অন্তর্জীবনের পরিবর্তনেরও যে প্রয়োজন আছে তা আমরা স্বীকার করি না। তাই শ্রীঅরবিন্দকে বুঝতে বা তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে আমরা উদ্যোগী হইনি। যাঁরা শ্রীঅরবিন্দকে জেনেছেন,—অবশ্য পুরোপুরি জানা কারও সাধ্য নয়, তাঁরা এ-কথা দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারেন যে এক মহাবিপ্লবের সাধনায় তিনি হলেন সার্থক ঋষি।

Evolutionকে ত্বরান্বিত করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে যে কী কঠোর সাধনা করতে হয়ে ছিল তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর অমর সৃষ্টি 'সাবিত্রী' মহাকাব্যে।

যে বিধান অচলপ্রতিষ্ঠ নয়, যা মানবজাতিকে উন্নত অবস্থায় উন্নীত করতে সক্ষম নয়, বিপ্লবের সাহায্যে তাকেই আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। ফলে পরবর্তীকালে সে বিধান যখন তার কার্যকরী শক্তি হারিয়ে ফেলে তখন অন্যতর ব্যবস্থা প্রবর্তনে আমরা বিপ্লবের পথ গ্রহণ করি। এইভাবেই আমরা এগিয়ে চলেছি, এই ভাবেই আমরা আরও এগিয়ে যাব।

কিন্তু ও পথ যে ভ্রান্ত সে-কথা প্রথম আমাদের শোনালেন শ্রীঅরবিন্দ। কিন্তু আমরা কি শুনেছি সে কথা,—শুনিনি। শ্রীঅরবিন্দ জানতেন কেউ শুনবে না, তাই মানুষের রুদ্ধদ্বারে আঘাত না করে ভগবানের দ্বারে গিয়ে তিনি আঘাত করলেন। তারপর ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে গভীরতর তপস্যায় আবার নিমগ্ন হলেন। সে সাধনা তাঁর এখনও চলেছে। অথচ পৃথিবীর মানুষ জানে না, কোথা দিয়ে কেমন করে কী গভীর পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং এখনও হবে। মানুষ রূপান্তরিত হবে দেবতায়, এই পৃথিবীই হবে তার আবাসভূমি।

মনুষ্যচেতনার এই বিরাট রূপান্তর সাধনকে সত্যই বিপ্লব বলা যায় কিনা সে-প্রশ্নের মীমাংসা মানুষের অভিধানে নেই,—তাই বুদ্ধিবাদী যুক্তিবাদী মানুষের সংশয় আজও ঘোচেনি,—আজও সন্দিগ্ধ মানুষের প্রশ্ন—শ্রীঅরবিন্দ কি সত্যই মহাবিপ্লবী?—

মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

সুবিমল সিংহ

২

গত শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে "মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র" শীর্ষক আলোচনায় দেখিয়াছি যে ভাষান্তর বিভ্রাটের ফলে অর্থশাস্ত্রের অতিশয় প্রাথমিক এবং মৌলিক সংজ্ঞাগুলিও শিক্ষার্থীর অনধিগত থাকিতে বাধ্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখানো হইয়াছে যে "elasticity of demand" কথাগুলির তর্জ্জমা সোজাসুজি "চাহিদার সঙ্কোচ প্রসারশীলতা না করিয়া কোন কোন গ্রন্থকার হয়ত করিয়াছেন "চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা" এবং এই ভ্রান্ত তর্জ্জমার ফলে বিষয়টা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর কোন সুস্পষ্ট ধারণা ত হইতেই পারেনা অধিকন্তু এরূপ তর্জ্জমার ভিত্তিতে অর্থশাস্ত্রে চাহিদার মূল্যানুগ সঙ্কোচ-প্রসারশীলতাকে (Price Elasticity of Demand) যে পাঁচটি বিভিন্ন মানের শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় তাহাদেরও যথার্থ এবং সম্যক নামকরণ সম্ভব হয় না। অথচ চাহিদার এই বিভিন্ন মানের সঙ্কোচপ্রসারশীলতার সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলে অর্থশাস্ত্রের অতি সাধারণ বিচার বিশ্লেষণ ও সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখিয়াছি যে ট্রাম, বাস, রেলগাড়ি, কিম্বা বিমান ইত্যাদির ভাড়া বাড়াইলেই যে পরিবহন সংস্থার আয় বাড়িবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং আয় কমিতেও পারে। অপরপক্ষে ভাড়া কমাইলেও আয় বাড়িতে পারে। ইহা নির্ভর করে পরিবহনের চাহিদার সঙ্কোচ প্রসারশীলতার মানের উপর। তেমনি ডাক মাশুল এর হার বাড়াইলে ডাক-বিভাগের আয় বাড়িতেও পারে, আবার কমিতেও পারে।

মাঝে মাঝে দেখা যায় যে কোন কোন দেশ তাঁহাদের দেশীয় মুদ্রার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন করিয়া ফেলেন। সাধারণতঃ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রায় মূল্য হ্রাস করা হয়। ইহাকে Devaluation অথবা মুদ্রার অবমূল্যায়ন আখ্যা দেওয়া হয়। ভারতকেও দুইবার মুদ্রার অবমূল্যায়ন করিতে হইয়াছে—একবার ১৯৪৯ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৬৬ সালে। বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর মুদ্রার অবমূল্যায়নের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইতে পারে তাহা বুঝিতে হইলেও চাহিদার মূল্যানুগ সঙ্কোচ প্রসারশীলতার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। তবে পরিবহন এর মূল্য অর্থাৎ ভাড়া, অথবা ডাকমাশুলের হ্রাসবৃদ্ধির ব্যাপারের তুলনায় এই বিষয়টা অপেক্ষাকৃত জটিল, তবে খুবই কৌতুহলোদ্দীপক, সন্দেহ নাই। তাছাড়া ১৯৬৬ ইং সালে ভারতের মুদ্রার যখন অবমূল্যায়ন করা হইয়াছিল তখন বেশ একটু আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব আমরা এই বিষয়টা একটু বিশদভাবে আলোচনা করিব। তবে এই প্রসঙ্গে কোন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য কিভাবে স্থির হয়, কিভাবেই বা পরিবর্তিত হইতে পারে, তাহা জানা দরকার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের-পূর্ব্ব পর্যন্ত (১৯১৪ ইং) বিভিন্ন দেশের মুদ্রা স্বর্ণভিত্তিক ছিল, যাহাকে ইংরাজীতে বলা হয় gold standard এবং বাংলায় তর্জ্জমা করা হয় 'স্বর্ণমান'। এই সুবর্ণভিত্তিক মুদ্রা ব্যবসায় প্রকৃত কাঞ্চন মুদ্রা বাজারে চলতি থাকুক আর নাই থাকুক সরকার তাঁহাদের প্রচলিত কাগজী মুদ্রার সঙ্গে সোনার একটা নির্দিষ্ট বিনিময় হার বাঁধিয়া রাখিতেন এবং সেই হারে কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ লইতে অথবা দিতে অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় করিতে অঙ্গীকৃত থাকিতেন। উপরন্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী রপ্তানীতে কোনরূপ বিধি নিষেধ থাকিত না। সকল দেশই যদি তাহাদের

প্রচলিত মুদ্রার সহিত স্বর্ণের একটা বিনিময় হার নির্দিষ্ট রাখে এবং স্বর্ণের অবাধ আমদানী রপ্তানি চলে তবে ঐ স্বর্ণের ভিত্তিতে এবং মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন নামের বিভিন্ন মানের এবং বিভিন্ন আকৃতির কাগজী মুদ্রাগুলিরও একটা পারস্পারিক বিনিময় হার নির্দিষ্ট হইয়া যায়। ইহাকে বলা হয় "স্বর্ণ ভিত্তিক বিনিময় হার" (Gold Par of Exchange) অথবা "টঙ্কশালা নির্দিষ্ট বিনিময় হার" (Mint Par of Exchange)।

তবে অন্যান্য দ্রব্যের মতই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়েরও অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয়েরও একটা বাজার থাকে, যাহার নাম Foreign Exchange Market। আর এই বাজারের কারবারী হইলেন ব্যাঙ্ক এবং তজ্জাতীয় সংস্থা। এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে কোনরূপ বিধিনিষেধ অথবা নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের মতই বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যও অর্থাৎ পারস্পারিক বিনিময় হারও নির্দ্ধারিত হয় পারস্পারিক চাহিদা এবং যোগানের সংঘাতে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন দেশীয় মুদ্রার চাহিদা (অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান) আসে তাঁহাদের নিকট হইতে যাঁহারা বৈদেশিক মুদ্রাকে দেশীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে চান। যেমন দেশীয় পণ্যের বৈদেশিক ক্রেতা। অপর পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রার যোগান (অর্থাৎ দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা) আসে তাঁহাদের নিকট হইতে যাঁহারা দেশীয় মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে ইচ্ছুক। যেমন বৈদেশিক পণ্যের দেশীয় ক্রেতা অর্থাৎ আমদানীকারী। বৈদেশিক মুদ্রার লেন-দেন-কারী কারবারীদের অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যাঙ্ক (Foreign Exchange Bank অথবা কোন ব্যাঙ্কের Foreign Exchange Department) এবং তজ্জাতীয় সংস্থাগুলির বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে শাখা প্রশাখা অথবা প্রতিভূ (agent) বিদ্যমান থাকে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে তাঁহারা দেশীয় মুদ্রা দিলে একদিকে তাঁহাদের বৈদেশিক আফিসের তহবিলে বৈদেশিক মুদ্রা জমিতে থাকে অপরদিকে তাঁহাদের দেশীয় আফিসের তহবিল হইতে দেশীয় মুদ্রা কমিতে থাকে। পক্ষান্তরে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে তাঁহারা বৈদেশিক মুদ্রা দিলে একদিকে দেশীয় ভাণ্ডারে দেশীয় মুদ্রা জমিতে থাকে অপরদিকে বৈদেশিক ভাণ্ডারের বৈদেশিক মুদ্রা কমিতে থাকে। কোন একটা নির্দিষ্ট বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রার যোগান এবং চাহিদা যদি সমান হয় তাহা হইলে দেশীয় মুদ্রার ভাণ্ডারে যত টাকা জমা পড়িবে ঠিক তত টাকাই খরচ হইবে। এই অবস্থায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা এবং যোগানও স্বতঃসিদ্ধভাবেই সমান হইবে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারেও যত অর্থ জমা পড়িবে তত অর্থই খরচ হইবে। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে যদি দেশীয় মুদ্রার যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী হয় তাহা হইলে দেশীয় মুদ্রার ভাণ্ডারে যতটাকা জমা পড়িবে তদপেক্ষা বেশী খরচ হইবে। এই অবস্থায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী হইবে। ফলে বৈদেশিক ভাণ্ডারে যত বৈদেশিক মুদ্রা জমা পড়িবে তদপেক্ষা কম খরচ হইবে। অর্থাৎ একদিকে দেশীয় মুদ্রার ভাণ্ডারে টাকা ঘাটতি পড়িবে অপরদিকে বৈদেশিক ভাণ্ডারে ঐ নির্দিষ্ট বিনিময়হার অনুযায়ী সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উদ্বৃত্ত হইবে। এই অবস্থা দিনের পর দিন চলিতে থাকিলে একদিকে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ক্রমাগত ফাঁপিয়া উঠিবে, অপরদিকে দেশীয় মুদ্রার তহবিলের ঘাটতি ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে। এককভাবে কোন বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ী সংস্থার যদি এরূপ অবস্থা হয় আবার অপর ব্যবসায়ীর যদি বিপরীত অবস্থা হয় অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলে ঘাটতি এবং দেশীয় মুদ্রার তহবিলে উদ্বৃত্ত দেখা দেয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় করিয়া কাবাক মিটাইয়া ফেলিবেন। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ীর এ অবস্থা ঘটিলে তাঁহাদের সকলেরই

বৈদেশিক তহবিলে উদ্বৃত্ত এবং দেশীয় তহবিলে ঘাটতি জমিতে থাকিবে। এরূপ অবস্থায় দেশীয় মুদ্রা তহবিলের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য মুদ্রাব্যবসায়ীরা দেশের অপর ব্যাঙ্ক হইতে (অথবা ব্যাঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বিভাগ সাধারণ বিভাগ হইতে) টাকা ধার করিবেন এবং তদ্দরুণ তাঁহাদের সুদ দিতে হইবে। অপরদিকে তাঁহাদের বৈদেশিক শাখার যে উদ্বৃত্ত জমিতে থাকিবে তাহা বিদেশে খাটাইয়া সুদ পাইবেন। দুই দেশে সুদের হার যদি সমান হয় তবে তাঁহাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এবং বিদেশে সুদের হার বেশী হইলে তাঁহাদের বরং লাভই হইবে। কিন্তু এরূপ পরিস্থিতে বিদেশে সুদের হার বেশী না হইবারই কথা। কারণ বিদেশে সুদের হার বেশী হইলে দেশীয় কুসীদজীবীরা তাহাদের মূলধন বিদেশে অপসারিত করেন। ফলে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রার চাহিদার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রার যোগান বাড়িয়া যায়। ফলে যে কারণে দেশীয় মুদ্রার ঘাটতি এবং বৈদেশিক মুদ্রার উদ্বৃত্তি দেখা দিয়েছিল তাহার বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। আবার বিদেশে সুদের হার যদি কম হয় তাহা হইলে মুদ্রা ব্যবসায়ীদের ক্ষতি। এবং দেশে ও বিদেশে সুদের হার সমান হইলেও একটা সমস্যা থাকিয়াই যায়। তাহা এই যে বিদেশে যে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল জমিতেছে তথা সুদসহ বাড়িতেছে আর এদেশে যে ঋণ জমিতেছে এবং সুদসহ বাড়িতেছে চলতি বিনিময় হারে ইহাদের পরিমাণ এক হইলেও বিদেশের উদ্বৃত্তটা দেশের ঘাটতি মিটাইবার জন্য এদেশে আসিবে কি করিয়া? সুদূর ভবিষ্যতে যদি অবস্থা বিপরীতমুখী হয় অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা অপেক্ষা যোগান (দেশীয় মুদ্রার বিনিময় বৈদেশিক মুদ্রার যোগান অপেক্ষা চাহিদা) বেশী হয় তবে আবার সব ঠিক হইবে। কিন্তু তাহা যদি না হয়? কাজেই এই অবস্থায় আশু এবং অবশ্যম্ভাবী ফল হইল এই যে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রার মূল্য বাড়িবে (অথবা দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য কমিবে)। অর্থাৎ যে বিনিময় হারে লেনদেন চলিতেছিল তাহার পরিবর্তন হইবে। দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে পূর্বাপেক্ষা বেশী বিদেশী মুদ্রা এবং বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে পূর্বাপেক্ষা কম দেশীয় মুদ্রা মিলিবে।

এখানে মনে রাখা দরকার যে এমনিতেই সর্বাবস্থায়ই বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কারীরা কোন একটি দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে অপর দেশীয় মুদ্রা, অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা, কিনিবার সময় একটু কম দাম দেন এবং বেচিবার সময় একটু বেশী দাম আদায় করেন। এই ফারাকটা তাঁহাদের মুনাফা, পারিশ্রমিক এবং মুদ্রা বিনিময় অথবা মুদ্রা প্রেরণের ব্যয়। পণ্যদ্রব্যের কারবারীরাও কমদামে কিনিয়া বেশী দামে বিক্রী করেন, সব ব্যবসাবাণিজ্যেরই এই দস্তুর। তবে এক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়কারীরা ত হাতে হাতে 'মাল' ডেলিভারী (delivery) দেন না, দিলেও ক্রেতার দিক দিয়া কোন ফায়দা নাই। কারণ ক্রেতা এ মুদ্রা কেনেন বিদেশে পাঠাইবার জন্য অথবা ব্যবহারের জন্য। হাতে হাতে বিদেশী মুদ্রা পাইলেও স্বদেশে তাহা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। কাজেই এক্ষেত্রে বিদেশী মুদ্রার দেশীয় ক্রেতা অর্থাৎ প্রেরক দেশীয় বিনিময় ব্যাঙ্কে দেশীয় মুদ্রা জমা দেন আর বিদেশী প্রাপক বিনিময় ব্যাঙ্কের বিদেশস্থ শাখা অথবা প্রতিভূ (agent) এর নিকট হইতে বিদেশী মুদ্রা প্রাপ্ত হন। অতএব এক্ষেত্রে অর্থ প্রেরণ অথবা মুদ্রা বিনিময় কার্য্যতঃ একটা বার্ত্তা বিনিময়। ডাক অথবা তারযোগে (telegraphic transfer) সংবাদ পরিবহণের ব্যয়ও ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মনে করা যাক আমেরিকার ডলারের সহিত ভারতীয় টাকার প্রকৃত বিনিময় হার ১০০ টাকা = ১৩ ডলার ৩০ সেন্ট। কিন্তু ভারত হইতে আমেরিকায় অথবা আমেরিকা হইতে ভারতে টাকা পাঠাইতে হইলে মুদ্রা-বিনিময়-ব্যাঙ্ক খরচ আদায় করেন

প্রতি ১০০ টাকায় ১০ সেণ্ট। ফলে ভারত হইতে আমেরিকায় টাকা পাঠাইলে প্রতি ১০০ টাকার বিনিময়ে পাওয়া যাইবে ১৩ ডলার ২০ সেণ্ট এবং আমেরিকা হইতে ভারতে টাকা পাঠাইতে হইলে প্রতি ১০০ টাকার জন্য দিতে হইবে ১৩ ডলার ৪০ সেণ্ট। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ১০০ টি ভারতীয় মুদ্রা ক্রয় করিলেন ১৩ ডলার ২০ সেণ্ট দিয়া কিন্তু বিক্রয় করিলেন ১৩ ডলার ৪০ সেণ্ট লইয়া।

এইরূপ একটা বিনিময় হারে লেনদেন সুরু করিয়া আমাদের পূর্বোক্ত উদাহরণ অনুযায়ী যদি দেখা যায় যে ডলারের বিনিময়ে ভারতীয় মুদ্রার যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী হওয়ার দরুণ একদিকে ভারতীয় মুদ্রার ঘাটতি বাড়িতেছে আর অপরদিকে মার্কিনী মুদ্রার উদ্বৃত্ত বাড়িতেছে (ইহা বর্তমানে অলীক কল্পনা মাত্র) তাহা হইলে ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয় মুদ্রার মূল্য বাড়াইয়া দিবেন। ১০০ টাকার মূল্য যদি ১০ সেণ্ট বাড়িয়া যায় তাহা হইলে নূতন বিনিময় হার হইবে ১০০ টাকা=১৩ ডলার ৪০ সেণ্ট। এবং তাঁহারা ক্রয় করিবেন ১৩ ডলার ৩০ সেণ্টএ, আর বিক্রয় করিবেন ১৩ ডলার ৫০ সেণ্ট এ।

কিন্তু বিভিন্ন দেশের মুদ্রা যদি স্বর্ণ ভিত্তিক হয় তাহা হইলে বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির বিদেশস্থ তহবিলের উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে তথাকার সরকারের নিকট হইতে তাহাদের নির্দিষ্ট হারে সোনা কিনিয়া সেই সোনা দেশে আনিয়া দেশীয় সরকারের নিকট হইতে তাঁহাদের নির্দিষ্ট হারে দেশীয় মুদ্রা লইয়া দেশীয় মুদ্রার তহবিলের ঘাটতি পূরণ করিতে কোন বাধা নাই। প্রশ্ন শুধু সোনা বিদেশ হইতে দেশে আনার খরচের। মনে করা যাক ভারতীয় টাকা এবং মার্কিনী ডলার উভয়ই স্বর্ণভিত্তিক। এই অবস্থায় উভয় সরকার তাঁহাদের প্রচলিত স্ব স্ব কাগজী মুদ্রার সহিত স্বর্ণের একটা নির্দিষ্ট বিনিময় হার বাঁধিয়া রাখিবেন এবং ঐ হারে স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবেন। উপরন্তু উভয় দেশের মধ্যে স্বর্ণ আমদানী রপ্তানীতে কোনরূপ বিধিনিষেধ থাকিবে না। মনে করা যাক উভয় মুদ্রার সহিত স্বর্ণের বিনিময় হার এইরূপ যে ভারতীয় কাগজী মুদ্রার ১০০ টাকায় ভারত সরকারের নিকট হইতে যে পরিমাণ সোনা মিলিবে মার্কিনী ডলারের ১৩ ডলার ৩০ সেণ্ট-এও মার্কিন সরকারের নিকট হইতে সেই পরিমাণই মিলিবে। এই অবস্থায় ভারতীয় টাকা এবং মার্কিনী ডলারের স্বর্ণভিত্তিক বিনিময় হার(Gold par of Exchange) হইবে ভারতীয় ১০০ টাকা=মার্কিনী ১৩ ডলার ৩০ সেণ্ট। ইহাকে টাঁকশালা নির্দিষ্ট বিনিময় হার অথবা Mint par of Exchangeও বলা হয় এই কারণে যে একসময়ে প্রকৃত স্বর্ণ মুদ্রাই বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল এবং সরকার তাঁহাদের টাঁকশালে সোনা লইয়া গেলে তাহার বিনিময়ে সোনা দিতেন। অর্থাৎ লোকের চাহিদা অনুযায়ী সোনাকে টাকায় অথবা টাকাকে সোনায় পরিবর্তিত করিয়া দিতেন। এইরূপ "প্রকৃত স্বর্ণ মুদ্রা" ব্যবস্থাকে Gold Specie Standard আখ্যা দেওয়া হয়। তারপর ক্রমে যখন স্বর্ণ মুদ্রার পাশাপাশি কাগজী মুদ্রার প্রচলন হইল, তখন সরকার অথবা তাঁহাদের প্রতিভূ স্বরূপ সরকারী খাজাঞ্চী কিম্বা টঙ্কপতি সেই কাগজীমুদ্রার উপর এক সাক্ষরিত অঙ্গীকার মুদ্রিত করিয়া দিতেন যে দাবী করিবামাত্র কাগজী মুদ্রার বাহককে সেই মুদ্রার মূল্য অনুযায়ী স্বর্ণমুদ্রা দিতে বাধ্য থাকিবেন (I promise to pay the bearer the sum of...Rupees)। সেই প্রতিশ্রুতি কাগজী মুদ্রাগুলি আজও বহন করিয়া আসিতেছে, যদিও সম্পূর্ণ অর্থহীন ভাবেই। ক্রমে প্রকৃত স্বর্ণমুদ্রা অন্তর্হিত হইল অথবা কমিয়া আসিল। তবে সরকার কাগজী মুদ্রার বিনিময়ে একটা নির্দিষ্ট হারে সোনার তাল বা পিণ্ড ক্রয়বিক্রয় করিতেন,বৈদেশিক লেনদেনে আমাদের উপরে আলোচিত অবস্থার মোকাবিলা করিবার জন্য। ইহাকে আখ্যা দেওয়া হয় স্বর্ণপিণ্ড অথবা স্বর্ণধাতু ভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা (Gold Bullion Standard)। বৃটিশ শাসিত ভারতে সরকার আবার ভারতীয় মুদ্রার

বিনিময়ে স্বর্ণপিণ্ড না দিয়া বিলাতি মুদ্রা অর্থাৎ পাউণ্ড ষ্টার্লিং দিতেন, যাহার বিনিময়ে তথাকার সরকারের নিকট স্বর্ণের বাট বা Bullion পাওয়া যাইত। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রাকে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে একটা নির্দিষ্ট হারে বিলাতি মুদ্রার সহিত বিনিময়ের সুযোগ দিতেন। ফলে এই মুদ্রা ব্যবহারকে আখ্যা দেওয়া হয় "স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় প্রথা" (Gold Exchange Standard)।

যাহাই হোক মনে করা যাক আমাদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী ভারতীয় এবং মার্কিনী মুদ্রার স্বর্ণভিত্তিক বিনিময় হার (goldpar অথবা mint parfo Exchange) ১০০টাকা = ১৩ ডলার ৩০সেন্ট। এবং এইহারে লেনদেন সুরু করিয়া দেখা গেল যে মার্কিনী মুদ্রার হিসাবে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য বাড়িয়া হইল ১৩ ডলার ৪০ সেন্ট। এক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি যে বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি ১০০টা ভারতীয় মুদ্রা কিনিবেন ২০ সেন্ট কম দিয়া আর বেচিবেন ১০ সেন্ট বেশী দিয়া। তবে এই বিষয়টি আপাততঃ ভুলিয়া গিয়া এই কথা মনে রাখিলেই চলিবে যে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য স্বর্ণভিত্তিক বিনিময় হার অপেক্ষা ১০ সেন্ট বাড়িয়া গেল। এখন যদি দেখা যায় যে আমেরিকা হইতে ভারতে স্বর্ণ আমদানীর ব্যয় প্রতি ১০০ টাকায় ১০ সেন্ট-এর বেশী পড়ে না তাহা হইলে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য এর বেশী বাড়িবে না কারণ যদি আরও বাড়ে তাহা হইলে বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি তাঁহাদের মার্কিনস্থ তহবিলের উদ্বৃত্ত ডলারের বিনিময়ে সেখানে স্বর্ণ কিনিয়া ভারতে পাঠাইয়া অর্থাৎ আনিয়া ভারতীয় মুদ্রায় পরিণত করিয়া লাভবান হইবেন। বিভিন্ন বিনিময় ব্যাঙ্কএর মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে। কাজেই কোন ব্যাঙ্ক যদি ভারতীয় মুদ্রার দাম আরও বাড়াইয়া দেন আর সেই হারেই ক্রয় বিক্রয় চালিতে থাকে, তবে সব ব্যাঙ্কই তখন মার্কিন মুলুক হইতে স্বর্ণ আমদানী সুরু করিবেন এবং ফলে দাম আর বাড়িতে পারিবে না।

অপর পক্ষে স্বর্ণভিত্তিক বিনিময় হারে যদি ডলারের বিনিময়ে টাকার চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী হয় তাহা হইলে বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির ভারতীয় তহবিলে টাকা জমিতে থাকিবে, অন্যদিকে তাঁহাদের মার্কিনী তহবিলে ক্রমাগত ডলারের ঘাটতি বাড়িতে থাকিবে। ফলে ভারতীয়১০০টা মুদ্রার দাম ১০সেন্ট কমিয়া নতুন বিনিময় হার দাঁড়াইবে ১০০টাকা = ১৩ ডলার ২০সেন্ট। কিন্তু তারপর আর কমিবে না কারণ ভারত হইতে মার্কিন মুলুকে স্বর্ণ রপ্তানী সুরু হইবে।

অতএব দেখা গেল যে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা স্বর্ণ-ভিত্তিক হইলে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোনও দেশের দেশীয় মুদ্রার মূল্য স্বর্ণভিত্তিক বিনিময় হারের দুইপাশে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে উঠানামা করিতে পারে মাত্র। স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থায় কোন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্যের উঠানামার এই যে দুই সীমারেখা তাহাকে ইংরাজীতে বলা হয় Gold points অথবা Specie points, বাংলায় তর্জমা করা হয় "স্বর্ণবিন্দু" (হয়) তবে আমরা বলিব "স্বর্ণ-সীমা রেখা" অথবা "সুবর্ণ সীমা রেখা"। বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে দেশীয় মুদ্রার সম্ভাব্য উচ্চতম মূল্যকে বলা হয় Upper specie point অথবা "উচ্চতম স্বর্ণ-সীমা রেখা" এবং সম্ভাব্য নিম্নতম মূল্যকে বলা হয় Lower specie point অথবা "নিম্নতম স্বর্ণ-সীমা রেখা"। উচ্চতম স্বর্ণ-সীমা রেখাকে আবার বলা হয় Gold Import Point এবং বাংলায় তর্জমা করা হয় "স্বর্ণ আগম বিন্দু" তবে আমরা বলিব "স্বর্ণাগম বিনিময় সীমা"। অপর পক্ষে নিম্নতম স্বর্ণ-সীমা রেখাকে বলা হয় Gold Export Point এবং বাংলায় তর্জমা করা হয় "স্বর্ণ নিগম বিন্দু" কিন্তু আমরা বলিব "স্বর্ণনিগম বিনিময় সীমা"। বলা বাহুল্য বিনিময় হারের এই উঠানামার সহিত স্বর্ণের আগম (আমদানী) এবং নিগম (রপ্তানী) ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবে দেশীয় মুদ্রার মূল্য সম্ভাব্য উচ্চতম সীমায় পৌঁছিলেই বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী হইবে সম্ভাব্য নিম্নতম সীমায় পৌঁছিলেই দেশ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী হইবে।

বর্ত্তমানে পৃথিবীর কুত্রাপি যথার্থ স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রা ব্যবস্থা নাই। এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। অতএব ইহার খোলা বাজার অর্থাৎ Foreign Exchange Market নাই। তবে অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে যেরূপ সচরাচর হয় তাহা নিশ্চয়ই আছে অর্থাৎ কালোবাজার আছে। যাই হোক বিভিন্ন দেশে স্বর্ণ-ভিত্তি-বিবর্জ্জিত মুদ্রা ব্যবস্থায় যদি মুদ্রা বিনিময়ের খোলা বাজার অর্থাৎ Foreign Exchange Market থাকে তাহা হইলে বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় হার কিরূপে স্থির (অথবা অস্থির) হইতে পারে তাহা আমরা উপরের আলোচনা অনুসরণ করিলেই সিদ্ধান্ত করিতে পারিব। যেমন কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিনিময় হারে (যথা চলিত বিনিময় হারে) লেনদেন শুরু করিয়া যদি দেখা যায় যে বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রার যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী তাহা হইলে দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য বাড়িতে থাকিবে। অপর পক্ষে যদি দেখা যায় যে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রার চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী তাহা হইলে দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য কমিতে থাকিবে। কিন্তু স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থায় যেমন দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য হ্রাসবৃদ্ধির একটা সীমা আছে এক্ষেত্রে তাহা থাকিবে না। বিশেষতঃ এই কারণে যে এক দেশের উদ্বৃত্ত মুদ্রা তহবিলের মুদ্রাকে অপর দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া তথাকার ঘাটতি তহবিল পূর্ণ করা যাইবে না। এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন দেশীয় রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রথমতঃ দেশীয় মুদ্রার একটা নির্দ্দিষ্ট বৈদেশিক বিনিময় হার বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দেশীয় সরকার অথবা তাঁহাদের প্রতিভূ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (যেমন ভারতের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক) কিম্বা ইহার কোন ভারপ্রাপ্ত সংস্থা (Authorised dealer) ছাড়া আর কেহ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিবে না। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুমোদন ব্যতিত বিদেশে অর্থপ্রেরণ চলিবে না অর্থাৎ লোকে দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা পাইবে না। যতদূর মনে হয় বিদেশ হইতে স্বদেশে অর্থের আগমন অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রাকে দেশীয় মুদ্রায় রূপান্তর করণে দেশীয় সরকারের বিশেষ আপত্তি থাকে না। কারণ প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলে যদি যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা জমা না থাকে তবে তাহা তৈরী করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলে বৈদেশিক অর্থ জমা পড়িবে এবং তার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেশীয় মুদ্রা দিতে হইবে। কিন্তু দেশীয় মুদ্রায় ঘাটতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ইহা কাগজের (অবশ্য দামী কাগজের) উপর একটা মুদ্রাযন্ত্রের ছাপ দেওয়ার প্রশ্নমাত্র। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই এই ছাপাখানার কাজ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের গভর্ণরের স্বাক্ষরিত সেই কৌতুকাবহ প্রতিশ্রুতিটাও সেই মুদ্রণে থাকে।

এইরূপ স্বর্ণ-ভিত্তি-হীন নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ব্যবস্থায় মাঝে মাঝে সহসা (এই সব কাজ অতর্কিতেই সম্পাদ্য) কি কারণে সরকার দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়নে অর্থাৎ বৈদেশিক মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, অথবা উৎসাহিত হন, আর তাহার সম্ভাব্য ফলাফলই বা কি, তাহা ক্রমে আলোচ্য।

রাখাল ও রাজকুমারী

বিমলজ্যোতি দাস

(এক)

চিন্তিত হবারই কথা। ভয়াবহ বেকার সমস্যা সঙ্কুল এই যুগে চাকরি পাওয়া মকর-সঙ্কুল সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে তীরে পৌঁছন অপেক্ষা কম কথা নয়। কিন্তু সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিতে এত জায়গা থাকতে পোষ্টিং হল কি না সেই ঢাকায়—পদ্মার পারে! যে পদ্মা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব্ববঙ্গকে দিন থেকে রাত্রির মত পৃথক করে রেখেছে, তার পরপারে গিয়ে বাস করার কল্পনাও খাঁটি পশ্চিমবঙ্গীয়দের পক্ষে ভীতিকর!

সুতরাং নিয়োগ-পত্র পেয়ে গোকুল যে অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খাবে এ আর আশ্চর্য কি? তার শ্বশুরকুলের যে আত্মীয়ের সহায়তায় এই চাকরী যোগাড় হয়েছে, ছুটে গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হল। কিন্তু লাভ হল না কিছু। যদিও এই প্রতিষ্ঠানটি খুব বড় এবং কলকাতা ঢাকা, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি বহু স্থানে এঁদের অফিস আছে, তথাপি যে পদে গোকুলকে নিয়োগ করা হল তা আপাততঃ ঢাকার অফিসেই খালি আছে। সুতরাং যদি গোকুলের চাকরি নেবার ইচ্ছে থাকে তবে ওখানেই যেতে হবে। নিরুপায় গোকুল আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিস্তর পরামর্শ করে অবশেষে যাওয়াই স্থির করল।

এই ত গেল গোকুলের নিজের কথা। তার তরুণী স্ত্রী অরুন্ধতী এই সংবাদ শুনে মূর্ছা গিয়েছিল কি না আমাদের ঠিক জানা নেই, গিয়ে থাকলেও তাকে আমরা বিশেষ দোষ দিতে পারি না। কিন্তু গোকুলের শাশুড়ী ঠাকরুন গালে হাত দিয়ে চোখ বড় বড় করে বললেন—ওমা, এত জায়গা থাকতে কি না সেই ধাধ্ধাড়া গোবিন্দপুরে—ঢাকায়! মুখপোড়া মিন্সেদের আক্কেল দেখ দেখি, রাজ্যি আর কি জায়গা খুঁজে পেলিনি ব্যাটারা? তা হ্যাঁ গা, কি হবে?—বলে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাইলেন।

গোকুলের শ্বশুর সুরেনবাবু নির্ঝঞ্ঝাট ভালমানুষ প্রকৃতির লোক। একটু গম্ভীরও বটেন। পত্নীর উদ্বেগে বিশেষ বিচলিত না হয়ে বললেন—কি আর হবে? যাবে।

সেই লঙ্কায়-বল কি তুমি! —বাসন্তীদেবী পুনরায় গালে হাত দিলেন।

সুরেনবাবু বললেন—তা কি করবে বল? আজ কালকার বাজারে চাকরি পাওয়া কত শক্ত তা ত দেখছ। তবু অবিনাশবাবু অনেক চেষ্টা করে এটা জুটিয়ে দিলেন তাই রক্ষে। প্রথমেই একশো টাকা মাইনে কি সোজা নাকি? তা ছাড়া, বড় কোম্পানী, গোকুলও লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান ছেলে, ভালভাবে কাজ করে গেলে মাইনে চার পাঁচ শো টাকা পর্য্যন্ত উঠতে পারবে।

জামাতার ভবিষ্যৎ উন্নতির উজ্জ্বল চিত্র মানসনেত্রে দেখে বাসন্তীদেবী কথঞ্চিৎ শান্ত হলেন। দ্বিধাভরে বললেন—জানিনে বাপু! যা ভাল বোঝ কর তোমরা। টুনি আমার ঐ এক ফোঁটা মেয়ে, অতদূর নির্বান্ধব পুরীতে ছেলেপিলে নিয়ে কি করে থাকবে তাই ভাবছি। আচ্ছা, অবিনাশদাকে বলে করে কাজটা কলকাতায় করিয়ে দেওয়া যায় না?

সুরেনবাবু বললেন—গোকুল ত সে চেষ্টা করে দেখেছে। কিছু হবে না। সুতরাং আমি আর অবিনাশ বাবুকে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।

অতএব যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল। স্থির হল, আপাততঃ টুনি অর্থাৎ অরুন্ধতী সঙ্গে যাবে না গোকুল তার কনিষ্ঠ গোপালকে নিয়ে যাত্রা করবে।

তারপর সেখানে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাড়ি, ঝি, চাকর প্রভৃতি বন্দোবস্ত করে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে এসে নিয়ে যাবে।

দুই

ইতিপূর্বে গোকুল বার দুই তিন পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে পদ্মার পরপারে, যাত্রা এই প্রথম। পাঁজিতে ভাল দিন দেখে গোপাল ও গোকুল রওনা হল। এতদিন গোকুল কলকাতার আশপাশের অধিবাসীদের মধ্যেই জীবন যাপন করেছে, এইবার বাংলার অভ্যন্তরের ঘনছায়া-সুনিবিড় খাঁটি পল্লী-জীবনের আসল রূপটি তার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হবে। পূর্ববঙ্গের আকাশ বাতাস, গ্রাম গ্রামান্তর, নদীতীর নিকুঞ্জবন তাই বুঝি তাকে বহুদূর থেকে আহ্বান করেছে। ঢাকামেলের আরোহী-পরিপূর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় কল-কোলাহলের মধ্যে বসেও গোকুল সেই ধ্বনি তার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে শুনতে লাগল। নীরব ভাষায় মৃদু, অতি মৃদুস্বরে তালে তালে কে যেন ডাকছে—আয় আয় আয়! গোকুলের বুকের ভিতর থেকে তেমনি শব্দহীন মৃদুস্বরে প্রত্যুত্তর আসছে—যাই যাই যাই!

রাত্রির ঘনান্ধকার ভেদ করে তীব্রগতি অতিকায় লৌহ সরিসৃপ অগ্রসর হতে লাগল। গোকুলের চোখের সামনে তার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার মুখ ভাসতে লাগল; আহা, ওরা সঙ্গে থাকলে কত আনন্দ হত। দেখতে দেখতে পোড়াদহ স্টেশন এসে পড়ল। প্রকাণ্ড প্ল্যাটফর্ম জুড়ে যেন মেলা বসে গেছে। দুই ভাই জানলায় চক্ষু রেখে সেই আবর্তিত জন-সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল। কত রকমারি জিনিষের ফেরিওয়ালা যে প্লাটফর্মে ঘুরছে তার ইয়ত্তা নেই। সকলেই গাড়ীর আন্তোপান্ত ঘুরে ঘুরে তারস্বরে নিজেদের পণ্যদ্রব্যের মহিমা কীর্তন করছে এদের মধ্যে দুটো লোকের কথার বৈশিষ্ট্যে গোকু মনে মনে হাসল। একজন সন্দেশ বিক্রেতা মাথার উপর শালপাতা ঢাকা একটি ঝুড়ি নিয়ে হাঁকছে—বাড়ির তৈরি খুব ভাল সন্দেশ আছে বাবু, দু পোয়সা, চার পোয়সা দু পোয়সা, চার পোয়সা! আর একজন বাঁ হাতে বড় এক বাণ্ডিল-পকেট পঞ্জিকা ধরে তারই একখানা ডানহাতে নিয়ে মাথার ওপর আন্দোলিত করে ডাকছে—নতুন সালের পকেটে পাঁজি এ্যাক এ্যাক পয়সা, এ্যাক-এ্যাক পয়সা! সন্দেশওয়ালার কথা শুনে গোকুল কৌতুক বোধ করে গোপালের মুখের দিকে চাইতে সে ফিক্ করে হেসে ফেলল। গোকুল জিজ্ঞাসা করল—সন্দেশ কিনব, খাবি? গোপাল উত্তর দিল—ধ্যেৎ! গোকুল বলল তবে আয়, বাড়ীর খাবারগুলো এইবার খাওয়া যাক। দুইভাই বাড়ি থেকে আনা খাদ্যের কিছু অংশ খেল, এবং অবশিষ্ট ভোরের জন্য রেখে দিল। এখন ফাল্গুন মাস, বিকেলের ভাজা লুচি ও মিষ্টান্ন ভোরবেলা অনায়াসে খাওয়া যাবে, খারাপ হবে না। খাওয়া শেষ হতেই ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে পোড়াদহ পরিত্যাগ করল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হতে লাগল এবং যাত্রীদের বিচিত্র কল-কাকলি মন্দীভূত হয়ে এল। গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি হয়ে বসলেও নিদ্রাদেবী আপন স্নেহস্পর্শ থেকে এদের একেবারে বঞ্চিত করলেন না! গোকুল এবং গোপালের চক্ষুও মাঝে মাঝে নিমীলিত হয়ে আসতে লাগল, অবশ্য তা অল্পক্ষণের জন্যেই, কারণ অস্বস্তিকর অবস্থায় একটানা ঘুম সম্ভবপর নয়।

ওরই মধ্যে একবার গোকুল এক টুকরো স্বপ্নও দেখে নিল। যেন ঢাকায় এসে পৌঁছেছে। স্টেশনে বিস্তর লোক গোকুলকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ওরা নামতেই জনতা বিপুল উল্লাসে হর্ষধ্বনি করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গোকুলের ঘুম ভেঙে গেল এবং সে চকিতে চারিদিকে চেয়ে দেখল। কোথায় ঢাকা! ট্রেনের মধ্যেই ত বসে আছে। একটু তফাতে একজন স্ত্রীলোকের কোলে একটি বছর খানেকের শিশু তারস্বরে চীৎকার করে কাঁদছে এবং বুকের কাপড় ধরে টানছে। এরই ক্রন্দনশব্দে গোকুলের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। ছেলেটি স্তন্যপান করতে চায়। কিন্তু তার মা কাপড় আঁকড়ে

ধরে রেখেছে, বোধকরি এতগুলি লোকের সামনে বক্ষাবরণ উন্মোচন করতে অনিচ্ছুক। মুখে শিশুকে বলছে অহন্ না, অহন্ ওযা! কিন্তু শিশুটি স্তন্যের পরিবর্তে মাতার বচন-সুধায় তৃপ্ত থাকতে অসম্মত। শেষে তার বাবা তাকে কোলে নিয়ে বিস্কুট দিয়ে অতি কষ্টে শান্ত করল।

গোকুল স্বপ্নরতার ভাবতে লাগল। স্বপ্নে দেখল, বহু লোক তাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে। তা কেমন করে সম্ভব? সে ত অফিসে শুধু এই কথাই জানিয়েছে যে শীঘ্র আসছে, কবে তা ত জানায় নি। তবে কি তার মনে ইচ্ছা, অফিস থেকে লোক এসে তাকে সম্বর্ধনা করে নিয়ে যাক! আশ্চর্য মানুষের মন! কোনও কিছু অসম্ভব বুঝেও তার চিন্তার বিলাসটুকু ছাড়তে পারে না। গোকুল আপন মনেই হাসল।

রাত্রি প্রায় তিনটার কাছাকাছি ট্রেন গোয়ালন্দ পৌঁছল। এইবার নামবার তাড়া। যে যত শীঘ্র নামতে পারবে এবং নদীবক্ষে অপেক্ষমান স্টীমারে গিয়ে উঠতে পারবে তার পক্ষে ডেকে জায়গা পাওয়া তত সহজ হবে। এখানে প্লাটফর্ম নেই, বালির উপর লাইন আলগা ভাবে পাতা। সেইজন্য কিছু দূর থেকে গাড়ি অতি ধীরে এসেছে। পদ্মার প্রবল স্রোতের উচ্ছ্বাসে তটভূমি প্লাবিত হয়ে যায় বলে এখানে স্থায়ী স্টেশন করা বা লাইন পাতা সম্ভব নয়। গোকুলদের মালপত্র তত বেশি ছিল না বলে তাদের ট্রেন থেকে নামতে খুব বিলম্ব হল না। নেমে দেখে, আধো-আলোর মধ্যে দীর্ঘ যাত্রীশ্রেণী ট্রেন থেকে ঘাটের দিকে চলেছে। যারা অপেক্ষাকৃত ঝাড়া হাত-পা, তারা একরকম ছুটেই স্টীমারের দিকে এগুচ্ছে। রাত্রি-শেষের দিগন্তবিস্তৃত প্রকৃতির অপরিসীম প্রশান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে এই মুষ্টিমেয় বিপদ প্রাণ কণিকাগুলির চঞ্চলতা হাস্যকর বলেই মনে হয়। দূরে প্রায়ান্ধকার আকাশের গায়ে স্টীমারের চোঙা দুটি যেন দুইটি উত্তোলিত অঙ্গুলির মত নীলাম্বরকে কি ইঙ্গিত করছে। তা থেকে নির্গত ক্ষীণ ধূম্ররেখা ধীরে ধীরে উঠে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

স্টীমারের আয়তন দেখে গোকুল অবাক হল। এত বড় স্টীমার সে পূর্বে কখনও দেখে নি। গঙ্গার উপর কলকাতার নিকটবর্তী কয়েকস্থানে ফেরি স্টীমারে সে চেপেছে, এবং একবার চাঁদপাল ঘাট থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ঘাট পর্যন্ত স্টীমারে গিয়েছিল। কিন্তু সেগুলি এর তুলনায় শিশু। সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে দুই ভাই মালপত্র সমেত উপরের ডেকে উঠল। চারিদিকে যাত্রী গিস্‌গিস্ করছে। ইতিমধ্যে অনেকে ডেকের উপর বিছানা পেতে জাঁকিয়ে বসেছে। শূন্য স্থান পাওয়া দুষ্কর। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজি করে দুটি লোকের বিছানার মাঝখানে দেড়হাত খালি জায়গা আবিষ্কার করে গোকুল হাঁপ ছাড়ল। একদিকে উপবিষ্ট ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল—এখানে কারু জায়গা নেই ত। লোকটি বলল—না, বইস্যা পরেন। আপনারা কয়জন? গোকুল বলল দুজন। লোকটি বলল—তাইলে ঠিক আছে। তারাতারি বিছানা পাইত্যা লন। যাইবেন কৈ। গোকুল উত্তর দিল—ঢাকা। খুসি হয়ে লোকটি বলল—তাইলে বালই হইছে, আমরাও যামু।

লোকটির বাড়ি ঢাকা সহরেই। তার কাছে ওখানকার অনেক প্রাথমিক সংবাদ গোকুল সংগ্রহ করল। সেও গোকুলের পরিচয়াদি নিল, এবং একেবারে একশো টাকা মাইনের চাকরি যোগাড় করার তার কৃতিত্বের প্রশংসা করল। গুছিয়ে বসে গোকুল চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। ইতিমধ্যে সমস্ত ডেক পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের মিলিত চীৎকারে স্থানটি বাজারের মত মুখরিত হয়ে উঠেছে।

ভোর পাঁচটায় স্টীমার ছাড়বে। দেখতে দেখতে সময় হয়ে গেল। জাহাজের বাঁশি বাজল এবং খালাসীরা অবোধ্য ভাষায় কি একটা বলে চীৎকার করে উঠল। জেটি থেকে জাহাজে উঠবার গ্যাংওয়ে উঠিয়ে দেওয়া হল। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল এবং ভ্যাঁ—এ্যাঁ—এ্যাঁ—স্ করে আর-একবার মোটা চড়া গলায় বাঁশি বাজিয়ে ঘস্ ঘস্ করে ইঞ্জিন চলতে সুরু করল। সুবৃহৎ জলযান ধীরে ধীরে গতিশীল হল এবং ইঞ্জিনের গতিবেগে স্থির

থির করে কাঁপতে লাগল। তটভূমি ক্রমে ক্রমে সরে গেল, তারপর জাহাজ গন্তব্যপথের দিকে মুখ ঘুরিয়ে গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। তীরের গাছপালা ছবির মত দ্রুতগতিতে পিছনে সরে যেতে লাগল এবং দুই ধারের জল কেটে তরঙ্গমালা সৃষ্টি করে জাহাজ ছুটতে লাগল।

গোকুলরা দুই ভাই এবার উঠে জাহাজখানা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। উপরের ডেকের সামনের খানিকটা প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ডেক, তারপরের খানিকটা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন। তার পিছনে কতকটা ঘেরা জায়গায় মধ্যম শ্রেণীর আসন। পরে তৃতীয় শ্রেণীর বিস্তৃত ডেক। সব পিছনে জাহাজের টল বা খাবার, ফল প্রভৃতির দোকান। সেখানে চা, বিস্কুট ও নানা প্রকার আহার্যের সঙ্গে কাঁচকলার মত বড় বড় কলার কাঁদি রয়েছে। গোকুল জিজ্ঞাসা করে জানল, এগুলো মুন্সীগঞ্জের কলা। এগুলো দেখতে কাঁচা, কিন্তু ভেতরে পেকে গেছে। দুই ভাই দুটি কিনে খেল, অত্যন্ত মিষ্টি এবং সুস্বাদু। তাছাড়া এদের একটা সুবাস আছে। যা অন্য কোন জায়গার কলাতে নেই।

উপরতলা পরিক্রমা শেষ করে দুজনে নিচের ডেকে নামল। প্রথমেই ষ্টীমারের বিশাল ইঞ্জিন ও প্রকাণ্ড বয়লার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পাশাপাশি তিনটি সুবৃহৎ লৌহ পিষ্টন ভুস ভুস ভুস করে একের পর এক উঠে নেমে যাচ্ছে, আবার উঠছে। ইঞ্জিনের বহু কল-কব্জায় অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। দু-পাশে দুটি মস্ত চাকা জল কেটে জাহাজকে গতিশীল করে রেখেছে। চাকা দুটি কাঠের আবরণের মধ্যে ঢাকা, কিন্তু তার ছিদ্রে চোখ রাখলে তীব্রবেগে আলোড়িত জলরাশির চূর্ণগুলি ধোঁয়ার মত দেখা যায়। ওখান থেকে গোকুলরা নিচের ডেকের রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের পাশ থেকে উৎক্ষিপ্ত জলরাশির অজস্র শীকরকণা ফোয়ারার মত তাদের গায়ে এসে পড়তে লাগল। ফাল্গুনের ঈষৎ শীতল বাতাসে সেই স্নিগ্ধস্পর্শ যেন ভাসমান সন্তানদের অঙ্গে নদীমাতার স্নেহ-চুম্বনের মত মনে হতে লাগল। গোকুলরা অনেকক্ষণ সেখানে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে সেই স্পর্শসুখ অনুভব করল। দুদিকে চেয়ে দেখল, একদিকে তীর নিকটবর্তী বটে, কিন্তু অন্যদিকে বহুদূর। পদ্মা এত বিস্তৃত! এই খরস্রোতা দুরন্ত নদীর বহু বর্ণনা গোকুল পড়েছে, এর প্রলয়ঙ্করী কীর্তিকাহিনীও শুনেছে, কীর্তিনাশা বলে এর অপবাদের কথাও তার অজানা নয়। কিন্তু তথাপি নব-বসন্তানিল সংস্পর্শে ঈষদান্দোলিতা প্রশান্তা তরঙ্গিনীর রৌদ্রকরোজ্জ্বল ঊর্মিশিহরিত বক্ষের দিকে চেয়ে একে জননী ভিন্ন আর কিছু বলে মনে করতেই পারল না। অবশ্য মাঝে মাঝে ইনি যে রাক্ষসী হয়ে ওঠেন, তার জন্য কি আর করা যাবে? পৃথিবীতে জীবন ও মৃত্যু যে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে রয়েছে!

নিচের ডেকের বহু নর-নারী এরই মধ্যে তল্পীতল্পা গুছিয়ে অস্থায়ী সংসার পেতে বসেছে। মেয়েরা অনেকে পান সাজছে এবং হেসে হেসে গল্প করছে। একেবারে পিছন দিকে এক গাদা হাঁস-মুরগী বাঁশের চাঁচারির খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে চালান যাচ্ছে।

সব দেখে শুনে দুই ভাই উপরে উঠে এসে নিজেদের বিছানায় বসে প্রাতরাশ সমাপন করল। পাশের ভদ্রলোকটি ইতিমধ্যে আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। সাড়ে আটটা নাগাদ তার ঘুম ভাঙল। উঠে আড়ামোড়া দিয়ে বলল—এই যে আপনারা বইয়া আছেন, ঘুমান নাই? গোকুল বলল—না। লোকটি বলল—ঘুমাইয়া লন। অহনও বহুৎ সময় আছে। নারাণগঞ্জ যাইব বেলা একটায় সময়। তার উপদেশ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে দুই ভাই বেশ একচোট ঘুমিয়ে নিল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা বারোটা। জাহাজের দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করল। ডানদিকে সেই লোকটি নেই, বোধ হয় কোথাও গিয়েছে। বাঁদিকের লোকটি সম্ভবতঃ নেমে গেছে, তার পরিত্যক্ত স্থানে অত্যন্ত খাটো ময়লা কাপড় ও আধ-ময়লা ফতুয়া পরা একটি শীর্ণকায় পশ্চিমা ব্যক্তি লোটা ও কম্বল নিয়ে বসে আছে। গোকুলকে জেগে উঠতে দেখে প্রশ্ন করল—জাহাজে জল কি পাওয়া যায়। গোকুল

টলের কলার কাঁদি দেখিয়ে দিয়ে বলল—ঐ কলা আছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, খেতে কেমন এবং দাম কত। গোকুল জবাব দিল, খেতে সুস্বাদু এবং দাম তিন পয়সা। লোকটি ছুটে গিয়ে একটা কলা কিনে নিয়ে এল এবং উবু হয়ে বসে ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করল। বোধ করি তিন পয়সা উসুল করে নিল। তারপর লোটা থেকে আলগোছে খানিকটা জল খেয়ে মুখ মুছল। তার মুখে একটি পরম পারতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠতে দেখে গোকুল জিজ্ঞাসা করল, কলা খেতে কেমন? উত্তরে লোকটি মাথা নেড়ে বলল—একদম চিনি। যাক, বাঁচা গেল! গোকুলের পরামর্শ মত কাজ করে তার তিনটি পয়সা যে জলে পড়েনি এই রক্ষা! গোকুল তার পরিচয় নিয়ে জানাল, তার বাড়ী মুঙ্গের; এই প্রথম সে বাংলা মুলুকে আসছে; তার এক ব্যবসায়ী আত্মীয় নারাণগঞ্জে অসুস্থ হওয়ায় তাকে দেখতে এসেছে এবং দেখা করেই আবার মুঙ্গেরে ফিরে যাবে।

সাড়ে বারোটা বাজল। দীর্ঘ নদীপথ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের রশ্মি নদীবক্ষে পড়ে তরঙ্গছন্দে অসংখ্য হীরকখণ্ডের মত ঝকমক করছে। এইবার ছুচার জন করে লোক মোটঘাট বেঁধে নিচে নেমে যাচ্ছে গোকুল লক্ষ্য করল। ভাবল, এত তাড়াতাড়ি কেন? এখনও ত পুরো আধঘন্টা দেরি আছে। এমন সময় ডানদিকের বিছানার মালিক সেই লোকটি কতকটা ব্যস্ত সমস্ত ভাবে এসেই আরম্ভ করল—অখনও বইয়া আছেন যে! নিচে লামতে ওইব না? গোকুল বলল —এত তাড়াতাড়ি কিসের? এখনও ত আধঘন্টা দেরি আছে। লোকটি হাত ঘুরিয়ে জবাব দিল—তবে ওইছে! আধাগণ্টা এহানে বইয়া থাকলে লামতে পারবেন নাকি? আপনে নূতন মানুষ জানেন না। ষ্টীমার যখন বিরব (ভিড়বে) দেখবেন তখন কুলির ঠ্যালা! বাপরে বাপ্! সিরি (সিঁড়ি) বাইয়া লামতেই পারবেন না। হ্যাষে (শেষে) সব মানুষ লাইম্যা গেলে তার পর! লন্ লন্, মালপত্র গুটাইয়া লন্। বলেই নিজের সামান্য বিছানা ক্ষিপ্রহস্তে বেঁধে কাঁধে নিয়ে চলে গেল। তার উপদেশমত গোকুলরাও বিছানা বেঁধে ফেলল এবং অতিকষ্টে দুই ভাই ধরাধরি করে একে একে তিনটি বাক্স এবং দুটি বিছানার বাণ্ডিল নিচে নিয়ে গিয়ে একধারে গুছিয়ে রাখল। ইতিমধ্যেই ষ্টীমারের যেখানে গ্যাংওয়ে লাগবে সেখানে শতাধিক লোকের ভিড় জমে গেছে। লোকটি তাহলে মিছে কথা বলে নি। সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি দূরে পরপারে নিবদ্ধ। কেউ কেউ সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—ওই নারাণগঞ্জ দ্যাহা যায়।

দেখতে দেখতে নারায়ণগঞ্জ বন্দর এসে পড়ল। আবার জাহাজের ঘন্টা, খালাসীদের সেই দুর্ব্বোধ্য ভাষায় সাবধান-বাণী; কর্মব্যস্ততা, কোলাহল এবং ছুটাছুটি। ঘাটের জেটিতে প্রায় শতাবধি কুলি জমা হয়ে আছে। যেই গ্যাংওয়ে লাগিয়ে দেওয়া হল অমনি হৈ হৈ শব্দে তারা যাত্রীদের ঠেলে ধাক্কা দিয়ে হুড়মুড় করে ষ্টীমারে উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দুজন এসে গোকুলদের মালগুলো দেখে দর হাঁকল—দু'টাকা। অনেক কষাকষি করে শেষে দেড়টাকায় রফা হল। কুলি দুটির মাথায় মাল তুলে দিয়ে দুই ভাই দ্রুতপদে অপেক্ষমান ট্রেনের দিকে ধাবমান হল। সুখের বিষয় এবার ষ্টীমার থেকে ট্রেনের দূরত্ব গোয়ালন্দের মত অতটা নয়। মিটার গেজের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ট্রেনখানি দেখতে দেখতে পূর্ণ হয়ে উঠল। অল্পমালের কল্যাণে গোকুলরা তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠতে পারাতে বসবার জায়গা পেল। প্রায় আড়াইটের সময় ট্রেন ছাড়ল এবং সাড়ে তিনটার সময় ঢাকা ষ্টেশনে পৌছল।

দীর্ঘ ও বিচিত্র ইতিহাসশালিনী পূর্ব্ব বঙ্গের প্রধান সহর ঢাকায় গোকুলরা পদার্পণ করল। গোকুলের মনের ভিতরে নানা ভাবের উদয় হচ্ছিল। মাটিতে পা দিতেই কে যেন তার কানে কানে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল—এসেছ? সেও চুপি চুপি জবাব দিল—হ্যাঁ এসেছি।

(তিন)

মালপত্র নিয়ে ষ্টেশনের বাইরে আসতেই গোকুলরা একদল গাড়োয়ানের খপ্পরে পড়ল। বাবু, কৈ

যাইবেন? আমার গারিতে আসেন বাবু, নয়া গারি আছে,—ইত্যাদি প্রশ্ন ও আহ্বানে তারা কতকটা বিহ্বল হয়ে পড়ল। গাড়োয়ানরা কেউ বা কাছে এসে গন্তব্যস্থান জিজ্ঞাসা করল কেউ বা গাড়ির ছাদ থেকেই ডাকাডাকি করতে লাগল। যাই হোক, একজনকে গোকুল জিজ্ঞাসা করল—অমুক কোম্পানীর বাবুদের বাসায় যাব, কত নেবে? আসেন বাবু, দেড়ট্যাহা দিবেন। বলে একজন গাড়োয়ান মালবাহী কুলিকে ইঙ্গিত করল। গোকুল বলল না না, অত কেন? বারো আনা। তৎক্ষণাৎ সে প্রতিবাদ করল—কন কি বাবু? দূর আছে না? শেষে দর কষাকষি করে এক টাকা ভাড়া স্থির হল। স্টীমারের লোকটির কাছে গোকুল জেনে নিয়েছিল যে তার গন্তব্যস্থান ষ্টেশন থেকে বেশী দূর নয়। যাই হোক মোটঘাট গাড়িতে তুলে দুজনে উঠে বসল। গাড়োয়ান ঘোড়া দুটিকে চাবুক মেরে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল।

গোকুল রাস্তার দুধারে দেখতে দেখতে চলল। শহরটি প্রাচীন ও বাড়ীগুলি অধিকাংশই ছোট ও পুরাতন। কতকটা পশ্চিমবাংলার মফঃস্বল শহরের মত। মিনিট দশেক চলবার পর একটি নিচু দেওয়াল-ঘেরা কম্পাউণ্ডের মধ্যে গাড়ি প্রবেশ করল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করল—কুন্ বাসায় যাইবেন বাবু? গোকুল গাড়ি থামাতে বলে নেমে পড়ল। চারিদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট বাড়ি। তাদের মধ্যে দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ গিয়েছে। একটি বাড়ির রোয়াকে তিন চারজন প্রৌঢ় ব্যক্তি ছায়ায় বসে গল্প করছিল। গোকুলের স্মরণ হল আজ রবিবার। সম্ভবতঃ এরা ঐ কোম্পানীর কর্মচারী। গোকুল এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, এখানে একাউন্ট্যান্টের বাসা কোনটা বলতে পারেন? একজন উত্তর দিল—হ। আপনি কৈ থিক্যা আইছেন? গোকুল বলল—কলকাতা থেকে। আমি নতুন একাউণ্টেণ্ট। ও—বলে চারজনেই গোকুলের মুখের দিকে চাইল এবং হাত তুলে নমস্কার করল। যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল সে উঠে খড়ম পায়ে দিয়ে বলল, আসেন আমার লগে। বলে এগিয়ে চলল। গাড়োয়ানকে বলল—গাড়োয়ান, গাড়ি লইয়া আহ। একটু এগিয়ে গিয়ে একখানি বাড়ি দেখিয়ে বলল— এই বাসা; যান, ভিতরে লোক আছে। আমি আসি, পরে দেখা হইব। বলে চলে গেল।

ভিতরে প্রবেশ করে সুশীলের সঙ্গে গোকুলের পরিচয় হল। এরই জায়গায় গোকুল ভর্তি হয়েছে। সুশীলের সম্প্রতি স্ত্রী-বিয়োগ হওয়াতে ছ মাসের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছে। ছুটি শেষ হলে কলকাতার অফিসে জয়েন করবে, কারণ সেখানে একজন একাউন্টেন্ট ঐ সময় অবসর নেবে। সুশীলের বাড়ি যাওয়ার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, সম্ভবতঃ সপ্তাহখানেকের মধ্যে রওনা হতে পারবে। গোকুল ত পরিবার নিয়ে আসেনি, এই সাত দিন সুশীলকে সে বাসার একপাশে থাকতে অনুমতি দেবে কি? বেশি অসুবিধা হবে না ত? মাথা নেড়ে গোকুল বলল—না না, অসুবিধা কিসের? থাকুন না আপনি যতদিন দরকার। তবু ত দু'দণ্ড গল্প করবার লোক পাওয়া গেল। বাস্তবিক, গোকুল শীঘ্রই আবিষ্কার করল যে, সুশীল বেশ মজলিসী লোক; কি করে আসর জাঁকিয়ে গল্প ফাঁদতে হয় তা তার বিলক্ষণ জানা আছে। ফর্সা একহারা চেহারা, টিকোলো নাক, উজ্জ্বল চক্ষু দাড়ি কামানো, বড় বড় গোঁফ—সুশীলের নিজের ভাষায় দারোয়ানী গোঁফ। সাম্প্রতিক পত্নী-বিয়োগের শোক কিঞ্চিৎ মুহ্যমান করলেও তার অন্তরের হাস্যরসের উৎসটিকে সাময়িক ভাবেও শুকিয়ে ফেলতে পারে নি, তাই কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে কৌতুকরসের স্নিগ্ধধারা যখন তখন ফেটে বেরিয়ে পড়ে। গোকুলকে সে জিজ্ঞাসা করল—আপনার স্ত্রী সঙ্গে এলেন না কেন? এলে পরে বাঙালদেশের বিভীষিকা আপনাকে একা ভোগ করতে হত না! ভদ্রলোকের বাড়ি ফরিদপুর, কিন্তু শিক্ষা ও দীর্ঘকাল শহর বাসের ফলে ভাষা অনেকটা মার্জিত করে ফেলেছেন, যেমন অধিকাংশ শিক্ষিত চাকুরিয়ারা করে থাকেন। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে এই সব ব্যক্তির মুখ থেকে পূর্ববঙ্গের অপভ্রংশ ভাষা মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। তথাপি গ্রামের লোকেদের ভাষার সঙ্গে

এদের ভাষায় কিছু তফাৎ থাকে, যেমন, গ্রামের লোকেরা 'বসুন' অর্থে বলে 'বয়েন', এরা বলে 'বসেন' ইত্যাদি।

কম্পাউণ্ডের মধ্যে কর্মচারীদের জন্য একটি ক্লাব আছে। তাতে বাবুদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য তাস, ক্যারমবোর্ড, হুঁকো-কলকে, যার একটি ছোট আলমারিতে কয়েকখানি বই পর্যন্ত বিদ্যমান। সন্ধ্যার সময় অনেকেই এখানে সমবেত হয়। সুশীলের পরামর্শে হেডক্লার্ক প্রিয়নাথ বাবুর সঙ্গে পরিচয় করবার উদ্দেশ্যে গোকুল সন্ধ্যার প্রাকালে এখানে উপস্থিত হল। সুশীল গোকুলদের অভ্যর্থনা করেছিল বটে কিন্তু আহারাদির ব্যবস্থা করতে পারল না। বলল—আমার এমন ভাগ্য, আপনারা নূতন এলেন, আপনাদের একসাঁঝ খাওয়াতে পারলাম না। নিজে হাত পুড়িয়ে দু'বেলা দুটো ফুটিয়ে নি', সে অখাদ্য ত আর আপনাদের দিতে পারব না! সজনী বলে একটা চাকর আছে, বলে নাকি বাঁধতে ও জানে, কিন্তু ওর হাতে খাওয়া আমার চলবে না, কারণ একটা কচ্ছ ধারণ করেছি, তাতে ভিন্ন গোত্রের লোকের হাতের রান্না খাওয়া নিষেধ। গোকুল বলল—আমাদের খাওয়ার জন্য আপনি ভাববেন না, আমরা যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেবো। দুভাই মিলে স্থির করল আজ দোকান থেকে খাবার কিনে চালিয়ে দেবে, কাল থেকে যা হোক একটা বন্দোবস্ত করে নেওয়া যাবে। প্রাথমিক শিষ্টাচারের পর প্রিয়নাথবাবু ও ঐ কথা পাড়লেন—আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় খুসি হলাম। কিন্তু আমার বাসায় যে আপনাকে দুটো ডালভাত খেতে বলব সে উপায় নেই, গিন্নীর আজ তিন চার দিন জ্বর, কাজেই সংসার সব বিশৃঙ্খল। আর ছেলেপিলেও ত কম নয়, শোরের পাল! —বলে অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী করলেন। গোকুল তাড়াতাড়ি বলল—সে জন্য আপনি ভাববেন না। আমরা তার ব্যবস্থা করেছি। ভদ্রলোকের কথায় কিন্তু গোকুল অশ্চর্য হয়ে গেল। নিজের সন্তানদের—তা তাদের সংখ্যা যতই হোক না—কেউ যে প্রকাশ্যে শোরের পাল বলে বর্ণনা করতে পারে, এ তার ধারণার অতীত। প্রিয়নাথ বাবুকে অত্যন্ত বিরক্ত বলে মনে হল, কিন্তু এর কারণ কি? গোকুল পরের দিন সুশীলের কাছে শুনল, প্রিয়নাথ তাঁর তৃতীয় পক্ষের পরিবার এবং তিন পক্ষের তরফ থেকে পাওয়া বারোটি সন্ততি নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যতিব্যস্ত থাকেন। সুতরাং তাঁর মেজাজ প্রসন্ন থাকবে কেমন করে?

এরপর প্রিয়নাথের সঙ্গে কথা তেমন জমল না, তিনি আর তিনজনকে নিয়ে তাস খেলতে খেলতে ক্রমাগত হুঁকো টানতে লাগলেন। তাঁদের এই তাসের আড্ডাটি ক্লাবের প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। প্রিয়নাথ ও তাঁর কয়েকটি অনুগত কর্মচারী এই খেলার সাথী। যাই হোক, আর কয়েকজন ব্যক্তি গোকুলকে ঘিরে বসে হাল্কা ধরণের আলাপ আলোচনা চালাতে লাগল। তাদের মধ্যে বিপিন বলে একটি ছোকরা আসর জমিয়ে তুলল। তার বাড়ী চব্বিশ পরগণায়। বছর খানেক হল এখানে কেরাণী হয়ে ঢুকেছে। কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা করল—আপনারা ষ্টেশন থেকে কিসে এলেন? গোকুল বলল—ঘোড়ার গাড়িতে। —কত ভাড়া নিলে? এক টাকা, প্রথমে অবশ্য পাঁচসিকে চেয়েছিল।

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসল দেখে গোকুল জিজ্ঞাসা করল—কেন, ঠকিয়েছে?

বিপিন বলল—নিশ্চয়। ন্যায্য ভাড়া হল চার আনা।

—চার আনা!

—হাঁা। কিন্তু আপনাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমিও যখন প্রথম আসি তখন এক টাকা দু'আনা দিয়েছিলাম। কে জানে যে ব্যাটারা চার আনার জায়গায় পাঁচসিকে দেড় টাকা চেয়ে বসবে? এখানকার ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানরা অদ্ভুত জীব। ওদের সম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প আছে। একবার এক ভদ্রলোক নাকি গাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে অসম্ভব কমদর বলেছিলেন। তাতে গাড়োয়ান জবাব দেয়—আস্তে কন্ কর্তা, গোরায় শুনসে আসব', মানে', ঘোড়া শুনলে হাসবে! আর একবার এক উকিল নাকি আলপাকা কোট কিনবেন বলে একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে এ-দোকান সে দোকান ঘুরে কোট দর করতে লাগলেন।

ভদ্রলোক কালো মোটা মানুষ, গায়ে বড় বড় লোম, জামার ভিতর থেকেও পষ্ট বোঝা যায়। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পরও যখন কোন দোকানের কোট তাঁর পছন্দ হল না, তখন গাড়োয়ান বিরক্ত হয়ে বলল—আর কত গুয়াগুরি করবেন কর্তা? আলপাকা কুট ত আপনার গায়েই আছে, এরখান দুগায় বুলাইয়া লন! বুঝলেন গোকুলবাবু, এরা সোজাচিজ নয়! —সকলে হেসে উঠল।

আর কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে গোকুল ক্লাব থেকে বেরিয়েছে, পিছন পিছন বৃদ্ধগোছের একটি বাবু বেরিয়ে এসে বলল— একাউন্ট্যান্টবাবু, একটা কথা কমু, যদি কিছু মনে না করেন?

গোকুল বলল—না না, বলুন।

লোকটি বলল—আমার নাম বৃন্দাবন। আমি এখানকার একজন ক্লার্ক। আইজ রাত্রে আমার বাসায় দুগা ভাল খাত—বলে উৎসুকভাবে গোকুলের মুখের দিকে চাইল। বৃদ্ধের বিনয়ে গোকুল প্রীত হয়ে বলল —বেশ ত, খাব আপনার ওখানে।

খুসি হয়ে বৃন্দাবন বলল—আচ্ছা আচ্ছা। আপনে বাসায় থাকেন, একটু পরে আমি পোলারে (ছেলেকে) পাঠাইয়া আপনাগো ডাকাইয়া লমু।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ষোল সতের বছর বয়সের একটি ছেলে এসে গোকুলদের ডেকে নিয়ে গেল। উপকরণ খুব উঁচুদরের না হলেও বুড়া বুড়ীর আদর যত্নে গোকুল খুব সুখী হল। বৃন্দাবন-পত্নী বারংবার বলতে লাগলেন—আপনাগো শুধাশুধি কষ্ট দিলাম। মোগার যত্ন কিছুই করবার পারি নাই।

উত্তরে গোকুল বলল—যথেষ্ট করেছেন। পেট ভরে খেয়েছি আমরা। এরপর তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে দুই ভাই বাসায় এল এবং অবিলম্বে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। সারাদিনের পরিশ্রম এবং ভ্রমণের ক্লান্তিতে শীঘ্রই দুজনে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে পড়ল।

(চার)

পরদিন সকালে উঠে রাঁধাবাড়ার কি ব্যবস্থা করা যায় দুইভাই সেই বিষয়ে গবেষণা করতে বসল। গোকুল বলল—তোর বৌদিরা যতদিন না আসছে' ততদিন যা হয় একটা বন্দোবস্ত করে রাখি। তারপর ওরা এলে ওদের সঙ্গে পরামর্শ করে পাকাপাকি রকম ব্যবস্থা করা যাবে, কি বল?

গোপাল—হ্যাঁ দাদা, সেই ভাল।

তারপর সুশীলের ভৃত্য সজনীকে আহবান করা হল। গোকুল জিজ্ঞাসা করল—তোমার নাম কি?

লোকটি মৃদু হেসে ঘাড় নিচু করে জবাব দিল—আইগ্গা, সজনী।

—বা, বেশ। বাড়ি কোথায়?

—আইগ্গা, সাতার।

—এখানে থেকে কত দূর?

—প্রায় বিশ মাইল হইব।

-বেশ বেশ। তুমি আমাদের রান্না করতে পারবে?

সজনী নিরুত্তরে ঘাড় নেড়ে জানাল, পারবে।

গোকুল—কত মাইনে নেবে?

—আইগ্গা, যা দিবেন।

—সুশীল বাবু কত দেন?

—খাওন পরন আর পাঁচ ট্যাহা।

—আমরা ও তাই দেব, রাজি?

সজনী সম্মতিসূচক মস্তক—সঞ্চালন করে যথারীতি গোকুলদের পাচক-বৃত্তিতে নিযুক্ত হল। সুশীলের কাছে গোকুল তার অতীত ইতিহাস ও চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করল। জবাব এল—আমি ত খারাপ কিছু শুনি নি বা দেখিও নি। আমার কাছে ও কাজ করছে প্রায় বছর দুই। আমার স্ত্রীর অসুখের সময় সেবাও করেছে ভাল। তবে লোকটি মুখচোরা এবং বুদ্ধিতেও কিছু কম। তা, চাকর বাকর বেশি বুদ্ধিমান না হওয়াই ভাল, কি বলেন? হলে মনিবের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে দ্বিধা করে না। আমার ত বরাবর ধারণা যে, স্ত্রী আর চাকর

বেশি বুদ্ধিমান না হওয়াই মঙ্গল!—বলে হা হা করে হেসে উঠল। গোকুলরাও সে হাসিতে যোগ দিল। তার মনে হল জিজ্ঞাসা করে,—আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে ও ঐ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন নাকি?

কিন্তু সদ্য-পত্নী-বিয়োগ-বিধুর পতির কাছে ও প্রশ্ন করা সমীচীন বিবেচনা করল না।

পরদিন গোকুল কাজে যোগ দিল। অফিস বাসার নিকটেই। কর্মচারীর সংখ্যা খুব বেশি না হলেও মন্দ নয়। নানা শ্রেণীর ছোট বড় পোস্ট আছে। বড় সাহেব ও সেলস্ মাস্টার দুজন ইংরাজ। এদের নিচে তিনটি মোটা মাইনের পোস্টে বাঙালীরা আসীন। কেরাণীদের ওপরে একাউন্টেন্ট, তাদের ওপর হেড ক্লার্ক, তার ওপর অফিস মাস্টার, এরা সকলেই বাঙালী। সাধারণতঃ একাউন্টেন্ট থেকে হেড ক্লার্কের পোস্টে প্রোমোশন হয়। গোকুল প্রথমেই একাউন্টেন্ট নিযুক্ত হওয়ায় সকলেই, এমন কি বড় সাহেব পর্যন্ত, তাকে ভাগ্যবান বলে বর্ণনা করল, কারণ সাধারণতঃ লোকে কেরানী অথবা এ্যাসিস্ট্যান্ট একাউন্টেন্ট হয়ে চাকরি জীবন আরম্ভ করে, এবং তাতেই দশ পনের বছর অতিবাহিত করে একাউন্টেন্ট পদে উন্নীত হয়। যাই হোক, নিজের উচ্চশিক্ষা এবং মধুর ব্যবহারের গুণে গোকুল শীঘ্রই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত বাবুদের ও অধিকাংশ পিয়ন-চাপরাশি প্রভৃতির সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়ে গেল।

সকলে উঠে চা ও জলখাবার খেয়ে দুই ভাই বাজার যায়। ওরা দেখে আশ্চর্য হল যে, এখানে মাছ ওজন-দরে বিক্রয় হয় না। ভাগা দিয়ে বিক্রয় হয়। আর সস্তাও খুব। বড় বড় ট্যাংরা কিম্বা চিংড়ি কিম্বা কৈ মাছ একটা এক পয়সা কি জোর দেড় পয়সা। এত বড় কৈ অথবা গলদা চিংড়ি তারা আগে কখনও খায় নি। দুভাই বেছে বেছে বড় বড় মাছ এনে মহানন্দে ভোজন করত। পাচক হিসাবে সজনী উৎকৃষ্ট না হলেও দৈনন্দিন মোটামুটি রান্না তাকে দিয়ে এক রকম চলে যেতে লাগল। তবে তার ওপর একটু নজর রাখতে হয়। নতুবা সে কোন কোন দিন এক একটা উদ্ভট কাজ করে বসে। অবশ্য গোপাল ওর রান্নার তদারক করে এবং এতে তারও শিক্ষানবিশী হয়। একদিন খেতে বসে গোকুল দেখল, মাছের ঝোলে শুধু আলু আর মাছ, অথচ সকালে পটলও আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করল—সজনী, ঝোলে পটল দাও নি কেন? এবার থেকে দেবে, বুঝলে?

সজনী ঘাড় নেড়ে জানাল, বুঝেছে। রাত্রে খেতে বসে গোকুল দেখল, ঝোলে শুধু মাছ আর পটল, আলু নেই। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—সজনী, এ কি? ঝোলে আলু দাও নি!

সজনীর মুখখানি লজ্জায় নববধূর মত আনত হয়ে এল। মৃদুস্বরে জবাব দিল—আইগ্যা, আপনে ঝোলে পটল দিবার কইছিলেন, আলু দিবার ত কন্ নাই!

শুনে দুভাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এ রকম লোকের ওপর রাগ করে লাভ নেই। কাজেই তাকে আলু এবং পটল উভয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়া হল।

গোপাল স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হল, বৃন্দাবন বাবুর বড় ছেলে ননীও ঐ ক্লাসে পড়ে। প্রথম দিন রাত্রে ননীদের বাড়ীতে খেতে বসে তাকে দেখেই গোপালের ভাল লেগেছিল। মুখখানায় কেমন একটা সরলতা মাখানো। এই ভাললাগা শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে ভালবাসায় পরিণত হল। অল্প দিনের মধ্যেই ননী গোপালের স্কুলের বন্ধু ও খেলার সাথী হয়ে উঠল। সংসারের কাজ ও লেখাপড়ার সময় বাদে অবসর সময়ের অনেকটাই সে ননীদের বাড়িতে যাপন করে অথবা ননীকে নিজেদের বাসায় ডেকে আনে। নিরীহ ভালমানুষ বলে অফিসে ও বাবু মহলে বৃন্দাবন বাবুর সুনাম আছে তাই তাঁর পুত্রের সঙ্গে ভাইয়ের অবাধ মেলামেশাতে গোকুল আপত্তি করল না। সে নিজেও সরল বৃন্দাবন বাবুর প্রতি বয়সের বৈষম্য সত্ত্বেও অনেকটা আকৃষ্ট হয়েছিল। মাঝে মাঝে ননী অথবা তার ভগিনী সন্ধ্যা বাড়ি থেকে রান্না তরকারি এনে গোকুলদের দিয়ে যায়। বৃন্দাবন বাবুর তিন সন্তা

ও দুই পুত্র। প্রথমে নন্দা। তার বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর যথাক্রমে ননী, সন্ধ্যা, মণি (পুত্র) ও ছন্দা। নন্দা চট্টগ্রামে তার শ্বশুর বাড়িতে থাকে। নন্দা বাদে অন্যান্য গুলি স্কুলে পড়ে। এদের খেলাধূলা ও কলহাস্যে মাঝে মাঝে সকালে ও বিকালে গোকুলের শূন্যপ্রায় গৃহের অঙ্গন মুখরিত হতে থাকে।

(পাঁচ)

দেখতে দেখতে একমাস অতিবাহিত হয়ে গেল। পূর্ববঙ্গকে দূর থেকে যত ভয়াবহ বলে মনে হয়েছিল, এখন দেখা গেল তার কিছুই না। বরং এখানকার অধিবাসীদের কথাবার্ত্তার বৈচিত্র্যে গোকুল বেশ কৌতুক অনুভব করে এবং নিজে তাদের অনুকরন করতে গিয়ে বন্ধুমহলে যথেষ্ট হাস্যরসের অবতারনা করে। ইতিমধ্যে সে এখানকার দর্শনীয় স্থান এবং বস্তগুলি মোটামুটি দেখে ফেলেছে। শ্রীশ্রীঢাকেশ্বরী দেবীর মন্দির তার খুব ভাল লেগেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুড়িগঙ্গার ধার, রমনার নূতন সহর, নবাবপুর, লালবাগ পুলিশ লাইন ঘুরে ঘুরে দেখেছে। নাতিপ্রশস্তা শান্ত নদীটি ও তার দুই তীর গোকুলের চক্ষে অতি মনোহর মনে হয়, তবে গঙ্গা নামের আগে বুড়ী বিশেষনের যৌক্তিকতা সে বুঝতে পারে না। কারণ বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সর্বতীর্থ-শিরোমণি সরিদ্বরা গঙ্গা চিরযৌবনা। হতে পারে এ নদীটি মূল গঙ্গার শাখা। তবু 'বুড়া' বিশেষণটি মোটেই সুপ্রযুক্ত নয়।

রমনা দেখে সে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হল। রমনা ঢাকারই একাংশ হলেও ঢাকা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের দুই ভাই পৈতৃক বাড়ি ও উঠান উত্তরাধিকার সূত্রে পাবার পর একজন হঠাৎ ধনবান হয়ে উঠে বাড়ির অর্দ্ধাংশ ভেঙে ঝকঝকে নূতন বাড়ি তুললে এবং নিজের ভাগের আঙিনা আগাগোড়া সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে ফেললে যেমন দেখতে হয়, এও যেন ঠিক সেই রকম। একজনকে অপরের ভাই বলে চিনে নেওয়া দুষ্কর।

একমাস কেটে যাবার পর গোকুল অরুন্ধতীকে আনতে যাবার কথা ভাবছে, এমন সময় ঢাকায় এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল। ইংরাজী ১৯৪১ সালের সেই ঘটনা বাংলা দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হল। প্রথমে এক আধটা লোক অলিতে গলিতে রাত্রে ছুরিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাতে লাগল। তারপর দিনের বেলাতেও যেখানে সেখানে রক্তাক্ত মৃতদেহ পাওয়া যেতে লাগল। সহরে তীব্র আতঙ্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের যে সব রোমহর্ষণ কাহিনী শোনা যেতে লাগল, তাতে বাড়ি ছেড়ে বার হবার কথা গোকুলরা কেউ কল্পনাও করতে পারল না। ভাগ্যে তাদের বাসাগুলো একত্র এবং পাঁচিল ঘেরা তাই রক্ষা। কোম্পানীর নিজস্ব কয়েকটি বন্দুক আছে। তাতে সজ্জিত হয়ে দারোয়ানরা পর্যায়ক্রমে রাত্রি জেগে পাহারা দিতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু সহরের অবস্থা ক্রমেই গুরুতর ও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। ভয়ে লোকে বড় একটা পথেই বেরোয় না। তবু কেমন করে গুপ্তঘাতকের ছুরি যে অতর্কিত এসে এক একজন অনন্যোপায় পথচারীর বক্ষে বিদ্ধ হয়, তা কেউ বুঝতে পারে না। দোকান-পসার এমনকি বাজার পর্যন্ত বন্ধ—রাস্তায় লোক চলাচল একেবারে নেই। সমস্ত সহরটা যেন ভয়ে নিশ্বাস রোধ করে মৃতবৎ পড়ে আছে। যেন একজন প্রকাণ্ড অদৃশ্য ঘাতক গোটা সহরটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে তার বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছে, এবং একহাতে কণ্ঠনালী চেপে ধরে অপর হাতে অদৃশ্য শাণিত ছুরিকা উদ্যত করে শাসাচ্ছে—এই খবরদার! নড়বি ত বুকে ছুরি বসাব।

এ রকম ভীষণ পরিস্থিতির মধ্যে গোকুল জীবনে কখনও পড়েনি। কয়েক বছর পূর্বে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল বটে, কিন্তু সে তা চক্ষে দেখেনি। নিজের গ্রামে সাঁতরাগাছিতে তখন সে স্কুলে পড়ে। কাজেই সেই পাশবিক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সে দূর থেকে কানেই শুনেছে, এত নিকটে বসে কণ্টকিত দেহে অনুভব করে নি। উঃ! কেউ যখন এসে

তারকণ্ঠে সংবাদ দেয়, অমুক পাড়ায় এই মাত্র একটা হয়ে গেল, তখন গোকুলের চোখের সামনে রুধিরাপ্লুত একখানা ছুরি ভেসে ওঠে এবং নাকে সদ্যো-নিষ্কাশিত উষ্ণ রক্তের গন্ধ এসে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটি জলে ভরে যায়। যারা এই কাজ করছে তারা কি? মনুষ্যত্বের সর্বনিম্ন সোপান ছাড়িয়ে পশুত্বেরও সর্বাধম গহ্বরে তারা নিমজ্জিত হয়েছে। যাকে জানি না চিনি না, যার সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই যার মুখ পর্যন্ত পূর্বে দেখিনি, শুধু সে আমার সম্প্রদায়ের লোক নয় বলেই তার বুকে তীক্ষ্ণধার ছুরি পিছন থেকে গিয়ে বসিয়ে দেব। এ কথা চিন্তা করলেও সর্বশরীর হিম হয়ে যায়। তার উপর রাত্রে সম্মিলিত গুণ্ডাদের কি বীভৎস চীৎকার! শুনলে ভয়ে বক্ষস্পন্দন থেমে আসতে চায়। কেন, কেন মানুষ এত নীচ, এত জঘন্য হিংসাকার্যে লিপ্ত হয়েছে, কি লাভ হবে এতে কার? গোকুলের এক এক সময় মনে হয়, বিংশ শতাব্দীর সহরে নয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সর্পসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে তারা বাস করছে, যেখানে সহস্র সহস্র উদ্যতফণা ফণী মুখে কালকূট নিয়ে দংশন করবার জন্য পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওঃ! পৃথিবীতে যদি কোথাও নরক থাকে তবে তা এখানেই, তা এখানেই।

(ছয়)

গোকুলের সহকর্মী রমানাথের এক দূরসম্পর্কীয় শ্যালক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কর্মচারী। নাম বরদাকান্ত। একদিন সন্ধ্যার সময় গোকুল ও আরও কয়েকজন রমানাথের বৈঠকখানায় বসে গল্প করছে, এমন সময় বরদা প্রবেশ করল। রমানাথ বলল— কিহে, আজকাল যে ডুমুরের ফুল হয়েছ, দেখাই পাওয়া যায় না।

মুখে একটা বিরক্তভাব প্রকাশ করে বরদা বলল— আর বোলোনা ভাই! খাটতে খাটতে মারা যাবার যোগাড়। সহরে দাঙ্গা হওয়া ত না, আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। রোজ গাড়ি গাড়ি নতুন আসামী আসছে, তার মধ্যে আবার প্রায় অর্ধেক লোক জখম নিয়ে আসছে। তাদের থাকার, খাওয়া-দাওয়ার চিকিৎসাপত্রের বন্দোবস্ত করা কি সোজা? রোজ দুশো আড়াইশো লোক কোর্টেই যাচ্ছে। বুঝে দেখ ব্যাপার। বলে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাইল।

সকলেই সহানুভূতি-সূচক ঘাড় নাড়ল। বরদা আবার আরম্ভ করল—রাত দশটা-এগারোটার আগে কোনদিন বাসায় ফিরতে পারি না। মাঝে মাঝে বারোটা-একটাও হয়ে যায়। আজকে শরীরটা তেমন ভাল নেই বলে সকাল সকাল চলে এসেছি আর এক জনের উপর কাজের ভার দিয়ে। ভাবলাম অনেকদিন তোমার এখানে আসা হয়নি, আজ এই ফাঁকে একবার ঘুরে আসি।

রমানাথ বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ করেছ। তোমার দিদি ক'দিন থেকে বলছে, বরদার আর দেখা পাই না কেন, একবার খোঁজ নিও দেখি। তা যাও, দেখা করে চা-টা খেয়ে এস।

হ্যাঁ, এই যে।—বলে বরদা উঠে পড়ল। গোকুলের পরিচয় জানা না থাকাতে জিজ্ঞাসা করল—এঁকে ত চিনলাম না, রমানাথ দা?

হেসে রমানাথ বলল—কি করে আর চিনবে বল? উনি মাস দেড়েক হল এসেছেন, কিন্তু তার পর থেকে ত আর তুমি এ-মুখো হওনি। উনি আমাদের অফিসের নতুন একাউন্টেন্ট গোকুলবাবু। সুশীলবাবুর জায়গায় এসেছেন।

—ওঃ, বেশ বেশ। নমস্কার।

গোকুল প্রতিনমস্কার করল। বরদা জিজ্ঞাসা করল—আপনার বাড়ি কোথায়?

—হাওড়া জিলায়।

—ওঃ বেশ। তা, বাঙালদের দেশ কেমন লাগছে? ভারি বিশ্রী, না?

সকলেই হেসে ফেলল।

গোকুল বলল—না না, বিশ্রী লাগবে কেন? বেশ ভালই ত লাগছে।

বরদা—যাক, শুনে সুখী হলাম। আমার কিন্তু প্রথম প্রথম ভারি খারাপ লেগেছিল, যদিও আমি খুলনা জেলার লোক। আচ্ছা, এখানকার কথাবার্তা?

গোকুল—আমার কাছে এদের কথাবার্তার ধরণ একেবারে নতুন। তা হলেও মন্দ লাগে না। আমি এদের কথাবার্তা বোঝবার চেষ্টা করছি। প্রথম প্রথম মোটেই বুঝতে পারতাম না। এখন তবু কিছু কিছু পারছি।

বরদা—হ্যাঁ হ্যাঁ, আর কিছুদিন চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে।—বলে রমানাথের দিকে ফিরে বলল—আর তোমরা ত রয়েছ, তালিম টালিম দিয়ে ঠিক করে নেবে।

ওদিক থেকে বিনোদ বলে আর একজন বলল—সে আর রমানাথকে বলতে হবে না। সেইজন্যই ত এই সান্ধ্য মজলিসে রেগুলার এ্যাটেণ্ডান্সের জন্যে ওঁকে রীতমত তাগাদা দেওয়া হয়।

বরদা হেসে বলল—তাই নাকি? তবে ত ওনার কনভার্ট হতে বেশি দেরি লাগবে না।—আচ্ছা, আপনারা বসুন। আমি একটু ভেতর থেকে ঘুরে আসি।—বলে অন্দরে প্রবেশ করল।

আধঘণ্টা আন্দাজ পরে ফিরে এসে পরিত্যক্ত আসনখানিতে বসে বলল—গোকুল বাবু, আপনি কখনও জেলখানার ভিতরে গিয়েছেন?

মাথা নেড়ে গোকুল বলল—না, সে সৌভাগ্য হয় নি।

কথাটার আর একরকম অর্থ হয়। তার প্রতি ইঙ্গিত করে বিনোদ বলল—ও আশীর্বাদ করবেন না।

সকলে হাসল। বরদা বলল—আহা, আমি কি তাই বলছি নাকি? উনি জেলখানার ভিতরটা কোন দিন দেখেছেন কি না সেই কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।

গোকুল—হ্যাঁ, সে আমি বুঝেছি। আমার কোন দিন দেখা হয়নি বরদাবাবু!

বরদা—তবে এক কাজ করুন না। আসছে রবিবার বিকালে আমাদের অফিসে আসুন না, সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবখন। এ এক আজব জায়গা মশাই! না দেখলে ধারণা করা যায় না।

সাগ্রহে গোকুল বলল—তা বেশ ত, আসব। কিন্তু ওখানে ঢুকতে গেলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয় না?

বরদা—সে আমি নিয়ে নেবেখন। সেজন্য আপনার ভাবতে হবে না। তা হলে রবিবার দিন আসছেন কেমন?

গোকুল—নিশ্চয়ই। কটার সময় যাব?

বরদা—এই, তিনটে সাড়ে তিনটে। সব ঘুরে দেখতে অন্ততঃ ঘণ্টা দুই লাগবে কি না, তাই একটু সকাল-সকাল যাওয়া ভাল।

গোকুল—বেশ। আপনাদের ওখানে এখন কত আসামী আছে?

বরদা—সাধারণতঃ দু হাজার থেকে বাইশ-শোর মধ্যে থাকে। এখন এই দাঙ্গার দরুণ তিন হাজারের ওপরে উঠেছে।

বিস্ময়ে চক্ষু গোলাকার করে গোকুল বলল—এঁ্যা, বলেন কি! তি-ন হা-জা-র! এযে একটা ছোট খাট সহর!

বরদা—তাই। কি নেই এখানে? হাঁসপাতাল, বড় বড় কারখানা, বাগান,—সবই আছে। এর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে, এ একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর পাচক, ডাক্তার, চাকর, নার্স, মালী, মিস্ত্রী, যার জলের ভারী পর্যন্ত সব কিছু এর ভিতরেই আছে। এমনকি পায়খানা পরিষ্কারের লোকও এখানেই আছে, মিউনিসিপ্যালিটির শরণাপন্ন হতে হয় না। বলতে গেলে এ একটা ছোটখাট জগৎ—এ মাইক্রোকজম্।

কথাটার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে গোকুল বলল—তাই ত, আশ্চর্যের কথা বটে। বেশ, আমি রবিবার তিনটের আসব। গেটে গিয়ে আপনার নাম করলেই হবে ত?

হ্যাঁ। আমি আগে থেকে সিপাইদের বলে রেখে দেব। আমার নাম করলেই আপনাকে অফিসে আমার

কাছে পৌঁছে দেবে।

আরও কিছুক্ষণ রমানাথের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর সকলের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে বরদাকান্ত বিদায় নিল।

[সাত]

রবিবার ঠিক তিনটার সময় গোকুল সেন্ট্রাল জেলের গেটে উপস্থিত হল। বরদাকান্তের নাম করতেই সশস্ত্র প্রহরী বলল—আসুন। এবং এগিয়ে গিয়ে গেটের ভিতরে যে সিপাই চাবি দিয়ে দরজা খোলে তাকে বলল —এঁকে নিয়ে ডেপুটি জেলার বরদাবাবুর কাছে পৌঁছে দিয়ে এস।

গোকুল লক্ষ্য করল, গেটের সামনে প্রায় আড়াইশো তিনশো নরনারী জড় হয়েছে। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক, কয়েকজন মধ্যবিত্ত ঘরের ভদ্রশ্রেণীর বলে মনে হল। এত লোক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছে!

অফিসে প্রবেশ করতে সামনেই বরদার সঙ্গে দেখা। সে—আসুন, আসুন! বলে গোকুলকে অভ্যর্থনা করে বসাল। বলল—তা হলে চিড়িয়াখানা দেখতে এলেন দেখছি।

গোকুল হেসে উত্তর দিল—চিড়িয়াখানাই বটে! আচ্ছা বরদাবাবু, বাইরে এত লোক জমা হয়েছে কেন? কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য?

বরদা—হ্যাঁ। আজকাল কয়েদীর সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে রোজই ইন্টারভিউ দিতে হচ্ছে। আগে সপ্তাহে তিন দিন করে দিলেই চলত। খানিকক্ষণ এখানে বসুন, এ পর্ব শেষ করে নিই, তারপর আপনাকে নিয়ে ভিতরে যাব। এক ঘন্টার ওপর সময় লাগবে, দেখুন না, লোক কি কম?—বলে ভিতরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল।

গোকুল দেখল, দুটি বড় কক্ষে বিভক্ত অফিস ঘরের টেবিল-চেয়ার বাদ দিয়ে যত শূন্য স্থান আছে, সবটুকু পূর্ণ করে সারি সারি বন্দীর দল উপু হয়ে বসে আছে। সংখ্যায় প্রায় একশো হবে। তার মধ্যে কতকগুলির গায়ে জেলখানার ডোরাকটা জামা-প্যান্ট, আর বাকিগুলি সার্ট ইত্যাদি বাড়ির জামাকাপড় পরে আছে। বরদা বুঝিয়ে দিল—যাদের পরণে সরকারি পোষাক দেখছেন ওরা হল কনভিক্ট, ওদের সাজা হয়ে গেছে। আর যারা নিজের জামা-কাপড় পরে আছে ওরা হাজতি, ওদের বিচার এখনও শেষ হয়নি—সন্তোষ, আবার দেখা আরম্ভ কর।

সন্তোষ নামক কয়েদীটি বলল—আচ্ছা স্যার! বলে হাতের একটি কাগজে মনঃসংযোগ করল। ঐ কাগজে আজকের দেখার জন্য সমাগত বন্দীদের নামের তালিকা আছে। যে টেবিলের একধারে বরদা ও গোকুল বসেছে তারই অপর পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে, তারপর বাইরের জানলা। জানলার ও পাশে অর্থাৎ বাইরে প্রশস্ত ছাদওয়ালা বারান্দা। বারান্দার দু'ধারে দুজন উর্দিপরা সিপাই দাঁড়িয়ে দর্শনার্থী লোকদের ডেকে দিচ্ছে এবং দেখা শেষ হলে সরিয়ে দিচ্ছে। যে কয়েদীর দেখা হবে তাকে জানলার এ ধারে মাটিতে বসতে দেওয়া হয় এবং ও পাশে, অর্থাৎ বাইরে, তার বাড়ির লোকজন এসে বসে। যাতে দুই পক্ষের কেউ কাউকে স্পর্শ করতে অথবা জানলার ভিতর দিয়ে কোন জিনিষ হস্তান্তর করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে জানলায় আগাগোড়া ঘন ও মজবুত লোহার জাল দেওয়া আছে, যার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে একটি আঙুলও প্রবেশ করতে পারে না, অথচ পরস্পরকে দেখার ও বাক্যালাপের কোনও অসুবিধা নেই।

গোকুল আসবার পর অল্পক্ষণের জন্য দেখা বন্ধ ছিল, তারপর বরদার আদেশ পেয়ে সন্তোষ আবার শুরু করল। তার কোমরে চামড়ার কটিবন্ধ দেখে গোকুল প্রশ্ন করল—এর কোমরে বেল্ট কেন বরদাবাবু?

বরদা বুঝিয়ে দিল—এরা হচ্ছে কনভিক্ট ওভারসিয়ার, জেলখানার ভাষায় 'মেট'। ছমাসের অধিক মেয়াদযুক্ত যে সমস্ত কয়েদীর জেল-জীবন মোটামুটি ভাল, তারা, অর্ধেক মেয়াদ কাটবার পর এই

পদে উন্নীত হয়,—এরা হল কনভিক্ট অফিসার। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এদেরকে নিয়োগ করেন। এদের কোনও শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয় না, তা ছাড়া আরও কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা আছে। এদের ওপর একদল কয়েদীর চার্জ দেওয়া হয়। এদের প্রধান কাজ সেই সব অধীনস্থ কয়েদীদের আইনমত যথাযথভাবে পরিচালনা করা।—নাও সন্তোষ, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সন্তোষ এতক্ষণ অবহিতচিত্তে বরদার মুখে মেটের মহিমা বর্ণনা শুনছিল। বরদার আহ্বানে সচকিত হয়ে উপবিষ্ট বন্দীদের সম্বোধন করে বলল—এ্যাই, সব চুপ! তারপর হস্তধৃত তালিকা থেকে নাম পড়ে ডাকল—হারাণ গুহ!

আছি।—বলে সাড়া দিয়ে একটি কয়েদী উঠে এসে জানলার সামনে বসল। সন্তোষ গলা বাড়িয়ে বাইরে সিপাইকে উদ্দেশ্য করে বলল—তাহেন হারাণ গুহের লগে কে দেখা করব?

সিপাই জনতাকে লক্ষ্য করে ততোধিক উচ্চকণ্ঠে হাঁকল—এই, হারাণ ঘোষের সঙ্গে কে দেখা করবে?

ডাক শুনে ঘোমটা দেওয়া মলিন বসনা একটি যুবতী বছর কুড়ি বয়সের একটি যুবক ও বছর তিনেকের একটি শিশু বারান্দায় উঠে এল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে বাদ দিয়ে অপর দুজনের ও হারাণের কণ্ঠ থেকে একটি সম্মিলিত কান্নার রোল উঠল। কয়েক সেকেণ্ড কেউই কোন কথা বলতে পারল না। বাইরে যুবতীটির এবং ভিতরে হারাণের দেহ কান্নার আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। গোকুল এই আকস্মিক হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসে কতকটা হতচকিত হয়েছিল, কিন্তু সন্তোষ এরকম দৃশ্যে অভ্যস্ত থাকায় মিনিট কয়েক চুপ করে দাঁড়িয়ে ওদের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের বেগটা বোধ করি প্রশমিত হবার অপেক্ষা করল। তারপর বলল—আরে, কান্দে না। কান্‌লে কথাবার্তি ওইব ক্যামনে? লও লও, কথা কও।

কিন্তু কে কথা কইবে? কান্নার বেগ একটু থামলে যেই স্বামী-স্ত্রীতে চোখাচোখি হয়, অমনি আবার দুজনে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। শেষে বিরক্ত হয়ে সন্তোষ বলে উঠল—কথা কও হারাণ! সময় যায় গা।

তবুও হারাণ অথবা তার স্ত্রীর কণ্ঠে কথা ফুটল না জানলার এক পাশে সন্তোষ দাঁড়িয়ে, অপর পাশে তার সহকারী সুধীর। এতক্ষণ সে চুপ করে ছিল! এইবার হারাণের পিঠে হাত রেখে বলল—এ্যাই দ্যাহ, আবার কান্দে, কথা হোনে না! অহনও কত মানুষ বাকি আছে, ভাহ না? এরপর আমাগো আবার ফাইল আছে। লও, কথা হাইর‍্যা (সারিয়া) লও।

এতক্ষণে হারাণ কথা কইল। ভগ্নকণ্ঠে বলল—কেমন আছ?

তার স্ত্রী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিল—আর থাহন! তোমরা বন্ধ রইলা, আমাগো দেহনের ক্যামনে!—বলে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে—। একজন বন্দীকে আর অধিক সময় দেওয়া যায় না। সন্তোষ তার হাত ধরে বলল—ওইছে, যাও গা।

হারাণ উঠে চোখ মুছতে মুছতে একপাশে গিয়ে বসল। সন্তোষ বরদাকে বলল—ছুনো বাই (ভাই) যেলে আইয়া পড়ছে কিনা স্যার, তাই।

বরদা বলল—তাই নাকি? এর ভাইয়ের নাম কি?

সন্তোষ—অরেণ, স্যার,—অরেণ গুহ। তাত (তাঁত) কারখানে কাম করে।

ও।—বলে বরদা সম্মুখস্থ সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করল।

সন্তোষ লিস্ট দেখে পরপর আসামীদের দেখা করিয়ে চলল।

(আট)

ক্রমে কয়েদীদের দেখা মোটামুটি শেষ হয়ে হাজতীদের দেখা আরম্ভ হল। কয়েকজনের পর মাধব বলে একটি হাজতীর ডাক পড়ল। তাকে মোটেই চিন্তিত বা বিচলিত মনে হল না। তার বাড়ির লোক

জানলার সামনে আসতেই সে জিজ্ঞাসা করল—কয় প্যাক বিড়ি আনছো ?

সন্তোষ ধমক দিয়ে উঠল—তর (তোর) বুঝি আর কথা নাই, মাখনা ? পরিবারের লগে দ্যাহা অইলেই—কয় প্যাক বিড়ি আনছো ? পরিবার কি খাইয়া বাইচ্যা আছে জিগাইছ ?

হে আর জিগাইয়া করুম কি ?—মাখন নিঃস্পৃহভাবে উত্তর দিল।

বিদ্রূপ করে সন্তোষ বলল—না, তা জিগাইবা ক্যান ? তোমার বিড়ির যোগার অইলেই অইল।

বাইরের স্ত্রীলোকটি সব শুনছিল। সে কপালে করাঘাত করে বলল—হে আমার কপালের দুধ বাবা, কপালের দুধ। বলে সশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাখনের দিকে ফিরে বলল—দুই প্যাক বিড়ি আনছি। তারপর আছো বাল (ভাল) ?

নিরুৎসুকভাবে মাখন উত্তর দিল—হ, বালা-ই। বিড়ি দুই প্যাক সিপাইএর আতে (হাতে) দিয়া যাওগা—বলে উঠে পড়ল।

মাখনের স্ত্রী সিপাইয়ের হাতে বিড়ি দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গেল।

মাখনের দিকে চেয়ে সন্তোষ বলল—বেটা বি কেলাস।

কথাটার মানে বুঝতে না পেরে গোকুল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। বরদা বুঝিয়ে দিল যারা চুরি প্রভৃতি অপরাধে একাধিকবার জেল খাটে তাদের B ক্লাস বলে। যারা প্রথমবার জেলে আসে তারা A ক্লাস।

ইন্টারভিউ আবার পূর্ববৎ চলতে লাগল। খানিকক্ষন পরে সন্তোষের সহকারী আসামী একগোছা ইন্টারভিউয়ের দরখাস্তের ভিতর থেকে এক টুকরা ছোট কাগজ বার করে বরদার হাতে দিয়ে বলল—একখান দরখাস্ত দেখেন স্যার !

গোকুল চেয়ে দেখল কাগজখানি অতি ক্ষুদ্র, ইঞ্চি চারেক লম্বা ও ইঞ্চি তিনেক চওড়া। তাতে আঁকা বাঁকা কাঁচা হাতে পেন্সিলে লেখা কয়েকটি ছাড়া ছাড়া কথা—ঢাকা সেন্টার জেলের সুপারেন সাহেব আসামী গোবিন্দ দাস থানা সোতরাপুর শাসতি ৬ মাস। নিচে কোন স্বাক্ষর নেই। দরখাস্ত পড়ে বরদাকে হাসতে দেখে সুধীর বলল—দ্যাহেন স্যার কেডা দরখাস্ত দিছে তার নাম নাই। দ্যাহা করামু ?

বরদা জিজ্ঞাসা করল—আসামীটাকে চিনতে পেরেছ?

সুধীর—হ স্যার, চিনছি। মেয়াদী আসামী। ৬ মাস সাজা। সুত্রাপুর থানায় এলাকায় বারি। দরখাস্তে সোতরাপুর ল্যাখছে।—বলে হাসল।

বরদা—থাকগে। যখন চিনেছ, তখন নিয়ে এসে দ্যাখা করিয়ে দাও।

আচ্ছা স্যার !—বলে সুধীর সেই বন্দোবস্ত করে ফিরে এসে পূর্বস্থানে দাঁড়াল। ক্রমে দেখা পর্ব শেষ হয়ে গেল। সন্তোষ আসামীদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—আর কেউর দ্যাহা বাকি আছে ?

একজন কয়েদী কুণ্ঠিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমার—

বাধা দিয়ে সন্তোষ বলল—তোমার ত ডাকছিলাম একবার। মানুষ নাই ত কি করুম ?

বিনীতভাবে লোকটি বলল—আর একবার—

আচ্ছা অইও—বলে সন্তোষ হাঁক দিল—হরলাল সা'র লগে কে দ্যাহা করব ?

কোনও সাড়া এল না। তখন বারান্দার সিপাই তার হাঁকের প্রতিধ্বনি করল। তবুও কেউ এল না। লোকও আর বিশেষ কেহ নেই। তখন সন্তোষ হরলালকে বলল—দ্যাখলা ? মানুষ নাই, বেহুদা প্যাচাল পার ? যাও !

ঘাড় নিচু করে হরলাল যথাস্থানে বসল। এমন সময় একটি কয়েদী গোবিন্দ দাসকে এনে হাজির করে বলল—এই গোবিন্দ দাস হুজুর (হুজুর) !

বরদা সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র দরখাস্তখানার দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—তোমার নাম গোবিন্দ দাস ?

হাত যোড় করে লোকটি উত্তর দিল- আইগ্যা হ।

—তোমার বাবার নাম কি?

—নকুল দাস।

—বেঁচে আছে?

—না উয্ুর, মিতু।

বরদা—আচ্ছা যাও, দেখা কর।

সন্তোষ তার লোক ডেকে দেখা করাল। তারপর বরদাকে বলল—হাহা শ্যার ওইছে' স্যার! মানুষগুলা বিতরে থুইয়া'হি (রেখে আসি)? কাইলে হাইবেন ত?

বরদা—হ্যাঁ যাব। শিগগির এস।

সন্তোষ—হ স্যার। বলে বন্দীদের সবাইকে ডেকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

গোকুল বিস্ময় প্রকাশ করে বলল—বাবা! এত লোকের দেখা রোজ হয়?

বরদা বলল—দেখলেন ত? কাজ কি কম! তাও ত এতক্ষণে মোটে প্রথম অঙ্ক শেষ হল। এইবার দ্বিতীয় অঙ্ক হবে জেলখানার ভিতরে। সেখানে 'ফাইল' আছে, অর্থাৎ সাজাবন্দী কয়েদীদের অভাব অভিযোগ শুনতে হবে, এবং তাদের যথাবিধি ব্যবস্থা করতে হবে। ততক্ষণ একটু ধূমপান করা যাক আসুন। —বলে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে গোকুলকে একটা দিল।

অতঃপর গোকুলকে সঙ্গে নিয়ে বরদাকান্ত ভিতরে ফাইল দেখতে চলল, সন্তোষ 'মেট' হুকুম-বরদার হিসাবে পিছনে রইল। যেতে যেতে বরদা বলল—আজকে হাজতীদের আর পাগলদের ফাইল। আগে হাজতীদের দেখে তারপর পাগলদের ওখানে যাব। জেলখানার হচ্ছে নিয়ম এই যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বন্দী ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকবে। হাজতীরা কয়েদীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকে। তাদের মধ্যে আবার যারা অপরাধ স্বীকার করে তাদেরকে স্বতন্ত্র গণ্ডীর মধ্যে একক ঘরে রাখা হয়, যাকে বলে 'সেল'। কয়েদীদের সংখ্যা খুব বেশি বলে তাদের কয়েকটা ওয়ার্ডে বিভক্ত করে রাখা হয়। মেয়েদের, পাগলের এবং যাদের বয়স একুশ বছরের কম সেই সব ছোকরাদের জন্ত আলাদা আলাদা বন্দোবস্ত আছে।

কথা কইতে কইতে তারা একটা প্রকাণ্ড তিনতলার ইমারতের কাছাকাছি এসে পড়ল। এর চারপাশে প্রশস্ত অঙ্গন দশ ফুট উঁচু লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিংএ মাত্র একধারে গেট, সেখানে সিপাই পাহারা। ভিতরে প্রবেশ করে গোকুল দেখল, বাড়িটার সামনের উঠানে পরস্পর মুখোমুখি দুটি সারিতে অনুমান তিনশো লোক উবু হয়ে বসে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে একখানা করে পাতলা শাদা শক্ত কাগজ, হাঁসপাতালে বহিরাগত রোগীদের যেমন 'আউটডোর টিকেট' দেওয়া হয়, কতকটা সেইরকম। বরদা বুঝিয়ে দিল, ঐগুলি হচ্ছে বন্দীদের হিস্ট্রি টিকেট। ওতে তাদের জেল জীবনের প্রধান ঘটনা এবং অপরাধের নাম ও ধারা, কোর্টে যাবার তারিখ, চিঠি, দরখাস্ত, দেখা প্রভৃতির বর্ণনা লেখা থাকে।

ওরা কাছাকাছি এলে বন্দীরা সিপাইয়ের আদেশে উঠে দাঁড়াল এবং পুনরায় উপু হয়ে বসল। জেলখানায় এইটেই অভিবাদন জ্ঞাপন করবার প্রথা। বরদা একধার থেকে আরম্ভ করল। নিয়ম হচ্ছে এই, যার কিছু বলবার নেই সে চুপ করে থাকবে, এবং যার বক্তব্য আছে, সে নিজের সামনে দিয়ে অফিসার চলে যাবার সময় তাঁর কাছে যা বলবার বলবে। প্রথম দু'তিন জন কিছু বলল না। তারপর একজন বলল—উয্ুর, একখানা চি টি (চিঠি) দেন। বরদা তার হাতের লাল পেন্সিল দিয়ে টিকিটের উপর 'পোস্ট কার্ড' কথাটা লিখে দিল। একজন বলল বাবু, একখান গামছা দ্যান।

বরদা বলল—গামছা বাড়ি থেকে আনিয়ে নেবে।

লোকটি বলল— বাড়িত কেউ নাই উয্ুর, ক্যাবল মাইয়া লোক আছে, তারা ত আইবার পারব না।

তখন বরদা তার টিকেটে 'গামছা' লিখে দিল। অতঃপর কয়েকজনকে অতিক্রম করে যাবার পর পিছন থেকে একজন বলল—উয্ুর আমার নালিশ।

বরদা ফিরে চাইল। সন্তোষ বলল—এতক্ষণ কি

করতে আছিলা? বাবু ০ম খনু হান্ তখন কও নাই ক্যা?

লোকটি বরদাকে উদ্দেশ করে বলল—মনো আছিল না উজ্জুর, মাপ করেন।

বরদা জিজ্ঞাসা করল—কি চাই তোমার?

—আই-গ্যা, একখানা ফেটিশন্ (পিটিশান) ছান।

বরদা—কেন?

—খাবার আমার ট্যাহা ২০ না আছে, ঢেল গেটে আনাইবার চাই।

—আচ্ছা। বলে বরদা টিকেটে দরখাস্ত মঞ্জুর করল। অন্য একটি বন্দী বলল বাবু, দুইবান্ বিড়ি, ওগলা মেচ।

গোকুল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু ভাবে চাইতে বরদা বলল—বান্ মানে বাণ্ডিল, আর ওগলা মেচ মানে একটা দেশলাই।

দুইজনেই হেসে ফেলল। বরদা টিকেট নিয়ে দেখল, লোকটির নিজের পয়সা জমা আছে। সুতরাং তার প্রার্থনা মঞ্জুর করে গোকুলকে বলল—বিড়ি দেশলাই গভর্ণমেন্ট খরচে কোন বন্দীকে দেওয়া হয় না, শুধু হাজতীরা নিজের পয়সায় কিনতে পারে, অথবা বাড়ি থেকে আনাতে পারে।

আর কিছুদূর গেলে একজন বৃদ্ধ আসামী বলল—একখানা লুঙ্গি ছান উজ্জুর, পিন্দনে (পরণে) নাই কিছু।

বরদা টিকেট পরীক্ষা করে বলল—কেন, তোমার টিকিটে যে লুঙ্গি লেখা রয়েছে, সে কি হল?

লোকটির কোমরে একখানা ময়লা গামছার মত শতচ্ছিন্ন বিবর্ণ বস্ত্র খণ্ড বাঁধা, সেটাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল—দ্যাহেন, লুঙ্গি ফাইর‍্যা (ছিঁড়ে) ত্যানা (ন্যাকড়া) অইয়া গেছে গা। একখান দ্যান বাবু।—বলে করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

অগত্যা বরদা তার টিকিটে লুঙ্গি লিখে দিল। কিছু দূর গেলে একটি লোক বলল—উজ্জুর, চার প্যাক বিড়ি দ্যান, আর আগুনের বাণ্ডিল।

গোকুল বরদাকে প্রশ্ন করল—আগুনের বাণ্ডিল কি?

বরদার হয়ে সন্তোষ হেসে জবাব দিল—স্যার, এরা একেবারে পেরাযের মানুষ, ম্যাচের কয় আগুনের বাণ্ডিল।

বরদা লোকটির প্রার্থনা মঞ্জুর করল। অপর একজন আসামী চিঠি চাইলে বরদা যেই টিকিটে 'পোষ্টকার্ড' লিখেছে, লোকটি বলে উঠল—একখান ইন্‌ভেলাপ (এন্‌ভেলাপ অর্থাৎ খাম) দ্যান উজ্জুর!

বরদা জিজ্ঞাসা করল—কেন?

—হক্কুকাটে (পোষ্টকার্ডে) সারব না। বহুৎ কথা আছে।

বরদা—কার কাছে লিখবে?

—আইগ্যা, পরিবারের কাছে।—বলে লজ্জিতভাবে ফিক করে হেসে ফেলল।

বরদা টিকিটে 'পোষ্টকার্ড' কেটে 'এনভেলাপ' লিখল, এবং টিকিট খানি প্রত্যর্পণ করে জিজ্ঞাসা করল—তুমি নিজে লিখতে পার?

—না উজ্জুর, আইটারে (রাইটার) লিখব।

বরদা—তবে, তুমি পরিবারকে কি লিখবে সে ত জানতে পারবে!

লোকটি পুনর্বার মৃদু হেসে মাথা নিচু করে জবাব দিল—আইগ্যা, কি করণ?

অর্থাৎ কি আর করা যাবে, নিরুপায়!

উপরে যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, বন্দীদের সাধারণ নালিস ওর ভিতরেই থাকে। কদাচিৎ পরস্পর মারামারি বা অন্য কোন বিষয়ের অভিযোগ আসে। সে গুলির তদন্ত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রথম ওয়ার্ডের ফাইল সারা হলে ওরা আর একটি ওয়ার্ডে গেল। সেখানেও প্রায় আড়াইশো লোক। তারপর আর একটি, সেখানকার জনসংখ্যা দুশো। এইভাবে প্রায় আটশো লোকের ফাইল শেষ করে বরদা বলল—হাজতীদের ত শেষ করলাম। এইবার উন্মাদ আশ্রমের পালা।

গোকুল—মানে, পাগলদের ওখানে?

—হ্যাঁ।

—কত পাগল এখানে আছে?

—তা, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হবে।

· বলেন কি।

-হ্যাঁ। আর তাই কি সব এক জাতের? নানা ধরণের পাগল জেলখানায় আছে। ওদিকে যেতে যেতে সব বলছি আপনাকে। তার আগে দাঁড়ান, একটু ধোঁওয়া খাওয়া যাক।—বলে দুজনে দুটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করল। গোকুল প্রশ্ন করল—আচ্ছা বরদাবাবু, জেলখানার ভিতরে ধূমপান নিষিদ্ধ না?

একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে বরদা উত্তর দিল—সাধারণভাবে তা-ই বটে, তবে আমরা চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে থাকি, আমাদের আর ও নিয়ম অত মেনে চলতে গেলে চলে না।—বলে একটু হাসল।

(নয়)

বিকৃতমস্তিষ্ক বন্দীরা যে ওয়ার্ডে আবদ্ধ থাকে, অতঃপর দুজনে সেইদিকে চলল। বরদা বুঝিয়ে দিল, পাগল প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, এক নিরপরাধ, দুই অপরাধী। যারা নিরপরাধ, তাদের আত্মীয়স্বজন তাদেরকে সামলাতে না পেরে সরকারের তত্ত্বাবধানে রেখেছে। যদি ভাল হয়ে যায়, তবে এদের আপনজনের কাছে প্রত্যর্পণ করা হয় অথবা ছেড়ে দেওয়া হয়। নতুবা জেলে রেখে চিকিৎসা করা হয় এবং রাঁচী উন্মাদ আশ্রমে 'সিট' পাওয়া গেলে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর যারা অপরাধী, তাদেরও দুটি শ্রেণী আছে—এক, যাদের মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য বিচারই হতে পারল না। আর দুই, যারা বিচারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু অপরাধ করবার সময় মাথা খারাপ ছিল বলে যতদিন না মস্তিষ্ক স্বাভাবিক অবস্থায় আসে ততদিন কারাদণ্ড মুলতুবি রেখে চিকিৎসা করান হয়। এই উভয় শ্রেণীকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাগারে আবদ্ধ থাকতে হয়। তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় এলেও কিছুদিন পর্যবেক্ষণাধীন রেখে তারপর যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়। পাগলদের এইসব প্রকারভেদ বর্ণনা করে বরদা বললেন এই যে এসে পড়েছি, আসুন।

দুজনে ভিতরে প্রবেশ করল। মানুষ-সমান উঁচু পাঁচিলে ঘেরা সেল-ব্লক। তাতে এদিকে কুড়ি ওদিকে কুড়ি এই মোট চল্লিশটি সেল থাকে। প্রত্যেক সেলে একজন করে পাগল থাকে। দুদিকেই সেলগুলির সামনে ছাদ দেওয়া চওড়া বারান্দা। বরদা বলল—সামনের এই যে কুড়িটা সেল দেখছেন এখানে যাদের মাথা একটু ভাল বা যারা সেরে গেছে এমন পাগলদের রাখা হয়। আর পিছনের কুড়িটা সেলে যারা বেশি খারাপ তাদের রাখা হয়। পিছনের সেলের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেই ভায়োলেন্ট। কারও কারও আবার আত্মহত্যার প্রবণতা আছে। তাদের ওপর খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। কখনও কখনও দু'এক জনের হাতে হাতকড়িও দিতে হয়, যাতে তারা নিজের দেহ জখম করতে না পারে। এরা বেশির ভাগই উলঙ্গ হয়ে থাকে। খাবার দাবার কেউ বা খায়, কেউ বা খায় না, ছড়িয়ে ফেলে দেয়। এদের জোর করে ধরে খাইয়ে এবং স্নান করিয়ে দেওয়ার জন্য লোক ঠিক করা আছে।

গোকুল জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা পাগলদের সকলেই সেলে থাকে, না?

বরদা—নিশ্চয়ই। ওরা একসঙ্গে থাকলে কখন কি অঘটন ঘটাবে তার ঠিক কি?

—ওরা কি সর্বদাই ঘরে বন্ধ থাকে?

—না। যারা সব সময়েই অপরকে মারতে বা তাড়া করতে যায়, কেবল তারাই বন্ধ থাকে, বাকি লোকদের সকালে বিকালে খুলে দেওয়া হয় এবং যারা একেবারে ভাল হয়ে গেছে তাদেরকে এই এনক্লোজারের মধ্যে ইচ্ছামত বেড়াতেও দেওয়া হয়।

গোকুল—বাঃ। বন্দোবস্ত ত খুব ভাল দেখছি আপনাদের।

বরদা—হ্যাঁ' তা ত নিশ্চয়। সরকারি বন্দোবস্ত কখনও খারাপ হতে পারে?

বারান্দায় উঠে প্রথম সেলের সামনে এসে ভিতরের বন্দীকে লক্ষ্য করে বরদা বলল—কি অনিল, ভাল আছ-ত?

অনিল আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বলল—আই গ্যা বালা আছি বাবা।

বরদা—কিছু চাই তোমার ?

—আইগ্যা। একখান্ ইন্‌ভেলাপ দ্যান।—বলে টিকিটখানা বাড়িয়ে দিল। বরদা টিকিটে এনভেলাপ লিখে টিকিটখানা ফেরৎ দিতে লোকটি আবার আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসল। এই তার ঊর্দ্ধতন কর্মচারীদের প্রতি অভিবাদন। সেখান থেকে আর ও দু-তিনটি সেল অতিক্রম করে একটির সামনে এসে বরদা বলল—কি খবর রবি ?

ভিতরের আসামীটির দিকে দৃষ্টিপাত করেই গোকুল বুঝতে পারল সে প্রকৃতিস্থ নয়। তার চোখ দুটি দ্রুতবেগে ঘুরছে এবং তা থেকে একটা কঠিন হিংস্র ভাব ফুটে বেরুচ্ছে, দীর্ঘ রুক্ষ চুল এবং বিশৃঙ্খল গোঁফ দাড়িতে মাংটা মস্ত বড় দেখাচ্ছে। বরদাকে দেখে তার ঘূর্ণায়মান শ্বাপদ চক্ষু দুটি নিমেষের জন্য স্থির হল, এবং সে কর্কশস্বরে প্রশ্ন করল—আমারে রবি কইলেন ক্যান্ ?

বরদা—কেন, রবি ত তোমার নাম।

—দুর অ। রবি আমার নাম অইব ক্যান্ ?

—তবে কি তোমার নাম ?

—আমার নাম ? আমার নাম বরদা ভিপ্.টি ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

তার আকস্মিক অট্টহাসিতে ঘর যেন ফেটে পড়বার উপক্রম করল এবং বরদা ও গোকুল উভয়েই সকচিত হয়ে উঠল। দেখল, তার দুই পাটি দাঁত সেই অস্বাভাবিক হাসির বেগে বীভৎসভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছে। গোকুলের মনে হল, মানুষ নয়, একটা গোরিলা যেন পিঞ্জরের ভিতর থেকে দাঁত বার করে তাদের বিদ্রূপ করছে! বরদা নিকটবর্তী সিপাইকে জিজ্ঞাসা করল—রামস্বরূপ, এ ত এতদিন মোটামুটি ভালই ছিল, কবে থেকে এ রকম হয়েছে ?

রামস্বরূপ—আজ চার পাঁচদিন থেকে হুজুর।

বরদা—কেন হল ?

রামস্বরূপ—কিছু বুঝতে পারছি না। তবে ওদনার পাঁচদিন আগে এর বাড়ি থেকে দেখা করতে এসেছিল।

বরদা—ওঃ, তা হবে। ডাক্তারবাবু জানেন ত ?

রামস্বরূপ—হাঁ হুজুর। তিনি রোজ দু'বেলা আসেন।

বেশ।—বলে বরদা গোকুলকে নিয়ে এগিয়ে চলল। এর পরের তিনটি সেলের আসামীরা একটু ভাল। তারা বিড়ি প্রভৃতি মামুলি জিনিষ চাইল। তার পরের সেলের লোকটি কিছুই বলল না, শুধু নমস্কার করল। বরদার প্রশ্নের উত্তরে ঘাড় নেড়ে জানাল, ভালই আছে। বরদা গোকুলকে বলল—এই লোকটি কথা কয় না। প্রায় ছ-মাস হল এখানে এসেছে, অথচ আজ পর্য্যন্ত কেউ ওকে একটাও কথা বলতে শোনেনি। কিন্তু এখানে আসবার পূর্বে স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা কইত।

গোকুল—তাই নাকি ? আশ্চর্য্য ত ! কি জন্য এ এসেছে ?

বরদা—ঘর জালিয়ে দেওয়া। ঘরে আগুন দিয়ে একটা লোককে পুড়িয়ে মেরেছে।

গোকুল—বলেন কি ! বাব্বাঃ ! শুনলেও ভয় হয়।

পরের দুটি সেল পেরিয়ে তৃতীয়টির সামনে আসতেই ভিতরের আসামী বলল—হুজুর, আমার নালিশ।

বরদা—কি ?

—আমার পরিবারের লগে দেখা করুম।

—তোমার পরিবার কোথায় ?

—ক্যান্, আমাগো বাড়িত্ (বাড়িতে)!

—কোথায় তোমাদের বাড়ি ?

—আইদ্যাবাদ।

বরদা গোকুলকে বলল—জায়গাটার নাম আদিয়াবাদ, এখানকার লোকে উচ্চারণ করে আইদ্যাবাদ। লোকটিকে বলল—আচ্ছা, ব্যবস্থা করছি।

বলে এগিয়ে যাবার উপক্রম করতেই লোকটি বলল—হোনেন বাবু, কবে হ্যাংা অইব ?

বরদা—দেখা যাক, তার ব্যবস্থা করতে হবে ত।

—কবে ব্যবস্থা অইব ? গত কাইলে কইলেন ব্যবস্থা করতে আছি, আইজও ব্যবস্থা অয় নাই ! তাইলে বুঝি

আর ওইব না! অরে, খেন্দী রে, তর লগে বুঝি আর দ্যাখা ওইল না!—বলে হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ আরম্ভ করল।

গোকুলের হাত ধরে বরদা বলল—চলে আসুন। সরে এসে বলল—ও ওর স্ত্রী খেঁদীকে খুন করে এসেছে। স্ত্রীকে নাকি ও খুব ভালবাসত, কিন্তু তার চরিত্রে সন্দেহ হওয়ায় তাকে খুন করে। খুন করবার সময় ও খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার পরেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। এখন অনেকটা সেরেছে বটে, কিন্তু ওর ধারণা খেঁদী এখনও বেঁচে আছে। তাই প্রত্যেক ফাইলেই তার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত নালিশ করে।

আরও কয়েকটি সেল পার হয়ে দুজনে এধারের শেষ সেলের সামনে এসে দাঁড়াল। ভিতরের আসামীটি মুখে একরকম অদ্ভুত বাঁকা হাসি ফুটিয়ে ডান ভ্রূ তুলে ওদের দিকে তাকাল। মুখের বাঁকা হাসিটুকু কিন্তু লেগেই রইল। বরদা জিজ্ঞাসা করল—কি যতীন, ভাল আছ?

যতীন উত্তর না দিয়ে বলল—তোমার টুপিটা আমায় দাও দিকিন সাহেব।

উচ্চারণে বোঝা গেল লোকটি পশ্চিমবঙ্গীয়। বরদা জিজ্ঞাসা করল—কেন, টুপি নিয়ে কি করবে?

ওষ্ঠাধরে একএকার 'পিচ্‌' শব্দ করে যতীন উত্তর দিল—চৌকা থেকে ভাত আনতে যাব।

গোকুল বরদাকে জিজ্ঞাসা করল—চৌকা কি?

বরদা—এদেশে রান্নাঘরকে চৌকা বলে। অনেকে পাকের ঘরও বলে।

যতীনের উদ্দেশ্যে বলল—কেন, ভাত আনতে গেলে টুপির দরকার কিসের?

যতীন জবাব দিল—বুঝলে না? আমাকে ত এখন এখান থেকে বেরুতে দেবে না, তাই তোমার টুপিটা পরে যেতে চাই।

বরদা—ওঃ। তা, তুমি ত আগে হাঁসপাতালে ছিলে। এখানে কবে এলেহ, আর কেনই বা এলে?

যতীনের ঠোঁটের দুই প্রান্ত আরও সঙ্কুচিত হয়ে বাঁকা হাসিটিকে অধিকতর তীক্ষ্ণ করে তুলল। বলল—এসেছি কি আর সাধে? তোমাদের ডাক্তার পাঠিয়েছে! কেন পাঠিয়েছে সে কথা তাকেই জিজ্ঞেস করগে যাও, যাও না!—বলে দুহাতে সেলের লৌহ দরজার দুটি গরাদে ধরে শরীরটাকে অল্প অল্প দোলাতে লাগল। সিপাই রামস্বরূপ কাছেই ছিল, সে ব্যাপারটা বরদাকে বুঝিয়ে দিল—ও ত এতদিন হাঁসপাতালে ছিল হুজুর, সেখানে ইদানিং বড় জালাতন আরম্ভ করেছিল। একে ত ওর একটা বাতিক আছে—কারও ছোঁওয়া ভাত খাবে না, বিশেষতঃ আসামীদের ছোঁওয়া। এতদিন সিক (পীড়িত) সিপাইদের চৌকা থেকে যা ইচ্ছে হত নিজে গিয়ে চেয়ে আনত, কেননা সেখানে একজন সিপাই রাঁধে। পাগলমানুষ বলে এতদিন কেউ কিছু বলে নি, কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে যখন তখন গিয়ে বড্ড বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছিল। একদিন ভাত-তরকারি পছন্দ হয়নি বলে যে সিপাই ওখানে রাঁধে তার গায়ে থালাশুদ্ধ ভাত-তরকারি ছুঁড়ে মেরেছিল। তাই ডাক্তারবাবু জালাতন হয়ে ওকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখানে এসে মুস্কিল হয়েছে এই যে, ও কিছুই খাচ্ছে না। ফাইলের ভাত তরকারি খায় না, বলে ওতে পায়খানার গন্ধ ছাড়ছে। তাই কদিন থেকে শুকনো চিঁড়ে খেয়ে আছে।

বরদা—তবে ত মুস্কিল। ডাক্তারবাবু কি বলেন?

রামস্বরূপ—তিনি ত রোজ দেখছেন। বলেছেন, এইভাবে থাক, পরে যা হয় দেখা যাবে।

যতীন এতক্ষণ রামস্বরূপের কথা শুনছিল। শেষ হলে বলল—উঃ! ফাইলের ভাত খাবে। তোমরা খাওগে ফাইলের ভাত! যতীন ওসব খায় না বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে বীরদর্পে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। মুখে সেই বিদ্রূপপূর্ণ হাসির রেশ লেগে আছে, যেন জগতের সমস্ত লোক অপদার্থ, আর টাংকারি ভিন্ন আর কিছুই তাদের প্রাপ্য নয়। মিনিট খানেক সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বরদা বলল—চলুন। ও দিকটা এক নজর দেখে আসি।—বলে যেদিকে বদ্ধ পাগলেরা থাকে সেদিকে গেল। ওখানকার ভারপ্রাপ্ত সিপাই

ঘুরিয়ে দিল, পাগলগুলির অবস্থা পূর্ববৎই আছে। খাওয়ান, স্নান করান, চিকিৎসা প্রভৃতি যথানিয়মে চলছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে দুজনে উচ্চশ্রেণীর বন্দীদের রন্ধনশালায় প্রবেশ করল। বরদা বুঝিয়ে দিল—এরা হচ্ছে ডিভিসান টু, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিভাগের কয়েদী। সাধারণ কয়েদীরা হল ডিভিসান থ্রী, অর্থাৎ তৃতীয় বিভাগের। এদেরও পরিশ্রম করতে হয়, তবে গমভাঙ্গা, জল তোলা বা রান্না এসব কাজ দেওয়া হয় না। এরা বেশীর ভাগই সেলাই, চরকা প্রভৃতিতে কাজ করে, কেউ বা অন্যান্য কয়েদীদের কাজের হিসাবপত্র রাখে, অথবা অফিসারদের ফরমাসমত দরকারী কাজে সাহায্য করে। এদের জামাকাপড় সাধারণ ভদ্রলোকের মত, খাওয়া-দাওয়াও ভাল—রোজ মাছ অথবা মাংস ডিম পাঁউরুটি, মাখন, চা, ইত্যাদি। চলুন, এদের এবেলা কি রান্না হয়েছে দেখে আসি।

দুজনে এসে ডিভিসানটুদের রান্নাঘরে প্রবেশ করল। এরা সংখ্যায় মাত্র কুড়ি বাইশ জন বলে আহার্যের পরিমাণও সেই অনুপাতে। তিনজন সাধারণ কয়েদী এখানে রান্না করে, উচ্চশ্রেণীর বন্দীদের একজনের তত্ত্বাবধানে। তাকে বরদা জিজ্ঞাসা করল—কি নবীন বাবু, আপনাদের এ বেলা কি মাছ পাক হয়েছে?

লোকটি বলল—আইগ্যা, আইড় মাছ।

বরদা—আপনাদের ত প্রায়ই শুনি 'আইড় মাছ'। ঐটেই বুঝি আপনারা বেশী পছন্দ করেন?

লোকটি সলজ্জভাবে মৃদু হেসে বলল—আইগ্যা, ওটার আবার বাদ কিসা!

বরদা—ও আচ্ছা বেশ! বলে গোকুলের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল কি মাছ, বুঝতে পেরেছেন?

মাথা নেড়ে গোকুল বলল—না, বুঝলাম না ত।

বরদা—কথাটা হল আড় মাছ। ট্যাংরা মাছের মত দেখতে, কিন্তু বেশ বড় সাইজ। নদীতে পাওয়া যায়। অনেকে বলে আড়-ট্যাংরা! তাই থেকে সংক্ষেপে আড়, এবং এদের ভাষায় 'আইড়'।

বরদা নবীনকে জিজ্ঞাসা করল—আজ এবেলা কি কি রান্না হয়েছে?

নবীন—আইগ্যা, মাছ, আলুর রসা, শুক্তানি আর পটল ভাজা।

বরদা—ও, তাহলে ক'পদ হল?

গোকুল জিজ্ঞাসা করল—পদ মানে কি, ভ্যারাইটি?

বরদা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

নবীন উত্তর দিল—আইগ্যা, চাইর পদ।

গোকুল রহস্য করে বলল—তাহলে চতুষ্পদ বলুন!

নবীন লজ্জিত মৃদুহাস্যে মুখ নিচু করল এবং মাথা চুলকে বলল—আইগ্যা—

বরদা বলল—আচ্ছা, বেশ বেশ। —আসুন গোকুল বাবু, এবার অফিসে যাওয়া যাক, সন্ধ্যা হয়ে গেল।

অফিসের দিকে যেতে যেতে বরদা বলল—জেলখানার কতকগুলো ব্যাপার ত দেখলেন। তবে কারখানা কোনোটা দেখা হল না, কারণ আজ রবিবার কি না। এগুলো রবিবারে বন্ধ থাকে। অন্য একদিন কাজ চলবার সময় আসবেন সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব।

গোকুল প্রশ্ন করল—মোটামুটি কি কি কাজ হয় এখানে?

বরদা—অনেক কাজ। সবচেয়ে বড় হল কম্বলের কারখানা। এখানে বহু রকমের হাজার হাজার কম্বল বছরে তৈরী হয়। বাংলাদেশের আর কোন জেলে কম্বলের ফ্যাক্টরী নাই কিনা, তাই বাংলার সব জেলের কম্বল ত এখান থেকে যায়ই, তাছাড়াও পুলিশের কম্বল, বহু হাসপাতাল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য নানা রকম দামী, ডিজাইন ও রঙের কম্বল এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। এইটেই হল এখানকার সব চেয়ে বড় ব্যবসা। এর পর হচ্ছে তাঁত। কয়েদীদের কাপড় ছাড়াও নানা রকম ঝাড়ন, গামছা, তোয়ালে, বিছানার চাদর, এমন কি মিহি ধুতি শাড়ি পর্যন্ত মাঝে মাঝে তৈরী হয়। বাহিরে এ সব জিনিষের খুব চাহিদা আছে। আমরাও অনেকে কিনি। এ ছাড়াও সতরঞ্চি, আসন, কার্পেট, ভাল ভাল টেবিল চেয়ার, পাপোষ, এ সবও তৈরী হয়। এখান থেকে বছরে গভর্ণমেন্টের সবশুদ্ধ পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার ওপর লাভ হয়।

বিস্ময়ে গোকুল বলল—বলেন কি! বৃহৎ ব্যাপার দেখছি।

বরদা—নিশ্চয়! বার তের শো লোক খাটছে, সোজা কথাত নয়।

দুজনে অফিসে ফিরে এল। ততক্ষণে আলো জ্বলেছে। বাইর থেকে অফিসের ভিতরে দৃষ্টিপাত করে বরদা বলল—ঐ যে, জেলার বাবু এসে গেছেন দেখছি। আসুন ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।

অফিস ঘর একটাই, বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা। দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমটাই জেলারের অফিস। ওধারের দুটো অংশে ডেপুটি জেলার ও কেরাণীরা বসেন। জেলারের কাছে এসে বরদা গোকুলের পরিচয় করিয়ে দিল—জেলারবাবু, ইনি হচ্ছেন গোকুলবাবু,—কোম্পানীর একাউণ্টেণ্ট। এঁর কথাই সেদিন আপনাকে বলেছিলাম।

স্মিতমুখে নমস্কার করে জেলার যতীশ বাবু বললেন—আসুন, আসুন, নমস্কার। বসুন।

গোকুল প্রতিনমস্কার করল এবং দুজনেই বসল। যতীশ বাবুর বাড়ি কুমিল্লা জেলায়, বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। ভদ্রলোক বেশ রসিক ও সদালাপী। মিনিট পাঁচ-সাত তাঁর সঙ্গে আলাপ করে দুজনে উঠে এসে বরদার টেবিলের দুপাশে বসল। সেখান থেকে দুই গেটের মধ্যবর্তী পথটা বেশ দেখতে পাওয়া যায়। একটু পরেই একদল সিপাই মার্চ করে ভিতর থেকে এসে বাইরে চলে গেল। এদের ডিউটি শেষ হয়েছে, নূতন দলকে ডিউটিতে রেখে এরা চলে যাচ্ছে। অফিসের সামনে দিয়ে যাবার সময় দলের অগ্রবর্তী জমাদার চিৎকার করে বলল—আইজ লেফ্‌ট্। সব সিপাই বাঁ-দিকে, অর্থাৎ এদিকে, চাইতে চাইতে গেল। শেষ লোকটি দরজা পার হবার পর আগের জমাদার হাঁকল—আইজ ফ্রণ্ট। আবার সবাই সামনে দৃষ্টি করল।

গোকুল জিজ্ঞাসা করল—কি বললে?

বরদা,—প্রথমে বলল—আইজ লেফ্‌ট্। সবাই বাঁ-দিকে চাইল। তারপর বলল আইজ ফ্রণ্ট। সবাই সামনে চাইল। মার্চ করে যাবার সময় অফিসার যেদিকে থাকেন সে দিকে এইভাবে চোখ ফেরাতে হয়। এটা এক রকমের স্যালিউট আর কি! জেলারবাবু এখন ওদের বাঁদিকে রয়েছেন, তাই আইজ লেফ্‌ট্ হল, ডান দিকে থাকলে আইজ রাইট্ হত। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন তাঁর অফিসে বসেন, তখন তিনি যেদিকে পড়েন সেই-দিকে চোখ ফেরাতে হয়।

গোকুল হেসে বলল—বাব্বাঃ। এতও আছে আপনাদের! আচ্ছা বরদাবাবু, এবার তাহলে উঠি। অনেক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলাম আপনার এখানে এসে, যেগুলো অন্য কোথাও হয়ত পাওয়া সম্ভব হত না।

বরদা—তা বটে। চলুন, আমিও যাই। আমার ওখানে একটু চা খেয়ে যাবেন।

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। বরদার বাসায় চা ও জলযোগে আপ্যায়িত হয়ে এবং তাকে নিজের বাসায় মাঝে মাঝে আসবার নিমন্ত্রণ করে গোকুল রাত্রি আটটার সময় বাসায় ফিরে এল।

এই এক দিনের পরিচয়েই জেলখানা ও তার অধিবাসিরা গোকুলের হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গেল। সমাজের চক্ষে, আইনের চক্ষে অপরাধী সহস্র সহস্র ব্যক্তি আপনাপন পারিবারিক উদ্যান থেকে উৎপাটিত হয়ে এখানকার রুক্ষভূমিতে রোপিত হয়েছে। তারপর প্রাকৃতিক নিয়মে এখানকার কঠিন মৃত্তিকা থেকে সারজল গ্রহণ করে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে এখানেই একটি উদ্যান রচনা করেছে। হয়ত এ কাঠগোলাপ, কাঠচাঁপার বাগান, তথাপি এর কি কিছুমাত্র সৌরভ নেই?

গোকুলের মনে হল, আছে।

বাউলগান ঃ আধুনিকতা ও প্রচার

অচিন্ত্য বসু

বাংলা দেশে বাউলগান একটি বিশেষ রীতির গান। একটি বিশিষ্ট মতবাদের গান। বাউল গান আদর্শে তাই সারি, জারি, ভাটিয়ালির থেকে পৃথক। বাউল গানের মধ্যে দেহতত্ত্বের যেটুকু আছে, তা সাধন ও ভজনের। বিশিষ্ট ভাবে স্বাতন্ত্র রক্ষা করাই হোল বাউল গানের মূল বৈশিষ্ট্য।

বাউলগানের মূলকথা সহজিয়া সুরের আকর্ষণ। সহজ গানে তার মনের মানুষের আহ্বান হোল বাউল গানের বক্তব্য। সেই মনের মানুষ কিন্তু আমাদের প্রচলিত চিন্তাধারার ভগবান নন, তিনি স্বতন্ত্র। তার মানসিকতা, সেই সংগীত সাধনা একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারাকে কেন্দ্র কোরে গড়ে উঠেছে। বাউল গান তাই অন্যসব গায়কী ঢঙের থেকে পৃথক, এই পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

সারি, জারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, প্রভৃতি সংগীতে গানের একটি বিশিষ্ট ধারা এবং বিশিষ্ট প্রক্রিয়া আছে এবং উপলক্ষ্যেও টেকনিক বা তার পদ্ধতিগত, দিকও তাই অস্বীকার করা যায় না—সেক্ষেত্রে বাউল গানের বিশিষ্ট ভাব মূর্তি আছে এবং তার মনের মানুষের ছবি বিমূর্ত ধারার সাধনা এবং পৌত্তলিক চিন্তাধারার সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাৎ। যখন কোন বাউল গানের মাতাল হন, গেয়ে ওঠেন, 'ভালোকোরে পড়া ইস্কুলে' কিংবা নিতাই বাবু সিভিল সার্জন—তখন তার রূপকচিত্রটি সহজেই ধরা পড়ে। এই পার্থক্য তার বিশিষ্ট রূপপ্রকাশের সহায়ক।

বস্তুতপক্ষে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য যে পর্যায়ে উঠেছিল তার যথাযথ কলশ্রুতি বাউলে পাওয়া যায়, এবং জনগণের মনের মত করে তার উপস্থাপনা, তাই বাউলগানের আকর্ষণ বেশী মাধুর্য্য অনেক বেশী এবং অত্যন্ত সুন্দর।

আধুনিক কালেও তাই আধুনিক গানের সঙ্গে বাউল গান চলিত যেমন ভাটিয়ালি প্রভৃতি প্রচলিত। আধুনিককালে আধুনিক সংগীতে পুরোনো গান যেখানে চাপা পড়ে যাচ্ছে সেখানে বাউল গান পুরোনো হচ্ছেনা —তার দ্বারা লোকগীতির চিরস্থায়িত্বকেও প্রকাশ করা হচ্ছে। আজও তাই পূর্ণ দাশ বাউল কিংবা অতীতের নবনী দাসের বা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব গান, আজও পর্যন্ত আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত।

'চুল ভিজাবোনা. আমি বেণী ভিজাবো না'—

তখন সাধনপদ্ধতির মূলকথাটি বলা হয়ে যায়। 'রন্ধন করিব, ব্যঞ্জন বাড়িব, তবু হাঁড়িতো ছোঁব না, এই কথাটির মধ্যে আমরা দেখি একটি সাধন তত্ত্বের বক্তব্যকে সহজ করে বলার প্রয়াস তা তাৎক্ষণিক জনগনের কাছে সহজ বোধ্য হয়ে উঠবে। এই সব গানকে আধুনিক করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয় নি। বস্তুতপক্ষে আধুনিক করণের প্রয়োজন হয়ও না। কেননা এরা ইতোমধ্যেই প্রাণের ভাষা—আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মর্যাদা প্রাপ্ত। বরঞ্চ বাউলগানের একেবারে আদি-ভাবটি অব্যাহত রাখার চেষ্টা হয়েছে। এখনো, ভবিষ্যতে কী হবে বলে যায় না। তবে এখনও পর্যন্ত পুরোনো পদ্ধতি অব্যাহত আছে। বাউলগানের প্রচারে রবীন্দ্রনাথ নিজে যেভাবে নেমেছিলেন তা অতুলনীয়। বাউলগানের দেশপ্রেম থেকে ভগবৎ প্রেম' আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা থেকে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা পর্যন্ত সর্বস্তরে প্রচার করেছিলেন—তাই রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা পরবর্তী কালে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রচেষ্টাও অনেকটা বাউলগান সম্পর্কে সচেতন করেছে।

ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিস্থানীয় সুর হিস'বে বাউলগান একদিন পৃথিবী জয় করবে এই আশা করা অন্যায় নয়।

পৌষ-সংক্রান্তির দিনে জয়দেবের মেলায় বাউলগানের চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্নস্থান থেকে নানাজাতের নানামানুষ পৌষ-সংক্রান্তির মেলায় বাউলগানের উৎসবে এসে প্রমাণ করেন বাউলগান একটি স্বতন্ত্র জাতের পৃথক প্রকরণের।

সেখানে বা'লের সুরের মাদকতায় অন্তরে তীব্র স্বরে আবেগ ছড়িয়ে দিয়ে যায়—লোকগীতির একটি বিশিষ্ট আদর্শকে তা প্রসার ও প্রচার করে। বাউল গান তাই আধুনিক যুগের একটি অনবদ্য সময়ের রূপচিত্র।

পূর্ববংগ ও পশ্চিমবঙ্গের বাউলগানের দুটি পৃথক চিত্র আছে, এবং সেই পার্থক্য তাই পদ্ধতিগত।

আধুনিক কালে বাউলগান ক্রত ছড়িয়ে পড়ছে। পদ্ধতিগতভাবে তাই ভাটিয়ালি, সারি জারি' বাউলের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পারছে না। শচীন দেবের 'পদ্মার ঢেউরে মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম দিয়ে যারে" এই ভাটিয়ালি আধুনিকতাই, ধোবার মেয়ের পা ধুয়ে জল খেলে' যে চণ্ডীদাসকে উল্লেখ করে তার প্রভাব অনেক বেশী স্থায়ী হয়।

বাউলগানে যে কোন শব্দ ভাব, ভাষা, আইডিয়া ঢোকান যায়—তাই নিতাইবাবুর পার্লামেন্টে মিটিং বসেছে, বলে বাউল ঢঙে গাইলে কোন আপত্তি লাগে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে আধুনিক প্রচার হিসাবে বাংলার বাউলগান ভারতের একটি বিশিষ্ট ভাবমূর্তিকে উপস্থিত করে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মূল্য কখনও ম্লান হবে না। অতি রাজনৈতিক ভাবধারাকে বাউলের মাধ্যমে নতুন ভাবেই উপস্থিত করা সম্ভব। সেই গ্রহনীয়তার ক্ষমতায় তাই বাউলগান অত্যন্ত প্রভাব মাধ্যম।

দুঃখের হোমাগ্নিশিখা জ্বলে

শান্তশীল দাশ
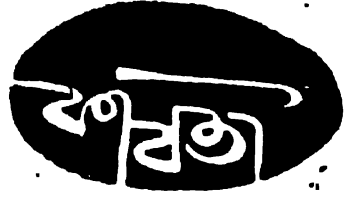
সে-দিন কি আসবেনা কোনদিন এই পৃথিবীতে,
যে-দিন পৃথিবী হবে স্নিগ্ধ শান্ত শান্তির আগার,
হিংসা দ্বেষ হানাহানি থাকবেনা আর কোনখানে ;
চারিদিকে উদ্‌ভাসিত জীবনের প্রসন্ন আলোকে ?
সে-আদিম যুগ হতে মানুষের কত না সাধনা ;
কত ত্যাগ, কত দুঃখ, কত না জীবন বিসর্জন ;
শুধু সে-জীবন-তৃষ্ণা, যে-জীবনে ভূমার প্রসাদ।
মৃত্যু হতে অমৃতেরে উত্তরণ-কামনার শেষ।
সে পাওয়া হয়নি আজো ; দুঃখের হোমাগ্নিশিখা জ্বলে,
সেখানে আহুতি দেয় তপঃক্লিষ্ট দুই চারিজন ;
আর সব পথভ্রান্ত, নিত্য শুধু ঘটায় প্রমাদ,
গড়ে না, শুধুই ভাঙে, চারিদিকে অশান্তি কেবল।
এ ভ্রান্তির শেষ হবে—আজো ওই দুইচারিজন
ধ্যানমগ্ন, স্বপ্ন দেখে ; সব আঁধার শেষ হবে, হবে ;
আসবে প্রসন্ন দিন, স্নিগ্ধ শান্ত হবে এ ধরণী
মানুষ চলবে পথে একসাথে, কণ্ঠে জীবনের
উদাত্ত সঙ্গীতধ্বনি—সে ধ্বনিতে সত্য শিব আর
সুন্দরের ঐকতান। সেই স্বপ্ন রূপ নেবে কবে ?

হে বন্ধু বিদায়

আবু সঈদ

সায়াহ্নের ক্লান্ত সূর্য
পশ্চিমদিগন্তে অস্তগামী।
অন্তরে ধ্বনিত তার
একটি জিজ্ঞাসা—:
সাক্ষ্য রেখে ইতিহাস,
অসংখ্য মুক্তিকামী,
ব্রিটিশের বেয়নেট,
কারার নির্যাতন,
ফাঁসির রজ্জু—
হাসিমুখে—
আলিংগন করে গেল সেকি,
এই দারিদ্রের হাহাকার আর
প্রতিকারহীন অবিচার—
মাৎস্যন্যায় প্রতিষ্ঠার তরে?
অন্নের অভাব,
শিক্ষার অভাব,
কর্মের অভাব
একদিকে;
দেশের ভাগ্য নিয়ে
অগণিত পার্টি আর নেতা
ছিনিমিনি খেলে
অন্যদিকে।

গণতন্ত্র……সাম্যবাদ……
মুখোশ আড়ালে
শবের প্রত্যাশী যত
বর্ণচোরা শৃগাল শকুন
কালের প্রহর গণে।
মধ্যাহ্নের তেজোদৃপ্ত
দীর্ঘ সংগ্রাম—
পুরনো অতীত কথা
দিনান্তে শ্রান্ত দেহ মন
সুষুপ্তির ক্রোড়ে আজ
শান্তি পেতে চায়।
কর্মের কোলাহল…
উলংগ বাস্তব
ঘৃণ্য এই রাজনীতি
কুৎসিত এ পরিবেশ
হোক শেষ তোমার জীবনে
ব্যথা ম্লান এই সন্ধ্যায়
অন্তরে বাহিরে তাই
পূরবীর সুরে বাজে
হে বন্ধু বিদায়।

(শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জীর ট্রেড ইউনিয়ন
আন্দোলন থেকে অবসরগ্রহণ উপলক্ষে)

আসুক না ঘুম

মনোরমা সিংহরায়।

আকাশ নিকষ কালো।
তবু যদি ঢেউ তুলে তুলে
সাগর পারের ঘুম আসে দুই চোখে
স্বপ্ন কিছু দেখবো না,
শুধু ঘুম অতলতা নিয়ে
ডোবাবে আমায় যতো মন্দ আর ভালো॥

* * *

কিছু জানবো না
কবে তুমি ডেকেছিলে—শুধু একবার।
হৃদয়ের করুণ প্রার্থনা
শুধু গান হয়ে বেড়ায় কি ভেসে?
আকাশের অচেল হাওয়ায়
গুঞ্জরিত যূথীবনে মালতীলতায়॥

* * *

হায়, নিরুপম সেদিন গিয়েছে চলে
গোলাপের শুক শাখে ফোটেনি গোলাপ
পাতাও গিয়েছে ঝরে
শুক মাটি আকাশের দিকে
আর্ত চোখে চায়।
জল নেই, হাওয়া নেই ধূ-ধূ করে অনন্ত প্রান্তর
যেন শুধু—হাহাকার করে
তুমি, শুধু তুমি কখনো আসোনি বলে॥

* * *

আসে যদি আসুক না ঘুম।
না যদি কখনো জানি
কখনও ডেকেছিলে কিনা
না-ই জানবো না॥

বাংলা ও বাঙালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের অরাজকতা — এ-মহামারীর প্রতিকার কি

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি তথাকথিত রাজনৈতিক দল ক্রমাগত সাধারণ মানুষকে সর্ব্বপ্রকার বেআইনী কার্য্যকলাপে এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতার উস্কানী দিতেছে প্রকাশ্যভাবে। এমন কি কোন কোন নেতা 'প্রাণের বদলে প্রাণ' এমন কথাও বলিতে কোন প্রকার সঙ্কোচ কিংবা ভয় করেন না, এই শ্রেণীর (বিশেষ করিয়া সি পি. এম, এবং তাহার ল্যাঙ্গবোট্, ছ্যাকড়া দলগুলি) নেতাদের ধারণা যে রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য সাধনে, পার্টির কল্যাণে এবং তাঁহাদের বিচিত্র 'জনসেবার' সার্থকতার জন্য তাঁহারা যখন যেখানে এবং যাহার যা খুসী তাহাই বলিতে পারেন, কারণ ভারতীয় সংবিধানে 'ফ্রিডাম্ অব্ স্পিচ' অর্থাৎ বাক্ স্বাধীনতা সকল ভারতীয় নাগরিকেরই আছে। কিন্তু সত্যই কি এই স্বাধীনতা বল্গা লাগামহীন এবং অন্যের সমপ্রকার স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করিয়া, রাজনৈতিক দল এবং দলপতিরা ইহা অবাধে প্রয়োগ করিতে পারেন? দেখা যাক —

ভারতীয় সংবিধানের ১৯নং ধারায় C L (২) ১৯৫১ সালে সংশোধিত সেক্সনে দেখা যাইতেছে—

"CL (2), as amended by the Constitution (first) Amendment Act, 1951, entitles the Legislature to impose restrictions upon the freedom of speech and expression, on the following grounds—

(i) Security of the State.
(ii) Friendly relation with foreign State,
(iii) Public order,
(iv) Decency or morality,
(v) Contempt of court,
(vi) Defamation,
(vii) Incitement to an offence

উপরে প্রদত্ত প্রায় সব কয়টি অপরাধে সি পি এম (লেজুড় দলগুলিসহ), সি পি আই, আর এস্ পি এবং আরো দু'তিনটি দলকে অবশ্যই অভিযুক্ত করা যায়। সরকারের ইহা করাও কর্ত্তব্য, যদি তাহাদের প্রশাসনিক দায়িত্ববোধ এবং এই দায়িত্ব যথাযথ পালনের ইচ্ছা এবং বিন্দুমাত্র সাহস থাকে। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গে আজ এই দুইটিরই একান্ত অভাব দেখা যাইতেছে। যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে যুক্ত-ফ্রন্ট পাপ মুক্ত রাষ্ট্রপতির শাসনে এ-রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গিক একটা প্রশাসনিক উন্নতি এবং স্বাস্থ্য দেখা যাইবে, তাঁহাদের সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে। এ-রাজ্যের প্রধান প্রশাসক এবং রাষ্ট্রপতির অযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে গোবর গণেশ ধাবন সর্ব্বভাবে নিজেকে গোময় লিপ্ত করিয়া পরমানন্দে রাজকীয় মর্য্যাদায় এবং আরামে রাজভবনে অবস্থান করিতেছেন। ধাবনের অনুধাবন শক্তি এবং প্রশাসনিক অতি-দক্ষতা দেখিয়া কেন্দ্রসরকার তাঁহাকে প্রায় পূর্ণ বিশ্রাম দান করিতেছেন। রাজ্যপালের উপদেষ্টা 'পক্ষহীন' গোষ্ঠি এখন রাজ্যের শাসন পরিচালনা করিতেছেন, একথা বলা অসঙ্গত হইবে কি? উপদেষ্টাদের সহিত রাজ্যপালের বিকৃত দৃষ্ট ভঙ্গীর যে মিল নাই, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সবকিছু সত্বেও এবং সর্ব্বভাবে 'অধম' প্রমাণিত হইয়াও ধাবন

অচল-অটল হইয়া নবীন কন্যাতাদের অর্থের পরম রাজকীয় সদ্ব্যবহার (শ্রাদ্ধ) করিতেছেন। নিজের সম্পর্কে তাঁহার যদি সামান্য ধারণাও থাকিত, তাহা হইলে আত্মসম্মান বজায় রাখিতে লজ্জায় তিনি অরণ্যবাস গ্রহণ করিতেন। কিন্তু আত্মসম্মান বস্তুটি সকলের থাকে না।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি পার্টি—যুক্তফ্রন্টের প্রথম আমল হইতেই—

Security of State, Public Order, Contempt of Court, Defamation এবং Incitement to an (and all kinds of) offence.

নির্বিচারে এবং বেপরোয়াভাবে চালাইয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য এ-বিষয়ে সি পি এম সকলের গুরু এবং প্ররোচক। পশ্চিমবঙ্গের অরাজকতা এবং বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বোলচাল, কার্য্যকলাপ এবং জনস্বার্থ বিরোধী প্রচার প্ররোচনার বিষয় বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে, কিন্তু শাসক কংগ্রেস কর্ত্রীঠাকুরাণী নিজের এবং নিজদলের আগামী নির্বাচনে পরমস্বার্থ বিষয়ে পরম অবহিত বলিয়া বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের তাঁহার সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলির (বিশেষ করিয়া সি পি আই) বিরুদ্ধে হঠাৎ কোন কঠোর ঔষধ প্রয়োগে উৎসাহী নহেন। নেহাত দায়ে পড়িয়াই তিনি সি পি এমকে তাঁহার 'স্নেহ' বঞ্চিত করিয়াছেন, করিতে বাধ্য হইয়াছেন ধাবনের মনে দুঃখ দিয়া।

কেন্দ্র সরকার শক্ত হইলে, সি পি এম যে ভাবে, জনসমাজ এবং রাষ্ট্রবিরোধী ক্রিয়া কর্ম্মে লিপ্ত ছিল এবং এখনো আছে, তাহাতে এই দেশদ্রোহী দলটিকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা যায়, বহুকাল পূর্ব্বেও ইহা করা যাইত। কিন্তু স্বাজনমূলত লজ্জা বিজড়িত বর্ত্তমান কেন্দ্রসরকার বোধহয় লোক লজ্জার ভয়েই প্রয়োজনেও কঠোর হইতে পারিতেছে না। এমত অবস্থায় বর্ত্তমান কেন্দ্রসরকারের পক্ষে একমাত্র দেশ-কল্যাণকর উচিত কাজ হইবে পদত্যাগ করা। যাহা প্রাণ থাকিতে এবং সজ্ঞানে অপমানিত হইয়াও কেন্দ্রসরকার করিতে পারিবে না।

কেন্দ্র কর্ত্রী ঠাকুরাণী কেন্দ্র কর্ণ ধারিণী তথা জাতির জননী: নিজের এবং নিজ দলের উদ্দেশ্য পূর্ণ সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ এবং অভাগা পশ্চিম বঙ্গবাসীদের 'অর্দ্ধসিদ্ধ' অবস্থায় রাখাটাই টেক্‌নিক্ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহারা অর্দ্ধ-সিদ্ধ অবস্থায় এ-রাজ্যের রাজনৈতিক তপ্তকটাহে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের বলার বা করার কিছু নাই, কারণ তাহারা আজ না-আছে বাঁচিয়া, না-গিয়াছে মরিয়া। যাক-যে-কথা বলিতেছিলাম—

কেন্দ্রসরকার কেন সি পি এমের মত বিকৃত-আদর্শযুক্ত বিদেশী রাষ্ট্রভক্ত, রাষ্ট্র এবং জাতিদ্রোহী দুর্নীতিপরায়ণ তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলিকে অবিলম্বে বে-আইনী ঘোষণা অর্থাৎ 'ব্যান্' করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন না? জ্যোতি বসু তথা সি পি এমের সহিত গোপন আঁতাত করার জন্য কেন রাজ্যপাল ধাবনকে এখনো এ-রাজ্য হইতে বিতাড়িত করা হইতেছে না (ধাবন নেহেরু-গুষ্টির আদরের দুলাল হইতে পারেন এবং নেহেরু-দুলালী প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা তাঁহাকে তাঁহার আনন্দভবনে যত ইচ্ছা আদর এবং স্নেহ দেখাইতে পারেন, কিন্তু ইহার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মত একটি অর্থাভাবক্লিষ্ট রাজ্যকে কেন ধাবন-পোষণ বাবদ অপব্যয়ের দ্বারা অধিকতর জর্জ্জরিত করা হইবে এবং হইতেছে?)

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলিকে (বিশেষ করিয়া বিকৃত-দৃষ্টি, রাষ্ট্র এবং সমাজ দ্রোহীদলগুলির কথাই বলা হইতেছে)—শায়েস্তা করিতে অসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহসে যদি না কুলায়, সেই ক্ষেত্রে, এ-রাজ্যে অন্তত পাঁচ-দশ বৎসরের জন্য সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন করিতে বাধা কোথায়? যে-ভাবে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, তাহাতে হঠাৎ এমন একটা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে যখন—সর্ব্ববিধ প্রশাসন-ব্যবস্থার ঠাট ভাঙিয়া পড়িবে। এমনিতেই একদা-খ্যাত প্রশাসনিক টিল্ ক্রেমে বেশ নরিচা

পাঁড়াইয়াছে যাহার ফলে সমগ্র কেসটাই প্রায়-জমুর অবস্থায়! এ-রাজ্যে সামরিক শাসন প্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের 'শক্ত-দল'গুলিকে ডাঁটা সমেত উৎপাটন করিয়া কয়লা খনির শুন্য গহ্বর ভরাটের কাছে লাগানো যাইতে পারে।

সি পি এমের ত্রয়ী—

বিগত বেশ কিছুকাল হইতে সি পি এমের 'রোম বার্লিন টোকিও' নেতা তিনজন—জ্যোতি প্রমোদ রামবল (গোঁয়ার) অহরহ এবং কথায় কথায় স্থানে অস্থানে পশ্চিমবঙ্গে "ভিয়েতনামী" ধরণের জন-যুদ্ধের কথা বলিতেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে তাঁহাদের জমিদারীর প্রজাদের এই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকিতে বলিতেছেন। মহাশয় প্রমোদ মহানেতা ত প্রকাশ করিয়াছেন যে—তাঁহারা এবং তাঁহাদের দল প্রস্তুত—এখন অপেক্ষা শুধু যুদ্ধ-ঘোষণা, এবং এই যুদ্ধ ঘোষণা প্রয়োজন বোধে তাঁহাদেরই হয়ত শেষ পর্য্যন্ত করিতে হইবে। ঠাকুর শ্রীজ্যোতি সোজা বলিয়া দিয়াছেন—'আত্ম'রক্ষার জন্য মানুষ খুন করিবার পূর্ণ অধিকার তাঁহাদের আছে এবং এই অধিকার সংবিধান সম্মত। জ্যোতি ঠাকুরের কথায় মনে হয়, যে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা সম্ভাব্য আক্রমণকারীকে 'লিকুইডেট' অর্থাৎ 'তরল' করিয়া দিবার অধিকার প্রাপ্ত। কিন্তু নিজেদের বেলায় সি পি এম যাহা দাবি করিতেছে, অন্যকে অর্থাৎ অ-সিপি এম-দের ঠিক সেই অধিকার দিতে রাজী আছে কি? গত দেড় দুই বছরে এ-রাজ্যে যে-সব নরহত্যা সংঘটিত হইয়াছে, যতগুলি দলীয় 'যুদ্ধবিগ্রহ' ঘটিয়াছে, তাহার প্রায় সব কয়টিতেই সি পি এম কমন্‌ন্যাকৃরট, এবং সেই কারণেই সি পি এম বাহিনীর 'মৃত্যু' সংখ্যাও স্বভাবত অধিকতর হইয়াছে। অন্যকে আমার খুসীমত খুনজখমকরিবার গণতন্ত্রবকার অজুহাতে, কিন্তু সেই 'অন্যও যদি সমপ্রকার যুক্তি দেখাইয়া সি পি এমের আদর্শ তথা দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তবে তাহা হইবে অগণতান্ত্রিক এবং সংবিধান বিরোধী।

সি পি এম এবং সহধর্মী কেবল বাক্‌সর্ব্বস্ব রাজনৈতিক দু-তিনটি পার্টি তাহাদের বুদ্ধিবিবেচনামত ভারতীয় গণতন্ত্ররক্ষার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের জন্য তাহারা এখুনি এবং আর তিন সেকেণ্ডকাল বিলম্ব না করিয়া এ-রাজ্য হইতে সি আর পি সরাইয়া লইবার 'সাংবিধানিক' দাবি পেশ করিতেছে বার বার। কারণ এই বাহিনী (সঙ্গে রাজ্যপুলিশ ও) থাকিতে এই পরম বিপ্লবী দলগুলি তাহাদের রাজনৈতিক খেলা দেখাইবার পূর্ণ সুযোগ লাভ করিতে পারিতেছে না। একই কারণে পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা এলাকা হইতে সি আর পি এবং রাজ্য-পুলিশ বাহিনী অপসারণ দাবি করা হইতেছে। এই রক্ষাবাহিনীগুলিকে সরাইয়া লইবামাত্র সি-পি এম নেতৃত্ব দেখাইয়া দিতে পারিবে কেমন করিয়া দুইচার দিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বপ্রকার শিল্প উদ্যোগ এবং সেই সঙ্গে শিল্পমালিকদের খতম করা যায়। আমরা মনে করি সি পি এমের দাবি অতি সঙ্গত। রাজ্যের জন এবং গণ স্বার্থ রক্ষার জন্যও ইহার প্রয়োজনও আজ সবিশেষ।

কথায় বলে পাপের শেষ রাখতে নাই; তাই বোধহয় সি পি এম শ্রমিক নিপীড়নকারী শিল্প সংস্থা, বিশেষ কলকারখানাগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া এ রাজ্যের শ্রমিক সাধারণকে পূর্ণ মর্য্যাদার সঙ্গে চির বিশ্রাম দিবার এই সুষ্ঠু শ্রমিক কল্যাণ পরিকল্পনা করিয়াছে। আমাদের রাজ্যপাল কিছুকাল পূর্ব্বে ঠাকুর শ্রী জ্যোতির নিকট হইতে যে সকল ভদ্র এবং বিনীত ভাষায় লিখিত কয়েকখানি পত্র পায়েন, তাহাতে শ্রীধাবনের অবশ্যই বুঝা উচিত ছিল যে সি পি এম-ই পশ্চিম বঙ্গে জনগণ বলিতে যাহাদের বুঝায়, তাহাদের শতকরা শতজনের প্রতিনিধি এবং সি পি এম নেতারা যাহা কিছু উচ্চারণ করিবেন এবং যে সকল দাবি তুলিবেন তাহা সবই পশ্চিম বঙ্গের জনগণের দাবি বলিয়া অবশ্যই স্বীকার এবং গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য সব দল এবং দলপতিরা সবাই রি-অ্যাক্‌সনারী, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া শীল এবং জোতদার ও ধনিক সম্প্রদায়ের কেবল তুক্‌‍॥ যে-কেহ

এবং যে কোন দল সি পি এমের প্রতিবাদ করিবে এবং সি পি এম ঘোষিত উত্তম নীতির সমালোচনা করিবে, বিরুদ্ধে যাইবে, তাহারা সবাই অগণতান্ত্রিক দোষ দুষ্ট, কাজেই তাহারা নিপাত যাক্। গত ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের মাত্র শতকরা ২০টি ভোট পাইয়াও সি পি এম-ই হইল জনস্বার্থের ধারক এবং বাহক—কিন্তু যাহারা প্রদত্ত ভোটের শতকরা আশিটি ভোট পাইল, তাহারাই হইল অগণতান্ত্রিক এবং জনস্বার্থ বিরোধী দলভুক্ত॥ এই পরম শুভ এবং অতি কল্যাণকর মার্কসীয় যুক্তির নিকট অন্য কোনো যুক্তি চলিবে কি? নিশ্চয়ই না।

বর্তমানে অবস্থা যাহা দেখা যাইতেছে এবং রাজ্যের গতি যে দিকে গড়াইতেছে, তাহাতে রাষ্ট্রপতি এবং জাতির জননী প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে উচিত কার্য্য হইবে এ রাজ্যকে হয় (১) সি পি এমের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া আর না হয় (২) কঠোরতম হস্তে সি পি এম, সি পি আই তাহাদের কৃপাপুষ্ট দু-তিনটি দল সমেত ঝাটাইয়া রাজ্য হইতে বিদায় করা। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করিতে যে সরকার অপারগ এবং অযোগ্য প্রমাণিত, সে সরকারের দায়িত্ব আর একদিনও রাখা উচিত নহে। রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার জঞ্জাল সাফ করিতে কবে কোন শুভক্ষণে জনগণ পথে নামিবে, তাহারই অপেক্ষায় আর কতকাল কাটাইতে হইবে—একমাত্র বিধাতাই জানেন। এখন প্রয়োজন একমাত্র জনগণের ডাণ্ডা বাজা।

তফাত কি? কোথায়?

পশ্চিম বঙ্গের দুইটি কম্যু পার্টির কার্য্যকলাপ এবং কথাবার্ত্তায় অনেকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে তীব্র-লাল সি পি এম পার্টি পুরাপুরি বি-জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং এই দল জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী, দেশ এবং জাতির প্রতি তাহাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। অন্য দিকে সি পি আই—কম্যু হইলেও তাহাদের একটা প্রখর জাতীয়তাবোধ আছে এবং এই পার্টি সর্ব্ব বিষয়ে দেশ এবং দেশবাসীর কল্যাণ প্রয়াসে সদা তৎপর, বিশেষ করিয়া এই দল যখন শ্রীমতী গান্ধীর উদ্ভাবিত ইনসট্যান্ট সোসালিজমের সমর্থক তখন ইহাদের সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে এবং সহজ বিচারে এমনই মনে হইতে পারে। কিন্তু আসলে এই দুইটি কম্যুদলের তফাত কোথায় তাহা সবিশেষ বিচার করিয়া একজন ঝানু সাংবাদিক বলেন যে—

—সি পি এম স্বভাবত নেকড়ে বাঘ এবং
—সি পি আই ভেড়ার চামড়া আবৃত নেকড়ে।

আমাদের মনে হয় দুইটি পার্টির রূপবর্ণনা যথাযথ হইয়াছে এবং ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি হইতে পারে না। সময় এবং সুযোগ মত দুইটি পার্টিই নরবধ এবং নররক্ত পানে সমান উৎসাহ এবং উন্মত্ততা দেখাইতে কসুর করে না। গত কিছুকালের পশ্চিম বঙ্গের অরাজকতা, যাহা বিশেষ ভাবে কম্যুদেরই সৃজিত দেখিলে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যাইবে। রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলা, খুন জখম, হৈহল্লা, শিল্পবাণিজ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে কোন দলই কম যায় না। তবে এই সব ক্রিয়া কলাপে দুই দলের কিছু প্রকারভেদ আছে—

সি পি এম যাহা ভাবে তাহা স্পষ্টকথায় প্রকাশ করে (হয়ত ইহা বোকামী) এবং সি পি আই যাহা ভাবে তাহার সবই প্রকাশ করে না। এই পার্টির বাক্যের মিল দেখা যায় না। ইহারা মনে ভাবে এক, কথায় তাহার উল্টা ব্যক্ত হয়।

আমরা সি পি এম ভক্ত এখনো হই নাই, কিন্তু এই দলের নেতাদের স্পষ্টবাদীতার প্রশংসা করা অন্যায় হইবে না, আমাদের মতে সি পি এম নেতৃত্বে ন্যাকামো দেখা যায় না, অন্যদিকে সি পি আই-এর সবল প্রচণ্ড ন্যাকামো ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না। নেকড়ে বাঘের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করার অবকাশ আছে কিন্তু ভেড়া কিংবা রাসভ চর্ম্মাবৃত নেকড়ে, মানুষের পক্ষে সদা-বিপদজনক।

রামমোহন সম্পর্কে একটি শুভ সংবাদ—

পশ্চিমবঙ্গের নেতা, উপনেতা এবং মহানেতারা জনস্বার্থ, জনকল্যাণ এবং তথাকথিত গণতন্ত্ররক্ষা করে যখন ধর্মঘট, বন্‌ধ্‌, ঘেরাও, শ্রমিক বিক্ষোভ, রাজ্য-সরকারকে অচল করিবার এবং অন্যান্য প্রায় সর্ব্বপ্রকার বে-আইনী কার্য্যকলাপে মত্ত আছেন—ঠিক সেই সময় কিছু সংখ্যক সামান্য ব্যক্তি দেশের এবং জাতির মহা-মানবদের কথা স্মরণ করিতেছেন—বর্ত্তমান ডামাডোলের বাজারে ইহা সামান্য শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে করিব। বাঙ্গালী যে এখনো পূর্ণ-মরণ লাভ করে নাই, নিয়ে প্রদত্ত সংবাদটিকে তাহার চিহ্ন বলা যাইতে পারে—

রামমোহনের বাড়ী জাতীয় সম্পত্তি রূপে গণ্যকরার দাবি

"শনিবার আমহার্স্ট ষ্ট্রিটে রাজা রামমোহন রায়ের বসত বাড়ীর সামনে এক নাগরিক সভায় রামমোহনের ওই বাড়ীটিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার দাবি তোলা হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা অভিযোগ করেন, রাজা রামমোহনের উত্তরাধিকারী শ্রীধরনীমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ওই বাড়ীটি নিয়ে নানা ব্যাপার চলছে। সভায় দাবি করা হয়: সরকার বা কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ওই বাড়ীটির দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং এটি যাতে একটি জাতীয় সম্পত্তি অথবা সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তার ব্যবস্থা করুন। সভায় বিভিন্ন বক্তা বলেন, তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে রামমোহনের বাড়ীটির শুচিতা রক্ষা করবেন—তার জন্ত যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তাঁরা প্রস্তুত।

"সভায় এই ব্যাপারে রামমোহন বসতবাটি সংরক্ষণ সমিতি গঠন করা হয়। শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক তার আহ্বায়ক।

"শ্রী মল্লিক জানান যতদিন না এই বাড়ীটিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হচ্ছে ততদিন তাঁরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত বিক্ষোভ এবং আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

"সভায় অধ্যাপক অপরেশ ভট্টাচার্য অধ্যাপক অলোক বন্দোপাধ্যায়, শ্রীনীলমণি দাস, শ্রীক্ষিতীন্দ্র-রায়চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

(আনন্দবাজার)

বলিতে লজ্জাবোধ হয় যে বাঙ্গলার অন্যান্য খ্যাতনামা অ-রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ভারতের নব-যুগের প্রবর্ত্তক এবং দেশও জাতিকে নূতন জ্ঞানের এবং প্রকৃত উন্নতির পথ প্রদর্শক—ভারত পথিক রামমোহন সম্পর্কে যতটা সচেতন থাকা উচিত ছিল তাঁহারা সে-কর্ত্তব্য পালন করিতে কোথায় যেন একটা দ্বিধা বোধ করেন। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে রামমোহনের উদার এবং সংস্কার মুক্ত দৃষ্টি বোধহয় ইহার কারণ।

আমরা আশা করিতে থাকিব যে রামমোহনের পবিত্র স্মৃতি জড়িত ভবন এবং সংলগ্ন উদ্যানটি অতি সত্বর লৌহ ব্যবসায়ীদের কবল-মুক্ত করিয়া জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা হইবে। এ-বিষয় কেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব কম নহে। রাজ্যপালের উপদেষ্টা মন্ত্রী কে কে সেন এ-বিষয়ে হয়ত বহু কিছু করিতে পারবেন। রাজ্যপাল ধাবনের উপর আমাদের কোন ভরসা নাই, হঠাৎ কোনদিন হয়ত শুনিব, তিনি রামমোহন নামক ব্যক্তিটি কে এবং কি ছিলেন তাহাই জানেন না।

অতএব যাহা কিছু করা দরকার আলোচ্য বিষয়ে তাহা বাঙ্গলার সাধারণ মানুষকেই করিতে হইবে। রাজ্যের বিবিধ রাজনৈতিক পার্টি এবং তাহাদের বরকন্দাজ বাহিনী, এ-বিষয় হয়ত বাধারই সৃষ্টি করিতে পারিবেন। সহায়তা নহে। দেখিয়া দুঃখ হয় বর্ত্তমান রাজনৈতিক দলগুলি পার্টি এবং পার্টি স্বার্থের বাহিরে আর কিছু ভাবিতে পারে না। জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় সম্মান, জাতীয় আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে পার্টিগুলির অবদান ধ্বংসাত্মক; গঠনমূলক কাজে পার্টিগুলির কোন ইচ্ছা নাই, অভিজ্ঞতাও নাই। গঠনের কাজে মানুষের যে শক্তি, যে-জ্ঞান, যে-দেশ প্রেম, যে দৃষ্টিভঙ্গি যে-শিক্ষার প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৯৯টি রাজনৈতিক পার্টি-নেতার তাহার কিছুই নাই।

পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি

যুগবাণী সাপ্তাহিকে সম্পাদকীয় মন্তব্যাংশে নিম্ন লিখিতভাবে বর্তমান বাংলায় শাসন ব্যবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে :

বাংলাদেশে মিলিটারি শাসন যে চাপিয়া বসিয়েছে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সি আর পি হঠানোর আন্দোলন করিতে গিয়া কপালে জুটিয়াছে মিলিটারির ফুটকাওয়াজ; সরকারী কর্মচারীরা মাহিনা বৃদ্ধির আন্দোলন করিতে যাইয়া দুই তিন মাস যাবত মাহিনা কম পাইতেছেন; দুর্গাপুরে দিলীপ মজুমদার মহাশয়ের মুক্তির আন্দোলনের ফলে তাঁর মুক্তি তো মিলেই নাই, উপরন্তু হাজার কয়েক কর্মচারীর চাকরী যাইতে বসিয়াছে। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিটি আন্দোলনে আজ বিপরীত ফল ফলিতেছে। তাই উঁহার সমর্থকরা দুঃখ, ক্লেশ ও হতাশার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতেছে—অথচ সেজন্য তাদের প্রতি কোনো সহানুভূতি জনসাধারণের মধ্যে নাই। প্রত্যেকেই ইহাকে ভ্রান্ত ও দম্ভপ্রসূত নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া মনে করিতেছে। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার এই যে সি পি এম পার্টির নেতাদের মনে তাঁদের অনুসৃত নীতি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জাগিতেছে না, আত্মদোষ অনুসন্ধানের কোনো ইচ্ছা তাঁদের নাই। হাজার হাজার আদর্শ বাদী যুবককে নেতাদের এই অন্ধতার খেসারত দিতে হইবে; নিহত, আহত, কর্মহারা, শিক্ষাহারা হইয়া তারা জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙারের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রমোদ বাবুর গলায় আইন ভঙ্গ করিবেন না জানাইয়াছেন, পুলিশের প্রহরায় সুরক্ষিত নিজ বাসভবনে মূল্যবান চুরুট টানিতে টানিতে একটা মারাত্মক আন্দোলনের উত্তেজনায় আগুন তিনি তৃপ্তি সহকারেই পোহাইবেন জানি; কিন্তু সি পি এম সমর্থক যুবকদের তিনি মিলিটারির সঙ্গে লড়িতে আদেশ দিয়াছেন, পরিণাম রূপে কত ভাগ্যহারা জননী শেষ পর্যন্ত পুত্রহারা হইবেন আমরা তাহাই ভাবিতেছি। কারণ বাংলায় যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহা দুই একদিনে নিভিবে না, ইহার পরিসমাপ্তি ভয়াবহ হইতে বাধ্য। দায়িত্বহীন, নির্বোধ স্বার্থপর নেতাদের পরিচালনায় দেশে দেশে এইভাবেই বিপ্লব ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, সমস্ত গণ-আন্দোলন এই ভাবে রক্তের সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। রোজা লুক্সেমবুর্গের সঙ্গে মনস্বিতায়, বৈপ্লবিক চরিত্র ও প্রতিভায় জ্যোতি প্রমোদ কোঙারের কোনো তুলনাই হয় না; কিন্তু তিনিও জার্মাণ বিপ্লবের ভরাডুবি ঘটাইয়াছিলেন এমনই ভ্রান্ত নীতি অনুসরণের ফলে।

অন্ধ ছাড়া আর সবাই দেখিতে পাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গে মিলিটারি শাসন একরকম আসিয়াই গিয়াছে। রাইটার্সে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট ঘরের সম্মুখের বারান্দায় একটা কাচের ঘর হইয়াছে, সেখানে বসিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার হেড-কোয়াটারের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ রাখিতেছেন ও অন্যদিকে ফোর্ট উইলিয়ামের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ অব্যাহত। তাঁরা সারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির শেষতম সংবাদ ফোর্ট উইলিয়ামে জানাইতেছেন ও সেখান হইতে সঙ্গে সঙ্গে যে নির্দেশ

করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন এখন এইভাবেই চলিতেছে। যাবতীয় মূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতেছে ফোর্ট উইলিয়ামে, উহাকে রূপায়িত করিতেছে সি আর পি ও মিলিটারী। রাইটার্স বিল্ডিংসে এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত নাই, বি, বি, ঘোষও রাজ্য চালাইতেছেন না।

আধ্যাত্মিকতার একটা সার কথা

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা হইতে বৃহদারণ্যকোপনিষৎ এর নিম্নের উদ্ধৃতিটি আমরা তুলিয়া দিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন: মৈত্রেয়ি! পতির জন্যই যে পতি (পত্নীর) প্রিয় হন তাহা নহে; পত্নীর আপনার প্রয়োজনেই পতি প্রিয় হন। পত্নীর জন্যই যে পত্নী (পতির) প্রিয় হন তাহা নহে; (পতির) আত্মপ্রয়োজনেই পত্নী প্রিয় হন। পুত্রদিগের জন্যই যে পুত্রগণ (পিতামাতার) প্রিয় হয় তাহা নহে; (পিতামাতার আত্মপ্রয়োজনেই পুত্রগণ প্রিয় হয়। সম্পদের জন্যই যে সম্পদ প্রিয় হয় তাহা নহে; (মানুষের) আত্মপ্রয়োজনে সম্পদ প্রিয় হয়।...লোকসমূহের জন্যই যে লোকসমূহ (জীবগণের) প্রিয় হয় তাহা নহে; আত্মপ্রয়োজনেই লোকসমূহ প্রিয় হয়।...ভূতবর্গের জন্যই যে ভূতবর্গ প্রিয় হয় তাহা নহে; আত্মার জন্যই ভূতগণ প্রিয় হয়। সর্ববস্তুর জন্যই যে সর্ববস্তু প্রিয় হয় তাহা নহে; আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়। আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। শ্রবন, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার দর্শন হইলে তদ্দারাই এই সমস্ত বিদিত হয়।

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

পারমাণবিক অস্ত্র-নির্ম্মান—ব্যয়ের কথা

"অদ্বৈত" মুখবাণীতে লিখিয়াছেন: ভারতে পারমাণবিক বোমা তৈরী করতে কত খরচ হতে পারে এ নিয়ে আজকাল বিভিন্ন ধরণের মতামত বেরুচ্ছে। সরকারী কেতাবী হিসাব অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে যে খরচ এত বেশী যে তা ভারতের সাধ্যের বাইরে কি আসলে কি তাই?

মোটেই তা নয়। এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

ডাঃ এডওয়ার্ড টেলার একজন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। ইনি নিজে প্রথম আণবিক বোমা তৈরীতে ছিলেন। তাঁর মত অবিশ্বস্ত রকমের সস্তায় মাত্র ২৫ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ সাড়ে চার লক্ষ টাকায় ১টি আণবিক বোমা তৈরী করা যায় যার যথেষ্ট শক্তি হবে অর্থাৎ বিগত হিরোসিমা বা নাগাসাকিতে যা নাকি ফেলা হয়েছিল। তার মতে ছোট ছোট দেশ কেন; এমনকি কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক দল বা দুর্বৃত্তরাও ইচ্ছা করিলেও ভবিষ্যতে তৈরী করতে পারবে।

যে কোন বাড়ীর নিচের তলায় ছোট কারখানায় অ্যাটমবোমা তৈরী করা সম্ভব! বর্ত্তমানে ইউরেনিয়াম-২৩৫—যা দিয়ে পারমাণবিক বোমা তৈরী হয় তার বাজার দর মাত্র ১০হাজার ডলার বা ৭৫ হাজার টাকা প্রতি কিলো। একটি বোমাতে ৬ কিলো বা আনুমানিক ১৩ পাউণ্ড ইউরেনিয়াম-২৩৫ দরকার। অর্থাৎ জিনিষের দাম মাত্র সাড়ে চার লাখ টাকা। তার মতে যদি কালোবাজারে বা ব্ল্যাক মার্কেট দরেও কেনা যায় ও বিভিন্ন লোকের মজুরী ও যন্ত্রপাতি নিয়ে অনায়াসে অন্তত ১ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড বা মাত্র ২১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকায় একটি বোমা তৈরী করা হয়।

আরেকজন মার্কিণ বিজ্ঞানী ডঃ রালফ ল্যাপ তিনিও ডঃ টেলারের হিসাব সমর্থন করেন। তাঁর মতে কিছুটি অসুবিধা হবে যেটা কারিগরি বিষয়ে তবে বিজ্ঞানী ও কারিগর লাগিয়ে এটা বানানো খুবই সোজা ও বছরে ৫০ হাজার ডলার বা মাত্র ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় করলেই তার সমস্যা মিটবে। তাঁর এটাও মত যে ট্রিগার মেকানিজম যা এককালে খুব গোপনীয় ছিল আজকাল তা আর গোপন নেই। মার্কিণ মুলুকে যে কোন উৎকৃষ্ট স্কুলের বিজ্ঞানী ছাত্র তার হদিস জানে। এই দুই বিজ্ঞানীর মতে এক্ষুনি যদি এর নিয়ন্ত্রণ না হয় ভবিষ্যতে ভীষণ বিপদ দেখা দিতে পারে।

ডঃ ভাবা ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে যা বলেছিলেন তা বাংলায় হল :—

শান্তিপূর্ণ কাজের জন্য পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কে জেনেভাতে তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলন হয় ইউ এন এর উদ্যোগে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে একটি বিবরণ (পেপার) বার করা হয় ও তাতে এইমত লেখা ছিল :—

"একটি দশ কিলোটন শক্তিসম্পন্ন অর্থাৎ ১০ হাজার টন টি এন টি ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরণ করতে গেলে সাড়ে সতেরো লক্ষ টাকা খরচ লাগে—এই ক্ষমতাসম্পন্ন বোমাই হিরোসিমাতে ফেলা হয়েছিল। দুই মেগাটন ব ২০ লক্ষ টি এন টি ক্ষমতাযুক্ত একটি বিস্ফোরণ করতে গেলে ৩৬ লক্ষ টাকা খরচ হয় অপরপক্ষে প্রচলিত টি এন টিকে ইউনিট ধরলে ২ মেগাটন বিশিষ্ট বিস্ফোরণ মামুলী উপায়ে করতে গেলে একশত পঞ্চাশ কোটি (১৫০ কোটি) টাকা খরচ পড়ে।"

"এতে দেখা যাচ্ছে যে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরণে পারমাণবিক বিস্ফোরক কুড়ি গুণ সস্তা ও থার্মোনিউক্লিয়ার বিস্ফোরক বা হাইড্রোজেন বোমা পাঁচশত গুণে সস্তা" এ ছাড়াও মামুলীমতে একসাথে এত ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরণ কার্যক্ষেত্রেও সম্ভব নয়।

ঐ ভিত্তিতে ডঃ ভাবা বলেছিলেন ১০টি পারমাণবিক বোমা তৈরীতে মাত্র দশ কোটি টাকা লাগে আর পঞ্চাশটি হাইড্রোজেন বোমা—প্রত্যেকটি দুই মেগাটন ক্ষমতা বিশিষ্ট—তৈরী করতে মোট মাত্র ১৪ কোটি টাকা লাগে।

পূর্ব্ব জার্ম্মানীর ট্রাক্টর সরবরাহের ব্যাপার

বহুকাল গত হইয়াছে; ইংলণ্ডের একব্যক্তি তৎকালীন ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী কৃষ্ণ মেননকে বহুলক্ষ টাকার জিপগাড়ী বিক্রয় করিয়া ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে জিপগুলি ভারতে আসিয়া পৌঁছায় নাই এবং উহা লইয়া একটা তোলপাড় হয়। যুগজ্যোতি সাপ্তাহিকে কিছুকাল পূর্ব্বে একটা খবর বাহির হয়, তাহা অনেকটা ঐ জিপ ক্রয়ের মতই শুনাইয়াছে। যুগজ্যোতি বলেন :

ভারত সরকার পূর্ব্ব জার্ম্মানী হইতে দুই হাজার "ট্রাক্টর" কিনিয়াছিল। ইহার মূল্য বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। পাঞ্জাবের কৃষি কার্য্যেরত জোতদারেরা অভিযোগ করিয়াছেন যে এই ট্রাক্টরগুলি নাকি একেবারেই অকেজো। অন্ধ্র প্রদেশ সরকারও এই-গুলিকে ত্রুটিযুক্ত বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছে। ভারত সরকার এ সম্পর্কে তদন্ত করিবার আশ্বাস দিয়াছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব জার্ম্মানী সরকারকে এ সম্পর্কে কোনরূপ পত্র লেখেন নাই। ইতিমধ্যে ভারত ও পূর্ব্ব জার্ম্মানীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে ভারতের ও ভারতে পূর্ব্ব জার্ম্মানীর "কন্সোলেট" খোলা হইয়াছে। শোনা যাইতেছে যে ইন্দিরা গান্ধী সমর্থকদের একাংশ যাঁহারা পূর্ব্ব জার্ম্মানী ও রাশিয়ার পরম মিত্র, তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারেই এত তাড়াতাড়ি "কন্সোলেট" খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রধান মন্ত্রীকে বুঝাইয়াছেন যে এই "ট্রাক্টর কলঙ্ক" লইয়া সংসদে ঝড় উঠিবার পূর্ব্বেই চুপে চুপে কাজটা সারিয়া লওয়া ভাল—না হইলে পরে বিশেষ অসুবিধা দেখা দিবে।

সাময়িকী

বোমার উপকরণ সংগ্রহের ও দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা

সম্প্রতি যে ভাবে বোমার ব্যবহার প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাতে অনেকের মনে হইতেছে কেমন করিয়া শত শত বোমা তৈয়ার করার বিস্ফোরক উপাদান পাড়ায় পাড়ায় সংগৃহিত হওয়া সম্ভব হইতেছে। পোটাসিয়াম ক্লোরেট ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় কিন্তু তাহাও পশ্চিম বাংলায় বিশেষ হয় না। উহা পশ্চিম ভারতের যে সকল স্থানে তৈয়ার হয় সে সকল স্থান হইতে রেল অথবা লরি ব্যতীত এই অঞ্চলে তাহার আমদানী অসম্ভব। রেলে বিস্ফোরক আনিতে হইলে কে আনাইতেছে এবং কে মূল্য দিতেছে সে কথা গোপন থাকে না। লরিতে অবশ্য পুলিশকে ঘুষ দিয়া কালো বাজারের মাল সর্ব্বত্রই চালান হইয়া থাকে এবং পটাসিয়াম ক্লোরেটও ঐ একই ভাবে আনয়ন করা হয় বলা যাইতে পারে। সুতরাং গ্র্যাণ্ড টাঙ্ক রোডের চেক পোষ্ট গুলিতে যদি সাধারণ পুলিশ না বসাইয়া বিশেষ এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ কিছু কিছু কালো বাজারের বোমার উপকরণ ধরা পড়িতে পারে। তৎপরে যাহারা এইরূপে বিস্ফোরকের উপাদান আমদানি করে তাহাদের যদি অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য কারাগারে পাঠান হয় তাহা হইলে কারবারটা অত সহজে আর চলে না। কিন্তু চোরা বাজার না থাকিলে বহু রাজকর্ম্মচারী ও রাজনৈতিক কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মহা অসুবিধা হয়, সুতরাং চোরা ও কালোবাজার চালাইয়া রাখা এই সকল ব্যক্তির পক্ষে একটা অতি আবশ্যকীয় ব্যবস্থা। এই জন্যই সম্ভবতঃ কালো বাজারের মাল ধরা পড়িলে কাহার কি সাজা হইতেছে সে কথার প্রায়ই কোনও উল্লেখ কোথায়ও দেখা যায় না। গাড়ী ফেলিয়া কে পলাইল, অথবা গাড়ীর চালক পলাইল ইত্যাদি কথায় অবতারণা হয়, কিন্তু তাহার অধিক কিছু জানা যায় না।

কিন্তু গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের চেক পোষ্টে সকল গাড়ীর চালকদিগের নাম, লাইসেন্স নম্বর ও ঠিকানা যদি লিখিয়া লওয়া আরম্ভ হয় তাহা হইলে পরে যদি কোনও চোরাই অথবা কালো বাজারের মাল কোন গাড়ীতে ধরা পড়ে তাহা হইলে চালক ও মালিক অবশ্যই ধরা পড়িবে। সর্ব্ব নিকটবর্ত্তী থানা হইতে নাম ধাম কি মাল কোথায় যাইতেছে প্রভৃতি লিখাইয়া "ক্লিয়ারেন্স" পত্র লইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইলেও বেআইনী মাল চালান বন্ধ হইতে পারে। এক কথায়, গভর্ণমেন্টের ঢিলা ভাবে কাজ চালান ও প্রকারান্তরে চোরা ও কালো বাজারের সহায়ক রীতি পদ্ধতির প্রচলন নিবারণ না করায় ভরই লরি বোঝাই হইয়া বিস্ফোরক উপাদান সকল পশ্চিম বাংলায় আসা সম্ভব হইতেছে। ইহা বন্ধ করার উপায় শুধু গভর্ণমেন্টের হাতে আছে।

পিক্রিক অ্যাসিড ও আর্সেনিক ডাই সালফাইড শুনা যায় হংকং হইতেই এদেশে আমদানী হয়। অর্থাৎ ঐ দুইটি বোমার উপকরণ জাহাজের মাল। জাহাজে যাহা কিছু আসে তাহাই জাহাজ ঘাটে কাষ্টম শুল্ক আদায়কারী রাজকর্ম্মচারীদিগের নজরে আসে। সুতরাং যদি দেখা যায় যে কে কে ঐ বোমার মাল আনাইয়াছে তাহাদের নাম ধাম কাষ্টমসের খাতায় লিখিত আছে তাহা হইলে বোমা প্রস্তুতকারকদিগের মাল সরবরাহ কারীদিগের ঠিকানা সেই সঙ্গেই পাওয়া যাইবে। এবং যদি কাহারও নাম ঠিকানা পাওয়া না যায় তাহা হইলে প্রমাণ হইবে যে কাষ্টমসের লোকেরা নিজ কর্ত্তব্য করে না; অথবা ঘুষ খাইয়া আইন বিরুদ্ধভাবে

জাহাজের মাল কাহাকেও কাহাকেও লইয়া যাইতে দেয়। এইরূপ অবস্থায় জাহাজ ঘাটে বড়াকড়ি আরম্ভ হইলে বিস্ফোরকের উপকরণ আমদানী ক্রমে ক্রমে যথেচ্ছাচারের নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে।

আর একটা কথা হইতেছে শাস্তির ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা। সংবাদপত্রের খবর যদি সত্য হয় তাহা হইলে বহুশত ব্যক্তি এখন পর্য্যন্ত বোমা হস্তে অথবা গৃহে বোমা থাকা অবস্থায় গ্রেফতার হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তির উৎপরে কি সাজা হইয়াছে, সে কথায় আর বিশেষ কোথাও উল্লেখ হয় না। অর্থাৎ তাহাদিগকে পুলিশ নিজেদের ইচ্ছামত ছাড়িয়া দেয় অথবা এরূপভাবে আদালতে চালান করে যাহাতে তাহাদের কোনও শাস্তি হয় না। অথবা হইলেও পাঁচশত ব্যক্তির মধ্যে হয়ত একজন দুইজনের হয়, যাহাদের সম্ভবতঃ মুরুব্বির অভাব থাকে অথবা যাহাদের অন্যায়ভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার পথে অন্য কোন প্রবল বাধা উপস্থিত হয়। কিন্তু একথা সকলেই বলিবেন যে বোমা নিক্ষেপ করা অথবা দাঙ্গা হাঙ্গামায় যুক্ত থাকা যেভাবে সর্ব্বত্র ছড়াইয়াছে সে তুলনায় আদালতে বিশেষ কাহাকেও চালান করা হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে না। এই কথাই সকলের মনে জাগ্রত হইতেছে যে বোমা লইয়া যুদ্ধ করা বোমা তৈয়ার করা অথবা ছুরি ছোরা পাইপ বন্দুক রিভলভার হস্তে ভ্রমণ করিলে কাহারও কোনও শাস্তি হইবে না। বিশেষ করিয়া যদি কেহ এমন কোন রাষ্ট্রীয় দলের সহিত সংযুক্ত থাকে যে দলের সরকারী মহলে প্রভাব আছে তাহা হইলে তাহার কিছুই হইবে না। পশ্চিম বাংলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধে লিপ্ত কিছু কিছু লোককে যদি বাঁচাইয়া দিতে হয় তাহা হইলে অন্য পক্ষের লোকেরাও অধিকক্ষেত্রে বাঁচিয়া যায়। কারণ দুইপক্ষ না থাকিলে দাঙ্গা হইয়াছে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় সরকারী নিরপেক্ষতা পূর্ণ সংরক্ষিত না হওয়াই দাঙ্গা হাঙ্গামা চালিত থাকার একটা প্রধান কারণ।

রাষ্ট্রপতি গিরির রুশিয়া ভ্রমণ

রাষ্ট্রপতি গিরির রুশিয়া গমন ও ভ্রমণের কোন বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। রুশিয়ান দিগের সম্ভবতঃ মনে হয় নাই যে ভারতের রাষ্ট্রপতির তাহাদের দেশে আসিবার কোন আবশ্যকতা ছিল। কারণ তাহারা গিরির আগমন লইয়া কোন মহা উৎসাহ প্রদর্শন করে নাই এবং ভারত সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রচার অপপ্রচার কোন ভাবে পরিবর্ত্তন করে নাই। গিরি মহাশয়ের রুশিয়া ভ্রমণ একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র বলিয়াই রুশিয়াতে গ্রাহ্য হইয়াছে। ভারতীয়দিগের আত্মসম্মান জ্ঞান যথাযথভাবে বর্ত্তমান থাকিলে তাহারা অথবা নিজদেশের নেতাদিগকে যত্রতত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিত না।

রুশিয়ানগণ যে ভারতের অনেক অংশ চীন দেশের অন্তর্গত বলিয়া মানচিত্রে দেখাইয়াছে তাহারা তাহা এখন অবধি ভুল বলিয়া স্বীকার করে নাই। ভারতের আপত্তিকে তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। যেন বিষয়টা একটা মহা কৌতুকের বিষয়। এ অবস্থায় আমাদের নেতাদিগের রুশিয়া গমন কখনও উচিত হইতে পারে না।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু সম্বন্ধে

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর পত্নী নাকি বলেছিলেন যে শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃতদেহ যখন তাসখন্দ হইতে দিল্লীতে আনা হয় তখন তাহার মুখ নীলাভ ও বিবর্ণ ছিল। মৃত দেহে নাকি অস্ত্রোপচারের চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল। এই সকল কথার উত্থাপন এই সময় কেন করা হইয়াছে? যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সন্দেহ কাহারও মনে হইয়া থাকে তাহা হইলে সে কথা পূর্ব্বে কেন উত্থাপিত হয় নাই? যাহা হউক যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহা হইলে তাহার সম্যক আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সংবাদপত্রে দুই চার কথা ছাপাইয়া দিলেই বিষয়টির গুরুত্ব উপযুক্তভাবে রক্ষা করা হয় না।

দেশ-বিদেশের কথা

বাংলায় আইনের নমনীয়তা

আমরা ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র বলিয়াছি যে পশ্চিমবঙ্গে আইনের সকল ব্যবহার প্রায় অজানা হইয়া দাঁড়াইতেছে। আইন ভঙ্গ করিলে অধিকাংশ অপরাধীর বিচারও হয় না; শাস্তি ত হয়ই না। এই অবস্থায় যদি দেশের অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিগণ অহরহ আইন ভঙ্গ করিয়া চলে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকে না। এইরূপ কার্য্যকলাপ এখন বাংলায় প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত ভাবে হইতেছে। বীরভূমের সাপ্তাহিক ময়ূরাক্ষী পত্রিকা হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে

কিছুদিন থেকে বীরভূম জেলায় ১৪৪ ধারা বলবৎ আছে বলে জানা যায়। কিন্তু কেউ মানছে কি? সম্প্রতি সিউড়ী শহরে জেলা কর্ত্তাদের নাকের ডগায় ১৪৪ ভঙ্গ হল। ৮ পার্টির বড় মিছিল এল, বক্তৃতা হল কিন্তু কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে বলে জানা যায়নি। এর ২দিন পরে আবার খটঙ্গা নগরী থেকে মিছিল সহর পরিভ্রমণ করতে দেখা গেল।

যে আইন কড়া ভাবে পালন করতে পারেন না সে আইন তুলে নেওয়াই ভাল। এতে আইনের মর্য্যাদা থাকে নইলে ক্রমে ক্রমে সব আইন-ই বানচাল হবে।

আসামের অবস্থাও একই রকম

করিমগঞ্জের যুগশক্তি পত্রিকায় দেখা যায় আসামের অবস্থা আইন মানিয়া চলা বিষয়ে বিশেষ উন্নত নহে। যথা:

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক বিক্ষুব্ধ জনতার আক্রমণে করিমগঞ্জ রেল ষ্টেশনের অফিসরুমের সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয় এবং টেলিফোন লাইন ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। প্রকাশ, ঐদিন শিলচর করিমগঞ্জের যাত্রীবাহী গাড়ীখানা পাথারকান্দি ষ্টেশনে আসিলে রেল কর্ম্মীদের সহিত কতিপয় যাত্রীর সংঘর্ষ হয় এবং রাত্রি এগারোটায় জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে ট্রেন পুনরায় চালানো হয়। কিন্তু ঐ ট্রেন বদরপুর আসিলে ড্রাইভার এবং গার্ড নিরাপত্তার অভাবে গাড়ী লইয়া অগ্রসর হইতে অস্বীকার করেন। এদিকে এই বিভ্রাটের দরুণ করিমগঞ্জ হইতে কোন যাত্রীবাহী ট্রেন না ছাড়িতে আদেশ দেওয়া হয়। ফলে দুল্লভছড়া ও বদরপুরের বহু যাত্রী, স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীসহ আটক পড়িয়া চূড়ান্ত দুর্ভোগের সম্মুখীন হন। এই নিয়া রেল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বাদ বিতণ্ডায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং যাত্রীদের একাংশ ষ্টেশন অফিসে ঢুকিয়া তাণ্ডব সুরু করে।

পুলিশ আসিয়া পড়িলে দুষ্কৃতিকারীরা সরিয়া পড়ে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া পরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আসামে জনসেবার কর্ম্মসূচী

যুগশক্তি পত্রিকা বলেন:

মানসিক ও শারীরিক অক্ষমতাযুক্ত মানুষের উপকারের জন্য আসামে সরকারী কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। বিকলাঙ্গ ও মানসিক পীড়াগ্রস্ত লোকেরাও যাহাতে কর্মক্ষম হইয়া জীবন যাপন করিতে পারে এই উদ্দেশ্যেই এই কর্ম্মসূচী গৃহীত হইয়াছে। প্রাক স্বাধীনতা যুগে এইরূপ সরকারী উদ্যম ছিল না। সামান্য সংখ্যক বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই ধরণের কিছু কিছু কাজ হইত। আশ্রয়দান, সযত্ন ভরণ পোষণ, বৈজ্ঞানিক ট্রেনিং ও শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা সরকার এখন এইসব লোকদের কর্মক্ষম নাগরিক রূপে সমাজে বাস করিবার উপযোগী করিতে প্রয়াসী হইয়া সমাজ কল্যাণের এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৬০ সালে নভেম্বরে আসাম সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগ স্থাপিত হয়। শিশু, স্ত্রীলোক, পঙ্গু, সমাজ পরিত্যক্ত অনাথ দুর্নীতিমূলক জীবন যাপনে অভ্যস্ত কারামুক্ত কয়েদী; এসব লোকের জন্য এর পর হইতে নানা স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। গৌহাটির বালুরবাড়ী হোমে ৮০ জন, নওগাঁ হোমে ৬৯ জন এবং শিলচর হোমে ২৫ জন বিভিন্ন পর্য্যায়ের মানুষের জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

সেবামূলক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং চাকুরীজীবী মেয়েদের হোস্টেলের জন্যও এই বিভাগ হইতে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়।

অসহায় স্ত্রীলোক বিধবাদের জন্য এবং অনাথ শিশুদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। অনাথ শিশুদের জন্য নওগাঁর যে অনাথ আশ্রম খোলা হইয়াছে তাহাতে ১২৫ জনের বিধিমত শিক্ষা ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে। ইহা ছাড়া প্রায় ৮০।৯০ জন ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হয়। শ্রীমন্ত শঙ্কর মিশন নামক একটি বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানও এই ধরণের কার্য্যক্রম পরিচালনার জন্য সমাজ কল্যাণ বিভাগ হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে।

সরকারী চাকুরেদের বেতন বন্ধ

ময়ূরাক্ষী সাপ্তাহিকে বলা হইয়াছে:

জেলা সমাজ শিক্ষা বিভাগের অব্যবস্থায় ও গাফিলতিতে বীরভূম জেলার প্রায় ৬০টি এক-শিক্ষক বিশিষ্ট পাঠশালের শিক্ষকগণ গত ছ'মাস থেকে তাঁদের বেতন বা ভাতা পায়নি। এছাড়াও জেলার বহু রুরাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক ও পিওনগণও তাঁদের বেতন নাকি দীর্ঘ দিন হতে পায়নি। সামান্য বেতন সময় মত না পাওয়ার ফলে তাঁদের দুর্গতির সীমা নেই। সমাজ শিক্ষা বিভাগের এই কি সামাজিক ন্যায় বিচার?

গর্দ্দভের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা

ব্রেজিলের ক্রসিলিয়া নগরের মেয়র নিজ শহরে মহা কষ্টসহিষ্ণু ও মানবজাতির পরম বন্ধু জীব গর্দ্দভের একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে এই জন্য পরে নাগরিকদিগের অর্থ অপচয় করার কারণে ঐ মূর্ত্তির মূল্য ২৮৫০ টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করা হয়। গর্দ্দভ যে মানবজাতির বিশেষ উপকারী বন্ধু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহা হইলেও গর্দ্দভের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা যে অর্থের অপচয় ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে। নাগরিকদিগের অর্থ নষ্ট করা অন্যায় একথাও মানিতেই হইবে। এবং যদি নাগরিকদিগের অর্থ অপব্যয় করিলে সেই অর্থ নগরের "পিতা"দিগকে ফেরত দেওয়ানই রীতি হয়, তাহাও উত্তম রীতি বলিয়াই বিবেচিত হইবে। কলিকাতায় অনেক মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে যাহা অর্থের অপচয় বলিয়াই প্রমাণ হইবে। অনেক রাজপথের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মানুষকে নূতন সাইন বোর্ড, নূতন চিঠির কাগজ প্রভৃতি আঁকাইতে ও ছাপাইতে বাধ্য করিয়া বহু (সামাজিক) অর্থ নষ্ট করা হইয়া থাকে। ইহার জন্য কংগ্রেসী ও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রনেতাগণই বিশেষভাবে দায়ী। এই সকল ব্যক্তিকে কিছু অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য করিলে সমাজের মঙ্গল হইবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭০তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পূর্ব্বপাকিস্থানে প্রলয়ঝঞ্ঝা

কয়েকদিবস গত হইল যে প্রবল ঘূর্ণবায়ু পশ্চিম চব্বিশপরগণা ও পূর্ব্ব পাকিস্থানের বঙ্গোপসাগর উপকূলস্থিত অঞ্চলের উপর দিয়া বহিয়া যায় তাহার ধ্বংসলীলার কথা এখন ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতেছে। প্রথমে জানা যায় যে ঐ সকল স্থানে যে বহু ক্ষুদ্রবৃহৎ দ্বীপপুঞ্জ আছে তাহার একটিতে হিন্দুদিগের একটি স্নানের মেলা সেই সময় চলিতেছিল এবং সেইস্থলে ঝড়ের প্রকোপে যে বিরাট ঢেউ উঠিয়াছিল তাহার উচ্চতা প্রায় পনের ফুট ও তাহাতে কয়েক সহস্র যাত্রীর প্রাণনাশ হয়। কিন্তু ঐ সকল অভাগাদিগের সংখ্যা কেহ বলেন ৭০০০ কেহবা ততোধিক অনুমান করেন। এই আলোচনা যখন হইতেছে তখন সংবাদ প্রকাশিত হইল যে আর একটি দ্বীপ, যেখানে ১২০০০০ লোকের বসতি, তাহার উপর দিয়াও একটা বিরাট সমুদ্র উদ্ভূত মহা তরঙ্গ চলিয়া যায় ও তাহার ফলে প্রায় অর্দ্ধেক দ্বীপ বাসিন্দার সলিল সমাধি হয়। এই সকল বিষয় প্রকাশিত হইতে হইতেই হাওয়াই জাহাজের সাহায্যে আরোও বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান চালান হইতে থাকে ও তাহাতে জানা যায় যে ঢেউয়ের প্রকোপ শুধু যে ঐ দুইটি দ্বীপের উপরেই পড়িয়াছিল তাহা সত্য নহে আরও বহু দ্বীপের উপরেও ঐ মহাপ্রলয়ের প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল ও ফলে আরোও অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে ২০০০ ছোটবড় দ্বীপ আছে এবং সম্ভবতঃ সকল দ্বীপই ঐ ঘূর্ণির ঘা খাইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছে। পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খাঁনের বর্ত্তমান বিবৃতি অনুসারে মনে হয় যে প্রায় ৩০০০০০ লক্ষ ব্যক্তি এই ঝড় ও তজ্জাত বন্যায় প্রাণ হারাইয়াছে। এইরূপ দুর্ঘটনা পাকিস্থানের ইতিহাসে ত হয়ই নাই; পাকিস্থান সৃষ্টির পূর্ব্বেও অখণ্ড ভারতেও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের জনসাধারণ এইসর্ব্বব্যাপ্ত মৃত্যুলীলার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হতভম্ব ও ত্রাস বিহ্বল অবস্থায় মৃতব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে শোকজ্ঞাপন করিতেছেন। বিশ্বজনের মনেও এই সংবাদ ভীতি কষ্ট ও সমবেদনার

সঞ্চার করিয়াছে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বন্যাক্রান্তদিগের সাহায্যের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও সম্ভবত ভারতের অন্যান্য নেতা ও ব্যবসাদারগণও মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়া নিজেদের মানবীয় কর্তব্য সাধন করিতে দ্বিধা করিবেন না।

জেনারেল দ্য গ্যল

৯ তারিখ নভেম্বর ১৯৭০ খৃঃ অব্দে সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় হৃদরোগের আকস্মিক আক্রমণে জেনারেল দ্য গ্যলের মৃত্যু হয়। ঐ সময় তিনি কলঁবে লেদোজ এগলিজ স্থিত নিজ বাসগৃহে ছিলেন। ঐ দিন তিনি নিজগৃহের উদ্যানে ভ্রমণও করিয়াছিলেন এবং রোগাক্রান্ত হইবার ঠিক পূর্বেই তিনি টেলিভিশন দেখিবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন। একটি টেবিলের নিকটে দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি হঠাৎ টেব্‌লের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া যান এবং তাঁহার পত্নী তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ও ধর্মযাজককে ডাকিয়া পাঠাইলেও তাঁহারা কিছু সাহায্য করিতে পারেন নাই। আক্রমণের ১৫ মিনিটের মধ্যেই জেনারেল দ্য গ্যল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শার্ল দ্য গ্যল (Charles De Gaulle) ১৮৯০ খৃঃ অব্দের ২২ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১১ খৃঃ অব্দে তিনি স্যা সীর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ফরাসী সামরিক বাহিনীতে সেনাপতিদিগের মধ্যে নিযুক্ত হ'ন। ১৯১৪-১৮ বিশ্বমহাযুদ্ধে তিনি যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে ভীষণভাবে আহত হইয়া জার্মানদিগের নিকট ধরা পড়িয়া যান। যুদ্ধ শেষ হইলে পরে তিনি পুনরায় যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন ও সমরশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পুস্তকাদি লিখিতে থাকেন। তাঁহার একটি পুস্তকে "ভবিষ্যতের সৈন্য বাহিনী" ১৯৩৪ তিনি ফরাসীদিগের দুর্ভেদ্য মাজিনো লাইনএর উপর অগাধ বিশ্বাসের তীব্র সমালোচনা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন জার্মানগণ অবাধে মাজিনো লাইন অতিক্রম করিয়া ফরাসী সামরিক শক্তি পরাস্ত করে; তখন দ্য গ্যল জেনারেল পেতাঁর জার্মানদিগের সহিত আত্মসমর্পণ মূলক সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া স্বাধীন ফরাসী দল গঠন করেন তাঁহার পরিচালিত গুপ্ত যোদ্ধাদল জার্মানদিগের বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া চলে ও নানাভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত জার্মানদিগের পরাজয় হয় ও জেনারেল দ্য গ্যল ১৯৪৪ খৃঃ অব্দে বিজয়ী সেনাদলের সহিত প্যারী পুনরাধিকার করেন। তিনি ফ্রান্সের চতুর্থ রিপাবলিকের সভাপতি হইয়া থাকিলেও ১৯৪৬ খৃঃ অব্দে পদত্যাগ করেন। কারণ উহার সংবিধান দ্য গ্যলের ন্যায্য মনে হয় নাই। ১৯৪৭ হইতে ১৯৫৯ পর্যন্ত দ্য গ্যল নানাভাবে ফরাসী রাষ্ট্রতন্ত্রকে সুসংগঠিত করিবার চেষ্টা করেন ও ১৯৫৯ পুনর্বার রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন। ফ্রান্স অতঃপর অর্থনৈতিক দিক দিয়া বিশেষ উন্নতি করিতে সক্ষম হয়। উপনিবেশগুলির সহিত ফ্রান্সের সম্বন্ধ উচিতভাবে স্থিরিকৃত হয় এবং ফরাসী জাতির আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা সবলতর হয়। অনেকে বলিতে চেষ্টা করে যে দ্য গ্যল এক-নায়কত্বে বিশ্বাসী (dictator) এবং মানবীয় অধিকারে আস্থাবান নহেন। তাঁহাকে হত্যা করিবার তিনবার চেষ্টা হয় (১৯৬১, ১৯৬২, ও ১৯৬৩) কিন্তু তিনি অক্ষত শরীরে বাঁচিয়া যান। তিনি কিছুকাল পূর্বে সবল হস্তে বিপ্লববাদী ছাত্রদিগের আইন বিরুদ্ধ কার্য্যকলাপ দমন করিয়া ফ্রান্সকে মহা ক্ষতি ও রাষ্ট্রীয় গোলযোগ হইতে রক্ষা করেন। বৃটেনের ইয়োরোপে প্রভুত্ব তিনি সহ্য করিতেন না এবং ম্যাকমিলানকে ইয়োরোপের সম্মিলিত আর্থিক ব্যবস্থাতে যোগদান করিতে না দিয়া তিনি বৃটিশদিগের শত্রুতা অর্জ্জন করেন। দ্য গ্যল ফ্রান্সকে পৃথিবীতে নিজের পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এক সময় ফ্রান্স ও জার্মানীর একটা এরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল যাহা থাকিতে ইয়োরোপে বৃটেন আমেরিকা বা রুশিয়ার কোন প্রভাব প্রকট হইয়া

উঠিতে পারিত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু দ্য গ্যল ইয়োরোপে আমেরিকা বা বৃটেনের প্রভুত্ব বাড়িতে দিতে চাহিতেন না। চিরশত্রু জার্মানী লাভবান হইলেও তাঁহার দুঃখ হইত না কিন্তু যাহাদের তিনি পশ্চিম ইয়োরোপের পরিবারভুক্ত মনে করিতেন না, তাহাদের ঐ স্থলে প্রভাববৃদ্ধি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি অনেক বিষয়ে ফ্রান্সের অহংকার বিসর্জন দিয়া বর্তমান আদর্শে নিজদেশকে চালাইয়াছিলেন; যথা অ্যালজিরিয়ার সহিত সম্বন্ধ নির্দ্ধারণে (১৯৫৮)। নেটো (NATO) দলভুক্ত না থাকিলে তাঁহার ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তিনি ফ্রান্সের পক্ষে আমেরিকার হুকুমে চলা অসম্মানের কথা মনে করিতেন এবং নিজেদের আনবিক অস্ত্র নিজেরা নির্ম্মাণ করিয়া আত্মনির্ভরশীলতার কঠিন পন্থা অবলম্বনে চলিবার ব্যবস্থা করিয়া ফ্রান্সের যথার্থ স্বাধীনতাকে জীবন্ত ও জাগ্রত রাখিবার চেষ্টায় নিবিষ্ট হইয়াছিলেন। দ্য গ্যল বর্তমান যুগের একজন মহাশক্তিশালী রাষ্ট্রনেতা। নেপোলিয়ানের পরে ফ্রান্সে তাঁহার সমতুল্য আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই বলিয়া ফ্রান্সের সর্ব্ব সাধারণের ধারণা এবং সেই ধারণা কিছুমাত্র ভুল নহে।

দেশপ্রেম ও দেশবাসীর আত্মসম্মানবোধ অকুণ্ঠিত-ভাবে চিরজাগ্রত রাখাই দেশনেতার প্রধান কর্ত্তব্য। জেনারেল শার্ল দ্য গ্যল এই আদর্শেই নিজ জীবন গঠন করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি চিরস্মরণীয়ভাবে ফরাসী জাতির অন্তরে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

কেরালার নির্বাচন

আমাদের সকলের বিশ্বাস যে কেরালার জন সাধারণ অত্যন্ত বামপন্থি ও সমষ্টিবাদী। অপরাপর বামপন্থিদিগের মতই কেরালার অধিকাংশ মানুষ পুরাতন সকল প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করিয়াই নিজেদের প্রগতিশীলতা সার্থক করিবার চেষ্টা করিতেন ও ভারতের অপরাপর প্রদেশের লোকেরা উন্নত রাষ্ট্র ও সমাজনীতির নবরূপ দর্শনের আশায় তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতেন। কিন্তু যখন কেরালার প্রগতিশীল বামপন্থিগণ রাজশক্তি করায়ত্ত করিয়া কিছুকাল রাজ্যশাসন করিতে সক্ষম হইলেন, তখন দেখা যাইল যে পূর্ব্বে যাহা ছিল নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত শাসকগণ রাজ্যভার হস্তে পাইয়া ঠিক সেই ভাবেই চলিতে থাকিলেন। বাংলার চৌদ্দ রাষ্ট্রীয় দলের রাজত্বের সময় যেমন রাজকর্মচারীগণ নিজেদের অকর্ম্মণ্যতা ও অবৈধ কার্য্যকলাপ পুরাপুরি চালিত রাখিয়া ঐ শাসকদিগকে বেইজ্জত করিয়া ছাড়িলেন এবং তাহারাও রাজশক্তির ভাগবাট লইয়া পারস্পরিক কলহে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ রাজশক্তি ছাড়িতে বাধ্য হইলেন; কেরালাতেও ঠিক সেই মতই হইয়াছিল। দলগুলি অনেক না হইলেও সেগুলির কোন দেশের ও জনসাধারণের মঙ্গলের প্রচেষ্টা ছিল না। ছিল শুধু দলের লোকের লাভ চেষ্টা ও শক্তি বৃদ্ধির আকাঙ্খা। এই অবস্থায় কেরালার প্রগতিশীল দলের রাজত্ব কায়েম রাখা কঠিন হয়।

সম্প্রতি যে নির্বাচন হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে জনসাধারণ আর বামপন্থা অনুসরনেচ্ছুক নাই। পূর্ব্বে যেভাবে ভোট পড়িয়াছিল এখন তাহা হইতে বহু আসন অন্য হস্তে চলিয়া গিয়া প্রমাণ হইল যে কেরালার জনসাধারণ অকর্ম্মণ্য ও অন্য নেতৃত্বে বিশ্বাস হারাইয়াছে। গান্ধীর নাম লইয়া যেমন কংগ্রেসের ভোট প্রার্থীগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতেই তৎপর থাকিত; সমষ্টিবাদী প্রগতিশীল বামপন্থীরাও ঠিক সেই ভাবেই লেনীন বা মাওৎসেটুঙের নাম করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতেন। সুতরাং সাধারণ মানুষ সহজেই দেখিল যে যাহারা আদর্শের আড়ালে গা ঢাকা দিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে, তাহাদের উপর রাজ্যভার দেওয়া দেশবাসীর পক্ষে সুশাসন লাভের সরল পথ নহে। কেরালার ভোটের হিসাব দেখিলেই বুঝা যায় যে জনসাধারণ কিভাবে বামপন্থায় বিশ্বাস হারাইয়াছিল যথা:

পার্টির নাম	১৯৭০-এর ভোটে আসন সংখ্যা	১৯৬৭তে আসন সংখ্যা	লাভ-লোকসান
সি পি এম	২৭	৫২	—২৫
এস এস পি	৬	১৯	- ১৩
কে টি পি	২	২	০
কে এস পি	৩	১	+২
সি পি এম সমর্থিত স্বাধীন পন্থি	৫		+ ৫
মোট হিসাব ৪৩ (সমগ্রের % ৩২.৪ ভাগ)		৭৪	— ৩১

১৯৬৭র নির্ব্বাচনে কংগ্রেস দলভুক্ত লোকেরা মোট ৯টি আসন পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে কংগ্রেস (আর) পাইয়াছেন ৩২টি আসন এবং কেরালা কংগ্রেস পাইয়াছেন ১২টি আসন। কংগ্রেস (ও) সমর্থিত স্বাধীন পন্থিগণও ৫টি আসন পাইয়াছেন এবং কেরালা কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীগণও ৬টি আসন দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে যাহারা সাধারণের সকল বিশ্বাস হারাইয়াছিল সেই কংগ্রেসকেও জনসাধারণ সমষ্টিবাদী কম্যুনিষ্ট জাতীয় রাষ্ট্রকর্ম্মীগোষ্ঠী অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় বিচার করিতেছেন। অবশ্য শ্রীমতী ইন্দিরার কংগ্রেস ঠিক গান্ধীর কংগ্রেস নহে। শ্রীমতী ইন্দিরার রুশিয়া প্রীতি তাঁহাকে ঠিক কোন রঙে রঙিন করিয়া তুলিয়াছে তাহা বিচার করিলে হয়ত তিনি ঈষৎলালই নির্দ্ধারিত হইবেন। কিন্তু তাঁর লালভাবও জনসাধারণের সুখ সুবিধা বৃদ্ধি করিতে বিশেষ সাহায্য করিতেছে না। কারণ শুধু লোক দেখান সমষ্টিবাদের ভঙ্গী দিয়া জাতীয় আর্থিক উন্নতি সাধন সম্ভব হয় না। যে পরিশ্রম ও চেষ্টা দারিদ্র্য দূর করিতে পারে তাহা বর্ত্তমানে কোন নেতাদিগের মধ্যেই দেখা যাইতেছে না।

সংস্থাপন অবস্থান ও অবসান

রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোন কার্য্যকরী ও সাধারণের মঙ্গলজনক রীতিনীতি বিধি বা কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান যখন প্রবর্ত্তিত বা সংস্থাপিত হয় তখন তাহার পরিচালনা ও অবস্থিতি হয় অবিরাম পরিশ্রমের কথা। এক মুহূর্ত্তের জ সাবধানতা ভুলিয়া অলস গতানুগতিকতার স্রো গা ভাসাইয়া দিলে বহু বৎসরের কঠিন চেষ্টার ফ লাভ হইতে মানুষ বঞ্চিত হইতে পারে; সুতর স্থির দৃষ্টিতে জাগ্রতভাবে সকল সময়েই দেখিতে থাকিতে হয় যাহাতে কোন সমাজ ও রাষ্ট্র বিরুদ্ধ কোনও সুযোগ পাইয়া অনুপ্রবেশে সক্ষম না হয় চলিত কথায় যে বলা হয় ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফা হয়ে বার হওয়া তাহা বড়ই সত্য কথা। কার সমাজদ্রোহী অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই কোনও না কোন নীতিকথা আওড়াইতে আওড়াইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আগাইয়া আইসে এবং তৎপরে সুবিধা পাইলেই নিজেদের কুমতলব হাসিল করিয়া লইতে তৎপর হয়। সুতরাং দেখা যায় নানা প্রকার সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকিলেও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও মন্ত্রীদিগের সাবধানতার অভাবে সর্ব্বত্র স্বার্থান্বেষণকারী দুষ্ট লোকের প্রভাববৃদ্ধি হইয়া সকল কার্য্যই অসফলতার অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যায়। অনেক সময় অসাবধানতা ও দুষ্টলোকের আগমন মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের সহায়তাতেই ঘটিয়া থাকে। এইরূপ পরিস্থিতিতে কোন সুচিন্তা ও মূল্যবান কর্ম্মপদ্ধতি বা পরিকল্পনার কোন মূল্য থাকে না। কোন কার্য্য যথাযথভাবে আরম্ভ হইতে না হইতেই গোলে হরিবোলের সূচনা হয়।

শুধু যে ভারতবর্ষেই এইরূপ হয় তাহা নহে। প্রায় সকল দেশেই কোন ভাল কাজ আরম্ভ করিলেই তাহাতে বাধা দিবার জন্য বিরুদ্ধপন্থী লোকে নানা পথে নানাভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। যে সকল অছিলা করিয়া লোকে আইসে তাহার মধ্যে সমর্থন সহযোগীতা সহানুভূতির অভিনয় করাই সাধারণতঃ লক্ষিত হয়। প্রবল সমালোচনা ও বিরুদ্ধবাদও হয়। যাহা করা হইবে তাহা সংবিধান বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম ও নীতিগত নহে অথবা দেশের রাষ্ট্রীয় অথবা মানবীয় আদর্শ নষ্টকারক এরূপ কথাও উত্থাপিত হইতে দেখা যায়। ফরাসী যোদ্ধা দেশনেতা দ্য গ্যল এই জন্য বলিতেন যে কালকে বড় করিবার জন্য যদি আমাকে

সকল রীতিনীতি আইন সংবিধান এমন কি রাষ্ট্রীয় কাঠামো অবধি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় তাহাই করিতে হইবে কিন্তু ফ্রান্সকে জগতজাতি সভায় আমাকে রাণীর আসনে বসাইতেই হইবে। দ্য গ্যলের এই দেশপ্রীতির জন্য বহু শত্রু জুটিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহাতে কখনও কিছুমাত্র টলেন নাই। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে ইংলণ্ডের রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী হীথ ইংলণ্ডের হারান গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তিনি প্রথম হইতেই নানাভাবে বাধা প্রাপ্ত হইতেছেন। বলা হইতেছে তিনি বৃটেনের নবলব্ধ বিশ্বমৈত্রী ও আন্তর্জাতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার আদর্শের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। পাউণ্ডের অবস্থা না কি রসাতলে যাইবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে? কমনওয়েলথের সর্ব্বনাশ হইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হীথ বলিতেছেন বৃটেনকে সমুদ্র মধ্যস্থ একটা ক্ষুদ্র দ্বীপমাত্র হইয়া থাকিতে কিছুতেই দেওয়া যাইবে না। বৃটেনকে আবার বিশ্বমানবের দৃষ্টিতে, বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহের দরবারে ও বিশ্বের অর্থনীতির বাজারে সম্মানার্হ, শক্তিমান এবং উত্তমর্ণপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যাহারা জাতিকে গৌরবাসনে সংস্থাপন করিয়া সেই অবস্থিতি স্থায়ী করিতে সক্ষম না হইয়া গৌরবের অবসানকে হৃতবীর্য্য কাপুরুষের ন্যায় মানিয়া লইতে লজ্জা অনুভব করে না তাহাদিগকে জীবনযুদ্ধের প্রকৃত সংজ্ঞা বোঝান সহজ নহে।

দেশকে জাতিকে কোন মহান আসরে অধিষ্ঠিত করিতে হইলে নীচ স্বার্থপরতার সাহায্যে তাহা সম্ভব হয় না। অপর দেশ বা অপর জাতির সম্মুখে নিজ দেশ ও জাতিকে হীন প্রতিপন্ন করিয়াও সে কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। যাহারা পরমুখাপেক্ষী ও অপরের মাহাত্ম্যে আত্মহারা তাহাদিগের দ্বারাও কোন দেশ বা জাতির বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। যাহারা অপরের শক্তি সামর্থ্য ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিভ্রান্ত হইয়া আত্মসম্মানবোধ রহিত অবস্থায় শুধু অপরের গুন কীর্ত্তন করিয়া জীবন যাপন করে তাহাদিগের দ্বারাও স্বজাতির উন্নতি সাধন সম্ভব হয় না।

ক্ষুদ্রদলীয় স্বার্থ সংরক্ষন চেষ্টাও জাতীয়তার পূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষার আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিলে এক প্রকারের অতি দোষাবহ মনোভাব। জাতীয়তার উপলব্ধি জাতির অধিকাংশ ব্যক্তিকে বাদ দিয়া শুধু হাতে গুনিয়া বাছাই করা অল্পসংখ্যক লোকের একত্র অধিবেশনের সাহায্যে হইতে পারে না। এইজন্য দুই তিনটি বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রীয় দল ততটা জাতীয়তাবোধ নষ্ট করে না, ততটা করে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল। ভারতে বর্ত্তমানকালে প্রকৃত দেশপ্রীতি, দেশের উন্নতি চেষ্টা প্রভৃতি প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে আসিয়াছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর লোকের যেমন করিয়া হউক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা। দেশ ও জাতিকে সর্ব্বনাশের অতলে ঠেলিয়া দিয়াও নিজেদের সুবিধা করিয়া লওয়াই এখানকার কর্ম্মকর্ত্তাদিগের অভ্যাস। এই ঘৃণ্য মনোভাব যতদিন থাকিবে ততদিন দেশের ও জাতির কোন উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

চীনের সহিত রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ স্থাপন

১৯৬২ খৃঃ অব্দে চীন সৈন্যবাহিনী যখন অকারণে ভারতে অনুপ্রবেশ করে ও পূর্ব্ব সীমান্তে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া হঠাৎ আবার ফিরিয়া চলিয়া যায়, তখন হইতে চীনের এই শত্রুতার জন্য ভারত ও চীনের রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। তখন হইতে এখন অবধি কোন সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন চেষ্টা হয় নাই। কিছুকাল পূর্ব্বে কথা উঠিতে থাকে যে চীন আজকাল ভারত বিরুদ্ধতা হ্রাস করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ ভারতের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিবার জন্য অপর চেষ্টাও করিয়াছে। কিন্তু এই সকল কথার কোনও সাক্ষাৎ প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় নাই। এখন মনে হইতেছে কথাগুলি কাহারও উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত এবং চীন বা ভারত কেহই রাষ্ট্রীয় বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য কোন চেষ্টাই করে

নাই। আর একটা কথা এই যে চীন যদি ভারতের সহিত শত্রুতার ভাব পোষণ না করিতেই চাহে তাহা হইলে চীন গায়ে পড়িয়া কাশ্মীর ভারতের জোর করিয়া দখল করা এলাকা অথবা ফরাক্কা বাঁধ খাড়া করিয়া ভারত পাকিস্থানের জলকষ্টের কারণ সৃষ্টি করিতেছে ইত্যাদি কথা বলিয়া ভারত বিদ্বেষ প্রকাশ করে কেন? আরও কথা এই যে চীনের সহিত ভারত সদ্ভাব স্থাপন চেষ্টা করিলে ভারতের রুশের সহিত মিতালী রক্ষা করিয়া চলা কঠিন হইবে। কারণ চীন কখনও রুশের সহিত পরোক্ষভাবেও মৈত্রী স্থাপনেচ্ছুক হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য পাকিস্থান রুশ ও চীন উভয় দেশেরই বন্ধু। যদিও একথা ভুলিলে চলিবে না যে পাকিস্থান ভাড়াটিয়া গাড়ীর আদর্শে যে কোন জাতিরই ভাড়া খাটিতে সদা প্রস্তুত। ভারতের সঙ্গে ঠিক সেই কথাটা প্রয়োগ করা চলে না। চীন আরও পাকিস্থানকে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও ১ শত কোটি টাকার ঋণ দিতে স্বীকার করিয়াছে। সকল অবস্থা বিচার করিয়া বলিতেই হয় যে চীন ও ভারতের মধ্যে সখ্য স্থাপন অতি কঠিন সমস্যার কথা। ইহা যে হঠাৎ হইয়া যাইতে পারে ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। অবশ্য ভারত যদি ২০০০০ বর্গমাইল ভারতের অংশ চীনকে ছাড়িয়া দিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন চেষ্টা করে তাহা হইলে চীন হয়ত সেই নির্ব্বীর্য্য ভারতকে করুণার চক্ষে দেখিয়া তাহার প্রতি সদয় ভাব পোষন করিতে আরম্ভ করিতে পারে। কিন্তু ভারতের ঠিক এরূপ অবস্থা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। অতএব মনে হইতেছে যে চীন ভারত দ্বন্দ্ব যে অবস্থায় ছিল তাহাই রহিয়া যাইল।

প্রাণ অথবা প্রাণের আশ্রয় স্থান সৃজন

ডাঃ জে এক ডানিয়েল্লি জীবন্ত অজকণিকা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। অর্থাৎ তিনি কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক উপাদান সমুচয়ের এরূপ সমন্বয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন যাহাতে তাঁহার দ্বারা রচিত সেই বস্তুকণা প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে প্রাণ সৃষ্টি করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে; আবার সূক্ষ্মতর বিচারের মর্য্যাদারক্ষার জন্য ইহাও বলা চলিতে পারে যে প্রাণের আবির্ভাব সহায়ক ব্যবস্থা সৃজনকে প্রাণ সৃজন বলা ন্যায়সঙ্গত নহে। সুতরাং ডাঃ জে এক ডানিয়েল্লি প্রাণ সৃজন করিয়াছেন বলা ঠিক নহে। বলা উচিত যে তিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বনে নানা উপাদান একত্র করিয়া এরূপ ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছেন যাহাতে তাঁহার রচিত বাস্তব আধারে প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি সেই বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন যাহাতে প্রাণ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ইহা করাও কম কথা নহে। যদি এমন বস্তু সমন্বয় করা যায় যাহাতে প্রাণ সক্রিয় হইয়া বস্তুর বর্দ্ধন, বিভাগ ও নব বস্তু প্রজনন ক্ষমতা আনয়ন করিতে পারে; তাহা হইলে তখন বলা চলিবে যে কৃত্রিম উপায়ে জীবন্ত বাস্তব দেহ সৃষ্টি করাহইয়াছে। ততঃপর সেই জীবন্ত দেহে প্রাণের মানসিক বিকাশ কতটা হইবে, অর্থাৎ সেই দেহস্থিত মনে চিন্তা, কল্পনা, সংকল্প, প্রবৃত্তি, প্রেরণা কার্য্যপ্রতিভা প্রভৃতি কতটা বিকশিত হইবে, তাহা দেখিয়া স্থির করা যাইবে যে প্রাণের সেই কৃত্রিম রূপ প্রকৃতিজাত প্রাণের সহিত তুলনীয় কি না। আমরা জানি যে সকল প্রাণ মানব প্রাণের সমতুল্য নহে। উদ্ভিদের প্রাণ ও জৈব প্রাণের বহু আদিরূপ মানব প্রাণের তুলনায় জড়ভাবাপন্ন ও আড়ষ্ট। পৃথিবীতে বহু কোটি বৎসর ধরিয়া প্রাণের ক্রমবিকাশ হইয়াছে এবং মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে মাত্র অতি সম্প্রতি —কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে। এখন বিজ্ঞান যদি ঐ দীর্ঘ পথের যাত্রী হইয়া একের পর এক প্রকার জীবন গঠনে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে কবে সে কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

চুরি

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে ভারতীয় রেলপথে চলনশীল মালবাহী ও অপরাপর গাড়ী হইতে যে মাল চুরি

হয় তাহার জন্য কর্তৃপক্ষকে বাৎসরিক এগার কোটি টাকার কিছু অধিক ক্ষতি পূরণের জন্য দিতে হয়। একথা সর্বজন জ্ঞাত যে রেলে যে মাল চালান হয় তাহার বহু অংশই রেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বর্জিত ভাবে চালান করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ সকল চুরির অনেকাংশের জন্যই সাধারণকে কোন ক্ষতি পূরণ করা হয় না। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে যদি এগার কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ করা হয় তাহা হইলে অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যের সম্পদ রেলগাড়ী হইতে চুরি হইয়া থাকে। ধরা যাইতে পারে যে বৎসরে অন্ততঃ ত্রিশ কোটি টাকার মাল চুরি হয়। অপরাপর চুরির মধ্যে মানুষের বাসস্থান, দোকান, গুদাম, মালবহনরত লরি বাস ও কারখানা হইতে চুরি রেলের তুলনায় বহু অধিক প্রতিপন্ন হইবে। আমরা শুনিয়াছি বড় বড় কারখানা হইতে বাৎসরিক লক্ষ লক্ষ টাকার মাল চুরি হয়। ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ বহু সহস্র কারখানা আছে। সেইগুলি হইতে কোথাও হাজারে ও কোথাও লক্ষে চুরি হইয়া থাকে। যদি ধরা যায় যে ভারতবর্ষের দশ হাজার কারখানা হইতে চুরি হয় তাহা হইলে বলা যায় যে সেই চুরির পরিমাণ প্রায় একশত কোটি টাকা হইবে। লরি, বাস, দোকান, গুদাম, ও ব্যক্তিগত আবাস গৃহ হইতেও চুরির সংখ্যা বাৎসরিক কয়েক লক্ষ হইয়া থাকে ও সেই সকল চুরির আর্থিক পরিমাণ দুই তিন শত কোটি টাকা হইতে পারে। তাহা হইলে বলা যায় যে ভারতবর্ষে চুরি ব্যবসায়ের আমদানি প্রায় ৫০০ শত কোটি টাকা। এই যে বিরাট চুরির কারবার ইহাতে বহু লক্ষ লোক জড়িত আছে। ইহারা নিয়মিত ও সর্বত্র চুরি চালাইয়া থাকে এবং তাহার কোন প্রতিকার চেষ্টা বিশেষভাবে করা হয় না। কারণ চুরির অংশীদারদিগের মধ্যে যাহাদের কথা লোকে সন্দেহ করিয়া বলে তাহাদের মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী পুলিশ রাষ্ট্রনেতা প্রভৃতির নামও করা হয়। চোরেরা বহু স্থলেই কর্মে নিযুক্তব্যক্তি ও তাহাদের চুরি প্রথমতঃ চুরি ও দ্বিতীয়তঃ বিশ্বাসঘাতের কার্য্য। ইহাদিগের মধ্যে সকল জাতি ও শ্রেণীর লোক আছে। আর আছে নানান রাষ্ট্রীয় দলের লোক।

চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম শতবার্ষিকী

চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম শতবার্ষিকীর সময় তাঁহার রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রের মতামত ও কার্যকলাপের আলোচনা করিয়া জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার আসনের উচ্চতা নির্ণয়ণ চেষ্টা এক প্রকারের ধৃষ্টতা। তিনি ভোগ, অর্থ উপার্জন ও রাজশক্তির সহিত মিতালী রক্ষা করিয়া নিজের প্রাত্যাহিক সুখসুবিধার ব্যবস্থা করার পথ ছাড়িয়া ত্যাগ ও কষ্টের মধ্যে জীবনের শেষদিন গুলি দেশ সেবাতে কাটাইয়া গিয়াছিলেন। আর্থিক ত্যাগ স্বীকার ও কৃচ্ছসাধন আধুনিক সমাজনীতির চূড়ান্ত বিচারে মহাপাপ কিনা তাহার আলোচনা করিয়া কোন লাভ হইতে পারে না; কারণ যে সকল ব্যক্তি বিচারের রায় বা সিদ্ধান্তকে তর্ক, আলোচনা ও যুক্তি অবতারণার পূর্ব্ব হইতেই স্থির নির্দিষ্ট করিয়া বসিয়া থাকে তাহাদিগের সহিত ন্যায় বিচার করিতে যাওয়া সময়ের অপব্যবহার। যে সকল লোক আত্ম ত্যাগী ও আদর্শের জন্য প্রাণ দিতেও পশ্চাৎপদ নহেন তাঁহাদিগকে নিন্দার্হ প্রমাণ করিবার চেষ্টা যে স্তরের বর্ব্বরতা তাহার বিরুদ্ধবাদ কথা দিয়া হইতে পারে না। জাতীয় এই মহা সমস্যার যুগে আমাদের সকল মিথ্যা, সকল পাপ, সকল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন, স্বৈরাচারকে অতিক্রম করিয়া স্থির নিশ্চয় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। চিত্তরঞ্জন যে যুগের মানব ছিলেন, সে যুগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদিগের বিরুদ্ধ পক্ষ এখনকার অস্থির প্রকৃতি সকল ন্যায় অন্যায় বোধহীন ব্যক্তিদিগের তুলনায় মহাশক্তিশালী ছিল। তাঁহারা কিন্তু সেই প্রবল শত্রুপক্ষের ভয়ে হতাশ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন নাই। সেই অতি অসমান শক্তি লইয়াই তাঁহারা যুদ্ধ চালাইয়া চলিয়াছিলেন ও শেষ পর্যন্ত সেই যুদ্ধে সফলকামও হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান

কালে আমাদিগকে সেই যুগের জাতীয় মহাবীর ও উচ্চ আদর্শবাদী নেতাদিগকে স্মরণ করিয়াই অতি প্রতিকূল অবস্থাতেও পূর্ণ উদ্যমে নিজেদের বিশ্বাস ও ন্যায়বোধের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। ইহাতে অসফল হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কারণ সেই যুগের নেতাদিগের পরে যে সকল ব্যক্তি দেশবাসীকে পথপ্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ঠিক তেজবীর্যবান মহাত্যাগী যোদ্ধা ছিলেন না। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও কূটরাজনীতির সহিত তুলনায় সরল সবল একনিষ্ঠভাবে মহাশক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া মানব চরিত্র বিচারের দিক দিয়া ঠিক এক জিনিস নহে। অভিসন্ধি ও মতলব সিদ্ধির গা বাঁচাইয়া চলার দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির সহিত জীবন পণ করিয়া যুদ্ধে অবতরণের তুলনায় প্রথমোক্ত চালাক চতুরদিগের স্থান কখনও উচ্চে হইতে পারে না। যে আদর্শের জন্য সবকিছুই দিতে প্রস্তুত সে যুদ্ধে অবতরণের পূর্বে দোকান চালাইত অথবা শেয়ারের দালাল ছিল কিনা; অথবা সে হরিকীর্তন বা সমাজ নীতি প্রচার করিয়া দানলব্ধ অর্থে দিন গুজরান করিত, এই সকল কথার উপর তাহার আদর্শ ও আত্মত্যাগের ওজন বিচার করা চলিতে পারে না। দোকানদার যদি নারী ও শিশুদের জীবন রক্ষার জন্য প্রাণ দেয় তাহা হইলে সেই আত্মোৎসর্গ কোনও স্বার্থপর পরশ্রীকাতর ভণ্ড ব্যক্তিগত সম্পদহীন মানুষের সমাজ সেবার অভিনয় অপেক্ষা অল্প পরহিতকর বিবেচিত হইতে পারে না। আর যদি অতীতে কে কি ছিল তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় তাহা হইলে যাহারা বৃটিশ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের বেতন ভোগীদিগের বংশধর, তাহারা এখন যাহাতে মার্কস লেনিন গান্ধী বা মাওৎসেটুঙের নাম করিয়া উচ্চ আদর্শবাদের সংস্থাপক বলিয়া সমাজে না চলিতে পারে, ঐতিহ্যের ঋণ শোধের আবশ্যকতার জন্য সে ব্যবস্থাও করা চাই।

একজন মহাপুরুষের জন্ম শতবার্ষিকী সূত্রে এতগুলি অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করা এইজন্যই প্রয়োজন হইল যেহেতু আজকাল সকল অর্বাচীনই অতীতের সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে এবং ফলে দেশপূজ্য মহাজনগণের সম্মান রক্ষা কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সকল বুদ্ধিবোধহীন সমালোচক গোষ্ঠীর কথা ও কার্যের প্রতিবাদ না করিলে জনসাধারণের মনে হইতে পারে যে তাহাদের কথায় হয়ত সত্যিই কোন মূল্য আছে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে মানব মাহাত্ম্য অতীতে যে ভাবে বিকশিত ও ব্যক্ত হইত এখনও ঠিক তাহাই হয়। স্বার্থপর নীচ প্রকৃতির মানুষ, যে কখনও সামান্য মাত্রও ব্যক্তিগত সুবিধা ছাড়িয়া পরহিতে আত্মনিয়োগ করে না, সে যদি সমাজ উন্নতির বক্তৃতা দিয়া বেড়ায় তাহা হইলে তাহার শ্রোতার অভাব হয় না। কিন্তু সে কখনও শেষাবধি তাহার প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারে না। কারণ সত্যকার স্বার্থত্যাগ ও পরহিত চেষ্টা না থাকিলে সে কথা সর্বজন জ্ঞাত হইয়া যাইতে সময় লাগিলেও শেষ অবধি সকলেই তাহা জানিয়া যায়। মানব মাহাত্ম্য যে সকল গুণের ভিতরে নিবিষ্ট থাকে তাহার মধ্যে বিদ্যা, ন্যায় অন্যায় জ্ঞান দুর্বল ও দরিদ্রের প্রতি গভীর ও সক্রিয় সহানুভূতি দান, পাপের বিরুদ্ধতা ও ধর্মের সহায়তা, সৎসাহস বীরত্ব ও সমাজের মানুষের মানবত্বের দাবি সংরক্ষণ ইত্যাদির কথা বলা যাইতে পারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অসীম উপার্জন ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ইংরেজ বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি ইংরেজ অধিকৃত ভারতে মহা প্রতিপত্তিশালী ছিলেন —যতদিন না তিনি আইন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। তৎপরে তাঁহাকে ইংরেজ নানাভাবে নির্য্যাতন করিয়াছিল, কিন্তু দেশবন্ধু সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া দেশমাতার সেবা করিয়া চলিয়া ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালাবধি, তিনি নিজ আদর্শে ও জনহিতব্রতে আপ্রাণ নিযুক্ত ছিলেন।

রামমোহন হ'তে বিদ্যাসাগর

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

"প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ একটি প্রবন্ধ পাঠালাম। প্রবন্ধটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা আছে। সেপ্টেম্বর মাস বিদ্যাসাগরের জন্ম ও রামমোহনের মৃত্যু দ্বারা বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ স্মরণীয়। সেই হিসাবে যদি 'প্রবাসীর' স্মারক সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন থাকে, তবে সমস্ত প্রবন্ধটি ছাপান যেতে পারে—অবশ্য যদি যোগ্য বিবেচিত হয়। আর যদি আপাতত দ্বিতীয়ার্ধ (বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয়) ছাপানো সংগত মনে হয় তবে তার শিরোনাম দেওয়া যেতে পারে—'পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর'।"

—লেখক

(১)

প্রাচীন গ্রীক জাতির ইতিহাসে ডিওগেনিস (Diogenes) বলে একজন সংসারবিমুখ, কঠোর প্রকৃতি নৈরাশ্যবাদী (cynic) দার্শনিকের সম্বন্ধে গল্প আছে যে, একদা তিনি দিনদুপুরে জলন্ত লণ্ঠন হাতে নিয়ে আথীনাই (ইংরেজীতে যাকে "এথেন্স" বলা হয়) নগরের রাজপথে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে লোক দেখলেই হাতের লণ্ঠনটা তুলে ধরে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। লোকেরা তাই দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করে—কী খুঁজছেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর? তিনি উত্তর দেন—"মানুষ খুঁজছি। প্রশ্ন হয়—"সূর্যের আলো ত যথেষ্ট রয়েছে, লণ্ঠন জেলেছেন কেন"? দার্শনিক উত্তর দেন—সূর্যের আলোতে এ শহরে তো মানুষ খুঁজে পেলাম না, তাই এই লণ্ঠনটাও জেলে এনেছি, কিন্তু তবুও এখন পর্যন্ত একটাও মানুষ দেখতে পেলাম না। এখানে স্মর্তব্য যে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষ ভাগে পেরিক্লীসের আথীনাই-এর সে শক্তি সমৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় গৌরব আর নেই। স্পার্টার সঙ্গে পেলপনেশিয়ান যুদ্ধে আথেন্সের অহঙ্কার ধূলিলুণ্ঠিত হয়েছে। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে সমগ্র গ্রীস, মাকেদন-রাজ ফিলিপের পদানত হয়েছে। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমসথেনিস জ্বালাময়ী বক্তৃতা (philippics) দিয়ে আথীনীয়গণকে অর্বাচীন মাকেদনীয়দিগের অধীনতাপাশ ছিন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করছেন। ডিওগেনিস ওই সময়েই আথেন্স-রাষ্ট্রে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, কিন্তু পাননি।

প্রকৃত মানুষ কে?

মানুষের মত—মানুষ অধিকাংশ সময়ে কোন দেশেই খুব সুলভ নয়। প্রায়শই সর্বত্র দেখা যায় গড্ডলিকা-প্রবাহ। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন আহার-নিদ্রা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি জৈব ক্ষুধার পরিতৃপ্তির চেষ্টাতেই অতিবাহিত হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে এবং পারিবারিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতেই সাধারণ মানুষের সমস্ত জীবনীশক্তি ব্যয়িত হয়। এই গতানুগতিক জীবন-যাত্রার প্রতি কখনও মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধা বা আস্থা জন্মাতে পারে না; বরং চারিদিকে এইরকম জীবন দেখতে দেখতে মনুষ্যত্বের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস কমে আসে, এবং তখন মনুষ্যত্বের গুরুতর কর্তব্য সাধন করবার শক্তিও চলে যায়। তখন আসে সমাজের পক্ষে অতি দুর্দিন: চারিদিকে নানাপ্রকার পাপ, গ্লানি, ক্ষুদ্রতা,

কদাচার ও কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হতে থাকে, এবং তখন সেই দুর্গতি হতে জন-সমাজকে উদ্ধার করবার জন্য দরকার হয় যুগান্তকারী মহাপুরুষের।

বহিঃপ্রকৃতিতে দীর্ঘকাল গুমোটের পর যেমন প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা, বর্ষণ ও প্লাবন ঘটে থাকে, তেমনি মানব-সমাজেও দেখা যায় নানাপ্রকার আলোড়ন ও বিপ্লব—যেমন গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি, ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্ ইত্যাদি

বিশিষ্ট অবতারবাদ স্বীকার না করেও আমরা অনায়াসে ভাবতে পারি যে, মহাবিশ্বের অন্তরালে বসে যে মহাশিল্পী অনুক্ষণ ভাঙাগড়া ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন, তিনি নিজেই আপনসৃষ্টির প্রতি বিরূপ হয়ে ওইরূপ মাঝে মাঝে তার সংশোধন করেন। তাই আমরা দেখতে পাই, কোন কোন দেশে সময়ে সময়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন সব অসাধারণ মহামানবের আবির্ভাব হয়, যাঁরা প্রাকৃতজনের ন্যায় গতানুগতিক জীবনযাপন করতে অপারগ। তাঁরা আপন বিদ্যাবুদ্ধি বিচারশক্তি দ্বারা চালিত হয়ে সমাজের পক্ষে যা কল্যাণকর সেই পন্থাই অবলম্বন করেন। তাঁদের মধ্য দিয়ে এক অপ্রত্যাশিত মঙ্গলচেতনা শত ধারে উৎসারিত হয়ে সমাজ-জীবনের পঙ্কিল আবর্জনা দূর করতে চেষ্টা করে। এঁরাই হলেন প্রকৃত মানব, সমাজনেতা ও যুগমানব। এইরকম একজন যুগমানব ছিলেন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যাঁকে আমাদের ঋষি-কবি বলেছেন—"ভারত পথিক"। আমি কিন্তু তাঁকে বলতে চাই নব্যভারতের পথিকৃৎ।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও ইংরেজের অভ্যুদয়—এই যুগসন্ধিকালে যখন ভারতের আকাশ মধ্যযুগীয় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, দীর্ঘকালের পরাধীনতায় জাতীয় জীবন যখন নানা পাপ, গ্লানি ও অশান্তিতে বিপর্যস্ত, মানবতাবোধ লুপ্ত-প্রায়, মানবমন ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণ শাস্ত্র-নিগড়ে আবদ্ধ, সমাজ-জীবন অর্থহীন ও হৃদয়হীন দেশাচার ও বিবিধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত, অসংখ্য মনগড়া দেবদেবীর ভক্তিহীন পূজার বাহ্যাড়ম্বরে হিন্দু-জীবন যখন বিব্রত ও বিভ্রান্ত—দেশের সেই দুর্দিনের ঘোর অন্ধকারে ভারত-ভাগ্যবিধাতার পরম আশীর্বাদে সুদীপ্ত নবসূর্যের ন্যায় রামমোহন উদিত হয়েছিলেন। ভারতের ভাগ্যাকাশে, নবজাগরণের অগ্রদূতরূপে তাঁর জন্ম—১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ—মতান্তরে ১৭৭২; মৃত্যু-২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ। সেই দুঃসময়ে মৃতকল্প, ক্লেদাক্ত জাতীয় জীবনধারার পঙ্কিল মুখটি তিনি প্রাচীন নির্বিচার, গতানুগতিকতার দিক হতে ফিরিয়ে স্বদেশবাসীকে জাগ্রত চেতনে, স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে, নবযুগের সূর্যোদয়কে অভিনন্দন জানাতে প্রবুদ্ধ করলেন। যুগ-যুগ সঞ্চিত ভয় ও জড়তায় ম্রিয়মাণ হিন্দুসমাজকে অকিঞ্চিৎকর শাস্ত্রীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধের জাল ছিন্ন করে, সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরে নিক্ষেপ করে দুঃসাহসী অভিযাত্রিকের ন্যায় বিশ্বের মুক্ত-পথে বেরিয়ে পড়বার জন্য তিনি আহ্বান জানালেন—চরৈবেতি, চরৈবেতি—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল—যেমন রাজা রোহিতের উপাখ্যানে ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে;—

পুষ্পিণ্যৌ চরণে জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ।
চরৈবেতি চরৈবেতি।

অস্যার্থ—যে ব্যক্তি চলে, তার পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকশিত হয়ে ওঠে, তার আত্মার নিত্য বিকাশ হতে থাকে—এটাই তার মস্ত ফললাভ, চলার বেগে তার ক্ষুদ্রতা নীচতাদি পাপ সকল পথে ঝরে পড়তে থাকে। অতএব চলো, অগ্রসর হও।

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ
উত্তিষ্ঠং স্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্।
চরৈবেতি চরৈবেতি।

অস্যার্থ - শুয়ে থাকলেই কলিকাল, জাগলেই দ্বাপর, উঠে দাঁড়ালেই ত্রেতাযুগ, আর চলতে আরম্ভ করলেই সত্য যুগ আসে। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

শুধু জেগে উঠে চলার ডাক দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না; কোন্ পথে কী ভাবে চলতে হবে, তারও

হাদিস এবং দৃষ্টান্ত বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নিজজীবনে দেখিয়ে গেলেন। তাঁরই প্রদর্শিত পথে চলতে চলতে ভারতীয়গণ স্বাধীনতার দুয়ারে পৌঁচেছেন; এ জন্যই তাঁকে বলা হয় যুগ-প্রবর্তক। তিনি যেসব উপায় ও প্রক্রিয়া বাতলে গিয়েছিলেন, তার বেশী আর কিছু নূতন পথ শতবর্ষকাল মধ্যেও ভারতীয় নেতারা ভেবেচিন্তে বার করতে পারেন নি।

ভুলে যাওয়া সঙ্গত হবে না যে, মহাপুরুষগণ নীল নভোমণ্ডল হতে আচমকা কোন শূন্যক্ষেত্রে (vacuum) এসে দৈবযোগে আবির্ভূত হন না, তাঁদের আবির্ভাবের জন্য এবং তাঁদের শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য পূর্ব হতেই উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া দরকার। কারণ তাঁরাও মানব-ইতিহাসেরই ফসল। উপযুক্ত প্রাকৃতিক, রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক এবং কৃষ্টিগত আবেষ্টন বা পরিবেশ না পেলে তাঁদের শক্তির স্ফুরণ এবং সাফল্যলাভ সম্ভবপর হয় না। তাই ইতিহাসে দেখা যায় প্রত্যেক মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রাক্‌কালে, সমকালে এবং পরবর্তিকালেও তাঁর সমধর্মী বা সমভাবাপন্ন পূর্বসূরি ও অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তিমান পারিষদবর্গ এসে তাঁর কাজে সহায়তা করেন, তাঁর আরব্ধ কাজ সমাপন করেন।

বাংলাদেশ, তথা ভারতবর্ষে নবজাগরণের এই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল উনিশ শতকের উদার এবং বিজ্ঞানভিত্তিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে। সে শিক্ষার সূত্রপাত যদিও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার দিন হতে, কিন্তু মনীষী রামমোহন—যিনি বহু-ভাষাবিদ্ ও সুপণ্ডিত ছিলেন—স্বীয় প্রচেষ্টায় ও তাঁর বন্ধু কালেক্টর ডিগ্‌বি সাহেবের সহায়তায় ভালরূপে ইংরেজি শিখে ১৮১৪ সালে কালেকটরের অধীন দেওয়ানি পদ ত্যাগ করে, কলকাতায় এসে সংস্কার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সর্বস্ব পণ করে, তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা জাতির সম্মুখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের সমন্বয়ে এমন একটি শিক্ষা ও কর্মের আদর্শ গড়ে তুললেন, যার অনুশীলনে, কেবল যে ব্যক্তির ও জাতির মুক্তি বিধানই সম্ভবপর করল তা নয়, অধিকন্তু উহা এক অভিনব ধর্মবোধে অনুপ্রাণিত সসীম মানবকে অসীম, উদার মানবতাবোধে, তথা বিশ্ববোধে, উদ্বুদ্ধ করল। এ দেশীয় জনগণের মধ্যে রামমোহনই প্রথম এই বিশ্ববোধধে অনুপ্রাণিত মানবতার পূজারি হতে পেরেছিলেন, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন তাঁরও বিশিষ্ট শিষ্য ও অনুগামী—রবীন্দ্রনাথ।

বাংলার এই "রিনেসাঁস" বা নবজাগরণের আন্দোলনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) ও তার অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরির অবদানও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আর স্মরণযোগ্য শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সম্প্রদায়, যাঁরা ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরে খৃষ্টীয় মিশনারি কলেজ স্থাপন করে এ দেশীয়-গণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য পুস্তক-প্রণয়ন ও মুদ্রণের জন্য প্রথম বাংলা ছাপাখানা স্থাপন করলেন। তাঁদের বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা ছাড়াও —গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অধ্যাপনাও প্রবর্তিত হয়েছিল। নানাবিধ পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও এই মিশনারিরা শ্রীরামপুর হতে প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত করেন, বাঙালী পাঠক (যদিও তাদের সংখ্যা তখন অতি সামান্যই) এই প্রথম সংবাদপত্রের রস আস্বাদন করতে শিখল। এই খবরের কাগজের সাফল্য ও লোকপ্রিয়তা দেখে অচিরে এদেশে বিবিধ সাময়িক পত্রের প্রকাশ ত্বরান্বিত হল। শ্রীরামপুরের পাদরিগণের আগ্রাসী খৃষ্টধর্ম প্রচার ও হিন্দুধর্মের ভ্রমাত্মক সমালোচনার প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধতা করবার জন্যই (রামমোহন "সম্বাদ-কৌমুদী" নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮২১ সালে প্রকাশ করলেন। অবশ্য তার পূর্বেই তিনি নিজ গৃহে "আত্মীয় সভা" নামক এক সমিতি স্থাপন (১৮১৫ খৃষ্টাব্দ) করে নানারূপ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, পৌত্তলিকতা পরবর্তীকালের তন্ত্র-পুরাণাদির ধর্ম; প্রকৃত হিন্দু ধর্ম—উপনিষদের, অর্থাৎ বেদান্তের একেশ্বরবাদ। ১৮১৫

হতে ১৮২০, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি বাংলায় বেদান্ত দর্শনের অনুবাদ, বেদান্তসার, এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্যোপনিষদের অনুবাদ, সতীদাহ-সম্বন্ধীয় বিচার, গোস্বামীর সহিত বিচার, এবং ইংরেজীতে হিন্দু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক, এবং মুণ্ডক ও কঠোপনিষদের অনুবাদ পুস্তক মুদ্রিত করে অকাতরে সাধারণ্যে বিতরণ করে আসছিলেন। "সংবাদ-কৌমুদী" স্থাপিত হবার পর এই সাপ্তাহিক পত্রের মাধ্যমে তাঁর ধর্মীয় আন্দোলন, শাস্ত্রবিচার ও সংস্কার আন্দোলনের সুযোগে তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের অশেষ উন্নতি সাধন করলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ কেরী (ইনি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কর্মকর্তা) সাহেবের প্ররোচনায় উক্ত কলেজের শিক্ষক, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের প্রতিপক্ষ হয়ে তাঁকে গালি দিতে গিয়েও স্বীকার করেছেন—"দেওয়ানজি জলের মতো বাংলা লেখেন।" তিনি রামমোহনের বেদান্ত ব্যাখ্যার প্রচুর নিন্দা করেছিলেন—বিশেষতঃ এই কারণে যে, তিনি সংস্কৃত ছেড়ে দিয়ে, সাধুভাষার ধার না ঘেঁষে, সাধারণের বোধ্য ভাষায় বেদের অন্তর্ভূত পবিত্র গ্রন্থসকল আপামর সাধারণের নিকট প্রচার করছেন।

রামমোহনই প্রথম এদেশে সর্বক্ষেত্রে সংস্কার-প্রচেষ্টা ও উন্নতিশীল চিন্তাধারা প্রচলিত করতে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে মানবপ্রেমের এক উচ্চ আদর্শ জাতির সম্মুখে স্থাপন করেছিলেন। সব রকমের অন্ধকুসংস্কার ও আচার-মূঢ়তা বর্জন করে উদার ও স্বাধীন চিন্তাধারা প্রবর্তন করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে একদিকে তিনি শিক্ষিত দেশবাসীর অন্তরে প্রকৃত ধর্মচেতনা জাগাতে এবং অন্যদিকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে খৃষ্টীয় মিশনারিগণের অপপ্রচার রোধ করিতে যত্নবান হয়েছিলেন। তাঁরই আন্দোলনের ফলে অবশেষে নৃশংস সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে আইন প্রবর্তিত হয়েছিল ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে; কিন্তু তার বিরুদ্ধে এ দেশীয় রক্ষণশীলগণের এক প্রবল প্রতিপক্ষ দল বিলাতে বোর্ড অব কনট্রোলে আপীল দায়ের করলেন। ঐ সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন সনদের কথা বিচার হবে ও সতীদাহ আইনের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানি হবে—শুনে রামমোহন বিলাতে গিয়ে ভারতীয় নারীদের হয়ে ঐ আপীলের বিরোধিতা করবার জন্য এবং ভারতীয়গণের অন্যান্য অভাব অভিযোগ বোর্ড অব কনট্রোলকে জানাবার জন্য বিশেষ উৎসুক হলেন। সুযোগ এল: পেনসনপ্রাপ্ত দিল্লীর বাদশাহকে কয়েকটি বিষয়ে অধিকারচ্যুত করা হয়েছে; তিনিও বিলাতে আপীলদায়ের করবেন বলে উপযুক্ত লোক খুঁজছিলেন। তিনি রামমোহনকে দূতের মর্যাদা ও সনন্দ দিয়ে এবং রাজাখেতাবে ভূষিত করে বিলাত প্রেরণ করতে মনস্থ করলেন। তদনুসারে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর রামমোহন কলকাতা হতে যাত্রা করে ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে ইংল্যাণ্ড পৌছলেন (১) সেখানে দুই বৎসরকাল কঠোর পরিশ্রম করে সব বিষয়ে সফলতা ও অশেষ সম্মান ও গৌরব তিনি অর্জন করলেন বটে, কিন্তু গুরুতর এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে সেখানে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। তখন লণ্ডন ত্যাগ করে আটলান্টিকের উপ-কূলবর্তী ব্রিস্টল শহরে তিনি এলেন ভারতবন্ধু ডেভিড হেয়ারের আত্মীয়-স্বজন ও ইউনিটেরিয়ান বন্ধুগণের সান্নিধ্যে শান্তি ও বিশ্রাম লাভের আশায়। কিন্তু অল্পদিন বাদেই জ্বরাক্রান্ত হয়ে কয়েকদিন রোগভোগের পর ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩ সালে তাঁর দেহাবসান হল, এবং সেইখানেই তার মরদেহ সমাহিত করা হল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান সুহৃদ ও সহায়ক দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহনের

(১) সে সময়ে সুয়েজ খাল কাটা হয়নি, কাজেই সব জাহাজকেই সমস্ত আফ্রিকা ঘুরে ইংলণ্ডে যেতে হত। সম্ভবতঃ তিনি পালতোলা জাহাজেই গিয়েছিলেন, তাই চার মাসের উপর সময় লেগেছিল।

পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক ব্রাহ্ম আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারের ভার গ্রহণ করে তত্ত্ব-বোধিনী সভা (১৮৩৯) তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালা (১৮৪০) ও তার মুখপত্র হিসাবে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩(প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথম হতেই অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ব-বোধিনী সভার সভ্য হয়ে উক্ত পাঠশালায় শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন; পরে পত্রিকা প্রকাশিত হলে তার সম্পাদক হন। প্রথম দিকে অক্ষয় কুমারের লেখা প্রবন্ধাদি দেবেন্দ্রনাথ ও 'ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা' দেখে সংশোধন করে দিতেন। অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র সমবয়স্ক, একই সালে (১৮২০ খৃঃ) জন্ম। তত্ত্ব-বোধিনীর ব্যাপারে উভয়ের মিলন হয় এবং সে মিলন স্থায়ী বন্ধুত্বে পর্যবসিত হয়। ১৮৪৮ সালে (১৭৭০ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে) ঈশ্বরচন্দ্র তত্ত্ববোধিনী সভার ও গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা—(অর্থাৎ তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার পরিচালক মণ্ডলীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। এই পত্রিকাতেই বিদ্যাসাগরের হিন্দুবিধবাগণের বিবাহবিষয়ক প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় (১৮৫৫, ফাল্গুন)।

ব্রাহ্মসমাজ এবং তত্ত্ববোধিনী সভা উভয়েরই পরিচালন ভার যখন দেবেন্দ্রনাথের হাতে এসে গেল, তখন স্থির হল, উভয়ের মিলন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তদনুসারে নির্ধারিত হল যে তত্ত্ববোধিনী সভাই ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণ করবে এবং তত্ত্ববোধিনী সভার উপাসনার কাজটা ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করবে। উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় প্রকৃতপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ একাই বহন করতেন।

ব্রাহ্মসমাজ যে একটি স্বতন্ত্র এবং স্থায়ী ধর্মমণ্ডলীর আকার ধারণ করল, সে কেবল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং তপস্যার ফলে। জীবনের সকল গুরুতর বিষয়ে সুস্পষ্ট নিয়মানুবর্তিতা ও শিঙ্খলাপ্রিয়তা তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ। তাই তিনি সব বিষয়েই সুনির্দিষ্ট নিয়ম এবং পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন, যথা—ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের জন্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর, দীক্ষাগ্রহণ, ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি প্রভৃতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর মধ্যেই বিদ্যাসাগর এর সভ্য হয়ে সভার (প্রথম পর্যায়ের) শেষ দিন (১৭৮১ শকাব্দের বৈশাখ) পর্যন্ত তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠার দিন হতে বার বৎসর কাল অক্ষয়কুমার দত্ত তার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকায় কোন লেখা ছাপা হবে, কি না হবে, তা ঠিক করে দিত গ্রন্থাধ্যক্ষসমিতি। এ সমিতিতে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি সভ্য ছিলেন। সমিতির অধিকাংশ সভ্যের পছন্দ না হলে কোন রচনাই পত্রিকায় ছাপা হত না। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং বিদ্যাসাগরের রচনাও ছাপা হবার আগে সমিতির অধিকাংশ সভ্যের সম্মতির প্রয়োজন হত। কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের অতিরিক্ত যুক্তিবাদপ্রবণতাওঅনাধ্যাত্মিক মনোভাবে দেবেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হলেন; কিন্তু তাঁদের শক্তি ও প্রতিভাকে স্বীকার করে, পত্রিকার কল্যাণে তাঁদের সহযোগিতা অপরিহার্য বলে মনে করতেন। পত্রিকার সাহিত্যিকী উন্নতি ও লোকপ্রিয়তা কামনা করেই তিনি নিজ ধর্মমত তাঁদের উপর চাপাতে চাইতেন না। এক সময়ে গ্রন্থাধ্যক্ষসভায় অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষীয় সভাদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছিল। ওই সময়ে রাজনারায়ণ বসুর একটি প্রবন্ধ (যা তিনি মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে পড়েছিলেন) দেবেন্দ্রনাথের খুবই ভাল লেগেছিল এবং তিনি সেটি পত্রিকায় ছাপাবার জন্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গ্রন্থাধ্যক্ষেরা সেটিকে প্রকাশযোগ্য মনে করলেন না। সেই কারণে দেবেন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে (২৬ ফাল্গুন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ) লিখেছিলেন—

"কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছেন, ইহারদিগকে এপদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই"।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তো স্বৈরাচারী ছিলেন না; তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক। তিনি ভাবতে লাগলেন—ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্তই তো পত্রিকা। সেই উদ্দেশ্য যদি সফল না হয় তো কাগজ চালিয়ে কী লাভ? ইতিমধ্যে ১৮৫৫ সালে অক্ষয়কুমার মস্তিষ্কের রক্তচাপ

বৃদ্ধি রোগে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে লেখা বন্ধ করতে এবং পত্রিকার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়ে দেওয়াই স্থির করেন। দেখা যায় যে, ওই সময়ে বিদ্যাসাগরই উক্ত সভার সম্পাদক ছিলেন। ১৭৮১ শক, অর্থাৎ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৬ বৈশাখ, সাম্বৎসরিক সভার যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় তার স্বাক্ষরিত হয়েছিল সম্পাদক "শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা" কর্তৃক।

ঈশ্বরচন্দ্র

"বীরসিংহের সিংহশিশু" ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। বীরসিংহ গ্রাম তখন হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল; ১৮৭২ সালে উহা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিতামহের নাম রামজয় তর্কভূষণ। তিনি ছিলেন যেমনি বলবান ও নির্ভীক, তেমনি তেজস্বী; কিন্তু তিনি আপন স্বাতন্ত্র্যগর্বে সকলকেই দূরে ঠেলে রাখতেন না। সাধারণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অমায়িক ও নিরহঙ্কার; কিন্তু যাঁদের আচরণে অহঙ্কার বা অভদ্রতা দেখতেন, তাঁরা যতই বিদ্বান, ধনবান ও ক্ষমতাশালী হোন না কেন, তাঁদের তিনি ছেড়ে কথা বলতেন না। যেমন তিনি স্পষ্টবাদী তেমনি ছিলেন যথার্থবাদী।

১৭৪২ শকের ১২ আশ্বিন (ইং ১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার পিতা ঠাকুরদাস হাটে গিয়েছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রকে বাড়ীর একটি শুভসংবাদ পথিমধ্যে জানালেন—"আমাদের একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।" বাড়ীতে তখন একটি গাভী আসন্নপ্রসবা ছিল, সুতরাং ঠাকুরদাস ঘরে এসে বাছুর দেখতে গোয়ালের দিকেই যাচ্ছিলেন; তর্কভূষণ হেসে বললেন "ওদিকে নয়, এদিকে এস।" এই বলে পুত্রকে আঁতুড় ঘরের দুয়ারে নিয়ে গিয়ে নবজাতককে দেখালেন এবং বললেন—"এঁড়ে বাছুর বললাম এই কারণে যে, এ ছেলে এঁড়ে বাছুরের মতোই একগুঁয়ে হবে। যা ধরবে তাই করবে, কাকেও ভয় করবে না। ও হবে ক্ষণজন্মা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, যশস্বী, দয়ার অবতার। ওর জন্য আমার বংশ ধন্য হবে। ওর নাম রাখলাম ঈশ্বরচন্দ্র।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, ঠাকুরদাস মাতুলালয় বীরসিংহ গ্রামে অতি দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হন। তাঁর পিতা, রামজয় তর্কভূষণের পৈতৃক বাসভবন ছিল বীরসিংহের অদূরবর্তী বনমালীপুরে। তাঁর পিতার নাম ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাঁর বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার; পাঁচ পুত্রের মধ্যে রামজয়ের স্থান তৃতীয়। পিতার মৃত্যুর পর বিষয়বিভাগ নিয়ে সহোদরদের সঙ্গে মনান্তর হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হন; তাঁর স্ত্রী, দুর্গাদেবী দুটি ছেলে ও চারটি মেয়েকে নিয়ে শ্বশুরালয়েই রইলেন, কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারলেন না। তখন বাধ্য হয়ে তাঁকেও ছয়টি ছেলে-মেয়ে নিয়ে শ্বশুরের ভিটে ত্যাগ করে পিত্রালয়ে অর্থাৎ বীরসিংহে আসতে হল। তিনি ছিলেন বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের মেয়ে। তর্কসিদ্ধান্ত মস্ত পণ্ডিত, কিন্তু তখন বৃদ্ধ; সে সংসারে তখন কর্তৃত্ব করেন উমাপতির পুত্র ও পুত্রবধূ, অর্থাৎ দুর্গাদেবীর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ। এতগুলি পোষ্যের প্রতিপালন কতদিন করতে হবে তার ঠিক নেই; সেখানেও ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃজায়া বিরূপ হয়ে উঠলেন।

কন্যার মান থাকে না দেখে বৃদ্ধ পিতা নিজের বাড়ীর কাছেই তাঁদের জন্য একখানা কুটির করে দিলেন। সেখানে চরকায় সুতো কেটে এবং মাঝে মাঝে পিতার কিছু সাহায্য নিয়ে বহু কষ্টে তাঁদের দিন কাটে। এই সময়ে রামজয় তর্কভূষণ সাত আট বৎসর বাদে দেশে ফিরে এসে দেখেন তাঁর স্ত্রী-পুত্র কন্যা বনমালীপুর হতে বিতাড়িত। ভ্রাতাদের আচরণ শুনে তিনি তাঁদের সংস্রব ত্যাগ করে ভিন্ন গ্রামে, অর্থাৎ বীরসিংহে, দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করাই সংগত মনে করলেন।

ঠাকুরদাসের বয়স যখন চোদ্দ-পনেরো বৎসর,

মায়ের এবং সংসারের দুর্গতি দেখে তিনি কলকাতায় চলে এলেন কিছু রোজগারের আশায়। লেখা-পড়া তেমন কিছুই শেখেন নি, রোজগার আর বেশী কি হবে? বেশী রোজগার করতে হলে ইংরেজী জানা দরকার। কিছুদিন কলকাতায় জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কারের বাসায় কাটিয়ে অল্প কয়েকটি ইংরেজি কথা শিখে ঠাকুরদাস একটা কাজ জোটালেন, মাইনে দুই টাকা। যে ভদ্রলোক কাজ জুটিয়ে দিলেন, তাঁরই বাড়ীতে ঠাকুরদাস দুটি খেতে পান। মাইনে দুটি টাকাই বাড়ীতে পাঠান, মায়ের সাহায্যের জন্য। তাঁর কাজকর্মে খুশি হয়ে মনিব দু-বছর বাদে মাইনে বাড়িয়ে পাঁচ-টাকা করলেন। এই সময়ে পিতা রামজয় সংসারে ফিরে এসেছেন, নানা তীর্থপর্যটন শেষ করে। কয়েকদিন বীরসিংহে কাটিয়ে রামজয় কলকাতায় ঠাকুরদাসের কাছে এলেন। রামজয়ের সঙ্গে বড়বাজারের ভাগবতচরণ সিংহের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি রামজয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে, এবং তাঁর পুত্র ঠাকুরদাসের দুরবস্থা জেনে ঠাকুরদাসকে নিজের বাড়ীতে এনে রাখবার প্রস্তাব করলেন। ঠাকুরদাস উঠে এলেন ভাগবতচরণের বাড়ীতে। তিনি ঠাকুরদাসকে আর একটা কাজ জুটিয়ে দিলেন, মাইনে আট-টাকা। আর দু-বেলা খাওয়া ভাগবতচরণের বাড়ীতেই হয়। এখন দুর্গাদেবীর অবস্থা অনেকটা সচ্ছল।

ঠাকুরদাসের বয়স যখন তেইশ-চব্বিশ, তখন তাঁর বিয়ে হল, ভগবতী দেবীর সঙ্গে। তাঁর পিত্রালয় গোঘাট গ্রাম, পিতার নাম রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় (তর্কবাগীশ) তিনি ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন। বাড়ীতে অনেকগুলি ছাত্রকে অন্নদান ও নিজ চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাদান করতেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চায় মনোনিবেশ করে শিক্ষাদানে অমনোযোগী হলেন। পরে শব-সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে উন্মাদগ্রস্ত হন, খবর পেয়ে ভগবতীর মাতামহ পাতুলগ্রামের পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ, তাঁর কন্যা গঙ্গাদেবীকে দুই কন্যা ও উন্মাদ স্বামীসহ নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। এই দুই কন্যার মধ্যে কনীয়সী হলেন ভগবতী, ঠাকুরদাসের স্ত্রী।

বিদ্যাবাগীশের বৃহৎ পরিবার—চার পুত্র ও দুই কন্যা, সকলেই বিবাহিত; এবং তাঁদের সন্তানাদিও আছে। কিন্তু সেকালের পক্ষেও, এটি ছিল এক অত্যাশ্চর্য একান্নবর্তী পরিবার: পিতা বিদ্যাবাগীশ বৃদ্ধ; পুত্রেরা এই সংসারের পরিচালনা করেন। কিন্তু চার পুত্রের মধ্যে কখনো মতান্তর বা মনান্তর হয় না, এমনি তাঁদের পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা। তাঁদের নিজ-নিজ পরিবার তো আছেই, তার উপর ভগিনীরাও তাঁদের সন্তানাদি নিয়ে প্রায়শঃ পিত্রালয়ে আসেন, কিন্তু তাতে কখনও তাঁদের ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হতে দেখা যায় না। তাঁদের ভাগিনেয়ী ভগবতী দেবীও অনেক সময় তাঁর পুত্র-কন্যাদের নিয়ে পাতুলে মাতুলালয়ে গিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর উত্তরকালে লিখেছেন যে, বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর পরে, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ সংসারের কর্তা হলেন; মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন পিতার চতুষ্পাঠী পরিচালনা করতে লাগলেন; তৃতীয় ও চতুর্থ কলকাতায় বিষয়কর্ম করতে লাগলেন; যিনি যা উপার্জন করেন, জ্যেষ্ঠের হাতে তুলে দেন; চার সহোদরে তাঁরা যাবজ্জীবন একান্নবর্তী ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা এরূপ সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, সকলের উপর তাঁর এরূপ স্নেহ ও যত্ন ছিল যে, তাঁর কর্তৃত্বে কেউ কখনো রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হতে পারেন নি। সৌজন্যে ও মনুষ্যত্বে চার ভ্রাতাই সমান ছিলেন। বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীদের পুত্র কন্যাদের উপরেও, তাঁহাদের অনুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেয়ীরা পুত্র-কন্যা লইয়া মাতুলালয়ে গিয়া, যেরূপ সুখে সমাদরে কালযাপন করিতেন, কন্যারা পুত্র-কন্যা লইয়া পিত্রালয়ে গিয়া, সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারেন না।...আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—যেঅবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া সকলে পরম

সমাদরে অতিথিসেবা ও অভ্যাগতপরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।”

ঈশ্বরচন্দ্রের ঠাকুরদাদা, রামজয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: “এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়াছিলেন।” সেই সঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, পাতুলের ঐ মুখোপাধ্যায় পরিবারের প্রভাব, ভগবতী দেবী ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে কম কার্যকর হয় নাই। ভগবতী দেবী যে অমন অসামান্যা রমণী হতে পেরেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে তাঁর এক মাতুলালয়ের প্রভাবেই।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে দয়াদাক্ষিণ্য, বদান্যতা, উদারতা, পরদুঃখকাতরতা, সমদর্শিতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি উত্তরজীবনে প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলি তাঁর মাতৃকুলের উত্তরাধিকার; আর অন্যদিকে তাঁর চরিত্রে যে দৃঢ়তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কঠোরতা, অনমনীয়তা নির্ভীকতা দুর্দমবেগবত্তা—এক কথায় যে উগ্র পুরুষকার দেখা গিয়েছিল, সেটি তাঁর পিতৃকুলের উত্তরাধিকার বলেই আমার বিশ্বাস। ঈশ্বরচন্দ্র অতিশয় সৌভাগ্যশালী সন্তান, যেহেতু তিনি মাতাপিতা উভয়কুলের সমস্ত সদ্গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁর মাতা ও পিতামহের জীবনচরিত কেমন করে প্রতিফলিত হয়েছিল, সেটা বুঝবার জন্যই এই বিস্তৃত আলোচনা।

এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালকটি আট বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। রামমোহন তখনও কলকাতায় আছেন, কিন্তু তিনি থাকেন মানিকতলায়; আর ঈশ্বরচন্দ্র থাকেন পিতার সঙ্গে বড়বাজারে। সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কখনো হয় নাই। রামমোহন যখন বিলাতগমন করলেন, ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র এগার বৎসর এবং তখন তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শ্রেণীতে পাঠ করছেন। তের বছরে সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি “বিদ্যাসাগর” উপাধিতে ভূষিত হয়ে বেরোলেন ৪ ডিসেম্বর, ১৮৪১ তখন তাঁর বয়স একুশ বৎসর মাত্র। সাতজন উক্ত কলেজের অধ্যাপক এবং কলেজের অধ্যক্ষ (Secretary)-রসময় দত্ত—তাঁদের নাম স্বাক্ষর করে ঈশ্বরচন্দ্রকে যে প্রশংসাপত্র (certificate) দিয়েছিলেন তা থেকে দেখা যায় বিদ্যাসাগর নিম্নলিখিত সাতটি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন:—(১) ব্যাকরণ, (২) কাব্যশাস্ত্র, (৩) অলঙ্কারশাস্ত্র (৪) বেদান্তশাস্ত্র (৫) ন্যায়শাস্ত্র (৬) জ্যোতিঃশাস্ত্র এবং (৭) ধর্মশাস্ত্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পিতামহের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর জীবনে সফল হতে চলেছে। এত অল্পবয়সে এতগুলি শাস্ত্র অধিগত করার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল।

দারিদ্র্যের সহিত কি কঠোর সংগ্রাম করে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়, বাংলা দেশে তা অনেকেরই সুপরিজ্ঞাত। তিনি ‘গোপাল’এর ন্যায় বাধ্য এবং সুবোধ বালক ছিলেন না, বরং কোন-কোন বিষয়ে ‘রাখাল’এর সঙ্গেই তাঁর বেশী সাদৃশ্য দেখা যেত। অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমির জন্য তিনি পিতার নিকট অনেক চড়-চাপড় খেয়েছেন, কিন্তু পড়াশুনায় তাঁর কখনও শৈথিল্য ছিল না। পিতা সকালেই কাজে বেরিয়ে যেতেন; ঈশ্বরচন্দ্রকে একহাতে বাসনমাজা, ঘর পরিষ্কার করা, বাজার করা, কুটনো কাটা, বাটনা বাটা প্রভৃতি সবই করতে হতো। পিতা এবং দুই ভ্রাতার জন্য দু-বেলার রান্না তাঁকেই করতে হতো। এত সব করেও তিনি প্রায় সমস্ত পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি সমস্ত অধ্যাপকদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবনে প্রায় সর্বদাই ছাত্রবৃত্তি এবং বহুমূল্যের পুরস্কার লাভ করেছেন।

ছাত্রজীবনের অধিকাংশ কাল তাঁর বড়বাজারে ভাগবত সিংহের বাড়ীতেই কেটেছে। এখানে ভাগবতচরণের কন্যা রাইমণির নিকট তিনি যে অতুলনীয়

স্নেহ-যত্ন লাভ করেছিলেন, জীবনে কখনও তা ভুলতে পারেন নি। রাইমণির একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র পরবর্তীকালে লিখেছেন—"আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে রাইমণির অনুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না। ফল কথা এই—স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্‌বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ-বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই।... আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধহয় সে নির্দেশ অসংগত নয়। যে-ব্যক্তি সেই রাইমণির দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূ-মণ্ডলে নাই।"

এই রাইমণি-চরিত্রের প্রভাবও বিদ্যাসাগরের জীবনে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর দেখতে একেবারেই সুশ্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন খর্বকায়, শীর্ণ, সেই কালের উড়েদের ন্যায় চক্রাকারে মুণ্ডিতমস্তক; উচ্চ প্রশস্ত তাঁর ললাট, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক অধরোষ্ঠ, কিন্তু প্রকাণ্ড একটি মাথা—যেজন্য তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে বিদ্রূপ করত 'যশুরে কৈ,' বা শব্দ দুটির প্রথম অক্ষরের স্থান পরিবর্তন করে, 'কশুরে যৈ' বলে। বাহিরটা তাঁর বজ্রাদপি কঠোর দেখালেও ভিতরটা ছিল কুসুমাদপি কোমল। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি তৃণ অপেক্ষাও হেয় মনে করতেন; কিন্তু পরের দুঃখে অশ্রুবিসর্জন প্রায় সর্বদাই করতেন। সামান্য রাখালবালক হতে মস্ত ধনী বা রাজা, মূর্খ বা পণ্ডিত—সকলেরই তিনি বন্ধু। বিপদ বা দুঃখের কথা জানালে, অথবা জানতে পেলেই তাঁর হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হত—অর্থ দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, বা পরামর্শ দিয়ে, অথবা অন্য যে কোন উপায়ে হোক—সাধ্যমতে সবরকম দুঃস্থের সেবা ও সাহায্য করা তাঁর স্বভাব। স্বদেশী হোক বিদেশী হোক, বাঙ্গালী হোক বা অবাঙ্গালী হোক, হিন্দু, খৃষ্টান বা মুসলমান—যাই হোক, বালক বা বৃদ্ধ হোক, ভিক্ষুক হোক বা রোগার্ত হোক, মূর্খ হোক বা পণ্ডিত হোক,—আর ছাত্র বা শিক্ষক হলে তো কথাই নেই—বিদ্যাসাগরের সাহায্যের হাত সদাই প্রসারিত। নিজের কাছে টাকা না থাকলে ধার করে এনে তিনি সাহায্য করতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিলাতে থাকাকালে তিনি হাজার-হাজার টাকা (অধিকাংশই ধার করা) না যোগালে, সপরিবারে তাঁকে বিদেশে অনাহারেই মরতে হতো; ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফেরা আর সম্ভব হতো না। বড়লোকের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে কখনো তিনি দরিদ্রকে অবজ্ঞা করেন নি, বরং গরীবের জন্য বড়লোকের সঙ্গে —এমনকি সরকারের সঙ্গেও অনেক লড়েছেন।

তাঁর বাহিরের পোশাক নিতান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো সাদা থান ধুতি, চৌবন্দী ফতুয়া, সাদা চাদর এবং তালতলার চটি হলেও অন্তরে অন্তরে তিনি ছিলেন খাঁটি ইউরোপীয়; নির্ভীক বলিষ্ঠতা, আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সত্যচারিতা, স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি এবং আত্মনির্ভরতায় তিনি রামমোহনেরই ন্যায় ইউরোপীয় মহাজনগণের সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন। কি রাজা কি ধনী কিংবা উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ কারো কাছেই তিনি কখনও কাপুরুষের ন্যায় মস্তক অবনত করেন নি। মেডিকেল কলেজের সাহেব প্রিন্সিপ্যাল এবং হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবকে তিনি ত্রুটি স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন। জাহানাবাদ পরগণার সামান্য আয়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উপর অন্যায়ভাবে আয়কর ধার্য হলে তাদের জন্য প্রায় দুইমাসকাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হয়ে আন্দোলন করে ছোট লাট সাহেবের সাহায্যে তাদের করভার মুক্তির ব্যবস্থা করতে সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করেছিলেন।

উপন্যাস

জন্ম-জন্মান্তর

রামপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তা কি খাঁটি সোনা দিয়ে গহনা তৈরী হয়—তার সঙ্গে খাদ মিশানো থাকে—থাকে পান গালা আরও কিছু মশলা। ভগবানও তেমনি একটা পরীক্ষা পাশ করিয়ে আর একটা পরীক্ষার সামনে হাজির করেন। তাঁর আইনে শুধু পরীক্ষা, জীবন ভোর শিক্ষা পাঠ না হলে যাওয়ার ব্যবস্থা। ব্যবস্থা কঠোর সন্দেহ নাই, কিন্তু কঠিনের অন্তরে আনন্দ স্বাদটুকুও লুকানো। বাইরে যেটা বিড়ম্বনা অন্তরে সেটাই হয়তো সান্ত্বনার আশ্রয়। বিয়ের পর মেয়ে জামাই অষ্ট বর্দ্ধনে আসতে তেমনি একটি পরীক্ষার আয়োজন দেখা গেল।

ইতিমধ্যে বিয়ের রাত্রিতে আরও এক পরীক্ষা হয়ে গেল। মহেশের বড় দুই শালক ছুটকু ও কটি কাজের বাড়ীতে এসে হাজির। মহেশ রমাকে জানিয়েছিল, কাজের দিন ওরা যেন এই বাড়ীতে কদাচ না আসে। বেয়াই এলাহাবাদের মানুষ—কটি ও ছুটকুকে উত্তম রূপেই চেনে। ওদের কাজের বাড়ীতে ঘোরা-ফেরা করতে দেখে যদি সম্বন্ধটি নির্ণয় করে ফেলে আর তার ফলে কোন অপ্রীতির ঘটনা ঘটে? তার চেয়ে ওদের না আসাই ভাল। রমা সঙ্কোচবশতঃ মাকে কথাটা জানাতে পারেনি। ভেবেছিল কাজের বাড়ীতে কে আর ওদের লক্ষ্য করে গোল বাধাবে।

কিন্তু লক্ষ্য করল মহেশ।

ওদের ডেকে বলল, দেখ—তোমরা এক পাশে চুপচাপ বসে থাকগে—বরযাত্রীদের সামনে ঘোরাফেরা কোরো না।

কটির মেজাজ এমনিতেই রুক্ষ—তার উপরে নেশার রঙ যথেষ্ট উদগ্র হয়েছিল, চোখ পাকিয়ে বলল, এর মানে?

মহেশ বলল, মানে সোজা আমার ইচ্ছা নয় বেয়াইএর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়।

কটি বলল, ওঃ—আমরা দাগী আর তোমার বেয়াইটি গঙ্গা জলে ধোয়া তুলসী পাতাটি। জান না যাদু কার পাল্লায় পড়েছ। ওটি একটি আস্ত রাঘব বোয়াল আমাদের কারবারের সিনিয়ার পার্টনার।

ধমক দিল মহেশ, বাজে বকোনা।

ঠিক আছে, সিস্টার ইন-ল—চললাম। ফলটা কিন্তু পাবে হাড়ে হাড়ে। এই ছুটকু চলে আয়, মা কে ডাক চরণকে ডাক।

চরণকে খুঁজে পাওয়া গেল না—মা কাঁদতে কাঁদতে একায় উঠলেন। বললেন আমি যাই বেহায় ভাই নেমন্তন্নে এসেছিলাম—অমন জামায়ের মুখ দর্শন করলে মহাপাতক হয়। কাঁচ মেয়ে ওকে ত শাপমন্যি দেব না—সাপকে মারতে শিবকে লাগবে, কিন্তু হে ভগবান তুমি এর বিচার করো—বিচার করো—

বিচার কি করবেন ভগবানই জানেন আপাতত কঠিন একটি প্রশ্ন মহেশের সামনে উপস্থিত করলেন।

নতুন বেয়াইএর নাম সদাশিব বাঁড়ুজ্যে। লোকে বলে শিবের অপগুণগুলি সবই ওতে বিদ্যমান। ওর অনুচর পাথিকরগুলিও অন্ধকার জগতের জীব।

চকের দোকানটি সর্ব কর্ম সমন্বয়ের আদর্শ স্থান ওখানে ছেলের হাতে কলকে বসিয়ে বাপ দেয় গড়গড়াতে

মুখটান। কটিরা অমনি ইঙ্গিতই যেন করেছিল। যাই হোক জামাইকে অষ্টবর্দ্ধনে পাঠিয়ে বাপ এলো তদারক করতে। মহেশকে আপ্যায়িত করতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অমায়িকভাবে হেসে আলাপ চালিয়ে গেল—তারপর এক সময়ে গলা নামিয়ে বলল, একটা গোপনীয় কথা ছিল বেয়াই—মানে কথাটা কানে গেল বলেই ছুটে এলাম।

মহেশ বলল, বেশ তো বলুন।

সদাশিব বলল, কথাটা গোপনীয় কিনা—আটঘাট বেঁধে প্রকাশ করাই ভাল, আপনার সঙ্গে এখন আত্মীয় সম্বন্ধ—পাড়ায় পাঁচ কান হলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি।

অস্বস্তিকর ভূমিকা,—মহেশ উদ্বিগ্ন হল। শুকনো গলায় বলল, কি এমন ঘটনা......তা এখানেই বলুন —পাঁচ কান হবার চান্স নেই। বলে উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

সদাশিব বলল, কথাটা হঠাৎই কানে এলো ভাবলাম শত্রুপক্ষের রটনা। যাই হোক—, গৃহিনী বললেন অত ভাবনার কি আছে—শুনেছি বেয়াই সাধু মানুষ তাঁর মুখ থেকেই যাচাই করে নাওনা। তাই এলাম।

একটু দম নিয়ে বললেন, আচ্ছা বিয়ের আগে বউমার কি খুব শক্ত ব্যারাম হয়েছিল? মানে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল?

বিয়ের আগে! ভ্রূ কুঞ্চিত করে মহেশ বলল, কৈ মনে তো পড়ছে না। হাসপাতালে ও জীবনে যায় নি।

সদাশিব হেসে বললেন, হাসপাতালে কোন মানুষটা আর সখ করে যেতে চায় বলুন। দায়ে পড়েই না ছুটতে হয়। তা সেখানকার ব্যবস্থা ট্যাবস্থা যাই বলুন—চমৎকার, আর চিকিৎসার কথাও কাকেপক্ষীতে টের পায় না। মানে কতকগুলো নিয়ম কানুনের মধ্যে থাকতে হয় বলে বাইরের কেউ জানতে পারে না।

মহেশের উদ্বেগ এবার বিরক্তিতে পরিণত হল —বলল, গৌরচন্দ্রিকাটা খুব লম্বা হয়ে যাচ্ছে বেয়াই যা বলবার বলে ফেলুন।

এই কথায় সদাশিবও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। বলল, আত্মীয় আপন জন বলেই সাবধানে তুলছিলাম কথাটা —না হলে আমার কি অত মাথাব্যথা। আপনি হয়তো কর্মস্থলে ছিলেন, পুরোপুরি খবর রাখেন না বেয়ানকে জিজ্ঞাসা করলে উনি সঠিক বলতে পারবেন। বিয়েতে অসুবিধা হবে বলে মেয়েকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন।

মহেশ ইঙ্গিতটুকু পুরোপুরি ধরতে পারল না,— অবাক হয়ে সদাশিবের পানে চেয়ে রইল।

সদাশিব বলল যে নার্স ওর শুশ্রূষা করেছিল সে গল্প করেছিল তার এক আত্মীয়ের কাছে। সেই আত্মীয়া ফুল শয্যার দিন এসেছিলেন আমাদের বাড়ীতে —তিনি আবার আমাদেরও দূর সম্পর্কের আত্মীয়া এখন মুশকিল হয়েছে কি—ওই আত্মীয়টি খুব গরীব —ওঁর স্বামী পুত্র নিকটজন কেউ নেই যে ওর ভরণ পোষণ করে। অথচ জীবন ধারন করতে টাকার প্রয়োজন। তাই উনি বলেছেন—ব্যাপারটি আমি চেপেই যাব কিছু টাকা পেলে। টাকাটা অবশ্য আমার কাছ থেকেই চেয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে আপনারা যখন মূল আসামী—তখন আমি কেন জরিমানা দেব?

মহেশ ক্রমশঃ যেন বুঝতে পারছিল ইঙ্গিতটা। বুঝতে পারছিল আর কঠিন হয়ে উঠেছিল মন। কদর্য্য ইঙ্গিত, তাদের বংশের উপর কটাক্ষপাত।

সদাশিব বলল, আশা করি বুঝতে পারছেন কি বিষয়ে বলছি। আমাদের শাস্ত্রেও আছে এমন দৃষ্টান্ত কানীন সন্তান নিয়ে কুন্তী সত্যবতী—

থামুন আপনি। মহেশ গর্জন করে উঠল।

সদাশিব প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল—একটুকাল চুপ করে থেকে কণ্ঠ উচ্চে তুলে বলল, মানে?

মানে আপনি ইতর।

কি আমি ইতর। চোখ পাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সদাশিব।

একশোবার। হাজারবার। গেট আউট—গেট আউট—, চীৎকার করে উঠল মহেশ।

চারিদিক থেকে লোকজন ছুটে আসার শব্দ শুনলো মহেশ। কোলাহল শুনলো। কিন্তু কারা ছুটে এলো কে কি বললো কিছুই বোধগম্য রইল না। চৈতন্য হারিয়ে মহেশ ততক্ষণে মেঝের উপর লুটাচ্ছে।

মন্দের মধ্যে ভাল খবর মেয়েকে রেখে যায়নি ওরা। বেয়াই-এর নাকি সেই ইচ্ছাই ছিল—জামাই রাজী হয়নি। এই নিয়ে বাপে ছেলেতে একচোট কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। জামাই বললে গুজবে কান দিলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি। যদি কিছু ঘটেই থাকে ঘটনা—এতদিন পরে তার সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করে কি লাভ। মানুষ তো দেবতা নয়—ভুল করা স্বাভাবিক। তা নিয়ে হৈ চৈ কেন।

বাপ ওকে ত্যাজ্য পুত্র করার ভয় দেখিয়েছিল। জামাই চলেনি। জবাব দিয়েছে আপনার সম্পত্তির আশা আমি কোনদিনই রাখি না—, আপনার খুসীমত ব্যবস্থা করতে পারেন।

আর কি করতে পারে সদাশিব, যাবার সময় আর একবার অচৈতন্য মহেশের উদ্দেশে শাসিয়ে ছিল, এর উপযুক্ত ফল তোমায় ভোগ করতে হবে জেনো।

আনন্দের হাটে কান্নার শোর গোল উঠল। তবু সবটাই নিরানন্দের নয়। ভগবানের আশীর্বাদ সুপাত্রে কন্যাদান করতে পেরেছে মহেশ।

ভগবানের দয়া, ছেলেটি সৎ-শিক্ষিত উচ্চমনা। সন্ধ্যা বেলায় ঠাকুর ঘরে বহুক্ষণ কাটলো মহেশের।

তবুও একটা আঘাত। নিদারুণ আঘাত। মেয়ে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল—শ্বশুর বাড়ীতে যে সম্মানের আসন তার জন্য নির্দিষ্ট সে কি স্নেহলতা কোনদিন ফিরে পাবে? নিজের শ্বশুর বাড়ীর কথা ভাবল রমা। নিজের মন্দ ভাগ্যের তুলনা দিয়ে মেয়ের মন্দ ভাগ্যকে নির্ণয় করতে লাগলো। সব সময়ে ওই একই চিন্তা—মেয়ে সুখী হবে কি? জামাইএর মন চিরকাল উদার থাকবে কি? ভাবতে ভাবতে অসুস্থ হয়ে পড়ল রমা। একদিন দুপুর বেলায় কাজ করতে করতে মাথা ঝিম ঝিম করে কেমন যেন এলিয়ে গেল দেহটা। আচ্ছন্নের মত বেশ কিছুক্ষণ পড়ে রইল। আবার একদিন সকাল বেলায় চৌকায় কাজ করতে করতে মাথা ঘুরে গেল।

মহেশ তখন লক্ষ্ণৌতে। চরণ মাঝে মাঝে আসত খোঁজ খবর নিতে। সেদিন এসে দেখে দিদি চৌকায় (রান্নাঘর) মেঝেয় চোখ বুজে পড়ে আছে। নাম ধরে ডেকে ডেকেও সাড়া পেল না চরণ। আরও কাছে এসে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। অনেক করে জ্ঞান ফিরিয়ে এনে বলল, একখানা টাঙ্গা ডেকে আনি আমাদের বাড়ীতে চল।

রমা বলল, না উনি রাগ করবেন। মা—মায়ের কথা আমরা ভাবব—আমি লক্ষ্ণৌতে জামাইবাবুকে সব জানিয়ে দিচ্ছি উনি এসে তোমাদের নিয়ে যান।

তা কি করে হবে—উনি তো বদলি নিয়ে এ-দিকে আসছেন।

চরণ বলল, এখন তো বাড়ী উঠছে না কি করবেন বদলি নিয়ে। তোমাদের লক্ষ্ণৌতে থাকাই ভাল।

কোন কথা শুনল না চরণ—জোর করে বাড়ীর তালা বন্ধ করে চাবিটা রমেনের হাতে দিয়ে বলল, দাদা আপনি একটু দেখবেন। এই অবস্থায় দিদিকে এখানে রাখতে পারব না।

রমেন বলল, তুমি নিশ্চিন্ত হও আমিও মহেশকে চিঠি লিখছি।

মানসিক বিপর্য্যয় মহেশেরও রীতিমত হয়েছিল। লক্ষ্ণৌতে ফিরে এলে মহেশের বন্ধুরা পরামর্শ করে স্থির করল—কোন তীর্থস্থানে দিন কয়েকের জন্য গিয়ে থাকলে মনের ভারসাম্য ফিরে আসবে। কাছে পিঠের অনেকগুলি তীর্থ সারা হয়েছে—এখন দূরের একটি পীঠস্থান ওরা বাছতে লাগল। মহেশ অগ্রসর তন্ত্র চর্চা করে—শাক্তমতে ওদের কুলগুরু দীক্ষা দেন।

সুতরাং বেছে বেছে শ্রেষ্ঠ যন্ত্রপীঠ কামাখ্যা ধামে যাওয়াই স্থির করল ওরা। সেই তন্ত্রভূমির মাহাত্ম্য আবার অম্বুবাচীর সময়ে শতগুণে বর্দ্ধিত হয়। হাজার হাজার ভক্তিপ্রাণ নরনারীর পূজা আরাধনায় দেবী নাকি প্রত্যক্ষীভূতা হন। তাঁর অলৌকিক রহস্যের বহু কাহিনী উপকথা কিংবদন্তী শোনা আছে। দেবী মহিমা বিস্তারে এইগুলির প্রভাব অসামান্য। প্রত্যক্ষীভূত হয়তো কিছু করা যাবে না—কৌতূহল নিবৃত্ত হবে এটাও কম লাভ নয়। ওরা দল বেঁধে চলল দেবীপীঠ কামরূপে।

তারপরের ঘটনা এই কাহিনীর প্রারম্ভেই বলা হয়েছে। শুধু রমার ভাগ্যে কেমন করে বিপর্য্যয় ঘটলো সেই সূত্রটা ধরা হয়নি। এখন সেই সূত্রটা ধরবার চেষ্টা করা যাক।

দেবীর মন্ত্রপূতঃ বস্ত্রখণ্ড ধারণ করার পূর্ব্বে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা ওপক্ষেরই মুখে শোনা কথা। চরণ গল্প করেছিল সেই বিয়োগান্ত ঘটনার পর। তার মুখে শোনা কথাগুলি পর পর সাজালে যা পাওয়া যায় তা মোটামুটি এইরকম:

মহেশের শাশুড়ী চিরকালই শক্ত ধরণের মেয়েমানুষ। সে কালের কোন কোন মেয়ে—যাদের শিক্ষা সামান্য মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস অসীম,—জপতপ ধ্যান ধারণা আরাধনার চেয়ে ঝাড়ফুঁক তুকতাকেই দেবী মহিমাকে প্রত্যক্ষ করতে ভালবাসে তাদের গোত্রে মিলবে মহেশের শাশুড়ী। ছোট ছেলেদের পেঁচোয় পাওয়ার ওষুধ কোথায় পাওয়া যায়—ভূত ছাড়ানোর ওস্তাদ থাকে কোন কোন মহল্লায়, কোন গাছে ঢিল বাঁধলে বন্ধ্যা মেয়ের সন্তান লাভ হয়, উপরি দৃষ্টি ছাড়ানোর জল পড়া কিভাবে যোগাড় করতে হয়—সন্ন্যাসী ফকির প্রেতসিদ্ধ সকলকার সন্ধানই ওর জানা। নিজেও কখনো কখনো জল পড়া তেল পড়া দেয় কোমরের ফিক ব্যথা ফুঁ দিয়ে মন্ত্র পড়ে সারায়—দৈবমাদুলিও ধারণ করিয়েছে বহু মেয়েকে। এই মহল্লার সবাই ওকে জানে, ভয় করে—মান্য করে। ভাল করার ক্ষমতা না থাক—অপকারের ক্ষমতা যে কোন মানুষেরই আছে,—আর যে যত এই ক্ষেত্রে পারদর্শী তার প্রতাপ তত অধিক। নিজের মেয়ে হয়ে রমা মা-কে যত না ভক্তি করে—তার চেয়ে বেশী করে ভয়। মায়ের অলৌকিক ক্ষমতার দুই একটি দৃষ্টান্ত ও স্বচক্ষে দেখেছে-শুনেছে বহু ঘটনা।

এখন চরণ ওকে ফিরিয়ে আনতেই মা বলল, কেমন কাঙালের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে কিনা। আমি পই পই করে বলেছিলাম—আলাদা বাসা করিস-নে পস্তাবি—পস্তাবি—পস্তাবি। কেমন?

তা সে যা হবার হয়ে গেছে এখন কি করা যায়?

মা বলল, এখন টানটা ছাড়াতে হবে। বশীকরণের টান, না হলে মানুষের মতিগতি এমন হয়।

এখন সমস্যা—কি করে টানটা বিপরীত মুখে আনা যায়? মহেশকে যারা আকর্ষণ করছে-তাদের কেমন করে হঠানো যায়? এখন থেকে খুব সাবধান। চার চক্ষু মেলে চলতে হবে। খবরদার—মহেশ যা পাঠাবে—যদি খাবার জিনিস হয়—মাকে না দেখিয়ে যেন রমা বাক্স জাতঃ কিংবা উদরসাৎ না করে। যদি ফুল হয় তার গন্ধ যেন না শোঁকে। যদি দর্পণ হয় সেই দর্পণে যেন মুখ না দেখে, যদি শয্যা হয়, খবরদার তার উপরে যেন গড়াগড়ি না খায়। ওর কাছ থেকে আসা প্রতিটি জিনিস এখন থেকে পরীক্ষা করে তবে ব্যবহার করা চলবে। সন্দেহ হলে সরিয়ে রাখবে একপাশে—তা সেটা যত ভাল আর লোভনীয় হোক। যত স্নেহ ভালবাসার দান বলেই আসুক।

মাদুলিটা তাকে পাঠিয়েছিল মহেশ। উপদেশ ছিল—শনি মঙ্গলবারে কৃষ্ণতিথি হলেই তাল-ধারণ করার আগে যেন দেবীর পূজা মানত করা পয়সা কপালে ঠেকিয়ে তুলে রাখে বাকসোয়। পরে পুজো পাঠিয়ে দেয় কালিবাড়িতে। আর প্রতি শনি বা মঙ্গল যে বারে ধারণ করা হবে যেন তণ্ডুল বা শস্যজাত কোন জিনিস না আহার করে। মুগের ডাল সিদ্ধ কলমূল

ইত্যাদি খেয়ে থাকতে হবে। মানে দুটো দিন বৈত নয়।

মাকে না জানিয়ে সেই মঙ্গলবারেই গঙ্গাস্নান করে মাদুলি ধারণ করল রমা। মাকে বলল, আজ আর ভাত রুটি খাব না—কলা খরমুজো কি আমটাম আনিয়ে দেব।

কেন। অমাবস্যে করবি?

না এমনি একটা ওষুধ নিলাম।

ওষুধ। কোথায় পেলি—কে এনে দিলে?

তোমার জামাই পাঠিয়েছে কামরূপ কামিখ্যের মাদুলি।

এই মরেছে। সত্রাসে বিস্ময়ে চমকে উঠলো মা। ওযে ভেড়া করার দেশ ডাকিনী শাকিনীর দেশ ফেল ফেল, খুলে ফেল।

রমা বাঁ হাতের কুনুই চেপে ধরে বলল না।

না কিলো—ও যে সর্বনাসীর ভুকতাক কাচাখাগী দেবী। ফেল ফেল—ছুড়ে ফেলে দে নর্দমায়।

আরও অনেক ভয় দেখাল মা। শেষ পর্যন্ত মাদুলিটা খুলেই ফেলল রমা। গোঁড়ামির জোর হাওয়ায় শিক্ষার প্রদীপ জেলে রাখা গেল না—মাদুলিটা খুলে নর্দমায় ছুড়ে ফেলল।

সেই রাত্রিতে প্রবল জ্বর সর্বাঙ্গে আড়ষ্ট ব্যথা। চোখ চাইতে কষ্ট—ঘাড় তুলতে অশান্তি—রমা কেমন দিশেহারা হয়ে গেল। কি করবে কি বলবে কিছু স্থির করতে পারল না।

ডাক্তার দেখে বললেন, আর থ্রাইটিস। পেট যাতে পরিষ্কার থাকে তেমন পথ্য দেবেন। নুন ঝাল খাওয়া কমাবেন—যদি দোক্তা জরদার নেশা থাকে ছাড়তে হবে।

মা ঠোঁট উল্টে বলল, ডাক্তারেরা অমন কত কি বলে। ওদের কথা মানতে গেলে দুনিয়ার সব মানুষকেই হাসপাতালে ঘর বাঁধতে হয়।

সারাদিন আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলো রমা। মা বার দুই ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে বললেন, নিশ্চয় উপরি বাতাস লেগেছে গায়ে। সন্ধ্যে বেলায় জলপড়া দেবখন ঠিক হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারী চিকিৎসা বজায় রাখলে চরণ। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুফল হলো না। মা ভাইকে কিছু না জানিয়ে জরুরি তার করলো মহেশকে।

মাদুলি পাঠানোর সঙ্গে চিঠিও দিয়েছিল। যথা সময়ে তার জবাব এলো না। তার পরের দুখানা চিঠির উত্তর নেই। মহেশের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো প্রথমটা চিঠি না পৌছানোর কথা ভেবেছিল—কিন্তু পর পর তিনখানা পত্র না পাওয়ার কথা ভাবা যায় না। এবার অসুস্থতার কথাই মনে আসে। খাশুড়ী আর বড় দুই শ্যালক যোগসূত্র রাখবে না এটা জানে ছোট শ্যালক চরণ তো সে গোত্রের নয়। ওই যেন দলছাড়া ওই পরিবারে বেমানান। কাল চরণকে একখানা চিঠি দেবে ঠিক করল। সেদিন মন খুবই উচাটন ছিল কেমন যেন একটি অশুভ ছায়া ঘনিয়ে উঠছে—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছিল। আপিস থেকে ফিরে হাত পা ধুয়ে ঠাকুরের জলচৌকির সামনে জপে বসল। সংকল্প করল অনেকক্ষণ ধরে জপ করবে—গাঢ়ভাবে ঈশ্বর চিন্তা করবে—তারপর পাঠ করবে ধর্মগ্রন্থ। মনকে কড়া শাসনে রাখবে—যাতে অমঙ্গল চিন্তায় চঞ্চল হতে না পারে।

খুব বেশীক্ষণ নয়—জপে ঈশ্বর চিন্তা হারিয়ে যাবার মুখে হঠাৎ ওর চোখের সামনে মৃদু আলো ছায়াভরা একখানা পরদা যেন দুলে উঠলো—আর সেই পরদার পাশ থেকে বেরিয়ে এলো নিকষকালো দুটি মূর্তি। মাথায় ওদের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল দু'একটি দীর্ঘ জটা তা থেকে বেরিয়ে পায়ের গোছ ছুঁয়েছে গলায় হাতে রুদ্রাক্ষ মালা কপালে রক্ত চন্দন আর সিঁদুরের ফোঁটা পরনে রক্তাম্বর কি কালো অন্তর্বাস ঠাহর হয় না—মুখখানা গোলাকার চোখদুটো জল জল করে জলছে—ভীষণ দর্শন দুটি ভৈরব সপাদ দাপে তাল ঠুকে সামনে এসে দাঁড়াল। এবং স্পষ্ট গলায় বলল,

হুকুম দাও—যারা তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করছে তাদের সাজা দিই।

চমকে উঠলো মহেশ—এ ছুটি মূর্ত্তি এই সময়ে কোথা থেকে এলো? একবার মনে হলো পরদা ভেদ করে এসেছে—পরক্ষণেই বোধ হল—একটিই তো পরদা রয়েছে এখানে ঘরের দেওয়াল নয় তার নিজের দেহ। তবে কি তারই দেহ থেকে এটা এসেছে? তার ইচ্ছা থেকে সঙ্কল্প থেকে—তেজ থেকে? মহেশ এই মুহূর্তে নিজেকে ছুটি অংশ পৃথক করে অনুভব করতে পারল। যেমন পারে জপে বসবার আগে পার্থিব বাসনা কামনা ঈর্ষা দ্বন্দ্বগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখে একনিষ্ঠ সাধনায় আত্ম-নিমজ্জন করার সময়। পৃথিবীর মঙ্গল হোক—সব জীবের কল্যাণ হোক—এই চিন্তার স্রোত মজ্জা শিরা রক্তে রক্তে যেন প্রবাহিত হওয়ার সময়ও দ্বিতীয় সত্তাকে অনুভব করে। মন তখন শুভ্র শান্ত নির্মল নিস্তরঙ্গ একটি নির্ঝরিণীর মত—অবিচ্ছিন্ন চৈতন্য ধারায় প্রার্থনারত··· কল্যাণ হোক কল্যাণ হোক—কল্যাণ হোক।

এই অর্দ্ধ আত্মনিমগ্ন অবস্থায় যে কোন জীবের প্রতি কণা মাত্র রূঢ়তা প্রকাশও সম্ভব নয়। শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সকল প্রাণীতে তখন সে করুণা পরায়ণ। আত্ম রক্ষার্থে শত্রু নির্য্যাতনের চিন্তা তখন অসহ্য। আত্ম মগ্নভাবে উচ্চারণ করল মহেশ—না-না-না।

মূর্ত্তি আবার বলল- হুকুম দাও।

মহেশের অন্তর থেকে ধ্বনি উঠল—না।

মূর্ত্তি মিলিয়ে গেল—বাস্তব ভূমিতে ফিরে এল মহেশ।

তখন নীচে তার পিওন হাঁকছে—চৌলগ্রাম বাবু।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তা ও জাতীয়তাবোধ

রণজিৎকুমার সেন

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের একস্থলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন—'বিদেশী শিক্ষা বিদেশী সভ্যতা আমাদের মনকে আমাদের বুদ্ধিকে যদি অভিভূত করিয়া না ফেলিত, তবে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা এত সহজে লুপ্ত হইতে বসিত না। গুরুতর রোগে যখন রোগীর মস্তিষ্ক বিকল হয়, তখনই ডাক্তার ভয় পায়। তাহার কারণ, শরীরের মধ্যে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা, তাহা মস্তিষ্কই করিয়া থাকে,—সে যখন অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন বৈদ্যের ঔষধ তাহার সর্বপ্রধান সহায় হইতে বঞ্চিত হয়। প্রবল ও বিচিত্র শক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে। সেই মনই সমাজের মস্তিষ্ক; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কি করিয়া।'

বস্তুতঃ 'নেশন' 'রেস' বা 'জাতি' বলতে আমাদের যে হাজার হাজার বছরের একটা বিরাট ঐতিহ্য আছে বা আমাদের সমাজের যে একটা শান্তসুখকর কল্যাণময়ী দিক আছে, তা বিস্মৃত হয়েছি বলেই বিদেশী সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাবে মন আমাদের ক্লিষ্ট রোগীর মত অসহায় হয়ে পড়েছিল। আজ যদিও ভারতবর্ষ স্বাধীকার অর্জন ক'রে সমাজোন্নয়নের নানা পরিকল্পনায় অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু একদা এই স্বাধিকার এর চাইতে আরও অধিক প্রাণবান ছিল—যখন এদেশ বৈদেশিক আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল। তখনকার ভারতবর্ষের চিত্র রূপায়িত করে তার ক্রমিক অধঃপতনের রূপটি রবীন্দ্রনাথ এইভাবে তুলে ধরেছেন: 'একসময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুর আসন লাভ করিয়াছিল; ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত সকল দিকে সুদুর্গম সুদূর প্রদেশ সকল অধিকার করিবার জন্য আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইভাবে ভারতবর্ষ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল, তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট হইয়াছে—আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে।... জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলঙ্কারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোওয়া যাইতেছে, তাহা খোওয়াই যাইতেছে।'

এর মূলে রয়েছে ভারতবাসীর দীর্ঘকালের একটানা ইতিহাসবিমুখতা। অতীতের ঐশ্বর্য সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে আমরা চিরকাল প্রচলিত জীবনযাত্রার মধ্যেই দিনগত পাপক্ষয় করতে অভ্যস্ত। তাই 'নেশন' 'রেস' বা জাতি হিসেবে যে গৌরব, সেই গৌরবের অধিকারী হয়ে আমরা কখনও মুক্তকণ্ঠে বলতে পারিনি যে, 'ভারতবর্ষের একমাত্র চেষ্টা প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন

করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে একককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়,তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।'

তাই—মানুষের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্য-গর্বোদ্‌গার কাল পর্যন্ত যেকিছু ইতিহাস কথা, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা—তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়। সেই অন্ধকারের মধ্যে নবাবের বিলাসশালার দীপালোকে নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলিয়া উঠে, বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাস উন্মত্ততার জাগররক্ত দীপ্তনেত্রের ন্যায় দেখা দেয়—সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন দেব মন্দির সকল মস্তক আবৃত করে এবং সুলতান প্রেয়সীদের শ্বেতমর্মর রচিত কারুখচিত কবরচূড়া নক্ষত্রলোক চুম্বন করিতে উদ্যত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা। কিংখাব আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা মসজিদের ফেন-বুদ্বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরিরক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরে রহস্য-নিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন—এ সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কি? তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটিকে একটি অপরূপ আরব্য উপন্যাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে। সেই পুঁথিখানিকেহ খোলে না, সেই আরব্য উপন্যাসেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলেরা মুখস্থ করিয়া লয়। তাহার পরে প্রলয় রাত্রে এই মোঘল সাম্রাজ্য যখন মুমূর্ষু, তখন শ্মশানস্থলে দূরাগত গৃধ্রগণের পরস্পরের মধ্যে যে সকল চাতুরী-প্রবঞ্চনা-হানাহানি পড়িয়া গেল, তাহাও কি ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত? এবং তাহার পর হইতে পাঁচ পাঁচ বৎসর বিভক্ত ছক-কাটা শতরঞ্জের মতো ইংরেজ শাসন, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ আরও ক্ষুদ্র; বস্তুতঃ শতরঞ্জের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহার ঘরগুলি কালোয় সাদায় সমান বিভক্ত নহে, ইহার পনেরো আনাই সাদা। আমরা পেটের অন্নের বিনিময়ে সুশাসন সুবিচার সুশিক্ষা সমস্তই একটি বৃহৎ হোয়াইট্যা-ওয়ে লেডলর দোকান হইতে কিনিয়া লইতেছি, আর সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ। এই কারখানাটির বিচার হইতে বাণিজ্য পর্যন্ত সমস্তই সু হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কেরানিশালার এককোণে আমাদের ভারতবর্ষের স্থান অতি যৎসামান্য।'

এই সামান্যের দিকে তাকিয়ে যদি আমরা আমাদের জাতীয়তাবোধ বা **Nationality**-কে ভুলে থাকি, তবে তার মতো পরিতাপের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আমরা আমাদের অতীতকে যত বড় করে ভাবতে পারবো, আমাদের ভবিষ্যতকেও ততোধিক বড় করে গড়ে তুলতে পারবো। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুইটি জিনিস বস্তুতঃ একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ; আর একটি পরস্পর-সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা,—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহাকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিতমতো নিজেকে হাতে হাতে তৈরী করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীতকালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য, মহত্ত্ব, কীর্তি, ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূল পত্তন। অতীতকালে সর্বসাধারণের এক এক গৌরব এবং বর্তমানকালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা, পূর্বে একত্রে বড় কাজ করা এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সঙ্কল্প; ইহাই জনসম্প্রদায় গঠনের ঐকান্তিক মূল। আমরা যে পরিমাণে ত্যাগ

স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি এবং যে পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিয়াছি, আমাদের ভালবাসা সেই পরিমাণে প্রবল হইবে। আমরা যে বাড়ী নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছি এবং উত্তরবংশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিব, সেই বাড়িকে আমরা ভালবাসি। প্রাচীন স্পার্টার গানে আছে, 'তোমরা যাহা ছিলে, আমরা তাহাই; তোমরা যাহা, আমরা তাহাই হইব। এই অতি সরল কথাটি সর্বদেশের ন্যাশনাল গাথাস্বরূপ।'

জাতীয়তার এই বোধ থেকে আমাদের চিত্ত যদি সকল বিষয়ে সতেজ ও সক্রিয় থাকতো, তবে বিলেত আমাদের সেই চিত্তকে বিহ্বল করে দিতে পারতো না। পারলো এই কারণে যে, 'ইংরেজ যখন তাহার কল-বল, তাহার বিজ্ঞান দর্শন লইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া পড়িল, তখন আমাদের চিত্ত নিশ্চেষ্ট ছিল। যে তপস্যার প্রভাবে ভারতবর্ষ জগতের গুরুপদে আসীন হইয়াছিল, সেই তপস্যা তখন ক্লান্ত ছিল। আমরা তখন কেবল মাঝে মাঝে পুঁথি রৌদ্রে দিতেছিলাম এবং গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম। আমরা কিছুই করিতেছিলাম না।'

তার ফলে যা হবার, কোনোদিকেই তার আর কিছু বাকী রইল না। প্রায় দুশো বছরের জন্য এদেশে ইংরেজশাসন কায়েম হয়ে গেল, কায়েম হয়ে গেল **Divide and Rule** নীতি। কিন্তু দুর্বল জাতির প্রতি ইম্পিরিয়ালিজমের এ কোন্ মনোবৃত্তিপ্রসূত রাষ্ট্রনীতির চাপ? ইংরেজ যখন মনের দিক থেকে শক্তির দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে, তখনই তার অপর রাষ্ট্র গ্রাস করবার প্রবৃত্তি তাকে আরও বেশী করে নিচের দিকে নামিয়েছে। 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে এই কথাটি চমৎকার করে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছেন: 'অধীন দেশকে দুর্বল করা, অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমস্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জীব করিয়া রাখা এ বিশেষভাবে কোন্ সময়কার রাষ্ট্রনীতি? যে সময়ে ওআর্ডস্ওআর্থ, শেলি, কীট্স, টেনিসন, ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপলিং হইয়াছেন কবি; যেসময়ে কার্লাইল, রাস্কিন, ম্যাথু-আর্নল্ড আর নাই, একমাত্র মর্লি অরণ্যে রোদন করিবার ভার লইয়াছেন; যেসময়ে গ্লাডস্টোনের বজ্রগম্ভীর বাণী নীরব এবং চেম্বার্লেনের মুখর চটুলতায় সমস্ত ইংলণ্ড উদ্‌ভ্রান্ত, যে সময়ে সাহিত্যের কুঞ্জবনে আর সে ভুবনমোহন ফুল ফোটে না—একমাত্র পলিটিক্সের কাঁটাগাছ অসম্ভব তেজ করিয়া উঠিতেছে; যে সময়ে পীড়িতের জন্য, দুর্বলের জন্য, দুর্ভাগ্যের জন্য দেশের করুণা উচ্ছ্বসিত হয় না, ক্ষুধিত ইম্পিরিয়ালিজম স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে, যেসময়ে বীর্যের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে স্বাদেশিকতা—ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।'

ভারতের বুকের উপর দিয়ে রোলারের মতো এই রাষ্ট্রনীতি চালিয়ে সত্যিকারের ভারতবর্ষকে পেয়েছে কি ইংরেজ? পায়নি। - 'ইংরেজের লোভ যে ভারতবর্ষকে পেয়েছে, ইংরেজের আত্মা সেই ভারতবর্ষকে হারিয়েছে। এই জন্যেই ভারতবর্ষে ইংরেজের লাভ ভারতবর্ষে ইংরেজের গর্ব, ভারতবর্ষে ইংরেজের ক্লেশ এইজন্যে ভারতবর্ষকে স্বাস্থ্য দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে ইংরেজের ক্রোধ অত্যন্ত সহজ। ইংরেজ ধনী বাংলাদেশের রক্ত-নেংড়ানো পাটের বাজারে শতকরা চার পাঁচশো টাকা মুনাফা শুষে নিয়েও সে দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এক পয়সাও ফিরিয়ে দেয় না, তার দুর্ভিক্ষে বন্যায় মারী মড়কে যার কড়ে আঙুলের প্রান্তও বিচলিত হয় না, যখন সেই শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন উপবাস-ক্লিষ্ট বাংলাদেশের বুকের উপর পুলিশের জাঁতা বসিয়ে রক্তচক্ষু কর্তৃপক্ষ কড়া আইন পাস করেন, তখন সেই বিলাসী ধনী স্ফীত মুনাফার উপর আরামের আসন পেতে বাহবা দিতে থাকে; বলে 'এই তো পাকা চালে ভারত শাসন।'

ইংরেজের এই ভারতশাসন যতই প্রখর হতে থাকে

ভারতের গণচেতনা ও আত্মিক বল ততই দৃঢ় হয়ে ওঠে এবং তার প্রেরণা সৃষ্টি করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পূর্বে যদিও রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য, নাটক সাহিত্যের দ্বারা বাঙালীর জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এসে সেই জাতীয় শক্তির নব নব উন্মেষ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের যৌবন ও মধ্যবয়সে জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাগ্যবিধাতাদের রুদ্ররোষ শ্যেনদৃষ্টি দিনের পর দিন প্রখর ও তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠছিল। তৎসত্ত্বেও স্বদেশীযুগের বাংলা তথা ভারতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প কবিতা ও প্রবন্ধের ওজস্বিনী ভাষায় ও সঙ্গীতের উদাত্ত স্বরে জাতির প্রাণে যে উন্মাদনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন, তার তুলনা নেই। যদিও স্বদেশীযুগে জাতীয় ভাবধারা দেশের সর্বস্তরে পৌঁছায়নি, তবু কবি কতকটা অন্তর্দৃষ্টিবলে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে জাতির জীবনস্পন্দন গভীরভাবে অনুভব করলেন। কবির মনোজগতে এলো আশ্চর্য পরিবর্তন; সৃষ্টি হলো 'কথা ও কাহিনী'র বহু কবিতা। এ সময়ে তাঁর রচিত স্বদেশী গান দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। যেমন—

'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।'...

অথবা

'আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।'...

কিম্বা

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।'...

এরকম আরও। যেমন—

—'ওরি ভুবন-মন-মোহিনী'...
'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'...
'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে'—
—'আমি ভয় করব না, ভয় করব না।'...
—'হে ভারত আজি নবীন বর্ষে
শুন এ কবির গান।'...
—'নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা।'...
—'বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে।'...

এরকম আরও কত গান, তার শেষ নেই।

অন্যদিকে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি পাঠ করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দশ বারো বছর আগেই কবি-হৃদয়ে দেশের ডাক পৌঁছেছিল। তিনি তাতে সম্পূর্ণভাবে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কবিতাটি ভাবের উৎকর্ষে সাবলীল বর্ণনায় এবং ব্যঞ্জনাশক্তিতে অনবদ্য, কিন্তু আমরা এতে নিভৃত-সাহিত্য-সাধনায়-রত কবির বাইরের জীবন ও জগতের 'রস-রূপের' অর্থাৎ দেশের সত্যিকার জীবনে আত্মসমর্পণ করবার জন্য হৃদয়ের প্রবল আকুলি-বিকুলি স্পষ্ট অনুভব করছি। দুর্গত, নির্যাতিত ও অবমানিত মানব-সন্তানের দীনতা-হীনতা ও গ্লানির প্রতি কবি-চিত্তের সহানুভূতির শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির ইতিহাসে 'কথা ও কাহিনী'র যুগ স্মরণীয় হয়ে আছে। স্বদেশীযুগের পূর্বাভাস উপলব্ধি করতে পেরেই যেন কবি বাঙালীর জন্য ভারত-ইতিহাসের কতিপয় মূর্ত স্বাধীনচেতা বিগ্রহের উচ্চ আদর্শ এই কাব্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেন। রাজপুত, মারাঠা ও শিখ—ভারতের এই তিন সমর-কুশল বীর জাতির অপূর্ব বীরত্ব-কাহিনী ও স্বদেশ-প্রেমের অতীত কাহিনীগুলি কবি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করে কাব্যের সুষমা-মাধুর্যে সরস ও জীবন্ত করে তুললেন। স্বদেশী যুগ থেকে শুরু করে এই কবিতাগুলি হাজার হাজার দেশবাসীর হৃদয়ে দেশ-প্রীতির প্রেরণা সঞ্চার করে আসচে। 'শিবাজী উৎসবে' ছত্রপতি শিবাজীর 'এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি'—এই মহান আদর্শের জয়গান করে ইংরেজ-পদানত ভারতকে নতুন প্রাণস্পন্দনে জাগিয়ে তুললেন রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর এই স্বদেশ-প্রীতির উচ্চাদর্শের কথা আলোচনা

করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। মূলতঃ প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের উপরেই তিনি বর্তমান ভারতের স্বাদেশিকতার বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। উপনিষদের মন্ত্রে যে-জীবন তাঁর বাল্যকাল থেকেই উদ্বোধিত হয়ে ওঠে, সেই ঔপনিষদিক মানসিকতা নিয়েই 'নৈবেদ্যে' কবি প্রথম প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—

'এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্বতুচ্ছ ভয়
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর

* * * *

এই আত্ম অবমান অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু···চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি' দূর করো।'...

স্বদেশসেবার এরকম প্রেরণামূলক রচনা রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুস্থলে নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে ব্যক্ত হয়েছে। এর যেকোনো ছত্র থেকে আমরা স্বদেশসেবার প্রেরণা ও পাথেয় সঞ্চয় করতে পারি। যেমন 'সুপ্রভাত' কবিতার একস্থানে কবি বলছেন—

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'

তেমনি 'সবুজের অভিযান' শীর্ষক কবিতায় কবি উদাত্তকণ্ঠে দেশের মুক্তিপথের অগ্রদূত যুবক-সম্প্রদায়কে আহ্বান করে বললেন—

'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'

এতদ্ব্যতীত 'ভারততীর্থ' ও 'অপমানিত' কবিতার ছত্রে ছত্রেও আমরা ভারতসভ্যতার ঔদার্য ও শাশ্বতধারা এবং হিন্দুসমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্যতার ফলে তার বর্তমান দুর্দশার চিত্র স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি। 'রাজা-প্রজা' 'চার-অধ্যায়' 'ঘরে-বাইরে' 'গোরা' 'রক্তকরবী' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যেও কবির একদিকে ইম্পিরিয়ালিজম্-বিরোধী মানসিকতা, অন্যদিকে দেশাত্মবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট-ভাবেই লক্ষ্য করি। 'গোরা'য় গোরার যে সাধনা, তা একান্ত করে ভারতবর্ষের চরণপ্রান্তে ভক্তিঅর্ঘ্যের পুষ্পাঞ্জলি দেবারই সাধনা। গোরা বলেছে—

'আমি আমার ভারতবর্ষকে চাই, তাকে তুমি যত দোষ দাও, যত গাল দাও, আমি তাকেই চাই,—তার চেয়ে বড় করে আমি আপনাকে কিম্বা অন্য কোনো মানুষকে চাইনে, সমগ্র ভারতবর্ষের ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান আমার বুকের কাছে এসে পৌঁছেছে। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান এই ভারতবর্ষের সকল জাতিই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।'

এ যেন গোরার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথা। তিনি যেমন বিংশ শতাব্দীর দানবীয় হিংস্রতাকে চূর্ণ করতে কল্যাণপথের যাত্রীদিগকে আহ্বান করে বলেছিলেন—

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই—
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

তেমনি মহাকাল-সিংহাসনে সমাসীন বিচারকের কাছে শক্তি প্রার্থনা করেছেন পৃথিবীর কুৎসিৎ বীভৎসতাকে ধিক্কার হানতে। বলেছেন—

মহাকাল-সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের

হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ তন্দ্রার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।'

এই ধিক্কারের ভিত্তিতেই তিনি বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজমের দান 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন, 'সভ্যতার সঙ্কট' লিখে বৃটিশের স্বরূপ চিত্রিত করেন, মিস র‍্যাথবোনের So-called appeal to Indians-এর জবাবে একস্থলে লেখেন—

'I look around and see famished bodies crying for bread... I look around and see riots raging all over the country. When crores of Indian lives are lost, our property looted, our women dishonoured, the mighty British arms stir in no action, Only the British voice is raised from overseas to chide us for our unfitness to put our house in order.'

এইভাবে আজীবন ভারতভাস্কর রবীন্দ্রনাথ জাতির দুর্দিনে, জাতির সংশয়-সঙ্কটের মধ্যে অকুতোভয়ে দেশের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন, জাতিকে জাতীয় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে একদিকে যেমন জাতীয় চেতনার উদ্বোধন করেছেন অন্যদিকে তেমনি বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, উপনিষদের সুরে ভারতবাসীকে ডেকে বলেছেন : 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত ॥'

সংস্কৃত গীতি-কবিতা

অনিলকুমার আচার্য

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার মনের ভাবকে নানা আকারে রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। সে প্রচেষ্টা কখনও গুহাগাত্রে অঙ্কনের রূপ নিয়েছে, কখনও বা রূপ নিয়েছে আদিম যুগের যৌথ নৃত্য ও গানে। আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে এসে এই প্রচেষ্টাই কাব্য মহাকাব্যে রূপায়িত হয়েছে। মানবের এই ক্রমোন্নতির অন্ততম বিকাশ গীতি-কবিতা। বস্তুতঃ কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি যখন একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছয়, তখনই সেই জাতির সাহিত্যে গীতিকবিতার জন্ম হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনা যখন সমাজে প্রবল হয়ে উঠেনি, যখন মানুষ ব্যষ্টির চেয়েও সমধিক গোষ্ঠি ভাবাপন্ন, সমাজের সেই স্তরে মহাকাব্যের সৃষ্টি। কিন্তু অবস্থা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যখন সমাজে ব্যক্তিচেতনা প্রাধান্য লাভ করে, সাধারণতঃ সেই সময়ই গীতি-কবিতার সৃষ্টির অনুকূল। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের পর ব্যক্তি মহিমা লাভ করল—ইংরেজী সাহিত্যে তার কিছু পরেই গীতিকবিতার সূত্রপাত। বাংলা সাহিত্যেও মাইকেলের "মেঘনাদ বধ কাব্য" হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার" নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" "রৈবতক" প্রভৃতির পর

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বিহারীলালের আবির্ভাব।

কিন্তু সংস্কৃত গীতি-কবিতার জন্ম সূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে অনুরূপ কোন বিশেষ বাঁধাধরা নিয়মের সাক্ষাৎ মিলেনা। সমাজের যে ব্যক্তিতান্ত্রিক পরিবেশ গীতিকবিতা রচনার অনুকূল, তদানীন্তন সমাজে সেরূপ কোন অবস্থা পরিস্ফুট নয়। বস্তুতঃ সে যুগ প্রধানতঃ মহাকাব্যেরই যুগ। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়, ভর্ত্তৃহরির ভট্টিকাব্য, মাঘের শিশুপাল বধ প্রভৃতি মহাকাব্যের অবদানে সে যুগ বিশিষ্ট। কিন্তু আশ্চর্য এই যে সংস্কৃত সাহিত্যে গীতিকবিতার সৃষ্টি মহাকাব্যের সমসাময়িক যুগেই। একই কালে মহাকাব্য ও গীতিকবিতার দুই বিপরীতমুখী রসধারা প্রবাহিত হয়ে জাতির জীবনকে সরস করে তুলেছিল।

যাই হোক সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম সার্থক গীতি-কবি হলেন কালিদাস। নাটক ও মহাকাব্যের ক্ষেত্রে যে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা তাঁর জন্য বিশ্বসাহিত্যের আসরে শ্রেষ্ঠ স্থান নির্দেশ করেছে, কালিদাসের গীতি-কবিতায়ও সেই অলোকসামান্য প্রতিভার সুস্পষ্ট সাক্ষর পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কালিদাসের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য হল মেঘদূত। কাব্যটি পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ—এই দুই অংশে বিভক্ত। সমস্ত কাব্যটিই মন্দাক্রান্তা ছন্দে ১১৫ টি শ্লোকে রচিত। কর্ত্তব্য অবহেলা-জনিত অপরাধ হেতু এক যক্ষ বৎসরকাল রামগিরি পর্বতে নির্বাসন যাপনে বাধ্য হয়। নির্বাসনের ক্লেশে দেহ তার শীর্ণ, পত্নী-বিরহে মন একান্ত কাতর। এরূপ অবস্থায় নব বর্ষা সমাগমে একটি কালো মেঘ-খণ্ডকে উত্তর দিকে ভেসে যেতে দেখে তার বিরহ-কাতর মন পত্নীর সহিত মিলনলাভেচ্ছায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠে। মর্মস্পর্শী ভাষায় যক্ষ মেঘের নিকট আকুতি জানায়—সে যেন সুদূর হিমালয়ের পরপারে অলকানগরীতে যক্ষের প্রিয়ার নিকট তার বিরহ-কাতর হৃদয়ের বাণীটুকু পৌঁছে দেয়। উত্তর দিকে অলকা নগরীতে মেঘের যাত্রাপথে যে সকল নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে পড়ে, পূর্বমেঘে যক্ষের মুখে অপূর্ব শক্তিশালী ভাষায় তাদের মনোরম বর্ণনা রয়েছে। উত্তর মেঘে অলকানগরী ও যক্ষের নিজ গৃহের সৌন্দর্য এবং তার পত্নীর বিরহ-কাতর অবস্থা অতি নিপুণতার সহিত বিবৃত হয়েছে। যক্ষের মুখে মেঘের যাত্রাপথের, অলকানগরীর ও যক্ষপত্নীর বিরহকাতর অবস্থার বর্ণনা-চ্ছলে কালিদাস যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি-সুগভীর প্রকৃতি-প্রীতি ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। সমস্ত কাব্যটিতে ইতস্ততঃ বহু নয়নাভিরাম চিত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সর্বোপরি নির্বাসিত যক্ষের মর্মবেদনাকে কালিদাস অতুলনীয় নিপুণতার সহিত এমন করুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, বিশ্বের কাব্যসাহিত্যে মেঘদূত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

নিম্নে মেঘদূত হতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হল:—

"উৎসঙ্গে বা মলিন বসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতু কামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চি-
দ্ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী॥

উত্তর মেঘ-২৫

অথবা দেখিবে, মলিন বসনে বীণাখানি কোলে ধরি'
গাহিতে চাহিছে আমারই নামের আখরে
গীতিকা করি।
কোনরূপে মুছি নয়ন-সলিলে সিক্তত্রী তার,
যায় সে ভুলিয়া আপনারি দে'য়া মূর্চ্ছনা বার বার॥

(যামিনীমোহন সাহিত্যাচার্য কৃত অনুবাদ)

মেঘদূতে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। মেঘ এখানে শুধু অচেতন জড় পদার্থ নয়। মেঘদূতে প্রকৃতি চেতনাশীল ও মনুষ্যধর্মী। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যে প্রকৃতির সহিত মানবের ও কবিসত্তার এই মিলনকে পরবর্ত্তীকালে আমরা আরও পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। কিন্তু কালিদাসের কাব্য নাটকে সেই সুপ্রাচীন যুগে

এই বিষয়বস্তুটীকে যেমন সার্থকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতে মন বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালীন সে বিদায়দৃশ্যের তুলনা হয় না।

শ্রেষ্ঠ কাব্য মাত্রেরই লক্ষণ এই যে বিশ্ব-মানব তার মধ্যে আপন হৃদয়-স্পন্দন খুঁজে পায়। ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ ও বেদনার সুর বিশ্ব-মানবের হৃদয়-তন্ত্রীতে অনুরণিত হয়ে উঠে। মেঘদূতেও নির্বাসিত যক্ষের বেদনা তার একান্ত নিজস্ব বেদনা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেঘদূত প্রবন্ধে মেঘদূতের মধ্যে যে একটা গভীর বিরহের আর্তি আছে, তার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাই, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে। সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার পথ নাই।" এ বিরহ যক্ষের একার নয়, এ বিরহ ব্যক্তি বিশেষের নয়। এ বিরহ সর্বমানবের। আবার এ বিরহ দেহের বিরহও নয়। বিরহের যে অগ্নিপরীক্ষায় প্রেমের হেমকান্তি ফুটে উঠে, যক্ষ তারই আবেশে মেঘের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তি থেকে সমষ্টির দিকে, দেহ থেকে দেহাতীতের দিকে এই যে জয়যাত্রা, এখানেই মেঘদূতের শ্রেষ্ঠত্ব।

ছয় সর্গে ও ১৫৩টি শ্লোকে রচিত "ঋতুসংহার" কালিদাসের অপর গীতিকাব্য। এই কাব্যে ষড় ঋতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি যে অসামান্য ছন্দ-দক্ষতা, সূক্ষ্মদৃষ্টি, সুগভীর প্রকৃতি-প্রীতি এবং রূপ ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে রসগ্রাহী পাঠকের মন অপার আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠে। শৃঙ্গারতিলক নামে মাত্র ২৩টি শ্লোকে রচিত একটি প্রেমের কবিতাও অনেকের মতে কালিদাসের রচনা।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ঘটকর্পরের রচিত ঘটকর্পর কাব্যের (মাত্র ২২টি শ্লোকে রচিত) বিষয়বস্তু মেঘদূতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ। পার্থক্য, নব বর্ষাসমাগমে বিরহিনী মেঘদূতের সহায়তায় দূর দেশে প্রবাসী স্বামীর নিকট বাণী প্রেরণ করছে। ঘটকর্পরের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ নীতিসারও গীতিকবিতামূলক।

কালিদাস ও ঘটকর্পরের পর হর্ষবর্ধনের সভাকবি ময়ূর সপ্তম শতাব্দীতে সূর্যশতক রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই ময়ূর সুপ্রসিদ্ধ কাদম্বরী রচয়িতা বানভট্টের শ্বশুর ছিলেন।

সংস্কৃত গীতি-কবিতায় শ্রেষ্ঠ অবদান ভর্তৃহরির তিনটি শতক। ভর্তৃহরি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং-এর মতে কবি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল পরে আবার সংসারধর্মে ফিরে আসেন। অনুরূপভাবে তিনি সাতবার সংসার হতে সন্ন্যাসে এবং সন্ন্যাস হতে সংসারে ফিরে অসেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ (১) শৃঙ্গারশতক (২) বৈরাগ্যশতক ও (৩) নীতিশতকের মধ্যে যদিও প্রকৃতপক্ষে প্রথমটিই গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত, অপর দুইটি কাব্যও কবিত্বমাধুর্যে গীতিকবিতার মর্যাদা লাভ করেছে। এই শতক ত্রয়ে অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও মুদ্রারাক্ষস হতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। এই ভর্তৃহরি সংস্কৃত ব্যাকরণ বিজ্ঞানের সর্বশেষ বিখ্যাত মৌলিক অবদান বাক্য পদীয়ের রচয়িতা। অনেকের ধারণা, তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বৈদান্তিক শৈব। কবির নিকট শিবই ব্রহ্মের চূড়ান্ত পরিপূর্ণ বিকাশ।

শৃঙ্গারশতক ১০০টি আদিরসাত্মক শ্লোকের সমষ্টি। এই কাব্যে কবি নারীজাতিসুলভ মনস্তত্ত্ব, তাদের ছলাকলা প্রভৃতি ব্যাপারে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন :—

অদর্শনে দর্শনমাত্র কামা দৃষ্টৌপরিষ্বঙ্গ রসৈকলোল
আলিঙ্গিতায়াং পুনরায়তাক্ষ্যামাশাস্মহে
বিগ্রহয়োরভেদম্॥

দূরে যবে থাক মনে হয় তোমার দরশ পেলেই বাঁচি

কাছে পেলে পরে বাঁধিতে চাহি যে নিবিড়
আলিঙ্গনে,
সুচারুনয়না, যত পাই তোমা, তত যায় লোভ বেড়ে,
পীরিতের রীতি প্রেমিকেরে টানে দেহের অভেদ
পানে।

বৈরাগ্যশতকে কবি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জয় গান গেয়েছেন। এই কাব্যের একটি শ্লোকে মানুষের জীবনকে রঙ্গমঞ্চের সহিত তুলনা করা হয়েছে :—

"ক্ষণমপি বালোভূত্বা ক্ষণমপিযুবা কামরসিকঃ
ক্ষণং বিত্তৈর্হীনঃ ক্ষণমপি চ সম্পূর্ণ বিভবঃ।
জরাজীর্ণৈরঙ্গৈর্নট ইব বলিমণ্ডিত তনু-
র্নর সংসারান্তে বিশতি যমধানী যবনিকাম্॥"

অভিনেতা যথা অভিনয়কালে কখনও বালক সাজে,
কখনও যুবক কামরসিক যুবতী বৃন্দমাঝে।
কখনও তাহার জোটেনা আহার, অতি নিঃস্বদীন,
কখনও বা পুনঃ দেখিবে বৈভব-শীর্ষে সমাসীন।
বয়সের ভারে কভু পড়ে নুয়ে, বলিভরা সারা দেহ,
অভিনয় শেষে যবনিকা পড়ে, খোঁজ করে না কেহ।
তেমনই মানুষ জীবন-মঞ্চে করি নানা অভিনয়,
মৃত্যু-যবনিকা-পারে চলে যায়, ভব-লীলা শেষ হয়।

এই শ্লোকটির সহিত Shakespeare এর Seven Ages এর ভাবধারার যথেষ্ট মিল আছে :—

"All the world's a stage,
And all the men and women merely players :
They have their exits and their entrances ;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurce's arms,
And then the whining school-boy, with his
satchel,
And shining morning face, creeping like a
snail
Unwilling to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress' eye brow.........
Last scene of all,
That ends this strange eventful historiy,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans
everything."

নীতিশতকে তিনি মানবীয় আদর্শের নির্দেশ দিয়েছেন। মহৎ লোকের যে সংজ্ঞা তিনি নির্দেশ করেছেন- তা শত শত বৎসর ধরে ভারতের গৃহে গৃহে আদর্শরূপে পরিকীর্ত্তিত হচ্ছে :—

বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা সদসি বাকপটুতা
যুধিবিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ, প্রকৃতিসিদ্ধমিদং
হি মহাত্মানাম্॥

বিপদে যিনি সুস্থিরচিত্ত, ধৈর্য্যে বাঁধেন বুক,
সম্পদেও অবিচল যাঁর ক্ষমাসুন্দর মুখ।
সভায় যাঁহার বাক-পটুতা সকলের মন জিনে,
সমরে যিনি মহা বলীয়ান, যুঝেন দিনে দিনে।
উদাসীন নন, যশোলাভ তরে আছে পুরা অভিলাষ।
শাস্ত্র চর্চায় অনুরাগ যাঁর ব্যসন-বিলাস।
প্রকৃতি যাঁর সহজেই ধরে এত সব গুণচয়।
তিনিই ধন্য, অগ্রগণ্য, তাঁরেই মহাত্মা কয়।

ভর্তৃহরির শতকত্রয়ের তুল্য কাব্যগুণবিশিষ্ট অমরু কবির "অমরু-শতক।" অমরু সপ্তম শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁর কাব্যের চারটি বিভিন্ন সংস্করণে ৯০ থেকে ১১৫ টি শ্লোকের দর্শন মিলে। তন্মধ্যে মাত্র ৫১টি শ্লোক সাধারণ। ভর্তৃহরির শৃঙ্গার শতকের মত অমরুশতকের উপজীব্য প্রেম। কিন্তু ভর্তৃহরি যেস্থলে প্রেমের সাধারণ সূত্রগুলো কাব্যের আকারে লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন, অমরু সেখানে নায়ক-নায়িকার পরস্পরের ভালবাসার অনন্ত বৈচিত্র্যের চিত্র পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। অনেকের মতে 'অমরুশতক' কি কাব্যগুণে কি রসমাধু-

বিশ্লেষণে, ভর্তৃহরির শৃঙ্গার শতকের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। প্রাচ্যবিদ্যার সুপণ্ডিত ম্যাকডোনেল সাহেবের মতে :—

"The author is a master in the art of painting lovers in all their moods—bliss, dejection, anger, devotion. He is specially skilful in depicting the various stages of estrangement and reconciliation.

কাশ্মীরী কবি বিহ্লনের (১১ শতাব্দী) চৌর পঞ্চাশিকা বা চৌরসুরত পঞ্চাশিকা কবির গুপ্তপ্রেম-ঘটিত পঞ্চাশটি শ্লোকের সমুচ্চয়। কাশ্মীর ও দক্ষিণ ভারতের দুটি ভিন্ন সংস্করণে কাব্যটি পরবর্তীকালে পণ্ডিতদের হস্তগত হয়। কথিত আছে রাজকন্যার সহিত কবির গুপ্ত প্রণয়-কাহিনী অবগত হয় কাশ্মীররাজ কবির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। রাজআদেশ পালনের জন্য কবিকে যখন বধ্যভূমিতে নেওয়া হয়, তখন মৃত্যুর প্রায় মুখোমুখী দাঁড়িয়ে করুণ আবেগময়ী ভাষায় পঞ্চাশটি কবিতাংশে কবি রাজকন্যার সহিত নিজ প্রণয়ের সুমধুর স্মৃতি বর্ণনা করেন। এই কবিতা বা শ্লোকগুলি একধারে কবির অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও রাজকন্যার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার দ্যোতক। এক প্রগাঢ় ভালবাসা ও আবেগের ফলেই যে শ্লোকগুলির সৃষ্টি তা যে কোন যত্নশীল পাঠকের কানে বাজে। বস্তুতঃ কবির অসাধারণ প্রত্যুৎপন্ন কবিত্বশক্তি ও রাজকন্যার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার কথা বিবেচনা করে কাশ্মীররাজ কবির মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা রহিত করেন এবং রাজকন্যাকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করেন। টীকাকার রামচন্দ্র তর্কবাগীশের মতে চৌর পঞ্চাশিকার শ্লোকসমূহ দ্ব্যর্থবোধক—এক অর্থে প্রত্যেকটি শ্লোকে মানবীয় প্রেমের জয়গান, অন্য অর্থে দেবী কালীর স্তবগাথা। আমার মনে হয়, কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আরোপ না করে সাধারণ স্বাভাবিক অর্থে কাব্যটিকে গ্রহণ করলেও তাতে এর কোন মর্যাদা হানি হয় না। বরঞ্চ সংস্কৃতসাহিত্যের সেই পৌরাণিক ও ধর্মমূলক পরিবেশের মাঝে কাব্যটির লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গি ও সুর নিজ স্বাতন্ত্রে সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাই হোক, এই কাব্যটির বিষয়বস্তু পরবর্তীকালে আমাদের বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে গ্রহণ করেছিলেন। চৌর পঞ্চাশিকার প্রতিটি শ্লোকের আরম্ভ "আজও তাকে দেখি" (অদ্যাপি তাং পশ্যামি) এই শব্দ কয়টি দিয়ে। নিম্নে বিহ্লনের চৌরপঞ্চাশিকা হতে একটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হল :—

"অদ্যাপি তাং প্রণয়িনীং মৃগশাবকাক্ষীং
পীযূষ পূর্ণ কুচকুম্ভযুগং বহন্তীম্।
পশ্যাম্যহং যদি পুনর্দিবসাবসানে,
স্বর্গাপবর্গ নররাজ্য সুখং ত্যজামি॥"

বিহ্লনের পর দ্বাদশ শতাব্দীতে গোবর্ধন আচার্য "আর্যাসপ্তশতী" রচনা করেন। এই গোবর্ধন বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণসেনের 'পঞ্চরত্ন' সভার অন্যতম কবি ছিলেন। তিনি হালের প্রাকৃত কাব্য "সপ্তশতীর" অনুকরণে সংস্কৃতে আর্যাছন্দে ৭০০ শ্লোক রচনা করেন। 'আর্যাসপ্তশতীর' শ্লোক সমূহ আদিরসাত্মক, কিন্তু কবিত্বশক্তিতে এ কাব্য হালের কাব্যের চেয়ে নিকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতকাব্য তথা গীতিকবিতার পর্যায়ে এ কাব্যকে ফেলা চলে না।

পরিশেষে কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দের" আলোচনা করে আমরা আলোচ্য প্রবন্ধের ছেদ টানব। গোবর্ধন আচার্যের মত জয়দেব গোস্বামীও লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। অনেকের মতে গীতগোবিন্দ একটি গীতি নাটিকা। বাংলা যাত্রাগানের উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে অনেকে আবার গীতগোবিন্দের নাম করে থাকেন তা ছাড়া, গীতগোবিন্দের সংস্কৃতের সহিত স্থলে স্থলে বাংলাভাষার অতি নিকটসাদৃশ্যের ফলে কাব্যটি ভাষাতত্ত্বের নিরিখেও অতিশয় মূল্যবান্। এসব বিষয় বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়; সে আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অপেক্ষা রাখে। যাই হোক, গানই গীতগোবিন্দের প্রাণবস্তু এবং গীতিকবিতার প্রায় তাবৎ শ্রেষ্ঠ লক্ষণ এই কাব্যে বর্তমান। অবশ্য, আমার বক্তব্য এই নয় যে কালিদাসের মেঘদূত বা সংস্কৃত সাহিত্যের

অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের সঙ্গে একই পংক্তিতে গীতগোবিন্দেরও স্থান। ভাষা, ভাব, উপমা ও ব্যঞ্জনার সার্থক অঙ্গাঙ্গী মিলনে কালিদাসের কাব্য উৎকর্ষের যে উত্তুঙ্গ শিখরে সমাসীন, তা গীতগোবিন্দের কবির হয়ত সম্যক্ অধিগম্য নয়। তা ছাড়া, কালিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবির সহিত তুলনামূলক বিচারে গীতগোবিন্দের উপমা, রূপক প্রভৃতির কৃত্রিমতা বিচক্ষণ পাঠকের নজরে পড়ে। এই প্রসঙ্গে কৌতূহলী পাঠক প্রমথ চৌধুরীর জয়দেব প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন।

কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটিসত্ত্বেও অতুলনীয় পদ-লালিত্য, ছন্দ-মাধুর্য, ধ্বনিসম্পদ, অনুপ্রাস ও তানলয়ের সুষ্ঠু প্রয়োগ, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা প্রভৃতি বিভিন্ন গুণের সমাবেশে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে গীতগোবিন্দের স্থান বিশিষ্ট ও একক। কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দসমষ্টির সার্থক সমন্বয়ে দ্রুত প্রবহমান ছন্দে, কখনও বা সান্দ্রগ্রথিত সুদীর্ঘ শব্দনিচয়ের সুনিপুণ প্রয়োগে বিলম্বিত লয়ে যুগপৎ যে ছবির পর ছবি ফুটে উঠে এবং ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়, তাতে কি পাঠক, কি গায়ক, কি শ্রোতা সকলেরই মন অপূর্ব আনন্দরসে আপ্লুত হয়ে উঠে। নিম্নে গীতগোবিন্দের একটি শ্লোক পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম :—

"পতিত পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥
—পঞ্চমসর্গ, দ্বাদশ শ্লোক

গাছ হতে পাখী পড়ে, বায়ুভরে পাতা নড়ে, বার বার চমকিয়া উঠে,
শয়ন রচনা করে, চকিত নয়নে হেরে, তব পথ পানে যায় ছুটে।

পাশ্চাত্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ গীতগোবিন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, গীতগোবিন্দের অতুলনীয় ছন্দ-লালিত্যকে ভাষান্তরিত করা অসম্ভব। অনুবাদের স্থূল অঙ্গুলি পাতে গীতগোবিন্দের অতুলনীয় পদ-লালিত্য, ছন্দমাধুর্য ও ধ্বনি ব্যঞ্জনার তার মুখর হয়ে বাজে না। কথাটা যে কত বড় সত্য, তা যিনি গীতগোবিন্দের অনুবাদের চেষ্টা করেছেন, তিনিই স্বীকার করবেন। যাই হোক্, কি ভাষাভঙ্গের নিরিখে, কি পদ-লালিত্য, ছন্দমাধুর্য ও ধ্বনিব্যঞ্জনা, যে দিক্ দিয়েই বিচার করা হোক না কেন, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে গীতগোবিন্দের বিশিষ্ট স্থান অবিসংবাদিত। তার ওপর, এত জনপ্রিয়তা অপর কোন সংস্কৃত কাব্যের ভাগ্যে জুটেছে কিনা সন্দেহ। গত আটশত বছর যাবত গীতগোবিন্দ বাংলার ঘরে ঘরে গীত হয়েছে—একথা মোটেই অত্যুক্তি নয়।

যত আঁধার তত আলো

(উপন্যাস)
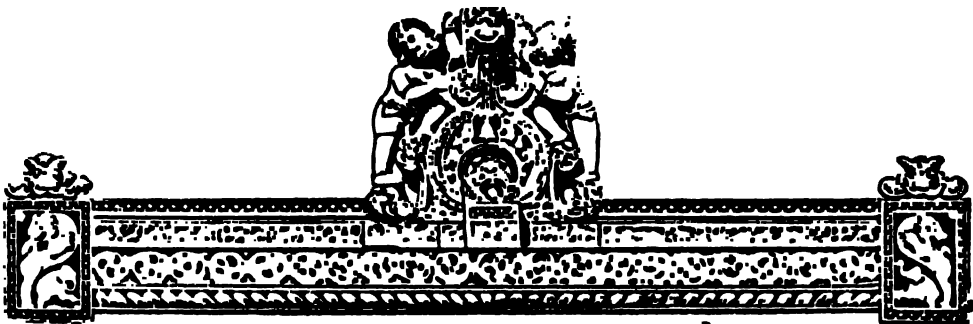
বিভূতিভূষণ গুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩০

বিকেল বেলা ইচ্ছে করেই মৃগাঙ্ক গিয়ে কেতকীদের আঙ্গিনায় উপস্থিত হল। কেতকীর মা সহাস্যে এগিয়ে এসে তাকে আহ্বান জানাল, বলল, কি মনে করে মৃগাঙ্ক? তারপরেই কণ্ঠস্বর আর এক পর্দা উচ্চে তুলে মেয়েকে উদ্দেশ করে বললেন, ও কেতু তোর মৃগুদা এসেছে রে? ওকে বসতে দে। মৃগাঙ্কর পানে মুখ ফিরিয়ে বলেন, ঘরে গিয়ে বসো মৃগাঙ্ক আমি রান্নাঘর থেকে আসছি।

কেতকী হাসিমুখে মৃগাঙ্ককে অভ্যর্থনা জানাল, বলল, ঘরের মধ্যে গিয়ে বসবেন না দাওয়ার উপর চেয়ারটা এনে দেবো।

মৃগাঙ্ক একবার চোখ তুলে তাকিয়েই মাথা হেঁট করে কেতকীর পিছু পিছু ঘরে এসে প্রবেশ করল।

কেতকী আস্তে আস্তে বলল, মা আসবার আগেই একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিই। আপনি কি সকাল বেলার জের টানতে এসেছেন?

মৃগাঙ্ক সংক্ষেপে জবাব দিল, কতকটা তাই—

কেতকী বলল, কিন্তু আমি বলি যেটা সকালে শেষ হয়ে গেছে তার জের আর বিকেলে টানবেন না।

মৃগাঙ্ক শান্ত হেসে জবাব দিল, আমি তোমাকে অন্যায় কটূক্তি করেছিলাম সেই ভুল স্বীকার করতেই এসেছি।

কেতকী একটুখানি বাঁকা হেসে জবাব দিল, সেকি আপনিও তাহলে ভুল করেন, আবার সে ভুল স্বীকার করতেও সাহস রাখেন। ভারী আশ্চর্য কথা তো?

মৃগাঙ্ক মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, তোমার রাগ এখনও যায়নি কেতকী। তাহোক আমার কথা তোমাকে জানান হয়েছে—এবারে চলি।

মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়াল।

কেতকী বলল, মা আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন। তিনি আসুন তাঁকে বলেই যান।

মৃগাঙ্ক পুনরায় বসল।

কেতকী বাঁকা চোখে মৃগাঙ্ককে একবার দেখে নিয়ে তারপরে বলল, ভুল স্বীকার করতে এসেও দম্ভ আপনার।

মৃগাঙ্ক অভিযোগটা স্বীকার করে নিয়েই একটু হেসে বলল, চেষ্টা করেও স্বভাব পাল্টাতে পারছি না কেতকী।

কেতকী গম্ভীর হয়ে বলল, পারলে ভাল করতেন, নইলে আপনার কাছে কেতকী আর মৃদুলা একই সমস্যা হয়ে দেখা দিবে।

মৃগাঙ্ক শান্ত হেসে জবাব দিল, আমার ভাগ্য—তাছাড়া স্বভাব পাল্টানো কি এত সহজ?

কেতকী বলল, সহজ যে নয় সেতো আমি নিজেকে দিয়েই দেখতে পাচ্ছি।

মৃগাঙ্ক চোখ তুলে তাকাল, বলল, কি দেখতে পেয়েছো?

কেতকীর চোখে মুখে রহস্যপূর্ণ হাসি দেখা দিল, দেখুন না আপনাকে দেখেই প্রথমে মনে করলাম আপনাকে বেশ করে নাকাল করে ছেড়ে দেবো কিন্তু ঘরে এসে বসতেই মনটা ভিজে গেল। ভাবলাম মৃগুদার এটা চা খাবার সময়। চাট্টা নয় চলে যাবেন না যেন আমি দুমিনিটেই আসব।

কেতকী চলে গিয়েও সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বলল, মা নিজে চা নিয়ে আসছেন। একটু থেমে কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামিয়ে বলল, ভাল কথা—আমার উপর রাগ করে যেন ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে থাকবেন না। মৃদুলা সত্যিই অসুস্থ। খানিক আগে ওখান থেকেই আমি ফিরে এসেছি।

মৃগাঙ্ক বলল, মৃদুলার কথা থাক।

কেতকী হেসে বলল, তাহলে থাক—

কেতকীর মা ঘরে ঢুকে বলল কি থাকবে কেতু? কার কথা বলছিস।

কেতকী বলল, ওঁর বড্ড তাড়া চা খাবেন না বলছিলেন।

মা হেসে বলল, তাকি হয় মৃগাঙ্ক। একটু চা খেয়ে না গেলে আমরা যে দুঃখ পাব বাবা—একটু খানি চা খেতে আর কত সময় লাগবে।

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে মৃগাঙ্ক চায়ের বাটিতে চুমুক দিল।

কেতকীর মা বলল, তাড়া থাকলে তোমাকে আজ আর আটকাব না। কিন্তু সময় করে একদিন এসো। তোমার কাছে সহরের দুটো ভালমন্দ গল্প শুনবো।

মা চলে গেল।

মৃগাঙ্ক বলল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কেতকী?

বিস্মিত কণ্ঠে কেতকী বলল, কোথায়?

মৃগাঙ্ক বলল, মৃদুলাদের বাড়ীতে।

কেতকী বলল, আপনি কি শোনেননি যে একটু আগেই আমি ওদের বাড়ী থেকে ফিরে এসেছি?

মৃগাঙ্ক বলল, না হয় আর একবার আমার সঙ্গে গেলে।

কেতকীর মুখে বিচিত্র ধরণের হাসি ফুটে উঠল। বলল, তাতে আপনার লোকসান হবে।

মৃগাঙ্ক বলল, এ কথা বলছো কেন?

কেতকী বলল, বড় অবুঝ আপনি। ভেবে দেখুন নিজেই বুঝবেন।

মৃগাঙ্ক অন্যমনস্কভাবে বলল, তাই দেখবো কেতকী। কিন্তু এবারে আমি যাই।

মৃগাঙ্ক চলে গেল। একবার ফিরেও তাকাল না আর। কেতকী একদৃষ্টে তার অগ্রসরমান মূর্তির পানে চেয়ে রইল। ওর এক চোখে আগুন আর এক চোখে জল।

কেতকীদের বাড়ী থেকে বার হয়ে এসে মৃগাঙ্ক জগন্ময় চৌধুরীদের বাড়ী গেল না। দীঘির পাড়ের বটগাছতলায় এসে খানিক চুপ করে বসে রইল। অন্যমনস্ক ভাবে ছোট একটি ঢিল তুলে নিয়ে জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল। আওয়াজ সামান্যই হল কিন্তু গোল হয়ে জলের উপর একটি বৃহৎ বৃত্ত সৃষ্টি করল সেই সামান্য আঘাতে। ধীরে ধীরে আয়তন ছোট হতে হতে একসময় তা জলের সঙ্গেই মিলিয়ে গেল।

একটা মাছরাঙা পাখী লক্ষ্য ঠিক করে নিয়ে জলের উপর নেমে এল। শিকার ধরে সঙ্গে সঙ্গেই শূন্যে উঠে গেল। ও পাশে একটা শঙ্খ চিল গাছের মগ ডালে বসে পরিত্রাহী চীৎকার করছে। এ ও হয়তো ক্ষুধিতের সকরুণ আহ্বান।

মৃগাঙ্ক মনে মনে খানিক চাঞ্চল্য বোধ করল। বহুক্ষণ সে এই বটগাছের তলায় বসে আছে। সন্ধ্যা হতে খুব বেশী দেরী নেই। গাছের পাতায় পাতায় মৃদু শিহরণ জাগিয়ে মোলায়েম বাতাস বইতে সুরু করেছে। বড় ভাল লাগছে এই স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ। এক ঝাঁক সাদা বক মৃগাঙ্কর মাথার উপর

দিয়ে উড়ে গেল। সাদা বকের কাল কাল ছায়া পড়েছিল দীঘির নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে।

একটা কুকুর ওপাশ থেকে এপাশে ছুটে আসতে আসতে কি জানি কেন থমকে দাঁড়াল। কান খাড়া করে সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে পুনরায় চলতে সুরু করল।

মৃগাঙ্ক জলের ধার থেকে রাস্তায় উঠে এল এবং একসময় মন্থর পায় মৃদুলাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল। দেখা হল শিবনাথের সঙ্গে। সলজ্জ হেসে তাকে জানাল, বড়বাবু দিদিমণির কাছে বসে আছেন। ডাকবো?

মৃগাঙ্কর সম্মতি নিয়ে সে চলে গেল। খানিক পরে জগন্ময় দেখা দিলেন।

মৃগাঙ্ক বলল, কেতকী খবর দিল মৃদুলা নাকি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? তাই একবার খবর নিতে এলাম।

তুমি এসে বড় ভাল কাজ করেছ মৃগাঙ্ক। জগন্ময় বললেন, তোমাকে কাছে পেয়ে মনে হচ্ছে তোমারই আসবার অপেক্ষায়ই বুঝি এতক্ষণ আমি বসেছিলাম। একবার ডাক্তারের কাছে যাবার দরকার—ওষুধ আনবার দরকার অথচ শিবনাথের উপর ভরসা করে বার হতে পারছিলাম না।

মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করল, অসুখটা কি? কাল রাত্রে মৃদুলা বেশ ভালই ছিলেন তো।

জগন্ময় বললেন, গুরুতর কিছু নয়। অত্যধিক গরমের জন্য হয়েছে বললেন। দু-চারদিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। টেম্পারেচার ঐজন্যেই হয়েছে।

উভয় কথা বলতে বলতে মৃদুলার শয্যার পাশে এসে উপস্থিত হল।

জগন্ময় বললেন, মৃগাঙ্ক এসেছে মিনু—

মৃদুলা চোখ বুজেছিল। চোখ মেলে একটু হেসে বলল, কেতকীর কাছে খবর পেলেন বুঝি! দেখুন দেখি কি দুর্ভোগ। কোথায় কাল রওনা হয়ে যাব না সময় বুঝেই অসুখ করে বসলো।

মৃগাঙ্ক একটু হাসল কোন জবাব দিল না।

জগন্ময় বললেন, যাওয়াটা দুদিন আগে পিছে হলে ক্ষতি নেই অথচ এই একটা কথা মৃদুলা আজ অন্তত দশবার বলেছে।

মৃগাঙ্ক নীরব। মৃদুলাও নীরব।

জগন্ময় পুনরায় বললেন, তুমি আছো তো কিছুক্ষণ? সেই ফাঁকে আমি তাহলে একবার ডাক্তারের ওখান থেকে হয়ে আসতে পারি।

মৃগাঙ্ক জবাব দিতে গিয়ে আর এক জোড়া চোখের নীরব অনুরোধ লক্ষ্য করেই বলল, আপনি অনায়াসে যেতে পারেন—আর আমাকে অনুমতি দিলে আমিও ডাক্তারের কাছে যেতে পারি।

জগন্ময় বললেন, তুমি গেলে আমার মন খুঁত খুঁত করবে মৃগাঙ্ক। মনে হবে রুগীর অবস্থা তুমি হয়তো ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারোনি।

সহসা জগন্ময় হা হা করে হেসে উঠে পুনরায় বলতে থাকেন, মা বাপ হবার যে কি জ্বালা তা হয়তো তুমি এখন ঠিক বুঝতে পারবে না।

মৃদুলার ঠোঁটের কোনে মিষ্টি হাসি দেখা দিল। জগন্ময়ের তা দৃষ্টি এড়াল না। তিনি সেই দিক চেয়ে থেকে মৃগাঙ্ককে উদ্দেশ করে বললেন, মৃদুলা মা হাসছেন। কিন্তু সময় হলে এযে কতবড় সত্য তা মনে প্রাণে স্বীকার করবে।

মৃদুলা হাসি মুখে বলল, এখুনি স্বীকার করে নিচ্ছি বাবা। কিন্তু তুমি ডাক্তার বাবুর কাছে যাবার আগে একবার শিবকে পাঠিয়ে দিও।

জগন্ময় বললেন, শিবুকে আবার কেন মা।

মৃদুলা বলল, মাথাটা বড্ড ধরেছে। একটু চা খেলে বোধ হয় আরাম পাব বাবা।

জগন্ময় বার হয়ে গেলেন। চায়ের কথা তিনিই বলে গেলেন।

জগন্ময় চলে যাবার খানিক পরে মৃদুলা বলল,

তোমার চেয়ারটা আমার বিছানার কাছে এনে বসো। তার পরে একটু হেসে আবার বলে, আমার এক বান্ধবী বলছিল, অসুখ না ছাই—অসুখটা হলো ছলনা। অসুখ আমার সত্যিই করেছে কিন্তু তাতে আমি খুশী হয়েছি।

মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করে, কেন?

মৃগাঙ্কর একখানা হাত নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে অনুরাগ ভরা কণ্ঠে বৃহলা বলল, কেন আবার বুঝতে পারছো না? তবে আমার অসুখ করবার জন্য নিজেই দায়ি তা জান।

মৃগাঙ্ক বোকার মত চেয়ে থাকে কথা বলে না। বৃহলা হেসে ফেলে বলে, তুমি কিই!

মৃগাঙ্ক বলে, আমি যা ঠিক তাই কিন্তু হাসছো যে?

সহসা গম্ভীর হয়ে উঠে বৃহলা বলে, হাসির কথা সত্যিই না বরং ভাবনার কথা। সারা রাত আমি মুহূর্তের জন্য চোখ বুঝতে পারি নি।

মৃগাঙ্ক বলল, আমার কিন্তু ঘুম গভীর ঘুম হয়েছিল। একটা অদ্ভুত সুন্দর অনুভূতি আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সারারাত।

হেসে বৃহলা বলল, তুমি ভাগ্যবান। আমার বেলায় ঠিক উল্টোটি হয়েছে। আমার মনের সবখানি ঘুমন্ত অনুভূতি জেগে উঠে এমন তোলপাড় সুরু করে দিল যে, ঘুমের কথা ভাববার সুযোগই পেলাম না।

কাল সারারাত তুমি এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়ালে যেতে পারোনি। ওকি তুমি হাসছো ছোট রায়! আমি কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলিনি। বরং লজ্জা করছে বলে অনেক কথা তোমার কাছে আমি গোপন করেছি।

বৃহলার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। মৃগাঙ্কর হাতখানা সে তার চোখের উপর রাখল।

মৃগাঙ্কর দেহ ও মনের উপর দিয়ে একটা পাগলা ঝড় বয়ে গেল, গভীর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে সে বলল, চোখ ঢাকছো কেন বৃহলা। তাকাও আমার দিকে—

বৃহলা এক অদ্ভুত কণ্ঠে বলল, কি জানি ভারী লজ্জা করছে তোমাকে ছোট রায়।

মৃগাঙ্ক ওর হাতে একটু চাপ দিয়ে বলল, হঠাৎ লজ্জা করতে গেলে কেন বৃহলা?

বৃহলা ছেলে মানুষের মত প্রগলভ হয়ে উঠেছে। বলল, তুমি হাসবে না কথা দিলে বলতে পারি।

কথা দিচ্ছি—মৃগাঙ্কর কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল।

বৃহলা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। বলতে পারলাম না ছোট রায়—

মৃগাঙ্ক দুঃখিত হয়ে বলল, তুমি কি আমায় বিশ্বাস করতে পারছো না বৃহলা?

বৃহলা অনুযোগ দিল। একটু হাসল, একটু ইতঃস্তত করল তারপর একসময় চোখকান বুজে বলে ফেলল, তোমার সঙ্গে আমি বাসর জেগেছি। তুমি আর আমি আর কেউ সেখানে ছিল না। সারাটা রাত শুধু গল্পে আর গল্পে আমার কেটেছে। শুধুই কি গল্প... বৃহলার কণ্ঠস্বর বুজে গেল। মুখের উপর এক ঝলক রক্ত উঠে এল।

মৃগাঙ্ক হেসে বলল, তারপর—

বৃহলা ভারী মিষ্টি করে একটুখানি হাসল। ফিস ফিস করে বলল, তার পরেরটুকু সময় মত জানতে পারবে ছোট রায়। আজ নয়।

মৃগাঙ্কর চোখের দৃষ্টি কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে উঠল।

বৃহলা অসহায় ভাবে বলল, আমি ধরা দিয়েছি বলে যেন সুযোগ নিতে চেওনা ছোট রায়।

মৃগাঙ্ক একটু যেন চমকে উঠল। ধীরে ধীরে বলল সব কথা কি বলতে হয় বৃহলা। কিছু উহ্য থাকার মধ্যে আসল সৌন্দর্য্য লুকিয়ে থাকে।

বৃহলা একটি নিঃশ্বাস চেপে গিয়ে বলল, তুমি খুব ভাল—ছোট রায় তুমি আমায় বাঁচালে।

মৃগাঙ্ক গভীর কণ্ঠে বলল, তুমিও আমাকে বাঁচালে বৃহলা।

শিবনাথ চা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

বৃহলা তাকে বিছানার পাশের টি-পয়ের উপর চা রেখে যেতে বলল। শিবনাথ চা রেখে চলে গেল।

তুমি কি নিজে থেকে উঠতে পারবে বৃহলা, মৃগাঙ্ক বলল।

হেসে ফেলে বৃহলা বলল, তুমি কি আমায় তুলে বসাতে চাও ছোট রায়।

মৃগাঙ্ক একটুও লজ্জা না পেয়ে বলল, তুমি যদি খুশী হও।

একটু হেসে বৃহলা বলল, নবো—জান ছোট রায় কাল তুমি চলে যেতে আমি বার বার ভগবানকে ডেকেছি।

মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করে, কেন?

বৃহলা মুগ্ধ চোখে মৃগাঙ্কর পানে খানিক চেয়ে থেকে নরম গলায় বলল, কেন আবার। যাওয়ার দিনটা পিছিয়ে দেবার জন্য।

প্রশান্ত হেসে মৃগাঙ্ক বলল, তোমার ভগবানও খুব ভাল। কথা শুনেছেন।

বৃহলা বলল, তা শুনেছেন। কিন্তু যে কটা দিন আমি বিছানায় শুয়ে থাকবো তুমি রোজ একবার করে দেখা দিয়ে যেও।

মৃগাঙ্ক বলল, গ্রামের লোকের মুখ বড় আলগা। তবুও আমি চেষ্টা করবো বৃহলা।

বৃহলা বলল, তাই করো। আচ্ছা ছোট রায় তুমি কলকাতা যাবে কবে।

মৃগাঙ্ক জবাব দিল, ভরতি শুরু হবার দিন কয়েক আগেই যাব।

বৃহলা চুপ করে থাকে। ওর আনত মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে মৃগাঙ্ক বলল, তোমাকে সময়মত আমি খবর দেবো। কোনদিক দিয়ে কোন সমস্যাই আসবে না বৃহলা।

বৃহলা টিপে টিপে হাসতে থাকে।

মৃগাঙ্ক জিজ্ঞেস করে, অমন করে হাসছো যে—

বৃহলা জবাব দিল, হাসছি নিজের কথা ভেবে। সত্যিই মানুষের মন কি অদ্ভুত। যে দিনে প্রথম তোমাকে দেখেছিলাম একবারও কি তখন মনে হয়েছে যে তুমিই আমার সকল ভাবনাকে একদিন এমন করে গ্রাস করে ফেলবে।

মৃগাঙ্ক বলল, ও চিন্তা কি তোমার একলার বৃহলা?

হাসতে হাসতে বৃহলা বলে, ভাবতে গেলে আমার কিন্তু ভারী মজা লাগে।

মৃগাঙ্ক বলল, তুমি আঘাত করে আমার চোখ খুলিয়েছো—

বৃহলা ফিস ফিস করে বলল, আর তুমি ঘৃণা করে আমার অহংকার চূর্ণ করেছো। তাইতো আমি এমন অকুণ্ঠ ভাবে এগোতে পেরেছি ছোট রায়। তোমাকে বিশ্বাস করে আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে শিখেছি।

মৃগাঙ্ক গভীর কণ্ঠে ডাকল বৃহলা—

বৃহলা সাড়া দিল, কি ছোট রায়—

মৃগাঙ্কর দুচোখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে সে বলে, তোমার একখানা হাত আমার হাতে দাও। আর একটা কথাও না। তোমার বাবা যতক্ষণ না আসেন এমনি করে তোমার হাত ধরেই বসে থাকবো।

বৃহলা নিস্তেজ গলায় বলতে থাকে, তার আগে আমাকে শুইয়ে দাও ছোট রায়...আমাকে শুইয়ে দাও। বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার।

মৃগাঙ্ক ওকে সযত্নে শুইয়ে দিতে পরম নির্ভরতার সঙ্গে বৃহলা তার একখানি হাত এগিয়ে দিল।

কিন্তু যে হাতখানি একদিন মৃগাঙ্ক সাগ্রহে নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল আর একদিন একটি চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে সেই হাতখানিকেই ত্যাগ করে ভেবে দেখার প্রশ্নটা কেমন করে ভুলতে পেরেছিল সেই কথাটাই তার পরবর্তী জীবনে তাকে স্থির হয়ে কোথাও বসতে দিল না।

বৃহলা তার চোখে এক পরম বিস্ময়। ঐ ফুলের মত নরম মেয়েটি যে একান্ত নির্ভরতায় তার সর্বস্ব দিয়েও মৃগাঙ্ককে খুশী করতে দ্বিধা করেনি তার সর্বস্ব

নিয়েই সে সত্যের মুখোমুখী দাঁড়াতে ভীত হয়ে পড়ল। ফুলের ভিতর থেকে বার হয়ে এল সাপ। বিষদাঁত ভাঙা সাপ কিন্তু দৃষ্টিতে তার বিষাক্ত আগুন। একবারের জন্যও গর্জন উঠলো না, ছোবল মারল না শুধুই ঘৃণার বিষে জর্জরিত আগুনে দৃষ্টি দিয়ে মৃগাঙ্ককে একবার লেহন করে নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল শুধু যাবার আগে হিস হিস করে জানিয়ে গেল, মৃগাঙ্কবাবু আপনি নমস্য ব্যক্তি।

মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে গেল। মুখে তার একটাও কথা যোগাল না।

মৃদুলা একবারের জন্যও কোন অনুরোধ জানাল না—এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না—দয়া ভিক্ষা করল না। তাদের বিগত দিনের এত হাসি গল্প, ভবিষ্যৎ জীবনের সংসার রচনার রঙিন কল্পনা সবকিছু একটি মুহূর্তে মুছে দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে মৃগাঙ্কর পথ ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অপরাধ তার ছিল বইকি—নিজের সন্তানকে অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করতে সে দ্বিধা করেছিল। পারিপার্শ্বিকের কথাটা সর্বাগ্রে তাকে বিহ্বল করে ফেলেছিল

* * *

মলয় থামল। তার মাথার মধ্যটা একেবারে খালি হয়ে গেছে। দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে। চোখ দুটাও কি জানি কেন সজল হয়ে উঠেছে। মলয় সহসা উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল।

(৩)

কিছুদিন ধরেই মনোরমার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে জগন্নাথ কতকটা শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। ওর মুখে আজকাল হাসি দেখা যায় না। কথায় কথায় তর্ক করতেও সে যেন ভুলে গেছে। যেখানে প্রতিবাদ করবার কথা সেখানেও মনোরমা মুখ বুজে থাকে। প্রশ্ন করলে দু'চোখ সজল হয়ে উঠে। অন্যমনস্ক ভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা চুপ করে বসে থাকে। হঠাৎ জগন্নাথ হয়ত ডেকেছেন মনোরমা অকারণে এমন করে চমকে উঠে যার কোন অর্থ হয় না।

জগন্নাথ অনুযোগ দিয়ে বলেন, তোর কি হয়েছে আমাকে বল ভাই। কিছু লুকোবার চেষ্টা করিসনে দিদি—

শান্ত কণ্ঠে মনোরমা বলে, লুকোবার কিছু থাকলে তো লুকোবো দাদু

জবাব শুনে জগন্নাথ মোটেই খুশী হতে পারেন না বরং একটা অজানা শঙ্কায় ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠেন। মনে পড়ে যায় মনোরমার মায়ের কথা সেই সঙ্গে আরও কত সুখ দুঃখের কাহিনী। যে কাহিনী তাঁর জীবনের একটি অভিশপ্ত অধ্যায়। ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না। অস্বীকার করবারও কোন রাস্তা নেই। মনের জোরও নেই। তাঁর দুঃখ প্রকাশ করবার উপায় নেই। বুকের মধ্যে আত্মমৃত্যু আসন গেড়ে কুরে কুরে খাচ্ছে। বেদনায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন কিন্তু কাঁদতে পারেন না। কাঁদবার তাঁর পথ নেই। সাবধানে তাঁর কান্নাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে হাসি মুখে ঘুরে বেড়াতে হয়। নইলে আর একটি নিষ্পাপ আর নিরপরাধ মেয়ে হয়তো কোনদিন মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

জগন্নাথের নির্বাক চিন্তিত মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে মনোরমা ধীরে ধীরে বলল, কি এতো ভাবছো দাদু ভাই?

চমকে উঠে জগন্নাথ বলেন, ভাবছিনে তো কিছু।

মনোরমা ম্লান হেসে বলল, যত দোষ মনোরমার কিন্তু তুমি যে দিন দিন কতো বদলে যাচ্ছ সে-কথা স্বীকার করবে না।

জগন্নাথ বললেন, দোষ কারুর নয় দিদি। দোষ

আমাদের অদৃষ্টের কিন্তু দোহাই দিদি আমাকে ঠকাতে গিয়ে নিজেকে ঠকাসনে ভাই। তাহলে দুঃখ রাখবার আমার ঠাঁই থাকবে না।

মনোরমা ক্লান্ত গলায় বলে, ঠকা জেতার প্রশ্ন আমার বেলায় খাটে না সে আমি বুঝি। কিন্তু তুমি যেন না বুঝে আর না জেনে দুঃখ পেয়ো না।

জগন্নাথ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, আমার বেলায় ও বিধান খাটে না মনোদিদি। আমি বুঝতে চাইলেই বরং বেশী দুঃখ পাই।

মনোরমা একটুখানি হাসল কোন জবাব দিল না। জগন্নাথ চমকে উঠলেন। ওর মাও ঠিক এমনি করেই হাসত। উত্তর দেবার ইচ্ছে না থাকলে এমনি হাসি দিয়েই প্রত্যাখ্যান করত। গত কদিন ধরে বারে বারেই তাঁর মনোরমার মায়ের কথা মনে পড়ছে। হতভাগী নিজেও মরল তাকেও জীবন্ত মেরে গেল।

মাস খানেক ধরে জগন্নাথের শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। রাত্রে ঘুম হয় না। মাথার মধ্যে থেকে থেকে একটা যন্ত্রণা অনুভব করেন। চোখ মেলে আকাশের দিকে আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে থাকেন। মন বলে আর সময় নেই—সময় নেই। দপ দপ করে মাথার ভিতরটা। জগন্নাথ কান পেতে একটা অপরিচিত পদধ্বনি শুনতে থাকেন। অদৃশ্য পদধ্বনি তাঁকে এগিয়ে যাবার সঙ্কেত করে।

সময় হলে চলে যেতে হবে। তা নিয়ে জগন্নাথের কোন ভাবনা নেই। ভাবনা হচ্ছে মনোরমাকে নিয়ে সহায়হীন সম্বলহীন মেয়েটার কথা ভেবে তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। দুর্ভাগিনী তোকে পৃথিবীতে না পাঠালে স্রষ্টার সৃষ্টি কি অসম্পূর্ণ থাকত! জগন্নাথের দমবন্ধ হয়ে আসে। তিনি ক্লান্তিতে হাঁপাতে থাকেন।

মনোরমার দৃষ্টি দাদুর অন্যমনস্ক মুখের পানে আবদ্ধ ছিল। সে শান্ত কণ্ঠে ডাকল, দাদু—

জগন্নাথ সাড়া দিলেন, কি দিদি—

মনোরমা বলে, রাগ না করলে একটা কথা বলতাম।

জগন্নাথ বলেন, অনায়াসে বলতে পার ভাই।

মনোরমা বলল, আমাকে নিয়েইতো তোমার বড় ভাবনা দাদু?

কথাটা স্বীকার করে নিয়ে জগন্নাথ বলেন, সত্যি কথা মনোদিদি।

তাই বলছিলাম, মনোরমা মুহূর্তের জন্য ইতঃস্তত করে বলল, আমাকে না হয় কোন আশ্রমে পাঠিয়ে দাও।

দিদি—জগন্নাথ আর্তনাদ করে উঠলেন। আমি তো আজও মরিনি যে, আজ থেকেই পথ খুঁজতে সুরু করেছিস।

মনোরমা শান্ত কণ্ঠে বলল, অনেক কথাই তুমি আমাকে বলো না। যাতে বলতে না হয় তার জন্য তোমার সাবধানতার অন্ত নেই। নিজে দুঃখ পেলেও তা নিয়ে কোনদিন তোমাকে অনুযোগ দিই নি। ভেবেছি নিশ্চয় কোন বড় কারণে এ কাজ তোমাকে করতে হয়েছে। আমার দাদুকে দুঃখ দেবো না বলেই নিজে দুঃখ সয়েছি।

জগন্নাথ অন্যমনস্ক ভাবে বলতে থাকেন, তোর দাদুও যে একই কারণে চুপ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে না তা কেমন করে জানলি ভাই।

মনোরমা বলল, না জানালে আর কেমন করে জানবো দাদু। তোমার নিজের শরীর কদিন ধরে খারাপ—রোজ রাত্রে উঠে গিয়ে তুমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাক। তোমার রক্তের চাপ বেড়েছে এ কথাটাও আমার জানবার উপায় নেই। অথচ আমি ছাড়া খবরটা অনেকেই রাখে। এর পরেও যদি আমার মত একটি মেয়ে তার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চায় সেটা কি অন্যায়।

জগন্নাথ খানিক বিহ্বল দৃষ্টিতে মনোরমার মুখের পানে চেয়ে থেকে পালটা প্রশ্ন করলেন, তুমিও তাহলে রাত্রে ঘুমাতে পারো না মনোদিদি।

আমি স্বীকার করে নিচ্ছি দাদু, মনোরমা বলল।

জগন্নাথ বলেন, আমিও স্বীকার করছি ভাই যে তোমাকে অনর্থক দুশ্চিন্তায় ফেলবো না বলেই নিজের

অসুখের কথা গোপন করেছি। এবারে তোমার অনিদ্রার আসল কারণটা বলবে কি মনোদিদি।

মনোরমা মৃদু কণ্ঠে বলল, তোমার প্রশ্নের জবাব অনেক আগেই তুমি পেয়েছো দাদু। তাছাড়া আমার কথা আমার চেয়েও তুমি অনেক বেশী জান।

জগন্নাথ বিন্দুমাত্র দমলেন না। বললেন, এতোদিন তাই ভাবতাম মনোদিদি কিন্তু এখন মনে হয় আমার জানাটাই সব নয়। কোথাও একটা মস্তবড় ফাঁক আছে যেখানে আমার দৃষ্টি গিয়ে পৌছাতে পারছে না।

মনোরমার দুচোখ জল ছাপিয়ে উঠল। ক্লান্ত গলায় বলল, আমি বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি বড় ভয় পেয়ে গেছি দাদু।

জগন্নাথের কথা হারিয়ে গেল। তিনি সস্নেহে মনোরমার মাথায় হাত রাখলেন। মনোরমা শক্ত হয়ে বসে আছে। এমনি নিঃশব্দে বহুক্ষণ কেটে যাবার পর জগন্নাথই প্রথমে কথা বললেন, ভেবে দেখলাম তুমিও এই পথেই চিন্তা করতে পার। এইটেই সুস্থ এবং স্বাভাবিক চিন্তা। আমি হয়তো নিজের দিকটা বড় করে দেখেছি বলে অপর দিকে চোখ পড়েনি দিদি। অনেক আগেই কথাটা আমার ভাবা উচিত ছিল। কিন্তু এতোদিনই যখন আমায় বলিস নি তখন আজ এমন ভয় পেয়ে পালাতে চাইছিস কেন?

মনোরমা আর্ত্তকণ্ঠে ডাকল, দাদু—মুখখানা ওর ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে।

জগন্নাথের সেদিকে লক্ষ্য নেই তিনি বলতে থাকেন অনেক ভাবনা চিন্তার মধ্যে এ ভাবনাটাও আমার সবসময়ই ছিল কিন্তু চুপ করে থেকেই সমাধানের পথ খুঁজে বেড়িয়েছি দিদি। সব কথা যে বলবার নয় তাই তাই দিনের পর দিন একলাই সে বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি। আমার বুকের বোঝা নামাতে গেলে তার চাপে আর একজন পিষে যাবে—তাই পারিনি। মন আর বুদ্ধি বলেছে, যা হবার তাতো হবেই তবে মিথ্যে কেন—

জগন্নাথ সহসা তাঁর কথার রাশ টেনে উঠে দাঁড়ালেন। কথায় কথায় ঝোঁকের বশে হয়তো তিনি একটু বেশী এগিয়ে গেছেন।

মনোরমা যদিও সাগ্রহে দাদুর কথাগুলি শুনছিল তথাপি হঠাৎ থেমে যেতেও সে কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ না করে নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে গেল। এবং কিছু সময়ের মধ্যেই তামাক নিয়ে ফিরে এল।

জগন্নাথ গড়গড়ার নলটি তুলে নিয়ে চোখ বুজে টানতে থাকেন কিন্তু মুখের উপর গভীর চিন্তার রেখা স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। একসময় তামাক খাওয়া বন্ধ করে ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, তোর বুড়ো দাদুর বিরুদ্ধে হয়তো তোর অনেক অভিযোগ আছে দিদি তাই আশ্রমের কথাটা বলতে পেরেছিস কিন্তু সে যে কত নিরুপায় তা যদি বলতে পারতো—

মনোরমা ককিয়ে উঠল, তোমাকে ব্যথা দেবার জন্য আশ্রমের কথা বলিনি দাদু। যে কথা দুদিন পরে ভাবতেই হবে তাই দুদিন আগে তোমাকে বলেছি।

জগন্নাথ বলতে থাকেন, দুঃখকে ভয় পেলে কি তোর দাদু আজও হেসে কথা বলতে পারতো মনোদিদি অনেক আগেই ধুলো হয়ে যেতো। কিন্তু দুঃখকে অগ্রাহ্য করে তোকে নিয়ে ভেসে উঠলাম। ভাবলাম বাঁচাতে হবে—বাঁচতে হবে। আজ মনে হচ্ছে আমিও বেঁচে নেই যাকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করছি সেও বাঁচবার রাস্তা খুঁজে পায়নি।

জগন্নাথের দৃষ্টি আর মন বহু দূর অতীতের একটি মর্ম্মভেদ অধ্যায় পুনরায় ফিরে গেল। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে বলতে লাগলেন, একটি ফুলের মত নিষ্পাপ সুন্দর মেয়েকে ফেলে রেখে রাক্ষুসী সরে পড়লো। একবার বাপের ভবিষ্যতের কথা ভাবল না। নিমক হারাম নিমক হারাম। আমিও জগন্নাথ চৌধুরী একদিনের জন্যও হতভাগীর নাম মুখে আনিনি। কিন্তু ঐ রাক্ষুসী পারলেও আমি পারিনি দিদি। বুকে তুলে নিতে হলো। লালন করতে হলো পালন করতে হলো। সাধ্যমত যতটুকু করা সম্ভব তাতেও

ত্রুটি করিনি। একদিন নয় দুদিন নয় প্রায় দু'যুগ আমার এমনি করেই আশা আর নিরাশার মধ্যে কেটেছে। অঙ্ক কষে দেখতে বসে ভুল ধরা পড়লো। আবার সুরুতে ফিরে যেতে হয়েছে দিদি কিন্তু—

সহসা চোখ মেলে জগন্নাথ অবাক হয়ে গেলেন। এতক্ষণ ধরে তিনি একলা একলাই বকে গেছেন। মনোরমা কখন যে চলে গেছে তা তিনি জানতেও পারেন নি।

জগন্নাথ ডাক দিলেন, দিদিভাই—

মনোরমা পুনরায় নিঃশব্দে এসে জগন্নাথের সম্মুখে দাঁড়াল। কথা বলল না।

জগন্নাথ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, চলে গেলি ভাই একবার বলেও গেলি না?

মনোরমা নিষ্প্রাণ কণ্ঠে জবাব দিল, তুমি কি সব আবোল তাবোল বলছিলে তাই চলে গেছি।

জগন্নাথ বার বার মাথা নেড়ে বলতে থাকেন, আবোল তাবোল মোটেই নয় মনোরমা। আমার জীবনে এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।

মনোরমা বলে, আমার এসব কথা আর শুনতে ভাল লাগে না দাদু।

জগন্নাথ স-ক্ষেদে বলেন, তোরা শুধু রাগই করিস তাই আমাকে বুঝতে চাস না। আমি যে কতবড় অসহায় সে কেবল আমিই জানি। কিন্তু থাক এসব কথা তুই যা ভাই আমাকে একটু একলা থাকতে দে।

মনোরমা যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল। আর জগন্নাথ শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়েরইল।

মনোরমা ইতিমধ্যে বারকয়েক এ-ঘরে এসে ফিরে গেছে। জগন্নাথ টের পাননি। সহসা মনোরমার আহ্বানে তিনি চমকে উঠে মুখ ফেরাতেই সে করুণ হেসে বলল, তুমি আমার ক্ষমা করো দাদু।

জগন্নাথের কণ্ঠ কি জানি কি কারণে রোধ হয়ে গেল। তিনি কথা কইলেন না শুধু দুই চোখে ব্যথিত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইলেন।

মনোরমা ভিজে কণ্ঠে বলল, কথা কইছো না কেন দাদু? যত দুঃখ তা বুঝি শুধু তোমার একলার আমার বুঝি কোন দুঃখ থাকতে নেই—নিজের কথা ভাবতে নেই? যার কথা মুখে আনতে তুমি নিষেধ করেছো—বাবার সম্বন্ধেও তোমার একই হুকুম। কেন তোমার এই নিষ্ঠুর হুকুম তা পর্যন্ত একদিনও তোমায় জিজ্ঞেস করিনি। তোমার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। নিতান্ত ছোট কারণে যে তুমি একাজ করোনি তা আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে দাদু।

জগন্নাথ তথাপি নীরব।

মনোরমা থামতে পারে না। বলে চলে, তাছাড়া কি হবে আমার তাঁদের কথা ভেবে যাদের কোনদিন আমি চোখে দেখিনি। ভাগ্য যখন বঞ্চিত করেছে তখন মিথ্যা কৌতুহল দেখিয়ে নতুন করে ব্যথা পেয়ে কি হবে। আমার আছে দাদু—দাদুর আছি আমি। এইবা মন্দ কি।

জগন্নাথ গাঢ় কণ্ঠে ডাকলেন, মনোরমা—

মনোরমা ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলল। বুক ভাঙা স্বরে ডাকল, দাদু—

জগন্নাথ সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে সুরু করেন, ওরে দিদি আমি সব বুঝি কিন্তু নিষ্ঠুর ভগবান যে আমাকে বোবা করে রেখেছে। আমার হাত পা ভেঙে একটা জড়পিণ্ড করে ফেলেছে। শক্তিহীন মানুষকে তার নিজের সমাজও গ্রহণ করে না ভাই। আমি বড় অসহায় দিদি—আমি বড় অসহায়।

জগন্নাথ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকেন—আর চোখ দুটো জলতে থাকে।

মনোরমা ভয় পেয়ে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে ডাকতে থাকে, দাদু—দাদু ভাই।

জগন্নাথ যেন ক্ষেপে গেছেন এমনি ভাবে বলতে থাকেন, তুই ঠাকুর পুজো করিস। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি আর ইচ্ছে হয় যে ওকে আছাড় মেরে গুড়ো করে দেখিয়ে দিই—

মনোরমা দাছর মুখে হাত চাপা দিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। ওর সারা দেহ আতঙ্কে ঠকঠক করে কাঁপছে।

মনোরমার হাতখানি ধীরে ধীরে মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত ধীর কণ্ঠে তিনি বললেন, আমার মনের কথাই তোকে বলেছি যদিও কোন দিন তোকে আমি বাধা দিইনি। ভেবেছি হয়তো এই পথেই তোর মন তৃপ্ত হবে। কিন্তু পেলি কিছু মনোদিদি। অতৃপ্ত আর—

মনোরমা পুনরায় তাকে বাধা দিল।

জগন্নাথ এতক্ষণ ধরে বসে বসে সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন কিন্তু যে আগুণ এতক্ষণ ধরে তাঁর বুকের মধ্যে জ্বলছিল আপাতত তা নিভে এসেও চতুর্দ্দিকে প্রচুর ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যা কেটে যেতে সময়ের প্রয়োজন। কথাটা জগন্নাথও যেমন অনুভব করেছেন মনোরমাও তেমনি বুঝেছে। হয়ত সেইজন্যই কেউই আর কথা বলল না। নিঃশব্দে মুখোমুখি বসে রইল।

(৩২)

হঠাৎ মনোরমা নিজেকে একেবারে গুটিয়ে এনে তাদের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলল। কথা কমেছে কাজ বেড়েছে। একটা কাজ দুবার করেও পছন্দ হয় না, আবার করে। পড়াশুনার প্রতিও অনুরাগের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এত করেও সময় কাটতে চাইছে না। আশ্চর্য্য রকম অবসর মিলছে। যে অবসর সময়টা তার মন বিক্ষিপ্ত চিন্তায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই আবদ্ধ পরিবেশ থেকে মনটা বাইরে ছুটে যেতে চায়। মুক্ত বায়ুতে মুক্ত মন নিয়ে ছুটো ছুটি করে বেড়াবারজন্য ছুট ফট করতে থাকে মনোরমা। কিন্তু চোখ মেলে তাকালেই তার চতুর্দ্দিকের আলো নিভে যায়। চাপ চাপ অন্ধকার তাকে ঘিরে ধরে। মনোরমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

অঞ্জন ইতিমধ্যে বার কয়েক খোজ নিয়ে গেছে। অনুযোগ দিয়ে বলেছে, এর চেয়ে আমার অসুখ এতো তাড়াতাড়ি না সারলেই ভাল ছিল।

মনোরমা একজোড়া ক্লান্ত চোখ তুলে তাকাল। বলল, তুমি বড় ছেলে মানুষ।

অঞ্জন ছেলেমানুষই হোক আর যাই হোক মনোরমার দৃষ্টি আর কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান পেল যে, তার পরে আর একটি কথাও না বলে ধীরে ধীরে চলে গেল। মনোরমা তাকে বসতেও বলেনি চলে যেতেও বাধা দেয়নি।

আজও জানালার কাছে বসে মনোরমা তার দাছর জন্য একটি মাফ্‌লার বুনছিল। দাছ গেছেন বাজারে মাসকাবারি জিনিষপত্র আনতে। দরজার বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে রঞ্জন সাড়া দিল, ভিতরে আসতে পারি কি ?

মনোরমা ভূত দেখার মত চমকে উঠে দাঁড়াল। রঞ্জন মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল, আমি রঞ্জন—

মনোরমা সামলে নিয়ে জবাব দিল, দাছতো ঘরে সেই রঞ্জনবাবু।

রঞ্জন বাইরে থেকেই জবাব দিল, আমি জানি। আর দরকার আমার আপনার সঙ্গেই।

মনোরমা আহ্বান জানাল।

রঞ্জন ঘরে প্রবেশ করে কোনপ্রকার ভূমিকা না করে সোজাসুজি বলল, অঞ্জনের কাছে একটা কথা শুনেই আপনার কাছে ছুটে আসতে হয়েছে। আমি নাকি আপনার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি আর সেই কারণেই আপনি আমাদের ছায়া মাড়াতে ভয় পান ?

মনোরমা স্নিগ্ধ হেসে বলে, অঞ্জন এইসব কথা বলে বুঝি।

রঞ্জন বলল, দেখুন আমার কথা বার্তা কিংবা ব্যবহার হয়তো তেমন মাজাঘসা নয় কিন্তু যতদূর মনে হয় আপনাকে কোনদিন অসম্মান করেছি বলে মনে পড়ে না।

মিষ্টি হেসে রঞ্জনকে মনোরমা জবাব দিল, তাহলে সেকথা আবার জিজ্ঞেস করতে এলেন কেন রঞ্জনবাবু।

রঞ্জন হকচকিয়ে গেল, আপনি ঠিক বলেছেন। আহাম্মকটার কথা শুনে আমার এ ভাবে ছুটে আসা ঠিক হয় নি। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝি না।

মনোরমা মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কি কথা ?

রঞ্জন বলে, আপনি আর আমাদের ওদিকে যান না কেন ?

মনোরমা হেসে ফেলে বলল, আপনারা দুজনেই সমান। অঞ্জনের অসুখ ছিল বলেই বাধ্য হয়ে ওখানে অত বেশী সময় আমাকে থাকতে হয়েছে। ভগবানের দয়ায় ও ভাল হয়ে গেছে—আমারও যাবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

রঞ্জনের সংকোচ ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। ও সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল, অঞ্জন এ-সব যুক্তি মানতে চায় না। তার মতে যত অপরাধ আমার। এ বাড়ীতে আমার জন্ম, শ্রীমানের অসুখ করার জন্ম; এমন কি ইদানিং আপনার আমাদের ওখানে না যাওয়ার জন্মও নাকি আমিই দায়ি।

মনোরমা হাসতে থাকে, জবাব দেয় না।

রঞ্জন বলে আপনি হাসছেন কিন্তু আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেছি। গাধাটা বলে কি জানেন ? ভগবানকে আমি রোজ ডাকছি দাদা আবার যেন একটা শক্ত অসুখ হয়। রঞ্জনের গলার আওয়াজ আতঙ্কের ছোঁয়া লেগে থম থম করতে থাকে।

মনোরমা চমকে ওঠে।

রঞ্জন বলতে থাকে, সেই জন্তেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আপনি হয়তো জানেন না অঞ্জন আপনাকে কত বেশী ,ভালবাসে আর শ্রদ্ধা করে।

মনোরমা খানিক চুপ করে থেকে গাঢ় কণ্ঠে বলে, সেই জন্তেই আমার এত ভয় রঞ্জন বাবু। জীবনে পেয়েছি খুব কম দিতে পেরেছি তার চেয়েও কম। এই দুটোর যাহই আমি আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি। তাই যা পেয়েছি তাতে সমালোচনা আর সন্দেহের কালি মাখাতে সাহায্য করতে পারছি না।

রঞ্জন বিস্মিত কণ্ঠে বলল, আপনি দেখছি নতুন কথা শোনাচ্ছেন। এরমধ্যে আবার সমালোচনার বিষয় বস্তু কোথায়। সন্দেহের কথাই বা ওঠে কেন।

মনোরমা ধীরে ধীরে বলতে থাকে, কিছু নেই একথা জোর করে বলতে পারলেই ভাল হতো রঞ্জন বাবু।

একটু থেমে একটু ভেবে নিয়ে সে পুনরায় বলল, মেয়ে আর পুরুষকে এক যায়গায় বার বার দেখা গেলে এ-আশঙ্কা অনেকের মধ্যেই প্রবল হয়ে ওঠে। সত্য মিথ্যার প্রশ্ন এখানে তুলবেন না। ওটা বিচার সাপেক্ষ।

রঞ্জন জবাবে দৃঢ় কণ্ঠে জানাল, আমার কথা ছেড়ে দিন নিন্দা সুখ্যাতি কোনটাই আমাকে বেশী বিচলিত করতে পারে না। আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কি কথা আর কাদের কথা বলতে চাইছেন। আচার্য্যি মশাইও সেদিনে দুঃখ করে এমনি একটা কি কথা যেন বলছিলেন। কিন্তু আমরা সব ব্যাপারেই শুধু দুঃখ জানাতে শিখেছি—প্রতিবিধান করতে ভয় পাই।

সহসা উঠে দাঁড়িয়ে সে পুনরায় বলে, আমি যাই।

রহস্য করে মনোরমা বলল, প্রতিবিধানের কথা এসে পড়তে আপনিও বুঝি ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছেন।

রঞ্জন বলল, আপনি কি বলতে চান আমি বুঝিনে কিন্তু এটুকু বুঝেছি যে আমি ব্যর্থ হয়েছি। অঞ্জনও ভুল করেছে। সত্যিইতো আমার উপর আপনি রাগ করতে যাবেন কিসের জন্ম।

মনোরমা একটু হেসে বলল, তবুও বুঝি একবার যাচাই করে দেখতে এলেন—কি জানি যদিইবা এর মধ্যে কিছু সত্য থাকে। তাছাড়া মেয়েদের মন তো ?

রঞ্জন সহজ ভাবেই জবাব দিল, কথাকটি যে ভাবেই বলে থাকুন আমার পক্ষে সত্য। আমার মেলামেশার গণ্ডি সীমাবদ্ধ। হিসেব করে মেপে মেপে চলতে আমি জানি না। তাই সব সময়ই ভয় থেকে যায়।

মনোরমা বলল, না জেনে কোন দোষ করেছেন কিনা এই ভয় তো রঞ্জনবাবু। দোষ কারুর নয় দোষ

ভাগ্যের। দেখুন না অঞ্জনের এতখানি ভালবাসা আর শ্রদ্ধার এতটুকু মর্য্যাদা দেবারও আমার কোন রাস্তা নেই।

রঞ্জন বলল, রাস্তা নেই একথা বলছেন কেন।

মনোরমা বলল, বেশ যাহোক রাস্তা নেই বলেই একথা বলছি।

রঞ্জন অন্যমনস্ক ভাবে বলল, রাস্তা নেই একথা সত্য নয়। তার চেয়ে বলুন সে-রাস্তায় চলবার সাহস নেই।

মনোরমা শান্ত কণ্ঠে বলল, একই কথা। সাহসের অভাবই মানুষকে নিরুপায় করে তোলে। নিরুৎসাহ এনে দেয়। মন যা একান্তভাবে চায় বাহ্যিক ব্যবহারে তার বিপরীত কাজ করতে বাধ্য করে রঞ্জনবাবু। অধিকারের প্রশ্ন, সম্পর্কের প্রশ্ন, সম্ভাবনার প্রশ্ন সবার উপরে নিজের বিচার বুদ্ধির প্রশ্ন। এতগুলো প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া শেষ পর্য্যন্ত আর সম্ভবপর হয় না।

রঞ্জন নীরব।

মনোরমা বলতে থাকে, আপনি কি মনে করেন আপনাদের দুঃখ দিয়ে আমি খুব আনন্দে আছি? তা নয়। বরং নিজের যথার্থ অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে আমি পাগল হয়ে উঠেছি। কিন্তু আর নয় এবারে আপনি যান রঞ্জনবাবু। অঞ্জনকে আমার কথা বুঝিয়ে বলবেন।

মনোরমার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল।

রঞ্জন বলল, অঞ্জনকে বলবো এবং আপনার কথাগুলোও ভাল করে ভেবে দেখবো। অঞ্জন অভিমান করলেও আমার আর কোন ক্ষোভ নেই। কিন্তু আমার একটা কথার জবাব দেবেন কি?

বলুন—মনোরমা নরম সুরে বলল।

রঞ্জন বলল, এরপরে আপনাকে যাবার জন্য আর অনুরোধ করা উচিত হবে না।...কিন্তু অঞ্জন যদি কোনদিন সম্পর্কের দাবী নিয়ে আপনাকে ডাকতে পারে তাহলে যেন তাকে আপনি ফিরিয়ে দেবেন না। এ অনুরোধ আজ আপনাকে আমি করে গেলাম।

মনোরমা বিস্মিত কণ্ঠে বলল, আপনার এ কথার অর্থ?

রঞ্জন শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, সহজ নয়। তাছাড়া আমি নিজেও ঠিক জানি না। গোলমালে পড়ে গেছি বলেই গোলমেলে কথা বলে চলে যাচ্ছি।

রঞ্জন আর দাঁড়াল না। একপ্রকার ছুটে ঘর থেকে চলে গেল। মনোরমা কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে পথের পানে চেয়ে আছে। তার দৃষ্টি পথের সবটাই যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে। খানিক অন্যমনস্কের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পুনরায় মাফলার বোনায় মনোনিবেশ করল।

ক্রমশঃ

পূর্ব ভারতে লকুলীশ

অদ্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

যে শুভদিন হইতে পঞ্চনদের নদীমাতৃক ভূমিতে প্রথম বেদসূক্তগুলি গীত হইয়াছিল তখন হইতে আর্য ও অনার্য অনেক দেব ও দেবী ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুধর্মের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐক্যই ভাবের প্রকৃত বাহন। সেইজন্য যুগে যুগে মহৎ ভাবগুলি সেই বাহনের সৃষ্টির জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। এই সৃষ্টির প্রেরণা কোন সংকীর্ণ প্রয়োজনমূলক ছিল না। তাহারা অনাদি, অনন্ত এবং অবিনশ্বর কালের প্রতীক। তবে একথাও সত্য যে যেমন একটা কাচা পাত্রে জল রাখা যায়, কিন্তু জল সেখানে স্থায়ী হয় না, তেমনি ভারতবর্ষের ভাবসাধনা কোন ভাবকে চিরস্থায়ী করিতে পারে নাই। উত্থান পতনের বন্ধুর পথ অবলম্বন করিয়া সে অনন্তকালের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই বোধ হয় বর্ত্তমানে প্রাণময় সর্বত্যাগী জাতীয়তার পরিবর্তে জাতীয়তার ব্যাভিচার ও বাঁদরামী আমাদের মধ্যে প্রভাবশালী। বিশ বৎসরের মধ্যে কত দলের উৎপত্তি হইল এবং গেল, কিন্তু Whig এবং Tory দের ন্যায়, যুক্তরাষ্ট্রের Rupublic এবং Democratic দলের ন্যায় দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। বিদেশের মরীচিকা আমাদের সুদূর-প্রসারী ছায়াপথ মনে করিয়া দিগন্তহীন করিতে চলিয়াছে।

আরাধনা এবং সন্ত পরম্পরায় আমরা এই বিবর্তনের চিত্র দেখি। ধরা যাক শিব, তিনি বৈদিক রুদ্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দক্ষ নিজেই গোত্রহীন, আচারবিহীন উপনয়নবিহীন জামাতাকে দেখিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবে কোন কালে নিষাদ কিংবা দ্রাবিড়জাতীয় ভয়ভীত আদিম মানব মনে বায়ুসঞ্চালিত পত্রমর্মরে শিবা কলতানে,অশরীরী প্রেতাত্মার লীলাভূমি শ্মশানচারী এক কায়া অথবা দেবতার কল্পনার সহিত সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, হেতু এক দেবাদিদেবের জটাজুট ব্যাঘ্রচর্মধারী, সর্পমাল্য-পরিহিত এক কল্পিত মূর্ত্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া হিন্দু শিবের সৃষ্টি হয়, তাহা এখন আর নির্দ্ধারিত করিবার উপায় নাই। বৈদিক বিষ্ণুর ন্যায় শিবেরও বহু অবতার আছে। কিন্তু জনসমাজ এবিষয়ে খুবই অজ্ঞ।

এইরকম একটি মতবাদ খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দী হইতেই লকুলীশ পশুপত মতবাদ বলিয়া প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। কয়েকটি পুরাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে দ্বাপর যুগের শেষে কায়াবরহোন নামে সৌরাষ্ট্রের একস্থানে (বর্ত্তমান কারাভান) শিব-পশুপতি শ্মশানে পরিত্যক্ত এক মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া এই মাটির পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেহেতু তাহার হাতে একটি 'লকুট' অর্থাৎ 'দণ্ড' থাকিত সেইজন্য তাঁহার নাম লকুলীশ বা লকুটনাথ হয়। তিনি শিবযোগ এবং শিবভক্তি দুইটি দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধের যেমন পঞ্চভদ্র বর্গীয় ছিল, তেমনি তাহার ছিল চারিটি শিষ্য—কুশিক, গার্গ, মিত্র এবং কৌরুষ। বায়ু, কূর্ম, শিব প্রভৃতি পুরাণে এবং কয়েকটি শিলালিপি ও ও তাম্রপটে এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। লকুলীশের প্রধান চারিজন শিষ্য তাঁহার প্রবর্তিত মতবাদের মধ্যে চারিটি শাখা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

এই শিব মতবাদের প্রতিষ্ঠার আদিমকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। তবে প্রাচীন মথুরার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত, গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একটি লিপি এই বিষয়ে

আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। লিপিটি রাজ্যাঙ্কের ৫ সনে গৌপ্তাব্দের ৬১ সনে (=৩৮০-৮১ খৃষ্টাব্দ) আচার্য উদিতাচার্যের আদেশানুসারে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা হইতে জানা যায় যে শৈব আচার্য উদিতাচার্য তাঁহার দুই গুরুর স্মৃতিরক্ষার্থে যে মঠ বা মন্দির সংস্কার ভূতপূর্ব গুরুদের দেহাবশেষ সমাহিত হইত (যখন রাজা-রাজীদের স্মৃতি) এবং তাহাদের নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হইত—সেইরকম গুরায়তনে কপিলেশ্বর এবং উপমিতেশ্বর নামক দুইটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজের গুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে উদিতাচার্য লকুলীশের শিষ্য কুশিক হইতে দশম এবং পরাশর হইতে চতুর্থ। সুতরাং একথা অনুমেয় যে লকুলীশ খৃষ্টকালের দ্বিতীয় শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। লকুলীশ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মমত, আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতির পরিচয় আমরা 'পাশুপতসূত্র' 'পঞ্চার্থভাষ' এবং মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন'-সংগ্রহ নামক গ্রন্থগুলিতে পাই। এই মহেশ্বরবাদের মধ্যে এমন অনেক আচার ছিল যা বর্তমান সমাজের মানদণ্ডে অপ্রীতিকর এবং দোষবহ। ইহারা গূঢ়চর্যা নামে পরিচিত ছিল। কারণ এইসব ক্রিয়া গোপনে সাধিত হইত বিশেষত কুমারী বেশ্যাকন্যার সাহচর্যে। লকুলীশ নিজে 'ঘোর' প্রকৃতির অতিমার্গিক ক্রিয়াকলাপ প্রচারিত করিয়াছিলেন- ইহার কোন প্রমাণ নাই। বর্তমান লেখকের মতে তাঁহার যে চারজন শিষ্য বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন কিংবা তাঁহাদের পরেও হয়ত এই ব্যভিচার লকুলীশ পাশুপত আচারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে। কাপালিক, কালমুখ, কৌল, বামাচারী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব প্রমাণের অভাবে সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে।

প্রাচীন উৎকল, কলিঙ্গ এবং ওড্র দেশে খৃষ্টকালের সপ্তম শতাব্দী হইতে ইহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। শক্তি অথবা ভক্তি যখন কালপ্রভাবে লুপ্ত এবং অসংযত হয়, তখন দেবতার আসনে অপদেবতার আবির্ভাব ঘটে। দলাদলি, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি ধর্মের নাম লইয়া অনাচার ও ব্যভিচারের সৃষ্টি করে। শুধু তাহাই নহে, যাহা পরম পবিত্র, পরম নিষ্ঠার পরম সাধনার বস্তু তাহা প্রেতের তাণ্ডবনৃত্যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। উড়িষ্যার মন্দিরে, বিশেষত, ভুবনেশ্বরে বেলুসাগরে লকুটনাথের মূর্তি এবং বিভিন্ন দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা বহু পণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্বভারতে আরও দুইটি দেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে ইহার প্রচলন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম।

পূর্বভারতে লকুলীশ পাশুপত ধর্মের প্রচলনের বার্তা আমরা উৎকল দেশ হইতে পাই কিন্তু বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গেও যে ইহার প্রচলন ছিল তাহা অনেকের অজ্ঞাত। মন্দিরগাত্রে এবং এখানে সেখানে উৎকীর্ণ বহু লকুলীশের মূর্তি প্রাচীন উড়িষ্যার অধিবাসীদের উপর এই শৈব সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাবের পরিচায়ক। কপিলেশ্বর, মিত্রেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরগুলি বোধ হয় তাহাই প্রমাণ করে। উড়িষ্যার মূর্তিগুলির মধ্যে আমরা বৌদ্ধ প্রভাব দেখিতে পাই, যেমন রাজস্থানের মূর্তিগুলির মধ্যে দেখি জৈনকলার '' প্রভাব। আরও একপ্রকার ভাস্কর্য আছে যাহা আমরা উড়িষ্যা ব্যতীত অন্য কোথায়ও দেখিতে পাই না। এই বিশেষ ভাস্কর্যের প্রমাণ আছে মুক্তেশ্বর এবং রাজা-রাণী মন্দিরে। মধ্যখানে লকুলীশ এবং উভয় পার্শ্বে নয়জন করিয়া সেবকের মূর্তি এখানে পাওয়া যায়। ইহারা কৌশিক, মৈত্রেয়, গার্গ্য, কৌরুষ, ঈশান, পারগার্গ, কপিল, মনুষ্যক, অত্রি, পিঙ্গল, পুষ্পক, বৃহদার্য, অগস্তি, সন্তান রাশিকর প্রভৃতির।

প্রাচীন মগধ অঙ্গ প্রভৃতি দেশে লকুলীশ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের প্রথম প্রমাণ সিংভূম জেলার অন্তর্গত বেলুসাগরে প্রাপ্ত ভগ্ন লকুলীশ মূর্তি। দ্বিতীয়টি ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন, যাহাতে উল্লেখিত হইয়াছে—"তত্র প্রতিষ্ঠাপিতস্য ভগবতঃ শিবভট্টারকস্য পাশুপতাচার্য্য পরিষদশ্চ .."।

নদীমেখলা বাংলাদেশেও এই মহেশ্বর সম্প্রদায়ের প্রভাব ব্যপ্ত ছিল। তাহার প্রথম প্রমাণ কালিঘাটের

সিদ্ধেশ্বর মন্দির গাত্রে লকুলিশ মূর্তি।

পশ্চিম দিকের ভাস্কর্য। লকুটসহ মানবমূর্তি, বরাহ-নৃসিংহ-বামন-বলরাম (?) অবতার প্রভৃতি।

৭ দিকে: ভাস্কর্য। উপরে মনসা ও নিচে [illegible]-সঙ্গী ও অন্যান্য দৃশ্য।

দক্ষিণ দিকের দৃশ্যাবলী। শিবপূজা সংক্রান্ত ভাস্কর্য।

২৫ লায়ের জেলা বর্দ্ধমান। বর্দ্ধমানেশ্বরী মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে গৃহীত চিত্র। ডানদিকে গণেশ মন্দির ও বামে দুর্গা মন্দির।
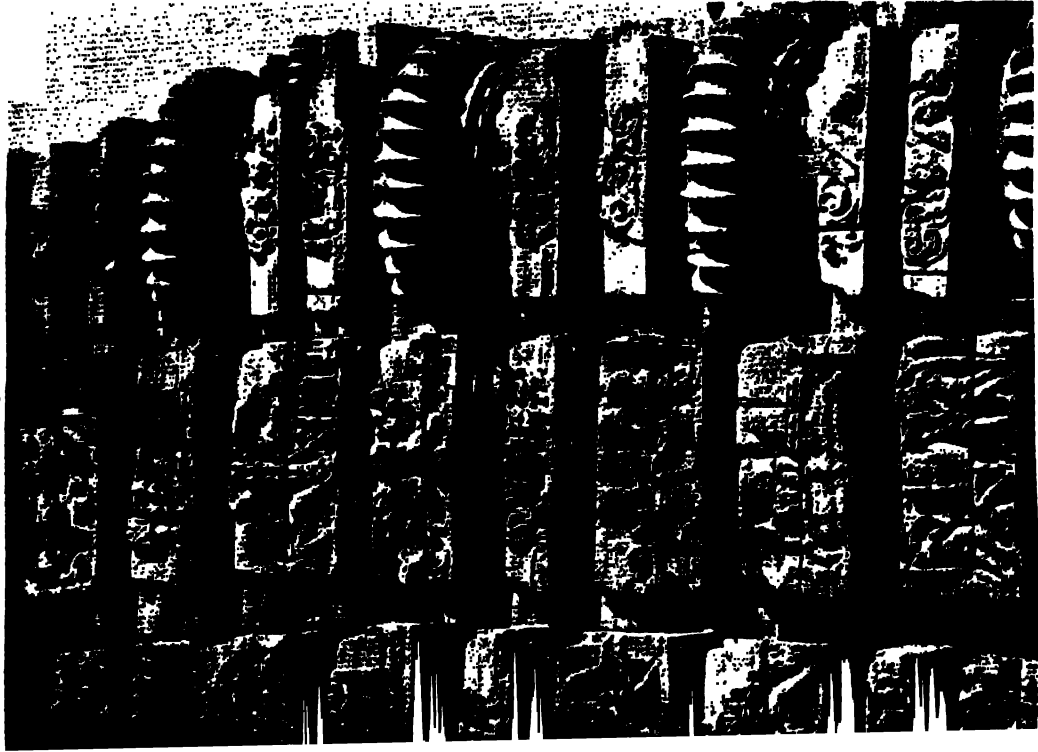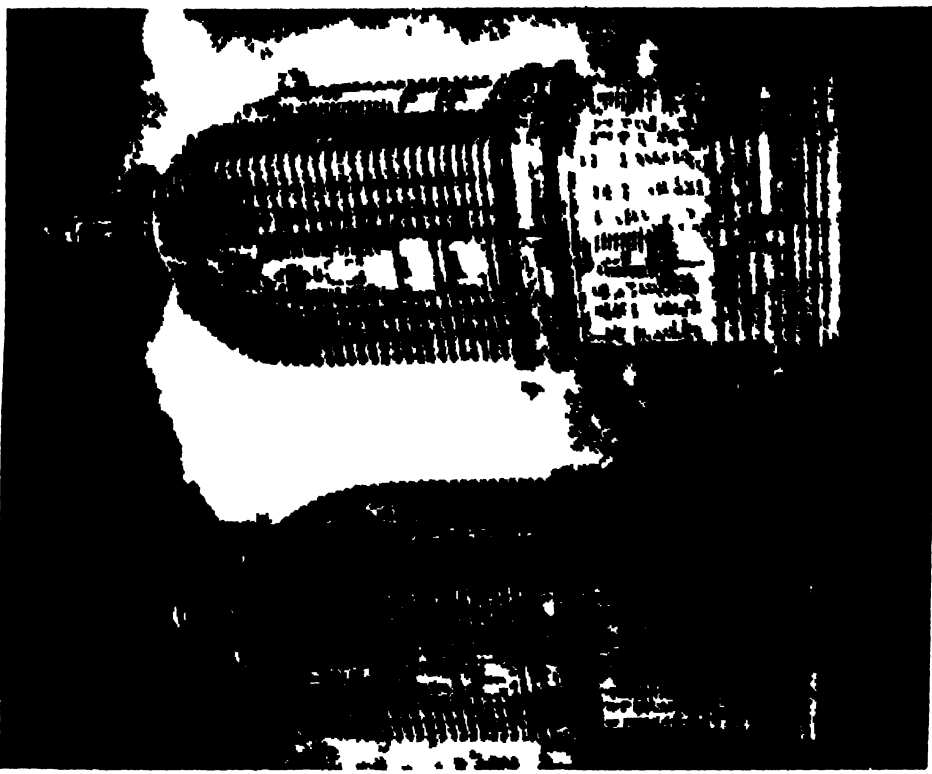
নিকটে নকুলেশ্বর তলায় নকুলেশ্বর মন্দিরের মূর্তি। বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত বরাকর স্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত বেগুনিয়া নামক চারিটি মন্দিরের অন্যতম চতুর্থ-সংখ্যক রেখ দেউল ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ। এই দেবালয়টি সিদ্ধেশ্বর মন্দির নামে খ্যাত। ইহার পূর্বদিকের রাহাপগের ঊর্দ্ধে একটি চৈত্যগবাক্ষে ধ্যানমগ্ন নিমীলিত লোচনে উপবিষ্ট, কৃশতনু, জটাজুট ধারী মুনিপ্রবরের একটি মূর্তি আছে। তাঁহার দক্ষিণ দিকে একটি লকুট। পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ বরাকর বর্তমানে গৃহ নগর এবং উপনগরে শোভিত। কিন্তু যে আদিম কান্তারে বরাকর নদীর বালুতটে পাশুপত মতের প্রতিষ্ঠাতার মূর্তি লইয়া ভক্তগণ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, আজও তাহা সেই স্মৃতি বহন করিয়া দণ্ডায়মান। এখন কয়লার কালো দেশ হইতে লকুলীশের নাম বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন। পূজার্থিগণ যখন শিবলিঙ্গ অর্চনা করেন তখন জানিতেও পারেন না যে কোন শৈব মতে এই লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই লিঙ্গ খুব সম্ভবতঃ শশাঙ্ক কিংবা তাহার পরবর্তীযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরের স্থাপত্যরীতি বাংলা অথবা উত্তরাপথের নগরশৈলীর নহে। ইহাতে কলিঙ্গদেশের রেখশৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়।

বরাকরের শ্যামল ভূমি হইতে দিকচক্রবালে শুশুনিয়ার বিরাট নীল দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরে শ্যামল বনানী শোভিত উৎকল দেশের পর্বতসংকুল প্রদেশ। মেদিনীপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে দণ্ডভুক্তির সহিত যুক্ত উৎকল প্রদেশের শাসনকর্তার নাম জানিতে পারা যায় সেইজন্য মনে হয় যে যখন কঙ্গোদমণ্ডলের শৈলোদ্ভব রাজবংশ গৌড়রাজ শশাঙ্কের করদ নৃপতি ছিলেন এবং পূর্বভারতের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক ব্যাপৃত ছিলেন—কান্যকুব্জ এবং কামরূপের সেনাদলের নিকট পরাজিত হইবার পূর্বেই এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ভুবনেশ্বরের পরশুরাম মন্দিরের ন্যায় ইহার নির্মাণকাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী ধরিয়া লইলে ভুল হইবে না।

পাকিস্থানে বাংলা

কালীচরণ ঘোষ

পাকিস্থান রাষ্ট্রের 'ইষ্ট (পূর্ব্ব) পাকিস্থান' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'পূর্ব্ব বাংলা' বা শুধু 'বাংলা' করিবার প্রস্তাব আসিয়াছে। যদি ইহা শেষ পর্য্যন্ত সম্ভব হইয়া উঠে, এবং যাহার সম্ভাবনা সমধিক, তাহা হইলে কেবল পূর্ব্ব বা পশ্চিম নহে, যেখানে যত বাঙ্গালী আছে সকলেই গর্ব্বানুভব করিবে। পকিস্থানের অন্যতর জাতীয় ভাষা (উর্দ্দুর সঙ্গে সমপর্য্যায়ে) বাংলা নিজ উৎসের সন্ধান এবং পুনর্বাসনে উৎফুল্ল হইয়া নিজ মহিমায় ফুটিয়া উঠিবার শক্তিলাভ করিবে। একদিন ইহা যে পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইয়া উঠিবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে? সপত্নী উর্দ্দুর শিরঃপীড়ার কথা পরে আলোচনা করিতেছি।

আয়ুবখানের পর (মেজর জেনারেল আঘা মহম্মদ) ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ মার্চ্চ ২৫-এ পাকিস্থানের ডিক্টেটর বা হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া মসনদ আরোহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পাকিস্থানে সামরিক শাসন (martial law) প্রবর্ত্তিত হইয়া গেল। রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনার স্থান ইহা নহে, তবে তিনি যে রাষ্ট্রনৈতিক বা সাংবিধানিক পরিবর্ত্তনের নির্দেশ দিয়াছেন তাহাতে (পূর্ব্ব) বাংলার অবস্থা কি দাঁড়াইতে পারে সংক্ষেপে সে বিষয় আলোচনার ক্ষেত্র উদ্ভূত হইয়াছে।

ডোমিনিয়ন (ব্রিটিশ উপনিবেশিক) শাসন হইতে পাকিস্থান ইসলামিক গণতন্ত্র (Islamic Republic) রূপে ১৯৫৬ মার্চ্চ ২৩-এ আত্মপ্রকাশ করে। আয়তন ৩, ৬৫, ৫২৯ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা (১৯৫১) ৬ কোটি ৫৬ লক্ষ। বহওয়ালপুর ও খয়েরপুর যুক্ত হইয়া আরও ৫০।৫২ লক্ষ বাড়িয়াছে। নূতন সংবিধান প্রচলিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরেজ আমলের প্রদেশ বিভাগ মানিয়া শাসন কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে। বজনীর মধ্যে জনসংখ্যা হিসাবে ইহারা ছিল, পাঞ্জাব (১ কোটি ৫৭ লক্ষ), উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ (৩০.৪ লক্ষ) সিন্ধু (৪৫.৩ লক্ষ) বালুচিস্থান (৫ লক্ষ)—আর ইহাদের সম্মিলিত জন সংখ্যা ২ কোটি ৩৮ লক্ষ। আর একা ইষ্ট পাকিস্থানের ছিল ৪ কোটি ১৮ লক্ষ। অর্থাৎ অপর সব কয়টি প্রদেশের সম্মিলিত সংখ্যা অপেক্ষা ১ কোটি ৬২ লক্ষ জন বেশী।

পাকিস্থানের কূটনীতিজ্ঞরা সহজেই বুঝিতে পারেন যে জনসংখ্যার শক্তিতে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব্ব বাংলার পিছনে পড়ে। আয়তন হিসাবে পশ্চিম পাকিস্থান অনেকটা বড়,—৩, ১০, ৪১৩ বর্গ মাইল। সেখানে পূর্ব্ব বাংলার মাত্র ৫৫, ১২৬। দুই প্রান্তের দুই অংশের দ্বন্দ্ব সম্ভাবনা রহিত করিবার এবং পূর্ব্বাঞ্চলের সামনে এক অবিভক্ত প্রচণ্ড শক্তির মূল্য প্রচারের জন্য পূর্ব্ব বাঙ্গলা যেমন একটি সম্পৃক্ত অঞ্চল, পশ্চিম পাকিস্থান সেই ভাবে এক ইউনিটে পরিবর্তিত হইল।

পূর্ব্ব বাঙলার জোড়াতালি প্রয়োজন হইল না। কেবল "বাঙালী" লইয়া চারটি ডিভিশন (division) বলিয়া প্রচারিত হইল, যথা—(১) ঢাকা, (২) চট্টগ্রাম (৩) রাজসাহী, (৪) খুলনা। ১৯৬১ সালের সেন্সাস মতে ইহাদের অধিবাসী সংখ্যা ৫ কোটি ৮ লক্ষ ৪০ হাজার।

পশ্চিম পাকিস্থান ৪ কোটি ২৯ লক্ষ অধিবাসী

লইয়া দ্বাদশ বিভাগে 'একত্রীভূত' বা এক ইউনিট নিয়মপে গঠিত হয়:

রাষ্ট্রীয় বিভাগ	বর্গ মাইল	জন সংখ্যা (হাজার)
পেশোয়ার	২৮,১৫৩	৬৩,৭২
ডেঃ ইসমাইলখাঁ	১১,১৩০	১২,০৬
রাওয়ালপিণ্ডি	১১,২০৬	৩১,৭১
সারগোধা	১৭,০৯৫	৫১,৭৭
লাহোর	৮,৯০৭	৬৪,৪১
মুলতান	২৪,৮২৬	৬৬,০৩
বহওয়ালপুর	১৭,৫০৮	২৫,৭৪
খয়েরপুর	২০,৭৯৩	৩১,৩৪
হায়দারাবাদ	৩৬,৮২১	৩২,৯১
কোয়েটা	৫৩,১১৫	৬,৩০
কালাট	৭২,৯৪৪	৫,৩১
করাচী	৮,৪০৫	২১,৩৫

ইহার মধ্যে পাঞ্জাবী রহিয়াছে ২ কোটি ৩০ লক্ষ। ১৯৬১ লোকস মতে সমগ্র পাকিস্থানের জন সংখ্যা ৯ কোটি ৩৭ লক্ষ। পাকিস্থানের প্রথমাবস্থায় পাঞ্জাবী ছিল ১ কোটি ৫৭ লক্ষ অর্থাৎ ইষ্ট পাকিস্তানের অনেক পিছনে। ব্যবহার ক্ষেত্রে দেখা গেল এই পাঞ্জাব, পশ্চিম-পূর্ব নির্বিশেষে, সকলের উপর প্রভুত্ব কায়েম করিতেছে। সুদূর পূর্ব পাকিস্থানে পশ্চিমী (বিশেষতঃ পাঞ্জাবী) পুলিশ ও সৈন্যদের অত্যাচার স্থানীয় লোককে জব্দ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিভ্রাট শুরু হইল ইষ্ট পাকিস্থানে। দুর্বল, ভীরু শান্তস্বভাব বাঙালীকে ভয় দেখাইয়া বশে রাখিবার মাত্রা বেশী হইয়া পড়ায় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। নানা প্রতিবাদের সহিত ভাষার দাবীতে বিরাট বিক্ষোভ দেখা দিল এবং ১৯৫২ ফেব্রুয়ারী ২১-এ তিনটি বাঙালী যুবক পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন করিল। পরের দিন এবং দিনের পর দিন "সংগ্রাম" সমানে চলিয়াছে। পাকা হিসাব মিলে নাই, অনুমান, নিহতের সংখ্যা প্রায় ৪০ এবং আহতের

পশ্চিম পাকিস্থানের এক ইউনিটেও আত্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস ফুটিয়া উঠিতে থাকে। জবরদস্ত পাঞ্জাবী শাসনের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। পূর্ব পাকিস্থানে ত ছিলই এখন আঞ্চলিক চাপে পড়িয়া আবার এক ইউনিট ভাঙ্গিয়া পূর্ব স্বতন্ত্র প্রদেশ ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছে।

আজ ভারত রাষ্ট্রভূক্ত (পশ্চিম) বাংলা অবাঙ্গলীর শাসনে উত্যক্ত। তাহার উপর ভিতরের শত্রু (তন্মধ্যে বাঙালীর অংশ উপেক্ষণীয় নহে) দেশকে একেবারে সকল আক্রমণকারীর ক্রীড়াভূমি করিয়া তুলিতেছে। আর "ও-পারের বাঙালী" আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ সুযোগের সম্মুখে উপনীত। ভাষার বন্ধন অমোঘ: পাঁচ কোটি বাঙালীকে আজ এক ভাষায় কথা বলিবার সুযোগ দিয়াছে। নিজ শক্তিতে বাংলা আজ শ্রেষ্ঠ সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত। অথচ পশ্চিম পাকিস্থানে পাঁচটি স্বতন্ত্র ভাষা যথা, উর্দ্দু, সিন্ধী, পাঞ্জাবী (গুরুমুখী) পুস্ত বা পোস্ত ও বালুচী প্রচলিত। শত চেষ্টা করিয়াও উর্দ্দুর প্রসার বিস্তার করা সম্ভব হয় নাই। কারণ শিক্ষিত মহলে ইংরেজি রহিয়াছে এবং ১৯৭২ পর্য্যন্ত ইহা সরকারী (official) ভাষা এবং বাংলা ও উর্দ্দু হইল জাতীয় (national) ভাষা। ভারতের মত সেখানেও ধনী, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী শিক্ষিত পরিবারে ইংরেজী শিক্ষার নেশা আজও কাটে নাই; কখনও কাটিবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

এতগুলির মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই উর্দ্দু হাবুডুবু খাইয়া মরিতেছে। সিন্ধুতে ভোটার তালিকা উর্দ্দুতে ছাপা নিষিদ্ধ হওয়ায় সিন্ধীতে ছাপা হইয়াছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য্য নিজ প্রদেশে "মাতৃ" ভাষা ব্যবহারের দাবী তুলিয়াছেন: উর্দ্দু বাঁচে আপত্তি নাই। মরিলে দুঃখ নাই। প্রতি প্রদেশেরই নিজস্ব একটা ভাষা আছে এবং তাহারা এ-উদাহরণ উপেক্ষা করিতে পারে না। তাহা ছাড়া ইংরেজীকে জীয়াইয়া রাখার দলটি উপেক্ষণীয় নয়।

বাংলা ত অন্যতম জাতীয় ভাষা সুতরাং উর্দ্দুর জন্য

অধিকাংশ লোকই উর্দ্দুর সহিত সংস্রব ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে। অন্য প্রদেশেও নিজ ভাষার প্রাধান্য রক্ষায় চেষ্টা হইবে তবে তাহাদের প্রত্যেকের গণ্ডি আকারে ছোট। পাকিস্থানের বড় শরিকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় কে জানে তাহারা হয় ত উর্দ্দু অপেক্ষা বাংলাকে ধরিয়া বসিবে। কারণ বাংলার সাহিত্য সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। বিরাট চেষ্টা করিয়াও রবীন্দ্র-নাথকে নির্বাসন দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

বর্ত্তমানের অবস্থায় এ চিন্তা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। পাকিস্তানে বর্ণমালায় "শিক্ষিত" (ilterate) লোকের হার শতকরা ১৫.৯। সে হিসাবে পূর্ব্ব বাংলায় শতকরা ২১.৫ আর পশ্চিমী পাকিস্থানের ১৬.৩। সারা পাকিস্থানের মধ্যে লিটারেটের হার খুলনায় সর্ব্বোচ্চ অর্থাৎ ২৭.২% ; পরেই রাওয়ালপিণ্ডি লাহোর, মুলতান নয়, পূর্ব্ব বাংলারই, আর এক অঞ্চল চট্টগ্রাম বিভাগ যেখানকার হার ২৬.৮%।

কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট বা লোকসভায় আঞ্চলিক জন সংখ্যার আনুপাতে প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইবে। বয়স্ক মাত্রেরই ভোটাধিকার হইয়াছে। এ হিসাবে এ সকল "সভা"য় বাঙালী সংখ্যাধিক্য থাকিয়া যাইবে। পশ্চিমী প্রভুত্ব খর্ব্ব হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বল্পকালের মধ্যেই বাঙালী প্রেসিডেণ্ট এবং অধিক মাত্রায় প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইবার কথা। অন্য ক্ষুদ্র শক্তি পূর্ব্ব বাংলার সহায়তার জন্য 'দল' পাকাইতে চাহিবে এবং বাংলার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

নেপাল পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিন্দু রাজ্য। পশ্চিম বাংলার যে দুর্দ্দশা হইয়াছে এবং বিদেশীকে ঘরে টানিয়া আনিবার যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছে, তাহাতে বাঙালীকে চীনা শিখিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে হিন্দি। এখন পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালী রাজ্য থাকিবে পাকিস্থানে। হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থানের জন্য হয় ত বাংলা একদিন একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হইতে পারে। বাংলা ভাষার এই এক বড় সান্ত্বনা।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

দিলীপকুমার রায়

ওঁ

হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুণা

৫. ৯. ১৯৭০

নীলকণ্ঠ

স্নেহাস্পদেষু,

তুমি দুতিনবার আমাকে লিখেছ জগতের "বর্তমান পরিস্থিতির" সম্বন্ধে কিছু লিখতে। আমি এ-যাবৎ ইতস্ততঃ করেছি এই জন্যে যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে "বর্তমান পরিস্থিতি"কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে আমার মন সরে না—যদি আমাকে লিখতেই হয় তবে ধর্মীয় দৃষ্টি-উদ্বুদ্ধ হয়েই লিখতে হবে—যে-দৃষ্টি অনেক "ইদানীন্তন"-এর (এ-বিশেষণটিও মহাভারতের) কাছে অগ্রাহ্য হবেই হবে—যদি অবজ্ঞাত না-ও হয়। তবে ভেবেচিন্তে মনে হল—এ-জন্যে মন খারাপ করা ভুল, কেন না অবিশ্বাসী অশ্রদ্ধালুদের সংখ্যা বর্ধমান হলেও বহু জিজ্ঞাসু এখনো বেঁচে বর্তে আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন "ধারণাৎ ধর্মমিত্যাহুঃ" (ধর্মই ধারণ করে)—তথা যুধিষ্ঠিরের দুটি মহাবাক্য—প্রথমটি তিনি বলেছিলেন যক্ষরূপী ধর্মকে:

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাৎ ধর্মং ন ত্যজামি মা নো ধর্মো হতো বধীৎ॥

অর্থাৎ

করিলে হনন ধর্মেরে সে-ও করিবে হনন তোমারে,
করিবে রক্ষা সে তোমায় তুমি করিলে রক্ষা তাহারে।

দ্বিতীয়টি কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে:

অফলো যদি ধর্ম স্যাৎ চরিতো ধর্মচারিভিঃ।
অপ্রতিষ্ঠে তমস্যেতদ্ জগন্মজ্জেদ্ অনিন্দিতে॥

অর্থাৎ

ধর্মচারীর ধর্ম বিফল হত যদি দেবি, জীবনে—
গভীর আঁধারে ডুবিত জগৎ মরিয়া অকালমরণে।

যুধিষ্ঠির আর একটি চিরস্মরণীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্" (ধর্মের গূঢ় চাল-চলন দুরবগাহ) বলে মানুষকে পথনির্দেশ চাইতে হবে কেবল মহাজনের কাছেই—অনুসরণ করতে হবে কেবল তাঁদেরই পদাঙ্ক, কেন না "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" (মহাজনেরা যে-পথের পথিক সেই পথই পথ)।

এ-কথায় মর্মার্থী শ্রদ্ধালুরা সায় দিলেও নিরীশ্বর ধর্মদ্রোহীরা শিরপা তুলবেন, বলবেন: "জানি জানি —the old old story—মহাজনদের কীর্তিকলাপ। যুগে যুগে তাঁরাই তো সাধুসন্তের তিলকধারী হ'য়ে দীনদুঃখীদের উপদেশ দিয়ে এসেছেন—নিরন্ন হ'য়ে কান্নাকাটি করাই ভালো, ধনী হলেই ডুববে—অর্থম্ অনর্থম্... ..."ইত্যাদি। অর্থাৎ, সাধুসন্তরা পরের মাথায় হাত বুলিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে চেয়েই মানুষকে ভুল পথে চালিয়ে এসেছেন। তাছাড়া যুগে যুগে সমাজনীতির বদল হয়েছে—ভবিষ্যতেও হবেই হবে, কেন না পরিবর্তন হল জীবনের ধর্ম—তাই অতীত যুগের মহাজনকে এ-যুগেরও দিশারি বলে বরণ করা চলবে না।

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা নয়, অথচ নিটোল সত্যও নয়। কারণ সভ্যতা বা নীতির বাহ্য কাঠামো কালাতিপাতে বদলালেও ভূয়োদর্শী সাধুসন্তের এ-রায় চিরন্তন সত্য-ভিত্তি যে, জগতে আবহমানকাল এক অনড় অটল প্রেরণা মানুষকে চৌতিকে তুলে এগিয়ে দিয়েছে—যে-জাগৃতির মন্ত্রপাঠ করে এসেছে মানুষের অন্তর্নিহিত মরিয়া-না-মরে-রাম ধর্মবুদ্ধি। "মরিয়া-না-মরে-রাম" বিশেষণটি অনুধাবনীয়—কেন না এ-ধর্মবুদ্ধিকে অবিশ্বাসী কালাপাহাড়েরা যুগে যুগে অজস্র উৎপীড়নের চাপেও নিষ্পিষ্ট করতে পারে নি—বার বার (গ্রীক) Phoenix

পাখীর মতন পুড়ে মরেও চিতার ভস্মের মতনই সে ফের জেগে উঠে উড্ডীন মানুষকে দিয়েছে আকাশ-চারণের দীক্ষা। তাকে যতই মারধোর করো না কেন সে প্রত্যাঘাত করে নি—বুদ্ধের ভাষায়ঃ অ-ক্রোধ দিয়ে ক্রোধকে জয় করার গুণগান করেছে, মহাভক্ত যবন হরিদাসের মতন কশাঘাতে মরণাপন্ন হয়েও গেয়েছেঃ

খণ্ড খণ্ড করে যদি যায় মোর প্রাণ,
তবু না বদনে আমি ছাড়ি হরিনাম।

লোভের রাজধানীতে বসেও সে লুব্ধ হয় নি, বলেছেঃ উপনিষদের ভাষায় "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্"—গীতার ভাষায়—কাম ক্রোধ ও লোভ এ তিনটিই নরকের দ্বার—আত্মঘাতী। এককথায়, মর্ত্যে স্বর্গরাজ্যের আভাস যেটুকু এসেছে যুগে যুগে তার আলোকধারা নেমেছে মহাজনদেরই পরার্থনিষ্ঠার জ্যোতির্গঙ্গোত্রী থেকে। গীতার এ-শ্লোকটিও সাধুদেরকে "আদর্শবাদী" উপাধি দিয়ে বরণ করেছেঃ

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্ ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধাঃ যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতেরতাঃ॥

অর্থাৎ

বীতসংশয় নিষ্পাপ যাঁরা সমাহিত নিজ আত্মায়,
লভেন মুক্তি নিখিল জীবের নিত্যহিতের সাধনায়।

এ-সাধনার আগ্রহ আসে কোত্থেকে—এ প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন ঠাকুর এই বলে যে, ভগবান্ই দেন এ-প্রেরণা সাধকের মনে এই চেতনা জাগিয়ে যে, তিনি "সর্বভূতের সুহৃৎ" (গীতা—৫।২৯ শ্লোক) তাই তাঁর পরহিতৈষণাকে বরণ করলে তবেই মিলতে পারে শান্তি, আনন্দ সুষমা। যথার্থ সাধুরা যে শুভব্রতী হয়ে শান্তি পেয়েছেন একথাও অনস্বীকার্য। এ-সংশয়ী নাস্তিক অশান্ত যুগেও আমরা চাক্ষুষ করেছি পরার্থনিষ্ঠ মহাজনদের নিত্যানন্দ স্থিতপ্রজ্ঞ শান্তি।

কিন্তু দুঃখ এই যে, এ-শ্রেণীর পরার্থব্রতী নিষ্কাম হিতব্রতী মহাজন সব দেশেই বিরল। তাই তাঁদের পরহিতব্রতের দিব্যজ্যোতি ঢেকে যায় অগণিত স্বার্থান্ধ দুর্মতির ঈর্ষা দ্বেষ হিংসার ঝড়ঝাপটায়। মানুষের মধ্যে অনেক গুণ থাকলেও একটি দারুণ অবগুণ তাকে চিরকাল ভুগিয়েছেঃ যে, সে প্রেমের বাণীতে সাড়া দেয় দোমনা হয়ে, কিন্তু দ্বেষের দুন্দুভি-আহ্বানে মেতে ওঠে সর্বান্তঃকরণে। তবু গীতার এ-উক্তির স্বপক্ষে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, "যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তদ্ এবেতরো জনঃ"—অর্থাৎ মহাজনদের সদাচরণের আলোই বহু মানুষের মনোমন্দিরে শুভবুদ্ধির আলো জেলেছে যার প্রসাদে সে ভগবানের কাছে বৈদিক ছন্দে প্রার্থনা করেছেঃ "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"—তিনি আমাদের অন্তরে শুভবুদ্ধিকে উদ্বোধিত করুন।" নাস্তিকেরা এ-কথায় রুখে উঠে বলেনঃ "যারা লক্ষ লক্ষ অসহায় দীনদুঃখীকে বঞ্চিত করে নিজেদের মুনফা বাড়িয়ে অকথ্য বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে তর তর করে তাদের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে নিষেধ করার নাম শুভবুদ্ধি নয়—অন্যায়ের ওকালতি।"

অভিযোগটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। মহামতি আলবার্ট শ্বাইৎজার আফ্রিকায় তাঁর হাসপাতাল ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই বলে যে, তাঁর স্বদেশবাসীদের অমানুষিক আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করতেই তিনি উৎপীড়িতদের সেবাব্রতী হয়েছেন। কিন্তু এই সঙ্গে স্মরণীয়ঃ তিনিও ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর এ-পরহিতৈষণার প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি খৃষ্টের প্রেমবাদ থেকেই।

কিন্তু নাস্তিকেরা বলবেনঃ One swallow does not make a summer—শ্বাইৎজার, স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ কয়েকটি মহাত্মার সর্বভূত-হিতব্রতের মহাবাণীকে ঢেকে ফেলেছে হাজার হাজার পুঁজিদারদের বিশ্বব্যাপী মুনফাবাদের নিষ্ঠুর শৃঙ্খধ্বনি। ফলে মানুষ ক্রমশ ক্ষেপে উঠে একজোটে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে কলরোল তুলেছেঃ "পুঁজিদার মুনফা-খোরদের মন গলানো দুচারটি সহৃদয় মহাজনের প্রেমবাণী বা শান্তিপাঠের কর্ম নয়। বুনো ওলের প্রতিকার হতে পারে কেবল বাঘা তেঁতুলে। আর এ-প্রতিকার পূর্ণসম্পন্ন হতে পারে না শুধু বাঘা তেঁতুল

গিলিয়ে—চাই বুনো ওলের বুলোছেদ—অন্ত কোন পথে মর্ত্যে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।" অর্থাৎ টুকিটাকি মেরামত নয়, চাই বিদ্রোহী বিপ্লবের ঘোর জিগির।

এ-বিদ্রোহের মধ্যে সবটাই গাজোয়ারি বাহ্বাস্ফোট নয়—কারণ পুঁজিদার মুনফাখোররা নিজেদের সুখসুবিধা ছাড়তে নারাজ। কেবল মুস্কিল এই যে, এখানে আসে উভয়সঙ্কট: একদিকে যেমন পুঁজিদারদের স্বার্থপরতাকে মঞ্জুর করে প্রবর্তমান উৎপীড়িতেরা সুভদ্র খাওয়া-পরার সংস্থান করতে পারে না, অন্যদিকে পুঁজিদারদের নির্মূল করতে খুনখারাপির পথে এগুলে দেখা যায় সেটা হয়ে ওঠে তপ্তকটাহ থেকে চুল্লীতে লাফ দেওয়ার সামিল—কেননা তখন সইতে হয় অসহিষ্ণু ডিকটেটর রাষ্ট্রপতি ও তাঁর সাঙোপাঙ্গের উচণ্ড অত্যাচার—স্বাধীন চিন্তার বিলোপ—সবাইকেই এক গোয়ালে মাথা মুড়োতে হয়, নইলে পরিণাম—অসম্মতদের লিকুইডেশন—উৎসাদন বা নির্বাসন। বলাবাহুল্য, এ-ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয় সংঘহীন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে—যাদের স্থান ধনিক ও শ্রমিকদের মাঝামাঝি।

এ-সাংঘাতিক উভয়সঙ্কটের সমাধান হবে কোন মন্ত্রে, কার নির্দেশে—এ নিয়ে এদেশে ওদেশে বহু মনীষীই ভেবে আকুল। কেবল একটি সিদ্ধান্তে সবাই সামসই করেছেন যে, আমরা এ-যাবৎ যে-নীতিকে সুনীতি বলে মান দিয়েছি তার মধ্যে বহু দুর্নীতির আগাছা গজিয়ে মানুষের অগ্রগতির পথ আগলে দাঁড়িয়েছে—যার মূলে আছে আমাদের স্বার্থময় অন্ধতা, তাই আমরা দেখেও দেখতে চাই নি দীন-দুঃখীদেরকে আমরা এ-যাবৎ কী ভাবে হেনস্থা করে এসেছি। এ-পাপের ফল ফলবে না? ফলছে আজ পদে পদেই—শুধু আমাদের দেশেই নয় সবদেশেই লাঞ্ছিত দুর্গতরা জেগে উঠে সংঘবদ্ধ হয়ে দাবি করছে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে এ-প্রায়শ্চিত্তের অবশ্যম্ভাবিতার আভাস দিয়েছিলেন সে কবে ষাট বৎসর আগে (১৩১৭ সালে)

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমান হবে হতে তাহাদের সবার সমান।
যারে তুমি নীচে ফেল' সে তোমারে বাঁধিবে
যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে
পশ্চাতে টানিছে।

কাজেই এ-যুগে এই অনবদ্য আদর্শ মান পেয়েছে যে, কতিপয় ধনীর সুখের জন্য নয়, সকলের সুখের জন্যেই রাষ্ট্র বা সমাজ গড়া হয়েছে—সকলকেই দিতে হবে সুভদ্র জীবন যাপন করার বিত্ত, উন্নতি, শিক্ষার সুযোগ।

কিন্তু আদর্শের ধ্বজা উড়ানো সহজ হলেও লক্ষ্যসিদ্ধি কোন পথে আশু আয়ত্ত হবে তার হদিশ দেওয়া মোটেই সহজ নয়। কারণ রোখ জাগায় রোখ, হিংসা জাগায় জিঘাংসা, যার সবচেয়ে শোচনীয় পরিণাম—ধর্মবুদ্ধির অধোগতি—ফলে অধর্মের অম্বুরচমূ এসে তামসী বুদ্ধিকে কায়েম করে যায় সংজ্ঞা পাই গীতায়:

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥

(যে বোধে: "ধর্ম মহা অধর্ম, আলোই অন্ধকার, তামসী বুদ্ধি সে—তার সর্বাদ বিপরীত চোখে তার।)

এ কথার কথা নয়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাই—যখন কোন মানুষ বা জাতি একবার ধর্মকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে অধর্মের পথে পা বাড়ায় তখন তার দৃষ্টি উত্তরোত্তর ঝাপসা হয়ে আসেই আসে যার শেষে ফল হয়—যে কালোকে দেখে শাদা, শাদাকে কালো। খুন করতে করতে যখন মাথায় খুন চেপে যায় তখন ব্যক্তির বা জাতির শুভবুদ্ধিকে বরখাস্ত করে মানুষ আসুরী বুদ্ধিকে ডাক দেয়। এ-দুর্বুদ্ধি তাকে পেয়ে বসলে সে নিজের অসদাচারকের সাফাই গায় সগর্বেই, বলে! "খুন বলো কাকে? দুষ্টের দমনের নাম কি খুন না সাজা?

এর ফল কী হয় আমরা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি উঠতে বসতে : এ-জাতি আনবিক বোমা জড়ো করছে দেখে ও-জাতিও সুরু করল আনবিক বোমার স্তূপ গড়তে—মানুষ আতঙ্কে দিশাহারা, কিন্তু উপায় কী। বুদ্ধি যখন একবার আসুরীবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় তখন সে আত্মরক্ষার অজুহাতে গড়িয়ে চলে আত্ম-ঘাতেরই রসাতলে—ইতিহাস থেকে শেখে না যে, খৃষ্টের এ ঘোষণা চিরন্তন সত্যের কোঠায় পড়ে যে, "All they that take the sword shall perish with the sword."

অসিধারে যারা মহীপতী হতে চায়
অসিই তাদের হয় কাল শেষে হায়।

এ-দারুণ আদর্শসঙ্কটে মহাজন ছাড়া কাকে সালিস মানব? পরার্থনিষ্ঠ স্থিতপ্রজ্ঞ ছাড়া আর কাকে সারথি করব অসংযত ইন্দ্রিয়াশ্ববাহী জীবনরথের? জানি, অনেক সাধু আছেন যাঁরা দেখতেই (ভেখধারী) সাধু, আসলে অসাধু, সুবিধাবাজ—যাঁরা তপোলব্ধ ছুচারটি বিভূতি ভাঙিয়ে খেতেই আছেন। কিন্তু মেকি আছে বলেই সাচ্চা নেই একথা বলা চলে না। সাধুদের বেলায়ও তাই তাঁদের কারুর কারুর মধ্যে অসাধুবৃত্তি আছে বলেই সরাসরি রায় দেওয়া চলে না যে, নির্ভেজাল পরার্থনিষ্ঠ সাধু নাস্তি। অলডাস হাক্সলি আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তিনি সাধুদের নস্যাৎ (debunk) করতে চেয়েই সাধুদের জীবনচরিত পড়তে গিয়ে দেখতে পান যে, যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে সাধুরাই সেবাব্রতের প্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন, আত্মজয়ের দীক্ষা দিয়ে শান্তির পাঠ দিয়েছেন, সর্বোপরি, মানুষকে ভালোবেসে কাছে টেনে নিজের ভগবৎপ্রেমের ছোঁয়াচে তাদের মনোমন্দিরে ভগবৎপ্রেমের দীপ জ্বালিয়েছেন। শুধু তাই নয়—অলডাস হাক্সলি লিখেছেন তাঁর নানা গ্রন্থেই যাঁরা দুশ্চর তপস্যা করে আপ্তকাম হয়েছেন তাঁদের মধ্যে যে ভাগবতী শক্তি নামে এ-সত্যও চাক্ষুষ করা যায়। তাঁর বিখ্যাত GREY EMINENCE গ্রন্থে এ-ভাবুক মহামনীষী নাস্তিকদের একটি দেবদ্রোহী প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন চমৎকার :

"Well, what of it?" it may be asked, "why shouldn't it (mysticism) die? What use is it when it is alive?" The answer to these questions is that where there is no vision, the people perish; and that, if those who are the salt of the earth lose their savour there would be nothing to keep that earth disinfected, nothing to prevent it from falling into complete decay. The mystics ARE channels through which a little knowledge of Reality filters down into our universe of ignorance and illusion. A totally unmystical world would be a world totally blind and insane."

(ভাবার্থ : ধর্ম—ওরফে আন্তিক সাধনা—লুপ্ত হ'লে কী আসে যায়? এ-প্রশ্নের উত্তর : যেখানে মানুষের চোখের সামনে কোন দিব্য আদর্শ না থাকে সেখানে জাতির সর্বনাশ সুনিশ্চিত এই জন্যে যে, যাঁরা পার্থিব চেতনার শ্রেষ্ঠ বিকাশে জ্যোতির্ময় হ'য়ে ওঠেন তাঁদের মাহাত্ম্য বিনষ্ট হ'লে পৃথিবীকে বিষবাষ্পের কবল থেকে অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। মহাজনদের প্রণালীর মধ্যে দিয়ে অলোকলোকের কিছুটা আলো নামে আমাদের অজ্ঞানতিমিরান্ধ মায়ামুগ্ধ জগতে। যেখানে ধর্ম—ঐশী সাধনা নিশ্চিহ্ন সেখানে মানুষ প্রবুদ্ধ হ'তে পারে না—অন্ধতা ও মত্ততার মোহে বিনষ্ট হয়ই হয়।)

এ উচ্ছ্বাসের অত্যুক্তি নয়—ঐতিহাসিক সত্য : কালে কালে দেশেদেশে মহাজনরাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে পর-হিতব্রতের দীক্ষা দিয়ে এসেছেন - বিপথে পা দেওয়ার দুষ্প্রবৃত্তির হাত থেকে মুক্ত করেছেন তাঁদের সদাচার ও মহত্ত্বের দৃষ্টান্তে, সর্বোপরি, শক্তি দিয়েছেন "কাঁচা আমি"-র কুমন্ত্র পাকে পাশ কাটিয়ে "পাকা আমি"-কে গুরুবরণ করে প্রাণসাধনায় কৃতকৃত্য হ'তে। এ-সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন একটি ভাববার কথা : যে

খাটি মহাজন (সাধু সন্ত মুনি ঋষি) সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ব'লেই তাঁদের আহৃত দিব্যশক্তির যোগফল আজ পর্যন্ত যথেষ্ট বলীয়ান হতে পারেনি। তাঁর "সাবিত্রী"তে পাই—মহামতি অশ্বপতি ভগবানের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে অনুযোগ করছেন:

Too little the strength that now with us is born
Too faint the light that steals through Nature's lids

(যে-শক্তি করেছি লাভ আমাদের অন্তরে—যে আলো
নেমেছে তারিণী করুণায়
দীর্ণ করি, প্রকৃতির আবরণ বাধা ঘনকালো—
নহে আজো পর্যাপ্ত সে হায়।)

ভাষ্য: মহাজনদের জ্ঞানদীপ্তি ও প্রেমশক্তি এ-দুরন্ত জগতের নিরন্ত রণোন্মত্ততার হানাহানিতে রুখতে পারছে না যথেষ্ট আলোকমন্ত্রবলকে তাঁরা এখনো আবাহন করতে পারেন নি বলে। শুধু তাই নয়, যথার্থ মহাজনদের সংখ্যাবৃদ্ধি করবার কোন বাঁধাসড়কের দিশাও তাঁরা দিতে পারেন নি, বিশেষ করে এই জন্যে যে, সে-পথ বহু ব্যক্তিগত সাধনার যোগফলে গড়ে ওঠে বহু কাঁটাবন ও মরুপথ পার হয়ে তবে। তবু মানতেই হবে তাঁদের এই মহাবাক্য যে, ভগবতী প্রজ্ঞা ও ভক্তির দুর্গম পথেই কেবল ব্যক্তির ও বিশ্বমানবের মুক্তির্দিশা মিলতে পারে—রণোন্মুখ বাহুবল বা নৈয়ায়িক যুক্তিতর্কের পথে নয়। কারণ, বলেছি—বাহুবলের বাহ্বাস্ফোটের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিপক্ষেরও বাহুবল স্পৃহা জেগে ওঠে যার উপসংহার রক্তারক্তির শ্মশান শয্যায়। যুক্তি তর্কের পথেও সত্যদৃষ্টি শুভবুদ্ধির অভ্যুদয় হয় না, কেন না, চতুর উকিল বাকনৈপুণে কুযুক্তিকেও সুযুক্তির পোষাক পরিয়ে কালোকে শাদা প্রতিপন্ন করতে পারেন—অহরহ করেও থাকেন। শ্রীঅরবিন্দের কাছে বহুবৎসর পূর্বে এই একটি পরমসত্যের মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছিলাম—যে, এমন কোন সার্বভৌম সর্বজনীন যুক্তি নেই বা সকলের কাছেই সুযুক্তি বলে স্বীকার্য হতে পারে। রাসেল তাঁর **Human Knowledge: Its Scope & Limits** তথা **Human Society In Ethics & Politics**-এ (এবং আরো নানা নিবন্ধে) লিখেছেন এই ঘোর সমস্যার কথা: মানুষ মানস যুক্তিতর্কের পথে কোনো সর্বগ্রাহ্য নিশ্চিত নীতির দিশা পেতে পারে কি না বা এমন কোনো সর্ববরেণ্য অটল ভিৎ গড়ে তুলতে পারে কি না যার উপরে স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলা যায়।

রাসেলের এ-সাংঘাতিক প্রশ্নটি আজকের দিনে বহু ভাবুককেই ভাবিয়ে তুলেছে। তাঁরা এবিষয়ে এখনো দোমনা কারণ "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা নতান্ তর্কেন সাধয়েৎ, (মনের অতীত লোকের ভাব-উপলব্ধি তর্ক-যুক্তির এলাকার বাইরে) মহাভারতের এ-বাণী তাঁরা মানতে নারাজ—তাঁদের কাছে যুক্তিপন্থী মনই সেরা সালিস বলে আজও মান পান। কিন্তু আমাদের আর্য প্রজ্ঞা আত্মিক সত্যকে 'অতর্ক্য' বলেছেন একবারেই। এ-মানসাতীত প্রজ্ঞার রায় এই যে, প্রজ্ঞান লাভ করতে হলে চাই তপোলব্ধ অন্তর্ভেদী দিব্যচক্ষু যে সত্যছদ্মবেশী মিথ্যার মায়াবরণ ভেদ করে (এক্স-রে-র মতন) নিত্যসত্যের অস্থিমজ্জার দিশা পায়। কিন্তু এজন্যে সব আগে চাই—"ভাবের ঘরে চুরি"-র দুরন্ত প্রবণতাকে বরখাস্ত করা। মহাভারতে উদ্যোগ-পর্বে একটি বিচিত্র রসাল শ্লোক আছে:

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধাঃ ন তে বৃদ্ধাঃ যে ন
বদন্তি ধর্মম্।
নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি, ন তৎ সত্যং
যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্।

(সে নয় সভা—যে সভায় বিরাজ করে না জ্ঞানী প্রবীণ
সে নয় প্রবীণ জ্ঞানী যে ধর্মে দীক্ষা দিতে না চায়,
সে নয় ধর্ম—নাই যেথা চিরসত্য নির্মালিন,
সে নয় সত্য—ছলনার লেশও যেথা প্রশ্রয় পায়।)

মানুষ সবদেশেই আবহমানকাল ধর্মের দীক্ষা চেয়ে এসেছে সত্যনিষ্ঠ ধার্মিকের কাছেই। কিন্তু এ-দীক্ষা পেতে হলে সব আগে সত্যকে চাওয়ার মতন চাইতে হবে। আর এ-চাওয়ার পথে বাধা অগুন্তি—শ্রেয়াংসি

বহির্বিমানি—প্রেয় ছেড়ে শ্রেয়কে বরণ করতে গেলেই প্রেয় হাজারো মোহিনীমূর্তি ধরে সত্যসাধককে যোগভ্রষ্ট করে—এ-সোনার হরিণীরাআসলে বন্ধু ছদ্মবেশী অসুর-বৈরীদেরই দূতী। গীতায় মানুষকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে: এক,যারা দৈবী সম্পদের অধিকারী, অভিজাত; দুই,যারা আসুরী বৃত্তিভোগী। শুধু দেবাশ্রিত অভিজাতরাই পায় পরা ভক্তি পরা প্রজ্ঞা বিশ্বপ্রীতি-বর্গীয় নিত্যধনের দিশা। আসুরী বুদ্ধিচালিত মদমত্তেরা আত্মাভিমানের মোহে দম্ভভরে মানসবুদ্ধির মধ্যে দিয়ে পেতে চায় অগাধ অন্তরাত্মার তল, তাই সে অধ্যাত্ম জীবনদর্শনকে উল্টো বুঝে বেঠিক পথের পথিক হয়ে দৈবী প্রেরণার সঙ্গে লড়াই করে। এ-যুদ্ধে প্রথম দিকে সে জয়ী হয় অনেকসময়েই, কিন্তু শেষে হার মানতে বাধ্য হয়। এই উল্টো বোঝার চমৎকার ছবি এঁকেছেন ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি একটি মনোজ্ঞ কথিকায়—ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষ অধ্যায়ে। কথিকাটি দীর্ঘ তাই সংক্ষেপে পেশ করি তার চুম্বকটুকু আমার ভাষ্য সমেত।

দেবতা ও অসুর ছিল ভাই ভাই, কিন্তু তাদের মধ্যে বিরোধ বাধল উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির ও স্বভাবের ভেদের দরুণ। অসুরের দৃষ্টিবিভ্রম হল কেমন করে ঋষি ফুটিয়েছেন এইভাবে:

দেবরাজ ইন্দ্র আর দৈত্যরাজ বিরোচন লোকপরম্পরায় শুনেছিলেন প্রজাপতির বাণী: যে অজর অমর আত্মাই অন্বেষণীয়—তাঁকে জানলে তবেই জীব আপ্তকাম হয়। তাই দুজনেই স্থির করলেন—প্রজাপতির কাছে দীক্ষা নিয়ে জেনে নিতে হবে কী ভাবে এ-বরদ আত্মাকে জানা যায়—কোন্ পথে।

তাঁরা বত্রিশ বৎসর প্রজাপতির কাছে কাটালেন ব্রহ্মচর্যব্রত নিয়ে। তারপর প্রজাপতি তাঁদের এক জলপাত্রের সামনে দাঁড় করালেন সুবসন পরিয়ে ও অলঙ্কারে সাজিয়ে।

"কী দেখছ? শুধালেন গুরু।

শিষ্যযুগল বললেন: দেখলাম সুসজ্জিত অলংকৃত মূর্তি আমাদের।

প্রজাপতি বললেন: ইনিই সেই আত্মা ওরফে অভয় অমৃত ব্রহ্ম—যাঁকে জানার মত জানলে জীব ব্রহ্মবিৎ হয়ে শাশ্বত পদ লাভ করে।

প্রজাপতি বলতে চেয়েছিলেন—সবই ব্রহ্ম বলে দেহও ব্রহ্ম হলেও আত্মাকে জেনে আত্মবিৎ হতে পারলে তবেই 'দেহও' ব্রহ্ম এ-সত্য আমাদের গোচর হয়। কিন্তু বিরোচন প্রজাপতির বাণীর এ-নিগূঢ়ার্থ না বুঝে ফিরে গিয়ে তার অসুর আত্মীয় বন্ধু সবাইকে বললেন: শোনো আমি গুরুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি পরম তত্ত্ব—অর্থাৎ এই দেহই আত্মা, সুতরাং দেহই জীবের সর্বস্ব, দেহপূজা করলেই ইহলোক পরলোকে আপ্তকাম হওয়া যাবে।

কিন্তু ইন্দ্রের মনে বিপরীত পথে খটকা জাগল: গুরু কী বললেন—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তো! ভুল বুঝলে তো হবে গোড়ায় গলদ, তাই যাই ফিরে।

ফিরে এসে ফের গুরুর কাছে দরবার। গুরু বললেন: কী ব্যাপার? ফিরে এলে যে?

ইন্দ্র বললেন: গুরুদেব আপনার মহাবাণী আমাকে অশান্ত করেছে, মনে হচ্ছে আমি আপনাকে ভুল বুঝেছি। কেন না দেহ কেমন করে অজর অমর অভয় ব্রহ্ম হবে? চোখ গেলে যে অন্ধ হয়, পা ভাঙলে যে খঞ্জ হয়, হাত কাটলে যে বিকল হয় সে তো অভয় অমৃত হতে পারে না। কারণ অমৃত মানে তো অবিনাশী? দেহ কী করে সে-পদবী পাবে যখন অন্তিমে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী?

প্রজাপতি প্রসন্ন হ'য়ে ইন্দ্রকে আরও উনসত্তর বৎসর স্বগৃহে রেখে ব্রহ্মচর্য সাধন করালেন। মনে হ'ল ইন্দ্রের চিত্তশুদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি হ'য়ে উঠলেন গ্রাহিষ্ণু (receptive)। তখন প্রজাপতি তাঁকে নিত্যসত্যের অধিকারী ব'লে সনাক্ত করে ফাঁশ করলেন "সর্বগুহ্যতম্" তত্ত্ব। যা বললেন তার মর্মবাণীটি এই যে, দেহ মন ও ইন্দ্রিয়জগতের ওপারে যার অধিষ্ঠান সেই আত্মাকে উপলব্ধি করলে তবেই হয় অভীষ্টসিদ্ধি, মেলে পরমানন্দ। সবই ব্রহ্ম তাই দেহও ব্রহ্ম—বটেই তো।

কিন্তু দেহের অন্তর্লীন আত্মাকে না জানলে এ-সত্যও শুধু মুখের কথাই থেকে যায়। পরমাত্মায় পৌঁছলে তবেই উপলব্ধি করা যায়—আত্মবোধের আলোয় দেখা যায়—সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম—যা কিছু আছে সবই তিনি। ব'লে শেষে প্রজাপতি ঘোষণা করলেন যে, দেবতারা দেবত্ব-পদবী পেয়েছেন এই আত্মবোধের অমৃত-পরশেই।

এই-ই হ'ল তার আত্মার শাশ্বত বাণী, আর্য দর্শন। উপনিষদে এই বাণীর ডঙ্কা বেজেছে নানা ছন্দে, নানা সুরেই যে, পরাবিদ্যা ওরফে আত্মবোধের পথেই মানুষের জীবন্মুক্তি নিত্যসিদ্ধি। অন্য সব বিদ্যার (অর্থাৎ অপরা বিদ্যার) যে কোনো সার্থকতাই নেই তা নয় তবে অপরা বিদ্যার প্রসাদে মন্ত্রবিৎ (ওরফে বহুপাঠী বিদ্বান্) হওয়া গেলেও আত্মবিৎ হওয়া যায় না। তার জন্যে চাই ঐকান্তিক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—ব্রহ্মচর্যের পথে—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—বস্তুলাভের আর কোনো বাঁধা সড়ক "শর্টকাট্" নেই। যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ী এই সনাতন সত্যটিকেই অঙ্গীকার করেছিলেন তাঁর ঝংকৃত প্রশ্নে (যার রেশ আজও প্রতি ধর্মাত্মার বুকের তারে বাজে): "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?"—অর্থাৎ ঐহিক আরাম, দেহসুখ, ইন্দ্রিয়ভোগ নিয়ে আমি কী করব যদি তার প্রসাদে অমৃত না হই?" (ভাস্ত: দেহবিলাস বস্তুতান্ত্রিকতার পথে মানুষ কৃতকৃত্য হ'তে পারে এ-বাণী ভ্রান্তদর্শী—নাস্তিক ভোগবাদের ডাক হ'ল সোনার হরিণের মায়াশঙ্খ)।

বিরোচন তাঁর দানবী বুদ্ধির দম্ভে এই ঠিকে-ভুল করেছিলেন ব'লেই অসুর ও দেবতা ভাই ভাই হওয়া সত্ত্বেও হ'য়ে দাঁড়াল ঠাঁই ঠাঁই—বাধল সংঘর্ষ। প্রতি চিত্তে এই চিরন্তন সংগ্রামেরই প্রতীক—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে। পাণ্ডবেরা দৈবী সম্পদে বিত্তবান, তাই হ'লেন শৌচ আচার শম দম ভক্তি জ্ঞানের পূজারী, আর কৌরবেরা দাঁড়াল দম্ভ কাম ক্রোধ নিষ্ঠুরতার ধ্বজাবাহী—আসুরী বৃত্তিকে বরণ ক'রে। গীতায় এই আসুরী বৃত্তির বিশদ বর্ণনা আছে ষোড়শ অধ্যায়ে, কৃষ্ণের মুখে নির্ঘোষিত হয়েছে তার মর্মবাণী এই যে, আসুরী বৃত্তি স্বভাবে নাস্তিক, দাম্ভিক, আত্মঘাতী।

এখানে স্বতঃই একটি প্রশ্ন মনকে টোকে: "এ-আত্মঘাতী বৃত্তিদের মূলোচ্ছেদ কি হবার নয়?" আর্য দর্শনের উত্তর: "না। কারণ সৃষ্টিলীলার বিকাশ কোনোদিনই হয় নি একটানা আনন্দের কুসুমাস্তৃত পথে, হয়ে এসেছে দেবাসুরের চিরন্তন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কাঁটাবনের মধ্যে দিয়েই—যে-বিচিত্র ইতিহাস মানুষের "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা"-র বাঁকে বাঁকে মর্মর-ফলকে উৎকীর্ণ। সে-ইতিহাসে দেখতে পাই—যুগে যুগে এ-কুরুক্ষেত্রে কখনো জয় হয়েছে দেবতার, কখনো অসুরের। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এ-যুদ্ধে অসুর প্রথমদিকে জয়ী হ'লেও অন্তিমে চিরদিন দেবতাই জয়লাভ করেছেন। ফলে আসে এক নবযুগ—তখন আবার নবচেতনার নবতন পরিবেশে যুদ্ধ বাধে দেবাসুরের—আর শুধু জাতির সঙ্গে জাতির নয়, প্রতি হৃদয় কুরুক্ষেত্রে বেজে ওঠে সে রণরোল—যে-সংগ্রামে দৈবাশ্রিত মহাজন দাঁড়ান সত্যের তরফে, বৈরাশ্রিত অসুর—মিথ্যার তরফে। কিন্তু অন্তিমে সত্যই জয়ী হয়, মিথ্যা হার মানে—"সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্" গেয়েছেন উপনিষদের ঋষি।

কিন্তু হ'লে হবে কি, আমাদের মানসবুদ্ধি চিরসংশয়ী তথা সুখলুব্ধ—তাই দুঃখ পায় যখন এ-যুদ্ধের আঁচ তার গায়ে লাগে—কান্নাকাটি করে: "ধর্ম যে লুপ্ত হ'তে চলল—অসুরদেরই যে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, মহাজনদের দুর্গতি!" কিন্তু এসব দুঃখব্যথাও আমাদের যে শুধুই নেহাৎ ভোগায় তা নয়, দুঃখক্লেশ পরাজয়ের মধ্যে দিয়েই ফুটে ওঠে নব আনন্দ শ্রী ও বিজয়ের দিব্য দীপ্তির নবারুণ—আমরা অনুভব করি যে, এক অমৃত করুণাশক্তি আমাদের নিয়ে চলেছে এক অচিন আনন্দের মোহনায়—সুখদুঃখ ওঠাপড়া আগুপিছু ভাঙাগড়ার আলো-আঁধারী পথে। পদে পদে মানুষ অতীতকে

বিদায় দিয়ে চলেছে তো চলেইছে—কোথায়, কেন, কিসের আশায় জানে না—শুধু চলা তার ফুরোয় না—ফুরোবার নয়। শ্রীঅরবিন্দ এ-সত্যটির পাঠ দিয়েছেন তাঁর মহাবাক্য সাবিত্রীর একটি গভীর দর্শনে :

The conscious doll is pushed a thousand ways
And feels the push but not the hand that
drives.

(প্রাণপুত্তলিকা মূঢ় ধায় দিকে দিকে গূঢ়
নিয়তির পরিচালনায়:
দেখে না সে কর তাঁর, জানে শুধু যে তাহার
অভিঘাত পথের চলায়)

ঘা খেতে খেতে দুঃখব্যথার অঞ্জনে সে দেখতে পায়—আভাসে মাত্র—তবু তাতেই সে পায় আঁধারে আলো—দেখে (সাবিত্রী)

A mystic motive drives the stars and suns
(সূর্যচন্দ্র নীহারিকা উধাও অসীম ব্যোমে
এক দিব্য শক্তির ইঙ্গিতে :
কোন্ লক্ষ্যপানে মন পারে না নির্ণিতে।

এ কেবল মহাকবির কাব্যোচ্ছ্বাস নয়, মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনও এ "মিস্টিক মোটিভের" আভাস পেয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত What I Believe নিবন্ধে তিনি করেছেন এ-অনুভূতির জয়ধ্বনি :

"The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead : his eyes are closed. This insight into the mystery of life, coupled though it be with fear, has given rise to religion. To know that what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty which our dull faculties can comprehend only in their most primitive forms—this knowledge, this feeling, is at the centre of true religiousness."

(ভাবার্থ : রহস্যের বিস্ময় জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতি—সব সত্য শিল্প ও বিজ্ঞানের মূলেই এই শিহরণ নিত্যাসীন। এ-অপরূপ হৃদয়াবেগের সঙ্গে যার আদৌ পরিচয় হয় নি, আশ্চর্যের ধ্যানে যে মুগ্ধ সম্ভ্রমে অভিভূত হয় নি, সে জীবন্মৃত, চোখ থেকেও অন্ধ। জীবনরহস্যের সম্পর্কে এই অন্তর্দৃষ্টিই ধর্মের আদি প্রসূতি। যখন আমরা জানার মতন জানি যে, যে-রহস্য আমাদের অজ্ঞেয় তার অস্তিত্ব স্বয়ংসিদ্ধ, সে উৎসারিত হয় তুঙ্গতম প্রজ্ঞায় তথা দীপ্যমান রূপশ্রীতে—আমাদের ম্লান মনোবৃত্তি যার শুধু উন্মেষটুকুর মাত্র আভাস পায়—তখনই কেবল আমরা উপনীত হই ধর্মবোধের কেন্দ্রবিন্দুতে।)

তাই নাহক হাহুতাশ না ক'রে এই আস্তিক বিশ্বাসের আশ্বাসকে বরণ করাই বাঞ্ছনীয় যে, দ্বৈতের মধ্যে দিয়েই ভগবান আমাদের এক অদ্বৈত মহা-পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছেন, প্রতি হৃদয়ে দেবাসুরের রণরোলের মধ্যে দিয়েই আমাদের উন্নীত করতে চাইছেন এক অনিন্দ্য সুষমালোকে—যুগে যুগে হয় নিজে অবতীর্ণ হয়ে, নাহয় তাঁর দেবদূত-মহাজনের অন্তরে দিব্যশক্তি সঞ্চার ক'রে, তার মর্ত্য বেদনায় অমর্ত্য চেতনার ঝংকৃত প্রার্থনা জাগিয়ে : "অসতো মা সদ্গময়—তমসো মা জ্যোতির্গময়—মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়"—আমায় উত্তীর্ণ করো অসৎ সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে।

ইতি—

দিলীপদা।

কংগ্রেস স্মৃতি

বিশেষ অধিবেশন—কলিকাতা১৯২০

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(১)

অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার পর সভাপতি মতিলাল নেহেরু ৮ই জানুয়ারী ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করে জানালেন যে অমৃতসর কংগ্রেস সম্রাটের ১৯১৯ সালের ২০শে ডিসেম্বরের সহৃদয় ঘোষণার জন্য সসম্মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে এবং আগামী শীতকালে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমনের প্রস্তাবে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং দেশের পক্ষ থেকে তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনারও—প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ঐ টেলিগ্রামে আরও জানান হল যে স্থির মস্তিষ্কে পরিচালিত নিরীহ লোক ও শিশুদের হত্যাকাণ্ডের জন্য (আধুনিক যুগে যার তুলনা নেই), জেনারেল ডায়ারকে সেনাপতির পদ থেকে অপসরণের জন্য কংগ্রেস ভাইসরয়কে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে।

অনুরূপ 'কেবল' ভারত সচিব মিঃ মন্টেগুর নিকটও পাঠান হল। তাতে আরও বলা হল সমগ্র জনমতের বিরুদ্ধে যে রৌউলেট আইন পাশ করা হয়েছে তা বাতিল না করা পর্য্যন্ত ভারতে শান্তি স্থাপন অসম্ভব। এ জন্য কংগ্রেস তাঁকে সম্মানের সহিত সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে যাতে তিনি 'ভিটো' প্রয়োগ করে বা অন্য কোন প্রকারে ঐ আইন রদ করতে ভারত সম্রাটকে পরামর্শ দেন।

লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও কংগ্রেস সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে। তুর্কীর খিলাফৎ প্রশ্নে বৃটিশ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধ মনভাবের প্রতিবাদ করে ভারতীয় মুসলমানদের ভাব প্রবণতা ও প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে খিলাফৎ প্রশ্ন সমাধান করতে অনুরোধ করেছে। এ না হলে ভারতের লোকদের মনে কোন শান্তি আসবে না।

প্রস্তাবিত ইনডেমনিটি বিল (কর্মচারীদের অপরাধ থেকে অব্যাহতি দিবার জন্য আইন) এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর যে নির্দয় ব্যবহার হচ্ছে কংগ্রেস তার প্রতিবাদ করেছে এবং পূর্ব আফ্রিকায় ভারত বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তথাকার ভারত-প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনুরোধ করেছে।

অমৃতসর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে জাতীয় স্মারক চিহ্নস্বরূপ জালিয়ানওয়ালাবাগ ক্রয় করা হল। এর দাম লেগেছিল সংসাকল্যে ৫॥ লক্ষ টাকা।

পাঞ্জাবের নির্য্যাতিত নেতাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য দেশের সর্বত্র আয়োজন হতে লাগল। কলকাতাতেও তাদের অভ্যর্থনা করা হয়েছিল।

কংগ্রেস সভাপতি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সচিবের নিকট 'কেবল' দ্বারা অনুযোগ করলেন যে নূতন ভারত গভর্ণমেন্ট আইনানুসারে (Government of India Act) নিয়ম প্রস্তুতের সময় উপদেষ্টা কমিটী থেকে কংগ্রেসের সমর্থকদের বাদ দিয়ে ভারত গভর্ণমেন্ট সংস্কার চালু করতে আরম্ভ করেছে এবং এ দ্বারা প্রথম থেকেই কংগ্রেসের সহযোগীতা বর্জন করেছে। সম্রাটের গত ডিসেম্বর মাসের সহৃদয় ঘোষণার উপর নির্ভর করে কংগ্রেস প্রতি পদক্ষেপে তাদের মতামত প্রকাশ করার জন্য প্রকাশ্য আলোচনার দাবি জানিয়েছে।

এ দিকে খিলাফৎ আন্দোলনের বেগ ক্রমশঃ প্রবল হতে লাগল। কলকাতায় একটি খিলাফৎ কনফারেন্স

আহ্বান করে তাতে প্রধান প্রধান উলেমা ও অন্যান্য হিন্দু মুসলমান নেতারা খিলাফৎ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

৩রা মার্চ বোম্বেতে কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটীর আহ্বানে উক্ত কমিটীর সভাপতি শ্রী ছোটানীর সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। গান্ধীজী এই সভায় তাঁর মত ব্যক্ত করলেন। তিনি বললেন যে তুর্কীর প্রশ্ন ন্যায্যভাবে সমাধান না হলে কাউনসিল থেকে মুসলমান সদস্যদের পদত্যাগের যে প্রস্তাব কলকাতায় গৃহীত হয়েছে তা তিনি সমর্থন করেন এবং এ বিষয়ে মুসলমানেরা হিন্দুদের সহায়তা পাবেন। তিনি উপদেশ দিলেন খিলাফৎ প্রশ্ন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে না ফেলার জন্য। মহাত্মা গান্ধী মিশরের (ইজিপ্ট) অধিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন যে এর সঙ্গে যেন খিলাফতের প্রশ্ন না জড়ান হয়। তিনি মুসলমানদিগকে তাঁদের ন্যূনতম দাবিগুলি ধরে থাকতে বললেন এবং আশ্বাস দিলেন যে তাঁরা হিন্দুদের সহযোগিতা পাবেন।

উক্ত সভার নির্দেশানুসারে ১৯শে মার্চ, দেশের সর্বত্র খিলাফৎ দিবস পালিত হল।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর নির্দেশানুসারে ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত জাতীয় সপ্তাহ পালিত হল। ৬ই এপ্রিল পূর্ণ হরতাল হল এবং জাতীয় সপ্তাহে ভারতের সর্বত্র সভা আহ্বান করে জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হল।

খিলাফৎ সম্বন্ধে অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। গান্ধীজী ২৮শে এপ্রিল সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়ে মুসলমানদের বিচলিত এবং ক্রোধের বশীভূত না হতে উপদেশ দিলেন এবং জানালেন যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে অসহযোগই প্রতিকারের প্রকৃষ্ট উপায়।

দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনার জন্য বেনারসে ৩১শে মে তারিখে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সভা আহ্বান করা হয়। ঐ সভা হাণ্টার কমিটীর মেজরিটি রিপোর্টকে নিন্দা করে একটি প্রস্তাব দ্বারা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করল এবং আশা প্রকাশ করল যে এই আন্দোলনের ফলে জনসাধারণ সংযত হবে এবং হিংসামূলক কার্য্য থেকে বিরত থাকবে। ভারতের মুসলমানদের মতানুসারে তুর্কীর সহিত সন্ধির সর্তের সংশোধনের জন্যও প্রস্তাব করা হল।

এই সভা আরও স্থির করল যে পাঞ্জাব ও তুর্কী সম্বন্ধে সুবিচার না হলে গভর্ণমেন্টের সহিত অসহযোগ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্যপ্রণালী বিবেচনা করে স্থির করার জন্য কলকাতায় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন করা সাব্যস্ত হল।

গাঞ্জামের একটি জনসভায় ৬ই জুন প্রস্তাব করা হল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের স্থান কলকাতার পরিবর্তে বহরমপুর (অন্ধ্র) নির্ব্বাচিত হোক।

লোকমান্য তিলক ও খাপর্দের সঙ্গে পরামর্শ করে পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত মুকুল আগষ্ট মাসে জব্বলপুরে বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাব করলেন এবং শ্রী সি, আর, দাশ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও পণ্ডিত গোকরণ নাথ মিশ্র মহাশয়দিগের টেলিগ্রাম দ্বারা অনুরোধ করলেন যাতে অধিবেশনের স্থান কলকাতার পরিবর্তে জব্বলপুর নির্দিষ্ট হয়।

শেষ পর্য্যন্ত কলকাতাতেই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাব স্থির থাকল।

এদিকে অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকল। সিন্ধু প্রদেশে এই আন্দোলন দমনের জন্য গভর্ণমেন্ট কঠোর হস্তে সত্যাগ্রহীদের শাস্তি দিতে লাগল।

লালা লাজপত রায় কাউনসিল বয়কট সমর্থন করলেন। তিনি মত প্রকাশ করলেন যে কোন কংগ্রেস সেবীর পক্ষে কাউনসিলের সভ্যপদের নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়ান উচিত হবে না এবং যদি কেউ দাঁড়ান তাঁকে কোন সাহায্য করা ত হবেই না বরং যাতে তিনি সফলকাম না হন তজ্জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রথম এক জন পাঞ্জাবী নেতা অসহযোগ আন্দোলনের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করলেন।

গান্ধীজী ভাইসরয়কে জানালেন যে যদি পাঞ্জাবের

ও খিলাফতের অবিচারের প্রতিকার না হয় তা হলে তিনি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করবেন।

আসন্ন কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যবস্থার জন্ত ২০ শে জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর একটি সভা আহুত হল। ঐ সভায় অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হল এবং শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী তার সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন, অধিবেশনের তারিখ পরে ধার্য্য হবে স্থির হল।

এই সময় লাহোরে একটি কনফারেন্স আহ্বান করে খিলাফতের প্রশ্নে কাউনসিল বর্জ্জনের আলোচনা হয়। মৌলানা সৌকত আলী ঐ সভায় বললেন যে মুসলমানদের পক্ষে এটি ধর্মের প্রশ্ন এবং তাঁদের কর্তব্য হবে যতদিন পর্য্যন্ত সিন্ধু প্রদেশের উলেমাদের ফতোয়া অনুযায়ী খিলাফৎ প্রশ্ন সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা না হবে ততদিন পর্য্যন্ত শাসনকার্য্যের সহিত সংশ্রব না রাখা।

গান্ধীজী সৌকত আলীকে সমর্থন করে বললেন যে যতদিন পর্য্যন্ত মার্শাল আইনের বলে যে সকল কর্মচারী দেশের লোকের উপর অত্যাচার করেছে তাদের শাস্তি না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কাউনসিলে কোন অংশ গ্রহণ না করা ভারতবাসীর পক্ষে আত্ম-সম্মান ও জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন।

এর পর মহাত্মাগান্ধী সৌকতআলী মহাদেবদেশাই দেবদাসগান্ধী ও আকবর আলীর সমভিব্যাহারে পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে প্রচার কার্য্যে বেরুলেন। পথে বড় বড় ষ্টেশনে তাঁদের অভ্যর্থনা করা হল।

(২)

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচনের জন্ত পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি লোকমান্ত তিলকের নাম সুপারিশ করে কিন্তু তিলক মহারাজ অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি লালা লাজপত রায়কে সভাপতি নির্বাচিত করল।

তিলকের অসুখ হওয়ার সংবাদে সকলের মনে আশঙ্কার ছায়াপাত হল। দেশের সর্বত্র তিলকের অসুখের সংবাদ জানার জন্ত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা উদ্গ্রীব হল। জানা গেল ক্রমশঃ তার অবস্থা খারাপের দিকে চলেছে।

অসুখের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সংবাদ পেয়ে মহাত্মা গান্ধী শ্রীমতী সরলা দেবী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মৌলানা সৌকতআলী, ছোটানী সাহেব এবং অন্তান্ত খিলাফত আন্দোলনের নেতারা বোম্বে গিয়ে তিলকের শয্যাপার্শ্বে 'সর্দার গৃহে' উপস্থিত হলেন।

২১ শে জুলাই (যেদিন লোকমান্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন) থেকে ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত দিন দিন তাঁর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল? কোন ফল হল না। অবশেষে ১লা আগষ্ট দিবা ১২-৪০ মিনিটের সময় দেশের একনিষ্ঠ সেবকের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটল।

ভারতবর্ষ তিলকের মত প্রগাঢ় বিদ্বান দেশ সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ আর কোন নেতা পায়নি। বৈদেশিক রাজশক্তির সহিত তিনি বরাবর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এসেছেন—কখনও নতি স্বীকার করেন নি। তিনি দেশের সেবায় তাঁর সমস্ত শক্তি ও সময় ব্যয় করেছেন।

কারাগারে আবদ্ধ হয়ে থাকার সময় ছাড়া তিনি কোন অবসর পাননি। যখনই কারাগারে বন্দী হয়েছেন তখনই তিনি গবেষণামূলক অতি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ রচনা করেছেন। Arctic home of the Vedas, The Orien প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্বজ্জন সমাজে সমাদর লাভ করেছে, তাঁর শেষ অবদান মান্দালয় জেলে রচিত 'গীতা রহস্ত।'

তিনি নির্লোভ ছিলেন। ক্ষমতা লাভের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। যখন তার ভ্যালেনটাইন চিরোলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা উপলক্ষে তিনি ইংলণ্ড যান তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে যদি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে তা হলে কি তিনি স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন। তদুত্তরে তিলক বলেছিলেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি পূর্বের ন্তায় বিত্তালয়ে অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপনা করবেন।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগনে তিনি সূর্য্যের

ন্যায় দীপ্যমান ছিলেন। ১৯২০ সালে ঐ আকাশে আর একটি সূর্যের উদয় হল। এক আকাশে দুজন সূর্য্যের স্থান নেই সেই জন্যই বোধহয় বিধাতা তাঁকে সরিয়ে নিলেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন একমাত্র লোকমান্য তিলক। তাঁর অভাবে গান্ধীজীর নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ করার কেউ রইল না।

তিলকের পরলোক গমনের সংবাদ দাবানলের ন্যায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেশের নেতারা ১ই আগষ্ট তাঁর জন্য শোক দিবস পালন করা স্থির করলেন। তদনুসারে ঐ তারিখে ভারতের সর্বত্র শোকসভা আহ্বান করে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করা হয়।

এদিকে দেশের কাজ সমভাবে চলতে লাগল। অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করে দেশের সর্বত্র সভা সমিতি হতে লাগল।

লালা লাজপত রায় সভাপতি মনোনীত হওয়ার পরই মডারেটদিগকে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে অনুরোধ করে একটি আবেদন প্রচার করলেন। তদুত্তরে মডারেট নেতা শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় জানালেন যে এই কংগ্রেসের বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হবে অসহযোগ আন্দোলন। এই অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করে বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে তা নিয়মানুগত করা। মেসার্স গান্ধী ও সৌকতআলী প্রকাশ্যেই বলেছেন যে তাঁরা বহু অনুচর সহ অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করতে কংগ্রেস যোগদান করবেন। সুতরাং অন্য কোন আলোচনাই সফল হবে না। মরুভূমিতে অবস্থিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁর কণ্ঠস্বর কারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে না।

(৩)

এই রকম পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয়। অধিবেশনের দিন ধার্য্য হয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর।

আমি রাজসাহী থেকে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হয়েছিলাম। যথারীতি রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক নির্বাচিত হয়ে বাংলার প্রতিনিধি স্বরূপ কংগ্রেসে যোগদান করে ছিলাম। ৪ঠা সেপ্টেম্বরের ২।৩ দিনের পূর্বে কলকাতায় পৌঁছি। এবার রাজসাহী থেকে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

নির্বাচিত সভাপতি লালা লাজপত রায় পাঞ্জাবের নেতৃবৃন্দ সহ হাওড়া ষ্টেশনে প্রাতঃকালে পৌঁছলেন। স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে সভাপতি মহাশয় ও তাঁর সহযাত্রীদের আনার জন্য লিলুয়ায় গিয়েছিলেন। ঐ স্পেশাল ট্রেন প্রাতঃকাল ৮॥ টার সময় হাওড়া ষ্টেশানে পৌছিল। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য বহু সদস্যসহ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্ল্যাটফরমে উপস্থিত ছিলেন। অসংখ্য নাগরিকও প্ল্যাটফরমে ভীড় করে দাঁড়িয়ে ছিল।

সভাপতি মহাশয় প্ল্যাটফরমে নামতেই চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে পুষ্পমাল্যে শোভিত করলেন। তারপর তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে নয়টি,—অশ্ববাহিত একটি 'ল্যাণ্ডো' গাড়ীতে চড়ান হল। সভাপতির পার্শ্বে শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী আসন গ্রহণ করলেন, তারপর বিরাট শোভাযাত্রাসহ তাঁকে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হল। শোভাযাত্রা হাওড়া ষ্টেশন থেকে হ্যারিসন রোড ধরে বরাবর পূর্ব দিকে কলেজ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত গিয়ে দক্ষিণ মুখী হয়ে কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট ক্যামাক ষ্ট্রীট ধরে—থিয়েটার রোডের দিকে গিয়েছিল। হ্যারিসন রোড (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) ও কলেজ ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থল থেকে হাওড়া ব্রিজ পর্য্যন্ত সমস্ত হ্যারিসন রোড কাগজ নির্মিত পতাকায় শোভিত হয়েছিল। চিৎপুর রোডের সংযোগস্থলে জালীয়ানওয়ালাবাগ তোরণ নির্মিত হয়েছিল। হ্যালিডে ষ্ট্রীট (বর্তমানে চিত্তরঞ্জন

অ্যাভেনিউয়ের মুখিকগত) ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগ স্থলেও দুটি গেট নির্মিত হয়েছিল। বৃহৎ বৃহৎ পতাকা টাঙান হয়েছিল। সেগুলিতে "স্বরাজ" "স্বায়ত্বশাসন আমাদের জন্মগত অধিকার", "নেশান দেশের লোকের দ্বারাই গঠিত হয়," "স্বাধীনতা অর্জন কর নচেৎ মৃত্যু বরণ কর" "জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মরণে রেখ" "স্বাধীনতার সংগ্রাম সবে সুরু হয়েছে" "ঐক্যই শক্তি" প্রভৃতি 'মটো' লিখিত ছিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্য এই সকল অলঙ্করণের অনেকটা ক্ষতি হয়েছিল। শোভাযাত্রার সঙ্গে বহু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যোগ দিয়েছিল। কলকাতা প্রবাসী গুজরাতীরা একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেছিল। ঐ বাহিনী ভারতমাতার একটি প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি এবং পুষ্পমাল্যে শোভিত লোকমান্য তিলকের প্রতিকৃতি শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। একদল অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবক গঠিত হয়েছিল। তাদের কাপ্তেন ছিলেন ব্যারিষ্টার শ্রী বি সি চ্যাটার্জি (বিজয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সুরেন্দ্রনাথের জামাতা)। অশ্বারোহীদের অন্যতম অধিনায়ক শ্রীযোশীর কথা মনে পড়ছে। তিনি গাড়ওয়ালের লোক ছিলেন। তাঁর পুরো নামটি স্মরণপথে আসছে না তাঁর সুগঠিত ও বলদৃপ্ত চেহারা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই অশ্বারোহী বাহিনীও শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিল।

পথিমধ্যে সভাপতির মস্তকোপরি বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারি মহিলারা পুষ্প বর্ষণ করছিলেন।

শোভাযাত্রা কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থল থেকে দক্ষিণ দিকে কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট (অধুনা নির্মল চন্দ্র চন্দ্র স্ট্রীট) ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট (অধুনা রফিআহমেদ কিদোয়াই ষ্ট্রীট) ক্যামাক স্ট্রীট হয়ে থিয়েটার রোডের (অধুনা সেক্সপীয়ার সরণী) দিকে অগ্রসর হল। ওয়েলেসলি স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট ও ক্যামাক স্ট্রীটের ভিতর দিয়ে যখন শোভাযাত্রা অগ্রসর হচ্ছিল তখন তা দেখার জন্য ঐ সকল রাস্তায় দুপার্শ্বের গৃহের অলিন্দে বহু য়ুরোপীয় নরনারী সমবেত হয়েছিল। ক্রমে শোভাযাত্রা থিয়েটার রোডে উপনীত হয়ে সভাপতির জন্য নির্দিষ্ট ৩৮নং ভবনের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কেঁপে ওঠা ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দারের বাড়ী) সম্মুখে দাঁড়াল। তখন বেলা ১১॥টা। সেখানে তাকে অভ্যর্থনা করার জন্যও বহু নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

গন্তব্যস্থলে পৌছে সভাপতি মহাশয় হিন্দীতে অভিভাষণ দিয়ে বললেন যে তিনি আসবার সময় পথে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর প্রতি এইরূপ সম্মান প্রদর্শনে অভিভূত হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে স্বরাজ অর্জন না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ আন্দোলন বন্ধ করবে না। ভারতের সেবাকার্য্যে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান অথবা শিখের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরিশেষে তিনি স্বেচ্ছাসেবকগণকে এবং অন্যান্য যাঁরা তাঁর জন্য ও দেশের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ দিলেন।

ক্রমশঃ

চায়ের রং

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

কিছুকাল হ'লো বাংলা-বিহারের প্রত্যন্ত প্রদেশে নূতন কাজ নিয়ে আস্তে হ'য়েছে।

না-সহর, না-পল্লী।

সুবিধা রয়েছে সব কিছুরই। কোর্ট-কাছারী, পুলিশ থানা, ছেলেমেয়েদের দুটো হাইস্কুল, সরকারী ছোট হাঁসপাতাল, হাট বাজার।

বাসাটা পেলাম ভদ্রপাড়াতেই। এবং অল্প ভাড়ায়।

দুজনের সংসারে চারখানা ঘর প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলেই মনে হয়। তবু ভালই হ'লো।

সুলতাও তাই চায়। ভালমত সাজিয়ে গুছিয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে থাকা। অতিথি-কুটুম্ব এলে তাদেরও দু'রাত্তির থাকার সুবিধা দিতে হবে অন্ততঃ।

নূতন সংসারের কাজকর্ম এমন বেশী কিছু নয়। তবু মানুষ রাখ্‌তে হ'লো একটি।

অন্ততঃ শ্রেণীর একটি স্ত্রীলোক। বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। মুখে অসংখ্য বলিরেখার মধ্যে ক্ষুদ্র চক্ষু দু'টি জলজল্ করছে। দেহটা সাম্‌নের দিক ঝুকে পড়া। ক্ষীণ শীর্ণ দেহে দারিদ্রের প্রকোপ স্পষ্ট।......

স্ত্রীলোকটিকে আমার অফিস দারোয়ানই ঠিক করে দিয়েছে।

নাম বলেছে 'সর্‌বতিয়া'।

দুদিনের কাজকর্মে সরবতিয়ার পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু সর্বত্রই অপটুত্বের ছাপ।

বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠলো সুলতার মুখে। ..

লক্ষ্য করলুম আমি।

স্ত্রীলোকটিকে দেখার পর থেকেই কেমন একটা দুর্বলতা অনুভব করছিলাম।

একটা অস্পষ্ট মমতাবোধ।

সুলতাকে জানিয়ে দিলুম যে, বুড়ীকে বেশী কাজের চাপ না দেওয়াই ভাল।

ধীরে ধীরে বুড়ী সর্‌বতিয়ার সব জানা গেল।

'...একমাত্র ছেলে প্রায় আট-দশ বছর ঘর ছাড়া।

তখন ছিল সতেরো আঠারো বছরের জোয়ান।

ঘরামীর কাজ আর লোকের মোট বয়ে যাসে যা উপায় করেছে 'গাজুরাম', তাতে দুজনের পেট ভালই চলে গেছে।

কোথাকার এক চা-বাগানের ঠিকাদার এলো গাঁয়ে একদিন,...আশা আর লোভের 'দিল্লীকা লাড্ডু' দেখালে দেহাতীদের, তখনই অনেকের মত সর্‌বতিয়ারও কপাল ভাংলো।

মায়ের বুক খালি করে দিয়ে গাজুরাম-ও একদিন অনেকের সঙ্গে গাঁ ছেড়ে চলে গেল ঠিকাদারের সঙ্গে।...

আর এত বছরের মধ্যেও ফিরে আসার সুযোগ পায়নি গাজুরাম।

আর পাবে ও না হয়তো।

কারণ, সংবাদ পেয়েছে সর্‌বতিয়া, ওখানে এক দেহাতী মেয়ে বিয়ে করে সুখের ঘর করছে তার ছেলে।

তবু আশা ছাড়েনি সরবতিয়া। একদিন ছেলে বৌ নিয়ে গাজুরাম গাঁয়ে ফিরবেই। এবং তখনই

মায়ের বুকের অতৃপ্ত স্নেহ ও বাসনাকে সে এসে পূরণ করবে।...

সরবতিয়ার আসল গাঁ ছিল এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূর—নয়ানপুরে।

যাতায়াতের কষ্ট হবে বলে তাকে বাসাতেই থাকতে দিতে হয়েছে। বাইরের ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো ভাবে সে শুতো।

ছোট একটি ভাঙাটিনের বাক্সে তার জীবনের ধন লুকিয়ে রেখে দিত হেঁসেলের এক কুলুঙ্গিতে।

মাসে দু'বার সে টুক্‌টুক্‌ করে গাঁয়ে যেত ঘর-দোর দেখে আসতে। কিন্তু দু'দিনের বেশী থাকতো না।

তার এমনি ছুটি সুলতাই মঞ্জুর করেছে।

এমনি করে কয়েক মাস কাটলো।

সেবার বুড়ী গাঁয়ে গিয়ে তিন-চার দিনের মধ্যেও ফিরলো না দেখে আমরা উভয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লুম।

তখন শীতটা পড়ি পড়ি করছে। এই সময়টা নাকি চারিদিকেই অসুখ বিসুখ বড় লাগে।

ধরেই রাখলুম যে বুড়ীর কোন একটা কিছু ঘটেছে, নইলে এমন হবার কথা নয়।

সুলতাই বললে: 'কালত...তোমার ছুটির দিন, যাওনা একবার গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো না বুড়ীর ..'

'তাই যাব ভাবছি। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি,... বেটির কোথায় আস্তানা...', আমৃতা আমৃতা করলুম।

'এত দিনের পুরানো লোক, অনেকেই হয় তো চিনবে।...একটু খোঁজ করলেই পাবে,'—সুলতা উপদেশ দিলে।

পরদিন বিকেলে সত্যই এক সাইকেলে চেপে বুড়ীর গাঁ—নয়ানপুরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম।

গাঁ-খানা বড়ই।

ভাগ্যভাল যে দু'একজনের কাছে জিজ্ঞেস করতে বুড়ীর ঘরের হদিশ বলে দিলে।

গাঁয়ের বাইরে এক পাহাড়ী ছোট টিলার নীচে একই ধরণের অনেকগুলো খোপড়ী। তার মধ্যে কোথায় বুড়ী সরবতিয়ার ঘর,...কাজেই আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতে হলো।

ঘরটি নির্দেশে দেখিয়ে দিয়ে সে যা বললে তাতে কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হতবাক্‌ হয়ে রইলাম।

"সংবাদ এসেছে, বুড়ীর ছেলেটি মারা গেছে। কোথায় আসামের এক চা-বাগানের বড়বাবুর কাছ থেকে চিঠি এসেছে নাকি।

'কারণ' জিজ্ঞেস করতে অস্পষ্টভাবে সে যা বললে, তা হচ্ছে, বাগানে ধর্মঘট চলছিল। ধর্মঘটিদের মধ্যে বুড়ির ছেলেও একজন। এরা 'প্রোসেশন' বের করেছিল একটি। পুলিস বাধা দিতে সংঘর্ষ বাঁধে। শেষে পুলিসের গুলিতেই নাকি প্রাণ হারায় বুড়ীর ছেলে গাঙ্গুরাম।'

প্রকৃতস্থ হতে সময় লাগলো।

কিন্তু ঠিক এ-সময় কী সান্ত্বনা দেব বুড়ীকে গিয়ে, ভেবে পাই না।

সহসা কয়েকদিন আগের দৈনিকে একটা খবরের কথা মনে পড়লো। কোন চা-বাগানের কুলিকামিনদের সঙ্গে পুলিসের বড় এক সংঘর্ষের কথাই যেন পড়েছিলাম যাতে কিছু সংখ্যক কুলি হতাহত হয়েছিল।...সাময়িক ভাবে লালরক্তে ভেসে গিয়েছিল বাগানের ঘন সবুজ আস্তরণ।...

তবে কি বুড়ীর ছেলে গাঙ্গুরাম দৈনিক লিখিত চা-বাগানের ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল?

অসম্ভব নয়।

অবশেষে, সান্ত্বনাই দিয়ে এলাম বুড়ী সরবতিয়াকে।

কিন্তু সে সান্ত্বনা অব্যক্ত ব্যথা কাতর স্নেহনিষিক্ত সরবতিয়ার মাতৃহৃদয়ে প্রবেশ করলো কিনা, আমার মত অনাত্মীয় পক্ষে বোঝার উপায় ছিল না।

ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফিরলাম।

সুলতা বললে: খোঁজ পেলে বুড়ীর?

হ্যাঁ। সংবাদ এসেছে, বুড়ীর ছেলেটা মারা গেছে নাকি।

'মারা গেছে'? সুলতার কণ্ঠে বিস্ময় ও বেদনা একসঙ্গে: 'কি করে গো'?

যা শুনে এসেছি তাই বলতে হোলো সুলতাকে।

সুলতাও নির্বাক হয়ে গেল।...

সন্ধ্যা লেগে গিয়েছিল।

আলোটা জেলে দিয়ে সুলতা বিমর্ষভাবে ভেতরে চলে গেল।

যাতায়াতে পরিশ্রান্ত আর পিপাসার্ত হয়ে উঠেছিলাম। এ-সময় একটা কিছু পানীয় হলে মন্দ হোতো না।...

একটু পরেই ফিরে এলো সুলতা।

একহাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ, অন্যহাতে কিছু খাবার।

জয় হোক সুলতার।

বুঝলে গো, তোমার আহ্লাদের পুষিঠাকরুণ সবটুকু দুধ দুপুরে চেটেপুটে খেয়ে গেছে। আজ তোমার চা-য়ে দুধ শূন্য। বলে চায়ের কাপ ও খাবারের থালা পাশের টিপয়ের উপর নামিয়ে রাখলো সুলতা। ...বাঃ, খুব ভাল' বলে চায়ের কাপ আগে হাতে নিলাম। কিন্তু কাপে চুমুক দিতে গিয়ে চায়ের রঙ্ দেখে চমকে উঠলাম।

কি অদ্ভুত রঙ্!

মনে হ'লো, সমস্ত চায়ের রঙটাই যেন গাঙুরামের খুনে ভরা। অন্যায়ের প্রতিবাদে চ-বাগানের অত্যাচারিত প্রতিটি কুলিকামিনের তাজা রক্তের স্পর্শ গোটা চায়ের রঙে। কাপটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে রেখে শুধু খাবারের প্লেটটা তুলে নিলাম নিঃশব্দে,—সুলতা কিছু বুঝতেও পারলে না।

রাখাল ও রাজকুমারী

বিমলজ্যোতি দাস

(এগার)

সহরের অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির কথা গোকুল পত্রযোগে পত্নী ও শ্বশুরকে জানাল। যথাসময়ে উভয় পত্রের উত্তর এল। অরুন্ধতী লিখেছে—এক রকম ভালই ত হয়েছে—বেশ কিছুদিন নির্ঝঞ্ঝাটে একলা থাকতে পারবে। তবে খুব সাবধানে থেকো—মোটে বাড়ির বার হবে না। সুরেশবাবু লিখেছেন—এ রকম অবস্থায় অরুন্ধতীদের ওখানে নিয়ে যাওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়। ওখানকার আবহাওয়া শান্ত ও স্বাভাবিক হলে বেশ কিছুদিন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তারপর ওদের নিয়ে যেয়ো।

গোকুলরা ত সশস্ত্র দারোয়ানদের দ্বারা সুরক্ষিত না হলেও কতকটা রক্ষিত হয়ে বাস করতে লাগল, কিন্তু আশপাশের হিন্দুদের পক্ষে আপনাপন গৃহে বসবাস করা দু-চার দিনের মধ্যেই অসম্ভব হয়ে উঠল। কোন কোন পাড়ায় গুণ্ডারা দল বেঁধে রাত্রে, এমন কি প্রকাশ্য দিবালোকেও, অপর সম্প্রদায়ের দোকান-পসার লুট করেছে এরকম সংবাদ পাওয়া যেতে লাগল। শুনে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, এবং দাবানলগ্রস্ত অটবী থেকে পশুরা যেমন প্রাণভয়ে দিগ্বিদিকে পালিয়ে যায়, পাড়ার হিন্দু অধিবাসীরাও সেই রকম আত্মরক্ষার জন্য যে যেখানে পারল জিনিসপত্র ও পরিবারবর্গ নিয়ে চলে গেল। কিন্তু সকলের ত ও রকম যাবার জায়গা নেই। তারা কি করবে? গোকুলের বাসার খুব নিকটেই বড় রাস্তার উপর নিবারণ বলে এক ব্যক্তির মাঝারি রকমের মুদিখানার দোকান আছে। দোকানের জিনিসপত্র এত দ্রুত স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়, বিশেষতঃ গত কয়েকদিনের হাঙ্গামার ফলে পথে যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। অনন্যোপায় নিবারণ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা উপায় আবিষ্কার করল। গোকুলদের ষ্টাফ কলোনির মধ্যে প্রবেশ করে সামনে যাকে পেল তারই কাছে মাথা গোঁজবার একটু আশ্রয় প্রার্থনা করল। কিন্তু সকলেরই গৃহ আত্মীয়-স্বজন পুত্রকন্যায় পরিপূর্ণ। কে তাকে জায়গা দেবে? অবশেষে একজন বলল—একাউণ্টেণ্ট গোকুলবাবুকে ধর। তাঁর বাড়িখানা বড় এবং খালিদ পড়ে আছে, তাঁর পরিবার এখানে নেই; তিনি যদি দয়া করেন ত—

মজ্জমান ব্যক্তি যে ভাবে তৃণ অবলম্বন করতে চায়, বিপদ সাগরে ভাসমান নিবারণ সেইভাবে প্রস্তাবটিকে আঁকড়ে ধরল। কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল—কোনটা একাউণ্টেন বাবুর বাসা?

ভদ্রলোক বাসা দেখিয়ে দিলে নিবারণ সেইদিকে ধাবিত হল। তখন সকাল আটটা। গোকুল বাইরের ঘরে বসে বই পড়ছিল, প্রৌঢ় নিবারণ ছুটে এসে একেবারে তার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল—বাবু, আমারে বাচান! মলাম, ধনে পেরাণে মলাম!

হতচকিত গোকুল বলে উঠল—আরে করেন কি! আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ লোক, পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? কি হয়েছে আপনার?

অশ্রুবিকৃত স্বরে নিবারণ বলল—আমার সব প্রায়

গা বাবু, সব যায়। গুণ্ডারা আমাগো বেবাকেরে মাইর‍্যা ফেলাইব।

অনেক কষ্টে তাকে প্রবোধ দিয়ে গোকুল তার বিপদের বৃত্তান্ত অবগত হল। একটি পরিবারের ধন-প্রাণ এবং স্ত্রীলোকের ধর্ম পর্যন্ত যখন বিপন্ন, তখন কেমন করে একে প্রত্যাখ্যান করবে? একবার ভাবল, বাড়ি ত তার নিজের নয়, কোম্পানীর। যদি কোম্পানীর তরফ থেকে আইনসঙ্গত আপত্তির কোন কারণ থাকে? আবার ভাবল দূর হোক, ওসব সূক্ষ্ম কথা ভাববার সময় এখন নয়। আর তাছাড়া মানুষের সুবিধার জন্যই আইন, আইনের জন্য মানুষ নয়। সে ত কোনও অন্যায় কাজ করছে না, বিশেষতঃ আতুরে নিয়মো নাস্তি। সুতরাং সম্মতি দিল। পুলকিত নিবারণ জিজ্ঞাসা করল—অকরারে (একেবারে) মালপত্র সব লইয়া আসুম বাবু?

পুনরায় পুস্তকে মনোনিবেশ করে গোকুল বলল—আচ্ছা।

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে নিবারণ অন্তর্হিত হল।

মালপত্র বলতে গোকুল মনে করেছিল তাদের, ব্যবহারের জিনিষপত্র। কিন্তু ঘন্টাখানেক পরে যখন সেগুলি এসে উপস্থিত হল তখন তাদের বহর দেখে গোকুলের চক্ষু চড়কগাছ হল। দুই গাড়ি বোঝাই মুদিখানার দোকানের মাল, তার ওপর ছেলে-বুড়ো নিয়ে মোট আটজন নর-নারী এবং তাদের সংসার বলতে যা-কিছু বোঝায়, সবই। বিস্মিত হয়ে দলের অন্তবর্তী নিবারণকে বলল—করেছেন কি? এযে এক জাহাজ মাল।

হাতজোড় করে ছলছল নেত্রে নিবারণ বলল—করুম কি কর্তা? আমার cz সব যায়। মাইয়া পোলা লইয়া ভাসে—বলে পুনরায় কান্নায় ভেঙে পড়বার উপক্রম করল। বেগতিক দেখে গোকুল বলল—আচ্ছা আচ্ছা, এনে ফেলেছেন যখন তখন আর কি হবে? তবে সব একধারে গুছিয়ে রেখে দিন।

আশ্বস্ত হয়ে নিবারণ বলল—আইচ্ছা, হে আমারে কওন লাগব না বাবু। মালপত্র আমি উঠানেই রাখুম, আপনার গরজ (ঘরে) লমু না। cz উপকার আমাগো করলেন—ইত্যাদি।

গোপাল এতক্ষণ ননীদের বাড়িতে ছিল। গোকুলর গাড়ি বোঝাই মাল এবং পিছনে কএকজন লোক তাদের বাসার দিকে যাচ্ছে এটা সে ননীদের বৈঠকখানার জানলা দিয়ে দেখতে পেল। ননীও দেখল। সঙ্গে সঙ্গে হাতের তাস ফেলে দিয়ে বলল—ব্যাপার কিরে গুপাল? চল, দেখ্যাহি (দেখে আসি)।

দুজনে বেরিয়ে গোপালদের বাড়ীতে এল। ননী বলল—তামসা দেখছ গুপাল? মালের গাদি তোগো বাসার সামনে খাড়াইছে (দাঁড়িয়েছে)। চল কাকাবাবুরে জিগাই কি ব্যাপার? গোকুলকে ননী কাকাবাবু বলে ডাকে, কেননা তার বাবার সহকর্মী।

সজলচক্ষু নিবারণকে গোকুল যেই মালপত্র ঢোকাবার অনুমতি দিয়েছে, অমনি গোপাল ও ননী তার সামনে এসে দাঁড়াল। গোপাল জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার দাদা?

গোকুল তাকে সব বুঝিয়ে দিল। গোপাল বলল—কিন্তু মাল যে অনেক দাদা।

গোকুল—কি আর করা যায় বল। মালগুলো আর কোথায় যাবে? লোকটাকে যখন জায়গা দেওয়া হল, মালগুলোকে তখন জায়গা দিতে হবে।

ননী স্বভাবতঃ একটু কৌতুকপ্রিয়। সে হেসে বলল—ভালই করছেন কাকাবাবু। নিবারণ যতদিন এখানে থাকব, ততদিন সস্তায় আপনাগো সওদা দিব। কি কও নিবারণ?

নিবারণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল—হে আর আমারে কওন লাগব না।

গোকুল ও গোপাল হাসল।

(বার)

নিবারণ সপরিবারে কলোনিতে আশ্রয় পেয়েছে শুনে গোকুলের কাছে আবেদনের পর আবেদন আসতে

লাগল। এদের সকলেরই অবস্থা নিবারণের মত। সে যদি বাবুর দয়ায় ঠাঁই পেয়ে থাকে, তবে তারাই কি শুধু বাবুর চরণের ধূলা থেকে বঞ্চিত হবে? তাদেরও ত মাতা-ভগিনী আছে, সেই মাতা ভগিনীদের সম্মান কি বিধর্মীর করস্পর্শে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে? শুধু যদি তাদের প্রাণ যেত, তাতে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বাবু নিজে হিন্দু হয়ে কি চোখের ওপর এতগুলি হিন্দু নারীর নির্যাতন—

ব্যস্, আর বলতে হল না। গোকুলের কোমল হৃদয় এতেই বিগলিত হল। এতগুলি লোক আজ তার কাছে আশ্রয়প্রার্থী। বাল্যকালে পিতৃহীন হয়ে সে নিজে একদিন আশ্রয়ের জন্য এখানে ওখানে সন্ধান করেছিল, সেই কথা স্মরণ হল। জগদীশ্বর কখন যে কাকে কি অবস্থায় রাখেন বলা যায় না। সেদিনের নিরাশ্রয় গোকুল আজ এতগুলি লোকের আশ্রয়দাতা। এ কথা ভাবতেও তার বুকখানা আনন্দে ভরে উঠল এবং সে মনে মনে ভগবানকে প্রণাম জানিয়ে তার গৃহদ্বার বিপন্নের, শরণাগতের জন্য খুলেদিল।

খাল কেটে দিলে বন্যাস্ফীত নদীর জল যেমন কল্‌কল্ করে মাঠে প্রবেশ করে, গোকুলের মুখ থেকে ঢালা সম্মতি পাবামাত্র সেইভাবে দাঙ্গাভীত নরনারীর দল কোলাহল শব্দে তার বাসায় এসে সমবেত হতে লাগল। তিন দিনের মধ্যে দেড়শতাধিক মানুষে তার গৃহ ও অঙ্গন পরিপূর্ণ হয়ে তিলধারণের স্থান রইল না। তৃতীয় দিন বিকালে অফিস থেকে ফিরে বাড়ির অবস্থা দেখে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার স্মরণ হল কোন্ একটা উপকথায় শুনেছে এক বাদশা বলেছিলেন তাঁর রাজপ্রসাদ প্রাসাদ নয়, সরাইখানা মাত্র। কথাটা যে কতদূর সত্য তা গোকুল আজ যেমন করে উপলব্ধি করল, পূর্বে কোনদিন এমন করেনি। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করে সে যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হল। লোকগুলি সংখ্যায় বহু হলেও নিজেদের মধ্যে যেন একটা বোঝাপড়া করে ফেলেছে, এবং এক একটি পরিবার প্রশস্ত অঙ্গনের এক এক অংশে আপনাপন অস্থায়ী সংসার যতদূর সম্ভব ছোটর উপর বেশ গুছিয়ে পেতেছে এবং পরস্পর পরস্পরের যত কম অসুবিধা করে পারা যায় সেদিকে দৃষ্টি রেখেছে। উঠানেই প্রায় আট দশটা উনুন পড়েছে, এছাড়া বারান্দার দুই কোনে দুটো, একটা ছোট কাঠ রাখবার ঘরে দুটো, এবং রান্নাঘর ও কলতলার মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে দুটো। যারা এসেছে তাদের অধিকাংশই ছোট ছোট দোকানদার, কাজেই তাদের সঙ্গে সঙ্গে দোকানের জিনিষপত্রও এসে হাজির হয়েছে। চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, তৈল, লবণ, ঘৃত, মিষ্টান্নের দোকানের বাসনপত্র, কাপড়ের দোকানের কয়েক পুঁটুলি কাপড়, গামছার দোকানের বাণ্ডিল বাণ্ডিল গামছা, মায় একগাদা কড়া, হাতা, খুন্তি, কুলো, ধুচনী ও ঝাঁটার কাঠি পর্যন্ত সবই আছে। ঘি, চিনি, বস্ত্র প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান সামগ্রীগুলিতে গোকুলের বৈঠকখানা প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে, আর অন্যান্য দ্রব্যগুলি উঠানের মধ্যেই একতলার সমান উঁচু উঁচু স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

রাত্রে শয়নের বন্দোবস্তও অভিনব। গোকুলের বাসায় মোট তিনখানি ঘর। তার মধ্যে বৈঠকখানাটিতে গোকুলরা দুই ভাই বিছানা পেতেছে। এবং বাকি দুখানি ঘর অভ্যাগতদের ছেড়ে দিয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে স্ত্রীলোক ও শিশুরা এই দুটি কক্ষে শয়নের অধিকার পেয়েছে। প্রত্যেক ঘরে রাত্রে দুই সারি করে লোককে শুতে হয়, নতুবা স্থান সঙ্কুলান হয় না। পুরুষদের শোবার ব্যবস্থা রান্নাঘরে ও উঠানে। যাদের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল তারা চওড়া বারান্দায় নিজ নিজ মশারি খাটিয়ে নিদ্রা যায়, এবং অবশিষ্টরা কেউ মশারির মধ্যে কেউ বা খোলা আকাশের নিচেই মনুষ্যদেহের এই আবশ্যিক নৈশ বিশ্রামের কাজটা সেরে নেয়। তাতে বারান্দা এবং উঠান দুই-ই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাত্রে কলতলায় যাবার প্রয়োজন হলে গোকুলকে খুব সন্তর্পণে পা বাড়াতে হয়, একটু অন্যমনস্ক হলেই লোকের গায়ে পা ঠেকবে। একদিন রাত্রি

কত হবে বলা যায় না, গোকুল কলতলায় যাবার জন্য উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশে কৃষ্ণাষ্টমীর অর্ধচন্দ্র। তার আবছায়া আলোয় মুক্তধার দুই কক্ষের অভ্যন্তর এবং বারন্দা ও অঙ্গনের দৃশ্য দেখে গোকুল কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চারিদিকে সারি সারি মশারি, তার কোনকোনটার ভিতর থেকে বৃহৎ নাসিকাগর্জন আসছে। সংসার চক্রে পিষ্ট উপক্রত গৃহ থেকে উৎখাত ব্যক্তিগুলি কিছুক্ষণের জন্য শান্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। চেয়ে থাকতে থাকতে গোকুলের মনে হল মশারিগুলি যেন সব তাঁবু, এবং ইতস্ততঃ শয়ান লোকগুলি যেন রণক্লান্ত সৈনিকশ্রেণী। সারাদিনের জীবন-সংগ্রামে পরিশ্রান্ত হয়ে পুনর্বার সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিচ্ছে। গোকুলের গৃহ যেন গৃহ নয়, বিশাল একটি রণক্ষেত্রের স্কন্ধাবার।

(তের)

তারপর পনের দিন অতিবাহিত হয়েছে। ইতিমধ্যে পাঁচ ছটি পরিবার সুযোগ সুবিধা করে অন্যত্র উঠে গেছে। কাজেই প্রাথমিক ঠাসাঠাসির সে ভাবটা এখন আর নেই। এখন প্রত্যূষে পায়খানার সামনে ও আটটা বাজলেই স্নানঘরের পাশে অপেক্ষমান দীর্ঘ পংক্তি মনে হতাশার সঞ্চার করে না। তবে এতগুলি লোক যে সকলেই পরস্পর প্রেমানন্দে গলাগলি হয়ে বাস করছে তাও নয়। ছোট-খাট বচসা কলহ প্রভৃতি লেগেই আছে এবং মাঝে মাঝে গুরুতর আকার ধারণ করবার উপক্রম করে। তখন ওদেরই মধ্যে কেউ মাতব্বর রূপে অথবা গোকুল বাড়ি থাকলে সে-ই অভিভাবক-রূপে বিসম্বাদ মিটিয়ে দেয়। নিবারণরা এখনও আছে। সে এ বাড়িতে প্রথম এসেছিল বলে কতকটা সর্দারির ভাব নিয়ে অপরের সঙ্গে কথা বলে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কনিষ্ঠদের উপর মাতব্বরি করে থাকে মাতৃগর্ভে প্রথম আসার অধিকারে, তার প্রভুত্বও যেন কতকটা সেই রকম। এ যুক্তে বলেও বটে, এবং বয়সেও নিবারণ অন্য সকলের চেয়ে বড় বলেও বটে, সবাই তার মুরুব্বিয়ানা স্বীকার করে নিয়েছে।

এদের সকলের সঙ্গে মোটামুটি রকম পরিচয় হলেও একটি পরিবারের সঙ্গে গোকুলদের কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। নিবারণরা যেদিন আসে, এরা এসেছে তার পরদিন। আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল না হলেও এরা ভদ্রশ্রেণীর। গৃহকর্তার নাম রমেন, বয়স গোকুলেরই মত—পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। সংসারে তার ভাই ভবেন, ডাক নাম চুনী, স্ত্রী উমা, ভগিনী সরযু এবং একটি শিশুকন্যা। চুনীর বয়স ষোল-সতের, উমার আঠার এবং সরযুর তের। সরযুর বুদ্ধি কিঞ্চিৎ স্থূল এবং বাকযন্ত্রে কিছু ত্রুটি আছে, গলার আওয়াজ মধ্যে মাঝে ভাল বেরয় না, একটু আড়ষ্ট বলে মনে হয়। অষ্টাদশী উমা একহারা, ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী, পীবরবক্ষা। রং তার ময়লা এবং চেহারা নিতান্ত সাধারণ। সৌন্দর্যের দরবারে প্রবেশ করবার তার যদি কোন ছাড়পত্র থাকে, তবে সে হল তার দুটি আয়ত চক্ষু, যা দৃষ্টিপাতমাত্রেই মৃগনয়নের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রমেনরা দুইভাই নানাবিধ মাল-সরবরাহের কাজ করে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে, একখানি চাদর-তোয়ালে গামছার ক্ষুদ্রায়তন দোকানও আছে। অবশ্য দোকানটি সম্প্রতি গোকুলদের বাড়ীতে উঠে এসেছে। রমেন লোকটি মোটামুটি সাদাসিধা, তবে কথা একটু বেশি বলে এবং যথেষ্ট বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন। এখানে আশ্রিত হিসাবে এসে যখন দেখল যে এত লোকের মধ্যে থাকা এবং খাওয়ার যথেষ্ট অসুবিধা, তখন বুদ্ধিকরে এক চাল চালল। দুটি দিন কষ্টের মধ্যে কাটিয়ে তৃতীয় দিনে গোকুলের ঘরে এসে বলল—বাবু, একটা কথা কমু যদি অনুমতি করেন।

গোকুল জিজ্ঞাসা করল—কি?

রমেন—দুই দিন দেখতে আছি আপনাগো খাওনের অসুবিধা। ঐ বেটা সাকুনী পাকের কি জানে? বেটা কোনকালে পাক করছে নি? ওর আতে খাওন দেইখ্যা আমাগো মনে কষ্ট ওইতে আছে। আমার পরিবারে কয় বাবুরে কও আমাগো লগে খাইতে। আমি পাকশাক

খাল যানি না। কিন্তু ঐ মানুষটার আত্তে খাওন আমাগো পছন্দ অয় না। তাই কইতে আছিলাম কি যদি হুকুম করেন ত এক লগে পাকশাক ওইব।

দ্বিধাভরে গোকুল বলল—কিন্তু তোমাদের অসুবিধা হবে যে। আর তা ছাড়া চাল ডাল তরকারি এসব—

কথা শেষ হবার আগেই মাথায় অল্প ঘোমটা দিয়ে উমা প্রবেশ করল এবং নত হয়ে গোকুলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। ব্যস্ত সমস্তভাবে গোকুল বলে উঠল —আরে না না, এসব কেন!

উমা ততক্ষণে প্রনাম সেরে উঠে দাঁড়িয়েছে। স্মিতহাস্তে শুভ্র দশনপংক্তি ঈষৎ বিকশিত করে বলল— চাউল ডাইলের লাগি আপনি চিন্তা করবেন না বাবু! আপনের দয়ায় আমাগো জীবনটা যে বাচছে এই আমাগো বাইগ্য। আপনের যা খুসি দিবেন, না ইচ্ছা না দিবেন।

গোকুল—কিন্তু আপনাদের—

বাধা দিয়ে রমেন বলে উঠল—আমাগো আর আপনে কইবেন না বাবু। আমি আপনার ছোট বাইর মত। আমাগো নাম দইর‍্যা ডাকবেন। যাও গো, পাকশাক চড়াইয়া দাও, বাবুর আপিস আছে না?

অগত্যা গোকুলকে এই প্রস্তাবে রাজি হতে হল। এই দেড়মাস সজনীর একঘেয়ে রান্না খেয়ে কতকটা অরুচি ধরে গিয়েছিল। গোপালও এতে খুব খুশী হল। আর সজনী রন্ধনশালার পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে মহানন্দে বাবুর প্রতিনিধি হিসাবে আশ্রিতদের খবরদারি করে বেড়াতে লাগল।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। দাঙ্গার অবস্থা এখনও ভয়াবহ। খুন আজকাল আর বিশেষ হচ্ছে না, কারণ মানুষ একলা বড় একটা রাস্তায় বার হয় না। তবে মাঝে মাঝে কোন কোন অঞ্চলে দুর্বৃত্তদের দ্বারা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একদিকের আকাশে কৃষ্ণবর্ণ ধূম্ররাশি ফুলে ফুলে উঠছে দেখা যায়। নরহত্যার সুযোগে বঞ্চিত হয়ে পিশাচরা গৃহদাহের নেশায় মেতেছে। সেদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয় ওগুলো বুঝি ধোঁওয়া নয়, সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয়ের হিংসা ও নিষ্ঠুরতা ধোঁয়ার রূপ ধরে আকাশ বাতাস অন্ধকার করে ফেলছে।

বাজার-হাট অল্পস্বল্প চলছে, কারণ সম্প্রতি রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারিরা লরীতে করে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। লোকে দলবদ্ধ হয়ে সকাল নটা থেকে এগারটার মধ্যে বাজারে গিয়ে আবশ্যক জিনিষপত্র কিনে আনছে, সঙ্গে সঙ্গে দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে শহরের হাজার হাজার অধিবাসী কোনমতে জীবন ধারণ করে আছে।

সেদিন রবিবার। সকালে ক্লাবে খানিকক্ষণ সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগুজব করে গোকুল বাসায় এল। উঠানে এসে দেখল সকলেই আপনাপন চুলার কাছে রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত। নিবারণ ও তার স্ত্রী প্রচুর মাংস কেটে থালায় রেখেছে, এবং সেটাকে ঘিরে তার ছেলেমেয়েরা বসে রয়েছে। মাংসের রং লাল দেখে গোকুলের কৌতূহল হল। নিবারণকে জিজ্ঞাসা করল— ও কিসে মাংস?

নিবারণ বলল—আইগ্যা আসের।

আস্ বস্তুটি কি গোকুল বুঝতে পারল না। তাই প্রশ্ন করল—কিসের মাংস বললে?

এবার অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করে নিবারণ বলল— আসের। আস্ জানেন ত?

মাথা নেড়ে গোকুল বলল—বুঝলাম না।

ঘোমটার ভিতর থেকে নিবারণের পত্নী স্বামীকে বলল—বালামতে বুঝাইয়া দাও।

নিবারণ গলা বেড়ে উচ্চৈঃস্বরে বলল—আস্ —আঁস্।

এবার গোকুল বুঝতে পেরে বলল—ও হাঁস?

একগাল হেসে নিবারণ উত্তর দিল—আইগ্যা হ, ধরছেন ঠিক। খাইবেন মাংস?

গোকুল—না।

নিবারণ—আইগ্যা লন্ না, অল্প দুগা!

গোকুল সম্মত হল না। হাঁসের মাংস সে কখনও

কত হবে বলা যায় না, গোকুল কলতলায় যাবার জন্য উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশে কৃষ্ণাষ্টমীর অর্ধচন্দ্র। তার আবছায়া আলোয় মুক্তদ্বার দুই কক্ষের অভ্যন্তর এবং বারান্দা ও অঙ্গনের দৃশ্য দেখে গোকুল কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চারিদিকে সারি সারি মশারি, তার কোনকোনটার ভিতর থেকে বৃহৎ নাসিকাগর্জন আসছে। সংসার চক্রে পিষ্ট উপক্রত গৃহ থেকে উৎখাত ব্যক্তিগুলি কিছুক্ষণের জন্য শান্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। চেয়ে থাকতে থাকতে গোকুলের মনে হল মশারিগুলি যেন সব তাঁবু, এবং ইতস্ততঃ শয়ান লোকগুলি যেন রণক্লান্ত সৈনিকশ্রেণী। সারাদিনের জীবন-সংগ্রামে পরিশ্রান্ত হয়ে পুনর্বার সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিচ্ছে। গোকুলের গৃহ যেন গৃহ নয়, বিশাল একটি রণক্ষেত্রের স্কন্ধাবার।

(তের)

তারপর পনের দিন অতিবাহিত হয়েছে। ইতিমধ্যে পাঁচ ছটি পরিবার সুযোগ সুবিধা করে অন্যত্র উঠে গেছে। কাজেই প্রাথমিক ঠাসাঠাসির সে ভাবটা এখন আর নেই। এখন প্রত্যুষে পায়খানার সামনে ও আটটা বাজলেই স্নানঘরের পাশে অপেক্ষমান দীর্ঘ পংক্তি মনে হতাশার সঞ্চার করে না। তবে এতগুলি লোক যে সকলেই পরস্পর প্রেমানন্দে গলাগলি হয়ে বাস করছে তাও নয়। ছোট-খাট বচসা কলহ প্রভৃতি লেগেই আছে এবং মাঝে মাঝে গুরুতর আকার ধারণ করবার উপক্রম করে। তখন ওদেরই মধ্যে কেউ মাতব্বর রূপে অথবা গোকুল বাড়ি থাকলে সে-ই অভিভাবক-রূপে বিসম্বাদ মিটিয়ে দেয়। নিবারণরা এখনও আছে। সে এ বাড়িতে প্রথম এসেছিল বলে কতকটা সর্দারির ভাব নিয়ে অপরের সঙ্গে কথা বলে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কনিষ্ঠদের উপর মাতব্বরি করে থাকে মাতৃগর্ভে প্রথম আসার অধিকারে, তার প্রভুত্বও যেন কতকটা সেই রকম। এ হিসাবে বলেও বটে, এবং বয়সেও নিবারণ অন্য সকলের চেয়ে বড় বলেও বটে, সবাই তার মুরুব্বিয়ানা স্বীকার করে নিয়েছে।

এদের সকলের সঙ্গে মোটামুটি রকম পরিচয় হলেও একটি পরিবারের সঙ্গে গোকুলদের কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। নিবারণরা যেদিন আসে, এরা এসেছে তার পরদিন। আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল না হলেও এরা ভদ্রশ্রেণীর। গৃহকর্তার নাম রমেন, বয়স গোকুলেরই মত—পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। সংসারে তার ভাই ভবেন, ডাক নাম চুনী, স্ত্রী উমা, ভগিনী সরযূ এবং একটি শিশুকন্যা। চুনীর বয়স ষোল-সতের, উমার আঠার এবং সরযূর তের। সরযূর বুদ্ধি কিঞ্চিৎ স্থূল এবং বাকযন্ত্রের কিছু ত্রুটি আছে, গলার আওয়াজ মধ্যে মাঝে ভাল বেরয় না, একটু আড়ষ্ট বলে মনে হয়। অষ্টাদশী উমা একহারা, ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী, পীবরবক্ষা। রং তার ময়লা এবং চেহারা নিতান্ত সাধারণ। সৌন্দর্যের দরবারে প্রবেশ করবার তার যদি কোন ছাড়পত্র থাকে, তবে সে হল তার দুটি আয়ত চক্ষু, যা দৃষ্টিপাতমাত্রেই মৃগনয়নের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রমেনরা দুইভাই নানাবিধ মাল-সরবরাহের কাজ করে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে, একখানি চাদর-তোয়ালে গামছার ক্ষুদ্রায়তন দোকানও আছে। অবশ্য দোকানটি সম্প্রতি গোকুলদের বাড়ীতে উঠে এসেছে। রমেন লোকটি মোটামুটি সাদাসিধা, তবে কথা একটু বেশি বলে এবং যথেষ্ট বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন। এখানে আশ্রিত হিসাবে এসে যখন দেখল যে এত লোকের মধ্যে থাকা এবং খাওয়ার যথেষ্ট অসুবিধা, তখন বুদ্ধিকরে এক চাল চালল। দুটি দিন কষ্টের মধ্যে কাটিয়ে তৃতীয় দিনে গোকুলের ঘরে এসে বলল—বাবু, একটা কথা কমু যদি অনুমতি করেন।

গোকুল জিজ্ঞাসা করল—কি?

রমেন—দুই দিন দেখতে আছি আপনাগো খাওনের অসুবিধা। ঐ বেটা সটুনী পাকের কি জানে? বেটা কোনকালে পাক করছে নি? ওর আতে খাওন দেইখ্যা আমাগো মনে কষ্ট ওইতে আছে। আমার পরিবারে কয় বাবুরে কও আমাগো লগে খাইতে। আমি পাকশাক

খাল জানি না। কিন্তু ঐ মানুষটার আতে খাওন আমাগো পছন্দ অয় না। তাই কইতে আইছিলাম কি যদি হুকুম করেন ত এক লগে পাকশাক ওইব।

দ্বিধাভরে গোকুল বলল—কিন্তু তোমাদের অসুবিধা হবে যে। আর তা ছাড়া চাল ডাল তরকারি এসব—

কথা শেষ হবার আগেই মাথায় অল্প ঘোমটা দিয়ে উমা প্রবেশ করল এবং নত হয়ে গোকুলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। ব্যস্ত সমস্তভাবে গোকুল বলে উঠল—আরে না না, এসব কেন!

উমা ততক্ষণে প্রনাম সেরে উঠে দাঁড়িয়েছে। স্মিতহাস্যে শুভ্র দশনপংক্তি ঈষৎ বিকশিত করে বলল—চাউল ডাইলের লাগি আপনি চিন্তা করবেন না বাবু! আপনের দয়ায় আমাগো জীবনটা যে বাচছে এই আমাগো বাইগ্য। আপনের যা খুসি দিবেন, না ইচ্ছা না দিবেন।

গোকুল—কিন্তু আপনাদের—

বাধা দিয়ে রমেন বলে উঠল—আমাগো আর আপনে কইবেন না বাবু! আমি আপনার ছোট বাইর মত। আমাগো নাম দইর‍্যা ডাকবেন। যাও গো, পাকশাক চড়াইয়া দাও, বাবুর আপিস আছে না?

অগত্যা গোকুলকে এই প্রস্তাবে রাজি হতে হল। এই দেড়মাস সজনীর একঘেয়ে রান্না খেয়ে কতকটা অরুচি ধরে গিয়েছিল। গোপালও এতে খুব খুশী হল। আর সজনী রন্ধনশালার পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে মহানন্দে বাবুর প্রতিনিধি হিসাবে আশ্রিতদের খবরদারি করে বেড়াতে লাগল।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। দাঙ্গার অবস্থা এখনও ভয়াবহ। খুন আজকাল আর বিশেষ হচ্ছে না, কারণ মানুষ একলা বড় একটা রাস্তায় বার হয় না। তবে মাঝে মাঝে কোন কোন অঞ্চলে দুর্বৃত্তদের দ্বারা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একদিকের আকাশে কৃষ্ণবর্ণ ধূম্ররাশি দুলে দুলে উঠছে দেখা যায়। নরহত্যার সুযোগে বঞ্চিত হয়ে পিশাচরা গৃহদাহের নেশায় মেতেছে। সেদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয় ওগুলো বুঝি ধোঁওয়া নয়, সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয়ের হিংসা ও নিষ্ঠুরতা ধোঁয়ার রূপ ধরে আকাশ বাতাস অন্ধকার করে ফেলছে।

বাজার-হাট অল্পস্বল্প চলছে, কারণ সম্প্রতি রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারিরা লরীতে করে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। লোকে দলবদ্ধ হয়ে সকাল নটা থেকে এগারটার মধ্যে বাজারে গিয়ে আবশ্যক জিনিষপত্র কিনে আনছে, সঙ্গে সঙ্গে দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে শহরের হাজার হাজার অধিবাসী কোনমতে জীবন ধারণ করে আছে।

সেদিন রবিবার। সকালে ক্লাবে খানিকক্ষণ সহকর্মীদের সঙ্গে গল্পগুজব করে গোকুল বাসায় এল। উঠানে এসে দেখল সকলেই আপনাপন চুলার কাছে রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত। নিবারণ ও তার স্ত্রী প্রচুর মাংস কেটে থালায় রেখেছে, এবং সেটাকে ঘিরে তার ছেলেমেয়েরা বসে রয়েছে। মাংসের রং লাল দেখে গোকুলের কৌতূহল হল। নিবারণকে জিজ্ঞাসা করল—ও কিসে মাংস?

নিবারণ বলল—আইগ্যা আসের।

আস্ বস্তুটি কি গোকুল বুঝতে পারল না। তাই প্রশ্ন করল—কিসের মাংস বললে?

এবার অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করে নিবারণ বলল—আসের। আস্ জানেন ত?

মাথা নেড়ে গোকুল বলল—বুঝলাম না।

ঘোমটার ভিতর থেকে নিবারণের পত্নী স্বামীকে বলল—বালামতে বুঝাইয়া দাও।

নিবারণ গলা ঝেড়ে উচ্চৈঃস্বরে বলল—আস্—আস্!

এবার গোকুল বুঝতে পেরে বলল—ও হাঁস?

একগাল হেসে নিবারণ উত্তর দিল—আইগ্যা হ, ধরছেন ঠিক। খাইবেন মাংস?

গোকুল—না।

নিবারণ—আইগ্যা লন্ না, অল্প দুগা!

গোকুল সম্মত হল না। হাঁসের মাংস সে কখনও

খায় নি। তাই আজ নিবারণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে তার প্রবৃত্তি হল না। বলল—আমি হাঁসের মাংস কখনও খাই নি, তাই নিচ্ছি না। তোমরা খাও। —বলে সেখান থেকে চলে এল।

উমা তাদের দুই ভাইকে খুব যত্ন করে খাওয়ায়। প্রথম দিন ভাত ধরে দিয়ে হেসে বলেছিল—কালো মানুষের আতে খাইতে আপকার কষ্ট ওইব না ত?

অন্নের গ্রাস মুখে পুরে গোকুল জবাব দিয়েছিল—কি যে বল। কষ্ট হবে কেন? আর তা ছাড়া আমিও ত কালো।

—হান্‌ তা'র হানিনা। —বলে উমা পাখা নিয়ে মাছি তাড়াতে বসল।

প্রত্যহ মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সে পাখা নিয়ে বসে। যদি কোনদিন কন্যাকে স্তন্যদান করতে ব্যস্ত থাকে তা হলে ননদকে ডেকে বলে—এই সরযূ কি কর? বাবুগো একটু পাখা করবার পার না?

শুনে সরযূ এসে জিজ্ঞাসা করে—মাছি খ্যাদায়ু বাবু?

তার কথা শুনে গোপাল হেসে বলে—খ্যাদায়ু কি দাদা? তাড়ানোকে বুঝি খ্যাদানো বলে এ দেশে।

গোকুল উত্তর দেয়, হ্যাঁ।

নিজের ভাষার ত্রুটি সরযূ বুঝতে পারে। তাই আবার কোনদিন প্রয়োজন সে জিজ্ঞাসা করে—মাছি তাবায়ু?

গোপাল উত্তর দেয়—হ্যাঁ, খ্যাদাও।

কৃত্রিম কোপে মুখ ঘুরিয়ে সরযূ বলে—হান্‌, ছোটবাবু হেন কি।

(চোদ্দ)

যেদিন দাঙ্গা সুরু হয় তার পরদিন থেকেই গোপালদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল। এতদিন তাদের আড্ডা বসত বিকালের দিকে স্কুল থেকে ফেরবার পর। এখন কিন্তু আড্ডার সময় প্রায়ই মধ্যাহ্ন থেকে সুরু করে সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্যন্ত সুদূরবিস্তৃত। গোকুলদের বাসায় এই বৈঠকটি বসবার তেমন সুবিধা না থাকাতে ননীদের বৈঠকখানায় অনুকূল পরিবেশের মধ্যে অধিবেশন হয়, কারণ ননীদের বাসা কতকটা হরিঘোষের গোয়ালের মত। বৃদ্ধ বৃন্দাবনবাবু অফিস থেকে এসে জলযোগ সেরেই ক্লাবের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন, এবং তাঁর স্ত্রী কচিকাচাদের চ্যাঁ-ভ্যাঁ ও সংসারের কাজকর্ম নিয়ে উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকায় বাহির্বাটিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করতে পারেন না। ইতিমধ্যে দাঙ্গার হপ্তাখানেক আগে চট্টগ্রাম থেকে বৃন্দাবনের জেষ্ঠ্যা কন্যা নন্দা তার পতি ও শিশুপুত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। তারাও প্রায়ই সঙ্গদান করে মজলিসটির শোভা ও রসালাপ বর্ধন করে।

একদিন দুপুরের পর ননীরা যথারীতি তাস খেলায় বসেছে। ননী ও গোপাল এক পার্টি এবং কলোনির অপর দুটি ছেলে অন্য পার্টি। ননীর ভগিনীপতি সলিল তার পিছনে বসে এবং নন্দা গোপালের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, এমন সময় কালো লম্বা একটি লোক ঘরে ঢুকে ননীকে জিজ্ঞাসা করল—হইষ্কট (পোষ্ট কার্ড) আছে?

ননী হস্তধৃত তাসের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে চাল ভাবছিল। জিজ্ঞাসা করল - ক্যান?

লোকটি বলল—মায়ে চাইছে আছে।

ঘরে পোষ্টকার্ড ছিল, কিন্তু পাছে আছে বললে উঠে গিয়ে এনে দিতে হয় এই ভয়ে ননী অম্লানবদনে বলল - নাইত।

লোকটি চলে গেলে গোপাল জিজ্ঞাসা করল—ওটা কে রে হুইয়্যা?—ননীকে বাড়ীর সকলে ঐ নামে ডাকে বলে গোপালও ওটা অভ্যাস করেছে। ননী জবাব দিল—মুল্যাবাবুর চাকর, নতুন আইছে।

নামটা ঠিক বুঝতে না পেরে গোপাল জিজ্ঞাসা করল—বিল্যা বাবু কে রে?

বিরক্ত হয়ে ননী বলল—আঃ। বিল্যানা, মুল্যা বাবু। জান না, অমূল্যধন কাল (পাল) ঐ দিকে বাসায় আছে?

এবার বুঝতে পেরে গোপাল বললবাব্বাঃ!—কে বুঝবে বল? অমূল্য হল মূল্যা, যেমন ননী হল মুইন্যা! বলিহারি তোদের ভাষা। বা বা বাঃ, বাহবা!

খেলায় বিঘ্ন হচ্ছে দেখে ননী চটে গিয়ে বলল—নে নে কাzলামো রাখ, খেলবার বইছs খেল—ফ্যাল তাস। তোগো বাবা (ভাষা) খুব বান, ওইছে?

—তাত ভালই!—বলে গোপাল তাস ফেলল। খেলা চলতে লাগল।

এখানে আসবার আগে গোপাল তাস খেলা জানত না। এদের পাল্লায় পড়ে শিখেছে, এরাই শিখিয়ে নিয়েছে। এখনও হাত ভাল পাকে নি, তাই খেলতে খেলতে একবার ভুল তাস দিয়ে ফেলল। আর যাবে কোথায়? ননী অমনি সোরগোল করে উঠল। তাদের প্রতিপক্ষের একটি ছেলে গোপালকে লক্ষ্য করে বলল—হেইটা বোদাই (বোকা)!

গোপাল এ কথা সহ্য করবে কেন? সে বলল—তুই বোদাই।

ননী তৎক্ষণাৎ মধ্যস্থ হয়ে বলল—নে নে কাইজ্যা (কাজিয়া অর্থাৎ ঝগড়া) রাখ। z। ওইবার ওইয়া গেছে। শুকাল এবার কিন্তু সাবধান!—আবার খেলা চলতে লাগল।

সন্ধ্যা নাগাদ খেলা ভাঙল। প্রতিপক্ষ ছেলে দুটি উঠে চলে গেল। ননী গোপালকে বলল—একটা কথা বুইল্যা গেছি। আz রাত্র তর আমাগো বাসায় নিমন্ত্রণ।

গোপাল—তাই নাকি? হঠাৎ?

ননী—কুন খালাসী বাবারে একটা মুরগা পাঠাইয়া দিছে।

কুক্কুটমাংসের প্রস্তাবে উৎফুল্ল হয়ে গোপাল বলল—বাঃ! সঙ্গে আর কি?

ননী—আবার কি?

সলিল গোপালকে জিজ্ঞেস করল—রাত্র আপনে কি খান? বাত?

এই চট্টগ্রামবাসী জীবটিকে নিয়ে গোপাল মধ্যে মধ্যে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ে না। বিশেষতঃ সে যখন ননীর ভগিনীপতি। তাই বলল—বাত? বাত মানে ত রিউম্যাটিজম্! না মশাই ও সব আমরা খাই না।

সলিল—আরে, আমি কি হেই কথা বলছি? বা—

বাধা দিয়ে ননী বলে উঠল—রাখ, খুব বুঝছে। শুকালের লগে তুমি কথায় পারবা না।

এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে নন্দার পুত্র কৃষ্ণ লাফাতে লাফাতে এল। গোপাল তাকে জিজ্ঞাসা করল—এই খোকা, তোদের বাড়ি কৈ?

কৃষ্ণ জবাব দিল—sোট্টগাম।

গোপাল—তাহলে তুই sাটিগার বুত (ভূত)?

ছেলেটি চটাটে ও বুদ্ধিমান। সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিল—ইঃ! আপনে sাটিগার বুত! বলেই ভিতরে ছুটে পালিয়ে গেল। সবাই হেসে উঠল। ননী বলল—তা কথা z। কইছs ঠিকই শুকাল! sাটিগার বুতই বটে! বাপরে! মানষে এত মরিচ (লঙ্কা) খাইবার পারে? আমরা ত তোগো চেয়ে অনেক বেশী মরিচ খাই, ওরা খায় আমাগো আট গুণ। গেছs কখনো sাটিগায়?

গোপাল—না, সে সুযোগ হয়নি।

ননী—শোন তবে। দিদির বিয়ার পর আমি গিছিলাম দুইবার। প্রথমবার গিয়া বাত খাইবার বইছি, দেখি cz পুঁঠি মাছ আর আলু দিয়া তরকারি বানাইছে। ব্যস czইক গ্রাস উঠাইয়া মুখে দিছি, গালটা যেন এ পুইড়্যা গেল। zামাই আমার পাশেই বইয়াছিল। ফিগয়ে কি ওইছে। zালের sুটে (চোটে) আমি তখন কথা কইবার পারি না। ফিগায়, zাল ওইছে? আমি মাথা নাইড়্যা কইলাম, হ। zামাই এক গ্রাস তরকারি খাইয়া কইল—কই zাল ওইছে? এ ত মিষ্ট লাগে। তুমি খাই দেখ্যা আমি অল্প মরিচ দিবার কইছিলাম। শুইন্যা আমি আইস্যা বাছি না। কইলাম—তোমাগো খুরে নমস্কার। এর নাম মিষ্ট ওইছে! বুইঝ্যা দেখ শুকাল! তারপর আরো আছে। আzoব ব্যাপার ঐ

গাটিগা। ওখানে মাইয়্যা লোক উকা (হুঁকা) খায়।

গোপাল বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ। শোন তাহলে একটা মজার কথা বলি। জানিসত রায়টের সময় থেকে আমাদের বাড়িতে অনেক লোক এসে আছে। যেদিন বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল, সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি আর দাদা বৈঠকখানায় বিছানার উপর বসে আছি। ভিতরের একখানা ঘর থেকে ফড়ফড় করে হুঁকোয় তামাক খাওয়ার আওয়াজ আসতে লাগল। দাদা বলল—গোপাল, কে তামাক খায় দেখত। ভেতরের ঘর দুখানায় ত মেয়েরা আর শিশুরা থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, তবে ওখানে এখন হুঁকো টানছে কে? আমি উঠে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি একটা বুড়ী বসে তামাক টানছে। আমি ত অবাক। বারান্দায় যারা ছিল তাদের জিজ্ঞাসা করলাম—মেয়েছেলে তামাক খাচ্ছে কি রকম?

ওরা বললে, বাবু ওদের বাড়ি নোয়াখালি। নোয়াখালি আর চাটগাঁয় মেয়েরাও তামাক খায়।

ননী বলল—তারপর শোন। আরও মজা আছে। ওদেশের লোক গাছের উপর উইঠ্যা পায়খানা করে।—বলে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। গোপালও সে হাসিতে যোগ দিল।

সলিল প্রতিবাদ করে বলল—হে আমরা না, নোয়াখালির মানষে।

ননী—হ, নোয়াখালির মানষে! তোমরাও মশায়! শুধু যদি না তোমাগো দ্যাশে গিয়া থাকতাম, দেখতাম সব!

অগত্যা সলিলকে চুপ করতে হল। একটু পরে সন্ধ্যা এসে গোপালকে বলল—গোপালদা! মা কইছে আজ রাত্রে আপনি এখানে খাইবেন।

ননী—হে আমি আগেই কইয়া থুইছি।

সন্ধ্যা বলল—ভুলিয়া যাইবেন না। আপনের যা ভুলা মন।

গোপাল বলল—কি রকম?

সন্ধ্যা—ক্যান, হে দিন যে গায়ের নিমন্ত্রণের কথা ভুলিয়া গিছিলেন।

গোপাল বলল—বাবাঃ, এতও তোমার মনে থাকে!

ননী—সন্ধ্যার কাছে চালাকি চলব না।

পূর্ববঙ্গের ভাষা নকল করে গোপাল বলল—যা কইছ! কি কও হনদা?

বাড়ির সকলে সন্ধ্যাকে সন্ধা উচ্চারণ করে বলে গোপাল মাঝে মাঝে মাত্রা আরও একটু বাড়িয়ে ঠাট্টা করে ডাকে 'হনদা'। এতে সন্ধ্যা বিস্তর আপত্তি জানিয়েও ফল পায় নি। তাই শেষে প্রতিশোধের পন্থা আবিষ্কার করেছে। গোপালের কথার উত্তরে বলল—শুকাল।

তবে রে!—বলে গোপাল উঠে সন্ধ্যাকে তাড়া করল।

ওমা! বলে চীৎকার করে উটে বেণী দুলিয়ে সন্ধ্যা বাড়ির ভিতর ছুটে পালাল। সকলেই হাসল।

গোপাল বলল—আচ্ছা ননী, এখন তাহলে চলি। ঠিক সময়ে আসব। বাড়িতে আবার আমার চাল নিতে বারণ করতে হবে।—বলে বেরিয়ে গেল।

[পনের]

পূর্ব্বেই বলেছি রমেন লোকটি প্রখর বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন। কিন্তু তার সরল ভালমানুষের মত মুখখানি দেখে এ কথা কিছুতেই বোঝবার উপায় নেই। অথচ ভিতর এবং বাইরের এই অসামঞ্জস্য তার ব্যবসার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সে যখন মুখ গম্ভীর করে বলে—বাবু, গামছাখান বেইচ্যা আমার দুইটা পয়সা থাকব, হেই দুইটা পয়সা আপনার কাছে চাইয়া লইতে আছি—তখন অত্যন্ত ঘাগী খরিদ্দারও কল্পনা করতে পারে না যে ঐ গামছাখানিতে রমেনের কমপক্ষে ছ'পয়সা লাভ রয়ে গেছে। কথামালায় যে মেষচর্ম্মাবৃত ভল্লুক উপাখ্যান আছে, তা বোধ করি এইরকম লোকের চরিত্রকে বোঝাবার জন্যই চিত্রিত হয়েছিল।

অচিন্তনীয় নিষ্ঠুর পরিস্থিতির তাগিদে আকস্মিক ভাবে রমেনরা যে গোকুলের গৃহে আশ্রয় পেয়েছে, এই ব্যাপারটাকে রমেন অনেক ভেবে-চিন্তে একটা মূলধনরূপে ব্যবহার করতে মনস্থ করল। ইতিমধ্যে আরও একমাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। যে সব দাঙ্গাভীত নরনারী বন্যার জলপ্রবাহের মত হুড় হুড় করে গোকুলের আঙিনায় প্রবেশ করেছিল, তাদের প্রায় সকলেই এই দু'মাসের মধ্যে একে একে নিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন আর গোকুলের বাসায় পূর্ব্বের সে কলরোল নেই, তবে বন্যার জল সদ্য নিষ্কাশিত হবার পর মাঠের দিকে চাইলে যেমন তার প্রাক্তন অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, উঠানের চার পাশে আশ্রিতদের ব্যবহৃত চুল্লীগুলি ভস্মাবলেপের মধ্যে সেইরকম তাদের স্মৃতি ধরে রেখেছে। দু'টি পরিবার কেবল আজও রয়ে গেছে। একটি হচ্ছে রমেনরা, আর একটি হচ্ছে উপেন ও বিপিন এই দুই ভাই। তাদের ক্ষুদ্র পানবিড়ির দোকানের চালাঘরটি দাঙ্গায় একেবারে ভস্মীভূত হওয়ায় তারা আপাততঃ অপর একজনের দোকানের একাংশে বসে বেচাকেনা চালাচ্ছে। ইচ্ছা আছে, শীঘ্রই একটি চালা বেঁধে সেখানে উঠে যাবে। যতদিন সে কাজ সম্পূর্ণ না হচ্ছে ততদিন এখানে থাকবার জন্য গোকুলের অনুমতি চেয়েছিল। বলা বাহুল্য গোকুল আপত্তি করেনি। দুই ভাই-ই প্রৌঢ়, তার ওপর অতি শান্ত প্রকৃতির। তারা গোকুলের ছোট্ট কাঠ রাখবার ঘরখানি অধিকার করে আছে; সেখানেই নিজেদের ক্ষুদ্র কারবারের জিনিসপত্র রাখে, এবং রাত্রে এসে শোয়। দিনের বেলা তাদের দেখতেই পাওয়া যায় না। যে দোকানের একাংশে বেচাকেনা করে সেখানেই দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ফুটিয়ে খেয়ে নেয়। তারা বাড়িতে আছে বলে যেন বোঝাই যায় না। তবে মাঝে মাঝে এক এক দিন দুপুরের দিকে এসে গোকুলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে যায়।

রমেনরা এখানে বেশ সুখেই আছে। চতুর রমেন বাগ্‌বিস্তার ও বিনয়ের আতিশয্য প্রকাশ করে ভালমানুষ গোকুলের কাছে যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকবার ঢালা হুকুম আদায় করে নিয়েছে। কলোনির অপর কোন বাবু যদি কখনও তাকে না যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তখনি সে রাজ্যের চিন্তায় মুখখানা কালো ও কুঞ্চিত করে উত্তর দেয় —বাসার লাগি ত রোজই বিছড়াইতে আছি বাবু। বাসা ত পাই না। কত মানুষে দাঙ্গার মধ্যে ছে পলাইয়া গেছে, তার ইসাব নাই। খালি বাড়ি কয়খান পইর‍্যা আছে, কিন্তু মালিকের দেখা না পাইলে বারা (ভাড়া) লয় কার কাছে কন্‌। আমি চেষ্টায় (চেষ্টায়) আছি, বাসা পাইলেই উইঠ্যা যামু। বাবুর (গোকুলের) কষ্ট ওইতে আছে আমি বুঝি না? আর শুধা বাবুর ক্যান্‌, আপনাগোও ত!— বলে অনুতপ্ত ম্লান দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে চায়। এরকম প্রতি-প্রশ্নের জন্য প্রশ্নকর্তা প্রস্তুত না থাকায় একটু নরম হয়ে জবাব দেয়—না না, আমাদের আর কি অসুবিধা? তা ছাড়া গোকুলবাবুর বাসায় ত মেয়েলোক কেউ নাই, শুধু নিজেরা দুই বাই (ভাই)। তা থাকেন আপনি।

ব্যস্‌, রমেনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। বিজয়ের উল্লাস ভিতরে গোপন রেখে চক্ষে ছল ছল ভাব এনে বলল—কন্‌ বাবু! আপনারা বদ্দলোক, আমার মত গরিব অনাথার দুঃখ আপনারা না বুঝলে বুঝব কি রামা-শ্যামা? কথায় বলে, বাল মানুষের আত্তা-কুরও বাল। তাই ত পইর‍্যা আছি আপনাগো চরণের তলে।

ভদ্রলোক আর থাকতে না পেরে—আচ্ছা, বেশ বেশ, থাকেন—বলে পিছন ফিরে নিজের কাজে চলে যায়। তার গমন-পথের দিকে চেয়ে রমেন মনে মনে, বুঝি বা প্রকাশ্যেও, ঈষৎ হাসে। গত দুই মাসে বাড়ি-ভাড়া বাবদ পনের বিশুণে ত্রিশ টাকা বেঁচে গেছে। কলোনির 'গোলা' লোকগুলাকে একটু তালিম দিয়ে বাড়ি না পাওয়ার অজুহাতে

আরও দু তিন মাস যদি এখানে থেকে যেতে পারে, ত আরও ত্রিশ-চল্লিশ টাকা বাঁচবে। এও একপ্রকার ব্যবসা।

ইতিমধ্যে রমেনদের কারবার পূর্ব্বের গতিবেগ প্রাপ্ত হয়েছে। আজকাল তার জন্য রমেন ও চুনীকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। কোন কোন সপ্তাহে উপর্যুপরি দু-তিন দিন তারা অনুপস্থিত থাকে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে দুই পরিবারের বাজার-হাট গোকুল করিয়ে দেয়। বিনিময়ে রমেন গোকুলদের দুভাই-এর চাল-ডাল সরবরাহ করে। সরযূ পাড়ার বাবুদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে এবং প্রায়ই রোরুদ্যমানা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে কোলে নিয়ে কলোনির গৃহ থেকে গৃহান্তরে ঘুরে খেলা করে বেড়ায়। গোপালদের স্কুল খুলেছে এবং পাড়ার ছেলেমেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে সেখানে যাতায়াত সুরু করেছে। সজনীদের গ্রামের অদূরেই দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে বলে, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্য সে দুমাসের ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে।

এই পারিস্থিতির কল্যাণে গোকুল ও উমা পরস্পরের অত্যন্ত নিকটে এসে পড়েছে। এই স্নিগ্ধ-স্বভাবা শ্যামাঙ্গী পল্লীবধূটির হৃদয় আসন্ন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে প্রথম হতেই গোকুলের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়েছিল। তার উপর গোকুলদের খাওয়া-দাওয়া ও তত্ত্বাবধানের ভার ক্রমশঃ একা তারই হাতে এসে পড়াতে সে যেন অন্তরের কৃতজ্ঞতা বাইরে প্রকাশ করবার সুযোগ পেল, এবং তার নারীসুলভ সমস্ত শক্তি ও নিপুণতা সংগ্রহ করে এদের, বিশেষ করে গোকুলের, সেবায় লেগে গেল। এটাকে কর্ত্তব্য জ্ঞান করে এই কার্যে সে ক্রমশঃ এমনি তন্ময় হয়ে পড়ল যে, দৃষ্টি তার গোকুলের চরণ থেকে কখন যে হৃদয়ের দিকে উঠে এসেছিল, তা সে অনুভব করতে পারে নি। যেদিন প্রথম পারল, সেদিন যে শুধু বিস্মিতই হল তা নয়, লজ্জায় তার মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত কিংশুক গুচ্ছের মত আরক্ত হয়ে উঠল।

সেদিন অপরাহ্ণে গোকুলের অফিস থেকে ফিরতে বিলম্ব হতে লাগল। অফিসটা বাসা থেকে খানিকটা দূরে, বুড়িগঙ্গার ধারে। প্রত্যহের মত আজও জলখাবার গুছিয়ে উমা গোকুলের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, গোকুল এল না। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হয়ে গেল, অধীর আগ্রহে উমা বাড়িময় ছটফট করে বেড়াল, কিন্তু গোকুলের দেখা নেই। কাউকে পাঠিয়ে যে সংবাদ নেবে সে উপায়ও নেই। রমেনরা দুইভাই আজ সকালে খাওয়া-দাওয়া করে নারায়ণগঞ্জ গেছে, পরশু ফিরবে। গোপালও নারায়ণগঞ্জ বেড়াবার জন্য দাদার অনুমতি নিয়ে তাদের সঙ্গে গেছে। এই আড়াই মাসের মধ্যে উমা প্রতিবেশিনী বধূদের কারও সঙ্গে সঙ্কোচ-বশতঃ আলাপ করতে পারে নি, কাজেই এখন কারও কাছ থেকে সংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আবার সরযূটা সেই যে বিকাল থেকে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে পাড়া বেড়াতে গিয়েছে, তারও ফেরবার নাম নেই। ক্রোধে ও উৎকণ্ঠায় উমা চঞ্চল হয়ে উঠল। খাবারটা ঢাকা দিয়ে রেখে রাত্রের আহারের যোগাড় করছে, এমন সময় উঠানে পদশব্দ শুনে চকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কে?

মৃদু শঙ্কিত কণ্ঠে জবাব এল—আমি বৌদি!

উমা জ্বলে উঠল—আমি! এতক্ষণ কই আছিলি বাদ্‌রী (বাঁদরী)? সেই কখন খুকীরে লইয়া বাইর হইছ্‌, ফিরবার নাম নাই। কোন্ চুলায় গিছিলি?

ভ্রাতৃজায়ার রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখে সরযূ প্রমাদ গনল, কিন্তু এর হেতু বুঝতে পারল না। সে ত প্রত্যহ দু বেলাই খুকীকে নিয়ে বেরোয়, তাতে বৌদি কোনদিন আপত্তি ত করেই নি, বরং শিশুকন্যার উৎপাত থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি পেয়ে খুশি-ই হয়েছে। তবে আজ? অবশ্য অন্যদিনের চেয়ে আজ বাড়ি

ফিরতে একটু বেশি দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু সে ত আর সরযূ ইচ্ছা করে করে নি। অনুকূলবাবুর বাড়িতে একজন শাড়িওয়ালা শাড়ি বিক্রি করতে এসেছিল। তাঁর পরিবারের মেয়েরা শাড়ী দেখে দেখে পছন্দ করে কিনছিল। সরযূ বসে দেখছিল। অতগুলি মূল্যবান রেশমী বস্ত্রের চাকচিক্যে তার লুব্ধ চোখ ঝলসে গিয়েছিল এবং ওরই মধ্যে কমদামী একখানি শাড়ীর জন্য বৌদির কাছে আব্দার করবার বাসনাও মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারছিল। কিন্তু বাড়ি ঢুকেই উমার কাছে যে স্বাগত সম্ভাষণ পেল, তাতে সে বাসনা মরীচিকার মত অন্তর্ধান করল। ঢোক গিলে বৌদির প্রশ্নের উত্তরে বলল—আমি ত—অনুকূলবাবুর—

বাধা দিয়ে উমা চেঁচিয়ে উঠল—চুপ থাক। আবার রা কাড়তে আছে।

অর্দ্ধসমাপ্ত কথা মুখে রেখে সরযূ হাঁ করে চেয়ে রইল। ইচ্ছা হল ক্রোধের হেতুটা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সাহস পেল না। উমা পুনশ্চ বলল—ধিঙ্গী মাইয়া, একটা কামের মধ্যে নাই, খালি পাড়ায় পাড়ায় গুরণ। ওদিকে একটা মানুষ যে আইল না, তার খবর রাখস?

অনুপস্থিত ব্যক্তিটি সম্ভবতঃ রমেন হবে অনুমান করে কোমলস্বরে সরযূ বলল—কেডা বৌদি? দাদা?

আর যায় কোথা! জলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। উমা ভেঙচে বলল—দাদা! বলদ কোথাকার! দাদা ত নারাণগঞ্জ গেছে।

এইবার সরযূর স্থূল মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ বুদ্ধির উদয় হল। বলল—ও, বাবু?

গোকুলকে তারা সকলেই শুধু 'বাবু' বলে উল্লেখ করে। বৌদিকে নীরব দেখে দরদভরা কণ্ঠে বলল—আইসেন নাই অহনও? ক্যান্ বৌদি?

উমা—আমি কি জানি? তরে দিয়ে যে খোঁজ করামু, তরও ত দেখা নাই।

সরযূ—আমি দেইখ্যা আমু?

উমা—তাই যা।

দু-চার পা গিয়ে সরযূ ঘুরে দাঁড়াল। প্রশ্ন করল—কারে জিগামু বৌদি?

মুখ ঝামটা দিয়ে উমা বলল—হেটাও আমারে কইয়া দিতে অইব? যা, তর যাওন লাগব না। —বলে রাগ করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

সরযূ কিছুক্ষণ ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় উঠানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অর্ধাস্থিত নিদ্রিত শিশুকে বিছানায় শুইয়ে দেবার জন্য ঘরে চলে গেল।

উমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত আজ আর রান্নায় বসছিল না। তথাপি না করলে নয় বলে কোনমতে রন্ধনকার্য সমাপ্ত করে রান্নাঘরে শিকল তুলে দিয়ে ঘরে এল। ভর্ৎসিতা সরযূ শিশুর পাশে শুয়ে নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছে। মৃদু দীপালোকে করলগ্নকপোলে বসে চিন্তা করতে করতে নানা রকম আজগুবি কথা উমার মনে উদয় হতে লাগল। বাবুর কি কোন বিপদ হয়েছে? দাঙ্গা কিছুদিন থেকে উভয় সম্প্রদায়ের দলপতিদের যৌথ অঙ্গীকার ও চেষ্টার ফলে বন্ধ আছে বটে, কিন্তু ধূমায়মান বহ্নির মত পুনরায় সন্দুক্ষিত হয়ে উঠতে কতক্ষণ? যে সব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মর্মন্তুদ বিবরণ সে শুনেছে, সেই সব আজ আবার নূতন করে মনে পড়ে তার হৃৎকম্প উপস্থিত হল। যদি গোকুল বাবু কোথাও বেড়াতে গিয়ে দৈবাৎ কোন গুণ্ডার কবলে পড়ে থাকেন? তিনি ত নিরস্ত্র, গুণ্ডার ছুরি থেকে আত্মরক্ষা করবেন কেমন করে? তারা যদি তাঁকে—ওঃ! উমা আর ভাবতে পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল এবং স্পন্দিত বক্ষকে দুইহাতে সজোরে চেপে ধরল। তারপর নিজেকে শান্ত করল এই বলে যে সে এ-কি ভাবছে? এ ও কখনো সম্ভব? তিনি শুধু শুধু একা বার হবেন কেন, আর অফিসের সকলেই বা তাঁকে যেতে দেবে কেন? তা যেন হল, কিন্তু তিনি আসছেন না-ই বা কেন? তবে কি বাড়ি থেকে কোন

সংবাদ পেয়ে সেখানে চলে গেছেন, এখানে বলে যাবার সময় পান নি? তা-ই বা কেমন করে সম্ভব? একবারটি এসে বলে যেতে কতই বা সময় লাগত? অন্ততঃপক্ষে এক টুকরা চিঠিও ত চাপরাশিদের হাতে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। তবে?

ঘরের ভিতর একাকিনী বসে উমা সম্ভব অসম্ভব নানা কথা চিন্তা করতে লাগল, আর বাইরে কৃষ্ণপক্ষের তমস্বিনী যামিনী দণ্ডে দণ্ডে একেকটি পদক্ষেপ করে নক্ষত্র খচিত আকাশ-পথে পূর্ব থেকে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে চলল। দূরে গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে গেল। তখন উমা উঠে নিজের ঘর থেকে গোকুলের ঘরে এল। একপাশে কমিয়ে দেওয়া হারিকেন মিট মিট করে জলছে, যেন গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে সেও দুঃখে ম্রিয়মাণ। টেবিলের উপর ঢাকা দেওয়া গোকুলের বৈকালিক জলখাবার। অবসন্নভাবে উমা টেবিলের সামনের চেয়ারখানায় বসে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হল, আচ্ছা গোকুল বাবু না আসাতে সে এত ভেবে মরছে কেন? হয়ত অফিসের কোন কাজে আটকা পড়ায় আসতে বিলম্ব হচ্ছে,—তাতে এত ভাববার কি আছে? উমারা এ বাড়ীতে আছে বলেই ত, নইলে তাঁর বিলম্ব হওয়া না হওয়ায় তাদের কি? তা ছাড়া উমাদের ত এখানে চিরকাল থাকা চলবে না, দু'দিন পরেই চলে যেতে হবে। তখন? তখন ত গোকুল বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।

দেখাই হবে না! কথাটা সে আপন মনে দু-তিন বার আবৃত্তি করল। সঙ্গে সঙ্গে গোকুলের সদাহাস্য-প্রফুল্ল সৌম্যমুখমণ্ডল তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল। তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না? তাঁর মিষ্ট মার্জিত কণ্ঠ আর শুনতে পাওয়া যাবে না?

তাঁর কাছ থেকে চিরবিদায়ের তাৎপর্য উপলব্ধি করে উমার বুকখানা যেন হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল, এবং বক্ষ বিমথিত করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। মনে হল তিনি সরে গেলে উমার জগৎ যেন একেবারে খালি হয়ে যাবে। তবে কি সে—

হ্যাঁ, তা-ই। একটু চিন্তা করতেই মনের গোপন কথাটি তার নিজের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল। অতীতকে বিশ্লেষণ করে দেখল, শুধু আজ নয়, বহুদিন থেকে এই ভাব তার হৃদয়ে আশ্রয় পেয়ে ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। এতদিন সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু আজ নিঃসন্দেহে বুঝেছে। হায়, কেন সে এমন করল, কেন এমন হতে দিল? এর পরিণাম কি হবে? টেবিলের ওপর দুই কনুই-এর ভর দিয়ে উভয় করতলে মুখ রেখে উমা বিহ্বলভাবে এই কথা চিন্তা করতে লাগল এবং তার দুই কপোল বেয়ে ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

সাড়ে দশটা নাগাদ গোকুল বাড়ি ফিরল। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল, কারণ মানসিক চাঞ্চল্যবশতঃ উমা অন্যান্য দিনের মত আজ সে-দরজা বন্ধ করে নি। গোকুল ভাবল সকলে বোধ হয় শুয়ে পড়েছে। তাই লঘুপদে বারান্দায় উঠে নিজের ঘরের দিকে চলল। তার নূতন রবার-যুক্ত জুতায় কোন শব্দ হল না। নিজের কক্ষের দরজায় প্রবেশ করতে গিয়ে ভিতরে দৃষ্টি পড়ায় গোকুল অশ্রুলাঞ্ছিতমুখী উমাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্যমনস্কা উমা প্রথমে গোকুলকে দেখতে পায় নি, পরে হঠাৎ দেখে চমকে উঠে দাঁড়াল। ত্রস্তে আত্ম-সংবরণ করে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে ফেলল এবং দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

গোকুল যে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে এসে তাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলবে এটা উমা ভাবে নি। তাই প্রথমটা তার সর্বাঙ্গে লজ্জার ঝড় বয়ে গেল, কারণ সে বুঝল তার চোখে জল দেখে ভেতরের কথাটা গোকুল অবশ্যই অনুমান করে নিতে পারবে। পরক্ষণেই ভাবল, নাঃ, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। যে কথাটা নিজমুখে সে গোকুলের কাছে কোনদিন প্রকাশ করতে পারত না, সেটা যে এই আকস্মিক ঘটনায় আপনা হতেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, এতে ভালই হল। দেখাই যাক্ না গোকুলের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কি হয়। উমা প্রাচ্য বধূ হলেও তার অন্তরে বসে চিরন্তনী নারী চিরজন

পুরুষের উদ্দেশ্যে পুষ্পধনুতে ফুলশর যোজনা করল।

খেতে বসে গোকুল জোর করে ক্ষণপূর্বের অপ্রস্তুত ভাবটা দূর করে যখন মুখ তুলে চাইল, তখন উমার মৃগনয়ন দুটি স্থিরভাবে তারই মুখে সংস্থাপিত দেখে একটু আশ্চর্য হল। অন্যান্য দিনের মত আজ উমা দৃষ্টি-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গেই চোখ নামিয়ে নিল না। যাই হোক, নিজ আচরণের কৈফিয়ৎস্বরূপ গোকুল আরম্ভ করল—আজকে একটা ব্যাপারে বড্ড দেরি হয়ে গেল আসতে। আমাদের কোম্পানীর একটা জাহাজ চাঁদপুর রওনা হয়ে গিয়েছিল। মাইল দশ-বার যাবার পর তার মাঝিমাল্লাদের মধ্যে একটা ছোটখাট দাঙ্গার উপক্রম হয়। তাই টেলিগ্রাফে খবর পেয়ে আমরা দাঙ্গা বন্ধ করতে গিয়েছিলাম। অন্য সময় হলে হয়ত ব্যাপারটাকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হত না। কিন্তু বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে সাহেবরা সংবাদ পেয়েই স্থির করল যে নিজেরা অবিলম্বে সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলবে। দুজন সাহেব, হেড ক্লার্ক এবং দশ জন বন্দুকধারী দারোয়ান যাবে এই স্থির হল। সাহেবরা আমাকেও সঙ্গে নিতে চাইল। আমি প্রথমে বলেছিলাম যাব না, কিন্তু সাহেবরা পীড়াপীড়ি করাতে বাধ্য হয়ে রাজি হতে হল। একটা দ্রুতগামী মোটরলঞ্চে আমরা রওনা হলাম। এক ঘন্টা পরেই আমরা সেই জাহাজে পৌঁছে গেলাম। কারণ গণ্ডগোল সুরু হবার পরই জাহাজের চালক জাহাজ থামিয়ে দিয়েছিল। যাই হোক হাঙ্গামা সহজেই মিটিয়ে দেওয়া হল। আটজন বন্দুকধারী দারোয়ানকে জাহাজে রাখা হল এবং যে দুজন মাল্লার মধ্যে প্রথমে বচসা সুরু হয়ে গণ্ডগোলে পরিণত হয়, সেই দুজনকে আমাদের লঞ্চে তুলে নেওয়া হল। জাহাজের কর্তৃপক্ষকে যা যা দরকার উপদেশ দিয়ে আমরা আবার লঞ্চে উঠলাম ফিরে আসবার জন্য। এত পথ যেতে আসতে হাঙ্গামা থামাতে দেরি হয়ে গেল। যাবার সময় একবার ভাবলাম তোমার কাছে একটা খবর পাঠিয়ে দিই। কিন্তু তাড়াতাড়িতে সে আর হয়ে উঠল না। ভারী অন্যায় হয়ে গেছে।—বলে অনুতপ্ত দৃষ্টিতে উমার মুখের দিকে তাকাল।

ভয় এবং দুশ্চিন্তার ভার থেকে মুক্ত হয়ে এখন উমা প্রকৃতিস্থ হয়েছে। এবং তার স্বভাবসিদ্ধ বালিকাসুলভ কৌতুকপ্রিয়তা ফিরে এসেছে। তাই ঈষৎ বাঁকা হাসি হেসে জবাব দিল—নাঃ, অন্যায় আর কি? বাসায় কে আছে যে তার কাছে খবর পাঠাইবেন? বলেই কিন্তু মনে মনে জিভ কাটল। কথাটা বলা বোধ হয় ভাল হয় নি। বাবু কি ভাববে?

তার কথা শুনে গোকুল কিন্তু অবাক হল এবং চেয়ে দেখল। উমার চোখে কি ব্যঙ্গ চিকচিক করছে? এই রমণীই কি আট-দশ মিনিট পূর্বে টেবিলে বসে নিঃশব্দে কাঁদছিল?

খেতে খেতে আরও দু-চারটে কথাবার্তা হল। গোকুলের মনে হল উমাকে যেন সে আজ নূতন রূপে দেখল। এতদিন যে সরল গ্রাম্যবালিকাকে সে দেখে এসেছে এ যেন ঠিক সে নয়। এ যে কি তা সম্পূর্ণ ধরতে না পারলেও, কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ সেবিকা ছাড়া যে অতিরিক্ত আরও কিছু, তা গোকুল সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারল।

(ষোল)

পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা নগণ্যা রমণী বলে যে-উমাকে গোকুল এতদিন তুচ্ছজ্ঞান করে এসেছে, তারই চক্ষু দুটি যেন সেদিন বাঙ্ময় হয়ে বলে দিল—আমি সামান্য নই। সেই রাত্রির পর থেকে গোকুল উমাকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে লাগল এবং করে বিস্মিত হল। এর মধ্যে যে এত জিনিষ আছে তা গোকুল কোন দিন ধারণা করতে পারে নি। বাস্তবিক, আমাদের চারপাশে কত যে দেখবার ও বোঝাবার, এবং বুঝে আনন্দ পাবার, বস্তু আছে তা আমরা অনেকেই জানি না। বাড়ির সামনে ছোট্ট একটু বাগান আছে, সেখানে নানা রকমের ফুলের গাছ আমিই লাগিয়েছি। রোজ দুবেলা সেই বাগানের মাঝের সরু পথটি দিয়ে যাতায়াত করি। একদিন হঠাৎ সকালবেলা হাতে কাজ

না থাকাতে বারান্দায় বসে বাগানের দিকে চেয়ে রইলাম। প্রভাত-রবির অরুণাভ রশ্মিগুলি কচি কচি পাতার ওপর ঝিকমিক করছে, মৃদুমন্দ অনিলস্পর্শে পাতাগুলি ঝিরঝির করে কাঁপছে, তাতে মর্মর শব্দ উঠছে। পূর্ণ ও অর্ধপ্রস্ফুটিত ফুলগুলি শাখাসমেত অল্প অল্প দুলছে, কখনও পরস্পর ঠেকে যাচ্ছে—যেন অনেকগুলি বধূ হেসে হেসে দুলে দুলে গল্প করতে করতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। দু-চারটি ভ্রমর গুঞ্জরণ করে কুসুম থেকে কুসুমান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেন একদল কুমার-কুমারীদের মধ্যে ঘটকালি করে ফিরছে। এই উদ্যান-টুকু তার আলোছায়া, গুটিকয়েক ফুল, কিছু গাছপালা এবং খানিকটা সূর্যালোক নিয়ে, যেন একখানি চিরনূতন সঙ্গীতের মত প্রকৃতির বীণায় প্রতিদিন বেজে উঠছে, আমরা চাই না বলে তার শোভা দেখতে পাই না, মনোযোগ দিই না বলে তার সঙ্গীত শ্রবণ করতে পারি না।

অথবা যেন একটি নদীর ধার, যেখানে আমি প্রত্যহ সকালেবিকালে বেড়াতে যাই বন্ধুবান্ধব অথবা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। গল্প করতে করতে খানিকক্ষণ তার তীরে পায়চারি করি, তারপর বাড়ি চলে আসি। কোনদিন মনটা উদাস থাকাতে একলাই বেড়াতে গেলাম এবং ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে জলের একেবারে কাছে গিয়ে বসলাম। ছোট-ছোট ঢেউগুলি ছলাৎ-ছল শব্দে অনবরত তটে আঘাত করছে। তারা কি খেলা করছে, না কিছু বলতে চাইছে? এই যে জলপ্রবাহ, কোথায় এর উৎপত্তি, কোন্‌খানেই বা শেষ? কোন্ সুদূর অতীত জন্মভূমি গিরিদরী পরিত্যাগ করে বাহির বিশ্বে এর যাত্রা সুরু হয়েছে? এতদীর্ঘ পথ বেয়ে কলনাদিনী অভিসারিণী কোন্ নায়কের উদ্দেশ্যে চলেছে? কত এর বয়স এবং কি বিপুল এর অভিজ্ঞতা? এর জলে কত মানুষ ডুবেছে, কত তরণী নিমজ্জিত হয়েছে, তীরে কত চিতা জলেছে, কত সন্ন্যাসী আসন করেছে, কত বাণিজ্যতরী ভিড়েছে, কত কন্যা শ্বশুরগৃহে গেছে, কত গৃহহারা ছিন্নকন্থা পেতে বিশ্রামশয্যা প্রস্তুত করেছে। সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এর জলে কত বিচিত্র বর্ণচ্ছটা খেলা করে যায়। কখনও বা সলিলরাশি নবোঢ়া বধূর কপোলের মত রক্তিমাভা ধারণ করে, কখনও বা শাণিত তরবারির মত ঝক ঝক করে কখনও বা মৃত্যুর মত কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। এই বিশাল—ইতিহাস-শালিনী গহন গভীর চিররহস্যময়ী চির-প্রবহমানা অনন্ত লীলাময়ী শৈবালিনীর কতটুকু পরিচয় আমরা জানি? কতটুকু আমরা দেখতে পাই?

কিম্বা যেন মাথার উপরকার আকাশ—সকালে বিকালে দিবসে রাত্রিতে সহস্রবার দেখছি, মনে কোনও ভাবান্তর উপস্থিত হয় না। একদিন হৃদয় ভারাক্রান্ত থাকাতে সন্ধ্যার পর মুক্ত গগনতলে এসে বসলাম। এর দিগন্তবিস্তৃত অসীম পরিধি ব্যাপ্ত করে অসংখ্য নক্ষত্র ঝিকমিক করছে। ওরা কি? কেনই বা জলছে? কে ওদের জালিয়ে দিয়েছে? এই প্রবাল, মরকত, হীরা, চুনী, পান্না খচিত অমূল্য মণিহারগুলি কোন্ ময়ূরকণ্ঠীর কণ্ঠের আভরণ? এই শ্বেত-রক্ত-নীল-পীতাভ দীপাবলি কোন্ মহিমময়ের আরতির শোভা বর্ধন করছে? এই নিবাত নিষ্কম্প মহাব্যোমে কত অসংখ্য সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-জগৎ উঠেছে পড়েছে আবার উঠবে পড়বে? কেন এরকম হয়? যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি বিরাটকায় ক্রীড়নক নিয়ে খেলা করে চলেছে কোন সে অদৃশ্য চিরজীব শিশু? ঐ অন্তরীক্ষের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে পৃথিবীকেই বিন্দুসম ক্ষুদ্র বলে মনে হয়, আমরা ত কোন ছার।

মানুষও ঐ রকম অসীম, অমনই দুরবগাহ অমনই, অজ্ঞেয়। এই ক্ষুদ্র সার্ধত্রিহস্ত পরিমিত মৃৎপুত্তলিকার মধ্যে অসীম সৃষ্টিকর্তার অসীমত্বের আভাস আছে। যে বলে আমি মানুষকে চিনেছি সে কিছুই চেনে নি।

কয়েকদিন ধরে ভাল করে চেয়ে দেখার ফলে গোকুলের চক্ষেও তাই সাদামাটা উমা নিত্যনূতন বলে প্রতিভাত হতে লাগল। খেতে বসে মাঝে মাঝে হঠাৎ চোখ তুলে দেখতে পায় উমার নেত্রদুটি তারই মুখে নিবদ্ধ। এতদিন যে আঁখিতে শুধু দৃষ্টি ছিল আজ সেখানে ভাষা ফুটেছে। দৃষ্টি-বিনিময় হলে কৃষ্ণমেঘে বিদ্যুৎ

স্মরণের মত আজকাল উমার কালো নয়নে কটাক্ষ খেলে যায়। উমার চলা-ফেরায় হাবে-ভাবে আগেকার সেই লজ্জার আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে যেন একটা সাবলীল ভাব ফুটে উঠেছে। বিস্মিত গোকুল মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে উমার অধর প্রান্তে মৃদু অথচ দুষ্টুমিভরা হাসি ঝিলিক দিয়ে যায়। আশ্চর্য হয়ে মনে মনে ভাবে এর অর্থ কি? উমা কি তাকে সৌন্দর্য দ্বারা আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে? দূর! তা কি হতে পারে? আবার কখনও কখনও গোকুল দেখে উমা তন্ময় হয়ে কি ভাবছে। যেন মনে মনে কোনও গভীর অভিনিবেশে ব্যাপৃত আছে। কি সে ব্যাপার যা তাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে দেয়? এ কি পঞ্চশরের কৌতুক? উমা কি নিজের মনোমালঞ্চে কোনও এক চঞ্চল চঞ্চরীকের পক্ষ-সঞ্চালন ধ্বনি শোনবার চেষ্টা করছে। দুষ্যন্তের সঙ্গে মিলনের অবসানে সদ্যোভিন্ন-যৌবনা শকুন্তলা একাকিনী নীপ-নিকুঞ্জ-তলে উপবেশন করে কি মাঝে মাঝে এমনি উদাসিনী, এমনি উন্মনা হয়ে উঠত! উমার হৃদি-কুরুবকের কিশলয়গুলি কি কোনও এক নব-রবি রশ্মির পরশে একে একে উন্মীলিত হয়ে উঠছে? কি আশ্চর্য! কোন্ অদৃশ্য যাদুকরের মন্ত্রবলে সরল শ্যামাঙ্গী পল্লীবালা নায়িকা-লক্ষণ-যুক্তা হয়ে উঠল?

উমার এই পরিবর্তন কিন্তু বাড়ির আর কারও চোখে ধরা পড়ল না, পড়বার কথাও নয়। অপর সকলে যথাপূর্ব চলতে লাগল, কেবল এই দুটি নর-নারী পরস্পরের নিকট বিশেষ পরিচয়ে পরিচিত হয়ে উঠল। বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন রমেন দোকানের কেনাবেচা ও লাভ লোকসান নিয়ে ব্যস্ত রইল, পত্নী তার যে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে এটা উপলব্ধি করবার মত সূক্ষ্মদৃষ্টি বা অবসর তার ছিল না। অধিকাংশ পুরুষেরই মত বিবাহের অব্যবহিত পরের কয়েকটা মাস কেটে যাবার পর স্ত্রী তার কাছে পুরাতন জামা-কাপড়ের মত ব্যবহারের সামগ্রীমাত্রে পর্যবসিত হয়েছিল। আপনার দেহের তাগিদে পত্নীর দেহ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য সচেতন থাকলেও দেহকে অতিক্রম করে মনোরাজ্যে পৌঁছান রমেনের হয়ে ওঠে নি। তার মনোযোগের পনের আনা টাকা-পয়সার দিকে নিবদ্ধ রেখে বাকি এক আনা আত্মীয়গণের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিল। অবশ্য এই এক আনার বেশিরভাগই উমার অংশে পড়লেও সমগ্র ষোল আনার এ অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ। কিন্তু অশিক্ষিতা হলেও উমার মন ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। ছোট্ট কৃষ্ণকলি ফুলটির মত তার কালো দেহের কৌটায় প্রকৃতিদেবী কিছু প্রণয়-সৌরভ ভরে দিয়েছিলেন। তাই মধুমাসে মলয়-পবনের স্পর্শে সেটুকুকে বাহিরের নিকট মেলে ধরবার একটা আকাঙ্খা উমার বক্ষের মধ্যে যৌবনের আরম্ভ হতেই প্রচ্ছন্ন ছিল। স্থূলবুদ্ধি রমেন এত দিনের সংস্পর্শেও তাকে প্রস্ফুটিত করতে পারে নি। মার্জিত সুদর্শন মিষ্টবাক গোকুল অল্পদিনের সাহচর্যে না জেনে তার মনের উপর বসন্তের স্পর্শ বুলিয়ে দিল।

তারপর একদিন একটা দমকা বাতাসে দ্বিধার পর্দাখানা ছিঁড়ে উড়ে গেল। একদিন বিকালে অফিস থেকে ফিরে গোকুল ঘরে ঢুকে দেখল, তার খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে উমা কাঁদছে এবং সরযূ ভূমিতে জানু পেতে বসে দুই হাতে তার কটিদেশ বেষ্টন করে বোধ করি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। গোকুলের প্রবেশে উভয়েই একটু চকিত হল, উমা চক্ষে আঁচল চেপে রইল। সরযূ উঠে দাঁড়াল এবং গোকুলের মুখে বিস্ময় লক্ষ্য করে বলল—দেখেন না বাবু, দাদার কাণ্ড! বৌদিরে আইজ আবার গালি দিছে।

গোকুল—গালি দিয়েছে! কেন?

সরযূ—একটা ট্যাহার হিসাব পাইতে আছিল না। তা বৌদি কি করব? বৌদি ত বাক্সের মধ্যে আতই দেয় না।

গোকুল—তবে?

সরযূ—আর কন্ ক্যান? রাগ উইলে দাদার উস্ (হুঁশ) থাহে না। এহানে আইয়া আপনাগো ডরে দুই মাস কিছু কয় নাই, নইলে প্রায়ই ত বৌদিরে গালি দেয়।

গোকুল—প্রায়ই গালি দেয়! ইস্, ভারি অন্যায় ত!

সরযূ—হ বাবু! ঠানেন, বৌদি আমাগো খুব বাল মানুষ। কিন্তু দাদা ওরে মোটেই বালবাসে—

বস্ত্রাঞ্চলের ভিতর থেকে উমার ভৎর্সনা—ভরা রুদ্ধস্বর শোনা গেল—এই সরি! —ঠা, খাবার লইয়া আয়।

সরযূ চমকে চুপ করল। তাইত, গোকুলকে জলখাবার দিতে হবে। হ, ঠাই—বলে বেরিয়ে গেল। উমা ভাল করে চোখ মুছে কাপড় নামাল। স্বামীর হাতে তার নির্যাতনের এই অপ্রত্যাশিত কাহিনী শুনে গোকুল মর্মাহত হল। কাছে এসে সস্নেহে বলল—বড্ড কি কষ্ট পেয়েছ?

বলে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে চিবুক ধরে উমার আনত মুখখানি উঁচু করল। ব্যথিতা উমা এই আদরে ও মধুর সম্ভাষণে আত্মবিস্মৃতা হল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে একেবারে গোকুলের বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার অচিন্তনীয় ব্যবহারে গোকুল মুহূর্তের জন্য বিহ্বল ও হতবাক হয়ে রইল। পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করে চেঁচিয়ে বলল—সরযূ, আমার খাবারটা নিয়ে তুমি রান্নাঘরে বোস। আমি ওখানে গিয়েই খাব।

রান্নাঘর থেকে সরযূর উত্তর এল—আচ্ছা বাবু।

গোকুল কতকটা নিশ্চিন্ত হল, সরযূ এসে পড়ে তাদেরকে এ অবস্থায় দেখতে পাবে না। কিন্তু উমাকে নিয়ে কি করা যায়? সে বালিকার মত গোকুলের বুকে মুখ রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ক্রন্দনের তালে তালে তার বক্ষের উঠানামা গোকুল স্পষ্ট বোধ করতে লাগল। গোকুলের দেহ রোমাঞ্চিত এবং হৃদয়-স্পন্দন অতিশয় দ্রুত হয়ে উঠল। সর্বশরীরে গোকুল কেমন এক প্রকার মৃদু কম্পন অনুভব করল। না পারল উমাকে ঠেলে দিতে, না পারল কোন কথা উচ্চারণ করতে। পাঁচ-ছ মিনিট এইভাবে থাকবার পর কোনমতে বলল—উমা, ওঠ। কেউ যদি এসে পড়ে?

এতক্ষণে উমার রোদনের বেগ অনেকটা প্রশমিত হয়েছে। সে মুখ না তুলেই বলল—আসুক!

শুনে গোকুল মনে মনে হাসল বটে, কিন্তু উদ্বিগ্ন ভাবে বলল- না না, সেকি? সেটা কি ভাল হবে? ভেবে দেখ—

উমা যেমন অকস্মাৎ গোকুলকে জড়িয়ে ধরেছিল, তেমনি চট করে তাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে বলল—ভাবছি, অনেক ভাবছি। ভাইব্যা কূল-কিনারা পাই নাই। আমার দুঃখ কেউ বুঝব না, আমার কেউ নাই, কেউ নাই! —বলে আবার উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এবার গোকুল এগিয়ে এসে এক হাত তার কাঁধে ও অপর হাত মাথায় রেখে সান্ত্বনার সুরে বলল—ছি, কাঁদে না উমা। সরযূর মুখে শুনে আমি বড় ব্যথা পেলাম। আমি ত কখনও এমন কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। রমেন তোমায় যখন তখন গালি দেয়।

আবেগরুদ্ধ স্বরে উমা বলল—আমি অনেক সইছি আর পারি না, আর পারি না। আপনি আমারে কোথাও লইয়া ঠান বাবু, ঠাইবেন?

গোকুলের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। পাগলিনী এ কি বলছে! কি আশ্চর্য, অসম্ভব কথা! গোকুল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখল উমা তার দুই অশ্রু-টলমল মৃগনয়নের দৃষ্টি তার মুখে মেলে ধরেছে। গোকুলের প্রাণে অভূতপূর্ব দোলা লাগল। যেন একখানি বৃক্ষপল্লব-ছায়া-শীতলা স্নিগ্ধ-সলিলা দীর্ঘিকা আপন রহস্যময় গহনে অবগাহন করবার জন্য তীরে দণ্ডায়মান পথিককে আহ্বান করছে। এ আহ্বান বড় মধুর, বড় তীব্র, বড় দুর্নিবার। আনন্দে বিস্ময়ে আবেশে গোকুলের মস্তিষ্ক ঝিমঝিম করতে লাগল। সে দুই চক্ষু মুদ্রিত করল।

একটু পরে চেয়ে দেখল উমার দৃষ্টি তখনও তার মুখে স্থাপিত। যেন উত্তরের প্রতীক্ষা করছে। গোকুলের চক্ষে সমস্ত পৃথিবীটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে, সেই ঘূর্ণনের বেগে সমাজ-সংস্কার, পাপ-পুণ্য, কর্তব্য-অকর্তব্য

সব জড়িয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় যে প্রশ্নের উত্তর গোকুল এক কথায় না বলে সেরে দিতে পারত, এই অভিনব পরিস্থিতিতে তাকে এত সহজে এড়িয়ে যেতে পারল না। বলল—আচ্ছা, ভেবে দেখি। পরে এর জবাব দেব। এখন তুমি একটু সামলে নাও, আমি ততক্ষণ খাবারটা খেয়ে আসি, কেমন? নইলে সরযূ হয়ত কিছু ভাববে। তর্জনী দ্বারা উমার গালে একটি মৃদু টোকা দিয়ে হেসে রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করল।

পরদিন গোকুল অনেকটা সকাল-সকাল অফিস থেকে ফিরল। রমেনরা নেই, গতরাত্রে মুন্সীগঞ্জ গেছে। সরযূ যথারীতি খুকীকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে গেছে। গোপালের স্কুল থেকে আসবার বিলম্ব আছে। গোকুল দেখল ঘর খোলা, উমা আপন বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। জুতো খুলে ধীরে ধীরে তার কাছে এসে বসল পতী কর্তৃক উৎপীড়িতা এই নারী গোকুলের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে চাইছে। সে একে গ্রহণ করবে কি না তা-ই প্রশ্ন। ভাবতে ভাবতে গোকুল উমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। উমা পাশ ফিরে শুয়েছে, একখানি হাত মাথার নিচে রেখে। শিথিল কবরী ভেঙে বালিশের উপর এলিয়ে পড়েছে। একটুক্ষণ ভেবে গোকুল মনস্থির করে ফেলল। তারপর সন্তর্পণে ডান হাত খানি উমার কাঁধের ওপর রাখল। চমকে চোখ মেলে সে ধড়মড় করে উঠে বসল এবং—ওঃ আপনি!—বলে অভ্যাসমত ক্ষিপ্রহস্তে অবগুণ্ঠন তুলে দিল।

—থাক, এখন আর ঘোমটার দরকার কি? কাল কি বলেছিলে মনে নেই?· বলে গোকুল দু হাত দিয়ে আলগোছে গুণ্ঠনের কাপড় মাথা থেকে খুলে কাঁধের ওপর ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কালকের প্রস্তাবের কথাটা মনে পড়ে উমার সমস্ত মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল এবং মৃদু অথচ মধুর এক টুকরো হাসি ওষ্ঠাধর প্রান্তে দেখা দিল। বলল—ওঃ, হ।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল—কিন্তু আপনি ও সে কথার উত্তর দেন নাই।

—এই বার দেব।—বলে গোকুল উমার দুই কাঁধে হাত রেখে বলল-উত্তরটা কি হবে অনুমান করতে পার?

একটু ভেবে মাথা নেড়ে উমা বলল—হ, পারি।

গোকুল—ইস্!

উমা—দেখবেন? আচ্ছা রাখেন, আমি একখান কাগজে লিখ্যা রাখি, আপনি কইলে পরে আপনারে দেখামু, কেমন?

সোৎসাহে গোকুল বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। তোমার অন্তর্যামীত্বের পরীক্ষাটা হাতে হাতেই হয়ে যাক।

তড়াক করে উঠে উমা টেবিলের কাছে গেল, কবরীর বন্ধনমুক্ত দীর্ঘ বেণী নিতম্ব স্পর্শ করে দুলতে লাগল। একখণ্ড কাগজে কি লিখে বইয়ের নিচে লুকিয়ে রাখল এবং ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—এইবার আপনার কথা বলেন।

গোকুল এগিয়ে এসে উমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল—দেখ উমা, তুমি যা দিতে চেয়েছ তা আমার কাছে রাজার ঐশ্বর্য। এরই চিন্তায় আমি কাল সারারাত ঘুমুতে পারি নি। কোনও একটি স্ত্রীলোক যে এমন ভাবে আমাকে তার সর্বস্ব দিতে চেয়েছে এ আমার পরম ভাগ্য। কিন্তু ভাবছি এ আমি নিতে পারি কি না। নেবার অধিকার আমার আছে কি? সাধারণ অবস্থায় হলে আমি হয়ত এত কথা ভাবতাম না, কিন্তু এখন তোমরা আমার আশ্রিত, তোমাদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে না। একদিন চলে যাবে, তা সে যবেই হোক। তখন নিজেদের বাড়িতে বসে হয়ত বা কোনদিন আমার কাছে নিজেকে এ-ভাবে বিলিয়ে দেবার কথা ভেবে তুমি অনুতপ্ত হবে। তোমার সে-দিনের চোখে হয়ত আমার আজকের সম্মতি যৌবনীয় বলে মনে হবে। হয়ত ভাববে তুমি নারী, তোমার ভুল হয়ে থাকলেও আমি পুরুষ, আমার ভুল হওয়াটা

উচিত হয় নি। তাই, সে-দিনের কথা ভেবে, পাছে তোমার ভালবাসা শেষে ঘৃণায় পরিণত হয় এই আশঙ্কায় আমি রাজি হতে ভয় পাচ্ছি উমা। তুমি আমায় ভুল বুঝোনা, লক্ষ্মীটি।

উমা—থাক, আর কওন লাগব না। আপনার মনের কথা আমি বুঝছি—

গোকুল—ছি উমা। তুমি ত জান—

গোকুলের ব্যথিত দৃষ্টি দেখে উমা সহসা খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল—নাঃ, ঠিকই কইছি। আপনার ওসব মিছা কথা, আসলে আপনি আমারে মোটেই বালবাসেন না।—বলে কালকের মত পুনরায় দুই বাহু দ্বারা গোকুলকে আলিঙ্গন করে তার বক্ষে মাথা রাখল। সে যে রহস্য করছে এটা গোকুল বুঝতে পারল। তারও উভয় বাহু ধীরে ধীরে এসে বক্ষলগ্ন লতিকাটিকে বেষ্টন করে ধরল। মিনিট-খানেক এইভাবে থেকে দুজনে পৃথক হল, এবং উমা বলল—আমি জানতাম। দেখবেন?—বলে বইয়ের নিচে থেকে কাগজের টুকরোটা এনে দেখাল, তাতে লেখা আছে 'না'।

গোকুল জিজ্ঞাসা করল—কি করে বুঝলে?

আরক্ত চক্ষে কটাক্ষ হেনে মাথা দুলিয়ে কৃত্রিম কোপে উমা বলল—জানু, কমু না। আপনি যখন রাজি না আমার কথায়, তখন কইয়া কি অইব?

গোকুল—আচ্ছা, না হয় না-ই বললে, কিন্তু রাগ করোনি বল, সত্যি বল?—বলে আগ্রহভরে উমার দিকে চাইল।

উমা—প্রথমে রাগ অইছিল বটে, কিন্তু অখন নাই। আপনার উপর রাগ কইর‍্যা আমি থাকুম ক্যামনে? রাগ নাই, তবে দুঃখ আছে, দুঃখ থাকব। আমার যেমন বাগ্য।—ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

গোকুল বলল—তুমি দুঃখ কোরো না, উমা। আমি তোমাকে গ্রহণ করতে পারলাম না বটে, কিন্তু তোমাকে কলঙ্কিত না করে যতটা দেওয়া যায় তা আমি দেব। তাই এস উমা, তাই এস। মনে কর তুমি একটি ফুল, আমি একটি ভ্রমর। পথে যেতে যেতে হঠাৎ আমি তোমার কাছে এসে পড়েছি। তোমার আছে গন্ধ, আমার আছে গুঞ্জন। যতদিন কাছাকাছি থাকি, তুমি দাও আমাকে তোমার সৌরভ, আমি দিই তোমাকে আমার গান। এই আলোতে বাতাসে তোমাতে আমাতে মিলে নাচি গাই, আনন্দ করে পরস্পরের নিকটে ঘুরে বেড়াই। আমি যেন তোমাকে দংশন না করি। তারপর যখন বিদায়ের দিন আসবে, তখন যেন তোমাকে অক্ষত রেখেই বিদায় নিতে পারি। তোমার মধ্যে যে মধু আছে, তার যতটুকু গন্ধের ভিতর দিয়ে পাওয়া যায় ততটুকুতেই আমি পরিতৃপ্ত থাকতে চাই। তোমাকে কাব্যের ভাষায় ডেকে বলতে ইচ্ছা করে—হে আমার যৌবন-নিকুঞ্জে দৈবাৎ-উড়ে-আসা মুক্ত বিহঙ্গী, এ বক্ষের কুলায়ে কিছুক্ষণের জন্য তুমি বিশ্রাম কর। লুব্ধ লালসার ব্যাধ তোমার শুভ্র পক্ষপুট লক্ষ্য করে শরসন্ধান করবে না।—বলে সকৌতুকে হো হো করে উচ্চহাসিতে ফেটে পড়ল। উমাও প্রাণ খুলে সে হাসিতে যোগ দিল।

হাসি থামলে গোকুল জিজ্ঞাসা করল—শেষের কথাগুলো বুঝতে পেরেছ উমা?

উমা উত্তর দিল—বাল বুঝি নাই, কিন্তু বুঝবার দরকার কি? আপনারে যখন বুঝছি তখন আপনার কথা না বুঝলেও চলব।—বলে অদ্ভুত ভঙ্গীতে তাকাল।

গোকুল আশ্চর্য হল। এ-ই নারীর সহজাত সংস্কার। যা সে মস্তিষ্ক দ্বারা বুঝতে পারে না, তা হৃদয়ের মধ্যে অতি সহজেই উপলব্ধি করে নেয়। ভালবাসা নারীর দৃষ্টিশক্তিকে গভীর ও অন্তর্ভেদী করে তোলে। বাঞ্ছিতের মনের মণি-মুক্তা ডুবুরির মত সে অনায়াসেই আহরণ করে আনতে পারে। গভীর প্রীতিতে গোকুল উমার মাথা দুই হাতে ধরে তার ললাট চুম্বন করল। আবেশে উমার দুই চক্ষু বন্ধ হয়ে এল।

ক্রমশঃ

স্বাস্থ্যের জন্য দৌড়

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

সে-দিন বিদেশী একটি পত্রিকায় দেখলাম পূর্ব জার্মানীতে নাগরিকদের সুস্থ ও সবল রাখার জন্ত "Run for your Health" নামে একটি আন্দোলন সুরু হয়েছে।

কিন্তু মানুষ জন্ত দৌড়াব কেন? এ-প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা জানি সুস্থ ও সবল ভাবে জীবন যাপন করতে হলে মানুষের শরীরে কয়েকটি গুণের সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন যথা,—শক্তি (Strength), সামর্থ বা ক্ষমতা (Power), ক্ষিপ্রতা (Agility) এবং সহশক্তি (Enduarance)। অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনেও এই কয়টি গুণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কেবল মাত্র অলিম্পিকেই নয় এ-সকল গুণের প্রয়োজন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায়ে। শিক্ষা জীবন ক্রীড়া জীবন কর্ম জীবন বা অবসর জীবন; প্রভৃতি জীবনের সর্ব্ব স্তরেই একটি পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে এই কয়টি গুণের প্রয়োজন।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দৌড়ের সঙ্গে ঐ সকল গুণের উৎকর্ষ লাভের মধ্যে কিছু সম্বন্ধ আছে।

বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমরা জানি—মানুষের এই প্রবহমান জীবন ধারা দেহাভ্যন্তরস্থ দুইটি অঙ্গের উপর নির্ভর করে। এই দুইয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের জীবন দীপটি জ্বলতে থাকে জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত। এ-দুটির যে কোন একটি থেমে যাওয়া মাত্রই আমাদের জীবন দীপটিও নিভে যায় সেই সঙ্গে। এই জন্তই ইহাদের সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখা একান্ত প্রয়োজন এবং দৌড়ের মাধ্যমেই ইহাকে কর্মক্ষম রাখা সম্ভব করা যেতে পারে। পূর্ব্ব জার্মানীর স্পোর্টস ম্যাগাজিন পড়ে বুঝলাম তারা এ বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন।

আমরা জানি হৃদপিণ্ড তার সঙ্কোচন ও প্রসারণ পদ্ধতির দ্বারা শরীরের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াটিকে অব্যাহত রাখে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত। অনুরূপ ভাবে ফুসফুসও সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা আমাদের শ্বাস কার্য্যের ক্রিয়াটিকে অক্ষুন্ন রেখে চলে—যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের শেষ বায়ু নির্গত হয়ে এর কার্য্য একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

হৃদপিণ্ড ও প্রধান প্রধান রক্তবাহী নলসমূহ
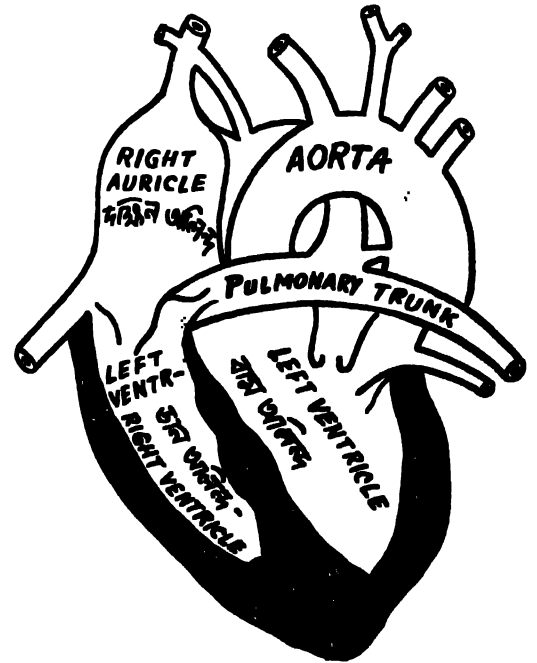
প্রশ্বাস (Inspiration) গ্রহণের পর বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং বায়ু মধ্যস্থিত অক্সিজেন ফুসফুসস্থিত রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়ে বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হয়। এই বিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুসের এক প্রকার শিরার (Pulmo-

nary Vein) ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হৃদপিণ্ডের বাম অলিন্দে (Left Auricle) প্রবেশ করে। পরে ইহা বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে গিয়া সঞ্চিত হয়। বাম নিলয়ের বিশুদ্ধ রক্ত শরীরের বিভিন্ন উপাদান ও অক্সিজেনের সংমিশ্রনে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এই বিশুদ্ধ রক্ত রক্তবাহী নলের (Aorta এবং Artery) সাহায্যে বিভিন্ন অঙ্গের কোষসমূহে উপস্থিত হয়ে তাদের ক্ষয় পূরণ ও পুষ্টি সাধন করে এবং এক প্রকার দহন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই দহন কার্য্যের ফলে আমাদের কর্মশক্তির (Energy) আবির্ভাব হয় এবং আমরা কর্ম করিবার প্রেরণা ও শক্তি লাভ করি। এই দহন প্রক্রিয়ার দেহাভ্যন্তরস্থ কার্বনের (Carbon) এর সহিত রক্ত সংবাহিত অক্সিজেনের মিশ্রন সংঘটিত হয়ে কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস রক্তের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং অবিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হয়।

এই অপরিশুদ্ধ রক্ত অপর এক প্রকার রক্তবাহী শিরার (Veins) সাহায্যে হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দ (Rt Auricle) হইয়া দক্ষিণ নিলয়ে (Ventricle) সঞ্চিত হয়। দক্ষিণ নিলয়ের সংকোচনের ফলে উক্ত অপরিশুদ্ধ রক্ত অপর এক প্রকার রক্তবাহী নলের (Pulmonary Artery) সাহায্যে ফুসফুসে উপস্থিত হয়। রক্তমধ্যস্থ দ্রবীভূত Co_2 রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্যাসীয় Co_2 পরিণত হয় এবং শ্বাস নিঃসরণের সময় উক্ত Co_2 গ্যাস ফুসফুস হইতে বাহিরে বেরিয়ে যায়।

এরপর পুনরায় শ্বাস-গ্রহণের ফলে বায়ুমধ্যস্থিত অক্সিজেন পুনরায় রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ রক্ত Pulmonery Vein নামক রক্তবাহী শিরার সাহায্যে হৃদপিণ্ডের বাম অলিন্দ হইয়া বাম নিলয়ে আসিয়া সঞ্চিত হয় পুনরায় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সঞ্চালনের জন্য।

হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের এই মিলিত কর্মধারা প্রতি-নিয়তই চক্রবৎ পরিক্রমণ করে শরীরের দৈনন্দিন ক্ষয়পূরণ বৃদ্ধি সাধন এবং কর্মশক্তি উৎপাদনের জন্য। দুইটি অঙ্গের এই মিলিত কর্মধারা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে।
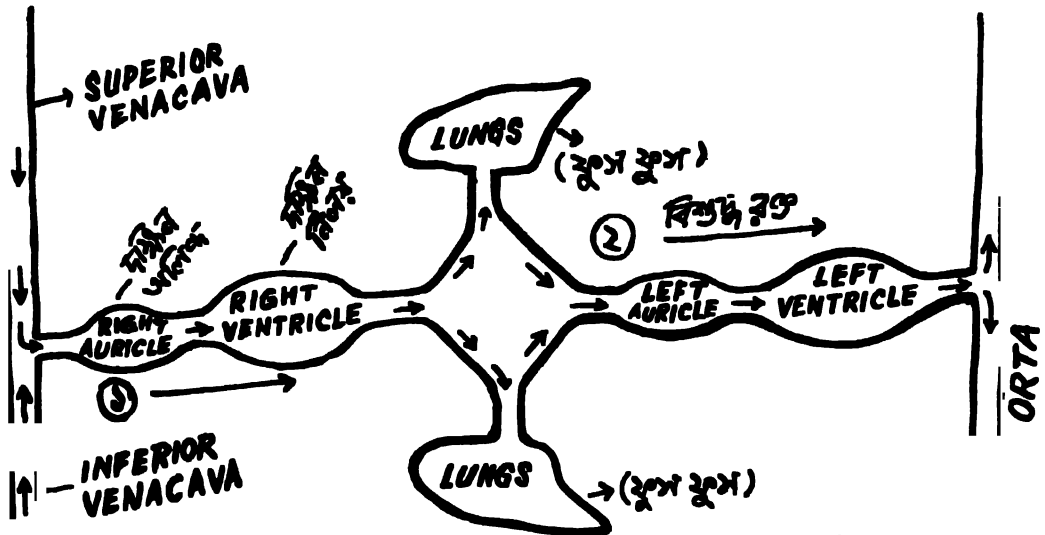
① শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে অবিশুদ্ধ রক্তের দক্ষিন নিলয়ে আগমন এবং তথা হইতে ফুসফুস আগমন ও পরিশোধন।

② বিশুদ্ধ রক্তের ফুসফুস হইতে বাম নিলয়ে আগমন এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালন।

উপযুক্ত পরিমাণ দৌড়ানর ফলে শরীর সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম থাকে এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত সঞ্চালনে শরীরের পেশীগুলিকে সতেজ সবল এবং কর্মক্ষম রাখে। সুতরা দেখা যায় এই দুইটি অঙ্গের মাধ্যমে দৌড় আমাদের শক্তি এবং সামর্থ্যর উপর প্রভূত পরিমান প্রভাব বিস্তার করে।

এখন Agility তথা ক্ষিপ্রতার কথায় আসা যাক। মেদবহুল শরীর মানুষের ক্ষিপ্রতা কমিয়ে দেয়। ইহার ফলে মানুষ কার্য্যকালে অল্প তৎপর এবং দৈহিক অপটুতা ভোগ করে। দৌড়ে অতিরিক্ত মেদ ঝরে যায় এবং মানুষ ক্ষিপ্র ও কর্ম তৎপর হয়।

Endurance অর্থে আমরা কষ্টসহিষ্ণুতা বা সহনশীলতাকে বোঝাই। আমরা জানি পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন মানুষ সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে চায়। এই সময় Endurance-ই মানুষকে সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তার প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্ত সেই কার্য্যে লেগে থাকতে সাহায্য করে। দূর পাল্লার দৌড়ে এই সহনশীলতা বা Endurance প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ইহা ব্যতীত নিয়মিত দৌড় হৃদপিণ্ড ও রক্তবাহী শিরা জনিত মারাত্মক ব্যাধির প্রতিষেধক রূপেও কাজ করে।

প্রতীচ্যের কয়েকটি দেশে ইঁদুরের উপর গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে অল্প পরিশ্রমে বা বিনা পরিশ্রমে রক্তের একটি উপাদান Cholesterol এর পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রক্তে Cholesterol এর মাত্রাধিক্যের ফলে উক্ত Cholesterol রক্তবাহী শিরার দেওয়ালের উপর সঞ্চিত হয় এবং উহাকে Atherosclerosis নামে অভিহিত করা হয়। ইহার দ্বারা রক্তবাহী শিরাসমূহ পুরু এবং শক্ত হইয়া রক্ত সঞ্চালনের পথে বাধার সৃষ্টি হয় এবং Arterial Tension বাড়িয়ে দেয় ফলে মানুষের রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে। রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্ত হৃদপিণ্ড এবং রক্তবাহী শিরার পীড়া জনিত নানা প্রকার দুর্ঘটনায় মানুষ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি রোগের নাম করা যেতে পারে যথা,—করোনারী থ্রম্বসিস, সেরিব্রাল থ্রম্বসিস, সেরিব্রাল এমবলিসম্, সেরিব্রাল হেমারেজ ইত্যাদি।

অপরপক্ষে ইঁদুরগুলিকে পরিশ্রম করান হলে দেখা যায় রক্তের Cholesterol পরিমাণ অতি শীঘ্র কমিয়া যায় এবং Athreosclerosis হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। ইহার ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি জনিত দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও দূরীভূত হয়। এই জন্ত প্রতীচ্যের চিকিৎসকেরা বলেন—বৃদ্ধজীব এবং অল্প পরিশ্রমী মানুষের জন্ত দৌড়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত দৌড় একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং সহজ পদ্ধতি। এক প্রকার বিনা ব্যয়ে এই পদ্ধতি অনুশীলন করা যায়। ইহার দ্বারা যে কোন দেশে একটি সুস্থ ও সবল মানবগোষ্ঠী গঠন করা যেতে পারে।

পত্রিকাটিতে দেখলাম জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। পূর্ব জার্মানীর ধনী নির্ধন, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আজকাল সপ্তাহের কয়েকদিন দলবদ্ধ ভাবে দৌড় আরম্ভ করেছেন।

এখানে "স্বাস্থ্যের জন্ত দৌড়াও" নামে একটি আন্দোলনও শুরু হইয়াছে।

বহু বিখ্যাত সংস্থা এই আন্দোলনকে উৎসাহ দিতে এগিয়ে এসেছেন। "G D R Sports and Gymnastic Association" "Free German Youth Association" "G D R Athletic Association" প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ক্রীড়া সংস্থা এই আন্দোলনটির পুরোভাগে রয়েছে।

দেশের অন্তান্ত বিভাগীয় সংস্থাগুলিও ইহাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়েছেন যথা—বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, সংবাদপত্র ও টেলিভিসন ইত্যাদি।

জার্মান সায়েন্স এ্যাকাডেমীর বিখ্যাত জার্মান হৃদপিণ্ড বিশারদ (Cardiologist) Dr Albert Woolenbeyer এই আন্দোলনটির উদ্যোক্তা।

এই আন্দোলনের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন German Sports and Gymnastic Association এর ভাইস প্রেসিডেন্ট Dr Edelfried Buggel. এই সব বিশিষ্ট দিকপালগণের সকলেই নিয়মিত যথোপযুক্ত দৌড়ও অভ্যাস করেন।

International Orienteering Association-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন "World Health Organisation এর রিপোর্টে জানা যায় জগতের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লোক হৃদপিণ্ড অথবা রক্তবাহী শিরা জনিত অসুখ হইতে উদ্ভূত দুর্ঘটনার জন্য অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার একমাত্র কারণ বিনা পরিশ্রম, অল্প পরিশ্রম অথবা কায়িক পরিশ্রমের তুলনায় অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম। এই দুর্ঘটনা হইতে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদের প্রত্যহ নিয়মিত পরিমিত পরিমাণ দৌড় অভ্যাস করা উচিত; এই জন্যই আমার দেশবাসীকে আমি নিয়মিত দৌড় অভ্যাস করতে বলি। ইহার দ্বারা সকলেই স্বীয় স্বাস্থ্যের সেবা করিবেন।

পূর্ব জার্মানীর বহু পত্রিকা এবং সংবাদপত্র থেকে জানা যায় যে নিয়মিত দৌড় অভ্যাসের ফলে আজকাল জার্মানীতে সত্তর এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিরা যথেষ্ট কর্মক্ষম রয়েছেন।

দৌড়ের কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় :-

প্রঃ দৌড় কি স্বাস্থ্য ভাল করে?

উঃ হ্যাঁ, তবে উপলব্ধি করতে কিছু সময় লাগে। কিছুদিন পর স্বাভাবিক কর্মক্ষমতার উন্নতি অনুভব করা যায়। সামর্থ্যের উন্নতি জানা যায় দৌড়ের দূরত্ব বাড়ালেও আর কোন কষ্ট বোধ হয় না।

প্রঃ দৌড় কি করে ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি করে?

উঃ শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরে গিয়ে মানুষ কর্মতৎপর হয় ও স্বাভাবিক দৈহিক পটুতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

প্রঃ দৌড় আমাদের কি কি উপকারে আসে?

(১) উঃ শয়ন কালে অতি শীঘ্র নিদ্রা আসে। নিদ্রা বেশ গভীর হয়। নিদ্রান্তে শরীর সতেজ এবং মন প্রফুল্ল হয়।

(২) ফুসফুস এবং হৃদপিণ্ড সবল ও কর্মঠ হয় এবং শরীরের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার প্রভূত উন্নতি হয়। নাড়ীর স্পন্দন(Pulse) প্রতি লক্ষ্য রাখলে ইহা ভালভাবে জানা যায়—প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পর নাড়ির গতি স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা ধীরে চলে। দৌড়ের পর দ্রুতগতি নাড়ী অল্প সময় মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে এ-রকম দেখা যায় না।

প্রবাসের ছবি

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

(১)

১৯২০—২১ সাল। সারা ভারতবর্ষব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন। বাংলাদেশ সব আন্দোলনের নেতা, বাংলা রত্ন-প্রসবিনী। বিশেষভাবে পূর্ববাংলার "সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা" বুকে অগণ্য কৃতী সন্তানের জন্ম। এমনই একটি রত্ন ছিলেন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। প্রথিত-যশা আইনজীবি একদিন তাঁর বিলাস-পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য-উপভোগ্য আরামের জীবন অবহেলায় পরিত্যাগ করে উদাসী বৈরাগীর বেশ ধারণ করে পথের ধুলোয় নেমে এলেন, দেশ-মাতৃকার সেবকদলের পুরোধায়। জন্মভূমির পথচারী সেবকদল তখন বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের সন্তরচিত স্বদেশী গান—"আমরা পথে পথে যাবো সারে সারে, তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে। বলব, জননীরে কে দিবি দান, কে দিবি ধন, তোরা কে দিবি প্রাণ? মা ডেকেছে, কব বারে বারে", গেয়ে, আঁচল ভরে টাকা, পয়সা, গয়না, ভারে ভারে তুলছেন। এমনই একসময় একদিন শুনলাম, দেশবন্ধু সস্ত্রীক, সদলবলে চট্টগ্রাম সহরে এসেছেন। স্থানীয় টাউন হলের বিরাট প্রাঙ্গণে জনসভা—লোকে লোকারণ্য। সুসজ্জিত উচ্চ মঞ্চে সহরের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি-পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়েছেন শুভ্র খদ্দর পরিহিত সৌম্য-মূর্ত্তি চিত্তরঞ্জন—জলদ-গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন, "বন্ধুগণ, তোমরা কি স্বরাজ চাও?" মুহূর্ত্তের মধ্যে বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের কোলাহল-তরঙ্গ যেন স্তব্ধ। দেশবাসীর প্রাণ-মন উদ্ধকারী জলন্ত অগ্নিময়ী বাণী নির্ঝরের অবারিত স্রোত-ধারার মতো অবিশ্রান্ত বর্ষিত হতে লাগলো। শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ, প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা বক্তৃতার শেষে ভিক্ষার ঝুলি হাতে [illegible] সাদা খদ্দরের শাড়ী পরিহিত, হাতে দু'গাছি শঙ্খ-বলয় মাত্র, খালি পা, তৈলবিহীন রুক্ষ কেশ, যেন কৃচ্ছ্রসাধনরতা তপস্বিনী দেশবন্ধুপত্নী বাসন্তী দেবী। তাঁর পশ্চাতে তাঁরই পুত্র-স্থানীয় কয়েকটি সেবক, তাদেরও হাতে ভিক্ষার ঝুলি। আমার শশ্রূমাতা জ্ঞানবালা দেবী বাসন্তী দেবীর বাল্যবন্ধু ও সহপাঠিনী। দূর থেকে দেখলাম তিনিও তাঁর সহগামিনী। সভা-ভঙ্গের পর সহরময় ভীষণ উত্তেজনা। স্থানীয় সরকারী কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল নৃপেন্দ্র ব্যানার্জী মহাশয় পদত্যাগ করেছেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। "ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউসন্" বিদ্যালয়ের পরিচালক, প্রোপাইটার এবং অধ্যক্ষ, সহরের বিশিষ্ট প্রধান শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত, ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও নেতা হরিশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও তাঁহার বিদ্যালয়কে দেশের কাজে দান করেছেন। এখন হতে সে বিদ্যালয়ে কেবল তাঁত, চরকা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হবে। আরও কত শত শিক্ষক, ছাত্র, দেশপ্রেমী জনসাধারণ চাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশ সেবার সংকল্প নিয়েছেন।

আমি আমার শ্বশুর মশায় হরিশচন্দ্রকে সভায় দাঁড়িয়ে বলতে শুনলাম, দেশে যখন শিক্ষাব্যবস্থা ভাল ছিল না, তখন তিনি এই বিদ্যালয় স্থাপন করে "ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসন্" নাম দিয়ে, নিজের আপ্রাণ চেষ্টায় ইহাকে সুপরিচালিত একটি হাই স্কুলে পরিণত করেন। সরকারী বা বাহিরের কোনোরূপ আর্থিক সাহায্য না নিয়ে, সম্পূর্ণ নিজের সামর্থ্য দিয়ে এতদিন স্কুলটি চালিয়েছেন। প্রায় ৬০০।৭০০ ছাত্র তখন স্কুলে। দেশনেতা চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে আজ এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের লোকের হাতে তুলে দিলেন। আমার মন

উদ্দীপনার তাণ্ডব, নিজের হাতের সোনার চুড়ি বালা যা ছিল, খালি হাত করে সব বাসন্তী দেবীর ঝুলিতে দিয়েছি, মনে হয়েছিল আজ বুঝি কেবল দিয়ে-ফেলার দিন। যার যা সম্বল আছে, দেশমায়ের সেবায় উৎসর্গ করে দিতে পারলেই যেন মহা তৃপ্তি॥

বাড়ী ফিরে এসে দেখি, এখানেও উত্তেজনার ঢেউ, আমার একটি দেবর প্রেমানন্দ, Chittaganj Customsএ Preventive Officerএর কাজে সম্প্রতি নিযুক্ত হয়েছিল, সেও পদত্যাগ-পত্র দিয়ে এসেছে। শাশুড়ী ঠাকুরণও তাঁর বড় সখের হাঙর-মুখো মোটা মোটা দু'গাছি সোনার বালা বান্ধবীর ভিক্ষার ঝুলিতে দিয়ে এসে পরম তৃপ্তিলাভ করেছেন।

বানের জল যখন প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসে কতো বাড়ী, ঘর, ক্ষেত-খামার ডুবিয়ে নিয়ে যায়, তখন বোঝা যায় না কতোখানি লোকসান হোল। জল শুকিয়ে গেলে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা মাথায় হাত দিয়ে হিসাব করতে গিয়ে দেখে, ক্ষতির পরিমাণ অপরিমেয়। দেশ নেতা দেশকে মাতিয়ে দিয়ে চলে গেলেন, ঘরে ঘরে হাহাকারও উঠলো। দেশ সেবার নামে যারা ঘর ছেড়ে, চাকরী ছেড়ে, লেখাপড়া ছেড়ে বেরিয়ে এলো, বিশৃঙ্খলার বেড়া-জালে পড়ে তাদের জীবনসূত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হোয়ে গেল।

আমার শ্বশুর মশায়ের বহু পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের শত শত ছাত্র অন্য বিদ্যালয়ে চলে গেল। দেশ নেতার প্রতিশ্রুত তাঁত, চরকা তাঁতী মাষ্টার, সর্ব্বোপরি অর্থ সাহায্য পাওয়া গেল না, ধীরে ধীরে বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল—বিরাট স্কুলবাড়ী খাঁ খাঁ, শূন্যতায় ভরে রইল। নিজের সন্তানের জীবন চোখের সম্মুখে যদি অনাহারে অযত্নে বিনা চিকিৎসায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যায়, সে দৃশ্য যেমন পিতার বুক ভেঙে দেয়, ঠিক তেমনি কোরেই বুঝি ত্যাগী, সাধু চরিত্র হরিশচন্দ্রের কোমল বুকে এই বিদ্যালয়ের মৃত্যু-বেদনা আঘাত করিছিল। তিনি এই শোকে দিনে দিনে ভেঙে পড়লেন, আর বৃদ্ধবয়সে অর্থকষ্টও ভোগ করে গেলেন।

আমার স্বামী এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র, উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত কোরে পিতার কার্য্যভারই গ্রহণ করবেন সংকল্প ছিল। সরকারী উচ্চপদের চাকরীর প্রস্তাব পেয়েও গ্রহণ করেননি। পিতারও আকাঙ্খা ছিল পুত্রই তাঁর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করবেন, কিন্তু পুত্র কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য প্রথমেই নিজের স্কুলের ভার না নিয়ে একটা খৃষ্টান মিশন স্কুলে কাজ নিলেন। পিতা ইহাতে ক্ষুব্ধ হন, পুত্র সেজন্য সে চাকরী ছেড়ে ১৯১৮ সালে বিবাহের কিছুকাল পরে চট্টগ্রামে গিয়ে নিজের স্কুলের ভার নেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ঝড়ে সংসারে, দেশে বহু পরিবর্ত্তন এলো। নিজের স্কুলে আর তাঁর স্থান নেই বুঝে কলকাতায় চলে এলেন চাকরীর চেষ্টায়। মাস ছয়েক নানা স্থানে চেষ্টায় ব্যর্থ মনোরথ হোয়ে অবশেষে এক পূজোর ছুটিতে বর্ম্মা-অভিমুখী জাহাজে চড়ে ভাগ্য অন্বেষণে যাত্রা করলেন।

(২)

প্রকৃতি-মায়ের অকুণ্ঠ ঐশ্বর্য্য সম্পদে সাজানো; নদ-নদী, ঝরণা, পাহাড়, অরণ্যে পরিবৃত চট্টল ভূমি আমার শ্বশুরকুলের জন্মস্থান। তরুণ বয়সেই সাধু চরিত্র হরিশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কোরে শ্রীপুর গ্রামস্থ পৈতৃক জমিদারী এবং বাসভবন পরিত্যাগ কোরে, চট্টগ্রাম সহরে নিজ কর্ম্মক্ষেত্র মনোনীত করেন এবং ধীরে ধীরে সহরের নন্দন কানন পাড়ায় অনেক জমি কিনে ব্রাহ্মপল্লী গঠনের প্রয়াস করেন। বসতবাড়ীর প্রায় সংলগ্ন কয়েক বিঘা জমি নিয়ে বিদ্যালয়ের জন্য কয়েকটা গৃহ নির্ম্মাণ করেন। স্কুলের বাড়ীগুলি পরি-বেষ্টিত বিরাট প্রাঙ্গণ, স্কুলের ছেলেদের খেলার মাঠ। এক-নিষ্ঠ সাধক হরিশচন্দ্র তাঁর চরিত্রের অপূর্ব্ব প্রভাবে শিক্ষক, ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হোয়েছিলেন। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি হতে আরম্ভ কোরে সাধারণ অশিক্ষিত জন-মণ্ডলী

পর্য্যন্ত সকলেই তাঁকে চিনত এবং অপরিসীম শ্রদ্ধা করত। আমি ১৯১৮ সালে এই পরিবারযুক্ত হই। তখন বাড়ী-ভরা পাড়া-ভরা লোকজনের স্নেহমমতাপূর্ণ ব্যবহারে অল্পদিনেই মুগ্ধ হই।

বিশেষভাবে চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমার মনকে আকর্ষণ করেছিল।

গৃহ-সংলগ্ন স্কুলটী সারাদিন গমগম করত, আর সন্ধ্যায় ঐ বৃহৎ প্রাঙ্গণে প্রতিবেশী শিশুদের যেন আনন্দ-মেলা বসত। শিশু মন চিরদিনই আমার আকর্ষণের বস্তু শিক্ষাজগত থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতার আজন্ম পরিচিত আবেষ্টন থেকে বঞ্চিত হোয়ে এখানকার নির্জ্জনবাস অনেক সময় মনকে বিষণ্ণ করে রাখত, কিন্তু এই শিশু-জগতে প্রবেশ করতে আমার বিশেষ সময় লাগেনি। প্রতিদিন কর্ম্ম অবসরে বৃহৎ পরিবারের এবং প্রতিবেশীদের শিশুসন্তানগুলি নিয়ে আমি কর্মক্ষেত্র রচনা করে ছিলাম। এদের গান শিখিয়ে আবৃত্তি শিখিয়ে, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি নাটক অভিনয় করিয়ে আমার দিন মহা আনন্দে কাটতো। আমার শিশুপুত্র 'কৌস্তভ', এতো বড় পরিবারে জন্মে, সকলের আদর যত্ন পাবার সুযোগ পাওয়াতে আমার খুবই সৌভাগ্য মনে হয়েছিল। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ডিণ্ডিমে এই আনন্দে ভাঙন্ ধরলো। আমার আড়াই বছরের ছেলেও চিত্তরঞ্জনের হৃদয়গ্রাহী চাঞ্চল্যকর বক্তৃতার মর্ম্ম কিছুই না বুঝলেও তাঁর ২।৪টা কথা সভায় শুনেই আয়ত্ত কোরে ফেলেছিল। বাড়ীতে এসেই বৃহৎ পালঙ্কের উপর কতকগুলি বালিশ স্তূপাকারে সাজিয়ে স্বদেশী সভার উচ্চ-মঞ্চ নির্ম্মাণ করল এবং নিজে দেশনেতার ন্যায় গলার স্বর যথোপযুক্ত গম্ভীর কোরে বলল,—"তোমা কি হোলাজ চাও? (তোমরা কি স্বরাজ চাও) বাড়ীর ছোট বড় শিশুরদল সম্মুখে উন্মুখ শ্রোতৃমণ্ডলীর ন্যায় বলে উঠলো—"চাই —চাই"। আমার শিশুপুত্র তখন দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ কোরে কিছু দেওয়ার ভাণ কোরে বলল, "এই, নাও।" এই সামান্য দৃশ্যটী সকলের মনকে একাধারে চমৎকৃত ও আলোড়িত করেছিল।

যাহোক, সুখের সংসারে একটী অগ্নি স্ফুলিঙ্গ কোথা হতে উড়ে এসে পড়ে, গৃহসংসার জ্বলে পুড়ে যেন ছাই হোয়ে যাবার উপক্রম। এত বড় পরিবারটী ধীরে ধীরে, তিলে তিলে অভাব অনটনের মধ্যে পড়ে তাদের জীবনের স্বাভাবিক উজ্জ্বল আনন্দ মুখরতা হারিয়ে বিষাদে ম্রিয়মাণ হোয়ে পড়তে লাগলো। বাক্সংযমী হরিশ্চন্দ্র নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করতেন কিন্তু তাঁর ধর্ম্ম এবং কর্ম্মনিষ্ঠ অদম্য চরিত্র বলই তাঁকে আবার সংসার পালনের উপায় নির্দ্দেশ করে দিয়েছিল।

আমার স্বামী পরিবারের বড় ছেলে, নিজেও তখন গৃহী এবং পিতা। অন্নসংস্থানের সমস্যা তখন সব চেয়ে প্রবল। আমার পিতা পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের আহ্বানে আমরা আত্মীয় স্বজন পরিবৃত মমতাময় বৃহৎ সংসারের মায়া ছেড়ে কলকাতায় চলে এলাম। খুব আশা ছিল, দুজনেই শিক্ষাব্রতী, আমরা সহজেই উপার্জ্জন করতে পারব, পিতাও সেই ভরসাই দিলেন। অনেক চেষ্টায় আমার স্বামী একটী বে-সরকারী স্কুলে মাত্র ৫০ টাকা বেতনে একটি অস্থায়ী শিক্ষকের পদ পেলেন এবং আমি একটী ধনী-গৃহের বালিকা বধূর সকল রকম শিক্ষার ভার নিলাম ১০০ টাকায়। দৈনিক চার ঘণ্টার কাজ, প্রায় স্কুলেরই মতন। শিশুপুত্রটিকে একটী ঝিয়ের হাতে রেখে আমরা চাকরীতে যাই, মনের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর এবং ভাবনার বিষয় হোল ২।১ মাসের মধ্যেই ছেলেটার কঠিন পীড়া, রুগ্নশিশু ফেলে চাকরীতে যাওয়া সম্ভব হয় না, ছুটী চাইলাম কয়েকদিন। সপ্তাহ খানেক ছুটীর পর ছাত্রীর কাছ থেকে চিঠি এলো, সে এখন আর পড়বে না, স্থানান্তরে যাচ্ছে। এই সময় স্বামীর মনে ভীষণ অশান্তি, জননীর প্রথম কর্ত্তব্য সন্তান পালন, চাকরীতে গেলে সে কর্ত্তব্যে অবহেলা হয়, সুতরাং তাঁর রোজগারেই সংসার চলা চাই এবং সে রোজগার কলকাতায় হবার আশা নেই।

বন্ধুবান্ধবের কেউ কেউ ছিলেন ব্রহ্মদেশে, রেঙ্গুণ সহরে, তাঁরা উৎসাহ দিয়ে ডাকছেন "সমুদ্র পার হোয়ে এসো, কোন ভয় নেই, ভাল চাকরী পাবে।" আমার

মেজদি ১৯১৭ সালে রেঙ্গুনে যান। ভগ্নীপতি মহিতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের বিবাহের অল্পদিন পরেই রেঙ্গুন প্রবাসী Juctice J. R. Das মহাশয়ের একান্ত আগ্রহ এবং অনুরোধে রেঙ্গুন বেঙ্গল অ্যাকাডেমীর প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হোয়ে সস্ত্রীক রেঙ্গুনে যান। আমার মেজদি জ্যোতির্ময়ী ঐ স্কুলেরই বালিকা বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। আমরা চট্টগ্রামে থাকতেই মহিতবাবু আমার স্বামীকে রেঙ্গুনে যেতে বলেছিলেন। সেখানে শিক্ষা-বিভাগে উপযুক্ত কর্ম্মীর খুব অভাব ছিল অনেক বাঙালী ভাল চাকরী পেয়েছিলেন। সে সময় আমরা দেশ ছেড়ে সুদূর ব্রহ্মদেশে যাবার কল্পনাও করতে পারিনি, তাই ভগ্নীপতির প্রস্তাব সহজেই প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। এখন অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়ে, কতকটা যেন বে-পরোয়া হোয়েই তিনি পূজোর ছুটীতে একমাসের অগ্রিম বেতন পেয়ে ঐটুকুই সম্বল নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিলেন।

সে সময় বি, আই, এস, এন কোম্পানীর সমুদ্রগামী জাহাজগুলি সপ্তাহে তিনবার রেঙ্গুন-কলকাতা যাওয়া আসা করত। রেঙ্গুন প্রবাসী এক বন্ধুর পরামর্শে একটী তৃতীয় শ্রেণীর ডেক্-টিকিট (Deck with European Diet) ২০ টাকায় কিনে অনির্দ্দিষ্ট ভাগ্য-পরীক্ষায় রওনা দিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর ডেক্-টিকিটের দাম ছিল মাত্র ১৩ টাকা, উপরি ৭ টাকা দিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্য পাওয়া যেতো আর রেঙ্গুন বন্দরে উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বে মেডিক্যাল পরীক্ষা জাহাজের উপরেই হোয়ে যেতো। সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জাহাজ থেকে নামিয়ে "Quarantine" নামক একটী ঘেরাও করা স্থানে জড় করা হোত, মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য নানাপ্রকার উৎপীড়নও সহ্য করতে হোত, অনেক বেশী সময়ও লাগত, ছাড়া পেতে। রেঙ্গুন প্রবাসী বন্ধুটীর পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় যথেষ্ট ক্লেশ পেতে হয়েছিল, সেজন্য তিনি আমার স্বামীকে এই ব্যবস্থায় যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমার স্বামী তখন নিরামিশাষী ছিলেন, জাহাজের European dietএ অধিকাংশই মাংস জাতীয় খাদ্য থাকে, তিনি সিদ্ধ শাক-সব্জীগুলি মাত্র গ্রহণ কোরে বাকী সব একটী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানসহযাত্রীকে দিয়ে দিতেন। বাঙালী যাত্রীরা তাঁকে অনুযোগ করতেন খাবেন না যদি এসব, কেন মিছে জাহাজ কোম্পানিকে ৭ টাকা বেশী দিলেন ?" তিনদিনের যাত্রা শেষে যখন তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে নেমে যেতে দেখ্‌লেন সকলে, তখন, বুঝলেন এই ৭ টাকা বেশী দেওয়া কতখানি সার্থক হোল।

রেঙ্গুনে মহিতবাবুর বাসায় থেকে তাঁর এবং বন্ধুদের চেষ্টায় Rangoon Daily News পত্রিকায় ভাল কাজ পেলেন। শিক্ষকতা কাজের চেয়ে এ-কাজে অভিজ্ঞতা হোলে ভবিষ্যতে দেশেও এই কাজ পেতে পারেন, এই আশায় Journalism এর কাজই উৎসাহে গ্রহণ করলেন। আর অবসর সময় ২।১টী টিউশন কোরেও কিছু আয়ের ব্যবস্থা হোল। স্বামী দেখে গেলেন আমিও তখন বেকার, তাতে তিনি সন্তুষ্টই। কিন্তু তাঁর রেঙ্গুন যাত্রার পরেই আমার ছাত্রীর আহ্বান আবার এলো।

১৯২১ সালের নভেম্বরে আমাকে রেঙ্গুনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হোল। তদানীন্তন "Angora" জাহাজ আড়াই দিনে English mail নিয়ে রেঙ্গুনে পৌঁছাত, অন্য জাহাজগুলিতে ৩।৪ দিন লাগত। "Angora" জাহাজের এক বাঙালী Burser আমার মেজদিদের পরিচিত, তাঁর সঙ্গেই আমি আড়াই বৎসরের শিশুপুত্র নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করি। এ এক অপরূপ অভিজ্ঞতা জীবনের। অসংখ্য যাত্রী বুকে নিয়ে, বিচিত্র বেশী নরনারীর কোলাহল মুখরিত একটী ভাসমান্ অট্টালিকা বিশেষ যেন এই জাহাজটী। তিন তলায় খোলা ডেক্, সারি সারি ডেক্ চেয়ার। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ছাড়া আর কারো সেখানে প্রবেশের অনুমতি নেই। মাঝখান দিয়ে এক সারি কেবিন, Dinning saloon, সুসজ্জিত ড্রয়িংরূম। এখানে জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং প্রথম-শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য সুব্যবস্থা। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দোতলায় Cabin

স্নানাগার, খাবার ঘর, প্রভৃতি। একতলা এবং দোতলার দুই প্রান্তে খোলা ডেকের ত্রিপলের চাঁদোয়ার নীচে অগণিত তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, নানা দেশীয় লোকের সমাবেশ, কোনরকমে একটু বিছানা বিছিয়ে "মাছ-পাতুরির মত পাশাপাশি, ঘেঁসাঘেঁসি কোরে শুয়ে বসে আছেন। মহিলাদের কোনো আব্রুর ব্যবস্থা নেই। এর উপর সমুদ্রের ঢেউয়ে যখন জাহাজ নৃত্য করতে থাকে, তখন কে কার উপর গড়িয়ে পড়ে, তার ঠিকানা নেই, আর তার উপর যখন Sea sick হোয়ে সকলে উদরের খাদ্য অবিশ্রান্ত উদ্গীরণ করতে থাকে, তখনকার দৃশ্য কী বীভৎস, দুর্গন্ধে সুস্থমানুষকেও অসুস্থ কোরে তোলে। একই স্থানে পশুপক্ষীদেরও রাখা হোয়েছে। গরু, ভেড়া, ছাগল, শূয়র, হাঁস, মুরগী ও মানুষ যাত্রী পাশাপাশি চলেছে তিন, চারদিন ধরে। নরককুণ্ডের কিছু আভাস পাওয়া যায়। কতো ভদ্র পরিবারের মেয়েরা অর্থাভাবে এইভাবে যাতায়াত করতে বাধ্য হন। এই নরকবাসের পর রেঙ্গুনে নেমে ইরাবতীর জলে অবগাহন কোরে পবিত্র হন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হিসাবে আমি সমস্ত জাহাজ ঘুরে ফিরে দেখার অনুমতি পেয়েছিলাম। একদিন একটি পরিচিত মহিলাকে অজ্ঞান-অবস্থায় ঐ দুর্গন্ধময়, অপরিচ্ছন্ন স্থানে পড়ে থাকতে দেখি। জাহাজের কেরানী ও ডাক্তার দুজনেই বাঙালী, তাঁদের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানাই আমার কেবিনে একটা বার্থ খালি আছে সেখানে তাঁকে আনা যায় কিনা। জাহাজের নিয়মে বাধে তা সত্বেও তাঁরা ব্যবস্থা করে দিলেন একটা সম্পূর্ণ খালি কেবিনে এনে তাঁকে রাত্রিটা থাকার। কিন্তু মহিলাটীর জ্ঞান হবার পর ব্যবস্থা শুনে তিনি আপত্তি করলেন তখন ডাক্তার তাঁকে জাহাজের হাসপাতালের কেবিনে নিয়ে গিয়ে ভালো চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন দেখে, তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি নিজের কেবিনে ফিরলাম। এমন কত শত মহিলার কতো ক্লেশ ও অসুবিধা দেখে ক্ষুব্ধ হোলাম। মানুষ দরিদ্র হোলে কি তার মর্য্যাদাও নষ্ট হোয়ে যায়। মানুষ কেন মানুষের যোগ্য ব্যবহার ও সম্মান পাবে না? হাজার হাজার তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের টাকায় জাহাজ, রেলকোম্পানীর কতো লাভ হয়, অথচ তাদের জন্য মনুষ্যোপযোগী ব্যবস্থা হয় না কেন? তিনদিন সমুদ্র যাত্রার নানা অভিজ্ঞতা ও আনন্দ সঞ্চয় কোরে রেঙ্গুন বন্দরে এসে উপস্থিত হোলাম। দূর থেকে সোনার মুকুটধারী বৌদ্ধ প্যাগোডার (Shwe Dagon Pagoda) সু-উচ্চ চূড়ার সোনার ছাতির ঝালরে ছোট ছোট ঘন্টা হাওয়ায় দুলে দুলে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি তুলছে, সে দৃশ্য কী মনোরম। মনটা গেয়ে উঠলো—"এলেন নতুন দেশে॥" Pontoon এ জাহাজ ধীরে ধীরে এসে লাগল, উপরের ডেক্ থেকে দেখ্তে পেলাম—স্বামী ও ভগ্নীপতি প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। কে বলে নতুন দেশ? পুরাতনের সান্নিধ্যে এলে আবেষ্টনকে আর তেমন নতুন বোধ হয় না। ভগ্নিপতি হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা কোরে নিয়ে গেলেন তাঁদের বিদ্যালয় সংলগ্ন বাসভবনে। সেখানে মেজদি ও তার শিশুপুত্র কন্যা দুটী আমাদের পেয়ে মহা খুসী, মেজদি বল্লেন—"সেই তো বর্মায়ই আস্তে হোল তোমাদেরও?" মুহূর্ত্তে যেন ভুলে গেলাম, দেশ ছেড়ে সুদূর প্রবাসে এসেছি, ঠিক যেন পিত্রালয়ে দুই বোনের মিলন। কথায় বার্ত্তায় বুঝলাম, স্বামীর যে চাকরীর উপর নির্ভর কোরে আমাদের সেখানে যাওয়া, দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিনই সে চাকরী গেছে। সংবাদপত্রের উপরওয়ালা ব্যয়সংকোচের প্রয়োজন বোধে একসপ্তাহের নগদ বেতন হাতে দিয়ে নব-নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের বিদায় দিয়েছেন॥ "অভাগা যেথায় যায়, সাগর শুকায়ে যায়" এ যেন সেইরকমই অদৃষ্টের পরিহাস। মনের ভার লঘু কোরে দেবার আশায় ভগ্নিপতি আশ্বাস দিলেন আমায়, কলকাতার চাকরীটা ছেড়ে এসেছে বলে আফশোষের কারণ নেই, আমাদের বালিকা বিভাগের একজন শিক্ষিকা ছুটী নিয়েছেন, কর্ম্মখালি, সুতরাং তুমিই সে কাজে লেগে যাও। অন্য ব্যবস্থা পরে হবে, দুর্ভাবনার অবসর নেই।"

অল্প দিনের মধ্যেই দুটি চাকরীর সন্ধান পাওয়া গেল, একটা রেঙ্গুন সহরেই, এক বে-সরকারী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের পদ আর দ্বিতীয়টি মফঃস্বলে Prome Govt H. E. School-এ একটা অস্থায়ী শিক্ষকের পদ, আপাততঃ ৪।৫ মাসের জন্য। আত্মীয় বন্ধু সকলের ইচ্ছা রেঙ্গুনেই থাকি আমরা। রেঙ্গুনসহরে এতো বাঙালী যে রাস্তায় বের হোলে মনে হয়না, বর্মা দেশে আছি। কিন্তু আমরা স্বামী স্ত্রী অনেক চিন্তার পর মফঃস্বলে যাওয়াই স্থির করলাম।

সুদূর প্রবাসে যখন আসতেই হোল, সরকারী কাজ নেওয়াই সমীচীন হবে। একবার কাজে নিযুক্ত হোলে হয়ত স্থায়ী ভালো চাকরী পাওয়া সম্ভব হবে না। ১৯২১ এর ডিসেম্বর মাসে প্রথমে একাই ইরাবতী নদী তীরস্থ প্রোম সহর অভিমুখে রওনা দিলেন। প্রবাসী এক বাঙালী বন্ধুর নিকট হতে পরিচয় পত্র নিয়ে Prome এর এক বর্ষিয়ান বাঙালী উকীলের বাড়ী অতিথি হোলেন। প্রোমে তখন মাত্র কয়েক ঘর বাঙালী আছেন, বাজারে, দোকানে বর্মা ভাষা ছাড়া হিন্দী, ইংরিজী কিছুই চলে না। স্কুলটা সহরের এক প্রান্তে, বাঙালী পাড়া হোতে বেশী দূরে। আমাদের জন্য একটি কাষ্ঠ নির্মিত দোতলা বাড়ী (সহরে বেশীর ভাগ গৃহই কাঠের) পাওয়া গেল সহরের মধ্যে। আমাদের সঙ্গী হোলেন স্কুলেরই আর একজন বাঙালী শিক্ষক তাঁর পরিবার তখনও দেশেই ছিলেন। বাঙালী একজনকে সঙ্গী পেয়ে আমরা খুশীই হোয়েছিলাম একে প্রবাস তার উপর ভাষা জানা নেই, প্রতিবেশী সবই স্থানীয় লোক, বাঙালী চাকর দুর্লভ, সংসারের বিশেষ ভাবে বাজারের কাজ চালানো এক একসময় দুঃসাধ্য হোত। আর এক দুর্ভাবনা, সে সময় প্লেগ মহামারীর প্রকোপে সহরবাসী শঙ্কিত দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দিনের মধ্যে কতোবার যে শব-যাত্রা দেখেছি। সকলে বলে—'common disease'—আমি তো ভয়ে যেন আধমরা। বাড়ীতে ইঁদুরের উপদ্রবও কম নয়। স্বামী এবং বাঙালী বন্ধুটী প্রাতে সাড়ে আটটায় স্কুলে যান, আর ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা। সারাদিন শিশুপুত্রটি নিয়ে সম্পূর্ণ একা। সন্ধ্যায় নদীর ধারে একটু বেড়াতে যাওয়া—এই একমাত্র অবসর বিনোদন। একদিন আমার ছেলেটি পিপাসাতুর, নদীর ধারে কোথায় জল পাই? অনতিদূরে একটা ছোট বাসগৃহ চোখে পড়ল, বারান্দায় একখানা শাড়ী শুকোচ্ছে বাঙালীর ঘরই মনে হোল। একটী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় জানলাম, সেটা তাঁরই বাড়ী তিনি সমাদরে গৃহে ডেকে নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, আমার ছেলেকে জল খাওয়ালেন। ভদ্রলোক চট্টগ্রামের লোক রেলের কর্মচারী। একটি বাঙালী পরিবারকে চেনে সেদিন আমাদের কি আনন্দ! অল্পদিনেই যেন আপনজন হোয়ে গেলেন। তাঁদের একটা পোষা ময়না পাখী ছিল, বড় সুন্দর কথা বলত। আমার ছেলে সে বাড়ীর মাহলাটিকে "ময়না-পাখী মাসীমা" বলত। ধীরে ধীরে ২।৪ ঘর বাঙালী পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হোলাম, সকলেই পর্দানশীন, সংকীর্ণ গোঁড়ামির অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোকেদের মতন ঠুনকো জাতের বড়াই নিয়েই ব্যস্ত। আমি পর্দা মানিনা, জাত মানিনা, তায় আবার ব্রাহ্মসমাজের লোক, কাজেই কেহই যেন আমাকে ঠিক আপন লোক মনে করতে পারছেন না, কেবল মৌখিক সম্পর্ক পর্যন্ত। আমার ছেলে কৌস্তুভের তৃতীয় বার্ষিক জন্মদিনে শিশুদের নিয়ে একটু আমোদ প্রমোদ করবার ইচ্ছা হোল। বাঙালী পরিবারে গিয়ে গিয়ে ১৩।১৪টি ছেলে মেয়ে নিমন্ত্রণ করে এলাম।

একতলায় একটা বড় ঘর ছিল, সেখানে খেলা-ধূলার আয়োজনে শিশু-সম্মেলনটি বড় আনন্দের হোয়েছিল। নিজে রান্না করে এই কয়েকটা বালক বালিকাকে নিজে পরিবেশন কোরে খাইয়ে শেষ করেছি, এমন সময় কয়েকটি ভদ্রমহিলা ছেলেদের নিয়ে যেতে এলেন। একজন আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন—'করেছেন কি দত্ত-গিন্নী? চক্রবর্ত্তী গিন্নীর উপবীত ধারী ব্রাহ্মণ ছেলেকে আপনার হাতের রান্না খাইয়ে জাত মেরে দিলেন? চক্রবর্ত্তী-গিন্নী ভীষণ

চটবেন কিন্তু।" আমি তো অপ্রতিভ, বললাম, "চক্রবর্তী গিন্নী তাঁর বড় ছেলেকে আমার বাড়ী পাঠালেন কেন? দোষ তো তাঁরই, ছেলেমানুষের কি আর জাত থাকে?

পরে জেনে বিস্মিত হোয়েছিলেন, চক্রবর্তী-জায়া বলেছিলেন, দত্তগিন্নী নাকি তত্ত্বভূষণের মেয়ে, হাজার হোক ব্রাহ্মণের রক্ত তো গায়ে আছে?" আমি তাঁদের ভুল সংশোধন কোরে বলে দিয়েছিলাম, আমার বাবাও ব্রাহ্মণ নন, তাঁর পাণ্ডিত্যের উপাধি "তত্ত্বভূষণ"। আমরা চার মাস প্রায় প্রোমে ছিলাম, একদিনও বন্ধুরা কেউ আমার বাড়ীতে এক পেয়ালা চাও খাননি। সমুদ্রপারে গিয়ে এতো বিচিত্র জাতির সংস্পর্শে এসেও গ্রাম্য-সংকীর্ণতার গণ্ডীর ঊর্দ্ধে উঠতে না পারা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। শিক্ষার অভাব উদারতার অভাব, দৃষ্টির অভাবই ইহার কারণ কিন্তু এ অভাব থাকা সত্বেও তাঁদের হৃদয়ের পরিচয় অনেক পেয়েছি, যা আজও মনে গাঁথা রয়েছে উজ্জ্বল হোয়ে, একটুও অস্পষ্ট হয়নি। অনবধানতার ফলে একদিন আমার ঘরে আগুন লাগে, কাঠের দেয়াল ও মেঝে, কেরোসিন পড়ে গিয়ে জ্বলে ওঠে, স্বামী শয্যায় অসুস্থ, শিশু মেয়েটা ভীষণ ভাবে পুড়ে যায়। বর্মীরা আগুনকে বলে 'মি' এটুকু জানতাম তাই বলে চীৎকার করি, প্রতিবেশী বর্মীরা ছুটে এসে আগুন নিভিয়ে দেন, ডাক্তার ডেকে দেন, অনেক করেন। সেই সময় বাঙালী বন্ধুরা এবং নিকট প্রতিবেশিনী একটি ইণ্ডো বর্মিজ মেয়ে আমাদের অবর্ণনীয় সাহায্য ও সেবা করেছিলেন। প্রতিবেশিনী আয়েসা নাম্নী অর্দ্ধ-বর্মী মেয়েটী পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানকে বিবাহ করে, পূর্ণ পর্দা মেনে চলতেন। বোরখা পরে উঠানটুকু পার হয়ে আমার বাড়ীতে এসে অসুস্থ ছেলেটির পার্শ্বে বসে, দিনের পর দিন তার সঙ্গে খেলা করতেন। আমার তখন একটীও ঝি বা চাকর ছিল না—আমার যে তাতে কতো সাহায্য ও উপকার হত তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা প্রোম ছেড়ে আসার আগে আমার কাছ থেকে আমার ছেলের একটা ফটো চেয়ে নিয়ে বোতামের উপর কাচ মুখের ছবিটি তৈরী করিয়ে নিজের এঁাজতে (বর্মী মেয়েদের জামা) পরে একদিন দেখালেন, বললেন "তোমরা আমায় ভুলে যাবে আমি কিন্তু একে ভুলতে পারব না।" মেয়েটীর অশ্রুসজল মুখখানি আমি আজও ভুলতে পারি নি।

এপ্রিল মাসে গরমের ছুটীতে আমরা রেঙ্গুন যাবার দিন বাঙালী কয়েকটী বন্ধু পরিবারকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালাম। স্থানীয় এক উকীল চ্যাটার্জি মশায়ের গৃহে রান্না ও খাওয়া হোল আমরাও নিমন্ত্রিতের মতো তাঁদের সঙ্গে আহার কোরে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা দিলাম। গিয়ে দেখি প্ল্যাটফর্মে বহু বাঙালী এবং ভারতীয় বন্ধু আমাদের বিদায় দিতে উপস্থিত হোয়েছেন। আমাদের সত্যিই সেদিন তাঁদের ছেড়ে আসতে কষ্ট হোয়েছিল। দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের পর ব্রহ্মদেশের অন্যতম একটী সুন্দর সহর "মৌলমিনে" সরকারী স্কুলে স্থায়ী চাকরী পেয়ে আমরা সেখানে যাই।

মৌলমিন সাল্যুয়িন (Salwean) নদীর তীরস্থ একটী বন্দর। সমুদ্রগামী বহু মালবাহী জাহাজ (Cargo Boat) এখানে যাওয়া আসা করে। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের আত্মচরিতে পড়েছিলাম—তিনি জাহাজে এই মৌলমিন সহরে একবার গিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় ভূগোলে ব্রহ্মদেশের যে সব নদী এবং সহরের নাম মুখস্থ করেছিলাম, কে জানত যে আমাদের সেই স্থানে থাকবার এবং দেখবার সুযোগ ঘটবে। সহরটীর এক প্রান্তে খরস্রোতা স্যালুইন নদী প্রবাহিত, অপর প্রান্তে উঁচু নীচু পাহাড় শ্রেণী সু-উচ্চ দুর্গ প্রাচীরের মতন সহরটাকে বেষ্টন করে আছে। অর্দ্ধ মাইল প্রশস্ত এবং সাত মাইল লম্বা সহরটী, পিচঢালা কালো রাস্তাগুলি সহরের বুকে ঢেউয়ের মতন উঁচু নীচু আঁকাবাঁকা ভাবে বিস্তৃত, সমতল নয়। প্রকৃতির ঐশ্বর্যে ভরা মনোরম, স্বাস্থ্য সম্পদবান স্থানটি বড় ভালো লেগেছিল।

রেঙ্গুনের বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম এখানে অতি বৃষ্টির প্রকোপ, একটানা পনেরো দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়, তবে পাহাড়ে ঢালু জায়গা বলে কখনো জল বা কাদা জমে না। আমরা যেদিন ভোরের অস্পষ্ট আলোয় পৌঁছলাম, তখন অজস্র মুষলধারে বর্ষণ চলছে। ট্রেনের টার্মিনাস ষ্টেশনটার নাম মার্টাবান (Martaban) সেখানে নেমে একটি ছোট লঞ্চে নদী পার হোয়ে অপর তীরে মৌলমিন সহরে পৌঁছান যায়।

অবিরাম বৃষ্টিধারা মাথায় কোরে মৌলমিন ষ্টেশনে নেমে দুইখানি ঘোড়ার-গাড়ী বোঝাই কোরে রওনা দিচ্ছি সরকারী স্কুল অভিমুখে, সেখানে স্কুল প্রাঙ্গণেই হেড্‌মাষ্টারের জন্য নির্দিষ্ট একটা দোতলা কাঠের বাড়ী খালি আছে, স্কুলের ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল, সেই বাড়ীতেই আমরা থাকতে পারব, জানিয়েছিলেন। অকস্মাৎ দেখি, ছাতি মাথায়, ধুতি পরা একজন বাঙালী ভদ্রলোক গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাতে বলছেন। তিনি আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি এখানে নতুন আসছেন? এই বৃষ্টিতে স্ত্রী, কচি ছেলে নিয়ে কোথায় চলেছেন?" স্বামী তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, সরকারী স্কুলের প্রাঙ্গণে একটা বাড়ী আমাদের জন্য ঠিক আছে, সেখানেই যাচ্ছি, সঙ্গে খাবার-দাবার আছে, চাকরও আছে, কোনো অসুবিধে হবে না।

ভদ্রলোক শিউরে উঠে বল্লেন—"সর্ব্বনাশ, সে বাড়ী তো ভূতুড়ে বাড়ী, বহুকাল কেউ থাকে না। না, না, সে হবেনা, এখন আপনারা আমার বাসায় চলুন আমার স্ত্রী বারাণ্ডা থেকে আপনাদের দেখ্‌তে পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হোয়ে, আপনাদের নিয়ে যেতে আমায় পাঠিয়েছেন। আপনারা নতুন আসছেন, ছোট ছেলে সঙ্গে, কিছুতেই আপনাদের ঐ ধাদ্দাড়া গোবিন্দপুরে ভূতের বাড়ীতে যেতে দেবো না। সেখানে একটা বাঙালীরও মুখ দেখতে পাবেন না।" আমরা অনেক প্রতিবাদ কোরেও তাঁর হাত থেকে মুক্তি পেলাম না। গাড়ী ঘুরিয়ে নদীর পারেই তার বাসাতেই যেতে হোল। ভদ্রলোক বিজয় সিংহ স্থানীয় ষ্টেশনের মাল-কেরানী, কাছেই একটি দুটী-ঘর সম্বলিত ব্যারাকে বাস করেন। বৃহৎ পরিবার, স্বামী স্ত্রী এবং ৬।৭টী ছেলেমেয়ে। ভদ্র-মহিলা যেন কত কালের আপনজন, এমনভাবে আমাকে আদরে অন্দরে ডেকে নিয়ে গেলেন। মুহূর্ত্তে ছেলে-মেয়েদের 'মাসীমা' হোয়ে গেলাম। কী যত্ন, কী সেবা, ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে, গরম চা, লুচি প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য খাওয়ান, মিষ্টি কথা, গল্পে, মধুর আপ্যায়ন। দুখানি মাত্র ঘর, অথচ সেখানেই থাকতে অনুরোধ করছেন আমাদের। কি মুস্কিলেই পড়া গেল, এ যেন আদরের অত্যাচার॥ অনেক আলোচনার পর স্থির হোল, একজন বাঙালী ডাক্তার আছেন কাছেই, তাঁর পরিবার সম্প্রতি দেশে গেছেন, সেই বাড়ীর একটা অংশে আমাদের স্থান সহজেই হবে। ডাক্তার অতি সদাশিব ব্যক্তি, বাঙালী পাড়া, সেখান থেকে সরকারী স্কুলে যাওয়া আসার কোন অসুবিধে হবে না। সত্যিই ডাক্তার বিশ্বাস অতি অমায়িক লোক, একা থাকেন, আমাদের পেয়ে বিশেষভাবে আমার ছেলেটাকে পেয়ে তিনিও মহা খুসী। পরিচয়ে জানা গেল তিনিও চট্টগ্রামবাসী। অস্থায়ী বাসস্থানে একটু গুছিয়ে বসে ভাবলাম এ কী অসামান্য বদান্যতা! সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির জন্য একী আন্তরিকতা! তাদের নিরাপত্তার জন্য এত মাথাব্যথা কেন? কি কোরে আমাদের আরামে নিরাপদে সুব্যবস্থায় রাখবেন। তারজন্য এই সামান্য কেরানী পরিবারের কি অধিক ব্যস্ততা! অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠলো। প্রাণ গেয়ে উঠলো—

"পুরানো আবাস ছেড়ে চলি যবে।
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে।
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই"...

ক্রমশঃ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভানুমতীর খেল্ ?

ভারতীয় সংবিধান লইয়া যে প্রকার এবং যেভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহাশয়া—বিচিত্র কৌতুক প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাকে 'ভানুমতীর খেল' বলা অত্যুক্তি কিংবা অন্যায় হইবে না। প্রধানমন্ত্রী তাঁহার খেয়াল খুশী এবং গরজমত যে কোন ধারাকে (সংবিধানের) পরস্পর-বিরোধী ব্যাখার দ্বারা ভূষিত করিতেছেন। আজ সংবিধানের যে ধারাকে বলিলেন অনমনীয় দুদিন পরেই গরজের ঠেলায় তাহাকে যাদুমন্ত্রবলে করিয়া দিলেন পরম নমনীয়! বিশেষ করিয়া ভাগ্যহত এই পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিম বঙ্গ বাসীদের লইয়া শ্রীমতী ইন্দিরা যে বিচিত্র খেলা দেখাইতেছেন, তাহা অব্যাহত থাকিলে অচিরে পশ্চিমবঙ্গ ভিয়েৎনামের অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান অস্থির অবস্থায় এবং এ-রাজ্যে খুনখারাপী, রাহাজানী, লুটপাট, মানুষের নিম্নতম নিরাপত্তা এবং তাহাদের একান্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্মের গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য এবং রাখিতে হইলে যে পুলিসি ব্যবস্থা এবং আইন একান্ত প্রয়োজন ইন্দিরা গান্ধী তাহা করিতে দিবেন না এবং ইহা করিতে না দিবার একমাত্র কারণ, দেশপ্রীতি নহে, সি পি আইকে তুষ্ট রাখা। এই পার্টির সর্ব্ববিধ নষ্টামীকে সদা কার্যকর রাখা এবং ইহার একমাত্র কারণ ইন্দিরাজীর গদি পোক্ত করিতে হইলে তাঁহার মাইনরিটি সরকারের সি পি আই সমর্থন একান্ত এবং অবশ্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে ইন্দিরাজী যে কোন পন্থা গ্রহণ করিবেনই।

বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের যে বিষম অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে পি ডি অ্যাক্টের আশু পুনঃ প্রবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। স্বয়ং রাজ্যপাল এবং তাঁহার পঞ্চপ্রদীপ পরামর্শদাতারাও এ-বিষয় একমত। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? এ-ভাগ্যহত রাজ্যে আজ রাষ্ট্রপতির শাসন, অর্থাৎ কেন্দ্রকর্ত্রী ঠাকুরাণীর বিধি বিধান মত রাজ্যের প্রশাসন যন্ত্রের চাকা ঘুরিতেছে। কর্ত্রীঠাকুরাণী সবই বুঝেন, পি ডি অ্যাকটেরও অতি প্রয়োজন তাহাও জানেন কিন্তু যেহেতু সি পি আই এবং অন্য কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল ইহার বিরোধী—অতএব পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যহ দু-চারজন করিয়া পুলিস, কিছুসংখ্যক নিরীহ প্রজা খুন জখম এবং স্কুল কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ধ্বংসাত্মক অভিযান চলতে থাকুক—প্রধান মন্ত্রীর মতে এইসব 'কিস্সু না'। এবং এ-বিষয়ে তাঁহার মতই সর্ব্বজন গ্রাহ্য এবং শেষ কথা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে যে দিন প্রত্যহ ২০০ পুলিস, ২০০০ সাধারণ নাগরিক খুন হইতে থাকিবে, শ-পাঁচেক বিদ্যালয়, ৫০।৬০টি স্মারক মূর্ত্তি চুরমার করা সুরু হইবে, একমাত্র সেই দিনই হয়ত কেন্দ্রকর্ত্রী পশ্চিম বাংলার অবস্থা স্বাভাবিক নহে বলিয়া স্বীকার করিবেন, তাহার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীমতী প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের

অবস্থা একান্ত 'স্বাভাবিক' বলিয়া ঘোষণা করিতে বিরত হইবে না।

প্রধান মন্ত্রীর ধারণা তিনি তাঁহার শক্তির বলে সি পি আই রূপী মেষ চর্ম্মাবৃত ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আরোহন করিয়া তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন এবং সি পি আই-ও তাঁহাকে পৃষ্ঠে লইয়া সানন্দে প্রধান মন্ত্রীর আদেশ নির্দেশ-পালন করিতেছেন। কিন্তু এমন দিন অচিরে আসিবে যখন এই ছদ্মবেশী ব্যাঘ্র হঠাৎ পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহারাণীকে অসহায় অবস্থায় লইয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বিনা বাধায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে। প্রধান মন্ত্রীর এত বুদ্ধি, এত বিদ্যা এত ইতিহাসি জ্ঞানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ও রাজনৈতিক চাতুর্য্যের এত বড় কুশলী হইয়াও কম্যুদের চরিত্র এখনও বুঝিতে পারিলেন না, আশ্চর্যের কথা। চাটুকারদের ভজনে এবং স্তুতিতে ইন্দিরা নিজেকে যাহা নয় তাহাই ভাবিতেছেন—কিন্তু তাহার এ-মোহ ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে তিনি হয়ত প্রাণপণ প্রয়াস করিয়া, দেশের সর্বনাশ করিয়াও নিজেকে ভারতের রাণীর সিংহাসনে চিরস্থায়ী করিবার শেষ চেষ্টা একবার করিবেনই।

ভাবিতে দুঃখ হয় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, বিজয় সিং নাহার, তরুণকান্তি ঘোষ প্রভৃতির মত শিক্ষিত এবং ভদ্র কংগ্রেসীরা আজ কেমন করিয়া ইন্দিরার স্তাবক বাহিনী ভুক্ত হইলেন? অতুল্য ঘোষের প্রতি বিষম ক্রোধেই কি ইহাদের শ্রেয়-অশ্রেয় জ্ঞান একাকার করিয়া দিল? ইন্দিরার ভক্ত এবং স্তুতিকার হইয়া ইহারা বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর জন্য কি করিতে পারিলেন? একান্ত হীন অবস্থাতেও পশ্চিমবঙ্গে এখনও এমন বহু গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, যাহারা রাজ্যপাল হইবার পরম যোগ্য। কেন্দ্রের শত শত কমিশন কমিটিতেও বহু বাঙ্গালীর স্থান হইতে পারে বিদেশী রাষ্ট্রে ভারতের দূত এবং প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবার যোগ্যতাও বহু বাঙ্গালীর আছে কিন্তু এইসব পদে অজ্ঞাত, অযোগ্য এবং অতি সাধারণ অবাঙ্গালীর নিয়োগ সম্ভব হইলেও বাঙ্গালী নাই—কেন? শিক্ষা এবং শিক্ষা সংস্থার খ্যাতনামা প্রশাসক আজ নব-কংগ্রেসের 'বহুগুণার' প্রতাপে প্রায়—ত্রিগুণা সেন বাঙ্গালী বলিয়াই হয়ত নিগুর্ণা হইয়াছেন। শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীকে আজ কে তৈলদান মন্ত্রীতে রূপান্তরিত করিল? সামান্য সম্মানহানির কারণে যে অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ, শরৎচন্দ্র কেন্দ্র মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেন, বিষম অপমান এবং অবমূল্য হইয়াও ত্রিগুণা সেন পদত্যাগ করিবার মত সাহস হারাইলেন কেন? কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব কি তাঁহার কাছে আজ এত মূল্যবান হইল?

পশ্চিমবঙ্গের নব-কংগ্রেস নেতারা বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর জন্য কি করিতেছেন?

বড় বড় ফাঁকা নীতিবাক্য, হিতোপদেশ এবং নব-কংগ্রেসের 'টপ্' নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য নিবেদন ছাড়া আমাদের বিজয়সিং নাহার সিদ্ধার্থ রায়, তরুণকান্তি ঘোষ প্রভৃতি নব-কংগ্রেসী নেতারা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙ্গালীর প্রকৃত কল্যাণ সাধনে আজ পর্য্যন্ত কি কতটুকু করিয়াছেন জানিতে পারিলে সুখী হইতাম। ভারতের অন্য রাজ্যের নেতারা যখন তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যের জন্য কেন্দ্রকে চাপ দিয়া শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর সেই সময় আমাদের এই দুঃখ দারিদ্র অভাব নিপীড়িত রাজ্যের জন্য কেন্দ্র সরকার একেবারে নির্ব্বাক। অন্য রাজ্যে যখন কেন্দ্রীয় আওতায় নূতন নূতন শিল্প স্থাপন এবং যে সব সংস্থা রহিয়াছে তাহাদের প্রসারিত করা হইতেছে, নূতন তৈল শোধনাগার, ইস্পাত কারখানা, মৎস চাষের জন্য গবেষণাগার প্রকল্প ঘোষণা করা হইতেছে, এমন কি অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গে শুভাগমন করিয়া এ-রাজ্যের শিল্পপতিদের তাঁহাদের রাজ্যে গমন করিয়া শিল্পসংস্থা স্থাপন করিতে বিবিধ প্রকার লোভনীয় টোপ ফেলিতেছেন, ঠিক সেই সময় আমাদের রাজ্য সরকার এবং জনহিতে অর্পিত প্রেহমন নেতারা নিজের নিজের

এবং নিজ নিজ দলের শক্তি প্রভাব বিস্তার বৃদ্ধি করিতেই ব্যস্ত। রাজ্য সরকারকে কিছু বলিবার নাই, কারণ ধাবন-বিশারদ রাজ্যপাল এবং তাঁহার 'পঞ্চ-প্রদীপ' কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত তেলের সহায়তায় প্রয়োজন মত অল্পবিস্তর প্রশাসনিক আলোক বিতরণ মাত্র করিতেছেন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য নূতন কিছু করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে কেন্দ্রের নির্দেশ ছাড়া। এমন কি যে-সকল শিল্পপতি, এ-রাজ্য হইতে, একান্ত বাধ্য হইয়া, তাহাদের সংস্থা অন্যরাজ্যে চালান করিতেছেন, তাহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কিংবা অধিকার বর্ত্তমান রাজ্য সরকারের নাই। অচিরে বর্ত্তমান অবস্থা এবং শিল্প অপসারণের গতিরোধ করা না হইলে, পশ্চিমবাঙলা অল্পকাল মধ্যেই ভ্যারেণ্ডা এবং আগাছা চাষের পরম মনোরম ভূমিতে পরিণত হইবে।

বাঙলার ত্রয়ী নব-কংগ্রেসী নেতা শুনিয়াছি বিষান বুদ্ধিমান এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণকামী, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার পরিচয় কতটুকু পাওয়া যাইতেছে? এই ত্রয়ীনেতাও কি তাঁহাদের নজর ১৯৭২ সালের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া, সেইমত নিজেদের আখের গুছাইতে ব্যস্ত রহিয়াছেন? দেশবন্ধু দৌহিত্র তাঁহার মাতামহের আদর্শ এবং বাঙলা ও বাঙালীর প্রতি গভীর স্নেহ প্রেমের কথা ভুলিয়া গিয়া 'দলে' ভিড়িলেন? আজ তাঁহারও এই বিশ্বাস হইয়াছে—ক্ষমতার শীর্ষস্থান দলহীনের ন-সত্য।

শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, আদর্শবাদী এবং পাকা ব্যারিষ্টার—আজ ছোট-আদালতী-পুঁটি প্রিতার জওয়ানের তাবক হইবেন বা হইতে পারেন, ইহা কেহ কখনও ভাবিতে পারেন কি? কিন্তু এই অসম্ভবই আজ পশ্চিমবঙ্গে সহজ সম্ভবই সত্যে পরিণত হইল—হায় দেশবন্ধু।

কলিকাতা ভূগর্ভ রেল

এখনও সেই পরিকল্পনার বিষম চক্রেই ঘুরিতেছে, কোনদিন যে ইহা বাস্তবে পরিণত হইবে এমন মনে হইতেছে না। কেন্দ্রে কত রেল মন্ত্রী বদল তিনটি পঞ্চবর্ষী পরিকল্পনাও শেষ হইলে,কিন্তু কলিক ভূগর্ভ (এবং চক্ররেল) এখন পর্য্যন্ত পরিকল্পনা আকাশের অথবা অদৃশ্যপারি হইয়াই রহিয়া গেল।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে তৎকালীন পশ্চিমব মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় কয়েক জন ফর ভূগর্ভরেল বিশারদ এবং যাদবপুর ইন্জিনিয়ারিং টেক্‌নলজী কলেজের সহযোগে কলিকাতায় ভূ রেল সম্পর্কে সমীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই সং সমীক্ষক দলের রিপোর্টে বলা হয় যে কলিকা ভূগর্ভরেল সম্ভব নয়। তাহার পর এই পরিকল্পনা প্রকার চাপা পড়িয়া যায়। গত কয়েক মাস হ কলিকাতার ভূগর্ভরেল সম্পর্কে আবার নূতন কা কথাবার্ত্তা সুরু হইয়াছে, এবার কয়েকজন রাশি বিশেষজ্ঞ আসিতেছেন তাঁহাদের অমূল্য উপদ দান করিতে। কিন্তু এত দেশ থাকিতে কেন্দ্র সরকা রেলমন্ত্রী হঠাৎ এমন ভাবে রাশিয়ার প্রতি নজর দিলে কেন। রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের ভূগর্ভে পরমাণ বোমা ফাটাইবার বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান এবং টেক্‌নিক্যা জ্ঞান অবশ্যই আছে, কিন্তু ভূগর্ভে রেল সম্পর্কে তাহাদে বিষম জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার কথা কাহারও জানা আ কি না সন্দেহ। কলিকাতার ভূগর্ভ-রেল সম্প অবশ্যই একথা বলা যায় যে যদি বিদেশী অভিজ্ঞত আশ্রয় এবং বিদেশী অভিজ্ঞব্যক্তিদের সহায় গ্রহন অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয় তাহা হইলে:

"Why not approach the London Transpo undertaking which operates an extensive an the most efficient underground railway syste in the world."

উপরিউক্ত সংস্থার ভূগর্ভরেল সম্পর্কে অভিজ্ঞ দীর্ঘকালের—। অল্পদিন পূর্ব্বে এই সংস্থা লণ্ডনে ভূগর্ভরেল আধুনিকীকরণ করার সঙ্গে সঙ্গে—এই রে প্রসারিতও করিতেছেন (the Victorian Line-extension)। আর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে

"the technical aspects of this latest venture could be useful to us considering the similiarity of the Calcutta sub soil to that of London."

আমাদের কেন্দ্রীয় প্রধানরা গত বেশ কিছুকাল হইতে সোভিয়েট প্রেমে এতই অভিভূত যে—ভারতের পক্ষে স্বার্থ বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহারা ভালমন্দ সর্ব্বপ্রকার রাশিয়ান প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন বলা চলে। প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—বি বি সি'র প্রতি ভারত সরকারের অসৌজন্যমূলক ব্যবহার। রেডিও প্রচার বিষয়ে রাশিয়ার একটি রেডিও প্রতিষ্ঠান যে ভাবে এবং যে ভাষায় ভারতের কুৎসা প্রচার দিনের পর দিন করিয়া যাইতেছে, ভারত সরকার তাহার অতি মৃদু প্রতিবাদ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতের এ-প্রতিবাদ ক্রেমলীন মালিকরা ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করিতে দ্বিধা করে নাই। রাশিয়ার জবাবে আমরা এই প্রথমবার জানিতে পারিলাম যে লৌহ যবনিকার দেশেও সরকারী আওতা মুক্ত স্বাধীন একটি রেডিও প্রতিষ্ঠান আছে—এতদিন এই তথ্য রাশিয়ার বাহিরে কাহারও জানা ছিল না।

কলিকাতার ভূগর্ভরেল সম্পর্কে নিয়ে একটি প্রখ্যাত দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি

আনন্দবাজার বলিতেছেন :

রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ কলিকাতায় ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপন সম্পর্কে রুশ বিশেষজ্ঞদের আহ্বানের কথা জানাইয়াছেন। শ্রীনন্দর ঘোষণা অনুসারে আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যেই রুশ-বিশেষজ্ঞেরা কলিকাতায় আসিবেন এবং আগামী বৎসর জুলাই মাসের মধ্যে সমীক্ষা শেষ করিয়া রিপোর্ট দিবেন। কয়েকমাস আগে রেল-দপ্তরের ভার পাওয়ার পর শ্রীনন্দ কলিকাতায় আসিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ভূগর্ভস্থ রেলপথই স্থাপিত হইবে এবং বর্তমান বৎসরেই উহার কাজ আরম্ভ হইবে। কলিকাতায় আসিয়া বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলিয়াই নাকি শ্রীনন্দ বুঝিয়াছিলেন যে, এই মহানগরীতে ভূগর্ভস্থ রেলপথ স্থাপনের কোন অসুবিধা নাই। তাহার পর একটি ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা নিজেদের উদ্যোগেই প্রস্তাবিত রেলপথ সম্পর্কে সমীক্ষা করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও বিশেষজ্ঞদের সমীক্ষা পর্যালোচনা না করিয়া রুশ বিশেষজ্ঞদের দ্বারস্থ হইয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতায় ভূগর্ভস্থ রেলপথ স্থাপনের সম্মতি না দিলে কলিকাতায় যাত্রী-পরিবহণের জন্য ভূগর্ভস্থ রেলপথের বদলে দমদম-প্রিন্সেপঘাট অর্ধ-চক্র রেলপথ স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইবে।

রুশ-বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সমীক্ষার নাম করিয়া রেলমন্ত্রী কলিকাতায় নূতন রেল-প্রকল্পে হাত দেওয়ার কাজ অন্তত আরও দেড় বৎসর পিছাইয়া দিলেন। ভূগর্ভ রেলপথ সম্পর্কে সমীক্ষার পাশাপাশি প্রস্তাবিত দমদম-প্রিন্সেপঘাট রেলপথ সম্পর্কে সমীক্ষা চালু রাখার কথা জানিয়া কলিকাতার নাগরিকেরা আদৌ আশান্বিত বোধ করিতেছেন না। কারণ প্রথম পর্যায়ে ভূগর্ভ রেলপথ হইবে টালিগঞ্জ হইতে ডালহৌসি স্কোয়ার এবং শিয়ালদহ হইতে ডালহৌসি স্কোয়ার পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিয়ালদহ হইতে দমদম পর্যন্ত ওই প্রস্তাবিত রেলপথ সম্প্রসারণের কথা বলা হইলেও মহানগরীর উত্তরাঞ্চলের যাত্রীদের বড় বাজার হাওড়া ব্রিজ ও ডালহৌসি স্কোয়ারে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য অর্ধ-চক্র রেলেরও প্রয়োজন। প্রস্তাবিত রেলপথ দুইটি কখনও একটি অপরটির বিকল্প হইতে পারে না। নূতন কোন সমীক্ষার কথা শুনিলেই উহা রেল দপ্তরের দায়িত্ব এড়ানোর আর একটি অজুহাত বলিয়া কলিকাতার নাগরিকেরা সন্দেহ করিয়া থাকেন। কারণ ১৯২৫ সন হইতে কলকাতায় চক্রবেড় রেল চালু করার কথা হইতেছে। এ বিষয়ে দেশী-বিদেশী সংস্থার সমীক্ষাও কম হয়

নাই। যেজন্ত কমিশনও এ ব্যাপারে সমীক্ষা করিয়াছেন। বার বার সমীক্ষা; কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটীর বার বার কলিকাতা শহরের জন্ত রেল-দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন সেই টাকায় অর্ধ-চক্র রেলের অন্তত অর্ধেক কাজ সমাপ্ত হইতে পারিত।

কলিকাতার ভূগর্ভস্থ রেলপথ সম্পর্কে ফরাসী ও অন্যান্ত বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট সরকারের ঘরেই আছে। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টও রেল-দপ্তরের হাতে আছে। কিন্তু রেলমন্ত্রী হঠাৎ বিদেশ হইতে নূতন করিয়া বিশেষজ্ঞ আনিয়া তাঁহাদের উপর সমীক্ষার ভার দিতেছেন কেন? দেশে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ না থাকিলেই বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনিতে হয় এবং দেশী বিশেষজ্ঞের পরামর্শের ভিত্তিতেই বিদেশী বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়া থাকে। রেলমন্ত্রী কাহার বা কাহাদের পরামর্শে রুশ-বিশেষজ্ঞদের উপর কলিকাতা সম্পর্কে সমীক্ষার ভার দিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানিতে উৎসুক।

পৃথিবীর বিভিন্ন বড় শহরেই ভূগর্ভ রেলপথ আছে। ভূগর্ভ রেলপথে সবচেয়ে বেশী যাত্রী চলাচল করে নিউ ইয়র্ক শহরে—দিনে সাড়ে ৩৫ লক্ষ। লণ্ডনের ভূগর্ভ রেলপথের যাত্রী-সংখ্যা দিনে ১৮ লক্ষ। কিন্তু মস্কো শহরে ভূগর্ভ রেলপথে প্রতিদিন ৭ লক্ষ যাত্রী চলাচল করে। ওই একই দূরত্বের রেলপথে টোকিও শহরে প্রতিদিন যাত্রীর সংখ্যা ৩০ লক্ষের উপর। কলিকাতা শহরে ভূগর্ভ রেলপথে যাত্রীর সংখ্যা ১২ লক্ষ হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ভূগর্ভে রেলপথ যখন চালু হইবে তখন শহরতলির যাত্রীর সংখ্যা ১২ লক্ষ ছাড়াইয়া যাইবে। টোকিও শহরে ভূগর্ভ রেলপথে কেবল বেশী যাত্রীই চলাফেরা করে না রেলগাড়ির গতিও অনেক বেশী। সমুদ্রের তলা দিয়া ভূগর্ভ রেলপথের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করিয়া জাপান কারিগরী দক্ষতার পরিচয় দেখাইয়াছে। জাপান ও ওসাকার মধ্যে ২৫০ মাইল গতির ট্রেন চালু করিয়া রেল চলা-চলের ক্ষেত্রে জাপান যুগান্তর আনিয়াছে। রেলমন্ত্রী অবশ্য বলিয়াই দিয়াছেন যে রুশ-বিশেষজ্ঞদের সম্মতি না মিলিলেও দমদম-প্রিন্সেপঘাট রেলপথ চালু করা হইবে। রুশ বিশেষজ্ঞরা ভারতের অন্যান্ত বিদেশী বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা কোন দিক হইতেই শ্রেষ্ঠ নন যে, তাঁহাদের মতামতই শিরোধার্য করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার যে সময় ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী দক্ষতা রপ্তানির প্রস্তাব করিতেছেন, সেই সময়ে বিদেশে খ্যাতি অর্জনকারী ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের পরামর্শ অনুসারে কলিকাতা ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনে উদ্যোগী হওয়া উচিত। কলিকাতার নাগরিকেরা সমীক্ষার কথা শুনিতে চায় না; ভূগর্ভ রেলপথের কাজের আরম্ভ দেখিতে চায়। রেলমন্ত্রী রুশদের উপর সমীক্ষার ভার না দিয়া কাজের নির্দেশ দিতেন, তাহা হইলে কলিকাতার নাগরিকেরা আশ্বস্ত হইতে পারিত।

এই মন্তব্যের পর আমাদের কোন বক্তব্য নাই।

এবং চক্ররেল

কলিকাতার চক্ররেল প্রবর্তন প্রকল্প লইয়া বিগত বহু বৎসর যাবত বহুত বহুত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চক্ররেল আলোচনা চক্রের ঘূর্ণি পরিত্যাগ করিয়া মাটিতে এখনও অবতরণ করিতে পারিল না। ইতিপূর্বে কয়েকবার বলা হইয়াছে কেন্দ্র সরকারে এখন একটি দুষ্ট চক্র আছে, যাহার একমাত্র কাজ পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রকার প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করা। বে মহামান্ত এবং মহাপণ্ডিত মন্ত্রী মহোদয়গণও এ-বিষয়ে নিরপরাধ নহেন, এবং এমন কয়েকজন প্রাক্তন ও বর্তমান

মন্ত্রীর কথা বলা যাইতে পারে যাঁহারা এমনিতে 'ভাল' মানুষ এবং মাসান্তে নিয়মিত বেতন উপভোগ করা ছাড়া আর কিছুই করেন না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিষয় কোন কিছুর প্রস্তাব মন্ত্রী মহলে উঠিলেই, এই শ্রেণীর মন্ত্রীরা পরম তৎপর হইয়া উঠেন এবং প্রস্তাব যাহাতে প্রস্তাবেই শেষ হয়, তাহার জন্য সর্ব্ববিধ সার্থক প্রয়াস করেন।

ভারতের অন্যান্য বহু রাজ্যে, বিষম অসুবিধা থাকা সত্বেও নানা প্রকার কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবে পরিণত করিতে এবং তাহার জন্য কোটি কোটি টাকা জলে-ভূগর্ভে নিক্ষেপ করিতে কেন্দ্রসরকার কোন দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু যে-রাজ্য হইতে কেন্দ্রের প্রশাসন বিলাসের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব আদায় হয়, সেই পশ্চিমবঙ্গকেই ভিখারীর মত মুষ্টি ভিক্ষা দান করিয়া সন্তুষ্ট করিবার সযত্ন প্রয়াস কেন্দ্রসরকার সর্ব্বদা করিয়াছে, করিতে থাকিবে-যতদিন পর্য্যন্ত না এই হতভাগ্য কেন্দ্র উপেক্ষিত রাজ্য চোখ রাঙ্গাইয়া ঘুসি পাকাইয়া তাহার ন্যায্য দাবি আদায়ের চেষ্টা করিবে। এ-বিষয় কেবল কেন্দ্রকে দোষী এবং দায়ী করিলে চলিবে না, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা হাতে পাইয়াও, তাহাদের সর্ব্বপ্রয়াস নিবদ্ধ করিল দল এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের সার্থকতা অর্জনে। রাজ্যের এবং রাজ্যবাসী হতভাগ্যদের দুঃখ মোচনের প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকিল কেবল বাক্যেই। ফলে এই দলগুলি না পারিল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতে, না পারিল সেই-নিপীড়িত-জনগণের, যে-জনগণের জন্য ইহারা পথে ঘাটে চোখে পেঁয়াজ ঘসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে অভ্যস্ত—কোন দুঃখ মোচন করিতে, না পারিল প্রশাসনিক গদিতে তের মাসের বেশী প্রতিষ্ঠিত রাখিতে নিজেদের।

এ-বিষয় বেশী কথা না বলিয়া আজ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে জনকয়েক 'বিশিষ্ট ব্যক্তি' তাহাদের জন-প্রতারণার পুণ্যপ্রয়াস চিরকাল চালাইতে পারে না। হঠাৎ এমন একটা সময় অবশ্যই আসিবে যখন বঞ্চিত জনগণ তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য যেমন করিয়াই হউক আদায় করিবে। এ-কথা অদ্যকার কেন্দ্রসরকার তথা শাসক নব-কংগ্রেসের সম্পর্কেও অতি-প্রযোজ্য। কেন্দ্রের শাসকদের মন্ত্রণা প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে চিড় দেখা দিতে আরম্ভ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতি একটু সদয় দৃষ্টি দান যদি না করেন, পশ্চিমবঙ্গকে মুষ্টি ভিক্ষা না দিয়া, এ-রাজ্যের ন্যায্য প্রাপ্য দান করিতে চেষ্টা করুন। কর্ত্তরা এ-কথা ভুলিয়া যাইবেন না, তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গকে যাহা দিবেন তাহা কাহারও উত্তরাধিকার-সূত্রে-প্রাপ্ত পৈত্রিক ধন ভাণ্ডার হইতে নহে। রামের টাকা রামকে দিবেন, তাহাতে শ্যামের ট্যাঁকে টান পড়িবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যাহাদের নিকট হইতে ১০০ টাকা গলায় গামছা দিয়া আদায় করা হইতেছে, পরিশ্রম এবং গামছার মূল্য বাবদ শতকরা ১৫।২০ টাকা কমিশন কাটিয়া লইয়া রামের ধন রামকে ফিরাইয়া দিতে দোষ কি? যাহার টাকা তাহাকে বঞ্চিত করিয়া, অর্থাৎ রামের টাকা শ্যামকে দিবার অধিকার কেন্দ্রীয় যুবরাজদের কে দিল?

বারোহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বিচি।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার পৌর সর্ব্বাধিনায়ক, অর্থাৎ সহজ বাঙ্গলায় যাহাকে মেয়র বলিয়া থাকি—তিনি হঠাৎ বিষম ক্ষেপিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী পৌর পিতারাও। এই অতি-স্বাভাবিক এবং ন্যায্য ক্রোধের কারণ Calcutta Metropolitan Development Authorityর (C. M. D. A.) হস্তে কলিকাতা এবং বৃহত্তর কলিকাতার সকলপ্রকার প্রকল্প উন্নয়ণ কার্য্য ন্যস্ত করা হইয়াছে, এবং সরকারের এই ব্যবস্থা প্রায় সবকয়টি সংবাদপত্র কর্ত্তৃক সমর্থিতও হইয়াছে। কি ভীষণ অন্যায় দেখুন! জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত কলিকাতা কর্পোরেশনকে তাহার কর্ত্তব্য পালন হইতে এমন করিয়া বঞ্চিত করা চলিতে পারে না, এবং চলিতে

পারে না বলিয়াই আর কালবিলম্ব না করিয়া C. M. D. A. কে বাতিল করিয়া কর্পোরেশনকে কলিকাতার (বৃহত্তর কলিকাতা সহ) প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পাদি কার্য্যকর করিবার বাধাহীন ক্ষমতা দিতে হইবে—দিতেই হইবে কারণ মেয়র মহাশয় বলিতেছেন ইহা কলিকাতার করদাতা এবং জনগণের দাবি। কথা শুনিয়া মনে হইতেছে জ্যোতি প্রমোদের কণ্ঠ হইতেই যেন সি পি এম বাণী নির্গত হইতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলকাতা কর্পোরেশনের পৌরপিতা-সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—প্রস্তাবে বলা হইয়াছে :—

"That this meeting further condemns the sinister, the most obnoxious leading editorial of the Statesman dated 16 9-70 that undermines the role of the Corporation of Calcutta and nakedly pleads for the CMDA as the best substitute of the Corporation of Calcutta, thereby undermining the great role of peoples right in earning the right of local self-government against imperialism through sustained struggles against foreign power and upholding its (Statesmans) imperialist heritage against all that stands for the essence of democracy. The Corporation of Calcutta reiterates that the right to execute the schemes for the development of Calcutta is an inherent right of this great Local Self-Government Institute and that the money assured by the Central Government for the purpose is Corporation money and the Corporation is the only competent body to handle this money and execute these schemes and therefore there is no question of Corporations refusing to work out this development work".

"That this House also condemns the role of other Bourgeois Presses like Ananda Bazar Patrika, Hindusthan Standard, Jugantar, Amrita Bazar Patrika etc which are nakedly advocating for the replacement of Corporation—a body of the elected representatives by CMDA—an AMERICAN agency, and urge upon them to put things in their proper perspective so that the people are not misled".

অর্থাৎ—একমাত্র পৌরপিতারাই কলিকাতার পৌর কর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং এই না পড়া পণ্ডিতের দল যাহা চাহিবেন, দাবি করিবেন তাহা সরকারকে নত মস্তকে স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ পৌরপিতারাই কলিকাতার করদাতা তথা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি "মাউথপিস্" (মুখপাত্র) একনিষ্ঠ সি পি এম মেয়র শাসিত পৌরসভার নিকট হইতেই এই প্রকার নির্লজ্জ এবং ধৃষ্টতা আশা করা যাইতে পারে।

কলিকাতা পৌরসভার গুণের কথা অকথ্য কথন—একথা কলিকাতাবাসী মাত্রেই বলেন এবং প্রত্যহ সকালে নিদ্রাভঙ্গের পরই "কলিকাতা কর্পোরেশন নিপাত যাউক" কলিকাতার ভাগ্যবিধাতার শ্রীচরণে এই প্রার্থনাই নিবেদন করেন।

"সি এম ডি এ" কোন হিসাবে মার্কিন্ এজেন্সি হইল ঠিক বুঝা গেল না—একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ভারত সরকারকেও এক হিসাবে মার্কিন এজেন্ট বলা যাইতে পারে, কারণ ভারত সরকারের অভাব মোচন করিতে যে দয়ার দান বিদেশ হইতে আসে তাহার শতকরা প্রায় নব্বই অংশই যোগান দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কলিকাতার সব কয়টি দৈনিক পত্র হইল বুর্জ্জয়া, বড়লোকদের স্বার্থবাহী, আর নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধি এবং স্বার্থরক্ষক হইল প্রচুর বিত্তশালী বামপন্থী বিশেষ করিয়া সি পি এম এবং সি পি আই—চীন এবং রাশিয়ার দালালী করাই হইল যাহাদের উপজীবিকা।

আরো আছে—

কলিকাতার পৌর পিতারা সি এম ডি-এ বাতিল করিয়া তাঁহাদের উপর কলিকাতার ভালমন্দ এবং ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া দিবার দাবি করিয়াছেন কিন্তু কলিকাতার জনসাধারণ, করদাতারা এবং সকল সংবাদ পত্রই দাবি পেশ করিয়াছেন, অবিলম্বে কলিকাতা পৌরসভাকে বাতিল করিয়া পৌরকর্ত্তব্য পালনের জন্ত কোন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কালবিলম্ব না করিতে।

বর্ত্তমান মেয়র তথা কলিকাতা পৌরসভার আর একটি সামান্ত দাবি আছে এবং তাহা এই যে—

কলিকাতা এবং সহরতলীর উন্নয়নের জন্য যে কোটি কোটি টাকা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার ব্যয় করিতেছেন তাহার সবটাই কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে দিতে —অর্থাৎ 'ডাইনির হাতে পুত্র সমর্পণ' করিতে। এ-বিষয় অধিক কিছু বলার প্রয়োজন এখন নাই কেবলমাত্র এইমাত্র বলা চলে যে 'লজ্জা, মান, ভয়'—এই তিন না থাকিলেই কলিকাতার মেয়র তথা কাউন্সিলার হওয়া যায়।

কলিকাতা পৌরসভার খাজনা (ক্রম বর্দ্ধমান) যাহা আদায় হয় তাহার সবটাই অকেজো এবং অদৃশ্ত কর্ম্মী —শ্রমিক খাওয়াতেই ব্যয় হইয়া যায়। অন্যান্য খরচ মিটাইবার জন্ত মেয়র সাহেবকে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের দুয়ারে হাত পাতিতে হয় অহরহ। এইমাত্র সেদিন মেয়র মহারাজ দিল্লী গিয়া কেন্দ্রের নিকট হইতে সামান্য দশ কোটি টাকার আবেদন জানাইয়া আসিয়াছেন ভিক্ষুকের বেশে। গরজের বেলায় দীন ভিখারী, আর অন্য সময় পরম হিটলারী চাল, একমাত্র বেকুফ বেহায়ার পক্ষেই শোভা পায়।

কলিকাতা পৌরসভার বিবিধ জনহিতকর ক্রিয়া কর্ম্মের বিষয় বহুবার বহু পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছে, সম্প্রতি আর একটি চমকপ্রদ ব্যাপারের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাপারটি এই: কোন এক কর্পোরেশন কর্ম্মী শ্রমিক মজদুর শ্রেণীর কর্ম্মীই বেশী—ছুটিতে দেশে যাইবার পূর্ব্বে তাহার স্থানে অর্থাৎ তাহার চাকরীতে সাময়িকভাবে অন্ত লোক নিযুক্ত করিয়া যায় অর্থের বিনিময়ে সোজা কথায় চাকরী বিক্রয় বা ভাড়া দিয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে এই চাকরী 'বেচা-কেনা' ঘটনার বিষয়টি প্রকাশ পায়। কর্ম্মী ছুটি ভোগান্তে ফিরিয়া আসিয়া বদলীর লোকটিকে তাহার চাকরী ফিরাইয়া দিতে বলে, কিন্তু বদলী লোকটি বলে যে সে তেরশত টাকা দিয়া চাকরীটি ক্রয় করে, অতএব সে চাকরী ছাড়িবে না। সম্প্রতি এই চাকরি বেচা-কেনার ব্যাপার লইয়া কর্পোরেশনের দুইটি ইউনিয়নে কলহ জাগিয়া উঠে। বলা বাহুল্য সি পি এম চাকরী ক্রেতার পক্ষে এবং কংগ্রেস প্রভাবিত ইউনিয়ন চাকরী বিক্রেতার পক্ষে। অবশেষ ধর্ম্মঘটের ঝামেলা এড়াইবার জন্ত কর্পোরেশন চাকরি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই চাকরীতে বহাল রাখিতে বাধ্য হয়েন। এক্ষেত্রে লোকের অর্থাৎ বাড়তি লোক দরকার আছে কি নাই, সে প্রশ্নের কোন স্থান নাই, বিশেষ করিয়া বাড়তি এবং অপ্রয়োজনীয় কর্ম্মীর বেতনের টাকাটা যখন পৌর পিতারা এবং মেয়র সাহেব নিজেদের ট্যাক হইতেই জোগাইবেন, আর এই ট্যাকের ভাণ্ডারে অর্থ যোগাইবে হয় রাজ্য আর না হয় কেন্দ্র সরকার কর্পোরেশনের চাহিদা মত।

পৌরসভায় প্রকৃত কত শ্রমিক কাজ করে, কত ভুয়ো শ্রমিক নিয়মিত বেতন লইয়া থাকে সেই তথ্য যাচাই করিবার জন্ত দুতিন বছর পূর্ব্বে সরকার নিয়োজিত একজন কমিশনার যে পদ্ধতি এবং প্রথা শ্রমিক নিয়োগ সম্পর্কে করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সত্যই একটি ভাল প্রস্তাব। কিন্তু কর্পোরেশন তথা কলিকাতার করদাতাদের ভাল করিতে গিয়া উক্ত কমিশনারকেই তালয় তালয় এই কর্পোরেশনের লাল বাড়ী ত্যাগ করিতে হয়।

এ-কথা সকলেই জানেন, কলিকাতা কর্পোরেশনের এক একটি ব্লকের সুপারভাইজার এবং ব্লক সরকার মাসে মাসে কি পরিমাণ কালচু রোজগার করে ভুয়ো

শ্রমিকদের কল্যানে। এ-কথা মেয়র হইতে সাধারণ কাউনসিলার সকলেরই জানা আছে, কিন্তু এই ভূয়ো শ্রমিক অর্থাৎ অদৃশ্য ভূতকে তাড়াইবার কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত কেহ করে নাই। ইহাকে ভাগের কারবার বলিবার মত সাহস আমাদের নাই।

কলিকাতা কর্পোরেশনে—বহিরাগত কর্মীর সংখ্যাই প্রবলতর। বাঙালী শ্রমিক আছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা কত? অন্যান্য রাজ্য যখন স্থানীয় লোকদের কর্ম সংস্থান বিষয়ে অতি সজাগ, ঠিক সেই সময়ে আমরা —নিজেদের বেকারদের নিরন্ন রাখিয়া, বাহিরের লোকদের পরমান্ন ভোজনের পরম আয়োজন করিতে লজ্জা বা দুঃখ বোধ করি না।

এই পরম হিতকর এবং কলিকাতা সহরের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটিকে বিশেষ একটি দিন দেখিয়া নিমতলার ঘাটে—গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিলে দোষ কি? তবে একটি দিক বিবেচনা করিয়া—অর্থাৎ বহিরাগত কর্মীরা বেকার হইবে, এই ভাবনায় হয়ত সি পি এম, সি পি আই এবং সম প্রকৃতির রাজনৈতিক দলগুলি কর্পোরেশনের শেষ ক্রিয়া অনুষ্ঠানে প্রবলতম বাধার সৃষ্টি করিবে। 'ঘর জ্বালানে পর ভুলানে, বলিয়া একটা অতি সত্য প্রবাদ বাক্য আছে।

সাময়িকী

পুলিশের যথেচ্ছা গুলি চালনার অধিকার

২৭শে অক্টোবরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্টদিগের মিলিত আলোচনা সভার প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা সরকার যে নিয়ম তিন মাসের জন্য করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে তিন মাস কালের জন্য পুলিশ প্রয়োজন বোধ করিলেই গুলি চালাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ এই তিনমাস কাল পুলিশ কোথাও গুলি চালাইলে তাহার কোন তদন্ত কেহ দাবি করিতে পারিবে না। এই সম্বন্ধে "যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিকে বলা হইয়াছে :

পুলিশ রেগুলেশনে নিয়ম ছিল যে পুলিশ গুলি চালাইলেই একজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়া তদন্ত করিতে হইবে। রাজ্যপালের সরকারের মতে এই তদন্তের ব্যবস্থা থাকার দরুনই পুলিশ নকশালপন্থী বা গুণ্ডাদের ক্ষেত্রে হাঙ্গামার সময় গুলি চালাইতে যথেষ্ট ইতস্ততঃ করিত এবং অনেক সময় তাহাদের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইত। তাই পুলিশ যখন গুলি চালাইবে তখন যাহাতে তাহারা তদন্ত বা কৈফিয়ৎ দিবার ভয় মনে না রাখে এই উদ্দেশ্যে সরকার উপোরক্ত নিয়মটি সাময়িক ভাবে বাতিল করিয়া দিয়াছে। ইহার সহজ ও সরল অর্থ এই যে পুলিশ গুলি চালাইলে তাহা উচিৎ কার্য্য হইয়াছে কিনা সে তদন্তের কথা দূরে থাকুক কেন গুলি চালাইয়াছে, পুলিশকে সে প্রশ্নও করা চলিবে না।

ইহাতে "প্রার্থিত" ফল যে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। মঙ্গলবার ২৭শে অক্টোবর শোভাবাজারে দুইজন, বুধবার মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে জলসায় একজন, বৃহস্পতিবার কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ছয়জন এবং শুক্রবার রামকান্ত মিস্ত্রী লেনে একজন ও বরানগরে একজন পুলিশের গুলিতে নিহত

হইয়াছেন। পুলিশের ভাষায় ইহারা কুখ্যাত দুর্বৃত্ত, হাঙ্গামাকারী খুনী অথবা "ওয়াগণ ব্রেকার" ছিলেন। কিন্তু পুলিশ বা প্রশাসক কর্তৃপক্ষের কথাই যে অভ্রান্ত সত্য সে কথা মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ ১৯৪২ এর আন্দোলনের সময়ও আন্দোলনকারীদের প্রশাসন কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে দুর্বৃত্ত গুণ্ডা নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। হাঙ্গামা নিবারণে অথবা আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ নিশ্চয় গুলি চালাইবে কিন্তু কোন একজন তথাকথিত দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তারের সময় সে পলাইবার চেষ্টা করিলে জনাকীর্ণ জলসার আসরে অথবা কলিকাতার জনবহুল রাজপথে গুলি চালানকে কোন মতেই সমর্থন করা চলেনা। পুলিশ কোন অপরাধের অভিযোগে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আদালতের বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইতেছেন, ততক্ষণ তাঁহাকে নির্দোষী বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। তাই কোন কারনেই বিচারের পুর্ব্বে কোন আসামীকে গুলি করিয়া নিহত করাকে নরহত্যা বলিয়াই বিচার করিতে হইবে। পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইবার পথে আসামী একক ভাবে কনষ্টেবলের হাত হইতে পিস্তল ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে গুলি করিয়াছে অথবা অকস্মাৎ ছোরা বাহির করিয়া গ্রেপ্তারকারী পুলিশ কর্মীকে আক্রমণ করিয়াছে এই সকল "আষাঢ়ে গল্প" যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহা শুধুমাত্র গ্রেপ্তারকারী পুলিশকর্মীদের অপদার্থতা ও নির্ব্বুদ্ধিতাই সপ্রমাণ করিতেছে।

বিনা বিচারে যাহাকে খুসী গ্রেপ্তার করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইবে, পুলিশ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে যথেচ্ছ ভাবে বেপরোয়া গুলি চালাইবে এই প্রশাসন নীতি ফাসিষ্ট কম্যুনিষ্ট বা সামরিক একনায়কতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি হইতে পারে কিন্তু ইহাকে কোন মতেই গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

১৯৬৩ সালে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"যে গভর্ণমেন্ট ক্রিমিনাল ল" অ্যামেণ্ডমেন্ট অ্যাক্ট ও অনুরূপ আইনের উপর নির্ভর করিয়া সংবাদপত্র ও সাহিত্য দমন করে, শত শত প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করে, বিনা বিচারে লোককে কারারুদ্ধ রাখে সেই গভর্ণমেন্টের টিকিয়া থাকার কোন অধিকার নাই।" বর্ত্তমানে যে গভর্ণমেন্ট শুধু বিনা বিচারে আটক রাখিবার আইন প্রবর্ত্তন নয় পুলিশকে বিনা বাধায় যথেচ্ছভাবে বেপরোয়া গুলি চালনার অধিকার না দিয়া রাজ্যের শান্তি বজায় রাখিতে অথবা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কথা চিন্তা করিতে পারে না, তাহাদের টিকিয়া থাকিবার অধিকার আছে কিনা এই প্রশ্নই আমরা জহর পুত্রী-ভারতের "প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক জনপ্রিয় নেত্রী" ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

উপরোক্ত মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্ব সপ্তাহের "যুগজ্যোতি"তে আমরা যাহা পাঠ করিয়াছিলাম তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে পুলিশের উপর আক্রমণ একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে এবং সেই আক্রমণের বন্যা নিরোধ সহজ পূর্ণ আইন সঙ্গত ও নীতি অনুগামী পন্থা অনুসরণে সাধিত না হওয়াই সম্ভব। "যুগজ্যোতি" লিখিয়াছিলেন :

গত সাতমাস পশ্চিমবঙ্গে ২৫ জন সাধারণ পুলিশ-কর্মীকে হত্যা করা হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে কলিকাতার নিহতের সংখ্যা ৮। কোনরূপ সংঘর্ষের ফলে ইহাদের মৃত্যু ঘটে নাই, অতর্কিত ভাবে নিজ ব্যক্তিগত কাজে ব্যাপৃত থাকা কালেই ইহাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছে। এই জঘন্য কার্য্যের নিন্দা করিবার উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন এবং হত্যাকারীদের যে উদ্দেশ্যই বর্ত্তমান থাকুক না কেন এই অপকার্য্যের ফলে তাহারা সমাজ বিরোধী দুর্বৃত্তের পর্য্যায়ে নামিয়া গিয়াছে ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কর্তৃপক্ষের অভিমত যে রাজনৈতিক কারণেই এই হত্যাকাণ্ডগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং নকশালপন্থী

বলিয়া খ্যাত চরমপন্থীরাই এই কার্য্যের জন্ত দায়ী। এই ভাবে নির্ব্বিচারে মুষ্টিমেয় পুলিশ কর্মীকে অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা নিহত করা কোন ধরণের রাজনীতি তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন। এই হত্যার ফলে পুলিশ বাহিনী আতঙ্কিত হইয়া নিস্ক্রিয় হইয়া যাইবে অথবা এইভাবে হত্যা করিয়া পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া যাইবে, একমাত্র উন্মাদ ব্যতীত একথা কেহই চিন্তা করিতে পারেন না।

জনসাধারণের সহযোগীতা ব্যতীত দেশে আইন ও শান্তিরক্ষার কার্য্য কখনও সুসাধিত হইতে পারে না। জনসাধারণের মানসিক অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে লিখিত ও কথিত প্রচারের উপর। সরকারী তদন্ত ও তাহার সাক্ষী সাবুদের সম্পর্কে এই প্রচার সচরাচর প্রবল হইয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। এবং তাহার ফলে স্থির ধীর বিচার করিয়া জনসাধারণ মত গঠনে সহজে সক্ষম হইতে পারে না। এই কারণে তদন্ত প্রভৃতি যদি করা হয় তাহা হইলে তাহা "ইন ক্যামেরা" অর্থাৎ বিচারকদিগের কক্ষ্যাভন্তরে ও অপ্রকাশিতভাবে হওয়া উচিত।

ত্রিপুরার পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হইবার দাবী

"ত্রিপুরা" সাপ্তাহিক সম্পাদকীয় ভাবে যাহা বলিতেছেন তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল:

লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ আর্ত্তনাদ করিতেছেন। বড় অসহায়ের মত আর্ত্তনাদ। লোকসভায় রাজ্যসভায় ত্রিপুরার দাবী পেশ করিবার মত লোক নাই। অথচ তিন তিনটি জাদরেল ব্যক্তিকে শ্রী সিংহ বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী লেবেল মারিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা শ্রী সিংহের কথা শুনেন না। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি কি না তাই ত্রিপুরার প্রতিনিধি হইয়াও যথা সময়ে ত্রিপুরার মৌলিক দাবীগুলি পর্য্যন্ত তাঁহারা লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় যথাযথভাবে রাখেন না। প্রত্যেকে নিজেকে লইয়া ব্যস্ত এবং বিব্রত। কংগ্রেসের "ক" অক্ষরও এই তিনের একের মধ্যেও নাই। প্রথমে নাম করিতে শ্রী জে কে চৌধুরী মহাশয়ের। তিনি উচ্চ শিক্ষিত; শিক্ষকতা করিয়া তিনি জীবন কাটাইয়াছেন। অবসর বয়সে রাজনীতিতে নামিয়াছেন। রাজনীতি হইল তৃতীয় শ্রেণীর পেশা। সাধারণতঃ চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকরা এই পেশায় প্রশংসনীয় উত্তম প্রয়োগ করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। আগের দিনে শিক্ষক, অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষগণ সমাজের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্যমান্য হইতেন। শ্রী চৌধুরী একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ খ্যাতিমান পুরুষ। রাজনীতি তাঁহার ধাতে সইতে পারে না। দ্বিতীয় হইলেন মহারাজা। শিক্ষাগত যোগ্যতা নেহাত মন্দ নহে; চলন সই। রাজকীয় অভিজাত্যের সহিত এখনও গণতান্ত্রিক রাজনীতির সমন্বয় ঘটাইবার মত বয়স নাই। এককালে হুকুম করাই ছিল যাহাদের জন্মগত অধিকার, তাহাদের পক্ষে হুকুম তামিল করার অভ্যাস আয়ত্ব করা সহজে সম্ভব নয়। আরও আছে, দ্বিধা বিভক্ত কংগ্রেস। নয়া কংগ্রেসীর পক্ষে কোন কংগ্রেসের হুকুম তামিল করিতে হইবে, তাহা ঠিক করাও ত কম কথা নহে। অতএব কথা বলার চাইতে না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তৃতীয় ব্যক্তি হইলেন রাজ্যসভার সদস্য শ্রীত্রিগুণা সেন। তিনি মন্ত্রীপদ গ্রহণ না করিয়া ত্রিপুরার দাবীদাওয়ার উর্দ্ধে বিচরণ করিতেছেন। পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের দাবীতে দিল্লীর দরবারে মহারোল উঠিয়াছে। টেরীটৈরী হিমাচল পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হইয়া গেল। সম পর্য্যায়ভুক্ত মণিপুর ও ত্রিপুরাকে সেই মর্য্যাদা দেওয়া হইল না। মণিপুরের এম পি গণ টেবিল চাপড়াইয়া দাবী রাখিলেন। উহার সমর্থন জানাইলেন অন্যান্ত রাজ্যের এম পি গণ কিন্তু ত্রিপুরার কথা ত্রিপুরার প্রতিনিধিগণ অতি মৃদুকণ্ঠেও উপস্থাপিত করিলেন না। ত্রিপুরার ইজ্জত রক্ষা করিয়াছেন জনসংঘ নেতা। তিনি মণিপুরকে সমর্থন করিতে যাইয়া তাঁহার বক্তব্যে ত্রিপুরাকে সংযোগ করিয়াছেন। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস

এবং ত্রিপুরার কংগ্রেসী মন্ত্রীপরিষদ উপায়ান্তর না পাইয়া টেলিগ্রাম যোগে দাবী পেশ করিয়াছেন দিল্লীর দরবার-প্রধান নব কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধান মন্ত্রীর নিকট। ইহা আক্ষেপের বিষয়, দুঃখের কথা এবং লজ্জার ঘটনা যাহা ঢাকিবার উপায় নাই। অত্যন্ত আশ্চর্যের সহিত লক্ষ্য করা যাইতেছে এই ব্যাপারে যাহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত, তাহারা ত্রিপুরার এম পি-গণ লজ্জা, দুঃখ ও আক্ষেপের মাথা খাইয়া বেশ আরামেই দিল্লীর দরবারে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে লজ্জিত হওয়া উচিত তাহাদের, যাহারা ত্রিপুরা বিধানসভায় একবাক্যে পূর্ণ-রাজ্যের প্রস্তাব পাশ করিয়াছিলেন। এখানেও দেখা যায় লজ্জার মাথাব্যথা কেবল মাত্র দুইজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ আর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট শ্রীউমেশ লাল সিংহ আর্তস্বরে পূর্ণ রাজ্যের দাবী দিল্লীর দরবারে তারযোগে পেশ করিয়াছেন। এই তারের কোন মূল্য নাই; কংগ্রেস রাজত্বে দিল্লীর দরবারে তার পৌঁছায় না, পৌঁছাইলেও মর্যাদা পাইয়াছে বলিয়া নজির নাই। এই তারবার্তা পাঠাইয়া তার প্রেরকগণ ত্রিপুরাবাসীর নিকট প্রশংসাভাজন হন নাই, বরং নিন্দিত ও সমালোচিতই হইতেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস এবং সরকার (সিংহ সরকার)—দুইয়ের মধ্যেই গলদ আছে। সেই গলদ প্রতিভাত হইয়াছে এম পি গণের বাকসংযম বা মৌনতার দ্বারা। যদি কংগ্রেস এবং সিংহ সরকার নিজেদের দুর্বলতায় অভিভূত না থাকিতেন, তবে তাহারা দিল্লীর দরবারে তারবার্তা না পাঠাইয়া—দিল্লী যে ভাষায় কথা বুঝে বা শুনে সেই ভাষাতেই দিল্লীকে আপ্যায়িত করিতেন। চোখের জলে চিড়া ভিজে না অর্থাৎ নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক কাল্পনিক আন্দোলন চোখে ঠুলি আর কানে তুলা দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট চিরকাল অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাতই থাকে। ঠুলি আর তুলা ভেদকারী আন্দোলন ছাড়া যে গত্যন্তর নাই হিমাচল আর মণিপুরই উহার প্রকৃষ্ট প্রমান। অতএব ত্রিপুরার ঐ একটি মাত্র পথই আছে, যে পথে অগ্রসর হইলে দাবী আদায় না হইলেও লজ্জা, দুঃখ ও আক্ষেপের বালাই থাকিত না; বরং সান্ত্বনাই পাওয়া যাইত —"যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কো অত্র দোষঃ।"

মধ্যবিত্ত সমিতি

শ্রীবিধুভূষণ জানা লিখিত "হিজলী হিতৈষী" সাপ্তাহিকে প্রকাশিত একটি পত্রের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বাংলা ও বংগসমাজের সর্বনাশের জন্য যে আমরা নিজেরাই প্রধানতঃ দায়ী সেই কথা জানা মহাশয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার মতে বাংলার জাতীয়তা, সভ্যতা ও কৃষ্টির আশ্রয়স্থল মধ্যবিত্ত সমাজ যদি যথাযথভাবে সুগঠিত ও সংঘবদ্ধ না করা যায় তাহা হইলে বাঙালীর ধ্বংসপথের যাত্রা কেহই রোধ করিতে সক্ষম হইবে না। জানা মহাশয় বলেন :

"মধ্যবিত্ত সমিতির সুস্পষ্ট আদর্শ ও উদ্দেশ্য বহুদিন হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সংগঠন ভিত্তির উপরই তাহার সাফল্য নির্ভর করে। সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যেসকল আঞ্চলিক কমিটি, থানা, মহকুমা ও জেলা কমিটি গঠন করা হইয়াছে, তার সকল ক্ষেত্রেই সমিতির আদর্শের কথা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তার ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা, দায়িত্ব পালনের কথা সমস্তই বিস্তারিতভাবে বলা হয় এবং সেইসকল কথা ব্যাপক প্রচারের জন্য 'প্রচার পত্রও' কিস্তি কিস্তি ডাকযোগে পাঠান হয়।

এই সমিতির সদস্য, পৃষ্ঠপোষক ও কর্মকর্তা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক, অভিভাবক এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ। সামাজিক ক্ষেত্রে ইহাদের প্রচুর দায়িত্ব। প্রত্যেকে সে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকিলে দেশের এই অবস্থা ঘটিত না। আমরাই নাশকতার কার্যে পুত্রকন্যাদের উৎসর্গ করিয়াছি, ছাত্র বেতন দিয়া অধ্যাপক-শিক্ষকদের রাজনীতি করিবার খরচ যোগাইতেছি। আমরাই জাতীয়তা বিরোধী সংবাদপত্রগুলিকে পরিপুষ্ট করিতেছি। আমরাই সকল রাজনৈতিক দলের পরিপোষক। এইভাবে আমাদের পরিবারগুলি তিন-চারিটি দলের অন্তর্ভুক্ত। ইহার নাম জাতীয় সংহতি নয়, জাতীয় প্রগতিও নয়। যত অন্যায় আইন হইতেছে আমরাই তাহা মানিয়া লইতেছি—সরকারী শোষণকে স্ফীত করিয়াছি, এজন্য অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় বাংলার রাজ্যে অকমিউনিষ্ট সংগঠন শক্তিশালী হয় নাই। ভূমিহীন অবাঙ্গালী ও উদ্বাস্তদের সংখ্যা বিস্তারের সুযোগ এই প্রদেশেই সম্ভব হইতেছে। খাদ্যসংকট, ভূমিসংকট, জীবিকার সংকটকে এই রাজ্যে চরমে লইয়া যাওয়া হইতেছে। ইহা যেন একটি জাতির মৃত্যুভপন্থা।

এই সমিতি সুস্পষ্টরূপে অকমিউনিষ্ট ও জাতীয়তাবাদী। এজন্য পূর্ববঙ্গীয় সংবাদপত্রগুলিতে আমাদের আর স্থান নাই। এইসঙ্গে একথাও সুস্পষ্ট যে, এই সমিতিকে ১৪ দলের দলবাজীর বিরুদ্ধে নূতন ঐক্যের পথে যে অভিযান চালাইতে হইতেছে, তাহা নিছক রাজনৈতিক বিলাসের পথ নয়। একথাও আজ গোপন নাই যে দিকে দিকে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তির ও যথেষ্ট অর্থের অভাববশতঃ অন্যান্য দলের ন্যায় এই সমাজ তাহার নিজের দাবীকে আশানুরূপ সোচ্চার করিতে পারে নাই। ১৯৬০।৬১ সালে সর্বভারতীয় বিভিন্ন নেতা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং প্রখ্যাত আইনজীবি, বিচারপতি সকলেই বাংলার এই অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া বহপূর্বেই এই সমাজকে ও সমিতিকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাহার গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। এই সমাজ সেই সময়

হইতে শক্ত ও সতর্ক থাকিলে বাংলার এই ভয়াবহ পরিণাম ঘটিত না। কিন্তু আপনারা এখনও উদাসীন— ইহাই বাংলার দুর্ভাগ্য।

একথা আপনাদের চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, এই মধ্যবিত্ত সমাজের ঐক্য ধ্বংস হওয়ায় অর্থাৎ ১৪ দলে বিভক্ত হওয়ার ফলে এই রাজ্যের যে কোন সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। দেশের ও জাতীর মেরুদণ্ডস্বরূপ এই সমাজকে পঙ্গু করার ফলেই এই দেশের রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রী সকলেই আজ সংবিধানকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি মহাশয় "জব ফর দি মিলিয়ান" প্রবন্ধে সংবিধানের সূত্রকে লঙ্ঘন করিয়াছেন। অথচ সকলেই সেই সংবিধানকে আশ্রয় করিয়া চূড়ান্ত কর্তৃত্ব বিস্তারে ও শোষণে পরিতৃপ্ত আছেন। এই সেদিন সংবিধান ও আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী ৩২ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে "যুক্তফ্রন্ট" নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য দিল্লীর অনুমতি পাইয়াছিল। বিনা প্রতিবাদে অথবা পরিণাম চিন্তা না করিয়া অজয়বাবুও ঐসকল কর্মসূচীকে রূপদানের জন্য পর্য্যায়ক্রমে দুবার মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন, কোন কোন সংবাদপত্রের মতে ঐসকল কর্মসূচী বাস্তব ভিত্তিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। বিনা বাধায় ও বিনা প্রতিকারে সেই ৩২ দফার অন্যতম বেআইনী কর্মসূচীগুলি এখনও দুর্বার গতিতে অনুষ্ঠিত হইতেছে, যাহার ফলে পশ্চিম বাংলার নাগরিকদের সম্পদ, সম্ভ্রম, জীবন ও জীবনযাপন ব্যবস্থা অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমেই তাহা সহরে ও সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। উপর মহল হইতে বাংলার এই রাজনৈতিক দুর্য্যোগকে স্তব্ধ করিবার আন্তরিক ইচ্ছা অপেক্ষা উদাসীন্য প্রমাণ বেশী পাওয়া যায়। গাড়ী গাড়ী বিস্ফোরক, বোমা, নানাবিধ মারণাস্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হইতেছে। এতদিন কি পুলিশ বিভাগ তাহাদের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়াছিল? কেন্দ্রীয় সরকারের যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে কি কোন অদৃশ্য হস্তক্ষেপ ছিল? এখনও ৮ দলের ও ৬ দলের ঐ ৩২ দফার কর্মসূচীকে অবিচল রাখিয়া এই পারিপার্শ্বিকের উপর পুনরায় নির্বাচনের মহড়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা নির্বাচনের নামে এক অভিনব ডিক্টেটারীর প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রেও আমরা নীরব দর্শক।

যেহেতু এই সমাজ এখনও রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে ঘুরপাক খাইতেছে। বিদেশী টাকার লোভে, ক্ষমতার লোভে দেশকে আবার পরাধীন করা কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ধ্বংসকামী দলের পরিপোষণে আমাদের যে নৈতিক অপরাধ দেখা দিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই অমার্জনীয়। মার্কস্ কিংবা লেলিনের মতবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বা সম্পদের মালিকানা আদৌ স্বীকৃত নয়, পরিমাণ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নাই—সমস্ত সম্পদ ও পুঁজি বিনা খেসারতে রাষ্ট্রের দখলে যাইবে। সুতরাং বৃথা সেলামী দিয়া ঘাতকের খাতায় নাম লিখিয়া নিজের সমাজ-শক্তিকে, জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করা হইতেছে। হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার দ্বারা সমাজকে দুর্বল করিয়া বিদেশী মতবাদকে মত দেওয়া হইতেছে। বিদেশী পতাকার সাহায্যে জমি ও সম্পদ দখল করিয়া লওয়া হইতেছে। জাতীয় পতাকা লাঞ্ছিত হইতেছে, ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিদের স্মৃতি লাঞ্ছিত ও ভূলুণ্ঠিত হইতেছে। খুন, জখম, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন সমাজের বিনা প্রতিবাদে ও প্রতিরোধেই হইতেছে। আমরা কি এখনও নীরব দর্শক থাকিব? এসকল বিষয়ে সতর্ক করিয়া নিজস্ব এই 'সমিতি" (শক্তদল) গঠন করিতে কি বলা হয় নাই? কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই আমার বা আপনার কাহারও একক ব্যক্তির কাজ নয়; কিন্তু এজন্য কে কতটা সময় ব্যয় করিয়াছেন? কে কি করিয়াছেন তাহার উপরই ফলাফল নির্ভর করে। কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, কোন বিষয়ে সহযোগিতা না করিয়া, সমিতির আদর্শ না বুঝিয়া বা প্রচারের চেষ্টা না করিয়া, কিংবা একটিও সদস্য বা সমর্থক কিংবা কর্মী বৃদ্ধি ও সৃষ্টি না করিয়া, কোন নির্দেশ পালন না করিয়া, বিরুদ্ধবাদীদের সাফল্যকেই

উৎসাহিত করিতেছি—নিজেদের অকর্মণ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি করিতেছি। কিন্তু কেহ অন্তরের সঙ্গে ঐসকল মতবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেছি কি? তাহা যেমন পারি নাই, তেমনি অনর্থ অলস ও নিস্ক্রিয় উক্তি কিংবা ব্যক্তিগত বেশী বুদ্ধি ও ধনগৌরব লইয়া এ ধরণের ধ্বংসকে প্রতিরোধ করাও সম্ভব হইবে না। যদি এই ধরণের অনর্থ ঘটিতেই থাকিল তবে বেশী বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধনগৌরবের পৃথক মূল্য কি থাকিল?

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন কথা

১৭৬৩ শকাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণ "তত্ত্বকৌমুদী" হইতে উদ্ধৃত করা হইল।

যে সকল মনুষ্য উত্তম সমাজে মান্য হয়েন, তাঁহাদিগের নিকট রামমোহন রায় এ প্রকার পরিচিত হইলেন যে অন্য কোন বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তুল্য কাল ইংরাজদিগের সহিত অবস্থান করিয়া তদ্রূপ প্রণয়ী হইতে পারেন নাই, তিনি আপন প্রজ্ঞা ও এবং ইউরোপ আগমনের কারণ বশতঃই কি রাজকীয় কি ধর্মসম্বন্ধীয়, কি বিদ্যার্থী, কি সাংসারিক সকল সমাজেই গমন করিয়াছিলেন। তিনি গির্জা কোর্ট, সেনেট, এবং অন্য অন্য সভাতেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রমণীয় স্বভাব, এবং সুশীল চরিত্র সকলের প্রশংসা এবং সমাদরকে অকর্ষণ করিল। যে প্রকার সহজভাবে তিনি ধর্ম সম্বন্ধীয় অভিপ্রায়ের উদ্দেশে সকল বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ইংরাজী আশয় ও কথোপকথনের প্রণালী যেরূপ সুন্দর ছিল, তাহাতে সমুদয় লোক বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। স্ত্রী সমাজে তিনি বিশেষ রূপ প্রিয় হইয়াছিলেন যেহেতু তাঁহার শরীর যেরূপ উৎকৃষ্ট সেরূপ কোমল অন্তঃকরণ সহিত তিনি তাহারদিগের প্রতি সবিনয় আদর প্রকাশ করিতেন, এবং যে প্রকার উত্তম পূর্বদেশীয় কবিতারসে মিশ্রিত করিয়া শিষ্টতা ব্যবহার করিতেন, তাহাতে তিনি সকলের প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন। অবশেষ তাঁহার আলোকমণ্ডল অতি বিস্তীর্ণ হইল, এবং যাহারা তাহার বন্ধু নামের অধিকারি হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা রামমোহন রায়ের বসতিস্থানে সদা উপস্থিত হইয়া তাঁহার নির্জনতা ভঙ্গ করিতেন।

ইং ১৮৩২ সালের শরৎকালে তিনি ফরাশীস দেশে গমনপূর্বক অতি সম্ভ্রমের সহিত আহূত হইয়াছিলেন। বিদ্যার্থি এবং রাজকীয় কর্মচারিগণ তাঁহার প্রতি সমাদর প্রকাশের নিমিত্তে ব্যগ্র হইয়াছিল। তিনি লুইস ফিলিপের নিকটে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অনেকবার একত্র ভোজন এবং অতি কৃতজ্ঞ বচনে ভূপতির অনুগ্রহ স্বীকার করিয়াছিলেন।

জানুয়ারী মাসে তিনি ফরাশীস হইতে বেড্‌ফোর্ড স্কোয়ার নামক স্থানে, ও মিসিযস জান এবং জোজেফ হেয়ার সাহেবের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন যে স্থানে তিনি ইংলণ্ডে গমনাবধি অবস্থান করিয়াছিলেন। কথিত জান এবং জোজেফ হেয়ার সাহেব কলিকাতা বাসি মৃত ডেভিড হেয়ার সাহেবের ভ্রাতা, যে ডেভিড হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়ের আত্মীয় বন্ধু এবং হিন্দুদিগের চরিত্র শোধন বিষয় তাঁহার সহকারী ছিলেন। কিন্তু রামমোহন রায় ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন-কালীন পীড়িত হইয়াছিলেন। সামান্যতঃ সময়ে সময়ে তাঁহার পিত্ত প্রাবল্য হইত, এক্ষণে সেই রোগ ইউরোপের বাতাসভাবে ক্রমে বৃদ্ধি হইল। আর্নট সাহেব বলেন, যে প্যারিস নগর হইতে আগমনের পর, তাঁহার শরীর এবং মন উভয়ই দুর্বল হইতে লাগিল। যখন এ প্রকার অবস্থাপন্ন হইলেন, তখন মিস্ কেট্‌লসের সমভিব্যাহারে ষ্টেপলটন গ্রামে কিয়ৎকাল যাপন করিবার নিমিত্তে তিনি সেপ্‌টেম্বর মাসের প্রথমাংশে ব্রিষ্টল নগরে যাত্রা করিলেন এবং বাসনা করিয়াছিলেন যে তৎস্থান হইতে ডিবল্যারে গমনপূর্বক শীতকালে তত্র অবস্থিতি করিবেন। সেপটেম্বর মাসের ১৮ দিবসে (তাহার ব্রিষ্টলে উত্তীর্ণ হইবার ১০ দিন পরে) তিনি পীড়িত হইলেন, কিন্তু প্রথমে তাঁহার তাদৃশ গুরুরোগ

হয় নাই। পরদিন রামমোহন রায়ের বন্ধু মেং এষ্টলিন সাহেব তাঁহার জরের লক্ষণ দৃষ্টি করিলেন। ঔষধ দ্বারা তাহার অনেক প্রতিকার হইয়াছিল, কিন্তু জিহ্বা-শোষ এবং নাড়ীর চাঞ্চল্য হওয়াতে গুরুতর রোগ বোধ হইল। ২১ তারিখে ডাক্তার প্রিচার্ড এবং ২৩ তারিখে ডাক্তার কোরিক সাহেব চিকিৎসা করেন, শিরোদেশে রোগের বসতি বোধ হইয়াছিল, কিন্তু রোগী উদরের পীড়া বলিতেন।

ডাক্তার কার্পেন্টর বলেন যে, ঔষধ দ্বারা তাঁহার রোগের কাশক দমন হইয়াছিল। ২৩ তারিখে কঠিন অঙ্গগ্রহ ও বাম বাহু এবং বামপদের পক্ষাঘাত উপস্থিত হইল, এবং সেই দিবস অপরাহ্নে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন, যাহা হইতে তিনি আর উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ২৭ সেপ্টেম্বর রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘন্টা ২৫ মিনিটের সময়ে রাজা রামমোহন রায় জীবন ত্যাগ করিলেন। তিনি জীবদ্দশায় পুনঃ পুনঃ এ প্রকার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যে ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে মৃত্তিকাস্থ করণের জন্য একখণ্ড নিষ্করভূমি ক্রীত হয় এবং তাহা রক্ষণের নিমিত্ত একজন নির্ধন সম্ভ্রমযোগ্য মনুষ্য তৎস্থানে বসতি করেন। মিস্ ক্যেস্টলেসের দাতব্যতায় ইহার সমুদয় প্রতিবন্ধক মোচন হইল। তিনি আপনার আত্মীয় বন্ধুবর্গের অভিমতানুসারে সুন্দররূপ উপযুক্ত একখণ্ড ভূমি প্রদান করিলেন। তৎস্থানে এই সম্রান্ত প্রিয়ব্যক্তি ১৮ অক্টোবর বেলা ২ প্রহর ২ঘন্টার সময়ে মৃত্তিকাস্থ হইয়াছেন। যাহা হইতে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের পরস্পর অনেক সভ্য উৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল, সেই অসাধারণ মনুষ্যের জীবন এ প্রকার দ্রুতবেগে সমাপ্ত হইল। ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের এক স্ত্রী এবং দুই পুত্র ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিৎকাল পূর্বে তিনি দিল্লীর রাজার বিষয় সমাধা করিয়াছিলেন, এবং ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত এরূপ সন্ধি স্থির হইয়াছিল, যে মহল রাজা আপন ব্যয়ের নিমিত্তে তাঁহার পূর্বপ্রাপ্তির অপেক্ষা আর ৩০০০০ পৌণ্ড অর্থাৎ ৩০০০০০ টাকা অধিক প্রাপ্ত হইবেন, সুতরাং তৎসংখ্যক মুদ্রা ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে ন্যূন হইল।

রামমোহন রায়ের শরীর অতি সুন্দর এবং প্রায় চারি হস্ত উচ্চ ছিল, তাঁহার অঙ্গ সকল বলবান এবং পরিমিত ছিল, কিন্তু জীবনের শেষভাগে স্থূলতা প্রযুক্তই হউক বা বয়ঃক্রমে আধিক্য প্রযুক্তই হউক কিঞ্চিৎরাক্রান্ত এবং কর্মাক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শোভান্বিত অবয়ব সকল সৎ এবং সবল, কপাল উচ্চ এবং বিস্তীর্ণ চক্ষুদ্বয় ঘোর এবং উজ্জ্বল, নাসিকা সুন্দররূপে বক্র এবং পরিমিত, এবং ওষ্ঠ পূর্ণ ছিল। তাঁহার আকৃতির ভাব দৃষ্টি করিলেই তাঁহাকে জ্ঞানী এবং দয়াবান বোধ হইত।

তাঁহার চরিত্র বর্ণন করা অতি কঠিন। তিনি অবশ্যই একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন। তিনি যে কেবল আপনার বুদ্ধি শক্তি দ্বারা হিন্দুদিগের অজ্ঞান দৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই পারস্ত বাঙ্গলা হিন্দুস্থানী, হিব্রু, গ্রীক্, লেটিন, ইংরাজী এবং ফরাশীশ প্রভৃতি দশ ভাষায় তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং তন্মধ্যে অধিক সংখ্যক ভাষায় সৎপ্রণালীর সহিত লিখিতে ও বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার বুদ্ধি অতি প্রখর এবং রচনা সকল উত্তম যুক্তিবিশিষ্ট ছিল। এই সমুদয় আন্তরিক শক্তি এবং নানাবিধ বাহ্যগুণে তাঁহাকে জনসমাজের শ্রেষ্ঠপদে স্থাপন করিয়াছে।

লাল চীনের অতি বিশুদ্ধ কম্যুনিজম বনাম "শোধনবাদী" কম্যুনিজম

শ্রী কাশীকান্ত মৈত্র "যুগবাণী" সাপ্তাহিকে কম্যুনিষ্ট রাজনীতির বৈচিত্র বিষয়ে যাহা লিখিতেছেন তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :

কিছুকাল আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা কলকাতার সমস্যা পর্যালোচনার জন্য কলকাতায় এলে মার্কসবাদীরা কলকাতা নগরীতে এক তাণ্ডবের আয়োজন করেছিলেন—। অথচ

আমেরিকার সর্ববৃহৎ মোটর গাড়ী নির্মাণকারী কোম্পানী জেনারল মোটরস্-এর প্রধান রোচ সাহেব যখন এই কলকাতাতেই বিড়লাদের সঙ্গে সহযোগিতায় বা কোলাবরেশন-এ হিন্দুস্থান মোটরস লিমিটেড (বিড়লার) কোম্পানী কারবার ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে তোলার জন্য এসেছিলেন, খোদ হিন্দুস্থান মোটরস-এ সামান্যতম শ্রমিক বিক্ষোভও হয়নি। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের উস্কানিদাতা প্ররোচক আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদীদের শিরোমণির সঙ্গে মিলেমিশে সাহায্য নিয়ে—যে বাংলার আর এক নাম নাকি ভিয়েৎনাম—সেই বঙ্গীয় ভিয়েৎনামে কারবার বাড়াবার 'ষড়যন্ত্রে'র বিরুদ্ধে, কারখানার আশে পাশে কোন গেট মিটিংও হয়নি। "মার্কিণ কুত্তা ভারত ছাড়ো—জলদি ছাড়ো" শ্লোগানে আকাশ বাতাস কম্পিত হয়নি—ট্রাম বাসও পোড়েনি,—রাস্তার বিক্ষোভও হয়নি। আর হিন্দ মোটরস-এর ইউনিয়নও সেই সাচ্চা মার্কসবাদী বিপ্লবীদের দখলেই ছিল।

প্রয়োজন কি আইন মানে—মার্কসবাদের অনুশাসন মানে? লাল চীন ও ১৯৬৮-৬৯ সালে বুর্জোয়া রাষ্ট্র ক্যানাডা থেকে ২০ কোটি ডলার মূল্যের গম খরিদ করেছে,—১ লক্ষ টন গম অষ্ট্রেলিয়া থেকে খরিদ করে খাদ্য ভাণ্ডার তৈরী করছে—ইউরোপে ওয়ারশ নগরীতে "বৃহত্তম" মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এশিয়ায় বিপ্লবের বাজার গরম রাখার জন্য লালচীন অহর্নিশি মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বাচনিক ও মসি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিপ্লবী লেনিনের যদি নিজের দেশের উন্নয়নের জন্য মার্কিণ ডলার, অস্ত্র-শিল্প ও রুশ মার্কিণ বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও স্ফীতি একান্ত প্রয়োজনীয় হতে পারে,—বর্তমান রাশিয়ার সঙ্গে যদি করমোজায় অধিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী বিশেষ করে কমিউনিষ্ট চীন বিদ্বেষী চিয়াংকাইশেক সরকারের পারস্পরিক আলোচনা চলতে পারে, ওয়ারশ নগরীতে পিকিং-এর কূটনীতিবিদদের সঙ্গে মার্কিণ কূটনীতিবিদদের গোপন বৈঠক দিনের পর দিন নিজেদের বৈষয়িক ও জাতীয় স্বার্থের তাগিদে চলতে পারে, রবার্ট ম্যাকনামারা যদি মস্কোতে ভারতে আসার পথে রুশ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হতে পারেন পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়,—প্রাক্তন মার্কিণ প্রতিরক্ষা সচিব রূপে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে নিজের সরকারকে সামরিক পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও, তাহলে ভারতবর্ষ তার নিজের বৈষয়িক স্বার্থে যদি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানরূপে (বিশ্বব্যাঙ্ক) রবার্ট ম্যাকনামারাকে এদেশে আমন্ত্রণ করে থাকেন আর সেই বিশেষ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যদি তিনি কলকাতার উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে পর্য্যালোচনার জন্য কলকাতায় অতিথি রূপে এসে থাকেন—তাহলে তুলকালাম কাণ্ড হবে কোন যুক্তিতে? আবার এই মার্কসবাদী—বেশী লাল, ফিকে লাল, মাঝারী লাল বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লীতেও আছেন। কেনই বা সেই সব ভারতের বড় বড় নগরীতে কোন বিক্ষোভের আয়োজন তারা করলেন না রবার্ট ম্যাকনামারা যখন সেইসব নগরীতে উপস্থিত হয়েছিলেন?

লেনিন "নূতন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর" যুগে বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা যেমন তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন সেই রুশ দেশে সফল বিপ্লবের পর পঞ্চাশ বৎসর একটানা সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিজের দেশে উৎপাদন বাড়াবার জন্য 'বুর্জোয়া' দেশ জাপানী বিশেষজ্ঞ ও জাপানী পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি রুশ জাপ কারিগরী সহায়তা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ৩০ কোটি ডলার ব্যয়ে সুদূর পূর্বাঞ্চলের সংগে ব্যবসা চালাবার জন্য নাখোড়কা নামক স্থানে জাপানী বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে একটি নূতন বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই বন্দর নির্মাণের এক তৃতীয়াংশ খরচের টাকাও যাতে জাপানের কাছ থেকে পাওয়া যায় তার জন্য রাশিয়া জাপানের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

(মস্কো থেকে প্রচারিত সংবাদ ১৯শে জানুয়ারী; যুগান্তর ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৩৭০)।

১৯১৮ সালেও লেনিন শিল্প কৃষি ও ব্যবসায় ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। দলের ভিতর বা বাইরে কেউ ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে কোন কথাই বলার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। অথচ ১৯২১ সালে সেই মহানায়ক লেনিন স্বীকার করে বসলেন ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা মালিকানা মেনে নেওয়া প্রয়োজন দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্যে। শ্রমিকদের জন্যে মজুরী প্রথা, কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের ওপর মালিকানার অধিকার মেনে নেওয়া হল—গ্রামে গ্রামে গৃহযুদ্ধের যবনিকা পতন ঘটল। ১৯২১ সালের ১৫ মার্চ লেনিন বলশেভিক পার্টির দশম অধিবেশনে ঘোষণা করলেন—"যে সকল কৃষকরা বিক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট এবং ন্যায় সঙ্গত কারণেই অসন্তুষ্ট তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। মূলতঃ ছোট খামারীরা দুটো জিনিষের প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হতে পারে। প্রথমত, উৎপন্ন খাদ্যশস্যের বেচা-কেনার ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতা ছোট ব্যক্তিগত মালিকের স্বাধীনতা থাকা দরকার, এবং দ্বিতীয়ত, ভোগ্যপণ্য ও দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহের ব্যবস্থাও তাদের জন্য করা দরকার।"

নূতন অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রবর্তন করে লেনিন খাদ্যশস্য ব্যবসায়ে রাষ্ট্রের একচেটিয়া কর্তৃত্ব—যেটা এতদিন সমাজতন্ত্রবাদের লেনিন বাদী তত্ত্ব বলে গণ্য ছিল—সেই মৌলিক নীতি থেকে সরে এলেন। 'লেভী' করে কৃষকদের খামার থেকে সম্পূর্ণ শস্য আদায় করার নীতির জায়গায় একটি নির্দিষ্ট কর বসাবার ব্যবস্থা হল। আর সেই কর বা খাজনা শস্যের বিনিময়েও পরিশোধ করা চলবে ঘোষণা করা হল। লেনিন বুঝেছিলেন এই নীতি গ্রহণ করে সংশোধিত আকারে পুঁজিবাদকে মেনে নেওয়া হচ্ছে নীতিগত ভাবে, অন্তত। কৃষকরা তাদের উদ্বৃত্ত শস্য পণ্য—খোলা বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ পেল মূল্যের বিনিময়ে। লাভ করার সুযোগও অর্জন করল। অথচ মার্কসবাদী চিন্তাধারায় এই ধরণের অধিকার স্বীকার করে নেবার অর্থই হল তার মূলে কুঠারাঘাত করা।

নূতন অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণের ফলে সমগ্র দেশে যে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা সমকালীন রুশ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। নূতন অর্থনৈতিক কর্মসূচীকে 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' বলে অভিহিত করেছিলেন লেনিন। তিনি বলেছিলেন যে কয়েকটি উপর্য্যুপরি বিবর্তনের যুগে—রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনার যুগ উত্তীর্ণ হয়েই দীর্ঘদিন ব্যাপী প্রাথমিক পর্য্যায়ের কাজ সম্পন্ন করে তবেই কমিউনিজম-এর স্তরে পৌঁছন যাবে। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যে উন্মাদনা ও উৎসাহ জন্ম নিয়েছে—সেই উন্মাদনা উৎসাহকে ভিত্তি করে নয়—তার সাহায্যে, ব্যক্তিগত স্বার্থ, প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ এবং উদ্দেশ্যব্যঞ্জক অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণের মধ্যে দিয়েই আমাদের চরম লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপযোগী ছোট ছোট সেতুনির্ম্মাণের কাজে হাত দিতে হবে। এই ভাবেই অসংখ্য ছোট ছোট জোত-খামারে ভরা এই বিশাল কৃষিপ্রধান দেশকে রাষ্ট্রীয়পুঁজিবাদের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। কমিউনিজম-এর লক্ষ্যে কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে যাবার অন্য কোনই পথ নেই।

মার্কসবাদের মৌলিক ভাবধারায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে লেনিনের এই বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নিছক প্রয়োজনের চাপে নৈতিক তত্ত্বকথা থেকে পিছু হটে এসে বাস্তবতার শক্ত মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবার কৌশল যদি লেনিনের বেলায় বিপ্লবী বাস্তবতাবোধ বা রেভোলিউশনারী রিয়্যালিজম বলে গণ্য হয়—অন্য অমার্কসবাদীদের ক্ষেত্রে সেই রকম পিছু হটে আসাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ অথবা অন্য মার্কসবাদীদের ক্ষেত্রেই বা অনুরূপ কৌশলগত পিছু হটে আসা সংশোধনবাদ রিভিশানিজম

বলে ধিকৃত হবে কেন? মার্কসবাদী তত্ত্বের বিচারে লেনিনের এই নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী 'সংশোধনবাদ' ছাড়া অন্য কি হতে পারে? নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সমর্থনে লেনিন যা বলেছিলেন যুগোস্লাভিয়ার নেতা মার্শাল টিটো অথবা তাঁর দল লীগ অব কমিউনিষ্ট অব যুগোস্লাভিয়া—তার রাজনৈতিক থিসীসে তা বলেন নি। নৈতিক মার্কসবাদ থেকে টিটো সরে এসেছেন এই অভিযোগে তিনি 'শোধনবাদী' বলে নিন্দিত হয়েছেন—সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক সাহায্য নেবার অপরাধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহায়ক দোসর বলে তথাকথিত সাচ্চা মার্কসবাদী দুনিয়ার ধিক্কার কুড়িয়েছেন। কিন্তু লেনিন ব্রেষ্ট লিটভস্ক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে রাশিয়ার ভৌগলিক আয়তনের বিশাল অংশ ও সংখ্যা সামরিক ভাবে খুইয়ে, কিম্বা নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর কালে বুর্জোয়া আমেরিকার সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে কোন মার্কসবাদী নিন্দার সম্মুখীন হন নি কিন্তু। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডুবচেক দেশের বৈষয়িক উন্নয়ন দ্রুত ত্বরান্বিত করার জন্যে নতুন মূল্যায়নের ভিত্তিতে তাত্ত্বিক মার্কসীয় গোঁড়ামি থেকে পিছু হটে এসে অধিক বাস্তবতা, উদারতা গণতন্ত্রের কথা বলার অপরাধে প্রতিক্রিয়াপন্থী প্রতিবিপ্লবী, পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবকদের সহায়ক বলে ধিকৃত হলেন কেন মস্কোপন্থীদের কাছে?

দেশ-বিদেশের কথা

পশ্চিম এশিয়াতে চীন প্ররোচিত বিপ্লবাশঙ্কা

ইসরায়েলের প্রাক্তন সামরিক অনুসন্ধান বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা মেজর-জেনারেল হাইম হার্ৎজগ বিশ্ববাসীজনকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন যে চীন দেশে কম্যুনিষ্ট নেতাদিগের মতলব আরব গেরিলা বাহিনীগুলিকে প্ররোচিত করিয়া পশ্চিম এশিয়ায় একটা বিপ্লবের সূচনা করা। জেনারেল হার্ৎজগ একটা সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, পিকিং-এর বিশেষ আগ্রহ যাহাতে ইসরায়েল ধ্বংস হইয়া যায়। তিনি এইজন্য এশিয়ার যেসকল দেশ চীনের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয়ে ভীত তাহাদের মিলিতভাবে ঐ বিপদ হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে আরব গেরিলা নেতা ইয়াসের আরাফত এবং সিরিয়ার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ পিকিং গমন করিয়াছিলেন। জেনারেল হার্ৎজগ এই সম্বন্ধে বলেন যে ইহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে চীনারা পশ্চিম এশিয়াতে প্রভাব বিস্তার করিতে কত অধিকভাবে প্রচেষ্ট। চীনাদিগের সক্রিয় চেষ্টা বর্ত্তমান যাহাতে ইসরায়েল বিপ্লবীদিগের হস্তে বিধ্বস্ত হয়। তাহারা প্যালেষ্টাইনের বিপ্লবীদিগকে এইজন্য বিশেষভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এইভাবে পশ্চিম এশিয়ায় বিপ্লববহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া এই অঞ্চলের সকল পুরাতন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ বিনষ্ট হইবে। এই বিশ্বাসে আস্থাবান থাকিতে ও চেষ্টা করিতে চীনাগণ

রুশিয়ানদিগের তুলনায় অধিক যত্নবান। চীনাগণ ঐ অঞ্চলের গেরিলাদিগকে প্রচুর সাহায্য করিয়া আসিতেছে। সাহায্য দিবার ব্যবস্থা আছে সিরিয়া ও দক্ষিণ ইয়েমেনের গেরিলাদিগের মারফতে। ইসরায়েলের সৈন্তগণ কখন কখন গেরিলাদিগের নিকট চীনা অস্ত্রশস্ত্র পাইয়া থাকে। অবশ্য রুশিয়ার আরব সহায়তা আরও অধিক প্রকট; কিন্তু চীনাদিগের উপর বিশেষভাবে নজর রাখাও অতি আবশ্যক। জেনারেল হার্কভিস সকল জাতিকেই চীন সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, যে সকল জাতি চীনের আক্রমণ আশঙ্কা করে তাহারা যেন বিশেষ করিয়া সজাগ থাকে যাহাতে চীন তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে না পারে।

অবশ্য নয়া দিল্লী চীনের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থান হইলেও বিশ্বপ্রেম তথা আরবপ্রীতিতে ডুবিয়া আছে। কে কাহার শত্রু; কে কাহার মিত্র হইতে পারে সে ভাবনা দিল্লীর স্বপ্নবিলাসমগ্ন মহারথীদিগকে কদাপি নিদ্রাত্যাগ করিয়া চক্ষু উন্মীলনে উদ্বুদ্ধ করে না।

রাষ্ট্রপতির অর্থনৈতিক লক্ষ্য নির্দেশ

কিছুদিন পূর্ব্বে, কনটপ্লেস সেনট্রাল পার্ক, উদ্বুক্ত করিবার সময় রাষ্ট্রপতি গিরি বলেন যে সকল ভারতবাসীর যথেষ্ট খাদ্য, উপযুক্ত বাসস্থান ও জীবন নির্ব্বাহের জন্য উপার্জ্জনের ব্যবস্থা হওয়া অত্যাবশ্যক। কথাটা একটা সর্ব্বজন জ্ঞাত অতি সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে অতি সহজ উক্তি। যথেষ্ট খাদ্য নাই, উপযুক্ত বাসস্থান নাই ও জীবন নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে সকলের উপার্জ্জন ব্যবস্থাও নাই; এই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন কি করিয়া হইতে পারে তাহা যদি রাষ্ট্রপতি কার্যকরীভাবে দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ একটা কাজ হইত। হইলে অবশ্য ভারতীয় অর্থনীতির একটা বিরাট সমস্যারও সমাধান হইত। কিন্তু সে কাজ না হইলে শুধু নাই নাই ও চাই চাই এর ইস্তাহার কোন ফলদান করিতে পারে না। ভারত সরকার ২৩ বৎসরে ঐ সমস্যা শুধু আরোও জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। এখন রাষ্ট্রপতির কথায় কোনও লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আসামে দ্বিতীয় তৈল শোধনাকেন্দ্র

করিমগঞ্জের (আসাম) "যুগশক্তি" পত্রিকাতে প্রকাশ:

কেন্দ্রীয় সরকার আসামে সরকারী উদ্যোগে দ্বিতীয় তৈল শোধনাগার স্থাপনের দাবী মেনে নিয়েছেন। গোয়ালপাড়া জেলায় বঙ্গাইগাঁও-এ একশত কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পটি স্থাপিত হবে। নতুন শোধনাগারটি শিবসাগর জেলায় স্থাপনে আসাম সরকার ইচ্ছুক ছিলেন, তবে বঙ্গাইগাঁও-এ হলেও রাজ্য সরকারের আপত্তি নেই। কিন্তু নতুন প্রকল্পটির তৈল উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় ঘোষণা মতে এই নতুন শোধনাগার থেকে পাওয়া এল্, এস্, এইচ্, এস্ উৎপাদন সিন্দ্রিতে সার তৈরীর জন্য প্রেরণের কথা—কিন্তু আসাম সরকার এই উপাদান প্রভাবিত পেট্রোকেমিকেল প্রকল্পে নাইলন, রবার প্রভৃতি উৎপাদনের পক্ষপাতী।

কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র জানিয়েছেন, আসামের দাবী মেনে নিতে হলে দু'শো কোটি টাকা লগ্নী করা দরকার। কিন্তু আসামে সঞ্চিত তৈলের বিষয় বিবেচনা করে এখন একশো কোটি টাকার বেশী ব্যয় করা সঙ্গত হবে না।

রাষ্ট্রীয় দলগুলি কি কোন কাজের নয়?

এই বৎসর অসময়ে যে প্রবল বারিবর্ষণ হয় তাহার ফলে ৬।৭টি জেলার বহু অংশ বন্যাপ্লাবিত হইয়া যায়। এই সময় সরকারী প্রভুদিগের উচ্চতম ব্যক্তিদিগের সহিত রাষ্ট্রীয় নেতাদিগের একটা

অকর্মণ্যতার প্রতিযোগীতা হয় এবং তাহাতে রাষ্ট্র-নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসু সর্বাপেক্ষা দেশসেবা বিমুখ পরিগণিত হইয়াছিলেন। "যুগবাণী" সাপ্তাহিক এই সত্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বলেন :

মাত্র কয়েক দিনের বর্ষায় পশ্চিমবঙ্গের একটা ব্যাপক অঞ্চল জলের তলে ডুবিয়া গিয়াছে ইহাতে দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লজ্জা বোধ করা উচিত। কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতা ডুবিবার জন্য দায়ী, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন হুগলী ও হাওড়ার বন্যার জন্য দায়ী, কংসাবতী বাঁধের ত্রুটি মেদিনীপুরের বন্যার জন্য দায়ী এবং নদী ও খাল সংস্কারের অভাবে চব্বিশ পরগণায় জল নামিতে পারে নাই—সেজন্য দায়ী বিগত কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট সরকার।

রাজ্যপাল ধাওয়ান মহাশয় এই বন্যায় যে চমৎকার দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ঐ লোকটি সম্পর্কে আর আলোচনার কোন প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু বি. বি. ঘোষ মহাশয়কে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই, কারণ পশ্চিমবঙ্গে ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত হইলেও, একটা অচল ঘুণেধরা প্রশাসন যন্ত্রকে তিনি যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই দৈব দুর্বিপাকের মোকাবিলায় নামাইয়াছেন, ভিতর হইতে সাবোটাজ ও বাহির হইতে অনবরত বাধা দান সত্বেও ধীরে ধীরে দুর্গত মানুষের দরজায় সাহায্য পৌঁছাইতে পারিয়াছেন ;—অন্তত সাধারণ মানুষ এবার বুঝিয়াছে যে সরকার বিপদের দিনে তার পাশে দাঁড়াইতে আগ্রহী। রাজনৈতিক পার্টির শাসনের চেয়ে বিবেকবান দক্ষ প্রশাসকের শাসন যে ভালো হইতে পারে লোকে এবার তাহা অনুভব করিয়াছে।

ভাদ্রের শেষে এই ধরণের প্রবল বারিপাত কেহ আশা করে নাই, সকলেই তাই অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল। কলিকাতা ছাড়াও চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ ও বাঁকুড়ায় জলপ্লাবন দেখা দিয়াছিল। সাধারণ যুবকরা উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও অগ্রসর হইয়াছে, স্থানীয় পুলিশ, সি আর পি ও মিলিটারিসহ সরকারও নামিয়াছে—কিন্তু সেবাকার্যে রাজনৈতিক পার্টিগুলি প্রথমে কোনো আগ্রহই বোধ করে নাই। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আবার সবাইকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রমোদ দাশগুপ্ত ও জ্যোতি বসু বক্তৃতা করিতেছেন যে সি আর পি মিলিটারী বন্যাপীড়িত মানুষদের উপর অকথ্য করিয়াছে। অথচ রিলিফ বিতরণ লইয়া ও সি পি আই মারামারি করিয়া করিয়া দিয়াছে, খাদ্য বিলি হইতে দেয় সব ঘটনাই প্রকাশিত।

বাংলাদেশে চিনি কল হয় না কেন ?

বাংলা দেশের বহুস্থলে আখের চাষ উত্তমরূপেই হইতে পারে এবং চাষীগণ নিজক্ষমতা ও ইচ্ছা অনুসারে করিয়াও থাকে। কিন্তু চিনির কল থাকিলে যে ভাবে ঐ চাষ চলিতে পারে চিনি উৎপাদন ব্যবস্থা না থাকায় সেরূপ চাষের আয়োজনও হয় না। বীরভূম জেলাতে বিশেষ করিয়া এই চাষ ও চিনিকল পরিচালনা উত্তমরূপে হইতে পারে। সিউড়ী হইতে প্রকাশিত "ময়ূরাক্ষী" সাপ্তাহিকে প্রকাশ :

উত্তর প্রদেশ সরকার এবং অন্যান্য সকল রাজ্য সরকার আপন আপন এলাকার চিনিকল রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারবেন, যদি ইচ্ছা করেন। উত্তর প্রদেশ সরকার এই মন্ত্রীর অপেক্ষায় ছিল।

হতভাগ্য পঃ বঙ্গ অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে চিনি খায় অনেক বেশী—উৎপাদন করে মাত্র একটি চিনিকল (পলাশীতে)। স্বাধীনতার পর ২২ বছরে মাত্র একটি নতুন কল স্থাপন করতে পেরেছেন বাংলাদেশের মুখ সর্বস্ব জাতীয় সরকার—সেটিও রুগ্ন, অচল এবং বর্তমানে প্রেসিডেন্টের শাসনের কবলে। কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা না হয় মিলটি চালু করার ব্যাপারে

জনগণকে মিথ্যা ও প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কাজে কিছুই করেনি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট শাসনেরই বা নমুনা কী? এই ছয়মাস শাসনের মধ্যে প্রেসিডেন্টের শাসন কী মিলটি চালু করার ব্যাপারে এক ইঁচিও এগিয়েছেন? অগ্রসর হওয়ার কোন লক্ষণ বীরভূমের কোন লোক জানেন?

শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় (যিনি এক সময় মিলের উৎপত্তি থেকে লালবাতি জ্বালা পর্য্যন্ত জনগণের পক্ষ থেকে একজন দরদী প্রহরীর কাজ করেছেন), দুঃখ করে বলছিলেন,—মন্ত্রীদের মুখে মিলটি পুনরায় চালু করার অন্ততঃ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পাওয়া যেত, প্রকাশ্য সভায় ও বিধানসভা কক্ষে, কিন্তু রাষ্ট্রপতির আমলের মুখ্য-উপদেষ্টা শ্রী বি, বি, ঘোষ আই-সি-এসকে চিঠি লিখে একটা জবাব পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, কাজের পরিচয় তো দূরের কথা। তিনি শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। মিহিরবাবু তাঁকে লিখেছিলেন—আমোদপুর মিল এলাকার সংলগ্ন নদীতে বারমাস জল বয়, নদীর ধারে পতিত ও আবাদী এত জমি আছে যেখানে আখ উৎপাদন করলে কিনে শেষ করতে পারবে না। নদীর ও ক্যানেলের জল আছে, বিস্তীর্ণ জমি আছে, চাষ করবার লোক আছে, চাষীরা কি এতই বোকা যে নগদ দাম পেলে বেশী মুনাফার আখ তারা উৎপাদন করবে না? এলাকাটির ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার মিথ্যা বদনাম কেন?

ময়ূরাক্ষী পত্রিকাকে পূর্বে জানিয়ে প্রেসিডেন্ট শাসন ঐ এলাকাটি একদিন তদন্ত করুন দেখি। কোন্ সরকারী কর্মচারী, কোন্ স্বার্থে গোপন কোন রিপোর্ট দিচ্ছে কে জানে? ঐ এলাকায় নাকি আখ হবে না—ডাহা মিথ্যা কথা। এ এলাকা আখের স্বর্ণখনি।

আচার্য যদুনাথ সরকার
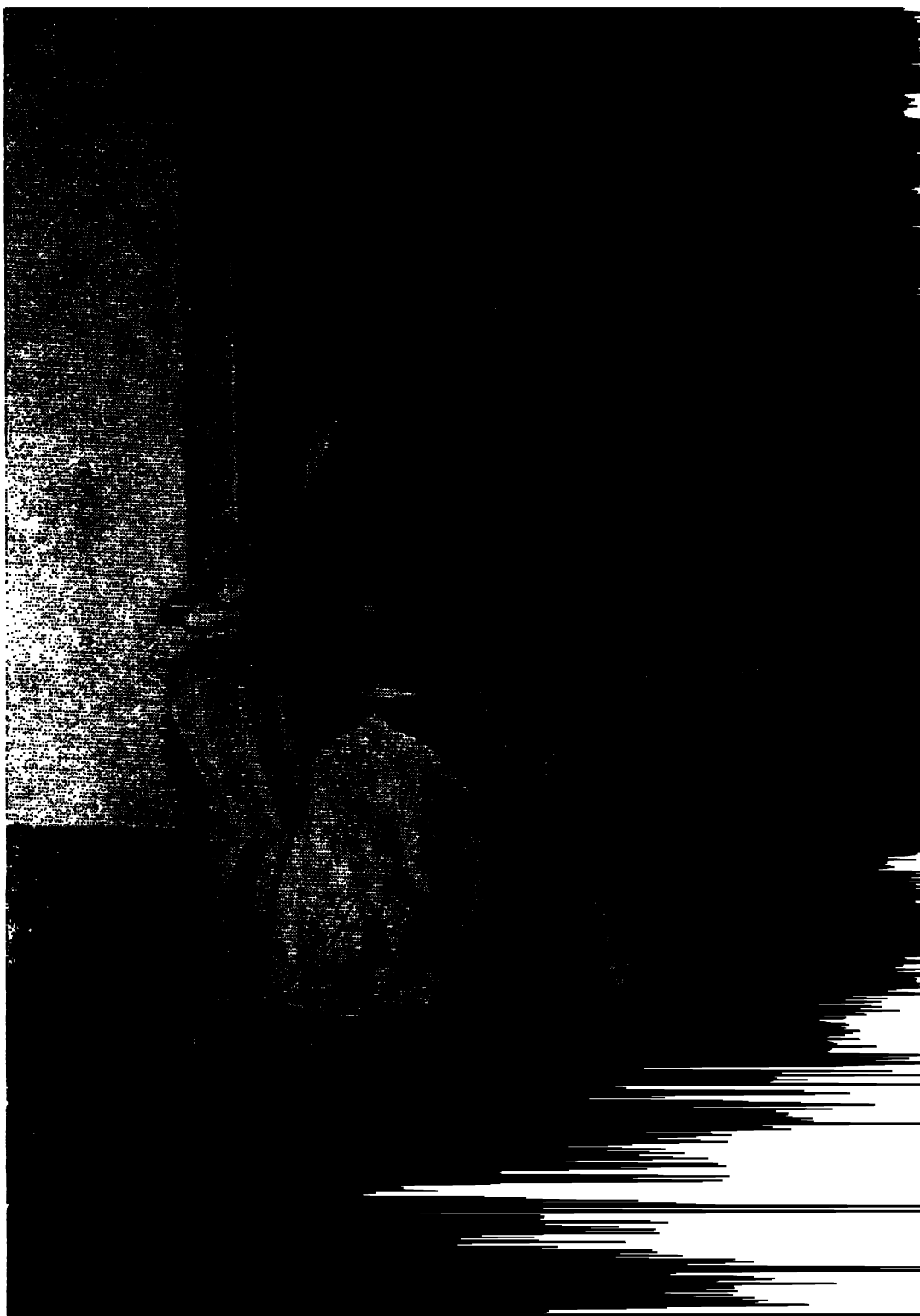
:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭০তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৭৭

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পাকিস্থানে নূতন শাসন নীতি

পাকিস্থান এতকাল সামরিক একনায়কত্বের অধীনে রাষ্ট্রীয় জীবন নির্ব্বাহ করিতেছিল। আয়ুবখাঁনের আমলে শাসনকার্য্য যে ভাবে চলিত তাহাতে পাকিস্থানবাসী জনসাধারণের কোন লাভ হইত কি না বলা যায় না; কিন্তু আয়ুবখাঁন ও তাঁহার পেটোয়াদিগের লাভ যথেষ্টই হইত বলিয়া সকলের বিশ্বাস। সেনাপতি ইয়াহিয়া খাঁন আয়ুব অপেক্ষা সুনীতি বোধে অনেক উন্নত শ্রেণীর মানুষ। অবশ্য সে সুনীতি বোধের তিনি একটা সীমা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার ভারত সম্বন্ধে কার্য্যকলাপ সেই সীমার বাহিরে। ইয়াহিয়া খাঁন বলিয়াছিলেন তিনি পাকিস্থানে সাধারণতন্ত্র অনুগত শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিবেন, এবং তিনি সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। পাকিস্থানে যে সম্প্রতি নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে এখন দেখা যাইতেছে যে আওয়ামি লীগ পূর্ণ সংখ্যা গরিষ্ঠভাবে জয়লাভ করিয়াছে। এই লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। অপর একদল নির্ব্বাচনে দ্বিতীয় স্থান দখল করিয়াছে। সে দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো। এইব্যক্তি পূর্ব্বে পাকিস্থান রাষ্ট্রে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল ও চরিত্রগুণে উচ্চস্তরের মানুষ নহে। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্থানের অধিবাসী-দিগের রাষ্ট্রীয় অধিকার সংরক্ষণ ও মানবীয় অধিকার অর্জ্জন বিষয়ে বিশেষভাবে সজাগ ও উন্নত পন্থা অনুসরণ প্রয়াসী। কিন্তু পাকিস্থানের মানুষের অধিকার ও অধিকারের দাবী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহার নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে যখনই ভারতীয়দিগের অধিকার

বা দাবির কথা উত্থিত হয় তখনই পাকিস্থানীদিগের নীতি ও ন্যায়বোধ হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। অর্থাৎ পূর্ব্ব পাকিস্থান যদিও পশ্চিম পাকিস্থানের বিভিন্ন অন্যায় কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন ও পশ্চিম পাকিস্থান কর্তৃক পূর্ব্বপাকিস্থানের মানুষকে অন্যায় ভাবে শোষণ চেষ্টার বিরোধী; তাহা হইলেও পূর্ব্বপাকিস্থানের ন্যায়বান নেতাগণ হিন্দুদিগের সম্পত্তি বেদখল করিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বপাকিস্থান হইতে বিতাড়ন করা সম্বন্ধে কোন অন্যায় বোধ করেন না। তাঁহারা অর্থাৎ পূর্ব্ব-পাকিস্থানের মুসলমানগণ যদি নিজেদের রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে এতই সজ্ঞান তাহা হইলে তাঁহারা পাকিস্থানের হিন্দুদিগের অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে লজ্জা অনুভব করেন না কেন? এখন যদি পূর্ব্বপাকিস্থান সত্য সত্যই পাক অথবা পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে কি সে দেশ হইতে অমুসলমানদিগকে বিতাড়ন বন্ধ হইবে? এবং পূর্ব্বে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দুদিগের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া বিতাড়িত করা হইয়াছিল; এখন ন্যায় ও ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরে কি তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া নিজ নিজ সম্পত্তি পুনরায় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে? যদি না হয় তাহা হইলে পূর্ব্বপাকিস্থানের ন্যায় ও সুনীতিবোধ কি পূর্ণ শক্তিতে বিকশিত হইতে পারিবে? সুনীতি, ন্যায়বোধ ও ধর্ম্মজ্ঞান নিজের সুবিধার জন্য একপ্রকার ও অপরের ন্যায্য অধিকার বিষয়ে অপর প্রকার হইলে সেই মানসিক অবস্থার তারিফ করা চলেনা। জোর করিয়া কাশ্মীর অধিকার চেষ্টাকেও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি অনুগত বলিয়া চালান যায় না। কাশ্মীর মুসলমান প্রধান দেশ হইলেও সে দেশের মানুষ কোন রাষ্ট্রে যোগদান করিবে তাহার নির্দ্ধারণ ভার পাকিস্থানের উপরে থাকিতে পারে না; কেননা ঐ নীতি অনুসরণ করিলে হিন্দু প্রধান নেপাল ও বালি প্রভৃতি দেশের উপর ভারতের অধিকার গ্রাহ্য করিতে হয়। বৌদ্ধ প্রধান চও ধর্ম্মহীন কম্যুনিষ্ট চীনের রাজত্ব চলিতে পারে না। পররাষ্ট্রে ধর্ম্ম, ভাষা প্রভৃতির দোহাই দিয়া নিজ প্রভুত্ব স্থাপন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি অনুগত বলিয়া স্বীকৃত হয় না। পাকিস্থান যে জর্ডনের রাজার সহায়তা করিয়া আরব বিপ্লবীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাও একটা বৃহৎ অন্যায় কার্য্য বলিয়া বিচার করা হইবে।

স্যার যদুনাথ সরকার

এই বৎসর প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ্ স্যার যদুনাথ সরকারের জন্ম শতবার্ষিকীর বৎসর। বর্ত্তমান কালে যে সকল জ্ঞানীগন ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া ও ইতিহাসের বিষয় লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, স্যার যদুনাথ সরকার তাঁহাদের মধ্যে এক উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। তিনি ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্ধার করিয়া সেই সময়ের কথা ইতিহাসের ছাত্রদিগের নিকট সহজ সরল ও সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন ও সেইজন্য তাঁহার খ্যাতি ইতিহাসের ছাত্রদিগের নিকট চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ঐ সময়ের ইতিহাস চর্চ্চা ও অনুসন্ধান কার্য্য যথাযথ ভাবে করিবার জন্য তিনি ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ফারসী আরবী, সংস্কৃত মারাঠী ও রাজস্থানী ভাষা সকল আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি শত শত হস্ত লিখিত পুঁথি ও বহু সহস্র মুঘল "আখবারাত" প্রভৃতি সংগ্রহ ও পাঠ করিয়া নিজের ইতিহাসের অনুশীলন পূর্ণ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত ভাষার শতশত পুস্তক ও পুস্তিকাদি তিনি পাঠ করিয়াছিলেন এবং নিজ ছাত্রদিগকে পাঠ করাইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে আমরা একাধারে যে মেধা প্রতিভা ও কঠিন পরিশ্রম ক্ষমতা দেখিয়াছি তাহা পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। এক সময় তিনি ইংরেজীর অধ্যাপকের কার্য্যও করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ইংরেজী মডার্ণরিভিউ, এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ণাল, হিন্দুস্থান রিভিউ, ইণ্ডিয়ান রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাংলায় তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্যার যদুনাথ সরকার আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ঐ সময়ের ইতিহাস পাঁচ খণ্ড পুস্তকে দ্বাদশ বৎসরে লিখিয়াছিলেন (১৯১২—১৯২৪) মুঘলযুগের ইতিহাস ও মুঘলশক্তির অবসান লইয়াও বিভিন্ন পুস্তক তিনি বহু বৎসর ধরিয়া রচনা করিয়াছিলেন। ইহার শেষ খণ্ড বাহির হইয়াছিল ১৯৫০ খৃঃ। তখন তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর। শিবাজীর ইতিহাস ও ভারতের প্রাচীন সামরিক বিধিব্যবস্থা ও যুদ্ধাবস্থার বর্ণনা লইয়াও স্যার যদুনাথ বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। এই বিষয়েও তাঁহার লিখিত দুইখানি ইংরেজী পুস্তক তাঁহাকে ইতিহাস রচনা ক্ষেত্রে খ্যাতি-লাভে সাহায্য করিয়াছিল।

স্যার যদুনাথ সরকারের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভারত সরকার বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা বহু বিখ্যাত লোকের চিত্র সম্বলিত ডাক টিকিট বাহির করিয়া সেই সকল ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের রীতি প্রবর্তিত করিয়াছেন। কিন্তু কখন কখন তাঁহারা বিশেষ সম্মানার্হ ব্যক্তিদিগের জন্য ঐরূপ ডাক টিকিট বাহির করিতে চাহেন না। এই অকারণ অনিচ্ছা ভারত সরকারের সুনামের হানী করে। স্যার যদুনাথের জন্ম শতবার্ষিকী এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও ক্যালকাটা হিষ্টোরিকাল সোসাইটির মিলিত চেষ্টায় এশিয়াটিক সোসাইটির সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সভায় বহুগুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। খ্যাতনামা বক্তাদিগের স্যার যদুনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এইভাবে স্যার যদুনাথের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হওয়াতে সকলেই আনন্দলাভ করেন ও ইহাই মনে করেন যে স্যার যদুনাথ নিজে যেরূপ কখনও কোন কিছু লইয়া সোরগোল ও জলুস করা পছন্দ করিতেন না, তাঁহার স্মৃতি রক্ষাও তেমনিই শান্ত, সুষ্ঠু ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশে হওয়াই উপযুক্ত ও শোভন হইয়াছে। তিনি মনে করিতেন যে সাড়ম্বর জাঁকজমক বহুল অনুষ্ঠান অন্তঃসারশূন্যতার নিদর্শন মাত্র। মহা সমারোহ করিয়া কোন কিছু করার তিনি কখনও সমর্থন করিতেন না। বিষয়ের সত্যরূপ যাহাতে যথাযথ ভাবে ব্যক্ত হয় তিনি শুধু তাহাই চাহিতেন। এই দিক দিয়া দেখিলে ভারত সরকারের ঔদাসীন্যেরও একটা মূল্য আছে বলিতে হয়।

স্যার সি, ভি, রামন

ডাঃ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন ভারতের তথা পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। পদার্থ বিজ্ঞানের আলোক ও শব্দতরঙ্গ সংক্রান্ত অনুশীলন ও বিশ্লেষণ কার্য্যে তাঁহার খ্যাতি জগতের বিদ্বান সভায় অতি উচ্চে ছিল। আলোকের বর্ণ পরিবর্ত্তনের হেতু ও অবস্থাভেদে আলোক বিকিরণের ফলে বর্ণ বৈচিত্রের আবির্ভাব সম্বন্ধে ডাঃ রামনের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার তাঁহাকে ১৯৩০ খৃঃ অব্দে নোবেল পুরস্কার পাইতে সক্ষম করে। তিনিই ভারতের প্রথম বৈজ্ঞানিক যাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। সমুদ্রের জলের, পর্ব্বত শিখরের বরফের, পাখীর পালকের, ফুলের পাপড়ির বর্ণ এবং বাদ্যযন্ত্রের বা অপর ক্ষেত্রজাত শব্দের বিশ্লেষণ সম্বন্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্দ্ধারণ বিজ্ঞান জগতে তাঁহাকে অমর করিয়াছে।

ডাঃ রামন ১৯০৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রথম বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ লণ্ডনের ফিলজফিকাল ম্যাগাজিনে প্রকাশ করেন। তিনি তৎপরে অনেক বৎসর সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার আগ্রহ এতই প্রবল ছিল যে তাঁহাকে যখন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পদার্থ বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিতে চাহেন তখন বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াই তিনি সরকারী কার্য্যে ইস্তাফা দিয়া ঐপদে অধ্যাপকের কর্ম্মে আত্ম নিয়োগ

করেন। কলিকাতাতে তিনি ঐ সময় হইতে (১৯১৮) বহু বৎসর ছিলেন ও তাঁহার এই মহানগরীর সহিত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বের সম্বন্ধ চিরবর্ত্তমান ছিল। তিনি বলিতেন মহানগরীগুলি বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের সহায়ক পারিপার্শ্বিক সৃজন করে না। শুধু পৃথিবীতে দুইটি মহানগরী আছে যেখানে কৃষ্টি ও বিদ্যাচর্চ্চা যথাযথভাবে চলিতে পারে। এক প্যারিস ও দুই কলিকাতা। কিন্তু কলিকাতার শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চ্চার আবহাওয়া ক্রমশঃ প্রতিকূল হইতে আরম্ভ করিয়াছে ও তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা না হইলে অতিশীঘ্রই কলিকাতা অপরাপর মহানগরীর মতই বিদ্যা ও কৃষ্টি বিমুখ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ডাঃ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন ১৯২৪ খৃঃ অব্দে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পরে, ১৯৪১ খৃঃ অব্দে আমেরিকার অপটিকাল সোসাইটির সদস্য নির্ব্বাচিত হ'ন। তিনি ১৯৪২ খৃঃ অব্দে ফ্রাঙ্কলিন পদক প্রাপ্ত ও ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে সোভিয়েট আকাডেমি অফ সায়েন্সের সদস্য নির্ব্বাচিত হ'ন। ১৯৫৭ খৃঃ অব্দে তিনি আন্তর্জাতিক লেলিন পুরস্কার ও ১৯৫৪ খৃঃ অব্দে ভারতরত্ন পদবী পাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি ফরাসী বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সভ্য নির্ব্বাচিত এবং অন্যান্য বহু সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন।

ডাঃ রামন শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া ছিলেন। ভারতের বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে তাঁহার বহু খ্যাতনামা ছাত্র ছিলেন ও এখনও আছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের তথা জগতের বিজ্ঞান অনুশীলন কার্য্যে যে অভাব দেখা যাইবে তাহা অপর কেহ সহজে পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন না। তাঁহার পত্নী ও দুই পুত্র বর্ত্তমান আছেন। আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। ডাঃ রামনের সহিত আমাদিগেরও ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের শোক একান্ত ও সাক্ষাৎভাবে অনুভূত।

পরলোকে কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাংলার সাহিত্যাকাশে সুদীর্ঘকাল শোভমান থাকিয়া কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। সরল স্বাভাবিক রস অনুভূতি ও তাহা সহজ সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করার জন্য কবি কুমুদরঞ্জন খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘজীবনে তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহার অনেকাংশ তাঁহার কাব্যগ্রন্থমালায় গ্রথিত আছে। এই সকল পুস্তকের সংখ্যা অত্যধিক নহে কারণ কবির কাব্য প্রেরণা ও অভিব্যক্তির আগ্রহ কদাপি শান্ত সুবিন্যস্ত সৌন্দর্য্য উপাসনার পথ ছাড়িয়া প্রবল উচ্ছ্বাসের বন্যা প্লাবনের ধারায় বহমান হইত না। তাঁহার কিছু কিছু কবিতা ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছিল এবং সমালোচক মহলে সেই অনুবাদগুলি সমাদৃত হইয়াছিল। তিনি কখন বহু সভা সমিতিতে গমন করিয়া সকলের নিকট নিজ পরিচয় দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন না। আত্ম প্রচার তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাহা হইলেও বাংলা দেশের পাঠকদিগের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি নিজ হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৮৮২খৃঃ অব্দের মার্চ মাসে বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৫ খৃঃ অব্দে ঐ গ্রামের নিকটে মাথরাণ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন ১৯০৮ খৃঃ অব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আজীবন নিজ গ্রামেই বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক এক সময় বাংলার বোর্ড অফ সেকেণ্ডারি এডুকেশন-এর সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী সিন্ধুবালা দেবী অসুস্থ ছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র বর্ত্তমান আছেন।

আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীতা

মানুষ যখন পরিবারগত অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গঠন করিয়া দিন কাটাইত তখন তাহার বস্তু জন্তু দিগের সহিত যুদ্ধ অথবা পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের মিমাংসা ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই এক প্রকারে সম্পন্ন হইয়া যাইত। পরিবার বা গোষ্ঠীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রভুত্বই সকল বিষয়ের রীতিনীতি পদ্ধতি নির্দ্ধারণের আদেশ নির্দেশ সম্পূর্ণ করিত। কিন্তু পরে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগল, পরিবার ও গোষ্ঠী অসংখ্য হইয়া দাঁড়াইল তখন সকল পরিবার ও গোষ্ঠীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মিলিতভাবে প্রধানের প্রধান ও পরে তস্য প্রধান নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হইল। এই সকল মহাপ্রধান ও সর্ব্বপ্রধানদিগের কার্য্য হইল পরিবার ও গোষ্ঠীগত ব্যক্তিগণ যাহাতে সুখে শান্তিতে ও সমৃদ্ধভাবে জীবন যাপন করিতে পারে সেইরূপ আয়োজন ও ব্যবস্থা করা। এই সকল ব্যবস্থা হইতেই ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর মানব সমাজ গড়িয়া উঠিল ও সেই সমাজের ব্যক্তিদিগের ব্যবহারাও কার্য্য যাহাতে সমাজকে আঘাত বা ধ্বংস না করে তজ্জন্য নিয়ন্ত্রিত বিধিসকল ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রযুক্ত হইয়া রীতিগ্রাহ্য বিধান বা আইনের রূপ গ্রহণ করিল। আইন ও বিধান প্রণয়ন কার্য্যের সর্ব্বদাই দুইটি দিক থাকিত। একদিকে ছিল মানুষের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অধিকার স্বত্ব ও দাবির সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ও অপরদিকে ছিল কর্ত্তব্য দায়িত্ব ও বাধ্যতামূলকভাবে না করিবার কার্য্যের অথবা অপরাধের ফিরিস্তি। নিয়মন ও দমন উভয় কার্য্যই যথাযথভাবে সম্পন্ন হইবার সুবিধার জন্য আদালত ও বিচারকের প্রতিষ্ঠা ও নিয়োগ ব্যবস্থা হইল। মানব সমাজের নিত্য নূতন অধিকার স্বত্ব ও দাবির এবং চিরবর্দ্ধনশীল কর্ত্তব্য দায়িত্ব ও অপরাধের তালিকার চাপে আইন প্রণয়ন কোন সময়েই স্থগিত রাখা সম্ভব হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে এখন অবধি আইন প্রণয়ন সংশোধন, বাতিল করা প্রভৃতি কার্য্য অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। এবং সকল আইনের দোষগুণ বিচার করাও একটা সমাজ গঠন ও পরিচালনার বিশেষ অঙ্গ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সকল আইনেরই মূলে সুনীতি সুযুক্তি ও ন্যায়ের কথা আছে। যদি কোন আইন নীতি-বিরুদ্ধ অথবা যুক্তিহীন হয় তাহা হইলে সে আইন সমাজের মঙ্গলকর হইতে পারে না। এই কারণে এক-নায়কত্ব, কাজীর বিচার, রাজার স্বৈরাচার, সামরিক প্রভুত্বের যথেচ্চাচার প্রভৃতি শাসন পদ্ধতি মানব অধিকার ও স্বাধীনতা বিরুদ্ধ বলিয়া সর্ব্বদাই আইনের শাসনের তুলনায় নিম্নস্তরের সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুবিচারের প্রধান অঙ্গ হইল বিচারাধীন মানুষের আত্মসমর্থনের অধিকার। এবং সেই বিচার কার্য্য সর্ব্বজন সমক্ষে খোলাখুলি ভাবে হওয়া আবশ্যক। কোনও বিশেষ কারণ না থাকিলে বন্ধ দরজার আড়ালে বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেওয়া কখনও উচিত হয় না। আদালত জনসাধারণের নিকট সদা উন্মুক্ত থাকাই শ্রেয় এবং আদালতের বিচার কার্য্যে অধিক ঢাকাঢাকি না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিচারকালে অভিযোগের কথা ও অভিযুক্তদিগের উপস্থিতি যথাযথ ভাবে বর্ণনা করা ও প্রমাণ হওয়া আবশ্যক। কে কি দাবি করিতেছে কে কাহাকে কোন অপরাধের জন্য দায়ী করিতেছে, এই সকল কথাই সর্ব্বসমক্ষে পূর্ণ বিবৃত হওয়া প্রয়োজন। দাবি বা দায়িত্ব কি তাহা কেহ জানিল না অথবা অপরাধ কি বা অপরাধী কে তাহাও জানা যাইল না; অথচ দণ্ড, জরিমানা, অধিকার বা অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া গেল; এই প্রকার ব্যবস্থা মানব সভ্যতার রীতি ও আদর্শ বিরুদ্ধ।

শান্তিরক্ষার জন্য অথবা সামরিক উত্তেজনাজাত অবস্থাতে মানুষকে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কখন কখন এমন করা আবশ্যক হইতে পারে যখন আইন আদালতের নিয়মবদ্ধ সুশৃঙ্খলতা ও

পদ্ধতি রক্ষা সম্ভব না হইতে পারে; কিন্তু রাজকর্মচারীগণ আইনের নিয়ম সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ঠিক কতদিন বা কত দূর কি করিতে পারেন সে কথাও আইন প্রণয়ন করিয়া স্থির করা আবশ্যক হয়। নতুবা স্বৈরাচর ক্রমশ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়া সমাজে রাজকর্মচারীদিগের প্রভুত্বকে এমনই একটা উৎকট উচ্ছৃখলতায় দাঁড় করাইবে যাহার প্রাবল্য মানুষের সকল মানবীয় অধিকার ও স্বাধীনতা বিনাশ করিয়া সমাজকে আমলাদিগের দাসত্বে নিমজ্জিত করিয়া সভ্যতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ করিবে। বৃটিশজাতি মানবীয় অধিকার ও সভ্যতার দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য বহু কিছু করিয়াছে। কিন্তু আবার ঐ বৃটিশজাতিই সাম্রাজ্যবাদের প্রলোভনের আকর্ষণে এমন বহু কার্য্য করিয়াছে যাহা মানবীয় অধিকারের সকল অঙ্গই বিকল করিয়া মানুষকে দাসত্বের গভীরে নিক্ষেপ করিয়াছে। ভারতবর্ষের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ বারেবারে আইনের প্রভুত্ব নাকচ করিয়া রাজপ্রহরীদিগের প্রভুত্ব কায়েম করিয়া ভারতের মানুষকে বৃটিশের দাস করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু শেষ অবধি তাহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ভারতের মানুষ ন্যায় ও সুবিচার বিরোধী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে প্রভুত্বের আসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিল। আজ কিন্তু আবার ভারতীয়দিগের স্বাধীনতার একটা নুতন পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের নিজস্ব দরবারের নিজস্ব প্রভুদের শাসন ক্ষমতা উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত না হওয়াতে দেশে আইন অমান্যকর কার্য্যকলাপ আরম্ভ হইয়াছে। রাজকর্মচারীগণ আইনের গৌরবরক্ষা করিতে সক্ষম না হওয়াতে আইনকে দমন করিয়া আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিবার আইন-সঙ্গত অধিকার প্রার্থী হইয়া শাসনের দরবারে দাবি পেশ করিতেছে। বাংলাদেশে এখন এরূপ আইন করা হইয়াছে যাহাতে মানুষকে শুধু সন্দেহের উপর গ্রেফতার করিয়া কারাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়। কিসের সন্দেহ, কে সন্দেহ করিল, কেন সন্দেহ হইল প্রভৃতি প্রশ্ন কেহ করিবে কি না তাহাও জনসাধারণের অজ্ঞাত থাকিবে। শুধু আইন অনুবর্ত্তিতা সংরক্ষণ অক্ষম পুলিশ পাহারাওয়ালাদিগকে আইনের নীতি পদ্ধতির অতিরিক্ত ক্ষমতা দান করার ব্যবস্থা হইল। এই ব্যবস্থা হইলেও ঐ অক্ষম আমলাতন্ত্র কখনও যে ভারতের সর্ব্বত্র উন্নতিশীল সুশাসন ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবে এরূপ বিশ্বাস জনসাধারণের মনে জাগ্রত হইতেছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ যেরূপ জনসাধারণের উন্নতি ও উপকার চিন্তা না করিয়া শুধু নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষা চিন্তাই করিত ও ফলে সেই সাম্রাজ্যবাদ যেরূপ বিনষ্ট হইয়া যায়; আমাদের নিজেদের রাষ্ট্রীয় দলের অনুগত দল-স্বার্থ সংরক্ষণ প্রচেষ্ট শাসকদিগেরও অবস্থা প্রায় সেই সাম্রাজ্যবাদীদিগেরই সমতুল্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। এরূপ অবস্থায় শাসকগোষ্ঠীগুলির কর্ত্তব্য সাধারণের নিকট নিজেদের জাতীয় ও সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রমাণ করিবার ব্যবস্থা করা। শুধু শক্তিবৃদ্ধি করিয়া সাধারণের বক্ষে প্রভুত্বের প্রস্তর চাপাইয়া কোন সাধারণতন্ত্র চলিতে পারে না। সাধারণতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য সাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ। অকর্মণ্য পুলিশ পাহারাওয়ালার শক্তি বৃদ্ধি নহে। আর প্রয়োজন জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা, কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রসার এবং জাতীয় সংগঠন। এই সকল কার্য্য ভারতে যথাযথভাবে সাধিত হইতেছে না। এই কারণেই শাসকদিগের বিরুদ্ধতা প্রবল হইতেছে। ইহার প্রতিকার না করিয়া রাজশক্তির অপব্যবহার চেষ্টা প্রবলতর করিয়া কোনও লাভ হইবে না।

এশিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

এবার ব্যাংককে এশিয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যেরূপ অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় তেমনি এশিয়ান ক্রীড়াতে ভারতবর্ষ দেশের আকার ও জনসংখ্যার অনুপাতে ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় বিশেষ

সক্ষমতা দেখাইতে অসমর্থ প্রমাণ হইয়াছে। জাপান দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড ও ইরাণ এই প্রতিযোগীতায় ভারতের বহু উর্দ্ধে স্থান অধিকার করিয়া নিজ নিজ জাতির সম্মান রক্ষা করিয়াছে। কোন ক্রীড়ায় প্রথম স্থান অধিকার করিলে স্বর্ণ পদক পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পাইলে রজত ও ব্রঞ্জ পদক লাভ হয়। জাপান লিখিবার সময় অবধি ৬৬টি স্বর্ণ পদক, ৪০টি রজত ও ১৬টি ব্রঞ্জ পদক প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ কোরিয়া ১২টি স্বর্ণ ১০টি রজত ও ২০টি ব্রঞ্জ পদক লাভ করে। থাইল্যাণ্ড পায় ৮টি স্বর্ণ, ১০টি রজত ও, ১০টি ব্রঞ্জ পদক, ইরাণ ৮টি স্বর্ণ ৬টি রজত ও ৫টি ব্রঞ্জ পদক ও ভারতবর্ষ ৬টি স্বর্ণ, ৭টি রজত ও ৯টি ব্রঞ্জ পদক। ভারতের এত অল্প পদক পাইবার কারণ প্রধানত ভারত সরকারের ক্রীড়াবিদ্দিগের সংখ্যা হ্রাস করিবার আকুল প্রয়াস। ইহাতে নাকি ভারতের বিদেশী মুদ্রা ব্যয় সংক্ষেপ হয়। কিন্তু এদেশ হইতে দলে দলে সরকারী পেটোয়াগণ সারা দুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে যে ব্যয় বৃদ্ধি হয় তাহা কমাইবার কোন চেষ্টা ভারত সরকার কখনও করেন না। অপরাপর কারণের মধ্যে দেখা যায় ভারতে ক্রীড়ার প্রসারের উপযুক্ত চেষ্টার অভাব। ভারতে পঞ্চ সহস্রাধিক সহরের শতকরা নিরানব্বইটিতেই কোন উপযুক্ত ক্রীড়া ময়দান নাই। স্কুলে কলেজেও খেলার ব্যবস্থা যাহা আছে তাহা না থাকার মতনই। ছেলে মেয়েদের খাওয়ার আয়োজন একান্তই অর্দ্ধাহারের মতন। ক্রীড়া শিক্ষার বন্দোবস্তও ঠিক মত কোথাও নাই। বহু ক্রীড়াতেই যতগুলি খেলোয়াড় যাওয়ার উপযুক্ত ছিল তাহার অর্দ্ধেকও ভারত সরকারের নিকট যাওয়ার অনুমতি পায় নাই। আবার যে সকল দল অধিক সংখ্যায় গিয়াছিল সে সকল দলের ক্রীড়কদিগের পিছনে সুপারিশের জোর ছিল, কিন্তু তাহারা ক্রীড়ায় সক্ষমতা দেখাইতে পারে নাই। সাধারণভাবে বলা যায় যে ভারত সরকারের স্পর্শেই জাতীয় সকল কর্ম প্রচেষ্টা ও উদযোগ সফলতার পথ ছাড়িয়া অনুর্ব্বর জড়তায় নিক্ষিপ্ত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগীতাতেও তাহাই হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে বেসরকারী চাটুকার তাঁবেদারদিগের অবদানও কিছু কিছু লক্ষিত হয়। খেলোয়াড় চয়নে ও অপরাপর আনুসঙ্গিকে মুরুব্বিয়ানা ও সুপারিশ করিবার মাতব্বরদিগের কার্য্যকলাপও ক্রীড়ার উন্নতি সাধনের প্রতিকূলতাই করিয়াছে। অবশ্য ভারত সরকারের সকল বিষয়ে মত প্রকাশ ও বাধা দিবার চেষ্টার তুলনায় বেসরকারী ব্যক্তিদিগের কার্য্য ততটা ক্ষতিকর হয় নাই।

ভারতে একনায়কত্বের সম্ভাবনা

সাধারণতন্ত্রের আদর্শ হইল স্বাধীনভাবে জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগের নির্ব্বাচন সম্পন্ন করিয়া সেই প্রতিনিধিদিগের অধিকাংশের মতানুসারে শাসনকার্য্য পরিচালনা করা। ভারতবর্ষ সাধারণতন্ত্র এবং সংবিধানের বর্ণনা অনুসারে নিজশক্তির উপরে পূর্ণ নির্ভরশীল, ব্যক্তিগত-রাজশক্তিবর্জিত সাধারণের-রাজাধিকার সম্পন্ন রিপাবলিক। কিন্তু ভারতবর্ষে নানা বিদেশী শক্তির অপপ্রচার ও প্রভাব বিস্তার চেষ্টার ফলে বহু তথাকথিত বামপন্থি রাষ্ট্রীয়দল গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দলগুলির পশ্চাতে বিদেশের অর্থ সাহায্যের সন্দেহও অনেকে করিয়া থাকেন। দক্ষিণ পন্থার সহিতও যে বিদেশী অর্থের কোনও সংযোগ নাই ইহাও কেহ মনে করেন না। অর্থাৎ খুলিয়া বলিলে বলিতে হয় যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দলগুলির অথবা দলের নেতাদিগের বহুল অংশেই জাতির সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলার অভ্যাস নাই। অনেক দল ও দলপতিই বিদেশীর অর্থপুষ্ট ও বিদেশীদিগের মতলবের অনুসরণকারী ভৃত্য। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের সাধারণতন্ত্র ঠিক সাধারণতন্ত্রের আদর্শে গড়িয়া উঠিতেছে না। দেশের ও জাতির নামে বিদেশীর অনুচরদিগের দ্বারা শাসিত হওয়া কোন যথার্থ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক নহে। আমেরিকা, রুশিয়া অথবা চীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া ভারতের স্বারাজ শাসনের স্বপ্ন ক্রমশঃ হাওয়ায় মিলাইয়া

যাইতেছে। এই দেশের জনসাধারণের মধ্যে বহু লোক আছে যাহারা ইহাতে কোনও লজ্জা অনুভব করে না। চীনের বেতন ভোগীগণ মুক্ত আসরে নিজেদের দেশ-দ্রোহিতা প্রচার করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করে। রুশিয়ার বন্ধুগন বিষয়টা কিছু কিছু স্বাধীন প্রচেষ্টার আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়া দাসত্বের পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। এবং আমেরিকার নিকট অর্থ লওয়া অনেকটা প্রকাশ্য ভাবে ও কিছুটা গোপনে করা হয়। যে ভাবে যাহাই করা হউক রাষ্ট্রীয় দল গঠনের সাধারণতন্ত্রের আদর্শ সম্মত যে নীতি, ভারতবর্ষে সেই নীতি অনুসৃত হইতেছে না। রাষ্ট্রীয় দলগুলি বিদেশীর আদেশে নির্দ্দেশে দেশ ও জাতির মঙ্গলের কথা ভুলিয়া বিদেশী দিগকে "উপরওয়ালা" বা প্রভু বলিয়া মানিয়া লইতেছে। জনসাধারণের তাহা হইলে কর্ত্তব্য রাষ্ট্রীয় দলগুলির প্ররোচনায় মুগ্ধ না হইয়া ঐ দলগুলিকে বর্জ্জন করিয়া শাসন কার্য্য চালাইবার চেষ্টা করা। তাহা না করিলে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ পরোক্ষভাবে হয় চীন নয়ত রুশিয়া অথবা আমেরিকার সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যাইবে।

পণ্ডিত নেহেরু আমরা কোন দলের নহি, আমরা কোন "ব্লক" বা রাষ্ট্র গোষ্ঠীর অন্তর্গত নহি ইত্যাদি বহু কথাই জোর গলায় বলিতেন। তিনিই কিন্তু আমেরিকা, রুশিয়া ও চীনের সহিত মিতালি করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমাগত দান অথবা ঋণ গ্রহণ করিলে যে আত্ম-সম্মান ও আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না, সেকথা পণ্ডিত নেহেরু জানিতেন না বলা যায় না। স্বাবলম্বন ব্রত স্বাধীনতা-কাঙ্খী সকল মানবের অন্তরে জাগ্রত থাকা প্রয়োজন সে কথাও পণ্ডিত নেহেরু উত্তমরূপেই জানিতেন। কিন্তু আর্থিক পরিকল্পনা ও জগতে শীঘ্র শীঘ্র উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগ্রহে শুভবুদ্ধির পরিবর্ত্তে দুরাকাঙ্খাই সেই সময়ের রাষ্ট্রদলনেতাদিগকে পাগল করিয়া রাখিয়াছিল। পরে সেই মনোভাব আরোও অধোগামী হইয়া কোন কোন রাষ্ট্রীয় দল খোলা বাজারে আত্ম বিক্রয় করিতে প্রচেষ্ট হ'ন। কোন কোন দল কালোবাজারে গা ঢাকা দিয়া পরধনপুষ্ট হইতে থাকে। যে যে ভাবেই চরিত্রহীনতা ব্যক্ত করিয়া থাকুক না কেন, ভারতের রাষ্ট্রীয় দলগুলি সম্বন্ধে কাহারও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না; এবং তাহার প্রধান কারণ পরমুখাপেক্ষীতা ও পরের নিকট সাহায্য, দান ও উৎকোচ গ্রহণ। কোনও শক্তিশালী স্বাধীন ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন জাতি কখনও বিদেশীর সহিত ঐ ভাবের আর্থিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না।

এই অবস্থায় কোন কোন রাষ্ট্রনেতা এরূপ কল্পনাও করিতেছেন যে অবস্থা বিপর্যয় ঘটিলে সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতে একনায়কত্ব স্থাপন করার কথাও এখন চিন্তা করা আবশ্যক। এই নেতাদিগের মধ্যে বামে ও দক্ষিণে উভয় দিকেই কেহ কেহ আছে। কোন কোন নেতাকে তাহাদের বিদেশী সহায়ক ও প্রভুগণ উপদেশ দিতেছে যে যথাশীঘ্র একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা চেষ্টা করা উচিত। এবং কোন কোন দলপতি ও নেতা সেইরূপ ব্যবস্থা চেষ্টা করিতেছে বলিয়াও অনেকের বিশ্বাস। জন সাধারণের পক্ষে এখনও সম্ভব রাষ্ট্র ক্ষেত্রের দল-গুলিকে বর্জ্জন করিয়া স্বাধীনভাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়া। অবশ্য তাহা করা হইবে বলিয়া আমরা মনে করিনা। কারণ ভারতের জনসাধারণ কর্তাভজা ও কর্ত্তা খুঁজিয়াই অদ্যাবধি বহু বিপদে পড়িয়াছে ও অতঃপরও পড়িতে থাকিবে।

রামমোহন হ'তে বিদ্যাসাগর

(২)

পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্রের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লিখিত এই শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবন্ধে আমি সেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মার জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিবরণ—যা শিক্ষিত বঙ্গ সমাজে সুপরিজ্ঞাত—বাদ দিয়ে তাঁর জীবনের শাশ্বত কীর্তি ও চারিত্র-মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তুলতেই চেষ্টা করব। তাঁর অত্যাশ্চর্য বিদ্যাবুদ্ধি, দয়াদাক্ষিণ্য, কর্মপটুতা, সমাজ-সংস্কার—প্রচেষ্টার চেয়েও অধিকতর প্রশংসনীয় কীর্তি হচ্ছে তাঁর শিক্ষা-সংস্কার, শিক্ষাপ্রসার-প্রচেষ্টা ও বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন। এক্ষেত্রে তাঁর অবদানকে অম্লান রাখতে তিনি যে আদর্শ পৌরুষ ও চারিত্র-বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিলেন, তাই আমি যথাসাধ্য বিবৃত করতে চেষ্টা করব।

লেখক

রবীন্দ্রনাথ একজায়গায় বলেছেন বিদ্যাসাগরকে "দয়ার-সাগর" এই আখ্যা দিয়ে, তাঁর দয়ার উদাহরণ ও গুণানুকীর্তন করে এদেশের লোকেরা এক "তিরস্করণী" অর্থাৎ ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে প্রকৃত বিদ্যাসাগরকে আবৃত ও আচ্ছন্ন রাখবার প্রয়াস করেছেন। কারণ, প্রকৃত বিদ্যাসাগরকে তাঁরা চান-নি, তাঁকে তাঁরা মনঃপূত করেন নি। সে-বিদ্যাসাগর ছিলেন—মোহমুক্ত, ...ক্তি ও বাস্তবতাবাদী পুরুষসিংহ। অধ্যাপক বিনয় রায় ঠিকই বলেছেন—"অসহায় নিপীড়িতের সমাজে তাবতই তিনি 'দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর' রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্য, বদান্যতা, মহানুভবতা ...ভৃতি—সব কটি মানবচরিত্রের মহৎগুণ হলেও ব্যক্তিচরিত্রের উপাদান হিসেবে তার বিশেষ কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই।"

ঐতিহাসিক মূল্য নেই তার প্রমাণ, যাঁরা বিদ্যাসাগরের সেই দয়াদাক্ষিণ্য ও বদান্যতার ফলভোগী হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই সেই মহাপ্রাণ দাতার জীবৎকালেই তাঁকে ভুলে গিয়ে, কত সময়ে তাঁর নিন্দাও করেছিলেন; —যারজন্য শেষ বয়সে তিনি নিরাশাবাদী (cynic) হয়ে গেলেন এবং অবশিষ্ট দিনগুলি তাঁকে নিঃসঙ্গ এবং বিষণ্ণ ভাবেই কাটাতে হল।

বিদ্যাসাগরের অন্যতম মহতী প্রচেষ্টা বিধবাবিবাহ প্রচলন, যার জন্য তিনি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ও করেছিলেন এবং একসময়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা

খনপ্রস্তও হয়েছিলেন। কিন্তু এত করেও, এই সংস্কার প্রচেষ্টায় তিনি যে সফলকাম হয়েছিলেন এ কথা বলা চলে না। কারণ, সম্রান্ত হিন্দুসমাজ কখনও স্বচ্ছন্দচিত্তে বিধবাবিবাহ প্রথাকে গ্রহণ করেনি।

রবীন্দ্রনাথ যে 'তিরস্করণী'র কথা বলেছেন, সে কথা যে কত সত্য, তা জানবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল, বিশ বৎসর পূর্বে, যখন আমি কলকাতার কোন উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরিচালনার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলাম। তারিখটা ২৬শে সেপ্টেম্বর—বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। ছাত্রদের সভায় বিদ্যাসাগরের জীবনী আলোচিত হচ্ছে। সেখানে আমি রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি করেই বললাম যে, যদিও আমরা বিদ্যাসাগরকে দীন-দুঃখী অসহায় ও পতিতের পরম বন্ধু এবং সমাজ-সংস্কারক বলেই বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রেখেছি, কিন্তু তাঁর প্রকৃত মহত্ত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে ও অদম্য চরিত্র বলে।...

...তিনি যে খুব দেবদ্বিজে ভক্তিমান এবং আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন, তা নয়। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, তখন ঐ কলেজের সংলগ্ন পাশের বাড়ীতে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে প্রচণ্ড সমাজবিপ্লবের আন্দোলন চলেছে। নব্য ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদল (Young Bengal) বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার মোহে সমস্ত দেশাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সেই যুক্তিবাদী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আন্দোলনের ঢেউ কিছু-কিছু যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করবে, এতে আর সন্দেহ কী?...

...পৈতা, টিকি থাকলেও, ছাত্রাবস্থাতেই বিদ্যাসাগর সন্ধ্যা-আহ্নিক করা যে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। তিনি বড় হয়ে কখনও কোন দেবমন্দিরে প্রবেশ করে কোন দেবমূর্তিকে প্রণাম করেছেন বলে জানা যায় না। মাতা পিতা, বিশেষ করে মাতা, তাঁর নিকট এমন প্রত্যক্ষ দেবতা ছিলেন যে, তাঁর জীবনে ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ করতে অন্য কোন দেবতার নিকট মাথা নত করতে হয় নি। তাঁর 'বোধোদয়' পুস্তকখানা যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাতে নীতিকথা ভিন্ন কোন ধর্মকথাই ছিল না। তা-দেখে কোন বন্ধু মন্তব্য করলেন যে, বইখানা যখন সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের পাঠ্য পুস্তক, তখন তাতে ধর্মের কথা কিছু থাকা উচিত ছিল। তাই শুনে পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর ধর্মসম্বন্ধে একটি মাত্র বাক্য যোগ করেছিলেন—"ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ।" ঐ একটি বাক্যেই তাঁর ধর্মমত সুপরিস্ফুট। কিন্তু তিনি নিজের ধর্মমত কখনও প্রচার করেননি বা অন্য কারো উপরে চাপাবার চেষ্টা করেননি। নিজের বিচারবুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যকে তিনি যেমন শ্রদ্ধা করতেন, অন্যের মতকেও তেমনি শ্রদ্ধা করতেন। নিজবুদ্ধির বিচারে তিনি যা সঙ্গত ও কর্তব্য মনে করতেন, কারও ভয়ে তা হতে একচুলও বিচলিত হতেন না। তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তাই তাঁকে চিরকালের জন্য বরণীয় ও স্মরণীয় করে রেখেছে।

আমার বক্তব্যের পর একজন শিক্ষক সহকর্মী বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন যে, প্রধানশিক্ষক যা বলেছেন তা ঠিক নয়, যেহেতু তিনি নাকি স্বচক্ষে বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন, খড়ম পায়ে দিয়ে, টিকিতে ফুল গুঁজে, ঠাকুরঘর হতে বেরিয়ে আসতে; পিতা-মাতাকে তো তিনি ভক্তি করতেনই, দেবদ্বিজেও তিনি সমান ভক্তিমান ছিলেন।

তাঁর এই উক্তির প্রতিবাদে অন্য কোন শিক্ষক কিছুই বললেন না। সুতরাং 'তিরস্করণী' বাংলা দেশে যে কতখানি কার্যকরী হয়েছে, তা বেশ বোঝা গেল। ফলকথা, এযুগে দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর একটি কিংবদন্তীমাত্রে পর্যবসিত। তাঁর সম্বন্ধে অন্য কিছু জানবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, এই অবক্ষয়ের যুগে। তাই বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাহা মিথ্যাও নির্বাধে চলে যায়।

সমাপ্তিতে আমি আর কী বলবো। শুধু বললাম যে, আমার কথা ঠিক কিনা তা বিদ্যাসাগরের চরিত্র

পাঠ করিলেই জানা যাবে। রবীন্দ্রনাথ বা ।ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্ম বলে যদি সন্দেহের অতীত ।বিবেচিত না হন, তবে বিদ্যাসাগরের সহোদর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের লেখা "বিদ্যাসাগর চরিত" পড়ে দেখতে পারেন। প্রখ্যাত অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও বিপিনবিহারী গুপ্ত তাঁদের প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাও পড়ে দেখতে পারেন।

শিক্ষক সহকর্মী যা বললেন, সে সম্বন্ধে উল্লেখ্য এই যে, বিদ্যাসাগর ইহলোক ত্যাগ করেন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে; তখন এই শিক্ষক-পুংগবের জন্মই হয়নি। বর্তমান বাংলায় শিক্ষকদলে এইরূপ সত্যবাদী ও সত্যচারী (!) নিতান্ত বিরল নয়।

বঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ যে কালাপাহাড়ী তাণ্ডব শুরু হয়েছে, তার অনেক কারণ আছে; কিন্তু তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী অধিকাংশ শিক্ষাকর্মীদের অযোগ্যতা ও আদর্শহীনতা এবং শিক্ষালয় পরিচালনায় দুর্নীতি, শক্তিমত্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থ ও কুটিল রাজনীতির অনুপ্রবেশ।

কর্মজীবন

সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করে ১৮৪১ সালে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শেরিস্তাদার এবং প্রধান পণ্ডিতের পদ লাভ করেন; বেতন মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

১৮৩০ হতে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ইংরেজীর পাঠ গ্রহণ করেছিলেন; তৎপরে সেখানে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা বন্ধ হলেও তিনি গৃহে ইংরেজী চর্চা বন্ধ করেননি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়ান ইয়োরোপীয় ছাত্রদের সংস্পর্শে এসে তাঁর ইংরেজী শিক্ষার অনেক সুবিধা হয়েছিল। তিনি ইংরেজীতে বিশেষ কৃতীবিদ্য হয়েছিলেন তাঁর হস্তাক্ষর কী সুন্দর ছিল—তা তাঁর হাতের লেখার প্রতিলিপি হতে বোঝা-যায়। আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা তাঁর এত প্রবল ছিল যে, তাঁর সংস্পর্শে এসে বন্ধুবান্ধব অনেকেরই মনে ঐ ইচ্ছা সংক্রামিত হয়েছিল।

পাঁচ বৎসর ফোর্ট উইলিয়মে কাজ করবার পর ১৮৪৬ এপ্রিল থেকে জুলাই ১৮৪৭ পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন; মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা। উক্ত কলেজের পঠন-পাঠনের উন্নতিকল্পে সেক্রেটারী (অধ্যক্ষ) রসময় দত্তের নিকট তিনি এক পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ সেটাকে গ্রাহ্য না করায় তিনি পদত্যাগ করেন।

ঐ সময়ে রাজনারায়ণ বসু সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে আসায়—ঈশ্বরচন্দ্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি কয়েক জন পণ্ডিতও তাঁর নিকট ইংরেজীর পাঠ নিতেন।

সহকারী অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করে বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু ও সহপাঠী মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগে "সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরি" নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তকের দোকান স্থাপন করেন। অচিরেই তিনি প্রেসের কাজ ভাল করে বুঝে নিয়ে ছাপাখানার উন্নতির জন্য অনেক পরিশ্রম করেন। বাঙলা টাইপ কেসের খোপে খোপে কোন্ অক্ষর কোথায় রাখলে কম্পোজিটারের কাজ সহজ ও সুবিধাজনক হয়, অনেক ভেবেচিন্তে তিনি তার একটি সুব্যবস্থা করেন।

টাইপকেসের সেই অক্ষর বিন্যাস পদ্ধতি 'বিদ্যাসাগরী সার্ট' নামে এখনও প্রচলিত আছে। এখানে সার্ট কথাটি সম্ভবত ইংরেজী Sorting কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ।

১৮৪৯ সালের ১লা মার্চ তিনি পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 'হেড-রাইটার য্যাণ্ড ক্যাশীয়ার' পদে নিযুক্ত হন। বেতন তখন মাসে আশি টাকা।

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজ-পণ্ডিত হয়ে মুর্শিদাবাদ গেলে এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবের বিশেষ অনুরোধ-

ক্রমে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন (৫ ডিসেম্বর ১৮৫০) এই শর্তে যে অধ্যক্ষ-পদ খালি হলে তাঁকে ঐ পদ দিতে হবে। অধ্যাপক পদের বেতন মাসিক নব্বই টাকা। দেড় মাস পরেই রসময় দত্ত অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করলে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (Principal) হলেন (২২ জানুয়ারি ১৮৫১) বেতন ধার্য হলো মাসিক দেড়শো টাকা।

অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি দেখলেন যে, কলেজের ছাত্র বা শিক্ষক কেউই নিয়মিত সময়ে আসেন না। এইসব অনিয়ম দূর করে সংস্কৃত কলেজে সকল ব্যাপারে নানাবিধ সুনিয়ম সুশৃঙ্খলা প্রবর্তিত করলেন। যথাঃ—(১) ব্রাহ্মণ-বৈদ্য ছাড়াও, অন্যজাতির হিন্দু ছাত্রগণও কলেজে পড়তে পারবে; (২) নিয়মিত কর্মপদ্ধতি ও প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন; (৩) ভর্তি ফী ও ছাত্রবেতন রীতির প্রবর্তন; (৪) সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথমপাঠ্য উপক্রমনিকা, ঋজুপাঠ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন; (৫) প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলির রক্ষণ ও মুদ্রণ; (৬) গ্রীষ্মাবকাশ ও রবিবারের ছুটির প্রবর্তন। এই সমস্ত সংস্কার প্রবর্তন করতে তাঁকে কত না চিন্তা ও পরিশ্রম করতে হল। দিন-দিন তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়তেই থাকল এবং পদবৃদ্ধিও হল। বিবিধ উন্নতির ফলে কলেজের ছাত্র-সংখ্যাও বেড়ে গেল। তখন অধ্যক্ষের বেতন মাসিক তিনশো টাকা বরাদ্দ হল।

এইসব কর্মব্যস্ততার মধ্যেই চলল বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন। বালবিধবার পুনর্বিবাহ প্রবর্তনের জন্য শাস্ত্রে কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, এর জন্য চলল দীর্ঘকালব্যাপী নিরন্তর অনুসন্ধান। অবশেষে পরাশর সংহিতায় মিলল সেই অনুমোদন :

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম আচার্য, প্রখ্যাত স্মার্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হিন্দুবিধবাগণের পুনর্বিবাহের সপক্ষে মত ও ব্যবস্থা দিয়েছিলেন (১৮৪৫)। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম লেখা বাল্যবিবাহের দোষ নামে একটি প্রবন্ধ ১৮৫০ এর অগাষ্ট মাসে সর্বশুভকরী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। "বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" এই শিরোনামায় বিদ্যাসাগর লিখিত প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ জানুয়ারিতে এবং ঐ প্রস্তাব প্রবন্ধরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছাপা হয় ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন মাসে—(অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী-মার্চ), ১৮৫৫।

বাংলা শিক্ষার নববিধান প্রবর্তন

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ইংরেজ আমলের সূত্রপাত হলেও প্রথম অর্ধ-শতাব্দ কাল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির সরকার কেবল রাজস্ব আদায়, সৈন্যদল বৃদ্ধি, ও রাজ্য বিস্তারের দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন; আর কম্পানির কর্মচারিগণের ঝোঁক ছিল শুধু লুঠের দিকে—কিসে রাতারাতি তাঁরা "নবাব" (Nabob) বনতে পারেন, সেইদিকে। এ ব্যবস্থায় শাসিতদের অবস্থা শোচনীয় ছাড়া আর কী হতে পারে? দেশের প্রকৃত সু-শাসনের দিকে বৃটিশ পার্লামেন্টের নজর পড়ল ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন (Pitts India Act) বিধিবদ্ধ হবার পরে। বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলির আমল হতে শিক্ষিত ইংরেজদের এদেশে এনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে (১৮০০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) দেশীয় ভাষা এবং রীতিনীতিতে তাদের কিছুটা তালিম দিয়ে জেলা জজ, ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টার রূপে জেলায় জেলায় পাঠানোর ব্যবস্থা শুরু হল।

তখনও কম্পানির সরকার ভারতীয়গণের শিক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কম্পানির সনদ যখন নতুন করে মঞ্জুর করা হয়, তখন তার একটি সূত্রে দেশীয় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিকল্পে কম্পানিকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে আদেশ দেওয়া হয়। ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে কম্পানির সরকারের এটুকুই হল প্রথম উদ্যম। ঐ সময়ে ব্রিটিশ-

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারকল্পে এই তিন দল লোক কাজ আরম্ভ করেছিলেন:—(১) প্রটেস্টান্ট মিশনারী দল, (২) শিক্ষাসুহৃদ ও শিক্ষা-ব্যবসায়ী দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিগণ; এবং (৩) কম্পানির সরকার। শিক্ষার আদর্শ নিয়ে ভারতীয়গণের মধ্যে মতবৈধ উপস্থিত হয়ে প্রাচ্যবাদী (Orientalist) ও পাশ্চাত্যবাদী (Occidentalist) নামক দুই দলের বাকবিতণ্ডা বহুদিন চলবার পর অবশেষে লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে (১৮২৮ থেকে ১৮৩৫) কম্পানির সরকার পাশ্চাত্য ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষানীতি গ্রহণ করলেন। এই আন্দোলনের সময় রামমোহন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষানীতির পক্ষেই কাজ করেছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কম্পানির সনদ নতুন করে মঞ্জুর করার সময় শিক্ষার ব্যয় এক লক্ষ হতে বাড়িয়ে বার্ষিক পনরো লক্ষ টাকা করার নির্দেশ এল। কেবল তাই নয়, অপর একটি সূত্রে ইয়োরোপ ও আমেরিকার যে কোন দেশ হতে সব সম্প্রদায়ের খৃষ্টীয় মিশনারিরা ভারতে এসে কাজ করবার অধিকার পেলেন।

শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তার

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব তদানীন্তন বড়লাটকে বিদ্যাসাগরের প্রণীত একটি প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা পাঠিয়েছিলেন। ঐ পরিকল্পনায় বিদ্যাসাগর, রামমোহনের শিক্ষানীতি অনুসরণ করে, অভিমত দিয়েছিলেন যে, কেবলমাত্র সামান্য বাঙলা লেখাপড়া আর একটু অঙ্ক শেখালেই চলবে না; শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করবার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা নীতিবিজ্ঞান, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি শেখানোরও প্রয়োজন আছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কম্পানির ইংলণ্ডস্থ বোর্ড-অব-কনট্রোল এর সভাপতি Sir Charles Wood সাহেবের বিখ্যাত নির্দেশনামায় (Despatch) অন্যান্য যুগান্তকারী সুপারিশের সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি স্বীকৃত হয়ে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হলো। তদনুসারে প্রত্যেকপ্রদেশেই শিক্ষাঅধিকর্তা(Director) এবং জেলায় জেলায় বিদ্যালয় পরিদর্শক (Inspector)-এর পদ সৃষ্টি হলো। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলির উন্নতিকল্পে স্থানে স্থানে আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয় (Model School) স্থাপিত হলো। বিদ্যাসাগরকে এই আদর্শ বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করবার প্রস্তাব হলো। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে তাঁকে সরানো কিছুতেই উচিত হবে না— এটা ছোটলাটের অভিমত। অবশেষে স্থির হলো তিনি অধ্যক্ষও থাকবেন এবং দক্ষিন বাংলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের সহকারী পরিদর্শকও হবেন। এই অতিরিক্ত কাজের জন্য তিনি অধ্যক্ষের বেতন ছাড়াও আরও দুশো টাকা মাইনে পাবেন অর্থাৎ মোট পাঁচ-শো টাকা।

১৮৫৫ সালের মে মাস থেকে বিদ্যাসাগর এই উভয়কর্মে ব্রতী হলেন। অবিলম্বে তিনি তাঁর অধীনে নদীয়া, হুগলী বর্ধমান ও মেদিনীপুর এই চারজেলার জন্য চারজন সহকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন এবং প্রস্তাবিত আদর্শ বিদ্যালয়গুলির (Model School) জন্য শিক্ষক নির্বাচন করতে গিয়ে মহামুশকিলে পড়লেন: অধিকাংশ পদপ্রার্থী অনুপযুক্ত; তাঁদের আরও কিছু শিক্ষার প্রয়োজন। অতএব এমন একটা নরম্যাল স্কুল দরকার যেখানে উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলা যায়। হিন্দু কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটা বাংলা পাঠশালা ছিল। বিদ্যাসাগরের প্রার্থনা-অনুযায়ী সে পাঠশালাটী তাঁর তত্ত্বাবধানে আনা হলো এবং সেটিকে নরম্যাল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষণালয়ে পরিণত করা হলো (১৭ জুলাই ১৮৫৫)। তার প্রধানশিক্ষক হলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু অক্ষয়কুমার দত্ত। দু'মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর স্থাপন করলেন কুড়িটি আদর্শ বিদ্যালয় —প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি হিসাবে, এবং শতশত নূতন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। নরম্যাল স্কুল হতে

শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকও তৈরী হতে থাকল প্রতি ছ'মাসে ষাটজন করে।

১৮৫৬ সাল বিদ্যাসাগর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল; এই সময়ে তাঁর কর্মপটুতা যে কত তার প্রমাণ পাওয়া গেল: সংস্কৃত কলেজের কাজ, কলকাতার নরম্যাল স্কুল, চারটি জেলায় কুড়িটি মডেল স্কুল এবং বহুসংখ্যক বাংলা প্রাথমিক ওমাধ্যমিক পাঠশালা—সবগুলির তত্ত্বাবধানের ভার বিদ্যাসাগরের উপর।

ভারত সরকারের নির্দেশে নভেম্বর ১৮৫৬ থেকে এখন তাঁর পদের নামকরণ হলো দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয় সমূহের বিশেষ পরিদর্শক (স্পেশাল ইনস্পেক্টর) অধিকন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তো বটেই। গুরু দায়িত্বের চাপে তাঁর কর্মশক্তি ও উৎসাহের দীপশিখা আরও উজ্জল হয়ে জলে উঠে, বাংলার শিক্ষা-ক্ষেত্রকে উদ্ভাসিত করে তুলল। অন্যদিকে চলেছে বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদিগণের আপত্তি খণ্ডনের জন্য পুস্তক প্রণয়ন, বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য আইন প্রণয়নের চেষ্টা, কার্যত বিবাহ ঘটানোর আয়োজন এবং পুস্তক প্রণয়ন; সব ব্যাপারেই তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে।

নারীশিক্ষা সম্বন্ধেও বিদ্যাসাগরের জলন্ত উৎসাহ। ইতঃপূর্বেই বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়েছে (১৮৫০ সালে) এবং বিদ্যাসাগর তার প্রথম অনারারি সেক্রেটারি। দক্ষিণ বাংলারবিদ্যালয় পরিদর্শক হওয়ার পর বিদ্যাসাগর মহোৎসাহে নানাস্থানে বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছেন, কারণ শিক্ষা ব্যতীত নারী জাতির দুরবস্থার অপনোদন সম্ভব নয়, এটা তিনি বুঝেছিলেন। কিন্তু শিক্ষাবিভাগের নতুন ডিরেক্টর, ইয়ং সাহেব বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় করতে অস্বীকৃত হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত বিল ফেরৎ পাঠালেন। যদিও ছোটলাটের মধ্যস্থতায় সেবারকার মতো তাঁর বিল পাস করা হলো, কিন্তু ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিবাদ ও মতভেদ ক্রমশই বেড়ে চলল এবং অবশেষে উত্যক্ত হয়ে ১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগরকে পদত্যাগ করতে হলো।

এই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের জন্য ভারত সরকার মহাবিব্রত। বিদ্যাসাগরের ক্রমবর্ধমান টাকার দাবি মেটান তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। অথচ, তিনি যে-সমস্ত বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছেন, শিক্ষক ও ছাত্রী ছাত্রদের বিদ্যালয়ে ডেকে এনেছেন, তাদের হতাশ করে ফিরিয়ে দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি সাধারণ্যে চাঁদা সংগ্রহ করে এবং নিজ তহবিল হতে বিদ্যালয়গুলি রক্ষার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন।

তাঁর গুণগ্রাহী উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরা তাঁকে পদত্যাগ পত্র ফিরিয়ে নিতে অনেক অনুরোধ করলেন। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও হিতৈষী ছোটলাট হ্যালিডে—সাহেব, তাঁকে কিছু সময় নিয়ে ভেবে দেখতে বললেন। কয়েক মাস পরেই যখন সত্যই তিনি পদত্যাগ করলেন ছোটলাট তাঁকে ডেকে পাঠালেন; বললেন—"আমি তো জানি, তুমি যা পাও, সব দানধ্যান করো, সৎকাজে ব্যয় করো, কিছুই রাখতে পার না। চাকরী ছাড়লে খাবে কী? তোমার দেশকল্যাণের কাজই বা চালাবে কী করে? এখনও বলি, ইস্তাফা দিয়ো না, কাজ কর। চিঠি ফেরৎ নাও।" বিদ্যাসাগর বললেন—যে কাজে মন বসাতে পারছি না, আমার আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখছি না, সেরকম কাজ করে আমি টাকা নিতে পারব না।

দুঃখের বিষয় এই যে, কর্মজীবনের মধ্যাহ্নকালে যখন পূর্ণশক্তিতে তাঁর কর্মোত্তম আদর্শের দিকে দুরন্তবেগে ছুটে চলেছে, তখন হঠাৎ তাঁকে মধ্যপথে থেমে যেতে হলো। তিনি যে উচ্চ আশা ও শিক্ষাদর্শ নিয়ে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন, সে পথে কোনও বাধাই তাঁরপক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হলো না। তাঁর মনস্বিতা এবং তাঁর স্বাতন্ত্র্য কারো কাছেই মাথা হেঁট করতে প্রস্তুত হলো না। তিনি অবহেলায় বিপুল অর্থাগম এবং প্রতিপত্তির পদ ছেড়ে দিয়ে সরে এলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আটত্রিশ বৎসর।

যদিও বিদ্যাসাগর সরকারী শিক্ষাক্ষেত্র হতে ১৮৫৮ সালে অন্তর্হিত হলেন, তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি

বহুকাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল : সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর যে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করেন, প্রায় শতবর্ষকাল সেই নিয়মই সেখানে রাজত্ব করেছে ; সাম্প্রতিক কালে তার সামান্য অদল-বদল হয়েছে বলে শুনেছি। বাংলা মাধ্যম নব্য শিক্ষারীতির যে বুনিয়াদ তিনি রচনা করেছিলেন, একাল পর্যন্ত এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সেই ভিত্তিভূমিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি প্রকৃতপক্ষে তাঁর দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল।

সরকারী শিক্ষাবিভাগের চাকরী ছেড়ে দেবার পরেও শিক্ষাবিভাগের সহিত তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই। বঙ্গীয় সরকার এবং কলিকাতা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা-সংক্রান্ত বহু বিষয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং সভ্য হিসাবে বহু শিক্ষা সমিতির ও বোর্ডের সঙ্গে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর যোগ ছিল। তাঁর অনুরোধে বহুস্থানে বালিকা বিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছিল।

১৮৬৬ সালে ভারত হিতৈষিণী ইংরেজ মহিলা, মিস মেরী কার্পেন্টার যখন ভারতে নারী শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনে কলকাতায় আসেন, তখন বিদ্যাসাগর তাঁকে উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় দেখাতে নিয়ে যাবার সময়ে ঘোড়ার গাড়ী হতে পড়ে গিয়ে পেটে গুরুতর আঘাত পান এবং তাঁর যকৃৎটি চিরদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। তদবধি তাঁর পরিপাকশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। কোন খাদ্যই আর হজম করতে পারেন না। যিনি নিজে খেতে এবং খাওয়াতে অত্যন্ত ভালবাসতেন, তাঁর পক্ষে কোন ভাল খাদ্য গ্রহণের আর উপায় রইল না। শেষদিকে কয়েক বৎসর কেবল বেলশুঁট দিয়ে ফোটান তরল বার্লি তাঁর দৈনিক পথ্য হয়। এইরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল তিনি নানাভাবে দুর্গত দেশবাসীর সেবা করে গেছেন।

বিদ্যাসাগরের বাস্তববুদ্ধি কর্মপটুতা ও শ্রমশীলতা

মাত্র আটটি বৎসর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে কাজ করবার পর বিদ্যাসাগর যখন পদত্যাগ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র আটত্রিশ বৎসর। জীবনের এত বড় একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত এত সহজে, অবহেলার সঙ্গে বিদ্যাসাগর নিতে পেরেছিলেন তাঁর অখণ্ড পৌরুষ বলেই ; তাঁর বাস্তববুদ্ধি, কর্মপটুতা ও শ্রমশীলতা কখনোই তাঁকে পরনির্ভরতা শিক্ষা দেয়নি। তাঁর রচিত পুস্তকাবলী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তকালয় হতে এ সময়ে তাঁর আয় নিতান্ত অল্প ছিল না।

'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ১৮৪৭ সালে ; তারপর ১৮৪৮ সালে বাংলার ইতিহাস, ১৮৪৯ সালে 'জীবনচরিত' এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে (১৮৫১-১৮৫৮) নানাবিধ কার্যে ব্যাপৃত থেকেও তিনি এই বইগুলি রচিত ও প্রকাশিত করেন :—বোধোদয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, সংস্কৃত ঋজুপাঠ (তিন ভাগ), ব্যাকরণ কৌমুদী (তিন ভাগ), চরিতাবলী, শকুন্তলা (মহাকবি কালিদাসের নাটক অবলম্বনে), বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ ১৮৫৪), বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব (১ম ও ২য়) ও কথামালা। এ ছাড়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি অনেকগুলি পুস্তক সম্পাদনাও করেছিলেন : যথা—বাংলা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এবং সংস্কৃত—রঘুবংশম্, কিরাতার্জুনীয়ম্, সর্বদর্শনসংগ্রহ ও শিশুপাল বধ।

শিক্ষাবিভাগের কর্মত্যাগের পর তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকাবলীর রচনা বা সম্পাদনা করেন : যথা—সংস্কৃত—কুমারসম্ভব, কাদম্বরী, মেঘদূত, উত্তররামচরিত, হর্ষচরিত, সংস্কৃত ব্যাকরণ-কৌমুদী (৪র্থ ভাগ) ; বাংলায় আখ্যানমঞ্জরী (দুই ভাগ) ভ্রান্তিবিলাস (Comedy of Errors অবলম্বনে) মহাভারতের উপক্রমণিকা ভাগ এবং পদ্য সংগ্রহ (কৃত্তিবাসের রামায়ণ অবলম্বনে)। এ ছাড়া দুখানা ইংরাজী বইও—গদ্য ও পদ্য চয়নিকাও ছিল।

এই সময়ে কিছুদিন তিনি 'সোম-প্রকাশ' এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামক সাময়িক পত্রিকা দ্বয়ের পরিচালনার সহিতও সংযুক্ত ছিলেন।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে, সমগ্র বঙ্গ-বিহার-ওড়িশা প্রদেশে, সমস্ত বাংলা ভাষী তো বটেই, অনেক অবাঙালীকেও, বিদ্যাসাগর-প্রণীত এইসব বাঙলা পুস্তক পড়তে হতো। সুতরাং ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা-ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের এক প্রকার ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যই গড়ে উঠেছিল। নাতিবৃহৎ ক্ষেত্রে তাঁর বাংলা পুস্তকগুলি বহুদিন ধরে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল। এইরূপে তাঁর পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ আয় একসময়ে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে উঠেছিল। কাজেই তাঁর পরিবার প্রতিপালন এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার জন্যে কোন দুর্ভাবনার কারণ ছিল না। তখনকার পঞ্চাশ হাজার এখনকার পাঁচলক্ষ টাকা তো বটেই। এই বিপুল বার্ষিক আয় তিনি দীন দুঃখী দেশবাসীর দুঃখমোচনে বিপন্ন বন্ধুজনের সহায়তায় ও অন্যান্য সৎকর্মে ব্যয় করেই গেছেন। কিছুই সঞ্চয় করেন নি।

আজীবন তিনি নিজেই সমস্ত পুস্তকের সংশোধন করতেন। কাজেই সেগুলি এত নির্ভুল ছাপা হতো যে, সে-যুগে সাধারণ লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ছাপার অক্ষরে কোন ভুল হতেই পারে না।

তাঁর কর্মজীবনে সাফল্যের মূলসূত্র নিহিত ছিল তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠার মধ্যে। কাজ যত ছোটই হোক না কেন, তিনি তাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে নিখুঁত করেই করবেন। তাই কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই তিনি সফলতা ও সমাদর লাভ করেছেন এবং উত্তরোত্তর জীবনে উন্নতিই হয়েছে। একটি উদাহরণ: তাঁর বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যার সুরেন্দ্রনাথের পিতা) পরলোকগত হলে, তাঁর বিষয় সম্পত্তির ভাগবণ্টন নিয়ে যখন ভ্রাতাদের মধ্যে বিরোধ হয়, তখন তার সালিশের ভার পড়ে বিদ্যাসাগরের উপর; তিনি কত গভীরে প্রবেশ করে, কত খুঁটিনাটি বিষয় বিবেচনা করে, ন্যায়সঙ্গত বণ্টন করে দিয়েছিলেন, তার বিবরণ পড়লে অবাক হতে হয়। আর তাঁর হৃদয়বত্তা যে কী অপার্থিব ও অপরিমেয় ছিল এবং দৃষ্টি কত সুদূরপ্রসারী ছিল তা তাঁর উইল থেকেও জানা যায়।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে গিয়েছিলেন। তাঁর অবর্তমানে স্বীয় বিষয়-সম্পত্তির উপস্বত্ব বণ্টনের যে ব্যবস্থা তিনি করে গিয়েছিলেন, সে এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। তাঁর উইলে পয়তাল্লিশ জনের উপর নিয়মিত বৃত্তিভোগীর নাম দেখা যায়। তাঁদের জন্য মাসিক বরাদ্দ প্রায় ৫০০ টাকা। অধিকন্ত ছিল তাঁর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে তাঁর দ্বারা স্থাপিত বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক একশত টাকা, দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা এবং গ্রামস্থ অনাথ ও নিরুপায় লোকদের জন্য মাসিক সাহায্য ত্রিশ টাকা; এ তিনটি তো তাঁর মাতৃদেবীকে প্রদত্ত 'গহণা'; সুতরাং তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা তো করতেই হবে। তাছাড়া ছিল বিধবাবিবাহের জন্য মাসিক বরাদ্দ একশত টাকা; ওই ব্যাপারটাকে তিনি তাঁর "জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম', মনে করতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে ক্রমশ প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হওয়ায় তাঁর পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ আয় শেষদিকে হ্রাস পাওয়া সত্বেও তিনি তাঁর উইলে মাসিক প্রায় এক হাজার টাকা বণ্টনের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন।

যখন তাঁর মাসিক আয় চার পাঁচ হাজারের মতো ছিল, তখনও তিনি তাঁর জীবনযাত্রার মান একটুও বাড়তে দেননি। তিনি চিরদিনই পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, ছাত্রাবস্থায় কলকাতা হতে হেঁটেই বীরসিংহে গমনাগমন করেছেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করবার সময়েও নিজের মোটঘাট মাথায় বয়ে নিয়ে হেঁটেই দেশে যেতেন। শুধু কি নিজের জিনিস-পত্র?—কত সময়ে অন্যের মালপত্রও বয়ে দিয়েছেন।

মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন

ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন জাত-শিক্ষক, উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন; তাঁর পক্ষে শিক্ষাক্ষেত্র হতে দূরে থাকা অসম্ভব। সরকারী শিক্ষাবিভাগের কাজ ছেড়ে দেওয়ার অল্পদিন পরেই তাঁর ডাক এল অন্য এক শিক্ষালয় থেকে: ১৮৫৯

সালে শংকর ঘোষ লেনে (ঝামাপুকুর) একটি বিদ্যালয়, নাম তার ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল; তার কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলেন—তাঁদের পরিচালিকা সমিতিতে যোগ দিতে। বিদ্যাসাগর যোগ দিলেন এবং অল্পকাল পরেই ঐ সমিতির কর্মকর্তা বা সেক্রেটারি হলেন। ১৮৬৪ সালে পূর্বনাম পালটিয়ে বিদ্যালয়ের নতুন নাম হল—হিন্দু মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশ্যান, তার পরিচালনভার ছিল ছয় জনের উপর; তাঁদের তিনজন সম্পর্ক রাখলেন না, আর দু'জন মারা গেলেন দুবছরের মধ্যে; রইলেন একা বিদ্যাসাগর। ১৮৭২ এর জানুয়ারিতে বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পালকে নিয়ে নতুন একটা কমিটী গড়লেন। সাহেবরা বলেছিলেন যে, সাহেব অধ্যাপক এবং সাহেব অধ্যক্ষ ছাড়া ইংরেজি কলেজ চালানো যায় না। বিদ্যাসাগর দেখাতে চাইলেন তাঁদের ধারণা ভুল; সাহেবদের বাদ দিয়েই তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশ্যানকে কলেজে উন্নীত করে বি. এ, বি. এল, এমনকি দিনকতক এম. এ. পরীক্ষায়ও ছাত্র প্রেরণ করে দেখালেন যে, দেশী অধ্যাপক দিয়েও কলেজ ভালভাবেই চালানো যায়।

বিদ্যাসাগরের চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায় ও পুরুষকার বলেই মেট্রোপলিটান কলেজ দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে চলল। দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশ্যানের নতুন বাড়ী তৈরী হল। ১৮৮৭ সালের জানুআরিতে কলেজ ঐ নতুন বাড়ীতেই বসল। কলেজের জন্য তাঁকে কিছু ধার করতে হয়েছিল; ক্রমে ক্রমে তিনি সে সব শোধ করলেন।

ধার তাঁকে আরও অনেকবার করতে হয়েছে: অনেক বিধবার বিয়েতে সমস্ত খরচ তাঁকেই বহন করতে হয়েছে এবং সেজন্য তাঁর ঋণের পরিমাণ এক সময় পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে উঠেছিল। 'প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু' বহু বড় এবং শিক্ষিতজন অনেকেই বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরকে অজস্র উৎসাহ এবং অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে প্রতিশ্রুতি পালিত হয়নি। বিদ্যাসাগরকে, ঋণভারে দুর্দমান দেখে তাঁর প্রকৃত সুহৃদ, প্যারীচরণ সরকার সহানুভূতি পরবশ হয়ে বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাতসারেই সংবাদপত্রে অভিযোগ করে সেই সব ভদ্রজনকে অঙ্গীকার পালনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে কথা জানতে পেরেই বিদ্যাসাগর ক্রোধান্বিত হয়ে বন্ধুকে গিয়ে ভর্ৎসনা করেন এবং তাঁকে তৎক্ষণাৎ উক্ত সংবাদপত্রে পত্র লিখতে বাধ্য করেন যে, বিদ্যাসাগর স্বীয় সামর্থ্যেই ঋণশোধে ইচ্ছুক; তিনি কারও কাছ হতে এ ব্যাপারে এক কপর্দকও সাহায্য গ্রহণ করবেন না।

উপর্যুপরি কতকগুলি বাল বিধবার পুনর্বিবাহ সংঘটিত হওয়ায় বহু রক্ষণশীল হিন্দু তাঁর উপরে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। তিনি রাস্তায় বেরোলে চারদিক থেকে লোকেরা এসে তাকে ঘিরে ফেলত; কেউ ঠাট্টা করত, কেউ বা গালাগালি দিত, কেউ-কেউ মেরে ফেলবার ভয়ও দেখাত; কিন্তু পুরুষসিংহ তাতে কণামাত্রও বিচলিত হতেন না। প্রিয়পুত্রের বিপদাশঙ্কা করে পিতা ঠাকুরদাস বীরসিংহ হতে একজন লাঠিয়ালকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের ভৃত্যরূপে সর্বদা পাহারা দিতে।

একদিন বিদ্যাসাগর শুনলেন যে, কলকাতার একজন বড়গোছের হিন্দুনেতা তাঁকে মারবার জন্য গুণ্ডা নিযুক্ত করেছেন এবং গুণ্ডারাও ঘুরছে সন্ধানে, একটু সুযোগ পেলেই বিদ্যাসাগরকে তারা মারবে। সংবাদ পেয়েই বিদ্যাসাগর সোজাসুজি সেই বড় মানুষের বাড়ীতে একলাই গিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন—শুনলাম, আমাকে মারবার জন্য আপনার ভাড়াটে লোকেরা আহার-নিদ্রা ছেড়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি ভাবলাম ওদের কষ্ট দেবার দরকার কি, আমি নিজেই যাই। তাই চলে এলাম, এখন আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। তাঁর কথা শুনে এবং তাঁর নির্ভীক তেজস্বিতা দেখে উপস্থিত সকলেই হতভম্ব।

বলা বাহুল্য, ভদ্রলোকের চক্ষুলজ্জার বেধেছিল; বিদ্যাসাগর অক্ষত দেহেই বাড়ী ফিরেছিলেন। এই নির্লোভ, আত্মত্যাগী, দেশহিতৈষী মহাপুরুষের প্রতি ঐ যুগের রাজপুরুষগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দেখেও বিরুদ্ধপক্ষ অনেকটা সংযত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন বিলাতে গিয়ে অর্থাভাবে সপরিবারে অনশনে মরবার উপক্রম হয়েছিলেন, তখন বিদ্যাসাগরই হাজার হাজার টাকা জুগিয়ে তাঁদের রক্ষা করেছিলেন। এই টাকার অল্পই তার নিজস্ব, অধিকাংশই ধার করা। মাইকেল আরও অনেকবার তাঁর কাছে ধার করেছিলেন, কিন্তু সে সব ঋণ তিনি পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করে পরে শোধ করেছিলেন।

মেট্রোপলিটান কলেজ বিদ্যাসাগরের চিরস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ - এখন তার নাম ন্যায়সঙ্গত ভাবেই বিদ্যাসাগর কলেজ করা হয়েছে। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন নামটি স্কুল বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছে এবং তার শাখা কলকাতায় এখন অনেকগুলি,—সবই সুপরিচালিত।

দরিদ্রবন্ধু বিদ্যাসাগরের কল্যাণে কত যে দীন দুঃখী ছাত্র স্বল্পবেতনে এক সময় কলেজের মাইনে মাসিক তিন টাকা মাত্র ছিল) এবং বিনাবেতনে শিক্ষালাভ করে জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, কে তার ইয়ত্তা করবে? শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যে কী প্রাণপণ প্রয়াস করেছিলেন তা ১৮৫৫-১৮৫৭র সরকারী শিক্ষা বিবরণী হ'তে জানা যায়।

বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি

রামমোহনের বহুমুখী সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যে সাহিত্যচর্চাও অন্যতম। তিনিই প্রথম দেশমধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রচলন করতে প্রয়াসী হন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকারণে দেশবাসীর মনে ধর্মচেতনা জাগ্রত করতে তাঁকে অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে এবং পরে খৃষ্টধর্ম নিয়ে শ্রীরামপুরের পাদরিদের সঙ্গে অনেক বাদবিতণ্ডা ও মসীযুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে নিজমত প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনি যে গদ্যের প্রচলন করেন, তাতে প্রাঞ্জলতা ও পারিপাট্যের কিছু অভাব থাকলেও তার দ্বারা তিনি স্বীয় বক্তব্য পরিস্ফুট করতে সমর্থ হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনিই সম্ভবত সর্বপ্রথম লেখক, যিনি অনুশীলিত মন নিয়ে গুরুগম্ভীর গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর গদ্যে লালিত্য বা রসকস না থাকলেও তাতে ভাষার মর্যাদা ও মননদীপ্তি সুপরিস্ফুট।

তারপর তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠীর লেখকদের নাম উল্লেখযোগ্য; যথা—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি। বাংলা গদ্য ও পদ্যের উন্নয়নে এঁদের দান নিতান্ত তুচ্ছ নয়। দেবেন্দ্রনাথের হাতে গদ্যভাষা রামমোহনের অপেক্ষা আরও মননশীল ও পরিমার্জিত হলো। তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম অনুভূতি ও অপূর্ব প্রকৃতি প্রেম পরিস্ফুট হয়েছে। অক্ষয়কুমারের বাংলা গদ্যে দৃঢ়বদ্ধ যুক্তিশৃঙ্খলা ও আবেগহীন তত্ত্বনিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর গদ্যে-বিশেষ করে জ্ঞানের অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার আলোচনাই করা হয়েছে।

রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ ধর্মচেতনা—দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ ও কেশবচন্দ্রের ভক্তি ও অনুভূতিরসে আপ্লুত হলেও তাঁদের ভাবপ্রবণতা সংযমের বন্ধন অতিক্রম করেনি। কেশবচন্দ্রের বাংলা এত সহজ সরল, সাবলীল ও সুমিষ্ট ছিল যে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন, তিনি মাঝে-মাঝে কেশবের বক্তৃতা শুনবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজে যেতেন।

বিদ্যাসাগরের অসাধারণ কৃতিত্ব যে তিনি কোর্ট উইলিয়মী আড়ষ্ট ভাষা এবং সম-সাময়িক সংবাদপত্রের অপভাষাকে ত্যাগ করে, বাংলা গদ্যকে তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠীর লেখকদের—বিশেষ করে তাঁর সুহৃদ অক্ষয়

সুমার দত্তের—সহযোগে রামমোহনের প্রবর্তিত বাংলা গদ্যকেই পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছেন। বাংলা ভাষা কৈশোর অতিক্রম করবার পর বিদ্যাসাগরের প্রতিভা—বলেই পূর্ণ যৌবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবনের বিচিত্র কর্তব্য পালনের ক্ষমতা লাভ করল। তিনি ভাষামধ্যে সুশৃঙ্খলা, পরিমিতি, ধ্বনিপ্রবাহ ও ছন্দঃস্রোত সঞ্চার করলেন; সরল শব্দ নির্বাচন দ্বারা অনাবশ্যক সমাস জটিলতা বর্জন করে, তিনি গদ্যকে সৌন্দর্য সুষমা ও পরিপূর্ণতা দান করে এমন এক ভাবগম্ভীর সুললিত ভাষার সৃষ্টি করলেন যা বহুকাল পর্যন্ত মানব-জীবনের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। সেইজন্য বাংলা সাহিত্যের এই যুগকে বলা হয় বিদ্যাসাগরের যুগ।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও বহুমুখী সাহিত্য-প্রতিভা বাংলা ভাষার এক নবযুগের সৃষ্টি করলেও সেটা ক্রমোন্নতির পথে ভাষার স্বাভাবিক পরিণতি। বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর অনুপম কবিতায় নিজেও স্বীকার করেছেন:

> "ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি, তোমার অতিথি,
> ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
> সেই তরুতল হতে, যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
> মরুর পাষাণ ভেদি প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে।"

বিদ্যাসাগর কেবল সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন জাত-শিক্ষক। তাঁর কর্মজীবন সাহিত্যকে অতিক্রম করে বিশালতর সমাজক্ষেত্রে প্রবেশ করে শিক্ষা সংস্কার, সমাজ সংস্কার ও নীতিপ্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হয়েছিল। সমাজসেবার ভূমিকা নিয়েই তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই তাঁর অধিকাংশ পুস্তক বিদ্যালয়-পাঠ্য এবং বেশীর ভাগই অনুবাদ সাহিত্য।
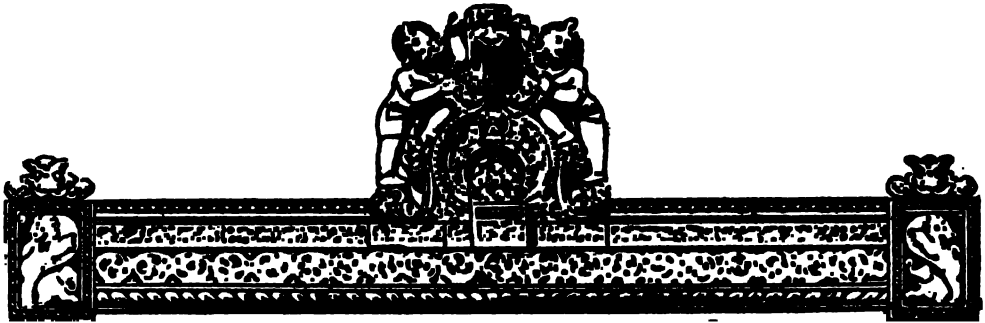
রামন ও ভারতের বিজ্ঞান গবেষণা

ত্রিদিবরঞ্জন মিত্র

ভারতীয় সমাজ যখন প্রাচীন কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধ'রে পাশ্চাত্যের নবাবিষ্কৃত সত্যকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল, সেই সময় আবির্ভূত হ'য়েছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর সমর্থকবৃন্দ। তাঁদের প্রচেষ্টায় ভারতে প্রবেশ ক'রেছিল আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান। সংগে সংগে দেখা দিয়েছিল শিক্ষার সংস্কার। এরই ফলে দেখা দেয় ভারতীয় সমাজের নবজাগরণ। নবজাগরণের একটি বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ফল হলো চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন।

বিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা কি তা নিয়ে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ থাকলেও বিজ্ঞানীর ধর্ম যে অজ্ঞের সত্যকে আবিষ্কার করা তা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না। রামন বিজ্ঞানীর ধর্মের প্রতিটি কথাকে পালন ক'রে পৃথিবীকে জানিয়েছেন প্রকৃত সত্যসন্ধানীর কর্তব্য। তিনি বলতেন "বিজ্ঞান-ই আমার ধর্ম এবং শেষ পর্য্যন্ত এ ধর্মকেই আমি অনুসরণ ক'রে চলবো। তিনি একথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন জীবনের শেষভাগ পর্য্যন্ত। তাই বিরাশি বৎসর বয়সেও পৃথিবীকে নতুন সত্যের সন্ধান দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'য়েছিল। রামণের বিজ্ঞান সাধকের জীবনের শুরু হয় ১৯০৭ সাল থেকে। তখন তিনি কলকাতায় আসেন ভারত সরকারের পদস্থ কর্মচারী হিসেবে। তাঁর বিজ্ঞান-প্রেম অফিসের ফাইলের মধ্যে তাঁকে আটকে রাখতে পারল না। তিনি চ'লে এলেন ইণ্ডিয়ান্ এ্যাসোসিয়েসন্ ফর্ দি কালটিভেশন্ অব্ সায়েন্স্-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের কাছে, অবসর সময় গবেষণার সুযোগ লাভের জন্য। এক প্রতিভা আর এক প্রতিভাকে চিনতে দেরী করে না, তাই আইনের বিভিন্ন বাধা সত্বেও ডাঃ সরকার রামনকে সুযোগ দিলেন গবেষণা চালাবার। আবার দেখা যায় ১৯১৭ সালে স্যর আশুতোষ যখন তাঁকে পদার্থবিদ্যার পালিত-অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন তখন তিনি সরকারী মাইনে থেকে অনেক কম মাইনেতে, নিজের দেশ থেকে অনেক দূরে ছুটে এলেন কলকাতায় কেবলমাত্র গবেষণার পূর্ণ সুযোগের আশায়। গবেশণার প্রতি গভীর প্রেম-ই তাঁকে দেয় ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার ও পরবর্তীকালের বিভিন্ন সম্মান। রামনের গবেষক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটা কথা-ই মনে হয়, সত্য সন্ধানের প্রতি প্রবল আকর্ষণই গবেষণার মূল কথা, যন্ত্র বা অর্থ নয়। তাই তিনি কখনো সরকারী সাহায্য পছন্দ করতেন না এবং বলতেন, "আলোক বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণার জন্য আমার সমস্ত যন্ত্রপাতি আমার ডেস্ক্-এর নীচের ড্রয়ারেই তোমরা খুঁজে পাবে।" এই প্রসংগে গর্বিত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী অ্যাস্টন্

ডাঃ সি. ভি. রামন

সম্পর্কে, একটি উক্তির উদ্ধৃতি দোষনীয় হবে ব'লে মনে হয় না, "...আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে, রাজপ্রাসাদতুল্য যন্ত্রশালা এবং ইউরোপের খুব ভাল ভাল কোম্পানীর তৈয়ারী যন্ত্রপাতি, খুব মোটা মাহিনা, চার-পাঁচজন সহকারী এবং খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকিলে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করা যায় না। অ্যাস্টনের যন্ত্রশালা এবং কার্য্যপ্রণালী দেখিলে তাঁহাদের মাথা অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। অ্যাস্টন প্রায় ষোল বৎসরকাল বেগার খাটিয়াছেন। যন্ত্র-পাতি প্রায় সমস্তই তাঁর নিজের হাতে তৈয়ারী। সমস্ত অংশ তিনি সাধারণ মিস্ত্রীর মত খাটিয়া নিজে তৈয়ারী করিয়াছেন আমাদের দেশের অধ্যাপকগণ যাহারা নিজেদের অকর্মণ্যতার জন্য হয় ব্যক্তি বিশেষকে নয় গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করেন, অ্যাস্টনের দৃষ্টান্ত একবার অনুসরণ করিলে তাঁহাদের অজ্ঞান-অন্ধকার অনেকটা ঘুচিয়া যাইবে।"

রামনের মৃত্যুতে (২১শে নভেম্বর, ১৯৭০) ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অন্যান্য কথার সঙ্গে বলেন, "তিনি ছিলেন অনেক যুবকের প্রেরণা স্বরূপ।" তাই আজ নতুন দিল্লীতে যখন ভারত সরকারের বিজ্ঞান সম্পর্কিত নীতির (১৯৫৮) মূল্যায়ণ নিয়ে বৈজ্ঞানিক, কৃৎকুশল ও শিক্ষাবিদদের সম্মেলন হচ্ছে (২৮শে নভেম্বর, ১৯৭০ থেকে শুরু), তখন অংশ-গ্রহণকারী শ্রদ্ধেয়দের এই কথাই মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়, তাঁরা যেন উচ্চপদের আশায় দলাদলি ত্যাগ ক'রে রামনের আদর্শ গ্রহণ করেন ও তার প্রচার সরকারের নীতির তালিকাভুক্ত করেন।
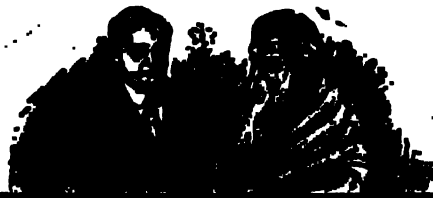
শ্রীঅরবিন্দের যোগ প্রসঙ্গে

সমর বসু

শ্রীঅরবিন্দের যোগ সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে তাঁর দর্শন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। শ্রীঅরবিন্দকে আমরা বলে থাকি ঋষি এবং দার্শনিক। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু নিজেকে দার্শনিক বলে স্বীকার করতেন না। তাঁর সুদীর্ঘকালের কঠোর যোগসাধনা লব্ধ সত্য যখন তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে তিনি প্রকাশ করলেন, তখন সেই রচনাগুলিকেই 'দর্শন' হিসাবে আমরা গ্রহণ করলাম। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তা যেমন রহস্যপূর্ণ তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। অপ্রাসঙ্গিক হবেনা বলে তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করা হল।

"And philosophy! Let me tell you in confidence that I never, never, never was a philosopher—although I had written philosophy which is another story altogether. I knew precious little about philosophy—I was a poet and a politician, not a philosopher! How I managed to do it and why?—First because Richard proposed to me to cooperate in a philosophical review—and as my theory was that a Yogi ought to be able to turn his head to anything, I could not very well refuse, and then he had to go to war, and left me in the lurch with sixty four pages a month of philosophy all to write by my lonelyself. Secondly, because I had only to write-down in the terms of intellect all that I had observed and came to know in practising Yoga daily and the philosophy was there automatically, but that is not being a philosopher."

সুদীর্ঘকাল ধরে দুরূহ যোগসাধনার সাহায্যে যে-সত্য তিনি দর্শন ও উপলব্ধি করেছিলেন তার অধিকাংশই তিনি বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন নিবন্ধে (১৯১৪ থেকে ১৯২১ সাল)। ঐ সব নিবন্ধে তিনি একদিকে যেমন—দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যা, যোগের পথ ও সাধনার দুরূহ বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি কাব্য ও সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন জটিল দিকগুলির করেছেন বিশদ বিশ্লেষণ। প্রাচীন চিন্তাধারা—অর্থাৎ বৈদিক ও ঔপনিষদিক ধ্যানধারণার সাহায্যে তিনি যোগ ও সাধনা এবং অধ্যাত্মদর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলির বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং কাব্য ও সাহিত্য কিংবা রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ইউরোপীয় চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতা কোথায় এবং কেন, তারও সন্ধান দিয়েছেন। তাছাড়া ভারতের মধ্যেই যে দর্শন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যেও মিলন এবং সমন্বয় সাধন করেছেন। সেইজন্যে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনে আমরা দেখতে পাই এই জগতের প্রায় সকল দার্শনিক মতের পরম সমন্বয়।

কঠোর তপস্যা ও সাধনার সাহায্যে ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ যে-সত্য ও তত্ত্বের দর্শন, উপলব্ধি ও অনুভূতি লাভ করেছিলেন এবং যা তাঁরা বিবৃত করেছেন বিভিন্ন উপনিষদে, সেইসব সত্য ও তত্ত্ব যুক্তি ও মননের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়না। উপনিষদে সত্য কি তা বলা হয়েছে কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। অপরের মতকে খণ্ডন করে আপন মতকে প্রতিষ্ঠা করার কোনও চেষ্টা উপনিষদে নেই। সত্যোপলব্ধির পর সানন্দে সে-বার্তা বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন ভারতের ঋষি। বলেছেন,—শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

আদিত্যবর্ণ যে-মহান পুরুষের কথা এখানে বলা হয়েছে তাঁকে ঋষি জেনেছেন বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নয়, তাঁকে জেনেছেন সাক্ষাৎ দর্শনে, অন্তরের গভীর উপলব্ধিতে। মনের সাহায্যে নয়, বোধির সাহায্যে।

পরবর্তীকালে যখন সাক্ষাৎদর্শন কিংবা অপরোক্ষানুভূতির শক্তি মানুষের মধ্যে ক্ষীণতর হতে লাগল এবং বুদ্ধির শক্তি পেতে লাগল প্রাধান্য তখন পূর্ববর্তী ঋষিগণের উপলব্ধ সত্যগুলিকে আচার্যেরা মননের সাহায্যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই যুগকেই বলা হয় ষড় দর্শনের যুগ। এই যুগের দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতেন যে বেদ ও উপনিষদে যে-সব তত্ত্ব আলোচিত তা যেহেতু ঋষিগণের সাক্ষাদ্দর্শন ও অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা লব্ধ সেই হেতু বেদ-উপনিষদ হল একমাত্র প্রামাণ্য দলিল। বেদকে মানতেন বলেই এঁদের রচিত দর্শনকে বলা হয় আস্তিক দর্শন। ভারতবর্ষে কেবল বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক দর্শন বেদকে অনুসরণ করেনি বা মানেনি। সেইজন্য ঐ গুলি 'নাস্তিক' দর্শন নামে খ্যাত।

বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী ক'রে বোধির সন্ধান লাভ করতে হয়। বোধির আলোকে উদ্ভাসিত পথ ধরে চললে তবে সত্যের লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়। দার্শনিক চিন্তা ধারা ঐ পথ ধরেই চলতে থাকে। কিন্তু ঔপনিষদিক যুগের পরবর্তী সময়ে মানুষের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ যত প্রবলতর হতে লাগল ঠিক সেই পরিমাণে হ্রাস পেতে লাগল বোধির দীপ্তি। ফলে বুদ্ধি তার প্রাধান্য বিস্তার করে বোধিলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে যুক্তি-বিচার লব্ধ জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রকার মতবাদ গড়ে তুললেন। আপন আপন মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে বেদ ও উপনিষদের কিছু অংশে বিশুদ্ধ জ্ঞানরাজির থেকে প্রয়োজনানুযায়ী উদ্ধৃতি সংগ্রহ ক'রে তাই প্রচার করতে প্রবৃত্ত হলেন।

বোধির দ্বারা অর্জিত জ্ঞান সত্যকে অখণ্ডরূপে দর্শন করে এবং সেইজন্য সত্যের বিভিন্ন অঙ্গের অন্তর্নিহিত একত্বকে হারায়না তেমনি সমন্বয় বা সমতা থেকে বিচ্যুত হয়না। কিন্তু বুদ্ধি, যুক্তি ও বিশ্লেষণের সাহায্যে বস্তুকে বহুধা খণ্ডিত করে বিচার ক'রে; পরে সেই খণ্ডিত অংশগুলিকে একত্র সমন্বিত করে একত্ব গড়ে তুলতে চায়। বস্তুত সমগ্র সত্যের আংশিক পরিচয় লাভ করে একটি মতবাদ (Theory) তৈরী করে। সেই মতবাদের সমর্থনে যা পাওয়া যায় তা-ই স্বীকার করে এবং যে-সব তত্ত্ব তার মতবাদের সঙ্গে মেলেনা তা-সবই সে পরিত্যাগ করে। এইভাবে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে বলেই শ্রুতির প্রাধান্য স্বীকার করেও তারা পরস্পর বিরোধী। বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায় এই ভাবেই গড়ে উঠেছে অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ ইত্যাদি। এই সব মতবাদের প্রবক্তাগণ স্ব স্ব মতবাদ একমাত্র সত্য এবং অপর মত মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রচার করে স্বীয় মতবাদকে সুদৃঢ় করবার চেষ্টা করেছেন। ফলে মূল দর্শনের সত্যস্বরূপ কি তা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্যই থেকে গিয়েছে।

অন্যদিকে ইউরোপীয় দর্শন সম্পূর্ণরূপে intellect এর উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশে দার্শনিক মতবাদের মধ্যে পারস্পরিক যতই বিরোধ থাকুক না কেন মূলে সমস্ত মতবাদই বৈদিক বা ঔপনিষদিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং প্রত্যেক মতবাদই ধর্মসাধনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে ধর্মসাধনার সাক্ষাৎ কোনও সম্পর্ক নেই। বরং অনেক স্থলে বিরোধ বর্তমান। যুক্তি-তর্ক-বিচার বিশ্লেষণই সে-দর্শনের মৌল ভিত্তি। বোধিলব্ধ জ্ঞান যে ইউরোপ পায়নি তা নয়, কিন্তু তাকেও সে বুদ্ধির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। এবং বুদ্ধির অধীন হয়ে বুদ্ধির নিয়ম পালন করে যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে সে-জ্ঞান সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুতরাং

বোধি-লব্ধ জ্ঞানে বুদ্ধির রঙ মিশে যাওয়ায় সে-জ্ঞানের মধ্যে পূর্ণ সত্য খণ্ডিত আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে আমরা দেখি বুদ্ধির ভাষায় প্রকাশিত পূর্ণ সত্যের পরম অখণ্ড রূপ। কঠোর তপস্যার সাহায্যে তিনি যে সাক্ষাৎ-দর্শন এবং অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা সত্য লাভ করেছিলেন, আধুনিক যুক্তিবাদী মনের উপযোগী ভাষায় বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে তাকে তিনি ব্যক্ত করেছেন। তাই শ্রীঅরবিন্দে ঘটেছে বোধি ও বুদ্ধির এক অপূর্ব সমন্বয়। ইউরোপীয় দার্শনিকদের মত বোধিকে তিনি বুদ্ধির অনুগত বা অধীন হতে দেননি। বোধিই লাভ করেছে সত্য এবং সেই সত্য বিশুদ্ধি এবং অখণ্ডতা না হারিয়ে বুদ্ধির ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। এতেই ভারতীয় ও ইউরোপীয় পদ্ধতির সমন্বয় ঘটেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সর্বভাবের অতীত যে পরম সত্য তাকে বুদ্ধির ভাষায় আদৌ ব্যক্ত করা যায় কিনা? যাকে বলা হয়েছে 'অবাঙমানসগোচরম্' বাক্ বিস্তারের জালে তাকে আবদ্ধ করা যায় কিনা?

এক কথায় এর উত্তর হ'ল না।—বুদ্ধির ভাষায় সেই অবাঙমানসগোচর পরম সত্যকে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এবং সেই জন্যেই বলা হ'য়েছে—"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" বাক্য মনের সংগে যাকে না পেয়ে ফিরে আসে। আমাদের এই 'মন'—তাকে শুধু জানেনা তা নয়, তাকে জানবার শক্তিও তার নেই। প্রাকৃত মনের কাছে যদিও সে চিরকাল অজ্ঞাত (unknown) থেকে গিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু অজ্ঞেয় (unknowable) নয়। তাকে জানা যায় যে শক্তিবলে সেই শক্তির সাহায্যেই মানুষের বোধগম্য ভাষায় তার কিছুটা প্রকাশও করা যায়। শ্রীঅরবিন্দ তাই ক'রেছিলেন।

যোগসাধনার সাহায্যে মানুষ মনকে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় করে এমন এক অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে অবরূঢ় হ'তে পারে যেখানে সে শুধু সত্য দর্শন বা সত্য উপলব্ধি করে না, সেই সত্যের পরিচয় দেবার মত উপযোগী ভাষা, এবং যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে তাকে প্রকাশ করার মত শক্তিও সে অর্জন করে। সেই শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েই শ্রীঅরবিন্দ যোগ, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, কাব্য-সাহিত্য, ধর্ম-ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা করেছেন আর্য্য পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে। এই সমস্ত প্রবন্ধে বিধৃত চিন্তারাজি ও গভীর মনীষা, এর প্রকাশভংগী ও ভাষার নৈপুণ্য, —সবকিছুই সেই অধ্যাত্মশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল বলেই এইসব রচনামালা বুদ্ধির রঙে রঞ্জিত হ'য়ে এর সত্য স্বরূপকে খণ্ডিত করতে পারেনি। এবং সেইজন্য সত্যকে আমরা পেয়েছি অবিকৃতরূপে। যে যোগযুক্ত অবস্থায় নিবিষ্ট থেকে শ্রীঅরবিন্দ এইসব প্রবন্ধ সৃষ্টি ক'রেছেন, সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—Out of an absolute silence of the mind—I edited the Bande-mataram for four months wrote six volumes of the 'Arya'—not to speak of the letters, messages etc., I have written since them.

জড়জীবনকে কেন্দ্র করে বহুতর দুরূহ সমস্যা ইউরোপীয় মহামনীষীগণকে যুগে যুগে চিন্তান্বিত করেছে। যে বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে সেইসব সমস্যার স্বরূপ ও তার গতি-প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করে তার নিরসনের উপায় তাঁরা নির্দ্ধারণ করে থাকেন, ইউরোপীয় মনীষীগণের সেই বিচার বিশ্লেষণের পদ্ধতি অনুসরণ করে শ্রীঅরবিন্দ শুধু জড়জীবনের নয়—পরন্তু জড়জীবনের অন্তরে নিগূঢ় যে অধ্যাত্ম-জীবন বা এশীয় তথা ভারতীয় চিন্তাচেতনায় বিধৃত, —তার রহস্যও উদ্ঘাটন করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের আগে ভারতীয় কোনও যোগীই এই পদ্ধতিতে অধ্যাত্মজীবন, যোগসাধনা ও পরমপুরুষের তত্ত্ব বিশ্ববাসীর কাছে এমনভাবে পরিবেশন করেননি। এই প্রসঙ্গে যে কথা শ্রদ্ধার সংগে স্মরণযোগ্য তা'হ'ল

যুগের প্রয়োজনেই মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করে থাকেন। আজকের এই যুগটাকে বলা হয় age of reason বা Rational age,—সেই কারণে যুক্তির সাহায্যেই পরম চেতনা বা 'ঋতচিত'কে বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

যোগ সাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য

যোগ সাধনা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, যা নিতান্তই নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক। আমাদের ধারণা যোগ মানে এমন কিছু যা অভ্যাস করলে পার্থিব সব কিছুর উপরই একটা বৈরাগ্য এবং অনাসক্তি আসবে যার ফলে পরিণামে পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করতে হবে। তাছাড়া কাজটাও কঠিন এবং দুরূহ। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

এ-ধারণা আমাদের মধ্যে জন্মেছে বিশেষ একটি কারণে। প্রাচীন দর্শনের কয়েকটি শাখায় এ দেশের আচার্যেরা জগৎকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে পরম ব্রহ্ম ও মোক্ষলাভকে জীবনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করায় আমাদের মধ্যে অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক অনীহা জন্মেছে। তাছাড়া আমরা দেখেছি, যে-সব সাংসারিক মানুষ অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন—তাঁদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভয়ের ভাবিত, ঠিক আন্তরিক অভীপ্সার নয়।

যোগের দুরূহতা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের এই অসম্পূর্ণ যোগ সাধনার সঙ্গে জীবনের কি সম্বন্ধ তা আমাদের জানতে দেয়নি, বুঝতে দেয়নি। শ্রীঅরবিন্দের যোগ এই মর্তলোকের সমস্ত সীমাবদ্ধতা, অন্ধতা ও অপূর্ণতা দূর করে মানুষকে কি করে "দেব মানবে" পরিণত করে তোলা যায়—সেই পথেরই দিশারী। সুতরাং যোগ-সম্বন্ধে আমাদের এতদিনের ধারণা মন থেকে মুছে ফেলে দিতে পারলে তবেই শ্রীঅরবিন্দের যোগকে বোঝা সহজ হবে।

যোগ হল সচেতনভাবে আত্মবিকাশের চেষ্টা। ছোট্ট একটি তৃণ যাছের শিশিরে স্নান করে ভোর বেলায় সূর্যের দিকে চেয়ে আত্মবিকাশের যে-তপস্যা করে সেটাও যেমন যোগ, আমরাও তেমনি প্রতিদিনের নানা কাজকর্মের মধ্য দিয়ে একটা কিছু হয়ে উঠছি। এই হয়ে ওঠারই অর্থ হল যোগ। প্রতিদিনের প্রতিটি কাজে কর্মে আমাদের মধ্যে যে আত্ম-বিভাবনা (self creation) আপনা থেকেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে তার রহস্য যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি, তাহলেই আমরা বুঝতে পারব শ্রীঅরবিন্দ কেন বলেছেন all life is yoga,—সমস্ত জীবনই হল যোগ। বাস্তব জীবনে আমরা বিভিন্ন ধরণের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে এগিয়ে চলেছি। আমরা কিন্তু সংগ্রাম চাইনা, চাই সমতা, সমন্বয় বা সামঞ্জস্য। তাই এই সামঞ্জস্য বিধানে আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রয়োগ করি। এবং তার ফলে অনেক নূতন নূতন ভাবনা নূতন নূতন জীবন যাপনের প্রণালী, আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, আমরা সেই নূতন ভাবনায় ভাবিত হই, সেই নূতন পথ ধরে এগিয়ে চলি। যোগের উদ্দেশ্য এই ভাবেই সিদ্ধ হয়। আমরা বলেছি—যোগ মানে হল আত্ম-বিকাশের প্রয়াস। এই আত্ম-বিকাশের ধারা-প্রবাহ বিশেষ একটি জীবনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না। এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে এর অনবচ্ছিন্ন প্রবহমানতা অব্যাহত থাকে। আমরা যেহেতু জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী সেই হেতু জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়ে আত্ম-বিকাশের ধারা কিভাবে বহে চলেছে তা বোঝা আমাদের পক্ষে, পাশ্চিমী মানুষদের মত (যাঁরা জন্মান্তরের তত্ত্ব মানতে চান না) কঠিন কিছু নয়। জন্ম-জন্মান্তরের প্রসঙ্গে আমরা যাকে বলি জীবাত্মা শ্রীঅরবিন্দ তারই নাম দিয়েছেন—'চৈত্য পুরুষ' (psychic being)। এই জীবাত্মা বা চৈত্য পুরুষই আমাদের কেন্দ্রমূল। অলক্ষ্যে থেকে এই শক্তিই আমাদের নিত্য নূতন ভাবে গড়ে তুলছে। একেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন 'পাকা আমি'। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে আমরা সব সময়েই একে ভুলে থাকি। একে ঠিক বুঝতেও পারি না। অনেক সময়

অহংকেন্দ্রিক (কাঁচা আমি) বুদ্ধির প্রভাবে একে অস্বীকারও করি। অথচ একটু যদি গভীরভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী বোঝাবার চেষ্টা করি (এবং যে-সব ঘটনার তাৎপর্য বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারিনা বলে তকে accident বলি) তাহলেই দেখব একটা কিছু আছে আমাদের মধ্যে যার নিয়ন্ত্রণে আমরা চলেছি। জীবনের ক্ষেত্রে এই রকম একটা সত্তা বর্তমান। কেন এই দেশে, এই পরিবারে, এমন বাপমার ঘরে আমি জন্মালাম। কেনই বা এমন লেখাপড়া শিখলাম, এই ধরণের পেশাই বা গ্রহণ করলাম কেন। এইসব ব্যাপারে আমার নিজস্ব ইচ্ছা কি কিছু ক্রিয়াশীল ছিল? তাহলে কোন্ শক্তি এইভাবে আমাকে প্রভাবিত করছে পরিচালিত করছে। এতে কি আমার একটুও হাত আছে? এই ধরণের প্রশ্ন যদি আমাদের মনে জাগে তাহলে সহসা আমরা তার জবাব দিতে পারি না। এবং তা পারি না বলে accident এর দোহাই পাড়ি।

(For believe it or not all life is a constant miracle—The Mother) মায়ের এই উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

কিন্তু সবটাই যদি accident বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বুদ্ধির সঙ্গে আপোষ করাই হয়। কিন্তু সেটা কি যুক্তি সঙ্গত। বিশেষ করে এই যুক্তি বুদ্ধির যুগে। সুতরাং মানতেই হয় এই সমস্ত ঘটনার পিছনে নিয়ত ক্রিয়াশীল এক শক্তি বর্তমান, অলক্ষ্যে থেকে যে আমাকে পরিচালিত করছে, নিয়ন্ত্রিত করছে। আমার একার জীবনেই যে এটা শুধু ঘটছে তা নয়, সকল মানুষেরই—মানুষ কেন। জীব-জন্তু, উদ্ভিদ-তৃণলতা এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও এই লীলা চলছে। সুতরাং প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে—আত্ম-বিকাশ ঘটছে তার থেকে এটা মেনে নেওয়া সহজ যে সামগ্রিকভাবে সারা বিশ্বে বিশ্বজনীন মানুষের মধ্যেও এই বিকাশ বা অভিব্যক্তি প্রকট হয়ে উঠছে

এর থেকে আমরা দুটো জিনিসের সন্ধান পাচ্ছি। (১) ব্যক্তি জীবনের বিকাশ। (২) ব্যক্তির জীবন ও তার বিকাশের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে বিশ্বজীবন ও তার বিকাশ। অতএব আমি যদি আপন মুক্তির আশায় যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হই তাহলে আমার পক্ষে মোক্ষ লাভ হয়ত সম্ভব হবে, কিন্তু যদি আমার সঙ্গে আমার প্রতিবেশীর জীবন সমভাবে বিকশিত হয়ে না ওঠে তাহলে মোক্ষলাভ করেও আমি আমার পারিপার্শ্বিক জীবনে সেই মুক্তচিত্ততাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না। তাই মহাপুরুষেরা স্ব-স্বজীবনে মুক্তি লাভ করেও সমাজকে সেই মুক্ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন নি। পারিপার্শ্বিককে অস্বীকার করে, জগৎ ও সমগ্র মানব সমাজকে অন্ধতার মধ্যে আবদ্ধ রেখে নিজে মুক্তিলাভ করার সার্থকতা কোথায়? তাই শ্রীঅরবিন্দের যোগ নিজের জন্য নয়। সে যোগ ভগবানের জন্য, ভগবানের অভিপ্রায় পূরণের জন্য।—**The Yoga we practise here is not for ourselves but for the Divine.**

শ্রীঅরবিন্দের যোগকে বলা হয়েছে পূর্ণ যোগ—**Integral Yoga**, এর অর্থ কি। এর অর্থ বুঝতে গেলে মানুষের দুইটি দিক সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত হতে হবে। মানুষের একটি দিকে আছে—দেহ প্রাণ মন,—অন্য দিকে আছে অধ্যাত্মজীবন। দেহ প্রাণ মনকে নিয়েই অধ্যাত্মজীবনে উত্তীর্ণ হতে হবে। শুধু দেহ ও প্রাণের জন্য এ যোগ নয়—তাই হঠ যোগের সঙ্গে এর প্রভেদ। শুধু মনের মুক্তির জন্য এ যোগ নয় তাই রাজযোগই এর শেষ কথা নয়, এমন কি পরমার্থ লাভ এ যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় বলেই—ত্রিমার্গ যোগ—অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তি ও কর্মযোগের লক্ষ্যের সঙ্গে এর লক্ষ্যের মৌল প্রভেদ। শ্রীঅরবিন্দ এর নাম দিয়েছেন অধ্যাত্মযোগ। গীতায় যে অধ্যাত্মযোগের কথা বলা হয়েছে এ হল সেই যোগ। দেহ-প্রাণ মন—সত্তার বিভিন্ন অঙ্গকে রূপান্তরিত করে মানুষকে দেব-মানুষ হয়ে উঠতে হবে। সেই জন্যই এ যোগের নাম পূর্ণ যোগ।

দেহ ও প্রাণ নিয়ে মানুষের পশুভাব; মন ও বুদ্ধি নিয়ে মানুষের মানুষীভাব, আর তুরীয় জ্ঞান ও আনন্দ নিয়ে মানুষের দেবভাব। মানুষের এই পশুভাব থেকে মানুষীভাবের ভিতর দিয়ে মানুষকে দেবভাবে উন্নীত করে যে শক্তি তার নাম যোগ শক্তি, যে পথ ধরে এই ভাবে এগিয়ে যেতে হয় তার নাম যোগ-সাধনার পথ।

আমরা জানি মানুষ মনোময় পুরুষ,—অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মনশ্চেতনা জাগ্রত হয়েছে বলে মানুষ আত্ম-সচেতন জীব হতে পেরেছে। প্রকৃতির ক্রমপরিণাম-বাদের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জড়জগতে প্রথম সৃষ্টি হল উদ্ভিদের। তারপর এল প্রাণী তারপর মানুষ। জড়ের মধ্যে যে চেতনা সুপ্ত উদ্ভিদের মধ্যে সেই চেতনাই রয়েছে স্বপ্নাচ্ছন্ন; প্রাণীর মধ্যেই সেই চেতনা জাগ্রত হয়েছে কিন্তু অন্তর্মুখী হতে পারেনি, সেই জাগ্রত চেতনা থেকে গিয়েছে বহির্মুখী। তাই দেহ ও প্রাণকে ঘিরে প্রাণীর সমস্ত কর্ম-প্রবণতা। মানুষের মধ্যেই সে-চেতনা অন্তর্মুখী হতে পেরেছে, তাই মানুষের মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

দেহ-প্রাণ মন বলতে আমরা কি বুঝি।

মানুষের দেহে প্রাণ ও মন এমন ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে যে বিচ্ছিন্নভাবে তাদের আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। সেই জন্য দরকার মানুষের ভারকেন্দ্র গুলির একটু ব্যাখ্যা। মানুষের এই দেহটা দৈর্ঘে প্রস্থে চতুষ্পদ প্রাণীর মত ছড়ানো। কিন্তু মানুষ দুইটি পায়ের উপরই শরীরের সমস্ত ভারসাম্য রক্ষা করে। এই জন্য মানুষের মেরুদণ্ড সোজা—মস্তিষ্ক থেকে মূলাধার পর্যন্ত লম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে। জন্তদের মেরুদণ্ড সোজা হতে পারেনি। জন্ত মাথা হেঁট করে যে-টুকু দেখে এবং আঘ্রাণ পায় তারই মধ্যে তার জগৎ সীমাবদ্ধ। মাথা তুলে আকাশকে,—অসীমকে দেখার অভীপ্সা তার জাগেনা। পশুর কথা থাক। মানুষই যখন আমাদের আলোচ্য তখন দেহ, প্রাণ ও মন নিয়েই মানুষ কি করে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে সেই আলোচনা করা যাক।

মানুষের দেহের নিম্নাঙ্গ থেকে উচ্চাঙ্গ কিন্তু অনেক বেশী ভারী। চলতে ফিরতে এ-ভার আমরা বুঝতে পারিনা। মানুষের ভারকেন্দ্র তাই উপরের দিকে। পশুর দেহে নিম্নাঙ্গ উচ্চাঙ্গ অপেক্ষা অনেকটা বেশী ভারী বলে পশুর ভারকেন্দ্র নিম্নাঙ্গে। আবার উদ্ভিদের ভারকেন্দ্র পশুর চেয়েও নীচে—একেবারে মূলের সঙ্গে। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারকেন্দ্র উপরে উঠতে থাকে বলে ভারকেন্দ্র রক্ষার জন্য উদ্ভিদকে মূলবিস্তৃত করে দিতে হয়, যাতে মাটি আঁকড়ে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

শরীরের যেমন, অন্তঃকরণেরও ঠিক তেমনি ভারকেন্দ্র আছে। অন্তঃকরণের ভারকেন্দ্র হল—শরীরের ভারকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রক। মানুষের অন্তঃকরণের ভারকেন্দ্র —মনে অর্থাৎ মস্তিষ্কে। মোটামুটি ভাবে প্রতিটি আধারে আছে তিনটি কেন্দ্র;—দেহ, প্রাণ, মন। মানুষের আধারে যে কেন্দ্র শুধু দেহকে নিয়েই নাড়াচাড়া করে, দেহের ধর্মে তাকে নিয়ন্ত্রিত করে তার স্থান হল পা থেকে নাভি পর্যন্ত দেহের বিস্তীর্ণ অংশ। প্রাণকেন্দ্রের ক্ষেত্র হচ্ছে নাভির উপর থেকে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত আর মনঃকেন্দ্রের ক্ষেত্র হৃৎপিণ্ডের ঊর্দ্ধ থেকে মূর্দ্ধা পর্যন্ত বিস্তৃত।

দেহ, প্রাণ ও মন নিয়েই মানুষ। দেহ হল ভোগের আয়তন। প্রাণ হল শক্তির আর মন হল চিন্তার আয়তন।

মানুষ প্রথমে চায় শরীরটাকে বজায় রাখতে। গ্রহণে বর্জনে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে শরীরটাকে সে সরস রাখতে চায়। তারপর খেলা-ধূলায়, আবেগে উত্তেজনায়, কাজে কর্মে আপনাকে সে চায় সতেজ করে রাখতে, সজীব করে রাখতে। সবশেষে তার আছে একটা কৌতূহল। সে জানতে চায়, দেখতে চায়, বুঝতে চায়, শুনতে চায়—নিজেকে সজাগ রাখতে চায়। মানুষের এই ভোগৈষণা, কর্মৈষণা আর জ্ঞানৈষণা এই তিনটির ক্ষেত্র হল—যথাক্রমে দেহ, প্রাণ ও মন।

মানুষ যেহেতু মনের অধিকারী, সেই হেতু জ্ঞানৈষণার জন্যই তার যা কিছু কর্মপ্রবণতা। মানুষের উদ্ভব হয়েছে

এই কারণেই অর্থাৎ জানবার ইচ্ছায়। আপনাকে জানবার ইচ্ছা। আপনার ক্ষেত্রসমূহের পরিচয় লাভ করা। গীতায় বলা হয়েছে—ক্ষেত্রজ্ঞ, মানুষ যতখানি আত্মসচেতন অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ হতে পেরেছে—ততখানি সে হয়েছে সিদ্ধপুরুষ।

'আত্মচেতন'—কথাটির অর্থ কি? আত্মচেতনার অর্থ হচ্ছে—ভেতরে একটা ছাড়াছাড়ি ভাব। অর্থাৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন। 'আমি জানব'—এই ইচ্ছার মধ্যেই রয়েছে—'যা' জানব তার থেকে আমি পৃথক। সুতরাং আগে চাই 'আমি'র জ্ঞান 'know thyself' এই আমিরই অন্যনাম—জীব:বা পুরুষ। এই 'পুরুষ পূর্ববর্ণিত একটি কেন্দ্র অবলম্বন করে থাকে। যে ধরণের বৃত্তি বাইরের জীবনে মানুষ গ্রহণ করে সেই ধরণের কেন্দ্রকে আশ্রয় করে এই পুরুষ। যেমন যখন শারীর ভোগের প্রেরণা জাগে তখন পুরুষ আশ্রয় নেয় নাভিকেন্দ্রের নীচে। যখন আমাদের মধ্যে জাগে আবেগ উত্তেজনা, তখন পুরুষ বাস করে হৃৎপিণ্ডের কেন্দ্রে। এবং যখন চিন্তা-ভাবনা, বিচার বিশ্লেষণ ইত্যাদির সাহায্যে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে প্রয়াসী হই তখন মস্তিষ্ক কেন্দ্রে বিরাজ করে পুরুষ। পুরুষ এই ভাবে কেন্দ্রের মধ্যে ওঠা-নামা করে। অথবা একথাও বলা যায় যে, পুরুষ যে কেন্দ্রে অবস্থান করে সেই কেন্দ্রের ভাব অনুযায়ী মানুষও অনুপ্রাণিত হয়।

আমরা বলেছি মানুষ মনোময়। মানুষের অন্তর-পুরুষের কেন্দ্র হল মস্তিষ্ক। অপর দুইটি কেন্দ্রে সে ওঠা নামা করলেও তার স্থান হল তৃতীয় কেন্দ্র। দেহ ও প্রাণের কেন্দ্রে আর সে অবস্থান করতে চায়না। যে স্তর সে অতিক্রম করে এসেছে। মানুষ যে আপনাকে জানতে চায় তা হল তার পুরুষের আপন কেন্দ্রের স্বধর্ম। তাই তার পুরুষের স্বাভাবিক আবাসভূমি (লীলাস্থল) নাভি কিংবা হৃৎপিণ্ডের কেন্দ্র নয়, আবাসভূমি—মস্তিষ্কের কেন্দ্র। তাই মানুষের স্থিতি মনোবুদ্ধিতে। দৈহিক বাসনা, প্রাণের আবেগ বা প্রেরণা যে সব বিধান দেয় মানুষ তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনা। সন্তুষ্ট থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়—। মানুষের নীতি, অর্থাৎ ধর্মনীতি, কর্মনীতি, সমাজনীতি, তার শিল্পকলা অর্থাৎ কাব্য-সাহিত্য চারু ও কারু শিল্প সৃষ্টি এ-সবই তার তার পুরুষের বিধান। পুরুষ তার মূর্দ্ধাদেশের দিকে ঊর্দ্ধমুখী। এই তৃতীয় কেন্দ্রস্থ পুরুষের অনুপ্রেরণাতেই মানুষের আধার গড়ে উঠেছে।

কিন্তু মনোবুদ্ধির উপরে যে স্তর আছে সেই স্তরে না উঠতে পারলে মনের ভূমি পাকা হয় না। অন্তর-পুরুষকে সেই স্তরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চাই সাধনা। এই আমার 'আমি'কে নিম্নভাগ, মধ্যভাগ থেকে তুলে ধরে উত্তমভাগের মধ্য দিয়ে আরও উপরে ব্রহ্মরন্ধ্রেরও উপরে তুরীয়লোকে প্রতিষ্ঠিত করাই হল যোগের উদ্দেশ্য। বাইরের কোনও বিধিব্যবস্থার প্রবর্তনে অর্থাৎ রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করে অন্তরপুরুষকে ঐ ঊর্দ্ধলোকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় বলেই যোগের প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়,—

The whole heart and action and mind of man must be changed, but from within and not from without, not by political and social institutions not even by creeds and philosophies, but by realisation of God in ourselves and the world and remoulding of life by that realisation.----(The yoga and its objects P—5)

অবতারের আবির্ভাব

সন্তোষকুমার ঘোষ

নিতান্ত দায়ে পড়েই ভগবান বিষ্ণুকে এই বয়েসে আবার অবতাররূপে মর্তে অবতীর্ণ হতে হল। কবে, কোথায় এবং কী অবস্থায় তিনি ভূমিষ্ঠ হলেন—আর কিভাবেই বা লীলা শুরু করলেন—তা পরে বলছি। আগে ভূমিকাটুকু শোনান দরকার। কারণ ভূমিকাটাই আসল।—

কলিযুগ পড়ে অবধি স্বর্গের আবহাওয়া, হালচাল ইত্যাদি বিলকুল পাল্টে গেছে। চিরবসন্ত, চিরযৌবন, চিরনীরোগ অবস্থা—স্বর্গে এসব এখন গল্প-কথা হয়ে গেছে। দেবতাদের আর সেকাল নেই। টিম্ টিম্ করে কোন রকমে অমরতাটুকু যা বজায় আছে। অদূর ভবিষ্যতে তাও টিকবে কি না সন্দেহ। অদিতিনন্দনদের এখন আমাদেরই মত বুড়হুড় হতে হচ্ছে—ভীমরতি ধরছে—ব্যামোতেও ভুগতে হচ্ছে। এ-ছাড়া শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এই হতচ্ছাড়া ঋতু তিনটির দাপটও সইতে হচ্ছে।

বৈকুণ্ঠের অবস্থাও তথৈবচ। বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীবিষ্ণু ইদানীং বুড়িয়ে গিয়ে একেবারে জবুথবু হয়ে পড়েছেন। সৃষ্টির কোথায় কি অনাসৃষ্টি ঘটছে—চেষ্টা করেও সেদিকে আর নজর দিতে পারেন না। হালে বৈকুণ্ঠে হাড়কাঁপানো শীত পড়েছে। শ্লেষ্মার ধাত ওঁর। উনি তাই রোদে বসে বুকপিঠ কড়া করে সেঁকে নিচ্ছেন। দেবর্ষি নারদ হঠাৎ বীণাঝঙ্কারের সঙ্গে 'প্রভু হে' বলে আওয়াজ দিয়ে ওঁর সামনে আবির্ভূত হলেন।

আজকাল ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করে সব দেখে শুনে দেবর্ষি মাঝে মাঝে বৈকুণ্ঠে শুধু একটা করে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন। তা পড়ে শ্রীভগবান আন্দাজ করে নেন—সৃষ্টি কি ভাবে চলছে ফিরছে। সম্প্রতি মর্ত্যের কোন কোন জায়গায় পরিস্থিতি নাকি একেবারে প্রলয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তাই দেবর্ষি শুধু রিপোর্ট পাঠিয়েই ক্ষান্ত হতে পারেন নি। সশরীরে উপস্থিত হলেন।

অল্প বিস্ময়ের সুরে বৈকুণ্ঠেশ্বর বললেন—অসময়ে, কোন রকম খবর-টবর না দিয়েই এসে হাজির হলেন যে হঠাৎ। ব্যাপার কি দেবর্ষি?

ঝুলির ভিতর থেকে তাড়াখানেক রিপোর্টের 'কপি' বার করতে করতে দেবর্ষি একটু উষ্মাব্যঞ্জকস্বরে বললেন—'সম্ভবামি যুগে যুগে' বলে দ্বাপরে তো খুব ঘটা করে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলেন; কিন্তু এখন আর আপনি কথা রাখতে পারেন না। সৃষ্টি পালনের দায়িত্ব আপনার। মর্ত্যভূমি যে দিন-দিন কি ভাবে গোল্লায় যাচ্ছে—তা ঝুড়ি ঝুড়ি রিপোর্ট পাঠিয়ে আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি। কমসে কম—হাজার দুই স্মারকলিপি মারফৎ তেড়ে তাগিদও দিয়েছি। বহুদিন আগেই অবতারের রূপ ধরে মর্ত্যের যে কোন জায়গায় আপনার জন্মান উচিত ছিল। উপস্থিত জায়গায় জায়গায় পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে—তাতে মনে হয়, দু'চার অক্ষৌহিনী অবতারেরও কর্ম নয় যে ঠেকায় বা সামলায়।

আমাশয়ের রুগীর মত মুখ চোখের ভাব করে শ্রীভগবান বললেন—কি করবো বলুন দেবর্ষি। কলিযুগ পড়ে অবধি আমার বাত শ্লেষ্মা বেড়েছে জানেন তো? তা ছাড়া স্নায়ুদৌর্বল্য আছে আমার। ইদানীং মাঝে মাঝে স্মৃতিবিভ্রমও ঘটছে। কবে, কোথায়, কাদের কী কথা দিয়েছি—তা আর মোটেই মনে করতে পারি না।

কথা শুনে মহাক্ষুব্ধ হয়ে দেবর্ষি বিড় বিড় করে বললেন—সাঃ, আপনাকে দিয়ে ত্রিভুবনের কাজ চালানো দায় হয়ে উঠল দেখছি। বৈকুণ্ঠে বসে বসে বার্দ্ধক্য আর রোগের অজুহাত দিচ্ছেন—ওদিকে মর্ত্যের মানুষ থেকে শুরু করে পোকামাকড়রা পর্যন্ত বিলকুল

নিরীশ্বরবাদী হয়ে উঠছে। হাল আমলের কেউই আর আপনার অস্তিত্ব মানে না। আপনার নাম শুনলে—উপহাস করে—'বগ' দেখায়। তা ঠিকই করে দেখাছি।

রীতিমত উত্তেজিত হয়ে শ্রীভগবান বললেন—বলেন কি? মর্ত্যবাসীদের জন্যে জল, আলো, বাতাস থেকে শুরু করে যথাসর্বস্ব যুগিয়ে যাচ্ছি আমি—আর আমারই অস্তিত্ব মানে না তারা। তা, মহেশ্বরেরও কি আমার মত যাই-যাই দশা হয়েছে দেবর্ষি? ভূমিকম্প, ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস; মহাপ্লাবন ইত্যাদি ঘটিয়ে ভেঙেচুরে ভাসিয়ে ডুবিয়ে সপ্তদ্বীপা মেদিনীকে ষষ্ঠদ্বীপা কি পঞ্চদ্বীপা করে দিয়ে দেখলেই তো হয়। মর্ত্যবাসীরা একদিনেই ঢিট হয়ে যায়।

দেবর্ষি বললেন—কচু। জায়গায় জায়গায় ছোটোখাটো প্রলয় ঘটিয়েত দেখা গেছে। অবস্থা—সেই একই রকম আছে। ঈশ্বরবাদকে হটিয়ে দিয়ে—শূন্যবাদ, জড়বাদ, যুক্তিবাদ—এসবই চারদিকে ক্রমশঃ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এরপর সেই মামুলি ধরণের ভক্তি আর থালাভরা নৈবিদ্যির বদলে—আপনার কপালে দেখছি 'অষ্টরম্ভা' জুটবে।

দেবর্ষির কথা শুনেশ্রীভগবান যৎপরোনাস্তি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। হঠাৎ মরিয়া হয়ে বললেন—দু'এক দিনের মধ্যেই আমি মর্ত্যে নামবো—আপনাকে কথা দিচ্ছি দেবর্ষি।

দেবর্ষি পরম খুশী হয়ে বললেন—তা মর্ত্যের কোন জায়গায় নামবেন প্রভু? বেশ ভেবে চিন্তে এবার আপনাকে জায়গা বাছতে হবে কিন্তু।

শ্রীভগবান চিন্তিত মনে বললেন—আপনার শেষ দিকের কয়েকবার বিবরণীতে যেন লিখেছিলেন যে, তামাম দুনিয়ার মধ্যে জম্বুদ্বীপের দু-একটা জায়গা নাকি সবচেয়ে বেশী বিগড়েছে। তা সেখানেই জন্মাব আমি।

দেবর্ষি মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন—আর যাই করুন, তা বলে জম্বুদ্বীপের সেই হতচ্ছাড়া জায়গায় আর জন্মাতে যাবেন না প্রভু দোহাই আপনার। 'মামেকং শরণং ব্রজ'—বললেই হুড়হুড় করে আপনার শরণাগত হবে—তেমন ধাতের মানুষ আর একটিও নেই সেখানে। এওাবাচ্চা থেকে সুরু করে ওখানকার সবাই এখন বিশেষজ্ঞ। প্রত্যেকেই বেদব্যাস—সকলেই যাজ্ঞবল্ক্য। আপনি সশরীরে গিয়ে হাজির হলেও আদৌ কলকে পাবেন না। যুক্তি আর জেরার ঠেলায় আপনি দুদিনেই 'ক্যাবলাকান্ত' বলে প্রমাণিত হয়ে যাবেন। হ্যাঁ বলতে ভুলছি। ওরা আপনার সেই গীতার মাধ্যমে প্রচার করা মামুলী মতবাদকে নিতান্ত বস্তাপচা বলে ঝেঁটিয়ে ভাগাড়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি তুলে শ্রীভগবান বললেন—বলেন কি দেবর্ষি! গীতা মানে না—সৃষ্টির সনাতন মতবাদ মানে না—এ্যাতোবড়ো কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে উঠেছে ওরা!

দেবর্ষি বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু, আপনার সেকেলে হাতাপড়া মতবাদের সঙ্গে আপনাকেও ওরা নস্যাৎ করে ছেড়ে দিয়েছে।

শ্রীভগবান রাগে এবং উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। মুখ দিয়ে একটিও বাক্য সরলো না।

দেবর্ষি টাক চুলকতে চুলকতে বললেন—সব কথা শুনলে আপনার মেজাজে হয়ত আগুন ধরে যাবে প্রভু। আপনার সেই বড় সাধের বর্ণাশ্রমও এযুগে একেবারে অচল হয়ে গেছে। এখন ঘটা করে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠছে। চারদিকে সাম্যের বান ডেকেছে।

শ্রীভগবান বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—সে আবার কি!

দেবর্ষি বললেন—সে বড়ই আজব ব্যাপার প্রভু। একে একাকারবাদও বলতে পারেন। দেবতা দানব, যক্ষ-রক্ষ, মানুষ-পশু, কীট-পতঙ্গ - মায় আপনার তিন এলাকার তিন বিধাতা—অর্থাৎ আল্লা, গড আর ঈশ্বর—সব একাকার হয়ে একশ্রেণীভুক্ত হয়ে যাবেন। ওজন—মাপ—আকার—গুণাগুণ ইত্যাদির কোনরকম ফারাক থাকবে না আর। সবাই এক হাটে এক পাল্লায় চড়ে একই দরে বিকোবেন। সকলেরই একই ভাগাড়ে গতি হবে।

শ্রীভগবান আবার দারুণ রকম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—এ হতেই পারে না দেবর্ষি। অসম্ভবকে সম্ভব করতে চায়—এতবড় বিধাতাঠাকুর হয়ে উঠেছে অর্বাচীনরা। সৃষ্টির সবকিছুকে তছনছ করে গোল্লায় দেবে দেখছি। নাঃ, এ অসহ্য দেবর্ষি। —বলতে বলতে রাগে উনি সেই মুহূর্তেই ফেটে পড়বেন বলে মনে হল।

ইদানিং না হয় অথর্বই হয়ে পড়েছেন। হাজার হোক—শ্রীভগবান সর্বশক্তিমান তো বটে। তাছাড়া ঐশ্বরিক গোঁটুকু যাবে কোথায়। বৈকুণ্ঠেশ্বর মহা-উত্তেজনাভরে বললেন—ওই জম্বুদ্বীপেই আবার নামবো আমি। আর যে জায়গাটা সবচেয়ে বেশী বিগড়েছে—সেখানেই জন্মাব। এসপার ওসপার যা হয় একটা করে তবে আমি ফিরব দেবর্ষি।

আপাতব্যঞ্জক স্বরে দেবর্ষি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—ওই কেমন আপনার বেয়াড়া গোঁ প্রভু। জম্বুদ্বীপের নিতান্ত বেগড়ন জায়গাগুলো ছাড়া কি আপনার জন্মাবার মত ঠাঁই নেই আর কোথাও? ওখানে জন্মালে আপনার ঐশ্বরিক মাহাত্ম্যের আর বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব থাকবে ভেবেছেন? ওখানকার হাল আমলের গণ-উপদেবতারা যে কী ধরণের চিজ তা তো আর চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হয়নি আপনার। দেখলে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যেতো। আজ্ঞে হ্যাঁ। পিতামহ প্রজাপতির ঠাকুর্দা এক-একটি। তাঁরা সব অনাগতদের অপেক্ষায় কড়া চাঁড়িয়ে তৈরী হয়েই বসে আছেন। আপনি ভূমিষ্ট হওয়ামাত্রই আপনার দেহ-মন আত্মাকে তাল গোল পাকিয়ে তাতিয়ে গালিয়ে নয়া ছাঁচে ফেলেই ঢালাই করে নেবেন। সেই সঙ্গে আপনার সেকেলে ধড়াচুড়ো ইত্যাদি ছাড়িয়ে আপনাকে চোঙা প্যান্ট নয়ত বালিশের খোল পরিয়ে রীতিমত কিটকাট আর ফ্যাসানদুরস্তও করে ছাড়বেন। শঙ্খ-চক্র—গদা পদ্মধারী আপনি। আপনার চোঙাপ্যান্ট পরা ঢালাই করা শ্রীমূর্তিটা কিরকম দাঁড়াবে—তা একবার ধ্যানস্থ হয়ে ভাবুন দেখি? আর ভাববেনই বা কি? তখন আর আয়নার নিজের শ্রীমুখ দেখে পাত্তা করতেই পারবেন না যে, আপনিই এককালে খোদ বৈকুণ্ঠেশ্বর ছিলেন।

বিস্ময়ঘন দৃষ্টি তুলে বৈকুণ্ঠেশ্বর বললেন—আমি খোদ শ্রীভগবান। আমাকেও তালগোল পাকিয়ে তাতিয়ে গালিয়ে ঢালাই করে কিম্ভূতকিমাকার করে ছাড়বে। বলেন কি দেবর্ষি?

দেবর্ষি বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। দেহের ছিরিছাঁদের কথা পরে ভাববেন। খোদ পরমাত্মা তো আপনি? এই ঢালাইয়ের মহিমায় আপনার শ্রীআত্মার পরকালটিও যে কিভাবে ঝরঝরে হয়ে যাবে —তা আপনি আদৌ ধারণা করতে পারবেন ভেবেছেন?—আগে ধীরেসুস্থে সব শুনুন। ব্যাপারটা আগাগোড়া হৃদয়ঙ্গম করুন। তারপর বিবেচনামত কাজ করবেন। হুট বলতেই—এ বয়েসে অমন করে নাটকীয় ঢঙে তেড়েফুঁড়ে লাফ দিতে যাবেন না।

শ্রীভগবান যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন। সুযোগ বুঝে দেবর্ষি বললেন শুধু ঢালাই হলেই রেহাই পাবেন ভেবেছেন? হরে রাম! ছাঁচ থেকে শুধু বেরুবার ওয়াস্তা। তারপর নাগাড়ে প্রগতির ঠেলা খেতে খেতেও আপনাকে পদে পদে নাস্তানাবুদ হতে হবে। তাছাড়া—যুগধর্ম কি যুগলীলা—এসব বোঝেন? আর বুঝবেনই বা কি করে? কতকাল মর্ত্যে নামেন নি বলুন তো? এ আর আপনার সেই সেকেলে গোষ্ঠলীলা কি গোবর্দ্ধণলীলা নয়। এ যাকে বলে যুগলীলা। একে হুজুগলীলাও বলতে পারেন। এ শুধু মাতায় না—রীতিমত উন্মত্তও করে তোলে। আজ্ঞে হ্যাঁ। ফুটবল-ক্রিকেট, সিনেমা-জলসা, রেস-জুয়া, কালাবাজার-চোরাকারবার, ব্যালেনাচ-টুইষ্টনাচ—এ সবের নাম শুনেছেন আপনি? 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ,' 'যুগযুগ জিও,' 'লাল সেলাম'—এ ধরণের কান ফাটানো, দিলদমানো আর পিলে চমকানো আওয়াজ আপনার দরবারে যা দিয়েছে কখনো?

বিস্মিত বৈকুণ্ঠেশ্বর শুধু বললেন—ওসব আবার কি?

দেবর্ষি বললেন—ওসবই হচ্ছে এখানকার যুগলীলা—যুগধর্মও বলতে পারেন। ওই চুলোর জায়গায় গিয়ে ভূমিষ্ঠ হলেই আপনাকেও বিশ্বসংসার ভুলে যে কোন একটা যুগলীলায় মাততেই হবে। আজ্ঞে না—কোন রকমেই রেহাই পাবেন না।

শ্রীভগবান বিস্ময়ে শুধু বললেন—বলেন কি!

দেবর্ষি বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু, একবর্ণও মিথ্যে বলছি না। হরেক রকমের লীলা। কোন লীলার কবলে পড়বেন—কে জানে। যদি ফুটবল-ক্রিকেটের লীলাভূত ঘাড়ে চাপে—তা হ'লে জানবেন—আপনার বরাত ভালো।—পুণ্যের জোর আছে। ফুটবলে আপনার ওই উদার পদপল্লব না ছুঁইয়েই—কি ব্যাট-উইকেটে কস্মিনকালেও শ্রীকরকমল না ঠেকিয়েই আপনি খাঁটি ক্রীড়াবিশেষজ্ঞ বনে যেতে পারবেন। তামাম দুনিয়ার খেলোয়াড়দের নাম-ধাম, গোষ্ঠী-গোত্র, তাদের হাঁড়িকুঁড়ির খবর ইত্যাদি সবকিছুই তখন আপনার নখদর্পণে ঝকঝক করতে থাকবে। আপনার নাওয়া-খাওয়া ইত্যাদির কোন রকম বালাই থাকবে না আর তখন। রকে বসে, পথের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে খেলোয়াড়দের গাজন গাইতে গাইতে নয়ত খেলার ব্যাপার নিয়ে তরজা লড়তে লড়তেই আপনার দিনরাতগুলো দিব্যি কাবার হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে আপনার বড় সাধের জীবন যৌবনও গড় গড় করে অস্তাচলের দিকে ঢলে পড়বে। ফলে, আপনার মর্ত্যে অবতরণ করার সব উদ্দেশ্যই তণ্ডুল হয়ে যাবে প্রভু।

বিস্মিতকণ্ঠে শ্রীভগবান শুধু বললেন তাই নাকি!

দেবর্ষি বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। এ ছাড়া সিনেমা রয়েছে। উর্বশী-মেনকা-রম্ভাদের খাস-বাহিন গোছের গণ্ডা গণ্ডা সিনেমাদেবীরা রয়েছেন। আর সিনেমামার্কা হাজারহাজার চুটকী গানও রয়েছে। এসবও যুগলীলারই অঙ্গ। ওই হতচ্ছাড়া জায়গায় গিয়ে জন্মালে—ওই সিনেমালীলাও প্রেতিনীর মত আপনার ঘাড়ে ভর করবেই। রেহাই পাবেন না কোনমতেই। চুটকী গান গাইতে গাইতে আর সিনেমালক্ষ্মীদের শ্রীমূর্তি ধ্যান করতে করতেই হয়ত আপনার গোটা ইহজীবনটাই বেমালুম ফুঁকে যাবে। সেই সঙ্গে আপনার মর্ত্যে নামার মহান উদ্দেশ্যেরও গঙ্গাযাত্রা হয়ে যাবে। তা ছাড়া, আপনি তো আর খবর রাখেন না প্রভু। সিনেমার স্টুডিওগুলোই এখন মর্তের মহাস্বর্গ হয়ে উঠেছে। আজ্ঞে হ্যাঁ। সেখানে একবার পদার্পণ করলে আপনার এই সাধের গোলকধামকেও এঁদোপড়া বাদাড় বলে মনে হবে। ওই মহাস্বর্গে টিকি গলাবার জন্মে আপনাকেও হয়ত তখন ক্যাপা কুকুরের মত হন্যে হয়ে ঘুরে মরতে হবে। আর কোনরকমে একবার স্টুডিও-স্বর্গে যদি মাথা গলাতে পারেন—তাহ'লে আপনার আর বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব কি পদার্থ থাকবে ভেবেছেন? আপনাকে আর কস্মিনকালেও পৈতৃক হাড়কখানি নিয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরতে হবে না। সিনেমা-দেবীরাই আপনার হাড়মাস চিবিয়ে খেয়ে শেষ করে দেবে। চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে। যথাসর্বস্ব খুইয়ে নিতান্ত হাবরে অবস্থায় যদি কোন দিন বৈকুণ্ঠে ফেরেন—সম্পূর্ণ নিরাকার আর নিরবয়ব অবস্থাতেই ফিরতে হবে। চিনতে না পেরে—বৈকুণ্ঠেশ্বরীও হয়ত তখন ঝাঁটা মেরে বিদায় করে দেবেন আপনাকে।

দম নেবার জন্যে দেবর্ষি থামলেন একটু। শ্রীভগবানের মুখেচোখে কেমন যেন একটু বিমূঢ়-বিমুগ্ধগোছের ভাব। বুড়ো বয়েসে হ্যাংলামি একটু বাড়েই। কেঁচে অগণ্ড অর্বাচীন হবারও সাধ হয়। তলেতলে শ্রীভগবানের যেন সেই ধরণের দশা হল। আগ্রহব্যাকুলকণ্ঠে তিনি শুধু বললেন—তাই নাকি?

দেবর্ষির মুখ থেকে আবার কথামৃত ঝরতে শুরু হল। তিনি আবার বলতে লাগলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। এছাড়া রাজনীতি রয়েছে। সব রকম লীলার ব্যামোকে এড়াতে পারলেও এ কিন্তু রাজরোগের মত আপনাকে পেয়ে বসবেই। বাঁজরা করেও ছাড়বে। হরেক রকমের রাজনৈতিক মতবাদ। কাকে রেখে

কাকে ফেলবেন? নানান মতবাদ আপনার মগজে নাগাড়ে তাণ্ডব মারতে থাকবে। স্বদেশ, স্বজাতি-স্বজন স্বধর্ম—মায়পিতৃ-পরিচয় পর্যন্ত সব ভুল-ভণ্ডুল হয়ে যাবে। পার্টির লাগাম পরে তখন আপনাকে হরদম দোড়ঝাঁপ করতে করতে হাঁপিয়ে মরতে হবে। আজ্ঞে হ্যাঁ, এইভাবেই আপনার গোটা ইহকালটাই বরবাদ হয়ে যাবে প্রভু। তাছাড়া -সভায় সভায় নাচন কোঁদন দেখাও রে—চোঙা ফুঁকে ফুঁকে অপোগণ্ড ক্যাপাওরে—পার্টির কেত্তন গাওরে—সে সব কি কম ঝঞ্ঝাট! না করতে পারলেই প্রগতিবিরোধী জবদব বলে ফসিলের দলে ফেলে আপনাকে ভাগাড়ে পাঠিয়ে দেবে। তবে, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যদি দলের বা পার্টির চাঁই হতে পারেন কোনরকমে—তাহ'লে অবশ্য দুদিনেই আপনার কপাল ফিরে যাবে। চালচুলোহীন অবস্থায় জন্মালেও—ভবিষ্যতের জন্যে আর মোটেই ভাবতে হবে না আপনাকে। গদি-চাঁদি-বাড়ি-গাড়ি—এসব তো আপসে জুটবেই; উপরন্তু আপনার সাতপুরুষের আখের গুছিয়ে নেবার মত রেস্তও পাহাড়প্রমাণ হয়ে জমে উঠবে। তা ছাড়া ঢাক পেটানোর মহিমায় রাতারাতি দেশবরেণ্যও হয়ে উঠতে পারবেন। ঘটা-ছটা করে আপনার নামে তখন ইস্কুল পাঠশালা রাস্তা-ঘাট মায় গ্রাম নগর কারখানা ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে। এক কথায়—যাকে বলে চতুর্বর্গ ফল—তাই আপনার মুঠোর মধ্যে এসে হাজির হবে। তখন কোথায় থাকবে আপনার মর্ত্যে নামার উদ্দেশ্য—কোথায় বা থাকবে আপনার মহা মহা সংকল্প। সব কিছুই তখন শিকেয় উঠে যাবে প্রভু। ওই গদি-চাঁদি ইত্যাদির মায়া কাটিয়ে আর কোনদিন বৈকুণ্ঠে ফিরতে পারবেন বলে তো ভরসা হয় না। কষ্টেসৃষ্টে কোন রকমে ফিরতেও পারেন যদি, তা হ'লে আপনার চাকচকানো চেহারা পেল্লায় ভুঁড়ি আর ঐশ্বর্যের বহর দেখে দেবতাদেরতো মাথা ঘুরে যাবেই—উপরন্তু বৈকুণ্ঠবাসীরও চোখজোড়া বিস্ময়ে কপালে উঠে যাবে।

শ্রীভগবান উসখুস করতে লাগলেন। বিস্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে বৈকুণ্ঠেশ্বরের মুখেচোখে যেন একটু মাদকতার ভাব ফুটে উঠল। আবেগবিহ্বল কণ্ঠে বললেন—রাম না জন্মাতেই এ যে রামায়ণের ফিরিস্তি দিতে শুরু করলেন দেবর্ষি। যাই হোক—একবার মতিস্থির করেছি বেকালে—আর নড়চড় করবো না। দেরী করেও লাভ নেই আর। আমি এই মুহূর্তেই মর্ত্যে নামবো আর ওই জম্বুদ্বীপেই জন্মাব। নানান ফিরিস্তি শুনিয়ে বুড়ো বয়েসের এ উত্তমটুকুকে আর দমিয়ে দিও না দেবর্ষি।

দেরি সইল না আর। শ্রীভগবান সেই মুহূর্তেই মহাশূন্যচিরে তীব্রবেগে মর্ত্যের দিকে নামতে শুরু করলেন। মাঝপথে কিন্তু বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল। মর্ত্যের আকাশে তখন হাইড্রোজেন বোমা ফাটানোর পরীক্ষা চলছিল। শূন্যপথে ঠিক বিস্ফোরণ মুহূর্তেই হাইড্রোজেন বোমার সঙ্গে পরমাত্মার মহাসংঘর্ষ ঘটে গেল। ফলে শ্রীভগবানের শ্রীআত্মার অস্তিত্ব আর আস্ত রইল না। পরমাত্মার সাড়ে নিরেনব্বইপার্সেন্ট অস্তিত্ব বাষ্প হয়ে মহাকাশেই মিলিয়ে গেল। বাকি আধপার্সেন্ট রেণু-রেণু হয়ে অর্থাৎ নিখচভাবে গুঁড়িয়ে গিয়ে রেডিও-এ্যাকটিভ ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে মর্ত্যের আকাশে আকাশে ভেসে বেড়াতে লাগল।

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। প্লক্ষ—শাল্মলি—কুশ—ক্রৌঞ্চ—শাক—পুষ্কর—এক এক মহাদ্বীপের আকাশের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে শেষে জম্বুদ্বীপের মাথার উপরে এসে পরমাত্মার চূর্ণবিচূর্ণ অস্তিত্বগুলো হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। জায়গায় জায়গায় আকাশ জুড়ে তখন ঘনবর্ষার ঘনঘটা শুরু হয়েছে। প্রবল ধারাবর্ষণ চলেছে জম্বুদ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলটায়। মেঘের সঙ্গে—বৃষ্টির সঙ্গে মিশে পরমাত্মার গুঁড়ো গুঁড়ো অস্তিত্ব শেষটায় ভূপৃষ্ঠে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল।

মুহূর্তখানেক পরে—অর্থাৎ মর্ত্যের কয়েক বছর পরে শ্রীভগবানের লীলাখেলা প্রত্যক্ষ করবার জন্ত দেবর্ষিও জম্বুদ্বীপে নামলেন। নেমেই যথারীতি ঢেঁকিতে

চড়ে পরিভ্রমনে বেরুলেন উনি। রম্যক—হিরণ্ময়—কুরু—হরিবর্ষ—কিম্পুরুষ—কেতুমাল—ভদ্রাশ্ব— একে একে জম্বুদ্বীপের সব জায়গাই চুঁড়ে ফেললেন। কিন্তু হায়! কোথায় শ্রীভগবানের অস্তিত্ব! শেষে ভারত নামক বর্ষের পূর্বাঞ্চলে সুপ্রাচীন বঙ্গভূমির একপ্রান্তে এসে হাজির হলেন। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন দেবর্ষি।—ব্যাপার কি! ঘরে-ঘরে, দাওয়ায়-দাওয়ায় রকে-রকে, হাটে-মাঠে-বাটে সব জায়গাতেই কাঁড়ি কাঁড়ি অবতার গিজগিজ কিলবিল করছে। হাজার হাজার কি লাখ লাখ নয়—কোটি কোটি অবতার। কত দিকে আর চোখ ফেরাবেন দেবর্ষি। যেখানেই যান—সেখানেই দেখেন—পুরোদমে অবতারদের লীলা শুরু হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে উঠতি বয়েসের অবতারপুঙ্গবরা মহাআস্ফালন করে দিব্যি মস্তানি করে বেড়াচ্ছেন। অনেকে আবার ঠোঁট টিপে সিটি দিয়ে দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইস্কুলগামিনী চতুর্দশী পঞ্চদশীদের হৃদয় নিবেদন করতে ব্যস্ত। সিনেমা আর ফুটবল ক্রিকেটের টিকিটের আশায় লাখ লাখ অবতার নাওয়া-খাওয়া ভুলে বুকিং অফিসের সামনে সামনে সার বেঁধে বেঁধে দাঁড়িয়ে ঠায় ধর্ণা দিয়ে চলেছেন। অবতার মহাত্মারা বিশ্বসংসার ভুলে চোরাকারবারেও মেতেছেন। গণ্ডা গণ্ডা অবতার নির্বিকার চিত্তে ব্লাডার ভর্তি চোলাই মদ বহে বেড়াচ্ছেন। হাজার হাজার অবতার চালের পোঁটলা মাথায় নিয়ে মহা উৎসাহভরে নিষিদ্ধ এলাকায় চাল এনে এনে হাজির করছেন। তাজ্জব ব্যাপার! অবতার মহাত্মারা ওয়াগন ভাঙার কাজেও দিব্যি হাত পাকিয়েছেন। বেপরোয়া অবতাররা দল বেঁধে বেঁধে প্রকাশ্য দিবালোকেই ওয়াগন ভাঙছেন—চোরাই মালও পাচার করছেন। অবতার মহাত্মারা করছেন না কি! পার্টি-মার্কা অবতাররা দেওয়ালে দেওয়ালে যে যাঁর পার্টির পোষ্টার সাঁটতে ব্যস্ত। আলকাতরা আর তুলি নিয়ে হরেকরকমের স্লোগান লিখতে লিখতে আর প্রতিকৃতি আঁকতে আঁকতে হায়রান হয়ে যাচ্ছেন অবতার বেচারীরা। দেখলে সত্যিই মায়া হয়। পড়ুয়া অবতাররাও রীতিমত লীলামত্ত হয়ে উঠেছেন। ভূত-ভবিষ্যৎ ভুলে পূর্ব সুরীদের মুণ্ডপাত করবার মহাব্রতে রত হয়েছেন তাঁরা। মহাউল্লাসভরে মহাজনদের মুখে চুণকালি দিচ্ছেন—তাঁদের মূর্ত্তি ভাঙছেন—প্রতিকৃতিও পোড়াচ্ছেন। এছাড়া আগুন জ্বালিয়ে—বোমা ফাটিয়ে আর ছোরাছুরি চালিয়ে বিদ্যাস্থানগুলোতেও দক্ষযজ্ঞ শুরু করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে শিক্ষা-গুরুদেরও আক্কেল গুড়ুম করে ছাড়ছেন।

কতদিকে আর চোখ ফেরাবেন উনি। হঠাৎ দেবর্ষির দিল দমিয়ে দিয়ে পট্‌কা-বোমা-পাইপগান ইত্যাদির ঐকতান শুরু হল। রামশিঙেও বেজে উঠল। ইট-পাটকেল, ছুরি-ছোরা, লাঠি-সড়কি, সোডার বোতল—এ্যাসিড্, বাল্ব্ ইত্যাদি সবরকম হাতিয়ার নিয়ে সংগে সংগে অবতারদের দু'দলের মধ্যে কুরুক্ষেত্র বেধে গেল।

ব্যাপার বেশ সুবিধের নয় দেখে দেবর্ষি কোন রকমে পৈতৃক প্রাণটুকু নিয়ে সরে পড়লেন। শুধু ঘটনাস্থল থেকেই সরে পড়লেন না।—'হায় হায়—শ্রীভগবানের কী দশা হ'ল'—ইত্যাদি বলে কপাল চাপড়ে নানাভাবে আক্ষেপ করতে করতে উনি অবতারমহাত্মাদের লীলাভূমি থেকে চিরকালের মত কেটে পড়লেন।

উপন্যাস

জন্ম-জন্মান্তর

রামপদ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তার পরেই ঝড় উঠল আকাশ জুড়ে, ঝড় নামল পৃথিবীতে—তার সংসারের ক্ষুদ্র পরিধি তছনছ হবার উপক্রম, স্থানীয় ডাক্তারের চিকিৎসায় কোন ফল হল না—রাজধানীতে এনে বড় চিকিৎসক দেখানো হ'ল। তাঁরাও সুবিধা করতে পারলেন না। মাস দুই রইলো—জেলা শহরের হাসপাতাল, সেখানেও এক অবস্থা। রাজধানীর সব চেয়ে বড় হাসপাতালে কাটলো চার মাস, তথৈবচ, অর্থে সামর্থ্যে মহেশ এখন সর্বস্বান্ত বিধ্বস্ত প্রায়। আরও অর্থ চাই, ধৈর্য্য চাই লোকবল চাই। কেনা জমিটা বিক্রি করে দিল—কিছু অর্থের সংস্থান হল, বন্ধুরা সাধ্যমত করল—অসীম মনোবলে বিপদের সঙ্গে লড়াই করে চলল মহেশ। কিন্তু কার বিরুদ্ধে লড়াই? একটানা গোপন চক্রান্তের—না দৈবের যোগ সাজস? যাই হোক—শেষ পর্য্যন্ত লড়াই তাকে করতেই হবে।

এলাহাবাদের জমিটা যখন গেল—বাসাটা রেখেই বা কি লাভ? সংসার প্রতিষ্ঠার আশা তখন আকাশ-কুসুমবৎ। আর কোনদিন ফিরবে না এলাহাবাদ—সুতরাং ও পাঠ তুলে দেওয়াই ভাল। রমেনকে বলল, বাসাটা ছেড়েই দেব ঠিক করলাম—মিছে ভাড়া টেনে মরি কেন?

রমেন বলল, চিকিৎসার তো কসুর করছ না, দৈব-দৈব ত মান- সেদিক দিয়ে কোন চেষ্টা করেছ কি?

মহেশ ম্লান হেসে বলল, দৈবের হাতে মার খাচ্ছি ভাই। দেবীর কোপেই এমন হচ্ছে।

কি রকম?

গত অম্বুবাচীতে কামাখ্যাধামে গিয়েছিলাম—জানই তো দেবীর প্রসাদী বস্ত্র খণ্ড মাদুলিতে পুরে ধারণ করতে পাঠিয়েছিলাম তোমার বৌদিকে—উনি সেটা অনাদর করে ফেলে দিয়েছেন, আমার ধারনা—এযাবৎ যা ঘটেছে তা দৈবেরই কোপ।

রমেন বলল, তাহলে ভাই, দৈবেরই শরণাপন্ন হও।

আমার সাধ্যমত করেছি—

তোমার সাধ্য তো বটেই অন্য গুণীর সন্ধানও কর। শুনেছি তাঁদের অনেক ক্ষমতা।

একটু থেমে রমেন বলল, একটা কথা বলব ভাই—কিছু মনে করো না, তোমার শ্বশুর বাড়ীর ফ্যামিলিটি মানে তোমার দুই অগ্রজ শ্যালক পাকা স্কাউণ্ড্রেল। আর বেয়াইটিও রাম ঘুঘু হেন কাজ নেই যা ওরা করে না। একদিন ওরা রেষ্টুরেন্টে বসে পরামর্শ করছিল—কিডগঞ্জের ফকির সাহেবকে দিয়ে কি নাকি মারণ উচারণ করছে।

তুমি শুনেছ?

আমি নয়—অরুণ সেই রেষ্টুরেন্টে চা খেতে খেতে শুনেছিল। আমায় এসে বলল, দাদা—আপনাদের রেল অফিসে কে নাকি মহেশ ভট্টাচার্য্য আছে—তার বিরুদ্ধে কালো রুটি আর কালো সাদা মিলে এই এই পরামর্শ করছিল। ওরা নাকি ফকির সাহেবকে দিয়ে মারণ যজ্ঞ করবে। দুজনেই কালো বাজারী তো—শহরের সবাই ওদের ওই টাইটেলে চিহ্নিত করে রেখেছে।

মহেশ বলল, এই খবরটা এতদিন আমাকে জানাও নি তো?

রমেন বলল, সত্যি বলতে কি—ওই মারণ টারণ আমি বিশ্বাস করিনি, দৈবটৈবও নয়। তবে তোমার কেসটায় ডাক্তাররা যখন কুলকিনারা পাচ্ছেন না—তখনই সন্দেহ হল—এমন ধারা কিছু নয় তো! তাই বললাম। এখনও যে খুব বিশ্বাস নিয়ে বলছি—তা নয়—তবে হলেও হতে পারে তো।

মহেশ ভাবতে লাগল।

রমেশ বলল, চল আমিও তোমার সঙ্গে কিডগঞ্জে যাচ্ছি, দেখে আসি গুণীন ফকির সাহেবকে।

তুমি তো বিশ্বাস কর না।

তা বলে কৌতূহল মেটাব না! জগতের মহাকবি বলেছেন—'দেয়ার আর মোর থিংস হুইচ ইয়োর ফিলজফি নেভার ড্রেমট অফ' চল ফকির সাহেবের আস্তানায় ঢু মেরে আসা যাক।

* * *

আস্তানা দেখলে মনে হয় না ফকির সাহেব গুণী লোক, কিডগঞ্জের, শেষ প্রান্তে—তেমাথা রাস্তার মোড় থেকে কেল্লার ময়দান সুরু হয়েছে; ত্রিবেনী রোডের দিকে বড় পেয়ারা বাগান—শেষ হয়েছে মিন্টো পার্কের সীমানায়, আর সব জমি কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। তার কিছু অংশ মিলিটারির দখলে—কিছুটার দপ্তর। সমস্ত জমিটা—সামরিক আইনের আওতায়—জন বসতি নিষিদ্ধ। পেয়ারা বাগান যে ধার থেকে সুরু হয়েছে—মোড়ের ডান ধারে প্রকাণ্ড একটি নিম-গাছ। বহু পুরাতন গাছ—হয়তো কেল্লার সমবয়সী—বাদশাহী শাসনের অনেক প্রমাণ পত্র ওর কাণ্ডে, ত্বকে আঁকা আছে। কাণ্ডময় মোটা মোটা পুরু ছাল—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্বুদ আর কয়েকটি গভীর গহ্বর। দুটি মানুষ চার হাতের বেড় দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারেনা তার দেহ। সেই গাছের তলাটায় মাটি উঁচু করে গাঁথা একটি বেদী। সেটার খানিকটা বাঁশ বাখারি ছেঁড়া চট ও নেকড়া দিয়ে ঘেরা—খানিকটা খোলা। গাছের গহ্বরে হাতের লাগানো ছেঁড়া কাঁথা, মগ, হাঁড়ি কুঁড়ি প্রভৃতিতে একটি অস্থায়ী সংসারের আদল চোখে পড়ে। লাল নীল, হলুদ, জরদ রঙের নানা কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরী ফকির সাহেবের আলখাল্লাটা নিমগাছের একটা নীচু ডালে মেলে দেওয়া—গাছ তলায় অত্যন্ত মলিনবেশী ছেঁড়া জামা গায়ে উসকো খুসকো চুল আধ পাগলাটে ধরণের মানুষ - উবু হয়ে বসে বিড় বিড় করে কি যেন বকছে। তার সামনে মাটির পাত্রে কাঠ কয়লার আগুন জ্বলছে —পাশে নারকেলের মালায় রয়েছে লাবান। ফকির সাহেব বিড় বিড় করে বকছে—আর মাঝে মাঝে তিন আঙুলে এক এক চিমটি লাবান উঠিয়ে আগুনে ফেলছে। আগুন অল্পক্ষণের জন্যে উজ্জ্বল হচ্ছে—গন্ধ বার হচ্ছে। সেখানে মানুষ জন কেউ ছিল না।

মহেশ আর রমেন সেলাম করে দাঁড়াল সামনে।

ফকির সাহেব ভ্রু কুচকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ক্যা চাহতে হো?

আপকী দয়া দু'হাত জোড় করে মহেশ বলল।

মৈঁ ক্যা কর সকতা হুঁ? আল্লা সে দুয়া করো। ফকিরের স্বরে বিদায়ের ইশারা।

মহেশ বুঝেও ভ্রুক্ষেপ করল না বেদির সামনে চেপে বসল—বলল, আপ হি মেরে আল্লাহ হৈঁ। আপকী দয়াহী খোদা কী মেহের বাণী হোগী।

কিছুক্ষণ চোখবুজে থেকে ফকীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, দাওয়াই চাহতে হো? তুমহারী বিবি তকলীফ পা-রহী হৈ। কিসী মর্জমে মবতিলা হৈ। রহী ন?

মহেশ বলল, জী হাঁ বিবিকে লিয়েহী আয়া হুঁ।

অল্প হেসে মাথা নাড়লেন ফকির সাহেব, সবকো রহী এক খাস সিকায়ত হৈ। বিবিওকে ওয়াস্তেহী উনহেঁ পরেশানী ঔর তকলীফ।

মহেশ কাতর কণ্ঠে বলল অগর ইজাজত হো তো মৈঁ অপনী পরেশানী ব্যান করুঁ।

ফকির সাহেব মাথা নাড়লেন। মহেশের দুঃখের কাহিনী শোনার অবসর তাঁর নাই। বললেন, বুঝে

খুবসুরত হী কঁহা? দেখতে-নহী, এক অহম কাম মেঁ মশগুল হুঁ। এক জালিম কা সারেজা করণে কা ওয়াদা কিয়া। ইস জালিস নে অপনী বিবিকো তলাক দেকর দুসরে ঔরাতপর মোহব্বাত কা ফান্দা ডালা হৈ। উসে সাজা দেনা জরুরী হৈ।

অবাক হল মহেশ, কাকে শাস্তি দিতে চান ফকির সাহেব? কে সেই দুশমন—যে নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে আর একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম সুরু করেছে? যাই হোক—তেমন কাজ কেউ যদি করেই থাকে-তাতে সংসার-চিন্তামুক্ত ফকির সাহেবের কেন মাথাব্যথা? তার মারণযজ্ঞে উনি কেন আহুতি দেবেন।

বেদনা বোধ করল মহেশ। ক্ষুব্ধ হল। বলল, ক্ষমা কীজিয়ে। আপ দরবেশ ঠরবেঁ। খোদাকা নাম লেনাহী আপকা কাম হৈ। আপ ক্যোঁ ঐসে গন্দে কামোমে হাথ ডালেঙ্গে। ঐসে কীচড়ো মেঁ ক্যা ফঁসনা চাহেঙ্গে।

ফকীর সাহেব চক্ষু রক্তবর্ণ করে বললেন, ক্যা ফরমায়া? কীচড় কী ক্যা বাত কহতে হো?

মহেশ বুঝল কাদা ঘাঁটার কথা বলাতে ফকির সাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। উনি ক্রুদ্ধ হলে সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে সবিনয় বলল, জী নহী, বুরা ন মানিয়ে। আপ কাফি পৌঁহছে হয়ে হৈঁ। আপমে খোদাকা নুর মৌজুত হৈ। ঐসে কীচড়ো মে ফসনা ক্যা আপকো শোভা দেগা?

ফকির সাহেব প্রসন্ন হলেন। মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, তুমনে ঠিকহী কহা। লেকিন য়হ কাম তো বুরা নহী হৈ। কিসীকা ফায়দাহী হোগা, হালা কী ঔর কীসীকো সজা মিলে গী। আখিরমে দোনো কোহী ফায়দা পহুঁচে গা।

ফকিরের যুক্তিটা মন্দ নয়। একজনকে সাজা দিলে আর একজনের উপকার হয়। মন্দ লোককে সাজা না দিলে তার লোক কষ্ট পাবে—এ আর কে না জানে! শেষ পর্যন্ত উভয়েই অর্থাৎ সমাজ উপকৃত হয়। কিন্তু সেই মন্দ ব্যক্তিটি কে?

কৌতূহল দমন করতে না পেরে রমেন জিজ্ঞাসা করল, কৌন হৈ য়হ দুশমন, ক্যা হৈ ইসকা নাম, জান সকতা হুঁ?

ফকির সাহেব সহসা উত্তর দিলেন না। ধুনীর পানে চেয়ে বেশ খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর মোটামুটি ব্যাপারটা খুলে বললেন। নামটাও প্রকাশ করে শেষে যোগ করলেন, অগর ইসকার কাবু হাসিল ন কর সকা তো মৈঁ ইসে খতম হী কর দুংগা।

মহেশ ও রমেন পরস্পরের পানে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। মহেশের ভ্রূকুঞ্চিত হল, রমেনের মুখ গম্ভীর হল। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে রমেন কি যেন বলতে গেল—মহেশ ওর কাঁধে ডান হাতের চাপ দিয়ে নিবৃত্ত করল। তারপর ফকির সাহেবের পানে চেয়ে স্থির স্বরে বলল, আপনে জিস জালিস কো সাজা করনে কে লিয়ে ধুনী জ্বালায় মৈ ওয়হী আদমী হুঁ।

ভীষণ ভাবে চমকে উঠলেন ফকির সাহেব। বললেন, সচ? ক্যা য়হ সচ্ হৈ? লাফিয়ে পড়ে ছুটলেন পেয়ারা বাগানের দিকে। দেখতে দেখতে পেয়ারা বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হলেন ফকির সাহেব। রমেন বলল, উঃ—কি সাংঘাতিক ব্যপার। এখন কি করবে?

মহেশ বলল, আর ডাক্তারী চিকিৎসা নয়—রোগের নিদান যখন জানা গেছে—সেইমত ব্যবস্থা হবে।

কি করবে?

আমার সাধ্যমত—শাস্ত্রীয় চিকিৎসা। ভাল ব্রাহ্মণ দিয়ে চণ্ডীপাঠ—হোম—প্রার্থনা। যদি ভাল হয়—এতেই হবে নচেৎ 'নিয়তে কেন বাধ্যতে'। বলে কপালে তর্জনী ঠেকিয়ে ম্লান হাসল।

* * *

আত্মীয় লিখেছে শেষ ব্যবস্থা হিসাবে চণ্ডী পাঠের আয়োজন করল মহেশ। ওর পূজা পাঠের ব্যবস্থা হল। পাঠের জন্ত আমাদের জানা শোনা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রী মশায়কে নিলাম। উনি পুরোহিত বটে, পাণ্ডিত্যও আছে। আজকালকার তথাকথিত ফুল কেলা ও চাল

কলা বাঁধা বামুন নয়। রীতিমত ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করেন প্রাণায়াম আসনমুদ্রার অভ্যাস আছে—পণ্ডিত সভায় বসে শাস্ত্রমতে সৃষ্টি বা ঈশতত্ত্ব—সম্বন্ধে আলোচনা করার ক্ষমতাও রাখেন। বিশুদ্ধ ওঁর দেব ভাষা উচ্চারণ—ব্যাখ্যা পাঠ তোতা বুলি কপচানো নয়—বাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে শ্রোতার মনে তার অর্থ বোধ সঞ্চারিত করেন। ওঁকেই আমরা নির্বাচন করলাম চণ্ডী পাঠের জন্ত। আমি হলাম তন্ত্রধারক—মহেশ উত্তোক্তা যাবতীয় আয়োজন উপচারের কর্তা উপরন্তু যতক্ষন পাঠ চলবে—ও দেবীস্তোত্র পাঠ করবে—মনে মনে—সর্বান্তঃকরণ দিয়ে আহবান জানাবে—জপ করবে ইষ্টমন্ত্র। নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারার মত চলবে পাঠ ঐকান্তিক আরোগ্য কামনা—দেবীর প্রসাদ ভিক্ষা।

যথাকালে আমাদের চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হল।

কিন্তু আরম্ভেই বিঘ্ন। শাস্ত্রীমশায় পূজাটুকু সেরে পুঁথি খুলেই চুপ।

কি হল শাস্ত্রী মশাই—এইবার পাঠ আরম্ভ করুন।

শাস্ত্রী মশাই পাঠ করতে গেলেন গলা দিয়ে স্বর ফুটলো না—একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বার হল শুধু। ইসারা করে বললেন, চোয়াল আটকে গেছে—কোনমতেই স্বর ফুটছে না।

বার বার চেষ্টা করলেন—স্বর ফুটলো না। শাস্ত্রী মশায় কোনমতে প্রণাম সেরে আসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন।

দ্বিতীয় দিনেও প্রায় ওই রকম অবস্থা। আজ যথারীতি গলার তোয়াজ করে গায়ত্রী জপ সেরে আসনে বসেছেন, কিন্তু অর্গলা ও কীলক স্তোত্র দুটি পাঠের পর প্রবল কয়েকটি হাঁচি বাধা জন্মাল। হাঁচতে হাঁচতে ওঁর চোখমুখ লাল হয়ে উঠল,—নাক চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো পাঠ আরম্ভ করবেন কি—ভারি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এদিকে পুঁথি খুলে তন্ত্রধারকের কাজ করবার চেষ্টা করছি আমি—হঠাৎ কোঁচার খুঁটে টান পাড়লো। চেয়ে দেখি সেখানটা ছিট ছিট রক্তের দাগ—কে যেন পিচকারিতে খুনখারাবী রং গুলে হোলী খেলে গেল এই মাত্র। ওদিকে মহেশ চোখ কপালে তুলে গোঁ গোঁ করছে। গোঁ গোঁ-করছে আর অস্পষ্ট বিড় বিড় করে বকছে বকুনির অর্থ ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে।

তোরা এসব করছিস কেন? এ কি ছেলেখেলা? পুজোর উত্তোগ আয়োজন নেই—রক্তজবা বেলপাতা অর্ঘ্য যোগাড় করলি যে—নৈবেদ্য দিলিনে—শুধু শুধু পুজো। এমন পুজো আমি নেব না—নেব না—নেব না।

দারুন মাথা নাড়তে লাগল—চক্ষু তো রক্তবর্ণ। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। আসন ছেড়ে উঠে—ওকে চেতন করাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে অনেক কষ্টে ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন ভাবটা কাটল ওর; সেদিন আর চণ্ডীপাঠ হল না।

মহেশ কিন্তু নাছোড়বান্দা—চণ্ডীপাঠ করাবেই। তৃতীয় দিনে যথারীতি ফুল বেলপাতা নৈবেদ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হল। আমরা স্নান সেরে শুদ্ধাচারে পট্টবস্ত্র পরে ভূত শুদ্ধি আসন শুদ্ধি ইত্যাদির পর দেবীর প্রসন্নতা লাভের জন্ত পাঠ আরম্ভ করলাম। এদিন কোন বাধা এলো না। পণ্ডিত মশাই পূর্ণ কণ্ঠে পাঠ করলেন—মহেশ সারাক্ষণ জপে তন্ময়চিত্ত রইলো—আমিও আমার কাজটি করে গেলাম। সবই শাস্ত্রচার মাফিক হল—তবু মন ভরল না। প্রথম দুদিনের বাধা মনের খুঁত খুঁতুনিটুকু কিছুতেই মুছতে দিল না। যেমন দেবী পূজার জন্তে সব সময় সব জায়গাতেই যথারীতি মন্ত্র পাঠ প্রাণপ্রতিষ্ঠা অর্চনা, বলিদান, হোম ইত্যাদির দ্বারা দেবী আরাধনা হলেও—বেশির ভাগ জায়গাতে মনে হয় এ যেন পুজো পুজো খেলাই জমলো—কাজের কাজ কিছুই হল না—তেমনি আমাদের চণ্ডীপাঠের অনুষ্ঠানটিকে লাগল।

ইচ্ছা ছিল সঙ্কল্প করে সপ্তাহ কাল চণ্ডী পাঠ হবে—হলও সপ্তাহ কাল, কিন্তু বাধা প্রাপ্ত দুটি দিন বাদ দিলে আমাদের সঙ্কল্পচ্যুতি যে হয়েছিল একথা যে-কেউ বুঝতে পারবে। এটা মহেশ বুঝল—আমিও বুঝলাম।

আমিই বললাম ; আসছে মাসে আর একবার চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা—

মহেশ বলল, ফল হয় তো এতেই হবে—আমরা তো চেষ্টার ত্রুটি করলাম না। যদি তাঁর ইচ্ছা হয়—হবে।

কিন্তু তাঁর ইচ্ছা বড় সহজ কথা নয়। আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে সেই ইচ্ছার সূত্র ধরা কঠিন। তবে ধোঁয়া দেখে যেমন আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করা সহজ—তেমনি পাঠের তৃপ্তিবোধ থেকে ফললাভের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে বাধা নাই।

যাইহোক আশু উপকার কিছু দেখা গেল, শয্যা-শায়িত রোগী শুধু উঠে বসতে পারল না—সামান্য সামান্য চলাফেরা করতে লাগল, আশান্বিত হলাম।

মহেশ বলল, রোগী ভালই আছে, শুধু সর্বদাই ভয় ভয় ভাব। ওটা কিছুতেই যাচ্ছে না। ওর মনে হয় অশরীরী আত্মারা আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ইসারা করছে চলে আয়। এক একদিন এমন বিকট স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে ওঠে। ভয়টা কিছুতেই যায় না।

একজন গুণীনকে আনালে কেমন হয় ? বললাম—

মহেশ বলল, আর গুণীন নয়—কিছু যদি হয় মা-কে একমনে ডেকেই সম্ভব হবে। আর সে কাজ করতে হবে আমাকে। গুণীনরা উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি করে।

আমি কিন্তু তলায় তলায় গুণীনের সন্ধানে রইলাম। আমার স্থির বিশ্বাস—ফকির সাহেবের মারণ যজ্ঞের কুফল এর মধ্যে কিছু রয়েছে—যদিও অভিচার কর্ম—তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। আর সেই সঙ্গে রয়েছে দেবীর কোপ। সত্যি বলতে কি কিছুদিন আগে পর্যন্ত এসব বিশ্বাস করতাম না। হিন্দুর ছেলে—অভ্যাসবশে—ঠাকুর দেখলে মাথা নোয়াই কিংবা কপালে দুটি হাত এক করে ঠেকাই—কিছু প্রার্থনা করি—ইহলৌকিক সুখ সম্পদ স্বাস্থ্য স্বাচ্ছন্দ—কিন্তু বিশ্বাসের ভিৎটা পাকা নয়। হয় হোক-না হলেও ক্ষতি নাই—এমনি ভাব। দেবতার চেয়ে বিজ্ঞান অনেক বড়—এ যুগে কোন্ মানুষ না বলবে। বলবে এই যুক্তিতে—আত্মবশেই সুখ—সর্বপ্রকারে পরবশ্যতায় গ্লানি। দেবতার আশীর্বাদ চেয়ে জীবনকে সার্থক করব পদে পদে পরবশ্যতার এই অক্ষমতা এই যুগের ধর্ম নয়। এ কারই বা ভাল লাগে। আমারও লাগতো না। কিন্তু যে কাহিনীর গ্রন্থি এখন উন্মোচন করতে বসেছি সেই কাহিনীই জীবন্ত সত্যের আকারে আমার বিজ্ঞান বিশ্বাসকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে তা বলে বিজ্ঞান প্রয়োগ নিরর্থক বা বিজ্ঞানের সার্থকতা নেই এ কথা আমি বলব না। এই শতাব্দীতে বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমার সংশয় নেই। আমি শুধু বলতে চাইছি—এই পরম সত্যের অন্তরালেও আর এক পরম সত্য রয়েছে —যা নাকি পরমা প্রকৃতিরই দান।

নাস্তিক্যবাদে আমরা তা স্বীকার করতে লজ্জা পাই—কুণ্ঠিত হই পাছে এ যুগের প্রগতিবাদীরা ওগুলীকে প্রস্তরযুগীয় সংস্কার বলে উপহাস করে। তা তারা যাই বলুক আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনগুলোকে মিথ্যা বলতে পারব না।

কেমন করে ভুলবো সেই ভয়ঙ্কর দিনটিকে প্রায় একমাস হয়ে গেল এখনও ছবিটা চোখের সামনে ভাসছে। সেটা ছিল রবিবার ছুটির দিন। আহারাদি সারতে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল—সামান্যক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রামকৃষ্ণমিশনে যাব ঠিক করেছিলাম। বেলুড়মঠ থেকে একজন বড় বেদান্তবাদী এসেছেন, বিকেল পাঁচটায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম জীবনে বেদান্তের প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। কথা আছে—মহেশ আমাদের বাসায় আসবে—চা খেয়ে একসঙ্গে আমরা মঠে যাব।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এলো মহেশ। এলো উদ্ভ্রান্ত বিপর্য্যস্ত বিপন্নের চেহারা নিয়ে।

বলল, ভাই—শীগগির চল—রমা বোধকরি চলেই যাচ্ছে।

চলেই যাচ্ছে। মানে? আমরা বাড়ী শুদ্ধ চমকে উঠলাম। কিছু জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ

মা দিয়ে ছুটে চলে গেল ও। আমি জামাটা গায়ে দিয়ে নিলাম। মা বললেন, চল—আমি তোর সঙ্গে যাব।

মহেশের বাসায় এসে যা দেখলাম বর্ণনা দিয়ে বিষয়টি করুণ করব না। এক কথায় চলেই গেছে রমা। একেবারে বিনা নোটিশে—হঠাৎই। এমনই হঠাৎ—ছোট ছেলেমেয়েগুলো—চীৎকার করছে না—কাঁদছে না—বড়গুলিও মৃত্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলছে না—নিঃশ্বাস ফেলছে না। ওরা বুঝতেই পারছে না—এমন একটি বিয়োগান্ত ব্যাপার ঘটেছে। মাকে ঘিরে চুপ চাপ বসে আছে ওরা। যেন মা ঘুমুচ্ছে—ওরা চুপচাপ বসে আছে; পাছে শব্দ হলে ঘুম ভেঙে যায় তাই আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিচ্ছে—ভীরু চোখে এ ওর পানে চাইছে। কখনো চাপা গলাতেও কৌতূহল প্রকাশ করছে না।

আমি মহেশের পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বললাম, ডাক্তার এসেছিলেন?

মহেশ মাথা নেড়ে বলল, তাঁকে ডাকবার সময় পেলাম কই—ও চলে গেছে অনেকক্ষণ।

কি করে কি হল সে বিস্তৃত বিবরণ থাক। আপাতত আমরা মহেশের মাতৃহারা ছেলেমেয়েদের আমাদের বাসায় নিয়ে এসেছি। উপস্থিত ওরা এখানেই থাকবে। কিন্তু এতো অস্থায়ী ব্যবস্থা। একটি মাত্র মানুষের অভাবে এখন ওর বিপর্য্যস্ত সংসার হাল ভাঙা নৌকার মত। আমাদের সাধ্য কি—তীরে টেনে তুলি। পাকা ব্যবস্থা কি হতে পারে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

আমরাই অবশেষে পরামর্শ দিলাম—ছেলেমেয়েগুলোকে ওদের ঠাকুরমার কাছে রেখে এসো। সেখানে তোমার ভাইয়েরা আছে—বৌমারা আছে—আর তোমার মা বুড়ো হলেও বর্তমান। নিজের বংশের অনাথ শিশুদের যেমন করে হোক মানুষ করে তুলবেন।

মহেশ করুণ হেসে বলল, সেই আশাই করব। যদিও বুঝি মানুষের বেশির ভাগ আশা বা ব্যবস্থার ফল ধরে না।

আমাদের সংসারটা খুবই ছোট—মানুষগুলিও সেই মাপে তৈরী।

কথাটা কম বেশি মধ্যবিত্ত সব সংসার সম্বন্ধেই খাটে। যেহেতু ওই ক্ষেত্রে উপার্জ্জনের অঙ্কটা স্ফীত নয়। পুরাতন দিনের আদর্শ বা কর্ত্তব্যবোধের চেহারাটা এখন পালটেছে এবং পৃথগন্ন পরিবারে একসংগে অন্ন বা সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার প্রথা না থাকায় এক রক্তের সমত্ববোধও শিথিল। এখনকার তৈরী প্রথার কল্যাণে আত্মীয়ে ও প্রতিবেশীতে তফাৎ কম।

যাই হোক—আমরা চেষ্টা করে মাস খানেকের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে ওকে কাশীতে পাঠিয়ে দিলাম। আশা করছি মাস খানেকের মধ্যে ছেলেমেয়েদের ব্যবস্থা পাকা করে অপেক্ষাকৃত সুস্থ মন নিয়ে ও ফিরে আসবে।

ক্রমশঃ

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তি

অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধ-কাব্য-গ্রন্থ। মূল কাব্যটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত; কিন্তু সংস্কৃত বুদ্ধচরিতের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ পাওয়া যায় না। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি মোট অষ্টবিংশ সর্গে পরিসমাপ্ত। চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটিতেও ঐ অষ্টবিংশ সর্গের অনুবাদ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিতের মূল সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি মাত্র ত্রয়োদশ সর্গে সম্পূর্ণ। পাণ্ডুলিপিতে চতুর্দ্দশ সর্গের মাত্র চারটি পদ সন্নিবেশিত হলেও তা অসম্পূর্ণ।(১) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পণ্ডিত অমৃতানন্দ চতুর্দ্দশ সর্গের অসমাপ্ত অংশ পূরণ করে আরও চারটি সর্গ সংযোজিত করেন।

আনুমানিক ৪১৫-৪২১ খ্রীষ্টাব্দে 'বুদ্ধ চরিত' সর্ব্বপ্রথম চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। পরবর্ত্তীকালে পৃথিবীর নানা ভাষায় এর একাধিক তর্জ্জমা হলেও একমাত্র তিব্বতী ও চীনা ভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষায় বুদ্ধচরিতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ সম্ভব হয়নি। অমৃতানন্দ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত বুদ্ধচরিত (চতুর্দ্দশ সর্গে পরিসমাপ্ত) অবলম্বনে E. B. Cowell একটি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করেন। কাউয়েল সাহেবের অনূদিত গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি উৎকৃষ্ট রচনা। ভারতে একমাত্র হিন্দী এবং বাংলা ভাষা ছাড়া এ-পর্য্যন্ত আর কোন প্রাদেশিক ভাষায় 'বুদ্ধচরিত' অনূদিত হয়নি। বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম রচনাটির তর্জ্জমা সুরু করেন শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত' নামে তাঁর অনুবাদ রচনাটি মোট দুটি খণ্ডে যথাক্রমে ১৩৫১ এবং ১৩৫৮ সালে বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। চতুর্দ্দশ সর্গে পরিসমাপ্ত ঐ গ্রন্থটি ডক্টর এইচ জনস্টন(২) কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী বুদ্ধ চরিতের বঙ্গানুবাদ।

অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ চরিত' আধুনিক কালে অধিক জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করলেও, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সারস্বত সমাজে কোন সময় উপেক্ষিত ছিল না। খ্রীষ্টীয় ৬-৭ম শতাব্দীতে উক্ত কাব্য রচনাটি ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জ্জন করেছিল। ঐ সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র অনুত্তম রচনা হিসেবে গ্রন্থটি পাঠকসমাজ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়েছিল। 'A Short History of Sanskrit Literature' গ্রন্থে এ-প্রসঙ্গে একটি উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার লিখেছেন, **The evidence of I-tsing shows us that the Buddha Caritam was read throughout India in the 6th and 7th centuries A. D**। অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধকাব্য বলে 'বুদ্ধ চরিত' সমকালীন যুগে হিন্দু পণ্ডিতসমাজে আশানুরূপ সমাদর পায়নি; কিন্তু এরূপ মন্তব্যের যথার্থতা সম্বন্ধে সংশয় আছে। বৌদ্ধ-কাব্য বলেই তৎকালীন যুগের হিন্দু পণ্ডিতেরা কাব্যটিকে যে অবজ্ঞা করেছিলেন এ-কথা কায়-মন-বাক্যে স্বীকার করে নিলে তাঁদের নৈতিক মনোভাবের প্রতি নেহাৎই বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। বৌদ্ধ-দর্শন বা সাহিত্য; পালি বা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও, তার পঠন পাঠনের সুব্যবস্থা সে যুগে ছিল না। সংস্কৃতে রচিত হিন্দুশাস্ত্রসমূহ পঠনের সুব্যবস্থা টোল এবং চতুষ্পাঠীর মাধ্যমে আজও চলে আসছে; কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ব্যাপারে শিক্ষাচার্য্যরা কোন সময়েই তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেননি।

শাস্ত্রবাক্যেরই তত্ত্ব তুরীয় এবং বুদ্ধি-কেন্দ্রিক। তত্ত্বের ভাবাত্মক বিবরণ এবং ধ্যানধারণার স্বরূপ যদি পঠন-

পাঠনের দ্বারা সুচারুরূপে বিশ্লেষিত না হয়, তবে তা কোন ধর্মসম্প্রদায়েরই কাছে ভাববস্তুরূপে আকর্ষণীয় হতে পারে না। সিদ্ধাচার্য্যরা মর্মবোধের চেয়ে ধর্মবোধের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আত্মবোধের জন্যই তাঁরা ধর্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ধর্মকে তাঁরা একান্ত আত্মপ্রয়োজনে নিয়োগ করেছিলেন বলে ধর্মশাস্ত্রসমূহের প্রশিক্ষণ ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেননি। ফলে, বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহের গূঢ়ার্থ এবং তাৎপর্য্য অনেকেরই কাছে সন্ধ্যাভাষার মতই অস্পষ্ট থেকে যায়। বলাবাহুল্য, ভাব ও ভাষার দুরূহতাই ছিল সে যুগের বৌদ্ধ-সাহিত্যের রসাস্বাদনমূলে একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায়; আর এই কারণেই ঐ সকল গ্রন্থসমূহের সাহিত্য ও নীতিগত বৈশিষ্ট্য সে যুগের বিদগ্ধ পাঠকসমাজকে আশানুরূপ আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাছাড়া বৌদ্ধদর্শনের যে সকল গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত, তার প্রমেয় ব্যবস্থা ভিন্ন ধরনের। সেই সংস্কৃত ভাষাও ভিন্ন প্রকৃতির। হিন্দু পণ্ডিতেরা তাই অনেকেই বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যপাঠে তেমন উৎসাহবোধ করতেন না। এ-প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গ্রন্থ পালি ভাষায় রচিত। সংস্কৃতাশ্রয়ী পণ্ডিতেরা তখন অনেকেই পালি ভাষা জানতেন না। ভাষার এই অজ্ঞতা হেতু বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি সামগ্রিক পরিচয় লাভ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এমন অনেক কারণেই তৎকালীন সংস্কৃতাশ্রয়ী পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করতে পারেনি। অতএব ধর্মবিরুদ্ধ মনোভাবের কারণেই যে এই বৌদ্ধরচনাটি সে যুগে হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে উপেক্ষিত হয়েছিল, এমন ধারণা নেহাৎই অযৌক্তিক।

'বুদ্ধচরিত' খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকের রচনা। গ্রন্থকারের জন্ম ও ব্যক্তি পরিচয় সম্বন্ধে সবিশেষ জানা যায় না। তাঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কয়েকটি ভিন্ন মত থাকলেও একথা প্রায় সকলে স্বীকার করেন যে তিনি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন।(৩) মধ্যভারতে অবস্থিত সাকেত-এর এক হিন্দু পরিবারে কবির জন্ম। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় অধিকার ছিল। কবি নাম গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি অপরিসীম ধৈর্য্য এবং কঠোর পরিশ্রম দ্বারা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন। ধর্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা যেমন ছিল অতুল, বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিও তেমনি ছিল অপরিসীম আগ্রহ। সেই জ্ঞানসম্পদকে উত্তরকালে কবি স্বকীয় শিল্প-প্রতিভার গুণে পরিমণ্ডিত করেছিলেন।

অশ্বঘোষের অধ্যাত্ম মনটি ছিল কবিস্বভাবিত। বুদ্ধের আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ তাঁকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। অবশ্য যে কোন গভীর ভাবচেতনা আধ্যাত্মিক হতে বাধ্য; এর সঙ্গে ধর্মসংস্কারের কোন সম্পর্ক নেই। অশ্বঘোষের জীবনে এই কথাটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। কবির রচনা পাঠ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে তিনি কিরূপ মণীষার আধার ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপ্রভায় ও রসজ্ঞতায় সকল অভিব্যক্তি সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠেছে। কবি এবং অধ্যাত্মরসবোদ্ধা এই ব্যক্তিপুরুষটি যেমন ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ, তেমনি সত্যাদর্শী। জগতের গূঢ়তম সত্যের অনুসন্ধানে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন অন্তর্লোকের সত্যে, যেখানে মানবাত্মা চিরসুন্দর, চিরপবিত্র ও মঙ্গলময়। অন্তর্লোকের পরম সত্যে, মানবাত্মা তার এই পরমানন্দ এবং পবিত্রতম সত্তাটিকে সহজে চিনে নিতে পারে; কারণ মানুষের পরমানন্দ এবং পবিত্রতম স্বরূপই, সেই অনন্ত শক্তি, যিনি পরম মঙ্গলময়। তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেই মানবাত্মা এক চরম ও পরম সার্থকতায় পরিপূর্ণ। কবি গুণোপেত অশ্বঘোষ মানবাত্মাকে অপূর্ব্ব গৌরব ও মহিমা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অন্তের অনুভূতিকে এই উপলব্ধির আধার বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে মানবজীবনের যেটুকু পরিচয় অভিব্যক্ত, তাই তার যথার্থ পরিচয় নয়। জীবনের

আর একটি গভীরতর দিক আছে যা বাহির্জীবনের সকল জটিলতা এবং ভাবুকতা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঐ দিকই মানবজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্রতম দিক। ঐ জীবনে প্রবেশ করতে হলে, চাই গভীর জীবনবোধ। একমাত্র গভীর জীবনবোধের মাধ্যমেই মানুষ তার পবিত্রতম সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারে। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষের অন্তরে চেতনা শক্তি হতে উদ্ভূত একটি বিশ্বাস নিহিত আছে। মানবাত্মা এই নৈতিক বিশ্বাসেরই বিষয়। জ্ঞান এবং কর্ম্মসাধনার আশ্চর্য্য বিকাশে মানুষের উপলব্ধ ঐ পরম বিশ্বাসটি ক্রমে বিশুদ্ধতর হয়ে এক অপরূপ অধ্যাত্ম চেতনার স্পর্শ লাভ করে। শুচিস্নিগ্ধ মানবাত্মা তখনই ভগবতসত্তার জ্যোতির্লোকে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। জ্ঞানতাপস অশ্বঘোষ স্বকীয় জ্ঞানগরিমায় এবং হৃদয়ানুভব থেকে উদ্ভূত একান্ত বিশ্বাস বলে একটি আধ্যাত্ম প্রবণতা গড়ে তুলেছিলেন। অধ্যাত্ম সত্য ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ নির্ম্মাণভূমি। ঐ সত্য-লোকের একটি দিগন্তে তিনি যেন ভক্তিবিহ্বলে শুচিস্নিগ্ধ ব্যক্তি-বিগ্রহ রূপে প্রতীয়মান, অপর দিগন্তে সত্যের ঘনীভূত সার সংকলন হিসেবে প্রতিভাত নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধের একটি প্রেমমূর্ত্তি, যাঁর নিত্য সৌন্দর্য্য, চিদানন্দ বিকাশ কবির স্মৃতিপথে উদিত হয়ে তাঁকে জীবনের গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছে। বুদ্ধের মত মহিয়ান পুরুষের মর্য্যাদাকে উপলব্ধি করতে হলে যে পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন, জ্ঞান-নিষ্ঠ অশ্বঘোষ তা স্বীয় প্রতিভাবলে রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বুদ্ধচরিত কাব্যখানি গ্রন্থকারের পরিণত বয়সের রচনা ;—পরিণত বয়সের একটি গভীরতর উপলব্ধি বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাব্যখানি তাঁর প্রৌঢ় প্রতিভার সাক্ষর আপন অঙ্গে সর্ব্বত্র বহন করছে। বুদ্ধের আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শে কবির মনোভূমি ইতিপূর্ব্বেই রচিত হয়েছিল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ আধ্যাত্ম-চেতনা অপূর্ব্ব কাব্যমন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয়ে গভীর জীবনের মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। অশ্বঘোষের আধ্যাত্মদৃষ্টির মূলে রয়েছে তাঁর গভীর আত্মোপলব্ধি। এই উপলব্ধি আধ্যাত্ম রসে পরিপুষ্ট। এক আধ্যাত্ম ভাবদেহকে আশ্রয় করে কবি হৃদয় প্রাণময় ভক্তিনিষ্ঠায় পরিপ্লুত। 'বুদ্ধচরিত' কাব্যে সেই ভক্তিবাদের সুরধ্বনি সঞ্চারিত। কবিপ্রাণের এই সুর, অকৃত্রিম, আন্তরিক এবং উপলব্ধি-সঞ্চ।

বুদ্ধচরিত রচনার পূর্ব্বে অশ্বঘোষ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। অন্তর্জীবনে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ই তাঁকে গভীরভাবে মুদ্রিত করেছিল। পরিণত বয়সে তিনি বুদ্ধের প্রেম-মহিমায় নিজেকে বিকীর্ণ করেছিলেন।

বুদ্ধ সর্ব্বসময়ে সর্ব্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তাঁর ব্রহ্মবিহার, প্রেমবিগলিত আত্মনিবেদনে মহিমান্বিত। ভক্তিবিনম্র চিত্তে পণ্ডিতপ্রবর অশ্বঘোষ সেই মহাপ্রেমিকের পাদমূলে আত্মনিবেদনে প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। মানবাত্মার এমন একটি অপূর্ব্ব মহিমা উপলব্ধি করে সশ্রদ্ধচিত্তে বুদ্ধের চির পবিত্রতার কথা প্রচার করেছিলেন। তথাগতের প্রাণময় ও প্রেমময় চরিত্রপ্রতিমাটিকে সর্ব্বগুণের বৈশিষ্ট্যে পরিমণ্ডিত করে বাস্তবলোকের সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর রচনায় সর্ব্বত্র ঐ মহামানবের একটি বলিষ্ঠরূপ আত্ম-প্রকাশ করেছে।

অশ্বঘোষ কবিগুণোপেত। জীবনে প্রেম ও সুন্দরকে লাভ করতে গিয়ে তিনি কখনও তার দেহময় আধারকে পরিহার করেননি। দেহকে আশ্রয় করে দেহতীর্থকে লাভ করার সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন। ফলে, তাঁর রচনায় প্রেমের সূক্ষ্মতা, গভীরতা, তন্ময়তা ও মাধুর্য্যের কখনো অসদ্ভাব ঘটেনি; বরং প্রেমের দেহাতীত তত্ত্বনির্দ্দেশ কাব্যের চিত্তোন্মাদী মাধুর্য্যে সুপরিস্ফুট। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্যচেতনা কবি মাত্রেরই মর্ম্মাগত। সৌন্দর্য্য স্বপ্নের সঙ্গে কবি হৃদয়ের সংযোগ ঘটলেই কবিমর্ম্মের যথার্থ পরিচয় ব্যক্ত হয়। মর্ম্মগত সৌন্দর্য্য স্বপ্নের সঙ্গে গভীর জীবন সংযোগই অশ্বঘোষের কবিপ্রতিভার মূল পরিচয়।

কবির উপমানির্ব্বাচন অপূর্ব্ব। উপমার অন্তর্নিগূঢ়

সৌন্দর্য্য পাঠকের চিত্তকে প্রলোভিত করে। শব্দচয়ন ও শব্দ যোজনার ক্ষমতাও কবির অসাধারণ। শব্দগুলি যেন বীণার ঝঙ্কারের মত সুরের লহর তুলে পাঠকের শ্রবণপথে ভেসে বেড়ায়। অসাধারণ শব্দচাতুর্য্যে তিনি যে চিত্র সৃষ্টি করেছেন তা তুলনা রহিত। শব্দ যোজনার প্রভাবে পাঠকচিত্তে যে একটি ভাবের আলেখ্য সৃষ্টি করেছেন, তা অতি মনোহর। ছন্দ-অলঙ্কারে, শব্দবিন্যাসে এবং বাগবৈদগ্ধে বুদ্ধচরিতের পদগুলি যেন হীরকখণ্ডের মত আলোক বিচ্ছুরণে সহস্র মুখী।

প্রথিতযশা কবির লেখনশৈলী অতিশয় প্রাঞ্জল, যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ। বিদগ্ধ সমালোচক Dr. Lakshman Sarup এর ভাষায়; His Language is simple and chaste, style refined and dignified and the diction vivid and elegant. ...Not only is the language very simple but the simile also is very homely and striking [A Short History of Sanskrit Literature: By Dr Lakshman Sarup] কবির পাণ্ডিত্যপ্রভায় বুদ্ধের জীবন ও বাণীর সকল আলোচনাই সার্থক সুন্দর হয়ে উঠেছে।

অশ্বঘোষের অনেকগুলি রচনা সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত ছিল সে যুগের অতি জনপ্রিয় ভাষা। ঐ সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাষাটি সে যুগের সাধুজনের ভাষারূপে পরিগৃহীত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, লালিত্য ও চারুত্ব গুণে সুসমৃদ্ধ বলেই ঐ ভাষায় একদিন মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেও সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধি এতটুকু ম্লান হয়নি। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীরা ধর্ম্মনীতি প্রচারকল্পে সংস্কৃতভাষা ব্যবহার করতেন।(৪)

কবি-দার্শনিক অশ্বঘোষ সমকালীনযুগে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্যকে অস্বীকার করতে পারেন নি। কাব্য-রচনা ও ধর্ম্মনীতি প্রচার উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সংস্কৃত ভাষার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এই দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ হয়না যে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হবার পরও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সমকালীনযুগের প্রচলিত ভাষায় ধারাবাহিক করতে অশ্বঘোষ একরকম ব্যর্থ হয়েছিলেন; আর এরই ফলে তাঁর 'বুদ্ধচরিত' এবং অন্যান্য কয়েকটি রচনা পালি ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

অশ্বঘোষের অন্যান্য রচনার মধ্যে সৌন্দরনন্দ, সূত্রলঙ্কার এবং শারিপুত্র প্রকরণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, বজ্রসূচী গান্ডীস্তোত্রগাথা ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ কবি-প্রতিভার সাক্ষর বহন করে। সৌন্দরনন্দ গ্রন্থে মহা-কাব্যীয় ধারায় সুন্দরী নামক এক রমণীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ সুন্দরীর প্রতি গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত। গৌতমবুদ্ধের সক্রিয়তায় কেমনভাবে নানা ঘটনাবৈচিত্রের মাধ্যমে তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে, তারই সবিশেষ কাহিনী গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে। রচনাটিতে, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরানের কতকগুলি সূত্র উল্লেখিত হয়েছে। সূত্রলঙ্কার গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের একটি কাহিনী বিবৃত হয়েছে। মহাযান শ্রাত্তোৎপদ বৌদ্ধদের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। গ্রন্থে মহাযান ধর্ম্মমতের প্রাথমিক সূত্রগুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। বজ্র সূচী গ্রন্থে জাতিপ্রথার প্রতি গ্রন্থকারের তীব্র কটুক্তি প্রকাশ পেয়েছে। শারিপুত্র প্রকরণ নয় অঙ্কে পরিসমাপ্ত একটি নাট্যগ্রন্থ। তালপাতার পুঁথিতে লিখিত এই নাটকটির বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি মধ্য এশিয়ায় পাওয়া যায়। তবে নাট্য-গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে অশ্বঘোষের রচিত কিনা, এ বিষয়ে সংশয় আছে। 'গান্ডীস্তোত্র গাথা' পুস্তকটি কয়েকটি গীতি-কবিতার সংকলন। পদগুলির কাব্যসমুৎকর্ষ প্রশংসনীয় হলেও এর মধ্যে অশ্বঘোষের বিস্ময়কর কবি-শক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

চৈনিক পণ্ডিতদের মতানুসারে অশ্বঘোষ সম্রাট কনিষ্কের সমসাময়িক। কনিষ্ক প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে সিংহাসন লাভ করেছিলেন। আলবেরুণী এবং হিউয়েন সাঙয়ের বিবরণলিপি হতে জানা যায়, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারকল্পে তিনি পুরুষপুরে বা পেশওয়ারে কতকগুলি সুবৃহৎ বৌদ্ধমঠ নির্ম্মাণ করেছিলেন। মঠগুলি ছিল সম-

সাময়িককালে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। কনিষ্কের সময়েই বৌদ্ধধর্মমত হীনযান ও মহাযান এই দুই মুখ্য বিভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

'হীনযান' পুরাতন, মহাযান আধুনিক। মৌর্য্য সাম্রাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন সুরু হয়। বিদেশীদের বার বার ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীক, পারসিক, খৃষ্টান, প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব বৌদ্ধধর্মে পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া বৌদ্ধধর্মের হীনযান ধর্মমত অতিশয় সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম ধর্মরীতি অনুসরণ সকলের কাছে সহজসাধ্য ছিল না। তাই বৌদ্ধধর্মে বিবর্তন একরকম প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। অবশ্য বিবর্তন মূলে আরও একটি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। ধর্মের সারবস্তু যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করে বিদেশীদের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে পারলে তারাও যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রভাবিত হতে পারেন, এমন ধারণা নিয়েই সিদ্ধাচার্য্যরা বিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, এই বিবর্তন বিদেশীদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার পক্ষে যে সহায়ক ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, হীনযান পদ্ধতির বিবর্তন রূপই হল মহাযান। কনিষ্ক পার্শ্বনামে জনৈক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর পরামর্শ নিয়ে গান্ধারে বা জলন্ধরে এক বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করেছিলেন। অনেকের মতে, ঐ বৌদ্ধসঙ্গীতি কাশ্মীরে আহূত হয়েছিল। সঙ্গীতির সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন বসুমিত্র এবং সহ সভাপতি, অশ্বঘোষ। সঙ্গীতি সভার সিদ্ধান্ত সমূহ (যথা বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মূল পাণ্ডুলিপি হতে সংগ্রহ করে সেগুলির যথাযথ অর্থ নির্দ্ধারণ করা এবং ধর্মগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করা ইত্যাদি) একটি তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ করে কাশ্মীরের একটি স্তূপে রক্ষিত হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন মূলে কনিষ্কের অবদান অনস্বীকার্য্য। অনেকের ধারণা, তিনি মহাযান বৌদ্ধ উপাসনা গ্রহণ করেছিলেন। ধারণাটির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কতকগুলি বলিষ্ঠ তথ্য প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

কনিষ্কের সময়ে বুদ্ধমূর্ত্তি রচনায় কাজ যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছিল। উপাসনা পদ্ধতিতে বুদ্ধমূর্ত্তি নির্মাণ করে বুদ্ধকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার মানসিকতা তাঁর সময়কালেই পরিদৃষ্ট হয়েছিল। মহাযান পদ্ধতিতে মূর্ত্তিপূজা স্বীকৃত। হীনযান পদ্ধতিতে মূর্ত্তি পূজার কোন স্থান নেই(৫)। কনিষ্ক স্বয়ং ধর্মাচারনে মূর্ত্তিপূজা অনুসরণ করতেন। তাঁর সক্রিয়তায় নির্মিত কতকগুলি বৌদ্ধ প্রস্তরমূর্ত্তি আজ শিল্পজগতে স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐতিহাসিকসূত্রে জানা যায়, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতক পর্য্যন্ত বুদ্ধের কোন মূর্ত্তি নির্মিত হয়নি; কত সালে ঐ মূর্ত্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা, গান্ধার ভাস্কর্য্যে গ্রীক-বৌদ্ধরা সর্ব্বপ্রথম গৌতমবুদ্ধের মূর্ত্তি রচনা করেছিলেন। কনিষ্কের সময়েই গান্ধারশিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। সে যুগে গান্ধার অঞ্চলে গ্রীক-রোমান-বৌদ্ধদিগের যে এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রন ঘটেছিল তাকেই আমরা গান্ধারশিল্প নামে অভিহিত করে থাকি। যাইহোক, বৌদ্ধমূর্ত্তি যে ভারতীয় শিল্পীর দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে রচিত হয়নি এবং তা বিদেশী বৌদ্ধ শিল্পীদের দ্বারাই রচিত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বৌদ্ধধর্ম বিবর্তন প্রচেষ্টায় অশ্বঘোষের অবদান কম নয়। তিনি কেবলমাত্র বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদই ছিলেন না, একজন প্রথম শ্রেণীর কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং তার্কিকও ছিলেন। মহাযান ধর্মমতের প্রচারকল্পে বসুবন্ধুর মত তিনিও কনিষ্ককে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন। ক্রমে মহাযান ধর্মমতটী চীন, তিব্বত এবং মধ্যএশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।(৬) অশ্বঘোষের জীবনী থেকে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়।

বুদ্ধচরিতে সুকবি অশ্বঘোষ পরমপুরুষ তথাগতের জীবনালেখ্য সৃষ্টি করেছেন। বুদ্ধের জীবন ও সাধনার চিত্ররূপ অতি নিপুণভাবে সম্পাদন করেছেন। কাব্যের প্রথম সর্গে বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলাবস্তু নগরীর বর্ণনা নানা চিত্ররূপ সৃষ্টি করেছে। একই সর্গে বুদ্ধের

অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত ও বংশপরিচয় সম্বন্ধ সবিশেষ তথ্য প্রদত্ত হয়েছে।

বাল্যকাল হতেই গৌতম ছিলেন ধর্মভাবাপন্ন। বাল্যকাল হতেই আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ তাঁর চরিত্রে অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। দ্বিতীয় সর্গে কবি অশ্বঘোষ গৌতমের বাল্য কৈশোর এবং যৌবনকালের তথ্যসমৃদ্ধচিত্রগুলি আরোপিত করেছেন।

বুদ্ধচরিতের ২য় ও ৪র্থ সর্গে পণ্ডিতপ্রবর অশ্বঘোষ গৌতমের প্রমোদশালার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন। প্রমোদশালায় দৈবলীলার উদ্দাম চিত্রাবলী অতি নিপুণভাবে উক্ত সর্গদ্বয়ে বিধৃত হয়েছে। মদোন্মত্তা স্রতীবিবসা, শিথিলকাঞ্চী বরাঙ্গনাদের লোলচাপল্যে মুখর প্রমোদভবনের চিত্র-চিত্রণে গ্রন্থকার কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নি। এখানে তাঁর উদ্দেশ্য, সংসারের ভোগ ঐশ্বর্যে নিস্পৃহ গৌতমের চরিত্র-মহিমাকে উদ্ঘাটন করা। জৈববাসনার পঙ্কিল আবর্তে সদা নির্লিপ্ত গোতম যেন পদ্মলে প্রস্ফুটিত একটি অনিন্দসুন্দর পঙ্কজ।

তৃতীয় সর্গে গৌতমের নগরপরিক্রমার চিত্রসমূহ অতি সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। মানুষের জীবনে ব্যাধি ও জরা অতি স্বাভাবিক পরিণাম। উপরন্তু জীব-মাত্রেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মানুষ তার জীবননাট্যের শেষ পরিণতি মৃত্যুর কথা জেনেও অতিশয় নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে এসংসারে কালাতিপাত করে। গৌতমের কাছে এ দৃশ্য এক মহাবিস্ময়কর বস্তু। জরায় জীর্ণ, ব্যাধিতে ভারাক্রান্ত এবং বিনাশে পরিত্যক্ত—মানুষের এই তিনটি স্বাভাবিক পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে সিদ্ধার্থ তাঁর সারথিকে মানব-জীবনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনটি প্রশ্ন করেছিলেন। সারথির কাছ হতে যথাযথ উত্তর পেয়ে তাঁর করুণার্দ্র চিত্ত মুহূর্তে ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। অতঃপর অত্যন্ত বিমর্ষ চিত্তে এবং চিন্তাকুল অবস্থায় তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

চিত্র রচনায় অশ্বঘোষ একজন রূপদক্ষ জীবনশিল্পী তৃতীয় সর্গে লৌকিক জীবনের যে তিনটি ভিন্নধর্মী চিত্র সংযোজিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে হৃদয়স্পর্শী। প্রত্যক্ষদৃষ্ট হৃদয়ার্তির যুগপৎ রূপ বিন্যাস তাঁর রচনাকে সার্থক করে তুলেছে।

নগর পরিক্রমণে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা গৌতম সেদিন অর্জন করেছিলেন, তারই ফলস্বরূপ তাঁর ঋষি-সদৃশ চিত্ত ক্রমে সংসারের সকল আমোদ-প্রমোদ হতে সংনিবৃত্ত হয়ে পড়েছিল। এরপর সংসারের কোন বন্ধনই তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। মাত্র বিশ বৎসর বয়সে রাজপ্রাসাদের সমস্ত সুখ এবং ঐশ্বর্যকে পরিত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেছিলেন (৫ম সর্গ)। সকলের অজ্ঞাতে এক গভীর রাত্রে সত্যান্বেষী গৌতম সংসার ত্যাগ করে গভীর অরণ্যে অভিগমন করেছিলেন।

বুদ্ধচরিতের ষষ্ঠ সর্গ হতে চতুর্দশ সর্গ পর্যন্ত সিদ্ধার্থের সাধনা, সিদ্ধি এবং ধর্মপ্রচারের বিষয় সমূহ বাণীবদ্ধ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে উক্ত কাব্যগ্রন্থে কতকগুলি দৃশ্য বর্ণনা রামায়ণের কাব্যভাণ্ডার হতে সমাহৃত। এ থেকে অনুমিত হয় যে অশ্বঘোষ বাল্মীকির সারস্বত নিস্যন্দে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও কবির মৌলিকতা কাব্যে কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

রামায়ণে ভরতের ভ্রাতৃভক্তির কাহিনী সকলেরই সুবিদিত। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্রের বনবাসের কথা শুনে আদর্শ পুরুষ ভরত অতিশয় ব্যথিত হয়েছিলেন। তারপর বিপুল সৈন্য নিয়ে রামচন্দ্রকে পুনরায় রাজধানীতে ফিরিয়ে আনবার জন্য চিত্রকূটে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে অগ্রজকে পিতার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করে রাজ্যভার গ্রহণ করতে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সে সময় ব্যথাবিক্ষুব্ধ ভরতকে সান্ত্বনা দিয়ে এবং সেই সঙ্গে নিজ প্রতিজ্ঞা পালনের অভিপ্রায় জানিয়ে রামচন্দ্র একটি অতি সুন্দর উপদেশবাণী প্রদান করেছিলেন। উক্ত উপদেশবাণী অধ্যাত্মরসে পরিপ্লুত। 'বুদ্ধ চরিতের' ষষ্ঠ সর্গে অনুরূপ একটি দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর গৌতমকে সংসারজীবনে পুনরায় ফিরে যাবার জন্যে ছন্দক যে-সকল যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, তা সত্যই সারগর্ভ।

প্রত্যুত্তরে সিদ্ধার্থ যে বাণী প্রদান করেছিলেন তাও অধ্যাত্ম ভাবাদর্শে পরিমণ্ডিত। রামচন্দ্রের বনগমন যেমন বিধিনির্দিষ্ট, গৌতমের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাসগ্রহণ তেমনি দৈব-নির্দিষ্ট। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধচরিতের কতকগুলি দৃশ্যপট এবং সহজ সুন্দর উপমাসমূহ রামায়ণ শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি মাত্র; যেমন সুপ্ত রমণীর দেহ-সৌন্দর্য্য বর্ণনায় কবি যে চিত্ররূপ সৃষ্টি করেছেন তা রামায়ণ শ্লোকেরই ঈষৎ পরিবর্ধিত রূপায়ণ মাত্র। রামায়ণীয় বর্ণনায় এমন ঘনিষ্ঠ সাম্য বুদ্ধচরিতের কয়েকটি সর্গে বিদ্যমান।

অশ্বঘোষ কালিদাসের সমপর্য্যায়ভুক্ত কবি। জনৈক সাহিত্য-সমালোচক তাঁর কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সমালোচনা কালে মন্তব্য করেছেন,—

"In fact, the close resemblance between Kalidas and Asva Ghose is admitted by all scholars. They however disagree regarding the priority of one or the other. Asva Ghose unlike Kalidas uses vedic words. He came after the transition. Besides it would appear that Asva Ghose is more artificial than Kalidas. He often sacrifices sense to sound."

বুদ্ধচরিতের তৃতীয় সর্গে (১৩-১৯ শ্লোকে) সিদ্ধার্থের প্রথম নগর পরিক্রমণের দৃশ্য বর্ণনার সঙ্গে কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের সপ্তম সর্গের (৫-১২) গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পুনরায় বুদ্ধচরিতের ত্রয়োদশ সর্গে বুদ্ধের প্রতি মারের আক্রমণ দৃশ্য কুমার সম্ভব কাব্যে (ত্রয়োদশ সর্গ) শিবের প্রতি আক্রমণ দৃশ্যেরই অনুরূপ। এমনি বহু ক্ষেত্রে উভয় কবির কাব্যে দৃশ্যবর্ণনা, শব্দ ও উপমার প্রয়োগবিধিতে গভীর সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

জীবনী-সাহিত্যের উদ্দেশ্য, একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের আলেখ্য সৃষ্টি করা। সুকবি অশ্বঘোষ এ কাজ অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। বুদ্ধের মহৎ চরিত্র কবির নিপুণ হাতের তুলিকাটানে মূর্ত্তি লাভ করেছে। জীবনকথাকে রূপকথা ও উপন্যাসের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে ইতিহাসের বর্ণ-বৈচিত্র্যহীন অসাধারণ দৃশ্যপরম্পরা থেকে উদ্ধার করে তিনি ব্যক্তিরূপের বৈশিষ্ট্যে বুদ্ধচরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

জীবনচরিতে গ্রন্থকার বুদ্ধের চরিত্র পূজা করেছেন। গ্রন্থে জীবনালেখ্যই চিত্রিত হয়নি, বৌদ্ধভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের পরিচয় বিবৃত হয়েছে। কবির পাণ্ডিত্যপ্রভায় ও রসজ্ঞতায় ভগবান বুদ্ধের জীবন ও সাধনার সকল আলোচনা সার্থক হয়ে উঠেছে। তাই শুধু ভারতের জীবনীসাহিত্যেই নয়, পৃথিবীর জীবনী-সাহিত্যেও অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

---

(১) "Buddha Caritam is based on one manuscript found written in Savada Characters which gives 13 cantos plus four verses of the 14th". "A Short History of Sanskrit Literature" by H. R. Agarwall and Dr. Lakshman Sarup.

(২) Dr. E. H Johnston (১৯৩৬ সালে ইনি চীনা ও তিব্বতী অনুবাদের ভিত্তিতে বুদ্ধচরিতের একটি ইংরেজী সংস্করণ সম্পাদন করেন)

(৩) 'অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত' (১ম খণ্ড) অনুবাদক: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৪) Sanskrit was still a living language during pre-Buddhist period...During the first centuries of Christian era, Sanskrit was used by the Buddhist also. ("Indian Literature, vol II Epics and Purans" by W. Winternitz)

(৫) বৌদ্ধদের দেব দেবী: বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য।

(৬) "Asva Ghose was the most important figure, if not the founder of the Mahayana system of Buddhism which spread in Tibet, China and central Asia. According to a biography [it was translated into Chinese under the dynasty of Yao-Tzine, A.D. 394-417 by Kumar Sya (Kumar Sila) from which M. Vassiliet derives the abridged life which was translated by Miss. E. Lyall] of Asva Ghose he lived in central India."

[A Short History of Sanskrit Literature]

প্রবাসের ছবি

শ্রীশান্তিময়ী দত্ত

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে অনেক বাঙালী পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হোয়ে গেল। ডাক্তার বিশ্বাস এবং বিজয়বাবু যেন আমাদের বড়ো ভাইয়ের মতন পরম স্নেহে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন। ডাক্তার বিশ্বাস আমাদের দশ বৎসর মৌলমিন-বাসের অকৃত্রিম বন্ধু এবং আত্মীয় ছিলেন। মনে পড়ে, কতোবার গুরুতর পীড়ায় অসুস্থ হোয়েছি, রোগশয্যায় আন্তরিক স্পর্শ দিয়ে, অক্লান্ত সেবা ও চিকিৎসা করেছেন একটি পয়সাও পারিশ্রমিক নেননি কখনো।

বিজয়বাবুর একান্ত অনুরোধ ও আকাঙ্খা এড়িয়ে আমাদের সরকারী কোয়ার্টার্সেই যেতে হোয়েছিল। বর্ষার দিনে অতো দূর থেকে যাতায়াত খুবই অসুবিধা হোচ্ছিল বুঝে বন্ধুবান্ধবরা আর বাধা দেননি। স্কুলের বাড়ী সম্বন্ধে নানা গুজব যা শোনা গিয়েছিল, তা ঠিক নয়, আমরা সেখানে বেশ নিরাপদে ও আরামেই বাস করেছিলাম। বাঙালী-পাড়া ছাড়লেও, বাঙালীর সঙ্গের অভাব হয়নি, সর্বদাই আমাদের গৃহ বন্ধু-বান্ধবের শুভাগমনে আনন্দমুখরিত ছিল।

প্রোমের মতন অতোখানি পশ্চাৎপদ না হোলেও মৌলমিনের বাঙালীদের মধ্যে পর্দা তখনো ছিল। "দত্ত-গিন্নী জুতো পায়ে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে দিবালোকে পাহাড়ে, ময়দানে ঘুরে বেড়ান, অ-বাঙালীর হাতে হাত দিয়ে করমর্দন করেন, বর্মীদের ছোঁয়া খান, একেবারে বে-সরম মেয়েমানুষ" এরকম বহু সমালোচনা কানে আসত। ২।৪ জন তরুণী মহিলা, প্রবীণাদের কড়া শাসন অতি অনিচ্ছায়ই মেনে চলতেন, দত্ত-গিন্নীর দৃষ্টান্তে তাঁরা ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে লাগলেন। স্বভাব-কৌতূহলী নারীর মন এই নবীনা বে-সরমী মহিলাটির সঙ্গে শুধু পরিচিত হবার বাসনা দমন করতে না পেরে বন্ধ ঘোড়ার গাড়ীতে দলে দলে আমার গৃহে আগমন করতেন। আমার ভৃত্যটি ছিল মদ্রদেশীয়, তার হাতের রান্না খাই জেনে একটি মহিলা বিস্ময়ে আপ্লুত। একটি ছোট মেয়ে খাবার জল চাওয়াতে, আমি যেই তার হাতে গেলাস তুলে দিয়েছি, দূর থেকে লক্ষ্য করে ছুটে এসে তিনি গেলাসটি কেড়ে নিয়ে জলটা ফেলে দিয়ে, মেয়ের মাকে তিরস্কার করে বললেন, "তোমরা কি জাত-ধর্ম কিছু আর রাখবে না?" অ-শিক্ষা মানুষকে কতখানি সংকীর্ণ ও দুর্বল করে রাখে, তার এমন অসংখ্য পরিচয় পেয়েছিলাম এই প্রবাস-জীবনে। দুঃখে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি আর বারবারই মনে এই কথা জেগেছে, অন্ধকার অন্দরমহলে শিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে প্রবেশ করতে হবে, এ-আলোতেই অন্ধকার ঘুচবে। যতই প্রবাসী বাঙালী সমাজে পরিচিত হলাম, ততই ঘরে ঘরে শিক্ষার অভাব এবং প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভব করলাম। বর্মার মফঃস্বলে তখন কোথাও বাঙালী মেয়ের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা ছিল না। বর্মীদের স্কুলে, বা খৃষ্টান মিশনারীদের স্কুলগুলিতে সাধারণ বাঙালী মেয়েদের পড়ানো অনেকে পছন্দ করতেন না আর মিশন স্কুলে বিশিষ্ট পরিবারের মেয়ে ২।৪টি ব্যতীত সকলকে গ্রহণও করত না। আমি একা, আমার সামর্থ্যই বা কতটুকু, তবুও উদাসীন থাকতে পারিনি। সহরের গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত ২।৪ জন ভদ্রলোক হলেন আমার সহায়। প্রবীণ খ্যাতনামা অ্যাড্‌ভোকেট মিঃ পি, কে, রায় তাঁর গাড়ী ব্যবহারের সুযোগ দিলেন। কেহ বা দিলেন বাড়ীতে একখানি ঘর, অনেকেই তাঁদের পরিবারের কিশোরী-বালিকা-কন্যা ও বধূদের ছাত্রী হিসাবে এগিয়ে দিলেন। দু'একটি অল্প শিক্ষিতা

তরুণী শিক্ষকতার কাজে সহায়তা করতে রাজী হলেন। এইভাবে গৃহে গৃহে ছোট ছোট শ্রেণী বিভাগ করে, পাঠ, সূচীশিল্প ও সঙ্গীত শেখাবার ব্যবস্থা করলাম। আর বয়স্কা বিবাহিতা মহিলাদের জন্য একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হোল। কলিকাতা সরোজনলিনী অ্যাসোসিয়েশনের সহিত যুক্ত রেখে এই সমিতিতে নানাপ্রকার শিল্পকাজ শেখানো হোত। বর্মী মেয়েরা কর্মঠ ও অনেকেই শিল্পী। আমি একটি বর্মী মেয়ের কাছে কাগজের ও কাপড়ের ফুল তৈরী করতে শিখেছিলাম। আমাদের সমিতির মেয়েদেরও একটি বর্মী মেয়ে নিযুক্ত করে, কাগজের ও কাপড়ের সুন্দর সুন্দর ফুল তৈরী করা শিখিয়ে সরোজনলিনীর বাৎসরিক শিল্প-প্রদর্শনীতে মৌলমিন মহিলা-সমিতির নানাপ্রকার সূচীশিল্প, কাগজ ও রেশমের তৈরী ফুল ইত্যাদি পাঠিয়েছিলাম। পর পর দুই বৎসর মৌলমিন মহিলা-সমিতি পদক ও প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিল। সরোজনলিনী সমিতির তদানীন্তন পরিচালিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর নিকট হ'তে সে সময়ে পত্রযোগে বহু প্রশংসা ও উৎসাহবাণী পাওয়া গিয়েছিল।

কয়েক বৎসরের মধ্যে মৌলমিন নারী-সমাজ নানা জনকল্যাণকর কাজে, যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা-বিধ্বস্ত, দাঙ্গা-প্রপীড়িত নর-নারীর সাহায্যকল্পে অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতিতে অগ্রগতি হয়েছিল। মৌলমিন একটি বহু বিচিত্র-জাতি-সম্বলিত (Cosmopolitan) সহর। সরকারী বিদ্যালয়ে ইংরেজ, ইঙ্গ-ভারতীয়, ইঙ্গ-বর্মী, ইণ্ডো-বর্মী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয়, চীনা, বর্মী, পাঞ্জাবী, বাঙালী অসংখ্য জাতীয় শিক্ষক-শিক্ষিকার সমাবেশ। মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সমিতি হইতে খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ, সান্ধ্য-মজলিশের আয়োজনে নিমন্ত্রিত হ'য়ে গিয়েছি। এতরকম জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে মনটা কতো প্রসারিত হয়েছিল। বাংলাদেশের লোকেরা সাধারণতঃ কেবল নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত হ'য়ে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীরেখা টেনে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছে। বিরাট মানব-সমাজে অবাধ-বিচরণের সুযোগ ঘটে, বাংলার তথা ভারতবর্ষের বাহিরে গেলেই। ইহাতে সঙ্কীর্ণতা ধীরে ধীরে খসে পড়ে, মনের উদারতা বৃদ্ধি পায়, স্বার্থপরতা চলে যায়।

মৌলমিন সহরটি ব্যবসায়ী-প্রধান। বহু বাঙালী কাঠ-ব্যবসায়ী বংশ-পরম্পরায় এখানে বাস করছেন। জঙ্গলে জঙ্গলে কাঠ-সংগ্রহে ইঁহাদের যাতায়াত, যেখানে স্থানীয় বর্মীদের সাহায্য ব্যতীত কাজ চালানো অসম্ভব। বর্মীদের সহিত অবাধ-মেলামেশার ফলে ইণ্ডো-বর্মীয় জাতির সৃষ্টি। মৌলমিন একটি বৃহৎ বন্দর, সমুদ্রগামী বিদেশীয় মাল-জাহাজ এখানে আসে, মাল আদান-প্রদান কার্য্যের জন্য জাহাজগুলি এককালীন অনেকদিন থাকে। এইসময় জাহাজীয় বিদেশী কর্মচারী বৃন্দ সহরের ক্লাবে অবসর বিনোদনের জন্য আসেন এবং সহরের স্থানীয় অধিবাসীর সহিত পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হন। এইভাবে ইঙ্গ-বর্মীয় জাতির উদ্ভব হইয়াছিল।

এককালীন দশ বৎসর মৌলমিনবাসের পর আমরা প্রোমের নিকটবর্ত্তী পাউডে নামক ছোট একটি স্থানে বদলী হই। আমাদের প্রবাসবাসের সহবাসী অকৃত্রিম বন্ধুদের নিকট হতে এবং প্রকৃতির লীলাভূমি, নদী-পাহাড়ে ঘেরা মায়াপুরী ছেড়ে বিদায় নিয়ে যেতে সত্যিই বড় কষ্ট হ'য়েছিল। কয়েক বৎসর নানাস্থানে ঘুরে আবার অল্পকালের জন্য মৌলমিনে ফিরে গিয়েছিলাম। তখন সহরের অনেক পরিবর্ত্তন এসে গেছে। পুরণো বাসিন্দারা অনেকেই স্থানান্তরে চলে গেছেন। হাল ধরবার উৎসাহী কর্মীর অভাবে মহিলা-সমিতি বন্ধ হ'য়ে গেছে। তবে বাঙালী মহিলারা তখন প্রকাশ্য রাজপথে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, বাঙালী মেয়েদের উন্নতি দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল।

মৌলমিনে অবস্থানকালে আমার স্বামীকে সরকারী স্কুলের হোস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট পদের গুরুভারও নিতে হয়েছিল। সে সময় আমাদের সহর হ'তে কিছু দূরে পাহাড়-উপরিস্থিত বোর্ডিং-সংলগ্ন কোয়ার্টার্সে বাস করতে হয়েছিল। ন্যূনাধিক পঞ্চাশটি বর্মী বালকদের নিয়ে বসবাস। তাদের পড়াশোনা, খাওয়া-দাওয়া,

খেলাধুলোর সকল দায়িত্ব ছিল তত্ত্বাবধায়কের। বর্মী-বালকরা সদা-প্রফুল্ল, নাচগান-প্রিয়। আমার ছেলেমেয়ে দুটি তাদের সঙ্গে খুবই মিশে গিয়েছিল। বর্মী ভাষা, নাচ-গানও তারা বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছিল। একবার সে দেশে ইণ্ডো-বর্মায় দাঙ্গা বেঁধেছিল, নির্বিচারে পরস্পরকে হত্যা করছিল। বন্ধু-বান্ধবরা আমাদের জন্ত খুবই উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন কিন্তু ছেলেরা এবং ভৃত্যরাও আমাদের এতো শ্রদ্ধা করত এবং ভালবাসত, তাতে আমাদের মনে ভরসা ছিল, তারা আমাদের কোনো অনিষ্ট করবে না এবং করেওনি। প্রায় এক বৎসর আমরা হোস্টেলে ছিলাম, আমাদের ছোট্ট পরিবারটি ব্যতীত সেখানে সবই বর্মী। হোস্টেলের বর্মী-পাচক সপরিবারে সেখানে একটি পৃথক ঘরে বাস করত। তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরাও হোস্টেলের আনন্দ-উৎসবে যোগ দিত এবং সকলের সহিত একত্রে পাশাপাশি চেয়ারে বসত। পাচকটি কিন্তু ঠিক ভৃত্যোচিত নম্র ব্যবহারে আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দূরে দাঁড়িয়ে যোগ দিত। বর্মীরা জাতিভেদ মানে না, নিরক্ষর বর্মী আছে বলে জানিনা। শ্রেণীভেদ আছে বলেও মনে হয় না। শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার উপরই সম্মান ও ব্যক্তির বৈষম্য নির্ভর করে বোধ হয়। বর্মীরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ, সুতরাং অহিংসবাদী। সকলেই গরু, শুয়োর, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগী ও নানারকম পাখী প্রভৃতির মাংস খায় কিন্তু নিজে হত্যা করে না, অন্যে হত্যা করে বাজারে নিয়ে এলে তাদের কিনে খেতে আপত্তি নেই। একবার আমরা ছেলেদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল বুঝে জীবন্ত হাঁস, মুরগী কিনিয়ে হোস্টেলের রান্নাঘরে দক্ষিণ-ভারতীয় ভৃত্যদিগের দ্বারা কাটিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করেছিলাম, তাতে বর্মীদের বিশেষ আপত্তি দেখে বন্ধ করতে হয়েছিল। অহিংসার প্রকৃত ভাবার্থ তারা বোঝে কিনা সন্দেহ হোত। বর্মীভাষা না জানায় খুব অন্তরঙ্গ ভাবে কোনো বর্মী-পরিবারে মিশতে পারিনি, ইংরেজী জানা মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে হৃদ্যতা কিছু হয়েছিল। তাদের আতিথেয়তা প্রশংসনীয়। দীর্ঘ

মৌলমিন বাসের পর ছোট্ট অপরিচ্ছন্ন পাউণ্ডে (Paungde) সহরে গিয়ে খুবই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখানকার রাস্তা-ঘাট ধুলায় পরিপূর্ণ। অনেকগুলি চালের মিল ছিল। সরকারী স্কুলে Science পড়ানোর ব্যবস্থা না থাকায় ছেলেকে রেঙ্গুনে রাখতে হোলো তার এক পিসীর কাছে। মেয়েটি মৌলমিনে St. Mathew's Girl's School-এ পড়ছিল, এখানে ইংরেজি স্কুল না থাকায় তাকে ঘরে বসিয়ে রাখতে হ'ল। বছরখানেক নানা অসুবিধা ভোগের পর আমরা 'বেসিন' বলে একটি বড় সহরে স্থানান্তরিত হই। রেঙ্গুন সহর হতে নদীপথে ছোট জাহাজে করে বেসিন যেতে হয়। বেসিনে বিস্তর বাঙালী, দু'একটি পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুকেও পেলাম, ছেলেমেয়েকে নিজেদের কাছে আবার রাখতে পেরে খুশী হলাম। এখানকার সরকারী স্কুলের Science-এর শিক্ষক ছিলেন আমার ভগ্নীপতির ছোট ভাই সুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর সহধর্মিণী সুহাসিনী আমাদের বাল্যকালের পরিচিত বন্ধু। সুহৃদের চেষ্টায় তাদের এবং বাঙালী পাড়াতেই আমরা বাড়ী পেলাম। ছোটবেলায় পরিচিত কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ পাড়ারই এক মহিলা "বনফুল দিদি"কে দীর্ঘকাল পরে সেখানে পেয়ে বড় আনন্দ হয়েছিল। তাঁর স্বামী ডাঃ রঘুনাথ সিংহ একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক, বহু বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের এই সহরে এসেছিলেন। বনফুলদিদি যখন মাঝে মাঝে দেশে যেতেন, তাঁর কাছে বর্মাদেশের কতো গল্প আমরা আগ্রহে শুনতাম। তাঁকে এত বৎসর পরে একেবারে প্রতিবেশীরূপে পেয়ে খুবই ভালো লেগেছিল। অল্প দিনের মধ্যেই সেখানে আবার একটি মহিলা-সমিতি গঠিত হোল আর সেটিও কলকাতা সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম। বন্ধু, সুহৃদ ও সুহাসিনীর চেষ্টায় সেখানে বাঙালী ছেলেমেয়েদের বাংলাদেশের কৃষ্টি অনুযায়ী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চার জন্ত একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাঙালী ছেলেমেয়েরা ইংরেজী ও বর্মী ভাষা এমনি আয়ত্ত করে

দেখেছিল যে, বাংলা স্কুলে সর্বদা নিজেদের মধ্যেও বর্মী বা ইংরেজীতে কথা বলত। এসব দেখেশুনে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে নিয়মিত বাংলা শেখাতাম। আর দেশের আত্মীয়-স্বজনকে নিয়মিত বাংলায় চিঠি লেখাতাম। আমরা সেখানে যাওয়ার পর মাঝে মাঝে ছোট ছোট নাটক, আবৃত্তি, গান প্রভৃতির আয়োজন হ'ত। মহিলা-সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের গান, অভিনয় হ'ত। একবার মনে পড়ে আমরা মহিলারা রবীন্দ্রনাথের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয় করেছিলাম।

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা একটি দল জড় হ'য়ে নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম। বাড়ী ফিরে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গান-বাজনা করতাম। এখানে দুই বৎসর বাসের পর আমাদের কিছুদিনের জন্ম রেঙ্গুন যেতে হয়। বোধ হয় ১৯৩৩।৩৪ সাল, আমার ভগ্নীপতি মোহিতবাবু হাসপাতালে অসুস্থ আছেন খবর পেয়ে আমি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মেজদির কাছে যাই। ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে মোহিতবাবু চিরকালের জন্ম চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন একজন ইংরেজ, মোহিতবাবুকে খুব চিনতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে অনুরোধ জানানোর ফলে তিনি আমাদের রেঙ্গুনে বদলীর অর্ডার দিলেন। আমরা একবৎসর সে সময় রেঙ্গুনে একটি বড় বাড়ী ভাড়া করে মেজদিদের সঙ্গে একত্রে ছিলাম। রেঙ্গুন সরকারী স্কুলেও তখন ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল। বিরাট স্কুল, অগণ্য ছাত্র এবং শিক্ষক। মনে পড়ে, আমার স্বামী, তখন এক-একটি শ্রেণীর ৬টি করে সেক্সান (Section), ছেলেদের সাপ্তাহিক পরীক্ষার খাতার বোঝা একটি ঘোড়া-গাড়ী করে বাড়ীতে নিয়ে আসতেন।

আমার মেজদি বেঙ্গল অ্যাকাডেমীর বালিকা বিভাগের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। মেজদির ছেলেটি তখন রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটী কলেজে ইন্টার-মিডিয়েট পড়ছে এবং মেয়েটি বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে। আমার ছেলে রেঙ্গুন সরকারী স্কুলে দশম শ্রেণীতে (Class X) এবং মেয়ে St. Philips স্কুলে নিম্নশ্রেণীতে পড়ছে। আমাদের দুই বোনের পরিবার একত্র থাকায় বড় আনন্দে একটি বৎসর কেটেছিল। মেজদি নানাদিক চিন্তা করে একটি ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করে ছেলেমেয়েকে নিয়ে সেখানে গুছিয়ে বসলেন, আর আমরাও তাঁরই কাছে আর একটি ফ্ল্যাট নিয়ে বসলাম। ইহার অল্পদিন পরেই আমরা আবার মৌলমিনে বদলী হলাম। রেঙ্গুনে থাকতেই আমার স্বামীকে অল্পদিনের জন্ম ইন্সিনে বদলী করেছিল। রেঙ্গুনের উপকণ্ঠেই ইন্সিন সহর, সেজন্ম রেঙ্গুন থেকেই যাতায়াত করতেন। মেজদিকে একা রেঙ্গুনে রেখে যেতে আমাদের খুবই কষ্ট ও দুশ্চিন্তা হয়েছিল। কিন্তু রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালী এবং অবাঙালী সমাজ মোহিত-বাবু এবং মেজদিকে এতো শ্রদ্ধা করতেন যে, তাঁর ঘনিষ্ঠ হিতৈষী বন্ধুর অভাব কোনদিন হয়নি। আমরা মৌলমিন থেকে পুনরায় বেসিনে যাই এবং সর্ব্বশেষে বোধ হয় ১৯৩৯ সালে, আপার বর্মার "থায়ামিয়ো" সহরে (Thayetmyo) বদলী হোলাম। এতদিন Lower Burmaতেই ঘোরাঘুরি করেছি, Upper Burmaর কোনো ব্যক্তিকেই চিনতাম না। Thayet-myoর Public Prosecutor একজন বাঙালী বহুকাল থেকে সেখানে আছেন খবর পেয়ে তাঁর কাছে লেখা হোল আমাদের জন্ম একটি বাড়ী ঠিক করে দিতে। মিঃ মনোমোহন ব্যানার্জী আমাদের পত্রের উত্তরে অত্যন্ত আগ্রহ ও সমাদরে আমাদের তাঁর বাড়ীতে অতিথিরূপে আহ্বান জানালেন। তখন আমার ছেলেটি রেঙ্গুন কলেজ থেকে ইন্টার-মিডিয়েট পাশ করে কলকাতা Science College-এ B.Sc. পড়ছে, তার কাকা সুশোভন দত্তের কাছে থাকে। আর মেয়েটিকে মৌলমিন St. Mathews' স্কুল থেকে ছাড়িয়ে ঘরে বসিয়ে রাখতে হয়েছে। তার চোখের নানা কষ্ট হোত, কোনো চশমাতেই ঠিকমত দেখতে পারনা, মাথাধরা, চোখব্যথার অসহ কষ্ট। ডাক্তারের পরামর্শে পড়াশোনা

সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হ'ল। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা নতুন যায়গায় রওনা দিলাম। রেঙ্গুন থেকে প্রোমে ট্রেণে গেলাম। সেখান থেকে ইরাবতী নদী দিয়ে একটি ছোট লঞ্চে Thayetmyo পৌঁছলাম। নদীর অপর পারে Allanmyo সহর। খবর পেলাম, সেখানকার সরকারী স্কুলের হেডমাস্টার হিমাংশুকুমার দাস, তিনি আমার স্বামীর এক বাল্যবন্ধু, সমপাঠী এবং সম্পর্কে ভাইঝি-জামাই। মনে হ'ল, এ পৃথিবীটা নিশ্চয়ই খুব বড় নয়, চারদিকেই যেন পরিচিত, আত্মীয় ছড়িয়ে আছে। জাহাজে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে আমরা ভর-দুপুরে প্রায় নতুন কর্মস্থলে পৌঁছলাম, ঘাটে মিঃ মুখার্জী (মিঃ ব্যানার্জীর শ্যালক) গাড়ী নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বন্ধুবরের বাংলোটি প্রশস্ত, একেবারে নদীর ধারে, বারান্দায় বসে নদীর সুন্দর দৃশ্য বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অতি মিষ্ট-প্রকৃতি, অমায়িক এবং অতিথি-বৎসল। তাঁর কাছেই জানলাম স্কুলের হেডমাস্টারের জন্ম একটি সুন্দর দোতলা বাড়ী নির্দিষ্ট আছে। অপরাহ্ণে তাঁর গাড়ীতেই আমাদের সে বাড়ীটি দেখতে নিয়ে গেলেন। বাড়ী দেখে আমাদের বেশ পছন্দ হ'ল, মস্ত কম্পাউণ্ড-ঘেরা অর্দ্ধ-কোঠা বাড়ী অর্থাৎ একতলাটি ইঁট ও সিমেন্ট বাঁধানো পাকা ঘর, সিঁড়ি ও দোতলাটি কাঠের তৈরী। স্কুল থেকে খুব বেশী দূরে নয়। ধারে-কাছের বাড়ীগুলিও ঐরূপ বিরাট কম্পাউণ্ড-বেষ্টিত বাড়ী, অবাঙালী, সাহেব, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রতিবেশী সব। বাড়ী পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে, আমাদের সঙ্গের ভৃত্যটিকে (চট্টগ্রাম থেকে নিয়ে যাওয়া) কাজের তদারকের ভার দিয়ে আমরা সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরলাম। বাড়ী ফিরে মিঃ ব্যানার্জীর বাড়ীর রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখ্‌লাম। দুপুরে স্বামী-স্ত্রীকে বাঙালীবেশে, পান চিবোতে দেখেছিলাম, সন্ধ্যায় তাঁরাই পুরো-দস্তুর মেম-সাহেব। লনে, বারাণ্ডায় চেয়ার-টেবিল, ফুলদানী সাজানো, পাউঁড্, বাউঁড্ বাঁধা (বর্মী পুরুষদের রেশমের রুমাল জড়ানো, মাথায় পাগড়ী বিশেষ) লুঙ্গীপরা বয় ট্রে-হাতে পানীয় পরিবেশন করতে ব্যস্ত—মিঃ ব্যানার্জীর হাতেও পানীয় পেলাস, মিসেস্ ব্যানার্জী সুসজ্জিত পোষাকে মেম-সাহেবদের ইংরেজীভাষণে আপ্যায়ণ করছেন। আমরা পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত তখন। সহরের গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, বর্মী ডেপুটী কমিশনার সস্ত্রীক, পুলিশের ইংরেজ বড়সাহেব, স্থানীয় Borstal-এর বর্মী বড় সাহেব সস্ত্রীক এবং কমার্শিয়াল নানা অফিসের উচ্চ কর্ম্মচারী অনেকেই সেখানে উপস্থিত। মিঃ ব্যানার্জী নবাগত আমাদের এই সুযোগে সকলের সহিত পরিচয় করিয়ে দিলেন, সকলেই সৌজন্যসূচক দু'চারটী কথা বলে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় অতিথিরা বিদায় নিলেন, তখন আমরা একত্রে রাত্রি ভোজন করে বিশ্রাম পেলাম। পরদিনই আমরা নিজেদের বাড়ীতে চলে গেলাম। আলাপ পরিচয়ে ক্রমশঃ জান্‌লাম, মিঃ ব্যানার্জীর গৃহে প্রতি সন্ধ্যায়ই এরকম বন্ধুসমাগম এবং পানাহার চলে। স্থানীয় জিমখানা ক্লাবেও প্রতিদিন এত লোক সমাগম হয় না। মিঃ ব্যানার্জী আলাপ আপ্যায়ণে এবং মূল্যবান পানীয় বিতরণে অকৃপণ, অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ব্যক্তি। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মহলে সেজন্ম অদ্বিতীয় লোকপ্রিয়, সকলেই তাঁকে চেনেন এবং ভালবাসেন। বাঙালী শিক্ষিত বা উচ্চপদস্থ আর কেহ ছিলেন না, কাজেই অন্ত দেশীয় লোকরাই তাঁদের বন্ধু স্থান নিয়েছেন। আমরা একটু গুছিয়ে বসে, বিকেলে প্রতিদিনই নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম, সেইটাই একমাত্র অবসর বিনোদন ছিল আমাদের বাড়ী ফিরবার পথে প্রায়ই মিঃ ব্যানার্জীর গৃহে অল্পক্ষণের জন্ম যেতাম, কিন্তু তাস, পাশা খেলা বা পানীয় গ্রহণে আমরা অংশ গ্রহণ না করায় সকলেই আমাদের "fit for cradle only" বলে উপহাস করতেন আমাদের জীবন ছিল চিরকালই, নিয়মে বাঁধা। শিক্ষাব্রতীদের জীবন বড় কঠোর, ছাত্রমহলে যাঁদের জীবন আদর্শ-স্বরূপ না ধরলে সম্মান পাওয়া অসম্ভব। আমরা সন্ধ্যায় ৮টার পরে নিমন্ত্রিত গৃহে ফিরতাম—পড়াশোনার কাজ নতুবা হবে কি করে?

শহরটা ছোট, সেজন্য অতি অল্পদিনের মধ্যেই বেশ খুবই পরিচিত হয়ে গেলাম। একটি ইংরেজ মহিলা Mrs. Fortescue একদিন একটি সাদা মস্ত গাড়ী হাঁকিয়ে আমার বাড়ীর ফটকে এসে, নেমে, জিজ্ঞাসা করছেন "আমি কি আসতে পারি?" আমি বারাণ্ডা থেকে দেখে ইসারায় আসতে বলে নীচে নেমে গেলাম। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন এবং কোথায় থাকেন জানালেন। তাঁর স্বামী Burma Yenan Mines এর Proprietor, রীতিমত ধনী এবং পদস্থ। আমার মেয়ে রুবির সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে তার চোখের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সে সারাদিন কি ভাবে কাটায় তার চিকিৎসার কি কি ব্যবস্থা হয়েছে, সব খুঁটিয়ে খবর নিলেন। তারপর থেকে তিনি প্রায়ই আসতেন। নানারকম খেলার সরঞ্জাম, ছবির বই নিয়ে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা রুবির সঙ্গে বসে গল্প করতেন আর তাকে ছবি ও গল্পের সাহায্যে অনেক কিছু শেখাতেন। স্থানীয় একটি শিশু-মঙ্গল-সমিতি ছিল, War Comforts Association ছিল, তার সভ্য করে নিলেন আমাকে। নানাজাতীয় মহিলারা একত্র হয়ে চাঁদা তুলে পশম কিনে যুদ্ধের সৈনিকদের জন্যে সোয়েটার, টুপি, মোজা বুনে, বালিশের ওয়াড়, জামা প্রভৃতি সেলাই করে পাঠাতেন, এই কাজটি আমার খুব ভাল লাগত, অনেকদিন ধরে এই কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলাম। শিশু-মঙ্গল সমিতির সভ্যদের দরিদ্র বর্মীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে সদ্য-প্রসূত শিশুদের যত্ন ও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে তাদের উপদেশ দেওয়া, অর্থ, দুধ, ওষুধ বিতরণ করা এবং মাসান্তে নিজের নিজের কাজের রিপোর্ট লিখে সম্পাদিকার কাছে দেওয়া, এই ছিল কাজ। Thayetmo তে এক্কা গাড়ীই (Tonga) ছিল একমাত্র পরিবহন, তাতে চড়ে একা একা ঘুরতে আমার ভাল লাগত না, কিন্তু কাজ চালিয়ে যেতাম। অল্প দিনের মধ্যেই Mrs. Fortescue আমার অসুবিধে বুঝে নিয়ে, তাঁর গাড়ী পাঠিয়ে দিতেন। আমি বার বার বারণ করা সত্ত্বেও তিনি শোনেন নি, যেখানেই যখন কোনো মিটিং থাকত, তাঁর গাড়ী নির্দিষ্ট সময়ে আমার বাড়ীতে হাজির থাকত। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার ও আন্তরিক ভালবাসা আমাকে অভিভূত করেছিল। তাঁর কোন সন্তান ছিল না; রুবির জন্য তাঁর অদ্ভুত আন্তরিক স্নেহ, তাকে আনন্দে রাখবার জন্য তাঁর কতো চিন্তা ও আয়োজন। রুবির চোখের চিকিৎসার জন্য একজন পার্সী ডাক্তার Billimoriaর নাম প্রস্তাব করেন। আমার এক নন্দাই প্রেমতোষ দাসগুপ্ত একবার আমাদের কাছে এসে রুবিকে তাঁর কাছে রেখে Billimoriaকে দেখানোর প্রস্তাব করলেন—আমরা তো নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত মনে রুবিকে তার পিসের সঙ্গে রেঙ্গুনে রাখলাম। প্রেমতোষ বহু কষ্ট এবং ধৈর্য্য সহকারে রুবির চোখের চিকিৎসা-ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করেছিল। Dr. Billimoria, প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অসংখ্য রোগী দেখতেন, সব শেষে রুবির চোখ ১০।১৫ মিনিট ধরে নানাভাবে পরীক্ষা করতেন। একদিনে বেশীক্ষণ দেখলে রুবির ক্লান্তি হবে, এই ভেবে অল্পক্ষণ প্রতিদিন দেখতেন। আগে অনেক বড় বড় চক্ষু চিকিৎসকরা দেখে যা বলেছিলেন এবং চশমার যে Prescription দিয়েছিলেন, Billimoriaর সিদ্ধান্তে একই রকম ফল দেখছিলেন, অথচ সেই চশমা পরলে চোখে এবং মাথায় কষ্ট বেড়ে যেতো। একমাস পরীক্ষা এবং গবেষণার ফলে তিনি বুঝলেন Prism glass দেওয়া প্রয়োজন। কলকাতার কোন ডাক্তার Prism glass দিতেন না এবং দিলে ক্ষতি হবে মনে করতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ডাঃ Billimoriaর Prescription অনুযায়ী চশমা দেওয়ার ফলে রুবির চোখের কষ্ট সম্পূর্ণ সেরে গেল। Mrs Fortescue রুবির চোখ ভাল হোয়েছে এবং পড়াশুনা করতে পারছে জেনে যে কী খুশী হোয়েছিলেন বলতে পারি না। বিদেশীর জন্য বিদেশীর এতো আন্তরিক টান এ যেন আমার জীবনের এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা ও ও মহাসম্পদ মনে হয়।

Thayetmyoর জীবনে আরও অনেক বিদেশীয়

সঙ্গে বন্ধুত্ব হোয়েছিল। সেখানে Burma Cement Companyর সাহেব অফিসারদের অনেকের সঙ্গে হৃদ্যতা হোয়েছিল, তারা ২।১জন আমার প্রতিবেশীও ছিলেন। তাঁরা বাড়ীতে এলে আমি আমার ঘরে তৈরী রসগোল্লা ও সরবোত দিয়ে আপ্যায়ণ করেছি। Delicious বলে খেয়েছেন। আমার এই বৈশিষ্ট আমি বজায় রাখতাম—আমাদের বাঙালীর খাত্ত দিয়েই অভ্যর্থনা করতাম, কখনো সাহেবী অনুকরণ করার চেষ্টা করিনি। অনেক বর্মী অফিসারের বাড়ী ইঙ্গ-ভারতীয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেয়েছি, আমিও তাঁদের নিমন্ত্রণ কোরে পোলাও, মাছ, মাংস, পিঠা পায়েস রেঁধে বাঙালী রীতি অনুযায়ী নিজে পরিবেশন কোরে খাইয়েছি তাতে মনে হোয়েছে—আমার জাতীয় বৈশিষ্ট রক্ষা পেয়েছে এবং জাতীয় সম্মানলাভ হোয়েছে। আমার মেয়ে রুবির পড়াশোনার অনেক ক্ষতি হোয়ে যাওয়াতে তাকে আর স্কুলে দেবার কথা না ভেবে প্রাইভেট পড়িয়ে কলকাতার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার স্থির করলাম। রুবিকে তার পিসীর কাছে রেঙ্গুনে রেখে একজন বাঙালী গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত কোরে পড়াবার ব্যবস্থা হোল। মফঃস্বলে আমাদের কাছে রেখে সে ব্যবস্থা সম্ভব হোল না।

১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে আমার স্বামী চার মাসের ছুটী নিয়ে, আমাদের নিয়ে কলকাতা রওনা হবার ব্যবস্থা করলেন। মেয়ে ম্যাট্রিক দেবে এবং ছেলে M.Sc দেবে, তাদের পরীক্ষার পর আবার আমরা কর্ম্মস্থলে ফিরবো এই স্থির কোরে আমাদের ঘর-সংসারের সমস্ত জিনিস ভাল কোরে বাক্স বন্ধ কোরে স্কুল বাড়ীর গুদাম ঘরে এমন ভাবে রেখে আসা হোল, যদি ছুটীর পর বদলীর হুকুম আসে তাহোলে কেরাণী মাল সব জাহাজে পাঠিয়ে দিতে পারে, কোন অসুবিধা না হয়। রুবির পোষা কুকুরটিকেও কেরাণীর জিম্মায় রেখে আসা হোল, আসবার দিন তার কী কান্না, কেবল লাফিয়ে আমাদের গাড়ীতে উঠতে চায়! কে জানত এই তার সঙ্গে শেষ বিদায়! আমরা রেঙ্গুন থেকে অনেক চেষ্টায় একটি চীনা-জাহাজে টিকিট পেয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হলাম। সে সময় বড় বড় ভালো জাহাজগুলি যুদ্ধের কাজে নিয়ে যাওয়া হয়ে ছিল। এই জাহাজে যাত্রীদের খাবার ব্যবস্থা না থাকায় আমরা আমাদের সংগের বাঙালী ভৃত্যটিকে দিয়ে খালাসীদের উনুন থেকে সিদ্ধ ভাত, খিচুড়ী ইত্যাদি রান্না করিয়ে এনে কেবিনে বসেই খেতাম। জাহাজেই দ্বিতীয় দিন ভোরে Radioতে শোনা গেল Pearl Harbourএ জাপানীরা বোমা ফেলেছে এবং অনেক জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। আমাদের জাহাজ কোথা দিয়ে কোথায় যাবে কিছুই জানা নেই, কোন আদেশও আসেনি। জাহাজের সমস্ত বাতি নিভিয়ে, মোমবাতি, টর্চ ইত্যাদির সাহায্যে যাত্রীদের চলাফেরার আদেশ হ'ল। কেমন একটা অজানা বিপদের ভয় ভয় ভাব নিয়ে চতুর্থ দিনে আমরা চট্টগ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের বাড়ীতে আমার শাশুড়ী আমাদের জন্ত অপেক্ষায় ছিলেন। আমাদের অভিপ্রায় ছিল, আমার মেয়ের পরীক্ষার পড়া-প্রস্তুতির জন্ত চট্টগ্রামে ২।৩ মাস নিরিবিলি আরামে থাকব, মার্চ্চমাসে পরীক্ষার পূর্ব্বে কলকাতা যাবো। কিন্তু মানুষের চিন্তা, ব্যবস্থার আড়ালে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার আয়োজন হয়ত হ'তে থাকে, যা মানুষের কল্পনার অতীত, সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় এই দেখে আসছি। সপ্তাহ দুই না যেতেই রেঙ্গুন থেকে অসংখ্য টেলিগ্রাম আসতে সুরু হোল, রেঙ্গুনে বোমা পড়েছে, বাঙালী পরিচিত অপরিচিত বন্ধুরা সপরিবারে দেশে চ'লে আসছেন, জাহাজ-ঘাটে যেন আমরা উপস্থিত থাকি। চট্টগ্রামে তখন বর্মা যাত্রীদের জন্ত অনেকগুলি যাত্রীনিবাসও খোলা হয়েছিল। আমাদের বাড়ীটিও একটি Refugee-Camp-এ পরিণত হ'ল। প্রতিদিনই একদল যাত্রী নিয়ে এসে, তাদের খাইয়ে-দাইয়ে রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা, কাহাকেও হয়ত দুই-একদিন বাড়ীতে স্থান দিতেও হোল। কোনো কোনো পরিবারের হয়ত শিশু পীড়িত, তাঁহাদের চিকিৎসার

ব্যবস্থা করা, যুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আশ্রয় দেওয়া, এই সব ব্যস্ততায় আমাদের দিন কাটলো। Upper Burmaর যাত্রীরা অনেকে এরোপ্লেনে এসে নামলেন। Thayetmyoর বন্ধু মিঃ ব্যানার্জিও একদিন সপরিবারে এসে নামলেন। সকলেই প্রায় এক-বস্ত্রে চলে এসেছেন। কতশত পরিবার সারা জীবনের গড়া সংসার সমুদ্রপারেই রেখে নিঃসম্বল অবস্থায় দেশে ফিরলেন।

আমরাও বেশীদিন নিজগৃহে থাকতে পারলাম না। চট্টগ্রামের প্রতিবেশীরা অনেকেই নানাস্থানে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলে গেলেন। আমাদের আত্মীয়-স্বজন সকলেই আমাদের কলকাতায় চলে যেতে অনুরোধ জানালেন। আমরা কলকাতায় পৌঁছে জানলাম, কলকাতা ইউনিভার্সিটি বহরমপুরে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং পরীক্ষার ব্যবস্থাও সেখানে হ'চ্ছে। আমরা অনেক চেষ্টায় বহরমপুরে একটি ছোট্ট বাড়ী ভাড়া করে গিয়ে থাকলাম। সে বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক্ বাতি পাখা নেই, কলের জল নেই, একটি কুয়ো সম্বল। কি কষ্টে কেরোসিনের বাতিতে আমার মেয়েকে পড়াশোনা করতে হয়েছিল। আবার যদি তার চোখের কষ্ট আরম্ভ হয়, এই ভাবনা আমাদের। যাক, সব কষ্টেরই অবসান হয় একদিন। মেয়ের পরীক্ষার পর কলকাতায় চলে এসে একটি বাড়ী ঠিক করে কোনোরকমে গুছিয়ে বসে ছেলের পরীক্ষার তোড়জোড় চলল।

যুদ্ধের হিড়িকে অদৃষ্টের বিপর্য্যয়ে, ভবিষ্যৎ চিন্তার কোন অবসর না দিয়েই যেন এক অজানা হস্তের-ইসারায় আবার আমাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। বিশ বৎসরের সংগ্রামে যে একটা নিশ্চিন্ত, আনন্দময় জীবনের স্পর্শ উপভোগ করছিলাম, তা হতে আবার নিঃসম্বল দুশ্চিন্তার জীবনে ফিরে এলাম। অনেক হাবুডুবু খেয়ে, মনের জোরে আবার সংগ্রাম সুরু করলাম। ১৯৪৫ সালে বর্মা ইংরেজের পুনরাধিকৃত হোল, সরকারী কর্ম্মচারীদের বর্মা যাবার আহ্বান এলো। তখনো দেশ মিলিটারী শাসনের অধীনে, সুতরাং পরিবার নিয়ে যাবার আদেশ নেই। আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে দেশে রয়ে গেলাম, আমার স্বামী, একাই আবার প্রবাসে ফিরে গেলেন। Upper Burmaর মিনজান্ (Myngyang) সহরে অত্যন্ত কঠোর কষ্ট জীবনে দেড়বৎসর কাটিয়ে ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে অবসর গ্রহণ কোরে দেশে ফেরেন।

এই আমার প্রবাস যাত্রার ছবি।

অনেকেই আমায় প্রশ্ন করেছেন, "তোমরা বর্মায় গেলে কেন"? আমিও ভাবি, সত্যিই অবাক লাগে অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে।

কল্পনায় যে জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তার সঙ্গে প্রকৃত জীবনের কোনই মিল দেখি না। আমাদের জীবন যাত্রার আয়োজনের পশ্চাতে যে মহাশিল্পীর হাত রং বেরঙের ছবি এঁকে চলেছে—তাঁর সঙ্গে আমাদের যে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই—অজানা যে চির কালই অচেনা থেকে গেল॥ তবে এইটুকু তাঁর পরিচয় পেয়েছি—সুখ, দুঃখ ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিপদ-সম্পদ উঠা-পড়া জীবন-মৃত্যু সকলের ভিতর দিয়ে জীবন-ধারা একটা মহান মঙ্গলের পথেই বেয়ে চলেছে—ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস যদিও রহস্যময়ই রয়ে গেছে॥

ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীগণের প্রথম ঐতিহাসিক ধর্ম্মঘট

সমর দত্ত

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের যে যুগ সেই যুগটিকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তামসিকতার যুগ। পূর্ব্বসূরীগণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণের মনের আকাশে সচেতনতার যে প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছিলেন সেই প্রদীপের আলো নিভে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোভ-লালসা এবং আত্মকেন্দ্রিকতার দমকা হাওয়ায়। ষ্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের নব-গঠিত কমিটির সদস্যগণ ছিলেন সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তাভজা। পরোক্ষভাবে এই কর্তাভজা সভ্যগণের সহায়তায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ কর্মচারীগণের উপর বিশেষ করে ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্যগণের উপর নানারূপ অত্যাচারের অভিযান চালাতে থাকে।

১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে কোন এক সময়ে ব্যাঙ্কের কলকাতা হেড অফিসের কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের এই বলে ভীতি প্রদর্শন করে যে তারা অনতিবিলম্বে এই মর্মে ঘোষণা পত্র স্বাক্ষর করে দিক যে তারা ষ্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যপদ পরিত্যাগ করেছে এবং অ্যাসোসিয়েশনের সংগে তাদের আর কোন রকম সম্বন্ধ নেই। কর্তৃপক্ষ কর্মচারীগণকে যুগপৎ এই কথা জানিয়ে দেয় যে কর্মচারীগণ যদি এই আদেশ অমান্য করে তাহলে ব্যাঙ্কের চাকুরী থেকে তাদের বিদায় নিতে হবে। কোন একটি বিশেষ কারণে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। ক্রমশঃ বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনের চতুর্দ্দিকে দেখা দেয় নৈরাশ্যের নিথর অন্ধকার। কেমন করে সংগঠনের চতুর্দ্দিক থেকে অন্ধকার দূরীভূত হবে, কিভাবেই বা কর্তৃপক্ষের অত্যাচার এবং নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে—সেদিন এই ধরণের চিন্তায় কর্মচারীগণের মন-প্রাণ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অত্যাচার এবং নিষ্পেষণের জগদ্দল পাথর ঠেলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস কর্ম্মচারীগণ হারিয়ে ফেলেছিল। এই প্রসংগে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শ্রীজ্যোতি ঘোষ তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন :—

Our endeavours to do something in the year 1941 to redress our (i.e. employees') grievances failed miserably as there was practically no response from the staff. Then came the Essential Service Ordinance which covered the Imperial Bank staff too. Fear exploitation, injustice, oppression and tyranny were then rampant. Fine, suspension, summary dismissal, putting adverse remarks on service records of the employees were the reward. The employees in the branches of the Bank had to work whole of the night of

and on. In New Delhi an employee being fed up resigned from the Bank's service. But he was hauled up under the Essential Service Ordinance and he was convicted in the law court of New Delhi. Service in the Bank at that time meant serfdom.

শুধু যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণের চাকুরী জীবন দুঃসহ হ'য়ে উঠেছিল তা নয়। সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যান্য কর্মচারীগণের চাকুরীর অবস্থাও শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রসংগে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা শ্রীপ্রভাত করের একটি প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি স্মর্তব্য।

The scale of pay was low and service condition was bad, security of service was unknown. There was no privilege or right. The employees' fate was dependent on the whims of the management. The employees could be hired and fired at any time.

যদিও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণের মতই অন্যান্য ব্যাংকের কর্মচারীগণের চাকুরী জীবন দুর্বিষহ হ'য়ে উঠেছিল তথাপি একথা সর্ববাদী সম্মত যে ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের দুর্ধর্ষ লালমুখো মনিবদের দুর্ব্যবহারের টেকনিকের বেশ খানিকটা বৈশিষ্ট্য ছিল। এই ব্যাংকের কর্মচারীগণের প্রতি কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার এবং অত্যাচারের বহু কাহিনী আছে যেগুলি অত্যন্ত বমরকর এবং কৌতূহলোদ্দীপক। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ছোট ছোট কাহিনীর উল্লেখ করা গেল।

এখনকার মত ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের ব্রাঞ্চ অফিসের সর্বাপেক্ষা উচ্চ পদস্থ অফিসারকে 'এজেন্ট' বলা হ'ত। একদা ঢাকা ব্রাঞ্চের একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে ব্যাংকের দৈনন্দিন কাজ ছাড়াও এজেন্ট সাহেবের ব্যক্তিগত একটি বিশেষ কাজ ক'রতে হ'ত। এই বিশেষ কাজটির জন্য কর্মচারীটিকে অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হ'ত না। এজেন্টের স্ত্রী কোন একটি বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে এজেন্ট পত্নীকে প্রত্যহ ছাগ-দুগ্ধ পান করতে হ'ত। বাসস্থান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূর থেকে কর্মচারীটিকে প্রতিদিন সাহেবের অর্ধাঙ্গিনীর জন্য ছাগ-দুগ্ধ এনে দিতে হ'ত। একদিন এক সুযোগে কর্মচারীটি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে এই কথা নিবেদন করে যে প্রতিদিন সকাল বেলা প্রায় পাঁচ মাইল পথ হেঁটে মেম সাহেবের জন্য তাকে ছাগ-দুগ্ধ এনে দিতে হয়। বাসস্থানে ফিরে এসে স্নানাহারের সময় থাকে না কারণ ঠিক দশটার সময় তাকে ব্যাংকে হাজিরা দিতে হয়। কর্মচারীটি অত্যন্ত বিনীত ভাবে সাহেবকে এই অনুরোধ ক'রে যে তাকে যেন একটু দেরিতে ব্যাংকে হাজির দেবার অনুমতি দেওয়া হয়।

কর্মচারীটির অসুবিধার কথা শুনে এজেন্ট সাহেব তাকে আশ্বাস দেন যে তিনি তার অনুরোধ বিবেচনা ক'রে দেখবেন। কিছুদিন পরে কর্মচারীটি জানতে পারে যে দেরিতে অফিসে আসবার অনুমতি দেওয়া তো দূরের কথা কর্মচারীটির মাহিনা যাতে আগামী তিন বছর না বাড়ে সেই সম্বন্ধে সাহেব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কারণ এজেন্ট সাহেবের বিবেচনায় মেমসাহেবের জন্য দুধ এনে দেওয়াটাই একটা বিশেষ কর্তব্য। এর সুযোগ নিয়ে দেরিতে ব্যাংকে আসবার অভিপ্রায় কর্তব্যের প্রতি পরোক্ষভাবে শৈথিল্য প্রদর্শন। সেদিন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের বিচারে কর্তব্যের প্রতি এই ধরণের শৈথিল্য প্রদর্শন ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই ব্রাঞ্চের এজেন্ট কর্মচারীটিকে যথোপযুক্ত (!) দণ্ড দিতে কাল বিলম্ব করেন নি। বলাবাহুল্য সেদিন শুধু চোখের জল এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া এই অসহায় কর্মচারীটির আর কিছু করবার উপায় ছিল না।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। এই ঘটনাটি ঘটে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ক'লকাতা হেড অফিসে। একজন বয়স্ক কর্মচারী ব্যাঙ্কের কারেন্ট এ্যাকাউন্ট বিভাগের অন্যতম লেজার-কিপার ছিলেন। তাঁর লেজারে ছিল বহু এ্যাকাউন্ট। সেইজন্য তাঁর কাজের চাপও ছিল অত্যধিক। স্বল্প বেতনের কর্মচারী, ঘরে পোষ্য অনেকগুলি। দু'বেলা পেটভরে আহার জোটে না। শুধু কাজ আর কাজ। জঠোরাগ্নির জ্বালা এবং মানসিক চিন্তার বোঝা নিয়ে কত কাজ আর করা যায়।

একদিন সেই ভদ্রলোকটি তাঁর উপরওয়ালা সাহেবের নিকট এই আবেদন জানালেন যে তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্য তাঁকে সাময়িক একজন সহকারী দেওয়া হোক্। তাঁর এই আবেদন উপরওয়ালা সাহেবের এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে ভদ্রলোকটি কিছুদিনের জন্য ছুটি চাইলেন। তখন কর্মচারীগণকে কেবলমাত্র ব্যাঙ্কের ডাক্তারের সুপারিশ অনুসারে medical leave দেওয়া হ'ত। অন্য কোন প্রকার ছুটির ব্যবস্থা তখন এ ব্যাঙ্কে ছিল না। তখনকার দিনে বাড়ী থেকে medical certificate পাঠিয়ে ছুটি নেওয়ার অনেক অসুবিধা ছিল। সেই সময়ে ব্যাঙ্কের ডাক্তারের কাছ থেকে ছুটি নিতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হ'ত। কর্মচারীটি কর্তৃপক্ষের কাছে বহু আবেদন নিবেদন ক'রেও ছুটি পেলেন না। ব্যাঙ্কের ডাক্তারকেও বহু অনুনয় বিনয় করেও ছুটি না পেয়ে তিনি দিশাহারা হয়ে পড়লেন। ভদ্রলোকটির দৈহিক দুঃখ কষ্ট বোধহয় শেষ হ'য়ে এসেছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য ছুটি পেয়ে গেলেন। ব্যাঙ্কের লেজার ঠেলতে ঠেলতে কর্মচারীটি এমনিভাবে দেহরক্ষা করলেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে ইউরোপের মত ভারতবর্ষ এবং চীন দেশে দাসপ্রথা নিতান্ত জঘন্য আকারে কখনও দেখা দেয়নি যদিও কোন কোন পরিবারে ক্রীতদাস দেখা যেত। একদা ইউরোপে প্রচলিত ভয়াবহ এবং ঘৃণিত দাস ব্যবসার সঙ্গে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের মর্মন্তুদ অবস্থার তুলনা না করে একথা বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষ এবং চীন দেশে ক্রীতদাসগণ অপেক্ষা তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে কর্মচারীগণের জীবন এবং জীবিকার অবস্থা খুব বেশী উন্নত ছিল না।

আরও একটি ঘটনার কথা বলি। খুব সম্ভবতঃ এই ঘটনাটি ঘটে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হাওড়া ব্রাঞ্চে। ব্রাঞ্চ এজেন্টের বাসস্থান ছিল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর ঠিক উপরে। এজেন্ট সাহেব বাসস্থান থেকে নেমে এসে অফিসের মধ্যে তাঁর চেম্বারে যখন প্রবেশ করতেন তখন ঐ ব্রাঞ্চের নিম্ন পদস্থ কর্মচারীগণকে সাহেবের চেম্বারের সামনে সারিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াতে হ'ত। সাহেব প্রত্যহ সকালে যখন তাঁর চেম্বারে প্রবেশ করবেন তখন কর্মচারীদের মিলিটারী কায়দায় সাহেবকে সম্মান জানাতে হবে। এইটাই ছিল আলোচ্য ব্রাঞ্চের প্রচলিত পদ্ধতি।

একদিন সাহেব তাঁর এক গুপ্তচরের কাছ থেকে খবর পেলেন যে জনৈক কর্মচারী বেশ কিছুদিন ধরে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সাহেবকে সম্মান প্রদর্শনে বিরত আছে। খবরটি শুনে সাহেবতো রেগে আগুন হয়ে উঠলেন। এতবড় একটা indiscipline (!) সাহেব বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি হেড অফিসে রিপোর্ট করে দিলেন যাতে এই রকম অপরাধ হেতু কর্মচারীটির চাকুরী যায়। তখন হেড অফিস কর্তৃপক্ষের চোখে ব্রাঞ্চের এজেন্টরা ছিলেন এক একজন যুধিষ্ঠির। তাঁরা যা বলতেন তাই ছিল ধ্রুবসত্য। সুতরাং এজেন্ট সাহেবের এক তরফা রিপোর্টের ভিত্তিতে অসহায় কর্মচারীটিকে চাকুরী খোয়াতে হয়েছিল।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ছিল না। যুগপৎ এই ব্যাঙ্কটি ছিল

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষাকারী একটি দুর্গ বিশেষ। এই ব্যাঙ্ক এবং এই ব্যাঙ্কের মত বহু প্রতিষ্ঠানের বাহিরে সাম্রাজ্যবাদের পর্বোন্নত পাওয়ারা মেহনতী মানুষকে বুটের তলায় থেঁতলে মেরেছে, সঙীনের খোঁচায় খুন করেছে, ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। অপর-দিকে এই ব্যাঙ্ক এবং এই ব্যাঙ্কের মত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকগণ সহায়হীন সম্বলহীন শ্রমজীবী মানুষকে হাতে না মেরে ভাতে মেরেছে। আলোচ্য কর্মচারীটি পরোক্ষভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বহু বলির অন্যতম।

এ-কথা অনস্বীকার্য্য যে সম্প্রতিকালে দৃশ্যপট ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান রাষ্ট্রায়ত্ত ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ভঙ্গিরও বেশ খানিকটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কিন্তু সেই তামসিকতার যুগে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের অকথ্য অত্যাচারের কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য কর্মচারী-গণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেদিন কর্মচারীগণের একমাত্র স্লোগান ছিল—মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। কিন্তু কে তাদের মুক্তি পথের সন্ধান দেবে?

একটা সময় আসে যখন তমসার আবরণও জড়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। ভয় তখন মন থেকে দূরে সরে যায়। সমস্যার চৌমাথায় দণ্ডায়মান দিশাহারা মানুষ তখন নতুন পথের সন্ধান পায়। আবার যাত্রা সুরু হয়। ১৯৪৪-৪৫ সাল। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণের মধ্যে দেখা দিল এমনই এক তরুন দল মনে যাদের অসাধারণ দৃঢ়তা, বুকে যাদের অদম্য সাহস। ইউনিয়ন এবং ইউনিয়ন কর্মীবৃন্দের তথা ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের কল্যাণসাধনে বদ্ধ পরিকর এই তরুনদল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের হাজার হাজার কর্মচারীকে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি পথের সন্ধান দেয়। ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের দুই যুগের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে এই তরুন দল জ্বালিয়ে দেয় এক প্রচণ্ড তমোনাসন আলো। তারা জড়ত্বকে আঘাত করে বুকের মধ্যে ঝড়ের মত্ততা নিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে।

এই প্রসঙ্গে সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থাটা একবার দেখে নেওয়া যাক্। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ সালে সুরু হয়ে ১৯৪৫ সালে শেষ হয়। যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল ছিল ইউরোপ। ক্রমশঃ সোভিয়েট রাশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পরাধীন ভারতবর্ষে এই যুদ্ধের সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর কাজের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণ প্রমাণ করে যে তারা নিজেদের শাসন ব্যবস্থা নিজেরা পরিচালনা করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। ১৯৪২ সালে গান্ধীজির ভারত ছাড় আন্দোলন (Quit India Movement), ১৯৪৩ সালে বাঙলার মন্বন্তর, ঐ ১৯৪৩ সালেই নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের সর্বাধিনায়কত্বে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার গঠন এবং ১৯৪৩-৪৪ সাল এবং পরবর্ত্তীকালে ছাত্র আন্দোলন, কৃষি আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলনের দুর্ব্বার স্রোত ভারতবর্ষের পাড় দিয়ে বইতে থাকে। এই সুযোগে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসো-সিয়েশনের সভ্যগণ উল্লিখিত তরুন দলের নেতৃত্বে সর্ব্বাত্মক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এমনিভাবে ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট নয়দফা দাবীর ভিত্তিতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রায় সাত হাজার কর্মচারী বাঙলা, আসাম, বিহার উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর অঞ্চলে অবস্থিত ব্যাঙ্কের প্রায় তিনশ' ছোট বড় অফিসের দরজা বন্ধ করে দেয়। যে নয় দফা দাবীর ভিত্তিতে এই ঐতিহাসিক ধর্মঘট সুরু হয় সেই দাবীগুলি এইরূপ :—

১) সমস্ত কেরানী, ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী এবং নিম্ন পদস্থ কর্মচারীগণের মাসিক বেতন শতকরা ৪০ টাকা বৃদ্ধিকরণ।

২) কর্মচারীগণ কর্ত্তৃক পেন্শন ফণ্ড বাবদ শতকরা ৫ টাকা দানের বিলোপ সাধন।

৩) সরকারী অফিসের ছুটির নিয়ম অনুসারে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের ছুটির নিয়ম প্রবর্ত্তন।

৪) ব্যাঙ্কের খরচায় কর্মচারীগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা।

৫) কেরানী থেকে উচ্চতর পদে উন্নতি লাভের যথোপযুক্ত নিয়ম প্রবর্তন।

৬) যে সমস্ত কর্মচারীগণকে পেন্‌শন্‌ দেওয়া হয় না তাদের গ্রাচুয়িটি দেবার ব্যবস্থা।

৭) কাজের সময় নির্দ্ধারণ।

৮) জীবনধারণের ব্যয়সূচী অনুসারে মাগ্‌গীভাতার হার স্থিরিকরণ।

৯) কোন কর্মচারীর সার্ভিস রেকর্ডে ক্ষতিকর মন্তব্য করবার পূর্ব্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীটির ত্রুটী সম্বন্ধে তদন্ত করণ।

যদিও কেবলমাত্র ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের দাবী দাওয়া পূরণের জন্য এই ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল তথাপি এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই ঐতিহাসিক ধর্মঘট থেকে যে আন্দোলনের স্রোত ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে বইতে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রদেশের (রাজ্যের) ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণ সেই স্রোতে অবগাহন করে। এই ধর্মঘটের অমোঘ প্রভাবে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণ ছাড়াও সারা দেশ ব্যাপী ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের মধ্যে এক অভিনব উৎসাহ ও উদ্দীপনার বন্যা বইতে সুরু হয়। মালিকগণ যে অপরাজেয় নয় এই বোধ ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের মনে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হয়। অনতিদূর ভবিষ্যতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণের মতন অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণও ইস্পাত কঠিন একতার মাধ্যমে সাংগঠনিক কর্মে আত্মনিয়োগ কোরে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়।

যত আঁধার তত আলো

(উপন্যাস)

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৩)

মলয়ের লেখা শেষ পর্য্যায় এসে পড়েছে।

......একটা প্রবল নেশার ঘোরে মৃগাঙ্ক পাগলের মত এগিয়ে চলেছিল। পরিণতির কথা চিন্তা করতেও অবকাশ পায়নি। তাই একান্ত আকস্মিক ভাবে যখন মৃদুলা তাকে খবরটা দিল মৃগাঙ্ক হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়াল। কথা তার গলার মধ্যে যেন আটকে গেল। অনতিবিলম্বে বিয়ের ব্যবস্থা না হ'লে একটা লজ্জাজনক পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে, মৃদুলা বলল। কিন্তু যাকে বলা হ'ল তার মধ্যে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না বরং কতকটা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে দেখে নিয়ে সে আরও কিছুদিন ভেবে দেখবার সময় চাইল।

মৃদুলা ভুল বুঝল কিংবা মৃগাঙ্ক ভুল ক'রল এটা বড় কথা নয়। মৃগাঙ্কর এই ধরণের দ্বিধা মৃদুলাকে সংশয়াকুল করে তুলল বিস্ময়াবিষ্ট করে তুলল। তার সমস্ত সত্তা ঘৃণা আর অবিশ্বাসের বিষে নীল হ'য়ে গেল। ভেবে দেখবার কথাটাই যদি এতদিন পরে তার মনে উদয় হ'ল তাহলে মৃদুলার ইহকাল নিয়ে এ-ভাবে ছেলে খেলা করল সে কিসের জন্ত। আর কেনই বা মৃদুলা তার এই ছেলে খেলার বিষ আকণ্ঠ পান করে ফুল ফোটাবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিল। এতবড় মিথ্যাচারীকে নিয়েই কিনা মৃদুলা একটি সুন্দর সংসার রচনার কল্পনা করেছিল।......

দরজা ঠেলে মনোরমা এসে ঘরে প্রবেশ করল। মলয় লেখা বন্ধ করে তাকে সাদর আহ্বান জানাল, এসো মনোরমা। তোমাকে আজ আমার বড় দরকার। তোমার দাদু বার হয়ে গেলেন দেখে তোমাকে ডাকতে যাবো ভাবছিলাম কিন্তু রঞ্জন তখন তোমাদের ঘরে তাই ফিরে এলাম

মনোরমা অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে মলয়ের মুখের পানে খানিক চেয়ে দেখে বলল, দরজা তো খোলা ছিল মলয়বাবু। ডাকলেন না কেন?

মলয় একটু হেসে বলল, দরজা খোলা থাকলেই প্রবেশ করা যায় না।

মনোরমা বলল, আপনাদের মত আমি ঘুরিয়ে ভাবতে পারিনা। কিন্তু কেন ডাকতে গিয়েছিলেন বলুন।

মলয় হেসে বলল, ব্যস্ত হচ্ছো কেন মনোরমা। আমার দরকার আছে জেনে তো তুমি আসো নি। অনেকদিন তোমাকে দেখিনি তাই।

মনোরমা অন্য প্রসঙ্গে উপস্থিত হল, আপনার বই কতদূর এগোল?

মলয় বলল, অনেক এগিয়েছে কিন্তু এখন বইয় কথা থাক। অন্য কথা বলো।

রঞ্জনবাবু কেন এসেছিলেন তাতো জিজ্ঞেস করলেন না? মনোরমা বলে।

ভারী সুন্দর এক ঝলক হাসি ফুটে উঠল মলয়ের মুখে। স্নিগ্ধ স্বরে সে বলল, নিশ্চয় তার কোন দরকার ছিল। শুনিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।

অঞ্জন তার দাদার জবানিতে অনুযোগ করে পাঠিয়েছিল, মনোরমা বলল।

মলয় বলে, এ-সব কথা আমি শুনতে চাই না মনোরমা।

মনোরমা বলল, কিন্তু আমি শুনতে চাই। আর সেই জন্তেই আপনার কাছে এসেছি। অঞ্জনকে আমি বড় ভালবাসি।

মনোরমার কথার ধরনে মলয় বিস্মিত হয়। বলে মানুষকেই মানুষ ভালবাসে। কিন্তু আমাকে এ-সব কথা হঠাৎ শোনাতে এলে কেন।

মনোরমা জবাব দেয়, তা জানি না। মন বলল, তাই আপনার কাছে চলে এলাম।

মলয় বলল, খুব আশ্চর্য্য তো।

মনোরমা নরম সুরে বলল, আপনার কাছে আসবার আগে এ-কথা আমারও একবার মনে হয়েছিল তবু থামতে পারিনি। কে যেন আমাকে ঠেলে এখানে নিয়ে এলো।

মলয় নীরব।

মনোরমা বলতে থাকে, কদিন ধরে নিজেকে আমি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিলাম। তাইতেই মনে হয়েছে অঞ্জনকে ভালবেসে আমার নিজের দুঃখকেই আরও বেশী করে ডেকে এনেছি। ও আমাকে দিন রাত ডাকছে কিন্তু আমি সাড়া দিতে পারছি না। আচ্ছা মলয়বাবু যারা অন্যায় আর অসংযত কথা বলে তারা কি কিছু দেখতে পায় না।

মলয় বলে হয়তো একটু বেশী দেখতে পায়—

মনোরমা বলে, ওদের মন আর যুক্তি দিয়ে দেখে নইলে অঞ্জনকে নিয়ে—ছি ছি। ও যে একেবারেই ছেলেমানুষ।

মলয় অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিল। বলল, তবুও তুমি সাড়া দিতে পারছো না মনোরমা।

মনোরমা ক্লান্ত সুরে বলল, আমি ভয় পাই—দুর্ব্বল হয়ে পড়ি।

মলয় সহসা সোজা হয়ে বসে, স্থির দৃষ্টিতে খানিক ওর মুখের পানে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলতে লাগল, তাহলে প্রশ্ন তোমার অঞ্জনকে নিয়ে নয়। অঞ্জন নিছক উপলক্ষ্য—

মনোরমা চমকে উঠে বিহ্বল কণ্ঠে বলে, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

মলয় কথা বলে না শুধু সস্নেহে ওর পানে চেয়ে থাকে।

মনোরমা মাথা তুলতে পারে না।

মলয় ওর আনত মুখের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় কথা কয়ে উঠল, ঠিক তোমারই মত আর একটি মেয়েকে আমি জানি। তোমারই মত সেও একদিন আমাকে এসে একই ধরণের প্রশ্ন করল। জিজ্ঞেস করল কি সে করবে?

মনোরমা কান খাড়া করে শুনতে থাকে কথা বলে না।

মলয় বলল, তারও ভাগ্য তাকে সব দিয়েও সর্ব্ববঞ্চিত করে রেখেছে। মেয়েটি কুমারী কিন্তু তার আত্মীয় পরিজন তাকে বিধবা সাজিয়ে রেখেছে, মেয়েটির বাপ আছে কিন্তু তাকে সে জানে না চেনে না। এই নিয়ে তার দুঃখ থাকলেও ক্ষোভ নেই। শান্তশিষ্ট মেয়েটি। মানুষকে সে ভালবাসে অবিশ্বাসও করে না। অথচ অপরের ভালবাসাকে সে ভয় করে। দেবার অধিকার আছে কিন্তু নেবার অধিকার নেই। এই অসহনীয় অবস্থার কথা তুমি ভাবতে পার মনোরমা?

মনোরমা অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দেয়, পারি। কথাটা বলে ফেলেই সে কুণ্ঠায় আর সংকোচে এতটুকু হয়ে গেল।

মলয় শুনেও যেন শোনেনি এমনি ভাবে বলতে থাকে, সে মেয়েটিও হয়তো পেরেছিল তাই নিজে হাতে আপন নির্ব্বাসন দণ্ড লিখে দিল। নিজের মনের পানে তাকিয়ে দেখলো না তার তৃষ্ণার্ত আত্মার কথা চিন্তা করল না। ভেবে ছিল এমনি করেই বুঝি রক্তের দাবিকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে।

মনোরমা মৃদু কণ্ঠে বলল, রাখতে পারেনি বুঝি?

মলয় আপন খেয়ালেই বলে চলল, কেমন করে বোঝাবে মনোরমা। প্রকাশ্যে সে যতটুকু বলেছে সেইটুকুইতো সব নয়। আসল সত্য রয়েছে তার বুকের মধ্যে। যা প্রকাশ করার পথে বহু বাধা—

মনোরমা প্রশ্ন করে, কেন?

মলয় বলে, বাধা ডিঙিয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করা সহজ নয় মনোরমা। সমালোচকের চোখ বলবে, এ অন্যায় অসংগত ..সমাজ বলবে অনাচার।...

মনোরমা ধীরে ধীরে বলল, সে ক্ষেত্রে আইন আছে।

মলয় মৃদু হেসে জবাব দিল, আইন করে মানুষের মন বদলান যায় না মনোরমা। আইন অনেক ভাল কথা বলে কিন্তু সে ভাল আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কতটুকু কাজে লাগে বলতে পার?

মনোরমা নীরব।

মলয় বলে চলে, অঞ্জনকে ভালবেসে তুমি নীতিভ্রষ্ট হও নি। এ ভালবাসার জাত আলাদা তবুও তুমি কাছে যেতে ভয় পাচ্ছ দুঃখের আঘাতে থেমে গেছো। যে কাজ তুমি নিজে পারনি সে কাজ অপরের কাছে কেমন করে আশা করবে?

মনোরমা বলল আপনার সেই মেয়েটির কথা বলুন।

মলয় গভীর কণ্ঠে বলে, আজও তার আত্মানুসন্ধান চলেছে। যাদের সে অনেক দিয়েছে তারা কতটুকু ফিরিয়ে দিতে চায়। কতটুকু সে নিতে পারে আর কতখানি দিতে পারে।

মলয়ের শেষ কথায় আর একবার সে চমকে ওঠে কিন্তু কথা বলতে পারে না।

মলয় বলে, কিছু বললে না যে মনোরমা?

মনোরমা মৃদু কণ্ঠে বলে, ভাবছিলাম নেবার কথা মেয়েটি ভাবতে গেল কোন ভরসায়।

আবহাওয়াটা হাল্কা করবার উদ্দেশ্যেই মলয় একটু হেসে বলল, মেয়েটির হয় বুদ্ধি নেই নয়তো দুঃসাহসী।

মনোরমা প্রশ্ন করে, দুঃসাহসী কেন বলছেন?

মলয় বলল, কারণ সে মেয়ে অঞ্জনের মত একজনাকে সামনে রেখে দশজনাকে ফাঁকী দিতে চায়।

একটু হাসবার চেষ্টা করে মনোরমা বলে, তাহলে সে মেয়ে দুঃসাহসী নয় বোকা।

মলয় প্রশ্ন করে, কেন?

কারণ আর দশজনাকে ফাঁকী দেবার আগে নিজেকেই সব চেয়ে বেশী ফাকী দিয়েছে। মনোরমা গম্ভীর ভাবে জবাব দিল।

মলয় বলল, তুমি তো বোকা নও। তুমি জেনে শুনে এগোতে পারছ না কিসের জন্য। অঞ্জন তা' তোমার কাছে সমস্যা নয় মনোরমা। তোমার সমস্যা অন্যত্র।

মনোরমা বলল, আমার সমস্যা আমি নিজেই মলয়বাবু।

মলয় বলল, অথচ একটু আগে তুমিই আইনের কথা বলেছিলে। আসলে আইন এখানে প্রধান নয়। প্রধান হলো মন।

মনোরমা বলে, আমার মন আমার বর্তমান অবস্থাকে মেনে নিয়েছে।

মলয় মাথা নেড়ে বলল, এ কথাটা তুমি ঠিক বলোনি মনোরমা। বরং মেনে নিতেও পারছে না গ্রহণ করতেও ভয় পাচ্ছে।

মনোরমার দৃষ্টিতে খানিকটা ভয় আর ভাবনা প্রকাশ পেল। মলয় তা বুঝতে পেরেই সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলল, আমাকে নিয়ে ভয় ভাবনার কোন কারণ নেই তোমার।

মনোরমা মন্ত্রমুগ্ধের মত বলতে থাকে, আমারও তাই মাঝে মাঝে মনে হয়। সেইজন্যই যখন তখন আপনার কাছে ছুটে আসি।

মলয় সহসা যেন বহু দূরে চলে গেল। অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, তোমার দাদুর মত আমিও তোমার শুভাকাঙ্খী কিন্তু তোমার দাদুর আছে অধিকার আর আমি একজন বাইরের লোক।

মনোরমা বলে, আপনার কথা সবসময় আমি বুঝি না। দাদুও মাঝে মাঝে আপনার মত করে কথা বলেন।

মলয় গভীর কণ্ঠে জবাব দেয়, হয়তো আমাদের

দুজনার জীবনের কোন একটা জায়গায় একইরকমের কোন সমস্যা আছে। যা একান্ত গোপনীয়। বলবার উপায় নেই।

মলয় পুনরায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মনোরমা বোকার মত চেয়ে থাকে।

আচ্ছা মনোরমা, যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে কথা বলছে এমনি জড়িয়ে জড়িয়ে মলয় বলে, রঞ্জনের নামতো তুমি একবারও উচ্চারণ করলে না। অথচ আমার মন বলে তাকে নিয়েই তোমার আসল সমস্যা।

মনোরমার দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটুখানি হাসবার চেষ্টা করে বলল, আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি আমার সমস্যা আমি নিজেই।

বলেই সে উঠে দাঁড়াল। প্রস্থান উদ্যত হয়েও আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আপনার পাণ্ডুলিপি খানা আমাকে দিন। পড়ে সম্ভব হ'লে কালই ফেরৎ দিয়ে যাব।

মলয় সস্নেহে বলল, নিয়ে যাও মনোরমা। কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝলে না তো।

ভুল বুঝবো কেন? মনোরমা বলে, আপনার জিজ্ঞাসার মধ্যে তো অসম্মান করবার চেষ্টা নেই মলয়বাবু—বরং আপনি আমাকে স্নেহ করেন এই কথাটার প্রকাশ পেয়েছে।

মলয় একটি আরামের নিশ্বাস ফেলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, মনোরমা তুমি আমাকে বাঁচালে—আমাকে সত্যিই বাঁচালে।

মলয়ের বলার ধরনে মনোরমা শুধু বিস্মিত হল না কতকটা অভিভূত হয়ে পড়ল।

[৩৪]

মলয়ের জীবনে আজ একটি সঙ্কটময় মুহূর্ত দেখা দিয়েছে। যদিও এমনি একটি পরিস্থিতির আশায়ই সে একদিন দিন গুনছিল।

মনোরমা তার পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে গেছে। অরই জীবনের বিগতদিনের গুটি কয়েক অধ্যায়। যে অধ্যায়গুলি এতদিন অন্ধকারে আত্মগোপন করে ছিল আলোর মুখ দেখার প্রত্যাশায়।

আর সেই গোপনতার বোঝা বইতে পারছে না। যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখিন হতেই সে প্রস্তুত। যতটুকু ভুল সে করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখ সে নিজে পেয়েছে। দিনের পর দিন বছরের পর বছর একটা ভারবাহী পশুর মত এই দুঃসহ দুঃখের বোঝা নিঃশব্দে বহন করে এসেছে। আর সে বইতে পারছে না। তার অতৃপ্ত আত্মা হাহাকার করে উঠেছে।

মলয় আজ যাবার কথাও ভুলে গেছে। ঘড়ির কাঁটা একটু একটু করে সরতে সরতে বারটায় গিয়েছে। রাস্তার কোলাহল থেমে গেছে। আকাশে আজ প্রচুর মেঘ জমেছে। বহুদিনের অসহ্য গুমোট গরমের পর বহু প্রত্যাশিত মেঘ। বৃষ্টি দেখা দেবে কিনা কে জানে?

রাজার বাড়ীর হৈ চৈ থেমে গিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে রাজার বাড়ী। ঘুম নেই শুধু মলয়ের চোখে। জেগে জেগেই সে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখছে সে বুলাকে। পরম নির্ভরতায় যে মেয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। তার জীবনের সকলদিক পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। তারপর...

মলয়ের বন্ধ দরজায় মৃদু আঘাত হল। তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। মলয় কান পেতে শোনে একবার, দু'বার তিনবার। মলয় যেন প্রস্তুত হয়ে ছিল এমনি ভাবে আহ্বান জানাল দরজা খুলে, কে? ও আপনি—আসুন।

দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন জগন্নাথ চৌধুরী। চোখদুটো তাঁর বাঘের মত জ্বলছে। মলয় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জগন্নাথ আর একবার অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলে উঠলেন, এই পাণ্ডুলিপিখানি তুমি মনোরমাকে দিয়েছো?

হ্যাঁ—মলয় জবাব দিল।

জগন্নাথ মুখ ভেংচে বললেন, বাহাদুরী করেছো। এ বই মনোরমা যদি পড়বার সুযোগ পেতো আর

ফল কি হতো মৃগাঙ্ক রায়। তোমার উপর শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে তাকে আত্মহত্যা করতে হতো।

মলয় কুণ্ঠিত হয়ে বলল, কথাটা আমার ভাবা উচিত ছিল।

খানিক চুপ করে তিনি বলতে লাগলেন, তুমি মলয় রায়—মৃগাঙ্ক রায়। খাসা ভোল পালটেছো। একদিনের জন্যও চিনতে পারিনি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি বৃহন্নার অতবড় সর্বনাশ করেও কি তোমার আশ মেটেনি?

মলয় নীরব।

জগন্নাথ বলতে থাকেন জবাব দিতে খুব কি লজ্জা পাচ্ছ মৃগাঙ্ক? বরাবরই তোমার উপর আমার সন্দেহ ছিল কিন্তু হতভাগী কিছুতেই নাম প্রকাশ করেনি। কিন্তু তুমি আবার কিসের জন্য আমার পিছু নিয়েছো। বাহাদুরী করে নিজের স্বরূপ প্রকাশ না করলেই কি চলতো না তোমার। আমার এতটুকু সুখও কি তোমার সহ্য হচ্ছে না মৃগাঙ্ক। আমি ত তোমার ক্ষতি কোনদিন করিনি।

মলয় এতক্ষণে কথা বলল, আপনি সবকথা জানেন না বলেই একথা বলেছেন। আমি অপরাধী একথা ঠিক কিন্তু আপনি নিজেও কম অন্যায় করেন নি।

জগন্নাথ ধমক দিলেন, চুপ কর মৃগাঙ্ক।

মলয় চুপ করতে পারল না। অবিচলিত কণ্ঠে বলতে লাগল, আপনি কোন যুক্তিতে মেয়েকে নিয়ে রাতারাতি দেশ ছেড়ে চলে গেলেন? কেন আপনি কটাদিন অপেক্ষা করে দেখলেন না। আপনি নিজেই বলেছেন যে, আপনার সন্দেহ আমার উপরই ছিল—অথচ একবার আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবার সাহস আপনার কেন হয়নি। তা যদি করতেন এতগুলি জীবন তাহলে এমন করে—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে জগন্নাথ গর্জন করে উঠলেন, তোমাকে সাফাই গাইতে হবে না মৃগাঙ্ক।

মলয় শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে পুনরায় জবাব দিল, আপনার রাগ করবার যথেষ্ট কারণ আছে কিন্তু আমি সাফাই গেয়ে আজ আর কতটুকু লাভ করবো বলতে পারেন। ক্ষতি আপনার দিক থেকেও হয়েছে আমার দিক থেকেও হয়েছে কিন্তু তা নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আমি নির্দোষ এমন কথা একবারও আমি বলছি না। আমার পাণ্ডুলিপিখানি হাতে নিয়ে আপনি ছুটে এসেছেন। আগাগোড়া আপনি পড়েছেন বলেই আমার ধারণা কিন্তু ওখানেই আমার বক্তব্য শেষ হয়নি। আমার অস্থির বুদ্ধি আমাকে স্থির সিদ্ধান্ত করতে বিলম্ব ঘটিয়েছিল তার প্রায়শ্চিত্ত আমি করেছি। আপনি করেছেন আপনার অপরাধের—

বাধা দিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জগন্নাথ বলেন, আমার অপরাধ…তিনি থতিয়ে গেলেন।

মলয় জোরের সংগে বলল, আপনার মেয়েকে আপনি এমন শিক্ষা দিয়েছিলেন যে সে একবারও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে নি—আমার দ্বিধাগ্রস্ত জবাবে চাবুক মেরে সায়েস্তা করতে পিছিয়ে গেল। তেমনি আপনি—মেয়ে বলল, আর আপনি সংগে সংগে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। শক্ত হ'তে ভয় পেলেন।

জগন্নাথ নীরব। ধৈর্য্যের সংগে মলয়ের অভিযোগ গুলি শুনে চলেছেন।

মলয়ের কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কাঁপছে। সে ব'লতে থাকে, ঘটনার আকস্মিকতায় আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছিলাম। সাহস হারিয়েছিলাম কিন্তু তা সাময়িক ভাবে। তারপরে আমি পাগলের মত আপনাদের অনুসন্ধান ক'রে ফিরেছি পাইনি। যখন পেলাম তখন আত্মপ্রকাশ করবার মন আ র হারিয়ে ফেলেছি। বৃহন্নার মৃত্যু সংবাদ আমার বুদ্ধিকে অবসাদগ্রস্ত করে ফেলল। তারপর কয়েক বছর যে আমার কোথা দিয়ে কেমন করে কেটেছে সেকথা আমি নিজেও জানি না। কিন্তু এসব কথা আজ আর বলেই বা কি হবে, আর বিশ্বাস করবেই বা কে?

জগন্নাথ নিরস কণ্ঠে বললেন, তুমি বলো আমি শুনব। এতদিন চুপ করে থেকে আজ কেন, আমাকে অভিযোগ দিতে সাহস করলে তা আমাকে জানতেই

হবে। একজনার মৃত্যুর সংগে সংগে সব শেষ হয়ে গেছে মনে করে—

তাঁকে বাধা দিয়ে মলয় বলল, না শেষ হ'য়ে যায় নি। শেষ হ'য়ে যেতে পারে না তাই আবার নতুন করে আমার খোঁজা সুরু হ'লো। মৃদুলা গেছে কিন্তু মনোরমা এখনও আছে। তার জন্তই মৃগাঙ্ক আজ এখানে।

সহসা জগন্নাথের মুখোভাব কঠিন হ'য়ে উঠল। তিনি রূঢ় কণ্ঠে বললেন, কিন্তু কেন? বাপের কর্তব্য পালন করতে বুঝি?

জগন্নাথের কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক পরিবর্তনে মলয় সহসা হচোট খেল। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে ম্লান কণ্ঠে বলল, আপনি ঠাট্টা করলেও কথাটা সত্য।

জগন্নাথ নিরস সুরে বললেন, নিজের পরিচয় দিতে পারবে তো মৃগাঙ্ক রায়।

মলয় শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, সেটা আপনার উপর নির্ভর করে।

জগন্নাথের কণ্ঠে বিস্ময় ফুটে উঠল, আমার উপর নির্ভর করে। এটা বেশ কথা বলছো তুমি। জগন্নাথ পাগলের মত হা হা করে হেসে উঠলেন।

হাসির শব্দে মলয় চমকে উঠল। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বলল, আপনি এভাবে হাসছেন কেন? আপনার স্বীকৃতি—

জগন্নাথ ধমক দিলেন, থামো। আমার স্বীকৃতি... তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি মৃগাঙ্ক। কার জন্যে আমি তোমাকে স্বীকার করতে যাব ব'লতে পার?

মলয় শান্ত সুরে জবাব দিল, মনোরমার ভবিষ্যতের জন্ত—

জগন্নাথ একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মনোরমার ভবিষ্যৎ। সে তো অনেক আগেই আমি স্থির করে দিয়েছি। এক পরিচয়হীন নাম-গোত্রহীন মেয়ের ..

বাধা দিয়ে মলয় বলল, সে তো মিথ্যে—

জগন্নাথ প্রশ্ন করেন, কোনটা মিথ্যে মৃগাঙ্ক রায়?

মলয় জবাব দিল, মনোরমার বৈধব্য।

জগন্নাথ ক্লান্ত গলায় বলেন, দেখছি অনেক খবরই তুমি সংগ্রহ করেছো।

মলয় নীরব।

চুপ করে আছো কেন, জগন্নাথ বলেন, বলো যে, কেন ঐ মেয়েটির মাথায় এতবড় একটা মিথ্যার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হ'লো। কেন ওকে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

মলয় তথাপি কথা বলে না।

জগন্নাথ বলেন, জীবনটা বড় সুন্দর মৃগাঙ্ক কিন্তু আমার ভাগ্য হু'চোখ ভরে সে সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করতেও দেয়নি।

মলয় তবুও চুপ করে থাকে। জগন্নাথ এতক্ষণ ধরে যত কথা বলেছেন তা ওর কানে গেছে কিনা তাও বোঝা গেল না।

জগন্নাথ বললেন, তোমার বইয়ের পাণ্ডুলিপিখানি আমি পড়েছি মৃগাঙ্ক কিন্তু যে কথা প্রকাশ করতেও মানুষ লজ্জা পায় তাই নিয়ে এতো বাড়াবাড়ি ক'রতে গেলে কেন? সোজা আমার কাছে যাওনি কিসের জন্ত।

এতক্ষণ পরে মলয় মুখ খুলল; এ ক্ষেত্রেও আমার হিসেবের ভুল রয়েছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপির কথা থাক, মনোরমার সম্বন্ধে কি করতে চান তাই বলুন। আমি অনেকদিন ধরে দেখে শুনে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি যে মনোরমাকে আপনি চোখ বেঁধে একখানি পথ নিয়ে এলেও তার কৌতূহলী দৃষ্টি আসে-পাশের অনেক কিছু দেখতে দেখতে এসেছে। আপনি আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

জগন্নাথ বিস্মিত কণ্ঠে বলেন, তুমি যে আবার নতুন কথা শোনাতে সুরু করলে।

মলয় বলল, নতুন আর কি। আপনার বহু আয় চেষ্টা ওর বাইরের চেহারাটা বদলাতে পারলেও মনের চেহারা পুরোপুরি পালটাতে পারেনি। মানুষের বুকের চিরন্তন সত্যটাই প্রকাশ পাবার জন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। একটু লক্ষ্য করলে আপনি নিজেও একই কথা বলতেন।

মলয় থামল, জগন্নাথ নিঃশব্দে বসে আছেন—মুখে তার চিন্তার ছায়া নেমে এসেছে।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মলয় পুনরায় বলতে সুরু করল, আপনার কাছে ক্ষমা পাবার আশা নিয়ে এতবছর আপনাদের আমি খুঁজে বেড়াইনি।

একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জগন্নাথ জিজ্ঞেস করেন, তাহলে কিসের জন্ম একাজ করেছো শুনি?

মলয় দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, আমার সাময়িক দুর্বলতা আর একটি নিরপরাধ মেয়ের জীবনটা ব্যর্থ করে দেবে এই চিন্তাই আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। আমি যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে আপনাদের খোঁজে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু সাক্ষাৎ পেলাম বড় দেরীতে, এখানে এসে।

জগন্নাথ চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে আছেন। কি ভাবছেন তা তিনিই জানেন। হয়তো জীবনের শেষ সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে শেষবারের মত পিছন ফিরে তাকিয়ে হিসেব করতে বসেছেন। মিলিয়ে দেখছেন কাজের খতিয়ান। একটির পর একটি ঘটনাকে পাশা-পাশি সাজিয়ে তিনি আবার নতুন করে মিলিয়ে দেখছেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও মেলাতে পারছেন না। মলয়ের অভিযোগগুলি তাঁকে নতুন সমাধানের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছে।

অনেকক্ষণ ধরে দুজনেই চুপ করে বসে আছে। মলয়ের দৃষ্টি জগন্নাথের মুখের পানে স্থির নিবদ্ধ। এমন আরও খানিক কেটে যাবার পর একসময় মলয় ধীরে ধীরে কথা ক'য়ে উঠল, আজ আর নতুন ক'রে আমার কাজের বিচার করতে বসবেন না এ আমার একান্ত অনুরোধ। আমি ক্ষমার অযোগ্য তা জানি কিন্তু মনোরমাকে যে আপনি ভালবাসেন তার মধ্যে ত' কোন মিথ্যা নেই। তাকে আপনি বাঁচতে দিন। সে তার সত্য পরিচয় জানুক।

জগন্নাথ ভগ্ন কণ্ঠে জবাব দিলেন, সে পরিচয় কি মনোরমা সহ্য করতে পারবে মৃগাঙ্ক।

মলয় বলল, আপনি কি ভেবে একথা বলছেন আমি বুঝি না। মৃদুলা আমার স্ত্রী—মনোরমা আমাদের উভয়ের সন্তান। এ পরিচয়ের মধ্যে কোন গ্লানি নেই।

জগন্নাথ পুনরায় চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর মাথার মধ্যেটা দপ দপ করছে। এত বিক্ষিপ্ত চিন্তার বোঝা আর বইতে পারছেন না। তাঁর চোখের সম্মুখের সব আলো নিভে গিয়ে চতুর্দিকে অন্ধকার হয়ে গেছে। মলয় মশাল জ্বালিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু এই সামান্য আলো কি এত পুঞ্জিভূত গাঢ় অন্ধকার দূর করতে সক্ষম হবে?

মলয় পুনরায় বলল, মনোরমার জন্যও কি এই সামান্য মিথ্যাকে আপনি মেনে নিতে পারবেন না? একদিন মনোরমার জন্য যে মিথ্যাটাকে সত্য বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন আজ না হয় তারই জন্য সেই মিথ্যাটাকে মিথ্যা বলে স্বীকার করে নিন।

জগন্নাথ ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে থাকেন। বলেন, মনোরমার যথার্থ পরিচয় তো প্রকাশ করার যোগ্য নয় মৃগাঙ্ক। মনোরমা তার বর্তমান জীবন-যাত্রার অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আবার তাকে নতুন ক'রে দুঃখ দিতে চাইছো কোন্ যুক্তিতে?

মলয় উত্তেজিত হ'য়ে উঠল, বলল, মনোরমার সত্য পরিচয়ের মধ্যে দুঃখ কোথায় দেখছেন। আপনি মেনে নিলেই সব গ্লানি আর অসম্মান মুছে যাবে। আমি মৃদুলাকেও অস্বীকার করছি না—মনোরমাকেও এড়াতে চাই না। যদি চাইতাম তাহলে আপনার কাছে এভাবে ভিক্ষা চাইতে আসতাম না। মৃদুলা তো আমাকে সবদিক দিয়েই মুক্তি দিয়ে গিয়েছিল।

জগন্নাথ পুনরায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'লেন। মলয়ের কথাগুলিই যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে দেখছেন। একসময় ধীরে ধীরে চোখ মেলে বললেন, তুমি আমার চেয়েও দুর্ভাগা। কিন্তু আমি যে কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না। আমি শুধু পরিণতির কথাই ভাবছি। মনোরমা যদি বলে আমি কেন তার জীবন নিয়ে এতবড়

ছেলেখেলা করেছি তার কি জবাব দেব ব'লতে পার মৃগাঙ্ক ?

জগন্নাথ ক্লান্ত সুরে বলতে থাকেন, তুমি আমাকে নিজে হাতে ফাঁসীর দড়ি গলায় পরতে ব'লছো মৃগাঙ্ক। মনোরমার এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না— মনোরমার জন্তই দেওয়া সম্ভব হবে না।......বলতে বলতে তাঁর মনটা যেন অনেক দূরে চলে গেল। আর দূর থেকে তিনি ফিস ফিস করে ব'লতে লাগলেন, মনোরমা ফিরে পাবে তার বাপকে...জীবনের একটা সুন্দর দিক তার কাছে খুলে যাবে...তার বন্ধ্যা কল্পনা পুত্রবতী হবে আর জগন্নাথ চৌধুরী তার পরিবর্তে পাবে ঘৃণা আর অশ্রদ্ধা। তার মনোদিদি তাকে ক'রবে ঘৃণা। কিন্তু সেতো মনোরমাকে ফাঁকি দিবার জন্ত এ পথকে বেছে নেয়নি এবং চতুর্দ্দিকের ফাঁক বোজাতে গিয়েই এতবড় অকরুণ ব্যবস্থা তাঁকে ক'রতে হ'য়েছিল। বলো দেখি মৃগাঙ্ক এতোবড় প্রচণ্ড আঘাত জগন্নাথ চৌধুরী কেমন ক'রে সহ্য ক'রবে।

জগন্নাথের কণ্ঠস্বর বুজে গেল। চোখদুটো চক্ চক্ ক'রে উঠল।

এরপরে মলয় সহজে কথা ব'লতে পারে না। কিন্তু চুপ ক'রে থাকলে তার চ'লবে না। আজ বিশ বছর ধরে যে ক্ষণটির সে অপেক্ষা ক'রে এসেছে সেই দুর্লভ মুহূর্ত্ত আজ তার সম্মুখে। মলয় জোর ক'রে তার সকল দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ধীরে ধীরে বলতে থাকে, সব দিক বজায় থাকে এমন কোন পথ যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তাহ'লেও মনোরমার জন্ত এ আঘাত আপনাকে সইতে হবে। আপনি আর কদিন, কিন্তু মনোরমার সামনে দীর্ঘ দিন পড়ে রয়েছে। আমার কথাটা আপনি আর একবার ভেবে দেখবেন।

জগন্নাথ বার বার মাথা নাড়তে থাকেন। বলেন, জীবন ভর শুধু ভেবেই গেলাম মৃগাঙ্ক রায়। আর একবার না হয় তোমার কথামত ভেবে দেখবো। আমার মনোদিদির যদি তাতে মঙ্গল হয় নিশ্চয় আমি ভাববো। কিন্তু তুমি ঠিক জান আমার হতভাগিনী চিরদুঃখী মনোদিদির এতে ভাল হবে? সে ঠকবে না? তার জীবন ভরে উঠবে?

মলয় দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আমার তাই বিশ্বাস। সমস্যা যেমন মানুষ সৃষ্টি করে সমাধানও সেই মানুষই করে।

জগন্নাথ আর দ্বিতীয় কথা না বলে উঠে দাঁড়ালেন। মাতালের মত টলতে টলতে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। মলয় তার চলার পথের পাশে ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

(৩৫)

মনোরমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, তোমার দুটি পায়ে পড়ি দাদু আমাকে আর এভাবে কষ্ট দিও না। যা ব'লবার তা বলে ফেল।

জগন্নাথ হাসতে হাসতে বললেন, লটারীতে হঠাৎ অনেক টাকা পাওয়ার সংবাদ পেলে অনেক সময় মানুষ তা সহ্য ক'রতে পারে না এ কথা জানিস তো দিদি?

মনোরমা রাগ ক'রে বলল, আমি লটারীর টাকাও পাইনি সহ্য করার কথাও তাই অচল।

জগন্নাথ বলেন, আমি আজ তোকে এমন একটা খবর দেবো দিদি যার কাছে লটারীর টাকা পাওয়া অতি তুচ্ছ ভাই।

মনোরমা রাগ করে বলে, তুমি কি আমায় পাগল পেয়েছো দাদু?

জগন্নাথের মুখে কেমন একপ্রকারের হাসি। তিনি মাথা নেড়ে বলেন, কে যে পাগল কাল সারারাত ধরে এই কথাটাই ভেবেছি দিদি—

জগন্নাথ হা হা ক'রে হেসে উঠলেন।

মনোরমা ডাকাল, দাদু—

জগন্নাথ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, কি ভাই—

মনোরমা তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কতকটা অভিযোগের সুরে বলল, তুমি তো এভাবে আমার সঙ্গে কোন দিন ঠাট্টা করোনি দাদু।

জগন্নাথ যেন কানে কানে কথা ব'লছেন এমনি চাপা সুরে বলতে থাকেন, আজও করিনি ভাই। আমার মনোদিদির জীবন মরণ সমস্যা নিয়ে তার দাদু কি

কখনও ঠাট্টা ক'রতে পারে বিদি? তোর দাদুর উপর অনেক অভিমান জমা হ'য়ে আছে—

মনোরমা বাধা দিয়ে বলল, এমন কথা কোন দিন তোমাকে আমি বলিনি দাদু।

জগন্নাথ বললেন, সব কথা কি ব'লতে হয় মনোদিদি। তোর দাদু কতগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেন যে নির্ব্বাক হ'য়ে থাকতো, কেন যে তাঁর দুঃখের কথা একদিনের জন্যও প্রকাশ ক'রতে পারেনি আজ তা বুঝতে পারবি ভাই।

মনোরমা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। জগন্নাথের এই রহস্যময় কথাবার্ত্তা তাকে কতকটা ভীত করে তুলেছে।

অবস্থাটা জগন্নাথ বুঝতে পেরেই পুনরায় ব'ললেন, আমার দিদিভাইকে পাছে অমঙ্গল স্পর্শ করে সেই ভয়ে সব সময় আমাকে সাবধান হ'তে হ'য়েছে। কিন্তু আজ আর আমার সে ভয় নেই। আজ সেই গল্পই শোনাব— তবে তা তোকে একলা নয়। রীতিমত লোক ডেকে সমারোহ করে—

জগন্নাথকে বাধা দিয়ে মনোরমা বলল, তুমি দেখছি রূপকথা সুরু করে দিলে।

জগন্নাথ হেসে হেসে বলতে থাকেন, মানুষের জীবন নিয়েই রূপকথার সৃষ্টি মনোদিদি। ভালকথা, একবার চট করে ঘুরে আসতে পারিস ভাই।

মনোরমা প্রশ্ন করে, কোথায় যেতে হবে? লোক ডাকতে নাকি?

জগন্নাথ বললেন, ঠিকই আন্দাজ ক'রেছো মনোদিদি। মলয় সাহিত্যিক, রঞ্জন, অঞ্জন, আর তোমার আচার্য্য কাকাকে ডেকে আনবে।

মনোরমা চেয়ে রইল।

জগন্নাথ পুনরায় বললেন, না বোঝার মত শক্ত কথা তো কিছু বলিনি ভাই। দেরী করো না যাও ওদের ডেকে নিয়ে এসো।

মনোরমা দ্বিরুক্তি না ক'রে অলীতিকলমে বার হ'য়ে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যে মলয় এসে ঘরে প্রবেশ ক'রল। বলল, আমাকে ডেকেছেন আপনি?

হ্যাঁ, জগন্নাথ বললেন, তেবে দেখলাম তোমার কথাই ঠিক। সমস্যা যেমন মানুষ সৃষ্টি করে সমাধানও সেই মানুষকেই করতে হয়। আমিও একটা সহজ সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছি বুধাত।

মলয়ের চোখমুখ উজ্জল হয়ে উঠল।

জগন্নাথ বললেন, তোমাদের জীবনের এই নতুন অধ্যায়ে তোমার বইখানি শুধু অপ্রয়োজনীয়।নয় বিপদজনক তাই এখানা আমি আগুনে আহুতি দিয়েছি বুধাত।

মলয় মুহূর্ত্তের জন্য একবার চমকে উঠে পুনরায় স্থির হয়ে বসল। বলল, আপনার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা আমার অজানা তবুও আমার মনে হয় খুব সামান্য কারণে এ কাজ আপনি করেন নি।

জগন্নাথ কিছু একটা ব'লতে গিয়েও থামলেন। আচার্য মশাই রঞ্জন আর অঞ্জন দরজার সম্মুখে দেখা দিয়েছে।

জগন্নাথ সকলকে সাদর আহ্বান জানালেন।

আচার্য্য মশাইর সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জন, অঞ্জন এবং মনোরমাও এসে ঘরে প্রবেশ করল।

আচার্য্য মশাই প্রথমে কথা কইলেন, হঠাৎ এমন জরুরী তলব কেন চৌধুরী মশাই?

জগন্নাথ প্রফুল্ল কণ্ঠে বললেন, আপনাদের আজ আমার জীবনের রূপকথা শোনাবার জন্য আহ্বান করেছি আচার্য্য মশাই। কিন্তু তার আগে সকলে বসুন, মনোদিদি তুমি এদের বসবার ব্যবস্থা করে দাও ভাই।

যোগেন আচার্য্যর চোখে মুখে বিস্ময়।

অলীতিকলমে ব্যবস্থা হ'ল। সকলে গোল হ'য়ে বসেছে। মাঝখানে জগন্নাথ চৌধুরী। গল্প শোনাবার মতই একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। অঞ্জন মনোরমার গা ঘেঁষে বসে ফিস ফিস করে বলল, ব্যাপার কি মনোদি?

মনোরমা ততোধিক চাপা কণ্ঠে বলল, বুঝতে পারছি না তাই।

জগন্নাথের এই সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের কথাই সকলে ভাবছে। হঠাৎ এমন নাটকীয় ভাবে ঘরে ডেকে কি বলতে চান জগন্নাথ চৌধুরী?

জগন্নাথ একটু নড়ে চড়ে বসে অবিচলিত কণ্ঠে সুরু ক'রলেন, আমি জানি আমার কাহিনী শুনে তোমরা অনেকেই হয়তো আমাকে পাগল ব'লে ঠাট্টা ক'রবে। আজ বিশ বছর ধরে আমি নিজেও নিজেকে অনেক সময় পাগল বলেই ভেবেছি। কিন্তু আজ আর আমার কোন ক্ষেদ নেই। আমি সাফল্যের সঙ্গেই আমার ব্রত উদযাপন ক'রতে পেরেছি। অবশ্য এই সাফল্যের মূলে র'য়েছে মনোদিদি।

হঠাৎ কথা বন্ধ করে তিনি যোগেন আচার্য্যকে প্রশ্ন করেন, আপনি ভাগ্য মানেন আচার্য্যি মশাই।

যোগেন আচার্য্য সংক্ষেপে জবাব দিলেন, খুব মানি—

জগন্নাথ অকারণে অনেকটা জোর দিয়ে বললেন, আমিও মানি আর একটু বেশী ক'রেই মানি। আমার একমাত্র মেয়ে বৃহন্নলাকে যেদিন হারালাম মনোরমা তখন দিন কয়েকের শিশু। বলো দেখি তোমরা ভাগ্য না মেনে আমি কি করি? কদিনের শিশুর যখন তার মাকেই একান্ত প্রয়োজন তখনই তাকে চলে যেতে হবে কেন। অনেকে সহানুভূতি দেখাতে এলে একরত্তি একটি শিশুর ভাগ্যকে দোষারোপ করে চলে গেল। ভাগ্য ওর খারাপ একথা আমারও মনে হ'য়েছে কিন্তু ঐ শিশুতো তার ভাগ্যকে নিজে হাতে গড়েনি। অপরাধ যদি কেউ ক'রে থাকে সে ওর ভাগ্য বিধাতা।

জগন্নাথ মুহূর্তের জন্য থেমে কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, আমার বৃহন্নলার দিন কয়েকের শিশু সন্তানকে বুকে তুলে নিলাম। চোখ বুজে আমি বৃহন্নলার স্পর্শ অনুভব ক'রতাম তার সন্তানের ভিতর দিয়ে। মনোরমা তার দাদুর বুকে মানুষ হ'য়ে উঠতে লাগল। জগন্নাথ চৌধুরী আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ ক'রলেন।

এমনি দিন হঠাৎ আমার কুলগুরুর আবির্ভাব ঘটল আমার বাড়ীতে। আমার স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার ক'রে দিলেন তিনি। বৃহন্নলার মেয়েকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি। তার কপালে বৈধব্য যোগ র'য়েছে দেখে।

আচার্য্য মশাই অন্যমনস্ক ভাবে বলেন; বলেন কি চৌধুরী মশাই!

জগন্নাথ বললেন, হ্যাঁ এই কথাই তিনি আমাকে জানালেন। সিদ্ধপুরুষ কুলগুরুর কথা আমি অবিশ্বাস ক'রতে পারিনি। ভাবুন দেখি আমার তখনকার মনের অবস্থাটা। আমি হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়লাম।

ঘরের মধ্যে থম থমে নিস্তব্ধতা বিরাজ ক'রতে লাগল। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

জগন্নাথ চোখ বুজে খানিক বসে থেকে একসময় পুনরায় বলতে সুরু ক'রলেন, গুরুদেব আমার অবস্থা দেখে বহুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন। এক সময় তিনি দৃষ্টি নামিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হয়তো একটা উপায় হ'তে পারে জগন্নাথ। কিন্তু তোমার তো এভাবে ছেলেমানুষের মত ভেঙে পড়লে চলবে না। তিনি আরও বললেন যে, সেই রাত্রেই ধ্যানস্থ হবেন এবং মায়ের কোন আদেশ পেলে হয়তো একটা বিহিত করা সম্ভব হবে।

সে রাতটা যে আমার কোনদিক দিয়ে আর কেমন কেটেছিল তা আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না। পরদিন সকাল হ'তেই ছুটে গিয়ে গুরুদেবের চরণ বন্দনা ক'রতেই তিনি গুরু গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন, মায়ের আদেশ পেয়েছি জগন্নাথ কিন্তু সে যে বড় নির্মম কাজ বাবা—তুমি কি তা পারবে?

আমি আশায় আনন্দে নেচে উঠলাম। বললাম, আমার বৃহন্নলার সন্তানের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ ক'রতেই আমি পিছু হ'ঠবো না গুরুদেব।

তাঁর আদেশ পেলাম। বড় কঠিন সে আদেশ। পালন ক'রতে গিয়েই মনোরমার বাপের সঙ্গে আমার

মুখ দেখা দেখি বন্ধ হ'য়ে গেল। আমি মনোরমাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালালাম।

মনোরমা বিচলিত কণ্ঠে ডাকল, দাদু—

অনেক দূর থেকে যেন জগন্নাথ কথা বলছেন এমনি ভাবে বলতে লাগলেন, বাধা দিসনে মনোদিদি। আজ যখন আমার প্রাণ খুলে কথা ব'লবার দিন এসেছে তখন ব'লতে দে ভাই। গোপনতার বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে হালকা হ'তে দে। আমি আর পারছিলাম না—অসহ হ'য়ে উঠেছিল। তার পরে মা হয় তোর দাদুর কাজের বিচার ক'রে যত খুশী শাস্তি দিস। আমি মাথা পেতে নেবো।

মলয়ের দুচোখ চক্ চক্ করতে থাকে। যোগেন আচার্য্য গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনছিলেন। সহসা তিনি কথা ক'য়ে উঠলেন, তার পর চৌধুরী মশাই ?...

জগন্নাথ বলতে লাগলেন, মনোরমার এ যুগের আধুনিক বাপ তার সে যুগের অদৃষ্টবাদী দাদুর এই যুক্তিহীন বিশ্বাসকে আমোল দিল না। কোমর বেঁধে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে এগিয়ে এল। জগন্নাথ তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন নাতনীর অমঙ্গল ভয়ে পাগল হ'য়ে উঠলেন। শেষ পর্য্যন্ত আর কোন উপায় না দেখে মনোরমাকে নিয়ে দেশ ত্যাগ করলেন। গুরুদেবের অনুজ্ঞা মত তাঁকে চলতেই হবে। লোকে জানল, মনোরমা তার বাপের পাগলামীর জন্যে বালবিধবা।

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হ'লেও বোধকরি উপস্থিত কেউ এতখানি বিস্মিত হ'ত না।

মনোরমা আর্তনাদ করে উঠল, দাদু—

যোগেন আচার্য্য উচ্চ কণ্ঠে বললেন, এ সব আপনি কি শোনাচ্ছেন চৌধুরী মশাই ?

জগন্নাথ পাগলের মত হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন, রূপকথা, রূপকথা আচার্য্য মশাই। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে কোথাও একবিন্দু মিথ্যে নেই। গত বিশবছর ধরে যে বৈধব্য যন্ত্রণা মনোদিদিকে সইতে হ'য়েছে সেটা আসল বৈধব্যকে এড়িয়ে যাবার জন্য। আমার গুরুদেবের এইটিই ছিল নির্মম আদেশ। আর সে আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।

অঞ্জন কতকটা উত্তেজনার বশে মনোরমার একখানি হাত ধরে ডাকল, মনোদি—

মনোরমা ঠিক যেন তার বশে নেই। ঠক ঠক করে কাঁপছে। অঞ্জন বারে বারে ডাকছে—মনোদি—

যোগেন আচার্য্য বললেন, এমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কথা আর শুনিনি।

মলয় এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, সহসা সকলকে অবাক করে দিয়ে জগন্নাথের পদধূলি মাথায় নিয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ কণ্ঠে বলল, সেদিনে আপনাকে চিনতে আর বুঝতে ভুল করলেও আজ করবো না। আমাকে আপনি ক্ষমা ক'রবেন। আমি স্বীকার ক'রে নিচ্ছি যে, এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হ'তে পারতো না।

জগন্নাথ প্রাণখুলে হেসে উঠলেন, আচার্য্য মশাই আজ আমার বড় আনন্দের দিন। মনোদিদির বাপ আমার হাতে হাত মিলিয়েছে। তিনি আর একবার হেসে উঠলেন।

সহসা অঞ্জনের শঙ্কিত চীৎকারে জগন্নাথের হাসি থেমে গেল। মনোরমার সারা দেহটা যেন সোনার মত হালকা হ'য়ে গেছে। আর কে যেন অদৃশ্য হতে তাকে শূন্য থেকে মহাশূন্যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে সে যেতে চায় না। দুহাতে মাটি চেপে ধরে সে উপুড় হয়ে পড়েছে। দু চোখ বেয়ে তার অশ্রুর বন্যা নেমেছে।

খবরটা বাজার বাড়ীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ নির্বিচারে বিশ্বাস করে খুশী হল। কেউ অবিশ্বাসের হাসি হেসে কানাকানি শুরু করল।

জগন্নাথ মলয়কে নিয়ে আচার্য্য মশাইর ঘরে জাঁকিয়ে বসেছেন। তাঁর কথায় আর ব্যবহারে আনন্দের জোয়ার এসেছে।

মনোরমা চুপ করে বসে আছে। ইদানিং সে আর ঘরের বাইরে যায় না। একলা ঘরে নিজের মনকে নিয়ে নানা ভাবে খেলা ক'রছে। স্বপ্ন দেখছে একটা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ জীবনের।

চোরের মত চুপি চুপি ঘরে এসে ঢুকল অজন। পিছন থেকে সে মনোরমার চোখ টিপে ধরল। মনোরমা হেসে ব'লল, দুষ্টু ছেলে চোখ ছাড়।

অজন চোখ ছেড়ে একখানা হাত ধরল। বলল, কেউ নেই দেখে চলে এলাম।

মনোরমা একমুখ হেসে বলল, সেতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা কি বলো দেখি ?

অজন সহসা গম্ভীর হয়ে উঠে বলে, উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু তার আগে কথা দাও আমাকে বিমুখ ক'রবে না।

বেশ যাহোক—মনোরমা নরম স্বরে বলল, কি চাও সেটা আগে বলবে তো ?

অজন ব'লতে থাকে, তোমার দু'হাত ভরে উঠেছে—

আঃ......মনোরমা ধমক দিল, কি ব'লতে চাও সোজা ভাষায় বলো।

অজন বলে, দাদা তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন আমি ভালবাসি। আমাদের সব ভার তুমি নেবে ?

একথার কোন জবাব না দিয়ে মনোরমা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

অজন বলল, মুখ ফিরিয়ে নিও না মনোদি। বলতে যদি লজ্জা পাও তাহলে বলো না শুধু আমার হাতটা চেপে ধরো তাইতেই আমার কথার জবাব পাবো। আমি বলছি দাদা তোমার অনুপযুক্ত নয়।

মনোরমা সহসা মুখ ফিরিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে ধমক দিল, অজন—

এই আকস্মিক ধমক খেয়ে অজন চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মনোরমা শক্ত করে তার একখানি হাত চেপে ধরল।

অজনের চোখে মুখে খুশীর বন্যা। সে হাসি মুখে বলল, হাত ছাড় মনোদি দাদাকে এখুনি খবরটা দিয়ে আসি।

সমাপ্ত

শারদীয়া উপহার

পুষ্প দেবী
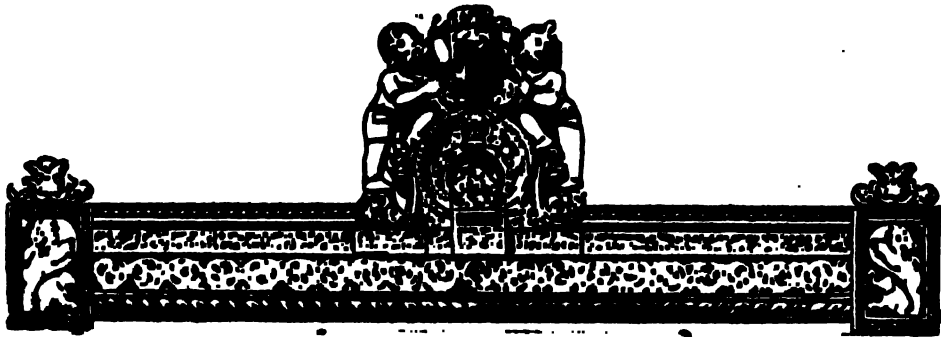
টুনুদিদির ভাবনার অন্ত নেই। সামনে পুজো আসছে। সারা বছর ধরে তিনি একটা বড়ো ট্রাঙ্কে কাপড়-জামা জমা করেন, পুজোয় দিতে হয়। শুধু ত তিন ছেলে পাঁচমেয়েকে দিলেই হবে না। জামাই নাতি-নাতনী ছাড়াও অনেক অনুগৃহিত আশ্রিত সুহৃ ও বন্ধুর দল আছে। প্রিয়া মা-মরা মেয়ে, মাসী হয়ে তাকে পুজোর কাপড় না পাঠিয়ে পারেন না টুনুদি। মালা নাতনীর বন্ধু হয়েও দিদিমা বলতে অজ্ঞান তাকে অন্ততঃ পুজোয় একটা ব্লাউজ পীসও দিতে হয়। সই প্রতি বছর ওই দিনের কাপড়-আলতা পাঠায় তাকেই বা না দিলে চলে কি করে? সেজ ঠাকুমা কাশীবাস করছেন, সত্যিই তবুও পুজোর দিনে এই স্মৃতির থানটুকু পেয়ে তাঁর কী আনন্দ। ছোট ভাই তিনটি নিজেদের সংসার নিয়েই হাবুডুবু খাচ্ছে,নিজেদের কাপড় অবধি কেনা আর পুজোর সময় হয়ে ওঠে না। তাদেরও বছরান্তে একখানা কাপড় না দিলে নয়। আবার ভাইদের দিয়ে ভাজদের না দিলে তাদের মুখ ভার, তাদের জন্ম অন্ততঃ দু'খানা তাঁতের সাড়ী চাই। টেপী বিদেশে থাকে, তার সংসার মোক্ষদারই হাতে, তার ওপর বুকুটাকে সে-ই মানুষ করেছে- তাকে পুজোর কাপড় না দিলে নয়। সরলা আপদে বিপদে বুক দিয়ে করে, সারা বছর মনিব যা দেয় নেয়, পুজোয় দিদিমার কাছে একটা ভালো কাপড় আশা করে। মেজ বৌমা লরেটোর পড়া মেয়ে, ক্লাব আর গান-বাজনা নিয়ে মত্ত। যা করে ঐ ক্যাণ্ড, নইলে বিদেশে অনাথ সত্যিই অনাথ হত। নতুন গুড়ের পায়েস, তালের বড়া, চন্দ্রপুলি কে আর তাকে করে দিতো? তাকে ত সর্ব্বাগ্রে কাপড় দিতে হবে।

সেজমেয়ের তরুণ ড্রাইভারটাকে আবার উর্দ্দী করিয়ে দিতে হবে, যখন যেখানে লোক-লৌকিকতা, পুজো-পার্ব্বণে ঐ মেয়ের গাড়ীই ভরসা। আর রামদীন ড্রাইভারটা লোকও বড় ভালো। জুতো খুলে পুজোর ঢালা বয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে ঘড়া করে গঙ্গাজল তুলে আনা কিছুতেই তার আপত্তি নেই। তারকেশ্বরে সেবার গাজনের সময় বেলগাছে উঠে টাটকা বেলপাতা পেড়ে দিলো। নইলে ত ঐ সাত-শুকনো বেলপাতা দিয়েই তারকনাথের পুজো সারতে হ'ত। সেজমেয়ে বলেছে পোষাকই যদি দাও মা ওতে তোমার জামাই-এর নামটা মনোগ্রাম করে দিও। কত যে ঝঞ্ঝাট।

তার ওপর কাজ করতে তো ঐ একটি মানুষ। খাকী পোষাকের কথা বললেই তো খেঁকে তেড়ে আসবে। বলবে টাকা যখন কামড়াচ্ছে দাও। যা বয় সয় তাই করো। একটা ধুতি দাও। তা নয় এখন ড্রাইভার বাবুর পোষাকের অর্ডার দাও। ধন্তি সাধ বটে তোমার। জামাইদের পোষাক করানোর হাঙ্গাম যদি বা চুকলো তো নাতি-নাতনীদের পোষাক হ'ল, এবার কচুয়ান গাড়োয়ানদের পোষাক করাও। বলতে আর বাধাটা কি বলো বান্দা ত হাজির আছেই। শেষে কত কাণ্ড

করে পোষাক ত তৈরী হল ড্রাইভারের। সুবোধ মিত্রের এস এমও লেখা হ'ল।

এধারে বড় ছেলের ছোট মেয়ে রুনুর আবার ক্যান্‌-ক্যান্‌ চাই। কর্তাতো শিপ্রামী ভাষায় 'ওসব প্যান্‌-প্যান্‌ বাপ-মারা বুঝবে, তুমি যেমন ফ্রক দিচ্ছে তেমনি দাও' বলে খালাস। রুনুর চোখ ছলছল। ডায়সেসানে পড়ে সেখানে ক্যাসনের রাজত্ব। বড় বৌমা সেকালের মহাকালী পাঠশালায় পড়া মন নিয়ে ক্যান্‌ক্যানের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে না। বড় ছেলে ত আরো সাদাসিধে, সেবার যখন বড় ছেলে জয়পুর যায় টেঁপী বললো দাদা আমার জন্তে ওখানের টাই এ্যান্‌ ডাই কাপড় এনো। প্রসাদ অবাক হয়ে বললো ও আবার কি কাপড়? গলায় দড়ি দিয়ে মরা হ'ল, ওর মানে—অমন অলুক্ষুণে কাপড় তোর কি হবে? টেঁপী তো হেসেই গড়াগড়ি। না দাদা তা নয়, ওর মানে বেঁধে ছোপান। ছাপা সাড়ী আর কি? সেই মানুষের মেয়ের আবার ক্যান্‌ক্যানের সাধ কেন?

আগে ছিল মেয়েদের নিউমার্কেট কালিঘাট। বাড়ীতে ফিরিওলা ঢোকা কর্তাদের বারণ ছিল। বারণ ছিল মেয়েদের দোকানে যাওয়া। কাজেই সাধ মিটুতে ঐ কালিঘাট যা করে। পালে পার্ব্বনে নির্জ্জলা উপোস করে কালিঘাট যেতে হত। গঙ্গাস্নান করে পূজো সারা হলে দলবেঁধে যেতেন দোকানে। ওমা কি সুন্দর গোপালের ছবিগো। ওমা কেমন এলোপ্লেন দেখ? কি সুন্দর তুলোর বেরাল। বাক্স খুললেই উঁকি মারছে গলায় সবুজ রিবণ বাঁধা। তারি পাশে কার্পেট বোনার বই। জয়গুরু, ওঁ তৎসৎ, পতি পরম দেবতা। গোছা গোছা সবুজ লাল পসমও বিক্রি হত। বেলকুঁড়ি কাঁটা রকমারি পুতুল ছোট উপুড় হওয়া শিশু থেকে খোঁপা বাঁধা গিন্নি অবধি। তারই পাশে পাথরের বাসনের দোকান। কালো পাথরের বাসনের মধ্যে পেতলের সিংহাসনগুলো যেন সোনার মত জলছে। তখনকার দিনের গিন্নিরা টাকায় বড়লোক ছিল। কারণ টাকা খরচের এত পন্থা তখন বেরোয় নি।

কালে অকালে ঘোড়ার গাড়ী চেপে পৈতে বা বিয়ের যাওয়া আর দুটাকা থেকে চারটাকা যৌতুক দেওয়া ছাড়া কিই বা খরচ ছিল?

কাজেই কালিঘাট আর তাতিনীদের কাছে তাদের যাকিছু খরচ। গঙ্গার ঘাটে আবার মেয়ে দেখাও হত। বিধবা গিন্নিরা গামছার খুঁটে তেল ভিজিয়ে নিয়ে যেতেন কনের গা রগড়ে দেখতেন রং বা পাউডার মেখেছে কিনা? কখন কখন বিভ্রান্তও যে হতেন না তাও নয়। আমারি বড় মাসীমা মামার জন্তে কনে দেখতে গেছেন সঙ্গে মোক্ষম অস্ত্র তেলে ভেজান গামছা। পুরুষরা আগে মেয়ে দেখে রায় দিয়েছেন মুখটি ফরসা বটে তবে হাত পা কালো। কে জানে রং টং মেখেছে কিনা? মা মরা মেয়ে, গঙ্গার ঘাটে দেখাতে এসেছে সঙ্গে পাড়ার এক বিধবা গিন্নি। তেল গামছার রগড়ানোর চোটে ময়লা কেটে ধপধপে শাঁখের মত রং বেরিয়ে পড়লো। বড় মাসীমা বল্লেন কনেটিকে, তুমি কি চান করো না? সরল অবাক চোখ তুলে মেয়েটি বল্ল করি ত? মাসীমা আবার বল্লেন কবে করেছ চান? শান্তস্বরে উত্তর আসে পূজোর সময় আশ্বিন মাসে। মাঘের শীতেও মাসীমার কপালে ঘাম দেখা-দেয়। এখনকার মত বাজারে বেরুতে হলে ঠোঁটে গালে রং দিতো না মেয়েরা। তখন কার দিনে ওটা তারি খারাপ কথা ছিল।

যাকগে ওসব কথা। এখন নতুন মার্কেট খুলেছে দেশপ্রিয় পার্কের পাশে হকার্স কর্ণার, না পাওয়া যায় এমন জিনিষ নেই। সেখানে ক্যানক্যানের খোঁজে যায় টুহীদ সঙ্গে রুনু। তারা বল্লে নেই বটে তবে পরশু আনিয়ে দোব ভেতরে তারের ঘেরা ফ্রকটা ফুলিয়ে রাখবার জন্তে। এধারে পূজোর গোড়া থেকে ছোনা ছোনাদের ছাড়াম।

তারা হ্যাসকে হ বলে তাই কথায় ছের ফের।

আসামী সিল্কের কাপড়গুলা। হোমা-মাদের জন্ত হাড়ে হাড় গজ কাপড় মাথায় করে ফিরি করছে হোনার জিনিষ জলের দরে বিক্রি করছে কিন্তু তারো আগে আসে সতীশ, নেড়া মাথা বগলে ছোট পুটলী, নাচের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে। বলে এবার আপনার জন্তে আসল জিনিষ এনেছি মাত্র চৌষট্টী টাকা থান দিদিমা। যদি একান্তই সে জিনিষ না নেয় টুনিদি তখন সতীশের স্ত্রীর ডেলিভারির জন্ত টাকা ধার দিতে হবে। কারণে আকারণে ইংরাজী বুকনী দেয়া তার স্বভাব। মোটের মাথায় টুনুদির মুক্তি নেই। চৌষট্টী টাকার থান একুশ টাকায় দিয়ে যায় সতীশ। কিন্তু সে কাপড়ে াকে জামা দাও তার মুখ ভার। সত্যি প্রতি বছর এক রকম চেক কাপড়ের জামা পরতে কার বা ভালো লাগে? পুজো ত নয় মাথা যেন খারাপ করে দেয়। নাতনীর আবার র কটন না র সিল্ক চাই। টুনুদির সাধ তাকে কালো নীলাম্বরী দেন। খোলে জরীর বুটি নীল আকাশে তারার মত জলবে। নববিবাহিতা। াতনী, বলে নীলাম্বরী আজকাল কেউ পরে না দিদিমা। ঠোটের কাছে আসে টুনুদির পরে ই কি তবে পাড় বিহীন শোকের কাপড়ের মত কালো ান। তাতে যে কী বাহার বুঝতে পরেনা সেকালের লাক নাতনীর শ্বশুর বাড়ী থেকে ঢালা জরী পাড় কাপড় রয়েছে অথচ তাকেই একটা র কটন দিতে মন চায় া। জরীপাড় নীলাম্বরী দেবার সাধ ছিল।

অতীতকালের জরী পাড় নীলাম্বরী পরার কথা ন করে প্রৌঢ়া টুনুদির অধর প্রান্তে ক্ষীণ হাসি ভেসে ঠে। সেসব কথা থাক্ ঐ ঢালা জরীপাড় সাড়ীটাই বার সইকে দেবেন ঠিক করেন। সই বরাবর দামী াপড় দেয় অথচ টুনুদির সইএর বেলাই যত টানাটানি ড়ে। কাপড়টা চট করে সরিয়ে ফেলেন নইলে কান মেয়েই বলবে না মা এ কাপড়টা অন্তত তোমায় াতে হবে ওসব চলবে না। কর্তা হেসে বলবেন এ া গিয়ে কত্তে পক্ষের ব্যাপার কিনেত থাবেনা পেলেও থাবেনা মনে মনে অবশ্য প্রসন্ন হন মিতব্যয়িতা দেখে। ঠিক এই সময়েই ঘটলো বিভ্রাটটা।

হঠাৎ জর বমি -এই সবে কর্তা শয্যা নিলেন। ছুটির দিন বাড়ী ভর্ত্তি লোক। তার মধ্যে সই পুজোর কাপড় পাঠিয়েছে। তার লোকটি আবার অভুক্ত না নেবে বিদেয় না খাবে কিছু। কোন রকমে তারি হাতে প্যাকেটটা গুঁজে দেয় টুনুদি। মেয়েদের চোখ এড়িয়ে। শুধু কি মেয়েদের সামনের চেয়ারেই নাত-জামাই বসে। তাদেরই বাড়ী থেকে এসেছে সাড়ীটা। যদি দেখে হয়ত ভুল বুঝবে যে দিদিমা বুড়ীর মনে ধরেনি কাপড়। সত্যি সত্যি অত দামী কাপড় নাহলে ঠিক পরতো টুনুদি কাপড়টা। আর অনেক দিন ধরে ভেবে রেখেছে একটা ভালো সাড়ী সইকে দেবে সে সাধও মিটলো পাওয়ার চেয়ে দেয়ার আনন্দ যে ঢের বেশী।

রাত প্রায় নটা বাজে ক্লান্ত শরীর আর বয়না। হঠাৎ ঝন ঝন শব্দে ফোন বেজে ওঠে, কর্তা বলেন দেখো কোন বন্ধু হয়তো তোমার? সবে ঘুম আসার সময় বাধা পড়ায় স্বরটা অপ্রসন্ন টুনুদির কানে সে স্বর শ্লেষেরআমেজ দেয়।

টুনুদি বলে নাগো হয়ত মেয়েরাই খোঁজ নিচ্ছে। বিরক্তি ভরা মন নিয়ে ফোন ধরে টুনুদি। কর্তা, জিজ্ঞাসুনেত্রে চান। তারো চেয়ে উত্তপ্ত কণ্ঠে টুনুদি বলে ঠিকই বলেছিলে বন্ধুই বটে এই মাঝ রাতে সই ফোন কচ্ছেন। সারাদিনে মনে ছিল না সই এর কথা। সেই যে বলে "ভালো কথা মনে পড়লো আঁচাতে আঁচাতে ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে"। মানুষের মন বিচিত্র। কর্তা তখন কিন্তু সই-এর পক্ষই অবলম্বন করেন। বলেন তেমন রাত ত হয়নি, চৌদ্দ কল তো? রাতে সস্তা। উত্তর দেন না টুনুদি। মনে মনে গজ গজ কর্ত্তে থাকে—ভালো কর্ত্তে নেই কারুর? অত দামী কাপড়টা পেলি, কোথায় খুসী হবি? না মাঝরাতে ডেকে ঘুম ভাঙ্গানো। আবার বলে কি

না কী পাঠিয়েছিস তুই আমাকে? এখান থেকে খুলে উত্তরও দেওয়া যায় না টুনুদি বলে যা পাঠিয়েছি পরবি তো? সরার অসুখ বলে ঠক করে ফোন নামিয়ে রাখে। ভাবে চিরকালটা সইএর একভাবে গেল নাতি-নাতনী ঘর ভরা আজো খুকীপনা গেলনা। বোধহয় নিজের খুকী জীবন ছিলনা দশবছরে বিয়ে হয়েছিল বলেই খুকী জীবনের ওপর এই আক্রোশ সাতাশ বছর বয়েসে খাশুড়ী হয়েছেন টুনুদি। এগারো বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে।

সকালে কর্ত্তাকে দেখতে ডাক্তার আসেন, সবে হাতে ব্লাড প্রেসারের যন্ত্রটি জড়িয়েছেন। কলিং বেল বেজে ওঠে। বারোয়ারি পুজোর চাঁদা নিতে এসেছে ছেলের দল। টুনুদিকে দেখেই উৎসাহিত হয়ে ওঠে তারা। বাড়ীতে অসুখ, কথাটা বলতে গিয়ে বাধা পান ছেলেদের পেছনে হাতজোড় করে রামদীন দাঁড়িয়ে। বলে নমস্তে মাঈজী। সাহেব বাইরে যাচ্ছেন বোলে আমিও ছুটি পেয়ে গেলুম দেশে যাবার—ভূমিকায় বাধা দিয়ে টুনুদি বলেন দাঁড়াও তোমার পুজোর পোষাকটা দিয়ে দিই। আকর্ণ বিস্তৃত দাঁত বের করে আনন্দ জানায় রামদীন।

ছেলেরা ততক্ষণ চাঁদার খাতা খুলে ধরেছে—মাসীমা আপনি বরাবর পাঁচ টাকা দেন—পদশব্দে পেছন ফিরে দেখেন ডাক্তার বাবু দাঁড়িয়ে। টুনুদিকে বলেন না ভয়ের কিছু নয় তবে বয়েস হয়েছে ত সাবধানে রাখবেন। প্রেসার টা তো দেখলুম। তাঁকে দাঁড়াতে বলে টাকা আনতে যান টুনুদি। আশ্চর্য্য ভাঙ্গানো টাকা নেই। তবে ডাঃ রায়ের পকেটেই ব্যাঙ্ক। দশ টাকার ভাঙ্গানি হাতে আসে। তবে ঘরে আসে না। ছেলেদের মধ্যে অতর্কিতে একজন টেনে নেয় পাঁচ টাকার নোটটা। বলে লেখ লেখ—মিসেস বোস পাঁচ টাকা। পাসের নেমপ্লেটের মধ্যে বোস পদবীটাই পছন্দ হয় তাদের। গঙ্গোপাধ্যায় আর চক্রবর্ত্তীর চেয়ে বানানে ঝঞ্চাট অনেক কম। তাড়াতাড়ি মিসেস বোস হয়ে যান টুনুদি।

রামদীন আর ডাক্তারবাবু থাকায় পাঁচটাকা খেসারত দিতে হল ভদ্রতার মাশুল। থাকগে পুজোয় যাবে টাকাটা। মনকে প্রবোধ দিতে দিতে ঘরে ফেরেন। কর্ত্তা খবরের কাগজের মধ্যে ডুব দিয়েছিলেন, টুনুদিকে দেখে বলেন জানো চার্চ্চিল বোধহয় আর বাঁচবে না। টুনুদি বলে কি আর করা যাবে বলো? ব্লাড প্রেসারটা কত দেখলো ডাক্তার? তোমায় ত বলে গেছে বলে আবার কর্ত্তা কাগজ নিয়ে তন্ময় হন। টুনুদি ভাবে ফোন করে প্রেসারটা জেনে নিতে হবে। আবার ওদিকে রামদীন গলা খ্যাকারি দেয় তার ট্রেনের টাইম। পুজোর পর ফিরবে দেশ থেকে। পুজোর দিনে যদি পুজোর পোষাক না পরতে পারে, তবে তার সার্থকতা কোথায়?

তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্ক খুলে পোষাক বার করতে যান টুনুদি? আশ্চর্য্য কোথায় যে রেখেছেন? কোথাও খুঁজে পান না। গরম কাপড়ের ট্রাঙ্ক বেনারসীর ট্রাঙ্ক অবধি ঢেলে দেখেন। কোথাও তার পাত্তা নেই। বারে বারে মনে হয় মনিরুদ্দিন কি নাম লিখতে নিয়ে গিয়ে ফেরৎ দেয়নি? আবার মনে পড়ে আড়াই টাকা মজুরী দিয়েছেন ঐ তিনটে অক্ষর লেখাতে। সত্যি মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে। রামদীন ততক্ষণে ঘরে ঢুকে কর্ত্তার সঙ্গে কথা কইছে। অসুস্থ মানুষ বয়েস হয়েছে অত হাঙ্গাম করে পোষাক করিয়েছেন। তাঁর কাছে আর হারানর কথাটা ভাঙ্গেন না টুনুদি। আলমারী থেকে দুখানা দশ টাকার নোট বের করে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। রামদীনকে সিঁড়িতে ডেকে বলেন এই টাকায় তুমি পুজোর পোষাক কিনে নিও—কোথায় যে রাখলুম পোষাকটা। তাঁর বিড় বিড় করে বলাটা কানে না নিয়ে রামদিন বলে বাবুজির বেমারি হয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল, ঠিক আছে মাঈজি নমস্তে বলে রামদীন চলে যায়। টুনুদি ভাবে অকারণ পঁচিশটা টাকা জলে গেল। কি যে হল অতবড় ফুলপ্যান্ট আর খাকী কোট আশ্চর্য্য ঘটনা।

ঘরে আসতে কর্তা বলেন কী ব্যাপার? পোষাক পছন্দ হল না বুঝি ড্রাইভার সাহেবের? টুনুদি বলে না না অপছন্দ হবার কি আছে? অত হাঙ্গামা করে তুমি করালে? আমি অন্য কথা ভাবছি। তোমার অসুখ এ সময় রামদীন দেশে গেল। রাত বিরেতে 'সে থাকলে গাড়ীর সুবিধে পেতুম। কথাটা চাপা দিতে চান টুনুদি—কিন্তু চাপা গেল না।

দুপুরে হাঁপাতে হাঁপাতে সই এসে হাজির। কর্তার সঙ্গে কুশল প্রশ্নের শেষে বগল থেকে বগলের নিচের প্যাকেটটি বার করেন তিনি। বলেন সই এটা—কি তুই পাঠিয়েছিস? তাঁর হাতে সেই বহুকষ্টের হারানিধি রামদীনের পোষাক। টুনুদি বাক্যাহত। অনেক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কর্তা বলেন তবে রামদীনকে দিলে কি? টুনুদি উত্তর দেন না। সই বলে চলে, তোর সখা বললেন "তোমায় ঠাট্টা করেছে সই। এক বার পরেই দেখোনা নয়ন সার্থক করি কেমন মানায়।" আমি বুঝলুম কিছু গোল হয়েছে হারে কার পোষাক? টুনুদি বলেন তরুর ড্রাইভারের। মনের মধ্যে ভাবনার সমুদ্দুর বইছে। শুধু শুধু কুড়িটা টাকা বেরিয়ে গেল ও পোষাক দেবেনই বা কাকে? আবার নইলে এক এক বছর ধরে সামলাও। লুকুনো সই এর কাপড় আর খোঁজার চেষ্টা করেন না। নিজের জন্যে কেনা সাধারণ তাঁতের সাড়ীই একটা তুলে দেন সইএর হাতে বলেন পরিস পুজোর দিনে।

পরদিন তোরঙ্গ রোদে দিতে গিয়ে দেখেন তোরঙ্গের তলায় ঢালা জরীপাড় কাপড়টা লুকুনো ছিল। হঠাৎ তার জরির জলুষটা বড় রূঢ় হয়ে চোখে লাগে।

রাখাল ও রাজকুমারী

বিমলজ্যোতি দাস

[সতের]

াকুলদের অফিসের কর্মচারীরা সংখ্যায় অনেক। চিত্তবিনোদনের জন্ম একটি ক্লাব আছে সে কথা বলা হয়েছে। উচ্চপদস্থ অফিসাররা এবং শি-দারোয়ান-দপ্তরী প্রভৃতি নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা সকলেই ক্লাবের সভ্য। ক্লাবের জন্ম প্রয়োজনীয় াব-পত্র, একটি ভাল রেডিও এবং এক আলমারি কাম্পানী নিজের খরচে কিনে দিয়েছে। তবে র দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব এবং ব্যয়ভার দের স্কন্ধে ন্যস্ত। বেতনের অঙ্ক অনুযায়ী সভ্যদের কের কাছ থেকে মাসে মাসে কিছু করে চাঁদা য় করা হয়ে থাকে। চাঁদার সর্বোচ্চ হার আট এবং সর্বনিম্ন হার দু আনা। এই হার সভ্যদের ক্রমে স্থিরীকৃত হয়ে বহু বৎসর ধরে চলে আসছে। ার্ক প্রিয়নাথ বাবু এই ক্লাবের সেক্রেটারী, এবং থের যূথপতি। তাঁকে কেন্দ্র করে এখানে প্রত্যহ র তাসের আড্ডা বসে। তাঁর প্রায় সমবয়স্ক সাত জন বাবু খেলায়, গল্পে ও হাসিতে এই আড্ডাটিকে দ করে রাখে। ক্লাবের খরচে প্রত্যেকে এক পা করে চা পেয়ে থাকে। এ ছাড়া মাঝে মাঝে াথ বাবুর বাসা থেকে সন্দেশ অথবা রসগোল্লা । এগুলি তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্বহস্তনির্মিত। াথ বাবুর গুটি তিনেক গাভী আছে। সুতরাং অভাব তাঁর নেই। তথাপি পরিবারটি বৃহৎ র এতগুলি মুখের থেকে দুধ বাঁচিয়ে তা দিয়ে রসগোল্লা প্রস্তুত করায় প্রিয়নাথ-গৃহিণীর যথেষ্ট ত্র পরিচয় পাওয়া যায়। সংসারের ঝামেলায় উপক্রত প্রিয়নাথের তপ্ত জীবনে ক্লাবের সান্ধ্য শটির অনুকূল পরিবেশ এবং তার মধ্যে বসে সপ্তাহে একদিন দুদিন স্বগৃহনির্মিত মিষ্টান্নের আস্বাদ গ্রহণ মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের মত একমাত্র আনন্দস্থল। অবশ্য তাঁর এই সাধের উদ্যানেও মাঝে মাঝে হিংসুকের নিন্দালোষ্ট্র এসে পড়ে। বাবুদের, বিশেষ করে অল্পবয়স্ক বাবুদের, কেউ কেউ তাঁকে 'জমিদার বাবু' এবং তাস-চক্রের লোকগুলিকে 'মোসাহেব' বলে আড়ালে বিদ্রূপ করে। তা করুক, সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ আর কোথায় আছে?

প্রিয়নাথ বাবুর নিজের দলটি ছাড়া কর্মচারীদের আরও দু তিনটি ছোট ছোট দল আছে, যারা সাধারণতঃ শনি-রবিবারে এবং অন্যান্য ছুটির দিন ক্লাবে হাজিরা দেয় এবং তাস, দাবা অথবা ক্যারমবোর্ড নিয়ে বসে। এ ছাড়া অন্যান্য বাবুরা নিজ নিজ সুযোগ-সুবিধা এবং অভিরুচিমত মাঝে মাঝে ক্লাবে আসে এবং কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে চলে যায়। গোকুল এই শেষোক্ত শ্রেণীর। কোনও বিশেষ খেলাধুলার প্রতি কোনদিন আকর্ষণ না থাকাতে সে খেলোয়াড়দের দলে না ভিড়ে সাধারণএর অন্তর্ভুক্ত হয়েই রইল।

কর্মচারীদের মধ্যে একটি বিশেষ ব্যক্তি আছে সে একাই এক দল। ব্যক্তিটি বয়সে তরুণ হলেও অত্যন্ত আলস্যপ্রিয় এবং বিলাসী। নাম বিমান ভাদুড়ি। পিতা এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন, দক্ষ চিকিৎসক হিসাবে সর্বত্র সুনাম অর্জন করে এসেছেন। বিমানকেও তিনি ডাক্তার করবেন আশা করেছিলেন, কিন্তু সে তাঁর সব আশায় ছাই দিয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পর অনেক চেষ্টা চরিত্র করে তিনি তাকে মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন, কিন্তু বৎসর না ঘুরতেই বিমান ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিল। সংক্ষেপে বলল—আমার দ্বারা হবে না। প্রবীণ ডাক্তার বুঝতে

পারলেন, গাধাকে তিনি ঘোড়া বানাতে চেয়ে ভুল করেছিলেন। এবার তার স্বরূপ উপলব্ধি করে তাকে স্কুল-মাস্টারীতে ভর্তি করে দিলেন। গোকুলদের কোম্পানী একটা প্রাইমারি স্কুল চালাচ্ছে। বিমান তারই কনিষ্ঠ শিক্ষক নিযুক্ত হল। কাজটা তার নেহাৎ মন্দ লাগল না, কারণ স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং দৈনিক গড়পড়তা তিনটার বেশি ক্লাশ নিতে হয় না। তার ওপর ক্লাশে এসে ছাত্রদের 'ল্যাখ রে ল্যাখ' অথবা 'পড় রে পড়' উপদেশ দিয়ে নিজে চেয়ারে হেলান দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়াতে বিশেষ বাধা নেই। ঈশ্বর বিমানকে মেধাশক্তি না দিলেও অন্য একটি মহৎগুণে অলঙ্কৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে সন্তোষ। কোম্পানীর প্রদত্ত চল্লিশ টাকা বেতনেই বিমান পরম পরিতৃপ্ত। পিতা তার জন্য গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেও নিজে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বেগ শান্তির মধ্যে কালযাপন করছে।

বিমানও ক্লাবের একজন সদস্য। এই পদাধিকার-টুকুকে সে এক অভিনব উপায়ে আত্মসেবায় লাগিয়েছে। প্রত্যহ তিনটায় সময় স্কুলের ছুটি হয়ে যায় এবং চারটার মধ্যে বিমান ক্লাবে এসে উপস্থিত হয়। ক্লাবের আধা-বাঙালী আধা-হিন্দুস্থানী ছোকরা চাকরটা তখনও দিবানিদ্রা থেকে ওঠে না। বিমান এসেই প্রথমে তাকে ডেকে তোলে এবং নিজে একখানা চেয়ারে বসে জুতো খুলে পা দুখানা টেবিলের ওপর তুলে দেয়। চাকর মুনিয়া চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এসে পদসেবায় নিযুক্ত হয়। এটি প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। অবশ্য মুনিয়া কর্তৃক বিমানের এই পাদ-সম্বাহন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নয়। এর জন্য বিমানকে প্রতি মাসে একটি করে রজতমুদ্রা ব্যয় করতে হয়। এ সময় ক্লাবের আর কোন সভ্য উপস্থিত থাকে না। কাজেই বিমান নির্বিবাদে একচ্ছত্র সম্রাটের মত ক্লাবের অপরূপ রাজত্ব ভোগ করতে থাকে। ব্যবস্থাটা খুবই লাগসই, তবে হতভাগা মুনিয়াটার গায়ে বেশি জোর নেই। তার অর্ধাশনক্লিষ্ট দেহের বল বিমানকে পরিতুষ্ট করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তাই ছ্যাকরা গাড়ির বেতো ঘোড়াকে গাড়োয়ান যেমন বারংবার চাবুক লাগিয়ে দ্রুতগতি করবার চেষ্টা করে, বিমানও তেমনি তিরস্কার কশাঘাতে মুনিয়ার অবশ ও অচলপ্রায় আঙুলগুলোকে সচল করবার চেষ্টা করে। চক্ষু মুদ্রিত করে সেবা নিতে নিতে চেঁচিয়ে ওঠে—কি করঃ? আরও জোরে, আরও—আরও। এক টাকা মাস-মাহিনার বাধ্য-বাধকতা মুনিয়াকে অল্পক্ষণের জন্য চাঙ্গা করে তোলে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার যে-কে-সেই। তখন বিমানের হুঙ্কারধ্বনি শোনা যায়—আরে ব্যাটা, বোঝঃ না? কিমা কর, পা দুটারে লইয়া কিমা কর।

প্রথমদিন এই 'কিমা করা' ব্যাপারটা নিরামিশাষী মুনিয়া উপলব্ধি করতে পারে নি। তখন বিমান বুঝিয়ে দিল, মাংস কিমা করতে হলে যে রকম বলপ্রয়োগ প্রয়োজন, তার পা টেপাতেও মুনিয়া যেন সেই রকম বলপ্রয়োগ করে। সেই থেকে এই কথাটা মুনিয়া প্রায়ই শুনে আসছে, এবং ঐ আদেশ উচ্চারিত হলে মুনিয়া বিমানের পদযুগলের উপর যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ করবার চেষ্টা করে, এবং মনে মনে ভাবে, মাষ্টার বাবুর গোড় দুটো যদি কোনও 'সন্‌যোগসে' টুটে যেত তা হলে বড়ই ভাল হত।

বাংলার বিভিন্ন স্থানে গোকুলদের কোম্পানীর কয়েকটি শাখা আছে, এবং কর্মচারীরা মাঝে মাঝে এক স্থান হতে স্থানান্তরে বদলি হয়। এই উপলক্ষে বিদায়ী ব্যক্তিকে ক্লাবের খরচে বিদায়-অভিনন্দন জানানো হয়। ঐ দিন প্রায় সকল সভ্যই উপস্থিত থাকেন, অফিসাররাও অনেকে আসেন এবং দু-চার জনের ক্ষুদ্র বক্তৃতার শেষে কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা থাকে।

এ্যাসিষ্ট্যান্ট একাউন্ট্যান্ট চিরঞ্জীব বাবুর বদলি উপলক্ষ্যে আজ সন্ধ্যায় এমনই একটি বিদায়-সভা আহূত হয়েছে। ধোপ-দুরস্ত কাপড়-চোপড় পরে বাবুরা সাড়ে পাঁচটা থেকেই একজন দুজন করে উপস্থিত হতে লাগল। সাড়ে ছটায় সভার সময় নির্ধারিত হয়েছে।

বাবুরা জমায়েৎ হয়ে খোস-গল্প করছে। নৃপেনবাবু একটু সৌখিন লোক। তাঁর স্ত্রী ধনীকন্যা। নৃপেনের শ্বশুরের পুত্র নেই, মাত্র তিনটি কন্যা। তাই মেয়েরা প্রত্যেকে মাসে একশো টাকা করে হাত খরচ পায়, এবং বাপের অবর্তমানে তারাই তাঁর সম্পত্তির ওয়ারিশান হবে। অতএব নৃপেনের সৌখিন হওয়া সাজে। নৃপেন লোকটিও ভাল। প্রায়ই বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে সহকর্মীদের নিমন্ত্রণ করে। এ ছাড়া নৃপেনের আরও একটি সখ আছে। তার বাসার সামনে যে খালি জায়গাটুকু আছে নৃপেন সেটুকুকে নিজের খরচে বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়ে সেখানে ফুল-বাগান করেছে। ভাল ভাল দেশী ও বিদেশী ফুলের উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় এবং মিশ্রিত সৌরভে নৃপেনের বাগান প্রায় সব সময়েই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। নৃপেন তার বাগানের নাম দিয়েছে "নন্দন-কানন"। আশ-পাশের লোক মাঝে মাঝে তার বাগান দেখতে আসে এবং তারিফ করে। কৃতি সন্তানকে পাঁচজনের সামনে উপস্থিত করে পিতা যে প্রকার গর্ব ও গৌরব অনুভব করেন, সুসমৃদ্ধ ও সযত্নলালিত উদ্যানখানি লোককে দেখিয়ে নৃপেনও সেই প্রকার গৌরবমিশ্রিত গর্ব অনুভব করে। এই বাগানের ব্যাপারে ঢাকার আরও কয়েকজন উদ্যান-বিলাসী ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়েছে। তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন পককেশ সুরসিক ত্রিভূবন হালদার। ইনি গোকুলদের কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন কর্মচারী। কাছেই তাঁর বাড়ি। অত্যন্ত অমায়িক ও রসালাপী মানুষ। তাঁর সঙ্গে নৃপেন বহুবার বীজ ও চারা বিনিময় করেছে। আজকের উৎসবে তিনিও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। নিকটেই থাকেন বলে এবং ভালমানুষ বলে ক্লাবের প্রত্যেক উৎসবেই তিনি আহূত হন। নৃপেন বসে তাঁর সঙ্গেই গল্প করছে। গল্প করতে করতে এক সময় বলল—দেখুন হালদার মশাই, পুণা থেকে সেই যে বীজগুলো আনিয়েছিলাম তার মধ্যে কতকগুলো থেকে বেশ ভালই ফুল পেয়েছি, কিন্তু বাকিগুলো সে রকম সুবিধা হয় নি। বিশেষ করে কস্‌মস্‌গুলো একটাও বাঁচল না। এখন কি করি বলুন দেখি? আপনার বাগানে কস্‌মস্ আছে বেশি? কয়েকটা দিতে পারেন?

ত্রিভূবনের বাগানে কস্‌মস্ নেই। কিন্তু জবাবটা তিনি সোজা না দিয়ে স্বভাব-সিদ্ধ কৌতুকপ্রিয়তা বশতঃ একটু অভিনব করেই দিলেন—না ভাই, আমার বাগানে cosmos একদম নেই, সব chaos।

একটা হাসির রোল উঠল। নৃপেন কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওধারের টেবিল থেকে ডাক্তার বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—আসুন আসুন, দাদা আসুন। দাদা যে একেবারে হিমালয় থেকে নেমে এলেন দেখছি।

যাঁর উদ্দেশ্যে এই কথা বলা হল, তিনি এর অন্তর্নিহিত খোঁচাটুকু নিঃশব্দে গ্রহণ করে ঐখান থেকেই একে একে সকলের উদ্দেশ্যে এক এক বার হাত যোড় করে নমস্কার জানালেন। এটি তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাস। প্রত্যেকদিন অফিসে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করার পূর্বে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে নমস্কার জানিয়ে তবে উপবেশন করেন। ইনি হচ্ছেন কোম্পানীর সিনিয়র একাউন্ট্যান্ট শিশির চৌধুরী। প্রায় সকলের চেয়েই বয়োজ্যেষ্ঠ বলে সকলেই এঁকে 'দাদা' সম্বোধন করে থাকে। ইনি বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান। পরিবারের কারও সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নেই। এখানে বাসায় একাই থাকেন। ভৃত্যের সাহায্যে স্বপাকে আহার করেন। সহকর্মীদের, এবং বিশেষ করে কোম্পানীর হিন্দুস্থানী দারোয়ানদের হৃদয়ে শিশিরবাবু একটি বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। দারোয়ানরা তাঁকে 'সাধু বাবু' বলে উল্লেখ করে। বাস্তবিক, থান ধুতি ও থান উত্তরীয় পরিহিত, দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু-সমন্বিত, নগ্নপদ, সৌম্য শান্ত গৌরবর্ণ শিশিরবাবুকে হঠাৎ দেখলে সাধু ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয় না। সংসারে কতকগুলি লোক আছে যাদের প্রকৃতি বা চারিত্রিক

বৈশিষ্ট তাদের মুখমণ্ডলে যেন ছাপ দিয়ে আঁকা থাকে। শিশিরবাবু তাদের অন্যতম। এগার বৎসর পূর্বে তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়েছে। তখন থেকে আজ পর্যন্ত শিশির বাবুর আচার আচরণে, বেশ-ভূষায় বা হাবভাবে লেশমাত্র তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয় নি। বৎসরে মাত্র দুই দিন অর্থাৎ মহালয়ার দিন এবং দোল পূর্ণিমার দিন কেশ ও শ্মশ্রু-গুম্ফ মুণ্ডন করেন। শীতকালে থান উত্তরীয়ের পরিবর্তে একখানি অত্যন্ত মোটা ও খসখসে ধূসরবর্ণের পশমী শীতবস্ত্র ব্যবহার করেন। এ বছরে শীত এখনও তেমন পড়েনি বলে এতদিন থান উড়ুনিতেই চালাচ্ছিলেন। আজ সবেমাত্র গরম চাদরটি গায়ে চড়িয়ে ক্লাবে উপস্থিত হয়েছেন। তাই তাঁকে দেখে ঢাকার অফিসে নবাগত ডাক্তারবাবুর মুখ থেকে উপরি-উল্লিখিত-উচ্ছ্বাস উক্তি স্বতঃই নির্গত হয়েছে। সত্যই তাঁকে দেখলে নগাধিরাজ হিমাদ্রির চিরহিমাবৃত শিখর হতে সদ্য-অবতীর্ণ তাপস বলে মনে হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আরও মনে হয়, এখানকার এই পরিবেশে তাঁকে যেন ঠিক খাপ খায়না, এ পরিবেশ যেন তাঁর মর্যাদাকে যথাযথ সম্মান দেখাতে পারছে না। প্রথম প্রথম তিনিও ক্লাবে আসতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু সহকর্মীরা তাঁকে কিছুতেই ছাড়বে না। কাজেই সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে শুধু উৎসবের দিনগুলিতে তিনি ক্লাবে আসেন। উৎসবে বাবুদের যে মিষ্টান্নাদি বিতরণ করা হয় তা তিনি গ্রহণ করতে চান নি। সেইজন্য সকলের সম্মতিক্রমে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে তাঁর জন্য কলা, কমলালেবু অথবা অন্য কোনও আস্ত ফল দু-চারটি সংগ্রহ করা হবে। বিস্তর সাধাসাধির পর শিশিরবাবু তাতে সম্মতি দিয়েছেন এবং অদ্যাবধি সেই বন্দোবস্তই চলে আসছে। আজও তার ব্যতিক্রম হবে না। তিনি আসার অল্পক্ষণ পরেই ছোট সাহেব অর্থাৎ এ্যাসিষ্টান্ট ম্যানেজার এবং অফিস মাষ্টার এলেন। বড় সাহেব আসবেন না, তিনি এখানে নেই। একটু পরেই সভার কার্য আরম্ভ হল।

সাধারণভাবে চাপরাশী ও দারোয়ানেরা এই উৎসবে আহূত না হলেও মাত্র দুজন চাপরাশীর এখানে প্রবেশাধিকার আছে। তারা হচ্ছে গোকুলদের অফিসের খাস চাপরাশী। অফিসের খাতাপত্র উঠানো নামানো, ফাইল প্রভৃতি এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে পৌঁছে দেওয়া, অফিস ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার রাখা, এই সব এদের কাজ। এই দুটি লোকের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট আছে, তাই এদের একটু বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমটি হিন্দুস্থানী, নাম চন্দ্রিকা সিং, বাড়ি ছাপরা জেলা। রোগা একহারা চেহারা, কিন্তু শীর্ণ মুখমণ্ডলে এবং তন্মধ্যস্থ উজ্জ্বল চক্ষু দুটিতে বুদ্ধির সুস্পষ্ট ছাপ। অত্যন্ত চতুর, কর্মঠ ও বিশ্বাসী লোক বলে বাবু মহলে সকলেই তাকে স্নেহ করে। যে কোনও কাজের ভার তার ওপর দেওয়া যাক সে পিছপাও হয় না সহজে। এমনকি প্রয়োজন হলে অন্যান্য অফিসের উচ্চ-পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের অফিসের বক্তব্য বুঝিয়ে বলবার সাহস ও মনোবলের পরিচয় সে একাধিকবার দিয়েছে। অফিসের কাজ ছাড়া বাবুদের বহু ব্যক্তিগত ফাই-ফরমাসও সে খাটে। ব্যবহারটি তার অত্যন্ত অমায়িক। এইসব নানা কারণে পূজা পার্বণে বাবুদের কাছ থেকে সিকি আধুলি বখশিস প্রায়ই তার ভাগ্যে জুটে যায়। তার মুখে কয়েকজন বাবুর নামের ঈষদিকৃত উচ্চারণও মাঝে মাঝে বাবুদের হাসির খোরাক যোগায়। গোকুল কাজে যোগদান করবার তিন চার দিন পরে একদিন যখন চন্দ্রিকা এসে তাকে বলল—হুজুর, মানুহ্ বাবু আপনাকে ডাকছেন, তখন গোকুল বুঝতেই পারল না কোন্ বাবুর কথা সে বলছে। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে গোকুল প্রশ্ন করল—মানুহ্ বাবু আবার কে? পাশে উপবিষ্ট নিতাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করল—হ্যাঁ মশাই, আপনাদের এখানে মাংস বাবু, মাছ বাবু এসব আছে নাকি? শুনে আশেপাশের কর্মচারীরা সব হেসে উঠল। নিতাই উত্তর দিল—ওর কথা-বার্তাই ঐ

রকম। বুঝতে আপনার কয়েকদিন সময় লাগবে। হিমাংশু বাবুর নামটা ও সম্পূর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না, মান্‌কু বাবু বলে, বুঝলেন? গোকুল বলল—ও বাবা! তা কেমন করে বুঝব?

পরদিনই আবার এক সময় এসে চন্দ্রিকা সেলাম করে বলল—হুজুর, ছত্তিশ বাবু যে ফাইলটা দিলেন, সেটা ফিরাইয়া দ্যান। গোকুল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে প্রশ্ন করল—ছত্রিশ বাবু আবার কে? বাবুদের নাম আবার ছত্রিশ সাঁইত্রিশ হয় নাকি?

নিম-দাঁতনের সাহায্যে সযত্নে নিত্য-পরিষ্কৃত শুভ্র-দশনপংক্তি উদ্‌ঘাটিত করে চন্দ্রিকা জবাব দিল—চিনলেন না? ঐ যে বাবু বসিয়ে আছেন। ঐ!—বলে আঙুল নির্দেশ করে দেখাল। সেদিকে চেয়ে দেখে গোকুল বলল—ও, সতীশ বাবু! সতীশ বাবুকে ছত্রিশ বাবু বানিয়েছ! কোন্ বাবুকে আবার সাঁইত্রিশ বানাবে তার ঠিক নেই।

চন্দ্রিকা প্রত্যুত্তর না করে মৃদু হেসে শুধু বলল—দ্যান হুজুর ফাইলটা।—বলে ফাইল নিয়ে চলে গেল।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে গোকুল জানতে পারল চন্দ্রিকার পরিভাষায় নলিনী বাবু হচ্ছেন লোলনী বাবু, অশ্বিনী বাবু অশ্‌নী বাবু, শরদিন্দু সরিন্দু বাবু, শশাঙ্ক শিউশঙ্কর বাবু, এবং অবনী অমনী বাবু।

বাবুদের নাম ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ে চন্দ্রিকার নিজস্ব অপভ্রংশ ভাষা আছে। তার দু একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বছর দুই আগে চন্দ্রিকা একবার লম্বা ছুটির জন্য কলকাতার হেড অফিসে আবেদন করেছিল। কিন্তু অনুমতি আসতে দেরী হতে লাগল। তখন সে হেড ক্লার্কের কাছে গিয়ে বলল—হুজুর, আমার ছুটির একটা রবিন্দর দ্যান। প্রিয়নাথ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—রবিন্দর? সে কি?

চন্দ্রিকা বুঝিয়ে দিল—তাগিদ। আপনারা কি বলেন, রবিন্দর না রমিন্দর, তাই।

এবার প্রিয়নাথ বুঝতে পারলেন। হেসে ফেলে বললেন—ওঃ, রিমাইণ্ডার? একগাল হেসে চন্দ্রিকা উত্তর দিল—জী হাঁ, ওহি। প্রিয়নাথ বললেন—আচ্ছা, দিচ্ছি।

আর একবার একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। চন্দ্রিকা একদিন দুপুরে শুকমুখে এসে নলিনীবাবুকে বলল—বাবু, একটা মনি অর্ডার লিখিয়ে দ্যান। নলিনীবাবু করেস্‌পণ্ডেন্স ক্লার্ক। তাঁর কাছে মনি অর্ডার প্রভৃতির ফর্ম সব সময় মজুত থাকে। একখানা ফর্ম বার করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কার কাছে মনি অর্ডার করবে? চন্দ্রিকা বলল—আমার ভাই অম্বিকা সিংএর কাছে। নলিনী জানতেন অম্বিকা সিং কলকাতার একটা অফিসের আর্দালী। জিজ্ঞাসা করলেন—কেন, সে ত চাকরি করে? তাকে টাকা পাঠাবে কেন? উত্তরে চন্দ্রিকা বলল—হাঁ চাকরি করে বটে, কিন্তু দুদিন আগে হঠাৎ পাড়িয়ে গিয়ে হাথ ভাঙিয়ে গেছে। তাই এখন কমল হাঁসপাতালে ভর্তি আছে।

নলিনীবাবু তখন অল্পদিন হ'ল চাকরিতে বহাল হয়েছেন, সেজন্য হিন্দুস্থানীদের বিচিত্র পরিভাষার সংগে সম্যক পরিচিত হননি। চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন—কমল হাঁসপাতাল? সে আবার কোথায়?

পাশে উপবিষ্ট প্রবীণ অবনীবাবু বললেন—বুঝলেন না, ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল।

ওঃ!—বলে নলিনী হেসে ফেলেছিলেন।

চন্দ্রিকা বলল—জী হাঁ। সামনা এতোয়ার ওর একৃসিরা হোবে। তাই হামার কাছে টাকা চাইয়েছে।

নলিনী পুনরায় চমৎকৃত হলেন। বললেন—একশিরা? হাত ভাঙার সংগে একশিরার সম্বন্ধ কি?

অবনীবাবু আবার তাঁকে আলোকদান করলেন। বললেন—সে একশিরা নয়। ওরা 'এক্স-রে'-কে বলে একৃশিরা!

এ-হেন ঐতিহ্যমণ্ডিত চন্দ্রিকা সিং আজ ক্লাবে উপস্থিত। বাবুদের জলযোগ হয়ে গেলে 'পরসাদী' পাবে। প্রসাদ বলতে অবশ্য সত্যই উচ্ছিষ্ট নয়, ওদের জন্যও হিসাব করে খাবার আনানো হয়েছে। চন্দ্রিকা

সিং বাবুদের প্রতি সম্ভ্রম বশতঃ তাকে প্রসাদী বলে উল্লেখ করে।

এবার অফিসের দ্বিতীয় চাপরাশীর প্রসংগে আসা যাক। এটি বাঙালী, নাম উমেশ দস্তিদার। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, লম্বা একহারা চেহারা, শ্যামবর্ণ। পান-দোক্তার একটু বেশি ভক্ত। বাবুরা মাঝে মাঝে পান-দোক্তার উৎকোচ প্রদান করে তার কাছে থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ আদায় করে থাকেন। উমেশ অল্প লেখাপড়া জানে এবং সেইজন্য আর নিজের সম্বন্ধে বেশ একটু উচ্চ ধারণা আছে। প্রায়-নিরক্ষর চন্দ্রিকা সিং অপেক্ষা নিজেকে সে বহু উন্নততর জগতের অধিবাসী বলে জ্ঞান করে। তার উপর, এই কোম্পানীতে চাকরি নেবার পূর্বে বছরখানেক কলকাতার এক ওষুধের দোকানে কম্পাউণ্ডারের সহকারী ছিল। সেই সময় নিত্য পরিচয়ের ফলে কয়েকটা ঔষধের নাম কিছুটা বিকৃতভাবে তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে নামগুলো তার স্মৃতিতে এখন আরও বিকৃত হয়ে গেছে, কিন্তু সে বিষয়ে উমেশ অবহিত নয়। অবশ্য এই দিকের বিদ্যাটা সকলের কাছে সে জাহির করবার সুযোগ পায় না। তবে ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডারের কাছে মাঝে মাঝে ব্যক্ত না করে পারে না। ডাক্তারবাবু সদাশয় লোক। বিকৃতিগুলো শুনে মুচকে হাসেন, কোনও প্রতিকূল মন্তব্য করেন না। কিন্তু কম্পাউণ্ডারের ধৈর্য এবং মনের বিস্তার কম, তিনি এ রকম দৃষ্টান্ত পেলে উমেশকে তিরস্কারই করেন এবং বলেন—যখন ঠিকমত জানো না, তখন ও সব বলবার দরকার কি? লোকে শুনলে হাসবে। তার চেয়ে বাংলায় বললেই পার।

এতে কিন্তু উমেশের আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় ইমারৎ কিছুমাত্র শিথিল হয় না। সে ভাবে, কম্পাউণ্ডারবাবু অন্যায় পূর্বক তাকে বকছেন। উমেশ একটা চাপরাশী মাত্র, সে ইংরাজি বলবে এটা সহ্য করতে পারছেন না তিনি। ওঃ ভারী কম্পাউণ্ডার! উমেশ যদি ওষুধের দোকানে আর কিছুদিন টিঁকতে পারত তবে সেও কম্পাউণ্ডার হোত।

এবার উমেশের ভেষজ সম্বন্ধীয় বিদ্যাবত্তার দু একটা নমুনা দেওয়া যাক। একবার তার হজমের গোলমাল হয়েছিল। তখন সে সোজা ডাক্তারখানায় গিয়ে ডাক্তারবাবুকে বলল—বাবু, আমাকে এক ডোজ কার্বুয়েটিব মিকচার দ্যান।

ডাক্তারবাবু তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—কার্বুয়েটিভ মিকচার? সে আবার কি?

উমেশ বলল - কেন, সেই যে হজমের ওষুধ, লাল রঙের, যাকে আপনারা কার—

—ওঃ! কার্মিনেটিভ মিকশ্চার?

লেশমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে উমেশ বলেছিল—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জিনিষ।

উমেশের স্ত্রীর দাঁতগুলো পানসে, মাঝে মাঝে তা দিয়ে রক্ত বেরোয়। একদিন এসে ডাক্তারবাবুকে সে বলল—স্তার, আমার স্ত্রীর দাঁতগুলো বড় খারাপ। কুলি করবার জন্য একটু পটাশ পারমঙ্গলম্ দ্যান।

এবার আর ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন না। তিনি ওকে কিছু পটাশ পারম্যাঙ্গানেট দিলেন। উমেশের নিজের দশনপংক্তিও নির্দোষ নয়। মাঝে মাঝে দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণা হয় ও মাড়ি ফোলে। এমনি অবস্থায় একবার সে হাঁসপাতালে এল ওষুধ নিতে। দেখল ডাক্তার নাই, অগত্যা কম্পাউণ্ডারের কাছে গিয়ে বলল—বাবু, একটা শিশিতে করে একটু গাটা পারচা আমাকে দ্যান ত।

কম্পাউণ্ডার অবাক। জিজ্ঞাসা করলেন—গাটা পারচা?

হ্যাঁ হ্যাঁ। দাঁতের ব্যথা হলে আর মাড়ি ফুললে যা লাগায়।

—ওঃ তাই কও, গাটা ডেন্টা। তুমি বাপু—

অসহিষ্ণু উমেশ বলে উঠল—রাখেন। ওষুধটা দিয়ে দ্যান।

এই হল উমেশের পরিচয়।

গোকুলদের অফিসের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত রেখা-চিত্র অঙ্কন করা গেল। সব বড় বড় অফিসেই ঠিক

এইরকম না হলেও এই ধরণের চরিত্র দেখা যাবে। ঈশ্বরের সৃষ্টি বাস্তবিকই অতীব বিচিত্র ও রহস্যময়। আবার সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র, সবচেয়ে অদ্ভুত। এই অনন্ত বৈচিত্রময় মানব সমাজকে যিনি ভগবানের চিড়িয়াখানা বলে অভিহিত করেছিলেন, তাঁর উক্তি যথার্থই মৌলিক এবং প্রশংসনীয়।

আজকের সান্ধ্য মজলিশে খান দুই গান ও গুটি তিনেক বক্তৃতা হল। তারপর জলযোগ পর্ব্ব। জলযোগান্তে বাবুরা অধিকাংশই বেরিয়ে গেলেন। কেবল তাস দাবা ও ক্যারমবোর্ডের ভক্তরা রয়ে গেলেন এবং আপনাপন খেলার সরঞ্জাম নিয়ে বসলেন। তাঁদের বাসায় ফিরতে রাত্রি দশটা, সাড়ে দশটা, কারো বা এগারটা।

[আঠার]

মানুষ চলমান জীব, গতিই তার স্বাভাবিক নিয়ম। থেমে সে থাকতে পারে না, চলতে তাকে হবেই। এই চলা শুধু যে জন্ম থেকে মরণের পথে প্রতিনিয়ত তিল তিল করে অগ্রসর হওয়া তা-ই নয়, এই চলার ছন্দ তার সকল কাজে, সর্ব্ব প্রচেষ্টায় অনুস্যূত হয়ে রয়েছে। সময় এবং সুযোগ পেলেই তা স্পষ্টভাবে অনুরণিত হয়ে ওঠে।

উমার যৌবন-নিকুঞ্জে যখন বিলম্বিত বসন্ত দেখা দিল এবং তার অকস্মাৎ-প্রস্ফুটিত প্রসূন-গুচ্ছের মদির সৌরভ সন্নিহিত মধুকরের কাছে আমন্ত্রণ-লিপি পাঠাল, তখন এক নূতন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দলোকে উমার প্রথম পদক্ষেপ হ'ল। চলার স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী সে পায়ে পায়ে ক্রমাগত এগিয়েই চলতে লাগল। ওদিকে তার চ্যুতমঞ্জরীর গন্ধে আকৃষ্ট নবাগত পথিকও থেমে রইল না, সেও ধীরে ধীরে নিজের অগোচরে পায়ের পর পা ফেলে রসঘন আনন্দকোষের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। পরস্পরের কাছে পরস্পরের মন জানাজানি হয়ে যাবার পর তাদের উভয়ের মধ্যে শুরু হল নানা বৈচিত্রময় লীলা-বিলাস। নারীর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় হ'ল তার দেহখানি। একে ঘিরেই তার মনোলোক আবর্ত্তিত হতে থাকে। এ-হেন তনুটিকে উমা সেই যে বিয়ের পর মাত্র বছর খানেক সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছিল, তার পর থেকে অপর পক্ষের উৎসাহের অভাবে এর প্রতি সে ক্রমশঃ অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। ইদানীং অভ্যাসবশতঃই চুল বাঁধা, টিপ পরা, মুখ মোছা প্রভৃতি করত, কোনও একজনের উৎসুক প্রেম-প্রদীপ্ত চক্ষের উজ্জ্বল দৃষ্টি সেই সব প্রসাধন-প্রক্রিয়ার উপর সোনালী আভা প্রতিফলিত করেনি। আজ যখন সহসা আবার অনুকূল পরিবেশ এসে উপস্থিত হ'ল তখন উমার ভিতরকার চির-অভিসারিকা নারীপ্রকৃতি আবার বাসর-সজ্জার প্রতি উদ্যোগী হ'ল। সামর্থ্য তার অল্প, উপকরণ তার সামান্য, রূপের সম্পদও তার নগণ্য, তথাপি এদেরই সাহায্যে ছোট্ট শ্যাম-চিক্কণ দেহের বরণডালাটুকু যথাসাধ্য পরিপাটি করে সাজিয়ে দয়িতের সম্মুখে নিবেদন করে দেবার আগ্রহ তার এখন দিন দিন বেড়ে উঠছে। দেবতাটিও স্নিগ্ধ পরিতৃপ্ত দৃষ্টির প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে এই সামান্য আয়োজনকে অসামান্যের মর্য্যাদায় মণ্ডিত করে দিচ্ছে। আদর করে উমার সুকুমার চিবুকটি ধরে গোকুল যখন বলে—উমা, তোমায় আজ তা-রি সুন্দর দেখাচ্ছে। তুমি যে এত সুন্দর করে সাজতে পার, আমি তা আগে ভাবতেই পারতাম না।—তখন উমার গাল দুটি লাল হয়ে উঠে এবং চোখের পাতা কি এক মধুময় লজ্জায় নেমে আসে। তারপর গোকুল যখন উমার আপাদমস্তক সপ্রশংস দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়, তখন উমার মনে হয় সে যেন মৃদু, অতি মৃদুভাবে উমার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

কোন কোন দিন অবসর সময়ে গোকুল নিজের ঘরে চেয়ারখানিতে বসে থাকে, উমা টের পেয়ে রান্না নামিয়ে রেখে ঘরে চলে আসে। অকারণে হাত দুটি তুলে মাথায় খোঁপাটা একটু ঠিক করে নেয়, প্রকোষ্ঠের রোল্ডগোল্ডের চুড়ি কগাছি টুংটাং করে মৃদু শিঞ্জনী

তোলে। গোকুল মুগ্ধ নেত্রে নিরীক্ষণ করে তার দেহ-বল্লরীর সঞ্চালন, লক্ষ্য করে তার ভুরু-যুগলের উত্থান-পতন। গোকুলের তন্ময়তা দেখে হেসে ওঠে মায়াবিনী, পাতলা আরক্তিম ঠোঁট দুখানির ফাঁকে ঈষৎ বিকশিত হয় শুভ্র সুগঠিত দন্ত-পংক্তি। ঘাড়টা একদিকে একটু হেলিয়ে কটাক্ষ হেনে প্রশ্ন করে—কি দেখতে আছেন অত কইরা ?

গোকুলের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে ছোট্ট একটি কথা—তোমাকে।

যেন বিশ্বাসই করতে পারেনি এইভাবে বলে ওঠে উমা—ইস্ !

কণ্ঠস্বরে গাঢ় অনুরাগ ফুটিয়ে গোকুল উত্তর দেয়—হ্যাঁ, সত্যি। তারপর সহসা দু'বাহু প্রসারিত করে ডাকে—এসো।

উমার ধমনীতে রক্তস্রোত চঞ্চল হয়ে ওঠে। তবু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বলে—না।

কণ্ঠে মধু ঢেলে গোকুল আবার ডাকে—এ-সো, লক্ষ্মীটি।

আর নিজেকে সংবরণ করতে পারে না নায়িকা। খিল খিল করে হেসে উঠে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নায়কের বক্ষে, আবদ্ধ হয় দৃঢ় আলিঙ্গনে। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে পড়ে থাকে সেই বাহুবন্ধনে বাঁধা হয়ে। দুজনের বক্ষের স্পন্দন দুজনে স্পষ্ট শুনতে পায়। কেটে যায় সর্বাঙ্গঅবশ-করা আবেশে কয়েকটি আবেগস্পন্দিত অমৃতময় মুহূর্ত। উমার প্রতি রক্ত-কণিকার দ্রুততালে জলতরঙ্গ বাজতে থাকে। মনে হয়, এই অবস্থায় যদি মৃত্যু হয় ত সে বড় সুখের, বড় সাধের মৃত্যু।

ধীরে ধীরে গোকুল মুক্ত করে দেয় উমাকে। ধীরে ধীরে উমা উঠে দাঁড়ায়। মাথার এলো খোঁপা বিস্রস্ত, বক্ষের অঞ্চল স্খলিত। দুই-চোখ-ভরা বিদ্যুৎ নিয়ে আবার তীব্রবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রিয়তমের বক্ষে, আবার কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায় অনির্বচনীয় আনন্দের আতিশয্যে।

এই রকম নানা খেলার মধ্য দিয়ে বয়ে যায় হালকা দিনগুলো। মনে হয় জীবনটা ছোট্ট শুভ্র একটি বকের পালকের মত অসম্ভব লঘু হয়ে গিয়েছে। তাই হাওয়ায় ভর করে ক্রমাগত দিগ্বিদিকে মহানন্দে উড়েই বেড়াচ্ছে, ধূলার ধরণীতে নামতেই চাইছে না। এইসব আত্মবিভোর-করা নানা ধরণের বিলাসের মাঝে মাঝে ঝরে পড়ে স্বতঃ-উৎসারিত অফুরন্ত কথার ঝরণা। উমা স্বভাবতঃই একটু লাজুক প্রকৃতির, তার উপর অশিক্ষিত। কাজেই সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত গোকুলের সামনে এত দিন সে খুব সংযত এবং সাবধান হয়েই বাক্যালাপ করে এসেছে। কিন্তু আজ তারা দুজনে এমন এক জায়গায় এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে যেখানে ও সব তুচ্ছ লজ্জা সঙ্কোচের স্থান নেই। প্রেমের দরবারে উভয়ের সমান অধিকার। তাই অশিক্ষিতা গ্রাম্য যুবতী উমার মুখ দিয়ে আজকাল উৎসারিত হয় ভাবোচ্ছ কথার নির্ঝরিনী। পাহাড়ী জংলা ঝরণা ধারার মতই তার অস্ফুট কলগুঞ্জন সুমিষ্ট লাগে গোকুলের কানে। মুগ্ধ হয়ে সে বসে বসে শোনে। গোকুল নিজেও নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে। কল্পনার পক্ষ বিস্তার করে ভাবের আকাশে অবাধে উড়ে চলে যায়। প্রিয়াকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করে পরিতৃপ্তি লাভ করে। এ এমন একটা জগৎ যেখানে দেওয়াতেই সুখ। দুহাতে সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েও যেন আশ মেটে না।

একদিন গোকুল বলল—আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো উমা ?

কি ?

আন্দাজ কর দেখি।

আমি ?

হ্যাঁ।

ক্যামনে কমু ? আপনার মনে কি কথা উঠে—

বাধা দিয়ে গোকুল বলল—আমার মনে হয় তা তুমি সহজেই বুঝতে পার। প্রেম মানুষকে অন্তর্যামী করে। আমার মনে যে ঢেউ ওঠে তার দোলা নিশ্চয় লাগে তোমার হৃদয়ের তটে, তার ছায়া দোলে

তোমার মনের মুকুরে। তুমি আমি যেন এক জোড়া হংস-মিথুন। ছুই বিভিন্ন জায়গা থেকে উড়ে এসে মিলেছি একই সরোবরে।

এই পর্যন্ত বলে গোকুল থেমে উমার মুখের দিকে তাকায়। গোকুলের সামনে ছোট্ট টুলটির ওপর ইতিমধ্যে বসে পড়েছে উমা, হাটুর ওপর কমুইএর ভর দিয়ে ডান হাতখানি উঁচু করে রাখা, এবং দক্ষিণ করতলে কপোল ন্যস্ত। তন্ময় হয়ে শুনছে গোকুলের কথা। গোকুল তাকাতেই ফিক করে হেসে ফেলে। গোকুলও হাসে। প্রশ্ন করে—বুঝেছ ?

হু।—ঘাড় নাড়ে উমা।

গোকুল প্রশ্ন করে—আরও কি মনে হয় জানো ?

কন্।—উমার আয়ত চক্ষে আবার ঔৎসুক্য ঘন হয়ে আসে।

গোকুল আরম্ভ করে—এক এক সময় ভাবি, তুমি যেন কোন্ এক অচিন দেশের রাজকন্যা, এক নির্জন ঘুমন্ত পুরীর মধ্যে একাকী অপেক্ষা করে আছ কোন্ এক দুরাগত পথিকের পদধ্বনির প্রত্যাশায়। দিন যায়, রাত্রি আসে। রাত্রি যায়, আবার আসে দিন। প্রত্যহ নূতন আশা নিয়ে তুমি পথ চেয়ে বসে থাকো। মনে জানো একদিন সে আসবে, নিশ্চয় আসবে। কত শরৎ, কত বসন্ত পার হয়ে গেল। ঋতুচক্র কতবার আবর্তিত হল। তারপর—তারপর একদিন সে এলো। সেই বহু প্রত্যাশিত পাত্র। বল দেখি উমা, সে কে ?

উমা জবাব দেয়—রাজপুত্র।

গাঢ়স্বরে গোকুল বলে চলে—না, রাজপুত্র নয়। রাখাল। শুধুই এক রাখাল সে। সম্বলের মধ্যে তার কেবল একটি বাঁশের বাঁশি। সেই বাঁশিই তাকে অজানার সন্ধানে পথে বার করেছে। সেই বাঁশির সুরই তার প্রাণে এনেছে সুদূরের স্বপ্ন। তার দীর্ঘ অভিসারে এই বাঁশিই তাকে কেমন করে জানিনা পথ দেখিয়ে এনেছে। তার ত আর কিছু নেই, তাই সে এই নিত্য-সংগী বাঁশিখানি রাজকুমারীর পায়ের কাছে রেখে বলছে—এ-ই আমার সর্বস্ব, একে তুমি নাও। রাজকন্যা দুহাতে বাঁশিটি তুলে নিয়ে ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করিয়ে আবার রাখালকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে—বাজাও। তোমার বাঁশি বড় মধুর, প্রাণ কেড়ে নেয়। স্বপ্নে আমি কতদিন শুনেছি এর স্বর। মনে মনে কামনা করেছি কবে জাগ্রত অবস্থায় শুনব। আজ আমার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। হে রাখাল, তুমি প্রাণভরে বাঁশি বাজাও, আমি তোমার কোলে মাথা রেখে শুনি।

এই বলে গোকুল নিস্তব্ধ হয়ে যায়। চারি চক্ষের মিলন ঘটে। তারপর উমার মাথাখানি ধীরে ধীরে নেমে আসে নিকটেই চেয়ারে উপবিষ্ট গোকুলের কোলের উপর। দু'চার মিনিট গোকুল নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করে সেই সুকুমার শ্যামচিক্কণ মুখশ্রী। তারপর আস্তে আস্তে ডান হাতখানি অত্যন্ত আলগোছে বুলিয়ে নিয়ে যায় চুল, কপাল এবং গালের উপর দিয়ে বারংবার। ক্রমশঃ উমার চোখ মুদে আসে। বন্ধ চোখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে জলের ধারা। গোকুল নীরবে বসে দেখে, কোনও কথা বলতে পারে না। তার বক্ষ উদ্বেল করে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। তারও দুই চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। প্রাণটা কেমন যেন অজ্ঞাত বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে হয়, মানুষের জীবনে কোথাও বুঝি অমিশ্র সুখ নেই। তাই পরিপূর্ণ মিলনের মাঝেও থেকে থেকে শোনা যায় বিরহের দুরাগত রাগিণীর ঝঙ্কার।

[উনিশ]

শশাঙ্ক ও সুধীরের বাসা পাশাপাশি। উভয়েই ক্লার্ক। বয়স দু'জনেরই চল্লিশের কাছাকাছি। সুধীরের স্ত্রী লতা গৌরবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী। যৌবনে সে যে রীতিমত সুন্দরী ছিল তা এখনও তাকে দেখলে বোঝা যায়। এক পুত্র ও দুই কন্যার জননী। শশাঙ্কর স্ত্রী বেলা শ্যামবর্ণা, স্থূলাঙ্গী এবং ছয়টি পুত্র-কন্যার জন্মদাত্রী। লতা একটু গম্ভীর, বেলা লঘুপ্রকৃতির ও বহুভাষিণী। আকৃতি ও প্রকৃতিতে এত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিন্তু উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা খুব বেশি। এত বেশি যে

অন্যান্য বাসার গৃহিনীরা মধ্যে মধ্যে তা নিয়ে আড়ালে আলোচনা করে এবং কেউ কেউ মন্তব্য করে—ইস্, এত মাখামাখি টিকব ত? প্রতিবেশিনীদের এই বিরূপ মনোভাবের কথা এরা যে জানেনা তা নয়। জানে, এবং মধ্যে মধ্যে তা নিয়ে পরস্পর আলাপও করে। লতা বলে—আমাগো বালবাসা দেইখ্যা ওগো হিংসা হয়। তা হউক গিয়া, কি কন্ দিদি?

বেলা উত্তর দেয়—হ ভাই। করুক গিয়া হিংসা। ভান্ আর একটা পান ভান। আপনার পানগুলি বড় মিঠা।

পরিতৃপ্তির হাসি হেসে লতা বান্ধবীকে একটার স্থলে দুটা পান এগিয়ে দেয়।

এইভাবে গত কয়েক বৎসর অতীত হয়ে গেছে। এদের বন্ধুত্বে যে কোনও দিন চিড় খেতে পারে সে কথা এদের তো নয়ই, প্রায় কারুরই বিশ্বাস হয় না। তবু এই দুই অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মধ্যে হঠাৎ একদিন কি করে যে তুচ্ছ কারণে তুমুল কলহ হয়ে অসূয়া এবং অপ্রিয়-ভাষনের সূত্রপাত ঘটল তা সত্যই বিস্ময়কর। হয়ত এই অবাঞ্ছিত এবং অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য নারী প্রকৃতিই দায়ী—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং দেবাঃ ন জানন্তি। মানব-মনের গভীরে কোথায় যেন একটা অসামঞ্জস্যের বীজ নিহিত আছে। সময় এবং সুযোগ পেলে সে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং ক্রমশঃ পল্লবিত হতে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার বৃদ্ধি এত অধিক হয়ে পড়ে যে, সকলের প্রচলিত ধারণাকে ওলট-পালট করে দেয় এবং বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গোকুল একদিন বিকালে অফিস থেকে ফিরে গোপালের মুখে যখন শুনল যে দুপুরে সুধীরের স্ত্রী এবং শশাঙ্কর স্ত্রীর মধ্যে খুব একচোট ঝগড়া হয়ে গেছে, তখন সে প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারল না। মাথা নেড়ে বলল—যাঃ। তা কখনও হয়?

গোপাল বলল—হয় কি, হয়েছে। শোনো তবে সব। বাপ, সে এক লঙ্কা কাণ্ড!—বলে গোপাল দাদার কাছে ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করতে লেগে গেল। বালক, কিশোর এবং স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ অপরের কলহ অত্যন্ত উপভোগ করে। গোপালের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। তিনটার সময় যখন সে স্কুল থেকে ফেরে তখন ষ্টাফ কোয়ার্টারের হাতার মধ্যে ঢুকেই দূর থেকে শশাঙ্কর বাসার সামনে জটলা দেখতে পায় এবং দুই বাসার অভ্যন্তর থেকে সুউচ্চ রমনীকণ্ঠের তীব্র চীৎকার, গালাগালি এবং আস্ফালন তার কানে আসে। দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে সমবেত জনতার কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নেয়। জনতার প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক ও শিশু। কোলাহলে আকৃষ্ট হয়ে আশপাশের বাসাগুলি থেকে একে একে এসে জুটেছে। তাদের কাছে অনুসন্ধান করে গোপাল জানল যে ঘণ্টাখানেক আগে থেকে দুই বাসার গৃহিনীর মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হয়েছে। ঝগড়াটা যে কি নিয়ে তা কেউই সঠিক বলতে পারছে না, তবে উভয় পক্ষের বাক্যস্রোত থেকে যেটুকু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে মনে হয় সুধীরবাবুর পুত্র দিলীপ শশাঙ্কের কন্যা শেফালিকে কি কারণে ঢিল ছুঁড়ে মেরেছিল। তাতে শেফালির পা একটুখানি কেটে গিয়েছিল। তাই না দেখে বেলা এসে দণ্ডায়মান দিলীপের কর্ণমর্দন ও গণ্ডে চপেটাঘাত করে। ব্যাস, আর যায় কোথা? রোরুদ্যমান দিলীপ মার কাছে গিয়ে সরোদনে বেলার বিরুদ্ধে নালিশ জানায় এবং ক্রুদ্ধা লতা ছুটে এসে বেলাকে তর্জন করে—আপনে আমার পোলার গায়ে হাত উঠাইছেন ক্যান?

বেলাও ছাড়বার পাত্রী নয়। সেও সমান তেজে উত্তর দেয়—আপনের পোলা আমার মাইয়ারে মারছে ক্যান? একেবারে রক্ত বাহির অইয়া গেছে গা।

লতা—পোলাপানের ঝগড়া অমন হইয়া থাকে। তার মাঝে আপনে আসেন ক্যান? বুরা মাগী—

সঙ্গে সঙ্গে বেলা দলিতা ফণীনীর মত ফুঁসে উঠল—কি! আমি অইলাম বুরা মাগী! আর নিজে বুঝি কচি খুকী?

এর পর কলহের তাপ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। দুই রমণীর মুখবিবর থেকে যে সব উক্তি নির্গত হতে লাগল তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা যায় না। উভয়ে উভয়ের চরিত্র, স্বামী, পুত্রকন্যা, এমনকি পিতামাতাকে নিয়ে যতদূর কুৎসিৎ মন্তব্য করা যায় তা করতে বাকি রাখল না। যুদ্ধ লাগলে যেমন এক দিনের বোমাবর্ষণের ফলে সহস্র বর্ষের শান্তিকালীন প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি এক ঘণ্টার কলহের মধ্যে গালিবর্ষণের ফলে দুটি পরিবারের এত বৎসরের প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা লুটিয়ে পড়ল। মানুষ আসলে ধুলার জীব কিনা, তাই তার সব কিছুই এত ভঙ্গুর, এত অল্পকালস্থায়ী, এমন স্পর্শ-সকাতর। তার আনন্দ প্রদীপকে নির্বাপিত করবার জন্য একটি ফুৎকারই যথেষ্ট।

গোপাল ঝগড়ার বর্ণনা শেষ করে থামতেই নিকটে উপবিষ্ট ননী গোকুলকে লক্ষ্য করে বলে উঠল—বুঝছেন নি কাকাবাবু, অত্তদিন এরা মানবের কাইজ্যা দেইখ্যা নাক সিটকাইত, আর অহন? অহন যে দুনোজনে হুলাহুলি ওইয়া গেল। অহন যে বেবাক মানবে আসতে আছে?

গোকুল বলল—তাই নাকি?

ননী—আসব না? আসবই ত। হানেন কাকাবাবু কাইজার মধ্যে দিলীপের মায়ে একখান কাঠ লইয়া শেফালির মায়েরে মারবার আইছিল।

—সত্যি?

—হ।

—আচ্ছা ননী, এদের ত দুজনেরই ছেলেমেয়ে আছে। আগে কোনদিন ছেলেমেয়েদের মধ্যে মারামারি হয় নি?

—অয় নাই আবার? কত ওইছে। তবে হে পোলাপানের মধ্যে। আবার ভাবসাব ওইয়া গেছে। কিন্তু আইজ শেফালির মায়ে দিলীপের কান ডইল্যা দিয়া মুস্কিল বাধাইছে।

ঝগড়াটা খড়ের আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে উঠলেও খড়ের আগুনের মত থপ্ করে নিভে গেল না; তুষানলের মত ধিকিধিকি জ্বলতে লাগল। উভয় পরিবারের মধ্যে সেদিন থেকে বাক্যালাপ বন্ধ হল। বাবুমহলে এই নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হতে লাগল। দিন তিনেক আর কোনও ঘটনা ঘটল না। চতুর্থ দিনটা ছিল রবিবার। গোকুল রমনায় এক ভদ্রলোকের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। পৌনে বারটা নাগাদ ফিরে এসে যে দৃশ্য দেখল তা সে দেখবার আশা করেনি। সুধীরের বাসার সামনে সুধীর ও শশাঙ্ক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উভয়েরই আদগা গা, খালি পা, মুখমণ্ডল আরক্ত, চক্ষু ঘূর্ণিত, হাত মুষ্টিবদ্ধ। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান পাঁচ ছয় হাত। শশাঙ্কর ক্রুদ্ধকণ্ঠ শোনা গেল—ক্যান্, আপনার পোলা আমাগো বিছানায় বালু দিব ক্যান্?

সুধীর মুষ্টি আস্ফালন করে জবাব দিল—দিছে বেশ করছে। আপনার পোলা দিলীপেরে গালি দিছে ক্যান্?

—গালি দিছে কইয়া আপনার পোলায় বালু দিব?

—দিবইত। হানু, আপনি কি করবার পারেন করেন গিয়া।

—বটে। আপনার নাকে এক ঘুষা লাগাইয়া দিমু।

—কি। ঘুষা লাগাইবেন। আসেন, কে কারে ঘুষা লাগায় দেখি।

ক্রোধের আতিশয্যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দুজনেই এগিয়ে আসছিল এবং সত্যই হাতাহাতি সুরু হত, যদি না গোকুল দৌড়ে গিয়ে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ত। দু হাত দু দিকে প্রসারিত করে দিয়ে গোকুল বলে উঠল—ছি ছি। করেন কি আপনারা? এ যে ভয়ানক লজ্জার কথা। ছেলের ছেলের ঝগড়া হয়েছে বলে কি বাপে বাপে মারামারি করতে হবে? লোকে শুনলে কি বলবে বলুন দেখি। শুধু আপনাদের নয়, সমস্ত টীক কোয়ার্টারের বদনাম হয়ে যাবে। আমরা আর বাইরের কারু কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

আপনারা থামুন, মাথা ঠাণ্ডা করুন, নিজের নিজের বাসায় যান্। যান্, আর দাঁড়াবেন না এখানে। এই দুপুর রোদ্দুরের মধ্যে—ছি ছি,ছি।

বৃদ্ধমাত্র ভদ্রলোক দুটি কিছুটা অপ্রতিভ হলেও রাগ তাদের তখনও পড়েনি। দুজনেই রোষকষায়িতলোচনে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। ইত্যবসরে আশ-পাশের বাসা থেকে নলিনী, সতীশ ও বিপিন বেরিয়ে এল। নলিনী ও বিপিন সুধীরকে ধরে তার বাসার ভিতর দিয়ে এল এবং গোকুল ও সতীশ শশাঙ্ককে নিয়ে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে এল।

এর পর দুই পক্ষ আর প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হল না বটে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি আক্রোশের ভাবটা অনেকদিন পর্যন্ত রইল। বাবুদের ভিতর ঝগড়াঝাঁটি কখনও কখনও হয় বটে, কিন্তু এতদূর বড় একটা গড়ায় না। এই ঘটনার ফলে দারোয়ান মহলে বাবুদের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাব বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করা গেল এবং সেইজন্য সুধীর ও শশাঙ্ক বহুদিন পর্যন্ত অন্যান্য বাবুদের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল। বিপিন বয়সেও নবীন এবং একটু কৌতুকপ্রিয়ও বটে। সে মাঝে মাঝে গোকুলের কাছে এসে পরিহাসচ্ছলে ঘুষি পাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলে—দিমুনে, বাপু দিমুনে!—বলে আর হাসে। গোকুলও সে হাসিতে যোগ দেয়।

বৃদ্ধ তারকবাবু খুব নিরিবিলি প্রকৃতির লোক। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে বাড়ি। শশাঙ্কদের ঝগড়ার দু তিন দিন পরে তিনি একদিন কথাচ্ছলে গোকুলকে বললেন—ভাখেন গোকুল বাবু, আপনারে একটা কথা কমু, কিন্তু মনে করবেন না। আমি বুড়া মানুষ—

—না না, মনে করবার কি আছে? আপনি বলুন তারকবাবু। আমি ত আপনাকে কয়েক মাস দেখছি, আপনি অন্যায্য কখনও বলেন না। বলুন—

—ভাখেন, আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর কোম্পানীর ঘরে চাকরী করতে আছি। বহু জায়গায় ঘুরছি, অনেক দেখছি, অনেক শুনছি। যেখানেই দেখছি মাইয়ালোকের মধ্যে আইজ খুব ভাব, হেখানেই দুইদিন পরে দেখছি কলহ। আমার মনে হয় বেশি মাখামাখি ভাল নয়। হেই লাগি আমার পরিবারেরে আমি অন্যের পরিবারের লগে বেশি মিশবার দিই নাই। ফলে কেউর লগে আমার দহরম মহরমও যেমন নাই বিবাদ বিসম্বাদও তেমনি নাই। আপনি ভাল মানুষ দেইখ্যা আপনারে কইয়া থুইলাম, পরিবারেরে কেউর পরিবারের লগে বেশি গলাগলি করবার দিবেন না। দেখবেন, শান্তিতে থাকবার পারবেন। অখন আপনার পরিবার লগে নাই, কিন্তু একদিন ত আইবেন। হে সময় মনে রাখবেন এই বুড়ার কথাটা।

তারকবাবুর উপদেশ খুবই সমীচীন বলে গোকুলের মনে হল এবং সে স্থির করল এটা সে পালন করবে।

ক্রমশঃ

ডাঃ কালিদাস নাগ স্মৃতিরক্ষা পুরস্কার

ডাঃ কালিদাস নাগের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার কন্যাগণ যে স্বর্ণ পদক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই পুরস্কার বর্ত্তমান বৎসরে শ্রী পুলিন বিহারী সেনকে অর্পণ করা হইয়াছে। ডাঃ কালিদাস নাগের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী শ্যামশ্রী দেবী নিজ গৃহে পুরস্কার দিবার সময় একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। "ইন্দিরা" সংগীত গোষ্ঠীর একক গায়ক শ্রী প্রসূন দাশগুপ্ত "জগতে আনন্দ যজ্ঞে" গানটি সম্মেলনের আরম্ভে গাহিয়া সমবেত সকলকে তৃপ্ত করেন। ইন্দিরাদেবীর নাতিনী সুপর্ণা দেবী "কিছুতো বুঝিনে প্রভু" ও "তোমার সোনার থালায়" এই দুইটি গান গাহিলেন। পরে উভয়ের মিলিত কণ্ঠে "তোমায় আমায় মিলন হবে" গানটি সুন্দরভাবে গাহিলেন ও সর্ব্বশেষে ডাঃ কালিদাস নাগের দৌহিত্র দৌহিত্রীগণ "তুমি আমাদের পিতা" গাহিয়াছিলেন। স্বর্ণপদক প্রাপ্তিকালে শ্রী পুলীন বিহারী সেন যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

ইতিপূর্ব্বে কালিদাস নাগ স্মৃতি-পুরস্কারে যাঁরা সম্মানিত হয়েছেন দুই মহাদেশে তাঁদের সৃজনীয় লেখার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত; আমি তথ্যানুসন্ধিৎসু মাত্র, মনীষিতার কোনোই দাবি করতে পারি না—আমাকেও পুরস্কৃত করা দ্বারা আপনারা বস্তুতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে যে শ্রমের মর্যাদা আছে সেই কথাই স্বীকার করলেন। একজন মহামানবের জীবনের সকল প্রাসঙ্গিক কিন্তু অপরিজ্ঞাত তথ্য এবং বিস্মৃত ও বিলুপ্ত প্রায় রচনা সমসাময়িক ও উত্তরকালের কাছে তুলে ধরবার দায়িত্ব সেই মহামানবের সমকালীন অনুগামীদের সেই তথ্য এবং রচনারই মূল্য আপনারা দিলেন—সংগ্রহ কর্মে নিযুক্ত অনেক কর্মীও বাইরের অন্যতমকে সমাদৃত করার দ্বারা।

দীর্ঘকাল এই সংগ্রহ কাজে রত থাকতে হয়েছে পুরস্কারের বাসনায় নয়, ভালবাসায়—আমার সৌভাগ্য হয়েছে এই কাজে জ্যেষ্ঠ পূর্বসূরী ও কনিষ্ঠ সহকর্মী বহুজনের অপরিসীম প্রীতি ও অকৃপণ আনুকূল্য লাভের। সংখ্যায় তাঁরা অগণিত, আজকের স্বল্পাবসরে দুজনের কথা উল্লেখ করাই প্রাসঙ্গিক। প্রথমতঃ পূজনীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় তাঁর নির্দেশে কয়েক বৎসর তাঁর সহযোগীতা করবার সুযোগ হয়েছিল তখন প্রত্যহ যা দেখেছি ও তাঁর কাছে শুনেছি তাতে মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি সুদীর্ঘকাল ধরে সর্ব্বমুখী অনুরাগের গভীরতায়, তাঁর সঙ্গে একমাত্র তুলনীয়, আমাদের দেখা মানুষের মধ্যে, দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ। তাঁর সেই অনুরাগ আমাদের মত সাধারণ স্তরের লোককেও সাধ্যানুযায়ী রবীন্দ্রচর্চ্চায় অনুপ্রাণিত করেছে।

কালিদাস নাগ মহাশয়ের স্মরণে যে পুরস্কার, তা লাভ করা আমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের এই কারণে যে, আমার সহকর্মীবৃন্দের সহযোগে আমি যে জাতীয় তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত তা তাঁর সমাদর লাভ করেছিল; নিরন্তরই তিনি আমাদের নূতন উদ্যোগে উৎসাহিত করছেন নবীন কর্মীর সামান্য কৃতিকেও তিনি অতিরেক করে আনন্দ প্রকাশ করতেন; বিদেশে গুণীসমাজেও তিনি আমাদের মত সাধারণ লোকেরও সামান্য কাজের কথা সোৎসাহে উল্লেখ করেছেন। আজ যে পদক আপনারা আমাকে দিলেন, তাঁর স্নেহস্মৃতির স্মারক রূপে তা আমার কাছে বহুমূল্য।

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি

কালীপদ সিংহ

কলিকাতা মহানগরীর যে সব দ্রষ্টব্য স্থান আছে তা অনেকেই দেখেছেন, কিন্তু ইদানীং বঙ্গ ভাষা প্রচারের উদ্দেশ্যে লোক রোডের উপর (ঢাকুরিয়া রেলওয়ে ক্রসিং এর সম্মুখে) পূর্বোক্ত সমিতি যে নিজস্ব ভবন নির্মাণ করেছেন তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইহা একটি অনন্য সাধারণ স্থান অধিকার করেছে। এই বিরাট চারতলা বিশিষ্ট সৌধ, ইহার পাঁচ শতাধিক দর্শকের উপযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, ইহার বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ—যেখানে বহু প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ ও চিত্রসংগ্রহ সুরক্ষিত আছে, যিনি দর্শন করেন নাই, তাঁহার কলিকাতা দর্শন সার্থক হয় নাই, নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ইহার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অশীতিপর বৃদ্ধ অথচ তারুণ্যের প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহে সম্প্রতি ইহা দর্শন করার সৌভাগ্য হওয়ায় নয়ন মন সার্থক মনে হল।

এই সমিতির প্রতিষ্ঠা ও ইহার উদ্দেশ্য এর কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুচার কথা নিবেদন করছি। "১৯৩৮ সালে যখন মহাত্মা গান্ধী হিন্দুস্থানীকে (সংস্কৃত ও ফার্সী মিশ্রিত নূতন ভাষা) স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে বলিয়া ঘোষনা করেন, তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে সাহিত্যিক ও সংবাদিকদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতি হীরেন্দ্র নাথ দত্ত "মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, রাষ্ট্রই নাই তার রাষ্ট্রভাষা" বলিয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। তখন রামানন্দ বাবু যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া "ভারতে রাষ্ট্র ভাষা হইবার উপযুক্ত বাঙ্গলা ভাষা" এই দাবী আমার সহিত উত্থাপন করেন এবং নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতি স্থাপন করার প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। (১১শে মাঘ ১৩৪৫ সালে) এই সমিতির সম্পাদক এই লেখক নির্বাচিত হন এবং রামানন্দ বাবু ইহার সহ-সভাপতির পদ সানন্দে গ্রহন করেন; তিনি আমার উক্ত সমিতিকে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

(শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ লিখিত "যাঁদের সংস্পর্শে এসেছি।" নামক পুস্তক—পৃঃ ১২২)

এই সমিতির প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রামানন্দ বাবুর নিকট জ্যোতিষবাবু যথেষ্ট প্রেরণা ও সহায়তা লাভ করেছিলেন। তাঁহার জবানীতেই আবার বলিতেছি ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন এলাহাবাদে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সেই সময় মদীয় আত্মীয় মেজর ডাক্তার বামন দাস বসুর বাড়ীতে রামানন্দ বাবুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎও আলাপ হয়। তখন কেদার বাবুর বয়স ১১।১২০ বছর এবং অশোক বাবুর বয়স ১৩ বছর।

বঙ্গভাষার প্রতি মমত্বের প্রেরণা রামানন্দ বাবুর নিকট লাভ করি"।

(পূর্বোক্ত পুস্তক পৃঃ ১২০)

এই সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন ভাষাভাষী দের মধ্যে একটি একাত্মবোধ জাগাবার জন্য ও জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য পাঠচক্র বক্তৃতা ও সেমিনারের মাধ্যমে নিয়মিত অনুষ্ঠান করা হয়। বাংলা শিক্ষার জন্য ইংরাজী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। ইং ১৯৬৬ সালে ১৮৬০ সালের ২১নং বিধি অনুযায়ী এই সমিতি রেজেষ্ট্রী করা হয়েছে। সারা ভারতে এবং বিদেশে প্রায় ৩০টি স্থানে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারমধ্যে দিল্লী, বোম্বাই, পুরী,

ত্রিবান্দ্রম, বেনারস, দার্জিলিং জামসেদপুর, বাঙ্গালোর, দুর্গাপুর উল্লেখযোগ্য। কানপুরেও ইহার একটি শাখা স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা চলছে। বিদেশে ওয়াশিংটন, মস্কো, লণ্ডন, টোকিও বন্ প্রভৃতি স্থানে ইহার শাখা সক্রিয় ভাবে চলছে।

স্বল্প সময়ে ও পরিশ্রমে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার জন্য সুচিন্তিত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাঠ্য পুস্তক ও পাঠক্রম রচিত হয়েছে।

আদ্য, মধ্য ও ডিগ্রীকোর্সের ব্যবস্থা আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীর বাড়ীতে যেয়েও শিক্ষাদান করেন। ডাকযোগেও শিক্ষাদান পদ্ধতি আছে। বহু বাঙ্গালী ও বিদেশী এবং বিদেশী দূতবাসের কর্মিবৃন্দ এই সমিতির সাহায্যে বাঙ্গলা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেছেন। মধ্যে মধ্যে রেডিওতে এঁদের রবীন্দ্র সঙ্গীত ও চমৎকার আবৃত্তি অনেকেই শুনেছেন।

আদ্য পরীক্ষার পাঠসময়—৪ মাস, মধ্যপরীক্ষার পাঠসময় ৮ মাস এবং অন্ত্য পরীক্ষার (ডিপ্লোমা) পাঠ সময় ১২ মাস ব্যাপী। উপাধি পরীক্ষার পাঠ সময় ২ বছর—ইহা বি, এ, বাঙ্গলা অনার্সের সমতুল্য।

ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ দানের জন্য সমিতির উদ্যোগে প্রতি বছর নিম্নোক্ত পুরস্কার বিতরণ করা হয়—।

১। দিল্লী বিশ্ব বিদ্যালয়

(ক) নরসিং দাস আগরওয়ালা পুরস্কার (১০০০৲) সংশ্লিষ্ট বৎসরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গলা পুস্তক।

(খ) লীলা পুরস্কার (১০০৲)
বাঙ্গলা প্রবন্ধ পরীক্ষার শ্রেষ্ঠ ছাত্র—ছাত্রী

(গ) সুধীরাপদক বাঙ্গালা বিএ পরীক্ষাতে প্রথম।

২। এলাহাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয় নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত পুরস্কার (১০০৲) বাঙ্গলা প্রবন্ধ পরীক্ষায় প্রথম।

৩। উৎকল বিশ্ব বিদ্যালয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পুরস্কার (১০০৲)
বাঙ্গলা প্রবন্ধ পরীক্ষায় প্রথম।

৪। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়—
ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পুরস্কার (১০০৲)
বাংলা প্রবন্ধ পরীক্ষায় প্রথম।

৫। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়
বিচারপতি—পি. বি. মুখার্জী পুরস্কার (১০০৲)
বাংলা প্রবন্ধ পরীক্ষায় প্রথম, অথবা বি, এ বাংলা পরীক্ষায় প্রথম।

৬। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
প্রিয়ম্বদা দেবী পদক।
বি, এ পরীক্ষায় প্রথম।

৭। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়
অশ্বিনী চৌধুরী পুরস্কার
বাঙ্গলা প্রবন্ধ পরীক্ষায় প্রথম।

৮। জ্যোতিষ জয়ন্তী পুরস্কার
অবাঙ্গালীদের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ পারদর্শী।

৯। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রৌপ্য পদক
আদ্য পরীক্ষায় প্রথম।

এই পুরস্কারটি বর্তমান লেখকের উদ্যোগে রামানন্দবাবুর সুযোগ্য পুত্র প্রবাসী সম্পাদক শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৯৫৭ সাল হইতে দিয়া আসছেন এবং ইহার জন্য একটি স্থায়ী এণ্ডাউমেন্ট গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সমিতির এই বিরাট ভবনে বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিলে ইহার প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ পুঁথি ও চিত্রের সংগ্রহ দেখলে বিস্ময়ে ও আনন্দে মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। নিম্নোক্ত সংগ্রহশালাগুলি বিশেষ আকর্ষণীয়।

১। লীলামোহন সিংহ রায়—কক্ষ।

চকদিঘির প্রাক্তন জমীদার শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়ের দানে নির্মিত। ইহাতে রাঢ়ের প্রাচীন শিল্প কলার বহু নিদর্শন রক্ষিত আছে।

২। জ্যোতিষজয়ন্তী কক্ষ।

জ্যোতিষচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী রমা মিত্রের দানে নির্মিত। ১৪।১।৬৪ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম, সি চাগলা ইহার উদ্বোধন করেন। জ্যোতিষচন্দ্র প্রতি বছর তাঁহার জন্মদিনে অবাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রিদের নিকট যে সব বিভিন্ন উপহার পেয়েছেন, তাহা রক্ষিত আছে।

৩। আন্তর্জাতিক চিত্রশালা।

৩০।১২।৬৪ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উদ্বোধন করেন। ইহাতে রাজা রামমোহন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, নেপালের রাজা মহেন্দ্র, জাপানের সম্রাট হিরহিতো, লেনিন, ডাঃ রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্র সংগৃহীত আছে।

৪। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কক্ষ।

শ্রী লীলামোহন সিংহরায়ের দানে নির্মিত। ১৪।৮।৬৭ তারিখে প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি, এন, সিংহ উদ্বোধন করেন। এখানে বহু প্রাচীন বৈষ্ণব পুঁথি ও গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে গবেষণার জন্য প্রচুর উপকরণও রয়েছে।

৫। নরসিংহদাস অডিটোরিয়ম।

ইহাতে একটি রঙ্গমঞ্চ, প্রেক্ষাগৃহ (৫০০ দর্শকের উপযোগী) ও সুন্দর গ্যালারী আছে। ইহা নির্মাণ করিতে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ইহা প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং শ্রী নরসিংহ দাস আগরওয়ালা অর্থানুকূল্যে সম্ভব হয়েছে। ৫।৭।৬৮ তারিখে ভারতের প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই উদ্বোধন করেন। সমগ্র ভবনের নির্মাণ কার্য্য এখনও চলছে এবং অদ্যাবধি চার লক্ষের অধিক টাকা ব্যয় হয়েছে।

এই সাংস্কৃতিক ভবনটির কর্মসূচী যখন পূর্ণভাবে রূপায়িত হবে তখন ইহা শুধু বাংলা নয় ভারত তথা সারা বিশ্বের বিদগ্ধ মানবের সাংস্কৃতিক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হবে এ আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে।
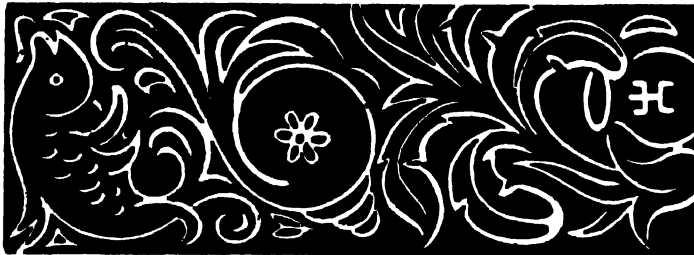
কংগ্রেস স্মৃতি

বিশেষ অধিবেশন—কলিকাতা১৯২০

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(৪)

অভ্যর্থনা সমিতি কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নির্মাণ করেছিল বিরাট প্যাণ্ডেল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)। নানা প্রকার ধ্বজা পতাকা দ্বারা প্যাণ্ডেল সুশোভিত করেছিল।

৪ঠা সেপ্টেম্বর অধিবেশনের সময় বেলা ১টার বহু পূর্ব থেকেই প্যাণ্ডেল প্রতিনিধি ও দর্শকদ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। এই কংগ্রেসে বহু মডারেট নেতা যোগ দিয়েছিলেন। আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মত ছিল তা হচ্ছে বড় বাজার অঞ্চল থেকে অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থনের জন্য বহু প্রতিনিধি সভামণ্ডপে উপস্থিত হয়েছিল।

একে একে কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সভামণ্ডপে প্রবেশ করতে লাগলেন, যখন ব্যারিষ্টার শ্রীডি সি ঘোষ প্রবেশ করলেন তখন বহু দর্শক তাঁর উপস্থিতিতে আপত্তি জানিয়েছিল কারণ তিনি ষ্টেটসম্যান পত্রিকা বয়কট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। তাঁর পিতা রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরকে যখন সভাপতির শোভাযাত্রার সঙ্গে দেখা গেল তখন লোকে তাঁকে 'শেম' 'শেম' ধ্বনি দ্বারা ধিক্কার দিল কারণ তিনিও ষ্টেটসম্যানের বন্ধু ছিলেন।

সভাপতি মহাশয় শোভাযাত্রাসহ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন বেলা ১টার সময়। ঐ শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত, মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতি কস্তুরবাই গান্ধী (পরবর্তী কালে তিনি কস্তুরবা নামে অভিহিত হতেন), মৌলানা সৌকত আলী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, সর্বশ্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, বসন্তকুমার লাহিড়ী, জে এন্ রায়, ললিতমোহন দাস ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বশ্রী ইয়াকুব হোসেন, ছোটানী, কেল্কী প্রভৃতি।

ডায়াস বা মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী কস্তুর বাই গান্ধী, শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরানী, শ্রীমতী জিন্না (পার্শী ধনকুবের স্যর দীনশা পেটিটের কন্যা) শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী (সুকবি, স্যর আশুতোষ চৌধুরীর ভাগিনেয়ী) লেডী নীলরতন সরকার শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ('বীরবল' প্রমথনাথ চৌধুরীর স্ত্রী ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা) ডাঃ শ্রীমতী গাঙ্গুলী, শ্রীমতী নৃপেন্দ্রলাল সরকার, শ্রীমতী শ্যামলাল নেহরু (পণ্ডিত মতিলালের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ), কুমারী নেহেরু (শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী) স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, শ্রীবসনা দাস দ্বারকা দাস, নাটোরের বিদগ্ধ মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় দীঘাপতিয়ার কুমার, সর্বশ্রী এন্ সি কেলকার (পুনার বিখ্যাত 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক। ইনি লোকমান্যের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন), খাদিলকর, করাণ্ডকর, দেশপাণ্ডে, বৈদ্য, ভি জে প্যাটেল (বোম্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, ব্যারিষ্টার। পরবর্তীকালে ইনি দিল্লীর ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের স্পীকাররূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন) রামভুজ দত্ত চৌধুরী, লালা হরকিষণলাল, সর্বশ্রী রঘুনাথ সহায়, এম্ আর জয়াকর (বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। ইনি পণ্ডিত ও সুবক্তা ছিলেন)। কে শন্তানম্, এস্ কস্তুরী আয়েঙ্গার, ডাঃ সত্যপাল, শ্রীগোবর্ধন দাস, লালা দুনীচাঁদ, শ্রীরাম মূর্তি (বিখ্যাত পালোয়ান ও ব্যায়ামবীর। ইনি বুকের উপর হাতী ধারণ করতেন এবং শক্তিশালী মোটর-

কারের গতিরোধ করতে পারতেন)। পণ্ডিত গোকর্ণ নাথ মিশ্র, সর্বশ্রী বসন্তকুমার বসু (কলিকাতা হাই-কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, ও উক্ত হাইকোর্টের বার এসোশিয়েশনের সভাপতি), কামিনীকুমার দত্ত (শিলচরের বিখ্যাত নেতা), অশ্বিনী কুমার দত্ত (বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ নেতা) শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্যামলাল নেহেরু, যোসেফ ব্যাপ্টিষ্টা (বোম্বের ব্যারিষ্টার ও তিলকের অনুগত ভক্ত) বিপিনচন্দ্র পাল, যদুনাথ মজুমদার (যশোহরের বিখ্যাত উকিল ও নেতা), মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা সৌকত আলী, স্যর আশুতোষ চৌধুরী, সর্বশ্রী এম. এ. জিন্না, চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, সর্বশ্রী সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (বিখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক), হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক), যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার, স্যর আশুতোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা), যতীন্দ্রনাথ বসু (কলকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এটর্ণী, ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র), ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু, জে, এন্, রায় (কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার), সত্যানন্দ বসু, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত জগৎনারায়ণ (১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি), রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকির জমিদার), শ্রীবিজয় রাঘবাচারিয়ার (মাদ্রাজের বিখ্যাত নেতা), শ্রীফজলুল হক্, নবাব সরফরাজ খাঁ প্রভৃতি, অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরূপে আমিও ডায়াসে আসন গ্রহণ করেছিলাম।

মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কলকাতা প্রবাসী—গুজরাটি মহিলারাও দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

নির্বাচিত সভাপতি লালা লাজপত রায় আসন গ্রহণ করার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হ'ল।

প্রথমে অল্প বয়স্ক কতিপয় যুবক ও ৫০ জনের অধিক সংখ্যক বালিকা সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গাইলেন। গানের সময় সভায় সকলে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর হিন্দী নাট্যপরিষদ কর্তৃক একটি হিন্দী জাতীয় সঙ্গীত গীত হল।

সঙ্গীত সমাপ্ত হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী তাঁর অভিভাষণ পাঠ করলেন।

প্রথমে তিনি প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করে ধন্যবাদ দিলেন এবং বৃষ্টিপাতের ফলে যে সকল অসুবিধা হয়েছে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন।

লোকমান্য তিলকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে চক্রবর্তী মহাশয় বললেন যে তাঁর মৃত্যু হয় নি। তিনি অশরীরে বেঁচে আছেন এবং কংগ্রেসের পথ নির্দেশের জন্য তাঁর আত্মা আজ এখানে উপস্থিত আছেন।

তিলকের নাম উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক হতে হর্ষকোলাহল শোনা যেতে লাগল।

তারপর চক্রবর্তী মহাশয় ব্রিটিশ শাসনের চিত্র উদ্ঘাটন করে দেখালেন কিভাবে দেশের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংশ করা হয়েছে।

অতঃপর তিনি পাঞ্জাবের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে শোনালেন এবং বললেন যে অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে হাণ্টার কমিটী বা কংগ্রেস সাব-কমিটির অনুসন্ধান শেষ হতে পারে নি। এখন তা শেষ হয়েছে এবং কংগ্রেস সাব-কমিটির রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে, ঐ রিপোর্টে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি করা হয়েছে :—

(১) পাঞ্জাবে কোন প্রকার রাজদ্রোহিতা হয়নি।

(২) গোলযোগের কারণ সত্যাগ্রহ নয়। এর কারণ মাইকেল ওডেয়ারের সহানুভূতিশূন্য রূঢ় শাসন, সৈন্য সংগ্রহের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন, আয়করের (ইনকাম্ ট্যাক্স্) চাপ এবং অর্থনৈতিক দুরাবস্থা।

(৩) মার্শাল আইন জারি করার অজুহাতে এবং পাঞ্জাবের রাজনৈতিক চেতনা ধ্বংশ করার জন্য ওডেয়ার গোলযোগকে রাজদ্রোহিতার রূপ দিয়েছে।

(৪) মার্শাল আইন জারি হওয়ার পূর্বে বা অনতি-কাল পরে গোলযোগ প্রশমিত হওয়ায় ভুল মামেধ

মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মার্শাল আইন চালু রাখার কোন সার্থকতা ছিল না।

(৫) অমৃতসর, লাহোর এবং গুজরানওয়ালার কতকাংশে যে সকল বর্ব্বরোচিত নৃশংসতার সহিত মার্শাল আইন ব্যবহার করা হয়েছিল তা সভ্যতা ও মানবতার কলঙ্কস্বরূপ।

(৬) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অতিশয় নৃশংস। বিনা কারণে এ আরম্ভ হয়েছিল এবং মানবিকতার প্রতি কোন প্রকার সম্পর্ক না রেখে এ চালানো হয়েছিল এবং হতাহতের প্রতি ভাবলেশহীন পাশবিক অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন হতেই একজন প্রতিনিধি মন্তব্য করল যে এর প্রতিফল দিতে হবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তারপর হাণ্টার কমিটির সিদ্ধান্তগুলি বিষদভাবে আলোচনা করে বললেন যে অমৃতসর কংগ্রেসে এবং বেনারসে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে পাঞ্জাবের অত্যাচার ও তৎসম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্টের ওবৃটিশ মন্ত্রী সভার কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে পার্লামেণ্টের কমন্‌স্ সভায় ও লর্ডদের সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মনে করেন যে ঐ সকল প্রস্তাব সংশোধন ও পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

তারপর তিনি খিলাফৎ সম্বন্ধে বললেন। খিলাফতের প্রশ্ন উঠতেই একজন মুসলমান নেতা "আল্লা-হো-আকবর" ধ্বনি তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলে তাতে যোগ দিল। অনেকক্ষণ ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল। সভা শান্ত হলে চক্রবর্তী মহাশয় খিলাফৎ সম্বন্ধে আলোচনা করে এ সম্বন্ধে মোহম্মদ আলীর দীর্ঘ বক্তৃতা উদ্ধৃত করে শোনালেন। তিনি বললেন যে এই প্রশ্নের বৈধতা বা অবৈধতা যাই থাক না কেন উত্থানে ও পতনে মুসলমানদের সংগে সংগে হিন্দুরাও থাকবে।

তিনি বললেন যে পাঞ্জাব ও খিলাফতের প্রশ্ন সমবেতভাবে অসহযোগের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অসহযোগের প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশে বঙ্গ-ভঙ্গ জনিত স্বদেশী আন্দোলন উল্লেখ করে বললেন যে কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটিতে অসহযোগ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যেসকল পন্থা নির্দ্ধারণ করেছেন সেই সকল পন্থাই বাংলা দেশ গ্রহণ করেছিল। গান্ধীজীর নাম উল্লেখ হতেই চতুর্দ্দিক থেকে হর্ষ কোলাহল হতে লাগল। "গান্ধী মহারাজ কী জয়" শব্দে সভামণ্ডপ পরিপূরিত হল। উত্তেজনা সবচেয়ে বৃদ্ধি পেল যখন চক্রবর্তী মহাশয় অসহযোগের কথা উল্লেখ করলেন। উচ্ছ্বাস থামতে যথেষ্ট সময় লাগল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় বললেন যে বাংলাদেশের নিকট অসহযোগ আন্দোলন নূতন নয়। বাংলার আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বর্তমান অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ আশা পোষণ করেন না।

তিনি বললেন যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন তা যেন স্থায়ী হয়। কেবলমাত্র পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফত সম্বন্ধে ব্রিটিশ পলিসির জন্য ক্রোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে একটা সাময়িক পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যেন না হয়। এর একটি উপায় হচ্ছে অর্থনৈতিক দাসত্ব ও বৈদেশিক শোষণের পথ বন্ধ করা। এই প্রসঙ্গে তিনি মিশরের (ইজিপ্ট) দৃষ্টান্ত দেখিয়ে শাসন গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে বললেন যে মিশরে যে প্রকার আভ্যন্তরিক ব্যাপার পরিচালনার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ভারতে অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হোক। মিশরের মত ভারতের সংগে একটা ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তি দ্বারা ইংরাজের স্বার্থ বজায় রেখে অন্যান্য বিষয়ের দায়িত্ব দেশের লোকের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক। তিনি বললেন যে এটা সুস্পষ্ট যে যেভাবে এদেশের শাসন চলছে তা আর চলবে না।

তারপর তিনি পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের দুরবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

পরিশেষে তিনি বললেন যে অন্যায় যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের যেন নিয়োগ করা না হয়।

ঋগ্বেদের একটি শ্লোক উচ্চারণ করে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁর দীর্ঘ অভিভাষণ শেষ করে আসন গ্রহণ করলেন।

তাঁর আসন গ্রহণ করার পর একদল বালিকা কর্তৃক বেদমন্ত্র গীত হল।

বেদমন্ত্র গান শেষ হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরীকে সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপন করতে আহ্বান করলেন। তিনি মন্তব্য করলেন যে, তিনি আশুতোষকে স্যার না বলে ঢুকেন মিষ্টার বলতে চান, এই উক্তিতে সকলে আনন্দ প্রকাশ করল।

স্যার আশুতোষ চৌধুরী যথাযোগ্য ভাষায় লালা লাজপত রায়ের গুণাবলী উল্লেখ করে তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করার প্রস্তাব করলেন।

পাটনার নবাব সরফরাজ খাঁ এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এরপর প্রস্তাব সমর্থন করতে দাঁড়ালেন শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত। পরমত অসহিষ্ণুতার কতক প্রকাশ এই কংগ্রেসে দেখা গেল। শ্রীমতী বেশান্ত গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন জনমত তা সহ্য করতে পারে নি। যে বেশান্ত মহোদয়াকে ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের সভানেত্রী করে এই কলকাতা সহরেই তাঁকে সকলে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করেছিল সেই বেশান্ত মহোদয়া বক্তৃতা মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে 'শেম' 'শেম' ধ্বনি উঠতে লাগল। একজন বলে উঠল যে গভর্ণমেন্টের গোয়েন্দার কথা তারা শুনবে না। গণ্ডগোল যখন চরমে উঠল তখন ডায়াস থেকে নেতাগণ সকলকে শান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগল। কোন ফল হল না।

চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীমতী বেশান্তের ভাষণ শোনার জন্য সকলের নিকট আবেদন জানালেন। তাঁর আবেদন গ্যালারীর গণ্ডগোলে তলিয়ে গেল।

তখন পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এসে বেশান্ত মহোদয়ার পাশে দাঁড়িয়ে জনতাকে শান্ত হতে আবেদন করলেন। বিক্ষুব্ধ জনমত শান্ত হল না। পূর্বের ন্যায় 'শেম' 'শেম' ধ্বনি ও গণ্ডগোল হতেই লাগল।

অবশেষে মহাত্মা গান্ধী রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। তিনি একটি চেয়ারের উপর দাঁড়ালেন। একজন ভদ্রলোক চেয়ার ধরে থাকলেন। মহাত্মা দাঁড়াতেই দীর্ঘকালব্যাপী জয়ধ্বনি হতে লাগল। তিনি শ্রীমতী বেশান্তের বক্তব্য শোনার জন্য করজোড়ে ইংরাজিতে সকলকে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন যে তিনি চান যে সকলে বেশান্ত মহোদয়ার বয়সের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং ভারতবর্ষের জন্য তাঁর অনবদ্য ত্যাগের কথা স্মরণ রেখে তাঁর বক্তব্য শোনেন। এর ফলে দর্শকমণ্ডলী শান্ত হল।

যতক্ষণ এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছিল শ্রীমতী বেশান্ত অতি শান্ত ও অবিচলিত ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার সেই অবিচলিত দৃঢ়তাব্যঞ্জক দাঁড়ানোর ভঙ্গি এখনও আমার চিত্তে গভীর ভাবে অঙ্কিত আছে।

গোলমাল শান্ত হলে শ্রীমতী বেশান্ত তাঁর অনবদ্য ভাষায় একটি সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সর্বশ্রী বিজয়রাঘবাচারিয়ার, বিঠল ভাই প্যাটেল, সিন্ধুর গোবর্ধন দাস, মধ্যপ্রদেশের বিষণ দত্ত শুক্ল ও অন্ধ্রের 'জন্মভূমির' সম্পাদক আর পি রামায়া প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

পাটনার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীমজহর উল্‌হক হিন্দীতে প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে এখন ভারতবর্ষে ত্যাগ ও কষ্টবরণের সময় এসেছে এবং তিনি আশা করেন যে লালা লাজপাত রায় এই সময়ে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি লালা লাজপত রায়ের বুকে সভাপতির ব্যাজ

এঁটে দিলেন এবং তাঁকে পুষ্প মাল্যে শোভিত করে সভাপতির আসনে নিয়ে গেলেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণ পড়বার জন্ম দাঁড়াতেই সকলে তাঁকে করতালিধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা জানাল। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ অভিভাষণ পড়ে শোনালেন।

প্রথমেই তিনি তাঁর প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনের জন্ম ধন্যবাদ দিলেন। এই সম্মান তিনি আরো গভীর ভাবে অনুভব করছেন কারণ যে কংগ্রেসের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তার অধিবেশন—কলকাতায় হচ্ছে—যে কলকাতা ভারতের জাতীয়তার সর্বোত্তম ও খাঁটি আদর্শের জন্ম তাঁর স্মৃতিতে মুদ্রিত আছে। এই কলকাতাতেই বিগত শতাব্দীতে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং এই কলকাতারই একজন বক্তা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) সমগ্র উত্তর ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের পতাকা প্রথম উত্তোলন করেছিলেন। এই কলকাতাতেই জাতীয়তার নব আদর্শ যা এখন ভারতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত করছে তা ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করেছিলেন বাংলার একজন অতিশয় উন্নতমনা ও বিদগ্ধ গুণী সন্তান শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, এই কলকাতাতেই সকলের ভক্তি ও সম্মান ভাজন ভারতের প্রবীণ বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজী দেশের সামনে স্বরাজের আদর্শ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরেছিলেন—যে আদর্শ আজ পর্য্যন্ত সকলকে প্রেরণা দিচ্ছে।

তার পর তিনি বললেন যে আবেদন নিবেদনের দিন চলে গিয়েছে। এখন সকলকে নিজ ক্ষমতার উপর দাঁড়াতে হবে।

এর পর তিনি পরলোকগত লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করে তিলকের গুণাবলী বর্ণনা করলেন

যখন কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন করা স্থির হয় তখন উদ্দেশ্য ছিল হাণ্টার কমিটীর সিদ্ধান্ত আলোচনা। সেই সময়ের পর জাতীয় সমস্যার সঙ্গে আর একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তা হচ্ছে খিলাফৎ।

তিনি বিস্তারিতভাবে পাঞ্জাবের দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ওডেয়ারের অপকীর্ত্তি, সামরিক আইনানুসারে পাঞ্জাবের শাসন, ভারত রক্ষা আইনের অপব্যবহার, তিলক ও পালের উপর পাঞ্জাব প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, ডাঃ সত্যপাল ও ডঃ কিচলুর প্রতি দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

সভাপতি মহাশয় হাণ্টার কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করে বললেন যে উক্ত কমিটীর মেজরিটি রিপোর্টও পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত কতকগুলি কার্য্যের কঠোর ভাষায় নিন্দা করতে বাধ্য হয়েছে। তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে মার্শাল আইনানুসারে শাসন পরিচালনার সময় শ্রেণীয় মনোভাব বরাবর কাজ করেছে।

তার পর তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের আলোচনা করে খিলাফৎ প্রসঙ্গ উপস্থিত করলেন। দর্শক মণ্ডলী থেকে অনেক খিলাফৎ সম্বন্ধে হিন্দীতে বলতে সভাপতিমহাশয়কে অনুরোধ করল। সভাপতি মহাশয় তখন তাঁর মুদ্রিত অভিভাষণ ৪৫ পৃষ্ঠা পাঠ করে শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তথাপি তিনি সহাস্যে তাদের অনুরোধ পালন করতে সম্মত হলেন। তিনি হিন্দীতে বললেন যে মুসলমানেরা খিলাফতের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট নয়। তিনি আর বেশীক্ষণ হিন্দীতে বলতে পারলেন না। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ায় এক গ্লাস জল পান করে কোন প্রকারে তাঁর মুদ্রিত অভিভাষণের শেষ অংশ পড়ে তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত করলেন।

তিনি অসহযোগের প্রশ্ন উল্লেখ করতেই সর্বত্র আনন্দধ্বনি হতে লাগল। তিনি নিজেকে একজন বদ্ধমূল অসহযোগী বলে বর্ণনা করলেন এবং বললেন যে বাল্যকালে যখন তিনি বাঙালী বাগ্মীর (সুরেন্দ্রনাথের) ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডী সম্বন্ধে বক্তৃতা পড়েন

তখনই তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প হন যে কখনও গভর্ণমেন্টের অধীনে চাকুরী করবেন না।

পরিশেষে তিনি শ্রীমতী বেশান্তের প্রতি দুর্ব্যবহারের উল্লেখ করে বললেন যে যাঁরা এই প্রকার আচরণ করেছেন তাঁদের লজ্জিত হওয়া উচিত। শ্রীমতী বেশান্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত ভারতের সেবা করেছেন। তাঁর সেবা অননুকরণীয়। এজন্য তাঁর প্রতি সকলের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। শ্রীমতী বেশান্ত এখন অতিশয় বৃদ্ধা। একারণেও তাঁকে সম্মান করা কর্ত্তব্য। তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে।

সভাপতির অভিভাষণ শেষ হওয়ার পর বালক ও বালিকাগণ কর্তৃক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "বঙ্গ আমার জননী আমার" গানটি গীত হয়েছিল। "বঙ্গ আমার" এর পরিবর্তে "ভারত আমার" করা হয়েছিল।

সঙ্গীতের পর সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত গোকর্ণ নাথ মিশ্র যে সকল মডারেট নেতা—কংগ্রেসে যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিলেন ও যাঁরা অনিবার্য্য কারণে যোগ দিতে পারেনি তাঁদের নাম পড়ে শোনালেন।

তার পর তিনি বিষয় নির্বাচনী সমিতির সদস্য নির্বাচনের কার্য্যক্রম জানালেন। স্থির হল যে পর দিন ৩২নং বৌ-বাজার ষ্ট্রীটে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন হবে এবং ৬ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১ টার সময় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন হবে।

এরপর সমবেত জনতার অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলালের গান পুনরায় গাওয়া হল। তার পর সভাভঙ্গ হল।

এবার আমি বিষয় নির্বাচনী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হতে পারি নি।

ক্রমশঃ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কেন্দ্র সরকার কৃত সঙ্কল্প!

হস্তিনাপুর হইতে কেন্দ্র সরকার ঘন ঘন ঘোষণা করিতেছেন যে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা এবং সর্ব্বপ্রকার অনাচার বন্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প। ঘোষণা অতি উত্তম এবং সঙ্কল্পও সাধু—কিন্তু বাস্তবে অদ্য ৬-১২-৭০ পর্যন্ত কি দেখা যাইতেছে? এ-রাজ্যে, বিশেষ করিয়া কলিকাতা, দম দম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দিনের পর দিন নরহত্যা এবং সেই সঙ্গে বিবিধ প্রকার অনাচার এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি মুখেই চলিয়াছে! কেন্দ্রসরকারের কথায় এবং কাজের মধ্যে কোথাও সামান্যতম মিলও দেখা যাইতেছে না কেন? সাধু বাক্যেই যদি কেন্দ্র সরকারের কর্ত্তব্য সীমিত থাকে, তাহা হইলে এই শাপগ্রস্ত পীড়িত এবং সর্বভাবে নিপীড়িত পশ্চিমবঙ্গবাসীদের বলিবার কিছুই নাই। কেন্দ্র সরকার যদি মনে করিয়া থাকে যে কেবল বাক্য দ্বারাই তাহারা এ-রাজ্যকে অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে, তবে তাহারা সজ্ঞানে আত্ম-প্রতারণা করিতেছে। কেন্দ্রকর্ত্রী প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা বুদ্ধিমতী এবং প্রধান মন্ত্রীর গদিতে বসিয়া তিনি প্রশাসন ব্যাপারে বহু অযোগ্যতা সত্বেও কিছু যোগ্যতারও পরিচয়ও দিয়াছেন ইহা স্বীকার করিব। কিন্তু ইহা সত্বেও এ-কথা অবশ্যই বলা যায় যে—নিজের প্রাধান্য এবং গদি রক্ষা করিবার মানসে তিনি যে-পথে চলিতেছেন, এমন কতকগুলি রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা লাভের জন্য এমন অতিরিক্ত মূল্যদান করিতেছেন যাহা পরিণামে তাঁহার পক্ষে ক্ষতিকর হইতে বাধ্য এবং তাহার সূচনাও পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা বিশেষ করিয়া সি, পি, আই-এর কথাই বলিতেছি। এই বিশেষ কম্যু পার্টিতে বিশ্বাস করা অনুচিত বলিয়া মনে করি। নেকড়ে বাঘ হইয়াও যাহারা মেষ চর্ম্মদ্বারা নিজেদের প্রকৃত রূপ গোপন করিতে সদাসচেষ্ট, তাহাদের আর যাহাই বলা যাউক না কেন, কখনও সদাচারী বলিয়া ধরা যায় না। সি পি এম কম্যু হইলেও, নিজেদের প্রকৃত পরিচয়, এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কি কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিবে সে-বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া সব কথাই বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটাইবার কথাও ঘোষণা করে। কথায় বার্ত্তায় এবং রাজনৈতিক আচরণে প্রমোদ-জ্যোতি-হরেকৃষ্ণকে বুঝিতে কষ্ট হয় না, ইঁহাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করার অবকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু সি পি আই দলের গলিপথের অন্ধকারে বিচরণ সত্যই মানুষ এবং সমাজের পক্ষে বিপদজনক। ভয়ের কথা—শ্রীমতী ইন্দিরা এই দলের সহিত আঁতাত স্থাপন করিয়াছেন এবং মনে করিতেছেন যে আগামী নির্ব্বাচনের সময় তিনি এই কথায়-এক-আর-কাজে-আরেক দলের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিয়া নির্ব্বাচন সাগর অবলীলাক্রমে পার হইয়া তাঁহার আসন বজায় রাখিবেন। কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা যদি ইহাই ভাবিয়া থাকেন যে সকল অবস্থায়, সকল বিপদে, সকল সঙ্কটেই এই দল তাঁহাকে পূর্ণ সহযোগিতা দিবে, তবে তিনি স্বপ্নে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার সুখনিদ্রা ভাঙ্গিতে দেরী হইবে না।

কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের ভবিষ্যৎ কি? রাষ্ট্রপতির শাসন(?) যে ভাবে চলিতেছে, সুবেদার রাজ্যপাল ধাবন যে পথে ধাবন করিতেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী যে-ভাবে অনুগৃহীত ধাবনকে সর্বভাবে পোষণ-তোষণ করিতেছেন, তাহাতে অচিরে হয়ত এই রাজ্যের মরিচা পড়া প্রশাসন লৌহক্রেম সশব্দে ভাঙিয়া পড়িবে। আজ যে-জনগণ বিভ্রান্ত দিশাহারা অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেই নির্বাক জনগণই হয়ত নিজেদের অন্ধকার কারা-মুক্তির পথ নিজেরাই খুঁজিয়া লইবে। স্বার্থসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির ভুয়া-সংগ্রামের ডাকে সাড়া না দিয়া এবার এই দলগুলিকেই হয়ত, সোজা কথায় পিটাইয়া দেশ ছাড়া করিবে। (আমেন!)

বাঙালী কি মৃত্যুর পথে চলিয়াছে?

"ইহা কি সত্য যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলিকাতার একটি দাঙ্গাবাজ গোষ্ঠীকে নয় লক্ষ টাকা দিয়াছেন—যাদের কাজ হইবে কলিকাতার খুন জখমের কাজ চালাইয়া যাওয়া, চরম অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি করা? ইহা কি সত্য যে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে কলিকাতার পুলিসী কার্য্যকলাপকে তিনি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন যাহার ফলে কয়েক হাজার বাঙালী যুবক নিহত হয়? ইহা কি সত্য যে যৌবনশ্রীসম্পন্ন, তেজীয়ান, সক্রিয় বাঙালী যুবক মাত্রকেই খতম করার একটা পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে?"

(যুগবাণী ২১-১১-৭০)

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলি করিয়াছেন যুগবাণী এবং আমরা মনে করি ইহার প্রতিবাদ কেন্দ্রীয় সরকারের করা একান্ত প্রয়োজন। কোন প্রতিবাদ যদি প্রধান মন্ত্রীর তরফ হইতে না হয়, বিষয়গুলি মিথ্যা হইলেও লোকের কাছে মনে হইবে সত্য। তবে আমাদের মনে হয় এমন প্রকার ভীষণ ষড়যন্ত্র প্রধান মন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে করা একান্ত অর্বাচীনতার পরিচায়ক হইবে। 'যুগবাণী' আরো বলেন যে—

"পশ্চিম বঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্টের আমল হইতে যে শ্রম-অসন্তোষ চলিয়া আসিতেছিল আপাতত তাহা শান্ত হইয়াছে (সত্যই কি হইয়াছে?)। কিন্তু ইতিমধ্যে বহু কোম্পানী তাহাদের কারবার গুটাইয়াছে, নতুবা সম্প্রসারণ বন্ধ করিয়াছে এবং তাহাদের মূলধন পশ্চিম-বঙ্গের বাহিরে চলিয়া যাওয়ার উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দিল্লী, তামিলনাড়ু, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্য বিশেষভাবে লাভবান হইতে পারিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে উহার ফলে বেকার সমস্যা বাড়িয়াছে, কিন্তু চতুর্থ প্ল্যানে পশ্চিম-বঙ্গের বরাদ্দ কমিয়াছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র প্রতিশ্রুত অর্থ দিতেছে না, কলিকাতা বন্দরকে ধ্বংস করিয়া আনা হইতেছে, কলিকাতার মাটির তলায় রেলের নামে পনেরো বছর যাবত প্রহসন ছাড়া আর কিছুই চলিতেছে না। এখনো এই মৃত নগরে প্রাণের যে চাঞ্চল্য আছে সেটুকু শেষ করিতে পারিলে কেন্দ্রীয় কর্তারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন এবং কলিকাতাকে পশ্চিম বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেন্দ্রীয় তথা পুরা অবাঙালী শাসনে লইয়া সুদীর্ঘকাল পোষিত পরিকল্পনা সহজেই সফল করিতে পারিবেন।"

কিন্তু এ-বিষয়ে ইহাও কি বলা যায় না যে পশ্চিম বঙ্গ হইতে যে সকল শিল্পপতি তাঁহাদের সংস্থা অন্যত্র সরাইয়া লইতেছেন, তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করিবার জন্য সাধ করিয়া নিজেদের নাসিকা কর্তন করিতেছেন না, প্রাণের দায়ে একান্ত বাধ্য হইয়াই তাঁহাদের এ-কার্য করিতে হইতেছে! এ-রাজ্যের লেবার ইউনিয়ন নেতারা কি কারণে, অকারণে, সামান্য কারণে তাঁহাদের খেয়ালখুশীমত ধর্মঘট করিয়া, শ্রমিকদের উত্তেজিত করিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিতেছেন না? শ্রমিকদের নানাভাবে অলীক প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া শ্রমিক নেতারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রতাপ প্রকাশ করিতেছেন না? যে কোন ব্যবসায়ের শ্রমিকদের বেতন ভাতা প্রভৃতি দিবার একটা শেষ সীমা আছে। সীমার পারে শ্রমিকতোষণ করিতে হইলে কারবারে অবশ্যই লোকসান হইবে এবং ইহাও সত্য যে কোনও

ব্যবসায়ী ক্ষতি স্বীকার করিয়া কারবার চালাইতে কখনই রাজী হইতে পারেন না। শ্রমিকদের পাহাড় প্রমাণ দাবী মিটাইতে হইবে, কিন্তু শ্রমিকদের পক্ষে উৎপাদন সম্পর্কে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। এ-যুক্তি অচল। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সকল শিল্প সংস্থাতেই দেখা যাইতেছে যে নেতাদের উস্কানীতে শ্রমিক মহল কলকারখানাতে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে, সংস্থার কাজ চালাইবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন আইন কানুন বাধানিষেধ মানা না-মানা শ্রমিকদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে। মালিকদের অবস্থা এমনই হইয়াছে যে ঘোরতর অন্যায় করিলেও কোন শ্রমিককে সংস্থার কর্তৃপক্ষ কোন কথা বলিতে পারিবেন না, শ্রমিক অন্যায় করিলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে কোন প্রকার শাস্তি দিতে পারিবেন না। মালিক পিটাইবার পূর্ণ অধিকার শ্রমিকদের থাকিবে এবং মালিককে তাহা হাসিমুখে সহ্য করিতে হইবে। গায়ের জোরে কিছুকাল হয়ত শ্রমিক অনাচার চলিতে পারে, কিন্তু চিরকাল ইহা চলিতে পারে না। নেতাদের স্বার্থ সিদ্ধির কারণে শ্রমিক প্ররোচনামূলক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য, এবং এই প্রতিক্রিয়া এবার দেখা দিতেছে।

আমাদের মনে হয় পশ্চিম বঙ্গের শ্রমিক নেতাদের এবার দমন করিবার সময় আসিয়াছে। শ্রমিক নেতারা যদি নিজেদের সংযত না করেন, অথবা শ্রমিক নাচানো বন্ধ করিয়া সত্য সত্যই শ্রমিক-কল্যাণকাজে নিজেদের কর্মশক্তি নিয়োজিত না করেন তাহা হইলে এমন দিন একটা আসিতে বাধ্য যখন প্রতারিত শ্রমিক মহলই তাঁহাদের খেদাইয়া অরণ্যবাসে প্রেরণ করিবে।

পশ্চিম বঙ্গের অসীম দুর্দশার জন্য সকল বিষয়ে অন্যকে, বিশেষ করিয়া কেবল কেন্দ্রসরকারকে দায়ী করিলে অন্যায় হইবে, অন্যকে নিন্দা করিবার পূর্বে আমরা নিজের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য কি এবং কতটুকু করিতেছি তাহা দেখা দরকার। আশা করি পশ্চিম বঙ্গ দুধ-পোষ্য শিশু নহে, স্বাধীনতার পর ভারতের অন্য বহুরাজ্য যদি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করিয়া থাকিতে পারে, আমরা বাঙ্গালীরা কেন তাহা পারি নাই, তাহাও চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য। এ-রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যদি কেবলমাত্র নিজেদের দলগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একদল অন্য দলের সহিত কামড়াকামড়িতেই কালক্ষেপ করিতে থাকে—রাজ্য এবং রাজ্যবাসীদের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দান করার প্রয়োজনবোধ না করে, তাহা হইলে 'হায়! পশ্চিম বঙ্গের কি হইল!' বলিয়া কাতর ক্রন্দনে কালক্ষেপ করিয়া ফললাভ কিছুই হইবে না। নিজেরা যদি নিজেদের বাঁচাইবার কোন প্রয়াস না করি, তাহা হইলে অন্য কেহ, এমন কি স্বয়ং মানব ভাগ্য বিধাতাও আমাদের ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

সি পি এম বনাম নকশালী

সি পি এম নকশালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে কিছুদিন পূর্বে। ডিসেম্বর মাসের বিশেষ একটি দিন হইতে এই যুদ্ধারম্ভ হইবে এবং এই যুদ্ধের নীতি স্থির হইয়াছে—দাঁতের বদলা দাঁত, কানের বদলা কান এবং প্রাণের বদলা প্রাণ। অপরিমিত বিত্তবান, প্রভূত শক্তিশালী এবং যুক্তফ্রন্টের দ্বিতীয় আমলে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যবিধাতা শ্রীজ্যোতি বসুর বিষম শাসনকালে নকশালীদের উদ্ভব হয় এবং সেই সময় এই পরম জ্যোতির্ময় পুরুষ ঘোষণা করেন যে তিনি দুদিনেই এই দলকে ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ঠাণ্ডা করার বদলে নক্‌শালীদের তিনি তাঁহার কোমল প্রাণের স্নেহের শাসনে লালন করিতে থাকেন পরম যত্নে। কিন্তু জ্যোতিবাবু যখন দেখিলেন তাঁহারই স্নেহবারিসিঞ্চিত এই নক্‌শালীরা তাঁহারই দলের (সি পি এম) বাহিনীকে ঠাণ্ডা করিতে আরম্ভ করিল, তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার হুঁস হইল, যে তিনি দুধকলা দিয়া সাপ পুষিতেছেন। জ্যোতিবাবুর চেতনা হইল একটু বিলম্বে, আজ নক্‌শালীরা যে ভাবে তাহাদের নীতি এবং আদর্শ অনুযায়ী তাহাদের কার্য্য চালাইয়া যাইতেছে তাহাতে সি পি এমের পক্ষে এখন আর নক্‌শালী দমন

কার্য্য সকল করা সম্ভব হইবে কি? নক্‌শালীদের সূচনাকালে জ্যোতিবাবু মনে করিয়াছিলেন সি পি এম বিরোধী সব কয়টি দলকেই নক্‌শালীদের সক্রিয় সাহায্য দ্বারা কোণঠাসা করিয়া তিনি এবং তাঁহার দল পশ্চিমবঙ্গে অবাধ রাজত্ব স্থাপন করিতে অবশ্যই সক্ষম হইবেন। কিন্তু হায়! ব্যাপারটা হইয়া গেল 'উল্টা বুঝিলি রাম'—অবস্থার গতিকে আজ সি পি এমই কোণঠাসা হইল। পশ্চিমবঙ্গে যে দিকেই দেখুন, দেখিতে পাইবেন যেখানে যত দলীয় সংঘর্ষ হইতেছে সর্ব্বত্রই সি পি এম কমন্ ফ্যাক্টর—সর্ব্বত্রই সি পি এম বনাম ফরোয়ার্ড ব্লক, সি পি এম বনাম সি পি আই, সি পি এম বনাম বাংলা কংগ্রেস, সি পি এম বনাম এস ইউ সি—ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্ব্বত্র প্রতিদিন সি পি এমের সহিত একটা না একটা সংঘর্ষ হইতেছে এবং প্রত্যেকটি সংঘর্ষেই সি পি এম বাহিনীর এক বা ততোধিক ব্যক্তি হতাহত হইতেছে। সাধারণ:জনের হাতেও সি পি এম সমর্থকগণ বহুস্থানে নিগৃহীত এমন কি হতাহতও হইতেছে—অন্যদিকে লোকে শুনিতেছে প্রত্যহ যে সি পি এম নাকি জনগণসমর্থনপুষ্ট একমাত্র রাজনৈতিক দল এবং এই পার্টির সকল কাজেই পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৯৫ জনের অকুণ্ঠ সমর্থন রহিয়াছে। এ-কথা আজ সি পি এম নেতারা মনে মনে অবশ্যই স্বীকার করিতেছেন যে তাঁহারা নিজেদের বেকুবী, ধূর্ত্ততা, মিথ্যা আত্মতুষ্টি এবং দেশ ও জাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই নির্ব্বাণের পথে চলিতেছেন। কিন্তু এ-সব কথা থাক—সি পি এম নক্‌শালীদের সহিত যে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার ফলে এ-রাজ্যের আরো বহু নিরীহজন অকালে স্বর্গলাভ করিতে বাধ্য হইবে। হইবে 'রাজায় রাজায়' যুদ্ধ আর পুড়িয়া মরিবে উলুখড়। এই যে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতেছে, তাহার ফলে উভয় দলের পরম পরাক্রমশালী সেনাদের হাতে সাধারণ এবং সাতে নাই পাঁচে নাই নিরীহ মানুষই বিপর্য্যস্ত হইবে, প্রাণ দিবে! উভয় দলের সেনাপতিরা আড়ালে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন, মরেতো মরিবে নেতাদের প্ররোচনায় মিথ্যা আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রতারিত সাধারণ সৈনিকরাই—স্বর্গে যাইবে দুঃখকষ্ট অভাবক্লিষ্ট জর্জ্জরিত সাধারণজন।

কিন্তু নাক্‌সাইলদের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া যুদ্ধ ঘোষণার কোন প্রয়োজন ছিল কি? যুদ্ধ ত কিছুকাল হইতেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া কলিকাতার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে যেখানে সি পি এম এর প্রাধান্য আছে। এই সব স্থানে সুযোগ সুবিধা মত নক্‌সাইল সমর্থকদের সি পি এম সমর্থকরা হত্যা করিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে যে সব অঞ্চলে নক্‌সাইলদের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে সেই সব অঞ্চল হইতে সি পি এম হটিয়া আসিয়াছে। হত্যা যদি এই দুই দলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে হয়ত আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড যদি এ-বার ব্যাপকতা লাভ করিয়া সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে এ-রাজ্যকে ভিয়েতনামে পরিণত হইতে হইবে এবং দুই দলীয় সংঘর্ষ সর্ব্বদলীয় এক মহাসংঘর্ষে পরিণত হইতে কালবিলম্ব হইবে না; এবং তাহার ফলভোগ করিতে হইবে আমাদের সকলকেই।

বিস্ময়ের কথা, সবকিছু দেখিয়া, সবকিছু জানিয়াও পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান শাসক শ্রীমতী ইন্দিরা তথা কেন্দ্র সরকার অনড় অচল হইয়া বসিয়া আছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা বোধহয় এ বিষয়ে সি পি আই এর নির্দ্দেশের অপেক্ষায় রহিয়াছেন। সি পি এম নক্‌শালই এই দুইটি বিবদমান দলকে নিষিদ্ধ করাতে বাধা কোথায়? এ-বিষয় রাষ্ট্রপতির কি কোন কর্ত্তব্য নাই? তিনিও কি ইন্দিরার আদেশের অপেক্ষা রহিয়াছেন?

নক্‌শালী উপদ্রব বন্ধের আয়োজন

অন্যদিকে বৃদ্ধ শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে দেখু কি সাহস এবং উৎসাহের সহিত তিনি পশ্চিম ব অত্যাচার এবং অনাচারের প্রতিকারে একক যুদ্ধ চালাই যাইতেছেন। তাঁহার আহ্বানে যে সকল পথ এ

ময়দান সভা হইতেছে তাহার অনেকগুলিতেই বোমা ফাটিতেছে। অজয়বাবুর প্রাণ হত্যারবহ চেষ্টাও হইতেছে (এবং এই প্রচেষ্টা করিতেছে কাহারা—নক্‌শালী না সি পি এম পন্থীরা, জানিনা ?)

নকশালী অনাচার বন্ধ করিতে অজয়বাবু প্রাণের বদলে প্রাণ, নাকের বদলে নাক প্রভৃতি হুমকী, কানকাটা কমুদের মত এমন কথা একবারও বলেন নাই। তিনি বলিতেছেন নকশালী বলিয়া কথিত যুবক এবং কিশোররা কয়েকজন বুনো নেতার দ্বারা প্ররোচিত এবং নকশালী আদর্শে (ইহা যে কি তাহাও জানি না) উদ্বোধিত দলের সহিত কিছু সংখ্যক শিক্ষিত, কিছু অল্প এবং অপ-শিক্ষিত এবং বহু সমাজ বিরোধী ব্যক্তির সংমিশ্রন ঘটিয়াছে এবং যেখানে যাহা কিছু অত্যাচার অনাচার, খুন-খারাপী ঘটিতেছে, সবই নকশালীদের পৃষ্ঠে আরোপিত হইতেছে—পুলিস এবং সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা।

অজয়বাবুর মতে পাল্টা-মার দিয়া কোন কাজই হইবে না। নকশালী বালক এবং যুবকদের যেমন করিয়াই হউক ঠিক পথে পরিচালনা করিতে হইবে, তাহাদের মনে শুভবুদ্ধির জাগরণই তাহাদের সংশোধন এবং ব্যাধি মুক্তির একমাত্র পথ বা ঔষধ। সামাজিক ব্যাধি দূর করিতে হইলে সামাজিক ঔষধই প্রায়োজন। বিলম্ব হইলেও ইহাতে নিরাময় স্থায়ী হইতে পারে। এ-বিষয় পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিলে চলিবে না। পুলিসও আমাদের লোক—তাহাদের উপর যে-প্রকার হামলা চলিতেছে তাহাতে কিছুসংখ্যক পুলিসও হয়ত প্রাণের দায়ে আজ বেপরোয়া গুলিচালনা করিতে বাধ্য হইতেছে—ইহার জন্য সাধারণ-ভাবে পুলিসকে জনহত্যাকারী বলিব করিয়া কি ?

নকশালীদের কাছে একটি সামান্য নিবেদন

সংবাদে প্রকাশ মহান চীনের প্রায় সর্ব্বপ্রকার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিত্তালয় এবং অন্যান্য বিত্তা-শিক্ষা সংস্থা বিগত চারি বৎসর মহা বিপ্লবের স্রোতে ভাসিয়া যায় আবার চারি বৎসর পরে ঘটা করিয়া চীনে সেই স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিত্তালয়গুলি গত কয়েকদিন পূর্ব্বে খুলিয়াছে। বালক-বালিকা যুবক-যুবতীদের আবার শিক্ষাদান কাজ সুরু হইয়াছে। ইহা সবই নিশ্চয় মহান নেতা মাও-সে-তুঙ এর নির্দ্দেশক্রমেই সংঘটিত হইল। এই নেতা নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে দেশের লোককে শিক্ষা বঞ্চিত করিয়া রাখা মানেই দেশকে অগ্রগতির পথে না লইয়া পশ্চাৎগতির পথে ঠেলিয়া দেওয়া।

কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের নকশালী নেতারা এবং তাঁহাদের অনুচরবৃন্দ এখনও সমানে চালাইয়া যাইতেছে স্কুল, কলেজ, বিজ্ঞানাগার ধ্বংসাত্মক কাজ। চীনে এখন যে হাওয়ার পরিবর্ত্তন হইল, সে-সংবাদ কি তাহারা এখনও পান নাই, না সংবাদ পাইয়াও ধ্বংসাত্মক কার্য্য এবং খুন জখমের নেশায় এতই মত্ত যে এখন আর ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা তাঁহারা হারাইয়া বসিয়াছেন ?

এ রাজ্যেও মানুষের মনে সাহস এবং নষ্টামী প্রতিরোধ শক্তির সূচনা হইয়াছে, নকশালীরা এ-কথাটা মনে রাখিয়া তাঁহাদের গতিপথ পরিবর্ত্তন করিলে সকলেরই মঙ্গল হইবে।

সাবিত্রী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

তোমারি মতনই তো সকলেই পাশে বসে থাকে ।
হাত দুটো ধরে। চেয়ে মুখ পরে।
হয়ত বা দুটি হাতে নিয়ে মাথাটাকে।
যদিও আকাশে থাকে রবি-শশী-তারা-নক্ষত্রের টিপ
যদিও ঘরের কোণে জ্বালা থাকে রাতের প্রদীপ
হয়ত তোমাকে সে বলেছিল জ্বালা জোনাকীর টিপ
কিংবা তারাদের আকাশপ্রদীপ।
নিবে গিয়েছিল দেবী তোমারও চোখের আলো,
(আমাদেরই মত ?)
চারিদিকে দেখেছিল নামে অন্ধকার কালো,
(আমাদেরি মত ?)
সেই ঘোর অন্ধকারে টিপে টিপে ফেলে নীরব চরণ,
এসেছিল সেই ভয়ঙ্কর লোক অন্ধকার দৈত্যের মতন,
দেহহীন! কিন্তু যেন মহা ভীমকায়
হাতের 'পাশা'টি তার মাটীতে লুটায়।—
আর ছুঁয়ে দিল সত্যবানে। প্রাণটাকে তার ধরে নিল হাতে।
শুকাইয়া গেল বুক-গলা তব যেন কাঠ হয়ে,—
বিশুষ্ক নয়নে তার দিকে চাহিলে বিস্ময়ে।
এমনি করেই ওতো নিয়ে যায় প্রাণ সবারির। সকলেই মানে
ধরণীর।
আর কিছু নাই করিবারে।
কিন্তু তুমি গেলে তার সাথে। (আমরা যাইনি দেবী
দেখিতে তো পাইনি তাহারে।

আর সেই প্রাণটাকে হাত থেকে তার ছিন্ন করে পাশদাঁড়
পারিলে ফিরাতে।

* * *

তারপর চিরকাল কত সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগযুগান্তর এসেছে
ধরাতে,
কত লক্ষকোটি সত্যবানের জীবন নিয়েছে সে বেঁধে দণ্ডপাশ
হাতে—,
সকালে সন্ধ্যায় প্রহরে নিমেষে মুহূর্তে দিনেরাতে।
কারুকেই তারা সেই নারী কোনদিন পারেনি ফিরাতে।

॥ শরাহত ॥

শঙ্কর মিত্র

অদৃশ্য এক চৈতন্য প্রবাহ মাঝে মাঝে নিষাদের মত
অতর্কিতে শরহানে। ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর আনন্দ আলাপে
অকস্মাৎ কালো মেঘের ছায়া নামে। মূর্ত বেদনায় অস্থির হৃদয়
হাহাকার করে উঠে।
কোথায় আলো? কোথায় বাতাস? আর্তপ্রশ্নে জীবনের
সত্য উদ্‌ঘাটিত। পা ফেলে ফেলে পথ চলা, ভাবনার রেখাগুলি
সারি সারি বাঁকা পথে আনাগোনা। তবু কি জানি অর্থমার সত্য
মনের আড়ালে থাকে আচ্ছাদিত
মৃত্যুর শোক বিচ্ছেদের নদীতে ঢেউ তোলে। রাত্রির অন্ধকারে
নিঃশব্দতার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাই। যদি কোন কথা থাকে
জনান্তিকে বলি। কথা বলা, আর কথা না বলার
সীমান্তে দাঁড়িয়ে ভেসে ভেসে চলে যাই।

স্নিগ্ধরূপ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

স্নান-তৃপ্ত মহিষের রুক্ষ দেহটিরে
রশ্মি-স্নানে তৃপ্ত করে আবার তপন।
দূর নীলাম্বর হ'তে আলো-প্রস্রবণ
অনুক্ষণ ঝরিতেছে, পড়িতেছে নীরে,
ঝরিতেছে পলি-পড়া তীরে ধীরে ধীরে।
মহিষের ছায়াটিও কেমন মোহন।
মায়াময় নদী-তীর হিরণ কিরণ
ভরিয়া তুলিছে শুধু ;   প্রাণের গভীরে
প্রশান্তি নামিয়া আসে এই স্নিগ্ধতায়
পাখী-ডাকা পুষ্প-বাস-মাখানো সকাল,
নদীর নির্মল মূর্তি, শান্ত মহিষের
পরিতৃপ্ত অবস্থান, বিটপী শাখায়
মৃদুমন্দ আলাপন, সব সুর—তাল
কত স্নিগ্ধ।—আছে কভু তুলনা কি এর।

কার কণ্ঠস্বর

সন্তোষকুমার অধিকারী

যতদূর হেঁটে যাই, কেউ ত' থাকেনা কাছে কাছে।
ভিড়ের বিষণ্ণমুখ, সবাই অচেনা উদাসীন ;
নিশীথের স্তব্ধতায় মুহূর্তেরা আসে আর যায়
অস্থির চঞ্চল।   বাতাসের জ্বালা চোখে, আঁধারের
গভীর বেদনা চারিদিকে।   ঘুম নেই, উদ্বেলিত
চোখে ঘুম নেই।   হঠাৎ পলকছায়া ;   সাড়া দিলে
কে তুমি অচেনা বন্ধু ?   আগন্তুক, পথে যেতে যেতে
হঠাৎ এ'কার মুখ, কে তুমি বিষণ্ণ হৃদয়েতে ?
বড় শ্রান্তি।   নিঃসঙ্গমুহূর্ত ছেড়ে দুর্গম আকাশে
পাড়ি দিতে পারিনাক।   একা এই কুয়াশাজড়ানো
নির্জন আঁধারে শুধু·· ···বড় শ্রান্তি।   ভাবি, চলে যাই,
কিন্তু কোথা যাই ?   কার দু'চোখে আশ্রয় ভালবাসা ?
এলো এই ভিড় ঠেলে অসাড় জীবনে যদি ঝড়,
কে জানে সে কার স্পর্শ, ডাক দিলো কার কণ্ঠস্বর ?

খুনীর বিচার

চিত্তরঞ্জন দাস

জনকল্যাণব্রতী রাজনৈতিক দলগুলির শরিকী সংঘর্ষ শুরু হয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে, এ তথ্য সর্বজন-বিদিত। বলাবাহুল্য উক্ত সংঘর্ষেরই ক্রম-বিস্তারের ফলশ্রুতি—পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতির মূল কারণ। সকলেরই এক উদ্দেশ্য অর্থাৎ গদি দখলের নিমিত্ত পরস্পর বিরোধী দলগুলির অস্বাভাবিক সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টই আজকের এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। জনসাধারণ তাদের বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু তারা করেছেন বিশ্বাসঘাতকতা। ক্ষমতা লাভের জন্য তারা উন্মত্ত এবং সেহেতু যে কোন ঘৃণ্যনীতি অবলম্বন করতেও তারা দ্বিধাবোধ করেন না। তাদেরই গৃহিত হিংসাত্মক কর্মসূচীর অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণাম আজ পশ্চিম বাংলার জনজীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ করে তুলেছে। সুতরাং দেশ কিম্বা জাতির জন্য তাদের বিন্দুমাত্র দরদ আছে বলে স্বীকার করি না। পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ হত্যা করতেও যাদের হাত একদিন সহজে উদ্যত হত না, আজ তাদের কাছে প্রকাশ্য দিবালোকে নরহত্যা হয়েছে অতি সহজ এবং স্বাভাবিক কাজ। সুতরাং বাঙালীর সুসভ্য সমাজ আজ কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে সহজেই তা অনুমেয়।

পশ্চিম বাংলার প্রচলিত খুন-জখমেরখতিয়ান প্রত্যহ সংবাদপত্রের শীর্ষস্থানে প্রকাশিত হয়। কারণ উক্ত খবরই বর্তমানে পাঠকদের নিকট সর্বাধিক আকর্ষণীয় ও আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন দলের কর্মী খুন, সমর্থক খুন, নিরীহ পথচারী খুন এবং ইদানিং কিছুদিন যাবৎ শুরু হয়েছে পুলিশও খুন। অবশ্য ইতিমধ্যে পুলিশ হতাহতের সংখ্যা নাকি মাত্র সাড়ে তিনশত। (৩০শে অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে প্রকাশিত) তাঁদের বর্তমানে পাইকারী খুনের সংখ্যা নিরূপণ করাও খুব সহজসাধ্য নয়। তবে উক্ত সংখ্যা যে কয়েক সহস্র হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আজ পর্য্যন্ত এ জাতীয় একটি খুনেরও বিচার কিম্বা কোন খুনী আসামীর শাস্তির খবর পত্র-পত্রিকায় দৃষ্ট হয়নি। সুতরাং জনসাধারণের মনে এ ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে স্বাধীনোত্তর ভারতে হয়ত খুনের কোন বিচার হয় না বা বিচারের প্রচলন হলেও প্রকৃত খুনী আসামীর জন্য নির্দিষ্ট প্রাক্তন ফাঁসির বিধান হয়ত বা বর্তমান সংবিধানে নেই। কারণ তা যদি থাকত তাহলে অদ্যাবধি যত খুন-জখম সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে, তার বিচার এবং দণ্ডাদেশের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বিবরণ নিশ্চয়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। সংবাদপত্রের একজন নিয়মিত পাঠক হিসাবে বলতে পারি যে শরিকী সংঘর্ষ শুরু হবার পর থেকে অদ্যাবধি খুন জখমের সংবাদ নিয়মিত পেয়ে আসছি, কিন্তু কোন খুনীর বিচার অথবা বিচারে ফাঁসী হওয়ার খবর পাই নি। অবশ্য যদি কোন পাঠক সে খবর পেয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে ভাগ্যমান বলতে হবে।

বৃটিশ আমলে হত্যা অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হত। আবার ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসেরও ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং খুন করলে যে আইনের বিধান অনুসারে দোষী ব্যক্তিকে কঠোরতম শাস্তি পেতে হবে, সে আশঙ্কা বা ভীতি সমাজের সর্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ছিল। তাই খুন জখম তৎকালে খুব স্বাভাবিক ছিল না। নেহাৎ পারিবারিক, বৈষয়িক কিম্বা

সাম্প্রদায়িক কলহ যখন চরম পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছত, তখন সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ খুন জখম সংঘটিত হত বা এখনও হয়। কিন্তু উহা উদ্দেশ্যমূলক নয়। আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। অথচ সে সব ক্ষেত্রেও প্রকৃত অপরাধীর শাস্তির বিধান থেকে অব্যাহতি ছিল না।

পশ্চিমবাংলার বর্ত্তমান প্রচলিত পাইকারি খুন জখম এখন আর একেবারেই অস্বাভাবিক বা আকস্মিক পর্য্যায়ে নেই। উহা এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মানুষ যেন বন্য শিকার। কারণে অকারণে বধ করতেই হবে। প্রতিদিন খুনের খতিয়ান দেখে মনে হয় যেন পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে উহার প্রতিযোগীতা চলছে। কে কত খুন করতে পারে। নৃশংসতায় এরা এখন হিংস্র পশুকেও হার মানিয়েছে কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হিংস্র জন্তু দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ষার্থে মানুষ ছুটে যায়, কিন্তু আজ মানুষ মানুষের দ্বারা যখন আক্রান্ত বা হতাহত হচ্ছে, তখন তার রক্ষার্থে কোন ব্যক্তিই অগ্রসর হচ্ছে না। সকলেই নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। এমন কি খুনের প্রত্যক্ষ দর্শনেও সাক্ষ্য প্রদানে পশ্চাৎপদ হয়। অথচ জনসাধারণ যদি কিছুটা সাহস অবলম্বন করে এবম্বিধ ঘটনার প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন, তাহলে নিশ্চয়ই এর কিছুটা প্রতীকার হয়।

মহানগরী কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথে দিবালোকে লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রতিদিন আততায়ীর ছুরিকাঘাতে কিম্বা অন্য কোন অস্ত্রাঘাতে বহু অমূল্যজীবন বিনষ্ট হচ্ছে। এর কী কোন প্রতিকারই নেই? না কোন সুবিচার নেই?

যদি প্রতিটি ঘটনার যথোপযুক্ত বিচার কিম্বা প্রকৃত আসামীকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে তার ফাঁসীর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত অথবা প্রকাশ্য রাজপথে যেখানে উক্ত আসামী কর্ত্তৃক হত্যা সংঘটিত হয়েছে ঠিক সেখানে তাকে দাঁড় করিয়ে দিবালোকে সর্ব্ব-সমক্ষে গুলি করে হত্যা করা হত এবং সে খবরও যদি খুনের খবরের ন্যায় সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষস্থানে প্রকাশিত হত, তাহলে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে খুন-জখমের মাত্রা বৃদ্ধি না পেয়ে, যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেত, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।

রাষ্ট্র শাসনে পুলিশী ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত। রাজ্যের শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুলিশের। অথচ যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রশাসন যন্ত্র করে দিল সেই একান্ত প্রয়োজনীয় আরক্ষা বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়। সুতরাং রাজ্যে তখন শান্তি ও শৃঙ্খলার আর কোন বালাই রইল না। অবাধে চলতে লাগল লুটতরাজ খুন-জখম যাবতীয় হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ। জনসাধারণের কণ্ঠে উত্থিত হল ত্রাহি ত্রাহি রব। কিন্তু বিপন্ন ব্যক্তির সাহায্যে আর তখন একটি প্রাণীও ছুটে আসে না। মহানগরীর রাজপথ সন্ধ্যার পর প্রায় জনশূন্য। সিনেমা-থিয়েটার অচল। বলাবাহুল্য পুলিশ ও সরকারী কর্ম্মীবৃন্দ ক্রমশঃ অধিকতর সুযোগ সুবিধার আশায় হয়ে পড়লেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত, অথচ জনকল্যাণে যাদের থাকা উচিত সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ। পুলিশ অবসর প্রাপ্ত, জনগণ সন্ত্রস্ত। এ হেন অবস্থায় ফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষ ক্রমশঃ হয়ে উঠল অস্বাভাবিক জোরদার। রণক্ষেত্র হল কুরুক্ষেত্রে পরিনত। যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হল—যুক্তফ্রন্ট সরকারের শোচনীয় পতন। পশ্চিমবাংলার গদি হল শূন্য।

ভারতীয় সংবিধানে কোন রাজ্যে শূন্য গদি রাখা সম্ভব নয়, তাই ফ্রন্টসৃষ্ট ঘোরতর অরাজকতার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় প্রবর্ত্তিত হল রাষ্ট্রপতি শাসন। উক্ত অরাজকতা কঠোর হস্তে দমন করে রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনাই হল তখন বর্ত্তমান রাজ্য সরকারে মুখ্য কর্ত্তব্য এবং সে জন্য সরকারকে গ্রহণ করতে হল সি, আর, পির সক্রিয় সাহায্য। কারণ যুক্তফ্রন্ট-সৃষ্ট নিস্ক্রীয় রাজ্য পুলিশের পক্ষে তখন সক্রিয় হওয়া যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। তদ্ভিন্ন ভূত তাড়ান সরষে নিজেই যখন ভূতে পরিণত হয়েছে,

তখন সেই সরষে ভূতকে দিয়ে প্রকৃত ভূতকে তাড়ান সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহের যথেষ্ট কারণ থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই রাজ্য সরকারের পক্ষে গুরুতর পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একমাত্র সি, আর, পি নিয়োগ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই ছিল না। সুতরাং যখনই আরম্ভ হল সি, আর, পি কর্তৃক হাঙ্গামার প্রতিরোধ, অমনই উক্ত হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক দলগুলি সোচ্চার হয়ে উঠল সরকারের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন দলের দাবী হল—"অবিলম্বে সি, আর, পি তুলে নাও।" কারণ তাহলে অবাধে তারা খুন জখম লুটতরাজ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সরকার উক্ত দাবী না মানবার ফলে বর্ত্তমানে কিছুদিন যাবৎ শুরু হয়েছে পুলিশ নিধন যজ্ঞ এবং অদ্যাবধি সে যজ্ঞে আহুতির সংখ্যা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেখলাম পুলিশ খুনের প্রতিকারকল্পে পুলিশের ঊর্দ্ধতন কর্মচারীর নিকট থেকে সাধারণ পুলিশের নিকট নির্দেশনামা পাঠান হয়েছে যে তারা অর্থাৎ সাধারণ পুলিশ যেন বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন বাসগৃহের বাইরে না যান। এমনকি দৈনন্দিন বাজারও যেন পাড়ার অন্য কোন লোক কিম্বা নিজের স্ত্রীকে পাঠিয়ে করান হয়। তদ্ভিন্ন কোন পুলিশ কর্মীকে যখন একান্ত প্রয়োজনে বাইরে বেরুতে হবে তখন যেন তিনি অন্ততপক্ষে একটা লাঠিও হাতে নিয়ে বেরোন। অবশ্য সতর্কতার দিক থেকে উক্ত নির্দেশ কিছুটা যুক্তিপূর্ণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই কি পুলিশ খুনের প্রতীকার? না পুলিশের পক্ষে আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়?

পুলিশবাহিনী রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। সুতরাং সেই অঙ্গের উপর আঘাত হানলে রাষ্ট্রের নিম্নতম কর্মচারী থেকে রাষ্ট্রপতি পর্য্যন্ত সে আঘাত প্রাপ্ত হন। সুতরাং রাষ্ট্রের কল্যাণে সরকারের উচিত প্রয়োজন বোধে সর্ব্ব শক্তি নিয়োগ করে আজকের এই প্রচলিত নরমেধ যজ্ঞের হোতা অর্থাৎ দুষ্কৃতকারীদের সম্পূর্ণরূপে দমন করা। নচেৎ সরকারের দুর্ব্বল নীতির ফলে যদি পশ্চিমবাংলার এই নৃশংস খুন জখমের যথোপযুক্ত প্রতীকার না হয় এবং উহার মাত্রা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে, তাহলে সে সরকারের অস্তিত্ব থাকা না থাকা একই কথা।

বৃটিশ আমলে দেখেছি পল্লীগ্রামে সামান্য একজন চৌকিদারের উপরও কেউ কোনদিন দুর্ব্যবহার কিম্বা কোন প্রকার হামলা করতে সাহসী হত না। কারণ সকলেই জানত যে উক্ত চৌকিদারের পশ্চাতে রয়েছে বৃটিশ সরকারের সমগ্র পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী। সুতরাং যদি কখনও কোন চৌকিদার দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত বা নিগৃহীত হত, তাহলে সরকারের বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে পাইকারী হারে সে অঞ্চলের দুষ্ট লোকদের শায়েস্তা করে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে দিত যে সরকারের পক্ষে কোন পুলিশ কর্মচারীর উপর আক্রমণ বা উৎপীড়ন বরদাস্ত করা কখনও সম্ভব নয়। অবশ্য তৎকালীন পুলিশ কোন রাজনীতি দলভুক্ত ছিল না এবং নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে কখনও পরাঙ্মুখ হত না। তাই রাজ্যে তখন স্বাভাবিক শান্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার অভাব কখনও অনুভূত হত না।

কিন্তু আজ? পশ্চিমবাংলার সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা বলে যে কিছুই নেই, সে বিষয়ে সম্ভবতঃ সকলেই একমত। সাধারণ অসাধারণ মানুষ আজ স্বাভাবিক নিরাপত্তার অভাবে নিজেদের সম্পূর্ণ রূপে অসহায় বোধ করেছেন। এমনকি পুলিশ—যাদের উপর রাজ্যের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার ন্যস্ত এবং তদ্ভিন্ন যাদের আর প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন সরকারী দায় দায়িত্ব নেই তারাও আজ ঠিক উক্ত রোগেই ভুগছেন অর্থাৎ নিরাপত্তার অভাবে একটা স্বাভাবিক আতঙ্ক এবং নিজেদের নিতান্ত অসহায় বোধ করবার ফলে ক্রমশঃ তাদেরও মনোবল ভেঙ্গে পড়ছে।

বলাবাহুল্য ইদানীং পুলিশ খুন এবং সশস্ত্র আক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য সমগ্র পুলিশবাহিনীর মধ্যে

একটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে তাদের সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় করা। যাতে করে রাজনীতির মুখোশ পরিহিত গুণ্ডাদের দৌরাত্ম বা রাজত্ব সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে অপ্রতিহত-ভাবে চলতে পারে। সুতরাং সরকারের পক্ষে "যেমন কুকুর তেমন মুগুর" নীতি অবলম্বন করাই বর্তমান ক্ষেত্রে একান্ত সমীচিন বলে মনে করি। নইলে অদূর ভবিষ্যতে গোটা পশ্চিম বাংলা যে নর ঘাতকদের লীলাভূমিতে পরিণত হবে, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই।

ইউনিফরম পরিহিত পুলিশ খুনের ক্ষেত্রে না হয় অনুমান করা যেতে পারে যে দুস্কৃতকারীদের কর্মসূচী অনুসারেই উক্ত খুন সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু যেখানে সাদা পোষাক পরা পুলিশ খুন হয়, সেখানে নিশ্চয়ই তার পাড়ার পরিচিত লোকের দ্বারাই খুন সংঘটিত হওয়াই স্বাভাবিক বলে মনে করা উচিৎ। এবং তদনুসারে তদন্তকারী পুলিশের পক্ষে উক্ত পাড়ার অধিবাসীদের সাহায্যে সম্ভবত সহজ হয় প্রকৃত খুনীর সন্ধান পাওয়া। সংবাদপত্রে প্রত্যহ যেমন খুনের খবর দৃষ্ট হয়, তেমনই পুলিশ কর্তৃক আসামীদের গ্রেপ্তারের খবরও পাওয়া যায়। কিন্তু কারোর বিচার বা শাস্তির কোন খবর না পেলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা যে জামিনে মুক্তি পায়, সে খবরও পাঠকদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হয়। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত আসামীগণ বাইরে এসেই যে দেবদূত হয়ে গেল কিম্বা হিংসাত্মক কার্য্য কলাপ থেকে অবসর গ্রহণ করল, এ ধারণা করাও তো একেবারেই যুক্তি যুক্ত নয়।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত অদ্যাবধি খুন জখমের মোট সংখ্যা যেমন অজস্র তেমনই গ্রেপ্তারের মোট সংখ্যাও অজস্র। তন্মধ্যে কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশিত খবর নকশালপন্থী বলে বর্ণিত অপরাধীদের সংখ্যা নাকি ১২০০ এবং উক্ত সংখ্যার মাত্র ২০০ জন আটক আছে, বাকী সব অর্থাৎ ১০০০ নাকি জামিনে মুক্ত। সুতরাং গ্রেপ্তারের পর যথোপযুক্ত বিচার ও দণ্ডাদেশের পূর্বেই যদি ধৃত ব্যক্তি (অবশ্য যদি প্রকৃত অপরাধী হয়) সাময়িক অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, তাহলে বর্তমান প্রচলিত খুন জখমের মাত্রা যে ক্রমশঃ হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পাবে, সে বিষয়ে সন্দেহের লেশ মাত্র থাকা উচিৎ নয়। তাই এ জাতীয় মূল্যহীন গ্রেপ্তারের সার্থকতাই বা কি? শুধু লোকদেখান প্রহসন ভিন্ন আর কিছুই নয়।

সুতরাং পূর্বেও উল্লেখ করেছি এবং পুনরায় উল্লেখ করছি যে এজাতীয় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দিনের পর দিন যাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে, তাদের গ্রেপ্তারের পর দীর্ঘমেয়াদী বিচারের অপেক্ষায় জামিনে মুক্তি না দিয়ে অথবা থানা কিম্বা জেল হাজতে আটক না রেখে সঙ্গে সঙ্গে কঠোরতম দণ্ডাদেশ স্বরূপ প্রকাশ্য রাজপথে গুলি করে মেরে সরকারের উচিৎ বর্তমান উদ্দেশ্য প্রণোদিত খুনের যথোপযুক্ত বিচারের আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। কারণ যিনি যত বড় গুণ্ডা, যত বড় পাষণ্ড, যত বড় হত্যাকারীই হউন না কেন, প্রাণের ভয় সকলেরই আছে। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা যদি অপরাধীগণ বুঝতে পারে যে খুন করলে বিচারে তার প্রাণদণ্ডাদেশই হয় এবং উক্ত আদেশ কার্য্যকরী হয় অবিলম্বে প্রকাশ্য রাজপথে লোকচক্ষুর সম্মুখে। তাহলে ক্রমবর্দ্ধমান খুনের মাত্রা নিশ্চয়ই হ্রাস পাবে। নচেৎ চলছে, চলবে।

পঞ্চশস্য

কে দায়ী ?

বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া "যুগজ্যোতি সাপ্তাহিক বলিতেছেন :

পশ্চিবঙ্গে আজ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তিই তাহা সমর্থন করিবেন না। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী নকশাল পন্থীরা নয়। ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এই সকল তথাকথিত বামপন্থী দল ও বিশেষ করিয়া সি পি এম্। কাহারা রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করিয়া জনকল্যাণের কোন প্রচেষ্টা না করিয়া শুধুমাত্র নিজ নিজ দলীয় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করিয়া জনগণকে দুর্গতির অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়াছে? ক্ষমতায় আসীন থাকিয়াও কাহারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া জনগণকে উচ্ছৃঙ্খল ও বেপরোয়া হইতে উৎসাহিত করিয়াছে? পশ্চিমবঙ্গের জনগণ কংগ্রেস শাসনকে চূর্ণ করিয়া তাহাদের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা তুলিয়া দিলে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া কাহারা জনগণের মনোবল চূর্ণ করিয়া তাহাদের হতাশা ও নৈরাশ্য বর্দ্ধিত করিয়াছে? এই বামপন্থী দলগুলিই গত দুই বছর ধরিয়া নকশাল আন্দোলনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে এবং আজ তাহারাই আবার এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে আর্তনাদ তুলিয়া আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। নকশালীদের সহিত তাহাদের এইমাত্র প্রভেদ নকশালীরা সাহসী ও তাহারা কাপুরুষ। নকশালীরা স্বীয় আদর্শ বা কর্মপন্থার জন্য সরকার অথবা পুলিসের সহিত সংগ্রাম করিতে ভীত নয় কিন্তু ইহারা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গদি দখল করিয়া পুলিশের সহায়তা না পাওয়া পর্যন্ত নিজ লৌহহস্ত মখমলের দস্তানায় ঢাকিয়া রাখিতে চায়। তাই পশ্চিমবঙ্গ আজ যে সর্বনাশকর অন্তর্বিপ্লবের কবলিত হইতে চলিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী এই সব তথাকথিত বামপন্থী—বিশেষ করিয়া মার্কসিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতৃবর্গ।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পতনের পূর্ব্বমুহূর্তে (২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯) আমরা সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিয়াছিলাম "কংগ্রেস বিরোধিতার সময় জন মনে বিকল্প দল হিসাবে কম্যুনিষ্টদের প্রতি আস্থা ছিল কিন্তু আজ তাহারা উভয় পক্ষের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িয়া অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইতেছে। কে তাহাদের পথ দেখাইবে, কবে এই দুর্গতির অবসান ঘটিবে তাহার কোন ধারণাই তাহারা করিতে পারিতেছে না। ভবিষ্যৎ তাহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। কোন ক্ষীণ আলোকের রেখাও তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই অনিশ্চয়তা এই হতাশা ও নৈরাশ্য জনগণের রাজনৈতিক চৈতন্য হরণ করিয়া তাহাদের জড়ত্ব প্রদান করিবে এবং অনিশ্চিত কালের জন্য তাহারা সুযোগসন্ধানী কূটকৌশলীদের শিকারে পরিণত হইবে। এই অপরাধের জন্য ইহার মূল ও সর্বপ্রধান অনুষ্ঠানকারী মার্কিষ্ট কম্যুনিষ্ট দলের অদূরদর্শী নেতৃত্বকে ইতিহাস কোন দিনই মার্জনা করিবে না।" আজ আমরা তাহারই পুনরুক্তি করিতেছে।

নকশালী হাঙ্গামা যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতার স্বাভাবিক পরিণতি। ইহা দুঃখের হইলেও ইহাকে রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। নেতৃত্বের ভুলের মাশুল জাতিকে দিতে হয় ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তাই দুঃখ করিয়া লাভ নাই, তবু কতদিনে

এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইবে তাহাই ভাবিবার কথা।

উপনিষদের ঋষি পরিচয়

অতুলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য "তত্ত্বকৌমুদী"তে একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহা হইতে অনেকাংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া কতটা সমীচীন তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-বস্তু ছাড়া আর যে কিছু থাকিতে পারে তাহা যুবকদের নিকট একেবারেই সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আর উপনিষদের ঋষিরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করিতেন। তাঁহাদের নিকট আত্মাতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকৃত হইত না। ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাই উপদেশ দিয়াছেন, "আত্মা বা, অরে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্যো, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি বা অরে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে, বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদম্ বিদিতম্।" এখানে বলা প্রয়োজন যে ঋষিরা দেশকালে ব্যাপ্ত বস্তুগুলির সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা সম্পর্কশূন্য কোন শক্তিকে আত্মা বলিয়া বুঝিতেন না। ঐতরেয় উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে: "কোহয়ম্ আত্মেতি বয়মুপাস্মহে? কতরঃ স আত্মা?" অর্থাৎ—আত্মরূপে আমরা কাহার উপাসনা করি? ইন্দ্রিয় বা শক্তির মধ্যে কোনটি আত্মা? উত্তরে ঋষি বলিতেছেন, "যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি যেন বা বাচান ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদুচাস্বাদুচ বিজানাতি"; অর্থাৎ—যদ্দ্বারা লোকে রূপ দেখে, শব্দ শোনে, গন্ধ আঘ্রাণ করে, ইত্যাদি তাহাই আত্মা। বর্ত্তমান কালে হোয়াইটহেডের মত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি কোন একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। অর্থাৎ কৌষিতকী উপনিষদের ঋষি যে ভূতমাত্রা ও প্রজ্ঞামাত্রা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাহাই আজ সকল বিজ্ঞানেরও সিদ্ধান্ত? হোয়াইটহেডের দর্শনে world loyalty কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপনিষদ জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের জীবন-মৃত্যুর সান্ত্বনার কারণ হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালের মার্কিন পণ্ডিত উইল ডুরান্ট তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Story of Civilization এ বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের সভ্যতা গৌতম বুদ্ধ হইতে মহাত্মা গান্ধী ও ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। অবশ্য আজিকার দিনে যদি যুবকরা বুর্জোয়া সভ্যতার ফল বলিয়া ইহাকে বর্জন করে তবে তাহার দায়িত্ব যুবকদেরই। যাহোক শোপেনহাওয়ারের মত জার্মান দার্শনিক এই আত্মবাদ এমনই গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন যে তাঁহার মত সন্ন্যাসীর একমাত্র স্নেহের পাত্র একটি কুকুর "আত্মা" নাম পাইয়াছিল। বার বার এই কথাটি উচ্চারণ করিতে হইবে তাই ইহা যেন জপের মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল। উপনিষদ ভাল করিয়া পড়িলে দেখা যায় যে বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা বলিতে যাহা বোঝায় ঐতরেয় উপনিষদের ঋষি তাহা স্পষ্টই নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন, "যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জুতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি"; অর্থাৎ—এই যে হৃদয়, এই যে মন, সংজ্ঞা অর্থাৎ চেতনা, আজ্ঞান অর্থাৎ কর্তৃভাব, বিজ্ঞান, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জুতি অর্থাৎ তৎপরতা, স্মৃতি, সঙ্কল্প, ক্রতু অর্থাৎ অধ্যবসায়, অসু (প্রাণাদি) কাম অর্থাৎ বিষয়াকাঙ্খা, বশ অর্থাৎ অভিলাষ,—এই সমুদয় প্রজ্ঞানের নামমাত্র। এই প্রজ্ঞান বা আত্মাকেই যাজ্ঞবল্ক্য বার বার দেখিতে, শ্রবণ করিতে, মনন করিতে, নিদিধ্যাসন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর এই শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যো", ইহার অর্থ—আত্মদর্শনই উদ্দেশ্য, শ্রবণ মনন, নিদিধ্যাসন উপায়

মাত্র। এই ব্যাখ্যা পড়িয়া আমার মনে হয় শঙ্কর মধ্য যুগের লোক, প্রাচীনকালের ঋষিদের যে জীবনী শক্তি তাহা তাঁহাতে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। তাই প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়াতে যে ব্রহ্মের পরিচয় তাহা স্বাভাবিক ভাবে তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অবশ্য তিনি যে সাধনপন্থার নির্দেশ দিয়েছেন তাহা বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য। একবার এক ব্যক্তি ব্রহ্মদর্শনের অভিলাষী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়; তখন তিনি তাহাকে স্থূলদৃষ্টি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "নৈতৎ দ্রষ্টুং শক্যতে গবাদিবৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন গরু, ঘোড়া প্রভৃতি দেখার মত নয়।

আরুণি নিজপুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, 'তুমি ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ কিন্তু বেদাধ্যয়ন করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ হও। কেবল ব্রাহ্মণের পুত্র অতএব ব্রাহ্মণ এরূপ "ব্রহ্মবন্ধু" হইয়া জীবনধারণ বৃথা'। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া গুরু গৃহে শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত রহিলেন। যখন গৃহে ফিরিলেন তখন তিনি জ্ঞানাভিমানী ও স্তব্ধ। পুত্রের এই স্তব্ধভাব দেখিয়া আরুণি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি সে বিদ্যালাভ করিয়াছ কি, যে বিদ্যা আয়ত্ত হইলে অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত জ্ঞাত হয়'? শ্বেতকেতু উত্তরে বলিলেন, 'আমার উপাধ্যায় এ বিদ্যা জানিতেন না, তাহা না হইলে নিশ্চয় আমাকে এ বিদ্যা শিক্ষা দিতেন'। শ্বেতকেতুর আগ্রহ দেখিয়া আরুণি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "দেখ যেমন একটি মৃত্তিকাপিণ্ড দেখিয়া মৃন্ময় সমস্ত বস্তু জানা হয়, যেমন একটি সুবর্ণময় বস্তু জানিলে সুবর্ণের সকল বিকার জানা হয়, যেমন একটি লোহার নরুণ দেখিলে সমস্ত লৌহময় বস্তু জানা হয়, তেমনি এক অদ্বিতীয় বস্তু আছে যাহা দ্বারা সকলই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাকে জানিলে আর সব জানা হয়।......সদ্‌বস্তু বলিলেন আমি বহু হই। প্রথমে তিনি তেজ হইলেন, পরে হইলেন, অপ্‌, তার পর অন্ন। এই তিনের মিশ্রণে সকলই উৎপন্ন হইল। ইহাকে ত্রিবৃৎ করণ বলে। সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।...তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। সেই সদ্‌বস্তুই তুমি শ্বেতকেতু"। আরুণি নয় বার এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে যে সৃষ্টিতত্ত্ব আরুণি ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে সদ্‌বস্তুই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। আধুনিক দর্শন এই মতেরই সমর্থক। দ্বৈতবাদী বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব বেদান্ত স্বীকার করেন না। শঙ্কর তো সৃষ্টিই স্বীকার করেন না। যাহোক এই ছান্দোগ্যের ষষ্ঠাধ্যায়েই অতি বিখ্যাত "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আরুণির শিক্ষার সার এই: "শ্বেতকেতু তুমি সেই বস্তু।" জীব-ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। জীবের সুষুপ্তির অবস্থা অভেদতত্ত্বের দ্যোতক। এই তত্ত্ব আরুণির প্রধান শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য আরও বিস্তারিত আকারে বৃহদারণ্যকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদিও উপ-নিষদে মায়াবাদ নাই, মায়াবাদের প্রেরণা এই নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ হইতেই আসিয়াছে। এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের চতুর্দশ খণ্ডে দস্যু কর্তৃক বদ্ধচক্ষু গন্ধার-দেশীয় পথিকের দৃষ্টান্ত দ্বারা ও তত্ত্বমসি বাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর এই অংশের ব্যাখ্যা করিতে করিতে ধর্মজীবনে মানুষের যে অবস্থাপরম্পরার সম্মুখীন হইতে হয় তাহার অতি উপাদেয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন। চোখবাঁধা বলদের মত আমরা সংসারচক্রে ঘুরিতেছি। আবরণমুক্ত হইতে পারিলেই জ্ঞানলাভ হইবে। শঙ্কর-দর্শনে "আবরণ" কথাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। মনে হয় এই উপনিষদখানি হইতেই তিনি বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। শঙ্কর এই মহাবাক্যের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাকে বলা হয় ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণা। তাঁহার মতে জীবব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানের ভূমিতে নয় কারণ জীব অল্পজ্ঞ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। তাই জ্ঞান-অজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া চিৎ অংশে ঐক্যের সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। জীব তো শঙ্করের নিকট ব্রহ্মই, অপর নহে। সত্যই যে জীব আছে

তাহা শঙ্কর স্বীকারই করেন না। অতএব শঙ্কর এইরূপ ব্যাখ্যা তো করিবেনই। রামানুজ 'তত্ত্বমসি' বলিতে "তস্য ত্বম্ অসি" অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রভু ও জীব তাঁর দাস এই ভাবে ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ঠিক উপনিষদের ধারা রামানুজের ব্যাখ্যায়ও ধরা পড়ে নাই। মধ্ব 'তত্ত্বমসিকে' 'অতত্ত্বমসি' বলিয়া সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদীর মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন: "তুমি ব্রহ্ম নও"। আমি যতগুলি ব্যাখা পড়িয়াছি তাহার মধ্যে বল্লভাচার্য্যের ব্যাখ্যাই উপনিষদের ধারা ঠিক বজায় রাখিয়াছে। বল্লভজীবনকে ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আরুণি যে সকল উদাহরণ দিয়া শ্বেতকেতুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সকলই গ্রহণ করিয়াছেন। আমি নিম্বার্কের ব্যাখ্যা পড়ি নাই তবে শুনিয়াছি তিনি ও বল্লভ এবিষয়ে এক মতাবলম্বী জীবের জীবত্ব যাঁহারা অস্বীকার করেন তাঁহারা ব্রহ্ম কোথায় পান? ব্রহ্ম যে ব্রহ্ম তাহা জীবই বলিতে পারে। জীব ও জগৎ বাদ দিলে ব্রহ্ম তো সসীম হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার ব্রহ্মত্বই থাকে না। ব্রহ্ম মানে তো বৃহৎ-বস্তু—যাহার বাহিরে কিছু নাই। থিবো সাহেব বাদরায়নের ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ভেদাভেদবাদই সূত্রকারের মত। মায়াবাদীর ব্যাখ্যা কষ্ট-কল্পিত।

এতক্ষণ ঋষিদের কথা যতটুকু বলা হইয়াছে তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে আরুণি সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেখাইয়াছেন, যে সকল বিচিত্রতার মূলে আত্মিক ঐক্য বর্তমান। এখানে যদি কেহ উদ্দালক আরুণির নিকট **Blanshard** এর **Nature of Thought** নামক বিখ্যাত পুস্তকের যুক্তিতর্কের ও রাসেল প্রমুখ নাস্তিক দার্শনিকদের শক্তিশালী খণ্ডনের ক্ষমতা আশা করেন তবে তিনি নিশ্চয় নিরাশ হইবেন। সভ্যতার সেই উষা কালে যে আরুণি গ্রীক দার্শনিকদের মত স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন, ইহা কি কম গৌরবের বিষয়?

সাময়িকী

নেতাজী সম্বন্ধে অনুসন্ধান

ভারত সরকার শেষ পর্য্যন্ত তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়া নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় যে মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার করা হইয়াছে তাহার সত্য-মিথ্যার রহস্য উদ্ঘাটন চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই কমিটির কয়েকটি অধিবেশন কলিকাতায় হইবার পর কমিটির সভাপতি বিচারক শ্রীখোসলা মহাশয় অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে দিল্লী চলিয়া গিয়া অনুসন্ধান কার্য্য অর্দ্ধপথে স্থগিত করিয়া দিলেন। ইহার কারণ কি তাহা আমরা ঠিক বুঝিলাম না। শ্রীমতী ইন্দিরা কি কারণে অনুসন্ধান অন্ততঃ সাময়িকভাবে থামাইয়া দিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে মানুষে যাহা অনুমান করিতেছে তাহা কিছু কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনুসন্ধানের ফলে সকলেই জানিতে পারিয়াছেন যে বিমান দুর্ঘটনার গল্পটা সত্য ঘটনার উপরে রচিত নহে। কোন বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয় নাই। তাহা হইলে নেতাজীর অন্তর্দ্ধানের সত্য কাহিনীটি কি? নেতাজী কি এখনও কোথাও জীবিতভাবে বর্ত্তমান আছেন? নয়ত তিনি যদি জীবিত না থাকেন তাহা হইলে তিনি কি ভাবে ও কখন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন?

কাহারও কাহারও মতে নেতাজী এখনও জীবিত আছেন ও কোন রুশিয়ান কারাগারে বন্ধ আছেন। কি কারণে তাহা বলা যায় না। এবং রুশিয়ানগণ কথাটা অস্বীকার করিলেও তাহা মিথ্যা নহে। অপরপক্ষে অনেকে বলেন যে নেতাজী জীবিত আছেন এবং কোন কারণে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন না। কারণটা আধ্যাত্মিক অথবা রাজনৈতিক, যাহা কিছু হইতে পারে। অপর কাহিনী হইল যে নেতাজী জীবিত নাই। তাঁহাকে জাপানীগণ অথবা চীনা বা রুশিয়ানগণ হত্যা করিয়াছে। এই সকল কথার বৈচিত্র হইতে একটা কথা উত্তমরূপেই বুঝা যায় যে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মত কোন সত্যের উপর গঠিত নহে। শুধু অনুমান ও কল্পিত কথা। বিচারপতি খোসলাকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলা হইয়াছিল এই কারণেই যে এই প্রসঙ্গে নানা প্রকার কল্পনার বিস্তার করিয়া ভারতের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছিল। জাপানীরা ও রুশিয়া ভারতের বন্ধু জাতি। তাহারা নেতাজীকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে অথবা হত্যা করিয়াছে বলিলে বন্ধুত্ববোধ ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। জানিয়া শুনিয়া পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু ঐরূপ কার্য্যে বাধা দেন নাই বলাও অনুচিত যদি না কথাটা সত্য হয়। পরস্পর বিরুদ্ধ নানা প্রকার কথার সবগুলিই একাধারে সত্য হইতে পারেনা। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে যাহারা সাক্ষী দিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আন্দাজে কথা বলিতেছেন। শুধু একটা কথা প্রায় স্থির নিশ্চয় বলিয়া বুঝা যাইতেছে, তাহা হইল বিমান দুর্ঘটনার কাহিনীটির অসত্যতা। নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান নাই। কিন্তু তিনি জীবিত আছেন কি নাই; থাকিলে কোথায় আছেন ইত্যাদি কথার কোন উত্তর পাওয়া যাইতেছে না।

পাকিস্থানের নির্ব্বাচন

বহুবৎসর সামরিক হুকুমতের চাপে নিষ্পেষিত থাকিয়া এতকাল পরে পাকিস্থান আবার সাধারণতন্ত্র অনুযায়ী নির্ব্বাচন সম্পন্ন করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পুনঃ সংস্থাপন চেষ্টা করিল। নির্ব্বাচনের ফলে পূর্ব্ব পাকিস্থানে আওয়ামী লীগ এমন পূর্ণরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করিয়াছে যাহাতে ঐ লীগের সদস্যদিগের কথাতেই অতঃপর পাকিস্থান শাসন হইতে থাকিবে। কিন্তু লীগের সভ্যদিগের ইচ্ছা পূর্ব্ব

পাকিস্থানকে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে আলাদা রাজ্যের মত করিয়া পরিচালনা করা। এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে গিয়া লীগ পাকিস্থানের সামরিক শক্তির সহিত সংঘাতে পড়িবে কি না তাহা এখন বলা যায় না। কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে পাকিস্থানের পক্ষে হঠাৎ গায়ের জোরে কোন নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করিয়া লওয়া কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নহে। পূর্বপাকিস্থানের মুসলমানগণ পাকিস্থান সামরিক বাহিনীতে অত্যন্তই সংখ্যালঘু; সুতরাং তাহাদিগকে ভোটে জয়লাভ করার ঝোঁকে পাকিস্থানী বাস্তব পরিস্থিতি অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হওয়া নিরাপদ হইবে না। পাকিস্থানে বাংলা ভাষাভাষী লোকেরাই সংখ্যায় অধিক। কিন্তু সেই সকল বাংলা ভাষাভাষী লোকেরা যে অমুসলমান বাঙ্গালীদিগের প্রতি বন্ধুভাব পোষণ করে এরূপ চিন্তা করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। অবশ্য ধর্মের পার্থক্য ভুলিয়া জাতীয়তাকে উপরে স্থান দেওয়া বর্তমান জগতের উন্নততম সভ্যতায় বহু স্থলেই হইয়াছে দেখা যায়। পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম বাংলায় যে তাহা হইতে পারে না এমন কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। কি হইবে এ ক্ষেত্রে তাহা অনুমান করিয়া কাহারও কোন লাভ হইতে পারে না। সুতরাং পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় পরিণতির বিষয়ে বাস্তব যাহা ঘটিবে তাহার অপেক্ষায় থাকাই উপযুক্ত পন্থা। যতটা অনুমান করা যায় তাহাতে এই নির্বাচনে জয় লাভ করার ফলে পাকিস্থানের মনোভাব মূলত পরিবর্তিত হইয়া যাইবে আশা করিবার কোন সবল কারণ লক্ষিত হইতেছে না।

নরহত্যা কি প্রগতিশীলতা ?

একজন মানুষ কোন প্রকারে পরিশ্রম লব্ধ অন্ন উপার্জনের পয়সায় সংসার চালায়। একশত দেড়শত টাকা রোজগার, বাড়ীতে খাইবার লোক ৪।৫ জন, কোনও রকমে জীবন যাত্রা নির্বাহ হয়। হঠাৎ কয়েকজন নরহত্যা বিলাসী প্রগতির উপাসক লোকটিকে বোমা ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিল। ফলে একটি বিধবা স্ত্রীলোক, তিনটি শিশু সন্তান লইয়া বিধবা শাশুড়ীর সহিত পথে বসিল। সরকার বাহাদুর তাহাদের ৫০ টাকা মাসহারা ও এককালীন ৫০০০ টাকা দিয়া নিজেদের বদান্যতার চূড়ান্ত করিলেন। কিন্তু ৫০০০ টাকা আর কয়দিন থাকে? মাসিক ৫০ টাকার ঘাটতি মিটাইতেই সেই ৫০০০ দুই তিন বৎসরেই উবিয়া যাইবে। নিহত মানুষটিকে দেশের লোক অতিশীঘ্রই ভুলিয়া যাইবে কারণ হত্যাকাণ্ডের পূর্বেও সে ভি, আই, পি, ছিল না যে তাহার দ্বারা দেশের কোন ভালো মন্দ হইত; নিহত হইবার পরেও সে কাহার স্মৃতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রহিল না। শুধু ঐ বিধবা পত্নী ও মাতাই শোকাতুরা থাকিয়া যাইবেন আর অভাবক্লিষ্ট শিশুগুলি বয়স কিছু বাড়িলে মনে ভাবিবে অন্য ছেলে মেয়েদের বাবা আছে আমাদের বাবা কোথায়! অন্যদের বাবা খেলনা দেয় লজঞ্চুস দেয়, চিড়িয়াখানায় বেড়াতে নিয়ে যায়। আমাদের বাবা থাকলে আমরাও যেতে পারতাম। উপরোক্তরূপ পুলিশের প্রহরী হত্যা এখন সংখ্যায় অনেকগুলি হইয়াছে। ফলে দেশের সামাজিক দোষগুণ রীতি-নীতির বা রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয় নাই। জনগণের দারিদ্র্য কমে নাই। শুধু ঐ কয়টা পরিবারের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইয়াছে। পুলিশ এখন প্রত্যাক্রমণ করিয়া হয়ত দোষী নির্দোষী নির্বিচারে যাহার তাহার উপর গুলি চালাইয়া হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়াইতে থাকিবে। বিধবা পত্নী পুত্রহারা মাতা ও ভ্রাতৃহারা ভগিনীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিতে থাকিবে। সমাজ ও জাতি যেখানে ছিল সেইখানেই থাকিয়া যাইবে। শুধু কিছু লোকের মনে লক্ষ্যহীন হিংসা ও অমানুষিকতার অপবিত্র আগুন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়া তাহাদের মনের নিষ্কলঙ্কতাকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে। মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া গুপ্ত ঘাতকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পুরাকালের ঠেঙ্গাড়ে ঠগীদিগের মত নৃশংস হইয়া উঠিবে।

অনেকের মতে উদ্দেশ্য যদি উত্তম হয় তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় নিকৃষ্ট হইলেও দোষ হয় না।

কিন্তু এ কথাটা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে বাজ্জিত ও সকল ব্যতিক্রম অস্বীকার করিয়া সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। সমাজে জনসংখ্যা হ্রাস করা শুভ উদ্দেশ্য তাই বলিয়া সদ্যজাত শিশুদিগকে গলা টিপিয়া মারার ব্যবস্থা প্রচলিত হইতে পারে না। যাহার নিকট খাদ্য আছে তাহার গলা কাটিয়া সেই খাদ্য যাহার প্রয়োজন তাহাকে দিবার কথাও সুরীতি ও সুনীতি বলিয়া কেহ স্বীকার করিবে না। রাষ্ট্র চলিতেছে একভাবে, তাহা অপর পথে চালাইবার শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র সংগত উপায় সকল রাজ কর্ম্মচারীকে হত্যা করা, একথাও উন্মাদের প্রলাপ। বিদ্রোহ বা বিপ্লবের পৌরুষ ও পরাক্রম ব্যঞ্জক শৌর্য্যের পরিচয় ইহার মধ্যে দেখা যায় না। একজন নিরস্ত্র ও সম্ভব নির্দোষ ব্যক্তিকে পাঁচ-ছয়জন ঘিরিয়া ফেলিয়া ছুরি চালাইয়া হত্যা করাও কাপুরুষতার চূড়ান্ত নিদর্শন। এই সকল কার্য্যে যাহারা লিপ্ত থাকে শোনা যায়, তাহারাই পুস্তকাগারের পুস্তক জ্বালাইয়া দিয়া শিক্ষা সংস্কার ব্যবস্থা করে এবং অতীতের মহাপুরুষদিগের মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া সামাজিক আদর্শ নূতন ও উন্নত করিবার আয়োজন করে। এই সকল কার্য্যের সহিত ধর্ম্মান্ধ নিরেট মস্তিষ্ক, মানবতা বিনাশকারী, হত্যা-ধ্বংস ও লুণ্ঠনরত বর্ব্বরদিগের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই জাতীয় মানুষ যতই উচ্চ আদর্শ প্রচার করুক না কেন তাহাদের দ্বারা মানব জাতির কোনও শুভ বা মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

দেশ-বিদেশের কথা

ত্রিপুরার বিপ্লবাত্মক আবহাওয়া

"ত্রিপুরা" সাপ্তাহিকে প্রকাশিত সংবাদ :

আগরতলা ২০শে নভেম্বর। সহরের স্কুলগুলিতে টেষ্ট পরীক্ষা চলিতেছে। কড়া পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে প্রতিটি স্কুলের আশেপাশে। সরকারী স্কুলগুলিতে পরীক্ষা সুরু হয় গত সপ্তাহে এবং বেসরকারী স্কুলগুলিতে সুরু হয় এই সপ্তাহে ২৩শে নভেম্বর হ'তে। প্রগতি বিদ্যাভবনে পরীক্ষা হইতেছে না পরীক্ষার দুই দিন আগে ঐ স্কুলের বোর্ডিং সহ স্কুল অফিস গৃহ দুর্বৃত্ত দ্বারা আগুনে ছাই হইয়াছে প্রশ্নপত্র পোড়া যাওয়ায় পরীক্ষা স্থগিত আছে। ২৩শে নভেম্বর পরীক্ষা আরম্ভের সূচনাতে রামঠাকুর স্কুলে বালক বিভাগে হামলা চলে। পুলিশ আসে। সুরু হয় সংঘর্ষ। একদিকে বোমা ইট পাটকেল অন্যদিকে টিয়ার গ্যাস ও লাঠি চার্জ। উভয়পক্ষে পনর বিশজন আহত হয়। পুলিশ ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। এই ব্যপারে সমবেদনা ও সহানুভূতি সূচক ধর্মঘট বা বিক্ষোভ মিছিল হয় নাই। রামঠাকুর স্কুলের বালিকা বিভাগে যথারীতি পরীক্ষা চলিতেছে। এই সময় মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলে পরীক্ষা হলে একটি পটকা ফাটে। পুলিশকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয় না। বলা হয় যে বাহির হইতে উহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলিয়া শিক্ষক ও ছাত্রগণ পরীক্ষা বন্ধ করেন। অবশ্য পরদিন যথারীতি পরীক্ষা হইয়াছে। বোধজং স্কুলেও সেদিন পরীক্ষার হলের অভ্যন্তরে পরীক্ষা চলাকালে একটি বোমা ফাটে উহাতে একজন শিক্ষক আহত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন।

শ্রীআবদুল হামিদ চৌধুরী গ্রেপ্তার

করিমগঞ্জ (আসাম) হইতে প্রকাশিত "যুগশক্তি" সাপ্তাহিক প্রকাশ :

গত ২৩শে নভেম্বর ভোরবেলা করিমগঞ্জে বিশিষ্ট নাগরিক ও জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সহ সভাপতি শ্রী আবদুল হামিদ চৌধুরীকে পুলিশ প্রতারণা ও অন্যান্য অভিযোগে (৪২০, ৪৬৮, ৪৭১ ধারায়) গ্রেপ্তার করিয়াছেন। শিলচর পুলিশ ষ্টেশনে রাজ্য সরকারের ফাইনান্স সেক্রেটারীর পক্ষে দায়ের করা একটি অভিযোগের ভিত্তিতে উক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, পুরাতন রাইস সিণ্ডিকেটের প্রাপ্য প্রায় দেড়লক্ষ টাকা শ্রীচৌধুরী একটা ভুয়া 'পাওয়ার অব এটর্নি'র প্রত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করিয়া আসাম সরকারের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে এই লেনদেন হয়। শ্রীচৌধুরীকে করিমগঞ্জ কোর্টে হাজির করা হইলে তাহার জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য হয় এবং তাহাকে শিলচর স্থানান্তরিত করা হয়।

আকস্মিক এই গ্রেপ্তারের সংবাদে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

আসামে বুলগেরিয়ার সহায়তায় শিল্প প্রতিষ্ঠান

"যুগশক্তি"তে (আসাম, করিমগঞ্জ) আরও প্রকাশ যেঃ

আসামের শিল্পমন্ত্রী শ্রীবিশ্বদেব শর্মা বিগত ১১ই নভেম্বর রাজ্য বিধান সভায় ঘোষণা করেন যে, রাজ্য সরকার কাছাড়ে একটা চিনির কল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সম্পর্কে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে। প্রস্তাবিত মিলটির জন্য আড়াই কোটী টাকা ব্যয় করা হইবে।

শিল্পমন্ত্রী আরও জানান যে, কাছাড়ে পাবলিক সেক্টারে একটা ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র শীঘ্রই বুলগেরিয়ার সহযোগিতায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থাপন করা হইবে। বুলগেরিয়া হইতে বিশেষজ্ঞ দল স্থান নির্ণয়ের জন্য এই মাসের শেষ সপ্তাহে কাছাড়ে আসিবেন। এছাড়া ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাছাড়ে একটা ডেকরেটিভ প্লাইউড ফ্যাক্টরীও স্থাপন করা হইবে। সরকার হইতে এই ফ্যাক্টরীর জন্য কাঠ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীশর্মা বলেন, আপাততঃ কাছাড়ে এই তিনটী শিল্প স্থাপন করা হইবে।

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭০তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৭৭

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভোটে প্রতারণা

যতবার নির্বাচন হইতেছে ততবারই দেখা যাইতেছে যে ভোটে প্রতারণা ক্রমশঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। প্রথম প্রতারণা হইল মৃত অসুস্থ ও ভোট কেন্দ্রে অনুপস্থিত ব্যক্তিদিগের ভোট অপর ব্যক্তির দ্বারা দিবার আয়োজন করা। কোন কোন রাষ্ট্রীয় দলের স্থানীয় মাতব্বরগণ এই কার্য্যে বিশেষ প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই মৃত ব্যক্তিদিগের তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখেন এবং ভোট দিবার দিন অবধি কে অসুস্থ বা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে সে সকল খবরও উত্তমরূপে রাখার ব্যবস্থা করেন। ভোটের দিন দুই তিন দলের প্রতারকদিগের মধ্যে একটা প্রতিযোগীতা লাগিয়া যায় যে কাহারা সর্ব্বাগ্রে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছিয়া চোরাই ভোট দিয়া আসিতে সক্ষম হইবে। ধরা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষের মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যু অসুস্থতা ও অনুপস্থিতির অনুপাত হিসাবে এই জাতীয় চোরাই ভোট হইতে পারে শতকরা কুড়িটি অবধি। কতগুলি পড়ে তাহা স্থান কাল বিচারে শতকরা ১০ হইতে ১৫টি ধরা যাইতে পারে। যেখানে লক্ষ লক্ষ ভোটদাতা আছে সেখানে প্রতি লক্ষে ১০।১৫ হাজার মিথ্যা ভোটদাতার উপস্থিতি প্রার্থীদিগের জয় পরাজয়ের একটা প্রবল ও কার্য্যকর নির্ণায়ক হইয়া দাঁড়ায়। শুধু যে যাহারা কোন কারণে অনুপস্থিত তাহাদেরই ভোট লইয়া জুয়াচুরী করা হয় তাহাই নহে। যাহারা সশরীরে বর্ত্তমান আছে তাহাদের ভোটও অনেক সময় অন্যলোকে আগে আগে ভোটকেন্দ্রে গিয়া দিয়া আইসে। এইরূপ মিথ্যা

ভোটের সংখ্যাও কিছু কম নহে। লক্ষে ১।।/২ হাজার হইবে। অতঃপর দেখা যাউক এই মিথ্যা ও প্ররোচণার খেলা উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই শেষ হয় কি না। অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে উহা অপেক্ষাও গুরুতর অপকর্ম ভোটের জন্ত রাষ্ট্রীয় দলের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতারকগণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিজেদের সৃজন করা ভোটদাতার সংখ্যাও যথেষ্ট আছে। অর্থাৎ ভোটের সময় যাহাতে বহু কাল্পনিক মানুষ ভোটের অধিকারী হইয়া ভোট বাড়াইতে পারে তাহার ব্যবস্থা এই সকল প্ররোচকশ্রেষ্ঠ দুর্নীতিবিদগণ বহু পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখেন। "আমার নাম ভোট তালিকাভুক্ত করা হউক" বলিয়া যে সকল ব্যক্তি আবেদন পেশ করেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই কোনও অস্তিত্ব আছে কি নাই তাহা অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে। আমরা বহুকাল হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে ভারতে সকল ব্যক্তির চিত্র সম্বলিত পরিচয়—পত্র (card of identity with Photograph) একটা মহা প্রয়োজনীয় ও সুনিয়ন্ত্রিত শাসন পদ্ধতির অঙ্গ বলিয়া ধার্য্য হওয়া আবশ্যক। ইহা না থাকাতে চোর ডাকাইত ও অন্যান্ত অপরাধীগণ আত্মগোপন করিয়া যত্রতত্র বিচরণ সক্ষম হয়। জেল ফেরত মানুষ চাকুরী যোগাড় করিয়া লোকের গৃহে বিশ্বাসী ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। পরে ঐ সকল ব্যক্তি নিয়োগ কর্তার সর্ব্বস্ব অপহরণ অথবা তাহার প্রাণনাশ করিয়াও অন্তর্হৃত হইতে পারে। ভারতীয় গভর্নমেন্ট এই পরিচয়-পত্র রীতি প্রবর্ত্তিত না করিয়া নিজেদের একটা অতি বৃহৎ কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া দেশবাসীর মহা অমঙ্গলের সৃষ্টি করিতেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দলের পাণ্ডা ও চোর ডাকাইতদিগের বন্ধুগণ এই ব্যবস্থা যাহাতে না হয় ভিতর হইতে সেই চেষ্টাই করিয়া চলিতে থাকেন ও ফলে ভারত সভ্য জগতের এই অতি আবশ্যকীয় ব্যবস্থা না করিয়া অপরাধীর বন্ধুত্বের চূড়ান্ত করিতেছেন। এই ব্যবস্থা এখনও যদি বাধ্যতা-মূলক করা হয় তাহা হইলে শীঘ্রই দেখা যাইবে যে ফাঁকি, প্রতারণা, চুরী ডাকাইতি, নরহত্যা ও অন্যান্ত অপরাধ বিশেষ ভাবে হ্রাস হইতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু সমাজের মঙ্গল যাহাতে হয় সেরূপ কার্য্য ভারত সরকার অল্পই করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। শুধু সমাজ-তন্ত্রের নাম লইয়া সরকারী মহারথী, মন্ত্রী ও আমলাদিগের স্বৈরাচার বর্দ্ধনই প্রবল শক্তিতে প্রচলিত হয়। পৃথিবীর সকল সভ্যদেশে সমাজ ব্যক্তিকে যে সকল ব্যবস্থা করিয়া রক্ষা ও সাহায্য করিয়া থাকে ভারতে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। নিজেদের চেষ্টায় কোন আর্থিক উন্নতিকর কার্য্য করিবার ক্ষমতা না থাকায়, সমাজের নাম করিয়া লাভজনক ব্যক্তিগত ব্যবসাগুলিকে সরকারের হস্তগত করিয়া লওয়ার ব্যবস্থাকেই ভারত সরকার সমষ্টিবাদ বা সমাজতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন। ফলে অনেক ব্যবসায়ই সরকারী আমলাদিগের হস্তে লাভের পরিবর্ত্তে লোকসান দেখাইতে আরম্ভ করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। যে সকল ব্যাঙ্ক "জাতীয়" করিয়া লওয়া হইয়াছে, সেগুলিরও শুনা যায় যে ক্ষতির খাতায় নাম উঠিয়াছে।

বর্ত্তমানে ভোটের জুয়াচুরী বন্ধ করার জন্ত ভারত সরকার কি ব্যবস্থা করেন তাহা দ্বারা বুঝা যাইবে যে তাঁহাদের সমাজবাদের কোনও নৈতিক অবয়ব গঠিত হইতেছে কি না। "কার্ড অফ আইডেন্টিটি" করা কঠিন নহে। এই ভোটের হিড়িকের পূর্ব্বেই অন্ততঃ তাহার আরম্ভ হওয়া অতি আবশ্যক বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

রুশিয়ার সাদা, কালো ও লালবাজার

রুশিয়া সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেই শুনিব যে কথাগুলি রুশের বিরুদ্ধতাজাত অপপ্রচার। কিন্তু তাহার উত্তরে বলা যায় যে রুশসরকার নিজেদের জনহিতকর কার্য্যকলাপের যে তালিকা প্রকাশ করেন তাহাও সত্য নহে শুধু "প্রপাগ্যাণ্ডা" বা নিজেদের প্রচিন্ত আত্মপ্রশংসা মাত্র। কিন্তু যাহারা রুশিয়াতে বাসাস্থান করেন তাঁহারা তদ্দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলেন

তাহার মধ্যে সত্যমিথ্যা মিশ্রিত তথ্য পাওয়াই স্বাভাবিক। সকল ভ্রমণকারীই কিছু রুশশত্রু অথবা রুশবন্ধু নহেন। এবং আজকাল বহু লোকই ঐ দেশে যাইবার সুবিধা পাইয়া থাকেন ও নানা কথা বলিয়াও থাকেন, শুনা যায় যে রুশ দেশে যাহাদের রোজগার মাসিক ২০০।৩০০ শত রুবল (১৬৬৬।২৪৯৯ টাকা) তাহাদের জীবন যাত্রা নির্ভর করে সরকার নিয়ন্ত্রিত দোকান হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে আবশ্যকীয় খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিয়া। এই সকল দোকানকে সকলে সরকারী সাদা বাজার বলিয়া থাকে এবং এখানে সখের জিনিষ বা বিলাসের উপাদান কিছু পাওয়া যায় না। রুশ দেশে কোন কোন কর্মীদের বেতন মাসিক ৪০০।৮০০ টাকাও আছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প নহে এবং ইহারা সাদা বাজারে কেনা মোটা খাদ্যবস্ত্র দিয়াই দিন গুজরান করে। রুশিয়ার জনসাধারণের বাৎসরিক মাথা পিছু আয় এক হাজার রুবল অথবা মাসিক প্রায় ৮৪ রুবল (৭০০ টাকা) ঐ দেশে এক জোড়া ভালো জুতার দাম প্রায় ৭০০ টাকা। রুশিয়ার তৈয়ারী সাধারণ জুতাও প্রায় ৪০০ শত টাকা জোড়া। কালো বাজারে মাংসের দাম ৪০।৪৫ টাকা কিলো এবং একটা পাতি লেবুর মূল্য ৪ টাকার অধিক। সুতরাং যেখানে মানুষের বেতন, অধিকাংশের, মাসিক ১০০০ টাকার কম সেখানে জীবন যাত্রা ভোগের দিক দিয়া বড়ই কঠিন মনে হয়। সাদা ও কালো বাজার ব্যতীত আর একটা বাজার আছে যেখানে সর্ব্ব প্রকারের ভোগের ও বিলাসের উপকরণ পাওয়া যায় কিন্তু এই বাজারে রুশিয়ার রুবল দিয়া ক্রয় বিক্রয় হয় না। এখানে চলে আমেরিকান ডলার এবং এইখানে যাহারা যায় তাহারা লেখক, চিত্রকর, গায়ক, নৃত্যকলাবিদ, বৈজ্ঞানিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারী বা আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য ও সম্বন্ধ স্থাপনের সহিত সংযুক্ত। ইহাদের নিকট বিদেশী মুদ্রা থাকে ও ইহারাই লাল বাজারের দুষ্প্রাপ্য মালমশলা বিদেশী মুদ্রা দিয়া ক্রয় করে। রুশিয়ার মানুষ সাদা, কালো ও লাল বাজারের জন্য কোনও লজ্জা অনুভব করে না এবং রুশিয় সরকারও এই রকমারী কেনাবেচার আয়োজন নিবারণ চেষ্টা করেন না।

অর্থাৎ সাম্য বলিয়া রুশিয়ার কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। শতকরা ৯৫ জন উপার্জ্জকের আয় মাসিক ১০০ শত রুবলের নিচে। এই উপার্জ্জনের টাকায় কোন রকমে কায়ক্লেশে তাহারা জীবন কাটায়। কিন্তু উপরওয়ালা যাহারা আছে ও যাহাদের সংখ্যা এক কোটির অধিক তাহারা থাকে অন্য ভাবে। বলিলে বলা হয় তাহারা রুশিয়ার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দুগ্ধধর বা খাম্বা এবং তাহাদের সহিতই বাহিরের লোক মেলামেশা করে। সুতরাং তাহারা যদি সাজগোজ খানাপিনা, আসবাব যান বাহন ভৃত্য প্রভৃতি না করিতে ও রাখিতে পারে তাহা হইলে রুশিয়ার মুখরক্ষা করা কঠিন হয়। সাধারণের জন্য সমাজতন্ত্র ও সমষ্টিবাদ। বিশিষ্টজনের অপর ব্যবস্থা। শ্রীমতী ইন্দিরার সমাজবাদের নক্সা রুশিয়ার রং-এই চিত্রিত হইতেছে মনে হয়।

নির্ব্বাচনে প্রার্থীদিগের মনোভাব

যাঁহারা নির্ব্বাচনে প্রার্থীরূপে জন সাধারণের নিকট ভোট ভিক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের অন্তরের আকাঙ্খা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সকলের মনে নির্ব্বাচিত হইবার উদ্দেশ্য এক প্রকার নহে। কেহ রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাজশক্তি পাইবার চেষ্টা করেন দেশবাসীর মঙ্গল সাধন করিবার আগ্রহ হইতে, কেহ চাহেন নিজের শক্তিবৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত লাভের আশায়, কেহবা নিজ রাষ্ট্রীয় দলের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, অপর আরও কেহ স্বদেশী বা বিদেশী প্ররোচক গোষ্ঠীর অর্থপুষ্ট হইয়া দায়িত্ব পূর্ণ করিবার বাধ্যতামূলক আবেগের ফলে। যাঁহারা দেশবাসীর মঙ্গলসাধন প্রচেষ্ট তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। কারণ বর্ত্তমান যুগে নির্ব্বাচনে উপস্থিত হওয়ার জন্য বহু অর্থের ও জনবলের প্রয়োজন হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে সেই ব্যয়ভার বহন করা অথবা লোক সংগ্রহ করা অত্র

লোকের পক্ষেই সম্ভব হয়। অধিকাংশ প্রার্থীই এই কারণে রাষ্ট্রীয় দলগুলির সহায়তা সন্ধানে ধাবিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকেন এবং রাষ্ট্রীয় দলগুলিও বহুসংখ্যক প্রার্থীর নির্বাচনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে ইতঃস্তত ঘুরিয়া ফিরিতে আরম্ভ করেন। দেশের নানা ব্যক্তিগোষ্ঠী আছে যাহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের পাণ্ডাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে ব্যবসায়ীগণই অধিক লক্ষিত হয়। রাষ্ট্রক্ষেত্রে শক্তি লাভ করিতে পারিলে ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্য করিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া রাষ্ট্রনেতাগণ ব্যবসায়ী-দিগের নিকট অর্থ সাহায্য লইয়া থাকে। যে সকল প্রার্থী এই কথা জানিয়াও রাষ্ট্রীয় দলের সহিত হাত-মিলাইতে অগ্রসর হইতে লজ্জা অনুভব করেন না তাহাদের সংখ্যা অল্প নহে। ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি যাহারা দিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন "আদর্শ"বাদের অনুসরণকারী দিগকেই দেখা যায়। অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে কোন কম্যুনিষ্ট প্রার্থী কোনও কনট্রাক্টর অথবা আড়তদারের নিকট আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিতেছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকিবে না। নিরামিশ ভোজন বিশ্বাসী অহিংস ব্যবসাদার যেরূপ গোচর্ম বিক্রয়লব্ধ অর্থে অহিংসা ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করে; কম্যুনিষ্ট প্রার্থীগণও তেমনি শোষিত মানুষের রক্ত সিঞ্চিত ক্ষেত্রের ফসল হইতে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। নিজ স্বার্থ অথবা নিজ দলের স্বার্থ এতই প্রবল ভাবাবেশ ও আগ্রহাতিশয্যের সৃষ্টি করে যে তাহার জন্য মানুষ সকল ন্যায় অন্যায় বোধ রহিত হইয়া সুবিধার পথে চলিতে সদাই প্রস্তুত থাকে। স্বদেশের ব্যবসাদার অথবা লুঠেরাদিগের নিকট অর্থ লওয়া ততটা ঘৃণ্য কার্য্য নহে যতটা ঘৃণ্য ও কলুষকালিমালিপ্ত কার্য্য বিদেশীর প্ররোচনায় দেশদ্রোহিতা করিতে প্রস্তুত হওয়া। বহু রাষ্ট্রক্ষেত্রের নির্ব্বাচন প্রার্থী রুশিয়া, চীন, আমেরিকা অথবা পাকিস্তানের দাতব্যলব্ধ অর্থে ভারতে রাষ্ট্রীয় শক্তি আহরণের জন্য নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ইহাদের উদ্দেশ্য থাকে বিদেশীর কথামত কার্য্য করিয়া ভারতে বিদেশীর শক্তিবৃদ্ধি করা। যে সকল রাষ্ট্রীয় দল বিদেশীর অর্থে পুষ্ট ও বিদেশীর সহিত সংশ্লিষ্ট সেই সকল দলের দেশদ্রোহিতা অতি সুস্পষ্টভাবে সর্ব্বজনবিদিত। ভারতবাসী জনসাধারণের মধ্যে কেহ কেহ আছে যাহারা দেশদ্রোহিতার এক অভিনব রাষ্ট্র-রসআস্বাদনে সক্ষম হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ও রসঅনুভূতিজাত রুচির ক্ষেত্রে এই মানসিক অবস্থা ঠিক মানবীয় নহে। ইহা বিশ্লেষণে আত্মঘাত ইচ্ছার সহিত তুলনীয় ও এই মনোভাব আক্রান্ত ব্যক্তিগণ শেষ অবধি কোন আদর্শ অবলম্বন করিয়াই চলিতে সক্ষম হয় না। কারণ, মানুষের আত্মবোধ যে ভাবেই বাহ্য জগতে প্রতিকস্বরূপ ধারণ করুক না কেন; মানুষ আত্মহত্যাকাংখী হইলে সে নিজের নবলব্ধ স্বরূপেরও বিনাশ চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং দেশদ্রোহি মানুষের উপর তাহার নিয়োগকর্ত্তাও নির্ভর করিতে পারে না; কারণ ঐরূপ মানুষ কোনও ভাবেই কোনও বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে না। স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর মঙ্গল ও উন্নতি যাহারা চাহে, শেষ অবধি তাহাদেরই উপর সর্ব্বসাধারণ নির্ভর করিতে পারে।

মৃত্যুভয়

সকলেই জানেন যে জন্মিলেই কোনও না কোন সময়ে মানুষের মৃত্যু হয়। মৃত্যু নানা ভাবে হইতে পারে। আকস্মিক কারণে বহুলোকের মৃত্যু হইয়া থাকে এবং অনেকের স্বাভাবিক বার্দ্ধক্য হইতেও মৃত্যু হয়। কোন কোন অবস্থায় মৃত্যুর সম্ভাবনা অধিক থাকিতে দেখা যায় এবং অপর অবস্থায় সে সম্ভাবনা অল্প থাকে। কোনও কোন কার্য্য মানুষ বিপদজনক বলিয়া মনে করে এবং ধরিয়া লয় যে সেই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে মানুষের মৃত্যু সম্ভাবনা অধিক হয়। কিন্তু সত্য সত্যই তাহা হয় বলিয়া মনে হয় না। কারণ বিমান পরিচালক, মোটর বা রেলগাড়ী চালক, নাবিক,

খনির কর্মী, কারখানায় শ্রমিক, ডাক্তার ও সেবিকা, সৈন্ত প্রভৃতি নানা কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের যে মৃত্যু সম্ভাবনা অধিক থাকে; একথা অনুমান করিয়া বলা হইলেও যথাযথভাবে এইরূপ ধারণার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মানুষের বিভিন্ন রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর সম্ভাবনাই মনে হয় সর্বাধিক। ক্যানসার, যক্ষা, হৃদরোগ প্রভৃতিতে মানুষ যত অধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার তুলনায় যুদ্ধে, বিমান দুর্ঘটনায়, পথ চলিবার দুর্ঘটনায় বা কারখানায় কর্মে নিযুক্ত অবস্থায় মৃত্যু তত অধিক হয় না। ভারতবর্ষে প্রায় এক কোটি মানুষের যক্ষারোগ আছে বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে শতকরা নব্বই জনেরই মৃত্যু সম্ভাবনা নাই; কিন্তু বাকি যাহারা তাহাদের মধ্যে এক দশমাংশের মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ যক্ষায় মৃত্যু সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে বৎসরে এক লক্ষ লোকের হইতে পারে। ক্যানসারে ও হৃদরোগে মৃত্যুও ঐ তুলনায় অল্প লোকের হয় না। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষে প্রত্যহ কয়েক সহস্র ব্যক্তির ঐ সকল রোগে মৃত্যু হয়।

যাহারা ভাবে যে মানুষকে মৃত্যুভয় দেখাইলে মানুষ প্রাণভয়ে তাহাদের সহিত এক মত হইয়া যাইবে তাহাদের বুঝা উচিত যে তাহারা এত অধিক মানুষকে হত্যা করিতে কখনও সক্ষম হইবে না যাহাতে রোগ বা বার্দ্ধক্য জনিত মৃত্যুর তুলনায় গুলি, বোমা বা ছুরিকাঘাতের মৃত্যু অধিক হইয়া মানুষকে ভীতত্রস্ত করিয়া তুলিবে। নরহত্যা অধিক হইলে যুদ্ধের অবস্থার সৃষ্টি হয়। একটা মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হইলেও যুদ্ধ কখনও মৃত্যুভয় হইতে থামিয়া যায় না। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে কয়েক কোটি মানুষ মরিবার পরে অন্নাভাব ও সৈন্ত সংখ্যা হ্রাস হইবার ফলে যুদ্ধ থামিয়া যায়। মৃত্যুভয় হইতে কোনও দলই আত্ম সমর্পন করে নাই। সুতরাং ছুরিকাঘাতে কয়েক সহস্র ব্যক্তিকে হত্যা করিলেও তাহাতে ভারতীয় মহাজাতি মাওৎসে তুঙের নিকট আত্মসমর্পন করিবে বলিয়া মনে করার কোন কারণ দেখা যায় না। পরন্তু সম্ভাবনা এইরূপই যে উভয় পক্ষের লোকেই (হত্যাকারী ও জনসাধারণ) প্রবলতর ভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করিবে এবং সংখ্যায় জনসাধারণ অধিক বলিয়া হত্যাকারীদিগেরই পরাজয় হইবে। ১৯৪৬।৪৭ খৃঃ অব্দে মুসলীম লীগের গুণ্ডাদিগের আক্রমণে কলিকাতায় বহুলোকের প্রাণ গিয়াছিল কিন্তু তাহাতে নগরবাসী এই সকল ব্যক্তির নিকট আত্মসমর্পন করে নাই। প্রত্যাক্রমণে শেষ অবধি মহাত্মা গান্ধী আসিয়া শান্তি স্থাপন না করিলে গুণ্ডা দলেরই চরম পরিণতি হইত। এখন যাহা হইতেছে তাহার ফলও শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। সুতরাং সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই উচিত এই নরহত্যার লীলার অবসান চেষ্টা করা। মৃত্যুভয় মানুষকে তাহার স্বাভাবিক জীবন যাত্রা, ধর্ম, বিশ্বাস প্রভৃতি সহজে ত্যাগ করাইয়া নুতন পথে, নুতন স্থানে বা নুতন মতবাদে চলিয়া যাইতে বাধ্য করে না। দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার অথবা পরিবারের নারীদিগের অবমাননার ভয়ে মানুষ দেশত্যাগ করে কিন্তু অপরভাবে নিজ মনের অবলম্বন ছাড়িয়া দেয় না। কয়েক লক্ষ মানুষ বন্যায় প্রাণ হারাইলে অথবা অগ্ন্যুৎপাতে গৃহ হারা হইলেও মানুষ সমুদ্রতট বা আগ্নেয়গিরির সানুদেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায় না। সুতরাং মৃত্যুভয় দেখাইয়া মানুষকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করান যায় না। ইহা ব্যতীত বলা যায় যে ধর্মান্ধতা যে জাতীয় অল্পবুদ্ধি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের যেরূপ মানবতা বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে উত্তেজিত করিতে পারে; সেইরূপ অন্ধবিশ্বাস ও যুক্তিতর্ক বিরুদ্ধ মতবাদের বশ্যতা স্বীকার শিক্ষিত ও প্রগতিশীল যুবকদিগের করা উচিত নহে। নির্বিরোধী নির্দোষ মানুষকে নির্দয় ভাবে হত্যা করিয়া, স্কুল কলেজ ধ্বংশ করিয়া কখনও কোন মানবউন্নতিকর আদর্শসিদ্ধি হইতে পারে না। বিপ্লব বলিতেও কেহ নিরীহ মানুষকে হত্যা করা বুঝে না। এইসকল কারণে জাতীয় কলঙ্ক, চূড়ান্ত অবনতিকর ও সর্বনাশের কারণ এই ঘোর নিষ্ঠুরতার শেষ যথাশীঘ্র হওয়া

আবশ্যক। এইরূপ মহাপাতকের তাণ্ডব নৃত্য ভারতের ইতিহাসে অল্পই হইয়াছে। যাহারা এইরূপ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে তাহারা বিচার করিতে পারে যে ইতিহাসে কোন না কোন সময়ে মানুষ মানুষকে হিংস্র পশু দিয়া খাওয়াইয়াছে, পুড়াইয়া মারিয়াছে এবং আরও অন্য নানা প্রকার অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে। এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই আদর্শের দোহাই দিয়া সেই সকল চরম বর্ব্বরতা করা হইয়াছে। সুতরাং আদর্শ দেখাইয়া মহাপাপকে পুণ্য প্রমাণ করার চেষ্টা এই নূতন হইতেছে না। জন সংখ্যা হ্রাস করিবার শুভ উদ্দেশ্যে কেহ শিশু হত্যার প্রচলন করিতে পারে না। বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া রোগশান্তি চেষ্টাও গ্রাহ্য হইতে পারে না।

গরীবের শীত বস্ত্র

উত্তর ভারতে এই বৎসর শীতের প্রকোপ বিশেষ প্রবল ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলে অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার কারণ দারিদ্র্য ও উপযুক্ত গৃহ ও শীত বস্ত্রের অভাব। যাহারা প্রাণ হারায় নাই কিন্তু নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াছে তাহাদের সংখ্যা দুই তিন কোটির কম হইবে না। ভারত সরকার প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা কোন সময় ভারতের গৃহহীন গরীবদিগের জন্য বহু লক্ষ গৃহ নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; কিন্তু সে গৃহ নির্ম্মান কোথাও আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। যে সকল বাসস্থান পুরাতন হইয়া বাসের অযোগ্য হইয়া যায় সেগুলির মেরামত অথবা পরিবর্ত্তে অপর গৃহ নির্ম্মাণও হয় বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য গৃহ নির্ম্মাণ সহজ কার্য্য নহে। ভারতবর্ষে ৫।৬ লক্ষ গ্রাম আছে। গ্রামে গ্রামে ৫।১০টি কুটির নির্ম্মাণ করিতে হইলেই ২৫ হইতে ৫০ লক্ষ কুটির প্রয়োজন হইবে। ২৫ লক্ষ কুটির নির্ম্মাণ করিতে ন্যূন পক্ষে ২৫০।৩০০ কোটি টাকা লাগিয়া যাইবে। উত্তমরূপে নির্ম্মিত পাকাগৃহ হইলে ঐ কার্য্যে ২০০০।৩০০০ হাজার কোটি টাকা লাগিতে পারে। ভারত সরকারের রীতি অনুযায়ী আদর্শে গৃহ নির্ম্মান করিলে ব্যয় কম হইবে মনে হয় না। সুতরাং গৃহ নির্ম্মান করা বর্ত্তমানে হইবে না ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে কি ভারতের দরিদ্র মানুষ শীতে কাঁপিয়া মরিবে এবং আমরা সমাজবাদ আওড়াইয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? ভারত সরকার অন্ততঃ প্রতি বৎসর একান্ত গরীবদিগকে ৫০ লক্ষ লেপ কম্বল বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহাতে ৫।১০ কোটি টাকার অধিক ব্যয় হইবে না এবং মানুষের কষ্টের লাঘব হইবে। অনেকের প্রাণও বাঁচিবে। দরিদ্রদিগকে শীতবস্ত্র দান পুণ্য কার্য্য বলিয়া ভারতে সর্ব্বত্র স্বীকৃত এবং এই ব্যবস্থা করিলে ভারত সরকারের সুনাম হইবে। ভারত সরকার যাহাদের কিছু পয়সা আছে তাহাদের নিকট অতি বর্দ্ধিত হারে রাজস্ব আদায় করিয়া তাহাদের নিঃসম্বল করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং তাহারা আর গরীবের শীতবস্ত্র দিবার ক্ষমতা রাখেনা। সরকার অতিরিক্ত রাজস্ব যাহা আদায় করিতেছেন তাহার কিছু অংশ দরিদ্র্য সেবায় নিয়োগ করিলে মন্দ হয় না।

বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর পি, সি, সরকারের মৃত্যু

জাপানে হৃদরোগাক্রান্ত হইয়া বিখ্যাত যাদুবিদ্যাবিদ্ পি, সি, সরকারের অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়স মৃত্যুকালে মাত্র ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। বিশ্বের যাদুকরদিগের মধ্যে পি, সি, সরকারের স্থান সর্ব্বোচ্চে ছিল এবং তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ভারত তথা পৃথিবীর একজন গুণী ও কর্ম্মকৌশলী ব্যক্তির আসন খালি হইয়া যাইল। এই অভাব সহজে দূর করা সম্ভব হইবে না।

পি, সি, সরকার ১৯১৩ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান পূর্ব্ব পাকিস্থানের টাঙ্গাইল সহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৯ খৃঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন ও পরে অঙ্কশাস্ত্রে সম্মানেরপর্য্যায়ে পরীক্ষা দিয়া বি,এ, উপাধী প্রাপ্ত হ'ন। ১৯৩০ খৃঃ অব্দে তিনি যাদুবিদ্যায় প্রথম খ্যাতি অর্জ্জন

করেন ও সেই সময় হইতেই যাদুকরের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। তাঁহার নাম শীঘ্রই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে ও তিনি নানা দেশ হইতে যাদু দেখাইবার জন্য আমন্ত্রিত হইতে থাকেন। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেই তিনি ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, মালয়, চীন ও জাপানে আহূত হইয়াছিলেন। ১৯৩৮ খৃঃ অব্দে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান আছেন। তিনি য়ুরোপের প্রায় সকল দেশেই এবং আমেরিকায় যাদুকার্য্য প্রদর্শনের জন্য বহুবার গিয়াছেন ও তাঁহার খ্যাতি ও সম্মান সর্ব্বত্রই বিশেষ ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহাকে বহুদেশেই নানাভাবে সম্মানিত করা হইয়াছিল কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সাদাসিধা ও সরল প্রকৃতির মানুষই থাকিয়া যান। খ্যাতি বা ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে কোন গর্ব্ব বা অহংকার দোষদুষ্ট করে নাই। তিনি যে সকল ক্রীড়া দেখাইতেন তাহার মধ্যে অনেকগুলিই অপর কোন যাদুকর তাঁহার মত দেখাইতে সক্ষম হ'ন নাই। তিনি অনেকগুলি যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তকও প্রকাশিত করিয়াছিলেন ও এই সকল পুস্তক ইংরেজী, বাংলা, ও হিন্দীতে লিখিত হইয়াছিল। তিনি চোখ বাঁধিয়া কলিকাতা, নিউ ইয়র্ক ও প্যারীসের রাজপথে সাইকেল চড়িয়া ভ্রমণ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। এই জন্য লোকে তাঁহাকে ম্যান উইথ দি এক্সরে আই বা এক্সরে চক্ষু সম্পন্ন মানুষ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিল। তিনি চোখ বাঁধিয়া একটা ব্ল্যাক বোর্ডে যে কোন ভাষায় যাহা লেখা হইত তাহা পড়িয়া নিজ হস্তে তাহা লিখিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার শক্তি অত্যাশ্চর্য্য ও মহা বিস্ময়কর ছিল।

বেকার সমস্যার সমাধান

সমাজতন্ত্র বা সমষ্টিবাদ মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ চেষ্টায় ও নিজ বুদ্ধি ব্যবহার করিয়া জীবন পথের বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সফলতায় পৌঁছাইতে শিখায় না। সমাজের কর্ত্তা অর্থাৎ রাষ্ট্রনেতা সরকারী আমলা প্রভৃতি রথী মহারথীগনের নির্দ্দেশ ও ভাগবাটের উপরে সকল ব্যক্তির সকল বিষয়ের সকল ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হয়। সেই জন্য যেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যত প্রবল সেখানে শাসক গোষ্ঠীর কর্ম্মক্ষমতা তত অধিক ফলপ্রসূ হওয়া আবশ্যক। নিয়ন্ত্রণ জোরাল অথচ নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠীর কর্ম্মকর্ত্তাগণ অল্পবুদ্ধি অকর্ম্মণ্য, অলস ও কর্ত্তব্যবোধহীন হইলে সেইরূপ সমাজবাদ বা সোসিয়ালিজম জনসাধারণের পক্ষে অতি মারাত্মকরূপ ধারণ করে। পৃথিবীর প্রায় সকল সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রে যে সাধারণ মানুষের অবস্থা ততটা সুবিধার নহে তাহার কারণ সমষ্টিবাদী মহলের আমির ওমরাহ উজির নাজির প্রভৃতিদিগের কর্ম্মশক্তির অভাব। যে সকল রাষ্ট্রে সমষ্টিবাদ নাই কিন্তু ব্যক্তিগত কর্ম্মশক্তি, কর্ম্মকৌশল কর্ত্তব্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান ও সুনীতি অনুসরণ স্পৃহা পূর্ণমাত্রায় আছে, সেই সকল রাষ্ট্রে'র মানুষ সহজেই নিজ চেষ্টায় ও নিজ কর্ম্মক্ষমতা ব্যবহারে জীবন যাত্রার সকল ব্যবস্থাই করিয়া লইতে সক্ষম হয়। কিন্তু যে সকল রাষ্ট্রে পরহিতব্রত পালন বাধ্যতামূলক অথচ কর্ম্মভার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নিজ কর্ত্তব্য করিতে অপারগ ও অনিচ্ছুক, সেই সকল রাষ্ট্রের সাধারণ ব্যক্তিগণ অসহায় ও নিরাশ্রয়ভাবে জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়। অতএব সর্ব্বদেশে সকল অবস্থায় রাষ্ট্র কাহার জন্য কি করিয়া দিবে তাহার অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজ চেষ্টায় কি করা যায় তাহাই দেখা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে কোন রাজ কর্ম্মচারী অথবা রাষ্ট্রীয় বিভাগ কাহারও জন্য কিছু করিয়া দিবে ইহা বিশ্বাস না করিয়া নিজ চেষ্টায় যাহা সকল কিছু করিয়া লওয়াই সাফল্য আহরণের একমাত্র উপায়।

যে দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই পরিমাণে অল্পই উৎপাদিত হয় সে দেশে যে কোন অবশ্য ব্যবহার্য্য বস্তু উৎপাদন করিলেই একটা উপার্জ্জন করিবার পথ উন্মুক্ত হইয়া যায়। অল্প জমিতে তরিতরকারী লাগাইয়া

একজন মানুষের পরিবার প্রতিপালন হইতে পারে। বিশেষ করিয়া যদি তৎসঙ্গে কিছু হাঁস মুরগী মৎস ও ফলের ব্যবস্থা করা হয়। সহরের মানুষ হাজারে হাজারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান খুলিয়া ও নানা ব্যবসায় করিয়া দিন গুজরাণ করে। বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, ঠাণ্ডাকল, চুলা, জলগরমের কল প্রভৃতি নানান কিছুর প্রচলনের ফলে কারিগরের যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে ও আরও হইলে কাজের অভাব হইবে না। বস্ত্র ধোলাই ও নির্জ্জলা সাফাই শিক্ষা করিলে মাসিক ৩।৪ শত টাকা রোজগার হইতে পারে। ভাড়াটিয়া মটর গাড়ী চালালেও রোজগার ভালই হয়। সেলাই, বই বাঁধাই, ঘড়ি মেরামত, রেডিয়োর কাজ প্রভৃতি করিলেও উপার্জ্জন হয়। মূলধন কিছু থাকিলে দুই চারিজন মিলিত ভাবে দুধের কারবার করিলে যথেষ্ট লাভ হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় বাংলা দেশের বেকার ব্যক্তিদিগের সংস্থান সরকারী চেষ্টায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। সমাজবাদ সমষ্টিবাদ বা বা সোসিয়ালিজম অবলম্বন করিলেও সুবিধা হইবে না। একমাত্র উপায় এলাকাগত ভাবে বহু সংখ্যক পরিবারের সমবায় গঠন করিয়া নিজেদের নানান বস্তু ও কর্ম্মের চাহিদার উপরেই নিজেদের বেকারদিগের কর্ম্ম সংস্থান ব্যবস্থা করা। এক এক এলাকায় ২০০০।৩০০০ হাজার পরিবারের নানা প্রয়োজনে মাসিক ২।৩ লক্ষ বা ততোধিক টাকা ব্যয় হয়। অধিকই হয়, কম নিশ্চয়ই হয় না। এই পরিবার সকল যদি নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ও নানা প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন নিজেদের বেকারদিগের দ্বারা করার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে অনায়াসেই এক এক সমবায় ১০০।১৫০ বেকারকে কাজে লাগাইতে পারে। ইহার ব্যবস্থা সব দিক বিচার করিয়া করিতে হইলে প্রতি এলাকায় সকলে মিলিত হইয়া সকল বিষয় উত্তমরূপে আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা আশা করি যে কোথাও কোথাও যুবকগণ মিলিত হইয়া এই উপায়ে বেকারত্বের দূরীকরণ চেষ্টা আরম্ভ করিবেন। বাস্তব পরিস্থিতিতে এই চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা না হইলে অর্থ নৈতিক বিলিব্যবস্থা কখনও কার্য্যকর হইতে পারে না।

রামমোহন হ'তে বিদ্যাসাগর

(৩)

বিদ্যাসাগরের মানস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগরের মানস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এদেশে এক নূতন জীবন্ত সভ্যতার উদ্ভব হবে আশা করেই রামমোহন ও তাঁর অন্যান্য প্রতীচ্যবাদী সহকর্মীরা ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইয়োরোপীয় 'রিনেসাঁস' বা নব জাগরণের সংবাদে ও প্রগতিমূলক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবাসী সমস্ত জড়তা ত্যাগ করে ও বিভেদ ভুলে, ধর্মে ও কর্মে মহান হয়ে আবার জগৎসভায় শ্রদ্ধা ও গৌরবের আসন লাভ করবে—এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাঁরা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল, হিন্দু-কলেজের নব্যশিক্ষিত যুবকদল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে: একদিকে ধর্মহীন শিক্ষায় উচ্ছৃঙ্খল, বিদ্রোহী ইয়ংবেঙ্গল' অন্যদিকে রামমোহন প্রবর্তিত ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণ ব্রাহ্মদল—যাদের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ন বসু ও কেশবচন্দ্র সেন। এঁরা সকলেই হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন।

ধর্মের বন্ধনে সংযত এই নব্যশিক্ষিত ব্রাহ্মগণ, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে, শিক্ষাবিস্তার, সন্নীতি-প্রচার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রগতিমূলক কর্মধারায় আগ্রহী ও উৎসাহী হয়ে এমন একটি বিদগ্ধ-সমাজের সৃষ্টি করেছিলেন, যার আকর্ষণ উনিশশতকের মধ্যভাগে শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে দুর্নিবারই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেশবচন্দ্রের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাগ্মিতা, ত্যাগ ও সমাজসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রচারকদল যখন একজাতি, একপ্রাণ, একতা মন্ত্রশিরে ব্রাহ্মধর্মের পতাকা ধরে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়লেন, তখন মনে হয়েছিল রামমোহনের স্বপ্ন বুঝিবা সফল হতেই চলল। ব্রাহ্মসমাজের গঠনমূলক প্রয়াসের ফলে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অচলায়তনে বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হল; লোকে বুঝল ইংরেজী শিক্ষা পেলেই সন্তান বিধর্মী বা সমাজদ্রোহী হয় না। রামমোহনের আরব্ধ ব্রাহ্মসমাজই খৃষ্টীয় প্লাবন হতে শিক্ষিত হিন্দুসমাজকে সেদিন রক্ষা করেছিল। ব্রাহ্মসমাজের আলোকবর্তিকা সমস্ত কুসংস্কারের কুয়াশা ভেদ করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে অবহেলিত নারীজাতিকে মধ্যযুগের মূঢ়তা ও অন্ধকার হতে টেনে বাইরে এনে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে দেখে অবলাবন্ধু, মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর কি আর দূরে থাকতে পারেন? কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার অল্পদিন মধ্যেই (১৮৪৮ সালে) তিনি দেবেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পরিচালক সমিতি ('গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা')-র সংশ্লিষ্ট হয়ে সংস্কার আন্দোলনে যোগদান করলেন। রামমোহনের ন্যায়, শাস্ত্রব্যাখ্যায় তিনিও এক উদার বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত প্রমাণ করলেন। বিধবা-বিবাহ আইনসঙ্গত বলে ঘোষিত হ'ল, নিন্দিত হল বহুবিবাহ।

এতদিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের নয়নের মণিরূপে আদৃত ছিলেন; কিন্তু বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হওয়া এবং কার্যত কয়েকটি বিধবা-বিবাহ ঘটে যাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া শুরু হল। প্রতিক্রিয়া কেবল বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধেই

নয়, সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধেই। বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের জন্ত সর্বস্বপণ ক'রে নেমেছেন, কোন বাধাতেই নিরস্ত হবেন না দেখে, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ প্রমাদ গনলো। তাঁর বিরুদ্ধে চারদিক হতে কটূক্তি বর্ষিত হতে লাগল। অবশেষে তাঁর একমাত্র পুত্রও যখন এক বিধবাকে বিবাহ করলেন, তখন সামাজিক নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করল। ক্রমে ক্রমে তিনি প্রায় সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও হিন্দু বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা পরিত্যক্ত হতে লাগলেন। বীরসিংহে তাঁর মাতা-পিতাও সামাজিক নিপীড়ন হতে নিষ্কৃতি পেলেন না। এতৎসত্ত্বেও দৃঢ়চেতা পুরুষসিংহ কিছুমাত্র দমলেন না। প্রচীন রোমের অভিজাত বংশীয় (Patrician) নেতা কোরায়োলেনাস (Coriolanus)-এর স্তায় তিনিও ঘোষনা করলেন—'তোমরা আমাকে নির্বাসন দেবে কি। আমিই তোমাদের সকলকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করলাম"। শুরু হল তার একক-নিঃসঙ্গ জীবন।

সামাজিক নির্যাতনের ভয়ে ক্রমশ বিধবাবিবাহের উৎসাহে ভাটা পড়ে এল। রক্ষণশীল সম্রান্ত হিন্দু-সমাজ বিদ্যাসাগরের 'জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম" গ্রহণ করল না। তখন হতে শুরু হল 'তিরস্করণী'র সূত্রপাত—তাঁর যুক্তিবাদ, সমদর্শিতা ও নির্যাতিত নারীজাতির উন্নয়নকে ছাপিয়ে আরম্ভ হল তাঁর দয়াদাক্ষিণ্য ও ও বদান্ততার গুণগান—'দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর।'

বিধবাবিবাহ প্রচলনে যে অনমনীয় দৃঢ়তা তিনি দেখিয়ে ছিলেন, বাঙালীচরিত্রে সে বস্তু ইতঃপূর্বে আর দেখা যায় নি। তাই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন—"এই দেশে এই জাতির মধ্যে, সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কাল (মেরুদণ্ড) বিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখনো নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক যাহা কখন ক্ষমতার নিকট বা ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল—তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ, যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতেও জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যায়"।

দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সচরাচর যে ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা ও দুর্বলতা দেখা যায়, তাঁর চরিত্রের ধারে-কাছে সে বস্তু কখনো ঘেঁষতে পারেনি। সর্ববিষয়েই তিনি ছিলেন বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকচরিত্রের বিপরীত। তাই রবীন্দ্রনাথ সার্থক উপমা দিয়ে বললেন, বাংলা দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের স্তায় দৃঢ়চরিত্র মানুষের জন্ম ও প্রতিপালন অনেকটা কাকের বাসায় কোকিলছানা প্রতিপালনেরই স্তায়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—"যিনি বাল্যকালে অধিকংশ সময় অর্ধাশনে থাকিতেন, তিনি একসময় তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়।" শিবনাথ আরও বলেছেন বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মেরুদণ্ড ছিল—মানবজীবনের মহত্ত্বজ্ঞান। সেই মানবতার মহত্ব হতে তিনি নিজেকে কখনও স্খলিত হতে দেন নি—এখানেই তাঁর ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মহৎব্যক্তিরা এই নিজের প্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র, একক; অন্তদিকে তাঁহারা সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপরদিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায়, আচারে-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালী ছিলেন; স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ

ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, দেশহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন।"

ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র অগ্রজ সম্বন্ধে লিখেছেন—"তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোনও প্রকার অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন; অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে তিনি কখনও পরের উপাসনা ও আনুগত্য করিতে পারেন নাই।"

এই সমস্ত চারিত্রিক সদগুণাবলীর জন্যই—বিশেষতঃ তাঁর সরল সবল অটল মনোবল, তাঁর পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায়, কর্মপটুতা, কর্তব্যপরায়ণতা, নির্লোভতা, আত্মত্যাগ ও দেশহিতৈষণার জন্য, ইয়োরোপীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ, যাঁদের সংস্রবে তিনি এসেছিলেন, প্রায় সকলেই তাঁকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে গ্রহণ করেছেন। এমন কি যাঁদের সঙ্গে তাঁর মতবৈধতা ও বিরোধ ঘটেছিল, তাঁরাও প্রীতি দিতে না পারলেও তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে কখনও ত্রুটি করেন নি। তাঁদের সকলের কাছেই তিনি ছিলেন "দ্য গ্রেট পণ্ডিত"। বড় বড় পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের আগেও অনেক ছিলেন, তাঁর সমকালেও ছিলেন, এবং পরেও হয়েছেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় এরূপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উদারপ্রকৃতি, মানবহিতৈষী, আপামর সাধারণের নিকট সুপরিচিত, সমদর্শী পণ্ডিত জগতে সুদুর্লভ।

তিনি ছিলেন একজন যথার্থ মানুষ, যাঁর সম্বন্ধে যোগবাসিষ্ঠ বলেছেন "স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি", সে-ই প্রকৃত মানুষ যে মননক্রিয়া দ্বারা জীবিত থাকে। প্রকৃত মানুষ যাঁরা তাঁদের শাস্ত্র তাঁদের অন্তরেই নিহিত। তাই ওলাউঠা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, সে ব্রাহ্মণই হোক বা মেথরই হোক, তাকে ছুঁতে এবং তার ক্লেদ পরিষ্কার করতে বিদ্যাসাগরের বাধে না; দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁর গ্রামে তাঁর অন্নসত্রে খেতে আসে যেসমস্ত নিম্নশ্রেণীর হাঁড়ি, ডোম, মুচি-জাতীয় স্ত্রীলোক, তাদের অস্পৃশ্য রুক্ষ মস্তকে নিজহাতে তেল মাখিয়ে দিতেও তাঁর কোন বাধা হয় না।

কেবল যে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিতেই তিনি বলিষ্ঠ ছিলেন তা নয়। তাঁর ন্যায় জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্মে কুশলতা, চরিত্রে সংযম, সংকল্পে অটলতা এবং কর্তব্যজ্ঞানে অনমনীয় দৃঢ়তা জগতে খুব অল্পসংখ্যক মহাজনই দেখাতে পেরেছেন।

বিদ্যাসাগরের আচারনিষ্ঠা

বাইরের চেহারায় একেবারে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মতো দেখালেও বিদ্যাসাগর যে মামুলী আচারনিষ্ঠ দেবদ্বিজে ভক্তিমান ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তার অজস্র প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে: চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—একদিন একটা জরুরি কাজে কোথায় যেন তাঁর দেরী হয়ে গেল, বাড়ীতে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে আসতে হ'লে ঠিকসময়ে কলেজে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাই আর বাড়ী না গিয়ে—পথে কলেজের ছাত্রদের বোর্ডিং, সেখানে গিয়ে মাথায় কয়েক ঘটি জল ঢেলে ছাত্রদের খাওয়ার ঘরে ঢুকলেন। তারা তখন খেতে বসেছে। তিনি সকলের পাত থেকে এক-এক থাবা ভাত তুলে নিয়ে খেতে বসে গেলেন। ছেলেদের সঙ্গে কত হাসি ঠাট্টাও গল্প। তারা মহাখুশি। কোন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের আচার এ রকম হয় না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাক্ষ্য দিয়েছেন: তাঁদের নৈহাটির বাড়িতে কি একটা উপলক্ষ্যে কতকগুলি ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাঁরা খেতে বসেছেন, এমন সময়ে মেয়েমহলে গোলগোল উঠল—"ওমা এমন তো কখনো শুনিনি;—বামুনের ছেলে; অমুক মিত্তিরের পাত থেকে কইমাছের মুড়োটা কেড়ে নিয়ে খেয়েছে।

হরপ্রসাদ তখন ছেলেমানুষ, তার জানবার ইচ্ছা হলো—কে সেই বামুনের ছেলে। মাকে জিজ্ঞেস করতে হর-প্রসাদের মা বললেন—"জানিস না—বিদ্যাসাগর!"

হবে না কেন? ছেলের শিক্ষা তো মায়ের কাছ হতে। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন—"১২৬৬ সাল হইতে ১২৭২ সাল পর্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহ-কার্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিধবা লোককে বিপদ-হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজ মহাশয় বিশেষরূপ যত্নবান ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপনার দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে, একারণ জননীদেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকদের সহিত একত্র একপাতে ভোজন করিতেন।

আর একটা ঘটনা: সিভিলিয়ান হ্যারিসন সাহেব কার্যোপলক্ষে মেদিনীপুরে এসেছেন; তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ। ভগবতী দেবী তাঁকে স্বনামে পত্র পাঠিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন "জননীদেবী, সাহেবের ভোজন সময় উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দু স্ত্রীলোক সাহেবের ভোজনের সময় চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।... জননীদেবী প্রবীণা হিন্দু স্ত্রীলোক, তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত, এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই।"

"আরেকটি ঘটনা—অগ্নিদাহে বীরসিংহ গ্রামের বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি বলিলেন—যে-সকল দরিদ্রলোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে, তাহারা কি খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে?"

কথিত আছে যে, এই সকল ছাত্রদের ভুক্তাবশিষ্ট সামগ্রী তিনি কুড়িয়ে তুলে রাখতেন এবং আহার কালে নিজেই ঐ উচ্ছিষ্ট খেয়ে নিতেন। কারণ, খাদ্যবস্তু নষ্ট হতে দেওয়া তাঁর নীতি-বিরুদ্ধ ছিল।

শম্ভুচন্দ্র আবারও লিখেছেন—একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া (বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হতো)ছয়-সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভাল, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকগুলোকে ঐ টাকা অবস্থা হিসাবে মাসে মাসে কিছুকিছু সাহায্য করা ভাল?' ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন—"গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে, পূজা করিবার আবশ্যক নাই।"

কোন মামুলী দেবদ্বিজে ভক্তিমান হিন্দু এরূপ প্রস্তাব মনেও স্থান দেবেন কিনা সন্দেহ।

বিদ্যাসাগরের ধর্ম

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ভগবতীদেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ—তাঁহার নিত্য নিয়মিত কার্য ছিল।" এইরূপ মায়ের সন্তান বিদ্যাসাগর যে দীন-দুঃখী রোগার্ত ও পতিতের পরম বন্ধু হবেন তার আর আশ্চর্য কী?

১৮৫৩ সালের ২১শে অগাষ্ট কাউনসিল-অব-এডুকেশন বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইন সাহেবের একটি রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রিপোর্টে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর পাঠ্যক্রমের যে সব ব্যবস্থা করেছেন তার কিছু অদলবদল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর ব্যালান্টাইনের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হতে পারলেন না। সে বিষয়ে একখানা চিঠিতে তিনি আপন বক্তব্য কাউনসিলকে জানিয়ে দিলেন। এই চিঠিতে বিদ্যাসাগর অভিমত ব্যক্ত করেছেন—"বেদান্ত ও সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন।'

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—"মনে মনে অনেক পণ্ডিতব্যক্তি ঐ দর্শনকে, অন্তত বেদান্তকে ভ্রান্তদর্শন মনে করিয়া থাকেন। এই উক্তিটির জন্যই পণ্ডিত সমাজের গোঁড়া অংশ এখনও বিদ্যাসাগরকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই।

'আমার তো মনে হয়, প্রকাশ্যে বেদান্তকে 'ভ্রান্ত দর্শন' ঘোষণা করাই দুঃসাহসী বিদ্যাসাগরের দুঃসাহসিকতম কার্য; তুলনায় বিধবাবিবাহ সমর্থক বা বহুবিবাহ প্রতিকূলতা নিতান্ত ছেলেখেলা।"

বিদ্যাসাগরের সারাজীবনের ক্রিয়াকর্মে যে অসীম মানবপ্রেম ও মানবসেবা প্রকটিত হয়েছে, তা'হতে মনে হতে পারে—তিনি বুঝি রামমোহনেরই ন্যায় বিশ্বাস করতেন—মানবসেবাই ঈশ্বরের সেবা (The service of man is the service of God),—যে-সূত্র ধরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক পুস্তকে "ব্রাহ্মধর্মবীজ" বলে নির্দেশ দিলেন—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"—অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করাই উপাসনা।

সে কথা যদি ঠিক হয়, তবে বলতে হবে বিদ্যাসাগর রামকৃষ্ণ মিশনের অগ্রদূত; কারণ বিবেকানন্দের পূর্বেই তিনি কার্যতঃ বহুদৃষ্টান্ত দ্বারা দেখিয়েছেন—"জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"। কিন্তু তিনি যে জ্ঞাতসারে কখনও মানুষকে 'নারায়ণ' জ্ঞানে সেবা করেছেন—তার প্রমাণ নেই। তাঁর মানবসেবা, মানবেরই সেবা 'নর-নারায়ণ'-এর ধারণা তাঁর নিকট একেবারেই অবাস্তব এবং অজ্ঞাত ছিল। 'সোঽহম' বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-আমিই ব্রহ্ম, 'তত্ত্বমসি'—তুমিও ব্রহ্ম—এইসব চমকপ্রদ, কিন্তু হাস্যকর, স্পর্ধিত উক্তি, তাঁর নিকট জ্ঞানকৃত আত্ম-প্রতারণা বা পাগলের প্রলাপ বলেই অবজ্ঞেয় ছিল।

অবশ্য কেনোপনিষদের এই উক্তি থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন: যথা—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥

অস্যার্থঃ—আমি তাঁকে সুন্দররূপে জেনেছি এমন মনে করি না, জানিনা যে—তা'ও নয়। "আমি তাঁকে জানি না, এমনও নয়, আবার জানি যে এমনও নয়" —এই তত্ত্বের মর্মবোধ যাঁর জন্মেছে, তিনিই তাঁকে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) জানেন।

অনেক সুশিক্ষিত ও সাধুপ্রকৃতির ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানগণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল, তাঁদের অনেককেই তিনি বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে তিনি আপন সন্তানদের ন্যায় স্নেহ করতেন। দশ বৎসরকাল তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যরূপে তিনি, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গ লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও 'ব্রাহ্ম' হন নি। অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায়, তিনি একেশ্বর বিশ্বাসী হলেও ঈশ্বরের পূজা আরাধনা ও প্রার্থনার মূল্য কখনও স্বীকার করেন নি।

মুণ্ডক-উপনিষদের একটি শ্লোকের অর্ধাংশ তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাঽপি বাচ্য নান্যৈ দেবৈস্তপসা কর্মণা বা—তিনি চক্ষুর দ্বারা গ্রাহ্য নন, বাক্যেরও গ্রাহ্য ন'ন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও গ্রাহ্য ন'ন তপস্যা বা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মের দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায় না।"

কিন্তু ঐ শ্লোকের অপরার্ধে যা বলা হয়েছে—শুদ্ধজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযোগে সেই নিরবয়ব ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মাতে উপলব্ধি করেন—তাকে তিনি গ্রাহ্য মনে করেন নি। তিনি ছিলেন মানবপ্রেমিক, বাস্তববাদী। যে-দেশে, যে-সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানে বহুকাল ধরে মানুষের উপর মানুষের—বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির উপর পুরুষদের—অত্যাচার—সমগ্র সমাজ দেহে অজ্ঞতা, অন্ধতা অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার এবং অনাচার-এত পুঞ্জীভূত হয়েছিল যে, সেই হৃদয়বান মহাপুরুষ ধ্যানে বসবার ফুরসৎ আর পেলেন না। চারিদিকের এই অসেয় অজ্ঞতা, অন্ধতা, অপ্রেম দুঃখ আর্তি ও নির্মম দেশাচারের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন অক্লান্ত সংগ্রাম করেই গেলেন।

চিরাভ্যস্ত সংস্কার ও গতানুগতিকতার বশে তিনি বাহ্যতঃ অনেক হিন্দু-অনুষ্ঠান, দেশাচার ও কুলাচার মানতেন, যথা—চিঠির ঊর্ধ্বভাগে আরম্ভেই 'শ্রীশ্রী দুর্গাশরণং', "শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং", মাথায় শিখা বা টিকি, গলায় উপবীত, চক্রাকারে মস্তকমুণ্ডন প্রভৃতি। কিন্তু যেখানে লোকাচার ও দেশাচারের সঙ্গে তাঁর হৃদয়-ধর্মের সংঘাত বাধত, সেখানে মানবপ্রেমিক বিদ্যাসাগর বিদ্রোহীর ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন। মাতাপিতার মৃত্যুর পর তিনি যথারীতি হিন্দু শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও করেছেন। তাঁদের প্রীত্যর্থে তিনি ব্যক্তিগত মতামতও সময়ে-সময়ে বিসর্জন দিয়েছেন। কারণ মাতা-পিতাই তাঁর সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন।

কাশীবাসী বৃদ্ধ মা-বাবাকে দেখবার জন্য তিনি যখন সেখানে গেলেন, তখন স্থানীয় পাণ্ডা-পুরোহিত, ব্রাহ্মণেরা তাঁকে দাতাকর্ণ জেনে ধরে বসলেন—"কাশীধামে এলে সকলেই ব্রাহ্মণদিগকে কিছু দান করে থাকেন, দাতা বলে আপনার দেশজোড়া সুনাম। আমরা বিশ্বেশ্বরের পূজারি-পাণ্ডা—আমাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করে যান"। বিদ্যাসাগর তাঁদের কিছুই দিলেন না। তিনি বললেন—"আমি আপনাদের কাশী বা বিশ্বেশ্বর মানি না"। ক্রোধান্বিত ব্রাহ্মণেরা জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনি তবে কী মানেন', বিদ্যাসাগর জনক-জননীকে দেখিয়ে বললেন—"আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা এই আমার পিতৃদেব ও জননী দেবী।"

এই কথা স্মরণে রাখলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব "ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোন পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।"

১৮৮২ সালের অগাস্ট মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। না, মা কালীর মহিমা ও লীলা-বিভূতি সেখানে আলোচিত হয় নি; হয়েছিল, ব্রহ্ম এবং নিষ্কাম কর্মযোগ সম্বন্ধেই কথাবার্তা। অবশেষে বিদায় গ্রহণের পূর্বে পরমহংসদেব বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেছিলেন—দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য। বিদ্যাসাগর যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু জীবনের অবশিষ্ট নয় বৎসরের মধ্যে কখনও যাননি এতে রামকৃষ্ণদেব এবং দক্ষিণেশ্বরীর প্রতি তাঁর যে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি বা আকর্ষণ ছিল, তা মনে হয় না।

যিনি সাংখ্য বেদান্ত ন্যায় ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন "বেদান্ত ও সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন", তাঁর পক্ষে শাঙ্কর বেদান্তের অনুগামী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে লোভনীয় কী এমন আকাঙ্ক্ষার বস্তু মিলতে পারে? অবশ্য তিনি যদি যেতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দেব নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরকে "নারী নরকের দ্বার", "কামিনী-কাঞ্চন সর্বথাই পরিত্যাজ্য" বা "টাকা মাটি, মাটি টাকা ইত্যাদি উপাদেয় অধ্যাত্ম-বাণী শোনাতেন না। কারণ সাধু-মহাত্মারা যতই সংসার-বিরাগী হোন না কেন, লোকচরিত্র তাঁরা ভালোরকমই বোঝেন। কোথায় কী বলতে হয়, তা-ও বেশ জানেন।

ব্রাহ্মসমাজ এ জগৎ সংসারকে ইন্দ্রজাল বা শুধু মায়ার খেলা, বলে উড়িয়ে দেয়নি বরং বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ অথবা জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hegel) এর মতাবলম্বন করে, তাকে মানবের কর্মক্ষেত্র বলেই মেনে নিয়েছিল; তবুও কর্মযোগী ঈশ্বরচন্দ্রকে তারা দলে টানতে পারেনি। আর "মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা" বলে অধ্যাত্ম মহিমার ভেল্‌কি দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে তাঁর গোষ্ঠে ঢোকাবেন তা কি কখনও সম্ভব!

তবু বিদ্যাসাগর তাঁর কথার খেলাপ করলেন কেন?– এ প্রশ্ন থেকেই যায়। বরং শ্রীরামকৃষ্ণই অভিযোগ করেছেন—"বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন? সেদিন বললে এখানে আসবে; কই, এল না ত?"

আমার মনে হয়, ভক্তদল দেখে বিদ্যাসাগর ভড়কে গিয়ে থাকবেন। অন্ধভক্তির পক্ষে অকরণীয় যে কিছুই নেই, তা তিনি ভাল করেই জানতেন। অমন সাধু

সজ্জন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, যাঁর ধর্মের জন্য ঐকান্তিকী আকুলতা, ঈশ্বর-প্রেম, ধর্মসাধন, অনুপম বাগ্মিতা, ও অক্লান্ত প্রচারের ফলে উদার ধর্মসমন্বয়ের বাণী, নীতিবোধ ও মনুষ্যত্বের মর্যাদাজ্ঞান এদেশে শিক্ষিত সমাজে কতকটা গৃহীত হয়েছিল, যিনি দক্ষিণেশ্বরের "পাগলা ঠাকুর"কে আবিষ্কার ও প্রচার করে, তাঁকে ধর্মপ্রাণ বিশিষ্ট সাধু বলে শিক্ষিত ভদ্রসমাজের গোচরে আনলেন, সেই কেশবচন্দ্রকে লোকচক্ষে হীন করবার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ধ ভাবকদল যেরূপ মিথ্যাভাষণ ও অতিকথনের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তা দেখে যে কোন গণ্যমান্য লোকের দক্ষিণেশ্বরের দিকে পা বাড়াতে ইতস্ততঃ করা আদৌ অসঙ্গত নয়। মহেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'বসওয়েল'; একখানাকে সাতখানা করতে তিনি ছিলেন মহা ওস্তাদ। সম্ভবত তাঁর ভয়েই বিদ্যাসাগর আর দক্ষিণেশ্বরের নাম করতে সাহস করেন নি। তাঁর এই বাস্তববুদ্ধিই শ্রী'মার অযথা প্রচারণার হাত হ'তে তাঁকে রক্ষা করেছে। সম্ভবত ঐ একই কারণে রবীন্দ্রনাথও, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দী আন্দোলন হতে সযত্নে নিজেকে দূরেই রেখেছিলেন। কারণ তাঁরা উভয়েই, কেশবচন্দ্রের ন্যায় মূর্তি পূজার সঙ্গে আপস করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

যিনি ছাত্রাবস্থাতেই সন্ধ্যা-আহ্নিক, এমনকি ব্রাহ্মণের অবশ্যকরণীয় গায়ত্রীমন্ত্র জপও ছেড়ে দিয়েছিলেন (ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রেরই এই উক্তি) তিনি যে কেঁচে গণ্ডুষ করে মা-কালীর দুয়ারে ধরণা দেবেন—সেটা অন্য লোকের পক্ষে সম্ভব হলেও সত্যসন্ধ বিদ্যাসাগরের ধাতুপ্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব ছিল।

বিদ্যাসাগরের ধর্মমত নিয়ে তাঁর শত্রু মিত্র ও ছাত্রেরা বহু আলোচনা সমালোচনা করেছেন, কিন্তু কোন মীমাংসা করতে পারেন নি। তাঁর -ছাত্র, আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মনে করতেন, বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন; কিন্তু অধ্যক্ষ হুদিরাম বসু,—যিনি বিদ্যাসাগরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, লিখেছেন—"বিদ্যাসাগর যে একেশ্বরবাদী ছিলেন, 'বোধোদয়ে' আমরা তার পরিচয় পাই। প্রতিমা পূজা তিনি লৌকিকভাবেই দেখতেন। কেননা, তাঁর বাড়ীতে কোন পূজা হতে দেখিনি। মোটের উপর মনে হয় তিনি য়্যাগ্‌নস্টিক (সংশয়বাদী) ছিলেন।"

রক্ষণশীল হিন্দু, বিহারীলাল সরকার লিখেছেন, ঠাকুরমার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও "তিনি (বিদ্যাসাগর) পিতামহীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই; পরন্তু সন্ধ্যাহ্নিক পূজাদিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তবে অপর কাহারও সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন না। শ্রাদ্ধাদি ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানকে প্রশ্রয় দেন নাই।"

কিন্তু বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন—"আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না; দুনিয়ার একজন মালিক আছেন, তা বেশ বুঝি। নিজে যেমন বুঝি তেমনি চলি। কেউ পীড়াপীড়ি করলে বলবো,—এর বেশী বুঝতে পারি নি। কিন্তু এ-পথে না গিয়ে ও পথে গেলেই স্বর্গে যেতে পারবো, তাঁর প্রিয় হবো—এসব বুঝিও না, কাউকে বোঝানোর চেষ্টাও করি না।" এর পর তাঁকে সংশয়বাদী ছাড়া আর কিছু বলা চলে কি?

বিধবাবিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ নিবারণের আন্দোলনের ফলে তাঁকে পরবর্তী জীবনে অনেক সামাজিক নিগ্রহ ও মানসিক ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছিল। শিক্ষিত বাঙালীর অকৃতজ্ঞতার এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনের অসৎ ব্যবহারে শেষ জীবন তাঁর বড়ই মনঃকষ্টে,—স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে; একক 'নিঃসঙ্গ' ভাবেই কাটাতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল (মেট্রোপলিটান) ও কলেজটিকে একাগ্রচিত্তে প্রাণাধিক যত্নে পালন করিয়া, দীন-দরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জনা করিয়া, বন্ধু-বান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনা-শল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভর উন্নত-বলিষ্ঠ

চরিত্রের মহান আদর্শ বাঙালী জাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।"

মৃত্যুর পূর্বে কয়েকদিন তাঁর অচৈতন্যভাবে কেটেছিল। কিন্তু, সজ্ঞানে কি অজ্ঞানে, কখনও তাঁর মুখ হতে কেউ কোন ঠাকুর-দেবতার নাম বা ভগবানের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত কোন উক্তি শুনতে পাননি। তবুও 'তিরস্করণী'র এমনই প্রভাব যে বিংশ শতকের বঙ্গীয় শিক্ষকদের নিকট তিনি হয়ে গেলেন দেবদ্বিজে ভক্তিমান পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

মৃত্যুপূর্বের ঐ আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে জ্ঞান যে বিলুপ্ত হয় নি তা বোঝা গেল, যখন তিনি হঠাৎ মাথাটি উত্তরদিক হতে ঘুরিয়ে পশ্চিমদিকে নিয়ে গেলেন—মায়ের ছবিখানি দেখতে সুবিধা হবে বলে। ঘরের পূর্ব দেয়ালে হাড্‌সন (Hudson) সাহেবের অঙ্কিত তাঁর স্নেহময়ী জননীর প্রতিকৃতি আলম্বিত ছিল। মায়ের ছবির মুখোমুখী হয়ে, অপলকদৃষ্টিতে তিনি মায়ের সেই 'সুদূরদর্শী—স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র ও পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা' অশ্রুবিগলিত নেত্রে নিরীক্ষণ করতে করতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মাতৃহারা সন্তান মায়ের বক্ষেই বিলীন হয়ে গেলেন কি? স্বর্গ বিদ্যাসাগর মানতেন না। জননীই তাঁর নিকট স্বর্গমর্ত্যের সবচেয়ে গরিয়সী।

এরূপ অকৃত্রিম মাতৃপ্রেম ও মাতৃভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহের বিষয়।

স্বর্লোক, পরলোক, জন্মান্তর ইত্যাদি নিয়ে তাঁকে কঠোর রকমের ব্যঙ্গোক্তি করতেও মাঝে মাঝে শোনা গেছে। ধর্ম মানুষের অন্তরের অনুভূতির বস্তু; তা নিয়ে হৈ চৈ করাটা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। শাক্যমুনি গৌতমবুদ্ধের ন্যায় তাঁর চিন্তাধারা ইহজগতে এবং মানবেই কেন্দ্রীভূত ছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃত মানব দরদী মানবতাবাদী, তাঁর মানবসেবা যে সম্পূর্ণ নিষ্কাম কর্ম, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে,—মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা কৃতঘ্নতা ও প্রবঞ্চনার অজস্র পীড়াদায়ক দৃষ্টান্ত নিজ জীবনে ভোগ করা সত্ত্বেও, তিনি কখনও তাদের প্রতি বিমুখ হন নি; সমানভাবেই তাদের সেবা আজীবন করে গেছেন। মানবসেবাই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এমন অকুণ্ঠ মানবপ্রেম, মানুষের দুঃখ বেদনা ও আর্তিতে এরূপ আন্তরিক সহানুভূতি এবং সেই দুঃখ দুর্দশা বিমোচন বা লাঘবের জন্য এরূপ সর্বস্বপণ আর ক'জন করেছেন আমি জানি না। তাঁর জীবনের সমস্ত কার্যকলাপ এই কথাই ঘোষণা করে—

"শোন্ রে মানুষ-ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

মানবত্বকেই তিনি দেবত্বেরও উপরে উন্নীত করতে প্রয়াস করেছিলেন। মানবত্বের মহত্ত্বকেই তিনি নিজজীবনে প্রমাণিত করে গেলেন।

মানবহিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বিদ্যাসাগরের অমেয় মৈত্রী, অপার করুণা, অনুপম আত্মত্যাগ, অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্বের আদর্শ আজ জাতির সম্মুখে বিশেষ ভাবে তুলে ধরবার সময় এসেছে।

(সমাপ্ত)

"কাণ্টের সৌন্দর্য্য বিচার"

শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এই যে দৃশ্য জগৎ এতো বুদ্ধির রাজ্য। আমরা তো বুদ্ধির দ্বারাই এর সম্বন্ধে জানি। কিন্তু অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক জগতে তো এ বুদ্ধি প্রবেশ করতে পারে না। তবে সেখানে আমরা যাব কেমন করে? না এ বুদ্ধির জগৎ থেকে কেবলই আকাঙ্খায় নিঃশ্বাস জেগে থাকবে? কিন্তু কাণ্ট বলেন ব্যবহারিক প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা পারমার্থিক জগতের কথাও বলতে পারি। আমাদের সম্মুখে প্রসারিত এ জগৎ নিয়মে বাঁধা হলেও, অতীন্দ্রিয় জগতে স্বাতন্ত্র্যই নিয়ম। এই জগতে তাহলে দেখছি সবই বুদ্ধির নিয়মে চলে, অতীন্দ্রিয় জগতে শুধু প্রজ্ঞারই প্রবেশাধিকার। তাহলে দুটি জগতকে নিয়ে আমাদের কারবার; বুদ্ধির ও প্রজ্ঞার কিন্তু মানুষের মন তো কেবলই মেলাতে চায়; এ দুটি জগতকে স্বভাবত সে মেলাতে চাইবে। দৃশ্য জগতেও সে নৈতিক নিয়ম খাটাতে চাইবে। এ দৃশ্য জগৎ ও পারমার্থিক জগতের মিলন ঘটালে তারও যে সংশয় মুক্তি ঘটে; জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। এই সমন্বয় বা ঐক্যের কথাই প্রধাণত বলেছেন কাণ্ট তাঁর রস বিচারে।

জ্ঞান জন্মে বুদ্ধি থেকে, প্রজ্ঞা থেকে পাই নৈতিক জ্ঞান। বুদ্ধিও প্রজ্ঞার মাঝে একটি তৃতীয় শক্তি যদি এনে ফেলা যায় তাহলে এ দুটি শক্তির মিলনটি সার্থক হয়। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মাঝখানে কাণ্ট এক তৃতীয় শক্তির কথা বললেন একে তিনি বলেছেন বিচার শক্তি বা The power of Judgement। সাধারণ বুদ্ধিতে এতদিন তো আমরা জেনেছিলুম যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করি। আর তাই সাধারণ লোক বুদ্ধিমান লোকের কাছে ছোটে। কিন্তু কাণ্টের বিচার শক্তির একটি বিশেষ অর্থ আছে। দেখা যাক্ তিনি বিচার শক্তি বলে কি বোঝাতে চান।

কাণ্টের মতে জ্ঞান, সুখ ও ইচ্ছা মানবাত্মার তিনটি মৌলিক ধর্ম্ম। এ তিনটি ধর্ম্ম তিনটি শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হয়, জ্ঞান থেকে পাই বুদ্ধি, সুখাকাঙ্খা থেকে বিচার শক্তি ও ইচ্ছা থেকে জাগে প্রজ্ঞা। বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান জন্মে একথা বোঝা খুব কঠিন নয়, প্রজ্ঞা দ্বারা ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত হয়—একথা ঠিক বুঝতে না পারলেও অনুমান করতে পারা যায়। কিন্তু সুখের বুঝতে সাথে বিচারের সে সম্বন্ধ কোথায়—এ বুঝবার শক্তি অন্ততঃ সাধারণ লোকের কাছে আশা করা যায় না। তবে কি সাধারণের বিচার ক্ষমতা নেই? না তারা অজ্ঞাতসারেই এ শক্তির প্রয়োগ করে চলেছে? দেখা যাক্।

কাণ্টের মতানুসারে এই বিচার শক্তির বলে আমরা বুঝতে পারি কোন পদার্থ কোন নিয়মের মধ্যে পড়ে। নিয়মগুলি পাই আমরা বুদ্ধি থেকে। কিন্তু কোন বস্তু সে নিয়মের মধ্যে পড়বে তা নির্ভর করে বিচারশক্তির উপর। এ বিচারশক্তি ঠিক শেখান যায় না। অনেক সময় অসাধারণ পণ্ডিতও লোকজনের

সঙ্গে, আলাপে ব্যবহারে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন। কান্টের মতে এদের যথেষ্ট বুদ্ধি থাকলেও, বিচারশক্তি নেই। তাছাড়া এতো হামেশাই আমরা দেখছি।

বিশেষকে সামান্যের বা নিয়মের মধ্যে আনাই বিচারশক্তির কাজ। এ নিয়ম আমাদের আগে থেকে জানা থাকতেও পারে। অনেক সময় নিয়ম আমাদের খুঁজে বার করতে হয়। যখন নিয়মটি জানা থাকে, এবং তাকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি তখন সে বিচারকে কান্ট পরিচ্ছেদক বিচার বলেছেন।

বুদ্ধির দ্বারা যে নিয়মগুলি করেছি তা তো সাধারণ নিয়ম। এই বৌদ্ধিক নিয়ম ছাড়া জ্ঞান সম্ভব নয়। কিন্তু ঐ সব বৌদ্ধিক নিয়মের দ্বারা আমরা সাধারণ ভাবে বা অতি ব্যাপকভাবে প্রকৃতিকে জানি। প্রাকৃত পদার্থের একান্ত বৈশিষ্টটি জানতে হলে এই ধরণের ব্যাপক আবশ্যিক নিয়ম দিয়ে তো জানা যাবে না। বিশেষের আধারে রূপের সে অভিব্যক্তি তার জন্য ঐ আবশ্যিক নিয়ম যথেষ্ট নয়।

সুতরাং বৌদ্ধিক সাধারণ নিয়মকে আমরা আবশ্যিক নিয়ে বলে, বিশেষের ক্ষেত্রে সে নিয়ম প্রয়োগ করে ঐ বিশেষকে জানি, সে নিয়মকে বৈকল্পিক নিয়ম বলতে পারি। এই ধরণের বৈকল্পিক নিয়মের মধ্যে অনিবার্য্যতা নেই, যখন নিয়মটিও আমাদের খুঁজে নিয়ে বিশেষকে সেই নিয়মের আলোতে জানতে হয়, সেখানের নিয়মকে কান্ট বলেছেন বৈমর্শিক বিচার। তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে পরিচ্ছেদক বিচারের বেলায় নিয়মটি আমাদের আগে থেকে জানা থাকে, আর বৈমর্শিক বিচারের বেলায় নিয়মটিও আমাদের খুঁজে বার করতে হয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে বিশেষকে তার স্বরূপে উদ্ভাসিত করাই বিচারশক্তির কাজ।

কান্টের মতে আমাদের রসবোধ এই বৈমর্শিক বিচার শক্তির প্রকাশ। জ্ঞানীয় বিচার থেকে রস বিচার পৃথক। জ্ঞানীয় বিচারে আমরা বিষয়ের ধর্মটি জানি, কিন্তু রস বিচারের মূল কথা ঐ বিষয়টি আমাদের কেমন লাগে। এর ফলে বিষয়টির গুণধর্মের কথা ভুলে তার কল্পনা ও প্রত্যক্ষের ফলে যে আনন্দ পাচ্ছি তাই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। বিষয় থেকে বিষয়ী প্রধান হয়ে উঠে।

তাহলে এই আনন্দবোধই কান্টের মতে সৌন্দর্য্যের মূল কথা কিন্তু নলেনগুড়ের সন্দেশ দোকানে সাজান দেখলেও তো আনন্দ হয়, খাবার সময়ের আনন্দের কথা না হয় নাই তুললাম কিন্তু এ আনন্দ তো নিষ্কাম নয়, এক প্রকার দৈহিক উত্তেজনা এখানে জেগে থাকে। এই উত্তেজনার মধ্যে মানসিক ক্রিয়ার সামঞ্জস্য থাকে না। সৌন্দর্য্য বোধ জন্মায় আমাদের জ্ঞান শক্তির সামঞ্জস্য ক্রিয়ার ফলে, কামিক উত্তেজনার স্থান এখানে নেই। রবীন্দ্রনাথও একথা বারবার বলেছেন কায়িক আনন্দের উত্তেজনায় কামনা জড়িত আছে, কিন্তু সৌন্দর্যবোধ কামগন্ধহীন।

মনে রাখতে হবে কামগন্ধহীন মানে এ নয় যে নৈতিকদৃষ্টিতে যা ভাল, তাকেই বোঝান হচ্ছে। নৈতিকচেতনায় তো কামনা আছে, তা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হলেও তা কামনা তো বটেই। কায়িক বা নৈতিকদৃষ্টির আনন্দ কেবলই ফল প্রাপ্তির দিকে আমাদের প্রলুব্ধ করে; এ আনন্দ আপনাতে আপনি বিকশিত হয় না। কিন্তু সৌন্দর্য্যের আনন্দের পর্যবসান আপনাতেই হয়।

সৌন্দর্য্য যদি কামগন্ধহীন হয়, তাহলে স্বভাবতঃ প্রত্যাশা জাগে যে সকলে এ আনন্দের ভাগ পাবে। যা আমার কাছে সুন্দর, আমি ভাবব তা অন্য সকলের কাছেও সুন্দর হবে। সৌন্দর্য্যবোধ এক বিশিষ্ট আনন্দেরই প্রকাশ সে আনন্দ ব্যক্তিগত চাহিদার জোগানে সংকীর্ণ নয় বলে একে সার্বত্রিক আনন্দ বলতে পারি। রসবিচারকে এ কারণে সার্বত্রিক জ্ঞানীয় বিচার বা Logical Judgement রূপে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তা বলে সৌন্দর্য্য বস্তু নিষ্ঠ নয়।

জ্ঞানের অন্যসব বিষয় সম্বন্ধে যে ধরণের জ্ঞানীয় বিচার হতে পারে, রস বা সৌন্দর্য্য বিচারে তেমনটি সম্ভব নয়, কারণ অন্যান্য জ্ঞানীয় বিচারের মূলকথা জাতি বা শ্রেণী, রস বিচারের মূলকথা কিন্তু কোন ব্যক্তি বা individual.

কাণ্টের মতে জ্ঞান শক্তির সমঞ্জস ক্রিয়ার অভিব্যক্তিই সৌন্দর্য্য বা রস, তা যদি হয় তাহলে এখানে জ্ঞান শক্তি অর্থে কল্পনা ও বুদ্ধিকে বুঝতে হবে।

ব্যবহারিক জীবনে যাকে জ্ঞান বলি সেখানে দেখি কল্পনার স্থান অতি কম, কল্পনা যেটুকু আছে তা বৌদ্ধিক মূল সূত্রগুলিকে অনুসরণ করে চলে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের বেলায় আমাদের কল্পনার অবাধ গতি, বৌদ্ধিক নিয়মের দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু কল্পনা এখানে বুদ্ধির প্রতিকূলে না চলে, তবে আনুকূল্যই করে। কিন্তু কোন বাধ্যবাধকতার সম্পর্কে নেই এ দুয়ের মধ্যে। বুদ্ধি ও কল্পনার এ সমঞ্জস ক্রিয়াই তো সৌন্দর্য্য।

কিন্তু এ সামঞ্জস্যটি আমরা বুঝি কি করে? জ্ঞানের বিষয়ে কল্পনা বুদ্ধির অনুগামী হয়, তখনও একপ্রকার সামঞ্জস্যে নতুন কি আছে যাতে এক বিশেষ আনন্দানুভূতি জাগে? জ্ঞানীয় বিষয়বোধে কল্পনাক্রিয়া করে এবং এক নির্দিষ্ট বিষয় বোধে তা পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু সৌন্দর্য্যজনক বিচার শক্তিতে কল্পনা ও বুদ্ধি শক্তির এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনা অনুভব করি যা এক পূর্ণ বিষয় বোধে সমাপ্ত হয় না। শুধু এটুকু আমরা অনুভব করি যে এরা অনির্দিষ্ট ভাবে ও সামঞ্জস্যের সঙ্গে কাজ করছে, বুদ্ধি ও কল্পনার এই harmony বা সুসঙ্গতি এক প্রকার প্রীতির উদ্রেক করে, তাই সৌন্দর্য্য এ অবাধ সামঞ্জস্য জনিত যে অনুভূতি তা রূপ, স্পর্শ বা গন্ধের অনুভূতির মত নয়, জড় বস্তুর থেকে এ অনুভূতি জন্মায় না। রসজাত বা সৌন্দর্য্যজাত আনন্দের কারণ জ্ঞানীয় কারণ, ইন্দ্রিয় গোচর বিষয় নয়, সৌন্দর্য্যানুভূতি জনিত এ আনন্দ সম্পূর্ণ নিষ্কাম, এখানে কাণ্ট ও রবীন্দ্রনাথ বড় কাছাকাছি, রবীন্দ্রনাথ আত্ম-চৈতন্যের বিকাশের ওপর জোর দিয়েছেন, কাণ্ট কল্পনা ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য ক্রিয়ার ওপর, রবীন্দ্রনাথের এ সামঞ্জস্যবোধ আসে আত্মচৈতন্যের বিকাশ থেকে, আত্মার আত্মীয়তা থেকে। কাণ্টের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথে নেই। রবীন্দ্রনাথের দর্শনের কাব্য-ব্যাখ্যাও কাণ্টে নেই। নাই থাক, তবু দু'জনের সৌন্দর্য্য বিচারে নিষ্কামচেতনা ও সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় পাই।

কাণ্ট সুমহান বা Sublimity কাকে বলে তার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আমরা যেখানে অসীম শক্তি বা অসীম বিশালতার পরিচয় পাই সেখানেই সুমহত্তার আরোপ করে থাকি। পরিমাণ ও শক্তিভেদ অনুসারে সুমহানকে দুই ভাগে ভাগকরা যায়। পারমার্থিক ও শক্তিরূপে এদের পার্থক্য দেখান যেতে পারে, প্রথম শ্রেণীর পরিচয় পাই বিশাল গিরিমালায় বা সমুদ্রে, দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচয় মেলে জলপ্রপাতে, কিন্তু মজার কথা এই যে কাণ্ট মনে করেন সুমহত্তা বস্তুতে নেই। বস্তু উপলক্ষ মাত্র বস্তু দর্শনে সুমহানের যে বোধ জেগে ওঠে তাকেই মাত্র বিচার করতে হবে, পদার্থে সুমহত্তা নেই। বস্তু বিশাল হলেও তা সসীম, কিন্তু তার বোধ অসীম হতে পারে।

কল্পনা ও বুদ্ধির মধ্যের সামঞ্জস্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। কিন্তু সুমহানের বোধে ঐ সামঞ্জস্যের তো পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং একটা বিরোধই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, বিরাট বস্তুকে পূর্ণরূপে কল্পনা করতে তো স্বভাবতঃ বাধার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় বস্তুর বিরাটত্ব আমাদের অভিভূত করে। কাণ্ট মনে করেন এই অভিভব সাময়িক। আমাদের কল্পনা বস্তুকে যখন আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়, তখন জেগে উঠে আমাদের প্রজ্ঞা শক্তি। এই প্রজ্ঞা শক্তির প্রকল্পনায় আমরা সচেতন হয়ে উঠি এবং আমরা অসীমের কল্পনায় সমর্থ হই। কল্পনা যখন ব্যর্থ,তখনই প্রজ্ঞার জাগরণ ঘটে,

তখন বিরাট প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে রূপ ধারণ করে, এখানে প্রজ্ঞা ও কল্পনার বিরোধটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রস বা সৌন্দর্য্য তো অনুভূতি নির্ভর। কল্পনা শক্তি যখন অসীমকে ধারণ করতে সমর্থ হয় না, তখন সেই অসীমের স্বরূপ অনুভূত হয় প্রজ্ঞা শক্তির দ্বারা।

বাহ্যপদার্থের বিশালতায় নিজেদের প্রথমে ক্ষুদ্র মনে হয়, কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ি। আমাদের জড়-সত্তার ক্ষুদ্রতা বোধই এর মূলে। এই পরাজয়ের মনোভাব কেটে গিয়ে ক্রমশঃ জাগে প্রজ্ঞা দৃষ্টি। বাহ্য-পদার্থকে অসীমের নিকট ক্ষুদ্র মনে হয়। আমাদের অজড় প্রকৃতির মহীয়ানতা বোধ জাগে। কান্টের মতে এই বোধেই সুমহত্তা। কান্ট এ বোধকেও একপ্রকার রসবোধ বা সৌন্দর্য্যবোধ বলে মনে করেছেন। রসবোধে যে আনন্দ এই সুমহান বোধে সে আনন্দ নেই। এখানে শ্রদ্ধা ভক্তির ভাবটাই বেশী জাগে। কল্পনার সহজ লীলায় এ সহজ সুন্দর নয়, একটি মহান জিজ্ঞাসা যেন এই সুমহত্তাকে গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত করে।

অনেকের ধারণা রসিক লোক নৈতিক জীবনে শিথিল হন। কান্ট দেখিয়েছেন সুমহানের বোধ আমাদের নৈতিক জীবনের সহায়ক। রসবোধ যেমন রবীন্দ্রনাথের কাছে তেমনি কান্টের কাছে এক পরম আধ্যাত্মিক ব্যাপার সৌন্দর্য্য বোধ বিষয় নিরপেক্ষ এক পরম সন্তোষ।

আজ সমস্ত বিক্ষুব্ধ মানবসত্তাতো অমনই একটি আধ্যাত্মিক সন্তোষ খুঁজে মরছে। মানবমন থেকে বোধ হয় কেবলই একটি আক্ষেপ জেগে উঠছে—তা হ'ল ঐ সৌন্দর্য্যের, ঐ সুমহানের প্রতি শ্রদ্ধা বিজড়িত রস চেতনার।

বাংলা কাব্যে 'গঙ্গা'

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তি

সুদূর অতীতকাল থেকে গঙ্গা ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীর হৃদয়ে অকৃত্রিম ভক্তির একটি পুণ্যস্মৃতি বহন করে নিয়ে আসছে। নগাধিরাজ হিমালয়, দেবাদিদেব মহাদেবের লীলাভূমি কৈলাস ও মানসসরোবর আর তারই দেহ-নিঃসৃত নির্মল জলধারা যা অলকানন্দা, গঙ্গা, ভাগিরথী ইত্যাদি নামে স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে নেমে এসেছে—পুরাণ বর্ণিত সেই ভগীরথের গঙ্গাবতরণের কাহিনী আজও আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে উপভোগ্য মনে হয়। একদা প্রাচীন ভারতের মুণিঋষিগণ তাঁদের বৈদিক যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্মের সূচনায় যে স্নানমন্ত্র - 'কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করানি চ' অথবা তীর্থ আবাহন মন্ত্র—'গঙ্গে চ যমুনাচৈব গোদাবরী সরস্বতী' ইত্যাদি উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন তারপর থেকে অগণিত বৎসর অন্তে আজও হিন্দুর সকল ক্রিয়াকর্মের (ইহ-লৌকিক অথবা পারলৌকিক) সূচনায় তা অব্যাহত ভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। গঙ্গার আকর্ষণ অন্তরে অনুভব করেন না এমন মানুষ সত্যসত্যই বিরল। হিন্দুর অনেক তীর্থ যেমন উত্তর কাশী, হরিদ্বার, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল ও বারানসী থেকে নবদ্বীপ ত্রিবেণী দক্ষিণেশ্বর, কালিঘাট—অথবা কপিল মুনির আশ্রম গঙ্গাসাগর—পবিত্রতা ও পুণ্যতায় যে ভারতবাসীকে যুগ যুগ ধরে আবিষ্ট করে রেখেছে তার পশ্চাতেও রয়েছে গঙ্গার সক্রিয় ভূমিকা। বস্তুতঃ ভারতের চিরাগত ঐতিহ্য, শাশ্বত ধর্ম ও অন্তহীন সাধনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে গঙ্গার অমৃতনিস্যন্দী তোয়ধারা আর অসংখ্য ভক্ত কণ্ঠে উচ্চারিত সেই স্তবঃ—

"দেবী, সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে।
ত্রিভুবন তারিনী তরল তরঙ্গে॥"

আমাদের রামায়ন মহাভারতে যেমন গঙ্গার মহিমা কীর্তিত ও মুখরিত তেমনি কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল কবিগণই অল্পবিস্তর গঙ্গার গৌরব বর্ণনায় কাব্যকুশলতা প্রদর্শন করেছেন। ভারতচন্দ্রের বহুশ্রুত 'ভাগিরথী পূর্ব্বকূল বারাণসী সমতুল' অথবা রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত শ্লোকছন্দ :—

"নম নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গারতীর স্নিগ্ধসমীর জীবন জুড়ালে তুমি।"
ইত্যাদি

কাব্যপ্রাণ বাঙালীর গঙ্গার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তিরসের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্যান্য অনেক কবি তাঁদের কাব্যে 'গঙ্গা'কে নানাভাবে ও বিচিত্র কল্পনায় চিত্রিত করেছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যিনি বঙ্গজননী ও ভারতমাতার বন্দনায় বাংলা-কাব্যের ভাণ্ডারকে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সমৃদ্ধ করে অমৃতরসধারা ঢেলে দিয়েছেন তিনিও 'গঙ্গা'র উদ্দেশ্যে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে গেয়েছেনঃ—

"পতিতোদ্ধারিনি গঙ্গে।
শ্যামবিটপিঘন তটবিপ্লাবিনি,
ধূসর তরঙ্গ ভঙ্গে।
... ...
পরিহরি ভব-সুখ দুখ যখন মা
শায়িত অন্তিম শয়নে,

বারিব শ্রবণে মম তব জল কলরব,
বারিব শান্তি মম নয়নে।
বারিব শক্তি মম ক্লান্ত প্রাণে
বারিব অমৃত মম অঙ্গে,
মা ভাগিরথী! জাহ্নবী! সুরধুনি!
কলকল্লোলিনী গঙ্গে।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ 'গঙ্গা'র মাহাত্ম্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর একাধিক রচনার মধ্যে গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি ও 'গঙ্গার প্রতি' কেবলমাত্র কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গের নিদর্শন নয় এই দুটির ভাবগত তাৎপর্য্য বর্ত্তমান যুগের নাস্তিকতা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যাবে না। কবি যখন আত্মগতসুরে বলে ওঠেন:

"ধ্যানে তোমার রূপ দেখিগো, স্বপ্নে তোমার
চরণ চুমি,
মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি!
তুমি জগৎধাত্রীরূপা, পালন কর পীযূষদানে
মমতা তোর মেহুর হল, মধুর হল নবীন ধানে।"

তখন তাঁর ছন্দের ঝঙ্কারে ও শব্দের ব্যঞ্জনায় এক স্নেহশীলা মাতৃমূর্ত্তি আমাদের নয়নগোচর হয়। আমরা সেই মাতার ধ্যানগম্ভীর দেবীমূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করে কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে থাকি—

"অন্নদা তুই, অন্ন দিতে পিছপা নহিস বৈরীকে
গৌরী তুমি—ভৈরবী তুমি গিরিরাজের গৈরিকে।
লক্ষী তুমি জন্মনিলে বঙ্গ সাগর মন্থনে
পারিজাতের ফুল তুমি গো ফুটলে ভারত নন্দনে।"

কবির কল্পনা উপসংহারে গঙ্গার মধ্যেই আত্মনিমজ্জন করে এই পরম সান্ত্বনা লাভ করেছে:

"ধাত্রী! তোমায় দেখছি আমি—দেখছি
জগৎধাত্রী বেশ,
জয়গানে তোর প্রাণ ঢেলে, মোর গঙ্গা
হৃদি বঙ্গদেশ।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অন্য কবিতা গঙ্গার প্রতি ভাবের দিক দিয়ে যেমন গাঢ়বদ্ধ, তাবা ছন্দের দিকেও তেমনি শ্রুতিমধুর। কবি যেন অন্তরের ঐশ্বর্য্যকে রসপিপাসুর সেবায় নিবেদন করেছেন। কবির এই কাব্যে ভারতীয় জীবনদর্শনের শাশ্বত সত্যটি সাকার বিগ্রহ নিয়ে জেগে উঠেছে।

"অয়ি সুরধুনী ধারা। অমোঘ তোমার আশীর্বাদ
পালিছ সংসার তুমি লোকপাল—বিষ্ণুর প্রসাদ।"

* * * *

তোরে ঘিরি উর্দ্ধরতা, তোরে ঘিরি তব উপাসনা
তোরে ঘিরি চিতানল উদ্ধারের খসিছে কামনা
তীরে তীরে প্রেতভূমে, অয়ি রুদ্র জটা নিবাসিনী
শবেরে করিছ শিব তুমি দেবী অশিবনাশিনী।

* * * *

পর্ব্ব রচি তাই মোরা, তোরি তীরে মিলি বারবার,
পরশি তোমাকে—অয়ি পিতৃপুরুষের ভস্মাধার।
চক্ষে হেরি শূদ্র দ্বিজ সকলের মিলিত সমাধি,
অয়ি গঙ্গা ভাগিরথী! ভারতের অন্ত,
মধ্য, আদি।"

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা কাব্যের একজন গতানুগতিকতামুক্ত ভিন্ন পথের সাধক। তাঁর লেখনীতে গঙ্গাস্তোত্র এক অপূর্ব্ব লিরিক বেদনায়, প্রাণের গভীর ক্রন্দনে উৎসারিত হয়েছে:—

"চিরক্রন্দনময়ী গঙ্গে!
কুলুকুলু কলকল প্রবাহিত আঁখিজল
দেব মানবের একসঙ্গে!

* * * *

যুগে যুগে যত ব্যথা মানব পেয়েছে হেথা
তারি পূজা করি যে তা বুঝি না
তাই গাহি তব তীরে তাই নাহি তব নীরে
তাই চাহি ঘুমাতে ও কোলে মা!

* * * *

বন্দী ত্রিকালজয়ী গঙ্গে মূর্তিময়ী
অনন্ত জীব ব্যথা প্রবাহ।
অনাদি ও ক্রন্দনে মিশাইনু ক্রন্দন এ
বুঝে নে মা এ প্রাণের কি দাহ।"

রবীন্দ্রযুগের অন্যতম শক্তিমান কবি—যাঁর কাব্যে সুঠাম চাল, সুদৃঢ় বন্ধন, ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গী রসিক চিত্তকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে—সেই মোহিতলাল মজুমদারও পূর্বসূরীদের মত গঙ্গার মহিমা কীর্তন করতে বিস্মৃত হননি। তাঁর 'গঙ্গাতীরে' নামক কবিতাটি নানা বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কবিপ্রাণ এই কাব্যে অত্যন্ত আর্তগত সুরে গঙ্গার মাধুরীকে মনের মুকুরে প্রতিফলিত করে অনবদ্য ভাষা ও ছন্দে রূপায়িত করেছেন। এই কাব্যের সূচনা যেমন শ্রুতিমধুর তেমনি এর সমাপ্তি জীবনবোধের বা জীবনবেদের আশ্চর্য্য ও অভিনব ইঙ্গিতের পরিচায়ক :

"বহুদিন পরে দাঁড়াইনু আজ গঙ্গার এই কূলে—
পল্লীপ্রান্তে, পথ হ'তে নামি দিনের ভাবনা ভুলে।
জীবনের দিবা, যৌবন চিতা—শীত সায়াহ্ন ম্লান,
শ্রান্ত পথিকে তাই এ তীর্থ করিল কি আহ্বান'

কবি তীরে দাঁড়িয়ে প্রথমে গঙ্গার পারিপার্শ্বিকতাকে লক্ষ্য করলেন দৃশ্যমান জগৎ তাঁর চোখের সামনে নতুন যবনিকা টেনে দিল। কবি ধীরে ধীরে কল্পলোক থেকে অধ্যাত্মলোকে প্রবেশ করলেন। উপসংহারে সেই লোকোত্তর অনুভূতি গভীর এক আকুতিতে ও আত্মবিশ্বাসে অভিব্যক্ত হয়েছে :

"অতুল শান্তি বিপুল বিরতি আজিকে মাগিছে প্রাণ
মনে হয় এই গঙ্গার কূলে আছে তারি সন্ধান
আজ বুঝিয়াছি, কেন অন্তিমে এই বালু-শয্যায়
আমাদের দেশে যত মহাজন নয়ন মুদিতে চায়।"

রবীন্দ্র অনুসারী কবিদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় কবি কালিদাস রায়ও গঙ্গা বন্দনায় সার্থকতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর কাব্যের সরলতা, ছন্দোনৈপুণ্য, অলঙ্কারপ্রীতি এবং বৈষ্ণবকাব্য রসধারায় প্রীতিসংস্কার সব কিছু মিলিয়ে যা সৃষ্টি করেছে তা সত্যই অভিনবত্বের পরিচায়ক। তাঁর গঙ্গা নামক কবিতাটি কেবলমাত্র আকারেই দীর্ঘ নয়, বক্তব্যের দিক দিয়েও বিচিত্র স্বাদবাহী। এই কবিতার আদিতে কবির বন্দনাগান, মধ্যে ভারতের শ্রুতিস্মৃতির রোমন্থন আর অন্তে কবির বিনম্র প্রার্থনা আছে। নিম্নে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল :

"নমি সুরধুনী পতিত পাবনী তুমি সনাতনী সারাৎসারা,
নমি মা অমলা, কমলা-বাঞ্ছিত—চরণ-কমল-মধুর ধারা।

* * * *

অত্রি জায়ারে হেরি, তপোবনে আশ্রমে তোমা
আনিছে-টানি
হেরি তীরে তীরে সতী দেহ শিরে ফিরে সতীহারা
পিনাকপানি।
মৃতসুতবুকে হেরি শৈব্যাকে তব তটে পতি
চরণমূলে,
ভীষ্ম তোমায় পূজে এক কূলে, বাল্মীকি পূজে অন্য কূলে।

* * * *

তব সিকতায় মার মমতায় অনলশয্যা পাতিয়া রেখো,
তারকব্রহ্মনাম কানে দিও জননী আমার শিয়রে
থেকো
ইহ জীবনের শেষ সম্বল চিতার ভস্ম অর্ঘ্য নিও,
তব তীরে নীরে যার গুণে তরে ক্রিমিকীটও,
মোরে দিও তা দিও।"

রবীন্দ্র অনুগামী কবিগণ যাঁরা রবীন্দ্রভাবধারা ও রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই গঙ্গার মাহাত্ম্যকথাকে তাঁদের কাব্যের অঙ্গীভূত করেছিলেন। পরবর্তী যুগের কবিদের বিষয় ও কল্পনা এই ধারা থেকে ভিন্ন পথের আশ্রয় নেওয়ায় এবং রবীন্দ্রযুগের অধ্যাত্ম চেতনা তাঁদের কবি মানসে কিছু শিথিল হওয়ায় তাঁদের কাব্যকৃতিতে গঙ্গার প্রতি সমান ভক্তি ভাবের পরিচয় প্রায়শ পাওয়া যায় না। তথাপি একথা বলা

সমস্ত যে এযুগের অনেক কাব্যরসিক তাঁদের অন্তরে পূর্ব্বযুগের কবিদের স্থায় গঙ্গায় প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাব পোষণ করেন এবং গঙ্গাকে অবলম্বন করে সাহিত্যে-বা কাব্যে যা কিছু রচিত হয় তার প্রতি একটা সহৃদয় আকর্ষণ অনুভব করেন। মঙ্গল কাব্যের যুগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে গঙ্গার যে উত্থাপন করেছেন অথবা তাঁর পরবর্তীকালের কবি দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী কাব্যে যে বিষয়কে অবলম্বন করেছেন সেই কাহিনী ও কাব্যবস্তু একালের পাঠকের মধ্যে যে আবেদন জাগাতে পারে না সে কথা বলাবাহুল্য, কিন্তু এ কালের রসিক যিনি রবীন্দ্রনাথের-'জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুনা' পাঠ করবেন অথবা সুরসংযোগে শ্রবণ করবেন তিনি নিশ্চয়ই মনে প্রাণে গঙ্গার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হবেন এবং রবীন্দ্রঅনুগামী-কবিদের কাব্যকৃতি পাঠ করেও উদ্বোধিত হবেন।

গঙ্গার মহিমা হিন্দুর সংস্কারে যেমন রয়েছে শিরায়ধমনীর রক্তধারার স্থায় প্রবাহিত হচ্ছে তেমনি তার পুণ্যস্রোতধারার শাশ্বত ভক্তিস্মৃতি চির অম্লান হয়ে তার অন্তরলোকে বিরাজ করছে। তাই কবি হোন, প্রেমিক হোন, অথবা ভক্ত হোন—একেবার গঙ্গার দৃশ্য নিরীক্ষণ করলে অথবা তার সন্নিকটবর্তী হলে উৎফুল্ল হননা কিম্বা প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় পুলক অনুভব করেন না এমন ব্যক্তির সংখ্যা একালেও নেই বললেই হয়। কারণ ধর্ম্মপ্রাণ বাঙালী অথবা কাব্যরসিক বাঙালী বিগত যুগের কবির সঙ্গে আজও অনুভব করেন :

সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-বালকে
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্ন পাখীর পালকে।"

"স্বর্গত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের স্মৃতি তর্পণ"

পুষ্প দেবী

কবি কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় কি আমার আজকের? তাঁর শতাধিক কবিতায় লেখা চিঠি আজো আমার কাছে সঞ্চিত আছে, আছে তাঁর সঙ্গে কত ছবি। তাই মনের মধ্যে আজ কত যে কথার ভীড় তা ভাষায় বর্ণনা করা সহজ নয়। শিশু বয়সে কবিতার বইএ প্রথম তাঁর সঙ্গে পরিচয়। পাতলা একহারা একটি কিশোর, একমাথা কোঁকড়ানো চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়ানো। চোখ দুটি ভাবময় কিন্তু তাতে শিশুর সারল্য মাখা। তাঁর সেই চাহনির শেষ অবধি পরিবর্ত্তন হয়নি। মনটি ছিল পূত পবিত্র পতিত পাবনী গঙ্গার মত। অমন মানুষ আর দেখিনি।

শেষ তাঁর সঙ্গে দেখা বালিগঞ্জ প্লেসে তার পুত্র ডাঃ শরৎকুমারের বাড়ীতে। আসার সময় আমায় গাড়ী ভাড়ার টাকা দিলেন। বললেন নিতে হয় মা। এই উপলক্ষ্যে পাথেয় বলে একটি কবিতা আমার লেখা ছিল এখানে বলছি—

"ভরিল না মন পেয়ে ক্ষণতরে অমৃতের আস্বাদ
তাই তব গৃহে গিয়েছিল মেয়ে পাইতে আশীর্ব্বাদ
শিবদূর্গার কৈলাস তুমি হেরিয়া ভরিল মন

যাহা চাই আমি তারো চেয়ে ঢের লভিলাম বহুধন
বধূ কল্যাণী সুমধুর বাণী ঢেলে দিলো প্রীতি তার
আমি ফিরে আসি বুক ভরে লয়ে সেই প্রীতি সম্ভার
আসিবার কালে প্রণমি চরণে তুমি সঙ্কোচ ভরে
পাথেয় আমায় দিয়ে দিলে হাতে কত আপনার ক'রে
অভিভূত আমি বিচলিত আমি মনে পড়ে কথা কত
স্নেহময় মম জনকের স্মৃতি তুমি যেন সেই মত
বলিলে এসেছ বাপের বাড়ী মা পাথেয় লইতে হয়
দুটি হাত পেতে নিয়েছি আমি তা আনন্দ সঞ্চয়
সেই টাকা দুটি দিয়েছি রাখিয়া মাথা সে আশীর্ব্বাদ
তনয়ার তরে জনকের স্নেহ অমৃতের আস্বাদ
দুটি টাকা নয় পরশ রতন সোনা হয়ে গেল মন
তোমার স্নেহের গভীরতা স্মরি লভিলাম সেই ধন
তুমি জানিলে না বুকের মাঝেতে সমুদ্র উতরোল
বলে যায় সে যে অকথিত কথা সুগভীর কল্লোল।
পিতৃহীনারে পিতৃস্নেহের দিলে পুনঃ পরিচয়
আমার মনের গভীরে রহিল বলিবার যাহা নয়।

আমার পিতৃদেব (শ্রীনিকেতন সচীব সুকুমার চট্টোপাধ্যায়) এঁর পুণ্যকাহিনী পড়ে লিখেছিলেন—

"পিতাই তোমার স্বর্গ মর্ত্ত কি টান পিতার প্রতি
পরম পিতার পেলে সন্ধান তাইত ভাগ্যবতী"

তার লেখা যেন অমৃতের উৎস ছিল তার ছিল স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তাঁর লেখা একটি কবিতা "যদি" মানুষের নিত্যপাঠ্য হওয়া উচিৎ তার কয়েক ছত্র আমি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—

"যদি তবে তুমি রেখে দিতে পার চঞ্চল তব চিত্তকে
দাস বলে যদি ভেবে নিতে পার তুমি সব তব বিত্তকে
সন্তোষে যদি বহে যেতে পার হয়েছে যে তার অর্পিত
সম্পদে যদি বহিরান্তরে নাহি হও তুমি গর্বিত
প্রেমে আপনার করে নিতে পার যদি এ নীরস পৃথিবীকে
বিফলতা মাঝে বরে নিতে পার যদি চিরাগত সিদ্ধিকে
হাসি মুখে যদি সহে যেতে পার তুমি সম্মান লাঞ্ছনা
বঞ্চিত হয়ে তুমি যদি কভু অপরে না করো বঞ্চনা"

এই ছিল তাঁর লেখার ধারা, লেখাই শুধু নয় জীবনের আচরণেও তিনি তা পালন করে গেছেন। আর একটি কবিতার কথা বারে বারে মনে পড়ছে সেটির নাম হল

"ভৃত্য"

প্রভু হবার নাইক আমার শক্তি সামর্থ্য
যুগ যুগ ধরি পরিচারক আর আমিই যে ভৃত্য
মনুরে আমি যে করিনু মানুষ সহিয়াছি আবদার
কোলে করে আমি কান্না ভুলানু সেদিন মান্ধাতার
রামভদ্রের হামা গুড়ি দেখি হাসিয়া হয়েছি খুন
দাদা বলে মোর গরব বাড়ালো বালক ভীমার্জুন
... ...
উমার বিয়ের টোপর এনেছি আনিয়াছি চিঁড়া ক্ষীর
অক্রুর শাঁখা গড়ায়ে এনেছি বিবাহে সাবিত্রীর
দময়ন্তীর স্বয়ম্বরের বহিয়াছি শত ভার
ঘিরা গমনেতে সংগে গিয়েছি শ্রীবৎস-চিন্তার।
পাতিয়া দিয়াছি বেদব্যাসের আমিই আস্তিনাসন
জননান্তর ভাগ্য স্মরিয়া উড়ু উড়ু করে মন।

তাঁর লেখা "মাঝি তরী হেথা বাঁধবো নাকো আজকে সাঁঝে" অনেকে এ লেখাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বলে ভুল করতেন।

তিনি অন্তরে বাহিরে কায়মনবাক্যে বৈষ্ণব ও ভক্ত ছিলেন—তাঁর লেখার প্রতিটি ছন্দে তার প্রকাশ মনকে মুগ্ধ করতো। তাঁর লেখার বিষয়ে লেখার যোগ্যতা আমার নেই। আমার লেখার বিষয়বস্তু গীতা, উপনিষদ, ভাগবদ বলে তাঁর আমার প্রতি স্নেহের অন্ত ছিল না সেই অপরিমেয় স্নেহ ভাষায় প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই। যিনি এই মর্ত্য জগতে থেকে অমৃতের আস্বাদ সকলকে দিয়ে গেছেন আজ তিনি অমৃত রাজ্যের অধিবাসী হয়েছেন এই আমাদের সান্ত্বনা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

সন্তোষকুমার অধিকারী

১৯০৮ সালের ২সরা মে শেষরাত্রে শ্রীঅরবিন্দ পুলিশের হাতে বন্দী হলেন। মানিকতলার বাগান তল্লাসী করে বারীণ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বোমা তৈরীর মামলায় অন্যান্যদের সঙ্গে অরবিন্দকেও জড়ানো হল। আলিপুর কোর্টে এই বিখ্যাত মামলাটি যেদিন উঠলো সেদিন আসামীপক্ষ সমর্থন করতে এসে এক স্বল্পখ্যাত ব্যারিষ্টার যে অপূর্ব ভাষণ দিয়েছিলেন তা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। ব্যারিষ্টার সি আর দাশ সেদিন কোর্টে বলেছিলেন—

"My appeal to you is this, that long after this turmoil, the agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed, not only in India, but across distant seas and lands. Therefore, I say that the man in his position is not only standing before the bar of this court, but before the bar of the High Court of History."

চিত্তরঞ্জনের অপূর্ব বাগ্মিতা সেদিন বিচারপতি বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌কে এমনই মুগ্ধ করেছিলো যে সেই ঐতিহাসিক মামলায় তিনি অরবিন্দকে মুক্তি দিলেন। শুধু অরবিন্দকে। কিন্তু বারীণ ঘোষ ও উল্লাসকরের হল মৃত্যুদণ্ড। চিত্তরঞ্জন আপীল করলেন। আবার সেই ক্ষুরধার বিশ্লেষণী প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হল বাগ্মিতা। চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বে ব্রিটিশ আদালত টলে গেল। মৃত্যুদণ্ড রহিত হল। চিফজাস্টিস স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স তরুণ চিত্তরঞ্জনের মামলা পরিচালনায় মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করলেন—

"I desire in particular to place on record my high appreciation of the manner in which the case was presented to the court by their leading advocate Mr. C.R. Das."

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন সেদিন যে উক্তি করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। এই ঘটনায় চিত্তরঞ্জনের ভূমিকা স্মরণ করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে, চিত্তরঞ্জন মহাশক্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই এগিয়ে এসেছিলেন।

"You have all heard the name of the man who put away from him all other thoughts and abandoned all his practice, who sat up half the night day after day for months and broke his health to save me,—Srijut Chittaranjan Das................I had the message from within, "This is the man who will save you......"

মহাশক্তির প্রভাব ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু তাঁর স্বদেশচেতনা এবং মর্যাদা বোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল বলেই বারবার তিনি ব্রিটিশ শাসকের অন্যায় পীড়নের প্রতিবাদ করতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এর জন্যে সর্বস্ব পণ করতে হয়েছে তাঁকে। ১৯০৭ সালে ব্রহ্ম বান্ধবের পক্ষ সমর্থন করতেও চিত্তরঞ্জনই এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর প্রথম

আত্মমর্যাদাবোধের স্ফুরণ ঘটেছিল ছাত্রজীবনেই। তখন তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। জেমস ম্যাকলীন ওল্ডহামের এক সভায় নির্বাচনী বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন—

"Hindus are slaves and Mohammedans are none but indentured slaves. We have conquered India by the sword and we shall keep it by the sword."

চিত্তরঞ্জন লাফিয়ে উঠলেন। লণ্ডনের একটি সভায় ম্যাকলীনের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন—

"......To attribute all this to the sword and and then to argue that the policy of the sword is the only policy that ought to be pursued in India, is to my mind absolutely base and quite unworthy of an Englishman."

সম্ভবতঃ তাঁর এই উক্তির জন্যেই তাঁকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করানো হয়নি।

একদিকে স্বাজাত্যবোধ অন্যদিকে অন্যায়ের প্রতিরোধেচ্ছা, মুক্তির আকাঙ্খা এবং বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা চিত্তরঞ্জনকে ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রতাভোগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই নিজের জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের প্রলোভনকে তুচ্ছ করে তিনি সেদিন প্রত্যেকটি স্বদেশী মামলায় আসামী পক্ষকে সমর্থন করতে ছুটে গিয়েছেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, রেঙ্গুনের ডাক্তার মেটার মামলা, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। ১৯১৭ সালে মাদ্রাজ সরকারের আদেশে এ্যানি বেসান্ত অন্তরীণে আবদ্ধ হলেন। সে সংবাদ পেয়ে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলের সভায় চিত্তরঞ্জন যে বক্তৃতা দিলেন তা যেমন মর্মস্পর্শী তেমনই কাব্যময়। চিত্তরঞ্জন সেদিন বলেছিলেন—

"I do not think that the God of humanity was crucified only once. Tyrants and oppressors have crucified humanity again and again and every outrage on humanity is a fresh nail driven through his sacred flesh."

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে চিত্তরঞ্জনের ভূমিকা ১৯১৭ সালেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তাঁর আবির্ভাব নায়কের ভূমিকায়। তাঁর আবির্ভাবকে শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় দৈবনির্দিষ্ট বলা যাবে কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর পরিণত চিন্তাধারা এবং চিন্তার প্রচণ্ড গতিবেগ যে রাষ্ট্রনীতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের স্বরূপ দেশবাসীর সামনে তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি কিন্তু তাঁর আপোষ ও রক্ষামূলক মনোভাব মাঝে মাঝে অস্বস্তির কারণ ঘটিয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধের সঞ্চার হতে দেখে ব্রিটিশশাসক চণ্ডনীতি গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অসম্প্রীতির ভাব আন্দোলনের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু বিপ্লবীর দল তখনও পর্য্যন্ত দেশবাসীর আস্থা অর্জন করতে পারেনি। সেই মুহূর্তের বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জনের মত বলিষ্ঠ ও ঋজু ব্যক্তিরেই প্রয়োজন ছিল। মৌলানা আবুলকালাম আজাদ চিত্তরঞ্জনের সেই আবির্ভাবের ক্ষণকে স্মরণ করে বলেছেন—

"My mind goes back to C.R.Das. One of the most powerful personalities, thrown up by Non-Co-operation movement.........He was a man of great vision and breadth of imagination."

[India Wins Freedom]

দেশবন্ধুর চোখের সামনে সেদিন 'স্বরাজ' এর রূপ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে স্বাধীনতার আন্দোলনে গান্ধীজির সান্নিধ্য তিনি বেশী পেয়েছেন কিন্তু তাঁর চিন্তায় অরবিন্দের প্রভাবই বেশী কার্য্যকরী হ'য়েছে। গয়া কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন—

"I would rather rebel against the Congress and any institution in India if I felt that the realisation of the demand of Swaraj makes it necessary. I want Swaraj."

যদি স্বরাজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কংগ্রেস অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়, তবে আমি বিরুদ্ধেই দাঁড়াবো। আমি স্বরাজ চাই।

কি এই স্বরাজ? এ'কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বললেন—

"Swaraj is indefinable and is not to be confused with any particular system of Government. Swaraj is government by the people and for the people."

অর্থাৎ স্বরাজকে কোন একটি সংজ্ঞা দিয়ে বোঝা যায় না। কোন বিশেষ ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থাও স্বরাজ নয়। স্বরাজ হ'ল জনগণের জন্যে জনসাধারণ পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা।

তাঁর আগে এবং তাঁর পরেও এতখানি স্পষ্ট ভাষায় এবং এত দৃঢ়তার সঙ্গে স্বরাজকে কেউ বিশ্লেষণ করেনি। বরিশালের এক বক্তৃতায় তিনি আরও সহজবোধ্য ভাষায় পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসনের দাবি ঘোষণা করে বললেন - ইহা হিন্দুদিগের স্বায়ত্ব শাসন হইবে না, জমিদারের স্বায়ত্বশাসন হইবেনা, ইহা হইবে বাঙলার প্রজাতন্ত্রের স্বায়ত্ব শাসন।"

এই প্রজাতন্ত্রের দাবিকে উপস্থাপিত করেছিলেন চিত্তরঞ্জন আজ থেকে তেপ্পান্নো বছর আগে। সেদিনই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, এই স্বায়ত্বশাসনে প্রপীড়িত নির্যাতীত প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হ'বে।

অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোষ রফাকে তিনি ঘৃণা করতেন। ব্রিটিশ শাসন অন্যায় ও ঘৃণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে কোন সহযোগিতার কথা তিনি ভাবতে পারতেন না। কংগ্রেসের কর্মপন্থা হিসেবে অহিংসাকে তিনি অস্ত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন।

সঙ্গে তাঁর বার বার মত

ভাষায় বলেছেন—বর্তমান সময়ের অবস্থানুসারে কেবল চরকার সহায়তায়ই স্বরাজলাভ হইবে না। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে যখন শাসনসংস্কার আইন পাশ হয় তখন গান্ধীজি এমনকি তিলকও সহযোগিতার পক্ষে মত দেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ছিলেন সম্পূর্ণ প্রতিরোধমূলক নীতি গ্রহণের পক্ষে। ১৯২১ সালে ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ এদেশে এলেন। সমস্ত দেশে তীব্র উত্তেজনা। বাংলাদেশ চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে সেদিন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নামলো এবং বাংলাদেশের ষোল হাজার লোক কারাবরণ করলো।

কাউন্সিলে প্রবেশ নিয়েও গান্ধীজি ও রাজাগোপালচারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর প্রবল মতবিরোধ ঘটেছিল। যার ফলে দেশবন্ধু স্বরাজ্যদল গঠন করলেন। পরিণামে দেশবন্ধুর নীতির সার্থকতা প্রমাণ হ'ল এবং কংগ্রেস তথা গান্ধীজিও নীতিস্বীকার করলেন।

অহিংসা তাঁর অস্ত্র ছিল কিন্তু গান্ধীর কাছে ধর্ম। চৌরীচৌরার ঘটনায় হঠাৎ গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিলেন তখন সবচেয়ে বেশী বিক্ষুব্ধ হ'য়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। বিপ্লবকে তিনি স্বাধীনতার চেয়ে বড় মর্যাদা দিয়েছিলেন তাই গুপ্তবিপ্লবীদলের গোপীনাথ সাহার আত্মদানকে মর্য্যাদার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেননি। কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা সুভাষচন্দ্রকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করা হ'লে চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলেন। কর্পোরেশনের সভায় তিনি বললেন—"বিপ্লব বাদীর বর্তমান পন্থা ধরিলে আমি বিপ্লববাদী নহি, কিন্তু আমার মন বিপ্লবের পক্ষপাতী।...স্বাধীনতার জন্য বিপ্লববাদীদের যে হৃদয়াবেগ তাহা আমিও অনুভব করিতেছি। এই স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যদি আমার দুঃখভোগ কৃচ্ছসাধনা অথবা আমার প্রতিশোণিত বিন্দু পাতের প্রয়োজন হয় আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি।

মৃত্যুর মাত্র একমাস পূর্বে ফরিদপুর সম্মেলনে দেশবন্ধু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সে ভাষণ তাঁর পরিণত রাষ্ট্রজ্ঞান, দর্শনচিন্তা ও স্বদেশচেতনার পরিচয় বহন করে। কিন্তু সমকালীন বহুলোক তাঁকে ভুল বুঝেছিল। যাদের মধ্যে পল্লবগ্রাহী ভাবাবেগ, তাদের পক্ষেই সম্ভব সবকিছুর সমালোচনা। ২২ শে বৈশাখ ১৩৩২-এর(৫ই মে ১৯২৫) আনন্দ বাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়—"সুরেন্দ্রনাথের ডিগবাজী যাহারা ক্ষমা করে নাই তাহারা কি চিত্তরঞ্জনের রূপান্তর সহ্য করিবে?" ওই প্রবন্ধেই আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক মশাই লেখেন—ফরিদপুরের সভাপতির অভিভাষণ কৃত্রিম ও প্রাণহীন। এ'যেন ডিপ্লোম্যাট চিত্তরঞ্জন পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া বার্কেনহেডের উদ্দেশ্যে রাজীনামা পড়িয়া শুনাইয়াছেন।"

আনন্দবাজার পত্রিকা নিশ্চয়ই তার এ মন্তব্যের জন্য পরবর্তীকালে দুঃখীত হ'য়েছে। চিত্তরঞ্জনের চিন্তার গভীরতা এবং তাঁর দূরদর্শিতা বুঝবার মত ক্ষমতা তখন পত্রিকায় কারও ছিল না নিশ্চয়ই। ফরিদপুরে চিত্তরঞ্জনের ভাষণ প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন "শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সকলই আমার কথা।"

ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নিচু করেন নি এমন ব্যক্তি বিরল। আমেদাবাদ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলে চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে গভর্ণর লর্ড রোনালড্‌সে বলেছিলেন—"A great personality will preside over the destiny of India..." ডিপ্লোমাট হিউটরের মতে—"Mr Das was a more aggressive nationalist than Mr Gandhi." দেশবন্ধুর রাজনীতিক দূরদর্শিতা, বিপ্লবমূলক চিন্তাধারা, গভীর দেশপ্রেম, ত্যাগ ও আত্মদানের আদর্শকে রূপায়িত করে' পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরসাধকরূপে সুভাষচন্দ্র এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন সংগ্রামে এবং তাঁর প্রতিটি উক্তিতে আমরা দেশবন্ধুর ছায়া দেখেছি। সুভাষ দেশবন্ধুকে তাঁর গুরু বলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

জন্ম-জন্মান্তর

রামপদ মুখোপাধ্যায়

এর পরের ঘটনাগুলি—মহেশের মুখে যেমন ওর বন্ধু (আমার আত্মীয়) শুনেছিল—তেমনি করেই আমাদের বলেছে। এর কিছু অংশ অঘটনের পর্য্যায়ে পড়ে—সহজ বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ শেষ পর্য্যন্ত ঘটনার ধারা অনুসরণ করলে আশ্চর্য্য বোধ হবে। এমন স্তরে স্তরে শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজানো ঘটণা স্বকপোল কল্পনাতে সম্ভব নয়—, অথচ যা ঘটেছিল সেটাকেও যুক্তিগ্রাহ্য বুদ্ধির আলোতে স্বীকার করতে বাধে। আত্মীয় বলেছিল আমরা সেই সব ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। জানি বিরুদ্ধবাদীরা বিশেষ একটি প্রবণতার কথা তুলে আমাদের সাক্ষ্য প্রমাণকে অগ্রাহ্য করবেন। সংশয় তিমিরাচ্ছন্ন মানসক্রিয়ারই ফল বলে ঘোষণা করবেন তবু সত্য সত্যই যা যা ঘটলো চোখের সামনে —প্রগতিবাদের তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাই না, মধ্যযুগীয় মন,—সহজ বিশ্বাস প্রবণতা হয়তো বা ভাবালুতা, যাই সংমিশ্রণ হোক...জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করেই ঘটনাগুলো যথাযথ সাজিয়ে দিলাম। স্থান কাল পাত্রের স্বরূপ শুধু আবৃত রইল সূক্ষ্ম ছদ্ম আবরণে। যাঁরা কৌতূহলী হয়ে ওদের জীবন বৃত্তান্তে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে এগিয়ে আসবেন—তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। তাঁদের শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখছি অবিশ্বাসী মনের কৌতুহল চরিতার্থ করার বাসনা নিয়ে যেন না আসেন। কেন না—এই বৃত্তান্তের বুনিয়াদ হিন্দু জীবনের যুগযুগবাহী চিন্তাধারায় অনুস্যূত রয়েছে গীতার একটি শ্লোকে জন্ম জন্মান্তরের ক্রমপর্য্যায়টি ব্যাখ্যাত রয়েছে সুন্দর ভাবে।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥

চারটি ছেলে মেয়ে নিয়ে কাশীর বাড়ীতে এলো মহেশ। দেখল মায়ের মুখ ভার ভার,—ভাই এবং ভাদ্র-বৌয়েরা বিষণ্ণ। নিজ অন্তরের শোকের ঘন ছায়ায় সকলের মনকে দেখল মহেশ। বিচার করল নিজের যুক্তি দিয়ে। মা বললেন, একটা খবরও তো দিলিনে এদের—এরা দুঃখ করছিল।

খবর দেওয়ার সময় পেলাম না; হঠাৎই ঘটে গেল।

মা বললেন, অকূল পাথারে ফেলে গেল বউমা। এই এতগুলি কাচ্চা বাচ্চা—কি করে সামলাবিরে। এদের দিদিমা কি বলে?

জানই তো—ওঁদের সঙ্গে আমাদের তেমন ইয়ে ছিল না, মানে ইদানীং আসা-যাওয়া খবরা-খবর ছিল না

তাতো বুঝলাম—, কিন্তু মা-মরা ছেলে মেয়েরা মানুষ হয়, হয় মামার বাড়ীতে—না হয় তার নিজের বাড়ীতে—বাপ ঠাকুরদার কাছে। অবিশ্যি সৎমায়েতেও পালে। তা কথায় বলে—সৎমায়ের ছেদ্দা—পান্তা ভাতে ঘি।

মহেশ বলল, সেইজন্যেই তো এখানে নিয়ে এলাম-এখনও তুমি আছ ওদের, কাকীমারা আছেন।

মা বললেন, আমি আর আছি কই বাতে পঙ্গু জরায় জীর্ণ। অর্থে সামর্থে একেবারে সংসারে বাইরে। নেহাৎ যমের অরুচি বলে মরণ অভাবে বেঁচে আছি। আমি রইলাম বসে আর ভাগ্যমানি এয়োরাণী আমার ড্যাং ড্যাঙিয়ে চলে গেল। হায়রে কপাল?

মহেশ কি বলবে—নীরবে দাঁড়িয়ে ওর খেদোক্তি শুনতে লাগল।

যথা বিহিত শোক প্রকাশ সেরে মা বললেন, তু

বউমা আছেন বটে—ওরাওতো কচি কাচা নিয়ে নাজেহাল। পারে ভালই - সবাই ধন্যি ধন্যি করবে। পরে গলা খাটো করে বললেন, এখন কি আমাদের কাল আছে—, সবাই এখন—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

এইটুকু ইঙ্গিতেই যথেষ্ট। কিন্তু আর কোন উপায় ছিল না।—ভাইদের সংগে পরামর্শ করবে বলে রয়ে গেল কয়েকদিন। মহেশ এইটুকু বুঝলো বাপের ভিটে হলেও—পাকাপাকিভাবে এখানে ওরা ঠাঁই পাবে না। একই রক্ত-স্রোতটা তবু এক মুখী নয় জ্ঞাতিতে-প্রতিবেশীতে প্রভেদ সামান্যই।

মৃত্যুর অন্ধকারে মন এমনিতেই বিচ্ছিন্ন হতে চাইছিল, মায়াবন্ধন ভোগবাসনা বিষের জ্বালা ধরিয়েছিল। সেই জ্বালা বেদনার মধ্যে ধীরে ধীরে একটি সঙ্কল্প দৃঢ় হয়ে উঠেছিল—সংসার ত্যাগের সংকল্প। বাচ্ছাগুলোর কোনরকম একটা ব্যবস্থা করে বেরিয়ে পড়বে তীর্থভ্রমণে মুক্ত মনে চলে যাবে হিমালয়ের আশ্রয়ে। গিরিকন্দরে, গহণ অরণ্যে, দেবতার আলয়ে—মন্দাকিনীর উজান ধারায়, চিরতুষার রাজ্যে যে পথ স্বর্গালোকে উধাও হয়েছে। যে পথ চির নিরুদ্দেশের দেশে পৌঁছে দেয়, বাচ্ছাগুলোর ব্যবস্থা পাকা করে সেই পথ ধরবে।

সেদিন সন্ধ্যায় গঙ্গার চাতালে বসে সন্ধ্যা বন্দনার পর সেই কথাই ভাবছিল মহেশ। এদের কি হবে—এদের কি হবে—এই চিন্তার মূলে প্রবল বাসনার ক্রিয়াই অনুভব করছিল, বাসনাকে কেমন করে নির্মূল করা যায় সেই চিন্তায় যখন তন্ময়চিত্ত তখনই তার কানে গেল লঘু পায়ের শব্দ, কে যেন তার পিছনে কাছটিতে এসে দাঁড়াল। চোখ বুজেও তার সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে পারল মহেশ।

মহেশ ঘাড় ফিরিয়ে চোখ চাইল। সন্ধ্যা উৎরে গেছে, ঘাটের কোলাহল এখন শান্ত—দু'একজন ঘাটের কিনারার পাণ্ডা তক্তাপোষের উপর জপে মগ্ন। একটানা হাওয়া কখনো ঈষৎ প্রমত্ত হয়ে সিঁড়ির কিনারে ছলছলাৎ জলের সুর তুলছে। ঘাটের আলোটা কেমন যেন ঘোলা ঘোলা। হাঁ আবছা আলো—বিশ হাত দূরের মানুষকে চেনা যায় না। মুখ পাতলা অস্বচ্ছ কুয়াশা নেমেছে এই সিমানায়—মাঝ গঙ্গাও কুয়াশার চাদর মোড়া। হেমন্তের বিষণ্ন সন্ধ্যা সমস্ত চরাচরে তার বিষাদ বার্তাকে ছড়িয়ে দেয়, সারারাতে শিশির হয়ে ঝরে তার দুঃখ; –মন উদাস করা বেদনায় ম্রিয়মাণ সন্ধ্যা। মহেশের মনটা কেমন বিষণ্নতায় উথলে উঠল, মিথ্যা সংসার, মিথ্যা মায়া-বন্ধন কঠিন স্বার্থের সুতোয় শক্ত করে বাঁধা পাল্লা সব সময় কোলের দিকেই ঝুঁকে রয়েছে, মায়ের কি দোষ ভাইয়ের কি দোষ। যৌবনে বার্দ্ধক্যে আপন অধিকার আর আরামের পিপাসা—আদি বৃত্তি থেকে উৎসারিত। সত্যি এ সংসার ধোকার টাটি।

মহেশ।...সামনে থেকে ভেসে এলো স্বর। অস্পষ্ট কুয়াসা থেকে স্পষ্টতর হয়ে এলো মানুষটি। তার দিকে আসতে আসতে বলল, ও সব চিন্তা ছাড়। নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে তোমাকে।

মহেশ বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে বলল, মাস্টার মশাই। মূর্তি বলল, মহেশ তোমাকে বলতে এলাম এখনও ভোগভূমির আধখানা পথও পার হওনি—এখনও তুমি যাত্রী। যাও এগিয়ে যাও—

মাথা নাড়ল মহেশ, বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল, কোথায় যাব মাষ্টার মশায়, এই ভোগের কূপে—

মূর্তি বলল, কূপে নয় সরোবরে। ফিরতেই হবে তোমাকে। তোমাকে শান্ত করতে হবে ভবানীকে নতুন করে পাততে হবে সংসার।

না-না-মাষ্টার মশাই, না ও কথা বলবেন না, সত্রাসে বলে উঠল মহেশ।

আমি বলছি না—তোমার কর্ম তোমায় নির্দেশ দিচ্ছে। যাও, দুঃখ করো না। একদিন মুক্তি ভূমিতে অবশ্যই পৌঁছবে—সেই সুকৃতি তোমার আছে। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হলে চলবে না—সে তোমাকে শ্রমের দ্বারা অর্জন করতে হবে। দেখছ ওপরের চাতালটি, গঙ্গার কোল থেকে পর পর বারটা সিঁড়ি উপরে উঠেছে। ওগুলো সব পেরোলে তবে চাতাল। এক

একটা ধাপে পা না ঠেকিয়ে লাফিয়ে উঠতে পার ওখানে ?

না।

তবে ? সংসারও এমনি ধাপের পর ধাপ। কর্মের বন্ধন কি অমনি অমনি কাটে কর্মের দ্বারাই তার ক্ষয়। যাও—দেশে ফিরে ভবানীকে লাভ কর তোমার মঙ্গল হবে।

মাস্টার মশাই, শেষ বারের মত মিনতি জানাল মহেশ।

মূর্তি তখন চাতাল পেরিয়ে কুয়াশার মধ্যে এগিয়ে চলেছে—একেবারে মাঝগঙ্গার উপর দিয়ে চলেছে—পূর্ব কূলের বালুচড়ার দিকে, কুয়াশায় অস্পষ্ট একখানা হাত আশীর্বাদের ভঙ্গিতে উপরে উঠতে দেখা গেল তার পর কুয়াশা ঘন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মাঝগঙ্গায়।

উঃ—কতদীর্ঘ দিন পরে মাষ্টার মশায় দেখা দিলেন। উনি কি এখনও বেঁচে আছেন ? না কি দৃষ্টি ভ্রম ? কাপড়ের খুঁটে চোখ দুটি ভাল করে মুছে নিয়ে আবার চাইল মহেশ কুয়াশাহীন পরিষ্কার আকাশের ছায়া পড়েছে গঙ্গার বুকে-তারায় তরঙ্গে ঝিক-মিক করছে জল।

দৃষ্টিভ্রমই—মনের চিন্তা জট পাকিয়ে কাল্পনিক সংলাপের সৃষ্টি করেছিল। কি সাংঘাতিক চিন্তা। মতিভ্রমই বটে।

আশ্চর্য্য, পরের দিনও ঘটলো মতিভ্রম। গোধুলিয়ার মোড়ে চায়ের দোকানে চা খাবার জন্ত ঢুকছে—পেছন থেকে কে যেন ডাকল মহেশ।

মহেশ ফিরে দেখল—পিসেমশাই। দূর সম্পর্কের পিসেমশায়—থাকেন পাঁড়ে হাউলিতে। কচিৎ কখনো আসেন এদিকে। দশাশ্বমেধ বাজারে এলে যাতায়াতের সোজা পথ বাঙ্গালী টোলার মাঝখান দিয়ে—এরোর বটতলার মোড়।

মহেশ ফিরতেই পিসেমশায়, বললেন কি সব চিন্তা করছ—যাও সংসার করগে। ভবানীকে বিয়ে করে সুখী হও।

ভবানী। এই বিয়ে বার দুই শুনল ওই নামটি। কে ভবানী—; কোথায় থাকে, কেনই বা তার সঙ্গে জীবনকে যুক্ত করার কথা বলছেন এঁরা ?

মুহূর্তকালের চিন্তা মহেশকে আকুল করল। ও প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে কি যেন বলতে গেল—কিন্তু বলবে কাকে ? গোধুলিয়ার মোড়ে তখন সাইকেল রিক্সার ঠাসবুনুনিতে কুয়াশার চেয়েও দুর্ভেদ্য হয়েছে। পিসেমশাই তার মধ্যে হারিয়ে গেছেন।

চায়ের দোকানে না ঢুকে পাঁড়ে হাউলিতে এলো মহেশ। বাজারের থলি হাতে পিসেমশাই বাড়ী থেকে বার হচ্ছেন।

পিসেমশায়—আপনি কি এইমাত্র মোড় থেকে আসছেন ? শুধোল মহেশ।

গোধুলিয়া! বিস্মিত হলেন পিসেমশাই। এক সপ্তাহ ওদিকে যাইনি।

মহেশ আকুল কণ্ঠে বলল, কিন্তু আমি যে এইমাত্র দেখলাম—আপনি ভবানীর নাম করলেন। উত্তেজনায় মহেশের স্বর কাঁপছে।

ভবানী কে। অধিকতর বিস্ময়ে পিসেমশাই ওর মুখের পানে চাইলেন। শোক মানুষকে বুদ্ধিভ্রষ্ট স্মৃতিভ্রষ্ট করে এ তো জানা কথা। আহা বেচারা। ভাবলেন উনি।

মহেশ নিজেকে সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। তাড়াতাড়ি বলল, ও একটা মেয়ে। চলুন আপনার সঙ্গে বাজার পর্যন্ত যাই।

মা বললেন তুমি বাপু আবার বিয়ে কর—নাহলে এদের সামলাবে কে। তাই কি স্থির শান্ত ছেলে মেয়ে —একটি দিনে ভুলক্রাম বাধিয়ে দিয়েছে। মেজবৌমার কোলের বাচ্ছাটাকে এমন খামচে দিয়েছে, যাতে মেজ-বৌমা যাচ্ছেতাই করছে।

মহেশ বলল, মা ওদের আমি এখানে রাখব না—একটা ব্যবস্থা হলেই নিয়ে যাব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভাল রকম বাসা পাই।

মা বললেন, দেখ বাছা—আসবে তো ? ওই উৎপাত মেয়েটার মত যেন সব ফেলে ছড়ে পালায় না। আমি একা বুড়ো মানুষ, যাতে ভাল নজর চলে না।

তুমি নিশ্চিন্ত থাক—সাতদিনের মধ্যে আসছি আমি।

* * *

মনে শান্তি ছিল না। বন্ধুকে বলল, মনে করছি হরিদ্বার থেকে ঘুরে আসি—সংসারে কিছুতেই মন বসছে না।

বন্ধু বলল, বাচ্চাগুলোর কিছু ব্যবস্থা হলো ? ওরাই হলো পায়ের বেড়ি—জানি না ভগবানের একী পরীক্ষা! নিঃশ্বাস ফেলে বলল মহেশ, যদি না-ই ফিরি হরিদ্বার থেকে—ওরা কাশীর বাড়ীতে রইলো—এক একবার খোঁজখবর নিও।

বন্ধু মাথা নেড়ে বলল, তা হয় না। ওদের ব্যবস্থা না করে তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। তোমার ভাইয়েরা কি বলে।

মহেশ বলল, আমার অবস্থা এখন যাকে বলে :—

ন পিতা ন মাতা
ন বন্ধু ন ভ্রাতা
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেক ভবানী।

ভীষণ ভাবে চমকে উঠল মহেশ। লক্ষ্য করল বন্ধু। শেষ নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মহেশ বলল, তুমি ভাই বাধা দিয়ো না হরিদ্বার থেকে ঘুরে আসি একবার। ফিরে আসতে আমাকে হবেই—

স্থির হল পরশুদিন রাতের গাড়ীতে হরিদ্বার যাবে। তার আগে এলো কাশী থেকে একখানা টেলিগ্রাম। মীরা মিসিং উইথ বাবলু কাম সার্প মাদার।

বারো বছরের মেয়ে মীরা—আর সব চেয়ে ছোট ছেলে তিন বছরের বাবলু—হঠাৎ এরা গেলই বা কোথায় ? তবে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটল ? গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে, রাস্তায় গাড়ী চাপা কিংবা ছাদ থেকে পড়ে…ব্যাকুল মনে দুর্ঘটনার নানা ছবি আঁকা আর মোছা চলতে লাগল।

মা ওকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন ওরে বাবা কি সর্বনেশে ডাকাত মেয়ে। একটু বকেছি কিনা বকেছি অমনি কেঁদে যেঁযে একশা কাণ্ড। নিয়ে যাও বাবা—এগুলোকেও নিয়ে যাও—শেষকালে কি হাতে দড়ি দেওয়াবে।

ছেলে মানুষ—শহরের পথঘাট ভাল চেনে না—গেল কোথায়। উদ্বেগ প্রকাশ করল মহেশ।

ছেলে মানুষ। হুঁ—তাই বটে সাত সাহেবের নাক কান কাটা মেয়ে-কথার ঝুড়ি। কি পাকা পাকা বুলি বলে বাবা কি তোমাদের টাকা দেয়নি—তাই আমাদের ভাতের সঙ্গে মাছ দাও না।

অভিযোগ অনেক শুনলো। যতটা সম্ভব অনুসন্ধানও করলো কিন্তু কোথাও ওদের পাত্তা মিলল না।

অগত্যা এলাহাবাদে চরণকে একখানা চিঠি লিখে-অন্য ছুটিকে নিয়ে লক্ষৌ ফিরে এলো।

বন্ধুকে বলল, সমীর—তোর বাসাতেই এ ছুটোকে আপাতত রেখে দে—

সমীর বলল সে না হয় উপস্থিত, ব্যবস্থা হল, চিরদিন তো ওরা উদ্বাস্তর মত থাকবে না।

ভাবছি কাল থেকে ভাবছি ওদের সম্বন্ধে কি করা যায়।

সমীর বলল, আমার একটা যুক্তি নিবি ? নিস যদি তাহলে মনে হয় ওদের ভাল ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে ওদের কাছ ছাড়া হয়ে থাকতে হবে ইচ্ছে করলেই দেখতে পাবিনে।

মহেশ বলল, সেটা কঠিন হবে না কিন্তু ব্যবস্থাটা কি ?

গেল বার দেশ থেকে খুড়তুতো দাদা বৌদি এসেছিলেন আলাপ হয়েছিল আমাদের সঙ্গে। চমৎকার লোক ওঁরা। সহৃদয়। না হলে তোর মেয়ের বিয়েতে অযাচিত ভাবে টাকা পাঠান। আজকাল নিজের ভাইয়ের কথা কেউ ভাবতে পারে না—; জিজ্ঞাসা বাদ না করে পরের অভাব কোথায় ক'জন পারে বুঝতে ? টাকা কড়ির কথা উঠলে তো না শোনার ভান করে অথচ…। তেবে দেখ ভাল করে প্রস্তাবটা যদি ওঁদের কাছে তোলা যায় ভাল কি কিছু হবে না ?

মহেশ বলল কাচ ছেলেমেয়ে মাথায় অনেক ঝঞ্ঝাট যে তার নিজের মা ভাইএরা নিতে নারাজ—তা দূর সম্পর্কীয়দের কাঁধে চাপানো ঠিক হবে কি? কথাটা ভুলতে পারব না ভাই—।

বেশ তো তুমি ভুলো না। আমরা কৌশল করে জানাব। তোমার স্ত্রীর মৃত্যু আর ছেলে মেয়েদের অসহায় অবস্থার কথা জানাব। ওঁদের সাহায্য চাইব না। যদি ওঁরা প্রকৃত দরদী হোন—

না ভাই—, ও ভাবে মানুষকে বিপদগ্রস্ত করা উচিৎ নয়। এখন দিন কাল বিষম দেশে অন্ন, বস্ত্র, খাবার জিনিস অগ্নিমূল্য—এই সময়ে কারও কাছে কারও আতিথ্য নেয়াই পীড়ন করা। ও আমি পারব না। তুমি ওঁদের কিছু জানিও না।

সমীর বলল, সকলকার অবস্থা সমান নয়। আমরা চাকরি করি বাঁধা আয়—; ওঁর জমি জমা আছে, তাঁরাই লক্ষ্মীর দুলাল।

মহেশ কোন কথা বলল না।

সমীর বলল, বেশ তবে আর এক কাজ কর, এখানেও তো তোমার দুসপ্তাহ ছুটি রয়েছে—তুমি চলে যাও দেশে সরে জমিনে তদন্ত করে এসো ওঁদের সাংসারিক অবস্থা। কেমন সেই ভাল হবে না।

কি বিপদ—না হয় বিনা উদ্দেশ্যেই ঘুরে আসবে। হরিদ্বার যাচ্ছিলে—না হয় পূর্বেই যাবে। ওদিকেও তো কালীঘাট দক্ষিনেশ্বর আছে—

কি বলতে যাচ্ছিল মহেশ—সবেগে মাথা নেড়ে সমীর বলল, না-না—কিছুই শুনব না। দেশে তোমাকে যেতেই হবে। ওঁরাই তোমার প্রকৃত আত্মীয়—ওঁদের কাছে দুঃখের কথা জানানো তোমার কর্তব্য।

প্রকৃত আত্মীয়, কথাটায় কি যাদুমন্ত্র ছিল—মনটাকে নাড়া দিয়ে গেল। ওঁদের সাহচর্য্যে যে কপিট দিন কেটেছিল—স্মরণ হল। আহা—সে কত আমাদের কত আরামের দণ্ড প্রহর মূহর্তে ভরা দিনগুলি। বৌদির সেই আকুতি ভরা কথা—ঠাকুরপো, যা আদর যত্ন পেলাম চির জীবন মনে থাকবে। একটা কথা আমার রাখবে বল? জন্মে তো দেশ দেখলে না—একবার যাবে বল? একা নয়, সবাইকে নিয়ে যাবে—মাসখানেক থাকবে?

অতদিন!

তবু তো একমাস। না, না, কোন কথা শুনব না। আমাকে ছুঁয়ে বল—যাবে? তোমার ঠাকুরের সামনে সত্য করে বল—ভুলবে না আমার কথা, দেশে যাবে? বল যাবে? যাবে?

মহেশ বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল। সমীরও কিছু বলল না—ওকে ভাববার অবকাশ দিল। তারপর এই প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে পাঁজি টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল। মহেশ যদি কালই যাত্রা করে দিনটি শুভযাত্রার পক্ষে অনুকূল হবে তো?

অনেকক্ষণ পরে মহেশ বলল, কালই যাব—। তুমি ঠিকই বলেছ ওঁরা আমার প্রকৃত আত্মীয়—ওঁদের সব জানানো উচিৎ।

সমীর হেসে উঠল, দ্যাটস লাইক এ গুড বয়।

ট্রেন কামরায় উঠে পাথের হিসাবের কথা মনে হল। মনি ব্যাগ খুললো মহেশ। রেলের দৌলতে যাতায়াতের খরচ কিছু লাগবে না—বিনা শুল্কে বালিচক অবধি যেতে পারবে। পাশখানা ভাঁজ খুলে দেখে নিল একবার। তারপর টাকার খোপটায় আঙুল ছোঁয়ালো। একখানি মাত্র একটাকার নোট—আর সামান্য খুচরো রেজকি। কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনা এগারো হবে। অথচ পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ পথ—চব্বিশ ঘন্টারও বেশি। পেট ভরে না হোক কিছু জলখাবার চাই বালিচক থেকে খানিকটা পথ বাস ভাড়া আছে। আত্মীয়ের বাড়ী, একেবারে খালি হাতে ওঠারও লজ্জা আছে। কিছু না হোক—সামান্য মিষ্টি মাণ্ডা যা হোক...কিন্তু এযে শুধু লজ্জার ভারই বহন করে যেতে হবে। দুর্ভাগ্যের কাহিনী আর দৈন্যকে বিস্তারিত করতে হবে। ভগবান কি শুধু অপযশের ভারই বহন করতে পাঠিয়েছেন আমাকে। যাত্রার পূর্বে তহবিলের হিসাব নেওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু নিয়েই বা কি লাভ হতো। সমীরের কাছে চাইতে

পারত টাকা ? ওদের কাছে এযাবৎ কতই নিয়েছে— বাচ্চাগুলোকে ওদের সংসারেই গচ্ছিত রেখেছে—এছাড়া কায়িক পরিশ্রম উদ্বেগ দুশ্চিন্তার ভাগ কোনটার না অংশ ভাগ ওরা ? মরে গেলেও ওদের কিছু বলা সম্ভব ছিল না। এখন প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে চলেছে আত্মীয় বাড়ি—। নিকট আত্মীয়তার বন্ধনের স্বাদ—ইতিপূর্বে যথেষ্ট নেওয়া গেছে, তুলাদণ্ডে ওজন করে অর্থের বিনিময়ে মিলছে স্নেহ—পণ্য বস্তুরই রূপান্তর এই হৃদয় বৃত্তিজাত উপহার সামগ্রীগুলি। যাক যা হবার হবে—এখন পা যখন বাড়িয়েছে—তখনত্বরা হৃষিকেশবলা ছাড়া গত্যন্তর কি।

হাওড়া স্টেশনে নামল সকাল বেলায়—ভারী শীতল সকাল স্নান সেরে আহ্নিক তর্পণ করার লোভ জাগল। হাতে সময়ও ছিল অনেকখানি। ওদিকের গাড়ী ছাড়তে অন্তত চার ঘন্টা দেরী। পায়ে পায়ে চাঁদমারি ঘাটে এলো। তেল ছিল না। না থাক পলিমাটি খানিকটা মেখে নিয়ে জলে নামল। রাত্রি জাগরণ ক্লান্ত দেহ চিন্তাতপ্ত মস্তিষ্ক যেন জুড়িয়ে গেল। প্রাণ ভরে জপ করল, তর্পন করল—স্তব পাঠ করল। গঙ্গার একটানা হু হু হাওয়া পঁইঠায় আছড়ানো ঢেউএর শব্দ আর মিশ্র কণ্ঠের বিচিত্র আলাপ, অদ্ভুত এক আত্ম-তুষ্টির জগৎ। স্তব মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে মহেশ ডুবে গেল সেই জগতে।

গা হাত মাথা মুছে কাপড় জামা পরে ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়েছে—গরদের শাড়ী পরা এক ভক্তিমতী প্রৌঢ়া তার সামনে এসে বলল, বাবা, একটা কথা নিবেদন করব ?

মহেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল।

বর্ষিয়সী বলল, আমার ঘরে প্রতিষ্ঠা করা শিব আছেন—আজ পুরোহিত মহাশয় আসবেন না—আমার ইচ্ছে আপনি পুজোটি সেরে দিয়ে যান।

আমি! আমি তো ট্রেনের যাত্রী—ঘন্টা তিনেক পরেই আমার গাড়ী।

তিন ঘন্টা তো অনেক সময়—বর্ষিয়সীর মুখ উৎফুল্ল হল। এখান থেকে আমাদের বাড়ী—আধঘন্টা বড় জোর। যেতে আসতে এক ঘন্টা। তাহলেও আপনার হাতে রইলো পুরো একটি ঘন্টা। আপনার কি খুবই অসুবিধা হবে ?

মহেশ বলল, অসুবিধে বলছি নে—আপনার চেনা কাউকে ডেকে নিলে—

বর্ষিয়সী তাড়াতাড়ি বললেন, হয়তো হবে, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে আপনিই পুজোটি করে দেন। ঠাকুর তাতে খুশী হবেন, আমরা আনন্দ পাব। আসবেন না বাবা ?

মহেশ বলল, আপনার যদি তৃপ্তি হয়—চলুন।

আসুন বাবা—একটা ট্যাক্সি ডেকে নিন। আজ আমার পরম ভাগ্য—আসল ভোলানাথকে পেয়েছি কৈলাসের ভোলানাথকে তুষ্ট করার জন্যে

মহেশের ইচ্ছা হলো বলে—কৈলাসের ভোলানাথ যদি আসল হন,—তাহলে পথে পাওয়া ভোলানাথ খাঁটি আছেন কেমন করে। সে যাইহোক—ঘটনাটি ভারি বিচিত্র মনে হচ্ছে। যেন কোন ক্রীড়া-রসিকের ইঙ্গিতে ছকের পর ছক কেটে তৈরী হচ্ছে ঘরগুলি—খুঁটি গুলিও যথারীতিতে চলাচল করছে।

চিন্তায় আছন্ন ছিল পথটা চিহ্নিত রইল না। শুধু চিহ্নিত হল লাল রঙের বাড়ীটা, নকসা কাটা উঁচু সিংদরজা—খানিকটা দালিজ পেরিয়ে চওড়া একটি উঠোন। চকমিলানো বাড়ীর উঠোন। উঠোনের একধারে একতলা সমান উঁচু চুড়োওয়ালা শিব মন্দির—শ্বেত পাথরের নকসা কাটা দেওয়াল আর টালি বসানো মেঝে, দুয়োরের মাথায় একটি ঘন্টা ঝোলানো—আর চুড়াকৃতি মন্দির গর্ভ থেকে সরাসরি নেমে এসেছে একটি রূপোর ঝারি শিবের গ্রীষ্মকালে মাথায় জলধারা সিঞ্চনের ব্যবস্থা।

মন্দিরের একাংশে উঠোনটি বাঁধানো নয় মাটি ভর্তি। তাতে আকন্দ, শ্বেতকরবী, সাদা টগর, জবা, ধুতুরা জাতীয় ফুলের চারা—আর তারই মাঝখানে একতলা সমান উঁচু একটি বেল গাছ। মাটির গভীরতা বেশি নয়—এবং চারিদিকে পাকা ভিতের শাসন থাকায় গাছটির বৃদ্ধিপর্ব সীমিত। একতলা সমান উঠেই আকাশ ছোঁয়ার বাসনায়

নিরস্ত হয়েছে। তা হোক—গাছটিতে কিছু ফল আছে এবং পাতা আছে প্রচুর। ইটের গোলকধাঁধার বন্দী গাছটিকে কেমন অসহায় পথহারা মনে হচ্ছে। বনের পাখীকে খাঁচায় পুরলে যেমন লাগে, তেমনি শিবকে এবং তাঁর নিত্য পূজার উপচার উপকরণগুলিকে অট্টালিকার জঠরে বন্দী করে এঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন এটা এখানেই বোমানান ঠেকছে—কাশীতে বিশ্বেশ্বর মন্দিরকে তেমন ঠেকে না কেন? অত্যন্ত দৃষ্টির তারতম্যে কি?

দেব পূজার আয়োজনের মধ্যে সাচ্ছল্যের ছটা চোখে পড়ে। ধূপদান দীপদণ্ড ঘন্টা শঙ্খ-সম্পাধার তাম্রটাট কোশাকুশি ষোড়শউপচারের নৈবেদ্য—আর ভোগ পূজার বাসন কোসন। শিবের মাথায় রূপার সাপের ফনাকৃতি ছাতা—গৌরী পট্টের উপর রূপারই ছোট্ট একটি ডমরু। শ্মশানেশ্বরে রাজমহিমার আরোপ।

যে আসনটি সামনে পাতা রয়েছে—তার শ্রী ও শোভারই কি তুলনা আছে—আর পূজার আগে যে পট্টবস্ত্র পরিধান করল—তার মূল্য অনুমানেও ধরতে পারল না মহেশ। মহেশ পূজায় মনোনিবেশ করল।

পূজা শেষে ভক্তিমতী মহিলা একখানা পাঁচ টাকার নোট দক্ষিণাস্বরূপ পায়ের কাছে রাখলেন। সবচেয়ে দামি ফলমূল মিষ্টি উপচারের নৈবেদ্যটি হাতে তুলে নিয়ে মহেশকে বললেন, আসুন বাবা।

উঠোনের অন্য প্রান্তে তিন ফুকরের মাঝারি ঠাকুর দালান।

ছোট খাটো দুর্গা প্রতিমা থেকে যাবতীয় পূজা অনুষ্ঠান ওখানে হতে পারে। একসময়ে নিশ্চয় হতো এখনও হয় কিনা কে জানে। বাড়ীটার আগাগোড়া বিজলী ব্যবস্থা,—শুধু দালানেই পুরাতন কালের ঝাড় লণ্ঠন বাতিদানের আসর সাজানো। শ্বেত পাথরের ঝকঝকে মেঝে। তার উপর আসন বিছিয়ে—মহিলা বললেন, বসুন বাবা।

ঠাকুরের জলপানির থালাখানা সামনে নামিয়ে দিয়ে আর একবার প্রসাদ সেবা করুন বাবা। না-না-এ আর কতটুকু—আজ তো আপনার বরাতে অন্ন নেই, এ সামান্যই ফলমূল, সেবা করুন।

মহেশ দুহাত কপালে ঠেকিয়ে অল্প হাসল। হয়তো বা মনে মনে বলল, চমৎকার তোমার ব্যবস্থা শিবঠাকুর শ্মশানবাসী হয়েও রাজভোগের ব্যবস্থা করতে পার।

আহারান্তে হাত মুখ ধুয়ে দালান থেকে নামতে—কর্তা এলেন ব্যস্ত হয়ে। দাঁড়ান ঠাকুর মশায়,—প্রণামটা সেরে নিই।

প্রণাম সারলেন—। উনিও দক্ষিণা দিলেন—এক খানা পাঁচ টাকার নোট। বিস্ময়ে অভিভূত হল মহেশ। কাশীতে জাগ্রত বিশ্বেশ্বর কোন দিন এমন প্রসন্ন মধুর কৃপার পরিচয় দেন নি। মাতৃহারা অনাথ বাচ্চাদের নিরুদ্বিগ্ন আশ্রয়ের জন্য সকাল সন্ধ্যায় আকুল প্রার্থনা জানিয়েছে মহেশ। কোন সময়ের জন্য তাঁর কৃপাকণার ইঙ্গিতটুকু পায়নি। আজ এত দূরে গৃহ প্রতিষ্ঠিত শিবের মাধ্যমে তাঁর দাক্ষিণ্য পাঠাবার সময় হল বুঝি। হায় শিব—আর সামান্য দিন আগে কেন তোমার করুণার কণা বিতরণ করলে না। এ করুণাই তো, না করুণার আবরণে ছলনা।

ক্রমশঃ

প্রতিবেশীর আঙ্গিনায়

মীরা রায়

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল একযুগ আগে পর্যন্ত ভারতবাসীর কাছে লৌহ যবনিকার অন্তরালে ছিল। সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক কোন রকম যোগাযোগ নেপালের সঙ্গে ভারতের তখন পর্যন্ত ছিল না বল্লেই চলে। রাজতন্ত্রের দেশ নেপাল, রাজাই সেখানে সর্বেসর্বা এবং তিনি দেশে এবং বিদেশে সকলের নাগালের বহু উঁচুতে থাকতেন। তিনি সকলের কাছে অদৃশ্য হয়ে এক অপার্থিব দেবতাবিশেষ হয়ে বাস করতেন। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর থেকে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনায় উদ্যোগী হওয়ায় ভারত ও নেপাল পরস্পর ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছে। নেপাল এখন ভারতের পরম মিত্র প্রতিবেশী এবং ভারতের সঙ্গেল নানাপ্রকার আদান-প্রদান যোগসূত্রে সে আবদ্ধ। দুই দেশেরই রাষ্ট্রপ্রধানদের ঘন-ঘন আসা যাওয়ার ফলে দুই দেশের জনসাধারণের মনেও পারস্পরিক আদান-প্রদানের আগ্রহ জেগেছে। তাই এই প্রাচীন প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে তার রাজধানী কাঠমুণ্ডুকে জানবার ও দেখবার বাসনা প্রবল হওয়ায় ভ্রমণ-পথিকের ঝোলাঝুলি নিয়ে রওনা হলাম হিমালয়ের প্রহরাবেষ্টিত কাঠমুণ্ডুর পথে। বেশ কয়েকবছর আগেও পাহাড়ের দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে কাঠমুণ্ডতে যেতে হোত, কিন্তু সম্প্রতি ভারত সরকার সুদীর্ঘ 'ত্রিভুবন রাজপথ' বাস চলবার যোগ্য রাস্তা নির্মাণ করে দিয়ে সরাসরি কাঠমুণ্ডুর সঙ্গে ভারত সীমান্তের যোগাযোগের সহজ সুগম উপায় করে দিয়ে সকলের পক্ষেই খুব সুবিধা করে দিয়েছেন।

রক্সৌল ভারতের সীমান্ত শহর। এখানে চেকপোষ্ট ও কাষ্টমস অফিসের নানাবিধ বেড়াজাল পার হয়ে একটি ছোট নদী পার হয়ে নেপালের সীমান্ত শহর বীরগঞ্জে এলাম। এখানেও নেপাল সরকারের কাষ্টমস-অফিসার কিছু খানাতল্লাসী করে যাত্রীদের যাবার অনুমতি দিলেন, ভারতবাসী শুনলে এই তল্লাসের ব্যাপারে কড়াকড়িটা কিছুটা শিথিল হয় কারণ ভারত নেপালের বন্ধু-রাষ্ট্র। যদিও বিমানপথে কাঠমুণ্ডু দমদম বিমান বন্দর থেকে মাত্র তিনঘন্টার পথ, রক্সৌল হয়ে বাস যোগে সেখানে যেতে প্রায় দুদিন সময় লাগে। বিমানে গেলে হিমালয়ের পথের সৌন্দর্য দৃষ্টির অন্তরালে থাকে হিমালয় তার বনঅরণ্যের পর্বত-কন্দরের গ্রাম উপত্যকার অতুল সম্পদরাশি রহস্যময় আবরণে লুকিয়ে রাখে গতির আয়েসভোগী বিমানচারীদের কাছে। এতে না আছে গতির ছন্দ, না আছে হিমালয়কে জানবার দেখবার পদব্রজের দুস্তর তপশ্চারণা। পরিব্রাজক হিমালয়ের অঙ্গে অঙ্গে মিশে গিয়ে অন্তরে তার ডাক পাঠাবে তবেই সে শুনতে পাবে হিমালয়ের বার্তা, দেখবে তার অন্তর্নিহিত রূপটি। তাই বিমানপথ ত্যাগ করে বাস-পথে কাঠমুণ্ডু যাব বলে রেলপথে রক্সৌল হয়ে বীরগঞ্জে এসে রাত কাটালাম।

বীরগঞ্জে নেপালের রাষ্ট্রব্যাঙ্ক আছে। বেশীর ভাগ যাত্রীই এখানে ভারতীয় টাকার বদল করে নেপালী মুদ্রা সংগ্রহ করে নিলেন। ভারতীয় একশ টাকার পরিবর্তে নেপালী ১৩৩ টাকা পাওয়ায় যাত্রীরা সকলেই খুব খুশী। নেপালে ভারতীয় নোটের মতই দশ টাকা পাঁচ টাকা এক টাকার নোট এবং নয়াপয়সার মত দশমিক প্রণালীতে খুচরা পয়সার প্রচলন আছে।

পরদিন ভোর ছয়টায় বাস ছাড়ল কাঠমুণ্ডুর উদ্দেশ্যে। প্রথমে বেশ খানিকটা সমতল জায়গার পর পাহাড়ী চড়াই সুরু হল। উত্তর আকাশের পটভূমিকায় জেগে

রইল নগাধিরাজ হিমালয়ের আদিগন্তবিস্তৃত শৈলশ্রেণী। একটি পাহাড়শ্রেণী পার হয়ে উৎরায়ে নেমে এসে একটি সমতল উপত্যকা, এখানে কিছুক্ষণ বাস থামল তারপর আবার চড়াই এ উঠতে সুরু করল। পথে সিমরা, আমলকগঞ্জ, চৌরী, ভাঁইসি, দামন, পালং, থানকোট প্রভৃতি বহু পাহাড়ী গ্রাম পড়ল। বাসের ওঠানামার শেষ নেই, বাস উঠতে উঠতে প্রায় আট হাজার ফুট উঁচুতে দামনে এসে থামল, এখানে খানিকটা বিশ্রাম নেবার মত জায়গা একটা হোটেল আছে। এখান থেকে এভারেষ্টের শিখর ও হিমালয়ের অন্যান্য শিখরগুলি অত্যন্ত চমৎকারভাবে দেখা যায়। এবার নামবার পালা, দুধারে হিমালয়ের আরণ্যক শোভা দেখতে দেখতে প্রহরগুলোর পালিয়ে যাওয়ার হিসাব ছিল না, হুঁশ হল যখন দেখলাম বাস নেমে এসে প্রকাণ্ড এক সমতল উপত্যকার ওপর দিয়ে চলছে, অর্থাৎ আমরা কাঠমুণ্ডু উপত্যকায় প্রবেশ করেছি। তখন অপরাহ্নের সোনালী রোদে চারদিক ঝলমল করছে। সমুদ্রতল থেকে চার হাজার ফুট উঁচুতে এই উপত্যকা। চারদিকে হিমালয় পাহাড়ের প্রহরাবেষ্টিত; যুগ যুগ ধরে এই পাহাড়শ্রেণী কাঠমুণ্ডুকে বাইরের আক্রমণ থেকে সযত্নে রক্ষা করে এসেছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় না এতঘন পর্বতশ্রেণীর অন্তরালে এত বিরাট কোন উপত্যকা লুকিয়ে থাকতে পারে। বিদায়ী সূর্যালোকে মুখ ঢাকবার আগে কাঠমুণ্ডু শহর আমাদের অভ্যর্থনা জানাল।

শহরের প্রধান রাস্তা নিউরোড, এখানেই সব বাসের মূল কেন্দ্র। কাঠমুণ্ডু বেশ বড় শহর। ঝকঝকে পরিষ্কার প্রশস্ত রাজপথ, দুধারে সুন্দর সাজানো বড় বড় বাড়ী, হোটেল, সিনেমাহল সরকারী কার্যালয়, বিদেশী দূতাবাস, রত্নাপার্ক ইত্যাদি রয়েছে, আধুনিক সভ্য জগতের যে কোন বড় শহরের সঙ্গে কাঠমুণ্ডুর তুলনা চলে। শহরকে পিছনে রেখে আমরা ট্যাক্সি করে এগোলাম পশুপতিনাথের মন্দিরের দিকে, দুধারে ধানক্ষেত ও পুরানো কাঠের বাড়ী হচ্ছে শহরের বাইরের রূপ। শহর থেকে তিন মাইল পূর্বদিকে এসে পশুপতিনাথের মন্দিরসংলগ্ন অতিথিশালায় সেদিনের মত আমরা সকলে বিশ্রাম গ্রহণ করলাম। মন্দিরের পিছনেই বাগমতী নদী, উচ্ছল ধারায় বেগে ছুটে চলেছে, গভীর বেশী নয় কিন্তু প্রবলস্রোত। মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বহু সিঁড়ি নেমে গিয়েছে তার গর্ভে, এই সোপানবলীর একপাশে অতিথিশালা, ঘরের জানলা খুললেই চোখে পড়ে কল্লোলময়ী বাগমতীকে।

পশুপতিনাথ হিন্দুদের একটি পরম তীর্থ। কাঠের প্যাগোডাকৃতি ক্রমসঙ্কীর্ণমান দুটি থাক বিশিষ্ট এই মন্দিরের কারুকার্য, এক কথায় অনবদ্য। মন্দিরের গায়ে চতুর্দিকে নানারকমের দেবদেবীর সর্পাকৃতি ড্রাগন, দেবদাসী, সিংহমূর্ত্তি ইত্যাদি হরেকরকমের রংবেরং-এর মূর্ত্তি খোদাই করা আছে, মন্দিরের শীর্ষদেশে উর্দ্ধমুখী কলসচূড়া। সোনার কারুকার্যের জন্য এই মন্দির জগদ্বিখ্যাত। বিস্তৃত প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে আরও অনেক দেবদেবীর মন্দির রয়েছে। পশুপতিনাথের মূলধারের ওপরে পাথরে খোদিত হিমালয়শ্রেণীর মধ্যে দণ্ডায়মান এক পরম সুন্দর শিবমূর্ত্তি আছে। মন্দিরাভিমুখী এক বিরাট স্বর্ণকান্তি ষাঁড় সকলের দৃষ্টি অবরোধ করে বসে আছে।

পশুপতিনাথের মন্দিরের চারদিকে চারটি বৃহৎ রূপার পাতে মোড়া দরজা, চারিদিকে সরু শ্বেতপাথরের বারান্দা এই বারান্দাকে চারদিকে বেষ্টন করে আছে পেতলের তৈলাধারের সারি, উৎসবে এইগুলিতে বাতি জ্বালানো হয়। মন্দিরের দক্ষিণে রাজা মহেন্দ্রের উপাসনারত মূর্ত্তি। মন্দিরপ্রাঙ্গণ চতুর্দিকে ইলেকট্রিক আলোর মালায় সাজানো, আরতির সময়ে নিত্য জ্বালা হয় অতি সকালে মঙ্গলারতির পর একজন রক্তাম্বরধারী পুরোহিত মন্দির-দ্বার খুললেন। একটু বেলায় আর তিনজন পূজারী বাকী তিনটি দ্বার খুলে পূজা আর করলেন। গর্ভগৃহের মাঝখানে বিরাট বড় শিবলিঙ্গ চারদিকে চার রকমের শিবের মুখ খোদাই করা আছে শিরদেশে বিস্তৃত রূপার গৌরীপট্ট মাথার ওপরে স[illegible]

গর্ভগৃহ আচ্ছাদিত করে রয়েছে রূপার চাঁদোয়া। সেখান থেকে রূপার শেকলে বাঁধা বিরাট রূপার পাত্রভরা জল, একটুএকটু করে ছিদ্র দিয়ে পশুপতিনাথের মাথার ওপর অবিরাম পড়েছে। পূজারীরা রুদ্রপাঠ করতে করতে পূজা আরম্ভ করেছেন। চতুর্দিকে রূপার তৈজসপত্র, খড়্গ ইত্যাদি সাজানো আছে। গর্ভগৃহে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। পূজারীর হাতে দেবতার উদ্দেশ্যে ফলফুল মিষ্টি ইত্যাদি নিবেদন করতে হয়। নিরন্তর রুদ্রপাঠ করতে করতে দেবতাকে পূজানিবেদন করে পূজারী প্রসাদ দিচ্ছেন ভক্তদের। প্রবল বারিসিঞ্চনে পশুপতিনাথের স্নানপর্ব চলেছে, ফলফুল বেলপাতার পাহাড় জমছে আবার সেগুলি সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। নেপাল কৃষিপ্রধান দেশ এবং ধানের ফলন এখানে প্রচুর হয়ে থাকে। পশুপতিনাথের পঞ্চোপকরণে স্নানের সময় ধান বা কাঁচা চাল একটি প্রধান উপকরণ। সব শুভকাজে নেপালীরা ধান ব্যবহার করে থাকে। পশুপতিনাথের পূজাতেও এর ব্যতিক্রম নেই। প্রথমে একঘড়া চাল দিয়ে পশুপতিনাথকে স্নান করান হল তারপরে যথাক্রমে চিনি, দৈ, দুধ ও ঘি দিয়ে অঙ্গমার্জনার পর্ব চলল, সর্বশেষ বাগমতীর জলে স্নান করিয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে শিবলিঙ্গ পরিষ্কার করা হল। এবার শৃঙ্গারবেশের পালা।

শিবলিঙ্গের চতুর্দিকে একটি ফালি বেঁধে একটি নতুন ধুতি কুঁচিয়ে পরান হল। তার ওপর লালজরীর ঘাঘরা কুঁচিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। চারমুখে চারটি পৈতা চারটি ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এবার এল স্বর্ণমুদ্রাখোলান তিননলীর মালা, এই রকম চারটি মালা চারমুখে পরান হল। মুখের কপালে ঘন চন্দনের প্রলেপের ওপর লালরং করা চালের পুরু আস্তরণ পড়ল পাথরের চোখগুলির ওপর, কাঁচের চোখ ও কপালে কাঁচের ত্রিনয়ন বসিয়ে দেবার পর শিবমূর্তিকে খুব প্রাণবন্ত বলে মনে হতে লাগল। পূজারীরা মন্ত্রপাঠের মূলশিরে অর্পণ করলেন, তারপর চন্দনের প্রলেপের ওপর থাকে থাকে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে শিবলিঙ্গকে উচ্চতায় আরও বড় করে তুললেন। পশুপতিনাথের মূলমস্তকে স্বর্ণমুদ্রাখোলান রত্নমালা পরিয়ে দেওয়া হল, এর ওপর মণিমুক্তাখচিত বিরাট স্বর্ণ মুকুটটি স্থাপন করা হল। সোনার দণ্ডের ওপর সোনার ছাতা মণিরত্নের ঝালর ঝুলিয়ে শিবলিঙ্গের ওপর শোভা পেতে লাগল। সর্বোপরি বহুবিস্তৃত ফণা মেলে রইল এক অতিকায় সোনার সাপ, সেই বহুমুখী ফণা থেকে ঝুলতে লাগল বহু রংএর মণিরত্ন। চারপাশের চারটি মুখের ওপরও চারটি ছোট সোনার ছাতা লাগিয়ে দেওয়া হল। প্রায় দুইঘণ্টা ধরে এই শৃঙ্গার বেশ সম্পন্ন হল।

শৃঙ্গার বেশের পর দ্বিপ্রাহরিক ভোগের আয়োজন শুরু হল। রূপার বাটিতে পরমান্ন জাতীয় একরকমের রান্না মূলভোগ হিসাবে এল। রূপার পাত্রে আস্ত ফলের ডালি এল, রূপার গ্লাসে পানীয় রূপার ঘটিতে সরবৎ, রূপার ডিবায় পান, রূপার খড়্গ রূপার ছড়ি রূপার পাত্রে মার্জনার জল, চারিদিকে রূপার ছড়াছড়ি হয়ে রইল। সোনা রূপার ঐশ্বর্যের আস্তরণে ভক্তের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য অকুণ্ঠ ভক্তি গ্রহণ করলেন বৈরাগী মহাদেব তাই তাঁকেও রাজসিক বেশধারণ করতে হল। সঙ্গে সঙ্গে আরতি আরম্ভ হল, বেজে উঠল বিরাট ডমরু, কাঁসর, ঘণ্টা সানাই ঢাক দামামা। শিবলিঙ্গের চারমুখে চার পুরোহিত দাঁড়িয়ে আরতি করতে লাগলেন। পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূরবাতি, পঞ্চমুখী শাঁখ, চামর ইত্যাদি চারমুখের সামনে প্রদক্ষিণ করিয়ে আরতি সাঙ্গ হল। শাঁখ বাজল, শিঙা বাজল ধূপ কর্পূরের পবিত্র গন্ধের গাঢ় ধোঁয়ার মাঝে পূজারীরা বিভোর হয়ে আরতিস্তোত্র পাঠ করলেন। রূপে রসে শব্দে গন্ধে আলোবাজনার ডমরুর শব্দে সমস্ত চরাচর যেন শিবমহিমায় মাতোয়ারা হয়ে উঠল, মনে হল যেন শিবলোকে অবস্থান করছি।

এখানে বেশ সস্তায় পাওয়া যায়। মন্দিরের অলিন্দের চারদিকে রুদ্রাক্ষফল দিয়ে গেঁথে সুন্দর সুন্দর আলোর ঝাড় করে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুরোহিতরাও গলায় মাথায় হাতে বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করে পশুপতিনাথের সেবা করেন। চার দরজায় ভক্তের ভীড়, রূপার শাঁখ থেকে শান্তিবারি তাদের মাথায় ছিটিয়ে দিয়ে পুরোহিতরা দরজাগুলি বন্ধ করে দিলেন। নিমেষের মধ্যে সব বাজনা থেমে গিয়ে মন্দির নীরব স্তব্ধ হল, দেবতার ভোগ হবে লোকচক্ষুর অন্তরালে, হবে তারপর তাঁর শয়ন এবং বিশ্রাম। মন্দির আবার খুলবে বিকাল তিনটের পর। একঅপূর্ব মাদকতায় ভরামন নিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে গেলাম।

বিকালে মন্দির খুলবার পর আবার জনসাধারণের দর্শন ও পূজা চলতে থাকল। মন্দিরের ঢোকবার প্রধান রাস্তার দুপাশে পূজার সামগ্রীর দোকান বসেছে, নেপালী মেয়েরা বেশীর ভাগ দোকানে বিক্রেতার কাজ করছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মন্দিরপ্রাঙ্গনের চারদিকের ইলেট্রিকের বাতিগুলো জলে উঠেছে। পশুপতিনাথের সেই শৃঙ্গার বেশই আছে এবং সকালের ভোগারতির মতই সন্ধ্যায়ও আরতি হল, সেইরকম আলো বাজনা বাদ্য ধুপধুনা। সেইরকম সমারোহ, সেইরকম ক্ষণিকের মত শিবলোকের অনুভূতি। কাশীর বিশ্বনাথের আরতির সঙ্গে একমাত্র এই আরতির তুলনা চলে। আরতির পর ভোগ এবং ভোগের পর শয়নের ব্যবস্থা আছে। শীতের দেশ বলে রাত নটার পরই মন্দির বন্ধ হয়ে যায়, আলোক-মালায় উজ্জল সমস্ত মন্দির চত্বরটি নিরব নিথরভাবে ভাবী দিনের আলোর প্রহর গোণে।

নেপাল তান্ত্রিক দেশ। পশুপতিনাথের কাছে হাঁস, মুরগী, পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। এমনকি একটি ডিম ফেলে ভেঙে দিয়ে ডিমও বলি দেওয়া হয়ে থাকে। বাগমতী নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে বারশটি শিবমন্দির রয়েছে, এসব ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠে গেলে পড়ে বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, কোথাও দেবমূর্তি আছে, কোথাও নেই। এরপর উৎরাইএ নেমে গেলে পড়ে দেবী গুহেশ্বরীর মন্দির। একান্ন মহাপীঠের এটি একটি পীঠস্থান, দেবীর সতীঅঙ্গ গুহ্য এখানে পড়েছে। মন্দিরের মধ্যে কোন মূর্তি নেই, মাঝে চারচৌকা এক বাঁধানো জায়গা সমস্তটা সোনা দিয়ে মোড়া। মাঝে একটি গর্ত, সেটি জলে পূর্ণ। সোনা বাঁধানো জায়গাটি মানুষের নিতম্বের মত ঈষৎ স্ফীত। এইখানেই সব যাত্রীরা ফলফুল ধুপ সিন্দুরের ডালা দিয়ে পূজা নিবেদন করছে। এখানেও প্রচুর মোষ, হাঁস মুরগী ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। হাড়িকাঠ বলে কিছু নেই, পশুগুলোকে দাঁড় করিয়ে চেপে ধরে মুণ্ডছেদ করা হয়, মন্দিরের সমস্ত চত্বরটা কাঁচা রক্তে সর্বদাই ভিজে রয়েছে। মন্দিরের বাইরে স্তূপীকৃত মোষের মৃতদেহগুলি আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারই গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ভরপুর। দুর্গাপূজার তিনদিন এখানে প্রতিমিনিটে একটা করে বলি দেওয়া হয়ে থাকে।

দুর্গাপূজা বা দশেরা নেপালের একটি বড় উৎসব, সবমন্দিরে বিশেষ পূজা হয়। বিশেষ করে শক্তি মন্দিরে তিনদিন খুব উৎসব চলে। ভারতীয় দূতাবাস ছাড়া রাজার বাড়ীতে দুর্গপূজা হয়ে থাকে, অন্তকোথায়ও দশভূজা মূর্তি পূজার প্রচলন নেই। নেপালের সব চেয়ে বড় উৎসব শিবরাত্রি, এছাড়া রাজার জন্মদিন, রাষ্ট্রীয় দিবস, দেওয়ালী, সো যাত্রা, নববর্ষ, বৈশাখী বুদ্ধ পূর্ণিমা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে ছোট বড় উৎসব হয়ে থাকে। এইসব উৎসবে নেপালীদের লোকনৃত্য ও সঙ্গীত বেশ উপভোগ্য হয়।

কাঠমুণ্ড শহরটি বেশ সাজানো পরিষ্কার। নিউরোডের দুধারে বাসষ্ট্যাণ্ড, বাজার, সিনেমা, দোকানপাট, সরকারী ভবন ইত্যাদি আছে, এটি শহরের প্রাণকেন্দ্র। হনুমান ঢোকা আগেকার রাজার দরবার হল, এখন এটি সরকারী সেক্রেটারিয়েট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রাজা মহেন্দ্র শহরের উত্তরদিকে নতুন প্রাসাদ তৈরী করে চলে গেছেন সেখানে। নিউরোড ধরে উত্তরে গেলে আগেকার রাজবাড়ী সিংহদরবার পড়ে, এখন পরিত্যক্ত

অবস্থায় পড়ে আছে। কাঠমুণ্ডুর প্রাচীন বাড়ী ও মন্দিরগুলি প্রায় একই প্যাটার্নের দেখতে, মন্দিরগুলির মাথা কাঠের দুতিন থাকবিশিষ্ট, দরজাগুলি কাঠের কারুকার্যবিশিষ্ট ভীষণাকৃতি ড্রাগন সিংহ প্রভৃতি মূর্তি দরজায় পাহারায় রয়েছে।

শহরের তিন মাইল উত্তরে বাঁসবাড়ীতে নেপাল সরকার চীনার সহযোগিতায় একটি জুতার কারখানা স্থাপনা করেছেন, এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাঠমুণ্ডু তথা নেপাল বড় বড় শিল্পবিষয়ে এখনও বেশ অনগ্রসর আছে। কৃষিজ সম্পদের বিনিময়ে নেপাল প্রতিবেশী-রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক আদানপ্রদান করেথাকে এবং দেশের শিল্পোন্নয়ন কাজে উন্নততর দেশগুলির সহযোগিতাও কামনা করে।

বাঁশবাড়ীতে শহর শেষ হয়েছে, এরপর মেঠো পথ সুরু হয়ে সোজা উত্তরে শিবপুরি পর্বতের সানুদেশে চলে গিয়েছে, এখানে রয়েছে বুড়ানীলকণ্ঠ নারায়ণ মূর্তি। একটি বৃহৎ বাঁধানো জলাশয়ের মাঝখানে বিস্তৃত পাথরের সর্পশয্যার ওপর যোগনিদ্রায় শয়ান বিষ্ণুমূর্তি, জায়গাটি আরাধনার ভাবগম্ভীর পবিত্রতায় ও শান্ত নির্জনতায় অত্যন্ত মনোরম। এইরকম আর একটি বিষ্ণুমূর্তি আছেন বালাজু উদ্যানে। বাইশটি ড্রাগনের মুখ দিয়ে প্রস্রবণের জল নির্গত হচ্ছে, মাঝখানে শুয়ে আছেন বিষ্ণুমূর্তি। চারদিকে সুন্দর সুসজ্জিত বাগান গাছপালা জায়গাটিকে অপূর্ব করে তুলেছে।

কাঠমুণ্ডু শহরের বুক চিরে বাগমতী ও বিষ্ণুমতী এই দুটি প্রবল নদী বয়ে চলেছে। পশ্চিমে বিষ্ণুমতী নদী পার হয়ে গেলে পড়ে নেপালের মিউজিয়াম। বহু প্রাচীন দর্শনীয় বস্তু এখানে রয়েছে। প্রাচীন নেপালের রাণাদের সাজপোষাক অস্ত্রশস্ত্র, নেপালী কিউরিও ইত্যাদির সঙ্গে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল ও তিব্বতের যুদ্ধের গাদা বন্দুক এবং নেপোলিয়নের ব্যবহৃত তরবারিটিও নেপাল-মিউজিয়ামের অবশ্য দ্রষ্টব্য বস্তু। তিব্বতী ক্লোল রাজপুত পট, ব্রোঞ্জ ও অন্যান্য ধাতুর বিভিন্ন মূর্তি, বিশেষ করে বুদ্ধমূর্তির বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি এই সংরক্ষণ-শালায় সত্যই বিস্ময়কর দর্শনীয় জিনিস। এই সংরক্ষণ-শালায় জিনিসপত্র দেখলে মনে হয় প্রাচীন নেপালের রাণারা ভারত, তিব্বত, চীন ইত্যাদি মধ্য ও দূর প্রাচ্য এশীয় দেশগুলির সঙ্গে বেশ যোগাযোগ রাখতেন। নেপাল বুদ্ধের জন্মস্থান, এজন্য এর অধিকাংশ জনগণ বৌদ্ধপ্রভাবান্বিত এবং সেইজন্য কাঠমুণ্ডুর সর্বত্র বুদ্ধমূর্তি চৈত্য, গুম্ফা স্তূপ এসবের ছড়াছড়ি।

এই রকম একটি বৌদ্ধ স্তূপ মিউজিয়ামের কাছেই একটি ছোট পাহাড়ের শীর্ষদেশে রয়েছে। মিউজিয়াম থেকে এই রাস্তাটা ঘুরে ঐ পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই পাহাড়ের গায়ে খাঁজকেটে প্রায় হাজার খানেক সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে, সেই সোপানবলী অতিক্রম করে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা বেশ কষ্টসাধ্য। এই পাহাড়ের চূড়া থেকে সমস্ত কাঠমুণ্ডু শহর ছবির মত একনজরে আসে। একটি বিরাট বৌদ্ধ স্তূপের ওপর মন্দিরাকৃতি সরু চূড়া গগনমুখী হয়ে গেছে। তার চার পাশে চারজোড়া বড়বড় চোখ আঁকা আছে। ছোট ছোট পতাকার সারি দিয়ে চূড়াটি সজ্জিত আছে। প্রায় দুই হাজার বছরের পুরানো এই বৌদ্ধ স্তূপটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহিমময় ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। এই স্তূপটির পাশে একটি প্রকাণ্ড মন্দিরের মধ্যে অনুরূপ আতিকায় এক সোনার বুদ্ধমূর্তি আছেন, এঁকে স্বয়ম্ভূনাথ বলা হয়ে থাকে। কাঠমুণ্ডুর পাঁচ মাইল উত্তরপূর্বে গোকর্ণবন একটি সুন্দর পিকনিকের জায়গা, এখানে বনে জন্তু-জানোয়ার ছাড়া আছে, শিকার নিষিদ্ধ। প্রবেশমূল্য দিয়ে এখানে আসতে হয় এবং সরকারী অনুমতি যোগাড় করতে পারলে শিকারও করা যেতে পারে। এর কাছেই গোকর্ণেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। কাঠমুণ্ডুর শাক্তমন্দিরগুলির মধ্যে দক্ষিণাকালীর মন্দির তীর্থযাত্রী-দের কাছে পরম আকর্ষণের স্থান।

বর্তমান নেপালের রাজবংশ বিখ্যাত শাহ বংশের অবধারক। এই বংশের পূর্বতন রাজা পৃথী নারায়ণ শাহ বর্তমান নেপাল রাষ্ট্রের জন্মদাতা। অবিভক্ত দেশগুলিকে পুনর্গঠন ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে একত্রীকরণ করে

একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বেশের তিনি সূচনা করেন। তাঁর বংশের রাজারাই বর্ত্তমানে নেপালে রাজত্ব করেছেন। শাহ রাজবংশ ছাড়াও বহু প্রাচীনকালে নেপালে মল্লরাজবংশের রাজারা রাজত্ব করে গেছেন। প্রায় বারশত বছর আগে রাজা আনন্দমল্ল ভক্তপুরের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তারপরে রাজা যক্ষমল্ল বিশ্ব মল্ল, নরেন্দ্রমল্ল, রণজিৎ মল্ল, সুমতি জয়জিত্র মিত্র মল্ল, জগৎজ্যোতি মল্ল প্রভৃতি মল্ল বংশীয় রাজারা রাজত্ব করে গেছেন। মল্ল বংশের সবচেয়ে নামকরা রাজা ছিলেন রাজা ভূপতি ইন্দ্র মল্ল, তিনি নেপালের শিল্প সৌকর্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছেন এবং নিজেও বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা ও স্থপতিকলায় উৎসাহদান করেছেন। মল্ল রাজারা কাঠমুণ্ডুর পশ্চিম দিকে কীর্ত্তিপুর নামে একটি নগরের প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। এখন এখানে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কাঠমুণ্ডুর সব দেখা শেষ করে এবার নেপালের পূর্বতন রাজধানী পাটন ললিতপুর দেখতে আমরা রওনা হলাম। ২৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বীরদেও এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন, বর্ত্তমান নাম পাটন পূর্বেকার নাম ললিতপুর। স্থপতিকলায় শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত মন্দিরময় শহর কাঠমুণ্ডুর চেয়ে অনেক বেশী দর্শনীয় জায়গা। রাস্তার দুধারে কেবল মন্দির, প্যাগোডা, স্মৃতিস্তম্ভ, বৌদ্ধ গুম্ফা ইত্যাদি রয়েছে, সবগুলিই কাঠের ও পাথরের অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন। কাঠমুণ্ডুর দক্ষিণ পূর্বে তিনমাইল দূরে এই শহরটিতে আসতে গেলে বাগমতী নদী পার হয়ে আসতে হয়। নদীর ওপর নূতন আধুনিক ব্রিজটি ভারত সরকার নির্মাণ করিয়ে দিয়েছে। সরু সরু রাস্তা ঘিঞ্জি ঘেঁষাঘেঁষি করা জীর্ণ বাড়ীগুলি এই শহরটিকে আধুনিক কাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এত অসংখ্য মন্দির সবগুলি দেখা সম্ভব হল না বলে প্রধান কয়েকটি মন্দির আমরা দেখে নিলাম। মল্ল রাজাদের বাসস্থানে রয়েছে তাঁদের রাজদরবার গৃহ, তাঁদের নির্মিত দেবদেবীর মন্দির, প্রত্নতাত্বিক উদ্যান, পূর্বতন রাজাদের প্রস্তর মূর্ত্তি ইত্যাদি। এসব ছাড়া রয়েছে কুম্ভেশ্বর শিব মন্দির, জগৎনারায়ণ মন্দির এবং কৃষ্ণ মন্দির। জগৎনারায়ণ মন্দিরটি শখমুল নদীর তীরে অবস্থিত। আকৃতিতে দক্ষিণভারতীয় মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়। মন্দির অভ্যন্তরে নারায়ণ মূর্ত্তি আছেন। মন্দিরের সামনে বিরাট স্তম্ভের ওপর গরুড় মূর্ত্তি উপাসনারত। কৃষ্ণ মন্দিরটি প্রায় চারশ বছর আগে রাজা সিদ্ধি নরসিংহ মল্ল তৈরী করান। এই মন্দিরের গায়ে রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধের দৃশ্যগুলি উৎকীর্ণ করা আছে। পাটনের চার কোণে চারটি স্তূপ রয়েছে এর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ভারতের হিন্দুরাজা অশোক, যখন তিনি কাঠমুণ্ডু ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। সুদূর অতীতেও ভারত ও নেপালের মৈত্রীর পরিচয় বহন করছে এই অশোক স্তূপটি।

কাঠমুণ্ডুর নয় মাইল পূর্বে মল্লরাজাদের প্রতিষ্ঠিত ভক্তপুর শহরটি এবার দেখবার জন্য রওনা হলাম। ট্যাক্সি করে দুপুরে সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। ভক্তপুর গেটের কাছে সর্ব প্রথম নজরে পড়ল একটা বিরাট আটকোণা জলাধার, তারপর পড়ল মায়নগেট, এখানে হনুমানের মূর্ত্তি বসান আছে। এখানকার গোল্ডেন গেট নেপালী সৌন্দর্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি অতি মনোহর কারুকার্যবিশিষ্ট। মল্লরাজাদের একটি প্রাসাদ আছে তাতে পঞ্চান্নটি জানালাবিশিষ্ট একটি বারান্দা আছে, এটি বেশ বিস্ময়কর দ্রষ্টব্য বস্তু। মন্দিরের মধ্যে দত্তাত্রেয় মন্দিরটি দেখবার মত কিন্তু এটি দেখলে ভক্তি যত না উদ্রেক হয়, ভয়হয় তার অনেকগুণ বেশী। একটি শাল কাঠের গুঁড়ি থেকে নাকি এই মন্দিরটি রাজা যক্ষমল্ল চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্মাণ করেছিলেন। এখানে প্রচুর বলি হয়, চতুর্দিক কাঁচা রক্ত ও মাংসের গন্ধে ভরপুর। এর কাছেই ময়ূরাকৃতি কাঠের জানালাগুলি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া ভৈরবনাথের ও সূর্য বিনায়কের মন্দির আছে দেখবার মত। এই মন্দিরগুলি প্যাগোডার আকৃতিতে তৈরী। ভক্তপুর অথবা ভদগাওন হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরও

মধ্যযুগীয় স্থাপত্যকলার জন্ম বিখ্যাত, পাটনের তুলনায় ভক্তপুর বয়োকনিষ্ঠ। ভক্তপুর দেখা শেষ হল সেদিনের মত তার আয়ুর শেষ করে দিয়ে। কাঠমুণ্ডুর আশেপাশের প্রায় সবই দেখা হল, শুধু বাকি রইল নগরকোট। নেপালীরা এভারেষ্টকে সাগর মাথা বলে এই সাগরমাথা দেখবার জন্ম পুরো একদিনের কষ্ট স্বীকার করে যাত্রীরা কাঠমুণ্ডু থেকে আঠার মাইল দূরে এই নগরকোটে আসে। সাতহাজার ফুট উঁচুতে উঠতে হয় জীপ গাড়ীর সাহায্যে। টুরিষ্টদের থাকবার জন্ম নেপাল সরকার এখানে পাহাড়ের শীর্ষদেশে বাংলো তৈরী করিয়ে দিয়েছেন। এই চূড়ার ওপর থেকে হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গগুলি বেশ সুন্দর দেখা যায়। উত্তরপূর্ব কোনে ধ্যানগম্ভীর এভারেষ্ট পার্বতীচূহিতা কাঠমুণ্ডু নগরীকে ক্রোড়গত করে যুগযুগ ধরে তাকে সযত্নে প্রহরা দিয়ে আসছে। চারপাশের তুষার-সমুদ্রের নিশ্চল উচ্চ ঢেউগুলি যেন কোন মহাকালের ইঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে আকাশের পটভূমিকায় মিশে গিয়েছে।

ভ্রমণ-পথিকের থলি শুধু জ্ঞানসঞ্চয়েই পূর্ণ হয়ে ওঠেনা, সেই দেশীয় উপহার দ্রব্যও একান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে সেটা পরিপূর্ণ করতে। নেপালের নিজস্ব উৎপন্নসম্ভার দেখতে ও কিনতে আর একটা দিন বরাদ্দ করতে হল। কাঠমুণ্ডুতে ঘোরবার যানবাহনের অভাব নেই। প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়ে বাস চলাচল করে। বাঘআঁকা হলুদ রঙের ট্যাক্সিগুলিও শহরের সর্বত্র খুব সুলভ, তবে ভাড়ার হার আমাদের দেশের তুলনায় বেশী বলেই মনে হল। শহরের কেন্দ্রস্থলে অতি সুরম্য সুসজ্জিত রত্না পার্ক, এই পার্কের ধারে বাসকেন্দ্রগুলি রয়েছে। কাঠমুণ্ডুর রাজপথ-গুলি বেশ সুন্দর সুন্দর তোরণ ফোয়ারা রাজাদের প্রস্তরমূর্তি ইত্যাদি দ্বারা সুশোভিত। ইন্দ্রচক, নুথাসড়ক, তোতাহীত প্রভৃতি এলাকাগুলি কাঠমুণ্ডুর বাণিজ্য-প্রধান কেন্দ্র, এসব জায়গাগুলিতে দোকান বাজার প্রচুর আছে। নেপালের নিজস্ব কুটিরশিল্প ধাতুর, কাঠের ও নানাবিধ পাথরের কারুশিল্পকে কেন্দ্র করে খ্যাতিলাভ করেছে। নেপালী কিউরিওর মধ্যে মধ্যযুগীয় সব মূর্তি, বিভিন্ন দেবদেবীর ও বুদ্ধের বিভিন্ন ভঙ্গিমার মূর্তি।

ড্রাগনজাতীয় বীভৎস জন্তুর মুখ, ইস্পাতের ভোজালী পাথরের গহনা ও তার কারুকার্য করা পাত্র কাঠের তামা বা পিতলের কারুকার্যমণ্ডিত বিভিন্ন জিনিস পর্যটক-ক্রেতাদের মন আকর্ষণ করে। পশ্মের বাজারে নেপালী পশমবস্ত্রেরও খুব চাহিদা আছে। পশমী বস্ত্রশিল্পও নেপালের নিজস্ব শিল্প। পাহাড়ের সানুদেশে রুদ্রাক্ষগাছের প্রাচুর্য থাকায় কাঠমুণ্ডুতে রুদ্রাক্ষ খুব সস্তা, এত কমদামে রুদ্রাক্ষ আর কোথাও মেলেনা। পূজার্থীদের কাছে তাই নেপালী রুদ্রাক্ষের খুব চাহিদা আছে। কৃষিজাত ফসলের মধ্যে নেপালে সর্বত্র প্রচুর ধান চাষ হয়। নেপালীরা পরিশ্রমী জাতি, তারা পাহাড়ের কঠিন শ্রমসাধ্য বুকে ক্ষেতের পর ক্ষেতের সৃষ্টি করে নেপালকে কৃষিজ সম্পদে সম্পদশালী করে তুলেছে। ধান ছাড়াও গম ভুট্টা আখের চাষের প্রচুর ফলন এখানে হয়ে থাকে। পাহাড়ের গায়ে থাকে-থাকে সাজানো ক্ষেতের সোপানগুলি অতি মনোরম দেখতে লাগে।

নেপালে বড় বড় শিল্প এখনও ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাকে বহু জিনিস আমদানী করতে হয়। দক্ষিণে ভারতরাষ্ট্রের এবং উত্তরে তিব্বত চীনের সাহায্যে এই বাণিজ্যিক লেনদেন চলে। দক্ষিণে ত্রিভুবন রাজপথ দ্বারা যেমন ভারতরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ সহজসাধ্য হয়েছে, উত্তরেও তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষাকারী সড়ক আছে। এই রাস্তার সাহায্যে চীনার সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন করা সম্ভব হয়েছে। এশিয়ার মধ্য প্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্য দেশগুলি যেমন জাপান চীন তিব্বত সিঙ্গাপুর ভারত পাকিস্থান এদের সকলের সঙ্গে নেপালের ব্যবসায়গত যোগাযোগ আছে, তাছাড়া ইউরোপীয় দেশগুলিও নেপালের সঙ্গে আমদানী-রপ্তানী ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। ফলে বিদেশী গরম কাপড় নাইলন,

টেরিলিন, ঘড়ী, কলম, ক্যামেরা, রেডিও টয়লেটের আধুনিক বিলাসদ্রব্যাদি কলকাতার তুলনায় অনেক কম দামে কাঠমুণ্ডুর বাজারে বিক্রি হচ্ছে। পর্যটকদের মনে তাই প্রচুর পরিমাণে কেনবার লোভ জাগলেও কেনা সম্ভব হয় না কারণ সীমান্তে কাষ্টমস্ অফিসারদের অনুমতি না পেলে সে জিনিসপত্রগুলি অন্য রাষ্ট্রে আনা নীতিবিগর্হিত হয়।

পৃথিবীর বিশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি নেপালের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে; কাঠমুণ্ডুতে তাদের স্ব স্ব প্রতিনিধিদের আবাসগুলি তার পরিচয় বহন করছে। ব্যাঙ্ক, ক্লাব, লাইব্রেরী, হাসপাতাল, সিনেমা, সাংস্কৃতিক-কেন্দ্র এসব আধুনিক জীবনযাত্রার উপযোগী কোনকিছুরই অভাব নেই এখানে। বিদেশী যাত্রীদের জন্য কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রী এম্পোরিয়াম, পাটন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট এবং বালাজু ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট নেপালী পণ্যবস্তুর ডালা-পসরা সাজিয়ে বসে আছে, বিদেশীদের এই স্থানগুলো অবশ্য দ্রষ্টব্য। পশুপতিনাথ মন্দিরের কাছে গৌচর বিমান-বন্দর নির্মিত হওয়ায় বহির্জগতের সঙ্গে কাঠমুণ্ডুর যোগাযোগ ত্বরান্বিত হয়েছে। নেপাল ভারতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। এখানে সাতদিনের বেশী থাকতে হলে রাজার অনুমতি প্রয়োজন হত, এখন এ নিয়মের শিথিলতা দেখা যায়। সাতদিনের আগেই আমরা কেনাকাটা ও বেড়ানোর পালা শেষ করে ফেল্লাম। কাঠমুণ্ডুর কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়ে ঝোলাঝুলি ভর্ত্তি হয়ে উঠেছে, এবং এগুলি এমনই একান্ত নিজস্ব করে নিয়ে আমরা ফিরে যাচ্ছি যার ওপর সীমান্ত অফিসাররা একটি ক্ষমতার আঁচড়ও কাটতে পারবেনা এইরকম মানসিক সম্পদের আদান-প্রদানে দুটি প্রতিবেশী আরও নিকট থেকে নিকটতর হয়ে উঠবে। লোভের দানবকে এড়িয়ে চলে দেশের মানবকে আঁকড়ে ধরলে সে হৃদয়ের বন্ধন দুটি দেশকে যুগযুগ ধরে বেঁধে রাখবে। এই আশায়ই এক ছবি দেখতে দেখতে হিমালয়ের পর্বতপ্রাচীর ডিঙিয়ে তরাইএর জঙ্গলপথ ধরে সন্ধ্যায় কখন যে বীরগঞ্জের পথে এসে পড়েছি মনে নেই। সকালে যখন বাসে করে কাঠমুণ্ডু ত্যাগ করছিলাম, বর্ষামুখর বিষণ্ণ প্রকৃতিও আমাদের অন্তরের কান্নার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের বিদায় জানিয়েছিল। তার এই বিষণ্ণ বিদায়-অভিনন্দনে মনে হল, যেন এক ঘনিষ্ঠ পরম আত্মীয়কে রেখে যাচ্ছি প্রতিবেশীর আঙিনায়।

আমেরিকায় বর্ণবৈষম্য—
শিক্ষায়, সমাজে ও ব্যক্তিত্ববিকাশে

সন্তোষকুমার দে

বিচিত্র দেশ এই আমেরিকা। বিশাল পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যখনি ঝড়ঝঞ্ঝা, দুর্ভিক্ষ, প্লাবন ও মহামারিতে জনসাধারণ কষ্ট পেয়েছে, তখনি এই দেশের জনসাধারণ ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা সাহায্যের উপকরণ নিয়ে ছুটে এসেছেন। পৃথিবীর যে কোন অংশের লোকের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনায় তাঁদের হৃদয় পূর্ণ; অথচ এই দেশই আবার স্বদেশবাসীর ওপর (শুধু গাত্রবর্ণের জন্যে) সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক—এক কথায় সকল বিষয়ে অত্যাচার, উৎপীড়ন করতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না জীবন-মানের সার্বিক উজ্জীবনের শত্রুতা সাধন করতে। জেল থেকে কৃষ্ণাঙ্গকে জোর করে ধরে এনে ঠেঙিয়ে মেরে ফেললে, কি কাছাকাছি কোন আলোকস্তম্ভে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিলে, সে দৃশ্য উপভোগ করতে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ছুটে আসে, কেউ বাধা দেয় না। অথচ এদেশ গণতান্ত্রিক। জাতিধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সমান সুযোগ ও অধিকার দেবার বিধান তার শাসনতন্ত্রে বহুকাল হল বিধিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এও বাহ্য। এই দেশে যে শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা করা হয়েছে—সে শুধু শ্বেতকায়দের জন্যেই। কৃষ্ণ, পীত, লোহিত বা মিশ্র রঙের লোকের কাছে সকল দুয়ার বন্ধ। দাসত্ব প্রথা রহিত হবার একশ বছর পরে আজও সেখানে শুধু নিগ্রো নয়—মেক্সিকান, রেড-ইণ্ডিয়ান চীনা, জাপানী, পিউএরটোরিকান প্রভৃতিরা, জন্মসূত্রে ঐ দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সবরকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রায় দাসের মত জীবন যাপন করছে।

এতদিনে নিদ্রা এদের ভেঙেছে। তাই দেখা যায় ১৯৬৩ সালের ২৮শে আগষ্ট তারিখটি আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গেরা স্মরণীয় দিন বলে মনে করে থাকেন; কারণ ঐদিন আমেরিকান গান্ধী মার্টিন লুথার কিংএর (পরে তাঁকে শ্বেতাঙ্গের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল) নেতৃত্বে আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে আগত দুলক্ষ নিগ্রো শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে হোয়াইট হাউসে এক প্রতিবাদপত্র পেশ করেন। ঐদিন সমগ্র আমেরিকা কৃষ্ণাঙ্গদের একতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও নিয়মানুবর্তিতা লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

এরচেয়ে আরও স্মরণীয় শুভদিন হল ২রা জুলাই, ১৯৬৪। এইদিন হোয়াইট হাউসের উদীচী-ইষ্টহাউসে মার্কিন নাগরিক অধিকার বিলটী প্রেসিডেণ্ট জনসনের স্বাক্ষরে আইনে পরিণত হয়। এই আইনের বলে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সমানভাবে কৃষ্ণাঙ্গ ও মিশ্রবর্ণের লোকেরা সাঁতারের, আহারের ও ভোট দেবার অধিকার পেল।

বর্ণবৈষম্য-নীতি কত গভীরে প্রবেশ করেছে এবং কৃষ্ণাঙ্গদের (এক ভাষাভাষী ও একধর্মী হওয়া সত্বেও) সর্ববিষয়ে কি পরিমাণে অসুবিধা ভোগ করতে হয় তা তাদের জীবনধারা পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায়। প্রথমেই ধরা যাক, তাদের শিক্ষাবিষয়ে অসুবিধাগুলি।

১৯৫৭ সালে আমেরিকার শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ ছিল ৮,১৭৬,০০০,০০০ ডলার। কিন্তু এই বিপুল অর্থের অতি সামান্য অংশ মাত্র কৃষ্ণাঙ্গদের শিক্ষাবাবদে ব্যয় হয়েছিল।

দক্ষিণাংশে শিক্ষাব্যবস্থা

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় বিজাতিতত্ত্ব অনুসৃত হয়। গৃহযুদ্ধ অবসানের বহুকাল পর পর্যন্ত দক্ষিণাংশে নিগ্রোদের শিক্ষা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত অবস্থায় ছিল। ১৯০০ সালে মাত্র একটি রাষ্ট্রে—কেন্টুকিতে কৃষ্ণাঙ্গ বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক বলে ঘোষিত হয়। আজও সেখানে স্কুলে যাবার বয়সোপযোগী ছেলেমেয়েদের মাত্র ৪০% নিয়মিত ভাবে স্কুলে যায় এবং এদের প্রতি দশজনে একজন মাত্র পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌছায়। এই রাষ্ট্রটি শিক্ষায় এতই অনগ্রসর যে, এখানে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও ১১% এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে ৪৮% এখনও ভালভাবে লিখতে পড়তে পারে না। এরকম হবার কারণ হল, আমেরিকার দক্ষিণাংশ সাধারণত কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত, কাজেই এসব অংশ অত্যন্ত অবহেলিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বিশ্বপ্রেমিক রকফেলার ও পী-বডির অর্থানুকূল্যে কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার জন্যে কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছিল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে দক্ষিণের সমস্ত রাষ্ট্র থেকে নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে এক প্রবল অভিযান চালান হয়েছিল। এর ফলে সবত্র বিদ্যালয়ে যোগদান করা বাধ্যতামূলক হওয়ায়, এর নিট ফল ১৯৩২ সালে নিম্নলিখিতভাবে দেখা যায়:—

দক্ষিণাংশের সীমান্তবর্তী ১৫টা রাষ্ট্রের ৮৮৩ কাউন্টিতে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে ছোট ছোট ৫০০০ বিদ্যালয়-গৃহ তৈয়ার হয়; কিন্তু এই ক্ষীণ দীপশিখায় কতটুকুই বা যুগান্ত সঞ্চিত অজ্ঞান অন্ধকার দূর হবে? তাই ১৯৫০ সালের আদমসুমারি রিপোর্টে দেখা যায়, উত্তরে এবং দক্ষিণে স্কুল-না-যাওয়া নিগ্রো ছেলেমেয়েদের সংখ্যা স্কুল-না-যাওয়া শেতাঙ্গ ছেলেমেয়েদের সংখ্যার দ্বিগুণ। দক্ষিণাংশে শ্বেতাঙ্গ স্নাতকের সংখ্যা নিগ্রো স্নাতকের চেয়ে তিনগুণ বেশী। দক্ষিণে প্রতি ৭টি নিগ্রো ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র একজন হাইস্কুলের পড়া শেষ করে, আর উত্তরে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ হাইস্কুলের পড়া শেষ করে। বিশ্ববিদ্যালয়েও ঠিক এই অনুপাতে শেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গদের সমানুপাত দেখা যায়। যেসব রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ১০০ শ্বেতাঙ্গ স্নাতক বৎসরে বার হয়, সেখান থেকে মাত্র তিন জন কৃষ্ণাঙ্গ স্নাতক বার হয়।

এই অসঙ্গতির কারণ হল, নিগ্রোদের জন্যে কলেজ খুললেই শিক্ষার সমাধান হবে না—চাই সেই কলেজ-গুলি চালাবার মত অর্থানুকূল্য। শিক্ষাখাতে বাজেটের দিকে চোখ দিলে, একনজরেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝা যাবে। আগে শিক্ষাখাতে যে বিরাট ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে, তার কতটুকু এই কৃষ্ণাঙ্গদের স্কুল পেয়ে থাকে তা জানা দরকার। প্রতিটি শ্বেতাঙ্গ ছেলে মেয়ের শিক্ষায় জন্যে যে অর্থব্যয় করা হয়, তার অর্ধেক, কোথাও বা সিকি অর্থব্যয় করা হয় কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েদের জন্যে, কাজেই তাদের শিক্ষার প্রসার হবে কি করে?

কৃষ্ণাঙ্গদের শিক্ষার আগ্রহ

যে সব কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কৃষ্ণাঙ্গদের আবেদনের ফলে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে সেগুলি ছাড়া দাক্ষিণাংশে প্রায় সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশাধিকার এখনও পর্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। লুসিয়ানা ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৫৩ সালে প্রথম নিগ্রো অবস্নাতক এক ছাত্রকে প্রবেশাধিকার দেয় নি, পরে ফেডারেল কোর্টের হস্ত-ক্ষেপের ফলে ঐ ছাত্রটি প্রবেশাধিকার পায় এবং তার সঙ্গে আরও ১০৪ জন কৃষ্ণাঙ্গ ঐ কলেজে প্রবেশ করতে পারে। এখানে কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েরা কলেজ হোষ্টেলে প্রবেশাধিকার পেলেও, কোন শেতাঙ্গ তাদের সঙ্গে একই ঘরে বাস করবে না। এখানে কৃষ্ণাঙ্গেরা যেসব সুখসুবিধে পায়, তা তারা অন্য কোথাও পায় না। ভোজন কক্ষে, স্নানাগারে, কাফিহাউসে তাদের প্রবেশা-ধিকার আছে; কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে এক টেবিলে

বসবার অধিকার নেই। খেলার মাঠে বৈষম্য দেখান হয় না; কিন্তু সাঁতারের চৌবাচ্চায় বা নাচঘরে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। দক্ষিণের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটা বিশেষত্ব হল, প্রথমে তারা কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশ নামঞ্জুর করবে, সুপ্রীম কোর্ট হস্তক্ষেপ করলে প্রবেশাধিকার দেবে। দুটি মহাযুদ্ধে ও বিগত কোরীয় যুদ্ধে এবং বর্তমান ভিয়েৎনামে কৃষ্ণাঙ্গেরা যখন শ্বেতাঙ্গদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে, তখন কারও আপত্তি হয়নি; কিন্তু স্কুল কলেজে ভর্তি হতে দিতেই আপত্তি।

কালা আদমিদের কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সব বাধা জন্মাবার কারণ মনে হয়, আমেরিকান কংগ্রেস শিক্ষাবিষয়ে নিয়মতন্ত্র রচনা করেন না এবং ফেডারেল গভর্ণমেন্টেরও শিক্ষায়তনে বর্ণবৈষম্য নিষিদ্ধ করবার ক্ষমতাও নেই; কারণ শিক্ষা বিভিন্ন রাষ্ট্র ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন।

আজও দক্ষিণের ১৭টি রাষ্ট্র এবং ওয়াসিংটন ডি সি তে স্কুলকলেজে বর্ণবৈষম্য বহাল তবিয়তে বর্তমান। বছর কয়েক আগে প্রেসিডেন্ট ট্রুমান নাগরিক অধিকার বিলের' প্রশ্ন উত্থাপন করলে, দক্ষিণী-শ্বেতাঙ্গেরা তাঁর ওপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণী-শ্বেতাঙ্গেরা ডেমক্রেটিক কনভেনসনের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন, কারণ 'প্রেসিডেন্ট কমিসনের' প্রস্তাব ছিল, দক্ষিণে কৃষ্ণাঙ্গদের চাকুরি ও ব্যবসায়ে সুযোগ দান করা, লিঞ্চ-আইন উঠিয়ে দেওয়া এবং যানবাহন ও ভোজনাগার প্রভৃতিতে যেসব বর্ণবৈষম্য নীতি মেনে চলা হয়, সেগুলো উঠিয়ে দেওয়া। ট্রুমানের এই সব প্রস্তাব দক্ষিণী শ্বেতাঙ্গদের কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর বোধ হয়। তাঁদের সমবেত প্রতিবাদে ট্রুমানকে নতি স্বীকার করে বিল উঠিয়ে নিতে হল। বর্ণবৈষম্য নীতি সেখানে শিক্ষিত লোকের মধ্যেও এত অন্তস্থলে প্রবেশ করেছে যে, যখন উত্তর-কেরোলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাউয়ার্ডের মন্তব্য শুনি, "দাক্ষিণী-শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গদের আদবেই তাদের মত মানুষ বলে ভাবতে পারে না। এই মনোভাবটা মনে রাখা দরকার।" তখন আর অবাক হবার কিছুই থাকে না।

অন্যান্য অসুবিধা

বর্ণ-বৈষম্য শুধু শিক্ষাবিষয়েই নয়, সর্ববিষয়ে। জীবনের সমস্ত সুখ সুবিধা, গৌরব ও ঐশ্বর্য থেকে যুগযুগান্ত ধরে কৃষ্ণাঙ্গদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। কয়েকটা অসুবিধার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণে বহু রাষ্ট্রে জিম-ক্রো আইন আছে। এর ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের সর্বসাধারণের গন্তব্যস্থল যেমন উদ্যান, প্রেক্ষাগৃহ, হোটেল, রেস্তোঁরা প্রভৃতিতে যেখানে শ্বেতাঙ্গেরা গিয়ে থাকেন, সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের যাবার অধিকার নেই। ষ্টেশনে তাদের জন্যে ভিন্ন বিশ্রামাগার ও স্নানকক্ষ, গির্জার শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে প্রার্থনা করবার অধিকার নেই, যদিই বা কখন কখনও প্রবেশ করতে দেওয়া হয়, তাদের জন্য থাকে নির্দিষ্ট আলাদা আসন। অনুরূপভাবে ট্রেণে বা বাসে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে ভ্রমণ করবার অধিকার তাদের নেই। এ ছাড়া আছে ছোট খাটো উৎপাত ও অসুবিধা। এম ডি প্লেট গাড়িতে লাগিয়েও যখন কোন কৃষ্ণাঙ্গ ডাক্তার বার হন, পুলিস তাঁকে নানাভাবে হয়রাণ করে থাকে। পুলিসের ধারণা কালা আদমি যখন ভাল গাড়ি চালাচ্ছে তখন এটা নিশ্চয়ই চোরাই গাড়ি। কালা আদমি পথে ঘাটে সাহায্য চাইলে, পুলিস তাকে সাহায্য ত করেই না, করে নানারকম অপমান সূচক ব্যবহার।

এই নৈরাশ্যজনক অবস্থা ক্রমাগত আন্দোলন ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার ফলে একটু একটু করে শিথিল হচ্ছে। তাই দেখা যায় ১৯৬১ সালে উত্তরাংশে তিনটি সর্বপ্রধান রেললাইনে ভোজনাগার, বিশ্রামাগার, শৌচাগার ও টিকিট অফিসে যেসব বিধিনিষেধ ছিল তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়: কিন্তু সমগ্র আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের যে অপমান সহ্য করতে হয়, তার তুলনায় এই সুবিধাটুকু কতখানি? আমেরিকায় নিগ্রোদের "দশম মানুষ" বলা হয়; অর্থাৎ সমগ্র দেশে তাদের সংখ্যা হল ১০% শতাংশ; অথচ এদের কি পরিমাণ অপমান ও অসুবিধে না সহ্য করতে হয়।

এবার এই দশ শতাংশ লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা সরকার কি রকম করেছেন তার বিচার করা যাক। শ্বেতাঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার জন্যে ব্যয়বরাদ্দ অত্যন্ত কম। দক্ষিণের সমস্ত রাষ্ট্রগুলিতে শ্বেতাঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোট শিক্ষা ব্যয় বর্ধিত হয়ে ১৯৫১-৫২ সালে দাঁড়ায় ৯২৫·৩ মিলিয়ন ডলার, এই ব্যয়বরাদ্দ ১৯৩৯-৪০ সালে ছিল ৪৩০·৮ মিলিয়ন ডলার। আর কৃষ্ণাঙ্গদের শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫২ সালে দাঁড়ায় ১৪৭ মিলিয়ন ডলার। শ্বেতাঙ্গদের জন্যে মাথাপিছু শিক্ষাব্যয় হল ১৬৬ ডলার আর কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে হল ১১৬ ডলার। ১৯৬২ সালের শিক্ষাব্যয় বরাদ্দ এই অনুপাতেই বৃদ্ধি পায়।

দক্ষিণে সাতটি রাষ্ট্রে শহর ও শহরতলীর শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে মাথা পিছু গড় শিক্ষাব্যয় বরাদ্দর হিসাব দেখুন :—

(১) শহর ১৯৬২ সাল

শ্বেতাঙ্গ	কৃষ্ণাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গ
$১৬৪·৮৩	$১১১·৪০·০৮	$১০৮·২৪

শহরতলী শ্বেতাঙ্গের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গের সংখ্যা

কৃষ্ণাঙ্গ	শহর	শহরতলী
৮৫·১০	৭০%	৬২%

(২) বিদ্যালয়, গৃহনির্মাণ, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি-ক্রয়ের জন্য শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে ৮টি রাষ্ট্রে মাথাপিছু খরচেও বেশ পার্থক্য দেখা যায় (১৯৬২ সাল):—

শ্বেতাঙ্গ	কৃষ্ণাঙ্গ
$৩৬·২৫	$২৯·৫৮

শ্বেতাঙ্গের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গের সংখ্যা

৮২

(৩) শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষার মান (শিক্ষণে শিক্ষাপ্রাপ্ত) ১২টি রাষ্ট্রে গড়:—

শ্বেতাঙ্গ	কৃষ্ণাঙ্গ
৩৮ জন	৩৫ জন

(৪) শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষকদের বেতনের মধ্যেও প্রচুর পার্থক্য। ১৯৬২ সালে ১২টি রাষ্ট্রে শিক্ষকদের গড় বেতনের হার :—

শ্বেতাঙ্গ	কৃষ্ণাঙ্গ
$২৭৪০	$১৩৪১

শ্বেতাঙ্গের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গের বেতনের পার্থক্য:—

৮৭%

(৫) শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ-স্কুলের গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যাও গাত্র-বর্ণ হিসাবে কমবেশী। দক্ষিণে ৫টি রাষ্ট্রে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে ছাত্র-ছাত্রীর মাথাপিছু গ্রন্থের সংখ্যা ১৯৬০ সালে ছিল :—শ্বেতাঙ্গদের ৪·৭ খানি পুস্তক আর কৃষ্ণাঙ্গদের মাথা পিছু ১·৮ খানি পুস্তক।

শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুখসুবিধার এই ভয়ঙ্কর-বৈষম্য লক্ষ্য করে দক্ষিণাংশ থেকে দলেদলে কৃষ্ণাঙ্গেরা উত্তরাংশে চলে যেতে লাগল। ১৯৪০ থেকে ১৯৫০-র মধ্যে দশলক্ষের বেশী নিগ্রো উত্তরে চলে যায়। প্রথম প্রথম উত্তরাংশে বর্ণবৈষম্য তেমন বিশেষ দেখা যায় নি; কিন্তু যখন কাতারে কাতারে কৃষ্ণাঙ্গেরা উত্তরে এসে বসবাস করতে লাগল, তখন ওখানকার শ্বেতাঙ্গেরা নির্মম হয়ে উঠল।

উত্তরাংশে যে বর্ণবৈষম্য ছিল, তা প্রধানতঃ ছিল আবাসিক ধরণের; অর্থাৎ শহরগুলির নিকৃষ্টতম অংশে কৃষ্ণাঙ্গদের থাকতে হত। অবশ্য অন্যান্য অসুবিধাও ছিল অল্পবিস্তর; যেমন "পৃথক কিন্তু সমান" নামে এক শ্রেণীর নতুন ধরণের স্কুল-কলেজে কৃষ্ণাঙ্গদের পড়াশুনা করতে হত। এই সব বিদ্যায়তনে শ্বেতাঙ্গেরা পড়াশুনা করত না; তবে শ্বেতাঙ্গদের এক সঙ্গে পড়াশুনা করবার বাধাও উত্তরে তেমন বেশী ছিল না। দক্ষিণের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শিক্ষাসংক্রান্ত যেসমস্ত বাধা ছিল, সেগুলি সম্প্রতি অনেক যায়গায় উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরিজোনা ষ্টেটে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত স্কুলে বর্ণবৈষম্য ছিল; কিন্তু কলেজে ছিল না। কানসাস ষ্টেটে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে বর্ণবৈষম্য এখনও আছে। নিউ মেক্সিকোতে স্কুলে বর্ণবৈষম্য

আছে। ড্রামিং রাষ্ট্রে নিয়ম হল, ১৬টির বেশী কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র হলে, তাদের জন্যে আলাদা স্কুল করতে হবে। সীমান্তে ১১টি রাষ্ট্রে স্কুলে বর্ণ বৈষম্য খুববেশী দেখা যায় না কিন্তু বাকি ১৩টি রাষ্ট্রে বর্ণ বৈষম্য এখনও আছে। নিউজার্সি ও ইলিওয়িসে শিক্ষায়তনেবর্ণ বৈষম্য নেই; সেখানে কোন বিত্তালয়ে বর্ণ বৈষম্যের অভিযোগ হলে সরকারী অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। টেক্সাস ষ্টেটে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে পৃথক স্কুল ও শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়বার স্কুল দুরকম ব্যবস্থাই আছে। এই সব রাষ্ট্রগুলির নাম অলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করবার কারণ হল যে, উত্তরাংশের শিক্ষায়তন থেকে বর্ণবৈষম্য নীতি ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে তাই দেখান। অবশ্য উঠে যাবার মূলে হল কৃষ্ণাঙ্গদের দুশতাব্দী ধরে ক্রমাগত আন্দোলন; কিন্তু অন্তান্ত ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য এখনও অটুট।

উত্তরাংশে যে আবাসিক ধাঁচের বর্ণ বৈষম্য দেখা যায়, তার একটু বিশদ বিবরণ জানা দরকার। কৃষ্ণাঙ্গেরা দারিদ্র্য বশতঃ শহরের বাইরে অপরিচ্ছন্ন বস্তিতে বাস করতে বাধ্য হয়। বস্তি-উন্নয়নের জন্যে F.H.A. (ফেডারেল হাউসিং এড্‌মিনিস্ট্রেসন) ৯০ কোটি টাকা খরচ করে বছরে বছরে যেসব বাড়ি তৈরি করে, তার মধ্যে কালারা পায় মাত্র ২%শতাংশ কালা আদমিদের ৪০০,০০০ পুরাতন বস্তি বাড়ি ভেঙে মাত্র ১০০,০০০ বাড়ি তৈরি হল ১৯৭০ সালে; কিন্তু যাদের বাড়ি ভাঙ্গা হল তারা পেল মাত্র ২৫,০০০ বাড়ি।

কালাআদমিদের স্কুল বাড়িগুলি জীর্ণ, সংস্কারহীন এবং আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম অত্যন্ত কম, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার নেই বললেই চলে। বকাটে ছেলেমেয়ের দল সাধারণতঃ এই সব স্কুলেই বেশী। শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্ন স্তরের। যোগ্য ও গুণবান শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

এবার খাস রাজধানী ওয়াসিংটন ডি.সি র কথা ধরা যাক। এখানে স্কুলকলেজ দুই-অংশে-বিভক্ত। "ক"-শ্রেণীর বিত্তালয়গুলি শ্বেতাঙ্গদের জন্যে। এখানে এলাহি ব্যবস্থা, টাকা পয়সা দিয়ে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যা ব্যবস্থা করা সম্ভব তা সবই আছে; আর আছে মোটা মাহিনার যোগ্য শিক্ষক। আর "খ" শ্রেণীর বিত্তালয়গুলি হল কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে। এখানে আছে ভাঙ্গা টেবিল, বেঞ্চি, রং চটা ব্ল্যাকবোর্ড, আর অপরিচ্ছন্ন ছাত্র ও শিক্ষকদের দল। এখানে বর্ণ বৈষম্য পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিত্তালয়, শিক্ষক-শিক্ষা কলেজ, কারিগরি কলেজ প্রভৃতি সর্বত্র। শিক্ষা-পরিচালন ও পরিদর্শক বিভাগেও এই পার্থক্য দেখা যায়—এই দুই বিভাগ শীর্ষে এসে যেখানে মিলেছে, সেখানে আর কোন ভেদাভেদ নাই, কারণ সেখানে আর কোন কৃষ্ণাঙ্গের স্থান নেই।

এই অবস্থায় এই দুই বিভাগের শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক একই রকম ভাল ফল দেখাতে পারেনা। ওয়াসিংটনে নিগ্রোদের শিক্ষার জন্যে মাথা পিছু ব্যয় হল ২১২·০২ ডলার, আর শ্বেতাঙ্গদের জন্যে হল ২৭৩·২১ ডলার। ৮৮·১%নিগ্রো প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রতি-শ্রেণীতে ৬৭·১ জন ছাত্র-ছাত্রী; আর শ্বেতাঙ্গদের স্কুল হল প্রতি শ্রেণীতে ৩০ জন। ৪০·৩%নিগ্রো স্কুলে প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী হল ৪০র ওপর, আর শ্বেতাঙ্গদের ৪০র ওপর ছাত্র-ছাত্রীযুক্ত স্কুলের সংখ্যা হল ১৮%। ১৯৫৪ সালের রিপোর্টে দেখা যায়, অতিরিক্ত ঠাসাঠাসি শ্বেতাঙ্গদের প্রাথমিক বিত্তালয়ের সংখ্যা হল ৩৪·২% আর কৃষ্ণাঙ্গদের হল ৮৬%। অন্তান্ত ক্ষেত্রে যেমন থিয়েটার ভোজনালয়, খেলার মাঠ প্রভৃতিতেও অনুরূপ অবিচার ও পার্থক্য।

অপরিমেয় দারিদ্র্য

কালা আদমিদের মধ্যে বেকার অসংখ্য। গৃহভৃত্য, রাস্তাসাফ করা, বাসট্যাক্সি ধোয়া-মোছা ছাড়া সম্মান-যোগ্য কাজ তারা খুবই কম পায়। প্লাম্বিং বিজলী-মিস্ত্রি, ছুতার মিস্ত্রি প্রভৃতির কাজ শেখার জন্যে নিউ-ইয়র্ক ও মিশিগানে ২৪,৪৯৭ জন শিক্ষানবিস নেওয়া হয়ে ছিল; কিন্তু তার মধ্যে ৯৫১ জন অর্থাৎ ৪% হল

কৃষ্ণাঙ্গ। তাই দারিদ্র্য হল তাদের চিরদিনের সাথী। সরকারী রিপোর্ট Hunger U.S.A.-1969 থেকে জানা যায় আমেরিকার নিগ্রো-অধ্যুষিত দক্ষিণাংশে আড়াই কোটির বেশী অনশনক্লিষ্ট লোক এখনও আঁস্তাকুড়ে পরিত্যক্ত খাদ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। এদের মধ্যে ৯০% হল কৃষ্ণাঙ্গ। সাহায্য সমিতি থেকে এই আড়াই কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৬০ লক্ষ লোক অল্প স্বল্প আহার্য পেয়ে থাকে।

কৃষ্ণাঙ্গদের-নিদ্রাভঙ্গ

বহু নির্যাতন, অন্যায় ও অবিচার ভোগ করবার পর অবশেষে কৃষ্ণাঙ্গদের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। নবাবিষ্কৃত আমেরিকার উন্নতি সাধনে কৃষ্ণাঙ্গ-সম্প্রদায়ের দান অবিস্মরণীয়, সেই কৃষ্ণাঙ্গরা আজ আর বিজাতি-তত্ত্ব মেনে নিতে চায় না; তারা চায় আপন অধিকারে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে। ডু-বইস, ওয়ালটার হোয়াইট, মার্টিন লুথার কিং প্রভৃতির মধ্যে তারা অদম্য উৎসাহী ও উৎকৃষ্টপ্রাণ মহান নেতা খুঁজে পেয়েছে। তাই তারা বহুদিনের জড়তা ত্যাগ করে মাথাচাড়া দিয়ে শত অত্যাচারে বজ্র হানিয়া রুখে দাঁড়িয়েছে, বলছে "মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান, নাহি দেশকাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি"। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে লড়বার জন্যে তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। ১৯০৯ সালে ন্যাশনাল এসোসিয়েসন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব কলারড পিপল স্থাপিত হল, ১৯১১ সালে স্থাপিত হল আরবান লিগ। প্রথম সংস্থাটি বৈষম্যদূরীকরণ, রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার লাভের জন্যে প্রবল আন্দোলন চালাতে লাগল। দ্বিতীয় সংস্থাটি যেসব কৃষ্ণাঙ্গ দক্ষিণ থেকে উত্তরে এসে বসবাস করছে; তাদের রুজি রোজগার এবং বাসগৃহের বন্দোবস্ত করতে লাগল। সম্প্রতি কংগ্রেস ফর সোসাল ইকুয়ালিটি নামে আর একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সংস্থাটি পূর্বোক্ত দুটি সংস্থা অপেক্ষা অধিকতর সংগ্রামশীল। দক্ষিণে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সমান অধিকার পাবার জন্যে এই সংস্থাটি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করে দিয়েছে। এই সংগ্রামের পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় ১৯৬৩ সালের ২৮শে আগস্টের গণ-আন্দোলনে। তবে এই সঙ্গে উল্লেখ করা ভাল যে, এদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্পূর্ণ অহিংস।

মামলা মোকর্দ্দমা

প্রথম প্রথম এই সংস্থাগুলি আদালতে অনেকগুলি মামলা মোকর্দ্দমা রুজু করেছিল; ফলে দক্ষিণের পাঁচটি রাষ্ট্র ছাড়া সমস্ত স্নাতক বিদ্যালয় থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশের বাধা উঠে যায়। উত্তরেও ওহিও, ইণ্ডিয়ানা ইলিনয়িস, উত্তর-জারসি প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার কায়েম হয়। ১৯৫৪ সালে দক্ষিণে কয়েকটি শ্বেতাঙ্গদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ২০০০ কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রছাত্রী প্রবেশাধিকার পায়। এই সময় দুটি কট্টর বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণী রাষ্ট্র জর্জিয়া এবং দক্ষিণ-কেরোলিনা, সুপ্রীম কোর্ট সাধারণ বিদ্যালয়ে বর্ণবৈষম্য সংবিধান বিরোধী বলে রায় দিলে, সমস্ত স্কুল কলেজগুলিকে বে-সরকারী বলে ঘোষণা করে—ফলে আদালতের রায় বানচাল হয়ে যায়।

বর্ণবিদ্বেষ গভীর শিকড় গজিয়েছে

যে বর্ণবিদ্বেষ প্রায় দুশ'বছর ধরে চলে আসছে, তা যে সহজে দূর হবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা নানা আছিলায় ও নতুন নতুন চাতুরির আশ্রয় নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায় অমান্য করছে। এই রকম করবার কারণ মনে হয়, দক্ষিণে শ্বেতাঙ্গদের জন্মহার অত্যন্ত বেশী। ১৯৪০-৫০ সালে দেখা যায় দক্ষিণে শ্বেতাঙ্গদের জন্মহার সমগ্র আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের জন্মহারের চেয়ে বেশী হয়েছে। কাজেই সংখ্যাধিক্যের জোরে কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ক্ষমতা তাদের অনেক বেড়েছে। মানবিক অধিকারের প্রশ্নে মর্যাদার লড়াই প্রায়ই লেগে আছে। কুখ্যাত কু-ক্লুস-ক্ল্যান আবার এটলান্টা, জর্জিয়া, লিট্‌লরকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কানসাস ষ্টেটে ১৯৫৭ সালে সুপ্রীমকোর্টের ডিক্রি অনুসারে কৃষ্ণাঙ্গেরা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে একসঙ্গে

পড়বার অধিকার পেয়েছিল ; কিন্তু গোঁড়া শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে দল পাকিয়ে গভর্ণর অরভাল ফেবস এতে বাধাদান করেন। ফলে প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার ছত্রী সৈন্য পাঠিয়ে স্কুলে জোর করে কৃষ্ণাঙ্গদের পড়বার ব্যবস্থা করে দেন।

১৯৬০ সালে ফেডারেল জজ, স্কিলি রাইট নিউ-অরলিয়েন্সের সমস্ত বিদ্যায়তনে বর্ণবৈষম্যনীতি রদ করে দেন। ফলে হোয়াইট সিটিজেন্স কাউন্সিল নামে এক ভুঁইফোড় সংস্থা কৃষ্ণাঙ্গদের শ্বেতাঙ্গ স্কুলে প্রবেশে বাধা দিতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও প্রেঃ আইসেন হাউয়ার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন; ফেডারেল সৈন্য পাঠিয়ে কৃষ্ণাঙ্গদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়ে দেন। কিন্তু এই ভাবে কতদিন ও কতবার চলতে পারে? বারে বারে যদি রাজধানী থেকে সৈন্য পাঠিয়ে ছাত্র ভর্ত্তি করতে হয়, তাহলে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। শ্বেতাঙ্গদের মনোভাবের পরিবর্তন না হলে কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই মনোবৃত্তির পরিবর্তনও খুব কঠিন। শিক্ষিত-সমাজে সেনেটর ম্যাকার্থীরমত বহুলোক আজও আছেন, আজও তাঁরা বলেন,"সুপ্রীম কোর্টে'র রায় একদেশদর্শী, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের নামান্তর মাত্র, জাতিত্বের দিক দিয়ে এই রায় অপমানজনক এবং এটি একটি বে-আইনী আইন।"

এই মনোভাবের ফলে দেখা যাচ্ছে, ভোজনগৃহের মালিকেরা প্রাণপণে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করছেন। ৪০নং সড়কটির কথাই ধরা যাক। এটি বলটিমোর ও ডিলওয়ারার মধ্যে একমাত্র সংযোগ পথ। ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে যাবার এই পথে অনেকগুলি বে-সরকারী ভোজনগৃহ আছে। প্রধান রাজপথ হওয়ায় এখান দিয়ে এশিয়া আফ্রিকার কূটনীতিকরা প্রায়ই যাতায়াত করেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত হয়ে এইসব ভোজনগৃহে প্রবেশ করলে, গায়ের রঙের জন্যে প্রায়ই তাঁদের অপমানিত হয়ে ফিরে যেতে হয়। এই সড়কটি আমেরিকার বৈদেশিক নীতি-নির্দ্ধারণ ক্ষেত্রে ক্ষত স্থান বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

শিক্ষাব্রতী, রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজবিজ্ঞানীরা এই অন্যায়, অপমান, অসামঞ্জস্য ও শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্যকে এখনও উপেক্ষার চোখে দেখছেন। তাঁরা বলেন, আমেরিকার যেটুকু কোনঠাসা নীতি আছে তাকে ফলাও করে কমিউনিষ্টদেশেরা পরিবেশন করছে। এশমোর নামে একজন সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী লিখছেন, "পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সংঘাতে এশিয়া এবং দূর প্রাচ্যের দেশ-গুলি হল অমূল্য রত্ন; কারণ এইসব দেশ নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ। এদের হস্তগত করতে পারলে, অনেক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব, তাই কম্যুনিষ্ট প্রচার-যন্ত্র এসব দেশের কালো ও বাদামি রঙের জাতের মন হরণ করবার জন্যে সবসময় প্রচার করছে যে আমেরিকা কৃষ্ণাঙ্গ স্বদেশবাসীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে সে কখনও এশিয়া ও মুসলমানপ্রধান দেশগুলির নেতৃত্ব করতে পারে না। তাই সেলমা ও আলবামার ভোজনাগারে, কি প্রেক্ষাগৃহে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে সামান্য-মাত্র ঝগড়া হলেই, সেগুলি বোম্বাইএর পত্র-পত্রিকায় অতিরঞ্জিত করে লেখা হয়। ঐরূপ উক্তি কম্যুনিজমের প্রতি সুলভ কটাক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়, তা সকলেই বুঝতে পারে।

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ জেমস্ ব্রায়ন্ট কনান্ট এ-বিষয়ে বেশ নিরপেক্ষ সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,"একথা প্রথমেই স্বীকার করতেই হবে যে, আমেরিকার আদর্শবাদ ও তার সামাজিক আচরণের মধ্যে বিরাট সংঘর্ষ বেধেছে। দ্বিতীয় কথা হল, দেশের সংখ্যালঘু জাতিদের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া যে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করে তার সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি আমাদের আচরণ তুলনা করলে বলতেই হবে যে, আমরা এ-বিষয়ে হেরে গিয়েছি। কিন্তু তা বলে কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষ ও ইহুদি-বিতৃষ্ণা দূর করবার জন্য আমরা কোন চেষ্টা করব না, তা হতে পারে না; তবে হতে পারে যে, হয়ত আমাদের জীবদ্দশায় এ চেষ্টা ফলবতী হবে না।" এ কথা অনস্বীকার্য যে, একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ায় বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে সমস্ত জাতি শুধু লেখাপড়াই নয়,

জীবনের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। তাই দেখি এশিয়াটিক রাশিয়ায় তাতার, বাসগির, বুরিয়াট, মোঙ্গল, মোরাভিনিয়ান, ইয়াকুট, ওকিটিন, হান্ট, কারিয়াট, কাজাগ, চুক-চিং, নেনটি প্রভৃতি যত অনগ্রসর ও আদিবাসী জাতি ও সম্প্রদায় আছে, আজ তারা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক সমস্ত সুযোগ পেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পদ বলে পরিগণিত হচ্ছে।

ফল

আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের রাশিয়ার মহৎ আদর্শ অনুকরণ করা কি সম্ভব? দেশের এক দশমাংশ লোককে শত্রুভাবাপন্ন করে রাখলে, দেশ কি সামগ্রিকভাবে উন্নতিলাভ করতে পারবে? "যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে। পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢাকিয়াছ যারে, তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।" কবির একথা আমেরিকার ভাববার সময় এসেছে। তাছাড়া এই ক্ষত ও কলঙ্ক নিয়ে আমেরিকার বিশ্বের নেতৃত্ব করা ও বিশ্বপ্রেমিক হওয়া কি সাজে? কোনঠাসা হয়ে থাকার জন্যে অনেক কৃষ্ণাঙ্গ আজকাল মুসলমান হচ্ছে এই আশায় যে মুসলমান হলে,আফ্রিকা ও এশিয়ার মুসলমান-রাষ্ট্রগুলির সাহায্য ও সহানুভূতি পাবে। আমেরিকার দেড় কোটি কৃষ্ণাঙ্গের আয় হল ১৫ বিলিয়ন ডলার—সমগ্র কানাডার বা আয় প্রায় ততটা। কৃষ্ণাঙ্গদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, সম্পদ ও একতা আমেরিকার বিরুদ্ধে নিয়োজিত হলে, তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হবে, একথা শ্বেতাঙ্গদের বুঝা উচিত। রোম অর্ধেক দেশকে ক্রীতদাস করে রেখেছিল, ফলে সমগ্র জাতকে ক্রীতদাসে পরিণত হতে হয়েছিল।

দুর্বলের ওপর প্রভুত্ব করাই হয়ত মনুষ্যচরিত্র। তাই দেখি দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, মোজাম্বিক আঙ্গোলা প্রভৃতি রাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গপ্রভুরা সংখ্যালঘু হয়েও শুধু গায়ের জোরে কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর (যারা হল ঐসব দেশের প্রকৃত মালিক) অকথ্য অত্যাচার করছে আর তাদের প্রায় দাস করে রেখেছে। মার্কিন নাগরিক অধিকার বিল আইনে পরিণত হয়েছে। যে অপমানিত কৃষ্ণাঙ্গেরা প্রায় দু'শ' বছর ধরে শুধু মানুষের মত বাঁচবার অধিকারের জন্যে অবিশ্রাম সংগ্রম করে আসছে, সে সংগ্রাম কি শেষ হবে এবার? নির্ভীক সৈন্যেরা কি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলতে পারবে, "বজ্রশিখার এক পলকে, মিলিয়ে গেল সাদা কালো?" শুধু আইন পাস হলেই কি এই জাতের নামে বজ্জাতি বন্ধ হবে? চাই হৃদয়ের পরিবর্তন, নইলে শুধু আইনে কিছুই হবে না। তাই দেখা যাচ্ছে এখনও শ্বেতাঙ্গদের রাং দেহি মনোভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। ওয়াসিংটনের নিগ্রো ডিরেক্টর অব এডুকেশনকে এই সেদিন গুলি করে মেরে ফেলা হল, মেরে ফেলা হল মার্টিন লুথার কিংকে। রচেষ্টার শহরে ১৯৬৪ সালে ২৫শে জুলাই থেকে কদিন ধরে নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে দাঙ্গা চলল। এই দাঙ্গা থামাবার জন্যে রাজ্য সরকারের ৪০০ সৈন্য নিয়োগ করতে হয়েছিল।

এইসব দেখে শুনে এক প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকের কথা মনে পড়ছে। এথেন্সবাসীরা একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এথেন্সের অধিবাসীরা কবে সুবিচার পাবে? উত্তরে পণ্ডিতপ্রবর বলেছিলেন—যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তারা যখন ক্ষতিগ্রস্তদেরই মত রাগে জ্বলে উঠবে তখনি। আমেরিকাতেও সেই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলা চলে, যখন সুবিধাভোগীরা অসুবিধা-ভোগীদেরই মত রুখে দাঁড়াবে, তখন কৃষ্ণাঙ্গেরা পাবে সুবিচার।

রাখাল ও রাজকুমারী

বিমলজ্যোতি দাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[কুড়ি]

আরও মাসখানেক কেটে গেছে। গোকুলদের অফিসের যামিনী নামে একজন এ্যাসিস্টেণ্ট একাউণ্টেণ্ট বছর দেড়েক আগে হাওড়া অফিস থেকে এখানে বদলি হয়ে এসেছিল। এখানে এসে কোয়ার্টার না পাওয়াতে পরিবার আনতে পারেনি। এতদিন সে ক্লাবেই থেকেছে। হঠাৎ একদিন তার শ্যালক এসে তার স্ত্রী ও মেয়েছুটিকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। যামিনী মহা মুস্কিলে পড়ল। কোথায় এদের রাখবে? সহরের যে রকম অবস্থা তাতে কোনও ভাড়া বাড়িতে এদের রাখতে সাহস হয় না। নিরুপায় যামিনী কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হল। অনেক বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিলেন যে, গোকুলের যদি অমত না থাকে তবে তার বাসায় আপাততঃ যামিনীর স্ত্রী-কন্যারা থাকতে পারে। শীঘ্রই তাঁরা একটা কোয়ার্টার খালি করবার ব্যবস্থা করবেন। প্রস্তাব শুনে গোকুল উমাকে জিজ্ঞাসা করল—কি করা যায় উমা? রাজি হব?

উমা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—হ।

দ্বিধাভরে গোকুল প্রশ্ন করল—কিন্তু তোমরা থাকবে কোথায়?

বইরের ঘরের পাশে কাঠ ঘুটে রাখবার ছোট ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে উমা বলল—আমরা হেই কোঠায় থাকুম। অখনত ঠাকুরপো আর সঙ্গে নাই, অসুবিধা হইব না।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে গোকুল বলল—উমা, তুমি সত্যিই মহৎ। উমার শ্যামলিম কপোল দুটিতে আবীর ছড়িয়ে গেল।

এই ব্যবস্থাই করা হল। গোকুলরা পূর্ব্ববৎ বাইরের ঘরটিতেই রয়ে গেল। ভিতরের ঘর দুটি যামিনীকে ছেড়ে দিয়ে বাবেন, উমা ও তাদের কন্যা ছোট ঘরটিতে চলে এল।

গোকুলের এই উদারতায় যামিনী তার প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞতা অনুভব করল। যামিনীর স্ত্রী মন্দাকিনী কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। সে অত্যন্ত স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ হৃদয়। গোকুলের মহত্ব তার মনে কোনও রেখাপাত করল না। বরঞ্চ সে ভাবল, কোম্পানীর আদেশের জোরেই সে এ বাড়িতে এসে উঠেছে এবং গোকুলের চেয়ে তার স্বামীর অধিকার কিছুমাত্র কম নয়। সে এ বাসায় পদার্পণ করেই উমাদের বিষচক্ষে দেখতে আরম্ভ করল। স্বামীর কাছে থেকে সে উমাদের এখানে আগমনের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করল তারপর প্রথমদিনই বিকালের দিকে যখন গোকুল এবং যামিনী উভয়েই অফিসে গেছে, তখন উমাকে ডেকে কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করল—আচ্ছা, বামুট ব

অনেকদিন থেকে গেছে। তবুও তোমরা এখান থেকে যাচ্ছ না কেন?

তার কণ্ঠস্বরের কঠোরতায় সরলা উমা বিস্মিত হল। এ বাড়ীতে সদ্য-আগতা এই নারীর আকস্মিক বিরূপতার কারণ কি? খানিকক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে থেকে উত্তর দিল—উনি বাসার লাগি বিস্তড়াইতে আছে, কিন্তু বাসা পাইতে আছে না।

অনেকটা যেন ধমকের সুরে মন্দাকিনী বলল—নাঃ, এত বড় শহরে বাসা আর পাওয়া যাচ্ছে না! ভাল করে খুঁজতে বলবে তোমার স্বামীকে, বুঝলে? এখানে বেশীদিন থাকা চলবে না।

উমা নিরুত্তরে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

বিকালে গোকুল অফিস থেকে এলে উমা নিরস্বরে তার কাছে ব্যাপারটা বিবৃত করল। শুনে গোকুল চটে উঠল—তোমাদের থাকা নিয়ে ওর মাথা ঘামাবার দরকার কি? সে আমি বুঝব। আসুক যামিনীবাবু, আমি আচ্ছা করে দুকথা শুনিয়ে দেব।

ভীত ত্রস্ত হয়ে উমা গোকুলের হাত দুটি ধরে ফেলে মিনতির সুরে বলল—এই লইয়া আপনি ওনার লগে কাইজ্যা করবেন না।

—কেন? ওরাই ত অন্যায় কথা বলেছে।

—কউক। আপনি কাইজ্যা করবেন না কথা দ্যান।

—আচ্ছা, তুমি যখন বলছ।

মন্দাকিনী কিন্তু শুধু উমার সঙ্গেই নয়, আশপাশের কারও সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। কারণ তার বিপুল আত্মম্ভরিতা। তার পিতা কলকাতায় একটি বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ অফিসার, তাই সে নিজেকে স্বামীর সহকর্মীগণ ও তাদের পরিবারবর্গের থেকে অনেক উচ্চস্তরের জীব বলে মনে করে। ফলে যামিনীর সঙ্গে যেখানে যেখানে সে গিয়েছে কোথাও কারও সঙ্গে তার প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। নিঃসঙ্গ মন্দাকিনী একা-একাই দিন কাটিয়েছে। এখানে টাক কোয়ার্টারের কম্পাউণ্ডের মধ্যে সুধীরবাবুর বাসার পশ্চিম দিকে এক টুকরো ঘাসে ঢাকা জমি আছে—এবং তারই এক প্রান্তে একটা সিমেন্ট-বাঁধানো বসবার জায়গাও আছে। বৈকালিক গা-ধোওয়া এবং প্রসাধন-পর্ব সেরে মন্দাকিনী একাকিনী সেই তৃণাবৃত স্থানে ঘোরাফেরা করে এবং মাঝে মাঝে বসবার জায়গাটায় বসে। অন্যান্য গৃহিনীদের মধ্যেও কেউ কেউ ঐ সময় ওখানেই বেড়ায়। তবে তারা মন্দাকিনীর কাছে আসে না, একটু দূরে দূরে চক্রাকারে পরিভ্রমন করে। মন্দাকিনীর সঙ্গে এক আধবার তাদের চোখাচোখিও হয়ে যায়। তখন মন্দাকিনী স্বভাবসুলভ উদ্ধত দৃষ্টি হানে। তার বড় বড় চোখ দুটো চশমার ওধার থেকে অসম্ভব রকমের বড় দেখায়। প্রতিবেশিনীদের চোখেমুখে চাপা হাসি ফুটে ওঠে। সেটা মন্দাকিনীর লক্ষ্য এড়ায় না। সে আরও ক্রুদ্ধ হয়। কিন্তু কিছু করতে না পেরে নিষ্ফল আক্রোশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকায়। আর হাসি চাপা হয়ত অসম্ভব হয়ে পড়বে দেখে অন্যান্যদের মধ্যে একজন অপরাকে বলে—চলেন ভাই বাসায় যাই, কাম আছে। বলে অপেক্ষা না করে নিজের বাসায় ঢুকে হেসে গড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন বাসার বৌয়েরা মন্দাকিনীকে নিয়ে মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে সরস আলোচনা করে। তারা মন্দাকিনীর একটা নামকরণও করে ফেলেছে, ছন্দা দেবী। ছন্দা দেবী আজকালকার বিখ্যাত অভিনেত্রী। তার সঙ্গে মন্দাকিনীর চেহারার সাদৃশ্যই এই নামকরণের হেতু। জীবন-রঙ্গমঞ্চে মন্দাকিনীর অদ্ভুত আচরণ তাকে নিজের অজ্ঞাতসারে এই উপাধিটুকু উপহার দিয়েছে।

মন্দাকিনীর হৃদয় শুধু যে অসার দম্ভে স্ফীত তা-ই নয়, উপরন্তু সন্দেহ-বাতিক-গ্রস্তও বটে। স্ত্রী-পুরুষের বেশি ঘনিষ্টতা সে প্রায়ই ভাল চক্ষে দেখে না। এ বাসায় কয়েকদিন থাকবার পর গোকুল ও উমাকে কেন্দ্র করে তার মনে নানা অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠতে লাগল। গোকুলের স্ত্রী এখানে নেই, উমার স্বামীও প্রায় না থাকারই মধ্যে, অর্থাৎ দিনের বেলা তার টিকিটি দেখা যায় না, রাত্রেও কদাচিৎ তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

গোকুলের ভাই গোপাল প্রায় সারাদিনই বাড়ির বাইরে, অর্থাৎ হয় স্কুলে, নয় ননীদের বাসায়। সুতরাং গোকুল ও উমা পরস্পরের অত্যন্ত নিকট সান্নিধ্যে বাস করছে। মন্দাকিনীর সন্দিগ্ধচিত্ত ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলছে—এ ঠিক নয়। তাই, যখন ওরা দুজনে গোকুলের ঘরে থাকে, তখন মাঝে মাঝে মন্দাকিনী হঠাৎ হাতের কাজ ফেলে ঐ ঘরের পাশে নিজের ঘরখানায় চলে আসে এবং উৎকর্ণ হয়ে ওদের বাক্যালাপ শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু গোকুলও নির্বোধ নয়। এই বাড়িরই অন্য কক্ষে অপর ভদ্রমহিলা বাস করছেন এ সে জানে এবং সেই মহিলার চক্ষে নিজেদের আচরণে কোনও ত্রুটি যাতে ধরা না পড়ে এ বিষয়ে সে নিজেও সতর্ক থাকে এবং উমাকেও সাবধান করে দিয়েছে। তাই তারা ঘরের একপ্রান্তে সরে এসে খুব নিম্ন স্বরে কথাবার্তা বলে। এ ঘরে উৎকর্ণা মন্দাকিনী তাদের কথোপকথন শুনতে না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে গজরাতে থাকে। পর-পুরুষের সঙ্গে এত ফিসফাস কথা কি? কি রকম বেহায়া মেয়েমানুষ উমা? আর গোকুলেরই বা কি আক্কেল? যুবতী পরস্ত্রীকে নিজের অধিকারের মধ্যে পেয়ে তার সঙ্গে নির্জনে অবস্থান এবং দীর্ঘকাল আলাপ করা কি ভাল? উমার স্বামীটারই বা আক্কেল কি। লোকটা নিশ্চয়ই নপুংসক জাতীয় ইডিয়ট একটা। নিজে বাইরে বাইরে ঘুরবে, আর এদিকে তার স্ত্রীকে নিয়ে অপরে দিব্যি—

মন্দাকিনীর মাথা গরম হয়ে ওঠে। একেই তার ব্লাড প্রেসার বেশি হওয়ার দরুণ মেজাজ একটু খিটখিটে, তার ওপর এই ধরণের চিন্তার ফলে মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়ে যায়, এবং আভ্যন্তরীণ উত্তাপ বাইরে প্রকাশ পায় নিজের স্বামীর ওপর বাক্যবাণ এবং কন্যাদের ওপর চপেটাঘাত বর্ষণে। তারপর চেঁচামেচির ফলে ভীষণ শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় এবং কপালে ওডিকলোন লাগিয়ে দু তিন ঘণ্টা বিছানায় পড়ে থাকে।

গায়ের রং কালো হলেও উমার রূপের যে একটা যৌন-আবেদন আছে এটা মন্দাকিনী অস্বীকার করতে পারে না। গোকুল এই রূপের ফাঁদে ধরা পড়েছে অনুমান করে মন্দাকিনী এখান থেকে উমাদের তাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওদের প্রসঙ্গ নিয়ে অনবরত চিন্তা করতে করতে একদিন হঠাৎ একটা নূতন ভাবনা তার মস্তিষ্কে উদ্ভূত হল। যেরূপ দেখে গোকুল মজেছে সে রূপ দেখে যামিনীও ত মজতে পারে। মন্দাকিনীর নিজের গায়ের রং ফর্সা হলেও মুখের আকর্ষনী শক্তি যে কম এ কথা সে বোঝে, মর্মান্তিক ভাবেই বোঝে। অতএব অগ্নিশিখা—রূপিনী তন্বী উমাকে স্বামী—পতঙ্গের চোখের সামনে থেকে যত শীঘ্র সম্ভব সরানো দরকার, এই ধারণা তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হল, এবং কি উপায়ে তা সম্ভব করা যায় সেই চিন্তায় সে ব্যাকুল হয়ে পড়ল।

এইখানে কিন্তু মন্দাকিনীর ভুল হল এবং নিজের স্বামীর উপর সে অবিচার করে বসল। পুরুষদের সাধারণতঃ দুটি শ্রেণী আছে। এক শ্রেণী কামিনীর প্রতি অধিক আসক্ত, অপর শ্রেণী কাঞ্চনের প্রতি। দেখা যায় যে, সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রকৃতি যাদের মধ্যে একটির প্রতি অত্যধিক আসক্তি দিয়েছেন, অপরটির প্রতি আসক্তি সেই পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছেন। কোন কোন পুরুষ নারীদেহ ভোগের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে থাকে। তা দেখে এ কথা মনে করা ঠিক নয় যে তাদের চিত্ত অর্থের প্রতি আকাঙ্খাশূন্য; পক্ষান্তরে অত্যধিক অর্থগৃধ্নু ব্যক্তিকে কামিনীর প্রতি উদাসীন মনে করাও সমান ভ্রমাত্মক। আসল কথা এই যে, মানুষের মনোযোগটা একদিকে কেন্দ্রীভূত থাকলে স্বাভাবিক নিয়মেই অপর দিকে মন্দীভূত হয়ে আসে। তাই সেটার অস্তিত্ব সহজে নজরে পড়ে না। যামিনী এই শেষোক্ত শ্রেণীর। সুতরাং উমাকে তার দৃষ্টিপথ থেকে অপসারিত করার ব্যাপারে মন্দাকিনী এতখানি তৎপরতা অবলম্বন না করলেও পারত। কিন্তু তার নিজের যৌনচেতনা একটু প্রখর বলে 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' এই নিয়মানুসারে স্বামীকেও সে অনুরূপ ভাবাপন্ন বলে মনে করে নিল এবং উমাকে

স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে আদাজল খেয়ে লেগে গেল।

অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে স্বামীর কাছে একদিন সে কথাটা উত্থাপন করেই ফেলল—ভাখো, উমার হাব ভাব আমার কিন্তু ভাল মনে হয় না। গোকুলবাবুর স্ত্রী কাছে নেই এই সুযোগ নিয়ে উমা ওঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্টভাবে মাখামাখি করছে। প্রায়ই ঘরের ভেতর দুজনে ফিস ফিস করে অনেক কথাবার্তা কয়। পর-পুরুষের সঙ্গে নির্জনে এত গল্পগুজব হাসি ঠাট্টা কি ভাল? কি এমন কথা যা চুপিচুপি বলতে হবে? ওর স্বামীটাই বা কি রকম? প্রায়ই ত আসে না। কোথা যায় কে জানে। সেই সুযোগে এরা দুজনে দিব্যি জমিয়ে তুলেছে না না, আমি এমন বেহায়াপনা চোখের ওপর দেখতে পারবো না। তুমি শিগগির এর একটা বিহিত কর।

যামিনী প্রথমে কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিল—দূর! কি যা-তা বলছ? গোকুলবাবু কখনও অন্যায় কিছু করতে পারেন না। কথাবার্তা কইছে তাতে কি হয়েছে? এক বাড়িতে থাকলে কথা কইতেই হয়। তা ছাড়া গোকুলবাবু ওদের আশ্রয় দিয়েছেন, বিপদে উপকার করেছেন। সুতরাং মেয়েটি যদি তাঁকে দুটো বেঁধে খাওয়ায় বা তাঁর সঙ্গে হেসে কথা কয়, সেটা কি দোষের হল? বরং সেটাই ত করা উচিত। না করলেই দোষের হত।

—তাই বলে অত হাসি-ঠাট্টা, ফিসফাস কথাবার্তা?

—তা, মানুষ একটু হাসি তামাসা করবে না? চব্বিশ ঘণ্টা মুখ গোমড়া করে বসে থাকবে? আর, ফিসফাস কথাবার্তা যে বলছ, তা কি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে না কি? নানা, ও সব বাজে চিন্তা ছেড়ে দাও। এখন যাও, চা নিয়ে এস।

—দিচ্ছি চা। কিন্তু উমাদের এখানে আর না থাকাই ভাল।

—আচ্ছা আচ্ছা। যাবেই ত একদিন।

কথাটা সেদিন

মন্দাকিনী বুঝল যে, সোজা

সুতরাং সে মিথ্যার আশ্রয় নিল। গোকুল ও উমাকে নিয়ে এমন দু তিনটা কাল্পনিক ঘটনা সত্যের মত করে সাজিয়ে স্বামীর কাছে বর্ণনা করল, যা থেকে বোঝা যায় উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটা সাধারণ বন্ধুত্বের সীমানা ছাড়িয়ে অবৈধতার দিকে খানিকটা অগ্রসর হয়েছে। অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য কিছু বলল না, কারণ তাহলে যামিনী বিশ্বাস করবে না। বলল, সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে আড়াল থেকে দুদিন সে গোকুলকে উমার অঙ্গস্পর্শ করতে দেখেছে, এবং একদিন ঘরের ভিতর থেকে চুম্বনের স্পষ্ট আওয়াজ পেয়েছে। যামিনী প্রথমটা বিশ্বাস করতে চায় নি, কিন্তু মন্দাকিনী বারংবার কঠিন শপথ করার পর তার মন টলে গেল। চিন্তিতভাবে বলল—তা যদি হয়, তা হলে ত খুব ভাল কথা নয়।

মনের উল্লাস মনে চেপে রেখে গম্ভীর মুখে মন্দাকিনী বলল—ভাল ত নয়ই। তবে আর এ্যাদ্দিন ধরে তোমায় বলছি কি? একটা কেলেঙ্কারী হওয়ার আগে ভালয় ভালয় ওটাকে বিদায় করার চেষ্টা কর।

অতঃপর স্বামী-স্ত্রীতে ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তর পরামর্শ হল, এবং যামিনী অফিসে ছোট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল দেখুন—স্যার, একটা বলছি, কিছু মনে করবেন না। একাউটেন্ট গোকুলবাবুর বাসায় রায়টের সময় অনেকগুলি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল। এখন তারা সকলেই চলে গেছে, কেবল রমেন বলে একটি লোক এবং তার স্ত্রী এখনও রয়েছে। গোকুল বাবুর স্ত্রী ত এখানে নেই, আর রমেন লোকটিও অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে প্রায়ই বাইরে বাইরে থাকে। সুতরাং এ রকম অবস্থায় তার স্ত্রী গোকুলবাবুর হেফাজতে থাকলে একটু দৃষ্টিকটু—

ছোট সাহেব অর্থাৎ এ্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার চোখ তুলে তাকালেন। তিনি বাঙ্গালী, নাম অজয় চট্টোপাধ্যায়। অত্যন্ত গম্ভীর ও কড়া মেজাজের

অফিসার। মাথা নেড়ে বললেন—বুঝেছি। এই নিয়ে ষ্টাফের মধ্যে কিছু কাণাঘুষো হচ্ছে কি?

—আজ্ঞে, এখনও হয়নি, তবে—

—হতে পারে, এই ত? আচ্ছা এই রমেনের স্ত্রী দেখতে কেমন, বয়স কত? আপনি ত ঐ বাসাতেই উঠেছেন, নিশ্চয় দেখেছেন তাকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেছি। বয়স আঠারো-উনিশ হবে, ছিপছিপে শ্যামবর্ণ চেহারা, মুখশ্রী ভাল।

—ও আচ্ছা। আমি দেখব। আর কিছু আছে?

—না স্যার। নমস্কার। যামিনী বেরিয়ে গেল।

অজয়বাবু ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখলেন। গোকুলকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন। সে এখানে আসা অবধি তার কাজে কর্মে বা আচারে ব্যবহারে কোনও খুঁত তিনি পান নি। তবে কথা হচ্ছে গোকুলের বয়স অল্প, স্ত্রীও এখানে নেই। সুতরাং হাতের কাছে একজন সুশ্রী যুবতী থাকলে মন বিচলিত হতে কতক্ষণ? 'ঘৃত-কুম্ভ সমা নারী, নর তপ্ত অঙ্গার যেমন'। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ এখনও বেশিদূর গড়ায় নি, সুতরাং এখনই সাবধান হওয়া দরকার। অজয়বাবু নীতির ব্যাপারে একটু গোঁড়া। তা ছাড়া, কোম্পানীর সুনাম বজায় রাখা তাঁর কর্তব্যের মধ্যে বলে তিনি মনে করেন। ষ্টাফ কোয়ার্টারে যদি কোনও কেলেঙ্কারী ব্যাপার ঘটে, তা নিয়ে কোম্পানীর বদনাম হতে পারে। তিনি জেনে শুনে সেটা হতে দেবেন না। অতএব পরদিন অফিসে এসে গোকুলকে ডেকে পাঠালেন।

গোকুল শঙ্কিতবক্ষে সামনে এসে দাঁড়ান। অজয়বাবু বললেন—দেখুন গোকুলবাবু, আপনাকে একটা কথা বলব বলে ডেকেছি। ব্যাপারটা একটু ডেলিকেট; তাহলেও এ সম্বন্ধে খোলাখুলি আপনাকে বলাই আমি উচিত মনে করছি।

গোকুলের বক্ষস্পন্দন দ্রুততর হল। কি এমন কথা? কাজে কোনও গলদ বেরিয়েছে? ওপর থেকে কোনও চিঠি এসেছে? কেউ তার বিরুদ্ধে কিছু নালিশ করেছে? নানা প্রকার চিন্তার ঢেউ তার মনে উঠল। ক্ষীণস্বরে বলল—বলুন, স্যার।

—গত রায়টের সময় আপনার বাসায় অনেকগুলি পরিবারকে আপনি আশ্রয় দিয়েছিলেন। মানুষের বিপদে মানুষ না দেখলে কে দেখবে? তা, রায়ট ত অনেকদিন মিটে গেছে। ওরা সকলেই বোধহয় এতদিন চলে গেছে, না?—বলে চোখ তুলে গোকুলের দিকে তাকালেন।

শুষ্ককণ্ঠে গোকুল জবাব দিল—আজ্ঞে, একজন ছাড়া আর সকলেই গেছে।—একজন যায়নি কেন?—কণ্ঠস্বরে নিছক প্রশ্নের সুর, উষ্মার আভাস নেই। গোকুল ধীর স্বরে বলল—আজ্ঞে, লোকটি বলছে যে বাসার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু পাচ্ছে না।

—তার পরিবারের কে কে আপনার বাসায় আছে?

—আপাতত তার স্ত্রী ও একটি ছোট মেয়ে। তার-ভাই বোনও ছিল, কিছুদিন হল তারা দেশের বাড়িতে গেছে।

—আচ্ছা স্ত্রীটির বয়স কত?

—আজ্ঞে আঠারো উনিশ হবে।

মিনিট দুই অজয়বাবু নীরব হয়ে রইলেন। তাঁর হাতে লাল-নীল পেন্সিলটা টেবিলের গ্লাস স্ল্যাবের উপর টুক্‌টুক্ করে কয়েক বার টোকা দিল। এর পরে কি আদেশ আসবে তা অনুমান করে নিয়ে গোকুল নিজেকে প্রস্তুত করে রাখল।

দু মিনিট নীরবতার পর সোজা গোকুলের চোখের দিকে চেয়ে অজয়বাবু বললেন—দেখুন গোকুলবাবু, আপনার স্ত্রী এখানে নেই শুনেছি; এ অবস্থায় ঐ মেয়েটি আপনার বাড়িতে থাকলে প্রতিবেশিদের কারও কারও চোখে সেটা হয়ত ভাল না দেখাতে পারে, বিশেষ যখন তার স্বামী অনেক সময়ই বাইরে বাইরে থাকে। আপনাকে আমি ভালমানুষ বলেই জানি। সুতরাং আপনাকে কেন্দ্র করে যদি কোনও কুৎসার ঢেউ ওঠে,

তাতে আপনারও সুনাম নষ্ট হবে, আর আমিও দুঃখিত হব। তাই আমার বিবেচনায় ওদের অবিলম্বে অন্যত্র সরে যাওয়া প্রয়োজন। আপনি লোকটির ওপর একটু চাপ দিলে সে চলে যেতে বাধ্য হবে।

—আজ্ঞে হাঁ স্যার। আমি যত শীঘ্র সম্ভব ওদের চলে যেতে বলব।

—বেশ।—অজয়বাবুর মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল।

এবার গোকুলের চলে আসবার কথা। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রইল, কারণ তার মনে একটা প্রশ্ন উঠেছে। কুণ্ঠিতভাবে বলল—কিন্তু স্যার—

—বলুন।

—এই নিয়ে বাবুদের মধ্যে কেউ কি কিছু বলেছেন?

ছোট সাহেবের হাসি আরও বিস্তৃত হল। বললেন—ঠিক যে আপনার বিরুদ্ধে বিশেষ কোনও নালিশ হয়েছে তা নয়, তবে ওরা আর কিছুদিন থাকলে নালিশ হবার সম্ভবনা আছে, এমন ইঙ্গিত আমি পেয়েছি। তাই আগে থাকতেই আপনাকে সাবধান করে দিলাম। প্রিভেনশন্ ইজ বেটার দ্যান কিওর; কেমন, তাই নয় গোকুল বাবু?

হ্যাঁ স্যার।

—আচ্ছা। আসুন।

গোকুল সাহেবকে অভিবাদন করে বেরিয়ে এল। বাবুদের মধ্যে কেউ যে তার নামে লাগিয়েছে এটা বোঝা গেল। কিন্তু কে, কে করল এমন কাজ? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে পড়ল, মন্দাকিনী উমাকে এখান থেকে চলে যাবার জন্য বলেছিল। তবে কি মন্দাকিনীই স্বামীকে দিয়ে উপরওয়ালার কাছে এই অভিযোগ করিয়েছে? নিশ্চয় তাই। সে ছাড়া আর কার এমন গরজ পড়েছে যে উপযাচক হয়ে সাহেবের কাছে এ কথা উত্থাপন করবে?

শীঘ্রই গোকুল এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারল। বাবুদের মধ্যে বিপিনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা একটু বেশি। বিপিন ছেলেটি এদিকে সরল হলেও বেশ বুদ্ধিমান। কোনও ব্যাপারে পরামর্শের প্রয়োজন হলে গোকুল সাধারণতঃ তার সঙ্গেই পরামর্শ করে। আজ বিকালে অফিস থেকে বেরিয়ে বাসায় যাবার পথে ছোট সাহেব ঘটিত সকল কথা সে বিপিনকে জানাল। শুনেই বিপিন বলে উঠল—এ ঠিক যামিনীবাবুর কাজ।

—আপনি কি করে জানলেন?

—আজ অফিসে এসে একটা কাজ নিয়ে ছোট সাহেবের খাস কামরায় যাচ্ছিলাম। কিন্তু ঢুকতে পেলাম না। চাপরাশী বলল—যামিনীবাবু ভিতরে আছেন। কাজেই আমি ফিরে এলাম। কিন্তু যতটুকু সময় ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার মধ্যে ভিতর থেকে ছোট সাহেবের গলার আওয়াজ পেলাম। সবকথা শুনতে পেলাম না, তবে 'রমেনের স্ত্রী' এ কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। কাজেই যামিনীবাবুই যে আপনার নামে লাগিয়েছে এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। ছোট সাহেব যে রকম বাঘের মত লোক, অন্য কেউ তাঁর কাছে এ প্রসঙ্গ তুলতে সাহস পাবে না। যামিনীবাবুর সাহসটা কিছু বেশি, তাছাড়া উনি আপনার বাসাতেই উঠেছেন, সুতরাং ও প্রসঙ্গ তোলার একটা অজুহাত ওনার আছে।

গোকুল মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ, তা—ই হবে। তাহলে এখন কি করা যায় বলুন ত বিপিনবাবু?

—কি আর করবেন? ওদের তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলুন। আর বৌদিকে আনাবার ব্যবস্থা করুন। নইলে আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হবে।

গোকুল ভেবে দেখল এই যুক্তি অনুসারে কাজ করাই সমীচীন। ব্যাপারটা যখন কর্তৃপক্ষের কানে উঠেছে তখন অবিলম্বে এর বিহিত করা আবশ্যক। তার নিজের জন্য তত চিন্তা নেই, কিন্তু সরলা নিরপরাধা উমার নামে যাতে কলঙ্কের কালিমা না লাগে সে ব্যবস্থা করতেই হবে।

—লগে যাইব্যা দিমু। আপনে ত আর তখন আমার কাছে থাকবেন না, আমার কাছে আপনের ছবি থাকব। ওরই লগে কথা কমু, ওরেই দেখুম। উমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

—আচ্ছা, তা যেন হল। কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কার ছবি, কেন তুমি রেখেছ, তাহলে কি জবাব দেবে?

—কমু আমার দেবতার ছবি।

আ—হা, তা বুঝি লোককে বলা যায়?

—ক্যান, যাইব না ক্যান্? মানুষের ভিতরই ত দেবতা আছে। নাই?

জবাব শুনে গোকুল আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল—হ্যাঁ, তা আছে বটে। কিন্তু তুমি এ সব জানলে কেমন করে?

—আপনের কাছে শিখছি। যা, এতদিন আপনের লগে ভালবাসা অইছে, আপনের গুণ কিছু পামু না? জানেন ত, সোনার লগে রূপা থাকলে রূপার উপর সোনার জলুষ লাগে।

—হ্যাঁ, ঠিক বটে। বাস্তবিক, এই ক মাসে তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজকের উমা আর যেদিন তুমি এ বাড়িতে প্রথম আসো, সেদিনের উমা এক লোক নয়। এতদিন তুমি শুধু নারী ছিলে, আজ হয়েছ নায়িকা; এতদিন শুধু কথা ছিলে, আজ হয়েছ গান।

—হে আপনের দয়া।

—হ্যাঁ, তা বলতে পার, কেননা ভালবাসার মধ্যেই দয়া রয়েছে। দয়া-শূন্য ভালবাসা হতে পারে না। ভাবে-ভঙ্গীতে, রঙে-রসে অপরূপ রমণী তুমি। তোমাকে যে পেয়েছিলাম এ আমি সত্যই সৌভাগ্য মনে করি উমা।

সেদিন রাত্রে রমেন এল না, এল তার পরদিন রাত্রি সাড়ে আটটা আন্দাজ সময়ে। উমার সঙ্গে আগেই গোকুলের বন্দোবস্ত করা ছিল যে, রমেনের কাছে চলে যাবার কথাটা গোকুলই উত্থাপন করবে। সুতরাং রাত্রির আহারাদি সমাপ্ত করে গোকুল এই অপ্রিয় কর্তব্যটুকু সম্পন্ন করল এবং এই প্রসঙ্গে সস্ত্রীক যামিনীর নেপথ্য—ভূমিকাটুকুও সংক্ষেপে রমেনকে জানিয়ে দিল, যাতে তার মনে এ ধারণা না হয় যে, গোকুলই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে তাদেরকে বিতাড়িত করবার জন্য উৎসাহিত হয়েছে। মন্দাকিনী যে এ বাড়িতে পদার্পণ করেই উমার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছিল এবং তাড়াতাড়ি এ বাসা ছাড়বার জন্য তাগিদ দিয়েছিল, এ কথা রমেন ইতিপূর্বেই শুনেছে। সুতরাং আজকের এই পরিস্থিতির জন্য যে মন্দাকিনীই দায়ী এটা সে বুঝতে পারল এবং এই সঙ্কীর্ণহৃদয়া নারীর প্রতি তার মন বিরূপ হয়ে উঠল। মুখে একটা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক শব্দ করে বলল—ওঃ বদ্রলোক! বদ্রলোকগিরি ফলাইবার আইছে! বদ্রলোক মানুষের গায় ল্যাহা থাহে না বাবু, হে বুঝা যায় মানুষের ব্যবহারে। বদ্রলোক যদি এহানে কেউ থাহে, সে আপনে। আমাগো অনেক করছেন, হে আমি ভুলুম না কোনদিন। আমরা যামু গিয়া বাবু! আপনের মত লোকের অসুবিধা করুম না। বিচড়াইয়া বাসা ত পাইলাম না, অহন্ তাগেই যামু, এগো রাইখ্যা আমু। কাইল আমার নিজের থাকনের লাগি একটা বাসা ঠিক কইর‍্যা লই, পরশু সহালে এগো লইয়া ম্যালা করুম।

চলেই যখন যেতে হচ্ছে তখন দুষ্টা মন্দাকিনীকে লক্ষ্য করে দুচারটে বাক্যবাণ নিক্ষেপ না করে রমেন যাবে না। আজ রাত্রি হয়ে গেছে, সুতরাং আজ আর সে আবহাওয়া গরম করল না। পরদিন সকালে উঠে সুযোগ খুঁজতে লাগল। যামিনী একটু আগে অফিসে যায়, গোকুল যায় তার আধ ঘণ্টাখানেক পরে। যামিনী বেরিয়ে যাবার পর রমেন উঠানে একটা টুল নিয়ে বসল। তারপর যেই গোকুল তার ঘর থেকে বেরিয়ে কলতলার দিকে যাচ্ছে, অমনি গলা চড়িয়ে (যাতে মন্দাকিনী শুনতে পায়) বলল—কাল বিহানে আমরা যামু গা, বাবু! আপনাগো অনেক কষ্ট দিছি, আর না। তা যারা, আমরা অইলাম যারা-তারা মানুষ,

আপনেরা অইলেন বড়লোক, আপনাগো লগে একত্র থাকন আমাগো উচিত না। হে আমি বুঝি বাবু! কিন্তু কি করুম? বাসার লাগি আজ দুই মাস যাবৎ কি কম বিচড়াইছি, কিন্তু আমার অদৃষ্ট, বাসা পাইলাম না। মানুষে হয়ত কইলে বিশ্বাস করব না, কিন্তু ধর্মতঃ কইতে আছি বাবু, আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। কত কষ্ট দিয়া গেলাম আপনাগো, মাপ-সাপ করবেন।

কথাগুলো যে মন্দাকিনীকে শুনিয়ে বলা এটা গোকুল বুঝতে পেরেছে, তাই জবাব দিল না, মুখ টিপে হাসল। কথাগুলো কিন্তু রাজা দশরথের শব্দভেদী বাণের মত উড়ে গিয়ে অদৃশ্য লক্ষ্যস্থলে ঠিক বিদ্ধ হল। ওর ভিতরকার প্রচ্ছন্ন শ্লেষ মন্দাকিনী ধরে ফেলল, এবং নিষ্ফল ক্রোধে ফুলতে লাগল। কিন্তু কথাগুলো সরাসরি তাকে বলা হয় নি, সুতরাং উত্তর দেওয়া চলে না। তা ছাড়া যে লোক কাল চলে যাবে, তার সঙ্গে আর ঝগড়া বিবাদ করে লাভ কি?

সারাদিন সহরে ঘুরে ঘুরে রমেন তার নিজের জন্য একটা আস্তানা ঠিক করে ফেলল এবং উমা তাদের ক্ষুদ্র গৃহস্থালির সামান্য জিনিষপত্র গোছগাছ করে নিল। রাত্রে একটু সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করে সকলে শুয়ে পড়ল। উমার চোখে ঘুম আর আসে না। আজ প্রায় আট মাস হল তারা এ বাড়িতে এসেছে। যেদিন প্রথম এখানে আসে সেদিনের সঙ্গে আজকের দিনের কত তফাৎ। ভালবাসা জিনিষটা যে কি, তার মধ্যে যে কত বৈচিত্র, আনন্দ, প্রতীক্ষা, প্রাপ্তি ও শিহরণ আছে তা এমনভাবে আগে কোনওদিন উমা উপলব্ধি করে নি। শোনা যায়, পরশ পাথর বলে নাকি এক রকম পাথর আছে, যার স্পর্শে লোহাও সোনা হয়ে যায়। এই পাথরের নাম ও গুণের কথা উমা শুনেছে, কিন্তু চোখে কোনদিন দেখেনি। আজ তার মনে হচ্ছে গোকুল সেই পরশ পাথর উমার মত পাঁচপাঁচি গ্রাম্য মেয়েকেও সেই স্পর্শমণি কি অদ্ভুতভাবে পরিবর্তন করে ফেলেছে! এবার গোকুলকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। হয়ত চিরদিনের জন্য। হয়ত কেন, নিশ্চয়। সে শুনেছে গোকুল বিবাহিত, সন্তানাদি আছে। সে নিজেও বিবাহিতা, তারও কোলে মেয়ে রয়েছে। কিন্তু এর জন্য তাদের উভয়ের ভালবাসায় বিঘ্ন হয়নি, হৃদয়ের আদান-প্রদানে আসেনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ। এ বাড়িতে উমার আজ শেষ রজনী। কথাটা মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে উমার দুচোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বাণ ডাকল। বহুক্ষণ কেঁদে সে অবশেষে শান্ত হল। কি করবে, এর উপর ত হাত নেই। বিচ্ছেদ একদিন হতই। চিরকাল আর এভাবে চলতে পারে না। তবু এই কমাসে সে যা পেয়েছে তাতে তার দীন রিক্ত জীবন কানায় —কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই আট মাসের অনির্বচনীয় সুখের স্মৃতিটিকে সে আটটি হীরায় খচিত স্বর্ণহারের মত আমরণ বক্ষে ঝুলিয়ে রেখে দেবে। এরই দ্যুতিতে তার সমগ্র ভাবিকৎ জীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

এই সব চিন্তায় উমা কিছুতেই দুচোখের পাতা এক করতে পারল না। শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল দূরে কোতোয়ালি থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘন্টার পর ঘন্টা বেজেই চলল – বারোটা-একটা-দুটো-তিনটে। পাশে শুয়ে রমেন অকাতরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার আসন্ন-প্রিয়-বিয়োগ-বিধুরা বধূ যে অশ্রুলাঞ্ছিত নেত্রে বিনিদ্র যামিনী যাপন করছে তার বিন্দু-বিসর্গও রমেন টের পেল না।

ভোর পাঁচটা বাজতেই উমা উঠে পড়ল। সকাল সকাল রান্না করে নিজেরাও দুটি খেয়ে নিতে হবে, গোকুলকেও শেষবারের মত খাওয়াতে হবে। আজ রবিবার। সুতরাং গোকুলের ছুটি। মন্দাকিনী তার স্বামী ও মেয়েদের নিয়ে আজ সকালেই নারায়ণ-গঞ্জে যাবে, আসবে বিকালে। কাল সন্ধ্যায় ওরা পরস্পর আলোচনা করছিল। উমা শুনেছে। যাক, ভালই হয়েছে। শেষ সময়টা মন্দাকিনীর মুখ দেখতে হবে না। হয়ত ওরাও বিদায়ের সময়টা উপস্থিত থাকতে চায় না বলেই এই ব্যবস্থা করেছে। তা সে

যা-ই হোক,শেষ মুহূর্তগুলিতে বাড়িটা নিরালা হওয়াতে উমা খুশিই হয়েছে। দশটার মধ্যে আহারাদির পাট মিটে গেল। রমেন একখানা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ি ডেকে আনতে গেল। ইত্যবসরে উমা তার যৎসামান্য প্রসাধন ও বেশ-বিন্যাস সেরে নিয়ে প্রস্তুত হল। খানিক বাদে রমেন গাড়ি এনে গাড়োয়ানের সাহায্যে মালপত্র তুলে নিল। তারপর গোকুলকে বহু কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে প্রণাম করে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বাইরে গিয়ে গাড়ির কাছে অপেক্ষা করতে লাগল। উমাকে বলে গেল—তাড়াতাড়ি আইও।

ঘরের ভিতরকার আবহাওয়া আসন্ন বিরহ-বেদনায় মেঘ-মেদুর-শ্রাবন-সন্ধ্যার মত ভারাক্রান্ত, ম্লান ও বিষন্ন। গোকুলের চক্ষু সজল, উমার চক্ষে ত ধারার বিরাম নেই। শেষ সময়ে অনেকগুলো কথা বলবে মনে করে রেখেছিল। কিন্তু কিছুই বলা হল না। কথা বলার উপক্রম করলেই কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটবার পর বাইরে থেকে রমেনের ডাক এল—কই গো।

উমা তার কম্পিত হাত দুখানি বাড়িয়ে গোকুলের দুটি হাত ধরে বলল—আমাকে মনে রাখবেনা। ভুলবেন না।

গদগদ-স্বরে গোকুল বলল—না উমা, না।

—তিন সত্য করেন।

—ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না।

উমা ঝাঁপিয়ে গোকুলের বক্ষে এসে পড়ল। কিছুক্ষণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিল। তারপর গলায় আঁচল দিয়ে গড় হয়ে গোকুলের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করল—চিরদিন হতভাগীরে এমনি বালবাসবেন ?

—হ্যাঁ উমা, বাসব। নিশ্চয় বাসব।—বলে গোকুল ডান হাত দিয়ে তার চিবুক স্পর্শ করল। চোখ মুছে মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে ধীরপদে বেরিয়ে এসে উমা গাড়িতে বসল। রমেনও গাড়িতে উঠে বসল এবং বলল—আসি বাবু। গোকুল ঘাড় নাড়ল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

উমা চলে গেল—আত্ম-সমর্পিতা, প্রত্যাখ্যাতা, জন্মদুখিনী উমা। তার দুই চক্ষু থেকে নির্গত দুই বিন্দু অশ্রু গোকুলের বক্ষের বিন্দুকে মুক্তা হয়ে রয়ে গেল।

সমাপ্ত

আমার দেশের ভাষা

রমনীমোহন মাইতি

এখন যুগ পরিবর্তন হয়েছে—যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং জীবিকার প্রয়োজনে ও রাজনীতিক আবর্তনে বহু স্থানচ্যুতলোক আমাদের মহিষাদল অঞ্চলে এসে পড়েছেন (তমলুক থেকে পূর্ব দক্ষিণ দিকে) অনেক অন্য জেলাবাসী সরকারী কর্মচারী বদলী হয়ে এসেছেন আবার পূর্ববঙ্গীয় বাস্তহারা অনেক নূতন বাস্ত করে বসবাস ও ব্যবসায় করছেন। এখানের এক সমাজের মধ্যেই বাংলার নানাস্থানের কথা ভাষার সংমিশ্রণ সবার অজ্ঞাতে হয়ে চলেছে। কিছু অনুসন্ধান করলে আমরা এমন বহু শব্দ পেতে পারি যা বাংলা অভিধানে নাই অথবা থাকলেও এখানে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। এরূপ কিছু শব্দ ও তাদের ব্যবহার নিবেদন করছি।

প্রসঙ্গতঃ বলি সুন্দরবন এলাকায় নানা স্থানের লোক গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন—তাঁদের মধ্যে আমাদের কাঁথি মহকুমার বহু লোক আছেন—তাঁদের কথায় ওড়িয়া ভাষার বেশ মিশ্রণ আছে-আবার ২৪ পরগণার বহু স্থানের লোক আছেন যাঁদের বাচনভঙ্গী বিশিষ্ট রকমের (রেডিওতে কাশীনাথের ভাষা)—তমলুক অঞ্চলের ও অনেক লোক ওখানে বসতি করেছেন। ফলে সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নানা ভাষার ভিয়ান হয়ে এক অদ্ভুত রকমের বাংলা শোনা যায়। বাইরের লোকের কানে তা লাগে—স্থানীয় লোকেরা ধরতে পারেন না।

এখন আমাদের সংগৃহীত কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করি। আশাকরি সমাগত ও স্থানীয় লোকগণ এই ভাষা উপভোগ করবেন। শব্দগুলি যথাসাধ্য বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে দিই :—

১। অল্যাজল—চালের জল যেখানে পড়ে
২। অটকল—আন্দাজ
৩। অমবতী—অম্বুবাচী (আষাড় মাসে)
৪। আঁহাড়—আড়াল
৫। আউলা—খোলা (আউল্যা গা)
৬। আন্যা—কাপড়ের ছেঁড়া পাড়
৭। আউন্দ—যে দড়ির ফাঁস লাঙ্গলকে জোয়ালের সঙ্গে যুক্ত রাখে
৮। আনক—চশমা
৮। (ক) আলতি—কচু
৯। ইত্রানি—মাথা খারাপ করে উপদ্রব
১০। উন্দুর—ইন্দুর (সংস্কৃত উন্দুরু হইতে)
১১। উধার—ধার (borrow)
১২। উড়ুশ—ছারপোকা
১৩। উনকুল—আরম্ভ (রোয়া উনকুল করা)
১৪। খাইসোদ—মন্দ অভ্যাস
১৪। (ক) কাই—কোথায় (ওড়িয়া থেকে)
১৫। কুনাঠি—কোথায় ঐ
১৬। কোকতুল—ঘুঘু পাখী
১৭। কৌয়া—কাক (হিন্দী থেকে)
১৮। কান্দোল—ঘরের পেছন দিক
১৯। কানা, কানি—কাপড়ের টুকরা
২০। কাঁকড়ী তলা—শুকনো জমিতে ধানের বীজতলা
২১। কুকাপ অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার
২২। কষাফল—হরিতকী
২৩। করভাঙ্গা—কামরাঙ্গা
২৪। কাঁধাবাড়—বাঁধের ধারের জমি
২৫। খঁজা—দুই চালের সংযোগস্থল
২৬। খিড়কী—পিছনের দরজা
২৭। খাল—চামড়া অর্থে

২৮। খলাবার—ধান ঝাড়ার স্থান (ওড়িয়া)
২৯। খুড্যা কলাই—খেশারি
৩০। খাবোল—খাদ্যের এক গ্রাস
৩১। খিরান—ছড়ান
৩২। খশড়া—অমসৃণ
৩৩। গদা—গভীর ধানের জমি
৩৪। গাংকই—মিরগেল মাছ
৩৫। গড়াদানা—গরু বাঁধার জায়গা
৩৬। গিরশা—ঘামাচি
৩৭। গাব—(১) তেরেণ্ডা গাছ
(২) কয়ফল
৩৮। গেড়্যা—পুকুর (ওড়িয়া)
৩৯। গইরা—গভীর
৪০। গোড়—পা (ওড়িয়া)
৪১। গিলাফ—মোটা চাদর
৪২। ঘুনী-মুগরী—মাছ ধরার যন্ত্র
৪৩। ঘুটী—জমির কোনের সীমা চিহ্ন
(যে জমিতে আইল নাই)
৪৪। চাট—পাঠশালার ছাত্র
৪৫। চেংলা—কম বয়সের ছেলে
৪৬। চগার—চীৎকার
৪৭। ছাঁদ—জমির আইল
৪৮। ছামড়া—কোন জায়গার উপরে চট বা কাপড়ের আবরণ
৪৯। ছেন্তা—খেজুর বা হেতাল পাতা দিয়ে তৈরী ঝাঁটার মত জিনিষ
৫০। জাণ—জল নির্গম পথ (ওড়িয়া)
৫১। ঝুঁড়ি—ছোট ডোবা (লবন প্রস্তুত ব্যাপারে)
৫২। জারিন্দা—বারান্দা
৫৩। জামির—টক কমলা লেবু
৫৪। টজর—অরহর কলাই
৫৫। টাবা—টক লেবু
৫৬। টৈক—জিদ
৫৭। ডিজোর—মাথার বড় উকুন
৫৮। নিক—উকুনের ডিম
৫৯। ডিঞা—(১) বড় পিপীলিকা
(২) মাছ ধরার গর্ত্ত
৬০। ডাব—গভীর মাঠ
৬১। তোহরে—তোমাদের (ওড়িয়া থেকে)
৬২। মোহরে—আমাদের "
৬৩। মরে—আমরা "
৬৪। দোরথা—আলোর রাখার কাঠের পিলসুজ
৬৫। দাউলী—কাটারি
৬৬। ধুপ—রৌদ্র (হিন্দী)
৬৭। নিশ—গোঁফ
৬৮। নান্দা—মাটীর বড় কলসী (ব্যবহার—নান্দা পেটা)
৬৯। নিহ্মা—বেশ বড়
৭০। নেপাল ইন্দুর—কাঠবিড়ালী
৭১। নিমকী পুলিশ—আবগারী পুলিশ
(আগে এরা লবন তৈরী করত)
৭২। পড়েক—ছেলে
৭৩। পুৎরা—ভাইপো
৭৪। পতা—উচু ঢিবি
৭৫। পিছা—খেজুর পাতার ঝাঁটা
৭৬। পাশা—কোদাল বা টাজীর গোড়া
৭৭। পুতা—নোড়া (বাটনা বাটার জন্য)
৭৮। পেখ্যা—তালপাতার আবরণ
৭৯। পাগড়ী—গরু বাঁধা দড়ি
৮০। পালা চুড়কী—যে মেয়ে পালিয়ে গেলে খুঁজতে হয়।
৮১। বাণ—আতসবাজী—(ওড়িয়া)
৮২। বনী পাখী—শালিক
৮৩। বেলেই—বিড়াল
৮৪। বদা—পুং ছাগল
৮৫। বিচা—বীজ
৮৬। বহ্মাতী—মন্দিরের পরিচারক
৮৭। বুদা—ঝোপ
৮৮। বাসনা গাছ—বক পুষ্পবৃক্ষ

৮৯। বাঁদর লাঠি—সোঁদাল

৯০। বোল—জলনির্গম পাইপ

৯১। বড়কী, মাজকী, ছোট্‌কী—বড় মেজ, ছোট বধূ

৯২। ভিতা—জমির ধার

৯৩। ভেড়া—বড় বাঁধ (এম্‌ব্যাঙ্কমেন্ট)

৯৪। ভাগারী—পরিবারের অংশীদার

৯৫। ভাউল্যা—ছোট পালী নৌকা

৯৬। ভুকামারা—মুষ্টি আঘাত

৯৭। মাতারী—মতৃস্থানীয়া

৯৮। মাকান্দু—মেয়ের সঙ্গিনী মহিলা (স্বামী গৃহে যাওয়ার সময়)

৯৯। মাগুরিকা—ফড়িং

১০০। মাড়া—মাঠের মধ্যে পায়েচলা রাস্তা

১০১। মুনাভ—গরুর মুখের দাঁড়কাস

১০২। লম্ফ—ল্যাম্প (কুপী)

১০৩। শলা, পড্যা—জাল বুনবার কাঠি

১০৪। সাহী—পাড়া (ওড়িয়া)

১০৫। সুকা—সমুদায় (হিন্দী সমুচ্চা)

১০৬। সৈয়—ভিন্ন, ছাড়া (হিন্দী সিওয়ায়)

১০৭। সাপ—মাদুর

১০৮। সোড়ো—শ্যালিকার স্বামী (ওড়িয়া)

১০৯। সিয়াপুয়া—পুনর্ণবা।

১১০। সাটোলে—মহলে (মেয়েদের)

১১১। হোড়—ঘোরতর কান্না

১১২। হড়কা—পিচ্ছিল

১১৩। হিটমা—জেদী

১১৪। হল্লান—গোলমাল (ছেলেদের)

১১৫। হদ—জলের পানা (যেমন কচুরী পানা)

১১৬। বড়া মারা—চুপ করে থাকা

আমাদের কতক শব্দ অন্যান্য অঞ্চলে বা জেলায় অন্তরূপ বলা হয়—কিছু সংগ্রহ দিয়ে দিই—জেলার নাম সংকেত এইরূপ মেদিনীপুর (ম) বাঁকুড়া (বা) চট্টগ্রাম (চ) ফরিদপুর (ফ) ঢাকা (ঢা) মালদহ (মা) হাওড়া (হা) বরিশাল (ব)

১। কলার কাঁদি—ছড়া (ঢা) থোকা (মা)

২। মিষ্টি কুমড়া—বৈতাল (ম) ডিংলে (বা)

৩। কাঁকরোল—কাঁকড়া (মলিমাদল) ঘি কাল্লা (বা)

৪। করমচা—করঞ্জা (হা) করজা (ঢা)

৫। রেড়ীর গাছ—ভেরাণ্ডা (ম) রয়না (ফ)

৬। উইচিংড়া—উৎরাঙ্গা (ঢা)

৭। তামাক—তামুক, তাঁউ (চ) গুড়ুক, গুড়াক (কলিকাতা)

৮। চিটা—রাব (ঢাকা, ত্রিপুরা)

৯। দোক্তা—হাদা (চ) গুণ্ডি (উড়িষ্যা)

১০। তালতা বাঁশ—তরল বাঁশ (ম) টল্লা বাঁশ (ফ)

১১। ছেলে—লাত্তভা (চ-মগ) পোয়া (চ-মুসলমান) পোলা, ছ্যামরা, কোকা, কুকী (ঢা) ছেলে ছোকরা (ক) খোকা খুকু (কলিকাতা) ছাওয়াল (ব) পড়েক, টকা, পিলা (ম—দক্ষিনাংশ)

১২। ঢেড়স—ভেঁড়ির (ম) রাম ঝিঙা, রামপটল (বা)

১৩। পেঁপে—পম্পা, পাইপ্যা (ফ)

১৪। পেয়ারা—গইয়া (ফ)

১৫। মাঠ পাতর (চ) ডাব, জলা (ম) চক (ঢা)

১৬। মুখ—তুঁড় (ম) ব্যাৎ—(বা) মুখ করা—তিরস্কার (বা)

১৭। বরবটী—রম্ভাকলাই (ম) লাফপা (ফ) রমাকলাই (বর্ধমান)

১৮। নাটাফল—লাটা (ম) গুণ্ডগুলে (ব)

১৯। বিচাকলা—আঠ্যাকলা (খুলনা)

২০। উই—উলি (ঢা)

আরও বহু শব্দ আবিষ্কার হতে পারে—বাঙ্গালীকে চিনতে হোলে তার ভাষার ও চর্চা করতে হবে। কেবল ব্যাকরণের উপরে ভরসা করলে চলবেনা। ভারতকে এক করতে হলে বাংলা, বিহার, উৎকল, মারাঠা, দ্রাবিড় প্রভৃতি সকলের ভাষার চর্চা করতে হবে—সকলের উপরে সংস্কৃত ভাষাকে স্থান দিতে হয়। তবেই না ভারত সংহতি হবে। বাঙ্গালী ছড়িয়ে আছেন সারা ভারতে—বাঙ্গালীই একাজে সকলের চেয়ে যোগ্য হবেন আশা করি।

বঙ্গদেশে জৈন-প্রভাব

রামপ্রসাদ মজুমদার

ভারতবর্ষের তথা বঙ্গদেশের প্রাচীন সভ্যতাকে স্থূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে,—ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন। ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতা বা গোঁড়া হিন্দুয়ানী যে অনেকদিন ধরে বাঙ্গালী সমাজে বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে প্রভুত্ব করেছিল ও এখনও প্রবল তা সহজে বোঝা যায়। ঐতিহাসিক, আনুষ্ঠানিক ও ভাবাতাত্ত্বিক দিক দিয়েই একথা বলছি। বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাবকে সাধারণতঃ দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়। রাজা শশাঙ্কের কালে (৭ম শতক) মুর্শিদাবাদে 'রক্তমৃত্তিকা' বিহারে বা কর্ণসুবর্ণে ও মেদিনীপুরের 'তাম্রলিপ্তে' বৌদ্ধ সভ্যতা ছিল, পরবর্তী পালরাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন, আবার পালযুগের শেষে বা সেন যুগে ঢাকার বজ্রযোগিনী অঞ্চল ও নানা স্থলে বৌদ্ধ প্রভাব ছিল। চর্যাপদে এমন কি খনার বচন বা ডাকের বচন প্রভৃতিতেও বৌদ্ধ প্রভাব দেখা যায়। হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতা সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়েছে জৈন সভ্যতা নিয়ে এদেশে বিশেষতঃ বাংলায় তেমন হয় নি। এর কারণ বোধ হয় জৈন সভ্যতার দান তুলনায় অল্প মনে করা হয়; আরও একটা কারণ জৈন সাহিত্য প্রধানতঃ পুঁথির মধ্যেই দীর্ঘকাল থাকায় লোকচক্ষে তেমন প্রকাশিত হয়নি।

ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন মতগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখান কিন্তু খুব সহজ মনে হয় না। ঋগ্বেদাদির মধ্যে এমন কি মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার মধ্যেও এই তিনের কয়েকটা মৌলিক আদর্শ অন্তর্নিহিত নিহিত রয়েছে একথা কেউ কেউ (বর্ত্তমান লেখকও তন্মধ্যে) বলেছেন। ঋগ্বেদের মধ্যেই সর্প-ঋষি, বয়ঃপেক্ষী বলা হয়। ঋষি (তার্ক্ষ্য অরিষ্ট-নেমি' প্রভৃতি ঋষি ও নানাপ্রকারে জাত ও নানা বিরুদ্ধ মতের ঋষিও রয়েছেন; ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থেও একেবারে ব্যতিক্রম নয়। 'পুরাণাদিতে ত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরাদি ও জম্বুদ্বীপাদি বর্ণনে ঋষভ-দেব (আদি জৈন) তৎপুত্র ভরত (১ম) প্রভৃতির ও অবতার বর্ণনাদিতে (বুদ্ধদেব বা গৌতমের বিষ্ণুর অবতাররূপ নানা বর্ণনা রয়েছে। আর্য অবদান ও অনার্য্য অবদান নিয়ে কথাতেও এই ধরণের নানা বিতর্ক উঠে পড়ে। মহেঞ্জোদড়োর ধ্যানী যোগী মূর্ত্তিকে পশুপতিমূর্ত্তি বলা হয়, এর সঙ্গে ঋগ্বেদের 'রুদ্র' বা 'মহো দেবো-'র তুলনাও কেউ কেউ করেছেন, মহেশ্বরের নামে চতুর্দ্দশ মাহেশ্বর-সূত্রের উপর বিখ্যাত পাণিনির ব্যাকরণ-বেদাঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে; পাণিনির শিক্ষা-বেদাঙ্গেও।

"ত্রিষষ্টিশ্চতুঃ ষষ্টি-র্বা বর্ণাঃ শম্ভুমতে মতাঃ।...“১”

শম্ভুর নাম। শিবকে নিয়ে অনার্য্য-দেবতা সাজান বা 'কুচুনীপাড়া' প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত করা সাহিত্যিকদের ও সমালোচকদের পক্ষে সহজ হয়েছে। এই শিবেরই সংসারভুক্তরূপে অম্বিকা উমা বা দুর্গা, গণেশ কার্ত্তিকের প্রভৃতিকে,—এমন কি পরবর্ত্তী সাহিত্যে চণ্ডী, মনসা প্রভৃতিকে বিশেষভাবে পাই। 'হৈমবতী উমা' উপনিষদে ইন্দ্রাদির দর্পচূর্ণকারী ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে রুদ্র ও অম্বিকাকে ভাই-ভগিনী রূপে দেখা যায়। নারী বা দেবীরূপে ঋগ্বেদে 'অম্বা' ও 'ননা' শব্দের প্রয়োগ আছে, অবার সিংহবাহিনী-দেবীরূপে 'ননা'র মূর্ত্তি—কমবেশী দু'হাজার বছর পূর্বের তৈরী বা খোদাই করা, এসিয়া মাইনর প্রভৃতিতে পাওয়া যায়, আর ঐরূপ মূর্ত্তি মোন্ ও খ্মের (Mon-Khmer) সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম-শ্যাম অঞ্চলে পাওয়া যায়।

এইবারে জৈন-প্রসঙ্গে বলি। উক্ত 'অম্বিকা' দেবী যক্ষিণী-রূপে জৈন সম্প্রদায়ে পূজিতা তা বলা যায়, কমবেশী দেড় হাজার বছর পূর্বের মূর্ত্তি পশ্চিমভারতে

পাওয়া যায়; প্রাচীনতম সরস্বতী মূর্তিও জৈন-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজপুতানা-সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পাওয়া যায়। সরস্বতীতে পুরাণাদিতে দুর্গার কন্যারূপ ধরা হয়, ঋগ্বেদের "বাক্ আম্ভৃণী"র সূক্তটি দেবীসূক্তরূপে দুর্গা-পূজা বা চণ্ডীপাঠে পঠিত হয়। উক্ত 'বাক্' দুর্গার প্রকৃতি না বাগ্দেবী সরস্বতীর প্রতীক তা সহজে বলা যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণের বৃহদারণ্যক উপনিষদে এক গুরুপরম্পরা-বর্ণনে ৩০।৪০টি নামের মধ্যে প্রথম দিকেই 'অম্ভৃণের কন্যা বাক্' কে পাওয়া যায়। অতএব স্থূল হিসাবে উপনিষৎকে ৮০০খৃঃ পূঃ ধরলে উক্ত বাক্ বহু পূর্বের। ঋগ্বেদের 'সরস্বতী'-প্রসঙ্গ নদীরূপে বা দেবীরূপে ব্যাখ্যাত হয়। অম্বিকা ও সরস্বতীর প্রাচীন মূর্তির দিকে লক্ষ্য করলে বলা যায় যে হয়ত তাঁরাই এই দুই দেবীকে মূর্তিরূপে তথা বঙ্গে পূর্বে প্রচার করেছে। উল্লেখ হিসাবে মহাভারতে (—খৃঃ পূঃ—খৃঃ অব্দ) দুর্গা প্রভৃতির কথা আছে।

আচারাঙ্গ-সূত্র বনাম ভগবতী-সূত্র

দু-হাজার বছর পূর্বের জৈন আচারাঙ্গ-সূত্রে দেখা যায় যে 'সুব্ভ' বা সুহ্মের অধিবাসীরা রুক্ষভাবে জৈন তীর্থঙ্কর ও জৈনদের পিছনে ছুক-ছুক শব্দে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ জৈন মতকে ঠেলে দিয়েছে, কিন্তু তাই বলে জৈনেরা এদের 'অনার্য্য' বলে নি। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ 'পণ্ণবণা'বা প্রজ্ঞাপনা-সূত্রে তথা প্রায় ২৫০০হাজার বছর পূর্বে লিখিত বা সঙ্কলিত জৈন ভগবতীসূত্রে' লাঢ় বা 'রাঢ়' প্রভৃতির লোককে 'আর্য্য' বলা হয়েছে। শেষোক্ত-গ্রন্থে আর্য্য জনপদগুলির তালিকায় বঙ্গের (কোনও পাঠে ত্রিলিঙ্গ) রাজধানী-রূপে তাম্রলিপ্ত ও 'লাঢ়ে'র বা লাঢ়ের (রাঢ়ের) রাজধানী রূপে 'কোড়িবরিষ' বা কোটীবর্ষ ব'লে ("কোড়িবরিষং লাডায়ে" প্রজ্ঞাপনা মতেও) ধ'রে এদের 'আর্য্য'দেশ বলা হয়েছে। হিন্দু-শাসনে বৌদ্ধমত বাধা পেলেও বুদ্ধদেব যখন বঙ্গদেশের স্থানবিশেষ ঘুরে গেছেন ও বঙ্গীশ-থেরো (বঙ্গাধিপতি—) তাঁর শিষ্যরূপে মিলিন্দ-পঞ্হো (মিলিন্দ বা মিনান্দারের প্রশ্ন) ইত্যাদিতে বিশেষরূপে সম্মানিত হয়েছেন তেমনি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ প্রভৃতি বঙ্গদেশের অংশবিশেষ ঘুরে গেছেন একথা জৈনসাহিত্যে দেখা যায়। বাংলার পাশে পরেশনাথ-পর্বত প্রভৃতিতে জৈন আধিপত্য ছিল বলা যায়।

দেবার্চনাঃ—এ প্রসঙ্গে পূর্বেই কিছু বলেছি, এখন বিখ্যাত ও জৈনলিপিতে প্রাপ্ত (পঞ্জাব-অঞ্চলে) ও প্রকাশিত জৈনগ্রন্থ 'কথাকোষঃ' হতে কয়েকটী অনুষ্ঠানের উল্লেখ করছি—যেগুলি বাঙ্গালীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অন্নমতে দুর্লভ-প্রায়।

১। বীতরাগ-পূজাপ্রসঙ্গে "লক্ষ্মী; চঞ্চলাং বিমুক্ত", অর্থাৎ অর্থের সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্বন্ধ। ২। বিশেষ বিশেষ তীর্থঙ্করের "বিম্ব-প্রতিষ্ঠা" বা পাঠভেদ"—প্রতিকৃতিঃ", বিম্বটী প্রতীকরূপে খোদাই করা হত বা আঁকা হত। ৩। "চাতুর্মাসিক পর্বণি-পুষ্পচতুস্-সরিকঃ" অর্থাৎ ফুলের ব্যবহার। বৈদিক সাহিত্যে ফুল দিয়ে উপাসনা বা 'পূজা' শব্দের প্রয়োগ নেই,—অতএব তা ছিল না; একথা কেউ কেউ বলেন। ও মত সত্য হউক বা না হউক জৈনদের মধ্যে এই সব রীতি ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল। প্রতিমা সম্বন্ধে ও একথা কিছুটা বলা যায়, যেমন "শৈলময়ী; জিনপ্রতিমাং দৃষ্টবান্"। 'ব্রত' শব্দ বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, জৈনদের মধ্যেও "ব্রত; জগৃহতুঃ" শ্রাবক আরাম প্রভৃতি শব্দ বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যেও আদরের বস্তু। যোগিনী বা বৌদ্ধতন্ত্রে খ্যাতিযুক্তা উক্ত কোষে যোগিনীর প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু এদের স্থান কি জানিনা। এক প্রসঙ্গে শাকিনীর নিন্দা; "কিং ত্বং-শাকিনীতি গৃহীতা..."। ৩। আসন—পূজনাদি। ধ্যানে আসনের প্রাচীনতম উল্লেখ সম্ভবতঃ (দুহাজার বছর পূর্বের) পাতঞ্জল যোগসূত্রে। কিন্তু আসনের বিবিধ নাম ও সংজ্ঞা আরও পরবর্তী—এই সাধারণ মত। দু হাজার বছরের বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি হতে কিন্তু আসনাদির রূপ বোঝা যায়। জৈনকোষে দেখি "তাবন্মুনিরেকো বদ্ধ পদ্মাসনো দৃষ্টঃ।", পূজা ও পূজাকাল-প্রসঙ্গে আরও দেখি, "তং স্নপয়িত্বা চন্দন-পুষ্পাদ্যৈঃ পরিপূজ্য...",

নাগদত্তের জিনপ্রাসাদ-গমন প্রসঙ্গে "ত্রিবেলাং যাতি"। অন্যাদি-মতে ফুল-চন্দন, অক্ষত বা আতপ চাল প্রভৃতির দ্বারা যেমন পূজাবিধান, এখানেও তাই ; ঐরূপ ত্রিসন্ধ্যার মত ত্রি-বেলার কথা। দীপালি উৎসব, বসন্ত উৎসব প্রভৃতির প্রসঙ্গও এই কোষে তথা অন্যত্র জৈন-গ্রন্থেও আছে। এই কোষে 'গৌড়দেশে', 'চম্পা', শ্রীপুর 'হতে 'রত্নদ্বীপে' বণিক্‌দের গমন প্রভৃতি প্রসঙ্গ নানাভাবে আছে। উক্ত শ্রীপুরটী ঢাকার নিকটে ও চাঁদ রায় প্রভৃতির রাজধানীরূপে বিখ্যাত শ্রীপুর বলে মনে হয়। আসনসোল: রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থলে যে সব প্রস্তরমূর্ত্তি দেখেছি তার কয়েকটী জৈন বলেই শুনেছি ও তাই মনে হয়েছে। হনুমান্ ও মহাবীরের পূজা উক্ত কোষেও আছে, আর ঐরূপ অর্বাচীন মূর্ত্তি বাংলার নানাস্থানে তা দেখাই যায়। ৪। রাম-কাহিনী। এক অর্বাচীন রামতাপনীয় উপনিষদে' রামসীতার কাহিনী আছে, সম্ভবতঃ রাবণ-কাহিনী নাই ; বৌদ্ধ 'দশরথ জাতিকে' (দশ) রাম ও সীতাকে ভাই-বোনরূপে ধরা হয়েছে, উক্ত কোষে কিন্তু শ্লোকে সীতার পবিত্রতা ও অগ্নিশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

পূর্বোক্ত কতকগুলি রীতি পুরাণঅন্যাদি হতে (শেষ সঙ্কলনকাল প্রায়ই খৃষ্টের বহুপরবর্ত্তী বলে ধরা হয়) জৈনরা তথা আমরা নিয়েছি অথবা জৈনদের নিকট হতে অন্যেরা ও আমরা নিয়েছি, তা বিচারের বিষয়।

ভাষাতাত্ত্বিক দিক : পালিভাষার ও বৌদ্ধসংস্কৃত-গ্রন্থের শব্দের সংগে বাংলাভাষার যে সাদৃশ্য দেখা যায় তার চেয়েও অনেক বেশী সাদৃশ্য প্রাকৃত বিশেষতঃ জৈন প্রাকৃত ও জৈনসংস্কৃত গ্রন্থের শব্দের সংগে রয়েছে, এই কথাই আমার মনে হয়, বোধ হয় অনেকেই তা বলবেন। ধারাপাতে আমরা যে-সব হিসাব ও গণনা শিখি তার কিছু কিছু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, পরবর্ত্তী বৌদ্ধগ্রন্থে, ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ইত্যাদি গ্রন্থে দেখা যায় বটে, কিন্তু ব্যাপকতর হিসাব-নিকাশ,-যেমন বরাটক-গণ্ডক-কার্ষাপণ প্রভৃতির ব্যাপক বিচার ইত্যাদি,-তা জৈনসাহিত্যেই দেখা যায় যেমন সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষায় 'অংগবিজ্জা' (অংগবিদ্যা) 'ত্রিশতী' প্রভৃতি প্রাক্-গুপ্তযুগের ও পরবর্ত্তী গ্রন্থ হতে। পালিকে প্রাকৃতের শাখা ধরলেও পালি ও প্রাকৃত-অপভ্রংশে সাধারণভাবে বহু ভেদ। কতকগুলি বাংলা লৌকিক শব্দ যার প্রয়োগ পালি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতে দেখা যায় না বা সহজে পাওয়া যায় না তা জৈন সংস্কৃত বা প্রাকৃতে মেলে। জৈন ও পশ্চিমী হেমচন্দ্র (১১ শ শতক) রচিত প্রাকৃত ব্যাকরণ ও কোষ, পূর্ব ভারতীয় ও হয়ত বাঙালী পুরুষোত্তমের (-১২ শ শতক) প্রাকৃতানুশাসন ব্যাকরণে ও অন্যান্য প্রাকৃতগ্রন্থে এরূপ বহু শব্দ পাওয়া যায়। উক্ত কথাকোষ হতে কয়েকটি মাত্র শব্দের নমুনা দিচ্ছি, এদৃষ্টান্ত অন্যান্য প্রাকৃতগ্রন্থে এরূপ বহু শব্দ পাওয়া যায়। উক্ত কথাকোষ হতে কয়েকটী মাত্র শব্দের নমুনা দিচ্ছি, এ দৃষ্টান্ত অন্যান্য প্রাকৃত গ্রন্থেও বোধ করি অনুপস্থিত বা বিরল। অছ্ (অস্-থাকা) থক্ক (স্থা,-থাকা) প্রভৃতি বহুস্থলে আছে, এবারে দেখুন :-
১। খাটায় (চালায়) অর্থে "হালিক...হলং খেটয়তি"। ২। চড়া (আরোহণে), "পর্ব্বতে চটিত্বা কালং কৃ'ন্ কামা-শ্রবণীং কুরুতে"। "কোপে চটিতঃ"। ৩। ছড়ান "অক্ষতৈঃ দৃংঠরেখা। দৃংঠিতঃ সজীবো বভূব।" ৪। সম্ভবতঃ ছোটা (ধাবন) অর্থে, সম্পূর্ণ "আয়ুষি ছুত্বা... বণিক্ বভূব"। ৫। হাঁকা, "কুমারেণ হাঁকিত পুরুষঃ-রে রে দুরাচার"। ৬। মাগা (চাওয়া) "মার্গয়স্ব মনোবাঞ্ছিতম্।" 'এরূপ' ছড়ান, ঢালা, ঢোলান প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগও আছে।

এইরূপ নানাভাবে ভেবে দেখলে জৈন প্রভাব বাঙালীর সভ্যতা, আচারে ও ভাষায় রয়েছে তা প্রত্যক্ষভাবে বা অপ্রত্যক্ষভাবে হ'ক, একথা কতকটা জোরের সংগে বলা যায়।

কংগ্রেস স্মৃতি

বিশেষ অধিবেশন—কলিকাতা ১৯২০

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(৫)

৬ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট ছিল বেলা ১১টা। পূর্ব্ব দিনের মত যথাসময়ের বহু পূর্ব্বেই সভামণ্ডপ দর্শক ও প্রতিনিধি দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল। তখনকার দিনে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার সুব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি, গরমের জন্য প্যাণ্ডেলের ভিতর বহু হাতপাখা বিতরিত হয়েছিল।

ঠিক ১১টার সময় শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত তাঁর অনুচর সহ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় আজ তাঁকে 'বন্দে মাতরম' ও আনন্দধ্বনি দ্বারা সকলে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করল।

এর কিছু পরে সভাপতি পূর্ব দিনের মত শোভাযাত্রা সহকারে, প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে ডায়াসে তার আসনে উপবেশন করলেন।

সভার কার্য্যের প্রারম্ভে বালক-বালিকাগণ কর্তৃক সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'জাগ্রত ভগবান' গীত হল।

তারপর সভাপতি মহাশয় প্রথম দিন ইংরাজিতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার ভাবার্থ হিন্দীতে বললেন।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও ডাঃ মহেন্দ্রনাথ ওহেদ্দেদারের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্বয়ং সভাপতি মহাশয়। সকলে নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করল, (ডাঃ ওহেদ্দেদার লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন)।

এরপর পণ্ডিত গোকরণ নাথ মিশ্র—য়ুরোপ থেকে কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করে প্রেরিত সরোজিনী নাইডু, মহম্মদ আলী, সুলেমান ও আবদুল করিমের টেলিগ্রাম উল্লেখ করলেন।

কংগ্রেসের প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে পাঞ্জাব অনুসন্ধান সব কমিটি ও তাদের দ্বারা নির্বাচিত কমিশন যে গুরুতর পরিশ্রম ও জুডিসিয়াল সতর্কতার সহিত সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন—যে রিপোর্ট কেবল নিজের গৃহীত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয় পরন্তু হাণ্টার কমিটির সাক্ষ্য দ্বারাও সমর্থিত—তজ্জন্য এই কংগ্রেস তাদের ধন্যবাদ দিচ্ছে এবং উক্ত কমিশনাররা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাতে সহমত প্রকাশ করছে এবং

(ক) হাণ্টার কমিটির অধিকাংশের—রিপোর্টে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তজ্জন্য এই কংগ্রেস গভীর হতাশা প্রকাশ করেছে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্নমত প্রকাশ করছে।

(খ) এই কংগ্রেস আরও সুচিন্তিত মত প্রকাশ করছে যে

(১) হাণ্টার কমিটীর মেজরিটি রিপোর্ট পক্ষপাত ও জাতিবিদ্বেষ দোষে দূষিত, সাক্ষ্য প্রমাণের স্বল্প বিবেচনার উপর রচিত এবং সংশ্লিষ্ট,—গভর্ণমেন্ট কর্মচারীদের প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট অন্যায় আচরণের কলঙ্ক থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য স্পষ্ট ইচ্ছা এবং পাঞ্জাব ও

ভারত গভর্ণমেন্টের আচরণের দোষক্ষালনের ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবান্বিত।

(২) ঐ রিপোর্ট গ্রহণের অযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য কারণ ইহা অসম্পূর্ণ, একমুখী এবং আত্মস্বার্থ রক্ষার জন্য পক্ষপাতদুষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রেকর্ডের (নথি পত্রের) প্রমাণানুসারেও মেজরিটী রিপোর্টের সিদ্ধান্তগুলি ন্যায্য বলে গ্রহণ করা যায় না এবং তার সুপারিশগুলি পাঞ্জাবের সর্বনিম্ন দাবির চেয়েও অনেক কম।

(গ) হান্টার কমিটীর উভয় রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত গভর্ণমেন্টের 'রিভিউ' সম্বন্ধে এই কংগ্রেস সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করছে যে—

(১) ঐ রিভিউ কোন প্রকার—বিশ্লেষণ না করে মেজরিটি রিপোর্ট মেনে নিয়েছে।

(২) মাইনরিটি রিপোর্টের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত স্বল্প ও অপ্রচুর বিবেচনা করেছে যদিও তাদের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত রেকর্ডের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত।

(৩) ঐ রিভিউয়ের মত সবই ছিল ঘটনা সম্বন্ধে কোন ন্যায্য ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা চেপে যাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দুষ্কৃতির উপর বিস্মৃতির যবনিকা ফেলা।

(৪) রিভিউতে দোষী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করা হয়েছে তা প্রমাণিত ঘটনাবলীর গুরুত্বের তুলনায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং এতে ব্রিটিশ বিচারের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার আস্থা নষ্ট হয়েছে।

স্যার আশুতোষ প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন যে প্রস্তাবের বিষয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন সুতরাং তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা দেবেন না। তিনি কংগ্রেস সব কমিটীর সদস্যগণকে তাদের পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বললেন যে তাঁরা ১৭০০ সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁরা ন্যায্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

বোম্বের শ্রী যোসেফ ব্যাপ্টিষ্টরা এই প্রস্তাব সমর্থন করে প্রথমেই বললেন যে তিনি আশা করেন স্যার আশুতোষ তাঁর নাইটহুড ত্যাগ করবেন। ব্যাপ্টিষ্ট মহাশয় জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে স্বরাজ অর্জন না হওয়া পর্য্যন্ত—বিগত ঘটনা ভুলে না যেতে সকলের নিকট আবেদন করলেন।

সিন্ধুর শ্রী চৈতরাম (হিন্দিতে), দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁ (উর্দুতে) ব্যায়ামবীর প্রফেসর রামমূর্তি, মাদ্রাজের শ্রী এন এস রঙ্গস্বামী, যুক্তপ্রদেশের শ্রীমতী মঙ্গলা দেবী ও জলন্ধরের শ্রীমতী সরস্বতী দেবী (হিন্দিতে) প্রস্তাব সমর্থন করার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে বৃটীশ মন্ত্রী সভা পাঞ্জাবের নৃশংসতা সম্বন্ধে কোনপ্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ভারত গভর্ণমেন্টের সুপারিশগুলিতে সম্মতি দেওয়ায় এবং প্রকৃত পক্ষে পাঞ্জাবের কর্মচারীগণের আচরণ কার্য্যতঃ মেনে নেওয়ায় এই কংগ্রেস তিক্ততা অনুভব করছে। এই কংগ্রেস আরও অভিমত প্রকাশ করেছে যে তাদের 'ডেসপ্যাচে' মহান ও উচ্চাঙ্গের ভাব প্রকাশ করা সত্বেও ব্রিটিশ মন্ত্রী সভার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অক্ষমতার জন্য ভারতীয় নাগরিকগণ তাদের উপর আস্থা হারিয়েছে।

জিতেনবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বললেন যে এই নিন্দাসূচক প্রস্তাব সমগ্র মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে হলেও—এ বিশেষ করে মিঃ মণ্টেগু বিরুদ্ধে হয়েছে। মন্ত্রী সভার ডেসপ্যাচে জু (ইহুদী) ভারত সচিবের হস্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এই উক্তিতে বাধা দিয়ে সভাপতি মহাশয় জানালেন যে মিঃ মণ্টেগু জু হতে পারেন কিন্তু তাঁকে জু বলে সম্বোধন করা উচিত নয়। প্রত্যুত্তরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বললেন যে সভাপতি মহাশয় বলেছেন যে মিঃ মণ্টেগু জু কিন্তু তিনি যেন তাঁকে এই বলে সম্বোধন না করেন। এই আদেশ মেনে নিলেন। এতে সভার হাস্যরোল উঠল।

সর্বশ্রী জয়রামদাস দৌলতরাম, আজাদ সোভানী

এবং পান্নালাল হিন্দীতে সমর্থন করার পর প্রস্তাব গৃহীত হল।

সেদিনের মত সভার কার্য্য শেষ হল।

সাধারণ সম্পাদক জানালেন যে সভার প্রকাশ্য অধিবেশন ৮ই তারিখে বেলা ১১টার সময় আরম্ভ হবে। বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন ৭ই তারিখে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে হবে।

(৩)

৮ই সেপ্টেম্বর ১১টার সময় কংগ্রেসের তৃতীয় দিনের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট ছিল।

এদিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে বিষয় নির্বাচনী সভায় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং স্বয়ং গান্ধী এই প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থিত করবেন এবং এই প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করবেন বিপিনচন্দ্র পাল, সি আর দাশ, জিন্না ও অন্যান্য অনেকে এবং শ্রীমতী বেশান্ত মূল ও সংশোধনী উভয় প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যানের জন্যে বলবেন। সুতরাং দর্শকদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

এদিনের দিনের দর্শকদের সংযত করতে স্বেচ্ছা-সেবিকাদলের অধ্যক্ষা শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বেচ্ছাসেবকগণের অন্যতম কাপ্তেন শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়ের কর্মক্ষমতা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়েছিল।

শ্রীমতী বেশান্ত তাঁর প্রিয়শিষ্য সুদর্শন ও সুবক্তা যমনাদাস দ্বারকা দাসের সঙ্গে সভামণ্ডপে একটু সকালে উপস্থিত হলেন। তিনি ডায়াসে উঠতেই জনতা হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাল। যখন মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন তখন সকলে দাঁড়িয়ে "গান্ধী মহারাজকী জয়" ধ্বনি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করল, গান্ধীজী একটি চেয়ারের উপর উঠে এই অভ্যর্থনা গ্রহণ করলেন।

নির্দিষ্ট সময় সভাপতি মশায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী শ্রীরামভূজ দত্ত চৌধুরী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা সৌকত আলী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও অন্যান্য নেতা সহ শোভাযাত্রা করে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আসন গ্রহণ করার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

প্রথমে কয়েকজন সুসজ্জিত মহিলা সরলা দেবীর "নমঃ হিন্দু স্থান" গান গেয়ে শোনালেন। সাধারণ সম্পাদক শ্রীগোকরণনাথ মিশ্র নানা স্থান থেকে প্রেরিত কংগ্রেসের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপক টেলিগ্রামগুলির উল্লেখ করলেন।

তারপর অসহযোগের প্রস্তাব ও তার প্রস্তাবের মুদ্রিত কপি প্রতিনিধিগণের মধ্যে বিতরিত হল। এতে অনেকটা সময় লাগল।

নন কো-অপারেশন বা অসহযোগ সম্বন্ধে মূল প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে স্যার আশুতোষ চৌধুরী একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে যেহেতু নন-কোঅপারেশন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব কংগ্রেসের সামনে আনা হবে তার বিরুদ্ধে প্রবল মত আছে অতএব এই কংগ্রেসের অধিবেশন আগামী শীতকালের অধিবেশনের সময় পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হোক যাতে এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে স্যার আশুতোষ বললেন যে যদিও অসহযোগের সমর্থকেরা মনে করেন যে এ দ্বারা কংগ্রেসে দলাদলি সৃষ্টি হবে না কিন্তু অনেক আশঙ্কা করেন যে এতে কংগ্রেসে ভাঙ্গন দেখা দিবে।

মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর ডি. পি মাধব রাও এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বিপুল ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তারপর মহাত্মা গান্ধী এই কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাব উত্থাপন করতে মঞ্চোপরি দাঁড়ালেন। হর্ষধ্বনিদ্বারা সকলে তাঁকে অভ্যর্থনা করল।

তিনি প্রথমে কিছুক্ষণ ইংরাজিতে বললেন। তার

ভারত গভর্ণমেন্টের আচরণের দোষক্ষালনের ইচ্ছা দ্বারা প্রভাবান্বিত।

(২) ঐ রিপোর্ট গ্রহণের অযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য কারণ ইহা অসম্পূর্ণ, একমুখী এবং আত্মস্বার্থ রক্ষার জন্য পক্ষপাতদুষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রেকর্ডের (নথি পত্রের) প্রমাণানুসারেও মেজরিটী রিপোর্টের সিদ্ধান্তগুলি ন্যায্য বলে গ্রহণ করা যায় না এবং তার সুপারিশগুলি পাঞ্জাবের সর্বনিম্ন দাবির চেয়েও অনেক কম।

(গ) হান্টার কমিটীর উভয় রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত গভর্ণমেন্টের 'রিভিউ' সম্বন্ধে এই কংগ্রেস সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করছে যে—

(১) ঐ রিভিউ কোন প্রকার—বিশ্লেষণ না করে মেজরিটি রিপোর্ট মেনে নিয়েছে।

(২) মাইনরিটি রিপোর্টের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত স্বল্প ও অপ্রচুর বিবেচনা করেছে যদিও তাদের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত রেকর্ডের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত।

(৩) ঐ রিভিউয়ের মত সবই ছিল ঘটনা সম্বন্ধে কোন ন্যায্য ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা চেপে যাওয়া এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দুষ্কৃতির উপর বিস্মৃতির যবনিকা ফেলা।

(৪) রিভিউতে দোষী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করা হয়েছে তা প্রমাণিত ঘটনাবলীর গুরুত্বের তুলনায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং এতে ব্রিটিশ বিচারের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার আস্থা নষ্ট হয়েছে।

স্যার আশুতোষ প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন যে প্রস্তাবের বিষয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন সুতরাং তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা দেবেন না। তিনি কংগ্রেস সব কমিটীর সদস্যগণকে তাদের পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বললেন যে তাঁরা ১৭০০ সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁরা ন্যায্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

বোম্বের শ্রী যোসেফ ব্যাপ্টিষ্টরা এই প্রস্তাব সমর্থন করে প্রথমেই বললেন যে তিনি আশা করেন স্যার আশুতোষ তাঁর নাইটহুড ত্যাগ করবেন। ব্যাপ্টিষ্ট মহাশয় জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে স্বরাজ অর্জন না হওয়া পর্য্যন্ত—বিগত ঘটনা ভুলে না যেতে সকলের নিকট আবেদন করলেন।

সিন্ধুর শ্রী চৈতরাম (হিন্দিতে), দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁ (উর্দুতে) ব্যায়ামবীর প্রফেসর রামমূর্ত্তি, মাদ্রাজের শ্রী এন এস রঙ্গস্বামী, যুক্তপ্রদেশের শ্রীমতী মঙ্গলা দেবী ও জলন্ধরের শ্রীমতী সরস্বতী দেবী (হিন্দিতে) প্রস্তাব সমর্থন করার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে বৃটীশ মন্ত্রী সভা পাঞ্জাবের নৃশংসতা সম্বন্ধে কোনপ্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ভারত গভর্ণমেন্টের সুপারিশগুলিতে সম্মতি দেওয়ায় এবং প্রকৃত পক্ষে পাঞ্জাবের কর্মচারীগণের আচরণ কার্য্যতঃ মেনে নেওয়ায় এই কংগ্রেস তিক্ততা অনুভব করছে। এই কংগ্রেস আরও অভিমত প্রকাশ করেছে যে তাদের 'ডেসপ্যাচে' মহান ও উচ্চাঙ্গের ভাব প্রকাশ করা স্বত্বেও ব্রিটিশ মন্ত্রী সভার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অক্ষমতার জন্য ভারতীয় নাগরিকগণ তাদের উপর আস্থা হারিয়েছে।

জিতেনবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বললেন যে এই নিন্দাসূচক প্রস্তাব সমগ্র মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে হলেও—এ বিশেষ করে মিঃ মন্টেগু বিরুদ্ধে হয়েছে। মন্ত্রী সভার ডেসপ্যাচে জু (ইহুদী) ভারত সচিবের হস্ত পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এই উক্তিতে বাধা দিয়ে সভাপতি মহাশয় জানালেন যে মিঃ মন্টেগু জু হতে পারেন কিন্তু তাঁকে জু বলে সম্বোধন করা উচিত নয়। প্রত্যুত্তরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বললেন যে সভাপতি মহাশয় বলেছেন যে মিঃ মন্টেগু জু কিন্তু তিনি যেন তাঁকে এই বলে সম্বোধন না করেন। এই আদেশ মেনে নিলেন। এতে সভায় হাস্যরোল উঠল।

সর্বশ্রী জয়রামদাস দৌলতরাম, আজাদ সোভানী

এবং পান্নালাল হিন্দীতে সমর্থন করার পর প্রস্তাব গৃহীত হল।

সেদিনের মত সভার কার্য্য শেষ হল।

সাধারণ সম্পাদক জানালেন যে সভার প্রকাশ্য অধিবেশন ৮ই তারিখে বেলা ১১টার সময় আরম্ভ হবে। বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন ৭ই তারিখে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে হবে।

(৬)

৮ই সেপ্টেম্বর ১১টার সময় কংগ্রেসের তৃতীয় দিনের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট ছিল।

এদিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে বিষয় নির্বাচনী সভায় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং স্বয়ং গান্ধী এই প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থিত করবেন এবং এই প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করবেন বিপিনচন্দ্র পাল, সি আর দাশ, জিন্না ও অন্যান্য অনেকে এবং শ্রীমতী বেশান্ত মূল ও সংশোধনী উভয় প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যানের জন্যে বলবেন। সুতরাং দর্শকদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

এদিনের দিনের দর্শকদের সংযত করতে স্বেচ্ছা-সেবিকাদলের অধ্যক্ষা শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বেচ্ছাসেবকগণের অন্যতম কাপ্তেন শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়ের কর্মক্ষমতা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়েছিল।

শ্রীমতী বেশান্ত তাঁর প্রিয়শিষ্য সুদর্শন ও সুবক্তা যমনাদাস দ্বারকা দাসের সঙ্গে সভামণ্ডপে একটু সকালে উপস্থিত হলেন। তিনি ডায়াসে উঠতেই জনতা হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাল। যখন মহাত্মা গান্ধী সস্ত্রীক প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন তখন সকলে দাঁড়িয়ে "গান্ধী মহারাজকী জয়" ধ্বনি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করল, গান্ধীজী একটি চেয়ারের উপর উঠে এই অভ্যর্থনা গ্রহণ করলেন।

নির্দিষ্ট সময় সভাপতি মশায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী শ্রীরামভুজ দত্ত চৌধুরী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা সৌকত আলী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও অন্যান্য নেতা সহ শোভাযাত্রা করে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আসন গ্রহন করার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

প্রথমে কয়েকজন সুসজ্জিত মহিলা সরলা দেবীর "নমঃ হিন্দুস্থান" গান গেয়ে শোনালেন। সাধারণ সম্পাদক শ্রীগোকরণনাথ মিশ্র নানা স্থান থেকে প্রেরিত কংগ্রেসের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপক টেলিগ্রামগুলির উল্লেখ করলেন।

তারপর অসহযোগের প্রস্তাব ও তার প্রস্তাবের মুদ্রিত কপি প্রতিনিধিগণের মধ্যে বিতরিত হল। এতে অনেকটা সময় লাগল।

নন কো-অপারেশন বা অসহযোগ সম্বন্ধে মূল প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে স্যার আশুতোষ চৌধুরী একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে যেহেতু নন-কোঅপারেশন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব কংগ্রেসের সামনে আনা হবে তার বিরুদ্ধে প্রবল মত আছে অতএব এই কংগ্রেসের অধিবেশন আগামী শীতকালের অধিবেশনের সময় পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হোক যাতে এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে স্যার আশুতোষ বললেন যে যদিও অসহযোগের সমর্থকেরা মনে করেন যে এ দ্বারা কংগ্রেসে দলাদলি সৃষ্টি হবে না কিন্তু অনেক আশঙ্কা করেন যে এতে কংগ্রেসে ভাঙ্গন দেখা দিবে।

মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর ডি. পি মাধব রাও এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বিপুল ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তারপর মহাত্মা গান্ধী এই কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাব উত্থাপন করতে মঞ্চোপরি দাঁড়ালেন। হর্ষধ্বনিদ্বারা সকলে তাঁকে অভ্যর্থনা করল।

তিনি প্রথমে কিছুক্ষণ ইংরাজিতে বললেন। তার

পরই 'হিন্দী' রব উঠতে লাগল। মহাত্মা জানালেন যে প্রথমে তিনি ইংরাজিতে বলবেন এবং হিন্দীতে তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে দেবেন। তিনি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে অসমর্থতা জ্ঞাপন করে সভাপতি মহাশয়ের নিকট বসে বলার অনুমতি চাইলেন। জনতার মধ্য থেকে অনেককেই বলতে শোনা গেল "বৈঠ যাইয়ে।"

মহাত্মাজী সভাপতির অনুমতি নিয়ে চেয়ারে বসে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করলেন :—

যে হেতু খিলাফৎ প্রশ্নে ভারত গভর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় মুসলমানদের নিকট তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন এবং মুসলমান ভ্রাতাদের ধর্মসক্রান্ত যে বিশেষ বিপদ দেখা দিয়েছে তাতে প্রত্যেক অমুসলমান ভারতীয়ের কর্তব্য হবে তা অপসারণ করতে মুসলমান ভ্রাতাদের সর্বপ্রকারে ন্যায্যভাবে সাহায্য করা।

এবং যেহেতু ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনা সম্পর্কে ভারত ও বৃটিশ উভয় গভর্ণমেণ্টই পাঞ্জাবের নির্দোষী জনগণকে রক্ষা করতে এবং অসামরিক ও বর্বরোচিত ব্যাহারের জন্য দোষী কর্মচারীগণের শাস্তি বিধান করতে গর্হিত ভাবে অবহেলা করেছে অথবা অপারগ হয়েছে এবং যিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কর্মচারীদের অপরাধের (ক্রাইমের) জন্য দায়ী এবং যিনি তাঁর শাসনাধীন প্রজাগণের যন্ত্রণা সম্বন্ধে উদাসীন সেই মাইকেল ওডয়ারকে তারা সমস্ত দোষ হতে মুক্তি দিয়েছে এবং যেহেতু পার্লামেন্টের হাউস অব কমনসে বিশেষতঃ হাউস অব লর্ডসের বিতর্কে ভারতের জনগণের প্রতি সহানুভূতির অভাব প্রদর্শিত হয়েছে এবং প্রকৃত-পক্ষে পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাসজনক ও ভীতিপ্রদ কার্য্যাবলী সমর্থিত হয়েছে এবং যেহেতু খিলাফৎ ও পাঞ্জাব সম্বন্ধে আনুশোচনার সম্পূর্ণ অভাব ভাইসরয়ের ঘোষণায় প্রকাশিত হয়েছে—

অতএব কংগ্রেস মনে করে উপরোক্ত দুইটি অন্যায়ের প্রতিকার ব্যতীত ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং জাতীয় সম্মানরক্ষা এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ কার্য্যের বাধাদানের একমাত্র উপায় হচ্ছে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা।

এই কংগ্রেস আরও মনে করে যে উপরোক্ত অন্যায়ের প্রতিকার ও স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত মিঃ গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন ও অবলম্বন করা ছাড়া ভারতবাসীর গত্যন্তর নেই।

এবং যেহেতু এতদিন পর্য্যন্ত যে শ্রেণীর লোক জনমত গঠন করেছেন এবং তার প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রাথমিক কার্য্য তাদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং যেহেতু উপাধি ও সম্মান বিতরণের দ্বারা এবং বিদ্যালয়, আদালত ও বিধানসভার (কাউন্সিলের) মাধ্যমে গভর্ণমেণ্ট তাদের ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত করেছেন এবং যেহেতু আকাঙ্খিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুপাতে আন্দোলন পরিচালনার জন্য ন্যূনতম ঝুঁকি গ্রহণ ও স্বার্থত্যাগ করা সঙ্গত—অতএব এই কংগ্রেস সনির্বন্ধভাবে উপদেশ দিচ্ছে :—

(ক) উপাধি ও অবৈতনিক পদ ত্যাগ এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান থেকে মনোনীত সদস্যদের পদত্যাগ।

(খ) গভর্ণমেণ্টের লেভি দরবার এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠান (ফাংসান) যা গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীরা আয়োজন করবেন বা তাঁদের সম্মানে আয়োজিত হবে সেগুলিতে যোগদানে অস্বীকার।

(গ) গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত স্কুল এবং কলেজ এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বা সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্কুল ও কলেজ থেকে ক্রমে ক্রমে ছাত্রদের ছাড়িয়ে আনা এবং এই সকল স্কুল ও কলেজের স্থলে বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপন।

(ঘ) আইনজীবি ও মক্কেল কর্ত্তৃক ক্রমে ক্রমে বৃটিশ আদালত বয়কট করা এবং ব্যক্তিগত বিবাদ মীমাংসার জন্য সালিসী আদালত স্থাপন।

(ঙ) মেসোপোটেমিয়ায় চাকুরির জন্য সামরিক, করণিক বা শ্রমজীবি শ্রেণী থেকে কাউকে বরখাস্ত না করা।

(চ) নবগঠিত কাউনসিলের সমস্ত নির্বাচনের জন্য পদপ্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার করা এবং কংগ্রেসের উপদেশ অগ্রাহ্য করে যাঁরা পদপ্রার্থী হবেন ভোটারদের তাদের পক্ষে ভোট না দেওয়া।

(ছ) বিদেশী দ্রব্য বয়কট।

এবং যেহেতু অসহযোগ আন্দোলন—নিয়মানুবর্তিতা ও আত্মোৎসর্গের মাপকাঠি হিসাবে পরিকল্পিত হয়েছে যা ব্যতীত কোন জাতিই প্রকৃতপক্ষে উন্নতিলাভ করতে পারে না এবং যেহেতু প্রত্যেক নরনারী ও বালককে এই প্রকার ত্যাগের ও সংযমের সুযোগ দেওয়া কর্তব্য সুতরাং এই কংগ্রেস বহুল পরিমাণে স্বদেশীবস্ত্র ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছে এবং দেশী মূলধন ও কর্তৃত্বে পরিচালিত কাপড়ের মিলগুলি জাতীয় প্রয়োজনানুসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুতা ও কাপড় প্রস্তুত করতে পারছে না এবং দীর্ঘ সময়ের পূর্বে তা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং এই কংগ্রেস ব্যাপকভাবে এই সকল প্রস্তুত করার জন্য প্রতি গৃহে হাতে সুতা কাটার ব্যবস্থা পুনর্জীবিত করতে এবং যে লক্ষ লক্ষ তন্তুবায় উৎসাহদানের অভাবে তাদের প্রাচীন ও সম্মানজনক ব্যবসা পরিত্যাগ করেছে তাদের কাপড় বোনার জন্য প্রেরণা দিচ্ছে।

এই সুদীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করে মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে তার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করলেন।

তিনি প্রথমেই বললেন যে তিনি 'সেন্ট' বা 'ডিকটেটর' নন। তিনি জানালেন যে দেশের সর্বত্র অসংখ্য সভায় অসহযোগের প্রস্তাব সমর্থিত হয়েছে। তিনি জানেন যে এই প্রস্তাব দ্বারা এ পর্য্যন্ত যে নীতি দেশকে পরিচালিত করছিল তার আমূল পরিবর্তন হবে এবং এতে তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধেও তিনি সচেতন।

তিনি বললেন যে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে তিনি দেশের রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন করবেন। তিনি মনে করেন যে কংগ্রেস কোন পার্টী বিশেষের প্রতিষ্ঠান নয়। এতে সকল পার্টীর এবং সকল দলের স্থান আছে এবং সংখ্যা-লঘুদের কংগ্রেস ত্যাগ করার কোন প্রয়োজনই হবে না। তিনি আশা করেন যে যদি এই আন্দোলনে যথোচিত সাড়া পাওয়া যায় তাহলে এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ অর্জিত হবে।

পরিশেষে তিনি বললেন যে অসহযোগ ছাড়া স্বরাজ অর্জনের অন্য পন্থা আছে তা হচ্ছে তরবারি ধারণ কিন্তু, ভারতবর্ষের হাতে তরবারি নেই। তিনি জানেন যে যদি তা থাকত তাহলে ভারতবর্ষ অসহযোগের বাণী গ্রহণ করত না। এই উক্তিতে অনেকে হর্ষ প্রকাশ করল।

মহাত্মার ভাষণ শেষ হওয়ার পর ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে স্বরাজ্যের উপরেও হিন্দুমুসলমানের ঐক্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া সম্বন্ধে মহাত্মার মত তিনি পূর্ণ সমর্থন করেন, তিনি জানালেন যে মুসলিম লীগ অসহযোগ প্রস্তাব পাশ করেছে।

এমন সময় পণ্ডিত গোকরণ নাথ মিশ্র মহাত্মার প্রস্তাবের বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে বললেন যে কংগ্রেসের ক্রীড না বদলালে—অসহযোগ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে না।

তাঁর এই মত সমর্থন করলেন এলাহাবাদের মুন্সী ঈশ্বর শরণ।

মিশ্র মহাশয়ের আপত্তি অগ্রাহ্য হল।

এর পর পণ্ডিত শ্যামলাল নেহেরু—একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করে মহাত্মার মূল প্রস্তাব থেকে ক্রমে ক্রমে (gradual) শব্দ বাদ দিতে এবং বিদেশী দ্রব্য শব্দগুলির পরিবর্তে 'ব্রিটিশ দ্রব্য' শব্দ গ্রহণ করতে বললেন।

প্রস্তাবের স্বপক্ষে বক্তৃতা করার সময় শ্যামলাল নেহেরু মহাশয় পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হলেন।

শ্রী চামনলাল এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সভাকর্তৃক এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তারপর শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় মূল প্রস্তাবের একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, মূল প্রস্তাব যেমন দীর্ঘ এই সংশোধনী প্রস্তাবও প্রায় তদনুরূপ দীর্ঘ।

এই সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে :—

যেহেতু ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেন্ট ও ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট উভয়েই পাঞ্জাবের নির্দোষী জনগণকে রক্ষা করতে এবং তাদের প্রতি অসামরিক ও বর্বরোচিত ব্যবহারের জন্য দোষী কর্মচারীদের শাস্তি দিতে গর্হিতভাবে অবহেলা করেছে বা অসমর্থ হয়েছে এবং স্যার মাইকেল ওডেয়ার যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিকাংশ সরকারি দুষ্কৃতির জন্য দায়ী এবং তাঁর অধীনস্থ প্রজাগণের নির্যাতন সম্বন্ধে উদাসীন বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেই মাইকেল ওডেয়ার-কে নির্দায়ী করেছে এবং হাউস অব কমনস বিশেষ করে হাউস অব লর্ডসের বিতর্কে ভারতের জনগণ সম্বন্ধে সহানুভূতির মর্মন্তুদ অভাব এবং পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাস-জনক ও ভীতিপ্রদ কার্য্যে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

এবং যেহেতু ভারতের সরকারি ও বেসরকারি ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ উক্ত সন্ত্রাসজনক ও ভীতিপ্রদ কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে এবং যারা এই কার্য্যের জন্য দোষী প্রমাণিত হয়েছে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য চাঁদা তোলা ও অন্যান্য অমানুষিক কাজ করছে।

এবং যেহেতু খেলাফৎ প্রশ্নে ভারত গভর্ণমেন্ট ও বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতের মুসলমানদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে সম্পূর্ণভাবে পরাঙ্মুখ হয়েছে এবং প্রধান মন্ত্রী স্বেচ্ছাপূর্বক তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন।

এবং যেহেতু শান্তি সম্মিলনের চুক্তিমত তুর্কী সাম্রাজ্যের সংহতি নষ্ট করে তাকে কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা ভারতের সম্ভাব্য বিপদের উৎপত্তিস্থল হবে।

এবং যেহেতু এই সকল অন্যায়ের কার্যকরী প্রতিকার এবং তার পুনঃ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে একমাত্র গ্যারান্টি হল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার অবিলম্বে মেনে নেওয়া।

অতএব প্রস্তাব করা হচ্ছে—

(ক) অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত একটি মিশনকে অবিলম্বে স্বায়ত্ত শাসনের দাবিসহ ভারতের অভিযোগ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি তাঁর নিকট উপস্থিত করার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করা হোক।

(খ) যদি তিনি (প্রধানমন্ত্রী) মিশনের বক্তব্য শুনতে রাজি না হন বা ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইনের পরিবর্তে ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করেন তাহলে এরূপ সক্রিয় অসহযোগের নীতি অবলম্বন করতে হবে যাতে ভারতকে আর অধীনস্থ রাখা যাবে না, এ সম্বন্ধে ব্রিটেনের লোকদের সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

(গ) ইতিমধ্যে এই কংগ্রেস সুপারিশ করছে যে সমস্ত ভারতের জন্য বা বিশেষ অবস্থানুসারে কোন বিশেষ প্রদেশের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত একটি যুক্ত কমিটির সিদ্ধান্তানুসারে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের কার্য্যতালিকা পরিবর্তন পরিবর্জন বা সংযোজন সহ দেশের সম্মুখে বিবেচনার জন্য রাখা হোক।

(১) কংগ্রেসের ২০ জন প্রতিনিধি

(২) অল-ইণ্ডিয়া মুসলীম লীগের ৫ জন প্রতিনিধি

(৩) কেন্দ্রীয় খিলাফৎ কমিটির ৫জন প্রতিনিধি

(৪) প্রত্যেক হোমরুল লীগের ৫ জন প্রতিনিধি

এই যুক্ত কমিটির সভাপতি হবেন মহাত্মা গান্ধী।

(ঘ) ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব রূপায়িত করার প্রস্তুতি স্বরূপ কংগ্রেস নিম্নলিখিত পন্থা অবিলম্বে অবলম্বনের সুপারিশ করছে—

(১) ভোটারদের অসহযোগের নীতি সম্বন্ধে শিক্ষাদান।

(২) জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন।

(৩) সালিশী আদালত স্থাপন

(৪) উপাধি এবং যে সকল অবৈতনিক পদ দেশের লোক দ্বারা সৃষ্ট হয় নি সেগুলি ত্যাগ।

(৫) গভর্ণমেন্টের লেভি দরবার এবং অন্যান্য ফাংশন বর্জন।

(৬) শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ান গঠন

(৭) ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক এবং ভারতে ইউরোপীয়ান দ্বারা পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি হতে ক্রমে ক্রমে ভারতীয়দের মূলধন ও ভারতীয় শ্রমিকদের সরিয়ে আনা

(৮) বৈদেশিক আক্রমণ ব্যতীত সামরিক কর্মিক ও শ্রমিকশ্রেণীর ভারতের বাইরে কাজে যোগদান করতে অস্বীকার

(৯) স্বদেশী-গ্রহণ এবং বিশেষ করে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার এবং হাতে সুতা কাটা ও তাঁতে কাপড় বোনার শিল্প পুনর্জীবিত করা

পালমহাশয় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে এই সংশোধনী প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে আর একটা চান্স দেওয়া হোক। পাল মহাশয় কাউন্সিল বর্জনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন।

বোম্বের ব্যারিষ্টার শ্রী যোসেফ ব্যাপ্টিষ্টা পাল মহাশয়ের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তিনি অসহযোগের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে গান্ধী এমন একটি গর্ত খুঁড়েছেন তাতে হয় তিনি নচেৎ কংগ্রেস কবরস্থ হবে।

মাদ্রাজের শ্রীইয়াকুব হোসেন মহাত্মাজীর মূল প্রস্তাব সমর্থন করে ইংরাজিতে বক্তৃতা দিলেন। পুনঃ পুনঃ হিন্দিতে বলতে অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি ইংরাজিতেই অভিভাষণ দিলেন।

তার পর শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত মঞ্চোপরি আরোহণ করলেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সমবেত জনতা করতালি ও হর্ষধ্বনি দ্বারা বিপুলভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করল, তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর মূল প্রস্তাব এবং বিপিন চন্দ্র পালের সংশোধনী প্রস্তাব উভয়েরই বিরুদ্ধে বললেন। তিনি প্রশ্ন করলেন যে যাঁরা মোটর গাড়ী ছাড়া চলতে পারেন না এবং যা চারদিকেই দেখা যাচ্ছে তাঁরা কি করে বিদেশী-দ্রব্য বর্জন করবেন। তারপর তিনি কাউন্সিল বর্জনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বললেন যে স্যার ফিরোজ সাহ মেহেতা ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে দ্বারা ৩০ বৎসর ধরে পবিত্রীকৃত কাউন্সিলের বয়কট তিনি সমর্থন করতে পারেন না।

শ্রীমতী বেশান্তের পর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন। ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে মহাত্মা প্রথমে পণ্ডিত মতিলালকে তাঁর স্বমতে আনতে পেরেছিলেন। তিনি ইংরাজিতে মূল প্রস্তাবের সমর্থনে তাঁর অভিমত প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন কিন্তু পুন পুনঃ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি হিন্দিতেই তাঁর বক্তব্য বললেন। পাল মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে ইংলণ্ডে পুনরায় একটি মিশন পাঠানোর সার্থকতা তিনি দেখতে পেলেন না। কাউন্সিল সম্বন্ধে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বহু বৎসর যাবৎ কাউন্সিলের মেম্বর আছেন। তিনি জানেন যে এ-গুলি দেশের কাজের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরর্থক।

মতিলাল নেহেরুর বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় মাধ্যাহ্নিক ভোজনের জন্য সভার কার্য্য এক ঘণ্টার জন্য মুলতুবি রাখলেন।

সকলে প্যাণ্ডেলের বাইরে চলে গেলেন। প্যাণ্ডেলের বাইরে এসে পাল মহাশয় আর্তস্বরে বলে উঠলেন যে গান্ধী খিলাফৎ কংগ্রেসের কাঁধে চাপিয়ে দেশের সর্বনাশ করছেন। তাঁর সেই আর্তকণ্ঠস্বর এখনও আমার কানে বাজছে।

বিরতির পর অপরাহ্ণ ৩টার সময় পুনরায় কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ হল।

প্রথমেই মাদ্রাজের উদীয়মান তেজস্বী নবীন নেতা সত্যমূর্তি পাল মহাশয়ের সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে সংশোধনী প্রস্তাব অপেক্ষাকৃত নরম এবং গণতন্ত্রসম্মত নয় এবং এই প্রস্তাব মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরোধী। তিনি কাউন্সিল বয়কটের বিরুদ্ধে বললেন এবং এর পোষকতায় লোকমান্য তিলক ও মতিলাল ঘোষের মত উদ্ধৃত করলেন।

দিল্লীর ডাঃ আনসারি ও মৌলানা সৌকত আলী মূল প্রস্তাব সমর্থন করে উর্দু'তে বক্তৃতা দিলেন।

এর পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করলেন, সকলে তাঁকে আনন্দধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা করল। তিনি বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে আলোচিত ঘটনা উল্লেখ করতেই সভাপতি মহাশয় তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন যে বিষয় নির্বাচনী সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা হতে পারে না, এতে স্বামীজী আর কোন কথা না বলে মঞ্চ হতে নেমে গেলেন।

সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠলেন বোম্বের প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার বাগ্মী ও সুপণ্ডিত শ্রীএম, আর জয়াকর। তিনি বহু যুক্তি প্রদর্শন করে ওজস্বিনী ভাষায় পাল মহাশয়কে সমর্থন করলেন।

এর পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মঞ্চোপরি দাঁড়ালেন। তিনি দাঁড়াতেই সকলে তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করল এবং চারদিক থেকে "হিন্দী" "হিন্দী" রব উঠতে লাগল, তিনি প্রধানতঃ ইংরাজিতেই বললেন, তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে অসহযোগের নীতি সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত নীতি। এই নীতি অবলম্বন করলে কতকগুলি অন্যায়ের প্রতিকার হতে পারে। কিন্তু এই নীতি অবলম্বনের পূর্বে তিনি তাঁর ভাই গান্ধী ও সৌকত আলীকে দেশের লোককে এ-বিষয়ে শিক্ষা দিতে উপদেশ দিলেন। মালব্যজী কাউনসিল বয়কটের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। তিনি জানালেন যে তিনি সংশোধনী প্রস্তাবও সমর্থন করেন না।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মূল প্রস্তাব সমর্থন করে উর্দু'তে বক্তৃতা দিলেন। মৌলানার উর্দু'তে আরবি শব্দের প্রাচুর্য্য থাকাতে অধিকাংশের পক্ষে তাঁর বক্তৃতা বোঝা অত্যন্ত কঠিন হল।

সিন্ধুপ্রদেশের স্বামী গোবিন্দানন্দও উর্দু'তে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এর পর শ্রীমতী বেশান্ত মহোদয়ার প্রিয় শিষ্য সুদর্শন বোম্বের যমনা দাস দ্বারকা দাস মূল প্রস্তাব ও সংশোধনী প্রস্তাব উভয়েরই বিরোধিতা করে বক্তৃতা করলেন। মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য সম্বন্ধে আলোচনার সময় বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেছিলেন। যমনা দাসজী মহাত্মার উক্ত বক্তৃতা থেকে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করতেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল, শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ হর্ষধ্বনি করে উঠল এবং অনেকে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দ্বারা তাঁর ভাষণে বাধা সৃষ্টি করল।

যমনা দাস দ্বারকা দাস অবিচলিত ভাবে তাঁর বক্তব্য বলে যেতে লাগলেন। তিনি মনে করিয়ে দিলেন যে গত বৎসর হিংসাত্মক কার্য্যের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখতে হয়েছিল এবং প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় যদি হিংসামূলক কার্য্যের সৃষ্টি হয় তা হলে এ-আন্দোলনও স্থগিত রাখতে হবে। এই উক্তির পর সভায় এত গোলমালের সৃষ্টি হল যে বক্তার পক্ষে আর কিছু বলা সম্ভব হল না, তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

মাদ্রাজের শ্রীভেঙ্কটারমণ মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলতে উঠে বুঝতে পারলেন যে বিক্ষুব্ধ শ্রোতার নিকট মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলার চেষ্টা বৃথা, তিনি শ্রোতাদের সামলাতে পারবেন না বলে বক্তৃতা না দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন

এর পর বাগ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীজিতেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায় মূল প্রস্তাব সমর্থন করে সংশোধনী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বললেন। কাউনসিল বয়কট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি জানালেন যে এ-কথা সত্য যে তিলক মহারাজ কাউনসিল বয়কটের বিরুদ্ধে ছিলেন। এই শুনে অনেকে জয়ধ্বনি করে উঠল। তিনি সকলকে একটু সবুর করতে অনুরোধ করে জানালেন যে লোকমান্য তিনি তাঁর মতের সঙ্গে একটি বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ অংশ যোগ দিয়েছিলেন। লোকমান্য বলেছিলেন যে যদি মুসলমানেরা কাউনসিল বয়কট করে তা হলে হিন্দুদের কর্তব্য হবে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া।

বিহারের শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ সিং এবং যুক্তপ্রদেশের

শ্রীমতী আনন্দী দেবী হিন্দীতে মূল প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করে নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে এখনই কি স্কুল থেকে সব ছাত্রদের ছাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হবে? এ-প্রস্তাব কার্য্যকরী নয়—এটা একটা আদর্শ মাত্র। সভাগৃহ থেকে একজন বললেন যে এর উত্তর মহাত্মা গান্ধী দেবেন। প্রত্যুত্তরে দাশ মহাশয় বললেন যে তিনি গান্ধীজীর কথা শুনবেন। যদি মহাত্মা তাঁকে বোঝাতে পারেন তা হলে তিনি মহাত্মাকে অনুসরণ করবেন।

যুক্তপ্রদেশের পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও পণ্ডিত রাধাকান্ত মালব্য মূল প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিলেন।

পণ্ডিত রামভুজ দত্তচৌধুরী মহাত্মা গান্ধীর মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর তার বিরোধিতা করলেন।

এরপর শ্রীমোহম্মদ আলী জিন্না বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করলেন। তিনি জানালেন যে এ-সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ইতিপূর্বে মুসলিমলীগের সভায় বলেছেন। তিনি জানতে চাইলেন মহাত্মা গান্ধী চরমপত্র ভাইসরয়ের নিকট পাঠিয়েছেন কি না। উত্তর হল—হ্যাঁ, পাঠান হয়েছে, জিন্নাসাহেব জানালেন যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন চরমপত্র পাঠান হয় নি। এই উক্তিতে অনেকে হর্ষধ্বনি করে উঠল।

জিন্নাসাহেবের পর অন্ধ্রের একজন প্রতিনিধি মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর মহাত্মা গান্ধী বিতর্কের উত্তর দিতে উঠলেন। তিনি মঞ্চের উপর উঠে একটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন। করতালি ও হর্ষধ্বনিতে সভাগৃহ মুখর হয়ে উঠল, মহাত্মা বললেন যে তিনি বেশী সময় নেবেন না। তিনি বিরোধীদের মত খণ্ডন করে বললেন যে দাশ মহাশয় ও জিন্নাসাহেবের যুক্তি শুনেও তিনি তাঁর মত পরিবর্তনের কোন কারণ দেখতে পেলেন না।

মহাত্মার বক্তৃতার পর পাল মহাশয়ের সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হল। অধিকাংশের ভোটে তা অগ্রাহ্য হল, তারপর মূল প্রস্তাব দেওয়ায় অধিকাংশের ভোটে তা গৃহীত হল, তখন 'পোলের' দাবি করা হল।

সভাপতি মহাশয় ভোট গণনার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের জন্য বিভিন্ন সময় ধার্য্য করলেন।

অতঃপর কংগ্রেসের অধিবেশন সেদিনের মত শেষ হল।

পরদিন ৯ই সেপ্টেম্বর বেলা ২টার সময় শেষদিনের অধিবেশনের সময় স্থির হল।

ক্রমশঃ
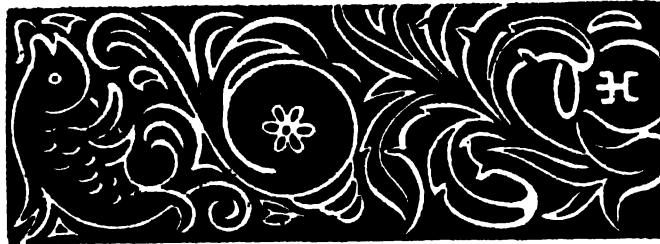
ভয়ঙ্কর ও সুন্দরের পূজারী রবিনসন

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

মিডল ওয়েট বিভাগে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই। র‍্যাণ্ডলফ টারপিন বনাম সুগার রে রবিনসন। ইতিপূর্বে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান রবিনসনকে টারপিনের নিকট পরাজিত হয়ে স্বীয় বিজয়মুকুটটি হারিয়ে আসতে হয়েছে লণ্ডনে। আবার রবিনসন টারপিনকে শক্তি পরীক্ষার আহ্বান করেছেন।

প্রতিযোগিতার দিন স্থির হয়েছে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১। স্থান যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নিউ ইয়র্ক শহর।

আজ সেই নির্দ্ধারিত দিন। স্টেডিয়ামে আর তিল ধারণের স্থান নেই আজ। উপস্থিত দর্শক সংখ্যা একষট্টি হাজার তিনশো সত্তর, আর এই মুষ্টিযুদ্ধে লব্ধ টাকার পরিমাণ সাতলক্ষ সাতষট্টি হাজার ছশো সাতাশ ডলার অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

যথারীতি পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হল।

এরপর একে একে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রিংএর ভেতর প্রবেশ করলেন। প্রথমে উপস্থিত হলেন রবিনসন, পরিধানে নীল সাদা আলখাল্লা। নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তিনি তাঁর বহির্বাস খুলে দিলেন। উৎসুক নেত্রে সকলে দেখতে লাগলেন দীর্ঘদেহী সুগঠিত রবিনসনকে। পরণে রয়েছে নীল ষ্ট্রাইপযুক্ত সাদা প্যাণ্ট। জড়তা দূর করার জন্ম রবিনসনকে কয়েকবার ওঠবস করে নিতে দেখা গেল। মাইকে নাম ঘোষণার সময় তিনি বাতাসে হাত আন্দোলিত করে দর্শকদের অভিবাদন জানালেন।

প্রবল চীৎকার আর করতলধ্বনির মধ্যে বলশালী খর্ব্বকায় শেতাঙ্গ টারপিন রিংএর মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন। ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে চুপটি করে বসে রইলেন। তাঁকে একটি কথাও বলতে দেখা গেল না। মাইকে দর্শকদের নিকট তাঁর পরিচয়দানের সময়ও তাঁর কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

টারপিনকে মনে হচ্ছিল যেন নির্ভীক, ধীর, সঙ্কল্পে অটুট এক বীর যুবক।

অন্যদিকে দাঁড়িয়ে আছেন চঞ্চল রবিনসন। সকলেরই জানা আছে—কি উচ্ছল এই নিগ্রোবীর, কি উদ্দাম তাঁর গতিবেগ আর কি নির্ভুল তাঁর প্রতিটি মুষ্টাঘাত।

সকলেই আজ উৎকণ্ঠিত—ভাগ্যদেবী আজ কার গলায় পরাবেন তাঁর বিজয়মাল্য।

অতঃপর সেকেণ্ডদের রিং থেকে বেরিয়ে যাবার আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই লড়াই শুরু হবার ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল।

শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ। চঞ্চল রবিনসন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় সাবলীল গতিতে টারপিনের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে বিদ্যুৎগতিতে চালাতে থাকেন তাঁর নির্ভুল ঘুষি। ঘুষিগুলিও অব্যর্থভাবে লাগছে গিয়ে টারপিনের মুখ, চোয়াল, পেট প্রভৃতি শরীরের সমস্ত দুর্ব্বল স্থানে। টারপিনের শরীরের কোন দুর্ব্বল অংশ খোলা পাওয়া মাত্রই রবিনসন ক্ষিপ্রগতিতে অব্যর্থ মুষ্টাঘাতে তার সদ্ব্যবহার করে নিচ্ছেন। কোন রকমেই টারপিন আর সামলাতে পারছেন না তখন তিনি লড়ছেন আর চিন্তা করছেন—রবিনসনের পক্ষে এই তীব্রগতি বেশীক্ষণ আর বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কিছুক্ষণ বাদে ক্লান্তিতে নিশ্চয়ই তাঁর গতির বেগ কমে আসবে, আর তখন তিনি নিজের প্রচণ্ড মুষ্টাঘাতে রবিনসনকে ধরাশায়ী করে ছাড়বেন। প্রথম রাউণ্ড শেষ হয়ে গেল কিন্তু টারপিনের ভাগ্যে একটিও সুযোগ এসে উপস্থিত হলো না।

দ্বিতীয় রাউণ্ডের শুরু এবং শেষ হলো। কিন্তু অবস্থা ঠিক পূর্ব্বের মতনই রইল। রবিনসনের তীব্র গতির কোন তারতম্য ঘটতে দেখা গেল না। ক্রমে ক্রমে আটটি রাউণ্ড পার হয়ে গেল। ফলাফল সম্বন্ধে সকলেই এখন নিঃসংশয়।

অতঃপর নবম রাউণ্ডের সময় রবিনসনের চোখের উপর একটি ক্ষত দেখা গেল। ক্ষত দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হতে দেখা গেল। কিন্তু তখনও দেখা যায় রক্তাপ্লুত মুখে রবিনসন সমান তেজে টারপিনকে পিটিয়ে চলেছেন।

দশম রাউণ্ডের পূর্ব্বের বিশ্রাম ক্ষণটিতে রবিনসন চিন্তা করছেন—এই রাউণ্ডে লড়াই শেষ করতে না পারলে রেফারী হয়ত তার ক্ষতের জন্য লড়াই থামিয়ে দিয়ে টারপিনকে বিজয়ী ঘোষণা করতে পারেন। সুতরাং তাকে এই রাউণ্ডে লড়াই শেষ করতেই হবে।

শুরু হলো দশম রাউণ্ড। ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মতন রবিনসন টারপিনের দিকে এগিয়ে এলেন। টারপিনের উপর ঘুঁসির ঝড় বইয়ে দিলেন। প্রহারে জর্জ্জরিত টারপিন শরীরটাকে কুঁচকে নিয়ে নীচু হয়ে আত্মরক্ষা করতে থাকেন। এরপর পুনরায় প্রহার এড়াবার জন্য তিনি দুহাতে মুখটি ঢাকা দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন মনে হাচ্ছল তিনি যেন রবিনসনকে আর প্রহার না করার জন্য ইঙ্গিতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। সাদা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তখন তাঁর মুখখানি।

রেফারী ছুটে এসে লড়াই থামিয়ে রবিনসনের হাত তুলে দিয়ে তাঁকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করলেন।

মাইকে শোনা গেল যুক্তরাষ্ট্রের যে রবিনসন মিডল ওয়েট বিভাগে পুনরায় বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন নির্ব্বাচিত হয়েছেন।—বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপ হারিয়ে তাকে আবার ফিরে পেলেন রবিনসন, ইতিহাসের একটা নজীর। যে রবিনসন ১৯৫১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী জাক লা মোটাকে পরাজিত করে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হন।

শক্তি, চাতুর্য্য ক্ষিপ্রতা এবং সদ্গুণের সুষ্ঠু সমন্বয়ে এই বীর কৃষ্ণাঙ্গ এক দুর্দ্দান্ত মুষ্টিযোদ্ধা রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। মুষ্টিযুদ্ধে রত রবিনসনকে বনের মধ্যে আক্রমনোদ্যত চিতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। রবিনসনকে বিশ্বের সেরা মুষ্টিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। প্রায় দীর্ঘ পাঁচশ বৎসর ধরে তিনি মুষ্টিযুদ্ধ করেছেন। ওয়েলটার ওয়েট বিভাগেও তিনি প্রায় চার বৎসর ধরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ছিলেন। বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানদের মধ্যে তিনিই একমাত্র মুষ্টিযোদ্ধা যিনি একাধিকবার চ্যাম্পিয়ানশিপ হারিয়েও তাহা পুনরুদ্ধার করেছেন।

ওয়েলটার ও মিডল ওয়েট বিভাগেই যে তিনি শুধু বিশ্বচ্যাম্পিয়ান ছিলেন তা নয়, সম্ভবতঃ ক্রুজারওয়েট বিভাগেও তিনি বিশ্বের সেরা মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

রবিনসন সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা যে তিনি আবার একজন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। নৃত্যে তাঁর সাপ্তাহিক আয় ছিল প্রায় ১৫০০ ডলার। অপরূপ তাঁর নৃত্যের ছন্দ আর ভয়াল ও ভয়ঙ্কর তাঁর মুষ্টিযুদ্ধের ছন্দ। মুষ্টিযুদ্ধ-কালীন ভয়াবহ রবিনসনের ছন্দের মধ্যেও দেখা যায় এক ছন্দোবদ্ধ ধারা। একই সঙ্গে ঘটে সুন্দর ও ভয়ঙ্করের উপলব্ধি। মনে এনে দেয় একটা আনন্দের শিহরণ।

সেইজন্যই আজ জগতের কাছে তিনি Sugar Ray Robinson.

মেজর জেমস্ রেণেল

হারাধন দত্ত

ভারত বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে মেজর জেমস্ রেনেল এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি ভারতবর্ষে ভূগোল বিদ্যাচর্চার জনকরূপে পূজিত। বিগত সপ্তদশ শতক থেকে বিদেশী ভারত পথিকগণ ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাসের ধারাকে আজও অব্যাহত রেখে চলেছেন। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠমন কেবলমাত্র ধর্মপ্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রীসের অবিনশ্বর দৃষ্টিভঙ্গি পঞ্চদশ শতক থেকেই য়ুরোপের মনে এক অভূতপূর্ব নূতন জিজ্ঞাসা এনে দেয়। এক সর্বগ্রাসী বিশ্ব-মানবিকতা তাঁদের মনকে আচ্ছন্ন করে। এই নবোদ্ভূত চেতনা য়ুরোপকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির ধর্ম-ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করবার এক বিপুল প্রেরণা এনে দেয়—এই বিচিত্র জ্ঞান সম্পদের দ্বারা মানসিক পুষ্টি সাধনের জন্য তাঁরা অধীর হয়ে উঠেন। কেবলমাত্র স্বর্ণ-রৌপ্য ও পণ্যদ্রব্যের পার্থিব সম্পদে য়ুরোপীয় মনীষা পরিতৃপ্ত থাকেনি। এই মনীষা বিশেষ করে এশিয়া খণ্ডের সভ্যতা সংস্কৃতির আবিষ্কারে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। সপ্তদশ শতকের শেষের দিক থেকে এশিয়ার বিরাট ভাবরাজ্যের বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল পশ্চিম সমুদ্রের তটদেশে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে য়ুরোপের সাংস্কৃতিক জীবনে [illegible] পদক্ষেপ ঘটল। ভারতবিদ্যাচর্চা এক [illegible]ভাবনীয় রূপ পরিগ্রহ করল এই সময়ে। এই সূত্রেই মেজর জেমস্ রেনেলের অবিস্মরণীয় ভারত-সাধনার কথা মনে আসে। রেনেলে'র ভারত আগমন এদেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

জেমস্ রেনেল' ভারতে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ভৌগলিক মানচিত্র অঙ্কনের পথিকৃত। এদেশের জরিপ পদ্ধতিতে তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রবর্তন করেন। তাঁর এই সাধনা আমাদের জাগরণ ও বিজ্ঞান চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে গূঢ়অর্থবাহী হিসেবে দেখা দিয়েছিল। মাত্র ১১ বৎসর কাল এ দেশে যাপন করে রেনেল যে ভারতকাহিনী বিশ্বকে উপহার দিয়েছিলেন সেই রোমাঞ্চকর বৈজ্ঞানিক অভিযানের বিবরণ দীর্ঘশতাব্দী পরেও সমান মূল্য নিয়ে বিরাজ করছে। স্বভাবতই রেনেলের কাছে ভারতবাসীর ঋণ অপরিসীম।

১৭৫৭ সাল, পলাশীর যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের স্বাধীনতা সূর্য হ'ল অস্তমিত। এদেশে ইংরেজ অধিকার পাকা হয়ে গেল। ইতিহাসে এ এক ক্রান্তির লগ্ন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লুপ্ত হ'ল—কিন্তু আমাদের চিন্তার দিগন্তে ভাবনার আকাশে হ'ল সূর্যোদয়। পালতোলা জাহাজ শুধুমাত্র শত্রুর কামান বন্দুকই বহন করে আনলো না ভাবনা চিন্তার নব নব বাণীকে বহন করে এনে দিল। পলাশী যুদ্ধের মাত্র তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেমস্ রেনেল' মাদ্রাজে এসে উপস্থিত হলেন। ঈশ্বর-আদিষ্ট যে কর্ম সম্পাদনের জন্য তাঁর আবির্ভাব—

তরুণ রেনেলের প্রথম কর্মজীবনে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। কিশোর রেনেল ভারতে এলেন বৃটিশ কামানবাহী জাহাজের শিক্ষানবিশ নাবিক হিসেবে। রেনেলে'র জন্মস্থান, ইংলণ্ডের ডিভনশায়ার (Devonshire)। জন্ম সন ১৭৪২। পিতার নাম, John Rennel, Captain R. A. রেনেল' যখন ভারতে এলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮।

মেজর জেমস্ রেনেল' মানচিত্র পরিকল্পনা ও মানচিত্রাঙ্কনের স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে জন্মেছিলেন। রেনেলে'র বাল্যজীবনেই ভবিষ্যৎ মানচিত্রাঙ্কনবিদের লক্ষণ নানাভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তথাপি ভিন্নতর কর্মজীবনকে অঙ্গীকার করে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন। তিন বছর পরে রেনেল নৌবিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর marine serviceএ যোগ করলেন। সে সময়ে মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন Palk সাহেব। ১৭৬৪ সালে মাদ্রাজের গভর্ণর Palk সাহেবের একখানি পরিচয় পত্র নিয়ে রেনেল কোলকাতায় পাড়ি দিলেন। দেখা করলেন বাংলাদেশের গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের সঙ্গে। ভ্যান্সিটার্ট অভিনিবেশ সহকারে তরুন রেনেলের আগ্রহের কথা শ্রবণ করে মুগ্ধ হলেন। কেবল তাই নয়, ১৭৬৪ সালে বাইশ বছরের তরুণ রেনেলকে তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসিত বাংলাদেশের সার্ভেয়র 'জেনারেলের' পদে নিয়োগ করতে দ্বিধা করলেন না। কোম্পানী' অবাধ বাণিজ্যের জন্ত সহজ ও নির্বিঘ্ন পথের অনুসন্ধান করছিলেন—দেশের অভ্যন্তরের পণ্যদ্রব্য কোলকাতায় এনে বানিজ্য করতে হ'লে—সুপরিচয় এবং স্থল ও জলপথের বৃত্তান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। ১৭৬৪ সালে সার্ভেয়র জেনারেল' পদে যোগদান করেই রেনেল' বাংলাদেশের একখানি 'বানিজ্যিক ও জলপথের মানচিত্র' প্রণয়নের কাজে ব্যাপৃত হলেন। ভ্যান্সিটার্ট রেনেলের নিয়োগপত্রের সঙ্গে লিখলেন—"You will coast along the south side of the great river (Ganges) and examine every Creek or Nulla which runs out of it to the southward, tracing them as far as you find them navigable for Boats of Three Hundred Maunds Burthen and informing yourself by Enquiry from the country people whether they are Navigable all the year: of which circumstance you may yourself form a tolerable Judgment by the Appearance and steepness of the Banks. You will keep a very particular Journal of your proceedings, noting the Appearance and produce of the countries thro' which you pass; the name of every village, and whatever else may seem remarkable, of which Journal you will give me a copy along with the Drafts you are to make of the Rivers and Creeks"

নিঃসন্দেহে এ-এক কঠিন দায়িত্ব। নবাবীযুগের বাংলাদেশের অগম্য পথ-ঘাট-নদী-প্রান্তর এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অশান্তির কথা মনে রাখলে বিদেশী রেনেল যে দায়িত্বভার নিয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তিনি দেশের সেকালীন পথ-ঘাট লোকাচার কোন কিছুর সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন না। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিই ছিল তাঁর প্রতিকূলে। তবু দুর্জয়সাহস কর্তব্যনিষ্ঠা এবং বিজ্ঞানীবুদ্ধিকে সম্বল করে তিনি এই দুঃসাহসিক অভিযানের কাজে লেগে গেলেন। বাধা পেলেন পদে পদে। জলযাত্রার প্রথম দিনেই তাঁর নৌকা প্রায় জলমগ্ন হতে চলেছিল। আরও পাঁচ মাস পরে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন—কিন্তু দায়িত্ব পালনে তিনি নির্ভীক ও অবিচল। ১৭৬৪ সালের মে'মাস থেকে ১৭৬৭ সালের মার্চ' পর্যন্ত তিনি তাঁর অভিযানের বিবরণ লিখলেন। এই লিখিত বিবরণ বাংলাদেশের ভৌগলিক বানিজ্যিক ও অর্থনীতিক চিন্তার ভাণ্ডারকে আজও সমৃদ্ধ করে রেখেছে।

বাংলাদেশের বিচিত্র নদীপ্রবাহ ধরে রেনেল ঢাকা শহরে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে গভর্ণর

ভ্যান্সিটার্টের কাছে তিনি নূতন প্রস্তাব ও পরিকল্পনার খসড়া পাঠালেন। পূর্ববঙ্গের নদীগুলির উপর একটি সার্বিক জরিপ ও সমীক্ষা চালাবেন এই ছিল রেনেলের উদ্দেশ্য। গভর্ণর সানন্দে রেনেলের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। এই সমীক্ষা ফলপ্রসূ করতে গিয়ে রেনেল জলপথে বহু শ্বাপদ-সঙ্কুল জল-জঙ্গলময় দুর্গম দূর বিস্তৃত ভূখণ্ড পর্যটন করেন এবং সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন। রেনেলের এই অভিজ্ঞতার কাহিনী এদেশের ভৌগলিক চিন্তার জগতে নতুন আলোকসঞ্চার করেছে।

সপ্তদশ শতকের শেষলগ্নে ফরাসীদেশেই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক মানচিত্রাঙ্কনের প্রচেষ্টা চলে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভূগোলবিত্তাবিশারদ জিন-স্ত-এর্নাভিল ১৭৫৪ সালে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের মানচিত্র অঙ্কন করেন। ভারতবর্ষ ভ্রমণ না করেও বিভিন্ন নক্সা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রভৃতি অবলম্বন করে তিনি যে মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন তা অবিশ্বাস্যরূপে সার্থক হয়েছিল। এই ফরাসী ভূগোলবেত্তা যেখানে শেষ করেছিলেন—মেজর রেনেলের সূচনা সেখান থেকে। নির্ভুল গাণিতিক ও জ্যামিতিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা মেজর জেমস্ রেনেলই বাংলাদেশের বিজ্ঞানসম্মত মানচিত্রাঙ্কনের পথিকৃৎ হলেন। সহায় সম্পদ বা লোকবলের কোন প্রাচুর্যই রেনেলের ছিল না। তথাপি তিনি মানচিত্রাঙ্কনে অসাধ্যসাধন করে যে তারতাহিতৈষণা দেখিয়েছিলেন- -সে জন্য সঙ্গত কারণেই তিনি এ-দেশের মানচিত্রাঙ্কন বিত্তার জনকরূপে পূজিত থাকবেন। এদেশে মানচিত্রাঙ্কনবিত্তায় আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রবর্তক মেজর জেমস্ রেনেল।

ভ্যান্সিটার্ট (১৭৬০-৬৪) এর পর আবার ক্লাইভ (১৭৬৫-৬৭)। লর্ড ক্লাইভের আগ্রহাতিশয্যে রেনেল এর পরেই বাংলাদেশের ভৌগলিক মানচিত্র প্রণয়ণ করলেন। আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সার্ভেয়র জেনারেল রূপে রেনেল ইতিপূর্বেই বাংলাদেশের বাণিজ্যিক পথ-ঘাটের ইতিবৃত্ত নথিবদ্ধ করেছিলেন। সেই জরিপ বিবরণীর মধ্যেই রেনেল বাংলাদেশের ভৌগলিক মানচিত্রের অনেক উপকরণ পেয়ে গেলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওরম (Orme) বাংলাদেশের একখানি মানচিত্রের জন্য ক্লাইভের কাছে আবেদন করেন। তদনুসারে ১৭৬৪ সালের অক্টোবর মাসে ক্লাইভ মেজর জেমস্ রেনেলের উপর বাংলাদেশের ভৌগলিক মানচিত্র প্রস্তুতের ভার দিলেন। বাংলাদেশের এই প্রথম মানচিত্রের জন্য তাঁকে আবার দুঃসাহসিক অভিযানে নামতে হোল। বাংলার মাঠ-ঘাট-বাট, প্রান্তর, নদী, খাল-বিল দুর্গম বনভূমি এ-সব কিছুকে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করে চললেন। গণিত ও বিজ্ঞানবুদ্ধির নিকষে সে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে নিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও জরিপ করতে গিয়ে তিনি পেলেন নির্মম প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশের অগণিত মানুষের সমাজে বসে তাঁকে কর্তব্য পালন করতে হয়েছিল। কিন্তু পলাশী যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের মানুষ সেদিন বিদেশী রেনেলকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেনি। রেনেল তৎকালীন বাঙালীর অসৌজন্যতার সেই ভয়াবহরূপকে আগে থেকে অনুমান করতে পারেননি। তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের কথা জনসমাজে বুঝিয়ে বলা হলেও সেদিনের দেশবাসী তাঁকে বিশ্বাস করেনি। বহুক্ষেত্রেই দেশের লোক তাঁর জরিপকাজে বাধা দিয়েছেন—তাঁকে সন্দেহ করেছেন। বাংলাদেশের বহু জনপদ থেকে তিনি প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। এ-জন্য অনেক সময় তিনি রক্তাক্ত সংগ্রামেও লিপ্ত হয়েছেন। বাংলাদেশের প্রথম মানচিত্র উপহার দিতে গিয়ে পথিকৃৎ রেনেল এক দুঃসহ বেদনা ও নির্যাতনের স্মৃতি সঞ্চয় করে ফিরলেন।

ক্লাইভের দ্বিতীয়বার গভর্ণর পদের কার্যকাল শেষ হয়ে এল। অচিরে তাঁকে কলিকাতা ত্যাগ করে যেতে হবে। সে-জন্য ক্লাইভ রেনেলকে ঢাকা থেকে ফিরে আসবার নির্দেশ দিলেন। ১৭৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রেনেল কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করে ক্লাইভের

হাতে 'বাংলাদেশের ভৌগলিক মানচিত্র' তুলে দিলেন। মানচিত্র প্রণয়নে রেনেলের এই অসাধারণ কৃতিত্বে ক্লাইভ অপ্রত্যাশিত আনন্দলাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আগেই রেনেলের এই কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ক্লাইভ রেনেলকে 'First Surveyor General of India' পদে নিযুক্ত করেন। কেবল তাই নয়, ইংরেজ যুবক রেনেলের এই বিস্ময়কর প্রতিভা অদ্বিতীয় কর্তব্যনিষ্ঠা, দুর্জয় সাহস, ও নির্ভিকতাকে সম্মানিত করার ও এক ব্যবস্থা করলেন ক্লাইভ। তদনুসারে ১৭৬৭ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম তারিখে ক্লাইভের ইচ্ছানুযায়ী এক বিশেষ সম্বর্দ্ধনাসভায় জেমস্ রেনেলকে পুরস্কৃত করা হয়। ভারত ইতিহাসে ক্লাইভের এই গৌরবময় ভূমিকার কাহিনী নানা কারণে স্মরণীয়।

মেজর জেমস্ রেনেল তাঁর কর্মবহুল জীবনে একজন দক্ষ ইংরেজ শাসক প্রতিনিধির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কেবল জীবনের পার্থিব সাফল্যে তৃপ্ত হননি, তাঁর আত্মায় ছিল ভারত অন্বেষণের সুগভীর তৃষ্ণা। দিগন্তবিস্তৃত উর্মিমুখর নীল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তিনি এসেছিলেন এই বৈচিত্রের দেশ ভারতবর্ষে। দায়িত্ব পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও ভূগোলবিজ্ঞার চর্চায় তিনি ছিলেন অক্লান্ত। কলকাতায় আগমন করার পর থেকেই রেনেল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ব্যাপারে গুরুত্ব-পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—সে জন্য দেশের অভ্যন্তরে দূর-দূরান্ত অঞ্চলে তাঁকে অধিকাংশ সময়ে কর্মব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। নিজ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃকপাত করার অবসর পাননি। যৌবনরাগরঞ্জিত জীবনের অনেক সোনাঝরা দিনগুলিকে তিনি হেলায় ফেলে এসেছেন। সৌভাগ্যের সূর্যোদয় ঘটল তাঁর জীবনে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় এবং ঐহিক সুখসম্পদে। এমনি সময়ে তাঁর জীবনে এল প্রেমের বন্যা। ঢাকা থেকে ফিরে এসে তিনি প্রায়শ কলকাতার গভর্ণর কার্টিয়ার (Cartier) এর বাসভবনে মিলিত হতেন। এখানেই 'জেন থ্যাকারের' সঙ্গে পরিচিত হলেন। জেন থ্যাকারে মেকপিস্ থ্যাকারের বোন। মেকপিস থ্যাকারে এ সময়ে কলকাতার গভর্ণরের সেক্রেটারী ছিলেন। এই মেকপিস্ থ্যাকারে বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডব্লু এম থ্যাকারের পিতামহ। ১৭৭২ সালে রেনেল কলকাতার সেন্ট জোনস্ চার্চে জেন থ্যাকারের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তাঁদের বিবাহিত ও দাম্পত্যজীবন ছিল মধুর ও পরম রমনীয়।

১৭৭৬সালে রেনেল Major of the Bengal Engineers পদে উন্নীত হন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একটানা তেরো বৎসর পরিশ্রম করে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে তিনি নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত ও অবসন্ন মনে করলেন। এই সময়ে তিনি Council of Fort William এর কাছে অবসর গ্রহণের জন্য এক আবেদন পত্র পেশ করলেন। কোম্পানী রেনেলের আবেদনকে মঞ্জুর করলেন। বাৎসরিক £৬০০ এর পেনসন ও মঞ্জুর করা হোল। ১৭৭৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। ঐ বৎসরের মার্চ মাসে রেনেল সপরিবারে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় ৮৭ বৎসর বয়সে ১৮৩০ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন। Westminister Abbeyতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

১৭৮১ সালে রেনেল রয়াল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। তিনি কিছুকালের জন্য Chief of the British Geographers এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮২৫ সালে তিনি ইংলণ্ডের Royal Society of Litarature থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন। আধুনিক ভূগোল বিজ্ঞায় রেনেলের অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে তাঁর Bengal Atlas (1779) Description of the Roads in Bengal and Bihar (London 1778), Memoirs of the Map of Hindostan (London 1788). The Marks of the British Army in the Peninsula of India এবং Rennell's Journals (Cal-1910). এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি Asiatic Society of Bengal এর পক্ষে T.D.La Tuche কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য

গ্রন্থগুলির মধ্যে Observation on the Topography of the plain of Troy., Memoirs on the Geography of Africa. The Geographical system of Herodotus explained প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া তাঁর কিছু অপ্রকাশিত চিঠি ও রচনা Bengal Past and Present এবং অন্যান্য পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। রেনেলের এই সব রচনা থেকে বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতের পূর্বাকলের নদীপথ, স্থলপথ, ভূপ্রকৃতি, বনসমুদ্র, দেশের বানিজ্যকেন্দ্র বাজারগঞ্জ পণ্যসামগ্রী গ্রাম-নগর পরিচয়, শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনীতি, ধর্ম-লোকাচার-উৎসব-পার্বন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রভৃতি বহু কিছু বিষয়ের মূল্যবান তথ্য, ইতিহাসের ইঙ্গিত ও উপকরণ লাভ করা যায়। বাংলাদেশের ভৌগলিক বাণিজ্যিক অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে রেনেলের এই বিবরণগুলি আজও মূল্যবান ও অপরিহার্য।

অগ্রপথিকের অসাধারণ প্রতিভা ও মণীষা নিয়েই রেনেলের আবির্ভাব। তিনি তাঁর জীবৎকালে যখন যে মানুষের সমাজে মিলিত হয়েছেন তখনই সমস্ত সমাজটাকে সাহস, আশা, উদ্দীপনার মন্ত্রে আলোড়িত করে তুলেছেন। তাঁর জীবনসাধনা, তাঁর নিজ যুগে ছিল বিস্ময়কর—কিন্তু আজ প্রায় দু'শো বছর পরে পুরাতত্ত্বানুশীলনের ক্ষেত্রে রেনেলের অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের কথা ভাবলে আরও বিস্মিত হতে হয়। আধুনিক ভূগোলবিদ্যার চর্চায় রেনেলের দুঃসাহসিক অভিযান নিঃসন্দেহে পথিকৃতের প্রয়াস। এদেশে মানচিত্রাঙ্কনের জনক জেমস্ রেনেলের কাছে বাংলাদেশ চিরকাল ঋণী থাকবে। শুধু বাংলাদেশ কেন আধুনিক ভূগোল বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীতে রেনেল এক অবিস্মরণীয় নাম। ভারতবন্ধু রেনেলের জীবন থেকে একালেও অনেক শিক্ষার উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে।

ঋণী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক
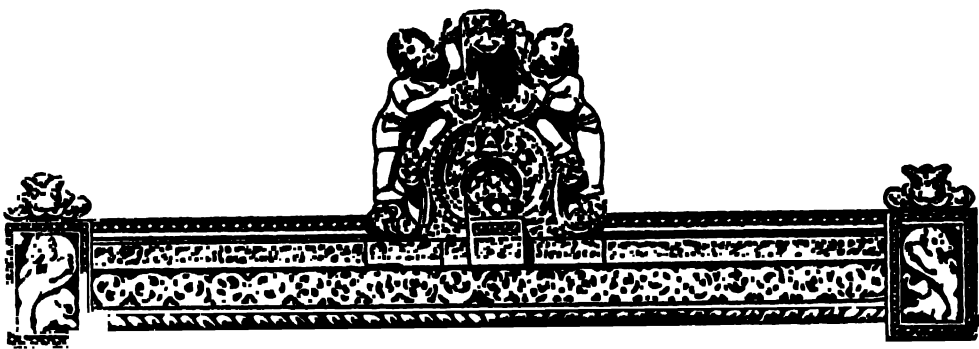
সুদূর যুগ ও জাতির কাছে—
আছি আমি ঋণী।
জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতদের
কজন বল চিনি ?
সুদূর দেশের সুদূর যুগের,
কালজয়ী অচেনা লোকের
সঙ্গে আমি কারবার ও'যে
আসছি করে দিনই।

(২)

সৃষ্টি আমি কতই কৃষ্টি
কতই সভ্যতার।
সে ঐশ্বর্য্য ঐতিহ্যের যে
আমি অংশীদার।
সবার আশীষ আমি সাধি
ঋণেই আমি বুনিয়াদী,
আমার তরে মুক্ত—গোটা
জগতের দরবার।

(৩)

আমার ঋণে সর্ব্বশাস্ত্রে,—
ইতিহাসের ছাপ
তাদের সাথে অফুরন্ত
আমার যে হিসাব।
বাঁধা আমি সর্ব্বদা হায়—
তাদের সৌখ্যে কৃতজ্ঞতায়
বক্ষে বহি আজও তাদের
অখণ্ড প্রতাপ।

(৪)

করি নাক পূজ্য পূজার
আমি ব্যতিক্রম,
মনে প্রাণে জাগে তাঁদের
সম্ভ্রম সংযম।

মহামানব মহাত্মাদের
মূর্তি ভক্তি সমাদরের
ভাঙি নাকো—পূজি সকল
করতে চাই জনম।

(৫)

বাঁচি আশায় ভালবাসায়
পূজায় প্রশংসায়
সমাগত সিদ্ধি গলায়
গুণীর অবজ্ঞায়।
অবহেলায় হয় না কিছু
শেখ মাথা করতে নীচু
যায় যে পাওয়া দিব্য জীবন
কেবল তপস্যায়।

কবির ইহাই শেষ রচনা

কুমুদ-অঞ্জলি

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

তুমি কবি বিপশ্চিত, রসমূর্তি সত্যের পূজারি,
চেতন-স্পন্দের প্রতি ছন্দে তাহা উঠিত উৎসারি।
অনন্ত আনন্দঘন নিত্য যাহা অনির্বচনীয়
তোমার বাণীর স্পর্শে হত তাহা প্রত্যক্ষ অমিয়।
ইন্দ্রিয়-সীমার মাঝে শব্দে রূপে-রসে যেত ধরা ;—
জগতের লীলাক্ষেত্রে সেই তব বিচিত্র পসরা
এনেছিলে পূর্ণ করি বাহিয়া জীবন-তরীখানি—
অরূপের রূপচিত্র অব্যক্তের ছন্দোময়ী বাণী।
সে বাণীর মৌন-মর্ম জাগ্রত করেছে মোর প্রাণ,
তুমি কি জেনেছ তাহা ? কিন্তু আমি বহু ভাগ্যবান
তোমার সস্নেহস্পর্শ পেয়ে যাঁরা হর্ষোৎফুল্ল মুখ,
আমি কবি—কাব্যরসে লভিয়াছি সেই স্নেহ-সুখ।
জীবিতে তোমার পূজা করি নি চন্দন ফলে ফুলে,
কেবলি লিখেছি নাম 'কবি' বলে বাণীর দেউলে।
আজিকে মৃত্যুর পরে মোর সেই ভাবাঙ্কিত ছবি
অঞ্জলি হইয়া থাক—"কুমুদরঞ্জন, তুমি কবি!"

আচার্য যদুনাথ : শতাব্দী প্রণাম

শান্তশীল দাস

সমগ্র জীবনব্যাপী কী অতন্দ্র সাধনা তোমার ;
সত্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী, যে সত্য বিস্মৃত ইতিহাসে ;
সেই ইতিহাস পথে তোমার বিচিত্র বিচরণ,
সত্যসন্ধী হে সাধক, তোমাকে প্রণমি বারংবার।

আচার্যের উচ্চাসনে সমাসীন হে জ্ঞান তাপস,
সঞ্চয় করেছ নিত্য, মহৈশ্বর্যে ভরেছ ভাণ্ডার,
আর সেই জ্ঞানরাজি রেখে গেলে, অমর সম্পদ,
সে মহা সম্পদে ধন্যা, গরীয়সী হ'ল জন্মভূমি।

তোমার এ দেশপ্রেম অতুলন নিঃশব্দ সাধনা,
যুগ যুগ ধরে এই মহাপ্রেম ছড়াবে সৌরভ ;
মৃত্যু নেই এ প্রেমের ; প্রেম সাথে প্রেমী চিরজীবি,
হয়ে রবে হে বরেণ্য, সেই প্রেম স্মরি শ্রদ্ধাভরে।

তোমার সাধনা পথ ধ'রে কই আগামী দিনের
অভিযাত্রী চলে না তো—বিস্ময় বেদনা জাগে মনে ;
আজ দেখি চারিধারে নিষ্ঠাহীন বিভ্রান্ত জীবন,
জ্ঞানের তপস্যা নেই, নেই সেই দেশ সেবা ব্রত।

জন্মশতবর্ষক্ষণে বেদনার্ত চিত্তখানি লয়ে
প্রণাম অঞ্জলি দিই ও চরণে, কর তা গ্রহণ।

কোথায় যাই ?

হরেন্দ্রনাথ নাথ

(১)

বাইরে ঘরে জায়গা নাই
বল্ মা তবে কোথায় যাই ?
গিন্নি করেন সদাই ফোঁস
কথায় কথায় অসন্তোষ ।
মুখ খুললে তোলে কাঁটা
সদাই কাঁপি বলির পাঁঠা ।
চুপ থেকেও রেহাই নাই
বল্মা তবে কোথায় যাই ?

(২)

ছেলে আমার রকবাজ
জুলপি রাখে, নাহি লাজ
হাতে বোমা, কেসটুন
মুখে বুলি মাওসেতুঙ্
বললে কথা দেখায় রোষ
আমি যেন বুড়ো মোষ ।
ভয়েই থাকি উপায় নাই
বলমা তবে কোথায় যাই ।

(৩)

মেয়ে আমার হ'ল বড়
চিন্তায় আছি জড় সড়
রাস্তা ঘাটে মারে শিস্
আগলে রাখি অহর্নিশ ।
পাত্র পেলেও দু'একজন
ছেলের বাবা মহাজন ।
পণের টাকা আমার নাই
বল্মা তবে কোথায় যাই ?

(৪)

অফিসেতে খেটেই যাই
তবু তাদের মন না পাই
কাজে অকাজে হাঁক পাড়ে
অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়ে ।
পারলে করি জুতো সাফ্
ভুলের তবু নেইকো মাফ্
মুখে হাসি তবুও নাই
বল্মা তবে কোথায় যাই ?

পূজ্য বিনোবা

কানাইলাল দত্ত

ভূদান গ্রামদান আন্দোলনের প্রবক্তারূপে বিনোবাজি সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেছেন। সর্বোদয়ের মূর্ত প্রতীকও বলা হয় তাঁকে। এ বছরের এগারই সেপ্টেম্বর পূজ্য বিনোবাজি পঁচাত্তর বৎসর অতিক্রম করে ৭৬ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করবেন। মহারাষ্ট্রের কোলবা জেলার গাগোদা গ্রামে ১৮৯৫ সনে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদেব নরহর ভাবে গৃহী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন। মাতা রুক্মিণী দেবী ছিলেন করুণা ও সেবার প্রতিমূর্তি।

বিনোবা নামটি গান্ধীজির দেওয়া। আসল নাম হলো বিনায়ক। লোকে আদর করে ডাকতেন—বিন্যা। বিনায়ক আর বিন্যা এ দুটো নামের কিছু কিছু নিয়ে গান্ধীজি যোগ করলেন মারাঠী ভাষায় শ্রদ্ধাসূচক 'বা'। বিন্যা হলেন বিনোবা, অর্থাৎ 'পরম প্রিয়' 'শ্রদ্ধার পাত্র।' গান্ধীজির দেওয়া নাম যে সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছে সে কথা আজ কে না জানেন।

বিনোবাকে গান্ধীজি যেমন গভীরভাবে স্নেহ করতেন তেমনি শ্রদ্ধাও ছিল প্রগাঢ়। হবে না কেন? এমন খাঁটি মানুষ তো কোটিতে গুটিকয়েক মেলে। গান্ধীতীর্থে কত দিকপাল নরনারী সমবেত হয়েছিলেন। দেশবন্ধু দাস, নেতাজি সুভাষ, সরোজিনী নাইডু, জহরলাল, রাজাজি, সর্দার প্যাটেল, বাদশা খান…… প্রভৃতি মানুষগুলি যে কোন যুগে যে কোন দেশের পক্ষে একান্ত শ্লাঘার ও গৌরবের বলে বিবেচিত হবেন। এঁরা সকলেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বত্যাগী সৈনিক ও দেশ গঠনের কুশলী নায়ক বলে স্বদেশে বন্দিত হয়েছেন। গান্ধীতীর্থে আর একদল মহাপ্রাণ সাধক সমবেত হয়েছিলেন যাঁরা অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মত সমগ্র মানব জীবনকে সরস ও সমৃদ্ধ করে গেছেন। মাতা কস্তুর বাঈ, আশাদেবী, বিনোবা প্রভৃতি ছিলেন এই গোষ্ঠীর মানুষ।

মানুষ চিনতে গান্ধীজি কখন ভুল করেন নি। আর যোগ্য মানুষকে যথাযথ মর্যাদায় আসন দিতেও তিনি কোনদিন কুণ্ঠিত হলেন না। বিনোবার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতির নানা ঘটনা আছে। সব চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৯৪০ সনে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রথম সত্যাগ্রহী নির্বাচিত হন বিনোবাজী। এ এক বিরল সম্মান। সারা ভারতের রথী মহারথী জননেতৃবর্গ—নেহরু-প্যাটেল-প্রসাদ-আজাদ থাকতে গান্ধীজি নির্বাচিত করলেন নীরব কর্মসাধক বিনোবাজিকে। হরিজন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখে তিনি বস্তুত বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন কেন এই নির্বাচন। গান্ধীজি লিখেছিলেন—।

"কেন তাঁকে [বিনোবা] এই সত্যাগ্রহের প্রথম সত্যাগ্রহী নির্বাচন করা হলো? অন্য কাউকেই বা কেন নয়। আমার ভারতে আসার পর ১৯১৬ সনে তিনি কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত তিনি। সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি আশ্রম জীবনে প্রবেশ করেন। আশ্রমের প্রথম সদস্যদের তিনি একজন। . ...

আশ্রমের সব রকম সেবা কাজে—রান্না থেকে আরম্ভ করে পায়খানা পরিষ্কার অবধি, সব কাজে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্মরণ শক্তি আশ্চর্য রকমের।..... তিনি বিশ্বাস করেন ব্যাপক সুতোকাটাকে সমস্ত রচনাত্মক কাজের কেন্দ্রমণি-রূপে গ্রহণ করলে গ্রামের দারিদ্র্য দূর হতে পারে।—

স্বভাবতই শিক্ষক হওয়ার দরুণ হাতের তাঁতের মাধ্যমে বুনিয়াদী শিক্ষা দানের ব্যাপারে তিনি

আশাদেবীকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। শ্রীবিনোবা সুতাকাটাকে বুনিয়াদী শিক্ষার বনিয়াদ করে একখানা বইও লিখেছেন। বইখানা সম্পূর্ণ মৌলিক।...

......তাঁর হৃদয়ে অস্পৃশ্যতার গন্ধ পর্যন্ত নাই। সাম্প্রদায়িক একতায় তাঁর বিশ্বাস আমারই সমান। ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য বুঝবার জন্য তিনি এক বৎসর ধরে মূল আরবীতে কোরাণ শরীফ অধ্যয়ন করেছেন, এ-জন্য তিনি আরবী ভাষাও শিখেছেন।......তাঁর কাছে তাঁর শিষ্য ও কর্মীদের এমন একটি দল আছে যাঁরা তাঁর ইশারায় যে কোন রকম বলিদান দিতে প্রস্তুত।...তিনি ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করেন। ইতিহাসের তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত কিন্তু দৃষ্টি তাঁর পক্ষপাত শূন্য। তিনি বিশ্বাস করেন গ্রাম-বাসীদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ ছাড়া সত্যিকারের স্বরাজ আসতে পারে না।.........

শ্রীবিনোবা যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী কিন্তু তিনি নিজের অন্তরাত্মার মত তাঁদের অন্তরাত্মারও সম্মান করেন......। (শ্রীবিধুভূষণ দাশগুপ্তের আচার্য বিনোবা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।)

সে সময়কার সকল প্রাণবন্ত মানুষের মত বিনোবাও দেশমাতৃকার বন্ধন দশায় মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করতেন। তাঁর কৈশোর যৌবনে দেশে, বিশেষ করে বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের জোয়ার বইছিল। বজ্র কঠিন দৃঢ় ও নির্মল চরিত্র গৌরবে অম্লান, দক্ষতায় ও নিষ্ঠায় অনতিক্রমণীয় হীরের টুকরো সব দামাল ছেলেরা দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনের প্রচেষ্টায় হাসিমুখে নিজেদের কাচ কাঁচা তাজা প্রাণগুলি অঞ্জলি ভরে স্বদেশ জননীর পাদপদ্মে অর্ঘ্য নিবেদন করছেন। সেই সব বিস্ময়কর দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কর্মের উত্তেজনা বিনোবাকেও স্পর্শ করেছিল। তাঁর আকাঙ্খা হয়: দেশের জন্য হিংসাত্মক ... করে জীবন সার্থক করবেন। অনেক পড়া-... আলাপ আলোচনা করেও বিপ্লবের অস্পষ্ট কল্পনা তাঁর নিকট সুস্পষ্ট হলো না। অশান্ত হৃদয়ে প্রচলিত শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই তিনি ঘরছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। এলেন কাশীতে।

ঐ সময় কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় (১৯১৬) মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক বক্তৃতা পড়ে বিনোবা আলোর সন্ধান পেলেন। গান্ধীজির এই কথাগুলি বিনোবার বিপ্লবী মনে ঝড় তুলেছিল!

"হিংসা পন্থীরা আতঙ্ক সৃষ্টি করছেন। এতে ভারতের লাভ হবে না। ভারত যদি বিজেতাকে জয় করতে চায়, তবে তাকে নির্ভীকতার পথে চলতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তবে ভয় আমরা কাউকে করব না। কাউকে না। রাজা মহারাজাদের নয়, বড়লাট বাহাদুরকে নয়,—গোয়েন্দা পুলিশকে নয়, এমনকি স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জকেও নয়। দেশ প্রেমের জন্য বিপ্লবীদের আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাদের শুধাই খুন করায় কি বাহাদুরি আছে?"

এই বক্তৃতার সূত্র ধরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বিনোবাজির যোগসূত্র স্থাপিত হয়। অল্পকাল মধ্যে তিনি সবরমতী আশ্রমে যোগ দিলেন। সবরমতী আশ্রমের বিশ্বজোড়া খ্যাতির অন্তরালে যে ক'জন নম্র কর্মসাধক নীরবে কাজ করে গেছে বিনোবা তাঁদের অন্যতম, প্রধানতম বললে অত্যুক্তি হবে না।

গান্ধীজির পরলোক গমনের পর দেশের গঠনকর্মীরা অসহায় বোধ করতে থাকেন। দেশে তখন স্বাধীন সরকার, আর কংগ্রেসের সহকর্মীরাই সে সরকার পরিচালনা করেন। উঠতে বসতে তারা সহস্রবার গান্ধী নাম উচ্চারণ করেন কিন্তু দেশ গঠনে গান্ধী-পথ বর্জন করে চলেন। নানা কারণে সময়টা প্রকাশ্যে সরকারের প্রতিকূল সমালোচনা করার পক্ষে অনুকূল ছিল না। আর সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার উত্তেজনায় ভরপুর দেশবাসী তখন ও-সব সমালোচনা শুনতে অনাগ্রহী। এই দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে ১৯৪৮ সনের ১৩ মার্চ সেবা-গ্রামে গঠনকর্মীরা বিনোবাজির নেতৃত্বে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে সর্বোদয় সমাজ গঠন করে গান্ধী প্রদর্শিত পথে দেশসেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

সর্বোদয় কথাটি গভীর অর্থবহ। যে ব্যবস্থার মধ্যে সর্বমানবের সর্বোত্তম হিত নিহিত রয়েছে তাকেই বলা হয় সর্বোদয়। গান্ধীজি রাসকীনের 'আন টু দিসলাস্ট' বই খানার অনুবাদ সর্বোদয় নামে প্রকাশ করেন কিন্তু ভাবটা সর্বতোভাবে ভারতীয়। সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্বে আমাদের এই ভারতবর্ষের তপোবন থেকে প্রাজ্ঞ ঋষি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 'সর্বে নঃ সুখিনঃ সন্তু।' সমস্ত লোক সুখী হোক। সর্বোদয়ের অপর নাম অন্ত্যোদয়। এই চিন্তা প্রকটিত হবার পূর্ব পর্যন্ত সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক হিত সাধনের প্রচেষ্টাকেই সর্বোত্তম সামাজিক ন্যায় বিচার বলে গৃহীত হয়েছিল। এ-মতবাদকে স্বীকার করার অর্থই হলো সকল মানুষের হিতসাধন সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করা। গান্ধীজি বল্লেন এ হতে পারে না। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের হিতসাধন করা যেতে পারে এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব। কিন্তু কোন পথে? সত্য, নিষ্ঠা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, যন্ত্র নির্ভরতা পরিহার, কায়িক শ্রমদান, প্রেমের প্রসার, সেবা ইত্যাদি কয়েকটি উপায়ের কথা গান্ধীজি আলোচনা করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার প্রয়োগও হয়। কিন্তু গান্ধীজির উত্তর সাধক বিনোবাজি এই চিন্তনকে ব্যাপক কর্মের মধ্যে প্রসারিত করে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছেন। বিনোবাজির কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রবিন্দু হলো ভূদান। একে তিনি ভূদান যজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন।

ভূদান যজ্ঞ আরম্ভের ইতিহাসটি খুবই চমকপ্রদ। বিধাতার অলক্ষ্য নির্দেশে আকস্মিক ভাবে বিনোবাজির ভূদান কার্য সুরু হয়। পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানাতে ভূমিহীন কৃষকেরা কম্যুনিষ্টদের নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন সুরু করেন। একদিকে পুলিশ মিলিটারি অপর দিকে হাজার হাজার ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক বিরামহীন সংঘর্ষে লিপ্ত। শান্তি ও স্বস্তি সেখানকার মানুষের জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকটি ভূমিহীন চাষীকে বাধ্য করা হয়েছিল এই সংঘর্ষে যোগ দিতে। ঐ সময় বিনোবাজি তেলেঙ্গানা যান। হরিজনদের একটি গ্রাম সারা। সেখানে সকলেই চাষী। কিন্তু জমি নেই কারো। বিনোবাজি ঘুরে ঘুরে বুঝতে চাইলেন সমস্যা কোথায়? চাষীদের নিকট জানতে চাইলেন কি পেলে তারা সুখী হয়। তাঁরা সহজেই উত্তর দিলেন—আমরা চাষী, চাষের জমি পেলে বেঁচে যাই।

বিনোবা ভাবলেন সরকারকে বলে কয়ে এদের কিছু জমির ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু ব্যাপারটা তাঁর মাথায় ঘুরতে থাকল। ইতিপূর্বে তিনি গ্রাম গঠনের সংস্থাগুলিকে অর্থ-নির্ভরতা পরিহার করে শ্রম নির্ভর করে গড়ে তুলবার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। এ-ক্ষেত্রেও তিনি ভাবতে লাগলেন কি করে সরকার নির্ভরতা পরিহার করে সমস্যার সমাধান করা যায়। তাঁর মনে হলো সরকার তো দিল্লী থেকে জমি পাঠাবেন না। জমি তো এখান থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। যাদের জমি আছে তাদের কাছ থেকেই নিতে হবে জমি। তিনি দিল্লীর দিক থেকে চোখ ফেরালেন তেলেঙ্গানার ভূস্বামীদের প্রতি। মর্মস্পর্শী আবেদন জানালেন জমির জন্য। ভূমিহীন হরিজন অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করে তিনি জমির জন্য আবেদন জানালেন। সাড়া পেতে দেরী হলো। চাইবার মত করে যদি কেউ কিছু চাইতে পারে তবে মানুষ, সাধারণ মানুষও তার সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারে। এগিয়ে এলেন শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডি। বিনা বাক্যব্যয়ে একশত একর জমি তিনি তুলে দিলেন বিনোবার হাতে। শুরু হলো নব-ভারতের নতুন বিপ্লব। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই দিনটি (১৮ই এপ্রিল, ১৯৫১) একদিন সোনার আখরে লেখা হবে।

বিশ্বের অধিকাংশ ঝগড়া সংঘর্ষের মূল কারণ দারিদ্র্য। ভারতবর্ষের মানুষ যে কত গরীব তা বোধ হয় লিখে প্রকাশ করা যায় না। বহু মানুষ এখনও পশুখাদ্য দিয়ে পেট ভরায়। গ্রামের এই গরীবি দূর করার পরিবেশ সৃষ্টির কাজে ভূদান আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ বিবেচিত হয়েছে। দু'মাসের মধ্যে বিনোবাজি তেলেঙ্গানায় বারো হাজার একর জমি দান হিসেবে

গেলেন। পূর্বেই বলেছি ইতিপূর্বে দীর্ঘদিন ধরে এ-অঞ্চলে ভূমিহীন কৃষকেরা ভূমিবানদের জমি জোর করে কেড়ে নেবার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। এর ফলে মালিকরা ভয় পেয়ে ভূদান করেছেন বলে কোন কোন মহল থেকে প্রচার করা হলো। ক্ষেত্র বিশেষে যে এমনটি না ঘটতে পারে তা নয়। তবে ভূদান আন্দোলনের নিজস্ব একটা শক্তি আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এই শক্তির প্রভাবে হায়দ্রাবাদের বাইরের ভূমিবানেরা সহস্র সহস্র একর জমি দান করলেন।

তেলেঙ্গানায় ভূদান আন্দোলনের প্রারম্ভকালে বিনোবাজিকে প্লানীং কমিশনের সভায় যোগদানের জন্য দিল্লীতে আহ্বান করা হয়। তিনি স্থির করলেন—গাড়ীতে বা প্লেনে নয়, পদব্রজে যাবেন দিল্লী। আর প্রতিটি জনপদে ভূদানের কথা মানুষকে শোনাবেন, ভূদান গ্রহণ করবেন। দু'মাস লাগলো তাঁর দিল্লী পৌঁছিতে। ৭৯২ মাইল পথ তিনি পায়ে হেঁটে গেলেন। এরপর অবশ্য বিনোবাজি ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে বহু সহস্র মাইল পদযাত্রা করেছেন। দিল্লী যাবার পথে তিনি পেয়ে গেলেন ১৮ হাজার একর জমি। এ-সামান্য কথা নয়।

সারাদেশে ভূদান আন্দোলন এখন একটা শক্তি অর্জন করেছে। দানের মধ্যে দাতা ও গৃহীতার একটা সম্পর্ক থাকে। শ্রদ্ধা ও প্রীতির পূর্ণ দানও প্রকাশ্যে গ্রহণের মধ্যে কিঞ্চিৎ গ্লানি থাকা সম্ভব। তাই ভূদানের জমি যারা পান, হীনমন্যতা যেন তাদের কোনক্রমেই স্পর্শ করতে না পারে এ-কথাটা বোধ হয় বিনোবাজির চিত্তে উদয় হয়েছিল। বোধ হয় এই কারণে ও অন্যান্য কয়েকটি আধ্যাত্মিক কারণে তিনি ভূদানকে ভূদানযজ্ঞ বলে অভিহিত করেন। যজ্ঞের প্রসাদ সারা দেশে বিতরিত হবে। সব মানুষ তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবেন—দাতা ও গৃহীতার সম্পর্ক ঘুচে যাবে। ভূদান এখন গ্রাম দান আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সমগ্র গ্রামটিকে একটি মাত্র পরিবারের মত করে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা আছে এই পরিকল্পনায়। গ্রামদান ক্রমে প্রসারিত হয়ে জেলা দান, রাজ্যদানে পর্যবসিত হবে। সব শেষে সেই সার সত্যের প্রতিষ্ঠা সব ভূমি গোপালকী। সব জমি ঈশ্বরের। আলো বাতাস জলের মত ভূমির পর সর্বমানবের সমান অধিকার—কারো মালিকানা এ-ক্ষেত্রে চলবে না। ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাঁচিতে কর্মীদের নিকট এ-সম্পর্কে বিনোবাজি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা বলেন।

"ব্যক্তির হাতে জমি থাকবে কিন্তু মালিক হবে গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রত্যেক পরিবার আবাদ করার জন্য পাঁচ একর জমি পাবেন। অবশিষ্ট জমি হবে সামূহিক। গ্রামের সকল জমির খাজনা, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যয় সামূহিক জমি থেকে মেটানো হবে। আট দশ বৎসর অন্তর জমির পুনর্বণ্টন হবে। ...জমি বিক্রী করা যাবে না। সন্তানের মত তা রক্ষণীয়।" বিনোবাজি প্রশ্ন করেন কেহ কি তাঁর ছেলে মেয়ে বিক্রী করে?

গ্রামদানী গ্রামের মানুষ অবিলম্বে চার প্রকার সুফল পেয়ে থাকেন,—আর্থিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক।

অনেকে বলেন অনুর্বর চাষের অযোগ্য জমি লোকে ভূদানে দিয়েছেন। কথাটা অনেকাংশে সত্য। মোট ৭৫% জমিই হয়তো ভাল না। কিন্তু অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ সে কি কম? এ-বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে (ভূদান যজ্ঞ, ১ আগষ্ট '৭০) "আইনের বা হত্যার পথে আজ পর্যন্ত এই দেশে কেউ কি এত জমি পেয়েছে? কত সত্যাগ্রহ হলো। সেখানে জমি একেবারে অকেজো, তবু ঐ জমি রক্ষাকারী সৈন্যদের মহাবীর চক্র দেওয়া হয়। পাথুরে বা পাহাড়ে জমিও লোকে বিনোবাকে কেন দিয়েছিল? তাঁর কাছে না ছিল ক্ষমতা, না রিভলবার। এ-প্রশ্নের নানা উত্তর হতে পারে। তা নিয়ে তর্ক করব না। তাঁর এ-কথাটি বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলতে চাই যে, ভূদান গ্রামদান ভারতধর্মানুসারী একটা পথ আর এই পথে মানুষের ধর্ম রক্ষা করে দারিদ্র মোচন সম্ভব।

সমাজ পরিবর্তনের ও দারিদ্র্যের মুক্তির দুটি মাত্র পথ আছে। একটি হলো—উগ্র সাম্যবাদীদের হত্যা ও ধ্বংসের শ্মশানে নব জন্মের প্রতিষ্ঠা। নকশাল-পন্থীরা এই পথের যাত্রী। হিংসায় অর্জিত সম্পদ হিংসা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে রক্ষা করা যায় না। বহু মানুষ হিংসাত্মক কাজে প্রবৃত্ত হলে অল্পকাল মধ্যেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় এবং তার ফলে মানুষ সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পশুর স্তরে অবনমিত হয়। শোষণের উৎসগুলি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে বলে খাওয়া পরার অভাবটা অবশ্য দূর হয়।

দ্বিতীয় পন্থা—বিনোবা—ভূদানের পন্থা। অহিংসার মাধ্যমে সর্ববিধ অশান্তি দূর করে প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠবে। দরকার হলে সেখানে মানুষ দারিদ্র্য বণ্টন করে নেবে। নকশাল বনাম সর্বোদয়ের সংঘাত অনিবার্য হয়ে একদিন দেখা দেবেই। সে সংঘর্ষে সর্বোদয়ের জয় অবশ্যম্ভাবী বলে আমি মনে করি। গ্রামদানী গ্রামের বিধিব্যবস্থার মধ্যেই প্রত্যেকটি মানুষের হিতের উপায় রয়েছে। সর্বাধিক মানুষের সর্বোত্তম হিতের কথা বলা সে দিন ভুল বিবেচিত হবে। হিংসা অহিংসার কথা তো নিশ্চয়ই আসবে। হিংসার ভিত্তিই হলো লোভ। গ্রামদানে তো লোভের অবকাশ নেই। সেখানেই সকলকে সব দিয়ে দিতে হবে—ভূদান, গ্রামদান, শ্রমদান, সম্পত্তিদান এমন কি বুদ্ধিদান—। সব দিয়ে দেবার সাধনাই হচ্ছে ভারতবর্ষের মৌলিক সাধনা। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

পৃথিবীতে এই নতুন বিপ্লব এলো বলে। ভারতবর্ষ থেকে এর সুরু হবে। ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে। নতুন এই বিপ্লবের চিন্তন দিয়েছেন গান্ধীজি, একে রূপ দিলেন বিনোবা। তাই বিনোবা আজ নতুন ধ্বনি তুলেছেন—জয় জগৎ। বিশ্বের বিশ্বমানবের জয় হবেই—মানুষের ইতিহাসে পিছিয়ে যাবার ইতিহাস সত্য নেই। অতএব বিশ্বের জয় হবেই। ভারতের গান্ধী শিষ্য বিনোবা সেই জয় জগতের পথিকৃৎ হবেন এ-ভাবতেও রোমাঞ্চিত হই।

বাংলা ও বাঙালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙালী পল্টন

আবার নূতন করিয়া বাঙালী পল্টন গঠনের দাবী উঠিয়াছে—প্রথমবার এ-দাবি উত্থিত হয় স্বর্গত ডঃ বিধান রায়ের আমলে, কিন্তু তৎকালীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী বলেন যে "ইহার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ যোগ্য এবং শিক্ষিত বহু বাঙালীকে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে গ্রহণ করা হইতেছে।" তাহা ছাড়া পণ্ডিত-প্রবর সুদক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসক আরো বলেন যে বাঙালী, বিহারী প্রভৃতি নাম দিয়া বাঙালী রেজিমেণ্ট, প্রভৃতি গঠন করিলে—প্রাদেশিকতা এবং বিভেদমূলক বিষ দেশের সর্বনাশ করিবে।' মোক্ষম যুক্তি। কিন্তু শিখ মহারাষ্ট্র, জাঠ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, গুর্খা প্রভৃতি (নাগা রেজিমেণ্ট হইতেছে অল্পকাল মধ্যে) নামে বিশেষ বিশেষ বাহিনী কিংবা রেজিমেণ্ট গঠন করিলে এবং ইংরেজ আমলের এপ্রথা বহাল থাকিলে কোন দোষ হইবে না। ইংরেজের মতে ভারতের বিশেষ কয়েকটি প্রদেশের লোকেরা 'সামরিক জাতি' এবং বাকি সবাই অসামরিক। বলবীর্য্যে যাহারা মহান এবং চেহারার দিক হইতে যাহারা [illegible],—মাংসাল অর্থাৎ যাহাদের হরিয়ানার বি[illegible] 'বুল'দের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সৈনিক হইতে হইলে বিদ্যা, বুদ্ধি, এবং লেখাপড়ায় কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই।, কাপ্তান—মেজর, কর্ণেল এবং অন্যান্য সেনাপতিদের আদেশ বুঝা এবং নির্বিবাদে তাহা পালন করিতে পারিবে, পারিতেছে কেবলমাত্র তাহারাই সৈন্যদলভুক্ত হইবার উপযুক্ত এবং যোগ্য। কিন্তু বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট এবং বেঙ্গল লাইট হর্স গঠন করিতে ইংরেজ সরকারও আপত্তি করে নাই। উপরিউক্ত দুইটি মিলিটারি সংস্থা কেবলমাত্র বাঙালী দ্বারাই গঠিত হয় এবং আমরাও ঐ বাহিনীভুক্ত হই। বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় করুণাময় মহাশয় ব্যক্তিরা অনেক ভাবিয়া এবং প্রচণ্ড গবেষণা করিয়া অতি মূল্যবান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট গঠন করিলে ভারতে উগ্র প্রাদেশিকতার উদ্ভব হইবে এবং ভারত সরকার ইহাতে কখনও প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কিন্তু এখানে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, তাহাই যদি হয় তাহা হইলে বিবিধ প্রদেশের নাম দিয়া যে সব বাহিনী এখনও বজায় রাখা হইতেছে, সেই 'প্রাদেশিক জাতি' নামধারী বাহিনীগুলির নাম তুলিয়া দিয়া কেন অপ্রাদেশিক এবং 'অ-জাতি' মূলক নামে—যথা এক নম্বর বাহিনী, দুই নম্বর বাহিনী, অমুক নম্বর বাহিনীর ১০নং রেজিমেণ্ট ইত্যাদি নূতন ভাবে নামকরণ হইতেছে না? বাঙালী রেজিমেণ্ট নাম দিলেই তাহা প্রাদেশিকতা দোষ-দুষ্ট হইবে এবং দেশে বিভেদ বৃদ্ধি পাইবে এবং

অন্য প্রদেশের নামধারী ভারতীয় বাহিনী বা রেজিমেন্ট-গুলি তুলসী পাতা এবং বিশুদ্ধ গঙ্গার জলে ধৌত, নারায়ণের ন্যায় প্রায় নির্বিকার। বাঙালী রেজিমেন্টের দাবি যখন উঠিয়াছে তখন আজ না হয় কাল এ-দাবি সফল হইবে এবং সেই দিনই সফল হইবে যখন দাবি কেবল সোচ্চার নহে, দাবি পূরণে যখন আমরা পরম চাপনিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রয়োজনমত চাপ দিতে পারিব। বর্তমান ভারত সরকারের স্বভাবই এই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ন্যায্য দাবি তাহারা প্রেসচুলি পূরণ করিতে পারে না বা চায় না। দাবি কচলাইয়া, অথবা তিক্ততার গলার বাড় ফুলিয়া কেন্দ্র শেষ পর্যান্ত নেহাত দায়ে পড়িয়া একান্ত অন্যায় দাবিও ঢোক গিলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতের বর্তমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর—বিমান, নৌ এবং স্থল বাহিনীতে বহু বাঙ্গালী অসাধারণ শৌর্যবীর্য্য এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেকটি বাহিনীর প্রধান পদে কয়েকজন বাঙ্গালী যশ, মান এবং খ্যাতি অর্জন করেন, যেমন সুব্রত মুখার্জ্জি (বিমান), অ্যাডমিরাল চক্রবর্তী এবং চ্যাটার্জ্জি (নৌ), জেনারেল চৌধুরী (স্থল)। কাজেই সামরিক বাহিনীতে বাঙ্গালী কাহারো অপেক্ষা কম এ-কথা বলা চলিবে না এবং এ-কথা কর্ত্তব্যে কঠোর এবং দেশের কল্যাণে অর্পিত প্রাণ কেন্দ্রীয় সরকার জানে। কিন্তু কথায় বলে দুরাত্মার ছলের অভাব নেই।

বিগতকালে ইংরেজ সরকারও বাঙ্গালীদের সেনা-বাহিনীতে ভর্ত্তি করিবার বিষয়ে কেবল উদাসীন ছিল না, কৃতসঙ্কল্প ছিল। ইংরেজদের মতে বাঙ্গালী জাতি হিসাবে দুর্বল এবং তাহারা সৈনিক জীবনের ধকল সহিতে পারিবে না। এ-কথা অবশ্য সত্য যে কয়েকজন বাঙ্গালী বিলাতের স্যাণ্ডহার্ষ্ট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর উচ্চপদ লাভ করেন, বিশেষ করিয়া বিমান বাহিনীতে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এক কোটিতে দুইজনও হইবে কি? আজ হাওয়ার পরিবর্তন সর্ব্ববিষয়ে হইতেছে, বর্ত্তমানকালে যুদ্ধের রীতি এবং টেক্‌নিক্ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন হরিয়ানা ষাঁড়ের কিংবা রয়েল বেঙ্গল ব্যাঘ্রের মত বলবান লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় প্রয়োজনহীন। মোটামুটি সুস্থনীরোগ দেহ এবং কিছু শিক্ষার প্রয়োজন সৈনিক মাত্রেরই এবং এই রকম যোগ্য বাঙ্গালী যুবক দশ-পনেরো লক্ষ অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীকে-হীন-চোখে-দেখেন কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের দৃষ্টিতে ইহা হয়ত সহজে না পড়িতেও পারে। প্রয়োজন বোধে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে বেকারী সংখ্যা অসীম, এবং সেনা-বাহিনীতে বাঙ্গালীর স্থান হইলে কয়েক লক্ষ না হইলেও অন্ততঃ এক-দুই লক্ষ বেকার অথচ যোগ্য বাঙ্গালীর স্থান সৃষ্টি করা সহজ সম্ভব। এই ব্যবস্থা করিলে সঙ্গে সঙ্গে এ-রাজ্যের নানা উৎপাত ও বহু পরিমাণে প্রশমিত করা সম্ভব হইবে। কাজ চায়, কাজ পায় না, বেকার বসিয়া মানুষ ধৈর্য্যচ্যুত হয় এবং ক্রমে ক্রমে ভদ্রশিক্ষিত বেকার যুবকেরাও নানা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হইয়া পড়ে, এবং একবার এইদিকে পা ফস্‌কাইয়া শেষ পর্য্যন্ত কোথায় তাহারা তলাইয়া যাইবে কেহই বলিতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গে এই অবস্থার সূচনা দেখা যায়, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবকের কর্ম্মসংস্থান হইল এ-আর-পিতে, কলিকাতা সহ অন্যান্য অঞ্চলে অসামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মের প্রভূত উন্নতি দেখা গেল। বাজে বিষয় লইয়া বাজে সোশ্যালিষ্টিক্ প্যাটার্ন অব্ সোসাইটির বিষয় অবান্তর এবং অবাস্তব বুকনী না ছাড়িয়া সরকার (কেন্দ্র এবং রাজ্য) যদি বাস্তবের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেয় এবং রোগের প্রতিকারের চেষ্টা করে, তাহা হইলে হয়ত দেশের অবস্থার উন্নতি হইবে। সৈন্যবাহিনীতে বাঙ্গালীর নিয়োগ রাজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান বেকারীর কিছুটা সমাধান অবশ্যই করিবে। পরীক্ষা করিতে দোষ কি?

আটপার্টি তথা জ্যোতিবসুর গণআজ্ঞা

সি পি এমের এক 'গণ' সমাবেশে, মাতব্বর প্রতীক্ষায় ভীম এবং ন্যায় ধর্মাচরণে মহাভারত খ্যাত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দাদা শ্রীজ্যোতি বসু ঘোষণা তথা আদেশ জারি করিয়াছেন যে বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটায় যাহারা, তাহাদের আঁবলম্বে সি পি এমের—তথা এ-রাজ্যের জনগণের নিকট কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া কৃত অপরাধের জবাবদিহী করিতে হইবে। সি পি এমের দাবি (প্রমাণ সাপেক্ষ না হইলেও)—এই দেশ তথা জাতিদ্রোহী এবং পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান অনাচার, অত্যাচার ব্যাপক নরহত্যা এবং অন্যান্য সর্ববিধ অসামাজিক ধ্বংসাত্মক নষ্টামীর স্রষ্টা এবং অনুষ্ঠাতা দলই নাকি পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি এবং এ-রাজ্যের শতকরা শতজনই সি পি এমের সঙ্গে আছে এবং এই জনগণই স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের হতাহত করিবার পুণ্য প্রয়াসে, দেওয়ালী পোকার ন্যায় মারণাীর অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতেছে পরম উল্লাসে। অন্যের কথা না বলিয়া সি পি আই নেতা সংসদ সদস্য ভূপেশ গুপ্তের কথা বলিব—পরম পণ্ডিত এবং কম্যু-বিজ্ঞানী এই বিখ্যাত গুপ্তসাহেব প্রকাশ্যেই বলিয়াছেন যে সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে নর হত্যার রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে—এই পার্টির রেকর্ডের বহু পশ্চাতে পড়িয়াছে নক্সালপন্থীরা। জ্যোতি বসু তথা অন্য কোন সি পি এম নেতা ভূপেশ গুপ্তের এই অভিযোগের কোন প্রতিবাদ আজ পর্যন্ত (৩-১-৭১) করেন নাই। এই মৌনতার অর্থ কি ধরিব? সি, পি, এমের প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই, না, ভূপেশ গুপ্ত মহাশয় সি পি এম অনুষ্ঠিত হতাহতের সংখ্যা কম করিয়া দেখানোতে সি পি এম ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

একথা আজ রাজ্যের যে সকল অধিবাসী সংবাদপত্র পাঠ করেন কিংবা প্রাত্যহিক পার্টি সংঘর্ষের সংবাদ রাখেন যে পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম (এবং ইহার ভটিকয়েক তাঁবেদার তথা পুটি পার্টি) অন্যান্য প্রায় সব কয়টির সহিত প্রত্যহ সংঘর্ষে লিপ্ত রহিয়াছে অস্ত্র বলিতে তাহাদের হাতে বোমা, বন্দুক, ছোরা শাবল এবং ক্ষেত্র বিশেষে বল্লম ও তীরধনুক। যুদ্ধ হইতেছে পার্টিতে পার্টিতে কিন্তু মরিতেছে শতকরা ৮০ জন সি পি এম বর্ণিত অসহায় জনগণ যাহারা নাকি সি পি এম সমর্থক এবং এই পার্টির আদর্শে উদ্বোধি 'সংগ্রামী' মানুষ, আর মরিতেছে—তথাকথিত 'অত্যাচারী' ঘৃণিত পুলিসের লোক। আর সি পি এম কথিত ঘৃণিত জন-নিপীড়নকারী পুলিসের প্রোটেক্‌শন্ লইতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেছেন না প্রমোদ জ্যোতি এবং হয়ত আরো কয়েকজন এই গোষ্ঠীর নেতা সি পি এম নেতাদের আশঙ্কা এই যে তাঁহাদের অনুগামী জনগণই আজ তাঁহাদের 'তরল' করিতে বদ্ধপরিকর। একি প্রকৃতির বিচিত্র পরিহাস। 'যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।'

মেরুদণ্ডহীন সি পি আই

ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই কি সুরে গান গাহিবে, সেই সুর বাজাইবে একতারা না দোতারায় তাহা স্থির করিয়া দিবে ক্রেমলীন হইতে মনিব সোভিয়েট জমিদারীর বড় শরিকের বড় কর্তারা। এ-কথা আজ সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছে—কেহ কোন প্রতিবাদ করেনাই—প্রতিবাদ করিবার মুখও কাহারো নাই। ভারতীয় সি পি আই স্বভাব চীনের তাহাদের বড় শরিকের বৈমাত্র ভ্রাতার মতন হইলেও, কপালগুণে রাসভ চর্মাবৃত হইয়া বাহিরের ভেক বদলাইতে বাধ্য হইয়াছে বিদেশী মানবদের নির্দেশ ক্রমে এবং যাহার ফলে সি পি আই হঠাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশুতে পরিণত হইয়াছে, এখন এই পার্টির বিশেষ ভরসার, আশার স্থল কেন্দ্রকর্ত্রী করুণাময়ী ইন্‌স্ট্যান্ট সোস্যালিজমের জন্মদাত্রী এবং প্রবর্তক-জাতির জননী ঠাকুরানী ইন্দিরা, যাঁহার জনক ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাচের নূতন সমাজ গঠনে মনোনিবেশ করেন, বাক্যে বচনে,

বাস্তবে নহে। পুণ্যশ্লোক পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কন্যা আজ কৃতসংকল্প।

সি পি এম, নক্সালীদের হয়ত বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু আদর্শ তথা পথ ভ্রষ্ট, মনে মনে ব্যাঘ্র সিংহ মারিবার দুর্দ্দম অভিলাষ কিন্তু এই সাধপূরণে সাধ্যহীন সি পি আইকে দেখিলে হাসি পায়, কষ্টও হয়। একদা যাহারা সারা ভারতে কমিউনিজ্‌ম তথা শ্রেণী হীন না-আম-না-আমড়া সমাজ স্থাপনে অভিলাষী ছিল, আজ সেই তাহাদেরই নিজেদের আয়ু এবং হাসিম বজায় রাখিবার জন্য সদা সতর্ক সন্ত্রাসের মধ্যে বাস করিতে হইতেছে এবং একদা ঘৃণিত এবং বহু নিন্দাভাগী সেই কংগ্রেসের সঙ্গেই একটা বোঝাপড়া করিয়া আগামী নির্বাচনী দুস্তর-দরিয়া ভাঙ্গানৌকায় অতিক্রম করিবার বিষম প্রয়াস করিতে হইতেছে। হায়! মার্ক্স! হায়! লেনীন! হায়! ষ্টালীন এবং হায় হায়!! মহান মাওৎ সে তুঙ্গ!!! তোমাদের আদর্শ এবং জগতে নূতন এক যুগের আমদানী করিবার দায়িত্ব কাহাদের উত্তরাধিকারী রাখিয়া গেলে? তোমাদের ইউটোপিয়া কি টমাসমোরের পুস্তকেই আবদ্ধ রহিল এবং থাকিবে অনন্তকাল?

ভারতীয় কমিউনিষ্ট তিনটি পার্টিকে আমরা কখনই নীতিভ্রষ্ট—এ-কথা বলিব না, কারণ নীতি (সুনীতি মনে করিতেছি) কোন প্রকার নীতি এবং মানবের কল্যাণকর নীতি এবং সেই নীতি সমর্থিত আদর্শের বালাই যাহাদের নাই—কোনদিন ছিল না, তাহারা কখনও নীতিভ্রষ্ট হইতে পারে না, আদর্শের কোন কথা এখানে উঠে না, উঠিতে পারে না।

তবুও সর্বকিছু সত্বেও এ-কথা স্বীকার করিব যে পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে যে কোন ব্যক্তি এবং পার্টির নিজ নিজ মত পোষণ এবং প্রচার করিবার স্বাধীনতা আছে কিন্তু আপনার মত ও পথ অন্যের ঘাড়ে জোর করিয়া চাপাইবার অধিকার নাই। আমার মতে এবং পথে যে না আসিবে তাহাকে হত্যা বা আহত করিবার অধিকার যদি এই সঙ্গে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও এই অধিকার দিতে হয়। এ-কথা বিশেষ ভাবে নক্সালীদের সম্পর্কে বলা যায়। এই নূতন কমিউনিষ্ট পার্টির তাহাদের রাজনৈতিক এবং সমাজ-শিক্ষা সংস্কার নীতি গ্রহণ এবং তাহা সাধারণে প্রচার করিবার পূর্ণ অধিকার আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এই প্রচারের মধ্যে ভিন্ন মত ও পথাবলম্বীদের ঠেঙ্গাইয়া, ঘায়েল করিয়া এবং দেশব্যাপী একটা সন্ত্রাস রাজের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মতে এবং পথে অন্যকে চলিতে বাধ্য করার কোন প্রশ্নই থাকিতে পারে না। 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই' এবং এই লড়াইয়ের বিপরীত পক্ষও অবশ্য তাহাদের কঠিন সংগ্রাম চালাইতে বাধ্য হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদেরই হইবে জয়।

দেশের যাহারা আমাদের অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের পথে এবং তথাকথিত আদর্শে না চলিবে—তাহাদেরই থাকিতে হইবে প্রতিক্রিয়াশীল। এ-মোক্ষম যুক্তির পাল্টা জবাবে প্রতিক্রিয়াশীল বলিতে পারে, কম্যু এবং সমধর্মা এবং মর্মী দলগুলি প্রতিক্রিয়াশীল?—যাহাদের মানসিক ধৈর্য্য এবং সাম্যবোধের উপর কোন সুস্থমনা এবং শ্রেয়ের পূজারী স্বাভাবিক মানুষ বিন্দুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না।

সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে এই মাত্র বলা যায় যে বর্ত্তমানে এইদল সুভাষ নীতি আদর্শ বর্জ্জিত—অন্যান্য পার্টির মতই নীতি হীন এবং নির্ব্বাচনে কয়েকটা আসন লাভের লোভে সর্ব্বপ্রকার বোঝাপড়া করিতে অতি আগ্রহী এবং সদা প্রস্তুত।

নির্ব্বাচনী চড়কের ঢাক বাজিয়াছে

এ-বার পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ প্রস্তুত থাকুন, এ-রাজ্যের কটিদষ্ট ১৮ কিংবা তাহারও বেশী দলগুলি আমাদের সাধারণ মানুষের কুটীরের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিতে আরম্ভ করিবে এবং আবার নূতন করিয়া প্রতি-শ্রুতি দিবে যে নির্ব্বাচনের দুস্তর ঘোলাজল পার হইয়া পার্টি নেতারা যার একবার পার্লামেন্ট বিধান সভার

আসন লাভ করিতে পারিলে তাঁহারা আমাদের সাধারণ মানুষের সকল অভাব অভিযোগ দুঃখ কষ্টের অবসান অবশ্যই ঘটাইবেন। প্রত্যেক পার্টি'ই ঘোষণা করিবে তাহারাই প্রকৃত গণতান্ত্রিক এবং যে বা যাহারা অন্যমত বা পথের, তাহারাই জোতদার, ব্যবসায়ী তথা "ভেস্টেড ইন্টারেস্ট" শ্রেণীর স্বার্থরক্ষী তথা তল্পীবাহক।

কিছুকাল হইতে জানা যাইতেছে জাতীয় কংগ্রেসের মত গণতন্ত্রের দুইটি রূপ হইয়াছে—একটি বামপন্থীদের আদর্শে—বামগণতন্ত্রী, দ্বিতীয়টি 'ডান' ঘেঁষা গণতন্ত্র। কিন্তু বামপন্থীরা বলিতেছে তাহাদের গণতন্ত্র খাঁটি ২৪ ক্যারেট সোনা, আর অন্যটি অর্থাৎ ডান-ঘেঁষা গণতন্ত্র মেকি। কিন্তু আমাদের পক্ষে ঠিক বুঝা অসম্ভব—কোন পার্টি'র গণতন্ত্র আসল এবং সর্বজন গ্রহণযোগ্য। কারণ কোন গণতন্ত্র পার্টিই প্রকাশ করিয়া বলিতেছে না তাহারা দেশকে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিয়া সেই সঙ্গে দেশের মানুষের কল্যাণব্রতী হইবে কি না। সকলেই জনগণের কথাই বলিতেছে—দেশকে বাদ দিয়া আবার কয়েকটি দলের একমাত্র এবং প্রধান উদ্দেশ্য কংগ্রেসকে ধ্বংস করা, অর্থাৎ কংগ্রেস যদি দেশের এবং সেই সঙ্গে দেশের সকল মানুষের কল্যাণ করিতে আগ্রহী হয়, সাধারণের মানুষের সকল প্রকার পার্থিব দুঃখ কষ্ট দূর করিতে চায় তাহা হইলেও কংগ্রেসকে এই কয়েকটি পার্টি ক্ষমা করিবে না, ১৯৬৭র মত ইহাদের একমাত্র বুলি হইল কংগ্রেসকে তাড়াও, কংগ্রেসের নাম দেশের রাজনৈতিক পট হইতে চিরতরে মুছিয়া দাও।

সি পি এম, এস ইউ সি এবং এস এস পি এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা মুখর। ইহারা এমন ভাবে এমন সকল কথা বলিতেছে, কংগ্রেসকে হুমকী দিতেছে যাহাতে মনে হইবে যেন ইহারা সারা ভারতের রাজনীতিতে অতি শক্তিশালী, যে কোন রাজ্যে ইহারা একক ভাবে প্রশাসন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভুত্ব করিতে পারে। অথচ ইহাদের জোট বাঁধা ছাড়া উপায় নাই। এমন অবস্থায় [illegible] তাহাদের মুখে বাঘের বোয়ালের বুলি শোভা [illegible]?

কিন্তু নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের প্রকৃত চিত্র কি?

এ বিষয় আনন্দবাজার পত্রিকা যাহা বলিতেছেন, তাহার বেশী বলার নেই।

শোক, পাপ, প্রায়শ্চিত্ত

নির্লজ্জ এবং নিতান্তই আনুষ্ঠানিক যেটুকু কর্তব্য, তাহাই আজ সম্পাদন করিতে বসিয়াছি: নিহত উপাচার্য শ্রী গোপালচন্দ্র সেনের জন্য শোক প্রকাশ। ভাবিতেছি, কোন্ বিশেষণে তাঁহাকে বিভূষিত করিব। শহীদ অথবা গালভরা এবং শুনিতে জমকালো অন্য কিছু? জনচিত্তে প্রতিক্রিয়ারই বা উপযুক্ত ভাষা কী? তাহাকে কি বলিব "নিন্দার্হ," না কি অন্য কোনও আখ্যা দিব? তাহার বেশী কিছু নয়। বাছাই-করা গোটাকয়েক শব্দ পাইলেই আমাদের ন্যূনতম সাংবাদিক কর্তব্য ফুরাইবে।

বাকী যাঁহারা, তাঁহাদেরও করণীয় খুব বেশী কিছু নয়। দলে দলে শান্তিপ্রিয় ধর্মভীরু নাগরিক শবযাত্রায় যোগ দিলেই যথেষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিবেন। মালাচালার যেন ঘাটতি না হয়, এবং অপিচ অন্যের একটিও পরিপাদন প্রকাশিত বিবরণ হইতে যেন বাদ না যায়। তাহার অধিক কিছু না। নিন্দাবাদের ভাষা একটু মিঠেকড়া হইবে মাত্র—কেননা, হত্যার সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, সরকারী সন্ত্রাস, এই সব তো জোড়া দেওয়া চলিবে না।

স্থানবোধ কিংবা চিত্তের নিপীড়ন হইতে পদত্যাগ করিবেন না একজনও, না কোনও শিক্ষাব্রতী, না কোনও জননেতা। আত্মহত্যা তো দূরের কথা। বিবেক ডাকিলে, ব্যর্থতাবোধ হইতে এবং সব-কিছু অসহ্য হইয়া গেলে, বিদেশে আত্মহত্যা ঘটে, তাহা এ দেশে বিরল। এই অদ্ভুত "[illegible]" সমাজ সব সহে। যে [illegible] সাঁচিয়াছে [illegible] নাম [illegible]। প্রতিশ্রুতি পরে প্রাণ [illegible] সে তো পরের

প্রাণ। প্রত্যেকেই আমরা পৈতৃক প্রাণটুকু বাঁচাইতে ব্যস্ত আছি। প্রাণের বিনিময়ে সাহস আর সততা, আত্মা আর বিবেককে বিকাইয়া দিয়াছি। আত্মা থাকিলেই তবে তাহাকে হত্যা করার কথা ওঠে। প্রাণ বাঁচে তো ভালো। কিন্তু বাঁচিবে তো? সব গোবরই ক্রমে ঘুঁটে হইয়া যাইবে—এবং অবশেষে পুড়িবে। সেই সর্বগ্রাসী সর্বনাশী শ্মশানে সকলের জন্য চিতাশয্যাও মিলিবে না। রাষ্ট্রযন্ত্রকে দোষ দেওয়া বৃথা। তাহার যতটুকু সাধ্য সে করিয়াছে। সংঘবদ্ধ এবং প্রকাশ্য হানাদারিজ ঠেকাইয়াছি। লুক্কায়িত পলাতক গুণ্ডারা এখন অতর্কিতে অন্ধকারের চোরা-গোপ্তা আক্রমণ আর হননের রাস্তা বাছিয়া লইয়াছে। ইহার শিকার সকলেই, আমরা বৃথাই এক-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বলিদান লইয়া মাথা ঘামাই, কারণ খুঁজি। কারণ নাই। বিশেষ বলিয়াও কিছু না। সব লক্ষ্যই আজ একাকার নির্বিশেষ। শিক্ষা, শিল্প—জীবনের সব ক্ষেত্র হইতে প্রাণের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে।

ইহার মধ্যে একান্ত বিমূঢ়তা এবং চূড়ান্ত লজ্জাহীনতা ভোটাভুটির মধ্যে বাঁচিবার রসদ মিলিবে বলিয়া চিৎকার করিতেছে। ইহারই মধ্যে চলিয়াছে গাঁটছড়ার খেলা—রাজনৈতিক জোটবাঁধাবাঁধি। ভোটের মারফৎ কোন স্বর্গ আসিবে জানি না। কিন্তু ভোটই যদি ভণ্ডুল হইয়া যায়, তবে ঢাকে যত কাঠিই পড়ুক, সব হিসাবই তো ভণ্ডুল? যদি নির্বাচনের আগে হুঁশিয়ারি দেওয়াল-লিপি পড়ে, তবে গণতন্ত্রপ্রিয় কিন্তু সাবধানী পথিকদের কয়জন ভোটকেন্দ্রের পথে পা বাড়াইবেন? ব্যালটবাক্সের বহ্ন্যুৎসব ঘটিবে কি ঘটিবে না, সে-সব তো পরের কথা।

যাহাকে চূড়ান্ত নির্লজ্জতা বলিয়াছি, তবু তাহার চেঁচামেচি বা মাতামাতি থামিবে না। কেননা নির্বাচন না হইলে দল যায়। যাদবপুরের ঘটনার পরও মুখর রসনাগুলি মওকা পাইলেই লকলক করিয়া উঠিবে। কারণ, আমাদের বাক্‌স্বাধীনতা আছে। কারণ, দেশটা তো পোল্যাণ্ড বা চেকোশ্লোভাকিয়া নহে। এখানে সরকারী সন্ত্রাসের কথা অবাধ, অকুণ্ঠ, অনর্গল কণ্ঠে উচ্চারণ করা যায় প্রশাসককুল অপছন্দ হইলে নিছক ভোটেই তাহাকে দেওয়া যায় বিদায়। অন্তত সেদিন অবাধ দেওয়া গিয়াছে। আর দেওয়া যাইবে কি না বলা শক্ত—যেহেতু একাধিক দলের প্রাণভয়। যে-ব্যবস্থা বরদাস্ত করে না, সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাসীরাও এদেশে যেমন বাক্‌স্বাধীনতার, তেমনই দলবাহুল্যের পুরাপুরি সুবিধা উশুল করিয়া লইয়াছে। বাকীটা পুষাইয়া লইতে চায় যে যেখানে পারে, বাহুবলে।

কিন্তু অস্তিত্ব যেখানে বিপন্ন সেখানে রাজনীতির কথা থাক। দায়িত্ব তো একা রাজনৈতিক কুলের নয়। দায়িত্ব সমগ্র সমাজের—পাপ আমাদের প্রত্যেকের। পাপ ভীরুতায় আর সাঙ্ঘুতায়। পাপ প্রশ্রয়ে আর সম্মতিতে। প্রতিদিন সস্তা বুলির উচ্চারণে আর আচরিত মিথ্যাতে। এই পাপ নিরাপদ বুঝিয়া ছোট অন্যায়ের নিন্দা করিয়া বড়োর ব্যাপারে ভয়ে চুপ করিয়া রহিয়াছে, ভরসা আর প্রতিবাদ দুই-ই সরকারের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিয়াছে। আজ অবস্থা সেই পর্যায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছে, যখন সেই ভরসা আর নিন্দাবাক্য উচ্চারণে কুলাইবে না। যিনি সামান্য দোকানী এবং কেরানি তাঁহাকে নিজের বাঁচার রাস্তা নিজেকেই করিতে হইবে। যে-শিক্ষক মাস গেলে মাহিনা চান এবং চান পড়াইতে; যে ছাত্রগণ সত্যই পড়িতে চান, শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার দায় তাঁহাদেরই লইতে হইবে। "চলবে না চলবে না" বলিয়া রাজপথ পরিক্রমা করিলে আর চলিবে না কেননা রাষ্ট্রযন্ত্র একটা সীমার পর নিরুপায়, অপিচ বধির—কিছুই শুনিবে না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যাহা সত্য, তাহা সত্য সর্বক্ষেত্রে—শিল্পে, ব্যবসায়ে, পরিবহণে। নতুবা একে একে

সবই বন্ধ হইয়া যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে জুটিবে না উপাচার্য, মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ, কেননা পুলিসকেই সব-কিছুর নাটের গুরু বলিয়া চালানোর চালাকি আর চামড়া বাঁচাইতে পারিতেছে না। ওই নীতি যে ভ্রান্ত, সেই সত্য উচ্চারণ করার সময় আসিয়াছে। "ভুল করিয়াছি" এই স্বীকৃতিই হইবে প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

এখনও তাহার লক্ষণ নাই। এখনও "শিবতীর্থ" কবিতায় যেমন আছে, অধিনেতাদের দিকে আঙুল দেখাইয়া কেহ বলি নাই "আমাদের প্রবঞ্চিত করিয়াছ।" করি নাই যখন, তখন নিহত উপাচার্যের জন্য হা-হুতাশ, শোক প্রকাশের অধিকারও আমাদের নাই। মামুলী ভাষায় অতএব তাহারা আত্মার জন্য শান্তি কামনা করি না। বরং আত্মা বলিয়া কিছু যদি থাকে তবে সেই অশান্ত আত্মা অভিশাপ দিক—আমাদের সকলকে, আমাদের নিজেকে ঠকানো এবং তোলান ভীরুতাকে।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও বাঙলা ও বাঙালীর কোন চেতনা হইবে কি? বানের জলের মত শোকের প্রবল প্রবাহ অল্পকাল মধ্যেই শেষ হইবে এবং আমরা আবার অন্য কোন মহত এবং প্রকৃত দেশব্রতী ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তির আততায়ীর হস্তে নিহত হইবার অবকাশের জন্য অপেক্ষা করিব—এবং সেই সঙ্গে দেশময় আবার প্রবল শোকপ্রবাহ সেই একই বাঁধা গতে বহাইব—এ-যেন একটা রুটিন গত নিষ্ঠুর পরিহাস আমাদের গ্রাস করিতে বসিয়াছে। ইহা অপেক্ষা রাশিয়ার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালে জার্মান বিজয়ী সৈন্যবাহিনীকে প্রতিহত করিতে 'পোড়া-মাটি' নীতি শ্রেয়। বাঙলাদেশকে পোড়া মাটিতে পরিণত করিতে পারিলে, সেই পোড়া মাটিতে হয়ত বিধাতার আশীর্ব্বাদে নূতন মনুষ্য ফসল জন্মালেও জন্মাতে পারে।

গান্ধীজী ও নেতাজী

ভবেশচন্দ্র মাইতি
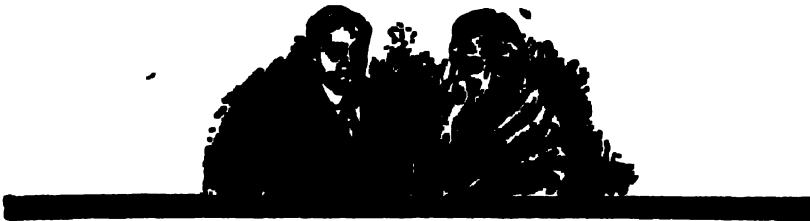
১৯৬৯ সালের ২রা অক্টোবর ভারতে এবং পৃথিবীর সর্বত্র গান্ধীজীর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন সুরু হয়েছে। ইউনেস্কোর কাছে আবেদন জানান হয়েছিল যাতে ১৯৬৮-৬৯ সালটি পৃথিবীর সকল দেশ গান্ধীশতাব্দী বৎসররূপে উদযাপন করে। কয়েকটি দেশে গান্ধীজীর স্মারক ডাক টিকিট ছাপা হয়েছে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে একজন বিদেশীর স্মারক ডাকটিকিট সর্বপ্রথম ছাপা হইল।

এই অনুষ্ঠান সুরু হয়েছে ১৯৬৯ সালের ২রা অক্টোবর মনে হয় গান্ধীজীর আত্মদানের দ্বাবিংশতম বার্ষিক দিবসে (১৯৭০) ৩০শে জানুয়ারী অতিক্রম করে কস্তুরাবা ২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী (১৯৭০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী) দিবসে গিয়ে তার পরিসমাপ্তি হয়েছে।

গান্ধীজী ও নেতাজী সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য নিতান্ত ভীতচিত্তে দুর্বল লেখনী হতে অগ্রসর হইতেছি। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে দুই সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষ, তাই বলে অন্যান্য নেতাদের অবদানের কথা লঘু করা হচ্ছে না। সমস্ত শহীদদের সম্মিলিত চেষ্টার জন্য স্বপ্ন সফল হয়েছে। গান্ধীজী (বাপুজী) সুভাষকে স্নেহ করিতেন। গান্ধীজীও তাঁর শ্রদ্ধেয়। দুজনের মতান্তর হওয়াকে বিধাতার আশীর্বাদ বলা যায়। কারণ এই মতভেদের দরুণ আমরা রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র থেকে নেতাজী সুভাষের আবির্ভাব দেখতে পাই। এ-কথা আজ ঐতিহাসিক সত্য যে নেতাজীর আজাদহিন্দ ফৌজের চূড়ান্ত আঘাতের সম্মুখীন হয়েই ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল, তাদের বিদায়ের দিন আসন্ন।

সুভাষচন্দ্র তাহার মুক্তি সংগ্রাম গ্রন্থে গান্ধীজী সম্বন্ধে লিখেছেন "......সকলেই ভাল করে অবগত আছেন যে শ্রীযুক্ত গান্ধী তাহার প্রথম জীবনে যীশুখৃষ্টের উপদেশ ও টলিস্টয়ের চিন্তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অতএব তাহার চিন্তাসমূহ যে একেবারে মৌলিক কিংবা তাহার কর্মসাধনা অভিনব তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহার যথার্থ গুণ ছিল দ্বিবিধ, খৃষ্টের উপদেশ তার টলস্টয়ের ও থোরোর ভাবধারা তিনি বাস্তব কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা সম্ভব। প্রথমতঃ স্থানীয় অভাব অভিযোগ প্রতিকারের জন্য নহে, বরং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই তিনি অসহযোগকে লাগাইয়াছিলেন এবং তদ্বারা যে কোন বিদেশী গভর্ণমেন্টের অসামরিক শাসন ব্যবস্থাকে অচল করিয়া দিয়া নতি স্বীকার করানো সম্ভব, ইহা প্রায় প্রমাণ করিয়াছেন।......

......"ইহা অনস্বীকার্য যে তাহাকে ঘিরিয়া স্বর্গীয়তুল্য একটা জ্যোতির্মণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছিল। যে দেশে লোকে ধনকুবের বা শাসক অপেক্ষা সাধুকেই অধিক ভক্তি করিয়া থাকে সে দেশে ইহার মূল্য ছিল তাহার কাছে অপরিমেয়।......

"অধিকন্তু, জনগণ তাহাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মহাত্মা (যাহার প্রকৃত অর্থ মহৎ হৃদয় ব্যক্তি বা সাধু) আখ্যায়

অভিহিত করেন। তাহাকে দিবার মত ইহাই ছিল ভারতবাসীর সর্ব্বোচ্চ সম্মান।...

The 75th anniversary of Mahatma Gandhiji's birthday was celebrated at Rangoon by the Azad Hind Fauz on Oct 2, 1943. Subhas Bose delivered speech on the auspicious occasion.

"His name will be written in letters of gold" said Bose (about Gandhi) Mahatma Gandhi has firmly planted our feet on the straight road to liberty. He and other leaders are now rotting behind prison bars. The task that Mahatma Gandhi began has therefore to be accomplished by his countrymen at home and abroad.

"I would like to remind you that when Mahatma Gandhi commended his non-co-operation programme to the Indian Nation at the annual session of the Congress at Nagpur in December 1920, he said "If India had the sword to-day, she would have drawn the sword." And proceeding further Mahatmaji said that since armed revolution was out of the question, the only alternative before the country was that of non-co-operation or Satyagraha. Since then times have changed and it is now possible for Indian people to draw the sword. We are happy and proud that India's Army of liberation has already come into existence, and is steadily increasing in members.

Subhas Bose addressed the following message to Mahatma Gandhi from Azad Hind Radio on July 6, 1944. "For Indians outside India" he said "you are the creator of present awakening of the country."

"Father of the Nation : In this holy war for India's liberation, we ask for your blessings and goodwishes.

(Important speeches and writings of Subhas Bose—Jagat S Bright).

নেতাজী সম্বন্ধে গান্ধীজী কি বললেন দেখা যাক—

"The greatest lesson that we can draw from Netaji's life is the way in which he infused the spirit of unity amongst his men so that they could rise above all religious and provincial barriers and shed together their blood for the common cause. His unique achievement would surely immortalise him in the pages of history. Every one of Netaji's followers who saw me on their return to India had said to me without exception that Netaji's influence acted like a charm on them and they had acted under him with the single aim of achieving Indian freedom. The question of religious and provincial or any such difference had never cropped in their minds at all."

[Netaji Commemoration Volume
—S. Agarwal].

আমাকে "কিন্তু এই মাত্র সুভাষবাবুর জন্মতিথির কথা বলা হইয়াছে। এই কথা মনে করাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আমি খুশী হইয়াছি, তাহার কারণ তিনি হিংসার পন্থায় বিশ্বাসী, আর আমি অহিংসায় বিশ্বাসী হইলেও, দেশপ্রেমিক সুভাষবাবুর জন্মতিথির উল্লেখ করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে এই কথাটি বিশেষ স্মরণযোগ্য যে, প্রাদেশিকতার ও সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধও তাঁহাতে ছিল না। তাঁহার নির্ভীক সেনাবাহিনীতে বৈষম্যের স্থান ছিল না। ভারতের সকল স্থানের নরনারীর দ্বারা সেই বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। আর তাহাদের কাছ হইতে তিনি যেমন ভালবাসা ও আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন, তেমন ভালবাসা ও আনুগত্য লাভ অতি অল্পের ভাগ্যেই ঘটে। কোন উকিল বন্ধু আমার কাছে হিন্দুধর্ম্মের একটি উত্তম সংজ্ঞা চাইয়াছেন। আমি সনাতনী হিন্দু বটে, কিন্তু তাহা হইলেও হিন্দুধর্ম্মের যে কি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে তাহা বলিতে অক্ষম। আমি অনুসন্ধিৎসুকে লিখিয়াছি যে অনেক দিন হইল আমি আইন ভুলিয়া গিয়াছি। এ-কথাও বলিয়াছি যে ধর্ম-

বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। কিন্তু সাধারণ লোক হিসাবে বলিতে পারি যে, হিন্দুধর্ম সকল ধর্মের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখে। আমি মনে করি সুভাষবাবু এইরূপ হিন্দু ছিলেন। এই মহান দেশপ্রেমিকের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের মন হইতে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূর করিতে হইবে।"

হরিজন পত্রিকা ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

সত্য ও অহিংসার পূজারী গান্ধীজী শ্রীরামকৃষ্ণের মত ভগবানকে দেখেন নি, জীবন স্মৃতিতে তিনি লিখেছেন "সত্যের জ্যোতির কিছুটা আভাষমাত্র চকিতের জন্য কখনো কখনো আমি পেয়েছি, সেই আভাষে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে আমি কেমন করে বর্ণনা দেবো সত্যের সেই অনির্বচনীয় জ্যোতির? লক্ষ লক্ষ সূর্য্যের দীপ্তি ম্লান হয়ে যায় সেই দীপ্তির কাছে। (যুগান্তর ২রা অক্টোবর ১৯৬৬)

সুভাষচন্দ্রেরও ছাত্রজীবনে গুরুসন্ধানে একবার গৃহত্যাগ করে কিছুদিনের জন্য হিমালয়ের পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী অধ্যায়ন করে প্রভাবান্বিত হন, বিবেকানন্দের অভয়মন্ত্রের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী সুভাষচন্দ্র ১৯৪১ সালে কলিকাতার গৃহ হইতে অন্তর্ধান করিবার প্রাকালে মহাশক্তির পূজা করিতেন।

প্রার্থনা সম্বন্ধে গান্ধীজী বলতেন, -

Prayer is the key of the morning and bolt of the evening. Prayer is an unfailing means of cleansing the heart of passions."

(জনসেবক-১৯-১০-৪৮)

গান্ধীজী তাহার প্রিয় 'রামধুন'কে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসাবে জাতিকে দিয়াছেন। শেষ প্রার্থনা সভাতে প্রবেশ করিবার পথে গান্ধীজী আততায়ীর দ্বারা গুলিবিদ্ধ হওয়াতে, আর 'রামধুন' গীত হইতে পারে নাই কিন্তু তিনি অর্থাৎ গান্ধীজী 'হে রাম' উচ্চারণ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নেতাজী জাতিকে দিয়াছেন অমর মন্ত্র 'জয় হিন্দ'। কবিগুরুর রচিত 'জনগণমন' ভারতবর্ষে জাতীয় সঙ্গীত মনোনীত হবার বহু আগেই, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে নেতাজীর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে জনগণমনের হিন্দি ভাষায় 'শুভসুখচৈন-পরিবর্তিত আকারে গাওয়া হইত। মহাজাতিসদনের নক্সাতে জাতীয় পতাকাতে চক্রের প্রবর্তন তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন, পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় পতাকাতে চক্রের মনোনয়ন দেখা যায়।

ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ

ত্রিপুরা পত্রিকায় প্রকাশ—ভারতের ভাগ্যাকাশ থেকে আর একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চ্যুত হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৭০ সনে এ জ্যোতিষ্কের উদয় পূর্ব্বাঞ্চলের অখ্যাত কোণে নোয়াখালীর এক ক্ষুদ্র গ্রামে। কিন্তু তাঁর কর্ম্মজীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয় কুমিল্লায়। সে সময়ে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা তাঁর রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারে পরামর্শ গ্রহণ করেন মনীষী শ্রীরাধাগোবিন্দের। সেই পরামর্শে রাজ্যে শিক্ষা বিস্তার প্রভৃত কল্যাণ সাধিত হয়। পরবর্ত্তী কালে ত্রিপুরার রাজমাতা আগরতলায় এবং কলকাতায় শ্রীরাধাগোবিন্দের কাছ থেকে হরিকথা শুনবার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

১লা ডিসেম্বর রাত্র ৮টা ৪০ মিঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাঁর টালিগঞ্জস্থ বাসভবনে। অনন্য সাধারণ মেধা সম্পন্ন সুদীর্ঘ ৯৪ বৎসর কর্ম্মময় জীবনের অধিকারী ডঃ নাথের সাধনায় বঙ্গভারতীর যে সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছে তার তুলনা চলেনা। চৈতন্য চরিতামৃতের টীকা লিখনে তাঁর প্রতিভার প্রকাশ পায়। তার পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মহা গ্রন্থের জন্য ডঃ নাথকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রীরাধাগোবিন্দকে বিদ্যাবাচস্পতি ভাগবতভূষণ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সর্বপ্রথম শ্রীরাধাগোবিন্দকে D.Litt (পরবিদ্যাচার্য) উপাধিতে ভূষিত করে বৃন্দাবন বৈষ্ণব থিওলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। তৎপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে D Litt. উপাধিতে ভূষিত করে। বিগত বৎসর রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে D Litt. উপাধি দানের গৌরব অর্জন করে। বার্দ্ধক্যের জন্য এবং নিয়মিত ভাবে লিখনের অভ্যাসের জন্য তাঁর পক্ষে সভাসমিতিতে যাওয়া সম্ভবপর হত না, কিন্তু বাংলার মনীষীগণ তাঁকে বৈষ্ণব সম্মিলনীর পৌরহিত্য করবার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত হতেন।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচৈতন্য ভাগবতের টীকার জন্য বঙ্গভাষা তাঁর কাছে ঋণী। সর্বশেষে তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকা লিখতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দেহত্যাগের পূর্বদিন পর্য্যন্ত লেখনীর বিরাম ছিল না।

তাঁর দেহত্যাগে বঙ্গভারতীর এক বিশিষ্ট সাধকের জীবন নির্বাপিত হল।

ধর্ম্মতেজার বিচারের কথা

ধর্মতেজাকে যাহাতে বিদেশ হইতে ধরিয়া আনিয়া ভারতের আদালতে তাহার নামে নানা অভিযোগের, জন্য বিচার করা যায় সেই জন্য লণ্ডনের চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে যে শুনানী হয় তাহার কিছু বর্ণনা "যুগবাণী সাপ্তাহিক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল:

কৌঁসুলী। বিভিন্ন সময়ে এরকম অভিযোগ কি করা হয়েছে যে টি. এন. কাউল তাসখন্দে লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে হত্যা করেছেন?

তেজা। হাঁ। টি. এন. কাউল হলেন জেনারেল কাউলের আত্মীয়। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে শাস্ত্রী যখন তাসখন্দে মারা যান টি. এন. কাউল সে সময় রাশিয়ার ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

কৌঁসুলী। শাস্ত্রীর মৃত্যুর পিছনে জেনারাল কাউলের হাত ছিল এমন কোনো কথা কি কখনো উঠেছে?

তেজা। একথা উঠেছে যে শাস্ত্রীর মৃত্যুর পিছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র ছিল। জেনারাল কাউল ঐ ষড়যন্ত্রে একজন অংশীদার ছিলেন। ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে এইঅভিযোগ ওঠে যে টি. এন. কাউল বিষপ্রয়োগে শাস্ত্রীকে হত্যা করেছেন।

কৌঁসুলী। ভারতীয় পার্লামেন্টে ১৯৬৭ সালে কি এই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছিল?

তেজা। হাঁ। সেই সময় প্রথমবার আমার নামও ঐ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত করা হয়। কয়েকজন এম পি প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন যে জে. ডি. তেজা শাস্ত্রীর মৃত্যুর সময় তাসখন্দে উপস্থিত ছিলেন কিনা।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি ঐ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে কোনো কথা উঠেছে কি?

তেজা। হাঁ।

কৌঁসুলী। শাস্ত্রীর মৃত্যু সম্পর্কে প্রথম বিতর্ক সৃষ্টি হয় ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে। জয়ন্তী শিপিং কোম্পানীকে সরকার দখল করার বিল আনেন ১৯৬৬ সালের জুন মাসে। নয় কি?

তেজা। হাঁ।

কৌঁসুলী। তাসখন্দে প্রকৃতই কী ঘটেছিল আপনি সেকথা জানেন বলে বলা হয়ে থাকে। একথাও বলা হচ্ছে যে শাস্ত্রী হত্যার সঙ্গে আপনি জড়িত ছিলেন। নয় কি?

তেজা। আমার সম্পর্কে এরকম কথা অনেকবার উঠেছে।

অতঃপর তেজা তাহাকে ভারতে লইয়া আসিয়া বিচার সম্বন্ধে যাহা বলে তাহাও আরও বিস্ময় উদ্রেক:

কৌঁসুলী। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের কিছুদিন পর, যে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে আপনার বহিষ্কারের বিরুদ্ধে দাবী জানিয়ে মামলা আনা হয়?

তেজা। হাঁ। আমদানী পরিবহন মন্ত্রী মিঃ রাও বলেন যে এই ব্যাপারের সঙ্গে বহু ব্যক্তির রাজনৈতিক ভাগ্য জড়িত। সেজন্যই সাধারণ নির্বাচন শেষ হবার আগে মামলা আনা হয়নি।

কৌঁসুলী। আপনি ভারতে ফিরে গেলে সেখানে আপনার সুবিচার লাভের আশা কতখানি?

তেজা। কোনো আশা নাই। পার্লামেন্টে বার বার বিতর্কের মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে একটা বদ্ধমূল খারাপ ধারণা সৃষ্টি করা হইয়াছে। পার্লামেন্ট আমাকে নিন্দিত করেছে। রায় দেওয়া হয়েছে যে আমি একটি বদমাশ—

ম্যাজিস্ট্রেট। জয়ন্তী শিপিং কোম্পানীর ব্যাপারে কি আপনাকে বদমাস বলা হয়েছে?

তেজা। না, শুধু সে ব্যাপারে নয়, আরও অনেক কিছু জড়িয়ে আমাকে বদমাস বলা হয়েছে। তবে কোম্পানীর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু ভারতে আপনার বিচার করবে আদালত, সাংবাদিক বা রাজনৈতিক নেতারা নন। আপনি কি বলতে চান যে ভারতে আদালত রাজনৈতিক নেতা ও সংবাদ পত্রের প্রভাবাধীন?

তেজা। হাঁ। গত পাঁচ বছর যাবৎ এই অবস্থা চলছে। ভারতে ফিরে গেলে আমার জীবন বিপন্ন হবে। দুটি গুরুতর বিষয়ে—শাস্ত্রীর মৃত্যু ও চীন ভারত যুদ্ধের পরিচালনা আমার এত তথ্য জানা আছে যে আমাকে শেষ করে ফেলা হবে। যদি প্রকাশ্য তদন্ত হয় ও আমাকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেওয়া হয় তবে আমি যেতে প্রস্তুত আছি। বর্তমান ভারত সরকারের হাতে বন্দী রূপে গেলে আমাকে হত্যা করা হবে। আমি বার বার অনুরোধ জানিয়েছি যে প্রকাশ্য তদন্তের ব্যবস্থা হলে আমি স্বেচ্ছায় ভারতে যেতে প্রস্তুত। আমি লণ্ডনে গ্রেপ্তার হবার পরও সলিসিটরদের মাধ্যমে এ অনুরোধ আমি জানিয়েছি। ভারত সরকার তার উত্তরও দিয়েছে। কিন্তু পার্লামেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে একজন মন্ত্রী বলেছেন যে তাঁরা

আমার কাছ থেকে এরকম কোনো অনুরোধ পাননি। মিথ্যাবাদী ভারত সরকার আমার নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেবে এ বিশ্বাস আমার নেই।

কাছাড় আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কি হইবে

করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" সাপ্তাহিকে বলা হইয়াছে :

কাছাড়ের শিল্পোন্নয়নের দাবীতে আন্দোলন পরিষদ যে আন্দোলনের সূচনা করিয়াছেন, তাহা কাছাড়কে আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইবে কিনা, কোন কোন রাজনৈতিক মহলে তাহা নিয়া বিস্তর জল্পনা হইয়াছে। বিশেষতঃ স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে মেঘালয়ের স্বীকৃতি লাভের পর কাছাড়ের নেতৃস্থানীয় কোন কোন ব্যক্তি কাছাড়কে ত্রিপুরার সহিত যুক্ত করা অথবা স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করার প্রশ্ন প্রকাশ্যেই তুলিয়াছেন। অতিতের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিয়াছি যে এই ধরণের দাবী যখনই উত্থাপিত হইয়াছে, তখনি জেলার অধিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মনকষাকষি ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব এই ধরণের দাবী উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে গোটা বিষয়টা সম্পর্কে যথাযোগ্য বিবেচনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গত ২২ বৎসরকাল কাছাড় জেলা আসাম সরকারের নিকট হইতে সুবিচার পায় নাই। এই জেলার ভাষা ও সংস্কৃতির উপরও আক্রমণের প্রয়াস হইয়াছে। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অণুমাত্র সুযোগ হইতেও ইহা বঞ্চিত হইয়াছে।

কিন্তু আসাম রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই এই জেলার সমুদয় সমস্যার সমাধান সম্ভব কিনা তাহাও যুক্তি তথ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। পাশের বঙ্গভাষী ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত সংযুক্তির দাবীর যৌক্তিকতা এককালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনও মানিয়া নিয়াছিলেন, কিন্তু এই ব্যাপারে ত্রিপুরার মতামতও অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। পরিস্থিতি দৃষ্টে মনে হয় যে, ত্রিপুরার নেতৃত্ব তথা জনসাধারণ বর্তমান অবস্থায় কাছাড়ের সহিত সংযুক্তির ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী নন। দ্বিতীয় বিকল্প হইল কাছাড় জেলাকেই একটী স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা। এই দাবীর সমর্থকরা ত্রিপুরা নাগাল্যাণ্ড বা সভ্যগঠিত মেঘালয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে চাহিবেন। কিন্তু এই সমস্ত রাজ্য খণ্ডজাতি বা পার্ব্বত্য জাতিদের বাসভূমি হওয়ায় এবং নানা জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় যে কোন মূল্যে ঐ সমস্ত এলাকার জনসাধারণের আনুগত্য ক্রয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সেই সীমাহীন সাহায্য স্বতন্ত্র কাছাড়ের কপালে জুটিবার সম্ভাবনা খুবই অল্প।

এদিকে খণ্ডিত আসামে কাছাড় জেলা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একটি উপনিবেশে পরিণত হইবে ইহাও অসহনীয়। বর্তমান আসাম সরকার বা আসামের দায়িত্ব-শীল নেতৃবৃন্দ কাছাড়ের সমস্যাবলী সম্পর্কে এখন চিন্তা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু সমস্যাবলী সমাধানের কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা এখনও গৃহীত হয় নাই। কাছাড়ের জনমত সঙ্গত কারণেই বিক্ষুব্ধ। এখন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি সর্ব্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া কাছাড়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অভিমত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি।

বাঁচিবার একমাত্র পথ

শ্রী অনিলবরণ রায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক "স্বর্ণযুগ" পত্রিকাতে বলা হইয়াছে : বাংলাদেশের অনেকেরই আজ এই অভিমত যে, বাঙ্গালী জাতি মরিতে বসিয়াছে, তার রক্ষার আর কোন উপায়ই নাই। এইভাবে মরণকে ডাকিয়া আনিলে স্বয়ং শিবও তাহা ঠেকাইতে পারিবেন না। অন্যান্য বহু প্রাচীন বিখ্যাত জাতির ন্যায় ভারতীয় জাতিও ইতিপূর্ব্বে বহুবার মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছে—কিন্তু অন্যান্য জাতির সহিত ভারতের প্রভেদ এই যে, সে বার বার মরিতে মরিতে নূতন জীবন লইয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে,

"ডুবেও যে মা ভেসে উঠি"

যে মন্ত্রে ভারত এতদিন মৃত্যুকে জয় করিয়াছে সে মন্ত্র সে এখনও ভুলিয়া যায় নাই, সেই মন্ত্রেই বাঙ্গালী

নিজে বাঁচিয়া ভারতকে, সারা জগৎকে বাঁচিবার পথ দেখাইবে। বস্তুতঃ মৃত্যুটা আজ শুধু বাঙ্গালীর সম্মুখে নহে, সারা জগৎ সারা মানবজাতির সম্মুখে। বর্ত্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতি দিব্য চোখে দেখিয়া ১৯৪৫ সালেই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন,

"About the present civilisation, it is not that which has to be saved ; it is the world that has to be saved and that will surely be done though it may not be so easily or so soon as some wish or imagine or in the way they imagine"

নকশালরা যাহা করিতেছে তাহাতে ধর্ম ও সংস্কৃতি নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া যাহারা আতঙ্কিত হইয়াছেন তারা দেখিতে পাইতেছেন না যে, এই সব পবিত্র জিনিষ একেবারে অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছে, ধর্মের নামে চলিতেছে কুসংস্কার, আচার (Culture) দাঁড়াইয়াছে অনাচার, মিথ্যাচার ও অত্যাচারে। সত্যাগ্রহের নামে সর্ব্বত্র চলিতেছে মিথ্যাগ্রহ। সেদিন ফিলিপাইনে যে ব্যক্তি পোপকে খুন করিতে গিয়াছিল সে বাংলার নকশাল নহে, সমাজদ্রোহী নহে, সে বলিভিয়ার একজন সুবিজ্ঞ আর্টিষ্ট, সে বলে "আমি কমিউনিষ্ট নহি, সোস্যালিষ্ট নহি, আমি মানব-প্রেমিক—পোপের শিক্ষা Superstition and hypocrisy—তার বিরোধী"। আজ শুধু খৃষ্টান ধর্ম নহে, সকল ধর্ম (Religion) ও নৈতিকতা (Morality) সম্বন্ধেই ইহা বলা যাইতে পারে। নকশালরা যে মূর্ত্তি ভাঙিতেছে ইহা ভ্রান্ত পথ হইতে পারে, কিন্তু যারা অতীত মনীষীদের পূজার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাদের কাজও কম বিভ্রান্তিকর নহে। সে-সব মনীষীরা যতই মহান থাকুন, আজ তাদের পথ ধরিয়া থাকিলে আমাদের অতিপ্রয়োজনীয় সংস্কার ও প্রগতিতে বাধা পড়িবে। যাঁহাকে পূজা করি আমরা যদি সর্ব্ব বিষয়ে তাঁর মতন হইতে না চাই, তাকে সর্ব্ববিষয়ে অনুসরণ করিতে না চাই সে পূজা ভণ্ডামি (hypocrisy)—তাহা মানুষের পূজাই হউক আর দেবতার পূজাই হউক। ভগবান আছেন, তিনিই একমাত্র Real, বাস্তব সত্য—hypothesis বা কল্পনা নহেন, তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়—সব মন প্রাণ হৃদয় দিয়া তাহার সহিত যুক্ত হওয়া যায়—আর সেইটিই মানব জাতির বাঁচিবার একমাত্র পথ, অন্য কোন পথ নাই। ভারতের ঋষিরা ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়া এই বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

> বেদাহং এতং পুরুষং মহান্তম
> আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
> তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি।
> নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

জগৎকে এই বাণী ভারতবাসী শুনাইবে, বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতিকে ভগবান এই মহৎ কার্য্যটির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—এক যুগে বাংলাদেশে যত মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কখনও তাহা হয় নাই। বাঙালী যদি আজও তার এই ভগবদ নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতে উদ্যোগী না হয়, তাহা হইলে সে রক্ষা পাইবে না। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিপদ শুধু বাঙালীর পক্ষেই নহে, সমগ্র মানবজাতির প্রতিই প্রকৃতির সাবধান বাণী। জগতে ভগবান আছেন যুগ যুগান্তরের বিবর্তনের ফলে এই পৃথিবীতে মানুষেরও আবির্ভাব হইয়াছে—উদ্দেশ্য জড়দেহের মধ্যে ভগবান নিজেকে প্রকট করিবেন—মানুষই হইবে মূর্ত্তিমান দেবতা, তার দেহটা হইবে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ, জরা ব্যাধি এমনকি মৃত্যু হইতে মুক্ত, বেদ উপনিষদের ইহাই ভাষায় "অতিমৃত্যু" বা "অমৃতত্ব"। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষকে এই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে— এখনও যদি মানুষ ভগবানের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে অগ্রসর না হয়, তাহা হইলে সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস কেহ আটকাইতে পারিবে না। সমুদ্র উচ্ছ্বাসের আঘাতটা মানুষের প্রতি সাবধানী হিসাবে অন্যত্র আসিতে পারিত, সেটা পাকিস্তানের উপর আসিল, তাদের কর্ম্মফল। ঢাকার সংবাদে প্রকাশ "৪৩লক্ষ লোক বিপন্ন, মৃতের হিসাব নেই।" পাকিস্তান কত নিরীহ হিন্দুকে উদ্বাস্ত করিয়া অকূলে ভাসাইয়াছে তাহা গণনা করিলেই ঐ হিসাব মিলিয়া যাইবে। কর্ম্মের ফল বিধি বিষ্ণুও এড়াইতে পারেন না।

সাময়িকী

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হত্যা

কয়েকদিন পূর্ব্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ গোপাল চন্দ্র সেনকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত লাঠি ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়াছে। ডঃ সেন জনপ্রিয় অধ্যাপক ছিলেন ও তাঁহার শত্রু বলিতে কেহ ছিল না। তাঁহার হত্যাকারীগণ তাঁহাকে জনপ্রিয়তার জন্যই হত্যা করিয়াছে কারণ তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কার্য্য যোগ্যতার সহিতই করিতেছিলেন এবং সকলের মনে আশা হইয়াছিল যে তাঁহার পরিচালনায় ঐ উচ্ছৃঙ্খলতার কেন্দ্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্ব্বার শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হইবে। কিন্তু কিছু কিছু অপরাধ প্রবণ সমাজ ধ্বংস প্রচেষ্ট অর্দ্ধ-উন্মাদ ব্যক্তি সেইরূপ পরিণতি হইলে নিজেদের অভিসন্ধি পূর্ণ হইবে না দেখিয়া ডঃ সেনকেই হত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছিল ও তাহারা বা তাহাদের প্ররোচিত ব্যক্তিরাই এই চরম দুষ্কার্য্য করিয়াছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস। নরহত্যা সকল সময়েই মহাপাপ। নির্ব্বিরোধী অসহায় বৃদ্ধ অধ্যাপককে একাধিক সশস্ত্র ব্যক্তি আক্রমণ করিয়া হত্যা করা যে কতবড় পাপ ও অতি ঘৃণ্য অপরাধ তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলা আবশ্যক হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে বাংলাদেশে এখন এমন মানুষ কিছু জন্মিয়াছে যাহারা বিচার বুদ্ধিহীনতার চরমে পৌঁছিয়া নিজেদের পিতামাতা, স্ত্রীলোক, শিশু, অন্ধ, বিকলাঙ্গ—যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই হত্যা করিতে পারে। শতশত মহামানবের জন্মভূমি ভারতবর্ষে যে এইরূপ হিংস্র পাশবিকতা কখনও "আদর্শ" বলিয়া মানব হৃদয়ে স্থান পাইবে, কেহ কখনও চিন্তাও করিতে পারে নাই। সেকালে ঠগীদিগের কোন আদর্শবাদের দোহাই দিবার অভ্যাস ছিল না। পরধন অপহরণের জন্যই তাহারা নরহত্যা করিত। রাষ্ট্রীয় আদর্শের সাফাই দিয়া তাহারা কখনও হীনতার শেষ স্তরে নামিয়া মনুষ্যত্বের সকল আদর্শের বিলুপ্তি সাধিত করে নাই।

রাশিয়ায় ইহুদী নিপীড়ন

অতি প্রাচীন কাল হইতেই রুশ দেশে ইহুদীদিগের উপর অত্যাচার করা একটা সামাজিক রীতির মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহুদীগণ বৃহৎ বৃহৎ সহরে নিজেদের বিশেষ এলাকায় স্বতন্ত্রভাবে বাস করিত ও সে পাড়াগুলির নাম ছিল ঘেট্টো। রুশিয়ানদিগের প্রথা ছিল যে তাহারা মধ্যে মধ্যে ইহুদীনিগ্রহে আত্মনিয়োগ করিত। এইরূপ লুণ্ঠতরাজ মারপিঠ খুনজখম নারী নির্য্যাতন ও অত্যাচারকে পগ্রম বলা হইত। পগ্রম কথাটি রুশিয়ান ও উহার অর্থ ধ্বংস কার্য্য। এই সকল ইহুদী হিংসার আরম্ভ হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং তাহা ১৯১৭ খৃঃ অব্দের বিপ্লবের পূর্ব্ব অবধি মধ্যে মধ্যে রুশিয়ার সর্ব্বত্রই চলিতে দেখা যাইত। আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহুদীগণ কোন অপরাধে অপরাধী ছিল না। তাহাদের একমাত্র দোষ ছিল যে তাহারা মিতব্যয়ী, হিসাবী, কর্ম্মদক্ষ ও সঞ্চয়ী বলিয়া তাহাদের অবস্থা সমস্তরের রুশিয়দিগের তুলনায় ভাল ছিল। তাহারা সুদে টাকা খাটাইত ও কেনা বেচার কার্য্য করিত। চুরী, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি ইহুদীগণ করিত না। পগ্রমগুলি যখন হইত তখন ইচ্ছা করিলে রুশ সরকার তাহা সহজেই দমন করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা করা হইত না। রুশ সরকারের সমর্থনে ও সাহায্যেই ঐ দুষ্কার্য্য করা হইত।

রুশ বিপ্লবের পরে অদ্যাবধি রুশিয়ায় আর পগ্রম ঘটে নাই। ইহার কারণ রুশ সরকারের সাম্য নীতিতে বিশ্বাস। কিন্তু সম্প্রতি রুশিয়ার মানুষ আবার ইহুদী নিগ্রহে মন দিতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ ইসরায়েলের সম্বন্ধে রুশিয়ার বিরুদ্ধ মনোভাব।

ইসরায়েল আমেরিকা ও বৃটেনের সহায়তায় গঠিত ও অস্ত্রসজ্জে সুসজ্জিত হইয়াছে। রুশিয়া সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রকে সাহায্য করিলেও তাহারা ইসরায়েলের নিকট ছয় দিনের যুদ্ধে পূর্ণ বিধ্বস্ত ও পরাজিত হয়। রুশিয়ার ইহুদী বিরূপতার ইহাই প্রধান কারণ। শুনা যাইতেছে রুশিয়াতে অকারণে ইহুদীদিগকে গ্রেফতার করিয়া বিচারের অভিনয় করিয়া কারাগারে পাঠান হইতেছে। দুই একজনের নাকি প্রাণদণ্ডেরও আদেশ হইয়াছে। রুশিয়ারনূতন করিয়া ইহুদী দলন পরিকল্পনার ইহা শুধু আরম্ভ। তবে রুশিয়ার মানুষের ইহুদী বিরুদ্ধতার একটা ঐতিহ্য থাকাতে বিষয়টা সহজেই উৎকটরূপ ধারণ করিতে পারে। এই ঐতিহ্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার ভিতরে রুশিয়ারই শুধু হাত ছিল না। অন্যান্য দেশও খ্রীষ্টীয় ধর্মরক্ষা হেতু যেরূপ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইত (ক্রুসেড ও জেহাদ) তাহাদের দেশাভ্যন্তরেও তেমনি ইহুদী বিরুদ্ধতা প্রবল হইয়া উঠিত। রোমান যুগেও এই ইহুদী নিপাত চেষ্টা বহুবার বহুস্থলে হইয়াছে দেখা গিয়াছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহুদী দিগকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও জার্মাণী হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহাদিগকে স্পেন হইতে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা হয়। এই সকল ইহুদী বিতাড়নই তাহাদের পূর্ব্ব যুরোপস্থিত দেশ গুলিতে চলিয়া যাওয়ার কারণ। পোল্যাণ্ড ও রুশিয়াতে ইহুদীদিগকে জমি ক্রয় করিয়া চাষবাস করার অধিকার না দেওয়াতে এবং বিভিন্ন কর্ম্মের শিল্প সংগঠন (craft guilds) গুলিতে যোগদান নিবারণ করার ফলে ইহুদীগণ শুধু কেনা বেচা ও টাকার লেনদেন করিয়াই জীবন নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে যে ধারণা গড়িয়া উঠে যে তাহারা সুদখোরী ও দোকানদারী করিতেই জাতিগতভাবে পছন্দ করে, সে কথাটার মূলে আছে যুরোপের লোকের নিজেদের ইহুদী দমন প্রচেষ্টা। সে যুগে খৃষ্টানদিগের মধ্যে সুদের কারবার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ছিল বলিয়া কোন খৃষ্টান সুদের কারবার করিত না। টাকা ধার করিতে হইলে মানুষ শুধু ইহুদীর নিকটই ঋণ পাইতে সক্ষম হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহুদীদিগকে আইনতঃ নানা অধিকার দেওয়া হইলেও যুরোপের সর্ব্বত্রই ইহুদী বিরুদ্ধতা প্রবল ভাবে বর্ত্তমান ছিল। রুশিয়ার রাজশক্তি নিজ দেশে বিপ্লবাশঙ্কা করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টি অপর ক্ষেত্রে চালাইবার জন্য ইহুদী বিরুদ্ধতা প্রচারে সহায়তা করিত। গরীব কৃষকদিগকে রুশিয়ায় বুঝান হইত যে ইহুদীদিগের দোকানদারী ও সুদখোরীই তাহাদের দারিদ্র্যের মূল কারণ। পোল্যাণ্ড ও রুশিয়া হইতে ঐ সময় সহস্র সহস্র ইহুদী পলাইয়া ফ্রান্সে, বৃটেনে ও জার্মাণীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে গমন করে। ইহাতে ইহুদী বিরোধ ঐ সকল দেশে আরও প্রবল হইয়া উঠে। এই বিরোধ বর্ত্তমান শতাব্দীতে হিটলার চালিত নাৎসি জার্ম্মানীতে চরম অবস্থায় উপস্থিত হয়। এই সময় যুরোপের বহু দেশে নাৎসিগণ পঞ্চাশ লক্ষাধিক ইহুদী নরনারী বালকবালিকা ও শিশুদিগকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করে। ইসরায়েল রাষ্ট্রগঠন করিয়া ইহুদী দিগকে একটা নিজের দেশ গঠন করিয়া লইবার ব্যবস্থা ইহার পরে বিশ্ববাসী সকলেই সমর্থন করেন। রুশিয়াও এই ব্যবস্থা তৎকাল হইতেই সমর্থন করিয়া আসিয়াছে।

বৃটেন-পাকিস্থানের মনোমালিন্য

পূর্ব্বপাকিস্থানে সম্প্রতি যখন প্রবল ঝঞ্ঝা ও বন্যার প্রকোপে বহু লক্ষ লোকের মৃত্যু হয় তখন বৃটেনের সংবাদ পত্রগুলি পাকিস্থানের শাসকদিগকে বিশেষ নিন্দাবাদ করিয়া মানবীয় দায়িত্ববোধহীনতার জন্য সমালোচনা করে। এই দুর্ঘটনার বহুপূর্ব্ব হইতেই পাকিস্থানের প্রভুরা জানিতেন যে মোহানার নিকটস্থ সকল স্থানেই ঝড় ও প্লাবনের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য সমুদ্র ও নদীর যোগস্থলের নানান এলাকায় বাঁধ নির্ম্মাণ (Dikes and Break-water) একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাঁহারা কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইসলামাবাদ নির্ম্মাণে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্ব

পাকিস্থানের ইসলামী ভ্রাতাদিগের প্রাণ বাঁচাইবার আবশ্যকতা অন্তরে তেমন করিয়া নিবিষ্ট হয় নাই। তৎপরে যখন ঝড় ও বন্যাতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণহানী হইল তখনও ইসলামাবাদে তাহা লইয়া কেহ কোন ব্যস্ততা দেখাইল না। ঐ ঘটনার পরে সাতদিন কাটিয়া যাইলেও পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ কোনও ডাক্তার ঔষধ, খাদ্য, বস্ত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন নাই। এবং বৃটেনের সংবাদপত্রগুলি কেন তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিয়াছে তাহা লইয়া আপত্তি ও অভিযোগ করিয়া বিশ্ববাসীকে নিজেদের অমানুষিকতার আরও পূর্ণতর পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের কর্তব্যবোধহীনতার ফলে আরও কত লক্ষ মানুষ মৃত ও রোগ জর্জ্জরিত হইয়াছিল তাহা বিচার না করিয়া নিজেদের সাফাই গাহিতেই পশ্চিম পাকিস্থানী নেতাগণ ব্যস্ত ছিলেন ও ফলে তাঁহাদের নির্ব্বাচনে তাঁহারা যে ভাবে পরাজিত হইয়াছেন তাহাতে দুই পাকিস্থান আর এক রাষ্ট্র অন্তর্গত থাকিবে কিনা তাহা লইয়াও সন্দেহের উদ্ভব হইতেছে। পশ্চিম পাকিস্থান কিন্তু বৃটেন বিরুদ্ধতা আরও প্রবল ভাবে ব্যক্ত করিতে প্রচেষ্ট হইতেছে।

বিগত পৌষ মাসের শেষের দিকে হজরত মহম্মদ সম্বন্ধে কি একটা লেখা বৃটিশ-প্রকাশিত কোন পুস্তকে বাহির করা হইয়াছে বলিয়া পশ্চিম পাকিস্থানে হাঙ্গা হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। প্রায় ১০০০ হাজার ছাত্র লাহোরে বৃটিশ কনসুলেটে গিয়া তিন খানা মোটর গাড়ী ও একটা মটর সাইকেল পুড়াইয়া দেয়। কনসুলের নিজের একটা নুতন মোটর গাড়ীও পুড়াইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর দাঙ্গাকারীগণ বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনরকে আক্রমন করে কিন্তু পাকিস্থানী পুলিশ তাহাদিগকে বিতাড়িত করে। ছাত্রগণ সেন্ট জনস অ্যাম্বুলেন্স হল ও ক্রিমেশনদিগের সভাগৃহও আক্রমন করে। কয়েকটি জানালা ভাঙ্গিয়া ও পরে একটি মদের দোকান লুট করিয়া ইসলামী ছাত্রগণ চলিয়া যায়। রাওলপিণ্ডিতে ছাত্র বাহিনী কাঁদুনে বাষ্প অগ্রাহ্য করিয়া বৃটিশ হাই কমিশন ভবন আক্রমনে অগ্রসর হয় কিন্তু পরে পুলিশের বন্দুক ও বল্লম দেখিয়া নিরস্ত হয়। লায়ালপুরেও আন্দোলন চালিত হয়। ভিতরের কথা পাকিস্থানে বৃটিশ বিরুদ্ধতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। পুস্তকে কি বাহির হইয়াছে তাহা অপর কোন মুসলমান জানিল না, শুধু লাহোর ও রাওলপিণ্ডিতেই তাহা সকলে জানিল ;ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহা ব্যতীত পুস্তকটি বৃটিশ সরকার বাহির করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হয় নাই। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ এই সময় পশ্চিম পাকিস্থানে আসিয়াছেন বলিয়াই বৃটিশ বিরুদ্ধতাজাত হাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ করা হইয়াছে মনে হয়।

দেশ-বিদেশের কথা

চীনের অর্থনীতির সম্বন্ধে

চীন দেশের বিষয়ে কোন কথাই যথাযথভাবে খোঁজ খবর করিয়া বলা যায় না। কারণ খোঁজ খবর করিবার উপায় উপযুক্ত রকম পাওয়া অসম্ভব। যে সকল খবর পাওয়া যায় তাহা চীনের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশিত হয়। তাহা হইলেও কিছু কিছু খবর যাহা পাওয়া যায় তাহাই বিচার বিশ্লেষণ করিয়া অনেকটা সত্যের নিকটে যাওয়া সম্ভব হয় ও সেইরূপে যাচাই করিয়া কিছুটা বুঝা যায় যে বাস্তব অবস্থা চীনে কি প্রকার। অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুকাল "কৃষ্টি বিপ্লব" এর তাড়নায় আড়ষ্ট থাকায় চীনের অবস্থা খারাপ হইয়াছিল; কিন্তু সেই কৃষ্টি বিপ্লবের অবসান হইলে পরে চীনে আবার পুরাতন ধরনের কার্য্যকলাপ আরম্ভ হয় ও আর্থিক অবস্থাও ভালর দিকে যায়। এখনও অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় হয় নাই কিন্তু অধোগতি থামিয়াছে। ১৯৬৯ খৃঃ অব্দে চীনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আমদানি রপ্তানি মিলিত ভাবে দেখিলে দেখা যায় যে মোট কেনা বেচা হইয়াছিল ৩৮২৫ কোটি টাকার মত। ইহার মধ্যে আমদানির তুলনায় রপ্তানি প্রায় ২০০ শত কোটি টাকা প্রমাণ অধিক হইয়াছিল। এই সকল হিসাব দেখিলে বুঝা যায় যে চীনের আর্থিক অবস্থা খুব উন্নত নহে। আকারে ও জনসংখ্যায় চীন ভারত অপেক্ষা কিছুকম দেড়গুণ অধিক। চীনের মানুষ অক্লান্ত কর্মী। কিন্তু তৎসত্বেও চীনের বাণিজ্য ভারতের তুলনায় যথেষ্ট অধিক নহে। অর্থাৎ চীন, অর্থনৈতিক অবস্থা বিচারে ভারত অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নহে। চীন যে সকল বস্তু আমদানি করে তাহার মধ্যে গম আমদানি অত্যধিক। এইখানেও চীনের আর্থিক অবস্থা ভারতের সহিত তুলনীয়। রপ্তানির ক্ষেত্রে বস্ত্র প্রভৃতি বয়নশিল্পজাত বস্তু, অধিক দেখা যায়। ভারতের রপ্তানির মধ্যেও বয়ন কার্য্য সম্ভূত বস্তু অধিক দেখা যায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চীন যে ভারত অপেক্ষা বহু উন্নত তাহা ঠিক বলা চলে না। তবে চীনের আত্মরক্ষার ও পরদেশ আক্রমন ক্ষমতা সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন শক্তির হিসাবে ভারত অপেক্ষা অনেক অধিক। বহু সবল দেহ ব্যক্তি সৈন্যের কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় চীন উৎপাদন ক্ষেত্রে কিছুটা পিছাইয়া থাকে। এবং ঐ বিরাট সামরিক ব্যবস্থার খরচ মিটাইবার জন্য উৎপাদিত বস্তুর বহু অংশ সামরিক ব্যবহারে লাগিয়া যায় এবং সাধারণের ভোগের আয়োজনে ঘাটি পড়ে। ৭৫ কোটি মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করিবার তাগিদে চীনের অর্থনীতিতে চাষ করিবার আবশ্যকতা প্রবলতমভাবে বর্ত্তমান থাকে। ঐ একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন করিয়া তৎপরে অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। চাষের ব্যবস্থার জন্য মূলধনও অধিকাংশে ব্যবহৃত হইয়া যায়। কারখানার জন্য ততটা থাকে না। এই সকল কারণে চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা যতটা উন্নত হইতে পারিত ততটা উন্নত হয় নাই।

সামাজিক জীবনে অভাব নিবারণ

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই বর্ত্তমানকালে বহুবিধ

হইতেই সামাজিক ভাবে ব্যক্তিকে নানা প্রকার সাহায্য করার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যাহাতে মানুষ অভাবের আক্রমণে সহসা চরম দুর্দ্দশায় পতিত না হয়। যথা, বেকার হইলে কর্ম্মীদিগকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা। এই রীতি অনুসারে কোন ব্যক্তির যদি চাকুরী না থাকে তাহা হইলে তাহাকে বেকার-ভাতা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে তাহার ও তাহার পরিবারের লোকেদের কোন প্রকারে অবশ্য প্রয়োজনীয় খরচ মিটাইবার মত অর্থ জুটিয়া যায়। অপরাপর সাহায্যের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা, পাঠের খরচ, আহত বা রোগাক্রান্ত হইলে সাহায্য দান, বৈধব্য ঘটিলে বিধবা ও তাহার সন্তানদিগের ভরণ পোষণের জন্য অর্থ সাহায্য, বার্দ্ধক্যের জন্য সাহায্য ব্যবস্থা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই সকল ব্যবস্থা থাকায় সভ্যজগতের মানুষ নিজের সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব পোষণ করিয়া থাকে, সমাজ ব্যক্তিকে সকল প্রকারে সকল অবস্থায় রক্ষা করে। ইহা কোন "সোসিয়ালিষ্ট" বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নহে। যে সকল দেশে এই জাতীয় ব্যবস্থা সর্ব্বোত্তমভাবে প্রচলিত আছে সেই সকল দেশগুলির অধিকাংশই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানিয়া চলে না। কয়েকটি দেশের নাম করা যাইতে পারে। যথা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, বৃটেন সুইডেন, ডেনমার্ক হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্ম্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান প্রভৃতি দেশ। এই সকল দেশের শ্রমিকদিগের বেতন ও অপরাপর সুখ সুবিধার আয়োজনও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির তুলনায় উন্নততর।

ভারতবর্ষের "সোসিয়ালিষ্ট" নক্সার রাষ্ট্রনীতি শুধু নামে সমাজতন্ত্র অনুগতভাব অবলম্বন করিয়া চলে। কিছু কিছু ব্যক্তিগত অধিকার নাকচ করিয়া রাষ্ট্রের শক্তি ও রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেই সমাজতন্ত্র হয় না। কারণ তাহা হইলে বাদশাহী চঙে প্রজার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলে তাহাই বা সমাজতন্ত্র না হইবে কেন? ভারতে বর্ত্তমান কালে কোন ব্যক্তিই কোন সামাজিক সহায়তা লাভ করে না। চিকিৎসা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হয়, যদি মানুষের বাসস্থানের দুই দশ মাইলের মধ্যে কোন স্কুল বা চিকিৎসালয় থাকে। অনেকেরই সে সুবিধা নাই। যাইবার মত রাস্তাও বহুস্থলে নাই। অর্থাৎ ভারতের সমাজতান্ত্রিক নক্সার খর্পরে পড়িয়া ব্যক্তি শুধু উচ্চতম হারে খাজনা মাশুল ও রাজস্ব দিয়া মরে; আর মরে না খাইয়া, বিনা চিকিৎসায়, রোজগারের সন্ধানে হা-হুতাশ করিয়া এবং অসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায় দুর্দ্দশার চরম পেষণে। ইহা অপেক্ষা অশোক বা আকবরের সাম্রাজ্য অথবা বাদশাহি অধিক জনমঙ্গলকর ছিল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থা

শুনা যাইতেছে চেকোশ্লোভাকিয়াতে রুশিয়ার প্ররোচনায় এরূপ ব্যবস্থা হইতেছে যাহাতে সেখানকার উচ্চশিক্ষিত, কর্ম্মকৌশল পারদর্শী ও নানা বিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিদিগের জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় এখন যাহারা পূর্ব্বে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া সাধারণ শ্রমিকের কার্য্য করিতে বাধ্য করা হইতেছে। যথা যাহারা শাসন ক্ষেত্রে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, আইনজ্ঞ ছিলেন এখন তাঁহারা আদালত চুনকাম করা, লিফট চালনা, দারোয়ানের কাজ কিম্বা ঝাঁট দেওয়া অথবা নালা পরিষ্কার করাতে নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্বে যাহারা ঝাড়ু চালাইত এখন তাহারা আদালতের বিচারক হইয়া বসিয়াছে কিনা তাহা জানা যায় নাই। তবে রুশিয় পন্থায় সকল অসম্ভবই সম্ভব হইতে পারে। শুধু হোটেলের ম্যানেজার যদি রন্ধন করে ও বাবুর্চ্চি যদি হিসাব লেখা ও পত্রাদি লেখন কার্য্য করে তাহা হইলে রন্ধন করা খাদ্য খাইয়া নূতন সৃষ্ট "কমিসার"দিগের স্বাস্থ্যহানী ঘটিতে পারে এবং হোটেল পরিচালনা কার্য্যেও মহা বিপ্লবের সূচনা হইতে পারে। কম্যুনিজম অধিকার অনধিকার ভেদ বুঝে

করিতে পারে না। তাহা না জানিয়া তাবাবিদ হওয়া যায় না। চিকিৎসকের কার্য্য হালুইকর করিলে রোগীর মৃত্যু সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। আইন না জানিয়া জজিয়তি এবং স্থাপত্য বিদ্যাহীনের অট্টালিকা গঠনভার গ্রহণ বড়ই বিপদজনক কার্য্য। রুশিয়ার তোপ ও বন্দুক বিদ্যা, কর্ম্ম কৌশল ও পাণ্ডিত্য সৃজন করিতে পারে না।

পোলাণ্ডে খাদ্যাভাব

কিছুদিন হইল পোলাণ্ডের শাসকদিগের বিরুদ্ধে মহা অভিযোগ আরম্ভ হয় যে তাহারা অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ অক্ষমতা দেখাইয়াছে, যাহার ফলে মানুষ যাহা বেতন পায় তাহাতে পেট ভরিয়া খাওয়া সম্ভব হয় না। অর্থাৎ খাদ্যমূল্য যথেচ্ছা বাড়িয়া চলিয়াছে কিন্তু বেতন বৃদ্ধি সেই অনুপাতে হইতে দেওয়া বন্ধ করা হইয়াছে। সমালোচকদিগের নেতা ছিলেন এডওয়ার্ড গীরেক। এই ব্যক্তি কয়লা খাদের শ্রমিকনেতা ও এখন এই ব্যক্তিই পূর্ব্বকার প্রধান পার্টি সেক্রেটারি গোমুলকাকে সরাইয়া তাঁহার স্থান নিজে দখল করিয়া বসিয়াছেন। এই সকল নূতন ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে পোলাণ্ডের অনেক সহরে খাদ্যমূল্য লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া বহু লোকের মৃত্যু হয়। দনাস্ক সহরে দাঙ্গায় ৩০০ লোক মারা যায়। এই সহরের নাম পূর্ব্বে ছিল ড্যানজিগ। গোমুলকা স্টালিনের আমলে কারাগারে বদ্ধ ছিলেন। তিনি মধ্যপন্থি ছিলেন। ১৯৫৬ খৃঃ অব্দে তিনি এই প্রকারের দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে রাষ্ট্রক্ষেত্রে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গোমুলকাকে যে কেহ রাষ্ট্রীয় শক্তি হইতে অপসৃত করিতে পারিবে এমন কথা কেহ ভাবিতেও পারিত না। কিন্তু গীরেক গোমুলকা গোষ্ঠীর তীব্র সমালোচনা কিছুদিন হইতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে গোমুলকা সরকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে অপারগ ছিল এবং তাহাদের রীতি অনুসরণ করিলে পোলাণ্ডের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইতে আরও খারাপের দিকেই যাইবে।

শোকসংবাদ

ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ পি ব্যানার্জী গত ২৩শে পৌষ ১১ই জানুয়ারী সোমবার সকাল ৮টা ২০ মিনিটে মিহিজামস্থ তাঁর বাস ভবনে পরলোক গমণ করিয়াছেন।

তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসাকে তিনি নিজের হাতে নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। তাঁর চিকিৎসা ধারা সম্পূর্ণ অভিনব ছিল। দান ও হৃদয় বত্তায় ও যেধায় তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথার্থ বংশধর ছিলেন। চিকিৎসার বিনিময়ে কাহারও কাছে তিনি কপর্দক গ্রহণ করেন নাই বরং পথ্যাদি কিনিয়া দিতেন ইহা সর্ব্বজনবিদিত। সর্পদংশনের জন্য লৌকসন কুটের ওষুধ আরো কিছু দুরারোগ্য রোগের জন্য তিনি পেটেন্ট ওষুধ তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসা জগতে তাঁহার দান অসামান্য আজকাল সহজেই মানুষ পদ্মশ্রী পদ্ম বিভূষণ উপাধি পাইতেছে। হয়ত নোবেল পুরস্কার দিলে এই মানুষটিকে যথার্থ সম্মান দেয়া হইত।

তিনি বহু সুযোগ্য ছাত্র তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন আশাকরি তাহারা তাঁহার কীর্ত্তি অনির্বাণ রাখিবে।

তাঁর চারটি সুযোগ্য পুত্র আছে। তাঁহার সহধর্মিনী ও সন্তানদের সঙ্গে সমগ্র দেশবাসী আজ এই শোকে নিমগ্ন। ভগবান তাঁহাদের সান্ত্বনা দিন। —পুষ্প দেবী

জগদ্গুরু বিবেকানন্দ :— (ডঃ) প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
প্রকাশক—সাধনা সোম, সবিতা প্রকাশন
সি ৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২
মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রদ্ধেয় ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের লেখা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী "জগদ্গুরু বিবেকানন্দ" পড়লাম।

আজকাল বাংলা ভাষায় তিন শ্রেণীর জীবনকথা দেখতে পাই। প্রথম শ্রেণীভুক্ত জীবনীগুলিতে সংযত ভাষায় জীবন সংক্রান্ত তথ্য সকলের সমাবেশে, যুক্তি-ভিত্তিক বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত জীবনী হচ্ছে ভক্তজনের লেখা ভাবালুতার রঙে রঞ্জিত জীবন আলেখ্য। সেখানে প্রায়ই সংযমের অভাব ঘটে, চরিত্রের সর্বদিক যথাযথ প্রকাশ পায় না।

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে উপন্যাসের ঢংএ লেখা জীবন চরিত, তথ্যের চেয়ে সেখানে কল্পনার প্রাধান্য বেশী, তাবাও অনুরূপ।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের লেখা স্বামীজীর জীবন চরিতখানি প্রথমপর্য্যায়ভুক্ত। তাঁর মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সম্পন্ন বিদগ্ধজনের কাছ থেকে যা আশা করেছিলাম তাই পেয়েছি। স্বামীজীর প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই সর্বদা তাঁর লেখনীকে সংযত রেখেছে। সত্য থেকে বিচ্যুত হতে দেয় নি।

ডাঃ ঘোষ বিবেকানন্দকে "জগদ্গুরু" বলে অভিহিত করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবনের এইটিই মূলকথা, তিনি কেবল বাংলাকে নয়, কেবল ভারতকে নয়, জগৎকে উদ্বুদ্ধ করতে এসেছিলেন।

ভূমিকার আরম্ভেই দেখতে পাই ডাঃ ঘোষ চিকাগোর মহাধর্ম সভার ছবিটি এঁকেছেন, জগৎসভার সামনে শাশ্বতধর্মের বাণী শোনাতে উঠে দাঁড়িয়েছেন যুবক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। চিকাগো ধর্মসভা স্বামীজীর জীবনের কেন্দ্র মনে করে নিলে তার পূর্ববর্তী কাল হবে প্রস্তুতির ও পরবর্তী কাল হবে প্রচারের যুগ। ডাঃ ঘোষ বলেছেন "ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার পর হতে আমেরিকা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ১১ বছর ৬ মাস স্বামীজীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়।" রোমাঁ রোলাঁ এই সময়টাকে সেতু নির্মাণের যুগ বলেছেন, দুই তীরের ব্যবধান ঘুচাবার জন্যে সেতু নির্মাণ, এক তীর তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি আর এক তীর বাস্তব জগৎ।

ডাঃ ঘোষ কত সংযম ও সাবধানতার সংগে স্বামীজীর জীবনকথা লিখেছেন তার প্রমাণ বহুস্থানে পাওয়া যায়। কেবল গুণাবলীর কথা বল্লেই মহামানবের জীবন আলেখ্য সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় না, সামান্য হলেও, ক্ষণিকের হলেও তাঁর ভুলগুলির উল্লেখ থাকা দরকার। তাতে মহামানবের মহত্ব ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। কোন কোন

বিষয়ে স্বামীজীর একাধিকবার মতের পরিবর্তন হয়েছিল একথা ডাঃ ঘোষ উল্লেখ করেছেন।

বইখানি পড়তে পড়তে বার বার যে কথাটি আমার মনে হয়েছে সবশেষে সেই কথাটাই বলবো। যার তেজোদ্দীপ্ত জীবন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ডাঃ ঘোষ সাধকের মত দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন আজ তাঁরই জীবনকথা লিখতে বসেছেন। বইখানিতে তাই এমন কিছু পাই যা অন্য বইতে পাইনি।

বইখানির ছাপা পরিছন্ন ও নির্ভুল, বাঁধাই সুন্দর, আমি এই বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

কুমারলাল দাশগুপ্ত

(১) নমস্কার (বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে... অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার)—রবীন্দ্রনাথ। সুর ও স্বরলিপি: তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২) সুরদীপন—কথা: নিশিকান্ত। সুর ও স্বরলিপি: তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩) সুরলিপিকা—কথা: নিশিকান্ত। সুর ও স্বরলিপি: তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৪) সুরলিপিকা (দ্বিতীয় খণ্ড) কথা: নিশিকান্ত। সুর ও স্বরলিপি: তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৫) সুরবাণী—কথা: অমিয়ময় গোস্বামী। সুর ও স্বরলিপি: তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৬) প্রার্থনা—কথা: কান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। সুর ও স্বরলিপি: তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই সংগীত গ্রন্থাবলী পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস থেকে মুদ্রিত। আশ্রমের সঙ্গীতাধ্যক্ষ ও সঙ্গীতশিক্ষক শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র গীতাবলীতে সুর সংযোজনা করেছেন এবং স্বরলিপি রচনার কৃতিত্বও তাঁরই। গীতি সংকলনগুলির সুরকার ও স্বরলিপি রচনাকার রূপে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারার তাবৎ অনুগামীবৃন্দের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। কারণ গানগুলি সুর ও স্বরলিপিতে গ্রথিত হওয়ার ফলে যথাবিধি পরিবেশিত হয়ে শ্রোতাদের অন্তরের মণিকোঠায় স্থান পাবে; উপরন্তু মুদ্রিত আকারে স্থায়িত্ব লাভ করবে।

প্রথম পুস্তিকা 'নমস্কার' এর জন্যে শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে অভিনন্দন যোগ্য। অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' নামে সুপরিচিত ও স্মরণীয় কবিতাটি উদ্দীপক সুর লয়ে গঠিত করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এক মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯০৭ সালের বিপুল স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নায়করূপে শ্রীঅরবিন্দকে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, উত্তরকালের মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের পটভূমিকায় তা ব্যাপকতর তাৎপর্য লাভ করে। সেই বিরাট ভাবের উপযুক্ত সুরের দ্যোতনা সাধক-সঙ্গীত শিল্পী শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সঙ্গীতকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্র রচনাটির উচ্চ ভাবের সার্থক আধার হয়েছে তাঁর হৃদয়গ্রাহী সুর রচনা। সঙ্গীত-রূপের উদ্বোধনে তিনবার এবং অন্তে দুবার যে সুর বিন্যাসে অরবিন্দ' রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' ধুয়াকে সুরকার গ্রথিত করেছেন তা শ্রোতাদের অন্তর আপ্লুত করবে।...

অপর পাঁচখানি পুস্তিকা শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও ভাবধারায় গভীরে উদ্বুদ্ধ। তার মধ্যে 'সুরদীপন' এবং দুখণ্ড 'সুর-লিপিকা'র কাব্যাংশ রচনা করেছেন স্বনাম প্রসিদ্ধ সাধক-কবি ও আশ্রমিক নিশিকান্ত। তাঁর অনবদ্য কবিকৃতি ও মহান অধ্যাত্ম-চিন্তার দ্যোতক এই রচনাবলী সাধন-লোকের নানা প্রকারে মর্মসন্ধানী এবং বিশদভাবে আলোচ্য। কিন্তু বর্তমান সমালোচনার পরিবেশে তার স্থানাভাব বশতঃ শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন করেই তৃপ্ত থাকতে হল। শ্রীঅমিয়ময় গোস্বামীর ভক্তিগীতিগুলিও লেখকের লক্ষ্য অনুসারে সফল: 'আমার উদ্দেশ্য সঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়ে ভগবানের উপাসনা করা।' শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার

কয়েকটি অমৃত বাণীর ভাব সম্পদ অবলম্বন করে শ্রীকান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় প্রার্থনার গীতিরূপগুলি প্রাণের আকূতিতে সাবলীলভাবে নিবেদন করেছেন। শ্রীঅমিয়ময় গোস্বামী ও শ্রীকান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় প্রতিটি গান বিভিন্ন রাগে ও তালে শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গঠিত।

সমস্ত গানগুলিই ভাবানুগ সুরে ও ছন্দে গ্রথিত করে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুরকার রূপে বিশিষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি কৃতবিদ্য সঙ্গীতজ্ঞ বলেই সুরসংযোজনার কারুকর্ম এমন সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। কাব্য সঙ্গীত ও রাগসঙ্গীত দুই ধারাতেই তিনি অভিজ্ঞ এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন শিল্পী। পণ্ডিচেরীতে আশ্রমিকরূপে অধ্যাত্ম জীবনচর্যা আরম্ভ করবার আগে কলকাতায় দীর্ঘকাল যাবৎ পদ্ধতিগত ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চা করেছিলেন। এ সম্পর্কে প্রধানত স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্য ছিলেন তিনি। তাছাড়া, বীণকার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিক্ষাধীনে ধ্রুপদসঙ্গীতের চর্চাও করেন। সুরসাগর হিমাংশু কুমার দত্তের শিক্ষায় কাব্যসঙ্গীতেও কৃতী হন তিনি। তারপর বহু বছর পণ্ডিচেরীতে আশ্রমিক জীবন যাপনের মধ্যে তাঁর সঙ্গীতসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনা অঙ্গাঙ্গী হয়ে পূর্ণতার পথে বিকাশমান। আলোচ্য সঙ্গীতাবলীর সুর রচনায় তারই এক সার্থক ও সানন্দ প্রকাশ ঘটেছে।

সাধক কবি নিশিকান্তের সুষমামণ্ডিত এবং আত্মউপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে সাধক সঙ্গীতজ্ঞ তিনকড়ির সুরসম্পদ যুক্ত হয়ে আর এক যুগলমিলনের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে শিল্পলোকের উদ্দেশে। একের নীরব অঞ্জলি অপরের সঙ্গীতকণ্ঠে মুখর হয়ে উঠেছে। দুয়েরই উৎসমূলে আছে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের দিব্য-জীবনের প্রেরণা। ..

অধ্যাত্মিক অনুভবের সঙ্গীতময় প্রকাশ স্বরূপ এই সঙ্গীত গ্রন্থাবলীর বহুল প্রচার কামনা করি।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

পরমহংস রামকৃষ্ণ
শিল্পী : ক্রানৎস ডোরাক

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭০তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

ফাল্গুন. ১৩৭৭

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কালাপাহাড়ী প্রেরণার প্রকাশ

কালাপাহাড় ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন ও তৎপরে মন্দির ও মূর্ত্তি চূর্ণ করার জন্য ইতিহাসে একটা বিশেষ অখ্যাতি অর্জন করিয়া ধর্মধ্বংসীতার প্রতীকরূপে পূর্ব ভারতের জনসমাজে একটা প্রবাদের মতই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ইংরেজীতে আইকনোক্লাজম কথাটার অর্থ মূর্ত্তি বা ধর্মমতবাদ বিনাশ করা। অর্থাৎ যাঁহারা অপরের ধর্ম বা মতবাদে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা যে অনেক সময় সহজ পথে সিদ্ধি লাভ চেষ্টায় অপরের ধর্মগ্রন্থ পূজার স্থান বা উপকরণ প্রভৃতি জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া নিজেদের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করেন; সেইরূপ ব্যবহারকেই আইকনোক্লাজম বলা হয়। আইকনোক্লাস্ট এর অর্থ কালাপাহাড়ী রীতি অবলম্বনকারী ধর্মদ্রোহী-ধর্মীবিধ্বংসী হিংসাত্মকভাবে স্বমত প্রতিষ্ঠাকারী পরমতধর্ষক দৌরাত্ম্যে বিশ্বাসী। অবশ্য বর্ত্তমান যুগের আরম্ভ কালে ঐ মনোভাব অনেক সময় ততটা প্রবলভাবে প্রকাশিত হইতে দেখা যাইত না। হিংস্র আবেগে জল মিশাইয়া তাহাকে শুধু বাক্যে পরিণত করিয়া কথাতেই আক্রমণ অনেকক্ষেত্রে শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু সম্প্রতি মানবসমাজে আবার কালাপাহাড় জাগ্রতভাবে স্বরূপ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মতবৈধ আর শুধু কথাতেই ব্যক্ত হইয়া বিবাদের শেষ হইতেছে না। পুরাকালের ক্রুসেড ও জিহাদ আবার সাক্ষাৎভাবে রণক্ষেত্রেই অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা একমতে বিশ্বাসী তাঁহারা অন্য সকল মতাবলম্বীকে অবিশ্বাসী, কাফের বা বুর্জোয়া বলিয়া অভিহিত করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে নিজেদের ঘৃণা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা পুণ্যমতে বিশ্বাসী হইলেই কিছুটা পার্থক্য রক্ষা করিতে চাহেন তাঁহারা "ঐশ্বরিক" বাণী সংশোধন চেষ্টার অপরাধে "রীভিশনিস্ট" বলিয়া দুর্নামের ভাগী হইয়া থাকেন। কখন কখন তাঁহাদের মুণ্ডচ্ছেদও ঘটিয়া থাকে।

ঐ সংশোধন লইয়া কয়েকটা যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। যথা হাঙ্গেরী ও চেকোস্লোভাকিয়াতে। রুশিয়া ও চীনের মধ্যে যে মতবাদ সংক্রান্ত কলহ তাহাও ঐ সংশোধন লইয়াই। চীন বলেন যে রুশিয়া রিভিশনিষ্ট ও রুশিয়া বলেন যে চীন ভ্রান্ত-স্বৈরাচারী-আত্ম-মত প্রতিষ্ঠা চেষ্টায় সত্য-মত-সংশোধনকারী ইত্যাদি। অবশ্য আমরা ঐ সকল মার্কসবাদের ন্যায়ের কচকচি বুঝিবার চেষ্টা করিনা। কারণ কোন মতবাদ-কেই অভ্রান্ত মনে করিতে আমাদের বাধে। মানুষের মানবীয় স্বাধীন চিন্তার অধিকার তাহাকে সকল সময়েই যে কোনও মতের সমালোচনা করিতে দিতে পারে। সকল ধর্মমতেরই বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে এবং সকল ধর্মেরই প্রধান বা প্রথম গঠিত সম্প্রদায়ের অতি শীঘ্রই নানান খণ্ডিত বা উপ-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় মতবাদের ক্ষেত্রেও সেইরূপই হইয়া থাকে। মার্কসের মতবাদ লইয়া দলাদলি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং লক্ষণ দেখিয়া মনেহয় যে ঐ মতবিভাগ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে যে শতাধিক গোষ্ঠীর মার্কসবাদীগণ ধরাপৃষ্ঠে বিরাজ করিবে তাহার সকল লক্ষণই ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এখনও মার্কসবাদ লইয়া যুদ্ধ জন সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা দেয় নাই। রুশিয় মার্কসিষ্ট ও চৈনিক মার্কসিষ্টদিগের কলহ উচ্চাঙ্গের তর্কবিতর্কে হইয়া থাকে শুনা যায়; কিন্তু সেসকলের তাৎপর্য্য আমাদিগের বোধগম্য নহে। চৈনিক মার্কসবাদীগণ আবার শুনা যায় একাধিক দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছেন। ইহাদিগের মধ্যে একদল শুধু অপর মার্কসবাদীদিগের শত্রু নহেন; তাঁহারা সকলপ্রকার সর্ব্বমতবাদীদিগেরই শত্রু ও ধর্ষক। তাঁহারা কি বিশ্বাস করেন তাহা আমরা জানিনা কিন্তু তাঁহারা ব্যাপকভাবে কোনও ধর্মমত, রাষ্ট্রমত ঐতিহ্য, আদর্শবাদ, রীতি নীতি বা সামাজিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন না একথা তাঁহারা নানা ভাবে দেশবাসীকে বুঝাইতেছেন। বলাই বাহুল্য যে তাঁহারা "এথীষ্ট" বা নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু নিরীশ্বরবাদের কোনও পর্য্যায়ে তাঁহারা পড়েন কি না তাহা বলা কঠিন।

কেননা বুদ্ধকে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলিতে কেহ শুনে নাই; কিন্তু এই সকল নিরীশ্বরবাদীগণ বুদ্ধের মূর্ত্তির উপরেও বোমা ছুঁড়িয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। নিরীশ্বর-বাদীগণ দার্শনিক, সমালোচক, সন্দেহবাদী ও অন্ধভাবে অবিশ্বাসী বলিয়া নিরীশ্বরবাদের ইতিহাসে বিভক্ত হইয়া থাকেন। এই নূতন নিরীশ্বরবাদীগণ শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্ধ-অবিশ্বাসী নহেন; প্রায় সকল বিষয়েই তাঁহারা অবিশ্বাসী। দেশের ও জাতির প্রতিষ্ঠিত সকল আদর্শ ও বিশ্বাস তাঁহারা ধ্বংস করিতে সচেষ্ট। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্কুল কলেজের পুস্তকাগার, রসায়ন বা অপর বিজ্ঞান-কেন্দ্র দোকানপাট ইত্যাদি যে কেহ বা যাহা কিছু সমাজের মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সকল কিছুই জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছারখার করিতে হইবে। এই হিসাবে এই সকল ব্যক্তি রুশিয়ান বিপ্লবকারী 'নিহিলিষ্ট' দিগের সহিত তুলনীয়। ঐ নিহিলিষ্টগণ রুশিয়ার সম্রাট জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৫৫-৮১) এর রাজত্বকালে গঠিত হ'ন। তাঁহারা কোন কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না ও প্রতিষ্ঠিত সমাজের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উচ্ছেদ কামনা করিতেন। এই কারণে রুশিয়ার সাহিত্যিক তুর্গেনীভ তাঁহাদের নিহিলিষ্ট নামকরণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে তাঁহারা একটা নিদারুণ হিংসাত্মক বিপ্লবের আরম্ভ চেষ্টা করেন ও জার আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করেন। কিন্তু পূর্ব্বের কিছুই থাকিবে না এবং পুরাতনের সহিত সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষ একটা পূর্ণরূপে নূতন-সৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে জীবন নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া লইবে; এইরূপ সর্ব্বাজে নূতন সমাজ গঠন কখনও সম্ভব হয় না এবং সেই কারণে নিহিলিজমের প্রচলন দীর্ঘদিন থাকা সম্ভব হয় নাই। দেনা পাওনা, অধিকার অনধিকার, ভাল মন্দ বিচার, উচ্চ নীচ ভেদ, ন্যায় অন্যায় শৃঙ্খলা রীতিনীতি প্রভৃতি মানবীয় সংস্কার মানুষ যেমনভাবেই থাকুক না কেন কোনও না কোনভাবে গঠিত হইয়া মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে। মুক্তি ও সকল বন্ধন হীনতা মানুষ কখনও কোনও অবস্থাতেই অধিক সময়ের

জন্য উপভোগ করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং সকল প্রতিষ্ঠান, আদর্শ, ঐতিহ্য, রীতিনীতি ভাঙ্গিয়া দিলেও মানুষের কোন সুবিধা হয় না। নূতন যাহা গড়িয়া উঠে তাহা মানব মনোভাবের মধ্যাকর্ষণের টানে প্রায় সেই পুরাতনেরই আকারেই পুনর্ব্বার নবকলেবর ধারণ করে। নূতন করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা পুরাতনেরই অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত সংস্করণ এবং পরযুগের চিন্তাশীল-গণ সকল কথা বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইয়া থাকেন যে বহু হাল্লা হাঙ্গামা,খুনা-খারাবি ও ওলট-পালট করিয়া বিপ্লবান্তে যাহা পাওয়া যায় তাহা খোড়বড়ি খাড়ার পরিবর্ত্তে খাড়াবড়ি খোড়ই হইয়া থাকে। মানবজীবনের আবর্ত্তনের ভিতরে যে সকল আবেগ ও প্রেরণা প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে তাহা বিপ্লববাদের মহিমায় কখনও শক্তিহারা হইয়া যায় না। জন্ম বিবাহ মৃত্যু, খাদ্যবস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা চিকিৎসা গমনাগমন, কর্ম্ম কর্ত্তব্য উপার্জ্জন, ব্যয় সঞ্চয় দেয় প্রাপ্য প্রভৃতি যে সকল অবস্থা ব্যবস্থা মানবজীবনকে নানাভাবে চালিত করে তাহা ঋকবেদ বাইবেল কোরান বা "দাস কাপিতাল" যাহাই অবলম্বন করা যাউক না কেন; নিজ নিজ স্বরূপ কখনও বদলাইয়া অপর রূপ গ্রহণ করে না। মানবজীবন ও সভ্যতা অতি গভীরভাবে রূপরস উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল। পারিপার্শ্বিকের সহিত সংঘাতজাত অনুভূতি ও উপলব্ধি মানবমনের চেতনা ও অবচেতনা কেন্দ্র সকলকে প্রভাবিত করিয়া মানবচরিত্র গঠন করে। রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি পরিবর্ত্তন করিলে মানবজীবনের মূল বাসনা কামনা বা বাস্তব ভিত্তির এরূপ কোন প্রগাঢ় পরিবর্ত্তন হয় না যাহাতে মানবচরিত্র বিশেষভাবে অন্য আকার ধারণ করে। সুতরাং বিপ্লব ঘোষণা করিয়া ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া, পুস্তক চিত্রমূর্ত্তি প্রভৃতির ধ্বংসসাধন করিয়াও মানবমনের মূল আবেগ আগ্রহ আকাঙ্খার কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। আগুন জ্বলিয়া নিভিয়া যায়, হতাহতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও ক্ষতচিহ্ন শেষ ও বিলুপ্ত হইয়া মানুষ আবার আগের মতই জীবনযাত্রা পথে চলিতে থাকে। নক্সা বদলাইলেও টানাপড়েন ও বয়ন কৌশলের কোন বদল হয় না। পরশ্রমজীবীগণ পুরোহিত ও ব্যবসাদার না হইয়া রাষ্ট্রীয় দলের নেতা রূপে সমাজে চলিতে ফিরিতে আরম্ভ করেন এবং ধন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার না গড়িয়া রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবহারের দ্বারা পদমর্য্যাদায় বিশেষ সুবিধা সম্ভোগ করিয়া নিজেদের বৈশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সমাজে শ্রেণীবিভেদ রক্ষা করেন।

বিপ্লবের ফলে সচরাচর কি ঘটিয়া থাকে তাহা অনুমান করিতে হইলে পৃথিবীর দুইটি মহা বিপ্লবে কি ঘটিয়াছিল তাহা দেখিলে বিচার সহজ হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় মানুষের আভিজাত্য ও রাজঅধিকার নাশ করিয়া সাম্য, স্বাধীনতা ও ঐক্য স্থাপন করিবার একটা অতি রক্তাক্ত ধরণের চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু শেষ অবধি বহু মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া এমন কি একটা সাধারণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হইল সামরিক শক্তির একাধিপত্য ও সামরিক সাম্রাজ্য স্থাপন। ব্যবসাদারদিগের শোষণ-কার্য্যে কেহ কোনও বাধা দেয় নাই এবং দারিদ্র্য সমস্যার কোন সমাধানও কেহ করিল না।

রুশিয়ার ১৯১৭ খৃঃ অব্দের মার্চ মাসের বিপ্লবের ফলে একটা রিপাবলিক গঠিত হয় কিন্তু দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়ার ফলে দেশবাসীগণ নভেম্বর মাসে লেনিন এর নেতৃত্বে বোলশেভিক রাজত্ব স্থাপন করে। ১৯১৮হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় তিন বৎসর বৃটিশ,ফরাসী, আমেরিকানওজাপানী সৈন্যগণ রুশিয়া দখল চেষ্টা করে। একদল রুশিয়ান "শ্বেত" রুশিয়া নাম লইয়া আভ্যন্তরীন যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং পোলাণ্ড লিথুয়ানিয়া ল্যাটভিয়া, এসথোনিয়া ও ফিনল্যাণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্র সংস্থাপন করিয়া রুশিয়া হইতে পৃথক হইয়া যায়। রুমেনিয়া বেসেরাবিয়া দখল করিয়া লইল এবং পোলাণ্ড লইল পশ্চিম ইউক্রেন ও শ্বেত রুশিয়া। দ্বিতীয় বিশ্ব মহা যুদ্ধের পরে রুশিয়া আবার রুশরাষ্ট্র পুনর্গঠন করে। পরে রুশিয়া নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সহিত সংঘর্ষণ করিয়া নিজমত প্রতিষ্ঠা করিয়া অখ্যাতি অর্জ্জন করে। হাঙ্গেরী ও চেকোস্লোভাকিয়ার কথা সকলের এখনও বিশেষ করিয়া মনে আছে।

বিপ্লব হইলেই যে বিপ্লবী-দেশবাসীর অথবা অপর দেশবাসীদিগের কোন একটা মহা লাভ হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা দেখা যায় না। বিপ্লব হইলে দীর্ঘ-কালব্যাপী অশান্তি ও সকলের ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টিই হইয়া থাকে দেখা যায়। সুতরাং বিপ্লববাদ জনসাধারণের পক্ষে কোনও সুবিধার ব্যবস্থা নহে এবং বিপ্লব না হওয়াই জনমঙ্গলের দিক দিয়া বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়। সামাজিক সংস্কৃতি অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা বিপ্লব না করিয়াই হওয়া সম্ভব হইয়া থাকে। জনমঙ্গল সর্বদাই বিপ্লবের দ্বারা আহত হয়। এই সকল কারণে বিপ্লব বিদ্রোহ কিম্বা হিংসাত্মক কলহ করিয়া জনমঙ্গল-কর কোন শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধি চেষ্টা মানবসমাজে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইলেই তবে করিবার কারণ উদ্ভূত হয়। অর্থাৎ শান্তিপূর্ণভাবে জনমত ব্যক্ত করিয়া ও সংবিধানিক উপায়ে সমাজসংস্কারের সকল প্রচেষ্টা করিয়াও যদি দেখা যায় যে শুভাকাঙ্খা পূর্ণ হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না; তাহা হইলেই এবং শুধু সেই অন্যায় ও অশুভ সংস্কার সাফল্য বিরোধী অবস্থাতেই বিপ্লবের কথা উঠিতে পারে। সেইরূপ অবস্থা ভারতে হইয়াছে কিনা বিচার করা প্রয়োজন। ভারতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকাতে জনমত অনুসারে সমাজনিয়ন্ত্রণ সহজেই হইতে পারে ও সেই কারণে সেই উপায়ে সংস্কার ব্যবস্থা না করিয়া গুলি বারুদের ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। এবং যাঁহারা ঐভাবে নিজেদের মতলবসিদ্ধি চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের মতকে জনমত আখ্যায় বিভূষিত করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না। অধিকাংশ ভারতবাসী যদি কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় অথবা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাহিতেন তাহা হইলে হিংস্রশক্তি ব্যবহার না করিয়াই সেই ব্যবস্থা হইতে পারিত। অধিকাংশ ভারতবাসী যদি কোন প্রকারের ব্যবস্থা না চাহেন তাহা হইলে সেই ব্যবস্থা গায়ের জোরে করাইয়া লইবার চেষ্টাকে জনমতের অভিব্যক্তি বলা যায় না। সেইরূপ চেষ্টা কোন ক্ষুদ্র গণ্ডি বা গোষ্ঠীর আবেগের প্রকাশ মাত্র এবং সর্বসাধারণ বা অধিকাংশ লোক যদি সেই চেষ্টার সমর্থন না করেন তাহা হইলে তাঁহারা নিজ অধিকারের বাহিরে যাইতেছেন মনে করিবার কোনও কারণ থাকে না। বরঞ্চ যাঁহারা গুলি চালাইয়া সমাজ-সংস্কার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারাই গায়ের জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মত অনুসারে চলিতে বাধ্য করিতেছেন। সেই চেষ্টাকে রাষ্ট্রীয় অধিকার রক্ষার দিক দিয়া শুভ উদ্দেশ্য বলা চলে না। সর্ব-মানবের রাষ্ট্রীয় অধিকার সংরক্ষণ মানবীয় অধিকার সংরক্ষণের একটি অতি আবশ্যকীয় অঙ্গ। সেই সংরক্ষণ কার্য্য যাহারা নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা মানব স্বাধীনতার পরম শত্রু ও মানবসমাজের উচিত সেইরূপ জনগণকে দমন করিয়া সর্ব মানবের রাষ্ট্রীয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা।

অনেকে মনে করেন কম্যুনিজম মানুষকে নিজ মানবীয় অধিকার লাভ করিতে অপর সকল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তুলনায় অধিক করিয়া সাহায্য করে। যদি এ কথা সত্য হইত তাহা হইলে দেখা যাইত যে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে মানুষ স্বাধীনভাবে নিজমত ব্যক্ত করিতেছে, নিত্য নূতন উপায়ে সর্বমানবের মুক্ত আসরে সকল সামাজিক ব্যবস্থা বিচার করিয়া মানব-কল্যাণ চেষ্টা বিভিন্নভাবে করিতেছে এবং কোনও ক্ষুদ্র গণ্ডিকে রাষ্ট্রীয় দলের নাম করিয়া একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জনসাধারণকে তাঁহাদিগের কথায় উঠিতে বসিতে বাধ্য করিতেছে না। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায় যে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে শুধু একটিই রাষ্ট্রীয় দল থাকে ও সেই দলের প্রার্থীকেই সকলকে ভোট দিয়া নির্বাচন করিতে বাধ্য করা হয়। ইহা রাষ্ট্রীয় অধিকার সংরক্ষণের অভিনয় মাত্র। এই অভিনয়ের ফলে যে সকল মতামত ব্যক্ত হয় ও তাহার ফলে যে সকল নিয়ম কানুন প্রবর্ত্তিত হয় ও সেই সকলের ফলে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের জনগণ যেভাবে জীবন নির্বাহ করে তাহা অপর অনেক স্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত তুলনায় অধিক মানব স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক বা মানব-অধিকার সংরক্ষক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। বহু স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের মানুষ উপার্জন ও

ভোগের দিক দিয়া কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির অধিবাসীদিগের তুলনায় অনেক অধিক সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করে। সুতরাং সকল কথার পূর্ণ পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে বাধ্য হই যে কম্যুনিজম কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রীয় দলের নেতা ও তাঁহাদের অনুচরদিগের শক্তি আহরণের দিক দিয়া কার্য্যকর হইলেও রাষ্ট্রের সকল মানবের শুভ অথবা সুবিধাকর নহে।

যাঁহারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অতীতের নেতাদিগের মূর্ত্তিগুলির মুণ্ডপাত করিয়া কম্যুনিষ্টরাষ্ট্র গঠন চেষ্টা করিতেছেন, আমরা বলি যে তাঁহারা সর্ব্বমানবের সুখ সুবিধা অধিকার ও স্বাধীনতার প্রচেষ্টা গুলি বারুদ ব্যবহারে না করিয়া সর্ব্বমানবের মত গঠন করিয়া সকলের মতানুসারে সেই সুখ সুবিধার প্রতিষ্ঠা করিলে তাঁহাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠাও হইবে এবং অযথা রক্তপাতও করিতে হইবে না। কালাপাহাড়ের যুগ এখন আর নাই। কালাপাহাড়ী ঢংএ কোন কিছু করিলে মানবসমাজ তাহা বর্ত্তমানকালে কদাপি মানিয়া লইতে পারে না। গায়ের জোর ব্যবহার করিয়া সাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্তি কখনও সম্ভব হয় না। পুরাকালের আদর্শ, বিশ্বাস ও ধর্ম্ম যদি প্রগতিশীল মানব আর না মানিতে চাহে তাহা হইলে সে পুরাকালের ধর্ম্মান্ধতা, আত্মমত প্রতিষ্ঠার্থে শ্বাপদের ন্যায় হিংসার নখাঘাতে অপরের হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করা, বর্ব্বরতার চূড়ান্ত করিয়া পরমত উচ্ছেদ ব্যবস্থা প্রভৃতিও ছাড়িয়া দিলে তাহার আধুনিকতা সহ্য করা জনসাধারণের পক্ষে ততটা কষ্টকর হয় না। বিচার ও তর্কের উপর যেখানে জীবন গঠন করা আধুনিক মানুষের চেষ্টা, নখদন্তের ব্যবহার সেখানে শোভা পায় না।

জীবনময় রায়

জীবনময় রায় প্রবাসীর আরম্ভের সময় হইতেই প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতার পরিবারের সহিত ঘনিষ্ট সামাজিক সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রবাসী যখন প্রথম বাহির হয়, সত্তর বৎসর পূর্ব্বে, জীবনময় রায় তখন বার তের বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র। পরে তিনি প্রবাসীর লেখক হিসাবে পরিচিত হ'ন কিন্তু অল্প বয়স হইতেই প্রবাসীর প্রতি তাঁর একটা বিশেষ টান ছিল। জীবনময় রায়ের পিতা ইন্দুভূষণ রায় এলাহাবাদে তৎকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও সমাজ সেবকের কার্য্যের জন্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বলিষ্ঠ, সুপুরুষ, সুগায়কও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। কবিতা ও সঙ্গীত রচনার জন্যও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার রচিত অনেকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত সঙ্গীত পুস্তকে মুদ্রিত হইয়া থাকে। জীবনময় রায় পিতার এই সকল ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তিনি বহুকাল শান্তিনিকেতনে শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন ও কলিকাতার ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলেও তিনি শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। উভয় স্কুলেই তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্কুলের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া তিনি পরিণত বয়সে চিকিৎসকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী উভয় প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতিই তিনি অনুসরণ করিতেন। ক্ষয়রোগের চিকিৎসা করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিছুকাল হইতে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং বিশেষ ঘোরাফেরা করিতে কষ্ট হইলেও কাহার রোগের কথা শুনিলে তিনি যেমন করিয়া হউক দেখিতে যাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার পিতার সেবাধর্ম্ম তিনিও অবলম্বন করিয়া চলিতেন। জীবনময় রায় চির কুমার ছিলেন। কখন কখন তিনি বন্ধুদের গৃহে বাস করিলে কাহারও সেবা গ্রহণে তাঁহার অনিচ্ছা দেখা যাইত। তিনি নিজের রন্ধন নিজেই করিয়া লইতেন এবং অনেক সময়েই কয়েকজন অভাবগ্রস্ত লোককে খাওয়াইবার ভার তিনি লইতেন। এই কারণে কখন কখন দেখা যাইত যে তিনি ও তাঁহার পোষ্যগণ শুধু ডাল ভাত খাইয়া রহিয়াছেন। মৃত্যু কালে জীবনময় রায়ের বয়স কিঞ্চিৎ অধিক বিরাশি বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পূর্ব্বে যখন তাঁহাকে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রাঙ্গনে লইয়া আসা হয় তখন সেখানে বহু লোক সমাগম হয়।

ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরেই তাঁহার আত্মশ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা পরিচালিত একটি অথর্ব্বাশ্রমে নিজের সঞ্চিত সকল অর্থই দান করিয়া গিয়াছেন।

কারখানার শ্রমিক দিগের পেনশন ব্যবস্থা

মাঘমাসের শেষদিনে রাষ্ট্রপতি ভি, ভি, গিরি একটি অর্ডিনান্স জারি করিয়া ভারতের কারখানার শ্রমিক দিগের জন্য একটি পেনশন পদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পেনশন পদ্ধতিতে যদি কোন পেনশন অধিকারি শ্রমিকের পেনসন প্রাপ্তির পূর্ব্বে মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাহার পরিবারের উত্তরাধিকারীগণ মাসিক ৪০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা অবধি মাসহারা পাইবেন। শ্রমিকের জীবদ্দশায় উপার্জ্জনের অনুপাতে পেনশনের পরিমান স্থির করা হইবে। ইহা ব্যতীত শ্রমিকের অকাল মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারের লোকেরা এক কালীন ১০০০ টাকা পাইবেন। ভারতে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র যাহারা তাহাদের এই ব্যবস্থায় কোন লাভ হইবে না। যাহারা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ব্যবস্থায় উপার্জ্জনের শত করা ৮ টাকা ঐ ফাণ্ডে জমা করে শুধু তাহারাই এই পদ্ধতিতে লাভবান হইবে। ভারত সরকার তাহাদের পেনশন ফাণ্ডে তাহাদের উপার্জ্জনের শতকরা 1¹/₆ টাকা দান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি এই পদ্ধতি চালিত হইলে উপকৃত হইবে তাহাদের সংখ্যা হইবে প্রায় ৩০ লক্ষ। অর্থাৎ ভারতের যে সকল মানুষ শ্রম করিয়া দিন কাটায় তাহাদের মধ্যে শতকরা ২ জনেরও কম। ইহাতেও ভারত সরকারকে বাৎসরিক ঐ ফাণ্ডে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা জমা করিতে হইবে। কিন্তু আসল কথা এই যে যদি দরিদ্রতম শ্রমজীবি ও তাহাদের পরিবারের লোকদিগকে জীবন যাপনে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া দিবার চেষ্টা পূর্ণরূপে করিয়া দিতে হয় হইলে ভারত সরকারকে কয়েক শত কোটি টাকা বাৎসরিক জমা করিতে হইবে। আর একটা কথা এই যে দরিদ্রতম শ্রমজীবিগণ নিজেরা প্রায় কোন অর্থই পেনশন বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা করিতে পারিবে না। সুতরাং তাহাদের ও তাহাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিদের জন্যে বিনা কষ্টে ও নিরাপদে জীবন কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া প্রায় অসম্ভব কার্য্য।

বর্ব্বরতায় ফিরিয়া যাওয়া

মানুষ যখন বর্ব্বর ছিল ঃ সভ্য, শোভন ও সুনীতি রক্ষা করিয়া কোন কাজই প্রায় করিতে জানিত না, তখন রাষ্ট্রীয় শক্তি আহরণ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করিবার জন্য একে অন্যকে আক্রমণ করিয়া নিহত বা আহত করিবার চেষ্টা একটা অতি সাধারণ ও সদা প্রচলিত রীতি ছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকিত এবং নানা ভাবে নানা পরিস্থিতিতে ঐ যুদ্ধের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ পরিণামে বহু উলুখড়ের প্রাণ যাইত। এক রাজবংশের সহিত আর এক অভিজাত গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব কখনও শেষ হইত না। গুপ্তঘাতক, বিদ্রোহী, ষড়যন্ত্রকারী, বহিঃশত্রুকে "খাল কাটিয়া" ঘরে ডাকিয়া আনিবার ব্যবস্থাপনা, প্রভৃতি দেশের রাজশক্তিনাশক অপকর্ম্মকারীর অভাব ঘটিত না। অল্প চেষ্টা করিলেই কেহ কাহাকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইত। যুদ্ধ, রাজ্যজয়, শত্রুনিপাত, আন্দোলন, অপপ্রচার তখন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ ছিল। আন্দোলন অপপ্রচার সভ্যতার যুগেও চলিত; কিন্তু সভ্যভাবে চলিত, হৈ হৈ, রৈ রৈ, মার! কাট! করিয়া মহাশব্দে উৎকট জান্তব আবেগের কোন অভিব্যক্তি তাহাতে প্রকট ভাবে দেখা যাইত না। বর্ব্বরতার লক্ষণই হইল অশ্লীল কদর্য্যতার সহিত সকল কিছু করিবার চেষ্টা। সভ্যতা অতি ভয়াবহ যাহা তাহাকেও সাজাইয়া গুছাইয়া লোক সমাজে চালাইয়া লয়। ধরা যাউক প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থার কথা। প্রকাশ্য স্থলে রক্তাক্তভাবে মুণ্ডপাত করিয়াও প্রাণদণ্ড দেওয়া যাইতে পারে আবার লোকচক্ষুর অন্তরালে যাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে তাহাকে নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম্মের কথা শ্রবণ এবং নিজ শেষ

ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দিয়া তৎপরে যথা সম্ভব কদর্য্যতা বর্জ্জিতভাবে নিহত করাও ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সভ্য উপায়। সভ্যতা ও বর্ব্বরতার পার্থক্য তাহা হইলে ঐ শ্লীল ও অশ্লীল শোভন ও কুৎসিৎ এর পার্থক্যের মধ্যে অনেকাংশে নিবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। অতি বড় পাপ কার্য্য করিতে হইলেও যদি তাহা প্রকট ভাবে নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত করা হয় তাহা হইলে তাহার ঘৃণ্যরূপ অনেক অধিক ঘৃণ্য হইয়া দেখা দেয়। মানব সভ্যতার প্রারম্ভ কাল হইতেই কতকগুলি বিশেষ প্রকারের ব্যবহার ও কার্য্য ঘৃণ্য ও কদর্য্য বলিয়া বিচার করা হইয়া আসিয়াছে। মানব সমাজ বহু কালাবধি উন্নতির পথে চলিয়া আসিয়া তাহার সৌন্দর্য্য,সুনীতি ওমানবীয় আদর্শের বিচার কার্য্যে পুরাকালের দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষা করিয়াই চলিয়া আসিতেছে। ১০ জন বলিষ্ঠ যুবক মিলিয়া ধরিয়া যদি একজন বৃদ্ধকে ক্রমাগত ছুরিকাঘাতে শতচ্ছিন্ন-অঙ্গ-ভাবে হত্যা করে তাহা হইলে সেই কার্য্য যে কত কদর্য্য, কুৎসিত ও বর্ব্বর মনোভাবের পরিচায়ক সে কথা কাহাকেও বলিয়া দেওয়ার আবশ্যক হয় না। জনসভার মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করা, গৃহে আবদ্ধ অবস্থায় মানুষকে পুড়াইয়া মারা, মূল্যবান পুস্তকাদি জ্বালাইয়া দেওয়া কিম্বা বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়াকেও কেহ সভ্য ব্যবহার বলিয়া স্বীকার করিবে না। চেঙ্গীস খান ম্যর্ভ সহর দখল করিয়া তিনটি নরমুণ্ডের পিরামিড গঠন করাইয়াছিলেন। প্রথমটি পুরুষের, দ্বিতীয়টি স্ত্রীলোকের ও তৃতীয়টি শিশুদিগের মুণ্ড দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাকে বর্ব্বরতার একটা চূড়ান্ত নিদর্শন বলা চলে। মানব মন যে অমানুষিকতায় কত নীচে নামিতে পারে তাহার কোনও সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। সেই জন্য সময় থাকিতে মানুষের উচিত যথা সম্ভব বর্ব্বরতা ও কদর্য্য অশ্লীলতা ত্যাগ করিয়া ন্যায় ও শোভন সভ্যতার পথ ধরিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা।

দীনবন্ধু চার্লস্ ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজ

১২ই ফেব্রুয়ারী দীনবন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজের জন্মশতবার্ষিকী দিবস। ঐ দিন ভারতের বহু স্থলে সভা করিয়া দীনবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইয়াছে। কলিকাতায় দুইটি সভা হইয়াছিল একটি সেন্টপলস্ গীর্জ্জার প্যারিশ হলে ও অপরটি মহাজাতি সদনে। প্রথমটিতে সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং উদ্বোধন করেন বাংলার রাজ্যপাল ধাবন। দ্বিতীয়টিতে ছিলেন আচার্য্য কৃপালানী ও আরও অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি। প্রথম সভাতে গ্রেটবৃটেনের পক্ষ হইতে গ্রেটবৃটেনের ডেপুটি হাই কমিশনার ও অষ্ট্রেলিয়ার দিক হইতে অষ্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাইকমিশনার অতি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ এবং সারগর্ভ ভাষণ দিয়াছিলেন। রাজ্যপাল ধাবনের ভাষণে তিনি দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের মানবতা ও মহত্বের কথা সকলকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

অ্যাণ্ড্রুজ যেরূপ ভারতকে নিজের দেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ভারতবাসীগণও সেইরূপ অ্যাণ্ড্রুজকে নিজেদের আপনজন বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন। যশ, অর্থ, শক্তি, প্রতিষ্ঠা, কোনও কিছুর কথা কদাপি ক্ষণিকের জন্যও চিন্তা না করিয়া অ্যাণ্ড্রুজ নিজ জীবনের অধিকাংশকাল ভারতে ভারতবাসীর সেবাতে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। যখন তিনি বাহিরে গিয়াছেন তখনও তাঁহার প্রাণে মনে ঐ একই চিন্তা চির জাগ্রত থাকিত—কেমন করিয়া দুঃখী দুস্থজনের দুঃখ দূর হইবে, অসহায় সাহায্য লাভ করিবে, উৎপীড়িতের লাঞ্ছনার অবসান হইবে, ক্ষুধার্তের খাদ্যের, বস্ত্রহীনের বস্ত্রের, গৃহহারার গৃহের রোগীর চিকিৎসার ও অজ্ঞজনের শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। তিনি নিজের শেষ কপর্দক পর্য্যন্ত দীনদুঃখীদিগকে দিয়া রিক্তহস্তে নিজ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। বহু সময় তিনি নিজ অঙ্গের বস্ত্র খুলিয়া বস্ত্র হারার অঙ্গে পরাইয়া দিয়াছেন; নিজ শয্যাবস্ত্রও অপরকে দিয়া নিজে [illegible] কাঠে শুইয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন। দীনবন্ধুর হস্তে বহু অর্থ আসিত ও তিনি সেই অর্থ শান্তিনিকেতনে, নয়ত

গান্ধী আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া পুনরায় নিজ সেবাধর্মে আত্মনিয়োগ করিতেন। যে মানুষ পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদৃত হইতেন তিনি কখনও একদিনের জন্যও নিজের সুখ সুবিধার কথা ভাবেন নাই, এরূপ অত্যাশ্চর্য্য নিঃস্বার্থ চরিত্রের কথা কে কোথায় কবে শুনিয়াছে? ভারতে যিনি সর্ব্বদাই গোখলে, লাজপত রায়, মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্য করিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, যাঁহার প্রতি বিরূপভাব থাকিলেও যাঁহাকে ভারতের উচ্চতম রাজপ্রতিনিধিগণ চাহিবামাত্র মন্ত্রণা কক্ষে আনিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিতে ব্যাগ্রতা প্রদর্শন করিতেন, সেই মানুষ কোনও ভাবে কখনও নিজের সুখ, নিজের প্রভাব, নিজের যশ বৃদ্ধি চেষ্টা করেন নাই ইহা আমরা দীর্ঘকাল সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই মানুষে সম্ভব বলিয়া জানি। ঋষি তুল্য ঋষি প্রকৃতি নিঃস্বার্থ মানব সেবক শুদ্ধ চরিত্র চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজকে সকলে বলিত সি, এফ, এ —ক্রাইষ্টস ফেথফুল অ্যাপশল—খৃষ্টের বিশ্বস্ত আধ্যাত্মিক প্রতিভূ। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার অতি সুন্দর পরিচয় বলা যায়। তিনি খৃষ্টের আদর্শেই সর্ব্বত্যাগী ও সেবাকার্য্যে পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেন। পূত চরিত্র দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ভারতবাসী সাধারণ একটি মহা কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন।

পাকিস্থানে উন্মত্ত ব্যবহার

পাকিস্থান এখন যে পথে চলিতেছে তাহা স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় ভাবের পথ নহে। আকাশ পথে চলন্ত বিমান দস্যুতা করিয়া অপহরণ এবং পরে সেই বিমান ধ্বংস করিয়া, বিষয়টা একটা নির্দ্দোষ স্বাধীনতালাভ চেষ্টা মাত্র প্রমাণ করিবার আয়োজন, উন্মত্ততা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? পাকিস্থানের বিমানগুলি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে পাক-রাজ্য গমনকালে ভারতের উপর দিয়া যাইত। এই দস্যুতার পরে ভারত সরকার ঐরূপ গমনাগমন বন্ধ করিয়া দেওয়ায় এখন পাক বিমানগুলি সিংহল ঘুরিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। পাকিস্থান ইউ, এন্ এর দরবারে নালিশ করিয়াছে যে ভারত তাহার যে ক্ষতি করিয়া দিতেছে তাহা আন্তর্জাতিক চুক্তি বিরুদ্ধ; সুতরাং ভারতকে পাকিস্থানের ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে। এইরূপ নালিশ হইতেও পাকিস্থানের মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। পাকিস্থান চোরাই বিমান লাহোরে নামিতে দিয়া এবং চোর দিগকে রাষ্ট্রীয় ভাবে আশ্রয় দিয়া যে উক্ত বিমানের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেদের হস্তে লইয়াছিলেন সে কথা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। কিন্তু পাকিস্থানের মতে চোরাই বিমানের কি হইবে তজ্জন্য তাহারা দায়ী নহে। চোর দিগকে আশ্রয় তাহারা দিবে কেননা ঐ চুরী কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত জড়িত। তাহাই যদি হয় তাহা হইলে পাকিস্থান কাশ্মীরের তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার ও ঐ সংগ্রাম বর্ত্তমানে বিমান চুরি দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং যখন ভারত ও পাকিস্থান যুদ্ধে লিপ্ত তখন পাকিস্থানের সহিত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি এখনকার মত খারিজ হইয়া রহিয়াছে। পাকিস্থানের ক্ষতিপূরণের দাবি তাহা হইলে গ্রাহ্য হইতে পারে না। এবং ভারতের উচিত পাকিস্থানের সহিত রাষ্ট্রীয় সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া।

বাংলা কথাসাহিত্যে আধ্যাত্মিক চেতনা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যে অন্য আরো অনেক অভিনবত্বের মতো আধ্যাত্মিকতার প্রথম প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র। রোমান্স রচনার জগতে তাঁর পূর্বসূরী স্কট, ডুমা প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য এই যে, তিনি শুধু চিত্তরঞ্জক কাহিনী বলাকে সাহিত্যসৃষ্টির চরম সার্থকতা ব'লে মনে করতেন না। গল্প বলাই কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এ-কথা তিনি কখনও স্বীকার করেন নি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাই তাঁর মহৎ জীবনদর্শন বা weltanschaung (ভেলটআনশাউউং) লক্ষ্য করে সশ্রদ্ধভাবে লিখেছিলেন :—

"বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের ও জগদ্বিধানের এই সমস্যা—এই গোড়ার কথা—অতি সুন্দর চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন এবং এই জন্য তিনি উচ্চ শ্রেণীর কবি।... যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিস বাংলাদেশে অচল।...বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটা জিনিসকে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই কয়টা জিনিস বাংলাদেশে চলিতেছে।"

এই জিনিসগুলির অন্যতম হল বাংলা কথাসাহিত্যে উচ্চতম মানসিকতা অর্থাৎ অধ্যাত্মচিন্তার প্রবর্তন ; এদিক থেকে বিশ্বের রোমান্সসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ভিক্টর হ্যুগোর সগোত্র। বাংলা সাহিত্যে এ-পথে তাঁর শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ উত্তরসাধক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে আধ্যাত্মিক চেতনায় অনুপ্রাণিত শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক দিলীপকুমার রায়। বাংলা কথা সাহিত্যে ভাবধারার বিবর্তন ও গতি মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করার প্রয়োজন আছে। বাঙালির জাতীয় সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে হলে তার আত্মিক বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে গেলে অধ্যাত্মিক শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রথম থেকেই সন্ন্যাসী-চরিত্রের প্রভাব খুব বেশি দেখা যায় ; অলৌকিক ও অতি প্রাকৃতের অবতারণাও তাঁর উপন্যাসে প্রচুর। কিন্তু পাশ্চাত্য উপন্যাসের অনুকরণে এই অলৌকিকতার প্রয়োগ বা Treatment of the Supernatural ঠিক অধ্যাত্মিকতা নয়। অতি প্রাকৃতের দ্বারা বাস্তব জীবন-সমস্যার সমাধান কদাচিৎ পাওয়া যায়। জীবনের সকল সমস্যার মৌল সমাধান আহরণ করাই আধ্যাত্মিকতার উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিকতার লক্ষ্য জীবনকে বর্জন না ক'রে তার একটা দিব্য ভাবের রূপান্তর নিয়ে আসা। সুতরাং অধ্যাত্মবোধ অবাস্তব কোন কিছুকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয় না, বরং বাস্তব সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণ করে-জীবন চেতনার মর্মমূলে সক্রিয় হওয়াই তার লক্ষ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের একেবারে প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিকতার সুপ্রয়োগ থাকলেও গভীর অধ্যাত্মবোধের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাস দুটি থেকে। সমালোচক মাত্রই স্বীকার করেন যে, এই উপন্যাসদুটিতেই বঙ্কিম সব

চেয়ে বেশি বাস্তববোধ অনুপ্রাণিত হয়ে লেখনী চালনা করেছেন। আর কতকটা সেই জন্যে জীবনের তীব্রতম সমস্তা-সঙ্কুলতার সমাধানকল্পে তাঁকে খানিকটা অধ্যাত্ম-ভাবনাভাবিত হতে হয়েছে। নিজের প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে সচেতন না হলে মানুষ এমনকি তার বহির্জাগতিক ঐন্দ্রিয়িক সত্তার সমস্তাগুলিরও স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। আর নিজের প্রকৃত সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার প্রয়াসের নাম অধ্যাত্মভাবনা। সেই উপলব্ধির দ্বারা জীবনের বহিরঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার নাম দিব্য রূপান্তর—The Life Divine। শ্রী অরবিন্দ ঠিক এই কথা বলতে চেয়েছিলেন এই উক্তির দ্বারা : From within outside, is, indeed the rule। তিনি যে মুগ্ধচিত্তে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষিউপাধি দিয়েছিলেন তার কারণ, বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমই সর্বপ্রথম অন্তঃপুরুষের চেতনার দ্বারা বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রণের কথা তাঁর উপন্যাসেই ব্যক্ত করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বিষবৃক্ষে লিখেছিলেন : "তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না, তিনি সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার-আলো কুপথ-সুপথ সব সমান।...শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশুসন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাহারা পরোপকারী পরপ্রেমে বলবান, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।" এখানে অধ্যাত্ম-বোধের নৈতিক বলের দিকটা দেখানো হয়েছে। চন্দ্র-শেখর উপন্যাসে লেখকের আধ্যাত্মিক ধারণা সুপরিণত হয়ে যে-রূপ নিয়েছে তার সঙ্গে পরবর্তীকালে বিভূতি ভূষণের উপন্যাসের একটি অধ্যাত্মভাবনার বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। এর মধ্যে যদি কেউ জার্মান দার্শনিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) এর প্রভাব খুঁজতে যান তাহলে তিনি ঠকবেন। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের আত্মিক উপলব্ধিসমূহ তাঁদের অন্তর্মুখী ভাবসাধনার [illegible]পুরস্কার। আমাদের দেশে হেগেলের মতবাদ নিয়ে অনেকে বেশ বাড়াবাড়ি করেন। তাঁদের ধারণা, দ্বন্দ্ব-সমন্বয়বিষয়ক মতবাদের প্রবর্তক হেগেল খুব গভীর ভাবের ভাবুক। তাঁদের জন্যে বিবেকানন্দের এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :—

"অনন্তস্বরূপ—Hegel's Absolute Mind, আপনাকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সত্য হইলে অনন্ত যথাকালে আপনাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব, নিরপেক্ষাবস্থা বিকাশিতাবস্থা অপেক্ষা নিম্নতর; কারণ, বিকাশিতাবস্থায় নিরপেক্ষস্বরূপ আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। যতকাল অনন্তস্বরূপ আপনাকে সম্পূর্ণ বহির্নিক্ষেপ করিতে না পারিতেছেন, আমাদিগকে ততকাল এই অভিব্যক্তির উত্তরোত্তর সাহায্য করিতে হইবে। ইহা অতি শ্রুতিমধুর এবং আমরা অনন্ত, বিকাশ, ব্যক্তি প্রভৃতি দার্শনিক শব্দও ব্যবহার করিলাম। কিন্তু সান্ত কিরূপে অনন্ত হইতে পারে, এক কিরূপে দুই কোটী হইতে পারে; এ সিদ্ধান্তের ন্যায়ানুগত মূল ভিত্তি কি, তাহা দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা সোপাধিক হইয়াই এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এ স্থলে সকলেই সীমাবদ্ধ থাকিবেই। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির মধ্য দিয়া আসিবে তাহাকে স্বতই সীমাবদ্ধ হইতে হইবে। অতএব, সসীমের অসীমত্বপ্রাপ্তি নিতান্ত মিথ্যা। ইহা হইতে পারে না।"

এখন দেখা যাক বঙ্কিমের জগৎদর্শন চন্দ্রশেখরে কি রূপ ধারণ করেছে এবং হেগেলের তুলনায় তাঁর অধ্যাত্ম-চিন্তা কতটা পরিণত :—

"দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ-দুঃখ-তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চির-দুঃখী বলিতে হয়। যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি এই দুঃখময় অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখরাশি অনাদি অনন্ত কালাবধি হৃদয়মধ্যে অবশ্য অনুভূত করেন। তিনি কি সেই দুঃখরাশি অনুভূত করিয়া দুঃখিত হন না? তবে দয়াময় কিসে? দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ—দুঃখ

না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? যিনি দয়াময়, তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্তকাল দুঃখী—নচেৎ তিনি দয়াময় নহেন। যদি বল, তিনি নির্বিকার, তাঁহার দুঃখ কি? উত্তর এই যে, যিনি নির্বিকার, তিনি সৃষ্টিস্থিতিসংহারে স্পৃহাশূন্য—তাঁহাকে স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া মানি না। যদি কেহ স্রষ্টা বিধাতা থাকেন, তবে তাঁহাকে নির্বিকার বলিতে পারি না—তিনি দুঃখময়। দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহ সৃষ্টির দুঃখ নিবারণে নিযুক্ত। সংসারে সেই দুঃখনিবৃত্তিতে ঐশিক দুঃখেরও নিবারণ হয়।"

বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরূপ :—

"এই সুখও যতখানি, দুঃখও তাহার সমপরিমাণ। যতখানি সুখ ততখানি দুঃখ। ইহাই মায়া। আর যদি আমরা মনে করি—একজন সগুণ ঈশ্বর আছেন, যিনি ঠিক মানুষেরই মতো, যিনি সব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ যে সকল ব্যাখ্যা মত প্রভৃতি, যাহাতে বলে —মন্দের মধ্য হইতে ভালো হইতেছে—তাহা পর্যাপ্ত হয় না। হউক না শত শত সহস্র সহস্র উপকার—মন্দের মধ্য দিয়া উহা কেন আসিবে? সুতরাং ইহা কোন যুক্তি হইল না। কেন মন্দের মধ্য দিয়া ভালো হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কিন্তু এই প্রশ্নের তো উত্তর দেওয়া যায় না।"

বিভূতিভূষণ তাঁর অনুপম ভঙ্গিতে সমস্যাটির আলোচনা করেছেন এইভাবে যার সঙ্গে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক টয়নবি সাহেবের মতেরও অদ্ভুত মিল আছে :—

"এ সব কথা বলে কি কিছু বোঝান যায়? মনে হল কোথায় যেন একজন পথিক আছেন। ঐ নীল আকাশ, ঐ রঙিন মেঘমালা, এই কলরবপূর্ণ জীবনধারার পেছনে তিনি চলেছেন…চলেছেন…কোথায় চলেছেন নিজেই হয় তো জানেন না। তাঁর কোন সঙ্গী নেই, তাঁকে কেউ বোঝে না, তাঁকে কেউ ভালোবাসে না। অনাদি অনন্তকাল ধরে তিনি একা একা পথ চলেছেন। এই দৃশ্যমান বিশ্ব, এদের সমস্ত সৌন্দর্য—তিনি আছেন বলেই আছে। আমি তাঁকে ছোট ক'রে দেখতে চাইনে। তাঁকে নিয়ে পুতুলখেলার বিরুদ্ধে ছোটবেলা থেকে আমি বিদ্রোহ ক'রে আসছি। তিনি বিরাট, সমগ্র মানবজাতি যুগে যুগে তাঁকে উপলব্ধির পথে চলেছে।"

পুত্র ফিলিপ টয়নবির সঙ্গে আলোচনা-কালে পিতা আর্নল্ড টয়নবিও এই কথাই বলেছেন স্বয়ং ঈশ্বরের অনাদি অনন্ত যাত্রাপথের সম্বন্ধে।

ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে জীবনসমস্যার সমাধান খোঁজার নামই আধ্যাত্মিকতা ; কারণ, ঈশ্বরই আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃত স্বরূপ। এ-বিষয়ে কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্র পথনির্দেশ দিয়েছেন এই ভাবে :—

"আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন। বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।……বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। ……সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায়? কদাপি না। ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই।"

আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জীবনের দুঃখ-কষ্টেরও শ্রেষ্ঠ সমাধান পাওয়া যায়,এ-কথা শুনে বিদ্রূপে নাসা বা ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করার মতো সুশিক্ষিত লোক সর্বকালে সর্ব দেশে সুলভ ; "রজনী" উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র শচীন্দ্র-সন্ন্যাসী সংলাপে ঐ শ্রেণীর লোকদের মনোভাবের যোগ্য উত্তর দিয়েছেন। মানসিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার পার্থক্যও সেখানে সহজ ও সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে। গানের মধ্যে ভক্তি সঙ্গীতই যে শ্রেষ্ঠ, সে কথাও বঙ্কিম নির্ভয়ে ঘোষণা ক'রে গেছেন। ঐ উপন্যাসেই অমরনাথের কথায় ভক্তহৃদয়ের যে আর্তি ব্যক্ত হয়েছে তার কোন তুলনা কোথাও নেই :—

"তোমার অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটিতোন্মুখ হৃদপদ্মই তোমার প্রমাণ—ইহাতে তুমি আরোহণ কর। তুমি নাই? না থাকো, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি তাহা লইবে না? তুমি লইবে। নহিলে এ-কলঙ্কের ভার আর কে পবিত্র করিবে?"

রজনীর পরের উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যাত্মচিন্তা সুব্যক্ত—পাঠকদের কাছে সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ না দিলেও চলে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যে ঈশ্বরভাবনা সূক্ষ্ম ও প্রকট উভয়ভাবে বিরাজিত। তাঁর ঈশ্বরভক্তি বা ঈশ্বরবিশ্বাস বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও শক্তিমানের বিশ্বাস, দুর্বলচিত্ত ভাবকের অন্ধ উচ্ছ্বাসমাত্র নয়। নির্মমভাবে এ-কথা বলতে তাঁর বাধে নি যে :—

"বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম? সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে—উহা অর্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি অনন্ত শক্তিময়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা কথাসাহিত্যে অধ্যাত্মভাব-রস অনেক লেখক-লেখিকার মধ্যেই দেখা গেল। মহিলা লেখিকাদের মধ্যে শৈলবালা ঘোষজায়ার "বিপত্তি" সম্ভবত প্রথম এমন একটি উপন্যাস যা সমস্তটাই আধ্যাত্মিক-সাধনাকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করে লেখা। বইটি অতি সুখপাঠ্য। নিরুপমা দেবীর "অনুকর্ষ" উপন্যাসেও কিছু কিছু ভক্তি-ভাবনার পরিচয় আছে। পুরুষ লেখকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ক্ষীরোদপ্রসাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ উপন্যাসে ভিন্ন অন্যত্র আধ্যাত্মিক চেতনার কোন প্রকাশ দেখা যায় না। ক্ষীরোদপ্রসাদের গুহামুখে, গুহামধ্যে, নিবেদিতা ও পুনরাগমন উপন্যাস চারটিতে অধ্যাত্মবোধ ও ধর্মচিন্তা বেশ কিছু আছে। কিন্তু তাঁর রচনায় সংস্কারান্ধতা যত প্রবল, সত্য অনুভূতি তেমন নেই। এক সময়ে এক শ্রেণীর সাহিত্যরসিক তাঁকে ঐ উপন্যাসগুলির জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও বড় সাহিত্যিক বলতেন। ১৩৪১ সালে হিন্দু স্কুলের বাংলা শিক্ষক রামরেণু আচার্য প্রকাশ্যে বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের বাংলা পড়াতে পড়াতে অসঙ্কোচে বলেছিলেন যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদকে বড় ঔপন্যাসিক মনে করেন। এই বিচিত্র মানসিকতার কারণ ব্যাখ্যা ক'রে দিলীপকুমার রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, "অনেকে বলেন যে, অমুক বাঙালি নাট্যকারই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিক। যুক্তি জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উত্তর দেন যে, বর্তমান বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে এক তাঁর মধ্যেই য়ুরোপের প্রভাব বিন্দুমাত্রও প্রতিফলিত হয়নি। আমার সত্যিই আশ্চর্য লাগে যখন আমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকের মুখেও অম্লানবদনে এরূপ যুক্তি প্রযুক্ত হতে শুনি। এহেন কূপমণ্ডূকতা বোধ হয় আমাদের দেশে যে-রকম নির্বিচারে হাততালি পায় অন্য কোনো সভ্য দেশে সেভাবে পেতে পারে না, পারে কি?" ১৯২৫ সালের ২৯ শে মার্চ তারিখে দিলীপকুমারের এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :—

"যদি বাঙালীর বিরুদ্ধে কেউ এ অভিযোগ আনে যে, তার মনের উপর য়ুরোপীয় সভ্যতা সব আগে প্রভাব বিস্তার করেছে তাহলে আমি তাতে বিন্দুমাত্রও লজ্জা পাই না, বরং গৌরব বোধ করি। কারণ এই-ই তো জীবনের লক্ষণ। হাজার প্রমাণ দাও না যে, বিজয়-বসন্ত বাংলার বিশুদ্ধ কথা—সাহিত্য, বঙ্কিমের নভেল বিশুদ্ধ বঙ্গীয় বস্তু নয়—তবু বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা বিজয়-বসন্তকে ত্যাগ ক'রে বিষবৃক্ষকে গ্রহণ করার দ্বারাই প্রমাণ করছে যে ইংরেজি সাহিত্যাভিসার

বঙ্কিমের নভেল বাংলার প্রাণের জিনিষ।" (সাপ্তাহিকী, ১৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা, বঙ্গবাণী পত্রিকা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।)

ক্ষীরোদপ্রসাদ তখন জীবিত; তিনি পুরাতন রক্ষণশীল সমাজের সব প্রথাকেই আলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তির মহিমায় মণ্ডিত ক'রে দেখাবার চেষ্টা করছিলেন তাঁর পূর্ব-বর্ণিত উপন্যাসগুলিতে। যোগাযোগে বিপ্রদাস ও কুমু-র সঙ্গীত অনুশীলনের বর্ণনায় মীরা-র ভজন-গুলির উল্লেখের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ যে শান্তশুচি অধ্যাত্মশ্রী রচনা করেছেন, তা সৃষ্টি করার সামর্থ আবেগপ্রবণ সংস্কারবদ্ধ ক্ষীরোদপ্রসাদের ছিল না। কিন্তু তাঁর "পুনরাগমন" উপন্যাসের একটি বর্ণনা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ব্যঞ্জনায় বিশেষ উপভোগ্য :—

"পিতামহের মুখে দামোদরের নাম শুনিবামাত্র প্রদীপ্ত পাঠকের মতো সেই স্বপ্নচিত্র আমার স্মৃতিমুখে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে এক মর্মস্পর্শী আবেদন—যেন বহু দূর হইতে উচ্চারিত এক অতি সূক্ষ্ম স্বর আমার শ্রবণবিবরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। "গোপীনাথ, জল দে। আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।"

"দে, দে, গোপীনাথ। জল দে।" আমার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দামোদরের আবেদন ধ্বনিয়া উঠিল। উঃ, দামোদরের অঙ্গ এত উষ্ণ। "দে, দে, গোপীনাথ। পুড়িয়া মরি, জল দে।" গৃহের চারিদিক হইতে অসংখ্য কলরবে যেন ধ্বনি উঠিতেছে। আমি সেই ধ্বনির তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তাঁহার আদেশানুযায়ী আমি সেই জল দামোদরের অঙ্গে নিক্ষেপ করিলাম। দেখিতে দেখিতে এক স্বর্গীয় সৌরভময় ধূমে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

দামোদরকে যথাস্থানে রক্ষা করিলাম ও তাঁহার চরণামৃত লইয়া দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া গৃহ হইতে আমি বহির্গত হইলাম। বুঝিলাম, গোপাল বাঁচিয়াছে।

বৃদ্ধপিতামহ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গোপীনাথ। তোমাদের গোপাল যমপুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।" দুর্বল বাহুযুগলে গোপাল আমার কণ্ঠদেশ বেষ্টিত করিল।

আমাদের হৃদয়ের উত্তাপে ছাদিগ্রহিত দামোদর নিত্য দগ্ধ হইতেছে—সে থাকিয়া থাকিয়া কাতরকণ্ঠে বলিতেছে—"দে, দে, জল দে—আমি পুড়িয়া মরি, জল দে।"

দিলীপকুমার পরবর্তীকালে এই ধরনের "অঘটন"এর কথাই তাঁর অঘটন বর্গীয় উপন্যাস ও গল্পগুলিতে লিখেছেন।

বিশুদ্ধ অধ্যাত্মকাহিনী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস প্রথম লিখেছিলেন শৈলবালা, তারপর বিভূতিভূষণ। শৈলবালার "বিপাশ" বেদান্ত-সাধকের ব্রহ্মচারী-জীবনের মনোজ্ঞ কাহিনী। বিভূতিভূষণের "দেবযান" পারলৌকিকতার চরম। প্রেততত্ত্বে লেখকের বিপুল অভিজ্ঞতা এ-উপন্যাসে বর্ণিত। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় এর অনুকরণে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন; সেটি রচনানৈপুণ্যের অভাবে নিকৃষ্ট ধরনের। বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মচেতনার মহত্ত্ব এই যে, তা বড়লোকের ভাব-বিলাস নয়, জীবনের কাঁটাপথে চলতে চলতে হোঁচট-খাওয়া ক্ষতপদ পথিকের রক্তঝরা বেদনার সাক্ষ্য বহন করে ঐ দিব্য শান্ত কল্যাণময় অনুভবসমূহ। দুঃখী, দরিদ্র, ক্লিষ্ট মানুষদের চোখের সামনে শান্তির ধ্রুবতারা জ্বালিয়ে দিয়েছেন লেখক তাঁর অমৃতবর্ষী লেখনীর সাহায্যে। দৃষ্টি প্রদীপ ও ইছামতী উপন্যাসে উচ্চতম বৈদান্তিক ও ঔপনিষদ অনুভূতির সহজ স্ফুরণময় বর্ণনা পড়ে মুগ্ধ হতে হয়। দারিদ্র্যের বিবর্তিত পটভূমিতে এমন প্রশান্তির ফসল ফলে যে মহৎ চেতনায় তাকে সাধুবাদ না দিয়ে উপায় নেই।

বিভূতিভূষণের পরে দিলীপকুমার রায় শুধু যে পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক উপন্যাস লিখেছেন তাই নয়, ১৯৩৮ সাল থেকে "তরঙ্গ রোধিবে কে?" উপন্যাসের পর থেকে তাঁর সব উপন্যাসই অধ্যাত্মজীবনকে বিষয়-

স্বতরূপে গ্রহণ ক'রে লেখা। এমনভাবে আর কোন লেখক কথাসাহিত্যে দিব্যচেতনা রূপায়ণের কাজে আত্মনিয়োগ করেননি। বিভূতিভূষণের যা বলার ছিল কিন্তু অধ্যায়-র জন্যে বলতে পারেন নি, তাকে দিলীপকুমার পূর্ণতা দিয়ে চলেছেন বললে অত্যুক্তির সম্ভাবনা নেই। বিভূতিভূষণের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত অধ্যাত্মচেতনাকে সমাজের সর্ব স্তরে প্রসারিত করার জীবনব্যাপী ব্রত নিয়েছেন দিলীপকুমার। বিশেষত তাঁর "প্রেমল বৈরাগী" আর "পতিতা ও পতিতপাবন" উপন্যাসদুটির তুলনা মেলা ভার।

বাইরের জীবনে অনেক প্রভেদ থাকলেও অন্তঃপ্রকৃতিতে বিভূতিভূষণের সঙ্গে দিলীপকুমারের কতকগুলি ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। দু জনেই উদাসীন, ভ্রাম্যমান, অধ্যাত্মভাবের ভাবুক, সংস্কারমুক্ত, ধর্মীতী, এবং ভক্তস্বভাব। বিভূতিবাবু মীরার ভজনের অনুরাগী ছিলেন। রাহানা দেবীর লেখা ভক্তি-গীতি দিলীপকুমারের কণ্ঠে শুনে তাঁর উচ্ছ্বাস এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :—

"কাল রাত্রে দিলীপ রায়ের গান শোনার নিমন্ত্রণ ছিল। দিলীপ আসতে বড় দেরি করল। এল যখন প্রায় রাত ন'টা। বড় সুন্দর লাগল আব্বাস তায়েবজির মেয়ের (রাহানা বেন তায়েবজি) সেই হিন্দি গানের অনুবাদটা—দিলীপের মুখে সেদিন যেটা থিয়েটার রোডে শুনেছিলুম। কাল ওর মেজাজ আরো ভালো ছিল, কি চমৎকারই গাইলে।" (উৎকর্ণ, ৪৯ পৃষ্ঠা।)

বিভূতিভূষণ ও দিলীপকুমারের সম্প্রীতি ছিল পারস্পরিক। বিভূতিভূষণের পরলোক গমনের আগেই দিলীপকুমার সাতটি আধ্যাত্মিক উপন্যাস রচনা করেন; অনেকগুলি ছোট গল্পও তিনি লিখেছিলেন তাঁর আশ্রম-জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম আধ্যাত্মিক উপন্যাসের একটি বর্ণনা কবিত্বময় অধ্যাত্মবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বর্ণনাটি এক সন্ন্যাসীর :—

"দুটি পাতলা ঠোঁটের প্রান্তে মৃদু হাসির এক-টুকরো ছোট্ট আভা চমকে চমকে বেড়ায়—ভোরবেলার কিশলয়ের মধ্যে যেমন সূর্যের আলো। কিন্তু সবচেয়ে অভাবনীয় তাঁর চোখ দুটি। অমন চোখ আমি জীবনে কখনো দেখি নি। মনে হল তাঁর জ্যোতির্ময় দেহখানির সমস্ত আগুন যেন মণির স্নিগ্ধতা নিয়ে ফুটে উঠতে চায় তাঁর নয়নতারার সাগরমৌনে। সাগর বলতে সচরাচর আমাদের মনে আসে কল্লোলের কথা। এ-কল্লোলধ্বনি উচ্ছল তাও মানি। কিন্তু যে-ই কান পেতে শুনেছে সে নিশ্চয় অনুভব করেছে যে, সমুদ্রের এই অঘোর ধ্বনি হৃদ্‌কায় তার জলগর্ভের এক অতল নীরবতার উৎস থেকে। অন্তত শব্দের মধ্যে নৈঃশব্দ্যের এ-নিশ্চিত সমাহিতি আমি সাগরতীরে বারবারই অনুভব করেছি। মনে হয়েছিল জীবনের সব স্বতোবিরোধ যেন গ'লে ডুবে ম'জে গেছে ঐ সিন্ধুমৌনে—তাঁর দুটি চোখের ভাষাহারা ধ্বনিপারের শান্তিলোকে। সে-চোখ প্রথম প্রণয়িনীর আধ-লাজুক আধ-উজ্জ্বল আঁখিরআলোর চেয়েও শিহরণময়, শিশুর চঞ্চল নিকলুষ চাহনির চেয়েও শুভ্র, রোগশয্যায় পীড়িত সন্তানের দেহাশ্রয়ী মায়ের অভয়দৃষ্টির চেয়েও করুণাভরা, আকাশে প্রথম তারার আধফোটা কিরণের চেয়েও সুদূরান্বেষী।"

এ-বর্ণনা সেই লোকটির যাঁর চোখ সম্বন্ধে কবি ব্রাউনিঙের পৌত্র অসবোর্ণ ব্রাউনিং বলেছিলেন : জোয়ান অব আর্ক যদি শুনে থাকে স্বর্গের বাণী, তবে অরবিন্দ নিশ্চয়ই দেখে স্বর্গের আলো।

ঐ "আশ্চর্য" উপন্যাসেই অন্যত্র লেখকের একটি অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায় যা বিভূতিভূষণের "দৃষ্টিপ্রদীপ"—এর নায়কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় :—

অমনি মনে হল যে শুধু তিনি আমাদের সবার সাথী নন—তিনি আছেন বলেই আকাশের প্রতি তারা আমার সাথী, চাঁদ আমার সাথী, ঝিলম আমার সাথী, ঐ পাহাড়ের হাজারো তৃণ লতা ফল ফুল কে সাথী

নয়?—এ-সংসারে একলা কে? ঐ যে তারা চাঁদ গ্রহ উপগ্রহ সবাই একলা পথে চলছে ব'লে কি বলব ওরা নিঃসঙ্গ? কত অদৃশ্য আকর্ষণ বিকর্ষণ ওদের ধরে রয়েছে তাই না ওরা চলে? না, স্পষ্ট মনে অনুভব করলাম যে, শূন্যের পিছনে এক পরম অবলম্বন সদা সজাগ। নইলে এ-নিরাকারে আকারের সমারোহ এলো কোথা থেকে? এ-দেহ জড়পিণ্ড কে বলে? এ যে বিদ্যুৎ-চঞ্চল প্রভাময়। এ তো খাঁচা নয়—এ যে সেই দেবতার পুণ্যপীঠ যাঁর চোখের প্রতি চাউনিতে জ্বলে সূর্যের প্রদীপ, যাঁর কণ্ঠের প্রতি মিড়ে বাজে প্রেমের বাঁশি, যাঁর পায়ের প্রতি চমকে মন্দ্রিত হয়ে ওঠে প্রাণের লাস্য।"

আশ্চর্য-বর্গীয় উপন্যাসগুলি ১৩৪৬ সালে লেখা শেষ হয়ে যায়। এরপর নানা কারণে দিলীপকুমার দীর্ঘকাল কোন উপন্যাস লেখেন নি। অকস্মাৎ ১৩৫৬ সালে তিনি আবির্ভূত হলেন তাঁর অঘটন আজো ঘটে উপন্যাস নিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি পেলেন বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা।

উপন্যাসশিল্পের দিক দিয়ে বিচার করলে দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা যে দুই খণ্ডে সমাপ্ত ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত "তরঙ্গ রোধিবে কে?" উপন্যাসটি, সে-বিষয়ে তর্কের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু কেন 'অঘটন' গ্রন্থমালা সমাদৃত হল, সেটা বিচার্য।

তরঙ্গ রোধিবে কে-তেই প্রথম অধ্যাত্ম উপলব্ধির বিবরণ আছে যদিও উপন্যাসটি মুখ্যত রোমান্স এবং রোমান্টিক প্রেম-কাহিনীই বটে। সেখানে যে অধ্যাত্ম-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় তা সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় এবং কতকটা যৌগিক। তা সাধারণ পাঠকের বোধশক্তির অতীত। একটু নমুনা দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে:—

"নিজের দেহ নেই তার। দেহের জায়গা জুড়েছে—কী বলবে সে? বলা যায় না।—এক তীব্র আনন্দঘন চেতনা......সাক্ষী চেতনা কোন্ এক উদ্ভাসিত সত্তার। সে-সত্তা শুধু ঐ স্ফটিক নীল আকাশকেই দেখছে না, দেখছে নিজেকেও। দেখছে বললেও ভুল হবে। নিজেকে যেন অনুভব করছে। আর কী গভীর আনন্দ সে অনুভবে! কী এক চিন্ময় চেতনা থেকে যেন উচ্ছলিত রসধারা বর্ণস্রোত হয়ে চলেছে ঐ আকাশে।. শুভ্র আকাশ···নির্মল আকাশ···নেই তারা, নেই মেঘ, নেই চাঁদ, নেই সূর্য, তবু যেন স্বয়ংদীপ্ত স্বয়ংস্বচ্ছ।"

প্রায় এই রকম বিবরণ বিভূতিবাবুর লেখাতেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। এ সব হল যোগীর ধ্যানজ উপলব্ধি; যাঁরা কখনও ধ্যানে বসে চেতনাকে মাথার ওপরদিকে নিয়ে যেতে পেরেছেন, তাঁরা তরঙ্গ রোধিবে কে-র বিভিন্ন যোগানুভূতির বিবরণের মর্ম বুঝবেন, অন্যেরা ভাববেন: এ হল হেঁয়ালি কিম্বা জটিল কবি-কল্পনা।

তবু মানতে হবে যে, বাংলা কথা-সাহিত্যে দৃষ্টি-প্রদীপ আর তরঙ্গ রোধিবে কে-তে আধ্যাত্মিক চেতনা সবচেয়ে সুমার্জিত অথচ শিল্পসম্মত উপায়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্কিমের সন্ন্যাসী-প্রীতি দিলীপকুমারেও অব্যাহত আছে। অমরনাথের আত্মানুসন্ধান জিতুর মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে মলয় ও অসিতের উপলব্ধিতে পরিণতি লাভ করেছে।

সাধারণ পাঠকের চিত্ত জয় করার যে-কৌশল অঘটন পর্যায়ে দেখা গেল তার রহস্য এই যে, এ-সব কাহিনীতে নায়কের আত্মোপলব্ধির বর্ণনা না দিয়ে লেখক তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখা বা শোনা বিচিত্র বহিরঙ্গ ঘটনাবলীর বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাতে গল্প জমে উঠেছে, সাধারণ পাঠকের চিত্ত হয়েছে প্রথমে আকৃষ্ট, পরে মুগ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে লেখকের জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যাও আছে অব্যাহত। কেবল আগের উপন্যাসগুলির চেতনা-ব্যাপ্তি ও ভাবগভীরতা আর নেই। গল্প জমাবার কৌশলটা বঙ্কিমের রোমান্সের মতো ঘটনাপ্রাধান্যের শরণাগত। অতি প্রাকৃত বা দৈব ঘটনার দ্বারা ভাগবতী মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখে ভক্ত মন সহর্ষে জয়ধ্বনি করে ওঠে। এই পন্থায় লেখক তাঁর আধ্যাত্মিক প্রচারকর্ম

সহজে সুসম্পন্ন করতে পারবেন—বহুজন তাঁর অধ্যাত্ম-বাণী মনোযোগের সঙ্গে শুনবে।

কিন্তু তা হলেও বলতে হবে যে, এ হল নিপুণ ও কলাকুশলী কথকঠাকুরের শিল্পদক্ষতা—প্রকৃত উপন্যাস-শিল্পীর জনপ্রিয়তা এর চেয়ে কম হলেও মননশীলতা ও আত্মানুভূতির প্রাধান্য যেখানে, সেখানেই শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, এমনকি ভক্তিরও।

আশ্চর্য-পর্যায়ের নায়ক অসিতের সঙ্গে অঘটন-পর্যায়ের "অসিত" চরিত্রটির প্রধান পার্থক্য এই যে, আশ্চর্যের অসিত স্বয়ং সমস্ত ঘটনার উপভোক্তা, কেন্দ্র-স্বরূপ এবং তার আত্মোপলব্ধি সর্বদা সক্রিয় ও সজাগ। কিন্তু অঘটন-গ্রন্থমালার অসিত মুখ্যত কথক—তার ভূমিকা দ্রষ্টা ও বর্ণনাদাতার। তার নিজের অনুভূতি-উপলব্ধির কথা আর কিছু নেই। আর অন্যের বহিরঙ্গ ক্রিয়া ও আচরণের যত মনোজ্ঞ বর্ণনাই সে দিকনা কেন, অন্যের আত্মানুভূতি থেকে যাচ্ছে তার অজানা। তাতে বাইরের ঘটনা ও ক্রিয়ার বিবরণে-ভরা গল্পগুলির রসোত্তীর্ণ হতে কোন বাধা নেই—আখ্যানবস্তু, পরিবেশ, চরিত্রচিত্রণ যার ভক্তিবাদী জীবনদর্শন সবই ঠিক থাকছে, মনোবিশ্লেষণের পরিমাণ একটু কমে যাচ্ছে. কিন্তু লেখক বিভিন্ন চরিত্রের নিজের মুখে তা দেবার অবকাশও পাচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃত অভাব হচ্ছে নায়ক-নায়িকার মর্মগহনে পাঠকের প্রবেশলাভের সুযোগের অভাব। চরিত্রগুলির চেতনার ক্রমবিকাশ তাদের হয়ে বুঝবার কোন সুযোগই পাঠক পাচ্ছে না যা অমরনাথ, জিষ্ণু, মলয় প্রভৃতির বেলায় পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক উপন্যাসে "আমি"—কে বাদ দিলে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা পাওয়া দুষ্কর। অবশ্য ভক্ত যদি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন : আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল, তা হলে তাঁকে ঠেকানো দায়!

বিশ্বাস অবিশ্বাস

(গল্প)

সুধীরচন্দ্র রাহা

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ। শীত বেশ চাপিয়া পড়িয়াছে। এখন বৈকাল বেলা হইলেই যেন অন্ধকার হইয়া যায়। কুয়াশায় কাছের মানুষকে চেনা যায় না। এ কয়দিন হইতে ঠিক কুয়াশার মতন একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব সমস্ত গ্রামকে ঘিরিয়া ধরে। মানুষ সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া লয়। আজ কয়দিন হইতে মেঘলা করিতেছিল। সেদিন বৈকাল হইতেই সুরু হইল বাতাস আর বৃষ্টি। সারা আকাশে মেঘ। কখনও মেঘ ডাকিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে—অতি জোরে বাতাস বহিতেছে। একে এই শীতকাল, তাহার উপর এই বৃষ্টি-বাতাসে লোকে পরিত্রাহী ডাক ছাড়িতে লাগিল। সেদিন সকাল সকাল শয়ন ঘরে আসিলাম। ছেলে মেয়েরা সব ঘুমাইতেছে। আমি সারা শরীর চাদরে ঢাকিয়া তামাক টানিতে লাগিলাম। গৃহিণী এক কড়াই আগুন আনিয়া বলিলেন, হাত-পা সেঁকব। মরণ দশা মেঘের। একে শীতকাল, দিনরাত হিঃ হিঃ করে মরছি, আর তার ওপর এই ঝড়বৃষ্টি। গৃহিণী রাগে গজ্ গজ্ করিতে করিতে অসময়ের ঝড়বৃষ্টি ও সেই সঙ্গে ভগবানের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। আমি তামাক টানিতে টানিতে বলিলাম, ভগবানকে যতপার গাল দাও ক্ষতি নেই। তিনি তো প্রতিবেশীদের মত তেড়ে মারতে আসবেন না। কিন্তু তোমার পা আর-আগুন সামলাও। ঐ আগুন পায়ে পড়লে সে সাংঘাতিক কাণ্ড হ'বে। গৃহিণী সতর্ক হইয়া, একটা পান মুখে দিলেন। আবার মেঘ ডাকিয়া উঠিল—আমার ঘরের দরজা জানালা সব ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। ছেলেটি ভয়ে কাঁদিয়া উঠিতেই, গৃহিণী খোকাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, ভয় কি বাবা। এই যে আমি—

আমি আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। আমার মন পড়িয়া রহিয়াছে মাঠের দিকে। পাকা ধানগুলির কি যে অবস্থা হইতেছে তাহাই ভাবিতেছি। অবশেষে সারা বৎসরের আশা এমনিভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। সারা বৎসরের জন্য ঐ ধানকটি মাত্র সম্বল। ঐ ধান যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে ছেলেপুলে লইয়া না খাইয়া মরিব যে।

বাহিরে সমানভাবে মাতামাতি চলিতেছে।

ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছে। কালো আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সচকিত করিয়া বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়া উঠিতেছে।

মেঘের গর্জ্জন, বাতাসের দাপাদাপির মাঝে গাছ পড়িয়া যাওয়ার ভীষণ শব্দ হইতেছে। কাহারও আমগাছ—নারিকেলগাছ বা কলাগাছ ধুপ্ ধাপ্ করিয়া পড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু এই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে, ভাবিয়াই বা কি করিব। যাহা অদৃষ্টে আছে

তাহাই হইবে। এখন এই ঝড়ের প্রচণ্ডতা আর বেশী মাত্রায় না হইলে বাঁচি। আমি তামাক টানিতে টানিতে বারংবার ঊর্দ্ধমুখে পুরাতন জীর্ণ ছাদের দিকে, অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত নয়নে চাহিতে লাগিলাম। না, আজ রাত্রে আর আমার ঘুম হইবে না। গৃহিণী ঘুমাইয়াছেন। ছেলে মেয়েরাও অঘোরে ঘুমাইতেছে। আমার চোখে ঘুম নাই। এই জীর্ণ ঘরে স্ত্রী-পুত্র লইয়া অত্যন্ত সশঙ্কচিত্তে বাস করিতেছি। কিন্তু আজকের রাতের সহিত অন্যদিনের তুলনা হয় না। আমি আবার তামাক সাজিতে বসিলাম। মেঘ গর্জন করিতেছে কড়্ কড়্ শব্দে বাজ পড়িল। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। ঘরের দরজা জানালা ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতেছে। ভাবি আজ-কি আকাশ থামিবে না। এই উন্মত্ত ঝড় জল, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রের শব্দ এমি এমনি চলিবে? মনে হইতেছে বুঝি-বা প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের এই অতি ক্ষুদ্র জীর্ণ মাথা গোঁজার স্থানটুকু লইয়া নিদারুণ মরণ-খেলায় না মাতিয়াছে।

আমি চুপ করিয়া শুধু মুহূর্ত্ত গুণিতে থাকি। এমনি করিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা চলিয়া গেল। হঠাৎ বাতাসের বেগ—ঝড়ের দাপাদাপি বন্ধ হইল: পাগলা প্রকৃতি বহুক্ষণ দাপাদাপির পর শান্ত হইল—আমিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। লণ্ঠনটি হাতে করিয়া সন্তর্পণে ঘরের দরজা খুলিলাম। দেখি উঠানের মাঝে কলাগাছ পেঁপেগাছ কাৎ হইয়া পড়িয়া গেছে। চারিদিকে জলের স্রোত - তখনও সোঁ-সোঁ করিয়া মাঝে মাঝে বাতাস বহিতেছে—তবে বাতাসের বেগ কম। আমি হাত পা ধুইয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছি, হঠাৎ মনে হইল, কে যেন বাহিরে ডাকাডাকি করিতেছে। আলোটি উস্‌কাইয়া, গৃহিণীকে জাগাইয়া দিয়া বলিলাম ওগো শুনছ—বাইরে আমায় কে যেন ডাকছে—

—ডাকছে? এই রাতে কে আবার ডাকবে। ও মনে হয় বাতাসের শব্দ। আগে যেন হট্ করে দরজা খুলোনা। এই রাতে চোর ডাকাত হতে পারে। আমি আলো হাতে করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিলাম, কে? কে ডাকছ? লোকটি বলিল, উঃ ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গে গেল। দরজাটা খোল ভবেশদা—ভিজে গোবর হয়ে গেছি। আমি নবু। নবু সান্যাল—

—নবু? ওঃ হোঃ—। আমি দরজা খুলিয়া অবাক। সত্যই নবু। পিছনে একজন মহিলা।

—আরে নবু তুমি? এই দুর্য্যোগের রাতে এতদিন পরে হঠাৎ কোত্থেকে?

এস এস। নবুর হাতে একটি বেডিং—আর এক হাতে চামড়ার সুটকেশ। উভয়ের কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ ঝুলিতেছে—

লণ্ঠনটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলাম, কি ব্যাপার। এই রাতে এ্যাদ্দিন পরে কি রকম। কোথা থেকে হঠাৎ এলে—

নবু বলিল, বলছি—সব বলছি। আগে জামা কাপড় ছাড়ি। উঃ শীতে কেঁপে মরছি ভবেশদা। চা চাই। বৌদি বোধ করি ঘুমুচ্ছেন। এই দুর্য্যোগের রাতে খুব উপদ্রব করছি। কিন্তু আমাদের দোষ নয়। রেলের ইঞ্জিনের দোষ। ব্যাণ্ডেলে এসে আর নট্ নড়ন-চড়ন। শেষে ঘণ্টা তিনেক পর উনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এই পর্য্যন্ত এলেন। কিন্তু ষ্টেশনে নেমেই চক্ষুস্থির। দেখি যেন এখানে প্রলয় কাণ্ড চলছে। উঃ কী দারুণ বৃষ্টি—আর তেমনি বাতাস আর মেঘের ডাক। কপাল-ক্রমে টর্চ্চটাও খারাপ হয়ে গেল। জল কাদা ভেঙ্গে কোন রকমে ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছালাম। কতদিন দেশছাড়া সব এখন বদলে গেছে। ভবেশদা তুমি চায়ের ব্যবস্থা দেখ।

আমি গৃহিনীকে নবুর আসার সংবাদ দিলাম। এই দুর্য্যোগের রাতে হঠাৎ অতিথি আগমনের সংবাদে গৃহিণী তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিলেন। —বেশ। সমস্ত দিন খেটে-খুটে একটু যে ঘুমোবো তার উপায় নেই। তখনই জানি বিকেল বেলা জলশুদ্ধ এক ঘটি জল হাত থেকে পড়ল, তখনই ভাবলাম এরকম

একটা কাণ্ড হবে। এখন নাও রাত দুপুরে অতিথি সেবা কর। এই রাতে কে আবার নোতুন করে উনুন জ্বালাবে বল দেখি। কাঠ ঘাস সবই তো ভিজে কাদা। আমার কপালে যত জ্বালা। সাধে কি মুখপোড়া ভগবানকে গাল দিই।

বলিলাম, আহাঃ শুনতে পাবে ওরা। শুধু নবু আসেনি সঙ্গে বউও আছে। এসে দেখসে। আহা কী সুন্দর চেহারা—কী রূপ—

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, যাও তাই যাওনা। বসে বসে বন্ধুর বৌয়ের আহা মরি রূপ নিরীক্ষণ কর না। চা করে দাও ভাত রান্না কর। আমি তো বেঁচে যাই। আঃ আমার কপালরে। পরের বৌয়ের রূপের বর্ণনা রাত দুপুরে দিতে বসলেন। আমি বুঝিলাম কথাটা বড় বেফাঁস বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু আর উলটাইবার সময় নাই, উপায় নাই। কিন্তু, এক্ষণে গৃহিণী চটিয়া যাইলে সমূহ বিপদ। সত্যই, এখন অতিথিদের খাওয়ার কি করি। আমি চিন্তিত মনে বাহিরের ঘরে আসিলাম।

নবু বলিল, ভবেশদা, তুমি খুব বিব্রত হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে। এই বর্ষাবাদল রাতে, উনুন ধরান যে কি ঝক্মারী ব্যাপার, তা আমি জানি।

বৌ-দিকে ডাক। গেলাস খানিক চা আর তেল মাখা মুড়ি হলেই আর কিছু দরকার হবেনা।

—আহাঃ ভাবনা নেই। সবই হচ্ছে। বৌ-মারও খুব কষ্ট হচ্ছে দেখছি।

ইতিমধ্যে নবু ও তাহার স্ত্রী ভিজা জামা কাপড় ছাড়িয়াছে ও বেডিংটা খুলিয়া তক্তাপোষের উপর পাতিয়া ফেলিয়াছে—।

বলিলাম বিছানা ভিজে যায়নি তো—

ও যৎসামান্য। ওতে কিছু আসে যাবেনা। ও এমনি শুকিয়ে যাবে—

নবুকে এখন অনেকেই চিনতে পারবেনা। নবু আমার চেয়ে বছর চারেক ছোট হইবে। তথাপিও, আমরা সমবয়সীর মত কথাবার্তা বলিতাম। একসঙ্গে বিড়ি, সিগারেট খাওয়া, তাশ-পাশা খেলা, প্রভৃতি কাজে আমাদের সামান্য দু-চার বৎসরের পার্থক্যটা নেহাৎই নগণ্য ছিল। সে আজ আট দশ বৎসরের আগের কথা। হঠাৎ একদিন নবু উধাও হইয়া গেল। কোথায় যে গেল তাহার সন্ধান মিলিল না। নবুর পিতামাতা পূর্ব্বেই গত হইয়াছিলেন, এবং নিজের ভাইবোন বলিয়া কেহই ছিল না। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহা প্রতিবেশীরাই একরূপ আত্মসাৎ করিয়া ভোগ-দখল করিতেছে। এক্ষণে নবুর চেহারার যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তেমনি কথাবার্ত্তা চালচলন বেশভূষা সব কিছুরই একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হাতের ঘড়ি, আংটী, চোখের চশমা, ও অতি উচ্চ মূল্যের পোষাক পরিচ্ছদ, বেশভূষায় তাহাকে অতি সম্ভ্রমশালী বিত্তবান লোকই মনে হয়। উহার কথাবার্ত্তার মধ্যে, এমন একটি বিশেষ ভঙ্গিমা দেখা যায়, সহসা ইহার কথা, বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। জানিনা—কিন্তু মনে হয়, ভগবান বোধ করি, কোন কোন মানুষের কণ্ঠস্বর—এমন ভরাট, সুরেলা করিয়া সৃষ্টি করেন যে, যে কোনও লোকই সেই ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। নবু সেই জাতের লোক। নবুর স্ত্রীকে শুধুমাত্র রূপসী বলিলেই তাহার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা হয় না। উহার রূপ, স্বাস্থ্য, সত্যই হাজার হাজার মহিলার ভিতর এমন সুষ্ঠু শ্রী সচরাচর নজরে আসে না। ইহাদের দুইজনকে অতি সুন্দর মানাইয়াছে। মনে হয় ভগবান ইহাদের মিলাইবার জন্যই, কোন অজ্ঞাত কারণে, নবুকে দেশত্যাগ করাইয়াছিলেন।

দিনকয়েকের মধ্যে নবু ও তাহার স্ত্রী আমার গৃহিনীর ও ছেলেমেয়েদের মন জয় করিয়া ফেলিয়াছে। নানাপ্রকার সন্দেশ, মাছ মাংস প্রভৃতি আনিয়া গৃহিনীর মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেদিন গৃহিনী এক খানি ভাল সাড়ী আনিয়া বলিলেন, নবু ঠাকুরপো আমায় দিলেন। কত দাম জান? অনেক টাকা গো। পঁয়ষট্টি টাকা দাম —। নবু পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেকার

যুবকদের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন রাখাল ভট্টাচার্য্য মশায় আসিয়া আমায় বলিলেন, বাবা নবু তো তোমার বন্ধু। ছেলে দুটো বেকার বসে আছে নবুকে বলে, ছেলে দুটোর কোন কাজটাজ হয়—তবে সেদিন নবু নাকি ছেলেদের বলেছে, ওদের নাকি সঙ্গে করে নিয়ে যাবে—

—সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। কোথায়? ভট্টাচার্য্য মশায় বলিলেন, কেন ও যেখানে থাকে। বোম্বাইয়ে। ওতো বোম্বাইতে ব্যবসা করে। কেন এ কথা কি তুমি জান না।

বলিলাম—মানে, ঠিকমত জানি না। আচ্ছা, নবুকে বলব আমি। আমার দ্বারা যদি কিছু উপকার হয়, তবে কেন করব না বলুন।

সেদিন সন্ধ্যার পর মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিয়া ভিতরে ঢুকিতে যাইতেছি, হঠাৎ কানে আসিল সুন্দর গানের শব্দ। ভাবিলাম কে এমন গান গাহিতেছে। এমন সুন্দর গলা এমন সুন্দর গান কে গায়। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। নারীকণ্ঠের গান। বোধহয় নবু রেডিও আনিয়াছে। একপা একপা করিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া অবাক হইলাম। বাড়ীর সমস্ত উঠান পাড়ার বৌঝিতে ভরিয়া গিয়াছে সেই সমবেত অসংখ্য নারী-শ্রোতার মধ্যস্থলে বসিয়া মঞ্জু বৌমা গান গাহিতেছে। আমাকে দেখিয়া মাথার ঘোমটা একটু টানিয়া হারমোনিয়ম বন্ধ করিল।

বলিলাম, বাঃ থামলে কেন বৌমা। গান চলুক—বাঃ কী সুন্দর গান—ভারী সুন্দর গলা তোমার বৌমা—। নাঃ নাঃ গান চলুক—। ভাবিলাম, ভগবান যেমন রূপ দিয়াছেন, তেমনি দিয়াছেন, মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর। মঞ্জু বৌমা সর্বদিক দিয়াই গুণবতী। নবু আমার বন্ধু। আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে। উহার জন্য আমিও যেন লোকের নিকট গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছি। লোকে আসিয়া আমার নিকটেই কাহারও ছেলে ভাইপো বা ভাগনের চাকুরীর জন্য, নবুকে বলিবার জন্য ধর্ণা দেয়। উহারা মনে করিতেছে আমার একটা কথাতেই, তাহাদের পুত্র কন্যাদের বেকারত্ব ঘুচিয়া যাইবে। মঞ্জু বৌমাও এই সব অনুরোধের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। পাড়ার গৃহিনীরা নিজ নিজ সন্তানের চাকুরীর জন্য উহার তোষামোদ করে।

আমি গৃহিনীর নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ পাই।

নবু বলে, দাদা এত বেকারের চাকরী আমি কোথা থেকে দেব। তবে, দু একজনকে চেষ্টা করে ঢোকাতে পারি। আপনি সাফ বলে দেবেন আমার কথা। ওঁরা যেন আমার সঙ্গে কথা বলেন। তবে বুঝতেই পারছেন, আজকালকার দিনে, কেউ শুধুহাতে এই সব ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নেবে না। আমি অবশ্য কিছু চাই না। কিন্তু যে লোক কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন, তাঁকে তো দিতেই হবে।

বলিলাম—কথাটা ঠিক। কিন্তু কি জান, যারা তোমার কাছে চাকরীর জন্য আসছে, তাদের সকলকার অবস্থা আমি জানি। বেশী কিছু কেউ দিতে পারবে না। নবু বলল, দাদা শুধু হাতে কোনমতেই চাকরী করে দেওয়া সম্ভব নয়। অন্ততঃ দুশো টাকা চাই-ই। ওর কমে হবে না। নবুর সহিত এই পর্য্যন্ত কথা। ইহার পর আমি সকলকেই নবুর সহিত যোগাযোগ করিতে বলিলাম। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকদিন চলিয়া গেল। সেদিন নবু স-স্ত্রীক শহরে গিয়াছে। বৈকাল চলিয়া গেল -সন্ধ্যা হইয়া গেল, তথাপিও উহাদের দেখা নাই। একটু চিন্তিত হইলাম। গৃহিনী বলিলেন, সহরে নবু ঠাকুরপোর কি যেন দরকার আছে—বোধ হয় তাতেই দেরী হচ্ছে—রাত প্রায় নটা নাগাদ উহারা বাড়ী ফিরিল। রিকসার ভিতর অনেক জিনিসপত্র। নবু বলিল, এই ঘোরাঘুরি করতে করতেই দেরী হয়ে গেল। নবু সের দুই মাংস, মাছ, দই, দু রকমের মিষ্টি ফলমূল আনিয়াছে।

বলিলাম—হঠাৎ এত খাবার দাবার কেন হে—

—এমনি। বৌদি আগে চায়ের জল চড়ান। মাংসটা আমিই রান্না করব। মাছ কোটা বাছা আপনার বৌমা করবে- আমি এসব ছেড়ে ছুড়ে আসছি—। মাং

মাংস মিষ্টি দেখিয়া ছেলেরা আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল। আমি নবুর এই অযথা খরচপত্র করা দেখিয়া, ভাবিলাম কাঁচা পয়সা রোজগার তাই এমনি অঢেল খরচ করছে। অবশ্য মনে মনে বিশেষ প্রীতই হইলাম। তবুও দাদাসুলভ গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া চক্ষু-কোণে বলিলাম—উহুঃ এমন বে-হিসাবী খরচ ভাল নয় নবু। বৌমা, তুমি বাপু একটু হিসেব করে, রাশ টেনে ধরবে—। মঞ্জুবৌমা শুধু হাসিতে লাগলেন। অনেক রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। খাওয়ার সময়ই জানিলাম, নবু আর মঞ্জু বৌমা কাল ভোরের ট্রেনেই কলকাতা যাচ্ছে। দু চারদিন পর এখানে ফিরে এসে, তারপর বোম্বাই যাওয়ার দিন স্থির করবে।

সকলের খাওয়া দাওয়া সারিতে অনেক রাত হইল। গুরুভোজনের পর রাজ্যের ঘুম আসিয়া দুই চোখে ভর করিয়াছে। বিছানায় শুইয়া গৃহিনী ও মঞ্জুবৌমার হাসি কানে আসিল। তারপর একসময় ঘুমাইয়া পড়িলাম। ভোর হইতে না হইতেই নবু উঠিয়া পড়িয়াছে। গৃহিনী ব্যস্তভাবে চা আর কিছু খাবার তৈরী করিতেছেন। ছেলে মেয়েরা ঘুমাইতেছে। একে শীতের দিন, তাহার উপর অসম্ভব ঠাণ্ডা। আমি বিছানায় বসিয়া বিড়ি টানিতেছি। গৃহিনী বলিলেন, মুখে জল দিয়ে গরম চাটুকু খেয়ে নাও। নবু ঠাকুরপো চলে যাচ্ছে—দেখা করসে—। রিকসার হর্ণ শুনিলাম। নবু বলিল, দাদা, ঠিকানা তো দিয়েছি চিঠি দেবেন। তবে আমি তো দু-চারদিন পরই ফিরে আসছি। একটু বিশেষ কাজ রয়েছে কলকাতায়—। মঞ্জুবৌমা হেঁট হইয়া আমাদের প্রণাম করিল। নবু হাতের ঘড়ি দেখল—। সময় সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে, আর দেরী করা চলে না। সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে রিকসা ছুটিয়া চলিল। নবু আর মঞ্জু বৌমা হাত নাড়িতে লাগিল।

গৃহিণী বলিলেন, এই দুদিনেই আমায় একেবারে আপন করে নিয়েছে। কত বললাম থাকতে। বললাম, ঠাকুরপো কলকাতায় কাজ সেরে আসুক—তুমি না হয় থাক। ও বলল, যাই একটু ঘুরে আসি—। এখানে এসে পরে বোম্বাই চলে যাবে—। আহা সুখে থাকুক—দুটীতে মানিয়েছে কিন্তু খাসা। নয় গো—?

দিন কয়েক পর সেদিন দুপুর বেলায় হঠাৎ গৃহিনী বলিলেন, দেখছ, কি ভুল হয়ে গেছে। বলিলাম—কি হ'ল আবার। গৃহিনী বলিলেন, মঞ্জু বৌমা যাবার একদিন আগে আমার সোনার হার গাছটা চেয়ে নিয়েছিল নবু ঠাকুরপোকে নাকি দেখাবে ঐ রকম প্যাটার্ণের হার তৈরী করতে দেবে, কিন্তু তারপর আমার আর চাইতে মনে নেই। তাছাড়া, সেদিন সকালে নবু ঠাকুরপো আমার কাছ থেকে পঞ্চাশটে টাকা চেয়ে নিয়ে বলল, বিকেলে দেবে। কিন্তু ওরাও দেয়নি আর আমারও খেয়াল নাই—। আমি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

তারপর বলিলাম—কই এসব কথা আমায় আগে বলনি কেন? গৃহিনী বললেন। আমার কি ছাই খেয়াল আছে। কালই ঐ ঠিকানায় পত্র দাও। তাদের তো উচিত ছিল, ওসব ফেরত দেওয়া। যাবার আগের দিন অত রাতে, ঐ মাছ মাংস সব আনল। রাতে রান্না করতে করতে, খাওয়া দাওয়া সারতেই বারটা বেজে গেল। শুতে গেলাম তো অনেক রাতে। আর রাতেই জানলাম, ওরা সকালে কলকাতা যাবে—তখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আর ভোর হতে না হতেই তো ওরা চলে গেল—

আমার মনে একটা কথা খেলিয়া গেল। কিন্তু কিন্তু নবুকে অবিশ্বাস করি বা কি করিয়া। কিন্তু বিশ্বাসও তো করা যায় না। তবে কি এসব পূর্ব্ব-পরিকল্পিত ব্যাপার। সেকি এই রকম একটা কু-মতলব লইয়াই—এতদিন পর নিজ দেশে ফিরিয়াছিল? একটা দারুণ দুশ্চিন্তায় মন খারপ হইয়া গেল। নগদ পঞ্চাশটে টাকা আর দুভরি সোনা, এতো কম কথা নয়। আমর মত লোকের পক্ষে, ও যে লাখটাকার সমান। আমার মনটা খারাপ হইয়া রহিল। সকাল হইতেই একখানা লম্বা পত্র লিখিয়া তাহার দেওয়া ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু উহারা যে কয়দিন পর ফিরিয়া আসিবে বলিয়া গিয়াছে। দিন চলিয়া যাইতে থাকে। না আসে পত্র—না ফিরিল নবু।

কয়দিন পর রাখাল ভট্টাচার্য আসিয়া বলিলেন। ওহে নবুর কোন পত্রটত্র পেয়েছ ?

—না। কিন্তু কেন ? ভট্টাচার্য মশায় বিষণ্ণমুখে বলিলেন। চিঠি পত্র—আসেনি। তাই তো—

বলিলাম—কেন, নবুর খবর চাইছেন কেন ?

—মানে, ছেলে ছুটোর চাকরী করে দেবে বলেছিল। তাই মানে ধার-ধোর করে, শ আড়াই টাকা নবুকে দিয়েছি,—

—টাকা দিয়েছেন। আড়াই শো—। ভট্টাচার্য্যমশায় বলিলেন, ও কথা বলছ কেন ? কেন টাকা কি তবে জলে গেল—

ইহার পর আরও দু চারটি সংবাদ যা পাইলাম, তাহাতে সমস্ত কিছুই এখন দিনের আলোর মত স্পষ্ট হইয়া গেল। সে নাকি কাহাকে বোম্বাইয়ে সিনেমায় নামাইবে—কাহারও চাকরী করিয়া দিবে বলিয়া বেশ মোটা রকমের টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। এখন বুঝিলাম নবুর হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য। ভাবিতেছি, সঙ্গের মহিলাটি কি উহার স্ত্রী না অন্য কিছু। নবু যাহা করিয়াছে শুনিলাম, একশে মধু-বৌমা পাড়ার বৌ-ঝিদের কোন্ স্বর্গরাজ্যে তুলিয়া আরও কিছু গহনা হাতাইয়াছে কিনা তাহা কে জানে।

কিছুকাল আগে বন্ধুগর্বে গর্বিত হইয়াছিলাম, একণে লজ্জায় নিজের কাছে নিজেকেই ছোট-মনে হইতেছে। ভাবিতেছি, আমি কি বোকা। এ পৃথিবীতে কাহাকেও আর বিশ্বাস করা যায় না। আমার দু-ভরি সোনা, আর নগদ পঞ্চাশটে টাকা, আর অন্যেরও অনেক কিছু গিয়াছে। আমি বসিয়া নবুর কথাবার্তা চাল চলন, সমস্তই বিশ্লেষণ করিতে লাগিলাম। নাঃ—এখন দেখিতেছি, ভাইটি আমার, দাদার উপর এক হাত চাল চালাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। উহার দেওয়া ঠিকানা যে সম্পূর্ণ বাজে, তাহা আর সন্দেহ নাই। ঐ ঠিকানায় তাহাকে কোনদিনই পাওয়া যাইবে না। নবু আর তাহার সঙ্গিনী এখন কোথায় কাহার ঘাড়ে চাপিয়া সুন্দর অভিনয় করিবে, তাহাই ভাবিতেছি। আর যে উহাদের সহিত জীবনে দেখা হইবেনা, ইহা সুনিশ্চিত।

মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

সুবিমল সিংহ

(৩)

বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় হার সংক্রান্ত আলোচনায় (কার্ত্তিক, ১৩৭৭) দেখিয়াছি যে মুদ্রা বিনিময়ে কোন বিধি-নিষেধ না থাকিলে কোনও দেশীয় মুদ্রার বহির্মূল্য নির্ধারিত হয় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার চাহিদা এবং যোগানের সংঘাতে। কোন একটা বিশেষ বিনিময় হার চালু অবস্থায় যদি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রার যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী হয়, তবে দেশীয় মুদ্রার বহির্মূল্য বাড়িয়া ঐ বিনিময় হারের উপরে উঠিবে। আর যদি চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী হয় তবে দেশীয় মুদ্রার বহির্মূল্য কমিয়া ঐ বিনিময় হারের নীচে নামিবে। কিন্তু যদি বিনিময় হারটী এমন হয় যাহাতে চাহিদা এবং যোগান সমান থাকে তবে ঐ বিনিময়হারটী স্থির থাকিবে।

এখন বিনিময়হার, চাহিদা, এবং যোগান, এই কথাগুলির প্রকৃত-তাৎপর্য্য এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে একটু আলোচনা দরকার। অর্থশাস্ত্রে বিনিময়হার এবং মূল্য প্রায় সমার্থবোধক। তবে অর্থশাস্ত্রে মোটামুটি ত্রিবিধ মূল্যের সংজ্ঞা আছে, যথা (১) ব্যবহার-মূল্য অথবা উপযোগিতা (use-value অথবা utility) (২) বিনিময়-মূল্য (Exchange-value) এবং (৩) অর্থমূল্য (Price)।

অনেক অপরিহার্য্য অথবা অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু আছে যাহা অবাধে পাওয়া যায় অর্থাৎ যাহার বিনিময়ে কিছু দিতে হয় না, যেমন জল, বায়ু ইত্যাদি। ইহাদের ব্যবহার-মূল্য অথবা উপযোগিতা (use-value অথবা utility) যথেষ্ট থাকিলেও কোন বিনিময়-মূল্য (Exchange-value) নাই। ইহারা অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য নহে।

যে সকল বস্তু শ্রম অথবা অপর কোন বস্তুর বিনিময়েই লভ্য অথবা হস্তান্তরযোগ্য, তাহাদের একটা বিনিময়-মূল্য (Exchange-value) আছে। ইহারাই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য। কোন বস্তুর বিনিময়ে অপর কোন বস্তু যে পরিমাণ পাওয়া যাইবে তাহাই হইল শেষোক্ত বস্তুটীর হিসাবে প্রথমোক্ত বস্তুটীর বিনিময়-মূল্য। এক্ষেত্রে বস্তু দুইটি পরস্পরের সহিত বিনিময়-যোগ্য বলিয়া ইহাদের উভয়েরই একটির হিসাবে অপরটির একটা বিনিময়-মূল্য আছে। যেমন, চার কিলোগ্রাম ধানের বিনিময়ে যদি পাঁচ কিলোগ্রাম গম পাওয়া যায়, তাহা হইলে একদিকে যেমন চার কিলোগ্রাম ধানের মূল্য পাঁচ কিলোগ্রাম গম, অপরদিকে তেমনি পাঁচ কিলোগ্রাম গমের মূল্য চার কিলোগ্রাম ধান। অর্থাৎ ১ কিলোগ্রাম ধানের মূল্য ১ কিলো ২৫০ গ্রাম গম এবং ১ কিলোগ্রাম গমের মূল্য ৮০০ গ্রাম ধান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, অর্থাৎ আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আবির্ভাবের একশত বৎসর পূর্ব্বে, ইংরাজী সাহিত্যের প্রথিত ব্যঙ্গরচয়িতা স্যামুয়েল বাটলার (Samuel Butler) এর রচিত কালজয়ী ব্যঙ্গকাব্য হুডিব্রাস (Hudibras) হইতে দুইটী পংক্তি......কার্লমার্ক্স উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রচিত তাঁহার বিশ্ব-বিশ্রুত অর্থশাস্ত্রীয় আলোচনা গ্রন্থ ''ক্যাপিটেল (Capital) এ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদ্ধৃত পংক্তি দুইটি এইরূপ : The value of a thing. Is just as much as it will bring. বাটলার অর্থশাস্ত্র লিখেন নাই। কিন্তু তাঁহার এই আপ্তবাক্যটী বিনিময়-মূল্যের Exchange-value) প্রকৃত অর্থশাস্ত্রসম্মত চিরন্তনী সংজ্ঞা। অবশ্য তারও

দুই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল কোন বস্তুর—যেমন "পাদুকার"—"প্রকৃত ব্যবহার" এবং "বিনিময়ার্থে ব্যবহার" এই দুই এর পার্থক্য করিয়াছিলেন।

তবে আর্থিক জগতে সরাসরি দ্রব্যবিনিময় (barter) হয়না। কোন একটা বিশেষ দ্রব্য অথবা প্রতীক বিনিময়ের মাধ্যম স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এই বিনিময়ের মাধ্যমটার নামই অর্থ (money)। এবং অর্থের হিসাবে প্রকাশিত বিনিময়-মূল্যকেই বলা হয় অর্থ-মূল্য (price)। অর্থাৎ কোন বস্তুর বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে তাহাই হইল সেই বস্তুটার অর্থমূল্য বা দাম। "মূল্য" বলিতে আমরা সচরাচর এই অর্থমূল্য বা priceই বুঝি।

সরাসরি দ্রব্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে যেরূপ, বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়ের ক্ষেত্রেও সেরূপ, দ্যাটা একটা উভয়-মুখী ব্যাপার। বিনিময়যোগ্য বস্তুগুলির উভয়েরই পরস্পরের হিসাবে একটা বিনিময়-মূল্য আছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে দেশীয় মুদ্রার মূল্য বাড়িলে (বা কমিলে) দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য যে কমিল (বা বাড়িল) এই উভয় তথ্যই আমাদের নিকট সমান তাৎপর্য্যপূর্ণ। কিন্তু সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে মূল্যের এক তরফা দিকটাই প্রকট থাকে কোন পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িলে (বা কমিলে) ঐ পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে অর্থের মূল্যও যে কমিল (বা বাড়িল) এই তথ্যটি আমাদের অগোচরে থাকে। কারণ অর্থই অপর সমস্ত দ্রব্যের মূল্যের মাপকাঠি অথবা মানদণ্ড-স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। অতএব এক্ষেত্রে অর্থের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির প্রশ্ন অবান্তর। তবে অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অর্থতত্বের (Theory of money) বিভাগে অর্থের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির আলোচনায় সাধারণভাবে পণ্যসামগ্রীর মূল্যস্তরের উঠানামাকেই ভিত্তি করিতে হয়। যেমন ১৯৬০ ইং সালের তুলনায় বর্তমানে [illegible]গ্রীর মূল্য বাড়িয়া যদি দ্বিগুণ হইয়া থাকে, [illegible]র্থের মূল্যও কমিয়া অর্দ্ধেক হইল বলিতে

সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে "মূল্যের" সহিত "চাহিদা" এবং 'যোগানের' কিরূপ সম্পর্ক তাহা বুঝিতে পারিলে, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে তাহাদের বিনিময় হারের সহিত পারস্পরিক চাহিদা এবং যোগা-নের কিরূপ সম্পর্ক, তাহা অনুধাবন করা অনেকটা সহজ হইবে। অর্থশাস্ত্রে "চাহিদা" (Demand) এবং "যোগান" (Supply) এই শব্দগুলির সহিত একটা "মূল্যের" ধারণা ওতপ্রোত। মূল্য ব্যতিরেকে চাহিদার কোন "মূল্য" নাই, আর যোগানের কোন অস্তিত্ব নাই। কারণ বিনামূল্যে লভ্য বস্তু অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য নয়। এক কথায় অর্থশাস্ত্রে চাহিদার অর্থ ক্রয় (অথবা ক্রয়েচ্ছা) এবং যোগানের অর্থ বিক্রয় (অথবা বিক্রয়েচ্ছা)। কিন্তু বিনামূল্যে ক্রয় বিক্রয় নাই। তবে এটাই আসল কথা নহে। আসল কথা এই যে কোন দ্রব্যের মূল্য বলিতে যেমন প্রশ্ন আসে মূল্য কত, তেমনি দ্রব্যটার চাহিদা অথবা যোগান বলিতেও প্রশ্ন আসিবে চাহিদা অথবা যোগান কত, অর্থাৎ কি পরিমাণ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল এই যে মূল্যের পরিবর্তনের সহিত চাহিদা এবং যোগান এই উভয়ের পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ মূল্যের সহিত চাহিদা এবং যোগান এই উভয়েরই একটা আপেক্ষিক সম্পর্ক বিদ্যমান, গাণিতিক ভাষায় যাহাকে বলা হয় functional relation। যে কোন সময়ে কোন দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন মূল্যে ক্রেতাদের চাহিদা অর্থাৎ সম্ভাব্য ক্রয়ের পরিমাণ যেরূপ বিভিন্ন হইবে বিক্রেতা-দের যোগান অর্থাৎ সম্ভাব্য পরিমাণও তেমনি বিভিন্ন হইবে। দ্রব্যটার মূল্য যত কম হইবে চাহিদা তত বেশী হইবে, অথচ যোগান তত কম হইবে। অপর পক্ষে মূল্য যত বেশী হইবে, চাহিদা তত কম হইবে, অথচ যোগান তত বেশী হইবে। অতএব কোন মূল্যের উল্লেখ ব্যতিরেকে চাহিদা অথবা যোগানের পরিমাণের উল্লেখ অর্থহীন এবং অবান্তব।

অর্থশাস্ত্রের মূলতত্বে (Price Theory) কোন পণ্য দ্রব্যের মূল্য কিভাবে চাহিদা এবং যোগানের সংঘাতে

স্থির হয় তাহার বিশ্লেষণ করা হয়। কোন একটি বিশেষ মূল্যে যদি দ্রব্যটির যোগান অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণ বেশী হয় অর্থাৎ ঐ মূল্যে বিক্রেতারা যে পরিমাণ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ক্রেতারা তদপেক্ষা বেশী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে দ্রব্যটির মূল্য বাড়িবে। অপর পক্ষে ঐ মূল্যে যদি চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী হয় অর্থাৎ ক্রেতারা ঐ মূল্যে যে পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক বিক্রেতারা তদপেক্ষা বেশী বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে দ্রব্যটির মূল্য নামিবে। কিন্তু মূল্যটি যদি এরূপ হয় যাহাতে চাহিদা এবং যোগানের পরিমাণ সমান থাকে তবে সেই মূল্যটি স্থির থাকিবে। এখানে মনে রাখা দরকার যে প্রকৃত ক্রয় এবং বিক্রয়ের পরিমাণ সব সময়ই সমান। কিন্তু ঈপ্সিত ক্রয় এবং ঈপ্সিত বিক্রয়ের পরিমাণ সমান হইবে, অথবা প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় এবং ঈপ্সিত ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমান এক হইবে, এরূপ নিশ্চয়তা নাই। কোন একটা বিশেষ মূল্যে দ্রব্যটির যোগান অপেক্ষা চাহিদা যদি বেশী হয় তবে ইহার ক্রয় এবং বিক্রয়ের পরিমাণ এক হইলেও ক্রেতারা ঐ মূল্যে আরও কিনিতে ইচ্ছুক ছিলেন কিন্তু বিক্রেতারা অথবা উৎপাদকেরা ঐ মূল্যে আর সরবরাহ করিতে সমর্থ নহেন অতএব ক্রেতাদের ক্রয়েচ্ছা (এবং ব্যয়েচ্ছা) অপূর্ণ রহিল। এই অবস্থায় ক্রেতাদের গরজে আখেরে দ্রব্যটির মূল্য চড়িবে। এবং মূল্য চড়িলে যোগানও বাড়িবে চাহিদাও কমিবে। অপর পক্ষে ঐ মূল্যে যদি চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশী হয় তবে ক্রয় এবং বিক্রয়ের পরিমাণ এক হইলেও বিক্রেতারা ঐ মূল্যে আরও বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন নেহাৎ ক্রেতার অভাবে তাহাদের মাল আটক রহিল। এ অবস্থায় বিক্রেতাদের গরজে আখেরে দ্রব্যটির মূল্য নামিবে। এবং মূল্য কমিলে ক্রেতাদের চাহিদা অর্থাৎ ক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে এবং ঐ দিকে বিক্রেতাদের যোগান অথবা সরবরাহের পরিমাণও কমিবে। উভয়ক্ষেত্রেই মূল্যের গতি হইবে সেইদিকে যেদিকে গেলে চাহিদা এবং যোগানের সমন্বয় ঘটে। যে মূল্যে চাহিদা এবং যোগান সমন্বিত থাকে তাহাকে বলা হয় **Equilibrium Price** এবং বাংলায় তর্জমা করা হয় "ভারসাম্য মূল্য"।

সাধারণ পণ্যদ্রব্যের মতই বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যও অর্থাৎ বিনিময় হারও বিশ্লেষণ করা হয় "বিনিময়হার", "চাহিদা", এবং 'যোগান' এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই। তবে সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় এবং কোন দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে অপর দেশীয় মুদ্রার ক্রয় বিক্রয়-এর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। একটি হইল অর্থের বিনিময়ে পণ্য সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়, অপরটি হইল অর্থের বিনিময়ে অর্থের ক্রয় বিক্রয়। পণ্যসামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়ে অর্থকেই মূল্যের মাপকাঠি স্বরূপ ব্যবহার করা হয়। এবং আমরা দেখিয়াছি যে এক্ষেত্রে মূল্যটা একটা একতরফা ব্যাপার। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যদিও অর্থ এবং পণ্যসামগ্রী পরস্পরের সহিত বিনিময়ে এবং এই উভয়েরই পরস্পরের হিসাবে একটা বিনিময় মূল্য আছে, তথাপি অর্থের মূল্যের প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর। কিন্তু কোন দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে অপর দেশীয় মুদ্রার ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটা অপরটার মূল্যের মাপকাঠি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে না। এবং এই উভয়েরই পরস্পরের হিসাবে যে একটা বিনিময়-মূল্য আছে তাহা সমানই তাৎপর্যপূর্ণ। তেমনি সাধারণ পন্যদ্রব্যের চাহিদা এবং যোগান এবং কোন দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে অপর দেশীয় মুদ্রার 'চাহিদা এবং যোগান এই দুইএর তুলনা করিলেও সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য ধরা পড়িবে। বস্তুতঃ সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার অর্থ "অর্থের বিনিময়ে ক্রয়েচ্ছা" এবং যোগানের অর্থ "অর্থের বিনিময়ে বিক্রয়েচ্ছা" অর্থাৎ ক্রেতার দিক হইতে পণ্যদ্রব্যের চাহিদার সহিত অর্থের যোগান এবং বিক্রেতার দিক হইতে পণ্যদ্রব্যের যোগানের সহিত অর্থের চাহিদা ওতপ্রোত। তবুও এক্ষেত্রে অর্থের চাহিদা অথবা যোগানের প্রশ্নটা শুধু যে আমাদের অগোচরে থাকিয়া যায় তাহাই নহে, এক্ষেত্রে ইহা অবান্তরও অর্থাৎ আমাদের বিবেচনা বহির্ভূতও। কিন্তু

কোন দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে অপর দেশীয় মুদ্রার ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই উভয়মুখী চাহিদা এবং যোগান সমানই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় টাকাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলারে রূপান্তরিত করিতে হইলে ভারতীয় টাকার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলার ক্রয় করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদা হইল অপরদিকে তেমনি ডলারের বিনিময়ে টাকার যোগানও হইল। শুধু তাহাই নহে। এক্ষেত্রে যিনি ডলার বিক্রয় করিবেন তিনি ডলারের বিনিময়ে টাকা ক্রয় করিলেন। অর্থাৎ বিপরীত দিক হইতে ইহা ডলারের বিনিময়ে টাকার চাহিদা অথবা টাকার বিনিময়ে ডলারের যোগান। এই গোলকধাঁধার মধ্যে আমরা কোন্ চাহিদার সহিত কোন্ "যোগানের" তুলনা করিব ?

অর্থশাস্ত্রে ব্যাপারটাকে এইভাবে সরলীকৃত করা হয়। যে কোন একটা মুদ্রার বিনিময়ে অপর মুদ্রার মূল্যকে বিচার করিতে হইবে। টাকার বিনিময়ে ডলারের মূল্যের বিচার করিলে টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদার সহিত টাকার বিনিময়ে ডলারের যোগানের তুলনা করিতে হইবে। ডলারের বিনিময়ে টাকার মূল্যের কথা ভাবিলে ডলারের বিনিময়ে টাকার চাহিদার সহিত ডলারের বিনিময়ে টাকার যোগানের তুলনা করিতে হইবে। তবে আমরা দেখিয়াছি যে টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদা আসে তাঁহাদের নিকট হইতে যাঁহারা টাকাকে ডলারে রূপান্তরিত করিতে চান। কিন্তু টাকার বিনিময়ে ডলারের যোগান আসিবে কাহার নিকট হইতে? সাধারণ পণ্যদ্রব্যের মত নিশ্চয়ই ডলারের কোন দোকানদার অথবা বিক্রেতা বসিয়া নাই যদি না তাঁহারও ডলারের বিনিময়ে টাকার প্রয়োজন থাকে। পণ্যদ্রব্যের দোকানদার অথবা বিক্রেতারা উৎপাদকের নিকট হইতে টাকার বিনিময়ে পণ্য ক্রয় করিয়া রাখেন তারপর সেই পণ্য ক্রেতার নিকট পুনরায় টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করেন। এ ক্ষেত্রেও ডলারের 'দোকানদার' অথবা বিক্রেতা হয়ত আছেন, যেমন বিনিময় ব্যাঙ্ক। কিন্তু "উৎপাদক" কোথায়? কাহার নিকট হইতে ক্রয় করিবেন? বস্তুতঃ ডলারের কোন "উৎপাদক" নাই। তবে ডলার পাওয়া যাইবে তাঁহাদের নিকটেই যাঁহারা ডলারের বিনিময়ে টাকা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি তাঁহাদের নিকট হইতেই টাকার বিনিময়ে ডলার ক্রয় করিয়া পুনরায় সেই ডলারই টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করেন, অথবা বলা যায় যে ডলারের বিনিময়ে পুনরায় টাকা ক্রয় করেন। অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে ডলারের যোগান মানেই ডলারের বিনিময়ে টাকার চাহিদা। আবার সেই গোলকধাঁধা! অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদার সহিত টাকার বিনিময়ে ডলারের যোগানের তুলনা বস্তুতঃ টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদার সহিত ডলারের বিনিময়ে টাকার চাহিদার তুলনা করা। সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এমনটা হইলে ব্যাপারটা একটু উদ্ভট হইত, অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে পণ্যের চাহিদার সহিত পণ্যের বিনিময়ে টাকার চাহিদার তুলনা করা।

তবুও আমরা আধুনিক অর্থশাস্ত্রকারদের বিধান অনুসারে সাধারণ পণ্যদ্রব্যের মতই মূল্য অর্থাৎ 'বিনিময় হার," "চাহিদা" এবং "যোগান" এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই দুইটি বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার বিনিময়হার কিভাবে নির্ধারিত হয়, অথবা ঐ ভাবে তাহা আদৌ নির্ধারিত হইতে পারে কিনা, তাহা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে যেরূপ, এ ক্ষেত্রেও সেরূপ চাহিদা এবং যোগানের সহিত অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত একটা বিনিময়হারের প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্য। কারণ কত টাকার বিনিময়ে কত ডলার পাওয়া যাইবে অথবা দিতে হইবে, অথবা কত ডলারের বিনিময়ে কত টাকা পাওয়া যাইবে অথবা দিতে হইবে, তাহা ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই অবশ্য জ্ঞাতব্য। তবে সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে যেরূপ মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে অথচ যোগান কমে, মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে অথচ যোগান বাড়ে, এক্ষেত্রেও সেরূপ হইবে কিনা এবং হইলে কেন হইবে তাহা দেখা দরকার। অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে ডলারের

মূল্য কমিলে টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদা বাড়িবে কিনা, এবং চাহিদা যদি বা বাড়ে, সেই সঙ্গে টাকার বিনিময়ে ডলারের যোগানও কমিবে কিনা তাহা দেখা দরকার।

এক্ষেত্রে প্রথমেই ভাবা দরকার টাকার বিনিময়ে কেনই বা ডলারের অথবা ডলারের বিনিময়ে কেনই বা টাকার চাহিদার উদ্ভব হয়। সাধারণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা হয় ঐ সব পণ্যদ্রব্যের জন্যই। তাহাদের একটা প্রত্যক্ষ ব্যবহার মূল্য অথবা উপযোগিতা আছে। কিন্তু অর্থের (টাকার অথবা ডলারের) কোন প্রত্যক্ষ ব্যবহার-মূল্য অথবা উপযোগিতা নাই। কারণ অর্থ আমরা খাইও না, পরিও না। অর্থের বিনিময়ে যে সমস্ত বস্তু ক্রয় করা যায় তাহাদের উপযোগিতা হইতেই অর্থের উপযোগিতা। অর্থাৎ অর্থের উপযোগিতা পরোক্ষ। এক কথায় বলা যায় যে অর্থের বিনিময়-মূল্য আছে বটে, কিন্তু কোন ব্যবহার-মূল্য নাই। আবার এই বিনিময়-মূল্যও যে দেশের অর্থ সেই দেশের বাজারেই। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতের টাকার কিংবা ভারতের বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের কানাকড়িরও মূল্য নাই। হয়তবা লোকে চিনিতেই পারিবে না। অর্থাৎ যে দেশের অর্থ সেই দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করিলে তাহার ব্যবহার মূল্যও নাই, বিনিময় মূল্যও নাই। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার মূল্য অথবা বিনিময়-মূল্য কোনটাই রাষ্ট্রীয় সীমানার ধার ধারে না। বরং যে দেশের পণ্য সে দেশের সীমানা অতিক্রম করিলে ইহার ব্যবহার মূল্য এবং বিনিময়-মূল্য উভয়ই বাড়িয়াও যাইতে পারে। দেশের বাজারে যে জিনিষ তেমন বিকায় না তাহারও কদর বিদেশের বাজারে যথেষ্ট হইতে পারে। ভারতে জাত অথবা সহজলভ্য এমন অনেক বস্তু থাকিতে পারে স্বদেশে যাহার ব্যবহার-মূল্য অথবা বিনিময়-মূল্য কোনটাই তেমন নাই, অথচ যুক্তরাষ্ট্রে অথবা অন্যত্র এই উভয়ই যথেষ্ট। যেমন ধরা যায় ব্যাং অথবা ঘোড়ার মাংস, যাহা এদেশের খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত নহে, কিন্তু অনেক দেশে সাধারণ খাদ্য। কিংবা এদেশের অর্দ্ধভুক্ত মানুষেরই ন্যায় অগণিত অযত্ন-পালিত অকর্মণ্য (হয়ত বা দেবস্থানে প্রাপ্ত) গো-মহিষাদির চর্ম। অথবা অনেকে বলিতে পারেন, অনাহারে মৃত নিরাশ্রয়, কিংবা ব্যাপক মন্বন্তরে নিহত মানব, মানুষের বেওয়ারিশ কঙ্কাল, যাহা এদেশে অপেক্ষাকৃত সুলভ কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে দুর্লভ, এবং শারীর-বিজ্ঞান (Anatomy) শাস্ত্রচর্চায় অপরিহার্য বিধায় বিশেষ মূল্যবানও। তেমনি যুক্তরাষ্ট্রে অথবা অন্যত্র জাত তথা সহজলভ্য এমন অনেক বস্তু থাকিতে পারে স্বদেশে যাহার ব্যবহার-মূল্য অথবা বিনিময় মূল্য কোনটাই তেমন নাই, অথচ ভারতে এই উভয়ই যথেষ্ট। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত কৃষিজ পণ্য অথবা গুঁড়া দুগ্ধরেণু, হয়তবা নিরুদিত (dehydrated) সহজলভ্য মেষ দুগ্ধ।

এই সব স্বদেশে সুলভ অথবা মূল্যহীন অনাদৃত অথবা অনাদৃত, বস্তু যদি ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে, অথবা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে, প্রেরিত হয় তবে প্রভূত ওখানে বহুমূল্যে বিকাইবে। কিন্তু বিকাইবে স্থানীয় মুদ্রার বিনিময়ে। ভারতীয় পণ্য বিকাইবে ডলারের বিনিময়ে, যুক্তরাষ্ট্রীয় পণ্য বিকাইবে টাকার বিনিময়ে। কিন্তু ভারতীয় বিক্রেতা সেই ডলার দিয়া কি করিবেন? যুক্তরাষ্ট্রীয় বিক্রেতা এই টাকা দিয়া কি করিবেন? তবে ভারতীয় পণ্যের বিক্রেতা যদি তাঁহার ডলারের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রে সুলভ অথচ ভারতে দুর্লভ অপর কোন পণ্য তথায় ক্রয় করিয়া ভারতে লইয়া আসেন তবে সেই ডলার কাজেও লাগিবে তাঁহার লাভও হইবে। তেমনি যুক্তরাষ্ট্রীয় পণ্যের বিক্রেতা যদি তাঁহার টাকার বিনিময়ে ভারতে সুলভ অথচ যুক্তরাষ্ট্রে দুর্লভ অপর কোন পণ্য এখানে ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যান তবে তাঁহার টাকা কাজেও লাগিবে, তাহার লাভও হইবে। অতীতের বণিকরা তাহাই করিতেন। "চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গা" স্বদেশজাত সওদা বোঝাই হইয়া সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত এবং বিদেশজাত সওদা বোঝাই হইয়া স্বদেশে ফিরিত। সেক্সপীয়রের

"ভেনিসের বণিক" (Merchant of Venice) অ্যান্টনিও-র বাণিজ্যতরীগুলি মেক্সিকো, ইংল্যাণ্ড, স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, ভারত ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে সওদা লইয়া অপর দেশে যাইত, আবার সওদা লইয়াই ফিরিত। তবে সু-প্রাচীন কাল হইতেই স্বর্ণ রৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতু পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিনিময়ের মাধ্যম অর্থাৎ "অর্থ" স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অতএব বিদেশে প্রেরিত পণ্যের বিনিময়ে বিদেশের অর্থ আনাও প্রকারান্তরে মূল্যবান ধাতুরূপ পণ্য আমদানী করা। আজও প্রায় সেই একই ব্যবস্থা চলিতেছে। অর্থাৎ বিদেশে প্রেরিত পণ্যের বিনিময়ে তাহার মূল্য-স্বরূপ বিদেশজাত পণ্যের আমদানী। তফাৎ এই যে একই বণিককে একই সঙ্গে আমদানী এবং রপ্তানী এই উভয় কাজ করিতে হয় না। ভারতীয় বণিক তাঁহার যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্ত অথবা প্রাপ্য ডলারের সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় বণিকের ভারতে প্রাপ্ত অথবা প্রাপ্য টাকার বিনিময় করিয়া লন। এই মুদ্রা-বিনিময়ের কাজও সরাসরি করিতে হয় না। বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে সাধিত হয়। ফলতঃ বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির কাজ হইল একদেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে অপর দেশীয় মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় করা।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে উভয় দেশীয় মুদ্রা যদি স্বর্ণ ভিত্তিক (gold standard) হয় এবং স্বর্ণ ভিত্তিক বিনিময় হারে যদি যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের দেয় অর্থ অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ বেশী হয় অর্থাৎ ডলারের বিনিময়ে টাকার যোগান অপেক্ষা চাহিদা, অথবা টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদা অপেক্ষা যোগান) যদি বেশী হয় তবে টাকার বিনিময় মূল্য বাড়িবে (অর্থাৎ ডলারের বিনিময়-মূল্য কমিবে) এবং টাকার বিনিময় মূল্য বাড়িয়া অথবা ডলারের বিনিময় মূল্য কমিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সীমানা (Goldpoint অথবা স্বর্ণ-সীমারেখা) [illegible]র উপক্রম করিলেই যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে আমদানী হইবে, কিন্তু বিনিময় হার ঐ সীমানা ছাড়াইয়া যাইতে পারিবেনা। যদি ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে লেন-দেন কেবল মাত্র পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে ইহার অর্থ হইত এই যে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতের আমদানী অপেক্ষা ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানীর মূল্য যদি বেশী হয় তবে যুক্ত-রাষ্ট্র হইতে স্বর্ণের আমদানী হইয়া সেই মূল্য পরিশোধ হইবে, কিন্তু বিনিময় হার একটা সীমার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ভারতের পাওনা থাকিলেও অপর কোন স্বর্ণভিত্তিক দেশে যদি ভারতের সমপরিমাণ দেনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমপরিমাণ পাওনা থাকে তবে স্বর্ণের গমনাগমন ছাড়াই এই তিনটি দেশের সব দেনা পাওনা চুকিয়া যাইবে। অতএব পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানী ছাড়া অপর কোন আন্তর্জাতিক লেন-দেন না থাকিলে, এবং স্বর্ণকেও আমদানী রপ্তানীর অন্তর্ভুক্ত ধরিলে, বলা যায় যে প্রত্যেক দেশকেই রপ্তানীর দ্বারা আমদানীর মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে (Exports pay for Imports)।

কিন্তু বর্ত্তমানে কোথাও প্রকৃত স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা নাই অথবা স্বর্ণের অবাধ আমদানীও নাই। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক পাওনা দেনাই বা কিভাবে মিটিবে, বিনিময় হারই বা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, অথবা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহা বুঝিবার জন্য "চাহিদা এবং "যোগান" এর প্রকৃত ভূমিকার পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। অধুনা পণ্যদ্রব্যের আমদানী রপ্তানী ছাড়াও আরও হরেকরকমের প্রয়োজনে এক-দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে অপর দেশীয় মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করিতে হয়। তবে আপাততঃ ইহার বিস্তারিত আলোচনা মুলতুবী রাখিয়া আমরা পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রপ্তানীর মধ্যেই আমাদের বিচার-বিবেচনা সীমাবদ্ধ রাখিব। অতএব আমরা শুধু এইটুকু মনে রাখিব যে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে পণ্য আমদানী করিতে হইলে ভারতীয় টাকার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ডলার ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দিতে হইবে। অর্থাৎ

টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদা (ডলারের বিনিময়ে টাকার যোগান) আসিবে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে পণ্যের আমদানী হইতে। অপরপক্ষে ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যের রপ্তানী হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্রেতাকে ডলারের বিনিময়ে টাকা ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দিতে হইবে। অর্থাৎ ডলারের বিনিময়ে টাকার চাহিদা (টাকার বিনিময়ে ডলারের যোগান) আসিবে ভারত হইতে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যের রপ্তানী হইতে। তারপর আমরা দেখিব টাকার বিনিময়ে ডলারের মূল্যের পরিবর্তনের সহিত টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদা এবং যোগানের কিরূপ পরিবর্তন হইতে পারে। আমরা যে কোন একটা ধর্তব্য, বিবেচ্য, অথবা চলিত সময়ে টাকার বিনিময়ে ডলারের বিভিন্ন মূল্যে টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদা এবং যোগান কিরূপ হইতে পারে তাহা দেখিব।

মনে করা যাক বর্তমানে টাকার সহিত ডলারের বিনিময়হার ১ ডলার=৫টাকা। অর্থাৎ টাকার হিসাবে ১ ডলারের মূল্য ৫টাকা এবং ডলারের হিসাবে ১টাকার মূল্য ২০ সেন্ট (১ডলার=১০০ সেন্ট)। মনে করা যাক এই বিনিময়হার চালু অবস্থায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে (যেমন প্রতি তিন মাসে) গড়ে ১০ কোটি ডলার মূল্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় পণ্য ভারতে আমদানী হয়। স্বভাবতঃই চলতি বিনিময় হারে তদ্দরুণ যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের দিতে হইবে ৫০ কোটি টাকা। মনে করা যাক এই একই সময়ে গড়ে ভারত হইত যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হয় ৫০কোটি টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্য। স্বভাবতঃই তদ্দরুণ চলতি বিনিময় হারে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের দিতে হইবে ১০ কোটি ডলার। অর্থাৎ চলতি বিনিময় হারে টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদা এবং যোগান উভয়ই ১০ কোটি, ডলারের বিনিময়ে টাকার চাহিদা এবং যোগান উভয়ই ৫০ কোটি। অতএব এই বিনিময় হারকে বলা যায় চাহিদা যোগান-সমন্বিত বিনিময় হার অথবা **Equilibrium Rate of Exchange** (যাহাকে বাংলায় তর্জমা করা হয় "ভারসাম্য বিনিময় হার")।

এখন আমরা বর্তমান অবস্থায়ই যদি বিনিময়হারটী অন্যরূপ হইত তাহা হইলে চাহিদা এবং যোগানের উপর ইহার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইতে পারিত দেখিব। মনে করা যাক্ যদি বিনিময় হারটি ১ডলার=৪টাকা হইত। ইহাতে ডলারের মূল্য ৫টাকা স্থলে ৪ টাকা হওয়ার দরুণ ভারতীয় ক্রেতার নিকট যুক্তরাষ্ট্রীয় পণ্যের মূল্যও সেই অনুপাতে কম হইবে। অর্থাৎ ১ডলার=৫টাকা হারে ১০ কোটি ডলারের যুক্তরাষ্ট্রীয় পণ্যের জন্য যে স্থলে দিতে হয় ৫০ কোটি টাকা, ১ডলার=৪টাকা হারে একই পণ্যের জন্য দিতে হইবে ৪০ কোটি টাকা। অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্রেতার নিকট টাকার মূল্য ২০ সেন্ট এর স্থলে ২৫ সেন্ট হওয়ার দরুণ ভারতীয় পণ্যের মূল্যও সেই অনুপাতে বাড়িবে। অর্থাৎ ১ টাকা=২০সেন্ট হারে ৫০ কোটি টাকার ভারতীয় পণ্যের জন্য যেস্থলে দিতে হয় ১০ কোটি ডলার, ১টাকা=২৫ সেন্ট হারে ঐ একই পণ্যের জন্য দিতে হইবে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। অতএব সাধারণ পণ্য দ্রব্যের চাহিদার নিয়ম অনুসারে ভারতীয় ক্রেতার নিকট যুক্তরাষ্ট্রীয় পণ্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশী হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্রেতার নিকট ভারতীয় পণ্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম হইবে। মনে করা যাক যুক্তরাষ্ট্রীয় পণ্যের চাহিদা ১০ কোটি ডলারের স্থলে ১১ কোটি ডলার হইবে এবং ভারতীয় পণ্যের চাহিদা ৫০ কোটি টাকার স্থলে ৪৪ কোটি টাকা হইবে। এক্ষেত্রেও আমাদের প্রকল্পিত ১ ডলার=৪ টাকা বিনিময় হারে টাকার বিনিময়ে ডলারের, এবং ডলারের বিনিময়ে টাকার, চাহিদা এবং যোগান সমান (কারণ ১১কোটি ডলার=৪৪ কোটি টাকা)। অতএব ইহাও হইবে চাহিদা যোগান সমন্বিত বিনিময় হার অর্থাৎ **Equilibrium Rate of Exchange**।

সর্ব্বশেষে মনে করা যাক বিনিময় হারটী যদি উপরের কোনটাই না হইয়া ১ ডলার=৩ টাকা হইত। ইহাতে ১ ডলার=৪ টাকা হারের তুলনায় টাকার বিনিময়ে ডলারের মূল্য কম এবং ডলারের বিনিময়ে

টাকার মূল্য বেশী। অতএব সাধারণ পণ্য দ্রব্যের চাহিদার নিয়মানুসারে ভারতীয় ক্রেতার তরফ হইতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পণ্যের চাহিদা আরও বেশী, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্রেতার তরফ হইতে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা আরও কম হইবে। মনে করা যাক, যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের চাহিদা ১১ কোটি ডলারের স্থলে ১২ কোটি ডলার হইবে, এবং ভারতীয় পণ্যের চাহিদা ৪৪ কোটি টাকার স্থলে ৩৬ কোটি টাকা হইবে। এক্ষেত্রেও ১ ডলার=৩ টাকা বিনিময় হারে টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদা এবং যোগান (উভয়ই ১২ কোটি) এবং ডলারের বিনিময়ে টাকার চাহিদা এবং যোগান (উভয়ই ৩৬ কোটি) সমান। অতএব ইহাও হইবে চাহিদা যোগান সমন্বয় সাধক বিনিময় হার অথবা Equilibrium Rate of Exchange।

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইবে যে টাকার বিনিময়ে ডলারের মূল্য যত কম হইবে টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদাও তত বেশী হইবে, অপর পক্ষে ডলারের বিনিময়ে টাকার মূল্য যত বেশী হইবে, ডলারের বিনিময়ে টাকার চাহিদাও তত কম হইবে, চাহিদার এই নিয়মটি সাধারণ পণ্যদ্রব্যের চাহিদার নিয়ম হইতে স্বতঃসিদ্ধভাবেই আসিতেছে। কারণ টাকার বিনিময়ে ডলারের চাহিদা আসলে ডলারের বিনিময়ে ক্রেয় পণ্যের চাহিদা এবং ডলারের বিনিময়ে টাকার চাহিদা আসলে টাকার বিনিময়ে লভ্য পণ্যের চাহিদা। অতএব এক্ষেত্রে "ডলার" অথবা "টাকাকে" সাধারণ পণ্যের মতই গণ্য করা যায়। অর্থাৎ ডলার যুক্তরাষ্ট্রীয় পণ্য, এবং টাকা=ভারতীয় পণ্য। কিন্তু যোগানের বেলায় দেখা যাইতেছে যে, "মূল্য কমিলে যোগান কমে, মূল্য বাড়িলে যোগান বাড়ে" যোগানের এই নিয়মটি খাটিতেছে না? টাকার বিনিময়ে ডলারের মূল্য যথাক্রমে ৫ টাকা হইতে ৪ টাকায় তারপর ৩ টাকায় নামিল অথচ টাকার বিনিময়ে ডলারের যোগান না কমিয়া বরং ১০ কোটি হইতে ১১ কোটি তারপর ১২ কোটিতে উঠিল। তেমনি ডলারের বিনিময়ে টাকার মূল্য ক্রমে ২০ সেণ্ট হইতে ২৫ সেণ্ট, তারপর ৩৩ সেণ্ট এর উপর উঠিল, অথচ ডলারের বিনিময়ে টাকার যোগান না বাড়িয়া বরং ৫০ কোটি হইতে ৪৪ কোটিতে নামিল। শুধু তাহাই নয়। টাকার বিনিময়ে ডলারের মূল্য কমার ফলে যে হারে ডলারের চাহিদা বাড়িতেছে ঠিক সেই হারে যোগানও বাড়িতেছে। অথবা ডলারের বিনিময়ে, টাকার মূল্য বাড়ার ফলে যে হারে টাকার চাহিদা কমিতেছে, ঠিক সেই হারে টাকার যোগানও কমিতেছে। ফলে আমাদের দৃষ্টান্তের অন্তর্ভুক্ত সবগুলি বিনিময় হারই Equilibrium Rate of Exchange অথবা "ভারসাম্য বিনিময় হার"। পণ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যাপার প্রায় কল্পনাতীত। সেখানে একই অবস্থায় একটি মাত্র Equilibrium Price অথবা "ভারসাম্য মূল্য" থাকিবে। এক্ষেত্রে কেন এই "বিধিবহির্ভূত" ব্যাপারটি ঘটিল তাহা ক্রমশ আলোচ্য।

যদুনাথ সরকার

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

যদুনাথের জন্ম ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে—এবং পরলোক গমণ ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে। গত বৎসর (১৯৭০) তাঁহার শতবার্ষিকী পালিত হয়। বলা বাহুল্য—মূলত পশ্চিম বঙ্গেই। ভারতের অন্যত্র যদুনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালন সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য হইয়াছে কি না এখনও জানিতে বা শুনিতে পাই নাই, এমন কি দিল্লীতে গুজরাল-গুলজারি শোভিত এবং কোন-গুণ নাই—বিষম গুণি-পুরুষ নবকংগ্রেস সেক্রেটারি বহুগুণা এ-বিষয়ে কিছু করা হইবে বা হইয়াছে বলিয়া কোন বাণী প্রদানও করেন কি না জানি না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন—আজ দিল্লীতে বসিয়া বোধহয় নির্গুণা হইয়াছেন, বাঙ্গালী হইয়াও তিনি যদুনাথের বিষয় কিছু করা উচিত কি না সে-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন পরামর্শ বা অনুরোধ করা বোধহয় যথাযথ বিবেচনা করেন নাই নানাদিক ভাবিয়া। বুদ্ধিমানের কাজই হইয়াছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা অবাক হইয়া ভাবিতেছি—ইনি কি সেই ত্রিগুণা সেন, না অন্য কেহ আজ শিক্ষা-দপ্তর হইতে অপসারিত হইয়া তেলদান মন্ত্রিত্ব পদে আরোহণ (অবরোহণ?) করিয়াছেন। বিগত কালে আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা যে ত্রিগুণা সেনকে জানিতাম, বর্ত্তমান রূপান্তরিত ত্রিগুণার সহিত তাহার কোন প্রকার সামান্য মিলও খুঁজিয়া পাইতেছি না।

প্রসঙ্গক্রমে একটি পুরাণ কথার উল্লেখ করা যায়। প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে পাঠকালে আমাদের শ্রীভাটে নামে এক মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপক (আই, ই, এস) ইতিহাস পড়াইতেন। সেইকালে বিহার এবং ওড়িষা একই বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ভুক্ত ছিল। অধ্যাপক ভাটে একবার পাটনাতে সিণ্ডিকেট-মিটিং যোগদান করিয়া কটকে আমাদের ইতিহাস অনার্শ ক্লাসের ছাত্রদের বলিলেন—Well students I met the professor of history of the Patna College. He asked me, 'Professor what do you think of your history students at Cuttack?'—I gave the correct reply and told him that my students belong to the Pre-Historic Period! The Patna professor said—'you are fortunate professor—Your students have some connection with history. My brilliant group of studens belong to the stone-age"—

উপরে উক্ত কথাগুলি এই কারণে বলিলাম যে আজ নব-হস্তিনাপুরের প্রায় সকল তথাকথিত পণ্ডিতবর্গ, বিশেষ করিয়া কেন্দ্র সরকারের হস্তি-পণ্ডিতের দল, সকলেই বোধ হয় প্রস্তর যুগের মানুষ। বর্ত্তমান যুগের, বিশেষত ১৯শ এবং ২০শ শতাব্দীর চিন্তাধারা এবং জাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কোন ঐতিহাসিক বিষয়ের সহিত তাঁহাদের কোন যোগ বা সম্পর্কও নাই। তাঁহাদের মতে ইহা প্রয়োজনহীন এবং সেই কারণে

তাঁহারা ভারতের এক নূতন ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত। কেন্দ্রমন্ত্রী নেহরু দুলালী ত সোজা কথায় প্রকাশ্যে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি এবং তাঁহার বশম্বদ প্রখর বিদ্যাভূষিত মন্ত্রীমণ্ডলী যাহা বলিতেছেন এবং করিতেছেন সবই HISTORIC! এই সম্পর্কে বিশেষভাবে নাম করিতে হয় কেন্দ্রাকাশে হঠাৎ আবির্ভূত শ্রী আই, কে, গুজরাল নামধারী বেতার, ইন্‌ফরমেশন এবং জন-সংযোগ প্রভৃতি দপ্তরের ডেপুটি মন্ত্রীর। বিশ্বে এমন কোন বিষয় নাই, এমন কোন বিদ্যা নাই যাহা এই গুজ্‌রালী মনোমুকুরে প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু কথায় বলে প্রদীপের শিখার নীচেই অন্ধকার। কাজে কাজেই গুজরালী প্রদীপের নীচে অবস্থিত দেশের মহামান্য এবং বিদ্বজনের শ্রদ্ধাভক্তি এবং প্রশংসিত দেশীয় মহামানবগণ গুজরালী স্নেহ-দৃষ্টিতে পরিবার দুর্লভ সৌভাগ্য-সুযোগ বঞ্চিতই থাকিয়া গেলেন। যাক্।

স্যর যদুনাথকে একটি সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে COLUMBUS OF MUGHAL HISTORY। কথাটি অতিযোগ্য ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কলম্বাস যেমন পাল তোলা জাহাজে একদল অল্প শিক্ষিত নাবিক এবং নিজের অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও—দুস্তর বিপদসঙ্কুল মহাসাগর পাড়ি দিয়াছিলেন—নিজের অমিত সাহস এবং বিশ্বাস মাত্র নির্ভর করিয়া সকল বিপদ কাটাইয়া, বিদ্রোহী নাবিকদের কোন প্রকারে শান্ত করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত অবধারিত মৃত্যুর হাত এড়াইয়া, ভারতের বদলে আমেরিকা আবিষ্কার করেন;—স্যর যদুনাথও তেমনি মুঘল রাজত্বের, বিশেষ করিয়া আলমগীরের রাজত্বের অবহেলিত, লোকচক্ষুর এবং জ্ঞানের বাহিরে অবস্থিত অসংখ্য পুঁথি, সমকালীন ঐতিহাসিক এবং প্রায় অবলুপ্ত অসংখ্য চিঠিপত্র দলীল প্রভৃতি ঘাঁটিয়া (—যাহার জন্য যদুনাথকে পারস্য ভাষা রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়—অন্যান্য বহুভাষাতেও তাঁহার জ্ঞান ছিল অ[illegible]ক্ষেত্রে পাঠোদ্ধার করিয়া,—এক কথায় দুস্তর বাধাবিপত্তি পার হইয়া নিজের তপস্যায় ইতিহাস রচনায় সার্থকতা লাভ করিতে হয়। এ-বিষয় তাঁহাকে ভারতের পুণ্যশ্লোক যোগী এবং সাধকদের সহিত সমগোত্রে ফেলা যায়। ইতিহাস সাধনার ক্ষেত্রে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের নীরব সাধনার ফলে অবশেষে সিদ্ধিলাভ করেন, এবং এই সিদ্ধিলাভের ফলেই আজ যদুনাথ বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক, পণ্ডিত এবং সাধকদের সহিত সম আসন লাভ করেন। অন্যান্য সভ্যদেশের ঐতিহাসিক পণ্ডিতবর্গ যদুনাথকে তাঁহাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং শ্রদ্ধাভক্তি দিয়া তাঁহাকে পৃথিবীর একজন অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক বলিয়া বন্দনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। প্রকৃত ঐতিহাসিকদের নিকট আমাদের ঐতিহাসিক যদুনাথ গুণীর একান্ত প্রাপ্য ভক্তি-সমাদর লাভে বঞ্চিত হয়েন নাই। কিন্তু দুঃখের এবং লজ্জার কথা নিজের দেশে যদুনাথ তাঁহার প্রাপ্য সম্মান এবং রিকগ্‌নিশন সর্বক্ষেত্র এবং দেশের তথাকথিত গুণী মহলে পায়েন নাই। যেমন ধরুন—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যর আশুতোষ ছিলেন এক বিরাট পুরুষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অবদান চির অম্লান থাকিবে। আশুতোষ দেশ বিদেশ হইতে বহু বিদ্বান এবং পণ্ডিতকে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেবায় নিয়োজিত করেন. কিন্তু ঠিক কি কারণে এবং কেন জানা নাই স্যর যদুনাথকে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। বৈজ্ঞানিক নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী রমন, দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতিকে আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদে বরণ করিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যত উন্নতি এবং পণ্ডিতসমাজে পরিচিতিলাভে সুযোগ দান করিয়া তাঁহাদের বিরাট ভবিষ্যতের সূচনা করেন। কিন্তু যতদূর জানি স্যর আশুতোষ যদুনাথ সরকার মহাশয়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দান করেন নাই—এ-কথা তিনি চিন্তাও করিতে পারিতেন না। অবশেষে স্যর যদুনাথ যখন কপালগুণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য পদে বসিলেন, সেই দুইবৎসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিচিত্র পলিটিক্সের' আবর্তে তাঁহাকে পদে পদে

সর্ব্ববিষয়ে প্রবল বাধা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকা এবং বাস্তু ঘুঘুদের বিষম চক্রের অসহযোগিতার ফলে, তাঁহার উপাচার্য্য-জীবন এমনই দুঃসহ হইল যে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য আর উপাচার্য্য পদপ্রার্থী হইলেন না এবং এ-বিষয়ে তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য বাঙ্গলার গভর্ণরের অনুরোধ উপরোধও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় ওড়িষার ইতিহাস লেখক প্রত্নতাত্ত্বিক স্বর্গত প্রখ্যাত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অকৃত্রিম যদুনাথ-ভক্তিশ্রদ্ধার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অস্পৃশ্যই থাকিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য শুধু আশুতোষই সেইকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য না থাকিয়াও সর্ব্ববিষয়ে একচ্ছত্র ডিক্‌টেটার ছিলেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতেই অধ্যাপক নিয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রশাসনিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করা হইত। দুষ্ট পরনিন্দুক লোকে বলে যে এই সময় "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ এক গুষ্টির জমিদারীতে পরিণত হয়।"—কথাটা বিশ্বাস করা না করা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। এ-সব কথার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই—এখন ইহা অহেতুক। তবে এটুকু অবশ্যই স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই যে আশুতোষ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যাহা করেন, তাহা বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালী চিরদিন স্মরণ করিবে—ইহা অস্বীকার করার অর্থই হইবে এক কথায় চরম অকৃতজ্ঞতা।

যদুনাথ সরকারের ঐতিহাসিক গবেষণা এবং ইতিহাসকে এক নব আদর্শে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অক্লান্ত সাধনা এবং দীর্ঘ প্রায় ৬০ বৎসর একটানা এবং অনবসর পরিশ্রমের বিচার করা এবং এ-বিষয় কোন মতামত প্রকাশ করা আমাদের মত অতি সামান্য-নগণ্য ব্যক্তিদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, পঙ্গু হইয়া পর্ব্বত লঙ্ঘনের অসম্ভব কার্য্য।

স্যর যদুনাথের ইতিহাস এবং অন্য কিছু প্রকাশিত, অপ্রকাশিত রচনার কিছু তালিকা দিতেছি :

IMPORTANT WORKS OF SIR JADUNATH

NAME OF THE BOOK AND YEAR OF PUBLICATION

1. India of Aurangzib—1901, 2. History of Aurangzib, Vol I—1912. 3. History of Aurangzib, Vol. II—1912. 4. Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays—1912. 5. Chaitanya: His Pilgrimage and Technique—1913. 6. History of Aurangzib, Vol. III—1916. 7. Shivaji and his Times—1919. 8. Studies in Mughal India—1919. 2. History of Aurangzib, Vol. IV—1919. 10. Mughal Administration—1921. 11. History of Aurangzib Vol. V—1924. 12. Nadir Shah in India—1926. 13. India Through the Ages—1928. 14. Shivaji (In Bengali)—1929. 15. A Short History of Aurangzib—1930. 16. Bihar and Orissa during the fall of the Mughal Empire—1932. 17. Fall of the Mughal Empire, Vol I—1932. 18. Studies in Aurangzib's Reign—1933. 19. Fall of the Mughal Empire, Vol. II—1934. 20. Maratha Jatiya Bikash (In Bengali)—1936. 21. Fall of the Moghul Empire, Vol. III—1938. 22. House of Shivaji—1940. 23. Shivaji—A Study in Leadership—1949. 24. Fall of the Moghul Empire Vol. IV—1950. 25. Military History of India (Posthumous)—1960.

BOOKS EDITED

1. Gour Sundar Mitra's Bengali Translation of the Siyar-ul-Mutakharin—1915. 2. Irving's Later Mughals, Vol. I & Vol. II—1922. 3. Cambridge History of India, Vol. IV. Chapter on Later Mughals—1930. 4. History

of Jaipur State—1940. 5. Poona Residency Correspondence, Vol. VIII—1945. 6. Persian MSS of the Nawabi Period (A.S.B.)—1945; 7. History of Bengal, Vol. II (Muslim Period) (Dacca University)—1948. 8. Ain-i-Akbari, Vol. III. (A.S.B.)—1948. 9. Poona Residency Correspondence, Vol. XIV—1949. 10. Ain-i-Akbari, Vol. II (A.S.B.)—1950. 11. Poona Persian Records, Part I—1953. 12. Poona Persian Records, Part II—1954.

UNPUBLISHED WORKS

1. The Rani of Jhansi (Hindusthan Standard). 2. Famous Battles of Indian History (Hindusthan Standard)—1952-54. 3. Rajasthan Records. 4. Military Tradition of Western India. 5. Chronology of Indian History (1730-1800). 6. Itihaser Sadhana (In Bengali)—1949. (Reply to Sahitya Parisad Reception).

যদুনাথ সরকারের আরো হয়ত বহু কিছু ইতিহাস এবং সাহিত্য-কর্ম থাকিতে পারে, যাহা আমাদের জানা নাই। জন্মের শতবৎসর অতিক্রান্ত হইলেও যদুনাথ এখনও আমাদের অনন্যসাধারণ, অনতিক্রম্য এবং অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এবং সারা পৃথিবীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের প্রথম সারিতে বিদ্যমান আছেন এবং থাকিবেন, এই ঐতিহাসিকের নাম ইতিহাসের ইতিহাসে চির-দীপ্যমান রহিবে।

যদুনাথ ইতিহাস লিখিতে গিয়া—সেই ইতিহাসে কিম্বদন্তী, লোকসমাজে প্রচলিত কল্পনাপ্রসূত 'কাহিনী' সযত্নে পরিহার করিয়াছেন, ভিত্তিহীন কাহিনী কিংবা 'গল্পের' কোন প্রকার সংমিশ্রণ তাঁহার লিখিত ইতিহাসে নাই। ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিতে পুরাতন পুঁথি, চিঠিপত্র প্রভৃতি যাহার প্রায় সবই ফার্সিতে লিখিত যদুনাথের পরম সহায় ছিল পাটনার খোদাবক্স গ্রন্থাগার। এই অমূল্য কিন্তু অবহেলিত গ্রন্থাগারটির মধ্যে লুকাইত এবং সাধারণের (সাধারণ বলিতে সাধারণ ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের কথাই বলিতে চাই) অবগত ঐতিহাসিক রত্নরাজির ব্যবহার দূরের কথা সেগুলি একপ্রকার অজ্ঞাতই ছিল।

প্রকৃত তথ্য খুঁজিতে এবং ঐতিহাসিক মালমশলা বাহির করিতে যদুনাথ দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর অনবসর অনলস গবেষণার কাজে গভীরভাবে নিবদ্ধ থাকিতেন। এত সতর্ক হইয়া তাঁহাকে গবেষণা চালাইতে হয় এইজন্য যে যাহাতে কোন প্রকার অনৈতিহাসিক কিছু তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া না যায়। কার্লাইল, ফ্রেড্রিক দি গ্রেটের এবং মেকলে তৃতীয় উইলিয়ামের চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া যেমন ভারসাম্য হারাইয়া ফেলেন, যদুনাথের বেলায় তাহা ঘটে নাই। প্রকৃত তথ্যের গবেষণা-পটে যাহা প্রতিভাত হইয়া সত্য বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে যদুনাথ তাহার ভিত্তিতেই ইতিহাস লিখিয়াছেন, তিনি নূতন করিয়া ইতিহাস 'রচনা' করেন নাই। বিখ্যাত ঐতিহাসিক TOCQUEVILLE এর কথা এই সম্পর্কে স্মরণ করা যাইতে পারে। এই ঐতিহাসিক বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী বীর যোদ্ধা এবং সম্রাট নেপোলিয়নের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন এই বলিয়া, "He (Napoleon) was as great as a man can be without MORALITY." যদুনাথ সরকার মহাশয়ও আলমগীর-ইতিহাস বর্ণনা কালে এই মুঘল সম্রাটের ভাল এবং মন্দ সবই বলিয়াছেন, তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব এবং হীনতা সবই যদুনাথ দেখাইয়াছেন, সত্য এবং মিথ্যার বিচার সমভাবে করিয়াছেন, কোথাও মাত্রাজ্ঞান হারান নাই।

কথায় বলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট পথ এবং গতি আছে, যাহা প্রতিরোধ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। ইতিহাসের গতি এবং পুনরাবৃত্তি সর্বক্ষেত্রে ঘটে কি না বলা শক্ত কিন্তু বহুক্ষেত্রে ইতিহাসের এই বিচিত্র চরিত্র ও গতি

দেখা যায়। ইতিহাস হইতে শিক্ষা করিবার বহুকিছু আমাদের আছে। যদুনাথ মুঘল রাজত্বের শেষ দিনগুলির কথা যে-ভাবে বলিয়াছেন, বর্তমান 'স্বাধীন' ভারতের প্রশাসকদের তাহা হইতে এই নির্মম সত্য উপলব্ধি করা উচিত এবং সময় থাকিতে সতর্ক দৃষ্টি না দিতে পারিলে, মুঘল সাম্রাজ্য যেভাবে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ কবলিত হয় বর্তমান ভারতে তাহারই সর্বপ্রকার আভাস প্রকাশ পাইতেছে ইহা বোঝা আবশ্যক কেবলমাত্র মুখের কথায় এবং নেতা—মহলের National Integrationরক্ষা করিবারজন্য বেহুঁস জনগণকে সকাতর "আহ্বান" জানানো বেকুফি ছাড়া আর কি বলা যায়?

যদুনাথ সম্পর্কে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও যদুনাথকে বিচার করিবার শক্তি, এবং তাঁহার ইতিহাস-কর্ম সম্পর্কে জ্ঞানও এ-বিষয় একান্ত সীমিত। এই প্রসঙ্গে এইটুকু সতর্ক এবং সজাগ হইতে সকলকে বলা প্রয়োজন যে মুঘল সাম্রাজ্যে আলমগীরের জীবনের প্রাক্ সন্ধ্যাকালে যে সকল বিবিধ বিষম 'ক্ষয়'-রোগের সিম্‌টম্‌স্ প্রকাশ পায়, বর্তমান ভারতেও দেখি আমাদের রাজ্যে রাজ্যে, নিজ নিজ রাজ্যের ক্ষুদ্র-স্বার্থ, দল এবং মানুষের বর্ণ-বৈষম্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। তাহাতে ভারত যে এক জাতি এক দেশ ইহা নেতারাও ভুলিতে বসিয়াছেন এবং ইংরেজ 'কৃত' মহা-ভারত এবং ভারত-ঐক্য প্রায় ধ্বংসের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রশাসক মহল এবং আমাদের সর্বস্বার্থত্যাগী নেতা, সংসদ সদস্য বিভ্রান্ত, প্রাদেশিক তথা দলীয় এবং বর্ণ-স্বার্থই আজ সকলের লক্ষ্য। নির্মম ভবিতব্য আমাদের এ-অপরাধ ক্ষমা করিবে না, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে আমাদের ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া।

বর্তমান ভারতের মহান নেতা 'বাকৃবর' জবাহরলালের নির্দেশে, ঐতিহাসিক শ্রীরমেশ মজুমদারকে তাড়াইয়া জনৈক—ডঃ তারাচাঁদকে দিয়া করমাসী ভারতের স্বাধীনতার তথাকথিত ইতিহাস রচনা করিয়াও ইতিহাসের অধঃগতির গতিরোধ করা যাইবে না।

অতীব আনন্দের কথা কেন্দ্রীয় তথ্য, সংযোগ-রক্ষা ও বেতার মন্ত্রীর বিচারে যদুনাথ ভারতীয় ডাক-বিভাগ কর্তৃক স্মারক 'ডাকটিকিট' শ্রেণীতে স্থান লাভ করিবার যোগ্য বিবেচিত হইলেন না। অথচ ১৯৭০ সালের স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের তালিকাভুক্ত না থাকিয়াও বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুরস্রষ্টা বিটোফেনের স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশে কোন বাধা বা অসুবিধা হইল না। এইটা অবশ্য উত্তম কার্য হইয়াছে, যদিও বিটোফেনের সম্মান ইহাতে কোন দিক দিয়াই বৃদ্ধি পাইল না, তিনি নিজগুণে অমর হইয়া আছেন ও থাকিবেন। যদুনাথের স্মারক ডাকটিকিট কেন্দ্রীয় পণ্ডিত মন্ত্রী প্রকাশ না করিয়া একদিক হইতে তাঁহাকে অতি বিদ্বান এবং অতি-মানবদের 'সম্মান' হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তম্বাই বাসীদের পক্ষে অরণ্যের অন্ধকার ভেদ করিয়া গৌরীশৃঙ্গের স্বর্গীয় দৃশ্যশোভা দেখা এক অসম্ভব কার্য্য এবং দুরাশা।

পরিশেষে যদুনাথের বিষয় তাঁহার অল্প ব্যক্তিগত বিষয় কিছু বলা অবান্তর হইবে না। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ এবং সদাসর্বদা পড়াশুনা এবং গবেষণার কাজে ব্যাপৃত থাকিলেও যদুনাথ ফুটবল এবং হকি খেলার অতি অনুরক্ত ছিলেন। অধ্যাপক জীবনের শেষের দিকে তিনি যখন কটকে ছিলেন, সেই সময় তিনি আমাদের ফুটবল ম্যাচের বড় বড় প্রতিযোগিতার রেফারি হইতেন। হাফ্-প্যান্ট্ সার্ট্ পরিহিত, হাতে হুইশীল তাঁহার উৎসাহ এবং তৎপরতা দীপ্ত মূর্তির কথা আজও আমাদের মনে বিরাজ করিতেছে! খেলার মাঠে তাঁহাকে মনে হইত বয়স্ক যুবক।

অধ্যাপনা হইতে অবসর লইয়া যদুনাথ কলিকাতায় বসবাস করিতে থাকেন। জীবনসন্ধ্যায় তিনি এক বিষম আঘাত পাইলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ডঃ অবনী সরকারের অপঘাত মৃত্যুতে। ১৯৪৬-এর কলিকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় অবনী ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট এবং ধর্মতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েন। এই সময় অবনী একটি ছাপাখানা

স্থাপনা করিয়া তাহার কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেন। অবনী ছিলেন আমার বাল্যবন্ধু। বড় পুত্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে যদুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র (সামরিক বিভাগে কাজ করিতেন) যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করেন। দুই পুত্র-বিয়োগব্যথা যদুনাথের জীবনে নির্মমতম আঘাত হইলেও, তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। জীবনের সকল আনন্দ বেদনাকে তিনি সমভাবে গ্রহণ করিতেন—এবং পারিবারিক ক্ষুদ্র পরিবেশের ক্ষুদ্র-ইতিহাসের ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে নিজেকে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। অবনীর শোকাবহ অকাল মৃত্যুর কয়েকদিন পরে যদুনাথের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। অন্তরে নিদারুণ পুত্রশোক—কিন্তু মুখে তাহার বিশেষ প্রকাশ পায় নাই। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিবার প[র] যদুনাথ বলিলেন—

"কেমন আছ? অবনী ত ছেড়ে চলে গেল—ক[...] হয় বই কি—কিন্তু দেখ ব্যক্তিগত এবং পারিবারি[ক] ব্যথা বেদনা আনন্দ, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ সব[ই] পারিবারিক ইতিহাসের মধ্যে পড়ে—এর সঙ্গে অ[ন্য] কারো বিশেষ সম্পর্ক নেই। বন্ধুবান্ধব সমবেদন[া] জানাতে আসেন। কিছু সান্ত্বনা অবশ্যই পাওয়[া] যায়, কিন্তু এর অন্য দিকও আছে। যা ভুলতে চাই বারবার তাই যেন নূতন করে জেগে ওঠে।"

যদুনাথের সম্পর্কে আর কিছু বলিবার নাই, সাধ্যও নাই, তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া শ্রদ্ধা তর্পণ করিলাম।

জন্ম-জন্মান্তর

রামপদ মুখোপাধ্যায়

বালিচক পর্য্যন্ত ট্রেন তারপর কয়েক মাইল বাস। সে পথ শেষ হলো—অপরাহ্ন বেলায়। তার পরেও রয়েছে পাঁচ মাইল। অবশ্য সোজা পথে। পথটা সোজা হলেও সহজ নয়। অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বটে—কিঞ্চিৎ বাধাবিঘ্নসঙ্কুল। এ ছাড়া সুগম একটি পথ রয়েছে নদীর বাঁধ ধরে ধরে তিন মাইল ঘুরে যেতে হবে। এদিকে বেলা যায়—এই পাঁচ মাইল পার হতেই সন্ধ্যা উৎরে যাবে তার উপরে আবারও তিন মাইল। ক্লেশকর পথ, সংক্ষিপ্ত পথটাই ধরল মহেশ। মাইলটাক পায়ে-চলা পথ তারপর প্রকাণ্ড একটা মাঠ—তিন মাইল আন্দাজ এত বড় খাঁ খাঁ করা মাঠ—জীবনে গোচর হয়নি। ট্রেনের পথে দেখেছে অনেক,—পশ্চিমে এমন কূল-কিনারা হীন মাঠের সংখ্যা কম নয়। মাঠের সামনে এসে মনটা দমে যে গেল না তা নয়—এই অকূল বিস্তারে পথ হারানোর সম্ভাবনা পদে পদে। যে লোকটা কাচা সড়ক থেকে মাঠে তুলে দিল—সেই ভাল করে বুঝিয়ে দিল, একেবারে কোনাকুনি পার হয়ে যাবেন—নাকের সোজা কোনাকুনি, ডাইনে হেলবেন না—বাঁয়েও না। তারপর পাবেন একটা গ্রাম—সে গ্রামের শেষে ঝাঁকড়া একটা বটগাছ, বিশ পঁচিশটা ঝুরি নেমে হয়েছে বিশ পঁচিশটা গাছ। সেই বট গাছের—দুদিকে দুটো ফকড়ি বার হয়েছে দুটো পথের। আপনারটা ডাইনের—হঁস রাখবেন। ডাইনের পথ।

মাঠের মাঝখানে এসে দিশা ঠিক রইলো না। তবু এখানে এখন গোধূলি আলো—গ্রামে রীতিমত একপ্রহর গ্রামের শেয়ালগুলো এইমাত্র যাম ঘোষণা করল—মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই শব্দের বেশ আর্তনাদের মত লাগছে। মাঠের কোন দিকে গাছপালা নেই, মানুষজনের চিহ্ন নেই—কোন জন্তু-জানোয়ার কি পাখ-পক্ষীর সাড়াশব্দ নেই। বন নেই—তবু বিজন মাঠ—আকাশ থেকে আর দিগন্ত থেকে পাতলা ধোঁয়ার মত পাঁশুটে অন্ধকার ঝোঁপে আসছে। এখন কোনাকোনি হিসাব করে পথটা চিনে নেওয়া যাবে কি? পথ হারানোর চিন্তা কিংবা আর কোন অশুভ ছায়াপাত—কে জানে মহেশের সমস্ত অন্তর শিউরে উঠল। মনে হল, খুব হালকা পায়ে—কে যেন তার পিছু পিছু আসছে। চারিদিকে এখন অগাধ স্তব্ধতা—অনুভূতি খুব তীক্ষ্ণ ও সজাগ হয়েছে—বাতাসটুকু পর্য্যন্ত বইছে না, তাহলেও বা মাঠের শুকনো পাতা পড়ার হালকা আওয়াজ জীবন্ত দিগন্তের ইঙ্গিত দিতে পারত। এখন স্তব্ধতার মহাসমুদ্রে ক্রমশই ডুবে যাচ্ছে মহেশ প্রাণপণে সংগ্রহ করতে চাইছে কিছু জীবনের আভাস—অন্তত সামান্য শব্দ। সমস্ত বৃত্তি সংহত করে শ্রবণ পথে একাগ্র করল মহেশ—আর সেই সময়ই ধরাপড়ল লঘু পায়ের আওয়াজ—কে যেন তার পিছু পিছু আসছে। অমনি চির-পুরাতন সংস্কার প্রবল হল—রাত-বিরেতে পথ চলতে চলতে কখনো পিছন ফিরে দেখবে না—যদি মনে হয় তোমাকে কেউ অনুসরণ করছে, করছে। জেনো-সেই রাতের মানুষটি কখনোই সাধারণ মানুষ নয়—তোমার অনিষ্ট কামনা নিয়ে তোমার পিছু নিয়েছে। তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যাও তুমি নির্বিঘ্নে।

নিদারুণ উত্তেজনায় মহেশ কেঁপে উঠল, পুরাতন নিষেধবাণী ভুলে চীৎকার করে উঠল কে?

এতখানি জোরে চীৎকার করেছিল—তার সিকির সিকি তাগও খাটছিলো না ঘরে—অস্পষ্ট

ঘড়ঘড়ানির মত শোনালো। সবলে ভয়টুকু মুছে ফেলে পিছনে তাকাল মহেশ। আবার বলল, কে?

অন্ধকার মাখা একটি মূর্তিই বটে—একেবারে পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে।

মূর্তি বুঝল মানুষটা ভয় পেয়েছে—আপন মনে হেসে নিয়ে বলল, চিনবেন না।

আশ্বস্ত হল মহেশ। আঃ ভগবান এতক্ষণে একজন সঙ্গী মিলিয়ে দিয়েছ, অশেষ তোমার করুণা। অত্যন্ত খুসীভরা কণ্ঠে বলল, তপসে গ্রামটা এখান থেকে কতদূরে ভাই?

মূর্তি সরাসরি উত্তর না দিয়ে মহেশের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিল। তারপর প্রতিপ্রশ্ন করল, সে গ্রামে আপনার কে আছে?

আমার আত্মীয়। আমার খুড়তুতো ভাই—হরিশ ভট্টাচার্য্য—ডাকনাম মন্টি। তার বাড়ী যাব আমি।

আপনি ব্রাহ্মণ? প্রণাম। দুহাত তুলে প্রণাম জানাল লোকটা। তারপর বলল, তা ভরসন্ধেবেলা এই পথে চলছেন কেন ঠাকুরমশাই, আপনি কি এ পথের বিত্তান্ত জানেন না?

মাথা নাড়ল মহেশ, না। কেমন করে জানব ভাই, আমরা বরাবর পশ্চিমে থাকি—বাংলার গ্রামে এই প্রথম আসছি।

ওর সরল প্রত্যুত্তরে লোকটা হাসল। তা পথের বিত্তান্ত ভাল করে জেনে নেবেন তো। আরও একটি ভাল পথ ছিল আবিপ্তি ঘোর পথ- তা সেই পথে গেলেন না কেন? কাউকে কেন শুদোন নি—

এটা সোজা পথ বলে—

'লোকটা এবার শব্দ করে হেসে উঠলো—তাইতো ঠাকুর মশায়, পথটা সোজাই বটে। রেতের বেলা যে ঝট করে ঠিকানায় পৌঁছে দেয় এটাও কেউ বাতলে দেয়নি। ভাল করেন নি। লোকটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

মহেশের বুকটা অমনি ধড়াস করে উঠল—কি বলতে চায়ও।

লোকটা তখন পাশাপাশি চলছে। চুপচাপ চলছে। মহেশের নীরবতা ভাল লাগছিল না, বাংলার গ্রাম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার কৌতূহল হচ্ছিল। বলল, তুমিও কি ওই গ্রামে যাবে?

লোকটা কোন উত্তর দিলনা—গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে। চলতে চলতে হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে পড়ল তারপর বলল, সঙ্গে কিছু টাকা কড়ি আছে নিশ্চয়। তাই বলছিলাম কাজটা ভাল করেন নি।

মহেশ বলল, সামান্য টাকা—এক জায়গায় ঠাকুর-পূজো করে দক্ষিণে পেয়েছিলাম, দশটা টাকা, তাই আছে।

আছে তো কিছু। এই গাঁয়ে ছুঁয়ে আকালের সময় গরীব গুরবোরা গাছের পাতা পুকুরের কলমি শাক খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, ওই বা কি কম।

মহেশ বলল, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

হো হো করে হেসে উঠলো লোকটা বুঝতে পারলে আর এ পথে আসেন। তা যাক বরাত ভাল আমার সঙ্গে পোরথম সাক্ষাৎ। চলুন গণ্ডীটা পার করে দিয়ে আসি।

কিসের গণ্ডী।

লোকটা আবার হা হা করে হেসে বললো, লক্ষ্মণের গণ্ডী। মা জানকীরে যার মধ্যে রেখে গিয়েছিল। চলেন চলেন, আর পাচাল পাড়বেন না—ঝামেলায় পড়বেন।

লোকটা এবার পা চালিয়ে দিল। এতক্ষণে মাঠ শেষ হল। পাতলা মত বন খানিকটা। দুধারে কালকাসুন্দা ভাঁট গাছের ঝোপ ঠেলতে ঠেলতে ওরা প্রকাণ্ড একটি বট গাছের তলায় এলো। মাঝখানে ঝাঁকড়া বটগাছ—যত রাজ্যের অন্ধকার এসে জমেছে তার তলায়। এইখানেই দুটো অপেক্ষাকৃত চওড়া পথ নজরে পড়ল। মহেশ বলল, ওই ডান ধারের পথটাই কি—

হাঁ। ঠাকুর মশাই, ওইটি ধরে বরাবর চলে যান।

আর আমার যাবার হুকুম নেই—আপনি স্বচ্ছন্দে চলে যান। এর পরের গ্রাম তপসে। গ্রামে ঢুকতেই দেখবেন একটি অশ্বত্থ গাছ—তার নীচের নিকোনো দাওয়ায় মা মনসার ঘট পাতা। তাঁর বাঁ কোল ঘেঁসে রাস্তা, নির্ভয়ে চলে যান, আপনার কেশাগ্র কেউ স্পর্শো করবে না।

আচ্ছা ভাই তোমার নামটি কি? মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে দেখে কেউ নেই। অন্ধকারেই টুপ করে মিশিয়ে গেছে লোকটি।

* * * *

খুড়তুতো ভাই বাড়ী ছিল না। বৌদি সমাদর করল। এস-এস ঠাকুরপো। তা এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়লো?

দাওয়ার তক্তাপোষের উপর বসে পড়ে মহেশ বলল, সব বলছি। তার আগে বলুন তো, যে-পথ দিয়ে এখানে এসেছি—মানে প্রকাণ্ড মাঠ পার হয়ে—

ওমাগো—বলকি। এই রাত্তিরে ঠ্যাঙাড়ের মাঠ দিয়ে এলে তুমি? সাহস তো কম নয়? বৌদি চোখ কপালে তুলল।

মহেশ দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, এতো তাঁরই কৃপা। তৎকৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং।

হাতমুখ ধুয়ে সুস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, মন্টিদা কোথায় গেছেন বললেন?

উনি গেছেন সদরে। জমিজমা নিয়ে প্রায়ই গোলমাল বাধে কিনা, মামলার তদ্বির করতে যান উকিলবাড়ী। এবার বলে গেছেন তিন চার দিন পরে ফিরবেন। থাকবে তো দু-চার দিন?

থাকব। মনে মনে বলল, থাকতেই হবে।

আহারাদির পর ভাবতে লাগল কথাটা কিভাবে পাড়বে। যাই হোক সে সুবিধা বৌদিই করে দিলেন। বললেন, এসে অবধি দেখছি চুপচাপ রয়েছ। এত কি ভাবছ বলতো?

মহেশ বলল একটা কথা বলা হয়নি সেটা বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি নে।

কি কথা? রমার সম্বন্ধে কিছু? তা যত বারই তার কথা জিজ্ঞেস করছি হুঁ-হ্যাঁ দিয়ে সারছ। সে কি এখনও এলাহাবাদে রয়েছে?

মহেশ মাথা নেড়ে বলল, না।

তবে কোথায়? তাকে অনায়াসে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতে।

পারতাম না বৌদি। বিষণ্ণ কণ্ঠে মহেশ বলল, আর কোন দিনই তা পারব না।

বৌদি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, কেন বল তো?

মহেশ বলল, রমা নেই—মারা গেছে।

মারা গেছে। আঘাত খাওয়া প্রিয়জনের মত বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বৌদি। কোন সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করল না। চৌকির উপর বসে পড়ে অনেকক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে শুধোল, কি হয়েছিল?

সংক্ষেপে সমস্তই জানাল মহেশ।

সব শুনে একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বৌদি বলল, আহা। এত অল্প বয়সে কত সাধ আহ্লাদ—নিয়তি।

ছাড়া ছাড়া কটি কথা কি অপূর্ব সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়েই না দিল। রমার বিয়োগ-বেদনা নতুন করে অনুভব করল মহেশ। সুখে দুঃখে মতান্তরে মনান্তরে অনেকগুলি বছর এক সঙ্গে কেটেছে। ভালবাসাকে তেমন গভীরভাবে অনুভব করেনি—সব কামনার তৃপ্তি তবু ছিল। আর ছিল নিশ্চিন্ত নির্ভরতা সংসারের বহু ঝামেলাই মাথায় তুলে নিয়েছিল—বহু চিন্তার ভার থেকে দিয়েছিল অব্যাহতি। অনেক—খানি জায়গা খালি রেখে গেছে রমা।

অনেকক্ষণ পরে বৌদি বলল, তা ভাই পুরুষমানুষ শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবেই তোমাকে। ছোট ছোট বাচ্চারা তোমার মুখ চেয়েই আছে—তাদের মানুষ করে তোলার ব্যবস্থা......তা ওরা কি কাশীর বাড়ীতে ঠাকমার কাছে রইলো?

ছিল এখন নেই। ওদের ঠাকমা ওটা পছন্দ করলেন না।

ও বুঝেছি দিদিমার কাছে।

সে দুয়োরও বন্ধ।

দু'চোখ কপালে তুলে বৌদি বলল, তবে? তবে কোথায় রেখে এলে ওদের?

আমার এক বন্ধুর জিম্মায়।

তা সেখানে তো চিরকাল থাকতে পারবে না।

না তা সম্ভব হবে না।

তাহলে কি করবে ভাই। বৌদির উৎকণ্ঠা যেন বেড়েই চলেছে।

এখনও ভাবছি বৌদি—কীবে করা যায়।

বেশ তো ভাব। তোমার দাদা সদর থেকে ফিরে আসুন তার সঙ্গেও পরামর্শ কর। আমিও ভাবছি। তিনজনে পরামর্শ করলে একটি ভাল উপায় নিশ্চয় বার হবে? কি বল, হবে না?

বৌদির কথায় পরম নিশ্চিন্ত বোধ করে মহেশ। উনিও ওদের জন্য ভাবছেন। উনিও মা। নিশ্চয় ওদের একটি ভাল ব্যবস্থাই হয়ে যাবে।

আলো নিভিয়ে চৌকির উপর শুয়ে পড়ল। ঘুমের আগে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ওই চিন্তাই চলল—ওর আশ্বাসে মন ভরে রইল।

শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখল মহেশ। স্থানটা কোথায় বুঝতে পারল না, কালের হিসাবও ধরা গেল না, শুধু দেখল মাষ্টারমশায় দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। হাসছেন মৃদু মৃদু। বললেন, খুশী হয়েছি—মহেশ খুব খুশী হয়েছি। আমার কথা রেখেছ দেখে আনন্দ পেয়েছি। তবন আর দেরি করো না। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড সিদ্ধিনাথের থানে। সেইখানে ভবানী অপেক্ষা করছে। তাকে লাভ করতেই হবে—তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

ব্যাকুল হয়ে উঠলো মহেশ কিন্তু আমি যে—

হাসির শব্দটুকু এবার স্পষ্ট শোনা গেল। ওরে মূর্খ, ভোগ-বাসনা পূর্ণ না হলে সাধনার পথে এগুনো যায়? একেবারে পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে নিশ্চিন্ত হও। মনে থাকবে—ভোলা মহেশপুর গ্রাম—বাবা সিদ্ধিনাথের মন্দির। কাল সন্ধ্যার মধ্যে সেখানে পৌঁছানো চাই-ই।

অধিকতর ব্যাকুল হয়ে কি বলতে গেল মহেশ। দম আটকে ঘুমটা ভেঙে গেল। তখনও কানের কাছে সেই আদেশ ভোলামহেশপুর গ্রাম সিদ্ধিনাথের মন্দির।

সকালে বৌদিকে শুধোল, সিদ্ধিনাথের মন্দির এদিকে কোথায় আছে জানেন?

অনেক দূর—প্রায় মাইল দশেক হবে। ওই যে ইষ্টিশানের পথে বাস থেকে নামলে যেখানে—সেখানে ফের বাস ধরে—উজিয়ে যাবে মাইলটাক—তারপর হাঁটতে হাঁটতে তা অনেকখানি পথ। গরুর গাড়ীতে গিয়েছিলাম কিনা পথ যেন আর ফুরোয় না। সারা অঙ্গে টাটানি। একটু থেমে বলল, গাজনের সময় খুব ধুম হয়—চড়কের মেলা বসে, কাঁহা কাহা মুলুক থেকে আসে মানুষ।

জামাটা গায়ে দেবার জন্য আলনা থেকে টেনে নিল মহেশ। বলল, আমি চল্লাম—

সে কি এক্ষুনি। সবে কাল রাত্তিরে এসেছ—এর মধ্যে যাবে কি। না-না-সে হবে না। হাতমুখ খোও, চান কর—খাওয়া দাওয়া কর—

তাহলে পৌঁছতে দেরী হবে।

হোকগে দেরি, কি এমন রাজকায্য যে এক্ষুনি যাওয়া চাই। পায়ে দেখছি কাজ বেঁধে এসেছ। ছাড বলছি জামা।

বৌদি শুনলো না—সকাল সকাল রান্না করল। আহারাদি সেরে রওনা হল মহেশ। দিনের বেলা সেই মাঠ অনায়াসে পার হয়ে গেল। মাঠ এখন নির্জন নয়—বুকচাপা অন্ধকার নেই—শব্দহীন অথৈ মরণ-সমুদ্র মনে হচ্ছে না। দিনের আলোয় ঝলমল করছে—বহু লোকের আনা গোনা। পা চালিয়ে দিলে মহেশ।

সিদ্ধিনাথে পৌঁছতে বেলা গড়িয়ে গেল। এখনি সন্ধ্যা হবে। অজানা অচেনা জায়গা—কোথায় পাবে রাতের আশ্রয়? সে ভাবনাও খুব ছিল না—আগে তো পৌঁছানো যাক বাবার মন্দিরে।

তখনও আকাশ থেকে নরম আলো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি—সিদ্ধিনাথের মন্দিরের আঙিনায় পৌঁছল মহেশ।

আঙিনাতে আর কেউ ছিল না শুধু এক প্রৌঢ়া মহিলা ধরণা দিয়ে পড়েছিলেন। তিন দিন ধরে ধরণা দিচ্ছেন উনি, নিরম্বু উপবাসী, একটু একটু চরণামৃত ছাড়া আর কিছু মুখে দেন না। জপ করছেন বাবা সিদ্ধিনাথের নাম—আর প্রার্থনা করছেন—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর বাবা—পূর্ণ কর।

কি তাঁর মনোবাঞ্ছা?

এই সব বৃত্তান্ত পরে শুনেছিলাম।

প্রৌঢ়ার তিন কন্যা, পুত্র সন্তান নাই। বাড়ীর অবস্থা মোটামুটি ভাল। স্বামী চাকরি না করেও—জমিজমা আছে পুকুর আছে বাগান বাগিচা আছে। এ সবের আয় থেকে সচ্ছলভাবেই চলে সংসার। মেয়েরা বিবাহ-যোগ্যা হয়েছে, দুটি মেয়ের বিয়েও হয়েছে ইতিমধ্যে। ভাল ঘর-বরে তারা পড়েছে—তবু মায়ের মনে দুঃখ। দুঃখ আইবুড়ো মেয়েটির জন্য—তার বিয়ের বয়স কবে পেরিয়ে গেছে—তবু পছন্দমত একটি ঘরে তাকে স্থিত করতে পারেন নি। তা সে জন্য দায়ী মেয়েটিই। সে এতদিন কোন মতেই বিয়ে করতে রাজী হয় নি। এখন সমস্যা যা দাঁড়িয়েছে হয়তো বিয়েতে তার মত হলেও বিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। কেননা ওই মেয়েটিই সকলকার বড়। বড় বোন রইল কুমারী ছোটদের বিয়ে হয়ে গেল এটা অন্যের চোখে নানান সন্দেহ জাগায়। সামাজিক অখ্যাতির জের বহুদূরে টানা হয়।

যে কেউ মেয়ে দেখতে এসে কথায় কথায় প্রশ্ন তুলবেই—ছেলেমেয়েদের নিয়ে। কটি সন্তান? ছেলে কটি—মেয়ের সংখ্যা কত? কি করছে ওরা? কতদূর পর্যন্ত শিক্ষা? গৃহকর্ম শিল্প সঙ্গীত নৃত্য...সামাজিকতার নানা পর্য্যায়ে খুঁটিনাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা। আগের কাজটি আগে—সমাজ-শৃঙ্খলার এইটিই রীতি। এ মেয়ের বেলায় রীতি লঙ্ঘিত হল কেন? মেয়ে কি অঙ্গহীনা? অস্বাস্থ্যা? কিংবা প্রণয়ঘটিত কোন সরস পরিণতি? শুধু যদি বলা যায় মেয়ের অনিচ্ছা—সে কি একটা বিশ্বাসযোগ্য উত্তর। বাপ মায়ের সংসারে অন্ন-বস্ত্রের মুখাপেক্ষী আশ্রিতা যে মেয়ে তার আবার স্বাধীন অভিরুচি। এমন নয় যে চাকরী করে সংসার প্রতিপালন করছে সে। প্রথম প্রথম দুচারটি সম্বন্ধ এসেছিল—, পরে কথাটা মুখে মুখে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ায় এই ঘটনার ইতি।

মা বাপ কি চেষ্টা করছেন আজ থেকে। মেয়ে যখন বোল উৎরেছে—তখন থেকেই চেষ্টা চালিয়েছেন। মেয়েকে বেশিদূর লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি; এই গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না—ওঁদের ছিল আবার বংশ-কৌলীন্যের গৌরব। গ্রাম ছাড়িয়ে গ্রামান্তরে পায়ে হেঁটে মেয়ে যাবে বিদ্যার্জন করতে—এটা কুলরীতি বিরুদ্ধ। এখন দিন কাল পালটালেও এই অজ পাড়াগাঁয়ে পুরান কাল এবং পুরান দিনের মানুষ কিছু কিছু রয়ে গেছেন। তাঁদের মনের ধারায় সনাতনী নীতি নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে মিশে আছে। মুখে তাঁরা কালের আবহাওয়াকে স্বীকার করেন—অন্তরে অন্তরে স্বীকার করেন না। তাঁদের আদর্শ-ভিত্তিক উচ্চশিক্ষার দায়ে অন্তঃপুরের পবিত্রতা হাটের ধুলোয় ময়লা হবে,এ কেমন শিক্ষা। অতএব গ্রামের ইস্কুল ছেড়ে মেয়েকে রামায়ণ মহাভারত পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন—আর উৎসাহ দিয়েছেন দেব-দেবীদের ভক্তিশ্রদ্ধা প্রনাম নিবেদন করতে। সেই নিয়মবশে মেয়ে প্রত্যহ সকালে স্নান সেরে ফুল বেলপাতা তুলে সাদা আর রক্তচন্দন ঘষে এবং আতপ চালের অর্ঘ্য সাজিয়ে সিদ্ধিনাথের মন্দিরে আসে। কুমারী মেয়ের শিবপূজা বিধি। প্রতিদিন মাটির শিব গড়িয়ে পূজা। কিন্তু অতি নিকটে জাগ্রত দেবতা থাকলে তার প্রয়োজন কি? মেয়ে সকালে তো শিবপূজা করেই, সন্ধ্যার আরতির সময়েও আসে। ভক্তিমতী মেয়ে। বাপ মা খুসী, পাড়াপড়সীর মুখে সুখ্যাতি ধরে না। এ হেন,মেয়ে বিয়ের সম্বন্ধ আসতেই বেঁকে বসল—বিয়ে করব না। আকাশ থেকে পড়ল সবাই। একি অনাসৃষ্টি জেদ। তলায় তলায় ভাব-ভালবাসার স্রোত বইলে এমনটা হয়—কিন্তু মেয়ে যে গঙ্গাজলের মত নির্মল—পবিত্র, ওর মুখে এমন কথা।

অনেক বোঝালেন মা,—ছি মা এমন কথা বলতে

সেই, নিশ্চে হবে। বিয়ে না করলে মেয়েদের ধর্ম-কর্ম ভস্মে ঘি ঢালা।

বাপ বোঝালেন—ধমকও দিলেন। মেয়ে অচল অটল—না বিয়ে করব না।

কেন করবে না বিয়ে তার হেতু বলেনা—শুধু মাথা নাড়ে।

কয়েকবারই ভাল ভাল সম্বন্ধ এলো, প্রতিবারেই মাথা নাড়ল মেয়ে—না এখন নয়।

মা রাগ করে বললেন, এখন নয় তো কবে? বুড়ি থুখুড়ি হয়ে বিয়ে করবি?

মেয়ে বলল জানি নে।

মা বললেন, তোর পরেও তো দুটো রয়েছে—ও দুটোও থুবড়ো হয়ে থাকবে?

তা কেন ওদের বিয়ে দাও গে।

তাই হয়। বড় রইল বসে—ছোটদের হবে বিয়ে। লোকে কি বলবে।

মেয়ে বলল, কি বলবে আবার—আজকাল কেউ কিছু বলে না।

মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার হয়েছে মরণ। কেউ যদি শোনে কথা—।

মেয়ে বলল, যদি তোমাদের অসুবিধা হয়—বল চলে যাচ্ছি।

মা স্তম্ভিত হয়ে মেয়ের পানে চাইলেন। আশ্চর্য্য শান্ত দুটি চোখ—এতটুকু উত্তেজনার আভাস নাই,—অথচ আশ্চর্য কঠিন দুটি পাতলা ঠোঁটের রেখায় দুরন্ত একটি সঙ্কল্পবাক্য সংযমিত। মা বুদ্ধিমতী—আর প্রতিবাদ জানিয়ে শোরগোল তুললেন না আস্তে আস্তে একটি নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, তাহলে তুই অনুমতি দিচ্ছিস—ওদের বিয়ে হোক।

মাথা হেলাল মেয়ে।

তোর মনে একটুও দুঃখকষ্ট হবে না?

দু'বার মাথা নাড়ল মেয়ে—হবে না।

মা আপন মনে বললেন, তাই হবে—বাবা সিদ্ধিনাথের মনে যা আছে তাই হোক।

হলোও তাই। পরপর দুটি মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেল। বড় মেয়ে হাসি আনন্দের তুফান তুলে বিয়ের আসর জাঁকিয়ে তুলল।

মা মনে মনে সাধুবাদ দিলেন-ধন্য-ধন্য। কোন কোন পড়শী মুখ বাঁকিয়ে বলল, আদিখ্যেতা।

সেই থেকে মায়ের মনে শান্তিছিল না। উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় চোখের ঘুম মুখের অন্ন কমে আসছিল। কর্তাকে খালি বলেছিলেন, হাঁ গো—আমাদের অবর্তমানে ওর দশা কি হবে। চিরটা কাল কি ওর অমনি যাবে।

কর্তা কি আর বলবেন—সান্ত্বনা দেন, বাবা সিদ্ধিনাথকে জানাও। প্রার্থনা কর। উনি যদি সুমতি দেন।

মা বললেন, ডাকছি তো নিত্যই—এইবার মনে করছি—বাবার থানে হত্যা দেব—,বাবা যদি আদেশ দেন উঠব—না হলে বাবার চরণেই রাখব দেহ।

আষাঢ়ী পূর্ণিমার মানত করে হত্যা দিলেন মা। তিন দিন ধরে নিরম্বু উপবাসে রয়েছেন। প্রত্যহ সকালবেলায় পুকুরে স্নান করে—ভিজা কাপড়ে দণ্ডি কাটতে কাটতে মন্দিরে আসেন—তারপর মন্দির ঘিরে বার তিনেক দণ্ডি কেটে চাতালে পড়ে থাকেন—আর প্রার্থনা করেন—হে বাবা সিদ্ধিনাথ, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর বাবা—পূর্ণ কর?

ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ ও রবীন্দ্রনাথ

প্রভাত বসু

রাজর্ষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আচার্য শিবনাথ, এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—এই পঞ্চপ্রদীপের দিব্য আলোয় ব্রাহ্মসমাজের নবজাগরণপূত ইতিহাস চির-ভাস্বর। ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান পর্যন্ত, মাত্র ১১৩ বছরের মধ্যে বিশ্বধর্মের বীজ মহা-মহীরুহে পরিণত হয়েছে,—দর্শন, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে মানবসভ্যতার নব-অভ্যুদয় ঘটেছে, এ কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষিত সমাজের আধ্যাত্মিক চেতনার গণ্ডির মধ্যে একদিন যা আবদ্ধ ছিল, আজ তারই পরম পরিণতি "মানুষের ধর্মে"। রামমোহনের অখণ্ড মানবপরিবারের স্বপ্ন, দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মানুভূতি, কেশবচন্দ্রের "নববিধান" শিবনাথের মহত্তর সমাজ-সংগঠন, ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ ইতিহাসের ধারাবাহিকতার পথ বেয়ে অভিব্যক্ত হল বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শে—মানবসংস্কৃতির পরম সম্পদরূপে। আজ ব্রাহ্মসমাজের বাণী, ব্রাহ্মধর্মের আহ্বান ভারতবর্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে—ভারতপথিক রামমোহনের যাত্রাপথ প্রসারিত হয়েছে বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথের সুদূর দিগন্ত-পরিক্রমণে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ বর্তমানে নির্জীব, সভ্যসংখ্যার নিরিখে অকিঞ্চিৎকর - কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায় যে একশ দেড়শ বছর আগে বিশ্ববোধ অর্থাৎ "এক বিশ্ব—এক মানবতা"র আদর্শ যেখানে ছিল, আজ ব্রাহ্ম চিন্তাধারার কল্যাণে তা' অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। "এক-ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত" জগৎকে বেঁধে দেবার স্বপ্ন একেবারে অবাস্তব বলে আজ মনে হয় না। মহাকাশ পরিক্রমার যুগে আজ মানুষের ভৌগোলিক সীমা অবলুপ্ত।

"মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা—
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?"

রবীন্দ্রনাথ সব সংকীর্ণতা, সকল গোঁড়ামির, সামাজিক দলাদলির ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাই তাঁর প্রকৃত পরিচয় ব্রাহ্মনেতা-রূপে নয়, বিশ্বকবি হিসাবে। তিনি বলেছেন,

"আমরা ধর্মলাভের জন্য ধর্মসমাজ স্থাপন করি, শেষকালে ধর্মসমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে। আমাদের নিজের চেষ্টারচিত সামগ্রী আমাদের সমস্ত মমতা ক্রমে এমন করিয়া নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লয় যে, ধর্ম, যাহা আমাদের স্বরচিত নহে তাহা ইহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। তখন, আমাদের সমাজের বাহিরে যে আর কোথাও ধর্মের স্থান থাকিতে পারে সে কথা স্বীকার করিতে কষ্টবোধ হয়। ইহা হইতে ধর্মের বৈষয়িকতা আসিয়া পড়ে। দেশলুব্ধগণ যেভাবে দেশ জয় করিতে বাহির হয় আমরা সেই ভাবেই ধর্মসমাজের ধ্বজা লইয়া বাহির হই। অন্যান্য দলের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দলের লোকবল, অর্থবল, আমাদের দলের মন্দিরসংখ্যা গণনা করিতে থাকি। মঙ্গলকর্মে মঙ্গল সাধনের আনন্দ অপেক্ষা মঙ্গলসাধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড়ো হইয়া উঠে। দলাদলির আগুন কিছুতেই নেবে না, কেবলই বাড়িয়া চলিতে থাকে। আমাদের এখানকার প্রধান কর্তব্য এই যে, ধর্মকে যেন আমরা ধর্মসমাজের হস্তে পীড়িত হইতে না দিই। ব্রহ্ম ধন্য—তিনি সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বজীবে ধন্য—তিনি কোনো দলের নহেন, কোনো সমাজের নহেন, কোনো বিশেষ ধর্মপ্রণালীর নহেন, তাঁহাকে লইয়া ধর্মের বিষয়-কর্ম ফাঁদিয়া বসা চলে না। ব্রহ্মচারী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। হে

ভগবন্‌, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? ব্রহ্মবাদী গুরু উত্তর করিলেন, স্বে মহিম্নি। আপন মহিমাতে। তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে হইবে, আমাদের রচনার মধ্যে নহে।

এ থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ কেন গণ্ডীবদ্ধ ধর্মসমাজের মধ্যে নিজেকে সীমিত রাখতে চাইতেন না। "সমস্ত সম্প্রদায়ের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে" রবীন্দ্রনাথ চির-আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন। "গোরা" উপন্যাসে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণবুদ্ধির প্রতি কঠোর বিদ্রূপ করেছেন অথচ, তিনি যে প্রকৃত ব্রাহ্ম এবং ব্রহ্মোপাসনার একান্ত অনুরাগী ছিলেন তা তাঁর ব্রহ্মনিষ্ঠ বিচিত্র কর্মধারা ও বিভিন্ন উক্তির মধ্যেই সুস্পষ্ট। তাঁর মতে—

"মানবসংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক— কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা—সেই উপাসনাদ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।"

ব্রাহ্মসমাজের উৎসবকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "নবযুগের উৎসব"। তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে "ব্রাহ্মোৎসব" "ব্রহ্মোৎসব" হয়ে উঠেছে। তিনি বলছেন—

"আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব।... আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখতে হবে। এই উৎসবে সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করেছে। সেই মহাদিন এসেছে, অথচ এখনও সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। তার মধ্যে যে সত্য বিরাজ করছে সে তো এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে বসে আছি, যাকে বলব 'এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের'। না আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি নি; আমরা যে কিসে জন্য এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আসছি ত ভালো করে বুঝতে পারিনি।...এষ দেবো বিশ্বক মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ—এই-যে মহা আত্মা, এই-যে বিশ্বকর্মা দেবতা যিনি স'দা জনগণে হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্তমান যু জগতে ধর্মসমন্বয়-জাতিসমন্বয়ের আহ্বান এই অধ্যা বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন। আম তাই বলছি, ধন্য, ধন্য আমরা ধন্য। এই মহৎসত্যে আ আমাদের উদ্‌বোধিত হতে হবে, বিধাতার এই মহত কৃপার যে গভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করত হবে।"

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, কেশবচন্দ্র ১৮৭ সালে বলেছিলেন—

Our religion is the religion of the whol world ! The NewSamhitaর দীক্ষাগ্রহণকারী ব্রাহ্মে প্রতিজ্ঞাবাক্যে তিনি লিখলেন,

"I believe in the church universal which is the depository of all ancient wisdom and the receptacle of all modern science, which recognizes in all prophets and saints a harmony, in all scriptures a unity and through all dispensations a continuity, which abjures all that separates and divides and always magnifies unity and peace, which harmonizes reason and faith, yoga and bhakti, asceticism and social duty in their highest forms, and which shall make of all nations and sects one kingdom and one family in the fulness of time."

ব্রাহ্মধর্মই যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথ নির্দেশ করতে পেরেছে এ-কথা বার বার স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র-শিবনাথের বিশিষ্ট সাধনা সম্পর্কে তাঁর উক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। নিজ জীবনে এঁদের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার প্রভাবের সাক্ষ্য তিনি দিয়ে গেছেন। শুধু ভাষণ, উপাসনার মাধ্যমেই নয়, দীর্ঘকাল আদি ব্রাহ্মসমাজের সক্রিয় সম্পাদকরূপে এবং শান্তিনিকেতন-মন্দিরের

আচার্য হিসাবে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের আদর্শের পূর্ণতর বাস্তবরূপ দেবার প্রচেষ্টা করেছেন। কবির দিনচর্যার মধ্যে ব্রাহ্ম আদর্শের সার্থক প্রতিফলন বিশেষ লক্ষণীয়। ব্রাহ্মনেতাদের অবদান বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত মূল্যায়নগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

রামমোহন

"আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।...রাজা রামমোহন এই এককে, অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই এককেই তিনি দেশাচার লোকাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত করে, কেবল বাঙালিকে নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসীকে দেখালেন।...তিনি এক দিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্য দিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর পর্যন্ত আধুনিক হওয়া যায়। তিনি তাই।* আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তাহা স্বীকার করলেন না, তিনি সকলকেই বললেন, 'ভাব সেই একে।...তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন।... আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।...আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর ; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন।...মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব।"

দেবেন্দ্রনাথ

"সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে এই সামগ্রস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কিরকম প্রবল এবং তাকে আপনার মধ্যে কিরকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।...যে মুক্তির বাণী তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রচার করে গিয়েছিলেন তাকেই আমরা গ্রহণ করব—সেই তাঁর দীক্ষামন্ত্রটি : ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তকে দেখো। সেই যে দীক্ষা সেদিন তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেটি সহজ ব্যাপার নয়। সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয়, সে অগ্নির দীক্ষা...তাঁর প্রভুর কাছ থেকে এই সত্যের দান নিয়ে তার পরে আর তো তিনি ঘুমোতে পারে নি। তাঁর আত্মীয় গেল, ঘর গেল, সমাজ গেল, নিন্দায় দেশ ছেয়ে গেল—এত বড়ো বৃহৎ সংসার, এত মানী বন্ধু, এত ধনী আত্মীয়, এত তাঁর সহায়, সমস্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেল এমন দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন। জগতের সমস্ত আনুকূল্যকে বিমুখ করে দিয়ে এই সত্যটি নিয়ে তিনি দেশে দেশে অরণ্যে পর্বতে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছিলেন। এ যে প্রভুর সত্য। এই অগ্নি-রক্ষার ভার নিয়ে আর আরাম নেই, আর নিদ্রা নেই।...আমাদের দেশে এক সময়ে বলেছিল, ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই, কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাঁকে চেয়েছিলেন—এই জন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণ বর্জনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যত ক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অন্তরতর ব্রহ্মে তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ একমুহূর্ত তিনি থামতে পারেন নি। এই কারণে তাঁর

*"Rammohun was the only person in his time in the whole world of man, to realize completely the significance of the Modern Age"—Tagore

জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে সে জ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হন নি।...তাঁর চিত্তের এই সর্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্মকর্মে সর্ব প্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিরস্ত রক্ষা করেছে; গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্য-বোধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি।"

কেশবচন্দ্র

"The first opening of my eyes to the light or the sun closely coincided with my first meeting with Brahmananda Keshub Chunder Sen when he came to our Jorasanko house and made it his home for some time at the early period of his life consecrated to the service of God. I was fortunate enough to receive his affectionate caresses at the moment when he was cherishing his dream of a great future of spiritual illumination. Since then I have journeyed on across a long stretch of time through the vicissitudes of amazing experiences of creative religion in Bengal which greatly owes its evolution to the dynamic power of the devotional genius of Keshub Chunder."

"কেশবচন্দ্রের কর্মজীবনের যখন উজ্জ্বল উদীয়মান অবস্থা, তখন আমার বয়স অল্প ছিল। সে সময় কেশবচন্দ্র যখন বিদেশী সাধু ঈশার জীবনের কথা বিবৃত করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগ ভক্তি ও দেশে তাঁহার ধর্ম ও ধর্মজীবনের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন আমার মনে সহজেই এই ভাবের উদয় হইল, বিদেশী সাধুজীবনের গৌরব ভারতে প্রচার করিতে যাইয়া ভারতের সাধু মহাজনদিগের গৌরবের হানি করিতেছেন। শেষে আমার পরবর্তী জীবনে কেশব জীবনের শিক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধিলাভের অনুশীলন করিতে যাইয়া আমি পূর্ব সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।...পরবর্তী সময়ে আমি কেশবের জীবনের সাধনার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিলাম, ঋষিগণ যেভাবে সকল ভুবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব, ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন, কেশব সেই ভাবের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে যাইয়া স্বদেশী বিদেশী সকল সাধু মহাজনদিগের জীবনে তাঁহার প্রকাশ ও বিশেষ লীলা প্রত্যক্ষ করিলেন।...এইরূপে স্বদেশের বিদেশের সকলকে গ্রহণ করিতে যাইয়া, তিনি ধর্মের ও ধর্ম-সাধনের এক উচ্চতর প্রশস্ততর স্তরে, সার্বভৌমিক স্তরে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব বুঝিলাম, স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম।...যিনি সত্যস্বরূপ, তাঁকে সকল ধর্মের মধ্যে প্রকাশ করা, গ্রহণ করা এই কথা সত্য, ব্রহ্মানন্দের মনের কথা, এবং তাই নূতন করে তিনি লাভ করে 'নববিধান' বলে প্রকাশ করেছেন।"

শিবনাথ

"আমার পিতার জীবনের সঙ্গে তাঁহার (শিবনাথ শাস্ত্রীর) সুরের মিল ছিল।...কেবল বাহিরের পথ-বাঁধায় নহে, সেই অন্তরের উদ্বোধনে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিয়াছেন শিবনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; সেটি তাঁহার প্রবল মানববৎসলতা।...যে ভূমিতে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা মানবপ্রেমের রসে কোমল ও শ্যামল আর যে আকাশে তিনি তাহাকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা সত্যের জ্যোতিতে দীপ্যমান ও কল্যাণের শক্তি প্রবাহে সমীরিত।"

বিদেশী ঐতিহাসিকের ভাষায়— "Cosmopolitan Bengal where English thought left its deepest imprint, produced the Brahmo Samaj in whose bosom Tagore was born." Edward Thomson লিখেছেন, "Rabindranath was fortunate in the date of his coming." কবি একটি চিঠিতে নিজের সম্পর্কে লিখেছেন—

"ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে, সেটা যে আমি

আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মত নয়—একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব—আমার সুখ দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব।"

অন্যত্র লিখেছেন,—

"আমার রচনার মধ্যে যদি কোন ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ-উপলব্ধিই ধর্মবোধ যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর-একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য রূপ এবং রস সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে, যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তিকে মানে মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে। আমার ধর্ম যে আগমনীর গান গায় সে এই—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।"

কবি বলেছেন,—"My religion is in the reconciliation of the Super-personal Man, the universal human spirit, in my own individual being" এই সার্বভৌম, সত্যের আদর্শের উপরই "বিশ্বভারতীর" প্রতিষ্ঠা। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। "বিশ্বভারতী"র উদ্দেশ্য এইভাবে বর্ণিত হয়েছে:

"To study the mind of Man in its realization of different aspects of truth from diverse points of view. To bring into more intimate relation with one another through patient study and research the different cultures of the East on the basis of their underlying unity. To approach the West from the standpoint of such a unity of the life and thought of Asia. To seek to realize in a common fellowship of study the meeting of the East and the West and thus ultimately to strengthen the fundamental conditions of World Peace through the establishment of free communications of ideas between the two hemispheres. And, with such ideals in view to provide at Santiniketan a centre of culture where research into and study of the religion, literature, history, science and art of Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian and other civilizations may be pursued along with the culture of the West with that simplicity in externals which is necessary for true spiritual realization, in amity, good fellowship and cooperation between the thinkers and scholars of both Eastern and Western countries, free from all antagonisms of race, nationality, creed or caste."

এই মহান্ আদর্শ রামমোহন বিরচিত The Trust Deed of the Brahmo Somaj' এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই। কারণ, কবির মতে—"যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে, সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস।"

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মোপলব্ধির মূল কথা—'আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা—মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।' "ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি এ কথা বুঝেছেন—ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়—শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায়, কেন

না সমস্ত রসের সার তিনি : রসো বৈ সঃ।" কবি গাইলেন—

"আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।"

তাই কবি সার্বভৌম অজস্র ব্রহ্মসঙ্গীতে অন্তরের গভীর আনন্দ প্রকাশ করলেন, আর সেই অমৃত সুরলহরীর মাধ্যমে আনন্দময় ব্রহ্ম প্রিয়তর, প্রিয়তম হয়ে সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত হলেন। নিরাকার পরব্রহ্মকে এত সহজে সব মানুষের এত আপন করে দেওয়ার কৃতিত্ব "গানের রাজা" রবীন্দ্রনাথের। শুধু নিজে যে "অপরূপকে ছুটি নয়ন মেলে" দেখে নিয়েছেন তা নয়—তাঁর 'পূজা' সকলের জন্য।

"মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে।"

রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র শিবনাথ এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতির মধ্যে ব্রহ্মসাধনা এক অবিস্মরণীয় প্রকাশ-মাধুরীতে সার্থক হয়ে রইল। কবি বন্ধু সাধু প্রমথলাল সেনের উক্তি—"In our hymns a new Bible। যথার্থ। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত "ত্রয়ী"* প্রমথলাল, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ও অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কথা।

জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণান্তে (১৯১৬-১৭) রবীন্দ্রনাথের দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' আয়োজিত সংবর্ধনা-সভায় সভাপতিরূপে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল † বলেছিলেন, "পূর্ব ও পশ্চিমের যে-সম্মিলন স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ এদেশে আবির্ভূত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পশ্চিম যাত্রায় সেই পূর্ব ও পশ্চিমের পরস্পরের আদান-প্রদানের কার্য তাঁহার ভিতর দিয়া কি ভাবে সাধিত হইয়াছে, তাহা এই উপলক্ষে আমরা দেখিবার সুযোগ পাইতেছি। ...symbols (প্রতীক), rituals (পদ্ধতি) প্রভৃতির বন্ধন হইতে সেই বিশাল মুক্তির তত্ত্বকে মুক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে প্রদান করিতেছেন এবং ইউরোপের সর্বোচ্চ মুক্তির আদর্শের সহিত তাহার সৌসামঞ্জস্য দেখাইতেছেন। এই উভয় মুক্তির আদর্শের এক মহাসম্মিলন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা—ইহাই ব্রাহ্মসমাজের চিরকালের কার্য। সেই মহাসম্মিলনের বার্তা যিনি পশ্চিমে লইয়া গিয়াছেন, আজ যে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার সংবর্ধনা করিতেছেন, ইহা ব্রাহ্মসমাজেরই পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।"

রবীন্দ্র-দর্শন বা রবীন্দ্রধর্মতত্ত্ব আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভবপর নয়। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে ব্রহ্মবাদী কবিকে যাঁরা Pantheist কিংবা নিছক দ্বৈতবাদী আখ্যা দেন তাঁরা তাঁর সমন্বিত মানসিক ও আধ্যাত্মিক গঠনের কথা ভুলে যান। মনীষী রাধাকৃষ্ণনের ভাষ্য এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। Brahman and Isvara are not distinct entities but different aspects of the same Reality. Brahman is Isvara when viewed as creative Power. The view that the representation of Brahman as Isvara is a concession to the weakness of the human mind as some Advaitins hold is not supported by the Brahma Sutra." ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কিছুটা মিল আছে। "মানুষের ধর্ম"র ভূমিকায় কবি লিখেছেন, "সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।"

Columbia University থেকে প্রকাশিত "Sources of Indian Tradition" পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজ প্রসঙ্গে Stephen Hay লিখেছেন,

---

* এঁদের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের অমূল্য পত্রাবলী বিশ্বভারতী প্রকাশের আয়োজন করছেন।

† আশ্চর্যের সঙ্গে কবির আত্মিক যোগ বিষয়ে লেখকের প্রবন্ধ ভূমানন্দময় ব্রজেন্দ্রনাথ ('তত্ত্বকৌমুদী' অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬, দ্রষ্টব্য,)

"With characteristic enthusiasm, Keshub saw in the simple theism of the Brahmo Samaj a platform on which the major religious traditions of India--Hindu, Muslim, Christian —could unite. The resulting faith, he thought, would sustain not only the future church of India, but would qualify India to take part in a world-wide religious brotherhood............ Like Keshub Chunder Sen, Tagore believed that all Asia was united by a profound spirituality from which the more materialistic nations of the West could benefit."

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃষ্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।'...ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা নিবন্ধে কবি বললেন—

"এ কথা সত্য নয় যে ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিক কালের হিন্দুসমাজকে সংস্কার করবার একটা চেষ্টা অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয়-সাধনের বর্তমানকালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ।...চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীনকালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনও এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার, সকল জটিলতার, যথার্থ সমাধান করে দেবে—এই একটা আশা ও আকাঙ্খা বিশ্বমানবের বিচিত্রকণ্ঠে আজ ফুটে উঠেছে। ব্রাহ্মসমাজকে, তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে। আমরা ব্রহ্মকে স্বীকার করেছি এই কথাটি যদি সত্য হয়, তবে আমরা ভারতবর্ষকে স্বীকার করেছি এবং ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্রে সমুদয় পৃথিবীর সত্যসাধনাকে গ্রহণ করবার মহাযজ্ঞ আমরা আরম্ভ করেছি।

তাই কবি শান্তিনিকেতনে নিয়মিতভাবে খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, কবীর এবং অন্যান্য দেশীয় ও বিদেশীয় মহাপুরুষদের উৎসব পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সাধু-সমাগম ও ধর্ম-সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথই Comic Humanism-এর উদ্গাতা।

"যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞ যাগ,
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।"
"ওরা তুলে নিয়ে গেল ওদের দেবতার পূজায়
শাস্ত্র মিলিয়ে বাছা-বাছা ফুল,
রেখে দিয়ে গেল আমার দেবতার জন্যে
সকল দেশের সকল ফুল,
এক সূর্যের আলোকে চিরস্বীকৃত।"

The Religion of Man-এ তিনি The Prophet অধ্যায়ে জরথুস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর "খৃষ্ট" ও "বুদ্ধদেব" এর দুটি ধর্মার্থীর পক্ষে অমূল্য সম্পদ। এই দুই মহামানব সম্পর্কে তাঁর কবিতা ও গানগুলিও অনবদ্য। কবির ভাষায় মানুষের পরম সত্য হচ্ছে মানুষ, এই সত্যকে প্রশস্ত ও গভীরতম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের (মহাত্মাদের) কাজ। তিনি বললেন, "এখন ধর্মসাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘুচিয়াছে।...এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্মের মহাপুরুষদের মহাবাণীসকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্যকে বৈচিত্র্যদান করিতে পারি।" এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় মধ্যযুগীয় সন্ত ও অন্যান্য ভারতীয় সাধকদের বাণীর সংকলন "ভক্তবাণী"

তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া হিন্দুশাস্ত্র, ধম্মপদ, পালি-প্রাকৃত কবিতা, মধ্যযুগীয় হিন্দী, শিখ, ভজন, বৈষ্ণবকাব্য, গুরুমুখী ও মারাঠী প্রভৃতির কবিকৃত রূপান্তর তাঁর সমন্বয় সাধনার পরিচয়ই বহন করে। বেদান্তের সঙ্গে বাউলগান, খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সুফী ভাবধারা, ক্লাসিকের সঙ্গে মিস্টিসিজম—বিশ্বকবি এক অখণ্ড ব্রহ্মচেতনার মধ্যে মিলিয়ে দিলেন। তাঁর বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে সীমার সঙ্গে অসীমের মিলনের পালা পরিপূর্ণ হল।

বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ, শান্তির মহাদূত রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের ভাষায় 'মানবের শাশ্বত কণ্ঠ' রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে সার্থক বিশ্বধর্মে অভিব্যক্ত করেছেন—এই আমাদের পরম গৌরব, চরম উপলব্ধি।

"সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে
আমার অন্তরতম আনন্দে।"

মিলনের যে মহামন্ত্র ব্রাহ্ম যুগপ্রবর্ত্তকরা দিয়ে গেলেন, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ধর্মসমন্বয়ের যে অভিনব বিবর্তন ঘটল—তারই পুণ্যশিখা দীপ্যমান হয়ে ভারতের ও পৃথিবীর অন্ধকার বিদূরিত করবে, "এক মানবজাতি এক বিশ্বধর্ম" সুপ্রতিষ্ঠিত হবে—এই আশা আমাদের অন্তরে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করুক। কবির অমর বাণীতে ব্রহ্ম সংগীতের সুরে আমরা উদ্বুদ্ধ হই।

"সেই অভয় ব্রহ্মনাম আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়।
মোরা করিব না শোক যা হবার হোক চলিব
ব্রহ্মধাম।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
যদি মৃত্যু নিকট হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।"
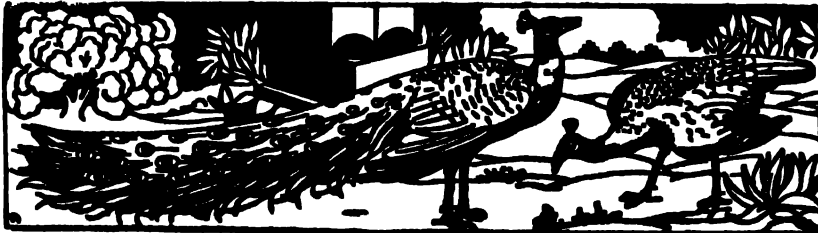
গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দী

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

একদা যে সকল গৌড় কবি সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাদি অবতারণা করে স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় দান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দী অন্যতম। তিনি কেবল গৌড়বঙ্গের সন্তানই ছিলেন না, সভাকবি হিসেবে দীর্ঘকাল গৌড়াধিপ রামপালদেবের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। গৌড় রাজকুল দীর্ঘকালব্যাপী কবির পাণ্ডিত্য ও শিল্প-সাধনায় ধাত্রীত্ব করেছিল। গৌড়বঙ্গের তদানীন্তন সারস্বত সমাজ তাঁর সৃষ্টিক্ষম কবির শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে, তাঁকে 'কবিকুলপতি' রূপে বরণ করে নিয়েছিল। কবির রচনাশৈলী ও কাব্য ভাষার প্রকৃতি গৌড়বঙ্গের সমকালীন কবিকুলকে নবীন কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই পারম্পরিক ঐক্যতা ও পরিপূরকতার প্রীতিসূত্রেই সন্ধ্যাকর নন্দী আজও সংস্কৃত সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বলাবাহুল্য, গৌড় কাব্য রীতির আদি গুরু রূপে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে সন্ধ্যাকর নন্দীর অক্ষয় প্রতিষ্ঠা। পাল বংশের শেষ প্রতিভূ রামপালের কাছে কবি গৌরবভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা একদা বঙ্গের প্রাদেশিক সীমাকেও অতিক্রম করেছিল। সংস্কৃত ভাষা সম্পদ ও প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা তাঁকে কাব্য রচনায় এক নতুন শক্তির প্রেরণা দিয়েছিল। কবি-মনের ভাবনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে কবি বাস্তব তথ্যকে কোথাও আচ্ছন্ন করে ফেলেন নি। তাঁর শিল্প রচনার অন্তর্নিহিত মূলে ছিল নিষ্ঠাপ্লুত পরিকল্পনা এবং সুগভীর নীতিবোধ। সেই নীতি ও নিষ্ঠাকে অপূর্ব কাব্যমন্ত্রে পরিশুদ্ধ করে সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর বহুখ্যাত কাব্য 'রামচরিত' রচনা করেছিলেন। উক্ত কবিকর্ম স্বদেশে কালজয়ী হয়েছে।

'রামচরিত' সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মহতী কাব্য। অনেকে উক্ত কাব্যটিকে বাংলার ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ স্মারক গ্রন্থ রূপে চিহ্নিত করেছেন। তথ্যসমাকুল ঐতিহাসিক উপাদানই রামচরিতের একমাত্র সম্পদ নয়, কল্লোলিত ছন্দোঝঙ্কার, অলঙ্কার ও শব্দ বিন্যাসের বাগ-বৈদগ্ধ্য রচনাটিকে সুঠাম মানবরসের সিঞ্চনে হৃদ্য করে তুলেছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একটি তথ্যবহুল প্রামাণিক গ্রন্থ প্রায় তুলনারহিত। গ্রন্থটি কবি প্রতিভার স্বাক্ষর আপন অঙ্গে সযত্নে বহন করছে।

'রামচরিত' রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গৌড়বঙ্গেই কবির জন্মস্থান, শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের সংলগ্ন 'বৃহদ্বটু' গ্রামে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিচয় আছে। মহম্মদ বখতিয়ার আনুমানিক ১২০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন বরেন্দ্রভূমি অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন, তখন তাঁর পথপ্রদর্শক ছিলেন আলি নামে এক মেচ সর্দার। মহম্মদ বখতিয়ার স্বয়ং ঐ সর্দারটিকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। অভিযান কালে আলি সর্বপ্রথম মহম্মদ বখতিয়ারকে যে নগরের সন্নিকটে উপস্থিত করেছিলেন, তারই নাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর। কালক্রমে বরেন্দ্রভূমির কতক অংশ বখতিয়ার করতলগত করে-ছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী তার মধ্যে অন্যতম। অতঃপর উক্ত নগরী পাল রাজাদের অধিকারে আসে। পাল বংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীরও গৌরব রবি অস্তমিত হতে সুরু করে (১)। একসময় গৌড়বঙ্গে ঐ নগরী একটি সমৃদ্ধশালী নগরী রূপে পরিচিত ছিল। কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে এর সবিশেষ উল্লেখ আছে। বরেন্দ্র-মণ্ডলে 'বৃহদ্বটু' গ্রামটি ছিল ভারতীর লীলাভূমি। বহু শাস্ত্রজ্ঞ ও শিক্ষার্থী তখন ঐ পবিত্র আশ্রয়ভূমিতে প্রশান্তভাবে শাস্ত্র সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। শাস্ত্র সাধনার ভিত্তিতে সেখানে এক

নবতর আদর্শ গড়ে উঠেছিল। বেদান্ত ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্যাধীন ঐ গ্রামটি বহুকাল ব্যাপী নিজের সমৃদ্ধি ও জ্ঞান গরিমার পরিচয় দিয়েছিল। জ্ঞান সাধনার পীঠভূমি এই 'বৃহদ্বটু' গ্রামের এক অতি সম্রান্ত পরিবারে সন্ধ্যাকর নন্দী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম, প্রজাপতি নন্দী। জ্ঞান এবং দূরদর্শিতায় প্রজাপতি নন্দী তৎকালীন লোকসমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি সঞ্চয় করেছিলেন।

বরেন্দ্রীমণ্ডলের অধিবাসী হলেও, সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 'রামচরিত' কাব্যে পরিশিষ্টরূপে যে একটি 'কবি প্রশস্তি' (বিংশতি শ্লোক সমন্বিত) সংযুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে সন্ধ্যাকরের জাতি ও ব্যক্তি পরিচয় সূচক আকারে আভাসিত হয়েছে। উক্ত প্রশস্তির চতুর্থ শ্লোকে কবির কুলপরিচয় সম্পর্কে উল্লেখ আছে,—

নন্দিকুল-কুমুদ-কানন-পূর্ণেন্দুর্নন্দনোৎভবত্তন্তু।
শ্রীসন্ধ্যাকর নন্দী পিশুনাস্কন্দী সদানন্দী ॥৪॥

ঐ শ্লোকে 'নন্দীকুল' শব্দটির ব্যবহার একটি উল্লেখ্য বিষয়। অনেকের মতে, 'নন্দীকুল' শব্দটি কুলপরিচয় জ্ঞাপক। অপর একটি শ্লোকে কবির কুলোপাধির পরিচয় বিবৃত হয়েছে।

তত্র বিদিতে বিখ্যোতিনি নন্দিবয় সন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিধিগু পৌথগু ॥২॥

এই শ্লোকে প্রযুক্ত 'নন্দিবয় সন্তানে' কথাটি অনেক পণ্ডিতের মতে কুলোপাধি পরিচয় জ্ঞাপক। এ-প্রসঙ্গে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অন্যতম প্রবর্তয়িতা প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। প্রত্নতাত্ত্বিক উক্তি করেছেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে নন্দীকুল নামে কোন কুল বা কুলোপাধি নাই, আছে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে (২)। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে অবশ্য নন্দীগ্রামে গাঞী বা গাঁই আছে, তবে 'নন্দী'বা 'নন্দীকুল' নামে কোন উপাধি নেই। 'কবি প্রশস্তি'তে সন্ধ্যাকরের কুলস্থান সম্পর্কে কোথাও নন্দীগ্রামের উল্লেখ নেই। অতএব 'নন্দী'শব্দটি এক্ষেত্রে গ্রামবিশেষে অনুমান করার উপায় নেই। 'নন্দীগ্রাম' স্থলে বরং নন্দিবয় সন্তান অর্থাৎ নন্দিবয় সন্তানে নন্দী, কথাটি কুলোপাধি স্বরূপ উল্লেখিত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রের মতে, 'নন্দিকুল' বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের একটা সম্রান্ত কুল। বারেন্দ্রভূমির অধিবাসীদের কুলস্থান 'নন্দন' বা 'নন্দ' বা 'নন্দী' নামে চিহ্নিত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে 'নন্দনবাসী' বা সংক্ষিপ্তাকারে নান্দসী নামে তাঁদের কুলস্থান চিহ্নিত হলেও তার সঙ্গে নন্দিকুলের কোন সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম শ্লোকে প্রযুক্ত 'বৃহদ্বটু' শব্দটির সঙ্গে নন্দীকুলের কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় না, বরং নন্দীকুলের 'কুলস্থানের'ই সম্পর্ক বিদ্যমান। 'বৃহদ্বটু' অর্থে কবির কুলস্থানভূত গ্রামবিশেষের নাম। ঐ গ্রামটি পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ একটি কুলস্থান। মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে 'বৃহদ্বটু'কে পুণ্যক্ষেত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উপরন্তু, কবি-প্রশস্তির তৃতীয় শ্লোকে, "করণনামগ্রণীরর্থগুণ" কথাটির প্রযুক্তি লক্ষ্য করা যায়। জাতিবাচ্যে 'করণ' শব্দটির অর্থ, কায়স্থ। সন্ধ্যাকরের পিতা প্রজাপতি (নন্দী) করণ বা কায়স্থদিগের অগ্রণী পিনাকীনন্দীর পুত্র ছিলেন। এই সকল কারণেই বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রবর্তয়িতা মৈত্র মহাশয়, সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ-কুল-সম্ভূত বলে স্থির করেছেন। তাঁর কথায়, "সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ বলিয়া স্থির করাই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত"(৩)। এ-প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, 'রামচরিত' কাব্যের বাংলা অনুবাদ ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের ব্যাখ্যায়,—সন্ধ্যাকর নন্দী কায়স্থ-কুল-সম্ভূত। শ্লোক নিচয়ে সন্নিবিষ্ট করণ নামগ্রনীরর্থগুণঃ বাক্যটি তাঁর ব্যাখ্যায় বা তর্জমায়—কায়স্থদিগের অগ্রণী। 'করণ' শব্দটির অর্থ, কায়স্থ। উক্ত শব্দটির ব্যাখ্যা পরিপোষক আলোচনায় ডঃ বসাক লিখেছেন,—'করণো লেখকো রাজ্ঞাম্' ইতি, কায়স্থঃ স্যাল্লিপিকরঃ করণেৎক্ষর জীবনঃ লেখকোৎক্ষর চঞ্চুশ্চ ইতি চ বৈজয়ন্তী'(৪)। পক্ষান্তরে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, সন্ধ্যাকর নন্দী জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'Memoirs of the Asiatic Society of

Bengal' নামে এক পুস্তিকায় রামচরিতের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,—

'The author belonged to a very respectable family of Varendra Brahmans who derived their name from their residence in the Verendra country i.e. North Bengal, the scene of the struggles of Rampala for empire. The residential village from which Sandhyakara's family derived their congnomen is Nanda, perhaps a contraction of Nandana. The family is still well known'

বলাবাহুল্য, ডঃ শাস্ত্রী একজন প্রতিভাবান পুরুষ। তাঁর পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতা সর্বজনবিদিত। সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতিকুল সম্পর্কে তাঁর অভিমত যে গবেষণা প্রসূত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। রামচরিতের পাণ্ডুলিপিখানি (তালপত্রে লিখিত), আচার্য হরপ্রসাদই সর্বপ্রথম নেপাল থেকে সংগ্রহ করে আনেন। কয়েক বছর কঠিন পরিশ্রমের পর তিনি ঐ পাণ্ডুলিপির মূল ও টীকার পাঠোদ্ধার সাধন করতে সমর্থ হন। ১৯১০ সালে, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal' [Vol. III No. 1] পুস্তিকায় তাঁর 'রামচরিত' বিষয়ক রচনাটি প্রকাশিত হয়। 'রামচরিত' গ্রন্থটির আবিষ্কার সম্পর্কে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য্য। গ্রন্থটির আবিষ্কার এবং মূল পাণ্ডুলিপির মর্মোদ্ধার করেই তিনি কেবল তাঁর কর্তব্য সমাধা করেন নি, বরং ঐ গ্রন্থের রচনাকার কবিগুণোপেত সন্ধ্যাকর নন্দীর জন্ম, জাতিকুল ও আবির্ভাবকাল সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণা করে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত কবি সম্পর্কে তাঁর এই গবেষণা বহু ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারে সাহায্য করেছে; ঐতিহাসিক তথ্য নির্ভরতায় বহু জটিল বিষয় নির্ভুল সিদ্ধান্তরূপে প্রতিভাত হয়েছে। অতএব সন্ধ্যাকরের জাতিকুল সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায়ের গবেষণা প্রসূত অভিমত সংশয় শূন্য সিদ্ধান্তরই পরিপোষক। কবির ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনার্থে তিনি যে সকল সারগর্ভ যুক্তির অবতারণা করেছেন তা মূলতঃ ভৌগোলিক। বরেন্দ্রীভূমি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারেই কবির জন্ম। যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা নন্দবংশ নামে খ্যাত। 'নন্দী' বা 'নন্দ', 'নন্দন' শব্দেরই সংক্ষিপ্তরূপ। কবির কুলস্থানের সঙ্গে 'বৃহদ্বটু' শব্দের প্রয়োগই প্রমাণ করে যে, তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত ছিলেন। 'বৃহদ্বটু' বরেন্দ্রীভূমিরই অন্তর্গত। সেখানে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদেরই বাস ছিল। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'রচয়িতা মহিমাচন্দ্রের একাধিক শ্লোকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বারেন্দ্র সমাজভুক্ত অধিবাসীদের নন্দনবাসী বলা হত। এমন একজন বিখ্যাত নন্দনাবাসী ছিলেন, ভট্টদিবাকরের পুত্র কল্লুক ভট্ট। বারেন্দ্রী লোকসমাজে শাণ্ডিল্য গোত্রে 'নন্দনাবাসী' একটা গাই বা গাঞী। বহুদর্শী হরপ্রসাদের বিচারনায়, 'নন্দ' শব্দটি 'নন্দনা'রই প্রতিরূপ। রামচরিতের কবিপ্রশস্তিমূলক অংশে নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ না থাকলেও, নন্দীকুল শব্দটির উল্লেখ আছে। কুল অর্থে কেবল বংশ, জাতি ও গোত্রকেই বুঝায় না। সমাজ, আবাস, দেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও 'কুল' শব্দার্থের প্রয়োগ পরিলক্ষিত। অতএব 'নন্দীকুল' ও 'নন্দীগ্রামী', এই দুইটি শব্দ একই অর্থবোধে বিবেচ্য হলে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না। আবার 'নন্দীগ্রামী' বারেন্দ্র সমাজে ভরদ্বাজ গোত্রে অপর একটি গাঞী। মহিমাচন্দ্র মজুমদার বিরচিত 'গৌড় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে; যথাঃ

নন্দী-গ্রামী গোগ্রামী চ নীখটী চ সমুদ্রকঃ

সুতরাং উপরোক্ত বিচার বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধ্যাকর নন্দীকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নেওয়াই সহজ এবং যুক্তিসঙ্গত।

সন্ধ্যাকরের জাতিকুল প্রসঙ্গটি নিয়ে একদা দুই প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ যথা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তুমুল তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। অধুনালুপ্ত 'সাহিত্য' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় তার পরিচয় পাওয়া যায়, যাইহোক, উক্ত পত্রিকায় লিখিত একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'রামচরিত' প্রণেতার জাতিকুল সম্পর্কে নানা

যুক্তি তর্কের অবতারণা করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর বিচারনায়, "সন্ধ্যাকর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইলে বহু গৌরবান্বিত ব্রাহ্মণ সমাজও গৌরব লাভ করিত।......কবি যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, এই সিদ্ধান্ত বরেন্দ্রের অধিবাসীগণের নিকট সংশয় শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না।" প্রত্নতাত্বিকের উপরোক্ত মন্তব্য গবেষণাপ্রসূত হলেও তিনি যে কোনরূপ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অভিমত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। তাই আলোচ্য প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত অবিসংবাদিত রূপে গ্রহণ করা যায় না। লেখকের ব্যাখ্যায় করণ্য শব্দের অর্থ,—কায়স্থ। অবশ্য জাতিবাচ্যে করণ অর্থে বৈশ্য শূদ্রার পুত্র,—মতান্তরে কায়স্থ। কিন্তু ভিন্ন অর্থেও ঐ শব্দার্থটির প্রয়োগাবধি পরিলক্ষিত। প্রসঙ্গক্রমে প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর ব্যাখ্যায়, "করণানামগ্রণী' বলতে সাধারণতঃ রাজকর্মচারীগণের মধ্যে প্রধানকে বুঝায়। 'কায়স্থ' শব্দে তখন লেখক বুঝাইত কি জাতি বুঝাইত, তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই।" যাইহোক, পুরাতাত্বিক রাখালদাসও সন্ধ্যাকর নন্দীর ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনার্থে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। "রামচরিত' প্রণেতা ব্রাহ্মণ হইলেও হইতে পারেন। তিনি যে নিশ্চয়ই কায়স্থ ছিলেন, তাহা বলা উচিত নহে"—এই বক্তব্য নিবেদন করেই তিনি সকলপ্রকার তর্কযুদ্ধ হতে নিরস্ত হয়েছেন। এরপর উক্ত বিষয়টি নিয়ে আর কোন প্রত্নতাত্বিক বা ঐতিহাসিক তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করেননি। কবির জাতিকুল সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য বা ঐতিহাসিক বিচারে কোনরূপ সঠিক সিদ্ধান্ত আজও নিরূপিত হয় নি।

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সন্ধ্যাকরের আত্মপরিচয় জ্ঞাপক শ্লোকগুলিকে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করে প্রত্নতাত্বিক অক্ষয় কুমার কবির জাতিকুল নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর তর্কপ্রণালী একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। তবু তাঁর ঐ যুক্তিতর্ক সকলক্ষেত্রে ঐতিহাসিকোচিত রূপে প্রতিভাত নয়। যে সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট দ্বিধা রয়েছে। সাধারণের কাছে তাই তাঁর সিদ্ধান্ত অভ্রান্তরূপে প্রতিপাদিত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তথ্যপূর্ণ আলোচনাটি সুচিন্তিত এবং ঐতিহাসিকোচিত। ঐতিহাসিক বিচারে তিনি রামচরিত প্রণেতার কুলস্থান ও কুলোপাধি নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যেহেতু ঐতিহাসিক বিচারেই যে কোন বিষয়বস্তুর সত্য নির্ণয় সম্ভব, মহামহোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত সেইহেতু অমূলক বলে মনে হয় না। সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনার্থে তিনি 'রামচরিত' কাব্যোল্লিষ্ট 'আত্মপরিচয়জ্ঞাপক' শ্লোকগুলিকে প্রামাণিক তথ্যরূপে গ্রহণ করেননি। ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধানকল্পে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। গৌড়ভূমির কুলজ্ঞদের প্রচলিত সিদ্ধান্ত সমূহ পর্যালোচনা করে তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণের প্রকৃতি নির্ণয় করেছিলেন; বরেন্দ্র কুলশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থে সন্নিবেশিত জ্ঞাতব্য তথ্যগুলিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে বিশ্লেষণ করে প্রতিপাদ্য সত্যের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আচার্য শাস্ত্রীর ঐতিহাসিকত্ব সকলের পদ্ধতি, সংযত, প্রণালীবদ্ধ এবং স্থির লক্ষ্যে সুপ্রযুক্ত। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ঐতিহাসিকের সত্যদৃষ্টি নিয়ে পূজ্যপাদ হরপ্রসাদ একদা প্রাচীন সাহিত্যসম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর সকল প্রচেষ্টায় আর্য্য সাহিত্য নবজীবন লাভ করেছে। তাঁর পবিত্র সাধনা ও সুচিন্তিত আত্মপ্রত্যয় সর্বজয়ী সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির শিক্ষানবীশগণ এক সময় তাঁরই অনুপ্রেরণায় এবং পথ নির্দেশে ঐতিহাসিক সত্য সন্ধানের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। একথা স্মরণ করেই লিপিতাত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় বহুদর্শী পণ্ডিতের দীর্ঘকালের গবেষণা

প্রসূত সিদ্ধান্ত কখনও বরেন্দ্র অধিবাসীগণের নিকট সংশয়িত রূপে প্রতিভাত হইতে পারে না। সর্বজয়ী সাহিত্যের আসরে তিনি ছিলেন, সত্য ও শুচিতার উপাসক। স্বাধীন চিন্তায় শুচিবাইকে কোন সময় স্থান দেননি; কারণ তাঁর বিচারে কেবল শুচিবাই কোনও জাতিকে পবিত্র করতে পারে না। শুচিতাই জাতীয় পবিত্রতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে,—শুচিতাই তার প্রাণ রক্ষা করে। এই দারিদ্র্যদগ্ধ দেশে মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে পণ্ডিত হরপ্রসাদ এক পবিত্র সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন, নিজের কষ্টলব্ধ অবসরটুকু প্রসন্নচিত্তে মাতৃসেবায় অর্পণ করেছিলেন। সেই মহৎ সাধনায় মাতৃ ও ধাত্রী শক্তির স্বরূপ নির্ণয় সম্ভবপর হয়েছিল বলেই তিনি আজও সকলের কাছে এক স্মরণীয় পুরুষ।

মূল রামচরিতের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে কবি একযোগে শিব ও কৃষ্ণের বন্দনা করেছেন। পদগুলি শ্লেষাত্মক হলেও, প্রাণময় ভক্তিরসে আপ্লুত। এই ভক্তিবাদের মধ্যে কবি তাঁর ধর্মমত প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় শ্লোকে তিনি আবার একযোগে সূর্য্য ও সমুদ্রের করুণা কীর্তন করেছেন। এই সকল ক্রিয়া প্রকরণ ব্রাহ্মণ ধর্মেরই পরিপোষক। অতএব সন্ধ্যাকর নন্দী যে ব্রাহ্মণ কুলসম্ভূত ছিলেন, সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না

'রামচরিত' চতুঃ পরিচ্ছেদাত্মক একখানি সংস্কৃত কাব্য। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লিখিত। কাব্যাস্থিত সমগ্র শ্লোকাবলী একই ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত হয়নি। লিপিকার মূলতঃ দুজন। উভয়েই ব্যক্তিতে বৌদ্ধ; কারণ মূল শ্লোকগুলির প্রারম্ভে ও টীকার প্রারম্ভে বুদ্ধ নমস্কৃতি বিজ্ঞাপিত হয়েছে। লিপিকারদ্বয় এই নমস্কৃতির মাধ্যমে তাঁদের ধর্মমত প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত মূল অংশের পুঁথি লেখক; বৌদ্ধ শীলভদ্র। আবার কাব্যগ্রন্থটির টীকাকার একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। তিনি হয়ত সমগ্র কাব্যের টীকা রচনা করেছিলেন; কিন্তু পাণ্ডু-লিপিতে প্রাপ্ত কাব্যের ২২০টি শ্লোকের মধ্যে মাত্র ৮৫টি শ্লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশিষ্টাংশ টীকার অভাবে সমগ্র কাব্যটা অর্থবোধে সহজতর হতে পারেনি। অনেকের ধারণা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী স্বয়ং রামচরিতের টীকা রচনা করেছিলেন; কিন্তু এমন ধারণা নেহাৎই অযৌক্তিক। কারণ কাব্যাস্থিত শ্লোকের টীকা-কার একই শব্দের একাধিকার ব্যাখ্যা ও টীকা রচনা করেছেন। গ্রন্থকার ও টীকার যদি একই ব্যক্তি হতেন, তাহলে নিশ্চয় এ ধরণের অসংগতি বা পাঠ ভেদের নজির থাকতনা। তাছাড়া রামচরিতের মূল ও পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি; যা পাওয়া গেছে তা উক্ত রচনার অসম্পূর্ণ অংশ মাত্র। শীলভদ্র কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপিখানি 'রামচরিত' কাব্যের পূর্ণাঙ্গ রচনা হিসেবে গ্রহণ করা যায় না: কারণ তাঁর লিখিত পাণ্ডুলিপিতে সর্বশুদ্ধ শ্লোকের পরিমাণ,—২১৫। অথচ তিনি কাব্য সমাপ্তির পরে শ্লোকগুলির সংখ্যা গণনা করে লিখেছেন, আর্য্যা ২২০। এছাড়াও কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর রচনায় অঙ্গহীন শ্লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে রামচরিত কাব্যের হস্তলিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ আকারে আজও আবিষ্কৃত হয়নি। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য রাধাগোবিন্দ বসাক এই মর্মে উল্লেখ করে বলেছেন,—"আশাকরি ভবিষ্যতে আমাদের দেশে এই কাব্যের আরও হস্ত-লিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইবে এবং তৎসাহায্যে ইহার মূল শ্লোকগুলির পরিশুদ্ধ পাঠ নির্ণীত হইতে পারিবে।"

রামচরিত কাব্যখানিতে পরিশিষ্টরূপে বিংশতি শ্লোক সমন্বিত একটি 'কবিপ্রশস্তি' সংযুক্ত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই 'কবিপ্রশস্তি'টিকে সন্ধ্যাকর নন্দীর আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক শ্লোকরূপে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, এই ভিত্তিতে তিনি উক্ত কবির জাতিকুল সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করে কয়েকটি সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছেন। কিন্তু ঐ 'কবিপ্রশস্তি' আদৌ কবির স্বরচিত কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ

আছে। প্রাচীন সাহিত্যে গ্রন্থকারের পরিচয় জ্ঞাপন কোন নূতন বিষয় নয়, বরং ঐ রীতি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রচলিত। সাধারণতঃ গ্রন্থের প্রস্তাবনা ভাগে সাহিত্যকারের পরিচয়লিপি বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকে। এই পরিচয় লিপিতে সাহিত্যকারের ভূয়সী প্রশংসা ও সংকীর্তিত হয়ে থাকে। এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে প্রস্তাবনার ঐ ভাগ সাহিত্যকারেরা নিজেরা লেখেন না। তাঁর কোন অনুগত সহচর বা গুণমুগ্ধ শিষ্য উক্ত পরিচয়লিপি প্রশস্তি আকারে রচনা করে দেন। এরূপ অনুমান একেবারে অমূলক নয় কারণ প্রায়শঃক্ষেত্রে পরিচয় ভাগের রচনারীতির সঙ্গে গ্রন্থের অপরাপর অংশের রচনায় যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রামচরিত কাব্যেও এধরণের বৈসাদৃশ্য যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত। কাব্যাহৃত 'কবিপ্রশস্তিভাগে' যে ধরণের রচনাপ্রণালী অনুসারিত, তার সঙ্গে গ্রন্থের অপরাপর ভাগের সাদৃশ্য খুবই কম। সুতরাং অনুমিত হয়, বিংশতি শ্লোক-সমন্বিত 'কবিপ্রশস্তি'টি কবির নিজের রচনা নয়। রচনাটি সন্ধ্যাকরের কোন একজন পরমানুগত শিষ্য। সন্ধ্যাকরের গভীর নীতিবোধ এবং সারস্বত নিঃস্বন্দই তাঁকে সৃষ্টিক্ষম কাব্যরচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। রামচরিত কাব্যের চিত্তোন্মাদী মাধুর্য, উপমার অন্তরনিগূঢ় সুষমা এবং অসাধারণ-শব্দ চাতুর্য্য তাঁর চিত্তকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই অগ্রজ কবির অন্তপ্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের সংবেদনটি তিনি কবিপ্রশস্তির মধ্যে এমন সুন্দরভাবে নিবেদন করতে সমর্থ হয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর প্রাণময় ভক্তি নিষ্ঠাই উৎসৃষ্ট হয়েছে। কবিপ্রশস্তির রচনা অনুধাবন করলে দেখা যায়, এ যেন তাঁর এক বিস্ময়ান্বিত পলক উপলব্ধি। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, এই কবিও যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবিশক্তির সমতুল্য। অতএব কবি সন্ধ্যাকর নন্দী যে নিজেই 'কবিপ্রশস্তি' রচনা করেছিলেন, এই মত অসমীচীন; আর এই বিচারণায়, প্রত্নতত্ত্ববিদ অক্ষয় কুমারের 'রামচরিত' রচয়িতার জাতিকুল বিষয়ক সিদ্ধান্ত সমূহকেও যুক্তিবহ স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

'রামচরিত' একটি দ্ব্যর্থবোধক শ্লেষকাব্য। গৌড়াধিপ রামপাল ও তাঁর পুত্র মদন পালদেবের রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। এক পক্ষে রঘুপতি রামচন্দ্র, অপর পক্ষে গৌড়েশ্বর রাম পালের কাহিনী। রামায়ণকথা ও রামপালের চরিতকথা একই ব্যক্তি দ্বারা সূচিত হয়েছে। কবি যখন রামচরিত কাব্যের রচনা শেষ করেছিলেন, তখন বরেন্দ্রভূমিতে গৌড়াধিপ ছিলেন রামপাল নন্দন মদনপালদেব, কাব্যের সর্গশেষ শ্লোকে কবি মদন পালের কল্যাণ কামনা ও তাঁর রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন।

রামায়ণ কাহিনীর অনুসরণে গ্রন্থকার রামচরিতের পরিচ্ছেদ বা সর্গগুলির নামকরণ করেছেন। পরিচ্ছেদ সমূহের নাম যথাক্রমে,—'আরম্ভরাম', 'রাম প্রত্যাগমন' ও 'রামোত্তর চরিত'। 'আরম্ভরাম',—অর্থাৎ শত্রু প্রতিক্রমনার্থে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অভিযানাদির কার্য্যারম্ভ; 'রাম প্রত্যাগমন' পরিচ্ছেদের অন্তর্নিহিত অর্থ,—শত্রু নিধনান্তে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন এবং 'রামোত্তর চরিত' অর্থে রামচন্দ্রের শেষ জীবনের কাহিনী নিবদ্ধ। পাণ্ডুলিপিতে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম বিলুপ্ত। ঐ পরিচ্ছেদটি যে শত্রুনিধনকারী-রামচন্দ্রের কাহিনী-বিষয়ে ইঙ্গিতান্বিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং শ্লেষকাব্য হলেও 'রামচরিত' বাহ্যত রামায়ণকেই অবলম্বন করেছে। কবিপ্রশস্তির ১১শ শ্লোকে উল্লেখ আছে,—

> অবদানং রঘু-পরিবৃঢ় গৌড়াধিপ রামদেবয়োরেতৎ
> কলিযুগ রামায়ণমিহ কবিরপি কলিকাল বাল্মীকিঃ॥

অর্থাৎ রঘুপতি রামচন্দ্র ও গৌড়াধিপ রামপাল এই দুই রাজার অবদান সম্বলিত ইতিহাস কাব্যখানি কলিযুগের রামায়ণ এবং কবিও কলিকালের বাল্মীকি সদৃশ। কিন্তু কবিপ্রশস্তির শ্লোকাবলী সন্ধ্যাকর নন্দীর স্বরচিত নয় বলেই অনুমিত। কবি কখনও নিজেকে বাল্মীকি সদৃশ বলে প্রচার করিতে পারেন না। এরূপ উক্তি নেহাৎই আত্মপ্রচারের নামান্তর। পক্ষান্তরে, সাহিত্য-

নিহিত আত্ম প্রশংসাত্মক প্রমাণও ঐতিহাসিকোচিত বলে সর্বথা-গ্রহণ যোগ্য নয়। আর্য্য গ্রন্থকারেরা বৈদিক সংস্কার বশে নিজেদের প্রশস্তি সর্বদা পরিহার করতেন। 'মৃচ্ছকটিক' রচয়িতা শূদ্রক এমন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লোকের উপকারের উদ্দেশ্যেই প্রাচীন গ্রন্থকারেরা গ্রন্থ রচনা করতেন; সমাজ ও দেশাচার বর্ণনার স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা নিয়েই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হতেন। অতএব নামের কাঙাল তাঁরা কোন সময় ছিলেন না।

'কলিকাল বাল্মীকি' রূপে সন্ধ্যাকর নন্দী নিজেকে কখনও প্রচার করেননি। ঐ উপাধিটি কবিকে গৌড়-বঙ্গের সারস্বত সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন,— গুণগ্রাহী প্রাচীন সমাজ গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে 'কলিকাল বাল্মীকি' উপাধিটি প্রদান করেছিল এবং সন্ধ্যাকরের পিতা প্রজাপতি নন্দীকে 'সান্ধি বিগ্রহি'কের উচ্চপদ প্রদান করেছিল।

উত্তর ভারতে একদা একটি প্রাচীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সাম্রাজ্যটি 'পাল সাম্রাজ্য' নামে উল্লেখিত। এর প্রকৃত ঐতিহাসিক নাম, গৌড়ীয় সাম্রাজ্য। গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত গৌড়বঙ্গেই প্রাচীন বরেন্দ্রীভূমি অবস্থিত। বরেন্দ্রীভূমি পাল রাজাগণের জনকভূমি। রামচরিত কাব্যে এর সবিশেষ উল্লেখ আছে। উল্লিখিত বিষয় সমূহ হতে প্রমাণিত হয় যে পাল রাজাগণ বাঙালী ছিলেন। বরেন্দ্রভূমি মহানন্দার পূর্ব তীর হতে করতোয়ার পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানটিতে বহু ভগ্ন দেবালয় এবং রাজভবনের মধ্যে নানা ঐতিহাসিক তথ্য এখনও অনাবিষ্কৃত হয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে (১০৭০-১০৭৫) বরেন্দ্রমণ্ডলে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দেয়। স্বয়ং মহীপাল-দেবই প্রজা বিদ্রোহ প্রধূমিত করে তুলেছিলেন। সেই বিদ্রোহ বহ্নিতে তিনি কেবল নিজেই ভস্মীভূত হননি, বরেন্দ্রমণ্ডল হতে কিছুদিনের জন্য পালবংশের শাসন ক্ষমতাও ভস্মীভূত করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে মহীপাল প্রজাদের ওপর নিদারুণ অত্যাচার সুরু করেন। তাঁর অত্যাচারের ফলে প্রজাদের মধ্যে এক গভীর অসন্তোষ দেখা দেয়। রাজ্য শাসনের নামে নির্মম নিপীড়ন এবং নৃশংস অত্যাচার ক্রমে চরমে ওঠে। অবশেষে রাজ্যে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ প্রধূমিত হয়ে ওঠে। কৈবর্ত্তনেতা দিব্বোক মহীপালকে পরাজিত ও নিহত করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। পালরাজা-গণের জন্মভূমি বরেন্দ্রমণ্ডল এইভাবে কৈবর্ত্ত রাজাদের অধিকারে চলে যায়। মহীপালের ভ্রাতা শূরপাল ও রামপাল সেই সময় জন্মভূমি হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তারপর বরেন্দ্রমণ্ডলে পুনরায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পালরাজাদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল। জনকভূমি উদ্ধারকল্পে রামপালদেবকে বিপুল সমর সজ্জার আয়োজন করতে হয়েছিল। অবশেষে স্বীয় বাহুবলে এবং সামন্তদের ঐকান্তিক সাহায্যে তিনি তৎকালীন কৈবর্ত্ত-রাজ ভীমকে পরাজিত এবং নিহত করে জন্মভূমি অধিকার করেছিলেন। প্রজা বিদ্রোহের প্রকোপে পড়ে জন্মভূমি হতে তাড়িত হবার পর নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে বরেন্দ্রভূমি উদ্ধার সাধন করে তিনি যেরূপ অধ্যবসায় এবং কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার সবিশেষ ইতিবৃত্তই রামচরিত কাব্যের অন্যতম বিষয়বস্তু। মহীপালদেবের এইরূপ বীরত্ব ও বাহুবলের কথা স্মরণ করেই কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁকে দ্বিতীয় রামচন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করে অযোধ্যা-পতি রামচন্দ্রের মতই গৌড়াধিপ রামপালদেব যশস্বী হয়েছিলেন। যাই হোক, যাঁর সাহায্য এবং মন্ত্রণা কৌশলে রামপালদেব জন্মভূমি উদ্ধারে সফলকাম হয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি পুরুষটি তাঁরই মাতুল এবং চিরসুহৃৎ অঙ্গাধিপতি মহনদেব। এই মহনদেবের মৃত্যুই একদিন গৌড়াধিপের জীবনে চরম আঘাত হেনেছিল। রামচরিতে উল্লেখ আছে, রামপালদেব ভাগীরথী তীরে অনশনে দেহত্যাগ করেছিলেন। পরম সুহৃদের মৃত্যু

সংবাদ শুনে তিনি মুহূর্তে শোকাকুল হয়ে পড়েন। পৃথিবীর সকল সুখ ঐশ্বর্য্য তখন তাঁর কাছে বিষময় হয়ে উঠেছিল। জীবনের কোন আকর্ষণই তাঁকে আর ধরাধামে ধরে রাখতে পারেন। তাই অত্যন্ত শোকাকুল অবস্থায়, ভাগীরথী তীরে তিনি তিলে তিলে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন।

ধর্মে বৌদ্ধ হলেও পাল নৃপতিগণ জাতিতে বাঙালী ছিলেন। অতএব পাল সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস, বাঙালীরই ইতিহাস; পালরাজাগণের জন্মভূমি বরেন্দ্রীমণ্ডলের কাহিনী বাঙালীরই কাহিনী। গৌড়ীয় সাম্রাজ্যকে বাঙালীর সাম্রাজ্য বললেও ইতিহাসের কোনরূপ অমর্যাদা করা হয় না। গৌড়বঙ্গের তৎকালীন সমাজরূপ এবং গৌড়াধিপ রামপালদেবের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বিষয়ক যে সকল চিত্র সমূহ রামচরিতে বিবৃত হয়েছে, তা বাঙালীরই সমাজজীবনের চিত্রালেখ্য। বাংলার ইতিহাসে রামচরিত তাই একটি শ্রেষ্ঠ স্মারক গ্রন্থরূপে পরিচিত।

রামচরিতে একটি বিশেষ সাহিত্য রীতি পরিলক্ষিত। এই রীতি, 'গৌড়ীয়' বা গৌড়ী রীতি নামে অভিহিত। কবি বাণভট্টের (হর্ষের সভাকবি) বর্ণনায়, গৌড়দেশে অক্ষর ডম্বর, রীতি প্রচলিত ছিল। বাণভট্ট, সাহিত্যের গুনাবলী বিষয়ে আলোচনাকালে বর্ণনা করেছেন,

শ্লেষ প্রায়মুদীচেৎষু প্রতীচ্যে র্ব্বর্থ মাত্রকম
উৎপেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গৌড়ক্ষর ডম্বরঃ
[হর্ষচরিতম, শ্লোক, ॥৭॥]

অবশ্য কবির ভাষায় 'অক্ষর ডম্বর' সাহিত্য রীতির কথাটি অবিস্তর শ্লোকার্থক ভাবে উল্লেখিত হয়েছে। 'অক্ষর ডম্বর' অর্থে বাগড়ম্বর। 'রামচরিত' যেহেতু দ্ব্যর্থবোধক কাব্য,সেইহেতু, অলঙ্কার ও অক্ষরের আড়ম্বর থাকতে বাধ্য। তাছাড়া অক্ষরের বাগড়ম্বর মাঝেই কাব্যে শব্দচাতুর্য্য নিহিত। শব্দচাতুর্য্য কাব্যের একটি বিশেষ গুণ।

সন্ধ্যাকর নন্দীর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে সবিশেষ তথ্য আজও সকলের অজ্ঞাত। তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব,—এই দু'য়ের সঠিক কাল নির্ণয় আজও নির্ণিত হয়নি। তবে রামপালদেবের সভাকবি রূপে তিনি বিরাজ করলেও মদনপাল দেবের রাজসভাও অলংকৃত করেছিলেন। কবি নিজের আশ্রয়দাতা উভয় রামপাল দেব ও মদনপাল দেবকে পুরুষোত্তম বলে অভিহিত করে স্বকাব্যে তাঁদের গুণকীর্তন করেছেন; কাব্যের শেষ পরিচ্ছেদে মদনপাল দেবের চরিত্র পূজা করে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।

রামচরিত কাব্যটি কবির পরিণত বয়সের রচনা। মদনপাল দেবের রাজত্ব কালেই সম্ভবতঃ তিনি উক্ত কাব্য গ্রন্থটির রচনা পরিসমাপ্ত করেন। তারপর ঐ গ্রন্থটি মদনপাল দেবের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। ভূমীশ্বর-মদনপাল, শব্দগুণ-সমন্বিত, অলঙ্কার বিশিষ্ট ঐ মনোজ্ঞ কাব্যখানি সাদরে পাঠ করে যারপর নাই পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

তৎকালীন যুগে সন্ধ্যাকর নন্দীর মত গৌড়বংশে আরও কয়েকজন কবি কাব্য রচনা করে যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কবি মনোরথ এবং কবি চতুর্ভুজের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মনোরথ এবং চতুর্ভুজ উভয়েই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। গৌড়াধিপতি রামপাল দেবের নিজ জন্মভূমি উদ্ধার সাধনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে গৌড়কবি মনোরথ একটি মাত্র শ্লোকে এক মহাবিপ্লবের ইতিহাস ব্যক্ত করে গেছেন। পরিচয় স্বরূপ শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃতি করা যেতে পারে,—

তস্মোর্জ্জ্বল পৌরুষস্ত নৃপতেঃ শ্রীরামপালোহভবৎ
পুত্রঃ পালকুলাব্ধি শীতকিরণঃ সাম্রাজ্য বিখ্যাতভাক্।
তেনে যেন জতোত্রয়ে জনকোড় লাভাৎ যথাবৎ যশঃ।
ক্ষৌণী নায়ক ভীম রাবণ বধাৎ দুর্ব্বার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ ॥ (৬)

কবির 'জনকোভূ-লাভাৎ' শব্দটির ব্যবহার এখানে শ্রীরামচন্দ্র এবং রামপাল দেবের পক্ষে তুল্যরূপে প্রযোজ্য। শ্লোকটি যেন রামচরিতের পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ প্রদত্ত হয়েছে। মনোরথ তৎকালীন গৌড়বঙ্গের

অশুভ নির্ব্বাচন

চিত্তরঞ্জন দাস

কী বিচিত্র এক দেশ। কী বীভৎস এর রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গে একদিকে চলছে ঘোরতর রাজনৈতিক খুনোখুনি, অন্যদিকে আবার নির্ব্বাচনের জোর প্রচার বা প্রলাপবাণী। একদিকে পীড়িত গ্রামবাসীর মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন, অন্যদিকে নির্ব্বাচন-প্রহসনের বিরাট আয়োজন। নির্ব্বাচন বৈতরণী পার না হলে কারোর পক্ষেই গদি দখল করা সম্ভব নয়। তাই এ রাজ্যের গদিভ্রষ্ট পরস্পরবিরোধী নেতৃবৃন্দ সমস্বরে পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় আজ অন্তর্বর্ত্তী নির্ব্বাচনের প্রবল দাবী তুলেছিলেন একটা অত্যদ্ভুত যুক্তি সহকারে যে নির্ব্বাচনই নাকি রাজ্যের বর্ত্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতি প্রতিকারের একমাত্র সহজ ও প্রকৃষ্ট পন্থা। সুতরাং ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার দাবী মেনে নিয়েছেন এবং আগামী ১০ মার্চ নির্দ্ধারিত দিবসে উক্ত নির্ব্বাচন-প্রহসন, বা রাজ্যের প্রচলিত নির্ব্বাচন যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। উক্ত মহানুষ্ঠান যে কোন দিক থেকেই স্বাভাবিক কিম্বা শান্তিপূর্ণ হতে পারে না, সে সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণরূপে অবহিত আছেন। কিন্তু তা'-সত্ত্বেও কী এমন মহান উদ্দেশ্য নিয়ে উনত্রিশ হাজার ভোটকেন্দ্রে কয়েক লক্ষ বাধ্য বেরাজ্যের সরকারী কর্মচারী এবং কেন্দ্র, রাজ্য ও বিভিন্ন রাজ্যের বিরাট পুলিশ বাহিনী, যার মোট সংখ্যা দেড়-দুই লক্ষ, আমদানী করে তৎসঙ্গে যথোপযুক্ত সামরিক বাহিনী নিযুক্ত করে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় দেউলিয়া রাজ্যের বিপুল অর্থব্যয়ে এই মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হচ্ছেন, একমাত্র সরকার এবং সর্ব্বনিয়ন্তাই জানেন।

পশ্চিমবাংলার বর্ত্তমান শোচনীয় পরিস্থিতি যে কোন দিক থেকেই নির্ব্বাচনের অনুকূল নয়, এ সহজ সত্য বাক্যটি ইতিপূর্বে বহুবার সরকার এবং কতিপয় নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতির কী এমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হ'ল কিম্বা দলীয় সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক খুনোখুনির কি কি এমন সন্তোষজনক খতিয়ান সৃষ্টি হ'ল যার জন্য সরকার অবিলম্বে অর্থাৎ ১০ই মার্চ নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব অথবা রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র সংগ্রামের বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিলেন? অবশ্য শান্তিপূর্ণ নির্ব্বাচন সকলেরই কাম্য এবং সে জন্য রাজ্য সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বন করবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্ববিধ সরকারী ব্যবস্থা প্রয়োগ করা সত্ত্বেও সরকার কি অব্যাহতি পেয়েছেন এ রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী দৈনন্দিন নৃশংস খুনোখুনির বিন্দুমাত্র নিরসন করতে? কিম্বা রাজ্যের জনসাধারণের সন্ত্রাস অথবা নিরাপত্তার সম্পূর্ণ অভাব দূর করতে? না, সরকার তা' পারেন নি। তার প্রকৃত কারণ, যারা এ রাজ্যের জননিরাপত্তার রক্ষক, তারা নিজেরাই নিরাপদ নন। তাই অধিকাংশ ঘটনাস্থলেই আরক্ষা বাহিনীর আগমন হয় দুর্ঘটনার বহু পরে যখন আর সেখানে কোন আততায়ীর সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং কর্ত্তব্যরত পুলিশ তখন কর্ত্তব্যপালন করেন নিরীহ নিরপরাধ পথচারী দর্শক শ্রেণীর উপর। এমতাবস্থায় কোন সাহসে সাধারণ ভোটার যাবেন নির্ব্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থীদের ভোট প্রদান করতে? রাজ্যের নেতৃবৃন্দের জীবন না হয় সরকারের নিকট অতি মূল্যবান এবং সরকার কর্ত্তৃক উহা সুরক্ষিত হতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন তো অত মূল্যবান নয়, তাই উহা সংরক্ষণেরই বা প্রয়োজন কি? সুতরাং সেখানে নিরাপত্তার কোন বালাই নাই সেখানে ভোট কেন্দ্রে এক দলের ভোটার অন্য দলের পরিচিত কর্মীরা যে আক্রান্ত বা নিহত হবেন না

তারই বা নিশ্চয়তা কি ? অতএব নিজের জীবন বিপন্ন করে অপরকে সিংহাসনে বসাবার সদিচ্ছা সম্ভবতঃ এবারকার নির্বাচনে অধিকাংশ ভোটদাতারই নেই বা থাকাও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় পশ্চিমবাংলার ভীত সন্ত্রস্ত, নিরাপত্তাহীন জনগণের নিকট আসন্ন নির্বাচন-প্রহসন একটা দারুণ অভিশাপ কিম্বা মহাকাল সদৃশ বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি হয় না।

স্বীকার করি যে সরকারী শান্তিরক্ষা বা শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য বহুলক্ষ সরকারী কর্মচারী, পুলিশ ও সামরিকবাহিনী নিয়োগ করবেন। কিন্তু তারা সকলেই ত আর দেবদূত নন যে দৈব প্রক্রিয়া বলে অশান্ত লোকদের একমুহূর্তে শান্ত করে ফেলবেন, অথবা তাদের মধ্যে অনেকেই যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে সংশ্লিষ্ট নন এবং দলীয় সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেন না, ইহাও একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং প্রয়োজন হলে সুযোগমত তারাও যে একে অপরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন না তারই বা নিশ্চয়তা কি ? অতএব উক্ত মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের মহাপ্রস্তুতি যে সর্বতোভাবে পশ্চিমবঙ্গে অভূতপূর্ব মহাসঙ্কটেরই পূর্বাভাষ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।

প্রবাদ আছে "অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট"। তাই এবারকার নির্বাচনে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যখন উল্লেখযোগ্য কোন নির্বাচনী আঁতাত সম্ভব হয় নি, তখন প্রার্থী সংখ্যা স্বভাবতই বিগত নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশী হবে। সুতরাং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সকলেরই যদি মনোভাব থাকে "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" তা হলে পরস্পরবিরোধী প্রার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত অথবা দলগত সশস্ত্র সংগ্রাম যে অনিবার্য, সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র থাকা উচিত নয়। ফলে রাজনৈতিক রোষানলে ভস্মীভূত হবে অসংখ্য জীবন এবং পণ্ড হবে মহাযজ্ঞানুষ্ঠান। অতঃপর, এ রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনই থাকবে কায়েম বা সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় সরকারেরও একান্তই কাম্য, অথবা অবস্থার গুরুত্ব বিধায় সামরিক শাসন প্রবর্তনও একেবারে অসম্ভব নয়।

ক্ষমতার লোভ যে মানুষকে কী ভাবে অমানুষ অথবা উন্মাদ করে তোলে,দেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা বাহুল্য কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই এখন রাজনৈতিক উন্মাদনা চলছে; যার একমাত্র মূল উদ্দেশ্য হল গদি অর্থাৎ শাসন-ক্ষমতা দখল।—সুতরাং এই মহৎ কার্য্য উদ্ধারের জন্য এখন আর ন্যায়, নীতি, বিবেক, আদর্শ কোন কিছুরই বালাই নেই।" যেন তেন প্রকারেণ কার্য্যসিদ্ধি বিধিয়তে।" তবে বাংলা দেশ চিরকালই সর্ব বিষয়ে অগ্রণী এবং পথপ্রদর্শক। তাই রাজনৈতিক উন্মাদনার ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবৃন্দ বিশ্ব রেকর্ড-সৃষ্টি করেছেন। উন্মাদ ভিন্ন কোন সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে মানুষ খুন করা কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং এ হেন মহৎ কার্য্যে পশ্চিম বাংলার নেতৃবৃন্দ অবশ্য অনুচরগণ সহ (অর্থাৎ যাহারা এরবিধ পুণ্যকার্যে ব্রতী আছেন) অদ্বিতীয় প্রমাণিত হয়েছেন। নরহত্যার প্রতিযোগিতার যদি কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে উহা সর্বাগ্রে উক্ত নেতৃবৃন্দেরই প্রাপ্য হত কারণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁদেরই, যেহেতু তাঁদের অনুসৃত নীতি নির্দেশ ও প্ররোচনার ফলেই এ হেন জঘন্য পাশবিকতা পশ্চিমবঙ্গে চলছে। বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত রাজনীতি এখন সম্পূর্ণরূপে হিংস্র বা হত্যা-নীতিতে পরিণত হয়েছে। গণতন্ত্র এখন গুণ্ডাতন্ত্রের ভয়ে গভীর গর্তে প্রবেশ করেছে। 'ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করব।' 'খুন কা বদলা খুন' প্রভৃতি রাজনৈতিক শ্লোগান যেখানে প্রতিনিয়ত আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করছে, সেখানে শান্তির আশা একান্তই দুরাশা নয় কি ? কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক শান্তিকামী চিন্তাশীল ব্যক্তি কি কখনও অস্বীকার করতে পারেন যে রাজ্যের এই ভয়াবহ নৃশংস খুনোখুনির সৃষ্টি, যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিকী সংঘর্ষের মাধ্যমে হয় নি ? কিম্বা একথা কি সত্য নয় যে উক্ত লাগাতার সংঘর্ষ এবং খুনজখমের ক্রমবিস্তারের পরিণতির

আজকের এই সরকার ও জনগণের সম্পূর্ণ আয়ত্ত-বহির্ভূত পরিস্থিতি? সুতরাং কেবলমাত্র আসন্ন নির্বাচন দ্বারাই যে এ রাজ্যের বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র প্রতিকার হবে, সে আশা বা বিশ্বাস কোন অর্বাচীনেরও সম্ভবতঃ থাকা উচিত নয়। নির্বাচনের বিপরীত ফলই দৃষ্ট হবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।

বিগত নির্বাচনে একমাত্র গদি দখলের নিমিত্তই পরস্পরবিরোধী চৌদ্দ দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট এবং রাজ্যের জনসাধারণও বহু আশা করেই সেই অস্বাভাবিক যুক্তফ্রন্টকে এনেছিলেন সুস্বাগতম। কিন্তু দুর্ভাগ্য পশ্চিমবাংলার জনগণের যে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রায় শুরু থেকে শুরু করলেন শরীকী বিবাদ, যার ফলে মাত্র তের মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই উক্ত ফ্রন্ট গেল ভেঙ্গে এবং সরকারের হল আকস্মিক পতন। সুতরাং রাজ্যের বাম, ডান, নরম গরম, চরম প্রায় সবপন্থীই উক্ত যুক্তফ্রন্টে থাকা সত্ত্বেও যখন স্থায়ী সরকার সম্ভব হয় নি, তখন এবারের নির্বাচনে শরিকী সংঘর্ষ ও খুনোখুনির মাত্রাধিক্যের ফলে, সেরূপ উল্লেখযোগ্য কোন আঁতাত না হওয়ায়, কোন দল বা মিলিফ্রন্ট একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং পুনরায় গোজামিল ছাড়া এরাজ্যে যেকোন সরকারই গঠিত হওয়া সম্ভবপর হবে না, এ অতি সহজ এবং সত্য বাক্যটা সম্ভবতঃ সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন রাজ্যের এই বীভৎস রাজনৈতিক হানাহানির অতিশয় চরম অবস্থায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে পুনরায় এই ব্যয়বহুল নির্বাচনের প্রবল উন্মাদনা এসেছে, তখন তার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল পরিদৃষ্ট হবে যখন নির্বাচন প্রতিযোগিতার বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্র দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রে পরিণত হবে। সুতরাং নির্বাচনে বিজয়ী না হয়েও অনেকেই যে নৃশংস নরহত্যার প্রতিযোগিতায় জয়মাল্য অর্জন করতে পারবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হয়েছে যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হওয়ার পর থেকেই নাকি রাজনৈতিক দলীয় সংঘর্ষ ও খুনোখুনির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই যদি হয়, তা হলে এখন ত সবেমাত্র বোধন, এর পরে অধিবাস, অনুষ্ঠান, মহাযজ্ঞ প্রভৃতি সবই ত বাকী। সুতরাং পরবর্তী চিত্র যে ক্রমশ কী বীভৎস রূপে প্রদর্শিত হবে, তা অতি অতি সহজেই অনুমেয়। এমতাবস্থায় সরকারের সম্ভবতঃ একান্ত উচিত পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করে অলমতি বিস্তারেণ নীতি গ্রহণ করা।

পশ্চিম বঙ্গের কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভোটারদের মধ্যেও নানাপ্রকার বিভ্রান্তি ও ভীতির চিহ্নও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভোটকেন্দ্রে যাওয়াও যেমন বিপজ্জনক তেমনি ভোট প্রদান অন্তে গৃহে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তাও খুবই সন্দেহজনক' সুতরাং সেক্ষেত্রে অধিকাংশ ভোটারই যে ভোটদানে বিরত থাকবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নির্বাচন প্রার্থীদের অনেকেই ত একাধিকবার বিজয়ী হয়ে নিজেদের কেরামতি দেখাবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন, এমনকি গদিতে বসবার সুযোগ পেয়েও জনসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সুতরাং আর কেন? এখন সসম্মানে অবসর গ্রহণ করুন না। জনসাধারণও আপনাদের বেশ ভালভাবেই চিনবার সুযোগ পেয়েছে। অতএব ইতিহাস আপনাদের সহজে ভুলবে না। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষের সৃষ্টিকর্তা আপনারাই এবং উক্ত সংঘর্ষেরই ক্রমবিস্তারের ফলে এ রাজ্যের জনজীবন আজ সম্পূর্ণরূপে বিপন্ন, বিপর্যস্ত। অথচ আপনারা জনদরদী বলেই নিজেদের প্রচার করেন, বিশেষতঃ নির্বাচনের প্রাক্কালে। সুতরাং আপনাদের জনদরদের নমুনা যদি এই হয় যে জনগণকে সর্বদা অকালমৃত্যুর করাল বিভীষিকা দেখে শংকিত বা সন্ত্রস্ত থাকতে হয়, তা হলে জনসাধারণ আপনাদের সে বীভৎস দরদের প্রত্যাশী নয়। কিন্তু যদি সত্যই আপনারা জনদরদী হন কিম্বা বাংলা এবং বাঙালীর প্রকৃত কল্যাণকামী হন, তা হলে দয়া করে অবিলম্বে জনস্বার্থে, দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে পশ্চিমবাংলার এই ভয়াবহ নৃশংস খুনোখুনি বন্ধ করুন। রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনুন, জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করুন নির্বাচনের জয়মাল্য তারাই স্বেচ্ছায় আপনাদের প্রদান করবেন। বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে নির্বাচনের জয়ঢাক কিম্বা নরনিধনযজ্ঞের পূর্ণাহুতির সর্ববিধ ব্যবস্থা আর করবেন না। নেতৃবৃন্দের নিকট জনগনের ইহাই একমাত্র নিবেদন।

কংগ্রেস স্মৃতি

বিশেষ অধিবেশন—কলিকাতা ১৯২০

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(৭)

৯ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট ছিল ২টায় কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন প্রদেশে ভোট গ্রহণ ও গণনা করতে অনেক সময় লাগায় সভার অধিবেশন নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হওয়া সম্ভব হল না।

প্রায় ৩টার সময় সভাপতি মহাশয় প্রধান প্রধান নেতাগণ সমভিব্যাহারে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন।

যথারীতি জাতীয় সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

সভাপতি মহাশয় ভোটের ফল জানালেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবের স্বপক্ষে ১৮২৬ ভোট এবং বিপক্ষে ৮৩৪ ভোট হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই ভোট বিভক্ত হয়েছিল কিন্তু মধ্যপ্রদেশের ডাঃ খপর্দে, ডাঃ গৌর ও ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতি সজ্জন শ্রদ্ধেয় নেতারা সকলেই অসহযোগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় তথাকার প্রতিনিধিগণ সকলেই মূল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। সভাপতি মহাশয় রায় দিলেন যে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছে।

এরপর সভাপতি মহাশয় বিদায় অভিভাষণ দিতে উঠলেন। প্রথমেই তিনি গত ৮ দিন ধরে সকলের নিকট থেকে যে সহযোগিতা ও সৌজন্য পেয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণকে এবং স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে এবং তাদের ক্যাপ্টেন ও ভাইস ক্যাপ্টেনকে কংগ্রেসের সুব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বাংলা দেশের মহত্বের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বরাবর বাংলা দেশকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতারূপে সম্মান দিয়ে এসেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলার প্রতি একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন এই কারণে যে বাংলা সম্প্রতি নেতৃত্ব দিতে অসমর্থ হয়েছে। ভারতবর্ষে আর কোন প্রদেশ নেই বা আর কোন সম্প্রদায় নেই যারা বাংলার মত ত্যাগের দ্বারা এবং মাতৃভূমির জন্য গৌরবময় কার্য্য দ্বারা মহান কংগ্রেসের ভিতর বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে।

তারপর তিনি জনৈক বাঙ্গালী বক্তার মন্টেগু সাহেবের জাতির উপর কটাক্ষ করার উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে এই উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইহুদী সম্প্রদায় তাঁর নিকট করেছেন। তিনি জানালেন যে আমেরিকায় প্রবাস কালে তিনি এই সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসেছেন। এই সম্প্রদায় থেকে পৃথিবীর কয়েকজন সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, কবি, গায়ক ও লেখকের সৃষ্টি হয়েছে।

সভাপতি মহাশয় গত বৃহস্পতিবারের আচরণের তুলনায় গত শনিবারে শ্রীমতী বেশান্তের প্রতি সুব্যবহারের জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিলেন এবং যমনাদাস দ্বারকা দাসের প্রতি কুব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি বৃহস্পতিবারের পূর্বে বুঝতেই পারেন নি যে মডারেট নেতাদের কংগ্রেস বর্জনের সিদ্ধান্ত কত নির্ভুল। যে সকল মডারেট নেতা এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তাঁদের সাহসিকতার জন্য তিনি প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন যে যদি এ-রকম ব্যবহার চলতে থাকে তাহলে কংগ্রেস একটি ক্ষুদ্র পার্টির সংস্থায় পরিণত হবে। কংগ্রেসের জাতীয় রূপ বজায় রাখতে তিনি সকলকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন।

উপরোক্ত মন্তব্যের পর তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন এই ভেবে যে অবশেষে দেশ তার আত্মার সন্ধান পেয়েছে। তিনি মন্তব্য করলেন যে দেশের উদ্ধারের উপায় দেশের অভ্যন্তর থেকেই বের করা প্রয়োজন।

তিনি আন্তরিকভাবে অসহযোগের পক্ষপাতী কিন্তু তিনি স্কুল ও কলেজ থেকে ছাত্রদের সরিয়ে আনার সমর্থন করেন না। তিনি মনে করেন না আইন আদালত বয়কট কার্য্যকরী হবে। তিনি মনে করেন যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করা কর্তব্য।

তারপর তিনি অর্থনৈতিক শোষণ সম্বন্ধে বললেন। অসহযোগ সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে অর্থনৈতিক শোষণের মূলে কুঠারাঘাত আবশ্যক।

তিনি বিদেশী-দ্রব্য বর্জনের পক্ষপাতী নন এবং কাউন্সিল বয়কটও তিনি সমর্থন করেন না।

তিনি বললেন যে, যে দুটি অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য এই কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত হয়েছে সেই দুটি অন্যায় হিন্দু মুসলমানকে মিলিত করেছে। এই দুইটি অন্যায় সত্বেও তিনি স্বরাজের জন্য লড়াই করবেন।

প্রত্যেক কাজে স্বরাজ ও পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনকে প্রথম স্থান দিতে হবে। খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের প্রশ্নে যাই ঘটুক না কেন পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দেশের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন যে গান্ধীজী কংগ্রেসকে খিলাফৎ কমিটীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করেছেন। তিনি খিলাফৎ কমিটীর কোন দোষ দেখেন না কিন্তু উক্ত কমিটী একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছে।

গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে প্রচার কার্য্যের উপর সভাপতি মহাশয় জোর দিলেন। তিনি ভগবানের দোহাই দিয়ে এই অস্ত্র পরিত্যাগ করতে নিষেধ করলেন।

পরিশেষে তিনি সকলের নিকট সুষ্ঠ আচরণের জন্য আবেদন জানালেন। তিনি বললেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না কেন কংগ্রেসের প্ল্যাটফরমকে পবিত্র এবং সমগ্র জাতির জন্য সুরক্ষিত রাখতে হবে।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরী সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেবার প্রস্তাব উপস্থিত করে লালাজীর নানা গুণাবলী কীর্তন করলেন।

এই প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে মৌলানা সৌকত আলী সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন যে যতদিন খিলাফৎ প্রশ্ন মুসলমানদের সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা না হবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত মুসলমানদের পবিত্র ভূমি ইংলণ্ডের হাতে থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁরা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারবেন না। তিনি বললেন যে মুসলমানদের মধ্যে বহু নেতা থাকা সত্বেও হিন্দুদের উপর আস্থার নিদর্শনস্বরূপ তাঁরা মহাত্মা গান্ধীকে খিলাফৎ আন্দোলনের নেতা নির্বাচন করেছেন।

এরপর শ্রী বি, চৌধুরী স্বেচ্ছাসেবকগণকে করপোরেশনের চেয়ারম্যানকে, পুলিশ কমিশনারকে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীকে সর্বপ্রকার সাহায্য দানের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

তারপর কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটল। অসহযোগ আন্দোলন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নবজীবনের সূত্রপাত করল।

ষট ত্রিংশ অধিবেশন—আমেদাবাদ-১৯২১

১

নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সমস্ত দেশব্যাপী অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। দলে দলে ছাত্রগণ ভারতের সর্বত্র স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল। বহু উকিল ব্যারিষ্টার এই আন্দোলনে

সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করলেন। অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপক কলেজের চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। মহাত্মাজীর প্রভাবে সকল প্রদেশের শীর্ষ স্থানীয় আইনজীবিগণ যথা বাংলার চিত্তরঞ্জন দাশ, বিহারের মজহর হক্‌ মুক ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আসামের নবীন বরদোলই। যুক্ত প্রদেশের মতিলাল নেহেরু, বোম্বাইয়ের এম্‌ আর জয়াকর ও বিঠল ভাই ঝাবর ভাই প্যাটেল, আমেদাবাদের বল্লভ ভাই ঝাবর ভাই প্যাটেল, মধ্যপ্রদেশের অভঙ্কর রাঘবেন্দ্র রাও ও আনে, মাদ্রাজের এডভোকেট জেনারেল' শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও চক্রবর্তী রাজগোপালচারী প্রভৃতি ব্যবসা পরিত্যাগ করে এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য আত্ম-নিয়োগ করলেন। তা ছাড়া প্রতি জেলা থেকে সাত সহস্র আইনজীবিগণ ব্যবসা ত্যাগ করে এই আন্দো-লনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভানেত্রী শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত কিন্তু এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত দিলেন এবং কংগ্রেসের এই নীতির প্রতিবাদে মাদ্রাজ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

পাঞ্জাবে যখন লালা লজপত রায় ছাত্রদের কলেজ বর্জনের প্রচার কার্য্য চালিয়েছিলেন তখন— লাহোরের উকিল দুর্গাদাস সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করে লালাজীর কাজের সমালোচনা করে জানালেন যে যখন লালাজী তাঁর পুত্র অমৃত রায়কে এম, এ, পাশের পর উচ্চ শিক্ষার্থে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যা-লয়ে পাঠিয়েছেন তখন তাঁর পক্ষে এই আচরণ অশোভন হয়েছে।

ইতিমধ্যে মহাত্মার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে নানা প্রকার আজগুবি সংবাদ প্রচার হতে লাগল। সাধারণ লোক মহাত্মাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ রূপে জ্ঞান করতে লাগল। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে তিনি দেবতারূপে পূজিত হতে লাগলেন।

২০শে জানুয়ারী তারিখে মফঃস্বলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গ্রাম উন্নয়ন সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে মৌলানা আবু বকর সিদ্দীকি, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খাজা আবদুল করিম ও চিত্তরঞ্জন দাশের স্বাক্ষরে প্রচার করল।

এই পরিকল্পনাতে প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, গভর্ণমেন্টের সাহায্য প্রত্যাহার করে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক, ধর্মগোলা প্রভৃতি সংগঠন, কৃষির উন্নতি, পাটচাষের ভূমির পরিমাণ হ্রাস, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার এবং যতদূর সম্ভব বিদেশী দ্রব্য বর্জন, বস্ত্রশিল্পীদের সংঘবদ্ধকরণ, হাতে সুতা কাটা ও তাঁতে বস্ত্র উৎপাদন, তুলা উৎপা-দনের উপায় উদ্ভাবন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ, কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিতে গ্রাম ইউনিয়ন গঠন, কংগ্রেসের সংবিধান অনুসারে ভোটারদের তালিকা প্রস্তুত করণ, গ্রামবাসিদের মোকদ্দমা থেকে বিরত করে সালিশী বোর্ডের মাধ্যমে তাদের বিবাদের নিষ্পত্তি, মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ এবং সেবা সমিতি স্থাপন করার নির্দেশ ছিল।

জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধী মৌলানা মহম্মদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় আসেন।

তাঁর আসার কয়েক দিন পরই ২৮-শে জানুয়ারী ডিউক অব কনট কলকাতায় পদার্পণ করলেন। কংগ্রেসের নির্দেশে ঐ দিন পরিপূর্ণ হরতাল পালিত হল। দোকানপাঠ, যানবাহন প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ ছিল। লোকের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

হরতালের পরদিন একটি ছাত্রসভা আহুত হল, সেই সভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মৌলানা মহম্মদ আলী ও মহাত্মা গান্ধী ছাত্রদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদিতে আহ্বান করলেন।

মহম্মদ আলী ইংরাজিতে বক্তৃতা দিলেন। কথা-

প্রসঙ্গে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে স্কুলের ছাত্ররা পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে অগ্রসর হয়েছে অথচ স্নাতকোত্তীর্ণ ছাত্ররা এখন পর্য্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি জানালেন তাদের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার প্রতিবিধানের একমাত্র উপায় অসহযোগ। দেশবন্ধুও এই মর্মে বক্তৃতা দিলেন।

মহাত্মা গান্ধী তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে বড়বাজারে গিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর আসতে দেরি হল। তিনি সভায় উপস্থিত হতেই সকলে তাঁকে 'মহাত্মা গান্ধী-কি জয়' ধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা করল। মহাত্মা বক্তৃতা করতে উঠে জানালেন যে মাড়োয়ারী মহিলাদের নিকট থেকে প্রায় ১০ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার ও বহু অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি যে সময়ে অসময়ে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ প্রাপ্তির আশা দেন তা কি আশ্চর্য্যজনক? যেভাবে জনগণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে এবং অর্থ সংগৃহীত হচ্ছে তাতে মজ্জাগত নৈরাশ্যবাদীদেরও তাঁর মত সমর্থন করতে হবে। তিনি বিশেষ করে স্নাতকোত্তীর্ণ ছাত্রদের কংগ্রেসের আহ্বানে এবং তাঁদের বিবেকের অনুশাসনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে বললেন। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরের গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতার নীতির পরিবর্ত্তনের কারণ বিস্তারিতভাবে বললেন। ডিউক অব কনটের আগমন উপলক্ষে কলকাতার নাগরিকবৃন্দ যে পূর্ণ হরতাল পালন করেছে তজ্জন্য তাদের ধন্যবাদ দিলেন।

পরিশেষে তিনি ছাত্রদের নিকট দাসত্বের শিক্ষায়তন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে ও চরকা গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন এবং বললেন যে যদি ছাত্ররা তাঁর আবেদনে সাড়া দেয় তা হলে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি তিনি দিচ্ছেন।

মহাত্মা গান্ধী ২রা ফেব্রুয়ারী ডিউক অব কনটের নিকট তাঁর অভ্যর্থনা বর্জন করার কারণ বিশ্লেষণ করে এক পত্র লিখলেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ের দাক্ষিণাত্য সভা (ডেকান সভা) কর্ত্তৃক আহূত এক সভায় প্রসিদ্ধ মডারেট নেতা মনস্বী মাননীয় শ্রী শ্রীনিবাস শাস্ত্রী অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বুঝতে পারেন না কি করে শিক্ষায়তন বর্জন অত্যাচারের প্রতিকারের সহায়ক হবে। ৯ মাসের মধ্যে স্বরাজ অর্জনের জন্য অসহযোগ আরম্ভ হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে চরকায় সুতা কাটা এবং হিন্দুস্থানী ভাষা শ্রবণ করা ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার শ্রেষ্ঠ উপায়। কি করে তা সম্ভব তা তাঁর বুদ্ধির অগম্য। তিনি পরিশেষে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে জানালেন যে যদি অসহযোগ আন্দোলন উদ্দেশ্য সাধনে অসফল হয় তা হলে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তা ভারতে স্থায়ী হবে এবং এর ফলে তরুণদের যে ৮ মাস ক্ষতি হয়েছে তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে দেশের ক্ষতি হবে।

শাস্ত্রী মশায়ের বক্তৃতায় অসহযোগীরা পুনঃপুনঃ বাধা দিচ্ছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে দেশবন্ধু দাশ সস্ত্রীক অসহযোগ আন্দোলনের প্রচার কার্য্যে পূর্ব বঙ্গ সফরে বের হলেন, প্রথমে ঢাকায় উপস্থিত হয়ে ২৭ শে ফেব্রুয়ারী একটি জনসভায় বক্তৃতা দেন।

আরও কয়েক স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার পর দেশবন্ধু সদলবলে ময়মনসিংহে রওনা হয়ে ২রা মার্চ বেলা ১২টায় ময়মনসিংহ ষ্টেশনে পৌছান। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী ও তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে দশ হাজারের বেশী লোক উপস্থিত হয়েছিল। ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ময়মনসিংহ সহর ও জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেশবন্ধু দাশ ও তাঁর দলের উপর জারি করলেন এবং ময়মনসিংহ এসোসিয়েসনের সম্পাদক মনোমোহন নিয়োগী ও খিলাফত কমিটীর সম্পাদক তেজাবুদ্দিনের উপর নোটীশ জারি করে তাঁদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকার বণ্ড সম্পাদন করার হুকুম দিলেন। এই সংবাদে সমবেত জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। জনপ্রিয়

নেতা মনোমোহন বাবু জনতাকে শান্ত করে—সকলকে ফিরে যেতে বললেন। এর ফলে ময়মনসিংহ সহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হল এবং আইনজীবিগণ এক সপ্তাহের জন্ত আদালত বয়কট করার সিদ্ধান্ত করলেন।

দেশবন্ধুর উপর উপরোক্ত বহিষ্কার আদেশের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কলকাতার মির্জাপুর পার্কে (বর্তমান শ্রদ্ধানন্দ পার্কে) মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে এক বিরাট প্রতিবাদসভা আহুত হয়। এই সভায় শশাঙ্কজীবন রায় (হাইকোর্টের উকিল) জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, মৌলভী আক্রাম খাঁ (আজাদ পত্রিকার সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে মুসলীম লীগের অন্যতম নেতা) প্রভৃতি নেতাগণ ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুর নিকট অভিনন্দন জ্ঞাপক একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমানে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে আর একটি বিরাট প্রতিবাদ সভার অধিবেসন হয়। এই সভায় বিপিনচন্দ্র পাল, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় (হাইকোর্টের উকিল এবং পরে হাইকোর্টের জজ), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রসিদ্ধ লেখক, সাংবাদিক ও সুবক্তা) প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

দেশবন্ধু তাঁর বিরাট আইন ব্যবসা ত্যাগ করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগের জন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র তাঁর প্রতি লোকের শ্রদ্ধা প্রকাশ হতে লাগল।

অত্যাচারী ইংরেজের দেশেও কেউ কেউ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কুণ্ঠিত হন নি। এই প্রসঙ্গে স্যার মাইকেল স্যাডলার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের ভূতপূর্ব সভাপতি) ১১শে ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের লিডস্ সহরের মাইনিং সোসাইটির বার্ষিক ভোজসভায় সভাপতির অভিভাষণে বলেন :—

"আমি একজন ভারতীয় ব্যারিষ্টারকে জানি যিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন, তিনি দেশের সেবার জন্ত তাঁর সম্পত্তি দান করেছেন এবং দৈনিক পাঁচ শিলিং খরচে জীবিকা নির্বাহের সঙ্কল্প নিয়েছেন। সুতরাং দরকার হলে আমি আপনাদের তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলব"।

তার পর তিনি বলেন :—

"যদি গান্ধীর অহিংস অসহযোগের পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয় তা হলে পৃথিবীর চোখে তা উচ্চ স্থান অধিকার করবে।"

যাই হোক, দেশবন্ধু চট্টগ্রাম ও নোয়াখালিতে গিয়ে অসহযোগ সম্বন্ধে জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই দুই শহরে তিনি বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হন।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে করাচী শহরে গভর্ণরের পরিদর্শন উপলক্ষে সম্পূর্ণ হরতাল হয়।

বারানসীতে বিদ্যার্থীরা কুইন্স কলেজে পিকেটিং করার জন্ত গেটের সামনে শুয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৫শে মার্চ বরিশালে বঙ্গীয়প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশনের দিন নির্দিষ্ট হয়। ঐ সভায় সভার সভাপতি নির্বাচিত হন প্রসিদ্ধ নেতা ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল।

কনফারেন্সে যোগ দিতে মহাত্মাগান্ধী ২১শে মার্চ কলকাতায় পৌঁছে দেশবন্ধুর গৃহে উপস্থিত হন এবং সেই দিনই সন্ধ্যার সময় বরিশাল রওনা হন।

এই কনফারেন্সের ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সভাপতির মত মহাত্মার মতের সঙ্গে না মেলায় তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়।

কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণে অধিকাংশ প্রতিনিধি ক্ষুব্ধ হন। পাল মশায় তাঁর অভিভাষণে বলেন যে তিনি ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মযাজকের ক্ষমতা মানেন নি—রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি তা মানতে পারবেন না। এই যদি নূতন বেদবাক্য (Gospel) হয় তা হলে যারা তা গ্রহণ করেছেন তাঁদের সাফর্চ্য্য তাঁকে (সভাপতিত্ব) ত্যাগ করতে হবে। তিনি বললেন যে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে অধিকাংশ লোক যা চায় তা তিনি দিতে

পারেন নি। তাঁরা চান ম্যাজিক, তিনি দিতে পারেন শুধু লজিক।

তিনি বললেন যে তিনি জানতেন অসহযোগ সম্বন্ধে সকলে তাঁর সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু তিনি অতিশয় বিস্মিত হয়েছেন তাঁর স্বরাজের আদর্শের প্রতিবাদ শুনে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কেন তিনি স্বরাজের ব্যাখ্যা করতে চান। প্রতিবাদকারীরা বলেন—স্বরাজ হল স্বরাজ। এর কোন শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না—এ ভিতরের অনুভূতির বস্তু। পাল মশায় বললেন যে স্বরাজ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কেউ শুনতে চায় না। সমালোচনাও কারুর মনঃপুত নয়। তাঁদের কথা হল তোমার যা কিছু আছে তা বিক্রয় করে আমার অনুসরণ কর। এই হল নূতন নির্দেশ।

সভাপতি মশায় বক্তৃতার সময় পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হন।

বরিশাল কনফারেন্সের পর পাল মশায় কংগ্রেসের রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হন। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়।

বরিশাল থেকে কলকাতায় ফিরে মহাত্মা গান্ধী বিহারের প্রসিদ্ধ নেতা মজহর উল হককে সঙ্গে নিয়ে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে অসহযোগ প্রচার করতে যান। ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে তিনি চার দিন বক্তৃতা দেন। এই ভ্রমণের সময় ওড়িশার লোকজনের চরম দারিদ্র্য দেখে তিনি মর্মাহত হন। এর প্রভাব তিনি আজীবন এড়াতে পারেন নি। ওড়িশা ভ্রমণের পরেই মহাত্মা সমস্ত পরিচ্ছদ ত্যাগ করে কেবল কটিবাস ধারণ করলেন।

মহাত্মার নির্দেশে ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহ দিবসরূপে পালিত হবে স্থির হল। ঐ তারিখে বাংলায় সর্বত্র হরতাল পালনের জন্য ঘোষণা করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধু তিলক স্বরাজ্য ফাণ্ডের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানালেন। যথারীতি সত্যাগ্রহ দিবস পালিত হল।

ক্রমশঃ

ঠুন্‌কো

(গল্প)
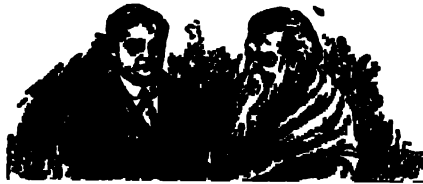
গৌতম সেন

দু'বছরের ছেলে রেখে শাশুড়ী অত্যন্ত আকস্মিক মারা গেলেন।

ঘর-বসতি করতে এসে নতুন বৌ সেই ছেলেকে বুকে তুলে নিলে।

বড় ছেলে—বধূর স্বামী অমিতাভ বললে, পারবে তো? পনের বছরের কাঁচা বৌ সপ্রতিভ ঘাড় নেড়ে জানায়, নিশ্চয় পারবে।

সত্যিই পারলো। পাড়া-প্রতিবেশী দেখে চমকে যায়! একরত্তি মেয়ে—সত্যি, যার পুতুল-খেলার বয়স এখনো শেষ হয়নি, যে এলো নতুন ঘর করতে, শাশুড়ী ননদে জমজমাট সংসারে যার পরম নিশ্চিন্ত মনে শুধু খুনসুটি করবারই কথা—কোন্ নিষ্ঠুর ভাগ্য-বিধাতা তার সেই কিশোর-যৌবনের পরম দিনগুলিকে জীবনের অধ্যায় থেকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেল! শুধু 'মা' না হয়েও তাকে আজ 'মা' হ'তে হলো।

কিন্তু অদ্ভুত এই বোঝার দায়িত্ব! অপরিণত বুদ্ধি নিয়েই সে তার আপন কল্পনামত সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছে। সাজিয়ে নিয়েছে সে নিজেকে, তার সংসারকে। কত কাজ বধূ মালতীর। সারাদিন ঘোরে, তবু যেন কাজের অন্ত নেই। আবার ওরি মধ্যে আছে খোকার প্রতি তার সজাগ-দৃষ্টি। ঘুম পাড়িয়ে বার বার দেখে আসা, কাঁদলে ছুটে যাওয়া—তাকে সাজানো-গোছানো, টিপ পরানো, কাজল দেওয়া—

স্বামী অফিস থেকে এসে থমকে দাঁড়ায়। ছোট্ট সংসার, কিন্তু কোথাও তার জায়গা নেই। মালতীকে দেখে মুগ্ধও হয়, আবার বিরক্তও হয়। মনে হয়, মালতী এতটা বাড়াবাড়ি না করলেও পারে। অফিস থেকে এসে সে পায়না 'একটু' হাত-মুখ ধোয়ার জল, এক কাপ চা কিম্বা একটুখানি মিষ্টি হাতের খাওয়া—

অমিতাভর বয়স তো বেশি নয়। এই তো বছর-খানেক হ'লো তাদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের রোমান্স কি জানবার আগেই সে যেন বুড়ো হয়ে গেল! বন্ধুরা কত কি বলে, সে শোনে। এক-একবার মনে হয় মালতী কি এসব কিছু জানে না! ওর বয়সের মেয়েরা তো কত কি বায়না করে। কিন্তু ও তো নিজের জন্যে কোনোদিন কিছু বলে না! ওর কি সাধ-আহ্লাদ কিছুই নেই? সব কি অকালে শুকিয়ে গেল?

বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে অমিতাভ। বন্ধুদের আড্ডায় চা গিলে তাস খেলে বেশ রাত করেই বাড়ী ফেরে। এসে দেখে, পরম নিশ্চিন্ত মনে খোকাকে নিয়ে মালতী ঘুমুচ্ছে।

অমিতাভ একদিন মালতীকে জিগ্যেস করেছিলো? তোমার এসব ভাল লাগে?

বধূ মালতী হেসে বলেছিলো, ভাল লাগবে না কি গো? নিজের ঘর-সংসার—তা ছাড়া, খোকাকে তো মানুষ করতে হবে।

তোমার কি সাধ-আহ্লাদও সব গেল ?

মালতী হেসে উত্তর দিয়েছিল, সময় পাই কখন বলো ?

অমিতাভ নিজের বয়স ভুলে যেতে লাগল। সে ভুলে গেল তার যৌবন কোনোদিন এসেছিল কিনা! অথবা এসেছিল, তারই প্রতীক্ষায় তিলে তিলে ক্ষয় ক'রে গিয়েছে নিজেকে।

কিন্তু এ কি অভিশপ্ত জীবন! নিজের সংসারে নিজের প্রয়োজনই সর্বাগ্রে ফুরিয়ে গেল। কিন্তু কার ওপরেই বা সে রাগ করবে? রাগ করতে হলে, ঐ মালতীর ওপরেই করতে হয়। কিংবা করতে হয় ঐ খোকাটার ওপরে। কিন্তু ওদের কি দোষ? দোষ তার ভাগ্যের। নইলে তারই বা আজ এই বয়সে চাকরিতে ঢুকতে হবে কেন? কত সাধই ছিল বাবার। সাধ ছিল, পৈত্রিক এই জমিটার ওপর একখানা ভাল বাড়ী করে যাবেন, সাধ ছিল ছেলেকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন—কিন্তু কোনো কাজই তাঁকে শেষ করতে হ'লো না। বাবাও গেলেন, তার হু'বছর পরে মা-ও আর রইলেন না। মা তাঁর কাজ শেষ করেছেন ছেলের বিয়ে দিয়ে। কিন্তু ছেলে বধূকে পেলো না, পেলো গৃহিণীকে। পেলো এক ব্যতিক্রমকে—যার যৌবন নেই, আছে যৌবনের জৌলুষ—আকাঙ্খা নেই, আছে কর্মে আসক্তি।

প্রতিবেশীরা আসে, মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখে তার প্রতিটি গৃহিণীপণা। বলে, আহা, বৌ পেয়েছিলো বটে অনুর মা। এমন বৌ নিয়ে ঘর করতে পেলে না গো!

মালতীর বাবা ছুটে আসেন। ইচ্ছা হয়, মেয়েকে নিয়ে গিয়ে দুদিন নিজের কাছে রাখেন। কিন্তু মেয়ে যেতে চায় না। বলে খোকার অ-যত্ন হবে।

একটি মাত্র ছোট্ট কথায় বুড়োর অনেকখানি জানা হয়ে যায়।

খোকা বড় হচ্ছে। বড় হওয়ার সঙ্গে তার প্রয়োজনও বাড়ছে। তার জামা-ইজের সেলাই করবার জন্য সেলাই-এর কল এসেছে—এসেছে নানা রকমের খেলনা, পাউডার, ক্রিম, স্নো, গোরুর দুধে শরীর ভাল থাকছে না বলে, এসেছে বিলিতি কৌটার দুধ।

মালতীর চোখে স্বপ্ন—এই খোকা বড় হবে, নিজের হাতে গড়া, তারই আদর্শে সে একদিন মানুষের মতো মানুষ হয়ে এ-বাড়ীর মুখ-উজ্জ্বল করবে। সে কিন্তু খোকাকে খোকাই বলবে, যে যাই বলুক।

অমিতাভ তাই এর নাম রাখলে অরুণাভ। মালতীকে শুনিয়ে বলে, কেমন নাম হয়েছে বলো দেখি?

মালতী বলে, বেশ হয়েছে। কিন্তু ও আমার কাছে খোকাই।

বুড়ো খোকাকে 'খোকা' বলতে গেলে লোকে নিন্দা করবে।

করুক। তারা কি বুঝবে, ও আমার কে?

সত্যিই, এ খোকা যে মালতীর কতখানি তা অপরে বুঝবে কি করে। অমিতাভই কি বোঝে? সে জানে, তার না-বালক ভাইকে একজন মানুষ করছে—যেমন মানুষ করে, বাড়ীর দাসী-বাঁদীরা। কিন্তু মালতী যে খোকার কতখানি, সে শুধু নিজেই জানে। কিন্তু যদি সে অমিতাভকে বোঝাতে পারতো! সে বোঝে-না বলেই তো এত জ্বালা হয়েছে। খোকা তো তার ভাই, সে তো নিজের গরজেই তার ভাই-এর প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আনতে পারে, রোজ রোজ বলতেই বা হয় কেন!

অমিতাভও চেয়ে চেয়ে দেখে, একটি দুটি করে নানান্ জিনিসে তার ঘর ভর্তি হয়ে উঠেছে। একটা খোকার আর কত প্রয়োজন হ'তে পারে! কিন্তু মালতীকে বোঝায় কার সাধ্য!

অমিতাভ নটা-দশটায় অফিস বেরিয়ে যায়, তারপর মালতীর দীর্ঘ অবকাশ। খোকাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে একটা লম্বা ঘুম দিয়েও তার সময় কাটে না।

সমবয়সী প্রতিবেশিরা আসে—এসে দেখে, কোথায় মালতী? মালতীর সবখানি জুড়ে রয়েছে ঐ খোকা।

মালতীকে নিয়ে ওরা তাস খেলতে বসে, কিন্তু মালতীর মন আর খেলাধুলায় বসতে চায় না—তবু বসতে হয়, নইলে বন্ধুরা রাগ করে। প্রতিদিনের নিয়মিত আড্ডা—হয় তাস, নয় গল্প।

বয়স্থারা আসেন। আড্ডা দিতে নয়, মালতীকে দেখতে। কিন্তু যারাই আসুক, সকলের মুখে ঐ এক কথা: নিজের পেটের কেউ নয়—দেওর, কিন্তু কি ভালটাই বেসেছে ঐ খোকাকে। আগের জন্মে ও ওর ছেলে ছিল।

অমিতাভও শোনে। মালতীর কথা সত্য। বন্ধুরা বলে বৌ পেয়েছিল বটে।

* * *

কুড়ি বছর পরে।

কলেজ থেকে অরুণাভ ফিরে এলো জ্বর নিয়ে। মালতী ছুটে আসে—গায়ে হাত দিয়ে দেখে, গা পুড়ে যাচ্ছে!

মালতীর তখনো খাওয়া হয়নি—আর বোধহয় খাওয়া হবেও না। কারণ সে তো জানে অরু কত অল্পেই কাতর হয়।

বিছানায় শুয়ে অরু ছটফট করে আর কাৎরায়। মালতী সারাক্ষণ তার পাশটিতে শুয়ে হাওয়া করে, মাথা টিপে দেয়।

রান্নাঘরের দরজা খোলা পড়ে থাকে। বন্ধ করে দিয়ে আসবে সে-সময়টুকুও অরু দেয় না।

জ্বর কার না হয়! মালতী নিজের মনকে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পোড়া চোখ দিয়ে জল গড়াতেই থাকে।

প্রতিবেশিরা আসে। দেখে মালতী শুয়ে আছে অরুর পাশে। ছি ছি কি লজ্জা! জিভ কেটে তারা পালিয়ে যায়।

পাড়ায় ছি ছি, পড়ে গেলো।

বিচিত্র সাপ বিচিত্র নাম

অবনীভূষণ ঘোষ

বাংলা সর্পসংকুল অঞ্চল। কত বিচিত্র সাপ এখানে পাওয়া যায়, আর কত বিচিত্র তাদের নাম। জেলাভেদে—এমন কি একই জেলার বিভিন্ন অংশভেদে, স্থানভেদে আবার ভিন্ন ভিন্ন সাপকে একই নামে অভিহিত করা হয়। রাজসাপ বলতে কেউ বোঝে শাঁখামুটি, কেউ আবার শঙ্খচূড়কে রাজসাপ বলে। কালনাগিনী সাপে কাউকে দংশন করেছে—লোকবিশেষের এ কথার অর্থ জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে ওঠে। আসলে কালনাগিনী হল বিচিত্র রঙের কেউটে সাপ; এ সাপ কদাচিৎ মানুষকে দংশন করে, দংশন করলেও প্রাণহানি ঘটে না। কিন্তু কালনাগিনী বলতে কেউ কেউ কাল কেউটে বুঝে থাকে। বলাবাহুল্য, কাল কেউটের দংশনে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

বিভিন্ন সাপের বিচিত্র নামের ব্যুৎপত্তিও লক্ষ্য করার। অনেক নামই গ্রামের সাধারণ নিরক্ষর লোকের দেওয়া। তাদের কত অভিজ্ঞতা কত কল্পনা লুকিয়ে আছে এই নামগুলির মধ্যে। আদিম প্রাক্ সাক্ষর মানুষের চোখে সাপ ধরা পড়েছিল এক রহস্যময় অসাধারণ জীবরূপে। বাঘ সিংহ হাতির মত গায়ে নেই বল। অথচ সামান্য এক ছোবলে মানুষকে যমের সদনে পাঠিয়ে দেয়। কি রহস্য রয়েছে এই শক্তির পিছনে। প্রাক্ সাক্ষর মানুষ সাপকে করত যেমন ভয়, তেমনি শিখেছিল তাকে শ্রদ্ধা করতে। আজও সাধারণ লোকে সাপ সম্পর্কে এই শ্রদ্ধাসমন্বিত ভয় পোষণ করে থাকে। এই মনোভাব সাপের অনেক নামের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। জীবটির শ্রেষ্ঠতা নির্দেশ করতে অনেক নামের সঙ্গে 'রাজ' যুক্ত হয়েছে। বিষধর সাপের ক্ষেত্রে তো বটেই, বিষহীন সাপের ক্ষেত্রেও। ভয়াবহ মারাত্মক বিষধর শঙ্খচূড় স্বভাবতই রাজসাপ। সম্পূর্ণ বিষহীন নিরীহ বেলেসাপও (বালিবোড়া) শ্রেষ্ঠতার দাবি রাখে; সে অন্তত রাজকুমার। অল্প বিষধর কৃশকায় কাড়সাপও বঙ্করাজ।

সাপের নামগুলির মধ্যে প্রাক্ সাক্ষর মানুষের আর একটি চিন্তাধারা বিধৃত হয়ে আছে। সাপকে বিশেষ করে বিষধর ও বিষধর বলে গণ্য সাপকে স্ত্রী-সূচক নাম দিয়ে অভিহিত করার প্রবণতা। কোন কাল কেউটে নাগ নয়—সব কালনাগিনী। শাঁখামুটি মাত্রই শাঁখিনী। বিষহীন ঘরাচিতিও ঘরমোহিনী। নিরক্ষর মানুষের মনে এই প্রবণতা এত প্রবল যে আজও তারা ভাবে, বিষধর সাপমাত্রই নারী—তাদের মধ্যে পুরুষ নেই। প্রাচীন পুরাণের অভিমতও যেন কতকটা অনুরূপ ধরনের। পুরাণকার পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক—তিন প্রকার সাপের কথা বলেছেন। নপুংসক সাপের কল্পনা পুরাণকারের কেন হল বোঝা দুষ্কর। অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর মত নপুংসক সাপ নিছক ব্যতিক্রম। যা হক, অগ্নিপুরাণের মতে মা-সাপ পুরুষ ও নপুংসক বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে—মাত্র স্ত্রী বাচ্চাদের রেখে দেয়। সব বিষধর সাপই স্ত্রী, এ চিন্তাধারার মূলে কি থাকতে পারে? বিষধর সাপের মুখে আছে বিষ, আর মুখরা নারীর মুখে থাকে বিষ। এই প্রতীক সাদৃশ্যে কি এই চিন্তাধারার উদ্ভব? মনে হয় না। এই যুক্তি আপনাদের রসপ্রবণ মনকে তুষ্ট করতে পারলেও মানুষের ক্রমবর্ধমান কল্পনাশক্তির যে স্তরে এরূপ চিন্তাধারা সম্ভব, তার বহু পূর্বেই সাপগুলি চিহ্নিত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। বাঙালীর আরাধ্যদের অনেকেই দেবী। সাপও উপাস্য; সুতরাং তার নামও স্ত্রী-সূচক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হয়, সব সাপের নারী ভাবার মূলে রয়েছে সাপের আঙ্গিক গঠন। সাপের জনন-অঙ্গ এমনই, দৃশ্যত সব সাপকেই নারী বলে

মনে হয়। অতীতে এবং আজও বিষধর সাপকেই ঘিরে মানুষের যত আগ্রহ। তাই বিশেষ করে বিষধর ও বিষধর বলে গণ্য অনেক সাপের নাম ভীতিসূচক হয়ে গেছে। যা হক, বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন সাপের বিচিত্র নামের মাত্র সামান্য অংশই আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য কয়েকটি নাম নিয়ে সাধ্যমত এখানে আলোচনা করলাম।

গোখরো ও কেউটে আমাদের পরিচিত সাপ। সাপ বললেই এ দুটি যেন স্বতই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মারাত্মক বিষধর সাপ। ফণা থাকায় এ দুটিকে একত্রে বলা হয় চক্রধর। প্রাচীন আয়ুর্বেদকার নাম দিয়েছেন দর্বীকর। দর্বী অর্থাৎ ফণা ধারণ করে, তাই এই নাম। ফণায় গরুর খুরের চিহ্ন, তাই গোখরো। গোখরো খরিশ (বীরভূম) নামেও পরিচিত। খরবিষ থেকে এ নামের উৎপত্তি গোখরোর আর একটি নাম গোমা (জলপাইগুড়ি, পশ্চিমদিনাজপুর, মালদহ, রাজশাহী)। গোখরো সাধারণত গম রঙের হয়ে থাকে; তাই গোমা (গহমা গমুনা)। কেউটে নাম এসেছে কৈবর্ত থেকে—বং সাদৃশ্যে। কৈবর্তেরা সাধারণত কাল হয়ে থাকে, কেউটেও কাল। কেউটের সঙ্গে কৈবর্তদের আর এক ভাবে অনুষঙ্গ রয়েছে। কৈবর্তদের পেশা মাছ ধরা; কেউটেও জলে নেমে মাছ ধরতে খুব পটু। মাছ ধরতে গিয়ে কৈবর্তদের অনেক সময়ই কেউটের সম্মুখীন হতে হয়। কারও মতে কৃষ্ণ থেকে কেউটে নামের উৎপত্তি। দুজনেই কাল। কেউটের আর এক নাম মাছুয়া (পশ্চিম-দিনাজপুর, ময়মনসিংহ); মাছুয়া অর্থাৎ মাছখেকো। আর একটি নাম কানস (নোয়াখালি) আর এক নাম পানক (ত্রিপুরা)। কেউটেকে আলাদও (নদীয়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর শ্রীহট্ট) বলা হয়। কোথাও বলে সেহে। আলাদ। অলগর্দ থেকে আলাদ এসেছে। অলগর্দ জলঢোঁড়া সাপ। খাদ্যের সন্ধানে কেউটে অনেক সময় জলে বিচরণ করে। তাতেই অলগর্দের অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে কেউটেকেও বুঝিয়েছে। আলে বাস করে বলেও কেউটের নাম আলাদ হতে পারে। আলাদই খাল কেউটে। কেউ বলে আলান অর্থাৎ বন্ধনখুঁটি সদৃশ।

গায়ের বিচিত্র রং অনুসারে গোখরোর বহুনাম। অল্প কালোর উপর খইয়ের মত সাদা ফুটকি—খয়ে গোখরা (খইজাত)। লাল আভা রঙের পদ্ম গোখরা। অল্প সাদা রঙের দুধে গোখরো,দুধিয়া বা দুধরাজ। বিচিত্র রং অনুসারে কেউটেরও বহু নাম। গেঁড়ি বা শামুক ভেঙে গেলে যেমন দেখতে হয় কতকটা পাশুটে রঙের—এরকম কেউটের নাম গেঁড়িভাঙা বা শামুক ভাঙা কেউটে। ছোবল মেরে গেঁড়ি-শামুক ভেঙে খায় বলে গেঁড়িভাঙা কেউটে, একথা ঠিক নয়। গেঁড়িভাঙা কেউটেকে সরষেফুলি কেউটেও (পশ্চিম-দিনাজপুর) বলে—কালোর উপর সাদা সরষের ছিট, তাই এই নাম। আগে যে আলাদ বলেছি, তা এই গেঁড়ি ভাঙা কেউটেই।

সাপেদের রাজা শঙ্খচূড়ের নামের কারণ কি? দেহের অনুপাতে শঙ্খচূড়ের ফণা তত চওড়া নয়—কতকটা লম্বাটে ধরণের। ফণা কতকটা শাঁখের মত; তাই শঙ্খচূড় নাম। কারও মতে দেহে শাঁখাচুড়ির মত ডোরা আছে বলে এই নাম। পাহাড়ে ও তার আশপাশে থাকে বলে পাহাড়রাজ। পাতার মত সবজেটে বলেও এই নাম হতে পারে। গোখরোর জাতি বড় তাই, তাই রাজগোখরো।

কালচে সাধারণত কাল হয়ে থাকে, তাই এই নাম। মাথার পেছনে সাধারণত একটি সাদা দাগ থাকে; তাই আর একটি নাম শেয়র চাঁদা (শিখরচাঁদা) দাগটি যেন চাঁদ। কুরেত (করাইত) নামেও এ সাপ পরিচিত। কিরাতভূমির (ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল) সাপ, তাই বোধ হয় এই নাম। এই অঞ্চলে করেত-গণের বেশ কয়েকটি প্রজাতি দেখা যায়। আজও অনেক বাঙালী সাপুড়ের মুখে শোনা যায়, কালাচ বাংলা দেশের সাপ নয়; বাইরে থেকে এসেছে। অতীতে বন্যার জলে ভেসে এসে বাংলায় মৌরসিপাট্টা

লাভ করেছে। কিরাতবাসীরা খর্বকায় বলে গণ্য; এ সাপও সাধারণভাবে খর্বকায়। তদনুসারেও কিরাত নাম হতে পারে। গায়ের রং কতকটা ধোঁয়ার মত' তাই ধুমনাচিতি (ধুমলাচিতি)। ডোমনাচিতিও (ডোমন করেত) এ সাপের নাম। ধুমনাচিতি থেকে এ নাম এসেছে। ডোমজাতির মত নিরীহ এই অর্থেও ডোমনাচিতি হতে পারে। কালাচের আর এক নাম কানড বা কাদোড় (খুলনা, যশোহর)। কর্ণাট থেকে এ নামটি এসেছে। দ্রাবিড় ভাষাভাষী সম্পৃক্ত মালজাতি বাংলার সর্প ঐতিহ্যে নানা উপকরণ জুগিয়েছে। তারাই বোধ হয় এ নামের মূল। কানড নাম কণ্ঠোট (নীল-পদ্ম) থেকেও আসতে পারে। সাপটি কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকলে নীল পদ্মের কথা মনে আসা আশ্চর্য নয়।

শাঁখামুটি আমাদের আর একটি পরিচিত সাপ। শাঁখামুটির গায়ে অল্প হলদে রঙের চওড়া ডোরা আছে। ডোরাগুলি অনেকটা চাকাই শাঁখার মত। তাই শাঁখামুটি। বাংলার পূর্বাংশে শাখিনী (শাঁখিনী, নাগী) নামে পরিচিত। রাজসাপও বলা হয় একে। সাপেদের রাজা শঙ্খচূড়কে রাজসাপ বলা হয়। কিন্তু শাঁখামুটিকে রাজসাপ বলার কি কারণ থাকতে পারে? শাঁখামুটি উগ্র বিষধর সাপ, দেখতেও খুব বড় হয়, অন্য সাপ এর খাদ্য, তার উপর শিকার ধরতে ছুটোছুটি করে বেড়ায় না, এক জায়গাতেই পড়ে থাকে—সেজন্যে রাজসাপ। রাজসাপ (মেদিনীপুর) নামেও এ সাপ পরিচিত। খাটের দু প্রান্তের উঁচু পাড় রাখা, আর শাঁখামুটির পৃষ্ঠ-মাঝ বেশ শির করা। কোথাও বলে পানিচিতা; জল পছন্দ করে তাই। বারুণে চিতিও বলে। চামরকণা (চব্বিশ-পরগণা) নামেও এ সাপ পরিচিত; লেজের শেষাংশ চামরের মত খেবড়া বলে বোধ হয়। শাঁখামুটির আর একটা নাম খালিয়াচুর (চট্টগ্রাম)।

চন্দ্রবোড়ার (চন্দ্রবোড়া) গায়ের উপর চাঁদের চাকা-চাকা দাগ থাকার এই নাম। প্রাচীন আয়ুর্বেদকার নাম দিয়েছেন মণ্ডলী। লাল চন্দনের মত রং, তাই চন্দনবোড়া। চন্দ্রবোড়ার দংশনে ক্ষত স্থান অনেক সময় পচে যায়; সেজন্যে পচাবোড়া। রক্তক্ষরণ হয় বলে রক্তচুটে নাম।

অল্প বিষধর লাউডগার নামের কারণ সহজেই বোঝা যায়। সবুজ রঙের লাউডগাটার মত দেখতে। লাউলতাও (খুলনা) বলে। অল্প বিষধর আর একটি সাপ কাড। পিঠের রং অল্প হলদে-বাদামী বা বালি রঙের। বৃক্ষবাসী সাপ। তাই বোধ হয় কাঁড় অর্থাৎ গাছের কাণ্ড। তীর অর্থেও এ নাম হতে পারে, তীরের মত ক্ষিপ্র এ সাপ। কাণ্ডেশ্বর (মেদিনীপুর) নামেও পরিচিত। সামান্য উত্যক্ত হলেই কাড় উগ্র মূর্তি ধারণ করে। দেহের অগ্রভাগ ৪-এর আকারে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাথাটা তার মধ্যস্থলে নিয়ে ভূমি থেকে তুলে ধরে। তাই নাম বক্ররাজ অর্থাৎ বাঁকা মল সদৃশ।

বিষহীন সাপদের মধ্যে বৃহৎকায় অজগর সাপের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। অজ অর্থাৎ ছাগল গিলে খায় বলে অজগর নাম। হরিণ খায় বলে হরিণবোড়া। প্রাক্ সাক্ষর মানুষের চোখে অজগর সাপ কি ভয়াবহ রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল, তার পরিচয় আমরা পাই এর ময়াল (মহাকাল) নাম থেকে। পাহাড়ের ওপর পড়ে থাকে, তাই পাহাড়িয়া বোড়া বা পাহাড়ে চিতি। গায়ে গোল গোল বাহার, তাই গোলবাহার (চব্বিশ-পরগণা)। বরা অর্থাৎ শূকর খায় বলে বরাচিতি (চব্বিশ-পরগণা)। মেঘজাল শাড়ির মত রং; তাই এ সাপের আর একটি নাম মেঘডুম্বুর (বরিশাল)। অজগর ওলোধুড়ী (শ্রীহট্ট) নামেও পরিচিত।

ঢেমনা পল্লীবাসীর অতি পরিচিত সাপ। বিষহীন হলেও বলিষ্ঠকায়। ধর্মন (বৃক্ষবিশেষ) থেকে ঢেমনা নামের উৎপত্তি। ঢেমনার অর্থ লম্পট। সাধারণ লোকের ভুল ধারণা আছে, ঢেমনা বিষজাতীয় গোখরো কেউটের সঙ্গে মিলিত হয়। এ হিসাবেও ঢেমনা নাম হতে পারে। দণ্ডাকার বলে অথবা দণ্ডের মত

সবেগে মানুষকে আঘাত করে বলে দাঁড়াশ (দণ্ডাস) নাম। দারাইহও বলে।

গাঁয়ে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করে ঘরচিতি। একই কারণে অন্য নাম : ঘরমণি, ঘরমোনাই, (ত্রিপুরা), ঘরঘুরনী, চালবাউনী। দেয়ালের ফাটলে অনেক সময় থাকে বলে কেঁখোচিতি (চব্বিশ-পরগণা)। কেঁখো অর্থাৎ দেয়াল। চাকলা পোড়াও (ময়মনসিংহ) বলে। চেরা কাঠ সাদৃশ্যে চাকলা। ঘরচিতির মত হেলে একটি সাধারণ বিষহীন সাপ। হলকর্ষিত জমিতে থাকে বলে হেলে। বিষহীন তুচ্ছার্থেও হেলে নাম হতে পারে। কিলবিল করে চলে বলে হলহলিয়া বা হলহলে (বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া)। হরওল্লা (বগুড়া), ভেমটা (জলপাইগুড়ি, পশ্চিম-দিনাজপুর) ও ভ্যাপটা (মালদহ) নামেও এ সাপ পরিচিত।

পিঙ্গল রঙের বেতের মত সরু ছিপছিপে বেত-আছড়া সাপ। বেতেরই মত শিকারের উপর বুঝি লাফিয়ে পড়ে, তাই এই নাম। বেতআছড়া (বেতআছাড়) সাপ বেতেড়া (হাওড়া, হুগলি), বেতাঙ্গী (চব্বিশ-পরগণা), বেতিয়া বা বেতি নামেও পরিচিত। জংলাপোড়াও (ঢাকা, ময়মনসিংহ) নাম; জংলা অর্থাৎ বাঁশের কঞ্চি। লাউডুগিও (ময়মনসিংহ) বলে। গাছের শুকনো ডালের মত দেখতে কাঠসাপ (চব্বিশ-পরগণা) বেতআছড়ার একটি নাম সুতলি বা সুতানলি (ঢাকা); সুতলি অর্থাৎ সরু দড়ি। সবুজ রঙের লাউডগাকেও কখনও কখনও সুতানলি বলা হয়। এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফিয়ে চলে বলে ফড়িঙ্গেপোড়া (ঢাকা, বরিশাল)। ফড়িঙ্গে সাপও বলে। উড়িয়া বুড়িয়া (ঢাকা), উড়কী (নোয়াখালি) ও উড়কাবোড়াও (চট্টগ্রাম) বলে। সচরাচর দুই আর একটি সাপ জলঢোঁড়া (জলধোড়া, জলদাঁড়া) জলে বিচরণ করে, তাই জলঢোঁড়া। পানিবোড়াও বলে। শুধু ঢোঁড়া নামেও এ সাপ পরিচিত। ঢোঁড়া এসেছে ডুণ্ডুভ থেকে। কোথাও কোথাও ধোড়ও বলে। জলে নেমে মাছ খায় বলে মেছোওয়ালা। অপর একটি নাম লাউঢোঁড়া, লাউয়া অর্থাৎ মোটা। জলব্যাল বলতে জলঢোঁড়াকেই বুঝিয়ে থাকে। জলঢোঁড়া বোঝাতে কোথাও কোথাও কেউটিয়া নামও ব্যবহৃত হয়। এই গোলমেলে ব্যবহারের মূলে অলগদ শব্দটি রয়েছে বলে মনে হয়। অলগর্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা আগেই করেছি।

অল্প বিষধর মেটৌল সাপ পুকুরের স্নানার্থীদের পা অনেক সময় জড়িয়ে ধরে। গায়ের রং মেটে; সে জন্য মেটে, মেটৌল বা মেটিয়া। এই সেই মেটিয়া সাপ লখিন্দরকে দংশন করতে অপারগ কেউটিয়াকে যা হতে মা মনসা দেবী অভিসম্পাত করেছিলেন : 'ছিলে কেউটিয়া সাপ হও গে মেটিয়া'। অন্যান্য নাম প্যাং কেরালি (চব্বিশ-পরগণা), মেচেতা সাপ (চব্বিশ পরগণা), ক্রে (হাওড়া)। কোথাও বলে মাটিশংচে, কুঁচে সাপ (কুঁচিয়ালা, কুঁচিলা) বলতে এ সাপকেই বুঝায়। কুঁচে মাছ সদৃশ, তাই এ নাম। নদী-নালা খাল-বিলে বা তাদের আশে পাশে ঢেনী সাপ দেখা যায়। ঢেনী (কামিনী) নাম হল কেন? কামিনী অন্য জাতের সাপও তো হতে পারে। গাঁয়ের বালকেরা পূর্ণগর্ভা ঢেনী সাপ দেখলে কখনও কখনও তার উপর গোবর চাপা দেয়। তাতে তার পেট থেকে জীবন্ত বাচ্চা বেরিয়ে পড়ে। বাচ্চাগুলি বেরিয়ে বেশ চলাফেরা করে। এ অভিজ্ঞতা থেকেই বোধ হয় এ সাপের নাম ঢেনী (বীরভূম)। মেটেবোড়া (ঢাকা) ও ধুসরে সাপ (যশোহর) বলতে বোধহয় এ সাপকেই বোঝায়।

ঐতিহ্যময় অলিম্পিকের একটি ঐতিহাসিক দৌড়

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

"কালস্য কুটিলা গতি।" কালপ্রবাহের অন্তরালে জগতের সব কিছুই হারিয়ে যায়। কোন কিছুকেই ধরে রাখা যায় না। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে কত বীরের শৌর্য্য বীর্য্য ধুলায় বিলীন হয়ে যায়, কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন সংঘটিত হয়; আর দেখা যায় কত জাতির অভ্যুত্থান ও বিলুপ্তিসাধন। কত বীরের বীরত্ব গাথা বিস্মৃতির অতলতলে বিলীয়মান হয়ে যায়। আবার দেখা দেয় নূতন দেশ ও জাতির অভ্যুত্থান।

মহাকালের এই ছলনময় লীলার মধ্যেও অলিম্পিক কিন্তু তার স্বীয় ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলেছে ঠিক একইভাবে। কোন্ সুদূর অতীতে গ্রীসদেশে এই অলিম্পিক আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু কালপ্রবাহের সঙ্গে সমানভাবে তার আলোকবর্ত্তিকা জ্বালিয়ে নিয়ে চলেছে।

পদে পদে পরাজয় আর আত্মগ্লানির মধ্যেও বিশ্ব-অলিম্পিকই হয়ত তাই মানুষের কাছে একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় হয়ে আছে।

আজ অলিম্পিকেরই একটি কালজয়ী ঘটনার কথা বলতে চেষ্টা করব। আর এই জন্যই কিছু অলিম্পিক তথ্য আমাদের জানা প্রয়োজন।

জগতের মধ্যে গ্রীকরাই একমাত্র জাতি যারা নিজেদের অলিম্পিকের প্রবর্ত্তক বলে গর্ব্ব করতে পারে। গ্রীসই একমাত্র দেশ যেখানে সর্ব্বপ্রথমে দেশ এবং মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য মানুষের শক্তি ও সামর্থকে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল।

এই অলিম্পিক কিন্তু চলে আসছে বহু প্রাচীন কাল থেকে। অন্তর্বর্তীকালীন কিছু সময়ের জন্য ইতিহাস অলিম্পিক সম্বন্ধে নীরব থাকে। তারপর অলিম্পিককে আবার আরম্ভ হতে দেখা যায় খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ অব্দে। এরপর প্রায় দীর্ঘ একহাজার বৎসর পর্য্যন্ত অলিম্পিক অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে চলে এসেছে। প্রতি চার বৎসর অন্তর এই অলিম্পিকের আসর বসত গ্রীসের Olympia নগরীতে। ৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমান আক্রমণে Olympia নগরী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অলিম্পিকের আকর্ষণও অনেকটা কমে যায়। তবুও কিন্তু অলিম্পিক চলে এসেছে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে।

অতঃপর উপর্য্যুপরী কয়েকটি ভূমিকম্পে অলিম্পিয়া নগরী মাটির নীচে প্রোথিত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠানেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

অলিম্পিয়া নগরী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও অলিম্পিকের ইতিহাস কিন্তু কিংবদন্তীরূপে লোকের মুখে মুখে চলে এসেছিল পরবর্ত্তী বংশধরদের নিকট। তবে অলিম্পিকের সত্যতা সম্বন্ধে জগতের অনেক জাতিই তখন কিন্তু বেশ সন্দিহান ছিলেন।

জগতের দুটি মাত্র জাত কেবল অলিম্পিকের ইতিহাসকে অমূলক বলে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা হল ফরাসী এবং জার্ম্মান। অলিম্পিয়া নগরীর আবিষ্কারের জন্য ফরাসীদের উদ্যোগে ১৮২৯ সালে ইহার খনন কার্য্য শুরু হয়। দীর্ঘ প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দীর পর ১৮৮০ সালে ফরাসী এবং জার্ম্মানদের যৌথ প্রচেষ্টায় অলিম্পিয়া নগরীকে লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরা সম্ভবপর হয়।

ইহার পর থেকে অলিম্পিকের পুনঃ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলতে থাকে। গ্রীসের এইরকম দুটি প্রচেষ্টা

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর বিখ্যাত ফরাসী ক্রীড়ানুরাগী ব্যারণ-ডি-পিয়েরে কুবেটিনের উৎসাহে আধুনিক কালের প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠান হওয়া সম্ভবপর হয়।

গ্রীস অলিম্পিকের জন্মস্থান হওয়ার জন্য আধুনিক কালের প্রথম অলিম্পিক ১৮৯৬ সালে গ্রীসের এথেন্স নগরীতে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়।

তৎকালীন দরিদ্র দেশ গ্রীস। বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হওয়ার মতন ষ্টেডিয়াম নির্মাণ করা তাদের পক্ষে তখন সম্ভবপর ছিল না। এ ছাড়াও বিশ্ব অলিম্পিকে প্রতিযোগিতা করার মতন কোনও বিখ্যাত প্রতিযোগীও তখন গ্রীসে ছিল না। সুতরাং এঁদের প্রেরণায় স্বদেশে অলিম্পিকের অনুষ্ঠান গ্রীসবাসীদের নিকট তখন খুবই অর্থাপকর হবে উঠেছিল।

কিন্তু তাদের অর্থ ও মনোকষ্টজনিত হতাশা দূরীভূত করেছিল একজন গ্রীকের অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য— যার নাম Spirodin Lous

ঘটনাটি অবতারণার পূর্বে আমাদের ইতিহাসের সে নো পাতাগুলিকে আর একবার চোখের সামনে খুলে ধরতে হবে। আমাদের স্মরণ করতে হবে আর একজন সংবাদবাহী দৌড়বীরকে। তিনি হলেন প্রায়: ৪৯০ বছরের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন Phidippides। শুধুমাত্র গ্রীসের জন্য নয়। সকল দেশের সকল কালের মানুষ তাঁর নাম শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করে এইজন্য যে ক্রীড়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা স্বীয় শক্তি ও সামর্থকে তিনি দেশের এক অতি সঙ্কটময় মুহূর্তে, দেশেরই কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ সকল ক্রীড়াবিদই জানেন উপযুক্ত সময়ে তাদের প্রত্যেকেরই জীবন দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত। তারা জানেন দেশপ্রেমে তারা কারো সকলের থেকে পেছিয়ে নেই। দৌড়বীর Phidippides দেশের হয়ে ম্যারাথনের রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন। তারপর যুদ্ধে গ্রীসের জয়লাভ হলে তিনি সেই সংবাদ বহন করে এনেছিলেন এথেন্সে। ম্যারাথন থেকে এথেন্স পর্যন্ত ২৬ মাইল পথ তিনি দৌড়ে এসেছিলেন।

কথিত আছে এই যুদ্ধেরই বিষয়ে যুদ্ধের পূর্বে তাঁকে ছুটবার দৌড়ে ম্যারাথন আসতে হয়। তারপর তিনি যুদ্ধে যোগদান করেন এবং সবশেষে দেশের বিজয়লাভ সংবাদ বহন করে আনেন এথেন্সের মাটিতে। এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। দেশপ্রেমের এক জলন্ত উদাহরণ।

Phidippdes এর এই অতুলনীয় দেশপ্রেম ও ঐতিহাসিক দৌড়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিশ্ব অলিম্পিককে একটি ২৬ মাইল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হল—নাম ম্যারাথন রেস। ইহা অলিম্পিকের একটি অন্যতম প্রধান প্রতিযোগিতা। সেই অতুলনীয় কীর্তিকথা স্মরণ রেখে আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিযোগীরা বিশ্ব অলিম্পিকের ম্যারাথন রেসে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে আসেন।

১৮৯৬ সালের প্রথম অলিম্পিকের ম্যারাথন রেসে যোগদান করার মতন বিখ্যাত কোন প্রতিযোগী তখন গ্রীসে ছিল না। কিন্তু তবু গ্রীসের নিজস্ব ম্যারাথন দৌড়ের গৌরব স্মরণ করে গ্রীস ঐ বিভাগে প্রতিযোগিতার জন্য দেশের এক অখ্যাতনামা মেষপালককে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিখ্যাত সব প্রতিযোগীরা গ্রীসে এসেছেন অলিম্পিকের ম্যারাথন রেসে প্রতিযোগিতা করার জন্য। ক্রীড়াজগতে গ্রীসের পূর্ব গৌরব তখন অস্তমিত। এ পর্যন্ত অলিম্পিকের কোন বিভাগেই তারা সাফল্যলাভ করেননি। ম্যারাথন রেসেও তারা সাফল্যলাভ করবে না—এই ছিল তাদের ধারণা। দৌড়ের পূর্বেই তারা পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন।

ম্যারাথন দৌড় শুরু হবার সময় অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে এই অখ্যাতনামা মেষপালককেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেল। শক্ত সমর্থ, চঞ্চল প্রাণময় যুবকটির নাম জানা গেল—Spiridon Lous, পেশায় সে

মেষপালক। সেদিন সেই সময় গ্রীকবাসীরা এর বেশী কিছুই জানতে পারেন নি। সুতরাং ফলাফলের কথা পূর্বাহ্নেই চিন্তা করে গ্রীসের বহু ক্রীড়ামোদীই সে দিন এই সময় ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত থাকতে তেমন কোন উৎসাহবোধ করেন নি।

অতঃপর দৌড় শুরু হল। পূর্বধারণানুযায়ী দেখা গেল সত্যিসত্যিই বৃটেন যুক্তরাষ্ট্র জার্মাণী প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগীরাই এগিয়ে আছেন। দীর্ঘ প্রায় তিনঘণ্টাব্যাপী কঠিন অসমতল প্রস্তরময় অলিম্পিক পথে দৌড়ানর পর ষ্টেডিয়াম ক্রীড়াঙ্গনেই এই দৌড় শেষ হওয়ার কথা। যতই দৌড় সমাপ্তি সময় এগিয়ে আসে ততই হতমান হতাশ, অধৈর্য্য গ্রীক দর্শকেরা একে একে ষ্টেডিয়াম পরিত্যাগ করে চলে যেতে থাকেন। কারণ ইতিপূর্বেই খবর এসেছে অষ্ট্রেলিয়ার E H Flock দৌড়ে প্রথম আসছেন এবং তাকে অনুসরণ করে দ্বিতীয় আসছেন একজন আমেরিক্যান।

অধৈর্য্য দর্শকদের ষ্টেডিয়ামে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। ষ্টেডিয়ামের গেটের নিকট দর্শকদের উল্লাসধ্বনিতে প্রথম স্থানাধিকারীর আগমন-বার্তা জানা যায়। দর্শকেরা অধীর আগ্রহে দেখতে থাকে—"ঐ তো প্রথমজন ষ্টেডিয়ামের ভেতর প্রবেশ করেছে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে তারা ভাল করে দেখতে থাকে,—কে এই দৌড়বীর? এতো অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত দৌড়বীর Flock নয়। এতো গ্রীসেরই প্রতিনিধি, ক্রীড়াজগতে অজ্ঞাতনামা সেই মেষপালক —Spiridon Lous.

'গ্রীসের জয়ধ্বনিতে' সমস্ত ষ্টেডিয়াম উল্লাসে ফেটে পড়ল। দর্শকদের আনন্দ, উদ্দীপনা ও কোলাহলের মধ্যে শ্রান্ত, ক্লান্ত Spiridon Lous অসীম দৃঢ়তার সহিত নিজেকে একরকম যেন টেনে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন ম্যারাথান রেসের দৌড়ের শেষ সীমানায়।

অলিম্পিকের দেশে আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম দৌড় প্রতিযোগিতায় 'অলিম্পিক প্রবর্ত্তক' দেশের একজন প্রথম হয়ে স্বীয় দেশ এবং অলিম্পিক ঐতিহ্য রক্ষা করলেন।

স্বপ্নশ্রুতি

দিলীপকুমার রায়

ওরা বলে ওদের কথা তোমার মুখের বাণী ব'লে।
"আমার আমার" ক'রে তবু হাসে কাঁদে অশ্রুজলে।
বাসনাকে বসায় ওরা সাধনারি ভজন গেয়ে,
তৃষ্ণা জপে মুক্তি-ভ্রমে মায়া সোনার হরিণ চেয়ে।
যারা তোমার ডাক শুনেছে তাদের মাথায় মিথ্যে কালি,
ভোগের শ্রীহীন মুখরতায় ভরে প্রাণের পূজার ডালি।
বাঁধতে যে চায় পথ সে হারায়, জানে না সে—পারাবারে
দৃষ্টিপ্রদীপ নিভলে কিছুই যায় না দেখা অন্ধকারে।
সুখ যাকে নাম দেয় সে যে হায় মরীচিকা—জানবে কবে
কামনাকে বিদায় দিয়ে নিষ্কামনার মহোৎসবে?
তোমার আশিসপরশ পেয়ে গর্বে সে-বর হারায় যারা
তুমি তাদের ডাকলে কাছে—'না' ব'লে চায় মৃত্যুকারা।
তাই তো ওরা তোমায় পেয়েও ফিরিয়ে দিয়ে কালোর টানে
অপ্রেমেরি আঘাত হানে ভালোবাসার প্রতিদানে
তবুও তুমি জানো—এরাও সুরই খোঁজে বেসুর মাঝে,
শুনতে যেদিন শিখবে সেদিন শুনবে – তোমার বাঁশি বাজে:
"তাঁকে যদি আপন জানি—অচেনাও হবে আপন,
জ্বললে আলো তাঁর প্রসাদের—আলো হবে বিশ্বভুবন।
তাঁকে যদি না পাই – যারা আপন ছিল হবে অচিন,
করলে অস্বীকার তোমাকে রবির রবিও হবে মলিন।"

কাব্য

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

জীবনটা অতি নাটকীয় তাই কাব্যময়
রূপ ও রূপকে স্তুতি-নিন্দায় কী সুন্দর।
যেহেতু হৃদয়সাগর উদার অন্তহীন
কান্না-নদীর মোহানার কাছে নিরুত্তর।
বন্ধুর পথ। কৃপণ পাথেয়। সীমিত দিন।
কল্পলোকের স্বপ্নে লালিত অবুঝ মন।
পথে পথে তার প্রস্তুত চেতনা অলৌকিক
সৃষ্টি-লীলায় লগ্ন-বিলীন চিরন্তন।
যেহেতু জীবন কাব্যধর্মী, স্পর্শাতুর
অন্ত হৃদয় সমীপে মুখর জলপ্রপাত :
যখন পৃথিবী নিছক কঠোর গদ্যময়
কৃপণ পাথেয় নিঃশেষ হয় অকস্মাৎ।

আমাকে ডেকোনা আর

—মনোরমা সিংহরায়।

আমাকে ডেকো না আর তোমার অমের অহঙ্কারে
বারবার দিয়েছ ফিরিয়ে। স্বতঃসিদ্ধ অবহেলা
সময়ের স্রোতে ভেসে যায় নি কক্ষনো। অন্ধকারে
হীরকনিন্দনী দ্যুতি ছড়িয়ে জ্বলছে। ইন্দ্রনীলা
দুই চোখ কে ভোলাবে ? তবু মন কেন নিরন্তর
তোমাকে অচেনা বলে ভাবে। হায়, দূরাগত স্বর
বররুচি অনিন্দ্য বিলাসে তবু চোখে আনে জল।
বসন্ত বিদায় নিয়ে বহুদিন হয়েছে বিলীন
তখনো ডাকোনি তুমি। আজ এই মনোমুগ্ধকর
অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে ডাকো যদি সে তোমার শুধু
অহঙ্কার—। এ হৃদয় হবে শুধু একান্ত নির্ভর
অন্তরে মমতা যদি থাকে কিছু শান্ত অমলিন।
অহঙ্কার ব্যর্থ জেনো। হৃদয় বিমুখ করে দিয়ে
তোমার করুণা জেনো আনবেনা ফিরিয়ে সে দিন।

রক্ত শোষে যারা

শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মশা দিয়েই সুরু করি—
ক্ষুদ্র এক প্রাণী, রক্ত শোষাই কাজ,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে রক্ত আস্বাদনে
নিশিথে, সূর্য্যালোকের অবসানে—
দিনান্তের ক্লান্তি নিয়ে
সবাই যখন থাকে ঘুমে নিমগ্ন।

আরও আছে জোঁক—
মেরুদণ্ডহীন ছোট্ট এক প্রাণী
কিন্তু রক্তশোষায় সুনিপুণ।
হিংস্র শ্বাপদকুলে
আছে বাঘ, সিংহ আরও কত
জানা অজানা প্রাণী,
রক্ত যাদের প্রিয়—
রক্তের আস্বাদনে যারা থাকে
সদাই ব্যস্ত।

(কিন্তু) মানুষের সমাজে,
শিক্ষা ও সভ্যতার মুখোস নিয়ে
যারা নিঙড়ে নিচ্ছে রক্ত
অন্য মানুষের জীবন থেকে
তাদের চেনে ক'জন?

একের হাড়ভাঙ্গা শ্রমে
উঠছে গড়ে অন্যের সম্পদ!
একের নিঃশব্দ ক্ষয়ে, আত্মবলিদানে
হচ্ছে সমৃদ্ধ অন্যের বিলাসের
শত আয়োজন।

নিজের রক্ত দিয়ে এক মানুষ তৈরী করছে
অন্য এক মানুষের সুখের আগার,
সন্তোষের কত উপাদান—
ভাবলে মনে জাগে বিস্ময়!

হায়, সুখের বনিয়াদ যে গড়ল,
সুখের শিখরে বসা মানুষ
তার কথা ভুলেও মনে আনে না—
সংসারের কি বিচিত্র এ নিয়ম!

মশাতেই ফিরে আসি—
রক্ত, সে তো তার খাদ্য,
প্রাণধারণের প্রয়োজন।
(তাই) নিতান্ত নির্দোষে, সে ছোটে
তার অন্বেষণে।

অন্য সব প্রাণীদেরও ঐ একই কথা,
রক্ত তারা চায় শুধু বাঁচার তাগিদে
জীবনের স্বয়ংক্রিয় প্রেরণাতে।

কিন্তু) মানুষের মাঝে দেখি
এ নিয়মের ব্যতিক্রম।
এক মানুষ অন্যেয়ে শোষে
নিজের সুখ, সম্পদ ও সম্ভোগ
বাড়ানর অভিলাষে।

সুচরিতাসু

নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়

সুচরিতা,
আমি তোমাকে খুঁজেছি জীবন রঙ্গালয়ে—
যেখানে দক্ষ কুশীলব ভীড় করে;
এবং বিলাপী আত্মারা হাসে কিছু বিদূষক হয়ে
মূল নাটকের তৃতীয় অঙ্ক সু-অভিনয়ের পরে।
তোমাকে খুঁজছি সেই দিন থেকে যখন এ' চেতনায়
অভিষেক হ'ল শাশ্বত কান্নার।
এখন জীবন বহু অভিনীত সলাজ যন্ত্রণায়
যাদুকরী রাতে প্রেতাম্বিত বহুবার।

সুচরিতা,
তুমি পাড়ি দিয়ে গেছ ডাকিনী রাতের মায়া—
সমুদ্রগুলি মৃত্যুর মহিমায়?
অথবা লুকিয়ে যেখানে একটু পাদ-প্রদীপের ছায়া
অপেক্ষা করে অভিনীত হ'তে নির্বাক ভূমিকায়?
অনেক দৃপ্ত সমুদ্রগামী মনে
ঋণ রেখে যায় মৃত কুশীলবগণ;
সুচরিতা,
আমি একটি সহজ ইচ্ছার তর্পণে
এই জীবনের পঙ্কমাঝে কান্নার সনাতন।

পরীক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে

বিনোদশঙ্কর দাশ

তখন আমাদের কলেজে 'প্রি-য়ুনিভার্সিটি' পরীক্ষা চলছে। ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা-পরিচালক্‌ হিসেবে অধ্যক্ষের অফিসে কাজকর্ম করছি, হঠাৎ দ্রুতগতিতে চার পাঁচটি ছাত্র অফিসে ঢুকে পড়ল। তারা প্রচলিত শ্লোগান দিতে দিতে টেলিফোনের তার কেটে দিলে, গান্ধিজীর ছবি চুরমার করে দিলে, আর একজন কাগজপত্রে পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালবার চেষ্টা করল। মাও-সে-তুঙের ছবিটি টাঙাবার সময় না পাওয়ায় নিমেষে টেবিলে রেখে দিয়ে তারা অন্তর্ধান করলে। ছেলেদের আমরা চিনি। কলেজের তারা বিনীত ভালো ছেলে। কোনদিন তারা আমাদের পড়ানোর প্রতিবাদ করেনি বা অশ্রদ্ধা করেনি। কিন্তু সেদিন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ও খবর কাগজে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হামলার খবর পড়ে অধ্যাপক বন্ধুরা অনেকেই আতঙ্কিত হোলেন, কেউ বললেন পুলিশ ডাকতে। অন্য ছেলেরা কিন্তু আমাদের ভয় পাওয়ার সুযোগ নিল এবং পরীক্ষার হলে ব্যাপকহারে টুকতে লাগল। তখন কয়েকটি ছেলেকে আলাদা করে অন্য ঘরে বসিয়ে দেওয়া হোল যাতে সমস্ত পরীক্ষা ব্যবস্থাটাই ওরা বানচাল করে দিতে না পারে। ফলে কিন্তু পার্ট ওয়ান ও টু পরীক্ষাগুলিতেও ছেলেরা ব্যাপকহারে টোকবার বিশেষ সুবিধা দাবী করল এবং পরীক্ষা হলের চেয়ার টেবিলগুলি ভেঙে দেবার ভয় দেখাল। এ-বছর তো কোন রকমে পরীক্ষা পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। সামনের বছর কী এই ঘটনার তীব্র পুনরাবৃত্তি ঘটবে, তাই ভাবছি।

প্রতিবছর এই সময় ছেলেরা যখন স্কুল থেকে কলেজে ভর্তি হতে আসে তখন তাদের বিনীত, নম্র ও প্রাণবন্ত ব্যবহার দেখি অথচ কলেজের চার বছর তার জীবনে এমন কী দারুণ পরিবর্তন নিয়ে আসে যার ফলে তারা অসহিষ্ণু ও অসন্তুষ্ট জনসমষ্টিতে পরিণত হয়? ছেলেরা হঠাৎ এই ধরনের বাঁধন ছাড়া ডাকাবুকো 'পুরিয়া' তৎপর কেন হয়ে উঠল তাই নিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষাবিদরা নানান চিন্তা করছেন। জনসমাজের নৈতিক চরিত্রের নিদারুণ অধোগতি, রাজনৈতিক দলগুলির গুণ্ডাবাজি এবং গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দান, বেকার সমস্যার দ্রুত সমাধানের অভাব, সংরাক্ষলে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক কারণের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আজ আমরা মনে করতে শুরু করেছি, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙে পড়েছে তার সংস্কারের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব এসেছে। তার মধ্যে যে প্রস্তাবটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরতলা থেকে এসেছিল এবং যার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ তা অধ্যক্ষ মহোদয়েরা করজোড়ে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। অতএব, সামনের বছর পরীক্ষাগুলি নিতে শুরু করার আগে আমাদের সবাইকে আর একবার ভেবে দেখতে হবে কী উপায়ে এই দুর্নীতির মূল উৎপাটন করা যায়। নতুবা যে ছেলে ফেল করবার উপযুক্ত সে তিনটি লেটার সহ প্রথম বিভাগে পাশ করবে আর ক্লাশের ফার্স্টবয়ের খাতা অন্য বকাটে ছেলেরা ভয় দেখিয়ে টোকার শাস্তিস্বরূপ সে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে নকশাল আন্দোলন জোরদার করবে।

স্কুলের শিক্ষকমশাইরা মাফ করবেন, আমার ধারণা আমাদের ছাত্রসমাজ পরীক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতির প্রথম পাঠ স্কুলের শিক্ষকমশাইদের কাছে গ্রহণ করে। মাষ্টারমশাইরা অনেকেই বিশেষ রাজনৈতিক সংস্থার কর্মী এবং পারস্পরিক কলহে মত্ত। ছেলেদের সামনে আমি বহু অধ্যাপক ও শিক্ষককে হাতাহাতি করতে দেখেছি। ওঁদের অনেকে স্কুলের সরকারী অর্থ-সাহায্য বাড়াবার

জন্য মিথ্যে ছাত্রী সংখ্যা দেখিয়ে থাকেন এবং স্কুল-পরিদর্শককে নানান গোপন উপায়ে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেন, পরীক্ষায় পাশ করানর জন্য বাড়িতে প্রাইভেট কোচিং দেবার আছিলায় প্রশ্ন বলে দেন, এমন কি পরোক্ষভাবে পরীক্ষা হলে পুরিয়া সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। গুরুজনরা সেই শিক্ষকের কাছেই ছেলেদের পড়তে পাঠান যিনি ছলে-বলে তাঁর ছাত্রদের ভালোভাবে পাশ করাতে পারবেন। অতএব, প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদকে যুগ্মভাবে দুটি ব্যবস্থা নিতে হবে। এক, অবিলম্বে স্কুলগুলির বিভিন্ন প্রকারের গ্র্যান্ট বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রদের বেতন থেকে যতটুকু অভাব পড়বে কেবল বিলের মাধ্যমে অন্ততঃ পক্ষে বছরে চারবার ডাক মারফৎ ততটুকুই দিয়ে দিতে হবে। আজকাল স্কুলের শিক্ষকমশাইদের সেই কয়টি টাকা আদায় করবার জন্য জিলা সদর অফিসে বছরের মধ্যে অন্ততঃ ত্রিশদিন দৌড়তে হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের অসাধু উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাব হোল, যে সমস্ত শিক্ষকরা দুর্নীতির আশ্রয় নেবেন, যেমন নিজেদের ছাত্রদের প্রশ্ন বলে দেওয়া এবং পাশ করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সঙ্গে টিউটোরিয়াল হোম ও সিওর সাকসেশ ব্যবস্থা আইন করে বন্ধ করতে হবে। এবং প্রশ্ন রচনা ও উত্তরপত্র পরীক্ষাব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন করতে হবে। আমি আমাদের শিক্ষা-অধিকর্তাদের কাছে আবেদন জানাব। তাঁরা শিক্ষকমশাইদের যে পাঠগুলো বি, টি, কোর্সে নিতে বাধ্য করেন সেই পাঠগুলো তাঁরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকেই চালু করুন না কেন? তা হলে তো স্কুলের পরীক্ষাগুলোতেও মাষ্টারমশাইরা সেই পদ্ধতি চালু করতে বাধ্য হবেন।

আমাদের ছাত্রদের দুর্নীতির দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয় কলেজে ভর্তি হবার সময় থেকেই। প্রধান অধ্যাপকের [illegible] পড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে অনেকে কলেজে ঢোকে। অধ্যাপকরা নিজেদের মধ্যেকার দলাদলিতে ছাত্রদের সালিসী মানেন। ছাত্রদের সংস্থাগুলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত অধ্যাপকরা উত্তেজনার ইন্ধন জোগাতে থাকেন ছাত্রদরদী হিসেবে। অনেকে ক্লাশে আসেন দেরীতে। এবং ঘন্টা বাজার আগে ক্লাশ ছেড়ে দেন। বহু অধ্যাপক ছাত্রদের ভয় করেন, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের কাজে লাগান এবং তারা বিপদে পড়লে আপ্ত বাক্য শোনান কিন্তু তাদের কেউ ভালোবাসেন না। ছেলেরা আজ তাদের মাষ্টারমশাইদের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। এই দুর্নীতি মোচন অধ্যাপকরা নিজেরাই করতে পারেন, যদি তাঁরা সবাই সচেতন হন।

কিন্তু অধ্যাপকদের দুর্নীতি সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার দুর্নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত রয়েছে। ওঁদের মানসিক পরিবর্তন পুলিশ ডেকে, আইন করে বা বেতনের হার পরিবর্তন করে সম্ভব নয়। আবার সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা যে ত্রুটিযুক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তার পরিবর্তন না হোলেও অধ্যাপকদের দুর্নীতি মুক্ত হবার উপায় নেই। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত প্রশ্নকর্তারা টাইপ প্রশ্নের দিকে না গিয়ে স্বাধীনভাবে প্রশ্ন করতে পারতেন কিন্তু আজ আর সম্ভাব্য প্রশ্নের বাইরে প্রশ্ন করতে সাহস পান না। প্রধান পরীক্ষকরা নিযুক্ত হন অদৃশ্য মন্ত্র বলে অলৌকিক শক্তির অঙ্গুলি-সংকেতে। খাতা বিতরণের একদিন আগে পরীক্ষকরা নিমন্ত্রণপত্র পান এবং সমস্ত খাতা পাবার জন্য অন্ততঃ তিনবার দ্বারভাঙা ভবনের নীচের তলায় দৌড়ুতে হয়। কিছু বেশী খাতা পাবার লোভে এবং পরের বছর পরীক্ষকের লিষ্ট থেকে যাতে নাম না কাটা যায় তার জন্য প্রধান পরীক্ষকমহাশয়কে বিনীত অনুরোধ করতে হয়। গলদ ঘর্মাক্ত প্রধান পরীক্ষক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাতা পরীক্ষা শেষ করার জন্য এমন অনেককে খাতা পরীক্ষা করতে দেন যাদের পক্ষে তখন নানান কারণে উপযুক্ত মার্কস বিচার করে দেবার সময় বা ক্ষমতা থাকে না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধীনে প্রায় ১৭৮টি কলেজ আছে যার এক-তৃতীয়াংশ কলেজের ছাত্র সংখ্যা ৫০০, আবার এক-তৃতীয়াংশ কলেজের ছাত্র সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। প্রতি বছর এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আমার মনে হয় দুই দিক থেকে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এক, শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে, আর দুই, পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্থানীয় দায়িত্বের সঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিচালনার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে।

হয়ত অনেকে শিক্ষা সংস্কারের যে কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন এই অজুহাতে যে, শিক্ষা ও পরীক্ষা-ব্যবস্থার যা কিছু পরিবর্তন করতে হবে তা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হওয়া ভালো। কিন্তু আজ এই ভেঙে-পড়া পরীক্ষা-ব্যবস্থার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আসুন না আমরা এই মৃতপ্রায় পশ্চিমবংগ থেকেই আমাদের আশু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন শুরু করি, যা ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গৃহীত হতে পারবে। বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশন ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন যে কলেজগুলিকে সুষ্ঠু পঠন-পাঠনের জন্য বেশী পক্ষে এক হাজার ছাত্রবিশিষ্ট এক একটি য়ুনিটে ভাগ করতে হবে এবং প্রত্যেকটি ইউনিটের নিজস্ব পরিচালক-সমিতি, অধ্যাপকমণ্ডলী ও অধ্যক্ষ থাকবেন। এখন সেই সুপারিশটি গ্রহণ করার সময় এসেছে। এর ফলে নোতুন অধ্যাপক নিয়োগের সুযোগ বেড়ে যাবে। সেই সঙ্গে প্রতি পনেরটি কলেজের মধ্যে সব থেকে বড় ও প্রাচীন কলেজে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের বাইরে বহুরাজ্যে এই ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক জায়গাতে দেখা যায় ছাত্ররা তার নিজেদের কলেজে পোস্টগ্র্যাজুয়েট পড়া পছন্দ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার থেকে। বড় কলেজে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার প্রস্তাব অনেক পক্ষে হাস্যকর মনে হবে। আজ থেকে অন্ততঃ বারো বছর আগেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ কর্তারা মফস্বল কলেজে অনার্স খোলার অনুমতি দেবার ভরসা পেতেন না। অথচ আজ অতি সাধারণ কলেজেও সব বিষয়ে অনার্স খোলা হচ্ছে। দশ পনেরটি কলেজের ছাত্রের জন্য নোতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলে প্রভূত অর্থব্যয় না করে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পঠন-পাঠন বিকেন্দ্রীকরণ একদিন না একদিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে করতেই হবে। কিন্তু তখন করতে হবে উত্তেজিত ছাত্র-শিক্ষকের বিক্ষোভের সম্মুখে চাপে পড়ে। উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলোর ওপর ছাত্রদের চাপ কমে যাবে এবং হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ওপর চাপও সেই সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। বড় কলেজগুলির অধ্যাপকমণ্ডলী গবেষণা করার উৎসাহ পাবেন। মাঝে মধ্যে সেমিনার ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের সমবেত করে শিক্ষা-ব্যবস্থার সমন্বয় ও শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা করতে হবে। দরকার হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে-বিষয়গুলি যেভাবে পড়াবেন সেই বিষয়ে অনুমোদিত কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা চক্রে মিলিত হয়ে পড়ানোর বিষয়বস্তু ঠিক করে নেবেন। প্রত্যেক বিষয়ের ওপর মাঝেমধ্যে জর্নাল প্রকাশ করে গবেষণা নিবন্ধসমূহ প্রকাশ করলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ে উপকৃত হবেন এবং একটা পারস্পরিক সহযোগিতামূলক আবহাওয়া গড়ে উঠবে, যার আজকের শিক্ষাজগতে একান্ত অভাব।

এটা আজ সকলেই স্বীকার করে থাকবে যে শিক্ষা-ক্ষেত্রে অশান্তির একটা মূল কারণ শিক্ষক ও অধ্যাপকদের বেতন সমস্যা। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে এবং সরকার শিক্ষার ব্যয় তাই পুরাপুরি নিজেদের ওপর নিতে চান না। অথচ ছাত্রদের বেতন ছাড়া পরোক্ষভাবে সরকারকে শিক্ষার সমস্ত ব্যয়টাই বিভিন্নভাবে যুগিয়ে যেতে হয়। এই অসঙ্গতির অবস্থাই আজ শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। কিন্তু আজ বোধহয় সময় এসেছে যখন সরকারকে ভাবতে হবে কী উপায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় আয়ের সামঞ্জস্য পূর্ণ হতে পারে। আর শিক্ষা-ক্ষেত্রের থেকে আয় যে সবসময় প্রত্যক্ষ ও দৃশ্যমান হবে এমন তো হতে পারেনা। কিন্তু এটা কোনমতেই অস্বীকার করা চলবে না যে অধ্যাপক ও শিক্ষকদের

বেতনক্রম অন্য সমান যোগ্যতা সম্পন্ন চাকুরীজীবিদের সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার মনে হয় প্রত্যেক অধ্যাপকের বেতনের হার বাড়ানোর থেকে পার্টটাইম অধ্যাপক নিয়োগ বাদ দিয়ে বেশী মাত্রায় ফুল টাইম অধ্যাপক নিয়োগ করলে নিয়োগের সুযোগ বেড়ে বহু শিক্ষিত বেকারের মানসিক অশান্তির উপশম হবে। এখনো ১৯৬৬ সালের চাগলা সাহেবের প্রতিশ্রুত বেতনক্রম সর্বত্র চালু হয়নি অথচ ১৯৬৬ সালের মূল্যমান ১৯৭০ সালের থেকে অনেক নীচে ছিল। তবু আমি এখনও বেতনের কাঠামো পুনর্বিন্যাসের যৌক্তিকতা স্বীকার করি না। কিন্তু আমার মনে হয় ভারত সরকার যদি আগে থেকে সতর্ক হন এবং উক্ত শিক্ষার ব্যয়ের দায়িত্ব ও খরচটা পুরোপুরি নিজেদের হাতে নেন তাহলে ভবিষ্যতের আসন্ন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবেন। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন বেতনক্রম শিক্ষক-আন্দোলন শুরু করার আগেই ১৪৫০৲ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া। হয়ত বহু সাম্যবাদী অধ্যাপক আমার প্রস্তাবে আপত্তি করবেন কিন্তু আমার মনে হয় যদি প্রত্যেক সাধারণ অধ্যাপক ৯৫০৲ পর্যন্ত বেতন পেয়ে যান তা'হলে তার ওপরের ধাপে উন্নীত হবার জন্য মৌলিক গবেষণার প্রয়োজন স্বীকার করতে হবে। এবং সেই সঙ্গে শিক্ষক ও অধ্যাপকরা যাতে তাঁদের নিজেদের বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারেন সেজন্য ইচ্ছুক গবেষকদের আংশিক ব্যবস্থার অন্ততঃ যদি য়ুনিভার্সিটি গ্রাণ্টসকমিশন গ্রহণ করেন এবং গবেষণা নিবন্ধ স্বীকৃত হলে একটি বা দুইটি আগামী ইনক্রীমেণ্ট দিয়ে তাঁদের পুরস্কৃত করেন তা'হলে মনে হয় অধ্যাপক ও শিক্ষকরা পড়াশোনায় অধিকতর আগ্রহশীল হবেন। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের চাকরী সব সময়ে বদলী হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। এর ফলে শিক্ষকদের যেমন অপেক্ষাকৃত অবহেলিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নততর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার প্রবণতা বাড়বে এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা শিক্ষার মান উন্নয়ন করবে তেমনি ভালো শিক্ষকের উপস্থিতি নিম্নমানের কলেজগুলিকে উন্নত করে তুলবে এবং কলেজগুলিতে বহুদিনের গড়ে ওঠা পুঞ্জীভূত দুষ্টচক্রের অবসান ঘটবে।

অনেককে বলতে শুনেছি শিক্ষকদের খুব আরামের চাকরী কারণ বছরের অধিকাংশ সময় ছুটিতে কাটে। সে সময়টা তাঁরা তাশ-পাশা খেলে ও পলিটিক্স করে অতিবাহিত করেন। ওঁদের দশটা-পাঁচটা করতে হয় না। সারাদিনে একটা কি দুটো লেকচার দিলেই সে-দিনের মত কাজ খতম। ছেলেরা কেউ তা'শোনে আর কেউ প্রক্সি দিয়ে সিনেমার লাইনে কিউ দেয়। অধ্যাপক বা শিক্ষকের বক্তৃতা তার পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কোন কাজেই আসে না। আচ্ছা বলুন তো, এই অবস্থার প্রতিকার করার প্রয়োজন নেই কি? আগে তবু অধ্যাপকরা গবেষণার উদ্যোগ নিতেন কিন্তু নোতুন পে-স্কেল সংস্কারের ফলে যখন তিনটি আগাম ইনক্রীমেণ্টের ব্যবস্থা ধামা চাপা পড়ে গেল তখন অনেকেই ব্যয়বহুল উদ্বেগযুক্ত গবেষণার পথ পরিত্যাগ করলেন। আমার মনে হয় কলেজগুলিতে সাময়িক ছুটি একদম বন্ধ করে দিতে হবে। সারা শিক্ষাবর্ষকে দুইটি শিক্ষা-ক্রমে বিভক্ত করে দুটি বড় ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রীষ্মাবকাশ দুইমাস এবং বড়দিনের ছুটি একমাস করে দিলেই আমার মনে হয় যথেষ্ট হবে। পুজোর ছুটি সপ্তাহ-খানেকের বেশী হবার কি কোন প্রয়োজন আছে? জানুয়ারী ও জুলাই এই দুই মাসে প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষা-ক্রমের শুরু হওয়া উচিত এবং এটা মেনে নেওয়া উচিৎ যে কোন কারণে বা অজুহাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি দেওয়া চলবে না। কোন শোক বা আনন্দ-উৎসব দিবসে কলেজের কাজের শেষে স্মরণসভা আহ্বান করা যেতে পারে কিন্তু ছুটি দেবার কোন যৌক্তিকতা আছে কি? নিয়ম করে প্রত্যেক অধ্যাপককে সপ্তাহে ১৮টি বক্তৃতা এবং ছয়টি আবশ্যিক টিউটোরিয়্যাল ক্লাস নিতে হবে। আর টিউটোরিয়্যাল ক্লাসের প্রাপ্ত মার্কের গড় প্রতি পরীক্ষার্থীর ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রাপ্ত মার্কে যুক্ত হবে। এর ফলে যে সমস্ত সন্তানরা ওস্তাদের মার শেষ

বাজে দেখিয়ে বাজিমাৎ করতে চাইবে তাদের সারা বছর পড়াশোনা করতে হবে এবং শিক্ষকদের নির্দেশ মান্য করতে হবে। সেই সঙ্গে আইন করে সিওরসাকশেষ মার্কা নোটবইগুলি বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং টিউটোরিয়্যাল হোমগুলি তুলে দিতে হবে।

এরপর আসে পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার। পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় সেই সঙ্গে স্কুল ও মধ্যশিক্ষাপর্ষদের যৌথ দায়িত্ব মেনে নিলে স্থানীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধন করতে হবে। এবং সেজন্য প্রয়োজন প্রতি পনের বা সমসংখ্যক কলেজ নিয়ে একটি পরীক্ষাসমিতি গঠন করা যাতে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা-সমিতির কয়েকজন এবং স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির কয়েকজন প্রতিনিধি। এই সমিতির অধীনে গৃহীত হবে প্রত্যেকটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষা-সমিতিগুলি করবেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পঠন-পাঠনের তদারকী, খবর সমহারে পরীক্ষা প্রবর্তিত অগ্রগতি হচ্ছে কিনা, প্রশ্ন-পত্র রচনা করবেন এবং পরীক্ষক নিযুক্ত করবেন। যদি প্রস্তাব করা যায় প্রত্যেকটি উত্তরপত্র দুইবার একজন ভেতরের অন্যজন বাইরের পরীক্ষা-সমিতির পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষা করতে হবে তাহলে কি খুব একটা অসম্ভব প্রস্তাব করা হবে? আমার মনে হয় এটা খুব অসম্ভব হবে না যদি প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের অন্তে একটি পরীক্ষা নেওয়া যায় যার মোট ১০০ মার্কসের পরীক্ষায় ২৫% টিউটোরিয়্যাল, ২৫% লিখিত নিবন্ধের মাধ্যমে এবং ৫০% লিখিত উত্তরপত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায়। সায়েন্স টেকনিক্যাল সাবজেক্টের ২৫% লিখিত নিবন্ধের বদলে প্র্যাক্টিক্যাল বিষয়ের ওপর গৃহীত হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষাসমিতির কাজ হবে প্রত্যেকটি স্থানীয় পরীক্ষাসমিতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন এবং একটি পরীক্ষা সমিতির খাতা অন্য সমিতির পরীক্ষকদের কাছে পাঠিয়ে আবশ্যিকভাবে দুইবার খাতা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা যাতে নম্বর দেবার একটা উচ্চমান বজায় থাকে। এর ফলে প্রত্যেক অধ্যাপক পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারবেন। অনেক বেশী জন অল্প খাতা দেখলে দ্রুত অনেক বেশী উত্তরপত্র পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। কিন্তু অনেকে মনে করতে পারেন এইভাবে পরীক্ষা-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে দুইটি বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। এক, স্থানীয় শিক্ষকরা দুর্নীতি-যুক্ত হয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বেশী মর্কস দিয়ে বেশী হারে পাশ করিয়ে দিতে পারেন এবং দুই, তার ফলে পরীক্ষা-ব্যবস্থার কোন নির্দিষ্ট মান না থাকতে পারে। এর ফলে অনেকে ভীত হয়ে ভাবতে পারেন কোন কোন কলেজে ছাত্রভর্তির হার বাড়বে আর অপেক্ষাকৃত কঠোর পরীক্ষকযুক্ত কলেজে ভর্তির হার কমবে। কিন্তু আমার ধারণা বাস্তবে এই ঘটনা না ঘটতেও পারে যদি আমরা দুটি পন্থা গ্রহণ করি। যেমন একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ছাত্র যদি অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে চায় তাহলে তাকে উপযুক্ত সময়ে সেই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে। এই ব্যবস্থা আই, আই, টি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে এখনো রয়েছে। এবং কেন্দ্রীয় সমিতি প্রতি বছর বাইরের পরীক্ষকদের অদল-বদল করে দেবেন। বিজ্ঞানের প্র্যাকটিকেলের ক্ষেত্রে যদি এখন আমরা অনেকটা এই ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পেরে থাকি তাহলে আর্টস ও কমার্স পরীক্ষায় ক্ষেত্রে তা গ্রহণ করার বাধা কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন বাধা রয়েছে অর্থসঙ্গতির ওপর। কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও অর্থমন্ত্রক বেশী পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরী না করলে যে কোন রকমের পরীক্ষাসংস্কার অসম্ভব হয়ে পড়বে। সবিনয়ে আমি সকলের কাছে একটি নিবেদন করতে পারি। এর জন্য আপাততঃ পরীক্ষার ফিস্ ছাড়া যে বাড়তি টাকাটুকু ব্যয় করতে হবে তা অর্থমুদ্রায় না দিয়ে দশবছরের মেয়াদী সঞ্চয় সার্টিফিকেটে দেওয়া যেতে পারে কিনা তা' সবাইকে ভাবতে অনুরোধ করব। কারণ যাঁরা পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে নিযুক্ত থাকবেন তাঁরা তো নিশ্চয় কোন না কোন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন-পাঠনে নিযুক্ত থাকবেন সুতরাং এই উদ্বৃত্ত অর্থ জাতীয় সঞ্চয়ে বিনিয়োগে নিশ্চয় কোন আপত্তি থাকবে না ?

সর্বশেষে আসে আমাদের প্রিয় ছাত্রদের কথা। তাদের বুঝতে দিতে হবে পরীক্ষায় তাদের ন্যায়বিচার করা হবে। পড়াশোনার সঙ্গে আবশ্যিক করতে হবে তাদের খেলাধুলা এবং সামরিক শিক্ষা যা তাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে। কলেজে প্রায়ই দেখি ছেলেরা মিথ্যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে সামরিক শিক্ষা নিতে অপারক ঘোষণা করে। চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় এন, সি' সি, আবশ্যিক করার কথা হয়েছিল কিন্তু নানান কারণে আজ তা' শীকেয় তুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকারকে আমি ভেবে দেখতে বলব সামরিক শিক্ষা আবশ্যিক করা যায় কিনা। এটা কি সম্ভব হবে যে প্রত্যেকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ সংযোগ রাখবেন, যাতে পড়াশোনার অবসানে কোন স্থায়ী চাকুরী পাবার আগে পর্যন্ত বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে আবশ্যিকভাবে নিযুক্ত হতে পারবে ? স্থানীয় উন্নয়নী প্রকল্পগুলি স্থানীয় প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি নিয়ে এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে প্রতি বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সমস্ত উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরাই নিযুক্ত হতে পারে। শ্রমনিবিড় পরিকল্পনাগুলিতে অধিকমাত্রায় ছাত্রদের নিযুক্ত করতে পারলে নিশ্চয় তাদের বেতন দিতে হবে এবং এত টাকা সরকার এখন কোথা থেকে সংগ্রহ করবে এই দুশ্চিন্তা নিশ্চয় আমাদের মাথার চুল সাদা করে দিতে পারে। বেশী টাকা লগ্নী করার বড় বড় পরিকল্পনার দিকে না গিয়ে স্বল্প পুঁজি লগ্নী করে স্বল্পকালীন কৃষি ও কুটীর-শিল্পের উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য দিলে ভালো হত না ? কোনটা করা ভালো স্বতন্ত্র অর্থনীতি তৈরী করার জন্য সেই বিতর্ক অর্থনীতির বিদগ্ধ পণ্ডিতদের জন্য তুলে রেখে আমি আমার ছাত্রদের দিকটাই আগে পরিকল্পনা কর্তাদের ভেবে দেখতে বলব। যদি তাদের মাথা সেই কথাটা ভাবতে সাদা হয়ে যায় তাহলে না হয় আমাদের ছেলেদের বেতন ওঁরা তিন ভাগে ভাগ করেই দেবেন। এক ভাগ, নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের রেশনের মাধ্যমে সেজন্য সরকারকে একটা রিজার্ভ ষ্টক সব সময় বজায় রাখতে হবে। দ্বিতীয় ভাগ জাতীয় উন্নয়নী সার্টিফিকেটের মাধ্যমে এবং তৃতীয়াংশ ক্যাশ টাকায়। এতে ছাত্ররা বুঝতে পারবে দেশ তাদের সেবা প্রত্যাশা করে, জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে তাদের অবদান রয়েছে। তারা প্রথম থেকেই সঞ্চয় করতে শিখবে এবং ভাবতে শিখবে আজ তাদের দুঃখিনী বাংলাদেশ দরিদ্র কিন্তু এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে এবং সরকারের পক্ষে তাদের পুরো টাকা দিয়ে স্থায়ী চাকরী দেওয়া সম্ভব হবে তখন তারা তাদের সঞ্চিত অর্থ ফিরে পাবে। ছেলেরা দেশকে ভালো বাসতে শিখবে এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ভুলে ভবিষ্যতের আশাভরা দিনগুলির কথা ভেবে দেশ-গড়া কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। (সবাই জানেন সঞ্চয়ে গ্যারান্টি থাকলে কেউ কখনো সঞ্চিত মূলধন উৎপাদনে বিনিয়োগ থেকে তুলে নিতে চায় না বাস্তব জগতে।) এবং সরকারকেও টাকার জন্য ভাবতে বসতে হবে না বা বিদেশী সাহায্যের জন্য ভিক্ষাপাত্র হতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দরবার করে বেড়াতে হবে না।

সতী অলকমণি

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

উনিশ শতকের প্রথমদশক।

অলকমণি আরো দুজন সপত্নীসহ স্বামীর শয়নকক্ষে তাঁর দেহের কাছে কেউ বা পাশে নিজ নিজ ঘরে শোকাভিভূত আচ্ছন্নভাবে বাহুতে মুখ আবৃত করে পড়েছিলেন।

সহসা কারা ঘরে প্রবেশ করলেন। গ্রামবৃদ্ধ পুরুষ এবং নারীও।

শোনা গেল কুলগুরুদেবের ভারি গলার স্বর। "হ্যাঁ, যখন তিনটি ধর্মপত্নী ওঁর রয়েছে সব বিবেচনা করে একটির নিশ্চয়ই সহগমন শাস্ত্রমত বিধেয়। যদি কোন পারিবারিক বাধা না থাকে যেমন স্তনন্ধয় শিশু অথবা আতুর শিশু বা বালক।"

কুলপুরোহিতের কণ্ঠস্বর শোনা গেল "এ বিষয়ে কর্ত্রী অর্থাৎ লোকান্তরিতের জননীর অভিমতই সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত। আপনারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আরো দু-একটি জানা-অজানা কণ্ঠে কিছু মন্তব্য শোনা গেল। একজন বর্ষীয়সী নারীকণ্ঠ শোনা গেল বড়-বৌ ঠাকরুণ ঘরনী গৃহিণী সংসারের, শাশুড়ীর ডান্‌হাত।. ছোট বধূমাতার কোলে শিশু সন্তান......।

কথা খানিকক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল অথবা অন্যত্র চলে গেল কোন বধূই বুঝতে পারলেন না।

শোকার্ত্ত অন্তঃপুর। কখনো বিলাপের মৃদুগুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, কখনো শ্মশানের মত স্তব্ধ।

কারা যেন অলকমণির ঘরে এল। বিধবা বর্ষীয়সী কে একজন ডাকলেন "মেজ-বৌ ওঠো। একবার উঠে এসো গুরুদেব বললেন।"

অলকমণি উঠে বসলেন। মুখ অবগুণ্ঠনে অর্দ্ধাবৃত। চুলগুলি রুক্ষ ধূলোয় ধূসর। অধর বিবর্ণ। মুখ যেটুকু অনাবৃত দেখা যাচ্ছে তাতে ভস্মের মত বিবর্ণ কপোল, তখনও মাথায় অম্লান সিঁদুর। ঘোমটার ফাঁকে একটি রূপ আর শ্রী তখনও থেমে আছে সৌভাগ্যের চিহ্ন নিয়ে।

যাঁরা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন সবাই দুর্ভাগা ভাগ্যহীনা নারী। বিধবাই বেশী। বর্ষীয়সী অনূঢ়া কুলীনকন্যাও আছেন। একজন মৃদুকণ্ঠে বললেন তোমাকে একবার ঘাটে যেতে হবে। স্নান করতে হবে।"

অলকমণি মূঢ়ভাবে মুখ তুললেন। স্নান? নাইতে হবে? তাঁকে? অন্য সপত্নীরা কই?

কিন্তু সেই সেকালে বর্ষীয়সী নারী গুরুজনদের সঙ্গে কথা কওয়ার প্রথা ছিল না। মুখের ঘোমটাও খোলার নিয়ম ছিল না। তারা কে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গেল মেয়েদের স্নানের ঘাটে। মুক্তোবসানো সোনার গুঁজিকাঠি গোজা খোপা ভেঙে পিঠে ছড়িয়ে পড়ল। ডুব দেওয়া হল। বিহ্বল মূক নারী ঘরে ফিরে এলেন। শয়নঘরে মাদুরের ওপর যত মানুষ তত মাঙ্গলিক জিনিষ। পালঙ্কের ওপর রয়েছে লালচেলী আর গহনার বাক্স। শাশুড়ীর ঘরের সিন্দুক থেকে আনা হয়েছে।

কে তাঁর সিক্ত বস্ত্র ছাড়িয়ে লালচেলীখানি গায়ে জড়িয়ে দিয়ে মাদুরে বসিয়ে দিলে।

কে একজন বললে "এবারে? এবার কি করতে হবে? আর একজন মৃদুস্বরে বললেন "গুরুদেব, পুরুত ঠাকুরদের জিজ্ঞাসা কর।"

অলকমণি যেন এবারে বুঝতে পারছেন এবারে কি করতে হবে.........প্রশ্নের অর্থ। মূঢ়ভাবে এদিকে ওদিকে চাইলেন। গায়ে জড়ানো রাঙা চেলীখানি, মাদুরের ওপর রাঙা আলতাপাতার স্তূপ, চন্দন, সিঁদুর কৌটো, সিঁদুরের থান, গহনার বাক্স, কাজললতা,

মঙ্গলঘট ও ফুলের মালার মানে বুঝতে পারলেন। ......তাহলে? তাহলে? তাঁকে ওরা সতী? সতী সাজাচ্ছে।

কখনো কারুকে সতীসাজতে তিনি দেখেননি। কিন্তু গ্রামের মেয়ে, বড় ঘরে বধূ কন্যা তিনিও তো। বাল্যকাল থেকেই কত গল্প-কাহিনী তিনিও কি শোনেননি। পিত্রালয়ের গ্রামে, মাতুলালয়ের দেশে, পতিগৃহেরও কত কাহিনী তাঁর মনের পাতায় ঝলমল করে উঠল। সেই সতী লোকেরই আগুনের আলোয়।

তারা আস্তে আস্তে গহনার বাক্স খুলল। গহনা পরাতে লাগল। নীচের হাতে গুজরীপঞ্চম, বাউটি, তাগাবাজু পরাল বাহুতে। আঙুলে আংটি। গলায় কণ্ঠমালা, মুড়কী মাদুলী হার। কানে সারি মাকড়ি ছিলই, আবার চৌদানী পরাল। কোমরে রূপার চন্দ্রহার গেটে। পায়ে চরণপদ্ম, মল, চুটকী।

চুলে এলো খোঁপা হল। কাজললতা হাতে বা খোঁপায় দেওয়া হল। সবশেষে মাথায় সিঁদুর ঢেলে লাল করে দেওয়া হল। মুখে পান দিল কে। পান? কি করে পান খাবেন? মুখ কাঠ হয়ে আছে। পায়ে আলতা দিয়ে পদ্মের মত শুভ্র পা দুখানি লাল করে দিল সবাই মিলে। কেউ বা চোখ মুছতে মুছতে, কেউ বা যন্ত্রের মত নীরব হাতে।

অলকমণির আটবছরের শিশু মেয়েটি জননীর পাশে এসে বসেছিল। একবছর আগে তার বিবাহ হয়েছে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। মা কি কোথাও নিমন্ত্রণে যাচ্ছে? সে তাহলে গহনা কাপড় পরে সঙ্গে যাবে। বিয়োগ শোক মৃত্যু বোঝবার বয়স তার হয়নি। মৃত্যু যদি তো অত গহনা কাপড় কেন? পিতা কি নিদ্রিত? ঘুমোচ্ছেন? বড়দের জিজ্ঞসা করলে কেউ উত্তর দেয় না। ছোটবড় বৈমাত্র ভাইবোনগুলিও হতবুদ্ধি-ভাবে চারিদিকে যেন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন "তোমাদের সতীসজ্জা হয়েছে? তাহলে আর বিলম্বের দরকার নেই।।"

একজন বিধবা বর্ষীয়সী জিজ্ঞাসা করলেন "তা বৌমা কি করে যাবেন বাবা?

কর্তাস্থানীয় সমবেত পুরুষদল চিন্তিত হলেন। হেঁটে? অতটা শ্মশানঘাটের পথ—এতবড় বাড়ীর বধূ যাবেন কি করে? আবার হাঁটতেই বা পারবেন কি করে? এই প্রচণ্ড আঘাতের পর মনের কি শরীরের আর শক্তি আছে কিছু? জগমোহনই তো বাড়ীর বড়। তাঁরই বিয়োগ হয়েছে। একজন কে বলল "অন্তঃপুরে জিজ্ঞাসা কর। জননীকে।"

আর একজ গ্রামবৃদ্ধ বললেন "না, তার আর দরকার নেই, তাঁকে কষ্ট দেবার। একটা শিবিকায় করে বধূমাতা সতীযাত্রা করবেন। তাই তো নিয়ম।"

পুরোহিত বললেন "বধূমাতাকে একবার স্বামীকে প্রদক্ষিণ করে নিতে বলো।

গুরু বললেন "সে তো শ্মশানে করতে হবেই। এখানে আর কেন।" পুরোহিত বললেন "না বাড়ী থেকে যাত্রা করবেন তো। এটিও বিধি একটি।"

অলকমণিকে সাজানো হয়েছে। চাইবের ম॰ বিবর্ণ মুখখানি কিন্তু বসনেভূষণে সিঁদুরে আলতায় যেন তাঁকে নবযৌবনা পঞ্চতপা পার্বতীর মতই দেখাচ্ছে মৃত্যু যেন বাড়ীতে দক্ষযজ্ঞ করে গেছে। মৃত সতীদেহ-খানি সাজিয়ে গুছিয়ে এবারে শিবের স্কন্ধে তুলে দেওয়ার মত পতির সঙ্গে দিয়ে দেবে সবাঃ তাঁকেও। নবাবিবাহিতা নারীর সাজে তাঁকে পতির পাশে নিয়ে আসা হল। এখনকার কাজ অমাঙ্গলিক, এ কাজে কোন সৌভাগ্যবতী নারী নেই। দু' একজন প্রা॰ বিধবা তাঁর হাত ধরে প্রদক্ষিণ করাতে এলেন।

অলকমনির কোন অনুভূতিই নেই। তিনি যে জীবিত নেই। তবু পরিক্রমা দিয়ে স্বামীর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন তাঁর পায়ে মুখ রেখে। পৃথিবীতে আজ কেউ নেই তাঁর। কে॰ নেই? ভয়-লোক-বিয়োগ—ভাবনা একটি অজা॰ জীবিত মরণের দেহ যন্ত্রণার মহাআতঙ্ক থেকে কে॰ তাঁকে আজ রক্ষা করবার নেই।

কেউ নেই। কেউ আর বলবে না "ভয় নেই, ভয় নেই তোমার, আমি আছি।"

সমবেত জনতা গুরুদেব পুরোহিত গম্ভীর স্তব্ধ। শোকার্ত নীরব। অবশেষে তাঁরাই কেউ কেউ বলতে লাগলেন "মা আপনার এ মহাসৌভাগ্য। যথার্থ সহধর্মিণী তো আজ আপনিই। জ্যেষ্ঠ্যাপত্নী না হয়েও...।

"সশরীরে সতীলোকে গমন করছেন।"

"জন্মান্তরে আর বৈধব্য ঘটবে না...। এ আপনার দেবী জন্ম হল মা।"

"আপনি সাক্ষাৎ দক্ষসুতা সতীর মত...পতির জন্য দেহত্যাগ করবেন।"

চারদিকে প্রশস্তি সান্ত্বনাবাক্য ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আশ্বাসবাণী ? না। কই, কেউ তো বলছে না ভয় কি ? আমি আছি তোমার কাছে। লাগবে না তোমার দগ্ধ হতে, জ্বলে যেতে।

সহসা অলকমনির মনে হল আরো কত কত শোনা সতীকাহিনী, সহমৃতা কাহিনী। তাঁরা কি ভয় পেয়েছিলেন জীবিত দগ্ধ হতে ?

পাননি তো। পাননি, নিশ্চয়ই পাননি। নিশ্চয়ই তাহলে ভয় বা কষ্ট নেই সহমৃতা সতী হতে। অলকমণি উঠে দাঁড়ালেন। অবচেতনমনে লোকলজ্জা আর দেহযন্ত্রণার ভয় ছড়িয়ে আছে। না, তো পৃথক করা যাচ্ছে না দেহ এবং নারীসত্তার সংস্কার থেকে। শুধু ভাবছে না ভয় নেই। তবু বিহ্বলদৃষ্টি যেন কারো সাহায্য চায়। কারুর খুব কাছে দাঁড়াতে চায়। কারুর হাত ধরেই সতী হতে যেতে চায়। কেউ বলুক কোন কষ্ট হবেনা। প্রাণ, মৃত্যু ভয় বিয়োগের দুঃখে মূঢ় হয়ে আছে কিন্তু জীবিত চিতাদগ্ধ...সে কেমন...। কেউ হাত ধরে নিয়ে চলুক। যেতে পারবেন তাহলে।

এবারে পুরোহিত কাকে বললেন "বাবা, তোমরা কেউ মেজমার হাত ধরো।

একটি কিশোর আর একটি বালক এসে অলকমনির হাত ধরল। কিশোরটি জ্যোষ্ঠা সপত্নীর পুত্র। বালকটি তাঁর নিজের পুত্র। অলকমনি পুত্রদের স্তব্ধ দুঃখম্লান মুখের দিকে চেয়ে আবার ভেঙে পড়লেন। বড়টি সপত্নী সন্তান। তার কাঁধে হাত রাখলেন অলকমনি। নিজের পুত্র মাকে জড়িয়ে ধরল। তিনজন তিনজনকে জড়িয়ে ধরলেন ব্যাকুলভাবে।

তারা দুজনেই মায়ের সতীসজ্জার অর্থ বুঝতে পেরেছে। তিনজনেরই চোখ এবারে জলে ভেসে গেল।

গুরুদেব বললেন "আর বিলম্ব করা উচিত নয় বাবা। তোমরা শিবিকাতে জননীকে নিয়ে বসাও"।

মাঙ্গলিক উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি নয়। হরিধ্বনি আর পরিজনদের ক্রন্দনের রোলের সঙ্গে মৃত্যু মহাবিবাহের বর শব ও সতীযাত্রা নিষ্ক্রান্ত হল। সতীশিবিকায় দুটি আত্মজ-বালকের কোলে মুখ রেখে অলকমনি নীরব নিস্পন্দ দেহে বসে আছেন। জড় দেহে কোন অনুভূতি বুঝতে পারছেন না। শুধু মনে হচ্ছে ওরা, এই বালকেরাই তাঁকে সতীযাত্রায় পৌঁছে দেবে। লোকলজ্জা ও ভয়ের সময়ে পাশে থাকবে। লোকলজ্জা ? হ্যাঁ, যদি আগুন দেখে ভয় পান। যদি চিতারোহণে ভীত হন। যদি কেঁদে ফেলেন। চেঁচিয়ে ওঠেন। ধিক্কার দেবে সবাই। শ্মশানঘাট। লোক-সমাবেশ সমারোহ যেন উত্তাল সিন্ধুর মত হয়েছে। যে অসূর্য্যম্পশ্যা নারীদের লোকে দেখতে পায় না সেই রূপবতী রাজকন্যা রাজরাণীদের একজনকে সতী-সজ্জায় গহনা কাপড়ে বসনভূষণে সাজানো দেখবে...... আবার চিতায় বসে জীবিত দগ্ধও হতে দেখবে......।

অনাত্মীয় উচ্চ নিম্নবর্ণের পুরুষের জনতার সীমা নেই। নিম্নবর্ণের নারীও কম নয়।

"আহা মাগো। সতী হবে গো।......আহা সাবিত্রী রে......আহা কি রূপ রে মার।

কেউ বলল...... হ্যাঁ গা, ভয় লাগবে না মার ? ......কেউ বলে এই গেল বছর মেয়ের বিয়ে দিয়েছে গো।......আহা কিসের বয়স।......তা বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো। একবারই পুড়বে। চিরকাল জ্বলে পুড়ে মরবে না বামুনের ঘরের বিধবা

হয়ে। সব সুখে বঞ্চিত হয়ে।......তা আরো তো বউ আছে কর্তার।

......এটাকে বুঝি বেশী ভালবাসত।

......গুঞ্জনের, মন্তব্যের শেষ নেই।

গুরু পুরোহিতের সঙ্গে পুত্রদের বাহু জড়িয়ে ধরে চুবড়ী খাঁধি হাতে দিয়ে সাতবার চিতাবাসর প্রদক্ষিণ করাবে বাজনা শাঁক উলুধ্বনির সঙ্গে থালায় থালায়, তামার পুষ্পপাত্রে ফুলের স্তূপ, মালা, চন্দন সিন্দুর আলতা শাঁক ঘন্টা কাঁসর, সোনার ঘুচি মধু পঞ্চরত্ন পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য ইত্যাদি। কোন কিছুই বাকি নেই। —এদিকে কলসীভরা ঘৃত।চন্দন কাঠ রাখা আছে।

চারদিকে ঢাকী ঢুলী কাঁধে গামছা বস্ত্রখণ্ড পরা। রাজবাড়ীর পাইক বাগদী নায়েব গোমস্তা দারোয়ান ঘেরা চিতা যজ্ঞশালা। আত্মীয় বান্ধব-স্বজন পরিজনও সঙ্গে সঙ্গে আছেন। কেউ কাতর শোকার্ত। আছে কতক কৌতূহলী ও কৌতুক দর্শক জনতা।

রাজকন্যার মত তপস্বিনী পার্বতীর মত অসূর্য্যম্পশ্যা রূপবতী রাণীর মত অলকমনি ছোট সন্তানের বাহুবেষ্টনের মধ্যে শিবিকা থেকে নেবে দাঁড়িয়েছেন চিতার পাশে মাঙ্গলিক সম্ভারের পাশে। তিনি নিজেও একটা মাঙ্গলিক সম্ভার বিশেষ তিনি তা বুঝতে পারছেন না। প্রদক্ষিণ শেষ হল।

ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স। পূর্ণ যৌবন তখনো দেহে তন্বী রূপবতী নারী। মাথায় গুণ্ঠন নড়ে সরে গেছে। দুর্বলতায় ও ভয়ে পা শরীর টলমল করছে। যেন ঐ চারখানি কচি কোমল বাহুই তাঁকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

পুরোহিত বড় একজন কাকে বললেন "মাকে তোমরা চিতায় স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়ে দাও"।

গুরুদেব বললেন "মা আপনি পতির চরণদুটী কোলে করে বসুন। তাঁকেই ধ্যান করুন। স্মরণ করুন কোনো ভয় নেই। মহাসতী লোক আপনাদের জন্যই মা। কিন্তু তাঁরও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। চিতা বিবাহসজ্জায় সজ্জিত অলকমণির বিভ্রান্ত কোমল মুখখানির দিকে চেয়ে। আগে তাঁরা কেউই অলকমণিকে দেখেননি।

সকলেরই চোখ সজল ব্যাকুল হয়ে উঠল।

একজন বললেন "এবারে মায়ের অলংকারগুলি "শিথিল করে নেওয়া হোক, সিঁতলে দেও মা, দাও মা গলার হার গুরুদেবের হাতে দাও। হাতের গুজরী-পঞ্চম পুরোহিতের প্রাপ্য। নাকের নথ, কানের গহনা যাকে ইচ্ছা দাও। অন্য সব গহনা বাড়ীতে ফিরে যাবে। যা ইচ্ছে স্বর্ণ দান করে দাও। ঐ দানই তো কীর্ত্তি হয়ে থাকে। ইচ্ছা? দান? ইচ্ছা? গহনা? বাড়ীতে ফিরিয়ে নেওয়া? কার গহনা? কোথায় বাড়ী? কার বাড়ী? অলকমনি কোনো কথার মানে আর বুঝতে পারছে না।

তারা গহনা খুলে নিচ্ছে শুধু দেখছেন। আর ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে। শাঁখা লাল কড় চন্দন সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছে জনে জনে।

সতীকে স্পর্শ পুণ্য, সতী দর্শন পুণ্য। সতী নাম শ্রবণও পুণ্য।

গুরু পুরোহিতরা বলছেন, মা পতির চরণ ধ্যান করো। ভয় নেই কিছু।'

অলকমণি নিস্পন্দ মূর্ত্তির মত চোখ বুজে মাথা নিচু করে বসে আছেন। ভাবনা? ভয়? কোনো কিছুই মনে নেই।

সহসা মনে হয় কত দেরী—আর কত দেরী? শেষ হয়ে যাক্। কেন দেরী আর? অকস্মাৎ চারদিকে উলুধ্বনি ও হরিধ্বনির সঙ্গে একসঙ্গে কাঁসর ঘন্টা শাঁক ঢাক ঢোল তুমুল রবে বেজে উঠল।

অলকমণি চমকে চোখ খুললেন। আলো হয়ে গেছে চারদিক গরম হলুদ রঙের আলো। সূর্য্যের আলো? না—আগুন?

সভয়ে অলকমনি ভীত মাথাটি স্বামীর হাঁটুর ওপর পা ছড়ানো কোলের উপর রাখলেন। জড়িয়ে ধরলেন কঠিন হাঁটু দুটো।

হঠাৎ এবারে পিঠে কি একটা ভারি স্পর্শ অনুভব

করলেন। স্বামীর হাত? স্বপ্নের মত মনে হল, তিনি কি বেঁচে উঠেছেন, পিঠেহাত রেখেছেন? এবারে বলবেন, ভয় পেয়েছো? এই তো আমি রয়েছি।" আরো তারি কঠিন ছোঁয়া পিঠ স্পর্শ করছে।

তিনি জানেন না, ওটা স্বামীর বলিষ্ঠ হাত নয়। চন্দন কাঠ। ঘৃতসিক্ত চন্দন কাঠের টুকরা তাঁর পিঠের ওপর সাজিয়ে ঠেলে দিচ্ছে লোকেরা।

এবার একবার আরো অলকমণি মাথা উঁচু করতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। চোখ খুলতে পারলেন না। এবারে মাথাতেও স্বামীর হাতের স্পর্শ কি। না চন্দন কাঠই, জানেন না তিনি। এত আলো কেন বন্ধ চোখের সামনে। বাদ্যভাণ্ড। শব্দ কোলাহল। আগুন। অলকমণির সংজ্ঞা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল। নিঃশব্দে নীরবমুখে অলকমণি সতীলোকে যাত্রা করলেন। নিঃশব্দে দেহ পুড়তে লাগল। মহাভয় ছিল লজ্জা ছিল তাঁর সতীযাত্রাতে অসঙ্গত কোনো অসংযম, অস্থিরতা চঞ্চলতা প্রকাশ পায় যদি।

কয়েকদিন কেটে গেছে। রংপুর কর্মক্ষেত্র থেকে ভ্রাতার বিয়োগ খবর পেয়ে রামমোহন এসে পড়েছেন।

শোকার্ত্ত পুরী। অন্তঃপুর নীরব শোকে মূঢ়। বহির্বাটীর পারজন, আত্মীয় স্বজন বন্ধু সসঙ্কোচে স্তব্ধ তাঁর সামনে। জগমোহনের তিন স্ত্রীর সন্তান পিতৃহীন বালকবালিকার দল বিক্ষিপ্ত উদ্ভ্রান্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সতী অলকমণির সহমরণ কথা অস্পষ্টভাবে কর্ণগোচর তাঁর হয়েছে। রামমোহন শোকার্ত্ত অন্তঃপুরে জননীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। অলকমণির বালক পুত্রদের হাত ধরে।

শোকে ক্ষোভে রুদ্ধ কণ্ঠে জননীকে জিজ্ঞাসা করলেন "মা মেজ বধূঠাকুরাণীর সহমরণে ওরা তোমার অনুমতি নিয়েছিল?"

জননী নীরবে চোখের জল মুছতে লাগলেন। উত্তর দিলেন না।

১৯৭২ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের আসন্ন দ্বিশত জন্মবার্ষিকী স্মরণে লেখা। সতী অলকমণি রামমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন রায়ের দ্বিতীয় পত্নী। তাঁর সহমৃত্যুতেই রাজা মর্মাহত ও বিচলিত হয়ে এ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রথা সরকারী আইনে নিষিদ্ধ হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে।

সাহিত্যিক ও মাষ্টারমশাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ণেন্দু বসু

নভেম্বর ৮, রবিবার সন্ধ্যায় বেতারে বাংলা খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা শোকস্তব্ধ। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আর একটি আঘাত। শরদিন্দুর মৃত্যু তবু বয়সের দিক থেকে খুব আকস্মিক না-ও মনে হতে পারে। কিন্তু কথা-সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যে এত শীঘ্র সকলকে ছেড়ে যাবেন—একথা কেউ ভাবতে পারে নি। বোধহয় মন তা ভাবতে চায়নি কখনও, তাই তা ভাবাও কঠিন হয়েছে। ৫২।৫৩ বছর বয়সে মৃত্যু খুবই বেদনাদায়ক। খ্যাতির চূড়ায় শিখরে পৌঁছবার মুহূর্তে তাঁর প্রয়াণ। খুবই আকস্মিক। তিনি আমাদের মধ্যে নেই—একথা ভাবাই কঠিন। একটি মধুর হাসি—কৌতুকস্নিগ্ধ পরম প্রসন্নতা যেন সব সময় তাঁর মুখে লেগে থাকত। সে মুখ আর কেউ দেখবে না। লেখার সে স্বাদ আর কেউ পাবে না নতুন ক'রে। তবু তাঁর লেখা তাঁকে অমর করে রাখবে—এইটুকুই সান্ত্বনা।

দেশের সুধীসমাজ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সাহিত্যে তাঁর দান, বন্ধুবৎসলতা ও অমায়িকতার কথা উল্লেখ করেছেন; স্মরণ করেছেন তাঁকে।

কবিতা দিয়ে তাঁর প্রথম সাহিত্যে প্রবেশ। পরে কথা-সাহিত্যে প্রবেশ করেছেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুপ্রেরণায়। উপন্যাসের মধ্যে 'উপনিবেশ,' 'বৈতালিক', 'লালমাটি', 'অসিধারা', 'শিলালিপি', 'পদসঞ্চার', 'বনজ্যোৎস্না,' 'তিনপ্রহর', 'মেঘের উপর প্রাসাদ', 'নির্জন শিখর', 'কৃষ্ণচূড়া', 'অমাবস্যার রাত্রি' প্রভৃতির নাম করা চলে। এছাড়া ছোটগল্পের সংখ্যাও কম নয়।

ছোটগল্পে তাঁর অনন্যসাধারণত্ব আমাদের চোখে পড়ে। সূক্ষ্ম অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশে, সংলাপের সাবলীলতায় ও পরিমিতিবোধের সার্থক রূপায়ণে তাঁর গল্পের একটি বিশিষ্ট স্বাদ আছে। কথাসাহিত্যে তিনি মূল্যবান আসন লাভ করবেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলা কথা-সাহিত্যের আজ প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। তারাশঙ্করের পর বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে মানবমনের বিকাশধর্মের সঙ্গে প্রকৃতিজগতের অনুভূতির সংমিশ্রণ তেমনভাবে অপর কারো লেখায় ধরা পড়ে না, যতটা পড়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায়। মানবমনের অন্তর্দ্বন্দ্বে কখন যে অলক্ষে প্রকৃতির একটি রূপসুষমা মিশে গিয়েছে তা আমরা টের পাইনা। এইরূপ-সুষমার কাজল-কালো তুলিতে তাঁর লেখা হয়ে উঠেছে স্নিগ্ধোজ্জ্বল।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তাঁর একটি স্থান আছে। তাঁর বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল সুন্দর। তাঁর সেই মনোভঙ্গী অধ্যাপনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। "সাহিত্যে ছোটগল্প" গ্রন্থটি ছিল তাঁর ডি. ফিল (১৯৬০) এর বিষয়বস্তু।

শিশুসাহিত্যে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। শিশুদের জন্য লেখেন তাঁরা, যাঁরা শিশুদের ভালবাসেন। দু'-একজন সাহিত্যিক বন্ধু তাঁকে ছোটদের জন্য লিখতে বলায় তিনি আনন্দের সঙ্গে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। তাঁর টেনিদা, প্যালারামকে চেনে না, এমন ছেলে খুব কম আছে। ছেলে-বুড়ো সবাই তাঁর ছোটদের উদ্দেশে লেখা পড়ে সমান আনন্দ পাবে। ছোটদের জন্য লেখা গল্পগুলিতে কৌতুকরসের চমৎকার এক প্রবাহ লক্ষ্যকরা যায়।

চিত্রনাট্যরচনায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। 'রামমোহন' 'দেশবন্ধু' তাঁর উৎকৃষ্ট রচনা।

দিনাজপুরের বালিয়াডাঙ্গিতে ১৯১৮ ফেব্রুয়ারীতে তাঁর জন্ম। দিনাজপুর জেলাস্কুল থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ফরিদপুর কলেজে ভর্তি হন। পরে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে পড়েন। এখান থেকে তিনি আই. এ. ও বি. এ. পাশ করেন। ১৯৪১ এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলায় এম. এ. তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৪২ থেকে জলপাইগুড়ি কলেজে এবং ১৯৪৫ থেকে কোলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৯৫৬ সাল থেকে শেষ দিন পর্যন্ত অধ্যাপক ছিলেন।

অধ্যাপকরূপে আমি তাঁকে পেয়েছি (১৯৬৪-৬৬) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্লাসের বাইরে সভা-সমিতিতেও তাঁকে দেখেছি। সর্বত্রই তাঁর মুখে প্রাণোচ্ছল হাসি ছিল। অনেক ক্লাসে দেখেছি ছাত্র-ছাত্রীদের বিরক্তি। কিন্তু T. N. G. র ক্লাস মানেই স্বস্তি। বিনম্র হাসি নিয়ে তিনি ক্লাসে প্রবেশ করতেন—পড়ানোর শেষ সময় পর্যন্ত সেই হাসি। তাঁর পড়ানোর ভঙ্গীটি ছিল চমৎকার। স্পষ্ট উচ্চারণ, পরিমিত শব্দ আর ছোট মন্তব্য—নিজে হাসছেন, একটু একটু করে সেই হাসি সংক্রামিত হয়ে সমস্ত ঘরে ফেটে পড়ছে। সরস মন্তব্যের এক একটি বাণ নিক্ষেপ ক'রে তিনি মুহূর্তের জন্য নীরব গম্ভীর হয়ে যেতেন। অপেক্ষা করতেন পরমুহূর্তের জন্য, যখন হাসিতে সমস্ত ঘরটা যাবে ছেয়ে।

"সমালোচনা সংগ্রহ" বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্য-তালিকাভুক্ত একটি সংকলন গ্রন্থ। সমালোচনার আদিযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমালোচনা প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। অমাদেরও কতকগুলি পাঠ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ত্রয়ী—আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, বিষবৃক্ষ পড়াতে দেখেছি তাঁর অপূর্ব বিশ্লেষণ ক্ষমতা। মনে হয় তিনি পড়াতেন না। আমাদের সঙ্গে পাঠে অংশ নিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'হাসির গান' পড়াবার সময় বিশুদ্ধ হাসির যে ঢেউটি তিনি তুলতেন তা অনেকদিন মনে রাখবার মত। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ মনে হয় তাঁর পরিমিতিবোধ। কখনও তাঁকে কোন বিষয়েই মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে দেখিনি। প্রসঙ্গ থেকে বেশী দূরে কখনও যেতেন না। হাসতেন—আবার হঠাৎ পড়ার গভীরে চলে যেতেন অনায়াসে। যাদের দিক চেয়ে পড়াচ্ছেন তাদের অন্তরে প্রবেশের সতত চেষ্টা ছিল তাঁর। নিজে গভীর অধ্যয়ন করেছেন—অথচ পাণ্ডিত্যের কোন অহংকার কখনও প্রকাশ পায়নি; নিজের লেখা সম্বন্ধে একটি দিনও কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে দেখি নি

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি—তিনি পড়াবার সময় ধরে নিতেন আমরা সবাই অনেক কিছু পড়েছি। অথচ পাঠ্য বইয়ের বাইরের জ্ঞান যে আমাদের অনেকেরই সীমিত, তা তিনি ভাবতেন না। এই উচ্চ ধারণা থাকার ফলে অনেক প্রসঙ্গ কেবল একটু ছুঁয়ে যেতেন। সবটা বলার অর্থ সময় নষ্ট করা বলেই হয়ত মনে করতেন। এতে আমাদের স্বল্প-অধ্যয়নজনিত লজ্জা হত। পরের দিন চেষ্টা করতাম বাইরের যেসব বিষয় উনি বলতেন তার কিছু জ্ঞান সঞ্চয়ে। অবশ্য অনেক সময় মুখের দিকে চেয়ে যদি বুঝতেন বেশীর ভাগের বিষয়টিতে অধ্যয়ন নেই, তখন একটু একটু করে সুরু থেকে বিষয়টি বলতেন। নাটকের ও ছোটগল্পের দুটি ক্লাসে গিয়ে রবীন্দ্রনাটক ও ছোটগল্পের তাত্ত্বিক সহজ সুন্দর ব্যাখ্যা পেলাম তাঁর কাছে।

অপরাপর অধ্যাপক ও গুণীজন সম্পর্কে তিনি আমাদের অনেক কথা বলতেন। দ্বারভাঙ্গা হলে বক্তৃতা থাকলে অনেক সময়ই বলতেন 'যেও, ভারি সুন্দর মানুষ।' মনে আছে কবিশেখর কালিদাস রায় ডি এল রায়ের কাব্য সম্পর্কে চারদিন ব্যাপী মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। চমৎকার সে বিশ্লেষণ। মাষ্টারমশাইয়ের কথামত বক্তৃতায় গিয়ে সত্যিকার আনন্দ পেলাম। কবিশেখরের বিশ্লেষণ অধ্যাপকের বিশ্লেষণ নয়, রসজ্ঞের বিশ্লেষণ।

বহু জীবিত মৃত গুণীজন সম্পর্কে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনুসন্ধিৎসা—সাধনা যেখানে সেখানেই তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। ফাঁকি তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না।—তা পাঠেই হোক আর সাহিত্য-সাধনাতেই হোক।

ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের গল্পের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। অনেকবার তাঁর গল্পের কথা আমাদের বলতেন।

পত্র-পত্রিকার জন্য লেখা চাইলে কর্মব্যস্ত থাকলেও তিনি কিছু না কিছু দিতেন। ভাল লেখা পেলে উৎসাহ দিতেন। একবার ছোটদের স্থানীয় একটা কাগজের জন্য লেখা চেয়েছিলাম। যত্ন করেই লিখে-ছিলেন প্যালারামের ছড়া। পত্রিকা হাতে পেয়ে তিনি অনেক পরামর্শ দিলেন। বললেন, ছোটদের পত্রিকায় আরো ছবি থাকা চাই। লেখায়-রেখায়-বর্ণে তাকে সুন্দর হয়ে উঠতে হবেই।

বাংলাকাব্য পড়াতে এসে দেখেছি বাংলা দেশের প্রতিটি জিনিসের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বাংলায় প্রকৃতির রূপবর্ণনায় তার 'শ্যামল-কোমল' বাংলাকে মনে জেগেছে। মনে পড়েছে দীঘি, পুকুর, শ্যাওলা, পুঁটি, খেজুররস আর পিঠে পার্বণকে। স্নিগ্ধ বাংলার শ্যামল সুষমা তাঁর অন্তর ভরে দিয়েছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথের কিশোর-মনের কবিত্বকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। দীঘির কালো জলে কত স্বপ্নছবি এঁকেছেন।

আজ মনে হয় অনেক সহজে তিনি যেন বঙ্গ-সরসীতে ঢেউ খেয়েছেন, ডুব দিয়েছেন, নিয়েছেন বিদায়। শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তাঁর আলাপে বাংলার জন্য ব্যাকুলতা, দরদ গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। স্বীকার করেছেন আমাদের অনেক ত্রুটির ফলে দেশের এই অস্বস্তিকর অবস্থা এসেছে। সেই সঙ্গে বার বার মার্জিত ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে নিন্দা করেছেন দেশের কৃষ্টি-কলার ধ্বংসাত্মক কাজকে। এমন শ্রদ্ধাশীল সংস্কৃতিবান দরদী পুরুষ দেশে খুব বেশী আছে বলে মনে হয় না। ক্লাসের পড়ার ফাঁকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন আলোচনায় দেখেছি সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ। সংস্কৃতি ক্ষুণ্ণ হলেই তিনি অস্বস্তির সঙ্গে দুঃখ করেছেন। সেই সঙ্গে আমাদের মধ্যেও জাগিয়ে দিচ্ছেন অনুরক্তি।

বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের ঘরে তাঁকে দেখেছি সকলের সঙ্গে নীচু স্বরে বেশ রঙ্গ-পরিহাসে আছেন। আমাদের অনেকেই গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করলেও তিনি একটুও বিরক্তিবোধ করতেন না। মুহূর্তে প্রসঙ্গ ছেড়ে ছাত্র-ছাত্রীর কথা শুনতেন—কথা বলতেন। ছবির প্রতি তাঁর খুব অনুরাগের পরিচয় পেয়েছি। অনেক ছবির প্রদর্শনীতে যাবার কথা তিনি আমাদের বলেছেন।

মাষ্টারমশাই যে চমৎকার অভিনয়ও করতে পারেন তা জানতাম না। আসলে ছোটদের আনন্দ দেবার কোন সুযোগ তিনি ছাড়তে রাজী নন। স্বপনবুড়োর (অখিল নিয়োগী) আহ্বানে সব পেয়েছির আসরের বার্ষিক উৎসবে মহাজাতি সদনে সাহিত্যিকদের অভিনয়ে তাঁকে দেখেছি। তাঁর লেখা হাসির নাটক 'ভাড়াটে চাই', 'চারমূর্তি,' 'বারোভূতে' চিরদিন বিশুদ্ধ হাসির একাঙ্ক নাটকরূপে সমাদৃত হবে ছোট বড় সবার কাছেই।

অধ্যাপকমণ্ডলে তাঁর আসন সাহিত্যিকদলের আসনের মতই সমান উজ্জ্বল থাকবে। এ দৃঢ় প্রত্যয় বিদগ্ধমহলের সকলেরই। শুধু প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ই নন, বাংলাদেশের একটি বন্ধু দেশদরদীকে আমরা হারালাম—এটাই মনে হয় আজকের সবচেয়ে দুঃখ-বেদনা। সাহিত্যে তিনি বেঁচে রইবেন, কিন্তু দেশদরদী বন্ধুকে আমরা আর পাব না—এ দুঃখ চিরদিন থাকবে।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

ঢং ঢং ঢং ক'রে দূরে কোথায় যেন গির্জার ঘণ্টা বাজলো। রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা।

নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতাকে ভঙ্গ ক'রে ঘণ্টার গুরুগম্ভীর আওয়াজ বাতাসে ভেসে ভেসে বহু দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো।

মোজেস কার্ভার শয্যা ত্যাগ ক'রে জানালার কাছে উঠে এলেন, অবাধ উন্মুক্ত ক'রে জানালার দুটো কবাটই খুলে দিলেন। দেখলেন, পটে আঁকা ছবির মতো নীরব নিস্তব্ধ গ্রাম খানা আকাশের গায়ে লেগে র'য়েছে।

সারা পৃথিবী স্তব্ধ শান্তিতে ঘুমোচ্ছে।

ঘুম নেই শুধু মোজেস কার্ভারের চোখে। কী যেন একটা বিভীষিকা দেখে তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠছেন।

একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে তিনি খোলা জানালার সামনে ব'সলেন। অপলক দৃষ্টিতে তিনি দূরে পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এখনি তো ওদের আসার সময়।

ওই, ওরা আসছে নিশাচর প্রেতের মতো বীভৎস চীৎকারে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ ক'রে। পল্লীর শান্ত নির্জন পথে ওদের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে খট্ খট্।

তুহিন শীতল রাত। ঝোড়ো হাওয়ার মতো তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে শন্ শন্ ক'রে শীতের হিমেল বাতাস বইছে, মনে হয় কে যেন নির্দয় আঘাতে চাবুক মারছে পৃথিবীর বুকে।

মোজেস কার্ভার অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে ব'সে র'য়েছেন। অনেক চেষ্টা ক'রেও তিনি কিছুতেই ঘুমোতে পারছেন না, তাঁর চোখে ঘুম আসছে না।

ওই সব নিশাচর দস্যুদের নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্য যে কী, মোজেস কার্ভার তা ভালোই জানেন।

এমনিভাবে ওরা প্রায়ই আসে নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে বিভিন্ন পল্লীতে এসে হানা দেয় নিগ্রো ক্রীতদাস-দাসীদের লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যাবার জন্য, তাদের নিয়ে গিয়ে ওরা চড়া দামে দাসবাজারে বিক্রী করে। কয়েকদিন আগেও ওই জল্লাদের মতো নিষ্ঠুর দস্যুরা রাত্রির অন্ধকারে এসে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল এই পল্লীর বুকে, গৃহস্থদের ওপরে চালিয়েছিল নির্মম অত্যাচার, তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে ঘরবাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আর যাবার সময় তারা নিগ্রো ক্রীতদাস-দাসীদের জোর করে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। যারা বাধা দিতে গিয়েছিল তাদের ওপরে ওরা নির্মম অত্যাচার চালিয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নিয়েছে। তারপর ছায়ার মতো রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছে।

দস্যুদের ধ'রতে পারা যায় না। যারাও বা সাহস ক'রে ওদের বাধা দিতে বা ধ'রতে এগিয়ে যায় তাদের দুর্দশার আর অন্ত থাকে না।

বেশী দিন আগের কথা নয়। মাত্র এক সপ্তাহ আগে ওই নিশাচর শ্বেতাঙ্গ দস্যুর দল এসে হানা দিয়েছিল, ক্রুদ্ধ আক্রোশে মোজেস কার্ভারের খামার বাড়ীর ওপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল, বেত্রাঘাতে কার্ভারের সর্বাঙ্গ জর্জরিত ও রক্তমাখা ক'রে দিয়েছিল, তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলে লোহার তার জড়িয়ে বেঁধে তার

নর দেহ গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে নির্মমভাবে চাবুক চালিয়েছিল। মোজেস কার্ভারের স্ত্রী সুসান কার্ভার অসহায়ের মতো সেই অবর্ণনীয় অত্যাচার শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছেন আর কেঁদেছেন। স্বামীকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করার তাঁর কোন উপায় ছিল না, তাই চোখের জল ফেলা ছাড়া তিনি আর কিছুই ক'রতে পারেননি। তিনি শুধুই কেঁদেছেন, আর কেঁদেছেন।

অত্যাচার ক'রে নিপীড়ন চালিয়েও দস্যুরা কার্ভারের কাছ থেকে দাসদাসীদের লুকিয়ে থাকার জায়গার সন্ধান বের ক'রতে পারেনি। কর্কশ কণ্ঠে তারা মোজেস কার্ভারকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, "বলো তোমার নিগ্রো দাসদাসীদের তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছো?"

মোজেস কার্ভার তাদের একটি প্রশ্নেরও জবাব দেননি। দস্যুরা নির্দয়ভাবে তাঁর মুখে মাথায় ঘাড়ে তাঁর সর্বাঙ্গে চাবুক চালিয়ে সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত রক্তমাখা ক'রে দিলো।

দস্যুরা জলন্ত কয়লার টুকরো নিয়ে এসে মোজেস কার্ভারের পায়ের পাতার উপর শক্ত ক'রে চেপে ধরলো, আগুনে পুড়ে দগ্‌দগে ঘা হ'ল তাঁর পায়ে। কিন্তু তথাপি, মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য ক'রেও, কার্ভার টুঁ শব্দ পর্যন্ত ক'রলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা তো দূরের কথা সামান্য কাতরোক্তিও বের হ'ল না। সে এক আশ্চর্য্য সহ্যশক্তি, অদ্ভুত মনোবল! সর্বশক্তি দিয়ে কার্ভার দাঁত দিয়ে জোর ক'রে ঠোঁট চেপে রইলেন যেন একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বের না হ'তে পারে। মনে মনে তিনি ভগবানকে স্মরণ ক'রতে লাগলেন, অস্ফুট স্বরে ব'লতে লাগলেন, "হে দয়াল! হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর! আমাকে তুমি শক্তি দাও, আমি যেন সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট না হই!"

মোজেস কার্ভারের মেরী নামে নিগ্রো একটি যুবতী ক্রীতদাসী ছিল সে খবর দস্যুরা জানতো, বিশেষ ক'রে মেরীকে পাবার জন্যই তাদের যত চেষ্টা। দস্যুরা মেরীর সন্ধান জানবার জন্য কার্ভারের উপর যতই অমানুষিক অত্যাচার ক'রতে লাগলো তিনি তাঁর অদ্ভুত মানসিক শক্তির জোরে ততই তা সহ্য ক'রে যেতে লাগলেন।

মেরী তার শিশু সন্তানগুলিকে নিয়ে নিকটের একটা পাহাড়ের গুহার মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছে। দস্যুরা যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেও কার্ভারের মুখ থেকে তা' খবর বের ক'রতে পারলো না। সম্পূর্ণ নিরাশ হ'য়ে তাদের ফিরে যেতে হ'ল।

কিন্তু দস্যুরা যে আবারও আসবে, এবং শুধু আসবেই না, তারা এবারকার চাইতে অনেক বেশী এবং জঘন্যতর অত্যাচার ক'রবে, মোজেস কার্ভার তা ভালো করেই জানেন।

ক্রমশঃ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাদের রাজ্যপাল ও অদ্যকার সংবাদপত্র—

শ্রীধাবনকে আমরা যতটা ছোটকথাতে অজ্ঞ বলিয়া মনে করি আসলে তিনি তাহা নহেন তাঁহার এমন একটা অন্তর্দৃষ্টি আছে যাহার দ্বারা তিনি এমন অনেক কিছু দেখিতে পারেন, যাহা সাধারণের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না, এমন বহু গলদ আমাদের আছে যাহার সম্পর্কে শ্রীধাবন সজাগ এবং সেইসব গলদ দূর করিতে সদা সচেষ্ট। যেমন ধরুন আজকের সংবাদপত্র সম্পর্কে রাজ্যপালের অমূল্য উপদেশ এবং সতর্ক বাণী তথা ওয়ার্নিং

"সংবাদপত্র একচেটিয়া মালিকানায় চলিয়া যাইতে পারে, এই বিপদজনক পরিস্থিতিতে জনস্বার্থে রাষ্ট্রও একচেটিয়া অধিকার দাবি করিতে পারে এখনও করে নাই পরম দয়া, এবং এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন সাংবাদিকরা নিজেরাই। সংবাদপত্র অতি দ্রুত বৃহৎ শিল্পে পরিণত হইতেছে। ফলে এই শিল্প (সংবাদপত্র) শিল্পপতিদের পরিচারিকা (!) হইতে পারে।"

আরো আছে: শ্রীধাবন বলেন:

"জনসাধারণ অনিরুদ্ধভাবে তথ্যাদি পাইলেই গণতন্ত্র সফল হয়"—কিন্তু "একচেটিয়া মালিকানা এবং পার্টি প্রথার জন্যই সত্য সন্ধান কঠিন হইতেছে। রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের দলীয় প্রচারে যতটা আগ্রহী সত্য-তথ্য প্রচারে ততটা নহেন। কেন্দ্র সরকার সত্য-তথ্য প্রচারে পরম নিষ্ঠাবান, তাই ইন্দিরা পুত্রের প্রেস ফটোগ্রাফারের ক্যামেরা ছিনতাই এবং ফটোগ্রাফারকে অপমান করার সংবাদটাকে বোধহয়—সত্য নয় বলিয়া প্রচারে বিরত ছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাহিলেও সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের স্বাধীন স্বতন্ত্র সংবাদপত্রের ঐতিহ্য গড়িয়া তুলুন। ক্ষমতাসীনদের সমালোচনার অধিকার আমি সংবাদপত্রের অস্বীকার করি কারণ ইহা ক্ষমতাসীনদের নিজেদের সংশোধনের সুযোগ দেয়। (দেয় সত্য—কিন্তু লজ্জা মান ভয় থাকিতে নয়।) আমরা যারা ক্ষমতায় আছি তাঁহাদের সমালোচনা করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্র গণতন্ত্রের অভিভাবক এবং প্রহরীর মত কাজ করিতেছে!" কথা দুরকম হইল না কি?

রাজ্যপালের বক্তব্য কি তাহা যথাযথ বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না, তিনি নিজেও ঠিক কি বলিতে চাহেন তাহাও প্রকাশ করিতে পারেন নাই কিম্বা জানেন না। খুব সম্ভবত, প্রেস ক্লাবের 'আজকের সংবাদপত্র" সম্পর্কিত সেমিনারের উদ্বোধনকালে শ্রীধাবন বিজ্ঞজনোচিত কিছু বলিতে হইবে বলিয়া আবল-তাবল বকিয়াছেন এবং এই আবল-তাবল ভাষণে সংবাদপত্র মালিকদের উপর একহাত লইয়াছেন। তিনি এ-রাজ্যের সংবাদপত্রের উপর খুসী নহেন নানা কারণে। সংবাদপত্র মালিকদের সতর্ক করিয়াও দিয়াছেন যে প্রয়োজনবোধে তাঁহাদের হটাইয়া দিয়া সংবাদপত্রগুলিকে সরকারী আওতায় আনা হইতে পারে। বিবিধ সংবাদপত্রের মালিকগোষ্ঠি বিভিন্ন—ইহাতে ধাবন মহাশয় "একচেটিয়ার" গন্ধ কোথায় কেমন করিয়া পাইলেন তাহা তিনিই জানেন।

গত কিছুকাল যাবত সরকার, সরকারী কর্মকর্ত্তারা এবং এক শ্রেণীর সংসদ সদস্য শিল্পপতি মহলে প্রায়

সর্ব্বক্ষেত্রে মনোপলির ভূত দেখিতেছেন। নিজেরা যত বেশী মনোপলি 'কারবারী' হইতেছেন, অন্যের বেলায় ততই কৃপণ এবং বিরূপ হইতেছেন। সত্য সংবাদ এবং তথ্য পরিবেশনে আমাদের কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলি যে প্রকার সততা এবং নিষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন, তাহার কথা না বলাই ভাল—কারণ অপ্রিয় সত্য সকলের সহ্য হয় না। সরকারী সংবাদ এবং তথ্য পরিবেশনের যে বিভাগ বা দপ্তর আছে, তাহার শতকরা ৯০ ভাগ শ্রীমতী ইন্দিরার গুণগান, তাঁহার মূল্যবান চিন্তা-ধারা, ইন্দিরা উদ্ভাবিত নিও-সোস্তালিজ্ম্ প্রচারে এবং অবশিষ্ট দশভাগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর সদস্যদের কার্য্যকলাপ এবং ভ্রমন কাহিনী প্রচারেই যায়। এককথায় গরীবদের অর্থ নষ্ট করিয়া এমন অখাদ্য বিতরণ করার কোন অর্থই হয় না। কাজেই শ্রীধাবনকে অনুরোধ করি, তিনি সময় থাকিতে কেন্দ্র সরকারকে বলুন Physican Heal Thyself। আগত নির্বাচনের পর অন্তকার 'ক্ষমতাসীনরা' কে কোথায় তলাইয়া যাইবেন বলা যায় না। শ্রীধাবনও হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পশ্চিম-বঙ্গ নামক "State of Slaves" হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইবেন, রাজ্যের বিলাসবহুল রাজভবন অন্ধকার করিয়া।

কলিকাতা পৌরসভার মেয়রের অভিযোগ

শ্রীপ্রশান্ত শূর বলিতেছেন আগতপ্রায় সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস (আর) সমর্থনে ভোট সংগ্রহের জন্য সি-এম-ডি-এ নানা পরিকল্পনা নিয়ে তড়িৎ গতিতে অগ্রসর হইতেছে। খুবই অন্যায় কথা, সি-এম-ডি-এর পরিকল্পনাসমূহ, অবিলম্বে বন্ধ করিয়া বরাদ্দ অর্থ কলিকাতা পৌরসভা তথা শ্রীপ্রশান্ত শূরের হাতে অর্পণ করা, এবং ইহা করা হইলে আর কিছু না হউক বিদ্যাধরী প্রকল্পে—আরো প্রচুর আবর্জ্জনা জমিবে এবং বহু ভাগ্যবান নিজ নিজ ব্যক্তিগত পরিকল্পনা কার্যকর করিবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করিবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু পৌরপিতাদের (এবং একজন পৌর-মাতাও আছেন) লজ্জা-মান-ভয় এতই নিরেট যে পরের পয়সায় নবাবদের কোন প্রকার চেতনা ইহাতে হয় নাই হইবে না।

কলিকাতা কর্পোরেশনকে শ্রীনীরদ সি চৌধুরীর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—

"I began to say from the early thirties that if full democracy came into operation in the whole of India the coumtry will become only a CALCUTTA CORPORATION writ large."
—Nirad C Chodhury.

ইতিপূর্ব্বে এত প্রশংসা, এত সম্মান পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা নামক আবর্জ্জনা সম্রাজ্ঞী শহরকে অন্য কেহ দেন নাই।

প্রার্থনা করি বর্ত্তমান মেয়রকে রাষ্ট্রপতি তাঁহার বিশেষ অধিকার বলে (অবশ্যই ইন্দিরাজীর অনুমত্যা-নুসারে) আরো দশ বৎসরের জন্য বহাল রাখিবেন। ইহা সম্ভব হইলে বিগত বিশ বছরে কংগ্রেস শাসিত কর্পোরেশন যাহা করিতে পারে নাই, সি পি এম শাসিত তাহা আর দুই বৎসরেই তাহা করিবে, অর্থাৎ কলিকাতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে পারিবে।

আজকার সমাজ

ভাগবতদাস বরাট

সমাজ কথার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'সোসাইটি' এবং পরিবার কথার প্রতিশব্দ 'ফ্যামিলি'। বহুকাল থেকে আমরা সমাজ ও সোসাইটি এবং পরিবার ও ফ্যামিলিকে সমার্থক বলে ভেবে আসছি। কিন্তু সোসাইটি বলতে ইংরেজ বা মার্কিনরা যা বোঝেন, সমাজ বলতে অনেক সময় আমরা তা বুঝি না। আমাদের কাছে অসামাজিক কথাটা অধর্মীয় ও অনৈতিক।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সুতরাং অনেক সময় তাকে সমাজের অনুশাসন মেনে ভেবে চিন্তে পা ফেলতে হয়। ফলে, মানুষ সমাজের আচার বিচার ও বিধি-নিষেধের গণ্ডির মধ্যে জড়িয়ে থাকে। তার ফলে সে সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়লেও অসামাজিক কোন কাজকে প্রশ্রয় দিতে পারে না।

'আন সোশ্যাল', কথার বাংলা তর্জমা লিখতে গিয়ে আমরা লিখি হয় অভদ্র বা সমাজ বিরোধী। আন্ সোশ্যাল বা অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাকটিভিটিজ (unsocial or anti-social activities), কথার অর্থ আমাদের কাছে সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ। অসামাজিক কার্যকলাপ নয়। তার কারণ, সোসাইটি, সোশ্যাল, আন্ সোশ্যাল ও অ্যান্টি সোশ্যাল বলতে ইংরেজ বা মার্কিনরা যা বুঝে থাকেন সমাজ, সামাজিক ও অসামাজিক বলতে এদেশে আমরা তা বুঝি না।

পরিবার এবং ফ্যামিলি সম্পর্কেও ঠিক এই একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের দেশের পারিবারিক সম্বন্ধ অন্যান্য দেশের মত কুল, গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হলেও এই সম্বন্ধগুলির মধ্যে ধর্মভাব বিদ্যমান। এবং অধুনা পরিবর্তিত পরিবেশে তা যথেষ্ট ক্ষীণ। কিন্তু ফ্যামিলি রিলেশনসিপের মধ্যে পাশ্চাত্যে কোন কালেই ধর্ম বা ধর্মবোধকে জড়িত করা হয় নি।

অনেকের অভিমত মানুষের সমাজ জীবন তার মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক! আবার অপরের ধারণা অন্যরূপ। সমাজে যদি নানা কু-সংস্কার ছড়িয়ে থাকে বা সমাজবদ্ধ জনমানব যদি কোন হুজুগে মেতে উঠে সমাজের চিরাচরিত বিধি বিধান পাল্টে দিয়ে সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপে লিপ্ত হয়, তা হলে সেই পরিবর্তিত বিধান মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। "সত্যমেব জয়তে"—আমরা রাষ্ট্রীয় মন্ত্র করেছি। কিন্তু এই মন্ত্রকে কলঙ্কিত করতে পরাঙ্মুখ নয় এমন ভদ্রবেশী দেশদ্রোহীর সংখ্যাও তো স্বাধীন ভারতে কম নয়। পত্র পত্রিকার পাতায় নিত্য তার পরিচয় মিলছে।

গত কয়েক দশকে বাংলা তথা ভারতের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপ্টা বহে গেছে। তার ফল অনেক ক্ষেত্রে ভাল হলেও খারাপও কম হয় নি। হুজুগে মেতে বা দেশদ্রোহীর প্ররোচনায় গুণ্ডামি করা এবং দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা এক নয়। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য শুধু সাহস নয়, শিক্ষারও প্রয়োজন। কথাটা শুনতে কটু হলেও মিথ্যা নয়। পরিবর্তমান সমাজ তা ক্ষমা করবে কি?

ভারতীয় সমাজ ও সমাজ বিধি সম্পর্কে যে কোনও আলোচনায় হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সমাজ বিধির আলোচনাই মুখ্য হয়ে ওঠে। তার কারণ, ধর্মোন্মাদ মুসলমান সমাজ সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করা অমুসলমানদের পক্ষে পলিটিক্যাল ট্যাবু বলে বিবেচিত হয়। তেমনি খৃষ্টান সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের সাজে না। কারণ, এদেশের খৃষ্টান সমাজ পরিচালিত হয় বিদেশী গীর্জার বিধি-বিধান অনুযায়ী। কিন্তু তা হলেও খৃষ্টান সমাজ উদার মানবতাবোধের আদর্শে দীক্ষিত

বলে হিন্দু সমাজের উপর তাদের ধ্যান ধারণার বহু প্রভাব পড়েছে। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করে খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ইংরেজরা আমাদের সামাজিক প্রত্যয়গুলি রূপান্তরে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

এককালে সমগ্র ভারতবর্ষ বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধরাই আবার শঙ্করাচার্য্যের বৈদান্তিক আদর্শের সম্মুখীন হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ করে বৈদিক ধর্ম্মকে গ্রহণ করেছিল। এই ধর্ম্মীয় পরিবর্ত্তনের ফল এই হয়েছিল যে, হিন্দুরা বুদ্ধকে ভগবান জ্ঞানে পূজা করতে সুরু করে। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে কি বৌদ্ধ, কি বৈদিক সকলেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ ও পরিচালনায় মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি অনুসরণ করতে থাকে। মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক স্মৃতির এই দাপট এদেশে চলে এসেছে কয়েক হাজার বছর ধরে। মাঝে মাঝে হিন্দু মনীষীরা নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে সামাজিক বিধি বিধানগুলি সম্পর্কে প্রাচীন স্মৃতিকারদের বক্তব্যের নূতন নূতন ব্যাখ্যা করেছেন, এবং সেই ব্যাখ্যা অনুসারে হিন্দুর সামাজিক জীবনে দেশাচার, লোকাচার ইত্যাদি মর্যাদা লাভ করে এসেছে।

হিন্দু সমাজ বিধি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিখ্যাত ইংরেজ বিচারপতি জে ডি মেন, (J D Mayne) বলেছেন,—

"Hindu law has the oldest pedigree of any known system of jurisprudence, and even now it shows no signs of decrepitude. At this day, it governs races of men, extending from Kashmir to Cape Comorin, who agree in nothing else except their submission to it."

বর্ত্তমানে সমাজের অনুশাসন আগের মত জোরাল নয়। সে যুগে মানুষ সতীদাহ ও কৌলিন্য প্রথার মত বহুবিধ কুসংস্কার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পালন করত। সভ্য জগতে মানুষের সমাজ ব্যবস্থা আগের তুলনায় যদিও অনেকাংশে মার্জ্জিত, তবু সমাজের বিধি বিধানে রদবদলের এখনো প্রয়োজন আছে। পক্ষান্তরে বিধবা বিবাহ প্রভৃতি আইন সম্মত করা সত্ত্বেও আজও তা হিন্দুসমাজ প্রসন্ন চিত্তে মেনে নিতে পারেনি। এতেই বুঝা যাচ্ছে রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্র বিধিবদ্ধ হলেও সমাজে কতকগুলি বিষয় আছে, যে গুলির পরিবর্ত্তন সময়সাপেক্ষ।

হিন্দুর মানস জগতে কমিউনিজম, সোস্যালিজম প্রভৃতির আক্রমণ জনিত মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অর্থনৈতিক উন্নতিবিধানকল্পে দেশে কলকারখানার ব্যাপ্তি ঘটেছে। অন্যদিকে দেশরক্ষা প্রভৃতির জন্যও সামগ্রিক প্রচেষ্টার আহ্বান আসছে। পরিবর্ত্তিত এই পরিপ্রেক্ষিতে আপামর হিন্দু অহিন্দু জনসাধারণের কাছে এই বাণীটি এসে পৌঁছচ্ছে যে তোমাকে তোমার গণ্ডীর বাইরে এসে সামগ্রিক উৎপাদনের কাজে দেহ মন নিয়োগ করতে হবে। যদি অপারগ হও তা হলে এদেশে তোমার স্থান নেই। এই বাণী আজও বাস্তব। দেশকে সাড়া দিতেই হবে। সুতরাং গণজগতে বিরাট বিপ্লব সুরু হয়েছে। সমাজ ও সামাজিক বাধা নিষেধ এই বিপ্লবের পরিপন্থী হয়ে টিকে থাকতে পারে না। তাই সমাজেও আলোড়ন দেখা দিয়েছে।

আমরা ছোটবেলা থেকেই পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি কতকগুলি অভিনব ধারণার মধ্যে গড়ে উঠেছি। এবং যদিও বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও মার্কস্‌ীয় দর্শনের পাল্লায় পড়ে নাস্তিকতারও প্রচার হয়েছে অনেকদিন, তথাপি এখনও ধর্ম্মবিশ্বাসী নরনারীর সংখ্যা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্ববৃহৎ। অর্থাৎ আমরা অধিকাংশ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারী চিন্তায় ও আচরণে অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং গতানুগতিক। পাপ এবং পুণ্যের কতকগুলি ধরা বাঁধা গৎ আমরা চোখ বুজে মুখস্থ করে ফেলেছি। যেমন গঙ্গাস্নান পুণ্য কর্ম্ম, এবং গণিকা বৃত্তি পাপ। সুতরাং যখন কোন যুবতী বা স্ত্রীলোক গণিকাবৃত্তির অভিযোগে ধরা পড়ে; কিম্বা কোন পুরুষ, গণিকাদের উপার্জ্জনকে স্বীয় উদরান্নের সংস্থান হিসাবে গ্রহণ করে,—তখনই আমরা পাপ

ব্যবসায় শব্দটি গ্রহণ করি। কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীকেই হীনতর বলে গণ্য করা হয়। আর তার সতীত্বকে দাসত্বের সমপর্যায় বিবেচনা করা হয়। সুতরাং তার বিন্দুমাত্র পদস্খলনকেও কোন প্রকার যুক্তি—উদারতা বা ক্ষমার দ্বারা বিচার করা হয় না।

গণিকাবৃত্তিকে পাপ ব্যবসা বলা হলেও ভেজাল দ্রব্যের কারবারকে কিন্তু পাপ ব্যবসা বলে ঘৃণার উদ্রেক করা হয় না। ভেজাল ওষুধ ভেজাল তেল ও ঘি এবং অন্যান্য ভেজাল পণ্যে যখন বাজার ছেয়ে গেছে,—এই ধন বৈষম্যাশ্রিত সমাজে এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষ যখন বাকি কোটি কোটি মানুষকে প্রতিনিয়ত শোষণ করে সোনার পাহাড় তৈরী করছে এবং সেই সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরে দৈন্য বঞ্চনা এবং জীবন যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিচ্ছে, তখন মানুষের রক্ত শোষকের সেই সঙ্ঘবদ্ধ নিষ্ঠুর ব্যবসাকে কি পুণ্যের ব্যবসা বলব না বলব পাপের ব্যবসা?

সমস্ত পৃথিবীতে আজ পুরানো সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি নড়ে গেছে। তার লক্ষণ সর্বত্র। হিংসা, দ্বেষ, যন্ত্রণা, ভয়, নীতি-বর্জিত আনন্দলাভের অসুস্থ কামনা, যৌনবিকৃতি এই সমাজের সর্বত্র ছেয়ে আছে যা প্রকাশ হয় সাহিত্যে। এই বিকৃত সমাজের দূষিত আবহাওয়া থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। আমাদের দেশে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নিজের শক্তিতে সমষ্টির ক্ষমতা দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস জেগে উঠেছে, যে আস্থা ও বিশ্বাস সব চাইতে বড় দৃষ্টিশীল শক্তি। আর সেই সঙ্গে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে সমাজ বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হয়ে দেশের সুখ সমৃদ্ধি ও ভোগ্যবস্তু নষ্ট করা এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের সুস্থ জীবন বিঘ্নিত করা কোন ক্রমেই উচিত নয়।

অধুনা রাজনৈতিক মতানৈক্যে নানা দলের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নানা হুজুগে ক্ষণে ক্ষণে সমাজের পটভূমি পরিবর্তিত হচ্ছে। এর সুফল থাকলেও এই ক্ষণে তা মনের নাগালের বহির্ভূত। মানুষের জন-জীবন যে বিপন্ন হচ্ছে বারবার তাই শুধু দেখতে পাচ্ছি। মানুষের মন থেকে ধর্মভাব অনেকাংশে ক্ষীণ হওয়ায় এহেন সমাজের বিপর্যয়। মানবিক সুকোমল বৃত্তি ঝিমিয়ে পড়েছে। তাই এই জীবন যন্ত্রণা। এ ছাড়া আর কি বলব তা ভেবে পাচ্ছি না।

নির্ব্বাচনের নানান সম্ভাবনার কথা

যুগবানী সাপ্তাহিকে, যে নির্ব্বাচনের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছিল আমরা তাহা হইতে অনেকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

নির্বাচনের আগে সব পার্টিই তাহাদের নিজ নিজ ইসতেহার প্রকাশ করিয়াছে। প্রতিটি ইসতেহারেই বেশ ভালো ভালো কথা আছে। তবে পার্টিগুলি নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ করিয়াছে। যেমন নব কংগ্রেস জয় লাভ করার পর সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব দিয়াছে ও সি পি এম ভাবে ভঙ্গিতে বুঝাইয়াছে যে তারা জয়লাভ করিলে আর কোন পার্টির অস্তিত্বই থাকিবে না। ইসতেহার পড়িয়া লোকে ভোট দিতে যায় না, স্থানীয় সাংগঠনিক শক্তির জোরে পার্টিগুলি ভোট আদায় করে। পশ্চিমবঙ্গে আগামী নির্বাচনের ফলাফল সেই দিক হইতেই অনুমান করিতে হইবে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন এ রাজ্যে সবচেয়ে মজবুত ও শক্তিশালী, তাদের জয়লাভের সম্ভাবনাকে তাই খাটো করিয়া দেখা চলে না। তারা এককভাবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক প্রার্থী দিয়াছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে তারাই সরকার গড়িতে পারিবে, আর কোন পার্টির সে আশা নাই। আঁতাতের সরকার বা জোট বা কোয়ালিশন সরকার স্থায়ী হয় না। শরিকী হানাহানি উহাতে বাড়ে। নব কংগ্রেস-বাংলা কংগ্রেসের মতো সমধর্মী ও সম দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন দুটি দল—যারা উভয়েই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব মানে—তারাই একবার আঁতাত গড়িল আবার ভাঙিল, আবার গড়িয়া পুনর্বার ভাঙিল। অধ্যাপক সমর গুহ বাংলা বাঁচাইবার মহান উদ্দেশ্যে আদি, নব ও বাংলা কংগ্রেস ইত্যাদি মিলাইয়া একটি জাতীয়তাবাদী মোর্চা গড়িতে চাহিয়াছিলেন, ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেসের তরুণরা উহাতে প্রবল আপত্তি তোলায় ঐ মতলব সফল হয় নাই। ছাত্র ও যুবকরা যে কথা বলিয়াছে আমরা তাহা সমর্থন করি। জাতীয়তাবাদের নামে সুবিধাবাদী ভণ্ডদের লইয়া মোর্চা গড়ার দরকার নাই বাংলাকে বাঁচাইবার দায়িত্ব অতুল্য ঘোষ বা বিজয় সিং নাহার পরিচালিত প্রতিষ্ঠান লইতে পারে না। বাংলাকে ধ্বংস করার জন্য যারা দায়ী তারাই বাংলার রক্ষাকর্তা সাজিবে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। এদের মুখে বড় বড় কথা থাকিলেও উদ্দেশ্য যে সৎ নহে অধ্যাপক গুহও এতদিন তাহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন। নব কংগ্রেস যেভাবে অকস্মাৎ বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি ভাঙিয়া দিয়া অজয় মুখার্জী ও সুশীল ধাড়াকে পথে বসাইয়াছে ও গোপনে সি পি আই প্রভৃতির সঙ্গে হাত মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে উহাদের বিশ্বাসঘাতক চরিত্রই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তবে এই দুর্ভাগ্য অজয়বাবুর প্রাপ্য ছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শেষদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে গোপন চুক্তির পর সরকার ভাঙিবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া দিনক্ষণ স্থির করিয়া শেষ মুহূর্তে তিনি পিছাইয়া গিয়াছিলেন। সেদিন বিজয় সিং নাহার, তরুণকান্তি ঘোষ, সিদ্ধার্থ রায় চরম ঘটনার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে উৎকণ্ঠিতভাবে কোন ধরিয়া বসিয়াছিলেন অপর প্রান্ত হইতে অজয়বাবুর পদত্যাগের সংবাদ পাইবার আশা লইয়া—এমন সময় জানা গিয়াছিল যে অজয়বাবু তাঁর মত পরিবর্তন করিয়া সব পরিকল্পনাটাই নষ্ট করিয়া দিয়াছেন; সেদিনকার নৈরাশ্য ও অপমানের প্রতিশোধ এতদিন পর বিজয়-

মাহার, তরুণ ঘোষ, সিদ্ধার্থ রায়েরা ভালোভাবেই লইয়াছেন। এই ষড়যন্ত্র প্রতিশোধ ও পাল্টা প্রতিশোধ ইত্যাদিতে লিপ্ত দল ও ব্যক্তিরা দলগত স্বার্থসিদ্ধির বিষাক্ত আবহাওয়ায় বাংলা বাঁচাইবার পক্ষে উপযুক্ত একটি জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিবেন ও তাহাতে আমাদের আস্থা রাখিতে হইবে ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।

তথাকথিত জাতীয়তাবাদীরা যখন পারস্পরিক কলহে লিপ্ত তখন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি একক শক্তিতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তাদের প্রকৃত বিপদ আসিয়াছে নকশালদের পক্ষ হইতে, আর কাকেও খুব বেশি ভয় করবার কোন দরকার তাদের নাই। কারণ আট পার্টি জোটের অবস্থা খুবই বেগতিক, তারা আমাদের লেখার সময় পর্যন্ত (২৬শে জানুয়ারি) কোনো প্রার্থী তালিকা বাহির করিতে পারে নাই। তারা জোট হইবে না কর্মসূচীর ভিত্তিতে ফ্রন্ট হইবে তারও এখন স্থিরতা নাই। আট পার্টির, মুখে আট পার্টি, সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক ও এস ইউ সি ছাড়া উহার বাকি দলগুলি নামে মাত্রই আছে। তারপর এই আট পার্টি জোট আবার মুসলিম লীগের সঙ্গে আঁতাত করিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে এরা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিষ্ঠার পথ করিয়া দিতেছে। ভোটের লোভে এই যে কুকীর্তি এরা করিল এরপর প্রগতিশীলতার বুলি এদের মুখে সাজিবে না। ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার তোষণে কংগ্রেস ও মার্কসবাদী শক্তিগুলি সমান উৎসুক - ইতিহাসে চিরকাল ইহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এদের বিচারে জনসঙ্ঘ সাম্প্রদায়িক, কিন্তু মুসলিম লীগ সেকুলার। এরই নাম মার্কসবাদ, লেনিন বাদ ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত নকশালদের কথাই ঠিক মনে হইতেছে—মার্কসবাদের নামাবলীধারী ভোটবাবুরা আসলে পরম সুবিধাবাদী ছাড়া কিছুই নয়।

যতদূর অনুমান করা চলে আগামী ভোটযুদ্ধে আদি কংগ্রেস পর্যুদস্ত হইবে, নব কংগ্রেস কতকটা ভালো ফল করিলেও একশটির চেয়ে বেশি আসন পাওয়া তাদের পক্ষেও দুষ্কর হইবে আট পার্টি জোটভুক্ত দলগুলি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি হইতে মুছিয়া যাইবে, মুসলিম লীগের প্রতিপত্তি বাড়িবে, বাংলা কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক জোট চল্লিশটি আসন পাইলেই যথেষ্ট মনে করিতে হইবে এবং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি অন্ততঃ একশতটি আসন পাইবে। নির্বাচনের পর বিধানসভা একটা সাড়ে ছত্রিশ ভাজা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। সব কেন্দ্রগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ আছে। সরকারী কর্মচারীরা নির্বাচন পরিচালনার কাজে যোগ দিতে আপত্তি করিতেছেন। আপত্তি ব্যাপক হইয়া উঠিলে বলপ্রয়োগের নীতি অবলম্বন করাও সুবিধাজনক হইবে না। দণ্ডের ভয় দেখাইয়া অনিচ্ছুক কর্মচারীদের ঘাড়ে ভোটবাক্স চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব হইলেও সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনা করা উহার ফলে সম্ভব হইবে না। এমনকি শেষ পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীরা সবাই মিলিয়া বাঁকিয়া বসিতে পারেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ

শ্রীপাকজন্য যুগজ্যোতি পত্রিকায় ভারত সরকারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ চেষ্টার সমালোচনা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ঐ বিষয়টা সুবিচারের চক্ষে দেখা সহজ হয়। আমরা ঐ সমালোচনার মূল ভাগ নিচে প্রকাশ করিতেছি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে ভারত সরকার যেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এর পক্ষে প্রচার চালানো হচ্ছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পথে ঘাটে আনাচে কানাচে, পত্র পত্রিকাতে, সিনেমার পর্দায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। মাধ্যম হিসাবে রেডিওকেও বাদ দেওয়া হচ্ছে না। রেডিও ঘরে ঘরে 'অশ্লীলতার বাণী' পৌঁছে দিচ্ছে। এমন প্রচার আর নতুন নতুন আবিষ্কার সমাজে ব্যভিচার ও

অনাচারের আমদানী করছে, সমাজকে অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

ভারত সরকারের অবস্থা দেখে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত একটি প্রবাদের কথা মনে পড়ছে। প্রবাদটি এই 'ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারণের যম!' প্রবাদের অর্থ, যে স্বামী স্ত্রীর ভাত যোগাতে পারে না সেই স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করতে হয় পারদর্শী। স্থুলতিকটু হলেও প্রবাদটি ভারত সরকারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। দেশময় আজ ক্ষুধার্তের হাহাকার, অশিক্ষার অন্ধকারে অনেকে অন্ধ, বেকারত্বের যন্ত্রণায় যুবশক্তি আজ মুহ্যমাণ। এ সবের সমাধানে ভারত সরকার অযোগ্য, তাই তার এত বাগাড়ম্বর, এত চণ্ডমূর্তি তাই। নিজের সৃষ্ট ব্যর্থতাকে চাপা দিতে ভারত সরকারের এই প্রচার অভিযান—দেশবাসীর মন অন্য দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে।

জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের স্থান দ্বিতীয় এ কথা ঠিক। আগামী আদমসুমারীতে জনসংখ্যা যে পঞ্চান্ন কোটিতে পৌছুবে একথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু প্রশ্ন—মানুষ কি শুধু পেট নিয়েই জন্মগ্রহণ করে? সেই সঙ্গে তার দুটু হাতও থাকে না? সুযোগ পেলে এই হাতে অর্থাৎ শ্রম তথা বুদ্ধি দিয়ে ক্ষেতে সে সোনা ফলাতে পারে, শিল্পক্ষেত্রে প্রভূত উৎপাদন করতে পারে। পারে বলেই পাশ্চাত্য দেশে মানুষের জন্মকে অভিশাপ বলে মনে করে না, সেখানে নব জাতককে আশীর্বাদরূপেই গ্রহণ করে। মানব শক্তিকে সেখানে সম্পদ বলেই মনে করে। চীন-জাপান-রাশিয়া প্রসঙ্গে বলছি এসব কথা। জাপান ও রাশিয়াতে না হোক জনসংখ্যা কম, চীনে তো কম নয়—প্রায় পঁচাত্তর কোটি, পৃথিবীতে প্রথম। এই সব দেশে তো মানুষের জন্ম নিয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ওঠে না। ওঠে না আরও অন্যান্য দেশে। প্রশ্ন উঠতে পারে এইসব দেশে তো ভূমির পরিমাণ যথেষ্ট, ঠিক কথা। কিন্তু একথাও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সব জমিই উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না সেখানে। ভারতে. পতিত জমির পরিমাণ আজও নগণ্য নয়। তাছাড়া নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বা বৃদ্ধি পেয়েছে, পূর্বে যে জমিতে এক ফলন হতো যেখানে দু'ফলন উঠছে। এমন দিন হয়তো আ যখন উৎপাদিকা শক্তি আরও বাড়বে, জমিতে তি চার ফলন করা অসম্ভব নাও হতে পারে। তাছ রয়েছে শিল্পোন্নয়ন। এর মাধ্যমেও দেশ প্র বিত্তশালী হতে পারে। উৎপাদিত দ্রব্যের যদি সমবণ্টন, পৃথিবীতে থাকে যদি দেয়া-নেয়ার মনোভ তবে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা আসলে তে কোন সমস্যাই হতে পারে না।

ভারত সরকার বার বার প্রমাণ করে দিয়েছেন। সমস্যা সমাধানের নামে সমস্যা সৃষ্টিতে তারা পারদর্শ ভারত সরকারের দ্বিতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট হলো. সমস্যাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন তার মানবতার প্রশ্নে বহু বিবাহ আজকাল বর্বরতা ছা আর কিছু নয়। অথচ ভারত সরকার ধর্মের না সেই বর্বরতাকে জিয়েই রেখেছেন এক শ্রেণীর মধ্যে— ধর্মনিরপেক্ষতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে। বহু বিবা নিষিদ্ধ আইন সেই শ্রেণীর মধ্যে যদি প্রসারিত হতে তবে মানবতার জয়ই শুধু হতো না, জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত যে সমস্যার জন্যে ভারত সরকার বিশেষভাবে বিব্রত সেই সমস্যারও খানিকটা সমাধান হতো—যে জন্যে প্রয়োজন হতো না অশ্লীলতা আমদানীর, অপ ব্যয়েরও না।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু বি কারণে জনসংখ্যা বাড়ছে তা তলিয়ে দেখা হয় না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূলে রয়েছে ক্ষুধা আর অশিক্ষা। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত যারা, যারা পায় না পেট ভরে খেতে, মা ষষ্ঠির কৃপা হয় তাদের উপর বেশী দারিদ্র্য যাদের নিত্য সঙ্গী বহু সন্তানের সঙ্গী হয় তারা। অপরদিকে, শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত যারা, অভাবের যন্ত্রণায় যারা নয় ভারাক্রান্ত, প্রয়োজন মিটিয়ে জীবনকে উপভোগ করতে পারে যারা বিভিন্নভাবে তাদের ঘরে বহু সন্তানের আগমন ঘটে না। তাই জনসংখ্যা

বুদ্ধি রোধে প্রথমে প্রয়োজন দারিদ্র্যতা দূর করা—দেশ থেকে বেকারত্বের অভিশাপ নির্মূল করা, শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার করা।

আসাম ও আসন্ন নির্বাচন

করিমগঞ্জের (আসাম) যুগশক্তি পত্রিকায় নির্বাচন বিষয়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা কিছু কিছু তুলিয়া দিলাম।

লোকসভার আসন্ন মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ রাজ্যব্যাপী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা শুরু হয়েছে। নির্বাচনী জোট কিছু একটা আসামে স্পষ্ট ভাবে না হলেও নির্বাচনী সমঝোতা যে হবেই, তা সুনিশ্চিত। আসাম এ বিষয়ে সর্ব্বভারতীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। শাসক কংগ্রেস দল অধিকাংশ রাজ্যেই কম্যুনিষ্ট পার্টি ও পি এস পি-র সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চাইছে। প্রকাশ্য অথবা গোপন বুঝাপড়া প্রায় রাজ্যেই হয়েছেও; আসামে কিন্তু এই দুই দলই কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ এবং শাসক কংগ্রেসের হাত থেকে লোকসভার অধিকাংশ আসন কেড়ে নেওয়ার জন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি ও পি এস পি এক জোট হয়ে সর্ব্বশক্তি দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তৈরী হচ্ছে। এস, এস, পি-ও কতকগুলি কেন্দ্রে তাদের প্রার্থী দাঁড় করাবে, কিন্তু অন্য বামপন্থী দলগুলির সঙ্গে সমঝোতায় না এলে কোন লোকসভা আসন জয় করা তাদের পক্ষে শক্ত হবে। পি, এস, পি, নেতৃত্ব এস, এস, পি-কে কংগ্রেস বিরোধী ভোট ভাগ না করার উদ্দেশ্যে একটি আসন-সমঝোতায় আসার জন্য চাপ দিচ্ছেন বলে জানা গেছে। মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি আসামে এখনও তেমন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। দু'একটি কেন্দ্রে তারা প্রার্থী দেবেন, কিন্তু তা মুখ্যতঃ সংগঠন প্রসারের জন্য। এস, ইউ, সি-ও তাদের পক্ষে প্রার্থী দাঁড় করানোই বড় মনে করছেন, কোন আসন জয়ের আশা তারা করেন না। অন্য বামপন্থী দলের সঙ্গে আসন রফায় না এলে নির্বাচনী সাফল্য আর, সি, পি, আই-র পক্ষেও অসম্ভব। জনসঙ্ঘ বা স্বতন্ত্র দলের আসামে কোন রাজনৈতিক প্রভাব নেই। সংগঠন কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছু বলা শক্ত তবে তাদের নেতিবাচক ভূমিকাই বেশী প্রাধান্য পাবে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

অন্ততঃ পক্ষে চারিটি আসনে এইবার নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব প্রবল হবে নির্বাচনী পরিভাষায় যাকে মর্য্যাদার লড়াই বলে। গৌহাটি কেন্দ্রে শ্রীধীরেশ্বর কলিতার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী খুব শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী, উপরন্তু এই আসনে সি, পি, এম, এর শ্রীনন্দেশ্বর তালুকদার ও সংগঠন কংগ্রেসের শ্রীরমেশ চৌধুরী দাঁড়িয়েছেন। এই কেন্দ্রে বিধানসভার মোট সাতটি আসনের মধ্যে মাত্র দু'টি কংগ্রেসের আয়ত্বে বাকী পাঁচটিই কম্যুনিষ্ট, পি, এস, পি, বা তাদের গোষ্ঠিভুক্ত এম, এল, এ এর হাতে। সেই হিসেবে পি, এস, পি কম্যুনিষ্ট আঁতাতের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকলিতাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেন বলে মনে করা যেতে পারে। সি, পি এম প্রার্থী থাকায় অবশ্য বেশ কিছু বামপন্থী ভোট ভাগ হবে। কিন্তু সংগঠন কংগ্রেসের প্রার্থীও একই ভাবে কিছু কংগ্রেসী ভোট ভাঙতে পারবেন। কম্যুনিষ্ট মহল এই আসন নিশ্চিন্ত বলেই মনে করছেন।

শ্রীঅরবিন্দ ও মানব জাতির ভবিষ্যত

শ্রীঅনিল বরণ রায় সম্পাদিত স্বর্ণযুগ পত্রিকাতে "শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবনে পঞ্চস্বপ্ন" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে আমরা কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রীঅরবিন্দের পঞ্চম ও প্রধান স্বপ্ন মানবজাতির ভবিতব্য, মানব হইবে অতি-মানব, এই মর্ত্ত্য দেহেই দেবতা, বেদের ভাষায় মর্ত্ত্যেষু অমৃত। আজ জগতের সর্বত্র বর্ণ, ধর্ম্ম, কালচার, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আদর্শ প্রভৃতি লইয়া ভেদ বিবাদ খুবই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে—আচিরে ইহার সমাধান না হইলে মানবীয় সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। এই পরম সমাধানেরই পথ দেখাইয়াছেন, শ্রীঅরবিন্দ। তিনি সকল ভেদ বৈষম্যের মধ্যে মানবজাতির যে মূল ঐক্য, এমন কি একত্ব রহিয়াছে সেইটিই দেখাইয়া দিয়াছেন। মানুষ যেখানেই থাকুক এবং যাহাই করুক, মানুষ

হিসাবে তাহারা সকলেই এক, তাহাদের প্রকৃতি, human nature সর্ব্বত্রই এক। এটা ত সকলেই স্বীকার করিবেন, যদিও কার্যতঃ বাহ্য দ্বন্দ্বের জন্য সেটা মনে রাখা হয় না। মানুষ হিসাবে কোন দেশ বা জাতির মানুষ অন্য দেশের মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে—দোষ ও গুণ সকল মানুষের মধ্যেই আছে। এই দোষগুলি দূর করিয়া মানুষকে perfect বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করাই পৃথিবীতে মানুষের ভবিতব্য। মানুষ এখন চেতনার যে স্তরে রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা একটা উর্দ্ধতন স্তরে উঠিতে হইবে—চেতনার উন্নতির সহিত তাহার দেহের উন্নতিও অনিবার্য্য। একটি আদিম যুগের মানুষ এবং এখনকার সভ্য মানুষের দৈহিক গঠন তুলনা করিলেই দেখা যায় মানুষ বাহ্যিক আকৃতি ও গঠনে কত বেশী সৌষ্ঠবশালী ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার দেহ জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে মুক্তি পায় নাই—ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় মানুষ এই মুক্তিও একদিন লাভ করিবে, ইহাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের জীবনের প্রধান স্বপ্ন ও সাধনা। তাঁহার অন্য স্বপ্নগুলি এই প্রধান স্বপ্নেরই উদ্যোগপর্ব্ব বলা যাইতে পারে। এখন মানুষের মধ্যে যে মন ও বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে, যাহার ফলে মানুষ অন্য সকল জীবজন্তু অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে, এইখানেই ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা থামিয়া যায় নাই, মানস চেতনের পর অতিমানস চৈতন্যের বিকাশ হইবে—তাহারই ফলে মানুষ হইবে অতিমানব। এই উন্নয়নের জন্য মানুষকে এখন অধ্যাত্মভাবাপন্ন হইতে হইবে, মানুষের জীবনে এখন যে মানসিক বুদ্ধির প্রাধান্য ইহাকে ছাড়াইয়া সেখানে আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। মানুষকে এই ভাবে অধ্যাত্মভাবাপন্ন করাই (Spiritualisation) শ্রীঅরবিন্দের চতুর্থ স্বপ্ন।

মানব সভ্যতা এতদিন যে ধর্ম Religion ও নৈতিকতা Morality অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়াছে—এখন সেইগুলিই তাহার প্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। Religion হইতেছে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তাঁহার উপাসনার জন্য পদ্ধতি ও প্রণালী। এখানে বস্তুতঃ ভগবান সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান বা উপলব্ধি নাই, মানসিক ধারণা ও বিশ্বাস (dogma) বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন হয়, নিজেরটিকেই লোকে একমাত্র সত্য বলিয়া এবং আর সকলকে মিথ্যা মনে করিয়া পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব করে—এই ভাবে পৃথিবীতে কত যুদ্ধ ও রক্তপাত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। Religion যে অজ্ঞান মনের ক্রিয়া—একটি এখন বুঝিতে হইবে, এটাকে ছাড়াইয়া প্রকৃত ভগবদ্‌জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—আত্মা ও ভগবানকে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন ও উপলব্ধি করিয়াই এই জ্ঞান লাভ করা যায়। সকল দেশেই এই আধ্যাত্মিকতার সন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু ভারত এ বিষয়ে যত অগ্রসর হইয়াছে অন্য কোথাও আর তাহা সম্ভব হয় নাই। তাই আজ পৃথিবীর সকল দেশের লোক অধ্যাত্ম সাহায্য এবং একটা দিশারী আলোকের জন্য ভারতের দিকে ফিরিতেছে। ভারত জগৎকে এই আলো দিবে, এইটিই শ্রীঅরবিন্দের জীবনের চতুর্থ স্বপ্ন। প্রাচীন ভারতে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে অধ্যাত্ম সাধনা হইয়াছিল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে তাহার সার সংগৃহীত হইয়াছে। তবে গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ—শুধু গীতার শ্লোকগুলি পড়িয়া তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, আর শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ গীতার যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহাও এ যুগের উপযোগী নহে।

দেশ-বিদেশের কথা

বৃটেনে বেকারীবৃদ্ধি

অনেকে ভাবিয়া ছিলেন যে রক্ষনশীল দল শাসন ভার প্রাপ্ত হওয়ার ফলে বৃটেনের আর্থিক অবস্থা উন্নততর হইবে; কারণ অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী দেশগুলি রক্ষনশীলতার সমর্থক ও তাহাদের অর্থনৈতিক সহযোগীতা আরও বিস্তৃত ও জোরাল হইলে বৃটেনের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে অর্থনৈতিক উন্নতি হইতেছে না এবং বিশেষ করিয়া বৃটেনের বেকার সমস্যা আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছে। ১১ই জানুয়ারীতে যে হিসাব করা হয় তাহাতে বৃটেনে সাহায্য লাভের অধিকারী সাত লক্ষ ত্রিশ হাজার বেকার মানুষ ছিল। বৃটেনে বেকার ভাতা যাহা দেওয়া হয় তাহাতে এই সকল মানুষকে বৃটেন সপ্তাহে দেড় দুই কোটি টাকা দিতে থাকিবে। অর্থাৎ বাৎসরিক বেশ মোটা খরচের কথা। ভারতবর্ষে বেকার কত আছে তাহা কেহ হিসাব করেনা। করিলে নিশ্চয়ই ৭লক্ষ না হইয়া ৭কোটিই দেখা যাইত। এইসকল বেকার ব্যক্তিকে ভারত যদি সপ্তাহে পাঁচ টাকাও দিত তাহা হইলে ভারতের বেকার ভাতাতেই বাৎসরিক ব্যয় হইত দুই হাজার কোটি টাকা। ভারতের যাহা রাজস্ব তাহা হইতে সামরিক ব্যয়ের টাকা বাদদিলে প্রায় বাকি সমস্ত টাকাই ঐ হারে ভাতা দিলে বেকার ভাতাতেই খরচ হইয়া যাইত। অতএব সহজেই বোধগম্য হয় যে ভারত কখনও বেকার ভাতার ব্যবস্থা করিলেও তাহা সম্পূর্ণ হইবে না। শতকরা ১০ জন কর্ম্মীকেও সাহায্য করার ক্ষমতা ভারতের আছে কি না সন্দেহ। ভারতে বেকারীর প্রসার হইয়াছে প্রধানত বড় বড় কারখানা গঠন করিয়া সমস্ত মূলধন আটকাইয়া ফেলাতে। সর্বত্র ব্যপক ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবার চালাইলে এইরূপ হইত না। ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের ব্যবস্থা মূলধন বহুল বহুমূল্য কলকব্জা সমন্বিত কারখানাতেই শুধু হইতে পারে এমন নহে। অল্পমূলধন ও কলকব্জার সাহায্যে শ্রমশক্তির পূর্ণতর ব্যবহারেও সে ব্যবস্থা করা যায়। কুটির শিল্প গ্রামে গ্রামে গঠিত হইলে অযথা মালপত্র লইয়া দূরদূরান্তরে চালানের আয়োজন করিতে হয় না। উৎপাদন স্থলের নিকটই উৎপাদিত বস্তুর ব্যবহার হইলে বহন করিয়া লইয়া যাওয়াতে ব্যয়াধিক্য হয় না। কিন্তু নেহেরু যুগ হইতেই ভারত ভুল পথে চলিয়া বৃহৎ বৃহৎ কারখানা গঠনে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে। ফলে শ্রমশক্তির ব্যবহার ব্যবস্থা উপযুক্ত পরিমাণে হইতে পারে নাই। এই কারণে আজ কোটি কোটি মানুষ এ দেশে বেকার ও আরও অনেক শ্রামক অংশতঃ বেকার।

ইউগ্যাণ্ডাতে "রাজা" বদল

ইউগ্যাণ্ডার রাষ্ট্রপতি ডঃ মিলটন ওবোটে যে সময় কমনওয়েলথ কনফারেন্স করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় ইউগ্যাণ্ডার সেনা বাহিনী রাজশক্তি গায়ের জোরে নিজেদের হস্তে লইয়া মেজর জেনারেল ইদি আমিন দাদাকে সামরিক শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করে। এনটেবের হাওয়াই বন্দর ও কাম্পালার সরকারী আফিস

দফতর দখল করিয়া লইতে সৈন্যদের কোনই কষ্ট হয় নাই। কিছু কিছু যন্ত্র-বন্দুক ও মর্টার তোপ চালান হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা জনগণের উপর প্রভাব বিস্তারার্থেই করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সৈন্য দিগকে বাধা দিবার প্রায় কোন চেষ্টাই হয় নাই। নূতন সামরিক রাষ্ট্রপতি পরম ঔদার্য্যের নিদর্শন দেখাইবার জন্য প্রচার করেন যে ডঃ ওবোটে ইচ্ছা করিলে দেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন; কেহ তাঁহাকে বাধা দিবে না। এই সকল পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইবে কিনা কেহ বলিতে পারে না। রাষ্ট্রের গঠন ও স্থিতি যেখানে পুরাতন জাতীয় ঐতিহ্য ও সমাজিক আকাঙ্খা অভিরুচির উপর নিবিষ্ট হয়, সেখানে রাষ্ট্র সহজে স্থিতি হারায় না। যেখানে শুধু বাহিরের শক্তির অথবা ভিতরের ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠীর ইচ্ছার উপর রাষ্ট্র গঠিত হয় সেখানে তাহার ভিত্তি শক্ত হয় না ও সেইরূপ রাষ্ট্রের উত্থান পতন সহজেই হইয়া থাকে। আফ্রিকার নব সৃষ্ট রাষ্ট্রগুলি বৃটেনের ইচ্ছাতেই হঠাৎ গঠিত। সেই কারণে সেইগুলির স্থিতির নড়চড় হওয়া সহজ কথা।

খ্রুশ্চেভ, সেভ্‌তলানা ও অপরাপর স্মৃতি-কথা লেখক

খ্রুশ্চেভ তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন বলিয়া ঐ স্মৃতিকথার প্রকাশক পৃথিবীর জনসাধারণকে জানাইয়াছেন। রুশিয়ার প্রভুদিগের মতে ঐ স্মৃতিকথা খ্রুশ্চেভের দ্বারা লিখিত নহে, উহা জাল স্মৃতিকথা। ইতিপূর্ব্বে যখন স্টালিন কন্যা শ্রীমতী সেভ্‌তলানা নানা প্রকার স্মৃতিজাত কথা ইত্যাদি পৃথিবীর পাঠক দিগকে পরিবেশন করেন; তখন কথা উঠিয়াছিল, ঐ রুশিয়ার প্রভুদিগের তরফ হইতেই, যে শ্রীমতী সেভ্‌তলানার সকল স্মৃতিকথা অতীতে যাহা ঘটিয়াছিল ঠিক সরলভাবে সেই সকল ঘটনার উপর নির্ভরশীল নহে। ইহাতে দেখা যায় যে রুশিয়ার যে কোন ব্যক্তিই স্মৃতিকথা লিখিতে বসেন তাঁহাদের মনে তৎক্ষণাৎ স্মৃতি বিভ্রাটের আরম্ভ হয়। কারণ রুশিয়ার নেতাদিগের ইচ্ছামত মনোভাব জোয়াল প্রচার ও মত-সৃজন কার্য্যের দ্বারা মানুষের মনে জাগ্রত করা যাইতে পারে, কিন্তু অতীতের কথা যাহা স্মৃতি পথে জাগ্রত হয় তাহা ভুলাইয়া সে স্থলে অপর কথা বসাইয়া দেওয়া সম্ভবতঃ ততটা সহজ হয় না। সেই জন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস লিখাইবার পন্থা অনুসরণ করিলে হয়ত রুশনেতাদিগের অভিলাষ পূর্ণ আরও সহজে হইতে পারিত। কারণ আমেরিকানদিগের দ্বারা যদি খ্রুশ্চেভের স্মৃতি-কথা লিখিত হইতে পারে, তাহা হইলে রুশিয়ান প্রেরণায় তাহা আরও সহজে রুশিয়ার "খবর দফতর" হইতে অনায়াসে লিখিত হইতে পারিত।

আইন ও শান্তি রক্ষার কথা

বাংলা দেশে এখন যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে একটা কথা খুবই পরিষ্কার ভাবে লোকের মনে সর্ব্বদাই জাগ্রত হইতেছে। প্রবল রাজশক্তি হস্তে থাকা সত্ত্বেও সামান্য কয়েক সহস্র অপরাধীদিগকে দমন করিয়া দেশে আইন শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না কেন? সকলেই মনে করিতেছেন যে রাজ্যপাল ভবন হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নিম্নস্তরের রাজ কর্ম্মচারী অবধি কাহাকেও কর্ম্মক্ষম মনে করা যায় না। অথচ অক্ষম মানুষগুলিকে নিজ নিজ পদে মোতায়েন রাখিয়া দেশের অবস্থা ক্রমশঃ আরই অবনতির দিকে যাইতেছে। একথা বড়ই আশ্চর্য্যের যে শত শত মানুষ খুন জখম হইতেছে অথচ ধরপাকড় কোর্ট আদালত সাজার ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রায় কিছুই নাই কিম্বা থাকিলেও দৃষ্টিগোচর হয় না বলিলেই চলে। পুলিশ যাহাদের ধরিতেছে তাহাদের শাস্তি হইতেছে না; সুতরাং বুঝিতে হয় যে, পুলিশ হয় যাহাকে তাহাকে আন্দাজে ধরিতেছে, নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধীদিগকে ছাড়িয়া দিবার আয়োজন করিতেছে। এই সন্দেহের কারণ এই যে বহুলোকের মতে পুলিশের ভিতর অনেক লোক

রাজনৈতিক দলের সহিত সংযুক্ত এবং তাহাদিগকে সরাইয়া দিবার কোন ব্যবস্থা রাজ্যপাল ধাবন সাহেব করিতেছেন না। বাংলার পুলিশকে অন্য প্রদেশে কর্মে নিযুক্ত করিলে ও তাহাদের স্থলে অন্য প্রদেশের পুলিশ বাংলায় লইয়া আসিলে উদ্দেশ্য অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে বিষয়টা উচ্চস্তরের নির্দেশের বিষয়। তাহাতে রাজ্যপাল ও প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। ইহা ব্যতীত রাজ্যে আইন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত না থাকার ফলে অপরাধের বন্যা প্রবল বেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে ও তাহার সুযোগে পুলিশ যথেচ্ছা অপরাধীদিগকে চুরী, ডাকাইতি, খুনোখুনির সুবিধা করিয়া দিতেছে। কিন্তু ঐ সকল অপরাধই জনসাধারণের নিকটে রাষ্ট্রীয় দলের গুণ্ডাদিগের কার্য্য বলিয়া চালান হইতেছে। বাংলাদেশের আইন ও শৃংখলার পুনঃ প্রতিষ্ঠার মূল কথা এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে রাজকর্মচারীদিগকে সুবুদ্ধি ও সবলতায় সহিত নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য করা। ইহা করিতে হইলে অনেক ব্যক্তির কর্ম্ম হইতে অপসারণ অথবা অন্যত্র প্রেরণের আবশ্যকতা লক্ষিত হইবে। তাহা কি করা হইবে ?

অন্তঃসারশূন্য দলাদলি

দলাদলি প্রবল আবেগের সহিত চলিতেছে। প্রত্যেক দলই নিজেদের ভারতের অথবা বাংলাদেশের একমাত্র রক্ষক বলিয়া প্রচার করিতেছে এবং ঐ কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য অপর দলগুলির অক্ষমতার কথা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতেছে যে, অপর দলগুলিকে দিয়া দেশবাসীর কোনলাভ হইবে না। এই পারস্পরিক সমালোচনার সকল নিন্দার যদি শতকরা পঞ্চাশ ভাগও সত্য হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে রাষ্ট্রীয় দলগুলির কোনটির ভিতরেই সত্যকার দেশপ্রেম, জনসেবার আগ্রহ ও জাতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির উন্নতি সাধন চেষ্টার চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না। তাহাদের নেতা ও সভ্যদিগের একমাত্র আকাংখা স্বার্থ সিদ্ধি এবং সেই স্বার্থ অনেক সময়েই দেশের ক্ষতিকর অন্যায় গুপ্ত অভিপ্রায়ের সহিত জড়িত থাকিতে দেখা যায়। যথা ভারতকে যেসকল দেশ ও জাতি কমজোর ও অল্পপ্রভাবশালী করিয়া রাখিতে চায়, ভারতের অনেক রাষ্ট্রীয় দল সেই সকল বিদেশী রাষ্ট্রের অনুগত ভৃত্যের কার্য্য করিয়া ভারতের অশেষ ক্ষতি ও সম্মানের হানী করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে যে সকল রাষ্ট্রীয় দল সাধারণের চক্ষে সর্ব্বদাই প্রকট ভাবে উপস্থিত থাকিতেছে সেই দলগুলির মূল্য বিচার লোক সমাজে কিরূপ হইতেছে তাহা বলা যাইতে পারে। পুরাতন কংগ্রেস দল সম্বন্ধে লোকে বলে তাহারা ধন-কুবেরদিগের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া আছে, তাহারা সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট। তাহাদের দলপতিগণ অন্যায়ভাবে নিজেদের অর্থ ও শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহার উপর তাহারা আমেরিকার কথায় ওঠে বসে এবং তাহাদের রাজত্বে গরীব আরও গরীব হইবে এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদিগের ঐশ্বর্য্য আরও বৃদ্ধিলাভ করিবে। কংগ্রেস (ইন্দিরার) নামেই কংগ্রেস ; বস্তুতঃ তাহারা রুশিয়ার প্রেরণা চালিত এবং তাহাদের ব্যাঙ্ক জাতীয় করা অথবা রাজামহারাজাদের মাসহারা বন্ধ করার চেষ্টা, সমষ্টিবাদের অভিনয় মাত্র। উপরন্তু তাহারা বাংলা দেশের মহাশত্রু কারণ তাহাদের চেষ্টা নানা ভাবে বাংলা দেশের ক্ষতি করিয়া অপর প্রদেশের সুবিধা করিয়া দেওয়া।

সি পি আই রুশিয়ার আদেশের দাস। তাহাদের নিজস্ব বলিয়া কিছু নাই। ইহা ব্যতীত তাহাদের শাসন স্থাপিত হইলে তাহা অল্পকালও টিকিবে না। সি পি এম ত খোলাখুলি ভারতশত্রু চীনের অনুরক্ত। তাহারা চায় শ্রেণী সংগ্রাম ও তাহাদের জন্যই দেশের আজ এই অবস্থা হইয়াছে, তাহারা যদি শক্তি লাভ করে তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দেশের অবস্থা যত খারাপ হইবে, সি পি এম এর ততই আনন্দ হইবে ; কারণ তাহারা চায় দেশে সকল

আইন শৃঙ্খলা রাজ্য পরিচালনার কার্য্য বানচাল করিতে। সেইরূপ হইলে তখন দেশ কম্যুনিজম মানিয়া লইয়া চীনের দাসত্বে আত্ম বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবে।

অন্যান্য দলগুলি ক্ষুদ্রাকার ও তাহাদের শক্তি অল্পই। কিন্তু তাহারা কোন ভাবেই দেশের কোনও উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া কেহ মনে করে না।

টাকার মূল্য হ্রাস চেষ্টা

কালোবাজারে যে ডলার বিক্রয় হয় তাহার এক ডলার ক্রয় করিতে ১০ টাকা বা ততোধিক মূল্য লাগে। ইহাতে কোন কোন আমেরিকান মহারথীদিগের মতে ভারতের টাকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের হার পরিবর্তন করিয়া এক ডলারের মূল্য ১০ টাকা করা উচিত। বর্ত্তমানে যে হার স্থির করা আছে তাহা হইল এক ডলারের মূল্য ৭৷৷০। কিন্তু ঐ মূল্য অর্থে ইহা বুঝিলে চলিবে না যে ৭৷৷০ টাকা দিলে এক ডলার পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ খোলা বাজারে ৭৷৷০ অথবা ১০৷১২ টাকা দিলেও কেহ ডলার ক্রয় করিতে পারে না। যদি সরকার বাহাদুরের মর্জ্জি হয়, তাহা হইলে ডলার ৭৷৷০ টাকায় পাওয়া যাইবে; নতুবা নহে। সুতরাং আমেরিকান মহারথীদিগের অভিযোগ অকারণে করা হইয়াছে। একথা ঠিক যে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে টাকার ক্রয়শক্তির হ্রাস হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ডলারের মূল্য টাকায় কি হইবে তাহা বলা যায় না। আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে টাকা, ক্রয় বিক্রয় ব্যবস্থা নাই। শুধু আছে সরকারী নির্দ্দেশে মাত্র অপর দেশীয় মুদ্রার বিক্রয় ব্যবস্থা। অতএব খোলাবাজার ও কালো-বাজার নামগুলি অনর্থক উচ্চারিত হয়। এখন দাম যাহাই করা হইবে কালোবাজারে তাহা অপেক্ষা অধিক মূল্যে ডলার বিক্রয় হইবেই। সুতরাং প্রথমে চাই বাজার খুলিয়া দেওয়া অন্য কথা পরে।

সাময়িকী

পরলোকে ডাঃ মুন্সি

কানাইয়ালাল মানেকলাল মুন্সি ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বরোদা কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে আইনজীবিরূপে যোগদান করেন। সেসময় তাঁহার বয়স মাত্র ছাব্বিশ বৎসর। তিনি এই কার্য্যে প্রভূত অর্থ ও যশ অর্জ্জন করেন ও পরে সুপ্রীম কোর্টেও তিনি মামলা পরিচালনা করিতে উপস্থিত হইতেন। তিনি বোম্বাই কাউন্সিল (পরে এসেম্বলী)-এ ১৯২৭ হইতে ১৯৪৬ পর্য্যন্ত সভ্য ছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে তিনি ১৯৩০শে নির্বাচিত হ'ন। পরে তিনি নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলেন ১৯৩০-৩৬ পর্য্যন্ত ও পুনর্ব্বার ১৯৪৭ এ। ১৯৩৫এর শাসন সংস্কারান্তে তিনি বোম্বাইএর হোম মিনিষ্টার নিযুক্ত হ'ন এবং ১৯৩৮ খৃঃ অব্দে ঐ কার্য্যে ইস্তাফা দিয়া তিনি ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের তিনি জীবনের শেষদিন অবধি সভাপতি ছিলেন এবং ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির পুনর্গঠন চেষ্টায় তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই চেষ্টার মধ্যে প্রাচীনের সংরক্ষণের সহিত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় এমন একটা নতুনত্ব আনিয়াছিল যাহা তৎপূর্ব্বে অপর কোনও ঐরূপ প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় নাই। তিনি ১৯৪১ খৃঃ অব্দে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া অখণ্ড হিন্দুস্থান দল গঠন চেষ্টা করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল মুসলীম লীগের ভারত-বিভাগ চেষ্টা যাহাতে সফল না হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

ডাঃ মুন্সি ১৯৪৬এ পুনর্বার কংগ্রেসে যোগদান করেন ও তিনি সংবিধান রচনাকারীদিগের অন্যতম ছিলেন। ১৯৪৮ খৃঃ অঃ তে তিনি হায়দ্রাবাদে এজেন্ট জেনারেল নিযুক্ত হ'ন। তৎপরে তিনি লোকসভায় গমন করেন ও ১৯৫২ অবধি তাহার সভ্য থাকেন। ১৯৫০-৫২ অবধি ডাঃ মুন্সি ইউনিয়ন ফুড এণ্ড এগ্রিকালচার মিনিষ্টার ছিলেন। তিনিই প্রথম সরকারী-ভাবে প্রতিবৎসর বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত করা আরম্ভ করেন। উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে ভারতের অরণ্য সম্পদ ক্রমশঃ বিস্তার ও বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। ১৯৫২ খৃঃ অব্দে তিনি উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হ'ন ও ১৯৫৭ পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

ডাঃ মুন্সি ১৯৫৯-শে পুনর্ব্বার কংগ্রেস ত্যাগ করেন ও স্বতন্ত্র দলে যোগদান করেন। তিনি আরম্ভকাল হইতেই স্বতন্ত্র দলের একজন উপসভাপতি ছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় তিনি ১৯১৫ অব্দে সহ সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। পরে তিনি গুজরাট পত্রিকার সম্পাদক হ'ন। ইংরেজী ও গুজরাটিতে ডাঃ মুন্সি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের আত্মস্মৃতিও এই সকলের অন্যতম।

বহু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাঃ মুন্সি নানান উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই সকলের মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডি, লিট (সম্মানের সহিত)—বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়; এল, এল, ডি—বোম্বাই, সাগর ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতি। ডাঃ মুন্সির মৃত্যুতে ভারত একজন কৃতী ও বিদ্বান সন্তানকে হারাইল। ডাঃ মুন্সি রাজনীতির সহিত আজীবন জড়িত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্রে কূটনীতি-বিদের দোষগুলি কখনও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার কারণ তিনি সর্ব্বদাই সুরুচির আদর্শ অবলম্বনে চলিতেন; যেন তেন প্রকারে নিজের বা দলের মতলব সিদ্ধ করাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। ইহার ফলে হয়ত তিনি রাষ্ট্রক্ষেত্রে আরও উচ্চ শিখরে উঠিতে সক্ষম

হ'ন নাই। কিন্তু সেরূপ উন্নতি তিনি কখনও কামনা করিতেন না। আদর্শের পথে অবিচলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ভারতমাতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

বিমান চুরি

ভারতীয় এয়ার লাইনসের একটি বিমান শ্রীনগর হইতে জম্মু গমনকালে দুইজন পাকিস্থানের দ্বারা নিযুক্ত আততায়ী বিমান চালককে পিস্তল দেখাইয়া লাহোরে যাইতে বাধ্য করে। লাহোর হাওয়াই বন্দরে অবতীর্ণ হইলে পরে ঐ দুইব্যক্তি বিমান চালক ও যাত্রী দিগকে বিমান হইতে নামাইয়া দেয় ও নিজেরা বিমান দখল করিয়া থাকে। পাকিস্থানী কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের বিশেষ কোন গ্রেপ্তার চেষ্টা না করার ফলে ঐ দুই দস্যু প্রায় তিন দিন বিমান দখল করিয়া বসিয়া থাকে। শুনা যায় যে তাহারা পাকিস্থানী কর্ত্তাদিগের সাহায্যে বিমান হইতে নামিয়া টেলিফোন যোগে নিজেদের দলের লোকেদের সহিত কথাবার্ত্তাও চালাইয়াছিল। যাহাই হউক নানাভাবেই দেখা গিয়াছে যে ঐ দুই দস্যু পাকিস্থানী সরকারের সহায়তাতেই এই দুষ্কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। তিন দিন পরে যখন বিমানটি তাহারা বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়াইয়া দেয়—তখনও পাকিস্থানীদিগের কোনও-তাপ উত্তাপ লক্ষিত হয় নাই। বিমান ধ্বংস করিয়া তাহারা মহা আনন্দে পাকিস্থানী-দিগের আসরে সম্মানার্হরূপে বিরাজ করিতে থাকে ও এখন অবধি তাহাদের এই মহা অপরাধের জন্য তাহাদিগকে কোনই শাস্তি, শাসন বা কষ্টভোগ করিতে হয় নাই।

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া হইয়া একটা নিয়ম করা হইয়াছে যে বিমান দখল করিয়া যদি কেহ গায়ের জোরে বিমান চালককে গন্তব্যস্থান ব্যতীত অপর স্থানে যাইতে বাধ্য করে তাহা হইলে সেই কার্য্য গর্হিত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। পাকীস্থান কিন্তু ঐরূপ অন্যায়ে দুই ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিয়া শাস্তি হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে। আন্তর্জাতিক নিয়মে পাকিস্থান একটা মহা অন্যায় কার্য্যে করিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে যে পাকিস্থানকে বিশ্বজাতি সংঘ কি ভাবে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করে। কেহ কিছু করিবে বলিয়া গভীর সন্দেহ। কারণ পাকিস্থান, আমেরিকা, রুশিয়া ও বৃটেনের দ্বারা সর্ব্বদাই রক্ষিত ও আশ্রিত। অর্থাৎ যত দোষই করুক পাকিস্থানের সাত খুন মাফ। অন্ততঃ এ সকল সুবিধাবাদী জাতিগুলির নিকট। তাহা হইলে মনে হয় যে পাকিস্থানকে শায়েস্তা করিতে হইলে ভারতকে শুধু নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। কতটা সাজা দিবার সাহস ভারতের হইবে তাহাও আলোচনার বিষয়। আমেরিকা, রুশিয়া ও বৃটেন ভারতের উপর কি ভাবে ও কতটা চাপ দিয়া পাকিস্থানকে বাঁচাইবে তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। যাহাই হউক বর্ত্তমানে ভারত পাকিস্থানের বিমান চলাচলে বাধা দিয়া উহাদের কিছুটা অসুবিধা ঘটাইতে পারিয়াছে। ঐরূপ চাপ দেওয়া কতদূর চলিবে তাহাও মহা মহা সামরিক শক্তিদিগের মতলবের ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। পাকিস্থান অবশ্য বলিতেছে যে বিমান দস্যুগণ দস্যু নয়, তাহারা কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা। কিন্তু লাহোরে কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম কি করিয়া হইতে পারে? আর একটা কথাও এই সূত্রে উত্থিত হয়। পূর্ব্ব পাকিস্থানে মুজিবর রহমন সাহেবের বিজয়ের ফলে পশ্চিম পাকিস্থানের অবস্থা বিশেষ কম জোর হইয়াছে। সেই অবস্থা হইতে পুরাতন শক্তিশালী অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইলে পশ্চিম পাকিস্থানকে হয় কাশ্মীর দখল অথবা অপর কিছু করিয়া সামরিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। সুতরাং এখন ভারতের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা "পলিসি" বলিয়া ধার্য্য নাও হইতে পারে। বিমান দস্যুদিগকে ভারতের হস্তে ফিরাইয়া না দিলে এই বিষয়টার কোন ন্যায্য সমাধান হইতে পারে না।

আর একবার চন্দ্রে গমন

বুধবার ১০ই ফেব্রুয়ারীর প্রারম্ভে, রাত্রি আন্দাজ ২৷৷০টার সময়, চন্দ্রলোক হইতে প্রায় পঞ্চাশ কিলো

প্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া "চতুর্দশ অ্যাপোলো" প্রশান্ত মহাসাগরে সামোয়ার সন্নিকটে আসিয়া নামিয়াছে। অভিযানের নেতা ছিলেন অ্যালান শেপার্ড। আর ছিলেন এডগার মিচেল ও স্টুয়ার্ট রুসা। চন্দ্রলোকে গমন ও সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন সুকঠিন গণিতের অতি সূক্ষ্ম গণনার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। এই কারণে ঘণ্টায় ৪।৫ হাজার মাইল গতিবেগ রক্ষা করিয়া এবং লক্ষ লক্ষ মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করিয়াও অনন্ত আকাশচারী বৈমানিকগণ যথাস্থলে, ঠিক যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়া থাকেন। "চতুর্দশ অ্যাপোলো" একেবারে বিনা বাধায় সকল কিছু সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন বলা যায় না। চন্দ্রে যে স্থলে তাহারা যাইবেন ঠিক ছিল সেখানে তাঁহারা পৌঁছাইতে সক্ষম হ'ন নাই। কারণ পরিশ্রমের ফলে তাঁহাদের হৃৎপিণ্ডের গতি অসম্ভব বাড়িয়া যায় ও তাঁহাদের আরও উপরে ও দূরে যাওয়া বন্ধ করিতে হয়। ইহার পূর্ব্বে আকাশ পথে চন্দ্রে উত্তরণ-যানের সহিত আকাশ-যানের যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টার পরে সে কার্য্য ঠিক ভাবে করা সম্ভব হয়।

কিন্তু "ত্রয়োদশ অ্যাপোলোর" যাত্রাকালে যেরূপ মারাত্মক গোলমাল হয়, এইবারে সেইরূপ কিছু হয় নাই। এইবারে যেসকল বহু মূল্যবান প্রস্তরাদি সংগৃহীত হইয়াছে সেগুলির পূর্ণ বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা হইলে পরে বলা যাইবে যে এইরূপ আকাশ যাত্রা জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক দিয়া কতটা ফলপ্রসূ। "চতুর্দশ অ্যাপোলোর" অভিযাত্রীদিগকে প্রায় ২০০ শত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্য্য করিতে বলা হইয়াছিল। তাঁহারা অল্প কয়েকটি অনুসন্ধান কার্য্য করিতে পারেন নাই। অন্যগুলি করিয়া আসিয়াছেন।

লাওসে অনুপ্রবেশ

৮ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদ যে বহু সহস্র দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সৈন্য আমেরিকান হেলিকপ্টার সমর্থিত ভাবে লাওসে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। ইহাদিগের উদ্দেশ্য উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্য চলাচলের হো চি মীন পথ বন্ধ করা। অর্থাৎ, যদিও যুদ্ধ ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইতেছে বলিয়া রাষ্ট্র করা হইতেছে তাহা হইলেও বস্তুতঃ যুদ্ধ চলিতেই থাকিতেছে এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভিয়েৎনামী অথবা আমেরিকানগণ, কেহই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। চীন লাওসের সীমান্তে নিজেদের সৈন্যশক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া বিষয়টাকে আরও ভীতিজনক সম্ভাবনাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কারণ ঐ স্থলে যদি চীনও এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িয়া ক্রমে ক্রমে আরও ব্যাপক ও আন্তর্জাতিক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ভারতবর্ষ শুনা যায় দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও আমেরিকাকে শান্তি রক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষের কথা জগৎশান্তি সংঘের মধ্যে বিশেষ কেহ শুনে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করিয়া কিছু আশার কথা বলা চলে না। রাজপুত্র সিহানুক এখন পিকিংএ দরবার করিতেছেন। তিনিও চীনাদিগকে যুদ্ধে নামাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

ওবোটেকে ইউগ্যাণ্ডা হইতে বিতাড়ন

ইউগ্যাণ্ডার রাষ্ট্রপতি ডঃ মিলটন ওবোটেকে সামরিক শক্তি ব্যবহারে তাঁহার নিজ পদ হইতে অপসৃত করাতে পূর্ব্ব আফ্রিকার জাতিগুলির মধ্যে কিছু আলোড়ন আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন জাতি এইভাবে ডঃ ওবোটেকে অপসারণ করাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছে। কিনিয়া ইউগ্যাণ্ডা ও ট্যানজানিয়া, এই তিন রাজ্যের যে সম্মিলিতভাবে নানা ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা, জাতিগুলির মধ্যে ডঃ ওবোটেকে অপসারণ করার জন্য মতানৈক্য হইলে সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। ইউগ্যাণ্ডার সামরিক শক্তি ডঃ ওবোটেকে সরাইতে পারে কিন্তু কিনিয়া ও ট্যানজানিয়াকে দমন করিয়া ইউগ্যাণ্ডার সামরিক শক্তির হুকুমে চলিতে বাধ্য করাইবার ক্ষমতা ঐ সামরিক নেতাদিগের নাই। যখন ঐ সকল ব্যবস্থা হয় তখন আশা ছিল যে পরে

ইথিওপিয়া, কাম্বিয়া ও সোমালিয়াও ঐ সম্মিলিত জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইবে; কিন্তু ডঃ ওবোটেকে বিতাড়িত করিয়া সমস্ত বিষয়টাই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মনে হইতেছে যে ইউগ্যাণ্ডার সামরিক নেতাদিগের সহিত ঐ জাতিসংঘের বিভিন্ন নেতাদিগের মতের মিল হওয়া সহজ হইবে না। ইহাতে বুঝা যায় যে আজকাল কোনও জাতির পক্ষেই "ইহা আমাদের নিজেদের কথা" বলিয়া যথেচ্ছাচার করা লাভজনক হয়না। কারণ নিজেদের কথা যাহা তাহা অপরে না পছন্দ করিলে অপরের নানা সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া নিজেদের অবস্থা খারাপ হইতে পারে। সুতরাং নিজেদের কথার পরোক্ষ ফলাফল ও পরিণাম বিচার না করিয়া একান্ত স্বাধীনভাবে কোন এক পথে অগ্রসর হওয়া আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ রক্ষার দিক দিয়া সময় ক্ষতিকর হইতে পারে।

আমরা বিদ্যাসাগর ভবন সংরক্ষণ সমিতির নিকট হইতে একটি বিজ্ঞপ্তি-পত্র পাইয়াছি। তাহা এইস্থলে মুদ্রিত করা হইল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই পত্রে বর্ণিত বিদ্যাসাগর ভবন সংরক্ষণ ব্যবস্থা জাতীয় দিক দিয়া অতি আবশ্যকীয় ও শুভ উদ্দেশ্য। আমরা সর্বসাধারণকে এই শুভকার্য্যের সহায়তাতে আমন্ত্রণ করিতেছি।

—প্রবাসী, সম্পাদক

প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

বিদ্যাসাগর ভবন সংরক্ষণ সমিতি গত ২১শে ডিসেম্বর গভর্ণর শ্রী এস, এস, ধাবনের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানস্থিত গৃহটী সংরক্ষণের ও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য আবেদন জানিয়েছে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর এই গৃহটি নির্মাণ করেন এবং তাঁর জীবনের শেষ ষোল বছর এই গৃহেই বাস করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সমিতির দাবি এই গৃহটিকে সংরক্ষণে এনে 'বিদ্যাসাগর ভবনে' রূপান্তরিত করা হোক। 'বিদ্যাসাগর ভবনে' তাঁর গ্রন্থাগারটি স্থাপিত করা হোক এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাদি, হাতের লেখা, ও অন্যান্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে একটি রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ স্থাপন করা হোক।

সমিতির পক্ষ থেকে আপনার কাছে আমি এই আবেদন জানাই, যে প্রবাসী পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যে সমিতির এই দাবিকে শক্তিশালী করে তুলুন।

বিনীত

সন্তোষকুমার অধিকারী

সম্পাদক

জীবনময় রায়

৮১ বৎসর ৬ মাস বয়সে জীবনময় রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ইন্দুভূষণ রায়, সুকবি ও সুগায়ক। কিন্তু ইহার উপরে তাঁহার আর একটা বড় গুণ ছিল আর্তজনের সেবক হিসাবে। ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন কর্মী মিলিয়া গত শতাব্দীতে যে "দাসাশ্রম" স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই 'দাসাশ্রমে' ইন্দুভূষণ ছিলেন একজন "দাস"। তাঁহার পত্নী সরোজবাসিনীও "দাসী" নাম লইয়াছিলেন। আমার পিতৃদেবও একজন কর্মী ছিলেন, তবে তিনি 'দাস' নাম গ্রহণ করেন নাই। তিনি "দাসী" পত্রিকার সম্পাদকরূপেও অন্য বহুভাবে এই আশ্রমের কাজ করিতেন। তখন হইতেই ইন্দুভূষণের সহিত পিতৃদেবের পরিচয়। কিছু আগেও হয়ত ছিল বলিতে পারি না। ইন্দুভূষণ বহু প্লেগরোগীর চিকিৎসা ও সেবা করিয়াছিলেন।

জীবনময় পিতামাতার কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার গুণগুলি পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে কবিতা রচনায় তাঁর হাত ছিল। তিনি শিক্ষকরূপে জীবিকা অর্জন সুরু করিলেও একটু বয়স হইতেই চিকিৎসার দিকে তাঁহার মন যায়। হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ অবলম্বন করিয়াই তিনি চিকিৎসা করিতেন। তবে পথ্যের দিকেও তাঁহার ঝোঁক ছিল। কোন্ রোগে কি পথ্য কিভাবে তৈয়ারী করিয়া দিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। বাল্যকাল হইতেই রন্ধনে তাঁর হাত ছিল। তাঁর দিদির অল্পবয়সে মৃত্যু হওয়াতে মাকে রন্ধনাদিতে তিনিই সাহায্য করিতেন। পরে যখন একলা সংসার করিতেন তখন বোধহয় বরাবরই নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করিতেন। মাঝে মাঝে অপরের সংসারেও থাকিয়াছেন।

বহুলোকের কঠিন রোগ তিনি চিকিৎসা করিয়া সারাইয়াছিলেন। যখন তাঁহার শক্তি ছিল তখন শুধু ঔষধ লিখিয়া দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না; অনেক রোগীর শিয়রে তিনি রাত্রি জাগিয়াছেন।

উপন্যাস রচনাও তিনি করিয়াছিলেন। মানুষ হিসাবে ছিলেন বন্ধুবৎসল ও হাস্যরসিক। বাল্যকালের বন্ধুদের শেষ বয়স পর্য্যন্ত ভোলেন নাই। জীবনে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন তাহা ব্রাহ্মসমাজের হাতে অথর্ব্বদের সেবার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। পিতামাতা ও দিদির নামে মাঝে মাঝে বড় বড় দানও করিয়াছেন।

—শান্তা দেবী
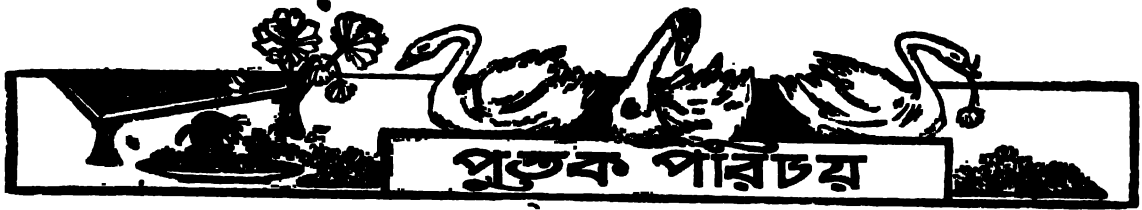
নির্বাচন : নিশীথদে। সৌমেন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভিউজ এণ্ড রিভিউজ, ১৫ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। মূল্য—চার টাকা।

বইখানি অভিনব। ঠিক এই ধরণের বই ইহার পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে রহিয়াছে নির্বাচনী ইতিহাস।

দেশ স্বাধীন হইবার পর ১৯৬২ সাল হইতে এই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। তখন ভারতে একমাত্র কংগ্রেসই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী-সর্বভারতীয় দল। এই ১৯৫২ হইতে ১৯৬৯ সাল পর্য্যন্ত যতগুলি নির্বাচন হইয়াছে তাহার ফলাফল এই গ্রন্থে দেখানো হইয়াছে।

গ্রন্থখানিতে আরও দেখানো হইয়াছে, একদল ভাঙিয়া কি করিয়া আর একটি দল হইয়াছে—সেই দল হইতে আরও কত দলের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ থাকিলে সংঘর্ষ বাধে। এবং এই সংঘর্ষের পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে, তাহার চিত্রও এই গ্রন্থে দেখানো হইয়াছে।

গত পাঁচ-সাত-বছর ধরিয়া ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যে ভাঙা-গড়ার খেলা চলিয়াছে তাহা অভিনব। যাহার ফলে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রভাবসম্পন্ন কংগ্রেসদল ভাঙিয়া দু-টুকরা হইয়া গেল। কিন্তু কেন হইল? কংগ্রেসের অনেক অপকর্ম ইহার কারণ। সাধারণ লোকের মন হইতেও এখন কংগ্রেস সরিয়া গিয়াছে। তাহারাও চাহিতেছে একটা পরিবর্তন। এই সুযোগ লইয়া সি, পি, এম দল তথা জ্যোতি বসুর দল [illegible] যুদ্ধে নামিয়া পড়িলেন। এবং জয়ী হইলেন। বাংলা দেশে ইহা একটি বড় পরিবর্তন কিন্তু এই পরিবর্তন যোপে টিঁকিল না। তাহার কারণ কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। তাঁহারা বিভিন্ন দলকে লইয়া একটি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করিলেন। 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না!' ভাঙ্গন ধরিল। এই সংঘর্ষের ফলে রাষ্ট্রপতির শাসন সুরু হইল। আবার নির্বাচন আবার পতন, ফলে রাষ্ট্রপতির শাসন।

লেখকের কথায় বলি : "কোয়ালিশন সরকার গঠনের ঢেউ থেকে জনসাধারণের মনে যতই আশার সঞ্চার হোক না কেন, প্রশাসনে মতপার্থক্য বেড়ে গিয়েছে, বিভিন্ন দলের মধ্যে নীতির সংঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, চতুর্থ নির্বাচনের মধ্যে কংগ্রেসের ব্যর্থতা আর বামপন্থী দলগুলির উত্থানে রাজনীতিতে একদিকে বিবর্তনের সূচনা হয়েছে, আর একদিকে বিপর্যয় ঘনিয়ে উঠেছে। অকংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকারের স্থায়িত্বের প্রশ্ন যেমন অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে তেমনি অন্যদিকে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে অনেকখানি রাজনীতি, দলীয় সংকীর্ণ রাজনীতির দ্বারা।

রাজনৈতিক দলগুলো স্বীকার করুক আর না করুক, এটা অনেকখানি সত্যি যে ক্ষমতার লোভে, নির্বাচনে টিকিট পাওয়ার রেষারেষি নিয়ে যেমন কংগ্রেস মূল লক্ষ্য থেকে সরে গিয়েছে তেমনি বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে ভাঙ্গন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে। দলত্যাগ যেমন সরকারের স্থায়িত্বের প্রশ্নকে জটিল ক'রে তুলেছে তেমনি রাজনীতির মানকেও

অনেক নিচে নামিয়েছে। নির্বাচনে আসনের ভাগ বাঁটোয়ারা অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন কষ্টের জন্ম দিয়েছে আবার কষ্ট ভেঙেছে।"

আজ দেখিতেছি রাজনীতির নামে মানুষকেও তাহারা নিচে নামাইয়াছে। দোষ পরস্পরের ঘাড়ে চাপাইয়া লাভ নাই—ইহা বলিতেই হইবে রাষ্ট্রপতির শাসনে আইন শৃঙ্খলার কোনো বালাই নাই। তাই খুন ও বোমাবাজি চলিতেছে। এরূপ অবস্থায় আবার অবাধে ইলেক্‌সন হইতে চলিয়াছে। ইহা ইলেক্‌সন নয়—ইলেকসনের প্রহসন।

যাই হোক, এরূপ একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইহারা জনসাধারণের উপকার করিলেন। ইহার সাহায্যে পাঠক অনেক কিছুই জানিতে পারিবেন। ইহারা যেভাবে সাধারণ নির্বাচন হইতে সুরু করিয়া চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন পর্য্যন্ত সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বিভিন্নরাজনৈতিক দলের রূপ-পরিবর্ত্তন ও নির্বাচনে তাহাদের জয়-পরাজয়ের পরিষ্কার একটি চিত্র তাঁহারা এই পুস্তকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। আজকের দিনে এই মূল্যবান গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল।

গৌতম সেন
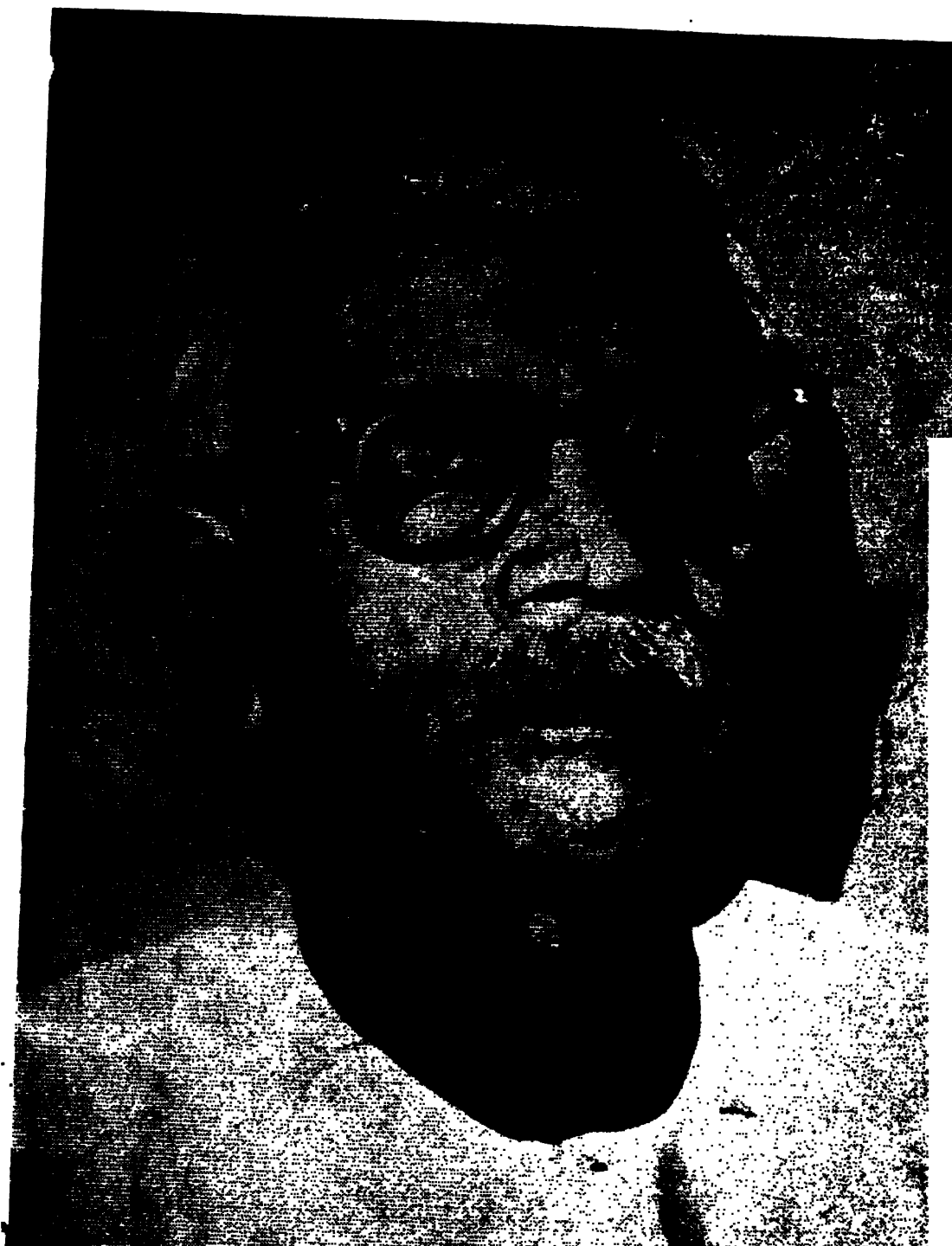
হেমন্তকুমার বসু

: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭০তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৭৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ কি ধ্বংস হইয়া যাইবে ?

আজকাল প্রায়ই শুনা যায় যে বাংলা দেশ, বাঙালী জাতি ও বঙ্গ সভ্যতা ও কৃষ্টি অতঃপর আর থাকিবে না। যাহারা এইসকল ভবিষ্যৎবাণী করেন তাঁহারা যে ঠিক কি মনে করেন তাহার কোন বিশদ ব্যাখ্যা করিবার কোনও চেষ্টা তাঁহারা করেন না। অর্থাৎ ধরা যাউক বাংলাদেশ আর থাকিবে না, ইহার অর্থ কি হয়? গঙ্গার পলিমাটি জমা হইয়া বাংলাদেশের কতক অংশ সমুদ্রবক্ষ হইতে উত্থিত হইয়া আকার গ্রহণ করিয়াছে। সেই অংশ এবং ইহার সংলগ্ন পার্বত্য ও অপরাপর অংশ যাহা আমরা এখন বাংলা দেশ বলিয়া জানি সেই দেশাংশগুলি অতঃপর বাস্তবরূপ হারাইয়া ফেলিবে এ কথা কেহ কল্পনা করে না। সুতরাং বাংলা থাকিবে না বলিলে বুঝিতে হইবে পূর্বে যেরূপ হইল [illegible] সিন্ধু, [illegible] আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি বাংলা দেশের কোন কোন অংশ বিহার বা উড়িষ্যা দেশের অংশ হইয়া গিয়াছিল; এবং সেইরূপভাবেই ভবিষ্যতে [illegible] কারণে সমগ্র বাংলা দেশই অপর দেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। ইহা [illegible] হইতে পারে। আবার কিছুই না হইতে পারে। একটা কথা প্রায়ই বলা হয়। সেটা হইল কলিকাতা সহর লইয়া। কলিকাতা [illegible] জাতির [illegible]। সুতরাং কলিকাতাকে কেন্দ্রীয় শাসনের স্থল বলিয়া বাংলার শাসনের বাহিরে স্থাপিত করা উচিত। এইসকল কথা যাহারা বলেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে বোম্বাই দিল্লী, বেনারস প্রভৃতি সহরেও স্থানীয় অধিবাসী ব্যতীত অন্যান্য দেশবাসী বহুলোক থাকে। হিসাব করিলে দেখা যাইবে অনেক সহরই ঐভাবে কেন্দ্রীয়

শাসনে পড়িতে পারে। বোম্বাই সহরে অনেক গুজরাটী, পার্সী, কাচ্ছিমুসলমান, মাদ্রাজী প্রভৃতি থাকিলেও বোম্বাই মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত এবং তাহাই স্বায়ত্ত স্থায়ী ব্যবস্থা হওয়া উচিত। দিল্লীতে স্থানীয় লোক হয়ত অল্পই আছে। কিন্তু দিল্লী কেন্দ্রীয় শাসনেই আছে বলা চলে। সিমলা, দেরাদুন প্রভৃতি সহরে বহু বাহিরের লোকের বাসস্থান। সে সকল গুলি কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হইবে বলা বাতুলতা। ইহার কারণ বাহিরের লোক কোথাওই চিরকাল থাকে না। স্থানীয় লোকই স্থায়ী বাসিন্দা এবং শাসন অধিকার তাহাদেরই হস্তে থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত নানা জাতি যেখানে থাকে, যথা বোম্বাইয়ে গুজরাটী, পার্সী অথবা বেনারসে বাঙালী; সেই সকল স্থানে শিক্ষা ও কৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রভৃতিতে কোন স্থির পন্থা অবলম্বনে না চলিয়া নানা জাতির নানান ব্যবস্থা চালাইলে সভ্যতার বিকাশের দিক হইতে ঐ সকল সহর অর্দ্ধমৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কলিকাতাতে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে কলিকাতার মানবীয় স্বরূপ যে একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কলিকাতার ঐতিহ্য ও কলিকাতাবাসী জনসাধারণের মানসিক প্রগতি ও স্বাস্থ্য রক্ষার্থে এই সহরে শুধু তুলসীদাসের রামায়ণ অখণ্ডভাবে পঠিত হইতে থাকিলে সহরের অবস্থা বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। রামমোহন, মাইকেল মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মানবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সহিত মানসিক যোগ ছিন্ন করিয়া যদি শুধু রাষ্ট্রীয় অধিকার দিয়াই সহরের অধিবাসীদিগকে সকল কথা বিচার করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে সে ব্যবস্থা মানব সভ্যতা সংরক্ষণের দিক দিয়া অতি দুর্বল ও বন্ধ্যাতা দোষদুষ্ট হইবে।

দেখিতে হয় যে কলিকাতার অধিবাসীগণ কাহারা [illegible] তাহাদের জীবনযাত্রা কোন পথে চলে। কলিকাতার প্রধানতঃ জীবিকা কয়েকটি বিশেষ প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। শাসনকার্য্য আইন আদালত সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত থাকে যাহারা তাহাদের সংখ্যা নগণ্য নহে। তাহাদের মধ্যে উচ্চ-স্তরের অধিকাংশ ব্যক্তিই বাঙালী। অল্প বেতনের কাজ যাহারা করে তাহার ভিতর কিছু অন্য শ্রেণীর মানুষ আছে। সকলকে লইয়া হিসাব করিলে বাঙালীর সংখ্যাই অধিক হইবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র ও শিক্ষক যাহারা তাহারা অধিকাংশই বাঙালী। এই ক্ষেত্রেও কয়েক লক্ষ মানুষ দেখা যায়। পুস্তকের দোকান ইত্যাদিও বাঙালীর হস্তেই অধিক আছে। চিকিৎসার কথা বিচার করিয়াও দেখা যায় অধিকাংশ রোগী, চিকিৎসক, হাসপাতাল কর্ম্মী প্রভৃতির ভিতরে বাঙালীই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ঔষধের দোকান প্রভৃতিতেও বাঙালী অধিক, কিছু কিছু ঔষধের কারখানা, চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষাগার ইত্যাদিও বাঙালীদের হাতে। জাহাজী কারবার অর্থাৎ আমদানী রপ্তানী ইত্যাদি কর্ম্মে বেতনভোগী মানুষ বহু সংখ্যায় বাঙালী; যদিও ব্যবসাদারদিগের মধ্যে মাড়বারী, গুজরাটী, সিন্ধী প্রভৃতি বহু লোক আছে। সংখ্যায় ইহারা অনেক হইলেও তুলনামূলকভাবে বহুসংখ্যক নহে। বিভিন্ন প্রকারের যান-বাহন পরিচালনায় অনেক পাঞ্জাবী কর্ম্মী নিযুক্ত আছে। অল্পবেতনের শ্রমের কার্য্যে বহু হিন্দী ভাষাভাষী, ওড়িয়া প্রভৃতি জাতির মানুষও আছে। কলিকাতা করপোরেশনে বহু ওড়িয়া কাজ করে। গান, বাজনা, সিনেমা, সঙ্গীত, রঙ্গমঞ্চ, খাবার দোকান, গহনার দোকান, বস্ত্রালয়, চায়ের দোকান, ছাপাখানা, দফতরি, ও সাধারণ দোকানদারীতে অপরজাতীয় ব্যক্তি থাকিলেও বাঙালীর সংখ্যাই অধিক হইবে। যন্ত্রকৌশলী শ্রমিক, স্বর্ণকার, ধোবার কার্য্য, গোয়ালা, নাপিত, রন্ধন কার্য্য, ভৃত্যের কার্য্য, বৈদ্যুতিক কার্য্য, গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য প্রভৃতির অনেক পেশাতে অবাঙালীর সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হয়; কিন্তু বাঙালীর কোন কোন কার্য্যে অধিক্য আছে। মোটামুটি

হিসাবে দেখা যায় উচ্চ পদস্থ ও মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা অপর জাতির তুলনায় বহু অধিক। ধোবা, গোয়ালা, মালি, ঝাড়ুদার, ভৃত্য, শকট ও যান চালকদিগের মধ্যে অবাঙালীর সংখ্যা অধিক। মোট হিসাবে কলকাতার শতকরা পঁচাত্তরের অধিক বাসিন্দা বাঙালী। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের রাজত্ব এখানে চলিতে পারে না। যাহারা এখানে উপার্জ্জন করিয়া দিন গুজরাণ করে তাহাদের অধিকাংশই পরিবারাদি রাখে নিজ দেশে। অল্প কিছু অবাঙালীর ঘরবাড়ী এই মহানগরীতে আছে।

বাংলা ও বাংলা দেশের সভ্যতা, কৃষ্টি ও জীবনাদর্শ আর থাকিবে না যাঁহারা বলেন তাঁহাদের এই ধারণার মূলে রহিয়াছে কোন কোন বাঙালীর পরমুখাপেক্ষিতা, নিজ জাতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে ঔদাসিন্য এবং একটা নূতন ধরণের কৃষ্টি গঠন চেষ্টা: যে কৃষ্টি রস অনুভূতি অভিব্যক্তি বৈচিত্র, প্রেরণার উৎস প্রভৃতি বিচারে ঠিক বাংলা দেশের নিজস্ব প্রতিভাজাত নহে। কিন্তু এই বিজাতীয় ভাব যেরূপ নিজ সভ্যতা ও কৃষ্টি বিরুদ্ধ বলিয়া জাতীয়তা সংরক্ষণ অনুকূল নহে; তেমনি ইহার শিকড় দেশের মাটিতে গজায় নাই বলিয়াই ইহা প্রাণবান ও জীবন্ত নহে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যেমন বাঙালীর প্রাণের অন্তরতম কেন্দ্রের শিরা-উপশিরার সহিত সংযুক্ত; চৈনিক, রুশিয়ান অথবা মার্কিণ আবেগ ও আকাঙ্খা ঠিক সেইভাবে কখনও আমাদের জাতীয় জীবনের সহিত কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধে যুক্ত হইতে পারে না। বাঙালীদিগের মধ্যে কোন কোন পরগুণগ্রাহী স্বজাতি প্রতিভাকাতর পর পরিকল্পনা অনুকরণ প্রয়াসী সহজ সৃজন লালসা অনুপ্রাণিত ব্যক্তি নিজ অন্তরের অনুভূতির দারিদ্র্য হেতু ভিন্ন দেশের মানুষের উপলব্ধি নিজের অন্তরের কথা বলিয়া প্রচার করিতে কোন দ্বিধা অনুভব করেন না, [illegible] এই সকল মানুষের বিশ্বাস ভিন্ন দেশের কথা [illegible]দেশের পণ্ডিতের নাম লইয়া বলিলে নূতন কথা বলা হয়। এবং অনাদৃত পুরাতন রীতি অনুসরণে বলা চলে যে এই "নূতন" কথাগুলি পরম সত্য ও উন্নত চিন্তা, প্রসূত, যেহেতু সেগুলি অপর দেশের মানুষের মস্তিষ্ক নির্গত। ইহা হইল দুইশত বৎসর পরদাসত্ব করিয়া বিদেশীর প্রতি প্রণিপাত প্রদর্শনের একটা অন্ধ উপলব্ধ ভাবাবেশ। যাহাই হউক এই জাতীয় মনোভাব কখনও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। নাড়ীর টান যাহার সহিত তাহারই সহিত অন্তরের সংযোগ জীবন্ত ও প্রাণবান হইয়া থাকে। সুতরাং কুড়াইয়া আনা কথা কখনও মায়ের কাছে শেখা কথার মত মনের ভিতর গাঁথিয়া বসিতে পারে না। বিপ্লব, বিদ্রোহ, প্রলয়, সংঘাত, সংঘর্ষ প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক শব্দ ব্যবহার করিলেও কষ্টকল্পিত ও ধারকরা মনোভাব কখনও স্বভাবজাত আবেগের সহিত সমশক্তিমান হইতে পারে না। এই সকল কারণে পৌরাণিক কাহিনী ও উপাখ্যানলব্ধ চিন্তাধারা, কিংবা যে সকল মহামানবের কথা ও কার্য্য আমাদের জাতির অন্তরতম কেন্দ্রে নিবিষ্ট হইয়া আছে সেই ভাব প্রবাহকে অগ্রাহ্য করিয়া চলা স্বাভাবিকভাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। ক্ষণিকের আবেগ ও উত্তেজনা জীবন প্রবাহে তোলপাড়ের সৃষ্টি করিলেও স্বাভাবিক অবস্থা কিছু পরে ফিরিয়া আসে। তখন জীবনের গতির দিক নির্দ্দেশ করে অন্তরের গভীরে যে বংশপরম্পরায় দৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত নির্বাচন বা মনোনয়ন শক্তি আছে সেই ক্রিয়াশীল রুচি বা শ্রেষ্ঠতা বিচার ক্ষমতা। আমাদের মনে হয় না যে বাঙালী জাতিগতভাবে নিজ স্বরূপ হারাইয়া ফেলিতেছে। শত সহস্র বৎসর ধরিয়া যাহা ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া একটা বিশিষ্ট আকার ধারণ করে, তাহা কখনও হঠাৎ আবির্ভূত মোহের আবেশে হাওয়ায় মিলাইয়া যায় না। শব্দে, সুরে, ভাষায়, ছন্দে, রেখায়, বর্ণে, আকারে, স্বাদ-গন্ধের অনুভূতি উপলব্ধিতে যাহা মনের ভিতরে নিবিষ্ট তাহা বাহিরের হাওয়ার তোড়ে উড়িয়া যায় না। নিজের নিজত্বকে জোর করিয়া অস্বীকার করিতে যাইলে সে নিজত্ব আরও সবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। তাই মনে

হয় বাঙালীর বৈচিত্র্যময় প্রেরণা প্রতিভা ও সভ্যতাকে উচ্চ নিনাদে অস্বীকার করিয়া তৎস্থলে বিজাতীয় ভাববিকৃতিব্যঞ্জক কথাবার্তা প্রচলন চেষ্টা কখনও স্থায়ীত্বলাভ করিতে পারে না। প্রেরণা ও প্রতিভা মানবমনকে অগ্নিগর্ভ করিয়া রাখে। সেই আগুন বাহিরের আবর্জনা দিয়া আচ্ছাদিত হইলেও নির্বাপিত হয় না। বাহিরের আবরণকে জ্বালাইয়া ফেলিয়া তাহা যথাসময়ে পূর্ব্ব প্রজ্জ্বলিত শিখার আকারে প্রকাশিত হয়।

পরলোকে শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত

বিগত ২১ শে ফাল্গুন অপরাহ্নে কলিকাতায় নিজ বাসভবনে শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭১ বৎসর। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বাসনা দেবী ঐ সময়ে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। কিছুদিন হইতেই গুপ্ত মহাশয়ের শারীরিক অবস্থা তেমন ভাল থাকিত না। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি যখন এডিনবরাতে কমনওয়েলথ ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় গমন করেন তখন তিনি পীড়িত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। ইহার পরে শরীর কিছুটা সুস্থ হইলে পরে তিনি ব্যাংককে এশিয়া ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিতে যান। ফিরিয়া আসিয়া স্বাস্থ্যের কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। ২১শে ফাল্গুন কলিকাতা ময়দানে একটি হকি খেলা দেখিতে যাইবার সময় তাঁহার অসুস্থতা হঠাৎ বৃদ্ধি পায় ও গাড়ীর চালক ময়দানের পথ হইতেই তাঁহাকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আইসে। গৃহে আসিয়া তিনি "আমি ঠিক আছি" বলিয়া গাড়ী হইতে নিজেই নামিবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তাঁহাকে দুইজন যুবক উঠাইয়া লইয়া দ্বিতলে শয়ন কক্ষে লইয়া যায় ও চিকিৎসককে ডাকিয়া আনে। কিন্তু শ্রীগুপ্তর অবস্থা ক্রমশঃ আরও খারাপ হয় ও তিনি অল্পকালের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রবিবার ২২শে ফাল্গুন প্রাতে তাঁহার মরদেহ সুসজ্জিত করিয়া ময়দানের কয়েকটি ক্রীড়া প্রাঙ্গন ঘুরাইয়া কেওড়াতলা ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। তৎসঙ্গে তাঁহার বহু বন্ধুবান্ধব, খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ প্রভৃতিরা গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাঁহার বন্ধুজন, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান সমূহ, ও অপরাপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন কারীগণ তাঁহার গৃহে অসংখ্য পুষ্প অর্ঘ্য প্রেরণ করেন এবং সেইগুলির অল্প অংশই যাত্রাকালে সঙ্গে লইয়া যাওয়া সম্ভব হয়। শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত বন্ধু বৎসল মানুষ ছিলেন এবং কর্মক্ষেত্রেও তাঁহার সহযোগীতা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক ছিল। সংবাদপত্র দফতরের লোক, ফোটোগ্রাফার, লেখক, শিক্ষক, রাজকর্মচারী প্রভৃতিরাও বহু সংখ্যায় শ্রীপঙ্কজ গুপ্তকে শেষবারের মত দেখিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ছিল ভারতীয়দিগের আধুনিক পন্থায় ক্রীড়া শিক্ষা অভ্যাস ও প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে। তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, সন্তরন, দৌড়, উল্লম্ফন ইত্যাদি খেলা; বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, জিমন্যাস্টিক, প্রভৃতি নানা প্রকার ক্রীড়া সংস্থা ও প্রতিযোগীতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। এই সকল খেলার মধ্যে অনেকগুলি ছিল আন্তর্জাতিক ধরণের, বাকিগুলি ভারতের নানা প্রদেশ ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। বিশ্বক্রীড়া ক্ষেত্রে যে সকল বিরাট বিরাট প্রতিযোগীতা হয়, যথা বিশ্ব-অলিম্পিক, কমনওয়েলথ ক্রীড়া প্রতিযোগীতা, এশিয়ান ক্রীড়া প্রভৃতি; এই সকলের সহিত শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। ভারতের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের আরম্ভ হইতেই তিনি তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার কর্মশক্তি এইক্ষেত্রে পূর্ণরূপে নিযুক্ত না হইলে ভারতে অলিম্পিক ক্রীড়ার গঠন ও পরিচালনা কখনও হইত কিনা সন্দেহ। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যে হকি খেলায় বিশ্বে একটা মহা খ্যাতি অর্জন করিয়াছে তাহাও শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের দ্বারাই দিকে বহুলাংশে আয়োজিত হয়। পৃথিবীর সর্ব্ব, ক্রীড়াবিদদিগের সহিত ভারতীয় ক্রীড়াবিদ

যে ঘনিষ্ঠতা আজ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত।

সাংবাদিক, লেখক, জনসম্পর্ক গঠন বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি নানা বিষয়ে শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত ক্ষমতাশীল ছিলেন। তিনি সংবাদদাতা হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। প্রতিনিধির কার্যে তিনি এতই বুৎপন্ন ছিলেন যে তাহার দ্বারা যে কোন দেশের সহিত যে কোন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার কার্য্য অতি সুকৌশলে সাধিত হইতে পারিত। ভারতের ক্রীড়া জগতের বর্তমান পরিস্থিতি কিছুটা ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের মৃত্যু হওয়াতে অবস্থাটা আরই অবনতির দিকে যাইবার আশঙ্কা হয়।

পাকিস্থানে বিপ্লব, বিদ্রোহ, না আভ্যন্তরিক যুদ্ধ?

আইন সঙ্গতভাবে আহুত নির্ব্বাচন কার্য্য সমাধান হইলে পর যদি কেহ আইন সঙ্গতভাবে রাজ্য শাসন অধিকার দাবি করে এবং তাহার ফলে যদি সামরিক শক্তির অপপ্রয়োগে সেই অধিকার প্রাপ্তিতে বাধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে সংঘর্ষ হয় ও সামরিক শক্তিধারীগণ যদি অপরকে হত্যা করে বা যদি নিজেরা সেইজন্য হতাহত হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটাকে কি নামে অভিহিত করা উচিৎ? প্রথম অবস্থায় ইয়াহিয়া খান পাকিস্থানের অচল সংবিধান সচল করিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া সামরিক শাসন চালিত রাখিয়া শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি সেই সময় বলিয়াছিলেন যে পরে তিনি সংবিধান না থাকিলেও সংবিধানিক রীতিতে শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবেন। কিন্তু যখন তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া নির্ব্বাচনাদি সম্পন্ন করিয়া প্রায় নূতন সংবিধান গঠন করা যায় এইরূপ অবস্থায় আসিয়া পড়িলেন, ঠিক সেই সময়েই তিনি সামরিক শাসন ব্যবস্থা পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিলেন। অথবা ইহাও বলা যায় যে সামরিক শাসন যেমন পূর্ব্বে ছিল এখনও তাহাই রহিল, শুধু ইহা চলের বিষয়টা বেকার রাখিয়া দিয়া রাষ্ট্রীয় অবস্থার কোন পরিবর্তন হইতে দেওয়া হইল না। এই দ্বিতীয় অর্থটাই যদি ঠিক হয় তাহা হইলে অস্ত্র ব্যবহার করা হইল কেন? ২০০০ হাজারের অধিক লোকই বা মরিল কেমন করিয়া? মজিবুর রেহমানের হস্তে শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। তবে সামরিক বাহিনী জনসাধারণের উপর গুলি চালাইল কেন? পাকিস্তানের সকল কিছুই বেশ জটিল ও কষ্টবোধ্য হইয়া থাকে। ইয়াহিয়ার সৈন্যগণ যদি রাজশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইলে কাহার সহিত ও কেন তাহারা লড়িতেছে? যদি রাজশক্তি সাধারণের হস্তে আছে তাহা হইলে কখন হইতে ও কিভাবে সে শক্তি তাহারা পাইয়াছে?

পাকিস্থান যখন গঠিত হয়, ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে, তখন তাহা একটা নূতন সৃষ্ট বৃটিশ ডোমিনিয়ন রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ডোমিনিয়ন বা বৃটিশের অধিরাজ্যের প্রথম রাজপ্রতিনিধি বা প্রধান শাসক নিযুক্ত হইলেন মহম্মদ আলি জিন্না (১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭-১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮)। তৎপরে আসিলেন নাজিমুদ্দিন (১৭ই অক্টোবর ১৯৫১ অবধি), গুলাম মহম্মদ (১৭-১০-৫১ হইতে ৬-৮-১৯৫৫) ও মেজর জেনারেল ইসকন্দর মির্জ্জা (৭-৮-৫৫)। ইনি ৫ই মার্চ্চ ১৯৫৬ খৃঃ অব্দে পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হন ও ৭-১০-১৯৫৮ খৃঃ অব্দে ঐদেশে সামরিক রাষ্ট্র স্থাপন করেন। পাকিস্থানের অসামরিক শাসন পদ্ধতি, সংবিধান প্রভৃতি এইসময় উঠাইয়া দেওয়া ও বাতিল করা হয়। পাকিস্থানের সামরিক বাহিনীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ আয়ুবখানকে এই সময় হইতে শাসনে একাধিপত্য করিতে দেওয়া হয়। এই ব্যক্তি নানাভাবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি লইয়া ছিনিমিনি খেলা আরম্ভ করেন। তিনি দুইবার নিজ প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রক্ষেত্রে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া নির্ব্বাচিত হন। ১৯৬২ খৃঃ অব্দে ইনি একটা নূতন সংবিধানও গঠন করিয়া ফেলেন। এই সংবিধানটার

কি হইল আমরা সঠিক জানি না। মার্চ ১৯৭০ খৃঃ অব্দে আয়ুবখান রাষ্ট্রক্ষেত্র ত্যাগ করেন ও মেজর জেনারেল আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খানের হস্তে সকল শাসন শক্তি দান করিয়া সরিয়া দাঁড়ান। পাকিস্থানে এই সময় বা ইহার পূর্ব্বেও বহু বৎসর সামরিক শাসনই চালিত ছিল; কিন্তু ইয়াহিয়া খান অধিকন্তু ন দোষায় রীতি অনুসরণে পুনর্ব্বার সামরিক শাসন পদ্ধতি ঘোষণা করিয়া সকলের পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সকল সন্দেহ দূর করিয়া দিলেন। এই সময় পাকিস্থানে সর্ব্বত্র অরাজক অবস্থা বিদ্যমান ছিল। ইয়াহিয়া খান বলিয়াছিলেন শান্তি ফিরিয়া আসিলে তিনি নূতন সংবিধান গঠনের ব্যবস্থা করিবেন ও সংবিধানিক শাসন পদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজনও করিবেন।

কিন্তু পাকিস্থানের শকুনি জুলফিকার আলি ভুট্টোর পরামর্শে, প্ররোচনায় কিম্বা অপপ্রচারের ফলে নির্ব্বাচন প্রভৃতি হইবার পরেও ইয়াহিয়া খান শান্তিপূর্ণ সংবিধানিক জাতীয় শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন না করিয়া সামরিক শাসনই মোতায়েন রাখিয়া চলিতেছেন। শেখ মুজিবর রেহমান ইয়াহিয়া খানকে বলিয়াছেন যে এইরূপ ব্যবস্থার অবিলম্বে অবসান আবশ্যক। না হইলে তিনি পাকিস্থানে শান্তিপূর্ণভাবে শাসন বিরোধিতা করিবার আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। ইয়াহিয়া খান মুজিবর রেহমানের সহিত ব্যবহারে শান্তিরক্ষা এখন করিতেছেন না এবং অতঃপর করিবেন বলিয়াও মনে হয় না। সুতরাং পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির কি হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

মুজিবর রেহমান নেতৃত্বের দিক দিয়া পূর্ব্ব পাকিস্থানের জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাবশালী। পূর্ব্ব পাকিস্থানের অনেক রাজ কর্ম্মচারী, পুলিশ, কোন কোন সৈন্যগণ তাঁহাকে জননেতা বলিয়া মানিয়া থাকে। এই কারণে তিনি নির্দ্দেশ দিলে পূর্ব্ব পাকিস্থানের সর্ব্বত্র সকল কার্য্যকলাপ বন্ধ হইয়া যাওয়াই সম্ভব। সে অবস্থায় গুলি চালাইয়া বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইয়াহিয়া খানের আদেশেই পাকিস্থানের নির্ব্বাচন হইয়াছিল। এখন ইয়াহিয়া খান যদি সেই নির্ব্বাচন না মানিয়া নিজের স্বৈরাচার ও একাধিপত্যের উপরেই পাকিস্থানের শাসন কার্য্য চালাইতে যান, তাহা হইলে সে চেষ্টা সফল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্ব-পাকিস্থান, আমেরিকা ও বৃটেন

পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় আলোড়ন এবং পাকিস্থানের সহিত আমেরিকার সৌহার্দ্দ্যে ভাঁটা পড়া সময়ের ক্ষেত্রে প্রায় এককালীন, এই কথাটার কোনও বিশেষ মর্ম্মার্থ আছে কি না তাহা বিচার করা যাইতে পারে। চীনের ও রুশিয়ার সহিত পাকিস্থান ক্রমে ক্রমে নিকটতর ভাবে জড়াইয়া পড়িতেছে ইহা লক্ষ্য করিয়া আমেরিকা হয়ত এই কথা ভাবিয়া থাকিতে পারে যে রুশ-চীন বন্ধু পাকিস্থান যতটা অল্পশক্তি হইয়া যায় ততই আমেরিকার পক্ষে তাহা সুবিধার কথা হইবে। রুশ নৌবাহিনী গা ঢাকা দিয়া পাকিস্থানের বন্দরে আনাগোনা করিতেছে এবং চীনাদিগের একটা সুদীর্ঘ রাজপথ এখন তিব্বত ও উত্তর কাশ্মীরের ভিতর দিয়া পাকিস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে, এই পরিস্থিতি আমেরিকা ও বৃটেনের ভারত মহাসাগর ও এশিয়া অঞ্চলে প্রভাববৃদ্ধির পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছে। পাকিস্থানকে, সুতরাং কিছুটা শক্তিহীন করিতে পারিলে, আমেরিকা ও বৃটেনের সুবিধা হয়। ইহা ব্যতীত বৃটেনের রাষ্ট্রদূতের আবাস ও দফতরের উপর পাকিস্থানীদিগের হামলা করার ফলেও পাশ্চাত্য প্রভুদিগের পাকিস্থান সম্বন্ধে প্রীতি লাঘব ঘটিয়াছে। যখন পূর্ব্ব পাকিস্থানে ঝড় তুফান হইয়া বহুগ্রাম ধরাবক্ষ হইতে মুছিয়া যায় এবং যখন পশ্চিম পাকিস্থানের কর্ত্তাগণ পূর্ব্বপাকিস্থানে কোন সাহায্য পাঠাইতে অযথা বিলম্ব করিয়া বহু সহস্র লোকের অকাল মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করেন, তখন বৃটিশ সাংবাদিকগণ এ বিষয় লইয়া পাকিস্থানের রাজ শক্তির তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা

করেন ইহার উত্তরে পাকিস্থানীগণ নানা ভাবে বৃটিশ বিরুদ্ধতা করিতে আরম্ভ করে। পশ্চিম পাকিস্থানী কলেজের ছাত্রগণ বৃটিশ দূতাবাসে ইষ্টক নিক্ষেপ করে কোন বৃটিশ লেখক হজরত মহম্মদের অসম্মানকর কোন কিছু লিখিয়াছে বলিয়া। যাহাই হউক, সম্প্রতি আমেরিকা ও বৃটেন পাকিস্থানের সহিত বন্ধুত্ব দেখাইতে ততটা আর আগ্রহবান নাই বলিয়া মনে হয়। সুতরাং পূর্ব্ব পাকিস্তান যদি নিজের স্বায়ত্ত শাসন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে এবং পশ্চিম পাকিস্থানের সহিত সখ্য রক্ষা না করে তাহা হইলে বৃটেন হয়ত সেরূপ পরিণতিতে খুসীই হইতে পারে যাহাতে পূর্ব্ব পাকিস্থানে রুশ বা চীনের জাহাজ চলাচল কঠিন হয়, ব্যবসায়ে মন্দা পড়ে এবং পশ্চিম পাকিস্থানের রাজস্ব ও অর্থ সংগ্রহ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই রূপ অবস্থান্তর আমেরিকার গুপ্ত অভিপ্রায় সিদ্ধির সহায়ক হইতে পারে।

দুই বাংলার কথা

পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের ভিতর পূর্ব্ব পাকিস্থান লইয়া নানা প্রকার অনুমান, সম্ভাবনা বিচার, উভয় বাংলার পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা ইত্যাদি ক্রমাগতই করা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন উভয় বাংলা অতঃপর মিলিত হইয়া এক বৃহত্তর বাংলাদেশ গড়িয়া উঠিবে, কেহ বলিতেছেন চীন এই সুযোগে দুই বাংলাকে এক করিয়া একটা চীনা ঢং এর কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গড়িয়া ফেলিবে। কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্থানের কোন নেতা এই জাতীয় কোনও কথা বলিতেছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। শেখ মুজিবর রেহমান চীনের অথবা অপর কোন দেশের প্রেরণায় কিছু করিয়াছেন অথবা করিবেন এরূপ কোন কথা কখনও বলেন নাই। নিজ দেশে তিনি সামরিক শাসন উঠাইয়া দিয়া স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এই কথা তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্রমতে তিনি কম্যুনিষ্ট এমন কথাও বলেন নাই। এই কারণে পশ্চিম বাংলার মানুষের যাহার যেরূপ মনোভাব তাহার সেই আকাঙ্খা অথবা অভিলাষ শেখ মুজিবর রেহমানের অন্তরের কথা বলিয়া মনে করিবার কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ নাই। আমরা যতটা বুঝি তাহাতে মনে হয় না যে দুই বাংলা এক হইলে কোন বাংলার কোন সুবিধা হইবে। পৃথক থাকিয়া পরস্পরকে সাহায্য ও সহায়তা করিলে অনেক অধিক লাভের সম্ভাবনা। কারণ দুই বাংলার মানুষের সকল স্বার্থ এক নহে। ধর্ম্মের, কৃষ্টিগত বা রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীরও পার্থক্য আছে। একত্র হইলে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। আলাদা থাকিলে সখ্য গাঢ়তর হইবে।

ক্ষুদ্র স্বার্থ ও জাতীয় লাভের কথা

বহুজাতি একত্র থাকিয়া সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা অর্থনৈতিক বা অপর ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন একটা বৃহত্তর জাতি গঠনের আদর্শের কথা। এই আদর্শ অনেক সময় যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না এই কারণে যে বহু ভিন্ন ভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠী যখনই একত্র হয় তাহারা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা ভুলিয়া বৃহত্তর জাতি গঠনের আদর্শটিকে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রগমন করিতে সক্ষম হয় না। ক্ষুদ্র স্বার্থ কখন কখন এত প্রবল হইয়া উঠে যে তাহার চাপে উচ্চতর আদর্শ বিলুপ্ত হইয়া যায়।

পাকিস্থানে ইসলামি ধর্ম্মের মহান আদর্শ সমুদয় সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও পাঞ্জাবী মুসলমান বাঙালী মুসলমানকে দাবাইয়া নিজ সুবিধা সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত ছিল। বাঙালীরা যখন বন্যা বিধ্বস্ত হইয়া ধনে প্রাণে মারা যাইতেছিল তখনও তাহাদের ধর্ম্মভ্রাতাগণ নিজেদের ইমারৎ নির্ম্মাণের কথা ভুলিয়া বাংলাদেশের ভাইদের জন্য সামান্য সামান্য স্বার্থত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাভের চেষ্টাকে কখনও প্রশ্রয় দিতে নাই। প্রশ্রয় দিলে তাহার ফল বিষময় হয়। ভারতবর্ষে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মানুষকে নিজেদের সুবিধা অনুসরণ করিতে দিয়াছিলেন ও তাহার ফলে আজ দেশব্যাপী পরস্পর বিরোধী স্বার্থপরতা প্রবল আকারে নানারূপ ধরিয়া যুদ্ধে লিপ্ত

হইয়া রহিয়াছে। এই সকল স্বার্থান্বেষী গণ্ডিগুলিকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাদের স্থলে উচ্চতর জাতীয় আদর্শ সকলকে সম্প্রসারিত করিতে না পারিলে ভারতের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে। গণ্ডি গোষ্ঠী ও দলের নিজ নিজ উন্নতি চেষ্টাতে বাধা দিতেই হইবে এমন কোনও কথা নাই; কিন্তু যখনই দেখা যাইবে তাহারা অপরের ক্ষতি করিয়া নিজলাভের চেষ্টা করিতেছে তখনই তাহাদের দমন করিতে হইবে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা

মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিযোগীতায় যে সকল মুষ্টিযোদ্ধা শরীরের ওজন বিচারে গুরুভার পর্য্যায়ের তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাকেই পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম বলিয়া ধার্য্য করা হয়। বর্ত্তমানে অর্থাৎ ১৯৬৪ খৃঃ অব্দ হইতে নিগ্রো যোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লে, যিনি পরে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন ও মহম্মদ আলি নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি আমেরিকার সৈন্যদলে যোগদান করিয়া ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করিতে যাইতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার পদ হইতে অপসৃত করা হয়। পরে তিনি ঐ পদে পুনর্ব্বার অধিষ্ঠিত হইবার জন্য মুষ্টিযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অপর একজন নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জো ফ্রেজিয়ারের নিকট ৮ই মার্চ্চ ১৯৭১ খৃঃ অব্দে ১৫ রাউণ্ড লড়িয়া পয়েন্টের হিসাবে পরাজিত হইয়া যান। ফ্রেজিয়ার পূর্ব্বে পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন না। তিনি অলিম্পিকের মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগীতায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন ও তৎপরে পেশাদারী মুষ্টিযোদ্ধা হইয়া যান। তিনি ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলির সহিত মুষ্টিযুদ্ধে নিজের বৈজ্ঞানিক ভাবে মুষ্টিযুদ্ধ করিবার ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার উপরে ছিল তাহার পায়তারা ও মুষ্টি চালনার গতিবেগ; যাহা ক্লে অপেক্ষা অনেক তীব্র ও অধিক ছিল। ক্লে পরাজিত হইবার পরে স্বীকার করেন যে ফ্রেজিয়ারকে মুষ্টিযুদ্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এই মুষ্টিযুদ্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন বহু সহস্র দর্শক। তাঁহারা বহু লক্ষ ডলার ব্যয় করিয়া ঐ মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগীতা দর্শন করেন। দুই যোদ্ধা সমান ভাবে ২৫ লক্ষ ডলার করিয়া পুরস্কার পাইবেন। যাহারা সাক্ষাৎভাবে মুষ্টিযুদ্ধ দেখিবেন তাহারা এক একটি ১০০০৲ টাকারও অধিক মূল্যের টিকিট ক্রয় করিবেন। ইহা ব্যতীত ৩০টি দেশের ৩০ কোটি নরনারী ঐ যুদ্ধ টেলিভিষণে দেখিবেন। সকলের নিকট হইতে মোট প্রায় দুই কোটির অধিক ডলার পাওয়া যাইবে।

জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

[নিগ্রো মনীষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য]

অমল সেন

—দুই—

১৮৬২ সালের আর একটি এমনি ঘন অন্ধকার রাত।

দস্যুরা আবার আসছে।

এক মুহূর্তও আর দেরী করার উপায় নেই।

মোজেস কার্ভার চিৎকার ক'রে উঠলেন আর্তকণ্ঠে, তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে স্ত্রী সুসানকে ঘুম থেকে জাগালেন, ব'ললেন, দস্যুরা আবার হানা দিতে এসেছে। তোমরা আর এক মুহূর্তও দেরি করো না। শিগ্‌গীর পালাও, গুহার মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে থাকো।

কার্ভার নিজেও দগ্ধ পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চ'ললেন।

অশ্বারোহী শ্বেতাঙ্গ দস্যুরা তখন পর্যন্ত কার্ভারের খামার বাড়ীতে এসে পৌছাতে পারেনি। হঠাৎ মেরীর কথা মোজেস কার্ভারের মনে প'ড়ে গেল। তাকে তো ডেকে তোলা হয়নি। এখনো তাকে সেই পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রাখার সময় আছে।

মেরীর ঘরের দিকে ফিরে চ'ললেন মোজেস কার্ভার তাকে জাগাবার জন্য, ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতেই সেটা কেমন যেন আপনা থেকে খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে কার্ভার, দেখলেন, মেরী উনুনের পাশে স্তব্ধ নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো নিষ্প্রাণ নিশ্চেতন। সে যেন ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না এখন সে কী করবে? কী তার করা উচিত? এক পাও অগ্রসর হবার শক্তি নেই তার। তার মনে হচ্ছে, কে যেন তার পা পেরেক দিয়ে শক্ত ক'রে মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। মুখ তার বিবর্ণ ফ্যাকাসে, মর্মরপ্রস্তর হাইয়ের মতো সাদা, সে মুখে রক্তের চিহ্নও নেই।

মেরীর মেয়ে শক্ত করে মাকে ধরে আছে, বড় ছেলে জিম বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে, আর সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে মেরী বিহ্বল দৃষ্টিতে কী দেখছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মোজেস কার্ভার অধীর অধৈর্য কণ্ঠে প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলেন ভগবানের দোহাই ওগো ও মেয়ে, অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বিপদ ঘাড়ে নিয়ো না। দস্যুরা যে এসে পড়লো বলে, শিগ্‌গীর পালাও।

কার্ভার ছুটে গিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে ঘুমন্ত জিমকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে নিজের কাঁধের উপর রেখে দিলেন, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মেরীকে বললেন, "মেয়েকে আর কোলের বাচ্চাটিকে নিয়ে শিগ্‌গীর এসো আমার সঙ্গে।"

কিন্তু মেরী যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে রইলো, এক পাও নড়লো না। নড়তে পারলো না। তার নড়বার শক্তি নেই।

মেরীর কোলের ছেলেটা জন্ম থেকেই রুগ্ন। হাঁপানি ও শ্বাসকষ্টে ভুগছে। হাড়জিরজিরে কঙ্কালসার চেহারা।

দরজা খোলা পেয়ে এক ঝলক কনকনে ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। রোগা ছেলেটার গা ঢাকা দেবার জন্য মেরী একখানা গরম কাপড় খুঁজতে লাগল।

ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ততক্ষণে বেশ স্পষ্ট এবং জোরালো হয়ে উঠেছে। দস্যুরা নিকটে এসে প'ড়েছে।

মেরী তখনো গরম কাপড় খুঁজতে ব্যস্ত। ঘরের একটা কোণ খুঁজে কিছু না পেয়ে আর একটা কোণের দিকে গেল।

দস্যুর দল ততক্ষণে দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছে। মেরীর আর গরম কাপড় খোঁজা হ'ল না। দস্যুরা প্রথমে তার কোল থেকেই ছোট ছেলেটাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে কেড়ে নিল। তারপর দড়ি দিয়ে শক্ত করে মেরীর দুহাত বাঁধলো। হাতবাঁধা অবস্থায় তাকে ঘোড়ার পিঠে জিনের উপরে বসিয়ে দিল।

মেরী আর্তস্বরে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, নিরুপায়ের কান্না। কেউ তার সাহায্যের জন্ত এগিয়ে এলো না। আর কেই-বা আসবে? একটু আগে মোজেস কার্ভার তাকে বাঁচাতে এসেছিলেন, কিন্তু না পেরে নিজেকে বাঁচাবার জন্ত আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

মেরী কেবলই কাঁদছে আর অশ্রুভেজা কণ্ঠে দস্যুদের উদ্দেশ্ত করে মিনতি করে বলছে, "ওগো, তোমরা দয়া করে আমার রোগা ছেলেটাকে একটু কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও! কিন্তু কেউ শুনলো না তার কথা। তার করুণ মিনতিতে কেউ কান দিল না, কেউ তাকে দয়াও ক'রলো না।

লুণ্ঠন শেষ করে দস্যুরা আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো। চ'লে গেল তারা। তাদের অশ্বখুরের শব্দ ক্রমশ দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

পাহাড়ী উপত্যকার গড়ানো ঢালুপথ বেয়ে তারা নেমে গেল।

এক ক্ষুদ্র খণ্ডকালের একটি মাত্র নিমেষের মধ্যে কী যে একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল, সে কথা ভেবে মোজেস কার্ভারের সমস্ত অন্তর দলিত মথিত ক'রে একটা মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস বের হ'ল। অস্থির অশান্তভাবে তিনি সারা ঘরময় পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলেন। একটা কথা কেবলই তাঁর অন্তরকে কাঁটার মতো বিদ্ধ ক'রতে লাগলো, আমি মেরীকে রক্ষা ক'রতে পারলাম না। তিনি যতই চেষ্টা করেন মনকে কিছুতেই শান্ত ক'রতে পারেন না। ভারী বোঝার মতো অসহনীয় একটা অপরাধবোধ নিরন্তর তাঁর বুকের উপর চেপে রইলো।

মোজেস কার্ভার অসহায়ের মতো দুঃখের সান্ত্বনা খুঁজতে গিয়ে স্ত্রী সুসানকে ব'ললেন, "ভগবান যেন আমার দয়া ক'রে মার্জনা করেন। দস্যুরা মেরীকে আমার বাড়ী থেকে লুঠ ক'রে নিয়ে গেল। আমি তাকে রক্ষা করার জন্ত কিছুই ক'রতে পারলাম না,—শুধু শক্তিহীন অসহায়ের মতো চেয়ে চেয়ে দেখলাম।"

স্বামীর জন্ত এক গভীর মমতায় সুসানের হৃদয় ভ'রে উঠলো, কিন্তু কোন সান্ত্বনার ভাষা তিনি উচ্চারণ ক'রতে পারলেন না।

মোজেস কার্ভার জিমকে এনে সুসানের কোলে দিলেন। মায়ের মতো গভীর স্নেহে সুসান জিমকে বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে ব'লতে লাগলেন, "ওরে সোনা আমার, মাণিক আমার!" চোখের জলের বন্যায় তার বুক ভেসে যেতে লাগলো।

মোজেস কার্ভার জন্ম থেকেই মনেপ্রাণে ক্রীতদাসত্ব প্রথার বিরোধী। ক্রীতদাস রাখাকে তিনি ঘৃণা করেন, মনুষ্যত্বের পরিপন্থী ব'লে বিবেচনা করেন। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের, বিশেষতঃ মিসৌরির শ্বেতাঙ্গ বণিক সমাজ, কৃষক এবং ভূস্বামীরাই দাসত্ব প্রথাকে জিইয়ে রেখেছে। তারাই ক্ষেতে খামারে খাটিয়ে নেবার জন্ত বহু নিগ্রো ক্রীতদাস কিনে এনে দিনরাত তাদের ওপরে অত্যাচার ক'রছে—বিবেকহীন বিচারহীন নির্মম সে অত্যাচার। ক্রীতদাসরা সামান্ত ক্রটি বিচ্যুতি ক'রলেও তাদের উপরে নির্মম ভাবে বেত চালায়, চাবুকের আঘাতে সর্বাঙ্গ রক্তমাখা ক'রে দেয়। এমনিভাবে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা তাদের পৈশাচিক জিঘাংসা চরিতার্থ করে। জন্মের পর থেকেই মোজেস কার্ভার এসব দেখেছেন, দেখে দেখে তাঁর মনের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠেছে। তিনি ক্রীতদাস রাখা পোষণ করে সেইসব মালিকদের অন্তর থেকেই ঘৃণা করেন।

মোজেস কার্ভারের নিজের এতদিন একজনও ক্রীতদাস ছিল না। সুসান কার্ভার নিজের হাতে একাই রান্নাবান্না ছাড়াও ঘরগৃহস্থালীর সব কাজ ক'রেছেন। বহুদিন এইভাবে চ'লে এসেছে, অতিরিক্ত পরিশ্রম

করার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য সম্প্রতি খারাপ হ'য়ে পড়েছে। তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য এখন একজন লোক নিতান্তই দরকার আর, তা ছাড়া, মোজেস কার্ভার কর্ম উপলক্ষে সারাদিন বাইরে থাকেন। সুসানকে তাই বাড়ীতে একাকিনী নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাতে হয়। কথা ব'লবেন যে এমন একজন লোক পর্যন্ত নেই। এমনি বন্ধুবান্ধবহীন নিঃসঙ্গ জীবন সুসানের কাছে ক্রমশঃ অসহনীয় হ'য়ে উঠলো। একজন সঙ্গিনী এনে দেবার জন্য তিনি স্বামীর কা'ছ বারংবার বহু অনুরোধ উপরোধ করার পর মোজেস কার্ভার অল্প কিছুদিন আগে পাশের একটি গ্রাম থেকে মেরীকে কিনে এনেছিলেন, দাম দিতে হ'য়েছিল সাতশো ডলারের কিছু বেশী। তারপর ছয় বছর কেটে গিয়েছে। এই ছয় বছরে মেরী তাদের একান্ত আপনার জন হ'য়ে গিয়েছিল। সে তার সেবা দিয়ে, যত্ন দিয়ে কার্ভার দম্পতির মন কেড়ে নিয়েছিল। মেরী ছয় বছর তাদের সঙ্গে জীবন কাটিয়েছে, ফ'লে সে আর মনে ক'রতে পারতো না শেষ পর্যন্ত যে, সে একজন নিগ্রো ক্রীতদাসী মাত্র। মোজেস কার্ভার বা তাঁর স্ত্রী সুসান কার্ভারের ব্যবহারেও তেমন ভাব সে লক্ষ্য করেনি কখনো। তাঁরা বরং তাঁদের কন্যাসমা মেরীকে অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন। এই দুর্লভ সম্পর্কের কথা মেরী সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ ক'রতো। তার মনে যে আন্তরিকতার সুর গুঞ্জরিত হ'ত তার ফলে সে যে একজন ক্রীতদাসী সে কথা সে নিজেও প্রায় ভুলে যেতে ব'সেছিল। সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে মেরী হ'য়ে উঠেছিল কার্ভার পরিবারের সুহৃদ, শুভানুধ্যায়ী ও সমব্যথী। কার্ভার দম্পতির স্নেহের ছায়ায় মেরী আনন্দে এবং সুখেই জীবন কাটিয়েছে। দুঃখ বিষাদ কখনো বড় একটা তাকে স্পর্শ করেনি।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও মোজেস কার্ভার একটি মাত্র নিগ্রো ক্রীতদাসীর মালিক হবার জন্যে স্বীয় বিবেকের কাছে সব সময়ে নিজেকে অপরাধী ব'লে মনে ক'রতেন। কারণ তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস ক'রতেন সব মানুষকেই ভগবান সৃষ্টি ক'রেছেন, সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান। সব মানুষই সমান। দৈবায়ত্ত মানুষের জন্ম, জন্মের ওপরে মানুষের কোনই হাত নেই। নিগ্রো হ'য়ে জন্মানো তাই পাপ নয় এবং শ্বেতাঙ্গকুলে জন্ম গ্রহণও বড় পুণ্যের কাজ নয় মানুষের। ঈশ্বর মানুষের জন্মের জন্য দায়ী, আর মানুষ নিজে দায়ী তার কর্মের জন্য, কারণ কর্মের দ্বারা মানুষ বড় হয়, যশ, প্রতিষ্ঠা এবং সম্মান লাভ করে। তাই মোজেস কার্ভার নিগ্রোদের ওপরে শ্বেতাঙ্গদের অন্যায় অত্যাচার দেখে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ব্যথিত হন? মানুষের ওপরে মানুষের এই অন্যায় প্রভুত্ব, এই নিষ্ঠুর অত্যাচার, এই অবিচার ও ঘৃণা, কিছুতেই ঈশ্বরের অনুশাসন হ'তে পারে না। এই অন্যায়, এই বর্ণবিদ্বেষকে যারা বিধাতার বিধান ব'লে চালাতে চায় তারা ঈশ্বরের নাম নিয়ে নিজেদের লোভ ও লালসাকে পরিপুষ্ট ক'রছে এবং স্বার্থসিদ্ধির নতুন নতুন উপায় খুঁজে বার ক'রছে। মোজেস কার্ভার বিশেষতঃ এই কারণেই ক্রীতদাস প্রথার বিপক্ষে। তিনি মনে করেন, আসলে এ সবই হ'চ্ছে স্বার্থপর মানুষের সয়তানী।

মেরী অপহৃত হবার পর কার্ভারের অন্তরের এই অপরাধ-বোধ তীব্র হ'ল, একটা অসহ্য গ্লানি সারাক্ষণ তাঁর মন ছেয়ে থাকলো। বার বার একটা কথাই তাঁর মনে হ'তে লাগলো যদি মেরীকে আর ফিরে না পাওয়া যায় তবে জীবনের শেষমুহূর্ত অবধি মোজেস কার্ভার এই গ্লানি এবং অপরাধের বোঝা বহন ক'রে বেঁচে থাকবেন কেমন ক'রে?

অন্য অনেক দিনের মতো সেদিনও কার্ভার দম্পতি সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে চুপ ক'রে ব'সে আছেন, দু'ইজনেরই হৃদয় দুঃখ ও বেদনার ভারে ভারাক্রান্ত, দুজনেরই গণ্ড প্লাবিত ক'রে নেমেছে তপ্ত অশ্রুজলধারা। মেরী নেই। অন্ধকার ঘন হ'ল কিন্তু আলো জ্বালবার কেউ নেই। সুসান কার্ভারের ও আলো জ্বালবার কথা একবারও মনে হ'ল না। তিনি

শুধু ভাবছিলেন, মেরী এখন কোথায় কিভাবে আছে? কী ক'রছে? আবার কি তার ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা আছে? ভাবছিলেন মেরীর রুগ্ন বাচ্চা ছেলেটার কথা। সে কি এখনো বেঁচে আছে? বিগত ছয় বছরের অনেক পুরণো কথা, অনেক প্রায় ভুলে যাওয়া স্মৃতি আবার নতুন ক'রে একটার পর একটা তাঁর মনে পড়তে লাগলো। সুখে-দুঃখে মেশা দিনগুলির স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে এসে ভিড় করলো। একখানি বিষন্ন দেবী প্রতিমার মতো সুসান কার্ভার শুষ্ক নেত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

সেদিনকার সেই রাত্রি কার্ভার দম্পতির মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো অতিবাহিত হ'ল।

পরের দিন প্রত্যুষে, রাত্রির অন্ধকার গাছের ছায়ায় তখনও লুকিয়ে ছিল। সূর্যের আলো ফুটে ওঠার আগেই মোজেস কার্ভার ঘোড়ায় চ'ড়ে বের হ'লেন। চ'লে গেলেন তাঁর নিজের খামার বাড়ী ছাড়িয়ে আরো অনেকটা দূরে ডায়মণ্ড গ্রোভ উপনিবেশে জন বেন্টলি নামে একজন লোকের সন্ধানে। তাকে খুঁজে বেরও করলেন। লোকটার একসময়ে এমনি একটা নিশাচর দস্যুদলের পাণ্ডা ব'লে যথেষ্ট অখ্যাতি ছিল। সেও তখন এমনিভাবে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিত। লুণ্ঠন আর হত্যা ছিল তার পেশা। নারীর চোখের জলের সে কোন মূল্য দেয় নি, তার লালসার বহ্নিতে কত নারী যে আহুতি হ'য়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কত অসংখ্য শিশুকে যে সে গলা টিপে মেরেছে তার হিসাব সে নিজেও দিতে পারে না। কত অত্যাচার, কত নিষ্ঠুর আচরণ যে সে মানুষের ওপর ক'রেছে সে কথা ভেবে নিজেই আজ অবাক হয়। সে এখন এসব দুষ্প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত, ভালো মানুষের মতো এখন সে শান্তশিষ্ট নাগরিকের জীবন যাপন ক'রছে। আইন ভাঙার চাইতে আইন মেনে চলার দিকে এখন তার ঝোঁক বেশী।

এ হেন বেন্টলিকে খুঁজে বের ক'রলেন মোজেস কার্ভার। গভর্ণমেন্ট জেনারেল কো-অপারেটিভ স্টোর্সের সামনে একটা বড় বটগাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল বেন্টলি, সেইখানেই তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল মোজেস কার্ভারের। বেন্টলি এখন আর সেই আগেকার দস্যু নেই, এখন অন্য দশজনের মতোই একজন সাধারণ নাগরিক। কিন্তু তা হ'লেও সে হয়তো অনুমান ক'রতে পারবে কখন এবং কোথায় গেলে পরে মেরী ও তার সন্তানদুটিকে যে দস্যুদল লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে গিয়েছে সেই দস্যুদলের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব হ'তে পারে।

মোজেস কার্ভার ব্যাকুল কণ্ঠে বেন্টলিকে ব'ললেন, "একটা সাংঘাতিক বিপদে প'ড়ে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি বেন্টলি। যেমন ক'রে হোক আমাকে এই বিপদ থেকে তোমায় উদ্ধার করতেই হবে। গত রাত্রে নিশাচর দস্যুরা আমার নিগ্রো ক্রীতদাসী মেরী এবং তার দুটি সন্তানকে লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে গিয়েছে। তাদের উদ্ধার ক'রে আনবার দায়িত্ব আমি তোমার উপরে দিতে চাই। তুমি তাদের আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দাও। আমার সবচেয়ে ভালো ঘোড়া পেশারকে আমি তোমায় দিচ্ছি—এটাই তোমার পুরস্কার। এই ঘোড়া এখন থেকে তোমার হ'ল। এই ঘোড়া নিয়ে তুমি চ'লে যাও। যদি দস্যুরা মেরীকে অমনি ছেড়ে দিতে না চায়, যদি তার জন্য তারা মুক্তিপণ দাবী করে, তবে এই নিয়ে যাও আমার টাকার থলি তোমাকে দিচ্ছি। মুক্তিপণ দিয়েই তুমি তাদের মুক্ত ক'রে নিয়ে এসো।"

সেই দিনই সন্ধ্যার কিছু আগে বেন্টলি দক্ষিণ দিক অভিমুখে ঘোড়ায় চ'ড়ে রওনা হ'ল।

মোজেস কার্ভার আশান্বিত মন নিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

মেরী ও তার সন্তানদের আবার ফিরে পাবেন এই আশা নিয়ে কার্ভার দম্পতি উদগ্রীব চিত্তে দিন কাটাতে লাগলেন। মিসেস সুসান কার্ভারের কোলে পরিপূর্ণ মাতৃস্নেহে জিম লালিত হ'তে লাগলো।

বেন্টলিকে পাঠিয়ে মোজেস কার্ভার ফিরে

আসবার পর ছয়দিন ছয় রাত অতিবাহিত হ'ল। কিন্তু বেন্টলির তারপর থেকে আর কোন খবর নেই। সে কোথায় গিয়েছে, কী করছে, কিছুই জানা গেল না।

ইতিমধ্যে মহা সমারোহে বর্ষা নেমেছে। নিরন্ধ্র নিবিড় কালো মেঘে আকাশ সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছে, শুরু হ'য়েছে মুহুর্মুহু বিদ্যুতের ঝলকানি আর বজ্রের গর্জন। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া চাবুকের মতো আঘাত হানছে অরণ্যানির বুকে। অবিশ্রান্ত ভাবে চ'ললো এই বর্ষা বেশ কয়েকদিন ধ'রে।

ছয়দিন পরে এমনি দুরন্ত বর্ষার এক বৃষ্টিভেজা দিনে বেন্টলি এসে হাজির। ঘোড়াটা সঙ্গে নেই, দস্যুরা সেটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। কাজেই অনেকদূর পথ বেন্টলির পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে। অঝোর বৃষ্টিতে তার পোষাক পরিচ্ছদ সব ভিজে গিয়ে একাকার হয়েছে। সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝ'রছে। ভীষণ শীতে সে দস্তুর মতো ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। তার জামার নীচে ন্যাকড়ায় জড়ানো একটা ছোট পুটলি, সেটাও ভিজে জবজবে।

বেন্টলি অতি সন্তর্পনে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে তার জামার নীচে থেকে পুটলিটা বের ক'রে মোজেস কার্ভারের হাতে তুলে দিল, বললো, "আমি সেখানে গিয়ে যখন পৌঁছেছি মেরীকে সেখানে তখন আর দেখতে পাইনি। দস্যুরা সম্ভবত তাকে নদীর ওপারে কারুর কাছে বিক্রী ক'রে দিয়েছে। যাবার সময়ে দস্যুরা এই বাচ্চাটাকে পথের ধারে ফেলে গিয়েছে। মনে হ'চ্ছে বাচ্চাটা বেঁচে আছে।"

সুসান কার্ভার আগ্রহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ব্যস্ত-ভাবে সেই ভিজে ন্যাকড়ায় জড়ানো পুটলিটা মোজেস কার্ভারের হাত থেকে নিলেন। পুটলিটা খুলে ফেলে তার মধ্য থেকে ক্ষুদ্র শিশুটিকে বের ক'রে বুকে নিলেন। শিশুটি এতই দুর্বল ও ক্ষীণজীবি যে, প্রথমে বোঝাই মুশকিল হ'ল সে জীবিত না মৃত। তার হৃদ্‌পিণ্ডের ধুক ধুক আওয়াজ এতই অস্পষ্ট যে, তার বুকে বহুক্ষণ একভাবে কান পেতে রাখার পর তার হৃদস্পন্দন অনুভব করতে পারলেন সুসান কার্ভার। তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন। মেরীকে ফিরে পাওয়া গেল না কিন্তু তার ছেলে যে জীবিত অবস্থায় ফিরে এসেছে তাও ভগবানের অসীম দয়া, পরম আশীর্বাদ।

একমাস সময় কেটে গেল কিন্তু ছেলেটার সর্দিকাশী একটুও কমলো না। সুসান দিনরাত ছেলেটাকে নিয়েই থাকেন তাকে বাঁচিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জর্জ কার্ভারকে এই রোগের জের টেনে চ'লতে হ'য়েছিল। অতিরিক্ত সর্দিকাশিতে ভোগার ফলে তাঁর গলার স্বর ছিল অস্পষ্ট ও শ্লেষ্মা জড়িত। তিনি ফ্যাশফেসে গলায় কথা ব'লতেন। কাশির আক্রমনে তাঁর স্বরনালি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

মেরীর শিশু সুসানের যত্নে ও আদরে একটু একটু করে আস্তে আস্তে বড় হ'ল, দাঁড়াতে শিখলো, এক-পা দু-পা ক'রে হাঁটতেও শিখলো, কিন্তু কথা বলতে পারলো না। সে অনেক দেরীতে কথা বলতে আরম্ভ ক'রেছে।

কিন্তু মুখে কথা বলতে না পারলেও কোন কথা তার না-বলা থাকতো না। বিভিন্ন প্রকারের আকার-ইঙ্গিতে এবং তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দুই চোখের ভাষায় মনের ভাব সে প্রকাশ করতো অনায়াসে, তার চোখ দুটি ছিল অতিশয় উজ্জ্বল ও বাঙ্ময়। সুসান কার্ভার শিশুর সেই দৃষ্টির গভীরতা ও ভাবময় ব্যঞ্জনা লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'তেন। ব'লতেন, "জীবনে কখনো আমি আর কারুর এমন সুন্দর, স্বচ্ছ উজ্জ্বল ও শানিত বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টি দেখিনি।"

মোজেস কার্ভার তার জবাবে ব'লতেন, "অমন প্রখর ও বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি, অমন সজাগ ও সংবেদনশীল মন থাকার সার্থকতা কী, বলো। যদি তা একটা অতিশয় ক্ষুদ্র রুগ্ন দেহের মধ্যেই বন্দী রইলো সারাজীবন?"

সুসান গভীর বেদনার সঙ্গে ব'লতেন, "ঈশ্বরই একমাত্র তা ভালো জানেন। তিনি কাকে দিয়ে কোন মহৎ কার্য সম্পাদন করাতে চান তা ক্ষুদ্র মানুষ কেমন

ক'রে বলবে? তিনিই ওকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। ওকে বড় বড় ক'রে তোলা, মানুষ ক'রে তোলা, আমাদের শুধু সেইটুকুই কর্তব্য। ভগবানের দেওয়া সেই কর্তব্য যেন আমরা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি।"

মোজেস কার্ভার তার উত্তরে ব'ললেন,, "তুমি কি মনে ভাবো সুসান, সে কর্তব্যবোধ আমার নেই? কর্তব্য বুদ্ধি আমার যথেষ্টই আছে এবং ভগবান যে মহান দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন সে দায়িত্ব তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ক'রবো। তুমি দেখে নিয়ো সুসান, আমি কিছুতেই কর্তব্যে অবহেলা ক'রে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ ক'রবো না।"

সুসান কার্ভার স্বামীর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে দৃঢ়-কণ্ঠে ব'ললো, "আমিও করবো না।"

এইভাবে কার্ভার দম্পতি মেরীর দুই ছেলে জিম ও জর্জের মাতাপিতার স্থান গ্রহণ ক'রলেন। মেরীর আর কোন খবরই পাওয়া গেল না। জিম ও জর্জের নামের সঙ্গে মোজেস কার্ভার তাঁর আপন পারিবারিক পদবী জুড়ে দিলেন। তখন থেকে দুই ভাইএর নাম হ'ল যথাক্রমে জিম কার্ভার ও জর্জ কার্ভার।

—তিন—

জর্জ কিছুদিন পরে কথা ব'লতে শুরু করলো, কিন্তু তার কণ্ঠের জড়তা দূর হ'ল না, কোন কথাই সে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ ক'রতে পারে না। তাই কার্ভার দম্পতিকে বেশ একটু কষ্ট করে জর্জ কি কথা বলছে তা বুঝে নিতে হয়।

প্রথম যেদিন জর্জ কথা বললো সেদিন থেকেই আরম্ভ হ'ল তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা—অসংখ্য অবর্গল প্রশ্ন। সে কেবলই প্রশ্ন করে, কেবলই জানতে চায়।

বিশ্বে যেখানে যা কিছু আছে তার সব খবর তার জানা চাই। অফুরন্ত তার কৌতূহল, অদম্য তার জ্ঞান পিপাসা। শিশু জর্জের সব প্রশ্নের উত্তর বৃদ্ধ মোজেস কার্ভার সব সময় দিতে পারেন না। সুসান কার্ভারের কাছে জর্জ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতে গেলে তিনি জর্জকে আদর করে তার গাল টিপে দিয়ে বলেন, "বোকা ছেলে, আমার কি অত বিদ্যা আছে যে, তোর প্রশ্নের আমি উত্তর দেবো। তুই তোর আঙ্কেলের কাছে যা। তিনি তোর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন।"

জর্জ জানতে চায়— সূর্য কেন ওঠে? বৃষ্টি পড়ে কেন? ফুল কেন ফোটে? পাখী কেন গান গায়? রামধনুর সাতটা রঙ কী ক'রে হয়? পৃথিবী ঘোরে না সূর্য ঘোরে?

প্রশ্নের বন্যা ব'য়ে যায় জর্জের মুখে। সে আরো জানতে চায়, এসব বিচিত্র বর্ণের ফুল লতাপাতা গাছ জন্মায় কিভাবে?

জর্জের এমনি অনেক আর অজস্র প্রশ্ন। বড়দের কাছ থেকে সে তার সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পায় না, তার কৌতূহল মেটে না। তার জ্ঞান তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হয় না। তার অনুসন্ধিৎসু মন যা দেখে বা শোনে তারই রহস্য উদ্ঘাটন ক'রতে চায়।

মোজেস কার্ভারকে শিশু জর্জ একদিন এমন একটা দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে ব'সলো যার উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই সহজ হ'ল না। তিনি নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ ক'রলেন। জর্জের প্রশ্ন হ'ল, শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মানুষগুলো কেন কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের এত ভীষণ ঘৃণা করে? কালো চামড়ার মানুষগুলোকে তারা দেখতে পারে না কেন? কেন তাদের নিয়ে শ্বেতাঙ্গরা এত তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর নিষ্ঠুর রসিকতা করে? তাদের ওপরে অত্যাচার করে কেন? মোজেস কার্ভারের দিকে প্রশ্নগুলি তীরের মত ছুঁড়ে দিয়ে বালক জর্জ রোষে, ক্ষোভে আর দুঃখে কাঁদতে থাকে, তার ক্ষুদ্র বুকখানি বেদনায় উদ্বেলিত হ'তে থাকে। মোজেস কার্ভারও যে নিজে একজন শ্বেতাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি হিসাবে জর্জ তাঁর কাছ থেকেই তার সব প্রশ্নের জবাব চায়। সে আবার

জিজ্ঞাসা করে, "কই, তারা কালো ফুল লতাপাতা কিংবা গাছের সঙ্গে তো এরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করে না?"

তারপর একসময়ে আপনা থেকেই থেমে যায় জর্জ। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। পরে সে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়, "কেন তা তারা করে না, আমি জানি।"

জর্জ অনেক সময় একা একা আপন মনে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতির রাজ্যে কাননে কান্তারে ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের ফুল পাতা আর লতা ও গুল্মের চারা এবং বিবিধ কীট—পতঙ্গ সংগ্রহ ক'রে এনে ঘরের মধ্যে জমা ক'রে রাখে। এক এক সময় কি মনে ক'রে ছুটে যায় আন্টি সুসানের কাছে হাত ধরে তাঁর ঘরের মধ্যে টেনে এনে জর্জ তার ক্ষুদ্র সংগ্রহশালাটিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে, বলো তো আন্টি এ জিনিষগুলি দিয়ে কী কাজ হবে?

সুসান হেসে হেসে বলেন, "আমি মুখ্যুশুখ্যু মেয়ে—মানুষ, আমি কি ক'রে তা বলবো?"

জর্জ নিজেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়ায়। পায় না। কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর যে যেমন ক'রেই হোক তাকে পেতেই হবে।

তার নব-জীবনের পথ-পরিক্রমা শুরু হ'ল। ওজার্কস পাহাড়ের গড়ানো উপত্যকার ঢালু জমিতে একখানা ক্ষুদ্র বাগান তৈরি ক'রলো জর্জ, সেই হ'ল তার গবেষণাগার। তার বিজ্ঞানসাধনার জন্ম প্রথম বিজ্ঞানমন্দির। সেখানে কত যে অজস্র রকমের লতা ফুল আর গাছের চারা—সব সে সংগ্রহ ক'রে এনেছে নিজের হাতে। নিজের হাতে যত্ন এবংপরিচর্যা করে, গাছেদের খিদে পেলে সে যেন কেমন ক'রে বুঝতে পারে, মা যেমন বোঝে সন্তানের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা। সে তাদের খেতে দেয়, রোগ হ'লে ওষুধ দেয়, শুশ্রূষা করে। শুধু কি তাই? ভাবতে বিস্ময় লাগে। কান পেতে সে গাছ-লতা গুল্মের হৃদস্পন্দন শুনতে পায়, অনুভব করে। আর কারুর পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়।

কিন্তু বালক জর্জের সেই উদ্যান-গবেষণাগারের খবর কেউ জানে না। তা জর্জের একান্ত নিজস্ব এবং গোপনীয়। বহুদিন পর্যন্ত কার্ভার দম্পতি তার বিন্দুবিসর্গও টের পাননি। কিন্তু তাদের দুজনের মনেও একদিন কৌতূহল দেখা দিল, রোজই খুব ভোরে উঠে জর্জ কোথায় যায়, আর ফেরে সেই দুপুর বেলায়। সে কোথায় যায়, কি করে কিছুই তাঁরা জানতে পারে না। কেন কোন দিন এমনও হয়, সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘন হ'য়ে আসে তখন সেবাড়ী ফিরে আসে। মোজেস কার্ভার আর সুসান দস্তুরমতো চিন্তিত হন জর্জের জন্ম, এত ওর কাজ? কী সারাদিন ও কোথায় কাটায়? কী খায়।

একদিন খুব ভোরে উঠে জর্জ বের হ'তে যাচ্ছিল এমন সময়ে মোজেস কার্ভার তার পথরোধ ক'রে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসা ক'রলেন, সারাদিন ওই বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াও কোন আনন্দে? কী সুখ পাও তুমি? নাওয়া নেই, খাওয়া নেই ঠিক সময়ে। ওই বনের মধ্যে তোমার কী কাজ আছে বলো তো।"

জর্জ উল্লসিত হ'ল। তার এই গোপন রহস্যের সংবাদ এত দিনের মধ্যে কেউ তার কাছে জানতে চায় নি। মনে মনে সে একান্ত ভাবেই চেয়েছিল কেউ তাকে তার বনের মধ্যেকার নিভৃত উদ্যানগবেষণাগারের কথা জিজ্ঞাসা করুক। জিজ্ঞাসা ক'রলে সে খুসিই হ'ত। মোজেসের প্রশ্নে জর্জের মনের রুদ্ধ অর্গলে এতদিন পরে ঘা লেগে খুলে গেল। গভীর আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে সে ব'লতে আরম্ভ ক'রলো, "আমি একটি উদ্যান গবেষণাগার তৈরি ক'রেছি ওই বনের মধ্যে। সেটাকে তুমি উদ্যান গবেষণাগার না বলে উদ্যান হাসপাতালও ব'লতে পারো। সেই হাসপাতালে ব'সে আমি রুগ্ন গাছগাছালি এবং লতাগুল্মের চিকিৎসা করি, তাদের ঔষধ পথ্য দিই সেবাশুশ্রূষা করি।"

মোজেস কার্ভার অত্যন্ত কৌতূহলী হ'লেন, বললেন, "আমাকে তোমার উদ্যান হাসপাতাল দেখতে নিয়ে যাবে জর্জ?"

"নিশ্চয় নিয়ে যাবো। কেন নিয়ে যাবো না ?" জর্জ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'ললে। আনন্দে সে দুহাত দিয়ে মোজেস কার্ভারের কোমর জড়িয়ে ধ'রে ব'ললো, "চলো আঙ্কেল, এক্ষুনি আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে।"

মোজেস কার্ভারের বলিষ্ঠ দুইহাতের মুঠোর মধ্যে জর্জ তার ক্ষীণ ক্ষুদ্র ডানহাতখানা রেখে তাঁকে নিয়ে এগিয়ে চললো। গ্রামের সীমানা পেরিয়ে প্রকাণ্ড মাঠ, মাঠের অপর প্রান্তে শুরু হ'য়েছে সেই বন। আপেল, আখরোট, বাদাম আর ওক গাছে ছাওয়া ঘন বনের মধ্য দিয়ে দুজনে চলেছে। পায়ে হাঁটা পথ কিন্তু জর্জ এখনো খুবই দুর্বল, তার রোগের ধকল এখনো সম্পূর্ণ দূর হয়নি। জোরে হাঁটলেই তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, বুকে হাঁপ ধরে। তাই মোজেস কার্ভারকে ছোট জর্জের সঙ্গে পা মিলিয়ে খুব সন্তর্পনে আস্তে আস্তে পথ চ'লতে হয়। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে জর্জের কথাগুলি শুনতে থাকেন জর্জ অনর্গল কথা ব'লছে। কথা ব'লতে ব'লতে মাঝে মাঝে তার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। সব কথা এখনো সে স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ ক'রতে পারে না। কথা ব'লতে গিয়ে তোতলায়।

পাহাড়ের ঢালু উপত্যকার একখণ্ড জমিতে জর্জের তৈরি সেই বাগান যার নাম দিয়েছে উদ্যান গবেষণাগার। এখনে ওখানে নানা জাতের রঙবেরঙের লতা গুল্মের আর গাছের চারা লাগানো, কোন গাছই বিশেষ বড় হয়নি। বিশেষ কোন বিস্ময়কর জিনিষ মোজেস কার্ভারের দৃষ্টিগোচর হল না। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে তিনি অবাক হলেন, জিনিষটা হ'চ্ছে উদ্যানের সর্বত্রই একটা আশ্চর্য সেবাযত্নের ছাপ র'য়েছে মনে হয় কে যেন অতি নিপুন হস্তে উদ্যানটিকে সাজিয়েছে। গাছগুলি সবই তাজা; জীবন্ত এবং বেশ জোরালো, একটিও পাতা পোকায় কাটা বা মরা নেই। জর্জ গর্বভরে তার উদ্যান গবেষণাগারটিকে দেখিয়ে বললো, "এই হ'ল আমার উদ্যান হাসপাতাল।" সে উৎসাহে বৃদ্ধ কার্ভারকে উদ্যানের সব খুঁটিনাটি বিষয় বুঝিয়ে বলতে লাগলো। কিভাবে সে তার গাছপালার যত্ন ও পরিচর্যা করে "শীতকালে দারুণ ঠাণ্ডার প্রকোপে যখন গাছগুলি মুষড়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন আমি গাছগাছালিকে বাঁচাবার জন্তে এবং ঠাণ্ডার আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে গাছ-গুলিকে টিনের ঢাকনা দিয়ে ভালো ক'রে ঢেকে দিই। বসন্ত কাল এলে গাছের চারধার থেকে মাটি সরিয়ে ফেলে ঢাকনা খুলে সেগুলিকে আমি বাইরে নিয়ে আসি। খোলা রোদ হাওয়ায় সাজিয়ে রাখি, তারা মনের আনন্দে সূর্যের আলোতে আর মুক্ত বাতাসের মধ্যে খেলা করে, নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচে।"

আঙ্কেল কার্ভারের কৌতূহল শেষ হ'ল না, তিনি জানতে চাইলেন, "কিন্তু রাত্রে গাছগুলোকে বাঁচাবার জন্তে কী ব্যবস্থা করো ? তুমি তো জানো জর্জ; বসন্তকালে সারা ওজার্ক পাহাড়ে কি রকম সাংঘাতিক তুষারপাত হয়, গাছপালা সব সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে।"

জর্জ বললো, "শীতকালে ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্ত মানুষ যেমন ঘুমোবার সময় আপাদ-মস্তক চাদরঢাকা দেয়, অবিকল ঠিক তেমনিভাবে রাত্রে আমি গাছগুলিকে আবার ভালো করে ঢেকে দিই।"

"কিন্তু এসব তুমি কার কাছ থেকে কিভাবে শিখলে ? মোজেস কার্ভার জিজ্ঞাসা করলেন।"

জর্জ হাসিমুখে উত্তর দিল, "আমি যে ওইসব গাছপালা গুলোকে খুব ভালো বাসি। ওদের ইসারা ইঙ্গিত বুঝতে পারি। ওরা কখন কী করে, কী বলে, আমি জানতে পারি। ওদের মনের ভাব আমার কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ে। ওদের নড়াচড়া, বাতাসের সঙ্গে নেচে দোল খাওয়া, ওদের প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি ইঙ্গিত আমি সব সময়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি। তাই তো আমি এসব করতে শিখেছি।"

কথা বলতে বলতে মোজেস কার্ভার জর্জের সেই গোপন উদ্যান-গবেষণাগারে তার সঙ্গে গিয়ে হাজির হ'লেন। একখানি উঁচুনীচু এবরো-খেবরো জমি। তার তেমন কোন শ্রী-ছাঁদ নেই। কিন্তু সেই কঙ্করময়

রুক্ষ জমিকেই জর্জ একখানি মনোরম উদ্যানে পরিণত করেছে। এসব কেউ তাকে শেখায়নি বটে, কিন্তু প্রকৃতি দেবীর পাঠশালায় নিজে নিজে সেসব শেখার পক্ষে তার কোন অসুবিধা যে হয়েছে এমনও মনে হয় না। তার রচিত উদ্যান গবেষণাগারটিকে দেখে মনে হয় সবুজ বনের মধ্যে কে যেন নানা রঙের সুতোয় বোনা সুন্দর একখানা গালিচা পেতে রেখেছে। একটা বেগুনী রঙের ফুলেভরা গাছের ঝাড়, জর্জ তার কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলো। পরম স্নেহের সঙ্গে সেই ফুলগাছগুলির গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। স্নেহময়ী জননী যেমন আদর করে সন্তানের গায়ে হাত বোলান। গাছের গায়ে হাত বুলোচ্ছে আর ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে গুণ গুণ করে গান গাইছে জর্জ। মোজেস কার্ভার কি যেন একটা কথা বলতে গেলেন, জর্জ তৎক্ষণাৎ হাতের ইসারা করে তাকে থামিয়ে দিল। কথা বলতে নিষেধ করলো।

তারপর, গান গাওয়া যখন শেষ হ'ল, জর্জ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মোজেস কার্ভারকে বললো, "চলো আঙ্কল, এবার আমরা বাড়ী যাই।"

মোজেস কার্ভার জিজ্ঞাসা করলেন জর্জকে, "তুমি যখন গান গাইছিলে তখন আমি তোমাকে একটা কথা বলতে গেলাম আর তুমি আমাকে হাতের ইসারায় থামিয়ে দিলে, কেন বল তো?"

"কারণ ওই গাছটার বেগুনী রঙের ফুলগুলি যে মন দিয়ে আমার গান শুনছিল, তুমি কথা বললে ওদের গান শোনার অসুবিধা হ'ত" জর্জ বললো, "তাই তো বললো ওরা আমাকে।"

"বোকার মতো বাজে কথা বলো না, জর্জ। গাছ গান শোনে, গাছ মানুষের কথা বোঝে, এমন কথা তো কস্মিন কালেও শুনিনি বাপু! এ কি কখনো সত্যি হ'তে পারে?" মোজেস কার্ভার সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন।

জর্জের যেন আর ছেলেমানুষী ভাব নেই। তার বদলে তার কণ্ঠে ফুটে উঠেছে গাম্ভীর্য মেশানো এক আশ্চর্য দৃঢ়তা অবিকল একজন বয়স্ক মানুষের মতো। অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে তার চেহারায়। বিশেষ জোরের সঙ্গেই সে বললো, "পারে আঙ্কেল, পারে। গাছেরা মানুষের মতো মুখের ভাষা প্রকাশ করতে পারে না বটে কিন্তু গাছেরও প্রাণ আছে, অনুভব করার শক্তি আছে। সুখ-দুঃখ আনন্দ বেদনা আছে। আর, শুধু যে আছে তাই নয়, ওদের সঙ্গে একাত্ম হ'তে পারলে মানুষের পক্ষেও তা উপলব্ধি করা একটুও কঠিন নয়। বিশ্বাস করো আঙ্কেল, ওই গাছ, ওই ফুল, ওই লতাপাতা, ওরা সবাই আমার সঙ্গে কথা বলে, ওদের সে কথার ভাষাও আমি বুঝি। ওরাও আমার গান শুনে খুসি হয়, আনন্দ পায়। তাইতো রোজ ভোর না হ'তেই আমি ওদের কাছে এমন ক'রে ছুটে আসি। আমি এসে রোজ ওদের ঘুম ভাঙাই। এই অরণ্যের প্রতিটি তৃণ গুল্ম লতা ও বৃক্ষ আমার সঙ্গে কথা বলে, গান গায়, খেলা করে। বৃক্ষদের শাখাপল্লবের, ফুলেদের পাপড়ির প্রতিটি স্পন্দন আমার অন্তরে সাড়া জাগায়। ওদের স্পন্দন ওদের ইসারা আমি ততই স্পষ্ট বুঝতে পারি, যেমন স্পষ্ট বুঝতে পারি তোমার স্নেহ আর আন্টি সুসানের আদর-সোহাগ। তুমি ও আমার মতো ওদের কথা শুনতে পাবে আঙ্কেল, যদি দরদী মন নিয়ে এবং একটু কষ্ট করে কান পেতে রাখো।

জর্জের খেয়ালীপনাকে কার্ভার দম্পতি বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন ব'লে তার কোন কাজই তাঁদের কাছে খারাপ লাগে না, বরং তারা ভাবেন, জর্জ একটা খ্যাপাটে ছেলে। কিন্তু তাই ব'লে জর্জ অলসও নয়, ঘরের কাজকর্মে তার অবহেলাও নেই। তাকে কোন কাজ করার জন্য যখনই মোজেস কার্ভার অথবা সুসান ডাকেন সে তক্ষুণি গিয়ে হাজির হয় তাঁদের কাছে।

কার্ভার দম্পতি জর্জের মধ্যে একটা আশ্চর্য ক্ষমতার বিকাশ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। বাগানের মধ্যে কোন একটি বেশ তাজা একটা গাছ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মরার মতো হ'ল। আর কেউ না পারুক জর্জ অনায়াসেই গাছের অসুস্থতার সঠিক কারণ নির্ণয় করে বলে দিতে পারে এবং গাছের সেই রোগ সারাবার জন্য কেমন পরিচর্যা করতে হবে ও কী ওষুধ দিতে হবে, তাও সে বলে দিতে পারে।

গাছের চিকিৎসকরূপে জর্জের খ্যাতি ইতিমধ্যেই চারধারে বেশ ছড়িয়ে প'ড়েছে। কাছাকাছি বিভিন্ন গ্রাম থেকে দল বেঁধে লোক আসে এই আশ্চর্য খুদে চিকিৎসকের কাছে। রুগ্ন গাছের চারা সঙ্গে নিয়ে আসে তাদের কেউ কেউ আর কত বিচিত্র ধরণের প্রশ্ন তাদের। বয়স অল্প হ'লে কি হবে, জর্জের ধৈর্য ও তিতিক্ষা বয়স্কদের মতোই। সে কখনো রাগ করে না কিম্বা অসন্তুষ্টির ভাবও দেখায় না। একজন হয়তো জিজ্ঞাসা করলো, বলো দেখি জর্জ, আমার এই গাছটা দিনের পর দিন এমন রোগা হ'য়ে শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? জর্জ সেই গাছের কি রোগ এবং কিভাবে তা সারাতে হবে সে সব বলে দিল সেই লোকটিকে। কারুর গাছ হয়তো ফল ধরার মতো বড় হয়েছে কিন্তু তবুও তাতে ফল জন্মাচ্ছে না। জর্জ তাকেও ব'লে দিল কি করলে সেই গাছে ফল হবে। বালক জর্জের কথাবার্তা তাদের কাছে অনেক সময়েই অদ্ভুত ও বিসদৃশ মনে হয়। এ ধরণের কথা বলতে তারা আগে আর কারুকে কখনো দেখেনি। সে যাই হোক, জর্জের কথা কিন্তু সকলেই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। তার উপদেশ এবং পরামর্শও তারা শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করে। উপকার যখন পায় তাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না, তখন জর্জের ক্ষমতার উপর তাদের ভক্তি বিশ্বাস অসম্ভব রকম বেড়ে যায়।

একদিন একজন লোক এসে জর্জকে তার বাগান দেখাবার জন্য ডেকে নিয়ে গেল। বাগানে ঢুকে একটা গাছ দেখিয়ে সে বললো, এ গাছটার ফলের কুঁড়ি ধরে কিন্তু ফল হবার আগেই সব কুঁড়ি মাটিতে ঝ'রে পড়ে। একটা ফলও বড় হয়না কিম্বা পাকে না। কেন এমন হয়? কী রোগ হয়েছে এই গাছটার? সে জিজ্ঞাসা করলো জর্জকে।

জর্জ সেই গাছটার গোড়ায় গিয়ে বসলো তারপর সন্তর্পণে বেশ যত্নের সঙ্গে গাছের গোড়ায় শিকড়ের সঙ্গে যে মাটি জড়িয়ে ছিল দুই হাত দিয়ে সেই মাটি সরিয়ে দিতে লাগলো। খানিকটা মাটি সরানো হয়ে গেলে জর্জ মাথা নুইয়ে কী যেন দেখতে লাগলো গভীর অভিনিবেশ সহকারে। খালি চোখে সাধারণত দেখা যায় না এমনি এক জাতের অতিশয় ক্ষুদ্র কীট সারিবদ্ধভাবে গাছের অনেকগুলি শিকড় বেষ্টন করে আছে। সেই রাক্ষুসে কীটগুলিই গাছের গোড়া নষ্ট করে দিচ্ছে। শিকড়গুলি খেয়ে ঝাঁঝড়া করে দিয়েছে। কীটগুলো দেখতে অনেকটা ছারপোকার মতো। জর্জ নিজে দেখলো, লোকটিকেও ডেকে কীটগুলি দেখালো। তারপর সেই গাছটার গোটা কয়েক পোকায় নষ্ট করা রুগ্ন শিকড় এবং শুকনো ডালপালা ছেঁটে বাদ দিয়ে গাছের গোড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে কী এক রকম যেন ওষুধ মাখিয়ে দিল সেখানটাতে। সে যে কী ওষুধ তা জর্জ ছাড়া আর কেউ জানে না।

লোকটি জর্জের এইসব কাণ্ড-কারখানা দেখে যত খানি অবাক হ'ল, খুশি হ'ল তার চেয়ে ঢের বেশী। জিজ্ঞাসা করলো জর্জকে—"গাছের গোড়ায় শিকড়ের অনেক নীচে যে ক্ষুদ্র কীটগুলি র'য়েছে সে খবর তুমি জানলে কি ক'রে?"

"কীটগুলি আমি নিজের চোখে দেখতে পেয়েছি। এতে জানবার তো কিছু নেই," জর্জ উত্তর দিল।

"জানার কিছু নেই? তুমি বলছো কী জর্জ? এতো কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। তুমি আমাদের চেয়ে ঢের বেশী জানো জর্জ। আমাদেরও সকলেরই তো চোখ আছে, কিন্তু কই আমরা তো কেউ দেখতে পেলুম না কীটগুলোকে, তুমি দেখলে কী ক'রে। তোমার জ্ঞান আমাদের চাইতে অনেক বেশী ব'লেই তো তোমার পক্ষে দেখা সম্ভব হ'ল।" লোকটি মাথা নেড়ে ব'ললো।

"আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রেছি বলেই কীটগুলোকে দেখতে পেয়েছি। আমার মতন ক'রে দেখলে তোমরাও নিশ্চয় দেখতে পেতে।" জর্জ লোকটিকে বোঝাতে চাইলো।

একবার হ'ল কি, পাড়ার কতগুলি দুষ্ট ছেলে একটা বড় গাছের উঁচু মগডাল থেকে একটা পাখীর বাসা

পেড়ে নিয়ে এলো। তারা বাসার পাখীগুলি তাদের ছানাগুলি নিয়ে কোথায় যায়, জায়গা খুঁজে না পেয়ে কিচিরমিচির শব্দে খুব ডাকাডাকি করতে আরম্ভ করে দিল। জর্জ পাখীদের দুরাবস্থা দেখে পাখীদের জন্ম চমৎকার একটা বাসা তৈরী করে ফেললো। কারু-কার্য এমন বিস্ময়কর হ'ল যে, হঠাৎ দেখে লোকের সেটাকে আসল পাখীর বাসা মনে করা কিছু অসম্ভব নয়।

বনের গাছপালা ও পশুপাখী প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের প্রতি দরদ ও ভালোবাসা জর্জের অনেকটা মূল্যবান সময় কেড়ে নিত সত্য, কিন্তু তাই বলে ছেলেমানুষ জর্জের খেলাধূলা ও আমোদ প্রমোদের প্রতি আগ্রহ যে কিছু কম ছিল তা নয়। অন্যান্য বালকদের মতোই সেও খেলতে এবং আনন্দ কৌতুক করতে খুবই ভালোবাসতো। মজার মজার কথা ব'লে সে তার খেলার সঙ্গীসাথীদের হাসাতো। অনেক সময় সে এমনভাবে তাদের পিছনে লাগতো যে, তারা তার দুষ্টামির জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠতো। জর্জ তার সরু লিকলিকে কাঠির মতো চেহারা নিয়ে যখন লাফাতো, কিংবা কোন বড় একটা গাছের সবচেয়ে উঁচু মগডালে, যেখানে অনেক সাহসী জোয়ান ছেলেরাও উঠতে রীতিমত ভয় পায় সেখানে জর্জ কাঠবেড়ালীর মতো কেমন অনায়াসে গিয়ে চ'ড়ে ব'সতো। সঙ্গীসাথীরা তার কাণ্ড দেখে যেমন অবাক হ'ত তেমনি ভয়েও তাদের বুক কাঁপতো। অত উঁচু থেকে জর্জ যদি হঠাৎ কোন রকমে পা পিছলে নীচে পড়ে তবে তার অস্তিত্বই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাই তারা জর্জকে গাছের উঁচু ডাল থেকে নেমে আসবার জন্য কাতর অনুনয় বিনয় করতো। কিন্তু জর্জ হাসি হাসি মুখে তাদের ডাক উপেক্ষা ক'রে আরো উঁচু ডালে গিয়ে উঠতো আর তখন তাকে দেখে মনে হত, সত্যিই যেন একটা কাঠবেড়ালীর মতো খুব ছোট হয়ে গিয়েছে সে—তেমনি হাল্কা আর ক্ষুদ্র। জর্জের প্রকাণ্ড মাথা, চিবুকবিহীন আর্কাবিবৃত মস্তবড় মুখগহ্বর কিছুই আর নীচে থেকে দৃষ্টিগোচর হ'ত না।

আরো বিস্ময়ের কথা, জর্জের চেহারা রোগা হাড়জিরজিরে হ'লে কি হবে দৌড়ের পাল্লায়ও সে থাকতো সবার আগে সবচেয়ে প্রথম। তার চাইতে বয়সে বড় সবল স্বাস্থ্যবান ছেলেরাও তাকে হারাতে পারতো না।

জর্জ আলস্যেমি ভালোবাসে না, কোন না কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা তার স্বভাব। সে সদাই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়, কাজই তার প্রাণ। যখন আর কোন কাজ সে হাতের কাছে পায় না তখন আন্টি সুসানের সেলাইয়ের কাজে সাহায্য করতে লেগে যায়। তার কাছে গিয়ে বলে, "দাও না আন্টি সূঁচসুতোটা আমার হাতে। দেখ, আমি কেমন সেলাই ক'রতে শিখে ফেলেছি।"

মোজেস কার্ভারের খামার বাড়ি থেকে জর্জ একদিন অনেকগুলি পাখীর পালক সংগ্রহ ক'রে আনলো এবং কোথাথেকে একটা মরচে ধরা সুঁই আর খানিকটা সুতো জোগাড় ক'রে পাখীর পালক দিয়ে মোজা তৈরী করতে বসলো।

এমনি হরেক রকমের কাজ জর্জের।

একদিন জর্জ একটা দুর্লভ এবং মহামূল্যবান সম্পদের মালিক হয়ে প'ড়লো—সে সম্পদ হ'ল একখানা বেশ বড় ছুরি। সে ছুরি দিয়ে মুরগী জবাই করা যায়। আবার দরকার হ'লে গাছের ডালও কাটা যায়। মোজেস কার্ভারের কাছ থেকে এই ছুরিখানা উপহার পেয়ে জর্জের সে কি আনন্দ। ছুরি দিয়ে কাগজ কিংবা কাঠ কেটে সে নিজের ইচ্ছামতো নক্সা বানায়, ফুল লতাপাতা বানায়। ঘরের কাজে ব্যবহারোপযোগী অনেক জিনিসও সে তৈরি করে। তার সব সৃষ্টির মধ্যে, তার মতে, সেরা সৃষ্টি হ'ল একজোড়া ক্রাচ। কাঠ কেটে নিজের হাতে সে এটি তৈরী করেছে পাড়ার একটি খোঁড়া ছেলেকে দেবার জন্য, কেউ এ নিয়ে তাকে কোন প্রশ্ন ক'রলে "ভগবান আমাকে তৈরী ক'রতে হুকুম ক'রেছেন, তাই আমি করেছি।"

জর্জ যে কাজই যখন করে গভীর মনোযোগ দিয়ে

করে। তার সমগ্র সত্তা সেই কাজের মধ্যে এমনভাবে ডুবে যায় যে, বাইরের কোন কিছুতেই তার আর তখন খেয়াল থাকে না। পড়াশুনা কিংবা অন্য কোন কাজ হ'লেও জর্জের এই একই নিয়ম। কিন্তু এই গভীর মনোযোগ যে সব সময়ই তার পক্ষে কল্যাণের হ'য়েছে, তা নয়। অনেক সময় অনেক ক্ষতিরও তা কারণ হ'য়েছে।

খেলাধূলায় জর্জ অনেকসময় এমন ভাবে মত্ত থাকে যে, যে ভগবানের ওপর তার এত গভীর বিশ্বাস সেই ভগবানের ডাকও সে শুনতে পায় না। পশুপাখী শিকার করা তার একটা বিশেষ প্রিয় খেলা। সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে সে কাধে বন্দুক নিয়ে মাঝে মাঝে শিকারে বের হয়, কিন্তু বন্দুকের ব্যবহার সে তেমন ভালো জানে না। সে ঢিল ছুঁড়তে ওস্তাদ ছিল ছোঁড়ার পাল্লা দিয়ে সে পাড়ার আর কোন ছেলে তার সঙ্গে পেরে ওঠে না। এমনি এক শিকার খেলায় একবার একটা পাখীর মাথা তাক্ ক'রে জর্জ ঢিল ছুঁড়েছে। অব্যর্থ লক্ষ্য। ঢিলটা সবেগে গিয়ে পাখীটার মাথায় লাগলো। সেটা আকাশ থেকে পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে এসে মুখ থুবড়ে প'ড়লো জর্জ একদৌড়ে পাখীটার কাছে গিয়ে দেখে তার মাথাটা একেবারে থেঁতলে গুঁড়িয়ে গেছে। জর্জ সেই ছোট পাখীটার রক্ত মাখা দেহটা দুইহাতে তুলে নিল, আর তার দুচোখ দিয়ে ফোটা ফোটা জল প'ড়তে লাগলো।

রক্ত!

তাজা লাল টকটকে রক্ত!

জর্জ জীবনে এত রক্ত কখনো দেখেনি।

তার চোখের জলের সঙ্গে সঙ্গে তার দুই হাতের আঙুলের ফাক দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে ফোটায় ফোটায় রক্ত ঝ'রে প'ড়তে লাগলো।

জর্জের চোখ দিয়ে সেদিন যে তপ্ত অশ্রু অবিরল ধারায় ঝ'রে প'ড়েছিল সে অশ্রু আর কোনো দিন তার চোখ থেকে শুকোয়নি। তার কান্নাও থামেনি। দুর্বল ও নিপীড়িত এক মানবসমাজের জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কেঁদে গিয়েছেন।

চার

মোজেস কার্ভার তাঁর সারা বছরের উৎপন্ন ফসল গম গাড়ী বোঝাই ক'রে নিকটবর্তী নিয়াসো শহরে যান, সেখানকার কল থেকে ভাঙিয়ে আনার জন্য প্রতি বছরই তাঁকে একবার ক'রে যেতে হয়।

নিয়াসো শহরের সেই গমভাঙাবার কল মোজেস কার্ভারের খামার বাড়ী থেকে প্রায় আট মাইল দূর।

সে বছরও গম ভাঙাবার উদ্দেশ্যে নিয়াসো শহরের উদ্দেশে রওনা হবার সময় আঙ্কেল কার্ভার বালক জর্জকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কি হে জর্জ, যাবে নাকি আমার সঙ্গে শহরে?"

জর্জ অমনি এককথায় রাজী হয়ে গেল। সে এটা আশাই করেনি, কাজেই শহরে যাবার প্রস্তাবে সে তো মহাখুসি বিশেষত সে প্রস্তাব ক'রেছেন স্বয়ং আঙ্কেল কার্ভার।

একলাফে জর্জ গাড়ীর চালকের পাশের আসনে গিয়ে উঠে ব'সলো।

বালক জর্জের নয় বছর বয়সের জীবনে সে এক মহা সৌভাগ্যের দিন। নিয়াসো শহরে গিয়ে তারা যখন পৌছালো তখন শহরের জাঁকজমক আর ঐশ্বর্য দেখে জর্জের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'ল। সে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি শহরে এত অসংখ্য লোক বাস করে, আর এত প্রচুর তাদের ধনসম্পদ, বাড়ীগুলিও কি বড় বড়। প্রায় আকাশছোঁয়া। যেদিকেই জর্জ চোখ ফেরায় সেদিকেই সে দেখতে পায় বিপুল ঐশ্বর্য আর জাঁকজমকের ছড়াছড়ি, অগণিত মানুষের ভিড় আর ঠেলাঠেলি। দোকান পসারে সাজানো প্রশস্ত রাজপথের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে জর্জ বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার চোখের যেন আর পলক পড়েনা।

একটা বড় বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে জর্জের চোখে পড়লো অনেক উঁচুতে ঝোলানো একটা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। তাতে বড় বড় অক্ষরে কী লেখা আছে সে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো কিন্তু প'ড়তে পারলো না

প'ড়তে পারবে কি ক'রে? সে যে এখনো A B C D ও শেখেনি।

বড় রাস্তার ধার ঘেঁষে প্রকাণ্ডএকটা লালরঙের বাড়ী, মোজেস কার্ভার সেটাকে বলেন অট্টালিকা। জর্জকে সেই অট্টালিকাটা দেখিয়ে বললেন, "ঐ ওটা, হ'চ্ছে গিয়ে আদালত, বুঝেছ জর্জ?"

আদালত জিনিষটা যে কী, তাই-ই জর্জ জানে না। না জানুক, বাড়ীটা কিন্তু প্রকাণ্ড, আর কতোখানি জায়গা জুড়ে মাঠের মধ্যিখানে আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আদালতের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে সদর রাস্তা। সেই রাস্তারই অন্য ধারে রয়েছে একটা পার্ক, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য। পার্কের মাঝখানে একটা কৃত্রিম ফোয়ারা থেকে উৎসারিত হয়ে জল শত ধারায় ছড়িয়ে প'ড়ছে।

অবশেষে তারা তাদের গন্তব্যস্থল গম ভাঙানো কলের কাছে গিয়ে পৌছালো। মোজেস কার্ভারের মতো আরো বহু চাষী এসেছে গমবোঝাই গাড়ী নিয়ে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে, গমকলের দরজার কাছে স্তূপাকার করে জমা রাখা আছে গমের বস্তাগুলি। কলে সারাদিন গম ভাঙা হ'চ্ছে। পেশাই করা আটা ফের বস্তাভর্তি করে গাড়ীতে তোলা হচ্ছে। এমনি কত গাড়ী আসছে, আবার গম ভাঙা হ'লে বোঝাই আটা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

জর্জের হঠাৎ দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লো একটা মস্তবড় ওয়াগন এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত অদ্ভুত চেহারার একজন লোকের দিকে। মোজেস কার্ভারও সেই লোকটিকে দেখতে পেয়েছেন। জর্জের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, ও হ'চ্ছে একজন পাড়াগেঁয়ে হাতুড়ে বদ্যি অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের কাছে ভেজাল ওষুধ বিক্রী করাই হ'চ্ছে ওর কাজ।"

লোকটা অবিশ্রান্ত ভাবে একটানা বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। তার চারদিক ঘিরে একদল লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সেই বক্তৃতা শুনছে। দু'একজন লোক দু'একটা টোটকা ওষুধ কিনছেও। কিনছে বটে তবে তাতে কতটা উপকার হবে, কিংবা আদৌ কোনো উপকার হবে কিনা, তা তারা নিজেরাও জানে না। এ এক বিচিত্র চিকিৎসা পদ্ধতি এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এ রকম হাতুড়ে চিকিৎসার প্রচলন আছে।

জর্জেরও একটু ইচ্ছা হ'ল, সেও গিয়ে লোকটার বক্তৃতা শোনে। সে কার্ভারকে বললো, "আঙ্কেল কার্ভার, ওই ডাক্তার কী বলছে আমার শুনতে ভারী ইচ্ছা করছে। যাবো একটুখানি শুনতে?"

"তা বেশ তো, যাও না।" ব'লে মোজেস কার্ভার হাত ধ'রে সাবধানে জর্জকে নামিয়ে দিলেন গাড়ী থেকে। বললেন, "ওখানে বেশী দেরি করো না কিন্তু। শিগ্‌গীরই চলে আসবে। গমকলের কাছে পৌঁছেই আমাকে দেখতে পাবে।

জর্জ যখন গিয়ে সেই হাতুড়ে ডাক্তারের শ্রোতাদের মধ্যে দাঁড়ালো তখন সে নানা রকম ব্যাখ্যা করে উপস্থিত সব লোকেদের বোঝাচ্ছিল তার ওষুধের কি কি আশ্চর্য্য গুণ আছে। একটা ছোট শিশি হাতে নিয়ে তার ভিতরকার তেলের দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলে চলেছে, "আমার এই আশ্চর্য তেলের যে কতো রকম গুণ আছে তা আপনাদের কী বলবো? এই একটি মাত্র ওষুধ দিয়ে পৃথিবীর সব রোগ আমি ভালো করে দিতে পারি। এই আশ্চর্য তেল আমি প্রস্তুত ক'রেছি ভারতীয় হিন্দুদের পরম পবিত্র নদী গঙ্গার তীরে উৎপন্ন অদ্ভুত শক্তিশালী ওষধি বৃক্ষের শিকড় থেকে রস নিষ্কাষন করে নিয়ে সেই রস দিয়ে।"

হঠাৎ সেই হাতুড়ে বদ্যির দৃষ্টি পড়লো ভিড়ের মধ্যে ভয়ে ভয়ে জড়োসড়োভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বালক জর্জের উপর সে বুঝলো এই হচ্ছে তার একটি ভালো শিকার। বললো, "ওহে ছোক্‌রা তোমার কি একটা কুকুর আছে নাকি?"

লোকটা তাকেই জিজ্ঞাসা করছে জর্জ প্রথমটায় তা বুঝতে না পেরে চারপাশের লোকগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল। তারপর আবার সেই বদ্যির দিকে চোখ ফেরাতেই দেখলো, লোকটা তাকেই লক্ষ্য করে কথা

বলছে। তখন জর্জ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো আপনি, কি আমাকে বলছেন?"

হাতুড়ে বদ্যি বিক্রপের সুরে বললো, "হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি। তোমার কি একটা কুকুর আছে না কি?"

এবার সেখানে যতলোক উপস্থিত ছিল একসঙ্গে সবার দৃষ্টি গিয়ে জর্জের উপর পড়লো। তারা সকলে মিলে এমন অদ্ভূত কৌতূহল মেশানো দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে লাগলো যেন সে হঠাৎ পৃথিবীর বুকে ছিটকে এসে পড়া একটা আজব জীব। এরকম জীব যেন তারা আগে আর কখনো দেখেনি। জর্জ থতমত খেয়ে ভয়ে ভয়ে শুকনো গলায় কোন রকমে বললো, আঙ্কেল মোজেসের অনেকগুলি কুকুর আছে, তার মধ্য থেকে একটা স্প্যানিয়েলের বাচ্চা তিনি আমাকে পুষবার জন্য দিয়েছেন।

বদ্যি বললো, "যাও তো, সেই স্প্যানিয়েলের বাচ্চাটা নিয়ে এসো তো দেখি এখানে, দেখবে তার লেজ কেটে ফেলে কাটা লেজের জায়গায় এই তেল একটি ফোঁটা মাত্র দিলেই কেমন নতুন আর একটা লেজ গজিয়ে উঠবে।"

ছেলেমানুষ হ'লেও জর্জের এ কথাটা বুঝতে একটুও দেরী হয়নি যে, হাতুড়ে বদ্যিটা তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করছে। সেই ব্যঙ্গের মধ্যে অপমানের যে তীক্ষ্ণ কাঁটা লুকিয়ে ছিল তা জর্জের ছোট বুকের অন্তস্থল রক্তমাখা করে তুললো। সে আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াতে পারছিল না। চলে যাবার উদ্যোগ করতেই কতকগুলি লোক জোর করে তার হাত চেপে ধরলো, ধরে সেই হাতুড়ে ডাক্তারকে তারা জিজ্ঞাসা করলো, "আপনার ওই আশ্চর্য তেল দিয়ে এই নিগ্রোটার কালো চামড়া সাদা করে দিতে পারেন না? তাদের কণ্ঠস্বরে বিক্রপের বিষ মাখানো আর চোখে পৈশাচিক উল্লাস।

"অবশ্যই পারি", ডাক্তার ও তাদের সঙ্গে সমানে সুরে ব্যঙ্গবিক্রপ মিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দিল।

ভিড়ের মধ্য থেকে আর একজন শ্বেতাঙ্গ প্রশ্ন করলো। "তা কী করে সম্ভব?"

তৃতীয় একজন আরো বেশী রসিকতা করে বলে উঠলো, "কেন হবে না? তেলটা এমন সাঙ্ঘাতিক চিজ যে, ওই নিগ্রোটার গায়ে লাগা মাত্র ওকে একেবারে সাদা ভূত বানিয়ে ছাড়বে।"

জর্জ ইতিমধ্যে লোকগুলোর একটুখানি অন্যমনস্কতার ফাঁকে ভিড়ের মধ্য থেকে ছুটে পালিয়েছে। সবাইকার নিষ্ঠুর ব্যঙ্গবিক্রপের কাঁটার ঘায়ে তার মর্মমূল ক্ষত-বিক্ষত এবং রক্তাক্ত।

বহির্জগতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের শুভ লগ্নটাই তার এইভাবে রক্তমাখা হয়ে গেল।

কসাইদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে লোকগুলিকে জর্জের কসাই ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি। জর্জ এক দৌড়ে কার্ভারের কাছে ছুটে গিয়ে দুহাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো। তাঁর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, "বলো আঙ্কেল মোজেস, নিগ্রোরা কি মানুষ নয়? তাদের কি শ্বেতাঙ্গদের মতো সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার অনুভূতি নেই? তবে আমার গায়ের রঙ কালো বলে ওরা আমাকে এত ব্যঙ্গবিক্রপ করে কেন? কেন করে এই নিষ্ঠুর কৌতুক আর অপমান?"

"সব শ্বেতাঙ্গই ওদের মতো নয় জর্জ আর সবাই তারা কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের ঘৃণা করে না। যারা তা করে তারা শুধু যে নিগ্রোদেরই অপমান করে তাই নয়। তারা বিশ্ব বিধাতারও অপমান করে। সব মানুষকেই এক ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন সেকথা বুঝবার ক্ষমতা ওদের নেই। জ্ঞানের আলোকে যাদের মন উদ্ভাসিত, যারা সংস্কৃতিসম্পন্ন, তাদের আচরণ এরকম নয়। তারা শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে সব মানুষকে সমদৃষ্টিতে দেখে, সমান ব্যবহার করে। তাদের কাছে ছোট-বড় কিংবা উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই। জর্জের মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে পরম স্নেহের সঙ্গে হাত বুলোতে বুলোতে মোজেস কার্ভার কথাগুলি বললেন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই জর্জের জীবনে এমন একজন মহানুভব মানুষের সাক্ষাৎ মিললো যাঁর স্নিগ্ধ মধুর ও আন্তরিক সদয় ব্যবহার জর্জের অন্তরের দুঃখ ব্যথা ও গ্লানির সব জালা মুহূর্তের মধ্যে জুড়িয়ে দিল। সে মানুষটির নাম হ'চ্ছে হার্ম্যান জেগার সুইজারল্যাণ্ড নিবাসী একজন দ্রাক্ষা উৎপাদনকারী কৃষক। দ্রাক্ষাচাষ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার খ্যাতি লোকের মুখে মুখে এমনভাবে প্রচারিত হ'য়েছে যে, বহু দূর দূরান্ত থেকে আঙুরচাষীরা তাঁর কাছে উপদেশ ও পরামর্শ চাইতে আসতো। বহু কৃষককে তিনি দ্রাক্ষা উৎপাদনে উৎসাহিতও ক'রেছেন।

জর্জ অতি অল্পদিনের মধ্যেই হার্ম্যান জেগারের বিশেষ স্নেহের পাত্র হ'য়ে উঠলো। তিনি তার মনের কালিমা দূর ক'রে তার মধ্যে জ্ঞানলাভের একটা তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়ে তুললেন। মন দিয়ে লেখাপড়া শিক্ষা করার জন্য উৎসাহিত হ'ল জর্জ।

হার্ম্যান জেগারের অনুপ্রেরণায় মোজেস কার্ভারও আঙুর চাষে উৎসাহিত হ'লেন। একদিন তিনি জর্জকে সঙ্গে নিয়ে জেগারের আঙুরক্ষেত দেখার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ওজার্ক পাহাড়ের তরাই অঞ্চলে একটা বেশ স্নিগ্ধ ও ছায়াঘন পরিবেশ রচনা করেছে জেগারের সবুজ দ্রাক্ষাকুঞ্জ। বহুদূর অবধি প্রসারিত ঢেউ খেলানো আঙুরের ক্ষেত। মাচায় ঝোলানো লতায় গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ক'লে আছে।

দুদিন পথচলার পর মোজেস কার্ভার জর্জকে নিয়ে জেগারের খামারে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে তাদের চোখের সামনে কার যেন জাদুদণ্ডের স্পর্শে দিগবলয়ের ওপারে এক নতুন জগৎ দেখা দিল। নির্মল নির্মেঘ নীল আকাশ সূর্যোদয়ের রঙে রাঙা। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। সুন্দর প্রভাত। ভোর বেলাকার সূর্য এইমাত্র যেন ওজার্ক পাহাড়ের ওপর দিয়ে হঠাৎ একলাফে আকাশে উঠেছে। বিহঙ্গের কাকলী, মধুপের গুঞ্জন, নানা জাতীয় কীটপতঙ্গ ও ঝিঁ ঝিঁ পোকার আওয়াজ—সব মিলিয়ে সেখানে এমন এক সুন্দর ঐক্যতানের সৃষ্টি হয়েছে যে, সেখানে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তা না শুনে চলে যাওয়া যায় না! অন্যদিকে স্তূপীকৃত খড়ের গাদা ও ভিজে মাটি থেকে ওঠা সোঁদা গন্ধ বাতাস ভারী ক'রে রেখেছে। আপেল ক্ষেতের ধার দিয়ে যাবার সময়ে আপেলের মিষ্টি গন্ধও টের পাওয়া গেল। লাল নীল হলুদ বেগুনী শাদা নানা বর্ণের ফুলের বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত শারদলক্ষ্মী প্রকৃতি দেবীর গৌরবদীপ্ত শ্রী এক উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কল্পনাবিলাসী ও ভাবপ্রবণ শিশু জর্জের সমস্ত অন্তর অভিভূত হল। মুগ্ধ নেত্রে সে অভিনন্দন জানালো নবজাগ্রত সূর্যকে।

কিন্তু জর্জের জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা ক'রেছিল। খাড়া পাহাড়ের চড়াই ডিঙিয়ে যখন মোজেস কার্ভার এবং জর্জ অপর ধারে পৌঁছলো, সামনে দেখতে পেলো বহুদূর অবধি প্রসারিত আঙুরক্ষেত, থরে থরে সাজানো দ্রাক্ষাকুঞ্জ পাহাড়ের গা বেয়ে উপত্যকাভূমিতে নেমে এসেছে। সেই আঙুরক্ষেতেরই একধারে শাদারঙের বাংলো প্যাটার্ণের ছোট একখানা বাড়ী, বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান, অজস্র ফুল ফুটে আছে।

মিঃ জেগার বাড়ীর গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অতিথিদের তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। এমন অভিনব বাগান জর্জ আর কখনো দেখেনি। বাগানের চতুর্দিক পুরু কাচ দিয়ে ঘেরা এবং ছাদের মতো করে উপরটিতেও কাচ লাগান হয়েছে। বাগানটিকে দেখিয়ে মিঃ জেগার ব'ললেন, এই হচ্ছে আমার বাগান, কিন্তু একে আমি বলি আমার "সবুজ ঘর"।

ভাবাবেগ ও উচ্ছাসের সঙ্গে জর্জ ব'ললো, আমার যদি এখানে থাকবার সৌভাগ্য হ'ত আমি জীবনে আর কিছু বোধহয় চাইতাম না। সে ছুটে গিয়ে আঙুরের ক্ষেতের মধ্যে ব'সে পড়েছে এবং একটা একটা ক'রে অঙুরলতা পরীক্ষা ক'রছে। মাটি—যে মাটিতে আঙুরের লতাগুলি জ'ন্মেছে এবং বড় হ'য়েছে সেই মাটিও সে বেশ অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

ক'রে দেখতে লাগলো। আর দেখলো আঙুরের পাতা এবং লতিয়ে পড়া ডালগুলি। পাতাগুলির মধ্যে চোখ রেখে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে জর্জ দেখতে লাগলো। পাতায় ক্ষতিকারক কোন কীট কিংবা পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ইতি মধ্যেই সুরু হ'য়েছে নাকি। পাতাগুলি নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়েছে, না বেশ সতেজ সজীব আছে।

এসব জিনিষ কেউ জর্জকে শেখায়নি. এই উদ্ভিদবিদ্যা জর্জের জন্মগত বিদ্যা।

জর্জের দৃষ্টি এড়িয়ে মিঃ জেগার ফিস ফিস ক'রে মোজেস কার্ভারকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "উদ্ভিদ সম্বন্ধে ওর বেশ ভালো জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা আছে দেখছি। এ বিদ্যা ও পেলো কোথায়?"

মোজেস কার্ভার উত্তরে ব'ললেন, এ জিনিষ ওর কারুর কাছ থেকেই শেখা নয়। আমি যতদূর জানি এ ওর জন্মসূত্রে লব্ধ বিদ্যা। গাছপালা সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে ওর জ্ঞান তার চেয়ে ঢের বেশী। ওর যা জ্ঞান তাতে উঁচু দরের কৃষি পণ্ডিতকেও অনায়াসে ও হারিয়ে দিতে পারে।"

মিঃ জেগারের গা টিপে চুপি চুপি মোজেস কার্ভার ব'ললেন, "ওই শুনুন!"

আঙুরের লতাপাতা পরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে জর্জ ইতিমধ্যে কখন গুন্ গুন্ ক'রে গান ক'রতে আরম্ভ ক'রেছিলো এতক্ষণ দুজনের কেউ তা টের পায়নি হঠাৎ দেখতে পেলেন মোজেস কার্ভার।

"ও তো রীতিমত এক অতি আশ্চর্য ছেলে দেখছি।" মিঃ জেগার মন্তব্য প্রকাশ ক'রলেন।

"হ্যাঁ তাই বটে" মোজেস কার্ভার মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "জর্জ বেশ জোরের সঙ্গে দাবী করে সে গাছপালার কথা শুনতে পায় তাদের ভাষা বুঝতে পারে এবং তার ভাষাও গাছপালারা বোঝে, সে যে গান গায় তাও তারা মন দিয়ে শোনে।"

"ভারী অদ্ভুত তো!" মিঃ জেগার অবাক হ'য়ে ব'ললেন।

বালককে সেই আঙুরের ক্ষেতের মধ্যে একাকী রেখে মিঃ জেগার এবং মোজেস কার্ভার নিঃশব্দে সেখান থেকে স'রে এলেন।

মোজেস কার্ভার হতভাগ্য জর্জের মর্মন্তুদ জীবন কাহিনী, তার মায়ের লুণ্ঠিত হবার সেই ভয়াবহ রাত্রের কথা তার শৈশব থেকে দীর্ঘস্থায়ী রোগভোগের কথা তার শান্ত সুন্দর ভাবপ্রবণ স্বভাবের কথা এবং কীট পতঙ্গ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও প্রাকৃতিক রাজ্যের সমুদয় চেতন অচেতন পদার্থের প্রতি তার গভীর আকর্ষণ ও অপরিসীম মমত্বের কথা সবই মিঃ জেগারকে ব'ললেন।

"ঠিকমতো লেখাপড়া শেখাতে পারলে জর্জ ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত লোক হবে", মিঃ জেগার মন্তব্য ক'রলেন।

"আপনি ঠিকই ব'লেছেন" মোজেস কার্ভার তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হ'য়ে বললেন, কিন্তু জর্জের লেখা-পড়া শিক্ষার পথে একটা প্রকাণ্ড বাধা আছে। শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে ওর প্রবেশাধিকার রুদ্ধ। নিগ্রো শিশুদের লেখাপড়া শেখাবার জন্ম একটা স্কুল আছে বটে, কিন্তু তা অনেক দূরে। আমাদের এখান থেকে প্রায় আট মাইল পথ।"

"একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না মিঃ কার্ভার।" মিঃ জেগার ব'ললেন, "আমি যদি আপনার জায়গায় হ'তাম, আমি তা হ'লে ওকে এমন স্থানে পাঠাতাম যেখানে শুধুই নিগ্রোদের জন্ম স্কুল র'য়েছে। পদে পদে যেখানে শ্বেতাঙ্গদের কাছে অপমানিত উৎপীড়িত হবার ভয় নেই। নিজেকে হীন মনে করার কারণ যেখানে ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই। তেমনি জায়গায় স্বাধীন ও মুক্ত জীবন যাপনের উপযোগী একটি স্কুলে।"

"আরও কিছুদিন পরে যখন ও আরও একটু বড় হবে তখন ওকেও আমাদের পাঠাতেই হবে লেখাপড়া শেখার জন্ম ভালো একটা স্কুলে। সে স্কুল যদি দূরবর্তী কোন জায়গায় হয়, তবুও" মোজেস কার্ভার সামান্য একটুখানি হেসে মিঃ জেগারের কথার উত্তর দিলেন।

দুজনে আবার যখন আঙুরক্ষেতে ফিরে এলেন,

দেখলেন জর্জ তখনো সেখানে সেই আলুর খোপের আড়ালে একাকী ব'সে নিবিষ্ট মনে কী যেন দেখছে। আর কোনো দিকে, বাইরের আর কোন জিনিষের প্রতি তার একেবারেই কোন লক্ষ্য নেই।

"জর্জ!" মিঃ জেগার স্নেহের সুরে ডাকলেন, "আমার ঘরে গিয়ে একটু ব'সবে, চলো। আমি তোমাকে একটা মজার জিনিষ উপহার দেব।"

উপহারের নাম শুনে ছেলেমানুষ জর্জের দু'চোখ আনন্দে উত্তেজনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, তার কোমল ক্ষুদ্র ঠোঁট দুখানি থর থর করে কাঁপতে লাগলো: একটা সত্যিকারের উপহার: এ যে ভাবাই যায় না। জর্জ তার জীবনে উপহার কাকে বলে তা জানেই না। কেউ তাকে কোনো দিন কোনো উপহার দেয়নি। মিঃ জেগার কী জিনিষ উপহার তাকে দেবেন জর্জ কূল কিনারা পেলো না।

কিন্তু সে বেশীক্ষণ চিন্তা করার অবসর পেলো না। অল্প কিছুকালের মধ্যেই উপহারের সামগ্রী তার হাতে এসে পৌঁছলো—একখানা সুন্দর ছবির বই।

মিঃ জেগার বইখানা জর্জের হাতে দিয়ে ব'ললেন, এখানা অক্ষর শিখবার বই। জর্জ অসীম আগ্রহের সঙ্গে দুহাত বাড়িয়ে বইখানা নিল এবং নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধ'রলো। কিন্তু যে বিপুল আনন্দের অভিব্যক্তি তার সারা চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল, নিমেষের মধ্যে তা কোথায় মিলিয়ে গেল। তার পরিবর্তে ফুটে উঠলো গভীর ম্লান এক হতাশার ছবি। দুঃখিত স্বরে সে ব'ললো, "এ বই নিয়ে আমি কি করবো? আমি তো লিখতে পড়তে জানি না।"

"দুঃখ করো না জর্জ, তুমিও লেখাপড়া শিখতে পারবে, আন্‌কেল মোজেস কার্ভার তোমাকে অক্ষর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বানান করে পড়তে শেখাবেন" মিঃ জেগার জর্জকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তারপর একদিন তুমি নিজেই সব পড়তে পারবে।"

বইখানা হাতে নিয়ে জর্জ খানিকক্ষণ তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। বইর প্রথম পৃষ্ঠাটা ওল্টাতেই একখানা সুন্দর ছবি চোখে পড়লো। একজন পর্বত অভিযাত্রীর ছবি। সে পর্বতের চূড়ায় আরোহন ক'রছে, পর্বতের চূড়ায় শাদা বরফ সূর্যকিরণে ঝকমক ক'রছে। জর্জ জিজ্ঞাসা ক'রলো, "ওই বাড়ীখানা কার, মিঃ জেগার?"

"বাড়ী তুমি কোনটাকে ব'লছো জর্জ? ও হ'চ্ছে একটা বিদ্যালয়। ওটাকে তুমি বরং ব'লতে পারো জ্ঞানের মন্দির, মিঃ জেগার উত্তর দিলেন, এবং ভবিষ্যতে একদিন তুমিও নিশ্চয় ওই জ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ ক'রবার অধিকার অর্জন করবে," বালক জর্জের নরম ঢেউখেলানো চুলে পরম স্নেহের সঙ্গে হাত বুলোতে লাগলেন মিঃ জেগার।

সেদিন বালক জর্জের চোখের সামনে অকস্মাৎ এক নতুন জগতের দ্বার খুলে গেল, সেদিন থেকে তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হ'ল ওই পর্বতের চূড়ায় আরোহণ ক'রে কিভাবে ওই জ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ করা যায় তারই উপায় খুঁজে বের করা। কিন্তু আপাতত শুধুই বর্ণমালা শিক্ষা করে উপহারের বইখানার শব্দগুলি বানান করে পাঠ করে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

আন্টি সুসান এবং আন্‌কেল মোজেস কার্ভার বাড়ীতেই জর্জকে লেখাপড়া শেখাবার বন্দোবস্ত করলেন। তাঁরা দুজনেই যত্ন করে তার অক্ষর পরিচয় করালেন। জর্জ ABCD পড়তে শিখলো, স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হবার আগেই সে বেশ ভালোভাবে বর্ণমালা শিখে ফেললো।

জর্জের বিশেষভাবে দুটো শব্দ এমন ভালো লাগলো যে শব্দ দুটো যে অনায়াসেই মুখস্ত করে ফেললো— GOD এবং GOOD। আন্‌কেল মোজেস কার্ভার শব্দ দুটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে জর্জকে বললেন, "একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, এই দুটো শব্দ পরস্পরের খুবই কাছাকাছি এবং শব্দ দুটোর উচ্চারণও প্রায় একই রকম।"

"তার অর্থ হচ্ছে দুটো শব্দ সমগোত্রীয়" আন্টি সুসান

ব্যাখ্যা করে জর্জকে বুঝিয়ে বললেন—GOD IS GOOD ভগবান দয়ালু।"

"ভগবান কি সব মানুষের প্রতি সমান করুণাপরবশ সমান দয়ালু?" জর্জ জিজ্ঞাসা করলো।

মিসেস সুসান কার্ভার বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, "নিশ্চয়।"

"সব মানুষের প্রতি, এমন কি কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের প্রতিও কি ভগবান সমান দয়ালু?" জর্জ বিনা দ্বিধায় প্রশ্ন করে বসলো।

"ভগবানের চোখে সবাই সমান, জর্জ। তিনি শাদাকালোর তফাৎ দেখেন না, কারণ আমরা সব মানুষই সেই পরম করুণাময় ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাঁরই সন্তান এবং তিনি আমাদের সকলের পিতা।"

জর্জ জিজ্ঞাসা করলো, "তিনি কি আমারও পিতা হন, আণ্টি সুসান?"

মিসেস সুসান কার্ভার জর্জকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ জর্জ, হ্যাঁ, তিনি তোমারও পিতা।"

জর্জ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বললো তখন, "তাই যদি হয় আণ্টি সুসান, আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলছি, আমার কাজ দিয়ে, আমার কীর্তি দিয়ে আমি প্রমাণ করবো, আমি আমার সেই করুণাময় পিতার সুযোগ্য সন্তান। ঈশ্বরের নাম আমি বিশ্বে জয়যুক্ত ও গৌরবান্বিত করবো।"

ক্রমশঃ

আচার্য যদুনাথ সরকার
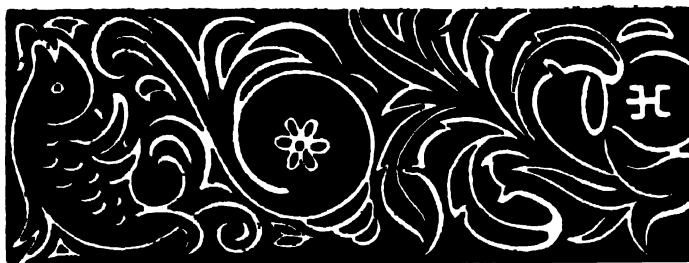
হারাধন দত্ত

Histories make men wise, কথাটা তার ফ্রান্সিস বেকনের। ইতিহাস মানুষকে প্রাজ্ঞ করে তোলে। ভারতবর্ষের-সংস্কৃতি সাধনায় ইতিহাসকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ভারতীয় দর্শনে জীবন সাধনার ভিন্নরূপ প্রকাশিত আছে। জীবনের অখণ্ড সত্য, ভূমার আনন্দ এ ছিল ধূসর অতীত ভারতের ধ্যান-জ্ঞান ও তপস্যার বিষয়। য়ুরোপ প্রাচীন কাল থেকেই ইতিহাসনিষ্ঠ। য়ুরোপীয় সভ্যতার উৎসভূমি গ্রীস সুপ্রাচীন কাল থেকেই বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ। সে দেশের হেরোডটাস্ থ্যুসিডিডিসয়ের নাম ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে? সেই পথ ধরেই এসেছেন প্লুটার্ক, গিবন, গিজো, বিউরি এইচ-জি-ওয়েলস, আর্ণল্ড টয়েনবি প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক বৃন্দ। এদেশের ইতিহাস চর্চায় এই ঐতিহ্য অনুপস্থিত। হিন্দুর পুরাণগুলি একহিসেবে ইতিহাস। তাছাড়া প্রাচীন ভারতে, 'রাজতরঙ্গিনী' প্রণেতা কাশ্মীরের কহ্লাণের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। কৌটিল্য, কামন্দক, ইতিহাস লেখেননি কিন্তু তাঁদের রচনায় ইতিহাসের উপাদান আছে, মুসলীম শাসনে আইন-ই-আকবারী প্রণেতা আবুলফজল ও গোলাম হোসেনের মত দু'একজন ইতিহাসবিদের সন্ধান মিলবে, এর পরেই প্রতীচ্যের সংঘাত—নবযুগের অভ্যুদয়—বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের পদসঞ্চারণ। আমাদের ইতিহাসবোধের সম্প্রসারণ ও দিগ্বিজয় মুখ্যত এই সময় থেকে। আচার্য্য যদুনাথ সরকার এই নবযুগের বিরলতম মনীষীবৃন্দের একজন। আমাদের ইতিহাস চেতনার জাগরণে তিনি ছিলেন শিল্পী ভগীরথ-নূতন দিগন্ত সন্ধানী কলম্বাস।

ঊনিশ শতকের তৃতীয় পাদে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করেছিল বঙ্গমনীষার সারিবদ্ধ মিছিল। বিংশশতকের তৃতীয় পাদে তাঁদেরই শতবর্ষ উৎসব উদযাপিত হচ্ছে। যদুনাথ বঙ্গসংস্কৃতি বিশেষ করে ভারতীয় ইতিহাস সাধনায় ক্ষেত্রে প্রতিভাভাস্বর ব্যক্তিত্ব। ১৯৭০ এর ডিসেম্বর দেশ জুড়ে যদুনাথের শতবর্ষ জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে। মহৎ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মূল্যবোধ জাতীয় জীবনে সঞ্চারিত করে দেওয়ার মাধ্যেই এসব উৎসবের সার্থকতা। গত ১০ই ডিসেম্বর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ক্যালকাটা হিষ্টরিকাল সোসাইটি ও এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' ভবনে আচার্য রমেশচন্দ্র-মজুমদারের পৌরোহিত্যে যদুনাথের জন্মশতবর্ষ উৎসবের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উদযাপিত হ'ল। এই উপলক্ষ্যে দেশের সাময়িক পত্রগুলিও কিছু কিছু দায়িত্ব পালন করেছেন। আচার্য যদুনাথের সুমহান জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ আমাদের অভিপ্রায় হলেও এই সীমিত পরিসরে মনস্বী যদুনাথের সর্বাঙ্গীন পরিচয় প্রদান এক প্রকার দুরূহ কাজ। আমরা অতি সংক্ষেপে এই মহাজীবনের একটা রেখাচিত্রকে আভাসিত করার চেষ্টা করবো।

ঊনিশশতকের বাঙলায় নানামুখী বিদ্যাচর্চার যে উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছিল, জোনস, উইলসন্, প্রিন্সেপ, কোলব্রুক, কাউয়েল, কানিংহাম, ম্যাক্সমুলার, গ্রীয়ারসন, প্রমুখ অগ্রনীদের চেষ্টায় ইতিহাস অনুশীলনের যে বিশিষ্ট ধারা এদেশে প্রবর্তিত হয় এবং যে সূত্রধরে অক্ষয়কুমার দত্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমেশচন্দ্র-দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, অবিনাশচন্দ্র দাস প্রমুখ মনীষীরা ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন-সেই বিদ্যাচর্চার শেষপর্বের বোধকরি শেষ প্রতিনিধি ছিলেন আচার্য

যদুনাথ সরকার। তিনি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক মন নিজেই ছিলেন একজন ঐতিহাসিক পুরুষ। তাঁর জীবনের খুঁটি নাটি ঘটনার বাহুল্যবিস্তার অভিপ্রেত নয়। তথাপি তাঁর বাল্যজীবন ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন সম্বন্ধে দু একটি কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে এসে যাবে।

১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর যদুনাথ রাজসাহী-জেলার 'করচামারিয়া' গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদেব রাজকুমার সরকার এবং মাতা হরিসুন্দরী দেবী। পিতৃদেব রাজকুমার-সরকার ছিলেন এফ এ পাশ। তিনি রক্ষণশীল হিন্দু হয়েও বাংলার নবজাগ্রত জীবনচেতনাকে অঙ্গীকার করেছিলেন। এমনকি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বন্ধুবর্গের অন্যতম ছিলেন। রাজকুমার ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। তিনি নিজে "রাজসাহীবাসী" নামক পত্রিকাখানির সম্পাদনা করতেন। বৃটিশ সিভিলিয়ানদের পরিত্যক্ত গ্রন্থাগারগুলি নিলামে ক্রয় করে নিজ বাসভবনে এক বিপুল গ্রন্থাগার তৈরী করেন। যদুনাথ তাঁর জীবন মন্ত্র পেয়েছিলেন পিতৃদেব রাজকুমার সরকারের কাছে। ১৩৫২ সালের ৫ঠা নভেম্বর তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি নিজেই লিখেছিলেন—"যাঁকে দেখে আমি নিজ জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি, তিনি আমার পিতা—স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার। ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার বালকচিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথমে প্লুটার্কের লেখা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান। সেই থেকে আমার যেন চোখ খুলে গেল।" আর খুল্লতাত হরকুমার সরকার তাঁকে দীক্ষিত করলেন সাহিত্য মন্ত্রে। তাঁরও ছিল বিপুল গ্রন্থাগার। অল্প বয়স থেকেই হরকুমার ছিলেন বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পাঠক। তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থরাজি 'বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে' দান করা হয়।

১৮৮৭ সালে যদুনাথ এনট্রান্স পরীক্ষায় ৬ষ্ঠস্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করেন। এফ এ পাশ করেন রাজসাহী কলেজ থেকে। এফ এ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করেন। পরে চলে এলেন কোলকাতা 'প্রেসিডেন্সীকলেজে'। ১৮৯১ সালে এই কলেজ থেকে ইংরেজী ও ইতিহাসে ডবল অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করে মাসিক ৫০ টাকা বৃত্তি-লাভ করেন। ১৮৯২ সালে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ছাত্রব্রতের যবনিকা এখানেই।

১৮৯৩ সালের জুন মাসে প্রতিভাদীপ্ত-যুবক যদুনাথ রিপন কলেজে (সুরেন্দ্রনাথকলেজে) ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। আরও তিন বছর পরে এলেন মেট্রোপলিটান (বিদ্যাসাগর কলেজে) ১৮৯৮ সালে প্রেসিডেন্সি-কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক। ছাত্রজীবনে প্রেসিডেন্সী কলেজের খ্যাতিমান অধ্যাপক টনি, পার্সিভাল ও রো' সাহেব তরুণ যদুনাথের মনে ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রীতি-অনুরাগ জাগিয়ে তোলেন। প্রেসিডেন্সীতে যোগদানের একবছর আগে India of Aurangazib গ্রন্থে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. আর. এস. লাভ করেন। তারপর পাটনা কলেজ। পাটনা কলেজ থেকে আবার প্রেসিডেন্সী কলেজ। কিন্তু এখানে তিনি বেশীদিন থাকতে পারেননি। Early Annals of the English in Bengal খ্যাত অধ্যক্ষ ডঃ সি. আর-উইলসনের আহবানে যদুনাথ দুমাসপরেই আবার এলেন পাটনাকলেজে। অতঃপর পাটনাই তাঁর জ্ঞান সাধনার কর্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। প্রথমে ইংরেজীর অধ্যাপক হয়ে কাজ করলেও ১৯০৮ সাল থেকে তিনি পুরাপুরি ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৯১৭ সালে যদুনাথ 'বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে' ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক হয়ে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিসে' উন্নীত হন। ১৯১৯ সালে কটক 'র‍্যাভেনশ' কলেজে ইতিহাস ও ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক রূপে দেখা গেল যদুনাথকে। ১৯২০ সালে পাটনা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ১১২৬ সালে 'এড্যুকেশন্যাল সার্ভিস' থেকে অবসর গ্রহণ।

যদুনাথের অবসর গ্রহণ তাঁর কর্মজীবনে যবনিকা টেনে দেয়নি বরং তাঁর গবেষণা, অধ্যয়ন গ্রন্থপ্রকাশনায় গতিবেগ সঞ্চারিত হ'ল। ১৯২৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হলেন। ১৯২৮ সালের পর আরও দু বৎসরের জন্য উপাচার্যের পদ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। যাঁরা পুরানো 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়্যু'র পাতা উলটেছেন তাঁরাই লক্ষ্য করে থাকবেন ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর ক্ষুরধার সমালোচনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গলদ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যধারা অনেকেরই নজরে পড়বে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন তিনি। কিন্তু দলীয় আবহাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করলেন। আশি বৎসর বয়সে তিনি সুবিশাল মোগল ইতিহাস সমাপ্ত করেন। জ্ঞান-চর্চায় তাঁর বিশ্রাম ছিল না। পাঠাভ্যাস ও জ্ঞানচর্চায় তিনি পরিশ্রমের সঙ্গে সুকঠিন শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতেন, তাই মনে হয়। যদুনাথের তিরোধানের পর একটা যুগবিদ্যা ও বৃহৎ ব্যক্তিত্বের অবসান হয়ে গেছে। শুধু ইতিহাস নয়, সাহিত্য, অর্থনীতি, শিক্ষা-ব্যবস্থা ও বহু কিছু বিষয়ে তিনি ভেবেছেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর প্রয়োগ করেছেন। পাটনার খোদবক্স লাইব্রেরী ছিল তাঁর জ্ঞানসাধনার যজ্ঞশালা। ইতিহাসের সত্য আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি আরবী, ফারসী, উর্দু, মারাঠী, রাজস্থানী, সংস্কৃত, ফ্রেঞ্চ পর্তুগীজ প্রভৃতি বহুভাষায় লিখিত পুঁথিপত্র Source material হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস সাধকগণের মধ্যে যদুনাথ এক্ষেত্রে যে অধ্যাবসায় ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন তা এক-প্রকার পথিকৃতের কাজ। তাইত তিনি লিখেছেন—**"India cannot afford to remain for ever an intellectual pariah, a beggar for crumbs at the door of Oxford or Cambridge, Paris or Vienna. She must create within herself a source of the highest original research and assume her rightful place at the school of Asia, even as Periclean Athens made herself the school of Hellas."**

সম্ভবত ইতিহাসান্বেষণ ও গবেষণায় নিরবচ্ছিন্নতার জন্য যদুনাথ দার্জ্জিলিং বসবাস শুরু করেন। এখানে ১৯২৮ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত একটানা তেরো বৎসর বাস করেন। ৭০ বৎসর বয়ক্রমকালে যদুনাথ কোলকাতায় ফিরে এলেন এবং ১৯৫৮ সালের ১৯শে মে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত লেক্‌টেরাসে, কোলকাতার নিজ বাসভবনে তাঁর ইতিহাস সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটান। ইংরেজী তাঁর লেখ্যভাষা ও প্রকাশের বাহন। বাংলা ভাষাতেও তিনি গ্রন্থপ্রণয়ন করেছেন। ১৯৫৮ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত J. N. Commemoration volume গ্রন্থে বীরেন্দ্রনাথ বোস এম, এ, বি, এল মহাশয় যদুনাথের গ্রন্থসূচী প্রণয়ন করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি ১৯ খানি বাংলাগ্রন্থ এবং ২৫ খানি ইংরেজী গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন। হয়ত এ সংখ্যাও সঠিক নয়। ইংরেজী ও বাংলায় রচিত তাঁর বিপুল সংখ্যক নিবন্ধরাজি পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত আছে। ১৯৫৮ সালে তাঁর পরলোকগমনের পর 'মর্ডার্ণ রিভিয়্যু', প্রবাসী' ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' তাঁর কিছু কিছু নিবন্ধের তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ক্যালকাটা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটীর পক্ষে বিমল রায় ও অমলেন্দু দে যদুনাথের বিচিত্র নিবন্ধমালা সংগ্রহের কাজে লিপ্ত আছেন। এ ছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক ডঃ জগদীশ নারায়ণ সরকার মহাশয় যদুনাথের এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত নিবন্ধমালাকে গ্রন্থরূপে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। যদুনাথের শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটী, ক্যালকাটা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটী, নানারূপ প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। কোলকাতা ইতিহাস পরিষদ, যদুনাথের স্বপ্নের রূপায়ন। পরিষদের মুখপত্র 'ইতিহাস' ও **Bengal ; Past and Present,** যদুনাথ স্মারক সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। আচার্য

যদুনাথ সম্পর্কে এই সমস্ত যাবতীয় প্রচেষ্টা নানা কারণে মূল্যবান বিবেচিত হবে।

প্রায় ষাট বৎসর ধরে তিনি একাগ্র মনে ইতিহাস সাধনা করে গিয়েছেন। প্রাচীন জ্ঞানব্রতী সত্যান্বেষীর আসন ছিল সমাজের শীর্ষস্থানে। যদুনাথের ঈপ্সিত আদর্শ ও কার্যক্রম আলোচনা করলে, তাঁকে আচার্য-রূপে চিহ্নিত করতে হয়। ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র। যদুনাথের দীর্ঘ, বৃহৎ, ইতিহাস অনুশীলন 'এপিক' পর্য্যায়ে পড়ে। জীবন সাধনায় তিনি নিঃসঙ্গ ও একক। নিজেই একটা প্রতিষ্ঠানের সামিল। ইতিহাসের এমন এক পর্বে ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র যেখানে তাঁর জুড়ি কেউ ছিল না। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁর বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র হলেও ইতিহাসের ব্যাপক ক্ষেত্রে তিনি বিহার করেছেন। ইতিহাস সাধনায় ইতিহাস লেখকের প্রস্তুতি মনোভাব উপাদান ও তথ্যসংগ্রহ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট। আংশিক ইতিহাসচর্চায় অথবা অসিদ্ধ প্রমাণে ভর করে ইতিহাস রচনায় তাঁর আস্থা ছিল না। Bengal; Past and Present, পত্রিকার জুবিলী সংখ্যায় ইতিহাস সাধকদের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর শেষ বক্তব্য বলে গেছেন। এটি তাঁর 'লাষ্ট টেষ্টামেন্ট'। নবীন গবেষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন—"When I first set my hand to the plough in 1891, research (Except in Sanskrit) meant only the pirating or translation of modern English or French books and we had no other resources. But today no genuine worker on Indian history is content unless he has mastered the language of the original authorities and can utilise the original records, despatches, state papers and iuscriptions, which are the primary indispensable sources." তাঁর ইতিহাস সাধনার 'ম্যাগনাম

' চার খণ্ডে সমাপ্ত Fall of Mughal

ε' তাঁর অসাধারণ ইতিহাস সাধনার

ভেবে Beveridge সাহেব বলেছিলেন 'Jadunath may be called 'Primus in India' as the user of Persian authorities for the history of India, he might also be styled the —"Bengalee Gibbon" কেউ কেউ তাঁর জীবন-ব্যাপী ইতিহাস সাধনার কথা চিন্তা করে তাঁকে জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বহুপূর্বে ১৯২৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী, তারিখের 'The Englishman' এক বিস্তৃত নিবন্ধে সম্পাদকীয়স্তম্ভে লিখেছিল—"But there is no doubt that he stands in the front rank of India's historians, European or Indian. Ferandwrites :—Among the modern historians of India.' Sarkar occupies one of the first, if not the first place." এই সূত্রে তাঁর অনুগামী শিষ্যদের মধ্যে ডাঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো, বি, এন, ব্যানার্জী, ডঃ জগদীশ নারায়ণ সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতিমান ঐতিহাসিকদের কথা মনে পড়ে।

যদুনাথ ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান নগণ্য নয়। সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপক হিসেবে তিনি ইতিহাসের আঙিনায় উপস্থিত হন। যদুনাথের প্রথম বাংলা রচনার নাম, "হরিদ্বার ও কুম্ভমেলা ৮১ বৎসর পূর্বে" কলিকাতা ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের সুহৃদ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'সুহৃদ' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩০২) রচনাটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি রমণীমোহন ঘোষ। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির উজ্জ্বল প্রমাণ আছে। ১৩১৩ সালে, 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত তাঁর 'সোনারতরী'র ব্যাখ্যা এবং ১৩১৭ সালে ঐ পত্রিকাতেই তাঁর "বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য" বাঙলার সাহিত্য সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, সাহিত্য, সমাজ ও ইতিহাস বিষয়ক চিন্তা-ভাবনাকে তিনিই সেকালে অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বদরবারে তুলে ধরেছিলেন। ১৩২২ ও ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমান ও চন্দননগরে অনুষ্ঠিত "বঙ্গীয় সাহিত্য

সম্মেলন”এ যদুনাথ ইতিহাস শাখার সভাপতিত্ব করেন। তিনি “হিষ্টোরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশনে”ও সদস্ত শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন। ১৩৪১ সালের ‘প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন’এও যদুনাথ ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলেন। বাংলাভাষায় রচিত তাঁর প্রবন্ধ নিবন্ধাদির সংখ্যা নগণ্য নয়, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, মাসিক বসুমতী, বঙ্গশ্রী, শিক্ষক, ইতিহাস, ভারতমহিলা, নবনূর, জাহ্নবী, প্রভাতী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, এড়ুকেশন গেজেট, শনিবারের চিঠি, প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় তাঁর বিপুল রচনারাজি বিক্ষিপ্ত আছে। তিনি ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে’র স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘকাল ধরে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। পরিষৎ সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, রাজসিংহ এই ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাসগুলির বিশদ ও প্রাঞ্জল ভূমিকা তিনি লিখেছিলেন। এ ছাড়া ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), হরিহর শেঠের, প্রাচীন কলিকাতা, প্রভৃতি বহু বাংলা গ্রন্থের বিশদ ভূমিকা লিখেছেন। ‘র‍্যাভেনশ’ কলেজে তিনি কিছুকাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গের মধ্যে। অন্যত্র তিনি ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শে এসে দেশ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যে আন্তরিক অনুরাগ ছিল বর্তমান ক্ষেত্রে তার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ইতিহাসেই আচার্য যদুনাথের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি-গবেষণা ও সত্যান্বেষণেই ছিল তাঁর আনন্দ। সভা যশ ও সম্মান আহরণে তাঁর আগ্রহ ছিল না। সে জন্ত ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে যখন ডক্টরেট উপাধিতে সম্মানিত করার প্রস্তাব এসেছিল— তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিলেতের ‘রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটী’ ও ‘আমেরিকান হিষ্টোরিক্যাল এসোসিয়েশন, যদুনাথের অবিস্মরণীয় ইতিহাস সাধনার কথা স্মরণ করে তাঁকে সম্মানিত করেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ক্যালকাটা হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটী, এশিয়াটিক সোসাইটী প্রভৃতি বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তাঁর সুমধুর সম্পর্ক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। যদুনাথ কেবল মাত্র ইতিহাসের নীরস তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহেই বিস্ময়াবহ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেননি—ভাষা ও সাহিত্যে ছিল তাঁর অসাধারণ দখল তিনি যে ভাষা শৈলীতে ইতিহাসকে বাণীরূপ দিয়েছেন তা যে কোন দেশের বরেণ্য ঐতিহাসিকের পক্ষে গৌরবের বিষয়। ‘দি ইংলিশম্যান’ পত্রিকা সম্পাদকীয়-ভাবে যথার্থই লিখেছিল—“Jadunath Sarkar excels in the art of presentation ; his style is of unsurpassable quality ; mere supply of words, facility with phraseology, pedantic description of which India is so very fond, never gained approbation for an Indian author writing in English (13th, Jan, 1923) ১৩৪৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, আচার্য যদুনাথকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। পরিষৎ পত্রিকায়, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। যদুনাথের শত-বর্ষ জন্মজয়ন্তীর এই শুভলগ্নে তাঁর জ্ঞান মনীষা ও জীবন-ব্যাপী ইতিহাস সাধনার বিস্ময়াবহ কাহিনী সমগ্র দেশ-বাসী সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছে। আমাদের এ আলোচনা নিতান্তই স্মৃতি তর্পণ। পরিশেষে যদুনাথের অকৃত্রিম বন্ধু ও মারাঠী ইতিহাসের যুগনায়ক G. S. Sardesai এর একটি উক্তি স্মরণ করে যদুনাথ প্রসঙ্গ শেষ করছি— “Sir J. N. *Sarkar*, as a historian, is not an accident, not a fortunate child of opportunities but the consummation of a life of preparation, planning, hard industry and ascetic devotion to a great mission.”

—যদুনাথের গ্রন্থপঞ্জী—

1) India of Aurangzib, Topography, Statistics and Roads : 1901
2) Economics of British India. 1909
3) History of Aurangzib : Vol. I, 1912
4) History of Aurangzib : Vol. II, 1912

5) History of Aurangzib : Vol. III, 1916
6) History of Aurangzib : Vol. IV, 1919
7) History of Aurangzib : Vol. V, 1924
8) Ancedotes of Aurangzib and other Historical Essays : 1912
9) Chaitanaya : His Pilgrimage and Teachings : 1913
10) Shivaji and his Times : 1919
11) Studies in Mughal India : 1919
12) Mughal Administration : 1st series, 1920
13) Mughal Administration : 2nd series, 1925
14) Mughal Administration : combined, 1925
15) Later Mughals : by W. Irvine, Ed. and Continued, Vol. I-II : 1922
16) India Through The Ages : 1928
17) Short History of Aurangzib : 1930
18) Bihar and Orissa during the Fall of the Mughal Empire : 1932
19) Fall of The Mughal Empire : Vol. I 1932
20) Fall of The Mughal Empire : Vol II 1934
21) Fall of The Mughal Empire : Vol III '38
22) Fall of The Mughal Empire : Vol IV '50
23) Studies in Aurangzib's Reign : 1933
24) House of Shivaji : 1940
25) Maasir-i-Alamgiri (Bibliotheca Indica) Trans : 1947
26) Poona Residency Correspondence (Edited) Vol. I 1930
27) Poona Residency Correspondence (Edited) Vol. VIII, 1945
28) Poona Residency Correspondence (Edited) Vol. XIV, 1949
29) Ain-i-Akbari, (Bibliotheca Indica) Edited. Vol. III Trans. 1948
30) Ain-i-Akbari, (Bibliotheca Indica) Edited. Vol. II Trans. 1950
31) History of Bengal. Vol. II (D.U.) Edited. 1948
32) Cambridge History of India, Vol. IV, 4 Chapters : 1937
33) Persian Records of Maratha History (Trans.) Vol. I
34) Persian Records of Maratha History (Trans.) Vol. II.
35) Bengal Nawabs (Asiatic Society)
36) Shivaji, A Study in Leadership. 1949
37) Military History of India.
38) History of the Dasnami Sect. Vols. I-II.
39) সিয়ার উল-মুতাখরীন—অনুবাদক গৌরসুন্দর মিত্র, সম্পাদিত, ১৩২২।
40) শিবাজী (১৯২৯)
41) মারাঠা জাতির বিকাশ ১৩৪৩।

যদুনাথ সরকারের গ্রন্থরূপে অপ্রকাশিত রচনা

1) The Rani of Jhansi (Hindusthan Standard)
2) Famous Battles of Indian History (Do)
3) Rajasthan Records.
4) Military Tradition of Western India.
5) Chronology of Indian History (1780-1800)
6) ইতিহাসের সাধনা।

[ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর বিপুলসংখ্যক প্রবন্ধ-নিবন্ধ এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।]

কৈবল্যের কবলে

(গল্প)

সন্তোষকুমার ঘোষ

শোনা যায়—কর্তাটিকে নাকি দায়ে পড়ে দেহ রাখতে হয়েছিল। তাই ওঁর আত্মার কোনরকম সদ্গতি হতে পারে নি। না হলে—ইহজীবনের শেষ দিকটায় কৈবল্যলাভের জন্যে উনি কম কাণ্ড করেন নি। কিছু না হ'ক, বার সাতেক সংসার ত্যাগ করেছিলেন। নেড়ানেড়ীদের দলে ভিড়েছিলেন। আউল-বাউলদের সঙ্গে ঘুরেছিলেন। অবধূতদের দল ভারি করেছিলেন। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদেরও শাগরেদি করেছিলেন। তিলকসেবা সার করে কৃষ্ণভজা—কুলকুণ্ডলিনী জাগানো—পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে সাধনা—মায় জটাচিমটেধারী হয়ে ছাইভস্ম মেখে ধুনি জ্বালিয়ে বসা—করতে কিছুই বাকি রাখেন নি উনি। হলে কি হবে। সাধনার পথে শেয়াকুল কাঁটা ছিলেন গিন্নীটি। যেমনি দজ্জাল, তেমনি খাণ্ডার। খাঁটি একটি বাঘবাঘিনী। এই বাঘিনী প্রতিবারেই খোঁজ-খোঁজ করে ধরে-পাকড়ে এনে সংসারের জোয়াল ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। উপায়ন্তর না দেখে উনি শেষটায় বাড়ীর কাছাকাছি নিজেরই বাগানে নিখুঁত একটি পঞ্চবটী বানিয়েছিলেন। এই পঞ্চবটীতেই উনি সাধনায় বসতেন। কর্তার সবশেষ নেশা হয়—ভৈরবীচক্রে বসা। এক রাতে এই চক্রে বসা অবস্থাতেই গিন্নী নাকি মুড়ো খ্যাংরা মেরে মেরে কর্তা আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সাধনার নেশা জন্মের মত ছুটিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ক্ষোভে-ধিক্কারে কর্তা সেই রাতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে বেলডালে ঝুলে ইহসংসার ত্যাগ করেন। মায়া প্রপঞ্চ বলে কথা। মুখ-অগ্নি না হওয়া পর্যন্ত উনি দেহটার কাছে কাছেই অবশ্য ঘুরঘুর করেছিলেন। চুল্লি দাউদাউ করে জ্বলে উঠতেই দেহের মায়া কাটিয়ে উনি সোজা গিয়ে শ্মশানধারের বটগাছটায় উঠে আশ্রয় নেন। সেই থেকেই ওখানে রয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে পুরো পঞ্চাশটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেছে—ওঁর সেদিকে খেয়ালই নেই।

ইহকালের অভ্যাসমত কর্তা সেদিন খুব ভোরে উঠে গাছের মগডালটিতে বসে নির্বিষ্টমনে মোহমুদ্গর আওড়াচ্ছিলেন। ঝাঁকানি খেয়ে ডালটা হঠাৎ বেয়াড়াভাবে দুলে উঠল। চমকে উঠলেন উনি। বাদুড়-পেঁচা নয়—চিল-শকুনি নয়—বাঁদর বা হনুমানও নয়। দেখলে আস্ত একটি মেয়ে মানুষ মাত্র গজ তিনেক দূরে ডালের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চোখাচোখি হতেই মেয়ে মানুষটি ফিক করে হেসে ওর দিকে বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করলেন।

সূক্ষ্ম শরীর। কাজেই বয়েসটা আন্দাজ করা খুবই শক্ত। আগাগোড়া কিন্তু রসে ডগমগ করছে। মুহূর্তের মধ্যে মোহমুদ্গরের মুণ্ডপাত হয়ে গেল। কর্তা চক্ষু ছানাবড়া করে চেয়ে রইলেন।

মেয়েমানুষটি আবার লীলাময়ীর মত ফিক করে হাসলেন। বললেন—মরণ তোমার। অমন করে

তাকিয়ে মরছো কেন? চিনতে পারছো না নাকি? অন্য কেউ নয়। আমি মুখী বামনী—তোমার যম।

রা কাড়বেন কি! গলার আওয়াজ শুনেই কর্তা খোঁচা-খাওয়া শামুকের মত গুটিয়ে গেলেন। মুখী বামনী—অর্থাৎ শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী। ওঁর ইহকালের অর্ধাঙ্গিনী। তবে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী বলাই ভাল। এঁর মুখঝামটা, তর্জনগর্জন, কথার কামড় বিষোদ্গার ইত্যাদি একটানা চল্লিশ বছর ধরে যা করে সয়েছিলেন উনি—তা শুধু পরমব্রহ্মই জানেন। ভাবলে—আজও ওর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। ভাবলেন—ইহকাল-টার হাড়মাস চিবিয়ে খেয়েছে—এবার পরকালের দফাও হয়ত গয়া করে ছাড়বে। উনি মনে মনে তারকব্রহ্মনাম জপতে লাগলেন।

গিন্নীর মুখ থেকে আবার শব্দব্রহ্ম ছিটকে বেরুল। —বলি, বাকরোধ হয়ে গেছে—না, এখানেও বসে বসে কুলকুণ্ডলী পাকাচ্ছ?

কর্তা কোন রকমে ঢোঁক গিলে তালু ভিজিয়ে নিয়ে বিস্ময়ের সুরে বললেন—গিন্নী, তুমি! চেহারা দেখে আন্দাজ করতে পারি নি বাপু। তা কবে দেহ রাখলে গো?

—মরেছি পরশু ভোরে। সেই থেকে নাগাড়ে ঘুরে মরছি। বেঁচে থাকতে, সেই যে গো—মায়া-প্রপঞ্চ না কি সব ছাই পাঁশ বকে মরতে না! তা, এজন্মে মরে বুঝলুম—তোমার কথাই সত্যি বাপু। দেহটার মায়া কিছুতেই আর কাটাতে পারি না।—বলতে বলতে গিন্নী কর্তার কাছে এসে মুখোমুখি হয়ে বসলেন।

পুরো পঞ্চাশ বছর পরে গিন্নীর সঙ্গে যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি ঘটলো। হ'ক সূক্ষ্ম শরীর। চেহারার চটক দেখে কর্তা রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এতদিনে গিন্নীর বয়েস একশো বছর পেরিয়ে যাবার কথা। মাজা ভেঙে তেবড়ে-তুবড়ে হাঁটু এক হয়ে যাবারও কথা। কিন্তু চেহারা দেখে—কে বলবে, একশো পাঁচ বছরের বুড়ি। সূক্ষ্মশরীর পেয়ে যেন টাট্টু ঘোড়ার মত টগবগ করছে। কর্তা ঢোঁক গিলে ছিটেখানেক দরদ দিয়ে বললেন—পরশু ভোরে গঙ্গা পেয়েছো বললে—তা, দুদিন ধরে কোথায় ঘুরে মরছিলে গো? আমার খোঁজে বেরিয়ে পথ ভুল করে অন্য কোথাও গিয়ে পড়েছিলে নাকি?

গিন্নী মুখঝামটা দিয়ে বললেন—পোড়া কপাল! তোমার কথা ভেবে আমার যেন আর ঘুম হচ্ছিল না! মরেই অমনি হাঁপাতে হাঁপাতে তোমার কাছে ছুটে আসবো—মুখী বামনীকে তেমন আদেখলে মেয়েমানুষ পাও নি। তুমি এ চুলোয় এখনো বটগাছ আঁকড়ে বসে আছো। এই নিয়ে আমার দু-দুবার দেহরাখা হল।—সে খবর রাখো?

কর্তা অবাক হয়ে অস্ফুটে শুধু বললেন—তাই নাকি!

গিন্নী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন—এবারের মত এর আগের বারেও মরি কোলকাতায়—বড় নাতির বাসায়। কোথায় কেওড়াতলার ঘাট—আর কোথায় এই ক্যাপাচণ্ডীতলার শ্মশান। শীতের ভর রাতে মরেছিলাম তো! কথায় বলে—মাঘের জাড়। উত্তুরে হাওয়া ঠেলে উজানে এতটা আসতে আর মন সরে নি বাপু। তা ছাড়া—ভিটেমুখো হবো কি! ছেলেরা কি ছেলেদের বউরা ছেদ্দা করতো নাকি কোন কালে! বলতে নেই—নাতবউ বাপু পেয়ার করতো একটু। কেমন একটা মায়াও প'ড়ে গিছলো। তাই আর এ-মুখো না হয়ে—'জয় দুগ্গা' বলে নাতবউয়ের পেটেই ঠাঁই নিয়েছিলুম। তা, এবারে জন্মে জীবনটা সার্থক হয়েছে বলতে হবে। পোড়া ক্যানসার অকালে খেলে তাই। না হলে—

বিস্মিত হওয়া চুলোয় যাক গিন্নী ইতিমধ্যে আর একটা জন্ম কাবার করে এসেছেন শুনে কর্তা বেশ খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। ভাবলেন—দু-দুবার চিতার আগুনে পোড় খেয়ে গিন্নীর মেজাজের খরো ভাবটা একটু নরম আর মোলায়েম হয়েছে নিশ্চয়ই। যাই হ'ক কৌতূহলের ঝোঁকে কর্তা আবার কস করে বলে

ফেললেন—ছ'দিন ধরে ঘুরে ঘুরে হায়রান হচ্ছিলে বললে না—তা তবে কী জন্মে গো?

গিন্নী হঠাৎ মনোজ্জ্বল হয়ে উঠে বললেন—ঘুরে মরেছি সত্যি—কিন্তু যে জিনিসের স্বাদ পেয়েছি—কী আর বলবো। মাইরি বলচি—স্বর্গে বলো, বৈকুণ্ঠে বলো—কোন চুলোতেই তা মিলবে না। সব দেখলে শুনলে তোমার মত বিবাগী মানুষেরও চোখ ট্যারা হয়ে যেতো। আর আমার মত বার বার জন্মাতেও ইচ্ছে হ'ত।

কর্তা দুঃসাহসিকের মত হঠাৎ বলে বসলেন—ভুল বুঝেছ গিন্নী। এই ক'বছরের মধ্যেই দু-দুবার দেহ রাখলে—তবু তোমার ইহসংসারের মোহ কাটলো না। তুরীয়ানন্দের চেয়ে বড় আনন্দ আর নেই। মোক্ষ—অর্থাৎ কৈবল্য পাবার জন্যেই আত্মা ছটফটিয়ে মরে—তা জানো?

গিন্নী মুখ ঝামটা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললেন—মারি ঝাড়ু তোমার কৈবল্যির মাথায়। সে জিনিস দেখলে—আর তার সোয়াদ পেলে—যত বড় শুকদেব ঠাকুরই হও না কেন—কোটি কোটি বার ঘুরে ঘুরে জন্মাতে ইচ্ছে হবে।

কর্তা মনে মনে আপশোস করতে লাগলেন। গোটা ইহকাল গেছে—পরকালের মিয়াদও ফুরিয়ে আসছে ক্রমশ। এতদিন ধরে মাথামুড়ো খুঁড়ে কসরৎ করেও তিনি যা পান নি—গিন্নী কি তা হ'লে এজন্মে মরবার আগে ফাঁকি দিয়ে সেই ব্রহ্মস্বাদগোছের কিছু পেয়ে এসেছে না কি।

প্রকাশ্যে বললেন—এ জন্মে গুরুটুরু ধরে কোনরকম সাধনা টাধনায় মেতেছিলে না কি গো?

আগের জন্মের স্বভাবমত গিন্নী খেঁকিয়ে উঠে বললেন—নুড়ো জেলে দিই গুরু মুখপোড়াদের মুখে। মুখীবামনী ও পাঠশালায় পড়ে না। আমি যে জিনিসের স্বাদ পেয়ে এসেছি—তা পাবার জন্তে বেম্মা-বিষ্টুদেরও নোলা সক্ সক্ করে। তুমি তো কোন ছার।

এ জন্মে মরবার আগে গিন্নী যে কি মহাসম্পদ পেয়ে ধন্য হয়েছেন—তা কর্তা ভেবে আদৌ আন্দাজ করতে পারলেন না। শুধু বিস্ময়ঘন দৃষ্টিভুলে গিন্নীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কর্তা বিস্ময়সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন দেখে গিন্নী মোনালিসার ধরণে হাসলেন। রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বললেন—কোলকাতায় বড়োনাতির বাসায় এবারেও দেহ রাখলুম তো? বললে পেত্যয় যাবে না—আমি মরতে বাড়ীতে সারা কোলকাতার লোক ভেঙে পড়েছিল। সে কী ভিড়। আমাকে শেষ দেখা দেখবার জন্যে—আমার শেষ ছবি তোলবার জন্য—আমার খাটিয়ায় শেষবারের মত কাঁধ দেবার জন্যে—লোকের সে কী ঠেলাঠেলি আর গুঁতো-গুঁতি। শেষকালে পুলিশের দল এসে ডাণ্ডা পিটোপিটে আর কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভিড় সামলায়। সত্যি বলছি।

কর্তা বিস্ময়ে ঢোঁক গিলে শুধু বললেন—তাই নাকি।

গিন্নী গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—ভাগবত পাঠের সময় কথক ঠাকুর পুষ্পবৃষ্টির কথা বলতো না। তা বাপু—কানেই শুনেছিলুম শুধু—চোখে তো আর দেখিনি কখনো। এবারে মরে নিজের চোখে পুষ্পবৃষ্টিও দেখলুম। কেওড়াতলার ঘাটে নিয়ে যাবার আগে আমার দেহটাকে সারা শহরে ঘোরালে তো? রাস্তায় রাস্তায় আমার খাটিয়ার উপরে সে কী পুষ্পবৃষ্টি। ফুল, ফুলের মালা আর ফুলের তোড়া জমে জমে আমার গায়ের উপরে ফুলের পাহাড় হয়ে উঠেছিল।

কর্তার বিস্ময়ের ভাব মনের মধ্যে ক্রমশঃ হিমালয়ের আকার নিতে লাগলো। এবারে মরবার আগে গিন্নী যে কী অলৌকিক কীর্তি করে এসেছেন—তা কিছুতেই ভেবে পেলেন না।

গিন্নী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন—তুমি তো আর চোখ কান দাও না কোন দিকে—খবরও রাখো না কোন কিছুর। না হলে—সবই দেখতে শুনতে পেতে—জানতেও পারতে সবকিছু। আমার জন্তে

রেডিওগুলো দু'দিন ধরে কেঁদে কেঁদে কিভাবে শোক জানাচ্ছে জানো ? খবরের কাগজগুলোও শোকের খবরে খবরে ছেয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, দেখো—আসছে রবিবারে গড়ের মাঠে আমার জন্যে বিরাট এক শোকসভা হবে। সভাপতি আর প্রধান অতিথি হবার জন্যে দিল্লী থেকে দুজন মহামন্ত্রী আসছেন। দেশের চারদিক থেকে সেরা সেরা নাচিয়ে আর গাইয়ে মেয়েরা আসছে। সিনেমা থিয়েটারের চাঁই চাঁই নটনটীরাও আসছেন। তাছাড়া দিকপাল পণ্ডিতরাও আমার গুণপনার ব্যাখ্যানা করতে আসবেন শুনছি। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আজ সবে বেস্পতিবার। তিনদিন সময় রয়েছে এখনো হাতে। কি আর করি। কোথায় বা ঘুরে মরি। ভাবলুম—যাই, তুমি সেই আগের মত চক্করে-টক্করে বসছো—না কুলকুণ্ডলী পাকাচ্ছো—দেখে আসি।

কর্তা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না প্রায় মরিয়া হয়ে বললেন—কী মহাকীর্তি করে এসেছো—খুলে বলো না বাপু। হেঁয়ালি করে লাভ কি।

গিন্নী রহস্যময়ীর মত হাসতে হাসতে বললেন—কীর্তি যা করে এসেছি—তা তোমার চোদ্দপুরুষও কোনদিন ভাবতে পারবে না। মুখে বললে তো বিশ্বাস করবে না তুমি ? তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। রবিবার বিকেলে তোমাকে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে চোখে অঙুল দিয়ে সবকিছু দেখিয়ে নিয়ে আসবো।

কর্তার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার সাহস হল না। মনে প্রচণ্ড কৌতূহল দাববার জন্যে উনি অসমাপ্ত মোহ-মুদ্গরের খেই ধরে আবার আওড়াতে শুরু—করলেন।

গিন্নী সঙ্গে সঙ্গে খ্যাক করে দাঁত ঝাড়া দিলেন। বিকৃত কণ্ঠে বললেন—আ মরণ! একজন্ম বাদে দেখা হল। দুটো প্রাণের কইবো—কান পেতে শুনবে—তা নয়, হাঁড়ুংবিড়িং মন্তর আউড়ে মরছে।

দায়ে পড়ে কর্তাকে আবার চুপ করতে হল। উৎকর্ণও হতে হল। গিন্নী হঠাৎ উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে বলতে লাগলেন—তোমাদের বংশে ওরা কবে টোল খুলে পণ্ডিতী করতো—সে সব এখন গল্পকথা হয়ে গেছে। ক'ঘর যজমান-শিষ্য—আর গাঁয়ের ক'বাড়ীর লোক—এছাড়া তোমাদের কে চিনতো বলতো ? আমার দৌলতে তোমাদের বাহান্ন পুরুষের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। হ্যাঁ শুনচো, সরকার থেকে খেতাব দিয়েছে আমাকে—পদ্মশ্রী। মাইরি বলছি।

চোখজোড়া বিস্ফারিত করে কর্তা বললেন—সে আবার কী! আমরা তো বরাবর চতুর্বর্গ ফল পাবার জন্যে মাথামুড়ো খুঁড়ে মরতুম। তা পদ্মশ্রী কী জিনিস ? পেলে কী ফায়দা হয় গো ?

ব্যাপারটা কি—গিন্নী তা বুঝিয়ে বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বাগড়া পড়লো। বলো—হরি—হরি—বো—ও—ওল। আকাশ বাতাসের বুক কাঁপিয়ে শববাহকরা চেঁচিয়ে উঠল। বার বার—তিনবার। একসঙ্গে জোড়ামড়া এসে হাজির হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক কাকও কোরাসে চেল্লাতে শুরু করে দিলে। কর্তা-গিন্নীর সূক্ষ্মশরীর ভেদ করে এডাল ওডালও করতে লাগল তারা। ওদিকে পূব আকাশের কিনারা থেকে সূর্যদেবও উঁকি মারতে লাগলেন। বিশ্রম্ভালাপে তখনকারমত তাই ছেদ পড়ে গেল।

এরপর তিনদিনের মধ্যে গিন্নী আর কথকতা জমাবার আদৌ সুযোগ পান নি। 'ছত্তোর' বলে কর্তা দম এঁটে যোগাসনে বসেছিলেন। চোখ খুললেন পুরো তিনদিন বাদে। গিন্নী ক্ষেপে উদ্দণ্ডগোছ হয়েই ছিলেন। চোখ মেলতেই কর্তাকে হেঁচকা টান দিলেন। সূক্ষ্ম শরীর তাই রক্ষে না হলে মাথা ঘুরে গিয়ে কর্তাকে গোছাগোছা সর্ষেফুল দেখতে হত। জলন্ত তুবড়ির মেজাজে গিন্নী সঙ্গে সঙ্গে বললেন—বসে বসে ধ্যান করে মরছো—এদিকে আজ বিকেলেই শোকসভা বসবে—সে খেয়াল আছে ? কোলকাতা মুখো হাওয়া নেই যে তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছবো। ওঠো শীগ্‌গীর।

কোলকাতায় গিয়ে গিন্নীর শোকসভার ভিড়ের গুঁতোগুঁতি দেখে কর্তার চোখজোড়া বিস্ময়ে ছানাবড়া

হয়ে গেল। কচি-কাঁচা, ধেড়েবুড়ো, বুড়ীবুড়ী—আসতে আর বাকি নেই কেউ। গাদাগাদিতে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে সব। পায়ের তলায় পিষে গণ্ডা গণ্ডা লোক অক্কা পেয়ে গেল। সশরীরে স্বর্গলাভ আর কি! পুলিশের দলও ডাণ্ডাপেটা করতে করতে হিমসিম খেয়ে গেল। ভিড় সামলায় কার সাধ্যি। উনি বাপের জন্মে এমন শোকসভা দেখেন নি। ওঁদের আমলে বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিম চাটুয্যে মরতে শোকসভা হয়েছিল বটে। কিন্তু কিসে আর কিসে! স্বকর্ণে গিন্নীর বহুবিচিত্র কীর্তিকলাপের কথাও শুনলেন উনি।—গিন্নীর এজন্মের জীবনটুকু নিতান্ত স্বল্পমিয়াদী বলে সবাই কাঁদো কাঁদো ভাষায় যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ করতে লাগলেন। মাত্র বিশ বছরের জীবন। তার মধ্যেই উনি কীর্তির হিমালয় রচনা করে গেছেন। জাঙিয়া পরার বয়েস থেকেই নাকি উনি অভিনয় করতে শুরু করেন। যাত্রায় বা থিয়েটারে নয়—ছায়াছবিতে অভিনয়। প্রথম অবদানেই নাকি উনি তামাম দেশকে চমকে দিয়েছিলেন। তাছাড়া—নানান ছবিতে ওঁর অভিনয় লীলা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই চোখ বিস্ময়ে ট্যারা হয়ে গেছে। পুরো পরমায়ু পেলে কী অভাবনীয় কীর্তি যে করতে পারতেন উনি - তাও অনেকে পঞ্চমুখ হয়ে বলতে লাগলেন।

সভার শেষে সেরা একখানি অবাক চিত্রও দেখান হল। কর্তা কোনরকমে তেঁতো গেলার মত মুখ করে তা আগাগোড়া দেখলেন। গিন্নীই তাতে নায়িকা সেজে অভিনয় করেছেন। যেমনি কাহিনী বানানোর ছিরি তেমনি অভিনয় করারও ঢং। দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। সাতবার গঙ্গাজলে ডুব দিলেও বোধকরি মনের গ্লানি কাটে না। ছবি দেখতে দেখতে কর্তার মনের মধ্যে যেন যুগপৎ ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস আর অগ্ন্যুৎপাত শুরু হল। সব দেখেশুনে উনি শেষটায় শুধু হতভম্বই হলেন না—হতবাকও হয়ে হয়ে গেলেন। ফেরবার পথেও একটিও রা কাড়লেন না উনি। স্বধামে অর্থাৎ ক্যাপাচণ্ডীতলার সেই বট গাছটিতে ফিরে কিছুটা ধাতস্থ হবার পরেও যথাপূর্বং নির্বাক রইলেন। গিন্নী হাজারো প্রশ্নের ঘা মেরে মেরেও রা কাড়াতে পারলেন না আর। শেষটায় 'মরুক গে যাক' বলে উনিও মুখ গোঁজ করে ভিন্ন একটি ডালে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

সপ্তাহখানেক পরের কথা। সন্ধ্যার আগে থেকেই বেশ ফুরফুরে দখিনা বাতাস বইতে শুরু করেছে। ঘেঁটুফুলের গন্ধে চারদিক ভরপুর। শিয়ালদের সান্ধ্য ঐকতান সবেমাত্র শেষ হয়ে এল। একজোড়া কালামুখো পেঁচা কোন চুলো থেকে এসে গিন্নীর বসত ডালটায় বসে বেপরোয়াভাবে গলা চড়িয়ে বিশ্রম্ভালাপ শুরু করে দিলে! গিন্নী আর স্থির থাকতে পারলেন না। ক'দিন হল দিলখোশ-করা মিষ্টিগোছের একটা ভাব বুকটার মধ্যে নাগাড়ে কুরকুরি দিচ্ছে। তার ফাগুন-সন্ধ্যায় এই টনমনে আর চুলবুলে পরিবেশ। উনি তাড়তাড়ি কর্তার ডালটায় গিয়ে ঘনঘন নাড়া দিয়ে দিয়ে কর্তার তদ্গত ভাবটুকু কাটালেন। কর্তা চোখ মেলতেই বিলোল কটাক্ষ হেনে বললেন—তোমার সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। মনটা হয়ত কর্কর্ করবে। তা করুক। আমি কিন্তু আজ রাতেই কোলকাতা, বোম্বাই কি দিল্লী—যেখানে হক গিয়ে জন্মাব ঠিক করেছি।

কর্তা কথা কইলেন না। শিবনেত্র করে অস্ফুটে মহাব্যাহৃতি আওড়াতে লাগলেন। গিন্নী উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—মরণ! মরেও তোমার বাতিক গেল না? কৈবল্য পাবার জন্যে এখনও হেদিয়ে মরছো। ওতে তোমার কি গতি হবে শুনি? তার চেয়ে তুমিও 'দুর্গা দুর্গা' বলে আমার সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি কোথাও জন্মাবে চলো। হামাগুড়ি দেবার বয়েস থেকেই কোনরকমে যদি সিনেমায় ঢুকতে পারো—তা হলে মানুষ হয়ে জন্মান সার্থক হবে। দেশের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সবাই দিনরাত তোমার নাম জপবে। সরকার থেকে খেতাব দেবে। আর টাকা যা রোজগার করবে—তা তোমার বাহাত্তর পুরুষ ভোগদখল করেও ফুরোতে পারবে না।

কর্তা শিউরে উঠলেন। ভাবলেন—মরার পরও

গিন্নীর মতিচ্ছন্ন হল নাকি! কিন্তু একটিও রা কাড়লেন না উনি। যথাপূর্ব্বং তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে দম এঁটে বসে রইলেন।

কর্তা কিছুতেই চোখ খুললেন না দেখে গিন্নী খেঁকিয়ে উঠে বললেন—মরো তবে তুমি। ভাগাড়ের এই গাছে বসে বসে ধ্যান করো আর কুলকুণ্ডলী পাকাও। আগেকার সেই হতচ্ছাড়া কাল আর নেই। এখন খানদানী ঘরের মেয়েরা-বউরা—এমন কি ঠাকুরমা-দিদিমারাও সিনেমায় নামছে। তোমাদের ওই কৈবল্য পাবার জন্যে কি ছাই এমন কসরৎ করতে হয়। সিনেমার ছবিতে ঠাঁই পেতে গেলে কত কাঠখড় পোড়াতে হয় আর কিভাবে উমেদারি করতে হয়—তা জানো? আমি বাপু সার বুঝিছি। সিনেমাই এ যুগের সেরা গতি। সিনেমায় ঠাঁই পেলেই আমার জীবনটা সার্থক হবে। আত্মারও তৃপ্তি হবে। এবারে জন্মে আমি আঁতুড় ঘর থেকে বেরুবার আগেই সিনেমায় নামবো ঠিক করেছি।

কর্তার ব্রহ্মরন্ধ্র দাউ-দাউ করে জলে উঠল। থাকতে না পেরে উনি শেষটায় চোখ মেললেন। চোখে ত্রিপুরারির মত মদনভস্মকারী দৃষ্টি। গিন্নী কিন্তু ভড়কাবার পাত্রী নন মোটেই। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন—মরণ আর কি! অমন করে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে মরছো কেন? ভেবো না— মুখী বামনী তোয়াক্কা করে কাকেও। জন্মে কোন রকমে একবার সিনেমায় ঢুকতে পারলে হয়। তোমার মত হাজার গণ্ডা বেটাছেলে তখন কুকুর-বেড়ালের মত পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে চাইবে। রাজা-মহারাজা—আর নবাব বাদশারাও পদসেবা করবার লোভে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবে।

তর সইলো না আর। গিন্নী সেই মুহূর্ত্তেই বটগাছ থেকে চির বিদায় নিলেন। বিদায় লগ্নে কর্তার মুখ থেকে শুধু দুটিমাত্র শব্দ বজ্রনিনাদে ছিটকে বেরুল।—'নিপাত যাও।'
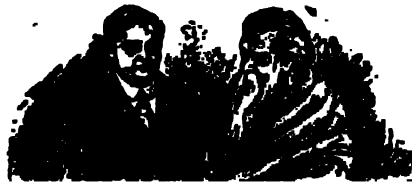
পূর্ণ যোগ—যোগের সম্পূর্ণ লক্ষ্য

(এক)

[শ্রীঅরবিন্দের 'The Hour of God' গ্রন্থে প্রকাশিত 'Purna Yoga—The entire purpose of Yoga' শীর্ষক নিবন্ধের বঙ্গানুবাদ]

অনুবাদক—শ্রী অরবিন্দ বসু

যোগের দ্বারা আমরা মিথ্যা থেকে সত্যে, শক্তিহীনতা থেকে শক্তিমত্তায়, দুঃখ ও শোক থেকে আনন্দে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতত্বে, তমসা থেকে আলোতে, সাঙ্কর্য থেকে শুদ্ধিতে, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণত্বে, অহং এর বিভেদ থেকে একত্বে এবং মায়া থেকে ভগবানে উত্তীর্ণ হতে পারি। যোগের আর সকল প্রয়োগই বিশেষ ও আংশিক সুবিধার জন্য যা সব সময় অনুসরণীয় নয়। যার লক্ষ্য ভগবানের সমগ্রতা লাভ করা—তারই শুধু পূর্ণযোগ। দিব্য-পূর্ণত্বের সাধক যিনি, তিনিই পূর্ণযোগী।

আমাদের নিশ্চিত লক্ষ্য হবে—ভগবান তাঁর সত্তায় ও প্রকৃতিতে যেমন নির্দোষ (perfect) তেমনি নির্দোষ হওয়া তাঁর মত শুদ্ধ ও আনন্দময় হওয়া এবং যখন আমরা পূর্ণযোগে সিদ্ধ হব, তখন সমস্ত মানবজাতিকে সেই একই দিব্য-সংসিদ্ধিতে উন্নীত করা। আমরা যদি এখনই সে-লক্ষ্যে না পৌঁছে থাকি, তাতে কিছু আসে যায়না - যতক্ষণ আমরা এই প্রয়াসে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করব এবং নিরন্তর তারই মধ্যে ও তারই নিমিত্তে জীবন ধারণ করে পথে যদি অনুমাত্রও অগ্রসর হতে পারি, তাহলে আমাদের সেই প্রয়াস,—আমরা যে জ্যোতির্ময় আনন্দ পাব বলে ভগবান সংকল্প করেছেন,—তার দিকে মানবজাতিকে তার বর্তমান সংগ্রাম ও আলোছায়াময় অস্তিত্ব থেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কিন্তু আমাদের আশু সাফল্য যাই হোক না কেন, আমাদের ধ্রুব লক্ষ্য হবে সমগ্র যাত্রাটি সম্পূর্ণ করা ও পথের পাশে কোথাও বা কোনও অনুত্তম বিশ্রামাগারে সন্তুষ্ট হয়ে শুয়ে না পড়া।

যে-সব যোগ আমাদের জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়ে যায়,—সেগুলি বিশেষ ধরণের উচ্চ আধ্যাত্মিক তপস্যা হতে পারে, কিন্তু তা সঙ্কীর্ণ।

ভগবান তাঁর পূর্ণতায় সব কিছু আলিঙ্গন করে থাকেন। আমাদেরও সবকিছু আলিঙ্গন করতে হবে।

সমস্ত অভিব্যক্তি ও জ্ঞানের অতীত নিজের পরম সত্তায় ভগবান হলেন নিরপেক্ষ (absolute) পরব্রহ্ম। জগতের সঙ্গে যেখানে তাঁর সম্পর্ক তার সম্বন্ধে যখন তিনি অবহিত হন বা তার থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন,—তখন সেখানে তিনি সমস্ত বিশ্বসত্তার অতীত, বিশ্ব তাঁর অন্তর্গত ও তাঁর দ্বারা বিধৃত, তিনি তাই, যা বিশ্বরূপে প্রকাশিত; তিনিই বিশ্ব, এবং বিশ্বে যা কিছু আছে সবই তিনি।

তিনি আবার পরাৎপর ও পরম পুরুষ বিশ্বরূপে বিশ্বে ক্রীড়াশীল। এই বিশ্বে তিনি বিশ্বের আত্মা ও

ঈশ্বর রূপে ব্যক্ত; বিশ্বরূপে এখানে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির ক্রমগতি অথবা ক্রমপ্রসারী প্রক্রিয়ারূপে ও সেই গতির অন্তর ও বাহিক ফলের পরিণাম রূপে প্রকট হন। ব্রহ্মের সব বিভাগগুলি—সর্বাতীত, সর্বাত্মক, বিশ্বজনীন ও ব্যষ্টিরূপে দিব্যপুরুষের দ্বারা পরিপূরিত ও বিধৃত।

তিনি একাধারে সত্তাবান এবং সৎস্বরূপ। নির্বিশেষ অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মকে আমরা সৎ বলি, সবিশেষ অর্থাৎ ব্যক্তি আরোপিত ব্রহ্মকে বলি সত্তাবান। আমাদের চেতনার লীলার কাছে ছাড়া এ-দুয়ের কোনও প্রভেদ নেই। কেননা, প্রত্যেক নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা যেমন প্রকট অথবা গূঢ় পুরুষের উপর নির্ভরশীল এবং যে পুরুষকে সে নিজের মধ্যে ধারণ করে অথবা আবৃত করে রাখে তাকে সে প্রকাশও করতে পারে, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তরূপ একটা নৈর্ব্যক্তিক সৎকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করেও তার মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করতে পারে,—এই দুই ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের প্রকাশ তাদের দ্বারা সম্ভব কেননা সবিশেষতা ও নির্বিশেষতা আমাদের পরাৎপর সত্তায় আত্মজ্ঞানের দুইটি ভিন্ন দিক মাত্র।

দার্শনিক মত ও ধর্মগুলি ভগবানের বিভিন্ন বিভাগের পূর্ববর্তিতা নিয়ে বিতর্ক করে এবং বিভিন্ন যোগী, ঋষি, ও সন্তগণ পারম্পরিক বিবদমান এই দার্শনিক বা ধর্মমতের একটিকে অথবা অপরটিকে গ্রহণ করে। আমাদের কাজ হল এগুলির কোনওটিকে নিয়েই বিতর্ক করা নয়, কিন্তু তাদের সবগুলিকেই উপলব্ধি করা এবং তাই হওয়া অঙ্গগুলিকে বর্জন করে একটি বিশেষ দিককে অনুসরণ করা নয়, পরন্তু ভগবানকে সাকল্যভাবে ও সকলভাবের অতীত রূপে আলিঙ্গন করা।

বিভিন্ন রূপে বিশ্বে অবরোহন করে ভগবান দেহ ও মন বিশিষ্ট যে-রূপটিকে এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ করে ধরেছেন তাকেই আমরা বলে থাকি মানুষ। সর্বনিয়ন্তা পুরুষের নিজের রূপদায়িনী ইচ্ছা ও শক্তির মাধ্যমে ভগবান এই জগতে প্রকট করে ধরেছেন সত্তার একটি ছন্দোবিন্যাস—জড় যার নিম্নতম এবং শুদ্ধসৎ যার উচ্চতম স্তর। মন ও প্রাণ অন্নের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এদের নিয়েই বিশ্বসত্তার অপরার্ধ; শুদ্ধচৈতন্য এবং অনাবিল আনন্দ সৎ থেকে নিঃসৃত এবং এরাই হল বিশ্বসত্তার পরার্ধ। শুদ্ধভাব অর্থাৎ বিজ্ঞান এই দুয়ের যোগ মূলরূপে অবস্থিত। সত্তার এই সাতটি স্তর হল,—সত্যলোক, তপঃ, জন, মহঃ, স্বঃ, ভুবঃ এবং ভূঃ—পুরাণের এই সপ্তধা ভুবনের ভিত্তি।

চেতনার এই বিন্যাস ব্যবস্থায়—"ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ"—বেদের এই তিনটি ব্যাহৃতি নিয়ে অপরার্ধ গঠিত। এগুলি চেতনার স্তর,—যারমধ্যে উচ্চতর জগতের সবতত্ত্ব প্রকটিত হয়, অথবা বিভিন্ন অবস্থায় নিজেদের প্রকট করতে চেষ্টা করে। নিজেদের স্তরে তারা শুদ্ধ কিন্তু এই বিদেশে তারা বিকৃত, অশুদ্ধ ও বিক্ষোভকারী মিশ্রণ ও প্রক্রিয়ার অধীন। জীবনের পরম উদ্দেশ্য হল,—এই বিকৃতি, অশুদ্ধি ও বিক্ষোভ অপসারিত করে উচ্চতর তত্ত্বগুলিকে এই অন্যতর অবস্থার মধ্যেই নিখুঁতভাবে প্রকাশ করা। এই জগতে আমাদের জীবন হল একটি দিব্য কবিতা,—আমরা পার্থিব ভাষায় যার অনুবাদ করছি অথবা সঙ্গীতের একটি মূর্ছনা যা, আমরা প্রকাশ করছি শব্দের স্বরালাপিতে।

সৎএর সত্তাবান হলেন বহুর মধ্যে এক, যে-এক নিজেকে হারিয়ে না ফেলে নিজের বহুত্বকে জানে বা তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়না এবং সেই বহু বিশ্বে তার বৈচিত্র্যের লীলার সামর্থ্য হারিয়ে না ফেলে নিজেকে এক বলে জানে। মন, প্রাণ ও দেহের অবস্থায় অহংকার উপজাত হয় এবং চৈতন্যের আভ্যন্তরীন অথবা বাহিক রূপগুলিতে স্বয়ম্ভু সত্তা ব'লে, দেহকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব ব'লে ও অহংকারকে স্বরাট ব্যক্তি ব'লে ভুল করা হয়। আমাদের অভ্যন্তরস্থ এক বহুর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিজের একত্বকে আবার ফিরে পায়, কিন্তু মনের স্বভাববশতঃ নিজের বহুত্বের লীলা বজায় রাখা

কঠিন বলে বোধ করে। সেই জন্ম যখন আমরা সংসারের মধ্যে লিপ্ত থাকি তখন ভগবানকে তাঁর সত্তায় দেখতে পাইনা, আবার যখন ঈশ্বরকে দেখি তখন বিশ্বে তাঁকে আমরা হারিয়ে ফেলি। মনোগত অহংকারকে চূর্ণ ও দ্রবীভূত করে, আমাদের সত্তার যে-শক্তি—ব্যষ্টি ও বহু,—যুগপৎ হবার সামর্থ ধরে; তাকে না হারিয়ে বিশ্বে আমাদের দিব্য একত্বে ফিরে যাওয়াই হল আমাদের সাধনা।

'চিৎ'-এ আলোকময়, মুক্ত, অসীম ও কার্য্যকরী চেতনার প্রকাশ; চিৎ, (জ্ঞানশক্তি) রূপে সে যা জানে তপোরূপে (ক্রিয়াশক্তি) তা-ই সে অভ্রান্ত ভাবে সম্পাদন করে। কারণ জ্ঞানশক্তি হল এক স্বয়ং প্রকাশ চৈতন্যময় সত্তার স্থির ও ব্যাপক রূপ (Comprehensive)* এবং ক্রিয়াশক্তি হল সেই সত্তার গতিশীল ও ঘনীভূত রূপ (Intensive) এ-দুটি ভগবানের বা সৎ-পুরুষের চিৎ-শক্তি—কিন্তু অপরার্ধে—মন, প্রাণ ও দেহের ক্ষেত্রে ও অবস্থায়—দীপ্তিময়তা, খণ্ডিত ও অসমান রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। স্বাতন্ত্র্য, অহংকার ও বিষমরূপের দ্বারা আবদ্ধ হয়;—কার্য্যকারিতা,—শক্তিসমূহের অসম লীলার দ্বারা আবৃত হয়। সেইজন্য, চেতনা, অচেতনা ও মিথ্যাচেতনার; জ্ঞান, অজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের; কার্য্যকারিতা, তামসিকতা ও ক্রিয়াশীলতাহীন শক্তির অবস্থা আমরা প্রাপ্ত হই। আমাদের বিভক্ত ও বৈষম্য-পূর্ণ ব্যক্তিগত ক্রিয়ার ও চিন্তার শক্তিকে কালীর অখণ্ড ও বিশ্বাত্মিকা চিৎশক্তির মধ্যে উৎসর্গ ক'রে আত্মশ্লাঘা-পূর্ণ কার্য্যাবলীর স্থানে আমাদের দেহের মধ্যে কালীর লীলাক্ষেত্র স্থাপিত করা এবং এই ভাবে অন্ধতা ও অজ্ঞানতার বিনিময়ে জ্ঞান এবং অক্ষম মানুষী শক্তির বিনিময়ে ফলপ্রসূ দিব্যশক্তিকে বরণ করাই হল আমাদের কাজ।

'আনন্দে'র বিভাবে পরম আনন্দ হল শুদ্ধ অবিমিশ্র এক হ'য়েও বৈচিত্র্যময়। মন, প্রাণ ও দেহের অবস্থায় তা হয়ে পড়ে বিভক্ত, সীমিত ও জটিল এবং বিপথে চালিত ও অসম শক্তিনিচয়ের আঘাত ও আনন্দের বিষম বন্টনের ফলে তা হয়ে পড়ে মন্দ অর্থক ও নঙ্‌অর্থক গতির,—শোকও হর্ষের, দুঃখও সুখের দ্বন্দ্বের অধীন। এই সব দ্বন্দ্বগুলির কারণ বিচূর্ণ করে সে-গুলিকে বিগলিত করা ও এক বৈচিত্র্যময় সমভাবে বিকীর্ণ—যা সর্বপ্রকার বস্তু থেকে আনন্দের স্বাদ-গ্রহণ করে; ও কোনও কিছুর কাছ থেকে ব্যথা পেয়ে সঙ্কুচিত হয় না,—এইরকম এক দিব্য আনন্দের মহাসমুদ্রে নিজেদের নিমজ্জিত করা হল আমাদের কাজ।

মোটকথা দ্বৈতের স্থলে একত্ব, অহংকারের স্থলে দিব্যচেতনা, অজ্ঞানের স্থলে দিব্যপ্রজ্ঞা, চিন্তার স্থলে দিব্যজ্ঞান, দুর্বলতা, কঠোরশ্রম ও প্রচেষ্টার স্থলে আত্মতৃপ্ত দিব্যশক্তি, দুঃখ ও অলীক সুখের স্থলে দিব্য আনন্দ—আমাদের স্থাপিত করতে হবে। একেই খ্রীষ্টের ভাষায় ধরায় স্বর্গরাজ্য নামিয়ে আনা বলা হয়, অথবা আধুনিক ভাষায় বলা হয় জগতে ভগবানকে উপলব্ধি করা ও সম্ভাবিত করা।

পৃথিবীতে মনুষ্যজাতি হল এই মানুষী আস্পৃহা ও দিব্যকৃতির জন্য বৃত প্রাণ-শক্তির রূপ; অন্য কোনও প্রাণীর এ ব্যাপারে হয় কোনও প্রয়োজন নেই, নয়তো তারা সাধারণ ভাবে এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে অপারগ, যদি না তারা মানুষী সত্তায় নিজেদের উন্নীত করতে পারে। সুতরাং ভাগবৎপূর্ণতা মানবজাতীর একমাত্র প্রকৃত লক্ষ্য ব্যক্তির মধ্যে তাকে প্রথমে ফলিত করতে হবে যাতে সমগ্র মানুষ্যজাতির মধ্যে তাকে রূপায়িত করা যায়।

মানবত্ব হল প্রাণবন্ত দেহে মনোময় সত্তা; এর ভিত্তি হল জড়, কেন্দ্র ও করণ হল মন এবং এর মাধ্যম হল প্রাণ। এই হল গড়পড়তা বা প্রাকৃত মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক অবস্থা।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে চারটি উচ্চতর স্তর বর্তমান। কিন্তু তারা অব্যক্ত। 'মহঃ' বিজ্ঞানে শুদ্ধভাবনা—

* শ্রীঅরবিন্দ এখানে 'Comprehensive' এই ইংরাজী শব্দটি 'বোধ' ও ব্যাপকতা এই দুই অর্থে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। এবং Intensive শব্দ প্রবল ও তীব্র, গাঢ় বা ঘন এই দুই অর্থে প্রযুক্ত।

ব্যাহৃতি নয়, কিন্তু ব্যাহৃতিগুলির উৎস—সেই কোষাগার যার থেকে মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক ক্রিয়া তার বিশাল ও অসীম সম্পদগুলিকে অবরসত্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রায় পরিণত করে। বিজ্ঞান—দিব্যত্তর ও মানবপশুর সংযোগসূত্র এবং সেইহেতু বিজ্ঞান হল মানুষের অতি প্রাকৃত বা দিব্য মনুষ্যত্বে নিষ্কৃতি পাবার পথ।

নিম্নতর মানবজাতি মন থেকে প্রাণ ও দেহের দিকে আকৃষ্ট হয়; গড়পড়তা মানুষ সর্বদাই মনের স্তরেই থাকে কিন্তু প্রাণ ও দেহের দ্বারা সীমিত এবং তাদের দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। উচ্চতর মানুষ আদর্শ মানসিকতা বা শুদ্ধভাবের সাহায্যে জ্ঞানের সাক্ষাৎ সত্য এবং সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত সত্যে উন্নীত হয়। সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ দিব্য আনন্দে উত্তীর্ণ হয় ও সেই স্তর থেকে হয় উপরে শুদ্ধসৎ ও পরব্রহ্মে উঠে যায় অথবা নিজের অবর অঙ্গগুলিকে আনন্দময় করার জন্য এবং নিজের ও অপরের মধ্যে এই মানুষী সত্তাকে দেবত্বে উন্নীত করার জন্য সেই স্তরেই থাকে।

আবরণ বিদীর্ণ করে যে ব্যক্তি নিজের চেতনার উচ্চতর বা দিব্য ও অনুনা-আবৃত পরার্ধে বাস করেন, তিনিই হলেন প্রকৃত বিজ্ঞানময় পুরুষ জড়ের থেকে ভগবানের সেই প্রগতিশীল আত্মপ্রকাশের ক্রমগতির,—যাকে এখন ক্রমপরিণামবাদের তত্ত্ব বলা হয়,—তার জন্য সেই স্তরেই শেষ ফলশ্রুতি।

দিব্য সত্তার শক্তি, জ্যোতিঃ ও আনন্দে উত্তীর্ণ হওয়া ও সেই ছাঁচে সমস্ত পার্থিব সত্তাকে গড়ে তোলা হল ধর্মের শ্রেষ্ঠ অভীপ্সা ও যোগের সম্পূর্ণ ব্যবহারিক লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হল ভগবানকে বিশ্বে উপলব্ধি করা—কিন্তু বিশ্বাতীত ভগবানকে উপলব্ধি না করলে তা সম্ভব হয় না।

ক্রমশঃ
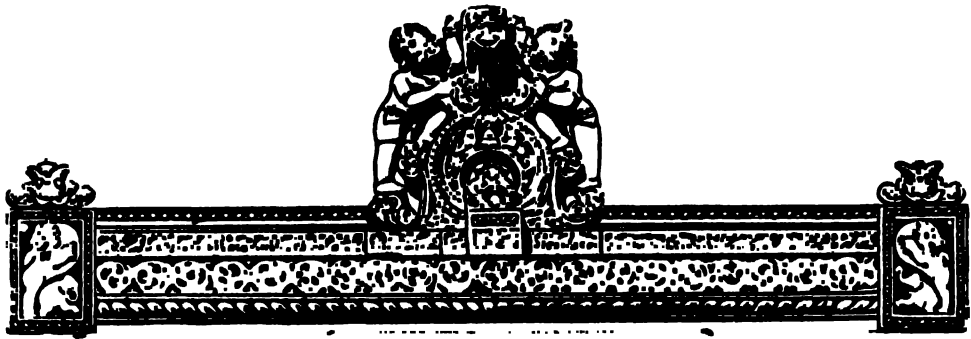
নাগপাশ

প্রতিভা মুখোপাধ্যায়

'সাপ'—কথাটার ভিতরেই একটা আতঙ্ক আছে। সাপের ক্রূরতা বিখ্যাত। ও জাতটাই অতিশয় খল, এতে কোন সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে কারো কারো মুখে শোনা যায়, আঘাত না দিলে সাপ কাকেও কিছু বলে না। এটা একটি প্রবাদ বাক্যের মতই শোনা যায়। সাপের একটি পরিত্যক্ত খোলস দেখলেও "ওরে বাবা" বলে ছুটে পালাবার ইচ্ছে জাতে অজাতে সকলের মনেই আসবে। রাস্তার মাঝখানটিতে সাপুড়ে তার ঝাঁপি থেকে হাত দিয়ে ধরে ধরে সাপগুলিকে নামাচ্ছে, তুলছে, সে সব দেখতে বেশ ভিড় জমে যায়। খুব কৌতূহলী জনতা বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখেই দাঁড়িয়ে দেখে সাপখেলা।

ক্রূর অবোধ সরীসৃপের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিও খুব তীব্র। এক রাস্তায় সাপ খেলা দেখতে দেখতে মনে পড়ল, পূর্ব্ববঙ্গে আমাদের গ্রামে সাপের কীর্ত্তি; দুটি কাহিনী এখনো মনে দাগ কেটে আছে।

পূর্ব্ববঙ্গ নিম্নভূমি, কোন কোন স্থানে বর্ষার সময় চারিদিক জলে থই থই হয়ে যায়। ঘর থেকে পা বাড়ালেই জল। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে কাঠ বা বাঁশ দিয়ে সাঁকো তৈরী করে নিতে হয়। হাট-বাজার স্কুল, ডাক্তারখানা সবই নৌকো করে যেতে হয়। মাঠ ঘাট বাগান পুকুর সব একাকার হয়ে যায়। বর্ষার সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। চুপিসারে আস্তে আস্তে কখন যে কোথা থেকে এত জলরাশি এসে সব ডুবিয়ে দেয়, কিছুই বোঝা যায় না।

জোয়ার স্রোত বা ঢেউ কিছুই চোখে পড়ে না। চুপি চুপি বুকে হেঁটে যেন ওরা এগিয়ে আসে। বাতাস জলের সঙ্গী। হাওয়া দুলিয়ে দুলিয়ে জলকে এগিয়ে দেয়। রাত্রে মুখ ধোবার সময় দেখে এলাম, ঘাটের দুটো ধাপ জলে ডুবে গেছে। সকালে উঠে দেখি, ছটা ধাপ জলের তলায়। দিনের ভিতর দেখতে দেখতে বারটি ধাপ ডুবে ঘাটের উপরের রাস্তা ডুবে গেল। পরে উঠোন, আনাচ-কানাচ সব জলে ভরে গেল। এই বিদেহী নবাগতের আগমনে আমাদের শিশুমন পুলকে ভরে যেত। কি দিয়ে আহ্বান করব ভেবে পেতাম না। ছোট ছোট ফুলগাছ, ঝোপঝাড়গুলো প্রাণপণে জলের উপরে মাথা উঁচু করে বাঁচবার চেষ্টা করত। কেহ কেহ আত্মরক্ষার লড়াইয়ে বেঁচে যেত। কেহ বা জলের স্পর্শেই বিবর্ণ হয়ে মাথাগুঁজে জলের নীচে লীন হয়ে যেত। আমরা তাদের বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টা করতাম। মাটি দিয়ে, ভাঙ্গা হাঁড়ি, টিনের টুকরো দিয়ে গাছের গোড়াগুলো বেঁধে দিতাম। যার যার প্রিয় গাছটির জন্য বহু যত্ন করা হতো। কিন্তু অত করেও সব কটিকে রক্ষা করা যেত না। জলকেই যেন বেশী প্রিয় মনে হত। ওকে তো বারমাস পাওয়া যায় না। ঘরের দাওয়ায় বসে জলে পা ডুবিয়ে, কাঠিতে দাগ দিয়ে জল জল মেপে মেপে কত মজার খেলাই না হতো। আমাদের বাচ্চা ভৃত্য কেনারাম ছোট নৌকোতে করে আমাদের এঘরের দাওয়া থেকে ওঘরের দাওয়ায় পৌঁছে দিত। দাওয়ায় বসে বসে মোচার খোলা পাতার নৌকা ভাসিয়ে জলের সঙ্গে মাছেদের সঙ্গে আত্মীয়তা করে কত আনন্দ লাগত। বড়রা অবশ্যি বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকতেন বর্ষাতের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ভেবে। মেঘের দলকেও আমরা সাথী করে নিতাম। কত খণ্ড খণ্ড মেঘ তড়িৎগতিতে ভেসে যেত, বড় মেঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শক্তি বৃদ্ধি করতে। এক এক খানাকে আমরা নিজেদের বলে ভাগ করে নিতাম। মেঘের কত খেলা, কত ছবি আমাদের শিশুমনকে উৎফুল্ল করত।

সেই বর্ষার সময় বিধাতার সৃষ্ট জীবেরা সবাই এক পরিবারভুক্ত হয়ে যেত। আমাদের শোবার ঘরের নর্দমার ভিতর লোহার সিন্দুকের পিছনে, উপরে কড়ি-কাঠের গায়ে বড় বড় সাপেরা এসে আশ্রয় নিত। কেউ একটু ভয় পেলে বা অসম্মতি প্রকাশ করলে, ঠাকুমা বলতেন আহা থাকুক না। এই বর্ষায় ওরা কোথায় যাবে? জীব তো! তোমাদেরও ওরা ভয় করে, তোমরা কিছু না বললে ওরাও কিছু করবে না, ওরা তো বিপন্ন। সত্যি, বিপদে সকলেরই একটা অহিংস ভাব এসে যেত। সিঁড়ির নীচে, সিঁড়িকোঠায় সংসারের বাড়তি জিনিষপত্র সব জড় হয়ে থাকত। বর্ষার চার মাস সে সাপেদেরই সংসার হয়ে যেত। ঠাকুমারও নিষেধ ছিল—তখন ওখানে কেউ যাবে না। মাঠ-ঘাট জঙ্গল শুকোলেই ওরা ওদের বাসস্থানে চলে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের সংসার বুঝে নিও।

পশ্চিমের ঘরের পিছনে খোলা বারাণ্ডায় রাত্রে শেয়ালেরা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বসত। আবার ঐ ঘরেই সামনের বারাণ্ডায় কুকুরের দল শুয়ে থাকত। জলের ভিতরে একটি ব্যাং লাফালে ঘেউ ঘেউ করে উঠত। অন্য সময়ে শেয়ালের গন্ধ পেলেই কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ত তাদের ঘাড়ে। আবার কুকুরের মোটা সোটা বাচ্চাগুলি শেয়ালের উপাদেয় ভোজ্য বলেই পরিচিত ছিল।

এখন সকলেই বিপন্ন বলে আত্মীয়ভাব এসে গেছে। আমাদের বাড়ীতে আত্মীয় অনাত্মীয় সাত আটজন ছেলে থেকে স্কুলে পড়ত। আশে পাশে আট দশখানা গ্রামের ভিতর আমাদের গ্রামেই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। তাই ছেলেদের থাকবার জন্য প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘরের দুপাশের লম্বা কোঠাদুটিতে ছেলেদের থাকবার জন্য খানকয়েক তক্তপোষ পাতা ছিল। মাঝের কোঠায় চার পাঁচখানা তক্তপোষ পেতে ফরাস করা ছিল। বড়দের সভা-সমিতি হত ওখানে, দারোগা কাজির-উজির এলেও ঐ ফরাসে বসিয়েই তাঁদের আপ্যায়ণ করা হত। ছেলেদের থাকবার ঘরে মাঝে মাঝে ছেলেদের সংখ্যা বেশী হয়ে যেত। ওর ভিতরেই তারা ঠাসাঠাসি করে থাকত। একবার পাশের গ্রামের নারায়ণদা এলেন পড়তে। নারায়ণদা একটু একরোখা ছেলে ছিলেন। তিনি কারো সঙ্গে একত্র থাকতে রাজি ছিলেন না। এঘর ওঘর ঘুরে দেখে, কোণের দিকে একটি ছোট্ট কুঠুরী ছিল,—সেখানে তামাক খাবার সাজ সরঞ্জাম থাকত।—সেই কুঠুরীটি পছন্দ করে, মেঝেটি ঝাঁট পাট দিয়ে বিছান বিছিয়ে নিলেন। কেনারাম বলল, নারাণ কত্তা, মাটির ঘরের মেঝেতে বর্ষার সময় শোয়া ভাল না। কখন কে দয়া করেন, কিছুই ঠিক নাই। নারাণদা তাকে এক ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিলেন। অন্য ঘরে ভাগের বিছানায় শোয়া ভাগের লণ্ঠনে পড়া, তাঁর অসহ্য ছিল।

বেশ কয়েকদিন চলছিল। একদিন সকালে কেনারাম নারাণদার বিছানা তুলে ঘর পরিষ্কার করবার সময় দেখে, ঘরের মেঝেতে বিছানার পাশেই মসৃণ একটি বেশ বড় গর্ত। সে তখনি নারাণদাকে ডেকে বলল, "নারাণ কত্তা, আর মাটিতে শোয়া উচিত না। দেখুন, ওটি কার সুরঙ্গ? আস্তিকের নাম নিয়ে ওঘরের চৌকিতে গিয়ে শোন।" নারাণদা ওকে এক বকুনি দিয়ে স্নানাহার শেষ করে স্কুলে চলে গেলেন। কেনারাম মাটি দিয়ে গর্তটি বন্ধ করে দিল। পরের দিনও ঠিক সেই জায়গাতে আবার গর্ত দেখে কেনারাম নারাণদাকে সাবধান করে দিল।

নারাণদা বললেন, তোমার যেমন কাজ! এক চিমটি মাটি ছড়িয়ে দিয়েছ, অমনি গর্ত বন্ধ হয়েছে আর কি! আমার চলার ঘায়েই মাটিটুকু ঢুকে গর্ত বেরিয়েছে। ওসব ভয় নারাণ শর্মার নেই। এই বলে নারাণদা বিছানাটি টেনে গর্তটিকে ঢেকে তার উপরে শুয়ে পড়লেন। আর ওঘরের হাসি-গল্পে রত ছেলেদের উদ্দেশে ব্যঙ্গোক্তি করতে লাগলেন—প্রাণের ভয়ে সব শুয়োরের খোঁয়াড়ে ঢুকেছে।

দুপুর রাতে গভীর ঘুমের ভিতর নারাণদা অনুভব করছেন যেন কে তাঁকে খুব শক্ত করে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধছে

ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে, বুঝি উনি গালিভারের মত কোন লিলিপুটদের কবলে পড়েছেন, কিন্তু বন্ধন ক্রমশঃ কঠিনতর হয়ে তাঁর দমবন্ধ করবার যোগাড়। ঘুম ছুটে গেছে, এ কি। একটুও নড়তে পারছেন না; সমস্ত শরীর যেন বরফের মত ঠাণ্ডা। আর, কি কঠিন বাঁধ। নিঃশ্বাস নেবার ফাকটুকুও যেন চেপে আটকে দিচ্ছে। চিৎকার করে কার্ত্তিকে ডাকবেন সে ক্ষমতাও নেই। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে চেতনা লোপ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, কোথায় আমি? কি হচ্ছে। পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছি, কেউ জানল না, বন্ধনের কি যন্ত্রণা। সব আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। আর জানেন না। কতক্ষণ পরে কি জানি, চেতনা ফিরে এলে মনে হলো, বন্ধন শিথিল, দম নিতে পারছেন, কিন্তু সমস্ত শরীর আড়ষ্ট, উঠে পালাবেন? না, নড়লেই আবার সেই অজানা শক্তি চেপে ধরবে সমস্ত দেহ? ওখানে শুয়ে থাকতেও ভরসা কই? কোনমতে বিছানা ছেড়ে উঠে ছুটে এসে ঠাকুমার শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। শব্দ শুনে ঠাকুমা, আমরা সবাই ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে নারাণদাকে ঐ অবস্থায় দেখে ভয়ে অস্থির। তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে ঘরের ভিতরে বিছানায় শুইয়ে মুখে চোখে জল, বাতাস দিতে দিতে খানিক বাদে জ্ঞান ফিরে এলো। সবাই মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতে লাগল। ভয় যে মানুষকে কতখানি কাবু করতে পারে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নারাণদাকে দেখে সেদিন বুঝেছিলাম। চোখ মুখ সাদা ফ্যাকাসে চোখ বসে গেছে, চাউনিটি আতঙ্কগ্রস্তের। আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকিয়ে চারদিকে পরিচিত মুখ এবং আলো দেখে কিছুটা যেন আশ্বস্ত হলেন এবং যা অনুভব করেছিলেন, সব বললেন। মাঝে মাঝেই ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন, মনে হচ্ছিল, তখনো বুঝি দম আটকে আটকে আসছে। শুনে কেউ বলল, স্বপ্ন দেখেছে; কেউ বলল বোবায় ধরলে ঠিক অমনি বোধহয়। কেউ বলল, ছাড়াঘর, ভূতটুত হবে হয়ত। কারো বা মনে হলো, একা শুতে সাবাসি দেখাতে গিয়েছিল, কাল্পনিক ভয় পেয়েছে বড়ীশুদ্ধ সবাই জেগে উঠেছে, কলরবে নিশীথ স্তব্ধতা ভেঙে খান খান করছে।

ঠাকুমা সব শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, "বুঝেছি, এ সর্বনাশা জীব, দয়া করে যে প্রাণটুকু রেখেছেন, এই ভাগ্য।" ছোটরা সব শুয়ে পড়। বড়ছেলেরা দুটো লণ্ঠন আর লাঠি নিয়েও ঘরে চলতো, দেখি কি ব্যাপার। বীরত্বের আস্ফালন করতে চার পাঁচজন লাঠি নৌকো বাইবার বৈঠা নিয়ে নিলো, বলল "আজ ভূত পিটিয়ে ঠাণ্ডা করব।" আলো হাতে ঠাকুমাই সকলের আগে গেলেন।

ছোট ঘর, দরজা খোলাই ছিল, ঘরে ঢুকেই ঠাকুমা দেখেন, বিছানার ওপাশে বেড়ার ধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফণা উঁচু করে বিরাট এক গোখরো সাপ বসে আছে। আলো দেখে নড়াচড়া দিয়ে উঠছে। ঠাকুমা চমকে দু'পা পিছিয়ে এসে, "বাবা আস্তিক আস্তিক" বলে বললেন, আমি গোড়ায়ই নারাণের বর্ণনা শুনে এই অনুমান করেছি। যাকে বলে নাগপাশ। অমন শক্ত বাঁধন আর কিসের হবে? খুব রক্ষা করেছ বাবা। পরের ছেলে। আমার মুখ রক্ষা করেছ। কালই দুধকলা দিয়ে পুজো দেব।" কিন্তু কেন? নারাণ আঘাত করেনি বলে প্রাণ রক্ষা করেছে। কিছু একটা অসুবিধা করেছে নিশ্চয়, যার জন্য এই শাস্তি দিয়েছে।

যখন কেনারামের মুখে কয়েকদিনের ইতিহাস এবং ঐ দিনের বিছানা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে শোবার কথা শুনে ঠাকুমা গর্জে উঠলেন। বললেন, আমাকে এর কিছুই জানাতে পারনি? ভগবান রক্ষা করেছেন, তাই। কালই ওকে মা বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব। এত বড় বোকা গোঁয়ার ছেলে। ছেলের দল লাঠি বাগিয়ে সর্প মহারাজের [illegible] চেষ্টা করতেই ঠাকুমা বাধা দিয়ে বললেন, থাক, উনি প্রাণ রক্ষা করেছেন, ওঁকে আর আঘাত করো না। বিছানা-

খানা আস্তে টেনে সরিয়ে দিলেন। দেখলেন, তার নীচে বেশ মসৃণ একটি গর্ত। দরজা বন্ধ করে ঠাকুমা সবাইকে সরিয়ে নিয়ে এলেন, বললেন, "ওঁর ছেলে মেয়ে সব ঐ গর্তের ভিতরে। আর উনি যেতে পারেন নি। রাগ তো হবেই।"

কুটিল হিংস্র সর্পজাতির ভিতরও বিবেকের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার হিংস্রতার নিদর্শনও অনেক আছে। তারই আর একটি ঘটনা কিছুদিনের ভিতরেই ঘটল।

একদিন সকালবেলা কেনারাম আবিষ্কার করল, আমাদের বহুকালের পুরানো চণ্ডীদালানের ইঁটের ফাঁকা দিয়ে দুটি বেশ বড় সাপ মুখ বের করে আছে। তাদের সমস্ত দেহ দালানের ইঁটের গাঁথুনীর ভিতরে আছে। কি করে আছে ভগবান জানেন। নিশ্চয়ই ইঁট ক্ষয়ে গিয়ে বড় ফাটলের সৃষ্টি করেছে। দলে দলে সকলে সর্পযুগল দেখতে এল। সকলেই ভয়ে অস্থির, কিন্তু কি করা যেতে পারে। চণ্ডীদালানের পাশ দিয়েই সকলের চলার পথ, সকাল সন্ধ্যে ছেলে-বুড়ো ওখান দিয়েই যাতায়াত করে, কখন কি হয় বলা যায় না। নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলে সারাদিন। চণ্ডীদালানের পিছনের জঙ্গলা সরু পথ দিয়েই সকলে চলতে লাগল। আমাদের পাঁচ ছয় শরিকের বাড়ী, লোকতো কম না। ঠাকুমা চণ্ডীদালানে দুধকলা দিয়ে পুজো দিলেন। কয়েকদিন আর তাদের দেখা গেল না। কয়েকদিন বাদে আবার তারা সেই ফাটলে মুখ বার করে থাকল। নিকৃষ্ট সরীসৃপের ভিতরও প্রেমের বন্ধন কত দৃঢ়, ওদের যুগলে চলাফেরাই তার একটা নিদর্শন।

কেহ বললেন, বেতের শীষে ব্যাঙ গেঁথে রাত্রে ফাটলের মুখে দিয়ে রাখলে সকালে দেখা যাবে, সর্পযুগল ব্যাঙের সঙ্গে বেতের শীষও গিলে বসেছে, তখন শীষের গোড়া ধরে টেনে বা'র করে পিটিয়ে মারতে কতক্ষণ? কথা অনুসারে ব্যবস্থাও হলো। সকালে দেখা গেলো, ব্যাঙের অর্দ্ধেকটা খেয়ে বাবাজীরা কোথায় উধাও হয়েছেন। অর্দ্ধেক ব্যাঙ শুদ্ধ শীষ পড়ে আছে। কিছুদিন আর তাদের সন্ধান নেই। বোঝা গেল, তারা ভয় পেয়ে সরে গেছে। সবাই কিছুটা নিশ্চিন্তেই চলাফেরা করে। তবে ঐ দালানের ভিতরেই যে ওরা সন্তান সন্ততি নিয়ে মৌরসীপাট্টা গেড়ে নিয়েছে, তার ভুল নেই। কয়েকদিন বাদে আবার সেই ফাটলে তাদের দুজনের শ্রীমুখ দেখা গেল। ভিতরে কিছু একটা অসুবিধা ছিল, যার জন্য ওরা ঐ মুক্ত পথে মুখ বাড়িয়ে হাওয়া খেত।

আমাদের ধোবার ছেলে কালাচাঁদ উঠতি জোয়ান, যেমন চেহারা, তেমনি গায়ের জোর, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। সে বল্লে, দেখুন আপনারা, আমি কেমন ওদের জব্দ করি। ঠাকুমা বল্লেন, দেখ, ব্যথা দিয়ে ছেড়ে দিওনা, মারলে দুটোকেই মারবে, ওরা বড় প্রতিহিংসা পরায়ণ, একজন ছাড়া পেলে কিন্তু সে ছেড়ে দেবে না। কিছুতো করছে না, থাকুক ওখানে বসে, ক'দিন পরে আপনিই চলে যাবে।

কিন্তু কালাচাঁদের দারুণ উৎসাহ। সে মাছ ধরবার বেশ বড় দু'টি জীবল-বড়শি এনে তাতে মোটা দড়ি বেঁধে পাশের আমগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল, আর বেশ মোটা মোটা দুটি কোলা ব্যাঙ এনে বঁড়শিতে গেঁথে ফাটলের মুখে রাখল। ব্যাঙেরা লাফাতে লাফাতে সেই সুরঙ্গ পথে এগিয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা এই মারণযজ্ঞের প্রস্তুতি দেখতে বেশ ভীড় জমে গেল।

আমরা ছোটরা শুয়ে শুয়ে কল্পনায় সাপ আর ব্যাঙের কথোপকথন শুনতে লাগলাম। সাপ বলছে, "ব্যাঙ তোকে খাব," ব্যাঙ বলছে "ইস্"। প্রবাদ বাক্যের ব্যাঙের বড়াই কথাটির সত্যতা ব্যক্ত হবে এখনই। কখন ঘুমিয়ে গেছি জানিনা। খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই উঠে ছুটেছি চণ্ডীদালানের দিকে, গিয়ে দেখি বেশ ভিড় জমে গেছে ঐ ভোরেই। আর সকলের চোখে মুখেই বিস্ময়, ভয়, অনুকম্পা সব মিলিয়ে চাপা উত্তেজনা, যেন কেহ গলায় দড়ি বা অন্য কিছুতে আত্মহত্যা করেছে, এখন কি উপায় করা যায় এইভাব

কালাচাঁদের যে সমস্ত রাত ঘুম হয় নাই তা তার চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

দেখা গেল, একটি সাপ ব্যাঙটি এবং বঁড়শিটি সম্পূর্ণ গিলেছে এবং বঁড়শিটি উদ্‌গিরণের জন্য যথেষ্ট ঝটাপটি করেছে, ফলে, তার দেহের অনেকখানি গর্তের বাইরে বেরিয়ে ঝুলছে। আর একটি ব্যাঙের লোভ ত্যাগ করে পালিয়েছে। কালাচাঁদ দড়ি ধরে সর্বশক্তি দিয়ে সাপটিকে টেনে বার করে আনল, আর সাহসী ছেলেরা বাঁশের লাঠি দিয়ে দমাদম পিটিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল। জাতি সাপ আস্তিকমুনিপুত্র জানে আগুন জ্বেলে তার সৎকার করা হলো। সমস্ত দিন ঐ উত্তেজনাই কাটল। আর প্রত্যেকে তাদের সাপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প নিয়ে কত আলোচনাই না করল। ঠাকুমা বললেন, 'কালা, একটি যে পালিয়ে গেলেন, ব্যাপারটা ভাল হলনা। তুমি একটু সাবধানে থাকবে। রাত বিরেতে অন্ধকার পথে বেশী চলাফেরা করো না। জানোতো, এদের জননী চাঁদসদাগরের উপর কি প্রতিহিংসাই না নিয়েছিলেন। বড়ই প্রতিহিংসাপ্রবণ জাত এরা।

গ্রামের মাঝখান দিয়ে একটি খাল। আমাদের বাড়ী এপারে, কালাচাঁদের বাড়ী ওপারে গ্রামের একধারে। খালের পাড়ে পাড়ে গ্রামের ভিতরে চলার পথ বাজার পর্য্যন্ত গিয়েছে। সেই পথে সন্ধ্যায়, রাত্রে মাঝে মাঝেই মস্ত একটি কালো সাপকে অনেকেই দেখেন, তাড়াতাড়ি খালপাড়ের জঙ্গলে ঢুকে যায়। দু-একজন লাঠি নিয়ে তাড়া করেছে, কিন্তু অন্ধকারে তাকে ধরা যায়নি।

মানুষ সব সময় অবস্থার দাস। বড়নদীর পাড়ে যাদের বসতি, তারা নদীর ভাঙ্গন বা কুমীর দেখে আতঙ্কিত হয় না। সাবধানে চলে। পাহাড়ের কোলে যাদের বাস, তারা পাহাড় ভেঙ্গে উপরে ওঠা বা গড়িয়ে পড়ার ভয় করে না। তেমনি পূর্ববঙ্গের নিম্নভূমির মানুষেরা জল, জঙ্গল, সাপ কোপকে এড়িয়ে চলতে চায়, তবে দিশেহারা হয় না। জীবন যাপনের এরাতো অপরিহার্য্য সঙ্গী হয়েই থাকে। প্রকাণ্ড সর্পমহারাজকে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে অনেকেই দেখেছিল।

ঠাকু'মা একদিন কালাচাঁদকে ডেকে বললেন, "কালাচাঁদ, তুমি না হয় কয়েকদিন তোমার পিসির বাড়ী ভিন্ন গ্রামে গিয়ে থাক। কি জানি উনি ওপথে অত ঘোরাফেরা কেন করছেন? সেই জোড়ার একটিই কি না কে জানে?" কালাচাঁদ বলল সামনে পূজা, এখন বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাব? পূজার পরে না হয় কয়েকদিন ঘুরে আসব। অত লোকের মাঝে আমাকে কি চিনে রেখেছে?"

সত্যি পূজা এসে গেছে, শরতের রূপালী রোদে আকাশ ঝলমল হয়ে উঠেছে। আনন্দময়ীর আবাহনের আয়োজনে সবাই ব্যস্ত। মণ্ডপে কুমোরেরা প্রতিমার গায়ে সাদা রংয়ের উপরে হলুদ লাল কালো রং দিয়ে মায়ের মূর্ত্তিকে প্রাণবন্ত করে সাজাতে ব্যস্ত। ঢাকীরা তাদের ঢাকগুলিকে গরম করে বাজিয়ে তালিম দিচ্ছে, আবাহনের বাজনা, আরতির বাজনা, বলির বাজনা, যখন যেটা বাজাতে হবে। ভুঁইমালী কোদাল দিয়ে মণ্ডপের সামনের ভূমি চেঁছে সমান করছে, বাড়ীর আনাচ, কানাচ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত, মা-যে আসবেন, কোথাও কোন কালিমা না থাকে, সর্ব্বত্র পরিচ্ছন্ন পবিত্রতার ছাপ।

কর্ত্তারা হাট থেকে পূজার কত রকম উপাচার নৌকো বোঝাই করে আনছেন। আর বাড়ীর ভিতরে মেয়েদের তো কথাই নাই। ধোয়া-মোছা, পরিষ্কার করা, মুড়ি মুড়কি, চিড়ে নাড়ু করে চলেছেন, মাকে তো সব কিছুর প্রাচুর্য্য দেখাতে হবে, মায়ের কোন সন্তান যেন বিমুখ না হয়। ছোট বড় সকলেই কর্ম্ম-ব্যস্ত। প্রবাসী ছেলেরা একে একে বাড়ী পৌঁছচ্ছে। ষ্টিমার ঘাট থেকে রোজই দু'চারখানা নৌকো ঘরের ছেলেদের ঘরে এনে পৌঁছে দিচ্ছে। সমস্ত বৎসরের ঝিমোনো একঘেয়ে জীবন যাত্রা সজীব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সকলের মুখেই আনন্দের দীপ্ত দেখতে

দেখতে পুজো এসে গেল। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যেবেলা বোধন অধিবাস আরম্ভ হলো। শুক্লাষষ্ঠীর জ্যোৎস্নায় চণ্ডীদালানের সামনের উঠান ভরে গিয়েছে। ছেলে-মেয়ের দল নূতন জামা-কাপড় পরে হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে। ঢাকীদের সঙ্গে তাল ঠুকে কালাচাঁদও অধিবাসের বাজনা বাজিয়ে গেল।

আসন্ন উৎসবের সন্ধ্যাটি আনন্দমুখর হয়ে উঠল। সপ্তমী পুজার আয়োজন, গোছ গাছ করে রেখে সেদিন সকলেরই শুতে অনেক রাত হয়ে গেল। শেষ রাতে হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে বাড়ীর অনেকেই জেগে উঠলেন। ঠাকুমা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে কোথায় শব্দ লক্ষ্য করতে লাগলেন। দেখেন, খালের উপরের পুলের উপর দিয়ে কালাচাঁদের মা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে। বলছে, "ঠাকরুনদিদি, সর্বনাশ হয়েছে, আমার কালাকে কালসাপে কেটেছে, আপনারা বাঁচান আমার বুকের ধনকে।" বলে চণ্ডীদালানের সামনে পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল। শুধু বাড়ী নয় গ্রামশুদ্ধ লোক ছুটে এল কালার বাড়ীর উঠানে, যেখানে কালা পড়ে আছে। তখনো তার হাতে একটি শক্ত লাঠি। শোনা গেল কালারা তিন ভাই এক মশারির ভিতর শুয়ে ছিল, কালা মাঝখানে। সেই মশারির মধ্যে ঢুকে মাঝখানে কালার পায়েই বজ্র কামড় দিয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বেগে দরজার ফাঁক দিয়ে পালিয়েছে। কামড় খেয়েই কালার অন্তর বুঝেছে যে, এই প্রতিহিংসা। সঙ্গে সঙ্গেই সে দরজা খুলে লাঠি নিয়ে তাড়া করে গেল। ঘরের পিছনের লতাপাতার ভিতর দিয়ে ঝাঁকড় গতিতে সাপ পালাচ্ছে আর কালা এলো পাথাড়ি লাঠি চালাচ্ছে। ভাবল, মেরে মরব, কিন্তু হঠাৎ শব্দ পেল, যেন খালের জলে ঝপাৎ করে কিছু লাফিয়ে পড়ল।

কালার শরীরও তখন অবশ হয়ে আসতে লাগল। বিষের জ্বালায় সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে। সে বুঝল, আর রক্ষে নেই, তখনো মনের জোরে মাকে জাগিয়ে দিল; বলল "মা তোমার কালাকে কালনাগে খেয়েছে।" প্রতিহিংসা। আস্তে আস্তে অবসন্ন হয়ে এলো তার সমস্ত চেতনা।

সপ্তমীর প্রভাতে ভৈরবীর বদলে বিষাদের সুর বেজে উঠল।

জন্ম-জন্মান্তর

রামপদ মুখোপাধ্যায়
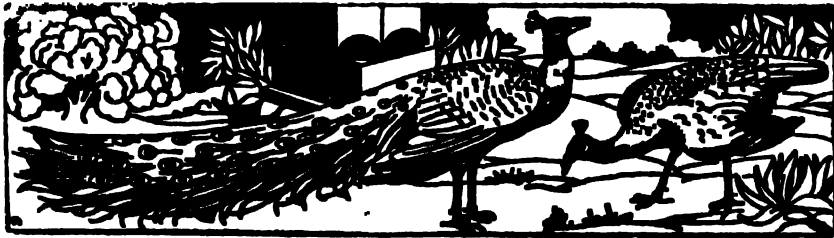
তিন দিনের দিনে অপরাহ্নে পশ্চিম আকাশে চাকি এখন ডুবু ডুবু—চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখলেন মা। স্বপ্নের দেশ কাল একাকার—আলো অন্ধকারে ভেদ নাই শুধু একটানা ফুরফুরে হাওয়া বইছে—চোখ না চেয়েও আলোর স্রোত অনুভূত হচ্ছে। স্বচ্ছ নির্মল দিগন্ত-হারা তরল আলোর সব কিছু স্পষ্ট—অথচ যাবতীয় বস্তু নামহারা। এ কোন দেশ স্বর্গ ভূমি—না মহাজন তপোলোকের সীমানা ? বিস্ময় ঘোর কাটতে না কাটতে সুগম্ভীর অভয়বাণী এলো কানে, ওঠ মা, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। যা চাইছ সে বস্তু তোমার কাছেই রয়েছে।

জয় বাবা সিদ্ধিনাথ। ভক্তি গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন ভক্তিমতী প্রৌঢ়া। উঠে বসে দু'হাত যুক্ত করে কপালে ঠেকালেন—তারপর চোখ চেয়ে দেখলেন—সামনে দাঁড়িয়ে মহেশ।

প্রৌঢ়ার সারাদেহে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল—তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মহেশ জিজ্ঞাসা করল, মা—এই কি সিদ্ধিনাথের মন্দির।

মাথার ততক্ষণে আধ ঘোমটা টেনেছেন প্রৌঢ়া। মাথা হেলিয়ে বললেন। হাঁ। তুমি কোথা থেকে আসছ বাবা ?

মহেশ সে কথা জানাল।

কোথায় যাবে ?

এখানেই তো এলাম।

এখানে কোন আত্মীয়বাড়ী বুঝি ? তা তাঁর নাম—

নাম জানি না। এই গ্রামে প্রথম এসেছি।

প্রৌঢ়া আর আনন্দ চেপে রাখতে পারলেন না—উচ্ছল কণ্ঠে বললেন, এস আমার সঙ্গে—আজ ওখানেই থাকবে।

মহেশ ইতস্তত করছিল- আপনারা তো আমায় জানেন না।

জানি। হাসি মুখে ঘাড় নাড়লেন প্রৌঢ়া সিদ্ধিনাথ তোমাকে পাঠিয়েছেন—তোমার পরিচয় দিয়েছেন।

সিদ্ধিনাথ আমার পরিচয় দিয়েছেন। আশ্চর্য্য তো। অবাক হয়ে গেল মহেশ।

প্রৌঢ়া ঈষৎ হেসে বললেন, কেন বাবা, সিদ্ধিনাথ তা পারেন না ? ওঁর অসাধ্য কি আছে। উনি আমায় এই মাত্র জানিয়ে দিলেন—এস বাবা, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। আজ তিনদিন ধরে দেখছি, তোমার বয়সী এক ব্রাহ্মণ যুবক সিদ্ধিনাথের নাটমন্দিরে ঘোরাফেরা করছে। মুখখানা স্পষ্ট দেখিনি বটে—তবু আমার ভুল হয়নি—তোমাকে চিনতে পেরেছি।

মহেশ এখন স্ববশে নাই। বলতে গেলে লক্ষ্ণৌ থেকে যাত্রা করার পরমুহূর্ত থেকে অন্য এক শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে চলেছে। হাওড়ার চাঁদমারির ঘাট থেকে—ঠ্যাঙাড়ের মাঠ—তারপরে রাতের স্বপ্ন—আর শেষবেলায় সিদ্ধিনাথের মন্দির পর্য্যন্ত এই টান ভয়ঙ্কর তীব্র হয়েছে—এখন দেহ এবং সময়বোধ দুইই নিশ্চিহ্ন, নিজের অভিলাষ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত। দুরন্ত গতিবেগে শেষ পরিণতি কোথায় এটুকুও ভাবতে পারছে না মহেশ। মহেশের সর্বাংশে দৈব বশ। স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল, 'হাঁ' 'না' কিছুই বলল না।

প্রৌঢ়া বললেন, এস বাবা।

প্রৌঢ়াকে অনুসরণ করে আচ্ছন্ন অভিভূত মহেশ। এক গৃহস্থ বাড়ীর বাহির আঙিনায় প্রবেশ করল। তারপর

প্রকাণ্ড উঠোন পার হয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রৌঢ়া কাকে উদ্দেশ করে বললেন, কৈগো তুমি কোথায়? কে এসেছে দেখ।

খেলো হুঁকো হাতে এক প্রবীণ পুরুষ চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বেরিয়ে এসে বললেন, কে?

হুঁকোশুদ্ধ বাঁ হাতখানা নামিয়ে দিলেন কোমর বরাবর—তারপর ডানহাতের তালুটা দুই ভ্রূর সমান্তরালে তুলে দৃষ্টিকে টানটান করে বললেন, কে?

প্রৌঢ়া বললেন, আগে ওকে পাটি পেতে বসাও—হাতমুখ ধুইয়ে মিষ্টি মুখ করাও তারপর পরিচয় করো।

দাওয়ার উপর বালতিতে জল দিল—পাশে দিল টিনের মগ, জল চৌকির উপর পাটকরা গামছা। প্রবীণ পুরুষের নির্দেশমত কৃত্য কর্ম সেরে মহেশ মাদুরে বসল—হুঁকো হাতে গৃহকর্তা বসলেন ওর পাশে। তারপর আরম্ভ হল পরিচয় দেওয়া নেওয়ার পালা।

সেই পালা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। তা শেষ হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় গেল। ইতিমধ্যে বাইরের দৃশ্যটুকু মুছে নিয়েছে অন্ধকার, হারিকেন লণ্ঠন জ্বালা হয়েছে—আর চণ্ডীমণ্ডপের এক কোণে তেল-সলতের প্রদীপটিও কে যেন বসিয়ে রেখেছে। সেই আলোয় দেয়ালে টাঙানো খান তিনচার দেব-দেবী ও সাধু-মহাজনের ছবি দূরকালের পটভূমিকা রচনা করেছে। স্থানকালের জ্ঞান হারিয়েছে মহেশ।

এক সময়ে গৃহকর্তা অন্দর মহলও ঘুরে এসেছেন।

মহেশ মুগ্ধচিত্তে ছবিগুলি দেখছিল—হঠাৎ গৃহকর্তা বললেন, তুমি দেখছি আমাদেরই পালটি ঘর—তপসের আমাদের জ্ঞাত কুটুম্বও আছে।

মহেশ বলল—অ।

গৃহকর্তা বললেন, তাই বলছিলেন গিন্নী—সম্বন্ধটি ঈশ্বরের মতই হয়েছে—বাবা সিদ্ধিনাথই ঘটকালি
।

মহেশ হতভম্বের মত বললেন, কার কথা বলছেন?

গৃহকর্তা বললেন, বলছি তোমাকে সিদ্ধিনাথই পাঠিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই শুভকর্ম। আমার বড় মেয়েটিকে তোমার হাতেই তুলে দিতে চাই বাবা—

ভীষণভাবে চমকে উঠল মহেশ, আমার হাতে! আপনি জানেন আমার পরিচয়?

এই তো জানলাম—আর বেশি কি জানব।

না—না—না—এ হয় না। প্রবল আপত্তি তুলল মহেশ। আপনি জানেন না—এক মাসও হয়নি আমার স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। জানেন না আমার পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। আমার বয়স চল্লিশের ওপর।

এতগুলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে গৃহকর্তা বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। প্রশান্ত মুখে বললেন, কিন্তু বাবা সিদ্ধিনাথ জানিয়েছেন—তুমিই আমার মেয়ের যোগ্য পাত্র।

মহেশ ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। এবার স্বর চড়িয়ে বলল, আমার বয়সের কথাটা ভাবছেন না?

হাসিমুখে মাথা নাড়লেন গৃহকর্তা। বললেন, ভাবছি বইকি—খুব বেশি করেই ভাবছি। ভেবেই বলছি—আশ্চর্য্য যোগাযোগ ঘটিয়েছেন বাবা। আমার মেয়েও তিরিশ ছাড়িয়েছে।

মহেশ লাফিয়ে উঠল মাদুরের উপরে। বলল, এ হতে পারে না। বিয়ে আমি করব না, করতে পারি না—ইচ্ছা নেই। সংসার আমার কাছে বিষবৎ। ও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

গৃহকর্তা উঠে দাঁড়িয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। মহেশের হাত ধরে প্রশান্ত স্বরে বললেন, বস বাবা—স্থির হয়ে বস। আমার একটি কথা শোন। জীবনে দেবতার কৃপা বারবার আসে না, দৈব যোগাযোগ একবারই ঘটে। সেই কৃপা যে গ্রহণ করতে না পারে তার মত অভাগ্য আর কে! তুমিতো বলেছ সিদ্ধিনাথ স্বপ্ন দিয়ে তোমাকে এই অজানা জায়গায় টেনে এনেছেন—আমার স্ত্রীও স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তোমাকেই আমার মেয়ের ভাবী স্বামী বলে স্থির করেছেন। আর বলতে কি বেটা সবচেয়ে অসম্ভব যা আমরা কোন কালেই ঘটবে বলে

বিশ্বাস করতে পারিনি—তাই ঘটেছে। সে-ও বাবার কৃপা। আমার মেয়ে এ যাবৎ বিয়েতে রাজী হয়নি—তার ছোট, দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে ও রাজী হয়নি বলে। আমরা জানতাম ও কোনদিন ঘর পাতবে না—ওর নারী জীবন সার্থক হবে না। কিন্তু বাবা আজ সেই অসম্ভবও সম্ভব হতে চলেছে। আমরা মেয়ের মন জেনেছি, মেয়ে আমার সম্মতি জানিয়েছে।

মহেশ ত স্তম্ভিত। বলেন কি ভদ্রলোক। গাঁয়ের নামী, মানী, প্রবীণ মানুষ সামান্য দায় মোচনের জন্য এমন ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে গল্প তৈরী করছেন? নিঃসম্বল কন্যাদায়গ্রস্ত হলেও এটা মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু...তথাপি শেষ বারের মত প্রতিবাদ করল মহেশ, আপনি প্রবীণ মানুষ—নিশ্চয় জানেন, বিয়েতে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতি প্রয়োজন হয়।

গৃহকর্তা বললেন, জানি বইকি বাবা। কন্যাপক্ষে তো আমি, বরপক্ষে কাছেই রয়েছেন তোমার দাদা। তপসের খবর পাঠিয়ে তাঁকে জানিয়ে দেব। তিনিই দাঁড়াবেন বরপক্ষ থেকে।

কত আর প্রতিবাদ করা যায়? কোন যুক্তি দিয়ে নিরস্ত করা যাবে ওদের। তার যুক্তিগুলিও ক্রমশঃ দুর্বল হচ্ছে। ক্রমশঃ অসহায়—আত্মসমর্পণের নিশ্চেষ্টতা দেহ-মনকে অবসন্ন করছে। যাক এ ভাবনার যা হবার হোক। একমাত্র আশা মণিদা, তিনি হয়তো রাজী না ও হতে পারেন। হে ভগবান—তিনি যেন রাজী না হন। আর গৃহবন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই না আমি। সংসার মোহ আর নয়। বৌদি আমাকে আশার আলো দেখিয়েছেন,—আশ্বাস পেয়েছি। ওঁদের কাছেই ছেলেমেয়েদের রেখে সংসার থেকে ছুটি নেব। এখন মুক্তি চাই,—মুক্তি চাই আমি। মুক্তিনাথ কি মুক্তি দেবেন না?

মুক্তি চাই বললেই মুক্তিকে পাওয়া যায় না? কি ভাবে কখন কোন ছদ্মবেশে সে আসে, সেই রহস্য ধরা কঠিন। সারারাত চিন্তায়, ছাড়া ছাড়া তন্দ্রায় কাটল। ইচ্ছা করল ভোরবেলাতে অন্তত স্বপ্নের ঘোরে কিছু ইঙ্গিত লাভ হোক। যেমন স্বপ্নের নির্দেশে—নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় এতদূর চলে এসেছে,—তেমনি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এই ঘটনার পরিণতিটুকু জানলভ্য হোক, সারা মন এক করে মুক্তির স্বাদ চাইছে—। শোনা আছে মনের একাগ্র কামনা ইষ্টের বেশে কখনো কখনো দেখা দিয়ে উত্তম পথে চালিত করে মানুষকে। এই ক্ষেত্রে তার অন্যথা কেন হবে?

ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমে স্বপ্ন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও—স্বপ্নের ছায়ামাত্র মনকে স্পর্শ করল না। ভোরবেলাতে অভ্যাস-মত ঘুম ভেঙ্গে গেল—, শয্যায় বসে ইষ্টনাম স্মরণ করতে লাগল মহেশ। ক্রমে আহ্নিককৃত্য শেষ হল। বেলা বাড়লে—মহেশ আশা করল এইবার অঘটন কিছু ঘটবে। বৃথা আশা। বরং আশঙ্কাই জাগল। এত বেলা হল—স্নান আহ্নিক সারা হল—তবুও অতিথি সৎকারে গৃহস্থ অমনযোগী। চা, জল-খাবার দিয়ে আপ্যায়ণ করল না। এ কেমন প্রথা এদেশে।

গৃহকর্তা এলে বলল, দেখুন, আমার ইচ্ছে দাদার ওখান থেকে ঘুরে আসি।

গৃহকর্তা বললেন, তা কেমন করে হবে- আজ গোধূলি লগ্নেই শুভকাজ হবে।

মহেশ বলল, দাদার অমতে—

তাঁর মত নিয়েই হবে লোক পাঠিয়েছি। কর্তা একটু হেসে বললেন, ভাবছ আমরা কি নিষ্ঠুর। অতিথিকে মিষ্টি মুখ না করিয়ে মুখের মিষ্টি কথা দিয়ে তুষ্ট করতে চাইছি। তা কি করবো বাবা—শুভ কাজের এই যে প্রথা। হিন্দুর বিবাহ, ব্রত-অনুষ্ঠান তফাৎ নেই। তোমরা দুজনেই আজ উপবাসী থাকবে, সংযম পালনের এই নিয়মটুকু পালন করলে শুভ হবে।

তা যাই বলুন—শেষ পর্য্যন্ত দাদা যদি না আসেন আমি বরাসনে বসবো না—সংকোচ কাটিয়ে স্পষ্ট মত প্রকাশ করল মহেশ।

নিশ্চয় বসবে না। তোমার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া আমিই সে কাজ কেন করব?

আশ্বস্ত হল মহেশ। দাদা আজ আসবেন না—

আসতে পারবেন না, এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। এরা লোক পাঠিয়েছেন তাপসের-দাদা এখন জেলা শহরে। আরও একদিনের পথ দূরে। তপসে থেকে সন্ধান নিয়ে জেলা শহর থেকে তাঁকে এখানে টেনে আনা অসম্ভব। সুতরাং এই যাত্রায় ফাঁড়া কাটবে বলে আশা হয়।

ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো। এদের লোক ফিরে এসে জানাল মন্টিবাবু তপসেয় নেই।

গৃহ কর্তার মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু। বললেন, তাহলে কি হবে। মহেশ মনে মনে বলল, শুভকাজ হবে না। বলল বটে মনে মনে,—মনের এককোণে সমবেদনার ছায়াও জমলো। আহা—নিরীহ পরিবারটি কত আশাই না করছেন। অনূঢ়া কন্যাকে পাত্রস্থা করার আনন্দ যে কোন বড় সঙ্কট মোচনের আনন্দের চেয়েও অধিক। সেই আনন্দের স্বাদ মহেশের অজানা নয়। মনটা নরম হল—আহা।

আশ্চর্য্য সমবেদনার সূত্র ধরেই সিদ্ধিনাথ যেন বাঞ্ছা পূরণের ব্যবস্থা করে দিলেন। বিকেল বেলাতেই দাদা এসে উপস্থিত। মহেশ তখন চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পায়চারি করছিল।

ওকে দেখে দাদা বলল, কিরে তোর ব্যাপার কি? কাশী থেকেই বুঝি বিয়ে ঠিক করে এসেছিস?

মহেশ অবাক হয়ে বলল, কে বললে, তোমাকে—বৌদি?

দাদা বলল, কোথায় তোর বৌদি, আর কোথায় আমি। তোর রাতে স্বপ্ন দেখলাম যেন সিদ্ধিনাথ বলছেন, শীগগির চলে যা আমার মন্দিরে আজ তোর ভাইয়ের বিয়ে সে তোর জন্যে অপেক্ষা করছে। তা কাশী থেকেই বুঝি—

মহেশ তো স্তম্ভিত হতচকিত। তার সব আশাই একক্ষণে ধূলিসাৎ হ'ল। দুর্জ্জের দৈব বাসনার ঝড়ে সে এখন শুষ্ক তৃণের মত বিপর্য্যস্ত, মুক্তির কোন আশাই আর নাই।

সংক্ষেপে মন্টিদাকে সব জানাল। শুনে মন্টিদা উৎফুল্ল মুখে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে ভক্তি গদ্‌গদ্ কণ্ঠে উচ্চারণ করল, জয় বাবা সিদ্ধিনাথ।

আর কোন বাধাই নেই। পুরোদমে বিয়ের উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল। উঠোনের মাঝখানে চাঁদোয়া খাটানো হল—এক পাশে শিল নোড়া কলার বেড় পুঁতে ছাদনাতলা তৈরী হল, পিঁড়িতে পড়লো আলপনা, শ্রীবরণ ডালা সব গুছিয়ে দিল এয়োরা। পুরোহিত থাকেন ভিন্ন গ্রামে—তাঁকে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে এমন সময় ঘটলো আর এক আশ্চর্য্য ঘটনা।

সিদ্ধিনাথের মন্দিরের দিক থেকে এলেন এক ব্রাহ্মণ। বেশ বয়স হয়েছে ব্রাহ্মণের, হাতের ও গলার চামড়া শিথিল, মুখে অনেক গুলি ভাঁজ পড়েছে কণ্ঠে গলায় বাহুমূলে রুদ্রাক্ষ মালা, কপালে লম্বা সিঁদুরের ফোটা, পরণে লাল রঙের খাটো ধুতি—গায়ে ওই রঙের ছাপা উত্তরীয়। রুক্ষশুষ্ক চুলের মাঝে মাঝে তেঁতুল ফলের মত জটা ঝুলছে। তাঁর ডান হাতে একটি থলি—বাঁ হাতের বগল দাবায় একখানা চামড়ার আসন।

ব্রাহ্মণ এসেই বললেন, নীলাম্বর চৌধুরীর বাড়ী তো এইটাই টোপর দেখেই বুঝেছি। তোমার মেয়ের বিয়েতে আমিই পুরোহিত—বাবা সিদ্ধিনাথের আদেশ—বুঝেছ?

এঁরা পরস্পরের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন। কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না। দৈবের যোগাযোগ যেমন অভাবনীয় তেমনি কৌতূহলজনক।

চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণ বললেন, বিয়ে তো এই জায়গায় হবে না—হবে মন্দিরের ভিতরে। বাইরের লোক কেউ থাকবে না। থাকব আমি, পাত্র পাত্রী, আর মেয়ে ও ছেলের পক্ষ থেকে একজন করে অভিভাবক। এ হল দেবাদিষ্ট অনুষ্ঠান, বেশি হৈ হৈ হট্টগোল হলে অনিষ্ট হবে।

অতএব মন্দিরেই দ্রব্য সম্ভার নিয়ে যাবার উদ্যোগ করলেন এঁরা। আর একবার হাত উঠিয়ে নিজের

করলেন ব্রাহ্মণ। না ওসবের প্রয়োজন নেই। শুধু ফুল চন্দন গঙ্গাজল আর টুকিটাকি দু একটি জিনিষ নাও। পিঁড়ি দুখানা নিয়ো; আর এক্খানা নৈবেদ্য। এছাড়া যাবতীয় দ্রব্য আমার সঙ্গেই রয়েছে। চল মন্দিরে চল।

বরকনে পুরোহিত ছাড়া মন্দিরের মধ্যে রইলেন বরের দাদা আর কনের বাবা।

মন্দিরের ভিতরে পুবধার ঘেঁষে চালের গুঁড়ি ফেলে একটি গণ্ডি কাটলেন ব্রাহ্মণ। তার মধ্যে দুখানা পিঁড়ি পেতে পাশাপাশি বসালেন বর কনে। তারপর থলি থেকে একে একে বার করলেন বিবাহের উপকরণ কোশাকুশি, রক্তবস্ত্র, পঞ্চমুখীশঙ্খ, শুকনো খর্জুরে কাঠ, তরল পানীয় ভর্তি বোতল, নর করোটি।

উপাচার উপকরণ দেখে দু'পক্ষের অভিভাবক শিউরে উঠলেন।

লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণ বললেন, শিবের স্থলে বিয়ে হবে অন্নমতে এই উপকরণই প্রশস্ত। তোমরা শুধু হোমের আয়োজন কর। গাওয়া ঘি, আরও কাঠ যা কুশণ্ডিকার জন্য যোগাড় করেছ, লাল জবা আর লাল করবী ফুল, বালি, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য আর বেলপাতা এইগুলি নিয়ে এস। বিয়েতে যে ক্রিয়া কর্ম হবে যা দেখবে যা শুনবে কোন প্রশ্ন করবে না। প্রশ্ন করলে অমঙ্গল হবে। আমার কাজ শেষ হলে লোকাচার স্ত্রী-আচার যা খুশী করতে পার। এমন কি ইচ্ছে হলে তোমাদের কুলপুরোহিতকে দিয়ে লৌকিক মতে বিয়ের মন্ত্রও পড়াতে পার। এখন এখানে যে অনুষ্ঠান হবে চুপ করে দেখ।

অবাক হয়ে দেখবার মতই অনুষ্ঠান; এরা জীবনে দেখেননি—হয়তো দেখবেন ও না কোনদিন। সামান্য দু'একটি আনুষ্ঠানিক কাজ সেরে নিয়ে হোমানল জ্বালালেন ব্রাহ্মণ। বরকনের হাত দু'টি এক করে ফুলের মালা জড়িয়ে দিলেন। ওদের গলায় পরিয়ে দিলেন লাল করবী আর জবা ফুলের মালা। বোতল থেকে নর করোটিতে ঢাললেন সুরা, অন্নমতে কারণ-বারি। ফুল বেলপাতা দিয়ে অগ্নি অর্চনা সুরু করে কুশী করে গাওয়া ঘি ঢালতে লাগলেন হোমানলে আর সঙ্গে সঙ্গে দুরুচার্য্য মন্ত্র উচ্চারণ। নাভিগহ্বর গর্ভ যুবজনোচিত কণ্ঠের নাদমন্দ্রধ্বনিতে মন্দির গমগম করতে লাগল।

নীলাম্বর চৌধুরী ও মণ্টিদা সভয়ে চেয়ে রইলেন পুরোহিতের মুখের পানে। কী সে মুখ আগুনের তাপে টস্ টস্, যেন ভিতরের প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস উথলে উঠছে মুখমণ্ডলে। চোখের তারায় তারায় সে কী প্রখর-দ্যুতি, দৃষ্টি মেলানো যায় না। একটু আগেকার নিষ্ঠাবান সৌম্য চেহারার মানুষটি পূজা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাদুমন্ত্রবলে অমানুষিক তেজবীর্য্যে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

হোম শেষ হলে ব্রাহ্মণ বর কনেকে পিঁড়ির উপরে দাঁড়াতে বললেন।

মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নামটি কি বাবা?

মহেশ—মহেশ্বর

উত্তম। মা, তোমার নাম?

ভবানী।

ধন্য ধন্য। সহর্ষধ্বনি করলেন ব্রাহ্মণ, এখন একটু কাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। চঞ্চল হয়ো না। এই বিবাহের সর্বোত্তম পর্বটি এইবার শেষ করব। বাবা তুমি তো দীক্ষিত শক্তিমন্ত্রের সাধক তোমার ইষ্টমন্ত্র স্মরণ কর—দেবীকে মনের মধ্যে বসাও। মনে মনে তারই দেহে নিজ শরীরকে বিলীন করে দাও।

কনের পানে ফিরে বললেন, আর মা তুমিও নিজেকে দেবী দুর্গার রূপের সঙ্গে এক করে মিশিয়ে নাও। সাযুজ্য, দেবী দুর্গারই এক নাম—ভবানী, সমগ্র স্ত্রী জাতি সেই শক্তিরই অংশভূতা।

তারপর দুই চক্ষু বন্ধ করে ধ্যানে বসলেন ব্রাহ্মণ। ধ্যান শেষে স্তবমন্ত্র পাঠ—সঙ্গে সঙ্গে তাম্রতাট থেকে মুঠো মুঠো বেলপাতা আর জবাফুল তুলে নিয়ে ওদের পায়ে অঞ্জলি দিতে লাগলেন।

বরকনে সম্মোহিত চিত্রার্পিতবৎ দণ্ডায়মান, ওদের অভিভাবকরা স্তম্ভিত জ্ঞানহারা মন্দিরগর্ভ জুড়ে সূচী-ভেদ্য অলৌকিক নিস্তব্ধতা। শুধু হোমের পোড়া ঘিয়ের গন্ধে অপার্থিব একটি লোকের আভাস, নামরূপহীন অপার্থিব লোক।

পূজা শেষে ব্রাহ্মণ নবদম্পতির সামনে মাথা নামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলেন। অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। বারবার আপ্লুত স্বরে বলতে লাগলেন, ধন্যোহং ধন্যোহং। আজ আমার মনোভিলাষ পূর্ণ জীবন ধন্য।

প্রণাম প্রার্থনা শেষে ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্রব্য সামগ্রী ঝুলিতে তুলতে তুলতে বললেন, আমার কাজ শেষ। এইবার এদের নিয়ে যাও বাড়ীর মধ্যে। এখন ইচ্ছা হলে তোমাদের করণীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পার। তবে জেনো এই বিবাহ সার্থক হয়েছে, সিদ্ধ হয়েছে, এদের জীবন সুখের হবে।

নীলাম্বর ও মন্টিদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে যথাক্রমে কনে ও বরের হাত ধরলেন। নীলাম্বরবাবু বললেন, এইবার বাড়ীর মধ্যে এসো বাবা—মেয়েরা স্ত্রী-আচার সারবেন। বাড়ীর মধ্যে ঘন ঘন শঙ্খও হুলুধ্বনি উঠতে লাগল। মেয়েরা নবদম্পতিকে ঘিরে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। লৌকিক প্রথাগুলি এইবার সুরু হবে।

নিমন্ত্রিতজন খুব বেশি ছিলেন না। তাঁদের আদর অভ্যর্থনা করতে করতে নীলাম্বরবাবুর হঠাৎ মনে হল শুভ বিয়ের প্রধান অঙ্গখানিই হতে চলেছে যে।

মন্টিদার পানে চেয়ে বললেন, একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। আমরা যেন যাদুমন্ত্রে বোবা হয়েছিলাম, আসল কাজটিই বাকি রয়ে গেছে।

পুরোহিতকে দক্ষিণা দেওয়া হয়নি। মন্টিদা বললেন, তাছাড়া ওঁকে সমাদর করে এনে ভোজন করানোও আমাদের কর্তব্য। নীলাম্বর চৌধুরী মন্টিদার হাত ধরে বললেন, চলুন চলুন আমরা দুজনে মিলে ওঁকে সমাদর করে নিয়ে আসি।

ওঁরা তাড়াতাড়ি মন্দিরে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন মন্দির জনশূন্য পুরোহিতের চিহ্নমাত্র নাই। মেঝের ছড়িয়ে আছে কুশাসন, তাম্রটাট, উপকরণ সমেত নৈবেদ্য তার পাশে একগোছা বেল কাঠ পাথরের বাটিতে কিছু ঘি। পোড়া ঘি ধুপ আর পুষ্পচন্দনের গন্ধ মিলে মন্দির মধ্যে এক অপার্থিব পরিবেশ।

দুজনে দুজনের পানে চেয়ে অভিভূতের মত বললেন, আশ্চার্য্য।

আত্মীয় লিখেছেন আশ্চর্য্য আমরাও কম হইনি। এখানে মেয়েটি আশ্চর্য্যভাবে গুছিয়ে নিয়েছে সংসার। মহেশের যে মেয়েটি কাকা, কাকী ঠাকুমার অত্যাচার সইতে না পেরে ছোট ভাইটিকে নিয়ে কাশী থেকে পালিয়েছিল তাঁকেও খোঁজ খবর করে আনিয়েছে তার মামার বাড়ী থেকে। মহেশের ছেলেমেয়েগুলির সেই হতছাড়া চেহারা নাই-আদর যত্ন পেয়ে ওরা দিব্য শ্রীমন্ত হয়ে উঠেছে। মহেশও উদাসীন নয়। সংসার সুখ কিংবা ভূমার অভিলাষ কোনটি পূর্ণ হবার আশ্বাসে ও উৎসাহ চঞ্চল জানিনা। মোটকথা ওর পরিতৃপ্ত চিত্তের উজ্জ্বল আলো মুখে চোখে সর্বক্ষণই ভাসতে দেখি। বুঝি আনন্দেরই প্রতিচ্ছায়া। মহেশ অবশ্য মুখ ফুটে কিছু বলে না।

ভবানী বৌদিও কিছু বলে না পূর্বজীবনের ইঙ্গিত-মাত্র দেয় না।

আমরা কিন্তু অদম্য কৌতুহলে অধৈর্য্য হয়ে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি, বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞসা করব?

ভবানি বৌদি মৃদু হেসে বললেন, বলুন না। বলি, আপনি তো বিয়ে করব না বলে ধনুক ভাঙ্গা পণ করেছিলেন তবে জীবনের অবেলায় হঠাৎ কেন মত দিয়ে বসলেন? নাকি সিদ্ধিনাথের প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন।

ভবানী বৌদি মৃদু মৃদু হাসেন কোন উত্তর দেন না।

বেশি পীড়াপীড়ি করলে বলেন, ওই রকমই একটা কিছু ধরে নিন না। আপনি তো অ্যাকাউণ্টস এ কাজ করেন।

হিসাবের ইঙ্গিতে চট করে আর একটা হিসাবের কথা স্মরণ হয়। অনেকদিনের পুরণো হিসাব-মেলে কিনা পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হয়।

বলি, আচ্ছা বৌদি আপনার বয়স কত?

ভবানী বৌদি বললেন, তা অনেক মার মুখে শুনেছি বয়সের গাছপাথর নেই চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে।

চট করে মহেশের বয়সটা মনে আসে একচল্লিশ তাহলে দুজনের বয়সের ব্যবধান সাত।

এবার ওই হিসাবের জের টেনে পেছিয়ে যাই তেত্রিশ বছর আগে যেদিন ভগবতী দেহত্যাগ করেছিল। হিসাবে গরমিল হয় কম করেও ছটি বছর। তবে কেমন করে মিলবে হিসাব? অনুমানে কি স্থির বিশ্বাসকে স্থিত করতে পারব! অনুমান তো প্রমাণ নয়।

ক'দিন ধরেই বিষয়টা নিয়ে ভাবছিলাম—হঠাৎ আজ গীতার একটি শ্লোকে মিমাংসার সূত্রটি যেন খুঁজে পেলাম।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥

যজ্ঞধূমে মেঘের সৃষ্টি, সেই মেঘে সঞ্চিত হয় জল। বৃষ্টিরূপে জলধারা পৃথিবীতে নেমে ক্ষেত্র করে উর্বর। উর্বরা ভূমি থেকে পাই শস্য-সেই শস্যে দেহের পুষ্টি রক্ত-মাংস মেদ-মজ্জা শুক্র। জীবন উপাদানে এদেরই তো মুখ্য ভূমিকা।

এই তত্ত্বে জীবসৃষ্টির রহস্য পাওয়া গেল, কিন্তু ছটি বছরের হিসাব। দশমাস গর্ভবাসের কালটুকু হিসাবে টানলে বাকি রইল যে সময় সেটিও শাস্ত্রমতে মিলে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর এক বৎসর কাল প্রেতলোকে বাস। বৎসরান্তে সপিণ্ডকরণ শেষে প্রেতলোকমুক্ত আত্মার ঊর্দ্ধগতি অথবা প্রবল বাসনাবশবর্তী হয়ে মর্ত্তলোকে অবতরণ। এর মধ্যে সামান্যকাল অবশ্য অন্তরীক্ষে মেঘগর্ভে সলিলের সঙ্গে মিশে থাকে আত্মা—বৃষ্টি ধারার সঙ্গে নেমে আসে পৃথিবীতে শস্যক্ষেত্রে। শস্যবীজে শুক্ররূপে বাসা বাঁধে আত্মা, তারপর অন্নরসপুষ্ট জীবদেহ থেকে সৃষ্টি হয় জীবন—নূতন দেহে চির পুরাতন আত্মা ফিরে ফিরে আসে বাসনার বশে—

আপনি হয়তো বলবেন, এই ঘটনা কাকতালীয়বৎ। এই প্রমাণ যুক্তিনির্ভর নয়, যুক্তির আলো ফেলে সত্যাসত্য নির্ণয় সম্ভব নয় এখানে। সেক্সপীয়রের সেই বিখ্যাত উক্তি দেব না—সেটা বৈজ্ঞানিক যুগের উক্তি নয়, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী পরিনতিতে পৌঁছবার জন্য মহেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবননাট্যের কথাও কি একবার স্মরণ করবেন না? না-ই করুন, ওদের মিলিত জীবন সুখের হোক, এই কামনা নিশ্চয় করবেন। আমরা হিতৈষী বন্ধুর দল এখন কায়মনোবাক্যে এই কামনাই করছি।

সমাপ্ত

মস্তিষ্ক ধর্ষণ

সন্তোষকুমার দে

মস্তিষ্ক ধর্ষণ কথাটা বাংলায় হয়ত নতুন। মনন-শক্তিকে বিকৃত বা তাকে হত্যা করা; এ ছাড়া আর কিভাবে প্রকাশ করা যায় ঐ ভাবধারাকে যা লুকিয়ে আছে, 'মেনটিসাইড' কথাটার মধ্যে। আমি যা ভাববো বা চিন্তা করব (তা সে যতই বীভৎস হোক না কেন) তাই হবে অপরের চিন্তা; আমি যা বলতে বলব, অপরে তাই বলবে, তা সে তার পক্ষে যতই ক্ষতিকর হোক না কেন, আমার ভাবে অন্যে হবে ভাবিত; বিবেক বুদ্ধি-যুক্ত মানুষের এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় কি? এক জনের মগজ থেকে তার বিচারবুদ্ধি, চিন্তাশক্তি সমস্ত উপড়ে ফেলে, তার আমিত্বকে মুছে দিয়ে এক নতুন 'আমিকে' প্রতিষ্ঠিত করা যায়, আর এই কাজটিকেই নতুন যুগের ভাষায় বলা হয় 'মস্তিষ্ক ধর্ষণ'। এর আর একটি নাম হল মানসিক অপমৃত্যু। অনেকে মনে করবেন এ অসম্ভব। অসম্ভব কিন্তু নয়—এটি বাস্তব সত্য। বিগত ২৫।৩০ বছরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে মনো-বিজ্ঞানীরা এই অসম্ভব কাজকে সম্ভবপর করে তুলেছেন। Rape of the mind ও কেউ কেউ বলেন।

এখানে বলে রাখা ভাল মেন্টিসাইডকে ব্রেন ওয়াসিংও বলা হয়। মেনটিসাইড একটি ব্যাপক অভিধা। এর প্রথম অবস্থা হল ব্রেণ ওয়াসিং (মগজ ধোলাই) আর দ্বিতীয় অবস্থা হল ব্রেণ-চেঞ্জিং (মস্তিষ্কের পরিবর্তন)—আক্ষরিক অর্থে নয়। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। সাধারণ লোকে অবশ্য এ দুটি জিনিসকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। মগজ ধোলাই কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল জিনিস। এ কাজটিকে ইনডকট্রিনেসনও বলা চলে। ব্রেণ চেঞ্জিং বা মস্তিষ্কের পরিবর্তন কাজটা হল কঠিন ও সময়সাপেক্ষ।

এই মস্তিষ্ক পরিবর্তনের জন্যে প্রথম কাজ হল, মানুষের মাথায় যে চিরাচরিত ভাবনা চিন্তা, পুরাণ স্মৃতি ও সংস্কার আছে, তাকে সম্পূর্ণভাবে উৎপাটিত করে মস্তিষ্ককে একখানা ধোয়া স্লেট বা শাদা কাগজের মত করে ফেলতে হবে; তারপর সেই পরিষ্কৃত মস্তিষ্কে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নতুন ভাবনাচিন্তা, ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের মতে লাল চীন মাত্র প্রথম প্রক্রিয়াটিই আয়ত্ত করতে পেরেছিল; দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি তখনও তার ছিল অনায়ত্ত।

মগজ ধোলাই বা মস্তিষ্ক ধর্ষণের কাজ আজকাল লালচীনে এত ব্যাপকভাবে করা হচ্ছে যে, এজন্যে সেখানে সমস্ত কলকারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে "পিপলস নিউ লাইফ লেবর স্কুল" নামে এক নতুন ধরণের স্কুল খোলা হয়েছে। এইসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ও কর্মীদের ব্যাপকহারে মগজ ধোলায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ওপর আছে "নর্থ চায়না পিপলস রেভোলিউশনারী ইউনিভারসিটি।" সেখানে হয় এ বিষয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা।

গত ১৫।২০ বছর ধরে ধোলায়ের ফলে চীনের নাগরিকেরা হয়ে উঠেছে অনুগত, আজ্ঞাবহ, বিশ্বস্ত ও নতুন ভাবনায় ভাবিত। যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া, গুপ্তচরের কাজ করা, শত্রুদলে মিশে সেখানে বিভেদ সৃষ্টি ও নাশকতার কাজ করা প্রভৃতি তাদের কাছে দেশ প্রেমের নামান্তর বলে সংস্কারবদ্ধ হয়ে উঠেছে। আজ

যে এক শ্রেণীর ছাত্রেরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন লাগাচ্ছে; পুঁথিপত্র পোড়াচ্ছে, দেশের শাশ্বত সংস্কৃতির বিনাশের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে, তা দেখে সন্দেহ হয়, এইসব কালাপাহাড়ীদের বুঝি মগজ ধোলাই করে দিয়ে কাজে নাবান হয়েছে।

এই মগজ ধোলায়ের কাজ সোভিয়েট রাশিয়ায় এত সফল হয়েছে যে, এ বিষয় একটা মজার ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমেরিকান দূতাবাসের এক পদস্থ রুশ কর্মচারীকে মার্কিন বিদ্বেষী করে তোলার জন্যে প্রথমে বেশ করে তার মগজ ধোলাই করে দেওয়া হয়। পরে তাকে বলা হয় যে তার স্ত্রীকে আমেরিকানরা হত্যা করেছে। প্রথমে ভদ্রলোক বিশ্বাস করতে চান নি, পরে দুচারজনের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে ঐরকম একটা গুজব শুনতে পান; তখন তাঁর সত্যসত্যই বিশ্বাস হয়। এর আগে ভদ্রলোকের স্ত্রীকে তাঁর বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলে অন্যত্র পাচার করে দেওয়া হয়। এর পর প্রায় মাস খানিক পরে ভদ্র লোকের স্ত্রীকে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়; কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারেন না। হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্রমাগত বলতে থাকেন, 'তুমি কে? তুমি ত আমার স্ত্রী নও, সেত মরে গিয়েছে।' স্ত্রী তাকে বিবাহিত জীবনের অতীত ঘটনাবলী বললেও, তাঁর কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। এমনিভাবে কিছুদিন পরে তাঁর মগজ ধোলায়ের প্রভাব অল্পে অল্পে কেটে গেলে, ভদ্রলোক নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারেন এবং বুঝতে পারেন মগজ ধোলায়ের প্রভাবেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকেই মগজ ধোলাই কথাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত; কিন্তু এই জিনিষটা কি; সে সম্বন্ধে অনেকের সঠিক ধারণা ছিল না। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হল, এই কথাটি যে, চীনাভাষা Hsi-Nao থেকে এসেছে তা অনেক শিক্ষিত লোকও জানেন না।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নির্জলা মিথ্যা, আজগুবি বিষয়, অতি বীভৎস ও ঘৃণিত চিন্তা সাধারণ মানুষের ত কথাই নেই, অতি দৃঢ়চেতা, সঙ্কল্পে মহীয়ান যে মানুষ তার মস্তিষ্কেও প্রবেশ করিয়ে দেওয়া সম্ভব এবং যার মস্তিষ্কে এই সব চিন্তা অনুপ্রবেশ করান হবে, সে প্রকাশ্য বিচারালয়ে এইসব কথা এমন অবাধে ও অসঙ্কোচে বলে যাবে যে, তার একটি বর্ণ কারও মিথ্যা বলে মনে হবে না। সে নিজেকে অতি ঘৃণিত কাজে লিপ্ত বলে স্বীকার করবে, অনুশোচনা প্রকাশ করবে এবং চরম দণ্ডের জন্যে বিচারকের কাছে আবেদন জানাবে। শুনলে মনে হবে যেন, যেসব গোপন কথা তার মনের গহনে এতদিন লুকান ছিল, আজ সেগুলো প্রকাশ করে তার মন ঠাণ্ডা হল।

এখন এইসব মগজ পরিবর্তনের ইতিহাস একটু আলোচনা করা যাক। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে জার্মাণীতে মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতে আরম্ভ করেন। পরে হিটলার যখন সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন, গেষ্টাপোর (গুপ্তচর বিভাগ) গোপন রিপোর্টের ফলে নিজের দলের কোন লোকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে, কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে সরাতে হলে, দেশের নামী সাইকিয়াট্রিষ্টদের ডেকে এই মগজ-পরিবর্তনের ব্যবস্থা ভাল করে করতে বলতেন; তারপর ব্যবস্থা যখন পাকাপাকি হত, তখন এক প্রকাশ্য বিচারের প্রহসন করা হত। এই বিচারে দেখা যেত, প্রতিদ্বন্দ্বীর দলের নায়ক বা নায়করা অকপটে সমস্ত দোষ স্বীকার করতেন (জার্মাণীর রাইসটাগে অগ্নিসংযোগের বিচারের কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে)। এই প্রক্রিয়ার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে হিটলার পাইকেরী হারে সমস্ত জাতির চিন্তা ও ভাবনা নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করলেন, যাতে সমগ্র জাতি তাঁর ভাবনায় ভাবিত হয়, তাদের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ বা অবকাশ না থাকে। তাঁর বাণী হল এক জাতি, এক ভাষা, এক চিন্তা।

সোভিয়েট রাশিয়াও এবিষয়ে পিছিয়ে থাকল না। সেও ১৯০৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত দেশের বৈজ্ঞানিকদের এবিষয়ে বিশেষ যত্নের সঙ্গে গবেষণার কাজ চালাতে নির্দেশ দিল, যাতে করে দেশের কর্মীরা অপনাপন সত্তা ও বিচারবুদ্ধি হারিয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতন কাজ করতে পারে।

মানুষের মস্তিষ্ক থেকে পূর্বস্মৃতি, ধ্যান-ধারণা, ভাবনাচিন্তা, শিক্ষা, সংস্কার সমস্ত ধুয়ে মুছে ফেলে তাতে আবার নতুন চিন্তাভাবনা, শিক্ষা, দীক্ষা ছেপে দেওয়া যায়। পাতঞ্জল দর্শনে ৩।১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে। "সংস্কার সাক্ষাৎ কারণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্" অর্থাৎ সংস্কার অর্থে প্রাক্ অভিজ্ঞতার ছাপ, যা আমাদের মনের অবচেতন স্তরে থাকে, তার কখনও বিনাশ নেই। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাক অভিজ্ঞতার ছাপকে সম্পূর্ণ লুপ্ত করে ফেলা সম্ভব। যাই হোক যেভাবে এটি করা হয় সেটি একটি জটিল বিষয়, তা সহজভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন।

সংক্ষেপে বলা চলে, এ বিষয়টি সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানবিদ্ আইভ্যান প্যাভ্লভ আবিষ্কার করেন। অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিছক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। তিনি এই প্রক্রিয়াটির নাম দিয়ে ছিলেন 'কনডিসনড্ রিফ্লেক্স্' বা নিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্তী। এই প্রতিবর্তী বা রিফ্লেক্স দুই প্রকারের। একটি হল সহজাত, আর একটি হল শিক্ষাসাপেক্ষ ও নিয়ন্ত্রণাধীন। সহজাত প্রতিবর্তীর উদাহরণ হল, আগুনে আঙুল ঠেকলে, আপনা আপনি আঙুলটি সরিয়ে নেওয়া হয়, এর জন্যে কোন শিক্ষা বা উপদেশের প্রয়োজন হয় না। আর নিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্তী হল শিক্ষাসাপেক্ষ। সযত্ন শিক্ষার ফলে মানুষ এক নতুন প্রতিবর্তী লাভ করতে পারে। এই নিয়ন্ত্রিত প্রতিবর্তী হল এক জটিল ব্যাপার। সংক্ষেপে প্যাভলভের এই প্রক্রিয়াটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :—

খাবার সময় প্যাভ্লভ কুকুরকে লক্ষ্য করে দেখেন, তার মুখ থেকে অজস্রধারে লালা নিঃসরণ হচ্ছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও স্বাদেন্দ্রিয়ের সহযোগে মস্তিষ্কে যে আলোড়নের সৃষ্টি হচ্ছে, তার ফলে লালাগ্রন্থি শিথিল হয়ে নিঃসরণ ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। এটি লক্ষ্য করে প্যাভলভ প্রতিবার কুকুরটিকে খাবার দেবার সময় একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। ক্রমে এমন হল যে, ঘণ্টা বাজালেই কুকুরের মুখে লালা নিঃসরণ হয়ে ক্ষুধার উদ্রেক হত। কয়েকদিন ধরে বারবার এই পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং দেখতে পেলেন, কুকুরের ক্ষুধা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে যে খাবার না দিয়েও ঘণ্টা বাজালেই কুকুরের মুখ লালায় পূর্ণ হয়ে ওঠে আর ঘণ্টা না বাজিয়ে খাবার দিলে, তার মুখে লালা নিঃসরণ হয় না। জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য যে খাদ্য ও ক্ষুধা তাকে অতি সহজে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব এটি সেদিন প্যাভ্লভ উপলব্ধি করতে পারলেন।

এতদিন পরে প্যাভ্লবের এই প্রক্রিয়াটি প্রথমে নাৎসীরা, পরে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক ও মানসিক প্রতিবর্তীর (ঘণ্টা বাজান ও লালা নিঃসরণের ভিন্ন রূপ) সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে মস্তিষ্কের সঙ্গে মননক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলেন। খাদ্য না দিয়ে শুধু মাত্র ঘণ্টা বাজিয়ে যেমন অজস্র ধারে লালা নিঃসরণ করা সম্ভব, তেমনি কোনো সত্য না থাকলেও, বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে মানুষের মগজে যে মিথ্যা চিন্তাধারা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা অবাধে বার করাও সম্ভব। তাই দেখা গেল ষ্ট্যালিনের আমলে যখনি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী সংকর্মী বা সন্দেহভাজন সেনাপতি কি নেতাকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসারণের প্রয়োজন হত; তখনি তাকে এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত করে, একটা লোক দেখান বিচারের ব্যবস্থা করা হত। সেখানে সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি অকপটে বাঞ্ছিত দোষ স্বীকার করে শাস্তির জন্যে প্রার্থনা করত; বা ক্ষমাভিক্ষা চাইত। বাইরের লোক মনে করত, সত্যসত্যই একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠেছিল,

যথাসময় ধরা পড়ায় বহু অনর্থের হাত থেকে দেশ রক্ষা পেল।

মানুষ যতই দৃঢ়চেতা ও অটুট সঙ্কল্পবিশিষ্ট হোক না কেন, তার মনের উপর দিনের পর দিন যখন অজস্র অত্যাচার চলতে থাকে, তখন তার পক্ষে স্বীকারোক্তি না করে, বা তাকে যা বলতে বলা হবে তা না বলে থাকতে পারে না। আমাদের দেশেও স্বদেশী যুগে পুলিশ সাহেবরা তরুণ বিপ্লবীদের কাছে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে থার্ড ডিগ্রি মেথড নামে তাদের দেহের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতেন। এতে তিনি সব সময় সফল হতে পারতেন না; কারণ, দেহের ওপর নির্যাতন অনেকে সহ্য করতে পারে। প্যাভলবের প্রক্রিয়ার কথা তিনি সেদিন জানতে পারেন নি। তাই মনের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে মনকে আয়ত্ত করতে পারেন নি।

প্যাভলবের এই প্রক্রিয়াটি যা নাৎসী জার্মানী আর সোভিয়েট রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা গত কোরিয়ার যুদ্ধে চীনারা বিজ্ঞান সম্মতভাবে আরও নিখুঁত করে তোলে। চীনারা চেয়েছিল, যুদ্ধবন্দীদের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে যে, আমেরিকা কোরিয়ায় বীজাণু যুদ্ধ আরম্ভ করেছে এবং এতে সফলও হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি করে মানুষের মনের দৃঢ়তা নষ্ট করে দিয়ে, তার মগজে নতুন চিন্তার রেখাপাত করা যায়। আর এই কাজে সাফল্যের জন্যে বিখ্যাত রোগ ও শল্য চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, সাইকিয়াটিষ্ট এবং যাঁরা সংবেশন বিদ্যায় পারদর্শী তাঁদের সকলের সাহায্য নেওয়া হয়। সেই বিশেষ অবস্থা ও প্রতিক্রিয়াগুলি কি, এবার সেই কথা আরম্ভ করা যাক। অনমনীয় মনকে নমনীয় করবার জন্যে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলির সাহায্য নেওয়া হয়:—

১) বন্দীর মন যদি অত্যন্ত দৃঢ় হয়, আর তাকে যদি সহজে আয়ত্ত করা না যায় তা হলে মর্ফিন ($C_{17}H_{19}O_3N$), বর্বিচুরেট [$CO(NH.CO)_2CH_2$] কোকেন, এলকোহল, হেরোইন হাসিস, Mescaline Marijuana প্রভৃতি নানাবিধ সংজ্ঞাপহারক ঔষধ প্রথমে প্রয়োগ করা হয়। এই ঔষধগুলির আর একটা ফল হলো যে, তারা অতি শিগগির বিস্মৃতি ঘটায়। ফলে পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে মস্তিষ্ক একখানা ধোয়া শ্লেটের মতন হয়ে যায়। এরপর দেহের ও মনের ওপর পর্যায়ক্রমে অত্যাচার চালানো হতে থাকে। অতিরিক্ত অত্যাচারের ফলে বন্দী মৃতপ্রায় হয়ে পড়লে বা সংজ্ঞা হারালে তাকে কোরামিন বা ঐ জাতীয় কোনো উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে চাঙ্গা করিয়ে নিয়ে আবার তার ওপর অত্যাচার চালানো হতে থাকে। এতেও যদি সায়েস্তা না হয়, তাহলে তাকে কয়েক সপ্তাহ নির্জন ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। এই ঘরটি হয় অন্ধকার ময়লা ও দুর্গন্ধময়। বন্দীকে ঘরের মধ্যে শৌচাদি করতে হয়। যে পাত্রে মলত্যাগ করে সেই পাত্রটি তাকে দিয়ে ধুইয়ে নিয়ে তাতেই তাকে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। দুর্গন্ধ, ময়লা ও নির্জনতার ফলে তার মনে ভাঙন ধরতে আরম্ভ করে। তাছাড়া, প্যাভলব পরীক্ষা করে জানতে পারেন, কোনো দুরূহ বিষয় শিক্ষার পক্ষে নির্জনতা হল অত্যন্ত অনুকূল। আমাদের দেশেও স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দকে এই রকম এক পূতিগন্ধময় নির্জন কক্ষে রাখা হয়েছিল। বোমা তৈয়ারকারীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে, সেবিষয় তাঁর কাছে একটা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যেই এই ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু যোগী শ্রীঅরবিন্দ প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা মনকে বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করায় তাঁর মানসিক শক্তি দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে নি।

২) দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল, বন্দীর চোখের সুমুখে রেখে কয়েকটি হাজার শক্তির বাতি জ্বালিয়ে, তাকে ডাণ্ডা-বেড়ি পরিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে ৯০।১০০ ঘন্টা পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করা। তীব্র আলোর সুমুখে দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকার ফলে সে

স্মৃতিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলে, তার শিরদাঁড়া ও ঘাড় বেঁকে যায়। তাকে প্রথমে অল্পাহারে, পরে কয়েকদিন অনাহারে রাখা হয়। এতেও বশ না মানলে তাকে ঘুমোতে দেওয়া হয়না কানের কাছে কাঁসার ঘন্টা, ঢাকঢোল অনবরত পেটানো হতে থাকে, অথবা গভীর নিদ্রার মধ্যে—যার মধ্যে আছে একটা মাদকতা, যা কর্মক্লান্ত জীবনের ওপর একটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়; অবচেতনার মাঝ-দুয়ার থেকে অবলুপ্তির-প্রান্তসীমা ছুঁয়ে যে আবেশ ধীরে ধীরে মানুষকে আচ্ছন্ন করতে এগিয়ে আসে সেই গভীর ঘুমের মধ্যেই তাকে বারে বারে জাগিয়ে তুলে নানাবিধ প্রশ্ন করা হয়। ছয় সাত দিন ঘুমোতে না পেয়ে বন্দী পাগলের মত হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাকে যা বলতে বা যা করতে বলা হয়, তাতেই সে রাজী হয়ে যায়। রাজা তৃতীয় রিচার্ড যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালাবার সময় চীৎকার করে ছিলেন, একটা ঘোড়া দাও, বিনিময়ে রাজ্যদান করব। বন্দীও তেমনি বলে, এক ঘন্টা ঘুমোতে দাও, বিনিময়ে যা বলবে তাই করব। শত্রুপক্ষের বন্দী সেনাপতিদের কাছ থেকে গুপ্ত সামরিক তথ্য জানবার জন্যও এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(৩) যখন বন্দীর মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়ে তার আপন ইচ্ছা ও বিচার শক্তি বলে আর কিছুই থাকে না, তখন বিচারালয়ে দাখিল করার উপযোগী এক বিবৃতি তৈরি করে, তাকে পড়িয়ে তার নাম সই করে নেওয়া হয়, তারপর চলে কদিন ধরে এই বিবৃতি বারবার তাকে পাঠ করিয়ে শোনান। তারপর ঐ বিবৃতিটি তাকে দিয়ে মুখস্থ করিয়ে নিয়ে অটো-সজেসসন বা স্বয়ং সংবেশন প্রক্রিয়ায় তার মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া। এইবার বন্দীর মনে হয়, সত্যসত্যই সে এই কল্পিত অপরাধে অপরাধী। মনে তার অনুশোচনা স উপস্থিত হয়। সে হয়ে পড়ে যেন একটা কলের -দম দিলে বা দড়ী টানলেই ইচ্ছামত নড়াচড়া, কথাবলা আরম্ভ করে।

(৪) পূর্বে যে স্বয়ং সংবেশনের কথা বলা হয়েছে, সেটি এইভাবে হয়ে থাকে ভয়, ক্লান্তি, অসহায়তাবোধ, নির্জনতা, নিদ্রার অভাব, অপুষ্টি, ক্ষুধা, দুর্ভাবনা, নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ প্রশ্নবাণ প্রভৃতির ফলে মন আপনা-আপনি দুর্বল হতে হতে সংবেশিত হয়ে পড়ে। নিদ্রার সময় তার ঘরে যে গোপন রেডিও সেটটি আছে তা থেকে যে বিবৃতিটাতে সে সই করেছে সেটি অতি মৃদু ও মিষ্টস্বরে রিলে করা হতে থাকে। তার মনে হয়, সে স্বপ্ন দেখছে, বা কোনো দেবদূত তার দুষ্কর্মের বিষয় তার কানে কানে বলছেন। ঘুম ভেঙ্গে গেলেও এই একই বিবৃতি রিলে হতে থাকে। কি জাগ্রত, কি সুপ্তাবস্থায় দিনের দিন একই বিবৃতি শুনতে শুনতে তার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হয়, সত্যসত্যই সে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তখন তার মনে পাপবোধ জন্মায়। ক্রমশই নিজেকে সে অপরাধী মনে করতে থাকে। এই বার তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার প্রবৃত্তি একটু একটু করে জাগতে থাকে। তা এই ইচ্ছাকে প্রবল করে তুলবার জন্যে নিদ্রার সময় অতি মিষ্ট স্বরে রিলে করা হতে থাকে, "ওরে পাপী। এখনও তোর মুক্তির উপায় আছে। আর লুকাস নে, যা জানিস সব বলে ফেল, নিজের পাপের বোঝা হাল্কা কর। তোর ভাল হবে।' এই ভাবে একই কথা বারবার ঘুম বা তন্দ্রার মধ্যে শোনার ফলে বন্দীর মন ফোনগ্রামের রেকর্ডের মতন বাজতে থাকে। দম দেওয়া গ্রামোফনের মত শেখানো কথাগুলো অবলীলাক্রমে সে বিচারকের সুমুখে বলে যায়।

(৫) এইবারে পরীক্ষা করে দেখা হয় যে, বন্দী স্বীকারোক্তির জন্যে ঠিক তৈরী হয়েছে কি না। যখন বুঝা যায় শিক্ষা পাকাপাকি হয়েছে, তখন তাকে বিচারালয়ে হাজির করে, বিচারকের কাছে তাকে দিয়ে এক এজাহার দেওয়া হয়। সে তখন মোহাবিষ্টের মত সমস্ত শেখান কথা স্বীকার করতে থাকে, অনুশোচনা প্রকাশ করে এবং চরম দণ্ড প্রার্থনা করতে থাকে। এই মোহাবিষ্ট ভাব অবশ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কিছুদিন

পরে আবার সে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষে পরিণত হতে পারে না। যার ওপর এই প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে চালানো হয়, তার মনের সাম্য অবস্থা চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়, মর্মভগ্ন হয়ে যায় ছিন্নভিন্ন। কিছুদিন পরে সে হয় উন্মাদ হয়ে যায়, নয়ত অকাল মৃত্যু বরণ করে, নয়ত আত্মহত্যা করে সব জ্বালা জুড়ায়। এই প্রক্রিয়া চলাকালে অনেকে-বিশেষতঃ যারা দুর্বল প্রকৃতির—মারা পড়ে। মোটের ওপর এই মস্তিষ্ক-পরিবর্তন প্রকরণ অতি সাংঘাতিক জিনিস, সংবেদের ভাব অবলুপ্ত হলেও, তার মনোজগৎ হয়ে যায় একেবারে ছিন্ন বিছিন্ন। তাই এর অপর নাম মেনটিসাইড।

মস্তিষ্ক পরিবর্তন ক্রিয়ার হাত থেকে ত্রাণ পাবার মত আজও কোন বৈজ্ঞানিক উপায় বার হয় নি, একমাত্র যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা বিক্ষিপ্ত মনকে একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

আত্ম সংবেশন (সেলফ হিপনসিস) পদ্ধতি অনুশীলন করে সজ্ঞান মনকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে অবচেতন (সাব কনসাস) মনকে জাগিয়ে তুলতে পারলে একে প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে হিপনটিক এনেসথেসিয়া (Hypnotic ancsthesia) বলা হয়। সহজ ভাষায় মন দিয়ে দেহকে জয় করতে হবে। দেহ বা দেহবোধ জয় করতে পারলে, দেহের ওপর শত অত্যাচার মনের দুয়ারে আঘাত হানতে পারবে না, ফলে দেহ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হলেও মন থেকে যাবে অটুট, অক্ষত। কাজটা অবশ্য মোটেই সহজ নয়। কল্পনা করতে হবে, তোমার দেহ এক জিনিস, আর তোমার মন অন্য জিনিস; অর্থাৎ তুমি হলে তুমি, আর তোমার দেহ হল এক স্বতন্ত্র সত্তা, যার ওপর আঘাত হানলে তুমি আহত হবে না। এ যোগাভ্যাসের একটা অঙ্গ বিশেষ। দেহ ও মনের স্বতন্ত্র সত্তাবোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র, দেহকে সজ্ঞান মন থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে। আর তখন দেহের ওপর অত্যাচার মনের ওপর দাগ কাটতে পারবে না, ফলে অত্যাচারীর সকল কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেহ বা দেহবোধকে আপন পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে সঙ্কুচিত করে এনে একেবারে শূন্যপর্যায় না হোক অন্তত অপরিহার্য স্তরে আনতে পারলে, এ কাজ করা সম্ভব। আমেরিকার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জ্যাক লণ্ডন তাঁর 'ষ্টার রোভার' নামে একখানি উপন্যাসে ডারেল ষ্টানডিং নামে একজন কয়েদি কি ভাবে এই হিপনোটিক এনেসথেসিয়া প্রক্রিয়ায় জেলের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে নিজের চিন্তা বজায় রাখতে পেরেছিলেন, তা বর্ণনা করেছেন।

এরপর ইনডকট্রিনেসন বা নিজেদের ভাবনায় ভাবিত করে তোলার বিষয়ে কিছু বলা দরকার। কোরিয় যুদ্ধে ইউনাইটেড নেশনের যুদ্ধ বন্দীদের ওপর ব্যাপকভাবে কম্যুনিষ্ট মতবাদ চাপিয়ে দেবার জন্যে চীন যে প্রচেষ্টা করেছিল, ম্যাসাচুসেটের এক অধ্যাপক H. Schein তার এক সমীক্ষা চালিয়ে ১৯৫৬ সালে একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। Joost A. M Meerlooএর Pavlovian Strategy as a Weapon of Menticideনামে একখানা পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে। এই দুই পুস্তক থেকে জানা যায় চীন যে পরিকল্পনাটা গ্রহণ করেছিল তা নিম্নলিখিত রূপ:—

(১) প্রথম পরিকল্পনা হল যুদ্ধবন্দীদের পর্যায়ক্রমে ভয় ও লোভ দেখান (cyclical reactivation of fears and their relief)। বন্দীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে প্রত্যহ রাতে গড় পড়তা ২০ মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত, খারাপ ও পরিমাণে কম খাদ্য দেওয়া হত, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান নিকৃষ্ট ধরণের হত, খালি গায়ে শীতে মেঝেতে শুইয়ে রাখা হত, গলায় দড়ির ফাঁস আল্গা করে বেঁধে আঙুলের ওপর ভর করিয়ে দাঁড়িয়ে রাখা হত, কখন কখনও খাঁচার মধ্যে বা শৌচাগারেও আটকে রাখা হত। বলা হত, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে, তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। তারপর একটু ভাল ব্যবহার করা হত, ভাল খাবার, কখন কখনও সিগারেটও

মদও দেওয়া হত এবং বলা হত তাদের আচরণে সন্তুষ্ট হলে কর্তৃপক্ষ যুদ্ধবন্দী প্রত্যার্পণের সময় তাদের নাম তালিকার প্রথম দিকে থাকবে। একটু আধটু খেলা ধুলার ব্যবস্থা, বই পড়ার সুযোগ এবং কখনও কখনও সিনেমা দেখানোর সুযোগ দেওয়া হত। কিন্তু বই মানে হল কম্যুনিষ্ট সাহিত্য আর সিনেমা হল কম্যুনিষ্ট দেশের কল্পিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের এক মনগড়া চিত্র। ফলে দুর্বল-চিত্ত যারা তারা একটু নরম হয়ে যেত।

(২) দ্বিতীয় ব্যবস্থা হল বন্দীদের চিঠিপত্র এলে তাতে যুদ্ধের কোন খবর, কোরিয়ার শান্তি-প্রস্তাব, বা তাদের নিজেদের পরিবারের কোন ভাল খবর থাকলে সেগুলো চেপে যাওয়া হত; আর যে সব চিঠিতে—দেশের কোন খবর থাকত না, বন্দীদের আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু সংবাদ বা সাংসারিক অভাব অনটনের ইঙ্গিত থাকত, সেগুলো সাত তাড়াতাড়ি বন্দীদের দেওয়া হত।

৩) নিগ্রো, পিউর্টোরিকো, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বন্দীদের আমেরিকানদের থেকে আলাদা করে রেখে, তাদের কানে তাদের দেশে যে ভীষণ বর্ণবৈষম্য ও তাদের ওপর শ্বেতাঙ্গেরা যে অন্যায় ও অবিচার করছে সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হত; আর বলা হত এসব বুর্জোয়া রাজনীতির ফল, কম্যুনিষ্ট দেশ এসব পাপ থেকে মুক্ত।

৪) অনেকদিন ধরে চিঠিপত্র না পেয়ে বন্দীরা আকুল হয়ে পড়লে তাদের বোঝান হত তাদের সরকার, তাদের আত্মীয়স্বজন, তাদের ভুলে গিয়েছে, তাদের প্রতি তারা উদাসীন। যে, সরকার ও আত্মীয়-স্বজন তাদের খোঁজ-খবর করে না। তাদের ওপর দরদ থাকার কি দরকার। এমনটি কিন্তু কম্যুনিষ্ট দেশে সম্ভব নয়।

৫) বন্দীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিরাগ, সন্দেহ ও বিদ্বেষের বিষ ছড়াবার চেষ্টা করা হত, যাতে তাদের মধ্যে বিপদে হৃদ্যতা গড়ে না ওঠে, একজন অপরজনের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষকে গোপন কথা বলে দেয়।

৬) বন্দীদের বিশ্বাস ও নিষ্ঠার ওপর আঘাত হানবার জন্যে গণতান্ত্রিক দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলো বড় করে দেখিয়ে প্রত্যহ যে বক্তৃতা দেওয়া হত, তা বন্দীদের জোর করে শুনতে বাধ্য করা হত এবং পরে তাদের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্যে তাদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে, এবিষয়ে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করতে উৎসাহ দেওয়া হত। যারা এইসব অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিষ্ট দেশের প্রতি একটু ঝোঁক দেখাত, তাদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হত ও তাদের বলা হত স্বাধীন-চেতা। নিগ্রোদের বলা হত, তোমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী, কেন তোমরা শ্বেতাঙ্গদের জন্যে মরতে এসেছ।

৭) সাধারণ সৈন্য ও অফিসারদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে আলাদা করে রেখে সাধারণ বন্দীদের বলা হত, তোমাদের অফিসাররা তোমাদের মত সাধারণ সৈন্যদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে নারাজ, তাই এই ব্যবস্থা। আমাদের দেশে এটা সম্ভব নয়—এখানে অফিসার ও সৈনিক, মজদুর ও মালিকে কোন ভেদ নেই। এছাড়া অনেক আমেরিকান ও নিগ্রোদের কেন বা কোন মহৎ উদ্দেশ্যে তারা কোরিয় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় আমেরিকা যে অহেতুক কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছে, এটা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হত।

৮) বন্দীদের অনেক সময় নির্জন কারাগারে রাখা হত। সময় কাটাবার কোন উপায় না থাকায় তারা যখন বিমর্ষ হয়ে পড়ত, তাদের দেওয়া হত কম্যুনিষ্ট সাহিত্য। হাতে প্রচুর সময় থাকায় এবং সে সময় আর অন্য কোনভাবে কাটাবার উপায় না থাকায়, বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইসব সাহিত্য পড়তে বাধ্য হত। তারপর এইসব সাহিত্য পড়ে তার ওপর প্রবন্ধ লিখতে বলা হত। যারা ভাল, অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট মতকে সমর্থন করে লিখিত; তাদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হত; যেমন বন্দীশিবিরের বুলেটিন বা প্রচার পত্রের সম্পাদনার ভার দেওয়া হত।

পুরস্কার আবার অন্ত বন্দীদের, যারা এ বিষয়ে চীনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করত না, তাদের দেখান হত ; এই উদ্দেশ্যে যে কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী হলে কত সুবিধা পাওয়া যায় সেইটা দেখান।

৯) এছাড়া অনেক সময় বন্দীদের জোর করে আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠি লিখতে বাধ্য করা হত এই বলে যে, তারা খুব সুখে স্বাচ্ছন্দে আছে, কোন অভাব অভিযোগ নেই। বন্দীরাও এই মনে করে এইসব চিঠি লিখত যে, আর কিছু না হোক তারা যে প্রাণে বেঁচে আছে, এইটুকুও আত্মীয়রা জানতে পারবে।

এই ইনডকট্রিনেসন কতটা সফল হয়েছিল, তারও একটা সমীক্ষা চালান হয়। দেখা গেছে নিম্নবিত্ত লোকেরা, বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গেরা যারা দেশে সমস্ত সুখ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, পীড়ন ও লাঞ্ছনা যাদের ভাগ্য-লিপি সেদলে যোগ দিয়েও যাদের উন্নতি হত কদাচিৎ তারা কমিউনিজমের আহ্বানে খানিকটা সাড়া দিয়েছে।

লোভ ও ভয় দেখিয়ে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপকভাবে কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী করা সম্ভব হয়নি। কিছু সংখ্যক বন্দী যারা দুর্বলচিত্ত, বা আগে থেকে কম্যুনিজমের প্রতি খানিকটা সহানুভূতি ছিল এবং স্বদেশে যারা নানা অভাব ও অসুবিধা ভোগ করত, তাদের এদিকে খানিকটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে চাননি এমন বন্দীর সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। এদিক দিয়ে বলা চলে চীনের এ চেষ্টা বিফল হয়েছিল। বিফল হবার কারণ বিশ্লেষণ করে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, পাশ্চাত্য, ক্লাইও ইংরাজী ভাষায় ভাল জ্ঞান না থাকায় এবং শিক্ষিত প্রচারকের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়ায় এদের প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে, নইলে টেকনিক সম্বন্ধে ভুল বিশেষ কিছু ছিল না। ভালভাবে না জেনে একদেশের সম্বন্ধে আজগুবি তথ্য প্রচার করলে, লোকের প্রাণে তা সাড়া বিশেষ জাগাতে পারে না (George Winokur—Brainwashing—A Social Phenomenon of our Time দ্রষ্টব্য)

কংগ্রেস স্মৃতি

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

এপ্রিলের শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলেন।

মে মাসের প্রথম দিকে চট্টগ্রামে—অসহযোগ আন্দোলন নূতন রূপ গ্রহণ করল। বার্মা অয়েল কোম্পানীর এজেন্ট মেসার্স বুলক ব্রাদার্সের শ্রমিকদের একটা ইউনিয়ন ছিল। স্থানীয় বার লাইব্রেরীর সভাপতি ব্যারিষ্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ঐ ইউনিয়নেরও সভাপতি ছিলেন।

ইউনিয়নের শ্রমিকরা তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারে অসমর্থ হয়ে ষ্ট্রাইক ঘোষণা করল। মালিক ও শ্রমিকদের বিবাদে নিরপেক্ষতা অবলম্বন না করে বিক্ষোভ মিছিল ও লোক সমাবেশ বন্ধ করার জন্য জেলার শাসকবর্গ সেনগুপ্তের উপর ১৪৪ ধারার নোটিশ জারি করল। বলাবাহুল্য এ আদেশ কেউ মানল না। একটি সভায় মিলিত হয়ে বার হাজার শ্রমিক ব্যাপক ধর্মঘট (ষ্ট্রাইক) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। চট্টগ্রাম শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হল।

বার্মাগামী জাহাজ "লঙ্কা" থেকে ভারতীয় নাগরিকগণও একযোগে নেমে গেল। মাল তোলা নামানো বন্ধ হল। ডাক বহন করা গেল না। জেটিতে ক্রেন চালানোর কোন লোক পাওয়া গেল না। সহরের সব দোকানপাঠ বন্ধ হয়ে গেল। যানবাহন চলাচলও রহিত হল। ইউরোপীয়ানদের চাকর বাকর কাজ বন্ধ করে দিল, দেশী বিদেশী সমস্ত কার্যগুলির কাজও বন্ধ হল। আদালতে কোন কাজ হল না। উকিল মোক্তাররা কেউ কোর্টে গেল না। মিউনিসিপ্যালিটীর জল সরবরাহ বন্ধ হল। কল্প বাজার এবং বার্মার স্টীমার বা নৌকা চালানোর কোন লোক পাওয়া গেল না। জেটীতে বন্দরে পাহাড়তলীর রেলের কারখানা, রেলের অফিস প্রভৃতি কর্মীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হল। তিনসুকিয়া থেকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে ধর্মঘট হয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ হল, জেনারেল হাসপাতালের রোগীদের জন্য কংগ্রেস কমিটীর হিন্দু মুসলমান স্বেচ্ছা-সেবকগণ বালতিতে করে জল এনে দিতে লাগল। স্বামী বিশ্বানন্দ, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় উকিল মহিমচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নেতাগণকে (যাঁদের প্রত্যেকের উপর ১৪৪ ধারার নোটীশ জারি করা হয়েছিল) পুরোভাগে রেখে কুড়ি হাজার লোকের এক বিক্ষোভ মিছিল চট্টগ্রাম সহরের রাস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করল।

এতে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। নিরুপায় হয়ে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পাবলিক প্রসিকিউটার এবং ডেপুটী কালেক্টার, জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে দেখা করে একটি কনফারেন্সে মিলিত হতে অনুরোধ করলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ১৪৪ ধারার নোটীশ অবিলম্বে প্রত্যাহৃত হবে। বার্মা অয়েল কোম্পানীর স্থানীয় ম্যানেজার মার্টিন সাহেবও বি, ও সি, ইউনিয়নের সব দাবি মেনে নিলেন।

চট্টগ্রামের এই ঘটনা অসহযোগ তথা শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম বৃহৎ সাফল্যমণ্ডিত পদক্ষেপ।

চট্টগ্রামে যখন এই পরিস্থিতি তখন গভর্ণমেন্ট ভারতের সর্বত্র প্রধান প্রধান নেতাদের গ্রেপ্তার করতে লাগল।

দেশের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ভাইসরয়ের আমন্ত্রণে মহাত্মা গান্ধী সিমলা গেলেন। ভাইসরয়ের সহিত আলোচনার সময় মহাত্মা জানালেন যে অবিলম্বে স্বরাজ প্রদান করলে অসহযোগ আন্দোলন থেমে যাবে। তদুত্তরে ভাইসরয় মত প্রকাশ করলেন যে

এ ব্যাপারে শাসন সংক্রান্ত কতকগুলি অসুবিধা আছে। মোটের উপর ইন্টারভিউ ব্যর্থতায় পরিচালিত হল।

সে মাসের মাঝামাঝি দেশবন্ধু দাস সদলবলে তিলক ফাণ্ডের জন্ত টাকা সংগ্রহ করতে উত্তরবঙ্গ সফরে ১০ই মে রাজসাহী সহরে উপস্থিত হয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রায় ৪০০০ টাকা সংগ্রহ করলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুকজনক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। দাসমশায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের সঙ্গে দেখা করে তিলক স্বরাজ ফাণ্ডের জন্ত তাঁর নিকট অর্থ সাহায্যের প্রার্থনা জানালেন। অক্ষয়বাবু খুব খাতির করে দেশবন্ধুকে অভ্যর্থনা করলেন কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। আসল ব্যাপারে দাসমশায় বিফল হলেন। মৈত্রমশায় জানালেন যে উদ্দেশ্রে দাশ মশায় অর্থ সংগ্রহ করছেন তা মহৎ কিন্তু তিনি (মৈত্রমশায়) তাঁর (দেশবন্ধুর) পূণ্য কাজরূপ দুগ্ধ তাঁর (মৈত্র মশায়) গোচোনা (গোমূত্র) স্বরূপ অর্থধারা নষ্ট করতে চান না। দাশমশায় অক্ষয়বাবুর নিকট হতে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন।

মে মাসের শেষের দিকে আসামের চা বাগানের কুলিদের ধর্মঘট নিয়ে আবার দেশময় উত্তেজনার সৃষ্টি হল। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিশ্বানন্দের নেতৃত্বে কুলিরা দলে দলে চা বাগান পরিত্যাগ করে দেশে যাওয়ার পথে চাঁদপুরে এসে জমায়েত হল। এতে চাঁদপুরের মত ক্ষুদ্র সহরের অবস্থা সঙ্কটময় হয়ে উঠল। এনড্রুজ সাহেব চাঁদপুরে উপস্থিত হয়ে কুলিদের সেবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনার জন্ত গভর্ণমেন্ট চাঁদপুরে গুর্খা সৈন্ত মোতায়েন করল।

চা বাগানগুলি অচল হয়ে পড়ল, তখন বাধ্য হয়ে ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েসন পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্ত টি. ম্যাকফারসন সাহেবকে চাঁদপুরে পাঠাল। তিনি সেখানে পৌছে তথাকার প্রধান নেতা হরদয়াল নাগের সঙ্গে দেখা করে বললেন যে দুজন সন্ন্যাসী মহাত্মা গান্ধীর নাম করে চা বাগানের কুলিদের ধর্মঘট করার জন্ত ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তিনি হরদয়াল বাবুকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কুলিদের বাগানে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হল। কুলিরা বলল যে তারা বরং অনাহারে ও রোগে প্রাণত্যাগ করবে তথাপি তারা সাহেবদের চা বাগানে ফিরে যাবে না।

২০শে মে রাত্রি ১০টার সময় চাঁদপুরের ষ্টেশন মাষ্টার কুলিদের ষ্টেশন থেকে চলে যেতে হুকুম করলেন এবং ভয় দেখালেন যে হুকুম অমান্ত করলে ভয়ানক ফলভোগ করতে হবে। কুলিরা হুকুম অমান্ত করায় তাদের উপর গুর্খা সৈন্ত লেলিয়ে দেওয়া হল। কুলিরা নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত হল।

সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে আসাম বেঙ্গল রেলে পূর্ণ ধর্মঘট হল। স্টীমার কোম্পানীর ধর্মঘটও আসন্ন হয়ে পড়ল। আদালতের কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ হল। দোকান-পাট খোলা হল না। সহরে পরিপূর্ণ হরতাল পালিত হল।

সসাধারণের চাঁদায় চাঁদপুরে আবদ্ধ ৩৫০০ কুলির আহারের ব্যবস্থা হল। যে সকল কুলি আগেই গোয়ালন্দ পৌছেছিল তাদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা হল। তাদের মধ্য থেকে ৫০০ জনকে নৈহাটীতে পাঠান হল।

ঢাকা ও চাঁদপুরে সম্পূর্ণ হরতাল পালিত হল।

২৯শে মে এনড্রুজ সাহেব মির্জাপুর পার্কে এক জনসভায় গভর্ণমেন্টকে চা বাগানের মালিকদের পক্ষাবলম্বন করার জন্ত দোষী সাব্যস্ত করলেন।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ষ্ট্রাইক ৪১ দিন চলেছিল। এর জন্ত ১লা জুলাই যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পূর্ববঙ্গে যখন রেলের ষ্ট্রাইক চলছিল, তখন উত্তর বঙ্গের রাজসাহী জেল থেকে কয়েকজন রাজবন্দীসহ অনেক সাধারণ কয়েদী পলায়ন করে।

তাদের অনুসরণ করে পুলিস বাহিনী তাদের উপর গুলি ছোড়ে ও নির্মম অত্যাচার করে। এ নিয়ে

রাজসাহী সহরে খুব হৈ চৈ হয়। এই অত্যাচার সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য কংগ্রেস কমিটী বি. কে. লাহিড়ী (বসন্তকুমার লাহিড়ী ব্যারিষ্টার) সুদর্শন চক্রবর্তী, ভবানী গোবিন্দ চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, (সকলেই রাজসাহীর উকিল) এবং গিরিজামোহন সান্ন্যালকে সভ্য করে একটি বেসরকারী অনুসন্ধান কমিটী গঠন করে। কমিটী অনুসন্ধান করে একটি রিপোর্ট কংগ্রেস কমিটির নিকট দাখিল করে। এতে গভর্ণমেন্ট কর্মচারীদের বিশেষ করে রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অমানুষিক অত্যাচারের জন্য দোষারোপ করা হয়। রিপোর্টটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর রাজসাহীর ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট অন্য সকল সদস্যকে বাদ দিয়ে একমাত্র বি. কে. লাহিড়ীর বিরুদ্ধে মানহানির জন্য ফৌজদারী মামলা কলকাতা প্রেসিডেন্সী কোর্টে রুজু করে। দেশবন্ধু দাসের জেঠতুতো দাদা এস্ আর দাসের (এডভোকেট জেনারেল) বাড়ীতে দেশবন্ধু, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী (বি কে লাহিড়ীর শ্বশুর) এবং আরও কয়েকজন উকিল ব্যারিষ্টার মিলিত হয়ে আসামী পক্ষে মোকর্দ্দমা চালানো সাব্যস্ত হয় এবং ঠিক হয় যে কোন মতেই আসামী খালাস পাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে না। কিন্তু মোকর্দ্দমার দিন দেখা গেল লাহিড়ী মশায় সকলের অজ্ঞাতসারে ক্ষমা প্রার্থনা করে মুক্তি লাভ করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এটি একটি কলঙ্কজনক ঘটনা।

জানা গেল যে ১০ই জুলাই যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে পদার্পণ করবেন। সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরই জুলাই মাসের প্রথম দিকে মহাত্মা গান্ধী একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানালেন যে, যে শাসন সংস্থা দ্বারা ভারতের দাবি পর্য্যুদস্ত হচ্ছে সেই শাসন সংস্থার প্রতিভূস্বরূপ যুবরাজকে ভারত অভ্যর্থনা করবে না। ডিউক অব কনটের আগমন উপলক্ষে যে রকম হরতাল হয়েছিল অনুরূপ হরতাল যুবরাজের আগমন উপলক্ষে দেশের সর্বত্র পালিত হবে। মানুষ হিসাবে যুবরাজের বিরুদ্ধে অসহযোগীদের কোন বিরুদ্ধ মনোভাব নেই।

গান্ধীজীর ক্রমবর্দ্ধমান একনায়কত্বের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের একাংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। জুলাই মাসের শেষের দিকে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বোম্বাইয়ের অধিবেশনে এই অসন্তোষ প্রকাশ পেল। এই সভায় মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব করলেন অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সমুদয় ক্ষমতা ওয়ার্কিং কমিটির উপর ন্যস্ত করা হোক। এর অর্থই হচ্ছে মহাত্মার একনায়কত্ব; কারণ ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের অধিকাংশই মহাত্মা গান্ধীর লোক। সুতরাং বিনা বাধায় মহাত্মা তাঁর মনোমত কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উঠল। কেলকারের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রীর সদস্যগণ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মধ্য প্রদেশের অভয়ঙ্কর, বিঠল ভাই প্যাটেল, রামভুজ দত্তচৌধুরী প্রভৃতি সভ্যগণ তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। তাঁরা জানালেন প্রস্তাবটি মারাত্মক এবং এর ফলে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র (অটোক্রাসি) জন্ম নেবে। সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে প্রস্তাব পাশ হল।

২৪শে আগষ্ট ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে (ঐ ইনষ্টিটিউটের প্রাসাদ ভেঙ্গে বর্তমান টেলিফোন ভবন নির্মিত হয়েছে) দেশবন্ধু দাসের সভাপতিত্বে একটি বৃহৎ জনসভায় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসকে অভ্যর্থনা বয়কট করার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হল।

অপর দিকে টাউন হলে বাংলার গভর্ণরের সভাপতিত্বে এক সভায় যুবরাজকে অভ্যর্থনা করা সাব্যস্ত হল।

এমন সময় ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে মালাবার উপকূলে মোপলা (প্রাচীন কালে যে সকল আরব ব্যবসায়ীরা মালাবার উপকূলে বাস স্থাপন করেছিল তাদের বংশধর) গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখনকার বিকৃত নীতি অনুসারে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হল

গভর্ণমেন্ট নয় তাদের প্রতিবেশী হিন্দু। তারা নির্বিচারে হিন্দুদের ঘর বাড়ী লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করতে আরম্ভ করে এবং বহু হিন্দুকে হত্যা করে। সমস্ত মালাবারে তখন বিভীষিকা সৃষ্টি হয়েছিল। গভর্ণমেন্টকে এই বিদ্রোহ দমন করতে নির্মমভাবে গুলি চালাতে হয়। গুলির আঘাতে চার শো'র উপর মোপলা প্রাণত্যাগ করল। অবশ্য বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যেও কয়েক জনকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। বহু মোপলাকে গ্রেপ্তার করে ট্রেনের কামরাতে ঠাসাঠাসি করে ভর্ত্তি করে অন্যত্র চালান দেওয়া হল। ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অনেক মোপলার জীবন অবসান হয়। এই নির্মম অত্যাচারের সংবাদ দাবানলের ন্যায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং সর্বত্র সাড়া পড়ে গেল। মহাত্মা গান্ধী তীব্র ভাষায় গভর্ণমেন্টকে এই বর্বরতার জন্য আক্রমণ করলেন।

দেশের অন্যান্য স্থানে ধর পাকড় আরম্ভ হল। আলী-ভ্রাতৃদ্বয় এবং ডঃ কিচলুকে গ্রেপ্তার করে করাচী জেলে পাঠান হল।

৫ই অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর এক অধিবেশন বোম্বাই সহরে বসল। তাতে এক প্রস্তাবদ্বারা আলী-ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁদের সাথীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় শাস্তির জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হল এবং করাচীর খিলাফৎ কনফারেন্সে সামরিক চাকুরি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব পাশ হয়েছে তা বিবেচনা করে বলা হল যে ঐ প্রস্তাব গভর্ণমেন্টের যে কোন কাজে বা চাকুরিতে যে কোন পদে ভারতীয়ের নিযুক্ত থাকা ভারতের জাতীয় মর্য্যাদা ও স্বার্থের পরিপন্থী বলে যে নীতি কলকাতা ও নাগপুর কংগ্রেস গ্রহণ করেছে সেই নীতিরই পোষকতা করছে। ওয়ার্কিং কমিটী সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের বেরিয়ে আসার জন্য কংগ্রেসের নামে আহ্বান করতে বিরত আছে তার কারণ যে সকল কর্মচারী চাকরি ছেড়ে দেবে এবং যাদের নিজেদের ভরণ-পোষণ করার ক্ষমতা নেই তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে বর্ত্তমানে কংগ্রেস অপারগ। কমিটি মনে করে যে, যে সকল—সামরিক অথবা অসামরিক কর্মচারী কংগ্রেসের সাহায্য ছাড়াও নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম, অসহযোগ প্রস্তাবের নীতি অনুসারে তাদের চাকুরী ছেড়ে দেওয়া কর্ত্তব্য কমিটী সকল সৈন্য ও পুলিশকে অল্প সময়ের মধ্যে তুলো ধোনা, হাতে সুতো কাটা ও হাতে কাপড় বোনা সম্বন্ধে শিক্ষানবিসী করে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের উপায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কমিটী-আরও মনে করে যে করাচী প্রস্তাবের জন্য শাস্তি দেওয়া ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা।

যে জেলায় বা প্রদেশে বিদেশী বস্ত্র বয়কট ফলপ্রদ হয় নি এবং জেলার চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত পরিমাণে খদ্দর তৈরীর জন্য চরকায় সুতো কাটা ও তাঁতে কাপড় বোনার ব্যবস্থা হয় নি সেখানে আইন-অমান্যের কোন পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করা ওয়ার্কিং কমিটী সঙ্গত মনে করে না। তবে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, যদি কেউ স্বদেশী প্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে কমিটী ব্যক্তিগত আইন অমান্য মঞ্জুর করছেন অবশ্য যদি তা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ক্ষমতাধীনে হয় এবং যদি ঐ কমিটী অহিংস পরিস্থিতি বজায় রাখা সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় হয়।

ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় আগামী ৫ঠা নভেম্বর অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ডাকার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হল। এই নিয়ে কংগ্রেসের সভাপতি বিজয়-রাঘবাচারিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মতিলাল নেহেরুর মধ্যে ঘোরতর মতান্তর দেখা গেল। সভাপতি রুলিং দেন বর্তমান অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর গঠন সংবিধান সম্মত নয় সুতরাং কমিটী পুনর্গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ কমিটীর কোন অধিবেশন করা যায় না। সাধারণ সম্পাদক ঐ রুলিংকে আলট্রা ভাইরেস ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন যে সভাপতির রুলিং মানতে গেলে অযথা বিলম্ব হবে। এমতাবস্থায় নূতন অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের মাত্র অল্পদিন আগে হতে পারবে। কয়েকজন সদস্য মত প্রকাশ করলেন যে সেই সময়ের মধ্যে হয় তাঁরা স্বরাজের পূর্ণ মূর্ত্তি দেখতে পাবেন নচেৎ সকল বিশিষ্ট কর্মীসহ মহাত্মা গান্ধীকে কারাবরণ করতে হবে। এমতবস্থায় সভাপতির রুলিং অগ্রাহ্য করা ছাড়া উপায় নেই, এই অবস্থায় সভাপতি সভা মুলতুবি রাখলেন। তৎক্ষণাৎ সাধারণ সম্পাদক পুনরায় সভা আহ্বান করে ৪ঠা নভেম্বর অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের তারিখ স্থির করা হল। সভাপতিকে একটি কাঠের পুতুলের মত ব্যবহার করা হল।

ক্রমশঃ

আধুনিক বাংলা নাটকে যাত্রার প্রভাব

মন্মথকুমার চৌধুরী

বাংলাদেশের যাত্রাগানের ইতিহাস এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে লিখিত হয়নি, যদিও এর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। আধুনিক বাংলা থিয়েটারের উপর যাত্রার প্রভাব নির্ণয় করতে গেলে যাত্রার বিবর্তনের যে ধারার সন্ধান পাওয়া আমাদের দরকার, নিঃসন্দিগ্ধভাবে তা পাওয়া যায় না বলে আমাদের বিষয়বস্তুর যথাযথ আলোচনার পক্ষে বাধা ঘটে। বিশেষত আধুনিক বাংলা নাটক ও অভিনয়ের ধারাকে যাত্রার প্রভাব হ'তে মুক্ত রাখার এখন একটা সচেতন প্রয়াস দেখা যায়—যার ফলে মনে হতে পারে যে, যাত্রার ঐতিহ্যকে অবহেলা করেই আধুনিক নাটক ও রঙ্গমঞ্চ আপন মুক্তি খুঁজছে। উনিশ শতকের বাংলায় আধুনিক থিয়েটারের প্রবর্তন হবার সময় থেকেই এই উন্নাসিক মনোভাব প্রশ্রয় পেয়েছিল। আজ তার পূর্ণ পরিণতি আমরা লক্ষ্য করতে পারছি।

নাট্যকলার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস যাঁরা পর্যালোচনা করেছেন তাঁদের মত এই যে—এর পিছনে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, আনন্দ উপভোগের বাসনা ও অনুকৃতির কৌতুকবোধ যুগপত বর্তমান ছিল। আদিম কৃষিসমাজে বীজ ও ফসল তোলার অনুষ্ঠান ও উৎসবের অংগ হিসাবে নাট্যকলার জন্ম হয়েছিল—নৃত্য, গীত ও অনুকৃতি ছিল তার প্রধান উপাদান। ক্রমে তারই বিকশিত পরিণাম রূপে প্রাচীন মানব সভ্যতার দুই প্রধান অঞ্চলে—গ্রীসে ও ভারতবর্ষে—আমরা পেয়েছি ট্রাজেডি ও কমেডি,—ক্যাথারসিস, বা রসোত্তীর্ণতার মান অনুসারে যার সার্থকতা নির্ণীত হত। অ্যারিষ্টটলের পোয়েটিকস্ বা ভারতের নাট্যশাস্ত্র উভয়েই যে নাটকের তত্ত্ব বিচার ও বিশ্লেষণ করেছে সে নাটক পূর্ণ বিকশিত, বিদ্বান রসিকের জন্ম উদ্দিষ্ট, তার বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত রঙ্গমঞ্চে হত। তাকে অবশ্যই যাত্রাগান বলা চলে না। এমন কি, রাষ্ট্রও সেই উচ্চমূল্যের নাট্যাভিনয়ের জন্ম অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করত না।

যাত্রাগানের আসর তেমন রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষিত বহু মূল্যবান রঙ্গমঞ্চে বসে না, দেশের অতি শিক্ষিত বিদ্বান রসিকেরাও তার উপভোক্তা নয়; অশিক্ষিত গ্রাম্য কালাগত সংস্কারে আচ্ছন্ন সাধারণ প্রজাবৃন্দই যাত্রার শ্রোতা ও দর্শক। যাত্রার পালা লিখিয়েরা নামহীন পরিচয়হীন মানুষ, সহজ কবিত্বই তাঁদের অবলম্বন, উপশিক্ষার কৌলিন্য অথবা পরিশীলিত মনের দীপ্তি তাদের নেই। যাত্রাগানের পালা লেখকদের মধ্যে ইস্কাইলাস সফোক্লিস, ইউরিপিডেস্ কিংবা কালিদাস, ভবভূতি শূদ্রক, প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়। কোন ইবসেন, বার্ণাড শ, মধুসূদন বা দ্বিজেন্দ্রলালের মতো প্রতিভাবান নাট্যকার কি যাত্রার পালা লিখতে রাজি হবেন?

সুতরাং যাত্রাকে লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত বলা যেতে পারে—লোক সাধারণের জন্ম, গ্রাম্য লেখক কর্তৃক রচিত ও গ্রাম্য শিল্পীগণ কর্তৃক অভিনীত ও অনাড়ম্বর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই নাট্যাভিনয় কলা সুপ্রাচীনকালে উদ্ভূত হয়ে আজ পর্যন্তও প্রায় একই ধারায় বহমান, আজও সেই নৃত্য, গীত ও অনুকৃতিই এর প্রধান উপাদান। অন্ততঃ বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি লোকসাধারণের কাছে এর সমাদর আজও অব্যাহত আছে অর্থাৎ যাত্রা আজও বাঙালী জনসাধারণে চিত্তের রসবাসনাকে বহুলভাবে তৃপ্ত করে থাকে শতাব্দীব্যাপী থিয়েটার চর্চার পরও বাঙালী আজও যে যাত্রাকে ভোলেনি, এটা লক্ষ্য করার মত বিষয়। তবে একথাও নিঃসন্দেহে সত্য যে যাত্রা থিয়েটারের বা

প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু থিয়েটার কি যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে? এই প্রশ্নটাই আমাদের বিচার্য।

বাঙালীর ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই এই যাত্রাগানের ধারা চলে আসছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে নিদর্শন আজ আমরা পাই তার সবটাই কাব্য। বিশুদ্ধ কাব্যও অবশ্য তা নয়; তা গীত হবার মতো পদ। চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়ের পদগুলি সুর তাল সহযোগে গীত হত—এই পদগুলি গানের আকারে পরিবেশনের কালে নিশ্চয়ই তার সংগে সংগে অঙ্গভঙ্গী, অভিনয় ও কথাও থাকত; নাথ সাহিত্য বা শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের মতো কাব্য তো যাত্রার পালা হিসাবেই ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়। ত্রয়োদশ শতকে লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যকালে কবি জয়দেব যে গীতগোবিন্দ রচনা করেছিলেন তাও নিছক কাব্য ছিলনা,—সব শ্লোকগুলিই ছিল গান, পরিবেশিত হত নৃত্য সহযোগে, —কথিত আছে যে জয়দেব গাইতেন পদ্মাবতী নাচতেন, এবং ঐ গ্রন্থের অধ্যায়গুলি যে এক একটা পালার আকারে রচিত তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কিন্তু প্রাচীন বাংলার নৃত্য গীত ও নাট্যকলার এই ধারাকে সবচেয়ে সম্মানিত করে গেছেন শ্রীচৈতন্যদেব নিজে। 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থমতে মহাপ্রভু তাঁর এক বৎসরের প্রকট নবদ্বীপ লীলাকালে আচার্য্য চন্দ্রশেখরের গৃহে 'রুক্মিণী হরণ' নাট্যাভিনয় করেছিলেন —তিনি যে নাট্যরসিক ছিলেন তার আরও বহু প্রমাণ আছে। যাইহোক প্রাচীন বাংলার এই নাট্যাভিনয়ের ধারা অন্ততঃ উনিশ শতক পর্য্যন্ত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকল বাঙালীকেই মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে এসেছে।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে যে অভাবিতপূর্ব কয়েকটি [illegible]তন ঘটনা ঘটেছিল তার মধ্যে একটি হল বাংলা গদ্য [illegible]াহিত্যের বিকাশ। বাংলা সাহিত্য তার পূর্ব পর্যন্ত [illegible]ন্ত পয়ার ছন্দে বিস্তৃত বাংলা কাব্যের মধ্যেই [illegible]ীমাবদ্ধ ছিল। নাটকের বিকাশের পক্ষে সে ছিল [illegible]ক বড় বাধা। উনিশ শতকে গদ্যের আবিষ্কার হল আর সেই নতুন গদ্য ভাষায় নাট্য রচনার একটা উৎসাহ দেখা দিল। অবশ্য মৌলিক নাটক রচনার চেষ্টা প্রথমে বিশেষ হয়নি, পদ্যকে একেবারে বাদ দেওয়াও যায়নি। প্রথম যুগে সংস্কৃত নাটক অনুবাদের একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিল কিন্তু তাতে আধুনিক নাটক সৃষ্টির পথ সুগম হয়নি। ইংরাজী সাহিত্যের সংগে পরিচয় লাভের ফলে ইংরাজী নাটক, বিশেষতঃ সেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদপ্রয়াসও বাঙালীদের মধ্যে দেখা দেয়—আর আধুনিক বাংলা নাটকের উৎপত্তি সেই অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়েই ঘটে। ইতিমধ্যে রাশিয়ার অধিবাসী লেবেডফ কলকাতায় এসে আধুনিক থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে আধুনিক নাটক বাংলায় রচিত ও অভিনীত হবার সুযোগ ও সম্ভাবনা এসে যায়।

বাংলায় প্রথম রসোত্তীর্ণ মৌলিক নাটক রচনা করেন মধুসূদন। তৎকালে প্রচলিত বাংলা নাটকের অভিনয় দেখে তিনি অসন্তুষ্টও বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তাই তাঁর ধিক্কার বাণী উচ্চারিত হয়েছিল:

অলীক কু-নাট্য রংগে।
মজে লোক রাঢ় বংগে॥

মধুসূদন নিজেকে বহুকাল ধরে প্রস্তুত করেছিলেন মহাকাব্য রচনার জন্য। তাঁর সর্বগ্রাসী প্রতিভা; বিশ্বের রাজবাড়ীর রংগমঞ্চে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে এমন নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন যা প্রাচীন যাত্রার ধারা অনুসরণ করেনি, যা ঐতিহ্য বিচ্যুত ছিল, যা আধুনিকতাকে বেশ অক্ষমভাবে ধারণ করতে চেয়েছিল। তবে মধুসূদন বাংলায় যে আধুনিক নাটক সৃষ্টি করেছিলেন তা পাশ্চাত্য ধারার অনুসরণে রচিত—দেশীয় ধারার রীতিতে নয়।

মধুসূদনের পর বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। তিনিও আধুনিক থিয়েটারে বিশ্বাসী ছিলেন—যাত্রায় নয়। যদিও তাঁর নাটকে গ্রাম্য চরিত্র, গ্রাম্য কথাবার্তা ও গ্রাম্য আচরণ অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে তবু যাত্রাপালার সংগে তার কোন সাদৃশ্য নেই।

কিন্তু দীনবন্ধু সমসাময়িক ও এক অর্থে বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ আধুনিক থিয়েটারের উপযোগী আধুনিক নাটক রচনা করতে চেয়েও বাংলার কালগত যাত্রার ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হননি। তাঁর অধিকাংশ ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও জীবনীমূলক নাটকে গদ্যের বদলে পদ্যের পুনরাবির্ভাব দেখতে পাই —সে পদ্যও পয়ারের কাঠামোকে অস্বীকার করেনি এবং তাঁর নাটকগুলির মূল আবেদন যাত্রার জন্য রচিত নাটকের আবেদনের অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথ গিরিশ ঘোষের অনুকারী বা অনুসারী ছিলেন না কিন্তু তাঁর বহু নাটকে ঠাকুর্দা জাতীয় যে চরিত্র পাই তা যাত্রাধর্মী নাটকের বিবেকের চরিত্রের অনুরূপ; এবং রবীন্দ্রনাথ বহু নাটকে সংলাপের ভাষাকেও পয়ার ছন্দে বিন্যস্ত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন রবীন্দ্র যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার—তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের বাংলা সংলাপও আবেগের তালে ও উচ্ছ্বাসের আবেশে পদ্যময় হয়ে উঠেছে এবং তাঁর নাটকেও বিবেকধর্মী চরিত্রের আনাগোনা লক্ষ্য করার মতো। ক্ষীরোদপ্রসাদ বা যোগেশ চৌধুরীর নাটকে যে শিথিলতা আছে যে ভাবোচ্ছাসময়তা আছে তাতে সেগুলিকে আধুনিক নাটক না বলে যাত্রাধর্মী নাটক বলাই ভালো। একেবারে সাম্প্রতিক বাংলা নাটকেও যেখানে ভক্তিধর্ম বা পুরাণের প্রসঙ্গই নেই, সেই বিমূর্ত ভাবধারার অনুযায়ী বা এমন কি মতবাদ প্রচারের বাহন নাটকগুলিতেও যাত্রা ধর্মকে অস্বীকার করা যায়নি। এই যুগের মানবজীবনের সামাজ্যতাবোধের ওপর ভিত্তি করে রচিত "এবং ইন্দ্রজিত" নাটকেও দেখি সেই বিবেক চরিত্রের আমদানি ঘটেছে,—"নাটকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র" নাটকে দেখি রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকের মধ্যে প্রভেদ ঘোচাবার চেষ্টা হচ্ছে, বস্তুত নবনাট্য আন্দোলনের ধারাটাই হচ্ছে রঙ্গমঞ্চকে আবার দর্শক সাধারণের মধ্যে নিয়ে আসা—প্রাচীন যাত্রার যেমন আসর ছিল সেই আসরকে ফিরিয়ে আনা। নাট্যাচার্য্য শিশির ভাদুড়ী বলতেন—অভিনেতা ও দর্শকের যুগপৎ অংশ গ্রহণেই নাট্যরস অবাধিত হতে পারে; আধুনিক রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রী সক্রিয় ভূমিকা নেন, দর্শকবৃন্দ নীরব ও নিস্ক্রিয়ই থাকেন। কিন্তু বিশ্বনাট্য চিন্তা এই রীতির বিরোধী রীতির প্রবর্তনার অভিমুখেই ধাবিত হচ্ছে,—দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে কৃত্রিম বিভেদের রেখা ঘুচিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। তাই নাটকের ক্ষেত্রেও এসেছে গণনাট্য বহুমূল্য সৌখীন রঙ্গমঞ্চের স্থানে ফিরে এসেছে মুক্তাঙ্গন। মনে হচ্ছে বাংলার যাত্রার রীতি ও প্রকৃতিকে বিশ্বের অগ্রণী নাট্যকার ও নাট্য পরিচালকরা সাগ্রহে বরণ করে নিতে চাইছেন—কেননা দর্শকের সংগে নাট্যকার ও অভিনেতার একাত্মতার অন্য কোন রীতির মাধ্যমে স্থাপন করা সম্ভব নয়। সেই অর্থে বাংলার কালাগত যাত্রার ধারা বিশ্বনাট্য চিন্তার মধ্যে পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছে এবং আমাদের দেশের আধুনিক নাট্যকাররাও সেই প্রভাব হতে মুক্ত নন। যাত্রার আবেদন নবযুগের নূতন নাট্যকলার ভিতর দিয়ে আবার আমাদের কাছে এসে পৌছতে সুরু করেছে—এটা বিস্ময়কর হলেও সত্য।

নীরপ্রভা চক্রবর্তী

শিপ্রা দত্ত

এ্যালবার্ট হলে হজরত মহম্মদের স্মৃতিতে আয়োজিত সভায় সভাপতি ভাষণে—

I have never heard such an eloquent lecture by any women East of Suez except the nightingale voiced Sorojini.

—এই উক্তি করেছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Sri C. V. Raman এই মহীয়সী মহিলার উদ্দেশ্যে।

কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক রমনের প্রশংসাই নয়—দীঘাপতির কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র, প্রসিদ্ধ মডারেট নেতা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সি, আই, ই, সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, আই, সি, এস গুরুসদয় দত্ত, বিখ্যাত সমাজসেবী রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এস, সি, কবি অতুল প্রসাদ সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজসেবী, খ্যাতনামা ব্যক্তিরা যে মহিলার কেবল সহকর্মীই ছিলেন না, বাংলার বিভিন্ন স্থানে নারী কল্যাণ সমিতি ও সমাজ উন্নয়ন কাজে তাঁর সহায়তা পেয়েছেন—সেই খ্যাতনামা মহিলা নীরপ্রভা চক্রবর্তী সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন।

ঢাকার ৺কামিনীকুমার গুপ্তের কন্যা, বরিশালের ৺ললিতমোহন চক্রবর্তীর তিনি সহধর্মিণী ছিলেন। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্ম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্ম মহিলা। ধার্মিক পিতা ও ধার্মিক স্বামীর সাহচর্য্যে তাঁর মধ্যে যে সুপ্ত ধর্মানুরাগ ছিল তা শতদলে বিকশিত করতে সহায়তা করেছিল।

নীরপ্রভাদেবী বেথুন কলেজ হতে বি, এ পাশ করেছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার উষা লগ্নে তিনিও উচ্চ শিক্ষার কোরকরূপে ফুটে ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র শিক্ষার উদ্যানে প্রস্ফুটিত হয়ে থাকেননি, জ্ঞানের দীপ শিখা তিনি জ্বালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন ঘরে ঘরে।

তাই প্রাক্-বিবাহে তিনি ময়মনসিংএর প্রসিদ্ধ বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বিবাহত্তোর যুগেও তিনি কয়েকটি মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করেন। বরিশালের পিরোজপুর মহকুমা শহরে, হুগলী, সরোজনলিনী সমিতি প্রভৃতি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে নারীশিক্ষা বিস্তারে তিনি সহায়তা করেছিলেন।

সমাজ কল্যাণ কর্মেই তিনি সারা জীবন ব্যাপৃত ছিলেন। আজীবন তিনি বাংলার বহু সমাজকল্যাণ সংসদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বরিশালের সেবা সমিতির প্রেসিডেন্ট, হুগলী মহিলা সমিতির সেক্রেটারী, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট, নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের ও কলকাতা নারী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ের চন্দননগরের আশ্রমের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তিনি বরিশালের সেবা সমিতির প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন Bengal after Care Association নামক সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত থেকে পিরোজপুর জেল পরিদর্শিকারূপে নিযুক্ত ছিলেন। পরে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি ও আলীপুর জেলও পরিদর্শন করতেন।

জনহিতকর ও কল্যাণকর কোন প্রতিষ্ঠান দেখলেই তিনি তার সাহায্য করতে এগিয়ে যেতেন। ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন বড়লাটের জাপান ত্রাণ তহবিলের জন্য ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আহত সৈনিকের জন্য চাঁদা আদায় করে দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষে, ত্রাণকার্য্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা তার উন্নতি, দুঃস্থ ব্যক্তির সাহায্য করে অর্থ বা বস্ত্র সংগ্রহ, প্রভৃতিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

আজীবন তিনি সরোজনলিনী প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদে ছিলেন। সেবা ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। জনসেবা ও ব্যক্তিগত নরনারীর সেবা। কখন তিনি যশের, মানের, অর্থের বা প্রতিপত্তির আকাঙ্খায় লোক সেবার ব্রতী হননি। সেবার মধ্যে যে আনন্দ, কর্মের মধ্যে যে পরিতৃপ্তি তাই তাঁকে নানাবিধ কল্যাণকর কার্য্যে ব্রতী করেছিল।

কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, এ্যালবার্ট হল ও অসংখ্য সভা সমিতিতে তিনি বক্তা বা সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করছেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাগ্মিতা ও মর্মস্পর্শী সুন্দর বচনভঙ্গী তৎকালীন সুধীসমাজে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল।

তিনি কেবল প্রসিদ্ধ বাগ্মীরূপেই খ্যাত ছিলেন না, বঙ্গলক্ষী, মাতৃমন্দিরে করে গেছেন তাঁর সেবাকর্ম। কোথাও কার বিপদের কথা শুনলেই তিনি ছুটে গেছেন। কত রাত তিনি অতিবাহিত করেছেন রুগ্নের পাশে; মৃতের পাশে বসে কাটিয়েছেন। দুঃখীর দুঃখ মোচন করতে পারলে, তাপিতজনের অঙ্গে তাঁর স্নেহ-সুশীতল হাত বুলিয়ে দিয়ে তিনি পেতেন অপার আনন্দ। তাঁর এই নিঃস্বার্থ সেবাকর্মের জন্যই, তিনি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার সর্বজনপ্রিয় ও পূজ্য হয়েছিলেন।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছে বলে তাঁর গৃহস্থালী কাজে তিনি কখনও অবহেলা করেননি বা তাঁর স্বামী ও সন্তানদের প্রতি কর্তব্যভ্রষ্ট হননি। পরন্তু নিজ হস্তে তিনি সংসারের কাজ করে, সমাজ কল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করতেন।

বৃদ্ধ বয়স অবধি তিনি ছিলেন আত্মনির্ভরশীল। যতটা সম্ভব গার্হস্থ জীবনেও তিনি স্বাবলম্বিনী। অপরের সাহায্য নিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন।

তিনি কেবল সমাজসেবীই ছিলেন না তিনি ছিলে ধার্মিকা মহিলা। অনেক বছর তিনি ব্রাহ্মসমা সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি চমৎক উপাসনা করতেন। তাঁর উপাসনার মধ্য দিয়ে তাঁ ভক্তহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভগবৎ প্রেমের উৎসধা প্রবাহিত হত। তিনি ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের পদ লাভ করেছিলেন।

নানাভাবে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সেবা করেছেন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে সহায়তা করেছেন। তিনি অত্য ভগবৎ বিশ্বাসী ছিলেন। এতটা ভগবৎ বিশ্বাস ছিলেন বলেই তিনি জীবনে অনেক বড় বড় কাজ একা সম্পন্ন করে যেতে পেরেছেন এবং কন্টকাকীর্ণ সংসারে শত ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করে উন্নত শিরে শেষদিন পর্য দাঁড়িয়েছিলেন।

অধর্মের সঙ্গে তিনি কখনও সম্বন্ধ রাখেন নি যেখানেই তিনি বুঝতেন কোনও অসাধুতার বাতা বইছে, তাঁর নির্ভীক বিবেক তার বিরুদ্ধে প্রতিবা মুখর হয়ে উঠত। এবং যেখানে সংগঠনী কাজ করতে গিয়ে এমন পরিবেশের সম্মুখীন তিনি হয়েছেন যেখান হতে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন। কখনও আধুনিক যুগধর্মের সাধু অসাধুর মধ্যে রাখী বন্ধন ঘটাতে ইচ্ছা করেননি।

তাই বলে তিনি পাপী, অসাধুদের দূরে সরিয়ে রাখতেন, তা নয়। তারাও যখন তাঁর কাছে ছুটে আসত তিনি চেষ্টা করতেন তাঁদের সদুপদেশ দিয়ে তাদের সুপথে চালিত করতে।

তাঁর ভালবাসার বন্ধনে যে একবার বাঁধা পড়েছে জীবনে সে কখনও তাঁকে ভুলতে পারেনি, পারবে না।

তিনি ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে ২৪ শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় ৮২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

ববড্ হেয়ার

পুষ্প দেবী

ছিঃ ছিঃ পাড়ায় কান পাতা যায় না। প্রভাদি হাল ফ্যাসানের ববড্ করে চুল কেটেছেন। কথাটা কানে কানে হেঁটে বেড়ায়। অলকা বলল দীপ্তিকে, দীপ্তি প্রীতিকে, প্রীতি বিভাদিকে—বলে আশ্চর্য্য কাণ্ড, মানুষের মনে কত কাণ্ডই থাকে। অথচ মুখে কত বড়াই যে সাজগোজ ভালবাসি না। বাইরের চেহারা নিয়ে মাথা ঘামান অনর্থক। বলে দীপ্তি, জানো অলকাদি ঐ কাপড়ের পুটলী চেহারা, আর বগলে উপনিষদের গোছা, হাটুর ওপরে কাপড় পরা চেহারায় ববড্ হেয়ার যা মানাবে বলিহারি। বেশী কথা খুঁজে পায়না বেচারারা কারণ, কারণ প্রভাদি কারুর সাজ-গোজ নিয়ে কখন মাথা ঘামায় নি তবু প্রীতি বলে বাবা মহারাজের জু-বাগানে কত জীবই না আছে। আশা বলে, আমার পুষ্পদি একবার বলেছিল সাজগোজ করতেও শিখলুম না, কটাক্ষবাণ ছাড়তেও শিখলুম না, আমি একটা খাপছাড়া মানুষ। তাই কর্ত্তাকেও হাত করতে পারলুম না। চিরটাকাল আমার ওপর উদাসীনই থেকে গেলেন। হো হো করে হেসে উঠলো দীপ্তিকণা তার স্বভাবসিদ্ধ প্রাণখোলা হাসি, যার জন্য ভালবেসে প্রভা তার সঙ্গে "সাগর" পাতিয়েছে। নিজের ছোটবেলায় অকারণ হাসির কথা মনে করে। বললে, তাই বুঝি পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধকে বশে আনার আয়োজন করছে প্রভাদি। প্রীতি বললে "মরা ইঁদুরকে শিকার করে তবে ত বেরাল মুখেতে পোরে," গবেষণার অন্ত রইল না। কিন্তু আসল মানুষ প্রভাদি এত কথার কিছুই জানে না। কি জানি কেন মাথায় আঠা হচ্ছে ভীষণ। যে মাথা জীবনে তিনবার আতুড় থেকে বেরিয়ে শুধু ষষ্ঠি পূজোর ঘষে-ছিলেন আজ সেই মাথা সপ্তাহে একবার করে ঘষেও নিস্তার নেই। না ঘসলে জল বসে মাথায়, চিরুণী চলে না। নানান খানা হাঙ্গামা। তাও সয়েছিল প্রভা মাথায় জটা বাধতে লাগলো, স্বামী ঠাট্টা করে বলে এবার তপস্বিনী সন্ন্যাসিনী হলে ঠিক। তাতেও নিস্তার নেই। আরম্ভ হল কান কটকটানি, তার সঙ্গে সারা মাথা জুড়ে যন্ত্রণা। সব চলে, চলে না খালি বাড়ীর গিন্নীর মাথার বিশ্রাম। বাড়ী শুদ্ধ লোকের মুখ ভার—সময়ে নিয়ম মতো চাটুকু নেই। নেই ঠিকে ঝির হাতে হাতে কাপড় ভেজান হাতে হাতে ঘর খালি। তারা সাফ জবাব দিলো এভাবে কাজ চলবে না। অনেক ভেবে চিন্তে একটা বাচ্ছা মেয়েকে রেখেছিল প্রভা। সে হল চারুপাঠের পুত্তলিকা। চক্ষু আছে কিন্তু দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে কিন্তু শ্রবণ করে না, তার অবস্থা হল আরো শোচনীয়। কর্ত্তার পেনসন উল্লেখযোগ্য নয় তাতে, বোতল বোতল শাম্পু কেনা প্রভাদির মতে অন্যায়। আরো অন্যায় রোজ রোজ ঠিকে ঝিকে পয়সা দিয়ে মাথা ঘষানো। হার্টের দোষের জন্য প্রভাদি বাঁ হাত তুলতে পারেন না একহাতে মাথা ঘষা যায় না। এখারে মাথায় জটা দেখে বাবি নাতি বলে আদিদিমা আমাদের পপি কুকুরের মাথায়ও জটা বেরোচ্ছে, যত বয়স বাড়বে তত জট বাড়বে। পপিও সন্নেসী হবে না দিদিমা? পপির সঙ্গে সমগোত্রীয়া হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় কথাটা মনে না হলেও কানে বাজে। এখারে মাথায় জল বসে কান কটকটানি [illegible]

অন্ত নেই। বড় ডাক্তার এসে উপনিষদের স্তোত্র গান :গয়ে যোক্ষম অস্ত্র এ্যাসপিরিণ দিয়ে পালালো। নতুন অস্ত্র মাথায় যোড়া ওষধ। কার সাধ্য বোঝে যে এ্যাসপিরিন? কালোসিয় এপিয়া নাম শুনে এশিয়া টৌসিয়া ভেবে খেয়ে আরম্ভ হল বমি—এবার আর বড় ডাক্তার নয় হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায়, এলেন শিববাবু, শিববাবু বলেন গ্যাসট্রিক ট্রাবল থাকলে এ্যাসপিরিণ বিষবৎ পরিত্যাজ্য। তার ওপর হার্টের রুগী দিনটা কোন মতে কাটলো। চোখের ডাক্তারকে কল দেয়া হল তার সাংঘাতিক পেটের অসুখ ক্রোরস্ট্রেপ চলছে। কাজেই বেরুন কঠিন মাথা হাতে টিপে ডাক্তারের বাড়ী গেলেন প্রভাদি। ডাক্তার নিজের কেরামতিতে নিজেই অবাক, বললেন, এতটা এ্যাসটিগমেটিজম রয়েছে অথচ আমি যে চশমা দিয়েছি তার লেশমাত্র নেই, অবাক কাণ্ড। এমনি অবাক কাণ্ড জীবন ভোর দেখেছে প্রভাদি, ডাক্তারের অজস্র ভুল আর নির্বোধিতার ঘটা, ডাক্তারকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রভাদি বলে রুগীর কপালে কষ্ট থাকলে ডাক্তারদেরও ভুল হয়; উপায়! ডাক্তার মহাখুশী হয়ে বলেন ঠিক বলেছেন প্রভাদি আপনি পণ্ডিত মানুষ পণ্ডিতের উপযুক্ত কথাই বলেছেন।

এবার সত্যি সত্যি পণ্ডিতের মতো কাজ করেন প্রভাদি। ভগবানের কাছে নাক কান মোলে ক্ষমা চেয়ে স্বামীর শতায়ু প্রার্থনা করে চুলের গোছায় কাঁচি চালান। তা ছাড়া যে বয়েসের যা অত বড় খোঁপা দেখেও লোকে কত কথা বলে, মেয়ের ননদ বলে এখনও আপনার কি চুল মাসীমা। নাতনীর দল বলে বাবা কত চুল তোমার এখনও। তবে চুল কেটেও লোকের কথা থেকে নিস্তার পায় না প্রভা, তবে মাথাটা ত হাড়লো?
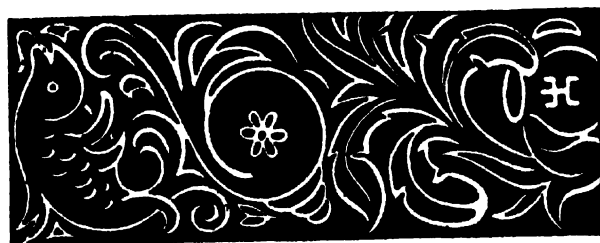
অপরাধী

(গল্প)

পরমেশ চৌধুরী

একটি ভোজনালয়ে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। সে একটা মদ্যপায়ী, একটা ভবঘুরে, চাটুকার ব্যক্তি। চাকরী একটা করতো কোথাও। কিন্তু নেশার ফাঁদে পড়ে ইস্তফা দিয়েছে তাতে। পোষাক পরিচ্ছদ বলতে প্রায় কিছুই তার ছিলো না। মদ্যপানে তার সব সম্বল নিয়োজিত থাকতো। সে কলহপ্রিয় উগ্রমেজাজের ছিলো না মোটেই। ভদ্র ও বিনয়ী ছিলো কথা বার্তায় চালচলনে। কিন্তু একটু পানীয়ের লোভে যে সে কি কাতর হয়ে উঠতে পারে তা চাক্ষুষ না দেখলে প্রায় অবিশ্বাস্য। যাহোক খানিকক্ষণের মধ্যে তার আকর্ষণ-জালে জড়িয়ে পড়লুম আমি। কিন্তু এ কি ধরণের লোক! যেখানেই যাবে তুমি কুকুরের মতো অনুসরণ করবে তোমাকে। মানুষও যে এমন অন্ত্যজ হতে পারে তা এই প্রথম দেখলুম। কেন যে তাকে এক রাতের জন্যে থাকতে দিয়েছিলুম আমার বাসায় তা বলতে পারব না। তার পরের রাতটাও কাটাতে দিলুম। তৃতীয় দিন সকালেও সে বাড়ী ছেড়েই গেল না। সারা-দিনটা কাটাল বসে বসে জানলার ধারে, রাত্রেও নড়লো না। আমার মতো একজন গরীব কেরাণীর পক্ষে তাকে এক বেলা খাওয়া পরার সংস্থান যোগানো প্রায় অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে না। শুনলুম ইতিপূর্বে সে অন্য একজন সদয় লোকের প্রতি আকৃষ্ট ছিলো। দুজনে মিলে মদ খেতো। কিন্তু তার সে প্রভু অতিরিক্ত নেশা করার বিষময় ফলহেতু মারা গেল একদিন। ভাবলুম এই নেশাখোরটাকে নিয়ে কি হবে আমার? তাড়িয়ে দেবো? কিন্তু তার মতো একটা নিঃস্ব অসহায় দুঃস্থ লোককে নিষ্ঠুরতা দেখাবার মতো অমন অন্তঃকরণ ছিলো না আমার। সে'ত নীরব নিস্তব্ধ থাকে; কখন কিছুর যাচ্ঞা করে না, শুধু বসে বসে এমন দৃষ্টিতে তাকায় যেন সে দৃষ্টিতে ঢেলে দিতে চায় সে তার মন প্রাণ। তার চোখের দৃষ্টির অসহায়তার তুলনা করে আমার মনে পড়তো আমার বন্ধুবরের কুকুরটির কথা। সেপ্রভুভক্ত কুকুরটাও ঠিক ঐ পানোন্মত্ত ব্যক্তির মতো চেয়ে থাকতো আমার বন্ধুটির দিকে। হ্যাঁ, নেশা মানুষকে এমনিই পশুবৎ নির্জীব অসহায় করে তুলে। এ্যামিলকে নিয়ে সত্যই একটা বড় অস্বস্তির মধ্যে পড়েছি আমি। এমনই কি পুণ্যফল আমার, মানুষের অধঃপতন এইভাবেই চোখের সামনে রাতদিন মেলে রাখতে হবে। কতোবার ভাবি—তাকে বলি 'এমিল, তোমার এখানে থেকে কাজ নেই, তুমি জোর করে কারও উপর আপনার বোঝা চাপিয়ে দিতে পার না। তোমাকে আমি খাওয়াই কি করে, পরাই কি করে?' শুধু ভাবি আর ভাবি। কথা কয়টি বলার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনে। আবার কথা কয়টি শুনলে সেকি নিদারুণ আঘাত পাবে না? তাছাড়া ওর মতো অবস্থা আমারও হতে পারে একদিন না একদিন। তাছাড়া

খানিকটা মায়াও পড়ে গেছে তার পরে। চলে গেলে হয়তো থাকবো গোমড়া মুখ করে। অগত্যা তাকে বললুম, 'দেখো এমিল, থাকতে পারো আমার সঙ্গে, কিন্তু আমার কথা মতো চলতে হবে'। মনে মনে ভাবলুম ধীরে ধীরে তাকে কর্মক্ষম করে তুলতে হবে। কিছু দক্ষতা তার মাঝে আবিষ্কার করাও তো যেতে পারে। তার দিকে সহানুভূতিপূর্ণ অন্তরে তাকাতে তাকাতে বললুম, 'নিজের কথা নিজে ভাবো'ত এমিল। এ অযত্ন জীবনের ইতি টানো এবার। তোমার পোষাক পরিচ্ছদের দিকে নজর দাও একটু। তোমার কোট্‌টা 'ত ঝাড়ন ছাড়া আর কোন কাজেই ব্যবহৃত হতে পারে না। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হবার চেষ্টা করো একটু'।

এমিল আমার কথা শুনলো, অনেকক্ষণ ধরে নতমুখে বসে রইলো। কিন্তু কিছু বলতে পারলো না। শুধু ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

কি হলো, এতো দীর্ঘশ্বাস ফেলছ কেন? হাসবার চেষ্টা করে বললুম আমি।

না, কিছু না। আজ দুজন স্ত্রীলোক রাস্তার উপরে ঝগড়া করছিল। একজন আর একজনের বেরি ফলের ঝাকেটটা উল্টে দিলো।

তাতে তোমার আমার কি?

তারপর দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি ক্ষুব্ধ হয়ে প্রথম জনের ঝুড়িটা দুমড়ে মুচড়ে দিলো পা দিয়ে, তারপর লাথি মেরে ফেলে দিলো ঝুড়িটা।

আমি বলছি তাতে তোমার আমার কী যায় আসে? একটু বিরক্ত হয়ে বললুম আমি।

না, কিছু না। এমনি। তার একজন ভদ্রলোক সাদোভয়াতে একটা ব্যাঙ্ক নোট ফেলে দিয়েছিল ভুল করে। একজন কৃষক সেইটে দেখতে পেয়ে বললো—'আমার!' কিন্তু অন্য একজন কৃষকও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলে 'না, আমার!' দুজনের মধ্যে মারামারি শুরু হলো। পুলিশ এলো। ব্যাঙ্ক নোটটা তার মালিককে ফেরৎ দিলো। দুজন কৃষককেই জেলের ভয় দেখিয়ে পুলিশ চলে গেলো।

তুমি কেন যে এসব কথা বলছ কিছুই যে বুঝতে পারছিনে। না, মানে ব্যাপারটা দেখে উপস্থিত জনতা বেশ হাসাহাসি করেছিলো। ভাবলুম এমিলের এসব বাজে বক্‌বকানি অতিরিক্ত নেশারই ফল। তাই রাগত স্বরে বললুম—বাজে বকে কাজ নেই এমিল। নিজের উপর সহানুভূতিশীল হও নিজে। কাজ করো।

কি আমি করতে পারি। কেউ তো আমায় কাজ দেবে না হতাশাভরা অন্তরে বললো এমিল।

এই জন্যে তোমার চাকরী গিয়েছিল, কারণ, তুমি একটা বদ্ধ মাতাল?

ধূর্ত সে'ত ছিলই। ধৈর্য ধরে সে আমার তিরস্কার শুনতো। তারপর চুপিসারে সরে পড়তো। সারাদিন মদ্যপানে ডুবে থেকে নেশামত্ত হয়ে ফিরতো বাসায়। কে তাকে মদ খাওয়াতো, কোত্থেকে সে টাকা পেতো তা একমাত্র ভগবানই জানেন। তারজন্যে দোষী আমি নাই।

না এমিল তোমাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। তোমার আচরণে আমি বিরক্ত। তুমি যদি আর কখনো মাতাল অবস্থায় ঘরে ঢুকো তাহলে বের করে দেবো তোমাকে ঘর থেকে।

একদিন আমার এহেন তিরস্কার শুনে সে দুদিন ঘরের বার'ই হলো না। কিন্তু তৃতীয় দিন যেন পালিয়ে বাঁচলো। মন খারাপ হলো ভীষণ আমার। আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম তার জন্যে। কিন্তু রাত্রেও সে ফিরল না। সন্ত্রস্ত হলুম এবার। তার কী করলুম আমি? তাকে কি ভয় দেখিয়েছিলুম? কোথায় যেতে পারে সে? পরদিন সকালে দরজা খুলেই দেখি দাওয়ায় শুয়ে সে, ঠাণ্ডায় যেন শরীরটা তার জমে গেছে।

কী হলো এমিল, এখানে পড়ে আছো কেন?

সেদিন তুমি আমাকে বলেছিলে মদ খেয়ে বাড়ীতে

ঢুকতে দেবে না। তাই এখানে পড়ে আছি। করুণ দৃষ্টি ফুটিয়ে বললো এমিল।

আমি কিছুটা বিগলিত হয়ে বললুম, 'বাইরে শুয়ে থেকে, উপোস করে, পশু-ছাগলের মতো জীবন যাপন না করে মানুষের মতো বাঁচবার চেষ্টা করতে পার না? যা হোক কাজ একটা করো। মানুষের মতো বাঁচবার চেষ্টা করো।

কিন্তু কী কাজ আমি করতে পারি বলো?

হায়রে হতভাগা, সেলাই কাজটা হলেও তো শিখতে পারো। ছেড়া নেকড়ার মতো তোমার কোটটাকে তো মেরামত করে মানুষের মতো করে তুলতে পারো। একটা সূঁচ সুতো নিয়ে তাতে লেগে যাও দেখি।

ভয় পেয়ে সূঁচ সুতো নিয়ে কিছুটা কর্মব্যস্ত হবার চেষ্টা করলো সে। সূঁচে সুতো গলাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হাতটা তার কেঁপে কেঁপে উঠলো, চোখ দুটো লাল টকটকে। অবশেষে অসহায়-এর মতো সূঁচ সুতো ফেলে চেয়ে রইলো আমার দিকে।

'দাঁড়াও এমিল, তোমাকে সাহায্য করছি আমি।

আমি কী করব, আমি মাতাল—সম্পূর্ণ অকেজো। বলতে বলতে তার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো জল। চোখের জলে তার লম্বা দাঁড়ি গোঁফ গুলোও ভিজে উঠলো। তার অবস্থা দেখে মনে হলো একটা ধারালো ছোরা দিয়ে কে যেন দাগ কেটে চলেছে আমার বুকে।

প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে আমিও বললুম—'হয়েছে, মন খারাপ করো না এমিল। আর কখনো বাইরে রাত কাটিও না। চলো, ভিতরে চলো, প্রাতঃরাশের সময় হয়ে এলো।

২

আমার একজোড়া খুব দামী ট্রাউজারস ছিল। একজন জমিদার বন্ধুর জন্যে তৈরী করিয়েছিলুম। কিন্তু জমিদারবাবু সে ট্রাউজার জোড়া গ্রহণ না করায় আমার কাছেই রেখে দিয়েছিলুম সময়ে কাজে লাগবে। বাজারে বিক্রি করলে কমপক্ষে পাঁচটি রুবল পাওয়া যাবে—আমার মতো গরীবের পক্ষে এ অঙ্ক নেহাৎ নগণ্য নয়। সে সময় এমিলের জীবনটা যেন শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে কাটছিল। দেখলুম তাকে নেশাহীনভাবে কাটালো সে একদিন। দ্বিতীয় তৃতীয় দিন কিছুই সে খেলো না। সারাদিন ধরে শুধু নির্জীব নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো বসে বসে কাটালো। ভাবলুম, 'হয়তো তোমার কপর্দক হীন অবস্থা, নয়তো নতুন জীবন পরিগ্রহ করেছ তুমি'। এইটে গ্রীষ্মের বন্ধের সময়কার কথা। সেদিন সন্ধ্যের প্রার্থনা সারার পর ফিরে এসে দেখলুম জানালার ধারে বসে আছে এমিল—মাতাল অবস্থায় ধুঁকছে, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। কয়েক দিনের নেশা এক বেলাতেই ষোলকলায় পূর্ণ করে নিলে তাহলে। হায় ভগবান, বৃথা চেষ্টা। ওকে আর মানুষ করা যাবে না। ভাবতে ভাবতে কি একটা জিনিস নেবার জন্যে আমার ট্রাঙ্কটা খুলতেই দেখি ট্রাউজারজোড়া নেই এ কী! চমকে উঠলুম। কোথায় গেলো? খোঁজাখুঁজি অনেক করেও পেলুম না খুঁজে। বাড়ীর একমাত্র চাকরটাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে ও বলতে পারল না কিছু। মাতাল লোকটাকে কিছু জিজ্ঞাসায় ফল পাওয়া যাবে না জেনেও জিজ্ঞেস করলুম—'জান কি এমিল, ট্রাউজারস জোড়া কোথায়? সেই যে জমিদারের জন্যে তৈরী করিয়েছিলুম।......

কেঁপে উঠে প্রায় চিৎকার করে বললো এমিল—'না না, আমি নিইনি, আমি জানিনে, আমি জানিনে।'

কী ব্যপার? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলুম। আর একবার ওলটপালট করে খুঁজলুম বাড়ীটা। পাওয়া গেলো না। অবশেষে হতাশ হয়ে এমিলের মুখোমুখি হয়ে ট্রাঙ্কের উপর বসলুম আমি। এমিলের দৃষ্টি পড়লো আমার উপর।

ভয় পেয়ে কেঁপে উঠলো এমিল, 'না না, আমি নিইনি। তুমি ভাবছ আমি নিয়েছি। আমি নিইনি কিন্তু।'

কিন্তু...কোথায় যেতে পারে?

আমি তো সেসব দেখিইনি কোনদিন, কি করে বলব?

শুনেও না শোনার ভান করলুম আমি। জানালার ধারে বসে লেগে গেলুম একটা সেলাইএর কাজে। কিন্তু আমি অন্তরের বিক্ষুব্ধতাকে দমিয়ে না রাখতে পেরে চঞ্চল হয়ে উঠলুম। রেখে দিলুম কোটটা। এমিলের দিকে তাকিয়ে দেখলুম বেশ উদ্বিগ্ন এবং ত্রস্ত হয়ে উঠেছে সে। পাখী যেমন ভাবী ঝড়ের আন্দাজ করে নিতে পারে পূর্বক্ষণে, তেমনি এমিল তার ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্য আন্দাজ করে নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল বুঝিবা? কম্পিত কণ্ঠে সে বলবার চেষ্টা করলো কিছু—ঢোক গিলল—বলল—

আজকে এনটন্ প্রকোভিচ্, যার পরশু হলো বিয়ে......আমি রক্ত চক্ষুতে তাকিয়ে রইলুম তার দিকে যতক্ষণ না সে আমার অন্তরের ভাব বুঝে নিতে সমর্থ হলো। এমিল উঠে দাঁড়াল এবং বিছানার দিকে এগিয়ে গেলো। বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগল। যেন কোন একটা অপ্রকাশ্য বেদনায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। একসময় সে বলে উঠল—'না, না, কোথায় ওগুলো যেতে পারে? আমি তার দেহে মনে আরও কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে তা দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। দেখলুম সে বিছানায় প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দেহ মনের যন্ত্রণা প্রশমনের চেষ্টা পাচ্ছে।

'কি হয়েছে এমিল? বিছানায় পড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছ যে?

'আমি ট্রাউজারসগুলোর খোঁজ করছি। সম্ভবতঃ কোথাও তারা পড়ে থাকবে, হয়তো এই খাটিয়ার নীচে......'

'তুমি একজন হতভাগ্য নির্বোধ। বিছানার উপর হামাগুড়ি দিয়ে কী লাভ হচ্ছে তোমার?'

কেন হবে না? মনে হচ্ছে খুঁজলে ফল পাওয়া যেতে পারে।

চুপ কর হতভাগা।

কেন?

তুমিই সেই ব্যক্তি যে চোর এবং মদ্যপদের মতো নিকৃষ্ট নেশার দাস হয়ে ট্রাউজারস জোড়া চুরি করেছ। নয়তো তোমার এই অস্বাভাবিকতা কেন, এতো অন্তর্দাহ কেন?

না না......বলতে বলতে সে বিছানা থেকে নেমে এলো। একটা সাদা চাদরের মতো দেখাচ্ছিল তাকে। সে জানালার ধারে গেলো এবং আমার দিকে পেছন ফিরে বসলো কিছুক্ষণ। অকস্মাৎ উঠে দাঁড়াল সে—কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলো আমার দিকে—'না না, আমি নিইনি, ওগুলো নিইনি। বিশ্বাস করো আমি নিইনি।' বলতে বলতে সে তার বজ্র কঠিন হাত দুটো দিয়ে আপন বক্ষটা চেপে ধরলো, ক্রোধে—উত্তেজনায় কাঁপছিল তার গলার স্বর।

তার অবস্থা দেখে ভয় পেলুম আমি। উঠে জানালার ধারে গিয়ে ধীরে ধীরে বললুম—ব্যাস্, তোমার যা ইচ্ছে করো, যদি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ অবিচার করে থাকি ক্ষমা করো আমাকে। ছেড়ে দাও ট্রাউজারসগুলোর কথা। চলো আমরা আবার বন্ধুর মতো সহজ হয়ে উঠি। ভয় কি হাত আছে, দেহে আছে শক্তি কাজ করে খাবো। কখনো চুরী করব না, কারও ক্ষতি করব না, চলো এই শপথ নিই আমরা।

এমিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সজাগ কর্ণে শুনলো আমার কথা। সারা সন্ধ্যেটা সে নিথর নিঃসাড় হয়ে বসে বসে কাটালো; আমি যখন রাত্রে শয্যা নিতে গেলুম তখনও সে ছিল ওখানে। যখন সকালে জাগলুম ঘুম থেকে তখনও তাকে দেখলুম উবুড় হয়ে ঠাণ্ডা মেঝের উপর পড়ে থাকতে তার একমাত্র সম্বল ছেঁড়া কোটটা গায়ে দিয়ে। সত্যি বলতে কি মুখে এমিল ওকে এরপরে আর বিশেষ কিছু না বললেও তার উপর একটা বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার ভাব জেগেছিল আমার মনে। মনে হতে লাগল কেবল যেন আমার আপন সত্তানই বিশ্বা

খাতকতা করেছে আমার সঙ্গে, আমারই ছেলে আমারই সর্বনাশ করেছে। আমার মনের অবস্থা বুঝতে না পারার মতো নির্বোধ ছিলো না এমিল। দু-হপ্তা ধরে নিরন্তর মদ গিলে যেতে লাগল সে। সকালে সেই যে বেরিয়ে যেতো ফিরতো অনেক রাত্রিতে। ইতিমধ্যে একটা কথাও বলতে শুনিনি তাকে। হয়তো বিবেকের বৃশ্চিক দংশনে সে অস্থির বেসামাল বোবা হয়ে পড়েছিল। তাই নিজেকে ভুলে থাকবার তার এই বৃথা চেষ্টা। প্রায় তিনসপ্তাহ কেটে যাবার পর তাকে শুধু জানালার ধারে বসে থাকতে দেখলুম। একটুও নড়চড় নেই। নিস্তব্ধ জড়। তিনদিন এ অবস্থা চললো। ভাবলুম ট্রাউজারস বিক্রির টাকা হয়তো শেষ। তাই সে অনন্যোপায়। একসময় তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলুম। অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে অবিরত, তার গণ্ড বেয়ে। একজন যথেষ্ট বয়স্ক লোকের চোখের জল নিশ্চয় উপাদেয় কিছু নয়—বরং একটা ভুতুড়ে আবহাওয়া সৃষ্টি করে অশ্রুবর্ষণার উৎস স্বরূপ কোঠরাগত ঝিলিকহীন চোখ। তাই জিজ্ঞেস না করে পারলুম না—কি ব্যাপার এমিল ?

তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। অনেকদিন পর তার সঙ্গে কথা বললুম কিনা—হয়তো তাই। তার ঠোঁট দুটোও কেঁপে উঠল—'না, কিছু না।'

তার কণ্ঠস্বরে আমার ভিতরটা আরও ভিজে গেল। বললুম "কিন্তু, ওভাবে বসে বসে কাঁদছ যে ?

আমি জানিনে। আমি কাজ চাই। আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দাও।

কি রকম কাজ চাও বলোত ?

যে কোন কাজ। হয়তো আগের যে positionএ ছিলুম সে positionই পুনরায় পাবো। আমাকে একজন কথা দিয়েছে। আমি আর তোমার সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে ত্যক্ত করতে চাইনে তোমাকে। যদি একটা চাকরী পাই তাহলে তোমার প্রাপ্য যা সব তোমাকে দিয়ে দেবো।

ঠিক আছে, ঠিক আছে এমিল। ওসব কথা ছেড়ে দও। চলো আমরা পূর্বের মতো বন্ধু হয়ে উঠি।

না, তুমি হয়তো এখনো ভাবছ ট্রাউজারস জোড়া আমিই নিয়েছি......কিন্তু আমি ওগুলো নিইনি.........

আমার কিছু বলার নেই এমিল। তোমার যা ইচ্ছা তাই করো।

কিন্তু আমি তোমার এখানে আর বেশীক্ষণ থাকতে পারিনে।

কি হলো তোমার ? কে তাড়িয়ে দিচ্ছে তোমাকে ?

না, আমার যাওয়াটাই শ্রেয়, বলেই সত্যি সত্যিই সে তার কোটটা কাঁধের উপর ফেললো।

দাঁড়াও এমিল, যুক্তি দিয়ে বুঝে দেখো, ভাবাবেগ ছাড়ো। কোথায় যাবে, কে আছে তোমার ?

গুড্ বাই, আটকাবার চেষ্টা করো না আমাকে। আমি লক্ষ্য করেছি আমার প্রতি তোমার মনোভাব আন্তরিকতাহীন সন্দেহপরায়ণ হয়ে উঠেছে।

আমার পরিবর্তন কোথায় দেখলে তুমি। বাইরে বেরুলে যে তুমি একটা ছোট নির্দোষ শিশুর মতো হারিয়ে যাবে। হাসবার চেষ্টা করে বললুম আমি।

তুমি তোমার ট্রাঙ্কটাতে আগে তালা লাগাতে না। এখন দেখছি প্রত্যেকদিন বাইরে বেরুবার সময় তাকে তালাবদ্ধ করে যাও। এ দৃশ্য যেন আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে।' বলেই চোখ মুছতে মুছতে সে বেরিয়ে গেলো। তিনদিনের মধ্যে সে ফিরলো না। ভয়ে ভাবনায় কাহিল হয়ে পড়লুম আমি। খেতেও পারলুম না,ঘুমুতেও পারলুম না। সব মদের দোকানগুলো তোলপাড় করে ছাড়লুম। কিন্তু কোথাও পেলুম না তাকে। ভাবলুম 'হয়তো আর এই জগতে নেই সে। আমারই নিষ্ঠুরতার জন্যে একটা অসহায় নির্দোষ লোক এভাবে প্রাণ বলি দিলে।'

অবশেষে একদিন সে ফিরলো। তখন তার শরীর অসুস্থ। অনেক বেশী রোগা হয়ে গেছে সে। যেন একটা কঙ্কাল। অতি যত্নে একটা বিছানায় শুইয়ে দিলুম তাকে। সারাদিন তার মাথার কাছে বসে

কাটালুম। সন্ধ্যের সময় তার অবস্থাটা খারাপের দিকে গড়িয়ে পড়লো।…ভয় পেয়ে একজন ডাক্তারকে ডেকে আনলুম। কিন্তু ডাক্তার কোন ভরসা দিতে পারলেন না। পরদিন সকাল থেকে এমিলের মুমূর্ষু অবস্থা। ঘরটাতে একটা হুমহুমে নিস্তব্ধতা। সে যেন আমার নিজের সন্তান—নিজের সন্তানই যেন মৃত্যুশয্যায় —এমনিধারা শোকার্ত হয়ে উঠলুম আমি। এমিল আমার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে অসহায় চোখ দুটো মেলে। সকাল থেকেই কিছু যেন বলবার চেষ্টা করছে। আমি তার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললুম — কিছু বলবে এমিল?

আমার কোটটা বিক্রি করে কতো পাওয়া যাবে?' এমিলের ক্ষীণ কণ্ঠ।

একটু ভেবে বললুম—'তিন রুবলের মতো পাওয়া যেতে পারে।' যদিও আমি জানতুম কোট্টা কারো কাছে বিক্রি করতে গেলেই হেসে বোকা বানিয়ে ছাড়বে আমাকে। বিনি পয়সায় দিলেও হয়তো কোটটা নেবে না কেউ।

আমি ভেবেছিলুম তিন রুবল পাওয়া যাবে। তুমিও কি নিশ্চিত যে তিনটে রুবল পাওয়া যাবে? আমি মারা যাবার পর কোটটা বিক্রি করে তিনটে রুবল রেখো তোমার কাছে। কোটটা কবরে দিও না আমার সঙ্গে।

মৃত্যু এসে দরজায় আঘাত করছে। আমি উপলব্ধি করতে পারলুম। কারও মুখে কোন কথা নেই। আমি অপলকে তাকিয়ে রইলুম তার দিকে, সেও।

একটু জল খাবে এমিল?

সে মাথা নাড়লো। একটু জল খাইয়ে দিলুম তাকে।

আর কিছু খেতে চাও এমিল?

না, আর কিছুই চাইনে............কিন্তু

কি বলছ, বলো এমিল।

ঐগুলো.....……...

কোনগুলো এমিল?

ঐ ট্রাউজারস গুলো......আমিই নিয়েছিলুম...... যখন.........

ঠিক আছে এমিল, ঠিক আছে, ভগবান তোমায় ক্ষমা করুন, তিনি তোমায় শান্তি দিন। আমি আর নিজেকে বুঝি ঠিক রাখতে পারলুম না। অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল অঝোরে। বড় বড় চোখ করে দেখলো এমিল আমাকে। বাঁ হাতটা তুলতে চাইলো। হয়তো মুছে দিতে চাইলো আমার চোখ। কিন্তু পারলো না। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। কিছু বলতে চাইলো। কিন্তু পারলো না। নির্জীব জড় হয়ে পড়লো কিছুক্ষণের মধ্যে।

ডস্টয়েভ্স্কির The Honest Thief গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

ধ্যানশ্রুতি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

"তোমাকে চাহে না যারা তারাও যে অস্বীকার মাঝে
তোমাকেই অঙ্গীকার করে"—এই বাণী শুনি বাজে
অপাঙ্গ মিড়ে আমার অন্তরের বীণায় কেমনে
জানি না, কেবল জানি—তোমারি কৃপায় মনোবনে
মধুর ঝঙ্কার শুনি জলে স্থলে ওঠে উচ্ছলিয়া
আকাশগঙ্গার ম'ত ধারাসারে নামে নির্ঝরিয়া
সুদূরের মন্ত্র আনি, আধচেনা—আধেক অচিন।
বিছায়ে সঙ্গীতশান্তি কে তুমি হে নেপথ্যনিলীন,
অপরূপ অভ্যুদয়ে গাও হেন শান্ত রাগমালা?
সান্ধ্য ছায়ানতে যেন তব আঁখিদীপে হয় আলা
কৃতজ্ঞ কৌমুদী প্রভা। সে জ্যোৎস্নার অনিন্দ্য লগনে
সংশয়-কুটিল বনে জলে পুষ্প-আরতিবন্দনে
সরল প্রত্যয়: স'রে যায় মিথ্যা কণ্টকের মায়া,
জিজ্ঞাসার ব্যথাবৃন্তে অকায়া করুণা ধরে কায়া।
"যে-তুমি সবার সাথী, তার বাতি কেন নিভে যায়—"
এ-প্রশ্নের মিলে সমাধান। তাই বেদনা মিলায়
আনন্দ চেতনা-লোকে—যবে তুমি গাও ধ্যানমাঝে:
"বিদ্যুতের অঙ্গীকার বজ্রমেঘ—অস্বীকারে বাজে।

অপর দিনের আলো

(The Light of Other Days.
Thomas Moore 1779-1852)

অনুবাদক—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

কতদিন কত ঘনালে রাত্রি কালো;
যাবৎ নিদ্রা নয়নে আসে না মম,
আমারে ঘেরিয়া অন্তরে জ্বালে আলো
অতীতকালের মধুস্মৃতি অনুপম।
ওঠেনি যখন শ্মশ্রু
সেদিনের হাসি অশ্রু,
প্রেমের আলাপ কত না করেছি তবে;
উজ্জ্বল আঁখি যত,
নিষ্প্রভ এবে নত
সুখী হৃদিগুলি ভেঙে গেছে এবে ভবে
এই ভাবে কত ঘনালে রাত্রি কালো,
যাবৎ নিদ্রা নয়নে আসে না মম,
আমারে ঘেরিয়া অন্তরে জ্বালে আলো
অতীতকালের দুখস্মৃতি অনুপম।

আমি যবে এই সব কথা একা স্মরি
বন্ধুরা ছিল এভাবে যুক্ত সাথে
চারিদিকে মোর দেখেছি যাইতে ঝরি'
যথা শীতকালে ঝরে পাতাগুলি বাতে,
বুঝি আমি তার মতো
কে ঘোরে ইতস্তত:
ভোজনের পরে শূন্য ভোজনাগারে,
নিভে গেছে যথা আলো,
মালাগুলি হোলো কালো,
ফেলিয়া রাখিয়া গিয়েছে সবাই যারে।
এই ভাবে কত ঘনালে রাত্রি কালো,
যাবৎ নিদ্রা নয়নে আসেনা মম,
আমারে ঘেরিয়া অন্তরে জ্বালে আলো
অতীতকালের দুঃখস্মৃতি অনুপম।

সে প্রদীপ জ্বলবে না

শান্তশীল দাশ

অনেক-আঁধার বেশে একটি উজ্জল শিখা চাই,
জীবন্ত প্রদীপ শিখা—যে ঘোচাবে সকল আঁধার ;
যে-আঁধার চারিদিকে, যে-আঁধার সম্মুখে চলার
পথ রুদ্ধ ক'রে আছে ; মেলে নাক' পথের নিশানা

কোলাহল তাই শুধু ঘন কৃষ্ণ আঁধারের বুকে,
কত অঘটন ঘটে, দিশাহারা সবাই এখানে ;
চায় পথ, চায় আলো, পায়নাক, কেঁদে কেঁদে মরে ;
জমে ওঠে দীর্ঘশ্বাস, ভারি হয়ে ওঠে চারিধার।

একটি উজ্জল শিখা আজ চাই, বড় প্রয়োজন ;
চারিদিকে অন্ধকার, অন্ধকার ঘন মসীমাখা ;
আর সেই অন্ধকারে 'শয়তান' এসে বাসা বাঁধে,
দিনে দিনে তার শক্তি ক্রমাগত বেড়ে বেড়ে যায়।

অসংখ্য জীবন কাঁদে : আলো চাই, প্রদীপ জ্বালাও ;
সে প্রদীপ জ্বলিবেনা ? জ্বালাবে না কেউ ? কেউ নেই !

চলমান এ জীবন

করুনাময় বসু

আশ্চর্য জলের রঙে পিছনের সময়ের নদী,
তবু কটি স্নিগ্ধমুখ কোথা থেকে দাঁড় টেনে টেনে
কাছে আসে, ডাক দেয়, ভালো আছো, সময়ের বাঁকে
কেন মুছে যায়, ভাবি, যদি সব গেল, স্মৃতিটুকু
রঙ হয়ে, শিল্প হয়ে বেঁচে থাকে কেন এত কাল ?
খণ্ড শুভ্র অনুভব, অস্তিত্বের উজ্জল আকৃতি,
সব কিছু মুছে গেলে বেঁচে থাকে অব্যয় প্রত্যয় :
তাই কি সবুজ মাঠ, হৃদয়ের মীড়ে মীড়ে গান,
মানুষের ভালোবাসা অশ্রুমুগ্ধ মমতায় ভরা,
তুমি আমি, চাঁপাফুল, নক্ষত্রের মিশ্র ঐক্যতান।

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র-বিক্ষোভ—

গত কয়েক বৎসর হইতে এ-রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্র প্রবল ছাত্র বিক্ষোভ অতিপ্রকট হইয়াছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গেই এই বিক্ষোভ আবদ্ধ নহে, ভারতের সকল রাজ্যে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আজ ছাত্র বিক্ষোভ সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে—ক্রমশঃ ইহার তীব্রতাও বৃদ্ধি পাইতেছে, আজ অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—ছাত্র মহলে এ অসন্তোষ কেন এবং তাহাদের ক্ষোভের কারণই বা কি। ইহা অনুমান করা কঠিন নহে যে—ছাত্রদের মনে অবশ্যই বিবিধ প্রচার অসন্তোষ জমা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অবশ্যই নানা অভিযোগ সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহার কারণে ছাত্রদের মনে পুঞ্জীভূত অভিযোগ অসন্তোষ আজ হঠাৎ বোমার মত ফাটিয়া প্রায় সকল বিদ্যায়তনে—এই বিষম বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। ছাত্র-বিক্ষোভ সম্পর্কে কয়েকজন খ্যাতনামা মার্কিন অধ্যাপক এবং সাংবাদিকের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া মনে করি। বলাবাহুল্য আজ মার্কিন দেশেও ছাত্র বিক্ষোভ অতি প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে এবং এই বিক্ষোভ ঐ দেশের অধ্যাপক মহলকে অতি চিন্তিত ও বিচলিত করিয়াছে। এ বিষয়ে মার্কিন দেশের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইওলজির অধ্যাপক জর্জ বলিতেছে ওয়াল্ড।

......But I think I know what's the matte I think that this whole generation of student is beset with a profound uneasiness, and don't think that they have yet quite defined i source. I think I understand the reasons fc their uneasiness even better than they d What is more I share their uneasiness.

"I am growing old, and my future, so speak, is already behind me. But there a those students of mine, who are in my mi always, and there are my children......who future is infinetly more precious than my ow So it isn't just their generation, its mine tc We are all in it together."

"Are we to have a chance to live? V don't ask for prosperity, or security. O for a reasonable chance to live, to work c our destiny in peace and decency. Not go down in history as the apocalyptic gene tion."

"Unless we can be surer than we are n that this generation has a future, noth else matters. It is not good enough to g it tender, loving care, to supply it with bre fast, to buy it an expensive education. Tl things don't mean anything unless this gen

tion has a future. And we are not sure that it has.

এই বিষয়ে ষ্টিফেন্ স্পেন্ডার (কবি এবং সমালোচক) নিউইয়র্ক টাইম্‌স্ মেগাজিনে লিখিয়াছেন (What The Rebellious Students Want)—

"………Which is the students movement about, the society or the university? For it soon becomes clear that the students have two sets of complaints, two sets of demands, one about the university one about the "society". Sometimes the two are merged and the university is seen as "a microcosm of the society." The university has become a faceless education factory."

"By now all the complaints have been thoroughly gone into, and there is (if one reads for example, the reports set up by the University of California and Columbia University) a plea of partial guilt from the universities and much excusing and explaining……… there has been an immense expansion of university all over the world. The consequent increase in university population, with corresponding increases in courses, tests and examinations, and its practical arrangements about dormitories, housing etc etc, has been so great that personal relations between teachers and taught have largely broken down ……Lectures are given through TV to overflow audiences, tests are made by mechanical system, professors are unapproachable the student thinks of himself (or thinks that he is thought of or likes people to think that he is thought of) as a number on a computer card.

"In addition to the depersonalization of the student-Teacher relationship the teachers themselves have begun to think that they are in a similar, depersonalized relationship with the university, with regents, chancellors, Vice-Chancellors, Presidents, alumni and the immensely overgrown administrations. Indeed, younger member of the faculty often identify with the students in thinking that both are dealing with an impersonal machinery of administration and knowledge distribution……

"All this is a bit exaggerated, but one can see it being built up into the great historical explanation of why the university went wrong."

ওয়াসিংটন্ পোষ্ট্ এবং নিউজ উইকের প্রকাশক এবং খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীমতী ক্যাথারীণ গ্রেহামের মন্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া এবারের মত সমাপ্তি দিব। বারান্তরে আরো উদ্ধৃত দিবার ইচ্ছা রহিল—কারণ বিষয়টি আমাদের জাতীয় জীবন এবং দেশের ভবিষ্যতের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত রহিয়াছে—

শ্রীমতী গ্রেহাম বলিতেছেন :

"This generation so hostile to so much of it heritage - spring in significant ways, most logically from that heritage. As a generation, it is no freak abortion. It has known a quite natural birth from the world it deplores.

"I wish I could say, in the face of so much to confound us……'I am not confused. I am just well mixed'……"

"I am certain only that we and by we I mean the press, the universities, the parents, the teachers -have at least so much homework to do as any body of students, if we are going to get matters somewhat straightened out in our heads and theirs.

"This means, above all, that we have to listen."

"It means that we have to listen most attentively when we hear what we like least."

"If we stuff our ears with cotton and our heads with contempt— against all student out cry, we shall be the losers. And they may be lost."

"…… ……If they sneer at old concepts of academic inquiry or academic freedom, we still must ask : How did they get this way ?"

"If their goals and purposes often seem to

is unclear, we must remember : This does not make them unreal."

"...........On the side of the rebellion, they will be content with nothing short of unconditional surrender. They will confuse the launching of the new with the libeling of the old. For these fanatics of perfection, the Magna Carta is only the work of anti-semites and the Declaration of Independence the work of slave-owners. And they will think their worth is sacred."

"We may hope someday to bring some of these zealous to grasp the definition of holiness as an intense not to have ours own way."

স্থানাভাব না হইলে আমরা ছাত্র বিক্ষোভ সম্পর্কে মার্কিন এবং অন্যান্য দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতামত এবং এই বিক্ষোভ দূর করিবার উপায় সম্পর্কে আরো বহু কিছু মন্তব্য দিতে পারিলে খুশী হইতাম, প্রয়োজন হইলে তাহা ভবিষ্যতে করিতে চেষ্টা করিব।

দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে যে প্রবল ছাত্র বিক্ষোভ এবং ছাত্র বিদ্রোহ গত কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে, শিক্ষাব্রতী এবং অন্যান্য ছাত্র কল্যাণপ্রার্থী ব্যক্তিরা আজ পর্য্যন্ত এই ব্যাধি নিরাময় করিবার "ঔষধ" কি সে বিষয় বিশেষ কিছু বলেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গোলমাল দেখা দিবামাত্র উপাচার্য্য, অধ্যাপক এবং শিক্ষক "যুদ্ধক্ষেত্র" হইতে দূরে সরিয়া যান, নিজেদের নিরপত্তার কারণে। আজ পর্য্যন্ত এমন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না একমাত্র স্বর্গত ডঃ গোপাল সেন ব্যতিক্রম যিনি সাহস করিয়া সকল সময়, সকল বিপদের সম্ভাবনা তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ সব কিছু গভীর সমবেদনার সহিত শুনিয়া—তাহার প্রতিকার পন্থা বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন আন্তরিকতার সহিত। আমারা বিশ্বাস করি যে বর্ত্তমানে ছাত্রদের [illegible] অসন্তোষ এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় [illegible] যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ছাত্রদের আজ [illegible]ন চিন্তা করিবার শক্তি অর্জ্জিত হইয়াছে। কঠিন মত কেবল পাঠ্য পুস্তকের মধ্যেই ছাত্রদের সময় এবং শক্তি আবদ্ধ রাখিবার দিন বিগত।

ছাত্রসমাজ এবং পলিটিক্যাল পার্টিরা কি চাহেন?

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলির অকারণ এবং অনাবশ্যক ছাত্র সমাজকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থসিদ্ধির কারণে প্ররোচিত, উত্তেজিত করিবার অভ্যাস দমন করা দরকার। কথাটা শুনিতে ভাল লাগিবে না—অধিকাংশ নেতারা দেশে এবং জাতির যথার্থ কল্যান সম্পর্কে অবহিত নহেন। এমন বহু নেতা আছেন, যাঁহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি এবং শিক্ষা-দীক্ষার বহর দেখিয়া—মানুষের মনে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার বদলে জাগে অশ্রদ্ধা, ভক্তির বদলে ঘৃণা। বহু নেতার চরিত্রবল এবং শুভবুদ্ধি কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। অপরিণত বয়স্ক বহু ছাত্র আজ এই ঘৃণিত নেতাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ এবং অনুসরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনার ফলে। এই শ্রেণীর নেতাদের ছাত্রসমাজ হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে তাড়াইতে পারিলে, ছাত্রসমাজ বা দেশের কল্যাণ হইবে।

ছাত্রদের প্রতি আহ্বান—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—আত্মত্যাগ

পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতারা কথায় কথায় ছাত্রদের দেশ এবং জাতির সেবায় আহ্বান করিয়া থাকেন। দেশের জন্য আরো দুঃখকষ্ট স্বীকার করিতে ছাত্রদের আবেদন করেন। সবকিছু দেখিয়া মনে হয় পশ্চিবঙ্গের তথা ভারতের ছাত্র এবং যুবসমাজই এই সবের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী এবং ইহা ছাত্রদেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু ছাত্র তথা যুবসমাজ যখন দেখেন যে প্রশাসক এবং অন্যান্য নেতারা—কোথায় কতটুকু আত্মত্যাগ এবং দেশের কারণে অভাবজনিত দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছেন—তাঁহারা কেবলমাত্র বাক্যেই তাহাদের কর্ত্তব্য সমাপন করিতেছেন

এবং সেই ফাঁকে নিজেদের, নিজ পরিবারের এবং অনুগৃহীত জনের সুখ স্বাচ্ছন্দ পুরামাত্রায় আদায় করিতেছেন, তখন ছাত্র এবং যুবসমাজ যদি অভকার নেতাদের এবং তাঁহাদের মূল্যবান উপদেশাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করিয়া, তাঁহাদের উপর কেবলমাত্র ঘৃণাই দেখান, তাহা হইলে ছাত্রদের দোষ কতখানি দিতে পারা যায়? যুবসমাজ আজ দেখিতেছে যে অতি অযোগ্য, তৃতীয় কিংবা তাহারও নীচের শ্রেণীর, অল্প অৰ্দ্ধ এমন কি প্রায় অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও, ভোটের অনুগ্রহে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব লাভ করিতেছেন এবং মন্ত্রিত্ব লাভ করিবার দুই মিনিটের মধ্যেই পরম বিজ্ঞতা লাভ করিয়া সাধারণ মানুষকে তাঁহাদের অসার বাণীবদ্ধ করিয়া তাহাদের হাড় জ্বালাইতে আরম্ভ করেন। কেবল ছাত্র ও যুবসমাজই নহে, সরকারী শিক্ষিত, অভিজ্ঞ এবং দক্ষ পদস্থ অফিসারগণও বেকুব, অনভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিবিদ্যাহীন তথাকথিত মন্ত্রিদের দ্বারা প্রশাসনিক কার্য পরিচালনায় কেবল বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকেন, যাহার ফলে সরকারী মহাকরণে এবং জিলাগুলিতেও প্রশাসন ক্ষেত্রে একটা বিষম নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়, কাজকর্ম প্রায় স্তব্ধ হইয়া যায়। আজ যাহারা নেতা কাল তাঁহারা মন্ত্রী হইয়া রাজ্যময় সকল কার্য্যের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা মাত্র সৃষ্টি করেন। এই প্রকার অদ্ভুত ক্রিয়াকর্ম চোখের সামনে অহরহ ঘটিতে দেখিয়া শিক্ষিত ছাত্র এবং যুবক যদি তথা নেতা মন্ত্রীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, দোষ দিবার কি আছে? শিক্ষার পালা শেষ করিয়া, ছাত্ররা কাজ চায়, কাজ পায় না। বাড়ীর ঘটিবাটি বিক্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তকমা লাভ তাহাদের জীবনে একটা বিরাট পরিহাস বলিয়া প্রমাণিত হয়।

কেবল ছাত্র ও যুবারাই নহে, পশ্চিমবঙ্গে সামান্ত কুলীমজুরের কাজও আজ বাঙ্গালীর নাগালের বাহিরে। চট এবং চা শিল্পে নিয়োজিত শতকরা প্রায় শতজনই বহিরাগত, ডকের কাজেও তাই। হাওড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে কুলীর কাজে বাঙ্গালী গেলে তাহাদের বহিরাগত কুলীরা ঠেঙ্গাইয়া তাড়ায়। বড়বাজার এলাকাটি কলিকাতার মধ্যে হইলেও বাহির হইতে কেহ এখানে গেলে তাঁহার মনে হইবে যে তিনি বাঙ্গলা বাহিরে রাজস্থান, বিহার কিংবা উত্তর প্রদেশে অবস্থিত কোন ব্যবসায় অঞ্চলে আসিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে বড় বাজার অঞ্চলে, সি পি এম প্ররোচিত মজদুর এবং কুলীদের এক বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি করা হয় ঐ অঞ্চলের মালবাহী কুলী মজুরদের কেবল রোজ বৃদ্ধি নহে তাহাদের বোনাসও দিতে হইবে। বলাবাহুল্য এই অঞ্চলে কুলী মজুরদের মধ্যে হাজার করা একটিও বাঙ্গালী শ্রমিককে দেখা যাইবে না। যাহারা এখানে দিন মজুরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন (দিনে প্রায় ১০ হইতে ১৫ টাকা) করে তাহারা সকলেই বিহার, উড়িষ্যা উত্তর এবং মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা (প্রায় সকলেই বাঙ্গালী)—এই সকল বহিরাগতদের স্বার্থ রক্ষার (এবং সেই সঙ্গে নিজেদেরও) বিষয়ে সদা অতি জাগ্রত এবং সতর্ক। শ্রমিক নেতাদের 'ঘর জ্বালানো পর ভুলানো' নীতিতে অবাক হইবার কিছু নাই, কারণ অবাঙ্গালী শ্রমিক সংস্থাগুলি নেতাদের সর্ব্বপ্রকার আর্থিক এবং অন্যান্য আরামদায়ক সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। এমনও শুনা যায় যে এক একজন অল্প কিন্তু সাংঘাতিক বিদ্যাধর শ্রমিক নেতার মাসিক আয় দেড়-দুই-আড়াই হাজার টাকার কম নহে। আর এহ টাকাটা সবই দেয় শ্রমিক মণ্ডল। ইউনিয়নের মাসিক চাঁদা যা আদায় হয় তাহার প্রায় তিন চতুর্থাংশ শ্রমিক ইউনিয়নের মালিকদের আরাম বিলাস এবং স্বার্থেই ব্যয় করা হয়।

যাঁহারা জোতদার, বড় কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়াশীল এবং ধনীর দালাল বলিয়া অহরহ চীৎকার করেন এবং ইহাদের নিধন কামনা করেন, সেই তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কোন শ্রেণীতে পড়েন? জোতদার, বড় কৃষক এবং ছোট বড় সকল ব্যবসায়ীকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, শ্রমিক ইউনিয়নের কথা সর্ব্বস্ব নেতাদের মত পরের অর্জ্জিত অর্থে নবাবী করা চলে

না। আসলে এসম্বন্ধটার বলিতে গেলে এইসব শ্রমিক নেতারাই, যাঁহারা শ্রমিক মালিক বিরোধের মীমাংসা সহজে হইতে দেন না। যে বিরোধ দুই দিনেই মিটানো যায়, সেই বিরোধকে নেতারা প্রাণপণ চেষ্টা এবং শ্রমিকদের স্তোকবাক্যে, মিথ্যা আশ্বাসে,মাসের পর মাস ঝুলাইয়া রাখেন—কারণ বিরোধ হইবে যত দীর্ঘস্থায়ী নেতাদের অর্থাগমও হইবে তেমনি বেশী। দুঃখের কথা অশিক্ষিত শ্রমিক নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন, নেতাদের ধোঁকা ধাপ্পাতে তাহারা বিভ্রান্ত।

পশ্চিমবঙ্গে নব আশার সূচনা

পশ্চিমবঙ্গে আজ যে অনাচার এবং সেইসঙ্গে নর-হত্যার স্রোত বহিতেছে—তাহার সবই অবসান হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। বিশ্ববিখ্যাত বস্তুকুল তিলক ধাবন-বিশারদ রাজ্যপাল ধাবন কর্তৃক প্রশংসিত এবং উচ্চ সার্টিফিকেট প্রদত্ত আমাদের প্রাক্তন সহকারী তথা পুলিস মন্ত্রী—শ্রীজ্যোতি বসুর ঘোষণায়।

জ্যোতি বসুর ঘোষণা :

"সুবিধাবাদীরা স্থায়ী সরকার গড়তে পারে না—জ্যোতি বসু।

শনিবার রাণাঘাটে ও চাকদায় দুটি জনসভায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বলেন, সুবিধাবাদীরা কোনও স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারে না এবং জাতিকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

তিনি বলেন, কংগ্রেস এখন দ্বিধাবিভক্ত এবং মৃত। কিন্তু এরাই দেশে বিশৃঙ্খলা ও বেকারি সৃষ্টি করছে। আর আট পার্টি জোট হল সুবিধাবাদী। কিন্তু সি পি এম এর নেতৃত্বে গঠিত সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধ এবং নির্যাতিত মানুষের কল্যানের জন্য এই ফ্রন্টকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা উচিত।

শ্রীবসু আশা প্রকাশ করেন, তাঁর দল সরকার গঠনের জন্য জনসাধারণের সমর্থনে গরিষ্ঠতা অর্জন করবে এবং দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজ বিরোধী-দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।

সহজ কথায় ইহাই কি বলা চলে না যে পশ্চিমবঙ্গে যে সব হাঙ্গামা, অনাচার, সমাজ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপও পার্টি স্বার্থে খুন জখম এবং নানাবিধ বহু কিছু অকল্যান-কর বস্তুর সৃষ্টি করে গত দুই বছরে যাহার প্রকোপ বৃদ্ধি মুখে—এবং এই সকল সমাজ ও জাতি বিরোধী কার্য্যের প্রধান কর্মকর্তা সি পি এম—জ্যোতিবসু যাহার একজন অতি বিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর নেতা। এ-রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে যে নৈরাস্য এবং ধ্বংসলীলার প্রবর্তন হয়, তাহার জন্মদাতা সি পি এম প্রধানত।

জ্যোতি বসুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁহার মন্ত্রিত্বকালে রাজ্য পুলিসকে তাঁহার ব্যক্তিগত বরকন্দাজ বাহিনীতে পরিণত করা। সাধারণের টেক্সের জোরে যে পুলিশ বাহিনী, জ্যোতি বসু সেই সাধারণকেই পরম বিপদের সময়ও পুলিস সাহায্য দেন নাই। সোজা কথায় ইহা বলা যায়, এ রাজ্যে তিনি এবং তাহার দল যে বিষম সঙ্কট আমদানী করেন, এবার যদি সেই তিনি এবং তাঁহার দল সরকার গঠন করিতে পারেন, তাহা হইলে, পশ্চিমবঙ্গকে সর্বভাবে এক পরম ঐশ্বর্যশালী এবং শান্তিপূর্ণ রাজ্যে পরিণত করিবেন।

অন্যান্য দল যখন স্বার্থপর এবং প্রতিক্রিয়াশীল এবং একমাত্র সি পি এমই যখন প্রকৃত জনদরদী এবং সাধারণ মানুষের অছি, আশা করা যায় জ্যোতি বসুই হয়ত আমাদের রাজ্যের সিংহাসন দখল করিয়া অশোকের মত চণ্ডাশোক হইতে ধর্মাশোকে—অর্থাৎ চণ্ডা-জ্যোতি হইতে ধর্মজ্যোতিতে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া এই অতিশপ্ত রাজ্যাকাশে শান্তির স্নিগ্ধ জ্যোতি ছড়াইতে থাকিবেন।

(জ্যোতিবাবু দীর্ঘজীবী হউন)

সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দল—কে নয়?

এ-বিষয় একটি দৈনিক পত্রের (আনন্দবাজার) মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক নহে :

অমুখ অমুকের শত্রু আমার মিত্র—কূটনৈতিক আচরণ বিধির সনাতন নিয়ম অনুসারেই এই দেশে—বিশেষ করিয়া এইরাজ্যে সব দলাদলি এবং গলাগলি চলিয়াছে। শ্রীজ্যোতি বসু শনিবার বাগবাটে ও চাকদহে দুইটি জনসভায় বলিয়াছেন—সুবিধাবাদীরা কোনও স্থায়ী সরকার গড়িতে পারে না।

অত্যন্ত খাটি কথা—জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর—এই ছয়টি জেলায় সি পি এম-এর কোনও প্রতিনিধি নাই, শুধু ইহাই নহে, অন্ততও উগ্রপন্থীরা এই দলের 'বি' টিম হিসাবে গররাজী হইয়াছে।

সুবিধাবাদীরা স্থায়ী সরকার গড়িতে পারে না ঠিকই, যেমন, মন্ত্রিত্ব যায় দেখিয়া স্বরাষ্ট্র-দপ্তর বিসর্জন দিয়াও অজয়বাবুর কাছে যুক্তফ্রন্ট জমানা বহাল রাখার বায়না। তেমনই যে সাম্প্রদায়িক দল গোটা দেশকে আরও একবার ভাঙিতে চাহে তাহাদের সঙ্গে মিতালীর ধর্ণা—কোনটাই আদর্শবাদী কোন দলকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারে না। সুবিধাবাদ, সুবিধাবাদ, আগাগোড়া সুবিধাবাদ। ইহাতে সর্বভারতীয় দলগুলির যত না ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয় রাজ্যস্তরে দলগুলির ভাবমূর্তি নষ্ট হয় ঠিক ততটাই।

কিন্তু সে যাহাই হোক, জ্যোতি বসুবাবুকে আমরা কখনই সুবিধাবাদী বলিব না, কারণ তিনিই একমাত্র বাঙালী নেতা—যিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থ, এবং তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য জীবন পণ করিয়াছেন—এবং এই মহান আদর্শের পথে বাধা দূর করিবার প্রয়োজন হইলে দরকার মত কিছু কিছু মানুষকে লিকুইডিয়েট অর্থাৎ তরল করিতেই হইবে। এ-রাজ্যে সি পি এম বা অন্য দলের হাতে যাহারা মর্গে যাইতে তাহারা সকলেই অবশ্য দেশের লোকের স্বার্থের বাধা স্বরূপ, জ্যোতিবাবুর বিচারে। অতএব ইহা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই যে পশ্চিমবঙ্গের গণপতির বিচারে যাহারা দোষী এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাদের যেমনকরিয়াইহোক যমরাজ্যে পাঠাইতে হইবে।

গত কিছুদিন হইতে গণপতি জ্যোতি বসুর কণ্ঠে আমরা সেই বিষম বজ্র নিনাদ শুনিতে পাইতেছি না কেন? তাঁহার কণ্ঠ কিঞ্চিত ম্রিয়মান, এবং পূর্বে যে দাবি আদায়ের জন্য তিনি সকলকে আদেশ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ সেই আদেশের বদলে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে তাহাকে এবং তাঁহার দল সি পি এম-কে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কাতর কণ্ঠে আবেদন জানাইতেছেন কেন? এমন কি হইল যাহার কারণে আদেশ করিবার বদলে জ্যোতিবাবু আজ মানুষের কাছে আপীল করিতে বাধ্য হইতেছেন?

'জনগণ অমঙ্গল বিধাতার' কণ্ঠে সুরের পরিবর্তন দেখিয়া মনে হয় তিনি আজ যেন কিঞ্চিত ভীত, দ্বিধাগ্রস্ত। যে ব্যক্তি ক্ষীণ দেহে অ্যাটমিক শক্তির ধারক, সেই ব্যক্তির কণ্ঠে বোমার বদলে পটকার শব্দ—স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। (সব সত্বেও আমরা বলিব গণপতি জ্যোতি বসু দীর্ঘজীবী হউন এবং অনন্তকাল দেশ সেবা করিতে থাকুন।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ—অনাচারের শেষ কবে কোথায়?

কয়েকটি নরহত্যা, জখম আমাদের রাজ্যের প্রাত্যহিক সংবাদে পরিণত হইয়াছে এবং "প্রত্যহ ইহাই ঘটিতেছে। তথাপি কী আশ্চর্য জাতীয় বিবেক, সামাজিক বিবেক, রাজনৈতিক বিবেক—বস্তুত বিবেক বলিয়া আজ কোনও স্তরে কোন কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে—একেবারে নিশ্চুপ শীতল রহিয়াছে। সন্দেহ হয়, সম্ভবত বিবেকেরও মৃত্যু ঘটিয়াছে। জীবিত থাকিলে সে এতদিনে অন্তত আর্ত চিৎকার করিয়া উঠিত, প্রতিকার বা প্রবল প্রতিবাদ করিতে পারুক বা নাই পারুক।

"মৃত্যুর প্রতিবিধান নাই, হত্যাকারীরা—যে দলের

আর যে-যে মার্কাধারী তাহারা হউক-যেন ওপেন জেনারেল লাইসেন্স লইয়া অবাধ বেসাতি চালাইতেছে। এক-একটি হত্যাকাণ্ডের পর এক-একটি এলাকায় বন্ধ অথবা ভজন খানেক বিবৃতি—আর কোনও কর্তব্য করণীয় আর কিছু নাই নিজেদের সঙ্গে বোঝাপড়া ব্যপারটা ওখানেই বিলকুল সাফ। প্রকাশিত বিবরণে শহীদ ও শিকারদের সনাক্তকরণ—সেও একটা সমস্যা। যাঁহাদের খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা আছে, তাঁহারা তবু ভাগ্যবান। অন্যদের ক্ষেত্রে শুধুই কারণ খোঁজা, কেবলই শবঢাকা চাদরের মতো একটা লেবেল জড়ানো, কোনমতে একটা পরিচয় লটকাইয়া দিয়া পরিতৃপ্ত থাকা এই ভাবেই কেহ ব্যবসায়ী, কেহ রাজনৈতিক কর্মী ইত্যাদি মরণোত্তর বিভূতিতে বিভূষিত হইতেছেন, নির্লজ্জ যুক্তি আবার মাঝে মাঝে নিহতদের অতীত অন্যায়ের কথা স্মরণ করিয়া সাফাই গায়, কিংবা গাহিতে চায়। মৃতের সঙ্গে কলহ নাই, এই সামান্যতম সৌজন্য ও মানা হয় না।

ইহাই চলিয়াছে। এই পটভূমিতেই নির্বাচন। মনোনয়নপত্র ঝুপ-ঝুপ করিয়া দাখিল হইতেছে, আসনের ভাগ-বাঁটোয়ারাও দিব্য চলিয়াছে, মিতালী অথবা মন-কষাকষি, কোনও উপচারেরই কমতি নাই। সবঠিক আছে শুধু মাঝে মাঝে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধিবে কে, তাহারই হদিশ মিলিতেছে না। বিশেষ করিয়া নির্বাচন কর্মীর বড়ই দুর্ভিক্ষ; ঘাটতি পুরাইতে ফেল হইয়াছে। একের পর এক টোপ, যেমন কর্মীদের জন্য জীবন-বীমা। কিন্তু যেখানে ছিদ্র শতদিকে, সেখানে একটি দুইটি রিপু আর সেলাইতে কি কুলাইবে এবার যে প্রার্থীদের প্রাণ লইয়াও টানাটানি। ইতিমধ্যেই দুইজন প্রার্থী প্রাণ দিয়াছেন—প্রথম জন চণ্ডীতলায় ফরোয়ার্ড ব্লকের সীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় রোমহর্ষক ঘটনার খবর আসিয়াছে সিউড়ি হইতে—সেখানে নব-কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযদু-গোপাল রায় নিহত।

আগেই বলিয়াছি, ইহা উন্মাদের কাণ্ড নহে, উন্মাদনার বশেও এসব ঘটনা ঘটে না। যাহারা মারে, তাহারা ঠাণ্ডা রক্তেই তাহাদের আসুরিক হিংসা চরিতার্থ করে। শ্রীরায় সাইকেলে ফিরিতে-ছিলেন, কিন্তু ফেরা তাঁহার হয় নাই। রাস্তার ধারে পড়িয়াছিল রক্তাপ্লুত দেহ, শরীরের অন্তত সাত জায়গায় অস্ত্রাঘাতচিহ্ন।

হিংসা; প্রতিহিংসা, যে-নামেই চিহ্নিত করি, এসব কীসের চিহ্ন? প্রচণ্ড এক অসুস্থতার, বিকৃত এক বিকারের। শেষ রাত্রে শয়নকক্ষ হইতে ডাকিয়া বাহির করিয়াও খুন করা হইয়াছে। এই মৃতদের রাজনৈতিক পরিচয় বা কুলক্ষণ লইয়া বিচারে বসিতে আমাদের কিছুমাত্র রুচি নাই। কেননা শেষ বিচারে কোন রাজনৈতিক কর্মীর তো মৃত্যু হইতেছে না, মরিতেছে মানুষ—সাধারণ মানুষ। আরও নিষ্ঠুর সত্য—পাইকারী এই যে হত্যাকাণ্ড, এ সবের ক্ষেত্রে আততায়ীরাও কিন্তু সাধারণ মানুষ, জমিদার কিংবা পুঁজিপতি, অথবা কোনও অত্যাচারী সরকারের হাতে সকলে বধ হইতেছে না। ইহার পরও প্রগতির কোন্ কৈফিয়ৎ গণতান্ত্রিক কোন্ সান্ত্বনা অবশিষ্ট রহিল? আছে শুধু রক্তাক্ত এবং মসীলিপ্ত একটি চিত্র—সে চিত্র আত্মঘাতী আয়োজনের, সে চিত্র মনুষ্যত্ব সমেত একটা গোটা জাতিকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়ার চক্রান্তের।

প্রখ্যাত আনন্দবাজার পত্রিকার মন্তব্য সময়োচিত এবং যথাযোগ্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু সন্দেহ, হয়, সারা পশ্চিমবঙ্গে আজ যে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে—তাহার মধ্যে সত্য কথা, উচিত কথা কর্তব্যের কথা কাহারো মনে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিবে কি না। সকলেই যখন নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাইতে, এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে কেহ কেহ স্বার্থসিদ্ধিও করিতে ভুলিতেছে না, এমন সময়

দেশ বা জাতির মঙ্গলামঙ্গল লইয়া কেহ বৃথা সময় নষ্ট করিতে এবং মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সাহস বা গরজ আজ কাহারো নাই। একটা জাতির অকাল মৃত্যু এবং আত্মবিলোপের সব কয়টি লক্ষণ আজ প্রকট হইয়াছে।

যে রাজ্যে এবং জাতির মধ্যে একদা বহু বহু মহামানব এবং প্রকৃত বিদ্রোহীর জন্ম হয়, যে জাতি সারা ভারতকে মাত্র ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও স্বাধীনতার পথ এবং পরশাসন হইতে মুক্তির উপায় তথা মন্ত্রে দীক্ষা দান করে, সেই রাজ্য এবং জাতি বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালী আজ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র ঘৃণিত উপহাসের পাত্র। এ রাজ্যে আজ এমন একটিও মানুষকে দেখিতে পাইনা, যিনি দেশ এবং জাতিকে নূতন করিয়া বাঁচিবার, মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে উদ্বোধিত করিতে পারেন। আমরা চিরকাল আশাবাদী কিন্তু ক্রমে সেই ক্ষীণ আশাও যেন বিলীন হইয়া যাইতেছে। আশার বদলে নিরাশাই যেন মনে আসিতেছে।

জ্যোতিবাবুর ঘোষণা

কিছুদিন পূর্ব্বে বিদেশী আদর্শ এবং তথাকথিত নীতি (?) বাহক ও ধারক সি পি এম নেতা এবং পন্থানির্দ্ধারক গণ-অমঙ্গল জনতারাজা শ্রীজ্যোতি বসু তথা সি পি এম ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি এবং তাহার দল এবার যদি ক্ষমতা দখল করিতে পারেন, তাহা হইলে আজ যাহারা সি পি এম দলের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, তাহাদের সকলকে তিনি একহাত দেখিয়া লইবেন এবং চেষ্টা করিবেন সর্ব্বোতভাবে একেবারে নির্ম্মূল করিতে। এই মহত্ত উদ্দেশ্য সার্থক করিতে তিনি হাজার হাজার জনের গঠিত একটা বিরাট বাহিনীও গঠন করিতে বদ্ধপরিকর। এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার বেশ কিছুদিন পরে জ্যোতিবাবুর দল— প্রকাশিত সংবাদ সত্য নহে বলিতেছেন। দলের নেতারা মনে করেন এসব কথা জ্যোতি বসু কখনও বলিতে পারেন না—কিন্তু বরং গণরাজ এ বিষয় নীরব। এই প্রকার কোন ঘোষণা বা হুমকি কোন সুস্থ মস্তিষ্কের এবং সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন নেতা যে করিতে পারেন, তাহা চিন্তা করিতেও কেহ পারে না; কাজেই জ্যোতিবাবুর মাথা ঠিক নাই এবং অবিলম্বে সরকারী অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার চিকিৎসা ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। জ্যোতিবাবুর মাথা খারাপ হইবার প্রধান কারণ—তিনি এবং তাঁহার দল অর্থাৎ সি পি এম আজ একেবারে কোনঠাসা হইয়া পড়িয়াছেন এবং স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে এবার হয়ত এই দলের এক চরম সঙ্কট—জীবন মরণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। তাহা না হইলে নূতন করিয়া সি পি এম-এর আবার সসস্ত্র বাহিনী গঠনের কথা বলার প্রয়োজন কি জন্য হইল? গত কিছুকাল হইতেই ত এই দলের বাহিনী তাহাদের আত্মপ্রকাশ করিয়াছে পথে ঘাটে। মারাত্মক অস্ত্রাদি লইয়া শোভাযাত্রাও করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের শাসক আজ কেন্দ্র সরকার—এক কথায় প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার রবার ষ্ট্যাম্প রাষ্ট্রপতি এ রাজ্যের শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব পালন কি করিতেছেন? রাজ্যের জ্ঞানপাপী এবং ছদ্মবেশী নেতা নামে পাষাচণ্ড—মতলবী উন্মাদদের কেন অবিলম্বে আটক করা হইতেছে না? ইহার অর্থ কি এই যে—কেন্দ্র সরকার এবং নেতারা পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করিবার চক্রান্তকে এই ভাবে কার্য্যকর করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এবং বাঙ্গালীকে দিয়াই বাঙ্গালীকে হত্যা করিবার মহত্ত উদ্দেশ্য সার্থক করিতে বদ্ধ পরিকর?

এস্ ইউ সির শুধু প্রস্তাব

এক দিকে পার্টি সশস্ত্র বাহিনী গঠন—অন্যদিকে বামপন্থী এস ইউ সির দাবি পশ্চিমবঙ্গে অস্ত্র আইন (Arms Act) বাতিল করিয়া—এ রাজ্যের সাধারণ

জনকে ইচ্ছামত বন্দুক, এবং অন্যান্য প্রকার মারাত্মক অস্ত্র ক্রয় এবং রাখিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানে আর্মস্ অ্যাক্ট বাতিল করিবার কোন প্রয়োজন আছে কি? অস্ত্র-আইন বিদ্যমান থাকিতেই চারিদিকে যে প্রকার বন্দুক, বোমা, ছোরা, তলোয়ার, সড়কি এবং অন্যবিধ মারাত্মক অস্ত্রের ছড়াছড়ি এবং তাহার অবাধ প্রয়োগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া সি পি এম, সি পি আই, এস ইউ সি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি তথাকথিত "গণতান্ত্রিক" দলগুলি নিজেরাই অস্ত্র আইনের বিলোপ সাধন করিয়া দিয়াছে। কলিকাতার বেলেঘাটা, দমদম, বরানগর, শ্যামবাজার, যাদবপুর এবং অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে দলীয় যুদ্ধ ত প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সকল দলীয় সংঘর্ষে বোমা, বন্দুক ছোরা এমন কোন মারাত্মক অস্ত্র নাই যাহার প্রকাশ্য প্রয়োগের ফলে প্রত্যহ নিরীহ, শান্তিকামী সাধারণ মানুষের প্রাণ এবং অঙ্গহানি ঘটিতেছেনা। পার্টি সংঘর্ষ যদি পার্টিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত এবং পার্টি বাহিনীর সৈন্য-সামন্তদের মধ্যেই হত্যালীলা সীমিত থাকিত তাহা হইলে হয়ত কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু তাহাত হইতেছে না। এই সকল—অর্থাৎ পার্টিদের বীর যোদ্ধাদের হাতে নিপাত যাইতেছে তাহারাই যাহারা কাহারো সাতে পাঁচে নাই সেই সাধারণ মানুষ! যুদ্ধ হইতেছে রাজার রাজার আর উলুখড় পুড়িয়া মরিতেছে। আর দলীয় মহামান্য রাজারা মেঘলোকে অন্তরীক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন। আজ পর্যন্ত কোন দলের কোন রাজাকেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতে দেখা গেল না কেন? রাজা তথা সেনাপতিদের প্রাণের মূল্য কি এতই বেশী, না তাহারা প্রাণভয়ে ভীত বলিয়া অন্তরালে থাকাই নিরাপদ মনে করেন?

অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতিকার করিতে হয়ত নির্দলীয়—অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে বাধ্য ইয়া সাধারণ বাহিনী গঠন করিতে হইবে। এই সাধারণ বাহিনীর একমাত্র কাজ হইবে প্রয়োজনবোধে পার্টি বাহিনীগুলির বিলোপ সাধন করা যে ভাবেই হউক। পশ্চিমবঙ্গে শাসক আজ কেন্দ্র সরকার, কিন্তু কর্ত্রী ঠাকুরাণী সব দেখিয়াও এ রাজ্যকে তাহার ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন—তাঁহার মনোবাসনা হয়ত এই যে—বাঙলা এবং বাঙালী নিজেদের ঘরে নিজেরাই আগুন লাগাইয়া নিজেরাই নিজেদের মহানির্বাণের পথ পরিষ্কার করুক এবং তাহার পর বাঙালা দেশকে টুকরা টুকরা করিয়া পাশাপাশি রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া দিলেই কেন্দ্রের কাঁটা বাঙলা এবং বাঙালীকে লইয়া যে সমস্যা দেখা যাইতেছে সে সব সমস্যার সহজ সমাধান আপনা হইতেই হইয়া যাইবে।

এ রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি যাহা, তাহাতে অন্য দেশ হইলে সামরিক শাসন জারি করা অতি আবশ্যক বিবেচিত হইত। কিন্তু দয়াময়ী, সমাজতন্ত্রে পরম আস্থা-বতী আমাদের প্রধান মন্ত্রী প্রাণ থাকিতে সামরিক শাসন এ রাজ্যে প্রবর্তন করিবেন না, কারণ এই ব্যবস্থা গৃহীত হইলে সি পি আই, সি পি এম দুঃখ পাইবে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষ বোধহয় বিবিধ বামপন্থী দলগুলির মানুষ। যাহারা প্রকৃত পক্ষে সাধারণ মানুষ তাহারা মনুষ্য পদবাচ্য নহে, কারণ এই সব মানুষ কথায় কথায় হুমকি দিতে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বোমা, বন্দুক ছোরা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে জানে না। সত্যকার সাধারণ মানুষ কেবল জানে নেকড়ে বাঘ অপেক্ষাও হিংস্র দল এবং দলীয় বাহিনীর ভক্তদের হাতে প্রাণ দিতে। কিন্তু এ অবস্থা এবং কেন্দ্রীয় বিধান আমরা আর কতদিন সহ্য করিব? মানুষের সহ্যের সীমা বলিয়া কি কিছুই নাই আজ, কেন্দ্র যে অবিচার, যে অপমান পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙালীকে করিতেছেন, তাহার জবাব কেন্দ্র ও কেন্দ্রকর্তাদের অচিরে দিতে হইবে। বামপন্থী নেতারাও রেহাই পাইবেন না, তাঁহাদের বিচার জনগণই করিবে—কিন্তু কবে সে দিন আসিবে তাহারই প্রতীক্ষায় রহিলাম।

পশ্চিমবঙ্গ অন্তহীন সমস্যা কণ্টকিত রাজ্য

এ-রাজ্যের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে আলোচনা করিবার মত বহু বিষয় রহিয়াছে যেমন :

শ্রমিক তথা স্বার্থপর ইউনিয়ন নেতাদের কথায় কথায় ধর্মঘটের এবং বন্ধের ডাক,চুক্তি হইবার পরেও শ্রমিকদের দাবি দাওয়ার শেষ নাই, শিল্প সংস্থার মালিক এবং ভারপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ অফিসারদের ঘেরাও এবং শারীরিক নির্য্যাতন, সিম্প্যাথেটিক ষ্ট্রাইক, স্থানীয় এবং সামান্য সংখ্যক ব্যক্তির অদ্ভুত এবং অকারণ দাবি আদায়ের জন্য প্রায়ই রেলচলাচল বন্ধ করিয়া হাজার হাজার নিরীহ যাত্রীকে দণ্ডদান করা অহরহ ঘটিতেছে। যেখানে যাহার এবং যাহাদের দাবি আদায় না হইবে, সেইক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকেই নানা ভাবে দণ্ড অর্থাৎ পিটুনী খাইতে হইবে, মনে হয় সাধারণ মানুষের সর্ব্বপ্রকার অন্যায়ের জন্য দায়ী। দৃষ্টান্ত কত দিব? একদিকে ইউনিয়ন নেতৃবর্গ এবং শ্রমিকদের হাজারো রকম দাবি, অন্যদিকে কিন্তু শ্রমিকদের তাহাদের দায়িত্ব পালনের জন্য কোন নেতাই একটি কথা বলাও প্রয়োজন মনে করেন না। শ্রমিকদের আর্থিক দাবি মিটাইতে হইলে, শিল্পসংস্থার কল-কারখানায় প্রোডাক্সন্ বৃদ্ধি করা যে একান্ত আবশ্যক ইউনিয়ন মহারাজারা সে বিষয় একেবারে নীরব? শ্রমিকদের অযথা এবং অন্যায় দাবি এবং অসহযোগের ফলে এ রাজ্যের প্রায় ২২০টি কলকারখানা বন্ধ রহিয়াছে এবং এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিমুখে। সি পি এম, সি পি আই এবং অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আজ্ঞাধীন শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে সর্ব্বপ্রকার শিল্পসংস্থার কলকারখানাগুলিকে পুরাপুরি বন্ধ না করিতে পারিলে তাহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে না, অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বন্ধ না করা পর্য্যন্ত শ্রমিক নেতাদের বিচিত্র আত্মঘাতি কার্য্যকলাপের পরিসমাপ্তি ঘটিবে না। এ রাজ্যে এই রকম একটা ডামাডোল, নৈরাজ্য সৃষ্টি করাই সি পি এম, সি পি আই প্রভৃতি দলগুলির একান্ত কাম্য। পশ্চিমবঙ্গের জল এমনিতেই ঘোলা, সেই জলকে আরো ঘোলা করিয়া এই দলগুলি সেই ঘোলা জলেই মৎস ধরিতে বদ্ধপরিকর। সবই হয়ত হইবে, কিন্তু তাহার পর কি?

আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম সমস্যা—

বিবিধ রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষ করিয়া সি, পি, এম, সি, পি, আই এবং ইহাদের স্তোকবাক্যে প্ররোচিত সমর্থকদের কঠোর হস্তে দমন করা এবং ইহাদের সর্ব্বপ্রকার অনাচার নষ্টামী এবং হত্যালীলার অবসান করা। এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে অন্য কোন সমস্যার কোন সমাধান কেহ করিতে পারিবে না। এ রাজ্যের প্রধানতম এবং মূল ব্যাধি ইহাই এবং সাময়িক ব্যথাবেদনার নিরশনে কেবলমাত্র অ্যাসপিরীন বিধানে কোন ফল হইবে না। সাফাই টোটকা ঔষধ বেকার। রাজ্যের ভূত তাড়াইতে হইলে উপযুক্ত রোজা দ্বারা যথাযোগ্য ধোলাইয়ের প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বাধিক। এ রাজ্যের দেহ হইতে ব্যাধি তাড়াইতে উপযুক্ত ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। মূল ব্যাধি যদি নিরশন করা যায়, অন্যান্য সকল সমস্যার যথাযথ সমাধান আপনি হইতেই হয়ত হইয়া যাইবে। রোগকে জিয়াইয়া রাখার অর্থই হইবে এই যে 'রাজ্য-দেহে' রোগকে পাকা করা এবং যাহার ফলে রোগ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিবে এবং পশ্চিমবঙ্গরূপ রাজ্যদেহকে চিরতরে বিকল করা। রোগকে ক্রমিক পর্য্যায়ে না পাঠানোই—বুদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু আজ কাহাদের নিকট হইতে বিচার বুদ্ধির সামান্যতম কিছু প্রাশা করিতে পারি? সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ আজ আড়ষ্ট, পশ্চিমবঙ্গের আত্মা (যদি থাকে) আজ জড়ত্বপ্রাপ্ত আঘাতের পর আঘাতও এ দেহে সাড়া জাগাইতে পারিতেছে না। প্রাণের কোন প্রকার স্পন্দন আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

তোরা যে যা বলিস ভাই—আমাদের সোনার হরিণ চাই

—এবং সর্ব্ববিধ অনাচারদুষ্ট, নীতিহীন, কথায়

কথায় সাধারণ মানুষের জন্ত লোক দেখানো মড়া-কান্নায় রাস্তায় জল-কাদা করা ও সদ্য প্রভৃত বাম, দক্ষিণ, কংগ্রেস (নব এবং অতিনব) রাজগুলির দাবির জন্ত তথা রাজ্য ক্ষমতা লাভের কারণে মরিবে এই যাহাদের নিয়তি তাহারা অন্ধপ্রায়, সামনের ভয়ঙ্কর হইতে ভয়ঙ্করতর ধাপগুলি তাহাদের চোখে পড়ে না। যাহারা মারিবে, তাহাদের সঙ্কল্প স্থির এই রাজ্যের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে ভূত বানাইয়া ছাড়িবে, এই তাহাদের প্রতিজ্ঞা। জুয়াড়ীরা যখন জুয়ায় বসে তখন আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। স্বয়ং যুধিষ্ঠিরেরই ছিল না। তিনি বাজি ধরিয়াছিলেন দ্রৌপদীকে। এখানকার দণ্ডমুণ্ডের মালিক আর পার্টিওলারা আর এক কাঠি আগাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বাজী রাখিয়াছেন মাতৃস্বরূপা জন্মভূমিকে।

নহিলে অন্তত এতদিনে নির্বাচনী হুজুগটা নাকচ হইয়া যাইত। কিন্তু ভূমিকম্পে সব ধসিয়া গেলেও এই দুনিয়া যেমন ঘুরিতেই থাকে, হাকিমদের হুকুমও যেন তেমনই এক অমোঘ বিধান। একবার যখন স্থির করিয়াছেন ভোট হইবে, তখন সে রায় পাল্টায় সাধ্য কার। রক্তস্রোতে সব ধুইয়া যাক, প্রলয়পয়োধির ঢেউগুলি তাথৈ নৃত্যে মাতিয়া উঠুক ভাগ্যবিধাতারা নিজেদের সিদ্ধান্তটিকে বেদের মতো বুকে আঁকড়াইয়া ভাসিতে থাকিবেন।

বন্ধুবর, পুরাতন সহকর্মী, নেতাজীর আদর্শ অনুপ্রাণিত—হেমন্ত বসুর হত্যায় আগামীকালের স্রোতের গতি নির্ধারণ করিতেছে কিনা কে বলিবে। নির্বাচন—পূর্ব কয়েকদিনে আরো কতগুলি প্রাণ রাজপথে বলী হইবে বলা শক্ত। হেমন্ত বসু হত্যায় প্রধান মন্ত্রী মর্মাহত, এবং এই মর্মাহত হওয়াটা তাহার পক্ষে প্রায় প্রত্যাহিক রুটিনে পরিণত হইয়াছে, এই হত্যার ব্যাপারে সি, পি, এম নেতাদের ক্রন্দন এবং বিলাপ যেন একটা বিরাট পরিহাস বলিয়া মনে হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে যে দল হত্যালীলায় প্রধান উদ্যোক্তা এবং প্ররোচক, সেই দলের নেতাদের কাহারো মৃত্যু বা হত্যা লইয়া এ-ন্তাকামো না করিলেই শোভন হইত। কথায় কথায় যে দলের নেতারা বিরুদ্ধ দল তথা বিরোধীদের লিকুইডেট্ অর্থাৎ 'তরল' করিবার হুমকী দেয়, তাহাদের "শোক প্রকাশ" মৃতের প্রতি অপমান দেখানো।

আশা করি প্রধান মন্ত্রীর প্রান এ রাজ্যে পূর্ণ সার্থকতা পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

রবীন্দ্ররচনায় কীর্তিত প্রাচীন ভারতের কথা

গৌরীদাস মল্লিক

একদিন রবীন্দ্রনাথ বড় ক্ষুব্ধ হয়েই বলেছিলেন—

"আজি এ ভারত লজ্জিত হে,
হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে ॥
নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা,
সত্যসাধনা,
অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে, সকলই ব্রহ্মবিবর্জিত হে ॥"

বর্তমান যুগের ভারত সম্পর্কে তাঁর এই খেদোক্তি উচ্চারিত হয়েছিল বহু বৎসর পূর্বে। তখন ভারত ছিল পরাধীনতার হীনতায় লজ্জাবনত। তখনই তিনি লক্ষ্য করে ছিলেন, সকল ধর্মে-কর্মে ভারতবাসীর নাই পুরুষোচিত উদ্যম ও সাহস, নাই তাদের ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার ক্ষমতা ও আধ্যাত্মিকতায় আন্তরিকতা। ভারতবাসীর এইরূপ মানসিক দৈন্যদশা তাঁর মর্মে করেছিল আঘাত তিনি যে মনে-প্রাণে ছিলেন ভারতপ্রেমিক, প্রাচীন ভারতের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। তার সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগের ভাবধারা ও কর্মধারা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই, সেই ভারতের উত্তরপুরুষদের এইরূপ মনোবৈকল্যে তিনি যে ক্ষুব্ধ হবেন, তা আর আশ্চর্য কি!

প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য, তার ধর্ম-সংস্কৃতি-চিন্তাধারা, এই সবই তাঁর অধ্যাত্মপরায়ণ দার্শনিকমূলত অন্তরে অঙ্কিত করে দিয়েছিল প্রাচীন ভারতের এক মহিমোজ্জ্বল ছবি, সৃষ্টি করেছিল এক আনন্দোচ্ছল আবেগ। তাই তাঁর কাব্যে, গীতে, প্রবন্ধে ও ভাষণে দেখতে পাই তাঁর ভারতপ্রশস্তির কথা ও ভারত গৌরবের প্রচার।

একদিন তিনি শোনালেন ভারতগৌরবের কথা তথা ভারতপ্রশস্তি—"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
... ...
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার।
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে।
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে,
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।"

রবীন্দ্রনাথের অন্তর ছিল স্বভাবতঃ মানবতাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। এই আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার মধ্যেও দেখেছিলেন মানবতাবাদের প্রভাব, তার কর্মধারার মধ্যেও দেখে-ছিলেন মানবিক কার্যক্রম। তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল —প্রাচীন ভারত ছিল মানবতাবাদের পীঠস্থান। তাঁর ছিল স্থির বিশ্বাস—প্রাচীন যুগে ভারতের মানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত ঐক্যসাধনার প্রভাবেই দেশ-দেশান্তর থেকে শত্রু বা মিত্রবেশে আগত নানা জাতি নানা ধর্মের বিরাট মানব গোষ্ঠী এই ভারতের বুকে স্থান পেয়েছিল ভারতীয়রূপেই। ইতিহাসই এর সাক্ষ্য দেয়। নানা জাতি নানা ধর্মের বিরাট মানবগোষ্ঠীর দ্বারা অধ্যুষিত এই ভারত হয়ে উঠেছিল মহামানবের সম্মিলন ক্ষেত্র।

তাই ভারতকে রবীন্দ্রনাথ ভারততীর্থ আখ্যা দিয়েছেন, আর মানবের অন্তরাত্মাকে তিনি ভারত-তীর্থের দেবতা বলে গণ্য করেছেন। তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ করে আবেগকণ্ঠে তিনি একদিন গেয়েছিলেন—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে
উদার ছন্দে, পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।"

অধ্যাত্মভারত চিরকাল ধরেই বিশ্বাস করে এসেছে যে, মানুষের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান। তাই মানুষ নরনারায়ণরূপী। রবীন্দ্রনাথেরও যে এই বিশ্বাস ছিল, তাঁর কথায় প্রকাশ তিনি এই প্রসঙ্গে মানব সত্য প্রবন্ধে বলেছেন, "তিনি (ঈশ্বর) সেই অখণ্ড মানুষ…যিনি অরূপ, কিন্তু সকল মানুষের রূপের মধ্যে যাঁর অন্তরতম আবির্ভাব। তাই ভারতে সম্মিলিত নানা জাতির মানবের মধ্যে তিনি দেখেছেন দেবতার প্রকাশ। তাই ভারত তার কাছে তীর্থস্থান, সেই ভারততীর্থে নরদেবতাকে তিনি নমস্কার জানালেন। এমনি করে তিনি ভারতকে শ্রদ্ধার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করলেন।

প্রাচীন ভারতের ঐক্যসাধনা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর বিশ্বাস সেই সাধনার প্রভাবেই নানা দেশের নানা জাতির বিভেদ বিবাদ ভুলে এক জাতির রূপে ভারতের মধ্যেই মিলেমিশে অবস্থান করতে পেরেছিলেন। ভারতবর্ষের সেই ঐক্যমন্ত্রসাধকদের কার্যদক্ষতার পরিণতি যে কিরূপ হয়েছিল, তা তাঁরই কথায় প্রকাশ—

"হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওঙ্কার ধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।"

কিন্তু কি প্রতিভাবলে ভারতের ঐক্যবিস্তার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হতে পেরেছিল, সে সম্বন্ধে তিনি বেদ-পুরাণ-ইতিহাস থেকে জ্ঞানলাভ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তা তিনি প্রকাশ করে বলেছেন, "পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে, ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, নাসা কুঞ্চিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতে বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপন করিয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বৈদিক যুগের নিরাকারবাদী ভারতে পৌত্তলিকতাবাদের সূচনা সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতে বৈদান্তিক আর্যগণ ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন, ঈশ্বরের কল্পিত সাকার মূর্তি উপাসনায় অবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ যখন আর্যগণ পুলিন্দ শবর, ব্যাধ প্রভৃতি অনার্যগণের সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন, তখন অনার্যদের বীভৎস ধরণের দেবদেবীর মূর্তি ও তাহাদের পূজার তামসিক পূজা পদ্ধতিকে সুসংস্কৃত করে ও তাতে আধ্যাত্মিকতার ভাব আরোপ করে বৈদিক ধর্ম বজায় রেখে ক্রমশঃ আর্যগণ পৌত্তলিকতাবাদ গ্রহণ করেছিলেন। এইরূপে ধর্মীয় ব্যাপারে সকল বিভেদ মিটিয়ে আর্যগণ অনার্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারত অনার্যদের দিয়েছে আর্যগুণগত মনোবৃত্তি ও ধর্মাচরণ ব্যবস্থা, আর সে গ্রহণ করেছে শৈব-শাক্ত-

গাণপত্য প্রভৃতি সাকারসাধনাভিত্তিক ধর্মব্যবস্থা। এই ভাবেই সম্ভব হয়েছিল আর্য-অনার্যদের মধ্যে মিলন-সাধন। প্রাচীন ভারতের নীতি ছিল রবীন্দ্রনাথের কথায়—"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

এই উদার নীতি অনুযায়ী (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়)—

"হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান-মোগল একদেহে হলো লীন।"

বহির্ভারতের নানা জাতি এই ভারতে এসেছিল কেউ দস্যুবেশে, কেউ বা পর্যটক হিসাবে। কিন্তু ভারতের ঐক্যনীতি অনুযায়ী নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া তারা সকলেই ভারতের মধ্যেই রয়ে গেল ভারত-বাসী হয়ে। ভারতের এই কৃতিত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ শোনালেন, "এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ।...... এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্মরণাতীতকালে এসেছিল যারা, তাদের চিহ্ন ভূগর্ভে। এইপথে একদা এসেছিল হোমাগ্নি বহন করে আর্যজাতি। এইপথে এসেছিল মুক্তিতত্ত্বের আশায় চীনদেশ থেকে তীর্থযাত্রী, আবার কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ অর্থকামনায়। সবাই পেয়েছে আতিথ্য। এ ভারতে পথের সাধনা, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া-আসার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে।"

প্রাচীন ভারতের আতিথিপরায়ণতার দৃষ্টান্ত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান ভারতকে উদ্দেশ্য করে উপদেশচ্ছলে একদিন ঐ কথা বলেছেন। প্রাচীন ভারত বিদেশীর সহিত আত্মীয়তার যোগ স্থাপন করতে পেরেছিল তারা ঐক্যের পথ অনুসরণ করে—একথাও তিনি শোনালেন। যাঁরা এই ঐক্যপথের প্রবর্তক তাঁদের তিনি ভারতপথিক বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের সম্বন্ধে তিনি বললেন, "এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলে, ছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, তেজঃপ্রতাপ অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের সাধনায় নয়।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ জানালেন ভারতপথিক তথা ভারতের উদার চিত্তের কথা। ভারতের ঐক্যসাধনা যে রাজনীতি ব্যাপারে মিলন সাধনার মতো জটিলতা-কুটিলতায় আচ্ছন্ন ছিল না, তা যে ছিল মানবতা ও মানসতার উৎকর্ষ সাধনে পবিত্র ও উদার—এইভাবের কথাই তিনি উপরোক্ত মন্তব্যে প্রকাশ করে পরোক্ষে প্রাচীন ভারতের গুণগান করলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভারতের ঐক্যসাধনার কথা আলোচনা-কালে ঐক্যধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যা মন্তব্য করলেন, তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বললেন, "ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মানুষ ব্যর্থ হয়, তার কারণ সমবায়ধর্ম মানুষের সত্য ধর্ম, তার শ্রেষ্ঠতার হেতু।"

প্রাচীন ভারতে ঐক্যবোধ জাগ্রত হলো কিরূপে, তা বলতে গিয়ে তিনি উত্থাপন করলেন উপনিষদের কথা—"ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্ত ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয়নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে 'যিনি ঈশান সর্বান্তরস্থঃ যসংবিদ্রূপবিদ বিধান'—নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরস্থ করে যিনি জানেন তিনিই বিধান।"

উপনিষদ মন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ উক্ত উপনিষদের বাণীকে ভারতের ঐক্যমন্ত্ররূপে পরিগণিত করলেন এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেন।

রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক। দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন প্রাচীন ভারতের জীবন-দর্শন। ভারতের সত্য কি, তার বাণী, তার ঐতিহ্য ও তার সত্য পরিচয়ই বা কী—এইসকল প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজে পেয়েছেন বেদ-উপনিষদ-পুরাণাদি শাস্ত্র ও প্রাচীন ইতিহাস সমীক্ষণে, অধ্যয়ন করে। ঐসব শাস্ত্র-পুরাণাদির অন্তর্নিহিত তথ্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে প্রাচীন ভারতের সত্য, তার ধর্ম, তার সত্য পরিচয় সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তিনি তা

বিশদভাবে আলোচনা করেছেন বিবিধ প্রবন্ধে ও ভাষণে। উপরন্তু, তাঁর এইসব আলোচনায় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তাঁর ভারতপ্রশস্তি।

ভারতের সত্য কী—এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছেন, "ভারতের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।"

তাঁর মতে ভারতের সত্য জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে কোথাও সংকীর্ণ নয়, তা সর্বক্ষেত্রে উদার মহান ও আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন। স্পষ্ট কথায় তিনি এই কথাই বোঝালেন—"সে সত্য বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে; বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্য তপস্যা করেছেন।"

কিন্তু বুদ্ধদেবের মতো সত্যজ্ঞানী কে—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বললেন, "আমাদের শাস্ত্রে বারবার বলেছে নিজের মধ্যে যিনি সর্বভূতকে এবং সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। অর্থাৎ অহং সীমার মধ্যে আত্মার নিরুদ্ধ অবস্থা আত্মার সত্য অবস্থা নয়।"

রবীন্দ্রনাথের মতে, এইরূপ অহং জ্ঞানবর্জিত সর্বভূতে মৈত্রীভাবাপন্ন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষদের সত্য-সাধনার দীপ্তিই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়। ভারতের বৈশিষ্ট্য ছিল তার অহমিকাশূন্য প্রকৃতি। এই অহমিকা অর্থাৎ অহং-ভাবকে প্রশ্রয় দেয় নাই বলেই ভারতের সত্য পরিচয় সগৌরবে বিশ্বে ঘোষিত হতে পেরেছে। ভারতের সত্য পরিচয় সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করে তিনি বললেন, "অহংকেই যে মানুষ পরম ও চরম সত্য বলে জানে, সে বিনাশ পায়।......বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবনাতেই এই অহংভাব লুপ্ত হয়—এই সত্যটি আত্মার আলোক। এই আলোকদীপ্ত ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখতে পারেনি। এই আলোকের আভাতেই ভারতবর্ষ আপনার ভূখণ্ড-সীমার বাইরে আপনাকে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং এইটিই হচ্ছে ভারতের সত্য পরিচয়।"

ভারতের এইরূপ সত্য পরিচয়ের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর যেসব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, বিশেষ করে প্রাচ্যদেশ পরিভ্রমণকালে, তার মধ্যে একটির কথা উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। জাপান পরিভ্রমণকালে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, "জাপানের প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানীর সুগভীর ধৈর্য আত্মসংযম তার রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন এ কথা কতবার শুনেছি যে, এইসকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধ-ধর্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছে।"

ভারতের সত্য পরিচয়ের আলো ভারতের বহির্দেশের মানুষের হৃদয়কেও উদ্ভাসিত করেছিল,—এর পরিচয় রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় নানাভাবে পেয়েছেন। তাই তিনি গর্ববোধ করে ভারতের সত্য পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "এই পরিচয়ের আলোকেই নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করতে পারি তাহলেই আমরা ধন্য। আমরা যে ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেছি, সে এই মুক্তিমন্ত্রের ভারতবর্ষ, সে এই তপস্বীর ভারতবর্ষ।"

এইভাবে তিনি আবেগময় ভাষায় ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

সত্যদর্শী ভারতের বিশ্বমৈত্রীর আদর্শের কথা, তার মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেবার কথা—যা তিনি বিশদভাবে বলে গেছেন, তা ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসজনিত নয়, তা বেদ-পুরাণ-ইতিহাসসিদ্ধ। তিনি এই আদর্শের কথা শুধু মৌখিক আলোচনা করেন নাই, তিনি ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিতও হয়েছেন। তিনি তাঁর কর্মসাধনায়ও বিশ্বমৈত্রী ও মানবতার আদর্শ কার্যে রূপায়িত করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন।

ভগবদ্-বিশ্বাসী ব্রহ্মবাদী রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম ভারতের মর্মবাণীও শুনিয়েছেন বেদ-বেদান্তের বাণী উদ্ধৃত করে, গীতা-পুরাণাদির তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা করে। তাঁর বেদ-উপনিষদের জ্ঞান ছিল সুগভীর। ঐ শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মবাদ

তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের ছিল পরম সম্পদ। ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে ছিল তাঁর উচ্চ ধারণা। তিনি বলেছেন, "ধর্মের সরল আদর্শ আমাদের ভারতবর্ষেই ছিল।" তারপরই তিনি উপনিষদের ব্রহ্মবাদের মূল কথা উত্থাপন করে তার বিশুদ্ধ সরলতার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণার কথা প্রকাশ করে বললেন, "উপনিষদের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনা-জালদ্বারা বিজড়িত নয়।......তিনি অনন্ত সত্য, তিনি অনন্ত জ্ঞান। এই বিচিত্র জগৎ-সংসারকে উপনিষদ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ বিশেষ লোককল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাহার বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকলপ্রকার জটিলতা, সকলপ্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে ?"

উপরোক্ত মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শাস্ত্র উপনিষদের 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—এই মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেন। বলাবাহুল্য, তিনি নানা জাতির ধর্মগ্রন্থও আলোচনা করেছিলেন এবং সকল ধর্মের আদর্শের তুলনামূলক আলোচনা করে তবেই উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন।

"ধর্মের সরল আদর্শ আমাদের ভারতবর্ষেই ছিল" —তাঁর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তিনি উপনিষদের অখণ্ড ও পরিপূর্ণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সরল বিধানের কথা উত্থাপন করে আলোচনা করেছেন। ঐ একই উদ্দেশ্যে তিনি উত্থাপন ও আলোচনা করলেন ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনার মন্ত্রের কথা। এ সম্পর্কে তিনি বললেন, "আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা। ভারতবর্ষের এই উদ্বোধনের যে মন্ত্র আছে তাহাও সরল। ..... তাহা গায়ত্রী মন্ত্র।"

গায়ত্রী মন্ত্র উল্লেখ ও তার বিশদ ব্যাখ্যা করে উপসংহারে তিনি প্রশংসাসূচক মন্তব্য করলেন—"এই-রূপে গায়ত্রী মন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে। ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই যে প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি, ইহা যেমন উদার তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার কৃত্রিমতা-শূন্য।"

আজন্ম ব্রহ্মোপাসক পিতার সান্নিধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও ঘোর ব্রাহ্মধর্মবিশ্বাসী হয়ে উঠে-ছিলেন। উপরন্তু বেদ-উপনিষদ-শাস্ত্রাদি চর্চার দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও তিনি অর্জন করে ছিলেন। তাই তিনি উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে উচ্ছ্বাসত হয়ে প্রশংসা করেছেন। আর একসঙ্গে তিনি উপনিষদের উদার সরল ধর্মকে ভারতের কীর্তি মনে করে ভারতের প্রশংসা করে বলেছেন, "আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম এরূপ সরল, এরূপ উদার, এরূপ অন্তরঙ্গ, তাহাতে সর্বাচিত কল্পনা-কুহকের স্পর্শ নাই।"

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে অন্তর্নিহিত মহর্ষিদের মহামূল্য আধ্যাত্মিক ও মানবিক বাণীকে ভারতের বাণী বলে অভিহিত করতেন। এমন বাণীর মধ্যে যেটি উপনিষদের মহত্তম বাণী অর্থাৎ বিশ্বমৈত্রীর বাণী, তা ভারত ও বৃহত্তর ভারতে যে উপায়ে প্রচার করেছিল, তাও তিনি মহৎ বলে প্রশংসা করেছেন। এই প্রসঙ্গেই এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের বাণী আমরা পাই সে বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ, তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে, তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা—সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, পীড়ন-লুণ্ঠন দিয়ে নয়।"

ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু উপনিষদের বাণীর গুণকীর্তন করেন নাই, গীতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র-বাণীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ

করে তাঁর গুণগানও করেছেন। কোন এক প্রসঙ্গে গীতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "গীতায় জ্ঞান-প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।"

জ্ঞান, প্রেম, কর্ম—এই তিনটি মনুষ্যত্বের পরম উপাদান। ইহাদের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য স্থাপন করলে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ—এই তিনটি সাধনা আর পরস্পর বিরোধী হয় না, বরং উহাদের মধ্যে পরস্পরের সমন্বয় ঘটে। গীতার এই সমন্বয়ের কথাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। গীতার উপরোক্ত সামঞ্জস্য-বিধানের শক্তি অবলম্বন করে তিনি ভারতের ধর্মের বহু-ব্যাপকতার সম্বন্ধে তাঁহার নিজ মত ব্যক্ত করলেন, "ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটতে বাধা দিয়াছে—আমাদের বুদ্ধি-বিশ্বাস-আচরণ, আমাদের ইহকাল-পরকাল সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম...... বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম,......এবং গুহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম,......ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।"

এই সর্বব্যাপী ধর্মের মূলে আছে যে ভারতের নিজস্ব সাধনা, তা হচ্ছে (রবীন্দ্রনাথের কথায়) "বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ আত্মার যোগ,......কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।"

এই কথা বলে তিনি উদ্ধৃত করলেন গীতার এক শ্লোক। তিনি বললেন, "গীতা বলেছেন,—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥"

এই শ্লোকের অর্থ বুঝিয়ে পরে তার ব্যাখ্যা করলেন, "ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি। ......ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয়। কিন্তু সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। ......মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি, যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারাই অনুভব করা ভারতের সাধনা।"

বিশ্বেশ্বরকে বিশ্বের মধ্যে যে বোধের দ্বারা অনুভব করা যায় তাহাই বিশ্ববোধ। এই বিশ্ব-বোধকে আয়ত্ত করা ছিল ভারতের সাধনা। এই সম্বন্ধে তিনি অন্য প্রসঙ্গে বলেছেন, "ভারতবর্ষ এই সাধনার উপরেই সকলের চেয়ে বেশী জোর দিয়েছিল—এই বিশ্ববোধ, সর্বানুভূতি।"

অবশেষে গীতার উপরোক্ত শ্লোকটি অবলম্বন করে তিনি বোঝালেন, "......ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত......কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।"

গীতার এক বাণী উল্লেখ করে এবং তার অন্ত-র্নিহিত সারমর্ম উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে দেখতে পেলেন বিশ্ববোধ সাধনার এক মহৎ উপদেশ। এইরূপ "ভারতের সাধনার" মহত্ত্ব উপলব্ধি করে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করলেন, "ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

তারপর ভারতের যেসব প্রতিভাশালী জ্ঞানী-যোগী-তপস্বী-ঋষিদের সাধনার দ্বারা নানা ধারায় প্রবাহিত বহুপ্রসারী ধর্মের প্রচার সম্ভব হতে পেরেছিল, সেই সব মহাপুরুষদের মহৎ বাণী স্মরণ করে তিনি তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন। ভারতের মহা-

প্রাণ ঋষি তাঁরা, তাঁরাই জগৎবাসীদের আধ্যাত্মিক জগতের কত আনন্দ-অমৃত-বাণী শুনিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের উদ্দেশে তিনি একদিন ভাবাবেগে শ্রদ্ধা জানালেন সুললিত-ছন্দোময় কবিতায়—

"একদা এ ভারতের কোন বনতলে—
কে তুমি মহান প্রাণ, কী আনন্দবলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে: 'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।'

এইভাবে ভারতের এক তপোবন বাসী মহাপ্রাণ মহর্ষিকে তিনি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে তাঁরই রচিত কবিতার মাধ্যমে শোনালেন সেই মহর্ষির এক আধ্যাত্মিক আনন্দময় অমৃতবাণী, যা লিপিবদ্ধ করা আছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এক শ্লোকে—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥"

সেই তপোবনবাসী মহর্ষির অমৃতের বাণী রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে যেন এক অপূর্ব আনন্দরসের সঞ্চার করেছিল। তাই, তিনি সেই বাণীকে বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত করে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—

"সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়,
পরম ঘোষণা, সে একান্ত নির্ভয়
অনন্তঅমৃতবার্তা।"

জীবনাবসানের প্রায় দুই বৎসর আগেও 'রোগ-শয্যায়' তিনি বেদমন্ত্র-রচয়িতা আর এক ঋষির বাণী স্মরণ করে ভাবাবেগে বলেছিলেন—

"ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর
দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।"

[illegible] 'আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি।' [illegible] উপলব্ধি করে [illegible] আনন্দরূপমমৃতং [illegible] আপনাকে [illegible] শোক-দুঃখ, অশান্তি-অভাব, বিচ্ছেদ-মৃত্যু [illegible] হাহাকার করিতে করিতে সংসারে [illegible]।"

মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর আগে ঐ ঋষির উক্ত বাণী উদ্ধৃত করে তার সম্বন্ধে তিনি যা উপলব্ধি করেছিলেন তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তাঁহার (ঈশ্বর) আনন্দরূপ অমৃতরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। ..... একবার যদি চোখ মেলে, যদি নাই পাই......তবে যেখানেই চোখ পড়ে সেখানে তাহাকেই দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। বনে-বনান্তে, জনে-প্রান্তরে, অপকারে অপমানেও তাঁহাকে দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। ......তখন বুঝিতে পারি, যে, আনন্দে আকাশে বাতাসে আলোক-উদ্ভাসিত আমাদের সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ: সেই আনন্দে আমি কাহারও চেয়ে কিছুমাত্র হীন নহি, আমি সকলেরই সমান, আমি জগতের সঙ্গে এক। সেই আনন্দে আমার ভয় নাই, ক্ষতি নাই, অসম্মান নাই।"

কী গভীর ও মহান তাঁর উপলব্ধি 'ঋষির একটি বাণী' সম্বন্ধে যা তাঁর চিত্তে দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল।' এইসব ঋষিরা ভারতের গৌরব—রবীন্দ্রনাথের ছিল এই স্থির বিশ্বাস। এই সম্বন্ধে এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী-জ্ঞানী, শূর-

বীর, রাজা-মহারাজার মধ্যে এমন কোন্ মানুষদের দেখেছিল যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে?......তাঁরা ঋষি। ......সেই ঋষি তাঁরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন। ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন, ভোগী নন, প্রতাপশালী নন, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।......তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।"

"ভারতবর্ষ...যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল" "সেই যুক্তাত্মা ঋষিরা রবীন্দ্রনাথের অন্তরে বিস্তার করেছিল অধ্যাত্মপ্রভাব যার ফলে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ব্রহ্মের স্বরূপ—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি'। আর তাঁর এই উপলব্ধি গানে গানে তিনি রূপায়িত করে তুলেছেন। আর, ভারত-ঋষিদের উদ্দেশ্যে কাব্যকুসুমের অঞ্জলি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন তাঁদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

যে 'তপোবন-তরুচ্ছায়ে' অবস্থিত 'বনভবনে' এই সকল বল্কলবসন ঋষিগণ করতেন "মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন। মহাতত্ত্বগুলি......" সেই তপোবনের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছেন 'কত জ্ঞান-ধর্ম্ম, কত কাব্যকাহিনী'। তাই সেই 'ভারতের তপোবনতলে'র করলেন গুণকীর্ত্তন—

> "যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
> স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষ শীতল,
> ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।
> বস্তুভারহীন মন সর্ব্ব জলেস্থলে
> পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
> জড়ে জীবে সর্ব্বভূতে অবারিত ধ্যান
> পশিত আত্মীয়রূপে।........."

এই প্রশস্তি শুধু তপোবনের নয়, 'ভারতের তপোবনতলে'র প্রশস্তি; তথা ভারতের প্রশস্তি। এই প্রশস্তি তাঁর আবেগজনিত নয়, তা তাঁর উপলব্ধজ্ঞানপ্রসূত। এই তপোবন যে কেন মহিমময়, তার কারণও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন তার সাধনার কথা উল্লেখ করে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, অর্থাৎ যা কিছু সমস্তের সঙ্গে ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন—এইটে হচ্ছে তপোবনের সাধনা।"

রবীন্দ্রনাথের মতে তপোবন সংসারে অনাসক্ত কৃচ্ছ্র সাধনরত বৈরাগ্যব্রতধারী সন্ন্যাসীদের কঠোর ব্রহ্ম-সাধনার তপঃক্ষেত্র ছিল না। বিশ্বের যা কিছু বর্তমান —আধ্যাত্মিক জগৎ, প্রকৃতি জগৎ, প্রাণী জগৎ ও মানব জগৎ—এই সকলের সঙ্গে পরস্পর আত্মিক যোগসাধনের তপস্যা ছিল এখানে। জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে বাদ দিয়ে এখানে শুধু ভগবদ্‌চিন্তায় আত্ম-নিয়োগ করা হয়নি। ভগবদ্‌চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে জীবের প্রতি হিংসা না করা পশুপক্ষী এমনকি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্ম্মের চর্চা করা, প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ের প্রীতির সম্বন্ধসূত্র প্রসারিত করা, সমাজ-কল্যাণকাজে আত্মনিয়োগ করা—এ সকলই ছিল তপোবনের সাধনা। তপোবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ছিল এইরূপ উচ্চ ধারণা। একদিকে যেমন, (রবীন্দ্রনাথের কথায়) "এখানে সূর্য্য অগ্নি বায়ু জলস্থল আকাশ তরুলতা মৃগপক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ, এখানে চতুর্দ্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই' —অপরদিকে তেমনি এইখানকার "আরণ্যকদের সাধন থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল—" যে "অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তপোবনের প্রভাব সুদূর-প্রসারী—অধ্যাত্মসাধনায়, গৃহধর্ম্মে, সমাজকল্যাণে রাজধর্ম্মে, শিক্ষাব্যাপারে সর্ব্বত্রই তার অবদান বিদ

মান। তাঁর এই ধারণার মূলে ছিল ভারতের পৌরাণিক কাহিনীগুলি যার পশ্চাৎপটে তিনি লক্ষ্য করেছেন তপোবনের প্রতিভাস্বিত প্রভাব। এ কথা প্রকাশ তাঁরই কথায়—"ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য সমস্ত সেই প্রাচীন তপোবন-স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত।"

প্রাচীন ভারতের তপোবনের উদার কল্যাণময় অবদান রবীন্দ্রনাথের অন্তরে যে গভীর রেখাপাত করেছে, তাতে সন্দেহ নাই। তাই তারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদিন তিনি শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির উন্মুক্ত অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এর কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—"আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।"

তাঁর এই বিশ্বাসের মূলে ছিল প্রাচীন ভারতের তপোবন সম্বন্ধে তাঁর এক উচ্চ ধারণা, যা তাঁরই কথায় প্রকাশ—

"যে প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসাসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।"

কিন্তু তপোবনের সেই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত তাঁর সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম আজকের নবসভ্যতার বস্তুতন্ত্রীয় যুগে আদর্শচ্যুত হতে বসেছে। কারণ এই যুগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী (তাঁর উক্তিতে)—

"চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।"

তাই বুঝি, তপোবনের আদর্শে সৃষ্ট তাঁর সাধের শান্তিনিকেতন আজ অশান্তির আগুনের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

পুরাণ ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অনুশীলন করে ভারতীয় সভ্যতা তথা হিন্দু-সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে প্রাচীনকালের বিশাল সমাজগঠন কার্যে যে দক্ষতার পরিচয় তিনি পেয়েছেন, তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। শুধু উল্লেখ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশদভাবে বুঝিয়ে তিনি তখনকার পরিবেশ অনুযায়ী সমাজব্যবস্থার নীতি সমর্থনও করেছেন। এই সম্বন্ধে এক প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "হিন্দুসভ্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাতি নাই। প্রাচীন শকজাতীয় জাঠ ও রাজপুত, মিশ্রজাতীয় নেপালী, আসামী, রাজবংশী; দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার—সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও সুবিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা বৃহৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একত্রে বাস করিতেছে। হিন্দুসভ্যতা......উচ্চ-নীচ, সবর্ণ-অসবর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্মের আশ্রয় দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধঃপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।"

কিন্তু কি উদ্দেশ্য এবং কি উপায়ে প্রাচীন ভারত 'নানা-ভাষা নানা-মত নানা-পরিধান' বিশিষ্ট বিবিধ মানবগোষ্ঠীকে মিলিত করে এক সুবিশাল হিন্দুসমাজ গঠন করতে পেরেছে, সে সম্বন্ধেও তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বললেন, "ভারতের লক্ষ্য ছিল সকলকেই এক সূত্রে আবদ্ধ করা। কিন্তু তাহার উপায় ছিল স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজ কলেবরকে এক এবং বিচিত্র কর্মের উপযোগী করিয়াছিল, নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ-বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই। পরস্পর প্রতিযোগিতার পথেই সমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রামপরায়ণ করিয়া ধর্ম-কর্ম-গৃহ সমস্তকেই আবর্তিত আবিল উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখে নাই।"

এইখানে রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে হিন্দুদের চার বর্ণাশ্রমের কথা তুললেন। এই চার বর্ণাশ্রমের নীতিকে তিনি সমর্থন করে বললেন, "বর্ণাশ্রমের সূত্র আমাদের

জীসমাজ ও পরিবারমণ্ডলীকে হারের মত গাঁথিয়া তুলিয়াছে।"

তাঁর এই সমর্থনের পিছনে যে এক সুনির্দিষ্ট যুক্তি ছিল, তা প্রকাশ করে তিনি বললেন, "বর্ণভেদদ্বারা ভারতবর্ষে প্রতিযোগিতার বন্দ্বযুদ্ধকে নিবৃত্ত করিয়াছে এবং ধন ও ক্ষমতার পার্থক্য যে অভিমানকে সৃষ্টি করে, জাতিভেদের বেড়ার দ্বারা তাহার সংঘাতকে সে ঠেকাইয়াছে। ....সমস্ত সুখ-সুবিধা-শিক্ষা-দীক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য নানা-বিধ ছোট-বড়ো প্রণালী বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে। এই জন্যে ভারতবর্ষে ধনী যাহা ভোগ করে নানা উপলক্ষে সর্বসাধারণে তাহার অংশ পায় এবং জন-সাধারণকে আহার দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া ক্ষমতাশালী ক্ষমতা খ্যাতিলাভ করে।"

নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানাপ্রকার বিরুদ্ধ আচার-বিচার হিন্দুসমাজে তথা প্রাচীন ভারতে স্থান পেয়েছিল। সেই সমস্তাসংকুল সমাজে নীচে হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধার যে সমাজবিধির নীতির প্রচলন ছিল, সেই সম্বন্ধে তিনি উল্লিখিত কথায় এক প্রশংসাসূচক বিবরণ দিলেন।

কিন্তু সেই নীতি পরিবর্তনশীল পরিবেশে চিরস্থায়ী থেকে তৎকালীন সমাজকে স্থবির ও পঙ্গু করে রাখেনি —এই সত্য উদ্ঘাটন করে তিনি আর এক প্রসঙ্গে বললেন, "এ কথা একেবারেই সত্য নহে যে ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে উদ্ভিন্ন হয় নাই। ভারত-বর্ষকেও অবস্থাভেদে নব নব বিপ্লবের তাড়নায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই—এবং ইতিহাসে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়।"

প্রাচীন ভারতের মনীষীরা সমাজের 'সুষ্ঠু' ব্যবহার যে নীতি প্রচলন করেছিলেন, তা তখনকার কালে অভিযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের কথায় "তখনকার নিয়ম, তখনকার অনুষ্ঠান তখনকার সময় হিসাবে নিরর্থক ছিল না।" কিন্তু সময় যখন বদলায়, তখন সেই নিয়ম, সেই অনুষ্ঠান নিরর্থক হয়ে পড়ে। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে পুরাতন নীতির পরিবর্তন সাধন করে যুগোপযোগী সার্থক নিয়মাদি প্রচলন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ভারতের পূর্বপুরুষগণ এই সত্য যে মানতেন তা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন এই বলে "আমাদের পিতামহরা যে বড়ো হইয়াছিলেন সে কেবল প্রপিতামহদের কোলের উপরে নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া নহে। তাঁহারা ধ্যান করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সচেষ্ট ছিল, সেই জন্যেই তাঁহারা বড়ো হইতে পারিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ যেন গর্বের সঙ্গে এই কথাটি বললেন। তিনি শুনিয়ে দিলেন যে, ভারতের পূর্বপুরুষগণ অলস ছিলেন না, পরিবর্তন-বিরোধী ছিলেন না। প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন করতেন, কিন্তু তা অকারণে নয় অবহেলা করে নয়, বিশৃঙ্খলভাবে নয় তা করতেন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সচেষ্ট হয়ে। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে "আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই জন্যেই এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এই সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষা করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।"

তাঁর এই কথায় বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারত সাম্রাজ্যবাদ অনুসরণ করে নাই, সে অনুসরণ করেছিল এক কল্যাণকর সমাজবাদ যা সে কার্যে রূপায়িত করেছিল সমাজের কল্যাণে ও ধর্মসংরক্ষণে; যুগপরিবর্তনে সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের স্বাধীনতা তখন তার ছিল সমাজকল্যাণেরই উদ্দেশ্যে। সে যুগের ভারতের স্বাধীনতা ও সমাজবাদ ছিল কল্যাণকর, এ যুগের মতো জটিল-কুটিল-অশান্তিজনক ছিল না। প্রকৃত

স্বাধীনতাকামী ও সমাজসংস্কারক রবীন্দ্রনাথের উদার অন্তরে প্রাচীন ভারতের এই গুণাবলী যে গভীর রেখাপাত করেছিল তাতে সন্দেহ নাই।

বৈদিকযুগ ও পৌরাণিক যুগের পর প্রাচীন ভারতে সূচনা হলো আর যে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ সে হলো বৌদ্ধযুগ। ভারতের বুকে আবির্ভাব হলো বুদ্ধদেবের। তাঁর অহিংসা মৈত্রীর বাণী ভারত ও বহির্ভারতে এনে দিল এক ধর্মীয় জাগরণ। তাঁর প্রবুদ্ধবাণী দয়া-ধর্মবিষয়ক উপদেশ রবীন্দ্রনাথের অন্তরকে করলো মুগ্ধ, হৃদয়কে করলো ভাবাবিষ্ট। বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি অজস্র ধারায় বর্ষিত হলো। বুদ্ধদেবকে সর্বান্তঃকরণে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে তিনি এক বুদ্ধপূর্ণিমায় বললেন, "আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।"

তিনি বুদ্ধকে মানব শ্রেষ্ঠরূপে উপলব্ধি করেছেন। তিনি মনে করতেন, বুদ্ধের সাধনা তাঁর ধর্মোপদেশবাণী তাঁর দর্শন ভারতে এনে দিয়েছিল এক মহান অধ্যাত্ম-যুগ, ভারতকে করেছিল ধন্য, দেশবিদেশের কাছে ভারতকে করেছিল মর্য্যাদাসম্পন্ন। তাই বুদ্ধদেব প্রসঙ্গে একদিন তিনি লিখেছিলেন 'বুদ্ধদেবের প্রতি'—কবিতায়—

> "ওই নামে একদিন ধন্য হলো দেশ দেশান্তরে
> তব জন্মভূমি।"

তিনি বৌদ্ধদর্শন, জাতক-কাহিনী প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে ঐতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনা করে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন। বুদ্ধের বাণী তাঁর অন্তরে অন্তরে এক অনির্বচনীয় ভাবরসের সৃষ্টি করেছিল। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন, বুদ্ধের প্রকাশে ভারত এক সত্যের আলোকে দীপ্ত হয়ে, দেশবিদেশে সম্মানিত হয়ে তীর্থে পরিণত হয়েছে। এক প্রসঙ্গে তাঁর সেই বিশ্বাসের কথা বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন. "ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশ করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হলো ভারতবর্ষের।.........ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেন না বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে, সকল মানবকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করেনি......সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশবিদেশের সকল জাতির কাছে।.........ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছেন।......শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান্‌ করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।"

এইভাবে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের অন্তর থেকে নিঃসৃত হলো বুদ্ধদেবের মানবপ্রেমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা, আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে জগৎসভায় তদানীন্তন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠার কথা।

প্রাচীন ভারতের আর্যঋষিদের উপনিষদ্‌বচন তাঁর চিত্তে যেমন গভীর রেখাপাত করেছিল, তেমনি করেছিল ভগবান বুদ্ধের অহিংসার মন্ত্র, তথা মৈত্রী করুণার বাণী। আবার প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক যুগের রামায়ণ মহাভারতের মানবজীবনের সংঘর্ষময় কথা কাহিনী যেমন তাঁর চিত্তকে করেছিল আকর্ষণ, তেমনি করেছিল বৌদ্ধযুগের জাতককাহিনী—বৌদ্ধগাথা। আর্যকীর্তি যথা, বেদ-উপনিষদের ব্রহ্মচিন্তা, বিশ্ববোধ, ঐক্যতত্ত্ব প্রভৃতি এবং ঐক্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, পরবর্তী যুগের বৌদ্ধধর্ম, তথা বুদ্ধ-উপদিষ্ট ব্রহ্মবিহারতত্ত্ব, যার মধ্যে নিহিত আছে অপরিমেয় মৈত্রীভাবনার নির্দেশ, অহিংসার আদর্শ ও প্রবুদ্ধবাণী—এই সব প্রাচীন ভারতের সম্পদরাশি রবীন্দ্রমানসপটে রচনা করেছিল

এক স্বপ্নময় ভারত যার গৌরবকথা স্মরণ করে তিনি গৌরবান্বিতবোধ করতেন।

কিন্তু আজ তাঁর সেই মহিমান্বিত ভারত (তাঁরই ছন্দোবদ্ধ কবিতার প্রকাশ)—"গত-গৌরব, হৃত-আসন, নতমস্তক লাজে।" এই জন্যই তাঁর আক্ষেপ—

"আজি এ ভারত লজ্জিত হে,
হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে।
নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা,
কঠিন তপস্যা, সত্যসাধনা।"

মানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত অধ্যাত্মভারতের স্বর্গীয় পরিবেশের কথা স্মরণ করে তাঁর বড় গৌরবের "এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" দাঁড়িয়ে তিনি ভাবাবেগে একদিন বলেছিলেন, "হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে।" কিন্তু "আজি সভ্যতার

অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,

দীনদরুধিরপুষ্ট" বর্তমান ভারতের অমানুষিকতার কথা স্মরণ করে আর একদিন তিনি শোনালেন ধিক্‌কার বাণী—

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাঁহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে, বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

যে ভারত এক যুগে ছিল মানবতার পীঠস্থান, সেই ভারতে আজ মানুষ অপমানিত, প্রতারিত, মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত। তাই রবীন্দ্রনাথ বিক্ষুব্ধ। কিন্তু তিনি সদাই কামনা করে এসেছেন অধ্যাত্মবাদ মানবতাবাদের অগ্রদূত এই ভারত আবার যেন জাগিয়ে তোলে প্রাচীন ভারতের সেই স্বর্গীয় পরিবেশ যে পরিবেশ তাঁর অন্তরকে মুগ্ধ করেছে তাঁর মনে ভারতগৌরববোধ জাগিয়ে তুলেছে। তাই তিনি একদিন জগৎপিতার কাছে জানালেন তার বিক্ষুব্ধ মনের কামনা—

"......................নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"
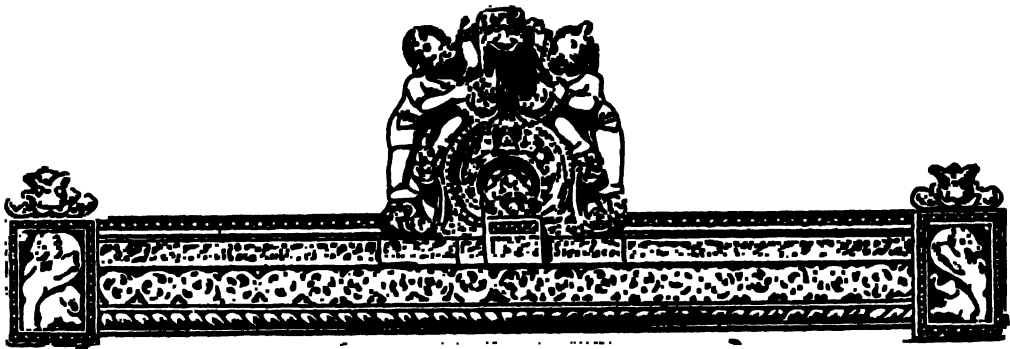
নির্ব্বাচন সম্বন্ধে জনমত

নিম্নের উদ্ধৃতিটি প্রকাশিত হইবার পূর্বেই নির্ব্বাচন হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু লেখকের মতামতের জনমতের সহিত বিশেষ ঐক্য থাকায় তাঁহার কথাগুলির একটা মূল্য সর্ব্বকালের জন্যই থাকিবে মনে হয়। লেখক শ্রীদেবল কুমার গুপ্ত কোন মতলব সিদ্ধির জন্য প্রচার কার্য্য করিয়া থাকেন বলিয়া মনে হয় না। জনমত গঠন ও তাহার পূর্ণতর অভিব্যক্তিই তাঁহার প্রচেষ্টার প্রেরণা বলা যাইতে পারে। তিনি বলিতেছেন :

এইসব দলগুলি এবং তাহাদের নেতাদের নিকট কি আশা করা যাইতে পারে? জনসাধারণের অধিকাংশের কোন নিজস্ব নীতি অথবা মত নাই। জনসাধারণ চার ভাগে বিভক্ত। সুবিধাবাদী, অজ্ঞ, বিভ্রান্ত এবং অতি সামান্য। লোকের নিজস্ব একটা নীতি অথবা মত আছে। নির্ব্বাচন হইলে দেশের কোন সুরাহা হইবে না, অনর্থক কিছু টাকা খরচ হইবে। উপরন্তু দলগুলির নেতাগণ যেভাবে জোট বাঁধার কথা চিন্তা করিতেছেন তাহাতে কোন ফ্রন্টই ১৪১টি আসন পাইবে না। Stable Government হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। গভর্ণমেন্ট হইলেও আগের মতই গোঁজামিল দিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করা হইবে।

নকশালগণ ভবিষ্যতে কিছুই করিতে পারিবে না। তাহাদের Constructive কোন plan and programme নাই। বর্ত্তমানের সমস্ত ধ্বংস করিবার পর তাহারা কি করিবে সে বিষয়ে তাহারা কিছুই জানে না। উপরন্তু তাহাদের নেতাগণ এ সম্বন্ধে কোন কিছুই প্রচার করেন নাই। কাজেই তাহারা ক্ষমতা হাতে পাইলেও দেশ কোন প্রকার লাভবান হইবে না উল্টা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। নকশালগণ-খুন, জখম, লুটতরাজ এবং ধ্বংসাত্মক কাজ করিতে পারিবে। "চীনের চেয়ারম্যান 'মাও সাতুং' আমাদেরও চেয়ার ম্যান এবং 'চীনের পথ' আমাদেরও পথ" এই কথাগুলি দেয়ালের গায়ে ভাল করে আলকাতরা দিয়া লেখার কেরামতী দেখাইতে পারিবে।

পূর্ববঙ্গের নির্ব্বাচনে ভোটের ফল দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের শিক্ষা লাভ করা উচিৎ। মুজিবর রহমনের দল রুশ, চীন, আমেরিকা, ইংলণ্ড অথবা অন্য কোন দেশের নীতি অনুসরণ না করিয়া আশ্চর্য্যজনক সাফল্যলাভ করিয়াছে। নির্ব্বাচনে পৃথিবীতে একটা নূতন record স্থাপন করিয়াছে। মুজিবর রহমনের দল যে নীতির উপর জয়ী হইয়াছেন, সেটি হইতেছে বাংলাদেশের বাঙ্গালীত্ব। বাংলার সাহিত্য, বাংলার সংস্কৃতি এবং সর্বপরি বাংলা ভাষার জয়।

আজ কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন, বাংলা কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় নব কংগ্রেসের বিজয়সিং নাহার সকলেই তাহারা বলিতেছেন 'Bengal Regiment গঠন করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গের জয়ে জ্যোতি বসুও আনন্দ প্রকাশ করিয়া সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়াছেন এবং তাহার পার্টি C. P. M. তরফ থেকে Poster মারা হইতেছে "পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রের উপনিবেশ হইতে দেওয়া হইবে না।" আমরা যখন এইসব কথা বলিতাম এবং আন্দোলন করিতাম তখন তাঁহারা আমাদের প্রাদেশিকতা করিতেছি বলিয়া আখ্যা দিতেন। শীঘ্রই আবার নির্ব্বাচন হইবে। এখন ভোট পাইবার জন্য এইসব কথা বলিতেছেন। এইসব মন্ত্রীগণ যখন ক্ষমতায় ছিলেন

তখন কোন প্রকার আন্দোলন করা দূরের কথা কোনও বিবৃতি সংবাদপত্রে দেন নাই, এমনকি ঐসব বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য পর্যন্ত করেন নাই।

কাজেই নির্ব্বাচনী প্রচার পত্রে দলের আদর্শ ও নীতি পরিষ্কারভাবে প্রচার করিতে হইবে। প্রচার পত্রে যাহা লেখা হইবে সেই মত তাহাদিগকে গভর্ণমেন্ট চালাইতে হইবে অন্যথায় তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন ইহা লিখিতভাবে প্রচার পত্রে ঘোষণা করিতে হইবে।

নেতাজী সম্বন্ধে নূতন কথা

খোসলা কমিশনের কি হইল তাহা সঠিক কি কেহ জানেন? ঐ কমিশনের নিকট যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহারও সকল কথা প্রকাশিত হয় নাই। যুগবাণী সাপ্তাহিকে কিছুকাল পূর্ব্বে একটি সাক্ষ্যের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল ; তাহা আমরা পুনঃমুদ্রিত করিতেছি :

দিল্লীতে নেতাজী তদন্ত কমিশনের দ্বিতীয় দফার অধিবেশনে যে সব সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে দুর্ভাগ্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের পক্ষে তাহা জানা সম্ভব হয় নাই। যদিও অধিবেশন প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলি উহার বিবরণ প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। এই নীরবতার ষড়যন্ত্র কেন। আমরা এখানে এক দিনের সাক্ষ্যের কথা প্রকাশ করিতেছি—উহা যে কতদূর চাঞ্চল্যকর পাঠকরা বুঝিতে পারিবেন।

গত ৩১শে ডিসেম্বর এস. এল জৈন নামে একজন টাইপিস্ট কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ১৯৪৫ সালে আই. এন. এ সৈনিকদের বিচারের সময় যে আই. এন. এ ডিফেন্স কমিটি গঠিত হইয়াছিল তিনি উহাতে একজন টাইপিস্ট হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন পরলোকগত আসফ আলি। ১৯৪৫ সালের ২৬।২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ৺জহরলাল নেহরু শ্রীজৈনকে আসফ আলির বাড়িতে ডাকিয়া পাঠান। সেখানে নেহরু তাঁকে একটি হাতে লেখা নোট টাইপ করার জন্য দেন। নোটের বয়ান ছিল এইরকম :

সুভাষচন্দ্র বসু সাইগন হইতে ২৩।৮।৪৫ তারিখে (অর্থাৎ ১৮ই আগস্টের তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পাঁচদিন পর) একটি বিমানে দাইরেনে আসেন। দাইরেন মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি। দুপুর দেড়টায় সেখানে বিমানটি অবতরণ করে। সেখান হইতে একটি জীপে চারজন সঙ্গী সহ শ্রীবসু রুশ অধিকৃত মাঞ্চুরিয়ায় চলিয়া যান। জীপটি রুশ এলাকা হইতে আবার দাইরেন বিমান বন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা বিমানের পাইলটকে খবর দেয় যে নেতাজী নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে রাশিয়ায় প্রবেশ করিয়াছেন।

খোসলা কমিশনে শ্রীজৈন এই সাক্ষ্য দিলে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে ঐ নোটটির লেখক কে। জৈন বলেন যে স্বাক্ষরকারীর নাম অস্পষ্ট ছিল। তাই তিনি নেহেরুকে স্বাক্ষরকারী কে তাহা জিজ্ঞাসা করেন। নেহরু বলেন শ্রীজৈনের তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই, টাইপ করার পর নোটের তলায় স্বাক্ষরকারীর নাম 'ইলেজিবল' লিখিয়া দিলেই চলিবে।

নেহরু ঐ নোটের সঙ্গে নিজের প্যাডে একটি চিঠি লিখিয়া ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্লিমেন্ট অ্যাটলিকে পাঠাইয়াছিলেন। নেহরুর চিঠিটি ও শ্রী জৈনকে টাইপ করিয়া দিতে হয়। নেহেরু ঐ চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে রাশিয়া যখন মিত্রশক্তির অন্যতম তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকার শত্রু সুভাষ বসুকে কিভাবে স্তালিন নিজ দেশে আশ্রয় দিতে পারেন? তাঁহার পক্ষে ইহা ঘোরতর অন্যায়—এমন কি স্তালিন ইহার ফলে মিত্রশক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন বলিয়া গণ্য করা যায়। মিঃ অ্যাটলি যেন সুভাষ বসুকে মিত্রশক্তির হাতে তুলিয়া দিবার জন্য স্তালিনের উপর চাপ দেন।

শ্রী খোসলা প্রশ্ন করেন সাক্ষী কি নেহরুর এই চিঠির কথা ১৯৪৫ সালে কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন? শ্রী জৈন বলেন যে তিনি

ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা লালা শঙ্করলালকে জানাইয়াছিলেন তবে সংবাদপত্রগুলি সে সময় নেহরুর বিরুদ্ধে কোন কিছুই প্রকাশ করিতে অসম্মত হওয়ায় চিঠির কপি কোন সংবাদপত্রকে দেন নাই।

শ্রী জৈনের আশঙ্কা অমূলক নয়—কারণ তাঁর এই চাঞ্চল্যকর সাক্ষ্য বাংলা দেশের বৃহৎ সংবাদপত্রগুলিও প্রকাশ করিতে অসম্মত হইয়াছে। খোসলা কমিশনে গৃহীত সাক্ষ্য যথাযথভাবে কোন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইতেছে না।

রাজস্থানে পাকিস্থানি অনুপ্রবেশ

ভারত সরকার অনেক সময়েই অবহেলা করিয়া নিজের দেশের অংশ পাকিস্থানের হাতে তুলিয়া দিয়া থাকেন। ইহার সেরা উদাহরণ "আজাদ" কাশ্মীর। আরও অনেক আছে। চীনের দখলেও বহু হাজার বর্গমাইল চলিয়া গিয়াছে। "যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিকে সুধীর মজুমদার রাজস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

রাজস্থান (ভারত) ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৬৪৪ মাইল। এই সীমারেখা বারামর, জয়সালমার, বিকানির ও গঙ্গানগর জেলা ছুঁয়ে অগ্রসর হয়েছে, এর অধিকাংশই মরুভূমি কাঁটার ঝোপ অথবা ঘাসের বন। বৃষ্টি ও পানীয় জলের অভাবের দরুণ সীমারেখার আশেপাশে জনবসতি বিরল।

আবাদের সুযোগ না থাকারই সামিল, এইজন্য এখানকার মুষ্টিমেয় লোক পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। শুধু গঙ্গানগর জেলার এক অংশে সেচের ব্যবস্থা আছে। এই অংশ ছাড়া অন্যান্য জায়গার লোক মেষ, উট, ঘোড়া জাতীয় পশুর পালন করে থাকে।

বারমার জেলার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে সীমারেখা ধরে গঙ্গানগর জেলার অনুপগড় অবধি এগিয়ে গেলে দেখা যাবে যে এ অঞ্চলের জনসংখ্যায় মুসলমানেরই প্রাধান্য। এদের অনেকে বিরাট জমি (৬০০ বিঘা পর্যন্ত) এবং প্রচুর পশুর মালিক। এই এলাকার তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই গরীব এবং এদের ওপর জুলুম খাটানোর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কোন এক সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এদের সামাজিক তথা অর্থনৈতিক অবস্থা ভূমিদাসদের পর্যায়ে নেমে এসেছে। কিন্তু হিন্দু প্রধান গ্রামের সংখ্যা খুবই কম। ভারত পাক সীমান্তের বহু জায়গায় বিশেষতঃ বারমার জেলার ছোট ছোট গ্রামগুলি সীমারেখার কাছেই অবস্থিত। কিছু গ্রাম আবার সীমারেখার উপরেই, যার ফলে সীমারেখা গ্রামগুলিকে দু ভাগে ভাগ করে এগিয়ে গেছে। সেদোয়া, বরণার, দীপলা, আকল, সজুনকা-পার এবং চন্দাক্সিয়া এরকম কয়েকটা গ্রাম। বারমারে একটি কুয়ো আছে, যার অর্দ্ধেক ভারতে বাকি অর্দ্ধেক পাকিস্তানে। এমনও গ্রাম আছে, যেখানে একই বাড়ীর সামনের দরজা ভারতে ও পিছনের দরজা পাকিস্তানে।

স্বভাবতঃই ভারত-পাক মধ্যবর্তী প্রান্তরেখা বহু নিকটজনকে দুপাশে বণ্টন করেছে। ভারতীয় মুসলমানদের আত্মীয়-স্বজন ওপার পাকিস্তানে বসবাস করে। দুজনের মধ্যে ব্যবধানের চিহ্ন একটি কাল্পনিক রেখা আর কিছু কাঁটা তারের বেড়া। অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় মুসলমানরা পাকিস্তানী মুসলমানদের ভারতে এসে বসবাস স্থাপনে সাহায্য করে।

১৯৫৫-৫৬ সালে পাকিস্তানের কুড়গড় গ্রামের একদল মুসলমান আমাদের এদিকে এসে কিলনোরে (বারমার জেলার চোহটান তহশীলে) হাজার দশেক বিঘা জমি জবর দখল করে চাস আবাদ শুরু করে। গাঁয়ের খাজনার খাতায় এদের নাম পাওয়া যায়। ১৯৫৭ সালে তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করায় এই সব পাকিস্তানের মুসলমানেরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে। সে সময় প্রকাশ হয়, যে তাদের মধ্যে অধিকাংশরই পাকিস্তানের ভোটদাতাদের তালিকায় নাম আছে। তাদের উৎখাত করার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না, এবং তারা নির্বিঘ্নে সেখানে বসবাস করে এবং সমবায় সমিতি ও গ্রামপঞ্চায়েত সদস্য হয়ে ঋণ গ্রহণের সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারীতে বারমার জেলার লোকসংখ্যার ৩৮.৪% বৃদ্ধির কারণ এই পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ।

কংগ্রেস ও কম্যুনিজম

শ্রীমতী প্রেমা নন্দকুমার ইংরেজী সাপ্তাহিক স্বরাজ্যতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কম্যুনিষ্ট প্রীতি, বিশেষ করিয়া তাঁহার রুশিয়ান ভক্তি লইয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহার কোন কোন অংশের বাংলা তর্জমা করিয়া দেওয়া হইতেছে। শ্রীমতী নন্দকুমার মনে করেন যে শ্রীমতী ইন্দিরার নির্বাচনে জয় হইলে ভারতের শাসনপদ্ধতি পুরাতন কংগ্রেস নীতি অবলম্বন করিয়া চলিবে না কারণ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় শক্তি নিজ হস্তে রাখিবার আগ্রহে বামপন্থী বিশেষতঃ কম্যুনিষ্টদিগের সহিত এত অধিক সৌহার্দ্য ও সখ্য স্থাপন করিয়া চলিয়াছেন যে ইন্দিরার রাজ্য অর্থে এখন বুঝিতে হইবে বামপন্থী ও কম্যুনিষ্টদিগের রাজত্ব। এবং কম্যুনিজম শাসন কার্য্য নির্ভর করে অন্ধভাবে জনসাধারণকে স্বৈরাচারী একনায়কত্বের উৎপীড়ন বরদাস্ত করিয়া চলিতে বাধ্য করার উপর। মনে রাখিতে হইবে যে সংবাদপত্রের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বামপন্থা ও কম্যুনিজম চালিত হইলে চিরতরে অতীতের অন্ধকারে মিলাইয়া যাইবে। বিদ্বান ও চিন্তাশীল পণ্ডিতজনের কোন মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। দেখুন, প্রাগের চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অতি উচ্চ পদস্থ দার্শনিক পণ্ডিত, শাসকদের কুনজরে পড়িয়া এখন মর্গে মৃতদেহ ধোলাই করার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। অধ্যাপক জারসোলাভ ক্রাদিভা, যিনি পূর্ব্বে কম্যুনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় সভার সভ্য ছিলেন, বলেন যে ঐ মৃতদেহ ধোয়ার কাজ তিনিও একসময় করিয়াছিলেন—নাৎসিদিগের মাথানসেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যখন আবদ্ধ ছিলেন সেই সময়। অধ্যাপকের কোন কোন বন্ধু বর্ত্তমানে এই মৃতদেহ ধোয়া অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হইয়া রহিয়াছেন।

নাৎসি জাতীয় সোসিয়ালিজম ও কম্যুনিজম এইভাবেই জাতির শ্রেষ্ঠজ্ঞানী ও গুণীদিগের প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

শ্রী কে. রঘুরামিয়া (কং আর) বলিয়াছেন যে তাঁহার দল যদি নির্ব্বাচনে জয়লাভ না করে তাহা হইলে ভারতের সকল প্রদেশ পশ্চিম বাংলার অবস্থা লাভ করিবে। কিন্তু তিনি একথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার দলের পরম বন্ধু কম্যুনিষ্টগণই পশ্চিমবঙ্গ বা কেরালার অবস্থার জন্য দায়ী। কংগ্রেস (আর) যদি রাষ্ট্রীয়শক্তি প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসনে কায়েম থাকেন তাহা হইলে আমাদের ভয় হয় যে কম্যুনিষ্টদিগের প্রতিপত্তি সেইরূপ পরিস্থিতিতে বৃদ্ধি পাইবে। কম্যুনিষ্টগণ জনসংঘ-স্বতন্ত্র-কংগ্রেস (O) মিলিত দলগুলিকে ফ্যাশিষ্ট আখ্যায় বিভূষিত করিয়া থাকেন। কংগ্রেস (R) এর কোন কোন বক্তাও ঐ একইভাবে কথা বলেন। ইহাদ্বারা মনে হয় যে ভাষায় কংগ্রেস (R) কম্যুনিষ্টদিগের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কম্যুনিষ্টগণ নিজ দেশভক্তিতে বিশ্বাস করে না। পর দেশভক্তিই তাহাদের মধ্যে প্রবলভাবে ব্যক্ত হইতে দেখা যায়। ইহার মূলে রহিয়াছে তাহাদের দেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিবার ক্ষমতার অভাব। একটি বিরাট কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র অর্দ্ধশতাব্দীকাল রাজশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও নিজ দেশের জনসাধারণের জীবন যাত্রা কোনওভাবে সুগম সহজ ও উপভোগ্য করিতে সক্ষম হয় নাই। আমরা ভারতে যদি কম্যুনিজমের পথে চলি তাহা হইলে শতবর্ষেও আমাদিগের দারিদ্র্য দূর হইবে না। উন্নত নৈতিক পথে চালিত ব্যক্তিস্বাধীনতা কেন্দ্রিক অর্থনীতি একটি দেশের উন্নতি কুড়ি বৎসরে কি করিতে পারে তাহা জাপান, পশ্চিম জার্ম্মানী ক্যানাডা প্রভৃতি দেশকে দেখিলেই বুঝা যায়।

সাময়িকী

নির্ব্বাচনে জয়লাভ চেষ্টা

নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোটে পরাজয় করাই এতকাল প্রচলিত রীতি ছিল। কিছুকাল হইল দেখা দেখা যাইতেছে যে প্রতিযোগীকে ভয় দেখাইয়া নির্ব্বাচন ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য করিয়া জয়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে। যদি ভয় পাইয়া কেহ পলায়ন না করে তাহা হইলে তাহাকে বোমা, গুলি অথবা ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়া নিরঙ্কুশ বিজয় যাত্রা সম্পূর্ণ হইতেছে। কোথাও কোথাও রাষ্ট্রীয় দলগুলি বহুলোক সংগ্রহ করিয়া পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে। ইহা গা ঢাকা দিয়া পিছন হইতে ছুরি চালনা অপেক্ষা কিছুটা সাহস ও মনুষ্যত্ব পরিচায়ক। গুপ্ত ঘাতকের কার্য্য যে অতি ঘৃণ্য ও সভ্যতা বিরুদ্ধ তাহা বলিবার কোন প্রয়োজন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু গুপ্ত ঘাতক ও রাষ্ট্রীয় দলের মতবাদ প্রচারক যেখানে এক হইয়া রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বিচরন করিতে আরম্ভ করে সেখানে বলা আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায় যে রাষ্ট্রক্ষেত্রের যে মতভেদ তাহা শান্তিপূর্ণভাবে ব্যক্ত হইবার কথা, পরস্পরের রক্তপাত করিয়া নহে। সাধারণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হইল দেশবাসীর অধিক সংখ্যক সাবালক-সাবালিকা দিগের মত অনুসারে এবং সংবিধান সংরক্ষণ করিয়া রাজ্য শাসন কার্য্য পরিচালনা করা। এই কার্য্য সুসাধিত যে ভাবে হইবে তাহাও সংবিধানে সম্যকরূপে বিবৃত থাকে; অর্থাৎ নির্ব্বাচন কোন কোন প্রার্থীদিগের মধ্যে কাহাকে কিভাবে করা হইতে পারে তাহাও অতি পরিষ্কার ভাবে নির্ব্বাচনকারীদিগকে বলা হইয়াছে। এই সকল রীতি পদ্ধতি ও নিয়মাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে সংবিধান সঙ্গত নির্ব্বাচন পদ্ধতি কি এবং সংবিধান বিরুদ্ধই বা কি। অর্থাৎ প্রার্থী বা ভোটদাতাকে ভয় দেখাইয়া অথবা বিরুদ্ধ দলের প্রার্থীকে হত্যা করিয়া নির্ব্বাচনে জয়লাভ চেষ্টা সাধারণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ও সাধারণতন্ত্র অনুগত জাতি সকলের রাষ্ট্রীয় নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য। যে রাষ্ট্রীয় দল ঐরূপ অসঙ্গত ও দুর্নীতিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে নির্ব্বাচন কার্য্যে অবতীর্ণ হয়, সে রাষ্ট্রীয়দলের সাধারণতন্ত্রের সংবিধানিক আসরে কোন স্থান থাকিতে পারে না। সে রাষ্ট্রীয় দল পাশবশক্তি ব্যবহারে অপর সকল রাষ্ট্রীয় দলকে পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়া নিজেদের একাধিপত্য স্থাপন করিয়া একাধারে সাধারণতন্ত্রের মূল বিনাশ ও দেশ শাসন অধিকার জনসাধারণের হস্ত হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং সেই দলকে সাধারণতন্ত্র বিরুদ্ধতা অপরাধের জন্য আইনতঃ অপরাধী দল বলিয়া ঘোষণা করিলে তাহা অন্যায় হইবে না। বরঞ্চ না করিলেই শাসকদিগের কর্ত্তব্যে অবহেলা দোষ ধার্য্য হইবে। চোর, ছ্যাচড়, ঘাতক, গুণ্ডা ও লুণ্ঠনকারী অপরাধীদিগের সহিত যদি শান্তিপ্রিয় খাজনা মাশুল রাজস্বদাতা সাধারণকে এক পর্য্যায়ে রাখা হয় তাহা হইলে জনসাধারণ সে ব্যবহারে আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু এখন অবধি তাহাই করা হইতেছে।

হিংস্র রাষ্ট্রনীতি

"যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিকে উপরোক্ত হিংস্র রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা উল্লেখ-যোগ্য। আমরা ইহার অনেকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় ৭৬ বৎসর বয়স্ক প্রবীন ও পশ্চিম বঙ্গের রাজনীতি ক্ষেত্রের অন্যতম প্রথমশ্রেণীর নেতা হেমন্ত কুমার বসু ঘাতকের হিংস্র ছুরিকাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আজীবন সন্ন্যাসী, স্বাধীনতা

যুদ্ধের খ্যাতনামা সৈনিক, নির্বিরোধী ও সর্বজনপ্রিয় নেতার শোণিতে পশ্চিম বঙ্গের ভূমি কলঙ্কিত হইয়াছে। এই ঘৃণিত হত্যাকাণ্ডের নায়ক কাহারা তাহা এখনও সঠিকভাবে প্রকাশ পায় নাই। অবশ্য পুলিশ সন্দেহক্রমে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে—কিন্তু তাহারা কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত কিনা এবং যুক্ত হইলেও কোন দলের সহিত যুক্ত সে সম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে পুলিশ অস্বীকৃতি জানাইয়াছে। রাজনৈতিক জীবন ব্যতীত হেমন্ত বসুর ব্যক্তিগত জীবন বলিয়া কিছুই ছিল না, তাই ব্যক্তিগত কারণে তাঁহাকে হত্যা করিবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তিনি অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও শ্যামপুকুর কেন্দ্র হইতে বিধান সভার নির্বাচন প্রার্থী ছিলেন। ঐ কেন্দ্রের উপর তাঁহার যে বিরাট প্রভাব ছিল তাহাতে তিনি যে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হইতেন সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ছিল না।

ফরোয়ার্ড ব্লকের সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে আট পার্টি জোটেরও তিনি একজন শক্তিশালী নেতা ছিলেন। তাই তাঁহার মৃত্যুতে শুধু যে শ্যামপুকুর নির্বাচনী কেন্দ্রের পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা নয়, ফরোয়ার্ডব্লক ও আটপার্টি জোটের পশ্চাৎ হইতে একটি বিরাট শক্তির বিলোপেরও প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে।

ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রধান শত্রু বর্তমানে সি পি এম দল এবং কয়েক মাস যাবৎ যে এই দুই দলের কর্মীদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে তাহা কাহারও অজ্ঞাত নয়। ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা দাবী করিয়াছেন যে আততায়ী সন্দেহে গ্রেপ্তার কৃত তিনজনই সি পি এম কর্মী এবং শুধু তাঁহারা নয় আদি কংগ্রেস ও নব কংগ্রেস সমেত সকল রাজনৈতিক দলের নেতারাই কেহবা সুস্পষ্টভাবে কেহবা অস্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে সি পি এম দলকেই এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করিয়াছেন। ইহার অর্থ অবশ্য এ নয় যে সি পি এম দল হেমন্ত বসুকেই হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। বল প্রয়োগের সাহায্যে স্বীয়দলীয় প্রভাব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিবার যে নীতি ঐ দল করিয়াছে, যে ভাবে দলীয় নেতারা কর্মীদের দাঙ্গাহাঙ্গামা ও খুন জখমকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করিয়া তাহাদের উৎসাহিত করিয়াছেন এবং যেরূপ দৃঢ় কণ্ঠে বার বার তাঁহারা রক্তস্রোতে পশ্চিম বঙ্গকে প্লাবিত করিবার হুমকি দিয়াছেন, তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই নির্মম হত্যাকাণ্ড। সি পি এম্ দল সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য নির্বাচনে অবতরণ করিয়াছে। দুইবার তাহারা নির্বাচনের মাধ্যমে অন্য কয়েকটি দলের সাহায্যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল এবং বর্তমান নির্বাচনে তাহারা জনগণের সমর্থনে এককভাবে ক্ষমতায় আসীন হইবে বলিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংগ্রাম হয় ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে—সেখানে ছুরি, বোমা বা বন্দুকের কোন স্থান নাই। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে জনগণকে আতঙ্কিত করিয়া বা বিপক্ষদলগুলিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ক্ষমতালাভ সংসদীয় গণতান্ত্রিক নীতি নয় এবং সেখানে ইহা আমদানী করা বিকৃত মস্তিষ্কের উন্মত্ততার বীভৎস প্রকাশ মাত্র। উন্মত্ততা উন্মত্ততা আনে এবং বলের বিরোধে বল জাগিয়া ওঠে। তাই আজ সকল রাজনৈতিক দলগুলিই অল্পবিস্তর হিংসাত্মক কার্যাবলীর আশ্রয় লইয়াছে ও পরস্পরের হানাহানিতে বহু কর্মী নিহত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে আজ শান্তি, সুস্থ রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহা শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

"ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংস গন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টি-হারা
শ্মশানের প্রান্তরে, আবর্জনা কুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রি দিন করে
কেরাফেরি—
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানা হানি।"

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের আসাম সফর

সি পি এম এর নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের খ্যাতি বাংলাদেশে সর্বজন জ্ঞাত। তিনিই হইলেন উক্ত দলের সবল দক্ষিণ হস্ত ও পরিচালক বলিয়া প্রচার। বক্তৃতা মঞ্চে তাঁহাকে যতটা আত্মমত ব্যক্ত করিতে উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তিনি অদৃশ্যভাবে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তির সহিত নিজ মতবাদ প্রয়োগে সক্ষম বলিয়া লোকের বিশ্বাস। করিমগঞ্জ, আসামে, গিয়া শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত একটা বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। আমরা তাহার বর্ণনা করিমগঞ্জের "যুগশক্তি" সাপ্তাহিক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গত ৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছয়টায় পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত করিমগঞ্জে আগমন করেন এবং স্থানীয় হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন। স্থানীয় প্রবীন কম্যুনিষ্ট নেতা ডাঃ নীরদভূষণ দে সভায় সভাপতিত্ব করেন। রাজ্য কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক শ্রীঅচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য ও শ্রীবীরেশ মিশ্র আসামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। শ্রীদাশগুপ্ত তাঁহার বক্তৃতায় পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতিতে আট পার্টি জোট এবং বাংলা কংগ্রেস ইন্দিরা কংগ্রেস এবং তাহাদের মুরুব্বী পুঁজিবাদীদের সহযোগী হিসাবে কাজ করিতেছে বলিয়া অভিযোগ করেন এবং কেরলে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভার তীব্র নিন্দা করেন।

শ্রীদাশগুপ্তের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি (মাঃ) মঙ্গলবার সকালে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা বাহির করেন এবং সভামঞ্চ সন্নিহিত অঞ্চল লাল পতাকা দ্বারা সজ্জিত করেন। বদরপুরে একটি জনসভায়ও শ্রীদাশগুপ্ত বক্তৃতা দেন।

ব্যবসায় একাধিপত্য দমন

যদি কোন ব্যবসাদার গোষ্ঠী কোন বিক্রয় বস্তুর সরবরাহ এতটা নিজ হস্তগত করিয়া লইতে পারে যাহাতে মূল্য নিয়ন্ত্রন ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার সম্ভব হইতে পারে; তাহা হইলে সেই ব্যবসায়ী অথবা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে একাধিপত্য দোষ দুষ্ট (মনোপলিষ্ট) বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। বৃটেনে এখন রক্ষনশীল দিগের হস্তে রাষ্ট্রশাসন কার্য্য ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা বাইশ বৎসরের পুরাতন মনোপলিজ কমিশনকে আরও জোরাল করিয়া গঠন করিয়া যাহাতে অন্যায় প্রতিযোগিতা পীড়িত হইয়া দেশবাসী অথবা বৃটেনের মাল ক্রেতা বিদেশীগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েন সেইরূপ চেষ্টা করিতেছেন। যেখানেই কোন বস্তু উৎপাদনকারী একক বা সমবেত ভাবে বাজারের সরবরাহের এক তৃতীয়াংশ অথবা ততোধিক ভাগ বস্তু সরবরাহ করে সেখানেই সেই উৎপাদক বা বিক্রেতা গোষ্ঠীকে একাধিপত্যের জন্য দায়ী বলিয়া দেখিতে হইবে। এই কমিশন যে সকল উৎপাদক কারবার গুলিকে গোপনে সংযুক্ত রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করিতে দেখিবে তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিয়া জনসাধারণের সুখ সুবিধা সংরক্ষণ চেষ্টা করিবে।

আমাদের দেশে মনোপলি কথাটির ব্যবহার বক্তৃতায় হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার অর্থ কি তাহাও কেহ বুঝেনা, না বুঝিবার চেষ্টা করে না। যদি সত্য মনোপলি থাকে তাহার কোন নিয়ন্ত্রন বা দমন চেষ্টা হয় না। ঐ কথাটা ব্যবহার করিয়া যাহারা কোনও ভাবে মনোপলিষ্ট নহে তাহাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হইয়া থাকে। এই কথাটা কেহ মনে রাখে না যে অর্থ থাকিলেই কেহ মনোপলিষ্ট হয় না। যাহার ধন ঐশ্বর্য্য আছে সে অনেক সময় সেই ধন ঐশ্বর্য্য ব্যবহার করিয়া জন সাধারণের কোন অপকারই করেই না; হয়ত উপকারই করে। সুনীতি বোধ ও সুনীতি উদ্বুদ্ধ ও চালিত কার্য্য কখনও মানবহিত বিরুদ্ধ হয় না। অর্থ যাহার নাই সেইই যে সর্ব্বদা জনহিত সহায়ক এমন কথাও বা কে বলিতে পারে? অনেক গরীবও সমাজ বিরুদ্ধতা করে।

অশ্লীল ও কুৎসিত কি ?

সাধারণত মানুষ অশ্লীলতা বা কদর্য্যতা বলিতে দৈহিক নগ্নতা অথবা বাস্তবে সৌন্দর্য্যের অভাবই বুঝিয়া থাকে কিন্তু ভাষায় ও রেখা-বর্ণে অশ্লীলতাও মানব সমাজে যথেষ্ট পাওয়া যায়। কথা ও চিত্রে কদর্য্যতা বহুক্ষেত্রেই ব্যক্ত হইতে দেখা যায়। আজকাল আমরা যে অশ্লীলতা ও কদর্য্যতার আলোচনা প্রায়ই করিতে বাধ্য হইয়া থাকি তাহা হইল আরও অপর প্রকারের। তাহার মধ্যে যে বর্ব্বর নগ্নতা কুৎসিত গুণহীন ভাবে প্রকাশ হইতে দেখা যায় তাহা মানুষের দলবদ্ধভাবে ব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট। যথা মানুষ যেখানে চিন্তা ও গঠন মূলক প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত, সেখানে যদি অপর কেহ যাইয়া মত্তপের মত চিৎকার মারপিট ও ভাঙ্গাচোরা আরম্ভ করে তাহা হইলে বলিতে হয় যে সেইরূপ ব্যবহার মানব চরিত্রের এমন একটা নগ্ন, বর্ব্বর, অসুন্দর ও অসভ্য আকৃতি সকলকে দেখায় যাহাকে অশ্লীল ও কুৎসিত বলিলে বর্ণনাটার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা যায় না। মানব চরিত্রের মধ্যে যে সকল জান্তব আবেগ সভ্যতার আবরণে ঢাকা থাকে; যদি কেহ প্রকাশ্যভাবে, সর্ব্বজন সমক্ষে বিজ্ঞপ্তির আলোক উদ্ভাসিতভাবে সেই সকল আবেগের স্বরূপ প্রকট ভাবে ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে সেই রকম ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা মানব সভ্যতা সংরক্ষন হেতু করিতেই হয়। রাষ্ট্রীয় আলোচনা সভায় বিস্ফোরক নিক্ষেপ অথবা অপরের দফতর গৃহে জোর করিয়া ঢুকিয়া কর্ম্মাধ্যক্ষকে টানিয়া লইয়া যাওয়া; কিম্বা ছুরি চালাইয়া যত্রতত্র যাহাকেতাহাকে আক্রমণ করা ঠিক একটা নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিবার উপায় অথবা সুন্দরের আরাধনার নূতন ধারা বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। মতদ্বৈধ থাকিলেই তর্ক বিচারের পথ ত্যাগ করিয়া নখদন্তের ব্যবহারে বিভিন্ন মতের কোনও উচ্চতর সমন্বয় সাধন কখনও সম্ভব হইতে পারে না সেইরূপ নিষ্ফল প্রয়াস মানব চরিত্রের কদর্য্যতার পরিচায়ক।

দেশ-বিদেশের কথা

আমেরিকার যুদ্ধ বিরতি ব্যবস্থা

আমেরিকার মনোভাবের সহিত কম্যুনিষ্ট মনোভাবের একটা বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কথাটা অসম্ভবের পর্য্যায়ের কথা বলিয়া বিবেচিত হইলেও সত্য। এই সাদৃশ্যের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে কম্যুনিষ্ট জাতিগুলি সমবেতভাবে পৃথিবীর উপর নিজেদের মতামত ও প্রভাব বিস্তারের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ প্রচার বা আন্দোলন করিতে সদা প্রস্তুত। আমেরিকাও নিজ রাষ্ট্রীয় গণ্ডির জাতিগুলির সহিত মিলিতভাবে নিজেদের রাষ্ট্রমত, জাতীয় ব্যবহার রীতি-নীতি প্রভৃতির পৃথিবীব্যাপী প্রচলনের জন্য ঐ একইভাবে জান-কবুল করিয়া লড়িতে প্রস্তুত। গণ্ডি অন্তর্গত সকল জাতি সকল সময় একইভাবে সংঘাত কামনা করিয়া কলহে প্রবৃত্ত না হইতেও পারে। কম্যুনিষ্ট গণ্ডির জাতিগুলি সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য। রুশিয়া যেভাবে সংঘাত ভয়মুক্ত, অথবা চীন; চেকোশ্লোভাকিয়া অথবা অপর কোন "লৌহ-পরদার আড়ালের জাতি ঠিক সেইভাবে সংগ্রাম অভিলাষী নাও হইতে পারে। আমেরিকান নেতৃত্বের ফলে যে জাতীয় মনোভাব গড়িয়া উঠিতেছে কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বে তাহা অপেক্ষা অধিক শান্তিপূর্ণ কিছু ঘটিতেছে বলিয়া মনে করা যায় না। এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে বিরাট ধনভাণ্ডার সৃজন প্রয়োজন হয়, তাহার গঠন প্রচেষ্টা আমেরিকা করে ব্যক্তিগত ধন ঐশ্বর্য্য যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিতে দিয়া ও রাজস্ব আদায়ের দ্বারা সেই ধনৈশ্বর্য্যের একটা বৃহৎ অংশ রাষ্ট্রের করায়ত্ত করিয়া। রুশিয়া অথবা চীন ঐ মতলব হাসিল করে সাধারণ মানুষের উপভোগ দমন ও নিয়ন্ত্রণ করিয়াও তাহাদের পরিশ্রমের ফলের অধিকাংশ রাষ্ট্রের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়া। অর্থাৎ দুই দলেরই অর্থনীতির মূল কথা হইল পরিশ্রমকারী শ্রমিকদিগকে উৎপাদনের তুলনায় অল্প উপভোগ করিবার ব্যবস্থা। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণ ও দমন কম্যুনিষ্ট জাতিগুলির জীবনযাত্রায় যে কঠোর ও সর্ব্বগ্রাসী আকার ধারণ করিয়াছে, আমেরিকান আদর্শ অনুগমনকারী জাতিগুলির জীবনে তাহা ততটা মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায় নাই। অপরের উপর নিজেদের মতামতের বোঝা চাপাইয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্র-মত-ক্ষেত্রে ভারবাহি জীবের ন্যায় চালিত রাখার নীতিও উভয় গণ্ডির ভিতরেই লক্ষিত হয়। রুশিয়া বা চীন ঐ কার্য্যে হয়ত চাবুক ব্যবহার করিয়া চালনা কার্য্য সম্পন্ন করে; এবং আমেরিকা সম্ভবত চাবুকের চর্ম্ম বস্তুতে সংলগ্ন মূলা-গাজর দেখাইয়া কিছুটা সদয়ভাবে ঐ তাড়না সকল করিতে সক্ষম হয়। এতকাল আমেরিকার মূলা ও গাজর প্রদর্শন হইত নানাভাবে ঋণ দান ব্যবস্থা করিয়া। শোধ্য ও অপরিশোধ্য ঋণের আয়োজন বহুকাল হইতেই নানান জাতির উপর আমেরিকার প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। পরে রুশিয়া এবং চীনও ঐভাবে অর্থ সাহায্য করা আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং মূল ধনবাদী এবং মূলধন সংগ্রহ ও ব্যবহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন জাতি গোষ্ঠী, উভয়ের অর্থনৈতিক অস্ত্র বিশেষ করিয়া একই প্রকারের দেখা যাইতেছে। অর্থনৈতিক গঠন কার্য্য; অর্থাৎ নানা প্রকার কারখানা স্থাপন, শিল্পকৌশল ও যন্ত্র নির্ম্মাণ পরিচালনা সংক্রান্ত আবিষ্কার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এই সকল জাতিগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য প্রকটভাবে দেখা দেয় না। যন্ত্র ও বাস্তব সম্পদবহুল সভ্যতা গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যের মধ্যে মানব জীবন যাত্রা সহজ, সরল ও আরামদায়ক করিবার চেষ্টা অপেক্ষা যুদ্ধবিগ্রহ ক্রমবর্দ্ধনশীল করিয়া সেই জীবনযাত্রা ভারাক্রান্ত, দুশ্চিন্তা ও নিরাপত্তাহীন করারই চেষ্টা উভয় জাতিসংঘ করিয়া থাকে।

রসদ সংগ্রহ হয় উভয় ক্ষেত্রেই মানুষকে পরিশ্রম করাইয়া তাহাকে তাহার প্রাপ্য সম্পদ যথাযথভাবে উপভোগ করিতে না দিয়া, অর্থাৎ শোষণ নীতি অনুসরণে।

বর্ত্তমানে যে আন্তর্জাতিক বিবাদ ও সংগ্রাম দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়াতে প্রবলভাবে চলিতেছে তাহার আরম্ভের জন্ম উভয় গোষ্ঠীই দায়ী। আমেরিকা চায় কম্যুনিজমকে নিজ সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে এবং কম্যুনিষ্টগণ (রুশিয়া-চীন ও তাহাদের শিষ্য উত্তর ভিয়েৎনাম) চাহিয়াছিল নিজেদের প্রভাব ও রাষ্ট্রনীতি আরও সুদূর বিস্তৃত করিতে। উত্তর ভিয়েৎনামের স্রষ্টা স্বর্গগত হো চি মিন্‌হ্‌ এই কার্য্যে কম্যুনিষ্টদিগের অগ্রদূত ছিলেন এবং আমেরিকার দলভুক্ত কয়েকটি জাতি থাকিলেও যুদ্ধ বিগ্রহ প্রধানতঃ আমেরিকাই চালাইয়া আসিয়াছে। এই যুদ্ধে বহু আমেরিকান হতাহত হওয়াতে এবং যুদ্ধে কোনও দিকই জয়লাভ না করাতে আমেরিকায় যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্ম একটা মহা আন্দোলন আরম্ভ হয়। ফলে আমেরিকার বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি নিক্সন সকলকে কিছুকাল পূর্ব্বে আশ্বস্ত করেন যে তিনি অতঃপর ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া ঐ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আমেরিকান সৈন্যবাহিনী সরাইয়া লইতে সুরু করিবেন। এই কথা মত তিনি দুই চারিটি সেনাদল ঐ স্থল হইতে উঠাইয়া লইবার আদেশও দিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহার পরেই আরম্ভ হইল লাওস—কাম্বোজ ক্ষেত্রে নূতন করিয়া যুদ্ধের আর একটা পালা। আমেরিকানগণ এখানে নিজেদের হেলিকপ্টার ও অন্যান্য সামরিক বিমান ব্যবহারে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এবং বিমানবিদদিগের উদ্ধার করিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হওয়াতে এখন সেখানে নূতন করিয়া সৈন্য প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া ঘোষণাও করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সৈন্যবাহিনী এখন নিজ দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ থামাইয়া লাওসে আসিয়া উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্যগণকে তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে বাধা দিবার জন্ম সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমেরিকানগণ প্রথমে বিমান ও পরে সৈন্য দিয়া ঐ যুদ্ধে সাহায্য করিতেছে। চীন সম্ভবতঃ পূর্ব্বের ন্যায় পিছন হইতে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ, যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া এবং যুদ্ধের কৌশল ও সৈন্য পরিচালনা সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়াই সাহায্য করিতে থাকিবে, যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ করিবে না। রুশিয়া পূর্ব্বে হ্যানয়কে সাক্ষাৎভাবে সাহায্য না করিলেও চীনের তুলনায় কিছু কম সাহায্য করিত না। বর্ত্তমানে রুশ নৌবাহিনী সর্ব্বদাই ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে বিচরণ করিতেছে। রুশের পক্ষে উত্তর ভিয়েৎনামকে সামরিক সাহায্য দান সেই কারণে কিছুমাত্র কঠিন কার্য্য নহে। সকল দিক বিচার করিয়া এই কথাই স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে আমেরিকানগণ যুদ্ধ বন্ধ ত করেই নাই; অধিকন্তু আরো প্রবলভাবেই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতেছে। চীন ও রুশিয়া পূর্ব্বের ন্যায় এখনও গা ঢাকা দিয়া যুদ্ধে সাহায্য করিতেছে। যুদ্ধটা দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়াতে ক্রমে ক্রমে আরও বিস্তৃতভাবে চালিত হইতেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐ বিস্তৃতি আরও ব্যাপক আকার গ্রহণ করিবে কি না; একথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে।

সমষ্টিবাদ ও ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ নীতি

আজকাল যাঁহারা মানব অধিকার ন্যায় ও অর্থনৈতিক সুবিচার লইয়া তর্কে অবতীর্ণ হ'ন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে সমষ্টিবাদ মানিয়া লইলেই মানুষ সকল দিক দিয়া সভ্যতা ও উৎকর্ষের চরমে উঠিতে সক্ষম হইবে। ব্যক্তিগত অধিকারগুলি বর্জ্জন করিয়া সামাজিক ও সমষ্টিগত অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই প্রগতির উন্নততম পথ। মানবীয় অধিকার বলিতে আমরা যাহা বুঝি, অর্থাৎ জীবন ধারণের উপায় ও উপকরণগুলি সম্যকভাবে উৎপন্ন হওয়া ও পাওয়া, তাহা যাহাদের জন্য হইবে তাহারা সমাজ বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকিলেও এত বা তত জন ব্যক্তি ব্যতীত আর কিছু নহে। খাওয়া, পরা, থাকা, শিক্ষালাভ, চিকিৎসা

হওয়া প্রভৃতি যে কোন অর্থনৈতিক বিষয়েরই কথা আমরা চিন্তা করি তাহার কোন কিছুই ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ উপভোগ করে না। অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অন্যায় অবিচারের আক্রমণ যাহাদের উপরে গিয়া পড়ে তাহারাও ব্যক্তি। যে দেশে বহু ব্যক্তি উপযুক্ত আহার বস্ত্র বাসস্থান পায় না সে দেশ সমাজবাদী হইলেও ন্যায় সুবিচার ও উন্নত সমাজনীতির কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত হইতে সক্ষম হইবে না। অন্ততঃ সামাজিক বা মানবীয় সভ্যতা ও উন্নতির প্রতীক বলিয়া কেহই সে দেশকে বিচার করিবে না। অভাবের তাড়নায় নিষ্পেষিত যাহারা তাহারা মিলিতভাবে দুঃখ ভোগই করে, আনন্দে ও উন্নতির শিখরে আছে বলিয়া কেহ তাহাদিগকে জগৎকে দেখাইবে না। ব্যক্তি যেখানে মাথা উঁচু করিয়া সসম্মানে নিজ অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে এবং জীবন নির্ব্বাহের সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজে পাইয়া অভাবের তাড়নামুক্ত অবস্থায় দিন কাটাইতে পারে; সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব সেখানে প্রবল ও সমষ্টিগতভাবে বর্ত্তমান না থাকিলেও মানবীয় সভ্যতার বিকাশের সেখানে কোন দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করা যায় না। আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া ব্যক্তির মানবীয় অধিকার-কেই আমরা বড় করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। বৃটিশের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ ছিল যে বৃটিশ আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতা যাহাতে দূর না হইতে পারে সেইজন্য সমাজের সকল অন্যায় ও অপরাধকে রক্ষণশীলতার নামে বাঁচাইয়া রাখিত। আমাদের দেশের মানুষ তাহার মানবীয় অধিকার প্রাপ্তির জন্য বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আজ আমরা অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রনেতাগণ, সমাজবাদের নাম করিয়া ব্যক্তির অধিকার খর্ব্ব ও রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী ও আমলাদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় প্রাণপণে লাগিয়া পড়িয়াছেন। ব্যাঙ্ক বা বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রের করায়ত্ব করিলে মানুষের কি উন্নতি বা লাভ হয় তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। আরও কিছু কিছু ব্যবসা বাণিজ্য আমলা-দিগের হাতে তুলিয়া দিলে তাহাদের ও তাহাদের মুরুব্বি রাষ্ট্রনেতাদিগের উপরি পাইবার সুযোগ হইবে বুঝি, কিন্তু জাতির মানুষ, তাহার উৎকর্ষ, সভ্যতা বা উপার্জ্জন বাড়িবে কি? কোন প্রতিষ্ঠান "জাতীয়" করিয়া লওয়ার প্রকৃত অর্থ হইল সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রীয় নেতা ও আমলাদিগের হস্তে নিঃশর্তভাবে তুলিয়া দেওয়া। তাহারা এই সকল প্রতিষ্ঠানের চাকুরী, আর্থিক সম্বন্ধের সুবিধা ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া নিজেদের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং সোসিয়ালিজম, ন্যাশনালাইজেসন প্রভৃতি নেতা ও তাহাদিগের অনুচরবর্গের শক্তিবৃদ্ধির একটা কার্য্যকরী উপায়। এই সকল পন্থা অবলম্বনে জাতির মানুষের বিশেষ কোন লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না, বরঞ্চ বহু ব্যবসা বাণিজ্য হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে অনেকের ক্ষতিই হইয়া থাকে। জাতির রাষ্ট্রনেতা ও রাষ্ট্রীয় দলের মোড়লদিগের লাভ হয়। এবং লাভ হয় আমলা-দিগের। যথা জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় করিয়া লওয়ার ফলে আমাদিগের দেশের মানুষের কোন লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বীমা ক্রেতাদিগের লাভ ও সুবিধা বৃদ্ধি হয় নাই বলিয়াই শুনা যায়। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের ফলে যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখে তাহাদের কোন লাভ হইয়াছে মনে হয় না। যাহারা টাকা ধার করে তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রনেতাদিগের পেটোয়াদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে কি না দেখা আবশ্যক। কিছুদিন পরে বুঝা যাইবে যে টাকা ধার দিলে ফিরাইয়া পাওয়া যাইতেছে কি না। টাকা যদি পরহস্তগতধনম হিসাবে চিরকালের মত বেহাত হইয়া যায় তাহা হইলে কোন কোন দেশবাসী লাভবান হইলেও ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে বলা চলিবে না। শুনা যাইতেছে যে সাধারণ বীমা কারবারগুলিকেও ন্যাশনালাইজ বা জাতীয় করিয়া লওয়া হইবে। সাধারণ বীমার সহিত সাধারণ মানুষের সম্বন্ধ নাই বলিলেই চলে। ব্যবসায়ী ও বিত্তবান ব্যক্তিগণই সাধারণ বীমার খরিদ্দার। সাধারণ বীমাতে অনেকাংশে সম্ভাব্য ক্ষতি সংরক্ষণার্থে রিইন-শিওর বা পুনরায় বীমা করিয়া নিজেদের লোকসান হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা লয়েডস প্রভৃতি সুবৃহৎ বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিই করে। সাধারণ বীমা লব্ধ অর্থের অধিকাংশই এইজন্য বিদেশীর হস্তে চলিয়া যায়। এই কার্য্যও কি জাতীয়ভাবে করা হইবে?

পুস্তক পরিচয়

বিদ্যাসাগর: সন্তোষকুমার অধিকারী, রূপা, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ৬৲

এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই পূর্বে "প্রবাসীতে" হইয়াছে। তখন হইতেই পাঠকের কৌতূহল, ব বই আকারে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিদ্যাসাগর ন্ধে অনেক বই পূর্বে বাহির হইয়াছে, কিন্তু এ-গ্রন্থ ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহার কারণও আছে, ইহাতে এমন নেকটি বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে যাহা অন্যত্র নাই। ল্যবান দলিল, উইল, দুষ্প্রাপ্য চিঠি এবং বংশ লিকা প্রভৃতির যে প্রামাণ্য তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত ইয়াছে তাহা গ্রন্থকারের বহু আয়াস-লব্ধ। এবং ইহার নেকগুলি নেহাৎই পরিবার-ভুক্ত। এখানে বলিয়া াখা প্রয়োজন গ্রন্থকার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র-পুত্র। সেইজন্যই তাঁহার পক্ষে এই অপরিজ্ঞাত সংরক্ষিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। যাহা অন্যের জানিবার কথা নয়, তাঁহার পক্ষেই সেইটাই হইয়াছে সহজ।

আকারে বড় না হইয়াও এই গ্রন্থ হইয়াছে মূল্যবান দলিল। ইহা ইতিহাস হইয়া রহিবে। ভাষা বলিষ্ঠ এবং স্বচ্ছ। কোথাও উচ্ছ্বাসের নামমাত্র নাই। এই সংযম লেখকের বড় গুণ। বিদ্যাসাগরের কথা পরে আরও আলোচিত হইবে নিঃসন্দেহে। এবং যত আলোচিত হয় ততই মঙ্গল। তবু এ গ্রন্থের প্রয়োজন ফুরাইবে না। —গৌতম সেন

প্রথম ফাল্গুন। রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সাহিত্যতীর্থ ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬। দাম চার টাকা।

প্রখ্যাত শিল্পী সর্বশ্রী সত্যেন্দ্রনাথ লাহার আঁকা মনোরম প্রচ্ছদপট, পরিছন্ন বহিরাবরণ, ঝরঝরে ছাপা 'প্রথম ফাল্গুন' উপন্যাসখানি প্রথম দর্শনেই পাঠকের ভালো না লেগে পারে না। রমেন্দ্রনাথ মল্লিক কবি হিসাবে সুপরিচিত, আনন্দের কথা তাঁর এই প্রথম উপন্যাসখানিও নানা দিক থেকে চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

সর্বনাশা দেশবিভাগের বলি হিসাবে পূর্ববঙ্গের যে সব ছিন্নমূল শরণার্থী বাঁচার আশায় পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসেছে তাদের কয়েকজনের বেদনার্ত কাহিনী 'প্রথম ফাল্গুন' ফুটিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। মানুষকে বিনা অপরাধে কত ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। কি রকম অসহায়ভাবে তারা টাকা-পয়সা মান-ইজ্জৎ হারায়, তাদের দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে কিছু নরপশু কি ভাবে আপন স্বার্থসিদ্ধি করে, এইসব করুণ ছবি হৃদয়বান লেখক আবেগসমৃদ্ধ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ভাগ্যের স্রোতে তৃণবৎ ভেসে যাওয়া উপন্যাসের নায়িকা মমতা শেষপর্যন্ত পায়ের তলায় শক্তমাটি পেয়েছে, উপন্যাসের এই উপসংহারে পাঠক নিঃসন্দেহে তৃপ্তিলাভ করেন। মমতা প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, এই নারী চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক নারীর জীবনরূপ সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ পুনর্নির্ধারণের যে প্রয়াস পেয়েছেন, তা বাস্তবিকই তাঁর আধুনিক মনের পরিচয়-বাহী। মমতার প্রথম জীবনে মোহজপদস্খলন হয়েছিল। তারপর বহু দুঃখ-গ্লানি সহ্য করে একা সীমান্ত পার হয়ে শেষপর্যন্ত সে সুস্থ পরিবেশে আশ্রয় পেয়েছে। এই আশ্রয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে তার নূতন পরিবেশের উপযুক্ত মনোভূমি রচনায় লেখক সাফল্যলাভ করেছেন। স্বাভাবিক সময়ে সুনীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে সামাজিক মূল্যবোধ দেশবিভাগের মতো অভাবিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পুনর্মূল্যায়িত হওয়াই উচিত, এই ফলশ্রুতি উপন্যাসটি পাঠ করে পাঠক সদর্থক ভাবে অন্তরে অনুভব করেন। সমাজ-বিবর্তনের দিক থেকে এ যুগ এই অনুভূতির দাম অনেক।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, যেখানে প্রকৃতির রূপবর্ণনার সুযোগ মিলেছে, সেখানে ভাষা সত্যই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। বর্তমান বিশৃঙ্খল যুগের সমস্যাকীর্ণ সমাজচিত্র বলে উপন্যাসটিতে স্বভাবতঃই নানা ধরণের চরিত্র দেখা দিয়েছে। ভালো-মন্দ সব ধরণের চরিত্রই এতে স্থান পেয়েছে। লেখক প্রত্যেক চরিত্রকে বিশিষ্ট কর্ম-মণ্ডলে আঁকবার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের পটভূমি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ হওয়ায় কয়েকটি চরিত্র আশানুরূপ বিকাশলাভ করতে পারেনি। তবে এখানেও লক্ষণীয় যে, চরিত্র যত হীনই হোক, এ উপন্যাস কোনো বড় চরিত্র মানবিক হৃদয়বোধ থেকে সর্বাংশে ভ্রষ্ট হয়নি। অসহায় বয়স্থা শরণার্থিনীদের ভুলিয়ে নরকের পথ দেখানো যার জীবিকা, মমতার দাদা সেই অভিজিৎও এ হিসেবে এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

—শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য ঃ

(ফরম নং ৪)

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশিত হওয়ার স্থান—	কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
২। কিভাবে প্রকাশিত হয়—	প্রতি মাসে একবার
৩। মুদ্রাকরের নাম—	শ্রী শমীন্দ্র নাথ সরকার
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
৪। প্রকাশকের নাম	ঐ
জাতি	ঐ
ঠিকানা	ঐ
৫। সম্পাদকের নাম	শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
৬। (ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম ঠিকানা এবং (খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারী-দের নাম-ঠিকানা—	১। শ্রীমতি অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, ১ উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
	২। শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
	৩। শ্রীমতী সুনন্দা দাস, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
	৪। শ্রীমতী ঈশিতা দত্ত, ১, উড ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৬
	৫। শ্রীমতী নন্দিতা সেন, ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
	৬। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
	৭। শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
	৮। শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
	৯। শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
	১০। শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়, ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ—

প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীশমীন্দ্রনাথ সরকার